শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

সম্পাদনা অনীশ দেব

সকল পর্ব একত্রে

শতবর্ষের সেরা
রহস্য উপন্যাস
১

সম্পাদনা

অনীশ দেব

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল : patrabha@vsnl.net

"I cannot live without brainwork.
What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না।
এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কয়েকটি কথা

এই বইটির সঙ্গে আমার জীবনের বেশ কিছু কথা জড়িয়ে আছে—অনেকটা আইভিলতার মতো। যেমন, ছোটবেলায় স্কুলের বাংলা বইয়ের গদ্য-পদ্য ছিল, ছিল রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম—যেমনটা সবার থাকে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার ছিল, যা সবার থাকে না। স্বপনকুমার ছিল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছিল, ছিল পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এ ছাড়া আরও অনেকে। ক্লাস থ্রি-তে যখন পড়ি তখন স্বপনকুমারের 'বাজপাখি' সিরিজ আমাকে রোমাঞ্চিত করত। পরের বছর নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র 'পিয়া মুখ চন্দা' পড়ে বাড়িতে বকুনি খেয়েছিলাম। তারপর কীভাবে যেন এই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের পাঠক হয়ে গেলাম।

রহস্য-গোয়েন্দা-কাহিনী পেলেই ডাইনোসরের খিদে নিয়ে সেগুলো আমি গোগ্রাসে গিলতাম। তার মধ্যে রহস্য-রোমাঞ্চ খুঁজতাম, সাসপেন্স খুঁজতাম, আর প্রতি মুহূর্তে অপরাধীর সঙ্গে চলত আমার বুদ্ধির লড়াই। রহস্য ও রোমাঞ্চের 'পাল্প' ম্যাগাজিনগুলো নিয়মিত পড়তাম এবং, বেশ মনে পড়ে, এক-একদফায় এক-একটা সংখ্যা ঝটিতি পড়ে শেষ করতাম। ক্লাস এইটে যখন পড়ি, বয়েস তখন বারো প্লাস, তখন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'সতীর দ্বিতীয় পতি' পড়ার জন্যে বাবা যাচ্ছেতাই বকাবকি করেছিলেন।

সুতরাং, রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা ও কল্পবিজ্ঞান গল্প আমার জীবনের সঙ্গে একেবারে ছোটবেলা থেকেই জড়িয়ে গিয়েছিল। আমিও বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেমন এক অলৌকিক টান আমাকে এই ধরনের সাহিত্যের সঙ্গে বেঁধে রাখছে। তখনও জানতাম না, একই ধরনের লেখালিখিতে কখনও চলে আসব। আমার ষোলো প্লাস বয়েসে লেখা 'ভারকেন্দ্র' নামে একটি দুর্বল গোয়েন্দা-কাহিনী সতেরো মাইনাস বয়েসে ছাপা হয়ে যায় বর্তমানে না-মিল 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র পাতায়। সেটা ১৯৬১ সালের আগস্ট মাস। ডাকে পাঠানো এই গল্পটি প্রকাশিত হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে আবার লেখা শুরু করলাম, আবার পাঠালাম, এবং আবার ছাপা হল। বাস, শুরু হয়ে গেল লেখালিখির একটি প্রক্রিয়া—যা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি,সমালোচকদের চোখরাঙানি, উপেক্ষা, উন্নাসিকতা ইত্যাদি দেশে বা বিদেশে সবসময়েই ছিল, আছে। কিন্তু আমি থামতে পারিনি। এই ধরনের সাহিত্যের পাঠক এবং লেখক হয়ে এক অলৌকিক তৃপ্তি নিয়ে আমি আজও প্রতিটি মুহূর্তে জীবনযাপন করি। যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তাকে কি সহজে ছাড়া যায়!

এত কথা বলার কারণ এই যে, নিজের মনের অবস্থাটা যদি ঠিকমতো বোঝাতে না পারি তা হলে বোঝানো যাবে না কোন টান থেকে এই রহস্য- উপন্যাস সংকলনের কাজে আমি হাত দিয়েছি। বছরদশেক ধরেই একটা ভাবনা মাথায় ঘুরে বেড়াত ঃ সেই শুরু থেকে বাংলার সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলো সম্পাদনা করে একে-একে প্রকাশ করব। সিরিজের নাম দেব 'রহস্য-কাহিনী গ্রন্থমালা'। কিন্তু যখনই সেই সিরিজটি সম্পাদনার পরিশ্রমের কথা ভেবেছি, তখনই ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছি। কোনও প্রকাশককে প্রস্তাব দিতে পারিনি—পাছে তিনি রাজি হয়ে যান! বছরতিনেক আগে 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ও 'পত্র ভারতী'-র কর্ণধার শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি আমার ইচ্ছের কথা জানাই। পরিকল্পনাটিকে সামান্য বদলে ওঁকে বলি, আমার পছন্দের সেরা রহস্য-উপন্যাসগুলো বেছে নিয়ে আমি কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করতে চাই। ত্রিদিববাবু রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনীর মনোযোগী পাঠক, এ ধরনের গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন। তিনি বোধহয় আমার আবেগ আর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলেন। তাই সঙ্গে-সঙ্গেই রাজি হলেন। আমিও পরদিন থেকে, বলতে গেলে ছোটবেলার উৎসাহ নিয়ে, কাজ শুরু করে দিলাম।

'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস' বইটি আনুমানিক তিনটি খণ্ডে পরিকল্পিত। প্রথম খণ্ডে আছে ১৫টি উপন্যাস। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় দিয়ে শুরু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র দিয়ে শেষ। বইয়ের নামের 'রহস্য' বিশেষণটি 'জেনারিক টার্ম' হিসেবে একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক, গোয়েন্দা, হরার, সব ধরনের উপন্যাসকেই আমি 'রহস্য' উপন্যাস বলেছি। রহস্য গল্প-উপন্যাস পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের সংখ্যা এখনও—এই টিভি সংস্কৃতির যুগেও—কিছু কম নয়। তাঁদের কথা ভেবেই এই বই। আমার পছন্দ তাঁদের পছন্দ হলেই পরিশ্রম সার্থক হবে। উৎসাহী পাঠকের জন্যে বইয়ের শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে লেখক ও লেখা সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছে। আর লেখাগুলো সাজানো হয়েছে লেখকদের জন্মসাল অনুসারে।

এই বইটির লেখা সংগ্রহের সময় লেখকদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে বন্ধুর মতো সাহায্য পেয়েছি। আর জরুরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্নেহভাজন অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী ধাপে, অর্থাৎ বই প্রকাশের কাজে, সবচেয়ে জরুরি ভূমিকা বন্ধুবর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। আমার রহস্য-কাহিনীর প্রীতিকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণসংস্থাপন ও বিন্যাসের কাজে অমানুষিক শ্রম দিয়েছেন অনুজপ্রতিম বরুণ রায়। আর প্রুফ সংশোধনে অসামান্য নিষ্ঠা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শ্রীমতী আরতি বসু। ধন্যবাদ ওঁদের সকলের অবশ্যই প্রাপ্য। তবে পাওনার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে আরও ভালো লাগত। ইতি—

অনীশ দেব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	অদ্ভুত হত্যা	১১
দীনেন্দ্রকুমার রায়	ঝোপে ঝোপে নেকড়ে	৩১
পাঁচকড়ি দে	মায়াবী	৯৩
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	হত্যা-বিভীষিকা	২৩৫
মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়	তারকার মৃত্যু	২৭৭
হেমেন্দ্রকুমার রায়	রহস্যের আলো-ছায়া	৩৩১
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	বেণীসংহার	৩৬৫
প্রমথনাথ বিশী	শাহী শিরোপা	৪০৩
শিবরাম চক্রবর্তী	বর্মার মামা	৪৪৩
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	সোনার হরিণ	৫০৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র	গোয়েন্দা হলেন পরশর বর্মা	৬৯৩
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	উদাসীবাবার আখড়া	৬৫৭
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	কারাগারে কৃষ্ণা	৭৯১
বুদ্ধদেব বসু	ভূতের মতো অদ্ভুত	৭৩৫
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	হায়নার দাঁত	৭৬৭
পরিশিষ্ট		৮১৫

অদ্ভুত হত্যা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শারদীয়া পূজার সময় প্রায় আশ্বিন মাস। সেই সময় গৃহস্থমাত্রেরই অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি যিনি সংসারে যেরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার অর্থেরও সেই পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই সময় জুয়াচোরের জুয়াচুরি বাড়িয়া যায়। সংসারী লোকের অপেক্ষা চোর-জুয়াচোরগণের খরচ তাহাদিগের অবস্থা অনুযায়ী না হইয়া প্রায় অধিক হইয়া পড়ে; সুতরাং, ওই সকল খরচের সংস্থান করিবার নিমিত্ত তাহারা যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। চুরি বলুন, ডাকাইতি বলুন, হত্যা বলুন, যাহা করিতে হয়, তাহা করিতেই তাহারা প্রস্তুত; কোনও গতিকে অর্থ উপার্জন করিতে পারিলেই হইল। এই নিমিত্তই পূজার পূর্বে হত্যা প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময় প্রায়ই একটি না একটি অদ্ভুত রকমের হত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার ঘটনাবলী এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক যে, বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও সেই সকল হত্যার রহস্য সম্পূর্ণরূপে সমুদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। সময় সময় দুই একটি হত্যার রহস্য সকল উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই আশ্বিন মাসে পূজার কিছুদিবস পূর্বে একটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার আমার উপর পতিত হয় ও ঈশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহে সেই মকদ্দমার কিনারা হইয়াছিল। আজ সেই মকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত হইতেছে।

এক দিবস অতিশয় প্রত্যূষে এক ব্যক্তি আসিয়া থানায় উপস্থিত হইল। যে থানায় আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই থানা শহরের অন্তর্গত নহে, শহরতলীর মধ্যে সংস্থাপিত। ভারতীয় পুলিশ বিভাগের মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই 'প্রথম এতলা' চলিত আছে, তাহা পুলিশ কর্মচারীমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় রাজধানীতে ওই 'প্রথম এতলা'র প্রয়োজন নাই। 'প্রথম এতলা কী?' এ কথা পুলিশ কর্মচারী ব্যতীত অপর পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; সুতরাং, তাঁহাদিগের নিমিত্ত উহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে দেওয়া আমার কর্তব্য। 'প্রথম এতলা' বা First Information আর কিছুই নহে, পুলিশের অনুসন্ধান উপযোগী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী কোনওরূপ ঘটনা ঘটিলে, সেই ঘটনার সংবাদ সর্বপ্রথম যে থানায় আনিয়া থাকে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্তৃক তাহার একটি এজাহার লওয়া হয়। ওই এজাহার বা জবানবন্দী যে পুস্তকে লিখিত হয়, সেই পুস্তকের নাম প্রথম এতলা বা First Information Report। যে পুস্তকখানিতে ওই এজাহার লিখিত হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; সুতরাং, প্রথম সংবাদদাতার সংবাদ ওই পুস্তকের এক অংশে লিখিত হয়; অপর দুই অংশে তাহারই ঠিক নকল হয়। নকলের একখানি থানায় থাকে, একখানি পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হয়, অবশিষ্ট একখানি বিচারকের নিকট প্রেরণ করা হয়। শহরতলীর মধ্যেও ওইরূপ প্রথম এতলার নিয়ম প্রচলিত আছে। যে মকদ্দমার অনুসন্ধানে আমাকে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা শহরতলীর একটি থানার এলাকায় ঘটিয়াছিল। ওই থানায় গমন করিয়া প্রথমেই আমি প্রথম এতলাখানি পাঠ করিলাম। উহার সারমর্ম এইরূপ ঃ

আমার নাম শম্ভু; জাতিতে আমি উড়িয়া। আমি বিজয়বাবুর বাগানের মালি। প্রত্যহ রাত্রিতেই আমি বাগানে থাকি। কিন্তু কল্য রাত্রিতে আমি বাগানে ছিলাম না। আমার দেশের একটি লোকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পর অতিশয় বৃষ্টি হয় বলিয়া রাত্রিতে আমি বাগানে আর প্রত্যাগমন করিতে পারি না। যাইবার সময় আমি বাগানের সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম। অদ্য প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সদর দরজার সেই তালা খোলা রহিয়াছে। বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে যে দোতালা পাকা বাড়ি আছে, তাহার নিকট আমি গমন করিলাম। দেখিলাম, তাহার দরজার চাবিও খোলা। আমি যে সময় বাগান হইতে গমন

করিয়াছিলাম, সেই সময় আমি নিজ হস্তে ওই তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম ও উভয় চাবিই আমি আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তালা খোলা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমত নিম্নতলার ঘরগুলি দেখিলাম; কিন্তু কোনও দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইল না। তাহার পর উপরে উঠিলাম। বিজয়বাবু বাগানে আসিয়া যেখানে উপবেশন করিতেন বা যে ঘরে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ ও গীত-বাদ্য করিতেন, প্রথমেই আমি সেই ঘরে গমন করিলাম। সেই ঘরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল, ওই ঘরে কেহ আসিয়াছিলেন, নৃত্য-গীত প্রভৃতি হইয়াছিল, মদ্যপানও চলিয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাইলাম, দুই তিনটি মদের বোতল ও গ্লাস সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে; বাদ্যযন্ত্র সকল যে স্থানে রক্ষিত ছিল, সেইস্থানে নাই; বসিবার বিছানার উপর রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ নৃত্য করিবার কালীন যে ঘুঙুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইল যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মনিব বাগানে আগমন করিয়াছিলেন। নৃত্য-গীত ও আমোদ-আহ্লাদ করিবার পর পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই ঘরের পার্শ্ববর্তী ঘরে গমন করিলাম। সেই ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতেও আমার ভয় হয়। সেই ঘরের অবস্থা দেখিয়া আমি আরও ভীত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক উলঙ্গ অবস্থায় সেই ঘরের মধ্যে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অনুমান হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া অমি ঘর হইতে বহির্গত হইলাম ও একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সময় আমি যে কী করিব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাগানের মধ্যে অপর কেহই ছিল না যে, কোনওরূপ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। আমি কিছুই বিবেচনা করিতে না পারিয়া দ্রুতগতিতে আমার মনিবের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি কলিকাতা শহরের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও যাহা যাহা আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত কথা আমি তাঁহাকে কহিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও কহিলেন, 'আমি তো কাল বাগানে যাই নাই।' তাহার পরই তাঁহার গাড়ি প্রস্তুত হইল। তিনি ওই গাড়িতে বাগানে আগমন করিলেন। আমিও গাড়ির উপর বসিয়া আসিলাম। বাড়ি হইতে আরও দুই তিন জন তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে বাগানে আসিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সঙ্গে-সঙ্গে গমন করিলাম। ঘরের ও মৃতদেহের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বাহিরে আসিলেন। আমি রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না বলিয়া আমার উপর নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে সহস্র গালি দিয়া পরিশেষে কহিলেন, 'যাও, তুমি গিয়া থানায় এই সংবাদ প্রদান করো। যে পর্যন্ত পুলিশ আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমরা এই স্থান হইতে গমন করিতেছি না।' মনিবের এই আদেশ শুনিয়া আমি থানায় আসিয়াছি ও এই সংবাদ প্রদান করিতেছি। আমি কাহারও উপর নালিশ করিতেছি না, বা কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয় না; কারণ, রাত্রিকালে আমি নিজেই সেইস্থানে উপস্থিত ছিলাম না। এই আমার এজাহার।

প্রথম এতলা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, এই মকদ্দমার অনুসন্ধান বা ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন নিতান্ত সহজ নহে। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে ও কষ্টভোগ করিয়াও যে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যাইবে, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, যখন অনুসন্ধানের ভার আমার উপর পতিত হইয়াছে, তখন সাধ্যমত চেষ্টা করিতেই হইবে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া থানায় সেই সময় যে সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদিগের থানার ইন্সপেক্টার কোথায়?' উত্তরে একজন কর্মচারী কহিলেন, 'তিনি এখনই ওই খুনের মকদ্দমার সংবাদদাতার সহিত যে বাগানে সেই মৃতদেহ পড়িয়া আছে, সেই বাগানে গমন করিয়াছেন; বোধহয় এখনও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই।'

BanglaBook.org

কর্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি সেই স্থানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলাম না। সেই থানা হইতে একটি লোক সঙ্গে লইয়া আমিও সেই বাগান অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি সেই বাগানে উপস্থিত হইবার অতি অল্পক্ষণ পূর্বেই সেই থানার ইন্সপেক্টার সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বাগানের মধ্যবর্তী সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওই মৃতদেহ দর্শন করিতেছেন, এরূপ সময় আমিও গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্রই তিনি কহিলেন, 'আপনি এখানে কোথা হইতে?'

আমি। আপনি যেখান হইতে।

ইন্সপেক্টার। আমি তো আমার থানা হইতে আগমন করিতেছি।

আমি। আমিও আপনার থানা হইতে আসিয়াছি।

ইন্সপেক্টার। আপনি কি আমার থানায় আসিয়াছিলেন?

আমি। হাঁ।

ইন্সপেক্টার। কেন?

আমি। এই মকদ্দমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত।

ইন্সপেক্টার। আপনি কীরূপে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন?

আমি। আপনি টেলিফোন করিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পাইয়া আগমন করিয়াছি। আমি প্রথমত আপনার থানায় গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে প্রথম এতলা পড়িয়া দেখিলাম ও শুনিলাম আপনি অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন; তাই আমি আপনার থানা হইতে এখানে আসিয়াছি।

ইন্সপেক্টার। আপনি যত শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এত শীঘ্র আর কেহই উপস্থিত হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আপনি যখন প্রথম হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আসুন, প্রথম হইতেই উভয়ে মিলিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি।

বলা বাহুল্য, আমিও সেই ইন্সপেক্টারের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যে ঘরে মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যেই অগ্রে প্রবেশ করিলাম; কারণ, সেই সময় ওই ঘরের মধ্যে সেই ইন্সপেক্টার উপস্থিত থাকিয়া মৃতদেহ দর্শন করিতেছিলেন।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মৃত্তিকার উপর একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর একেবারে উলঙ্গ। কোনও স্থানে বস্ত্রের চিহ্নমাত্রও নাই। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না। গৌরাঙ্গ ও দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, পরিধানে যেমন বস্ত্র নাই, তেমনি অঙ্গে কোনওরূপ অলংকারও নাই। পায়ে 'মেদি'র চিহ্ন আছে। ওই চিহ্ন নিতান্ত পুরাতন বলিয়া অনুমান হয় না; বোধহয় মৃত্যুর দিবসেই সে পায়ে 'মেদি' মাখিয়াছিল। সমস্ত শরীরের কোনও স্থানে কোনওরূপ অলংকার না থাকিলেও তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার অলংকার পরিধান করা অভ্যাস ছিল। নাসিকা ও কান দেখিয়া তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মৃতদেহটি উত্তমরূপে দেখিলাম। তাহার কোনও স্থানে কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু, তাহার চক্ষুদ্বয় দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, উহা যেন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে; সুতরাং, সেই মূর্তি দেখিতে অতিশয় ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে। শরীরের কোনও স্থানে কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু তাহার গলার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত একটি কাল দাগ দেখিতে

পাওয়া গেল। উহা দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বস্ত্র বা রজ্জু অথবা সেই প্রকারের অপর কোনওরূপ দ্রব্য দ্বারা উহার গলা বেষ্টনপূর্বক, উহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। আরও অনুমান হইল, উহাকে হত্যা করিয়া উহার পরিহিত অলংকার, এমনকী বস্ত্রখানি পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পরিধানে যে বস্ত্রখানি ছিল, তাহাও বোধহয় বহুমূল্যের হইবে; নতুবা, উহাকে বিবস্ত্রাবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার আর কোনওরূপ কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ওই ঘরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা অপর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য, যে সময় আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই সময় সেই বাড়ির অধিকারী বিজয়বাবুও আমাদিগের সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ওই ঘরটি অতিশয় বিস্তৃত ও উহার মধ্যস্থল একটি প্রকাণ্ড গালিচার দ্বারা আচ্ছন্ন। ওই গালিচাখানি একখানি পরিষ্কার বড় চাদরের দ্বারা আবৃত। ওই গালিচার তিন পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বসিবার উপযোগী কয়েকখানি মখমলে মোড়া চেয়ার আছে। গালিচা-বিছানার উপরও কয়েকটি মোটা মোটা তাকিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ওই সকল দ্রব্য যেন শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত নাই; সেই দিবস বোধহয় কোনও ব্যক্তি ওই সকল দ্রব্য যেন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু, তাহাদিগের স্থানে আর তাহাদিগকে স্থাপিত করা হয় নাই। ওই বিছানার উপর তিন-চারটি বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। উহা হইতে এখনও পর্যন্ত মদিরার গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনটি কাচের গ্লাসও সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে ও সেইস্থানে বসিয়া মাংসাদি আহার করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; কারণ, দুই এবং একখানি হাড় এদিক-ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, কয়েকজন লোক সেই স্থানে বসিয়া মদিরাদি পান করিয়াছে। তদ্ব্যতীত, ওই ঘরের যে স্থানে বাদ্যযন্ত্র সকল রক্ষিত থাকিত, তাহাও সেই স্থানে নাই। ওই সকল যন্ত্র সেই বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত, নৃত্য করিবার কালীন স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদিগের পায়ে যে ঘুঙুরগুচ্ছ বাঁধিয়া থাকেন, তাহারও একটি সেই স্থানে পড়িয়া আছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া সহজেই আমাদিগের মনে হইল যে, ওই স্থানে বসিয়া নৃত্য-গীত হইয়াছে, গান-বাদ্য হইয়াছে ও সুরাপানও চলিয়াছে; পরিশেষে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে।

ওই ঘরের মধ্যে বিজয়বাবুর একটি আলমারি ছিল; তাহা চাবিবন্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। বিজয়বাবুর নিকট হইতে চাবি লইয়া ওই আলমারি খুলিলাম। দেখিলাম, উহার ভিতর মূল্যবান বস্ত্রাদি অনেক আছে, কিন্তু উহার একখানিও স্থানান্তরিত হয় নাই। অপরাপর স্থানে অপরাপর অনেক দ্রব্যাদিও রহিয়াছে; তাহাও কেহ স্পর্শ করে নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। শম্ভু মালির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, ওই ঘরের সমস্ত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ হয় ও পরিশেষে একটি দরজায় বাহির হইতে তালা বন্ধ করা হয়। ওই তালা-চাবিও শম্ভুর নিকটেই থাকে। গত কল্য যখন শম্ভু বাহিরে গিয়াছিল, সেই সময় ওই তালা সে নিজ হস্তে বন্ধ করিয়া, ওই তালার ও সদর দরজার চাবি সে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ওই তালা ও সদর দরজার তালা দেখিয়া যেন অনুমান হইল যে, ওই তালাদ্বয়ের একটি তালাও কোনওরূপে ভাঙা হয় নাই, চাবি দ্বারা খোলা হইয়াছে। কারণ তালাদ্বয়ের কলের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ঠিক আছে; অথবা উহার উপরেও কোনও প্রকার চিহ্ন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাগানের এই সকল অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া আমরা সকলে বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলাম ও সেইস্থানে বসিয়া বসিয়া, এই মকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কোন পন্থা প্রথম হইতে অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই মকদ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষরূপ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১ম, ওই মৃতদেহটি কাহার। ২য়, কাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই দুইটি বিষয় লইয়া একটু ভাবিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আসিয়া মনে উদিত হইল।

১। ওই স্ত্রীলোকটি যেরূপ সুশ্রী ছিল বলিয়া অনুমান হইতেছে, তাহাতে কোনও বড় ঘরের গৃহস্থ রমণী যে এ না হইতে পারে তাহাই বা কী করিয়া বলা যায়?

২। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই রমণী বিজয়বাবুর পরিবারের মধ্যে বা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের পরিবারের মধ্যস্থিত কেহ হইবার খুব সম্ভাবনা নয় কি? বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমত যদি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই হত্যার উদ্দেশ্য চুরি নহে, ওই স্ত্রীলোকটির চরিত্র বা সেই প্রকার অপর কোনও বিষয়ই এই হত্যার কারণ।

৩। বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমত যদি এই কার্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হত্যার পর উহাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া যাইবার কারণ কী? সময় সময় ভদ্রলোকের দ্বারা তাঁহাদিগের ঘরের মহিলার হত্যা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মৃতদেহ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে কোনও ভদ্রলোককে দেখি নাই বা শুনি নাই। এরূপ অবস্থায় এই কার্য বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমতে যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাই বা অনুমান করি কী প্রকারে?

৪। বিজয়বাবুর দ্বারা বা যদি তাঁহার জ্ঞানমতে এই কার্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর কাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা? তাঁহার বিনা অনুমতিতে কে তাঁহার বাগানের মধ্যে গমন করিয়া এইরূপ ভয়ানক কার্য করিতে সাহসী হইতে পারে? আর তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমতেই যদি এই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেই কি তিনি নিজের বাগানের মধ্যে এইরূপ কার্য সম্পন্ন করিবেন ও তাঁহার নিজের বাড়ির মধ্যে ওই মৃতদেহ এরূপভাবে রাখিয়া দিতে সাহসী হইবেন? ইহাই বা কীরূপে অনুমান করা যাইতে পারে?

৫। স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুশ্রী বলিয়াই আমরা গৃহস্থ রমণী বলিয়া অনুমান করিতেছি; কিন্তু, এ যে বারবনিতা নহে, তাহাই বা অনুমান না করি কেন? গৃহস্থ রমণীগণ প্রায়ই অলক্তক রাগে তাঁহাদিগের পদযুগল রঞ্জিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। মেদি পাতার রং ব্যবহার করিতে কোনও গৃহস্থ হিন্দু রমণীকে ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয় না। ওই রং প্রায় বেশ্যাগণই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। আরও ব্যবহার করেন—মুসলমান গৃহস্থ রমণীগণ। ভদ্রবংশীয় মুসলমানদিগের স্ত্রীলোকগণ মেদি পাতার রং যেরূপ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ততদূর আর কেহ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় ওই স্ত্রীলোকটি বারবনিতা হইলেও হইতে পারে বা কোনও ভদ্রবংশসম্ভূতা মুসলমান রমণী হইলেও হইতে পারেন।

৬। ইনি যদি ভদ্রবংশীয় কোনও মুসলমান রমণীই হন, তাহা হইলে ইঁহার অলংকার প্রভৃতি চুরি করিবার নিমিত্ত এ কার্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; ইঁহার চরিত্রের নিমিত্তই এই কার্য হইয়া থাকিবে। তাহা হইলেই বা ইঁহাকে একেবারে বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়া যাইবে কেন?

৭। যদি এই মৃতদেহ কোনও বারবনিতার হয়, তাহা হইলে এই হত্যার উদ্দেশ্য চুরি হইবারই খুব সম্ভাবনা ও তাহা হইলে উহাকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া রাখিয়া যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নহে। কারণ, বোধহয় উহার পরিধানে কোনও বহুমূল্য শাড়ি ছিল। চোরগণ সেই শাড়ির লোভ কোনওরূপে সংবরণ করিতে না পারিয়া, উহার অঙ্গ হইতে উহা উন্মোচিত করিয়া লইয়া গিয়াছে; সুতরাং, উহাকে বিবস্ত্রা অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে।

৮। চোরের দ্বারাই যদি এই কার্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা কোন সাহসে স্ত্রীলোকটিকে

এই অপরিচিত বাগানের মধ্যে আনিতে সাহসী হইবে ও কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা উহার মৃতদেহ এইরূপ অবস্থায় পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিতে সাহসী হইবে? বিশেষত, যেরূপ আমোদ-আহ্লাদ, নৃত্য-গীত ও সুরাপানাদি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে, তাহা চোরের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে বলিতে পারি না, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোরগণও যদি এইরূপভাবে কার্য করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে এরূপ কার্য অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু বাগানের দরোয়ানের সহিত যোগ না করিয়া কোনও চোর যে এইরূপ কার্য করিতে সাহসী হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না।

৯। যদি চোরের দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ও দরোয়ানের সহিত যদি তাহাদিগের কোনওরূপ ষড়যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে শম্ভুর কথাই বা আমরা বিশ্বাস করি কী প্রকারে? যে ব্যক্তি ভয়ানক দুষ্কর্ম করিবার নিমিত্ত এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে পূর্ব হইতে এই বাগানের অবস্থা না জানিলে, কখনওই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই; কারণ, সে পূর্ব হইতে এই বাগানের অবস্থা জানিয়াছে; এই বাগানের ভিতর যে একজন দরোয়ান বা মালি থাকে, তাহাও তাহার জানিতে বাকি নাই; এরূপ অবস্থায় তাহাকে হাত না করিয়া কোন সাহসে সে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে? ওদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুইটি তালাদ্বারা বাগানের বাড়ি ও বাগানের দরজা আবদ্ধ ছিল, তাহা খোলা হইয়াছে অথচ উহার কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এরূপ অবস্থায় একেবারেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, শম্ভুর যোগে তাহারা এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাহা নহে। শম্ভু ইহার সমস্ত বিষয় অবগত আছে। ভয়বশত কোনও কথা বলিতেছে না।

১০। শম্ভু যদি ইঁহার অবস্থা অবগত থাকে, বা তাহার চাবি দিয়া সে যদি বাগান ও বাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কতদূর অবগত থাকিবার সম্ভাবনা? এই বাগানের ভিতর যে খুন হইবে বা চুরি হইবে, ইহা পূর্ব হইতে অবগত হইতে পারিলে, সে বোধহয় কখনওই এরূপ কার্যে সম্মতি প্রদান করিত না। চোরগণ বোধহয় ভদ্রবেশে ওই স্ত্রীলোকটির সহিত এখানে আগমন করিয়াছিল, 'বাগানের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আমরা প্রস্থান করিব,' এইরূপ বলিয়া শম্ভুকে কিছু প্রদানপূর্বক, তাহার মতানুযায়ী তাহারা ওই বাগানের ভিতর প্রবেশ করে ও পরিশেষে আপন কার্য উদ্ধার করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। পরিশেষে শম্ভু ভিতরে গমন করিয়া যখন এই ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পায়, তখন অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে ও মনিবের বাড়িতে গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান করে; কিন্তু নিজে বাগানে উপস্থিত ছিল ও তাহারই নিকট হইতে বাগানে আমোদ-আহ্লাদ করিবার নিমিত্ত কেহ যে উহা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা গোপন করিয়া রাখে। আমাদিগের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত শম্ভু প্রকৃত কথা না কহিবে সেই পর্যন্ত এই মকদ্দমার কোনওরূপেই কিনারা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শম্ভুকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদিগের কর্তব্য; কারণ, তাহার মনিবকে দিয়া এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কখনওই আহার নিজের দোষ স্বীকার করিয়া মনিবের অপ্রীতিভাজন হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব কথিতরূপ অনেক প্রকার ভাবনা-চিন্তার পর পরিশেষে শম্ভুমালিকে ডাকিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেই মনস্থ করিলাম। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, বিজয়বাবুও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বসিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলাম। তিনি স্থানান্তরে গমন

BanglaBook.org

করিলে আমরা শম্ভুমালিকে সেই স্থানে ডাকাইলাম। সে আমাদিগের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কী?'

শম্ভু। আমার নাম শম্ভু।

আমি। শম্ভু কী? তুমি কোন জাতি?

শম্ভু। শম্ভু পয়ড়া, আমি উড়িয়া।

আমি। তাহা তো দেখিতে পাইতেছি। কোন জেলায় তোমার বাসস্থান?

শম্ভু। বালেশ্বর জেলায়।

আমি। তুমি বিজয়বাবুর মালি না দরোয়ান?

শম্ভু। আমি দুই কার্যই করিয়া থাকি।

আমি। দুই কার্য তুমি কীরূপে করিয়া থাকো?

শম্ভু। দিবাভাগে মালির কার্য করি। আমার থাকিবার ঘর বাগানের দরজায়। আমি সেই স্থানে থাকি। বাগানের দরজার চাবিও আমার নিকট থাকে।

আমি। বাড়ির চাবি?

শম্ভু। তাহাও আমার নিকট থাকে।

আমি। তুমি ব্যতীত এই বাগানে আর কয়জন মালি আছে?

শম্ভু। আমি ব্যতীত আর কেহই নাই।

আমি। এত বড় বাগান তুমি একলা পরিষ্কার রাখো কী প্রকারে?

শম্ভু। অপর লোকের আবশ্যক হইলে, ঠিকা লোক নিযুক্ত করিয়া বাগানের কার্য করানো হয়। তাহারা দিবাভাগে কার্য করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যায়।

আমি। কাল কয়জন ঠিকা লোক এই বাগানে কার্য করিয়াছিল?

শম্ভু। কাল কেহ কাজ করে নাই। গত একমাসের মধ্যে অপর কোনও লোক কোনওরূপ কার্য করে নাই।

আমি। তুমি তো মালির ও দরোয়ানের উভয় কার্যই করিয়া থাকো; কিন্তু, বেতন পাও কয় টাকা?

শম্ভু। পাঁচ টাকা।

আমি। আর খোরাক পোশাক কিছু পাইয়া থাকো?

শম্ভু। না। কেবলমাত্র পাঁচ টাকাই পাইয়া থাকি।

আমি। কেবলমাত্র পাঁচ টাকার নিমিত্ত এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকো কেন? শহরের মধ্যে কাহারও বাড়িতে থাকিলে অভাবপক্ষে সাত-আট টাকা অনায়াসেই পাইতে পারো।

শম্ভু। বাগানে থাকিলে খোরাকি খরচ অনেকটা কম হয় বলিয়াই আমরা বাগানে থাকিতে ভালবাসি।

আমি। কেবল খোরাকি কেন, আরও কিছু কিছু তো তোমরা অনায়াসেই উপার্জন করিয়া থাকো।

শম্ভু। আপনারা তো তা সবই জানেন।

আমি। জানি বলিয়া বলিতেছি। অপরাপর বাবুরা বাগানে আসিলে সময় সময় তাঁহাদিগের নিকট হইতে তোমরা প্রায়ই তো বকশিশ পাইয়া থাকো।

শম্ভু। কেহ কেহ কখনও কখনও কিছু দিয়া থাকেন। তাহা আমার মনিবও অবগত আছেন। যাহা আমরা পাইয়া থাকি তাহা তাঁহার সম্মুখেই পাইয়া থাকি।

আমি। তাঁহার অসাক্ষাতে?

শম্ভু। তাঁহার অসাক্ষাতে আর কোথা হইতে পাইব?

BanglaBook.org

আমি। তাঁহার অসাক্ষাতে যাঁহারা বাগানে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহারা বকশিশ বলিয়া তো প্রায়ই কিছু না কিছু প্রদান করিয়া থাকেন।

শম্ভু। বাবুর সঙ্গে না আসিলে, আমি কাহাকেও বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতে দিই না।

আমি। মিথ্যা কথা।

শম্ভু। কীসে মিথ্যা হইল?

আমি। তোমার বাবু যদি নিজে বাগানে আসিতে না পারেন ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও না?

শম্ভু। না।

আমি। মিথ্যা কথা। তোমার মনিব তো এইখানেই উপস্থিত আছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব?

শম্ভু। তিনি যদি চিঠি দেন বা তাঁহার কোনও লোককে সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাগানে প্রবেশ করিতে দিই।

আমি। আর তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবার সময় বকশিশ দিয়া যান না?

শম্ভু। কখনও কখনও কেহ কিছু দিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটে না।

আমি। তোমার মনিব প্রত্যহ বাগানে আসিয়া থাকেন কি?

শম্ভু। না।

আমি। কোন দিন আসেন?

শম্ভু। শনিবার ও রবিবারে প্রায়ই আসিয়া থাকেন।

আমি। তিনি একাকী আসেন, না তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কেহ তাঁহার সহিত আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। কখনও চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া নিজেই আসেন, কখনও বা বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহার সহিত আসিয়া থাকেন। কখনও বা একাকী আসিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় চলিয়া যান।

আমি। স্ত্রীলোকগণ কখনও তাঁহার সহিত এখানে আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। কখনও-কখনও আসেন।

আমি। কোন স্ত্রীলোক আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। তাঁহার বাড়ির স্ত্রীলোক। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার কন্যা ও বাড়ির অপরাপর স্ত্রীলোক।

আমি। তুমি তোমার মনিবের বাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে চেনো?

শম্ভু। চিনি।

আমি। কীরূপে তুমি তাহাদিগকে চিনিলে?

শম্ভু। আমি তরিতরকারি লইয়া প্রত্যহই বাবুর বাড়িতে গিয়া থাকি। অন্দরমহলে গমন করিতে আমার কোনওরূপ নিষেধ নাই; সুতরাং সকলকেই আমি বাড়িতে দেখিয়াছি ও সকলকে চিনি।

আমি। যে-স্ত্রীলোকটি ওই ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে, সে তোমার বাবুর কে হয়?

শম্ভু। সে আমার বাবুর বাড়ির কোনও স্ত্রীলোক নহে।

আমি। তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ। তোমার বাবু যে এ-কথা আমাদিগের নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

শম্ভু। তাঁহার বাড়ির কেহ নহে, তিনি স্বীকার করিবেন কোথা হইতে?

আমি। আর যদি স্বীকার করিয়া থাকেন?

শম্ভু। তাহা হইলে হয় মিথ্যা কহিয়াছেন, না হয় অপর কোনও স্ত্রীলোক সম্প্রতি তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছে, যাহাকে আমি দেখি নাই।

BanglaBook.org

আমি। তোমার মনিবের বাড়ির স্ত্রীলোকগণ তো সময়-সময় এই বাগানে আসিয়া থাকেন; তদ্ব্যতীত আর কোনও স্ত্রীলোক এখানে আসিয়া থাকে কি?

শম্ভু। না, আর কোনও স্ত্রীলোক এখানে আসে না।

আমি। কোনও বেশ্যা?

শম্ভু। কোনও বেশ্যাকে আমি কখনও এখানে আসিতে দেখি নাই।

আমি। কোনও নর্তকী?

শম্ভু। তাহা তো আমি দেখি নাই।

আমি। তাহা হইলে যে-ঘরে বাদ্যযন্ত্র সকল পড়িয়া রহিয়াছে ওই ঘরে বসিয়া গান-বাদ্য কে করিয়া থাকে?

শম্ভু। তাঁহারা আপনারাই করিয়া থাকেন।

আমি। আর ঘুঙুরগুচ্ছ পায়ে দিয়া কে নৃত্য করিয়া থাকে?

শম্ভু। বাবুরা আপনারাই নৃত্য করিয়া থাকেন।

আমি। মিথ্যা কথা, ইহা একেবারেই হইতে পারে না। তুমি অনুমান করিয়া দেখো দেখি, ইহার পূর্বে তুমি আমাকে আর কখনও দেখিয়াছ?

শম্ভু। ঠিক মনে হয় না; যেন দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু, কোথায় দেখিয়াছি তাহা ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। দেখো দেখি, এই বাগানে তোমার মনিবের সহিত আমাকে কখনও দেখিয়াছ কি না?

শম্ভু। মনে হয় না।

আমি। যে-দিন একটি বাইজি আসিয়া এখানে গীত-বাদ্য করিয়াছিল, সেইদিন আমিও যে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম তাহা বোধহয় এখন তুমি মনে করিতে পারিতেছ না?

এইস্থানে পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া কর্তব্য যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করি নাই।

শম্ভু। বোধহয় আপনি ছিলেন, কিন্তু আমার ঠিক মনে হইতেছে না।

আমি। বাইজির নাচ হইয়াছিল তাহা তোমার মনে হইতেছে?

শম্ভু। তাহা মনে পড়িতেছে।

আমি। তাহা হইলে ইতিপূর্বে তুমি কীরূপে বলিতেছিলে যে, তোমার বাবুর পরিবার ব্যতীত আর কোনও স্ত্রীলোক কখনও এই বাগানের ভিতর প্রবেশ করেন নাই।

শম্ভু। কোনও বেশ্যা কখনও এই বাগানের ভিতর আইসে নাই, তাহাই আমি বলিয়াছিলাম।

আমি। তবে বাইজি আসিল কী প্রকারে?

শম্ভু। সে তো আর বেশ্যা নয়, সে বাইজি।

আমি। ঠিক কথা, যে বাইজি সে বেশ্যা হইবে কীরূপে? আচ্ছা, শম্ভু, আমি তোমাকে এখন গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর দিবে কি না?

শম্ভু। আমি মিথ্যা কহিব কেন? যথার্থ যাহা জানি তাহাই কহিব।

আমি। আমি তোমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তুমি এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার কথার উত্তর প্রদান করিও। আরও তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, তোমার মনিব রাত্রিকালে এই বাগানে ছিলেন না। তুমি ব্যতীত বাগানে আর কোনও লোকজন বা চাকর-চাকরানি কেহই থাকে না। বাড়ির চাবি তোমার নিকট থাকে; বাগানের দরজার চাবিও তুমি তোমার নিকট রাখিয়া থাকো। তুমি বাগানে সমস্ত রাত্রি উপস্থিত ছিলে; তোমার নিকট যে-চাবি থাকে তাহা দিয়াই বাগানের দরজা ও ঘরের তালা খোলা হইয়াছে এবং সেই ঘরের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় এই হত্যার নিমিত্ত তুমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। যদি এখনও সমস্ত কথা বলিয়া প্রকৃত

BanglaBook.org

হত্যাকারীকে ধরিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহায়তা না করো, তাহা হইলে জানিও, এই হত্যাপরাধে তুমি সর্বতোভাবে দোষী হও বা না হও, এই হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত তোমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। আমি জানি, এই হত্যা তোমার জ্ঞানত হয় নাই; কিন্তু তুমি যতদূর অবগত আছ, তাহার আর এখন কিছুমাত্র গোপন করিও না। তোমার দ্বারা যাহা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যেক বাগানের প্রত্যেক মালি বা দরোয়ানের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত আছি; নতুবা, কেবলমাত্র পাঁচ টাকায় তোমাদিগের কোনওরূপেই ভরণপোষণ নির্বাহ হইতে পারে না। তুমি চাকরি যাইবার ভয়ে তোমার যে-সামান্য অপরাধ এখন স্বীকার করিতে সম্মত হও নাই, আমি বলিতেছি সেই অপরাধ এখন স্বীকার করিলেও তোমার মনিব কোনওরূপে তোমাকে কর্মচ্যুত করিতে পারিবেন না। তোমার চাকরি যাহাতে থাকে তাহা আমি করিব। কিন্তু এখনও যদি তুমি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করার অপরাধে তোমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

আমার কথা শুনিয়া শম্ভু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল যে, এ যাহা বলিয়াছে, তদ্ব্যতীত অনেক কথা সে অবগত আছে। এখন সেই সকল কথা সে বলিবে কি না তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিবার পর সে কহিল, 'আমি তো গত রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না। এখানে কী হইয়াছে না হইয়াছে, তাহা আমি কীরূপে বলিব?'

তাহার কথা শুনিয়া আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম, 'এখনও দেখিতেছি তুমি মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিতেছ না। রাত্রিকালে তুমি যে-স্থানে গমন করিয়াছিলে বলিয়াছ ও যে-স্থানে ও যাহাদিগের নিকট রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছ বলিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, অনুসন্ধানে তাহার সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তুমি যাহাদিগের নাম করিয়াছিলে তাহাদিগকে থানাতে আনাও হইয়াছে; যদি ইচ্ছা করো তাহা হইলে তাহাদিগকে এখনই আমি এখানে আনাইয়া লইতেছি। তাহা হইলেই শুনিতে পাইবে তোমার সাক্ষাতে তাহারা কী বলে।'

আমার কথা শুনিয়া শম্ভু পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। পুনরায় আমি তাহাকে কহিলাম, 'আমি তোমাকে যাহা-যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এখনও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করো; নতুবা, জানিও, নিশ্চয়ই তোমার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইহার পর সমস্ত কথা বলিলেও তোমার পরিত্রাণের আর কোনওরূপ উপায় থাকিবে না। এখনও আমার পরামর্শ শুনিয়া কার্য করো।'

শম্ভু। আমার মনিব শুনিলে আমার চাকরি যাইবে।

আমি। আমরা তোমার মনিবকে কোনও কথা বলিব না; তথাপিও যদি তিনি কিছু জানিতে পারেন, তাহা হইলেও যাহাতে তোমার চাকরি না যায়, আমরা তাহার বন্দোবস্ত করিব।

শম্ভু। আমি আপনাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলাম; যাহা ভালো বিবেচনা হয় তাহা করিবেন। কিন্তু আমি তো তাহাদিগকে চিনি না।

আমি। কাহাদিগকে?

শম্ভু। কাল রাত্রিতে যাহারা বাগানে আসিয়াছিল।

আমি। কাহারা কাল রাত্রিতে বাগানে আসিয়াছিল?

শম্ভু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি তাহাদিগকে চিনি না। ইতিপূর্বে আর কখনও তাহাদিগকে দেখি নাই বা তাহাদিগের কোনওরূপ পরিচয়ও আমি গ্রহণ করি নাই।

আমি। তাহা হইলে তাহাদিগকে বাগানের মধ্যে আসিতে দিলে কেন?

শম্ভু। আমার কুবুদ্ধি, তাহার উপর লোভ।

আমি। কয়টি টাকা তুমি পাইয়াছিলে?

শম্ভু। পাঁচটি।

BanglaBook.org

আমি। এত অল্প টাকায় তুমি এরূপ কার্য করিতে মত দিলে কী প্রকারে?

শম্ভু। কী কার্য?

আমি। খুন।

শম্ভু। দোহাই ধর্মাবতার। আমি খুনের কিছুই অবগত নহি। আমি যাহা কিছু জানি তাহার সমস্তই এখনই আমি আপনার নিকট বলিতেছি; ইহার মধ্যে একটিও মিথ্যা কথা আপনি পাইবেন না।

আমি। আচ্ছা, যাহা জানো আনুপূর্বিক বলো দেখি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শম্ভু কহিল, 'কল্য সন্ধ্যার পর আমি এই বাগানের দরজায় বসিয়া আছি, এরূপ সময় একখানি গাড়ি আসিয়া হঠাৎ এই বাগানের দরজায় উপস্থিত হইল। ওই গাড়ির মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ও তিনটি পুরুষ ছিল। একটা পুরুষ সেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিল ও আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দরোয়ান, আজ তোমার মনিব এই বাগানে আসিবেন কি?"

আমি। না, তিনি শনিবার ও রবিবার ভিন্ন আর কোনও দিবস বাগানে আসেন না।

পুরুষ। তাহা হইলে তুমি আমাদিগের একটা অনুরোধ রক্ষা করিবে কি? সেই অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে দুইটি টাকা প্রদান করিতেছি।

আমি। কী করিতে হইবে?

পুরুষ। আমরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবার নিমিত্ত একটি বাগান স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বাগানে হঠাৎ বাবুর পরিবারবর্গ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমরা সেই বাগানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই নাই; সুতরাং, আমাদিগকে অন্য স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

আমি। আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত বাগানের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ করিবেন?

পুরুষ। দুই-তিন ঘণ্টার অধিক নহে। তাহার পর আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

আমি। দুই টাকায় এ-কার্য কখনও হইতে পারে না।

পুরুষ। কয় টাকায় হইতে পারে?

আমি। যদি দশ টাকা পাই, তাহা হইলে দুই-তিন ঘণ্টার নিমিত্ত আমি এই বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি।

পুরুষ। দশ টাকা কোনওরূপেই আমরা দিতে পারি না, নিতান্তপক্ষে পাঁচ টাকা পর্যন্ত প্রদান করিতে পারি।

তাহার সহিত এইরূপ কথাবার্তা হইবার পর, আমি পরিশেষে পাঁচ টাকাতেই স্বীকৃত হইলাম; কারণ, ভাবিলাম, 'মনিব কিছু আজ আসিবেন না; তবে কেন আমি পাঁচ টাকা পরিত্যাগ করি? ইহাতে আমার মনিবের কোনওরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই-তিন ঘণ্টা পরেই যখন উহারা আমোদ-আহ্লাদ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন এ-কথা কোনওরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় কেন পাঁচ-পাঁচটি টাকা পরিত্যাগ করি?' মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাহারা গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও বাগানবাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাদিগের সঙ্গে-সঙ্গে যাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও আলো জ্বালিয়া দিয়া আমি আমার ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলাম। উহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে-পর্যন্ত উহারা বাগান পরিত্যাগ না করিবে,

BanglaBook.org

সেই পর্যন্ত আমি শয়ন করিব না; কিন্তু তাহা পারিলাম না। কোথা হইতে কালনিদ্রা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। বাগানের দরজা খোলা ছিল; সুতরাং সেইরূপ অবস্থাতেই রহিয়া গেল। যখন আমার নিদ্রা ভাঙিল তখন দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। গান-বাজনা প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না। তাহারা চলিয়া গিয়াছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাদ্যযন্ত্রাদি এদিক-ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে, লোকজন কেহই নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেই স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। কী করিব তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্রুতগতি আমার মনিবের নিকট গমন করিলাম ও 'আমি রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না।' এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া আমার দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি আমার সহিত এইস্থানে আগমন করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দর্শন করিলেন ও পরিশেষে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। সেইস্থানে আমি ভয়ক্রমে যাহা-যাহা বলিয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন। ইহাই প্রকৃত কথা। ইহা ব্যতীত আর কোনও কথা আমি অবগত নহি।' এই বলিয়া শম্ভু নিরস্ত হইল।

আমি। তোমার কথা আমি এখন অনেকটা বিশ্বাস করিতেছি ও আরও দুই চারিটি কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসাও করিতেছি। ইহারও তুমি যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে।

শম্ভু। জিজ্ঞাসা করুন, আমি কোনও মিথ্যা বলিব না। প্রকৃত যাহা অবগত আছি, তাহাই আমি বলিব।

আমি। উহারা কয়জন আসিয়াছিল?

শম্ভু। চারিজন।

আমি। তাহার ভিতর পুরুষ কয়জন ও স্ত্রীলোকই বা কয়জন?

শম্ভু। তিনজন পুরুষ, একটি মাত্র স্ত্রীলোক।

আমি। পুরুষ কয়টি কোন দেশীয় লোক বলিয়া অনুমান হয়?

শম্ভু। তিনজনই বাঙালি।

আমি। বাঙালি সত্য; কিন্তু কী প্রকারের বাঙালি? ছোটলোক না ভদ্রলোক?

শম্ভু। তাহাদিগের পরিধানে বেশ পরিষ্কার কাপড় ছিল। দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়াই অনুমান হয়।

আমি। তাহাদিগকে তুমি চিনো?

শম্ভু। না, তাহাদিগকে আমি চিনি না। ইতিপূর্বে তাহাদিগকে যে কখনও দেখিয়াছি তাহাও আমার বোধহয় না। এ-কথা আমি পূর্বেই তো আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। যদি এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাও তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি?

শম্ভু। বোধহয় দেখিলে চিনিতে পারিব।

আমি। তিনজনকেই চিনিতে পারিবে?

শম্ভু। তিনজনকেই চিনিতে পারিব; কিন্তু, যে-ব্যক্তি আমার সহিত কথা কহিয়াছিল ও যাহার নিকট হইতে আমি পাঁচ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকে কখনওই ভুলিব না; যখন দেখিব তখনই তাহাকে চিনিতে পারিব।

আমি। যে-স্ত্রীলোকটি উহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে ইতিপূর্বে কখনও এই বাগানে আসিয়াছিল?

শম্ভু। না, তাহাকে আর কখনও এখানে আসিতে দেখি নাই।

আমি। যাহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ওই স্ত্রীলোকটিই কি তাহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল?

শম্ভু। হাঁ, ওই স্ত্রীলোকটিই আসিয়াছিল।

BanglaBook.org

আমি। যখন সে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার অঙ্গে কোনও অলংকার দেখিয়াছিলে?

শম্ভু। অনেক সোনার গহনা ছিল।

আমি। তাহার পরিধানে কীরূপ বস্ত্র ছিল?

শম্ভু। খুব একখানি ভালো কাপড় ছিল। বোধহয় মূল্যবান বেনারসী শাড়ি।

আমি। যখন তাহারা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় তাহাদিগের সহিত অপর কোনও দ্রব্যাদি ছিল?

শম্ভু। কয়েক বোতল মদ ছিল। কিছু খাবারও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া বোধহয়।

আমি। তাহারা যে-গাড়িতে আসিয়াছিল তাহা ঘরের গাড়ি না ভাড়াটিয়া গাড়ি?

শম্ভু। ভাড়াটিয়া গাড়ি; কারণ, আমার সম্মুখে তাহারা ওই গাড়ির ভাড়া দিয়া উহা বিদায় করিয়া দিয়াছিল।

আমি। কত ভাড়া দিয়াছিল, দেখিয়াছ?

শম্ভু। দুই টাকা আমার সম্মুখে দিয়াছিল; ইহার পূর্বে যদি কিছু দিয়া থাকে বলিতে পারি না।

আমি। গাড়োয়ান ভাড়া লইবার সময় কোনও কথা বলিয়াছিল?

শম্ভু। অপর কোনও কথা কহিতে শুনি নাই। যেমন তাহাকে ভাড়া দেওয়া হইল অমনি সে তাহার গাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

আমি। ওই গাড়োয়ান কোথা হইতে উহাদিগকে আনিয়াছিল, সেই সময় তাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলে?

শম্ভু। না।

আমি। এ-গাড়িতে ঘোড়া ছিল কয়টি, একটি না দুইটি?

শম্ভু। দুইটি।

আমি। কী রঙের ঘোড়া ছিল?

শম্ভু। দুইটি ঘোড়াই লাল রঙের।

আমি। ইহা ব্যতীত আর কোনও কথা তুমি অবগত আছ?

শম্ভু। আর যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় করুন, আমি যাহা অবগত আছি তাহা বলিব। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আর কোনওরূপ মিথ্যা কথা কহিব না, বা কোনও কথা গোপনও করিব না।

শম্ভুর নিকট এইসকল বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগের মনে অনেক সাহসের উদয় হইল। কী কারণে ও কাহাদিগের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তখন তাহার কতকটা অনুমান করিতে আমরা সমর্থ হইলাম। বিজয়বাবুর উপর আমরা যে একটু সন্দেহ করিতেছিলাম, সেই সন্দেহ এখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। এখন মনে হইল, শম্ভুর কথা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিলে যে এই মকদ্দমার অনুসন্ধান হইবে না, বা হত্যাকারীগণ যে ধৃত হইবে না তাহা নহে। মৃতদেহ যে কাহার তাহাও জানিতে পারা যাইবে। হত্যাকারীগণ যে কাহারা তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই স্থানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না। একখানি গাড়ি আনাইয়া যত শীঘ্র পারি সেই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া গেলাম। কোথায় যে গমন করিলাম তাহা পাঠকগণ ক্রমে অবগত হইতে পারিবেন। থানার ও কর্মচারী পূর্ব হইতেই এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই বাগানের ভিতর অবস্থিতি করিয়া ওই মৃতদেহ সম্বন্ধে 'সুরতহাল' ও অপরাপর আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাগান হইতে বহির্গত হইয়া আমি আমার প্রধান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে এই মকদ্দমার সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাঁহার দ্বারা শহর ও শহরতলীর সমস্ত থানায় একটা আদেশ প্রচারিত করাইলাম। টেলিফোন যোগে ওই আদেশ দেখিতে দেখিতে সমস্ত থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। যে আদেশ আমার প্রধান কর্মচারী প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ—

বাগানের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুমান করা হইতেছে যে-ওই স্ত্রীলোকটি কোনও সম্ভ্রান্ত বারবনিতা। তাহার পরিধানে একখানি ভালো বস্ত্র ও অনেকগুলি অলংকার ছিল। অনুমান হয়, নৃত্য-গীত প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত কোনও বাবু তাহাকে বাগানে আনিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত প্রত্যেক থানার ইন্সপেক্টারগণ তাঁহাদিগের এলাকার সমস্ত স্থানে ঢোল-সোরেত দ্বারা এই অবস্থা এরূপভাবে প্রকাশ করেন যে এলাকার সমস্ত লোক, বিশেষত, বারবনিতাগণ এই অবস্থা যেন অবগত হইতে পারেন। যদি কাহারও নিকট হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোনও স্ত্রীলোক গতকল্য কাহার সহিত বাগানে গিয়াছিল ও এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, তাহা হইলে সেই সংবাদ যত শীঘ্র হয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার দুই ঘণ্টা পরেই সংবাদ আসিল সিমলার তিনটি স্ত্রীলোক কল্য সন্ধ্যার সময় বাগানে গমন করিয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই। তাঁহাদিগের পরিধানে ভালো-ভালো কাপড় ও অনেকগুলি সোনা-রূপার অলংকার আছে।

এই সংবাদে পাইবামাত্রই আমি সিমলায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ি হইতে স্ত্রীলোক কয়েকটি গমন করিয়াছে সেই বাড়িতে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, সেই বাড়িতে নৃত্য নাম্নী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করে। গতকল্য সন্ধ্যার পূর্বে দুইটি বাবুর সহিত সে তাহার দুইটি কন্যাকে লইয়া বাগানে গমন করিয়াছে; কিন্তু, এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই।

এই কথা শুনিয়া আমার মনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, যদি শম্ভুর কথা প্রকৃত হয় তাহা হইলে যে-স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সে নৃত্য বা তাহার কন্যা হইতে পারে না; কারণ, তাহারা যখন তিনজন একত্র গমন করিয়াছে তখন একজনের মৃতদেহ পাওয়া যাইবে ও অপর দুই জনের কোনওরূপ সন্ধান পাওয়া যাইবে না, ইহা কখনওই হইতে পারে না। তথাপি মনের সন্দেহ একবার মিটাইয়া লওয়াই কর্তব্য। মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া ওই বাড়িতে অপর যে সকল স্ত্রীলোক বাস করিত তাহাদিগের দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া আমি পুনরায় সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও ওই মৃতদেহটি তাহাদিগকে দেখাইলাম। ওই মৃতদেহ দেখিবামাত্রই তাহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা গৌরবের মৃতদেহ।'

আমি। গৌরব কে?

স্ত্রীলোক। নৃত্যর বড় কন্যা।

আমি। তাহার ছোট কন্যার নাম কী?

স্ত্রীলোক। তাহার নাম শৈরব।

আমি। কাল যখন উহারা বাগানে যাইবার নিমিত্ত বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তখন তোমরা বাড়িতেই ছিলে?

স্ত্রীলোক। আমরা বাড়িতেই ছিলাম, আমাদিগের সম্মুখে উহারা বাহির হইয়া আইসে।

আমি। কাহার সহিত উহারা গমন করিয়াছিল?

স্ত্রীলোক। চারিটি বাবুর সহিত।

আমি। তাহাদিগকে তোমরা চিনো?

BanglaBook.org

স্ত্রীলোক। উহাদিগকে ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

স্ত্রীলোকগণের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল শম্ভু বোধহয় এখনও সমস্ত কথা সত্য কহে নাই। যাহা হউক, তাহাকে আর-একবার ভালো করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই ভাবিয়া শম্ভুকে পুনরায় ডাকাইলাম ও তাহাকে অনেকরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু, সে তিনটি স্ত্রীলোকের কথা কোনওরূপেই স্বীকার করিল না।

শম্ভুর কথা শুনিয়া, সে সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি তাহার কথা প্রকৃত হয়, যদি কেবলমাত্র একটি স্ত্রীলোকই ওই বাগানে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে অপর স্ত্রীলোক দুইটি কোথায় গেল? প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, দুইটি স্ত্রীলোক অলংকারে শোভিত হইয়া বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটিকে হতা অবস্থায় এইস্থানে পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিধানে একখানি অলংকার, এমনকী একখানি বস্ত্র পর্যন্ত নাই, সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় অপর স্ত্রীলোকদ্বয়ের অবস্থাও যে এইরূপ ঘটে নাই, তাহাই বা অনুমান করা যাইতে পারে কীরূপে?

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া, যে স্ত্রীলোক কয়েকটি আমার সহিত ওই বাগানে মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় আমি তাহাদিগের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই বাড়িতে আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাস করিত। মনে করিলাম উহাদিগের প্রত্যেককেই উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা কর্তব্য যে তাহারা কোনও কথা বলিতে পারে কি না।

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া, এক-এক করিয়া আমি সেই বাড়ির প্রত্যেককেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু যাহাদিগের সহিত স্ত্রীলোকত্রয় বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে কেহই কোনওরূপ সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। এইসকল অনুসন্ধান করিতে দিবা তিনটা বাজিয়া গেল। তিনটার পর আমি সেই বাড়ি হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, এরূপ সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া সেই বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিলাম ওই গাড়ি হইতে দুইটি স্ত্রীলোক বহির্গত হইয়া সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। উহাদিগের মধ্যে একজন প্রাচীনা ও একজন নবীনা। অনুমানে অবগত হইতে পারিলাম, প্রাচীনার নাম নৃত্য ও নবীনার নাম শৈরব। পাঠকগণ বোধহয় চিনিতে পারিয়াছেন, ইহারা দুইজন ও যাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে সে, একত্রে বাগানে যাইবার নাম করিয়া গতকল্য সন্ধ্যার সময় বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল।

ইহাদিগকে দেখিয়া আমার মনের একটি আশঙ্কা অন্তর্হিত হইল। পূর্বে মনে করিয়াছিলাম ইহারাও হয়তো কোনও স্থানে হতা হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু, ইহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া সে চিন্তা দূর হইল। তখন আমি শৈরবকে লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি যখন বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলে, সেই সময় তোমার সমস্ত অলংকার পরিধান করিয়া গিয়াছিলে; কিন্তু, এখন তোমার অঙ্গে সেই সকল অলংকার দেখিতে পাইতেছি না; তাহা আছে তো?'

শৈরব কহিল, 'আমার সমস্ত অলংকার আমার মাতার নিকট আছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শৈরবকে আমি যে সময় অলংকারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সেই সময় নৃত্য বাড়ির স্ত্রীলোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'গৌরব প্রত্যাগমন করিয়াছে কি?' কিন্তু তাহার কথায় কেহ কোনওরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া সকলেই আমাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'তোমার গৌরবের কথা ওই বাবুটি বলিতে পারেন, উহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করো।' উহাদিগের কথা শুনিয়া নৃত্য আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, 'বাবা, আমার গৌরব এখন কোথায়?'

BanglaBook.org

নৃত্য বেশ্যা ও গৌরব বেশ্যার কন্যা হইলেও মাতা ও সন্তানের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সন্তানের মৃত্যুসংবাদ মাতার কর্ণগোচর করা যে কীরূপ লোমহর্ষক ব্যাপার, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিমিত্তই সেই বাড়ির সকলেই ওই সংবাদ মাতার কর্ণগোচর না করিয়া, সেই দুরূহ কার্যের বিষম ভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করিল। যে অনুসন্ধান করিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই বারবনিতাগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি, সেই কার্য যদি আমাকে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে সন্তানের মৃত্যুসংবাদ মাতার কর্ণগোচর করাও আমার একরূপ কর্তব্য-কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল। যে কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আমাকে দিনযাপন করিতে হয়, তাহাতে হৃদয় একরূপ কঠিন হইয়াই পড়িয়াছে। তাহার উপর এই কঠিন হৃদয়কে আরও কঠিন করিয়া এই মর্মভেদী সংবাদ মাতার কর্ণগোচর করিতে বাধ্য হইলাম।

এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র নৃত্য একবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল ও দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে পতিত হইল। বাড়ির সকলেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবল শোক যাহার হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হইয়াছে, সান্ত্বনাবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দেওয়া কাহার সাধ্য! নৃত্য কাহারও কথা শুনিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় আমাকেই কথা কহিতে হইল। আমিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম 'দেখো নৃত্য, তোমার হৃদয়ে মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি রোদন করিতেছ। কিন্তু এখন রোদন করিয়া কোনও ফল নাই। ঈশ্বর তোমার ও তাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইয়াছে। রোদন করিলে সেই ফলের আর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। আমার বিবেচনায় এখন তোমার নিরস্ত হইয়া, যাহাতে তাহার সৎকার হয় এখন তাহারই উপায় বাহির করা উচিত ও আমাদিগকে সাহায্য করিয়া যে ব্যক্তি তোমার হৃদয়ে এই প্রবল যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, যাহাতে সে ধৃত হইয়া উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই এখন তোমার কর্তব্য। গৌরব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রত্যাগমন করিবার কোনওরূপ উপায় নাই; কিন্তু তোমার অসময়ের সম্বল যে সকল অলংকার অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির উপায় এখনও আছে। আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিলে যদি আমরা সেই হত্যাকারীদিগকে ধরিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে গৌরবের পরিহিত অলংকারগুলি যে আমরা তাহাদের নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিব না, এ কথা বলিতে পারি না।'

আমার কথা শুনিয়া নৃত্য চুপ করিল ও কহিল, 'আমাকে কী করিতে হইবে বলুন।'

আমি। বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না। কেবল গৌরব কাহার সহিত কোথায় গমন করিয়াছিল, তাহারই যথাযথ বর্ণন করিতে হইবে।

নৃত্য। মহাশয়, সে অনেক কথা। আমি আমার দুইটি কন্যাকে লইয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকি। ইহারা ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। আমি ইহাদিগকে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে দিই নাই। শৈশবকাল হইতেই আমি ইহাদিগকে নৃত্য-গীত শিখাইয়াছি। কোনও ভদ্রলোক কোনও স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা করিলে, প্রায়ই ইহাদিগকে লইয়া গিয়া থাকেন; সুতরাং, বাগানে যাওয়া ইহাদিগের একরূপ প্রধান কার্যের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। কোনও ভদ্রলোক ইহাদিগকে কোনও বাগানে লইয়া যাইতে চাহিলে, আমি সাহস করিয়া ইহাদিগকে কখনওই ছাড়িয়া দিতে পারি না; কারণ, সামান্য পরিমাণে সুরাপান করিলেই ইহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। এই নিমিত্ত যখন ইহারা কোনও স্থানে গমন করে, তখন আমিও উহাদিগের সহিত গমন করিয়া থাকি। আমরা কেবল একজন কোনও স্থানে গমন করি না। যদি কোনও বাবু কেবল আমার একটিমাত্র কন্যাকে বাগানে লইয়া যাইতে চাহেন ও একজনের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন, তাহা হইলেও আমি আমার অপর কন্যাকে লইয়া

BanglaBook.org

তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকি। এমনকী নিতান্ত পরিচিত লোক হইলেও আমার কোনও কন্যা কখনও কাহারও সহিত একাকী গমন করে না।

পরশ্ব সন্ধ্যার পর আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি, কন্যাদ্বয় তাহাদিগের ওস্তাদের নিকট বসিয়া একটি নূতন গানের রাগ গতের সহিত মিলাইয়া শিক্ষা করিতেছে, এরূপ সময় একটি বাবু আসিয়া আমার ঘরে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত সোনাগাছির রামাদালালও আগমন করিয়াছিল। ওই বাবুটি আমাদিগের ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে কহিলেন, 'বঙ্গদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তোমার একটি কন্যাকে তিনি একদিন বাগানে লইয়া যান। গীত-বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা যদি তোমার কন্যা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে মাসিক তিরিশটি টাকা বেতন স্থির করিয়া দিব। ঘরে বসিয়া সে মাসে-মাসে বেতন গ্রহণ করিবে। কেবলমাত্র সপ্তাহে এক দিবস তাহাকে বাগানে গমন করিতে হইবে।' ওই বাবুটির কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'বাগানে যাওয়াই আমার কার্য। তিনি একটিকে বাগানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন; আমি দুইটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। ইহাদিগের মধ্যে যেটিকে তাঁহার পছন্দ হয়, সেইটিকেই তিনি চাকর রাখিতে পারেন। কবে যাইতে হইবে ও প্রথম দিবসের নিমিত্ত কী পাওয়া যাইবে, তাহা আমাকে বলিয়া যান; কারণ, সেই দিবস উহাদিগকে আমি আর অন্য কোনও স্থানে পাঠাইয়া দিব না।' আমার কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'আগামীকল্য সন্ধ্যার পর আমি পুনরায় আসিব। সেই সময় সেই জমিদারমহাশয়ের আরও দুই-একজন প্রিয় সহচর আগমন করিবেন; কারণ, তাঁহাদিগের পছন্দ না হইলে তোমাদিগকে আমি লইয়া যাইতে পারিব না। যদি তোমার কন্যাদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগের পছন্দ হয়, তাহা হইলে অদ্যই তোমরা আমাদিগের সহিত গমন করিতে পারিবে ও যদি যাওয়া হয় তাহা হইলে এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাদিগকে পঁচিশ টাকা প্রদান করিব।' আমি কহিলাম, 'পঁচিশ টাকা তো যে সে ব্যক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। অত বড় জমিদার হইয়া যদি কেবলমাত্র পঁচিশ টাকা আমাদিগকে প্রদান করেন তাহা হইলে উহা আমাদিগের উপযুক্ত হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু, তাঁহার মান কোথায় থাকিবে?' আমার কথাগুলি শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিলেন, 'জমিদারমহাশয়ের সহচরগণ যদি তোমার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ করেন, তাহা হইলে টাকার জন্য আটকাইবে না। একরাত্রির নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে দেওয়াইয়া দিতে পারিব।' এই বলিয়া সেই ব্যক্তি সে-দিবস চলিয়া গেলেন। কল্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত রামাদালালকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু, তাঁহার সহিত অপর তিনটি বাবু আগমন করিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি অপর তিনজনকে সঙ্গে লইয়া আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন ও আমার কন্যাদ্বয়কে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যে দুইটি স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিলাম তাহারা ইহারাই। ইহারা দুই সহোদরা। যদি জমিদারমহাশয় ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ করেন, তাহা হইলে বলুন, আমি ইহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলি।' তাঁহার কথার উত্তরে ওই তিনজনের মধ্যে একজন অপর দুইজনের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, 'ইহারা দুইজনই দেখিতেছি সমান রূপবতী; গুণবতী বোধহয় একরূপই হইবে; সুতরাং, ইহাদিগের মধ্যে যে কোনওরূপ পার্থক্য আছে তাহা আমার বোধ হইতেছে না। যাহার ইচ্ছা হয় সে-ই গমন করিতে পারে। তাহাকেই জমিদারমহাশয় পছন্দ করিবেন।' এই কথার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, 'আমি ইহাদিগের দুইজনকেই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। জমিদারমহাশয় নিজে দেখিয়া-শুনিয়া পছন্দ করিয়া লউন।' উত্তরে তিনি কহিলেন, 'এ উত্তম কথা।'

BanglaBook.org

এইরূপ কথাবার্তার পর প্রথম ব্যক্তি আমার কন্যাদ্বয়কে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রস্তুত হইল। একটি বড় জমিদারের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে; বিশেষ তাঁহার পছন্দ হইলে মাসিক বেতন হইবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া দুই ভগ্নীই দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট বেনারসী শাড়ি পরিধান করিল ও উভয়ের যে-সকল অলংকার ছিল, তাহা দ্বারা উভয়েই আপনাপন অঙ্গ শোভিত করিল। আমি একখানি সাদা কাপড় পরিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হইলাম। রাত্রিযাপন করিবার কালীন কন্যাদ্বয়ের যদি বস্ত্র পরিধান করিবার প্রয়োজন হয়, এই ভাবিয়া দুইখানি বেশি বস্ত্র আমার সহিত গ্রহণ করিলাম। দুইখানি গাড়িতে করিয়া তাঁহারা চারিজন আগমন করিয়াছিলেন, ওই গাড়ি দুইখানিই আমাদিগের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। গৌরব প্রথমেই বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া ওই গাড়ির একখানিতে গিয়া উপবেশন করিল। সে গাড়িতে বসিবামাত্রই যে তিন ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই দিন আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও গিয়া সেই গাড়িতে উঠিলেন। প্রথম ব্যক্তি শৈরব ও আমাকে লইয়া অপর গাড়িতে উঠিলেন ও আমাদিগকে কহিলেন, 'উঁহারা যখন তোমার অপর কন্যার গাড়িতে উঠিয়াছেন, তখন আর তাহাকে এই গাড়িতে আনা ভালো দেখায় না।' আমাদিগকে এই বলিয়া তিনি দুই গাড়ির গাড়োয়ানকেই ডাকিয়া কহিয়া দিলেন, 'তোমরা কেহ অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিও না, দুইখানি গাড়িই একত্রে লইয়া যাইও।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আর কোনওরূপ প্রতিবাদ করিলাম না। গাড়ি দুইখানি চলিতে লাগিল। দেখিলাম দুইখানি গাড়িই অনেক দূর পর্যন্ত একত্র গমন করিল। তাহার পর আমাদিগের গাড়ির ঘোড়ার রাশ ছিঁড়িয়া গেল। ওই রাশ বাঁধিয়া লইতে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইল। সেই সময় অপর গাড়িখানি যে কোন দিকে চলিয়া গেল তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদিগের সহিত যে ব্যক্তি গমন করিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, 'উঁহারা যে বাগানে গমন করিলেন সেই বাগান আমি চিনি। সেইস্থানে তোমাদিগকে লইয়া আমি অনায়াসেই গমন করিতে পারিব। তাহার নিমিত্ত তোমাদিগের চিন্তা নাই।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম ও সেই গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শহর পরিত্যাগপূর্বক অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই গাড়ি নিতান্ত আস্তে-আস্তে চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল তথাপি আমরা সেই বাগানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলাম না। এইরূপে আরও দুই ঘণ্টা গমন করিবার পর, একস্থানে গিয়া আমাদিগের গাড়ি থামিল। সেইস্থানে তিনি অবতরণ করিলেন ও আমাদিগকেও নামিতে কহিলেন। আমরা গাড়ি হইতে অবতরণ করিবার পর গাড়োয়ান তাহার গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও কহিলেন, 'একটু গমন করিলেই আমরা বাগানে গিয়া উপস্থিত হইব।' এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে অগ্রে-অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুদূর গমন করিবার পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কত ডাকিলাম; কিন্তু, আমাদিগের কথার কেহই উত্তর দিলেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া যে স্থানে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই স্থানের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল উহার চতুর্দিকে বাগান ও জল। নিকটবর্তী কোনও স্থানে কোনওরূপ লোকজনের বসতি নাই। এই অবস্থায় ফিরিতে হইয়া আমাদিগের মনের গতিক সেই সময় যে কী হইয়াছিল তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া দেখুন। আমার নিকট যে আর দুইখানি বস্ত্র ছিল, তাহার একখানি আমার কন্যাকে পরিধান করিতে দিলাম; কারণ, সেই সময় পরিধানে ভালো কাপড় ও অলংকার দেখিতে পাইলে দুষ্ট লোকে নানারূপ বিপদ ঘটাইতে পারে। আমার কন্যা বস্ত্র পরিবর্তন করিলে তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলংকারগুলি খুলিয়া পরে কাপড়খানিতে বাঁধিয়া লইলাম। সেই স্থানের রাস্তাঘাট চিনি না, কোন দিকে যাইব জানি না, কোনও কথা

জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই, গাড়ি প্রভৃতি ভাড়া পাইবারও উপায় নাই; সুতরাং, অনন্যোপায় হইয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সেই সময় দেখিতে পাইলাম আমরা একটি পাড়াগাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই গ্রামের একটি ভদ্রলোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট আমাদিগের দুঃখের কথা কহি। তিনি আমাদিগকে এক স্থানে বসাইয়া অনেকরূপ চেষ্টা করিয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া দেন। ওই গাড়িতেই আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের অবস্থা তো এইরূপ হইয়াছে; কিন্তু, ইহার পূর্বে আমার বড় কন্যার কী অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে না পারিয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, এরূপ সর্বনাশ ঘটিবে তাহা কিন্তু একবারের নিমিত্তও ভাবিয়াছিলাম না।'

নৃত্যর কথা শুনিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। চারিজন একত্রে মিলিত হইয়া এই কার্য করিয়াছে। তিনজন এই হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিল। অপর একজন, যাহাতে ইহাদিগের দুইজনকে গৌরবের নিকট হইতে পৃথক রাখিতে পারা যায় সেই কার্য করিয়াছিল। কারণ, তিনটি স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে এ কার্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না।

অনুসন্ধানের রাস্তা বাহির হইল। ক্রমে রামাদালালের অনুসন্ধান করিলাম ও সোনাগাছিতেই তাহাকে পাইলাম যাহার সহিত সে প্রথমে নৃত্যর বাড়িতে আসিয়াছিল, তাহাকে সে চিনিত; সুতরাং, তাহার সাহায্যে সেই আসামী ধৃত হইল, এই ব্যক্তি নৃত্য ও গৌরবকে জঙ্গলের ভিতর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে সমস্ত কথা স্বীকার করিল, ও তাহার সঙ্গী অপর তিনজনেরও ঠিকানা বলিয়া দিল। বলা বাহুল্য, তাহারাও ধৃত হইল। অপহৃত অলংকারের মধ্য হইতে অনেক অলংকার তাহাদিগের নিকট হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

গাড়োয়ান দুইজনকে পাওয়া যায়। তাহারা ও শম্ভু এই মকদ্দমার সাক্ষী হইয়াছিল। বিচারে চারিজন আসামীর বিপক্ষে এই মকদ্দমা প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান বিচারালয় হইতে সকলেই আজীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

BanglaBook.org

ঝোপে ঝোপে নেকড়ে

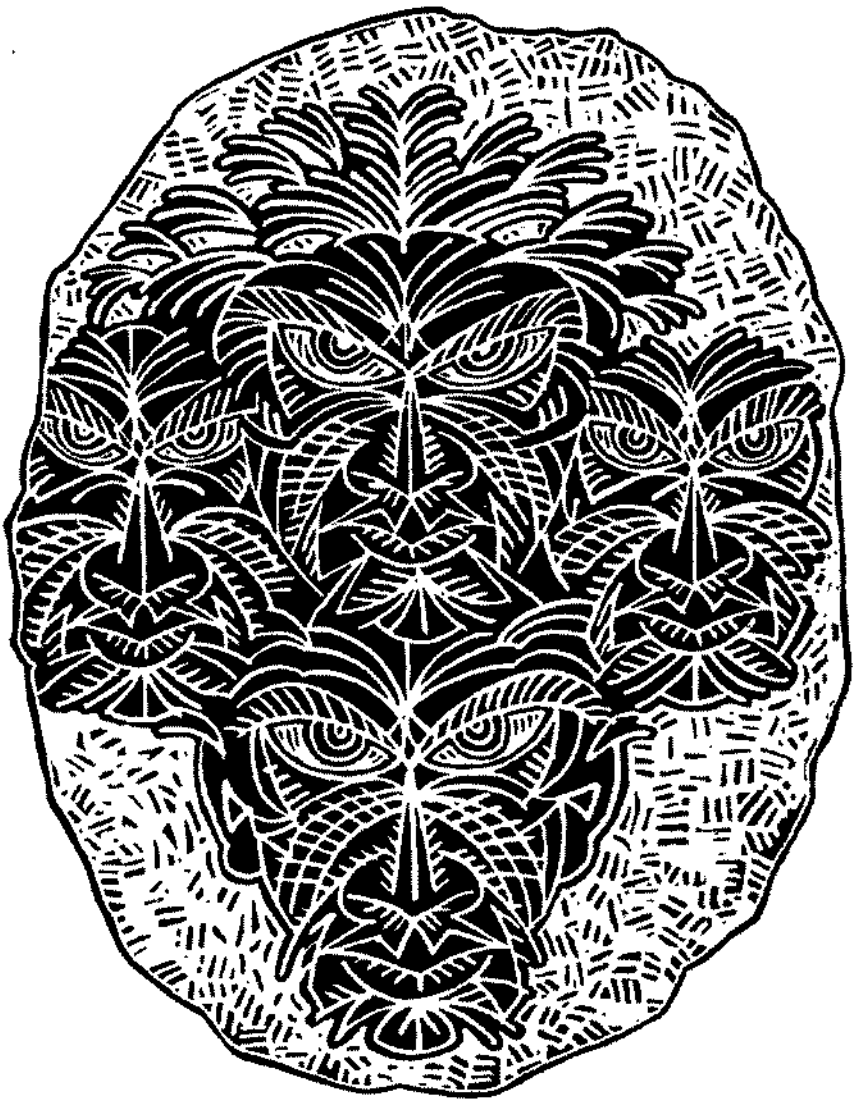

দীনেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম প্রসঙ্গ : পীত ইস্তাহার

ব্রিক্সটনের কারাগারের একটি কক্ষে দুইজন লোক মুখোমুখি উপবিষ্ট। হাজতের আসামীরা বাহিরের লোকের সঙ্গে এই কক্ষেই সাক্ষাৎ করে; সুতরাং এই কক্ষটিকে কয়েদীদের বৈঠকখানা বলা যাইতে পারে।

একজন কারারক্ষী সেই কক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল; কক্ষমধ্যে যে-দুইজনের আলাপ চলিতেছিল—তাঁহাদের একজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর কুট্‌স, দ্বিতীয় ব্যক্তি হাজতের আসামী সেপটিমস কস।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কুট্‌স, চেয়ারে ঠেস দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টেবিলের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট আসামীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—দেখ বাপু কস, সাইনস বা যাহাই তোমার নাম হউক, যদি তোমার ঘটে একবিন্দু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সকল কথাই প্রকাশ করিতে। যতই চালাকি আর ধাপ্পাবাজি করো, শেষে আইনের জয় সুনিশ্চিত। তোমার এক ভাই আত্মহত্যা করিয়াছে, আর-একজন ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠনে সাহায্য করিতে গিয়া ধরা পড়ায় কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; আবার তোমরা দুই ভাই গ্রেপ্তার হইয়াছ। তোমাদের পরিবারের অবশিষ্ট যে-কয়েকজন কারাগারের বাহিরে আছে, তাহাদিগকেও আমরা, শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক, জেলে পুরিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ইহাও বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ।

আসামী কোনও কথা বলিল না; সে টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিতে লাগিলেন,—তোমার পিতা পল সাইনসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; প্রতিহিংসার জন্য সে খেপিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতা কীজন্য নষ্ট করিতেছ? হ্যাঁ, তোমার পিতা সত্যই খেপিয়া উঠিয়াছে; এজন্য পুলিশ তাহাকে তাহার কুকর্মের জন্য দায়ী করিতে অনিচ্ছুক। পল সাইনসের মাথায় খুন চড়িয়াছে। তাহার প্রতি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারের পরিবর্তে ব্রডমুরের বাতুলাশ্রমে প্রেরণ করিতে হইবে। সেখানে তাহার পরিচর্যা চলিবে। কিন্তু পুলিশের এই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়, আমরা তোমার পিতার সন্ধান পাইতেছি না। তোমার পিতা এখন কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা আমাকে বলিবে কি? আমার নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করিলে বিচারে তোমার দণ্ডের লাঘব হইবে—ইহা আমি অঙ্গীকার করিতে পারি।

প্রফেসর সেপটিমস কস পল সাইনসের পুত্রগণের অন্যতম। মিঃ ব্লেক তাহাকে কীভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিদিত; সেই ঘটনার বিবরণ 'শকটে শয়তানীতে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেপটিমস কস মুখ তুলিয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি অপরাধী কি না, বিচারক তাহা বিচার করিবে; তুমি পুলিশের গোয়েন্দা, আমার দণ্ডের লাঘব হইবে—কোন অধিকারে তুমি এরূপ অঙ্গীকার করিবে? বিচারক তোমার মুখ চাহিয়া আসামীর অপরাধের বিচার করিবে? তোমার অন্যায় অনুরোধও রক্ষা করিবে? কিন্তু তুমি আমাকে কোনও অঙ্গীকারেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে কোনও কথা বলিব না। পল সাইনস আমার পিতা—ইহাও আমি স্বীকার করি নাই; ইহা রবার্ট ব্লেকের অনুমান মাত্র, কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। তুমি আমাকে এখানে বসাইয়া রাখিয়া যে-সকল কথা বলিতেছ তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। নিজের সময় নষ্ট করিতেছ—আমাকেও বিরক্ত করিতেছ। যদি পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা থাকে, গোয়েন্দা তুমি—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করো; আমাকে লোভ দেখাইয়া তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা নির্বোধ ইতরের কাজ। আমি তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি—পল সাইনস আজ লন্ডনেই থাকিবে। হ্যাঁ, সে তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লন্ডনের পথে-পথেই আজ ঘুরিয়া বেড়াইবে। সাধ্য হয়, তাহাকে গ্রেপ্তার করো। তুমি যাহাকে তাহার খ্যাপামি বলিতেছ—তাহারই সাহায্যে সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সকল পাকামাথার সম্মিলিত শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সে পুনঃ-পুনঃ পুলিশকে অপদস্থ

BanglaBook.org

ও পরাজিত করিয়াছে, এ-কথা তুমি স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ, ইন্সপেক্টর কুট্‌স! কিন্তু এই কাপুরুষসুলভ লজ্জা অপেক্ষা অধিক নির্লজ্জতা কোনও ভদ্রলোকের নিকট আশা করা যায় না!

এই সুতীব্র তিরস্কারে ইন্সপেক্টর কুট্‌সেরও বোধহয় লজ্জা হইল; তিনি মুখ লাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু লজ্জা অপেক্ষা রাগই তাঁহার অধিক হইল; তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! বেশ, দেখা যাইবে—কে জয়ী হয়। যুদ্ধের কি এখনই শেষ হইয়াছে? তোমার নিকট কোনও কথা বাহির করিতে পারিলাম না, কিন্তু তোমার যে-ভাই ম্যালকম বার্টনের ছদ্মনামে একটা বীমা কোম্পানিকে ফেরার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যুক্তিতর্কের খাতির রাখিবে। তাহার স্ত্রী-পরিবার আছে কি না? তাহাদের মুখের দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে তো?

সেপটিমস কস পুনর্বার মৃদু হাসিয়া বলল,—তাহার ষোলো বৎসরের অভিজ্ঞতা বৃথা হইবে না। যদি তুমি ম্যালকমকে আমার ভাই বলিয়াই মনে করো তাহা হইলে আমার নিকট যাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিকট তাহার অধিক কিছুই জানিতে পারিবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ওষ্ঠ দংশন করিয়া মানসিক উষ্মা প্রকাশ করিলেন। সেপটিমস কসের কথা সত্য—তাহা তিনি তৎপূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন; তিনি প্রথমে ম্যালকম বার্টনকেই জেরা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার পিতার বিরুদ্ধে একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। পিতার প্রতি ইহাদের ভক্তি ও নির্ভর অসাধারণ। পিতার আদেশে পুত্রগণ বিনা প্রতিবাদে নির্বিকার চিত্তে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে—একদিন ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই মানব-চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু পুত্রগণের উপর পল সাইনসের প্রভাব এইরূপই অসাধারণ ছিল।

দ্বারপ্রান্তে যে কারারক্ষী উপবিষ্ট ছিল—ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে বলিলেন,—আসামীকে উহার কুঠুরিতে লইয়া যাও।

কস উঠিয়া তাহার হাজত-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল; সে সেই কক্ষের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিল,—আমার অন্য তিন ভ্রাতার সহিত যদি কখনও তোমার সাক্ষাৎ হয়—তাহা হইলে আমার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিও। তাহাদিগকে এ-কথাও বলিও যে, নেকড়েরা দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিবার সময় যেরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠে; কোনও-কোনও মানুষ-নেকড়ে একাকীই তাহার শত্রুদলের পক্ষে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স এ-কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না। তিনি কারাগারের বিভিন্ন কক্ষের দ্বার অতিক্রম করিয়া অবশেষে কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন উইচারের খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। কারাধ্যক্ষ সেই কক্ষে বসিয়া প্রধান ওয়ার্ডারের সহিত কী পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়াই বলিলেন,—মিঃ কুট্‌স, আপনি চলিয়া যাইবার পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, এইরূপই আশা করিয়াছিলাম। দুইখানি পত্র আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি সেপটিমস কসের এবং অন্যখানি ম্যালকম বার্টনের নামে আসিয়াছে। উভয় পত্রেরই মর্ম অভিন্ন। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আপত্তিজনক মনে হওয়ায় আমি তাহা আসামীদের নিকট পাঠাই নাই। —তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে পত্র দুইখানি বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে দিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পত্র দুইখানি পরীক্ষা করিয়া উভয় পত্রের মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত দেখিলেন; হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা পল সাইনসেরই হস্তাক্ষর। পল সাইনসের হস্তাক্ষর তাঁহার সুপরিচিত।

প্রথম পত্রখানিতে লেখা ছিল ঃ

প্রিয় সেপটিমস, কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে আপাতত যে অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। তুমি বিচারাধীন কয়েদী, এজন্য তোমার সংবাদ-পত্র পাঠের অধিকার আছে। আগামী কল্য কাগজ খুলিয়া এরূপ কোনও বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা পাঠ করিয়া তুমি খুশি হইবে।

BanglaBook.org

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে কারামুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি; এজন্য কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। —পল সাইনস।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স উত্তেজনাভরে নাক ঝাড়িলেন। পল সাইনসের এই স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা তাঁহার অসহ্য মনে হইল। তিনি মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—কাপ্তেন উইচার, এই পত্রের মর্ম কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

কারাধ্যক্ষ বলিলেন,—কাল সকালে দৈনিকের 'ব্যক্তিগত স্তম্ভে' সম্ভবত এরূপ কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে, যাহার সাঙ্কেতিক অর্থ উহাদের দুইজনেরই সুবিদিত; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। এইজন্য আমি কাল উহাদিগকে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনসের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবার কোনও নতুন চাল আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে আমাদের সকলেরই সঙ্কট অপরিহার্য। তাহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মন অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল; তিনি মন স্থির করিতে না পারিয়া কারাগারের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি কারাগারের ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন এবং ব্রিক্সটন হিল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি চঞ্চল চিত্তে গোঁফ চুলকাইতে-চুলকাইতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সাইনস আবার কী শয়তানি চাল চালিবার মতলব করিয়াছে, তাহা জানিতেই হইবে। সে শীঘ্রই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবে। এবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

বস্তুত ইন্সপেক্টর কুট্‌সের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। আটদিন পূর্বে পল সাইনস লন্ডন নগরে যে-ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন তখনও পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই; তখনও লন্ডনের বিভিন্ন রাজপথের দুই ধারে অনেক প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাচের দ্বার-জানালাগুলির ভাঙা কাচ মেরামত হয় নাই; অনেক জানালা তখনও কাচহীন। কাঠের ও লোহার ফ্রেমগুলি যেন মুখব্যাদান করিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। তখনও রাশি-রাশি ভাঙা কাচ পথের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল।

পল সাইনস লন্ডনের লক্ষ-লক্ষ পাউন্ড ক্ষতি করিলে মিঃ ব্লেক পুলিশের সাহায্যে সাইনসকে তাহার গুপ্ত আড্ডায় গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্বেই সে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার পুত্র ধরা পড়িয়াছিল এবং তাহার আড্ডায় কাচধ্বংসকারী যন্ত্রটিও তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রফেসার সেপটিমস কসের আবিষ্কৃত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি বিধ্বস্ত করিয়া মিঃ ব্লেক লন্ডনবাসীদের আতঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু পল সাইনসের সাত পুত্রের মধ্যে তখনও কয়েকজন জীবিত ছিল; পল সাইনস তখনও ধরা পড়ে নাই। সে লন্ডনের কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, লন্ডনে নূতন অরাজকতা বিস্তারের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শক্তিশালী অসংখ্য দস্যু নানাভাবে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্থানে-স্থানে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিতে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়াও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভেরা পল সাইনসকে লন্ডনের চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

পল সাইনস শীঘ্রই পুনর্বার সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে—এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এবার সে কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে? তাহার শত্রুগণের নামের তালিকায় সর্বপ্রথমে এবার কাহার নাম আছে? এই প্রশ্নই সকলের মন আলোড়িত করিতেছিল। যাহারা ষোলো বৎসর পূর্বে পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বিনা অপরাধে তাহার কারাদণ্ডের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও পর্যন্ত সাইনসের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাদের সকলেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মনে-মনে বলিতে লাগিল,—এইবার আমার পালা, সেই শয়তান এবার আমাকেই চূর্ণ করিবে। হায়, তাহার কবল হইতে আর আমার পরিত্রাণ নাই!

BanglaBook.org

যাহারা ষোলো বৎসর পূর্বে দায়রার মামলায় সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল—পুলিশ তাহাদের সকলেরই নাম জানিত। পুলিশ তাহাদিগকে অভয়-দানও করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছিল পল সাইনস তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল প্রসারিত করিয়াছিল, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাদের একজনকেও রক্ষা করিতে পারে নাই। সাইনসের কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, বিড়ম্বিত বা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ-অবস্থায় পুলিশের আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সাইনসকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের অসাধ্য, এ-ধারণা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

পল সাইনস তাহার গুপ্ত আড্ডা হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক সহস্র পাউন্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু এ-পর্যন্ত কেহই সেই পুরস্কারের দাবি করে নাই। পল সাইনসের অনুচরবর্গের অনেকেই এই ঘোষণার কথা জানিত; তাহাদের কেহ-না-কেহ সাইনসকে ধরাইয়া দিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের কেহই পুরস্কারের লোভে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহসী হয় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সিতে চলিতে-চলিতে সম্মুখে মুখ বাড়াইয়া ট্যাক্সিচালককে কী বলিলেন। ট্যাক্সি তখন রিজেন্ট স্ট্রিটের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। পথের দুই ধারের দোকানগুলির ভাঙা জানালা তখনও সম্পূর্ণরূপে মেরামত হয় নাই; সেই অবস্থাতেই দোকানগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছিল। দোকান ও অন্যান্য অট্টালিকার অবস্থা দেখিলে মনে হইত—কেহ বোমা নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল দোকানের দ্বার-জানালা ভাঙিয়া দিয়াছে।

ট্যাক্সি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অক্সফোর্ড সার্কাসের নিকট হঠাৎ থামিয়া গেল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বহুসংখ্যক ট্যাক্সি, লরি, বাস পথ বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান, আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইবার উপায় নাই! সেখানে এইভাবে পথরোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স গাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একপাশের একখানি ভাঙা দোকানের সম্মুখে বিস্তর লোককে জটলা করিতে দেখিলেন, তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া গাড়িগুলি কোনও দিকে যাইতে পারিতেছিল না। ইন্সপেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট পরে সেই দোকানের দেওয়ালে আঁটা হলদে কাগজে লাল কালিতে ছাপা মোটা-মোটা অক্ষরে একছত্র মাত্র লেখা দেখিলেন; সেই হলদে কাগজখানিতে লেখা ছিল—

তুমি কি পল সাইনস?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই প্ল্যাকার্ডখানি দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সমাগত পথিকগণের ন্যায় তিনিও বিস্ফারিত নেত্রে পুনঃ-পুনঃ সেই প্ল্যাকার্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই একই লেখা দেখিলেন—তুমি কি পল সাইনস?

ট্যাক্সি ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, প্ল্যাকার্ডখানিও অদৃশ্য হইল; কিন্তু সেই প্ল্যাকার্ডের অদ্ভুত লেখাগুলি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া রহিল; তিনি মনে-মনে বলিলেন, —এ কী ব্যাপার? ইহা কি কোনও বিজ্ঞাপনদাতার চাতুরী? সে কি পাগল? এরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন তো পূর্বে কোনওদিন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই! দুর্দান্ত দস্যু পল সাইনসের কথা যাহাতে জনসাধারণ শীঘ্র ভুলিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে —তুমি কি পল সাইনস? ইহার কি কোনও অর্থ আছে?

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের গাড়ি ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে বেকার স্ট্রিটে প্রবেশ করিয়া মিঃ রবার্ট ব্লেকের বহির্দ্বারের সম্মুখে থামিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বন্ধু। তিনি যখন-তখন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এজন্য তাঁহাকে অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে হইত না। তিনি দ্বারে

BanglaBook.org

ধাক্কা দিলে মিসেস বার্ডেল দ্বার খুলিয়া দিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিসেস বার্ডেলকে দেখিয়া অভিবাদনের ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়িলেন, তাহার পর কাঠের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেন। মিঃ ব্রেকের উপবেশন-কক্ষ হইতে বেহালার একটি সুমিষ্ট গৎ ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কর্ণগোচর হইল। কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্রেককে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বেহালা-হস্তে উপবিষ্ট দেখিলেন। মিঃ ব্রেকের পরিধানে ফিকে লাল ড্রেসিং-গাউন, পায়ে চটি, তিনি বেহালাখানি চিবুকের নিচে ধরিয়া উৎসাহ ভরে তাহাতে ছড় বুলাইতেছিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাঁহাকে সেইভাবে বেহালা বাজাইতে দেখিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি পূর্বে কোনও দিন বেহালার এরূপ সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই। দীর্ঘকাল পুলিশের চাকরি করিয়া তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়াছিল, তথাপি বেহালার সেই সুমধুর করুণ স্বর-লহরী তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল। মিঃ ব্রেকের হস্তে বেহালা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর লাভ করিয়াছিল এবং তাহাতে হাসি, অশ্রু, আনন্দ ও বিষাদ পরিস্ফুট হইয়া যেন কোমল স্বরতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্রেক বেহালাখানি টেবিলে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কুট্‌স, তোমার মতো কাজের লোক এতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া বেহালা শুনিতেছিল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে নিষ্কর্মা দেখিয়া বোধহয় মনে-মনে চটিতেছিলে। একটা চুরুট ইচ্ছা করিবে কি?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছ; ইহাতেই দম বন্ধ হইবার জোগাড়! আবার চুরুট ইচ্ছা করিব?

মিঃ ব্রেক বলিলেন,—দোষ কী? তুমিও খানিক ধোঁয়া ছাড়ো। যদি জলপথে ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বোতল গ্লাস কোথায় থাকে তাহা তো তুমি জানো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে 'জলপথে' চলিবার জন্য কখনও দুইবার অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না; তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হুইস্কির ও সোডার বোতল লইয়া আসিলেন, তাহার পর আধগ্লাস হুইস্কি গলায় ঢালিয়া সশব্দে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন,—ব্রিক্সটনের জেলখানা হইতে আসিতেছি। পল সাইনসের যে-দুই অকালকুষ্মাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়াছি,—তাহাদের নাম মনে আছে তো? সেখানে কস ও বার্টনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম; কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাহাদের বাপের সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাদের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

মিঃ ব্রেক বলিলেন,—তাহাদের নিকট কিছু জানিতে পারিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি নাই। এতদিনেও উহাদের গোষ্ঠীকে চিনিতে পারো নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় কুট্‌স! যদি উহারা সকলে সুপথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে দেশের কত উপকার করিতে পারিত! কিন্তু উহাদের প্রতিভা দেশের সর্বনাশেই নিয়োজিত হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনস সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে। সে শীঘ্রই পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিবে। সে তাহার দুই পুত্রকে জেলখানায় যে-পত্র লিখিয়াছে,—তাহা কারাধ্যক্ষের নিকট দেখিয়া আসিলাম। সে লিখিয়াছে,—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবে; এজন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। তাহার উদ্দেশ্য কী? সে কী কৌশলে কস ও বার্টনকে স্বাধীনতা দান করিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ?

মিঃ ব্রেক সবিস্ময়ে বলিলেন,—সাইনস কস ও বার্টনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছে? সর্বনাশ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিরক্তি ভরে বলিলেন,—তাহারা মুক্তিলাভ না করিতেই সর্বনাশ! ব্রেক, তুমি দিন-দিন ভয়ঙ্কর কাপুরুষ হইতেছ! সাইনসকে তোমার এত ভয়? আমি তাহাকে একবিন্দুও ভয় করি না। —কুট্‌স সদম্ভে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্রেক বলিলেন,—তুমি ভয়ঙ্কর সাহসী তাহা কি জানি না? কিন্তু তোমার সাহস, বল ও কৌশলে কোনও ফল হইবে না। কুট্‌স! পল সাইনস যাহা লিখিয়াছে, তাহা করিবেই। তাহার কথার কখনও খেলাপ হয় না, তাহা বোধহয় অস্বীকার করিবে না। হ্যাঁ, সে কৃতকার্য হইতে না

BanglaBook.org

পারিলেও আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কস ও বার্টনকে ব্রিক্সটনের কারাগার হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে—এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে যে অবিলম্বে পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিবে—তাহার প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। সে আমাকেও পত্র লিখিয়াছে।

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পত্রেরও মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল; তদ্ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখিয়াই ইন্সপেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন—পত্রখানি সাইনসেরই স্বহস্ত-লিখিত পত্র।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স রুদ্ধনিশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

রবার্ট ব্লেক, আমি লন্ডন নগরের সমস্ত কাচের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার পূর্বেই তুমি তাহাতে বাধা দিয়াছ এবং আমার দুই পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ। তোমার এই ধৃষ্টতায় আমার সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইয়াছে; আর তুমি আমার দয়ার আশা করিতে পারো না। আমি বহুদিন পূর্বেই তোমার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা স্বাক্ষরিত করিতাম; কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা কীভাবে পূর্ণ করি, তাহা দেখিবার জন্য তোমার জীবিত থাকা প্রয়োজন বুঝিয়া এখনও তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান করি নাই। তুমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিয়া আমার শক্তির পরিচয় গ্রহণ করো—ইহাই আমার ইচ্ছা। তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অকর্মণ্য কুকুরগুলাকে জানাইতে পারো, তাহারা আমাকে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া, যেভাবে সাধারণের অন্ন ধ্বংস করিতেছে তাহাই করিতে থাকুক, তাহা হইলে তাহাদের সম্ভ্রম বজায় থাকিতেও পারে। আমি একমাত্র তোমাকেই আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী-বোধে সম্মান করি; কিন্তু তোমার ধৃষ্টতা আমার অসহ্য হইয়াছে। আর বারো-ঘণ্টার মধ্যে তুমি এবং ইংলন্ডের জনসাধারণ জানিতে পারিবে, পল সাইনস তাহার সঙ্কল্পের ব্যর্থতা ও অপমান সহ্য করিবার পাত্র নহে। আমি এই সময়ের মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এবং ব্রিটিশ বিচারপ্রণালীকে সমগ্র সভ্যজগতের নিকট উপহাসাস্পদ করিব। যাহারা আমার জন্য কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহাদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই, ইহাও অচিরে প্রতিপন্ন হইবে। নেকড়ে তাহার শাবকগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্যে এখনও বঞ্চিত হয় নাই।

পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াইলেন। বোধহয় পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অবসাদ বোধ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয়বার বারুণী-সেবনে মন কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন,—পাগল, নেকড়েটা একদম খেপিয়া গিয়াছে! জেলখানা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার মস্তিষ্ক বোধহয় বিকৃত হয় নাই; কিন্তু এখন আর সে-কথা বলা চলে না। স্কট স্যান্ডার্সের হত্যার অভিযোগে অবিচারে তাহার কারাদণ্ড হইলে তাহার অন্যায় নির্যাতনে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে যাহাদিগকে তাহার দণ্ডের জন্য দায়ী মনে করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অপদস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যেরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তাহা জনসাধারণের মহাউৎকণ্ঠা ও বিভীষিকার কারণ হইয়াছে। এখন তাহাকে খেপা কুকুরের মতো হত্যা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাইনস আবার কী শয়তানী চাল চালিবে বুঝিতে পারিয়াছ কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা বুঝিতে পারিলে আমরা তাহার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারিতাম। তাহার পত্র পাঠ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী বুঝিবার উপায় নাই। সে কী কৌশল অবলম্বন করিবে তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কে একজন ফন্দিবাজ ব্যবসাদার সাইনসের নাম ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে দাঁও মারিবার চেষ্টা করিতেছে! রাশি-রাশি প্ল্যাকার্ড ছাপিয়া তাহাতে লিখিয়াছে, 'তুমি কি পল সাইনস?' —এ যে কীরকম ব্যবসাদারী ফন্দি তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিতেছি না!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, অবিশ্বাস ভরে বলিলেন,—তুমি কী বলিলে? তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

কুট্‌স বলিলেন,—তোমার এখানে আসিতে-আসিতে অক্সফোর্ড সার্কাসের কাছে একখানা প্ল্যাকার্ড দেখিলাম; দুশো লোক পথে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সেই প্ল্যাকার্ডের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহাতে মোটা-মোটা হরফে লেখা আছে—'তুমি কি পল সাইনস?'

স্মিথ বলিল,—হ্যাঁ, এ-নূতন রকম বিজ্ঞাপন বটে! বোধহয় আগামী সপ্তাহে ওই স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে—যদি তুমি পল সাইনস না হও, তাহা হইলে আমাদের 'সিংহ-বিক্রম সালসা' খাও—তাহার ন্যায় বিক্রমশালী হইবে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—বিজ্ঞাপনে আর কোনও কথা দেখিলে না? কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন তাহা বুঝিতে পারো নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কে পল সাইনস তাহাই যাচাই করিবার বিজ্ঞাপন। অদ্ভুত বটে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—বিজ্ঞাপনের নিচে বিজ্ঞাপনদাতার নাম থাকা তো উচিত। প্ল্যাকার্ডখানি দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পোশাকটা বদলাইয়া আসি, তোমার সঙ্গে অক্সফোর্ড সার্কাসে গিয়া এই অপরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বেশ, চলো। আমার বিশ্বাস, পল সাইনস আজকাল কীরকম খ্যাতিলাভ করিয়াছে—তাহা সকলেই সুবিদিত; এইজন্য কোনও ব্যবসায়ী বোধহয় মনে করিয়াছে—বিজ্ঞাপনে তাহার নাম ব্যবহার করিলে সহজেই সে তাহার ব্যবসায়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—সাইনস যে-পত্র লিখিয়াছে, উহা পাঠ করিয়া মনে হয়, আর বারো-ঘণ্টার মধ্যেই জনসাধারণ উহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাইবে। সাইনসের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার আশা করা, আর আগ্নেয়গিরির ধারে দাঁড়াইয়া তাহার অগ্ন্যুদগমের প্রতীক্ষা করা অনেকটা একইরকম আতঙ্কজনক! তোমাদের চীফ কমিশনর এ-সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমাদের বড়সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার না শোনাই ভালো মনে হয়। আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি সাইনস শীঘ্র ধরা না পড়ে তাহা হইলে মান বাঁচাইবার জন্য আমাদের অনেককেই ইস্তফানামা দাখিল করিতে হইবে। লন্ডনের অধিকাংশ বাড়ির দ্বার-জানালা চূর্ণ হইবার পর আমাদের চাকরি বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে! শুনিতেছি, শীঘ্রই হোম-অফিস হইতে তদন্ত আরম্ভ হইবে। সেই তদন্তের ফল আমাদের কাহারও পক্ষে কল্যাণজনক হইবে বলিয়া তো মনে হয় না।

স্মিথ বলিল,—কিন্তু হোম-অফিস পুলিশের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে কাজটা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কাচ-ভাঙা ব্যাপারের তদন্তে যতখানি সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট নহে? সাইনস যেভাবে বাধা পাইয়াছে এবং পুলিশের তাড়া খাইয়া যন্ত্রপাতি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে—তাহাতে আশা হয় সে আর কখনও ওইরূপ অপকর্মে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহসী হইবে না।

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স যে-গাড়িতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতীক্ষায় রাখিয়া তাহার ভাড়া বহন করিবেন, কোনওদিন তাঁহার সেইরূপ অপব্যয়ের অভ্যাস ছিল না। তিনি তাহা পূর্বেই বিদায়

BanglaBook.org

করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের তিনজনকেই পদব্রজে চলিতে হইল। তাঁহারা অক্সফোর্ড সার্কাস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে ততদূর যাইতে হইল না। তাঁহারা প্রায় তিনশত গজ অগ্রসর হইয়া বহুসংখ্যক পথিককে পথের উপর দলবদ্ধ দেখিতে পাইলেন, তাহারা অদূরবর্তী গৃহপ্রাচীর-সংলগ্ন একখানি প্ল্যাকার্ড পাঠ করিতেছিল। সেই প্ল্যাকার্ডখানির বর্ণও পীত এবং তাহার আকার বৃহৎ। সেই প্ল্যাকার্ডে লালবর্ণ বৃহৎ অক্ষরে লেখা ছিল,—

'তুমি কি পল সাইনস?'

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নির্নিমেষ নেত্রে সেই প্ল্যাকার্ডখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কী কারণে বলা যায় না, তাঁহার মন সন্দেহে ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল। সেই পীতবর্ণ প্ল্যাকার্ড তাঁহার মনশ্চক্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিল। পল সাইনস সেইদিনই তাঁহাকে জানাইয়াছিল, সে পুনর্বার কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যেদিন সে তাহার পুত্রদ্বয়কে কারাগার হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়াছিল, ঠিক সেইদিনই পীত প্ল্যাকার্ডে তাহার নাম প্রকাশিত হইল; এই উভয় বিষয়ের মধ্যে কোনও নিগূঢ় সংস্রব আছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পল সাইনসই লন্ডনের জনসাধারণকে আতঙ্কাভিভূত করিবার জন্য এই প্ল্যাকার্ড বাহির করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জনতা ঠেলিয়া সেই দেওয়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাচীর-সন্নিবিষ্ট প্ল্যাকার্ডখানি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—বিজ্ঞাপন-প্রচারক বিলিংস কোম্পানি এই প্ল্যাকার্ড প্রচার করিতেছে। কুট্‌স, এই প্ল্যাকার্ড সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিতে হইবে। এই সকল প্ল্যাকার্ড দেখিবার জন্য যেরূপ জনসমাবেশ হইতেছে তাহা আপত্তিজনক বলিয়াই মনে হয়; শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছি।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—যদি আমাকে এই—কী বলিব, বিজ্ঞাপন না ইঙ্গিতের প্রচার বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমাকে এই বিজ্ঞাপনের অর্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। আমি তো ইহার কোনও অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি আমার সঙ্গে চলো, আগেই বিলিংস কোম্পানির কৈফিয়ৎ লওয়া প্রয়োজন।

তাঁহারা রিজেন্ট স্ট্রিটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই পথের ধারে বিভিন্ন স্থানে ওইরূপ প্ল্যাকার্ড আরও কয়েকখানি দেখিতে পাইলেন, সেখানেও বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া সেইসকল প্ল্যাকার্ড দেখিতেছিল। বিপুল জনসমাগমে সেইসকল স্থানে শকটাদির গমনাগমন বন্ধ হইয়াছিল।

স্মিথ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল,—কর্তা, ওদিকে ও কী ব্যাপার তাহা দেখিয়াছেন কি? বোধহয় কোনও নূতন কাগজ প্রকাশিত হইবে, তাহারই রাশি-রাশি অনুষ্ঠান-পত্র বিতরিত হইতেছে!

মিঃ ব্লেক স্মিথের অঙ্গুলি-নির্দেশে পথের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ছয়-সাতজন লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অদ্ভুত বেশে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহাদের বুকে পিঠে সুদীর্ঘ তক্তার আবরণ; সেই তক্তায় মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা ছিল ঃ

'তুমি কি পল সাইনস?'
২০০০ পাউন্ড পুরস্কার!
বিশেষ বিজ্ঞাপন দেখিতে চাহেন?
"হই-হই-রই-রই কাণ্ডে" দেখুন!
প্রথম সংখ্যা বিক্রয় হইতেছে।

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিজ্ঞাপন-শোভিত তক্তার দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—আরে বাপের বাড়ি গেল যা! এ আবার কী ব্যাপার? একি ফ্লিট স্ট্রিটের নূতন কোনও হুজুগে কাগজের বিজ্ঞাপন? কাগজের নাম 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড'! এ নামের কোনও কাগজ আছে, তাহা তো পূর্বে জানিতাম না! হই-হই-রই-রই কাণ্ড! হ্যাঁ, নামটা জমকালো বটে; অনেক হুজুগে চাষাভুষো নগদ দুই পেনি ফেলিবে আর উহা কিনিবে। তাহার উপর দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কার! কচুপোড়া খাও! পুরস্কার কেন রে বাপু? —ইন্সপেক্টর কুট্‌স সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ঘরপোড়া গরুর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—পুরস্কার কেন, তাহা যদি জানিতে চাও তাহা হইলে দুই পেনি ফেলিয়া একখানি কাগজ কিনিয়া লও। দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কারের লোভ না দেখাইলে ও-কাগজ কি কেহ কিনিত? একটাকার জিনিস বিক্রয় করিতে তিনটাকার ফাউ উপহার দেওয়া হয়, তাহা কি জানো না? স্মিথ, ওই কাগজের দোকান হইতে একখানা 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' কিনিয়া আনো।

স্মিথ দোকানের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—আর এক কপিও নাই কর্তা! গরম গরম ফুলুরির মতো সব উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, স্মিথ আরও কয়েকখানি দোকানে ঘুরিয়া অবশেষে হলদে মলাটের একখানি পত্রিকা কিনিয়া আনিল; সে তাড়াতাড়ি কাগজখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিল এবং মিঃ ব্লেককে বলিল,—কাগজ বিক্রয়ের জন্য ইহারা চমৎকার ফন্দি বাহির করিয়াছে কর্তা! ইহারা কুড়িজন লোককে পল সাইনসের মতো চেহারায় সজ্জিত করিয়া আজ বেলা বারোটা হইতে একটা পর্যন্ত পথে বাহির করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের পকেটে একশত পাউন্ডপূর্ণ এক-একটি থলি থাকিবে। সেই টাকাগুলি তাহারা পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যেই পকেটে রাখিবে। আপনি এই কাগজ একখানি কিনিয়া লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং তাহা একজনের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কি পল সাইনস?' যদি আপনি তাহাকে সাইনস বলিয়া সন্দেহ করেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পাঁচ পাউন্ডের একখানি খাসা আনকোরা নোট বাহির করিয়া দিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—কাগজের ব্যবসাটা জমকাইয়া তুলিবার জন্য এ আবার কীরকম ফিকির রে বাবা! উহারা ফৌজদারির আসামী পল সাইনসকে লইয়া টানাটানি করিতেছে কেন? কাজটা বেআইনি, ইহা কি উহারা বুঝিতে পারিতেছে না? এ রকম চালবাজি সরকার হইতে অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু ওই যে কাগজ—'হই-হই-রই-রই কাণ্ড'—উহার সম্পাদক তোমার সঙ্গে একমত হইবে কি না সন্দেহ, কুট্‌স! সে এই সংখ্যাতে আত্ম-সমর্থনের জন্য যাহা লিখিয়াছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। সে বলিতেছে—এই কার্যে পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে এবং সাইনসের চেহারার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। তাহারা এই কার্যে পুলিশকে সাহায্যই করিবে এবং নকলের পরিবর্তে আসল সাইনস একদিন ধরা পড়িতেও পারে। ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে খুঁজিতে-খুঁজিতে কোনও ঝোপে আসল নেকড়ে দেখিতে পাওয়াই সম্ভব। আর যদি সে ধরা পড়িবার ভয়ে বাহিরে না আসে, তাহা হইলে তাহার অত্যাচারের আশঙ্কাও হ্রাস হইবে। কেহই তাহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না এবং যে-ব্যক্তি তাহার চেহারার সর্বাপেক্ষা অনুরূপ চেহারার লোককে প্রশ্ন করিবে, সে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার পাইবে; এজন্য তাহার ঠিক চেহারার দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকিবে। যে-কুড়িজন সাইনস সাজিবে তাহাদের সকলেরই ছদ্মবেশ নিখুঁত হইবে—ইহা অবশ্যই আশা করা যায় না।

মিঃ ব্লেক নতমস্তকে কয়েক মিনিট কাগজখানি দেখিয়া পুনর্বার বলিলেন,—এই দেখো, ইহারা পল সাইনসের একখানি ফটোও প্রকাশ করিয়াছে;—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে পল সাইনসের যে-ফটো লওয়া হইয়াছিল—ইহা সেই ফটোর অবিকল প্রতিকৃতি। এই ফটোতে অসাধারণত্ব নাই, এরূপ চেহারার দুই-একডজন লোককে প্রতিদিন পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কিন্তু পল সাইনস একজনের অধিক নাই; যদি হাজার লোক

BanglaBook.org

তাহার ছদ্মবেশে পথে বাহির হয়, তাহা হইলেও আমি আসল লোকটিকে তাহাদের ভিতর হইতে চিনিয়া বাহির করিতে পারিব। কাগজওয়ালা যে-ফন্দি খাটাইয়াছে তাহা নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে হইতেছে না। পল সাইনস যাহাতে ধরা পড়িতে পারে, এ-বিষয়ে পুলিশ ইহা দ্বারা কতকটা সাহায্য পাইবে না কি?

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু একটু আগে তুমি অন্য সুর বাহির করিয়াছিলে। আসল সাইনস ইহাদের এই ব্যবস্থায় উপকৃত হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হয় না? পুলিশের কাজ আরও কঠিন হইবে না, এ-কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারো?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—তোমার কথার মর্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমার কথার মর্ম এই যে, পল সাইনসের চেহারার এত লোক লন্ডনের পথে-পথে বিচরণ করিবে যে, আসল সাইনস সেই দলে মিশিয়া সরিয়া পড়িলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা অসাধ্য হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ভ্রূভঙ্গি করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত এভাবে কুঞ্চিত করিলেন যে, তাঁহার গোঁফ সজারুর মতো কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,—বটেই তো, ও-কথা আমার মনে হয় নাই, পুলিশ সারাদিনে কতগুলো সাইনসকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিবে? তাহাদের কাজ বিস্তর বাড়িয়া যাইবে না?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, পুলিশ সারাদিন 'ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে' দেখিবে এবং তাহাদিগকে পালে-পালে গ্রেপ্তার করিয়া শেষে এরূপ বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হইবে যে, আসল সাইনস তাহাদের পাশ দিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিবে। তাহার প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—তুমি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছ ব্লেক! এই অদ্ভুত হুজুগের সঙ্গে পল সাইনস বা তাহার কোনও অনুচরের সংস্রব থাকা কি সম্ভবপর বলিয়া তোমার মনে হয় না?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনস বা তাহার দলের লোকেরাই কোনও দুরভিসন্ধিতে এই নূতন হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে—এ কথা নিশ্চিন্ত রূপে বলা কঠিন; তবে এই নূতন কাগজের মালিককে সতর্কভাবে দুই-একটি প্রশ্ন করা অসঙ্গত হইবে না। পল সাইনসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই যে কৌশলপূর্ণ অনুষ্ঠানের অবতারণা হইয়াছে, ইহা রহিত করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়াই আমার মনে হয় কুট্‌স! 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অনুষ্ঠাতারা তাহাদের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে-সকল লোককে সাইনসের ছদ্মবেশে সাজাইয়া পথে বাহির করিয়াছে, তাহাদের সকলকে ফিরাইয়া লইবার জন্য উহাদিগকে বাধ্য করাই উচিত। উহারা পুলিশের কর্তব্যপালনে বাধা দিতেছে—এই অভিযোগে উহাদের আরব্ধ কার্য বন্ধ করিতে পারো। ও আবার কী? কী হইল তোমার?

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ইন্সপেক্টর কুট্‌স হঠাৎ এভাবে লাফাইয়া উঠিলেন যেন কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল! তাঁহার দুই চক্ষু যেন অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল; তিনি উত্তেজিতভাবে মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন,—ব্লেক, দেখো-দেখো! ওই লোকটা দোকানের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া আছে—দেখিয়াছ? ওই লোকটাই আসল পল সাইনস; উহার ছদ্মবেশ যেন সোনার উপর গিলটি! আমি উহাকে ঠিক চিনিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ঃ কুট্‌সের ভাগ্যে পাঁচ পাউন্ড

ইন্সপেক্টর কুট্‌স দোকানের সম্মুখস্থিত যে-লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন, মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই লোকটির মুখের দিকে চাহিলেন। দশ-বারো গজ দূরে একখানি জহরতের দোকান ছিল, একজন লোক সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালাস্থিত জহরতগুলি পরীক্ষা

BanglaBook.org

করিতেছিল, তাহার মাথায় রেশমীবস্ত্র-মণ্ডিত টুপি, হাতে গজদন্তের হাতলের ছাতা, উভয় হস্ত দস্তানায় আবৃত। তাহার মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল না; মুখ বিবর্ণ, বার্ধক্যভরে তাহার দেহ ঈষৎ কুব্জ।

তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্রেক বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লোকটা যে পল সাইনস—ইহা তিনিও অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

স্মিথ বলিল,—কর্তা, উহার মুখ দেখিলেন কি? আপনার কী মনে হইল? আমারও বিশ্বাস —ওই লোকটাই আসল সাইনস; ও সাইনস ভিন্ন ছদ্মবেশী অন্য লোক নহে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, ওই লোকটাই পল সাইনস। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার কান মলিয়া দিও ব্রেক। সেপটিমস কস আজ জেলখানায় আমাকে বলিয়াছিল, পল সাইনসকে আজ লন্ডনের পথে হাঁটিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। তাহার এ-কথা মিথ্যা নহে। আমি এই মুহূর্তেই পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিব। তুমি এখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে পথ পার হইলেন, এবং পূর্বোক্ত লোকটি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার ঠিক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সেই লোকটির দৃষ্টি তখনও জহরতের দোকানের বাতায়নে সন্নিবদ্ধ। একখানি থালায় কয়েকটি স্বর্ণমণ্ডিত ও হীরক-রত্ন-খচিত ঘড়ি সজ্জিত ছিল; সে কৌতূহলভরে সেই ঘড়িগুলি দেখিতেছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গ্রেপ্তারের ভঙ্গিতে তাহার স্কন্ধে আচম্বিতে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন,— রকম কী হে পল সাইনস? বেশ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের এই সম্ভাষণে লোকটির ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; তাহার মুখে ভয় বা বিস্ময়ের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না। সে ধীরে-ধীরে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কঠোর গম্ভীর ক্রূর নেত্রের উপর ভাবসংস্পর্শহীন অচঞ্চল নীল চক্ষু-তারকা স্থাপিত করিয়া মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থাকিল, তাহার পর তাঁহার হাতের পীতবর্ণ কাগজখানি লক্ষ্য করিয়া যেন ঈষৎ বিরক্তিভরে মাথা নাড়িল, এবং অস্ফুট স্বরে বলিল,—কথাগুলি যেভাবে আপনার বলা উচিত ছিল, আপনি তাহা সেভাবে বলেন নাই; আপনি কাগজখানি কিনিয়াছেন, কিন্তু কীভাবে প্রশ্ন করিতে হয়—তাহা কি লক্ষ্য করেন নাই? আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—'তুমি কি পল সাইনস?' তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি বলিলেন,—'রকম কী হে পল সাইনস?' যাহা হউক, আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় নিয়মের যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন, আপনার এই ত্রুটি আমি উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন আপনার আরও একটু ত্রুটি হইয়াছে। ওইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যে-সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই আপনার ভাগ্য-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন। বারোটা বাজিবার পূর্বে আপনার আসা উচিত হয় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন; লোকটি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল—বারোটা বাজিয়া দুই মিনিট অতীত হইয়াছে। সে ঘড়িটি পকেটে রাখিয়া বলিল,—হ্যাঁ, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। আমি আমাদের কাগজের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি—আপনি এত শীঘ্র আমাকে পল সাইনসের অবিকল ব্যক্তিরূপে চিনিতে পারিবেন, ইহা আশা করি নাই। আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে, সুতরাং 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র প্রতিশ্রুত পুরস্কার আপনার প্রাপ্য।

লোকটি পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোট বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দিল। কুট্‌স হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই নোটখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভের আশা ছিল; ধরা পড়িয়া পল সাইনসই তাঁহাকে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দিল? অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স লোকটির দস্তানা-ঢাকা হাতের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে নিজের ভ্রম বুঝিতে

BanglaBook.org

পারিলেন। তিনি পল সাইনস বলিয়া যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিলেন—তাহার বাঁ-হাতের দুটি আঙুল নাই দেখিলেন। তাহার বাম হস্তে তিনটিমাত্র অঙ্গুলি বর্তমান! এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পল সাইনস নহে। সে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক নবপ্রকাশিত পত্রিকার কোনও প্রতিনিধি, পল সাইনসের ছদ্মবেশধারী কোনও কর্মচারী। তাহাকে পল সাইনস বলিয়া সন্দেহ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ভ্রম—ইহা বুঝিতে পারিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—কী বিড়ম্বনা! আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমিই পল সাইনস!

লোকটি হাসিয়া বলিল,—তোফা! আমার ছদ্মবেশের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রশংসাপত্র পাইবার আশা করি নাই দারোগা সাহেব! নমস্কার! লোকটা তৎক্ষণাৎ একখানি চলন্ত বাসে লাফাইয়া উঠিয়া বাসের আরোহীগণের ভিতর বসিয়া পড়িল। বাসখানি তাহাকে লইয়া পিকাডেলী সার্কাস অভিমুখে ধাবিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হতভম্বভাবে পথের অন্য ধারে মিঃ ব্লেক ও স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপদস্থ ভাব দেখিয়া স্মিথ হাসি চাপিতে না পারিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল। মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—আসামী পাকড়াইলে না কুট্‌স?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিব্রতভাবে বলিলেন,—এমন ঝকমারিতেও মানুষ পড়ে! লোকটা ছদ্মবেশ-ধারণে পাকা ওস্তাদ! প্রথমে দেখিয়া আমি উহাকে পল সাইনস বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিলাম, অবিকল সেই চেহারা।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, দূর হইতে দেখিয়া উহাকে পল সাইনস বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু নিকটে গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ভ্রম বুঝিতে পারা যাইত; বিশেষত পল সাইনসের বাঁ-হাতের কোনও আঙুল কাটা ছিল না।

স্মিথ বলিল,—আপনার তো আক্ষেপের কারণ কিছুই নাই; আপনি ফাঁকি দিয়া পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার আদায় করিয়াছেন, অথচ যে-কাগজ দেখাইয়া নোটখানি পাইলেন, সেই কাগজখানা পর্যন্ত আপনাকে কিনিতে হয় নাই! কাগজখানা লইয়া এবার আমি ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এবার আমার পালা।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিলেন,—এ-টাকায় আমাদের তিনজনের একরাত্রির খানার জোগাড় হইবে; কিন্তু ব্লেক, তোমার কথাগুলা খুব সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। ওই রকম কুড়িজন লোক পল সাইনসের ছদ্মবেশে লন্ডনের পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে লন্ডনের পুলিশ-প্রহরীদের দলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এক সাইনসে রক্ষা নাই, এককুড়ি সাইনস লন্ডনের বিভিন্ন পথে ভ্রাম্যমান! বাপ! লন্ডনের শান্তি-শৃঙ্খলা কিছুই বজায় থাকিবে না। উহাদের মতলবের মধ্যে বিলক্ষণ বদমায়েশি আছে—এ-বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নাই। এই হই চই কাণ্ডের অফিসটা কোন দিকে?

স্মিথ কাগজখানি পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিল, সে তাহা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল,—এই যে ঠিকানা আছে, নিউটন স্ট্রিট—স্ট্র্যান্ড।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার পাশে বসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে স্মিথ বলিল,—এরকম ছজুগ অল্পদিনের মধ্যে আপনারা দেখিয়াছেন কি? পথ দিয়া যত লোক যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনের হাতে এক-একখানি 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড'! পল সাইনসের ফটোর সঙ্গে যাহাদের চেহারার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আছে—তাহাদিগকেই উহারা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—'তুমি কি পল সাইনস?' ওই দেখুন, একজন কনস্টেবল একজন পথিককে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; অথচ যে-কোনও অন্ধজনও বলিতে পারে—ও-লোকটা সাইনস নহে।

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, পল সাইনসের চাতুর্য-

BanglaBook.org

জাল ভেদ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; তাহার ফন্দি-ফিকির সাধারণের দুর্বোধ্য। 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক পত্রিকার বিপুল প্রচারের জন্য যে-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোনও দুরভিসন্ধি আছে—ইহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে না বটে, কিন্তু পল সাইনস কোনও গুপ্ত দুরভিসন্ধির বশবর্তী হইয়াই নূতন কাগজ প্রচারের ছলে এই হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলেই কাগজখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এইসকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—পুলিশকে অপদস্থ ও বিব্রত করিয়া পল সাইনসের স্বাধীনভাবে ও অসঙ্কোচে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই কাগজখানির আবির্ভাব। পুলিশ ভ্রমক্রমে একদল লোককে পল সাইনস মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিবে; কিন্তু তাহার ফলে তাহাদিগকে অপদস্থ হইতে হইবে। তখন কাহাকেও দেখিয়া সাইনস বলিয়া ধারণা হইলেও পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া সঙ্গত মনে করিবে না। যাহা হউক, এই অদ্ভুত কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। কাজটা তেমন কঠিন হইবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—নিউটন স্ট্রিটের একটা পুরাতন অট্টালিকার তেতলায় তাহার অফিস। তাহার অফিসে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হইবে না। আমি ভাবিতেছি—সম্পাদকটি পল সাইনসের আর-এক পুত্র নয় তো?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না; তবে পল সাইনসকে ততদূর নির্বোধ মনে করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

তাঁহারা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তেতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে একটি যুবতী একটা টাইপ-রাইটারের সম্মুখে বসিয়া খটাখট শব্দে একখানি চিঠি টাইপ করিতেছিল। সেই কক্ষের এককোণে একটি বালক কতকগুলি লেফাফা আঁটিতেছিল; এবং তাহার কিছু দূরে একটি দীর্ঘদেহ যুবক একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া, কানে পেন্সিল গুঁজিয়া প্রুফ দেখিতেছিল। টেবিলখানি নানাপ্রকার কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—যুবকটি ইংরেজ নহে, মার্কিন মুলুকের আমদানি!

যুবকটি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া খনখনে আওয়াজে বলিল,—ওয়াল! অচেনা মহাশয়েরা কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমি—কি বলে—'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক নতুন হুজুগে কাগজের—ওর নাম কি—সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী।

যুবক বলিল,—সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী? তাঁহার দর্শনলাভ দুর্ঘট নহে, যেহেতু 'অহং' সেই ব্যক্তি অর্থাৎ সম্পাদক এবং আমার নাম কেনী—মিলট-ই কেনী। শুনিলেন তো আমিই সম্পাদক; এখন বলুন, আমাকে দেখিতে আসিবার কারণ কী? তাহার পর আস্তে-আস্তে খসিয়া পড়ুন, কারণ আজ এখনও পর্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সরোষে বলিলেন,—তোমার সম্পাদকীয় স্তম্ভ চুলোয় যাক। তুমি সম্পাদক; তোমাদের কাগজের মালিক কে?

যুবক বলিল,—স্বত্বাধিকারী কে, তাহাও জানিতে চান? আপনার কৌতূহল যে—ওর নাম কি—বেজায় রকম বেশি! তা আপনার এই কামনা পূর্ণ করিতেও আমার আপত্তি নাই; আমি মিলট-ই কেনী এই কাগজের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী! একাধারে আমিই সব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমি একজন পুলিশ অফিসার। আমার এখানে আসিবার কারণ—।

কেনী কাগজ কাটিবার নিকেলের লম্বা ছুরিখানি তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—তবে কি আমার আর-একজন অনুচরও পুলিশের মুঠোর ভিতর পড়িয়াছে? পল সাইনসকে লইয়া আমরা যে-চালটি চালিয়াছি তাহাতে আমাদের কাগজ সত্যই চারিদিকে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' উপস্থিত রিয়াছে। এ বড়ই সু-সংবাদ। কিন্তু গত আধঘণ্টা হইতে

BanglaBook.org

পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে আমি যে লবেজান হইলাম দারোগা সাহেব! ফোন মুখে লইয়া কেবলই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইতেছে। আমি বলিয়াছি—পল সাইনস আমাদের অফিসে চাকরিতে বহাল হয় নাই; কোনওদিন সে আমাদের চাকর ছিল না—সম্পাদকীয় বিভাগেও নয়, বিজ্ঞাপন বিভাগেও নয়। পুলিশ দেখিতেছে—তাহার মতো চেহারার লোককে সাইনস সন্দেহে ধরিলেই তাহার নিকট হইতে পাঁচ পাউন্ডের নোট বকশিস মিলিতেছে! কিন্তু সাইনসের সহিত তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের একজনও পল সাইনস নহে। কাগজখানাকে দাঁড় করাইবার জন্য যে-ফিকির খাটাইয়াছি—তাহা সফল হইয়াছে দেখিতেছি; চারিদিকে সত্যই 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' আরম্ভ হইয়াছে বটে!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, তা হইয়াছে বটে; কিন্তু আমি তোমাকে একটু সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি পল সাইনসকে লইয়া এই রকম 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' চালাইতে থাকো—তাহা হইলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। আমরা তোমাকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিব; তোমরা পথে অবৈধ জনতা ঘটাইয়া শান্তিভঙ্গ ও দাঙ্গার সূচনা করিতেছ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। তোমাদের কার্যে রাজপথে সাধারণের গমনাগমন বন্ধ হইতেছে। এজন্য আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি তোমার ঘটে একবিন্দু বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে আমার উপদেশে তুমি কর্ণপাত করিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া সম্পাদক-প্রবরের চক্ষুতে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট হইল। সে যে-কাগজ-কাটা ছুরিখানি হাতে লইয়া আন্দোলিত করিতে-করিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথাগুলি শুনিতেছিল—সেই ছুরি সে ক্রোধ ভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল,—কী! কী বলিলে? তোমার উপদেশে আমাকে কর্ণপাত করিতে হইবে? আমি যে-বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আমার কাগজখানিকে জাঁকাইয়া তুলিতেছি, সেরূপ চটকদার বিজ্ঞাপন এই ফ্লিট স্ট্রিটের কোনও সম্পাদকের মাথায় গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে স্থান পায় নাই; সেই বিজ্ঞাপন আমি তোমার তাড়ায় বন্ধ করিব? তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ দারোগা সাহেব? আমি তোমার হুমকিতে ভয় পাইব?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন-প্রচারের কৌশলটা খুব চটকদার বটে, লক্ষণ ফন্দিপূর্ণ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই ফন্দিটা কি তোমার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে—না কেহ তোমাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছে?

সম্পাদক বলিল,—হ্যাঁ, আলবৎ আমার মাথায় গজাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের কৌশলে কাগজগুলা কীভাবে বিক্রয় হইতেছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? কাল সকালে আমি কুড়ি লাখ কাগজ বিক্রয়ের আশা করিতেছি। এরূপ অব্যর্থ ফন্দি আমি আর কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়াছি—ইহাই কি তোমাদের বিশ্বাস?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কোনও কথা না বলিয়া নতমস্তকে মিঃ ব্লেকের পায়ের দিকে চাহিলেন। তিনি দেখিলেন—সম্পাদক-নিক্ষিপ্ত কাগজ-কাটা নিকেলের ছুরিখানা মিঃ ব্লেক মেঝের উপর হইতে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া জুতার সুকতলার উপর রাখিলেন, তাহার পর জুতা পরিয়া ফিতা বাঁধিলেন।

মিঃ ব্লেক চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—এরূপ অব্যর্থ ফন্দি তুমি আর কাহারও নিকট লাভ করিয়াছ কি না তাহা তুমি তো নিজেই জানো; তবে যদি আমাদের বিশ্বাসের কথা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাও তোমাকে বলিতে বাধা নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ফন্দিটি তুমি চতুর-চূড়ামণি পল সাইনসের নিকট লাভ করিয়াছ।

মুহূর্তের জন্য সম্পাদকের চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ অবজ্ঞাভরে বলিল,—কে জানিত যে তোমরা এরকম নিরেট! সাইনস যাহাতে সহজে ধরা পড়ে—এই উদ্দেশ্যেই আমি পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি; আর তুমি আমাকেই তাহার দলের লোক ভাবিয়া সন্দেহ করিতেছ, আবার ভয়ও দেখাইতেছ! পুলিশের অপার মহিমা!

BanglaBook.org

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন,—তুমি বাজে কথায় আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি যে-প্রণালীতে কাজ করিতেছ—ইহাতে সাইনসের অপকার না হইয়া উপকার হইবে এবং পুলিশ যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিবে; সাইনসকে গ্রেপ্তার করা তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিবে।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেনীর হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি যাহাদিগকে সাইনসের দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকের হাত দেখিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন—সাইনসের প্রত্যেক পুত্রের বামহস্তে উল্কিদ্বারা নেকড়ের মস্তক অঙ্কিত আছে। বিশেষত, পল সাইনসের জীবিত বিশিষ্ট পুত্রেরা কোথায় কীভাবে বাস করিতেছিল—তাহা তিনি জানিতেন না।

মিঃ ব্লেক সম্পাদকের হাতে উল্কি-চিহ্নের সন্ধান পাইলেন না। সুতরাং সে পল সাইনসের পুত্র নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের কথাগুলি শুনিয়া নীরব রহিল দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিচলিতস্বরে বলিলেন,—হুম! আমার বন্ধুর কথা তোমার বোধহয় ভালো লাগিল না; বোবার শত্রু নাই ভাবিয়া মুখ বুজিয়া বসিয়া আছ! কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া যাইতেছি—যদি তুমি ওইরকম ইস্তাহার বন্ধ না করো—ওইভাবে পল সাইনসকে পলায়নে সাহায্য করো—তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্যে তোমার বুজরুকি বন্ধ করিয়া দিব। তোমাদের কোনও অনুচরকে পল সাইনস সাজাইয়া পথে আর বাহির করিতে পারিবে না।

সম্পাদক বলিল,—তোমার এই হুকুমই বলো, আর অনুরোধই বলো—আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলাম; আমি আমার কাগজের প্রচার-বৃদ্ধির জন্য যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা বেআইনিও নয়, অসঙ্গতও নয়। আমার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈধ। তোমাদের কোনও-কোনও প্রধান সংবাদ-পত্র এই প্রণালীতে পসার জমকাইয়া আজ প্রচুর অর্থ ও মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছে। যদি এই ব্যাপার লইয়া কোনও বিভ্রাট ঘটে বা শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা হইলে দারোগা আর মিঃ ব্লেক—তুমিও সেজন্য দায়ী হইবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমাকে কি তুমি চেনো?

সম্পাদক বলিল,—ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেককে যে না চেনে—লন্ডনে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। হ্যাঁ, ইংলন্ডের সকল সম্পাদকই রবার্ট ব্লেককে চেনে। আমরা তোমার নিকট পল সাইনসের দুঃসাহস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাইবার আশা করিতে পারি কি? প্রবন্ধটিতে এক হাজারের অধিক শব্দ থাকিবে না। তাহার জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—তোমার কাগজে আমরা প্রবন্ধ লিখিব! তোমার স্পর্ধা তো অল্প নয়! আমরা এখন চলিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিও—এইভাবে তোমার কাগজের বিজ্ঞাপন-প্রচার বন্ধ না করিলে তোমার বিপদ অনিবার্য। আমি তোমার দলের প্রত্যেক লোককে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিব এবং তুমি যেভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছ—ওইভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিব।

সম্পাদক বলিল,—তোমার যাহা সাধ্য করিও; আমাকে ওভাবে ভয় দেখাইয়া কোনও ফল হইবে না। চালবাজি ছাড়িয়া দিয়া দুই একখান কাগজ কিনিয়া একবার নিজেদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখো—পাঁচ-পাঁচ পাউন্ড লাভ হইতেও পারে। আমরা দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি—তাহা বোধহয় বিজ্ঞাপনেই দেখিয়াছ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—হ্যাঁ, দেখিয়াছি; তোমাদের এই জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি আমি আজই বন্ধ করিয়া দিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সবেগে সম্পাদকের অফিস পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিলেন এবং মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—বড়সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ না করিলে চলিতেছে না, ব্লেক! এই ইয়াঙ্কিটা সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। লোকটাকে তুমি চেনো কি?

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—না; তবে উহাকে পূর্বে কোথায় যেন দেখিয়াছি—এইরূপ

BanglaBook.org

মনে হইতেছে। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না; সম্ভবত ফ্লিট স্ট্রিটেই দেখিয়া থাকিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—উহার কাগজ-কাটা ছুরিখান টেবিল ডিঙাইয়া মেঝের উপর পড়িবামাত্র তাহা জুতার ভিতর চালান করিলে! ইহার কারণ কী?

মিং ব্লেক বলিলেন,—অঙ্গুলি-চিহ্নের পরীক্ষা। কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; দাঁড়াও, ছুরিখানা বাহির করি। তিনি জুতা খুলিয়া ছুরিখানি জুতার ভিতর হইতে বাহির করিলেন এবং তাহা একখানি রুমালে মুড়িয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হাতে দিয়া বলিলেন,—এখানি তোমাদের অফিসে লইয়া যাও। কেনীর অঙ্গুলি-চিহ্ন তোমাদের অফিসের খাতায় আছে কি না মিলাইয়া দেখিও। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স রুমাল-মোড়া ছুরিখানি পকেটে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেই অদূরে একটি লোককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই লোকটি ফ্লিট স্ট্রিট হইতে সেইদিকে আসিতেছিল। পল সাইনসের চেহারার সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। ইন্সপেক্টর কুট্‌স কিছুকাল পূর্বে রিজেন্ট স্ট্রিটে যে-লোকটির নিকট পাঁচ পাউন্ডের নোট পাইয়াছিলেন, এ ঠিক সেই লোক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; পরিচ্ছদও সেইরূপ। কিন্তু ইহার হাতে ছাতা বা আঙুল কাটা ছিল না।

স্মিথ লোকটিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল,—এ-লোকটা কি পল সাইনস, না তাহার ছদ্মবেশে অন্য কেহ?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুহূর্তকাল ইতস্তত করিয়া আগন্তুকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন,—তুমি কি পল সাইনস?

আগন্তুক বাতাসে মাথা ঠুকিয়া তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া শার্টে আঁটা ধাতুনির্মিত একখানি পদক দেখাইল; তাহার উপর লেখা ছিল—'হই-হই-রই-রই কাণ্ড।' অনন্তর সে নিম্নস্বরে বলিল,—হ্যাঁ, তুমি পুরস্কার লাভের যোগ্য বটে, কিন্তু পুরস্কার লইতে হইলে আজকার 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' দেখাইতে হইবে, সেই কাগজখানি তোমার বাহির করা উচিত ছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হাতড়াইয়া কাগজ পাইলেন না, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—কাগজখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

তিনি কাগজখানি স্মিথের অনুরোধে তাহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ তাহা লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল; কিন্তু ট্যাক্সি হইতে নামিবার সময় তাহা সঙ্গে লইতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

আগন্তুক বলিল,—তোমার দুর্ভাগ্য! আজকার তারিখের কাগজ দেখাইতে না পারিলে তুমি পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার পাইবে না। তোমার প্রশ্ন অসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু কাগজের অভাবে পুরস্কারে বঞ্চিত হইলে; আশাকরি ভবিষ্যতে তোমার ভাগ্যে পুরস্কার মিলিবে।

লোকটা পাশ কাটাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স ক্ষুব্ধভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন।

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল,—বুদ্ধির দোষে পাঁচ পাউন্ড হাতছাড়া হইল!

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—কিন্তু আসল কি নকল তাহা ঠাহর হইল না।

BanglaBook.org

তৃতীয় প্রসঙ্গ ঃ পিতার আদেশ

পল সাইনস নদীতীরবর্তী পথ ধরিয়া চেয়ারিংক্রশ অভিমুখে চলিতে লাগিল; সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল; সাফল্য-গর্বের হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের ন্যায় মহাশত্রুর শ্যেনদৃষ্টিকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে সে ছদ্মবেশ ধারণের সময় কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক চেহারার কিছু-কিছু পরিবর্তন করিয়াছিল। সে গালের ভিতর রবারের পুঁটুলি পুরিয়া দিয়াছিল এবং একপাটি বৃহদাকার কৃত্রিম দন্তও ব্যবহার করিয়াছিল। সে দক্ষিণ দিকের চোয়ালের উপর চর্বিদ্বারা একটি লাল এঁচুলি নির্মাণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে যে-সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ দূর হইল না; সে আসল কি জাল সাইনস তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

সাইনস ট্রাফালগার স্কোয়ারে উপস্থিত হইবার পূর্বে দুইজন লোক পর-পর তাহার গতিরোধ করিল এবং কাগজ দেখাইয়া বলিল,—তুমি কি পল সাইনস? সে দুইবার সংবাদ-পত্রের নিয়োগ-চিহ্ন দেখাইয়া ও প্রত্যেককে পাঁচ পাউন্ডের নোট পুরস্কার দিয়া মুক্তিলাভ করিল। অবশেষে নীল পরিচ্ছদধারী একজন পুলিশম্যান তাহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিল,—মহাশয়, আমার ধৃষ্টতা মাফ করিবেন, কিন্তু—।

পল সাইনস তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল,—দেখো কনস্টেবল, আজ সকাল হইতে পর-পর ছয়বার আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু এই দেখো আমার চাকরির চিহ্ন। ইহা দেখাইয়া প্রত্যেকবার আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি। ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। এখন বেলা একটা বাজে, আমার কাছে আর-একখানি মাত্র পাঁচ পাউন্ডের নোট অবশিষ্ট আছে; তোমার কাছে যদি আজকার এক কপি 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' থাকে তাহা তুমি দেখাইতে পারিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

কনস্টেবল তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত পুরিয়া হলদে মলাটের একখানি কাগজ বাহির করিল; পল সাইনস সেই কাগজখানি দেখিয়া, তাহার হাতে পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোট গুঁজিয়া দিল এবং হাসিয়া বলিল,—'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র সম্পাদকের সসম্মান উপহার গ্রহণ করো।

কনস্টেবলটা আনন্দে অভিভূত হইয়া হাঁ করিয়া সেই নোটখানি দেখিতে লাগিল; খবরের কাগজ দেখাইতেই পাঁচ পাউন্ড বকশিস মিলিল, ইহা কি অল্প ভাগ্যের কথা! পল সাইনস তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া দূরে প্রস্থান করিল।

পল সাইনস অদৃশ্য হইলে কনস্টেবলটা নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিল,—কী সৌভাগ্য! দুই পেনির কাগজ দেখাইলেই যদি পাঁচ পাউন্ড পাওয়া যায়—তাহা হইলে আমি এই কাগজ কিনিবার জন্য প্রত্যহ দুই পেনি খরচ করিতে রাজি আছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকটা আসল পল সাইনস নয়। সে আসল পল সাইনস হইলে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এরকম শত-শত পাঁচ পাউন্ডের নোট বকশিস পাইতাম।

পল সাইনস আরও কিছু দূরে গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল এবং ধূমপান করিতে-করিতে মনে-মনে বলিল,—অতি চমৎকার কৌশল খাটাইয়াছি! বিপদের আশঙ্কা অল্প ছিল না; কিন্তু সে-ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছি। ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও গোয়েন্দা ব্লেক—দুজনেরই চোখে ধূলা দিয়াছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একদল নির্বোধের আড্ডা। আমার মনে হয়, উহাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এইভাবে চেষ্টা করা আমার সময়ের অপব্যয় মাত্র। আজ রাতটুকু কাটিবার পর রাজধানীর সমগ্র পুলিশবাহিনী সমস্ত পৃথিবীর নিকট হাস্যাস্পদ হইবে এবং পল সাইনসের নাম প্রত্যেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

মুহূর্তের জন্য পল সাইনসের চক্ষু ক্রোধে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল; কিন্তু সে মানসিক উত্তেজনা দমন করিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন বেলা একটার পর পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পল সাইনস জানিত—এক মুহূর্তের বিলম্বে তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইতে পারে।

ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে চলিতে-চলিতে একখানি ট্যাক্সি পল সাইনসের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

BanglaBook.org

শকটচালক পথের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইনস ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই পথে দেখিতে পাইল না; তখন সে গাড়ি হইতে মাথা বাড়াইয়া সাইনসের মুখের দিকে চাহিল। সাইনস পথের কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই গাড়ির দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

শকটচালক তৎক্ষণাৎ তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। পল সাইনস গাড়ির ভিতর বসিয়া নব বেশে সজ্জিত হইল; অবশেষে গাড়ি যখন বাকিংহাম প্রাসাদের দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিল —তখন পল সাইনসের কোট ও টুপি উভয়ই পরিবর্তিত হইল; তাহার মাথার পাকা চুলের উপর লম্বা পরচুলা কালো চুলের নিশান উড়াইতে লাগিল এবং তাহার নাকের ডগায় সোনা-বাঁধানো চশমার আবির্ভাব হইল। মুহূর্ত-পরে তাহার অধরের নিচে একদলা দাড়ি এরূপ ভঙ্গিতে আঁটিয়া বসিল যে, সাইনস তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি; তাহাকে পল সাইনস বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় রহিল না!

পল সাইনস এই নূতন ছদ্মবেশে ট্যাক্সিতে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিল; তাহাকে দেখিয়া ইংরেজ বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। ট্যাক্সি তাহাকে লইয়া নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে একটি লৌহনির্মিত ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সম্মুখেই কাচের ছাদবিশিষ্ট একটি প্রশস্ত অট্টালিকা। অট্টালিকার দ্বারে একখানি সাইন-বোর্ডে লেখা ছিল ঃ

সুইফট সিওর মোটরকার কোম্পানি

দিবারাত্রি মোটরগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

প্রকাণ্ড গ্যারেজ; গ্যারেজের ভিতর বহুসংখ্যক শকট সংস্থাপিত। পল সাইনস যে-গাড়িতে এই গ্যারেজে প্রবেশ করিল—সেই গাড়িখানি মাটির নিচে বিদ্যুতালোকিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে অনেকগুলি শকট শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল। তাহাদের একপাশে একখানি ভাঙা গাড়ি; দুইজন মিস্ত্রি সেই গাড়িখানি নিবিষ্ট চিত্তে মেরামত করিতেছিল। তাহারা পল সাইনসের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। পল সাইনস গাড়ি হইতে নামিয়া হল-ঘরের ভিতর দিয়া কিছু দূরে চলিয়া গেল। সেই কক্ষের দেওয়ালে একটি 'শো-কেস' সংস্থাপিত ছিল; তাহার সম্মুখভাগ কাচ-নির্মিত। সেই 'শো-কেসে' মোটর-গাড়ির টায়ার, টিউব, হর্ন, ল্যাম্প প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান পরিপাটিরূপে সজ্জিত ছিল।

পল সাইনস তাহার কাষ্ঠনির্মিত ফ্রেমের এক অংশ স্পর্শ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বোতামে আঙুলের খোঁচা দিল; তৎক্ষণাৎ সেই 'শো-কেস' তাহার কেন্দ্রস্থিত দণ্ডের উপর আবর্তিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল। পল সাইনস সেই দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা রুদ্ধ করিল; তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে একটি চৌকা হল-ঘর বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই হল-ঘরের চতুর্দিকে দ্বার; সেইসকল দ্বার দিয়া বাহিরে যাওয়া যাইত।

পল সাইনস সেই হল-ঘরে একটি ভৃত্যকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোট ও টুপি খুলিয়া তাহার হাতে দিল, তাহার পর মাথা হইতে লম্বা কালো পরচুলা খুলিয়া ফেলিয়া একটি দ্বার দিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষটি উক্ত হল-ঘরের সম্মুখে অবস্থিত। গ্যারেজটি দেখিলে অসাধারণ বলিয়া মনে হইত না এবং তাহার নিচে এইসকল গুপ্ত কক্ষ ছিল তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। সেখানে কয়েকটি 'ফায়ার-প্রুফ ট্যাঙ্ক' ছিল, তাহা পেট্রলে এবং মোটরে ব্যবহারোপযোগী তৈলে পূর্ণ ছিল। সেই কক্ষে যে-সকল ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহা হইতে আলোক-রশ্মি নিঃসৃত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছিল। লন্ডনের পার্ক-লেনে কোনও কোটিপতির বাসভবন যেরূপ মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, পল সাইনসের এই বাস-কক্ষও সেইভাবে সুসজ্জিত। সেই কক্ষের প্রত্যেক দেওয়ালে মূল্যবান চিত্রসমূহ শোভা পাইতেছিল; এতদ্ভিন্ন বিজ্ঞান ও রসায়ন-সংক্রান্ত অনেক দুর্লভ গ্রন্থরাজিতে বিভিন্ন আলমারি পরিপূর্ণ ছিল; সম্মুখে বিদ্যুতালোকিত একটি সেলফের উপর ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্মিত ন্যায়-দেবীর মূর্তি সংস্থাপিত; দেবীর চক্ষুদ্বয় বস্ত্রাবৃত, তাঁহার একহস্তে

তরবারি, অন্যহস্তে তুলাদণ্ড সংরক্ষিত; কিন্তু তরবারি ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ, তুলাদণ্ডের উভয় 'পাল্লা' অসমান এবং চক্ষুর উপর বস্ত্র এরূপ আলগা করিয়া বাঁধা যে, তাহার ভাঁজের নিচ দিয়া দেবীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ অব্যাহত! বোধহয় বর্তমান কালের রাজকীয় বিচারপ্রথাকে উপহাস করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল।

পল সাইনস একটি বৃহৎ ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তাহার বাম হস্তের অদূরে এক শ্রেণীতে তিনটি গজদন্ত-নির্মিত বোতাম এভাবে সংরক্ষিত যে, অঙ্গুলির সামান্য চাপেই তাহা বসিয়া যায়। তাহার সম্মুখে তিনটি টেলিফোন পাশাপাশি সংরক্ষিত এবং একটি ফ্রেমের ভিতর একখানি 'ভলকানাইট' চক্র, দেখিলে মনে হয় তাহা বে-তারের লাউড স্পিকার অর্থাৎ উচ্চ-ধ্বনি-কারক যন্ত্র।

সাইনস একটি সুইচে অঙ্গুলির চাপ দিতেই ঊর্ধ্বস্থিত গ্যারেজ হইতে সকল প্রকার শব্দই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বহু কণ্ঠের ধ্বনি, মোটরের ঘস ঘস শব্দ, পথে যে-সকল গাড়ি যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের ইঞ্জিনের আওয়াজও—সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অথচ যে-নিভৃত গুপ্ত স্থানে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—সেখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাহার গুপ্ত সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্যই সুইফট সিওর মোটরকার কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কোম্পানিতে যাহারা কর্মচারী ও কারিগর, মিস্ত্রি প্রভৃতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহারা সকলেই তাহার অনুচর, ছদ্মবেশী দস্যুর দল। কতকগুলি দ্রুতগামী শকট তাহার আদেশ-পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত, আর কতকগুলি তাহার আদেশে নিবারাত্রি লন্ডনের পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেইসকল শকটের সাহায্যে সে লন্ডনের সকল সংবাদ জানিতে পারিত, কারণ প্রত্যেক গাড়িতে এক-একটি মাইক্রোফোন যন্ত্র সুকৌশলে সংগুপ্ত ছিল; সেই যন্ত্রের সাহায্যে মোটরচালক মোটরের আরোহীগণের সকল গুপ্তকথাই শুনিতে পাইত। তাহারা প্রত্যহ নানা শ্রেণীর আরোহী সংগ্রহ করিত; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাদের ট্যাক্সিতে ভ্রমণ করিতে-করিতে যে-সকল গুপ্ত পরামর্শ করিতেন—তাহা অন্য কেহ শুনিতেছে—ইহা তাঁহারা মুহূর্তের জন্য ধারণা করিতে পারিতেন না; কিন্তু মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাঁহাদের প্রত্যেক কথা ট্যাক্সিচালকের কর্ণগোচর হইত; সুতরাং পল সাইনসেরও তাহা অজ্ঞাত থাকিত না। একখানি গাড়ি বেকার স্ট্রিটের নিকট সর্বদা ভাড়া খাটিবার জন্য উপস্থিত থাকিত এবং সেই গাড়ির ড্রাইভার মিঃ ব্লেককে পাইলে অন্য কোনও আরোহী লইত না। অন্যান্য গাড়ির চালকেরা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—মিঃ ব্লেককে খুশি করিতে পারিলে তাঁহার নিকট প্রচুর বকশিস পাওয়া যায়; এ-কথা সত্য, কিন্তু সে ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পাইলেও অন্য আরোহী গ্রহণ করিত না—যদিও সে জানিত ইন্সপেক্টর কুট্‌স কখন কাহাকেও এক ফার্দিং পুরস্কার দিতেন না, বরং সময়ে-সময়ে তাঁহার নিকট ন্যায্য ভাড়া আদায় করাও কঠিন হইত।

পল সাইনসের আশ্রিত দস্যুদল এইসকল গাড়ি যখন ইচ্ছা ব্যবহার করিত, তাহারা ইঙ্গিত করিলেই শকটচালকেরা বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত, অথবা তাহাদের সদর আড্ডায় লইয়া যাইত। বস্তুত ভক্সহল ব্রিজ-রোডের অদূরবর্তী সেই গ্যারেজটি পল সাইনসের অর্থে ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলেও কেহই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। পল সাইনস আধঘণ্টার মধ্যে অসংখ্য দস্যুকে তাহার নিকট আহ্বান করিয়া লন্ডনের সকল স্থানেই প্রেরণ করিতে পারিত এবং কোনও অপকার্যেই তাহারা কুণ্ঠিত হইত না।

পল সাইনস এই গুপ্ত গৃহে বসিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা করিত এবং তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে অতি অল্প সময়েই তাহা কার্যে পরিণত করা সহজ হইত। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে করিত, সুদীর্ঘ ষোলো বৎসর পূর্বে যাহাদিগের প্রতিকূলতায় তাহাকে বিনা অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহাদিগকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে-সকল ষড়যন্ত্র করিত—তাহা সে এই স্থানে থাকিয়াই কার্যে পরিণত করিত; কেহই ইহা জানিতে পারিত না। সে এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত ছিল; এমনকী, তাহার পুত্রগণের জীবন

বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।

পল সাইনস অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ডেস্কের নিকট বসিয়াছিল; তাহার মুখ বিমর্ষ, ললাটে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ পর্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্য সে প্রচণ্ড আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সে দুশ্চিন্তার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল—সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সে যাহাই করুক, ভবিষ্যতে তাহাকে তাহার পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিলেও তাহার শেষ পরাজয় ও পতন অপরিহার্য। অন্যায় চিরদিন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে না, অধর্মের ক্ষয় অনিবার্য—ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—তাহার শত্রুগণকে বিধ্বস্ত না করিয়া সে ধরা দিবে না, বা মৃত্যুকে বরণ করিবে না, দানবের মতো সে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করিবে।

পল সাইনস প্রায় একঘণ্টা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় সে বৈদ্যুতিক পাখার স্যুইচ টিপিয়া পাখা চালাইয়া দিল। পাখা তাহার মাথার উপর বন-বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিলে, সে একটি রিসিভার তুলিয়া লইল। একজন টেলিফোনে বলিল,—কনোলী জাল গুটাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সে পাঁচ নম্বর হইতে সংবাদ পাইয়াছে—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। সে কে, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে।

সাইনস বলিল,—কীরূপে জানিল?

উত্তর হইল,—রবার্ট ব্লেকের কৌশলে।

সাইনস হুঙ্কার দিয়া সক্রোধে বলিল,—আবার রবার্ট ব্লেক! এই লোকটাকে সাবাড় করিতে না পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাহার নিকট কোনও কথা গোপন করিবার উপায় নাই! আমাকে আমার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত করিতে হইবে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় রবার্ট ব্লেককে আমার কোনও কাজে হস্তক্ষেপণ করিতে দেওয়া হইবে না। আজ রাত্রেই তাহার অনধিকার চর্চা বন্ধ করিতে হইবে। তাহার মতো প্রতিভাসম্পন্ন ডিটেকটিভকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদদলিত করিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু উপায় কী? সে তাহার ধৃষ্টতার ফলভোগ করিতে বাধ্য, তাহার আর পরিত্রাণ নাই; সে বিলম্বে মরিত, কিন্তু নিজের দোষেই মৃত্যুকে সে এত শীঘ্র ডাকিয়া আনিল।

অতঃপর সাইনস তারের একটি ফাইল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া লইল; সেই কাগজখানিতে কতকগুলি নাম ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি নাম লাল কালি দিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তালিকার একটি নাম পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল; সাইনস একটি পেন্সিল লইয়া প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের নামের পাশেও একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই ব্যক্তিকেই সে কিঞ্চিৎ ভয় ও শ্রদ্ধা করিত।

পল সাইনস অস্ফুটস্বরে বলিল,—আজ রাত্রে আমার এক ঢিলে দুই পাখি মরিবে। রবার্ট ব্লেক ও বৃদ্ধ সোয়েন উভয়েই তাহাদের ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে। ব্লেক কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইতাম; সে আমার ক্ষমতার পরিচয় পাইত, আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত; কিন্তু তাহা হইবার নহে, আজই তাহাকে মরিতে হইবে—ইহা সত্যই ক্ষোভের বিষয়।

পল সাইনস সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে তাহার ডেস্কের কাছে বসিয়া রহিল, টেলিফোনে অনেকের সঙ্গেই তাহার পরামর্শ চলিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে ও কথাবার্তা শুনিলে মনে হইত—সে সেই অফিসের অধ্যক্ষ এবং তাহার আদেশেই সকল কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

ক্রমশ সেই কক্ষে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল; তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া অবনতমস্তকে তাহার উপদেশ অথবা আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহার পর টেলিফোনে লন্ডনের পশ্চিম পল্লীতে, লাইম হাউসে, স্যাডওয়েল, ওয়ার্পিং এবং শহরতলীর বিভিন্ন অংশে যে-সকল সংবাদ প্রেরিত হইল তাহা বাহিরের যে-কোনও লোক শুনিতে পাইলে মনে করিত সেইসকল সংবাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহাতে

BanglaBook.org

কেহ কোনও অসাধু উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পল সাইনস সেই সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহার দলভুক্ত বিভিন্ন স্থানবাসী দস্যুদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তাহারা রাজবিধান ও শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার আদেশ পাইল।

রাত্রি নয়টার সময় পল সাইনস চেয়ার হইতে উঠিয়া অগ্নিকুণ্ড-সন্নিহিত কৌচে শয়ন করিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিন্তু একঘণ্টার মধ্যেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাত্রি দশটার সময় একজন ভৃত্য তাহাকে এক পেয়ালা কফি ও কিছু খাবার আনিয়া দিল। কয়েক মিনিট পরে একটি খর্বকায় বিদেশি চেহারার লোক চর্মনির্মিত একটি এটাচিকেস লইয়া পল সাইনসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ডেস্কের উপর সেই ব্যাগটি রাখিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি চর্বিনির্মিত রঙিন বাতি, তরল রঙের কয়েকটি কৌটা, পরচুলা, দাড়ি-গোঁফ, পাউডার, রবারের কয়েকখানি চাক্তি বাহির করিল।

পল সাইনস জামা খুলিয়া আলোর ঠিক নিচেই একখানি চেয়ারে বসিল এবং আগন্তুককে বলিল,—মাসকোলো, আজ তোমার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে; তোমার দক্ষতার উপর আজ রাত্রে আমাদের কার্যের সাফল্য কী পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা জানিতে পারিলে তুমি বিস্মিত হইবে।

সাইনসের কথা শুনিয়া আগন্তুক দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, সে মাথা নাড়িয়া সাইনসের উক্তির সমর্থন করিল; তাহার পর তাহার ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি রঙিন ফটো বাহির করিল। এই ফটোখানি যাঁহার—তিনি ইংলন্ডের জনসমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার সেই দাড়ি-গোঁফ-সমলঙ্কৃত মুখ লন্ডনের অধিকাংশ লোকের, বিশেষত পুলিশ-কর্মচারী মাত্রেই সুপরিচিত। আগন্তুক সেই ফটো সম্মুখে রাখিয়া পল সাইনসকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিতে লাগিল। সাইনসের চেহারা ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া ফটোর চেহারা ধারণ করিল; সাইনস সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার লাভ করিল। ফটোর সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য রহিল না। বিবিধ বর্ণে, স্পিরিট-সংযুক্ত গঁদে, তুলির প্রত্যেক টানে এবং পূর্বোক্ত রবারের চাক্তিগুলির সাহায্যে আগন্তুক অসাধ্য সাধন করিল। অবশেষে সে তুলি ফেলিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সদম্ভে বলিল,—আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি নাই; আপনি আয়নায় আপনার মুখখানি দেখিলে আমার ক্ষমতার তারিফ করিবেন কর্তা!

পল সাইনস আয়না লইয়া ফটোর সহিত নিজের চেহারা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। উভয় চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; দিবসে উভয় চেহারা মিলাইয়া দেখিলে সামান্য কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হয়তো কাহারও-কাহারও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না, কিন্তু রাত্রিকালে তাহা ধরিবার উপায় ছিল না।

পল সাইনস মানসিক উল্লাস গোপন করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল,—হ্যাঁ, তোমার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে—এ-কথা বলিতে পারি না। এ-বেশ বোধহয় অচল হইবে না। তোমাকে যে-পুরস্কার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা তুমি অবশ্যই পাইবে। এখন তুমি যাইতে পারো মাসকোলো।

মাসকোলো তাহার জিনিসপত্রগুলি ব্যাগে পুরিয়া লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সাইনসও ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে তাহার ডেস্কের নিকট ফিরিয়া আসিল।

এইবার সে লন্ডনের একখানি মানচিত্র খুলিয়া মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সেই মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করিয়া কতকগুলি স্থানের উপর নীলবর্ণ এক-একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বৃত্তে এক-একটি সংখ্যা লিখিয়া সেগুলি একটি রেখাদ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

সাইনস অস্ফুট স্বরে বলিল,—ঠিক একই সময়ে সকল স্থানে কার্যারম্ভের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার আদেশ ঠিকভাবে পালন করিলে চেষ্টা বিফল হইবার আশঙ্কা নাই।

BanglaBook.org

সাইনস সেই মানচিত্রখানি আরও কিছুকাল নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। মুহূর্তপরে নীলপরিচ্ছদধারী একজন সোফেয়ার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সাইনসের নতুন রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—কর্তা, সমস্তই প্রস্তুত; এখন আপনার আদেশের প্রতীক্ষা।

সাইনস মানচিত্রখানি মুড়িয়া রাখিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ ওভারকোটে সজ্জিত হইল, তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিল। গ্যারেজের দীপালোক ম্লান; সাইনস সেই ম্লান দীপালোকে দেখিতে পাইল—কুড়িখানি মোটরকার গ্যারেজে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কারের ড্রাইভার স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট। তাহারা সকলেই নিস্তব্ধ এবং সাইনসের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। সাইনস জানিত প্রত্যেক কারে দুইজন আরোহী উপবিষ্ট ছিল, তাহার ইঙ্গিত পাইলেই কারগুলি আরোহীসহ দ্রুতবেগে স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইবে; তাহার পর কারের আরোহীরা কী ভীষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা সহজে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না।

গ্যারেজের মধ্যস্থলে যে-কার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুদৃশ্য। তাহার মাথায় উজ্জ্বল আলো দপ-দপ করিতেছিল এবং তাহার ইঞ্জিন হইতে 'ঘসর-ঘস' শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাতে যে-চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্ন লন্ডনের আর একখানি মাত্র কারে দেখা যাইত। তাহার ড্রাইভার সুইচ টিপিয়ামাত্র নম্বর-প্লেট উল্টাইয়া গেল এবং অন্য একটি নম্বর সেই স্থান অধিকার করিল। তাহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেরই নম্বর একসঙ্গে পরিবর্তিত হইল।

পল সাইনস কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া এই শেষোক্ত কারে প্রবেশ করিল। সোফেয়ার দ্বার রুদ্ধ করিল। অতঃপর সে তাহা চালাইতে আরম্ভ করিয়া নিঃশব্দে পথে উপস্থিত হইল।

সাইনস যে দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আরম্ভ হইল। সে গাড়িতে ঠেস দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া লইল। তাহার হাত সম্পূর্ণ অকম্পিত। তাহার পাশে চর্মনির্মিত একটি থলি ছিল—সেই থলির দিকে চাহিয়া তাহার মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ অধিক ঝাঁকুনি লাগিলে সেই কার ও কারের আরোহীরা চূর্ণ হইয়া ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে, ইহা সে জানিত।

সাইনসের কার ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট অভিমুখে ধাবিত হইল। সোফেয়ার গাড়ির মোড় ঘুরাইবার পূর্বেই সুইচ টিপিল; তৎক্ষণাৎ গাড়ির নম্বরের প্লেটখানির নম্বরগুলি ঘুরিয়া গেল এবং নূতন নম্বর তাহাদের স্থান অধিকার করিল।

পথের মোড়ে একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত কারের নম্বর-প্লেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং গাড়ি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবামাত্র সে আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। সেই দোদুল্যমান সাদা দাড়ির নিশান লন্ডনের কোনও পাহারাওয়ালার অপরিচিত নহে।

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির বিশাল গম্বুজ নৈশ আকাশে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। বিগবেনের বিরাট ঘটিকা-যন্ত্র আকাশের কোলে পরিস্ফুট হইল এবং তাহার সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কাঁটাদুটি আলোকোজ্জ্বল ডায়ালের উপর একটি সরলরেখার আকার ধারণ করিয়া জানাইয়া দিল—রাত্রি এগারোটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

সাইনসের শকট বাঁধের নিকট আসিলে তাহার গতি মন্দীভূত হইল; তাহার পর তাহা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির ভিতর দিয়া প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

একজন পুলিশম্যান রোঁদে বাহির হইয়া ক্যানন-রো অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়িখানি সম্মুখে থামিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইল এবং শকটের আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। সে জানিত রাত্রি এগারোটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কেবল একজন মাত্র পাহারাওয়ালা পরদিন বেলা আটটা পর্যন্ত সেখানে পাহারায় থাকে; তাহার পর অফিসের কাজকর্ম যথানিয়মে আরম্ভ হয়।

BanglaBook.org

পাহারাওয়ালা একবার আরোহীর মুখের দিকে, আর-একবার সেই গাড়ির নম্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল,—এ যে বড়সাহেবের গাড়ি! সাহেব এ-অসময়ে হঠাৎ অফিসে চলিলেন কেন? বোধহয় কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে!

পাহারাওয়ালা বড়সাহেবের চিরপরিচিত সাদা দাড়ির দিকে চাহিয়া সসম্মান অভিবাদন করিল; দাড়ি কিন্তু তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেও পাহারাওয়ালাটা দাঁড়াইয়া রহিল। বড়সাহেব কী উদ্দেশ্যে অসময়ে অফিসে আসিলেন তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল।

পাহারাওয়ালা চীফ কমিশনরের খাস-কামরায় হঠাৎ আলো জ্বলিতে দেখিয়া বুঝিল—বড়সাহেব খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়াছেন। সে ধীরে-ধীরে ক্যানন-রোর দিকে চলিয়া গেল।

পল সাইনস গাড়ি হইতে নামিবার সময় কনস্টেবলকে দেখিতে পাইয়াছিল। পাহারাওয়ালাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু পাহারাওয়ালা তাহাকে অভিবাদন করায় তাহার আশঙ্কা দূর হইল। সে দ্বারের সম্মুখে গিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন দীর্ঘদেহ পুলিশ কর্মচারী দ্বার খুলিয়া সাইনসের সম্মুখে দাঁড়াইল। পল সাইনস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—শম্মি।

পুলিশ কর্মচারী বলিল,—পাঁচ নম্বর। সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলে সাইনস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

এই পুলিশ কর্মচারী যুবকটি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন, প্রকৃত নাম সার্ল সাইনস। সে পল সাইনসের করমর্দন করিয়া বলিল,—আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে। আমার জানা না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইতাম। কিন্তু আমরা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। বাহিরে যে গাড়িখানি—।

পল সাইনস বলিল,—চীফ কমিশনরের গাড়ি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে কেন—এ-কথা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিবে? সার-হেনরি ফেয়ারফক্সের গাড়ির সহিত আমার গাড়ির বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই; তাহার গাড়ি ও আমার গাড়ি দেখিয়াও কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমার সোফেয়ার মাওসনকে জেরা করিয়া কেহ কোনও কথা জানিতে পারিবে না; কিন্তু এখন আমাদের আর এক মুহূর্তও বাজে কথায় নষ্ট করিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্কল্পানুযায়ী সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। সময়ের মুহূর্তমাত্র ব্যতিক্রম হইলে আমার সমস্ত কাজ নষ্ট হইবে এবং তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে।

সার্ল সাইনস বিবর্ণ মুখে ও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকায় উঠিতে লাগিল। সে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত পুলিশের চাকরি করিয়াছে, কর্তব্যপালনে সে কখনও ত্রুটি করে নাই, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু আজ সে তাহার পিতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিতার আদেশ সে অলঙ্ঘনীয় মনে করিত। পিতৃভক্তির তুলনায় সে কর্তব্য-জ্ঞান, তাহার দায়িত্ব তুচ্ছ মনে করিত; কিন্তু পিতার আদেশে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তাহার নিষ্ঠুর পিতা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে যে-বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার ফল কীরূপ ভীষণ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সমাজদ্রোহী, পুলিশের মহাশত্রু পল সাইনস ও তাহার পুত্র—পুলিশের সুদক্ষ কর্মচারী কর্তব্যনিষ্ঠ সার্ল সাইনস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঘরে উপস্থিত হইল। পল সাইনস প্রফুল্ল চিত্তে টেলিফোনের স্যুইচবোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল—সে ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্তে লন্ডনের প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সংবাদ প্রেরণ করিতে

পারে; কেহই তাহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারিবে না।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন যে-ডেস্কের নিকট বসিয়াছিল, সেই ডেস্কের উর্ধ্বে একটি আলো জ্বলিতেছিল। তাহার সম্মুখে একখানি খাতা খোলা ছিল, রাত্রিকালে বিভিন্ন থানা হইতে যে-সকল সংবাদ টেলিফোনের সাহায্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট করা হইত—তাহা সেই খাতায় লিখিয়া রাখা হইত। পরদিন প্রভাতে আটটার সময় অফিস খুলিলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ সে-সকল রিপোর্ট পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন।

পল সাইনস তাহার হস্তস্থিত ভারী চামড়ার ব্যাগটা পাশে রাখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—তোমার বড়সাহেবের খাস-কামরার আলোটা এই মুহূর্তেই জ্বালিয়া দাও। উহা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত জ্বালাইয়া রাখিবে তাহার পর আলো নিবাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন (সার্ল সাইনস) তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। পল সাইনস ডেস্কের নিকট বসিয়া পড়িল। সে রিপোর্ট বহিখানি কৌতূহলভরে পাঠ করিতে লাগিল; সেই রাত্রের কোনও-কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ তাহাতে লিখিত ছিল।

'দীর্ঘকালের একজন ফেরারী আসামী উত্তর লন্ডনে ধরা পড়িয়াছে।' 'স্ট্রাটফোর্ডে একটি দুর্ভাগিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছে।' —এইসকল বিবরণ পাঠ করিয়া পল সাইনস প্রফুল্ল চিত্তে দোয়াত-কলম লইয়া সেই পাতায় তাড়াতাড়ি কী কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিল এবং তাহার নিচে নিজের নাম লিখিল। —সে যখন খাতাখানি বন্ধ করিল, ঠিক সেইসময় তাহার পুত্র সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সাইনস উঠিয়া তাহার পুত্রকে সেই আসনে বসিতে আদেশ করিল; তাহার পর পকেট হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিল। সেই কাগজগুলি টাইপ-করা। পল সাইনস সেই কাগজগুলি টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—এখন কী করিতে হইবে তাহা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ। ইহাতে যাহা যেভাবে লেখা আছে—তাহা ঠিক সেইভাবেই পর-পর টেলিফোন করিয়া দাও। সিডেনহাম হইতে আরম্ভ করো।

সার্জেন্ট সিবর্ন সেই কাগজগুলি পাঠ করিল। তাহার মুখ ভয়ে নীল হইয়া গেল; কিন্তু সে তাহার পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সিডেনহামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আহ্বান করিল, বলিল,—আপনি কি সিডেনহামের থানা অফিসার? আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ কর্মচারী; এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল—পলাতক আসামী পল সাইনস আপনার এলাকায় লুকাইয়া আছে! আপনি যতগুলি পুলিশ কনস্টেবল সংগ্রহ করিতে পারেন—তাহাদের লইয়া ৫৪নং সিলভেস্টর রোডের বাড়ি আক্রমণ করুন; হ্যাঁ, সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া আসামীকে গেপ্তার করা চাই। চীফ কমিশনর স্বয়ং এই আদেশ জানাইতে বলিলেন।

এক মিনিট পরে সার্ল সাইনস আর-একটি থানায় ঠিক এই সংবাদ প্রেরণ করিল; কেবল ঠিকানাটি স্বতন্ত্র। থানার কর্মচারীকে আরও বলা হইল—পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া যাইবে—ইহা বড়সাহেবেরই অঙ্গীকার।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন টেলিফোনে যে-সকল কথা বলিল, পল সাইনস তাহা সকলই শুনিল। তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল সে সুইফট সিওর গ্যারেজ হইতে যে-সকল ট্যাক্সি সহ অনুগত দস্যুদলকে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিল —তাহারা অবিলম্বে লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে পারিবে। সকল থানার পুলিশের প্রহরীরা সদলে বিভিন্ন আড্ডায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবে, সুতরাং নগরের বিভিন্ন অংশ অরক্ষিত থাকিবে; তাহার অনুচরদের দস্যুবৃত্তিতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।

পল সাইনসের পুত্র বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করিয়া এই একই সংবাদ জানাইল। তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্মধারায় প্লাবিত হইল, তাহার ললাট হইতে টস-টস করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, ললাটের ঘর্ম অপসারিত করিয়া তাহার পিতাকে বলিল,—আপনার আদেশ পালন

BanglaBook.org

করিলাম; এখন আমাকে কী করিতে হইবে বলুন।

পল সাইনস পুত্রের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল,—তুমি এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন মূর্খ! মন স্থির করো। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এখন উপরের ঘরে কাজ আছে; হ্যাঁ, যে কুঠুরীতে বেতারযন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থা আছে, সেই ঘরে যাইতে হইবে।

তাহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উপরতলায় চলিল। কয়েক মিনিট পরে তাহারা যে-কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই কক্ষটি বেতারের নানাবিধ যন্ত্রাদিতে আচ্ছন্ন। সেইসময় বিগবেনের ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

তাহারা সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া আর-একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের দেওয়ালগুলি ধাতুমণ্ডিত; কারণ সেই কক্ষে যে-সকল যন্ত্রাদি ছিল, তাহা এরূপ সূক্ষ্ম যে, সেই কক্ষটি ওভাবে সুরক্ষিত না হইলে বাহিরের বৈদ্যুতিক প্রভাবে তাহাদের কার্যোপযোগিতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। নগরের বিভিন্ন অংশে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভ্রাম্যমাণ পুলিশ ফৌজকে তাহাদের চলন্ত গাড়িতে এই কক্ষ হইতে সংবাদ দিয়া তাহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করা হইত।

পল সাইনস সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল,—আমার বিশ্বাস, আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব।

অনন্তর সে সেই কক্ষের যন্ত্রগুলির দিকে চাহিয়া তাহার হস্তস্থিত চর্মনির্মিত ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার ভিতর হইতে ধাতুনির্মিত একটি আধার বাহির করিল—সেই আধারটি একটি ক্ষুদ্র গ্যাস-মিটারের অনুরূপ। তাহার সম্মুখে ঘড়ির মুখের মতো একটি চাকা; সেই চাকাতে যে দুইটি কাঁটা ছিল, তাহা দেড়টার ঘরে সংস্থাপিত। সাইনস সেই যন্ত্রটির একটি দণ্ডে ঈষৎ চাপ দিতেই সেই যন্ত্রের ভিতর হইতে টিক-টিক করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে পল সাইনস ও তাহার পুত্র সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া আসিল। নিচের তলায় আসিয়া সাইনস ঘড়ি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—স্মরণ রাখিও, আজ রাত্রি একটার পূর্বে তোমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সদর আড্ডায় যাইতে হইবে, হ্যাঁ, একটার পূর্বেই যাইবে এবং সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিবে।

সার্ল সাইনস কোনও কথা বলিল না। সে তাহার পিতার মুখের দিকে অভিমানপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পিতার কোনও অবৈধ আদেশেরই প্রতিবাদ করিবার তাহার শক্তি ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে সে কীরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া কীভাবে নিজের ভবিষ্যতের সকল আশা বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

পল সাইনস পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; কিন্তু পুত্রের সর্বনাশ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যান্য পুত্রেরও সর্বনাশ করিয়াছিল। তাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল। সে সঙ্কল্প-পথ হইতে বিচলিত হইল না; পুত্রের মঙ্গলকামনা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে তাহার শত্রুগণের বুকের উপর দিয়া 'জগন্নাথের রথ' টানিয়া লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প।

পল সাইনস তাহার পুত্রের করমর্দন করিল; কিন্তু তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সে বিস্মিত হইল না। সে জানিত—সে তাহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না; তাহার স্বার্থের যূপমূলে তাহার আর-একটি পুত্রের জীবন উৎসর্গ হইবে। সে দ্বার খুলিয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাহিরে আসিল এবং তাহার শকটের দিকে অগ্রসর হইল।

পল সাইনস গাড়িতে উঠিয়া বসিলে গাড়ি হোয়াইট হলের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই তাহার গাড়ির নম্বরগুলি হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। তাহার গাড়িতে পুলিশ কমিশনর সার হেনরি ফেয়ারফক্সের মোটর-গাড়ির নম্বর ছিল, সেই নম্বর পরিবর্তিত হওয়ায় তাহা পুলিশ কমিশনরের

BanglaBook.org

গাড়ি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। তাহার কাজ শেষ হইয়াছিল; তাহার অনুচরবর্গ ঠিক একই সময়ে শান্তিভঙ্গ করিয়া আইনের মর্যাদায় দণ্ডাঘাত করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা সে করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ষড়যন্ত্রের সাফল্য-বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

পল সাইনস তাহার সোফেয়ারকে নূতন আদেশ দানে উদ্যত হইয়া মনে-মনে বলিল,—এইবার আমার মহাশত্রু গোয়েন্দা ব্লেক ও বুড়া শয়তান সোয়েনের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করি। প্রভাতের পূর্বেই এই একজোড়া প্রধান শত্রুর নাম শত্রুপক্ষের নামের তালিকা হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ ঃ কুট্‌সের আক্কেল-সেলামি

ইন্সপেক্টর কুট্‌স স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথসহ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন—একখানি ট্যাক্সি দৈবক্রমে অথবা কাহারও গুপ্ত ইঙ্গিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ট্যাক্সিখানি খালি, কিন্তু তাহা যে 'সুইফট সিওর' গ্যারেজের গাড়ি—ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহা জানিতে পারিলেন না; তাহা জানিতে পারিলেও সন্দেহের কারণ ছিল না। সকল ট্যাক্সিই তাঁহার নিকট সমান। তিনি সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মুহূর্তপরে তাঁহার পাশে বসিলে—তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—দেখো ব্লেক, ওই যে 'হই-হই' না 'হই-চই' কাগজের সম্পাদক-বেটার—কী যেন নাম বলিল—কেনী না ফেনী,—উহার রকম-সকম আমার বড় ভালো বোধ হইল না! সে যে-লোকগুলাকে পল সাইনসের সাজে সাজাইয়া রাস্তা দিয়া চালান করিতেছে—তাহাদিগকে যদি ফিরাইয়া লইয়া না যায়—তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করিয়া গারদে পুরিব। দেখো, ওই দলের আর-এক বেটা ভিলিয়ার্স স্ট্রিটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। উহার পশ্চাতে একদল লোক—যেন ফুটবলের বাজি দেখিতে চলিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সকলের আগে ওই সম্পাদক মিঃ মিলট-ই কেনীকে পাকড়াইবার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতায় উহার সন্ধান পাইবে। সে যে-কাগজ-কাটা ছুরি ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সাহায্যে উহাকে শনাক্ত করা কঠিন হইবে না। অঙ্গুলি-চিহ্ন মিলিলেই জানিতে পারিবে—লোকটা কে! পল সাইনসের সঙ্গে উহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে রহস্য ভেদ করা অনেকটা সহজ হইবে। আরে! ট্যাক্সিওয়ালা কি আমাদিগকে পগারে ফেলিয়া জখম করিবে?

ট্যাক্সিওয়ালা হঠাৎ এত জোরে ট্যাক্সি চালাইতে লাগিল যে, তাঁহারা আসন হইতে ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে সামলাইয়া লইলেন; শেষে সে সেই প্রচণ্ড বেগ সংযত করিয়া হোয়াইট হলের দিকে চলিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মাথার সহিত স্মিথের মাথার ঠক্কর লাগিয়াছিল; ইন্সপেক্টর কুট্‌স শিরঃভ্রষ্ট টুপিটা তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন,—উঃ, মাথাটা যে ফুলিয়া উঠিল ছাই! কিন্তু কেনীর অঙ্গুলি-চিহ্ন আমাদের অফিসের খাতায় থাক না থাক—ওই পাগলামিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে আমি তাহাকে বাধ্য করিব। হ্যাঁ, আমি উকিল-সরকারের সাহায্যে উহার বিরুদ্ধে 'ইনজংশন' বাহির করিব।

ট্যাক্সি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে আসিয়া থামিল। ড্রাইভার ন্যায্য ভাড়া ও দুই পেনি বকশিস লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল; কিন্তু সে অধিক দূর না গিয়া অদূরবর্তী ভূগর্ভস্থ স্টেশনে উপস্থিত হইয়া গাড়ি থামাইল এবং ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নিকট যে-দুই পেনি বকশিস পাইয়াছিল, তাহা টেলিফোনের কলে খরচ করিল।

সে টেলিফোনে সাড়া দিয়া বলিল,—আমি জ্যাকোবি কথা বলিতেছি। সতর্ক হউন, আপনাকে

সন্দেহ করা হইয়াছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আপনার পশ্চাতে হুড়ো চালাইবার চেষ্টা হইবে।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিয়া কুট্‌সের খাস-কামরায় উপস্থিত হইলেন; ইন্সপেক্টর কুট্‌স পূর্বোক্ত ছুরিখানি একখানি লেফাফায় পুরিয়া তাঁহাদের ফৌজদারি-মহাফেজখানায় পাঠাইয়া দিলেন। ফৌজদারির আসামীদের অঙ্গুলি-চিহ্ন সেই স্থানে রক্ষিত হয়।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে সেই ছুরির সহিত একখানি রোকা ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইল। সেই রোকাখানি পাঠ করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের দুই চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি বলিলেন,—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ব্লেক। অঙ্গুলি-চিহ্নের দপ্তর হইতে রোকায় কী লিখিয়া পাঠাইয়াছে শোনো—'কেনেথ মিলটন ওরফে ছিপছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন। পরিচয়—ইউনাইটেড স্টেটসের অধিবাসী; নরহত্যা ও জালিয়াতি অপরাধে বাউমের বিধানানুসারে আজীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ফেরারি আসামী।'

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—উহা ছিপছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন? ঠিক হইয়াছে কুট্‌স! কনোলী পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যু। এখন সে লন্ডনে আসিয়া হুজুগে কাগজের সম্পাদক সাজিয়াছে! অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে—সে সাইনসের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাই উহাদের উদ্দেশ্য।

স্মিথ বলিল,—বাউমের বিধানটা কী কর্তা?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—ইহা ইউনাইটেড স্টেটসের ফৌজদারি আইনের এক নূতন বিধান। পুরাতন অপরাধীদের দমনের জন্যই এই বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। কোনও চোর তিনবার চৌর্যাপরাধে শাস্তি পাইবার পর, যদি চতুর্থবার কোনও অপরাধ করে—তাহা হইলে এই বিধান অনুসারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। এই চতুর্থবার তাহার অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব লক্ষ করা হয় না; অর্থাৎ সে সেই চতুর্থবার জালই করুক, নরহত্যারই চেষ্টা করুক, বা কোনও ডাকঘরে ঢুকিয়া চারি পয়সার একখানি টিকিটই চুরি করুক তাহাকে চিরজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—যদি আমি কনোলীর হাতে হাতকড়ি দিতে পারি আর যদি সে বুঝিতে পারে—দেশে ফিরিলে অবশিষ্ট জীবন তাহাকে জেলে কাটাইতে হইবে—তাহা হইলে আমি তাহার মুখ হইতে কোনও-কোনও কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। উহাকে একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সাইনসের ঠিকানা জানিয়া লইতে পারিব; সে কীভাবে আমাদের বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে—তাহাও জানিতে পারিব।

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িলেন; তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। যদি কনোলী পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণের সাহস করিত—তাহা হইলে পূর্বেই সে পুলিশকে তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দিয়া গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুত সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু দস্যু তস্করেরা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করিয়া চলে বলিয়া পুলিশ সহজে তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। যাহা হউক, যখন তাঁহাদের মধ্যে এই তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময় ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ব্রাউন একখানি ট্যাক্সি লইয়া সবেগে নদীতীরবর্তী পথে অগ্রসর হইল। ক্ষণকাল পরে মিঃ ব্লেক ফায়ার-ইঞ্জিনের ঢং-ঢং শব্দ শুনিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নিউটন স্ট্রিটের দিকে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর গিয়াই তাঁহারা পথে বিপুল জনতা দেখিতে পাইলেন।

ট্যাক্সি আর চলিতে পারে না, পথ বন্ধ দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সি হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে ভিড় ঠেলিতে-ঠেলিতে সম্মুখে চলিলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই জনতা ও কোলাহলের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

তখন অদূরবর্তী একটি তেতলার দ্বার-জানালা ভেদ করিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লোহিত অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাঁহারা প্রায় একঘণ্টা পূর্বে যে সংবাদ-পত্রের অফিসে আসিয়া সম্পাদক-প্রবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই অফিসেই আগুন লাগিয়াছিল! নবপ্রকাশিত 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে সম্পাদকের খাস-কামরাটি তখন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন,—না, আর রক্ষা নাই। আমরা ছিপছিপে কনোলীর সহিত দেখা করিতে আসিলে সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আমরা তাহাকে সন্দেহ করিয়াছি এবং তাহার প্রকৃত পরিচয় শীঘ্রই জানিতে পারিব। সুতরাং পুলিশের কাজে লাগিতে পারে—এরূপ প্রমাণ সমস্তই নষ্ট করিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; এই অগ্নিকাণ্ড তাহারই ফল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—তুমি কি মনে করো সে স্বেচ্ছায় তাহার অফিসে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি আর কোনও কথা বলিবার পূর্বেই ইন্সপেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দ্বারের সম্মুখে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া অসঙ্কোচে তাহার হাত ধরিলেন। তিনি তাহাকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে টানিয়া আনিলে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—যে-যুবতী সেই সংবাদ-পত্র সম্পাদকের অফিসে বসিয়া চিঠিপত্র টাইপ করিতেছিল—এ সেই যুবতী। যুবতী 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র সম্পাদকের টাইপিস্ট।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—তোমাদের কর্তা কোথায় পলাইয়াছে বলো।

যুবতী বলিল,—কর্তা কে? কাহার কথা বলিতেছেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—মিঃ কেনী বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু উহা যে তাহার আসল নাম নয়—তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি। সেই পাজী বদমায়েশটা কোথায় পলাইয়াছে বলো। এই ঘরে কীরকমে আগুন লাগিল, তাহাও তোমার কাছে শুনিতে চাই।

যুবতী আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিল; তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ভয়ে তাহার মূর্ছার উপক্রম হইল।

সে পড়িয়া যায় দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন,—তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও।

যুবতী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলিল,—ওই ঘরে কীরূপে আগুন লাগিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই; মিঃ কেনী কোথায় তাহাও আমি জানি না। আমি টিফিনের সময় বাহিরে গিয়াছিলাম; টিফিন করিয়া অফিসে আসিলে দেখি ঘরে আগুন লাগিয়াছে। মিঃ কেনীর সন্ধান পাইলাম না; বোধহয় তাহার পূর্বেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে জেরা করিয়া কোনও কথা বাহির করিতে পারিলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন—সে দুই সপ্তাহ পূর্বে একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া টাইপিস্টের চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ায় সে 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে টাইপিস্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে এক সপ্তাহের বেতন পাইয়াছে, আর-এক সপ্তাহের বেতন এখনও বাকি। দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্বেই এই অগ্নিকাণ্ড।

যে বালকটি বেয়ারার পদে নিযুক্ত হইয়াছিল—সে অদূরে দাঁড়াইয়া দমকলের সাহায্যে অগ্নিনির্বাপণের কৌশল লক্ষ করিতেছিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকেও মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিয়া আনিলেন; কিন্তু তাহাকেও জেরা করিয়া সম্পাদকের সন্ধান জানিতে পারিলেন না। সেই বালক বলিল—সম্পাদক মিঃ কেনী এক সপ্তাহ পূর্বে তাহাকে অফিসের বেয়ারা নিযুক্ত করিয়াছিল; তাহার এই এক সপ্তাহের বেতন বাকি আছে, তদ্ভিন্ন সে সম্পাদকের আদেশে নিজের

BanglaBook.org

পকেট হইতে পাঁচ শিলিং খরচ করিয়া ডাক-টিকিট কিনিয়া আনিয়াছিল। সম্পাদক কেনী তাহার নিকট হইতে টিকিটগুলি লইয়াছিল—কিন্তু মূল্য বাকি রাখিয়াছে। সুতরাং 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে চাকরি করিয়া তাহার এক সপ্তাহের বেতন ও নগদ পাঁচ শিলিং দণ্ড লাগিয়াছে। খবরের কাগজের অফিস পুড়িয়া গেল, সম্পাদক ফেরার; সুতরাং টাকাগুলি উদ্ধারের আশা নাই বুঝিয়া সে কেনীকে গালি দিতে লাগিল।

ফায়ার ইঞ্জিনগুলি অগ্নিনির্বাপণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসের ছাদ অগ্নিদগ্ধ হইয়া হুড়মুড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে যে-সকল লোক জমাট বাঁধিয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল—তাহারা প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল। তাহারা বুঝিল 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র নাম সফল হইয়াছে।

সার্জেন্ট ব্রাউন ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—অফিস তো ভাঙিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল। উহার প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা; দ্বিতীয় সংখ্যা আর বাহির হইবে না। এরকম হুজুগে কাগজের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। পল সাইনস কী মতলবে এই কাগজ বাহির করিয়াছিল—তাহা আমার অনুমান করা অসাধ্য।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—পল সাইনস কী মতলবে কোন কাজ করে—তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। আজ সকালে আমি যখন সেই হলদে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম —তখনই বুঝিয়াছিলাম—কোনও একটা কাণ্ড-কারখানা ঘটিবেই ঘটিবে।

সার্জেন্ট ব্রাউনের নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রবেশ করায় সে কাশিতে লাগিল; তাহার পর বলিল,—ধোঁয়ার চোটে গলা শুকাইয়া গিয়াছে; গলাটা একটু ভিজাইয়া লইতে না পারিলে শরীর চাঙ্গা হইবে না।

কী উপায়ে শরীর চাঙ্গা হয় তাহা ইন্সপেক্টর কুট্‌সের অজ্ঞাত ছিল না, তাঁহারও গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। এজন্য তিনি সার্জেন্ট ব্রাউনের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন,—কয়েক গজ দূরেই মদের দোকান আছে এবং আমার পকেটে পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোটও আছে; সুতরাং আমাদের পিপাসা শান্তি করা কঠিন হইবে না। ছিপছিপে কনোলী ধরা পড়িবার ভয়ে চম্পট দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে যে পাঁচ পাউন্ডের নোট আদায় করিয়াছি, তাহা দিয়া শ্যাম্পেন কিনিয়া আমরা গলা ভিজাইতে পারিব—ইহাও মন্দের ভাল।

স্মিথ বলিল,—ও পল সাইনসের টাকা, হজম করিতে পারিবে না বাবা! একবার তাহার টাকায় ম্যাগনিফিসেন্টে খানা খাইতে গিয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল; এবার কী হয় বলা যায় না! আমি উহার মধ্যে নাই।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স অদূরবর্তী মদের দোকানে উপস্থিত হইলেন। কুট্‌স মহানন্দে শ্যাম্পেনের বোতল খুলিলেন। মিঃ ব্লেক চুরুট টানিতে-টানিতে পল সাইনসের স্বাক্ষরিত অদ্ভুত পত্রখানির কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন পল সাইনস অসার দম্ভ ভালবাসিত না, সে পত্রে যাহা লিখিত, তাহা কার্যে পরিণত করিত; মিথ্যা কথায় কাহাকেও প্রতারিত করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সে পত্রে যে-কথা লিখিয়াছিল—তাহা কীরূপে কার্যে পরিণত করিবে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। বারোঘণ্টার মধ্যে সে তাহার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিবে—ইহা অসঙ্কোচে তাঁহার গোচর করিয়াছিল, কিন্তু কোথায় কীভাবে সে তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে—তাহা সে ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। মিঃ ব্লেক কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পল সাইনসের প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যর্থ এবং তাহার সুতীব্র রোষানল উদ্যত বজ্রের ন্যায় অবিলম্বে তাহার শত্রুগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স শ্যাম্পেনের গ্লাস খালি করিয়া বলিলেন,—চলো, এই মুহূর্তেই ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাই। কনোলীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে; যতগুলি লোক হাতে পাই

সকলকে চারিদিকে তাহার সন্ধানে পাঠাইয়া দিব। কনোলী তাহার কাগজের পসার-বৃদ্ধির জন্য যে-অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার সহিত পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধ আছে; সাইনসের সেই গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে। কিন্তু—ও আবার কী?

ঠিক সেই মুহূর্তে দোকানের আর্দালী একখানি ট্রে-র উপর ইন্সপেক্টর কুট্‌স-প্রদত্ত পাঁচ পাউন্ডের নোটখানি রাখিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল। এই নোটখানি তিনি সাইনস-বেশধারী পূর্বোক্ত লোকটির নিকট পাইয়াছিলেন এবং তাহা দিয়া তিনি শ্যাম্পেনের বোতল ক্রয় করিয়া বাকি টাকা ফেরত চাহিয়াছিলেন।

আর্দালী বলিল,—ম্যানেজার এই নোট লইতে পারিবেন না বলিলেন, এইজন্য আমি ইহা ফেরত আনিলাম।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—গোল্লায় যাক তোমাদের ম্যানেজার! সে এ-নোট লইতে পারিবে না কেন? —নোটের অপরাধ কী? আমাকে কী করিতে হইবে বলো। উহার পিঠে কি আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে?

আর্দালী বলল,—ওই কার্যটি সুবিবেচনার কাজ হইবে না মহাশয়! অনর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবেন? এ-নোট খারাপ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কী বলিলে? তিনি তৎক্ষণাৎ নোটখানি টানিয়া লইয়া তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তে সার্জেন্ট ব্রাউন ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নোটখানি দেখিতে লাগিল। ব্রাউন জাল ও জালিয়াত সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল; কোনও জালিয়াৎ তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিত না। জাল নোট সে একমাইল দূর হইতে দেখিলেও চিনিতে পারিত বলিয়া অহঙ্কার করিত। ইন্সপেক্টর কুট্‌স যখন এই নোট পুরস্কার পাইয়াছিলেন—সেইসময় সে ইহা দেখিলে জাল নোট বলিয়া চিনিতে পারিত।

ব্রাউন বলিল,—আর্দালীটা সত্য কথাই বলিয়াছে মহাশয়! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। এ-জাল নোট। এই অচল নোট কে আপনার কাছে চালাইয়া গিয়াছে? দোকানদার ইহা লইয়া আপনাকে বাকি টাকা দিবে কেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কী বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছিল; তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তিনি বহুদর্শী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, তাঁহার কাছে একটা বাজে লোক জাল নোট চালাইয়া গিয়াছে! শ্যাম্পেনের দাম এখন তাঁহাকে নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে? কী বিড়ম্বনা! মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন; তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিলেন না।

স্মিথ বলিল,—দুই পেনির কাগজ দেখাইয়া যখন ওই পাঁচ পাউন্ড মূল্যের উপহার লাভ করিয়াছিলেন—তখনই বুঝিয়াছিলাম উপহারে গলদ আছে। আপনি নোটখানি পাইয়াই বুঝি আনন্দে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছিলেন? উহা আসল কি জাল—তাহা পরীক্ষা করিবারও ফুরসৎ হয় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গর্জন করিয়া বলিলেন,—তুমি থামো হে ছোকরা! দুই পেনি দামের কাগজ দেখাইয়া যে-নোট পাওয়া গিয়াছিল—তাহা সচল কি অচল ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য কাহার আগ্রহ হয়? না, ইহা তখন আমি পরীক্ষা করি নাই। এই অচল নোট কি আমি ঘরে তুলিব ভাবিয়াছ? সেই ছিপছিপে কনোলীটাকে একবার হাতে পাইলে হয়, জাল নোট চালাইবার মজা তাহাকে বুঝাইয়া দিব। আমার সঙ্গে গোস্তাকি? বেটা চোর, ধাপ্পাবাজ, জালিয়াত, খুনে!

সার্জেন্ট ব্রাউন বলিল,—সে-পরের কথা পরে হইবে, এখন পকেট হইতে শ্যাম্পেনের দামটা দিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়ুন। আপনি পুলিশের লোক; একে জাল নোট তাহার উপর মদ কিনিয়া মদের দোকানে তাহা ভাঙাইবার চেষ্টা—ইহা তো আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নয়!

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিয়া অত্যন্ত বিরাগভরে দোকানদারের প্রাপ্য টাকা প্রদান করিলেন। মিঃ ব্লেক ব্যাঙ্ক-নোটখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, নোটখানি জাল নোট হইলেও জালিয়াতিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় ছিল। যে উহা জাল করিয়াছিল, সে যে প্রথম শ্রেণীর জালিয়াত, এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন; কিন্তু কে তাহা জাল করিয়াছিল তাহা তিনি কীরূপে বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন, পল সাইনস নানা প্রকার অপকর্মে অভ্যস্ত, অবশেষে সে জালিয়াতিও আরম্ভ করিয়াছে না কি? প্রত্যেক দুষ্কর্মের অনুষ্ঠানেই সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং পল সাইনস নোট জালও আরম্ভ করিয়াছিল—বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; বিশেষত সেদিন যে-সকল পাঁচ পাউন্ডের নোট বিতরিত হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই জাল নোট—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, কনোলী ওরফে মিলট-ই কেনী জাল নোট চালাইয়া জনসমাজকে প্রতারিত করিয়াছে; সে বুঝিয়াছিল তাহার প্রতারণা ধরা পড়িতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এজন্য সে ঘরে আগুন লাগাইয়া আজই সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই একদিনেই তাহার দুরভিসন্ধি সফল হইয়াছে। তাহার এই দুরভিসন্ধিটি কী—তাহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি!

স্মিথ বলিল,—এইভাবে সে তাহার মুরুব্বি পল সাইনসের পলায়নে সাহায্য করিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আমি ব্রাউনকে সঙ্গে লইয়া এখন ইয়ার্ডে চলিলাম ব্লেক; পুলিশ কমিশনরের নিকট আমাদের তদন্ত-ফল রিপোর্ট করিতে হইবে। আমাদের তদন্ত-ফল শুনিয়া তিনি খুব খুশি হইবেন। সময়ান্তরে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বেকার স্ট্রিটে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া স্মিথ তাঁহাকে বলিল,—কর্তা, পল সাইনস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই একটা উড়ো দমবাজিতে পুলিশকে থ বানাইয়া দিবে। আজ কয়েক ঘণ্টায় সে যে-হাত দেখাইয়াছে—তাহার ধাক্কা সামলাইতেই তাহারা লবেজান!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ স্মিথ, তোমার অনুমান সত্য। পুলিশ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই; সাইনস ঝড়ের মতো বেগে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসের আমদানি করিয়া এরকম একটা বিকট হই-চই কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে যে, সেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠা কঠিন হইবে।

স্মিথ বলিল,—আমরা যখন সম্পাদকের অফিসে গিয়াছিলাম—সেইসময় ইন্সপেক্টর কুট্‌স কনোলীকে গ্রেপ্তার করিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হইত কর্তা! বোধহয় সাইনসের গুপ্ত-সঙ্কল্পে কিছু বাধাও পড়িত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু তাহা হইলে কুট্‌স কনোলীর নিকট কোনও কথা জানিতে পারিত না। পল সাইনসের দলে বোধহয় একজনও বিশ্বাসঘাতক নাই। যদি তাহার কোনও অনুচর তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত তাহা হইলে সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা বিফল হইত না; সাইনসকে ধরা পড়িতে হইত। কনোলী পুরাতন পাপী, সে তিনবার জেল খাটিয়াছে, এই চতুর্থবার সে অপরাধ করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয়ে এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ তাহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারিত না; লন্ডনের পুলিশ, এমনকী, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাহার মুখ হইতে একটি কথাও কোনও উপায়ে বাহির করিতে পারিবে না।

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তামাকের ধূমে সেই কক্ষ যেন আঁধার হইয়া গেল; তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন! কিন্তু দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও পল সাইনসের নূতন ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন না। সে কোন শত্রুকে চূর্ণ করিবার জন্য কী কৌশল অবলম্বন করিবে, অথবা সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য কী নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। সাইনসের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা অধিকতর কঠিন ছিল। সে ইচ্ছা করিলে বহু স্থানেই ঠিক এক সময়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়া লোমহর্ষণ ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিতে

BanglaBook.org

পারিত; ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার নোট-বহি খুলিয়া পল সাইনসের অপরাধের আমূল বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। সে পার্কমুর কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর এ-কাল পর্যন্ত যে-সকল অপকর্ম করিয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার ধারাবাহিক বিবরণ আলোচনা করিয়া, তিনি তাহার শত্রুগণের নামের তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি সাইনসের দুইজন প্রধান শত্রুর নাম দেখিতে পাইলেন—একজন তাহার কারবারের কথরাদার জাবেজ নোল্যান্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি সার হারলি জেমস। এই দুই ব্যক্তিকে তাহার ষড়যন্ত্রে চূর্ণ হইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে তখন তাহার অনেক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনেকগুলি শত্রুর পরিচয় জানিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় হউক বা ঘটনাচক্রে হউক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সাইনস এবার তাঁহাদের মধ্যে কাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহা তিনি কীরূপে বুঝিবেন?

মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, পল সাইনসের কোনও-কোনও শত্রু পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; কেহ-কেহ তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা বহু দূরদেশে বাস করিতেছিল। অনেকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; এজন্য তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না। পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করাও তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

পল সাইনস মিঃ ব্লেককেও মহাশত্রু মনে করিত এবং মিঃ ব্লেকেরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং পল সাইনস সুযোগ পাইলেই যে তাঁহাকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন নাই; এমনকী, সেইদিন প্রভাতে তিনি পল সাইনসের স্বাক্ষরিত যে-ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন—তাহার কথাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চুরুট টানিতে-টানিতে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক এ-কথাও বুঝিতে পারিলেন যে, এবার পল সাইনস তাহার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিয়াছে। পূর্বে সে যাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিত, তাহার নাম প্রকাশ করিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিত; কিন্তু এবার সে সঙ্কল্প গোপন রাখিয়াছে। তাহার গুপ্ত-সঙ্কল্প প্রকাশিত হইলে তাহা কার্যে পরিণত করা কঠিন হইবে এবং মিঃ ব্লেক ও পুলিশ তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবেন; অধিকন্তু তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়া সে সতর্ক হইয়াছিল।

স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং ব্যগ্রভাবে জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে মিঃ ব্লেককে উত্তেজিতস্বরে বলিল,—কর্তা, কাগজ-বিক্রেতারা পল সাইনসের নাম করিয়া কী হাঁকিয়া যাইতেছে। সান্ধ্য দৈনিকে কি তাহার সম্বন্ধে কোনও নতুন সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে? —স্মিথ দুই-একমিনিট কান পাতিয়া কী শুনিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গিয়া পথ হইতে একখানি সান্ধ্য দৈনিক কিনিয়া আনিল। সেই দৈনিকখানি সে রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিতেছিল। সে কাগজখানি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া কৌতূহলভরে বলিল,—কর্তা, ইভিনিং নিউজে কী খবর বাহির হইয়াছে পড়িয়া দেখুন। অদ্ভুত ব্যাপার!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কী বাহির হইয়াছে?

স্মিথ বলিল,—পল সাইনসের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র। এই পত্রে সে পুলিশকে কঠোর ভাষায় গালি দিয়াছে; সদম্ভে লিখিয়াছে—আজ মধ্যাহ্নে সে পূর্ণ একঘণ্টা স্বাধীনভাবে পুলিশের চক্ষুর উপর বিচরণ করিয়াছে; কেবল তাহাই নহে—সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন প্রধান কর্মচারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছে এবং লন্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভের সম্মুখ দিয়া

BanglaBook.org

অবলীলাক্রমে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল; তিনি কাগজখানি খুলিয়াই প্রথমেই একখানি হাতে-লেখা পত্রের অবিকল নকল দেখিতে পাইলেন। পল সাইনস যে-পত্রখানি লিখিয়াছিল —তাহার ফটো প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহা যে পল সাইনসের স্বহস্ত-লিখিত পত্র ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। পত্রের নিচে তাহার স্বাক্ষর ছিল। সেই হস্তাক্ষর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত। মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিশ্বাসে পল সাইনসের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ ঃ

'জনসাধারণের নিকট স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সত্য কথা গোপনের চেষ্টা করিলে তাহা কি তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? না, সত্য-গোপনের অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু আজ বারোঘণ্টার মধ্যে তাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিবে—এ-কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি এবং ইভনিং নিউজ ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা আগামী-কল্য বেলা নয় ঘটিকায় সময় সদলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মুদ্রাযন্ত্র বিভাগে উপস্থিত হইয়া সেখানে দাবি করিবেন—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যে-সকল রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা জানিতে পারিয়াছে—তাহা বিস্তারিতভাবে তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা হউক; কারণ সেইসকল ঘটনার বিবরণ তাঁহাদের জানিবার অধিকার আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত পুলিশ বলিয়া যাহারা দম্ভ প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না—সেই লন্ডন-পুলিশ যদি শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হয়, জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অকৃতকার্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই অসামর্থ্য ও অপদার্থতার পরিচয় গোপন করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত এবং প্রকৃত সত্য জনসাধারণের গোচর করা অবশ্যকর্তব্য। পল সাইনস পুনর্বার যে-যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন—তাহাতে নিঃসন্দেহে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি পুলিশের শক্তি ও সম্ভ্রমের বনিয়াদ পর্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্য যে-কঠোর দণ্ডাঘাত করিবেন—তাহার বিবরণ জনসাধারণের নিকট গোপন করিবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—এ-কথা আমি—পল সাইনস দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছি।'

পঞ্চম প্রসঙ্গ ঃ নৈশ-আহ্বান

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্বাক্ষরিত সেই স্পর্ধাপূর্ণ পত্রখানি 'ইভনিং নিউজে' পাঠ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহা কি পল সাইনসের অসার ধাপ্পাবাজি, না স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্য অব্যর্থ দণ্ডাঘাত—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পুলিশকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য পল সাইনস যে কোনও বিরাট ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বিপন্ন পুলিশ অপদস্থ হইয়া তাহাদের লাঞ্ছনার কথা সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করিবে, বুঝিয়া সে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছে—এ-কথা মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—দেশের লক্ষ-লক্ষ লোক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে তাহাদের মুশকিল আসান বলিয়া মনে করে, বিপদে, সঙ্কটে তাহার অসাধারণ শক্তির উপর নির্ভর করে; সেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে যদি দেশের জনসাধারণের নিকট অসার, অপদার্থ, পঙ্গু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়—তাহা হইলে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে সে বিশ্বের সম্মুখে উপহাস্যাস্পদ করিতে পারিবে। দেশের সর্বত্র অরাজকতা আরম্ভ

BanglaBook.org

হইবে, সবেগে লুঠ-তরাজ চলিবে। পল সাইনসের কার্যে প্রতিপন্ন হইবে—গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী পুলিশ অপেক্ষা পল সাইনস অধিকতর বলবান! তাহার নেতৃত্বের নিকট সকলেরই মস্তক অবনত হইবে।

কিন্তু মিঃ ব্লেক এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাইনস প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে গোপনে বাস করিতেছিল, সে পুলিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের অপদস্থ করিতে সাহস করিবে—ইহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি তাঁহার হাতের কাগজখানি অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—সাইনস বোধহয় খেপিয়া গিয়াছে। সে পুলিশকে অপদস্থ করিয়া জনসমাজকে আতঙ্কাভিভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে এবং সংবাদ-পত্রে নিজের ঢাক বাজাইয়া সমাজে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। আজ রাত্রে সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিকট হয়তো কোনওরকম 'নাটুকে ভড়ং' প্রকাশ করিবে; তাহার ফলে কাল সকালে সকল ঘটনার কথা জানিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

স্মিথ বলিল,—তা বটে, কিন্তু পল সাইনসের এরূপ ষড়যন্ত্রের ফল অনিষ্টজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়। সাইনস কী মতলবে এই চাল চালিতেছে তাহা জানিতে পারিলে বোধহয় আমাদের ততদূর দুশ্চিন্তা হইত না; কিন্তু আমরা অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই; তবে এ-কথা সত্য যে, সাইনস যখনই ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তখনই কোনও না কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে! সেইসকল কথা আপনারও বোধহয় স্মরণ আছে। সে চিঠি লিখিয়া জাবেজ নোল্যান্ডকে চূর্ণ করিয়াছিল। সাইনস প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিল—সে ন্যাশনাল ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের দশ লক্ষ পাউন্ড লুঠ করিবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে দেখা গেল—সাইনসের চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছিল। তাহার পর সে যখন স্টেডফাস্ট লাইফ ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিকে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল—তখন তাহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার সেই সঙ্কল্প প্রায় সফল করিয়াছিল—ইহা আমরা সকলেই জানি। এইবার আবার সে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে। এক হুজুগে সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া এরূপ কৌশলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, সে লন্ডনের রাজপথে প্রকাশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না! সে নির্বিঘ্নে অন্তর্ধান করিয়া উৎকট দম্ভে পুলিশের মনে আতঙ্ক-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে; জাল নোট চালাইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মতো চতুর গোয়েন্দাকেও প্রতারিত ও অপদস্থ করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন, তিনি কী বলিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস ছদ্মবেশে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে প্রতারিত করিয়াছিল—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না; অথচ সে-সময় তাহাকে সাইনস বলিয়া গ্রেপ্তার করিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই! ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে কাগজ দেখাইয়া পাঁচ পাউন্ডের জাল নোট লইয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 'ইভনিং নিউজে' সাইনস যে-কথা লিখিয়াছিল—তাহা তো মিথ্যা নহে। সে দয়া করিয়া তাঁহার ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নাম উল্লেখ করে নাই; তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলে তাঁহারা অধিকতর অপদস্থ হইতেন।

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্পর্ধার পরিচয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সেইরাত্রে সাইনসের সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া তাঁহার অসাধ্য মনে হইল। লন্ডনের কোন অংশে সে কখন কীভাবে তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবে—তাহা তিনি কী উপায়ে জানিতে পারিবেন?

রাত্রি এগারোটা বাজিল। মিঃ ব্লেক তখনও চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে-করিতে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মিথ তাঁহার অদূরে বসিয়া কাগজ হাতে লইয়া পুনঃ-পুনঃ হাই তুলিতে

লাগিল, তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয়ন করিতে চলিল।

আরও দশ মিনিট পরে বহির্দ্বারে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ঝনঝনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলেন; তত রাত্রে কে দেখা করিতে আসিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া তিনি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—কে তুমি?

উত্তরের পরিবর্তে বাহিরে দাঁড়াইয়া কে শিস দিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাঁহার সঙ্গে দ্বিতলে চলিলেন। কুট্‌স চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে চারিদিকে চাহিলেন, তাহার পর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস টানিয়া লইয়া আধগ্লাস নির্জলা হুইস্কি গলাধঃকরণ করিলেন! এইভাবে গলা ভিজাইয়া লইবার পর তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। মদ না গিলিলে অনেক মাতালের বাক্যস্ফূর্তি হয় না!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—ব্লেক, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম—এখনও তুমি জাগিয়া আছ। আমি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অফিসেই ছিলাম। এগারোটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দরজা বন্ধ হইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অসময়ে যখন আসিয়াছ—তখন নিশ্চয়ই কোনও জরুরি সংবাদ আছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে একটি চুরুট লইয়া বলিলেন,—ইভনিং নিউজে পল সাইনসের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা দেখিয়াছ কি? সেই পাজিটা আজ রাত্রে কী কাণ্ড করিয়া বসিবে বুঝিতে না পারায় আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, ইভনিং নিউজ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সাইনসের পত্রের মর্মটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তবে তাহার কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। আজ রাত্রে কী ঘটিবে না-ঘটিবে তাহা আমি বলিতে না পারিলেও—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, লন্ডনের অধিকাংশ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার কাল সকালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া সাইনসের পত্রের মর্ম জানিবার জন্য তোমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে। সংবাদ-পত্রগুলি অনেকসময় পুলিশকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু কখনও-কখনও বিড়ম্বনাজনকও হইয়া উঠে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—এই ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি; আজ রাত্রে আমি ঘুমাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। পল সাইনস কীরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমি আমার এক বৎসরের বেতন ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তোমাদের পক্ষ হইতে কীরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—যতটুকু করা যাইতে পারে—তাহাই করা হইয়াছে; প্রত্যেক থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ তো সর্বত্রই সতর্ক আছে; এ-অবস্থায় তাগিদ দিয়া আর কী অধিক সুফলের প্রত্যাশা করা যাইবে? সাইনস লন্ডনের কোন পল্লীতে উপদ্রব আরম্ভ করিবে—তাহা জানিতে পারিলে আমরা সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিতাম। তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছ?

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি; অনুমানে নির্ভর করিয়া কী সিদ্ধান্ত করিব বলো। সাইনস এবার তাহার মতলবের কথা তো প্রকাশ করে নাই। আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি—সে লন্ডনের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে। ছিপছিপে কনোলী নিউটন স্ট্রিটের অফিসে আগুন লাগাইয়া অন্তর্ধান করিয়াছে; তাহার কোনও সন্ধান পাইয়াছ?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—না, সে একদম ফেরার। আমি তাহার সম্পাদিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের সহিত দেখা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কনোলী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারিল না। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি—সেই প্রতারক সম্পাদকের অফিস হইতে যে-সকল পাঁচ পাউন্ডের নোট উপহারস্বরূপ বিতরণ করা হইয়াছিল—সেগুলি সমস্তই জাল নোট!

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তুমি তো নিজেই একজন ভুক্তভোগী। সাইনসের চাতুরী

BanglaBook.org

ভেদ করা কীরূপ কঠিন তাহাও তুমি জানো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স নিস্তব্ধভাবে চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন; ক্রমে রাত্রি বারোটা বাজিল, তখনও তিনি উঠিলেন না। মিঃ ব্লেকও তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পল সাইনস সেই রাত্রে লন্ডনের কোন অংশে কাহার কী সর্বনাশ করিবে—এই চিন্তায় তাঁহাদের চক্ষুতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল না।

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া টেলিফোনের কলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—এরকম অসময়ে কে আমাকে টেলিফোনে ডাকিতেছে? এ-সময় আমি সাড়া দিতে চাহি না। লোকটা ডাকিয়া-ডাকিয়া হয়রান হউক।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—না, তোমার সাড়া না দেওয়া সঙ্গত হইবে না, বিশেষত আজ রাত্রে। কে কী উদ্দেশ্যে এই অসময়ে তোমার সন্ধান করিতেছে—তাহা জানিতে হইবে বইকী!

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন এবং রাগ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্টস্বরে সাড়া দিলেন।

প্রশ্ন হইল,—মিঃ ব্লেক! আপনিই কি মিঃ ব্লেক? কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ও ব্যাকুলতার অভাব ছিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কী বিপদ! আমি তো বলিয়াছি—আমিই রবার্ট ব্লেক, আপনি কে?

উত্তর হইল,—আমি—বিচারপতি সোয়েন কথা বলিতেছি; হ্যাঁ, আমার নাম বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন। আমি এই মুহূর্তেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাই মিঃ ব্লেক! আপনি দয়া করিয়া আসুন। আমার বিশ্বাস, অবিলম্বে কোনও সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা অপরিহার্য!

বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন এই রাত্রি বারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে উৎসুক! কে তিনি? পল সাইনসের সঙ্গে তাঁহার কি কোনও সম্বন্ধ আছে? —মনে-মনে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক বাঁ-হাতে নোটবহিখানি টানিয়া লইয়া খুলিলেন, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন—ষোলো বৎসর পূর্বে পল সাইনস নরহত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপর্দ হইলে, যে-বিচারক নিরপরাধ পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—তিনিই বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন! ভ্রান্ত জুরিদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হওয়ায় সেই বিচার-বিভ্রাটের জন্য তিনিও আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন। সুতরাং পল সাইনস যে তাঁহার নাম শত্রু-তালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাকেও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পল সাইনস সর্বাগ্রেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার দণ্ড উত্তোলিত করিলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়া বিচারপতি সোয়েনের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার আভাস পাইয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তাঁহার ধারণা হইল—এবার বিচারপতি সোয়েনের পালা! পল সাইনস এতদিন পরে তাঁহাকেই চূর্ণ করিবার জন্য সংহারাস্ত্র উদ্যত করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, এখন অত্যন্ত অসময়; আপনার কি আশঙ্কার কোনও কারণ আছে?

বিচারপতি সোয়েন অধীর স্বরে বলিলেন,—মিঃ ব্লেক, আশঙ্কার কারণ না থাকিলে এই রাত্রি বারোটার সময় আপনাকে বিরক্ত করিতাম? হ্যাঁ, আমার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই নরপিশাচ পল সাইনসের নিকট হইতে যে-সংবাদ পাইয়াছি, তাহা অত্যন্ত আতঙ্কদায়ক। সে আমাকে যে-ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, প্রভাতের পূর্বেই সে আমার সর্বনাশ করিবে; বোধহয় আমার মৃত্যু অনিবার্য। আপনি দয়া করিয়া আসুন, আর একমুহূর্ত বিলম্ব করিবেন না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিচারপতির কথা শুনিতে না পাইলেও মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিলেন—

BanglaBook.org

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে কোনও দুঃসংবাদ পাইয়াছেন। তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—ব্যাপার কী ব্লেক, টেলিফোনে নিশ্চয়ই কোনও মন্দ সংবাদ পাইয়াছ। কে তোমাকে ডাকিয়া কী কথা বলিল?

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে নিস্তব্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া টেলিফোনের রিসিভারের নিকট ওষ্ঠ স্থাপন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—আপনি বলিলেন, পল সাইনসের নিকট হইতে আপনি সংবাদ পাইয়াছেন! কী সংবাদ পাইয়াছেন বলুন তো। সে আপনাকে কীরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছে?

বিচারপতি বলিলেন,—তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিব না, কারণ আমি নিশ্চিত কিছুই জানিতে পারি নাই; তবে টেলিফোনে যে-সংবাদ পাইয়াছি—তাহা অত্যন্ত আতঙ্কজনক! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, দয়া করিয়া শীঘ্র—এই মুহূর্তেই আসুন মিঃ ব্লেক! আপনি এখানে আসিলে সকল কথা আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব। টেলিফোনে সেইসকল কথা আপনাকে বলিতে আমার সাহস হয় না। আপনি আমার বাড়ির ঠিকানা জানেন না কি? আমার ঠিকানা—ডলউইচ পল্লীর রেড হাউস। আপনি এই মুহূর্তেই আসিবেন কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তা আসিতে পারি, তবে কি না—কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই খট করিয়া শব্দ হইল—সঙ্গে-সঙ্গে লাইন বন্ধ হইয়া গেল। মিঃ ব্লেক আর কোনও সাড়া পাইলেন না। বিচারপতির ভয়ার্ত কণ্ঠ নীরব! মিঃ ব্লেক অগত্যা রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

ইনসেপেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,—এই রাত্রি বারোটার পর কে—।

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—বড় যে-সে লোক নহেন। যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন—তিনি বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন। ষোলো বৎসর পূর্বে ইঁহারই বিচারে—অথবা অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। উনি আজ রাত্রে পল সাইনসের নিকট হইতে অতি ভীষণ সংবাদ পাইয়াছেন; পল সাইনস উহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে! এজন্য বিচারপতি আতঙ্কে অধীর হইয়া আমাকে উঁহার বাড়িতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অর্থাৎ উনি বোধহয় আশা করিয়াছেন—পল সাইনসের পিস্তলের গুলি আমি 'গোলা খা-ডালা' করিয়া উঁহার প্রাণরক্ষা করিব!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হাত বাড়াইয়া টুপিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এতক্ষণ পরে পল সাইনসের মতলব বুঝিতে পারা গিয়াছে। এইবার জজসাহেবকে সে সাবাড় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে! এই জজটি 'ঘটিরাম' না হইলে কি আমাদের এত দুর্গতি হয়? যদি তিনি অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে পল সাইনস ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো সমাজের বুকে বসিয়া এভাবে রক্তপান করিত না; আমাদেরও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইতে হইত না; কিন্তু বেচারার প্রাণরক্ষার উপায় করিতে হইবে তো? তোমার মতলব কী? তুমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে যে! কী স্থির করিলে?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—জজ সোয়েনের কণ্ঠস্বর আমার অপরিচিত। তিনিই যে টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন—এ-বিষয়ে সর্বাগ্রে কৃতনিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। দেখো কুট্‌স, টেলিফোনের আহ্বানে কখনও-কখনও প্রতারিত হইতে হয়—ইহা বোধহয় তুমি অস্বীকার করিবে না; আমি একাধিকবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি। বিপদে পড়িয়া বিচারপতি সোয়েনই এই রাত্রে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন—ইহার অকাট্য প্রমাণ না পাইলে আমি রাত্রিকালে বাহিরে যাইব না। বক্তার কণ্ঠস্বরে যে-আতঙ্ক ও বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল না; সুতরাং বিচারপতি সোয়েনই যে আমার সাহায্য-প্রার্থী, এ-বিষয়ে সন্দেহের তেমন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; বিশেষত পল সাইনস বিচারপতি সোয়েনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে সে-সংবাদ অবিশ্বাসেরও যোগ্য নহে; তথাপি এ-বিষয়ে আমাকে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনের

BanglaBook.org

রিসিভারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং টেলিফোনের অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহার সহিত তিনি অল্পকাল পূর্বে আলাপ করিলেন—তাহার ঠিকানা কী?

প্রায় দুই মিনিট পরে অপারেটর তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল; তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া টেলিফোনের ডাইরেক্টরি দেখিতে লাগিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—সোয়েন—এন্ড্রু-রেড হাউস, ডলউইচ পল্লী। শোনো কুট্‌স, বিচারপতি সোয়েনের বাড়ি হইতেই টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অন্য কেহ কোনও দুরভিসন্ধিতে তাঁহার টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছে ইহা বিশ্বাস হয় না; সুতরাং বোধহয় ইহার মধ্যে প্রতারণা নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বিচারপতি সোয়েন বিপদের আশঙ্কায় তোমার সাহায্য প্রার্থনায় টেলিফোন করিয়াছেন; সাইনস আজ রাত্রে তাঁহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিব? আমরা সেখানে গিয়া দেখিব—বিচারপতি হয় নিরুদ্দেশ, না হয় নিহত হইয়াছেন।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন,—এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিচারপতি সোয়েন যদি জানিতে পারিতেন—তাঁহার বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হইলে তিনি আমাকে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই স্থানীয় থানায় সংবাদ দিয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। আমার সেখানে উপস্থিত হইবার অনেক পূর্বেই পুলিশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত। বিচারপতি সোয়েন আমাকে কীজন্য টেলিফোন করিলেন—তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে আমি তাঁহাকে পুলিশের অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিব না—ইহা তিনি কি জানেন না? তথাপি তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন। স্মিথ তখন তাহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত ছিল, মিঃ ব্লেক তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে ডাকিলেন না। তাঁহারা পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি পাওয়ায় তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক যে-ট্যাক্সিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন, ইহা সেই ট্যাক্সি! ট্যাক্সিওয়ালা যেন জানিতে পারিয়াছিল—তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইবেন এবং তাঁহার প্রতীক্ষাতেই সে যেন গাড়ি লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু পূর্বপরিচিত ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তিনি ট্যাক্সিতে উঠিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের পাশে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ট্যাক্সি দ্রুতবেগে নদী পার হইয়া লন্ডনের দক্ষিণাংশে ধাবিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অবসন্ন পদদ্বয় ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—দেখো ব্লেক, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিলাম। তোমার বাড়িতে না আসিলে আমি কি জানিতে পারিতাম—শয়তান সাইনস আজ কাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে? বৃদ্ধ বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন প্রায় আশি বৎসর; অনেকদিন পূর্বে তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে এতদিন পরে নির্যাতনের চেষ্টা করিয়া সাইনস কীরূপ হীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছে—ইহা চিন্তা করিয়া আমি কেবল বিস্মিত নহি, অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সাইনস কি মানুষ? সে এখন শোণিত-লোলুপ নেকড়ে; তাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই। বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন আশি বৎসরেরও অধিক, কারণ ষোলো বৎসর পূর্বে যখন তিনি পল সাইনসের মামলার বিচার করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি বোধহয় সাইনসের পিতার সমবয়স্ক। তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়া সাইনস যদি আনন্দ লাভ করে—তাহা হইলে তাহার প্রকৃতি কীরূপ তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আমার মনে হয়—।

মিঃ ব্লেক সহসা নীরব হইলেন। তাঁহাকে নির্বাক দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—তোমার

কী মনে হয়—কথাটা শেষ না করিয়া হঠাৎ চুপ করিলে কেন?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমার মনে হয় এই বৃদ্ধ বিচারপতিকে উৎপীড়িত করিবার জন্যই সাইনসের এ-সকল যোগাড়-যন্ত্র ও ষড়যন্ত্র হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে মশা মারিতে কামান পাতা! জাবেজ নোল্যান্ড ও সার হারলি জেমসকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে-বিরাট আয়োজন করিয়াছিল, যেরূপ চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছিল—তাহার সহিত তুলনা করিলে মনে হয় এবার তাহার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সে ভাবিয়াছে, যদি সে বৃদ্ধ বিচারপতিকে হত্যা করিতে পারে—তাহা হইলে তাহার গৌরব-বৃদ্ধি হইবে! লন্ডনের সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে—ষোলো বৎসর পূর্বে বিচারপতি সোয়েন বিনা অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করায় সে এই দীর্ঘকাল পরে তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল দিয়াছে। বিচারপতি সোয়েন রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবন-সায়াহ্নেও তাহার প্রতিহিংসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ পাঠে সে ও তাহার অনুচরেরা আনন্দিত হইবে এবং মনে করিবে ব্রিটিশ বিচার-পদ্ধতির উপর প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিয়াছে।

ট্যাক্সি ব্রিক্সটন অতিক্রম করিয়া হার্নি হিল অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার পর নানা পথ ঘুরিয়া ডলউইচ পল্লীতে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্র পল্লী তখন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন; সেই গভীর নিশীথে সেই শান্তিময় পল্লীতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনস কোনও নিষ্ঠুর কার্য করিবে—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সেই পল্লীর পথ-ঘাট ট্যাক্সিওয়ালার সুপরিচিত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল, কারণ সে কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিচারপতি সোয়েনের বাসগৃহের সম্মুখবর্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া গাড়ি থামাইল; বিচারপতির অট্টালিকার বহির্দ্বারে একখানি তাম্রফলকে খোদিত ছিল—'দি রেড হাউস' অর্থাৎ লালকুঠি।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গাড়ি হইতে নামিয়া ট্যাক্সিচালককে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি সেই অট্টালিকার দিকে চাহিয়া কোনও দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইল। অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেউড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেউড়ি পার হইয়া গৃহদ্বারের সম্মুখীন হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—আমরা ঠিক সময়েই এখানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে ব্লেক! এখানে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ওই দেখো জানালা দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতেছে। তুমিই আগে চলো ব্লেক! কারণ বিচারপতি সোয়েন তোমাকেই আহ্বান করিয়াছেন; আমার স্মরণ আছে—লোকটির প্রকৃতি উদ্ধত। আমাকে দেখিয়া তাঁহার মেজাজ গরম হইতে পারে; আমি পুলিশের লোক, বিনা আহ্বানে আমাকে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিলে তিনি হয়তো খেপিয়া উঠিয়া আমাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিবেন। আমি আগে যাইব না।

মিঃ ব্লেক অগ্রবর্তী হইলে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী একটি ক্ষীণকায় প্রৌঢ় দ্বার খুলিয়া দিল। সে তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত হল-ঘরে লইয়া চলিল। লোকটির বিনীত ব্যবহারে ইন্সপেক্টর কুট্‌স আশ্বস্ত হইলেন। সেই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—আপনিই তো মিঃ ব্লেক? জজসাহেব আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন মহাশয়! তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবেন। আমার সঙ্গে আসুন।

মিঃ ব্লেক তাহার সহিত অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু সেই কক্ষে তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের বাহিরের বারান্দা দিয়া কিছু দূরে আর একটি কক্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই কক্ষটির দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, উভয় পার্শ্বস্থ বাতায়ন পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। অর্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়া তাঁহারা সেই কক্ষে একটি বৃদ্ধের তুষারশুভ্র

BanglaBook.org

কেশরাশি এবং একখানি হাতমাত্র দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ও কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেও বৃদ্ধ সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সাড়াশব্দ না পাইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স দুই-এক পা অগ্রসর হইলেন এবং কাশিয়া সাড়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আশাকরি আপনিই মিঃ জাস্টিস সোয়েন?

বৃদ্ধ তথাপি কথা কহিলেন না; তাঁহার কোনও অঙ্গ নড়িল না। সেই কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত; কেবল ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেকের মন হঠাৎ গভীর সন্দেহ-পূর্ণ হইল। বৃদ্ধটি চেয়ারের হাতায় মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক সেই চেয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে একটি ধাক্কা দিলেন। সেই ধাক্কায় চেয়ার কাত হইল, সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধের মস্তক চেয়ার হইতে মেঝের গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—বিচারপতি নিহত হইয়াছেন! আমরা আসিয়াছি বটে, কিন্তু বড়ই বিলম্বে আসিলাম!

সেই মুহূর্তে বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—না মিঃ ব্লেক, একটুও বিলম্ব হয় নাই; ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। হ্যাঁ, ঠিক দরকারের সময়টিতেই।

কী সর্বনাশ! এ-স্বর যে মিঃ ব্লেকের পরিচিত! মিঃ ব্লেক সেই কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া পর্দা দ্বারা অর্ধাবৃত একটি বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সেখানে তিনি পল সাইনসকে ঈষৎ কুব্জভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার দৃষ্টি স্থির, তাহাতে নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে কঠোর হাসি; কিন্তু তাহা পিশাচের হাসির ন্যায় ভীষণ! তাহার অস্থিসার শিরাবহুল শীর্ণ হস্তে একটি পিস্তল, সে সেই পিস্তলটি মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে-ধীরে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক পল সাইনসকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে বুকের পকেটে হাত তুলিলেন; কিন্তু তিনি পকেট স্পর্শ করিবার পূর্বেই সাইনস দৃঢ়স্বরে বলিল,—না-না, ওই কার্যটি করিও না, পকেটে হাত পুরিয়াছ কি তোমরা দুজনেই মরিয়াছ। তোমরা উভয়েই শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকো। আমি আশা করিয়াছিলাম—এক ঢিলে দুই পাখি মারিব; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক ঢিলে তিন পাখি বধ করিবার সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে! আমার এ-পিস্তল নিঃশব্দে গুলিবর্ষণ করে; আমি তোমাদিগকে এক ইঞ্চি নড়িতে দেখিলেই গুলি করিয়া মারিব। তোমরা বোধহয় এতদিনে জানিতে পারিয়াছ—পল সাইনসের কথার কখনও অন্যথা হয় না।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ ঃ সাইনসের হাত-সাফাই

মৃত্যু অপরিহার্য দেখিয়া সম্মুখ-মৃত্যুকে সদম্ভে আলিঙ্গন করিলেই যে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করা হয় এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। তরবারি আস্ফালন করা অপেক্ষা তাহা কোষে আবদ্ধ করিয়া রাখাই অনেকসময় বীরত্বের নিদর্শন। যে-ব্যক্তি নিশ্চেষ্টভাবে বিপদের মুখে জীবন বিসর্জন করে—তাহাকে বীর না বলিয়া মূঢ় বলাই সঙ্গত। মিঃ ব্লেক পল সাইনসের গুলিতে নিহত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি ও ইন্সপেক্টর কুট্‌স সাইনসের আদেশে তৎক্ষণাৎ উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিলেন। কিন্তু তিনি মাথার উপর হাত তুলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না; কী কৌশলে সাইনসের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সাইনসের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার বিন্দুমাত্র অসতর্কতার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পল সাইনস এরূপ অতর্কিতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার

BanglaBook.org

জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা—আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কাও সামলাইতে পারেন নাই। তথাপি সাইনসের এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব ইহাও মিঃ ব্লেক মনে করিতে পারেন নাই। তিনি যে-মুহূর্তে বিচারপতি সোয়েনের নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—বিচারপতি সোয়েন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—ইহা একটু অস্বাভাবিক, ভিতরে কোনও রহস্য আছে। তিনি বিপন্ন হইয়া থাকিলে নিকটস্থ থানায় সংবাদ না দিয়া বহুদূরবর্তী লন্ডনে টেলিফোন করিয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন কেন? এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিচারপতির বাড়ি হইতে টেলিফোন করা হইয়াছিল—ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পল সাইনসের কবলে পড়িতে হইল। এখন তাঁহাদের অবস্থা—'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে মেঝের উপব নিপতিত বিচারপতি সোয়েনের প্রাণহীন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইনস্‌কে কঠোর স্বরে বলিলেন,—ওরে ইতর নরহন্তা, এই অপরাধে তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইবে। ইহার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু ক্রোধে কাঁপিতে থাকিলেও মাথার উপর হইতে তিনি হাত নামাইতে সাহস করিলেন না।

পল সাইনস তাঁহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—না ইন্সপেক্টর, বিচারপতি সোয়েন-হত্যাপরাধে আমার ফাঁসি হইবে না। তোমার অনুমান সত্য নহে। বিচারপতি সোয়েনকে আমি হত্যা করি নাই; এই হতভাগ্য বৃদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমি উহার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করি নাই। আমাকে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উহার মনে যে-আতঙ্ক হইয়াছিল, সেই আতঙ্কে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই উহার মৃত্যু হইয়াছে। উহার শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আমার উক্তির যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,—চুলোয় যাক তোমার এখানে হঠাৎ উপস্থিতি! উনি জানিতেন, উঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। উনি তোমার নিকট হইতে আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া যখন মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন আমি মিঃ ব্লেকের ঘরে উপস্থিত ছিলাম। হ্যাঁ, উনি ব্লেককে জানাইয়াছিলেন—তোমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই উনি আতঙ্কে অধীর হইয়াছিলেন।

পল সাইনস তাহার হাতের পিস্তল উভয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বাগাইয়া ধরিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিল,—না গো ইন্সপেক্টর সাহেব! তোমার কথা সত্য নয়। বিচারপতি সোয়েন তোমার বন্ধু মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে কোনও কথা বলে নাই, এখানে উহাকে আসিতেও অনুরোধ করে নাই। বেকার স্ট্রিটে টেলিফোন করিয়া যিনি মিঃ ব্লেককে এখানে আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি মিঃ পল সাইনস অর্থাৎ স্বয়ং আমি, এই অধম। বিচারপতির ওই টেলিফোন আমিই ব্যবহার করিয়াছিলাম; নতুবা আমি কি আমার দুই মহাশত্রুকে এভাবে ফাঁদে ফেলিতে পারিতাম? তোমরা কোন্ কীটস্য কীট যে বিচারপতি সোয়েন তোমাদের সাহায্য প্রার্থনায় লন্ডনে টেলিফোন করিবে? আমার এই সামান্য চালাকি বুঝিতে পারো না, অথচ মাদার গাছে দাদ চুলকাইতে তোমাদের সাধ হয়!

পল সাইনসের কথা শুনিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের ঝাঁটার মতো উদ্ধত গোঁফ মনস্তাপে ঝুলিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক ঈষৎ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, এ-চালাকি আমাদের বুঝিতে পারা উচিত ছিল। আমাদের এই নির্বুদ্ধিতার মার্জনা নাই। বিচারপতি সোয়েন চেষ্টা করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন; এ-অবস্থায় লন্ডনে আমাকে কেন সংবাদ দিবেন—ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পল সাইনসকে বলিলেন,—আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া তোমার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছে। উত্তম, এখন বলো—তুমি কী উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছ?

BanglaBook.org

পল সাইনস বলিল,—তোমাদিগকে? না, আমি তোমাকে এখানে আহ্বান করি নাই। তোমাকে আমি মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করি না; আমার নিকট তুমি একটা তুচ্ছ পতঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমি কেবল মিঃ ব্লেককেই এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম। তুমি তাহার লেজ ধরিয়া আসিয়া আমার কৈফিয়ৎ চাহিতেছ কেন? তোমাকে কি আমি ডাকিয়াছি? তোমার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধার পরিচয় পাইয়া হাসিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। হ্যাঁ, আমি মিঃ ব্লেককেই বিচারপতি সোয়েনের নামে এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম; তবে তুমিও স্বেচ্ছায় আসিয়া জুটিয়াছ—ইহাতে আমি অসুখী হই নাই, বরং আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদিগকে অনেক কথাই বলিবার ছিল, কিন্তু সে-অবসর আমার নাই; প্রভাতের পূর্বেই আমাকে বিস্তর কাজ শেষ করিতে হইবে, এজন্য আমাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিতে হইতেছে। যদি তোমরা ম্যান্টলপিসের ওই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখো তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, রাত্রি এখন একটা বাজিয়া নয় মিনিট হইয়াছে। একটা বাজিয়া বারো মিনিট হইলে এই কক্ষে একটির পরিবর্তে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া থাকিবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই আমি কার্যারম্ভ করিয়াছি। আমি মনের কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিতে অভ্যস্ত নহি; এইজন্য সরলভাবে বলিতেছি তোমাদের দুজনকে আর তিন মিনিটের মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ তোমরা এখনই মরিবে।

পল সাইনস এভাবে কথাগুলি বলিল, যেন সে তাঁহাদের সঙ্গে তামাশা করিতেছিল! কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সে সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। ইহা তাঁহাদিগকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন নয়। সে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে। আর তিন মিনিট মাত্র সময় আছে! এখন কর্তব্য কী?

পল সাইনসের চক্ষুতে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল, সে অধর দংশন করিয়া পিস্তলের নল আর একটু উঁচু করিয়া লক্ষ্য স্থির করিল। তাহা দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, (ট্রাউজারের অবস্থা কী হইল—তাহা অন্যের অজ্ঞাত) তবে তাঁহার দুই চক্ষু ভয়ে কপালে উঠিল, মুখ চুন হইয়া গেল। তিনি আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিলেন,—অ্যাঁ, তুমি বলিতেছ কী? তুমি আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে? স্বেচ্ছায় নরহত্যা করিবে? ইচ্ছা করিয়া ফাঁসির দড়ি গলায় পরিবে? না, না, তুমি তত নির্বোধ নহ; আমাদিগকে তুমি ভয় দেখাইয়া কাহিল করিতে চাহিতেছ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া পল সাইনস ক্ষিপ্তের ন্যায় হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল,—না, দুই মিনিট কাটিয়া গেল; কিন্তু তোমার কথার উত্তর না দিয়া গুলি করিলে তোমার মনে একটু আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে। আমার দয়ার শরীর, তোমার মৃত্যুকালে ওই আক্ষেপটুকু থাকিতে দিব না। আমি তোমাদিগকে বৃথা ভয় দেখাইতেছি না। সত্যই তোমাদিগকে গুলি করিব। আমি জানি, এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু প্রাণদণ্ডের মতো কাজ অনেক করিয়াছি। একবারের বেশি দুইবার ফাঁসি হইবে কি? মিঃ ব্লেক, আমার শত্রুগণের নামের যে-তালিকা আছে—সেই তালিকার অনেক নিচে তোমার নাম ছিল; কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার অনেক কাজ নষ্ট করিয়াছ, আমার অনেক সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছ। আমার যে-ক্ষতি করিয়াছ তাহার প্রতিকার নাই; সে কীরূপ সাংঘাতিক ক্ষতি—তাহা তুমিও জানো। এইসকল কারণে তোমার নাম তালিকার অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে; এইবারই তোমার পালা। তোমাকে হত্যা করিলে আমার অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। তোমাকে আমি অনেকবার সতর্ক করিয়াছি, অনধিকার-চর্চা করিতে নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করো নাই। এখন তাহার ফলভোগ করো; তোমার সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওই বেহায়া কুকুরটাও মরুক।

মিঃ ব্লেক কোনও কথা বলিবার পূর্বেই পল সাইনস তাহার হাতের পিস্তলটা ঈষৎ নামাইয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল; তাহার পর সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল,—তোমারই অনধিকার-চর্চার ফলে আমার একটি পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তিনজন আজও জেলে পচিতেছে। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কোনও কুকুরকে গ্রাহ্য করি না; কিন্তু তোমার

BanglaBook.org

শত্রুতায় আমার যে-ক্ষতি হইয়াছে—তাহা পূরণ হইবার নহে। এজন্য আমি নতুন কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার পূর্বে তোমাকে হত্যা করিতেছি। তোমার ধৃষ্টতার ফলভোগ করো।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—আর রক্ষা নাই, পল সাইনস খেপিয়া উঠিয়াছে; সে মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার বক্ষঃস্থলে গুলি করিবে—সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইবে। কিন্তু তিনি আত্মরক্ষার কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে একটু হটিয়া গিয়া গুলি করিবে—সেই মুহূর্তে মিঃ ব্লেক সম্মুখস্থ চেয়ারখানি উভয় হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিলেন, পিস্তলের শব্দ হইল না, কিন্তু গুলি চেয়ার বিদীর্ণ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স চিৎকার করিয়া বলিলেন,—ব্লেক, উহার গুলি ব্যর্থ হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, তাহার পর পল সাইনসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়াছিল, তাহাতে বাধিয়া তিনি সেই মৃতদেহের উপর আছাড় খাইলেন। মিঃ ব্লেক একলম্ফে সাইনসকে আক্রমণ করিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কণ্ঠ স্পর্শ করিবার পূর্বেই সে বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া গেল এবং তাহার হাতের পিস্তলটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক বাতির ফানুসের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল।

বাতিটা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিতেছিল। পল সাইনসসের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। বাতিটা সেই আঘাতে চূর্ণ হইল এবং কাচগুলা ভাঙিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িল। দীপ নির্বাপিত হওয়ায় সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষ সহসা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও পল সাইনস তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। সে তখন একটি জানালার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে সেই কক্ষের দীপ নির্বাপিত করিয়াই সেই জানালা খুলিয়া ফেলিল এবং সেইদিকের বাগানে প্রবেশ করিল।

পল সাইনসের আশা ছিল—সে সেই কক্ষেই মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; কিন্তু আশাপূর্ণ না হওয়ায় সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। সেই অট্টালিকায় আর মুহূর্তকাল বিলম্ব করা সে নিরাপদ মনে না করিয়া ডলউইচ পল্লী ত্যাগের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বিচারপতি সোয়েনের বাগানের বাহিরে আসিল।

পল সাইনস পথে আসিয়া, পকেট হইতে ফেল্টের টুপি বাহির করিয়া মাথায় আঁটিয়া দিল এবং একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া পথপ্রান্তবর্তী একখানি মোটরকারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌স এই গাড়িতেই বিচারপতি সোয়েনের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

এই গাড়িখানি সুইফট সিওর কোম্পানির আড্ডার গাড়ি—ইহা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। পল সাইনসের আদেশেই এই গাড়ির ড্রাইভার যথাসময়ে বেকার স্ট্রিটে মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল।

মোটরচালক পল সাইনসকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া দিল। পল সাইনস গাড়িতে উঠিয়া তাহার পাশেই বসিয়া পড়িল। মোটরচালক সেই মুহূর্তে গাড়ি চালাইয়া তাহাকে বলিল,—কর্তা, আপনি খুব সাফাই-হাতে কাজ শেষ করিয়াছেন। পিস্তলের আওয়াজ হয় নাই; কাজেই গোয়েন্দা দুটো বুড়ো জজের ঘরে অক্কালাভ করিয়াছে—ইহা কেহই জানিতে পারিবে না। কী চমৎকার পিস্তল, হাজার টাকা পাইলেও আমি কখনও উহা হাতছাড়া করিব না।

পল সাইনস যে-পিস্তলটি লইয়া গিয়াছিল, তাহা এই মোটরচালকেরই পিস্তল। মোটরচালকটি যে-সে লোক নয়; ইহারই নাম 'চটপটে' হ্যারিস। চিকাগো হইতে সে লন্ডনে আসিয়া পল সাইনসের দলে যোগদান করিয়াছিল। পিস্তলটি তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পল সাইনস সেই পিস্তল-নিক্ষেপে বৈদ্যুতিক দীপ নির্বাপিত করিতে গিয়া পিস্তলটি হারাইয়া আসিয়াছে; তাহা মিঃ ব্লেক বা ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইয়াছে—ইহা সে 'চটপটে' হ্যারিসের নিকট প্রকাশ করিল না। সে

বুঝিল—তাহা উদ্ধার করিতে হইলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে।

পল সাইনস যে-সময় পিস্তল নিক্ষেপ করিয়া বিজলি-বাতির ফানুসটি চূর্ণ করিয়াছিল—সে-সময় মিঃ ব্লেক সেই আলোকাধারের ঠিক নিচেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আলোকাধারের কাচগুলি তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ায় তাঁহার গাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কোনদিকে যাইবেন—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; যাহা হউক, অবশেষে অগ্নিকুণ্ডের মৃদু আলোকে তিনি দিকনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,—কুট্‌স, কোথায় তুমি? তোমার সাড়া পাইতেছি না কেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অন্ধকারে চতুর্দিক হাতড়াইতে-হাতড়াইতে বলিলেন,—এই যে আমি আছাড় খাইয়াছি! সাইনস কোথায়? সে কোনদিক দিয়া পলায়ন করিল? তোমার কাছে বিজলি-বাতি নাই?

খোলা জানালা দিয়া বাতাসের একটা দমকা আসিয়া মিঃ ব্লেকের চোখে-মুখে লাগিল; তিনি বুঝিলেন সাইনস সেই পথে অন্তর্ধান করিয়াছে। তিনি পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ ভিন্ন সেই কক্ষে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের প্রান্তবর্তী সেই খোলা জানালা দিয়া পার্শ্বস্থ বাগানের দিকে চাহিয়া সাইনসের পলায়ন সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,—সে আবার আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে? কিন্তু সে আর অধিক দূর পলায়ন করিতে পারিবে না ব্লেক! তুমি বাগান দিয়া তাহার অনুসরণ করো, আমি সম্মুখের পথে যাইতেছি। আজ তাহাকে গ্রেপ্তার করাই চাই।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই খোলা জানালা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন; ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষ হইতে সম্মুখস্থ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ!

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়াই ইন্সপেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন, যে-লোকটি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছিল সে বিচারপতি সোয়েনের পরিচারক নহে, সে পল সাইনসেরই কোনও অনুচর। ইন্সপেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণুভাবে রুদ্ধদ্বারে দুমদাম শব্দে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কয়েকবার পদাঘাতের পর দ্বারের অর্গল দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুক্তদ্বার দিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নিমেষে পথে নামিয়া আসিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পথে আসিয়াই দেউড়ির অদূরে মিঃ ব্লেককে দণ্ডায়মান দেখিলেন। মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া পথের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স একখানি ধাবমান মোটরগাড়ির পশ্চাতের লোহিতালোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—পল সাইনস সেই গাড়িতে উঠিয়া চম্পটদান করিয়াছে। মোটরকারের ইঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ দূর হইতে বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন,—পল সাইনস আমাদের গাড়ি লইয়া পলায়ন করিল! সে এই গাড়িতে উঠিয়া-বসিয়া সোফেয়ারকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাইয়াছিল; সে প্রাণভয়ে সাইনসের আদেশ পালন করিয়াছে। সোফেয়ার যে সাইনসেরই অনুচর—ইহা মিঃ ব্লেক তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিল,—সাইনস এখানে একাকী আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—না, যে-লোকটা আমাদিগকে বিচারপতি সোয়েনের সঙ্গে দেখা করাইতে লইয়া গিয়াছিল—সে সাইনসের দলভুক্ত দস্যু।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে একটি হুইসল বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন; তিনি ক্রমাগত পাঁচ মিনিট বোঁ-বোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলেন না। কোনও পাহারাওয়ালা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল না। সেইরাত্রে সে-অঞ্চলে কোনও পাহারাওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়াছিল—ইহারও কোনও প্রমাণ মিলিল না।

BanglaBook.org

যাহা হউক, সেই হুইসল শুনিয়া সেই পল্লীর অনেক লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারা ঘরের জানালা খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিল। গৃহবাসীরা ব্যাপার কী বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া বংশীধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেহ কাহারও নিকট সদুত্তর পাইল না। অবশেষে একটি বৃদ্ধ চটি পায়ে দিয়া পায়জামার উপর একটা ভারি ওভারকোট চাপাইয়া ফটাফট শব্দে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পুলিশ-হুইসল মুখে গুঁজিয়া নিস্তব্ধ রাজপথে দণ্ডায়মান দেখিয়া বৃদ্ধ বিস্মিত হইলেন, কুট্‌সকে বলিলেন,—কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে কি? আমি চিকিৎসক; যদি প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা বিচারপতি সোয়েনের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন যে! হ্যাঁ, উহা মিঃ সোয়েনেরই বাড়ি। বুড়া জজ পেনশন লইয়া বহুদিন হইতে এই বাড়িতেই বাস করিতেছেন। আমি অনেকবার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছি; তিনি অসুস্থ হইলে মধ্যে-মধ্যে আমাকে ডাকাইতেন। বুড়া মানুষ, ইদানিং প্রায়ই অসুখে ভুগিতেছেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আপনারই রোগী? দুঃখের বিষয় আপনাকে আর তিনি ডাকিবেন না; আর তাঁহার চিকিৎসাও আপনাকে করিতে হইবে না।

ডাক্তার বিস্ফারিত নেত্রে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স নির্বিকারভাবে বলিলেন,—অর্থাৎ তিনি শিঙা ফুঁকিয়াছেন; কিন্তু আমি যেভাবে শিঙা ফুঁকিতেছি—এভাবে নয়। তিনি এখন আরও বড় বিচারপতির আদালতের আসামী। আপনি তো তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার চিকিৎসা করিতেন বলিলেন; তাঁহার হৃদযন্ত্র কি দুর্বল ছিল?

ডাক্তার বলিলেন,—হ্যাঁ মহাশয়, তাঁহার হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিল। বয়স খুব বেশি হইয়াছিল কি না। হঠাৎ মারা পড়িবেন—আশ্চর্য কী?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সাইনস বোধহয় সত্য কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি সোয়েন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলেও তাঁহার মৃত্যুর জন্য নরপিশাচ সাইনসই দায়ী; হত্যার অপরাধ তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছে। সাইনস তাঁহাকে হাতে না মারিলেও তাহার হুমকিতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ-অঞ্চলের পুলিশের সন্ধান নাই কেন? সব বেটা পাহারাওয়ালাই মরিয়াছে না কি? না, সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে? বিচারপতির বাড়ির টেলিফোনটা কোথায় আছে বলিতে পারো?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাঁহার হল-ঘরে আছে—দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি সেই ডাক্তারটিকে সঙ্গে লইয়া পুনর্বার বিচারপতির বাসভবনে প্রবেশ করিলেন; ইন্সপেক্টর কুট্‌স নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স টেলিফোনের রিসিভার লইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক দীপের একটা ফানুস সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে পূর্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ আলোকিত করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই, আমার মতে বিচারপতি সোয়েন হৃদরোগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবত তিনি হঠাৎ মনে ভয়ঙ্কর আঘাত পাইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সম্ভব বটে; পল সাইনসকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলে ভয়েই প্রাণত্যাগ করে—এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে।

কুট্‌স সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—বীটে একজনও কনস্টেবল উপস্থিত নাই; কারণ এদিকে যত পাহারাওয়ালা ছিল—সকলকেই কোনও জরুরি কার্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেই জরুরি কাজটা কী বুঝিয়াছ ব্লেক? স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়াছিল—পল সাইনস আজ রাত্রে এই অঞ্চলে আসিয়া লুকাইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঠিক বাড়ি

BanglaBook.org

শনাক্ত করিতে না পারিয়া সিডেনহাম হিলের এক বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়াছিল; সুতরাং তাহারা পল সাইনসের সন্ধান পায় নাই। সেই বাড়িতে জনমানবের সমাগম ছিল না, একদম খালি বাড়ি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনসকে সেই বাড়িতে পাওয়া যাইবে—এ-সংবাদ পুলিশ কোথায় পাইয়াছিল?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতেই না কি এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল—অথচ আমি পূর্বে তাহা জানিতে পারি নাই। আমি রাত্রি এগারোটার সময় ইয়ার্ড হইতে তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম, তখনও পর্যন্ত পল সাইনস সম্বন্ধে কোনও সংবাদ ইয়ার্ডে প্রেরিত হয় নাই। সে সময় ইয়ার্ডে একজন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, তাহারই উপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভার ছিল; সুতরাং এই সংবাদ সে ভিন্ন অন্য কেহ পাঠাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মুহূর্ত পরে একখানি মোটর-গাড়ির ইঞ্জিনের ঘস-ঘস শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—এই পথে মোটরে কে আসিতেছে সন্ধান লইতে পারো?

কিন্তু ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পথ পর্যন্ত যাইতে হইল না; মোটরখানি বিচারপতি সোয়েনের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন সার্জেন্ট ও দুইজন কনস্টেবল সহ সেই মোটর হইতে নামিয়া বিচারপতির অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স নবাগত ইন্সপেক্টরকে বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যুসংক্রান্ত সকল কথা বলিলেন; তাঁহারা কী উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পল সাইনস কী উপায়ে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা শুনিয়া স্থানীয় ইন্সপেক্টর মিঃ কুট্‌সকে বলিলেন,—আমরা পল সাইনসেরই সন্ধানে আসিয়া অনর্থক হয়রান হইয়াছি—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। সে যে এই লালকুঠিতে আসিয়া এরূপ ভীষণ কাণ্ড করিয়া গিয়াছে—ইহা কি একবারও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম? পল সাইনসের পলায়নের পূর্বে যদি আমি সদলে এখানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ নিশ্চয়ই তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে উপদেশ পাইলাম—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বাধা দিয়া বলিলেন,—আপনি কোন সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কী উপদেশ পাইয়াছিলেন?

স্থানীয় ইন্সপেক্টর বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিবার আট মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ-ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী টেলিফোনে আমাকে জ্ঞাপন করেন, আজ রাত্রে সিডেনহাম হিল পল্লীর একখানি বাড়িতে পল সাইনস লুকাইয়া থাকিবে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে নির্ভর করিয়া তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন—আমি যেন আমার থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাগুলিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই এবং সেই বাড়ি ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাশ আরম্ভ করি। কিন্তু আমার সকল শ্রমই বিফল হইল; কারণ সেই বাড়ি খালি পড়িয়াছিল। গত দুইমাসের মধ্যে সেই বাড়িতে কোনও লোক প্রবেশ করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়া অনর্থক হয়রান করা হইয়াছে—এ-কথা আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট করিয়াছেন?

স্থানীয় ইন্সপেক্টর বলিলেন,—না, তাহার অবসর পাই নাই। আমি মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সে-কথা জানাইতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় আপনি টেলিফোনে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি। এখানে আসিবার সময় আমার থানার সার্জেন্টকে বলিয়া আসিয়াছি—সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ-কর্মচারীকে আমাদের খানাতল্লাশির সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমিই স্বয়ং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব। পল সাইনসের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে আপনি যে-সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ইহা তো বলা যায় না—কেবল বাড়ি ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, স্কটল্যান্ড

BanglaBook.org

ইয়ার্ড এ-সংবাদ কোথায় পাইয়াছিল—তাহাই আমি সর্বাগ্রে জানিতে চাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন; কিন্তু দুই-একমিনিট তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তিনি বিরক্তিভরে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিলেন এবং ব্যাকুলভাবে গোঁফ টানিতে-টানিতে স্থানীয় ইন্সপেক্টরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। বোধহয় 'লাইন' খারাপ হইয়াছে; কিন্তু অপারেটর তাহা স্বীকার করিল না। আমরা আপনাদের সঙ্গে থানায় যাইব—ইন্সপেক্টর! আপনি এজন সার্জেন্টের উপর এই বাড়ির ভার দিয়া যাইতে পারেন। আজ রাত্রে এখানে আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; পল সাইনস এতক্ষণ বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বেনসন বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু সম্বন্ধে যে-অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পল সাইনস সেইরাত্রির মতো কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেইরাত্রে সে আর কোনও স্থানে কোনওরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল—সে আরও নানাপ্রকার ফন্দি লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে এবং নূতন করিয়া যখন পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে—তখন বিচারপতি সোয়েনের অপমৃত্যুতেই তাহার সকল চেষ্টার নিবৃত্তি হইবে না। সে সংবাদ-পত্রের সাহায্যে যে-দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিল—বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যুতেই যে তাহার অবসান হইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যদি হৃদরোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে —তাহা হইলে পল সাইনসের শত্রুধ্বংসজনিত এই বিজয় তাহার পৌরুষ বা শক্তির পরিচায়ক নহে; তাহার একজন প্রধান শত্রুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার যে-বিজয়লাভ হইল, তাহা শোণিতপাত-রহিত রণজয়—ইহা বুঝিয়া সে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। ডলউইচ পল্লীর লালকুঠি নামক ভবনে উপস্থিত হইয়া সে যে-সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের ও মিঃ ব্লেকের জীবন যে-ভাবে বিপন্ন করিয়াছিল, তাহাতে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশ কোনও চেষ্টা করিতে পারে নাই; কিন্তু সেজন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে অপরাধী করা সঙ্গত নহে। পরদিন সকালে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিবর্গ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া যে-সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশের অক্ষমতা ও কলঙ্ক প্রচার-ভয়ে যে-সকল কথা তাহাদের নিকট গোপন করিতে বাধ্য হইবে—তাহা বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ অপেক্ষা অনেক অধিক লোমহর্ষণ ও ভীষণতর ঘটনায় পূর্ণ—এইরূপই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক এইসকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—পল সাইনস যদি আমাকে ও তোমাকে বিচারপতি সোয়েনের অনুসরণে পাঠাইতে পারিত তাহা হইলে সেই সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের যোগ্য হইত বটে, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ সে-সংবাদ সংবাদ-পত্রসমূহের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। এ-অবস্থায় পল সাইনস কী উদ্দেশ্যে সংবাদ-পত্রে ওইরূপ স্পর্ধাপূর্ণ বাণী প্রচারিত করিয়াছিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না! তবে এ-কথা সত্য যে, এখন হইতে আগামী-কল্য বেলা নয়টা পর্যন্ত এরূপ কোনও কার্য ঘটিতেও পারে—যাহার বিবরণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জনসাধারণের নিকট গোপন করাই সঙ্গত মনে করিবে।

অতঃপর মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত স্থানীয় ইন্সপেক্টর রোসির মোটরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মোটরখানি তাঁহাদিগকে লইয়া নিস্তব্ধ রাজপথ দিয়া সবেগে ধাবিত হইল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মানসিক উত্তেজনা দমন করিতে না পারিয়া গোঁফ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন! তিনি তাড়াতাড়ি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইরাত্রে পল সাইনসের সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষণ-কাহিনী কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্যই তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল এরূপ নহে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পল সাইনসের গতিবিধির সংবাদ কীরূপে জানিতে পারিল —

BanglaBook.org

তাহা জানিবার জন্যও তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাদের গতিরোধ হইল এবং তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে যে বিলম্ব হইল তাহা যেমন আকস্মিক সেইরূপ বিস্ময়াবহ। সহসা পুলিশ হুইসলের তীব্রস্বরে নিস্তব্ধ নৈশ-প্রকৃতি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি পথের একপাশ হইতে পথের মধ্যস্থলে লাফাইয়া পড়িল! সেই লোকটি পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ট্যাক্সি থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

ট্যাক্সির মাথার সম্মুখে যে দুইটি উজ্জ্বল আলো ছিল তাহা সম্মুখস্থ পথের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করিতেছিল; মিঃ ব্রেক ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই আলোকে পথিমধ্যবর্তী আগন্তুককে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে পুলিশ কনস্টেবল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ। তাঁহারা তাহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ দেখিতে পাইলেন না; তাহার পরিচ্ছদ ধূলি-ধূসর ও স্থানে স্থানে কর্দমাক্ত! তাহার অবস্থা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সে কোনও কারণে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনায় গাড়ি থামাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল।

ট্যাক্সি পূর্ণবেগে চলিতেছিল, ট্যাক্সিচালক তাহাকে দেখিয়া গাড়ি থামাইবার চেষ্টা করিবার পূর্বেই সে সবেগে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—থামাও, গাড়ি থামাও; রাজার দোহাই দাঁড়াও!

ইন্সপেক্টর রোসি গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই কনস্টেবলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিলেন,—কী সর্বনাশ! ও যে আমারই থানার কনস্টেবল কাইলী! ব্যাপার কী?

ট্যাক্সি অচল হইলে ইন্সপেক্টর রোসি কনস্টেবলটিকে বলিলেন,—খবর কী কাইলী? তোমার এরূপ দুর্গতির কারণ কী?

কাইলী স্খলিত পদে ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে ট্যাক্সির দরজার হাতল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাড়িতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কোনওরকমে সামলাইয়া লইল; সে তাহার উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরকে সেই গাড়িতে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল,—ডাকাতি, কর্তা! ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা মেট্রপলিটান ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা লুঠ করিয়া চম্পট দিয়াছে। তাহারা ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ট্যাক্সিতে চড়িয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। ট্যাক্সিতে দুইজন ডাকাত—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কনস্টেবলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—কী বলিলে? দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে চাপিয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল? পল সাইনস ও তাহার অনুচরের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি এই প্রশ্ন করিলেন।

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ হুজুর! দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে ছিল; আর একজন ট্যাক্সি চালাইতেছিল—সে-ও ডাকাত কি না বলিতে পারি না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—ডাকাত দুটোর চেহারা কীরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলে কি?

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ, তাহাদের চেহারা দেখিয়াছিলাম। দুজনেরই চেহারা। আমি রোঁদে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কের কোণে আসিয়া তাহাদের ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়াছিলাম; তাহা তখন ব্যাঙ্কের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল! তত রাত্রে ব্যাঙ্কের সম্মুখে ট্যাক্সি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল, ট্যাক্সির আরোহীরা হাওয়া খাইতে আসিয়া ওখানে ট্যাক্সি দাঁড় করায় নাই, উহাদের মতলব খারাপ। আমি দৌড়াইয়া ট্যাক্সির কাছে চলিলাম; কিন্তু ট্যাক্সির কাছে আসিতে না-আসিতে দুইজন লোক ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া ট্যাক্সির দিকে দৌড়াইয়া গেল। তাহারা দুজনে চামড়ার একটা ব্যাগ বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা ট্যাক্সিতে উঠিয়া ব্যাগটা ভিতরে ফেলিবামাত্র ট্যাক্সিচালক আমাকে দেখিয়াই ট্যাক্সি চালাইয়া দিল!

আমি ট্যাক্সি থামাইবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলাম, ট্যাক্সির গতিরোধ করিবার জন্য

পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিলাম; কিন্তু তাহারা লুঠ করিয়া পলাইতেছিল—আমার কথা শুনিবে কেন? আমার ঘাড়ের উপর গাড়ি তুলিয়া দেওয়ার উপক্রম করিল! আমি গাড়ি-চাপা পড়ি দেখিয়া একলাফে ট্যাক্সির ফুটবোর্ডে উঠিয়া দুই হাতে দরজা চাপিয়া ধরিলাম; ট্যাক্সির আরোহী দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দুই বেটারই ছোকরাটে চেহারা। আমাকে ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটা ডাকাত পকেট হইতে লোহার ডাণ্ডা কি হাতুড়ি কি ওইরকম আর কিছু—বাহির করিয়া আমার মাথায় খুব জোরে এক ঘা মারিল। উঃ, মনে হইল মাথায় আমার বজ্রাঘাত হইল! তাহার পর কী হইল—আমার স্মরণ নাই। যখন আমার জ্ঞান হইল—তখন আস্তে-আস্তে ঘাড়ে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলাম ঘাড় ভাঙে নাই বটে, কিন্তু পড়িয়া কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। পথের ধূলায় ও কাদায় পোশাকের এই অবস্থা হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া পথের দিকে চাহিলাম—কিন্তু ট্যাক্সিখানা তখন নিরুদ্দেশ।

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোথায়? তিনি কি ব্যাঙ্কের বাড়িতে রাত্রিবাস করেন না?

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ, তিনি ব্যাঙ্কের বাড়িতেই বাস করেন বটে, কিন্তু যে-সময় দস্যুরা ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল—সেইসময় তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ডাকাত দুটো ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙিলেও তাঁহার ঘুম ভাঙাইতে পারে নাই! অবশেষে আমার হুইসলে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে; তিনি ব্যাঙ্কে আসিয়া এখন টেলিফোনে থানায় সংবাদ পাঠাইতেছেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—ট্যাক্সিতে দুজন লোক ছিল, তবে কি পল সাইনস ও তাহার সঙ্গীই এই কর্ম করিয়া গিয়াছে! কিন্তু ডাকাত দুটো যে দেখিতে অল্পবয়স্ক; কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না! তিনি ইন্সপেক্টর রোসি ও মিঃ ব্লেকের সহিত ব্যাঙ্কের অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকার দ্বার খোলা ছিল; তাঁহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একটা উগ্র গন্ধ পাইলেন। ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙিবার জন্য যে-বিস্ফোরক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার তীব্রগন্ধী বাষ্প তখনও সেই কক্ষের বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

ইন্সপেক্টর কটস চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—ব্লেক, ইহা তো পল সাইনসের কাজ বলিয়া মনে হয় না। সে যখন লালকুঠি হইতে পলায়ন করে, তখন সিন্দুক ভাঙিবার কোনও উপকরণ তাহার সঙ্গে ছিল কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহার অথবা তাহার অনুচরের সঙ্গে উহা ছিল কি না তাহা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু ইহাই প্রধান কথা নহে। যদি কনস্টেবলটার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে সাইনস বা তাহার অনুচর এই ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সাইনসের যে অনুচর লালকুঠিতে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহার চেহারা ছোকরার মতো নহে; আর সাইনসের বয়স তো ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার মাথার একটি চুলও কালো নাই।

ব্যাঙ্কের ভিতর ডাকাতির বহু চিহ্ন বর্তমান। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজিত। বিভিন্ন আলমারি ও কাবোর্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন; তাঁহার পরিধানে নৈশ পরিচ্ছদ, পায়ে চটি-জুতা। বিশৃঙ্খল কেশগুলি তাঁহার ললাট আচ্ছাদিত করিয়াছিল; তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু আতঙ্ক-বিস্ফারিত।

ম্যানেজার ইন্সপেক্টর রোসি ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন,—মহাশয়, এ-অতি ভীষণ ব্যাপার! কোষাগারের দ্বার উড়াইয়া দিয়া ডাকাতেরা সিন্দুক ভাঙিয়া সিন্দুকের সমস্ত টাকাই লুঠ করিয়াছে। কাল যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়াছিলাম—তখন ত্রিশ হাজার পাউন্ডেরও অধিক অর্থ সিন্দুকে গচ্ছিত ছিল। দস্যুরা বোধহয় শেষ পেনিটি পর্যন্ত লুঠ করিয়াছে!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—তবে কি আপনি এখনও সিন্দুকটি পরীক্ষা করেন নাই?

ম্যানেজার বলিলেন,—না, পুলিশের অনুপস্থিতিতে সিন্দুকে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে করি

নাই। আপনাদের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলাম; এখন তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

মিঃ ব্লেক কোষাগারের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—কোনও বহুদর্শী দস্যু ভিন্ন অন্য কেহ তাহা সেভাবে ভাঙিতে পারিত না। কোষাগারের ইস্পাতনির্মিত দ্বার খুলিয়া একখানি কব্জায় ঝুলিতেছিল এবং তাহার একপাশ ভাঙিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল। দস্যু কোষাগারের ভিতর প্রবেশ করিয়া সিন্দুকটি সাধারণ টিনের ক্যানেস্তারের মতো ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। ভাঙা সিন্দুকের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সভয়ে আর্তনাদ করিলেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে গিনি, নোট প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। খোলা সিন্দুক খালি পড়িয়াছিল।

ম্যানেজার হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—সর্বনাশ হইয়াছে, শেষ পেনিটি পর্যন্ত লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে! দস্যুরা নোটে ও নগদে একত্রিশ হাজার চারিশত পাউন্ড আত্মসাৎ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—একত্রিশ হাজার চারিশত পাউন্ড বলিতেছেন কেন? বলুন, একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং। কেমন, আমার কথা কি সত্য নহে? এ-মন্দ দাঁও নয়; কিন্তু পল সাইনসের ন্যায় দস্যুর পক্ষে ইহা 'সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য'!

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সিন্দুক হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহার ঠিক পরিমাণ তিনি কীরূপে জানিলেন? এই বিপুল অর্থরাশি যে পল সাইনস কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে—ইহাই বা তিনি কীরূপে বুঝিলেন?

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—পল সাইনস! এই ব্যাপারের সহিত আপনি পল সাইনসকে জড়াইতেছেন কেন? সে ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে—আপনি কি ইহার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন?

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি কীরূপে জানিলেন—আমাদের সিন্দুক হইতে ঠিক একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং লুঠ হইয়াছে? দস্যু ও তাহার সহচর ভিন্ন বাহিরের অন্য কোনও লোকের তো এ-সংবাদ জানিবার উপায় নাই।

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া ভাঙা সিন্দুকের ঊর্ধ্বস্থিত দেওয়ালে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর কুট্‌স, ইন্সপেক্টর রোসি প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে সেই দেওয়ালের সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহারা সেই স্থানে দেখিলেন—নীলবর্ণ চা-খড়ি দিয়া মোটা-মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল—

একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড, দশ শিলিং
পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।

সপ্তম প্রসঙ্গ ঃ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্কট

ইন্সপেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের গায়ে চা-খড়ির সেই লেখাটি পাঠ করিয়া একবার সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—এই লুণ্ঠন-ব্যাপারের সহিত সাইনসের কী সম্বন্ধ তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না! আমরা যে-ট্যাক্সিতে বিচারপতি সোয়েনের বাসভবন লালকুঠিতে আসিয়াছিলাম—পল সাইনস সেই ট্যাক্সি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা আমাদের জানা আছে; কিন্তু সে দস্যুবৃত্তির এইসকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল—ইহা আমাদের অজ্ঞাত; বিশেষত, সিন্দুক ভাঙিবার জন্য যে-গ্যাসের চোঙ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা একজন লোকের পক্ষে দুর্বহ।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—দেওয়ালে চা-খড়ি দিয়া যাহা লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে

BanglaBook.org

পারা যায়—পল সাইনস স্বয়ং এখানে লুঠ করিতে আসে নাই; দেখুন লেখা আছে—'একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।' সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—পল সাইনসের অভিপ্রায় অনুসারে লুঠ হইলেও, তাহার দুইজন অনুচর ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল, সে স্বয়ং এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল না।

বীটের কনস্টেবল তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল,—আমি আমার বীটে উপস্থিত থাকিলে সেই দুইজন দস্যু ডাকাতি করিতে পারিত না। আজ রাত্রে সিডেনহাম হিলের একটা বাড়ি খানাতল্লাশ করিবার জন্য আমাদের থানার সকল কনস্টেবলকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং লোকাভাবে আমাকে একাকী দুই বীটের কাজ চালাইতে হইবে—এ-সংবাদ ওই দুইজন ডাকাত বোধহয় পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সেই খানাতল্লাশি নিতান্তই নিরর্থক হইয়াছিল। পল সাইনস এই অঞ্চলে থাকিলেও সে সিডেনহাম হিলের এক মাইলের ভিতর কোনও বাড়িতে ছিল না। আজ রাত্রে এই অঞ্চলের পুলিশ কোনও জরুরি কার্যে ব্যস্ত থাকিবে এবং প্রত্যেক বীটে পাহারাওয়ালার অভাব হইবে, এ-সংবাদ পল সাইনস পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনস এ-সংবাদ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল—ইহা কী করিয়া বিশ্বাস করি? ইন্সপেক্টর রোসি রাত্রি বারোটা বাজিবার আট মিনিট মাত্র পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই এই ডাকাতির ষড়যন্ত্র শেষ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর রোসিকে বলিলেন,—আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে যে-সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য তো?

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে আমাদের থানা পর্যন্ত টেলিফোনের যে স্বতন্ত্র তার আছে, সেই তারের সাহায্যেই ওই সংবাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। এমনকী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে-কর্মচারী টেলিফোনে ওই সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিল—তাহাকেও আমি চিনি। তাহার নাম ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—হ্যাঁ, আপনার এ-কথা সত্যই বটে; গত রাত্রে এগারোটার পূর্বে আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে বাহিরে যাই নাই। তাহার পর আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পরিত্যাগ করিবার সময় জানিতে পারি—ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন অবশিষ্ট রাত্রির জন্য অফিসের ভার পাইয়াছিল; আগামী-কল্য বেলা আটটা পর্যন্ত অফিসের সকল ভার তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা হইলে তুমি প্রথমে যাহা স্থির করিয়াছিলে—তাহাই করো। পল সাইনস আজ রাত্রে সিডেনহাম হিলের কোনও বাড়িতে লুকাইয়া থাকিবে—এ-সংবাদ সার্জেন্ট সিবর্ন কীরূপে জানিতে পারিয়াছিল তাহাই তাহাকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে ইন্সপেক্টর রোসিকে সিডেনহাম হিলের সেই বাড়ি ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাশের জন্য টেলিফোনে উপদেশ পাঠাইয়াছিল; কাহার প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া সে এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা জানিতে না পারিলে কোনও ফল হইবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর রোসির সহিত তাঁহার গাড়িতে থানায় উপস্থিত হইলেন; ইন্সপেক্টর রোসি তাঁহাদিগকে লইয়া অফিসঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন থানার সার্জেন্ট একজন কনস্টেবলের সহিত ব্যগ্রভাবে কী কথা কহিতেছিল।

সার্জেন্ট ইন্সপেক্টর রোসিকে দেখিয়া আগ্রহভরে বলিল,—আজ রাত্রে আমাদের এই বিভাগে যেন ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে। মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা-ব্যাঙ্কে আজ রাত্রে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সন্ডার্স এবং আর দুইজন কনস্টেবল সেখানে তদন্তে গিয়াছে।

ইন্সপেক্টর রোসি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন,—চোর পলাইয়াছে দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধি বাড়িয়া যাইবে। আমরা সেই ব্যাঙ্ক হইতেই ফিরিয়া আসিতেছি। সিডেনহাম হিলের যে বাড়িতে

BanglaBook.org

খানাতল্লাশি করিবার কথা ছিল—সেই বাড়ির খানাতল্লাশি সম্বন্ধে তুমি কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

সার্জেন্ট বলিল,—হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কোনও উত্তর পাইলাম না! আমি পাঁচ-সাতবার সাড়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কেহই সাড়া দিল না? এ যে বড়ই অদ্ভুত কথা! রাত্রে যাহার উপর অফিসের ভার আছে, সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য; হ্যাঁ, যে হউক একজন উত্তর দিবেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের লাইন কোথায়?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তিনি কয়েক মিনিট ধরিয়া হাঁকাহাঁকি করিলেন, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! কাহারও সাড়া পাইতেছি না, কেহ উত্তর দিতেছে না! ইহার কারণ কী? টেলিফোনের লাইন খারাপ হইয়াছে বলিয়াও তো মনে হয় না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অন্য লাইনের চেষ্টা করিয়া দেখো। সাধারণ লাইন দিয়া সাড়া লও। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই থানা পর্যন্ত টেলিফোনের যে পৃথক লাইন আছে—তাহার কোথাও কোনও দোষ হইয়া থাকিতে পারে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সাধারণ লাইনের সাহায্যে টেলিফোনে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ফল সেই যথাপূর্বং তথাপরম্! কেহই কোনও কথা বলিল না। অবশেষে তিনি হতাশভাবে রিসিভার ত্যাগ করিলেন; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—না, বৃথা চেষ্টা! আমি কাহারও সাড়া পাইলাম না; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে জনপ্রাণীও নাই, এইরূপ ভাব! অথচ লাইনের কোনও খুঁত নাই। অপারেটর আমাকে বলিল, সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঝনঝনি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছে, অথচ সকলেই নির্বাক! এ যে কী রহস্য—তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু রকম-সকম ভালো বলিয়া আমার মনে হইতেছে না! ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন নিশ্চয়ই অফিসে আছে; কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরের কথা, সাড়া পর্যন্ত দিতেছে না—ইহার কারণ কী ব্লেক! তোমার কী অনুমান?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, সকলে মৃতবৎ অসাড়, ইহা খুব তাজ্জবের কথা বটে!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—সার্জেন্ট সিবর্ন নিশ্চয়ই ওখানে আছে; কিন্তু সে সাড়া না দেওয়ায় মনে হইতেছে—সে হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে, উত্থানশক্তিরহিত। কিন্তু ইহাও তো আমার অনুমান মাত্র। এই অনুমান সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ব্যাপার সহজ নহে। সদর হইতে যদি সংবাদ পাওয়া না যায়—তাহা হইলে কাজ চলিবে কীরূপে? বড়ই বিভ্রাটের কথা। আজ রাত্রে পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন, ঘটনাচক্র সকল দিকেই তাহার অনুকূল!

পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন—রোসির এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন; সত্যই কি ইহা তাহার সৌভাগ্যের ফল? স্থানীয় পুলিশ সাইনসের সন্ধানে সিডেনহাম হিলে খানাতল্লাশ করিতে চলিল, সেই সুযোগে সাইনস ডলউইচ গ্রামে বিচারপতি সৌয়েনের গৃহে উপস্থিত হইল; তাহার দলের অন্যান্য দস্যুরা ঠিক সময় থানার প্রায় পাঁচশত হাত দূরবর্তী ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিল, অথচ সে-সময় থানায় একজন কনস্টেবল রহিল না! —ইহা কি পল সাইনসের কোনও ষড়যন্ত্রের ফল? না তাহার সৌভাগ্যবশতই এতগুলি সুযোগ একসঙ্গে জুটিয়া গেল—ইহাই মিঃ ব্লেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইন্সপেক্টর রোসি সেইরাত্রে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে যে-ভুল সংবাদ পাইয়া সদলে সিডেনহাম হিল পল্লীতে পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিবার কারণ কী—তাহা জানিবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পুনঃ-পুনঃ ডাকিয়াও

BanglaBook.org

সাড়া পাইলেন না! এজন্য তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু অতঃপর কী করা উচিত তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

রবার্ট ব্লেক অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইন্সপেক্টর রোসিকে বলিলেন,—আপনি অন্য কোনও থানায় সন্ধান লইয়া দেখুন। স্ট্রেথামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করুন —স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ডাকিয়া তিনি কোনও কথা জানিতে পারিয়াছেন, কি না।

ইন্সপেক্টর রোসি স্ট্রেথাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আহ্বান করিবার জন্য ফোনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন; তিনি মুহূর্ত-পরেই স্ট্রেথামের থানা হইতে সাড়া পাইলেন বটে, কিন্তু যে-উত্তর পাইলেন—তাহা যে তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই, ইহা মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন।

কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টর রোসি মিঃ ব্লেককে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—এ বড়ই বিষম ব্যাপার মিঃ ব্লেক! স্ট্রেথামের ইন্সপেক্টর বলিলেন—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া তিনিও কোনও সাড়া পান নাই; আধঘন্টা ধরিয়া বৃথা হাঁকাহাঁকি করিয়াছেন! আরও এক অদ্ভুত সংবাদ পাইলাম; আমাদের মতো উহাদিগকেও অনর্থক বুনোহাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বুনোহাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে—এ-কথার অর্থ কী ইন্সপেক্টর!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—স্ট্রেথামের ইন্সপেক্টর আজ রাত্রি বারোটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন—পল সাইনস আজ রাত্রে 'স্ট্রেথাম কমনের' উত্তরাংশে অবস্থিত একটি বাড়িতে লুকাইয়া ছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইন্সপেক্টর তাঁহার থানার সমস্ত কনস্টেবল লইয়া সেই বাড়ি ঘিরিয়া বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পল সাইনসের সন্ধান পান নাই। তাঁহাকে হতাশভাবে থানায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ সংবাদ নহে; ইন্সপেক্টর যখন স্ট্রেথামের সেই বাড়িতে পল সাইনসের সন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনজন দস্যু স্ট্রেথাম হিলের একটি ব্যাঙ্ক হইতে পনেরো হাজার পাউন্ড লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে! সেই তিনজন দস্যু একখানি ট্যাক্সি লইয়া লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া যাইবার সময় পল সাইনসের নামের একখানি কার্ড ব্যাঙ্কে ফেলিয়া গিয়াছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ইন্সপেক্টর রোসির কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিলেন,—কী সর্বনাশ! এ যে অতি ভয়ানক কথা! কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিশ্চয়ই ওইরূপ সংবাদ স্ট্রেথামের থানায় পাঠাইতে পারে না। সে আপনাকে জানাইল—আজ রাত্রে পল সাইনস সিডেনহাম হিলের এক বাড়িতে লুকাইয়া আছে; সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনি উপদেশ পাইলেন, আবার সেইসময় স্ট্রেথাম থানার ইন্সপেক্টর তাহার নিকট হইতে ওইরূপ সংবাদ জানিতে পারিলেন; তাঁহাকেও সদলে স্ট্রেথামের সেই বাড়িতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করা হইল। আপনারা উভয়েই এই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন; ওদিকে আপনারা সকল পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া পল সাইনসকে ধরিতে যাইবার পর উভয় স্থানেরই ব্যাঙ্ক লুঠ হইল! ইহা নিশ্চয়ই পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের ফল! আমার বিশ্বাস, পল সাইনস কোনও কৌশলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের তার হস্তগত করিয়া আপনাদের নিকট সেই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছিল; সেই সংবাদে নির্ভর করিয়া আপনারা স্ব-স্ব থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাহার দলস্থ দস্যুরা উক্ত উভয় ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল; তিনি অধীরভাবে বলিলেন, —কেবল কি দুটি ব্যাঙ্ক? পল সাইনস যদি এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার অনুচরবর্গ দ্বারা দুইটি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করাইতে পারে, তাহা হইলে লন্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা ব্যাঙ্কেও কি সে ওইভাবে লুণ্ঠন করাইতে পারে না? যদি দুইটি থানায় ওই মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য

হইয়া থাকে—তাহা হইলে সে কি লন্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা থানায় ওইরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সফল করিতে পারে নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া হতাশভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—কী সর্বনাশ! ব্লেক তুমি বলিতেছ কী? না, না, তোমার এই অনুমান নিশ্চয়ই সত্য নহে। ইন্সপেক্টর রোসি বলিয়াছেন—সার্জেন্ট সিবর্ন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে উহাকে সংবাদ দিয়াছিল। সার্জেন্ট সিবর্নের উপদেশ উনি অবশ্য-পালনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—হ্যাঁ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সার্জেন্ট সিবর্নের নিকট হইতে টেলিফোনে ওইরূপ উপদেশই পাইয়াছিলাম এ-কথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। আমি নানা উপলক্ষে অসংখ্যবার টেলিফোনে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি। পল সাইনস আমাকে কৌশলে প্রতারিত করিয়াছে—এ-কথা বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ সার্জেন্ট সিবর্ন আমাকে সাঙ্কেতিক ভাষায় উপদেশ প্রেরণ করিয়াছিল, সেই ভাষা পল সাইনসের বা বাহিরের কোনও লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—সে-কথা সত্য; কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও টেলিফোনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাড়া পাইতেছেন না, ইহা কি সন্দেহজনক নহে? যাহা হউক, এখানে আর বিলম্ব করিয়া কোনও ফল নাই। ইন্সপেক্টর রোসি, আমি আপনার ট্যাক্সি লইয়া এখান হইতে সোজা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাইতে চাহি; সেখানে না যাইলে এই রহস্যভেদের আশা নাই। কুট্‌স, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, অথচ কিছুই জানিতে পারিলাম না!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ইন্সপেক্টর রোসির ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক স্বয়ং সেই গাড়ি চালাইতে লাগিলেন। ট্যাক্সি বন্দুকের গুলির মতো সবেগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন রাত্রি অবসান-প্রায়; পল্লীপথ নিস্তব্ধ ও নির্জন। সম্মুখে কোনও বাধা না পাওয়ায় ট্যাক্সি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক অবাধে ব্রিক্সটনে উপস্থিত হইয়া ব্রিক্সটনের থানার অদূরে হঠাৎ ট্যাক্সি থামাইতে বাধ্য হইলেন, কারণ একদল পুলিশ-কনস্টেবল তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া ট্যাক্সির ব্রেক করিয়া গাড়ি থামাইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে একজন সার্জেন্ট গাড়ির পা-দানে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা কী উদ্দেশ্যে কোথা হইতে কোন স্থানে যাইতেছেন—তাহাও জানিতে চাহিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই সার্জেন্টের নিকট জানিতে পারিলেন—রাত্রি বারোটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে ব্রিক্সটনের থানার ইন্সপেক্টরকে টেলিফোনে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল—ব্রিক্সটনের একার লেনের একটি বাড়িতে পল সাইনস লুকাইয়া আছে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; অতএব ব্রিক্সটন থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরকে তাঁহার এলাকার সমুদয় পুলিশ কনস্টেবল সহ একার লেনে গমন করিয়া সেই অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। ব্রিক্সটন থানার ইন্সপেক্টর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার এলাকার সমস্ত কনস্টেবল ও পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে লইয়া একার লেনের সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিতে গিয়াছিলেন; সেই সুযোগে কয়েকজন দস্যু ব্রিক্সটনের প্রধান রাজপথে অবস্থিত ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সিন্দুক ভাঙিয়া নগদ কুড়ি হাজার পাউন্ড লুঠ করিয়াছে। এইসকল দস্যু পল সাইনসের অনুচর তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ব্রিক্সটন থানার সার্জেন্টের নিকট এইসকল কথা শুনিয়া বিচলিতস্বরে বলিলেন,—সাইনস ইভনিং নিউজে যে স্পর্ধাপূর্ণ পত্র প্রকাশিত করিয়াছে—সেই পত্রের উদ্দেশ্য এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে। কাল সকালে বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে

আসিয়া আজ রাত্রির সকল সংবাদ জানিবার জন্য মহা কোলাহল আরম্ভ করিবে। আমরা কীভাবে প্রতারিত ও অপদস্থ হইয়াছি—ইহা তাহারা জানিতে পারিলে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না; জনসমাজে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। এ-সকল কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করা কি সঙ্গত হইবে?

মিঃ ব্লেক কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি চঞ্চল চিত্তে অদূরবর্তী আলোকিত ট্রাম-লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহারা তখনও পর্যন্ত চরম দুঃসংবাদ জানিতে পারেন নাই। পল সাইনস টেলিফোনে লন্ডনের শহরতলীর কয়েকটি থানায় মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ করাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে এই কার্য কঠিন হয় নাই। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শক্তি ও সম্ভ্রমে কঠোর দণ্ডাঘাত করিবার জন্য যে-ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিল তাহার পরিণাম যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ—তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ওয়েস্টমিনস্টার সাঁকোর সম্মুখীন হইল। নদীর অন্য তীরে সুবিখ্যাত বিগবেন নামক ঘড়ির সমুন্নত সৌধ-চূড়া তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইল। সেই সৌধ-শিখর হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইতেছিল দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় তখনও কাজ চলিতেছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইতে পারিব। তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বোমা মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। সেই স্তব্ধ রাত্রে সেই শব্দ যেন শত কামান-নির্ঘোষবৎ প্রতীয়মান হইল। সেই ট্যাক্সির চাকার নিচের পথ সেই মহাশব্দে কাঁপিয়া উঠিয়া যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল লোহিতানলের লেলিহান জিহ্বা আকাশের একপ্রান্ত লেহন করিতে-করিতে সবেগে নৃত্য করিতে লাগিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই উজ্জ্বল আলোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে ভগ্নস্বরে বলিলেন,—ও কী ব্যাপার ব্লেক! কী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! চলো, শীঘ্র চলো, ওদিকে আগুন লাগিল কোথায়?

মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া দন্ত দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া সবেগে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ পার হইলেন। ট্যাক্সি ক্রমশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সমীপবর্তী হইল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বলস্বরে বলিলেন,—সর্বনাশ হইয়াছে ব্লেক! ওই দেখ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগুন লাগিয়াছে। উঃ, কী ভীষণ কাণ্ড! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেই বোমা ফাটিয়াছে, বোমার আগুনে চতুর্দিক ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! উঃ, কী ভীষণ হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা!

মিঃ ব্লেক নদী পার হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সেই বিরাট বিশাল হর্ম্যশ্রেণীর দিকে চাহিয়া তাঁহার বক্ষের শোণিত-স্রোত যেন স্তম্ভিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের অনুমান সত্য। তাঁহারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিকট অগ্রসর হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন—তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। শোণিতের ন্যায় সুলোহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সৌধ-শিরে সশব্দে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং সেই আলোকে আকাশের বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের মনে যে আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল তাহা তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিবার পূর্বেই তাঁহার ট্যাক্সির ইঞ্জিন হঠাৎ ভস্-ভস্ শব্দ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল; পরমুহূর্তেই ট্যাক্সি অচল হইল, আর একইঞ্চিও তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

মিঃ ব্লেক বিরক্তিসূচক হুঙ্কার করিয়া পেট্রল ট্যাঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—না, জুস-ট্যাঙ্ক শুকাইয়া খটখটে হইয়াছে। নামিয়া চলো কুট্‌স! এই অচল গাড়িতে

BanglaBook.org

পুতুলের মতো বসিয়া থাকিয়া কোনও ফল নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন, তাহার পর সেতুর উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা বাঁধের উপর উঠিবার পূর্বেই ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ির ঘণ্টার ঢন-ঢন শব্দ ও পুলিশ-হুইসলের তীব্র ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

তখনও পূর্বাকাশ উষালোকে রঞ্জিত হয় নাই; কিন্তু রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। সেই অসময়েও নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অদূরে বাঁধের উপর বহু লোকের সমাগম দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ক্যানন-রোর ফাঁড়ি হইতে কনস্টেবলেরা দলে-দলে বাহির হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ড দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই বাঁধ অসংখ্য নর-নারীতে পূর্ণ হইল এবং বাঁধের উপর যেন নরমুণ্ডের স্রোত চলিতে লাগিল। তখন চতুর্দিক হইতে সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় কোলাহল উত্থিত হইল। সমাগত নগরবাসীরা সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; পুলিশ কোনওদিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্নিকাণ্ডের ভীষণতা দর্শনে সকলেই উন্মত্তবৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ বলিতেছিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর রক্ষা পায় না; উঃ, কী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!

আর-একজন উত্তেজিতস্বরে বলিল, খামকা রক্ষা পাইবে? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ছাদে আগুন! ওই প্রকাণ্ড বাড়িটা হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে; আর উহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

আর একজন বলিল,—চোর-ডাকাত-খুনি-বাটপাড়দেরই মজা! এতদিনে তাহাদের পুলিশের ভয় দূর হইল। পথেঘাটে যখন তখন লুঠ চলিবে। দেখো-দেখো, কী জোরে আগুন জ্বলিতেছে! যেন কেন হাজার হাউই একসঙ্গে আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছে! হ্যাঁ, আগুন বটে!

এইরূপ মন্তব্য সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া গেল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স এইসকল মন্তব্য শুনিতে শুনিতে ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুকষ্টে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু সংখ্যক উর্দিধারী পুলিশ কর্মচারী সেইস্থানে দলবদ্ধ হইয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে! তাহাদের সর্বাগ্রে একজন ইন্সপেক্টর; তিনি রুদ্ধদ্বারে সজোরে ধাক্কা দিতেছিলেন। দেউড়ি ভিতর হইতে বন্ধ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই ইন্সপেক্টরের পাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ইন্সপেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—এই যে মিঃ কুট্‌স! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার—দেখিতেছেন তো? কিছুকাল পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে বোমা ফাটিয়াছে, তাহার পরেই এই অগ্নিকাণ্ড। ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার কোনও সাড়া পাইতেছি না। দেউড়ি বন্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বড়সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?

অন্য ইন্সপেক্টর বলিলেন,—হ্যাঁ, তাঁহাকে ও সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানারকে অবিলম্বে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। দেউড়ির চাবি সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানারের কাছেই আছে বোধহয়।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ভগ্নস্বরে বলিলেন,—ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্নের উপর অফিসের ভার আছে; তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! সে বেচারা আগুনে পুড়িয়া মরিল না কি? ব্লেক, তোমার কীরূপ অনুমান? তাহার সাড়া নাই; এ যে বড়ই ভয়ানক কথা!

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সের পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি ভারী গলায় বলিলেন,—সর্বনাশের আর বাকি কী?

মুহূর্তপরে একখানি স্টিমার ঢং-ঢং শব্দ করিতে-করিতে বাঁধের নিচে আসিয়া থামিল। তাহা দেখিয়া বাঁধের জনতা দুই পাশে সরিয়া গিয়া ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্মচারীদের পথ ছাড়িয়া দিল। ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্মচারীর দল স্টিমার হইতে নিচে নামিয়া তাহাদের হাতিয়ার সহ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সদর

BanglaBook.org

দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

পিতল-নির্মিত শিরস্ত্রাণমণ্ডিত এইসকল কর্মঠ ফায়ার-ব্রিগেড-কর্মচারী যখন দলবদ্ধ হইয়া কোনও স্থানে আগুন নিবাইতে যায়—তখন সেইসকল বাড়ি-ঘরের প্রতি তাহাদের মায়া-মমতা থাকে না; দরিদ্রের কুটির হইতে রাজপ্রাসাদ সকলই তাহারা সমান তুচ্ছ মনে করে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সেই সুবিশাল প্রাসাদতুল্য হর্ম্য তাহারা শহরতলীর একটা সাধারণ বাগানবাড়ি অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক মূল্যবান পদার্থ বলিয়া মনে করিল না। তাহারা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সুতীক্ষ্ণ কুঠার মাথার উপর তুলিয়া দরজার কপাট-চৌকাটে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে দ্বার খণ্ড-খণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল। দুই মিনিটের মধ্যে অর্গলরুদ্ধ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দ্বারের চিহ্নমাত্র রহিল না। তীক্ষ্ণধার কুঠারের আঘাতে মুহূর্তমধ্যে চিচিং-ফাঁক!

অনন্তর ফায়ার-ব্রিগেডের দল অগ্নি-নির্বাপণোপযোগী রাসায়নিক উপাদানসমূহ সঙ্গে লইয়া জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সবেগে সেই বিশাল সৌধে প্রবেশ করিল। তাহারা নিচের তলায় ধূম অথবা অগ্নি-জিহ্বা দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিল—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের 'মটকায়' আগুন লাগিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অনেক বাজে লোককে ফায়ার-ব্রিগেডের দলে মিশিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—তফাৎ! বাজে লোক সব তফাৎ যাও; কেবল আগুন নিবাইবার কর্মচারী ছাড়া অন্য কাহারও ভিতরে যাওয়া নিষেধ। বড়সাহেব যতক্ষণ না আসেন—ততক্ষণ অন্য লোক সব বাহিরে থাক।

মিঃ ব্লেক সেই ভাঙা দরজার একপাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষুতে নিরাশার চিহ্ন পরিস্ফুট। এই আকস্মিক আঘাত এতই ভীষণ, এরূপ সুতীব্র যে, তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বহুকাল পূর্বে ফিনিয়ানদের দাঙ্গার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর এ-পর্যন্ত আর কখনও এরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হয় নাই। ইহার পরিণাম কীরূপ শোচনীয় হইতে পারে—তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইলে লন্ডনের পুলিশ-ফৌজ নিরাশ্রয় হইবে। যেখানে যত থানা আছে পুলিশের সদর আড্ডার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সকল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারগুলি বিধ্বস্ত হওয়ায় বহির্জগতের সহিত তাহার সংবাদ আদান-প্রদান রহিত হইবে। বেতারের যন্ত্রাদি চূর্ণ হওয়ায় তাহার কার্যকারিতা নষ্ট হইবে। ফৌজদারির আসামীদের অপরাধসংক্রান্ত নথিপত্রগুলি এবং অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতাপত্রগুলি বিলুপ্ত হইলে পুনর্বার তাহা সংগ্রহ করিবারও উপায় থাকিবে না; সুতরাং বহু বৎসরের বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত দলিলপত্র সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে। দেশের প্রত্যেক অপরাধী আনন্দে নৃত্য করিবে। আইনের শক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং পুরাতন অপরাধীর দল আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া মহা-উৎসাহে দলবদ্ধ হইবে। তাহারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা-কল্যাণ সমস্তই অচিরে পদদলিত করিয়া সমগ্র দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। দেশের সেই ভয়ানক অবস্থার কথা চিন্তা করিতেও মিঃ ব্লেকের লোমহর্ষণ হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হঠাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া হতাশভাবে জড়িতস্বরে বলিলেন,—ব্লেক, তুমি কি বলিবে এই ভীষণ সর্বনাশের জন্য নরপিশাচ সাইনস দায়ী? সে ভয় প্রদর্শন করিয়া যে-পত্র লিখিয়াছিল—তাহার মর্ম তো তোমার স্মরণ আছে। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল; এখন দেখিতেছি তাহার—।

ইন্সপেক্টরের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া এভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন যে, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কথাগুলি আর শেষপর্যন্ত বলা হইল না। মিঃ ব্লেক কোনও কথা বলিতে পারিলেন না; তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য পল সাইনসই দায়ী, তাহার দম্ভ ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার

BanglaBook.org

মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। সে অন্য যে-সকল অপকর্ম করিয়াছিল, তাহা তাহার অসাধ্য নহে—ইহা তিনি জানিতেন; কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সে কী কৌশলে বিধ্বস্ত করিবার ব্যবস্থা করিল—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; এরূপ ভীষণ কাণ্ড তাঁহার কল্পনারও অতীত!

ফায়ার-ব্রিগেডের কাপ্তেন দ্রুতবেগে হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন; ধূমে তাঁহার মূর্তি কালো হইয়াছিল, আগুনের উত্তাপে তাঁহার চোখ-মুখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—অগ্নিনির্বাপণের উপকরণগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন আরও চাই। উপরের তলায় বোমা ফাটিয়াছিল; তাহার পর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড জীবনে আর কখনও দেখি নাই! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিভাইতে পারি বটে, কিন্তু আপনাদের বেতারের যন্ত্রাদি রক্ষা পাইবে না। নানারকম কল ও যন্ত্রাদি বিভিন্ন কক্ষে খাটাইয়া রাখা হইয়াছে—সেগুলি নষ্ট হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিহ্বলস্বরে বলিলেন,—এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কী, বলিতে পারেন? আকস্মিক দুর্ঘটনা?

কাপ্তেন বলিলেন,—আকস্মিক দুর্ঘটনা? অসম্ভব! কেহ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতেই এই কাজ করিয়াছে—এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থে নির্মিত বোমা দ্বারা, বা কোনও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কলের সাহায্যে অর্ধেক ছাদ ভাঙিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনারা আমার সঙ্গে আসিতে পারেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও এখন ভিতরে আসিতে দিবেন না।

একখানি সুবৃহৎ মোটরকার দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র লন্ডন পুলিশের চীফ কমিশনর সার হেনরি ফেয়ারফক্স ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার সেই গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন; তাহার পর ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত তাঁহাদের আলাপ চলিতে লাগিল। সার হেনরি যেন খেপিয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল কেহ তুবড়িতে আগুন দিয়াছে। কিন্তু ফায়ার-ব্রিগেডের চেষ্টায় অগ্নিরাশি নির্বাপিত হইল; কেবল ছাদ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রকুণ্ডলী ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ফায়ার-ব্রিগেডের যথাসাধ্য চেষ্টায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে যে-ক্ষতি হইল—শীঘ্র তাহার পরিপূরণের সম্ভাবনা রহিল না। বহু সুদক্ষ ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিভাবান কর্মচারীর দীর্ঘকালের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে যে-শৃঙ্খলা, যে-অনিন্দনীয় কার্যপদ্ধতি ধীরে-ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন পিশাচের এক ফুৎকারে শূন্যে বিলীন হইল।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে বলিলেন,—দৈব-দুর্ঘটনা, আলবৎ ইহা দৈব-দুর্ঘটনা; নতুবা এত স্থান থাকিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চূড়ায় আগুন লাগিবে কেন? সার্জেন্ট সিবর্ন কোথায়? আজ রাত্রে তাহার উপর অফিসের ভার ছিল যে! এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা জানে, তাহাই সর্বাগ্রে শুনিতে হইবে।

সার হেনরি বলিলেন,—ঠিক, সিবর্ন কোথায়? তাহাকে এখানে দেখিতেছি না কেন?

তখন বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল,—সিবর্ন কোথায়? সার্জেন্ট সিবর্ন কোথায় গিয়াছে?

কেহই সার্জেন্ট সিবর্নের সন্ধান করিতে পারিল না। অবশেষে ক্যানন থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর সার হেনরির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—রাত্রে আপনার সঙ্গেই তো সকলের শেষে তাহার দেখা হইয়াছিল, মহাশয়! গত রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় আপনি এখানে আসিয়াছিলেন; তখন সার্জেন্ট সিবর্নের উপরেই অফিসের ভার ছিল।

সার হেনরি বিস্মিতভাবে বলিলেন,—তোমার এ-কথার মর্ম বুঝিতে পারিলাম না ইন্সপেক্টর। কাল রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় আমি এখানে আসি নাই; অথচ সে-সময় তুমি আমাকে এখানে দেখিয়াছিলে। নেশা করিয়াছিলে না কি?

ইন্সপেক্টর সার হেনরির তাড়া খাইয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু গোঁ ছাড়িলেন না; তিনি

বলিলেন,—কনস্টেবল হেনিস কোথায়? হেনিস, এদিকে এসো।

একজন কনস্টেবল সার হেনরির সম্মুখে আসিয়া যথানিয়মে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল; তাহার পর বিনীতস্বরে বলিল,—হুজুরকে কাল রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় এখানে আসিতে দেখিয়াছিলাম। হুজুর এখন যে-গাড়িতে আসিয়াছেন—ওই গাড়িতেই আসিয়াছিলেন। গাড়ি যখন দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করে তখন আমি গাড়ির নম্বর দেখিয়াছিলাম; তাহা ওই নম্বরেরই গাড়ি। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন দেউড়ি খুলিয়া দিলে হুজুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিজের চক্ষুকে কী করিয়া অবিশ্বাস করি হুজুর?

স্যার হেনরি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—কনস্টেবলের মাথা খারাপ হইয়াছে। কাল রাত্রি নয়টার সময় আমি এখান হইতে বাড়ি গিয়াছিলাম; সমস্ত রাত্রি বাড়িতেই ছিলাম। এখান হইতে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দেওয়ার পূর্বে আমি বাড়ির বাহিরে আসি নাই; অথচ তুমি বলিতেছ আমাকে আমার গাড়িতে এখানে আসিতে দেখিয়াছিলে। অসম্ভব। তুমি পাগলের মতো কথা বলিতেছ কনস্টেবল।

কনস্টেবল হেনিস দৃঢ়তার সহিত বলিল,—হুজুর আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া গালি দিতে পারেন, নিজের চক্ষুকে তো অবিশ্বাস করিতে পারি না। আপনি আপনার গাড়িতে ঠিক আসিয়াছিলেন; হ্যাঁ, আপনাকেই দেখিয়াছিলাম। হুজুর ভিন্ন আর কে ওই সময় অফিসে আসিবে? বিশেষত ওই গাড়ি—।

সার হেনরি বিরক্তিভরে বলিলেন,—থামো তুমি! আমার গাড়ি সারারাত্রি গ্যারেজে ছিল। তোমার কোনও কথা শুনিতে চাহি না; তুমি ঠিক খেপিয়া গিয়াছ। তোমাকে আমি বরখাস্ত করিব কনস্টেবল! —সিবর্ন কোথায়? তাহাকে শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, কী একটা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। আমি সর্বাগ্রে সার্জেন্ট সিবর্নের কৈফিয়ৎ চাই। কোথায় সে? এই মুহূর্তে তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির করো সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার বলিলেন,—সে বোধহয় এখনও টেলিফোনের কামরায় আছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেন; ধূমের গন্ধ তখনও দ্বিতলের বায়ুস্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই গন্ধের সহিত নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের উগ্রগন্ধ মিশিয়া তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার টেলিফোনের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা দিলেন; কিন্তু দ্বার খুলিল না। তিনি অধীরভাবে বলিলেন,—এ কী! দরজা যে ভিতর হইতে বন্ধ? তিনি দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতেই কপাটের মাথায় ছিটকিনিটা ঘুরিয়া নামিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল।

সেই কক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। সার্জেন্ট সিবর্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সম্মুখে একখানি চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাথা একপাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষুর দৃষ্টিতে জীবনের লক্ষণ ছিল না।

সার্জেন্ট সিবর্নের মুখের দিকে চাহিয়া সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার বিচলিতস্বরে বলিলেন,—দেহে প্রাণ নাই! হ্যাঁ, সিবর্নের মৃত্যু হইয়াছে। এ কী শোচনীয় দুর্ঘটনা!

চেয়ারের পাশে একটি ক্ষুদ্র শিশি পড়িয়াছিল। সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার শিশিটা তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলেন; শিশিতে কিছুই ছিল না, কিন্তু তখনও গন্ধ ছিল। তিনি তাহার ঘ্রাণ লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পটাসিয়াম সায়ানাইড! আত্মহত্যা বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে! কিন্তু সিবর্ন কী দুঃখে আত্মহত্যা করিল? এ কী রহস্য?

মিঃ ব্লেকের মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর, চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ঘনীভূত। সিবর্ন কীজন্য সাড়া দেয় নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাহার আত্মহত্যার কারণ তখনও পর্যন্ত কেহ জানিতে পারিলেন না।

BanglaBook.org

সার্জেন্ট সিবর্নের সম্মুখে রিপোর্ট-বহি খোলা ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার তাহা তুলিয়া লইলে তাহাতে কী লেখা ছিল—তাহা দেখিবার জন্য অন্য সকলেই সেই খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েক দফা মন্তব্য সন্নিবিষ্ট দেখিলেন ঃ

সংবাদ-পত্রে সংবাদ পাঠাইতে হইবে—

'ডলউইচ গ্রামস্থিত লালকুঠিতে মিঃ জাস্টিস সোয়েনের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু।'

'রাত্রি বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে লন্ডনের শহরতলীর কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ, এবং সেইসকল ব্যাঙ্ক হইতে দুই লক্ষাধিক পাউন্ড অপহৃত।'

'রাত্রি দুইটার সময় বোমা দ্বারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্তপ্রায়!'

এই সকল বিভিন্ন কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার পল সাইনস স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই শোচনীয় পরাজয় ও হীনতার নিদর্শনসূচক এইসকল সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতে কখনও সাহস করিবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই সকল সংবাদ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, পল সাইনস প্রত্যেক সংবাদের বিস্তারিত বিবরণ জনসাধারণের অবগতির জন্য আগামী-কল্য বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্র-সমূহে পাঠাইবেন।

পল সাইনস এই মন্তব্যগুলি রিপোর্ট-বহিতে স্বহস্তে লিখিয়া তাহার নিচে নাম-স্বাক্ষর করিয়াছিল।

এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া সকলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন—পল সাইনস সার হেনরির ছদ্মবেশে রাত্রিকালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আসিয়া ইহা বিধ্বস্ত করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিল।

সার হেনরি ফেয়ারফক্স মুখ চুন করিয়া বিষাদভরে বলিলেন,—কিন্তু সার্জেন্ট সিবর্ন কী কারণে পল সাইনসকে এইসকল কুকার্যে সাহায্য করিতেছিল? অবশেষে সে আত্মহত্যাই বা করিল কেন?

মিঃ ব্লেক সার্জেন্ট সিবর্নের মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার বাঁ-হাতের আস্তিন বাহুমূল পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিলেন। তাহার বাহুর ঠিক নিচেই উল্কি দ্বারা নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল—তাহা সকলেই দেখিতে পাইলেন।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন সাইনসের সাত পুত্রের অন্যতম। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিয়াছিল।

এইরূপে পল সাইনস জয়লাভ করিল। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিয়া দেশের জনসাধারণকে আতঙ্কে অভিভূত করিবে বলিয়া যে-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা আংশিকভাবে পূর্ণ হইল। আইনের শক্তি এইভাবে সে স্তম্ভিত করিল। সে যে পুলিশের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

রাত্রি তিনটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দীপালোকগুলি পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। সার হেনরি ফেয়ারফক্স তাঁহার খাস-কামরায় মন্ত্রণা-সভা আহূত করিলেন। অতঃপর কী কর্তব্য, তাহাই নির্ধারণের জন্য এই পরামর্শ-সভার অধিবেশন। পুলিশ-ফৌজ মোটরে চাপিয়া নগরের ও শহরতলীর বিভিন্ন পথে সবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুনর্বার কোনও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত না হয়—সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি রহিল। শহরতলীর বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-লুঠের সংবাদ আসিতে লাগিল।

সার হেনরি ফেয়ারফক্স গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পল সাইনস আজ যেভাবে জয়লাভ করিয়াছে, অপরাধের ইতিহাসে ইহা অতুলনীয়! তাঁহার আশ্রিত দস্যুদল আজ লন্ডনের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা আমাদের পরাজয়েরই চূড়ান্ত নিদর্শন। আমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই অফিসে বসিয়াই সে এইসকল অপকর্ম সংশাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই স্থানে আসিয়াই সে বিভিন্ন থানায় মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত করিয়াছিল। পল সাইনস কোনও পল্লীর

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট অট্টালিকায় লুকাইয়া আছে—এই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া সে প্রত্যেক থানার কর্মচারীদের ওইসকল বাড়ি খানাতল্লাশ করিতে আদেশ করিয়াছিল। থানার কর্মচারী ও পাহারাওয়ালারা এইভাবে এক-একস্থানে সদলে আবদ্ধ থাকায়—সাইনসের অনুচরেরা অরক্ষিত নগরের ব্যাঙ্কগুলি নির্বিঘ্নে লুঠ করিয়াছিল, তাহাদের লুণ্ঠনে কোথাও কেহ বাধা দিতে পারে নাই। জনসাধারণ যখন এইসকল সংবাদ জানিতে পারিবে—তখন আমাদের অবস্থা কীরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সংবাদ—আমাদের এই পরাজয়-কাহিনী গোপন রাখিবার উপায় নাই। না, কোনও উপায় নাই। আমি এইসকল সংবাদ চাপিয়া রাখিতে সাহস করি না। একজন লোক কীভাবে আমাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিল, আমাদের বিপুল শক্তি বিফল করিল—এ-সংবাদ প্রকাশিত হইলে সমগ্র জগৎ কী মনে করিবে? কী করিয়া আমরা জনসমাজে মুখ দেখাইব? দেশের লোক আর কি আমাদের বিশ্বাস করিবে? বিপদে আমাদের শক্তিতে নির্ভর করিতে পারিবে? কিন্তু উপায় নাই, এ-সকল সংবাদ প্রকাশিত করিতেই হইবে।

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া বলিলেন,—আপনি ব্যাকুল হইবেন না সার হেনরি। এই পরাজয়ের পরও আমরা জয়লাভ করিতে পারিব—এ-আশা আপনি ত্যাগ করিবেন না।

সার হেনরি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশভাবে বলিলেন,—আবার জয়লাভ! এই শোচনীয় পরাজয়ের পর জয়লাভের স্বপ্ন দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি—তত উৎসাহ আমার নাই মিঃ ব্লেক!

সকলেই ব্যাকুলভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—এখন রাত্রি তিনটা। আর পাঁচ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ-পত্রে এইসকল অপ্রীতিকর সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না; অর্থাৎ বেলা আটটা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা সময় এখনও আপনার হাতে আছে। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অনেক অসম্ভব কার্য সংঘটিত হইতে পারে।

সার হেনরি বলিলেন,—অর্থাৎ? কীরূপ অসম্ভব কার্য সংঘটিত হইতে পারে বলিতেছেন মিঃ ব্লেক?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করা।

অনন্তর তিনি উঠিয়া টুপি লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—আমার আর এখানে বসিয়া থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; আমি চলিলাম। কিন্তু আপনার নিকট পাঁচ ঘণ্টা সময় চাহিতেছি; এই পাঁচ ঘণ্টার পর—বেলা আটটার সময় পল সাইনসকে বাঁধিয়া আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলেন। সকলেই স্তব্ধভাবে সেই কক্ষে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টর কুট্‌স মাথা তুলিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন। তাহার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—ব্লেকের মাথা খারাপ হইয়াছে। আহা, ভাবিয়া-ভাবিয়াই বেচারা খেপিয়া গেল!

নিদারুণ পরাজয়ে সকলেই 'লজ্জানম্র নতশির'। কেবল মিঃ ব্লেক এই দুঃসময়ে একাকী পল সাইনসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন।

মিঃ ব্লেকের এই অঙ্গীকারের কোনও মূল্য আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। আশাকরি, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ ও কৌতূহলও অল্প নহে। জানি না, কতদিন পরে লন্ডন হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইবে।

BanglaBook.org

মায়াবী

পাঁচকড়ি দে

বিজ্ঞাপন

'মায়াবী' যে-সময়ে বাহির হইবার কথা ছিল, তাহার অনেক পরে বাহির হইল। এজন্য অনেকেই যে আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা যে আমি বুঝি নাই, এমন নহে। এমনকী, এক বৎসরের মধ্যে 'মায়াবী'র জন্য প্রায় সহস্রাধিক গ্রাহকের আগ্রহপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ-কেহ দুই-তিনবার করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও 'মায়াবী' প্রকাশের এই অযথাবিলম্বে তাঁহারা যে বিরক্ত হইয়াছেন, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং তাঁহাদের নিকটে অপরাধী রহিলাম।

আশা করি, আমার সহৃদয় অনুগ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে আমার অদ্যকার এই ক্ষুদ্র উপহার উপেক্ষিত হইবে না।

গ্রন্থকার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উপক্রমণিকা

সর্পিণী—পদদলিতা

Mel. No, curse me,
Thy curse would blast me less than thy forgiveness.
Pauline. (laughing wildly) • • • •
O fool ! O dupe—wretch ! —I see it all—
The by-word and the jeer of every tongue
In Lyons. Hast thou in thy heart one touch
Of human kindnes?

LYTTON
"The Lady of Lyons"
Act III Scene II.

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নদীতটে

মোহিনী ক্রমে আকুল হইয়া উঠিল। মোহিনী দিন-রাত কাহার কথা ভাবে, মোহিনী নির্জনে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে, মোহিনী কাঁদিবার সময়ে বুকে করাঘাত করে এবং দুই হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়িতে যায়। কখনও বা মোহিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে হাসে, আবার হাসিতে-হাসিতে কাঁদে; মোহিনী পাগল হইয়াছে, অথবা হইতে বসিয়াছে; মোহিনীর আর সে-বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নাই; মোহিনীতে মোহিনী আর নাই। মোহিনীর এত দুঃখ কিসের? বলিতেছি।

অন্ধকার রাত্রি—পোহাইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অনেকক্ষণ পূর্বে একবার বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তথাপি এখনও সমস্ত আকাশ মেঘ করিয়া রহিয়াছে, গগন ব্যাপিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইতেছে; দেখিয়া বোধহয়, আর-একপশলা না ঢালিয়া এক পা নড়িতেছে না। দুই-একটি রবের জন্য এই নীরব রজনীকে একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ বলিতে পারা যায় না; সম্মুখস্থ নদীটির কলকলনাদ—নিরন্তর; নদীতীরস্থ লক্ষ ঝিল্লির সমবেত আর্তনাদ—(আর্তনাদই বটে!) ইহাও নিরন্তর; নীড়স্থ বিনিদ্র কোনও পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ—কদাচিৎ; পার্শ্ববর্তী লোকালয় হইতে কোনও নিদ্রোত্থিত শিশুর করুণ ক্রন্দন—ক্বচিৎ; অনতিদূরস্থ কুক্কুর-রব—ইহাও ক্বচিৎ। নদীবক্ষে তরঙ্গে-তরঙ্গে যে-মেঘের ছায়া ও অন্ধকার একসঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, তটে বসিয়া এক ব্যক্তি সেইদিকে অন্যমনে চাহিয়া ছিল। তখন মেঘের সঙ্গে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া অন্ধকারময় নদীবক্ষ আরও মসীময় করিয়া তুলিতে ছিল। বায়ু নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এক-একবার অল্প-স্বল্প চেষ্টা করিতেছিল—চেষ্টা মাত্র।

নদীতটস্থ লোকটির পশ্চাতে, কিছুদূরে মোহিনী শাণিত ছুরিকা-হস্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছিল; এবং পিশাচীর চোখের মতো তাহার চোখ দুইটা উল্কাপিণ্ডবৎ, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বড় ভয়ানক জ্বলিতেছিল।

যখন মোহিনী প্রায় তাহার নিকটস্থ হইয়াছে, তখন সেই লোকটি মুখ না ফিরাইয়াই মৃদুহাস্যে বলিল, 'মোহিনী, আজ আবার জ্বালাইতে আসিয়াছ? আর নিকটে আসিয়ো না—আমাকে মারিবে কি? তাহা হইলে তুমি নিজেই মরিবে।'

হতাশ হইয়া বিস্মিতের ন্যায় মোহিনী সেইখানে দাঁড়াইল। আর অগ্রসর না হইয়া বলিল, 'আমি তো মরিয়াছি—এমন মরণ আর কি আছে? কিন্তু বিনোদ, আজও তুমি বড় বাঁচিয়া গেলে। একদিন—এমন দিন আসিবে, সেইদিন দেখিবে, এই ছুরিখানা তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে।'

বিনোদলাল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'পাঁচ বৎসরের ছেলেকে এমন ভয় দেখানো অসঙ্গত নয়; আমাকে কেন, মোহিনী?'

সে-কথায় মোহিনী কোনও উত্তর করিল না।

বিনোদলাল বলিল, 'দেখো মোহিনী! তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো, তুমি আমাকে হত্যা করিবে কি? কোনওক্রমে তুমি আমার গায়ে একটি আঁচড়ও দিতে পারিবে না; কিন্তু আমি যদি একবার ইচ্ছা করি, তখন তোমার জীবনটা একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারি; সে-ক্ষমতা আমার আছে কি না, তাহা যে তুমি না জানো, এমন নহে। তোমাকে যদি আমার তেমনই একটা শত্রু বলিয়া বোধ হইত—তোমার দ্বারা আমার কোনও একটা অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার একটু সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে বিনোদলাল এতদিন তোমার সকল অপরাধ উপেক্ষা করিয়া তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিত না। তুমি জানো, আমার সন্ধানে কত গোয়েন্দা ফিরিতেছে—জীবিত কি মৃত, যেরূপ অবস্থায় হউক, তাহারা আমাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে; আমি কি সেজন্য একটু ভয় করি—না একটু ভাবি? আর তুমি তো একটা স্ত্রীলোক—তোমাকে দেখিয়া—না তোমার হাতের ওই ছুরিখানা দেখিয়া আমি ভয়ে হতজ্ঞান হইব? সেইজন্য বলিতেছি, মনে

BanglaBook.org

করিয়ো না, আমি ভয় পাইয়া তোমাকে এ-কথা বলিতেছি—তোমাকে ভালোবাসি বলিয়াই বলিতেছি। এখনও আমি তোমাকে আগেকার মতো তেমনই সুখে রাখিতে প্রস্তুত আছি; সেইরূপ বড়ো বাড়িতে থাকিবে—দাস-দাসী থাকিবে; আর যাহা চাহিবে, তাহাই তখনি পাইবে—কিছুরই অভাব তোমাকে অনুভব করিতে হইবে না। এরূপ পথে-পথে ঘুরিয়া কতদিন কাটাইবে?'

মোহিনী এক-একটি করিয়া বিনোদের সকল কথাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, আর ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল—ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল; ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, 'পিশাচ, আবার প্রলোভন? মনে করিয়াছ মোহিনী আবার তোমার প্রলোভনে ভুলিবে? এখনও কি তৃপ্ত হও নাই? এখনও কি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় নাই? কোন সুখের আশায় আবার আমি তোমার দয়া ভিক্ষা করিব? যে-ধর্ম একবার হারাইলে আর তাহা ফিরিয়া পাইবার নহে, তোমার কুহকে তাহাও গিয়াছে। মনে করিয়াছ, আবার তোমার মোহমন্ত্রে ভুলিয়া মুসলমানী হইব? কখনওই না। তুমি আমার কী সর্বনাশ না করিয়াছ? ধর্মভ্রষ্টা রমণীর পরিণাম যে কী, তাহা আমি এখন দেখিতেছি, তুমিও দেখিতেছ, জগতে সকলেই দেখিতেছে—কিন্তু তুমি যে একজন বিধবার সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছ, ইহাতে কি তোমায় পাপের কোনও ফলভোগ করিতে হইবে না? আজ দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, যখন আমার বয়স আঠারো বৎসর, যখন প্রবল পরাক্রমে যৌবন এ-অসহায় হৃদয়ে কী এক আত্মবিস্মৃতির তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, যখন দিনান্তে একবারও মনে করিতে পারিতাম না যে—আমি বালবিধবা; কবে বিবাহ হইয়াছিল? কাহার সহিত? কে তিনি? কেমন? এখন কোথায়? এ-সকল স্মৃতি যখন উদ্দাম যৌবনের আত্মবিস্মৃতিময় সেই তুমুল বিপ্লবের ভিতর হারাইয়া গিয়াছিল, মনে পড়ে কি, তখন তুমি কোন নরকের সহস্র প্রলোভন লইয়া, আমার তৃষিত লালসাময় চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে? সহজেই তুমি এ-অসহায় হৃদয় করতলগত করিলে। ক্রমে আমায় নরকের দিকে টানিয়া আনিলে, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় আমি তোমার অনুসরণ করিলাম। তখন একবার জন্মদাতা পিতার মুখ চাহিলাম না—স্নেহময়ী জননীর মুখ চাহিলাম না—উপরে যে ধর্ম রহিয়াছেন, সে-কথাও একবার ভাবিলাম না—কুক্কুরীর ন্যায় তোমার অনুসরণ করিলাম; শেষে স্বামীদত্ত প্রায় সাতহাজার টাকার গহনা লইয়া তোমার সহিত কুলের বাহির হইলাম। তুমি একে-একে দুই বৎসরের মধ্যে সে-সকলই আত্মসাৎ করিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে। এমনই অর্থপিশাচ তুমি, কিছুদিন পরে অর্থলোভে মুসলমান হইলে, একটা মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিলে; শেষে আমার যে-দশা করিয়াছ, তাহারও সেই দশা করিলে। আমি পাপিনী—পাপের ফলভোগ করিতেছি, সে মরিয়া বাঁচিয়াছে। তাহার পর তুমি আট বৎসরের জন্য কোথায় চলিয়া গেলে, আর সন্ধান পাইলাম না। যখন ফিরিয়া আসিলে, তখন দেখিলাম, আবার আর একটিকে অঙ্কশোভিনী করিয়া ফিরিয়াছ। তুমি যেমন, এখন ঠিক তেমনই মিলিয়াছে; যেমন তুমি পিশাচ—তেমনি পিশাচী তোমার জুটিয়াছে; এখন তুমি সুখী হইয়াছ; কিন্তু বিনোদ, মনেও করিয়ো না, আমার সুখ নষ্ট করিয়া তুমি সুখী হইবে—আর আমি দুঃখের ম্লানদৃষ্টিতে তোমার সুখ-শান্তির দিকে নিরীহ ভালোমানুষটির মতো শুধু দিন-রাত চাহিয়া থাকিব। এই ছুরিতে ইহার একদিন ঠিক প্রতিশোধ হইবেই হইবে। আমাকে যতদূর সহজ মনে করো—ততদূর নয়, একদিন তোমার সে-ভ্রম ভালো করিয়া ঘুচাইয়া দিব; তখন দেখিবে, স্ত্রীলোক একবার ধর্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে, তাহারা সকলই করিতে পারে; তাহাদের অসাধ্য এ-জগতে কিছুই থাকে না।'

ভ্রূকুটিকুটিলমুখে, সদর্প-পাদবিক্ষেপে মোহিনী তখনই তথা হইতে চলিয়া গেল। হাতে সেই উন্মুক্ত দীর্ঘ ছুরিখানা যেন তেমনি দর্পের সহিত ঘন-ঘন দুলিতে লাগিল।

বিনোদলাল নিতান্ত চিন্তিতের ন্যায় সেইখানে আলভাত বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গুমখুন

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন অরিন্দম বসু একজন প্রধান ডিটেকটিভ বলিয়া হুগলি জেলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার আফলোদয় অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যম, প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা এবং অসাধারণ আগ্রহ ও অধ্যবসায় তখনকার দস্যু, জালিয়াত, খুনি ইত্যাদির নিকটে তাঁহাকে যথার্থই 'অরিন্দম' বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিয়াছিল। আমাদের এই বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকায় তাঁহারই একটি ভীষণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব।

হুগলি জেলার অন্তর্গত কামদেবপুর গ্রামে অরিন্দম বসুর বাসাবাটি। একদিন অতি প্রত্যুষে স্থানীয় থানার অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অরিন্দম তাঁহার বাসাবাটির বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ আসিলে তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত বসিতে বলিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ না বসিয়া, দুই হাতে অরিন্দমের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, 'আপনি শীঘ্র আসুন—আসিয়াই যখন দেখা পাইয়াছি তখন আর বিলম্ব করা হইবে না।'

অরিন্দম তাঁহার সেই উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কী হইয়াছে? কোথায় যাইতে হইবে?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'থানায়। আপনি আসুন, সেখানে গিয়া সকলই দেখিবেন—সকলই শুনিবেন, এখানে আমি কিছুই বলিব না।'

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া টানিয়া থানার দিকে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন।

অরিন্দমের বাটি হইতে থানা বড় বেশিদূর নহে। অল্পক্ষণেই অরিন্দমকে লইয়া যোগেন্দ্রনাথ থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার একটি ঘর চাবিবন্ধ ছিল; যোগেন্দ্রনাথের নিকটেই চাবি ছিল, তিনি চাবি খুলিয়া অরিন্দমকে সেই কক্ষমধ্যে লইয়া ভিতর হইতে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে কাঠের একটি বড় সিন্দুক পড়িয়া ছিল। সিন্দুকটি নূতন ঝকঝকে; তথায় বসিবার উপযুক্ত আর কোনও সামগ্রী না থাকায় অরিন্দম সেইটির উপরে বসিতে যাইতেছিলেন; যোগেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেন এবং অতি দ্রুতহস্তে সেই সিন্দুকটি খুলিয়া অরিন্দমকে দেখাইলেন। দেখিয়া অরিন্দম শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ অনেকক্ষণের জন্য সেই সিন্দুকের মধ্যে নির্নিমেষ হইয়া রহিল; রুদ্ধশ্বাসে নিঃসংজ্ঞবৎ অরিন্দম প্রস্তর-গঠিতের ন্যায় নীরব নিস্পন্দ রহিলেন।

সেই সিন্দুক মধ্যে অন্যূন দ্বাদশবর্ষীয়া একটি বালিকার মৃতদেহ। সেই মৃতদেহের শতস্থানে অস্ত্রক্ষত, রক্তসিক্ত এবং অনেক স্থানে হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণ হস্ত একেবারে কাটিয়া লইয়াছে। কী ভয়ানক! কী ভয়ানক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় এ-বালিকাকে যে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হইতে থাকে। সেই মৃতদেহের দিকে চাহিয়া কখনও ওই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, কোনও মনুষ্য হইতে ওই কার্য সম্ভবপর। কে এমন নৃশংস নরপ্রেত যে এই ক্ষুদ্র বালিকার শিরীষকোমলদেহে শাণিত শতছুরিকাঘাত করিতে কাতর হয় নাই?

BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খুনি কে?

অরিন্দম দুই হাতে ধরিয়া সেই মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়া সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত

গবাক্ষ দিয়া প্রভাত-রবির রক্তাক্ত কিরণ সেই রক্তাক্ত মৃতদেহে পড়িয়া ভয়ানক দৃশ্য আরও ভয়ানক করিয়া তুলিল। অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, 'যোগেন্দ্রবাবু, ব্যাপার কী?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ব্যাপার কী—আমি কী বলিব? যাহা দেখিতেছেন, তাহাই; এখন আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, এ-ব্যাপার কী—সেইজন্যই আপনাকে আনিয়াছি।'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'সময়ে আমিই বুঝাইয়া দিব। এ-খুন কে করিল?'

যোগেন্দ্র। আপনি জানেন, আপনি তাহা বলিবেন।

অরিন্দম। ভালো, আমিই একদিন বলিব। এখন আপনি বলুন দেখি, এ-লাশ আপনি কোথায়, কীরূপে পাইলেন?

যো। এইখানে—থানায়। কাল রাত দুইটার পর মুটে-মজুরের মতো একটা হিন্দুস্থানী লোক এই সিন্দুকটা মাথায় করিয়া আমাদের এই থানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। এতরাত্রে এতবড় একটা সিন্দুক লইয়া, তাহাকে যাইতে দেখিয়া আমাদের রামদীন পাহারাওয়ালার সন্দেহ হয়—সে তখনই আমাকে খবর দেয়। আমি তখন রামদীনকে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলাম। রামদীন লোকটাকে ধরিয়া আনিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কাছে সেই সিন্দুকের চাবি আছে কি না। তাহাতে সে বলিল, চাবি নাই। তখন চোর বলিয়া তাহার উপরে আমারও সন্দেহ হইল। সে-লোকটাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথা হইতে সে আসিতেছে, কোথায় যাইবে, কাহার সিন্দুক। তাহাতে সে আপনার নাম করিয়া বলিল, আপনার নিকটেই সে এই সিন্দুক লইয়া যাইতেছিল।

অ। (সবিস্ময়ে) আমার নিকট!

যো। তাহার মুখে শুনিলাম, কলিকাতায় আপনার কে বন্ধু আছে, তিনি আপনাকে এই সিন্দুকটি পাঠাইয়াছেন। লোকটার চেহারা দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া লোকটাকে ছাড়িয়া দিলাম না—আটক করিয়া রাখিলাম বটে, তবে আপনার লোক শুনিয়া সে-লোকটার উপর তেমন নজর রাখিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। কেবল সিন্দুকটা এই ঘরে আটক করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর দেখি, রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সে-লোকটি পলাইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া মনে করিলাম, সিন্দুকটি আপনার ওখানে পাঠাইয়া দিব; সিন্দুকটি বাহির করিয়া দেখি, তলার কাঠখানার জোড়ের চারিদিকে রক্তের দাগ। তখন আমি সিন্দুক ভাঙিয়া ফেলিলাম।

অ। যে-লোক এই সিন্দুক বহিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে কেমন? বয়স কত?

যো। বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে। লোকটা হিন্দুস্থানী। আকৃতি যতদূর বিকট হইতে হয়। মুখখানা দেখিতে আরও বেশি বিকট; তাহাকে দেখিলে মানুষ বলিয়া হঠাৎ বুঝায় না। নাকটা খুব মোটা, চোখ দুইটা ছোট, ঠোঁট দুখানি এমন পুরু, যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে, দেহখানা বেশ হৃষ্টপুষ্ট; রঙ এত কালো, তাহার মৃত্যুর পর গায়ের চামড়াখানা পাইলে বেশ বার্নিশ-করা কয়েকজোড়া জুতা তৈয়ারি হইতে পারে। কপালে তিন-চারিটি কাটা দাগ আছে।

অরিন্দম সেই বালিকার মৃতদেহ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃত বালিকার শিথিল কবরীতে দুইটি রূপার তৈয়ারি মাথার কাঁটা ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খুনির বীরত্ব

এমনসময়ে একজন পাহারাওয়ালা বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। যোগেন্দ্রনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা একখানি পত্র লইয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিল। যোগেন্দ্রনাথ তখনই পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িবার সময়টুকুর মধ্যে তাঁহার মুখের ভাব ক্ষণে-ক্ষণে

শতপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পাঠশেষে তিনি সেই পত্রখানি অরিন্দমের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখুন, অরিন্দমবাবু, কাণ্ডখানা দেখুন; সে যে-ই হোক, সে বড় সহজ লোক নয়।'

'নতুবা কাহার এত সাহস, খুন করিয়া থানায় লাশ পাঠাইয়া রঙ্গ করে?' বলিয়া অরিন্দম পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

'যোগেন্দ্রবাবু,

'তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমাকে জানি। ইহাতে যদি আমাকে ধরিবার জন্য তুমি কোনও সুবিধাই না করিয়া উঠিতে পারো, তাহা হইলে পুলিশে চাকরি করা তোমার মতন একটি নিপুণ অর্বাচীনের কর্ম নহে। সিন্দুকের মধ্যে তুমি যে একটি বালিকার লাশ দেখিতে পাইবে, সে আমারই হাতে ওইরূপ অবস্থায় মরিয়াছে, জানিবে। কে সেই বালিকা, কেন খুন হইল, কে আমি, আমিই বা কেন তাহাকে খুন করিলাম, ওই সকলের একটিরও সন্ধান বোধহয়, তুমি চিরজীবনেও করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমি জানি, ইহার জন্য তুমি তোমার প্রিয়মিত্র অরিন্দমের সাহায্য লইবে; কিন্তু স্থির জানিয়ো, সাতটা অরিন্দমেও কিছুই হইবে না। বর্তমান বালিকাকে হিসাবে ধরিয়া আমার খুনের সংখ্যা আঠারো। কখন—কোথায়—কীভাবে থাকিয়া আমি এইসব খুন নির্বিঘ্নে করিতেছি, সে-পরিচয় তোমাকে দিবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

'এই বর্তমান সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে আমার খুনের সংখ্যা পুরোপুরি কুড়িটি হয়, তাহা করিব; আগে অরিন্দমকে খুন করিব, তাহার পর তোমায় খুন করিব। তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়ো, আর তুমি নিজে সাবধান হইয়ো। তোমাদের মতো দুই-একটিকে যদি না খুন করিতে পারিলাম, তাহা হইলে করিলাম কী?

'ইচ্ছা ছিল, তুমি যখন আমার এই পত্রখানি পড়িবে, তখন তোমার মুখের ভাব কেমন হয়—কী করো, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে-মজাটা প্রত্যক্ষ করিব। কোনও কারণবশত সে-ইচ্ছা আমাকে ত্যাগ করিতে হইল।

'আর দুই-একদিনের জন্য কেন এই বালিকার হত্যাকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবে? দু-একদিন পরে একেবারে "অরিন্দম - হন্তা"র সন্ধান করিতে বাহির হইতে হইবে।

তোমার পরিচিত

শত্রু'

অরিন্দম পত্রখানি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে ফিরাইয়া দিলেন; কোনও কথা কহিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনি আর কখনও এমন ব্যাপার দেখিয়াছেন কি?'

অ। না। লোকটি বড় সহজ নয়; যাই হোক, এখন যাহাতে তাহাকে সহজ করিয়া আনিতে পারি, তাহাই করিতে হইবে। পত্রখানি পড়িয়া দেখিলাম যে, লোকটি আপনাকে চেনে, আপনিও তাহাকে চেনেন। এই চেনাচিনির ভিতরেও লোকটা এত রঙ্গ করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য!

যো। আমার পরিচিতের মধ্যে কে এমন লোক, আমি তো ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। আবার দুই-চারিদিনের মধ্যে আপনাকে খুন করিবে বলিতেছে। আপনার সঙ্গে এমন কাহার শত্রুতা?

অ। কাহার শত্রুতা? অনেকেরই! যিনি চোর—তাঁহার, যিনি জালিয়াত—তাঁহার, যিনি খুনি—তাঁহার। এই তিন রকমের শত্রু লইয়া আমাকে সর্বদা ঘর করিতে হয়। সে যাহাই হোক, এখন এ লোকের-মতন-লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের নৈপুণ্য

অরিন্দম তখন সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে একটি কালো বনাতের জামা এবং একগাছি কালো রঙের ভাঙা ছড়ি বাহির করিলেন। রক্তে সম্পূর্ণ ভিজিয়া সে কালো বনাতের জামাটি গাঢ় পাটকিলা রঙের মতো দেখাইতেছে। জামাটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এই জামা পরিয়াই সে খুন করিয়া থাকিবে, জামাটি রক্তাক্ত হওয়ায় ও ছড়িটি কোনওরকমে ভাঙিয়া যাওয়ায় অব্যবহার্যবোধে এই সিন্দুকের ভিতরে চালান দিয়াছে। এই দুটিতে আমি সে-লোকটার চেহারা কিরূপ, মনে একটা অনুমান করিয়া লইতে পারিব। লোকটি লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি হইবে না।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেমন করিয়া আপনি জানিলেন?'

অরিন্দম সেই ভাঙা ছড়িটি দেখাইয়া বলিলেন, 'যে খুন করিয়াছে, এই ছড়িটি যদি তাহার হয় এবং ছড়িটি যদি তাহার মানানসহি হয়, তাহা হইলে আমার অনুমান মিথ্যা নহে। মাপে ছড়িটি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ওইরূপ পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি মাপের লোকেরই ব্যবহার্য। লোকটি আরও চারি-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইলে ছড়িটি আরও দুই ইঞ্চি বড় হইত। লোকটি তেমন খুব বেঁটে নয়, খুব লম্বাও নয়, লোকটির বুক প্রশস্ত, স্কন্ধ বিস্তৃত, কোমর তেমন মোটা নয়, বুকের মাপের অপেক্ষা কিছু কম। ইহাতে বুঝাইতেছে, লোকটি সেরকমের মোটা নহে; মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত; গলাটা কিছু বেশি মোটা।'

যোগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'বুঝিতে পারিলাম না, কীরূপে আপনি এমন অনুমান করিতেছেন।'

অরিন্দম বলিলেন 'এই জামার ছাঁট-কাট দেখিয়া আমি যাহা বলিলাম—আপনি জামাটি মাপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। লোকটির চুলগুলি অল্প কুঞ্চিত। জামার বোতামের সঙ্গে দুই-চারিগাছি চুল জড়াইয়া আছে। বোধহয়, সেই লোকটা খুন করিয়া নিজের মুখে, চোখে, মাথায় যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে; সেই সময়েই বোতামের সঙ্গে দুই-চারিগাছি চুল জড়াইয়া উঠিয়া আসিয়াছে—সকলগুলিই একমাপের—অল্প-অল্প কোঁকড়া।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এইগুলি মাথার চুল না হইয়া যদি দাড়ি-গোঁফের চুল হয়? মাথা মুছিবার সময় অবশ্যই সে নিজের মুখখানাও একবার এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, তাহা হইলে জানিতে পারিতাম। দাড়ি কিংবা গোঁফের চুল স্বভাবত গোড়া হইতেই ধনুকের মতো একদিকে কিছু বাঁকা হইয়া থাকে; কিন্তু মাথার চুল গোড়া হইতেই আগে খানিকটা কিছু কম আধইঞ্চি সোজা হইয়া থাকে। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তাহার পর ডগার দিকে বাঁকা হইয়া থাকে; আর যদি কাফ্রীদের চুলের মতন খুব কোঁকড়ানো চুল হয়, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহার আগাগোড়া প্রায় সমানই হয়। গোঁফ-দাড়ি আর মাথার চুলে কত তফাৎ একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আরও ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি, লোকটার দাড়ি-গোঁফ কিছুই নাই, তাহা হইলে গোঁফ-দাড়ির চুলও দুই-একটি লাগিয়া থাকিতে দেখিতাম। অবশ্যই সে ইহাতে মুখ-মাথা ভালো করিয়া জোর দিয়া মুছিয়া থাকিবে, কারণ রক্তের দাগ শীঘ্র উঠে না; বিশেষত, খুন করিবার সময়ে মানুষের হাতে-পায়ে এমন এক পৈশাচিক শক্তির সঞ্চার হয় যে, মনুষ্য তখন যে কাজ করে, সকল কাজেই অনিচ্ছায় অযথা বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। অবশ্যই সে-সময়ের এই গাত্রমার্জনীরূপে ব্যবহৃত জামায় গোঁফ-দাড়ি হইতে দুই-একটি চুল উঠিয়া আসিত। এই-সকলের মধ্যে আরও একটি অনুমান করা যায় লোকটা গৌরবর্ণ।'

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু শেষে গৌরবর্ণের কথা শুনিয়া তিনি একটা উপহাস করিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, 'কেন অরিন্দমবাবু, গায়ের রং কি একটু জামার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে না কি?'

BanglaBook.org

অরিন্দম বলিলেন, 'নজর থাকিলে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু নজর দিয়া তুমি- আমি, গাছপালা-ঘরবাড়ি দেখিলে হয় না—চোখ বুজিয়া আরও এমন অনেক জিনিস দেখা যায়—যাহা খোলা-চোখের কর্ম নয়।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'জামার সঙ্গে গায়ের রঙ না উঠিয়া আসিলে আমি তো এমন কোনও উপায়ই দেখিতে পাই না, যাহাতে সেই লোকটাকে গৌরবর্ণ বলিয়া বুঝতে পারি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কৃষ্ণবর্ণ লোকে কৃষ্ণবর্ণ বড় বেশি পছন্দ করে না, তাহা না হইলে জামা, ছড়ি উভয়ই কালো রঙের হইত না। যদিও জামাটি কালো রঙের হইত, ছড়িটি নিশ্চয়ই অন্য কোনও রঙের হইত। লোকটার বয়স চল্লিশের কম নহে; তাহার এদিকে লোকে এত বড় একটা দুঃসাহসিকতার কাজ এমন নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে পারে—আমার এমন বিশ্বাস হয় না।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনার অনুমানে লোকটার বয়স চল্লিশ বৎসর, গৌরবর্ণ, মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত, কেশ অল্প কুঞ্চিত, শ্মশ্রুগুম্ফহীন, লম্বা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি নহে, গলাটা কিছু মোটা, কোমরটা কিছু সরু। যখন হত্যাকারী ধরা পড়িবে, তখন আপনার এই অনুমানগুলি কতদূর সত্য, বুঝিতে পারা যাইবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তাহাই হইবে; এখন চলিলাম।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আবার কখন দেখা করিবেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যখনই দেখা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখিব। এই বালিকার একখানি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিবেন।'

অরিন্দম তথা হইতে বাহির হইলেন।

BanglaBook.org

প্রথম খণ্ড

সর্পিণী—সিংহ-বিবরে

When ruth three seasons thus had lain,
There came a respite to her pain;
She from her prison fled,
But on the vagrant none took thought :
And where it liked her best she sought
Her shelter and her bread.

WORDSWORTH,

BanglaBook.org

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রান্তরে

দ্বিপ্রহর রাত্রি। অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টিতে সে রাত্রি আরও কী ভয়ানক! আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন; আকাশের একপ্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্যন্ত মেঘ করিয়াছে; সে-মেঘ নিবিড়, ছিদ্রশূন্য, অন্ধকারময়। ভূতল হইতে আকাশতল পর্যন্ত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। মুহুর্মুহু বজ্র গর্জিতেছে; সে-গর্জন এমন বিকট এবং এমন ভীতিপ্রদ শুনিয়া অতি সাহসীরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এক-একবার বিদ্যুৎ ঝকিতেছে বটে; কিন্তু সে-আলোকের অপেক্ষা আঁধার অনেক ভালো। এই ঘোরতর দুর্যোগে ঝটিকাময়, শব্দময় এবং নানা বিভীষিকাময়, জনশূন্য, তারকাশূন্য ও দিগ্‌দিগন্তশূন্য সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা এক বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছিল। যখন তীব্রভাবে বিদ্যুৎ ঝকিতেছিল, তখন বালিকা সভয়ে প্রান্তরের একবার এদিক, একবার সেদিক করিয়া চারিদিকেই চাহিয়া দেখিতেছিল; ভয় হইতেছিল, পাছে কেহ তাহাকে সেই আলোকে দেখিতে পায়। আলো নিবিয়া গেলে, অন্ধকার পাইয়া বালিকা যেন তখন কতকটা নিঃশঙ্কচিত্তে আবার কিছুদূর অগ্রসর হইতেছিল। এই বিদ্যুচ্চকিত, মেঘকৃষ্ণ, বর্ষা-প্লাবিত নিশীথে জনহীন প্রান্তরে কে ওই বালিকা?

জানি না, কতক্ষণ সেই বালিকা এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছিল; কিন্তু তখন সে একান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তাহার নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দিয়া ঘন-ঘন শ্বাস বহিতেছিল। চেষ্টা করিয়া কিছুদূর কিছু দ্রুত চলিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে-গতির দ্রুততা আবার কমিয়া আসিতেছিল—আর পারে না। পা আর চলে না—যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বালিকা সেই বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে কতবার ভূতলাবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—কতবার পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল এবং ঝড়ে জলসিক্ত অঞ্চলও পায়ে-পায়ে জড়াইয়া বালিকাকে কতবার ভূতলে নিক্ষেপ করিল। উপরে মেঘ ছুটিতেছে—মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে—মেঘে-মেঘে মিশিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নিচে ঝড় ছুটিতেছে—ঝড়ে-ঝড়ে মিশিয়া ঝড় আরও ভয়ানক বেগে ছুটিতেছে, তাহার নিচে সেই অসহায়া বালিকা প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়াছে।

প্রান্তরের প্রান্তে আসিয়া বালিকা একখানি ছোট গ্রাম দেখিতে পাইল; কিন্তু সে-গ্রামও তখন মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—জনপ্রাণীর অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই নাই। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া, বালিকা হতাশ হইয়া সেই মৃতবৎ গ্রামের চারিদিকে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল বিদ্যুৎ সেই মৃতকল্প বালিকার হতাশদৃষ্টির সম্মুখে এক-একবার সেই মৃতবৎ গ্রামের ছবিখানি ধরিয়া কী রঙ্গ করিতেছিল, জানি না; কিন্তু তাহাতে বালিকার অবসন্ন, ক্লিষ্ট হৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে সত্বর গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়াছে এবং অসহ্য শীতে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ ও মুখশ্রী এখন পাণ্ডুর। সকল ইন্দ্রিয় এখন অবসন্ন এবং আর্দ্র; স্তূপীকৃত কৃষ্ণকেশদাম পৃষ্ঠে, বক্ষে, অংসে ও বাহুতে গুচ্ছে-গুচ্ছে জড়াইয়া লুটিতেছে।

বালিকা গ্রামের মধ্যে আসিয়া দেখিল, কিছুদূরে একটি গৃহে তখনও আলো জ্বলিতেছে। এই একমাত্র দীপালোক লক্ষ্য করিয়া বালিকা নূতন বলে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেটি একটি মুদির দোকান, তথায় চারি-পাঁচজন বসিয়া তাস পিটিতেছে, তামাক টানিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে এবং অন্যমনে গুনগুন করিয়া গীত গাহিতেছে। যাহার দোকান সে-লোকটাও ওই তাসখেলার দলের মধ্যে মিশিয়াছে, তাহার নাম বলাই মণ্ডল। আর তিন-চারিজন সেই পাড়ার; এই দুর্যোগে মুদি খদ্দেরের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আর সেই অপর তিনজন ঝড়বৃষ্টিতে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া দুঃসাধ্যবোধে অনন্যোপায় হইয়া তাসখেলায় মনোনিবেশ করিয়াছে। খেলা এখনও চলিতেছে এবং বেশ জমিয়াও আসিয়াছে।

যখন খেলাটা বেশ জমিয়াছে, সেই বালিকা তথায় আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,

BanglaBook.org

'তোমরা কেউ জানো গা—এখানে গোস্বামীপাড়া কোথায়?'

প্রথমে কেহই উত্তর করিল না। যে তাস পিটিতেছিল, তাহার তাস-পেটা বন্ধ হইল; যে তামাক টানিতেছিল, তাহার হাতের হুঁকাটা কাঁপিতে-কাঁপিতে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল; যে গল্প করিতেছিল, সে তখন একটা ভূতের গল্পের অর্ধেকটা বলিয়াছিল, তাহার গল্প বলা ঘুরিয়া গেল; এবং যে অন্যমনে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল, সমের মাথায় আসিবার পূর্বে তাহার গান থামিয়া গেল; এবং সকলেই অবাঙ্মুখে সেই বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি কেহ উত্তর করিল না। বিশেষত, যে ভূতের গল্প করিতেছিল, কিছুদিন আগে অমাবস্যার রাত্রে কোথায় সে স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছিল, সেই অদ্ভুত কাহিনী অতি সাহসের সহিত বলিতেছিল, ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল এবং বুকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে লাগিল। সুতরাং সে তখন মনে-মনে বারংবার অনতিপরিস্ফুটস্বরে আত্ম-সংরক্ষণে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল।

বালিকা কাতর্যে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে গোস্বামীপাড়া কোথায়?'

তাহাদিগের মধ্যে বলাইচন্দ্র বেশি সাহসের পরিচয় দিয়া প্রথমে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল, 'কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?'

বালিকা সে-কথায় কোনও উত্তর না করিয়া বলিল, 'আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, যদি গোস্বামীপাড়া জানো, কোনদিকে—শীঘ্র আমাকে বলিয়া দাও। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।'

বলাইচাঁদের সাহস দেখিয়া হলধর নামে তথায় আর একজন ছিল, তাহারও সাহস শেষে সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিল। সে তখন একবার তাহার অতি সাহসের পরিচয় দিয়া প্রেতিনী-অনুমিত বালিকার সহিত কথা কহিল, 'গোস্বামীপাড়ায় কার কাছে যাবে?'

বালিকা একবার ইতস্তত করিল; নাম বলিল না।

হলধরের নাম জানিবার তেমন বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না; সে বালিকার সহিত কথা কহিয়া, কেবল তাহার সঙ্গীদিগকে নিজের অতুল সাহস-বিক্রমের পরিচয় দিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল মাত্র। বালিকাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সে তখন তাহার অমানুষিক সাহসের পরিচয় দিল, 'গোস্বামীপাড়া এখান থেকে অনেকদূর; এইদিকের দিঘিটির পাড় দিয়া বরাবর দক্ষিণে প্রায় তিন-পো পথ গেলে—তারপর গোঁসাইপাড়া। এই ঝড়বৃষ্টিতে তুমি একা যেতে পারবে না, কোথায় পথ ভুলে বেঘোরে পড়ে প্রাণটা হারাবে।'

বালিকা আর কোনও কথা না কহিয়া চকিতে তথা হইতে বাহিরে আসিল। সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া দক্ষিণ মুখে আবার নূতন বলে চলিতে আরম্ভ করিল।

এ বালিকা কে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এ বালিকা কে?

দেখিতে-দেখিতে চক্ষের নিমেষে বালিকা বাহিরের সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল দেখিয়া, তথাকার সকলের—সাহসী বলাই মণ্ডল, কি তাহার-অপেক্ষা-অধিক সাহসী হলধর—সকলের মুখ ভয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিল।

যে ইতিপূর্বে ভূতের গল্প করিতেছিল, তাহার নাম হারানচন্দ্র। সে বলিল, 'এ আর কেউ নয় হে, হলধর; এ সে-ই, যার কথা আমি এখন বলছিলেম—সেই বাঁশঝাড়ের তলায় যাকে দেখেছিলেম, এ নিশ্চয়ই সে-ই। একবার জানানটা দিয়ে গেল। এখন দেখছি, এতরাত্রে, আর আজ

BanglaBook.org

আবার শনিবার, যে জলঝড়, ও-কথাটা তোলাই ভালো হয় নাই; নইলে এত জলঝড়ে মানুষের বাবার সাধ্য কী যে বাহির হয়; আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, এ সেই গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা গোয়ালাদের ছোট-বউ।'

আর একজন বলিল, 'দুর, সে কি এত সুন্দর দেখতে ছিল? এর মুখ-চোখ দেখলে না—যেন তুলি দিয়ে আঁকা—যেন দুগ্‌গো পিরতিমে?'

হারানচন্দ্র তখন দুই-একটা কঠিন প্রমাণ দিল, 'আমি বেশ করে দেখেছি, সে যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার একটুও ছায়া পড়তে দেখিনি। ঘোষেদের গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা সেই ছোট-বউ না হয়ে যায় না; আমি আগে একদিন একে স্বচক্ষে দেখেছি; আর সুন্দর-অসুন্দরের কথা ছেড়ে দাও, এখন ওরা যেমনটি মনে করবে, তেমনটি হতে পারে; আজ ওকে কী-বা দেখলে, আমি সেদিন যা দেখেছিলেম যেন রূপ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে; অন্য কেউ হলে সেই ফাঁদে পা দিত—আর মরত, আমি বাবা বড় শক্ত ছেলে!'

বলাই মণ্ডল আর এক পথে গেল, 'ওসব কাজের কথা নয়, গোঁসাইপাড়ার কোনও লোকের মেয়ে-টেয়ে হবে; শ্বশুরবাড়িতে বোধহয় জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাই আজ জলঝড়ে সুবিধা পেয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসছে।'

তামাক বন্ধ রাখিয়া, তাস-পেটা বন্ধ রাখিয়া, গল্প বন্ধ রাখিয়া এবং গুনগুন গান বন্ধ রাখিয়া, যখন অর্ধঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের মধ্যে কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা চলিতে লাগিল, তখন তথায় দ্রুতপদে আর একমূর্তির উদয় হইল।

সেই আগন্তুকের চেহারা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। তেমন বিকট হইতেও বিকট এবং কদাকার হইতেও কদাকার আকৃতির লোক তাহারা জীবনে আর কখনও দেখে নাই বলিয়াই ভয় পাইল। তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘ-দীর্ঘ হস্তপদাদি, দেহের সেই সুকৃষ্ণবর্ণ ও সেই বর্ণের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যে যথেষ্ট চিক্কণ তেলকালিও অতিশয় লজ্জিত হয়। প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল, সেই প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চক্ষু, প্রশস্ত নাসিকা, বিকট দন্তশ্রেণী।

তাহার উপরে আবার তেমনি কর্কশকণ্ঠ, 'ওহে, তোমরা এদিক দিয়ে একটা মেয়েকে যেতে দেখেছ?'

কেহ কোনও কথা কহে না।

তখন সেই বিকট আগন্তুকের সুবিকট কর্কশকণ্ঠ সপ্তমে উঠিয়া আরও কর্কশ শুনাইল, 'কী হে, তোমরা যে কেহই কথা কও না? বোবা না কি? যদি সত্য কথা না বল, এই দেখেছ আমার হাতে কী?'

এই বলিয়া একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল।

তখন সেই অতি-সাহসী হলধর ভয়কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ, আধঘণ্টা হবে, একটা মেয়ে দক্ষিণদিকের বড় দিঘির ধার দিয়ে গোঁসাইপাড়ার দিকে গেছে।'

আগন্তুক আর তথায় মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিল না। বালিকার অনুসরণে বাহির হইয়া গেল। অতি-সাহসী হলধর তখন একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হলধর বলিল, 'ব্যাপারটা কী বল দেখি?'

বলাই মণ্ডল বলিল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না, এর ভিতরে গূঢ় রহস্য আছে।'

হারানচন্দ্র বলিল, 'এ আর কিছু নয়—সবই ভূতের খেলা।'

বলাই মণ্ডল বলিল, 'না—না ভূত নয়। এ লোকটার কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছে।'

কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ অতি দূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ওগো কে আছ, শীঘ্র এসো, খুন—খুন করলে, খুন—খুন—'

বলাই মণ্ডল উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'ঠিক হয়েছে, সেই লোকটাই বুঝি সেই মেয়েকে খুন

BanglaBook.org

করলে। চলো, চুপ করে বসে থাকলে চলবে না; এসো—সকলে মিলে যদি এখনও মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি।'

তখন বলাই তিন-চারগাছা মোটা-মোটা লাঠি বাহির করিল।

এক-একজনের হাতে এক-একটা দিল; সকলেই লইল—লইল না কেবল বীরকুলর্ষভ হারানচন্দ্র। সে বলিল, 'তোমাদের কথায় ভুলিয়া আমি প্রাণ খোয়াইতে পারি না। যেতে হয়—তোমরা যাও; আমি তো প্রাণ থাকতে যাচ্ছি না। ভূতে ওইরকম অনেক মায়া জানে—ওইরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার দিঘির ধারে নিয়ে যেতে পারলে হয়—তখন কত ধানে কত চাল, তা বেশ ভালো করে দেখিয়ে দেবে। কী বলো, হলধর?'

হলধর 'হ্যাঁ,' কি 'না', কিছুই বলিল না।

হারানচন্দ্রের বড় মুশকিল বাধিয়া গেল—সকলেই যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তখনকার মতো তাহাকে সেইখানে একাকী থাকিতে হয়। আর তাহাদের সঙ্গে গেলে যে বিপদ সে অনুমান করিয়াছিল, তাহাও বড় সহজ নয়; সেইজন্য হারানচন্দ্র হলধরকে নিজের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তখনই সে-চেষ্টা এমনভাবে সফল হইল, কেহই তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিল না। অন্যের অলক্ষে চোখ টিপিয়া দুই-একবার হলধরের গা টিপিয়া, এমনভাবে হারানচন্দ্র তাহার আপাদমস্তকপূর্ণ করিয়া এমনই একটা মহা ভয় ঢুকাইয়া দিল যে, হলধর আর কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। তখন হলধর আর হারানচন্দ্র ছাড়া অপর তিনজন একটা লণ্ঠন লইয়া লাঠি হস্তে লাফাইতে-লাফাইতে বাহির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যদুনাথ গোস্বামী

যখন বলাই মণ্ডল অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাশ্রিতা বালিকার সন্ধানে বাহির হইল, তখন আকাশ অনেক পরিষ্কার; ঝড়ের বেগ অপেক্ষাকৃত ভূতমন্দী এবং বৃষ্টি অল্প-অল্প পড়িতেছিল। হলধর যে দিঘির ধার দিয়া বালিকাকে গোস্বামীপাড়ার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া সকলে দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহারা সেই দিঘির ধারে আসিয়া পড়িল। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না; দিঘির চারিধারে তাহারা সন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় অর্ধঘণ্টাব্যাপী অনবসর পরিশ্রমের কোনও ফলই ফলিল না দেখিয়াও কেহ নিশ্চেষ্ট হইল না, তথাপি অনুসন্ধান করিতে লাগিল; হয় সেই বালিকাকে, নয় তাহার মৃতদেহ তাহারা যেমন করিয়াই হউক খুঁজিয়া বাহির করিবে।

এইরূপে আরও অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাহারা দেখিল, দীর্ঘিকার অপর পার্শ্ব দিয়া কে একটি লোক সত্বরপদে চলিয়া যাইতেছে। তখন সকলে মিলিয়া সেইদিকে ছুটিল। নিকটে গিয়া লণ্ঠনের আলো ধরিয়া চিনিল, সে-লোক তাহাদেরই পাড়ার যদুনাথ গোস্বামী। তখন সকলে তাঁহাকে এক-একটা প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, 'কী রে বলা, এত রাত্রে এখানে যে লাঠি হাতে করে ঘুরছিস?'

বলাইচাঁদ তখন তাঁহাকে একে-একে সকল কথাই বলিল। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন, 'তবেই ঠিক হয়েছে, আমিও আসিতে-আসিতে পথে একখানা রক্তমাখা কাপড় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম।'

তখন বলাই বলিল, 'সে-কাপড়খানা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন; 'চলুন, সে-কাপড়খানা দেখিলেই আমরা চিনিতে পারিব।'

যদুনাথ গোস্বামী প্রথমে দুই-একবার অস্বীকার করিলেন; শেষে বলাইচাঁদের একান্ত পীড়াপীড়িতে যাইতে সম্মত হইলেন।

BanglaBook.org

যদুনাথ গোস্বামী, বলাইচাঁদ ও বলাইচাঁদের সঙ্গী দুইজনকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর আসিয়া যদুনাথ গোস্বামী সকলকে লইয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশিদূর আর যাইতে হইল না, দুই-চারিপদ অগ্রসর হইয়া তাহারা লণ্ঠনের আলোকে সেই রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইল। কেবল রক্তমাখা কাপড় নহে, সেখানে আরও একখানা প্রকাণ্ড ছুরি, দুই-তিনটা রৌপ্যনির্মিত মাথার কাঁটা পড়িয়া থাকিতে দেখিল।

বলাই মণ্ডল কাপড়খানা দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সেই নিরাশ্রিতা বালিকার। যদুনাথ গোস্বামী ছাড়া আর সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে-সকল রক্তমাখা কাপড়, ছুরি ইত্যাদি যাহা একটা ভয়ানক খুনের সাক্ষ্যস্বরূপ পড়িয়া ছিল, কেহই স্পর্শ করা দূরে থাক, অধিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহাদের ভয়ে হাত-পা কাঁপিতে লাগিল; রক্তের সঙ্গে এমনই একটা বিভীষিকা সকল সময়ে মিশিয়া থাকে। তখন তাহাদের হাতের লাঠি এবং হাতের লণ্ঠন হাতেই রহিল; কেবল তাহারা যে সাহসে ভর করিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছিল, সেই সাহসটি তাহাদের মনের ভিতর হইতে যাদুকরের হাত হইতে খেলার বর্তুলটির মতো অলক্ষ্যে কোথায় উড়িয়া গেল।

সকলে ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বন্দিনী

হুগলি জেলার জীবন পালের বাগানের নাম অনেকেই জানেন। অনেকেই জানেন, একসময়ে সেই বাগানের নিকট দিয়া দস্যুভয়ে এমনকী দিবালোকেও কেহ যাইতে সাহস করিত না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সেইদিকটা এমন বনজঙ্গলাবৃত ছিল যে, দিবসেও সেখানে যখন-তখন দস্যুরা তাহাদিগের হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে সমাধা করিত।

জীবন পালের বাগানের উত্তরপ্রান্তে একটি জীর্ণদশাগ্রস্ত, পুরাতন, পতনোন্মুখ ভাঙাবাড়ি ছিল। তাহার কোনও-কোনও অংশ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোনও অংশ পড়ো-পড়ো। ছাদের উপর বড়-বড় বট, অশ্বত্থ মৌরসীপাট্টা লইয়া, পুত্র-পৌত্র-পরিবার-পরিবৃত হইয়া দখলীকার আছে। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, আবর্জনাবহুল, মনুষ্যসমাগম-চিহ্ন-বিরহিত।

সেই নির্জন ভাঙাবাড়ির অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কোনও একটা প্রকোষ্ঠে অনিন্দিত-গৌরকান্তি, স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী, অনতীতবাল্যা একটি বালিকা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। হিমনিষিক্তপদ্মবৎ তাহার মুখ অশ্রুপ্লাবনে একান্ত মলিন; তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল দেহ কালিমাবৃত এবং কঙ্কালাবশেষ। কেশরাশি রুক্ষ, জড়িত এবং বিশৃঙ্খল। বালিকা নতমুখে এক-একটি নিশ্বাস অতিকষ্টে দুইবারে-তিনবারে টানিতেছিল। বালিকার সেই পরমসুন্দর মুখখানি এক্ষণে কাঁদিয়া ম্লান হইয়াছে। তাহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু এবং সেই আয়ত চক্ষুর মধুরোজ্জ্বল নীলাচঞ্চল দৃষ্টি সেই ম্লানমুখখানিতে এক অননুভূতপূর্ব সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া রাখিয়াছিল। যে কক্ষে সেই বালিকা বসিয়া ছিল, তাহা বাহির হইতে অবরুদ্ধ। বালিকা বন্দিনী।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ের বেগ কিছু শমিত হইলে বালিকা পশ্চিমদিকের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া বায়ুপ্রবাহ বালিকার রাশীকৃত রুক্ষ কেশভার উড়াইয়া-উড়াইয়া একবার তাহার সেই মুখখানির উপরে ফেলিতে লাগিল; পুনশ্চ উঠাইয়া ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া সেই বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মলিন অশ্রুবিবর্ণীকৃত মুখখানি ঢাকিতে লাগিল। এমন যে সুন্দর মুখ! এমন ম্লান? না দেখিয়া ঢাকিয়া রাখাই ভালো, ইহাই বুঝি, কি এইরকম কোনও একটা বায়ুর উদ্দেশ্য। বায়ুর যে উদ্দেশ্যই হউক, বালিকা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল।

বালিকা একদৃষ্টে দেখিতেছিল, দৃষ্টি-সীমায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্তাভ-নীলিমাময় বেলাপ্রান্তে কেমন

BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে আরক্তরবি ক্রমশ ডুবিয়া যাইতেছিল; এবং আরও কিছুদূরে কী ভয়ঙ্কর মূর্তিতে নিবিড় মেঘমালা গোধূলির হেমকিরণপরিব্যাপ্ত দিকচক্রবালে আকাশের সেই মধুর কোমলচ্ছবি ব্যাপিয়া, পুঞ্জীকৃত হইয়া, স্তূপীকৃত হইয়া অল্পে-অল্পে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বালিকার দৃষ্টি সেই সকলের উপরে নিস্পন্দ। অদূরস্থিত প্রচুর ভিন্ন জাতীয় সদ্য-প্রস্ফুট বন্যকুসুমের স্নিগ্ধ পরিমল একত্রে মিশিয়া, সেই সংমিশ্রণে আরও মধুর হইয়া, এক অপার্থিব উপহারবৎ নিদাঘসায়াহ্নসমীরণ বহিয়া যেখানে সেই রোরুদ্যমানা ধূলিধূসরিতা, বিগলিতাশ্রুনয়না, বিপদ-বিহ্বলা বালিকা প্রস্তরগঠিতের প্রায় একখানি মূর্তিমান দুঃখের জীর্ণ ছবিটির মতো, নীরবে ঈষদুত্তোলিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে সেই অলোকসম্ভবারূপিণী কিশোরীর চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। দূর বনান্তর হইতে কোনও-কোনও মধুরকণ্ঠ পাখির অমৃতবর্ষিণী কলকণ্ঠগীতি সেই বালিকার নিকটবর্তী সকল স্থানই মুখরিত করিয়া রাখিয়া ছিল। বালিকার সেদিকে লক্ষ্য নাই। বালিকা সেইখানে সেইরূপ নিশ্চলভাবে পাষাণ-প্রতিমার মতো অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে অবসন্ন বনতলে ধূসরবসনা সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে যখন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল এবং তখন সেই আসন্ন সন্ধ্যার অল্প-অল্প অন্ধকারে আর পশ্চিম গগনের নিবিড় জমাট মেঘের কালো ছায়ায় সায়াহ্নলীন অস্ফুট ম্রিয়মাণ দিবালোক আরও মলিন হইয়া আসিতে লাগিল, তখন বালিকার উদাসদৃষ্টি চঞ্চল হইয়া প্রকৃতির এই অপূর্ব পরিবর্তন-পারম্পর্যে সবিস্ময়ে ফিরিতে লাগিল; সহসা সেই আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কী দেখিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল এবং মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় চকিতে তথা হইতে সরিয়া গৃহকোণে গিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালিকা সভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মর্মাহতা

অনতিবিলম্বে রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিয়া এক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকার শয়নের নিমিত্ত এক কোণে একটি কদর্য শয্যা ছিল, লোকটা তাহার উপরে বসিল। বালিকা সেই শয্যার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া বালিকা অপর পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সেই আগন্তুকের বয়স চল্লিশ বৎসরের কম নহে; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তাহার দেহ বলিষ্ঠ, হস্তপদাদি মাংসপেশিতে স্ফীত, বক্ষ উন্নত, প্রশস্ত এবং অটুট স্বাস্থ্যের ও অতুল শক্তির পরিচায়ক। মুখাকৃতি মন্দ নহে; তবে একসময়ে যৌবনের প্রারম্ভে ওই মুখাকৃতি যে দেখিতে সুন্দর ছিল, সে অনুমানটা এখনও সহজেই করা যায়। দেহের বর্ণ গৌর।

বালিকাকে সম্বোধন করিয়া আগন্তুক বলিল, 'রেবতী, কতদিন আর এমন যন্ত্রণা ভোগ করিবে? আমার কথায় আর অমত করিয়ো না। তোমার জন্য আমি এতদূর লালায়িত দেখিয়াও কি তোমার মনে একটুমাত্র দয়া হয় না?'

রেবতী কোনও কথা কহিল না।

আগন্তুক আবার বলিল, 'রেবতী, কথা কও, এতদূর আসিয়া তোমার একটি মিষ্ট কথা শুনিব, এমন অদৃষ্টও কি আমার নয়?'

রেবতী মৃদুনিক্ষিপ্তস্বরে বলিল, 'আমি এখনও বলিতেছি, এ-জীবন থাকিতে আমি কখনওই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। তোমাকে বিবাহ করিয়া, শত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য উপভোগ করা অপেক্ষা এই বননিবাসে চিরবন্দিনী হইয়া থাকাও এখন আমার পক্ষে অতুল সুখ।'

BanglaBook.org

আগন্তুক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কী ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবে এই অতুল সুখেই চিরজীবনটা এইখানে কাটাও; কিন্তু নিশ্চয় জানিয়ো, আমার কথা না শুনিলে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। তুমি যত কঠিন হইবে, আমিও কঠিন হৃদয়ে তোমার উপরে সেইরূপ কঠিন-কঠিন ব্যবস্থাও ক্রমে চালাইতে থাকিব। চিরদিন আমি তোমার নিকটে এমনই বিনীত, এমনই অনুগ্রহপ্রার্থী থাকিব না; যে কোনও প্রকারে হউক, আমি আমার কার্যোদ্ধার করিবই। এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া যে সুখভোগ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমার উপপত্নী হইয়া স্বেচ্ছায় সে সুখের জন্য লালায়িত থাকিবে। এখন বুঝিতেছি, যতদিন তুমি সেই দেবা ছোঁড়াটাকে ভুলিতে না পারিবে, ততদিন আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইবে না; ভালো, শীঘ্রই তাহার ছিন্নমুণ্ড এইখানেই তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিবে।'

এই বলিয়া আগন্তুক এমন ভ্রূকুটিকুটিলমুখে সেই সরলা বালিকার দিকে চাহিল যে, বালিকা কী বলিতে যাইতেছিল, ভয়ে বলিতে পারিল না—ভয়ে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার শিরায়-শিরায় উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার নিষ্প্রভতার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ভীতিবিহ্বলা রেবতী আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া, ক্ষিতিতলন্যস্তজানু হইয়া, বাত্যাবিচ্ছিন্নবাসন্ত্যবল্লরীবৎ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, বুকফাটা-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'কেশববাবু, আমি মাতৃপিতৃহীনা, দুর্ভাগিনী। আমার মুখ চাহিয়া, আমার এই যন্ত্রণা দেখিয়া কি তোমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না? দয়া হয় না? আমার কাকার সঙ্গে তোমার কত হৃদ্যতা—কাকা তোমায় কত যত্ন করেন, আমি তো তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। তবে কেন আমাকে এখানে রাখিয়া এমন অসহ্য পীড়ন করিতেছ? তুমি আজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া আমাদের বাড়িতে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে প্রত্যহ যাইতে; আমাকে—আমার ছোট বোনকে তুমি কতই না স্নেহ করিতে; কতই না ভালোবাসিতে; কিন্তু সে-ভালোবাসায় তো এমন কোনও অন্যভাব ছিল না। কাকাবাবু আমাদিগকে যেমন ভালোবাসিতেন, তুমিও আমাদের সেইরূপ ভালোবাসিতে; তখন তো তোমার চোখে একদিনের জন্য এ-কলুষিত স্পৃহার কোনও চিহ্নও ফুটিতে দেখি নাই। আমি তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম; সে-ভক্তির বিনিময়ে আমি যে স্নেহ তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, তাহা না দিয়া তুমি আমার কাছে এ কী জঘন্য প্রস্তাব করিতেছ? কেশববাবু, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দাও; আমি প্রাণান্তে এ-সকল কথার একটি বর্ণও প্রকাশ করিব না। না জানি, আমার জন্য সেখানে এখন কী হাহাকারই পড়িয়া গিয়াছে!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মুক্তি

রেবতীর সেই ব্যথাব্যঞ্জক কাতরোক্তিতে পাপান্তঃকরণ, নারকী কেশবচন্দ্র কর্ণপাত করিল না; বরং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে বালিকার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুছাইয়া দিল, তাহার পর টানিয়া আপনার বুকের উপর তুলিতে চেষ্টা করিল।

স্ফীতজটা সিংহীর মতো রেবতী তখন আপন বলে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ও ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল রোষরক্তরাগরঞ্জিত হইয়া আর এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় বালিকা ফুলিতে-ফুলিতে রোষতীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'পিশাচ, ধিক তোকে! তোর মুখ দেখিতেও পাপ আছে; এখনি এখান থেকে দূর হ—তোর যা ইচ্ছা হয় করিস—যে যন্ত্রণা দিতে চাস—দিস, আমি তোকে আর ভয় করি না! তোর মতো নারকীর নিকটে দয়াভিক্ষা করা অপেক্ষা সহস্রবিধ যন্ত্রণাপ্রদ মরণও ভালো।'

BanglaBook.org

বর্ধিতরোষা রেবতীর দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দিয়া ঘন-ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল এবং সেই দ্রুতশ্বাসে বক্ষস্থল ঘন-ঘন স্ফীত হইতে লাগিল।

বালিকার সেই ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র কিছু বিস্মিত, কিছু স্তম্ভিত, কিছু বা ভীত হইল। তথাপি পাপী অস্খলিতসঙ্কল্পে সেই মুহ্যমানা বালিকার দিকে পুনরগ্রসর হইল। ব্যাধতাড়িত হরিণশিশুর ন্যায় বালিকা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কেশবচন্দ্রও বালিকাকে ধরিবার জন্য বাহিরে আসিতে গেল। বাহিরের কবাটের পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল। কেশবচন্দ্র যেমন বাহিরে আসিবে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে সজোরে এমন এক ধাক্কা দিল তাহাতে কেশবচন্দ্র পড়িয়া না গেলেও দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল। সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানেই তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই এক মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীলোকটি দুই হাতে তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল। তারপর রেবতীর হাত ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইল, রেবতী বিস্ময়-স্থিরনেত্রে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বাঘ ও সাপিনী

'মোহিনী, মোহিনী, কেন মরিবি? দে, কবাট খুলে দে—কেন মরিবি?' বলিয়া ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্তব্যাঘ্রবৎ বিকট গর্জন করিতে লাগিল এবং বারংবার কবাটের উপর সবলে পদাঘাত করিতে লাগিল। শালকাঠের কবাট সেই শত পদ-প্রহারে কিছুমাত্র ভিন্ন না হইয়া, বোধহয়, সেই নিরাশ্রিতা বালিকার মুখ চাহিয়া পূর্ববৎ স্থির রহিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন কি, যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিলাম, সে আমাদের সেই মোহিনী, সেই মরিয়া, দুঃখিনী, নৈরাশ্যপীড়িতা, লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী, উন্মাদিনী।

ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র সেই রুদ্ধদ্বারে দেহের সকল শক্তি একত্র করিয়া পদাঘাতের উপরে পদাঘাত করিতে লাগিল, আর বজ্রনিঃস্বনে বলিতে লাগিল, 'মোহিনী, পিশাচী, এখনই কবাট খুলে দে, কেন মরিবি!'

মোহিনী গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপের মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, 'আমার মরণের জন্য ইহার পর চিন্তিত হইয়ো—তখন অনেক সময় পাইবে। এখন নিজের মরণের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করো। এ যে-সে মরণ নয়, এইখানে—অনাহারে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মরণ—তোমার উপযুক্ত মরণ—তিল-তিল করিয়া অনেকদিনব্যাপী যন্ত্রণাময় সুদীর্ঘ মরণ। তোমার মরণ-প্রতীক্ষা করিয়া আমি এখনও মরি নাই। আগে যেমন দিন-রাত তোমার আরাধনা করিয়া মরিতাম—এখন তেমনি দিন-রাত তোমার মরণের আরাধনা করিয়া ঘুরিতেছিলাম। এখন তোমাকে সেই মরণের মুখে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম।'

যে তালা-চাবি কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিত, তাহা শিকলের আংটায় লাগানো ছিল; মোহিনী সেই শিকলে সশব্দে তালাবদ্ধ করিয়া চাবিটি দূরবনমধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কেশবচন্দ্র পুনরপি বলিল, 'মোহিনী, এখনও কবাট খুলে দে, কেন মরিবি?'

হাসিয়া মোহিনী উত্তর করিল, 'ভয় দেখাইতেছ কাকে? আমার আর মরণের ভয় নাই।'

কে। ইহাতে আমার কী ভয়ানক ক্ষতি হইবে, তুমি জানো না।

মো। তোমার ক্ষতিতে আমার কতখানি লাভ হইবে—তুমি তাহা জানো না।

কে। ইহার জন্য কখনওই আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।

মো। ক্ষমা করিবার জন্য কেহ তোমায় মাথার দিব্য দিবে না।

BanglaBook.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ মোহিনী ও রেবতী

মোহিনী, রেবতীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর আসিয়া উভয়ে এক নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল। সেখানে রেবতীর মুখ হইতে তাহার দুরবস্থার সকল কথা একে-একে মোহিনী শুনিল। শুনিয়া মোহিনী বলিল, 'এখন কী করিবে? কী করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? বেণীমাধবপুর এখান হইতে বিশ ক্রোশ, এতদূর পথ তুমি একাকী এখন যাইতে পারিবে না; তাহাতে বিপদও আছে, আর ধরা পড়িতে পারো। এ হুগলি জেলায় তোমার কেহ আত্মীয় নাই, যেখানে আপাতত কিছুদিনের জন্য লুকাইয়া থাকিতে পারো?'

রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কে আছে? কই তেমন আত্মীয় কেহ নাই; তবে চন্দননগরে গোঁসাইপাড়ায় আমাদের এক গুরু আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলে তিনি আশ্রয় দিতে পারেন।'

মোহিনী। চন্দননগর এখান হইতে দুই ক্রোশেরও বেশি। আকাশ যেরূপ ঘোর করিয়া রহিয়াছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে, পথে তোমার কষ্ট হইবে। যদি যাইতে সাহস করো, আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতে পারি। সে পথে গেলে তোমার কোনও বিপদ হইবে না।

রেবতী। তুমি এখানে থাকো কোথায়? নয় তোমার এখানে এ-রাত্রিটার মতো থাকিতাম।

মো। আমার থাকার নির্দিষ্ট কোনও স্থান নাই, যখন যেখানে যাই, সেইখানেই একটু থাকিবার সুবিধা করিয়া লই; এইরূপে বনে-বনে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াই।

রে। তোমার কি কেউ নাই?

মো। আছে—স্বামী।

রে। তিনি তোমার খোঁজ রাখেন না?

মো। তাঁহার অনুগ্রহ।

রে। তিনি কোথায় থাকেন?

মো। সেই যে তিনি—যিনি তোমাকে আমার সতীন করিবার জন্য খুব সাধা-সাধনা করিছিলেন!

রে। (বিস্মিত হইয়া) তিনি? এমন স্বামী!

মো। (ছুরি দেখাইয়া) এমন স্বামী বলিয়াই তো এই ছুরিখানা লইয়া ঘুরিতেছি। এ-জন্মে তো তাঁহাকে পাইলাম না; পাইলাম না—অথচ কলঙ্ক কিনিলাম। ইহলোকে পাইলাম না বলিয়া পরলোকে তাঁহার আশা ত্যাগ করি কেন? একদিন—যেদিন পরলোক যাত্রার সময় আসিবে, তখন এই ছুরি তাঁহার হৃদয়-শোণিতে আর আমার হৃদয়-শোণিতে একটা অবিচ্ছেদ্য অক্ষয় মিলন ঘটাইয়া দিবে। চলো, এখন আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিই। আমাকে এখনই ফিরিতে হইবে।

রে। তোমার কী হইবে? তিনি তোমার উপর যেরূপ রাগিয়াছেন, তাহাতে তোমার কী দশা হইবে—কে জানে? আমার জন্য তুমি কেন বিপদে পড়িবে?

মো। আমার এ-জীবনের উপর দিয়া আগে অনেক বিপদ গিয়াছে। এখন অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়া আছে, সেইজন্য কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়, তুমি বিপদ ভালোবাসো না। কিন্তু আমি নিত্য-নিত্য বিপদের সঙ্গে থাকিয়া বিপদকে কেমন যেন একটু ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। তাই আমি বিপদ ভালোবাসি। তোমার বিপদটা আমি যদি নিই, তাতে আর তোমার দুঃখ কী? এখন এসো, যতক্ষণ তোমাকে এখান হইতে না সরাইতে পারিতেছি—ততক্ষণ তোমার বিপদটা আমি সম্পূর্ণ দখল করিতে পরিতেছি না।

মোহিনী রেবতীর হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

BanglaBook.org

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কেশবচন্দ্রের মুক্তি

বাহির হইবার আর কোনও উপায় না দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেই অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং অন্ধকারমাত্রাত্মক হইয়া সম্মুখস্থ নিবিড় বনভূমি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রমে গর্জন করিয়া প্রবলবেগে ঝটিকারম্ভ হইল এবং ঝটিকান্দোলিত অসংখ্য বন্যবৃক্ষের সহিত নিবিড়তর অন্ধকার সংক্ষুব্ধসমুদ্রবৎ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। মেঘমণ্ডিত মসীমলিন আকাশের সহিত তদনুরূপ বনস্থলী একত্রে মিশিয়া নীলিমা ঢাকিয়া, তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র ঢাকিয়া প্রকৃতির বক্ষে চিত্রবৈচিত্র্যবিহীন, যতদূর-দৃষ্টি-চলে-ততদূর-বিস্তৃত একখানা কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল।

ক্ষণপরে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আর এক অন্ধকার-মূর্তি সেই অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে ডাকিল, 'রেবতী—রেবতী—'

তাহার কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি বলিতে-বলিতে উঠিল, 'কে রে, গোরাচাঁদ? এদিকে এক সর্বনাশ হয়ে গেছে,' বলিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদ বলিল, 'এই যে আপনি এখানে আছেন, আপনাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি; দরজাটা খুলে দিন, অনেক কথা আছে।'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'দরজা বাহির হইতে বন্ধ; শীঘ্র দরজাটা খুলে দে।'

অন্ধকারে হাতড়াইয়া গোরাচাঁদ শিকল অনুসন্ধান করিল। দেখিল, তাহা তালাবন্ধ; বলিল, 'ডাক্তারবাবু, এ যে চাবি দেওয়া, কেমন করে খুলব? আপনার কাছে চাবি আছে?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'চাবি নাই। যেমন করিয়া হোক, এখন ভাঙিয়া ফেল।'

গোরাচাঁদ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ব্যাপার কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কী হয়েছে?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'সর্বনাশ হয়েছে—পাখি উড়িয়াছে—ভরা জাহাজ ডুবিয়াছে—এক দমসে বিশহাজার টাকা লোকসান। আগে দরজাটা খুলিয়া দে, সব কথা বলিতেছি।'

গোরাচাঁদ অনেক অনুসন্ধান সেই ভাঙাবাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরিয়া জানালা ভাঙা একটা লোহার গরাদ সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহাতেই তাহার কার্যোদ্ধার হইল; শিকলের ভিতর সেই লৌহদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া একপাক ঘুরাইতেই ভাঙিয়া খুলিয়া গেল—কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ মোহিনীর সন্ধান

কেশবচন্দ্র বাহিরে আসিয়া গোরাচাঁদকে বলিল, 'গোরাচাঁদ, রেবতী পলাইয়া গিয়াছে।'

সবিস্ময়ে গোরাচাঁদ বলিল, 'সে কী! কোথায় গেল? কখন?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'কোথায় জানি না—একঘণ্টা হইবে, আমার চোখের সামনে সে পলাইয়া গিয়াছে।'

কেশবচন্দ্র আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা গোরাচাঁদকে বলিল। শুনিয়া গোরাচাঁদ আরও বিস্মিত হইল। বলিল, 'কী সর্বনাশ! এখনি রেবতীর খোঁজ করতে হবে।'

'এখনি কী, এই মুহূর্তে তাকে যেমন করে হোক ধরতে হবে নতুবা সব পণ্ড হবে। তুই তো সব গোল বাধাস। তোর ফিরতে এত দেরি হল কেন, বল দেখি? বেটা, যদি একঘণ্টা আগে ফিরতিস তা হলে আর আমাকে বাইশ হাত জলে পড়তে হত না। এখন আমার এমন রাগ হচ্ছে তোর উপর যে—তোরই মাথাটা ভেঙে ফেলি।'

'হ্যাঁ, আমারই বেশি দোষ কি না; আটক হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন, আমি এসে আপনাকে

BanglaBook.org

বার করলেম—এই আমার অপরাধ।'

(সক্রোধে) 'অপরাধ না বেটা, তুই যেখানে যাবি, সেইখানেই বাঘের মাসি—একঘণ্টার জায়গায় দশঘণ্টা কাটিয়ে তবে ফিরবি, তোকে নিয়ে আমার কাজ চালানো ভার দেখছি।'

'আমি তো সন্ধ্যার আগেই ফিরেছিলেম, বিশ ক্রোশ পথ সহজ নয় তো; তারপর আপনার বাড়িতে যদি গেলাম, সেখানে আপনাকে দেখতে পেলাম না; সেখান থেকে আবার তমীজউদ্দীনের বাড়িতে গেলাম। তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বেটি 'নাই' বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। তারপর এখানে এসে যা শুনলেম—শুনেই চক্ষুস্থির।'

'এখন যেখানে তোকে পাঠিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে তুই কী করে এলি বল দেখি? সে কী বলিল?'

'আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি একটা নির্জনে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালে; সেখানে আমি সেটা তার হাতে দিলেম, দেখেই খুব আপ্যায়িত।'

'টাকার কথা কী হল?'

'সেইদিকেই গোল বেধে গেছে; দুটো কাজই শেষ করা চাই, তা না করতে পারলে টাকা-কড়ির বিষয় কিছু হবে না। আপনি মনে করছিলেন, আগে একটা কাজ শেষ করে, কিছু টাকা হস্তগত করে শেষে তাকে জড়িয়ে ফেলে এমন এক চাল চালবেন যে, তার জমিদারি তালুক-মুলুক সবগুলি আপনার হাতেই আসবে; তা আর হল কই? সে ভারি ধড়িবাজ লোক, আমাদের উপরের একচালে সে চলে; সে বললে, দুটোতে আমার যা আশঙ্কা, একটাতেও তাই; এতে আর কাজ হাসিল হল কই?'

'এত যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম সকলই পণ্ড হল দেখছি।'

'আমি বললেম, দুটোকে একেবারে শেষ করুন, তা তো আপনি শুনলেন না; এখনি ঘরে রোক বিশহাজার টাকার তোড়া তুলতেন। গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্ট লাগে। আপনি পড়লেন বেশি লোভে, কাজেই অতি লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু।'

'কেন? তুই বললিনি, তার সঙ্গে কথা ছিল কী? এক-একটা কাজ শেষ হবে, এক-একটা কাজে দশ-দশহাজার টাকা; এই কথাই তো বলা-কহা ছিল; লেখাপড়ার মধ্যেও তো তাই আছে যে, দুইটি কাজ দশহাজার টাকা হিসাবে বিশহাজার টাকা দেওয়া হবে।'

'তা তো বুঝলেম, কিন্তু সেই বিশহাজার টাকা যে দুই কিস্তি নয়, এক কিস্তিতে। তা এখানে এসে যা দেখছি তাতে তো আপনি একেবারে কিস্তিমাৎ করে বসে আছেন; এখন বিশহাজার টাকার জায়গায় বিশটা পয়সাও পাবেন না।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কেশবচন্দ্র ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'গোরাচাঁদ, তুই যা, যেমন করিয়া পারিস, রেবতীকে ধরিয়া আন। যদি তাকে জীবিত অবস্থায় আনতে পারিস, আগে সে চেষ্টা করিস—আমি তাকে স্বহস্তে খুন করব। যদি তেমন কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিস, তা হলে খুন করে তার মৃতদেহ নিয়ে আসবি। জীবিত কি মৃত যে কোনও অবস্থায় রেবতীকে আমার চাই-ই চাই; নইলে বিশহাজার টাকা একেবারে ফাঁক হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি, অতি লোভটা করা আমার অন্যায় হয়েছে। তুই রেবতীর সন্ধানে যা, আমি মোহিনীর সন্ধানে যাই—এই বিশহাজার টাকার শোধ আমি মোহিনীর উপরে তুলব—তবে ছাড়ব; আগে আমি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেম; যা মনে করতেম, এখন দেখছি তা নয়; সে আমার একটা ভয়ানক শত্রু।'

তখন অদূরে থাকিয়া অন্তরাল হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, 'শত্রু বলে শত্রু—পরম শত্রু! সে শত্রুর সন্ধান করিতে কোথাও যাইতে হইবে না, এখানে আছে; তোমাকে ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত কোথাও থাকে না। তা যদি থাকিবে, তবে সে তোমার শত্রু কী? যদি দূরেই থাকিবে তবে বিনোদ, সে শত্রু তোমায় পদে-পদে শত্রুতা করিবে কী প্রকারে?'

পাঠক, বিনোদলাল আর কেশবচন্দ্র একই লোক।

কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিল, সে মোহিনী; কিন্তু চারিদিকে যে ভয়ানক অন্ধকার; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধকার ঠেলিয়া কোথাও তাকে দেখিতে পাইল না; তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং ঝড় তেমনি প্রবলবেগে তখনও গর্জন করিয়া ছুটিতেছিল। সেই ঝড়বৃষ্টির এলোমেলো শব্দে কেশবচন্দ্র কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, মোহিনী কোথায় দাঁড়াইয়া তাহাকে উপহাস করিল। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইল না।

'আমাকে দেখিতে পাইতেছ না? এই যে আমি।' বলিয়া তখনই মোহিনী একটি জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। ক্রুদ্ধ শার্দূলের মতন বিকট গর্জন করিয়া কেশবচন্দ্র মোহিনীকে ধরিতে গেল। সেই মুহূর্তেই মোহিনী চকিতে আবার সেই সর্পসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। একে নিবিড়তর অন্ধকার—সেই জঙ্গলের ভিতর যাইয়া কেশবচন্দ্র ও গোরাচাঁদ মোহিনীকে অনেক খুঁজিল; মোহিনীকে পাইল না।

কেশবচন্দ্র বলিল, 'এক কাজে দুজনে থাকিবার প্রয়োজন নাই। গোরাচাঁদ, তুই রেবতীর সন্ধানে যা, যেমন করিয়া পারিস, রেবতীকে আনিতে চাহিস। আমি এখানে রহিলাম—মোহিনীকে খুন না করিয়া আমি অন্য কাজে হাত দেব না। পিশাচী আমার বড় আশায় ছাই দিয়াছে।'

গোরাচাঁদ চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ জবানবন্দি

পাঠক, এখন কেশবচন্দ্র, গোরাচাঁদ, মোহিনী ইত্যাদির কথা রাখিয়া তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে-দুর্ঘটনার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই এখন আমাদিগের আখ্যায়িকার পুনরবলম্বন হইল। সেই দীর্ঘিকার অদূরবর্তী জঙ্গল-মধ্যে যে-রক্তমাখা কাপড়, দীর্ঘ ছুরি ইত্যাদি পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া পরদিন প্রত্যূষে গ্রামমধ্যে এমন একটা হইচই পড়িয়া গেল যে, কথাটা রঞ্জিত—ক্রমে অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে-মুখে ফিরিতে লাগিল।

গোবর্ধনের ঘরের সম্মুখে স্নিগ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন বটগাছের তলায় তৃণাস্তরণে বসিয়া হুঁকা হস্তে, কাশিকণ্ঠে, গম্ভীরমুখে এবং স্তিমিতনেত্রে প্রাচীনেরা সেই কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। ঘাটে কলসী-কক্ষে বামা, উচ্ছিষ্ট-মলিন তৈজসস্তূপহস্তে শ্যামা, একরাশি ক্ষারসিদ্ধ-বস্ত্রস্কন্ধে শম্ভুর মা এবং তৈলাক্তদেহে কামিনী সেই প্রসঙ্গের উপরে নিজেদের মতামতের এক-একটা অলঙ্ঘ্য দৃঢ় ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রভাতোদয়ের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম ঘটনাস্থলে দেখা দিলেন। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালাও আসিল। বলাই মণ্ডল ও তাহার সঙ্গিগণের জবান-বন্দি অরিন্দম একে-একে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহারা যাহা জানিত, ঠিক-ঠিক বলিয়া গেল; ভেবার ঘোর-ফেরে তাহাদের বড়-একটা পড়িতে হইল না। যেখানে একটু মিথ্যার গন্ধ আছে, সেইখানে গোলযোগ; সেই গোলযোগে যদুনাথ গোস্বামী একটু জড়াইয়া গেলেন। অরিন্দম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাল রাত্রে তেমন দুর্যোগে কোথা হইতে আসিতেছিলেন?'

য। গোঁসাইপাড়ায় আমার ভগ্নীপতির বাড়ি, আমার ভগ্নী পীড়িতা, তাই তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেইখান হইতে ফিরিতেছিলাম।

অ। ফিরিয়া আসিবার সময়ে আপনি কি আগে এই রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইয়াছিলেন? না, আপনার সঙ্গে আর কেহ তখন ছিল, সে আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছিল?

য। না, আমার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, আমিই আগে দেখিতে পাই।

BanglaBook.org

অ। ভালো, দেখিবার পূর্বে এই জঙ্গলের মধ্যে যাইবার আপনার তখন কোনও আবশ্যক হইয়াছিল কি?

য। না, আমি উহার ভিতরে যাইব কেন?

অ। তবে কেমন করিয়া আপনি যে তেমন অন্ধকারে ওই কাপড়খানা জঙ্গলের ভিতরে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

য। কেন? বিদ্যুতের আলোতে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

অ। কাপড়খানা দেখিবার পর, বলাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইবার আগে আপনি ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন?

য। (ক্ষণেক চিন্তা)

অ। বলুন না, ইহাতে ভাবিয়া বলিবার কী আছে?

য। না।

অ। এই চল্লিশোর্ধ বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ আছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। দিবালোকে চেষ্টা করিয়া দেখিলে বাহির হইতে বোধহয় এ-কাপড়খানা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যাইত না; রাত্রে বিদ্যুতের আলোকে তাহাও আপনি দেখিতে পাইয়াছিলেন; তা ছাড়া কাপড়খানা যে রক্তমাখা, তাহাও বাহির হইতে আপনি স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন গোস্বামী মহাশয়, এ-সকল যেন কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না?

য। আপনি কি মনে করিতেছেন যে, আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিলাম?

অ। তা কি মনে করিতে পারি? তবে যে আপনি সত্য কথা বলিতেছেন, ইহাও মনে করিতে পারিতেছি না। দেখুন, গোস্বামী মহাশয়, আপনি আমাকে বলাই মণ্ডলের মতো একজন সরল বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিবেন না যে, আপনি যাহা বলিয়া যাইবেন, তাহাই বিশ্বাস করিব। আর আমরা চোখ-বাঁধা বিশ্বাসেও কোনও কাজ করি না। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কথাটির উপরে সন্দেহ করিয়া-করিয়া তবে একটি সূত্র পাই; সেই সূত্র ধরিয়াই আমাদের কাজ করিতে হয়। যতক্ষণ না লোকে কোনও বিষয় গোপন না করিয়া অকপটচিত্তে প্রকৃত কথা আমাদিগকে শুনাইয়া যায়, ততক্ষণ আমরা আমাদের কার্যোদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতে পাই না। তাহার ভিতর একটু মিথ্যার ছায়া দেখিতে পাইলেই অনেকটা আশা করিয়া থাকি; আপনার দুই-একটি কথা শুনিয়াই আমার মনে সেই রকমের অনেকটা আশা হইয়াছে যে, আমি আপনার সাহায্যেই শীঘ্র কৃতকার্য হইতে পারিব। আপনি যেন এ খুন-রহস্যের ভিতর একটু-না-একটু জড়িত আছেন, আপনার কথা শুনিয়া এমনও একটু বোধ হইতেছে। দেখা যাক, কী হয়।

য। (রাগভরে) না হয়, আমিই খুন করিয়াছি, আমাকেই তবে চালান দিন। সাত পো অধর্ম না হলে কেউ পুলিশের হাঙ্গামে পড়ে না। আপনারা থানার লোক, আপনারা সব করিতে পারেন।

অ। (মৃদুহাস্যে) আঃ! আপনি রাগ করেন কেন? আপনি এখন স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারেন, আপনাকে আর আমার কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই।

যদুনাথ গোস্বামী মুখভার করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, অরিন্দম তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

BanglaBook.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পদচিহ্ন

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদুনাথ গোস্বামীকেই কি আপনি এ-খুন সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'খুন কোথায়, যোগেনবাবু? আপনি কি মনে করিয়াছেন, সেই বালিকাকে কেহ হত্যা করিয়াছে?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এই রক্তমাখা কাপড়, ছোরা দেখিয়া তাহা ভিন্ন আর কী মনে করা যাইতে পারে? বিশেষত একটা দস্যু ছুরি লইয়া সেই বালিকার অনুসরণ করিয়াছিল, শুনিলাম। আপনি কী বলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতটুকু বলিতে পারি, সেই বালিকা মরে নাই, কোথাও যায় নাই, এই গ্রামের মধ্যে আছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বলাই বগুল যে বালিকাকে "খুন করিল" বলিয়া বারংবার আর্তনাদ করিতে শুনিয়াছিল, সেটুকু কি বলাই মণ্ডলের একটা স্বপ্ন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'স্বপ্ন নহে, ওই জন্য আমারও মনের ভিতর একটু গোলযোগ বাধিয়াছে; নতুবা এখানে আসিয়া আর যাহা শুনিলাম, আর যাহা দেখিলাম, তাহাতে বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, বেশ বুঝা যাইতেছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সেই বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, এমন কী প্রমাণ পাইলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যে দুই-চারিটি প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আমি অনেকটা নির্ভর করিতে পারি। প্রথমত, এই জঙ্গলের ভিতরে ও বাহিরে কর্দমের উপর যে-সকল পদচিহ্ন রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোনওটিই বালিকার বলিয়া বোধ হয় না। সকলগুলিই যথেষ্ট লম্বা এবং যথেষ্ট চটলা।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাহা যেন হইল, কিন্তু হত্যাকারী অপর স্থানে সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া সেই জঙ্গলের ভিতরে রক্তমাখা কাপড় আর ছুরিখানা লুকাইয়া রাখিতে পারে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'দ্বিতীয়ত, হত্যাকারীর কোনও চিহ্ন দেখিতেছি না; এই জঙ্গলের ভিতরে কেবল চারি রকমের পায়ের দাগ দেখিতেছি; চারিজনের মধ্যে একজন বলাই মণ্ডল, একজন সাধুচরণ, *একজন হরেকৃষ্ণ, *একজন আমাদের গোস্বামী প্রভু। এই চারিজনেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিল বলিতেছে; চারিজনেরই পায়ের দাগ পাওয়া যাইতেছে; এই চারিজন ছাড়া এই জঙ্গলের মধ্যে কেহ যায় নাই, তাহা হইলে চারিটা ছাড়া অপর রকমের দাগ একটি-না-একটি দেখিতে পাইতাম। আর সত্যই যদি বালিকা খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই চারিজনের মধ্যেই কেহ সেই বালিকার হত্যাকারী।'

এই বলিয়া অরিন্দম উঠিলেন, জবানবন্দি দিতে আসিয়া বলাই মণ্ডল, সাধুচরণ, হরেকৃষ্ণ ও যদুনাথ গোস্বামীর যে-সকল পায়ের দাগ ভিজা মাটিতে পড়িতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেইগুলির সহিত জঙ্গল-মধ্যস্থিত পায়ের দাগগুলি এক-একটি করিয়া মাপে মিলাইয়া যোগেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। সকলগুলিই মাপে ঠিক হইল। কোনটি কাহার পায়ের দাগ, তাহাও বলিয়া দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টিতে অবাঙ্মুখে অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'আরও একটা কথা হইতেছে, এই কাপড়খানিতে যে ভাবে রক্ত লাগিয়াছে, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয়, কেহ কাপড়খানাতে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছে। তা ছাড়া, যদি ওই ছুরি কিংবা ওইরূপ কোনও অস্ত্র দিয়াই সেই বালিকাকে খুন করা হইত, তাহা হইলে ওই কাপড়ের কোনও এক অংশ সম্পূর্ণরূপে রক্তে ভরিয়া যাইত; এমন এখানে একটু, সেখানে একটু করিয়া চারিদিকে রক্ত লাগিবে কেন? হত্যাকারীর কাপড়ে এরূপভাবে রক্ত লাগা অসম্ভব নহে। তা ছাড়া, খুন করিয়া মৃতদেহ হইতে কাপড়খানি খুলিয়া লইবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না। কাপড়খানি এমন কিছু একটা ভারী জিনিস নয় যে, হত্যাকারী মৃতদেহের সহিত এ-কাপড়খানি বহন করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়াছিল।'

---

*বলাই মণ্ডলের সন্দিগ্ধ—যাহারা গতরাত্রে লাঠিয়াতে বলাই মণ্ডলের অনুসরণ করিয়াছিল।

মুগ্ধচিত্তে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি যে এইসব সামান্য বিষয় হইতে এতদূর ঠিক করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য; আমি তো এ-সকলের বিন্দুবিসর্গ লক্ষ্য করি নাই।'

অরিন্দম বলিলেন, 'ইহাই বা কী, অনেকসময়ে একগাছি সামান্য চুলের উপর নির্ভর করিয়াও আমাদের চলিতে হয়; সন্দেহের একটি পরমাণু পাইলেও সেটি লইয়া আমাদের সহস্রবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে হয়।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যদি খুনই হয় নাই, বালিকা বাঁচিয়া আছে, তবে যদুনাথ গোস্বামীর উপরে আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'খুন হয় নাই বলিয়াই যে কাহাকেও সন্দেহ করিব না, এমন কী কথা? আমি তো গোস্বামীকে খুনি বলিয়াই সন্দেহ করি নাই। গোস্বামী এইসকল কাণ্ডের কিছু-না-কিছু জানেন বলিয়াই আমি তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছি; নতুবা কোন প্রয়োজনে তিনি মিথ্যা বলিলেন? অবশ্যই মিথ্যা বলিয়া তিনি আমাদের দৃষ্টি হইতে কোনও বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবার ভিন্ন এই জঙ্গলের ভিতর আর যান নাই; কিন্তু তিনি যে দুইবার এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই দেখুন, গোস্বামীর পায়ের দাগগুলি এক মুখে দুইবার অঙ্কিত হইয়াছে। এই দেখুন, গোস্বামী মহাশয়ের এইগুলি দক্ষিণ পায়ের দাগ, এইগুলি এক ইঞ্চি তফাতে ঠিক পাশাপাশি; দেখুন, ওই ভাবে ওই মুখে আরও এক-একটি ওই দক্ষিণ পায়ের দাগ। যদি এ-দাগগুলি বিপরীত মুখে পড়িত, তাহা হইলে মনে করিতে পারিতাম, এ-দক্ষিণ পায়ের দাগ ফিরিবার সময়ে পড়িয়াছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এরূপ তো হইতে পারে, হয়তো ভিতরে ঢুকিবারে সময়ে ওইখানে তিনি একবার দাঁড়াইয়াছিলেন, ওই কারণে আবার একবার একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে এক পায়ের দাগ একমুখে দুইবার ওইরূপ পাশাপাশি অঙ্কিত হওয়া বিচিত্র নহে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'শুধু একস্থানে ওইরূপ দাগ পড়িলে আপনার এ-যুক্তি অন্যায় বোধ করিতাম না; দেখুন, প্রত্যেক স্থানে ওইরূপ দাগ রহিয়াছে। কোনও-কোনও স্থানে দাগের উপরেও দাগ পড়িয়াছে, কোনও স্থানে বা একটু বেশি তফাত; কেবল ফিরিবার সময়ে দাগগুলি এরূপ একপায়ের দাগ একমুখে পাশাপাশি দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, তিনি প্রথমবার এখানে আসিয়া এইদিক দিয়া বাহির হন নাই। এই দেখুন উত্তর মুখে এই যে সকল পায়ের দাগ ভিন্নদিকে চলিয়া গিয়াছে; এগুলিও গোস্বামী মহাশয়ের। তিনি একবার এই উত্তরদিক দিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি এই দাগগুলি দেখিয়াই চিনিতে পারিতেছি, ইহা গোস্বামী মহাশয়ের; কিন্তু আপনাকে মাপিয়া না দেখাইলে চিনিতে পারিবেন না।'

এই বলিয়া অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে সেই দাগগুলি মাপিয়া দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, 'গোস্বামী মহাশয় যে দুইবার এখানে আসিয়াছিলেন, সে-প্রমাণ তো এখন আপনি স্পষ্ট দেখিলেন; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় একবার ভিন্ন আর ইহার মধ্যে যান নাই, এই মিথ্যা কথাটির ভিতরে অবশ্যই একটা গূঢ় অভিপ্রায় সংলগ্ন আছে। আর এই ছুরিখানা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আছে; ছুরিখানা যেরূপ লম্বা-চওড়ায় বড় দেখিতেছি—খুনির ছুরির মতনই বটে। হইলে কী হয়, ইহাতে কিছু দেখিতেছি না, যাহাতে এই ছুরিতে বালিকার কোনও অনিষ্ট হইয়াছে, এমন বোধ করিতে পারি। তাহা হইলে এই ছুরির একস্থানে না-একস্থানে কণামাত্রও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম।'

যোগেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন, 'যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে রক্তের দাগ ধুইয়া যাইতে পারে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'ছুরিখানার যে-অংশ উপরের দিকে ছিল, সে-অংশের রক্তের দাগ বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ছুরিখানির যে অংশ নিচের দিকে ছিল, সেদিকে একটুকুও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম। ছুরির বাঁটের খাঁজের ভিতরেও একটু-না-একটু রক্ত লাগিয়া

BanglaBook.org

থাকিত। এই সকলের পর তেমন খুব বেশি বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধ হয় না। তেমন বৃষ্টি হইলে এ-সকল পায়ের দাগ এমন স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। আর কাপড়ে রক্তের দাগগুলি এমন গাঢ় থাকিত না, বৃষ্টির জলে বেশি রকমের ভিজিলে অবশ্যই অনেকটা ফিকা দেখাইত। এখন এই মাথার কাঁটা দুটির সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। এই দুটি কাঁটায় আমার অপর একটি কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। যোগেনবাবু, দুইদিন পূর্বে থানায় সিন্দুকের ভিতরে আপনি যে-বালিকার মৃতদেহ দেখেছিলেন, সেই বালিকার হত্যাকাণ্ডের সহিত আজকার এ-ঘটনার কিছু সংস্রব আছে, বুঝিতেছি। সেদিন সিন্দুকের মধ্যে যে-দুটি কাঁটা পাইয়াছিলাম, আর আজ এখানে আসিয়া যে-দুটি কাঁটা পাইলাম, এক কারিগরের হাতেই তৈয়ারি, এক মাপ—এক ধরনের।'

তখন পূর্বের সেই দুটি কাঁটা বাহির করিয়া অপর দুইটির সহিত মিশাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিয়া অরিন্দম বলিলেন, 'এইবার আপনি এই কাঁটাগুলি হইতে আগেকার সেই দুটি চিনিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন কি?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সকলগুলি তো একরকমের দেখিতেছি; কীরূপে চিনিব।"

তাহার পর অরিন্দম নিজের নোটবুকখানি বাহির করিয়া শেষের দিককার একখানি পাতা খুলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। তাহাতে এইরূপ একটি রজকের চিহ্ন অঙ্কিত কাপড়ের কোণ সংলগ্ন ছিল। যোগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, 'এ আবার কী—বুঝিতে পারিলাম না। আপনার সকলই অদ্ভুত।'

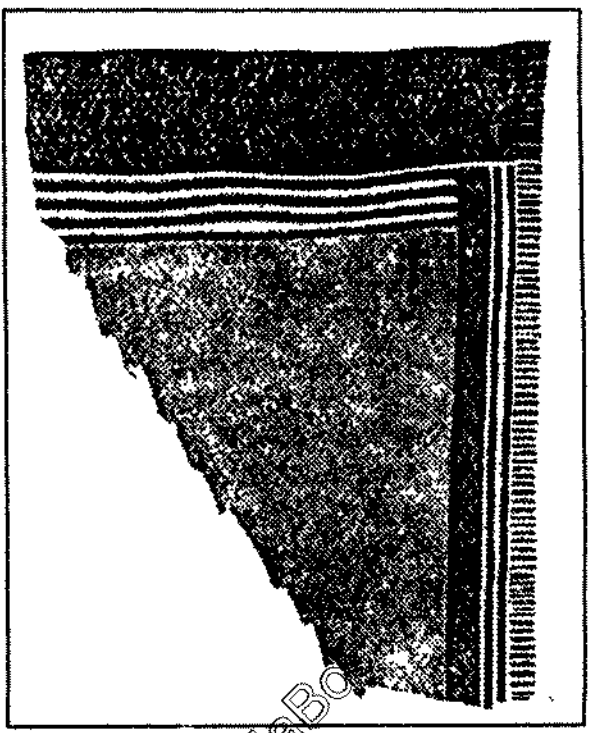

অরিন্দম বলিলেন, 'এমন বিশেষ কিছু নয়, তবে ইহা এখন একটা বিশেষ উপকারে লাগিল। থানায় সেই মৃতা বালিকার কাপড়ে যে-রজকের চিহ্ন ছিল, ইহা তাহাই; আজ এখানকার ঘটনার এই রক্তমাখা কাপড়খানিতে যে মার্কা দেখিতেছি, ইহার সহিত এই মার্কারও কিছুই প্রভেদ নাই; তাই বলিতেছি, সেই ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ-কাণ্ডের অনেকটা যোগাযোগ আছে। সেদিন সেই বালিকার মৃতদেহ দেখিয়া এই মাথার কাঁটা আর রজকের চিহ্ন ছাড়া হত্যাকারীকে ধরিবার কোনও সূত্র পাই নাই। আপনার মুখে সেদিন যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাও বড় জটিল বোধ হইয়াছিল। যেমন করিয়া হউক, পরে যে কৃতকার্য হইব, এখন এমন আশা করিতে পারি, কী বলেন?' বলিয়া অরিন্দম বিদায় লইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ একজন পাহারাওয়ালাকে দিয়া সেই রক্তাক্ত কাপড়, ছুরিখানা থানায় লইয়া চলিলেন।

BanglaBook

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : এ সুন্দরী কে?

সেইদিন অপরাহ্ণে অরিন্দম একাকী বাহির হইলেন। যদুনাথ গোস্বামীর বাটি অভিমুখে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। যদুনাথ গোস্বামীর বাড়িখানি একতল, ছোটবড় চারি-পাঁচটি ঘর আছে; ঘরগুলি পুরাতন, বাহিরের চারিদিকে লোনা ধরিয়াছে। একদিক হইতে লাউগাছ, আর একদিক হইতে কুমড়াগাছ, এদিক হইতে পুঁই, ওদিক হইতে ধুতুল, সীম, শশাগাছ ছাদে উঠিয়া সমুদয় ছাদ ব্যাপিয়াছে—শেষে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ছাদের চারিদিক দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

সেই সকল দেখিতে-দেখিতে অরিন্দমের দৃষ্টি একটি উন্মুক্ত ক্ষুদ্র গবাক্ষের উপরে গিয়া পড়িল; দেখিলেন, তিনি দেখিতে-না-দেখিতে একটি স্ত্রীলোক সেখান হইতে চকিতে সরিয়া গেল। বিদ্যুৎও বোধহয়, তেমন চকিতে মিলায় না। সেই নিমেষমাত্র সময়ে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অরিন্দমের অনুভব হইল, স্ত্রীলোকটির বয়স বেশি নয়, আশ্চর্যরূপ সুন্দরী, মুখখানি অতীব সুন্দর; কিন্তু যেমন সুন্দর তেমন যেন প্রফুল্ল নহে। আবার তাহাকে দেখিবার জন্য অরিন্দম কিছুক্ষণ সেইদিকে নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, কে ইনি? হয়তো যদুনাথ গোস্বামীর কন্যা হইবেন; কিন্তু বলাই মণ্ডলের নিকটে শুনিয়াছি, যদুনাথ গোস্বামী নিঃসন্তান। এক স্ত্রী ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই। অনেক ব্রাহ্মণ কুলগৌরবের জোরে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও বিবাহ করিয়া থাকেন, বিশেষত পঞ্চাশের অদৃষ্টে এখনও গোস্বামী মহাশয়ের পাদস্পর্শ লাভ হয় নাই। তাহা হইলে এখন যাঁহাকে দেখিলাম, তিনি কন্যা না হইয়া বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হইতে পারেন।

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময়ে সেই উন্মুক্ত গবাক্ষে আর একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককেও দেখিতে পাইলেন। তিনিও একবার অরিন্দমের দিকে চাহিয়া তখনই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অরিন্দমের সংশয় আরও বাড়িল। ভাবিলেন ইনিই গোস্বামী মহাশয়ের গৃহিণী হইবেন; ইহার পূর্বে যাহাকে দেখিলাম, সে নবীনা কে? গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কী সম্পর্ক?

সেখানে সেরূপভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রোচিত কার্য নহে বুঝিয়া, অরিন্দম তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। কেননা সে-দিকটা যদুনাথ গোস্বামীর ভিতর-বাটির পশ্চাদ্ভাগ। অরিন্দম তখন একবার গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য সদর-বাটির সম্মুখে আসিলেন। সেদিকের সমুদয় গবাক্ষ ও দ্বার বন্ধ দেখিলেন। সেখানে আসিয়া কাহাদের কথোপকথনের অস্ফুট শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন তিনি একটি রুদ্ধ জানালার পার্শ্বে আসিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইলেন। দুই-একটি কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ভিতরে আর এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতেছে। তখন তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, সেই ঘরে দুইটি লোক বসিয়া। একজনকে চিনিলেন, যদুনাথ গোস্বামী; অপর লোকটি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি যদুনাথ গোস্বামীর সহিত সেই অপরিচিতের সেইরূপ গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। অরিন্দম অনন্যমনে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন; ক্রমশই তাহাতে অধিকতররূপে তাঁহার চিত্তাকৃষ্ট হইতে লাগিল। যখন ভিতরে সেই গুপ্ত মন্ত্রণার শেষ হইয়া আসিল, অরিন্দম বাহিরে একবার চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে; এবং শুক্লাষ্টমীর অর্ধচন্দ্র মধ্যগগন ছাড়াইয়া পশ্চিম আকাশের অনেকদূর অবধি নামিয়াছে। তাহার দূরে ও নিকটে জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল তরল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি নির্মল আকাশের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

BanglaBook.org

অরিন্দম সেই জানালার ছিদ্রপথে দেখিলেন, তখন গোস্বামী ঝুঁকিয়া প্রদীপের সম্মুখে একখানি পত্র লিখিতেছেন; সেই অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখের একপার্শ্ব দীপালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। লোকটা দেখিতে একান্ত কুৎসিত, গঠন-প্রণালী দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; কখনও কোথায় দেখিয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। কোন উদ্দেশ্যে পত্রখানি লেখা হইতেছিল, অরিন্দম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ইতিপূর্বে তাহাদিগের মন্ত্রণার মধ্যে ওই সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল।

পত্র লেখা হইলে সেই অপরিচিত লোকটি সেখানি বুকপকেটে রাখিয়া দিল। অরিন্দম তাহা দেখিলেন। বুঝিলেন, লোকটি এখনই বাহিরে আসিবে; এইজন্য তিনি সেখান হইতে একটু দূরে একটি বটগাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই লোকটি বাহিরে আসিল, একটু দূরে দাঁড়াইয়া বাড়িখানি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আপনার গন্তব্যপথ ধরিল। অরিন্দম তাহার অনুসরণ করিলেন। তাহার অপেক্ষা দ্রুত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে-ক্রমে তাহার সন্নিকটবর্তী হইলেন। সেই অপরিচিত লোকটি দুই-একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও কথা কহিল না—অরিন্দমও না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : অনুসরণে

যখন যদুনাথ গোস্বামীর বাড়ি হইতে অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকের অনুসরণে অনেকদূর আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি উপযাচক হইয়া তাহার সহিত এইরূপ প্রথম আলাপ করিলেন, 'মহাশয়কে যেরূপ দেখিতেছি, যদিও আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই; কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, সামনে বললে খোশামুদি করা হয়—অতি—অতি—'

অপরিচিত লোকটি এইরূপ আলাপে যত সন্তুষ্ট না হউক, বড় বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কে হে বাপু, তুমি?'

অরিন্দম আরও একটু স্বরটা গড়াইয়া বলিলেন, 'এই, এই কথাটা হচ্ছে যে, মহাশয়ের সামনে বললে খোশামোদ করা হয়—আপনি অতি—অতি—'

অপরিচিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেবল "অতি-অতি"ই করছ যে—কী বলো না—অতি ভদ্রলোক, না অতি সদাশয় লোক?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আরে রাম রাম! তাও কি কখনও হতে পারে একজন অতি ধড়িবাজ লোক। সামনে বললে খোশামোদ করা হয়, তাই বলি-বলি করেও বলতে পারছিলেম না।' বলিতে-বলিতে অরিন্দম আরও একটু তাহার নিকটস্থ হইলেন। নিকটস্থ হইয়া তাহাকে—বিশেষত তাহার মুখখানি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইলেন।

সেই অপরিচিত লোকটি ললাট কুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিল। অরিন্দম দেখিলেন, তাহার মুখখানি গড়িতে বিধাতার কি জানি, এমনই এক সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা ছিল যে, সে-মুখখানিতে হাজার হাসি একসঙ্গে দেখা দিলেও বুঝাইত না, লোকটি হাসিতেছে, না কি এক অসহ্য অরুন্তুদ যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করিতেছে। লোকটি হাসিয়া—কি বিকৃত মুখে বলা যায় না—বলিল, 'তুমি কি পাগল না কি?'

অরিন্দম বলিল, 'এমন কথা পূর্বে আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই, এই প্রথম তোমার মুখে শুনিলাম। সে কথা যাক, এখন বলো দেখি, কী মনে করে আজ, আবার সন্ধ্যার পর বাহির হয়েছ? কাল রাতে তো একটাকে শেষ করেছ, আজ আবার কার বুকে ছুরি বসাবে, দাদা?'

অপরিচিত বলিল, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

অরিন্দম বলিলেন, 'মনে-মনে খুব বুঝতে পারছ; এই যে এত বড় একটা খুন হয়ে গেল, তার কি কোনও খবরই রাখো না?'

সেই লোকটি বলিল, 'না, কিছু না, আমি এখানে থাকি না। তুমি একজন গোয়েন্দা না কি?'

অরি। তা না হলে তোমার পিছু লইব কেন? আমি বেশ বলতে পারি, তুমিই সেই মেয়েটিকে খুন করেছ।

অপরিচিত। আমি কিছুই জানি না।

অরি। তুমিই না কাল রাতে একবার বলাই মণ্ডলের দোকানে আবির্ভূত হয়েছিলে?

অপ। না, আমি বলাই মণ্ডল নামে কাকেও জানি না।

অ। জানো বই কি, হয়তো এখন ভুলে গেছ। বলাই মণ্ডল মিথ্যা কথা বলবার লোক নয়, তার মুখেই আমি তোমার কথা শুনেছি।

অপ। সে কি তোমার কাছে আমার নাম বলেছিল?

অ। নাম না বললেও তোমার মুখখানি দেখে বেশ বুঝতে পারছি, তুমিই স্বয়ং সেই মহাপুরুষ।

অপ। মিথ্যা কথা; তবে আমি এ-খুনের কিছু-কিছু জানি বটে। তুমি এখন সেই বালিকার মৃতদেহের সন্ধান করছো না কি? তা হলে আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি।

অ। তা হলে আমি বাধিত হব।

অপ। মৃতদেহ বাহির করিতে পারলে তুমি বেশি রকমের একটা পুরস্কার পেতে পারো, এমন একটা সম্ভাবনা আছে কি?

অ। আছে বই কি, তা না হলে আর সেই সকাল অবধি এখনও পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে বেড়াব কেন, বল?

অপ। আমি যদি সেই মৃতদেহ বার করে দিই, তা হলে কিছু বখরা দিতে পার?

অ। তোমার দ্বারা যদি এতবড় একটি মহৎ কাজ হয়, তা হলে তা আর দিব না? তখনই।

অপ। আমি কাল রাত দুটার পর ওই দিঘির ধার দিয়ে যখন আসি ওই পশ্চিম দিককার একটা জঙ্গলের ভিতরে একটা বালিকার মৃতদেহ দেখেছি। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতে পারি।

অ। এখনও এ-কথা গোপন করে রেখেছিলে কেন?

অপ। সাধ করে কে পুলিশের হাঙ্গামে পড়ে বলো। এখন আমার সঙ্গে যাবে কি?

অরিন্দম একবার কী ভাবিলেন। বলিলেন, 'চলো যাইব।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ মল্লযুদ্ধ

সেই অপরিচিত লোকটি অরিন্দমকে সঙ্গে লইয়া চলিল, উভয়েই নীরব। তিন-চারিটি বড়-বড় জলাভূমি পার হইয়া চলিল। অবশেষে এমন এক স্থানে উভয়ে আসিয়া পড়িল যে, সেখান হইতে লোকালয়ের কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে—রাত্রির কথা দূরে থাক, কেহ কাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, এমনকী সেখানে প্রশস্ত দিবালোকে সে নির্বিঘ্নে সে-কাজ সমাধা করিতে পারে।

সেই অপরিচিত ব্যক্তি সেইস্থানে আসিয়া মৃতদেহ খুঁজিবার ভানে নিকটস্থ একটি জঙ্গলের এদিক-ওদিক দেখিয়া বলিল, 'তাই তো বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার!'

অরিন্দম সে-কথার কোনও উত্তর করিলেন না।

অপরিচিত লোকটা আবার অরিন্দমকে শুনাইয়া বলিল, 'তাই তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!'

BanglaBook.org

তখনও অরিন্দম নীরব।

অপরিচিত। কই হে, লাশটা যে দেখতে পাচ্ছি না।

অরিন্দম। কোথায় গেল?

অপ। কী করিয়া বলিব?

অ। তোমার মনের কথাটা কী, ভেঙে বলো দেখি?

অপ। তুমি কী মনে করো?

অ। আমি মনে করি, তুমি একটি ভয়ানক ধড়িবাজ লোক। এর বেশি আর কী মনে করতে পারি? এখন কী মনে করে আমাকে এখানে নিয়ে এলে, প্রকাশ করে বলো দেখি?

অপ। এই যে প্রকাশ করছি।

এই বলিয়া লোকটা একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের দিকে অগ্রসর হইল। অরিন্দম একান্ত ভয়ার্তের ন্যায় কাতরকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া বলিলেন, 'করো কী—করো কী—মেরো না—মেরো না—দোহাই তোমার—দোহাই তোমার!'

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'যদি তুমি আমার কথার ঠিক-ঠিক জবাব দাও আমি তোমায় কিছু বলিব না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'বলো, কী বলিতে হইবে?'

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'সকল কথাই তোমাকে বলিতে হইবে; তুমি কে, তোমার নাম কী, কোথায় থাক, কী করো, কেনই বা আমার পিছু নিয়েছ?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমি আবার কে? দেখছ না, একটি লোক আর কি? নামটা বড় ভালো নয়, কৃতান্তবাবু। থাকি খুনে-লোকের সঙ্গে-সঙ্গে; করিবার মধ্যে তোমাদের মতন বদমায়েশদের ধরিয়া বেড়াই—আর তোমার যে পিছু নিয়েছি, কেবল তোমাকে ধরিবারই জন্য।'

অপ। কেন, আমি কি খুনি?

অ। সে-বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? তা না, হলে এতবড় একখানা ছুরি নিয়ে তুমি দিনরাত ঘুরে বেড়াও।

অপরিচিত ব্যক্তি আবার সেই ছুরি লইয়া অরিন্দমকে মারিতে গেল। অরিন্দম আবার সেইরূপ—যেন কত ভয় পাইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন; অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সেবারও পার পাইলেন। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'এখন বল্, তুই কে, কোথায় থাকিস?'

অরিন্দম বলিলেন, 'বলছি-বলছি—ওই যে অনেক দূরে একটি নারিকেল গাছ দেখছ—তার পরে আরও দূরে একটি তালগাছ—ওই জ্যোৎস্নার আলোকে বেশ দেখা যাচ্ছে।' এই বলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া অরিন্দম অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুত সেখানে তালগাছ কি নারিকেল গাছ—কিছুই ছিল না।

অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে চাহিতে-চাহিতে অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'কই হে, কোথায় তোমার তালগাছ?'

অরিন্দম পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখনই সুবিধা বুঝিয়া আগে তাহার হাত হইতে সেই ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন; সেইসঙ্গে তাহার পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, সে-ধাক্কা তাহাকে আর সামলাইতে হইল না, সশব্দে সেইখানে পড়িয়া গেল। তাহার পর অরিন্দম তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। লোকটি জোর করিতে লাগিল। অরিন্দম তাহার গলাটি বাম হাতে চাপিয়া ধরাতে সে গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। লোকটি একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলে, তাহার গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অরিন্দম বলিলেন, 'কিগো, বড় যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলে? এখন আমি কী করি বলো দেখি, তোমায় ছেড়ে দিই, না তোমার প্রাণটা এইখানকার বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাই?'

BanglaBook.org

অপরিচিত লোকটি কোনও উত্তর করিল না।

অরিন্দম বলিলেন, 'না, তোমার মতো একটি এতবড় কাতলাকে যেকালে ছিপে গেঁথেছি, তখন হঠাৎ তুলে ফেলা হবে না—ভালো করে না খেলিয়ে তুললে হাতের সুখ হবে না।' তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'মনে কোরো না, এখন ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া তুমি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইলে; যখনই মনে করিব, তখনই আবার তোমাকে ধরিব। কোনও একটু আবশ্যক ছিল বলিয়াই তোমাকে এতটা বিরক্ত করিলাম। আবার যখন কোনও আবশ্যক বোধ করিব, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করিব। যাও, এখন কথা না কহিয়া এই সোজা পথটি ধরিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করো; নতুবা তোমার ছুরি তোমারই বুকে বসাইতে কুণ্ঠিত হইব না।'

অপরিচিত ব্যক্তি মাথা হেঁট করিয়া, কথাটিমাত্র না কহিয়া তথা হইতে খুব একটি নিরীহ ভালোমানুষের মতো ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ছদ্মবেশ

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর অরিন্দম বৃদ্ধবেশে যদুনাথ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণে অরিন্দমের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এমনকী তিনি যখন যে কোনও প্রকার ছদ্মবেশে বাহির হইতেন, কোনও পরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না; অনেক সময়ে পুলিশের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রবাবুও ভ্রমে পড়িতেন। অরিন্দমের বয়স পঞ্চাশের নিকটবর্তী। অনেকরকমের ছদ্মবেশ ধরিতে হয় বলিয়া, তিনি প্রত্যহ প্রাতে নিজ হস্তে নিজ শ্মশ্রুগুম্ফের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকেন। যদুনাথ গোস্বামীর সহিত অরিন্দমের সহজেই দেখা হইল। তখন যদুনাথ গোস্বামী আহারাদি শেষে বাহিরের ঘরে বসিয়া তাম্বুল-চর্বণ ও ধূমপানে রত ছিলেন। অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে সম্মুখীন দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

ছদ্মবেশী অরিন্দম বলিলেন, 'মশাই; বলতে পারেন, এখানে যদুনাথ গোস্বামী কোথায় থাকেন?'

যদুনাথ বলিলেন, 'আমারই নাম। কী আবশ্যক বলুন দেখি? কোথা হতে আপনি আসছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'অনেকদূর হতে আসছি, আপনারই এক শিষ্যের বাড়ি হতে। উঃ! বড় গরম, কী রোদ দেখছেন! উঃ! বড় সুখবর, তিনি শিব-প্রতিষ্ঠা করবেন, বড়লোক একেবারে বাঞ্ছাকল্পতরু হবেন; বিশেষত আপনি তাঁর গুরু, আপনার পাথরে পাঁচ কীল! উঃ! কী গরম—প্রাণ যে যায়!'

যদুনাথ অপেক্ষাকৃত আকৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'কে তিনি? আমার তো সকল শিষ্যই বড়লোক।'

অরিন্দম কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে বলিলেন, 'বলছি—বড় গরম। উঃ। একটু জল; পিপাসায় বুক থেকে গলাটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে।'—ঘরটির দুইটি দ্বার, একটি বাহিরের দিকে, অপরটি ভিতরের দিকে। শেষোক্ত দ্বার দিয়া যদুনাথ গোস্বামী জল আনিতে বাড়ির ভিতরে গেলেন। সেইদিকে আরও একটি গবাক্ষ ছিল; অরিন্দম দেখিলেন, সেই গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণমুখে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী—যাহাকে পূর্বদিন একবার বাটির পশ্চাদ্ভাগের গবাক্ষে এক মুহূর্তের জন্য দেখিয়া ছিলেন। অরিন্দমকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সেই ভুবনমোহিনী মূর্তি আর তথায় দাঁড়াইল না।

কিয়ৎপরে যদুনাথ গোস্বামী জল লইয়া আসিলেন। অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম এক

BanglaBook.org

নিশ্বাসে যতটুকু পারিলেন, পান করিলেন।

যদুনাথ গোস্বামী সেইরূপ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার নিকট হইতে আপনি আসিতেছেন?'

অরিন্দম হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, 'বলছি হে, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। উঃ! বড় কষ্ট হচ্ছে। উঃ! সমস্ত শরীরটা কেমন করছে; মাথাটা যেন ঘুরছে, চোখে এমন ঝাপসা দেখছি কেন? সর্দিগর্মির লক্ষণ নয় তো? পাখা! পাখা নাই? একি হল! প্রাণটা যেন বের হবার জন্য আইঢাই করছে; বড় ভালো বুঝছি না, গোঁসাই ঠাকুর। জল, জল—আবার জল! বড় পিপাসা—উঃ! গেলেম যে!' বলিতে-বলিতে অরিন্দম সেইখানে শুইয়া পড়িলেন; মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। এবং এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন—উঠিতে-পড়িতে লাগিলেন—শেষে নিঃসংজ্ঞ—মৃতবৎ। ব্যাপার দেখিয়া যদুনাথের ভয় হইল, ভয়ে মুখ শুকাইল এবং কী করিবেন ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চিৎকার করিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী আসিলে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে বলিয়া নিজে কবিরাজের বাড়িতে ছুটিলেন। কবিরাজের বাড়ি নিকটে নহে।

সহসা একি বিপদ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : শুশ্রূষা

অরিন্দম তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন। যে-উদ্দেশ্যে তিনি ভান করিয়া মৃতবৎ মাটিতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাহা সহজেই সফল করিতে পারিবেন বলিয়া আশা হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে আবার জল চাহিলেন। ব্রাহ্মণী জল আনিতে উঠিলে অরিন্দম কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'আপনি বসুন, যেমন বাতাস করিতেছেন, করুন। আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। মা! আপনি আমার আর-জন্মের মা ছিলেন। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করলেন।'

স্ত্রীলোকের মন নরম কথায় সহজে ভিজে। কাজেই ব্রাহ্মণী সেইখানে বসিয়া আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে আবার কিছুক্ষণ কাটিল। অরিন্দম আবার জল চাহিলেন। এইবার ব্রাহ্মণী আর একজনকে ডাকিয়া, তাহার হাতে পাখা দিয়া, বাতাস করিতে বলিয়া নিজে জল আনিতে গেলেন।

যে এখন পাখা লইয়া বসিল, অরিন্দম দেখিলেন, এ সেই অপরূপ—রূপলাবণ্যময়ী। দেখিয়া চিনিলেন; তিনি দুইবার ইহাকে বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'গোঁসাই মহাশয় তোমার কে হন?'

সে কোনও উত্তর করিল না; পূর্ববৎ বাতাস করিতে লাগিল।

অরিন্দম পূর্ববৎ মৃদুস্বরে নিজেই সে-প্রশ্নের উত্তর করিলেন, 'বোধহয় কেহই না; বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই তোমার কেহ নহেন। আমি তোমার বিষয় কিছু-কিছু জানি।'

শুনিয়া ব্যজনকারিণী সুন্দরীর ভয় হইল। সে পাখা ফেলিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'ভয় নাই—আমি তোমার শত্রু নই, আমার কাছে কোনও কথা গোপন করিয়ো না। তোমার উপরে আবার এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শীঘ্রই তুমি এমন বিপদে পড়িবে যে, তাহা হইতে তখন উদ্ধারের আশামাত্র থাকিবে না।'

ব্যজনকারিণী কী করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া আবার বসিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি গোরাচাঁদ বলিয়া কাহাকেও চেনো কি? আমার কাছে লুকাইয়ো না।'

গোরাচাঁদের নাম শুনিয়া সেই নবীনার মুখ শুকাইল; আবার সে উঠিয়া যাইবার উপক্রম

BanglaBook.org

করিল। অরিন্দম বলিলেন, 'বসো, আমার দ্বারা তোমার উপকার ভিন্ন কোনও অপকার হইবে না, নিশ্চয় জানিয়ো। আমার কাছে লুকাইয়ো না—তাহা হইলে তুমি ভালো কাজ করিবে না। আমাকে বিশ্বাস করো। গোরাচাঁদকে তুমি চেনো কি?'

নবীনা বলিল, 'চিনি।'

অরিন্দম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশবচন্দ্র নামে কোনও জমিদারকে চেনো?'

নবীনার শুষ্ক মুখ আরও শুকাইল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, 'হ্যাঁ চিনি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি শীঘ্রই আবার তাহাদিগের হাতে পড়িবে। তোমার গোস্বামী এই ষড়যন্ত্রে আছেন। গোরাচাঁদ নামে লোকটা কাল সন্ধ্যার পর এখানে এসে গোঁসাই মহাশয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে গেছে; আজ রাত্রেই তোমাকে আবার তাহাদিগের হাতে পড়িতে হইবে। এই পত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।' একখানি পত্র বাহির করিয়া নবীনার হাতে দিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

'মহাশয়,

যদিও আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, কিন্তু গোরাচাঁদের মুখে আপনার সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি। শুনিলাম, রেবতীর কাকা গোপালচন্দ্র বসু আপনার হস্তে রেবতীকে সমর্পণ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। রেবতীর নাকি এ-বিবাহে মত নাই, সেইজন্য তিনি এই শুভ-বিবাহ যাহাতে গোপনে সম্পন্ন হয়, সেজন্য রেবতীকে আপনার বাগান-বাটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথা হইতে আপনার অসাক্ষাতে রেবতী পলাইয়া আসিয়াছে। বেশি বয়স অবধি মেয়েদের অবিবাহিত রাখাই এইসকল গোলযোগের একমাত্র কারণ। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে মেয়েদের যত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পারো, ততই মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ আছে। বেশি বয়স হইলে মেয়েরা নিজে-নিজে পছন্দ করতে শিখে, পাত্রাপাত্র বুঝে না। আপনার সম্বন্ধে রেবতী আমাকে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, আমি সে-সকল বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যাহা হউক, যাহাতে এ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে আমিও ইচ্ছুক। আর গোরাচাঁদের মুখে আপনার যেরূপ বিষয়-ঐশ্বর্যের কথা শুনিলাম, তাহাতে রেবতীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। রেবতী এখন আমার কাছে আছে, গোরাচাঁদ আড়াইশত টাকা দিয়া রেবতীকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এ-সকল বিবাহের কাজে তো গুরু-বরণ ইত্যাদিতে দুই-চারিশত টাকা আমার পাইবারই কথা, তা ছাড়া আমি যে রেবতীকে সন্ধান করিয়া ধরিয়া রাখিলাম, তাহার জন্য আপনার মতো জমিদারের নিকটে কি আর কিছু আশা করিতে পারি না? আপনি পত্র-প্রাপ্তে পাঁচশত টাকা গোরাচাঁদের হাতে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহার সহিত তখনই রেবতীকে পাঠাইয়া দিব। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীযদুনাথ শর্মা'

BanglaBook.org

পাঠক মহাশয়কে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে, এই রেবতীই জীবন পালের বাগান হইতে মোহিনীর সহায়তায় দুর্বৃত্ত কেশবচন্দ্রের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, সেইদিন রাত্রে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া গোঁসাইপাড়ার পথ জানিতে বলাই মণ্ডলের দোকানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহারই

রক্তাক্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া পরদিন গ্রামমধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। যে-ব্যক্তি সেইদিন রাত্রেই রেবতী চলিয়া আসিলে অল্পক্ষণ পরেই বলাই মণ্ডলের দোকানে গিয়া বালিকার সন্ধান করিয়াছিল এবং পরদিন রাত্রে অরিন্দমকে জনমানবশূন্য প্রান্তরের মধ্যে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল সে সেই কেশবচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচর—সেই গোরাচাঁদ ব্যতীত আর কেহই নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ রেবতীর সন্দেহ

পত্র পড়িয়া রেবতীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া যেন সমস্ত শোণিত হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুভারে বুকটা বড় ভারী করিয়া তুলিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'আমি যে কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'যদুনাথ গোস্বামীর হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই বিশ্বাস করিতে পারিবে।'

রে। আমি তাঁহার হস্তাক্ষর জানি।

অ। এ কি তাঁহার হাতের লেখা নয়?

রে। তাঁহারই হাতের লেখা, এই সইও তাঁহার। গোঁসাই-ঠাকুর আমাদের গুরু হন, আবশ্যকমতো আমাদের বাড়িতে পত্রাদি পাঠাইতেন, তাহাতেই আমি তাঁহার হাতের লেখা ও সই অনেকবার দেখিয়াছি। দেখিলেই বেশ চিনিতে পারি। আপনি এ-পত্র কোথায় পাইলেন?

অ। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারো, কোনও কথা গোপন করিয়ো না। তুমি কে, কোথায় তোমার বাড়ি, পিতার নাম কী, এই কেশববাবু কে, গোরাচাঁদ কে, তোমার অবস্থান্তরের কারণ কী, তুমি যাহা জানো, সমস্তই অকপটে আমাকে বলো, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।

রেবতী পুনরপি বলিল, 'আপনি এ-পত্রখানা কোথায় পাইলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'কাল রাত্রে গোঁসাই-ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করিয়া যখন পত্রখানি লইয়া গোরাচাঁদ বাহির হয়, তখন আমি এই পত্রখানি হস্তগত করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করি। পথে দুই-একটি কথায় তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তোমার কথা তুলি, তোমার মৃতদেহ দেখাইবে বলিয়া, সে আমাকে একটি নির্জন প্রান্তরে লইয়া গিয়া, হত্যা করিবে মনে করিয়া আমাকে তার সঙ্গে যাইতে বলে। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার সঙ্গে যাই। সেখানে সেই নির্জনে আমাকে একা পাইয়া সে যেমন আমাকে ছুরি মারিতে আসে আমি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসি; সেই সময়েই আমি তাহার অজ্ঞাতসারে এই পত্রখানি হস্তগত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।'

রেবতী সন্দিগ্ধমনে বলিলেন, 'বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার মনের অভিপ্রায় কী? কেনই বা আপনি এইসকল ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন?'

অ। আমি একজন পুলিশ-কর্মচারী। তোমার বিপদের কথা আমি অনুমানে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যে সঙ্কল্প করিয়া আমি এ-কাজে হাত দিয়াছি, তোমাকে এই উপস্থিত বিপদের মুখ হইতে দূরে রাখিতে পারিলে, তাহা অনেকটা সফল হইবে।

রেবতীর মনের অবস্থা তখন কীরূপ, তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। অবিশ্বাস এবং সংশয়, ভয় এবং বিস্ময়, উৎকণ্ঠা এবং হতাশা এবং ঘোরতর সন্দেহ এইসকল একত্রে মিলিয়া তাহার দুর্বল হৃদয়কে মথিত করিতেছিল। রেবতী অস্থিরচিত্তে বলিল, 'আপনি যদি পুলিশ-কর্মচারী তবে গোরাচাঁদকে ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলেন কেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, যখনই মনে করিব, তখনই আবার তাহাকে

BanglaBook.org

ধরিব; তাহার মুখখানি যখন একবার চিনিয়া লইতে পারিয়াছি সে তখন ধরা পড়াই আছে। শীঘ্র-শীঘ্র একটি লোককে গ্রেপ্তার করা আমার অভ্যাস নহে। তাহাতে শীঘ্র পাপী ধৃত হয় বটে, শীঘ্র বিচারে তাহার যাহা হয়, একটা দণ্ডও হয়; সে দণ্ড অনেক স্থলে কোথাও লঘু পাপে গুরু—কোথাও গুরু পাপে লঘু। যাহাকে বন্দি করিয়া বিচারালয়ে দিতে হইবে, তাহার যাহা কিছু জানিবার সমস্তটুকু যতক্ষণ না জানিতে পারি; নিজের পাপের কথা, নিজের স্বভাব-চরিত্রের কথা সে যেমন নিজে জানে, আমিও সেইসকল ঠিক তাহারই মতন যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, ততক্ষণ তাহাকে আমি গ্রেপ্তার করি না। বুঝিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া, তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। এখনও বলিতেছি, ইহাতে তোমার ভালো হইবে না। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারো, কোনও কথা আমার কাছে গোপন করিয়ো না—তুমি কে, তোমাদের বাড়ি কোথায়, তোমার পিতার নাম কী, তোমার এই দুরবস্থার কারণই বা কী, এ-সকল তুমি যাহা জানো, সমস্ত আমাকে অকপটে বলো; আমি বার-বার বলিতেছি, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ রেবতীর আত্মকাহিনী

রেবতী বলিতে লাগিল, 'আমাদের বাড়ি বেণীমাধপুর; আমার পিতার নাম জানকীনাথ বসু। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর পূর্বে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। আমার আর একটি বোন আছে, তাহার নাম রোহিণী; আমরা দুই বোনে কাকার নিকটে থাকিতাম। কাকার নাম গোপালচন্দ্র বসু। কাকাবাবুর অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। শুনিয়াছি, তিনি একবার বাবার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া নিজের বিষয়ের সমস্ত অংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। তখন বাবা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের জমিদারি হইতে চারি আনা অংশ দান করেন। তখন থেকে বাবার সঙ্গে কাকাবাবুর যে মনোমালিন্য ছিল, তাহা ঘুচিয়া যায়। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আজ দুই বৎসরকাল কাকাবাবু সমস্ত জমিদারির কাজকর্ম নিজেই দেখিয়া আসিতেছেন। সন্তানাদি না থাকায় কাকা আর কাকিমা আমাদিগকে মাতাপিতার অধিক স্নেহ করেন। না জানি, আমার জন্য কাকামহাশয় কী কাণ্ডই না করিতেছেন! আপনি আমাকে কোনওরকমে কাকাবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার করিবেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সে-কথা পরে হইবে—এখন তোমার এ-দুরবস্থার কারণ কী বলো দেখি, যদি আমি কোনও প্রতিকার করিতে পারি।'

রেবতী বলিতে লাগিল, 'ইদানীং কেশবচন্দ্র নামে একটি লোক কাকাবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা-সাক্ষাৎ করিত। আগে তাহাকে কখনও দেখি নাই। লোকটা বড় মিষ্টভাষী; কাকাবাবুর সঙ্গে তাহার এমন ঘনিষ্ঠতা হইল যে, কোনওদিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে কাকাবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আসিলে কখনও বা তাহার সঙ্গে গল্প করিতেন, কখনও বা দাবা খেলিতেন, কখনও বা বেড়াইতে বাহির হইতেন। যদি কোনওদিন কেশবচন্দ্র না আসিত, সেদিন কাকাবাবুকে বড়ই বিমর্ষ থাকিতে দেখিতাম। কেশবচন্দ্রও আমাদিগকে কাকাবাবুর মতো স্নেহ দেখাইত; কিন্তু সে মানুষ নয়, পিশাচ—তাহার মনের ভাব অন্য রকমের। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল, কী জানি কী ঔষধের সাহায্যে আমাকে অজ্ঞান করিয়া চুরি করিয়া লইয়া আসে। যখন আমার প্রথম জ্ঞান হইল, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল; সমস্ত শরীরটা যেন কেমন একরকম অবশ হইয়া গিয়াছিল, এমনকী ভালো করিয়া চোখ চাহিতেও যেন কষ্টবোধ হইতেছিল। দেখিলাম, আমি নৌকার উপরে রহিয়াছি। নৌকাখানা গঙ্গার

BanglaBook.org

একদিককার কিনারায় লাগানো রহিয়াছে। সে-দিকটা ভয়ানক বন, তেমন বন কখনও আমি দেখি নাই। নৌকার উপর কেশবচন্দ্র, আর চারি-পাঁচজন দাঁড়ি-মাঝি, তাহারা তামাক খাইতেছে, আর কী বলাবলি করিতেছে। তখন যেন আমার সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথাটা আরও ভারী হইয়া উঠিল। তীরে একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গোরাচাঁদ। তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। সে বলিল, "ইহাকে লইয়া যাইব কি? ইহার যে জ্ঞান হইয়াছে, দেখিতেছি।" তাহার কর্কশকণ্ঠ আমার অবশ কর্ণে আরও কর্কশ শুনাইল; আমার বড় ভয় হইল—বিশেষত তাহার দস্যুর মতো বিকট চেহারা দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না, বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাঁদিতে গিয়া বুকে বড় ব্যথা লাগিল; কাঁদিতে পারিলাম না। তখন কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার নাকের কাছে একখানা রুমাল চাপিয়া ধরিল, মাথায় যেন বজ্র আসিয়া পড়িল; আবার আমি অজ্ঞান হইলাম। তাহার পর আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, সে গঙ্গা নাই, সে বন নাই, নৌকা নাই, দাঁড়ি-মাঝি কেহ নাই। আমি একটা নিবিড় বনের মাঝখানে, দুর্গন্ধ আবর্জনাপূর্ণ একটা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ; বাহির হইবার আর কোনও উপায় নাই। তাহার পর কেশবচন্দ্র প্রত্যহ এক-একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য যে সে এই কাজ করিয়াছে, একদিন তাহা প্রকাশ করিল। আমি কিছুতেই সে-পাপিষ্ঠের কথায় সম্মত হইতে পারিলাম না। সেজন্য আমাকে পিশাচ কত ভয় দেখাইত, কখনও বা ছুরি লইয়া কাটিতে আসিত—আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলাম না—কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তেমন পাপিষ্ঠের স্ত্রী হইয়া আজন্ম মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা তাহার শাণিত ছুরির মুখে মুহূর্তের মৃত্যু শ্রেয় বোধ করিলাম। গোরাচাঁদের উপরে আমার রক্ষার ভার ছিল; সে সেই নরপ্রেতের বিশ্বস্ত অনুচর। শেষে একটা স্ত্রীলোক আমাকে উদ্ধার করে। শুনিলাম, সে কেশবচন্দ্রের স্ত্রী; সে-ই আমাকে এখানে আসিবার পথ দেখাইয়া দেয়। একটা বড় প্রান্তর পার হইয়া আমি এই গ্রামে আসি, তখন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। এখানকার গোঁসাইপাড়ায় আমাদিগের গুরু যদুনাথ গোস্বামীর নিকটে যাইব মনে করিয়া এখানকার একটি মুদির দোকানে গোঁসাইপাড়ার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লই। সেখানে আরও অনেক লোক বসিয়া তাস খেলিতেছিল, তাহারা আমায় একটা দিঘির ধার দিয়া যাইতে বলিল। আমি আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন দিঘির ধার দিয়া যাইতেছি, তখন পশ্চাদ্দিকে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আগে বন ছাড়িয়া যখন প্রান্তরে পড়ি, তখন একবার গোরাচাঁদকে পথে আমার অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি ভয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়ি, সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, সে আর একদিকে চলিয়া গেল। আমি প্রান্তরের মাঝখান দিয়া সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া এই গ্রামে আসিয়া পড়িলাম; দিঘির ধারে আসিয়া যে পদশব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা তখন গোরাচাঁদের বলিয়াই আমার বোধ হওয়ায় আরও ভয় হইল। আমি আবার প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম; এমনসময়ে আমার আঁচলখানায় টান পড়িল; আবার গোরাচাঁদের হাতে পড়িলাম ভাবিয়া, আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; মাটিতে পড়িয়া গেলাম; এমনসময়ে কে আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল। বিদ্যুতের আলোকে তাঁহাকে চিনিলাম, তিনিই যদুনাথ গোস্বামী, ভরসা হইল। দেখিলাম, কেহই আমার আঁচল ধরে নাই, একটা কাঁটাগাছে আঁচলখানা জড়াইয়া গিয়াছিল; যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহা গোস্বামী মহাশয়েরই। পড়িয়া গিয়া কপালের একস্থানে কাটিয়া গিয়াছিল। ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, দুই-তিনদিনের জন্য আমাকে তাঁহার কাছে লুকাইয়া রাখিবার জন্য অনুনয় করিলাম।

তিনি সম্মত হইয়া আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার নিকটে শুনিলাম, তিনি গোঁসাইপাড়ায় আজকাল থাকেন না; সে-বাড়ি তাঁহার ভগিনীকে থাকিতে দিয়া নিজে এখন এইখানে থাকেন। আমাকে এইখানে লইয়া আসিলেন। যাহাতে আর কেহ আমার সন্ধান করিতে না পারে, যাহাতে আমাকে খুন করিয়াছে বলিয়া লোকের মনে একটা ধারণা হয়, সেইজন্য আমার রক্তমাখা কাপড়, একখানা বড় ছুরি, আর দুই-তিনটা মাথার কাঁটা লইয়া গোস্বামী মহাশয়, যেখানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সেইখানের একটা জঙ্গলে রাখিয়া আসিলেন। শুনিলাম, ফিরিয়া আসিবার সময়ে এখানকার দুই-একজন লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল; তাহারাও নাকি আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। যাই হোক, গোস্বামী মহাশয় যে আমাকে সামান্য টাকার লোভে আবার সেই বিপদের মুখে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, ইহা ভাবিতেও কষ্টবোধ হয়। যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন উনি তাঁহার নিকটে কত বিষয়ে কত টাকা পাইয়াছেন, সে-সকল কি একবারও এখন মনে পড়িল না! এ-সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।' বলিতে-বলিতে রেবতীর ফুল্লেন্দীবরতুল্য সেই বড়-বড় চক্ষু দুইটি সজল হইল, হিমনিষিক্তপদ্মবৎ সে চক্ষু দুইটি পরম শোভাময়, দুইটি চক্ষে দুইটি বড়-বড় অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল; আবার ভাবনার অপার সমুদ্রে পড়িয়া রেবতী আকুল হইয়া উঠিল। রেবতী আর কথা কহিতে পারিল না, রেবতীর বুক কাঁপিতে লাগিল; রেবতী চোখে দেখিতে পাইল না, রেবতী নীরবে সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রেবতীর কথা শুনিয়া অরিন্দম নিজের সন্দেহের সহিত অনেকগুলি বিষয় মিলাইয়া পাইলেন। যেখানে রেবতীর রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি পড়িয়াছিল, সেই জঙ্গলমধ্যে যদুনাথের দুইবার যাতায়াতের পদচিহ্ন পড়িবার কারণও বুঝিলেন। একবার সেই রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি রাখিতে গিয়াছিলেন, আর একবার বলাই মণ্ডল ও তাহার সঙ্গিগণকে সেই সকল দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অরিন্দম রেবতীকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে আর কোনও কথা তুমি জানো?'

রেবতী চোখ মুছিয়া বলিল, 'না, আপনি এখন দয়া করিয়া এ-বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আবার যদি সেই পাপিষ্ঠের হাতে পড়ি, তাহা হইলে আর বাঁচিব না। আপনি আমার কাকার কাছে আমায় রাখিয়া আসুন।'

অরিন্দম সে-কথায় কোনও কথা না কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত বয়সেও তোমার বিবাহ হয় নাই কেন? এখন বোধকরি, তোমার বয়স পনেরো বৎসরের কম নহে।'

রেবতী লজ্জিতভাবে বলিল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকিলে এতদিন তিনি আমার বিবাহ দিতেন। যখন আমার বয়স বারো বৎসর, তখন বাবা কলিকাতা শহরের দক্ষিণে ভবানীপুরে আমার বিবাহ দিবার জন্য ঠিকঠাক করিয়াছিলেন। তাহার পর হঠাৎ তাঁহার শরীর ভাঙিতে আরম্ভ হয়। কী এক উৎকট পীড়ায় হঠাৎ তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন; কোনও ডাক্তার কি কবিরাজ, কেহই সে রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাবা প্রায় ছয়মাসকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া ক্রমে আরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কী রোগ কেহ ঠিক করিতে পারিল না; কাজেই চিকিৎসাও তেমন হইল না। বাবা অসময়ে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন।'

অ। তোমার কাকাবাবু তোমার বিবাহে এতদিন উদাসীন ছিলেন কেন?

রে। তিনি জমিদারি কাজকর্মে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এমনকী স্নানাহারেরও সময় পাইতেন না।

অ। এই বলিলে তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সর্বদা গল্প করিতেন, দাবা খেলিতেন, তাস

BanglaBook.org

পিটিতেন, বেড়াইতে বাহির হইতেন; তোমার উপরে তাঁহার যেরূপ স্নেহ—তোমার মুখে শুনিলাম—তাহাতে তিনি তোমার বিবাহের কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া তাস, দাবা, গল্প, বেড়ানো দূরে থাক, তিনি যে কেমন করিয়া স্নানাহার করিতেন, বুঝিতে পারিলাম না। বোধহয়, কাকাবাবু, তোমায় এত অধিক পরিমাণে স্নেহ করিতেন, তিনি তোমাকে বিবাহ দিয়া, পরের ঘরে পাঠাইয়া, কেমন করিয়া প্রাণ ধরিবেন, সে-বিষয়ে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল।

রেবতী তাঁহার এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিল না। অরিন্দম তখন রেবতীকে যাহা-যাহা করিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন এবং এই চতুর্দিকব্যাপী বিপদের মুখ হইতে তাহাকে যে কৌশলে উদ্ধার করিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। আরও অনেকক্ষণ ওই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল, তাহাতে রেবতী অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল। রেবতীর চক্ষু হইতে যেন আরও একটা আবরণ সরিয়া গেল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ সাফল্য

বৃদ্ধকে তৃষ্ণাতুর মৃতপ্রায় দেখিয়া ব্রাহ্মণী সেই যে জল আনিতে গেলেন এখনও ফিরিলেন না—কারণ? ব্রাহ্মণী যখন জল লইয়া আসিলেন, তখন রেবতী ও অরিন্দমকে পরস্পর কথোপকথন করিতে শুনিয়া ঘরের ভিতরে আর ঢুকিলেন না; জলের ঘটি হাতে, বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের কথাবার্তা একান্ত নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে লাগিলেন, আর জলপূর্ণ ঘটিটি তাঁহার হাতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় বাড়িতে নাই, তিনি একাকী কী করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। স্ত্রীলোকের মন বড় কৌতূহলপ্রিয়। কুতূহলী মন বলিল, 'আগে শোনা যাক, তাহার পর যাহা করিতে হয়, করা যাইবে; তার আগে যদি তিনি আসিয়া পড়েন, তিনিই যাহা হয় করিবেন। এখন শুনিই না—কী কথা হয়।' ব্রাহ্মণী একমনে শুনিতে লাগিলেন। কতক শুনিতে পাইলেন, কতক বা না ; আবার যাহা শুনিলেন, তাহার কতক বা বুঝিতে পারিলেন, কতক বা না।

তাহার পর যখন অতি মৃদুস্বরে তাঁহাদিগের পরামর্শ চলিতে লাগিল, যাহা আমরাও এখন জানিতে পারি নাই, তখন ব্রাহ্মণীর কানে আর কিছুই আসিল না। কেবল জানালার ফাঁক দিয়া ব্রাহ্মণীর আগ্রহপূর্ণ চক্ষু এই সময়ে ক্ষণে-ক্ষণে রেবতীর মুখের রকম-রকম-ভাব দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সকল বিষয়ে তাঁহার মন এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাতের জলের ঘটির কথা কিছুই মনে ছিল না, কাঁপিতে-কাঁপিতে সেটি হাত হইতে সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন অরিন্দম প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়াছেন; যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, 'আর জল খাইব না।'

অনতিবিলম্বে যদুনাথ গোস্বামী কবিরাজ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কতক বা ঠিক, কতক বা বেঠিক অনেক কথা শুনাইলেন। শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কবিরাজ ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। তখন গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রেবতীকে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, কে সে? কেন আসিয়াছিল? কোথায় থাকে? কী বলিয়া গেল? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

রেবতী একটি কথারও উত্তর করিল না।

সেইদিন অপরাহ্ণে আর এক কাণ্ড ঘটিল। রেবতীর মাতামহ (?) পুলিশ-প্রহরী সঙ্গে লইয়া রেবতীকে লইতে যদুনাথ গোস্বামীর বাটিতে উপস্থিত। রেবতী সেখানে আছে কি না, যদুনাথ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্বীকার করিবেন, কি অস্বীকার করিবেন, তাহা

BanglaBook.org

ভাবিয়া দেখিবার পূর্বেই রেবতী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সে তাহার বৃদ্ধ মাতামহকে চিনিল। তখনই পালকি ডাকাইয়া রেবতীকে তন্মধ্যে উঠাইয়া লওয়া হইল। অরিন্দম ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অরিন্দম যদুনাথ গোস্বামীকে বলিলেন, 'কী গোস্বামী মহাশয়, পাঁচশত টাকা যে একেবারে ফাঁক হইয়া গেল। যাহা হউক, রক্তমাখা কাপড়ের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যে মর্চেধরা ছুরিখানা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যখন অবসর হইবে, সেখানা থানায় গিয়া লইয়া আসিবেন; অনর্থক আর কেন ঘর থেকে ছুরিখানা লোকসান দিবেন?'

গোস্বামী মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি একান্ত ভালোমানুষ, একটা খুব খেলাই খেলিলেন!'

ঠাকুর মহাশয় তথাপি কোনও উত্তর করিলেন না।

সকলে চলিয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কিসে কী ঘটিয়া গেল, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

শোণিত-প্রবাহ

Moresco. Perished ?

Alh. He had perished ;
Sleep on, poor babes ; not one of you doth know
That he is fatherless—a desolate orphan ;
Why should he make them ? can an infant's arm
Revenge his murder ?

One Moresco. (to another) Did she say his murder ?

Nao. Murder ? Not murdered !

COLERIDGE
"Remorse"
Act IV. Scene III

BanglaBook.org

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুলসম

অরিন্দম নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যে-হত্যাকারী সেই বালিকার লাশ সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া, থানায় পাঠাইয়া একটা অতি বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, যতক্ষণ না তাহাকে কোনওরকমে ধরিতে পারিতেছেন, তিনি কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবেন না। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যত ঘটনা ঘটিতেছে, সকলের সঙ্গে সকলের যেন কিছু-না-কিছু সংস্রব আছে। সকলেই যেন এক শৃঙ্খলে গ্রথিত; তথাপি তিনি সেই সকলের মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িলেন যে, কিছুকালের জন্য তিনি কোনও উপায় অবধারণে সমর্থ হইলেন না। যেখানে সন্দেহের একটু ছায়াপাত দেখিতেন, সেইখানেই যাইতেন, যতদূর সম্ভব সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেন; কিন্তু কাজে এ-পর্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অরিন্দমের ন্যায় একজন নামজাদা ডিটেকটিভের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কলঙ্কের কথা।

একদিন অপরাহ্ণে তিনি দূর লোকনাথপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বাটি ফিরিতেছেন। প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার আহারাদি হয় নাই। লোকনাথপুর তাঁহার বাসা-বাটি হইতে কিছু-কম এক ক্রোশ—বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। তখন পশ্চিম গগনে থাকিয়া কতকগুলি তরল নির্গলিতাম্বুগর্ভ শ্বেতাম্বুখণ্ড অস্তগত-প্রায় রবির স্বর্ণোজ্জ্বলকিরণ-রঞ্জিত সৌধ বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহারই কোমলোজ্জ্বলচ্ছায়া বীচি-চঞ্চলবক্ষে ধরিয়া লোকনাথপুরের আম-জাম-নারিকেলবৃক্ষপরিবৃত স্বনামখ্যাত বিমলী * সরোবর। এ-সকল ফেলিয়া চাহিয়া দেখিতে হয়, এমন এক অপূর্ব শোভাময় তখন ওই সরোবরের পশ্চিমঘাটে বিকশিত ছিল, যেখানে অনেকগুলি সৌন্দর্যসমুজ্জ্বলা স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী নবীনা, কেহ আকণ্ঠনিমজ্জিত, উপরে অতি সুন্দর মুখখানি, সদ্যপ্রোদ্ভিন্নপদ্মবৎ, তাহারই উপরে একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। কেহ ডুবিয়াছে—কালো জলে তাহার রাশীকৃত কালো কেশগুলির উপরে তরঙ্গে-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে—সেখানে একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। যেখানে কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ ঢেউ দিতেছে এবং কেহ জল ছিটাইতেছে, সেখানে সেই অতি সুন্দর হেমাভকিরণ খণ্ড-খণ্ড, চঞ্চল—তথাপি অতি সুন্দর।

যখন সকলে যে-যাহার কাজ সারিয়া, একে-একে উঠিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তখন সেই পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, সকলেই চলিয়া গেল, একজন গেল না; সে বসিয়া রহিল। তাহার রূপে সেখানটা আলো করিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার সে-রূপের বর্ণনা হয় না। বুঝি, সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরীই বিধাতার একমাত্র চরমোৎকৃষ্ট শিল্পচাতুর্য। এত অল্প বয়সে সর্বাঙ্গে এমন পরিণত ভাব বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কী সেই স্নেহপ্রফুল্ল মুখখানি! কী সেই বিশালায়ত, ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, সেই চোখে পীযূষনিস্যন্দিনী দৃষ্টি! যেমন আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, তেমনি আকর্ণবিশ্রান্ত চিত্ররেখাবৎভ্রূযুগল, তেমনি চূর্ণকুন্তলাবৃত অর্ধপ্রকাশিত ললাট; তেমনি সেই সুগঠিত নাসিকা, তেমনি অধর নির্মল, স্ফুরিত, রক্তাভ; ললিত, নির্মল, আরক্ত সে-কপোলদুটির কমনীয়তা চোখে না দেখিলে লিখিয়া কি বুঝানো যায়। সে চিবুক দেখিয়া কে না বলিবে, যাহা কখনও দেখি নাই তাহা দেখিলাম? এ যে পুষ্পপরাগসমাচ্ছন্ন নবমীর সমষ্টি! সংসর্পী, দীর্ঘ অথচ কুঞ্চিত, রাশীকৃত সিক্ত কৃষ্ণকেশদাম গুচ্ছে-গুচ্ছে কটক বা পৃষ্ঠে, কতক বা ঈষদুন্নত বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই শশাঙ্করশ্মিরুচির বর্ণবিভার নিকটে গোধূলির

BanglaBook.org

---

*এইরূপ প্রবাদ, বিমলা নাম্নী কোনও বৃদ্ধা ওই পুষ্করিণীর তটে একখানি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া আমরণ বাস করিয়াছিল; সেইজন্য উহার এইরূপ অপূর্ব নামকরণ। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সে বিমলা ছিল না এবং তাহার পর্ণকুটীরের কোনও চিহ্ন ছিল না। এখন সেই পুষ্করিণীরও চিহ্নমাত্র নাই।

উজ্জ্বলতম কাঞ্চনঘটাও ম্রিয়মাণ বোধ হইতেছিল। পাঠক! আপনি কি ভাদ্রের ভরা নদী কখনও দেখেন নাই? যদি দেখিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, এই বরবপুতে কেমন সে অলোকসামান্য সৌন্দর্যরাশি সেইরূপ কূলে-কূলে উছলিতেছিল—অথচ সীমাতিক্রম করে নাই। সর্বাঙ্গ পূর্ণায়ত, পরিপুষ্ট, প্রসৃত, সেই সর্বাঙ্গ বহিয়া অপরূপ রূপরাশি উচ্ছ্বসিত। সেই নির্জনতার মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, গোধূলির করকরাগের মধ্যে; মৃদুমন্দ স্নিগ্ধসমীরণের মধ্যে, দিগ্‌দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত ফুলগন্ধ মধ্যে থাকিয়া ঘাটের শৈবালাচ্ছন্ন প্রস্তর চাতালে বসিয়া সেই বনদেবীমূর্তি চিত্রার্পিতপ্রায় ও নীরব।

যখন সেই সুন্দরী দেখিল, সেখানে সে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন উঠিয়া তাড়াতাড়ি জলে নামিল এবং অধিক জলে গিয়া ডুবিল। অনেকক্ষণ গেল তথাপি উঠিল না। অরিন্দম দূরে থাকিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বড় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই সরোবরের পূর্ব-পশ্চিম কোণে বটবৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন; মনে কেমন একটা সন্দেহ হওয়াতে তিনি সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি সেই লোকললামভূতা সুন্দরী উঠিল না; অরিন্দম চিন্তিত হইলেন, এত অধিকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকা মনুষ্যমাত্রেরই অসাধ্য। তিনি দেখিলেন, যেখানে সে ডুবিয়াছিল, তাহার আরও অনেকটা দূরে দুইখানি হাত একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে।

তখন অরিন্দমের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি জলে নামিলেন। সেই হাত-দুখানি আবার ভাসিয়া উঠিতে ধরিলেন এবং নবীনাকে ঘাটে আনিয়া তুলিলেন। নবীনা যদিও সংজ্ঞাশূন্য হয় নাই, কিন্তু সে এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, বসিতে পারিল না, ঘাটের চাতালের উপরে শুইয়া পড়িল। এবং জল এত অধিক পরিমাণে তাহার উদরস্থ হইয়াছিল যে, কথা কহিতে পারিল না—এমনকী নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল, একটা নিশ্বাস দুই-তিনবারে টানিতেছিল।

দেখিতে-দেখিতে সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়িল। অরিন্দম তাহাদের মুখে শুনিলেন, সেই জলমগ্না সুন্দরী সেইখানকার বিখ্যাত ধনী তমীজউদ্দীনের কন্যা—নাম কুলসম। তাহারা সকলেই সেই তমীজউদ্দীনের প্রজা; তাহাদের সাহায্য পাইয়া অরিন্দম কিছু সুবিধা বোধ করিলেন; কুলসমকে বারংবার ঘুরাইয়া ও উঠা-বসা করাইয়া, তাহার উদরস্থ সমস্ত জল বমন করাইয়া ফেলিলেন। কুলসম অনেকটা সুস্থ হইল। একবার অরিন্দমের মুখপানে চাহিয়া মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে বলিল, 'কেন আপনি আমার জন্য এত করিলেন? ভালো করিলেন না, আমার মরণই ভালো ছিল।'

অরিন্দম সে-কথায় কোনও কথা কহিলেন না। যখন কুলসমের শারীরিক অবসন্নতা অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন একদিকে অরিন্দম, অপরদিকে অপর একটি লোক কুলসমের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কুলসম তাহাদের সঙ্গে ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। বেশি দূরে নয়, সেইখানেই সেই সরোবরের পূর্বপার্শ্বে তমীজউদ্দীনের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নূতন বিপদ

অনতিবিলম্বে কুলসমকে লইয়া অরিন্দম ও প্রতিবেশিচতুষ্টয় তমীজউদ্দীনের বাটিতে উপস্থিত হইল। সে-সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছাইতে বড় বেশি বিলম্ব হইল না। দুই-তিনজন ভৃত্য আসিয়া কুলসমকে লইয়া গেল। এমন সময়ে কুলসমের পিতা তমীজউদ্দীন সেখানে আসিলেন, পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রীও আসিলেন। তমীজউদ্দীনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ; জরাতুর অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার শরীর কটিদেশ হইতে ভাঙিয়া সম্মুখের দিকে অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চলিয়া আসিবার সময়ে মাতালের মতো তাঁহার পা টলিতেছিল।

BanglaBook.org

কম্পিতকণ্ঠে তমীজউদ্দীন অরিন্দমের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে যে আজ আমার—' বলিতে-বলিতে—বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া সহসা ঘড়ঘড়ি উঠিল। আবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল এবং আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অরিন্দম ধরিয়া ফেলিলেন। দুই হস্তে তাঁহাকে তুলিয়া বহির্বাটির একটি প্রশস্ত কক্ষে শয়ন করাইয়া দিলেন।

সশঙ্কচিত্তে আর সকলে সেইস্থলে প্রবেশ করিল। অরিন্দম দেখিলেন, ইতোমধ্যেই তমীজউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে।

তমীজউদ্দীনের স্ত্রীর নাম মতিবিবি; তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প—পঞ্চবিংশতির বেশি নয়, বরং তাঁহাকে আরও ছোট দেখায়। মতিবিবি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চুল ছিঁড়িয়া, হাত-পা আছড়াইয়া, বুক চাপড়াইয়া, ডাক ছাড়িয়া উঠানে কাঁদিতে বসিলেন।

অরিন্দম একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ-বাড়িতে কোনও ডাক্তার চিকিৎসা করেন?'

ভৃত্যের নাম আমেদ। আমেদ বলিল 'ফুলসাহেব।'

অরিন্দম বলিলেন, 'এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনো।'

ছুটিয়া আমেদ চলিয়া গেল। অরিন্দম তমীজউদ্দীনের দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে করিতে লাগিলেন, হয়তো তমীজউদ্দীন জীবিত আছেন; বোধহয়, এ একপ্রকার মৃগীরোগ হইবে। মতিবিবিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মতিবিবি আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

এমনসময়ে সেখানে দ্রুতপদে কুলসম প্রবেশ করিল। যেখানে তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেইদিকে অগ্রসর হইতে-হইতে বলিল, 'বাবা—বাবা—বাবা! কী হয়েছে তোমার? এই যে আমি, বাবা, কথা কও।' পিতার বুকে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

অরিন্দম বলিলেন, 'বোধহয়, তোমার পিতা জীবিত নাই। একজন ভৃত্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে।'

শুনিয়া শিহরিত হইয়া কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল; কর্তৃত্বের ভাবে মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'কোন ডাক্তার?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ফুলসাহেব নামে যিনি তোমাদের বাড়িতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।'

শুনিয়া এরূপ সময়েও কুলসমের মুখে হাসি আসিল। সম্মুখে তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া, পার্শ্বে মাতা আকুল হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, এ-ভয়ানক সময়ে কুলসমের মুখে সেই হাসি যেন কেমন-এক-রকম বড় অস্বাভাবিক দেখাইল। তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে একবার বলিল, 'ফুলসাহেব? হবে।' তখন আবার সে পিতার বুকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'বাবা! কোথায় তুমি? আর যে কেউ আমার নাই! বাবা! বাবা! আমার কী হবে!' তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। বলিল, 'ফুলসাহেব—শত্রু—আমার পিতার শত্রু—আমার শত্রু—এ-সংসারের শত্রু—পিশাচ—পিশাচ—কী সর্বনাশ!' আর বলিতে পারিল না—তাহার কাতরকম্পিত দেহলতা সেইখানে পড়িয়া মাটিতে লুটাইল; কুলসম মূর্ছিত হইল।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুলসমকে ধরিলেন। তাহার পর মতিবিবিকে বলিলেন, 'এ-সময়ে আপনি আকুল হইয়া কাঁদিলে চলিবে না। কুলসম অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; এখন আপনাকেই সকল দিক দেখিতে হইবে।'

মতিবিবি কুলসমের পাশে আসিয়া বসিলেন—চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে কুলসমের শীঘ্র জ্ঞান হইল।

BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফুলসাহেব

অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার ফুলসাহেব উপস্থিত হইলেন। সর্বাগ্রে বৃদ্ধ তমীজউদ্দীনকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া বলিলেন, 'না, জীবিত নাই; বুঝিতে পারিতেছি না, কেন এমন হঠাৎ মৃত্যু হইল।'

মতিবিবি বলিলেন 'কুলসমই যত অনর্থের মূল; ও যদি না আজ জলে ডুবিয়া মরিতে যাইত, তাহা হইলে কি এমন সর্বনাশ হয়!' তাঁহার দরবিগলিতধারে দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল; তথাপি সেই মুখে একবার একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অরিন্দম ডাক্তার ফুলসাহেবকে আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলেন। ফুলসাহেব মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ দেখিল না, তখন তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য ওষ্ঠাধরের একপার্শ্বে একপ্রকার বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। অরিন্দমের কথা শেষ হইলে ফুলসাহেব নিতান্ত বিনীতের ন্যায় বলিলেন, 'মহাশয়ের নামটি কী, জানিতে পারি?'

অ। অরিন্দম বসু।

ফু। বটে!

সহসা ফুলসাহেবের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে-ভাব সামলাইয়া তিনি আরও বিনীতভাবে বলিলেন, 'মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়? যদি কোনও বাধা না থাকে—'

অ। রঘুনাথপুর; এখান হইতে তিন ক্রোশ পথ হইবে, কোনও কাজে এখানে আসিয়াছিলাম। বলেন যদি আমি এখন যাইতে পারি।

ফুলসাহেব সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া, কুলসমের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি আর এখানে থাকিয়ো না, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে তোমার স্বাস্থ্য এখন তেমন ভালো বোধ করি না। যাও, তোমার মাকে লইয়া তোমার ঘরে যাও।' তাহার পর অরিন্দমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি অনুগ্রহপূর্বক আর একটু অপেক্ষা করুন।'

কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল। কোনও কথা কহিল না; কিন্তু সে এমনভাবে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল—ডাক্তারই সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তখন ফুলসাহেবের মুখের ভাব অন্য কোনও ভাবাপন্ন না হইলেও, একবার ক্ষণেকের জন্য ললাট কুঞ্চিত হইয়া মিলাইয়া গেল; সেইসঙ্গে তাঁহার সেই দৃষ্টিতে যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, সেইরূপ চকিতে মিলাইয়া গেল। ফুলসাহেব বলিলেন, 'যাও কুলসম, অবাধ্য হইয়ো না—তোমার মাকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে যাও।'

মতিবিবি উঠিয়া গেলেন। কুলসমও উঠিল। যাইবার সময়ে সে দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া অরিন্দমকে বলিল, 'মহাশয়, আমাকে যদি সেই সময়ে মরিতে দিতেন, ভালো করিতেন। এখনও বলিতেছি, আপনি ভালো কাজ করেন নাই।' কুলসম দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তখন ডাক্তার ফুলসাহেব একটা অতি দীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'কেহ মরিলে স্ত্রীলোকেরা যেন কাঁদিবার একটা মহা সুযোগ পায়—কাঁদিয়া বাড়ি ফাটাইতে থাকে। যত শীঘ্র উহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সে-চেষ্টা আমি আগে করি।' বলিয়া তিনি ভৃত্যদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিন-চারজন ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। অরিন্দম দেখিলেন, তাহারা সকলেই সশঙ্ক, ত্রস্ত, সকলেই ডাক্তারবাবুকে অতিশয় ভয় করে। তাহাদের মুখভাবে ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়, যেমন অতিশয় ভয় করে, তেমনি তাঁহাকে তাহারা মনে-মনে অতিশয় ঘৃণাও করে।

ফুলসাহেব তখন ভৃত্যদের যাহাকে যাহা করিতে হইবে, বলিয়া দিলেন; তাহারা যে-যাহার কাজে চলিয়া গেল। অরিন্দম চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, দুইবার তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন, ডাক্তার ফুলসাহেব দুইবারই তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সেই মৃতদেহ সম্বন্ধে অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে ফুলসাহেবের আরও প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত

হইল। তাহার পর তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, আরও যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন, ভালো হয়; আমি একবার মতিবিবি ও কুলসমের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেছি; তাহার পর একসঙ্গে যাইব, কী বলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ক্ষমা করিবেন, আমার কিছু আবশ্যক আছে—অধিকক্ষণ বসিতে পারিব না—আমি উঠিলাম।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'না না, বসুন আপনি, আমি এখনই আসিতেছি; আপনার সঙ্গে দুই-একটি কথা আছে। আপাতত মতিবিবি আর কুলসমকে এ-সময়ে যা-যা করিতে হইবে, বলিয়া আসিতেছি—এখনি আসিব।'

ফুলসাহেব উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সতর্কীকরণ

ডাক্তারের প্রস্থানের পরমুহূর্তেই কুলসম দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সেই কক্ষে এখনও তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। অরিন্দম মনে করিলেন, কুলসম বুঝি তাহার মৃত পিতাকে আবার দেখিতে আসিয়াছে; কিন্তু সে পিতার মৃতদেহের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না; যেখানে অরিন্দম বসিয়াছিলেন, সেইদিকে অগ্রসর হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। বলিল, 'অরিন্দমবাবু, সাবধান। ওই ডাক্তার বড় সহজ লোক নয়, আমি উহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, সে আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে।'

অরিন্দম তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, শোকে-দুঃখে কুলসমের মতিভ্রম ঘটিয়া থাকিবে; কুলসম অরিন্দমকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব একরকম অনুভবে বুঝিতে পারিল। সেই সময়ে একটা দুঃখের হাসি সেই ম্লানমুখে একবার দেখা দিল। কুলসম বলিল, 'আমাকে পাগল মনে করিবেন না, আমি সকলই দেখিতেছি—সকলই শুনিতেছি—সকলই বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি।' মৃত পিতার নিস্পন্দ কঠিন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, 'আমার পিতার এ-দশা কে করিল? কে? ওই পিশাচ—ডাক্তার, ডাক্তার ফুলসাহেব আমার পিতাকে খুন করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে—যখন ফুলসাহেবকে আমরা জানিতাম না, তখন আমার পিতা কেমন দেখিতে ছিলেন! সেই সবল শরীর আজ দুই বৎসরের মধ্যে জরাতুর বৃদ্ধের অপেক্ষাও জীর্ণ-শীর্ণ। আজ দুই বৎসরের মধ্যে ফুলসাহেব এ-সোনার-সংসার শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে। এখনও বলিতেছি, অরিন্দমবাবু, আপনি আমাকে পাগল মনে করিবেন না। আমি আমার পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, ফুলসাহেবকে যতদূর চিনিতে হয় চিনিয়াছি। আজ তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, এবার সে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে। আমি তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারি। সেইজন্য আপনাকে সতর্ক করিলাম। সাবধান—খুব সাবধান—ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক!'

কুলসমের সেই আগ্রহাতিশয্যে, তাহার সেই সোজাসুজি সারল্যপূর্ণ কথায় অরিন্দমের মনে কেমন-একটা খটকা লাগিল। তিনি বলিলেন, 'সকল কথা খুলিয়া না বলিলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

'না—না, এখন নয়; এখনই পিশাচ আসিয়া পড়িবে—এখন সে-সময় নয়।' এই বলিয়া কুলসম সভয়ে একবার ইতস্তত চাহিল।

অরি। যদি বা তিনি আসেন, তাহাতে কী হইয়াছে?

কুল। আমাকেই তার ফলভোগ করিতে হইবে।

BanglaBook.org

অ। যতক্ষণ আমি উপস্থিত, ততক্ষণ বোধহয় নয়।

কু। ততক্ষণ না হইলেও হইতে পারে। এমন নারকী আর আছে কি? এদিকে কথাগুলি এমন মধুমাখা, ভাবভঙ্গিতে এমন সাধুতার ভান, কাহার সাধ্য তাহার মনের ভাব বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে? কখনও তাহার মুখে কর্কশ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, কখনও রাগিতে দেখা যায় না; আজ আপনার সহিত যেরূপ অতিশয় ভদ্রভাবে উহাকে আলাপ করিতে দেখিলেন, চব্বিশঘণ্টা ঠিক ওইভাবেই থাকে। আর আজ যাহাকে দেখিলেন, যাহার বয়স আমার বয়সের চেয়ে বড় বেশি হইবে না, উনি আমার বিমাতা—উনিও বড় সহজ নহেন। আমার পিতার মৃত্যুতে তিনি যে-শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক; তিনি ইহাতে বরং মনে-মনে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। হায়, আজ সকল রকমে আমার যতদূর সর্বনাশ হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। আজ আমার আপনার বলিতে কেহ নাই—পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই—জানি না, কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইব—আমার কী হইবে?'

কুলসমের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি-সকলের পার্শ্ব দিয়া, অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া তাহার হাত দুখানি প্লাবিত করিল। অরিন্দম প্রবোধ দিয়া তখন তাহাকে শান্ত করিলেন। কুলসম বলিতে লাগিল, 'ফুলসাহেব এ-সংসারে পদার্পণ করিবার দুইমাস পরে আমার মাতার মৃত্যু হইল। তাহার আরও দশমাস পরে আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট একটি ভাই ছিল, তাহার মৃত্যু হইল। তাহার পর আরও ছয়মাস গত হইতে-না-হইতে আমার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এ-সকলের ভিতরে পিশাচের আরও একটা অভিপ্রায় আছে; পাপিষ্ঠ যে, আমাকেও আর অধিকদিন জীবিত রাখিবে; এমন বোধ হয় না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কেন—এ-কথা বলিতেছ কেন?'

কুলসম বলিল, 'যদি না তাহাকে আমি বিবাহ করি, সে শীঘ্রই আমাকে হত্যা করিবে। তেমন নরাধমকে বিবাহ করিয়া আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা একদণ্ডের মৃত্যু-যন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়। সেইজন্য পিশাচ—থাক, ও-কথা এখন থাক, আমি আমার দুঃখের কথা আপনাকে বলিব মনে করিয়া এখানে আসি নাই; আপনাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। এখনও আপনাকে বলিতেছি, ফুলসাহেবকে সাবধান; সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকের যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, আপনি সেইরূপ সাবধানে থাকিবেন। যখন প্রথমেই সে এখানে আপনাকে দেখে, তখনকার মুখের ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি, যদিও আপনি ফুলসাহেবকে চেনেন না, সে আপনাকে বেশ চেনে; শুধু চেনে না, আপনাকে সে যে তেমনি ঘৃণা করে, আপনার নাম শুনিয়া তাহার চোখ দুইটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেই আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যদিও ফুলসাহেব আপনার সহিত নম্রভাবে কথা কহিতেছিল, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, তাহার বিনীত, মিষ্ট, হাসিমাখা কথার অপেক্ষা কালসাপের গর্জনও মঙ্গলজনক। এখন আমি চলিলাম।'

এই বলিয়া কুলসম উঠিল।

'বসো, আমারও একটি কথা আছে,' বলিয়া অরিন্দম একখণ্ড কাগজে নিজের ঠিকানাটি লিখিয়া কুলসমের হাতে দিলেন। বলিলেন, 'যদি কখনও দরকার হয়, এই ঠিকানায় সংবাদ দিতে বিলম্ব করিয়ো না।'

কুলসম মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। তাহার পর চঞ্চলপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ পথিমধ্যে

তখন অরিন্দমের মনের ভিতর কুলসমের কথাগুলি তোলাপাড়া হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন,

হয়তো কুলসম যাহা বলিল, সমস্ত সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপভাবে কুলসম ফুলসাহেবের পরিচয় দিল, ফুলসাহেব কি তেমনই একটা ভয়ানক লোক, তেমনই একটা পিশাচ-চেতা? আবার ভাবিলেন, কই, ফুলসাহেবকে তেমন তো দেখিলাম না; লোকটাকে ভালো বলিয়াই বোধ হইল। হয়তো বা কুলসমের কিছু পাগলের ছিট আছে; যেরূপভাবে সে আমার সহিত কথা কহিল তাহাকে পাগলই বা বলি কী করিয়া? যাই হোক, ব্যাপারটা ভালো করিয়া দেখিতে হইবে; বুঝিতেছি, ইহার ভিতর অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে; চেষ্টা করিয়া দেখিলে সময়ে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে। দেখা যাক, ডাক্তার মহাশয় আসিয়া কী বলেন।'

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময়ে নিঃশব্দে ফুলসাহেব তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে তখন বড় চিন্তান্বিতের মতো দেখাইল। অরিন্দম কোনও কথা কহিলেন না। ফুলসাহেব ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, কিছু মনে করিবেন না, অনেকক্ষণ আপনাকে একলা বসাইয়া রাখিয়াছি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, সেজন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না; যাহোক, বাড়ির স্ত্রীলোকেরা আপাতত অনেকটা শান্ত হইয়াছেন তো?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'হ্যাঁ, একরকম বুঝাইয়া আপাতত তাহাদিগকে অনেকটা শান্ত করিয়া আসিলাম। মতিবিবি আমারই একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া; এমন গুণবতী স্ত্রীলোক প্রায়ই দেখা যায় না। উহাকে আমি বড় স্নেহ করি। কই, কুলসমকে সেখানে দেখিলাম না, সে কি আবার এখানে কান্নাকাটি করিতে আসিয়াছিল না কি?'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে সত্য কথাই বলিলেন, 'কই না, সে আর এখানে কান্নাকাটি করিতে আসে নাই।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'এখন চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।'

অরিন্দম উঠিলেন। উভয়ে বাহির হইয়া একটা সোজা পথ ধরিলেন।

কিছুদূর আসিয়া অন্যান্য কথাবার্তার পর ফুলসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে কতদূর যাইতে হইবে? এখন কি সেই রঘুনাথপুরেই ফিরিবেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, কামদেবপুরের বাসা-বাটিতে এখন যাইব।'

ফুল। সেইখানেই কি এখন কিছুদিন থাকিবেন না কি?

অ। হ্যাঁ, একটা কাজ আছে; বোধহয়, সেইখানে এখন কিছুদিন থাকিতে হইবে।

ফু। কামদেবপুরে আমার দুই-একজন রোগী আছে, মধ্যে-মধ্যে আমাকে যাইতে হয়। এবার যখন ওদিকে যাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব।

অ। যে আজ্ঞা।

কিছুদূর যাইয়া ফুলসাহেব একটি চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তখন একবার অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়ের কি চুরুট খাওয়া অভ্যাস আছে?'

অরিন্দম একটু হাসিয়া বলিলেন, 'মধ্যে-মধ্যে খেয়ে থাকি বটে, তবে তেমন অভ্যাস নাই।'

ফু। আমার এই চুরুট একটি খেয়ে দেখুন। একটু নূতন বোধ হইবে।

এই বলিয়া ফুলসাহেব পকেট হইতে আর একটি চুরুট বাহির করিয়া অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম চুরুট লইয়া বলিলেন, 'এখন থাক, ইহার পর একসময়ে খাইব, এখন শরীরটা বড় ভালো নাই।'

ফু। বেশ, যখন ইচ্ছা আপনি খাইয়া দেখিবেন। তখন বুঝিতে পারিবেন, এরূপ উৎকৃষ্ট চুরুট আপনি আর কখনও ব্যবহার করেন নাই। নিজের ব্যবহারের জন্য আমি এই চুরুট স্বহস্তে তৈয়ার করিয়াছি। ইহার গন্ধ অন্যান্য চুরুটের মতো নয়। ইহার এমন অনেক গুণ আছে, যাহা অপর চুরুটে

BanglaBook.org

নাই; বিশেষত মুখের দুর্গন্ধ ও দন্ত-সংক্রান্ত যে কোনও পীড়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে। একটা ব্যবহার করিয়া দেখিলে সে প্রমাণ পাইবেন।

তাহার পর তাঁহাদিগের অন্যান্য কথাবার্তায় আরও কিছু পথ অতিবাহিত হইল। যখন উভয়ে কামদেবপুরের পথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অরিন্দম বলিলেন, 'তবে ডাক্তারবাবু, আমি এখন বিদায় লইতে পারি?'

ঘাড় নাড়িয়া, বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়া ফুলসাহেব বলিলেন, 'ওঃ! এই পথেই আপনাকে যাইতে হইবে বটে। মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায় আমি বড়ই সুখী হইলাম। আসুন আপনি, এদিকেও সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আপনাকে অনেকদূর যাইতে হইবে।'

ফুলসাহেব গৃহাভিমুখে চলিলেন। অরিন্দম চিন্তিতমনে কামদেবপুরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কুলসম সম্বন্ধে

ফুলসাহেব যখন বলিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে বিলম্ব ছিল না। এ-সময়ে কামদেবপুরের পথ নির্জন, কদাচিৎ দুই-একজন লোকের গতিবিধি। পথের দুইধারে ছোট-বড় ডোবা, বনজঙ্গল, বড়-বড় গাছপালা, কোথাও বড়-বড় বাঁশঝাড় মাথার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেখানকার পথটা একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। বাঁশে-বাঁশে ঘর্ষণ হইয়া মধ্যে-মধ্যে এক-একবার বিকট শব্দ হইতেছিল। শৃগালেরা এদিক-ওদিক করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপরে ছুটাছুটি করিতেছিল; কোনও-কোনওটা দূরবনমধ্যে গিয়া, হাঁকিয়া-হাঁকিয়া নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিতেছিল। এবং নিজেদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া, পরিশ্রান্ত কুক্কুরেরা নিকটবর্তী গ্রাম হইতে তাহাদিগকে নীরব থাকিবার জন্য কর্তৃত্বের নিরতিশয় কর্কশকণ্ঠে বারংবার ভর্ৎসনা করিতেছিল। মাথার উপরে নিবিড় বাঁশঝাড়, অশ্বত্থ-বটের ঘনপত্রাচ্ছন্ন শাখা-প্রশাখা, তদুপরিস্থিত কৃষ্ণমেঘাবৃত নীরব আকাশ সন্ধ্যাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পূর্বে কামদেবপুরের পথ হইতে বিদায় অভিনন্দনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। অরিন্দম সেই অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিতে-করিতে তখনও কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা ভাবিতেছিলেন। কুলসম তাঁহাকে ফুলসাহেবের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিল, কই, ফুলসাহেবকে তেমন ভয়ানক কিছুই দেখিলেন না; ফুলসাহেব পূর্বাপর নিতান্ত ভদ্রলোকেরই ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। কুলসমের কথা শুনিয়া আগে তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয়তো পথে ফুলসাহেব তাঁহাকে একা পাইয়া ছুরি ধরিবেন, না হয়তো পিস্তল ধরিবেন, কি অন্য কোনওপ্রকারে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। সে রকম কিছুই দেখিলেন না; সুতরাং তখন তিনি মনে করিলেন, কুলসমের মস্তিষ্ক কোনও কারণে বিকৃত হইয়া থাকিবে; হয়তো ফুলসাহেবের উপরে তাহার কোনও কারণে দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া থাকিবে। যাই হোক, ফুলসাহেবের কথা লইয়া এখন ভাবিলে চলিবে না। এখন তাঁহার হাতে অনেক কাজ আছে; সে-সকল কাজ আগে শেষ করিতে হইবে।

যথাসময়ে কামদেবপুর আসিয়া, বাসায় যাইবার পূর্বে অরিন্দম একবার যোগেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া দুই-একখানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। অরিন্দমকে দেখিয়া, তখনকার মতো লেখনী বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন; তিনি অরিন্দমকে উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহার নিকটে আর একখানি স্বতন্ত্র চেয়ারে উপবেশন করিলেন। বলিলেন, 'হঠাৎ কী মনে করিয়া, অরিন্দমবাবু? সেই বালিকার মৃতদেহের কেসটার কিছু করিতে পারিলেন কি?'

BanglaBook.org

অরি। না—এ পর্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই।

যো। রেবতী সংক্রান্ত ঘটনার, সেই কেশব নামে লোকটার কোনও সন্ধান হইল কি?

অ। না, তাহা হইলে আপনি সংবাদ পাইতেন। সে-কথা থাক, আমি এখন আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; ফুলসাহেব বলিয়া কোনও লোককে আপনি জানেন কি?

যো। ফুলসাহেব? এখানকার সকলেই তাঁহাকে জানে।

অ। সকলেই কেন যে তাঁহাকে জানে, তা আপনি জানেন কি?

যো। লোকটা চিকিৎসা-বিদ্যায় খুব পারদর্শী। এখানকার অনেকের বাড়িতে ফুলসাহেব চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কেন অরিন্দমবাবু, তাঁর কথা আপনি বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

অ। আগে আমার কথার উত্তর দিন, তাহার পর আপনার কথার উত্তর করিব। আপনি তমীজ-উদ্দীনকে চেনেন কি?

যো। চিনি বইকি, তিনি একজন বিখ্যাত জমিদার।

অ। তিনি প্রভূত ধনশালী, কেমন না?

যো। নিশ্চয়ই, তাঁহার বিষয় আমি কিছু-কিছু জানি।

অ। বলুন দেখি।

যো। আজ দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি এখন শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহার পর তিনি আবার বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হন; কিন্তু তাঁহার কন্যা, যাহাতে তিনি আর বিবাহ না করেন, সেজন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তমীজউদ্দীন তাঁহার সেই কন্যাকে অতিশয় ভালোবাসেন; পাছে সে জানিতে পারে, এজন্য গোপনে বিবাহ করেন। এবং যাঁহাকে বিবাহ করেন, শুনিয়াছিলাম, তিনি ওই ডাক্তার ফুলসাহেবের একজন আত্মীয়ের কন্যা। সেইজন্য ফুলসাহেবই এ-বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বে ভিতরে-ভিতরে বৃদ্ধ তমীজউদ্দীন আর একটি বড় বুদ্ধিমানের মতো কাজ শেষ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মতো কিছু রাখিয়া স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কন্যাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে-সকল জানিতে পারেন। তখন তিনি আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া স্বামীকে বারংবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কারণ বিবাহের পূর্বে দানপত্র সমাধা হইয়াছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার এক কপর্দকও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কখনও তিনি রাত্রে দড়ি লইয়া ঘুরিতেন, কখনও তাঁহার বাক্সে আফিম থাকিতে দেখা যাইত, কাজেই তমীজউদ্দীন মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। শুনিলাম, তাহার পর না কি তমীজউদ্দীন তাঁহার কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া বলিয়া-কহিয়া একলক্ষ টাকা চাহিয়া লইয়াছেন; সেই টাকাটা তাঁহার স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ফুলসাহেবের সম্বন্ধে

অরিন্দম বলিলেন, 'তমীজউদ্দীন যে মারা গিয়াছেন!'

সবিস্ময়ে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে কী! বলেন কী!'

অরি। আজ সন্ধ্যার পূর্বে আমারই হাতের উপরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যো। তারপর—তারপর—

অ। তারপর আর কী—এখন তাঁহার কন্যা সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইল।

যো। তাহাই তো হইবার কথা

অ। কত টাকার বিষয় হইবে?

যো। প্রায় বিশ লক্ষ টাকার।

BanglaBook.org

অ। বিশ লক্ষ! বলেন কী? আচ্ছা, বিশ লক্ষই যেন হইল। এখন বলুন দেখি, ফুলসাহেব অবিবাহিত কি না?

যো। হয় অবিবাহিত, নয় তাঁহার স্ত্রী গতায়ু হইয়া থাকিবেন। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

অ। জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কী? হঠাৎ কথাটা মনে উঠিল, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

যো। আমার কাছে এতটা গোপন করা কি আপনার ভালো দেখায়?

অ। তমীজউদ্দীনের কন্যাকে ফুলসাহেব এখন বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন।

যো। বটে, ফুলসাহেব বড় চতুর লোক! তাঁহাকে দেখিলেই সেটি বেশ বুঝা যায়। তবে শুনিয়াছি, তমীজউদ্দীনের মেয়েটা কিছু পাগলাটে ধরনের।

অ। যাক, ফুলসাহেব লোকটা কেমন বলুন দেখি? এমনভাবে বলিবেন, যে কখনও দেখে নাই, সে যেন দেখিলেই চিনিতে পারে। মধ্যে-মধ্যে আপনি পলাতক খুনি আসামীকে ধরিবার জন্য যেমন অবিকল রূপবর্ণনা করিয়া চারিদিকে হুলিয়া পাঠান, বর্ণনাটা যেন ঠিক সেই রকমের হয়।

যো। বলিতেছি, কিন্তু আমি যে আপনার এ-সকল কথার মানে কিছুই বুঝিতেছি না।

অ। ইহার পর বুঝিবেন। এখন একবার ফুলসাহেবের রূপবর্ণনা করুন দেখি।

যো। লোকটা মোটা—

অ। কী রকম মোটা বলুন, সাধারণত লোক যেরূপ মোটা হইয়া থাকে, সেইরূপ মোটা, না ব্যায়ামাদির দ্বারা যেরূপ চুয়াড় ধরনের মোটা হয়, সেইরূপ মোটা?

যো। মোটের উপরে এখন একরকম মোটা বলিয়াই মনে করুন না। লম্বায় পাঁচ ফুট ছয়-সাত ইঞ্চির বেশি নয়, গৌরবর্ণ, বয়স চল্লিশের মধ্যে, মুখখানি একটু গোলাকার, কপালের পাশে একটা বড় আঁচিল আছে, নাকটা টানা ও একটু লম্বা, গোঁফদাড়ি কামানো, সর্বদাই হাসিমুখ, চুলগুলি অল্প কোঁকড়া, চলিবার সময়ে একপাশে মুখখানি প্রায় বাঁকাইয়া চলেন, মুখে সর্বদাই মিষ্ট কথা লাগিয়া আছে, চোখদুটির দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, ছোটর উপর টানা চোখ।

অ। কিছুক্ষণ পূর্বে ফুলসাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হইয়াছে; লোকটা খুব আলাপী বটে।

যো। ফুলসাহেবকে যদি আপনি দেখিয়াছেন, তখন আর তাঁহার রূপ বর্ণনা শুনিতে আপনার কী এত আবশ্যক, অরিন্দমবাবু?

অ। কিছুই না।

যো। আপনি আবশ্যক ছাড়া নিশ্বাসটি ফেলিতেও কুণ্ঠিত হন, আর বলিতেছেন, কিছুই না? আমি কি আপনাকে জানি না?

অ। কিছুই না, তবে এইটুকু জানিবেন, যদি আমার হাতে একটা উপস্থিত খুনি কেসের ভার না থাকিত, তাহা হইলে আমি একবার ডাক্তার ফুলসাহেবের চরিত্রটা সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

যো। ফুলসাহেবের উপরে সহসা আপনার এমন কৃপাদৃষ্টিপাত কেন হইল?

অ। তিনি এখন তমীজউদ্দীনের মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

যো। ফুলসাহেব যেরূপ চতুর লোক—তাহাতে তাঁহার পক্ষে সেটা বড় আশ্চর্যের কথা নহে; তবে শুনিয়াছিলাম, তমীজউদ্দীনের মেয়েটি না কি কিছু মাথা-পাগলা গোছের।

অ। এই আপনি আর আমি যেরূপ মাথা-পাগলা গোছের—সেইরকম, তার বেশি বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার নাম কুলসম। যোগেন্দ্রবাবু, শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, কুলসমের অদৃষ্টে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিবে। হয়, কুলসম

BanglaBook.org

ফুলসাহেবের স্ত্রী হইবে; সেটি যদি না ঘটিয়া উঠে, কুলসম মরিবে; সেটিও যদি না ঘটে—

যো। (বাধা দিয়া) তাহা হইলে কী হইবে?

অ। তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, অরিন্দমের এ-সম্বন্ধে একটু মাথাব্যথা পড়িবে; সে এ-বিপদের মুখ হইতে একদিন কুলসমকে উদ্ধার করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের বিপদ

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অরিন্দম বাসা-বাটিতে ফিরিলেন। বাটির বহির্দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ভিতর হইতে ভৃত্যের গম্ভীর, উচ্চ ঘন-ঘন নাসিকাধ্বনি অরিন্দমকে তাহার গভীর নিদ্রার পরিচয় দিল। তিনি অতিকষ্টে ভৃত্যের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মনে-মনে-বিরক্ত ভৃত্য উঠিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারোন্মুক্ত করিল। অরিন্দম দ্বিতলে নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া আহারাদির জন্য সর্বাগ্রে ব্যগ্র হইলেন। উদরস্থ অগ্নিদেব সারাদিন একাদশী করিয়া বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইতিপূর্বে সুবুদ্ধি পাচক-ঠাকুর সে-ঘরে আহার্য প্রস্তুত রাখিয়া নিজের নির্বিঘ্ন দীর্ঘনিদ্রার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। অরিন্দমও তাহাতে তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব, আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না, তাঁহার মন কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা লইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি ফুলসাহেবের প্রদত্ত চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া টানিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন—নিদ্রার নামগন্ধ নাই; ভাবিতে লাগিলেন, 'বোধহয়, আমি যাহার সন্ধানে আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলিয়া দিবারাত্র ঘুরিতেছি, সে আর কেহই নয়—ওই ফুলসাহেব। ওই বোধহয়, সেই খুনি। অত সংশয়-সন্দেহের ভিতর হইতে মন যেন বলিতেছে, ওই ফুলসাহেব—আর কেহই নয়—সেই বালিকার হত্যাকারী।'

ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল; একটু তন্দ্রাবোধ হইল, মাথাটা একটু পশ্চাদ্দিকে ঢলিয়া পড়িল, সেইসঙ্গে একটা হাই উঠিল।

অরিন্দম আপনার মনে বলিলেন, 'এই যে দেখিতে পাই, এখন একটু ঘুম আসিতেছে। আকৃতিতে অনেকটা মিল আছে, লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট, মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ অস্বাভাবিকরূপে প্রশস্ত, কোমরটা কিছু সরু, বয়সও চল্লিশ বৎসরের বেশি বলিয়া বোধ হয় না—।'

তাহার পর অরিন্দম আবার একটি জৃম্ভণ ত্যাগ করিলেন। পূর্বাপেক্ষা এবার কিছু বড়। অরিন্দম পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, 'দেখিতে গৌরবর্ণ তেমন উজ্জ্বল না হইলেও—' আবার একটা হাই উঠিল—'পরিষ্কার বটে, বিশেষত মুখের চেয়ে হাত দুখানার রং কিছু বেশি পরিষ্কার—' এবার একটা বড় রকমের হাই উঠিল।

'একি! আজ এত ঘুম পাইতেছে কেন? বরং ইহা অপেক্ষা বেশিরাত্রেই প্রায় ঘুমাইয়া থাকি, কোনওদিন তো এমন হয় না।' এই বলিয়া অরিন্দম উঠিয়া গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, 'চুলগুলি একটু কোঁকড়া, খুব কালো—' আবার একটা হাই উঠিল, তাহার পর আর একটা—আর একটা—'চুলগুলি মাথেও সেইরূপ বড়—' আবার একটা হাই উঠিল,—'নিশ্চয়ই এই ফুলসাহেব সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া সিন্দুক-মধ্যে লাশ চালান করিয়াছিল।'

অরিন্দম আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—বসিয়া পড়িলেন; হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—তারপর একটা—আর একটা—ক্রমান্বয়ে হাই উঠিতে লাগিল।

চিন্তামগ্ন অরিন্দম তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'ফুলসাহেবেরও দাড়ি গোঁফ নাই—' আবার হাই উঠিল—'লোকটা যেরূপ মিষ্টভাষী—' আবার হাই উঠিল—'দেখিলাম—' আবার

BanglaBook.org

হাই উঠিল—'তাতে—' আবার একটা হাই উঠিল—'কী—' আবার একটা হাই উঠিল—'বো—' আবার একটা হাই উঠিল—'ধ—' আবার একটা—অরিন্দম শেষে আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি সেই অর্ধদগ্ধ চুরুট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মাথার উপরে দুইখানি হাত ঋজুভাবে তুলিয়া, দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংবদ্ধ রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখে কেবলই জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—একটার সঙ্গে আর একটা—সেইসঙ্গে আর একটা, এইরূপ জৃম্ভণের উপর জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একবার মুখ বন্ধ করেন, এমন অবসরটুকুও পাইলেন না। চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল; যদিও একবার জোর করিয়া চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চারিদিকে ঘন অন্ধকার; ঘরে যদিও দীপ জ্বলিতেছিল, তথাপি তিনি অন্ধের ন্যায় হাতড়াইয়া বিছানা খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে তখন এমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল, তাঁহার সর্বাঙ্গ এমনই ভাবে অসাড় হইয়া আসিতেছিল যে, অপর কেহ হইলে এতক্ষণ তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত। অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, 'অবশ্যই আমি কিছু খেয়েছি; নতুবা এমন হইবে কেন? ওঃ! ঠিক হইয়াছে! ওই চুরুটে কোনওরকম বিষ ছিল! কী সর্বনাশ! নিশ্চয়ই ফুলসাহেব নরঘাতী পিশাচ—এখন আর কোনও সন্দেহ নাই—এখন ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, বালিকার হত্যাকারী আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। পিশাচ পত্রে লিখিয়াছিল, একদিন অরিন্দমকে হত্যা করিবে, শীঘ্রই সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুমুখে অরিন্দম

ঘরের এক কোণে একটা টেবিল ছিল; অরিন্দম দুই হাতে সেই টেবিলের একটা কোণ চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—পড়িয়া গেলেন—আবার উঠিলেন—আবার পড়িয়া গেলেন, সেইরূপ অবস্থায় তিনি সেই উজ্জ্বল দীপালোকেও দুই চক্ষে ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। হাই চাপিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। একটার পর একটা—তাহার পর আর একটা—তাহার পর আর একটা সেইরূপ হাই উঠিতে লাগিল। তিনি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'এখন না—এখন না—এখন কিছুতেই মরা হইবে না। মরিবার আগে যেমন করিয়া পারি, একটা কাজ শেষ করিবই।' এই বলিয়া তিনি টলিতে-টলিতে উঠিলেন; অন্ধকার গৃহমধ্যস্থবৎ তিনি হাতড়াইয়া টেবিলের ভিতর হইতে একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। অতিকষ্টে কলম ও দোয়াতের সন্ধান করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কী লিখিতেছেন দেখিতে পাইলেন না। অভ্যাস মতো লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। যাহা লিখিলেন, তাহার কোনও অক্ষর খুব বড়, কোনওটি আবার তেমনি ছোট—কোনওটার সঙ্গে কোনওটা মিলে না। পংক্তিগুলি আঁকাবাঁকা হইল; ঠিক তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া কিছুতেই বুঝাইল না। তিনি অতিকষ্টে লিখিলেন—

'যোগেন্দ্রবাবু,

ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক। যত শীঘ্র পারেন তাহাকে গ্রেপ্তার করুন। সে খুনে—সে-ই বালিকার হত্যাকারী। সে চুরুটের সঙ্গে আমাকে বিষ দিয়াছিল; আমি চুরুটের আধখানা মাত্র খাইয়াছি—বোধহয় বাঁচিব না। ফুলসাহেবকে শীঘ্র না ধরিতে পারিলে সে একদিন আপনাকে—'

আর লিখিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রমশ অসাড় হইয়া আসিতেছিল; সেই অসম্পূর্ণ পত্রে তিনি নিজের নাম সহি করিয়া পত্র শেষ করিলেন এবং একখানি খাম সংগ্রহ করিয়া পত্রখানি

BanglaBook.org

তন্মধ্যে বন্ধ করিলেন। আর একটি বর্ণও লিখেন, এমন শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। এখনও শিরোনামা লিখিতে বাকি, ক্রমশ তিনি নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িতেছিলেন, আর তখন তাঁহার নড়িবার শক্তিমাত্র ছিল না। হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছিল; তিনি আর কোনও উপায় না পাইয়া করতলে সেই লৌহলেখনী বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে হাতের সেই দারুণ অবসন্নতা তখনকার মতো একটু দূর হইল; লেখনী সেইরূপ বিদ্ধ রহিল। তিনি অপর লেখনী লইয়া শিরোনামা লিখিলেন। যাহা লিখিলেন, তাহা সহজে অপর কেহ পড়িতে পারিবে বলিয়া বোধ হইল না।

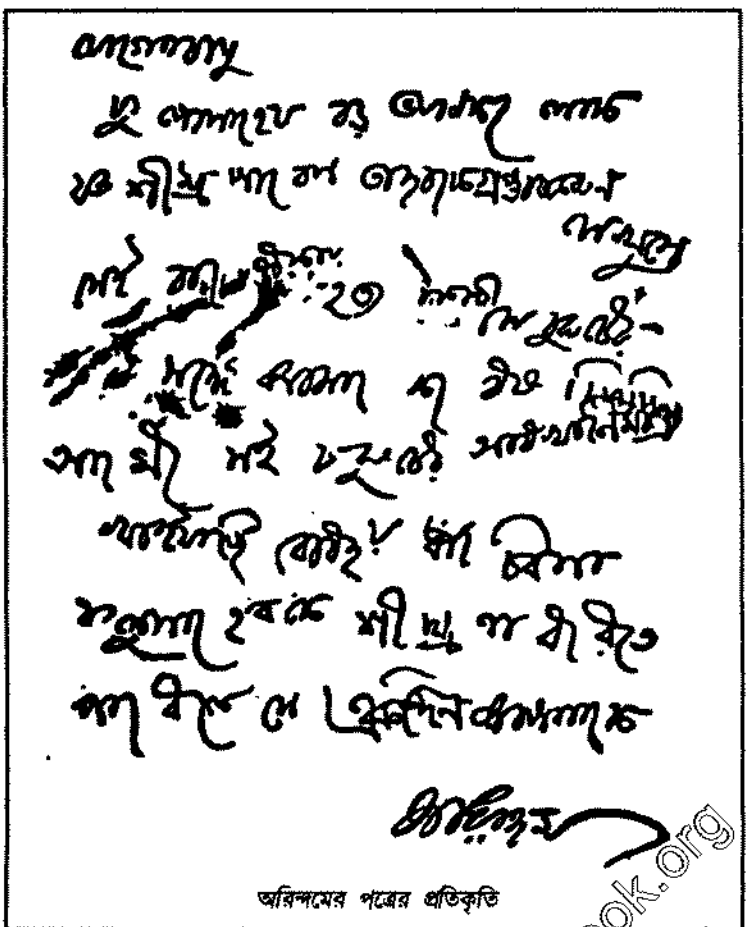

অরিন্দমের পত্রের প্রতিকৃতি

BanglaBook.org

তখনই ভৃত্য দ্বারা যাহাতে যোগেন্দ্রনাথের নিকট পত্রখানি পাঠাইতে পারেন, সেজন্য অরিন্দম ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার যে স্বরভঙ্গও ঘটিয়াছে, তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। স্বর এত মৃদু হইয়া আসিয়াছে, নিম্নতলে নিদ্রিত ভৃত্য শুনিবে কি, সে যদি তখন তাঁহার পার্শ্বে সম্পূর্ণ সজাগ দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলেও বোধহয়, শুনিতে পাইত না। এমনকী অরিন্দম নিজের স্বর নিজেই শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিজেই ভৃত্যের নিকট যাইবার জন্য সেই কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে গেলেন। ইতিপূর্বে আহারাদি শেষে নিজ হস্তে তিনি দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, কিছুতেই এখন তিনি সেই রুদ্ধদ্বারের সন্ধান করিতে পারিলেন না—তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে

নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একপার্শ্বে একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, তিনি তাহাই দ্বার মনে করিয়া তন্মধ্য দিয়া বাহির হইতে গেলেন, কপালে সজোরে আঘাত লাগিল; তিনি পত্রখানি সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি বাহিরের বারান্দায় গিয়া পড়িল। অরিন্দম সেইখানে পড়িয়া গেলেন; মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

এ-সময়ে যোগেন্দ্রনাথ হয়তো পয়ঃফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কেমন করিয়া তিনি জানিবেন, আজ তাঁহার পরম বন্ধু অরিন্দম শত্রুর চক্রান্তে মরণাপন্ন নিঃসহায় অবস্থায় মরিতে বসিয়াছেন?

দশম পরিচ্ছেদ ঃ চিকিৎসক না মূর্তিমান মৃত্যু

পরদিন প্রভাতে পাচক-ঠাকুর অরিন্দমের নিকটে অন্যদিনের ন্যায় বাজার-খরচ লইতে আসিয়া দেখিল, তখনও অরিন্দম উঠেন নাই। তাঁহার শয়ন-গৃহের কবাট বন্ধ রহিয়াছে। বাহির হইতে দুই-চারিবার 'বাবু' 'বাবু' বলিয়া ডাকিল, কোনও উত্তর নাই। দ্বার ঠেলিল, তথাপি কোনও উত্তর নাই, তখন গবাক্ষ দিয়া দেখিল, গৃহতলে অরিন্দম পড়িয়া আছেন। তাঁহার ললাটের একস্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, দেখিয়া পাচক-ঠাকুরের অত্যন্ত ভয় হইল। কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; তাহার সেই ইতস্ততের সময়ে অরিন্দমের লিখিত সেই পত্রখানি তাহার নজরে পড়িল; তাহার একটু লেখাপড়া জানা ছিল, অনেক কষ্টে একটির পর একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া একটি শব্দ, সেইরূপে আর একটি শব্দ, এইরূপে শব্দে-শব্দে মিলাইয়া শিরোনামার কতক অংশ পাঠ করিল। কতক অংশ না পড়িতে পারিলেও আন্দাজে বুঝিয়া লইল।

পত্রখানি লইয়া নিম্নতলে আসিয়া গভীর নিদ্রা হইতে ভৃত্যকে জাগাইল। তাহাকে আগে তিরস্কার করিল; তাহার পর সে যাহা জানিত, তাহা বলিয়া নিজে সেই পত্র লইয়া থানায় যোগেন্দ্রনাথের নিকটে চলিল।

থানায় তখন যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন না। একজন দারোগা আর দুইজন জমাদার বসিয়া ছিল। পাচক-ঠাকুর গিয়া দারোগাকে সেই পত্রখানি দিয়া যাহা ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে বলিল। তখনই দারোগা একজন জমাদারকে দিয়া সেই পত্রখানি যোগেন্দ্রনাথের বাটিতে পাঠাইয়া দিল এবং নিজে অরিন্দমকে দেখিতে চলিল। অপর জমাদার থানা-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

পাচক-ঠাকুর দারোগাকে অরিন্দমের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে লইয়া আসিল। দারোগা সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া অরিন্দমকে যেরূপ অবস্থায় অনাবৃত গৃহতলে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল, তাহাতে তাহার বড় ভয় হইল। তখনই রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া ফেলা হইল। সর্বাগ্রে দারোগা পাচক-ঠাকুর ও ভৃত্যের সাহায্যে অরিন্দমকে পার্শ্ববর্তী শয্যায় তুলিল। নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল, নিশ্বাস পড়িতেছে না; কিন্তু দেহ শীতল নহে, বরং কিছু উষ্ণ। সেইজন্য তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, অরিন্দমের তখনও মৃত্যু হয় নাই। দারোগা পাচক-ঠাকুরকে তখনই একজন ডাক্তার ডাকিতে অনুমতি করিল।

পাচক-ঠাকুর ছুটিয়া বাহির হইল। অনতিবিলম্বে সে একজন চিকিৎসককে সঙ্গে আনিল। চিকিৎসক আর কেহই নহেন—সেই ডাক্তার ফুলসাহেব। দারোগা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইয়া বলিল, 'এই যে আপনি আসিয়াছেন, ভালোই হইয়াছে—আপনাকে দেখিয়া অনেকটা ভরসা হইল।'

ফুলসাহেব বলিল, 'হ্যাঁ, আমি এইখানে একজন রোগী দেখিতে আসিয়াছিলাম। পথ হইতে তোমাদের লোক গিয়া ডাকিয়া আনিল। এখন ব্যাপার কী, বলো দেখি।'

দারোগা অরিন্দমকে দেখাইয়া দিল। ফুলসাহেব অরিন্দমকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আর কী হইবে, লোকটার মৃত্যু হইয়াছে।'

মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া দারোগা চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'মৃত্যু হইয়াছে! কী সর্বনাশ! কী রোগে হঠাৎ ইনি মারা পড়িলেন?'

ফুল। সম্ভব হৃদরোগে। ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

দারো। এমন বলবান ইনি, হৃদরোগে আচম্বিতে যে মারা গেলেন, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

ফু। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আমি কি মিথ্যাকথা বলিলাম?

দারো। আত্মহত্যা করেন নাই তো?

ফু। তাহাও হইতে পারে। কই, আপাতত তাহার কোনও প্রমাণ পাইলাম না।

দা। আপনি যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই?

ফু। না।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মিত্রের কার্য

এমনসময়ে যোগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অরিন্দমের পত্র পান নাই, জমাদার পত্র লইয়া তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইবার আগে, তিনি বাহির হইয়াছিলেন। থানাতে গিয়া—সেখানে সেই জমাদারের মুখে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইয়া এখানে আসিতেছেন। দারোগাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে যাহা জানিত যোগেন্দ্রনাথকে বলিল। অরিন্দমের সেই পত্রের কথা বলিতে মনে হইল না।

যোগেন্দ্রনাথ বিশেষ ব্যস্ততার সহিত ফুলসাহেবকে বলিলেন, 'আপনি কি কোনওরকমে অরিন্দমবাবুকে রক্ষা করিতে পারেন না?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'আমার আর কোনও হাত নাই।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তবে কি ইনি বাঁচিয়া নাই?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'না, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিতেন না। কী করিব, এখন আর কোনও উপায় নাই।'

যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তবে আর কী হইবে! ডাক্তারবাবু, হঠাৎ এরূপ মৃত্যুর কারণ কী? বোধহয়, অরিন্দমবাবু আত্মহত্যা করিয়াছেন।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না; আমার বোধ হয়, হৃদয়াঘাতেই মৃত্যু হইয়াছে।'

ফুলসাহেব তখন যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উঠিলেন। যাইবার সময়ে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার হাসিল; সেই হিংসাতীব্র চিরাভ্যস্ত মৃদুহাস্য—কেহ দেখিল না।

ফুলসাহেব চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে যোগেন্দ্রনাথ একখানি পালকিতে তুলিয়া অরিন্দমকে নিজের বাটিতে লইয়া গেলেন।

সেখানে অরিন্দমকে একটি প্রশস্ত পরিষ্কৃত গৃহমধ্যে রাখা হইল। বাটিতে আসিয়া অরিন্দমের সেই পত্র পাইয়া যোগেন্দ্রনাথ সকলই বুঝিতে পারিলেন। তখনই খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগকে আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি তখন নিজে যাইয়া অরিন্দমের বাসা হইতে সেই অর্ধদগ্ধ বিষাক্ত চুরুট সন্ধান করিয়া লইয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে দুই-তিনজন নামজাদা ডাক্তারকে আনাইলেন।

BanglaBook.org

সেইদিন রাত্রিশেষে তিনজন ইংরাজ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথের বাটি হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কুলসমের উদ্বেগ

প্রভাতে যোগেন্দ্রনাথের গৃহদ্বারে একখানি পালকি আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্য হইতে একটি কৃতাবগুণ্ঠনা কিশোরী বাহির হইয়া বাটিমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথ গৃহেই ছিলেন। বাটির বহিরঙ্গনে তাহার সহিত যোগেন্দ্রনাথের দেখা হইল। কিশোরী যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন তিনি?'

যোগেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কে কেমন আছেন? কাহার কথা আপনি বলিতেছেন?'

কিশোরী। অরিন্দমবাবুর। তিনি কি বাঁচিয়া নাই?

যোগেন্দ্র। ডাক্তার ফুলসাহেব তো তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

কি। (ক্রোধভরে) কে, ডাক্তার ফুলসাহেব? সেই পিশাচ? সেই তো অরিন্দমবাবুকে খুন করিয়াছে।

যো। বটে! আপনি কে?

কি। আমি কুলসম—তমীজউদ্দীনের কন্যা।

এই বলিয়া কুলসম অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। বলিল, 'আমি আগেই জানিতে পারিয়া অরিন্দমবাবুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। হায়, হয়তো তিনি আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই!'

যো। তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, ডাক্তার ফুলসাহেব অরিন্দমবাবুকে হত্যা করিয়াছে?

কু। আমি ফুলসাহেবের মুখ দেখিলে, তাহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি; আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না?

যো। কেন বিশ্বাস করিব না? তুমি কী বলিতে আসিয়াছ বলো।

কু। অরিন্দমবাবু কি ফুলসাহেবের সেই বিষাক্ত চুরুট খাইয়াছেন?

যো। হ্যাঁ।

কু। (অধীর হইয়া) কী সর্বনাশ! কোথায় তিনি? আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চলুন। কেমন আছেন তিনি?

যো। তুমি সেখানে গিয়া কী করিবে?

কু। আমি তাঁহাকে বাঁচাইব। তিনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এ-সময়ে আমি তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিব।

যো। কেমন করিয়া তুমি এখন তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে?

কু। তিনি এখনও মরেন নাই—বিষে মৃতবৎ হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে কোনও চিকিৎসক তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। আমি ওই বিষের সম্বন্ধে ফুলসাহেবের মুখে কিছু শুনিয়াছি। উহার প্রতিষেধক ঔষধের নামও তাহার মুখে শুনিয়াছি। একদিন আমার বিমাতাকে ওই কথা ফুলসাহেব বলিয়াছিল, আমি গোপনে থাকিয়া সব শুনিয়াছিলাম।

যো। তিনি মরেন নাই—অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছেন।

শুনিয়া কুলসমের মাথায় যেন কেমন একটা সুখের বজ্রাঘাত হইল। একটা নিরতিশয় আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সর্বাঙ্গ বহিয়া তাহার মস্তকের ভিতরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; ঠিক সেই সময়ে অরিন্দম তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরিন্দমের মুখ ম্লান, জ্যোতির্হীন, দেহ

BanglaBook.org

শীর্ণ, চোখদুটি ভিতরে বসিয়া গিয়াছে—যেন তিনি সে অরিন্দম নহেন, তেমন উজ্জ্বল বলময় দেহে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! অরিন্দম মৃদু হাসিয়া কুলসমকে বলিলেন, 'কী কুলসম! আমাকে তুমি দেখিতে আসিয়াছ? আমি মরি নাই, বেশ বাঁচিয়া আছি। তুমি কেন কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলে?'

কুলসম বলিল, 'আপনি একদিন আমার জন্য নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন; আর আমি আপনার এরূপ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া একবার দেখিতে আসিয়াছি, ইহা কি বড় বেশি হইল?'

অরি। কুলসম, তোমাকে আমার কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

কুল। বলুন, আমি আপনার কাছে একটি বর্ণও গোপন করিব না। আমি মাতৃপিতৃহীনা, আপনার শরণাপন্না; আমি আপনার নিকট অনেক উপকারের আশা করি। এ-বিপদে আপনি যদি আমাকে না রাখেন, আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি আবার ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি; যদি না আমি দুই-একদিনের মধ্যে ডাক্তার ফুলসাহেবকে বিবাহ করিতে সম্মত হই, তাহারা আমাকে খুন করিবে। তাহারা কাল যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল, তখন আমি গোপনে থাকিয়া তাহাদের অনেক কথা শুনিয়াছি।

অরি। তাহারা কে? তুমি আর কাহার কথা বলিতেছ?

কু। আর আমার সেই রাক্ষসী বিমাতা—।

অ। তিনিও কি এই ষড়যন্ত্রের ভিতরে আছেন না কি?

কু। তাহারই তো এই ষড়যন্ত্র, ফুলসাহেব উপলক্ষ মাত্র। আমার বিমাতাকে বড় সহজ মনে করিবেন না। সে না করিতে পারে, এমন ভয়ানক কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। শুনিয়াছি, আমার বিমাতা ফুলসাহেবের ভাগিনেয়ী। ফুলসাহেব জোগাড়-যন্ত্র করিয়া আমার পিতার সঙ্গে তাহার সেই ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়; কিন্তু ফুলসাহেবের সহিত আমার বিমাতার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখি, তাহাতে মনে বড় ঘৃণা হয়—কখনও ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না।

অ। তুমি গোপনে থাকিয়া কাল তাহাদের মুখে কী শুনিয়াছ? আমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিয়াছিল কি?

কু। আগে আপনারই কথা হইতেছিল। ফুলসাহেব আপনাকে বিষাক্ত চুরুট খাওয়াইয়া, কেমন করিয়া আপনাকে মরণাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই সে আমার বিমাতার কাছে হাসিতে-হাসিতে গল্প করিতেছিল। তারপর আমার কিসে সর্বনাশ হইবে, কেমন করিয়া আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবে, এই সব গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, যদি তাহাদের কার্যসিদ্ধি করিবার জন্য আমাকে খুন করিতে হয়, তাহাও করিবে। জানি না, বিধাতা কেন ফুলসাহেবরূপী পিশাচকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন! ওই ফুলসাহেব আমার করুণাময় পিতাকে খুন করিয়াছে, স্নেহময়ী মাতাকে খুন করিয়াছে, আমার একমাত্র ভ্রাতাকেও খুন করিয়াছে; এমনভাবে খুন করিল—কেহ জানিল না—কেহ বুঝিল না; অথচ তিনটি প্রাণী খুনির বিষে এ-জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল! পিশাচ যে-বিষ দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে মানুষ একদিনে মরে না—তিল-তিল করিয়া মরিতে থাকে; কেবল আমিই এতদিন বাবাকে মরিতে দিই নাই; আমার বিমাতা বাবার খাবারজলের সঙ্গে প্রত্যহ বিষ মিশাইয়া রাখিত, আমি সুবিধা পাইলেই, সেই জল ফেলিয়া দিয়া অন্য জল খাইতে দিতাম। সকল দিন সুবিধা হইত না, পিতা শয্যাশায়ী হইয়াও এতদিন সেইজন্য বাঁচিয়াছিলেন; নতুবা বোধহয়, তিনমাসের মধ্যে তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত। বিষ খাইয়াও বাবাকে এতদিনে বাঁচিতে দেখিয়া ফুলসাহেব আর আমার বিমাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজনে কেবল পরামর্শ করিত; মধ্যে-মধ্যে বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দিত। বাবার কাছে একদিন এ-কথা তুলিয়াছিলাম। তাঁহার যেরূপ সরল মন আপনার মতো সকলকেই সরল ভাবিতেন। নারকী ফুলসাহেবের উপরে, আমার

সেই দানবী বিমাতার উপরে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হায়, এমন দুর্ভাগিনী আমি, এত করিয়া বাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না!'

কুলসমের আয়ত চোখদুটি অশ্রুসজল হইয়া লাসিল। বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কুলসম আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : কুলসমের দুঃখ ও ক্রোধ

অরিন্দম বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কুলসম, যাহা হইয়া গিয়াছে, সেজন্য এখন কাঁদিলে কোনও ফল নাই। এখন যাহাতে এই সকলের ঠিক প্রতিশোধ হয়, তাহা করিবে না কি? যাহাতে তোমার সেই পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পাপী নিষ্কৃতি না পায়, তাহাই কি এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য নয়? উপযুক্ত প্রতিফল দিবে না?'

চক্ষু মুছিয়া, কুলসম মুখ তুলিয়া ক্ষণেক অরিন্দমের মুখের দিকে ক্রোধ-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'সেই পাপীর গায়ে একটি আঁকুড় লাগিবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ব্যয় করিব—উপযুক্ত প্রতিফল তো দূরের কথা। ফুলসাহেব আমাদের সোনার-সংসার শ্মশান করিয়া দিয়াছে, এখন আমাকে কোনওরকমে হত্যা করিতে পারিলে পিশাচ নিষ্কণ্টক হইতে পারে। আমাদিগের বাড়িতে আর একজন লোক থাকিতেন, তাঁহার নাম সিরাজউদ্দীন। আজ একমাস হইল, ওই পিশাচ আমার বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকেও কোথায় সরাইয়াছে। আজও তাঁহার কোনও সংবাদ নাই। পিতা তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি ফুলসাহেবকে কখনও চিনিতে পারেন নাই; ফুলসাহেবের ষড়যন্ত্রে যে সে-কাজ হইয়াছিল, তাহা তিনি একবার সন্দেহও করিতে পারিলেন না। নিজে বিছানায় পড়িয়া; কী করিবেন, ফুলসাহেবকেই সিরাজের সন্ধান করিতে বলিলেন, সুতরাং কাজে কিছুই হইল না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ফুলসাহেব তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে; এখনও তাঁহাকে খুন করে নাই। সম্ভব, সেই বিখ্যাত ডাকাত কালু রায়ের কাছে সিরাজকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সিরাজউদ্দীন তোমাদের কে হন?'

কুলসম বলিল, 'সিরাজউদ্দীনের পিতা বসিরুদ্দীন আমার পিতার জমিদারির প্রধান নায়েব ছিলেন; শুধু বসিরুদ্দীন কেন—বসিরুদ্দীনের পিতা, পিতামহ বংশানুক্রমে—আমাদিগের জমিদারি নায়েবী কাজে অনেক টাকা উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বসিরুদ্দীন আমার পিতামহের আমল হইতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সংসারে ওই একমাত্র পুত্র সিরাজ ছাড়া আর কেহই ছিল না। আজ পনেরো বৎসর হইল, বসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়; তখন তাঁহার পুত্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। মৃত্যুকালে বসিরুদ্দীন আমার পিতার হাতেই সিরাজউদ্দীনকে সমর্পণ করিয়া যান। সিরাজ আবার যেরূপ নম্র, বিনয়ী, বাধ্য, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমার পিতার খুব স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। পিতা আপনার পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি সিরাজউদ্দীনের ভরণপোষণের জন্য, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিছুতেই এ-পর্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে এক কপর্দক লইতেন না—নিজের ব্যয়ে সকলই নির্বাহ করিতেন। সিরাজ ইদানীং কলিকাতায় একজন বিখ্যাত সাহেব চিত্রকরের নিকটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন; সেজন্য বেতন ও বাসাখরচ ইত্যাদিতে প্রায় মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগিত। তাহাও আমার পিতা তাঁহাকে দিতেন। সিরাজ ইদানীং কলিকাতা হইতে মধ্যে-মধ্যে এখানে আসিতেন, তিন-চারিদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। ফুলসাহেব হইতেই যে আমাদিগের সংসার ক্রমে ধ্বংসের দিকে যাইতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি বাবাকে কতবার বুঝাইয়াছিলেন; মায়াবী ফুলসাহেবের মোহমন্ত্রে বাবা এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই ফুলসাহেবের উপরে তিলমাত্র সন্দেহ করিতে পারিতেন না; তথাপি সিরাজউদ্দীন যখনই এখানে

আসিতেন, বাবাকে ফুলসাহেব সম্বন্ধে অনেক বুঝাইতেন।'

অরি। এই একমাত্র কারণেই কি ফুলসাহেব তাঁহাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছেন, না তাঁহার আর কোনও উদ্দেশ্য আছে?

'আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেইটিই বোধহয় প্রধান,' বলিয়া কুলসম একটু লজ্জিতভাবে নতমুখী হইল।

অরি। কী?

কুলসম উত্তর করিল না। সেইরূপ অবনতমস্তকে চুপ করিয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, 'কুলসম, লজ্জা করিয়া আমার কাছে কোনও কথা অপ্রকাশ রাখিয়ো না।'

কুলসম নতমুখে বলিল, 'তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল।'

অরিন্দম বলিল, 'আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম। কালু রায় ডাকাতের কাছে তিনি যে এখনও বন্দি আছেন, এ-কথা তোমাকে কে বলিল?'

কু। একদিন ফুলসাহেবের সঙ্গে আমার বিমাতা এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল। আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম।

অ। কালু রায় যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত দস্যু, তাহার হাত হইতে সিরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়; তথাপি আমি তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিব। এ-পর্যন্ত কোনও গোয়েন্দা কালু রায়কে ধরিতে পারে নাই। ধরা দূরে থাক, সে কোথায় থাকিয়া ডাকাতি করে, সে-সন্ধানও কেহ করিতে পারে নাই। অনেকে তাহাকে ধরিতে গিয়া তাহারই হাতে প্রাণ দিয়াছে। আমিও তাহাকে ধরিবার জন্য অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শুনিয়া কুলসমের মুখ শুকাইল। সে অরিন্দমের মুখে কালু রায়ের যে অখণ্ড প্রতাপের কথা শুনিল, তাহাতে তাহার হাত হইতে যে কখনও সিরাজ মুক্তি পাইবেন, এ-আশা তখন আর কিছুতেই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; নিরাশার অপরিহার্য উৎপীড়নে তাহার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। কুলসম সিরাজকে কত ভালবাসে, তাহা সে নিজেও কিছুই বুঝিতে পারিত না; সে-ভালোবাসা উদ্দাম, পরিপূর্ণ, নিবিড়, অথচ অতি চঞ্চল, তথাপি ইহা অধীর যৌবনের একটা আরও অধীর, আরও চঞ্চল আবেগময় মদিরোচ্ছ্বাস নহে; তাহা তাহার আজীবন ধরিয়া তিল-তিল করিয়া, খেলায়-ধূলায়, হাস্য-পরিহাসে, গাথা-গল্পে একটা অতি প্রগাঢ় আত্মীয়তার মধ্য দিয়া, দিনে-দিনে তাহার হৃদয় এমন অল্পে-অল্পে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, কুলসমকে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে দেয় নাই। তাহাতে বড় আসে যায় না। কুলসমের সে অপার্থিব, অগাধ, অতি সরল একটা মনোবৃত্তি অটল নির্ভরতার সহিত প্রেমের মোহিনী মূর্তিতে বাহির হইয়া যাহার পদপ্রান্তে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল—সেই সিরাজ যে ইহার অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়া, তিনি যে তাঁহার হৃদয়ের সকল দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহারই জন্য সতত সমগ্র হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইহাই কুলসমের যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত।

কুলসম শঙ্কাকুল হৃদয়ে অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে কি তাঁহার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?'

অরিন্দম বলিলেন, 'উপস্থিত কোনও উপায় দেখিতেছি না। সিরাজের উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই আমি চেষ্টা দেখিব। তুমি ফুলসাহেবকে তোমার বিমাতার সঙ্গে আর কোনও বিষয়ে কোনও পরামর্শ করিতে কখনও শুনিয়াছ? কামদেবপুরের থানায় একটি বালিকার লাশ সমেত একটা কাঠের সিন্দুক চালান দেওয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কখনও কি কোনও কথা উঠিয়াছিল?'

'তিন-চারদিন হইল, একদিন ফুলসাহেব আমার বিমাতাকে ওই রকমের একটা কী কথা বলিতেছিল, আমি তাহা ভালো বুঝিতে পারি নাই; সেই কথায় তখন তাহাদের মধ্যে একটা খুব হাসি পড়িয়া গিয়াছিল।'

BanglaBook.org

'সেই সময়ে তাহাদিগকে কাহারও নাম করিতে শুনিয়াছ?'

'তিন-চারিজনের নাম করিয়াছিল, সে-সব নাম আমি আগে কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই।'

'নামগুলি মনে আছে?'

'হ্যাঁ—গোরাচাঁদ, গোপালচন্দ্র।'

'আর কী? তুমি যে তিন-চারিজনের নাম শুনিয়াছ বলিলে?'

'আর দুইটি স্ত্রীলোকের নাম; বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের নাম আমাদের বড় মনে থাকে না—বিশেষত, সে-নাম দুইটি যেন কেমন একটু নূতন রকমের।'

'রেবতী? রোহিণী?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, ওই দুইটি নামই তখন তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন বেশ মনে পড়িতেছে।'

তখন অরিন্দমের চোখের উপর হইতে অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল, সম্পূর্ণ রহস্যময় একটা অতি জটিল প্রহেলিকার দুর্ভেদ্য যবনিকা সহসা দূরে সরিয়া গেল—অরিন্দম স্তম্ভিত হইলেন। তিনি কুলসমকে বলিলেন, 'তোমার এখন বাড়িতে যাওয়া হইবে না, এইখানে থাক; সন্ধ্যার পূর্বেই তোমাকে আমি রাখিয়া আসিব।'

'কেন?'

'পরে জানিতে পারিবে,' বলিয়া অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'বন্ধুবর, কুলসমকে বাড়ির ভিতরে রাখিয়া আসুন।'

যোগেন্দ্রনাথ কুলসমকে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর অরিন্দমকে লইয়া থানার দিকে চলিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্ত মন্ত্রণা

থানার একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দমের একটা গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে উভয়ে বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ একজন দারোগাকে ডাকিয়া তাহাকে ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধরিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সহজে কেহ না চিনিতে পারে, এমন একটা ছদ্মবেশে তিনি নিজেও সাজিলেন। অরিন্দম সেই বেশেই রহিলেন। তখনই তিনজনে একখানি গাড়িতে উঠিয়া অতি সত্বর ফুলসাহেবের গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে যোগেন্দ্রনাথ দশজন পাহারাওয়ালাকে কিছুক্ষণ পরে ফুলসাহেবের বাটির নিকটবর্তী একটি গুপ্ত স্থানে উপস্থিত হইতে বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে সকলে ফুলসাহেবের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফুলসাহেবের বাড়িখানি মন্দ নহে, দ্বিতল—ছোটর উপরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে একখানি ছোট ফুলের বাগান। বাগানে দুই-একটি করিয়া অনেক রকমের ফুলের গাছ। সেই বাগানের মধ্যে একজন মালী বসিয়াছিল—তাহাকে যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডাক্তারবাবু এখন আছেন কি?'

মালী বলিল, 'উপরে আছেন, একটু পরে নিচে আসিবেন।'

বাহিরের একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া তিনজনে উপবেশন করিলেন। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। অরিন্দম নীরবে একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। সেখানে গিয়া একটি অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে দুই ব্যক্তিকে কথোপকথন করিতে শুনিলেন। সেই দুইজনকে তিনি তখন না দেখিতে পাইলেও কণ্ঠস্বরে তদুভয়কে বেশ চিনিতে পারিলেন, একজন ফুলসাহেব, অপর লোকটি সেই গোরাচাঁদ। যে-কক্ষে বসিয়া তাহারা কথোপকথন করিতেছিল, সেই কক্ষের দ্বারে একটি অঙ্গুলি দিয়া ধীরে ঠেলিয়া দেখিলেন, তাহা ভিতর হইতে অবরুদ্ধ। তিনি

সেই কবাটের উপর কান রাখিয়া তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

ফুলসাহেব। কেমন, তুমি কি বোধ কর, এদিকের কাজ অনেকটা শেষ করিয়া আনিতে পারি নাই?

গো। এখন এই শেষটা রাখাই বড় শক্ত কথা।

ফুল। তুমি সহায় রহিয়াছ, জুমেলিয়া সহায় রহিয়াছে, ইহাতেও যদি শেষরক্ষা শক্ত কথা হয়, তবে আর সহজ হইবে কিসে?

গো। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে বোধহয়, আপনি এত শীঘ্র এতটা কাজ কখনওই হাসিল করিতে পারিতেন না।

ফু। জুমেলিয়াই আমার দক্ষিণ হস্ত। সেইজন্যই তো কৌশল করিয়া আমি আগে তমীজউদ্দীনের স্ত্রীকে মারিয়া তাহারই আসনে জুমেলিয়াকে মতিবিবি করিয়া বসাই। তারপর সেই জুমেলিয়ারই খাতিরে তমীজউদ্দীনের সংসারে আমার একাধিপত্য; কিন্তু জুমেলিয়াকেও বিশ্বাস করিতে আমার প্রাণ চায় না—সে আমার একটা উপপত্নী ব্যতীত আর কেহই নয়। তা ছাড়া তার কূটবুদ্ধিতে, তার সাহসে, তার পরাক্রমে অনেক সময়ে সে আমাকেও ছাড়াইয়া অনেক দূরে উঠে। সেইজন্য একটু ভয় হয়, আমাকে আবার কোনওরকমে ফাঁকি না দেয়।

গো। একটা স্ত্রীলোক আপনাকে ফাঁকি দেবে? সেইজন্য আবার আপনার ভয় হয়? শুনে হাসি পায়।

ফু। জুমেলিয়াকে যে-সে স্ত্রীলোক মনে করিও না, জুমেলিয়ার যেরূপ ক্ষমতা—যেরূপ মনের বল, অনেক পুরুষেরও এমন নাই। সে না করিতে পারে, এমন কাজ কিছুই নাই। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে তমীজউদ্দীনের সংসার হইতে তিনটি প্রাণীকে এত সহজে আমি মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিতে পারিতাম বলিয়া বোধ হয় না। দেখ দেখি, কেমন নির্বিঘ্নে তিন-তিনটি খুন হইয়া গেল; অথচ কেহ কিছুই জানিল না—কেহ একটু সন্দেহও করিতে পারিল না! এরূপ বেমালুম খুন করিবার একশত আট রকম বিষ আমার হাতে আছে; তমীজউদ্দীনের বাড়িতে যে-বিষ ব্যবহার করিয়াছিলাম, প্রত্যহ খাবার জলের সঙ্গে একবার একফোঁটা করিয়া দিলে ঠিক ছয়মাসের মধ্যে মানুষ মরে; খুব বলিষ্ঠ হইলে আটমাসও লাগে—স্ত্রীলোককে চারিমাসের অধিক খাওয়াইতে হয় না। তবে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে হইলে রোজ দুই ফোঁটা এমনকী তিনফোঁটা করিয়া খাওয়ানো চলে—তার বেশি দেওয়া চলে না—তাহা হইলে জলটা একটু কষায় বোধ হয়। অরিন্দমকে চুরুটের সঙ্গে যে-বিষ দিয়া হত্যা করিলাম, উহাতে দশঘণ্টার মধ্যে যেমন বলবান লোক হউক না কেন—নিশ্চয়ই মরিবে।

গো। অরিন্দমকে হত্যা করায় ওইখানেই সকল কার্যের গোড়া বাঁধা হইয়াছে; এখন আর কাহাকে ভয় করিব?

ফু। অরিন্দম বড় সহজ লোক ছিল না; আজ-কাল না হোক, দুদিন পরে না হোক, এক-সময়ে-না-একসময়ে সে আমাকে ধরিতে পারিত। লোকটি বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছিল, তা বলিয়া আমি তাহাকে কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ভয় করি নাই। ওই রকম সাতটা অরিন্দম যদি মিশিয়া একটা হইয়া আসিত—তাহা হইলেও ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত না—ভয় কাহাকে বলে অদৃষ্টক্রমে এ-পর্যন্ত ফুলসাহেবের সে-শিক্ষা হয় নাই।

গো। অরিন্দম শুধু বুদ্ধিমান ছিল না—বলবানও যথেষ্ট ছিল, সেদিন সেই মাঠে লইয়া তাকে হত্যা করিতে গিয়া সে-প্রমাণ আমি বেশ পাইয়াছি। আগে আমার এমন বিশ্বাস ছিল না যে, কোনও লোক আমাকে এত শীঘ্র কাবু করিতে পারে। সে যাই হোক, আমার বোধহয়, সেই সময়ে যদুনাথ গোস্বামীর সেই পত্রখানি অরিন্দম আমার কাছ থেকে হস্তগত করিয়া থাকিবে; সে-পত্রে অনেক কথা খুলিয়া লেখা ছিল। তাহাতেই সে তখন রেবতীর মাতামহকে খবর দিয়া যদুনাথের বাড়ি থেকে রেবতীকে সরাইয়া দেয়।

BanglaBook.org

ফু। তুমি ভুল বুঝিয়াছ, রেবতী মাতামহের নিকটে গিয়াছে, এ-কথা একটি ছলমাত্র। রেবতীর সন্ধান করিতে না পারিলে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যখন অরিন্দমকে এ-সংসার হইতে বিদায় করিতে পারিয়াছি, তখন আর ভয় কী? সকল কাজই আমরা নির্বিঘ্নে অথচ খুব শীঘ্রই শেষ করিয়া উঠিতে পারিব।

গো। এদিকে রেবতীকে সন্ধান করিয়া শীঘ্র বাহির করিতে না পারিলে, গোপালচন্দ্রের কাছে একটি পয়সাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ফু। তাহা তো জানি, তুমি কি মনে কর, সেজন্য আমি কোনও চেষ্টা করিতেছি না? অরিন্দম যখন মরিয়াছে, তখন আর ভাবনা কী? আমি সকল সন্ধান রাখিয়া থাকি। ইদানীং যে অরিন্দম কেশবচন্দ্রের সন্ধানে ঘুরিতেছিল, তাহাও জানি; কিন্তু বোকারাম জানিত না যে, সেই কেশবচন্দ্র এদিকে ফুলসাহেব-মূর্তিতে তার চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অরিন্দম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে—ততদূর নহে, কারণ পূর্বেই তিনি অনেকটা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। আরও মনোযোগের সহিত কবাটের উপর কান রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ বলিল, 'এখন কুলসম যদি আপনাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আপনি তো অনেকটা তফাতে পড়িলেন।'

ফুলসাহেব বলিল, 'না স্বীকার করে, তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা যেখানে গিয়াছে, কুলসমকেও সেখানে পাঠাইব।'

গো। কুলসমকে হত্যা করিলেই একটা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ফু। কিছু না—কিছু না। এমনভাবে কাজ করিব যে, কেহ জানিতে পারিবে? হা—হা—হা (হাস্য) তা হলে তুমিও এখন আমাকে ঠিক চিনিতে পার নাই দেখিতেছি। দিনকে রাত করিতে পারে, রাতকে দিন করিতে পারে, এমন ক্ষমতা ফুলসাহেবের যথেষ্ট আছে।

গো। আমিও তা যথেষ্ট জানি। সিরাজউদ্দীনকে কতদিন সেইখানে রাখিবেন?

ফু। যতদিন আবশ্যক বোধ করিব।

গো। কুলসমকে আগে বিবাহ করিয়া তাহার পর তাহাকে কি ছাড়িয়া দিবেন?

ফু। তার কোনও ঠিক নাই; হয়তো সিরাজও মরিবে। তাহাকে যে এতদিন খুন করি নাই, তাহার একটা কারণ আছে। শুধু কুলসমের জন্য তাহাকে আমি সেখানে আটক রাখি নাই। ইহার ভিতরে আমার আর একটা গূঢ় অভিপ্রায় আছে।

গো। সে অভিপ্রায়টা কী?

ফু। পরে জানিতে পারিবে, এখন থাক।

এই বলিয়া ফুলসাহেব উঠিল; উঠিয়া বলিল, 'তুমি বসো, আমি নিচে হতে এখনই আসিতেছি।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ ফুলসাহেব ধরা পড়িল

অরিন্দম তখনই তাড়াতাড়ি নিচের সেই বৈঠকখানায় আসিলেন। সেখানে ছদ্মবেশী যোগেন্দ্রনাথ ও সেই দারোগা বসিয়া ছিলেন। উভয়েই অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইল?'

'ডাক্তার আসিতেছে,' বলিয়া নিমেষ-মধ্যে অরিন্দম সেইখানে একখানা বেঞ্চের উপর নিজের দীর্ঘ দেহটি ছড়াইয়া দিলেন এবং নিমেষ-মধ্যে তখন তাহাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। তাহার পর নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুদিলেন।

তখন ডাক্তার ফুলসাহেব সেই বৈঠকখানার দ্বারের উপর দেখা দিলেন।

BanglaBook.org

ছদ্মবেশী দারোগা বলিল, 'আমরা অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। (অরিন্দমকে দেখাইয়া) এই লোকটির মূর্ছারোগ আছে ; প্রত্যহ দুইবার-তিনবার মূর্ছা যায়, এতক্ষণ ভালো ছিল—এখানে আসিয়া আবার রোগে ধরিয়াছে; ভালোই হইয়াছে, ইহাতে রোগ কী আমাদিগকে আর ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে, না—আপনি রোগীকে দেখিয়াই ঠিক করিতে পারিবেন?'

কোনও কথা না কহিয়া ফুলসাহেব রোগীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্তী হইয়া দেখিয়া চিনিল—এ যে অরিন্দম—অভাবনীয়রূপে চমকিত হইয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। মুখ-চোখের ভাব বদলাইয়া গেল। সে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত—তখনই তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতর হইতে একখানি শাণিত দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের বুকে বিদ্ধ করিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিল। বাতায়নপ্রবিষ্ট সূর্যরশ্মি লাগিয়া ছুরিখানা ঝকমক করিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ পশ্চাদিক হইতে দুই হাতে ফুলসাহেবের সেই হাতখানি ঘুরাইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। অরিন্দমও সহসা উঠিয়া তাহার অপর হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন এবং দারোগা তদুভয়ের সাধ্যমতো সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল; তখন সেই ঘরের ভিতর চারিজনে একটা খুব ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। ফুলসাহেব এত বলবান যে, অরিন্দম, যোগেন্দ্রনাথ আর দারোগা তিনজনে মিলিয়াও শীঘ্র তাহাকে বন্দি করিতে পারিলেন না। সেই ঘরের ভিতরে একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল—ফুলসাহেব সহজ নয়; প্রায় অর্ধঘণ্টার পরে সেই তিনজন পুলিশ-কর্মচারীর একান্ত জেদাজেদি ও আগ্রহাধিক্যে অতি পরিশ্রমের পর ফুলসাহেবের হাতে তিন জোড়া হাতকড়ি দৃঢ়সংলগ্ন হইল।

ফুলসাহেব ধরা পড়িল।

তারপর গোরাচাঁদের অনুসন্ধান করা হইল—তাহাতে পাওয়া গেল না। সে বাহিরের গোলযোগ শুনিয়া, ইতিমধ্যে ভিতর-বাটির একটা জানালা ভাঙিয়া, নিজের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল।

অরিন্দম উপহাসের মৃদুহাস্যে ফুলসাহেবকে বলিলেন, 'কেমন গো ডাক্তারবাবু, এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, অরিন্দম মরে নাই—ঠিক আগেকার মতো বাঁচিয়া আছে?'

অরিন্দমের কথা শুনিয়া ফুলসাহেবের মুখে একবার সেই চিরাভ্যস্ত অপূর্বভঙ্গিতে এক-অপূর্বরহস্য-প্রাপ্ত অমঙ্গলের মৃদু হাসি দেখা দিল। সদর্পে সেই হাসির সহিত মিষ্টকণ্ঠে বলিল, 'যতক্ষণ ফুলসাহেব বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ অরিন্দম না মরিলেও মরিতে বেশিক্ষণ নয়—ততক্ষণ নিজেকে নিরাপদ মনে করা অরিন্দমের মহাভ্রম।' তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, 'শোনো অরিন্দম, যদি কোনওরকমে কখনও তোমাদের হাত হইতে পালাইতে পারি, তখন দেখিয়ো, আবার এই ফুলসাহেব আরও কী নিদারুণভাবে—আরও কী আশ্চর্য কৌশলে তোমাকে মরণের মুখে তুলিয়া দেয়!' বলিয়া অয়স্কঙ্কণাবদ্ধ হাত দুইখানি রাগ ভরে সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত করিল—হাতকড়িগুলি পরস্পর আঘাত পাইয়া সেইসঙ্গে ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল।

সকলে মিলিয়া ফুলসাহেবকে থানার দিকে লইয়া চলিলেন। পূর্বে যে-দুজন পাহারাওয়ালাকে যোগেন্দ্রনাথ আসিতে বলিয়াছিলেন, পথে তাহাদের সহিত দেখা হইল।

অরিন্দম একজন পাহারাওয়ালা ও সেই দারোগাকে সঙ্গে লইয়া কুলসমের বাটি-অভিমুখে চলিলেন। আর সকলে ফুলসাহেবকে লইয়া থানায় গেলেন।

BanglaBook.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : জুমেলিয়া ধরা পড়িল

ফুলসাহেব ধরা পড়িয়াছে। সে খুনি—সে দস্যু—সে জালিয়াত এবং সে ভয়ানক লোক, সুতরাং তাহার ফাঁসি হইবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাটিতে বসিয়া জুমেলিয়া

ওরফে মতিবিবি সে-কথা শুনিল। প্রথমে বিশ্বাস করিল না—হাসিয়া কথাটাকে মন হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর অনেকের মুখে সেই একই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইল। তখন আপন শয়ন-গৃহে যাইয়া, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মতিবিবি ঝটিকাচ্ছন্ন মাধবীলতার ন্যায় নিজের অবসন্ন দেহখানিকে প্রশস্ত বিছানার উপরে বিস্তৃত করিয়া দিল। অনেক রকম দুর্ভাবনায় তাহার সমস্ত হৃদয় উপদ্রুত ও অত্যাচারিত হইলে লাগিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে সেই অবরুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাতের গুমগুম শব্দ হইতে লাগিল। জুমেলিয়া চকিতে উঠিয়া বসিল—(পাঠক, আমরা জুমেলিয়াকে আর মতিবিবি না বলিয়া এখন হইতে জুমেলিয়াই বলিব।) জুমেলিয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

বাহির হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, 'আমি আমিনা।'

আমিনা তমীজউদ্দীনের সংসারের নবীনা দাসী; কিন্তু সে দাসীর মতো থাকিত না—সে নিজের বুদ্ধিচাতুর্যে প্রভু-কন্যার সহচরীপদ লাভ করিয়াছিল।

জুমেলিয়া বলিল, 'কেন? কী দরকার?'

আমিনা বলিল, 'দরজা খোলো—বলিতেছি—অনেক কথা আছে।'

জুমেলিয়া উঠিয়া কবাট খুলিয়া দিল; দেখিল, বারান্দার উপরে দ্বারের সম্মুখে ভীষণ মূর্তিতে দাঁড়াইয়া অরিন্দম আর তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যমদূতাকৃতি একজন দারোগা, আর একজন পাহারাওয়ালা এবং আমিনা হাসিয়া পলাইয়া যাইতেছে—দেখিয়া, জুমেলিয়ার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। বুঝিতে বাকি রহিল না, ফুলসাহেব ধরা পড়ায় সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমিনা কৌশল করিয়া তাহাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল। নিদারুণ রোষে তাহার মুখ-চোখ আরক্ত হইয়া গেল এবং চোখ দুটি উল্কাপিণ্ডবৎ জ্বলিয়া উঠিল। কোনও কথা কহিতে পারিল না; সেই মুহূর্তেই—এই অংশটি পাঠ করিতে পাঠকের যতটুকু সময় ব্যয়িত হইল—তাহার শতাংশের একাংশও লাগিল না—জুমেলিয়া সবেগে বাম হস্তে আমিনার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—সেইসঙ্গে অপর হস্তে কটির বসনাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিতোজ্জ্বল তীক্ষ্ণাগ্র অতি দীর্ঘ কিরীচ বাহির করিয়া তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল—পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া কিরীচের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল; জুমেলিয়া তখনই কিরীচ টানিয়া তুলিয়া লইল। 'বাবা রে—মা রে—গেছি রে' বলিয়া আমিনা সেইখানে পড়িয়া শোণিতাক্ত কলেবরে লুটাইতে লাগিল এবং প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইয়া সেখানকার অনেকটা স্থান প্লাবিত করিল। তখন সেই পিশাচীর সম্মুখীন হওয়া কতদূর শঙ্কাজনক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা ভয়ে দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইল। অরিন্দম বুঝিলেন, এ-সময়ে ভয় করিলে চলিবে না—বরং তাহাতে বিপদ আছে; যেমন বুক হইতে জুমেলিয়া কিরীচখানি টানিয়া তুলিয়াছে, অমনি ছুটিয়া গিয়া অরিন্দম তাহার সেই কিরীচ সমেত হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা তখন সত্বর হইয়া জুমেলিয়ার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল; কিন্তু জুমেলিয়া সেই সময়ে অকর্মণ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে সেই কিরীচখানি লইয়া ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি অরিন্দমকে আঘাত করিতে গেল; অরিন্দমকে না লাগিয়া, সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট কিরীচ পার্শ্ববর্তী পাহারাওয়ালার কটিদেশে লাগিয়া অনেকটা বিদ্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া আমিনার মতন সে-ও রক্তপ্লাবিত দেহে মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। দারোগা তখন দুই হাতে জুমেলিয়ার কিরীচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল। অরিন্দম জোর করিয়া জুমেলিয়ার হাত হইতে কিরীচখানি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিজের হাতে দুই-একস্থান কাটিয়া গিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। অরিন্দম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জুমেলিয়ার হাতে ডবল হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন।

জুমেলিয়া ধরা পড়িল।

অরিন্দম পূর্বে জুমেলিয়াকে যত সহজে গ্রেপ্তার করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কার্যত তাহা ঘটিল না। অরিন্দম তখন বুঝিতে পারিলেন, জুমেলিয়ার মতো এমন প্রখরা, প্রবলা, দুর্দমনীয়া, মরিয়া

BanglaBook.org

স্ত্রীলোক আর কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; দুইজনকে আহত করিয়া তাহার পর সে ধরা পড়িল। দৃঢ়স্বরে জুমেলিয়া অরিন্দমকে বলিল, 'বড় জোর কপাল তোমার অরিন্দম! তাই তুমি আমার হাত হইতে আজ পার পাইলে, যদি আর একটু অবসর পাইতাম—যদি এত শীঘ্র আমাকে নিরস্ত্র হইতে না হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে কেমন করিয়া আমি তোমার রক্তে স্নান করিতাম।'

অরিন্দম বলিলেন, 'ফুলসাহেবের উপপত্নীর পক্ষে এ-বড় আশ্চর্য কথা নহে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'আমি ফুলসাহেবের উপপত্নী? এ-মিথ্যা কথা তোমায় কে বলিল?'

অরিন্দম বলিলেন, 'জুমেলিয়া, আমি ফুলসাহেবের মুখে সব শুনিয়াছি; তুমি বিষ দিয়া কুলসমের পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছ, তাহাও আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি।'

জুমেলিয়া বলিল, 'মিথ্যা কথা! ইহাও কি ফুলসাহেব স্বীকার করিয়াছে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

জুমেলিয়া বলিল, 'তবে আমিও স্বীকার করিতেছি। (ক্ষণপরে) এখন আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যেখানে তোমার পাপের ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'চলো যাইতেছি; কিন্তু শুনিয়া রাখো, নির্বোধ অরিন্দম! সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী জুমেলিয়াকে ঘাঁটাইয়া তুমি ভালো কাজ করিলে না; তুমি সাধ করিয়া সাপের গায়ে হাত দিয়াছ—ইহার উপযুক্ত প্রতিফল তোমাকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে।'

অরিন্দম ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, 'সেজন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না—আমার ভাবনা ভাবিতে আমার যথেষ্ট অবসর আছে। অরিন্দম তোমার মতো সাতটা জুমেলিয়াকে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে।'

জুমেলিয়া একটা উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া—হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'আরে যাও, অরিন্দম, আর মুখ তুলিয়া কথা কহিয়ো না, ছিঃ-ছিঃ—তাই একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে একা আসিতে সাহস করো নাই—দল বাঁধিয়া আসিয়াছ—ধিক তোমায়! এখন দেখিতেছি, তোমার মতো কাপুরুষের দেহে অস্ত্রাঘাত না করিয়া আমি ভালোই করিয়াছি—তাহাতে আমার হাত কলঙ্কিত হইত।'

জুমেলিয়াকে লইয়া অরিন্দম ও দারোগা থানায় চলিলেন। সেই কথা লইয়া তখনই গ্রামের মধ্যে আবার একটা হইচই পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে আহতা আমিনার প্রাণবিয়োগ হইল। আঘাত তেমন সাঙ্ঘাতিক না হওয়ায় সেই পাহারাওয়ালার প্রাণটা এবারকার মতো থাকিয়া গেল।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে তথাকার জেলখানার একটা ঘরে হাজত-বন্দি রাখা হইল; অধিকন্তু তদুভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে একজন প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে ফিরিতে লাগিল।

BanglaBook.org

তৃতীয় খণ্ড

সর্পিণী—সুবর্ণরূপা

Think not I love him, though I ask for him;

* * * * * * *

I love him not, nor hate him not; and yet
I have more cause to hate him then to love him;
For what had he to do to chide at me?
He said mine eyes were black, my hair black;
And now I am remember'd scorn'd at me.

—"Dodd's Beauties of Shakespeare."

BanglaBook.org

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যু-চুম্বন

যেদিন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া ধরা পড়ে, সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ মেঘ করিয়া বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। সেই দিগন্তব্যাপী মেঘে বাতাস বন্ধ হইয়া এমন একটা গুমোট করিল যে, নিশ্বাস ফেলাও একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারাকার কৃষ্ণমেঘ হইতে অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঢাকিয়া—ভূতল হইতে আকাশতল ব্যাপিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে উন্নত, দীর্ঘশীর্ষ, শাখাপ্রশাখাপল্লববহুল বৃক্ষগুলি বিকটাকার দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক, নিকটে অন্ধকার—দূরে আরও অন্ধকার—বহুদূরে তদপেক্ষা আরও অন্ধকার—সেখানে দৃষ্টি চলে না। সেই ভয়ানক বিভীষিকাময় অন্ধকারময়ী রাত্রি-দ্বিপ্রহরের শেষে হাজতঘরের ভিতরে হস্তপদবদ্ধ ফুলসাহেব একপাশে পড়িয়া অমানুষিক নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিজের গভীর নিদ্রার পরিচয় দিতেছিল। একটু দূরে জুমেলিয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল—এবং বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহারই কতক অংশ লৌহনির্মিত গরাদযুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহারই একখণ্ড আলোক লাগিয়া জুমেলিয়ার মুখমণ্ডল বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল; সে-মুখ ম্লান নহে—বিষণ্ণ নহে—তাহাতে চিন্তার কোনও চিহ্নই নাই, বরং কিছু প্রফুল্ল। দ্বার-সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী ঘন-ঘন পরিভ্রমণ করিতেছিল; আর সেই প্রফুল্ল মুখখানি সতৃষ্ণনেত্রে দেখিতেছিল। সেই চন্দ্রশূন্য, তারাশূন্য, দিগ্‌দিগন্তশূন্য, শব্দশূন্য, মেঘময়, অন্ধকারময়, বিভীষিকাময় রজনীর অনন্ত ভীষণতার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি কত সুন্দর—পাঠক, তুমি-আমি ঠিক বুঝি না—প্রহরীর তখন সেই সৌন্দর্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। মুগ্ধ প্রহরীর মুখ-চোখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া জুমেলিয়ার বুঝিতে বাকি ছিল না যে, প্রহরী-পতঙ্গ তাহার রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিয়া, যখন প্রহরী আর একবার ঘুরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তখন জুমেলিয়া তাহার সেই যেমন-চঞ্চল-তেমনই-উজ্জ্বল নেত্রে প্রহরীর প্রতি এক বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বেচারা বড় বিভ্রাটে পড়িল, সে সচেতন থাকিয়াও অচেতন মতো হইল-এবং তাহার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, পা কাঁপিতে লাগিল, বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল, সে চোখে অন্ধকার দেখিল, কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগিল এবং দেহের লোমগুলি পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া—সেখান হইতে সরিয়া—দূরে গিয়া একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুকের ভিতরে সেই দবদবানিটা কিছুতেই গেল না। প্রহরী তখন নিজের অবস্থা যত বুঝিতে না-ই পারুক—জুমেলিয়া সম্পূর্ণরূপে পারিল। জুমেলিয়া ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে।

প্রহরী আবার ঘুরিয়া দ্বার-সম্মুখে কম্পিতপদে ফিরিয়া আসিলে জুমেলিয়া তাহাকে বলিল, 'পাহারাওয়ালাজী, আমাদের জন্য তোমার কত কষ্ট হচ্ছে—।'

প্রহরী মোলায়েমস্বরে বলিল, 'আরে ন্যাহি—ইয়ে হামরা আপনা কাম হ্যে।'

জুমেলিয়া পূর্ববৎ মিষ্টকণ্ঠে বলিল, 'তা যাই বলো, পাহারাওয়ালাজী, এ মানুষের উপযুক্ত কাজ নয়—এই রাত্রে কোথায় স্ত্রীকে বুকে নিয়ে ঘুমুবে, না বন্দুক ঘাড়ে করে হরঘড়ি একবার এদিক, একবার ওদিক করে ঘুরছ।'

প্রভুভক্ত প্রহরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যিসকা নিমক খ্যায়, উসকা কাম জান দেকে করনা চাহিয়ে।'

তাহার পর জুমেলিয়া এ-কথা সে-কথা অনেক অবান্তর কথা পাড়িল, তাহার পর অনেক সুখদুঃখের কথা উঠিল, বিরহব্যথার কথা উঠিল, জুমেলিয়া প্রহরীর দুঃখে অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইল। তাহার সহানুভূতিসূচক কথাগুলি বীণাগীতিবৎ প্রহরীর শ্রুতিতে সুখজনক আঘাত করিতে লাগিল। জুমেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা পাহারাওয়ালা সাহেব, তুমি তো আজ তিন বৎসর বাড়ি যাও না—তোমার

BanglaBook.org

স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আছে? আমি হলে তো তোমায় একদণ্ড চোখের তফাত করতেম না—তাতে খেতে পাই ভালো, বহুৎ আচ্ছা—না খেতে পাই, সেভি বহুৎ আচ্ছা।'

পাহারাওয়ালা সহাস্যে বলিল, 'আপলোগ বড়া আদমী; সবভি কর সকতে। আউর হমলোগ গরিব আদমী, আগে পেটকা ধান্দা করনে পড়তা।'

জুমেলিয়া বলিল, 'তোমার কয়টি ছেলে?'

প্রহরী। দো লেড়কা আউর ছও মাহিনেকী এক লেড়কী হুয়ি।

জু। তুমি তো আজ তিন বৎসর দেশে যাওনি, তবে এর মধ্যে আবার ছয় মাহিনেকী এক লেড়কী এল কোথা থেকে?

প্রহরী মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, 'আরে ক্যায়াবাৎ, হম হর মাহিনে চিঠি ভেজতা আউর জবাব ভি আতা, ইসি হালসে মেরা বড়া লেড়কা ভিখুরাম নৈ পয়দা হুয়া থা।'

জু। আরে পোড়ারমুখ, চিঠি লিখলে লেড়কা পয়দা হবে কী করে?

প্র। হামলোগকো চিঠিমে সব কাম হোতা।

কথা শুনিয়া জুমেলিয়া খুব একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি ভিখুর মাকে খুব ভালোবাসো?'

প্র। ভিখুমায়কি কেয়া ভালা বুরা?

জু। না না—তোমরা যাকে পিয়ার করা বলো?

প্র। হাঁ হাঁ, বহুৎ পিয়ার করতে হেঁ।

জু। ভিখুর মা দেখতে আমার চেয়ে সুন্দরী?

প্র। আরে রাম রাম! তোমরে মাফিক খ্যপসুরৎ হোনেসে হামরা হাজার রূপিয়া তলব মিলনেসে এক ঘড়িভি নহি ছোড় দেতা।

জু। এখন এ-কথা বলিতেছ; তখন বোধহয়, আমার মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিতে না; হয়তো—হয়তো কেন? নিশ্চয়ই দেশে আমাকে একা ফেলে রেখে, এখানে এসে কোম্পানির সাজগোজের সঙ্গে, চাপরাসের সঙ্গে, আর সঙিনদার বন্দুকটির সঙ্গে প্রণয় বেশ জাঁকিয়ে ফেলতে পাহারাওয়ালাজী। তুমি তো এখানে কোম্পানি বাহাদুরের পাহারা দিচ্ছ। সেখানে ভিখুর মা-র পাহারার ভার কার উপরে দিয়ে এসেছ? সেখানে যদি লুঠ হয়ে যায়?

প্রহরী জুমেলিয়াকে নির্দেশ করিয়া কহিল, 'আসা জহরৎ ছোড়কে কোই সিসা লুঠনে যাতা হই?'

জু। আমি খুব ভালো জিনিস? একেবারে জহরৎ?

প্র। আলবৎ—ইসমে ক্যায়া সক হই?

জু। দেখ, দুর্বল সিং।

প্র। হামারা নাম দুর্বল সিং নাহি হই।

জু। তবে কি মরণাপন্ন সিং?

প্র। ন্যাহি ন্যাহি—হামার নাম লঙ্কেশ্বর সিং।

জু। বাহবাঃ কি বাহবাঃ! চমৎকার নাম! ওই যে কী বলছিলেম—ভালো, হ্যাঁ মনে হয়েছে, দেখ লঙ্কেশ্বর সিং, বলতে লজ্জা হয়—তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা যেন কিস মাফিক হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার ওই আলু-চেরা চোখ, ওই হাতির মতো নাক, এই শতমুখীর মতো গোঁফ, আর ঝাউবনের মতো দাড়ি, আমার মাথা খেয়েছে—ইচ্ছা করে, তোমাকে নিয়ে বনে গিয়ে দুজনে মনের সুখে বাস করি। তা বিধাতার কী মরজি, তোমার হাতে আমাকে না দিয়ে (ফুলসাহেবকে দেখাইয়া) এই খুনির হাতে আমাকে তুলে দিয়েছে। তুমি যদি এখন পায়ে স্থান দাও, তবে এ-জীবনটা সার্থক হয়।

BanglaBook.org

এই বলিয়া জুমেলিয়া আবার এক কটাক্ষ করিয়াছিল। তাহাতেও লঙ্কেশ্বর সিং এখনও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া; সুতরাং লঙ্কেশ্বর ধন্যবাদার্হ। সে যে তখনও ঘুরিয়া পড়ে নাই, ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু সে ঘুরিয়া না পড়িলে তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং প্রাণটা বুকের ভিতরে মূর্ছিত হইয়াছিল। সে শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া আবাস্মুখে জুমেলিয়ার কথা শুনিতেছিল। শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইল, এবং লোভটা অত্যন্ত প্রবল ও অদম্য হইয়া উঠিল। বলিল, 'আরে, নাহি ন্যহি, এয়সা বাৎ মৎ বোলো; তুম হামকো পাএর মে রাখখো, তো হম তুমকো শিরমে রাখখে। মেরা নসিবকা জোর অ্যাসা হোগা, তুম হমকো এত্তা মেহেরবানি করেগী?'

জু। আমি তো মেহেরবানি করতে খুব রাজি আছি, এখন তুমি যদি একটু মেহেরবানি করো, তবে বুঝতে পারি।

প্র। তুম হামসে দিল্লগী করতী হৈ।

জুমেলিয়া বলিল, 'না লঙ্কেশ্বর সিং, তোমার দিব্য—আমি একটুও দিল্লগী করিনি—আমি সত্যি কথাই বলছি, তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা একদম মজে গেছে। দেখো, লঙ্কেশ্বর সিং, যদি কোনওরকমে তুমি একটা চাবি জোগাড় করতে পারো, তাহা হইলে এখানে যে-পাঁচ-সাতদিন থাকি, এমনি রাত্রে আমার স্বামী ঘুমাইলে রোজ দুই দণ্ড তোমার সঙ্গে আমোদ করতে পারি।'

প্রহরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'একঠো পুরানা চাবি হৈ, ও-চাবি সব হাতকড়িমে লাগতা যাতা।

তালার পরিবর্তে দ্বারে হাতকড়ি লাগানো ছিল। এখানে তালার পরিবর্তে হাতকড়ির ব্যবহারও হইয়া থাকে। লঙ্কেশ্বর কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া, হাতকড়ি খুলিয়া জুমেলিয়াকে বাহিরে আনিল। আবার দ্বারে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল।

জুমেলিয়া সর্বাগ্রে লঙ্কেশ্বর সিংহকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল; ধরিয়া তাহার সেই শ্মশ্রুগুম্ফপরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডলে ঘন-ঘন চুম্বন করিল। পরক্ষণেই প্রহরীর সংজ্ঞালুপ্ত হইল। সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল; পড়িয়া কৃষ্ণকে জবাব দিল।

জুমেলিয়ার চুম্বনে লঙ্কেশ্বরকে মরিতে দেখিয়া পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন না—সে সাপিনী, তাহার নিশ্বাস লাগিয়াও শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠে।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দানব ও দানবী

ভিতরে নিদ্রার ভানে পড়িয়া ফুলসাহেব সকলই দেখিতেছিল—শুনিতেছিল। প্রহরীকে পড়িতে দেখিয়া ফুলসাহেব কপট নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিল। বলিল, 'কাজ হাসিল?'

জুমেলিয়া প্রহরীর হাত হইতে সেই হাতকড়ির চাবিটি লইয়া, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, ফুলসাহেবকে বাহিরে আনিয়া, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিল, 'এই এতক্ষণে হাসিল হইল।'

ফুলসাহেব জুমেলিয়াব কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, সোহাগভরে বলিল, 'এত গুণ না থাকিলে, আমি তোমার এত অনুগত হইব কেন?'

জুমেলিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'লঙ্কেশ্বরের প্রাণটা আগেই আমি প্রায় সবটা হস্তগত করিয়াছিলাম—আর অমন একটা নির্বোধ মেড়ুয়াকে যদি ভুলাইতে না পারিব—তবে আর হইল কী? তাহার পর যখন দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া একটা চুম্বন দিলাম—তখন তার প্রাণের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু পর্যন্ত দখল করিলাম। যখন সব প্রাণটা হস্তগত হইল, তখন তাহাকে উকুনটির মতো নখে টিপিয়া অনায়াসে মারিব, তার আর আশ্চর্য কী? সেই বিষ-কাঁটাটি পিঠে ফুটাইয়া দিলাম।'

ফুলসাহেব বলিল, 'টের পায় নাই?'

BanglaBook.org

জুমেলিয়া বলিল, 'টের পাইলেই বা ক্ষতি কী? যদি টের পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে, এইজন্য চুম্বনের ছলে মুখ দিয়া তার মুখটা জোরে চাপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম—তা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতেই আনন্দে তার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল—একটা কাঁটা ফুটিলে কি—বোধহয়, তখন তাহার পিঠে সহস্র শেল ফুটিলেও অনুভবেই আসিত না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'চলো, এখনও অনেক কাজ বাকি।'

ফুলসাহেব জুমেলিয়ার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল; কিছুদূর গিয়া ফুলসাহেব সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'জুমেলিয়া, দাঁড়াও, তাড়াতাড়িতে একটা কাজ ভুল করিলাম, এখনই আসিতেছি।' বলিয়া জুমেলিয়াকে তথায় রাখিয়া ফুলসাহেব আবার সেই হাজতঘরের সম্মুখে আসিল; মৃত প্রহরীর বন্দুকের সঙ্গীন ও কোমর হইতে কিরীচখানি খুলিয়া লইল। তাহার পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরীচের মুখ দিয়া ভিতরের দেওয়ালে বড়-বড় অক্ষরে লিখিল—

'অরিন্দম! সাবধান, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে খুন করিব, তবে আমার নাম—
তোমার চিরশত্রু ফুলসাহেব।'

তখনই ফিরিয়া আসিয়া ফুলসাহেব, জুমেলিয়াকে সেই কিরীচখানি দিল; নিজের হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীনটি রাখিল। তাহারা উভয়ে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া পূর্বদিকের প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া চলিল।

ঘনান্ধতমোময়ী রাক্ষসী নিশা, নরপ্রেত ফুলসাহেবের ও রাক্ষসী জুমেলিয়ার সহায়তায় আরও ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে

সেই রাত্রি।

প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরিয়া তখন সেই মেঘচ্ছায়ান্ধকারভীষণা রাত্রি সমস্ত জগৎ বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এবং ঝটিকাসংক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড গাছগুলো মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মতো বিকটরবে মর্মকাতরতা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিতেছে; রূপকথার রাজ-অতিথি ছদ্মবেশী নিশীথে কর্তব্যপরায়ণ বুভুক্ষিত রাক্ষসের মতো ঝড় বিকট গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। সেই প্রবল ঝড়ের সহিত মিলিয়া, কৃষ্ণ, নিবিড়, ছিদ্রশূন্য, অকাতরবর্ষণসচেষ্ট বৃষ্টি মেঘ—ও একটা তুমুল বিপ্লবের মধ্যে ফেলিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে একটা পৈশাচিক তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

এমনসময়ে জেলখানার ভিতরে পূর্বদিককার অত্যুচ্চ প্রাচীরের কিঞ্চিদ্দূরে একটা বটগাছের তলে দাঁড়াইয়া, ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই—উভয়েই চিন্তামগ্ন। এখন কোনও রকমে এই শেষ বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারে। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরের উপরে সশস্ত্র প্রহরীরা নতশিরে দ্রুতপদে ফিরিতেছে। মস্তকের উপরে অনবরত ধারাপাত হইতেছে, ভীষণ ঝটিকায় তাহাদিগকে পতনোন্মুখ করিতেছে; তথাপি প্রভুভক্ত তাহারা কর্তব্যপরাঙ্মুখ নহে। এক-একবার গগনভেদী 'জুড়িদার হো'শব্দে পরস্পর-পরস্পরের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতেছে।

এখন সকল কয়েদীই যে-যাহার ঘরে আবদ্ধ। সারাদিনের অস্থিভেদী উৎকট পরিশ্রমের পর তাহাদিগের এখনও যে কেহ জাগিয়া আছে, এমন বোধ হয় না; তথাপি প্রহরীরা আজ এত সাবধান কেন? কেবল সেই শঠ-শিরোমণি ফুলসাহেবের জন্যই তাহারা ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, আজ এই

BanglaBook.org

দুর্যোগেও কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত বোধে প্রাচীরের উপর সতর্কচিত্তে সত্বরপদে পরিক্রমণ করিতেছে।

এমন সময়ে জেলখানার ঘড়িতে একটা বাজিল। যে-প্রহরী পূর্বদিকে প্রাচীরের উপর পরিক্রমণ করিতেছিল, সে অভ্রভেদীকণ্ঠে হাঁকিল, 'জুড়িদার ভেইয়া হো।' প্রতিধ্বনির ন্যায় সেইসঙ্গেই বহুদূরে—অপর দিক হইতে পরবর্তী প্রহরী তীব্রতরকণ্ঠে হাঁকিল, 'জুড়িদার ভেইয়া হো।' তাহার পর একদিক হইতে অপর একদিকে—এইরূপ চারিদিকে 'জুড়িদার ভেইয়া হো' শব্দে বহুদূর পর্যন্ত সেই মেঘকৃষ্ণ নৈশগগন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শুনিয়া ফুলসাহেব একবার হাসিল; হাসিয়া বলিল, 'জুমেলা, আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। এখন গোরাচাঁদ যদি নিজের কর্তব্য না ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা মুক্ত হইব। কাল হইতে অরিন্দম পলাতক কয়েদীর অনুসন্ধানে ফিরিবে।' শেষে শেষের দুই-একটি কথা ফুলসাহেবের মুখ হইতে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্যসর্পগর্জনবৎ বাহির হইল, তাহা কিছুতেই মনুষ্যের মুখনিঃসৃতের মতো শুনাইল না। যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনওরকমে ফুলসাহেবের মুখখানা তখন দেখা যাইত, তাহা হইলে পাঠক, দেখিতে পাইতেন, তখনও সেই দানবচেতার মুখে সেই অমঙ্গলজনক—বিভীষিকা ও মৃদুতার অপূর্ব সংমিশ্রণে অপূর্ব রহস্যপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ অশুভসূচক ভীতিপ্রদ হাসি লাগিয়াছিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে, সংযত নিশ্বাসে ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া, ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে প্রহরী তিমিরে অনন্যকায় তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া একদিক হইতে অপরদিকে চলিয়া গেল। প্রহরী অনেক দূরে চলিয়া গেলে ফুলসাহেব একখণ্ড ক্ষুদ্র ইষ্টক লইয়া প্রাচীর-গাত্রে ধীরে-ধীরে আঘাত করিল। তাহার পর প্রাচীরের উপর কান পাতিয়া দিল। তখন বাহির হইতে আবার সেইরূপ আঘাতের মৃদু শব্দ হইল। শুনিয়া অতি সাহসে ফুলসাহেবের বুক ফুলিয়া উঠিল এবং মুখ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইল। ফুলসাহেব আবার সেইরূপ শব্দ করিল। জুমেলিয়াকে বলিল, 'গোরাচাঁদ ভুলে নাই, সে-ই আসিয়াছে—আর ভয় করি না; একবার কোনওরকমে প্রাচীরটা ডিঙাইতে পারিলে হয়; তখন একবার অরিন্দম আর যোগেন্দ্রনাথকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিব, ফুলসাহেবকে ঘাঁটাইয়া ভালো কাজ করে নাই। আরও তাহারা দেখিবে ফুলসাহেব কেমন করিয়া অতি সহজে তাহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে পারে। তাহারা ফুলসাহেবকে এখনও চেনে নাই, তাই তাহাদের মূর্খতা সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে এতদূর উঠিয়াছে।'

জুমেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'গোরাচাঁদ এখন কী উপকার করিবে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।'

ফুলসাহেব সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি আমি কখনও জেলের ভিতর আটক পড়ি, সে যেন প্রত্যহ রাত্রে—রাত একটার পর এইদিকে প্রাচীরের উপর একগাছি দড়ি ঝুলাইয়া দেয়।'

বলিতে-না-বলিতে নৌকা বাঁধিবার কাছির মতো মোটা একগাছি দড়ি উপর হইতে তাহাদিগের নিকট ঝপ্ করিয়া পড়িল। ফুলসাহেব সেই দড়িটি ধরিয়া সাধ্যমতো জোরে একটা টান দিল, দড়ির অপর প্রান্ত বাহিরের দিকে ছিল, বাহির হইতে সেইরূপ একটা টান পড়িল। তখন ফুলসাহেব নিকটস্থ কোনও বৃক্ষের মূলে দড়িটা বাঁধিল; তাহার পর জুমেলিয়াকে কোমরের কাপড় আঁটিয়া ধরিতে বলিয়া জুমেলিয়াকে লইয়া ধীরে-ধীরে সেই দড়ি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। জুমেলিয়া ফুলসাহেবের কটিদেশ দুই হাতে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া, প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া প্রথমে ধীরে-ধীরে—তারপর দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—উপরে উঠিতে লাগিল। যখন সেই অতুচ্চ প্রাচীরের ঊর্ধ্বসীমার সন্নিকটস্থ হইয়াছে—তখন যে-প্রহরী প্রাচীরের উপরে পাহারা দিতেছিল, সে অপরদিক হইয়া সত্বরপদে ফিরিতেছিল।

BanglaBook.org

ফুলসাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভয় হইল, এইবার এইখানেই বুঝি তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘাটের নিকটস্থ হইয়া যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কী হইতে পারে! এইবার এই বুঝি, প্রথমবার ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিল, চিরহাস্যময় মুখখানি হাস্যশূন্য হইয়া শুকাইয়া গেল। তখন একহস্তের উপর নিজের ও জুমেলিয়ার দেহভার বহন করিয়া অপর হস্তে কটিদেশ হইতে সেই বন্দুকের সঙ্গীনটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল। সেইরূপ অবস্থায় একগাছি দড়ির উপর নির্ভর করিয়া, একহস্তে দুইটি দেহভার বহন করিয়া এক মুহূর্ত অতিবাহিত করা যতদূর কষ্টকর ব্যাপার আমরা মনে করিতেছি, ফুলসাহেব যেরূপ অসীম ক্ষমতাশালী, তাহাতে ইহা তাহার নিকটে একটা কঠিন কর্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। তাহার মনে ভয় হইতেছিল, পাছে প্রহরী সেই দড়িগাছটি দেখিতে পায়। যদি অন্ধকারে দেখিতে না পায়, যাইবার সময়ে যদি তাহার পায়ে ঠেকে, তবে কী হইবে? তাহা হইলে—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীনটা প্রহরীর বুকে সমূলে বসাইয়া দিবে—তাহার পর যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হইবে। একান্ত অকর্মণ্য বা নিশ্চেষ্টের ন্যায় বন্দী হওয়া নিতান্ত কাপুরুষতা। এইরূপ ভাবিয়া ফুলসাহেব সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীনহস্তে প্রহরীর—কেবল প্রহরীর নহে, একটা আশু বিপদের—একটা ভয়ানক দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নিজের অসাবধানতার জন্যই হউক বা ফুলসাহেবের সৌভাগ্যবশতই হউক, প্রহরী সেই দড়িটি দেখিতে পাইল না—পায়েও ঠেকিল না। সে সেই দড়িগাছটি পার হইয়া অপর দিকে অগ্রসর হইল।

পথ পরিষ্কার হইল। ফুলসাহেব তখন সেই সঙ্গীনটা দন্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিল। আর বেশি দূর উঠিতে বাকি ছিল না; এখন পাঁচহাত উঠিতে পারিলেই প্রাচীরের উপরিভাগে উপস্থিত হওয়া যায়। দুই-তিনবার হস্ত-চালনায় ফুলসাহেব প্রাচীরের উপরে উঠিয়া সেইরূপ অপর পার্শ্বে অবতরণ করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপ ফুলসাহেবের কটিদেশে সংলগ্ন রহিল।

অনেকদূর নামিয়া যখন আর দুই-তিনহাত মাত্র নামিতে বাকি আছে, তখন ফুলসাহেব লাফাইয়া ভূতলে পড়িল ; যেখানে পড়িল, সেখানে একটা ইষ্টকস্তূপ ছিল ও তদুপরি কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছিল। সেখানে লাফাইয়া পড়িতে ইষ্টকখণ্ডগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া এবং আগাছাগুলির শুষ্ক শাখা-প্রশাখা ভাঙিয়া একটা শব্দ হইল। তেমন বেশি শব্দ না হইলেও শব্দটা প্রহরীর কানে গেল; সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যেখানে শব্দ হইয়াছিল, সে স্থানটা নির্দেশ করিতে না পারিয়া, সেইখানে বসিয়া ঝুঁকিয়া নিম্নভাগে সতর্কদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। নিচে যেরূপ অন্ধকার, সেখানে দৃষ্টি চলে না; তথাপি প্রহরী সন্দিগ্ধমনে সেইরূপভাবে সেখানে বসিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া দৃষ্টিশক্তির উপরে সাধ্যমতো বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। নিচে যেমন অন্ধকার, উপরের উন্মুক্ত স্থানে সেরূপ নহে; ফুলসাহেব সেইখানে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া প্রহরীকে বেশ দেখিতে পাইতেছিল এবং তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার অভিপ্রায়টিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ প্রহরী-হত্যা

ফুলসাহেব আবার নিঃশব্দে উঠিতে লাগিল। আবার প্রাচীরের উপরে উঠিল। উঠিয়া প্রহরীর দিকে অগ্রসর হইল। একহাতে সেই শাণিত সঙ্গীন। নিঃশব্দে প্রহরীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম সুযোগেই বামহস্তে প্রহরীর গলদেশ সম্মুখদিক হইতে সবলে চাপিয়া ধরিল। প্রহরী একটিও শব্দ করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রহরীকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া ফুলসাহেব অপর হস্তে সেই সঙ্গীনটা প্রহরীর বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। প্রহরী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। প্রহরীর হস্তপদাদির উৎক্ষেপে প্রাচীরগাত্রে দুম-দুম করিয়া শব্দ হইতেছে দেখিয়া, ফুলসাহেব বামহস্তে

BanglaBook.org

তাহার গলদেশ ধরিয়া শূন্যে লম্বিতভাবে ঝুলাইয়া ধরিল, আর অপর হস্তে তাহার বক্ষে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কিরীচ দিয়া সবলে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। প্রহরীর বক্ষোনিঃসৃত রক্তধারা বৃষ্টিজলের সহিত মিশিয়া প্রাচীর প্লাবিত করিতে লাগিল।

তখন ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিলমুখে সেই ভীষণ অমঙ্গলময় মৃদুতায় তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফুলসাহেব মনুষ্যের মূর্তি ধরিয়া পিশাচ—এ-পিশাচে সকলই সম্ভব।

অনতিবিলম্বে প্রহরী মরিল। ফুলসাহেব তাহাকে সেই প্রাচীরের উপরে শোয়াইয়া দিল। তাহার বুক হইতে সঙ্গীনটা খুলিয়া লইয়া, তাহারই রক্তসিক্ত পরিচ্ছদে ভালো করিয়া মুছিয়া লইল। প্রহরীর কোর্তার ভিতরে একটা কিরীচ ছিল, সেটি বাহির করিয়া লইল। তাহার পর দ্রুতগতিতে সেইরূপ দড়ি বাহিয়া নিঃশঙ্কমনে নামিয়া আসিল।

নিচে নামিয়া আসিলে গোরাচাঁদ তাহার সম্মুখে একটা কাপড়ের বুঁচকি ফেলিয়া দিল। ফুলসাহেব বেশ পরিবর্তন করিয়া গোরাচাঁদকে বলিল, 'তুমি এখন এইখানে থাকো; কোথায় কী হয়—কাল আমাকে খবর দিবে—আমি এখনই জুমেলিয়াকে লইয়া পলাশীর বাগানে, সেই বাগান-বাড়িতে চলিলাম। সেইখানে দেখা করিয়ো, দেখা হইবে।'

গোরাচাঁদ বলিল, 'এখন যেরূপ স্রোতের টান—গঙ্গা যেরূপ কূলে-কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, কী করিয়া পার হইয়া যাইবেন? আপনি যদিও পারেন; কিন্তু জুমেলিয়াকে লইয়া কীরূপে পার হইবেন?'

ফুলসাহেব বিরক্তভাবে বলিল, 'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না—আমার কাজ আমি বুঝি, তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তাহা করো, এখন আর বেশি কথা কহিবার সময় নাই।'

'যে আজ্ঞা,' বলিয়া গোরাচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গঙ্গাবক্ষে

সম্মুখে গঙ্গা—বর্ষাকালে কূলে-কূলে পূর্ণ হইয়া অগাধ জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া গঙ্গাতটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড়বৃষ্টিতে জলস্রোত দ্বিগুণবেগে—প্রচণ্ডরূপে তরঙ্গায়িত হইয়া শৃঙ্খলছিন্ন উন্মত্তের ন্যায় উধাও হইয়া ছুটিতেছে। সশব্দে সবেগ তরঙ্গ তটে ঘন-ঘন প্রহত হইতেছে। গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায়, ঘনীভূত অন্ধকারের ছায়ায়—বিমল-শুভ্র গঙ্গাবক্ষ মসীময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই মসীময় অন্ধকারমাত্রাত্মক গঙ্গাবক্ষে সহস্র বিভীষিকা একসঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে—এখানে অশ্রান্ত জল গর্জিতেছে—সেইসঙ্গে উন্মত্ত বায়ু গর্জিতেছে—সেইসঙ্গে অনবরত বর্ষণশীল মেঘ গর্জিতেছে—তিন গর্জনে মিলিয়া ধরণীর বিপুল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া সেই তৃণটি-পড়িলে-খণ্ড-বিখণ্ডকারী স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। উভয়েই সন্তরণপটু; তরঙ্গ ভাঙিয়া, স্রোত কাটিয়া, উভয়ে সন্তরণ করিয়া অপার তটাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। স্রোতের বেগ তাহাদিগকে পথ হইতে নিজের পথে অনেকটা করিয়া টানিয়া লইতেছিল। মাঝখানে গিয়া জুমেলিয়ার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—সে আর সাঁতার দিতে পারে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া, তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল। সে স্রোতের মুখে পড়িয়া ফুলসাহেবের নিকট হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িল। ফুলসাহেব গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, 'তুমি আমার কোমরে ভর দিয়া আসো।' জুমেলিয়া দুই হাতে ফুলসাহেবের কটির বসন ধরিল। ফুলসাহেবেরও হস্তপদাদি ক্রমশ অবশ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে জুমেলিয়াকে লইয়া সন্তরণ করিতে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সন্তরণে পূর্বের ন্যায় বলপ্রয়োগ করিতে না পারিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল, সেইরূপ অবস্থায় প্রাণপণ চেষ্টায় একটু করিয়া তটের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে ফুলসাহেব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল—ঘন-ঘন

নিশ্বাস বহিতে লাগিল—তরঙ্গাঘাতে চোখে-মুখে জল ঢুকিতে লাগিল। অনেকদূরে আসিয়াছে—তট আর বেশি দূর নহে—কোনওরকমে আর এইটুকু যাইতে পারিলে হয়; কিন্তু সেখানে মাঝখানের অপেক্ষা টান বেশি; সেখানে ফুলসাহেবের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতে লাগিল। তাহাকে প্রবলবেগে একদিক হইতে অপরদিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ফুলসাহেব কিছুতেই একহাতমাত্রও আর অগ্রসর হইতে পারিল না; বারংবার বলপ্রয়োগে হাত দুখানা তখন একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ফুলসাহেব ভাসিয়া চলিল। অনেকদূরে ভাসিয়া গিয়া ফুলসাহেব একটা আশ্রয় পাইল। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তট হইতে জলের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাহার প্রকাণ্ড শাখা হইতে অনেকগুলি শিকড় জলের উপরে পড়িয়া লুটাইতেছিল; সেই শিকড় অবলম্বন করিয়া ফুলসাহেব সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপভাবে তাহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিল। প্রবল জলস্রোত তাহাদিগকে অবলম্বনচ্যুত করিবার জন্য বারংবার সবেগে ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দৃঢ়মুষ্টিতে সেই শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব একপ্রকার বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন একবার যদি হাত ছাড়িয়া যায়—ফুলসাহেব যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতে সেই তরঙ্গায়িত ফেনিল জলরাশি তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া ফেলিবে, কে জানে? হয়তো তাহাতে জুমেলিয়াকে হারাইতে হইবে—এমনকী তাহাতে তাহারও জীবনের শেষ হইতে পারে। অবসন্ন হস্ত যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে; তথাপি প্রাণপণে ফুলসাহেব সেই শিকড় ত্যাগ করিল না। বিশেষত, অদূরে একটা ঘূর্ণাবর্ত—সেখানে জল গর্জিতেছিল—ঘুরিতেছিল—উথলিতেছিল। উথলিয়া একপাশ দিয়া চতুর্গুণ বেগে ছুটিতেছিল। ফুলসাহেব বুঝিয়াছিল, যদি একবার হাত ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে স্রোতের মুখে তাহাদিগকে সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িতে হইবে; সেখানে পড়িলে জীবনের আশামাত্র থাকিবে না।

এমন সময়ে নিকটস্থ তটভূমির নিবিড়তম অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রাকৃতিক তুমুল বিপ্লবের তীব্রতর কোলাহল ভেদ করিয়া নারীকণ্ঠ নিঃসৃত খল-খল তীব্রতম হাস্যধ্বনি সম্মুখস্থ অনন্ত বারিরাশি কাঁপাইয়া গঙ্গার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পার হইয়া, ঝড়ের বেগে বহিয়া, দূর দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া গেল। সেই অট্টহাস্যের অতি তীব্রতায় চরাচর যেন পরক্ষণেই ক্ষণেকের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই নিভৃত বিপুল বিজনতার মধ্যে, এই তারাহীন, চন্দ্রহীন, মেঘময়, অন্ধকারময় গভীর নিশীথের ভীষণতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সর্পসঙ্কুল দীর্ঘ-তৃণপরিব্যাপ্ত সিক্ত তটভূমিতে কে এ উন্মাদিনী, উদ্দাম ও প্রবল হাস্যের বেগ কিছুতেই বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না?

ক্ষণপরে সেইরূপ অট্টহাসির সহিত স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, 'কি গো, প্রাণনাথ, কেমন আছ? এ দাসীকে কি এখনও মনে পড়ে?'

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল; শুষ্কমুখ আরও শুকাইয়া গেল; দেহে যেটুকু বল ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে-স্বর তাহার বহুদিনের পরিচিত—সেই মোহিনীর। যেখান হইতে মোহিনী এই প্রশ্ন করিল, সেইদিকে ফুলসাহেব ভ্রূকুটিসঙ্কোচ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিল, তটের উপরে সেই বটবৃক্ষের তলে অত্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে এক নারীমূর্তি একখানি অনতি দীর্ঘ ছুরিকাহস্তে দাঁড়াইয়া। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারা গেল না; কিন্তু সে যে রাক্ষসী মোহিনী ছাড়া আর কেহই নহে—সে-বিষয়ে ফুলসাহেবের মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেই অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে তাহার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকার অপেক্ষা তাহার উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষুদুটি ধক-ধক করিয়া বেশি জ্বলিতেছিল; তন্মধ্য হইতে প্রতিক্ষণে অমানুষিক ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গরাশি—জ্বলন্ত অন্তর্দাহের একটা ভীষণোজ্জ্বল দীপ্তিশিখা ও অতিশয় রোষতীব্রতা বিকীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

দেখিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল। ভীতহৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'এখানে—এমনসময়ে—মোহিনী, তুমি কোথা হইতে আসিলে?'

মোহিনী বলিল, 'অনেক দূর হইতে। কেন আসিয়াছি, শুনিবে? শোনো, তুমি তোমার

প্রিয়তমাকে লইয়া জলকেলিতে কেমন মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছ, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।' বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেরূপ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিদ্রূপব্যঞ্জক অভ্রভেদী হাস্যধ্বনি গুরুগম্ভীর বজ্রনাদ ভেদ করিয়া, ঝটিকাগর্জন ভেদ করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোল ভেদ করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত উঠিল—অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল—ফুলসাহেবেরও কম্পিত, অবসন্ন হৃদয়ে প্রবলবেগে একটা দুঃসহ আঘাত করিল। তখন মোহিনী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, 'বিনোদ, এখন কী হয়? এখন একবার সমস্ত জীবনের অশেষ পাপের কথা মহিমময়ী গঙ্গার সুশীতল অসীম পুণ্য-প্রবাহের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, একটা অতি দুর্বল, ক্ষীণতম নারীহৃদয় সহস্র প্রলোভনের মধ্যে লইয়া গিয়া শেষে অক্ষালনীয় কলঙ্কের মধ্যে চির-বিসর্জন? আরও মনে পড়ে কি বিনোদ, একটি মুগ্ধা, সহজে প্রলুব্ধা, কর্তব্যহীনা, জ্ঞানহীনা, বিমূঢ়া অবলাকে সংসারের সহস্র স্নেহবাহুর দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অপরিমেয় পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত করিয়া, অগাধ-অসীম-অনন্ত-অভ্রান্ত ভালোবাসার স্বর্গীয়সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, চিত্রবিচিত্র স্নিগ্ধচ্ছায়াময় যবনিকার সূক্ষ্ম আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া নারী-জীবনের প্রিয়তম রত্ন—সকল সৌন্দর্যের সার—সকল পবিত্রতার কেন্দ্র—সকল ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্য—সকল সুষমার ঔজ্জ্বল্য—সেই সতীত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অসহায় অবস্থায় উত্তপ্ত বালুকাময় দিগ্‌দিগন্তশূন্য, কর্কশতায় পরিশুষ্ক মরুভূমির স্নেহহীনতার মধ্যে—মমতা-হীনতার মধ্যে—প্রেম-পরিশূন্যতার মধ্যে চির-নির্বাসন? সে-সকল আজ মনে পড়ে কি? তাহার পর আবার লোভে পড়িয়া, তুমি একজন মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতি ও ধর্মভ্রষ্ট হইলে; শেষে স্ত্রীর পৈতৃক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য স্বহস্তে স্ত্রীহত্যাও পর্যন্ত করিয়াছ। একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহাকেও গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছ—তোমার মুখ দেখিলেও পাপ আছে। তুমি কি মনে করিয়াছ, বিনোদ! এই সকল পাপের ফল তুমি কখনও এড়াইতে পারিবে? কখনও নয়। এখনও দিন রাত হয়—চন্দ্র-সূর্য উঠে—বায়ু বহে—এখনও বিশ্বেশ্বরের পবিত্র সিংহাসনতলে পাপপুণ্যের বিচার হয়।'

বলা বাহুল্য প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত মোহিনীর সেই বিনোদ আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। যৌবনে ফুলসাহেবের বিনোদ নাম ছিল, সেই সময়েই বিধবা মোহিনী আপনা হারাইয়া প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল। তখন মোহিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে পাপ-লালসার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এখন তাহাতে বিষময় ফল ধরিয়াছে। সে-সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই মোহিনীর মুখেই সে-সকল কাহিনীর অনেকটা অবগত হইতে পারিয়াছি। এক্ষণে মোহিনী হতাশ হইয়া, ফুলসাহেব কর্তৃক শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় পরিত্যক্তা হইয়া, সমাজ-বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, দুর্বিষহ ক্রোধে, ঈর্ষায়, দ্বেষে মরিয়া—উন্মাদিনী। সে এখন কোনওরকমে ফুলসাহেবকে এ-জগৎ হইতে বিদায় করিতে পারিলে, তাহার নাম জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে তবে তৃপ্তচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে। তাহার বুকের ভিতরে রুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া একটা যে-প্রতিহিংসা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় আপনা-আপনি দংশন করিয়া আপনার বিষে আপনি জ্বলিয়া, দিবারাত্র গর্জন করিয়া কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল, সে ফুলসাহেবকে যতক্ষণ না দংশন করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সর্পিণী ও সর্পিণী

ফুলসাহেব মোহিনীর কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাহার পর বলিল, 'সে-সকল কথা এখন কেন? মোহিনী! এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে রক্ষা করো; তোমার অঞ্চলটা ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আমার জীবনরক্ষা হয়; এখানকার জলের টান এত অধিক, কিছুতেই আমি উঠিতে পারিতেছি না। এরূপ অবস্থায় আর এক মুহূর্তও কাটে না—বড় কষ্ট হইতেছে। একবার

BanglaBook.org

হাত ছাড়িয়া গেলে, সম্মুখের দহে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। মোহিনী! বাঁচাও—রক্ষা করো—আমি এখন বড়ই বিপন্ন! এরূপভাবে আর মুহূর্তও থাকিতে পারিতেছি না।'

'এরূপভাবে যাহাতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে না হয়, তাহার উপায় করিতেছি,' বলিয়া মোহিনী সেই বটশাখার উপর একটি শিকড় ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যে-শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব অতিকষ্টে জীবনটাকে মৃত্যুর মুখ হইতে এতক্ষণ তুলিয়া রাখিয়াছিল, তদুপরি ছুরিকার আঘাত করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! মোহিনী, তুমি কী করিতেছ, আমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়ো না—রক্ষা করো—বাঁচাও—মোহিনী, আমাকে ক্ষমা করো—বাঁচাও!'

মোহিনী সহাস্যে বলিল, 'তোমার অপরাধের ক্ষমা নাই—থাকিলে করিতাম। এমন এক বাণে দুটি পাখি মারিবার লোভ কি সহজে ত্যাগ করা যায়, বিনোদ? তোমাকে জলে ডুবাইয়া কি, যদি তোমাকে পুড়াইয়া মারিতে পারিতাম, তাহা হইলে আরও সুখী হইতাম।' সেইরূপ ভাবে মোহিনী আবার শিকড় ছেদন করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রাণভয়ে, প্রাণপণে, কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মোহিনী! এখনও—এখনও এ-সঙ্কল্প ত্যাগ করো—এখনও বাঁচাও—এখনও রক্ষা করো—আমি করজোড়ে তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি, দয়া করো—ক্ষমা করো—'

বাধা দিয়া মোহিনী রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, 'কিসের দয়া—কিসের ক্ষমা? পাপী তুমি—তোমার মৃত্যু এ-জগতে বাঞ্ছনীয়। পাপী, পিশাচ, তুমি যে গঙ্গার পবিত্র জলে মরিতে পারিতেছ, ইহা একটা তোমার মতো নারকীর পরম সৌভাগ্য বিবেচনা না করিয়া কাতর হইতেছ? ধিক তোমায়!' মোহিনী পূর্ববৎ ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ের উপর আঘাতের উপর আঘাত করিতে লাগিল।

আসন্নবিপদে নিরুপায় হইয়া ফুলসাহেব আত্মহারা হইয়া উঠিল—মাথা ঘুরিয়া গেল। আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষীতজট সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল, 'মোহিনী—পিশাচী—রাক্ষসী—এখনও কথা রাখ—যদি কোনওরকমে বাঁচিতে পারি, ইহার সমুচিত প্রতিফল পাবি। ফুলসাহেবের হাত হইতে কখনওই রক্ষা পাইবি না।'

উন্মাদিনী মোহিনী ছুরিকা চালনায় পূর্ববৎ তৎপর থাকিয়া বলিল, 'এখন নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করো; ইহার পর আমার ভাবনা ভাবিবার অনেক অবসর পাইবে। পিশাচ, তুমি কতদিন প্রসন্নমুখে কত নিরপরাধের প্রাণ লইয়াছ; তোমার বিষে—ছুরিতে কত লোকের প্রাণ এ-পৃথিবী হইতে চির-বিদায় লইয়াছে, তাহাদের যন্ত্রণাময় মৃত্যু হাসিমুখে দেখিয়াছ। আর আজ তুমি কিনা, এতবড় একটা বীরপুরুষ হইয়া নিজের মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইতেছ? মৃত্যু তো নিশ্চয়ই একদিন হইবে, এখন আর ইহার পর—ইহার জন্য এত কাতরতা? ছিঃ—ছিঃ! তোমাকে এত শীঘ্র মারিবার আরও একটা প্রয়োজন—বড় দুঃখের বিষয়, কিছুতেই আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তা যদি পারিতাম, তোমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে আসিতাম না। তোমাকে না মারিয়া আমি কিছুতেই মরিতে পারিতেছি না; এ-জগতে তোমাকে পাইলাম না। দেখি, তোমাকে মারিয়া তাহার পর আমি নিজে মরিয়া পর-জগতে—তা নরকেই হোক—আর যেখানেই হোক—তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি কি না। দেখি, যে-ভাবে প্রথম একবার দেখা দিয়েছিলে, সেই ভাবে তোমাকে পাই কি না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'মোহিনী, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার উপরে আমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাকে বাঁচাও—আবার আমি তোমারই হইব—সেইরূপ তোমাকে ভালোবাসিব।'

হাসিয়া মোহিনী বলিল, 'বিনোদ, আর ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। একবার ভুলিয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছি। তুমি কি মনে করো, তোমার মতো একটা প্রতারকের কথায় মোহিনী আবার ভুলিবে? এ এখন আর সে-মোহিনী নাই—এ এখন তোমার ভালোবাসা চাহে না, তোমার আদর

BanglaBook.org

চাহে না, তোমার স্নেহসিক্তস্বরের সুমধুর আলাপ চাহে না; চাহে তোমার রক্ত, তোমার মৃত্যু, তোমার পাপদেহ পদতলে দলিত করিতে। বড়ই দুঃখের বিষয় বিনোদ, সে-মোহিনীর এমনই একটা অসম্ভব পরিবর্তন ঘটিয়া গেছে।'

ফুলসাহেব তখন হতাশ হইয়া মর্মভেদীস্বরে বলিল, 'মোহিনী! পিশাচী—রাক্ষসী—কিছুতেই তোর দয়া হইল না!'

বিদ্রূপ করিয়া মোহিনী কহিল, 'রাক্ষসীর কাছে, পিশাচীর কাছে দয়াভিক্ষা করা তোমার যে একটা মস্ত ভুল, বিনোদ!'

জুমেলিয়া দেখিল, শিকড় দ্বিখণ্ড হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, অনতিবিলম্বে অদূরস্থ ঘূর্ণাবর্তের তিমিরময় গর্ভে তাহাদিগকে চির-আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ নীরবে অন্তরস্থ শঙ্কার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল, আর থাকিতে পারিল না। একান্ত বিনীতভাবে স্নেহমধুর সম্বোধনে মোহিনীকে বলিল, 'ভগিনী, এ-বিপদে তুমি যদি আমাদিগকে দয়া না করো, আর কোনও উপায় নাই—'

বাধা দিয়া মোহিনী কহিল, 'চুপ কর, পিশাচী—মরিবার সময়ে আল্লার নাম নে—অনেক পাপ করিয়াছিস।'

জুমেলিয়া অপমানিত হইয়া শীঘ্র আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। অপমানটা শক্তিশেলের মতো তাহার বুকে গিয়া বিঁধিল এবং বুকের ভিতরে তীব্রজ্বালাময় বিষ ঢালিয়া দিল। লাঙ্গুলাবমৃষ্ট সর্পিণীর ন্যায় সে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তকৃষ্ণকায় চক্ষু দিয়া বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। জুমেলিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া সরোষ-গর্জনে বলিল, 'যদি কোনওরকমে তোর কাছে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই পিশাচীর পরিচয় তোকে আজ ভালো করিয়া দিতাম; দেখতিস, এক পলকে কেমন করিয়া তোর রক্তাক্ত দেহ আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িত। দেখি, মরিতে বসিয়াও পিশাচী জুমেলিয়া তোর কোনও অপকার করিতে পারে কি না!'

এই বলিয়া জুমেলিয়া কটিদেশ হইতে মৃত প্রহরীর নিকটে প্রাপ্ত সেই কিরীচখানি লইয়া, সজোরে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। যে বামহস্তে শিকড় ধরিয়া মোহিনী নিজ দেহভার সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই বামহস্তের মধ্যস্থলে কিরীচখানি আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। সেইসঙ্গে প্রবলবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। মরিয়া উন্মাদিনী মোহিনী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্বিগুণ উদ্যমে সেই শিকড় ছেদনে মনোনিবেশ করিল। তেমন আঘাতেও ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখে যন্ত্রণা-প্রকাশের কোনও চিহ্ন প্রকটিত হইল না। যেমনি নিরুদ্বিগ্ন, তেমনি অটল, স্থির ও অবিচলিতভাবে আপনার কর্তব্য কার্যে নিযুক্ত রহিল।

ফুলসাহেব দেখিল, মোহিনীর নিকটে তখন আর তিলমাত্র দয়ালাভের আশামাত্রও নাই; তখন সে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া সেই বন্দুকের সঙ্গীনটা সজোরে ছুড়িয়া মারিল। অন্ধকারে লক্ষ্য ঠিক হইল না। সেটা সেই বটবৃক্ষমূলে সশব্দে—এত জোরে গিয়া পড়িল যে, কিয়দংশ তন্মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল।

মোহিনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকৃতকার্য হইয়া ফুলসাহেব অবনতমস্তকে রহিল। মোহিনী তখন আরও জোরে ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ের উপরে আঘাত করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেই শিকড় দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। সেইসঙ্গে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া প্রবল স্রোতের মুখে সবেগে ভাসিয়া গিয়া অদূরস্থ সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িল। দুই-একটা পাক খাইয়া অনন্ত জলরাশির মধ্যে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আর দেখা গেল না।

তাহার পর জল সেইখানে পূর্ববৎ তেমনি ঘুরিতে লাগিল—তেমনি উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল এবং তেমনি গর্জন করিতে লাগিল; জল তেমনি অশান্ত, বেগবান, ঘূর্ণামান, সশব্দ। তখন আর একবার মোহিনীর সেই অট্টহাস্য নৈশগগন কম্পিত করিয়া অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইল। দূর বনান্তের গঙ্গার অপর পারে তাহারই একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া ঝটিকা-গর্জনের সহিত, অবিরাম জলকল্লোলের সহিত মিশিয়া গেল।

BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ শেষরাত্রে

সেই ঘটনাপূর্ণ রাত্রের কথা বলিতেছি।

যখন রাত দুইটা, তখন প্রহরী-সকল বদলি হইতে লাগিল। সুতরাং সেই পূর্বদিককার প্রাচীরের সেই নিহত প্রহরীর পরিবর্তে একজন প্রহরী সেইদিকে আসিল। সে যাহার বদলিতে আসিয়াছে, তাহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহার পর প্রাচীরের উপরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল। তথায় তাহার সম্মুখে, যাহাকে না দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারই রক্তাক্ত শবদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে আরও বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ভীত হইল। দেখিল—বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, কর্মঠ প্রহরী শতচ্ছিন্ন বক্ষে, অর্ধনিমীলিতনেত্রে, প্রাণহীন দেহে পড়িয়া। ভাবিয়া পাইল না—কে ইহাকে এমন নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিল।

তখনও যে বৃষ্টি হইতেছিল না, তাহা নহে। তবে পূর্বাপেক্ষা বেগটা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার কী হইল—মরিল কি উঠিল জানি না—তাহাদের দুইজনকে আর এই নিরীহ, নিরপরাধ, নিহত প্রহরী দুইজনকে গ্রাস করিয়া ক্ষুধাতুরা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী নিশা যেন কথঞ্চিৎ শান্ত ও সুস্থির হইতে পারিল। মেঘান্ধকারময় আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই; শীঘ্র যে হইবে, এমন সম্ভাবনাও নাই; এখনও তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র ঢাকিয়া, কোমল নীলিমচ্ছবি ব্যাপিয়া মেঘ তেমনি পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তটিনীতীরবর্তী খদ্যোৎ-খচিত ঝিল্লিমন্দ্রিত সুদূরব্যাপী অরণ্যানী তেমনি বায়ুচঞ্চল হইয়া, আলোড়িত-বিলোড়িত হইয়া সেই অন্ধকারসমুদ্রে উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতেছে।

একটা যে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই শোণিতাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া প্রহরীর বুঝিতে বাকি রহিল না। ফুলসাহেবকেই প্রথমে সে সন্দেহ করিল; কারণ এ-দুঃসাহসিকতা তাহাতেই সম্ভব। ফুলসাহেব বন্দি হওয়ায় এইরূপ একটা অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়া কারাধ্যক্ষ হইতে প্রহরীরা পর্যন্ত পূর্ব হইতে সন্ত্রস্ত ছিল।

প্রহরীরা তখন ফিরিয়া গিয়া, সেখানে আর একজনকে মোতায়েন রাখিয়া ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে সংবাদ দিল। নিশ্চিন্ত জেলখানা পরিপূর্ণ করিয়া তখনই একটা ব্যাকুলতা, একটা অধীরতা সজীব হইয়া উঠিল। সর্বাগ্রে ফুলসাহেবের সন্ধান হইল—

সেখানে ফুলসাহেব নাই।

সে জুমেলিয়াও নাই।

প্রকোষ্ঠ শূন্য।

দ্বারসম্মুখে লঙ্কেশ্বরের জীবনবিচ্যুত দীর্ঘদেহ ভূলুণ্ঠিত, নীরব এবং নিস্পন্দ। তখনই ফুলসাহেবের সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। থানায়-থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। শুনিয়া যত পুলিশের মস্তক অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—যোগেন্দ্রনাথের মস্তক অধিকতর চঞ্চল হইল।

গ্রামের লোকেরা একদিনেই ফুলসাহেবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে তাহার পলায়ন-কাহিনী সকলে সবিস্ময়ে শুনিল। শুনিয়া সশঙ্ক হইল, সাবধান হইল। পাছে গ্রামে আসিয়া ফুলসাহেব হঠাৎ কাহারও সর্বনাশ করে, এই ভয়ে সকলে উৎকণ্ঠিত হইল।

সকলেই একাগ্রমনে স্ব-স্ব ইষ্টদেবতার নিকটে কায়মনোবাক্যে তাহার পুনর্বন্দিত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেহ মনে-মনে একেবারে তাহার ফাঁসিকাষ্ঠের আয়োজন করিতে লাগিল। সে যে জেলখানার তেমন অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া পড়িয়া মরিল না—তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, রেণু-রেণু হইয়া গেল না, সেজন্য দুই-চারিজন আন্তরিক আক্ষেপ করিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাসে বর্ষাপ্রভাতে শীতল বায়ু উষ্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রহরীর ছুরি ফুলসাহেবের বুকে না বিঁধিয়া, ফুলসাহেবের ছুরিখানা যে প্রহরীর বুকে বিঁধিয়াছিল এবং সেটা যে তেমন অন্ধকারে বিধাতারই একটা

BanglaBook.org

মহাভ্রম ঘটিয়া গিয়াছিল, সেজন্যও আবার লঘুপাপে গুরুদণ্ডের বিধানে কেহ একেবারে বিধাতার মুখাগ্নির, কেহ দগ্ধ কচু ও রম্ভার, কেহ নিত্য-ব্যবহারে-অর্ধাংশ-ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন সম্মার্জনীর, এমনকী কেহ-কেহ মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া তবে কতকটা সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : রাত্রিশেষে

প্রত্যুষে যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে লইয়া জেলখানায় আসিলেন। ফুলসাহেবের একরাত্রের কার্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিয়া পাইলেন না, কেমন করিয়া, কোন কৌশলে দানব ও দানবী দুইজন প্রহরীকে খুন করিয়া, একমাত্র দড়ির সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বহির্জগতের একজনের সাহায্য ব্যতীত যে, কখনওই এতটা ঘটিতে পারে না, তাহা অরিন্দম অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। অমানুষিক সাহসের জন্য, অমানুষিক বুদ্ধির জন্য, অমানুষিক বিক্রমের জন্য, অমানুষিক কৌশলের জন্য, আরও সেই প্রাচীরের উপস্থিত প্রহরীকে যেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে, সেজন্য ফুলসাহেবকে তিনি কিছুতেই মনুষ্য-তালিকা-ভুক্ত করিতে পারিলেন না, দানবদলভুক্তের সে যে একজন প্রধান বলিয়াই ধারণা হইতে লাগিল এবং মনে-মনে তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

সেই হাজতঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেই ফুলসাহেবের লিখিত ভিত্তিগাত্রের বৃহদক্ষরগ্রথিত সেই তিনটি পংক্তি সর্বাগ্রে অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মৃদুহাস্যে অরিন্দম বলিলেন, 'যোগেন্দ্রবাবু, শীঘ্রই আমি আবার ফুলসাহেবকে ধরিতে পারিব। সে নিরুদ্দেশ হইবে না, শীঘ্রই এ-গ্রামে আবার আসিবে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?'

অরি। সে আমাকে খুন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে কী লেখা রহিয়াছে, একবার পড়িয়া দেখুন।

যো। তাই তো! কী ভয়ানক লোক! এমন লোক আমি আর দেখি নাই।

অ। দিন-রাত চোর-ডাকাত-খুনিদের সন্ধানে থাকিয়া আমার এ-বিষয়ে এমন একটা অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে, বোধহয়, আপনিও তাহা জানেন। আমি তাহাদের বলবুদ্ধির পরিচয় প্রথম দর্শনেই অনেকটা বুঝিতে পারি; তা ফুলসাহেবকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে উহাকে আমার একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই আমার স্থির বিশ্বাস।

যো। ফুলসাহেবের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে আপনার মত কী?

অ। আমাকে দুই দিয়া গুণন অঙ্কে কষিয়া দেখিলে, আমার কী মত বুঝিতে পারিবেন।

যো। এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, অরিন্দমবাবু!

অ। শুনিয়াছি, এখানে অনেকেই আমাকে বলবান দেখিয়া আমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে দ্বিতীয় ভীম বলিয়া সে-কথার উপসংহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা যদি ফুলসাহেবের সম্যক পরিচয় পাইত, তাহা হইলে তাহাকে আসল ভীম বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না; ফুলসাহেব শারীরিক বলে আমার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিষ্ঠ।

যো। আর মানসিক বলে তাহাকে কীরূপে বুঝিয়াছেন?

অ। সে আমার সমতুল্য। তাহার বুদ্ধিমত্তা, কার্যতৎপরতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যাই হোক, বুঝিয়াছি সহজে কিছুই হইবে না—একদিন আমি আবার তাহাকে যেমন করিয়া হউক, গ্রেপ্তার করিবই—সে কখনওই আমার হাত ছাড়াইয়া পালাইতে পারিবে না। সে আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী—তাহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব।

BanglaBook.org

যো। যদি সে এমনিই ভয়ানক লোক হয়, তবে এক কাজ করুন, আপনি একা আর এ-কাজে হাত দিবেন না; আপনার সাহায্য করিতে যেরূপ লোকবল আবশ্যক মনে করেন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

অ। না, সেটি হবে না—তা যদি আপনি বলেন, তবে আমি এ-কাজে হাত দিব না। আমি একাকী এ-কাজ হাতে লইয়াছি, একাকী এ-কাজের নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিব; সেজন্য আপনি কোনও আপত্তি করিবেন না।

যো। কিন্তু অরিন্দমবাবু—

অ। (বাধা দিয়া) ক্ষমা করুন, কিছুতেই তাহা হইবে না; আপনি যখন আমাকে কাজের ভার দিয়াছেন—যখন যা করিতে বলিয়াছেন, আমি কখনও আপনার কোনও কথা অস্বীকার করি নাই, সেজন্যও অন্তত আপনি একবার আমার অনুরোধ রাখিতে স্বীকৃত হন—যতক্ষণ না আমি পরিত্যাগ করি, ততক্ষণ যেন এ-কেস কেবল আমারই হাতে থাকে।

যো। আমার কথা রাখুন, অরিন্দমবাবু। ফুলসাহেব যে বড় সহজ লোক নয় তাহা তো আপনি জানেন।

অ। জানি বলিয়াই তো আপনার কথায় কিছুতেই সম্মত হইতে পারিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি কখনও কোনওরূপ সাহায্য আমার আবশ্যক হয়, আপনাকে তখনই জানাইব—সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কে এ সুন্দরী?

পূর্বোক্ত ঘটনার সপ্তাহ পরে।

একদিন শরতের নির্মলীকৃত আকাশে স্নিগ্ধকিরণময় চন্দ্র উঠিয়াছে। তাহার নিম্নে চঞ্চল, তরল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি একখানির পর আর একখানি, তাহার পর আর একখানি চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তচিত্তে দূর-দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। এমনসময়ে একখানি নৌকা একটি যুবক আরোহীমাত্রকে লইয়া, হুগলির গঙ্গা বহিয়া কলিকাতা অভিমুখে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। পরিপ্লব চন্দ্রালোকে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত। গঙ্গার উভয় তটে কোথায় অতি দূর-বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদু পবনে তরঙ্গায়িত এবং কোথায় অতি দীর্ঘ তাল, তমাল ও নারিকেলের ঘনশ্রেণী নিঃশব্দ; কোথায় দিগন্তবিস্তৃত নিবিড়-শ্যাম বনরেখা—চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত, বায়ুচঞ্চল, ঝিল্লিমন্দ্রিত, খদ্যোৎ-খচিত, পাখিকলগীতিমুখরিত। কোথায় আমের বাগান, ভিতরে বসিয়া দোয়েল শিস দিতেছিল এবং পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে কোমল আকাশ বিদীর্ণ হইতেছিল, কোথায় দীর্ঘতৃণময় সুদূরব্যাপী চন্দ্রালোকিত প্রান্তর—অতি মনোহর; সেখানে সেই শরৎ-প্রারম্ভে সুকোমল শ্যামল তৃণাস্তরণের উপর জ্যোৎস্না নিদ্রিত ছিল। সেখানে নিস্তব্ধতা এত নিবিড়, সেখানে কেবল একটি সীমাশূন্য, দিশাশূন্য, শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নৌকারোহী যুবক মুগ্ধচিত্তে অন্যমনে ও অতিশয় বিস্ময়ের সহিত এই সকল দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল; গঙ্গাবক্ষ নিস্তরঙ্গ, জ্যোৎস্নাময়। নৌকা উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল, নৌকার দুই পাশে জল কল-কল ডাকিয়া ছুটিতেছিল। সেই জলকলতান, অপর পারস্থ জ্যোৎস্নামণ্ডিত ঝাউশ্রেণীর অনুচ্চ দূরাগত শন-শন শব্দ সেই প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে, দিগন্তবিস্তৃত বিজনতার মধ্যে, এক অপূর্ব, অপার্থিব ও অচিরশ্রুত সঙ্গীত-স্রোত সুমধুরভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। তাহারই তালে-তালে মাত্রায়-মাত্রায় দাঁড় নিক্ষেপের ঝপ-ঝপ শব্দ মৃদুমন্দ আঘাত করিতেছিল। এক-একবার সেই ক্ষেপণীর শব্দ লয়চ্যুত ও তজ্জন্য শ্রুতিকটু হইয়া পরিশ্রান্ত নীড়স্থ কাকগুলিকে বিনিদ্র ও মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

গঙ্গার পূর্বতট ঘেঁষিয়া নৌকা যাইতেছিল। গঙ্গার সেদিকে তৃণাচ্ছাদিত সেই বিস্তৃত প্রান্তর। যুবক দেখিল, সেইখানে তটের উপরে দাঁড়াইয়া এক শুভ্রবসনাবৃতা নারীমূর্তি। নাসাগ্র অবধি লম্বিত অবগুণ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত। সেই সুন্দর মুখমণ্ডলের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাতেই অপরিসীম সৌন্দর্যের বেশ-একটু আভাস হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হইতেছিল। যুবক ভাবিয়া পাইল না, কে এই শুক্লবসনা সুন্দরী, ভয়হীনা? এতরাত্রে, এমন নির্জনে, এই জনমানবশূন্য প্রদেশে? তাহার পশ্চাতে দূরব্যাপী প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। যুবক ভাবিল, মাথার উপরে অসীম নীলিমার বুকে তরল অনিবিড় শ্বেতাম্বুদ-আবৃত চন্দ্রেরই কি এই অসীম প্রান্তর প্রান্তে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মানা শুক্লবসনা নবীনা, একখানি অবিকল প্রতিচ্ছবি? না, ক্ষেপণী সঞ্চালনের শব্দে সেই প্রান্তরের সুকোমল তৃণশয্যা হইতে ঘুমন্ত জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠিয়া এখানে মূর্তিমতী? ভাবিয়া যুবক ঠিক করিতে পারিল না; মনের ভিতরে বড় গোলমাল বাধিয়া গেল। যুবক নির্নিমেষ মুগ্ধনেত্রে, বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে-ধীরে নৌকা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যখন নৌকা ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইল, তখন সেই অবগুণ্ঠিতা তটের উপর হইতে দ্রুতপদে নিম্নে আজানু জলে নামিয়া আসিল। তখন নৌকা দশহাত দূরে—ক্রমে তাহার সম্মুখবর্তী হইল, তখন কাতরকণ্ঠে সেই অবগুণ্ঠিতা রমণী নৌকারোহী যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'মহাশয়, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; এখানে এতরাত্রে আর কাহারও সাহায্য পাইব, এমন আশা নাই। একা আমি স্ত্রীলোক—আমার কী হইবে, কী করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি যদি এ-সময়ে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ না করেন, তবে আমার অন্য উপায় নাই।'

কথাগুলি স্পষ্টরূপে যুবকের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। যুবক মাঝিকে কিনারায় নৌকা লাগাইতে কহিল। নৌকা মুখ ফিরাইয়া তটে গিয়া আঘাত করিল। যুবক সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, 'বলুন, আমাকে কী করিতে হইবে? আমার দ্বারা আপনার যে-কোনও উপকার সম্ভব হয়, তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি।'

রমণী ব্যাকুলহৃদয়ে সবিনয়ে কহিল, 'আমি কুলস্ত্রী। এতরাত্রে একজন অপরিচিতের সঙ্গে নির্জনে কথা কহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অবিধি—বরং মৃত্যুও ভালো। কেবল নিজের জন্য হইলে কুলস্ত্রীর অমূল্য সম্মান খোয়াইয়া, এই অবিধেয় কার্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। অসহায় অবস্থায় মরিতে হইত—মরিতাম; কেবল আমার স্বামী—তিনি পীড়িত, রুগ্ন—তাঁহাকে কে দেখিবে? তাঁহার কী হইবে? মহাশয়, দয়া করিয়া যদি আমাকে আমার বাড়িতে রাখিয়া আসেন, কী বলিব, তাহা হইলে আপনি এ-অসহায় স্ত্রীলোকের কতদূর উপকার করিবেন!'

যুবক বলিল, 'আপনার বাড়ি এখান হইতে কতদূর? নিকটে?'

রমণী বলিল, 'না, এই প্রান্তরের উত্তর দিকে অনেক দূরে। ওই যে একটা আমবাগান দেখা যাইতেছে, আপনি বোধহয়, আসিবার সময়ে দেখিয়া থাকিবেন; ওই আমবাগানের মাঝখান দিয়া পূর্বমুখে গ্রামের মধ্যে যাইবার একটা পথ আছে, ওই পথ দিয়া কিছুদূর যাইতে হইবে। আমি একাকী যাইতে ভরসা করিতেছি না, পথে সহায়হীনা স্ত্রীলোকের অনেক বিপদ আছে।'

কথা শুনিয়া, বেশভূষা দেখিয়া, ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্রমহিলা বলিয়া যুবকের বোধ হইল এবং তাহার এরূপ অবস্থার কারণ জানিবার জন্য যুবকের মন অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কুলনারী হইয়া এই ভয়ানক স্থানে, এতরাত্রে কী জন্য আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।'

BanglaBook.org

দশম পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরীর অনুরোধে

সেই কৃতাবগুণ্ঠনা বলিতে লাগিল, 'আমার স্বামী আজ দুই বৎসর হইতে পীড়িত। অনেক চিকিৎসক

দেখিয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত কী রোগ অথবা রোগের কারণ কী, কেহ কিছু ঠিক করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদিগের ঔষধেও কোনও ফল হইল না। দুই-একজন কবিরাজ এক-প্রকার বায়ুরোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিল তাহাতেও কিছু উপকার হয় নাই; বরং আমার স্বামীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; আগে দিনে একবার মূর্ছা যাইতেন, এখন প্রতিদিন দুই-তিনবার মূর্ছা হইতে লাগিল; আগে একঘণ্টা মূর্ছিত থাকিতেন, মূর্ছা শেষে বেশ জ্ঞান হইত; এখন একবার মূর্ছিত হইলে দুই ঘণ্টায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারেন না। মূর্ছা ভাঙিলেও তাহার পর আধঘণ্টা সে-ঘোর লাগিয়া থাকে, উন্মত্তের মতো প্রলাপ বকিতে থাকেন। কলিকাতার অনেক দক্ষিণে বেহালা নামে যে-একটি গ্রাম আছে, সেখানে মূর্ছা রোগের একটি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। কাল শনিবার প্রাতে সেই ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়, তাই আজ রাত্রেই আমার স্বামীকে লইয়া, নৌকায় করিয়া সেখানে যাইতেছিলাম। এই প্রান্তরটি পার হইয়াই আমার স্বামী বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন; আজ যাওয়া হইবে না বলিয়া, অনেক আপত্তি করিতে লাগিলেন; মাঝিকে নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। আমি মাঝিকে মানা করিয়া দিলাম। নৌকা ধার দিয়া যাইতেছিল, আমার স্বামী লাফাইয়া তটে উঠিলেন; উঠিয়া চিৎকার করিয়া বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। আমিও তখন সেইসঙ্গে নামিয়া পড়িলাম। সেখানে বড় বনজঙ্গল, তাহার ভিতরে তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন; আর দেখিতে পাইলাম না। সম্ভব, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছেন। হয়তো সেখানে গিয়া তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন; অজ্ঞান হইবার কিছু পূর্বে তাঁহার মনের এইরূপ একটা চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।'

যুবক অনন্যমনে সেই অপরিচিতা সুন্দরীর কথাগুলি আকর্ণন করিলেন। তাহার কাতরোক্তিপূর্ণ কথা এবং উৎকণ্ঠিতভাব ইত্যাদিতে যুবক বিশ্বাসী ও দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চলুন, আমি আপনাকে রাখিয়া আসিব। আমিও কিছু-কিছু ডাক্তারি জানি, যদি বলেন, আপনার স্বামীর রোগারোগ্যের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারি।'

রমণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, 'আপনি ডাক্তার! ভালোই হইয়াছে; কিন্তু—কিন্তু—'

যুবক রমণীকে অর্ধসমাপ্ত বাক্যে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন, 'বলুন, কী বলিতেছেন?'

রমণী বলিল, 'বহুদিন হইতে ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসা করাইয়া কোনও উপকার দূরে থাকুক, বরং অপকার হওয়ায় আমার স্বামী আজকাল ডাক্তার-কবিরাজের নামে যেন জ্বলিয়া আছেন; এমনকী তাঁহারই দুই-একজন বন্ধু নামজাদা ডাক্তার। এখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না—ডাক্তার-কবিরাজের উপরে আজকাল যেরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে পাছে তিনি আপনাকে কোনওপ্রকার অপমানের কথা বলিয়া বসেন, তাহাই ভাবিতেছি।'

যুবক কহিলেন, 'সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।'

রমণী। এক কাজ করিবেন, আপনি যে ডাক্তার, এ-পরিচয় তাঁহাকে দিবেন না।

যুবক। সে যাহা ভালো হয়, আমি করিব।

র। না মহাশয়, আপনি তাঁহাকে জানেন না। তিনি বড় উগ্র-প্রকৃতির লোক, আপনি আমার কথা রাখিবেন।

যু। তাহাই হইবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর যুবক সেই অপরিচিতা সুন্দরীকে আপনার নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। মাঝি তাঁহাকে নিষেধ করিল। প্রেতিনীরা এইরূপভাবে সুন্দরী রমণীর মূর্তিতে পথিককে বিপথে চালিত করে, সে ভয় দেখাইল। এবং অনেক স্ত্রীলোক দস্যুর নিকটে অর্থসাহায্য পাইয়া এইরূপ নিশাচরীর ন্যায় সারারাত শিকার সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, অনেকরকমে কৌশলে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া দস্যুপতির করতলগত করিয়া দেয়। প্রেতিনী বা অপদেবতার ভয় যুবকের হৃদয়ে মুহূর্তের জন্য স্থান পাইল না। তিনি মাঝির এই কুসংস্কারপূর্ণ যুক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতে পারিলেন না। তিনি শিক্ষিত, সাহসী, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, যৌবনোন্মুখ। তিনি সেই অপরিচিতা সুন্দরীকে নৌকায় উঠাইয়া

BanglaBook.org

লইয়া নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। মাঝি অনিচ্ছায় নৌকা ফিরাইয়া লইয়া চলিল। তাহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল, না জানি কী-একটা ভয়ানক কাণ্ডই ঘটিবে; হয়তো নৌকা বানচাল হইয়া যাইবে, নৌকা ডুবিবে, নৌকার সঙ্গে তাহাকে যে প্রেতিনী ডুবাইয়া মারিবে না, এমনও কী হইতে পারে? দম আটকাইয়া প্রাণটা যাইবে? তখন তাহার গৃহিণীর কথা মনে পড়িল, সন্তান-সন্ততির কথা মনে পড়িল। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল এবং শরাহত পক্ষীটির ন্যায় রুদ্ধ পঞ্জর-পিঞ্জরের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল।

তাহার পর যখন স্রোতোমুখে নৌকা দ্রুত চালিত হইয়া, অনতিবিলম্বে প্রান্তর পার হইয়া সেই আমবাগানের ধারে গিয়া উপস্থিত হইয়া কিনারায় লাগিল, যুবক সেই রমণীকে লইয়া তটে অবতরণ করিলেন। তখন সুদক্ষ মাঝি একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়া ঈশ্বরকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

যুবক যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, যতক্ষণ না তিনি ফিরিয়া আসেন, নৌকা যেন সেইখানে বাঁধিয়া রাখা হয়।

যুবকের যে এই প্রত্যাগমন ঘটিবে না, মাঝি সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরীর কৃতজ্ঞতা

আমবাগানের ভিতর দিয়া সেই স্ত্রীলোকটি অগ্রগামিনী হইল। যুবক তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

যুবকের বয়ঃক্রম আটাশ বৎসরের অধিক নহে। মুখশ্রী সুন্দর, সুকৃষ্ণ গুম্ফ ও অনিবিড় শ্মশ্রু, মস্তকের অনতিকুঞ্চিত ঈষদ্দীর্ঘ কেশ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও দীর্ঘনেত্রে সে মুখমণ্ডলের সমধিক শোভাবর্ধন করিতেছে। দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, বলময়, মাংসপেশিতে সকল অংশ স্ফীত ও পরিণত। বর্ণ গৌর। মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হয়।

তাহারা আমবাগান পার হইয়া একটা বড় বনের ধারে আসিয়া পড়িল। বনের ভিতর দিয়া একটি শীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ কিছুদূরে গিয়াই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেই অপরিসর দীর্ঘ বনপথে পত্রান্তরালচ্যুত শীর্ণ জ্যোৎস্নালেখাগুলি মূর্ছিতভাবে পড়িয়া। যুবকের চক্ষে সেই অতুল সৌন্দর্যময়ী নবীনার প্রতি পাদবিক্ষেপে, সুকোমল চরণস্পর্শে সেই মূর্ছিত জ্যোৎস্নালেখাগুলি যেন সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু-প্রবাহে তাহার চঞ্চল অঞ্চল উড়িয়া এক-একবার যুবকের গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল। এবং ঝিল্লিরবে সেই বিজন বনপথ মুখরিত হইতেছিল এবং অরণ্য—বৃক্ষলতা-পরিব্যাপ্ত অরণ্যভূমি ছায়ালোক-চিত্রিত হইয়া একখানি উন্মুক্ত আলেখ্যবৎ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রিমা, বনকুসুমের গন্ধ, মৃদুমন্দ মলয়ানিল এবং মধুরকণ্ঠে বনবিহগের স্বরলহরী, সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বনস্থলী প্রতিক্ষণে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল।

চুম্বকের সহিত একখণ্ড লৌহের যে-সম্পর্ক, আর নারী-সৌন্দর্যের সহিত একটা পুরুষ-হৃদয়েরও ঠিক সেই সম্পর্ক। চুম্বকের সহিত নারী-সৌন্দর্যের এমন একটা অব্যর্থ আকর্ষণী শক্তি আছে যাহাতে পুরুষের হৃদয় অতি সহজে ও অজ্ঞাতভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে। যুবক এতদূর পথ সেই আকর্ষণেই কথাটি না কহিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যন্ত্রচালিতের ন্যায় অতিক্রম করিতেছিলেন। সেই আকর্ষণেই আমবাগানের অতি দীর্ঘপথ ছাড়াইয়া বনে পড়িলেন এবং সেই আকর্ষণেই সর্পসঙ্কুল ভীতিপূর্ণ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না—সেইরূপ নীরবে। তাহার পর যখন সেই বনের বিপুল গভীরতার মধ্যে, একান্ত বিজনতার মধ্যে পড়িয়া আর পথ পাইলেন না, তখন স্বপ্নশেষে আকস্মিক চেতনার ন্যায়, অকস্মাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় একটা শঙ্কা আসিয়া যুবকের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি তখন সেই অপরিচিতাকে বলিলেন, 'আমাকে আর কতদূর যাইতে হইবে? এ-গভীর

BanglaBook.org

বনের ভিতরে আমাকে আনিলেন কেন? নিকটে যে কোনও লোকালয় আছে, এমন তো বোধহয় না। এ-বন যে কিছুতেই শেষ হয় না। শীঘ্র যে শেষ হইবে, এমনও বোধ হয় না। আমি কোন দিকে যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। আপনি আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছেন, এ কোনদিকে যাইতেছি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণে?'

অগ্রগামিনী অনুচ্চস্বরে বলিল, 'এখন দক্ষিণ মুখে আমরা যাইতেছি, আর বেশি দূর নাই, দক্ষিণদিকে আর কিছুদূর গিয়া পূর্বদিকের একটা পথ পাইব সেই পথ ধরিয়া অল্পদূর গেলেই আমরা বন ছাড়াইয়া একটা বাগানে পড়িব, সেই বাগানে আমাদের বাড়ি।'

যুবক কহিলেন, 'তাহা যেন হইল; কিন্তু আপনি যেরূপ গোলমেলে পথ দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে ইহার পর পথ চিনিয়া একাকী নৌকায় ফিরিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।'

কৃতাবগুণ্ঠনা পূর্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, 'সেজন্য আপনি ভাবিবেন না, আর একটি সোজা পথ আছে, সে-পথ দিয়া গেলে অনেকটা রাস্তা যাইতে হয়; বাড়িতে শীঘ্র পৌঁছাইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য এই বনজঙ্গল ভাঙিয়া যাইতেছি। মনেও বুঝিতেছি, আপনার ন্যায় ভদ্রলোককে এ-দুর্গম পথে আনিয়া ভালো করি নাই; কিন্তু কী করিব? আপনি আমার মনের উৎকণ্ঠা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। যাই হোক, ফিরিবার সময়ে আমাদের একজন ভৃত্যকে আপনার সঙ্গে দিব; সে আপনাকে ওদিককার সোজা পথ দিয়া যাইয়া আপনার নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। না জানি, এ বনপথে আনিয়া আমি আপনাকে কত কষ্ট দিলাম! সেজন্য এ-দুর্ভাগিনীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।'

যুবক তাহার বিনয়পূর্ণবচনে আত্মবিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সরল হৃদয়ের মধ্যে দুঃসাহসিকতার উপরে যে একটা অশুভসূচক শঙ্কার অনিবিড় ছায়াপাত হইয়াছিল, সেই অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা সুন্দরীর অত্যধিক শিষ্টতায় ও বাক্যের তদধিক মিষ্টতায়, তাহা বালুকাস্তূপের জলরেখার ন্যায় নিমেষে মিলাইয়া গেল। যুবক কহিলেন, 'না, সেজন্য আপনি কেন এত 'কিন্তু' হইতেছেন? আমার কোনও কষ্ট হইতেছে না। আমার দ্বারা যে আপনার সামান্য উপকার হইল, তাহাতে বরং আমি সুখী হইলাম। মানুষমাত্রেরই যাহা কর্তব্য, তাহার বেশি আমি কিছুই করি নাই।'

রমণী বলিল, 'মহাশয় আপনি এ-বিপদের সময়ে আমার কতদূর উপকার করিলেন, কেমন করিয়া জানাইব? যদি আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হই, তাহা হইলেও আপনার কথা বোধহয়, আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনার নিকটে আমি কতদূর ঋণী রহিলাম, বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। যদি আপনি এতদূর কষ্ট স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমার কী হইত, বলুন দেখি? হয়তো কোনও নারকীর হাতে পড়িয়া আমার কী সর্বনাশ হইত! এত রাত্রে এ-সকল ভয়ঙ্কর স্থান গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে কীরূপ বিপজ্জনক, তাহা আপনার ন্যায় হৃদয়বান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলা বাহুল্য। আপনার চিত্ত অতিশয় উদার, মহৎ; আপনার ন্যায় পরোপকারী, দয়ালু ব্যক্তি এ-সংসারে খুব কমই আছে। আপনি যদি আমাকে এরূপ দয়া-প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে কে বলুন দেখি, আমার এ-বিপদে মাথা দিত? কে বলুন দেখি, নিজের সময় নষ্ট করিয়া একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইত? সাহায্য করা দূরে থাক, এ-অপরিচিতার উপরে কেহ যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনা করিতে পারিত, এমন বোধ হয় না।'

BanglaBook.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : বাগান-বাটি

তাহার পর সেই যুবক ও অবগুণ্ঠনবতী অনতিবিলম্বে একটি বাগানের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বাগানটি

প্রকাণ্ড, এমনকী পঞ্চাশ বিঘার কম নহে; বাগানের চারিপ্রান্তের বড়-বড় জ্যোৎস্নাস্নাত গাছগুলি দৃষ্টিসীমার যবনিকার উপরে সুদৃশ্য রঞ্জিতবৎ অতি সুন্দর। কোথায় সুদীর্ঘ ঝাউ, কোথায় তদধিক দীর্ঘ নিবিড়তর দেবদারুর শ্রেণী চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে আম, লিচু, কাঁটাল, তাল, নারিকেল আরও কত কি ফলের গাছ। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকা, বহুদিন মেরামত না করায় একান্ত শ্রীহীন। অনেক স্থানে বালি খসিয়া পড়ায় তাহার ইষ্টকপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রমণী যুবককে লইয়া সেই দ্বিতল অট্টালিকার দ্বার-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বাড়ি কি আপনাদের?'

রমণী কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। বলিল, 'অনেক রাত হইয়াছে, বোধহয়, চাকরেরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মনিবের শাসন না থাকিলে চাকর-বাকরদিগের স্পর্ধা এইরূপ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিয়া থাকে।' এই বলিয়া দ্বার ঠেলিয়া দিতে খুলিয়া গেল, তখন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'বাঁচলেম, এই যে কবাট খোলা আছে, তবে তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিতেছি।'

যুবক বলিলেন, 'তবে আপনি বাড়ির ভিতরে যান, যদি তিনি আসিয়া মূর্ছিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে খবর দিবেন; আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।'

'সে কি—মহাশয়! তাহা হইবে না।' এই বলিয়া সেই রমণী চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে একটা দমকা বাতাস লাগিয়া তাহার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন সেই রমণী অতিশয় লজ্জিত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, অবগুণ্ঠনটি আবার বেশি করিয়া টানিয়া দিল। সেই ক্ষুদ্র অবসরে যুবকের সতৃষ্ণদৃষ্টি একবার সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যসুধা ক্ষণেকের জন্য অতৃপ্তভাবে পান করিয়া লইল। রমণীর তখনকার ভঙ্গিটি যুবকের মুগ্ধ হৃদয়ে মৃদু-মৃদু আঘাত করিল। সেই ক্ষণেকের মধ্যে যুবক দেখিল, একটি মলিনতার ছায়াপাতে বিপুল কৃষ্ণচক্ষুর সলজ্জ অথচ উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক চাঞ্চল্য এবং ঈষদ্‌প্রোদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠের শ্রমজনিত মৃদুকম্পনে, সেই মাধুর্য-পরিপূর্ণ মুখশ্রী আরও উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহাতে যুবকের অপরিতৃপ্ত তৃষিত-নেত্রের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিল।

পরস্ত্রী-দর্শনে এরূপ একটা অধৈর্য আকুল তৃষ্ণা একজন সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবকের পক্ষে বড় পাপের বিষয় হইলেও তাঁহার মনে কোনওরূপ কলুষিত ভাব ছিল না। স্ত্রী-সৌন্দর্যের জন্য পুরুষ হৃদয়মাত্রেই যে একটি আকাঙ্ক্ষা সর্বদা সংলগ্ন থাকে, ইহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যখন বিন্দুবিসর্গ পাপ মিশিতে পারে, তখন ইহা মনুষ্যের একান্ত অদম্য ও অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। যাই হোক, যুবকের সম্বন্ধে এত ওকালতি করিয়া পুঁথি বাড়ানো আমার ভালো দেখায় না, বরং তাহাতে অনেক পাঠকের বিরক্তির আশঙ্কা করিতে হয়। এই যুবক এজন্য দণ্ডার্হ কি মার্জনীয়, সে-বিচারের ভার সদ্বিবেচক পাঠক ও পাঠিকার উপরে; তাঁহাদিগের সদ্বিচারে যাহা হয়, আমাদের এ-যুবক তাহাই।

বাজে কথায় আমাদিগের দেরি হইতেছে। রমণী অবগুণ্ঠনের পুনঃস্থাপনা করিয়াই বলিল, 'আপনি ভিতরে আসুন, আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন; বাহিরে একাকী এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন!'

যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটিমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই সুন্দরীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একটি প্রাঙ্গণে পড়িলেন। প্রাঙ্গণটি খুব বড়, বড় অপরিষ্কার। তাহার পূর্বপার্শ্বে একটি হলঘর, সেখানে আলো ছিল না। তথায় গভীর অন্ধকার আর একান্ত নিস্তব্ধতা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিল। তন্মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রমণীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না; নিজেকে নিজেই দেখিতে পাওয়া যায় না, স্থানটি এমনই অন্ধকারময়। মৃদু পদশব্দ, কঙ্কণের মৃদু মধুর কিঙ্কিণী সেই সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে, দুর্ভেদ্য তিমিররাশির মধ্যে অগ্রগামিনী অদৃশ্য সুন্দরীর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছিল।

BanglaBook.org

সেই হলঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে দ্বিতলে উঠিবার একটা সোপান ছিল। রমণী সোপানের উপর পদার্পণ করিয়া যুবককে বলিল, 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা আলো আনিতেছি।' পরমুহূর্তে রমণীর চঞ্চল চরণবিক্ষেপের শব্দ ক্রমশ ঊর্ধ্বে মিলাইয়া গেল।

তখন যুবক সেখানে একা।

যুবকের চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগী-কক্ষে

সেইখানে সেইভাবে একাকী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে যুবকের কষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষত, সিক্তভূমিতল হইতে এমন একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছিল, যুবকের তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। বায়ুর গতিবিধির জন্য কোনও বন্দোবস্ত না থাকায়, সেই অসহ্য দুর্গন্ধে যুবকের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। দিবারাত্র অবরুদ্ধ ও অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় এই হলঘর যে এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রমণীর ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, যুবক রুদ্ধ বাতায়নের সন্ধানে ভিত্তিগাত্রে উভয় হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যদিও সন্ধান করিয়া একটা রুদ্ধ গবাক্ষ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাহা উন্মুক্ত করিবার কৌশল সেই অন্ধকারে তখনকার মতো অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল। সম্ভব তাহা বাহির হইতে বন্ধ। তখন ইহা অপেক্ষা তথা হইতে বাহির হইয়া—বাহিরে অপেক্ষা করা ভালো মনে করিয়া, যুবক যেমন দুই-একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে সহসা সোপানের ঊর্ধ্বভাগ হইতে একটা উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আসিয়া, সেই সুবৃহৎ হলঘরের কিয়দংশ আলোকিত করিল।

যুবক ঊর্ধ্বমুখে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই রমণী সেইরূপ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া, একটি লণ্ঠন লইয়া সত্বর নামিয়া আসিতেছে। সোপানের অর্ধাংশমাত্র নামিয়া আসিয়া রমণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, 'মহাশয়, শীঘ্র আসুন, এতক্ষণ যে-ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে; তিনি এখানে আসিয়াই মূর্ছিত হইয়াছেন। হায়-হায়, না জানি কতক্ষণ তিনি এইভাবে আছেন! কী হইবে?'

'ভয় নাই, ব্যস্ত হইবেন না,' বলিয়া যুবক সত্বর তাহার অনুসরণ করিলেন। সোপানাতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটা বারান্দায় পড়িলেন। তথা হইতে তিন-চারিটি ঘর পার হইয়া একটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী লণ্ঠনটি বারান্দার উপরে রাখিয়া দিল। সে-উজ্জ্বল আলোক রোগীর কক্ষে লইয়া যাইতে তাহার সাহস হইল না। সেই ঘরের একপার্শ্বে একটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি জ্বলিতেছিল। যুবক সেই ক্ষীণালোকে দেখিলেন, তথায় একপার্শ্বে একটি পরিষ্কৃত শয্যার উপরে একজন প্রৌঢ়ব্যক্তি—তাহার বয়স চল্লিশের কম নহে—নিস্পন্দদেহে মৃতবৎ পড়িয়া। তাহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণীকৃত, চক্ষু নিমীলিত এবং হস্তপদাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিছানার অবস্থাও তদ্রূপ, বালিশগুলি বিশৃঙ্খলভাবে এখানে সেখানে ও মাথার বালিশটি কক্ষতলে পড়িয়া আছে। আচ্ছাদনের বস্ত্রখানা ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

যুবক সর্বাগ্রে সেই সংজ্ঞাশূন্য লোকটির নাড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া সহজ লোকের ন্যায় বোধ হইল; তখন তাঁহার মনে একটু সন্দেহও হইল; মনে হইল, লোকটির এ-একটা ভান মাত্র; নতুবা এ-রোগ এ-জগতে এই নূতন।

রমণী ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন দেখিলেন?'

যুবক। নাড়ি দেখিয়া রোগের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সহজ লোকের নাড়ির গতি যেরূপ থাকে, ইঁহারও তদ্রূপ।

BanglaBook.org

রমণী। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আপনিও তাহাই বলিতেছেন।

যু। ইনি মূর্ছা যাইবার পূর্বে কি বড় ছটফট করিতে থাকেন?

র। হ্যাঁ, তখন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

যু। বিছানার অবস্থা দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। আপনি বাহিরের লণ্ঠনটি এইদিকে একবার লইয়া আসুন।

র। কেন?

যু। নাড়ি দেখিয়া যখন রোগ নিরূপণ হইল না, তখন অন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

র। ইহাতে আপনার কী রোগ পরীক্ষা হইবে?

যু। আমার বোধ হইতেছে, ইনি ভান করিয়া পড়িয়া আছেন।

র। এমনও কি হইতে পারে?

যু। সেটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কী?

রমণী লণ্ঠনটি আনিলে অগ্রে যুবক তন্মধ্যস্থিত শিখাটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর সেটি সেই মূর্ছিত ব্যক্তির মুখের উপরে তুলিয়া ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তখন যুবক সেই নিঃসংজ্ঞ লোকটির চোখের পাতা দুইখানি তুলিয়া ধরিলেন; দেখিলেন, তাহার চোখের তারা দুটি স্থির, তেমন উজ্জ্বল আলোক লাগিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না, চিত্রলিখিতবৎ স্থির ও নিস্পন্দ। যুবক মনে করিলেন, সত্যই যদি লোকটি ভান করিয়া এরূপভাবে থাকে, তাহা হইলে লোকটি এ-বিষয়ে সুদক্ষ এবং এ-ভানও তাহার প্রশংসনীয়।

যুবক তাহাতেও নিরস্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার আগ্রহ ও কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি সেই রমণীকে লণ্ঠনটি রোগীর চোখের নিকট সঞ্চালন করিতে বলিলেন। রমণী তদ্রূপ করিলে অচেতন লোকটির চোখের তারা দুটিও তদ্রূপ নড়িতে লাগিল। যুবকের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তখন যুবক একটি চোখের পাতা ছাড়িয়া দিয়া, অপর চোখের তারা অঙ্গুলি দ্বারা যেমন স্পর্শ করিতে যাইবেন, তখন রোগী সভয়ে চোখ কুঞ্চিত করিল; ইহাই যথেষ্ট।

রমণী পূর্ববৎ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী দেখিলেন?'

মৃদুহাস্যে যুবক উত্তর করিলেন, 'এ-রোগ আমি আরোগ্য করিয়া দিব—কোনও ভয় নাই।'

রমণী বলিল, 'এখন কী করিলে জ্ঞান হইবে?'

যুবক মনে করিলেন, জ্ঞান বেশ টনটনে আছে; রোগী নিজে ইচ্ছা না করিলে, অন্য কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হইবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন, 'এখন আপনি ইহার চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন। আরও পারেন, যদি আপনাদের নিদ্রাতুর কোনও ভৃত্যকে ডাকিয়া যতক্ষণ জ্ঞানলাভ না হয়, ততক্ষণ পাখার বাতাসের একটা বন্দোবস্ত করুন।'

রমণী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ আশ্চর্য রোগী

রমণী চলিয়া গেলে, রোগী দুই-একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। যুবককে দেখিয়া তাহার দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়জনক ভাব প্রকটীকৃত হইল। অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আপনি? আপনার নাম?'

যুবক। আমার নাম দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র।

রোগী। কই, এ-নাম তো কখনও পূর্বে শুনি নাই?

যু। আমি এখানে থাকি না; আমার বাড়ি ভবানীপুর; কলিকাতার কিছু দক্ষিণে।

BanglaBook.org

রো। হবে, তা আপনি এখানে কীরূপে আসিলেন? কে আপনাকে এখানে আনিল?

যু। আপনি আপনার স্ত্রীকে নদীর ধারে একা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এতদূর একা ফিরিয়া আসিতে সাহস করিতেছিলেন না। সেই সময়ে আমি সেইখান দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া আপনার স্ত্রী তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন; তাই তাঁহাকে রাখিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আপনি পীড়িত। আমি ডাক্তার, সুতরাং একবার আপনাকে দেখিতে এখানে আসিলাম।

রো। ডাক্তার আপনি? ডাক্তারের উপরে যে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহা কি আমার স্ত্রীর মুখে শুনেন নাই?

যু। হ্যাঁ, তিনি একবার বলিয়াছিলেন, বটে।

রো। তবে আবার আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন কেন? তিনিই বা আপনাকে অনর্থক আনিলেন কেন?

যু। আপনি মূর্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিলেন। এখন আপনাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি, আর আমার এখানে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমি এখন যাইতে পারি। (গমনোদ্যোগ)

রো। বসুন, রাগ করিলেন না কি? আমাকে মাপ করিবেন। আপনার সহিত যে-কালে সাক্ষাৎ পরিচয় হইল, তখন আপনার হাতে একবার ডাক্তারি চিকিৎসার শেষ পরীক্ষা লইতে পারি! আপনি আমার এ-রোগের যাহাতে শীঘ্র উপশম হয়, এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারেন কি?

যু। একবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। তবে কথা হইতেছে, আগে রোগী আর চিকিৎসকের পরস্পর পরস্পরকে বুঝিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। তাহার পর রোগের চিকিৎসা। আপনি যদি আমার নিকটে রোগ গোপন করেন, আর আমি আজীবন ধরিয়া যদি অনবরত চেষ্টা করি, তথাপি আপনার রোগের কিছুই করিতে পারিব না। আমার মনের ভাব আমি আগেই বলিতেছি, আমি যখন প্রথমে আপনাকে আসিয়া দেখিলাম, তখন আপনি মূর্ছিতবৎ ছিলেন বটে, কিন্তু আপনি যথার্থ মূর্ছা যান নাই—ভান করিয়া পড়িয়াছিলেন। কী বলেন?

রো। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি অজ্ঞানের ভান করিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমার বেশ জ্ঞান ছিল।

যু। এরূপ করিবার কারণ কী?

যুবকের এরূপ প্রশ্নে রোগীর চক্ষু একবার ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া পূর্বভাব ধারণ করিল। তাহার পর শূন্যদৃষ্টিতে একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া, চারিদিকে চাহিল; আবার সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া, উদ্বেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'কেবল আমার স্ত্রীর জন্য—আর কিছু না। ডাক্তারবাবু, কোনওরকমে আমার এই মূর্ছাটি চব্বিশঘণ্টা স্থায়ী করিয়া দিতে পারেন, এমন কোনও উপায় আছে কি? যখন মূর্ছিত থাকি তখন আমি নীরোগ, তখন আমি বেশ ভালো থাকি! তাহার পর যখন বেশ জ্ঞান হয়, তখন কেবল যন্ত্রণা, বুকের যন্ত্রণা—মাথার যন্ত্রণা—বুক ফেটে যায়—মাথা ছিঁড়ে পড়ে—এমনই ভয়ানক যন্ত্রণা! আমি জানি, আমার এ-যন্ত্রণা ইচ্ছাকৃত। আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতেই যে একদিন আমার এ-জীবনের অবসান হইবে, তাহাও আমি জানি। সাধ করিয়া যে, আমি নরকাগ্নি বুকের মধ্যে জ্বালিয়াছি, তাহাও আমি জানি; কিন্তু প্রাণান্তেও আমি সে-কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই—পরেও করিব না। আপনিও এখন এক কাজ করুন, আপনি এখন অন্য ঘরে গিয়া বসুন। আমি এখন একা থাকিতে পারিলে অনেকটা সুস্থ হইব। আপনাকে যে-সকল কথা বলিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর কাছে তাহার একটি বর্ণও প্রকাশ করিবেন না। তাঁহাকেও এখন এখানে আসিতে মানা করিবেন। আমি আপাতত কিছুক্ষণ একা থাকিতে চাই। একটু সুস্থ হইলে পরে আপনাকে ডাকিব।' এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া একটা উন্মুক্ত গবাক্ষের সম্মুখে করতললগ্নশীর্ষ হইয়া বসিলেন; এবং ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

যুবক তাহার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন লোকটার মাথা বোধহয় কোনওরকমে খারাপ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি সেই অদ্ভুত রোগীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে সেই রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, 'আপনি যে একাকী এখানে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি কি—'

যুবক বাধা দিয়া বলিলেন, 'তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন। উঠিয়া জানালার নিকটে বাতাসের মুখে বসিয়াছেন; এখন তিনি একা থাকিতে চাহেন। বোধকরি, আপনার স্বামীর মনের ভিতরে কোনও শোক বা দুঃখের এমন একটা আঘাত লাগিয়াছে, যেজন্য তিনি একান্ত অধীর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন; বোধকরি, মাথাও কিছু বিগড়াইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তিনি আপনাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : বিপদের ছায়া

রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'কই, তেমন তো কোনও ঘটনা ঘটে নাই। আপনি এখন (অঙ্গুলি নির্দেশে) বারান্দার ওদিককার কোণের ঘরে গিয়া বসুন; সে-ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইবেন; আপনার বড় বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না; বড় দায়ে পড়িয়াই আপনাকে কষ্ট দিতেছি,' বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী রোগীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর যেমন যুবক দুই পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই রোগীর কক্ষ হইতে দুই-একটি বড় ভয়ানক কথা তাঁহার কানে গেল। কথাগুলি খুব মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও, বেশ বুঝিতে পারা গেল। যুবক সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রমণী বলিল, 'সেই লোক ঠিক? তুমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছ?'

রোগী বলিল, 'হ্যাঁ, সেই লোকই ঠিক।'

রম। ইহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয়?

রোগী। ইহারই নাম।

রম। তবে আমার ভুল হয় নাই?

রো। কোনওদিন যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইবে?

এই বলিয়া রোগী অনুচ্চস্বরে হাসিল। সে-শব্দও যুবক বাহির হইতে বেশ শুনিতে পাইলেন। তাহার পর—

রম। এখন কী করিতে হইবে?

রো। যাহা তোমার অভিরুচি।

রম। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

রো। খুন করো।

রম। খুন করিব।

রো। আশ্চর্য হইয়া গেলে যে! কই, এমন কথা তো তোমার মুখে আর কখনও শুনি নাই? আজ খুনের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িতেছ! আগে খুন করিতে তোমারই আগ্রহ অধিক দেখিতাম। কী জানি যুবকের রূপ দেখিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া পড়ো নাই তো? দেখিয়ো, আমাকে যেন শেষে পথে বসাইয়ো না।

রমণী। সে ভয় নাই, তাহা হইলে অসংখ্য বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া, তোমার সঙ্গে এতকাল ধরিয়া ঘুরিয়া মরিতাম না। তুমি কি আমাকে এমনই মনে করিয়াছ? আগে এই লোকটির সম্বন্ধে যেরূপ পরামর্শ করা হইয়াছিল, সেই পরামর্শ মতে কাজ করিলে ভালো হইত না কি?

BanglaBook.org

রোগী। সেই পরামর্শ মতেই কাজ করো। বিশেষত, সেইজন্যই লোকটাকে বেশি দরকার।

শুনিয়া যুবকের চক্ষুস্থির—শুনিয়া এক জটিল রহস্য হইতে তদধিক জটিল ও দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে তিনি নিমগ্ন হইলেন। মুখে তাঁহারই নাম। তাঁহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয়—তাঁহাকেই খুন করিবার কথা—আগেকার পরামর্শ মতে কাজ হইবে! এ-সকল কথার অর্থ কী? যুবক কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

সাহসে বুক বাঁধিয়া যুবক আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন তাহাদিগের আর কোনও কথা শুনা গেল না, তখন তিনি তথা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, অপর পার্শ্বে বারান্দার রেলিং-এর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানেও অত্যন্ত অন্ধকার; যুবক সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আপনার অদৃষ্ট ও বিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার তাঁহার চোখের উপরে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ ভয় ও সন্দেহ

অগৌণে সেই রমণী একটি প্রজ্বলিত দীপহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। পূর্বাপেক্ষা তাহার অবগুণ্ঠনের দীর্ঘতার এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে; তাহার স্বেদজড়িত চূর্ণালকবিশোভী অপ্রসর ললাটের কিয়দংশ আবৃত রাখিয়াছে মাত্র। কানের পাশ দিয়া তাহার বিপুলকৃষ্ণকেশরাশির একটা দীর্ঘ ও স্থূল গুচ্ছ, তাহার সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত পীন, পীবর ও উন্নত বক্ষের উপরে তরঙ্গায়িতভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই অপ্রশস্ত অবগুণ্ঠন ও কৃষ্ণকেশগুচ্ছে সেই আলোকোজ্জ্বল মুখখানি বোধ হইতেছে, যেন একখণ্ড শ্বেত ও একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ বসন্তপূর্ণিমার চন্দ্রকে উভয় পার্শ্ব হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। হস্তস্থিত দীপালোকে রমণীর ঈষল্লোহিতাভ মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া ও সেই চঞ্চল, হাস্যময় কৃষ্ণোজ্জ্বল আকর্ণ চক্ষুর, প্রাখর্যে মনোহর ও তীক্ষ্ণতায় মধুর ও চাঞ্চল্যে মধুরতর সে-দৃষ্টির মধ্য দিয়া একটা মুগ্ধকরী রমণীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সেই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী বিলোলকটাক্ষশালিনীর আগমনে ও তাহার সেই ললিতকোমলভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইলেন। আপনার বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন; মনে আর পূর্বের ভাব কিছুই রহিল না। তখন মনে হইতে লাগিল, বৃহদরণ্যমধ্যবর্তী অন্ধকারময় ভগ্নপ্রায় সেই প্রকাণ্ড জনবিরল নির্বান্ধব পুরীটাই তাঁহার ভয়ের একমাত্র কারণ, আর সেইখানে সেই অপরিচিতা রমণীই তাঁহার একমাত্র পরিচিতা। আর মনে হইতে লাগিল, অলক্ষে থাকিয়া তাহার মুখে যে-সকল ভয়াবহ কথা শুনিয়াছিলেন, সে আর কিছুই নহে, তাঁহার অলস মনকে চঞ্চল করিতে একটা অমূলক কল্পনা কখন অন্ধকারে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিয়া, সেখানে একটা বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিতেছিল। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ভুল—নিরর্থক—এবং তাহার কোনও মানে হয় না।

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের ভিতরে এইরূপ বিপ্লব, তখন রমণী তাঁহাকে মৃদুহাস্যে বলিল, 'আপনি যে এখানে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি, আমার সঙ্গে আসুন।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আর কেন, অনেকক্ষণ আসিয়াছি—আপনি একজন ভৃত্যকে বলুন, আমাকে নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। নিজে পথ চিনিয়া যাইতে পারিব না।'

রমণী বিনীতভাবে বলিল, 'মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, কিছু জলযোগ না করিয়া আপনি কিছুতেই যাইতে পাইবেন না।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিল, 'সেজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

BanglaBook.org

রমণী বলিল, 'তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। মহাশয়ের নামটি কী শুনিতে পাই না? এরূপ উপকারীর নাম আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখা উচিত।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'দেবেন্দ্রবিজয়।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : সুন্দরীর মনের ভাব

দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া রমণী সেই সুদীর্ঘ বারান্দার শেষ-সীমা পর্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল। সেখানে একটি ঘর চাবি-বন্ধ ছিল। রমণীর নিকটে চাবি থাকায়, তখনই খুলিয়া ফেলিল; উভয়ে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং রমণী ভিতর হইতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেখানে উপরে উঠিবার একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া উভয়ে উপরে উঠিলেন। সেখানে মুক্ত প্রকৃতির এক অপূর্ব শোভা! জ্যোৎস্নালোকপূর্ণ উন্মুক্ত ছাদ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সেখানে আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?'

রমণী মৃদু হাসিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি একটা অত্যন্ত তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'আপনি এত ভীত হইতেছেন কেন? আমি কি আপনাকে খাইয়া ফেলিব? আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ—আপনার সে-ভয় নাই, আসুন।'

দেবেন্দ্রবিজয় তাহার প্রশ্নের এইরূপ অনাকাঙ্খিত ও অপূর্ব সদুত্তর পাইয়া নিরুত্তরে রমণীর সহিত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক তখন অসম্ভবরূপে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এ-সকলই যেন একটা অভাবনীয় ও অনপেক্ষিত স্বপ্নের মতো তাঁহার মনোহর বোধ হইতেছিল—হইবারই কথা। সেই নির্জন নদীতীরে, প্রস্ফুটচন্দ্রালোকে, মধুর জলকল্লতানে, সহসা যে-মোহ একবার মুহূর্তের মধ্যে যুবকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁহার বুকের মধ্যে যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখন তেমনই শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রমণী বলিল, 'আপনি অপরিচিত, রূপবান যুবক, বিশেষত পরপুরুষ; আর আমি স্ত্রীলোক, আমারও রূপ আছে, যৌবন আছে বিশেষত পরস্ত্রী; এরূপ সময়ে কেহ যদি আমাদিগকে এই রাত্রে নির্জন ছাদের উপরে দেখিতে পায়, সে কী মনে করে, বলুন দেখি?'

এ কী প্রশ্ন? ইহার কী উত্তর করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে অস্থির হইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, কুলস্ত্রী বোধে তিনি যাহার বিপদে মাথা দিয়াছিলেন, সে অসচ্চরিত্রা পিশাচী—পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের মনোভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া, সহসা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অন্য সুরে বলিল, 'আপনি হয়তো আমার এরূপ ব্যবহারে আমাকে মনে-মনে দোষারোপ করিতেছেন। আশ্চর্য নয়, ইহা আপনার দোষ নয়—নারীজাতিরই হৃদয় বড় দুর্বল। সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতে চায়—আপনার কর্তব্য ঠিক রাখিতে পারে না। যাই হোক, আপনি আমাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবিতেছেন, সন্দেহ নাই। কী করিব, আমার এইরূপ বাচালতার জন্য আমি আজন্মকাল নিন্দাভোগ করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া আমার এ-নিন্দনীয় স্বভাবের হস্ত হইতে আমি কিছুতেই মুক্তি পাইলাম না। এজন্য আপনি আমাকে দোষী ভাবিবেন না।

তখন সরলচিত্ত দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের উপর হইতে সহসা একখানা মেঘ কাটিয়া গেল।

BanglaBook.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : সুন্দরীর আত্মপ্রকাশ

সেই ছাদের দক্ষিণ কোণে আর একটি ছোট ঘর ছিল; রমণী যুবককে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটির চারিদিক উত্তমরূপে বন্ধ। এক পার্শ্বে একটি পরিষ্কার ছোট শয্যা ছিল। অপর পার্শ্বে একটি আলমারি; রমণী যুবককে বসিতে বলিয়া সেই আলমারির ভিতর হইতে আপেল, নাসপাতি, নারাঙ্গী, আঙুর প্রভৃতি সুখাদ্য পরিপূর্ণ একখানি রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ধরিল। সেই সকল আহার্য-সামগ্রীর সুমিষ্ট গন্ধে জঠরের নিভৃত প্রদেশস্থ পরিতৃপ্ত ক্ষুধাও একবার অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে স্বপ্নোত্থিতবৎ চকিতে মাথানাড়া দিয়া স্পষ্টরূপে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

দেবেন্দ্রবিজয় সে-সকলের কিছুই স্পর্শ করিলেন না এবং যতদূর সম্ভব, বিনীতভাবে অস্বীকার করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয়ের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশত জানি না; কিন্তু রমণী সে-অস্বীকার কিছুতেই স্বীকার করিল না; আঙুরগুচ্ছ হইতে তাড়াতাড়ি একটি সুপক্ক আঙুর ছিঁড়িয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল। দেবেন্দ্রবিজয় মুখ সরাইয়া লইলেন; কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সেই রমণী সহসা দীপ নিবাইয়া দিল এবং দুই হস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বারংবার সবেগে তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রমণীর এইরূপ অসম্ভব, অযথা দুর্ব্যবহারে দেবেন্দ্রবিজয়ের হৃদয় হইতে মস্তিস্ক পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রমণীর সেই অজস্র চুম্বন-বর্ষণে তিনি বিস্ময় প্রকাশেরও এক বিপল মাত্র অবসর পাইলেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ে তাঁহাকে একেবারে নিঃসংজ্ঞ করিয়া দিল; কারণ একজন অপরিচিতার নিকটে এরূপ অযথা ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাহা হইলেও তাঁহার সেই নিঃসংজ্ঞভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না; অকস্মাৎ আলোক-রশ্মির ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের ন্যায়, তাঁহার মনের সেই অন্ধকার অচেতন অবস্থার ভিতর সংজ্ঞার জাগ্রতভাবের সঞ্চার হইল। তিনি রমণীকে জোর করিয়া, অদূরে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তথাপি তাঁহার দুই হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করুন—বলুন, ক্ষমা করিলেন, নতুবা আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ-হৃদয় যেমনি দুর্বল, তেমনি অদম্য, কিছুতেই বশ মানিবার নয়।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না, তিনি পিশাচীর হাতে পড়িয়াছেন, সহজে মুক্তি পাইবার আশা নাই। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের ন্যায় সচ্চরিত্র যুবকের মুখে যাহা ভাল শুনায়, তিনি তাহাই বলিলেন, 'আপনি ভদ্রমহিলা, আপনি এ কী করিতেছেন? আমি অপর লোক, আত্মীয় নই, অপরিচিত আমি, আমাকে স্পর্শ করিবেন না; তাহাতে আপনার স্ত্রী-ধর্মের হানি হইবে।'

রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের কথাগুলি মন দিয়া শুনিল এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; কিন্তু তাহার কোনওরূপ ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না; না লজ্জিত, না সঙ্কুচিত, না অপ্রতিভ, না বিস্মৃত—কিছুই না! ক্ষণপরে বলিল, 'দেবেন্দ্রবাবু, আপনি যেকালে আমাকে সহসা এতগুলি কথা শুনাইয়া দিলেন, আমি সকলের উত্তর করিতেছি। বলুন দেখি, দেবেনবাবু, আপনি যে আমাকে ভদ্রমহিলা বলিলেন, কিসে আমি ভদ্রমহিলা? যে-লোক জীবনের শেষ-সীমায় দাঁড়াইয়া, মরিতে বসিয়া, আমার মতো একজন অযোগ্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নারী-জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়া দিতে পারে, সে কিসে ভদ্রলোক? আমার এই বয়স, এই রূপ, এই যৌবন, একি একজন মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরই যোগ্য? আর আপনি কিসে অপরিচিত? যিনি একবার সাক্ষাতেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানে একটা চিরস্থায়ী আসন পাতিতে পারেন, তিনি কিসে অপরিচিত? সেই এক মুহূর্তের সে-পরিচয়—তেমনটি যে সহস্র বৎসরের হয় না। আর ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী কিসে আমি? বরং ঈশ্বরই আমার নিকটে অপরাধী। তিনি আমাকে জগজ্জয়ী রূপ দিয়া, উদ্দাম যৌবন দিয়া, তাহার ভিতরে একটা চির-তৃষ্ণাতুর হৃদয় দিয়া, শেষে একটি অযোগ্য বৃদ্ধের হাতে সেই সকল সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, সেজন্য কি তিনি আমার নিকটে অপরাধী নহেন? যখন এ-সংসারে একজন জ্ঞানবান বৃদ্ধের ধর্ম নাই, ঈশ্বরের ধর্ম নাই, তখন আমি একটা সামান্য স্ত্রীলোক বই তো নয়—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—তৃণাপেক্ষাও লঘু, আমার আবার ধর্মাধর্ম কী?'

রমণীর এইরূপ দুরভিসন্ধিপূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন,

তিনি পরের বিপদে মাথা দিতে আসিয়া নিজের বিপদটা অত্যন্ত গুরুতর ঘনীভূত এবং কাজটা অতিশয় অন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। বলিলেন, 'আপনি যা-ই হোন, যেরূপ প্রকৃতিরই হোন, আমার কাছে ও-সকল কথা না বলিলেই ভালো হয়। আমাকে পথ দেখাইয়া দিন। এমন জানিলে আমি কখনওই আপনার সঙ্গে আসিতাম না।'

রমণী বলিল, 'না আসিলে আমারও ভালো হইত। কে জানিত, আপনি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার হৃদয়ে এমন একটা সর্বনেশে পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবেন? দেবেন্দ্রবাবু, সত্য বলিতে কি, আমি মরিতে বসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন; আমি আপনার পদাশ্রিতা—আমাকে এরূপ কঠিনভাবে ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। আপনি আমার বিপদ-উদ্ধারের জন্য আসিয়া, এখন আমাকে সহস্রটা বিপদের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। আপনি এরূপ নির্দয়, জানিতাম না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : উপেক্ষিতা

দেবেন্দ্রবিজয়ের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। তিনি একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বেই রমণী দ্বারবদ্ধ করিয়া তদুপরি পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। এবং কটাক্ষের পর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিল, 'আমার মুখে আগুন! তাই এমন একটা নিষ্ঠুর অরসিককে দেখিয়া আপনা ভুলিয়াছি!'

দেবেন্দ্রবিজয় কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, 'পথ ছাড়ুন, আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।'

রমণী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, 'কখনওই না—যাইতে হয়, আমাকে খুন করুন। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি বড় ছুরিকা বাহির করিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া) এই ছুরি নিন—আমাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলুন। এখানে কেহ আসিবে না—কেহ কিছু জানিবে না—কোনও ভয় নাই; তাহার পর আপনার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান, আমি বাধা দিতে আসিব না। দেবেন্দ্রবাবু, আপনি কেমন জানি না; কিন্তু এরূপ আত্মহারা স্ত্রীলোককে প্রত্যাখ্যান করা অপরের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইত।' এই বলিয়া সেই লীলাবতী সুন্দরী আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া, যতদূর সম্ভব নিকটবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে সেই ব্যাকুলা সুন্দরীর অবৈধ আবদার ও অনুচিত দাবি যত সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে তেমনি আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের অত্যধিক ঘৃণা ও বিরক্তি তদধিক সীমাতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। ক্রোধভরে দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'তুমি পিশাচী, দূর হও—আমাকে স্পর্শ করিও না।'

রমণী আবার ছুটিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিল। অবিচলিতভাবে বলিল, 'ওঃ—দেবেন, তুমি কী নিষ্ঠুর! পুরুষমানুষ এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারে, তা আমি জানিতাম না।'

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা সজোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।'

তথাপি সে আবার ছুটিয়া আসিয়া, সেইরূপ আগ্রহভরে দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া, একটা বিদ্যুন্ময় সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া নম্রস্বরে বলিল, 'তথাপি আমি তোমাকে সেইরূপ অত্যন্ত ভালোবাসি।'

রমণীর বক্ষের বসন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। দীপালোকে তাহার পীবর যৌবনভারাবনত দেহ অনাচ্ছন্ন অবস্থায় অতিশয় সৌন্দর্যময় বোধ হইতে লাগিল। উন্মুক্ত কেশদাম বিশৃঙ্খলভাবে তাহার চোখ, মুখ, বুক ও পিঠের কোনও অংশ ঢাকিয়া ও কোনও অংশ কিঞ্চিন্মাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া আর

BanglaBook.org

একটা অপূর্ব শোভাময় প্রদীপের ক্ষীণালোকপূর্ণ সেই গৃহটি এককালে আলোকিত করিয়া তুলিল। সহনাতীত উৎকণ্ঠায় তাহার ললাটে স্বেদস্রুতি এবং ঘন শ্বাসে তাহার অনাবৃত পীবরোন্নত বক্ষঃস্থল ঘন-ঘন পরিস্পন্দিত হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষিতা রমণী নিরুপেক্ষিত ও অনপ্রতিভভাবে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের উপরে তাহার দীপ্ত কৃষ্ণকায় চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল, 'দেবেন্দ্রবিজয়, তুমি যতই আমাকে ঘৃণা কর না কেন, আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি; কিন্তু আশা করি নাই, আমার এই স্বার্থশূন্য ভালোবাসা তোমার হাতে এরূপ কঠোরভাবে পুরস্কৃত ও উপেক্ষিত হইবে!'

দেবেন্দ্রবিজয় ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন, 'কুলটা, তোমাকে স্পর্শ করিতেও পাপ আছে,' বলিয়া তিনি সেই রমণীকে দুই হাতে এরূপ সজোরে ধাক্কা দিলেন, সে একরকম প্রহার করা; সুতরাং রমণী তাহা সামলাইতে পারিল না; ঘরের কোণে গিয়া পড়িল এবং দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইল। তখন সে লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। তাহার প্রচুরায়ত রোষরক্ত চক্ষুদুটি উল্কাপিণ্ডবৎ অতি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং তন্মধ্য হইতে যেন জ্বলন্ত বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। সেই বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয় স্তম্ভিত হইলেন, মুখে কথা সরিল না। রমণী তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'নারকী, আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়াছ, এ-অপমানের প্রতিশোধ এইরূপেই হইবে।' এই বলিয়া তখনই পরিত্যক্ত দীর্ঘ শাণিত ছুরিখানা ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইল এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের বুকে তাহা আমূল বিদ্ধ করিবার জন্য সবেগে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিল। তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রবিজয় দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং ছুরিখানা কাড়িয়া লইয়া রমণীকে পুনরায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রমণী তখনই সবেগে উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। বাহির হইতে বলিল, 'তথাপি তোমার মৃত্যু অনিবার্য।' বাহির হইতে দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল।

দেবেন্দ্রবিজয় দ্বার উদ্‌ঘাটনের কোনও উপায় পাইলেন না। তিনি সেই নির্জন গৃহের মধ্যে এইরূপে বন্দি হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণনাশের চেষ্টা

দেবেন্দ্রবিজয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, এ-বিপদ হইতে উদ্ধারের আশামাত্র নাই। সেখানে তাঁহাকে এমনসময়ে একটু সাহায্য করে, এমন কেহ নাই।

রমণী চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই দেবেন্দ্রবিজয় একটা কী অনাঘ্রাতপূর্ব অতি তীব্র গন্ধ অনুভব করিলেন। চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াও কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমশ গন্ধ আরও তীব্র হইতে লাগিল; এমনকী শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, সেখানে এক মুহূর্ত অবস্থান করা মনুষ্য মাত্রেরই সাধ্যাতীত। শেষে দেখিলেন, কোনও অদৃশ্য স্থান হইতে ধূমরাশি সেই ছোট রুদ্ধ ঘরের ভিতরে অল্পে-অল্পে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ঘরের ভিতরে যত অধিক পরিমাণে ধূম সঞ্চিত হইতে লাগিল, সেইসঙ্গে সেই প্রাণান্তকর দুর্গন্ধও তীব্রতম হইয়া উঠিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, কোনও পার্শ্ববর্তী ঘরে আগুন লাগিয়াছে, অথবা সেই উপেক্ষিতা সর্পিণীসদৃশা স্ত্রীলোকটি সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে অপমানকারীর মৃত্যুর পথ সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণা দেবেন্দ্রবিজয়ের মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল; কারণ ঘরে আগুন লাগিলে সে-ধূম এমন উত্তাপশূন্য কিংবা এমন একটা উগ্র গন্ধযুক্ত হইত না। সে-গন্ধ অত্যন্ত বিষাক্ত সন্দেহ নাই; নতুবা তাঁহার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া শাণিত ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে থাকিবে কেন? দেবেন্দ্রবিজয় তখন বুঝিলেন,

আর নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার এ সময় নহে। তিনি উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, এবং উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া দ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন—চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি বাহির হইতে না পারেন, নাই—নাই, তখন সেই নিবিড়তর ধূমরাশির কতকটা বাহির হইয়া গেলে, তিনি তখনকার সেই শ্বাস-রাহিত্যের অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং ইহার পর অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, মনে করিয়া তাড়াতাড়ি রুদ্ধ গবাক্ষগুলি উন্মোচন করিতে গেলেন; তাহাতেও তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন; সবগুলিই বাহির হইতে বন্ধ; এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ যে, কিছুতেই খুলিল না। তখন তিনি একান্ত নিরাশ ও নিরুপায় হইয়া ছুটিয়া গিয়া, দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই রুদ্ধদ্বারে পদাঘাতের উপর পদাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র গৃহ সেই পদাঘাতের শব্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার মতন হইল, তথাপি সেই কঠিন কবাট-জোড়াটা কঠোর ও অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া সেই দুঃসহ পদাঘাতগুলা অনায়াসে সহ্য করিয়া, পূর্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে কে বলিল, 'বৃথা চেষ্টা—দেবেন্দ্র, বৃথা চেষ্টা। স্ত্রীলোক উপেক্ষিতা হইলে পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী হয়। বিধির লিখন, তোমার মৃত্যু এইরূপেই হবে। মরিতে বসিয়াছ, নিজে মরো—কবাট-জোড়াটার অপরাধ কী?'

তাহার পর খল-খল—কী ভয়ানক অট্টহাস্য!

সেই তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্য বিদ্যুতের শিখার ন্যায় সেই ধূমময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরক্ষণেই বাহিরের মুক্তপ্রকৃতির দূর-দূরান্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে ক্ষীণ—ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। তারপর, সকলই নীরব।

দেবেন্দ্রবিজয় স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, সেই তীব্র উপহাস এবং সেই উপহাসের অতি তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্যকল্লোল আর কাহারও নহে—এ-সেই দস্যু-রমণীর—সেই পিশাচীর।

রুদ্ধশ্বাসে সেই ক্ষুদ্র রুদ্ধকক্ষ-মধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় ইতস্তত ছুটিতে লাগিলেন। পূর্বেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া [illegible]য়াছিল, এখন যে সামান্য জ্ঞান ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সেই বিষাক্ত গন্ধ দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গ ক্রমে অবশ করিয়া আনিল। তখন সেই দুর্গন্ধ ধূম গৃহের মধ্যে এত নিবিড় হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে সেই দীপশিখা একান্ত ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহটি দেবেন্দ্রবিজয়ের চোখে আরও অন্ধকার দেখাইতেছিল। তিনি সহনাতীত যন্ত্রণায় আকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন এবং বুকফাটা-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'কে আছ, শীঘ্র এসো, রক্ষা করো—বাঁচাও—বাঁচাও—মৃত্যু—মৃত্যু—ভয়ানক মৃত্যু!'

ক্রমে তাঁহার পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া আসিল; তিনি মাতালের মতো টলিতে-টলিতে পড়িয়া গেলেন। দুইবার পড়িলেন, দুইবারই উঠিলেন, তাহার পর আর উঠিতে পারিলেন না—সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিষের হল্কা ছুটিতেছিল, তাই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় কক্ষতলে পড়িয়া তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

সেই সময়ে তিনি স্বপ্নবৎ দেখিলেন, যেন একজন দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত যুবক একটা অত্যন্ত শব্দ করিয়া সেই গৃহমধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

সেই সময়ে তিনি একেবারে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন; যেন তাঁহার ক্ষীণতম দৃষ্টির ও সেই অপরিস্ফুট দৃশ্যের মাঝখানে সমস্ত ঢাকিয়া একখানা মসীময় যবনিকা-পাত হইল।

BanglaBook.org

চতুর্থ খণ্ড

প্রতিহিংসা-মূর্তিমতী

Sacha. He catches her—
Melisa. And now he lets her go—
Again she's in his grasp—
Psyche. And now she is not !
He seizes her back hair—
Blanche. And it comes off ?

GILBERT
"The Princes"
Scene III

BanglaBook.org

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারিত

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের জ্ঞান হইল, দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মুক্ত পৃথিবীর চারিদিক প্রভাতরবির হিরণ্য-প্রবাহে পুলকিত এবং প্রদ্যোতিত; তিনি নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে, নৌকার উপরে। দাঁড়িরা অদূরে বসিয়া সশব্দে, দ্রুতহস্তে দাঁড় নিক্ষেপ করিয়া নৌকাখানাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে একদিক হইতে অপরদিকে লইয়া যাইতেছিল। নদীর দুই পার্শ্ব নীরব; কেবল দূর পল্লীমধ্য হইতে ক্রীড়াপরায়ণ বালকদিগের হাস্যকল্লোল এবং কোনও নিদ্রোত্থিত দুগ্ধপোষ্যের রোদনধ্বনি এক-একবার অস্ফুট শোনা যাইতেছিল। অনতিদূরস্থ একটি দেবদারুর শীর্ষদেশ হইতে করুণকণ্ঠ 'বউ-কথা-কও' পাখি, আলোকস্বরা ধরণীর নগ্ন বক্ষ শব্দ-তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া অভিমানমৌন প্রিয়াকে অবিশ্রাম সপ্রেম-সম্ভাষণ করিতেছিল। তাহার সেই বেদনা-গীতি, সেই শোভন স্তব্ধ, সুন্দর কিরণোজ্জ্বল প্রভাতের অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে নিরতিশয় মধুর শুনাইতেছিল এবং তটস্থ সঙ্গীহীন দীর্ঘ গাছগুলার ছায়া দীর্ঘতর হইয়া নদীবক্ষে—অনেকদূর অবধি প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় মুগ্ধনেত্রে ও অতি বিস্ময়ের সহিত সেই-সকল দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে, কিরূপে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল, তাহা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; এমনকী তখনও তিনি যে সসংজ্ঞ হইয়াছেন, সে-বিষয়েও তাঁহার মনে একটা দারুণ সন্দেহ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাও একটা স্বপ্নের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি কিছুতেই তাঁহার সেই ভয়ানক বিপদের কথা আগাগোড়া মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অতিকষ্টে তিনি সেইসকল একটু-একটু স্মরণ করিতেছিলেন; তথাপি তখন সেই দস্যু-রমণী ও আশ্চর্য রোগীর মুখ ভালোরকমে তাঁহার মনে আসিতেছিল না; তাঁহার অবসন্ন দেহ, যে দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত ব্যক্তি গৃহতল হইতে আপনার বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার মুখ যদিও এক-একবার মনে পড়িতেছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না; একটা প্রহেলিকাময় অপূর্ব দৃশ্য যে, তখন হইতে এখন পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি-সম্মুখে অভিনীত হইতেছে, ইহাই যেন তাঁহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। এখনও যেন সেই ধূম, সেই উগ্র গন্ধ তাঁহার শ্বাসরোধ করিতেছে। তিনি অতিকষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। মাথা ও বুক অত্যন্ত ভারী বোধ হওয়ায় তিনি চেষ্টা করিয়াও সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছিলেন না; একটা দুর্বিষহ উন্মাদক নেশা তাঁহার মস্তিষ্ক পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। তিনি সেই নেশার ঝোঁকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'একি ভয়ানক জটিল রহস্য! স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াই কি তাহারা দিনাতিপাত করে! সেই স্ত্রীলোকটি—কত সুন্দর দেখিতে সে! কে তাহাকে দেখিয়া বুঝিবে, তাহার হৃদয় এইরূপ কালকূটে ভরা; নিশ্চয় তাহারা দুইজনে মিলিয়া, আমাকে খুন করিয়া আমার নিকটে যা কিছু আছে, সমস্তই কাড়িয়া লইবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য! কে আমায় সেই ভয়ানক মৃত্যু হইতে, আরও সেই ভয়ানক খুনিদের হাত হইতে উদ্ধার করিল? এখন আমি কোথায়? কোথায় যাইতেছি? এ-নৌকার উপরেই বা আমাকে কে লইয়া আসিল?'

নৌকা দ্রুতগতিতে চলিতেছিল বলিয়া, নদীবক্ষের শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ প্রতিকূল বায়ু দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইয়া ক্ষণে-ক্ষণে স্পষ্টরূপে তাঁহার দুর্বল মস্তিষ্কের বলীধান করিতেছিল। দেবেন্দ্রবিজয় একজন দাঁড়িকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ, এ-নৌকার উপরেই বা কে আমাকে লইয়া আসিল?'

নৌজীবীদের দল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না—ঝপ্‌ঝপ্ শব্দে দাঁড় বাহিয়া সেইরূপ দ্রুততরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছ?'

BanglaBook.org

নৌ-বাহকদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমরা আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব, সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনি একটু চুপ করে বসুন।'

যুবক বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, কোথায়? যমপুরীতে না কি? সেই ভয়ানক মৃত্যুর পর কি এ যমপুরী-যাত্রা না কি? প্রকাশ্যে বলিলেন, 'আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ, না বলিলে আমি কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে যাইব না। আমাকে এখানে নামাইয়া দাও।'

এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া মাঝি সেইখানে উপস্থিত হইল এবং দেবেন্দ্রবিজয়কে বিনীতভাবে বলিল, 'আপনার বাড়িতেই আপনাকে নিয়ে যাব, আমরা আপনার ঠিকানা জানি, আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না—একটু স্থির হয়ে বসুন। আপনার এখনও নেশা আছে।'

মাঝি যদিও কথাগুলি যতদূর-সম্ভব মিষ্ট করিয়া বলিল, কিন্তু দুরদৃষ্টবশত তাহা দেবেন্দ্রবিজয়ের নিতান্ত নীরস ও অস্থিদাহকারীবৎ বোধ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে উঠিয়া মাঝিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা! মূর্খ, আমি কোথায় থাকি, তুমি কি তা জানো যে, আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে?' এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা করিলেন মাত্র, উঠিতে পারিলেন না, অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, মাঝি যে তখনও তাঁহার নেশা আছে বলিয়া ক্রোধোদ্রেক করিয়াছিল, সেটা নিতান্ত মিথ্যাপবাদ নহে; নিঃসন্দেহ সত্য। তখনও তাঁহার মাথাটা বেশ ঘুরিতেছিল এবং পা দুখানি তাঁহার দেহভার বহনে একান্ত অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত টলিতেছিল। মাঝির মূর্খতা হইতে তাঁহার মূর্খতা যে বহুপরিমাণে অধিক, বুঝিতে পারিয়া সর্বতোভাবে দুঃখিত হইলেন। হতাশভাবে একপার্শ্বে বসিলেন।

মাঝি দেবেন্দ্রবিজয়ের সেইরূপ ভাব দেখিয়া সেজন্য কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'আপনার বাড়ি ওপারে কামদেবপুরে; আপনার নাম তো অরিন্দমবাবু?'

দেবেন্দ্রবিজয় উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিলেন, 'আমার নাম অরিন্দমবাবু নয়—বাড়িও কামদেবপুরে নয়।'

মাঝি বলিল, 'তবে কি সেই ভদ্রলোকটি আমাকে মিথ্যা বলিলেন?' মাঝি মনে ভাবিল, 'বাবুর এখনও বেশ নেশা আছে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কে সে ভদ্রলোক? কে আমাকে নৌকায় তুলিয়া দিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি এখনই আমাকে সবকথা খুলিয়া বলো।'

মাঝি বলিতে লাগিল, 'বাবু, আপনি কাল রাতে বড় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। এত মদ খেয়েছিলেন যে, আপনার একটুও জ্ঞান ছিল না। একটা বটগাছের তলায় মড়ার মতো পড়েছিলেন। সে যাই হোক, তাতে আর হয়েছে কী, আজকাল অনেক ভদ্রলোকেরই এমন হয়ে থাকে। সেখানকার একটি ভদ্রলোক সেইরূপ অবস্থায় আপনাকে দেখতে পেয়ে আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, মথুর, একটা কাজ কর দেখি, এই ভদ্রলোকটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। যদি কোনও লোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে এখনি ফাঁড়িতে টেনে নিয়ে যাবে। এ-লোকটি কোথায় থাকে, আমি জানি; এই চিঠিখানা জামার পকেটে পাওয়া গেছে, এই চিঠিতে ঠিকানা লেখা আছে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কে সে ভদ্রলোক, তুমি তাকে চেনো?'

মাঝি উত্তর করিল, 'না বাবু, আমি চিনি না।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'তবে সে কেমন করিয়া তোমার নাম ধরিয়া ডাকিল?'

মাঝি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তা কী করে জানব, বাবু—তার আগে সে-ভদ্রলোকটিকে আর কখনও কোথায় দেখেছি, আমার তো বাবু, ভালো মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনেন তা না হলে, কেমন করে আমার নাম জানতে পারলেন। যাই হোক, লোকটি নিতান্ত ভদ্রলোক, খুব দয়ার শরীরও বলতে হবে; নইলে আজকালকার বাজারে কে কাকে দেখে, বলুন দেখি? আপনার

BanglaBook.org

বাপ-ভাইকে কেউ দেখে না, তা পর। আপনার জন্য অনেক করেছেন। আপনাকে নিয়ে যাবার ভাড়াটি পর্যন্ত তিনি নিজের কাছে থেকে আমাদের আগে চুকিয়ে দিয়েছেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে ভদ্রলোকটির বয়স কত, কী রকম দেখতে—লম্বা না বেঁটে, মোটা না রোগা, দাড়ি-গোঁফ আছে, না নাই ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। মাঝি সেইসকল প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিল, তাহাতে সর্বতোভাবে গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব রোগীকেই বুঝায়। দেবেন্দ্রবিজয় মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে-চিঠির কথা বলিতেছিলে, সে চিঠিখানা কোথায়? আমি সেখানা একবার দেখিতে চাই। আমাকে সেখানা দাও।'

মাঝি বলিল, 'সে-চিঠি আপনার জামার পকেটে আছে, তিনি ঠিকানাটা আমাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিয়ে, তখনই আবার আপনার জামার পকেটে রেখে দিয়েছেন।'

পকেটে হাত দিয়ে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'মাঝি, সর্বনাশ হয়েছে! তারা চোর, তারা ডাকাত—তারা অতি ভয়ানক লোক—ঘোর বিশ্বাসঘাতক! তোমরাও সেই খুনিদের লোক দেখিতেছি। আমার হাতে কেহই নিস্তার পাবে না, এর ফল তোমরা নিশ্চয়ই পাবে।'

মাঝি সে-কথার কোনও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অত্যধিক বিস্মিত এবং কতক বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিল, 'কী হয়েছে, বাবু? আমরা কিছুই জানি না।'

'সব জানো তোমরা,' বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মাঝির মুখ হইতে কথাটা যেন লুফিয়া লইলেন। ক্রোধভরে বলিলেন, 'আমার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, পকেটে নগদ তিনশতের অধিক টাকা ছিল, সব চুরি করে নিয়েছে—তারা সহজ লোক নয়। এখানে যদি কোনও থানা থাকে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো। এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা চাই।'

দেবেন্দ্রবিজয় এ-পকেট, সে-পকেট করিয়া তিনখানি অদৃষ্টপূর্ব পত্র বাহির করিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি তাঁহারই নামে লিখিত এবং বিভিন্ন হস্তাক্ষরে লিখিত। আর একখানির উপরে কামদেবপুরের ঠিকানা দিয়া অরিন্দমের নাম লিখিত ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় অটল মনোযোগের সহিত তিনখানি পত্রই পাঠ করিলেন। পাঠশেষে তিনি মাঝিকে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমারই নাম অরিন্দম—আমার বাড়ি কামদেবপুর, যত শীঘ্র পারো, সেইখানে নৌকা লইয়া চলো।'

তাহাতে মাঝি কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; কারণ তখনও তাহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত বেশ মনে হইতেছিল, নেশাটা এখনও বাবুর মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

নৌকা সেইরূপ সবেগে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পত্রাবলী

নৌকা যথাসময়ে হুগলির ঘোলঘাটে অসিয়া লাগিলে, দেবেন্দ্রবিজয় তন্মধ্য হইতে অবতরণ করিলেন। মাঝির মুখেই শুনিয়াছিলেন, নৌকার ভাড়া পূর্বেই তাহারা পাইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইল না। নৌ-বাহকদিগের নির্দোষতার প্রমাণ সেই পত্র-ত্রয়ের একখানির মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল; দেবেন্দ্রবিজয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

অরিন্দমের বাটির অনুসন্ধান করিতে দেবেন্দ্রবিজয়কে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেখানকার সকলেই অরিন্দমকে চিনিত। যখন দেবেন্দ্রবিজয় অরিন্দমের বাটিতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া একান্ত মনঃসংযোগপূর্বক একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। সহজেই সাক্ষাৎ হইল। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বসিতে বলিয়া, সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিজে ভালো হইয়া বসিলেন।

BanglaBook.org

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনার নাম কি অরিন্দমবাবু?'

অরিন্দম ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনার নামে একখানি পত্র আছে।'

এই বলিয়া তিনি সেই তিনখানি পত্রের ভিতর হইতে অরিন্দমের পত্রখানি বাছিয়া বাহির করিলেন।

অরিন্দম পত্রখানি পাঠ করিলেন, পত্রখানি এইরূপ—

'সুহৃদ্বরেষু—

বহুদিন হইতে তোমার কোনও সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি; আপাতত আমার কুশল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়ো। তুমি অযাচিতভাবে আমার যে কত উপকার করিয়াছ, তাহা আমি যতদিন তোমার মৃত্যু না হয়, ততদিন কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কিন্তু যতদিন না বিস্মৃত হইতে পারিব, ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিব না; সেজন্য যাহাতে তোমার মৃত্যুটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়, সেজন্য যত্নের ত্রুটি করিব না।

বুঝিয়াছি, তুমি কোনওরকমে আমার সন্ধান করিতে পারিতেছ না; সেজন্য এখনও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছ না দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পত্রবাহক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের নিকটে আমার সন্ধান পাইবে। উক্ত ভদ্রলোকটি আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন।

ফুলসাহেব।'

পত্রখানি পড়িয়া অরিন্দম বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জন্য ফুলসাহেব কর্তৃক আবার এক অভিনব রহস্যের সুচারু আয়োজন হইতেছে। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এ-পত্র কোথায় পাইলেন?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'পত্র আমি কোথায় পাইয়াছি, কখন পাইয়াছি, কে দিয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না—আপনাকে সকল কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া না বলিলে, আপনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবেন না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কোনও বাধা না থাকিলে আপনি সে-সকল কথা আমাকে বলিতে পারেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় গতরাত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিন্দু-বিসর্গ গোপন না করিয়া অকপটে সমুদয় বলিয়া গেলেন। সে-সকলের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুনিয়া অরিন্দম কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; তিনি জানিতেন, ফুলসাহেবে সকলই সম্ভব। দেবেন্দ্রবিজয় যে তাঁহার হাত হইতে প্রাণসমেত ফিরিতে পারিয়াছেন, এতবড় দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে ওইটুকু কিছু বিস্ময়জনক।

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি যে আরও দুইখানি পত্রের কথা বলিলেন, সেই দুইখানি বোধহয়, আপনি নষ্ট করেন নাই?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমার কাছেই আছে, আপনি পড়িতে পারেন।'

এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নিজের সেই পত্র দুইখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম ব্যগ্রচিত্তে পড়িতে লাগিলেন—

BanglaBook.org

'দেবেন্দ্রবিজয়!

তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু তোমাকে আমি খুব চিনি। তোমার বাড়ি ভবানীপুর এবং তুমি কীজন্য বেণীমাধবপুরে গিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি এবং সেখানে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রেবতীর উদ্ধারের জন্য কোনও একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলে, তাহাও জানি। যদি বাপু, আমার পরামর্শ শুনিতে চাও—যদি গোয়েন্দার মতো গোয়েন্দার হাতে কাজটি দিতে চাও তাহা হইলে হুগলি জেলার অরিন্দম বসুকে যাহাতে ঠিক করিতে পারো, আগে সে চেষ্টা দেখো। আমি জানি, তুমি রেবতীকে অত্যন্ত ভালোবাসো এবং তোমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল। তোমার মামা মহাশয় সেজন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল বলিয়া তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম। বেণীমাধপুরের যে কেশববাবুর নাম শুনিয়াছ, আমি সেই কেশববাবু।'

অপর পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা, এইরূপ—

'দেবেন্দ্রবিজয়!

তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইলে; মনে করিয়ো না, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ছিপে মাছ ধরা পড়িলে, যেমন সেটাকে খেলাইয়া শেষে উপরে তুলিতে বেশি আনন্দ হয়, তোমার মৃত্যুতে আমার সেইরকমের একটু আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই, তোমাকে আপাতত ছাড়িয়া দিলাম। তুমি এখনও বুঝিতে পারো নাই, তুমি কাহার ক্রোধে পড়িয়াছ; যেদিন তোমার বুকের রক্তে জুমেলিয়া তাহার উভয় করতল ধৌত করিবে, সেইদিন হইতে সেই অপমান, সেই লাঞ্ছনা এবং সেই ঘৃণার ঠিক প্রতিশোধ হইবে এবং সেইদিন বুঝিতে পারিবে, উপেক্ষিতা রমণী সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।

সর্পিণী জুমেলিয়া।'

অরিন্দম পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেশব আর ফুলসাহেব-সংক্রান্ত লীলা-খেলা একজনেরই। ইহাতে নূতনত্ব কিংবা আশ্চর্যের কিছুই নাই। পত্রপাঠ শেষে অরিন্দম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'দেবেন্দ্রবাবু, আপনার পূর্বজন্মের খুব একটা সুকৃতি ছিল, তাই আপনি এমন খুনিদের হাত থেকে নিজের দেহটাকে সচেতন অবস্থায় বাহির করিয়া আনিতে পারিয়াছেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনি কি ওদের চিনেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ওই রকম দুই-একজন মহাত্মাকে না চিনিলে আমাদের পেশা চলে কই? আপনি রেবতীর কাকা গোপালবাবুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সংবাদ রাখেন কি?'

দেবেন্দ্র। তিনি মহৎ লোক; সেখানকার সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে।

অরিন্দম। আপনি যদি আমার সহিত দুই-চারিদিন থাকিয়া আমার কিছু সহায়তা করেন, আমি রেবতীর উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারি। সম্মত আছেন?

দেবেন্দ্র। আমার আপত্তি কিছুই নাই, তবে আমার দ্বারা আপনার এমন কী বিশেষ সাহায্য হবে, বলিতে পারি না।

অরি। (সপরিহাসে) যে-বাড়িতে কাল আপনি শুভ নিশিযাপন করেছিলেন, সেখানে আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে। পথ মনে আছে কি?

BanglaBook.org

দেবে। না, বনের ভিতর দিয়া রাত্রে গিয়াছিলাম; এখন সে-পথ ঠিক করা কঠিন; তবে চেষ্টা করিলে সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

অরি। বেশ চলুন, আজ আহারাদির পর যাত্রা করা যাক। যেরূপে হউক, আজ সেখানে পৌঁছিতেই হইবে।

তখন তাঁহাদের মধ্যে ফুলসাহেব ও রেবতী সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। সে-সকলের উল্লেখ এখানে বাহুল্য বোধ করিলাম। অরিন্দমের মুখে ফুলসাহেবের অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক গুণগ্রাম শ্রবণে দেবেন্দ্রবিজয় অসম্ভবরূপে বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। এবং ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার মানবমূর্তি তাঁহার ধারণা-পটে ভীষণ আসুরিক বিভীষিকায় অবিকল চিত্রিত হইয়া গেল। অরিন্দম রেবতীর সম্বন্ধে কোনও কথাই তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে প্রকাশ করিলেন না; বরং তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকট হইতে রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অত্যাশ্চর্য অন্তর্ধান

সেদিন দেবেন্দ্রবিজয় অনুরুদ্ধ হইয়া অরিন্দমের বাসায় আহারাদি শেষ করিলেন। আহারাদির পর অনতিবিশ্রামে উভয়ে ফুলসাহেব-সন্দর্শনে বাহির হইলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র ফুলসাহেবের সহিত দেখা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, কাজে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। দেবেন্দ্রবিজয় অনেকবার পথ ভুল করিয়া ফেলিলেন। যখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা ফুলসাহেবের বাগান বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। একজন কৃষক সেখান দিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বাগান কার?'

কৃষক বলিল, 'জানকী বোসেদের।'

অরিন্দম একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, 'কোন জানকী বসু? তিনি কোথায় থাকেন?'

কৃষক বলিল, 'তিনি মারা গেছেন, তেনার বাড়ি বেণীমাধবপুর, আমাদের জমিদার।' কৃষক চলিয়া গেল।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'রেবতীর পিতার নাম জানকীনাথ বসু না? দেবেন্দ্রবাবু, রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, বোধকরি। আপনিও এখন তাহা কিছু কিছু বুঝতে পারছেন। রেবতীর কাকা গোপাল বসুকে আপনি যতদূর সদাশয় মনে করেন, সন্দেহ হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি ঠিক তেমনটি নন। একদিন অরিন্দমের হাতে পড়লে তিনি বাং কি সোনা সহজেই জানা যাবে।'

তখনই দুইজনে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অযত্নে বাগান বনের মতো ভীষণ হইয়াছে, এবং বন্য আগাছায়, লতাপাতায়, কণ্টকাকীর্ণতায় মনুষ্যের দুরতিক্রম্য। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই গাছের আড়ালের ফাঁক দিয়া সেই বাগান-বাড়ির ছাদের কিয়দংশ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়ে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, বাড়িটির পশ্চিম পার্শ্বের দ্বিতলস্থ একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে; সেখানে দাঁড়াইয়া রূপলাবণ্যময়ী মুক্তকেশী কোনও নারীমূর্তি। দূর হইতে দেখিয়াই অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। এ সেই মতিবিবি—স্বামীহন্ত্রী, মানবী-মূর্তিতে দানবী, বিধাতার একটি অনাগত সৃষ্টি। দেবেন্দ্রবিজয়ও তাহাকে চিনিতে পারিলেন, চিনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়, এই সেই ডাকিনী, আমি ইহারই কথায় ভুলিয়াছিলাম।'

BanglaBook.org

অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি উহাকে খুব জানি; তবে এখন এক কাজ করুন, এখন আমরা এদিক দিয়া না গিয়া ওই উত্তর দিকের পথ ধরিয়া যাই, তাহা হইলে জুমেলিয়া আমাদের দেখিতে পাইবে না; অথচ আমরা ওইদিক দিয়া অলক্ষ্যে বাড়ির ভিতরে যাইতে পারিব।'

অরিন্দমের কথামতো কাজ হইল। যাহাতে জুমেলিয়া তাঁহাদের দেখিতে না পায়, এরূপভাবে তাঁহারা অন্যদিক দিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এবং সরাসরি উপরে উঠিয়া—যে-ঘরে জুমেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন। অরিন্দম যেমন জুমেলিয়াকে ধরিতে যাইবেন, জুমেলিয়া ছুটিয়া গিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরে এবং সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পলাইতে লাগিল। অরিন্দমও তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। অবশেষে জুমেলিয়া একটি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেই মুহূর্তেই অরিন্দম এমনি জোরে সেই কবাটের উপর পদাঘাত করিলেন যে, সেই একটি আঘাতেই কবাট-জোড়ার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বিকট শব্দ করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। একলম্ফে অরিন্দম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কী আশ্চর্য! সেখানে কেহই নাই—না জুমেলিয়া, না তাহার কোনও চিহ্ন। সেই ঘর হইতে বাহির হইবার আর কোনও দরজা ছিল না, যে দুই-একটা জানালা ছিল, তাহাও লৌহের গরাদ দেওয়া; এবং গরাদগুলি যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত, নাড়িয়া ভালোরকম করিয়া পরীক্ষা করিতে হতভম্ব, বিস্মিত অরিন্দমের আর সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রহিল না। তন্ন-তন্ন করিয়া তিনি ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন; জুমেলিয়ার সন্ধান হইল না। ঘরের ভিতরে এমন কিছু ছিল না, এক পার্শ্বেই একটি আলমারি ও একটি ছোট খাটে ছোট বিছানা। আলমারিটি খোলা ছিল, সেটাকে তিনি আরও ভাল করিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সেখানেও জুমেলিয়ার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব; এবং জুমেলিয়ার মানবীত্বের উপরে তাঁহার ঘন-ঘন সন্দেহ হইতে লাগিল।

এদিকে যেমন একটা অপূর্বদৃষ্ট রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত নাটকের একটা অলৌকিক দৃশ্য অভিনীত হইয়া গেল, ঠিক এই সময়ে অপর স্থানে এই রকমের আর একটা অভিনয় চলিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পাতাল-প্রবেশ

অরিন্দম যখন জুমেলিয়াকে ধরিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন দেবেন্দ্রবিজয় একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে তাঁহার মতন দুইজন বীরপুরুষের অগ্রসর হওয়া অতিশয় লজ্জাজনক ও অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হতভাগ্য দেবেন্দ্রবিজয় সেই 'একটা স্ত্রীলোকের' নিকটে তেমন উচ্চশিক্ষা পাইয়াও শিখিতে পারিলেন না যে, সে ঠিক 'একটা স্ত্রীলোকের' মতন নহে; সে মানবী-মূর্তিতে রাক্ষসী—রাক্ষসী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন, অরিন্দম জুমেলিয়াকে নিশ্চয় ধরিবেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি যদি সেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে একটা কাজের মতন কাজ হয় এবং অরিন্দম যেমন তাঁহার কিঞ্চিৎ সহায়তা ও কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সাহায্যপ্রার্থী অরিন্দমেরও এই সময়ে যথেষ্ট উপকার এবং সাহায্য করা হইবে; এই মনে করিয়া তিনি ফুলসাহেবের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে নিম্নতলে কাহার পদশব্দ হইল, তখনই অনুসন্ধিৎসু দেবেন্দ্রবিজয় অনুসন্ধেয় ফুলসাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দ্রুতপদে নিচে নামিয়া আসিলেন। সেখানে দেখিলেন, তাঁহার সেই গতরাত্রির অদ্ভুত রোগী মহাশয় তাঁহার দিকে না

BanglaBook.org

চাহিয়া একটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রবিজয় তখন ছুটিয়া গিয়া সেই ঘরের দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

ফুলসাহেব দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সম্মুখীন দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'কী গো, দেবেন্দ্রবাবু যে, কী মনে করে আবার?'

দেবেন্দ্রবিজয় বজ্ররবে বলিলেন, 'কী মনে করে—এখনই জানিতে পারিবে; নারকী, আমার হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে।'

ফুলসাহেব পূর্ববৎ মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, 'বটে, তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আসিয়াছ! বেশ—বেশ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা, শিক্ষাটা তুমি একাকী দিতে আসিয়াছ, না তোমার সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছে? অরিন্দম আসে নাই?"

দেবেন্দ্রবিজয় সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন। সেই পিস্তল তিনি অরিন্দমের নিকটে পাইয়াছিলেন। পিস্তল ফুলসাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'যদি পলাইবার চেষ্টা করো, তাহা হইলে এই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।'

ফুলসাহেব কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ববৎ স্মিতমুখে বলিল, 'না, পলাইব কেন? তোমার ভয়ে? না তোমার ওই পিস্তলের ভয়ে? আমাকে গ্রেপ্তার করিবে মনে করিয়াছ?'

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ।

ফুল। কখন?

দেবেন্দ্র। এখনই।

ফুলসাহেব হাসিতে লাগিল—সেইরূপ বিদ্রূপের মৃদুহাসি। বলিল, 'তুমি কি মনে করিয়াছ, তুমি আমার হাতে হাতকড়া পরাইতে থাকিবে, আর আমি এমনি ভালোমানুষটির মতো চুপ করে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে থাকিব?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'তাই তোমাকে করিতে হইবে।'

ফুল। আর তা যদি না করি?

দেবেন্দ্র। তোমাকে হত্যা করিব।

ফুল। না, এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আমি এখান হইতে নড়িব না, তোমার মনের অভিলাষটা পূর্ণ করো; কিন্তু দেবেন্দ্র, আমি তো নড়িব না, কিন্তু তুমি যে আমাকে এখান থেকে একচুল নড়াতে পারবে, এমন বোধ হয় না।

দেবেন্দ্রবিজয় 'সে-বন্দোবস্ত আমি করিতেছি,' বলিয়া যেমন ফুলসাহেবকে ধরিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন, সহসা একটা বিকট শব্দ হইল এবং সেইসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গ সেখান হইতে এক নিমেষে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফুলসাহেব হাসিতে-হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কেশরী ও শার্দুল

দেবেন্দ্রবিজয়ের অকস্মাৎ পাতাল-প্রবেশের এবং নিজের বিজয়-বার্তা জুমেলিয়ার শ্রুতিগোচর করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ফুলসাহেব দ্বিতলে উঠিয়া, যে-কক্ষে জুমেলিয়া অরিন্দমকে একদম বোকা বানাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই কক্ষের দিকে চলিল। সেইটি জুমেলিয়ার শয়ন-কক্ষ। যখন অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন ফুলসাহেব বাড়িতে উপস্থিত ছিল না, অতএব তাহার পরম শত্রু অরিন্দমের আগমন এবং জুমেলিয়ার অন্তর্ধান সম্বন্ধে ফুলসাহেব কিছুই জানিতে পারে নাই। ফুলসাহেব জুমেলিয়ার শয়ন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সেখানে জুমেলিয়া নাই,

BanglaBook.org

কবাট-জোড়া ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ফুলসাহেব বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া ঘরের ভিতরে গেল। ঘরের ভিতরে সম্মুখদিককার কোণে অরিন্দম দাঁড়াইয়া ছিলেন; সুতরাং ফুলসাহেব বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু ভিতরে গিয়া সহসা অরিন্দমকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে-ভাব দমন করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, 'একি—অরিন্দম বাবু যে! হঠাৎ কী মনে করে?'

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, 'অনেকদিন হইতে মহাশয়ের কোনও সংবাদাদি পাই নাই—একবার দেখা করিতে আসিলাম।'

ফুলসাহেব একবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, 'আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নামক পদার্থটি যেরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের যথেষ্ট কষ্ট হইবারই কথা। আমিও তোমার অদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম। দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে আমার স্নেহ-পত্র পাও নাই?'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, পাইয়াছি বইকি।'

ফুলসাহেব। সেই পত্র পাইয়াই তুমি আসিয়াছ। খুব শীঘ্রই আসিয়াছ; এত শীঘ্র তুমি যে আসিবে, আমি এরূপ আশা করি নাই। তুমি যে-কাজে নিযুক্ত, তাতে সকল বিষয়ে এরূপ তৎপর হওয়া তোমার খুবই আবশ্যক। যাই হোক, তুমি দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে আনিয়া ভালো করো নাই, তাহা হইলে আজ বেচারাকে এমন অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না। লোকটা এবার অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তা তাহাকে একবারেই ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি।

ফুলসাহেবের কথা শুনিয়া অরিন্দমের ভয় হইল। বলিলেন, 'তুমি কি তাহাকে খুন করিয়াছ?'

ফুল। আমি তাহাকে খুন করিতে যাইব কেন? সে নিজেকে নিজেই খুন করিয়াছে—লোকটা এমনই বুদ্ধিমান! আমি তাহাকে স্পর্শও করি নাই। সে যা হোক, অরিন্দমবাবু, তোমার নিকটে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র আছে কি?

অরিন্দম। আছে। কেন?

ফুল। তা তো থাকিবারই কথা। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, তা হলে বোধহয়, তন্মধ্য হইতে কোনও-না-কোনও একটির আস্বাদ আমাকে অনুভব করাইবে, মনে করিয়াছ? এমনকী আমাকে হত্যাও করিতে পারো?

অরি। সে ইচ্ছা আমার নাই।

ফু। (উপহাস করিয়া) সহসা এত দয়ালু কবে হইলে, অরিন্দম?

অ। আপাতত তোমার নিকটে কোনও অস্ত্র আছে?

ফু। দুর্ভাগ্য আমার—আমি এখন নিরস্ত্র; নতুবা সে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাকে কষ্ট পাইতে হইত না।

অ। (সহাস্যে) কেন?

ফু। তাহা হইলে যে-মুহূর্তে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলে, সেই মুহূর্তে আমি তোমাকে এ-সংসার হইতে বিদায় করিতাম।

অ। (সহাস্যে) কেন?

ফু। আরও জানো বোধহয়, তোমার প্রাণ নিতে আমি প্রাণপণ করিয়াছি—হয় আমি মরিব, নয় তুমি মরিবে। আর তুমি মনেও স্থান দিয়ো না যে, জীবিত ফুলসাহেবকে তখন তুমি ধরিতে পারিবে।

অ। এখন যদি আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করি, তুমি কী করিবে মনে করিয়াছ?

ফু। অরিন্দমবাবু, সকল সময়েই আমি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি।

অ। আমি এখনই তোমায় গ্রেপ্তার করিব।

ফু। মুখের কথা নয়, মনে করিলেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারা যায় না। অনেকেই সে-

BanglaBook.org

চেষ্টা করেছে।

অ। সে অনেকের মধ্যে আমি সে-চেষ্টা সফল করিতে পারিব। তুমি আমার কয়েকটা পরিচয় পূর্বে পাইয়াছ।

ফু। আমি তোমাকে খুব জানি; তোমার বুদ্ধি, কৌশল, কুখ্যাতি, নৈপুণ্য, শক্তি, সাহস, ক্ষমতা কিছুই আমার অপরিচিত নহে। আমি তোমাকে যতদূর জানি, তাতে তুমি যে আমার একজন যোগ্য প্রতিযোগী, সে-সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া ফুলসাহেব কোথাও কিছুই নাই, একেবারে লাফাইয়া আচম্বিতে অরিন্দমের ঘাড়ে পড়িল। ফুলসাহেব সহসা যে তাঁহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিবে, এ-কথা আগে অরিন্দম মনে করেন নাই। তিনি এক হাতে ফুলসাহেবের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া, অপর হাতে তাহার ললাটে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

তাহার পর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণটা প্রচুর পরিমাণেই হইতে লাগিল। এবং দুম-দাম, ঠক-ঠকাস শব্দে ঘরটা ক্ষণে-ক্ষণে প্রতিধ্বনিত এবং উত্থান-পতনের ও পদক্ষেপের দুপ-দাপ, ধপ-ধপাস শব্দে ঘন-ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। এত চেষ্টা করিয়াও দুঃখের বিষয় কেহ কাহাকে সহজে বশে আনিতে পারিলেন না। প্রায় অর্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিল। তথাপি মল্লযুদ্ধটা সমভাবেই চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা ফুলসাহেব বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি তীক্ষ্ণমুখ লৌহ-শলাকা বাহির করিল। সেটা দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ সূচীর মতন, কেবল অগ্রভাগ একটু বাঁকা। দেখিয়াই অরিন্দমের বুঝিতে বাকি রহিল না, সেই লৌহ-শলাকা বিষাক্ত এবং তাহার এমন একটা শক্তি আছে যে, একটু আঘাতেই দেহ হইতে প্রাণটাকে অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে।

ফুলসাহেব যেমন সেই বিষাক্ত শলাকা অরিন্দমের দেহে বিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনই অরিন্দম দুই হাতে ফুলসাহেবের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ফুলসাহেব অপর হস্তে অরিন্দমের মুখের উপরে, নাকের উপরে, যেখানে-সেখানে অবিশ্রান্ত ঘুষি চালাইতে লাগিল। সেই সকল ঘুষির মধ্যে একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুষি নিজের সেই লৌহ-শলাকার উপর পড়িয়া ফুলসাহেবের এত উদ্যম—এত আগ্রহ সমুদয় নিষ্ফল করিয়া দিল—সেই বিষ-শলাকা ফুলসাহেবেরই মণিবন্ধে বিদ্ধ হইল।

যেমন বিদ্ধ হওয়া, অরিন্দমকে আর কোনওরূপ কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। ফুলসাহেব তখনই গৃহতলে পড়িয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই তাহার সবল ও সচল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে অসাড় ও অচল হইয়া আসিল।

বিস্মিত হইয়া, স্তম্ভিত হইয়া, শিহরিত হইয়া অরিন্দম সরিয়া দাঁড়াইলেন। এবং তাঁহার নিজের হৃষ্টপুষ্ট দেহের সমস্ত শক্তির অপেক্ষা, সুদীর্ঘ শাণিত ছুরি অপেক্ষা, অগ্নিগর্ভ সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য রিভলভারের অপেক্ষা সেই একখণ্ড অতি ক্ষুদ্র নগণ্য লৌহ-শলাকার কত বেশি শক্তি, মনে-মনে তাহারই সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ফুলসাহেবের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই নিস্পন্দ দেহ তখন অত্যন্ত শীতল এবং অত্যন্ত কঠিন। এবং তন্মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তথাপি অরিন্দম ফুলসাহেবকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হাতকড়া ও বেড়ি বাহির করিয়া ফুলসাহেবের হাতে-পায়ে সংলগ্ন করিলেন এবং খাটখানা টানিয়া আনিয়া তাহার একদিককার পায়া ফুলসাহেবের পিঠের উপরে চাপাইয়া দিলেন।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ যথা সময়ে অরিন্দম

ফুলসাহেবকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া অরিন্দম বাহিরে আসিলেন। এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের অনুসন্ধান

করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাড়ির চারিদিকে ফিরিতে লাগিলেন। ফুলসাহেবের মুখে দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। কারণ ভীষণপ্রকৃতি খুনি ফুলসাহেবের অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই।

উপরের সকল স্থান যখন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের অথবা তাঁহার মৃতদেহের কোনও সন্ধানই হইল না, তখন অরিন্দম নিচে নামিয়া আসিয়া নিচের ঘরগুলিতে সন্ধান করিতে লাগিলেন। যে-ঘরে দেবেন্দ্রবিজয়ের পাতাল-প্রবেশ হইয়াছিল, অরিন্দম অবশেষে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ অতি মৃদুভাবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু কোথা হইতে সেই শব্দটা আসিতেছে, তিনি অনেকক্ষণ স্থিরকর্ণে থাকিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এক-একবার জলের ছপাৎ-ছপাৎ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, অতি দূর হইতে সেইসকল শব্দ আসিতেছে; কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিলে আর কিছুই শুনা যায় না। ভীতিবিহ্বল অরিন্দম ঘরের ভিতরে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। এক স্থানে দেখিলেন গৃহতলে একটি লৌহনির্মিত গুপ্তদ্বার রহিয়াছে; সেটি মাপে দুই হাতের অধিক নহে, সমচতুষ্কোণ। সেই গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অরিন্দম শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া কিছুতেই সেটা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না; কিন্তু পরক্ষণে উপর হইতে একটু চাপ দিতেই নিচের দিকে একটু ফাঁক হইয়া গেল। আর কিছু বেশি জোর দিতে একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সেইসঙ্গে কী একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ অরিন্দমের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি উঠাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

অরিন্দম অতি কষ্টে সেই দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া অবনতমস্তকে তীব্রদৃষ্টিতে নিচের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই গোঙানি শব্দটা এখন বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অরিন্দম পকেট হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিলেন এবং সেই আলোকরশ্মি অন্ধকূপমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন, নিচে—অনেক নিচে অস্পষ্ট এক মনুষ্য-মূর্তি, পঙ্কিল জলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার কোনও উপায় নাই। অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, 'দেবেন্দ্রবাবু—দেবেন্দ্রবাবু—'

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল, 'আপনি আসিয়াছেন! আমি মরিতে বসিয়াছি—আমাকে রক্ষা করুন—ওঃ ! প্রাণ যায়—উঃ! কী ভয়ানক—!'

অরিন্দম বলিলেন, 'ভয় নাই—দেবেন্দ্রবাবু, আমার পরম সৌভাগ্য আপনি এখনও জীবিত আছেন—আমি নিজের প্রাণ দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিব।'

এই বলিয়া অরিন্দম গুপ্তদ্বার ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধকরি, ভিতরে স্প্রিং ছিল, তখনই ঝনাৎ করিয়া গুপ্তগৃহের কবাট আপনি রুদ্ধ হইয়া গেল।

অরিন্দম ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। উঠানের একপার্শ্বে একখানা লম্বা মই ছিল, সেই মইখানা দুই হাতে তুলিয়া আনিলেন এবং সেই অন্ধকূপের মধ্যে সেটা নামাইয়া দিলেন। সেটা যে তখন তাঁহার এতবড় একটা উপকারে আসিবে, অরিন্দম প্রথমে তাহা ভাবেন নাই।

অরিন্দম প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন লইয়া সেই মই অবলম্বনে নিচে নামিয়া গেলেন; মধ্যে মই থাকায়, গুপ্তদ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হইয়া অর্ধোন্মুক্ত রহিল।

ভিতরে নামিয়া অরিন্দম দেখিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় ক্রমশই সেই কূপের গভীর পঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মস্তকের একস্থান কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে; সে-আঘাত তেমন সাঙ্ঘাতিক না হইলেও অবস্থাটা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। সেই ভয়ানক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরিন্দম দুই হাতে দেবেন্দ্রবিজয়কে ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিলেন। সেই আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্য হইতে একটা লোককে টানিয়া তোলা কি সহজ কথা!

BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যথা সময়ে জুমেলিয়া

ভিতরে যেমন দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া এইরূপ যমে-মানুষে টানাটানি চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক সেই গৃহমধ্যে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, অন্ধকূপের গুপ্তদ্বার-সম্মুখে একবার ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং নীরব হাস্যের সহিত ক্ষণেক সেই অপূর্ব লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া সংযতপদে চুপিচুপি বাহির হইয়া গেল—সে জুমেলিয়া।

জুমেলিয়া বাহিরে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে একবার আপনমনে বলিল, 'আচ্ছা!' সেই 'আচ্ছা' শব্দটা স্পষ্ট ধ্বনিত না হইয়া অনেকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল। অরিন্দম অনেক কষ্টে দেবেন্দ্রবিজয়কে টানিয়া তুলিলেন। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের সংজ্ঞা নাই, অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের মৃতকল্প দেহ একহস্তে বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেমন উপরের দিকে এক পা উঠিতে যাইবেন, শাণিত ছুরিকার ন্যায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে বলিল, 'আমার হাতে দুইজনকেই আজ মরিতে হইবে। অরিন্দম, চাহিয়া দেখো, আমায় চিনিতে পারো কি?'

অরিন্দম চকিতহৃদয়ে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

'বাঃ! তুমি আমায় চেনো না?'

'না। কে তুমি?'

'আমি জুমেলিয়া। সেই তোমার পরিচিত মতিবিবি।'

সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলেও লোকে এত চমকিত হয় না, অথবা সেই কক্ষমধ্যে সহসা বজ্রপাত হইলেও অরিন্দম বোধকরি, এতদূর চমকিত হইতেন না, জুমেলিয়াকে দেখিয়া তিনি যেরূপ চমকিত হইলেন। দেখিলেন, সাক্ষাৎ মূর্তিমতী শত বিভীষিকার ন্যায় জুমেলিয়া অবনতমস্তকে উপরে দাঁড়াইয়া, এবং তাহার প্রচুরায়ত কৃষ্ণনয়নে প্রদীপ্ত নরকাগ্নি জ্বলিতেছে—কী ভীষণ! অধিক, উন্মুক্ত কেশদাম কৃষ্ণ, কুঞ্চিত, প্রচুর, সুদীর্ঘ, তেমনি ভীষণভাবে মুখের চারিপাশে ঝুলিতেছে। জুমেলিয়ার একহাতে একটি লণ্ঠন এবং অপর হাতে একটা ছোট শিশি; তন্মধ্যে লোহিত বর্ণের কী একটা তরল পদার্থ টলটল করিতেছে। কে জানে, পিশাচীর কী সঙ্কল্প!

নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই অরিন্দম নিরতিশয় ভীত হইলেন। যদি দেবেন্দ্রবিজয় সে সময়ে মূর্ছিত না হইতেন, তাহা হইলেও সেই প্রলয়ঙ্করী পিশাচীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটু সম্ভাবনা থাকিত। এখন তিনি কী করিবেন? দেবেন্দ্রবিজয়কে সেরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না; ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যদি দেবেন্দ্রবিজয় মরেন, তাঁহার সঙ্গে আমাকেও মরিতে হইবে।'

ঝটিকান্দোলিতজলোচ্ছ্বাসকল্লোলতুল্য তরঙ্গায়িত হাস্যের সহিত জুমেলিয়া বলিল, 'অরিন্দম, এখন আর তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানকে বেশি করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, এখন একমাত্র আমার অনুগ্রহের উপর, করুণার উপর, ইচ্ছার উপর তোমাদের ন্যায় দুই-দুইটি বীরপুরুষের জীবন নির্ভর করিতেছে।'

যেরূপ স্বরে কথাগুলি জুমেলিয়ার মুখ হইতে বাহির হইল, তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, জুমেলিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত কথাগুলি বলিতেছিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাহাই বটে।'

জুমেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'হবে অরিন্দম, আমার কাছে দয়াভিক্ষা করো, প্রাণভিক্ষা করো—ক্ষমা চাও; যদি দয়া হয়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'পিশাচীর নিকটে দয়াভিক্ষা! জুমেলিয়া, এমন নির্বোধ কে?'

BanglaBook.org

তীব্রস্বরে জুমেলিয়া বলিল, 'তবে মজাটা দেখো।'

অরি। কী করিবে তুমি? মনের কথাটা কী?

জুমে। মনের কথাটা তোমাকে হত্যা করিব—এখনই—এই মুহূর্তে।

অ। কীরূপে?

জু। এইরূপে।

জুমেলিয়া হাতের সেই শিশিটা উপরে তুলিয়া ধরিল। তাহার পর খল-খল, অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, 'ইহার ভিতরে কী আছে জানো? না, জানো না। ইহার ভিতরে যা আছে, তাই তোমার গায়ে ঢালিয়া দিব, অগ্নিশিখার ন্যায় তোমাকে পোড়াইতে থাকিবে, গলিত সীসা অপেক্ষাও ইহা ভয়ঙ্কর, তুলনায় ইহার নিকটে তাহা বরফ বলিলেও চলে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তোমার চিত্তবৃত্তিতে— তোমার কল্পনায়—তোমার নৃশংসতায় ও কুটিলতায় তুমি দানবী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো—আমি মরিতে প্রস্তুত।'

জুমেলিয়া বলিল, 'শোনো অরিন্দম, মরণটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে ঠিক তেমন সহজ হয় না। এ যে-সে মরণ নয়—জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধিয়া মরণ। মরো তবে, অরিন্দম। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ডাক ছাড়িয়া চিৎকার করিতে থাকিবে, আর তেমনই উচ্চকণ্ঠে আমি হাসিতে থাকিব—হো—হো—হো। কী মজা! তোমার চোখে দুই বিন্দু ঢালিয়া দিব, অন্ধ হইবে—চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেও সে যন্ত্রণা যাইবে না; তাহার পর মরিবে—ধীরে—ধীরে—ধীরে—ভয়ানক যন্ত্রণায়—ভয়ানক মরণ!'

আবার জুমেলিয়া হাসিতে লাগিল। কী ভয়ানক অমঙ্গলজনক সেই তীব্র হাসি! সে-হাসি শুনিয়া অতি সাহসীরও বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

অরিন্দমও ভয় পাইলেন। বুঝিলেন, জুমেলিয়া মুখে শুধু ভয় প্রদর্শন করিতেছে না, কাজে সে ঠিক তাহাই করিবে। এ-বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কী?

'এই দেখো, অরিন্দম,' বলিয়া জুমেলিয়া অল্পে-অল্পে শিশিটা কাৎ করিতে লাগিল। শিশির মুখের কাছে সেই তরল পদার্থ টলটল করিতে লাগিল। জুমেলিয়ার অলক্ষ্যে অরিন্দমের হাতে একবিন্দু পতিত হইল। গলিত সীসকের ন্যায় সেই একবিন্দু সেই স্থান দগ্ধ করিতে লাগিল। অরিন্দম নিজের অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া, নীরবে নিশ্বাস রোধ করিয়া অতিকষ্টে সে-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণাসূচক একটিমাত্র শব্দও তাঁহার মুখ হইতে তখন বাহির হইল না।

জুমেলিয়া বলিল, 'দেখো অরিন্দম, আর বিলম্ব নাই, এই দেখো, ছিপি খুলিয়াছি, এখনই তোমার সর্বাঙ্গে ঢালিয়া দিব; এখনও সময় আছে, প্রাণভিক্ষা চাও।'

অরিন্দম দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে নহে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে মুক্তি দিলেও দিতে পারি, প্রাণভিক্ষা চাও।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি পিশাচী।'

জুমেলিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, 'ছিঃ, অরিন্দম! চোখের মাথা একেবারে খাইয়াছ! এমন সুন্দরী আমি, এত রূপ আমার, আর আমি হলেম কি না পিশাচী!'

অরিন্দম কোনও কথা কহিলেন না।

জুমেলিয়া বলিল, 'প্রাণভিক্ষা চাও।'

তথাপি অরিন্দম নীরব।

জুমেলিয়া বলিল, 'আর বলিব না, এই শেষবার; এখনও প্রাণভিক্ষা চাও। তোমার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ যদি আমার কাছে প্রাণভিক্ষা করিয়া লয়, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত

BanglaBook.org

হইব, তাতে আমার যথেষ্ট সম্মান আছে, তাই বলিতেছি।'

তথাপি অরিন্দম নীরব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বিপৎকালে

জুমেলিয়া যখন দেখিল, অরিন্দম কিছুতেই তাহার নিকটে প্রাণভিক্ষা চাহিল না, দেখিয়া রাগিয়া যখন শিশি হইতে তরল অগ্নিবৎ ভিটরয়েল ঢালিবার উপক্রম করিল, এমনসময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি সেই শিশিটা জোর করিয়া তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। সেই সময়ে শিশি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে খানিকটা সেই তরলাগ্নি জুমেলিয়ার হাতে লাগিয়া গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া জুমেলিয়া ছুটিয়া সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরিন্দম কূপের ভিতর হইতে সেই অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনা দেখিয়া মনে-মনে ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিলেন। এতবড় একটা বিপদ যে, এত শীঘ্র এমন অল্পে-অল্পে কাটিয়া যাইবে, এ-কথা তিনি আগে মনেও স্থান দেন নাই। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের মূর্ছিত দেহ বুকে লইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং সেই বিপদ্ভঞ্জন অপরিচিত লোকটির নিকটে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

সেই অপরিচিত লোকটির বয়স সাতাশ বৎসর হইবে। তাঁহার দেহ সুগঠিত, দীর্ঘ ও প্রশস্ত। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে, মুখাকৃতিতে, সকরুণদৃষ্টিতে যে-ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, তাঁহার পরিহিত সেই মলিন বস্ত্র, মাথার উপর রুক্ষ, শুষ্ক অতি দীর্ঘ চুলগুলা, চোখের পার্শ্ববর্তী কালিমা ও হস্তপদদ্বয়ের বড়-বড় নখের সে-ভাবটুকু অনতিবিলম্বে মন হইতে মুছিয়া যায়। আরও গায়ে স্থানে-স্থানে শুষ্ক ময়লা জমিয়াছে; কানের নিচে, গলায় চারিধারে এবং কপালে এত ময়লা পড়িয়াছে যে, চিমটি কাটিলে খানিকটা উঠিয়া আসে। তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জাতিতে মুসলমান বলিয়া অরিন্দমের বোধ হইল। কে জানে, তবে কি ইনি ফুলসাহেবের কেহ?

যাহা হউক, উভয়ে মিলিয়া নিঃসংজ্ঞ দেবেন্দ্রবিজয়কে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্বে তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইল। দেবেন্দ্রবিজয় উঠিয়া বসিলেন।

অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকটির পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেই লোকটিকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মাথার ভিতরে একটা ঘোরতর সন্দেহ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সন্দেহটি যদি দৈবক্রমে সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি জুমেলিয়া ও ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য যে কষ্টটা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে বৃথা হয় না। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে যে নামটি শুনিলেন, তাহাতে বাজীকরের ভোজদণ্ডপ্রোথিত এক গ্লাস মসীর, সহসা এক গ্লাস দুগ্ধমূর্তি ধারণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ চক্ষু পালটিতে একেবারে অটল সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সবিস্ময়দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম সিরাজউদ্দীন; যাঁহার উদ্ধারের জন্য একদিন অরিন্দম কুলসমের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'আমি আপনাকে কখনও দেখি নাই; কিন্তু (দেবেন্দ্রবিজয়কে নির্দেশ করিয়া) এই ভদ্রলোকটিকে গতরাত্রে এখানে আর একবার দেখিয়াছিলাম। ধূমময় একটা রুদ্ধগৃহের মধ্যে ইনি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ডাক-ছাড়িয়া চিৎকার করিতেছিলেন। সেই সময়ে আমি জানালা ভাঙিয়া ইঁহাকে

BanglaBook.org

উদ্ধার করি। আমি সেদিন সেই ঘরের পাশের ঘরেই বন্দি ছিলাম; নতুবা সেইদিন জুমেলিয়ার হাতে ইঁহার জীবন শেষ হইত।'

অরিন্দম সিরাজউদ্দীনকে বলিলেন, 'আপনি বলিলেন, সেই সময়ে আপনি পাশের ঘরে বন্দি ছিলেন। কে আপনাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল?'

সিরাজ। ফুলসাহেব।

অরি। কোন অভিপ্রায়ে ফুলসাহেব আপনাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সিরাজ। না, তা জানি না, তবে ফুলসাহেব যেরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাতে বোধহয় তার সেইরকমের একটা কোনও ভীষণ অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল।

অরি। আজ আপনি কীরূপে মুক্তি পাইলেন?

সীরাজ। আজও আমি দ্বিতলের একটা রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ ছিলাম, একখানা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে নিজের অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে ঘরের বাহিরের কোণে কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম; সেই কোণে একটি ছোট দরজা ছিল, সেটা সহসা খুলিয়া গেল এবং জুমেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; আমি সেই পিশাচীকে দেখিয়া নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া আমার ঘরে বসিয়া রহিল। তাহার পর একবার সেই ছোট দ্বার দিয়া ঘরের বাহিরে গেল, আবার ফিরিয়া আসিল; আবার গেল, আবার ফিরিয়া আসিল, তিন-চারিবার এইরূপ করিয়া সে আর আসিল না। জুমেলিয়াকে এরূপ ব্যস্ত-সমস্ত-ভীত অবস্থায় আর কখনও দেখি নাই। মনে একটু সন্দেহ হইল, অবশ্যই আজ আবার একটু নূতন রকমের একটা-না-একটা কিছু ঘটিয়াছে, অথবা ঘটিবার সূচনা হইতেছে। যখন দেখিলাম, জুমেলিয়া আর ফিরিল না; তখন আমি ধীরে-ধীরে উঠিলাম, দেখিলাম জুমেলিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে ঘরের কোণের সেই ছোট দরজাটি বন্ধ করিয়া যাইতে ভুল করিয়াছে; জুমেলিয়ার সেই ভুলে আমার অনেকটা আশা হইল, মনে হইল, এই সুযোগে যদি দুর্মদ ফুলসাহেব এবং দানবী জুমেলিয়ার অসাক্ষাতে পলাইতে পারি। এই মনে করিয়া আমি সেই দরজা দিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত অন্ধকারে পড়িলাম। সেখানে এমন অন্ধকার যে, নিজেকে নিজেই সেই অন্ধকারের ভিতরে হারাইয়া ফেলিলাম। তখন জুমেলিয়ার সেই ভুলটাকে আর ভুল মনে না করিয়া আপনার কর্তব্য ভাবিতে লাগিলাম। অনুভবে ঠিক করিলাম, জুমেলিয়া আমাকে সে-ঘর হইতে এই অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকিবে; তথাপি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলাম। খুব সঙ্কীর্ণ পথ, ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া, দুই হাত বাড়াইয়া, দুই পার্শ্বের দেয়াল একসঙ্গে সহজে স্পর্শ করা যায়। মাথার উপরে ছাদ কিংবা একটা কিছু ছিদ্রশূন্য আবরণ ছিল। আমি কিছুদূরে আসিয়া সম্মুখে বাধা পাইলাম। ধীরে-ধীরে তাহার উপরে আঘাত করিয়া দেখিলাম, সেটা দেওয়াল নহে, একটা কাঠের কবাট; কিছুতেই ধাক্কা দিয়া, ঠেলিয়া সেটি খুলিতে পারিলাম না; কিন্তু সম্মুখের দিকে একটু জোর দিয়া টানিতেই সেটা খুলিয়া গেল এবং দিনশেষের ম্লান আলো আসিয়া চোখে লাগিল। আমি তখন তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঘরে পড়িলাম; তখনই সেই কবাট আপনি বন্ধ হইয়া গেল। তেমন আশ্চর্য ধরনের কবাট আমি আর কখনও দেখি নাই; বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দেখি, যে দরজা দিয়া বাহির হইলাম, সেটা একটি আলমারিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যাই হোক, সেই ঘরে কেহই ছিল না। আমি তখনই নিচে নামিয়া আসিলাম। বাহির হইতে এই ঘরের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ছুটিয়া আসিয়া, জুমেলিয়ার হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইলাম।

BanglaBook.org

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি আমাদের যে-উপকার করিলেন, তাহা আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনি না আসিলে জুমেলিয়া নিশ্চয়ই ভিটরয়েল দিয়া আমাদের দুজনকে পুড়াইয়া মারিত। আপনি কুলসমকে চিনেন?'

অরিন্দমের মুখে সহসা কুলসমের নাম শুনিয়া সিরাজউদ্দীন যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, 'কে কুলসম?'

অরি। কেন, তমীজউদ্দীনের কন্যা।

সিরা। জানি; কিন্তু এই ফুলসাহেবের হাত হইতে তাঁহাদের কেহ যে রক্ষা পাইয়াছেন, এমন বোধ হয় না।

অ। কুলসম রক্ষা পাইয়াছে। কুলসমের পিতা আর জীবিত নাই।

সিরা। এ-কথা আমি এখানে ইহাদের মুখে কিছু-কিছু শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছি, অরিন্দম নামে কোন ডিটেকটিভ না কি এদের সকল ষড়যন্ত্র ভাঙিয়া দিয়াছেন; আর তাঁহারই ভয়ে ইহারা এইখানে লুকাইয়া রহিয়াছে। যাই হোক, কুলসমের সংবাদ আপনি আর কিছু জানেন? কুলসমের সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন? শুনিলাম সেই ডিটেকটিভ না কি কুলসমকে রক্ষা করিয়াছেন। সত্য কি?

অ। আমারই নাম অরিন্দম। কুলসম নিরাপদে আছে, সেজন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

তাহার পর কুলসম ও ফুলসাহেবের সম্বন্ধে অরিন্দম যাহা জানিতেন, সংক্ষেপে সমুদয় বলিলেন।

সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'এখন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে গ্রেপ্তার করিবার কোনও উপায় ঠিক করিয়াছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'জুমেলিয়াকে যে আজ আর ধরিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া উপরের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। যখন তাহাকে গ্রেপ্তার করি, সে নিজের বিষ-কাঁটা নিজের হাতে বিদ্ধ করিয়াছিল। এতক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, বোধকরি। চলুন, তিনজনে উপরে যাই।'

তিনজনে ফুলসাহেবকে দেখিতে চলিলেন। অরিন্দম ফুলসাহেবকে যে-ঘরে হাতকড়ি ও বেড়ি লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, এখন সেই ঘরেই তিনজনে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই অতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, ফুলসাহেব নাই। দেখিয়া শুনিয়া—বিশেষত অরিন্দম যেন একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্তদ্বার

অনেকক্ষণ পরে সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'আপনি কি এইখানে ফুলসাহেবকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন? আমি তো মধ্যে এই ঘরে একবার আসিয়াছিলাম, কই, তখন এ-ঘরে কাহাকেও দেখি নাই।'

অরিন্দম বলিলেন, 'এই ঘরটাই ঠিক। দেখিতেছেন না, কবাট ভাঙা রহিয়াছে। এই ঘরটার মহৎ গুণ আছে, এই ঘরে ঢুকিয়া ছায়াবাজির ন্যায় জুমেলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল; এখন আবার এই এক অসম্ভব ব্যাপার দেখিতেছি।'

সিরাজ বলিলেন এ-ঘরের একটা গুণ আছে বইকি। আমি সেই অন্ধকারময় সুঁড়িপথ দিয়া এই ঘরের উঠিয়াছিলাম। এই যে আলমারিটা দেখিতেছেন, উহার ভিতর দিয়া একটা পথ আছে।

BanglaBook.org

আমি আপনাকে যে গুপ্তদ্বারের কথা বলিয়াছিলাম, সেই গুপ্তদ্বার এই আলমারির ভিতরে আছে। এই দেখুন,' এই বলিয়া আলমারিটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং ভিতরকার কাঠখানায় একটু ধাক্কা দিতেই সেটা ভিতরদিকে খানিকটা সরিয়া গেল; এবং ভিতরকার সেই অন্ধকার-পথ দৃষ্টিগোচর হইল। সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'এই পথ দিয়াই জুমেলিয়া তখন আপনার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার ঘরে গিয়া উঠিয়াছিল।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন তা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।'

এই বলিয়া অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয় ও সিরাজউদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া সেই আলমারির গুপ্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নিজে যে ঘরে বন্দি ছিলেন, সিরাজউদ্দীন অরিন্দমকে সেই রুদ্ধগৃহে লইয়া গেলেন। সে-রুদ্ধগৃহ হইতে বাহির হইবার কোনও উপায় না থাকায় সেই গুপ্তপথ অবলম্বনে সকলে বাহিরে আসিলেন।

তাহার পর তিনজনে মিলিয়া, পাতি-পাতি করিয়া বাড়িখানার সমুদয় অংশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন। ফুলসাহেব কিংবা জুমেলিয়াকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

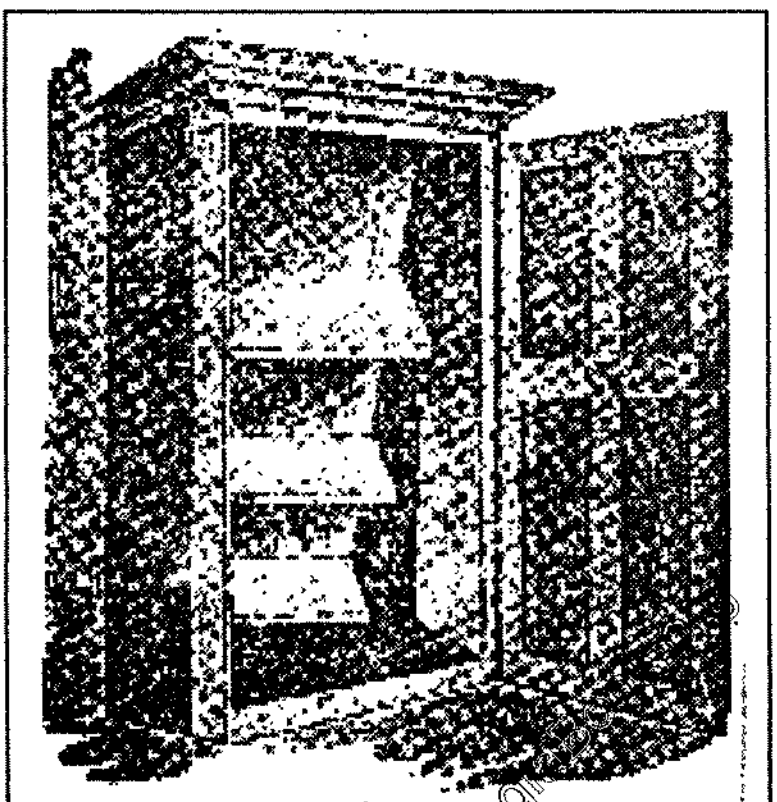

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া সমগ্র বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং দূরগ্রামের কলরব ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তখন সকলে নিরুদ্যমচিত্তে সেই বাগান-বাটি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

সেদিনকার অনুসন্ধানের সেইখানে সমাপ্তি। সকলে হুগলি যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ ভূগর্ভে

এখানে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা বোধকরি, অসঙ্গত হইবে না।

যখন জুমেলিয়াকে বাহির করিবার জন্য অরিন্দম, দেবেন্দ্রবিজয় ও সিরাজউদ্দীন তিনজনে মিলিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ঘুরিতেছিলেন, তখন পাতালপুরীর মধ্যে একটি কক্ষে জুমেলিয়া বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া নতনেত্রে ফুলসাহেবের মূর্ছাপন্ন অচেতন দেহ অতি মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সেই পাতালপুরীর একপাশে একটি ছোট দীপ তথাকার গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল এবং তাহার ক্ষীণ শিখাটা প্রচুর অন্ধকারের মধ্যে সিন্দুরের ন্যায় ঘোর আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পাতালপুরীর চারিদিক বন্ধ, কোন পথে যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহা জুমেলিয়াই জানে। আমাদের সেটা জানিবার তেমন কোনও আবশ্যকতা নাই।

দুই-তিনবার জুমেলিয়া শিশি হইতে ঢালিয়া দুই-তিনরকমের ঔষধ ফুলসাহেবের মুখে দিল। মুখের দুই পাশ দিয়া ঔষধ গড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন জুমেলিয়া একখানি বড় আকারের শাণিত ছুরি বাহির করিল এবং সেই ছুরিকা দিয়া ফুলসাহেবের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল। প্রবলবেগে রক্তধারা বহিতে লাগিল। ক্রমে যখন রক্তপাত বন্ধ হইয়া আসিল, তখন জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়া রক্তশোষণ করিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ করিলে ফুলসাহেবের একটু জ্ঞান হইল। সে আসন্নমৃত্যু রোগীর ন্যায় উঠিবার জন্য বারংবার ব্যর্থ বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। অবশেষে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া, জুমেলিয়ার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'পিশাচী, তুই কে? তুই আমাকে এ কোন নরকে এনেছিস? সর—সর—সর, এখান হতে তুই দূর হয়ে যা; নরকে এসেছি, এখানেও আমাকে সুখী হতে দিবি নে?'

এই বলিয়া, ফুলসাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘন-ঘন নিশ্বাস টানিতে লাগিল।

জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া ফুলসাহেবকে আবার একটা কী ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তাহাতে অনতিবিলম্বে ফুলসাহেবের দুর্বল দেহের অবসন্নতা অনেকটা কাটিয়া গেল। ফুলসাহেব ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল।

জুমেলিয়া বলিল, 'এখন কেমন আছ? আর কোনও কষ্ট হইতেছে?'

ফুলসাহেব ক্ষীণস্বরে বলিল, 'মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছে। জুমেলিয়া, তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছ কেন?'

জুমেলিয়া বলিতে লাগিল, 'অরিন্দমের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? আগে অরিন্দম আমাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন তুমি এখানে ছিলে না। এমনকী, সে আমার শোবার ঘর পর্যন্ত তাড়া করিয়া আসে। আমি সেই ঘরে সেই আলমারির গুপ্তদ্বার দিয়া সিরাজউদ্দীনের ঘরে পালিয়ে যাই; তখন সিরাজউদ্দীন ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার সেই গুপ্তদ্বারের পশ্চাতে থাকিয়া শুনিলাম, অরিন্দম আর তোমার কী কথাবার্তা হইতেছে। তখনই তোমাদের দুইজনে হাতাহাতি আরম্ভ হইল; আমি অন্তরাল হতে দেখিতে লাগিলাম। শেষে তুমি নিজের বিষ-কাঁটা নিজের হাতে বিঁধে অজ্ঞান হয়ে পড়লে। অরিন্দম তোমার হাতে-পায়ে হাতকড়ি ও বেড়ি লাগিয়ে তোমাকে ফেলে রেখে গেল। সে চলে গেলে আমি তোমাকে একা বুকে করিয়া এই ঘরে লইয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এই ঘরের পাশেই অন্ধকূপের ভিতরে একটা মানুষের গোঙানির শব্দ শুনিতে পাইলাম; কিন্তু এখান হইতে কিছুই দেখা যায় না; সেই গোঙানির কারণটাও ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এখান হইতে উপরে গিয়া দেখিলাম, ইহার উপরের ঘরটার অন্ধকূপের দ্বারের ভিতরে

BanglaBook.org

একটা মই লাগানো রহিয়াছে। ভিতরে উঁকি মারিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমুদয় বুঝিতে পারিলাম। তখন সেই ভিটরয়েল দিয়া অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়কে পুড়াইয়া মারিতে গেলাম; কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। সিরাজউদ্দীনের ঘর থেকে যখন বাহিরে আসি, তখন সে-গুপ্তদ্বারটা বন্ধ করিয়া আসিতে ভুল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দীন এমনসময়ে আসিয়া শিশিটা আমার হাত থেকে ছিনাইয়া লইল। তখন প্রতিশোধ নেওয়াটা সহজ হইবে না মনে করিয়া, এখানে আসিয়া তোমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। অনেকরকম চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই তোমার জ্ঞান হয় না দেখিয়া বড়ই ভাবনা হইল। শেষে তোমার হাতের যে শিরায় সেই কাঁটা ফুটিয়াছিল, সেই শিরাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিলাম; সেই ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া রক্ত শুষিয়া ফেলিতে লাগিলাম। রক্তের সঙ্গে বিষের অনেকটা তেজ বাহির হইয়া গেল, তোমার জ্ঞান হইল।'

ফুলসাহেব বলিল, 'তবে সিরাজউদ্দীনও হাতছাড়া হইয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম, ওই সিরাজউদ্দীনকে মাঝে ফেলিয়া কুলসমের কাছ থেকে পাঁচ-সাতহাজার টাকা আদায় করিব; সেটা আর হইল না।'

জুমেলিয়া বলিল, 'অরিন্দম বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের কোনও আশাই সফল হইবে না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'সেটা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; অরিন্দমকে খুন করিতে না পারিলে আমাদের অদৃষ্ট কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইবে না। অরিন্দম যাহাতে শীঘ্র মরে, এখন আমি প্রাণপণ করিয়া সর্বাগ্রে সেই চেষ্টাই করিব।'

BanglaBook.org

পঞ্চম খণ্ড

প্রতিহিংসা—রক্তে-রক্তে

Alh. I look far down the pit—
My sight was bouned by a jutting fragment :
And it was stained with blood. Then first I shrieked,
My eye-balls burnt, my brain grew hot as fire.
And all the hanging drops of the wet roof
Turned into blood — I saw them turn to blood !
And I was leaping wildly down the chasm.
When on the farther brink I saw his sword.
And it said, Vengeance ! Curses on my tongue?

COLERIDGE
"Remorse"
Act IV, Scence III.

BanglaBook.org

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভীষণ আয়োজন

তাহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে এমন কোনও ভীষণ রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে কোনও পাঠকের সুপ্ত বিস্ময় বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। ইতোমধ্যে সিরাজউদ্দীনের সহিত কুলসমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সুখে আছেন শুনিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিশ্চিন্ত হইবেন, আশা করি। এবং আরও আশঙ্কা করি, শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, ফুলসাহেবের অন্বেষণে এই দীর্ঘ দুইটি মাস শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ অরিন্দমের একান্ত নিষ্ফলে কাটিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তথাপি তিনি নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন নাই; যত সময় যাইতেছে, ফুলসাহেবের জন্য অরিন্দম তেমনি অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এই দুই মাস তাঁহার না আছে আহারের ঠিক, না আছে নিদ্রার ঠিক, না আছে মনের ঠিক এবং না আছে স্বাস্থ্যের দিকে দৃকপাত; অথচ এত পরিশ্রমে কাজ কিছুই হইতেছে না।

এদিকে অরিন্দম ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে লোকালয়ের বহির্ভাগে এক গহন বনের মধ্যে তাঁহার মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হইতেছে।

যে-বাড়ি হইতে অরিন্দম সিরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করেন, তাহা অতিক্রম করিয়া পূর্বোক্ত মুখে আরও অনেক দূরে যাইলে প্রকাণ্ড আমবাগান দেখিতে পাওয়া যায়। সে-জায়গাটার নাম কাঁপা। কাঁপার চারিদিকে বড়-বড় গাছ, ঘন জঙ্গল এবং নিস্তব্ধতা। সে-নিস্তব্ধতা যেন সজীব, যেন চারিদিক ছমছম করিতেছে।

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে, কৃষ্ণাসপ্তমীর ম্রিয়মান চন্দ্র। তাহার আলো বনের ভিতর তেমন আসিতে পারে না, এক-আধ জায়গায় একটু-আধটু; দেখিয়া একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই বনের পার্শ্বে যেখানে কালু রায়ের জীর্ণ মন্দির, সেখানের অনেকটা স্থান উন্মুক্ত থাকায় নির্বিঘ্নে সেখানে চাঁদের আলো একেবারে প্লাবিত হইয়াছে; কিন্তু সে ভীষণ স্থানে চাঁদের আলোও যেন কেমন বড় ভয়ানক-ভয়ানক বলিয়া মনে হয়।

এই বনমধ্যস্থ নির্জন মন্দিরটি একজন ডাকাইতের স্থাপিত। অনেকদিন পূর্বে এই মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য নরবলি এবং কত লোকের মাথা দেহ হইতে পৃথক করিবার নিভৃত মন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে। আজও এই কৃষ্ণাসপ্তমীর মধ্যরাত্রে অনেকগুলি লোক একসঙ্গে জটলা করিয়া, কবাট বন্ধ করিয়া সেইরূপ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এবং সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া আপাতত রাশি-রাশি তামাক ও গাঁজা মুহুর্মুহু ভস্মীভূত হইতেছিল। চারিদিক বন্ধ থাকায় অনর্গল ধূম ভিতরে জমাট বাঁধিতেছিল। একপাশে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং সেই ধূমরাশি ভেদ করিয়া আলোক বিস্তার করা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া সেটা যেন ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমনসময়ে বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাতের শব্দে মন্দিরের মধ্যভাগ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ভিতর হইতে একজন বলিল, 'কে ও?'

বাহির হইতে উত্তর হইল, 'আমি।'

বিকৃত মুখ আরও বিকৃত করিয়া দলের ভিতর হতে একটি তীক্ষ্ণ মেজাজের লোক অতিশয় বিরক্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আরে বাপু, আমিও তো আমি; নম্বর কত?'

'নম্বর ১।'

'আমাদের নিয়ে মোটের উপর?'

'১৩।'

মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটা লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। লোকটা আমাদের অপরিচিত নহে—ফুলসাহেব।

BanglaBook.org

ফুলসাহেব নিজের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিল। কেহ কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎপরে ধূমাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফুলসাহেব বলিল, 'আমাদের সকলেই কি আসিয়াছে?'

একজন গণনা করিয়া উত্তর করিল, 'হ্যাঁ।'

ফুল। আমাদের উদ্দেশ্যটা কী, তা বোধহয়, কাহারও জানিতে বাকি নাই?

সকলে। ঠিক প্রতিশোধ লওয়া।

ফুল। আমাদের লক্ষ্য কে?

সকলে। (সমস্বরে) অরিন্দম।

আবার সকলে নীরব।

বৃহৎ মন্দিরটা যেন গমগম করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভীষণ ষড়যন্ত্র

ফুলসাহেব বলিল, 'তোমাদের সকলেই সেই অরিন্দমের হাতে কোনও-না-কোনওরকমে লাঞ্ছিত হয়েছ। তোমরা যদি তাহার প্রতিশোধের কোনও চেষ্টা না করো, ইহার অপেক্ষা কাপুরুষতা আর কী হইতে পারে? দুই নম্বর কে? আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

দলের ভিতর হইতে তালগাছের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি লোক উঠিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকটা অসম্ভব লম্বা, তেমন দীর্ঘ দেহ বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখখানা দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা স্বতই মনে পড়ে।

ফুলসাহেব তাহাকে কর্তৃত্বের স্বরে প্রশ্ন করিল, 'অরিন্দম তোমার কী করেছে?'

২নং। আমার বাঁ হাত ভেঙে দিয়েছে।

ফুল। কীরূপে হাতটা ভাঙলে?

২নং। অরিন্দমের সঙ্গে আমার একদিন হাতাহাতি হয়; শেষে বেটা আমার হাতটা ধরে কবজির কাছটায় এমন মুচড়ে দিলে যে, হাতটা কেটে বাদ দিতে হল।

ফুল। বটে! তবে তার উপরে তোমার খুবই রাগ থাকতে পারে?

২নং। সে-কথা আর একবার করে বলতে? বেটাকে একবার সুবিধায় পেলে মাথাটা চিবিয়ে খাই, তবে রাগ কতকটা যায়।

ফুল। আচ্ছা, তুমি বসো। এর মধ্যে তিন নম্বর কে?

'আমি,' বলিয়া একটি লোক দুই নম্বরের স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। দুঃখের বিষয় দুই নম্বরের সমুদয় স্থানটি অধিকার করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অন্যান্য দিকে যাহাই হউক, ঊর্ধ্বের অনেকটা স্থান খালি রহিয়া গেল। লোকটা লম্বায় দুই নম্বরের যেন সিকিখানা, কিন্তু প্রস্থে খুব স্ফীত। ওজনে বরং চতুর্গুণ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। মুখখানি এমন বদখৎ, যেন একটা অতি-বিরক্তিকর, অতি-বিকৃতভঙ্গি মুখের উপর জমাট বাঁধিয়া চির-অবস্থিতির একটা পাকা বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়াছে।

ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অরিন্দম তোমার কী ক্ষতি করেছে?'

সে লোকটা নিজের ভগ্ন নাসিকা অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইল। সত্যই বেচারার নাসিকাটি একেবারে ভিতরে বসিয়া গিয়াছে।

ফু। ব্যাপার কী?

৩নং। এই নাকের শোধ তুলব—তবে ছাড়ব।

ফু। তুমি নাকের বদলে তার নাকটা চাও, কেমন?

BanglaBook.org

৩নং। আমার নাকের বদলে আমি তার প্রাণটা চাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—চার নম্বরের কে আছে হে?

দলের ভিতর হইতে একটি বিশ্রী চেহারার লোক খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে আসিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ফু। তোমার কী হইয়াছে?

৪নং। আমার পা ভেঙে দিয়েছে। এ-পায়ের শোধ আমি না নিয়ে ছাড়ব না।

ফু। পাঁচের নম্বর কে?

৫নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কী, বলো?

সে-লোকটা নিজের দক্ষিণ হস্ত ফুলসাহেবের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া সে-হাতে আর কোনও অঙ্গুলি বিদ্যমান ছিল না।

ফুলসাহেব বলিল, 'কী করে অরিন্দম একবারে তোমার চার-চারটে আঙুল ভেঙে দিলে?'

৫নং। পিস্তলের গুলিতে। যেমন আমি তাকে ঘুষি তুলে ছুটে মারতে যাব সে দূরে থেকে এমন একটা গুলি দাগলে যে, আমার ঘুষির আধখানা চোখের নিমেষে কোথায় উড়িয়ে দিলে, খোঁজ হল না।

ফু। নম্বর ছয়, উঠে এসো।

৬ নম্বরের প্রাণীটি সম্মুখীন হইলে ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কী দুঃখে আমাদের দলে মিশেছ? অরিন্দম তোমার কী অনিষ্ট করেছে?'

৬নং। অরিন্দম আমার একপাটি দাঁত একবারে উড়িয়ে দিয়েছে।

ফু। আর কিছু?

৬নং। আর আমার দাদাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

লোকটার যেমন বিকট চেহারা, তাহার যিনি দাদা, তিনি যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী।

ফু। তবে দেখছি, তুমি অরিন্দমের রক্তদর্শন না করে কিছুতে সুস্থ হবে না।

৬নং। সে কথা আর মুখে প্রকাশ করে বলতে!

ফু। সাত নম্বর কে আছ, এসো।

৭নং। আমি সাত নম্বর।

ফু। অরিন্দম তোমার কিছু ভেঙেছে?

৭নং। কিছুই না।

ফু। তবে তোমার কী হয়েছে?

৭নং। কিছুই না।

ফু। তবে যে তুমি আমাদের দলে মিশেছ—কারণ কী?

৭নং। কারণ, আমি অরিন্দমকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

ফু। কেন ঘৃণা করো?

৭নং। সে আমাকে একবার বোকা বানিয়ে নিজের একটা বড় কাজ হাসিল করে নিয়েছিল।

ফু। কী রকম, শুনি?

৭নং। লোখে নামে আমার একটা স্যাঙাৎ একবার একটা লোককে খুন করেছিল। আমরা যে-যেখানে খুনটা-আসটা করতুম, তা কেউ কারও কাছে কোনও কথা লুকুতুম না। যা করা যেত, তা দুজনে পরামর্শ করেই হত। লোখে একবার একটা খুন করবার পর, একদিন সন্ধ্যার সময়ে বেটা অরিন্দম ঠিক লোখের মতো সেজে এসে আমার কাছ থেকে এ-কথা সে-কথার পর সেই খুনটার

BanglaBook.org

সব কথা বার করে নিয়ে লোখেকে একেবারে বারো বৎসরের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলে। আমার জন্যই তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হল বলে, যাবার সময়ে শাসিয়ে গেছে যে, ফিরে এসে সে আমাকে খুন করে ফাঁসি যাবে। তা সে যে-রকম ভয়ানক লোক, বেঁচে যদি ফিরে আসে, নিশ্চয় সে যা বলে গেছে, ঠিক তা করবেই করবে। এর মধ্যে যদি আমি অরিন্দমের একটা কিনারা করতে পারি, তার রাগটা আমার উপর থেকে কমে যেতে পারে।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—আট নম্বরের লোক উঠে এসো।

সাতের স্থানে আট আসিয়া দাঁড়াইল।

ফু। তোমার ব্যাপার কী হে?

৮নং। বিষম ব্যাপার!

ফু। বটে! কী?

৮নং। আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না—ঘুমুতে গেলেই একটা-না-একটা স্বপ্ন লেগেই আছে; সকল স্বপ্নেই অরিন্দমের যোগাযোগ। কখনও স্বপ্ন দেখি, অরিন্দম আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছে; কখনও অরিন্দম আমাকে পচাপুকুরের পাঁকে চুবিয়ে ধরছে। কখনও বা আমাকে হাত-পায় বেঁধে জ্বলন্ত চিতার উপরে তুলে ধরছে। তা ছাড়া, কানমলাটা, চড়-চাপড়টা, লাথিটা-আসটা যেন লেগেই আছে; সেগুলো যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অরিন্দম না মরলে বোধহয়, এ স্বপ্ন-রোগ থেকে আমার কিছুতেই মুক্তি নাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও। নয় নম্বরের কে?

৯নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কী?

৯নং। তিন বৎসর ছয় মাস।

ফু। বটে!

৯নং। কঠিন পরিশ্রমের সহিত।

ফু। দশের নম্বর কে?

১০নং। আমি।

ফু। তোমার ব্যাপার কী?

১০নং। নয়ের চেয়ে আরও দেড় বৎসর বেশি; কিন্তু ভোগটা বেশিদিন হয় নাই। একমাস পরেই জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছি।

ফু। তবে তুমি খুব কাজের লোক হে! এগারো নম্বরের কে?

এগারো নম্বরে একটি বালক উঠিয়া আসিল। তাহার বয়স এখনও সতেরোর মধ্যেই আছে। তাহার মুখাকৃতি ও দৃষ্টি বড় ভয়ানক; কেউটে সাপের ছানা দেখিয়া ভয়ে বুকটা যেমন চমকে উঠে, তেমনি হঠাৎ যদি এর মুখখানি চোখের সামনে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের একটা ভীতি স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাহার হাতে একখানা খুব ধারালো, খুব বড় ছুরি ছিল। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, সে নিজের ছুরিখানা নাড়িয়া-নাড়িয়া আরম্ভ করিয়া দিল, 'আমি অরিন্দমকে সহজে ছাড়ব না। আমার বাবা একটি লোককে ছুরি মেরে খুন করেছিল বলে, অরিন্দম আমার বাবাকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে; আজ তিন বৎসর হল, বাবা মরেছে। যেদিন বাবা মরে, সেইদিন থেকে আমি এই ছুরির সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করেছি যে, একদণ্ডও ছুরিখানা ছেড়ে থাকি না। অরিন্দমের বুকে না বসিয়ে এ ছুরি ত্যাগ করব না।'

এমন পুত্রের যিনি জনয়িতা, তাঁহার অন্তিমে যে ফাঁসিকাষ্ঠ অপরিহার্য, ইহা সর্ববাদীসম্মত।

তাহার পর বারো নম্বরের লোক উঠিয়া আসিল। সে বয়সে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হইলেও এখনও যে তিন-চারজন সবল যুবককে আছাড় দিয়া ফেলিবার ক্ষমতা তাহার বেশ আছে, তাহার চেহারাখানার

BanglaBook.org

বিপুল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সেটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। এবং তাহার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির যে খুব সৌসাদৃশ্য আছে, তাহার কালিমা-লেপিত কোটরবিবিক্ষু চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি, প্রকটগণ্ডাস্থি মুখের ভীষণ ভঙ্গিতে সে-সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে বলিল, 'অরিন্দমের উপর আমার রাগের কোনও কারণ আছে কি না, তা আমি বলতে চাই না। তোমাদের সকলের চেয়ে তাকে যে আমি অনেক বেশি ঘৃণা করি, সেইটুকু জেনে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো—হও, বিশ্বাস করতে পারো, ভালো—থেকে যাই; না হয় বলো, আমি আমার '•'জের পথ দেখি। অরিন্দমের যমের বাড়ি যাবার পথটা সহজ করে দিবার ক্ষমতা আমার একারই যথেষ্ট আছে।'

তাহার পর তেরো নম্বরের লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি।'

লোকটা সেই গোরাচাঁদ। নামটা শুনিলে কাহারও লোকটাকে মনে করিতে বিলম্ব হইবে না।

গোরাচাঁদ বসিলে ফুলসাহেব নিজে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—বেশ হাসিমুখে মিষ্টকথায় শ্রোতাদের কর্ণে অমৃত-বর্ষণ করিয়া বলিল, 'আমি অরিন্দমকে কেন ঘৃণা করি, তোমরা কেহই জানো না। একমাত্র কারণ হচ্ছে, সে ঠিক আমারই মতো বলবান, আমারই মতো চতুর, আমারই মতো বুদ্ধিমান এবং আমারই মতো সকল কাজে তৎপর। আমি বেঁচে থাকতে আমার মতো আর একটা লোক যে পৃথিবীতে থাকে, সে-ইচ্ছা আমার একেবারে নাই। সেটা আমার একান্ত অসহ্য বোধ হয়ে আসছে; হয় সে পৃথিবী ত্যাগ করুক—আমি নিরাপদ হই, নয় আমি যাই—সে সুখী হোক। এ-দুটার একটা আমি না করে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারব না। দেখি, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! যাক, এখন তোমাদের মধ্যে এমন কেহ এখানে আছে, যে জীবনের মধ্যে কখনও একটা-না-একটা খুন করে নাই? কে আছ, বলো।'

কেহ কোনও উত্তর করিল না—সকলেই খুনি দস্যু।

ফুলসাহেব বলিল, 'ভালোই হয়েছে, এ-সব কাজে এইরকমই লোক দরকার। অরিন্দম-হত্যার জন্য এখন সকলকে শপথ করতে হবে।'

তখন সেই সকল খুনি লোক একমাত্র অরিন্দমের জীবন লক্ষ্য করিয়া শপথ করিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফুলসাহেবের নিকট হইতে এক-একখানি তীক্ষ্ণধার কিরীচ উপহার পাইল।

সেদিন এই পর্যন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মোহিনীর শেষ উদ্যম

দেবেন্দ্রবিজয় আশ্বাসিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া এখনও অরিন্দমের বাসায় অপেক্ষা করিতেছেন। যত দিন যাইতেছে, রেবতীর জন্য দেবেন্দ্রবিজয় ততই ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন। রেবতীর সন্ধানের জন্য অরিন্দমকে কোনও কথা বলিলে, অরিন্দম মুখে খুবই আশ্বাস দেন; কিন্তু কাজে তাহার কিছুই হয় না দেখিয়া, দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এমনকী অরিন্দমের সংসর্গ তাঁহার এক-একবার বড় তিক্ত বোধ হইত। সেই সময়ে মনুষ্যোচিত বিরক্তি এবং রেবতী উদ্ধারের জন্য অন্য ডিটেকটিভ নির্বাচনের কল্পনাটা তাঁহার মনের ভিতরে নিরতিশয় প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠিত; মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না। মুখে প্রকাশ না করিলেও মুখের ভাবটা সে-কথাটা যখন-তখন অরিন্দমের নিকট প্রকাশ করিয়া দিত। দুই-একটা কাজেও অরিন্দম তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন; ফুলসাহেবের অনুসন্ধান সম্বন্ধে কোনও কাজ করিতে হইলে দেবেন্দ্রবিজয় পাঁচ-সাতবার 'হ্যাঁ' 'না' করিয়া কখনও কোনও কাজে 'হ্যাঁ' দিতেন, কখনও কোনও কাজে 'না' দিতেন। এক-একসময়ে অরিন্দমের মিথ্যা (?) আশ্বাসবাক্যে তাঁহার বিরক্তি ও ধৈর্য একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া এতদূরে উঠিত যে, তাহা একটা নীরব

ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। এবং সেইসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয় গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। অসহ্য বিরক্তি, দারুণ উৎকণ্ঠা, দুঃসহ উদ্বেগ এবং লুপ্তপ্রায় ধৈর্যের মধ্য দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের দীর্ঘ-দীর্ঘ দিনগুলি দীর্ঘতম হইয়া অতিবাহিত হইতেছে।

একদিন দেবেন্দ্রবিজয় কোনও কাজে বাহির হইয়াছেন, অরিন্দম মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সংক্ষিপ্ত মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের আয়োজনমাত্র করিয়াছেন, এমনসময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

অরিন্দম সেই স্ত্রীলোককে সেইখানে লইয়া আসিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে মুখের উপর অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া একটি স্ত্রীমূর্তি অরিন্দমের সম্মুখীন হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া দ্বার-সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার বেশভূষা মলিন এবং বড় অপরিষ্কার। দুই-এক গুচ্ছ চুল—অতি রুক্ষ, কানের পাশ দিয়া, সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—সে গৌরবর্ণা হইলেও, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সে-বর্ণে কিছুমাত্র ঔজ্জ্বল্য ছিল না। সে-দেহ দাবাগ্নিদগ্ধকিশলয়সদৃশ কেমন যেন বিশুষ্ক ও শ্রীহীন, ঠিক বর্ণনা করা যায় না।

অরিন্দম তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঘরের ভিতরে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন; উঠিয়া বসিয়া, একটি তাকিয়া টানিয়া তদুপরে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে উত্তর হইল, 'আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী।'

ফুলসাহেবের স্ত্রী। শুনিয়া বিস্মিত অরিন্দম আরও বিস্মিত হইলেন। কতকটা যেন স্বপ্নের মতো বোধ হইল। একবার মনে হইল, ছদ্মবেশে জুমেলিয়া নহে তো? কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তো এমন নহে, জুমেলিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তীব্রতা মিশ্রিত আছে যে, একবার শুনিলে চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহা সহজে ভুলিতে পারে না। এ কে? সন্দিগ্ধ অরিন্দম কী উত্তর করবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া অবাঙ্মুখে তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দমকে নীরব দেখিয়া সেই কৃতাবগুণ্ঠনা রমণী বলিল, 'তুমি ফুলসাহেবকে কি জানো না?'

অরিন্দম। জানি।

রমণী। আমি তাহার স্ত্রী—আমার নাম মোহিনী।

অরিন্দম। ইহা এখন জানিলাম।

মোহিনী। ফুলসাহেব জেলখানা থেকে পালায়, সে-কথা তোমার মনে আছে?

অ। আছে।

মো। সে তোমাকে খুন করবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছে, তা এখনও তোমার মনে আছে কি?

অ। বেশ মনে আছে।

মো। তবে যে তুমি বড় ভালোমানুষটির মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

অ। চিন্তিত হইয়াই বা করিব কী? এই দুইমাস ধরিয়া কিছুতেই তাহার সন্ধান হইল না।

মো। তা না হলেও তোমার মতো একজন বড় গোয়েন্দার চুপ করে বসে থাকা কি ভালো দেখায়? দুই মাসে যা হয় নাই—দুই দিনে তা হতে পারে।

অ। তা যেন হল, তুমি ফুলসাহেবের স্ত্রী—তাতে তোমার লাভ কী?

মো। লাভ? অনেক। সে অনেক কথা—সে-কথা থাক। আসল কথাটা আগে শুনে যাও। ফুলসাহেব এখন তোমাকে খুন করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইবার সে যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না; তাই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। খুব সাবধান—ফুলসাহেব

BanglaBook.org

বড় ভয়ানক লোক। সে শুধু মানুষ না—সে অনেক রকম; সে মানুষও বটে; সে পিশাচও বটে; সে দানবও বটে, সে ডাকাতও বটে; সে খুনেও বটে, সে সাপও বটে, সে বাঘও বটে, একটু অসাবধান হলে হয় সে সাপ হয়ে দংশন করবে—না হয় বাঘ হয়ে গিলে খাবে—না হয় পিশাচ হয়ে ঘাড় মটকাবে। না হয়—

অ। (বাধা দিয়া) আসল কথা কী বলবে বলছিলে না?

মো। হ্যাঁ, মনে আছে। ফুলসাহেব তোমাকে খুন করবার জন্য একদল দস্যু সংগ্রহ করেছে। তারা সকলেই তোমাকে খুন করবার জন্য ফুলসাহেবের কাছে শপথ করেছে। একটু অসাবধান হলে কখন কে এসে তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, তুমি তা কিছুই জানতে পারবে না। খুব সাবধান—সারা দিনরাত সাবধান—বড় ভয়ানক লোক, তারা—সকলেই খুনি, খুন-জখম করতে তাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না।

অ। তারা কে জানো?

মো। না, তারা দু-চারজন নয়, সর্বসুদ্ধ তেরো জন। সকলেই যেন যমের দূত।

অ। তাদের আড্ডা কোথায়, বলতে পারো?

মো। আড্ডার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। যেখানে যখন তারা যেদিন একসঙ্গে জুটে, সেইদিন সেইখানে তাদের আড্ডা। তারা সকলেই দিনরাত যে-যার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অ। সে চেষ্টার লক্ষ্য আমার মৃত্যু, কেমন?

মো। তাতে আর সন্দেহ আছে?

অ। তাদের ভিতরকার আর কোনও কথা তুমি জানো?

মো। তাদের একটি পরামর্শের কথা আমি নিজের কানে শুনেছি; বড় ভয়ানক লোক তারা—বড় ভয়ানক কথা।

অ। কথাটা কী?

মো। আজ রাত্রে তোমাকে তারা এখানে খুন করতে আসবে।

অ। (বাধা দিয়া) এখানে! আমার বাড়িতে?

মো। কেন? বিশ্বাস হয় না?

অ। সকলেই আসবে?

মো। সকলেই—সকলেই শপথ করেছে।

অ। কখন আসবে?

মো। আজ রাত্রে।

অ। তা জানি। কত রাত্রে?

মো। রাত দুটার পর।

অ। বটে!

মো। শুধু নিজেকে রক্ষা করলে হবে না—দেখব তাদের ধরতে তবে জানব—গোয়েন্দার মতো গোয়েন্দা বটে! এখন থেকে পুলিশের লোকজন এনে বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখে দাও—আমার পরামর্শ শোনো।

অ। তা হলে ফুলসাহেবও ধরা পড়বে—ফুলসাহেব যে তোমার স্বামী।

মো। ফুলসাহেব যে আমার স্বামী, সে-কথা আর আমাকে এত করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী—আমি কি জানি না, ফুলসাহেব আমার স্বামী? নামজাদা বুদ্ধিমান গোয়েন্দা হয়ে তুমি সহসা এমন নির্বোধের মতো কথা কও কেন?

অ। তবে যে তুমি ফুলসাহেবের অমঙ্গল চেষ্টা করছ? কারণ কী?

মো। কারণ, সে আমার পরম শত্রু। মানুষ মানুষের এতদূর শত্রু হতে পারে, এ-কথা আগে জানতাম না। ফুলসাহেবের তুমি যেমন শত্রু, তার চেয়ে ফুলসাহেব আমার বেশি শত্রু। যখন সে

BanglaBook.org

জেলে গিয়েছিল, তখন একবার আমি সুখী হয়েছিলাম; এখন আমার যন্ত্রণায় বুকটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে!

অ। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার করলে তুমি সুখী হবে?

মো। খুন করলে সুখী হব।

অ। স্বামীর উপরে এত রাগের কারণ কী?

মো। সে-কথায় তোমার কোনও দরকার নাই, তবে এখন আমি যাই। যা বললেম, সব যেন বেশ মনে থাকে।

মোহিনী চকিতে উঠিয়া, অতি দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অরিন্দম পথের দিককার একটা জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, মোহিনী তখন ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছে—এমনকী অর্ধোলঙ্গভাবে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই-একজন পথিক পথের ধারে দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের আয়োজন

এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনাটা অরিন্দমের নিরতিশয় অদ্ভুতরসাত্মক বলিয়া বোধ হইল। কথায়-বার্তায় পূর্বেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মোহিনীর পাগলের ছিট আছে। এখন তাহাকে পথের উপর দিয়া সেরূপভাবে ছুটিতে দেখিয়া, সে-ধারণাটা কিছুমাত্র অমূলক নহে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাহা হইলেও অরিন্দম তাহার কথাগুলি উন্মাদের খেয়াল মনে না করিয়া, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। যদিও তাঁহার ন্যায় সাহসী, সুচতুর ও সদ্বিবেচক ব্যক্তির পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের উপর নির্ভর করা একান্ত নিন্দার কথা; তাহা হইলেও তিনি অনেক স্থলে দৈবের উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেন। তিনি জানিতেন এবং এমন অনেক হইতেও দেখিয়াছেন যে, প্রথমে দৈবাৎ এমন এক-একটি ছোট ঘটনা ঘটে যে, একসময়ে তাহার পরিমাণ অদৃষ্টপূর্ব গুরুতর হইয়া উঠে।

তিনি সেই অপরিচিতা উন্মাদিনীর কথায় একান্ত আস্থা স্থাপনপূর্বক দস্যুদল-দলনের অচিন্তিতপূর্ব এক বৃহৎ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আয়োজনটা নূতন রকমের, তাহাতে প্রচুর আমোদ আছে এবং ভয়, পরিশ্রম খুব কম আছে।

তিনি যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রনাথ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে ফুলসাহেবের এই নূতন কল্পনার কথা বলিলেন বটে, কিন্তু নিজে তাহাকে ধরিবার জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ব্যাপার তো বড় সহজ নহে, আপনার বাড়িতে ডাকাতি! এইবার আপনার বিদ্যাবুদ্ধি বাহির হইয়া পড়িবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তেরোজন ডাকাতকে ভয় করিতে অরিন্দমের এখনও শিক্ষা হয় নাই। কথাটা যদি ঠিক হয়, তা হলে কাল দেখবেন, অরিন্দম তেরোজনকেই আয়ত্তক্ষণভূষিত করে এখানে চালান দিয়েছে।'

যোগেন্দ্র। অরিন্দমবাবু, এ কি আপনি যে-সে তেরোজন মনে করেছেন? ফুলসাহেব তো তার মধ্যে আছেই; তা ছাড়া ফুলসাহেবের পছন্দ করা বারোজন। মনে থাকে যেন, তাদের এক-একজন দ্বিতীয় ফুলসাহেব।

অরিন্দম। নিঃসন্দেহ।

যো। তবে?

BanglaBook.org

অ। তবে আবার কী?

যো। এখন কী উপায় স্থির করেছেন?

অ। আত্মরক্ষার না তাদের বন্দি করবার?

যো। দুই বিষয়েই।

অ। এখনও অনেক সময় আছে, একটা-না-একটা উপায় স্থির করতে পারব।

যো। সময় আর কোথায়? আজ রাত্রেই তো তারা আসবে। এখন কতগুলি লোক আমাকে দিতে হবে, বলুন দেখি?

অ। একজনও না।

যো। (সবিস্ময়ে) সে কী!

অ। লোক নিয়ে আমি কী করব?

যো। একাই বা কী করবেন?

অ। যতদূর সাধ্য।

যো। কী পাগলের মতো কথা বলেন, মানে হয় না। ভেবে-ভেবে আর ঘুরে-ঘুরে আপনার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে দেখছি, অরিন্দমবাবু!

অ। (সহাস্যে) তা হবে!

যো। আপনার সকল কথায় পরিহাস। কাজের কথায় পরিহাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আপনি একা সেই তেরোজনের কিছুই করতে পারবেন না।

অ। দেবেন্দ্রবিজয় আছে।

যো। সেদিনকার ঘটনায় তার বলবুদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; সেদিনকার মতো আজ আবার সে আপনার সাহায্য করতে গিয়ে, আপনার বিপদ আর একদিকে না বাড়িয়ে দিলে হয়।

অ। নূতন লোক। তা যাই হোক, দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ-চোখের ভাব আর কথাবার্তা শুনে তার মাথাটা যে পরিষ্কার আছে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। আমার সঙ্গে এই দুইমাসে ঘুরে-ঘুরে গোয়েন্দাগিরি শিখতে তার একটু ইচ্ছা হয়েছে। মাথা পরিষ্কার না থাকলে এ-জঘন্য কাজে সহজে কাহারওই ইচ্ছা হয় না। যে একটু বুদ্ধিমান, যে একটু চতুর, যে একটু বলবান, এ-সব কাজে সে একটু আনন্দ বোধ করেই থাকে।

যো। না হয়, আপনার দেবেন্দ্রবিজয় চতুর, বুদ্ধিমান, বলবান সবই। তা হলেও দুইজনে কি সেই তেরোজনের সমকক্ষ হতে পারবেন? বিশেষত সেই তেরোজনের মধ্যে আবার স্বয়ং ফুলসাহেবের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব রয়েছে।

অ। একদিন আমি একা একুশজনের যে দুর্দশা করেছিলেম, তা বুঝি আপনার মনে নাই?

যো। তা জানি, আপনার বুদ্ধিবল অলৌকিক; কিন্তু ফুলসাহেব বড় সহজ লোক নয়, তাই বলিতেছি।

অ। একটা বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাই। কতকগুলি ইলেকট্রিক ব্যাটারি, আবশ্যক। সন্ধ্যার পূর্বে সংগ্রহ করতে পারবেন?

যো। ইলেকট্রিক ব্যাটারি নিয়ে কী হবে?

অ। (সহাস্যে) একটু বিজ্ঞানের চর্চা করা যাবে।

যো। আপনার অন্ত পাওয়া ভার—আপনি লোকটা একান্ত দুর্জ্ঞেয়।

অ। আপনার কাছেও?

যো। তা বইকি! ইলেকট্রিক ব্যাটারি ছাড়া আর কিছু চাই?

অ। আর চৌদ্দ জোড়া হাতকড়ি ও বেড়ি। যেন সকলগুলি বেশ মজবুত হয়।

যো। একটা বেশি কেন?

BanglaBook.org

অ। যদি সেই তেরোজনের সঙ্গে আমার বাড়িতে জুমেলিয়ারও শুভ পদার্পণ হয়। তা না হলেও ফুলসাহেবের জন্য জোড়া-দুই হাতকড়ি আবশ্যক করে।

যো। অরিন্দমবাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কথাগুলো আমার বড় ভালো ঠেকছে না। বেশি না হয়—আমি থানা থেকে বারোজন লোক দিচ্ছি, আজ রাত্রের জন্য আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিন, এ-সময়ে অনেক কাজে লাগবে।

অ। একজনও না। আমাকে কি আপনার বিশ্বাস হয় না?

যো। আপনার যা খুশি, তা করুন, আমি আর কোনও কথা বলব না।

অ। আমি উঠলেম—আর সময় নষ্ট করব না। ইলেকট্রিক ব্যাটারি আর হাতকড়ি ও বেড়িগুলা যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন।

যো। আধঘণ্টার মধ্যেই পাবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ******

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অরিন্দম বাসায় আসিয়া দেখিলেন, তখনও দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে একটা চুরুট টানিতে ও প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

যথাসময়ে মুটের মাথায় বোঝাই হইয়া যোগেন্দ্রনাথের প্রেরিত অনেকগুলি ইলেকট্রিক ব্যাটারি ও অনেকগুলি হাতকড়ি ও বেড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিন্দম প্রত্যেক জিনিসটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া ঘরে তুলিলেন। হাতকড়ি ও বেড়িগুলি দ্বিতলের উপরে এমন একটা স্থানে রাখিলেন যে, দরকারের সময়ে সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইলেকট্রিক ব্যাটারিগুলি দ্বিতলে উঠিবার সোপানের নিচে বসাইলেন; এবং সেই ব্যাটারিগুলির সঙ্গে তার যোগ করিয়া সোপানের চারিদিকে এবং রেলিং-এর গায়ে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। নিজের শয়ন-কক্ষের কবাটের কড়া দুইটির সহিতও একটি তার লাগাইয়া ইলেকট্রিক ব্যাটারির সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলেন।

সমুদয় ঠিকঠাক করিতে অরিন্দমের রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। রাত্রি নয়টার পর দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসিলেন।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'ফুলসাহেবের আজ এখানে শুভাগমন হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয় সদ্য-আকাশ-বিদ্যুতের ন্যায় বলিলেন, 'ফুলসাহেব! এখানে কোথায় আসবে?'

'এখানে—আমার বাড়িতে।'

'এখন সে কোথায়?'

'যেখানেই থাক, আজ আমার বাড়িতে আসবে।'

'আপনার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, আমার বাড়িতে।'

'ধরা দিতে নাকি?'

'অনেকটা সেইরকমেরই বটে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

(সহাস্যে) 'এসো, বুঝিয়ে দিই।'

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সোপানের সম্মুখে লইয়া আসিলেন; এবং ইলেকট্রিক ব্যাটারির সাহায্যে সিঁড়ির উপরকার তারগুলিতে সামান্যমাত্র বৈদ্যুতিক

BanglaBook.org

প্রবাহের সঞ্চার করিয়া দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'একবার তুমি সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়াও দেখি।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের অপেক্ষা অরিন্দম বয়সে অনেক বড় বলিয়া এবং এই দুই মাসের ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে 'আপনি', 'আপনার' ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক শব্দের পরিবর্তে স্নেহসূচক 'তুমি', 'তোমার' শব্দ ব্যবহার করিতেন। অরিন্দমের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় তাড়াতাড়ি পাশের রেলিং ধরিয়া সদর্পে সিঁড়িতে উঠিলেন; তখনই যন্ত্রণায় তীব্রতর চিৎকারে সমস্ত বাড়িটা আর্তনাদ-প্রতিধ্বনিত করিয়া সিঁড়ি হইতে পাঁচহাত দূরে লাফাইয়া পড়িলেন।

অরিন্দম তখন দেবেন্দ্রবিজয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বিস্মিত হইলেন। অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি একটা ব্যাটারির তেজ দেখিলে; যথাসময়ে দশটা ব্যাটারি একসঙ্গে কাজ করবে। তখন একবার পা দিলে আর এক পা নড়তে হবে না। ফুলসাহেব যখন ধরা পড়বে, তখন যতক্ষণ না রেবতীর সম্বন্ধে সব কথা সে বলে, ততক্ষণ তাকে এরূপ যন্ত্রণাময় অবস্থায় সিঁড়ির উপরে ধরিয়া রাখিব। দারুণ যন্ত্রণায় তখনই তাকে তার সমুদয় গুপ্তকথা আমাদের কাছে প্রকাশ করতেই হবে।'

শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে খুব খুশি হইলেন। মুখের ভাব বুঝিয়া অরিন্দমও যে তাহা না বুঝিলেন, তাহা নহে। বলিলেন, 'যেরূপ দেখছি, তাতে রেবতীর উদ্ধারটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে বলেই বোধ হয়।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনার কল্পনার ভিতরে আমি এখনও প্রবেশ করতে পারি নাই; আপনি যা বলছেন তা না বুঝবার মতন একরকম বুঝে যাচ্ছি। ফুলসাহেব এখানে কী করতে আসবে?'

অ। আমাকে খুন করতে।

দে। এত সাহস তার?

অ। ফুলসাহেবের পক্ষে এটা বড় বেশি সাহসের কথা নয়।

দে। কত রাত্রে?

অ। রাত দু'টার পর।

দে। কীরকম ভাবে আসবে?

অ। চোরের মতো চুপিচুপি আসবে না—ডাকাতেরা যেমন দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে আসে, ফুলসাহেব তেমনি সদলবলে আসবে।

দে। সে আবার দলবল পেলে কোথায়?

অ। এই দুই মাস কি সে নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ করে বসেছিল? ভিতরে-ভিতরে এই সব করেছে।

দে। তবে তো বড় ভয়ানক কথা! আপনি এ-সংবাদ কোথায় পেলেন?

অরিন্দম তখন মোহিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। মোহিনী নাম্নী একটা উন্মাদিনীর কথায় অরিন্দমের এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা অনেকেই মনে করিবেন, কাজটা ঠিক হয় নাই; কিন্তু অনেক দিনের ডিটেকটিভ অরিন্দমের এমন একটা অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অনন্যসুলভ অনুমান শক্তি ছিল যে, একটা কথা পড়িলে ভবিষ্যতে সেটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা তিনি ঠিক অনুভব করিতে পারিতেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিনী কোনও কথা না খুলিয়া বলিলেও তাহার কথাবার্তার ভাবে তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, মোহিনী ফুলসাহেবের নিকটে কোনও বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছে—এরূপ স্থলে অবশ্য সে-বিষয়টা আদিরসাত্মক এবং কিছু মর্মভেদী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : গুপ্তদ্বার

রাত্রি এগারোটার পূর্বে অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় আহারাদি শেষ করিলেন এবং সম্মুখ-দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া, দ্বিতলের একটা ঘরে বসিয়া উভয়ে দাবা-খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

BanglaBook.org

দেবেন্দ্রবিজয় খেলিতে-খেলিতে বারংবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। এক-একবার মনটা খেলা হইতে সরিয়া গিয়া ফুলসাহেবের পদধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছিল এবং ফুলসাহেবের দলবলের লোকগুলির ভীষণ চেহারা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু অরিন্দম অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খেলিতেছিলেন, সুতরাং বাজী জিতিতে ছিলেন। মাথার উপরে যে এতবড় একটা বিপদ, জীবন ও মৃত্যুর এবং ছুরি ও রক্তের একটা সংগ্রামাভিনয় যে আসন্ন, তথাপি সেজন্য তাঁহার মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা অথবা চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

রাত্রি দুইটার সময়ে খেলা বন্ধ হইল। অরিন্দম বলিলেন, 'এইবার তাদের আসবার সময় হয়েছে, একঘণ্টার মধ্যেই তাদের শুভাগমন হবে; আমরা দুইজনে মিলিয়া এখন হতে তাদের অভ্যর্থনা করবার বন্দোবস্ত করি, এসো।'

দেবেন্দ্র। আমি কোথায় থাকব, বলুন দেখি?

অরি। নিচে, সিঁড়ির পাশের ঘরটায় এখন তোমাকে থাকতে হবে। যাবার সময়ে রবারের জুতা আর দস্তানা পরে যাবে। সেগুলি এত মোটা রবারের তৈয়ারি যে, ইলেকট্রিক তারে কিছুই করতে পারবে না।

এই বলিয়া অরিন্দম দুই জোড়া রবারের জুতা ও দস্তানা লইয়া আসিলেন। উভয়ে সেইগুলি লইয়া হাতে পায়ে পরিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'নিচের ঘরে গিয়ে আমায় কী করতে হবে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'সেই ঘরের দক্ষিণ কোণে দেখবে, একটি দড়ি ঝুলছে; যখন দেখবে যে, তেরোজন লোক সিঁড়ির উপরে উঠেছে, তখন সেই দড়িটি টেনে ধরবে। তারপর যা করতে হয়, আমি করব।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'হয়তো তেরোজনের একজন বাহিরে পাহারা দিতে পারে।'

অ। তাদের পাহারা দিবার আরও লোক আছে, সে-কাজ জুমেলিয়া বেশ পারবে। জুমেলিয়ার উপরে ফুলসাহেব যথেষ্ট নির্ভর করে থাকে।

দে। তা হলেও তেরোজন কি একসঙ্গে উপরে উঠবে?

অ। তেরোজনই উঠবে। ফুলসাহেব যে প্রকৃতির লোক, তাতে যে সে চোরের মতো চুপি-চুপি, ভয়ে-ভয়ে কোনও কাজ করবে বোধ হয় না; এমন বীরত্বের অভিনয়টা সে কখনওই একেবারে মাটি করে ফেলবে না। একেবারে সকলকে সঙ্গে নিয়ে, আমার শয়ন-গৃহে গিয়া বিছানার চারিদিক থেকে তেরোখানা ছুরি একসঙ্গে অমার বুকে বসিয়ে যাতে এ-বীরত্বের অভিনয়টা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, বরং সে সেই চেষ্টা করবে, আমার তো এইরূপ অনুমান; তারপর তার মনে আর কী আছে, সে-ই জানে। তা সে যাহাই মনে করে আসুক, একবার এলে আর ফিরে যেতে হবে না। এই গোয়েন্দাগিরি কাজ বড় শক্ত, দেবেন্দ্রবাবু; যেখানে একটু সন্দেহের ছায়া আছে, সেই সন্দেহকে সত্যের আসনে বসিয়ে, সেখানে আমাদের এক প্রকাণ্ড আয়োজন ঠিক করে রাখতে হয়। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখছি, কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে তুমি একজন বড় ডিটেকটিভ হতে পারবে। তোমার কিছু-কিছু ডাক্তারি জানা আছে, এ-কাজে ডাক্তারি শিক্ষাটাও সময়ে-সময়ে উপকারে আসে।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কিন্তু ডাক্তারির মতো এ-কাজটা তেমন মান্য নহে। বিশেষত ডাক্তারিগিরি অনেক লোকের অনেক উপকারে আসে—এমনকী, কত লোককে আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করাও হয়।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তোমার এ-কথার উত্তরে আমাকে অনেক কথা বলতে হয়; গোয়েন্দাগিরিতে ডাক্তারি অপেক্ষা সহস্রগুণে লোকের উপকার করা হয়। এই গোয়েন্দাগিরি কত ধন-প্রাণে মরণাপন্ন ব্যক্তির ধন ও প্রাণ ফিরিয়ে এনে তার অবসন্ন দেহে নূতন জীবনসঞ্চার করে। গোয়েন্দাগিরি অপহৃত স্নেহের নিধি সন্তানে শোকাতুর পিতামাতার শূন্যক্রোড় পরিপূর্ণ করে। এই গোয়েন্দাগিরি দস্যুর হাত

BanglaBook.org

থেকে, খুনির হাত থেকে কত নিরবলম্বন শিশুর পিতা, কত অভাগিনী স্ত্রীর স্বামীকে উদ্ধার করে থাকে; তাতে কি পরোপকারের কিছুই নাই? কেবল পণ্ডশ্রম? বোধকরি, কোনও ডাক্তারকে পরোপকারের জন্য গোয়েন্দাদিগের মতো শ্রমস্বীকার করতে হলে, ডাক্তারি বিদ্যাটি মস্তিষ্ক হতে শীঘ্র বহিষ্কৃত করে ফেলবার জন্য স্মৃতিনাশক কোনও আশুফলপ্রদ নূতন ঔষধের আবিষ্কার করতে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। কতক বা কৌতূহল, কতক বা দয়া, কতক বা রোষপরবশ হয়ে ডিটেকটিভেরা শরণাপন্নের যে-সকল ভয়ানক-ভয়ানক বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে নিজের অসহায় প্রাণটাকে খুনিদের ছুরির নিচে স্বচ্ছন্দে যেমন ছেড়ে দেয়, আর কেহ তেমন পারে, বলো দেখি? তথাপি এ-দেশের লোকেরা ডিটেকটিভদের সম্মান করে না। তা তাদের দোষ নয়, আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ; নতুবা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার ডিটেকটিভেরা যেরূপ সম্মানিত হয়ে থাকে এবং আবালবৃদ্ধবনিতার এমন একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যে, সেখানকার বিচারপতিদিগের অদৃষ্টেও তেমনটি ঘটে না। যদিও আমার মুখে এ-সকল কথাগুলা ভালো শোনায় না—সম্পূর্ণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন অবসরে এক-একবার নিজেদের কথাগুলি ভাবি, তখন মনে যেমন দুঃখ হয়, তেমনি নিজেদের জীবনের প্রতি একটা ঘৃণাও জন্মে। আমরা অপরের জন্য দেহপাত ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত; কিন্তু অপরে সেটা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত এবং একটু সম্মান দেখাতে একেবারে অপ্রস্তুত। আমরা যদি তাহাদের দুই চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিই, আমরা পরের জন্য জন্মিয়াছি এবং পরের জন্য বাঁচিয়া আছি; এবং যখন মরিতে হইবে, পরের জন্যই মরিব; তথাপি তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না! বোধকরি, বাংলাদেশের ডিটেকটিভশ্রেণীর উপরে বিধাতার একটা অমোঘ অভিসম্পাত আছে। যাক, সে-সকল কথা এখন থাক, তুমি নিচে যাও। ফুলসাহেবের আসবার সময় হয়ে এসেছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নূতন প্রক্রিয়া

দেবেন্দ্রবিজয় নিচে নামিয়া গেলেন এবং সোপানের পার্শ্ববর্তী একটি অন্ধকারময় ঘরে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে একটা কী শব্দ হইল। দেবেন্দ্রবিজয় সেই ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরের রাস্তার দিককার একটা জানালা দিয়া এক-একজন বিকটাকার দস্যু প্রবেশ করিতেছে; এবং একজন দুইহস্তে গবাক্ষের লোহার গরাদ দুইটি ফাঁক করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাহারা যে ফুলসাহেবের দলবল, তাহাতে আর দেবেন্দ্রবিজয়ের তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, নিঃশব্দে অনেকগুলি লোক উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। এমনসময়ে তাহাদের ভিতর হইতে একজন লোক একবার একটা দিয়াশলাই জ্বালিয়া সকলে আসিয়াছে কি না, গণনা করিয়া দেখিল। সে গণনাকারী স্বয়ং ফুলসাহেব। সেই অবসরে দেবেন্দ্রবিজয়ও একবার তাহাদিগের গণনা করিয়া লইলেন। মোটের উপরে তাহারা তেরোজন। সকলের হাতে এক-একখানা তীক্ষ্ণধার কিরীচ।

তাহার পর তাহারা অন্ধকারে ধীরে-ধীরে সোপানারোহণ আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে—কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দেবেন্দ্রবিজয় দেখিয়া ভীত হইলেন, যদি ইলেকট্রিক ব্যাটারি এ-সময়ে কোনও কাজ না করে, তাহা হইলে এখনই যে ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। এ-সময়ে তাহারা সকলেই মরিয়া—প্রাণের ভয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সকলেই যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়াছে, তখন দেবেন্দ্রবিজয় সেই ইলেকট্রিক ব্যাটারির দড়ি সজোরে টানিয়া ধরিলেন।

তখনই চক্ষুর নিমেষে কী ভয়ানক!

তখনই দস্যুদলের আর্তনাদে, চিৎকারে, তর্জনে-গর্জনে, গালাগালিতে সমস্ত বাড়িখানা যেন

BanglaBook.org

ভাঙিয়া পড়িবার মতো হইল। তখনকার ব্যাপার বর্ণনায় পাঠকের ঠিক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। পাঠক, পারেন যদি অশ্বশালায় অগ্নিসংযোগের কল্পনা করিতে একবার চেষ্টা করুন, অনেকটা সেই রকমের। অবশ্যই সেই দহ্যমান অশ্বশালায় অনেকগুলি অশ্ব আছে।

এমনসময়ে অরিন্দম একটা লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিলেন। এবং সেই সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। আর নিচে দেবেন্দ্রবিজয় ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া হাসিয়া হতজ্ঞান হইতেছেন।

কী সুন্দর দৃশ্য—সিঁড়ির উপর হইতে নিচে পর্যন্ত তেরোজন সারি-সারি দাঁড়াইয়া। তর্জন-গর্জনের তো কথাই নাই—তাহার পরে তাহাদের কী চমৎকার মুখভঙ্গি! যন্ত্রণায় কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ সেই উদ্যোগে আছে এবং কেহ রেলিং হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য মুখ বিকৃত করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। যাহার যেখানে সেই ইলেকট্রিক ব্যাটারির সংস্পর্শ হইয়াছে, দেহ হইতে সেই অঙ্গটি যেন ছিঁড়িয়া উঠিয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ফুলসাহেব সিঁড়ির উপরের শেষ সীমায় অরিন্দমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া; যদিও তাহার মুখে চিৎকার, গোঙানি কি কোনও যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ছিল না, তথাপি তাহার মুখের ভাব এবং দেহের সুদৃঢ় মাংসপেশিগুলি যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার ভীষণ যন্ত্রণা বেশ অনুভব করা যায়।

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো? অনেকদিনের পর একেবারে সবান্ধবে শুভাগমন করেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্যের কথা; বোধহয়, আপনাদের অভ্যর্থনার আয়োজনটা ঠিকই করা হয়েছে—কোনও ত্রুটি হয় নাই—কী বলেন?'

ফুলসাহেব কোনও উত্তর করিল না; অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, 'আগে আপনার বন্ধুদের মুক্তি দিই, তারপর সকলের শেষে আপনার মুক্তিলাভ হবে।' এই বলিয়া অরিন্দম রাশীকৃত হাতকড়ি লইয়া নিচে নামিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে রবারের দস্তানা ও পায়ে রবারের জুতা থাকায় ব্যাটারিতে তাঁহার কিছুই হইল না।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে কতকগুলি হাতকড়ি দিলেন এবং দুইজনে মিলিয়া দস্যুদের হাতে হাতকড়ি লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বারোজন এইরূপে বন্দি হইল—বাকি ফুলসাহেব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : খুনির আত্মকাহিনী

ফুলসাহেবের যন্ত্রণাটা এই দীর্ঘকালে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তথাপি সে নীরব, এবং তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'ডাক্তারসাহেব, তোমার মুক্তির বিলম্ব আছে। আমি যে কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিব, যদি তুমি সত্য কথা না বলো, তা হলে তোমাকে এইরূপ অবস্থায় সারারাত এখানে কাটাইতে হইবে। সিন্দুকের ভিতরে যে বালিকার লাশ পাঠাইয়াছিলে, সে কে?'

ফুলসাহেব হাসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যন্ত্রণায় তাহা একটা ক্ষণস্থায়ী বিকৃত মুখভঙ্গিতে পরিণত হইল মাত্র।

ফুলসাহেব বলিল, 'তুমি যে রেবতীকে আমার হাত থেকে বাহির করে নিয়েছ, সেই রেবতীর ছোটবোন—রোহিণী।'

'কে তাহাকে খুন করিয়াছে?'

'আমি—স্বহস্তে।'

'কেন খুন করিলে?'

BanglaBook.org

'খুন করা আমার একটা নেশা।'

'নেশাটা এখন ছুটেছে কি?'

'যতক্ষণ না ফাঁসির দড়িতে আমি ঝুলছি ততক্ষণ নয়।'

'রেবতীর কাকা কেমন লোক?'

'আমার চেয়ে ভয়ানক লোক।'

'কেন?'

'যে বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে চায়, সে কি আমার চেয়ে ভয়ানক লোক নয়? আমি তো অপরলোক—আমার তাতে কষ্ট কী?'

'তুমি রেবতীর কাকার নিকটে এই কাজের জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক ঠিক করিয়াছিলে?'

'বিশ হাজার।'

'কত আদায় হইয়াছে।'

'কিছুই না।'

'কেন?'

'রেবতীকে খুন করিতে পারি নাই বলিয়া।'

'পারো নাই কেন?'

'তুমি আমার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছ।'

'এতদিন খুন করো নাই কেন?'

'রেবতীর রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম—আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; মনে করিয়াছিলাম, রেবতীকে হস্তগত ও মনের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে রেবতীর কাকা ফাঁকে পড়িবে—সমস্ত বিষয়টা আমারই ভোগ-দখলে আসিবে।'

'রেবতী ও তাহার কাকার কাছে তুমি কেশববাবু নামেই পরিচিত?'

'হ্যাঁ, আমি একটা লোক, কিন্তু কাজের খাতিরে আমার অনেকগুলি নাম আছে।'

'মোহিনী তোমার কে হয়?'

'তুমি এত খবর কোথায় পাইলে?'

'মোহিনী তোমার স্ত্রী?'

'মোহিনী আমার যম।'

'কেন এ-কথা বলিতেছ?'

'নতুবা আমার এ-দুর্দশা হইবে কেন?'

'মোহিনী কিসে তোমার এ-দুর্দশার কারণ হইল?'

ফুলসাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'অরিন্দম, আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়ো না। তোমার মুখে মোহিনীর নাম শুনিয়া এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, রাক্ষসী মোহিনীই স্বহস্তে আমার এ-মৃত্যুর আয়োজন করিয়াছে; নতুবা এখন ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত—তুমি যেমন আমাকে এই দুরবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে উপরে দাঁড়াইয়া কর্তৃত্ব করিতেছ; তেমনি তোমাকে ভয়ানক মৃত্যুমুখে তুলিয়া ধরিয়া এখন আমিও তোমার উপরে এমনই কর্তৃত্ব করিতে পারিতাম। সর্বনাশী মোহিনী আমার সে-সাধে বাদ সাধিয়াছে। নিশ্চয় সে এখানে আসিয়া আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে; অরিন্দম, আর না—তুমি আমাকে আপাতত এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও—প্রাণ যায়—বড় কষ্ট—'

অরি। আর একটু অপেক্ষা করো। তুমি রেবতীর কাকার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিলে, সকলই সত্য?

ফুল। একবর্ণও মিথ্যা নহে। মরিতে বসিয়া মিথ্যা বলিয়া লাভ কী?

BanglaBook.org

অরি। আর একটি কথা সত্য বলিবে?

ফু। কেন বলিব না?

অ। তুমি সিন্দুকে রেবতীর ভগিনীর লাশ পাঠাইবার সময়ে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলে যে, সর্বসুদ্ধ তুমি তখন আঠারোজনকে খুন করিয়াছ, তাহার একটা তালিকা দাও দেখি।

ফু। ইহা তো আমার গৌরবের কথা। কেন মিথ্যা বলিব? যখন দেখিতেছি, আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন আর এ-গৌরবের কথাটা অপ্রকাশিত না রাখাই ভালো। আঠারোটা খুনের জন্য আমাকে তো আঠারোবার ফাঁসি যাইতে হইবে না। আমার বাড়ি এলাহাবাদ—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। বোধহয়, খুনি বিনোদ চাটুয্যের কথা তুমি শুনিয়াছ। যে বিনোদ চাটুয্যেকে ধরিবার জন্য কত পুলিশ-কর্মচারী, কত সুদক্ষ গোয়েন্দা এ-পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—আমি সেই লোক! যে মোহিনীর কথা তুমি বলিতেছ, ওই মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা, ভাই একরাত্রে আমার হাতে খুন হয়। সে আজ দশ বৎসরের কথা। বিধবা মোহিনীকে অমি কুলের বাহির করিয়া আনি—অবশ্যই অর্থলোভে; কারণ আমার মনের ভিতরে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা এ-সকল বড় একটা স্থায়ী হতে পারে না। মোহিনীদের বাড়ি আমাদের পাড়ার ভিতরেই ছিল। মোহিনীকে বাহির করিয়া আনিলে মোহিনীর বাপ রাগে আমাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয়। আমি সেই প্রতিশোধে মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা আর ভাইকে একরাত্রে খুন করি। সেই রাত্রেই আমি মোহিনীকে নিয়ে সেখান হতে সরে যাই। তাহার পর নয়জন পুলিশের লোককে খুন করি—অবশ্যই যাহারা আমার সন্ধানে দুঃসাহসিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আর এক মুসলমানের মেয়েকে অর্থলোভে বিবাহ করিয়া তাহার বাপকে খুন করি—তাহাকে খুন করি। কুলসমের মাকে, ভাইকে খুন করি; রেবতীর ভগিনীকে খুন করি, এই তো গেল আঠারো জন; এ ছাড়া পরে তমীজউদ্দীনকে খুন করিয়াছি, জেলখানার প্রহরীকে খুন করিয়াছি, আরও যদি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম—আরও অনেক খুন করিতে পারিতাম। বিশেষত তোমাকে আর যোগেন্দ্রনাথকে খুন করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে আমার মরণে সুখ হইবে না। উঃ! বড় যন্ত্রণা! অরিন্দম, প্রাণ যায়—আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে—কী ভয়ানক!

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ফুলসাহেবের হাতে ডবল হাতকড়ি ও পায়ে ডবল বেড়ি লাগাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ ভীষণ প্রতিহিংসা

অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে এ-শুভসংবাদ দিবার জন্য দেবেন্দ্রবিজয়কে থানায় পাঠাইলেন। একঘণ্টার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিয়া-শুনিয়া তিনি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত অরিন্দমের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সকলকে থানায় লইয়া চলিলেন। অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় সঙ্গে চলিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ও যে পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালা যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা ফুলসাহেব ছাড়া অপর দস্যুদিগকে লইয়া আগে চলিয়া গেল। তাহাদিগের পশ্চাতে ফুলসাহেবকে লইয়া অরিন্দম ও যোগেন্দ্রনাথ থানার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূরবর্তী আমগাছের ঘন পল্লবের ভিতর হইতে দুটো-একটা কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাঁশবাড়ের ভিতর দিয়া শেষরাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস সর-সর শব্দে বহিয়া যাইতেছে; এবং অন্ধকারস্তূপবৎ গাছের ভিতরে অসংখ্য খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই। এমন সময়ে কে এই পিশাচী নিকটবর্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া

BanglaBook.org

চক্ষুর নিমেষে একখানা দীর্ঘ ছুরিকা ফুলসাহেবের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি যোগেন্দ্রনাথ যেমন সেই নরহন্ত্রীকে ধরিতে যাইবে, সে তেমনি ক্ষিপ্রহস্তে সেই ছুরিখানা নিজের বুকে বসাইয়া দিল। এবং একটা খিল-খিল-খিল্ কলহাস্যে সুপ্ত নিশীথিনী অন্ধকার-নিস্তব্ধ-বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া যেন তেমনি একখানা শাণিত ক্ষিপ্র ছুরির ন্যায় তীব্রবেগে খেলিয়া গেল। আমগাছে কোকিল থামিয়া গেল; এবং বাতাস যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং আকাশের সমস্ত নক্ষত্র নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে রাক্ষসী নিশার এই একটা ক্ষুদ্র অভিনয়ের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। প্রলয়ঙ্করী নিশার শোণিতাক্ত মূর্তির সমক্ষে, এবং তাহার শব্দহীন গাম্ভীর্যের মধ্যে পড়িয়া এবং তাহার এই দুর্নিরীক্ষ্য বিভীষিকার মধ্যে পড়িয়া শাসনভীত অপরাধী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সমগ্র প্রকৃতি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চারিদিক ছমছম করিতে লাগিল।

ফুলসাহেবের সর্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল—তখনই সেখানে সে লুটাইয়া পড়িল। যাহার ছুরির আঘাতে জীবনের সহিত ফুলসাহেবের বন্দিত্ব মোচন করিয়া দিতেছে, অরিন্দম তাহার ভাবভঙ্গিতে চিনিতে পারিলেন—সে সেই মোহিনী।

মোহিনী নিজের বুকে যে আঘাত করিয়াছিল, বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও তাহা সাংঘাতিক হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার হাত হইতে সেই রক্তাক্ত ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন। ফুলসাহেবের রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না। সে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আবদ্ধ হস্তে তালি দিতে-দিতে, হাসিতে-হাসিতে মোহিনী ফুলসাহেবকে বলিল, 'কেমন, বিনোদ। আমি কি মিথ্যা কথা বলি? দেখো দেখি, কেমন সুখ! এই না হলে মজা!"

মোহিনী খুব হাসিতে লাগিল।

ফুলসাহেব বলিল, 'মোহিনী, তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিলে, অরিন্দমের ফাঁসিকাঠের অপেক্ষা তোমার ছুরি অনেক ভালো।' তাহার পর অরিন্দমকে ডাকিয়া বলিল, 'অরিন্দম, আমি তো এখনই মরিব—তা বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি নিরাপদ হইতে পারিলে। জুমেলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে, সুবিধা পাইলে সে একদিন তোমাকে হত্যা করিবে। সে কোথায় লুকাইয়া আছে, আমি জানি না। জুমেলিয়াকে সাবধান—এখন হইতে তাহার সন্ধান করো—বিশেষত তোমাদের উপরে তার বড় রাগ আছে—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তোমাদের রক্তদর্শন করিয়া ছাড়িবে। আমি তো মরিতে বসিয়াছি—এখন বুঝিতে পারিয়াছি—এত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—অধর্মের জয় কিছুতেই হইবার নয়।'

অজস্র রক্তস্রাবে ফুলসাহেবের সর্বাঙ্গ শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া আসিল। চক্ষুর দীপ্তি ম্লান হইয়া গেল এবং গলায় ঘড়ঘড়ি উঠিল। ফুলসাহেব মৃত্যুর পূর্বে অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সে-দৃষ্টিতে এরূপ বুঝাইল, যেন অরিন্দমকে তাহার আরও কী বলিবার ছিল; বলা হইল না—ফুলসাহেব তখন বাক-শক্তি রহিত এবং কণ্ঠাগত প্রাণ। দুই-একবার কথা কহিবার জন্য মুখ খুলিল—কোনও কথা বাহির হইল না; একটি অব্যক্ত শব্দ হইল মাত্র; তাহার অনতিবিলম্বে দুর্দান্ত ফুলসাহেব এ-সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু তাহার সেই সকল ভীষণ কীর্তি-কাহিনী অনেকেরই মনে চিরজাগরূক থাকিবে।

যথেষ্ট রক্তপাতে মোহিনীর মৃত্যুকালও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হইল না। ফুলসাহেবের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে মোহিনীরও মৃত্যু হইল।

* * * * * * *

তাহার পর অরিন্দম ফুলসাহেবের জামার পকেট হইতে দুইটি বিষ-কাঁটা ও কয়েকখানি পত্র বাহির করিলেন। পত্রগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। অরিন্দম পত্রগুলি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। যোগেন্দ্রনাথও পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন, 'পত্রগুলি প্রয়োজনীয় বটে। এতদিনের পর এ গভীর রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইল।'

ফুলসাহেব ও মোহিনীর মৃতদেহ থানায় চালান দেওয়া হইল।

BanglaBook.org

দশম পরিচ্ছেদ ঃ ******

ফুলসাহেব ধরা পড়িল—মরিল। দস্যুরা ধরা পড়িল এবং তাহাদের সকলেই যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল। যখন সকলই হইল, অথচ রেবতীর সন্ধানের কোনও বন্দোবস্ত হইল না, তখন অরিন্দমের আশ্বাস-বাক্যগুলিকে দেবেন্দ্রবিজয়ের একান্ত নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় একদিন স্পষ্টই অরিন্দমকে বলিলেন, 'সকলই তো হইল, তবে এখন আমি বাড়িতে ফিরিয়া যাই। আর আমাকে আবশ্যক কী?'

রাগের ভাবটা মুখে-চোখে খুব শীঘ্রই ফুটিয়া উঠে। অরিন্দম মুখ দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, 'সে কী! আর দিনকতক তোমাকে থাকিতে হইবে—রেবতীর উদ্ধার এখনও হয় নাই।'

দে। সেজন্য কষ্টস্বীকার করা আপনার অনাবশ্যক।

অ। তুমি রাগ করিয়াছ, দেখিতেছি। রাগের কথা নয়, দেবেনবাবু! কেবল রেবতীর উদ্ধার করিলে হইবে না—যাহাতে তাহাকে তাহার বিষয়ৈশ্বর্যের সহিত উদ্ধার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। রেবতীর কাকা কীরকম প্রকৃতির লোক, ফুলসাহেবের মুখে শুনিলে তো? তিনিও বড় সহজ নহেন—তিনিও একটি ডিক্সএডিসনের ছোটখাটো ফুলসাহেব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'এখন কী করিবেন, স্থির করিয়াছেন?'

অরি। একবার রেবতীর কাকার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে। রেবতীর সন্ধান করিতে তিনি তোমাকে ডিটেকটিভের জন্য বলিয়াছিলেন; তুমি আমাকেই সেই ভালো ডিটেকটিভ বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে, তাহা হইলে যথেষ্ট। তাহার পর অগৌণে আমি নিজের পরিচয় তাঁহাকে ভালো করিয়াই দিব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'ওঃ! রেবতীর কাকা কী ভয়ানক লোক! বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অনায়াসে খুনিদের হাতে তুলে দিলেন! পাছে তাঁর উপরে লোকের সন্দেহ হয়, এজন্য আবার ডিটেকটিভ নিযুক্ত করছেন!'

অ। এ-সংসারে কত রকম লোক আছে, দেবেন্দ্রবিজয়! মানুষ চেনা বড় শক্ত কাজ। যে যতটা পরিমাণে মানুষ চিনিতে পারে, সে ঠিক ততটা পরিমাণে নিরাপদ। তোমার বয়স অল্প, এখনও এ-পৃথিবীর সকল সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছায় নাই।

দে। রেবতীর কাকার কথায়-বার্তায়, ভাবভঙ্গিতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা আসে, বুঝিতে পারি, ফুলসাহেবের মুখে যেমন শুনিলাম, তিনি তেমন ভয়ানক লোক নহেন। তিনি লোকের সহিত যেরূপভাবে কথা কন, যেরূপ ব্যবহার করেন, তাতে পরম শত্রু যে, সে-ও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না।

অ। তাই তো বলছি, তোমার বয়স এখন অনেক কম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার তার কাছে চলো, লোকটাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, খাদ বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যখন ধরব, তখন তুমিও জানতে পারবে, লোকটি কী দরের লোক। তখন আমাকে বেশি বাক্যব্যয় করতে হবে না।

BanglaBook.org

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাধুতার ভান

সেইদিনেই দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম রেবতীর কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেণীমাধবপুর যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের বাড়ি চিনিতেন। উভয়ে তাঁহার বহির্বাটিতে গিয়া বসিলেন

এবং একজন ভৃত্যকে দিয়া গোপালচন্দ্রের নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। গোপালচন্দ্র অন্তঃপুরে ছিলেন; সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন। এবং উভয়কেই মিষ্ট-সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে তাঁহার কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গোপালচন্দ্রের বয়স হইয়াছে—বয়স আটচল্লিশের কম নহে—বর্ণ গৌর—দেহ স্থূল। উদরটি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপেক্ষা দশগুণ স্থূল; যেন সে-সকলের সহিত সেটি ঠিক খাপ খায় না। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, শ্মশ্রুগুম্ফ একেবারে নাই। নাই থাকুক, মাথায় টাক আছে, তাহার পাশেই দীর্ঘ অর্কফলা আছে, গলায় হরিনামের মালা আছে, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আছে এবং তাহার সেই বিপুল দেহের চারিভিতে ছোটবড় অনেকরকমের হরিনামের ছাপ আছে।

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি দেবেন্দ্রবাবুর মুখে আমার দুরদৃষ্টের সকল কথা বোধহয়, শুনিয়াছেন। আহা! রেবতী মা আমার—কাকা বলতে অজ্ঞান হত! আর রোহিণী—সে তো আমার ঘাড়ে-পিঠে মানুষ হয়েছে—একদণ্ড আমার কাছছাড়া হত না। হায়-হায়, মানুষের এমন সর্বনাশ হয়! না জানি, পূর্বজন্মে কী মহাপাতকই করেছিলেম, হরি হে—রাধাগোবিন্দ! রাধাগোবিন্দ!'

অরিন্দম বলিলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের এমন বিপদ হয়! দেখি, মহাশয়ের আশীর্বাদে যদি আমি মহাশয়ের কোনও উপকারে আসিতে পারি। এখন মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ-কাজে নিযুক্ত করেন।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'এ আবার নিযুক্ত কী? আপনাকে সেইজন্য তো আহ্বান করা হয়েছে।'

অরিন্দম বলিলেন 'তাহা হইলে আমি আপনার কার্যোদ্ধার করিলে কিরূপ পারিশ্রমিক পাইব, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া একখানি স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিন।'

গো। ইহার জন্য আবার স্বীকার-পত্র কী; আপনি যাহা চাহিবেন, আমি আনন্দের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা দিব। যাতে আপনি সুখী হন, তা আমি করিব, সে আমার কর্তব্য। যদি সর্বস্ব খোয়াইয়া তাদের দুটিকে পাই, তাতেও আমার বুক দশহাত হইবে।'

অরিন্দম বলিলেন, অবশ্যই মনে-মনে, 'আর তাদের দুটিকে না পেলে উদরটি যে আরও স্ফীত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' প্রকাশ্যে বলিলেন, 'একটা লেখাপড়া না থাকিলে কী করিয়া চলিবে? সেজন্য আপনি এত 'কিন্তু' হইতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।'

গো। না—না, 'কিন্তু' হইব কেন, আমি এখনই লিখিয়া দিতেছি। কী লিখিতে হইবে, আর কত টাকা হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, বলুন?

অরি। একশত হইলে ঠিক হয় না?

গো। একশত! আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা দিব।

অরিন্দম মনে-মনে হাসিলেন। বলিলেন, 'মহাশয়ের হৃদয় যথেষ্ট উদার। যাই হোক, আমি আপনার জন্য আরও উৎসাহের সহিত কাজ করিব।'

গো। কী লিখিতে হইবে?

অরি। বেশি কিছু লিখিতে হইবে না; লিখিয়া দিন, আপনার কার্যোদ্ধার হইলে আমাকে পাঁচশত টাকা দিবেন। আর আপনার নামটি সহি করিয়া দিন।

গোপালচন্দ্র সেই মর্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং সেখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম 'ইহাই যথেষ্ট', বলিয়া সেখানি অবিলম্বে পকেটস্থ করিলেন। বলিলেন, 'তবে এখন হইতেই কাজ আরম্ভ করা যাক। মহাশয়, প্রথমে আপনার বাড়িখানা আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই।'

গোপালচন্দ্র হো-হো-হো করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে বলিলেন, 'তবেই হয়েছে, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা আমার যে-উপকার হবে, তা আমি

BanglaBook.org

দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি! এ-বাড়িতে অনুসন্ধান করে কী হবে? এখানে অনুসন্ধান করে তাদের কোনও সন্ধানই পাবেন না। তারা কি এতদিন বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে বসে আছে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'তাদের সন্ধান না পাই, তাদের যাতে সন্ধান করতে পারি, এমন কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে; সেইজন্য বলিতেছি, তাহাতে আপনার আপত্তি কী?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'আপত্তি কী—আর কিছুই না, তবে বাজে কাজে অনর্থক একটা হাঙ্গাম করা।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হাঙ্গাম কিছুই নয়। আমি আপনার বাড়ির সকল ঘর অনুসন্ধান করিতে চাই না, বাড়ির মেয়েদের না সরালেও চলে। আমি একবার কেবল বাড়ির চারিদিকটা দেখতে চাই। এতে আর হাঙ্গাম কী?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, এতে আর হাঙ্গাম কী, তবে এ দেখায় যে কী ফল হবে, বুঝলেন না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, সেটা এখন আপনার বোঝবার কোনও দরকার নাই।'

'তবে আমি একবার বাড়ির ভিতর হয়ে আসি,' বলিয়া গোপালচন্দ্র নিজ স্থূল দেহভার বহন করিয়া মন্থরগতিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া অরিন্দমকে বলিলেন, 'আসুন, মহাশয়।'

সকলে উঠিয়া ভিতর-বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাধুতার ভান

অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তাহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের গাছ। বাহিরের লোকের দৃষ্টি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এমনভাবে সেই স্থানটা চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই পুষ্করিণীটি অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

গোপালচন্দ্র ও দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম এই ছোট বাগানটি বেশ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অরিন্দম স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে অনেকগুলি মানকচু গাছ সুপ্রশস্ত পত্রে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্মধ্যে দুই-তিনটি গাছ অন্যান্য গাছগুলিকে ছাড়াইয়া অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বলিলেন, 'অন্যান্য গাছগুলির অপেক্ষা এই দুই-তিনটি গাছ অধিক তেজালো দেখিতেছি।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, হ্যাঁ, ওই গাছগুলি আলাদা জাতের। রামসনাতন নামে আমারই একজন প্রজা তার মামারবাড়ি থেকে আমাকে এনে দিয়েছে। চলুন, ওই দিকটা আপনাকে দেখাইয়া আনি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, আমাকে আর কোথায় যাইতে হইবে না। এইখানে আমার কাজ মিটিবে। একটা কথা হইতেছে, মহাশয়, আপনার এই মানকচু গাছগুলি আমাকে বাধ্য হইয়া নষ্ট করিতে হইতেছে; আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?'

গোপালচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, 'বিলক্ষণ, আপনি তো বড় মজার লোক!'

বলিতে-না-বলিতে অরিন্দম দুই-তিনটি গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। তেমন বেশি বলপ্রয়োগও করিতে হইল না। গোপালচন্দ্র 'করেন কী' 'করেন কী' বলিয়া সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন।

অরিন্দম গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং একবার 'চুপ করুন' বলিয়া তাঁহার ধৈর্যবিধান করিলেন। তাহার পর কটিদেশ হইতে একখানি দীর্ঘফলক ছুরিকা বাহির করিয়া সেইখানটি খনন করিতে লাগিলেন।

BanglaBook.org

দেখিয়া শুনিয়া গোপালচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল এবং তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। এক পা-এক পা করিয়া—তিনি পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। সেদিকে অরিন্দমের দৃষ্টি ছিল, তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, পলাইবেন না—স্থির হয়ে দাঁড়ান; নতুবা এই দেখিতেছেন? (পিস্তল প্রদর্শন) এক পা সরিলে, গুলি করিয়া পা ভাঙিয়া দিব।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, পালাব কেন, ভয় এত কিসের? পুলিশের লোক হলেও আপনি আমাদেরই উপকারী বন্ধু।'

অরিন্দম হাসিয়া বলিলেন, 'তা তো বটেই! (দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি) এই পিস্তলটা তুমি ঠিক করিয়া ধরিয়া থাক, সাবধান, উনি এক পা সরিলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবে।'

দেবেন্দ্রবিজয় এ-অদ্ভুত রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া অরিন্দমের নিকট হইতে পিস্তল গ্রহণ করিলেন।

অরিন্দম দ্রুতহস্তে ছুরিকার দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দুই-তিনটি মানকচুর গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে সেই স্থানটা পূর্বেই অনেকটা গভীর হইয়াছিল; এক্ষণে অল্প পরিশ্রমে অরিন্দম স্বকার্য উদ্ধার করিলেন। অনতিবিলম্বে সেখান হইতে তিনি একটি মনুষ্যের বাহুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল বাহির করিলেন। অঙ্গুলি অবধি স্কন্ধদেশের সন্ধিস্থল পর্যন্ত লইয়া সেই কঙ্কাল।

সেই কঙ্কাল দেখিয়া অরিন্দম আনন্দিত হইলেন; দেবেন্দ্রবিজয় শিহরিয়া উঠিলেন এবং গোপালচন্দ্র—তাঁহার চোখে সমুদয় পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া, কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 'এ কী ব্যাপার! এ-হাড় এখানে কে আনিল? রাধামাধব!'

অরিন্দম বলিলেন, 'আর কে আনিবে? আপনি আনিয়াছেন—এ-কাজ আপনারই। মনে পড়ে না, ফুলসাহেব প্রদত্ত রোহিণীর মৃত্যুর প্রমাণ?'

গোপালন্দ্র আকাশ-বিচ্যুতের ন্যায় বলিলেন, 'সে কী কথা! আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন যে খুব মিথ্যাবাদী, তা আপনি যেমন বুঝিতে পারিতেছেন, আমিও তেমনি বুঝিতে পারিতেছি। এখন বাধ্য হইয়া আপনার হাতে আমাকে হাতকড়ি লাগাইতে হইল।'

হাতকড়ির নাম শুনিয়া, গোপালচন্দ্র তাঁহার সুবৃহৎ ভুঁড়ি নাচাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অরিন্দম হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রমাণপত্র

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিলেন, 'আপনি আমারই লোক হইয়া আমারই হাতে হাতকড়ি দিলেন!'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমি আপনার নই—তাহার নই—আমি পুলিশ-কর্মচারী। যিনি দোষী, তাঁহার সহিত বাধ্য হইয়া আমাকে এইরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতে হয়।'

গোপালচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, 'কী প্রমাণে আপনি আমাকে দোষী স্থির করিলেন?'

অরিন্দম 'প্রমাণ আমার নিকটেই আছে' বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিলেন। সেই পত্রখানি গোপালচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, এ-পত্রখানি কার—চিনিতে পারেন কি?'

এই পত্রখানি অরিন্দম ফুলসাহেবের নিকটে পাইয়াছিলেন। সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে পথিক যেরূপ ভীতিব্যঞ্জক ভঙ্গি করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়, পত্রখানি দেখিয়া গোপালচন্দ্রের অবস্থা অনেকটা সেই রকমেরই হইল। গোপালচন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিলেন; এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কখনওই না—

BanglaBook.org

এ-পত্র আমার নয়।'

অরিন্দম বলিলেন, 'চুপ করুন, বেশি গোলমাল করিবেন না। এ-পত্রখানি কি আপনার হাতের লেখা নয়? আর নিচে যে সহিটি রহিয়াছে দেখুন দেখি, এই সহিটি ঠিক আপনার কি না?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, এ-লেখা আমার হাতের নয়—এ-সহিও আমার নয়।'

গোপালচন্দ্র ইতিপূর্বে অরিন্দমকে যে চুক্তিনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তখন সেই চুক্তিনামাখানি বাহির করিয়া বলিলেন, 'এ-লেখা তো আপনার? না, ইহাও আপনার লেখা নয়? দেখুন দেখি, আপনার হাতের লেখার সঙ্গে সহির সঙ্গে বেশ করে সব মিলাইয়া দেখুন দেখি?'

তথাপি গোপালচন্দ্র সেইরূপভাবে বলিলেন, 'জাল—জাল—এ-পত্র জাল—আপনারা বড় ভয়ানক লোক!'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনার অপেক্ষা নয়।' তাহার পর গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'বিষয়ের লোভে পড়িয়া যে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে পারে, সে মনুষ্য-মূর্তিতে দানব।'

* * * * * * *

যে পত্র অবলম্বন করিয়া অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বন্দি করিলেন, সেই পত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রখানি এইরূপ—

'কেশববাবু,

আজ দুইদিন গত হইল, তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। সেজন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, খুব সাবধান! যত শীঘ্র পারো, রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিবে। আমাকে খুনের কোনও নিদর্শন পাঠাইলেই, আমি তখনই তোমার প্রাপ্য মিটাইয়া দিব। ইতি

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

আর দুইখানি—

'কেশববাবু,

গোরাচাঁদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বেশ বুঝা যায় তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ। এখন আমি তোমাকে একটি পয়সা দিতে পারিব না—দিতে পারিব না কেন—দিব না—আগে কাজ শেষ হওয়া চাই। আমাকে তুমি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তোমাকে যে-টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দিতে স্বীকৃত আছি, তাহা তৎক্ষণাৎ দিব; তাছাড়া তোমাকে আরও কিছু পুরস্কার দিব। তুমি শীঘ্রই রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিয়া যত শীঘ্র পার, গোরাচাঁদ মারফৎ প্রমাণ পাঠাইবে। তোমার এই অযথাবিলম্বে আমাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। তুমি একজন পাকা কাজের লোক হয়ে কাজের কিছুই করিতে পারিতেছ না—বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, তুমি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তোমার প্রাপ্য আমার নিকট হইতে আদায় লইবে। ইতি—

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

'কেশববাবু,

তুমি অদ্যাবধি রেবতীর কিছুই করিলে না। পত্রপাঠ মাত্র রেবতীকে খুন করিবে এবং তাহার একটা প্রমাণ শীঘ্র পাঠাইবে। রোহিণীর লাশ থানায় পাঠাইয়া যেমন বাহাদুরি দেখাইতে গিয়াছিলে, রেবতীর লাশ লইয়া যেন সে-রকমের কোনও

BanglaBook.org

একটা বাহাদুরি দেখাইতে যাইয়ো না। তাহাতে কোনও প্রয়োজন নাই, বরং বিপদের সম্ভাবনা। রেবতীর লাশ একেবারে গোপন করিয়া ফেলিবে। তুমি রোহিণীকে খুন করিয়া চুক্তির অর্ধেক টাকা পাঠাইতে বলিয়াছ। রোহিণীকে খুন করায় আমার যদি কাজের অর্ধেক সুবিধা হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার অর্ধেক টাকা পাঠাইতে পারিতাম। রোহিণীকে খুন করিয়া তুমি আমার কিছু সুবিধা করিতে পারো নাই; সুতরাং আমি তোমাকে এখন কিছুই দিব না। রোহিণীর অবর্তমানে রেবতীই সমস্ত বিষয়ের মালিক হইবে, ইহাতে রেবতীরই বরং সুবিধা হইয়াছে। আমার তাহাতে লাভ কী? রোহিণীর মৃত্যু সপ্রমাণ করিতে তুমি যে তাহার একখানা হাত পাঠাইয়াছিলে সেটা আমি আমাদের ভিতর-বাটির বাগানে পুঁতিয়া ফেলিয়াছি। রোহিণীর ন্যায় রেবতীর একখানা হাত পাঠাইলে চলিবে না। রোহিণীর হাতে এক স্থানে একটা দগ্ধচিহ্ন ছিল বলিয়া সহজে চিনিতে পারিয়াছিলাম, রেবতীর ছিন্ন মস্তক পাঠাইবে। ইতি—

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

একান্ত যত্ন, আদর ও আগ্রহের সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্রকে আপাতত স্থানীয় থানায় চালান দেওয়া হইল।

অধর্মের পরিণাম এইরূপই শোচনীয় হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ তুমি কি সেই?

বেণীমাধবপুরের গোলযোগ মিটাইয়া অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া রঘুনাথপুরে আসিলেন। রঘুনাথপুর অরিন্দমের স্বদেশ। বেণীমাধবপুর হইতে হুগলি জেলায় ফিরিতে হইলে রঘুনাথপুরের নিকট দিয়াই আসিতে হয়। রঘুনাথপুরের মধ্যে অরিন্দম সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তিও আছে। তাছাড়া তাঁহার বসত-বাড়িখানিও প্রকাণ্ড। তেমন প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা সে-গ্রামের মধ্যে আর একখানিও নাই। বাটির পশ্চাদ্ভাগে লতাকুঞ্জবিশোভিত সুরম্য উদ্যান। উদ্যানে মৎস্যসঙ্কুল, স্বচ্ছবারিপূর্ণ সুবৃহৎ সরোবর। মোট কথা, এক সমৃদ্ধিসম্পন্নের যাহা কিছু আবশ্যক, অরিন্দমের তাহা সকলই ছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেইখানে দুইদিন কাটাইলেন। খাওয়া-দাওয়ার ধূমটা রীতিমতোই চলিল। চোর-ডাকাত ধরার ন্যায় অরিন্দমের মাছ-ধরার শখ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছিপ লইয়া বসিয়া মৎস্যকুল ধ্বংস করিতেন।

একদিন পূর্বাহ্নে নয়—অপরাহ্নে অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'তুমি যে-কালে দুইদিনেই বাড়ি যাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছ, তখন কাল প্রত্যুষেই রওনা করা যাইবে। তাহা হইলে আজ রাত্রের ভোজনের বন্দোবস্তটা পরিপাটি রকমের হওয়াই আবশ্যক। যেমন করিয়া হোক, আজ খুব কম করিয়া চার-পাঁচটি বড় মাছ ধরা চাই। ছিপ লইয়া তুমি বাগানে যাও, চার ফেলিয়া ঠিকঠাক হইয়া বসো—আমি এখনই যাইতেছি।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আজ আর থাক না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সে কি হয়, কাল যখন প্রাতে একান্তই রওনা হইতে হইবে, তখন আর না ধরিলে চলিবে কেন? তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি।'

দেবেন্দ্রবিজয় মৎস্য ধরিবার উপকরণাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অরিন্দমের একটা উদ্দেশ্য আছে।

BanglaBook.org

উদ্যানের ছায়াস্নিগ্ধ স্বচ্ছ সরোবর পত্রান্তরালচ্যুত সূর্যরশ্মিপাতে তকতক করিতেছে। বায়ুহিল্লোল-বিচলিত বীচিমালা হইতে অনুক্ষণ রবিকিরণ সহস্র-খণ্ডে প্রতিফলিত হইতেছে এবং সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে সমুদয় উদ্যান ভরিয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্রবিজয় ধীরপাদবিক্ষেপে ঘাটের নিকটে গিয়া দেখিলেন, স্বচ্ছ কম্পিত জলে পা দুইখানি ডুবাইয়া নিম্নের মগ্নপ্রায় সোপানের উপরে বসিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী নবীনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, অদূরস্থিত এক আমগাছের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত শাখায় বসিয়া যে একটা সুকণ্ঠ পাপিয়া তাহার বিরহাকুল অশ্রান্ত বেদনা-গীতিতে উদ্যান প্লাবিত করিতেছিল, তাহার নিরলস দৃষ্টি, সেই ঝঙ্কৃত পাপিয়ার প্রতি সংস্থাপিত ছিল, সুতরাং সে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিতে পায় নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, সেই মূর্তিমতী সৌন্দর্যরানীর মেঘের মতো নিবিড়, শৈবালের ন্যায় তরঙ্গায়িত এবং ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, বিমুক্ত কেশদাম গুচ্ছে-গুচ্ছে পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া লুণ্ঠিত এবং জলসিক্ত হইতেছে। সেইরূপভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একান্ত গর্হিত মনে করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় যেমন পশ্চাতে ফিরিবেন, একখণ্ড শুষ্ক পত্রের উপরে তাঁহার পাদক্ষেপ হওয়ায় একটা শব্দ হইল। নবীনা তাড়াতাড়ি সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল—দেখিয়া মুখ দিয়া তাহার কথা সরিল না। তাহার ভাব দেখিয়া এমন বোধ হইল, সে উঠিবে—ডুবিবে—কি পলাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

দেবেন্দ্রবিজয়ও সেই নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল এবং স্তম্ভিত। বিস্ময়াকুল দেবেন্দ্রবিজয় ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, 'তুমি—তুমি এখানে!'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ পরিশিষ্ট

ঠিক সেই সময়ে সেখানে অরিন্দম আসিয়া উপস্থিত। বোধহয়, তিনি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নবীনা দ্রুতপদে সোপানারোহণ করিয়া সলজ্জভাবে চলিয়া গেল এবং দেবেন্দ্রবিজয় একান্ত অপ্রতিভের ন্যায় এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। অরিন্দমের মুখের দিকে চাহিতে আর তাঁহার সাহস হয় না।

অরিন্দম তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'চলো, এখন আর মাছ ধরা হইবে না—এখনই পাড়ার মেয়েরা এ-ঘাটে আসিবে—সন্ধ্যার পর যাহা হয় হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। তিনি অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে এখন চলিয়া গেল, উহাকে আপনি জানেন কি?'

অরিন্দম বলিলেন, 'কেন বলো দেখি?'

দেবেন্দ্রবিজয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'ঘাটে পাড়ার কত মেয়ে আসে, আমি তাহাদের কেমন করিয়া চিনিব? তবে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা কাহাকে-কাহাকেও চিনিতে পারে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমি যাহাকে এখানে দেখিলাম, সে ঠিক রেবতীর মতো দেখিতে—সে রেবতী।'

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'বটে! তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'নাম জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি ঠিক চিনিয়াছি—সে রেবতী। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ভাব, সেই সব—আমার কখনও ভুল হয় নাই।'

BanglaBook.org

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, 'নিজের ভুল নিজে কেহই দেখিতে পায় না। বিশেষত এ-সব বিষয়ে ভুল হওয়া বড়ই দোষের কথা। যাই হোক, তোমাকে কোথায় মাছ ধরিতে এখানে পাঠাইলাম, আর তুমি কিনা একেবারে একটা আস্ত মেয়েমানুষ গাঁথিয়া ফেলিয়াছ—বাহাদুরি আছে বটে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনি সকলই জানেন—আপনি আমার নিকটে গোপন করিতেছেন। আমি এখন যাহাকে দেখিলাম, বলুন, সে রেবতী কি না?'

অরিন্দম বলিলেন, 'রেবতী! আমি তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি, রেবতীর সন্ধান করিয়া দিব; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার পূর্বেই আমি রেবতীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, একজন পুলিশের লোককে রেবতীর মাতামহ সাজাইয়া রেবতীকে অর্থপিশাচ যদুনাথের হাত হইতে বাহির করিয়া আনি। তাহার পর রেবতীকে আমি এখানে পাঠাইয়া দিই। সেই অবধি রেবতী এখানে আমাদের বাড়িতেই আছে। প্রত্যহ রেবতী এইসময়ে বাগানে একা আসিয়া থাকে। তাহার সহিত দেখা হইবে বলিয়াই আমি তোমাকে মাছ ধরিবার ছলে বাগানে পাঠাইয়া দিই। তুমি এখন রেবতীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ—আর তো সন্দেহের কোনও কারণ নাই?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'যেদিন ফুলসাহেব ধরা পড়ে, সেইদিন আপনি রেবতীকে খুন না করিবার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় ফুলসাহেব আপনাকে বলিয়াছিল, "আপনি তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন।" তখনই একবার আমার মনে খুব সন্দেহ হইয়াছিল যে, রেবতীকে আপনি কোনও নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'যাই হোক, রেবতীর নিকটে এখন তাহার ভগিনীর খুনের কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। যতদিন গোপন থাকে, ভালো। রেবতীর মনের অবস্থা এখন ভালো নহে, বড় ভয়ানক এবং দুশ্চিন্তায় শরীরও একান্ত দুর্বল; এ-সময়ে কোনও একটা শোকের আঘাত লাগিলে হয়তো তাহার ফল পরে শোচনীয় হইতে পারে। বিশেষত রেবতী—রোহিণী-অন্ত-প্রাণ। তাহার কাকার সম্বন্ধেও এখন তাহাকে কোনও কথা না বলাই ভালো। আরও একটা কথা হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু! রেবতীর বিবাহে আমিই কন্যাকর্তা হইবার আশা রাখি।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'সেটা আপনার অনুগ্রহ।'

উপসংহার

একটা শুভদিন স্থির করিয়া অরিন্দম কোমর বাঁধিয়া রেবতীর বিবাহে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ভবানীপুর হইতে দেবেন্দ্রবিজয়ের পিতাকে আনাইলেন।

দেবেন্দ্রবিজয়ের মাতুল মহাশয় বেণীমাধবপুরেই ছিলেন। বেণীমাধবপুরেই দেবেন্দ্রবিজয়ের সহিত রেবতীর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

দেবেন্দ্রবিজয়ের বিবাহ এবং নিজে অরিন্দম সে বিবাহে উদ্যোগী। নিমন্ত্রিত সিরাজউদ্দীন দেবেন্দ্রবিজয়কে, কুলসম রেবতীকে এক-একটি মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র এবং ধৃত গোরাচাঁদ ও দস্যুরা আইনানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল।

আপাতত জুমেলিয়ার কোনও সন্ধান হইল না।

BanglaBook.org

হত্যা-বিভীষিকা

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

এক

বৈশাখ মাস, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতি ভাব। আজ দশদিন ধরিয়া প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। কদাচিৎ কোনও সময় একটু-আধটু রৌদ্র ফুটিতেছে—আর জল-বাতাসে একেবারে প্রকৃতিকে অতি শীতল করিয়া তুলিতেছে।

বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এই সময় সুন্দরনগরের এক বিস্তৃত প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া গোবিন্দলাল একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্র পাঠ করিতে-করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

নামে সুন্দরনগর—কিন্তু কাজে সে নগর নহে, সামান্য ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য নানাবিধ জাতির বসতি। গোবিন্দলাল ব্রাহ্মণ—বয়স পঁচিশ বৎসরের উপরে নহে।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া পত্র পাঠ করিতেছিলেন, মেঘ-বিজড়িত দিবসে সমস্ত গ্রামখানি নিস্তব্ধতার কোলে বিশ্রান্ত। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; সমস্ত আকাশ জুড়িয়া মেঘখানা অতি ম্লান-মুখে বসিয়া আছে। গোবিন্দলাল যে-পত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাহা এই ঃ

শনিবার; বেলা ১২টা

পাষাণ হৃদয়!

*আমি ঘুমাইতেছিলাম, * * দিদি আপনার হস্ত-লিখিত পত্রখানি লইয়া আমার ঘরে আসিয়া বলিল, এই যে * * * বাবু পত্র দিয়াছেন; আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সেই বিছানায় শুইয়া-শুইয়াই পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম। বৃহস্পতিবার সেই ঝড়-জলের সময় আলো জ্বালিয়া আপনাকে আপনার প্রথম পত্রের উত্তর লিখি, আপনি পাইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। প্রিয়তম! বাড়িতে বসিয়া-বসিয়াই কি আমায় পত্র লিখিবেন? কলিকাতায় কি আর আসিবেন না? এ-দাসী কি আর আপনাকে দেখিতে পাইবে না? পত্র পড়িয়া কি প্রাণ স্থির থাকে; প্রাণ যে আরও জ্বলিয়া যায়; আরও 'দেখিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না—কী করি! ওগো আমার কী হইল? এ-জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায় পাই? আর যে সহ্য করিতে পারি না। নিষ্ঠুর! এমনই করিয়াই কি কাঁদাইতে হয়? কতদিন যে দেখি নাই, একবার দেখা দিন। মিথ্যাবাদী, মনে নাই আমায় কী কথা বলিয়া বাড়ি গিয়াছেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, "যদি আপনাকে কলিকাতায় আর না আসিতে দেয়?" আপনি বলিয়াছিলেন, "না, আসিতে দিবে না; বাড়িতে আমার কী করিয়া চলিবে!" আমি বলিলাম, "যদি পীড়াপীড়ি করে?" আপনি বলিলেন, "আমি কিছুতেই থাকিব না, শুক্রবারে নিশ্চয় আসিব, যদি কোনও কারণবশত না আসিতে পারি, শনিবারে নিশ্চয়ই আসিব।" আমার গা ছুঁইয়া বলিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার মনে আছে? বোধহয় ওই কথা আমাকে প্রাণের সহিত বলেন নাই—বলিতে হয়, তাই মৌখিক বলিয়াছিলেন, নতুবা পাষাণ হইয়া ভুলিয়া রহিলেন কেমন করিয়া? নির্দয় হইয়া থাকিবেন না, কলিকাতায় আসুন। কলিকাতায় আসিতে আপনার মন নাই, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, নতুবা যে-কোনও প্রকারেই হউক কলিকাতায় নিশ্চয় আসিতেন। অধিক আর কী লিখিব, যদ্যপি কখনও কলিকাতায় আসেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এ-দাসীকে দর্শন দানে চরিতার্থ করিবেন; মনে থাকে যেন। ভুলিবেন না। আপনার সময়মতো এ-দাসীকে একখানা পত্র লিখিবেন। আমি*

BanglaBook.org

*বুঝিতে পারিলাম, এ-পৃথিবীতে প্রেম নাই—আছে কেবল প্রেমের লাঞ্ছনা। আমার শরীর একটু ভালো * * *।*

প্রিয়তম! কলিকাতায় আসিবেন। নিতান্ত পাষাণ হইয়া থাকিবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন। এইবার আসা চাই-ই। শুধু পত্র লিখিলে আমি শুনিব না। না আসিলে আমি যাইব—বুঝিয়া কার্য করিবেন, নিবেদন ইতি—

আপনারই 'নীলিমা'

একই পত্র দশবার করিয়া পড়িয়া-পড়িয়া গোবিন্দলাল তাহার ভাবসাগরে ডুবিতেছিলেন — মজিতেছিলেন। এইসময় বৃষ্টিতে ভিজিতে-ভিজিতে তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর আগমনে গোবিন্দলালের চমক ভাঙিল। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া একখানা চৌকি আনিয়া সন্ন্যাসীকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া মৃদু হাসিতে-হাসিতে কুক্ষিস্থ সাবধানরক্ষিত একখানা কাপড় বাহির করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রাদি মুছিতে লাগিলেন। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কুশল তো?'

সন্ন্যাসী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের আবার কুশালাকুশল কী বাবা? তুমি কেমন আছ?'

গো। আমার হৃদয়ে যে-নরকানল জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নহে।

স। নরকানল কী? প্রেমই জগতের সার।

গো। দরিদ্রের পক্ষে নহে। যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে যদি দিবারাত্রি বক্ষে রাখিতে না পারিলাম, তবে সুখ কোথায় প্রভু?

স। তাহাতে অন্তরায় কী?

গো। অর্থ।

স। সে কি তোমার নিকট কেবল অর্থই চাহে?

গো। না প্রভু। তাহা নহে। তবে যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে যদি সুখী করিতে না পারিলাম, যে যদি অন্য প্রকারে অর্থ উপার্জন করিয়া উদরের উপায় করিতে থাকিল, তবে আমার আশা পূর্ণ হয় কই?

স। সাধনায় সকলই সিদ্ধি হয়। সাধনা করো, অর্থও পাইবে।

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কী ভাবিলেন। শেষে অতি গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'পরকালের পথ কণ্টকিত হইবে।'

স। কিন্তু ইহকালে পরম সুখে থাকিবে, ধন-ঐশ্বর্য প্রচুর হইবে। যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা সাধনফলে সিদ্ধ করিতে পারিবে।

গো। কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য।

স। সাধনার পথ কুসুমাবৃত নহে। আর শাস্ত্র বলিতেছেন, ক্রমে ইহকালের কাজ করিতে-করিতে ওই সাধনবলে পরকালের পথও পরিষ্কৃত হইবে।

গো। ওইরূপ কার্যে যে-অধর্ম হইবে, সে-পাপ কীরূপে স্খালন হইবে?

স। দেবীর কৃপায়।

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমার হৃদয়ে যে-নরকানল জ্বলিতেছে, তাহা হইতে পরকালের নরক অধিক কি না জানি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে, হইবে। নীলিমাকে চাই—নিরবচ্ছিন্ন নীলিমাকে বক্ষে রাখিতে যদি আমাকে রৌরব নরকে ডুবিতে হয়, প্রস্তুত আছি। অর্থের প্রয়োজন—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।'

সন্ন্যাসীর মুখে মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সন্ন্যাসী কাপালিক—বামাচারী। যথার্থ শাস্ত্রার্থ

BanglaBook.org

অজ্ঞাত, কন্দর্পার্থ পরিজ্ঞানে সাধনায় প্রবৃত্ত। গোবিন্দলালকে দিয়া কতকগুলি কার্য করাইয়া লইতে ইচ্ছুক—তাই তাঁহার এ-প্ররোচনা। গোবিন্দলাল কলিকাতার এক বেশ্যা-প্রণয়ে মুগ্ধ। বেশ্যার তুষ্ট্যর্থে অর্থের প্রয়োজন। সেই বেশ্যার লিখিত পত্রই গোবিন্দলাল পাঠ করিতেছিলেন। অর্থের জন্য গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কামার্ত ব্যক্তি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া অতি ধীরে-ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলি কথা বলিয়া সেদিনকার মতো বিদায় হইলেন। বৃষ্টিটাও তখন একটু থামিয়াছিল।

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া চিন্তা করিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অশ্রুত-স্বরে বলিলেন, 'নীলিমা, প্রাণাধিকে! তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। তোমারই সুখের জন্য সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তোমারই সুখের জন্য ভীষণ বহ্নি হস্তে করিলাম। কেবল প্রচুর অর্থাভাব-জন্যই আমি তোমার নিকট সর্বদা থাকিতে পারি না—দেখিব অর্থ হয় কি না। সন্ন্যাসী কখনওই মিথ্যা বলিবেন না। আর সেদিন যাহা আমাকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে সন্ন্যাসীকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না—সন্ন্যাসী সব করিতে পারেন।'

দুই

গোবিন্দলালের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। এ-পর্যন্ত আর তিনি বিবাহ করেন নাই। বিবাহের জন্য অনেক ঘটক আসিয়াছিল, অনেক কন্যার বাপ, তাঁহার পিতার নিকট কন্যাভারের সহিত অনেক তৈল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল বেশ্যা নীলিমার প্রণয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়ায়, আর সে-বিবাহে স্বীকৃত হয়েন নাই। অবশ্য দেশের কেহই এ-সংবাদ জানিতেন না, তাঁহারা ভাবিতেন, মৃতা পত্নীর প্রণয়ই তাঁহাকে বিবাহে বিমুখ করিয়াছে। গোবিন্দলাল শিক্ষিত এবং কলিকাতায় মাসিক প্রায় শত মুদ্রা বেতনে চাকুরি করিতেন। সেই অর্থেই তাঁহার খরচপত্রের সঙ্কুলান হইত। কিন্তু যখন বারবিলাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, অফিসে সময়মতো উপস্থিত ও কর্তব্যকর্মে অবহেলা-জনিত অফিসের কার্যে অত্যন্ত গোলযোগ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। আর চলে না—অগত্যা তিনি বাড়ি আসিলেন।

এতদিন পরে সহসা গোবিন্দলালের মত পরিবর্তন হইল। গোবিন্দলাল বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইতেছি।'

কথা সত্বরেই তাঁহার পিতা-মাতার কর্ণে উঠিল। তাঁহাদের আর আনন্দ ধরে না। পুত্রের বিবাহ দিবেন, বিবাহ করিতে পুত্রের মত হইয়াছে, তাঁহারা এ-ঘোষণা সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। মধুময়ী কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে বরং ভ্রমরাপালের আনাগোনা হইতে বিলম্ব হয়, বরং ক্ষতস্থানে পুঁজ হইলে মাছির পাল একটু পরে আসে—কিন্তু মাসিক শত রৌপ্যমুদ্রা উপার্জন করিতে পারে, এমন মনুষ্য বিবাহ করিবে, এ-সংবাদ প্রচারিত হইলে, কন্যাভারগ্রস্ত মানবনিচয় অতি সত্বর আনাগোনা আরম্ভ করিয়া দেয়। গোবিন্দলালদের বাড়িতেও তাহাই হইল—দিন নাই, রাত্রি নাই—কেবলই কন্যাভারগ্রস্ত ম্লানমুখ মানবের যাতায়াত হইতে লাগিল। শেষে নিকটবর্তী গ্রামের শশীভূষণ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

শশীভূষণ চক্রবর্তীর সংসারের আর্থিক অবস্থা ভালো নহে। কিন্তু কন্যাভারক্লিষ্ট মানবের অবস্থা দেখিলে চলে না—কন্যার বিবাহে যাহার বাস্তুভিটা বিক্রয় না হইল, তাহার মানবজন্মই বৃথা। শশীভূষণের একমাত্র কন্যা উমা, তাহার কি আর টাকার ভয়ে একটা মূর্খ ও কুরূপ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে! বিশেষত আর তো কচিকাচা নাই—স্ত্রী-পুরুষের দুটা পেট; ভগবান যাহা করেন,

BanglaBook.org

তাহাই হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ ফর্দমতো টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোবিন্দলালের পিতাকে কন্যা দেখিতে আমন্ত্রণ করিলেন।

গোবিন্দলালের পিতা ওরফে রামহরি ঘোষাল আজ কন্যা দেখিতে শশীভূষণের বাড়িতে গমন করিবেন। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ লোক। পছন্দ-অপছন্দ অত বুঝেন না। ফর্দের টাকা মিলিলেই হইল। সে-অঙ্গীকারও পাইয়াছেন।

শশীভূষণের আশা-উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন বুকের ভিতর দুরদুর করিতেছিল। ভাবী বেহাইকে ভালোরূপ আদর অভ্যর্থনার যাহাতে ত্রুটি না হয়, এই ভয়েই বেচারা সারা হইয়া যাইতেছিলেন। নিজে বাজারে গিয়া মৎস্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও সন্দেশ প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিয়াছেন, নিজে বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া আনিয়াছেন, নিজে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া বাহিরের ঘরের বিছানা করিয়া রাখিয়াছেন —বুঝি অপরে এ-সমস্ত কাজ করিলে বেহাই-এর পছন্দমতো হইবে না, আজ বুঝি তাঁহার মনোরঞ্জনই শশীভূষণের একমাত্র ভরসার স্থল।

গৃহিণীও শশীভূষণাপেক্ষা কম ব্যস্ত নহেন। তিনিও মধ্যাহ্নের আহারাদি তাড়াতাড়ি সম্পাদন করাইয়া সকাল-সকাল রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। রন্ধন-শাস্ত্রে তাঁহার এতদিনের অভিজ্ঞতার যেন আজ একটা মহা পরীক্ষা হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর যেন একটা মস্ত লাভ-লোকসান নির্ভর করিতেছে। নতুবা এত যত্ন, এত পরিশ্রম সব মিথ্যা। গৃহিণীর সঙ্গে পাড়ার পাঁচ মেয়ে আসিয়া যোগ দিয়াছেন—কুটনা কুটা, বাটনা বাটা প্রভৃতির ভার তাঁহারা নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন।

বেলা পাঁচটা বাজিতে গোবিন্দলালের পিতা রামহরি ঘোষাল মহাশয় পুরোহিত সঙ্গে করিয়া শশীভূষণের বাড়িতে আসিয়া দর্শন দান করিলেন। কীরূপে অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলতা, নম্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ পাইবে, শশীভূষণ প্রায় দু'তিনঘণ্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছিলেন। অনেকগুলা ভালো-ভালো কথাও জিহ্বাগ্রে জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ঘোষাল মহাশয় তাঁহার ভুঁড়ি, রেলির থান, গরদের চায়না-কোট আর মোটা ঘড়ির চেইন লইয়া হাজির হইলেন এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার যাতনা-ক্লিষ্ট শশীভূষণকে দেখিয়া কাঁচাপাকা গোঁফের পাশ হইতে খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'নমস্কার মহাশয়', তখন শশীভূষণ একটা বড় রকমের ঢোক গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অত যত্নে সংগৃহীত ভালো কথাগুলা সহসা ধাক্কা পাইয়া মসৃণ জিহ্বার উপর গড়াইতে-গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। শশীভূষণ যখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা নাগালের অনেক বাহিরে। শশীভূষণের ইচ্ছা ছিল, সৌজন্যের একটা রীতিমত অভিনয় করিয়া ভাবী বৈবাহিককে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু শেষে? —'আজ্ঞা হাঁ', 'পরম সৌভাগ্য', 'মহাশয়ের পদধূলি' ইত্যাদি ভগ্নপদ, ন্যুব্জদেহ দু-একজন মাত্র অনেক সাধনার পর জিহ্বামঞ্চে দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল। অভিনয়ের যেটুকু অঙ্গহানি হইয়াছিল, অতিরিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া শশীভূষণ সেটুকু সারিয়া লইলেন।

ঘোষাল মহাশয় বরের বাপ, কাজেই শশীভূষণের স্বহস্ত-পাতিত বিছানার উপর বড় তাকিয়ায় কনুইয়ের ভর দিয়া আড় হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গড়গড়ার নলে মুখ লাগাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। শশীভূষণ তৎপার্শ্বে উপবেশন করত অনুগ্রহ-পয়োধিমন্থিত ঘোষাল মহাশয়ের মুখভাণ্ড-ক্ষরিত এককিন্দু সুধার লালসায় তৃষিত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। গড়গড়ার নলে একটা লম্বা টান দিয়া, একটা ছোট হাসির কিরণে শশীভূষণের সন্দেহ-কণ্টকিত অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া নলটা তাঁহার হাতে দিলেন।

অনেকটা ভাবনা-চিন্তার পর সুখসেব্য তাম্রকূট পাইয়া শশীভূষণ ভাবিলেন, ঘোষাল মহাশয়ের মুখ না হউক, অন্তত এই গড়গড়ার নলটা সুধাভাণ্ড।

তাম্রকূট! তুমি সন্তাপীর তাপহারক, তোমাকে নমস্কার। তুমি না থাকিলে আমি হয়তো এতদিন চির-বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতাম। তুমি আমার দৈহিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—ত্রিতাপ নষ্ট করিয়া থাকো, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমি উত্তমর্ণের তাড়না, অধমর্ণের অসাধুতা ভুলিয়া

BanglaBook.org

যাই, তোমার প্রসাদে রাগ দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনা বিস্মৃত হই। তোমারই প্রসাদে বসন্তকাল, কোকিলের পঞ্চম, পাপিয়ার সপ্তম, ফুলের পরিমল, চাঁদের সুধা, চাঁদবদনীর আড়নয়ন—এ-সকলে আমার কিছুই করিতে পারে না। অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমারই প্রসাদে কাহারও শ্লেষ, কাহারও বিদ্রূপ আমার কর্ণে পৌঁছায় না—তোমাকে নমস্কার। হে তাম্রকূট! আমি তোমার উপাসক ও একান্ত ভক্ত—কিন্তু তুমি তেমন ভক্তবৎসল নহ। কেন আমার তাম্রকূটাধার মধ্যে-মধ্যে শূন্য হয়, কেন তুমি অক্ষয় হও না। তোমার জন্য আমি সকলই সহিতে পারি, সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, শয্যা'পরি প্রণয়িনী আসীনা, আমি ধীরে-ধীরে—হে তাম্রকূট! তবানুসন্ধানে নিরত। ভৃত্য কি এ-রাত্রে থাকে! বড় বিপদ। তাম্রকূট না সেবন করিলে যে প্রাণ যায়। প্রণয়িনী রাগিতেছেন—সকোপ-দৃষ্টিতে মিটিমিটি চাহিয়া দীপক রাগের কোমলসুরে বলিলেন, 'ও গো! সারাদিন খাটুনি, রাত্রেই বা কোন সোয়াস্তি যে একটু আলো নিভাইয়া ঘুমাই!' কিন্তু আমি কি, হে তাম্রকূট! তোমার সেই প্রকার ভক্ত যে, এই সামান্য বাধায় তোমার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি? আমি কি জানি না যে, 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।' সৎকার্যের বহু বিঘ্ন। প্রণয়িনী শেষে সুর বদলাইয়া পার্শ্বপতিত পুস্তকখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'ও গো, আমায় এইটুকু বুঝাইয়া দাও।' ততক্ষণ আমি, হে তাম্রকূট! তোমার বক্ষে ভাঙা টিকা কুড়াইয়া আরোপিত করিয়া ফুৎকার পাড়িতেছি—পাছে নিভিয়া যায়। প্রণয়িনী বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, 'গুলিখোর, গুলিখোর'—শুনিয়াও শুনিলাম না। প্রেম করিতে হইলেই লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। হে তাম্রকূট। তোমার উপর আমার অহেতুকী প্রেম, দেখো, যেন ভুলো না।

শশীভূষণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাকু-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মেয়ে-দেখা কি এখন হইবে?'

ঘোষাল মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হানি কী? তবে আগে দেনাপাওনার ফর্দটা সহি হইয়া গেলেই ভালো হয় না?'

শ। তবে তাহাই হউক।

দেনাপাওনার ফর্দে সহি হইয়া গেল। তৎপরে কন্যা দেখা হইল। মেয়ে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয়ের বড় পছন্দ হইল। শশীভূষণের কন্যা উমা যখন তাহার সেই ঝুমরো-ঝুমরো চুল-ঘেরা পুরন্ত, নিটোল পানপানা মুখখানা তুলিয়া সলজ্জ ছলছল চোখ মেলিয়া একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি—কিন্তু এমন শ্যামা, সুকেশী, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে তো দেখি নাই। এই মেয়েটিকেই বৌ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। এতটা মনে হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শশীভূষণকে বলিতে পারিলেন না যে, আমার ছেলে তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটিকে আমাকে দাও। অন্য দেনাপাওনায় আর কাজ নাই। তাহা হইবার নহে—কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে ভিটাচ্যুত করাই যে ভদ্রতা!

যাহা হউক, কন্যা পছন্দ হইল। সন্ধ্যার পর আশীর্বাদ হইবে। শশীভূষণ স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। সংবাদটা শ্রীঘ্রই বাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—গৃহিণীর আর আনন্দ ধরে না, শশীভূষণ বাজার হইতে দধি, সন্দেশ, পান, সুপারি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যসমুদয় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, গৃহিণী প্রতিবাসিনী কুটুম্বিনীদের নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে আনিলেন। সন্ধ্যার পরেই বাড়িটি আমোদময় হইয়া উঠিল—চারিদিকে কলরব। চারিদিকে বাক্যস্রোত। ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে। মুখুয্যেদের মেজমেয়ে নারায়ণী আসিতেই শঙ্খটা হাতে লইয়াছে—শঙ্খটা তাহার একচেটিয়া হইয়াছে। সন্ধ্যা না লাগিতেই গরীব শঙ্খের উপর সে এত জুলুম করিতেছে যে, সে-বেচারা ভাবিতেছে, হায়! কেন সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িয়া দুখানি কচি, পাতলা ঠোঁটের লোভে বাংলা দেশে আসিয়াছি! বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে—নহিলে ফিরিতাম।

সন্ধ্যার পর যথাসময়ে আশীর্বাদ আদি হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মিষ্টান্নাদি লইয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তিন

আশীর্বাদের কয়েক দিন পরেই গোবিন্দলালের সহিত উমার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় গোবিন্দলাল দেখিলেন, দুইটি কামকটাক্ষশূন্য পটল-চেরা চোখ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বুকটা যেন একবার কেমন করিয়া উঠিল। যাহা হউক, বৈবাহিক কার্য সমাপ্ত হইলে, গোবিন্দলাল সস্ত্রীক গৃহে গমন করিলেন।

আজ ফুলশয্যা। শশীভূষণ বাস্তুভিটা বিক্রয়ার্থ দিয়া ভারে-ভারে ফুলশয্যার জন্য দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। বিকাল হইতে গ্রাম্য যোষিৎগণ আসিয়া গোবিন্দলালদিগের বাড়িতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ, ফুলশয্যার ফলারে তাঁহাদিগের পরিতুষ্টি সম্পাদন হইবে; আর তাঁহাদিগের রচিত কুসুম-শয়নে গোবিন্দলালদিগের দাম্পত্য-প্রেমের পরিবর্ধন হইবে।

যথাসময়ে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ফুলশয্যার ফুলভূষণে ভূষিত হইয়া গোবিন্দলাল ও তদীয় নবোঢ়া পত্নী কিশোরী উমা একত্রে একগৃহে অবস্থান করিলেন। কৌমুদী-বিভূষিতা রজনী—মধুর মলয়ানিলে দিগন্তানুপ্রাণিত, কুসুম-সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নবদম্পতি শয়ন করিলেন, ক্রমে যামিনী দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিল, বালিকাও নিদ্রিতা হইয়া পড়িল—গোবিন্দলালের নিদ্রা নাই। গৃহের দীপ নির্বাপণ করিয়া দিয়া তিনি কী ভাবিলেন। ভাবনা যেন অত্যন্ত গভীর। সুগভীর চিন্তায় তাঁহার কপালপ্রদেশে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে—মুখভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

সহসা তাঁহার গৃহের দরজায় খটখট শব্দ হইল। গোবিন্দলালের চিন্তাভঙ্গ হইল; তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ-প্রবিষ্ট কৌমুদী-মাখা নববধূর মুখখানির প্রতি একবার চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, অতঃপর স্পন্দিত-হৃদয়ে দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালকে কহিলেন, 'আইস, বাহিরে যাই।' নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে-ধীরে উভয়ে বাড়ির বাহির হইলেন। বাড়ির পার্শ্বে পুকুরের ধারে একটা আম্র-বাগান—উভয়ে সেই আম্র-বাগানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আজই দিন, কেমন পারিবে তো?'

গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আহা, নিতান্ত বালিকা—নিতান্ত সরলা।'

স। মায়া হইতেছে? একদিনে এত ভালোবাসিয়াছ, একদিনে পূর্ব প্রণয়িনীকে একেবারে ভুলিয়াছ! মহাজনেরা যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুবকগণের ভালোবাসা অন্তরের নহে, চোখের। ভালোবাসিতে বা ভুলিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

গো। না ঠাকুর, আমি নীলিমাকে ভুলি নাই; এ-জীবনে কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিবও না।

স। তবে তাহাকে যাহাতে সর্বদা বুকে রাখিতে পারো, যাহাতে তাহাকে সুখী করিতে পারো—মোটকথা, ইহকালে মনের যে-কোনও সুখ উপভোগ করিয়া অন্তে পরমা গতি লাভ করিতে পারো, এমন কাজে তোমার অপ্রবৃত্তি হইতেছে কেন?

গো। অপ্রবৃত্তি বা অনিচ্ছা নহে ঠাকুর। নীলিমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি, তাহাকে পাইবার জন্য আমি সমস্ত বিষয়ে প্রস্তুত আছি। তবে ওই বালিকাটির লাজভরা সুন্দর মুখখানি, আর বলি-বলি বলিতে পারি না ভাবে অর্ধস্ফুট দুই-একটি কথাতে উহার উপরে আমার কেমন একটা মোহ জন্মিয়াছে।

স। সাধনা-ভজনা মায়ামোহের কর্ম নহে। শ্রেয় লাভ করিতে হইলে কঠোর ব্রতাবলম্বন অবশ্য-কর্তব্য।

BanglaBook.org

গো। প্রস্তুত হইলাম—অস্ত্র দিন।

সন্ন্যাসী একখানি ক্ষুদ্র খড়্গ গোবিন্দলালের হস্তে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল তাহা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি মুণ্ডটি এইস্থানে আনিয়া আপনার নিকট দিব, কি অন্যত্র যাইতে হইবে?'

স। হাঁ, এইখানেই আনিবে।

গো। এই একটি মুণ্ডতেই কার্যোদ্ধার হইবে তো?

স। না; আরও চারিটি চাই, মহা শ্মশানে পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতে হইবে।

গো। আর মুণ্ড কোথায় পাইব?

স। সে আমি ঠিক করিয়া দিব।

গোবিন্দলাল অতি বিষণ্ণ বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালিকার ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি চাহিয়া গোবিন্দলাল অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'তোমাকে বলি দিয়া আমি তাহাকে লাভ করিব। হায়! তুমি জানিতে পারিলে না যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি প্রেমের জন্য নহে, বলির জন্য। করালবদনী কালিকে! আমার সহায় হও—আমার মনাভীষ্ট সিদ্ধ করো।'

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী-প্রদত্ত খড়্গোত্তোলন করিলেন। পার্শ্বের বাঁশবাগান হইতে একটা পেচক অতি কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—একদল শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে ডাকিয়া অশিব ঘোষণা করিয়া দিল। আর বিলম্ব হইল না, গোবিন্দলালের খড়্গ বালিকার কণ্ঠদেশে আপতিত হইল। নববিবাহিতা বালিকার কণ্ঠদেশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেহটা ছটফট করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, তিনি একখানা বস্ত্রের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া লইয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, যাইবার সময় খড়্গখানি লইয়া যাইতে ভুলেন নাই।

যেখানে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কার্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া, অতি হৃষ্ট মনে মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শিক্ষা-মতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার চিৎকারে বাড়ির সকলে জাগ্রত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহারা দেখিল, নববধূর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন ও অপহৃত হইয়াছে—রক্তে গৃহখানি ভাসিয়া গিয়াছে। সকলে এই হত্যাকাণ্ডে শোকাকুল ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল। অচিরেই থানায় সংবাদ গেল।

প্রভাত হইতেই থানা হইতে দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন কনেস্টবল ও আট-দশজন চৌকিদারের শুভাগমন হইল।

দারোগাবাবু বয়সে প্রবীণ। গায়ে যথেষ্ট বল, পেটে ভুঁড়ি, মুখে শজারুকণ্টকবিনিন্দিত একরাশ গোঁফ, দাড়ি কামানো, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিধান খাকি ড্রিলের কোট-পেন্টুলান। দারোগাবাবু আসিয়াই মৃতদেহ দর্শন করিলেন। দেহ আছে, মুণ্ড নাই। দারোগাবাবুর বুদ্ধিতে ইহার কারণ এই নির্ণয় হইল যে, এই স্ত্রীলোকটিকে অন্য একজন ভালোবাসিত, সে বিবাহ করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছে— এবং সেই আক্রোশে হত্যা করিয়া মুণ্ডটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি গোবিন্দলাল ও বাড়ির অন্যান্য লোকের এজেহার ও জবানবন্দী লইয়া সিদ্ধান্তে পাকারূপেই উপনীত হইলেন।

গোবিন্দলাল দারোগাবাবুর সাক্ষাতে এইরূপ বলিলেন, 'আমি ও আমার পত্নী উভয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়াছিলাম। প্রথমে সে কিছুতেই মুখ তুলিবে না, কিন্তু আমি ছাড়িলাম না—ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাত কাড়াকাড়ি করিয়া, ছলেবলে কথা কহাইলাম। তাহার পর ধীরে-ধীরে, সাবধানে, সভয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিয়াছিল। ক্রমে অনেক রাত্রি হইল, আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইল; সেও ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে একবার দরজা ঝনাৎ করিয়া উঠিল—আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে-ও?" আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া বলিল, "আমি বাহিরে যাইব।" আমি আর কোনও কথা কহিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী ঘরে না-আসিতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং যে হত্যা করিয়াছে, সে তাহা দেখিয়াছিল—সে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া আমার এই সর্বনাশ সংসাধন করিয়া গিয়াছে।'

দারোগাবাবু সেইরূপ লিখিয়া পড়িয়া লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

চার

পুলিশ-হাঙ্গামা অতি সহজেই মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু গোবিন্দলালের বুকের হাঙ্গামা সহজে মিটিল না। সেই সংসারানভিজ্ঞা বালিকার ঘুমন্ত মুখখানি, নিরপরাধে তাহাকে পিশাচের ন্যায় হত্যা করা, তাহার মৃতদেহের ছটফটানি—এই সমুদয় মনে পড়িয়া গোবিন্দলালকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মনে-মনে ভাবেন, হায়! সন্ন্যাসীর পরামর্শে কী সর্বনাশই করিয়াছি! কেন তাঁহার পরামর্শে বিবাহ করিলাম, কেন তাঁহার পরামর্শে একটি বালিকাকে নিরপরাধে নিহত করিলাম—কেন নারীহত্যা মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম; হায়! আমার গতি কী হইবে?

গোবিন্দলাল বাহিরের ঘরে বসিয়া-বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি খামে-আঁটা, লাল-কালিতে লিখিত, এবং পার্শ্বে একটি সবুজ ও লোহিত রঙে ছাপানো সুন্দর ফুল, তৎপার্শ্বে ক্ষুদ্রাক্ষরে ইংরেজিতে দুইটি ক্ষুদ্র কথা লেখা—তাহার বঙ্গানুবাদ এই যে, 'শান্তি ও সুখে থাকো।'

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন। খুলিয়া পাঠ করিতে বুঝি তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি অর্থশূন্য চাহনিতে দূর পানে চাহিয়া-চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, আমি কী করিয়াছি, কীসের জন্য এই মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম, কীসের জন্য পিশাচেও যাহা পারে না, তাহাই করিয়া বসিলাম! বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাহার পাণিগ্রহণ করিলাম, যাহাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিব বলিয়া অগ্নি-সমক্ষে প্রকাশ করিলাম—হায়! ছার বেশ্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিলাম! আমার কী হইবে?

গোবিন্দলাল! একা তুমি নহ; তোমার মতো শত-শত যুবক ওই পাপ-কুহকে মজিয়া পরিণীতা পত্নী হত্যা করিতেছে। তুমি না-হয় একেবারে এককোপে কাটিয়াছ, আর অন্যান্য ধুরন্ধরেরা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতেছে।

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর না, আর সন্ন্যাসীর সহিত মিশিব না, সন্ন্যাসীর পরামর্শ শুনিব না। বেশ্যার সহিত আর দেখা করিব না—আর তাহার জন্য কাঁদিব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব—সন্ন্যাসী হইয়া পথে-পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া হস্তস্থিত পত্রখানির প্রতি চাহিলেন। দুই-তিনবার চাহিয়া-চাহিয়া শেষে খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে-ধীরে অল্পে-অল্পে তাহার সমস্তটুকু পাঠ করিলেন। সে পত্র কলিকাতা হইতে তাঁহার পাপপন্থা-প্রবর্তিকা বা প্রণয়িনী নীলিমা লিখিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ

৫ই জ্যৈষ্ঠ; বেলা ৩।।০ টা

পাষাণ-হৃদয়!

আপনি আমায় বলিয়াছিলেন, বাড়ি পৌঁছিয়াই চিঠি লিখিব। অদ্য নয় দিবস হইল একখানিও চিঠি লিখিলেন না। কলিকাতায় আসিলেই

BanglaBook.org

ভালোবাসা উথলিয়া উঠে, আর বাড়ি গেলেই সব ভুলিয়া যান। প্রেমিকবর, আমার না অসুখ দেখিয়া গিয়াছেন। আমার সহিত আপনি আলাপাদি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাকে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি কেমন আছি, একখানি পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে নাই? এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আত্মসংযম করিয়া আছেন। তবে দুইদিনের জন্য কেন মিছামিছি লাফালাফি করিলেন? পূর্বেই সাবধান হইতে পারিতেন তো। এখন আমায় বিশেষরূপে মজাইয়া আমার হৃদয়ের মরমে-মরমে আগুন জ্বালিয়া দিয়া আত্মসংযমে বসিলেন? ধন্য আপনি! আমার সাধ্য কী যে আপনাকে চিনিতে পারি। হায় হায়! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেন আপনার ছলনায় মজিলাম! এখন যে প্রাণ যায়! হায় প্রিয়তম, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমায় ছাড়িব না এবং ছাড়িতেও পারিব না।" পাষাণ! প্রাণের পাষাণ! এখন কেন ভুলিলেন? আপনার প্রাণ কি এতই কঠিন! মনচোর! সত্যই কি এ দাসীকে পদদলিত করিবেন? আর কি এ-দাসীর প্রতি করুণা-কটাক্ষে চাহিবেন না? আপনাকে দেখিয়া আমি যে সকল যাতনা ভুলিয়াছিলাম। হৃদয়নিধি! নিষ্ঠুর হইবেন না, আমার কাতর অনুরোধ ভুলিবেন না। আমি তো আপনার কোনও অনিষ্ট করিতেছি না। তবে কেন এ-দাসীর প্রতি বিরূপ হইতেছেন? বিমুখ হইবেন না, মনে রাখিবেন। আমার মাথা খান, মরা মুখ দেখেন, পত্রপাঠ উত্তর লিখিবেন, প্রণাম নিবেদন ইতি।

আপনার পদদলিতা—
'নীলিমা'।

গোবিন্দলাল পত্রখানি দুই-তিনবার পাঠ করিলেন, শেষে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'হায়! মানুষকে এমনই করিয়াই কি মজাইতে হয়? মানুষকে এমনই করিয়াই কি অধঃপাতে দিতে হয়? যাহা হউক, আমি আর তাহার নিকট যাইব না। আর এ-পত্রের উত্তর দিব না। কিন্তু প্রাণ বুঝে না—ওঃ! আমার সে যে বড় সুন্দর। আমি যে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। তাহার কথা মনে হইলে, আমি যে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যাই—তবে তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিব! কিন্তু সে যদি এখন মরিয়া যায়, তবে তাহাকে কোথায় পাইব, কেমন করিয়া তাহাকে দেখিব! তাই ভাবি না কেন, সে আমার নাই।

গোবিন্দলাল মাথামুণ্ড ছাইভস্ম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোবিন্দলাল অন্যান্য দিন যেমন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থানাদি করিয়া থাকেন, আজি আর তাহা করিলেন না। সম্মুখে একখানা চৌকি ছিল, তাহাতে বসিতে বলিলেন। চতুর সন্ন্যাসী ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, গোবিন্দলালের চিত্ত এই হত্যাজন্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছে। মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'গোবিন্দলাল, কেমন আছ বাবা?'

গো। ভালো নাই, প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি।

স। কীসে আঘাত পাইয়াছ?

গো। পাপে।

স। সে পাপ নহে।

গোবিন্দলাল গলার স্বর অতি মৃদু করিয়া বলিলেন, 'নরহত্যা যদি পাপ না হয়, বালিকাকে আজন্ম রক্ষা করিব, ভরণ-পোষণ করিব, লজ্জা-শরম-মান-সম্ভ্রম সমস্তই রক্ষা করিব বলিয়া ধর্মত

BanglaBook.org

প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়া আসিয়া স্বহস্তে বলি দিলে যদি পাপ না হয়, তবে জগতে আর পাপ কীসে আছে?'

সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'জগজ্জননী জগদম্বার তুষ্ট্যর্থ যাহা করা যায়, তাহা পাপ নহে।'

গো। পাপ-পুণ্য বুঝি না। কীসে কী হয় জানি না—তবে আমি বুঝিতেছি, আমি মহা পাপে লিপ্ত হইয়াছি।

স। তোমার হাতে ও কীসের কাগজ?

গো। একখানা চিঠি।

স। কোথা হইতে আসিয়াছে? বলিতে বাধা আছে কি?

গো। হাঁ। সেদিন বিবাহের বাজার করিতে গিয়া তাহার ওখানে গিয়াছিলাম, বাড়ি আসিয়া চিঠি লিখিব কথা ছিল, লিখি নাই—তাই লিখিয়াছে।

স। পত্রখানি আমি শুনিতে পাই না?

গোবিন্দলাল পত্র পাঠ করিলেন। সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'আহা! বেশ্যার হৃদয়ে এমন প্রেম, এমন ঐকান্তিকতা আমি কখনও শুনি নাই। যথার্থ ভালোবাসা জন্মিলে বারবনিতাও নিষ্কৃতি পায় না। পত্রে যাহা লিখিয়াছে, তুমি তাহাকে যথার্থই তাহা বলিয়া আসিয়াছিলে?'

গো। কী বলিয়া আসিয়াছিলাম?

স। আমি তোমাকে ভুলিব—আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব?

গো। হাঁ, বলিয়াছিলাম। আপনার পরামর্শে এই বিবাহ করা স্থির করিয়া অবধি আমার প্রাণে কেমন একটা অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়াছে, যেন তখন হইতেই আমার মনে হইতেছে, হায়! আমি বুঝি মরণের পথে—নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি। ভাবিলাম, এ-সকলের মূল কারণই বেশ্যার প্রণয়—তাই তাহাকে ওই কথাই বলিয়াছিলাম।

স। বলিতে তোমার কষ্ট হয় নাই? যে তোমাকে এত ভালোবাসে, তাহার মুখের উপর এতবড় কথাটা বলা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম নহে কি?

গো। আমি নিষ্ঠুর নহি? হাঁ ঠাকুর। আমি পিশাচ, আমি ঘোর নারকী।

স। কিন্তু ভালোবাসার নিকট বড় কঠিনও কোমল হয়, তাই তোমার প্রাণের কথা বলিতেছি। কী করিয়া বলিলে যে, আর তোমাকে ভালোবাসিব না?

গো। আমি বলিলাম, "দেখো, খেঁদু—"

স। খেঁদু কি? তুমি যাহাকে ভালোবাস, সে কি খাঁদা?

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'না ঠাকুর, সে খাঁদা নহে, বাঁশির মতো তাহার সুন্দর নাক, একদিন তাহাদের বাড়ির দুইটি স্ত্রীলোকে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, একজন আমাকে সুন্দর বলিতেছিল, আর একজন নীলিমাকে সুন্দর বলিতেছিল—শেষে আমাদের দুইজনকে ডাকিয়া ইহারা মীমাংসা করিতে লাগিল। আমরা ওই কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া দুইজনে হাসিয়া মরিতে লাগিলাম। একটা ব্যঙ্গভাবের গান গাহিয়া-গাহিয়া আরও হাসিতে লাগিলাম, গানটা এই—

"ইডি-ন বন-বিলাসিনী খেঁদি আমাদের,
খেঁদি আমাদের, আমরা খেঁদির, খেঁদি সকলের।
শুক বলে, আমার খাঁদা কল্কি অবতার,
শারী বলে, আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার,
নইলে মানাবে কেন?
শুক বলে, আমার খাঁদা কেমন সাবান মাখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে,

BanglaBook.org

কোথায় সাবান লাগে?
শুক বলে, আমার খাঁদা খবরের কাগজ লেখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে,
ইহার কোনটা ভালো?"

সেই অবধি আমি তাহাকে খেঁদি বলিয়া ডাকি, কখনও-কখনও পত্রেও খেঁদু বলিয়া লিখি—সেও আমাকে উহা বলে বা লেখে।

স। যাক; তারপরে?

গো। তারপরে আমি বলিলাম, "খেঁদু। তোকে ভালোবাসিয়া আমি সব ভুলিলাম—আমার বুঝি ইহকাল-পরকাল সকলই নষ্ট হইল, আমার উপায় কী খেঁদু?" সেও বলিল, "আমার উপায় কী খেঁদু; আমি তো এমন ছিলাম না।"

স। আহা! তাহাকে কী করিয়া বলিলে, তোমায় ভালোবাসিব না?

গো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খেঁদু! তুই আমাকে ভালোবাসিস?" বেশ্যার হৃদয় বুঝা ভার। সে ছলছল নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খেঁদু! আমি তোমায় ভালোবাসিয়া মরিয়াছি—প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি। যতদিন এ-দেহ পতন না হইবে, ততদিন বুঝি তোমায় ভুলিতে পারিব না।"

স। তারপর তুমি কী বলিলে?

গো। আমি বলিলাম, "খেঁদু! যাহাকে ভালোবাসিতে হয়, তাহার যাহাতে ভালো হয়, তাহা করা কি কর্তব্য নহে?" উত্তরে সে বলিল, "প্রাণপণে কর্তব্য।" আমি বলিলাম, "আমার মান, সম্ভ্রম, কাজকর্ম সমস্তই যায়, অতএব আর আমাকে চিঠিপত্র লিখিও না, আর আসিতে অনুরোধ করিও না, আমি আর তোমার এখানে আসিব না।"

স। শুনিয়া সে কী বলিল?

গো। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধ থাকিল—মূর্তি বড় স্থির, বড় গম্ভীর। শেষে ছলছল নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি না আসিতে বলিলে তুমি আর আসিবে না? আমি পত্র না লিখিলে তুমি আর লিখিবে না? কেবল আমি আসিতে বলি বলিয়াই তুমি আইস? কেবল আমি পত্র লিখি বলিয়াই তুমি লেখ? হা ভগবান!"

স। তারপর?

গো। তারপর আমি বলিলাম, "না, খেঁদু। আমার প্রাণের আকুল বাসনাতেই আসি—কিন্তু চিত্ত-সংযম করিব।" সে আমার এই কথা শুনিয়া আবার কী ভাবিতে বসিল, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমায় বলিল, "তুমি আমায় ভালোবাস?" আমি বলিলাম, "বড় ভালোবাসি বলিয়াই তো চিত্ত-সংযমের কথা বলিতেছি, যদি এত ভালো না বাসিতাম—তবে আসিতে আপত্তি কী ছিল?" সে বলিল, "তুমিই না বলিলে, যাহাকে ভালোবাসা যায়—তাহার উপকার করিতে হয়?"

স। ইহার অর্থ কী?

গো। শুনিয়া যান। আমি বলিলাম, "ভালোবাসিলে তাহার উপকার করিতে হয় বইকী।" সে বলিল, "আমার একটা উপকার করো—আমি তোমা ভিন্ন অন্যকে চাহি না, আমাকে দুইটা পেটের ভাত দিবে? আমি তোমাকে লইয়া থাকিব। যদি তুমি না আইস, আমি হতভাগিনী, পতিতা রমণী—যদি আমার সংসর্গে আসা একান্ত মহা পাতক বলিয়া আর না আইস—তবু আমাকে দুইটা পেটের ভাত দিবে, আমি তোমারই রূপধ্যানে জীবনাতিবাহিত করিব।" আমি কোনও কথা কহিলাম না।

সন্ন্যাসী—চতুর সন্ন্যাসী বলিলেন, 'গোবিন্দলাল! সে তোমাকে বড় ভালোবাসে, তাহার প্রাণে ব্যথা দিও না। আমার পরামর্শমতো কার্য করো। দেবীর দয়া হইলে টাকার অভাব তোমার

BanglaBook.org

হইবে না। তাহাকে রানির মতো রাখিতে পারিবে। টাকা, স্বাস্থ্য, মান, সম্ভ্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি হইবে।'

গোবিন্দলালের চিত্তভাব পরিবর্তন হইল। কাহার না হয়! একদিকে বিবেকের মৃদু আঘাত, অপরদিকে বেশ্যার প্রণয়-কুহক, ধনের বিপুল প্রলোভন। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আপনার পরামর্শ মত কার্য করিতে আমি অপ্রস্তুত নহি, তবে কার্য বড় নৃশংসের।'

সন্ন্যাসীর কক্ষদেশে একটা সুরাপূর্ণ বোতল ছিল, তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, 'ইহাতে মায়ের প্রসাদ কারণবারি আছে, পান করো।'

গোবিন্দলাল গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন। সুরাবিষ মস্তকে উঠিল। তখন সন্ন্যাসীর দুই পায়ে ধরিয়া সজল নেত্রে গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ঠাকুর! প্রতারণা করিবেন না। ডুবিয়াছি তো পাতাল কত দূরে দেখিব—আমার খেঁদুকে সুখে রাখিবার জন্য আমি সব করিব, কিন্তু যেন প্রতারিত না হই।'

সন্ন্যাসী পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'তুমি দেখো, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।'

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি রাজা হইতে চাহি না। আমার খেঁদুকে রানি করিব।'

অতঃপর সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কানের কাছে মুখ লইয়া কতকগুলি কথা বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

পাঁচ

স্বরূপনগরের নিম্ন দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত। ভরা ভাদ্রের খরস্রোত বুকে করিয়া ইছামতী কাহার উদ্দেশে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইছামতীর কলকল, শনশন গতি-শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—কচিৎ দূরে মৎস্যজীবীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমনসময় সেই তীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল কী ভাবিতেছিলেন, ঊর্ধ্বে—আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়া তাহার তরল রজত-কিরণে সমস্ত বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল, আর-একটা নাছোড়বান্দা পাখি তাহার প্রাণের অত্যন্ত করুণ কাহিনী ডাকিয়া-ডাকিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া দিতেছিল।

গোবিন্দলাল একা দাঁড়াইয়া কী ভাবিতেছিলেন, এমনসময় তথায় আর-একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, সে স্ত্রীলোক। বয়স চল্লিশেরও উপরে হইবে। বর্ণ কালো, মোটাসোটা, হাসি-চাহনিতে ভরা-ভরা। তাহার কাখে কলসী—হাতে একটা চুপড়ি।

গোবিন্দলাল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি। তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আমার কাজ কি সহজ?'

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'এত কঠিনই বা কিসে?'

স্ত্রী। সে কি সহজ মেয়ে!

গো। কী বলিল?

স্ত্রী। স্বীকার করে না।

গো। একদম না?

স্ত্রী। একদম না।

গো। বুঝিলাম, এ-জগতে প্রেম নাই—প্রাণ দিয়াও প্রাণ মিলে না।

স্ত্রী। অন্য চেষ্টা দেখিব?

BanglaBook.org

গো। না।

স্ত্রী। কেন?

গো। ইহা কি মাছ শাক? একটা না হইল, আর-একটার খোঁজ করা গেল।

স্ত্রী। ইহা হইবার কোনও উপায় দেখি না।

গো। আমার অদৃষ্ট। তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দিতাম।

'আচ্ছা, আর-একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। অন্য একদিন আমার সহিত দেখা করিও।' এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল, গোবিন্দলালও চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল পথে যাইতে-যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কোথায় চলিলাম, ক্রমে যে নরকের অতি নিম্নদেশে নামিয়া পড়িলাম, আমার গতি কী হইবে?

গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে বসিয়া পড়িলেন। খরস্রোতা নদী-পানে উদাস নেত্রে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি কী করিতেছি? কেন সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি এ কু-কাণ্ডে মাতিতেছি? কেন আমি ডাকিয়া ডাকিয়া নিরয়বহ্নি বুকে লইতেছি? কীসের জন্য আমার এ-সকল করা? আমার খেঁদু—খেঁদুকে না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না। ভালো আমি তো চাকুরি করিলে মাসে কিছু না হইলেও একশত টাকা উপার্জন করিতে পারি। খেঁদু আমার নিকট জোর করিয়া কিছুই চাহে না, তবে আমি চাহি খেঁদুকে আমার একার করিয়া রাখিতে। ভালো, আমার উপার্জিত অর্থে কি তাহার চলিতে পারিবে না। আমি চাহি, তাহাকে রানির মতো রাখিতে। সন্ন্যাসীর কথা কি সত্য হইবে? এই পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর আসন স্থাপন করিয়া শ্মশানে তাঁহার সাধনা করিলে, যথার্থই কি আমি মনোমতো বরলাভ করিতে পারিব? যথার্থই কি অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইব?

খেঁদু! প্রাণাধিকে! তোমার জন্য আমি আমার মান-সম্ভ্রম, জাতি-কুল-জ্ঞান-ধর্ম সমস্তই বিসর্জন দিতেছি, স্বহস্তে পরিণীতা পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি—আবার এই মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি। তুই আমায় ভুলিস না। তোকে সুখে রাখিবার জন্যই আমার এই সমস্ত মহাপাতকে পরিলিপ্ত হওয়া।

প্রেম বোধহয় চিত্তের মধুরতম বৃত্তি। তাই মাধুর্যের স্রষ্টা কবির প্রেম অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন। অনাদিকাল হইতে প্রেম কাব্যের উপাদান। কিন্তু বুঝিতে পারি না, পাপেও কেন প্রেমের বীজ উপ্ত হয়! কেন এত কঠোর, এত নৃশংস হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে! কেন এমন মরুভূমে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়! ইহাকে প্রেম না বলিয়া যদি রূপজ মোহ বলা যায়, তাহাতে একটা ঘোর সন্দেহ আসিয়া পড়ে। রূপজ মোহ কয়দিন থাকে, রূপ-সম্ভোগের সহিত সে-পিপাসা কেন মিটে না—ইহা বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না বলিয়াই—এই খেলা।

গোবিন্দলাল সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী-সৈকতে বসিয়া ভাবিতে-ভাবিতে সকল ভাবনা ভুলিলেন—তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই কুহকিনীর মুখখানি ফুটিয়া উঠিল। গোবিন্দলালের কণ্ঠে মিষ্ট স্বর ছিল, তিনি সেখানে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। গানে বুঝি প্রাণের ভাব বাহির হয়। গানে বুঝি প্রাণের আগুন একটু কমে। গোবিন্দলাল গাহিতে লাগিলেন,

"হরষ আকুল পিককুল গাহিছে,
দশদিক পুলকিত, তরুলতা হরষিত,
হরষে আকাশে শশী হাসিছে।
তটিনী হৃদয়-পরে, জোছনা পুলক-ভরে
হের সুখে খেলিছে।
যুগল মিলন হেরে, আমার পরাণ যে রে,
'সে কোথা', 'সে কোথা' ব'লে কাঁদিছে।"

BanglaBook.org

ছয়

সতীশচন্দ্র মিত্র জাতিতে কায়স্থ। বাড়ি স্বরূপনগর—আসামে চা-বাগানে ডাক্তারি কার্য করেন; বাড়িতে দূরসম্পর্কীয়া বিধবা মাসিমাতা ও স্ত্রী আছেন। স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, একটি মাত্র কন্যা-সন্তান হইয়াছে। কন্যাটির বয়স চারি বৎসর। সতীশের স্ত্রীর নাম মালতী।

মালতীর উপর গোবিন্দলালের পাপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে; ভগবান জানেন, এ-প্রেমের কোন প্রকার বিকাশ। একজনে মন সঁপিয়া আবার অন্যের উপরে কীরূপে আকৃষ্ট হয়! আমরা বুঝি, এ যে-শ্রেণীর প্রেম, তাহার পরিণতিই এইপ্রকার; কিংবা বুঝি উদ্দেশ্যই পৃথকরূপ আছে!

সেদিন ইছামতী নদীতীরে সেই স্ত্রীলোকের সহিত গোবিন্দলালের এই কথাই হইয়াছিল। তৎপরে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি যে বলিয়াছিল, কাজ বড় শক্ত, কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু পাপের প্রলোভন, রূপের আকুলতা সহ্য করা, দমন করা কিঞ্চিৎ কঠিন। মালতী স্ত্রীলোকের পাপ-প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃতা হয় নাই।

মালতীর কন্যার একদিন ভারি জ্বর হইল, গোবিন্দলাল সে-সংবাদ পাইয়া ডাক্তার লইয়া তাহাদের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন, যে-কয়দিন তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইয়াছিল, সে-কয়দিন যাতায়াত করিয়া, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বড় ঘনিষ্ঠতা করিলেন। মালতী এক-একবার তাঁহার দিকে চাহিত, সেই স্ত্রীলোকটির কথা স্মরণ করিত—স্বামীর মুখ মনে পড়িত—আর শিহরিয়া উঠিত; সে বুঝিতে পারিতেছিল, গোবিন্দলাল আটাকাটি দিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কী জানি, বিধাতার মনে কী আছে! সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিত।

একদিন গোবিন্দলাল তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন। একেবারে বাড়ির ভিতর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী তখন আদুড় গায়ে কন্যাকে স্তন দিতেছিল। গোবিন্দলালকে দেখিবামাত্র গায়ে-মাথায় কাপড় দিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিল। গোবিন্দলাল তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই সর্বনাশা হাসি! শিহরিয়া মালতী ছুতা করিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া গেল।

তারপর হইতে গোবিন্দলাল ঘন-ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। মালতী দেখিতে পাইল, ক্রমে গোবিন্দলালের সহিত তাহার মাসশাশুড়ীর বড় ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল, সে-ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মালতীর মনে সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, একদিন তিনি মালতীকে বলিলেন, 'হ্যাঁগা, বউমা! ও তোমার কীরকম আক্কেল? গোবিন্দলাল তোমার দেওরের মতো! তা, দেওরের সঙ্গে কথা কহায় দোষ কী?' মালতী বুঝিতে পারিল, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি, গোবিন্দলালকে ঘন-ঘন দেখিতে-দেখিতে, মালতীর আবার ভালো করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মালতী বুঝি আর সামলাইতে পারে না। সে ঘরে গিয়া ঊর্ধ্বমুখে যুক্তকরে সজল নেত্রে মাঝে-মাঝে ভগবানকে কতই ডাকিত, 'হে দুর্বলের বলদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ-দুর্বলকে বল দাও। এই আশ্রয়হীনের সহায় হও।'

একদিন গ্রীষ্মকালের দিবা দুই প্রহরের সময় বালিকা কন্যাকে কোলে লইয়া মালতী ঘরের মেঝেতে আলুথালু অবস্থায় ঘুমাইতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বে বসিয়া গোবিন্দলাল ধীরে-ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। নির্লজ্জ গোবিন্দলাল, তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল। সেই স্পর্শে মালতী কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সর্বশরীর কেমন করিতে লাগিল। একটিও কথা কহিতে পারিল না। হাতের ভিতর হাতখানি ঘামিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আমাকে যদি নিরাশ করো, তোমার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইবে। তোমাকে ভুলিবার উপায় আমার নাই।'

মালতীর দুর্বল চিত্ত তখন বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন চেতন ছিল, কি অচেতন ছিল, কিছুই মনে করিতে পারিল না। বুঝি চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়াছিল, বুঝি মাথা ঘুরিয়া

পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; সহসা মালতীর পতনোন্মুখ দেহ গোবিন্দলাল দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়া মালতী গোবিন্দলালের বুকের উপর পড়িল।

সে তাহার সর্বস্ব ধন হারাইল।

দশ-বারোদিন পরে, একদিন রাত্রে গোবিন্দলাল মালতীর গৃহে আগমনপূর্বক শয়ন করিলেন। মালতী এবং মালতীর কন্যাও সেই গৃহে শয়ন করিল। ক্রমে রাত্রি মধ্যযামে গত হইলে, মালতী ঘুমাইয়া পড়িল। কন্যাটি অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মালতীকে নিদ্রাগত দেখিয়া গোবিন্দলাল পা টিপিয়া-টিপিয়া উঠিয়া তাহার নাসারন্ধ্র-সমীপে একখানি রুমাল ধারণ করিলেন। সম্ভবত তাহাতে উগ্র ক্লোরোফরমের গন্ধাপ্লুত ছিল, সেই গন্ধে মালতীর চক্ষুতারা প্রসারিত ও নিশ্বাসবায়ু হ্রাস হইয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল সেই রুমালখানি মালতীর চারি বৎসরের নিদ্রিতা কন্যার নাসারন্ধ্রে ধারণ করিলেন, তাহারও অজ্ঞানতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নির্মম—নরপিশাচ গোবিন্দলাল তাহাকে বুকের উপর করিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন—সেখানে বালিকাকে বৃক্ষতলে শায়িত করিলেন। একটা গাছের গোড়ায় একখানা খড়্গ লুকান ছিল, সেখানা বাহির করিয়া বালিকার কণ্ঠদেশে তদ্দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন—এক আঘাতে গলা কাটিল না, দুই-তিন আঘাতে দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন গোবিন্দলাল খড়্গ ও মুণ্ড লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন—নদীতীরে একটা ঝোপের মধ্যে সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তাঁহাকে হাতের মুণ্ড ও খড়্গ প্রদান করিয়া, সেই বাগানে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে একটা গর্ত কাটা ছিল, তন্মধ্যে বালিকার দেহ প্রোথিত করিয়া, গোবিন্দলাল নদীতীরে চলিয়া গেলেন। পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া দেখিলেন, তাঁহার পায়ের জুতায় রক্ত লাগিয়াছে। ধুইয়া ফেলিলেন, ধুইয়াও যখন রক্তের দাগ গেল না, তখন জুতা দুইখানি নদীতীরে পঙ্কবালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া মালতীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—এবং গৃহের দরজা খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই মালতীর চৈতন্য হইল। সে ভাবিল, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, গোবিন্দলাল নিদ্রাভিভূত—বস্তুত গোবিন্দলাল নিদ্রিত নহেন, পরে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শান্তি বা নিদ্রা তাঁহার নাই। তিনি গাঢ় নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। যাহা হউক, মালতী দেখিতে পাইল, গোবিন্দলাল ঘুমাইয়া আছেন। কিন্তু তাহার কন্যা? মালতী গোবিন্দলালের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ও-গো আমার মেয়ে?'

দুরাত্মা গোবিন্দলাল নিদ্রোত্থিতের ভান করিয়া বলিলেন, 'কেন, সে তো তোমারই পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।'

মালতী পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গোবিন্দলাল অনুসন্ধানে যোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু আর তাহা কোথায় মিলিবে? নিশিপ্রভাত হয় দেখিয়া, গোবিন্দলাল মালতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মালতী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'ও-গো! আমার মেয়ে কোথায় গেল?'

গোবিন্দলাল কৃত্রিম করুণস্বরে বলিলেন, 'আমার আর থাকিবার উপায় নাই। যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখিও। আমি আবার কাল সকালে আসিয়া সন্ধান করিব এবং গ্রামের অন্যত্রও সন্ধান করাইব। এ-সম্বন্ধে থানাতেও একটা সংবাদ দিতে হইবে।'

গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। মালতী কাঁদিয়া মাস্পাণ্ডাকে ডাকিয়া সমস্ত বলিল। এদিকে রজনীও প্রভাত হইয়া গেল। মালতীর কন্যা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের মধ্যে একটা হইচই পড়িয়া গেল—কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারোগা আর ইহার তদন্তের জন্য গ্রামে আসিলেন না, ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিলেন মাত্র। ইহাই পুলিশের নিয়ম।

BanglaBook.org

মালতী কন্যাকে না পাইয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। শোকে পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিল—হায়! তাহার হৃদয় হইতে কে তাহার সর্বস্ব ধন কাড়িয়া লইয়াছে! গোপনে এই শোকের সময় মালতী অনেকবার গোবিন্দলালকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছে, কিন্তু আজি দশ-বারো দিনের মধ্যে তিনি আর একদিনও মালতীকে দর্শন দান করেন নাই। বুঝি গোবিন্দলালের যে-জন্য মালতীর সহিত প্রণয় করা, তাহা সংসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মালতী এখন বুঝিল, স্বামীই তাহার সব। যাহা শীতল সলিল বলিয়া পান করিয়াছিল, তাহা গরল। নতুবা এমন দুঃসময়ে কি গোবিন্দলাল তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন? মালতী বুঝিতে পারিল, এ-প্রণয় সুখের সময়ের, অসময়ের নহে। হায়! সে কেন মজিল, কেন নরকে নামিল! তাহার স্বামীর সে পবিত্র প্রণয়—সে স্নেহ-মায়া-মাখানো প্রীতি, সে কেন ভুলিল! বুঝি তাহারই মহাপাতকে তাহার অপাপবিদ্ধ কন্যাকে কোনও দেবতা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মালতী গৃহাঙ্গনের একধারে একটা ভাঙা প্রাচীরের নিকট বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেদিন শুক্লপক্ষের নিশি, কিন্তু আকাশে অল্প-অল্প মেঘ থাকায়, জ্যোৎস্না কিছু ঘোলাটে-ঘোলাটে হইয়াছে।

মালতী কাঁদিতে-কাঁদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই ভগ্ন প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া তাহার মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। মালতী পাগলিনীর মতো ছুটিয়া কন্যাকে কোলে লইতে গেল, কিন্তু কোথায় কন্যা? মালতী ভাবিল, আমার কি ভ্রম হইল! আবার স্পষ্ট—স্পষ্টতর—দূরে ওই মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। এবার মালতী সেই স্থান হইতেই সেই মেঘাবিল জ্যোৎস্নালোকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহারই কন্যা—কিন্তু তাহার কেশপাশ উন্মুক্ত ও আলুলায়িত! উন্মুক্ত কেশগুচ্ছে অবিরামবাহী রুধিরধারা! কণ্ঠদেশে ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ওই সকল ক্ষতমুখ হইতে, যেন ঝলকে-ঝলকে রক্ত উছলিয়া উঠিতেছে। মালতী আর চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; তাহার সে-চিৎকার কেহ শুনিতে পাইল না। বাড়ির নিকট অন্য কোনও লোকের বাড়ি ছিল না, তাহার মাসশাশুড়ী তখন বাড়ি ছিলেন না। সেই ছায়ামূর্তি তখন অতি গভীর ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠে কহিল, 'মা, ও-মা! চিৎকার করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি আর সে-দেহে নাই, তোমাদের ভাষাতে আমি মরিয়াছি। আমি মরিয়াছি, তোমারই পাপে। যেদিন গোবিন্দলাল, তুমি ও আমি একঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল ঔষধের আঘ্রাণে তোমাকে ও আমাকে অজ্ঞান করিয়া, আমাকে লইয়া গিয়া আম্র-বাগানে খড়্গাঘাতে অতি কঠিন রূপে হত্যা করিয়াছিল। হায়! আমি তখন একটু শব্দ করিবারও সময় পাইলাম না। দুঃসহ যাতনায় মুহূর্তমাত্র হাত পা আছাড়িয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য জন্মিল, তখন দেখিলাম আমার সেই ছিন্ন-কণ্ঠ-দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল, মুণ্ড চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। এই যে আমার গলদেশে তিন চারিটা ক্ষত দেখিতে পাইতেছ, এই সমস্তই সেই নিষ্ঠুর অসুরের খড়্গাঘাতের ফল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া আমার সেই মুণ্ডহীন দেহটিকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া নদীতীরে চলিয়া গেল। গোবিন্দলালের জুতায় রক্ত লাগিয়াছিল, সে উহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু রক্তের দাগ কিছুতেই উঠিল না, সুতরাং জুতা সেইস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।'

বালিকা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, 'আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি। মা! তুমি যদি দয়া করিয়া আমার এই কথা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দাও—তাহা হইলে আমার এই জ্বালা জুড়ায়—পাপীর শাস্তি হয়। তুমি না পারো, এই সমস্ত কাহিনী বাবাকে লিখিয়া পাঠাও এবং তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিয়া পাঠাও, যেন এই সমস্ত ঘটনা তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখেন। ইহা করিলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিব—আমি এখন মুক্তাত্মা, ইহা না করিলে তোমাকে অভিসম্পাত করিব।'

ছায়ামূর্তি শেষোক্ত কথা কয়টি একটু কর্কশকণ্ঠে বলিয়া, চক্ষের পলকে বাষ্পে পরিণত হইয়া

BanglaBook.org

শূন্যে মিশিয়া গেল, কোথায় বা সেই রুধিরধারা, কোথায় বা সেই আলুলায়িত কুন্তল, কোথায় বা সেই ভীষণ ক্ষতের ভয়াবহ দৃশ্য—আর কোথায় বা সেই অমানুষ-কণ্ঠের কাতর স্বর। সমস্তই সে-ছায়ার সঙ্গে শূন্যে মিশিয়া গেল। মালতী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আড়ষ্ট ও স্তম্ভিতভাবে আত্মবিস্মৃতের মতো রহিল।

রাখো বাপু তোমার গল্প লেখা। এ কি আরব্য উপন্যাস—না, পেত্নীর কাহিনী। মানুষ মরিয়া ভূত হইল, ভূত হইয়া আবার তাহার সেই সূক্ষ্ম শরীরে ক্ষতের চিহ্ন থাকিল, রুধিরের ধারা বহিল, চুলগুলা এলাইয়া পড়িল, মায়ের সঙ্গে আসিয়া বেশ করিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিল—আর জ্বলন্ত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তাহার খুনের কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিতে অনুরোধ করিল। এ সকল কাহিনী কী? এই সভ্যতালোক-প্রাপ্ত পাঠক-পাঠিকার নিকট এই জ্ঞান-বিজ্ঞানমণ্ডিত নর-নারী সমাজের—এই পাশ্চাত্য সায়েন্সজ্ঞ মানব-মানবীর সম্মুখে এমন কথা কি লিখিতে আছে! বন্ধ করো তোমার কলম। সন্ধ্যার সময় ঈষচ্চঞ্চল মৃদু-মলয়-প্রবাহিত বারান্দায় বসিয়া খোকা-খুকিকে ওই গল্প শুনাইয়া ঘুম পাড়াইও, আমাদের নিকট কেন বাপু!

কথাটা ওই প্রকারেরই বটে। কিন্তু মানুষ কি ভূত হয় না? এ-বিশ্বাস কি আপনাদের নাই? ব্যাস-বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিই, কেন না সে-সকল কথায়, সে-সকল প্রমাণে এখন আর বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপের বর্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞান-গুরু, বিখ্যাতকীর্তি, এলফ্রেডরাসের ওয়ালেসের সাক্ষ্য বোধহয় অগ্রাহ্য হইবে না। ডক্টর ওয়ালেস যুগতত্ত্ব-প্রবর্তক ডারউইনের সহযোগী ও সমান পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজিকালিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও বিজ্ঞানসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস আগে প্রেততত্ত্ব মানিতেন না; যাহারা উহা মানিত, তাহাদিগকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, পরে কিন্তু তাঁহার বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ভূত আছে, পরলোক আছে এবং মনুষ্য পৃথিবীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ও সেখানে সূক্ষ্মদেহী আত্মিকরূপে অবস্থান করিয়া আপনার পার্থিব জীবনের কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আরও তিনি এ বিশ্বাস করেন যে, পরলোকগত আত্মা অবস্থা-বিশেষে ও অধ্যাত্মজগতের বিশেষ-বিশেষ নিয়মানুসারে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনজন্য সময়-সময় মানবদিগকে দর্শন দান করিয়া থাকে এবং কথাবার্তাদি কহিয়া থাকে।

ডক্টর ওয়ালেস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা যে-প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে, এই অপ্রত্যক্ষ অপরিদৃশ্যমান জড় জগতের কার্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সর্বত্র পরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

এখন, কথা হইতে পারে, সূক্ষ্ম শরীরেই না-হয় আত্মা থাকিল, না-হয় কথাই কহিল, কিন্তু পার্থিব দেহের রুধিরধারা, ক্ষতচিহ্ন থাকে কী করিয়া, আর চুলই বা এলাইয়া পড়ে কী করিয়া? এ-বিষয়েও বিজ্ঞেরা বহু অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জড় শরীরের ক্ষতচিহ্ন বা রোগ ও যন্ত্রণার কোনও নিদর্শন সে অধ্যাত্ম শরীরে থাকে না। কিন্তু আত্মিকগণ, অবস্থা-বিশেষে কখনও-কখনও পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন।

BanglaBook.org

সাত

মালতী ভয়ে, বিস্ময়ে ও শোক-মোহে একেবারে মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ তাহার জ্ঞান ছিল না, যখন সুস্পষ্ট জ্ঞান হইল, তখন আর সে-ছায়ামূর্তি দেখা গেল না। মালতী কম্পান্বিত কলেবরে

গৃহে গমন করিল। ঘরের ভিতর বসিয়া দ্রুতস্পন্দিত হৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কী দেখিলাম? এ কী শুনিলাম? ও কি আমার মেয়ে? ও কী বলিল? গোবিন্দলাল তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া খড়্গাঘাতে অসুরের মতো হত্যা করিয়াছে! এ কথা কি সত্য? সত্যই কি আমার পাপে আমার প্রাণের কন্যা নিহত? এ-সমস্ত কি প্রকৃত ঘটনা, এ-সমস্ত কথা কি প্রকৃত? না-আমার চোখের ধাঁধা? যদি ধাঁধা হয়, ধাঁধা শুধু চোখের নহে। চোখের ধাঁধা, কানের ধাঁধা এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি ও মনের ধাঁধা। সমস্ত ধাঁধাই কি একসঙ্গে আসিয়া মিলিল? যদি মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই এরূপে একই সময়ে সুসঙ্গত ধাঁধা লাগিতে পারে, তাহা হইলে নিজের অস্তিত্বকেও ওইরূপ একটা ধাঁধা বলিয়া গণ্য করা যাইবে না কেন? ক্ষুদ্র পল্লীর একটা ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের মনে এই বিশাল তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল।

তাহার মেয়ের মূর্তি সে কীরূপ দুর্ধর্ষ দর্শন করিয়াছে! হায়! মালতী কেন মরিল না। হায়! গোবিন্দলাল, একি তোমারই কর্ম!

তাহার মেয়ের ছায়ামূর্তি এ-কথা বিচারকের কাছে বলিতে অনুরোধ করিয়াছে, না পারিলে মালতীর স্বামীর কাছে বলিতে বলিয়াছে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও তো মালতী তাহা বলিতে পারে না। এ-কথা বলিলে, আসল কথা, তাহার মহাপাতকের কথা প্রকাশ হইতে কি বাকি থাকে! কিন্তু গোবিন্দলাল! তুমি যেমন বিশ্বাসঘাতক, যেমন পিশাচ—তোমার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তোমাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করাই কর্তব্য। হায় নরাধম! আমার বুকের ধন, স্নেহের প্রতিমা কন্যাটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নিধন করিয়াছ? মা! মা! একি সত্য? মা! আয় মা! আমার কোলে আয়। দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিহিংসায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার যে সবদিকে গোলযোগ। মস্তকে ক্ষত হইলে কুক্কুরী যেমন কী করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, মালতী তেমনি কী করিবে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। সে তখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিয়া, গালে মুখে চড়াইয়া, কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

হায়! সত্যই কি তাহারই মহাপাতকে তাহার এই দুর্দশা ঘটিল? সে কেন মরে না? মরণ কি তাহার নাই?

এই ঘটনার পর চার-পাঁচদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, মালতী বড়ই বিষণ্ণ ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে কাল কাটাইতেছে, মেয়ের সে-ভীষণ ছায়ামূর্তি আর তাহার নয়নপথে পতিত না হয়, এজন্য সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু কোনও সতর্কতায় কোনওই কাজ হইল না। ইহার পর আর-একদিন মালতী তাহাদের গৃহাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু তখনও অন্ধকারের গাঢ় ছায়াপাত হয় নাই। মালতী সহসা চমকিয়া উঠিল। আবার সেই ভীষণ ছায়ামূর্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আইজ আর সে-মূর্তির মুখে কাতরতার লেশমাত্রও নাই। সে-মূর্তি মালতীর সেই চারি বৎসরের কন্যার অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। মূর্তি রুক্ষস্বরে বলিল,' মা, রাক্ষসি! তুমি আমার কথা রাখিলে না। আমার কথা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিলে না বা বাবার কাছে বলিলে না, আচ্ছা থাকো।' বলিতে-বলিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল, 'আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখো, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ।' মূর্তি আবার অদৃশ্য হইল। মালতী ভয়ে থরথর কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহে আসিল; সারানিশি ভয়ে, যন্ত্রণায় জাগিয়া কাটাইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া আপনার পাপকথা সম্বলিত এ-কথা কোথাও প্রকাশ করিতে পারিল না।

আর-একদিন মালতী অতি বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ির অঙ্গনে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, নিকটে অন্য কেহ নাই। সহসা অদূরে আবার সেই দৃশ্য। মালতী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে সেই করাল মূর্তি সন্ধ্যার রক্তিমরাগে, অধিকতর ভীষণ ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত। আজি তাহার চক্ষু, চক্ষু নহে যেন দুইটা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড ধকধক করিতেছে। মুখচ্ছবি ক্রোধোদ্দীপ্ত, বিকট ও ভয়ঙ্কর। বালিকার ছায়ামূর্তি মর্মভেদী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, 'পাপিয়সি! নিজ-কৃত অপরাধ প্রকাশ-ভয়ে এ-পাপও গোপন করিবি, আমার কথা প্রকাশ করিবি না! আজি আর তোর কিছুতেই আমার হাতে অব্যাহতি নাই।'

দেখিতে-দেখিতে সে-ছায়ামূর্তি আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মালতী আর তাহার দিকে চাহিতে পারিল না। সে মর্মভেদী স্বরও কানে সহিল না। ভয়ে মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল—ছায়ামূর্তিও দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

মালতী কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহে গমন করিল। মাটিতে পড়িয়া চিত্ত একটু স্থির করিল। ভাবিল, আজি না হয় কাল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমার মেয়ের ওই প্রেত-আত্মাই প্রকাশ করিবে। আমার সতীত্ব-নষ্টের কথা স্বামী জানিতে পারিলে, কখনওই আমায় গ্রহণ করিবেন না। সমাজেও মুখ দেখাইতে পারিব না। স্নেহের বন্ধন কন্যাটিকেও জন্মের মতো হারাইয়াছি, তবে আর কী সুখে কাহার জন্য জীবন রাখিব? গোবিন্দলাল—পাপিষ্ঠ দুরাত্মা গোবিন্দলাল—তাহার নাম করিতেও এখন ঘৃণা হয়, তাহার জন্য মায়া-মমতা কী? কথাটা না প্রকাশ করিলে ওই প্রেতমূর্তি যেরূপে লাগিয়াছে, তাহাতে একটা বিপদও ঘটিতে পারে, তবে এক্ষণে মৃত্যুই মঙ্গল। মালতী তাহাই স্থির করিল, সে মরিবে। যেমন সংকল্প অমনই কার্য। গৃহের একটা আড়ার গায়ে কাপড় বাঁধিয়া, তদগ্রভাগ নিজ গলদেশে বন্ধন করিয়া মালতী ঝুলিয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ হাত-পা আছড়াইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।

একটু রাত্রি অধিক হইলে মালতীর মাসশাশুড়ী মালতীকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখেন—সে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি তখনই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রতিবাসীগণ আসিয়া জুটিয়া পড়িল, সকলে বুঝিল, কন্যার শোক সামলাইতে না পারিয়া মালতী আত্মহত্যা করিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই এ-সংবাদ সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

আট

তৎপরদিবস প্রভাতেই গোবিন্দলাল শুনিতে পাইলেন, মালতী কন্যা-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কথাটা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দলালের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রাণের ভিতর কেমন একটা দুর্বিষহ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, হায়! আমি কী নারকী! আমি কী বিশ্বাসঘাতক! ভালোবাসি ভান করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ সাধন করিলাম, তাহার কন্যাটিকে স্বহস্তে নিধন করিলাম, আর সেই অসত্য-শোকে শেষে সে আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইল। হায়! আমার উপায় কী হইবে?

গোবিন্দলাল মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিব। পথে-পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় তাঁহার উপদেষ্টা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'গোবিন্দলাল! কী ভাবিতেছ?'

অতি কাতর কণ্ঠে, বিষাদ-বিহ্বল করুণ স্বরে গোবিন্দলাল বলিলেন, 'গ্রামের মধ্যে সংবাদ রাখেন?'

স। মালতী মরিয়াছে, সেই কথাই বলিতেছ, না?

গো। হাঁ।

স। আত্মঘাতী হইয়া মরা উহার প্রারব্ধের ফল; তুমি কী করিবে?

গো। হেতু কে?

স। হেতু কর্মফলদাত্রী শক্তি। তুমি-আমি কী করিতে পারি গোবিন্দলাল?

গো। তবে আমাদের সাধনসিদ্ধি-বাসনা কেন? কেন পুরুষকারের চেষ্টা?

স। তুমি শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করো?

BanglaBook.org

গো। শাস্ত্র-বিষয়ে আমার কী জ্ঞান আছে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস করিতে পারি? আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাহা বলেন—বিষয়ী আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি কই?

স। তবে তাহাই করো—আমি তোমাকে যে-পথে লইয়া যাই, তুমি সেই পথে চলো—ইহকালে অনন্ত ধনসঞ্চয় করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করত অন্তে কৈলাসধামে গমন করিতে সক্ষম হইবে।

গো। আর-একদিন বলিয়াছি—আবার আজও বলিতেছি, এইরূপে মহাপাতক করিলে কি দেবীর দয়া হইতে পারে?

স। সেদিনও বুঝাইয়াছি, আবার আজিও বলিতেছি—আত্মজন্য যে হননাদি করা যায়, তাহাই হিংসা-পদবাচ্য—আর দেবোদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহা হিংসা বা হনন নহে।

গো। আমার চিত্ত অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আর নরহত্যা করিতে পারিব না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, শ্মশানে পঞ্চ মুণ্ডের উপর পঞ্চ মকারে দেবীর সাধনা করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং বিগত-পাতক হইয়া ইহলোকে সর্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন ও অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।

গো। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, নরহত্যা করিয়া, মদ-মাংস খাইয়া, দেবীর তুষ্টি-সম্পাদন করিব?

স। তন্ত্রের তাহাই বিধান—কলিতে একমাত্র তন্ত্রোক্ত ধর্মই ধর্ম; আর সমুদয়ই নিষ্ফল।

গো। তন্ত্রে কি এইরূপ বিধানই আছে?

স। নতুবা আমি কি তোমাকে প্রতারণায় মুগ্ধ করিতেছি? তন্ত্রে আছে,—

'মদ্য মাংস তথা মৎস্য মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম না বিদ্যতে।'

অর্থাৎ পঞ্চ মকারে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

গো। যদি উহা পুণ্যই হইবে, তবে আমার হৃদয়ে এত আত্মানুশোচনা উপস্থিত হয় কেন? আমরা সাধারণত জানি, যাহাতে হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ। আর যাহাতে হৃদয়ের বিমলতা সম্পাদিত হয়, তাহাই পুণ্য।

স। এখন কি সাধনা করিয়াছ যে, চিত্তে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত হইবে?

গো। বুঝিলাম না, তবে আমি আর কাহারও নিকট এ-বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া, এ-মহাপাতকে লিপ্ত হইব না। আমাকে একটু সময় প্রদান করুন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'এদিকে যে দুইটি মুণ্ড সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হয়। আর তিনটি শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই সমুদয় কার্য সফল হয়। অন্নাদি রন্ধন করিয়া আহারের সময় কষ্ট ভাবিলে চলিবে কেন?'

গোবিন্দলাল কোনও কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীও নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত এইরূপে কাটিয়া গেল। অতএব সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তুমি কলিকাতার কোনও চিঠিপত্র পাইয়াছ?'

গো। হাঁ, পাইয়াছি—সে চিঠি প্রায়ই পাই।

স। কী লিখিয়াছে?

গো। সে যাহা লিখিয়া থাকে, তাহাই লিখিয়াছে। আমাকে যাইতে লিখিয়াছে।

স। তুমি তাহাকে ভুলিয়াছ?

গো। না ঠাকুর। জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি।

স। তবে যে বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছ?

গো। প্রাণের শান্তিই সুখ—আমি সে-শান্তি হারাইয়াছি। দিবানিশি মরমের পরতে-পরতে নিরয়-বহ্নি ধু ধু জ্বলিতেছে।

BanglaBook.org

স। একটু মনোযোগ করিয়া কার্যগুলি সম্পন্ন করো—এবং দেবীর প্রসাদ লাভপূর্বক ঐশ্বর্যবান হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়া তাহাকে লইয়া সুখী হও।

গো। এখন কিন্তু আমার অন্য ধারণা জন্মিয়াছে, যেমন ছিলাম তেমনই থাকিলে বুঝি সুখী হইতে পারিতাম, যেমন চাকুরি করিতেছিলাম—মধ্যে-মধ্যে তাহাকে দেখিয়া যেমন আনন্দলাভ করিতাম, তেমনই করিলে বোধহয় আমার শান্তি বজায় থাকিত।

স। সুখলাভ করিতে হইলে প্রথমে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় বইকি। আমার সঙ্গে কারণ-বারি আছে, পান করিবে?

গো। তাহাতে একটু চিত্ত ভালো থাকে, কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। দিউন।

সন্ন্যাসী মদ্যের বোতল গোবিন্দলালের হাতে দিলেন, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন।

যখন সুরাবিষ তাঁহার মস্তিষ্কে উঠিয়া ক্রিয়ারম্ভ করিল, তখন তিনি তাঁহার প্রণয়িনী বেশ্যা নীলিমার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সে কী প্রকারে তাঁহাকে ভালোবাসিত, কী প্রকারে তাঁহাকে যত্ন করিত—অর্থাৎ তাহার অভিসারিকা, মিলন, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্গার প্রভৃতি সমস্ত ভাবই একে-একে বর্ণিত হইতে লাগিল। শেষে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, 'গতকল্য তাহার একখানা পত্র পাইয়াছি, পাঠ করিব, শুনিবেন?'

মুচকি হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি ওইরূপ প্রণয় বড়ই সুন্দর দেখি। ওইরূপ প্রেমের কথা শুনিতে বড়ই ভালোবাসি। কারণ ওই ক্ষুদ্র প্রেম হইতেই মহান প্রেমের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শক্তির সহিত প্রেম করিতে-করিতে মহাশক্তির প্রেমের দিকে মানুষ চলিয়া যায়। তুমি পত্র পাঠ করো। আমি শুনিব।'

গোবিন্দলাল একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,

প্রাণের প্রিয়তম!

আপনি কি আর কলিকাতায় আসিবেন না? কলিকাতায় আসিতে আর বিলম্ব করিবেন না। ও গো! আর যে পারি না, আর যে সহে না, শীঘ্র আগমন করুন, নতুবা আমায় হুকুম করিলেই যাইতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, অতি শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিবেন। প্রিয়তম, আপনি আসিবেন না, আমিও লিখিয়া-লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর কী লিখিব, ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছি না, কলমও রাখি-রাখি করিয়া রাখিতে পারিতেছি না—

প্রণাম নিবেদন ইতি।

আপনারই 'নীলিমা'

স। যে এরূপ ভালোবাসে, তাহাকে সুখী করা আবশ্যই কর্তব্য।

গো। আমিও তাহা জানি, সেইজন্যই তো এ-নরকে ঝাঁপ দিয়াছি।

স। এখনও বলিবে নরক?

গোবিন্দলাল বোতলস্থ মদ্য আর একটু পান করিলেন। এবার প্রাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর! পাপ যাহা, তাহা চিরকালই পাপ। বেশ্যা-প্রণয়ে মত্ত হইলে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা, যে-অশান্তি আসিয়া থাকে, তাহা আমার ষোলো আনাই আসিয়াছে। জানি, আমি মরিতেছি—তবু মরণের পথ হইতে দূরে যাইতে পারিতেছি না। জানি, আমি মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি, তবু সরিতে পারি না। সরিবার সাধ্য নাই বলিয়াই সরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমায় যেন প্রতারণা করিবেন না। আমি বড় অকূলে ভাসিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ-হলাহল পান করিয়াছি। নতুবা আমার

BanglaBook.org

সোনার সংসার ছিল, উত্তম চাকুরি ছিল, হৃদয়ে শান্তি ছিল, গৃহে স্নেহ-ভালবাসা-প্রেম ছিল—কিন্তু নিজেই তাহা নষ্ট করিয়াছি, নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়াছি।'

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 'তোমাকে আমি অতুল সুখী করিব। মায়ের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি রাজার মতো ধনসম্পত্তিশালী হইয়া পরম সুখে থাকিবে। তবে আমার অনুরোধ, তৎপর হইয়া কার্য করো—বিলম্বে শ্রেয়-হানি হইবার সম্ভাবনা।'

গো। আমাকে এখন কী করিতে হইবে?

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কানের কাছে মুখ লইয়া কী বলিলেন, গোবিন্দলাল শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'এমন পারিব না।'

স। শীঘ্র কার্যোদ্ধার হইবে।

'ভাবিয়া দেখি।' এই কথা বলিয়া, গোবিন্দলাল টলিতে-টলিতে উঠিয়া চলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তবে আমি আবার কাল আসিব।'

গো। হাঁ, আসিবেন।

উভয়েই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

নয়

প্রাগুক্ত ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দলালদিগের বাড়ি গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের বয়স প্রায় ষাট বৎসর, বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, নাতি-স্থূল নাতি-ক্ষীণ দেহ। মুখভাব অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ ললাট, দীর্ঘাবয়ব। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। গলদেশে ও বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহার নাম হরিহর তর্কপঞ্চানন।

সন্ধ্যার পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে কুশাসনে উপবেশনপূর্বক মধুর উচ্চ-কণ্ঠে গান গাহিতেছিলেন—

মা আর কবে কী হবে,
পলে-পলে কমছে আয়ু
দু'দিন বাদে ফুরিয়ে যাবে।
অজ্ঞান-জলদ-রাশি
ক্রমে ঢাকছে যে মা জ্ঞানশশী,
তাই বলি মা মুক্তকেশী;
মলে কি গো সাধন হবে?
ভাই-বন্ধু-সুত-দারা,
আপন কাজে রত তারা,
অহং জ্ঞানে হৃদয় ভরা,
ফেলে সবাই পালিয়ে যাবে।
কৃপা করি মা ত্রিনয়না,
সবল থাকতে রসনা,
কালী কালী বলতে দে না।
কালের ভয় সুরেনের যাবে।

BanglaBook.org

তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সুগভীর মধুর কণ্ঠে গানটি গীত হইয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। গান থামিয়া গেল, কিন্তু শ্রোতাগণের শ্রবণ-বিবরে তাহার রেশ লাগিয়াই রহিল। অদূরে গোবিন্দলাল হৃদয়ের নিরয়-বহ্নি লইয়া বসিয়াছিলেন—তিনিও গানে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। হৃদয় পাপে-তাপে বড় জ্বলিয়া উঠিলে, একমাত্র ভগবানের নামেই সেখানে শান্তি-বিন্দু পতিত হয়। বিশেষত ভক্তকণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্বরে ভগবানের মহিমা কীর্তিত হইল, তাহাতে মুগ্ধ না হয় কে?

গোবিন্দলাল তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতি নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্বক কহিলেন, 'গুরুদেব, প্রাণের অশান্তি কীসে নিবারণ হয়, প্রভু?'

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'তাপেই প্রাণে অশান্তি হয়। জগতে তাপ ত্রিবিধ প্রকারের—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। মানব এই ত্রিবিধ তাপাতীত হইলে, হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গো। তাপাতীত হওয়া যায় কীসে?

ত। জ্ঞানার্জন, সাধুসঙ্গ ও ভগবানে নিষ্ঠা-ভক্তি—এই সমুদয়ে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গো। সমস্তই জানি প্রভু। কিন্তু জানিয়াও কিছু করিতে পারি না। যাহাতে পাপ আছে, তাহাতেই মতি হয় কেন? কেন প্রভু? এ বৈষম্য—কেন প্রভু হৃদয়ের এ-প্রকার অবনতি? জানিয়া-শুনিয়া মানব কেন মজে? জানিয়া-শুনিয়া মানুষ কেন না ভজে? জ্ঞান আছে, জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না কেন?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'জ্ঞান আছে, যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে অতি বিশদভাবেই বিবৃত হইয়াছে। সুরথ নামক রাজা শত্রু কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনগমনপূর্বক মেধস নামক মহামুনির দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন,

"'প্রভো! আমাকে হৃতধন ও হৃতবল জানিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র শত্রুকে ভজনা করিয়াছে, ইহাতে আমি তাহাদিগের চরিত্রাদি উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিয়াছি, অধিকন্তু আমার প্রতি তাহাদিগের যে-প্রেম তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি পোড়া মন তাহাদিগের জন্য এত কাঁদে কেন? মনকে বুঝাইতে পারি না কেন?"

'জ্ঞানযোগী মেধস প্রশান্তস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"'হে মনুজ-ব্যাঘ্রে! তুমি যে বলিতেছ, আমার বিষয়গোচর জ্ঞান থাকিয়াও কেন আমি অজ্ঞানের মতো মুগ্ধ হইতেছি? কেন পুত্র-কলত্রাদির দুর্ব্যবহার অবগত হইয়াও, তথাপি মমতাগর্তে নিপতিত হইতেছি? তোমার এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃষ্ট নহে। এরূপ জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই বিদ্যমান আছে। আহার- নিদ্রা, সন্তান-স্নেহ এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃতিজ, ইহা সকলেরই আছে। পশুপক্ষীদিও নিজে ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়াও সংগৃহীত কণাদিতে সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ তবুও সন্তানের দ্বারা উপকারের আশা করিতে পারে, কিন্তু পশুপক্ষীগণের তাহার কিছুই নাই—তথাপি তাহারা সন্তানাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে। কেন করে, জানো, রাজা? এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই মহামায়ার মহা প্রভাবে সংস্থিত, এবং মুহ্যমান। বুঝিয়াও মানুষে বুঝিতে পারে না, জানিয়াও জানিতে পারে না—সে কেবল সেই মহামায়ার ধাঁধা। সেই মহামায়াই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই পালন করিতেছেন, আবার তিনিই ধ্বংস করিতেছেন। তিনিই অবিদ্যারূপে বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই পরমা বিদ্যা, মুক্তির একমাত্র হেতুভূতা সনাতনী।"

'সুরথ কহিলেন, "প্রভো! সেই দেবী কে? তাঁহার স্বরূপ কী?"

'ঋষি কহিলেন, "তিনি নিত্যা, নিরাধারা—এই জগতই তাঁহার মূর্তি—এই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই তিনি। তাঁহার সাধনে সমস্ত বন্ধন বিদূরিত হয়।'"

গো। বুঝিলাম না প্রভো! সমস্ত জগৎ তাঁহার মূর্তি, জগতের সমস্তই তিনি। কিন্তু বিজ্ঞানে একথা টিঁকে কই? বিজ্ঞানে নাস্তিকতা আনিয়া দেয় না কি?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, 'ধিক তাহাদিগকে, যাহারা বিজ্ঞানের উপর এ-কলঙ্কারোপ করে। বিজ্ঞানের নাস্তিকতা! যাহারা বিজ্ঞানের অনুস্বর-বিসর্গও শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাও কি এমন কথা মুখে আনিতে পারে? যদি আস্তিকতার নির্ভর-স্থিতির কোনও দৃঢ় ভিত্তি কিংবা দৃঢ় স্থান থাকে, তবে সে-স্থান বিজ্ঞান। কেন না, বিজ্ঞানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আকাশের ওই অনন্তকোটি সূর্য অবধি মানুষের পদতলস্থ ধূলিকণাটি পর্যন্ত সমস্তই এক পদার্থ ও নিয়মের একই সূতায় গ্রথিত। আর যে-শক্তি সেই সূতা, অথবা নিয়মের অভ্যন্তরে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই জীবের প্রাণের উপাস্য দেবী।'

গো। বুঝিলাম, কিন্তু আর-একটা সন্দেহ আছে ঠাকুর। এই দেবীকে তুষ্ট্যর্থ মদ্য-মাংস প্রভৃতি পঞ্চ মকারের কী প্রয়োজন?

ত। সাধনা-ভজনার একটা কথা কী জানো, যে যে-বিষয়ে সাধনা করে, সে সেইপ্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে। তুমি যদি লেখাপড়া শিখিতে গিয়া অঙ্ক-বিষয়ে খাটিয়া থাকো, তাহাতে যদি তোমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, চাকুরি করিবার সময়েও তোমার প্রভু তোমাকে সেই বিভাগেই চাকুরি দিবেন। এইরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞানেও। যাঁহারা রজোগুণে সাধনাসিদ্ধ বিষয়ে প্রয়াসী, তাঁহারা ওই পঞ্চ মকারে সাধনা করিয়া থাকেন? আর যাঁহারা সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি লাভে আশান্বিত, তাঁহারা সত্ত্বগুণের সাধনায় নিযুক্ত—তাঁহারা উহা করিবেন কেন?

গো। মদ্য-মাংস বিনা নাকি দেবীর দয়াই হয় না? আমি তন্ত্রের এইরূপ একটি বচন জানিতাম, মনে আসিতেছে না।

ত। হাঁ, তন্ত্রাদিতে ওইরূপ বহুল বচন আছে। যথা—

'মদ্য মাংস বিনা দেবি কুলপূজাং সমারভেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি।'

কিন্তু আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রয়োজন ভেদে সাধনা, এবং সাধনা ভেদে ফললাভ। তন্ত্রে কুলাচার সাধনার এই প্রকরণ। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণাদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবগণকে এই কুলাচার সাধনাতে মদ্যপান নিষেধ আছে। শ্রীক্রমে—

'ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামো কামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।'

তবে যদি কোনও ব্রাহ্মণ এই আচারে লিপ্ত হয়েন এবং মদ্য দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে সে স্থানে—

'যত্রাসবমাবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাত্তাম্রে বারি সৃজেন্মধু।
ইতি কুল চূড়ামণৌ।'

কুল-চূড়ামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, যেখানে ব্রাহ্মণের অবশ্যই মদ্য দিবার প্রয়োজন হইবে, যেখানে গুড় ও আর্দ্রক এবং তাম্রপাত্রে মধু প্রদান করিবে।

ফল কথা—দ্রব্যজাত গুণের ধ্বংস নাই, অতএব সত্ত্বগুণাভিলাষী ব্যক্তিগণ কখনওই মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পুণ্যও নাই। অধিকন্তু মহাপাতক আছে।

গো। আমার উপায় কী হইবে? আমার চিত্ত মহাপাপভারে বড় ভার হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি মাকে ডাকিবার ক্ষমতাও আমার বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্তকে কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। আমার উপায় কী দেব?

ত। দীর্ঘ প্রণব দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্থির হয়। আর সাধুসঙ্গে শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি-সাধন, এই সমুদয় অবলম্বনেই চিত্ত স্থিরতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সেই সমুদয় অভ্যাস করো, উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে।

BanglaBook.org

গো। দীর্ঘ প্রণবাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্থিরতা-প্রাপ্ত হয়—কিন্তু প্রেম বিনা কি চিত্তের আনন্দ জন্মে? ভগবৎ প্রেমলাভের উপায় কী?

ত। কিয়দ্দিবস শাস্ত্রাধ্যয়ন করো। এতদর্থে তুমি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহানির্বাণ-তন্ত্র, বৈশেষিক অথবা সাংখ্যদর্শন, আপাতত পাঠ করো। তাহা হইলেই তোমার জ্ঞান লাভ হইবে। সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। শাস্ত্রে আছে, মহাশক্তিই এই নিখিল জগদ্‌যন্ত্রের নিত্য সিদ্ধা, কর্ত্রী ও নিয়ন্ত্রী। তিনি সেইভাবেই মানবের হৃদয়দেশে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সূত্রধার যেমন কলের পুতুলকে সূতায় টানিয়া ক্রীড়ার পথে চালনা করে, তিনিও সেইরূপে সকলকে প্রকৃতি অথবা স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তির সূত্রে সতত আকর্ষণ করিয়া কর্মপথে চালাইতেছেন। মানব তাহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই প্রসাদৎ পরমা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

মনে হয়, গঙ্গা ও যমুনার কুলুকুলু ধ্বনি বিহঙ্গ-নিচয়ের প্রভাতী বন্দনা ও সায়ং সঙ্গীত ওই কথাগুলিরই আবৃত্তি করিতেছে; এবং ঊর্ধ্বে আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা এবং অবনীতে মানুষের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি ওই কথা কয়টিই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। আগে জ্ঞানের অন্বেষণ করো—জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি ও প্রেম আপনিই পৌঁছিবে।'

গোবিন্দলাল কথাগুলি শুনিতে-শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, সে-রাত্রে গোবিন্দলাল ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণে সে-রাত্রিতে কেমন একটা পাপ-পুণ্যের মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়া বড় গোল পাকাইয়া দিয়াছিল।

দশ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গোবিন্দলালের হস্তে ডাকপিওন এক পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খামে আঁটা, উপরে লালকালিতে শিরোনাম দেওয়া। পত্রের শিরোনাম দেখিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিলেন, পত্র কলিকাতা হইতে নীলিমা লিখিয়াছে। তাঁহার চিত্ত আজি বড় ম্রিয়মাণ—পাপের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন, যে-পত্র পাঠ করিতে ইত্যগ্রে তাঁহার প্রাণের আকুল বাসনা ছিল, আজি যেন সে-পত্র খুলিতেও তাঁহার আর ইচ্ছা করিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

পাষাণ হৃদয়!

আর কতদিন আসিবেন না? যদি আসিবেন না মনে ছিল, এমন করিয়া মারিলেন কেন? আপনি যদি না আসিতে পারেন, আমাকে অনুমতি করিলে আমি নিকটে পৌঁছিতে পারি। যদি অনেকদিন ধরিয়া মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখেন, আমি থাকিতে পারিব না, আপনি না বলিলেও আপনার স্থানে যাইব। যদি মনে ছিল এমন করিবেন, তবে মজাইতে নাই। ওগো, এখন যে আমার প্রাণ যায়। আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। প্রণাম, নিবেদন ইতি।

আপনার 'নীলিমা'

কেমনই কুহক লইয়া জগতে নারীজাতি বিদ্যমান রহিয়াছে, বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কাহার। গোবিন্দলালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের যে-বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, এই পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা যেন নিভিয়া গেল। গোবিন্দলাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে-মনে বলিলেন, 'রাক্ষসি, আমাকে কি এমন করিয়া মজাইতে হয়? পাপে যে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। হৃদয় পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। আমি যে এখন অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিলাম, পাষাণি! তোর কথা মনে

BanglaBook.org

হইলে যে আমার রৌরবেও ভয় থাকে না। তোর মুখখানি মনে হইলে আমি যে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাই। তোর পত্র পাঠ করিলে, তোর হাতের লেখা দেখিয়া, তোর লেখার মতো তোকে দেখতে ইচ্ছা করে। প্রাণাধিক! একবার এসো, দেখিবে। তোমার হাতের লেখা দেখিতে পাইতেছি—লেখা দেখিয়া তোকে দেখার সাধ হইতেছে, কিন্তু প্রিয়তমে! লেখার মতো কেন দেখা দিতেছ না?'

এই সময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর! আমাদের গুরুদেব আসিয়াছেন, তিনি কহিলেন পঞ্চ মকারের সাধনা মোক্ষপ্রদ তো নহেই, অধিকন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য-মাংসাদি দেবীকে প্রদান বা ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, কিন্তু আপনি আমাকে এ কী পাপে মজাইতেছেন!'

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, তুমি বর্তমানে মোক্ষ-প্রয়াসী নহ, ধনৈশ্বর্য ও পার্থিবসুখ-প্রয়াসী। অধিকার ও কর্মভেদে সাধন-প্রণালী ভেদ হইয়া থাকে।

গো। আপনি বলিয়াছেন, এই পথে গেলেই তুমি ইহকালে ধনৈশ্বর্য ও পরকালে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

স। এখনও বলিতেছি।

গো। কী প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে?

স। দুগ্ধপানে প্রথমে রসনা পরিতৃপ্ত করো—এবং সুপেয় ও সুরস বলিয়াই লোকে পান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা যেমন আপনিই শরীর-পোষণ ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার করিয়া দেয়, তদ্রূপ কুলাচারমতে দেবীর আরাধনা করা হইলে, প্রথমে বাঞ্ছাসিদ্ধ হইয়া পরে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গো। তবে সকলেই এই পথ আশ্রয় না করে কেন? কেন লোকে ইন্দ্রিয়াদি সংযমময় বৈরাগ্যের পথে যায়?

স। রোগ হইলে চিকিৎসকে এমন ঔষধের ব্যবস্থা করেন, যাহাতে পথ্য, ঔষধি উভয়ই হয়—কিন্তু সাধারণ বৈদ্যে কেবল উপবাস দেওয়াইয়া তীব্র তিক্ত ঔষধিই ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

গো। আমি এখন কী করিব?

স। জানি না তুমি কী করিবে, ইচ্ছা হইলে অদ্য হইতেই এ-পথ পরিত্যাগ করিতে পার।

গো। আপনি বোধহয় রাগ করিতেছেন?

স। রাগ করি নাই। তবে প্রত্যহই তুমি ওই রূপ বলিয়া থাক। সাধনা-ভজনায় ঐকান্তিকতা চাই, তোমার কার্য বেগার দেওয়া।

গো আমার প্রাণে অত্যন্ত জ্বালা হয়।

স। তাই বলিতেছিলাম—যদি তোমার ঐকান্তিকতাই না হয়, এ-পথ পরিত্যাগ করো।

গো। কতদিনে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে?

স। আসনের জন্য বাকি তিনটা সংগ্রহ করিতে পারিলে, একদিনেই কার্যসিদ্ধি হইবে।

গো। উহা সংগ্রহই যেন আমার পক্ষে বড় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স। আমি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছি, তাহাতে অতি সহজেই হইবে।

গো। হাঁ, সংগ্রহ সহজেই হইতে পারিবে, কিন্তু কার্য শেষ হইলে আমার প্রাণে বড় পাপবহ্নি জ্বলিতে থাকে।

স। দেবীর দয়া হইলে, সমস্ত জ্বালাই জুড়াইয়া যাইবে।

গো। যত শীঘ্র দেবীর দয়া হয়, আমি ধনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় যাইতে পারি, দয়া করিয়া আপনি তাহার উপায় করুন। আমি আমার খেঁদুকে না দেখিয়া আর অধিক দিন থাকিতে পারিতেছি না।

স। আমিও সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আগামী ২০শে আষাঢ় মঙ্গলবারে অমাবস্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ওই দিনে আমাদের কার্য করিতে হইবে। ইহার মধ্যে তুমি আসনের

BanglaBook.org

অবশিষ্ট দ্রব্য তিনটি সংগ্রহ করিয়া দাও।

গোবিন্দলালের হৃদয়বৃত্তি অন্যমুখী হইয়া পড়িল। পাপের প্রলোভন, পুণ্যের ক্ষীণালোক আবৃত করিয়া দিল। গোবিন্দলালের প্রাণের দেবভাব দূর হইয়া অসুরভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ঠাকুর! সঙ্গে কারণবারি আছে কি?'

স। হাঁ, আছে।

গো। আমাকে দিন।

সন্ন্যাসী তাহা সযত্নে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল আকণ্ঠ পান করিলেন। তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

সন্ন্যাসী উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় রক্তিম রাগে দিগন্ত সমুচ্ছ্বাসিত। সবুজ খণ্ডবিখণ্ড মেঘের কোলে সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেখা সকল ভাসিয়া-ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তন্নিম্নে দিগন্তপ্রসারিত শ্যামবর্ণের আকাশ—তন্নিম্নে শ্যাম-সবুজ পত্রদলে শোভিত নিথর নিশ্চল দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি, তন্নিম্নে তটভূমি চুম্বন করিয়া খরস্রোতা ইছামতী নদী প্রবাহিতা, তীরে শ্যাম শোভায় সুশোভিত কাশফুল।

এই সময়ে সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল আকাশপানে চাহিয়া কী ভাবিতেছিলেন। ভাবিতে-ভাবিতে সেখানে বসিয়া পড়িলেন, এমনসময় দূরে একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া পা'শ জালে মাছ ধরিতে-ধরিতে একটা জেলে গান গাহিতেছিল—

'কৃষ্ণ-কাঙালিনী আমি কৃষ্ণ বিনা রইতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী,
ব'লে গেল যাবার বেলা, ভেবনাকো কুলবালা,
এল না সে চিকণ-কালা, আমার দু'নয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নাড়ি।
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি।
এবার যদি পাই তারে, করের উপর দিয়া করে,
বাঁধব আমি প্রেমডোরে, রাখব নয়ন প্রহরী।'

অদূরে তীরভূমিস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর হইতে একটা মেটে চিল, সেইদিকে চাহিয়া একান্ত-মনে জেলের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। আর বক তাহার বুকের ধনকে না পাইয়া ওই গানে জেলের উপর বড়ই চটিতেছিল—কেননা, সে ভাবিতেছিল, মানুষে বিরহের গান গাহিয়াই জগতে বিরহের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। গভীর জলে শুশুক ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিয়া জেলেকে উপহাস করিতেছিল—কেননা, সে জানে প্রেম দু'দিনের লাফালাফি বই তো নহে। প্রেম এই আছে এই নাই—যাহার স্থিরতা এতটুকু, তাহার জন্য আবার কান্নাকাটি কেন? আজি তোমার বিরহে আমার বুক ঝলসিয়া যাইতেছে, মুখে অন্ন-জল উঠিতেছে না, চক্ষুর শতধারায় বক্ষ বিপ্লাবিত, তোমাকে পাইলে আমার সকল দুঃখ দূরে যায়, তোমায় কোথায় রাখিব স্থির করিতে পারি না। বুঝি বুকের মধ্যে পুরিলেও বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। দু'দিন বাদে কোথায় সে প্রেম! আজিও দেখিয়া ঘৃণায় বদন ফেরানো পর্যন্ত না-ও হয়—যেন কত অপরিচিত, কেহ যেন কাহারও কেহই নহে। তাই শুশুক উপহাস করিয়া বুঝি বলিতেছে, মানব! মানবের প্রেমে কেন মুগ্ধ হইয়া অত চিৎকার করিতেছ—যে-প্রেম নিত্য, যাহা একবার পাইলে আর পরিত্যাগ করিতে হয় না, যাহার ধারায় রসের শতধারা প্রবাহিত হয়, সেই প্রেম-সুধা পান করো। আমরা তো তাহাই করিয়া থাকি।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ সকলে যাহাই বলুক বা করুক—গোবিন্দলালের মনে তাহার কোনও কিছুই স্থানপ্রাপ্ত হইতেছিল না। তিনি সেই সমস্ত সৌন্দর্যরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই প্রণয়িনী নীলিমার মুখখানি ভাবিতেছিলেন। জানি না, জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোনও মোহ অধিক আছে কি না। জানি না, এই পার্থিব প্রেম বা মোহ মানবকে স্বর্গের দিকে বা নরকের দিকে লইয়া যায়। যতদূর দেখি, যতদূর শুনি—এক দাম্পত্য প্রেম ভিন্ন মানুষের এই প্রেম বা মোহ নরকের দিকেই অধিকাংশ স্থলে লইয়া গিয়া থাকে। তবু মানব জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না। পাপ পুরুষের বুঝি, মানবগণকে পাপের দিকে লইয়া যাইবার এই প্রেম বা মোহই প্রধান অস্ত্র।

গোবিন্দলাল এক্ষণে এই মোহের ছলনায় নরকের কীট হইতে অধিকতর দূরে গমন করিয়াছেন। জানি না, তাঁহার উদ্ধারের উপায় আছে কি না। একে তো গোবিন্দলাল এই মোহের ছলনে একান্ত মুগ্ধ—তাহাতে আবার সন্ন্যাসীর পাপ-ছলনে একান্ত বিড়ম্বিত। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ মুগ্ধ মানবগণকে ভণ্ড, ধর্মধ্বজী, পাষণ্ডগণ আরও মহাপাতকে লিপ্ত করিয়া দেয়। এই ধর্মধ্বজীগণ ধর্মের মর্ম কিছুই অবগত নহে, শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, সদ্‌গুরূপদেশে বঞ্চিত, অথচ উপদেষ্টা, অথচ গুরুপদবীতে আরূঢ়। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক উভয়ই আছে। ইহারা যে কত প্রকারে কত নির্মল চরিত্র যুবককে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতেছে, কত সতীর সর্বস্ব ধন সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করিতেছে, কত সোনার সংসার ছারখার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অখাদ্য খাইয়া, অপেয় পান করিয়া, পরস্ত্রীর সর্বনাশ সাধন করিয়াই ইহাদের ধর্ম। এই স্বেচ্ছাচারের দিনে কেহ ইহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কেহই কোনও কথা কহেন না—যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনই করিয়া যায়।

গোবিন্দলাল একান্ত মনে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখচ্ছবি ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় একটি অনুমান অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। নাম অমরনাথ।

অমরনাথ আসিয়াই গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আপনি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছেন?'

গো। অধিকক্ষণ নহে, ঘণ্টাখানেক হইবে।

অ। আমার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আপনার বোধহয় সেজন্য কষ্ট হইয়াছে?

গো। না, আমার কষ্ট কিছুই হয় নাই। তোমার বিলম্ব হইল কেন?

অ। মামা একটা কথা বলিতেছিলেন, তাই শুনিয়া আসিতে এত বিলম্ব।

গো। কী ঠিক করিতেছ?

অ। নিশ্চয়ই যাইব।

গো। তোমার স্ত্রী?

অ। তিনিও যাইবেন।

গো। তাঁহাকে বলিয়াছ?

অ। হাঁ, বলিয়াছি বইকী—এখানকার অপমানে, ঘৃণায় তিনি যাইতে এখনই প্রস্তুত। বিশেষত আপনার নাম শুনিয়া বলিলেন, তিনি সুশিক্ষিত ও উদার-চরিত্র লোক, তিনি আমাদের আশ্রয় দিলে ও অনুগ্রহ করিলে আর ভাবনা কী?

গো। আগামী কল্যই যাওয়া স্থির। কারণ, অদ্যও আমার বন্ধুর পত্র পাইয়াছি, তোমার জন্য যে চাকুরিটি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, দুই-একদিনের মধ্যে সে-কার্যে নিযুক্ত না হইলে, অন্য লোক নিযুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

অ। সেই ভালো, কালই যাওয়া যাইবে।

গো। তোমার মামা আমাদের আত্মীয়। তিনি তোমাদিগকে যে-অবস্থাতেই রাখুন—আমি যে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তফাৎ করিতেছি, ইহা জানিতে

BanglaBook.org

পারিলে, তিনি জন্মের মতো আমার উপর চটিয়া যাইবেন অতএব তোমরা এক কাজ করো—স্বামী-স্ত্রীতে অদ্য রাত্রেই গৃহ হইতে যথাসম্ভব কাপড়চোপড় লইয়া বাবুদের বাগানের মধ্যে যে পুরাতন দালানটি পড়িয়া আছে, তথায় গিয়া থাকো—কাল দিনমানে খাওয়া চলে, এমন কিছু খাওয়ার জিনিসও সঙ্গে লইও। তৎপরে আমি রাত্রে তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব এবং আমার বিশ্বাসী জনৈক মাঝির নৌকাতে করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইব, এমন করিলে আমার আর দুর্নামটা হইবে না।

অ। বাগানের সেই স্থলে আমাদিগকে যদি কেহ দেখিতে পায়?

গো। সেখানে কেহ কখনও যায় না।

অ। যদিই যায়?

গো। তাহাতেই বা দোষ কী? তোমরা তো স্বামি-স্ত্রীতে থাকিবে, লোক বলিবে, মামা-মামির বাক্যযন্ত্রণায় পলায়ন করিতেছিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান চাকুরির আশায় মুগ্ধ যুবক, রাক্ষসের কথায় ভুলিয়া গেল। সে বলিল, 'এইরূপ প্রস্তাবে আমার স্ত্রী স্বীকৃত হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে সে যেরূপ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে, সহজেই স্বীকৃত হইতে পারিবে।'

গো। তিনি স্বীকৃত হইলেন কি না, তোমরা বাগানে গেলে কি না, জানিতে পারিব কী প্রকারে?

অ। যদি যাওয়া না হয়, আপনাকে আসিয়া বলিয়া যাইব। আর যদি রাত্রি বারোটার মধ্যে আপনার নিকট আমি না আসিলাম, তবে জানিবেন, আমরা সেই বাগানে চলিয়া গিয়াছি।

গো। তবে তাই; মনে থাকে যেন, অন্তত পরশু অফিসের সময়ের পূর্বেই না পৌঁছিলে, এ-কার্য হওয়া দুর্ঘট হইবে।

অ। যে আজ্ঞা। আর-একটি কথা।

গো। কী বলো?

অ। আমি স্ত্রীকে লইয়া গিয়া এখন কোথায় রাখিব?

গো। তাহার আর ভাবনা কী? সেই বন্ধুটিও স্ত্রী-কন্যাদি লইয়া আছেন, আমি বলিয়া দিব, তোমরা তাঁহার বাসায় একটা ঘর লইয়া থাকিও—তৎপরে একমাস চাকুরি করিয়া বেতন পাইলে, যেরূপ সুবিধা বোধ করো, সেইরূপই করিও।

অ। আপনি আমার ভরসা ও বল-বুদ্ধি—যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।

অতঃপর অমরনাথ চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া কত কী ভাবিতে লাগিলেন, শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে জগৎ বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল—আকাশপটে নক্ষত্রমালা উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া উদ্ভাসিত হইল, শনশন বাতাস প্রবাহিত হইয়া জগতে পরিবর্তনের পারিপাট্যতা বিঘোষণ করিয়া দিল, নদীতীরের দূরভূমিস্থ বাঁশবাগানের মধ্য হইতে শিবাকুল ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল, দূরে নদীগর্ভ হইতে পাইল-তোলা নৌকার মধ্যে বসিয়া পশ্চিমদেশীয় দাঁড়ি মাঝিরা—'ও পরদেশী সেঁইয়া দিনুয়া কত গেয়ি বি'—গাহিয়া-গাহিয়া সুর-লহরি বাতাসের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিল এবং নোঙর-করা নৌকায় বসিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা রন্ধন করিতে-করিতে জলদিন্ধনের নিকট উপুড় হইয়া পড়িয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছিল—তখন গোবিন্দলাল অতি ম্লানমুখে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র পথ বড় ব্যথিত-প্রাণে মূর্ছিতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্ব দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের হৃদয়টা ভয়ে বড় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হৃদয়ে বল-সঞ্চার করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া গেলেন,—যাইতে-যাইতে গোবিন্দলাল স্পষ্টত অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঝুমর-ঝুমর চুল-মাথায় একটি বালিকা ছুটিয়া-ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দ-মন্দ নিশ্বাসে, ঘামিতে-ঘামিতে তিনি চলিয়া গেলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন না।

এগারো

মানুষে কঠিন মাটির উপর ঘর বাঁধিয়া বেশ সুখে এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে—কিন্তু কোথা হইতে একটা আচম্বিতপূর্ব ঝড় আসিয়া ঘর-দ্বার ভাঙিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। বাহ্য প্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয়, তাহা নহে। মানবজীবনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অতি শৈশবকালে অমরনাথ মাতৃপিতৃহীন হইলে, তাহার মাতুল শ্যামাচরণবাবুই তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন এবং এই কার্য তাহার মাতুলানীর চক্ষে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইলেও, অমরনাথের স্নেহবঞ্চিত দুর্বল শিশুহৃদয় তাহার মাতুলের দীপ্ত স্নেহালোকে ক্ষুদ্র পল্লবের ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনিই বিশেষ আড়ম্বরে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমরনাথের মাতুল শ্যামাচরণবাবু কলিকাতায় কোনও ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার আর্থিক স্বার্থও এই ব্যাঙ্কের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত ছিল। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, সংসারখরচ যাহা লাগিত, তদ্বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা তিনি ওই ব্যাঙ্কেই জমা রাখিয়া দিতেন। আশা ছিল বার্ধক্যে ওই সঞ্চিত অর্থে তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, কর্মফল হইয়া যায় আর-এক। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া শ্যামাচরণবাবুকে পথে বসাইয়া দিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন, শ্যামাচরণবাবু যখন ব্যাঙ্কেরই একজন প্রধান কর্মচারী, তখন পূর্ব হইতেই তিনি ফেল হইবার সংবাদ অবশ্যই অবগত ছিলেন—এই সুযোগ ও সুবিধায় তিনি কোন পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া না লইয়াছেন। কিন্তু তাহা হয় নাই, বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতার অভাবেই হউক, আর অন্যবিধ কোনও কারণেই হউক, শ্যামাচরণবাবু তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘরে এক পয়সাও আইসে নাই, তাঁহার যাহা কিছু পূর্ব-সঞ্চিত ছিল, ব্যাঙ্কের সহিত তাহাও চিরজীবনের জন্য অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এরূপ বেকার-অবস্থায় রিক্ত-হস্তে থাকা চলে না, কাজেই তিনি গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন—তাঁহার বাড়িও এই স্বরূপ গাঁয়ে। বৎসর-বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যে-গ্রাম তাঁহাকে মহা সমারোহে এবং উচ্ছ্বসিত প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিত, আজ তাঁহার এই দুর্দিনেও সে তাঁহাকে তাহার ছায়স্নিগ্ধ ক্রোড়ে সস্নেহে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য তেমনই নবীন রাগে পূর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপ্রান্তে উঠিতে লাগিল, তরুশাখায় বিহঙ্গের তেমনই আনন্দকাকলী, গ্রামপ্রান্তবর্তী ইছামতী নদী তেমনি চঞ্চল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল এবং নদীতীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখালের দল পূর্ববৎ গরু চরাইয়া গান গাহিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু শ্যামাচরণবাবুর হৃদয়ে ঝটিকার বিরাম ছিল না।

যে-সকল বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহারা দুই-চারিদিন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটিতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে ম্লান দীপালোকে বহির্মণ্ডপের এক সতরঞ্চির উপর বসিয়া তাম্রকূট-ধূমের সহিত প্রচুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, লোকটা বাস্তবিকই শূন্য হস্তে বসিয়া আছে এবং পরিবার প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া বাক্স-চৌকি বিক্রয়পূর্বক মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেছে, তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আত্মীয়-প্রতিবেশীগণ মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা গোপনে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহারা এখন প্রকাশ্যে অসম্মান দেখাইতে লাগিল। নবীন ভট্টাচার্য বিজয়া-দশমীর দিন তাঁহার দরজা দিয়া অন্যান্যবার অপেক্ষা বেশি ঘটা করিয়া ঢাক বাজাইয়া গেল। তাঁহার দরজায় আসিয়া ঢাকীদিগের ঢাকে কিঞ্চিৎ জোরে কাঠি দিবার কী আবশ্যকতা ছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, শ্যামাচরণবাবু অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পূর্বকথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচারা অমরনাথের বিপদই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। মাতুলের উপর নির্ভর করিয়াই

সে প্রতিদিন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছে, কোনওদিন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা আবশ্যক বোধ করে নাই এবং সম্মুখে যখন যে-বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, বিলাতি জুতার তলায়-তাহাই নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; এখন ক্ষুদ্রের অপেক্ষাও সামান্য-সামান্য বাধা তাহার পক্ষে অসহ্য এবং দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িল এবং যে-পর্বতের সুশীতল শৃঙ্গকে অটল মনে করিয়া সে তাহার উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিতান্ত উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই পর্বত-শৃঙ্গের পতনের সঙ্গে তাহার উন্নত মস্তক একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

মাতুলানী তাহাকে স্পষ্ট বলিলেন, 'এতদিন আদরে প্রতিপালিত হইয়াছ, যাহা ইচ্ছা খাইয়াছ, পরিয়াছ, এখন আমাদের দিনচলা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমারই ছেলেমেয়েগুলি কী খাইয়া বাঁচিবে, তাহার ঠিক নাই—কেমন করিয়া আর তোমাদের স্ত্রী-পুরুষকে আমরা প্রতিপালন করিব? বরং তোমার এখন কর্তব্য রোজগার করিয়া আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করা। তাহা যখন পারিবে না, তখন তোমাদের যাহাতে পেট চলে, তাহার উপায় দ্যাখো, আমাদের সংসার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও।'

অমরনাথ এ-কথায় অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইল, সংসারের কোন দিকে কী আছে—কেমন করিয়া কোথায় কী করিতে হয়, সে তাহার কিছুই জানে না। সহসা সে কোথায় যায় কী করে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। মামার নিকট কথা কয়টা একদিন বলিয়া ফেলিল, ছলছল চক্ষুতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মাতুলের নিকট বলিয়া ফেলিল, 'মামি-মা, আমাদিগকে আর এ-বাড়িতে রাখিতে একেবারে নারাজ, কিন্তু এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন সহসা যাইব কোথায়? একটা পথ করিয়া দিয়া পৃথক করিয়া দিলে, সে-পথে যাইতে পারিতাম।'

শ্যামাচরণবাবুও সজল নেত্রে কহিলেন, 'তুমি অবশ্যই এখন সমস্ত বুঝিতে পারো, আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। দিনচলা ভার, এ-অবস্থায় তোমার অন্য উপায় দেখাই কর্তব্য। কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণে যে কী বেদনা লাগিতেছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে না।'

অ। সকলই বুঝি, কিন্তু একটা পথ করিয়া দিলে, সেই পথে যাইতাম।

শ্যা। আর আমার কোনওই ক্ষমতা নাই। যখন স্বপদে ছিলাম, টাকাকড়ির সংস্থান ছিল, তখন একজনকে বলিয়া দিলেই তোমার মোটা চাকুরি হইত, কিন্তু তখন যাহারা বন্ধু ছিল, এখন তাহারা ফিরিয়াও চাহে না।

অ। তবে আমি কী করি?

শ্যা। নিজে বাহির হইয়া একটা চাকুরির চেষ্টা দ্যাখো।

অ। মেয়ে-মানুষ লইয়া চাকুরির চেষ্টায় বাহির হই কেমন করিয়া?

শ্যা। যতদিন তোমার চাকুরির ঠিক না হয়, ততদিন বধূমাতা এইখানেই থাকুন।

অ। মামি-মা তাহাতেও অসম্মত।

শ্যা। না, তিনি ততদিন থাকিবেন, কেহ আপত্তি করিবে না।

অ। চাকুরির জন্য কোথায় যাই, কোথায় গেলে সুবিধা হইতে পারে?

শ্যা। কলিকাতাতেই যাওয়া কর্তব্য। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বহুবিধ কার্যের সুযোগ আছে। আর মফঃস্বলে কার্য করা একরূপ উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া, কলিকাতায় একটা যেমন-তেমন কার্য হাতে করিয়া বসিয়া, তৎপরে ভালো কার্যেরও চেষ্টা দেখিতে পারিবে।

অ। তবে তাহাই হইবে।

শ্যামাচরণবাবু অমরনাথের স্ত্রীকে অমরনাথের চাকুরির সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে স্থান দিতে ও আহারাদি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরানী একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্পষ্টত বলিলেন, 'যখন রোজগার করিয়াছ, তখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, আমি নিষেধ করি নাই। এখন রোজগার-পত্র নাই, আমার শ্বশুরের দুই বিঘা ধানের জমির আয় হইতে যে-সাতপাল বাজে লোক প্রতিপালন করিতে হইবে, আর আমি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া শুকাইয়া মরিব, তাহা হইবে না। অমর উহার স্ত্রী লইয়া চলিয়া যাউক।'

BanglaBook.org

অমরনাথের স্ত্রী মোহিনী সে-কথা শুনিতে পাইয়াছিল; যথাসময়ে সে-কথা সে স্বামীর নিকট বলিয়া দিল।

শুনিয়া অমরনাথ মহা বিপদ গনিল, মোহিনীও বলিল, 'তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও লইয়া চলো।'

অমরনাথ একান্ত বিপদগ্রস্ত হইল। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে—এ-জগতে এক মাতুল ভিন্ন অমরনাথ আর কাহাকেও যে জানে না।

ভাবনা-চিন্তায় দশ-পনেরো দিন কাটিয়া গেল। অমরনাথের মাতুলানী দেখিলেন, এত বলা-কহাতেও অমরনাথ তাহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেল না। তখন তিনি তাহাদিগের আহার বন্ধের সংকল্প ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একদিন রাত্রে মোহিনী রাঁধিতে গিয়াছে, ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সমাপ্ত করিয়া মামিশাশুড়ীর নিকট অন্নপাকের জন্য চাউল চাহিল, মামিশাশুড়ী সামান্য কিছু চাউল আনিয়া দিলে, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কয়টি চাউলে হইবে মা?'

তিনি বলিলেন, 'হইলেও হইবে, না-হইলেও হইবে। আজ আর চাউল নাই। ছেলেপুলেগুলির তো হউক।'

মোহিনী সেইগুলিই রাঁধিয়া নামাইল। গৃহিণী ঠাকুরানী ছেলেদের থালা এবং কর্তার থালা দিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে বলিলেন। সেই কয়খানি থালায় অন্ন দিয়া দেখিল, হাঁড়িতে আর অল্প চারিটি আছে। বলিল, 'এগুলি কী হইবে?'

গৃ। কর্তার থালাতেই দাও—পাতে দুইটা থাকে, গালে দেব এখন।

মোহিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অমরনাথের ভাগ্যে আজি আর ভাত নাই। কী করিবে? তাহাই করিয়া হস্তাদি প্রক্ষালনানন্তর তাহাদের বাসের নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া, শয়ন করিয়া রহিল।

অমরনাথ পাড়ার মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিল; রাত্রে প্রায় দশটা উত্তীর্ণ হইলে, সে গৃহে ফিরিল। আসিয়া দেখে, মোহিনী শয্যায় শায়িতা আছে, প্রায়ই শয়ন-ঘরে রাত্রের আহারীয় আনিয়া মোহিনী শয়ন করিয়া থাকিত, অমরনাথ পাড়া হইতে আসিয়া আহারাদি করিত। অমরনাথ আসিয়া মোহিনীকে ডাকিল, মোহিনী উঠিল।

অমরনাথ বলিল, 'ভাত দাও।'

মো। ভাত নাই।

অ। কী আছে?

মো। কিছু নাই।

অ। কিছু নাই—কী? বুঝিতে পারিলাম না।

এবার মোহিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে সমস্ত কথা স্বামী-সমীপে নিবেদন করিল। শেষ বলিল, 'আমি হতভাগিনী স্বহস্তে রাঁধিয়া-বাড়িয়া অপরাপরকে খাওয়াইয়া, কেবল তোমায় একমুঠা ভাত দিতে পারিলাম না।' —বলিতে-বলিতে দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অমরনাথও তাহার আদরের মোহিনীর কিছুই খাওয়া হইল না, এজন্য একান্ত কাতর হইল। তাহারা অনাহারে শয্যায় শুইয়া পড়িল, দুঃখে-কষ্টে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমরনাথ গভীর চিন্তায় মগ্ন—শুধু এক-একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, ক্ষুদ্র গ্রাম নিঃশব্দ। সকলেই নৈশ আহার শেষ করিয়া, নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, শুধু একটি বাড়ির একটি নির্জন কক্ষে এই শান্তিহীন ব্যথিত দম্পতি বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতেছিল ঃ দুজনের কাহারও মুখ দিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না।

অমরনাথ এতদিন সহিয়া আসিয়াছে, আর অধিক সহ্য করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল;

অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বিদেশে যাইবে, স্থির করিল। কিন্তু যায় কাহার সহিত, ভাবিয়া-চিন্তিয়া একবার গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করা শ্রেয় বোধ করিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই অমরনাথ গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলিকাতায় এখন যাবেন কি?'

গো। কেন?

অ। আমি বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছি—মামা আমাকে তাঁহার সংসার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এমনকী গতকল্য রাত্রে মামিঠাকুরাণী আমাদের আহার পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গো। আমাদের! কাহার-কাহার কথা বলিতেছ?

অ। আমার ও আমার স্ত্রীর।

গো। কলিকাতায় আমি কল্যই যাইব।

অ। কল্যই? কল্য কখন?

গো। সম্ভবত রাত্রে। তুমি অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অ। কলিকাতায় গেলে, আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারিবেন?

গো। হ্যাঁ—তোমার কপাল ভালো। একটা চাকুরি খালিই আছে। আমার একটি আত্মীয়ের জন্য একটি বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার অফিসে চাকুরি খালি ছিল না, বলিয়াছিলেন—খালি হইলে সংবাদ দিব। এখন খালি হইয়াছে, গতকল্য তাই পত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার সে-আত্মীয়টিকে অন্য একটা কাজে ভর্তি করিয়া দিয়াছি। তুমি যদি যাও—এই কার্যই হইতে পারিবে।

অ। আপনার দয়া। বেতন কত?

গো। মাসিক পঁচিশ টাকা।

অমরনাথ মহা আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'একটা কথা আছে, তোমার মাতুলানী লোক ভাল নহেন, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তুমি ভাত করিয়া খাও। তাঁহার একটি ভ্রাতার চাকুরির জন্য তিনি আমাকে কয়দিন ধরিয়া নিতান্ত অনুরোধ করিতেছেন। তাহাকে ফেলিয়া তোমাকে আমি চাকুরি করিয়া দিয়াছি, ইহা যদি জানিতে পারেন, তবে আমাকে তিনি নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিবেন। অতএব যাহাতে তুমি আমার সঙ্গে গিয়াছ, আমি চাকুরি করিয়া দিয়াছি, 'ইহা জানিতে না পারেন, তাহা করিতে হইবে।'

অ। আমি বড় কষ্টে ও নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছি, আমার প্রতিকার করিলে ভগবান আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।

গো। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অমরনাথ চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ইছামতী নদীতীরে গোবিন্দলাল ও অমরনাথে যে-সকল কথা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গোবিন্দলালের সহিত বাবুদের বাগানের কুঠিতে সস্ত্রীক রাত্রি-যাপন করার পরামর্শ স্থির করিয়া অমরনাথ মাতুলালয়ে গমন করিল। নিজ নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে গমন করিয়া মোহিনীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিদগ্ধ-হৃদয়া মোহিনী স্বামীর পরামর্শে স্বীকৃত হইল। সে অশ্রু-আপ্লুত নয়নে গদগদ-কণ্ঠে কহিল,—'তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার ছায়া, আমিও তোমার সঙ্গে-সঙ্গে যাইব। তুমি যাহা উপায় করিবে, অমৃত-বোধে তাহাই তোমাকে ভোজন করাইয়া, তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কৃত-কৃতার্থ হইব। যেখানে তোমার অপমান—সে রাজপুরী হইলেও, আমার পক্ষে নরক।'

অমরনাথের বক্ষ স্নেহ-প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আজ তাহার মুহূর্তের জন্য মনে হইল, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখী কেহ নাই। স্বামী স্ত্রীর প্রেম এবং স্ত্রী স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে সংসার-সমুদ্রের আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উভয়ে একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চাহিল; আকাশ মেঘনির্মুক্ত, নদীর বক্ষ দিয়া

বায়ু-প্রবাহ হুহু স্বরে বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল, অদূরে বনান্তরালে শৃগালের দল একবার চিৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং বকুল বৃক্ষের আগডালে বসিয়া একটা পেচক বড় কর্কশকণ্ঠে দুই-তিনবার ডাকিয়া-ডাকিয়া থামিয়া পড়িল। টিকটিক করিয়া একটা টিকটিকি দুই-তিনবার ডাকিয়া উঠিল।

ব্যথিত-দম্পতি নৈশ অন্ধকারে মিশিয়া কম্পিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে গ্রামাতিক্রম পূর্বক প্রান্তরে পতিত হইল। চারিদিকে নিস্তব্ধ নৈশান্ধকার—কেবল বায়ুপ্রবাহ শনশন স্বরে প্রবাহিত। মোহিনী বলিল, 'আমার বড় ভয় করিতেছে, এই অন্ধকার রাত্রে আমাদিগকে আর কতদূর যাইতে হইবে?'

অ। আর অধিক দূর নহে। সম্মুখে ওই যে অন্ধকারের জমাটটা দেখিতে পাইতেছ—ওই স্থানেই থাকিব।

মো। ওখানে অত অন্ধকার; আর-কেহ ওখানে নাই?

অ। না; ওখানে আর-কেহই থাকে না।

মো। জনমানব-শূন্য বাগান ও পুরাতন ঘর—সাপ থাকিতে পারে।

অ। আমি দিবাভাগে গিয়া গৃহটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

মো। আমার বড় ভয় করিতেছে। প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে।

অ। আমি সঙ্গে থাকিতে তোমার কোনও ভয় নাই।

কথা কহিতে-কহিতে তাহারা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আম্র, কাঁটাল, কুল, লিচু, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতির বৃক্ষের বাগান। বৃক্ষ সমুদয় খুব বড়-বড় হইয়াছে। তাহাদিগের চারাবস্থায় নিম্নস্থ জমি পাইট হইত, এক্ষণে বৃক্ষটি বড় হওয়ায়, তথায় আর বহুদিন হইতে পাইট হয় নাই—তলভূমিতে শেওড়া ভাঁট প্রভৃতি আগাছা সমুদয় জন্মিয়া পথ বন্ধুর করিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটা পুষ্করিণী আছে, কিন্তু সে বহুদিনের সংস্কারাভাবে পানা ও শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—এই বাগানের বৃক্ষাবলীর গলিতপত্র পচিয়া তাহার জল জীব-মাত্রেরই অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। একটি সামান্য ইষ্টকালয় ছিল—যখন প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন সেই সামান্য দুইটা কুঠরিতেই সুন্দর শোভা ছিল, এখন বহুদিনের অসংস্কৃতাবস্থা বলিয়া বৃদ্ধা মানুষের দন্তের ন্যায় তাহার ইষ্টকরাশির মূল পর্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে—খাঁজে-খাঁজে অশ্বত্থ-চারা জন্মিয়াছে। আর গৃহের মধ্যে চর্মচটিকাকুল একচেটিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছে। ফলকথা, রামহরিবাবু শখ করিয়া যখন এই উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তখন ইহার শোভা-সৌন্দর্য সকলই ছিল, এখন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তৎপুত্র এখন বাগানের মালিক। ফলভোগ করা ভিন্ন, তিনি ইহার সৌন্দর্যোপভোক্তা নহেন, কারণ তিনি মুনসেফি করেন—আশ্বিন মাসে পূজার সময় মাত্র বৎসরে একবার বাড়ি আসেন, সুতরাং ইহার অন্য কোনওরূপ মেরামত আদি হয় না।

এবম্ভূত দুরধিগম্য ঘনান্ধকারময় বাগানে দম্পতিযুগলে প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকারের দুর্ভেদ্য জমাট, কোনও বৃক্ষে খদ্যোতিকাকুল ঝাঁক বাঁধিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে, কোথাও বা এক-একটা উড়িয়া উড়িয়া বাগানের আলোক দর্শনেচ্ছার সাধ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। অমরনাথ উদ্যানপ্রান্তে পৌঁছিয়া একটু দাঁড়াইল—পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া হস্তস্থিত লণ্ঠনটা জ্বালিল। সেই আলোকে-পথ দেখিয়া উভয়ে ধীরে-ধীরে বাগানের সেই অসংস্কৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান বিষণ্ণ-হৃদয় দম্পতি, সেই ভয়াবহ উদ্যান, সেই অন্ধকারময়ী নিশীথে বিনিদ্র বসিয়া প্রেম-ভালবাসা, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার কথা কহিতে লাগিল।

সহসা বাহির হইতে কে অনুচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, 'অমর আসিয়াছ?'

অ। আজ্ঞা হাঁ, আসিয়াছি, আপনি ঘরে আসুন।

সে আসিল, সে গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল গৃহ-প্রবেশ করিল। গৃহে লণ্ঠনের মৃদু আলো

BanglaBook.org

জ্বলিতেছিল, গোবিন্দলালকে গৃহ-প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া মোহিনী এককোণে সরিয়া গেল।

অমর বলিল, 'আমাদের বড় ভয় করিতেছিল। আপনি আসাতে একটু সাহস হইল।'

গো। ভগবান ভয় নিবারণ করিলেন।

অ। ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করেন, কিন্তু তাহার উপলক্ষ থাকে—আমাদের আশ্রয়ের উপলক্ষ বুঝি আপনি।

গো। তোমরা আসিয়াছ, কেহ জানিতে পারিয়াছে কি?

অ। কেহ না।

গো। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাতাদি হয় নাই?

অ। না। যে অন্ধকার! এরূপ পাড়া-গাঁয়ে, এত রাত্রে এ-অন্ধকারে কি জনমানব পথ চলে?

গোবিন্দলাল বলিলেন, অমর! তোমার স্ত্রী কি একটু এই ঘরে একা থাকিতে পারিবেন না, তুমি আমার সঙ্গে দণ্ড-দুইয়ের জন্য মতিমালার কাছে যাইতে।'

অ। মতিমালা কোথায়? গ্রামের মধ্যে কি?

গো। না, এই বাগানের নিচের নদীতে মাছ ধরিতেছে।

অ। তাহার কাছে কেন?

গো। আমি বিবেচনা করিতেছি কি—এইরাত্রেই তোমরা তাহার নৌকায় উঠিয়া চলিয়া যাও, আমি ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি—কলকাতায় গিয়া আমার বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইও। তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া আনিয়াছি, এই চিঠি দিলে তিনি অপত্যবৎ যত্ন করিয়া তোমাদিগকে রাখিবেন। আমার আর তিনদিন পরে ভিন্ন কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ হইতেছে না।

অ। তবে সেই ভালো। আমাদের আর তিনদিন এ-বাগানে অপেক্ষা করা চলিবে না।

গো। আমি বাহিরে যাই, তুমি তোমার স্ত্রীকে একটু এখানে থাকিতে বলো।

গোবিন্দলাল বাহিরে গেলেন। অমরনাথ তাহার স্ত্রীকে সেই ঘরে কিয়ৎক্ষণের জন্য একা থাকিতে অনুরোধ করিলে মোহিনী শিহরিয়া উঠিল—সে বলিল, 'বরং বাড়ি ফিরিয়া গিয়া মামিশাশুড়ীর নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও শত প্রকারে অপমানিত হইব, তথাপি আমি এই গৃহে একা থাকিতে পারিব না।'

কিন্তু অমরনাথ তাহাকে পুনঃ-পুনঃ থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। যখন কিছুতেই মোহিনী তাহার স্বামীকে একা রাখিয়া যাওয়ার পক্ষে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন স্পষ্টত বলিল, 'এই সকল কার্য আমার মনে ভালো বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার হৃদয় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে।'

অমরনাথ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিল, 'কোনও ভয় নাই। গোবিন্দলালবাবু পরম ধার্মিক ও সুশিক্ষিত, তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটুকু অপেক্ষা করো।'

মোহিনী আর এ-অবস্থায় কী করিবে? অগত্যা স্বীকৃতা হইল। অমরনাথ বাহিরে আসিয়া গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আলোটি লইয়া গেলে, আমার স্ত্রী ও-ঘরে থাকিতে পারে না, আমরা কী লইয়া যাইব? আপনি কি অন্ধকারেই আসিয়াছেন?'

গো। না, আমি আলো আনিয়াছিলাম—কিন্তু আলো লইয়া এ-বাগানে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া পথে একটা গাছে লণ্ঠনটি ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অবশ্য তন্মধ্যস্থ আলোটি নিভাইয়াই রাখিয়া আসিয়াছি।

অ। তবে কী প্রকারে যাইব?

গো। ধীরে-ধীরে বাগানের বাহির হইলে বেশ পথ দেখা যাইবে এখন। আর এই তো নদী।

গোবিন্দলাল ও অমরনাথ বাহির হইলেন। মোহিনী ভিতর হইতে গৃহের সেই কীটভুক্ত, ভগ্ন দরজা টানিয়া দিল।

উভয়ে কিয়দ্দূর যাইয়া পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইল। অমরনাথ অগ্রে-অগ্রে যাইতেছিল,

BanglaBook.org

আর গোবিন্দলাল পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, সহসা দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল ভীষণ খড়্গোত্তোলনপূর্বক সজোরে অমরনাথের গলদেশে আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই অমরনাথ ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। কোনওপ্রকার চিৎকারাদি কিছুই করিতে পারিল না। ছিন্নকণ্ঠ দেহটি মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মুণ্ডটি কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাগানের বাহির হইলেন, একটা বৃক্ষান্তরালে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করিতেছিলেন, গোবিন্দলাল তদীয় হস্তে মুণ্ডার্পণ করিলেন।

সন্ন্যাসী মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, কক্ষস্থ বোতল গোবিন্দলালের হস্তে অর্পণ করিলেন, গোবিন্দলাল বোতলের কানায় মদ্য ঢালিয়া অনেকখানি পান করিলেন। বোতলটি সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিয়া, খড়্গ-হস্তে পুনরায় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দলালের সর্বাঙ্গে রক্ত লাগিয়া গিয়াছে—নরহত্যা ও সুরাপানজনিত চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মস্তকের কেশরাশি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—তিনি সেই গৃহ-সন্নিধানে গমনপূর্বক দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন 'ও গো! শীঘ্র দুয়ার খোলো।'

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে দুয়ার খুলিতে না বলিয়া, গোবিন্দলাল বলে কেন? সে দুয়ার খুলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'শীঘ্র দুয়ার খোলো। বিশেষ দরকার।'

মোহিনী কথা না-কহিয়া পারিল না। বলিল, 'আমার স্বামী কোথায়? তিনি কি আপনার সঙ্গে আসেন নাই?'

গো। হাঁ, তিনিও আসিতেছেন, তুমি শীঘ্র দুয়ার খোলো, বিশেষ দরকার আছে।

মো। আমার বড় ভয় হইতেছে, আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেই আমি দুয়ার খুলিয়া দিব।

গো। আমাকে অবিশ্বাস! এই মুহূর্তে দুয়ার না খুলিলে তোমার স্বামীর সমূহ বিপদ।

মোহিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে দুয়ার খুলিয়া দিল। গোবিন্দলাল অতি দ্রুত গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। একি দৃশ্য! গোবিন্দলালের এ কী রাক্ষস-মূর্তি! হায় তবে কি মোহিনীর একমাত্র অবলম্বন অমরনাথ নাই?

মোহিনী চিৎকার করিতে যাইতেছিল, গোবিন্দলাল খড়্গোত্তোলন করিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 'চিৎকার করিয়া ফল নাই, এখানে চিৎকার করিলে, কেহ শুনিতে পাইবে না।'

মোহিনী স্থিরভাবে দাঁড়াইল। তাহার মস্তকের কেশদাম খুলিয়া পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িল। অসাবধানে বক্ষের বসন বক্ষবিচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চক্ষুদ্বয় জলভরে নম্র হইয়া পড়িল, গৃহস্থিত লণ্ঠনের সেই মৃদু আলোকে গোবিন্দলাল দেখিলেন, কামমোহিনী মোহিনী মূর্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। একবার সে-কঠোর হৃদয়ও যেন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

মোহিনী বলিল, 'তুমি কি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ? আমার নিকট মিথ্যা বলিও না। আমি অসহায়া রমণী, আমি তোমার কী করিতে পারিব?'

গোবিন্দলাল কহিলেন, 'হ্যাঁ, তাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি।'

মো। কেন, তিনি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছিলেন? কেন এ-সমস্ত ছলনা করিয়া তাঁহাকে এই ভীষণারণ্যে আনিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলে?

গো। তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই। আমি তাহা বলিব না।

মো। আমার রূপই কি তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে? তুমি কি আমার রূপে মজিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমাকে লাভ করিবার আশা করো?

গো। না।

মো। তবে কী?

গো। আমি বলিব না!

মো। আমাকে এখন কী করিবে?

BanglaBook.org

গো। তোমার স্বামী যে-পথে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই পথে পাঠাইব, এই খড়্গে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিব।

মো। আমরা বড় কষ্টে তোমার শরণ লইয়াছিলাম, দেবতা ভাবিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমাদিগকে হত্যা করিয়া কী সুখ পাইলে, কোন অভীষ্ট তোমার পূর্ণ হইবে?

গো। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা বলিব না, তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মো। আমাকে খুন করিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন জীবন। তোমার স্ত্রী নাই—আমাকে লইয়া কলিকাতায় চলো, দুই জনে তথায় সুখে বসতি করিব।

গো। আমি আমার খেঁদুকে যেমন দেখি, আর কাহাকেও তেমন দেখি না—খেঁদুর জন্যই আমার সকল কার্য।

গোবিন্দলাল আর বিলম্ব করিলেন না। সজোরে মোহিনীর কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। কিন্তু খড়্গের ধারদিক না লাগিয়া উল্টাইয়া গেল, তাহার পশ্চাৎদিক মোহিনীর কণ্ঠদেশে লাগিয়া পৃষ্ঠদেশে লাগিল, সে আঘাতে মোহিনী মাটিতে পড়িয়া গেল। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, 'নরাধম। ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইবি। আমি সতী; সতীর রত্ন কাড়িয়া লইলি—নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিলি, বড় আশায় তোর শরণাগত হইয়াছিলাম, ভালোরূপেই শরণাগতের আশ্রয় দিলি। আমি বাঁচিতে চাহি না,—তোর সঙ্গে যে কলকাতায় যাইতে চাহিতেছিলাম, তোকে ভালোবাসিতে নহে—প্রতিহিংসানল নির্বাপিত করিতে। আমি পুলিশে তোকে ধরাইয়া দিতাম। সময় দিলি না—কিন্তু ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়া গেলাম; অবশ্যই—।'

গোবিন্দলাল আর সময় দিলেন না, তাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ এবার সজোরে সমভাবে মোহিনীর কণ্ঠদেশে আঘাত করিল। দেহ হইতে কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন হইল, ত্বরিত গতিতে মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন এবং সন্ন্যাসী যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গিয়া তাঁহার হস্তে মুণ্ডার্পণ করিলেন। শবদেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল রক্তাক্ত বস্ত্রাদি সমুদয় নদীতীরে পুঁতিয়া রাখিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান-পূর্বক গৃহে গমন করিলেন।

বারো

প্রভাতকালে সন্ন্যাসী আসিয়া গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোবিন্দলালের তখন মদ্যের অবসন্নাবস্থা, তাঁহার মনটা তখন তত ভালো ছিল না। সন্ন্যাসী আসিয়া কিঞ্চিৎ কারণবারি প্রদান করিলে, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন এবং সুরার উত্তেজনাক্রিয়া আরম্ভ হইলে, গোবিন্দলাল সুস্থতানুভব করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আর-একটি মুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের সাধনারম্ভ হইতে পারে।'

গো। আজি বোধহয় পুলিশ আসিতে পারে।

স। হাঁ, মানুষে শবদেহ দেখিতে পাইলেই থানায় সংবাদ দিবে।

গো। মনে-মনে এক-একবার ভয়ও হয়, হয়তো-বা ধরা পড়িয়া শেষে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়।

স। দেবোদ্দেশে হত্যায় পাপ নাই, সুতরাং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

গো। আমাদের গুরুদেব সেদিন বলিয়াছিলেন, যাহা পাপ—তাহা চিরকাল এবং সর্বত্রই পাপ; চিরদিনই অকল্যাণকর। পাপে কখনইই শান্তি এবং সিদ্ধি নাই।

স। তাঁহারা একদেশদর্শী। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো। অধিক দিন গিয়াছে, অল্প দিন

BanglaBook.org

বাকি আছে, সত্বরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

পাপে যখন মানুষ মজিয়া পড়ে, তখন আর তাহার বিবেক-চৈতন্য আদৌ থাকে না। প্রথমে মজিবার সময়, মধ্যে-মধ্যে যে-অনুতাপ উপস্থিত হয়, ক্রমে-ক্রমে অধিকরূপে মজিয়া বসিলে, ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করিয়া সে আত্মগ্লানিও কমিয়া যায়। গোবিন্দলালেরও তদ্রূপাবস্থা, তাহার হৃদয়ে আগে যে-আত্মগ্লানির বহ্নি মধ্যে-মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত, এখন আর তাহা নাই—এখন সে-হৃদয় পাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'গ্রামে পুলিশ আসিয়া পড়িলে আর মুণ্ড সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।'

স। আমি আর তোমার সহিত অধিকতররূপে ঘনিষ্ঠতা রাখিব না, তুমিও একটু সতর্কতাবলম্বন করিয়া থাকিও। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, সাধনার দিন অতি সন্নিকট। ইহার মধ্যে আর-একটি মুণ্ড চাই।

গো। পুলিশ গ্রাম হইতে না চলিয়া গেলে, কেমন করিয়া কী হইবে?

স। দুই-দুইটা খুন, তাহারা কি শীঘ্র গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে?

গো। দুই-তিনদিনের অধিক থাকিবে না।

স। দুই-তিনদিনেই কি তদন্ত পরিসমাপ্ত হইবে?

গো। তাহারা অধিক দিন থাকিয়া আর কী করিবে?

স। খুনের কিনারা করিতে না পারিলে উপরওয়ালারা কী বলিবে? এইরূপ খুন পূর্বে আর একটা হইয়া গিয়াছে।

গো। দারোগার রিপোর্ট যাইলে উপরওয়ালারা যদি সন্তুষ্ট না হয়, অন্য কোনও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু বর্তমান তদন্তকারী পুলিশ চলিয়া গেলে, চারি-পাঁচদিন আর বড় কেহ আসিবে না।

স। মায়ের ইচ্ছায় তুমি সিদ্ধিলাভ করো, অদ্য আমি চলিলাম, তোমার সংবাদ পাইলে, আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

এদিকে প্রভাতে উঠিয়া শ্যামাচরণবাবুর স্ত্রী দেখিলেন, অমরনাথ যে-গৃহে শয়ন করিতেন, সে গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ। গৃহমধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, তাহাদের জিনিসপত্র সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল কয়েকখানি কাপড় ও ব্যাগ নাই। অমরনাথের স্ত্রীরও সন্ধান নাই, তিনি বুঝিলেন, তাহারা তাঁহাদিগকে না বলিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মনে-মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহিরে একটু ভাবান্তর দেখাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া সংবাদটা কর্তাকে প্রদান করিলেন। সংবাদটা শুনিয়া কর্তার চক্ষুতে দুই বিন্দু জল দেখা দিল, আর পূর্বাবস্থা ও পূর্বস্মৃতি মনে জাগরূক হইয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল।

এইসময় গ্রামের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, বাবুদের মাঠের বাগানে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের মুণ্ডহীন মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সকালবেলা সাধু মণ্ডল ও বাবাচরণ ভুঁইয়া লাঙল লইয়া যাইতে প্রথমে দেখিতে পায়, তৎপরে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য চৌকিদারও সেখানে গিয়া তাহা দেখিয়াছে এবং গ্রামের মাতব্বর প্রজাকে ডাকিয়া সেখানে রাখিয়া সংবাদ দিতে থানায় দৌড়িয়াছে।

শ্যামাচরণবাবুও অতি সত্বর এ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মাতৃ-পিতৃহীন তাঁহার পালিত অমরনাথই কি তবে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়াছে? হায়! কেন তিনি গৃহিণীকে ধমক না দিলেন, কেন তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অন্ন একমুঠা খাওয়াইয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান না দিলেন!

BanglaBook.org

তিনি তাড়াতাড়ি বাবুদের বাগানে গমন করিলেন। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। একটা বৃক্ষতলে মুণ্ডহীন পুরুষ-দেহ—আর সেই বাগান-মধ্যস্থ ভগ্নগৃহে মুণ্ডহীন স্ত্রী-দেহ। পুরুষ-দেহটি স্থানে-স্থানে শৃগাল খাইয়া ফেলিয়াছে—স্ত্রী-দেহটি অবিকৃতই আছে।

শ্যামাচরণবাবু প্রথমে ভালো করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কারণ, দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া তিনি উত্তমরূপেই চিনিতে পারিলেন যে, এ-দুইটি দেহই তাঁহার যত্ন-পালিত অমরনাথ ও অমরনাথের স্ত্রীর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় সার্ধ-প্রহরের সময় কয়েকজন কনেস্টেবল সঙ্গে লইয়া সংবাদদাতা চৌকিদারসহ একটা খুব বড় সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগাবাবু আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু আসিয়া প্রথমেই এক হুঙ্কার ছাড়িলেন, বলিলেন, 'গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া খুনের আশকারা করিব।' বলিতে-বলিতে পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া অতি জোরে একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিলেন। যে-দর্শকেরা দর্শন করিয়াছিল, তাহারা ভাবিল, বুঝি ওই কাঠির আগুন জ্বালিয়াই গ্রাম দগ্ধ করিবে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তাহাদের ভ্রম নিবারণ হইল। দেখিতে পাইল, সেই আগুনে চুরুট ধরাইয়া একগাল ধোঁয়া দর্শকদিগের মুখের দিকে ছাড়িয়া দিয়া ধীর পদবিক্ষেপে দারোগাবাবু শবদ্বয়সন্নিধানে গমন করিলেন। শবদেহ দেখিয়া বলিলেন, 'এ কাহার-কাহার দেহ? এবং কাহার কাহার দ্বারা ও কী উদ্দেশ্যে খুন করা হইয়াছে?'

কে তাহার উত্তর দিবে? কেবল শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, 'মৃতদেহ দুইটি আমারই আত্মীয়ের। পুরুষ-দেহটি আমার ভাগিনেয়ের এবং স্ত্রী-দেহটি আমার ভাগিনেয়-বধূর।'

দারোগাবাবু চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, 'তাহা তো বুঝিলাম, ইহাদের মুণ্ড কোথায়? মুণ্ড চুরি কে করিল এবং খুনই বা কে করিয়াছে? যখন তোমার আত্মীয়, তখন এ-সংবাদ রাখা তোমার একান্তই উচিত।'

শ্যামাচরণবাবু কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি যদি সে-সকলই জানিতে পারিতাম, তবে কি আমার স্নেহের ধনেরা ওইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইত?'

দারোগাবাবু তাঁহার সে-উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ শ্যামাচরণকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। শেষে অন্যান্য দর্শকগণের উপরও যথেষ্ট অনুগ্রহ ও আপ্যায়িত করিয়া, শেষে শবদেহ দুইটি গ্রামের মধ্যে লইতে আদেশ দিয়া, স্নানাহারজন্য গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন।

দুই-তিনদিন গ্রাম হুলস্থূল করিয়াও দারোগাবাবু খুনের কোনওরূপ কিনারা করিতে না পারিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া থানায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমনসময় সংবাদ পাইলেন, তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী স্বয়ং এই খুনের তদন্তজন্য আগমন করিতেছেন। কারণ, অল্পদিন মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামে কতকগুলি খুন ও তাহাদের মুণ্ড চুরি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশের দ্বারা তাহার কোনওরূপ অনুসন্ধান হয় নাই।'

সংবাদ পাইয়া দারোগাবাবুর থানায় যাওয়া স্থগিত হইল। তখন অতি ব্যস্তভাবে তিনি গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী মহাশয়ও আজি দুইদিন হইল, এখানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু খুনের কোনও প্রকার আশকারা করিতে না পারিয়া, তিনিও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাত্রিকালে ঊর্ধ্বতন পুলিশ-কর্মচারী মহাশয় গ্রামের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনের ভাব, যদি কেহ গোপনে এই হত্যাদি সম্বন্ধে কোনওপ্রকার আলোচনাদি করে; এবং তাহা শুনিয়া যদি কোনওপ্রকার সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত রাত্রি সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও তাহার কোনওপ্রকার কিছুই জানিতে বা শুনিতে পাইলেন না। নিশিশেষে তিনি অতি বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিতেছিলেন—সেদিন শুক্লপক্ষের নিশি, দশমী কি একাদশী তিথি হইবে। এইমাত্র শশধর

BanglaBook.org

অস্তগত হইয়াছেন, ভাসা-ভাসা অন্ধকার-রাশি জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে—শনশন করিয়া বাতাস বহিতেছিল। সহসা ইংরেজ কর্মচারী মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

তিনি সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি বালিকা দাঁড়াইয়া। বালিকার সমস্ত কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন—সে-সমুদয় স্থল হইতে রুধিরধারা বাহির হইতেছে। মস্তকের চুলরাশি বাতাসে দুলিতেছে—বালিকা বলিল, 'আপনি ইংরেজ; আপনি ভূত মানেন?'

কর্মচারী মহাশয় হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া বলিলেন, 'না।'

বা। আমি ভূত হইয়াছি। আপনি কেন ভূত মানেন না? দেশের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা তো ভূত মানেন। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি আপনার খুনের সন্ধান করিয়া দিতেছি।

ক। ভালো—তাহাই বলো।

বা। গোবিন্দলাল নামক এক ব্রাহ্মণ-যুবক এই গ্রামে বাস করে, সেই এ-সকল খুন করিয়াছে। প্রথমে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া মুণ্ড চুরি করে। তাহারপর আমার মায়ের সহিত প্রণয় করিয়া, আমাকে চুরি করিয়া লইয়া কাটিয়া মুণ্ড চুরি করে—আমি ভূত হইয়া মাকে সমস্ত কথা বলি এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদয় ঘটনা জানাইতে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করি—তিনি নিজ কুকর্ম প্রকাশভয়ে তাহা প্রকাশ করেন না, আমার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে ভীত হইয়া তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে এই দম্পতিকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চাকুরি দিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া, এই বাগানে আনিয়া হত্যা করিয়া মুণ্ড লইয়া গিয়াছে।

ইংরেজ কর্মচারী মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন, ছায়ামূর্তি সেই সমুদয় কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল কী করিবে?'

বা। সে পঞ্চমুণ্ডী করিয়া তদুপরি কালিদেবীর মূর্তি স্থাপন করিয়া সাধনা করিবে।

ক। তাহাতে কী হয়?

বা। নরক হয়। শয়তানে বোঝে—শয়তানের খেলা।

ক। যে-সকল কথা বলিলে, তাহার সাক্ষীআদি মিলিবে?

বা। বড় না। গোবিন্দলাল খুন করিয়া তাহার বস্ত্রাদি যেখানে যেখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছে তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।

ছায়ামূর্তি সন্ন্যাসীর কথা এবং যেখানে-যেখানে গোবিন্দলাল বস্ত্রাদি পুঁতিয়া রাখিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, সমস্ত বলিয়া দিল। তৎপরে বলিল, 'এই মোকদ্দমা জজসাহেবের নিকট উঠিলে, আমি গিয়া সাক্ষ্য দিব, প্রতিহিংসানলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে।'

এই কথা বলিয়া ছায়ামূর্তি শূন্যে মিশিয়া গেল। কর্মচারী মহাশয়, অনেকক্ষণ অবাক হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সে-রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। বিবিধ প্রকারের ভাবনা-চিন্তায় নিশি প্রভাত হইয়া গেল।

ছায়ামূর্তির কথা পুলিশ কর্মচারী মহাশয়ের প্রথমে প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। কাহার না হয়? প্রহেলিকার উপরে বিশ্বাস করিয়া কার্য করিতে তাহার প্রথমত খুব বেশি সাহস হইল না। কিন্তু তথাপি তিনি অন্য সূত্রাভাবে একান্ত অনিচ্ছায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা হেলায় তাচ্ছিল্য ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও উহার পরিসমাপ্তি যারপরনাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। ছায়ামূর্তির কথিত সমস্ত স্থানে সমস্তই পাওয়া গেল।

পুলিশ কোম্পানি এইরূপ হত্যার সূত্র পাইয়া গোবিন্দলাল ও সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। পরবর্তী সেশনে তাহাদিগের বিচার হইল। বিচারে গোবিন্দলাল আত্মদোষ স্বীকার করিলেন, কিন্তু সে-প্রকার সাক্ষী মিলিল না। সন্ন্যাসী দোষ স্বীকার করিলেন না, কিন্তু গোবিন্দলাল তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষী, তথাপি সে দোষী—দুই-একটা সামান্য-সামান্য সাক্ষী তাঁহাদিগের বিপক্ষে যাহা মিলিল, তাহারই বলে জজসাহেব সন্ন্যাসীকে পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইলেন এবং গোবিন্দলালকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা করিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা ও ছায়াদর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী দেশের লোকের মুখে-মুখে আলোচিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংবাদপত্রে লিখিত হইতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার মানিকতলা স্ট্রিটের রামবাগান একটা প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী। এই পল্লীতে নীলিমা নাম্নী একটি বেশ্যা বসতি করে। বেলা দশটা বাজিয়াছে, নীলিমা স্নানাদি করিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এমন সময় একখানা বাঙলা খবরের কাগজ হাতে করিয়া একটি যুবক হাসিতে-হাসিতে তাহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী গো! অত হাসি কেন? হাতে ও কীসের কাগজ?'

যিনি আসিলেন, তিনি একজন অ্যাটর্নি, নামটি ঠিক মনে নাই, হরেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, শ্যামধন কি জ্ঞানেন্দ্রনাথ হইবে।

তিনি তদ্বৎ হাসিতে-হাসিতে সুর করিয়া বলিলেন, 'সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা। তোমার পীরিতের কানাই যে দ্বীপান্তর চলিল। এই পড়ো।'

নী। কে দ্বীপান্তরে চলিল?

আগন্তুক। তোমার গোবিন্দলাল। এই দ্যাখো।

নী। ওমা সে কী!

সে আসিয়া কাগজখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল

আগন্তুক কাগজখানি খুলিয়া গোবিন্দলালের মোকদ্দমা, ভৌতিক সংবাদ ও খুনের কথা পাঠ করিলেন এবং তাহার দ্বীপান্তরের আজ্ঞাও শুনাইলেন। সে-দ্বীপান্তর যাইবার দিন অদ্য, শুক্রবার, এগারোটার সময় আন্দামানগামী জাহাজ খুলিবে। সেই জাহাজেই গোবিন্দলাল জন্মের মতো ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবেন।

নীলিমা মূর্ছিতা হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। আগন্তুক যতটা রহস্য করিয়া নীলিমাকে সংবাদ প্রদান করিলেন, শেষে দেখিলেন, ব্যাপারটা তত সহজ নহে।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমার জ্ঞান হইল, সে চাহিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, 'আমার গোবিন!'

নীলিমা উঠিয়া বসিল। তাহার প্রাণের ভিতর অসহ্য যাতনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'আপনি আমার বন্ধুর কাজ করুন, জন্মের শেষ একবার গোবিনকে দেখান। এখনও সময় আছে—এখনই একখানা দ্রুতগামী গাড়ি ডাকাই, একবার জাহাজের কাছে চলুন—জন্মের শোধ একবার গোবিনকে দেখিয়া আসি।'

বেহারা তখনই গাড়ি ডাকিয়া আনিল। আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া নীলিমা জাহাজের ঘাটে চলিল। তাহারা যখন ঘাটে উপস্থিত হইল, তখন এগারোটা বাজিয়াছে, জাহাজে হুইসেল দিতেছিল। জাহাজ খুলিবার আর বিলম্ব নাই। গোবিন্দলাল বন্দি-অবস্থায় একধারে দাঁড়াইয়া দীন-নয়নে জন্মের মতো জন্মভূমি দর্শন করিতেছিলেন। সহসা তীরে নীলিমাকে দেখিতে পাইলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, 'নীলিমা, জন্মের মতো চলিলাম, আর দেখা হইবে না। হৃদয়ের সদ্বৃত্তি হারাইয়াই এ-পাপ করিয়াছি। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কিন্তু চিরদিন ও-মূর্তি এ-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।'

BanglaBook.org

তারকার মৃত্যু

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

শীতের রাত।

সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে জোর হাওয়া; ঘরের বাইরে পা দেওয়া অসম্ভব।

ঢং-ঢং করে এগারোটা একটু আগেই বেজে গেল 'জুবিলী স্টুডিয়ো'র পেটা ঘড়িটায়।

গঙ্গারাম রাতে স্টুডিয়োর চারদিকে পাহারা দিত; শীতে কাঁপতে-কাঁপতে দরোয়ান বাহাদুরের ঘরের কাছে এসে বলল, এরকম রাত বাবা হামার বাপ চোদ্দ পুরুষে দেখেনি। মানুষ মারার রাত আছে। তুমি ফটক এখনও খুলে রেখেছ কেন বাহাদুর?

বাহাদুরের অবস্থা তখন তার চেয়ে একচুলও সরেশ ছিল না, বৃষ্টি থেকে কোনওরকমে মাথা বাঁচিয়ে সে নিজের ছোট ঘরটার ছাঁচের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল; ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে বলল, না খুলে রেখে উপায় কী? শেখরবাবু রাত অবদি আজ কাজ করছেন—।

গঙ্গারাম কণ্ঠ বিকৃত করে বলল, তোমরাও যেমন, তেমনিই হইয়েসে ওই শেখরবাবু। হামি যদি 'পিলে' করতুম তো কবে শেখরবাবুর নাকে এক ঘুষি দিয়ে সব তোড় দিতুম—।

বাইরে থেকে একখানা মোটর চারদিকে জল ছিটোতে-ছিটোতে ফটকের ভেতর এসে ঢুকল। গাড়ির ভেতর থেকে সুন্দর একটি নারীর মুখ বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, বাহাদুর নাকি? কেউ আছে এখন স্টুডিয়োতে?

বাহাদুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে উত্তর দিল, শেখরবাবু একা কাম করছেন হুজুর। গাড়ি ভেতরেই নিয়ে যান।

অলকা হেসে উঠে বলল, যা রাত্তির—একলা ঢুকতেও যেন ভয় করে। কিন্তু এমন পোড়া ছাই ভুল! কাল যে নাগরমলবাবুর কাছে নতুন পার্টটা বলতে হবে, তা একেবারে ভুলেই গেছলুম, তাই এমন রাতেও লেপের মায়া ছেড়ে উঠতে হল—।

গাড়ি অন্ধকারের মাঝে স্টুডিয়োর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। বাহাদুর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল, অদূরে ভূতের মতো সুবৃহৎ বাড়িটার দোতলায় উঠে গিয়ে, অলকা তার নিজের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাহাদুর তার ঘরে ঢুকে তেলের দাগ-ধরা খাতাখানা টেনে বার করে লিখল :

অলকাদেবী—১১-১৫ মিনিটে স্টুডিয়োতে আসেন।

লিখল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ তার খচখচ করতে লাগল, অলকা যা বলে গেল, সব সত্যি কি না।

ফটকের বাইরে থেকে আবার ডাক এল, বাহাদুর, দরজাটা খুলে দাও—।

গলা শুনেই বাহাদুর বুঝল, আগন্তুক বিনয় মজুমদার—ডিরেক্টার শেখরনাথের সহকারী। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দরজাটা খুলে ধরতেই, বিনয় একছুটে একেবারে বাহাদুরের ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, শীতের দিনে রাতে এমন দুর্যোগ কখনও দেখেছ বাহাদুর? শেখরবাবু কি এখনও কাজ করছেন নাকি?

বোধহয় করছেন। তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখিনি তো হুজুর।

বিনয় অসন্তোষের সঙ্গে বলে উঠল, পাগলার পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল। তাড়াতাড়িতে 'সিনারিও স্ক্রিপ্ট'টা আবার 'সেটে'ই ফেলে গেছি বোধহয়। কাল বই শেষ করবে, কাজেই আজ রাতে খাতা না পেলে আবার তালে তাল দিতে পারব না। দেখি কর্তা কখন আবার শেষ করেন আজ—।

স্টুডিয়োতে খেয়ালী বলে শেখরনাথের দুর্নামের অন্ত ছিল না। কখনও-কখনও সে একলা কাজ করত; তখন কারও, এমনকী তার সহকারীরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

BanglaBook.org

সিগারেটের বাকি অংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে অন্ধকারের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যাবার আগে সে যে তার খাতার দিকে আড়চোখে চেয়ে গেল, সেটা বাহাদুরের দৃষ্টিতে যেমন এড়ায়নি, তেমনই তার গল্পটাও বাহাদুর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। তবু সে একটু খুশিই হল, কারণ সে জানত বিনয় অলকাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। খাতাতে সে আবার লিখল ঃ

বিনয় মজুমদার—১১-৩০ মিনিটে স্টুডিয়োতে আসেন।

আধঘণ্টাটাক পর আর-একবার রোঁদ সেরে গঙ্গারাম তার কাছে এসে হাজির। আসর জমানো ভাবে সে বলল, চাকরি না ছেড়ে উপায় নেই বাহাদুরজি! এমন রাতে সব দানা-পিরেত ঘুমতে বেরোয়। এক্ষুনি হামি একটাকে পিছনের মাঠটায় চলে বেড়াতে দেখলুম।

বাহাদুর বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল, দানা-পিরেত সব তোমার মাথায় চলাফেরা করছে।

গঙ্গারাম প্রতিবাদ করে বলল, ঠাট্টা নয় বাহাদুর, হামি স্পষ্ট দেখলুম, একজন মেয়েলোক ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিলাসবাবুর ঘরের দিকে চলেছে দেখলুম।

বাহাদুর একটু ইতস্তত করে বলল, অলকাদেবী ছাড়া আজ রাতে স্টুডিয়োতে আর কোনও মেয়েলোক আসেনি, তুমি তা জানো। অলকাদেবীও দেখছি তাঁর ঘরেই বসে খাতা পড়ছেন। ঝড়-জলের রাতে অনেকরকম ভুল দেখে লোকে। তোমারও তাই হয়েছে।

গঙ্গারাম তার কোনও যুক্তিই মানতে রাজি নয়; বলল, আচ্ছা, তাই যদি হবে, তা হলে আমি যখন তিন নম্বর স্টুডিয়োর কাছে গেছি, শেখরবাবু সেখানে কাম করছেন—দেখি না দপ-দপ করে সব আলো বুতে গেল আর অমনি তিন নম্বরের পাশেই যে ফুলগাছের ঝোপ আছে তার আড়াল থেকে একটা পিরেত তিন নম্বরের দিকে ছুটে গেল। ভাবলুম কি, কিসের জন্যে বাতি বুতে গেল দেখি; কিন্তু তিন নম্বরের কাছে পা দোব কি—শেখরবাবু বাঘের মতো চিল্লোতে লাগলেন যেন স্টুডিয়োর ভেতর না ঢুকি। আলো বুতে গেছে বলতে তিনি চিল্লে উঠে বললেন, তাঁর ভি আঁখ আছে। ঘুমকে চলে এলুম।

বাহাদুর হেসে বলল, ডর নেই। পিরেত আর কেউ নয়, বিনয়বাবু। খাতা নিতে তিন নম্বরের কাছে গেছেন।

গঙ্গারাম মাথা নেড়ে বলল, তভ্ভি হামি বুঝবে না। অন্দর-বাহার সব বাতি বুতল কেন?

বাহাদুর উত্তর দিল, বাইরের বাতি ঝড়-জলে হয়তো পুড়ে গেছে, আর ঠিক সেই সময় শেখরবাবু ভেতরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক এই সময় ভেতর থেকে একখানা মোটর গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। বাহাদুর তাড়াতাড়ি ফটকের দরজা দুটো খুলে ধরে সেলাম ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি চালাচ্ছিল যে, সে প্রাণীটি বলল, চললুম বাহাদুর! এবং তার পাশেই যে লোকটা বসেছিল সে হাত তুলে বলল, এমন দুর্যোগের রাতেও তোমাদের অনেকখানি কষ্ট দিলুম বাহাদুর!

মোটর বাইরে বেরিয়ে যেতে গঙ্গারাম ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, তাজ্জব ব্যাপার বাহাদুর! বাদলার রাত বলে কি আমাদের মতো গরীব আদমিদের সঙ্গে উনি বাতচিজ করলেন?

কে?

শেখরবাবুর বাত বলছি। কোনও আদমির সঙ্গে কি উনি বাতচিজ করেন? হামার সঙ্গে কিন্তু বাবা—।

বাহাদুর কোনও জবাব না নিয়ে তার খাতায় লিখল ঃ

শেখরবাবু আর বিলাসবাবু—১২-১৫ মিনিটের সময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান।

গঙ্গারাম আবার বলল, চলিয়ে যাক, একটু চাপিয়ে লেবে। বড় কড়া শীত আছে।

বাহাদুর প্রশ্ন করল, তুমি আলো ঠিক করতে যাবে না?

BanglaBook.org

গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল, দেখা যাক।

জুবিলী স্টুডিয়ো তখন সারা ভারতবর্ষে সেরা ছবি প্রস্তুতের জন্যে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। সুবৃহৎ বাগানের ভেতর চারটি স্টুডিয়ো। স্টুডিয়োর পেছনে অনেকটা জায়গা পড়েছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলবার জন্যে। আলোর বন্দোবস্ত থাকলেও সে-স্থানটা সচরাচর অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই পথ দিয়েই গুদাম-ঘরে নতুন আলোর খোঁজে যাবার সময় অকস্মাৎ গঙ্গারামের কানে ভেসে এল আর্তকণ্ঠ। কোনও স্ত্রীলোক যেন ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। সে-শব্দে দুর্যোগময়ী নিশীথিনী যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

গঙ্গারাম স্থাণুর মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

২

পরদিন সকালের দিকে শিবানী তার বুড়ো বাপের সঙ্গে স্টুডিয়োতে এসে যখন পৌঁছল, তখনও কর্তারা কেউ আসেনি।

স্টুডিয়োর একজন ওপরওয়ালার নামে শিবানীর চিঠি ছিল একখানা—যদি কোনও কাজের সন্ধান মেলে।

একজন অল্পবয়স্ক চাকর তাদের নিয়ে স্টুডিয়োর চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখিয়ে বেড়াতে লাগল।

শিবানীর বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। সমস্তটাই তার কাছে যেন ইন্দ্রজালের মতোই মনে হচ্ছিল।

তার বাপ অক্ষয় তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, এখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? চল, ছেলেটি আমাদের একটা 'ডামি' দেখাবে বলছে।

শিবানীর স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি; বলল, 'ডামি' কী বাবা?

অক্ষয়ের বিদ্যার যতটা পুঁজিপাটা ছিল, তাই থেকেই বলল, নকল মূর্তি—যেখানে এক্টোররা পেরে ওঠে না, সেখানেই নকল মূর্তি দিয়ে ছবি তোলা হয় কিন্তু তা বলে আসল-নকল চিনতে পারবি না।

বালক-ভৃত্য নুটু তাদের তিন নম্বর স্টুডিয়োর ভেতর নিয়ে এল। দু-নম্বর সেটের পর্দাটা সরাতে-সরাতে বলল, দেখেই যেন চিৎকার করে উঠবেন না। মনে হবে, সত্যিই লোকটা বুঝি মারা গেছে।

সেটের ভেতরটা অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন; তারই মাঝে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়া মূর্তিটার পানে তাকিয়ে শিবানী শিউরে উঠল। বলল, কিন্তু—কিন্তু সারা গা-ময় রক্ত আর দেখতেও—

নুটু গর্বভরে বলল, ওটা রক্ত না, তবে ছবিতে রক্তের মতো দেখাবার জন্যে আমরা ব্যবহার করি।

অক্ষয় আর শিবানী একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

মূর্তিটার মুখে কী সুগভীর আতঙ্কের ছায়া! শুধু আতঙ্ক নয়, দুর্বার বিস্ময় সেই স্থিরদৃষ্টির মাঝে এমনই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল যাতে মনে হয়, নিজের এই ভাগ্যের জন্যে লোকটি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার দেহের কাছেই পড়েছিল রক্তাক্ত ছোরা একখানা। মূর্তিটির প্রসারিত হাতের মাঝে ছিল আর-একটা ছোরা।

শিবানী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক বলছ নুটু, ও সত্যিকার লোক নয়?

BanglaBook.org

নুটু ঠোঁট উল্টে বলল, আপনি কি বলতে চান, সেটের মধ্যে আমরা মড়া ফেলে রাখি? বিশ্বাস না হয়, আপনি কাছে গিয়ে দেখুন না; দেখবেন মোমের তৈরি।

শিবানী আস্তে-আস্তে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে হাত দিল। ঠিক সেই সময় নুটুও মূর্তিটার পায়ের দিকে সজোরে একটা পদাঘাত করল।

মুহূর্তে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি আতঙ্কে যেন ঠিকরে পড়ার মতো হল।

শিবানী ছুটে এসে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, বাবা, বাবা, সত্যিকার মানুষ গো! ওরে বাপরে! চলো পালাই—

নুটু কিন্তু তাদের আগেই ছুটতে আরম্ভ করল। স্টুডিয়োর বাইরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল সে নাগরমল সিন্ধিয়ার বিপুল উদরের ওপর।

নাগরমল তাকে ধরে ফেলে বজ্রকণ্ঠে বলল, আরে রহো-রহো বাচ্চা! ঘোড়দৌড় লাগিয়ে দিয়েস যে? কী হয়েছে?

নুটু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, মরে গেছে। আমি ছুঁয়ে দেখেছি হুজুর, একেবারে মরে গেছে—

নাগরমল জুবিলী স্টুডিয়োর প্রেসিডেন্ট। পদের আভিজাত্যটা তার নেহাৎ কম ছিল না। নুটুর পিঠে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে বলল, আরে আমি বলছি, ঘাবড়াও মৎ বেটা! কী হয়েসে সব খুলে বলো।

নুটু বলে উঠল, মরে গেছে হুজুর, ডামিটা মরে গেছে!

নাগরমল ধমক দিয়ে উঠল, তিন বরষ হামার স্টুডিয়োতে কাম করছ, আর এখন বলছ, ডামি মরে গেছে! যাও, অফিসে গিয়ে মাইনে চুক্তি করে নিয়ে সরে পড়ো।

নুটু চঞ্চল হয়ে বলল, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না হুজুর, আমরা ডামিই মনে করেছিলুম, কিন্তু ছুঁয়ে দেখলুম—সত্যিকার লোক।

নাগরমল ভ্রূ কুঁচকে বলল, তুমি কি বলতে চাও, হামার স্টুডিয়োতে মরা লোক পড়ে আছে?

হ্যাঁ, হুজুর।

নাগরমল নুটুর দুই কাঁধে হাত দুখানা রেখে বলল, খবরদার! তুমি গিয়ে চুপটি করে আমার অফিসে বসে থাকো। বাইরের কোনও লোকের কানে যেন এ-খবর না যায়। আর আমি দুজন লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছি তিন নম্বর স্টুডিয়োতে পাহারা দিতে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় সেখানে। তোমার মুখ থেকে যদি একটা কথা বেরোয়, তা হলে দফা নিকেশ করে দোব মনে থাকে যেন।

৩

নাগরমল তার অফিসে বসেছিল। কত চিন্তাই তার মাথার ভেতর দিয়ে খেলে যাচ্ছিল। হয়তো এই হত্যা উপলক্ষ্য করেই তার এত সাধের ব্যবসার আজ সব শেষ!

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্রিজনাথ। বেঁটে ছোটখাটো লোকটি। উত্তেজনায়, আবেগে সে থরথর করে কাঁপছিল; বলল, নাগরমল, আমাদের তিন নম্বর স্টুডিয়োতে খুন!

নাগরমল আর ব্রিজনাথ দুজনেই, শোনা যায়, গঙ্গার ধারে কোনও ইটখোলায় কাজ করত। ব্রিজনাথই প্রথম এই স্টুডিয়োতে চাকরি জুটিয়ে আসে। পরে নাগরমলকে তার অধীনে একটা কাজ দিয়ে আনে। নাগরমলের ব্যবসা-বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, তাই ধীরে-ধীরে সে একসময় স্টুডিয়োর সর্বময় কর্তা হয়ে জেঁকে বসে। ব্রিজনাথ আজ তারই অধীনে একজন বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র।

BanglaBook.org

নাগরমল তার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে এসে বসো, গাধা কোথাকার! মাথায় তোমার একটু যদি ঘিলু থাকে। খুনের কথা তুমি জানলেই বা কী করে?

ব্রিজনাথ যেন আকাশ থেকে পড়ল। অসহ্য বিস্ময়ে বলে উঠল, আমি স্টুডিয়োর প্রোডাকশন ম্যানেজার, আর আমি জানব না? স্টুডিয়োতে কী হয়-না-হয়, সেটা আমার জানা দরকার নয় তুমি মনে করো?

নাগরমল মুখ বিকৃত করে বলল, খুব কাজের লোক তুমি! আর চিৎকার করে কাজ নেই; বাইরে জানাজানি হলেই বুঝতে পারছ তো কী অবস্থা হবে! বাইরের লোকের নানারকম মন্তব্য আর খবরের কাগজওলাদের টিপ্পনী ব্যবসার দফাটিকে একেবারে খেয়ে দেবে!

ব্রিজনাথ বলল, পুলিশে তো একটা খবর দেওয়া দরকার।

নাগরমল টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বলে উঠল, থামো, থামো, তোমার আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, আমি দিয়েছি পুলিশে খবর। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত তুমি দেখো কেউ যেন তিন নম্বর স্টুডিয়োতে না ঢোকে বা খুন নিয়ে কোনও হইচই না করে।

ডিরেক্টার শেখরনাথের গাড়ি এসে যখন স্টুডিয়োর ফটকের সামনে দাঁড়াল, দরজা দুটো তখন বন্ধই ছিল। ইলেকট্রিক হর্নটা তীব্র শব্দে বেজে উঠতেই দরোয়ান ছুটে এসে দরজা দুটো খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল, হুজুর যে আজ এত সকালেই আসবেন আশা করিনি!

শেখরনাথ কঠিন কণ্ঠে বলল, আমি যখন আসব, ঠিক তখনই আশা করবে আমায়—এক মিনিট আগেও না, পরেও না।

মোটরখানা ঢুকে সোজা তার বসবার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই শেখরনাথ নেমে ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল : শেখরবাবু নাকি?

শেখরনাথ জবাব দিল, হ্যাঁ মিস্টার সিন্ধিয়া। শুনুন, আজকেই আমার ছবি শেষ করতে চাই—

নাগরমল বলল, তার আগে সোজা একবার আমার অফিসে আসুন।

একটুখানি স্তব্ধ থেকে শেখরনাথ কঠিন কণ্ঠে বলল, আমি আমার অফিসে আছি।

তার মানে শেখরনাথ যেন বলতে চাইল, তুমি প্রেসিডেন্ট হতে পারো; কিন্তু জানো বোধহয়, খুশি না হলে আমি কারও অফিসে যাই না। দরকার হলে তোমরা আমার এখানে স্বচ্ছন্দে আসতে পারো।

কিন্তু আজকে ফল ফলল বিপরীত। নাগরমল গর্জন করে উঠল, আপনি জানেন আমি আমার অফিসেই বসে আছি। আপনাকে এখানে আসতে হবে, খুব জরুরি দরকার। কথাশেষে সে ফোন রেখে দিল।

শেখরনাথ গুম হয়ে হাতের দস্তানাটার দিকে তাকিয়ে রইল। শীতকালে বরাবরই সে সাদা দস্তানা ব্যবহার করত। কোনও জটিল দৃশ্য কীভাবে নেওয়া হবে—ভাবতে-ভাবতে কত দস্তানাই যে ছিঁড়ে ফেলত, তার আর ইয়ত্তা নেই। এটা তার প্রায় অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছল।

একটু পরেই লিকলিকে ছড়িটা তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুকোমল ঘাসে-মোড়া লনটুকু পার হয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োর ভেতর ঢুকতে যাবে, দরজাগোড়ায় বাধা দিল তারই অধীনস্থ একজন প্রপার্টি বয়। বলল, আমার ওপর হুকুম আছে হুজুর, কাউকে স্টুডিয়োর ভেতর ঢুকতে না দেবার—

শেখরনাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাতের বেতটা দিয়ে ছেলেটিকে কয়েক ঘা আঘাত

BanglaBook.org

করে গর্জন করে উঠল, সরে দাঁড়া। তোর তো খুব আস্পর্ধা হয়েছে দেখছি—

এই সময় সেটের ভেতর থেকে গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বলল, ছেলেমানুষ পেয়ে খুব তো ঘা-কতক দিলেন। কিন্তু ওর দোষ কী? কর্তার হুকুম, আমরা কিছুতেই ঢুকতে দিতে পারব না।

পাঁসনেটা নাকের ওপর লাগিয়ে শেখরনাথ স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গারামের মুখের পানে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা, তোমার ব্যবস্থা আমি করছি।

যে-পথে সে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরল।

এই নিন আপনার কনট্রাক্ট। আজ থেকে আমাদের মধ্যে সব সম্বন্ধ শেষ। শেখরনাথ কারও হুকুমের চাকর নয়।

নাগরমল টেবিলের ওপর থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো জড়ো করতে-করতে বলল, আপনাকে রুপেয়া দিয়ে রেখে, আপনি কি বলতে চান, দরকার-টরকার পড়লে আপনার অফিসে গিয়ে আমাকে মোলাকাৎ করতে হবে?

শেখরনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলল, সেকথা হচ্ছে না, আমাকে আমার সেটে ঢুকতে না দেবার কী মানে? আপনি জানেন, আজকে আমার ছবি শেষ করবার দিন। আর এই ছবির ওপর আপনার কোম্পানির ভাগ্য কতখানি নির্ভর করছে? তা সত্ত্বেও শেখরনাথকে সাধারণ চাকর-বাকরের মতো অপমান করানোর সাহস হল আপনার?

নাগরমল জবাব দিল, হামি তো আপনাকে ফোনে সোজাসুজি আমার অফিসেই আসতে বলেছিলুম। লেকিন আপনি না শুনে সোজা আমার অফিসের সামনে দিয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োর দিকে চলে গেলেন। হামি বেয়ারা পাঠিয়ে আপনাকে বারণ করতে পারতুম, কিন্তু ভাবলুম, একটু শিক্ষা হোক আপনার।

শেখরনাথ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, থামান আপনার লম্বা বক্তৃতা। আপনার এরকম ব্যবহারের কারণটা কি বলবেন আমায়?

নাগরমল টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কারণটা বলবার জন্যেই তো ডেকেছিলুম আপনাকে। আপনার সেটে একটা মড়া পড়ে আছে, যাবেন না ও-সেটে এখন।

শেখরনাথ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে নাগরমল আবার বলে উঠল, পুলিশ না আসা পর্যন্ত ওখানে কেউ আর ঢুকতে পাবে না। আপনিও এ-নিয়ে কোনও চেঁচামেচি করবেন না —এই আমার হুকুম। এখন যেতে পারেন।

নড়বার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে শেখরনাথ সংযত কণ্ঠে বলল, আপনার অ্যাকটিন থামিয়ে ব্যাপারটা আমায় ভালো করে খুলে বলুন; কে মারা গেছে?

বিলাসবাবু—বিলাসবাবু—।

বিলাস! শেখরনাথ চিৎকার করে উঠল, আর-একদিন হলেই যে অন্যের ছবি শেষ হয়ে যেত! এত বড় অকৃতজ্ঞ সে? দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আমার সর্বস্ব সাধনা সফল করে তোলবার চেষ্টা করছি—।

নাগরমল ঈষৎ কোমল কণ্ঠে বলল, আমি যতদূর শুনেছি তাতে বাকিটুকু না নিলেও ছবির কোনও মারাত্মক ক্ষতি হবে না শেখরবাবু।

শেখরনাথ হতাশ কণ্ঠে বলল, এখন আর বাদ না দিয়েই বা উপায় কী? তবে একজনের জন্যে আর সব নষ্ট করতে চাই না আমি। ওই সেটে আর সবায়ের যে সীন আছে, আজই আমি তা শেষ করতে চাই।

নাগরমল একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আজও ওই সেটে কাজ করবেন আপনি?

BanglaBook.org

আপনার কি একটু মায়া-দয়া নেই?

শেখরনাথ বলল, ভাবপ্রবণতাকে আমি কোনওদিনই প্রশ্রয় দিই না। আর তা ছাড়া একজন অভিনেতা মরেছে বলে আমাদের কাজ বন্ধ রাখার কোনও মানেই হয় না। আজ যে জীবিত, কাল সে মৃত—।

নাগরমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি মানুষ নন। কিন্তু আপনি যতই বলুন, হামি কিছুতেই আজকে ও-সেটে আপনাকে কাজ করতে দেবে না।

আমিও দোব না। —বলে অপরিচিত একজন ঘরে প্রবেশ করল।

৪

একজন অপরিচিত লোককে এভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে নাগরমলের আত্মসম্মানবোধ আবার জেগে উঠল। টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বলল, না বলে কয়ে আমার অফিসে ঢোকবার অনুমতি কে দিলে আপনাকে? নাম কী আপনার? দরকারই বা কী এখানে?

আগন্তুক একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, আমার নাম প্রতুল—প্রতুল লাহিড়ী। আর দরকার কী—জিগ্যেস যখন করলেন, তখন বলি, আমার কাজে আর দরকারে মেলে কম। মনে করেছিলুম, শীতের দিনে দিব্যি তোফা লেপ-মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব; কিন্তু ডাক পড়ল আপনার এখানে, নাগরমলবাবু। আর বিলাসবাবুরই বা গত রাতে মারা যাবার কী দরকার পড়েছিল?

নাগরমল দু-হাতে প্রতুলের ডান হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠল, ওঃ, আপনি তা হলে গোয়েন্দা অফিস থেকে আসছেন? আমার এখানে ভয়ানক বিপদ—।

প্রতুল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, শেখরবাবু, এই ব্যাপারে আমাকে বোধহয় একটু সাহায্য করতে পারবেন।

শেখরনাথ ছোট্ট করে বলল, পারলে খুশিই—।

প্রতুল নাগরমলকে বলল, পুলিশ-অফিস থেকে খবর পেয়ে আমার দুজন অনুচর রাখাল আর হরেনকে নিয়ে সোজা আপনার তিন নম্বর স্টুডিয়োতে উপস্থিত হলুম বটে, কিন্তু মশাই, সে কী বিপদ! আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্রিজনাথের 'ব্রিজ' আর কিছুতেই পেরোতে পারি না। এবার দয়া করে বলুন তো, বিলাসবাবুকে সবচেয়ে শেষে কে দেখেছিলেন?

আমি বলতে পারব না। সকালে স্টুডিয়োতে এসে যা আমি শুনিয়েসে—বলে নাগরমল আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, এ-ছবিতে ডামির কী দরকার, বলুন তো আমায়?

নাগরমল জবাব দিল, মোটামুটি বলছি, বিলাসবাবু এ-ছবিতে দুশমনের পাঠ করিয়েসে। বইয়ের হীরো শেষ সিনে তার বুকে ছোরা মেরে হত্যা কিয়া হ্যায়। সেই ছোরা-মারার একটা ক্লোজ আপ হামাদের লেনে হোগা জরুর, কাজেই ডামির দরকার। তারপর এই দুশমনের আর-একটা দুশমন এসে দেখে না—দুশমন মরে পড়ে আছে। তার একবারটি ইচ্ছে ছিল, সেই দুশমনের ছাতিমে ছোরা বসায়। এ-সিনটা সচরাচর যেমন করে ছাতির পাশে ছোরা চালানো হয়, আমাদের সে রকমভাবে নেবার ইচ্ছে ছিল না। যাতে লোকে ঘটনাটা হুবহু সাঁচ মনে করে, তাই করবার ইচ্ছে ছিল। ডামির ছাতির তলায় একটা পাত্রে এমনভাবে লাল রং রাখা আছে যে, ছোরা বসালেই রংটা রক্তের মতন গা-ময় ছড়িয়ে পড়বে।

প্রতুল হেসে বলল, কিন্তু এটা ভারি আশ্চর্য যে, স্টুডিয়োতে কাজ করেও আপনার ছোকরা চাকর নটু ডামি আর সত্যি মানুষের তফাৎটা বুঝতে পারল না।

BanglaBook.org

নাগরমল বলল, ওঃ, আপনিও তা হলে ডামি দেখেননি কখনও। দেখলে আপনি সুদ্ধ পহচান নেই সেকতে।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, কাল যে-জায়গায় ডামিটা পড়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই বিলাসবাবুর পড়ে-থাকাটা কি আশ্চর্য নয়?

নাগরমল মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়েসেন, আপনি বলতে মনে হচ্ছে—।

প্রতুল জিগ্যেস করল, আপনি কাল বিলাসবাবুকে কখন শেষ দেখেন শেখরবাবু?

শেখরনাথ উত্তর দিল, ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় বারোটা কুড়ি-পঁচিশ হবে।

কীসে আপনার তা মনে হয়?

শেখরনাথ জবাব দিল, বারোটার সময় বিলাস আমাকে বলে যে, বারোটা বেজে গেছে, আর কত রাত পর্যন্ত রিহার্সাল হবে? তারপরই আমরা মোটরে করে বেরিয়ে পড়ি। পথে তার বাড়ির কাছে তাকে নামিয়ে দিই।

প্রতুল ভারি গলায় বলল, বেশ। কাল রিহার্সাল শেষ হবার পরে বিলাসের এখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কী-কী ঘটেছিল, দয়া করে বলবেন কি? সংক্ষেপে বলবার কোনও আবশ্যকতা নেই, বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলুন।

পাঁসনেটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মুছতে-মুছতে শেখরনাথ বলল, আমার মনে হয়, আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন প্রতুলবাবু যে, বেশিরভাগ অভিনেতার মতোই ডিরেক্টাররা অত্যন্ত খেয়ালী হয়। আমিও অবিশ্যি সে-দুর্নামটা থেকে রেহাই পাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, সারা সিনেমা-জগতের মধ্যে সবচেয়ে খেয়ালী যে আমি, এটা আমিও যেমন জানি, আমার সব লোকরাও তেমনি জানে। আমি হয়তো খামকাই লোকদের গালাগালি করি, সময়-সময় যে মেয়েরাও বাদ যায়, এমন নয়। শুনি লোকে বলে, অমি নাকি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর।

নাগরমল শেখরনাথের এই সরল স্বীকারোক্তি শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শেখরনাথ বলে চলল, বিলাসকে নিয়ে আমি বড়ই মুশকিলে পড়েছিলুম। কাল সারাদিন তার মৃত্যুর দৃশ্যটা নিয়ে আমাকে বড্ড ভুগতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয়ের সে কিচ্ছুই জানে না। কিন্তু দৈহিক সৌষ্ঠবে সে আদর্শ ভিলেনের উপযোগী। দিনেরবেলা কিছু না করতে পেরে তাকে আমি রাত্রে আসতে বলেছিলুম। ভেবেছিলুম, সারারাত চেষ্টা করেও যদি হয়, সেও ভালো, এই মৃত্যু-দৃশ্যটা আমি এমনভাবে তুলব—যাতে দর্শকদের তাক লেগে যায়।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়নি যে, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে তার অভিনয় করার মতো মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়?

শেখরনাথের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, এই জিনিসটা ঠিক আপনারা বুঝবেন না। অভিনেতারা অভিনয় করতে-করতে যখন ক্লান্তির চরমে এসে পৌঁছয়, ঠিক সেই সময়েই তাদের দ্বারা ভালো অভিনয় হয়। কারণ, তখন তারা নিজেকে ভুলে যায়, নিজের মনের মধ্যে চরিত্রটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে।

প্রতুল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ, আমি বুঝেছি। এখন কী-কী ঘটেছিল, তাই বলুন দয়া করে।

শেখরনাথ আবার শুরু করল, খেয়ে-দেয়ে আমরা দুজনে ন'টা নাগাদ স্টুডিয়োতে ফিরে এসেছিলুম। বিলাস তার ঘরে গেল মেক আপ করতে, আমি সোজা তিন নম্বরে আমার সেট-এর কাছে হাজির হলুম।

প্রতুল সহসা প্রশ্ন করল, আপনার সেট? একই সময়ে একই স্টেজে কি অনেক সেট থাকতে পারে?

এর উত্তর দিল নাগরমল; ভারিক্কি চালে বলে উঠল, ছবি তৈরি সম্বন্ধে আপনার দেখসি

BanglaBook.org

বিশেষ কিসসু জ্ঞান নেই। আমার স্টুডিয়ো খুব বড়। তার প্রত্যেকটা স্টেজ অন্তত তিন-চার বিঘা মালুম হবে। অনেকগুলো সেট একসঙ্গে তৈরি হয়; রাখা হয় সেগুলোকে ক্যানভাস দিয়ে আড়াল করে।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, কাল সেখানে ক'টা সেট ছিল? মানে, আপনারা যখন রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, তখন কতগুলো লোক আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল?

স্টেজ তখন ছিল অন্ধকার—।

অন্ধকার!

শেখরনাথ বলল, তার মানে, আমার সেট-এর কথাই বলছি। সেটা যে একেবারে অন্ধকার ছিল, তা নয়—।

প্রতুল বলে উঠল, আচ্ছা, কীরকম অন্ধকার ছিল, সে-সম্বন্ধে একটু ধারণা—।

সামান্য নীল আলো দিয়ে স্টেজটাকে তখন আলোকিত করা হয়েছিল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, অপর সেটগুলো? সেগুলো কি অন্ধকারেই ছিল?

নাগরমল বলে উঠল, না, না, সারারাতই আলো জ্বলে সেখানে। আলো অবিশ্যি খুব জোরালো নয়। তবে তাতেও সেটের সব জিনিসগুলো বেশ দেখা যায়।

সে-আলোগুলো কাল রাতেও জ্বলেছিল?

হ্যাঁ।

আলোগুলো তদারক করবার জন্যে একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিল নিশ্চয়ই, কী বলেন?

শেখরনাথ বলল, না। কোনও বিশেষ দৃশ্য মহলা দেবার সময় সাধারণত আমি একলাই থাকি। সেইজন্যে অনেকগুলো আলোর স্যুইচ আমি একসঙ্গে করে নিয়েছি—যাতে আমি নিজেই আলোগুলো আয়ত্তে আনতে পারি।

প্রতুল নাগরমলের দিকে তাকাতেই সে ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি ওইরকম ভাবেই কাজ করেন বটে!

প্রতুল বলল, তা হলে আমি বুঝতে পারছি, রিহার্সাল দেবার সময় আপনি আর বিলাসবাবু ছাড়া আর কেউ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আর আপনাদের বিঘে তিন-চার জমি নিয়ে ওই যে স্টেজটা—তখন প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, কী বলেন?

শেখরনাথ শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, হ্যাঁ, তাই। প্রায় বারোটার সময় আমাদের কাজ শেষ হল—সে-কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে। গঙ্গারাম তখন স্টুডিয়োর দিকে আসছিল, আমি তার পায়ের শব্দ পেয়ে তাকে আসতে বারণ করে আলোগুলো নিবিয়ে দিলুম।

প্রতুল জিগ্যেস করল, আপনি তাকে আসতে বারণ করলেন কেন?

আগেই তো বলেছি, আমি বড্ড বেশি খেয়ালী। তা ছাড়া গঙ্গারাম বড় বেশি কথা বলে। হয়তো এসেই সে নানান কথা বলতে শুরু করবে, সেইজন্যেই। তারপরই হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে বললে, জানেনই তো, মানুষ যখন খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কারণে-অকারণেই মেজাজটা তার খাপ্পা হয়ে ওঠে।

প্রতুল যেন সবটাই বুঝে নিয়েছে—এমনই ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু আলো নিবিয়ে দিয়ে, তারপর আপনি কী করলেন?

তারপরই আমরা গাড়িতে উঠে পশ্চিম দিককার গেটটা দিয়ে চললুম। বিলাস এত ক্লান্ত হয়েছিল যে মেকআপ না খুলেই সে আমার সঙ্গে চলেছিল। আমার যতদূর মনে হয়, তার ঘরের আলোটাও সে নিবোয়নি। যখন আমরা গেটটা পার হয়ে গেলুম, তখন আন্দাজ বারোটা পনেরো হবে।

প্রতুল জিগ্যেস করল, বেরোবার সময় গেটে যে-লোক ছিল, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের

BanglaBook.org

কোনও কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। বাহাদুর বোধকরি তখন গেটে ছিল। আমি হয়তো তার সঙ্গে কথা কয়েছিলুম, হয়তো কইনি। সাধারণত চাকর-দরোয়ানদের সঙ্গে আমি খুব কমই কথা বলি। আর তা ছাড়া যে বৃষ্টি, আর যে ঠাণ্ডা কাল রাতে! তবে আমার মনে হয়, বিলাস বোধকরি বাহাদুরকে কিছু বলেছিল।

প্রতুল পুনরায় প্রশ্ন করল, তারপর?

আমি তাকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে নামিয়ে দিই, তখন আন্দাজ বারোটা পঁচিশ। ওটুকু যেতে সাধারণত মিনিট দশেকই লাগে, তবে কাল রাতে একটু-আধটু দেরি হওয়া বিচিত্র নয়, রাস্তা যেরকম পিছল হয়ে পড়েছিল—।

আচ্ছা, আপনার সঙ্গে রাস্তায় আর কারও দেখা হয়েছিল, যে প্রমাণ দিতে পারে আপনি যা বলছেন, সত্যি?

আমাকে চেনে—এমন কোনও লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আপনি নিজেই কি গাড়ি চালান?

প্রায়ই। মনে হয়, ওতে যেন আমি একটু বিশ্রাম পাই। তবে অন্যসময় আমার ড্রাইভারই গাড়ি চালায়।

কাল রাতে সে কোথায় ছিল?

অনেক রাত হয়ে গেছল, তাই তাকে ছুটি দিয়েছিলুম।

যখন বাড়ি ফিরলেন আপনি, তখন কেউ জেগেছিল?

না। ড্রাইভার কেবল তখনও আমার আর-একটা গাড়ি পরিষ্কার করছিল। সে ওটা মাঝে-মাঝে নিজেই ব্যবহার করে।

আপনি তাকে কিছু বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

তখন ক'টা বাজে?

দুটো বেজে গেছল।

তাহলে আপনিই বোধহয় বিলাসবাবুকে শেষ জীবিত দেখেন? অন্য সাক্ষী না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের তাই বিশ্বাস করতে হবে, কী বলেন?

আমরা যে-হোটেলে খাই, তার ম্যানেজারকে জিগ্যেস করলেই ব্যাপারটা আগাগোড়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কোন হোটেল সেটা?

সিটি রেস্তোরাঁ।

আচ্ছা, মনে করুন, ম্যানেজার যদি ব্যাপারটার কিছু না বলতে পারে?

শেখরনাথ প্রতুলের চোখের দিকে চেয়ে বলল, তা হলে আমাকেই সন্দেহ করবেন। কারণ সাধারণত তাই ঘটে কিনা।

প্রতুল বলে উঠল, তা ছাড়া আর কি।

শেখরনাথ নির্বিকার মুখে বলল, তা হলে আর-একটা সাক্ষী আমাকে খুঁজে বার করতে হবে—

প্রতুল চট করে বলল, সেটা আমার কর্তব্য, আমিই তা হয় করব।

শেখরনাথ প্রকাণ্ড একটা সিগার ধরিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, আমি কি যেতে পারি এখন? ছবিখানার অনেক কিছুই তো আবার বদলাতে হবে দেখছি।

হ্যাঁ, আমি বুঝেছি; আর একটু। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, বিলাসবাবু কীরকম লোক ছিলেন? অবিশ্যি সিনেমা জগতের নয়—কিন্তু আপনার সিগারের ধোঁয়ায় ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল!

BanglaBook.org

শেখরনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, লোকটা যাকে বলে একেবারে ইতর।

প্রতুল মাথা দুলিয়ে বলল, ইতর তো লোকে অনেক রকমেরই হতে পারে। আমি জানতে চাই, তিনি কী ধরনের ইতর ছিলেন?

নাগরমল বলে উঠল, জেনানা লিয়ে বহুৎ হুজ্জৎ করত।

প্রতুল হেসে বলল, ও।

শেখরনাথ স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, এই তো আপনার সূত্র মিলে গেল। যে-লোক অনেকগুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই সময়ে ঘনিষ্ঠতা করে, তার ওপর হিংসে করবার লোকের অভাব কী? অবিশ্যি আমি এরকম কাউকে যে চিনি, তা বলছি না। তবে তাদেরই একজন হয়তো হত্যা করতে পারে...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, পারে নয়, পেরেছে! অবিশ্যি আমরা যদি এটাকে আত্মহত্যা বলে গ্রহণ না করি। কিন্তু আঘাত দেখে মনে হয়, আত্মহত্যা হতেই পারে না।

শেখরনাথ মাথা নেড়ে বলল, যখন এখনও পর্যন্ত দেখিনি, তখন এ-ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভালো।

কিন্তু ঘটনাটা দেখে আমাদের বিচার করতে হবে। আপনারা দুজনে খুব ভালো করে একটু ভেবে দেখুন না। এমন কাউকে কি আপনারা সন্দেহ করতে পারেন না, যে এরকম কাজ করতে পারে?

নাগরমল সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল, শেখরনাথের মুখে একটা কথাও ফুটল না।

কিছুক্ষণ প্রগাঢ় স্তব্ধতা...।

শেখরনাথ আবার একবার তার পাঁসনেটা মুছে নিয়ে বলল, মাস দশেক আগেকার ঘটনা ভেবে দেখলে বিলাসের মতো লোকের ভাগ্যে এরকম যে ঘটবে, তা অনুমান করে নেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে দু-একটা সামান্য ঘটনা ছাড়া আমি বিশেষ কিছুই জানি না, আর সেই সামান্য ঘটনাই যে এতবড় হয়ে উঠতে পারে, এও আমি কোনওদিন কল্পনা করিনি।

সে দু-একটা ঘটনা কি আমি শুনতে পাই না?

সে-ও অবশ্য স্ত্রীলোকঘটিত। সেটা হচ্ছে—বাহাদুরের মেয়ে উলকি সম্বন্ধে। তার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই এটা-ওটা চলছিল। কিন্তু উলকি বুঝতে পারেনি, বিলাস কী চরিত্রের লোক।

কাল রাতে বাহাদুরই কি গেটে ছিল?

শেখরনাথ জবাব দিল, হ্যাঁ।

নাগরমল বলে উঠল, দেখুন শেখরবাবু, উলকি বাচ্চা লেড়কী। লেকিন ঝুটা নয়, সাচ্চা। ওসব নোংরা কাম সে করতেই পারে না। প্রতুলবাবু, আপনি এসব বাত শুনবেন না।

প্রতুল বলে উঠল, যা হোক, শুনলে ক্ষতি কী?

শেখরনাথ বলে চলল, একদিন সেটের একটা অন্ধকার কোণে হঠাৎ আমি তাদের কথা শুনতে পাই। উলকি বোধহয় বিলাসকে তিরস্কার করছিল। সে যে বিশ্বাসঘাতক, একটা কথাও সে যে ভুলে সত্যি বলে না, এই ছিল উলকির বক্তব্য। মেয়েটা ছোট হলেও তার মধ্যে তেজ আছে।

হঠাৎ নাগরমল চিৎকার করে বলে উঠল, এ যদি হামি আগে জানতুম, তা হলে বিলাসকে লাথ মেরে দূর করে দিতুম, না-হয় উলকিকে সাদী করতে রাজি করতুম।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, আর কোনও স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিছু জানেন?

ওরকম ব্যাপার প্রতিমাসেই দু-একটা করে ঘটে, তাতে আমরা নতুনত্ব কিছু দেখিনি।

আপনাদের স্টুডিয়ো তা হলে ব্যতিক্রম নয়।

নাগরমলের মুখ লাল হয়ে উঠল; উচ্চকণ্ঠে বলল, এত ইতর।

শেখরনাথ জবাব দিল, দিন কয়েক আগে এই ছবিখানারই নায়িকা অলকার সম্বন্ধে তার

BanglaBook.org

একটু দুর্বলতা দেখা গেছল।

নাগরমল ক্রোধে ফেটে পড়ে বলল, অলকার মতো মেয়ের সম্বন্ধে এমন যা-তা আলোচনা —হামি এখানে বসে কিছুতেই শুনতে পারব না। হামার স্টুডিয়োতে যত মেয়ে আজ পর্যন্ত এসেছে, ওর মতো লছমী একটিও আসেনি।

নাগরমলের কথায় কান না দিয়ে প্রতুল জিগ্যেস করল, অলকাকে নিয়ে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি?

শেখরনাথ জবাব দিল, আমাকে যদি ভুল না বোঝেন, তা হলে বলি। অলকা একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার মধ্যে ফ্লার্ট করবার ঝোঁকটা একটু বেশিমাত্রায় আছে। মুখে তার হাসি লেগে থাকলেও ভেতরে যে দুষ্টুমি একেবারেই নেই, তা নয়। বিলাসের অসম্ভব খ্যাতিই বোধহয় তাকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাহলেও এটা বেড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলা-করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতুল গম্ভীর ভাবে বলল, হুঁ।

নাগরমল পুনরায় প্রতিবাদ করে উঠল, আপনি প্রতুলবাবুকে বড় ভুল সড়কে নিয়ে চলেছেন শেখরবাবু! হামি তো জানি, বিনয় আর অলকা—দুজন দুজনকে কীরকম ভালোবাসে!

প্রতুল বলল, তা হলে এই বিনয়বাবু তো বিলাসের ওপর একটু...।

তাকে বাধা দিয়ে নাগরমল বলে উঠল, নেই, নেই, কভি নেই! এইসা বাত মৎ বলিয়ে। হাম উন্‌কে আচ্ছা মাফিক পছন্তা, বড় ভালা ছোকরা আছে।

প্রতুল হেসে বলল, আমি তো দেখছি, স্টুডিয়োর সব লোকেরই ওপর আপনার খুব ভালো ধারণা। তাহলে কেউই এ-কাজ করতে পারে না। কিন্তু একজন তো করেছে? আমি তা বলে কারও ওপর সন্দেহ করছি না। শুধু আলোচনা করছি—এই মাত্র। আপনাদের মতামতটা জানব বলেই আমি এখনও সেটে গিয়ে মৃতদেহটা দেখিনি। আচ্ছা শেখরবাবু, আপনার সঙ্গে বিলাসবাবুর কোনওদিন কোনও গোলমাল হয়েছিল? মানে কোনও ঝগড়াঝাটি?

শেখরনাথ জবাব দিল, আপনার কথার উত্তরে আমাকে 'হ্যাঁ'ও বলতে হয়, 'না'ও বলতে হয়। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন খুঁটিনাটি বেধে থাকে, তেমন দু-একবার হয়েছে বইকী। কিন্তু সাধারণত যেমন হয়, তারচেয়ে বেশি কিছু কোনওদিনই হয়নি।

যথা?

বেশির ভাগ অভিনেতাই ছবি তোলবার সময় চরিত্র, দৃশ্য, ভাবভঙ্গি সব ভুলে যায়। মনে তাদের জাগতে থাকে শুধু ক্যামেরাভীতি। দর্শকের তীব্র সমালোচনা আর কোন কোণ থেকে নিলে মুখখানা তাদের নিখুঁত আসবে—এই নিয়ে দিনের মধ্যে অন্তত একশোবার তাদের বকতে হয়।

তাহলে ছবি তোলবার সময় অভিনেতাদের আপনি স্বাধীনভাবে অভিনয় করতে দেন না?

শেখরনাথ মৃদু হাসল; বলল, যুদ্ধের সময় সৈনিকরা যদি সেনাপতির কথা না শোনে, তা হলে যুদ্ধের ফল যেরকম হয়, ডিরেক্টারের কথা না শুনলে ছবির দুর্দশাও সেইরকম দাঁড়ায়!

হ্যাঁ, বুঝেছি। তা হলে বিলাসের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আপনার কোনওদিন ছিল না?

না, না, কোনওদিনই না।

প্রতুল একটু ভেবে নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, বিলাসবাবু আবার কোন সময় স্টুডিয়োতে ফিরে আসেন? আর কেনই বা এসেছিলেন?

তা আমি বলতে পারি না। তবে দরোয়ানের কাছেই রেকর্ড পাবেন।

প্রতুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনারা যে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে এইসব আলোচনা করলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।

শেখরনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, ধন্যবাদ দেবার এতে কী আছে? এসব কথা তো আমাদের বলাই উচিত।

BanglaBook.org

নমস্কার জানিয়ে শেখরনাথ বিদায় দিল।

নাগরমল প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কোনও কথা বলবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিল না।

প্রতুল হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, শেখরবাবু আজ যেরকম ভদ্রভাবে কথা বললেন, এরকম ভাবে বোধকরি উনি প্রায়ই বলেন না, নয়?

নাগরমল জবাব দিলে, এরকম ভদ্র ব্যবহার উনি যে করতে জানেন, এর আগে হামি জানত না।

সিগারেট একটা ধরিয়ে নিয়ে প্রতুল বলল, উনি নিজে একজন খুব ভালো অভিনেতা বোধহয়? আচ্ছা, আজকে অন্যদিনকার মতো মেজাজ থাকলে উনি আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতেন?

ওঁর মেজাজ অনেকটা বোমার মতো। কখন কী কারণে যে ফেটে পড়ে, বলা কঠিন। অন্যদিন হয়তো এই সমস্ত জিগ্যেস করলে অপমানিত মনে করে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ আপনি তাঁকে একটু সন্দেহ করেছিলেন কিনা—তাই বুঝতে পেরে উনি এমন ব্যবহার করেসেন।

হতে পারে। কিন্তু তা হলেও আমি যখন সেটটা দেখতে যাব, তখন উনিও কি আমার সঙ্গে যাবেন না?

তা যাবেন বইকি। তবে হামি ওঁকে সেটে ঢুকতে বারণ করিয়ে দিয়েসে...আচ্ছা, হামি সেক্রেটারিকে দিয়ে বলে পাঠাচ্চি জরুর।

৫

রহস্যময় চির-অজ্ঞাত রাজ্য!

তার বুক থেকে ফুটে ওঠে কত বিচিত্র কাহিনী। স্বপন-দেশের কত রাজপুত্র দানবপুরীর মাঝে বন্দিনী রাজকুমারী কেশবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে পক্ষীরাজ করে উড়ে চলে; সওদাগর পুরন্দরের বাণিজ্যপোত অথই সাগরজলে পড়ে ঝড়ের মতো দুলতে থাকে; পাহাড়ের বুক-চেরা ঝরনার ধারে নেমে আসে জলবালার দল গীতকণ্ঠে...।

দর্শকের আসনে বসে নর-নারীর দল বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে পর্দার দিকে, চোখে ঘনিয়ে ওঠে রঙিন নেশা, দেহ রোমাঞ্চিত হয়, মন ভেসে যায় এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোন সুদূর কল্পলোকে।

প্রতুল নাগরমলের সঙ্গে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

নাগরমল গর্বস্ফীত কণ্ঠে বলল, কী দেখসেন প্রতুলবাবু? আমার আর একজন ডিরেক্টার রাজেশ্বর পরসাদ তার হিন্দি ছবি তুলছে। এ-ছবি তোলবার ব্যবসায় খালি জলের মতো রুপেয়া খরচ করিয়ে যাও। ব্যস, কুচ্ছু মিলল তো ভালো, না মিলল তো লাখ রুপেয়া জল হল...

স্টুডিয়ো-প্রাঙ্গণে ছবির একটা দৃশ্য তোলা হচ্ছিল—পল্লীপথ।

প্রতুল একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়েছিল। কৃত্রিম হলেও এমন সুন্দর পল্লীর আবহাওয়াটি সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, প্রতুলের মনে হল, ভারতের দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালে এমন বহু পল্লী নজরে পড়বে।

নাগরমল তার একখানা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, চলুন, আমরা ওপাশে যাই, নইলে রাজেশ্বর পরসাদের ছবিতে হামরা দাগী হয়ে যেতে পারি।

প্রতুল চলতে-চলতে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এই যে এত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা সবাই কি মাইনে করা লোক?

BanglaBook.org

না। এদের আমরা বলি একস্ট্রা। দিনভোর কাম করবে, দু-এক রুপেয়া লিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আপনার লোকসের একটু বলিয়ে দেবেন প্রতুলবাবু, তারা যেন কাউকে না বলে যে, তিন নম্বরমে খুন হইয়েসে; আর স্টুডিয়োর ভেতর খুনি ঘোরাফেরা করসে; তা হলে একদম ঘড়বড় হইয়ে যাবে।

প্রতুল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এই নিয়ে আপনি তিনবার আমাকে এই কথা বললেন, নাগরমলবাবু!

কী কথা?

যে খুনি স্টুডিয়োর ভেতর ঘোরাফেরা করছে। আপনি কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছেন?

নাগরমল তার চকিত দৃষ্টি দুটো প্রতুলের মুখের পানে ধরে বলল, আরে রাম, রাম, একী বাত বলসেন!

প্রতুল বলল, তা হলে ও-কথাটা বারবার আপনার মনে আসছে কেন?

নাগরমল মাথা চুলকে আমতা-আমতা করে বলল, কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না; এমনি খেয়াল মাফিকই বলে থাকব। শির আমার একদম গোলমাল হয়ে গেছে।

প্রতুল ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, বারোটা বেজে গেছে, এতক্ষণ বোধহয় তিন নম্বর স্টুডিয়োতে করোনারের তদন্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। স্লিপে আমি শেখরনাথকে স'বারোটার সময় তিন নম্বরে আসতে লিখে দিয়েছি।

নাগরমল বলল, ঠিক বাত! চলুন, চলুন।

ঘুরতে-ঘুরতে খানিকটা এসেই প্রতুল বলল, ঘুরে গিয়ে আমরা ফটক দিয়ে ঢুকি।

স্টুডিয়োর সম্মুখভাগটা সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

প্রতুল জিগ্যেস করল, স্টুডিয়োর চারদিকটাই কি এইরকম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আছে?

মাথা নেড়ে নাগরমল জবাব দিল, না, দরকার হয় না। সামনে পাঁচিল, দু-দিকে আমাদের অফিস, মেক-আপ রুম, লেবরেটারি—এই সব আছে, আর পিছনের দিকটা কাঁটার তার দিয়ে ঘেরা, তার সঙ্গে ইলেকট্রিক চার্জ করা আছে; নইলে বাহিরের লোক ভেতরে ঢোকবার জন্যে ভারি জুলুম করে।

ফটকে ঢুকতে-ঢুকতে প্রতুল বলল, এখানে আলোর বন্দোবস্ত নেই কেন?

ঠিক ভেতরেই খুব জোরালো একটা আলো আছে বলেই আর এখানে দেবার দরকার মনে হয় না।

তারা ভেতরে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে দরোয়ান তার ঘরে ঢুকে খাতায় তাদের প্রবেশের সময়টা টুকে রাখল।

প্রতুল সেটা লক্ষ করে বলল, বাঃ! আপনাদের এ-বন্দোবস্তটা বেশ ভালো দেখছি।

নাগরমল খুশি মুখে বলল, সব আদমির যাওয়া-আসা আমরা টুকে রাখি, তাতে হামার অনেক কামের সুবিধা হয়।

ডানহাতি সোজা রাস্তাটা বরাবর স্টুডিয়োর শেষ প্রান্ত অব্দি গেছে। দুইদিকে একই ধরনের সাদা বাড়িগুলো দিনের আলোয় ঝকঝক করছে; প্রত্যেকটার সামনে একটু করে লন, দু-চারটে ফুল গাছ।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, এগুলো কী?

নাগরমল বলল, এগুলো সব অফিস, পোশাকের ঘর, লেবরেটারি—এই সব আছে। আর ওই শেষ বাড়িটা দেখসেন—ওটা হাসপাতাল।

BanglaBook.org

প্রতুল সত্যিই বিস্মিত হল; বলল, সর্বনাশ! আপনি আবার হাসপাতাল সুদ্ধ রেখেছেন!

নাগরমল টেনে-টেনে হাসতে-হাসতে বলল, নাগরমল সিন্ধিয়া না পারে কী? সে বড় মজার বাত। দোসরা আদমির রুপেয়ায় বানিয়ে লিয়েসে। ডাংদার, নার্স—সব খরচ তার, হামি খালি বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছি এই শর্তে যে, হামার কাম করে যারা—তাদের বেমার হলে সব যাবে ওখানে, থাকবে, ওষুধভি মিলবে।

পাশে টিনের একটা প্রকাণ্ড ঘর দেখে প্রতুল জিগ্যেস করল, এটা কিসের?

এটা হামার দু-নম্বর প্রপার্টি গুদাম আছে। যত মূর্তির ছাঁচ সব বানানো হয় এইখান থেকে। নয়া এক আর্টিস্ট লিয়ে এসেছি হাজার রুপেয়া মাইনে দিয়ে; সে আপনাকে এমনিতর মূর্তি বানিয়ে দেবে যে আসল-নকল সমঝাতেই পারবেন না।

পাশেই একটা সরু সুরকি-ঢালা পথ।

সেটা দিয়ে প্রতুল সামনের বাড়িটার সিঁড়ির ওপরে উঠে এল। সেই বাড়িরই পিছনে তিন নম্বর স্টুডিয়ো।

আরও কয়েক ধাপ সে উঠেছে, এই সময় একজন সুন্দরী অবাঙালি তরুণী তার গা ঘেঁষে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

প্রতুল ওপরের বারান্দায় এসে পৌঁছল। সামনের ঘরটার দরজা খোলা ছিল; দেখা গেল, ঘরের ভেতর একটি মেয়ে একান্ত মনে সাজসজ্জা করছে।

প্রতুল অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইল।

নাগরমল তার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল, দেখুন প্রতুলবাবু, এটা মেয়েদের মেক-আপ বাড়ি। পুরুষ লোকদের উঠতে দিই না এখানে। তারা সব হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। মেয়েরা এখন তাদের কী করতে হবে, তাই ভাবছে...

প্রতুল সচকিত হয়ে তার পানে ফিরে বলল, আপনি কী করে জানলেন, আমাকেও কী করতে হবে তাই ভাবছি না? আমার কী মনে হয় জানেন, এই বাড়ি থেকে একজন মেয়েছেলে অনায়াসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সরু রাস্তাটা দিয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োতে যেতে পারে। দরোয়ান গেটে থাকলেও তাকে দেখতে পাবে না। আচ্ছা, আমি জিগ্যেস করলেই জানতে পারব, কাল রাতে এখানে কে কে ছিল। ...না, না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

নাগরমল বলল, খালি মেয়ের কথাই কেন বলসেন? পুরুষমানুষও তো ঠিক এইভাবে লুকিয়ে তিন নম্বরে যেতে পারে?

কেন বলছি তা এখন আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।

তিন নম্বর স্টুডিয়োর সামনে এসে ভেতরে না ঢুকে প্রতুল দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করল, বড়-বড় দরজা দুটো বুঝি মালপত্তর এনে গাড়িসুদ্ধ ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে? আর ছোট দরজাগুলো লোকজনের যাতায়াতের জন্যে বুঝি? এগুলো কি চাবিতালা দেওয়া থাকে রাতে?

না, দরজায় চাবিতালা দেবার রীতি নেই। দিনরাতভোর আমাদের পাহারা থাকে, চাবিতালার আর দরকার হয় না। চলুন, ভেতরে যাবেন তো।

দাঁড়ান, শেখরনাথের জন্যে একটু অপেক্ষা করা যাক। ওই যে—উনি বোধহয় আসছেন।

অদূরে দেখা গেল, শেখরনাথ তার ছড়িটা ঠুকতে-ঠুকতে আসছে। কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, কারও সঙ্গে বাক্যালাপ নেই, দু'পাশে লোক সরে গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

শেখরনাথ এসে দাঁড়াতেই প্রতুল বলল, এই যে—আপনি এসেছেন। চলুন... কিন্তু ভাবছি, এতগুলো দরজা কেন?

নাগরমল আবার এ-প্রশ্ন তাকে করতে শুনে বিস্মিত হলেও কোনও কথা কইল না।

শেখরনাথ তাকে বুঝিয়ে দিল।

BanglaBook.org

সেটের ভেতরে যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি আলোকের স্বল্পতা।

প্রতুল শেখরনাথকে পথ ছেড়ে দিয়ে বলল, আপনি আগে চলুন। আপনার সেটের সঙ্গে আমি পরিচিত নই।

শেখরনাথ চলল বটে, কিন্তু প্রতুল দু-পা যেতে না-যেতেই হোঁচট খেল।

শেখরনাথ সাবধান করে দিয়ে বলল, ইলেকট্রিকের তারটা আছে কিন্তু, আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে বলে আটকায় না।

সেটের দরজার কাছে এসে শেখরনাথই আগে ভেতরে ঢুকল।

প্রতুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল।

এদিক থেকে অনুজ্জ্বল একটা নীলাভ আলো এসে মৃতের মুখে-চোখে পড়ে অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

প্রতুল আপনমনে বলে উঠল, না, বিলাসবাবু দেখছি অত্যন্ত ভয় পেয়েই মারা গেছেন।

৬

শেখরনাথ কিন্তু সে-মুখ দেখে মোটেই চঞ্চল হল না; বললে, আপনারা একটা ভুল করেন। এটা হচ্ছে আলোর খেলা।

প্রতুল মৃতের দিকেই তাকিয়ে বলল, তাই নাকি! দয়া করে একবার এগিয়ে এসে দেহটা পরীক্ষা করে দেখুন না।

শেখরনাথ কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখাল না; চোখে-মুখে তার আবার সেই কাঠিন্য ফুটে উঠেছিল।

প্রতুল বলল, আমার ইচ্ছে যে, আপনি এই ছোরাখানা পরীক্ষা করে দেখেন শেখরবাবু! এইটাই কি আপনি রিহার্সালে ব্যবহার করেন?

চোখের দৃষ্টি তার আবার উগ্র হয়ে উঠল। আবার সেই অনিশ্চিত মুহূর্ত। তারপরই শেখরনাথ এগিয়ে এসে মৃতদেহের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং ছোরাখানা হাত দিয়ে তুলে নিতে যাবে...।

প্রতুল চিৎকার করে বলে উঠল, ছোঁবেন না, ছোঁবেন না...।

মাফ করুন আমায়, আমি ভুলে গেছলুম যে, আঙুলের ছাপের দরকার আপনাদের। তবে এটা ঠিক যে, এই ছোরাই আমরা রিহার্সালে ব্যবহার করি।

এমনসময় তাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল, প্রতুলের অন্যতম সহকারী রাখালের প্রবেশে। বলল, স্যার, চারদিক রক্তে মাখামাখি...

প্রতুল জিগ্যেস করল, সবগুলোর ফটো নিয়েছ?

নিশ্চয়ই।

প্রতুল নাগরমলের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আমাকে একটু ক্ষমা করতে হবে। আমি মৃতদেহটা আর সেটটা পরীক্ষা করে দেখব একবার, তারপর কর্মচারের সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে।

তাকে দেখেই বেঁটে মোটা ডাক্তারটি বলে উঠলেন, আমরা মৃতের শেষ ফটো নিয়েছি প্রতুলবাবু।

প্রতুল প্রশ্ন করল, হত্যা বলে আপনার মনে হল?

নিশ্চয়ই।

মরবার পর বিশেষ নড়ে-চড়েছে?

BanglaBook.org

সামান্য একটু।

কতক্ষণ মরেছে বলে মনে হয়? আমার হিসেবে দেড়টার আগে...।

ডাক্তার চিন্তাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ঠিক সময়টা বলতে গেলে আমাকে আর-একবার ভালো করে দেখতে হয়। তবে এখন দেখে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় দেড়টার আগেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রতুল বললে, বেশ, একটু পরেই আপনি আমাকে জানাবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন, সময়টা এর তদন্তে প্রধান সূত্র হবে।

ক্যামেরা-প্ল্যাটফরমের ঠিক পাশেই দুখানা চেয়ার ছিল। মৃতদেহের পাশ থেকে একসার রক্তমাখা পায়ের দাগ সেই চেয়ার দুখানা পর্যন্ত গেছে দেখে প্রতুল বিস্মিত হল।

করোনার বললেন, শুধু ওই না, ওরকম পায়ের দাগ দু-দিকেই আছে। এ-দাগ যারই হোক, সে মেঝের রক্ত মাড়িয়ে লাশ পর্যন্ত গেছে, তারপর তাকে ডিঙিয়ে ওই চেয়ার পর্যন্ত গেছে।

প্রতুল পরীক্ষা করতে-করতে বলল, হুঁ, পুরুষের জুতোর দাগ। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ছোট একটা ক্ষত থেকে কতক্ষণ ধরে রক্ত বেরোলে তবে এই দাগগুলো হতে পারে?

এর দুটো উত্তর আছে। দাগ যে-ই করে থাক, বিলাসবাবু মরবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রক্ত মাড়াতে পারে; কিন্তু আমার মতে রক্ত ততক্ষণে যথেষ্ট জমে যেত।

আমারও তাই মত। কতক্ষণ লাগে? ধরুন মিনিট পনেরো কুড়ি?

ঠিক তাই। দেখছেন না, লোকটা পায়ে রক্তের দাগ লেগেছে দেখে আবার মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছিল? কিন্তু দাগগুলো তুলে ফেলবার কোনও চেষ্টাই করেনি।

প্রতুল বলল, যা দেখা যায় সবই প্রমাণ নয়। ডাক্তারবাবু, আমি আর-একটা কিছু চাইছি।

সেট পরীক্ষা করতে-করতে ক্যানভাসের দেওয়ালে একটা দাগ দেখতে পেয়ে মুখটা ডাক্তারের খুশি হয়ে উঠল। ফিরে এসে বললেন, কীরকম আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয় আপনার? হাড়ের ভেতর দিয়ে আমূল ছোরাখানা বুকে বিঁধেছে। পায়ের সামনাসামনি থেকে নয়, ওপর থেকে...

ওপর থেকে! আপনি কি বলতে চান বিলাসবাবু মেঝেতে শুয়েছিলেন?

আমি যা বলতে চাই প্রতুলবাবু, শুনলে হয়তো আপনি আমাকে পাগল ভাববেন। আমার মতে মারা যাবার আগে বিলাসবাবু ঠিক ওইভাবে ওইখানেই শুয়েছিলেন। আর আমার মনে হয় না, মৃত্যুর সময় অতখানি ভয়ের ভাব ফুটে ওঠার যথেষ্ট সময় ছিল। মৃত্যুটা এমনভাবে এসেছিল যে, দেখছেন না ওঁর হাতে ছোরাখানা ব্যবহার করবারও সুযোগ পাননি?

প্রতুল জিগ্যেস করল, কোনও মেয়েছেলের দ্বারা এ-আঘাত সম্ভব?

নিশ্চয়ই। সাধারণ মেয়ের গায়ে যা শক্তি থাকে তাই যথেষ্ট।

অকস্মাৎ হাঁফাতে-হাঁফাতে আবার রাখাল এসে হাজির। বলল, স্যার, নতুন ঘটনা। বিলাসবাবুর সাজঘরে একটা লোককে ধরে ফেলে এটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আপনার কথামতো ঘরটা দেখতে গিয়ে দেখি না লোকটা এটা ছিঁড়ছে। কথাশেষে প্রতুলের হাতে সে একটা চিঠি দিল।

চিঠিতে শিরোনামা বা তলায় স্বাক্ষর ছিল না। ছিন্ন যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে, তাতে লেখা ছিল :

চিঠিগুলোর জন্যে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসে দেখছি আমি ভুল করেছি। চিঠিগুলো আমার, সেগুলো আমি চাই। আজ থেকে আমাদের মধ্যেকার সব সম্বন্ধ শেষ।

BanglaBook.org

প্রতুল বুঝল, এইখানে অলকার এই বিয়োগান্ত নাটকে প্রবেশ। রাখালকে সে বলল, অলকাদেবীর ঘরে সন্ধান নিয়ে দ্যাখো, এরকম আরও চিঠির কাগজ নিশ্চয়ই পাবে। দামি কাগজ। হয়তো তাঁর নামও ছাপা থাকবে। কাল রাতে তিনি কোথায় কী করেছেন, সেটাও জানবার চেষ্টা

করবে। আর অনর্থক এখানে ছুটে এসে তুমি বা হরেন কেউ আমাকে বিরক্ত করো না, বুঝলে?

ডাক্তার এবং রাখাল বিদায় হলে প্রতুল আবার সেটের চারদিকে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

দরজাগোড়া থেকে আহ্বান এল ঃ স্যার।

প্রতুল কঠিন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল।

রাখাল মাথা চুলকে ঢোক গিলে বলল, বলতে ভুলে গেছি স্যার! লোকটার নাম বিনয় মজুমদার—স্টুডিয়োর একজন অ্যাসিটান্ট ডিরেক্টার। অলকাকে ভালোবাসে। কাল রাতে তার পেছনে-পেছনেই স্টুডিয়োতে আসে।

তুমি কি এখনই সেটা আবিষ্কার করলে?

না স্যার। আর তাই যদি হয়, ক্ষতি কী? অলকাদেবীর ঘর থেকে স্যার, একগাদা চিঠির কাগজ পেয়েছি। এই লোকটার সঙ্গে স্যার, অলকাদেবীর গল্পটা স্টুডিয়োর দরোয়ান-চাকর সবাই জানে...।

তা জানুক। তোমার কর্তব্যটা ভোলোনি তো? গঙ্গারাম আর বাহাদুরকে আর-একটু পরে আমি ডেকে পাঠাব। তারা যেন কোথাও না যায়, দেখো।

রাখাল চমকে উঠল, মুখ দিয়ে তার আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল ঃ ওই যাঃ! ভুলে গেছলুম স্যার! ভাগ্যিস বললেন। তবে ক্ষতি নেই, পালাবার লোক তারা নয়। আর কেনই বা পালাবে? এদের দুজনের কেউই...।

প্রতুলের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হয়ে উঠল। তাই দেখে রাখাল ধীরে-ধীরে সরে পড়ছিল।

রাখাল...!

স্যার!

কে একজন নাকি বিলাসবাবুর মৃতটাকে ডামি ভেবে ভুল করে লাথি মারে। তোমার ভাগ্যেও যেন আবার তাই না হয়, মনে থাকে যেন।

৭

প্রতুল অফিস-ঘরে পদার্পণ করতেই নাগরমল সাগ্রহে জিগ্যেস করল, কিছু পেলেন কি?

প্রতুল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, এটা কি বায়োস্কোপের ছবি যে একখানা টিকিট করলেই একনিশ্বাসে সব গল্পটা দেখে ফেললেন?

একটু অপ্রতিভ হয়ে নাগরমল বলল, তা বটে! তবু কিছু কি আবিষ্কার করতে পারেননি?

কিছু কেন, পেয়েছি অনেকই। ব্যাপারটা বেশ জটিল। আমাকে অনেক কাঠখড়ই পোড়াতে হবে। উপস্থিত আর বেশি বলতে পারব না, মাফ করবেন।

নাগরমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সে আমি বলতে বলছি না। লেকিন কি জানেন, যদি জলদি খুনের কিনারা না করতে পারেন, তাহলে আমার সব নষ্ট হবে। দুশমন তো আছেই, তারপর লোকে ছিঁড়ে খাবে; কাগজওয়ালারা আমাকে সব কিছু বলবে। কোনও অ্যাকটার-অ্যাকট্রেস পাব না। আমাকে ফিন লোটা-কম্বল লিয়ে মুলুকে ফিরতে হবে।

প্রতুল হেসে বললে, ঘাবড়াবেন না। খুন সব জায়গাতেই হতে পারে—আমাদের মন্দিরেও হতে পারে, মসজিদেও হতে পারে। আপনি বেশি হইচই করবেন না; আর আজকের দিনটার মতো আপনার অফিসটা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবেন, দু-একজনকে কিছু-কিছু জিগ্যেস করবার আছে আমার।

নাগরমল বলে উঠল, বেশ তো, বেশ তো। আমি বাহার যাব?

BanglaBook.org

না, আপনাকে এখানে থাকতে হবে, আপনার লোকজনকে আমার চেয়েও আপনি ভালো বুঝবেন।

নাগরমল টেবিলের ওপরের ঘণ্টাটা টিপতেই সেক্রেটারি এসে ঘরে ঢুকল। নাগরমল তাকে বলে দিল, এখন আমার একটু কাজ আছে, কেউ যেন না ঘরে ঢুকে।

সেক্রেটারি বলল, ব্রিজনাথ দেখা করতে চান।

ইচ্ছে না থাকলেও নাগরমল সেক্রেটারির মনে আঘাত দিতে চাইল না; বলল, আচ্ছা, পাঠিয়ে দাওগে।

ব্রিজনাথ ঘরে আসতেই নাগরমল বলে উঠল, তুমি আজ বাড়ি যেতে পারো।

ব্রিজনাথ চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল, বাড়ি যাব আমি? কী যে বলো নাগরমল! তারচেয়ে বলো না কেন, স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ করে সকলে মিলে বাড়ি চলে যাই। এদিককার খবর শুনিয়েছ? তিন নম্বরে ভিড় জমে গেছে। কী করে জানি না, খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বেশ, তুমি গিয়ে তাদের হটিয়ে দাও হুঁয়াসে। এর জন্যে আমার কাছে আসিয়েছ?

ব্রিজনাথ সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠল, আরে না, ও কাম তো হামি সেকব। পুলিশে লাশ নিয়ে যেতে চায়, লেকিন নিয়ে যাবার বকৎ বহুৎ ভিড় জমবে!

কথাটা সত্য। নাগরমল বিপন্ন দৃষ্টিতে প্রতুলের দিকে তাকাতে সে বলে উঠল, এমন কোনও বন্দোবস্ত করতে পারেন না যাতে সকলে মনে করে—এও ছবি তোলারই একটা অংশ?

নাগরমল বলল, এখন আর তা কী করে হবে প্রতুলবাবু? আপনি রাতমে লাশ নিয়ে যাবার বন্দ্‌বস করতে পারেন না?

প্রতুল ঘাড় নেড়ে বলল, তা সম্ভবপর নয়। আপনি বরং আপনার লোকজনদের একটা নোটিশ দিয়ে দিন যে, বিলাসবাবুর মৃত্যুর জন্যে আজকে স্টুডিয়ো বন্ধ। তারপর সকলে চলে গেলে ধীরে-ধীরে লাশ চালান করা যাবে।

নাগরমল খুশি হয়ে বলল, বহুৎ আচ্ছা। ব্রিজনাথ, তুমি আমার নাম সই করিয়ে দিয়ে একটা লোটিশ দিয়ে দাও।

ব্রিজনাথ চলে গেলে প্রতুল বললে, আমি কি আবিষ্কার করেছি, এবার বোধহয় তার কিছু-কিছু শুনতে চান?

জরুর।

কাল রাত্রে তিন নম্বর স্টুডিয়োতে চারজন লোক উপস্থিত ছিল।

নাগরমল কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, চারজন লোক বলছেন? হয়তো শেখরবাবু, বিলাসবাবু বিনয়, কিন্তু না—শেখরবাবু তো একলাই কাম করতেন। আপনি তা হলে বলছেন...।

আমি বলছি বিলাসবাবু ছাড়া আরও চারজন, তার মধ্যে আমার মনে হয়, চতুর্থটি একটি মেয়েছেলে।

নাগরমল চোখ বড়-বড় করে বললে, তার মানে আপনি বলতে চান আরও একজন জেনানা আছে।

প্রতুল বলল, অলকাদেবী যে কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েইছি, আর দেখে যা মনে হয়—।

বাধা দিয়ে নাগরমল বললে, না, না, আপনি অলকাকে চিনেন না; চিনলে ও-কথা বলতেন না...।

প্রতুল তাকে চিঠির কথাটা খুলে বলতেই নাগরমল বলে উঠল, চিঠিটা পাওয়া গেল বলেই আপনারা তাকে খুনি বলে ধরিয়ে নিচ্ছেন?

BanglaBook.org

প্রতুল বললে, ধরে আমরা কিছু নিচ্ছি না। তবে সন্দেহ করতে বাধ্য; কারণ সেটের ক্যানভাসের দেওয়ালে স্ত্রীলোকের রক্তমাখা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। যদি চিঠির আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেগুলো মিলে যায়... কিন্তু তৃতীয় একজন লোক এর ভেতর আছে—পায়ে যার বুটজুতো ছিল। রাতে আপনার স্টুডিয়ো পাহারা দেয় যে-লোক—সে কি বুটজুতো পরে?

বলতে পারিনে।

প্রতুল বলল, খুনি যদি সে-ই হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে, বিলাসবাবুকে হত্যা করে কিছুক্ষণ সে সেটেতেই ছিল, আর না-হয় চলে গিয়ে ফের ফিরে এসেছিল। এবার চতুর্থ লোকটির কথা—হত্যার সময় সে-ও সেটেতেই ছিল। হয় সে নিজে করেছে, না-হয় হত্যাকাণ্ড দেখেছে। কী করে জানলুম তা এখন বলব না। তবে একসময় ভয় পেয়ে তাকে লুকোতে হয়েছিল, পরে বিলাসবাবুর মৃতদেহের কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে তাকে স্পর্শ করে। আঙুলে রক্ত লাগতেই ভয় পেয়ে ছুটে পালায়। দরজায় তার রক্তমাখা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

নাগরমল গুম হয়ে বসে রইল; পরে আপনমনে বলে উঠল, হায় ভগবান! হামার সব লোকই কি খুনি?

প্রতুল ভারী গলায় বলল, হ্যাঁ, নাগরমলবাবু, দুনিয়ার সব লোকই খুনি। মানুষের জীবনে এমন সময় আসে, যখন আইন-শৃঙ্খলার সব বাঁধন সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তখন কাজে না হোক, চিন্তাতেও সে অনায়াসে অপরকে খুন করবার সঙ্কল্প করতে পারে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই একসময়ে না একসময়ে অপরকে হত্যা করবার জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠে, এরই ফলে এমন অনেক হত্যাকারী দেখা যায়, যারা মুহূর্তের এই তীব্র বাসনাটাকে দমন করতে পারে না। হয়তো তাদের জীবনে ভবিষ্যতে কোনওদিন এ-উত্তেজনা আসবে না, শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতায়—।

বাধা দিয়ে নাগরমল বলে উঠল, না, না, এ আপনার ভুল কথা প্রতুলবাবু, আমার জীবনে কোনওদিনই এরকম দুর্বলতা আসেনি।

হেসে প্রতুল বলল, এটা আপনার ঠিক কথা হল না। আমি আপনার পূর্ব ইতিহাস জানি। গতদিনকার কথা মনে করুন, যখন আপনি দুর্দিনের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন, তখন মোটরে চড়ে হেসে-খেলে বেড়াত যারা, তাদের দেখে আপনার কি মনে হত? তখন হাতের কাছে পেলে অনায়াসেই তাদের খুন করতে পারতেন। আইনকানুনের যত শক্ত শেকলই আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখুক না কেন, তবু মূলে মানুষ তার জিঘাংসাটা ছাড়তে পারেনি। যুদ্ধই তার প্রমাণ।

নাগরমল মাথা হেঁট করে রইল।

প্রতুল ঘড়ি বার করে বলল, রাখালের তো এতক্ষণ গঙ্গারামকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় আঘাত হল।

প্রতুল গিয়ে দরজা খুলে দিতেই গঙ্গারামকে নিয়ে রাখাল ঘরে ঢুকল।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কঠিন কণ্ঠে প্রতুল জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম গঙ্গারাম?

হ্যাঁ হুজুর, গঙ্গারাম তেওয়ারী।

রাত্রে তুমি এই স্টুডিয়ো পাহারা দাও?

জী হুজুর।

তোমার কাঁধে যে ঘড়িটা ঝুলছে, কাল রাত্রে পাহারা দেওয়ার সময়ে ওটাই কি সঙ্গে ছিল?

হ্যাঁ হুজুর, সবসময় এটা আমার সাথে থাকে।

বেশ। রাখাল, ঘড়িটা নিয়ে খুলে ফেলে, ভেতর থেকে রেকর্ডটা বার করে নাও তো।

রাখাল ঘড়ির জন্যে হাত বাড়াতেই গঙ্গারাম চকিতের মতো দূরে সরে দাঁড়াল। চোখে-মুখে আগুনের হলকা যেন বয়ে যেতে লাগল। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, আইনের ভয় দেখিয়ে

BanglaBook.org

তাকে কোনও লাভ হবে না।

নাগরমল বলল, গঙ্গারাম, বাবুকে তোমার ঘড়িটা দাও, আর প্রতুলবাবু যা পুছবেন, তার সাচ্চা জবাব দেবে।

গঙ্গারামের মেজাজ বিশেষ নরম ছিল না; বলল, আমার গায়ে হাত দিয়ে ঘড়ি নেবে কেন? আর এই আদমিই বা হামাকে নিদসে টানিয়ে লিয়ে আসবে কেন?

নাগরমল কী বলতে যাচ্ছিল, প্রতুল হাত তুলে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করল। সে বুঝেছিল, এই পশ্চিমাটিকে ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ আদায় করা যাবে না। বরং চালাকির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। গলার স্বর কোমল করে তাই সে বলল, গঙ্গারাম, আমি কেন এখানে এসেছি, সে জেনে তোমার কোনও লাভ হবে না। তবে তোমার দ্বারা আমাদের যদি কোনও সাহায্য হয়, তা হলে ভারি খুশি হব। কাল রাতে যা ঘটেছে এমন ঢের জিনিসই ইচ্ছে করলে, তুমি আমায় বলতে পারো। সত্যি যে আমি আবিষ্কার করতে পারব না, তা নয়, তবে অনর্থক আমার সময় নষ্ট করার আশা করি কোনও বাসনাই নেই তোমার?

গঙ্গারাম চুপ করে রইল; অকস্মাৎ তার মুখের পানে তাকিয়ে প্রতুল প্রশ্ন করল, আচ্ছা গঙ্গারাম, তুমি ভূত বিশ্বাস করো? আমি করি। মাঝে-মাঝে তাদের কান্নার শব্দও শুনতে পাই...

গঙ্গারাম তার চকিত দৃষ্টিটা প্রতুলের মুখের পানে তুলে ধরল, যেন বুঝতে চায় সে বিদ্রূপ করছে কি না। কিন্তু সেখানে রহস্যের কোনও ছাপই দেখতে না পেয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, হামি আপনা কানমে দানার কান্না শুনিয়েসে হুজুর—।

কোথায় শুনেছ বলো দিকিন?

এই স্টুডিয়োমে, কালরোজ রাতমে—।

তাই নাকি! কীরকম শুনলে?

কীরকম আসে—তা বলতে পারব না। মালুম হল কি এক জেনানা ভয় পেয়ে চিল্লোচ্ছে। বহুৎ ডর লাগিয়েছিল হুজুর!

প্রতুল খুশি হয়ে বলল, তখন রাত ক'টা বলতে পারো?

বারা বাজকে বিশ পঁচিশ মিনিট হোয়েগা, আউর কেয়া। রোঁদমে ঘুমতে আছি, তিন নম্বরের কাসে গিয়েসে, দেখি বাতি বিলকুল আঁধিয়ার। নয়া বাতি নিয়ে আসতে যাচ্ছি—ওই বকৎ দানা চিল্লোল...।

তখন ঠিক ক'টা বলতে পারো না?

বারা বাজকে পঁচিশ মিনিট হোবে। সাড়ে বারাভি হো স্যাকতা। বারা বাজকে পনেরো মিনিটকা টাইনমে শেখরবাবু আউর বিলাসবাবু স্টুডিয়োসে নিকাল গেল।

তোমার ঘড়িতে দেখলে বুঝি?

জী হুজুর।

আচ্ছা, রোঁদ দেবার সময় কীভাবে কোথায় যাও?

গেটসে সিধা যাই। তিন নম্বর স্টুডিয়োর পিছন দিক হোকে ফিন বাহাদুরকা সাথ থোড়া বাতচিজ চালাই। কুছু-কুছু কামভি কোরতে হয়। কোই বাতি বুতকে ভুল গিয়া, কোই পাখা বন্ধ নেই কিয়া, কোই খাতা-কাগজ ছোড়কে চল যাতা...।

প্রতুল সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকেই ওরকম অন্যমনস্ক থাকে বটে, কোনও দিকে তারা খেয়াল রাখে না। আচ্ছা, কাল রাতে যা-যা করেছিলে, খুলে বলো দিকি?

গঙ্গারাম বলল, আট বাজে ডিউটিতে আসি; ওই বকৎ বহুৎ পানি পড়তেসিল। বহুৎ রাত তক্ শেখরবাবু তিন নম্বরমে আপনা কাম করসিলেন। তারপর অলকাবিবি আর বিনয়বাবু স্টুডিয়োমে আসেন—বাহাদুর বলিয়েসে আমার—তব বহুৎ গড়বড় শুরু হুল...।

BanglaBook.org

তারপর কী শুরু হল?

সব হামি বলতে পারব না হুজুর, বিশওয়াসও করবেন না। সাড়ে গারা, রোঁদমে ঘুমতে আসি, আপনা আঁখসে দেখলুম এক আওরৎ বিলাসবাবুকা ঘরকো পাশ ছুটিয়েসে; বাহাদুর আমাকে ঝুটা বাৎ বলে ঠাট্টা কোরল, লেকেন ফিন থোড়া বাদ এক কালা দানাকে হামি আপনা আঁখসে তিন নম্বরকো পাশ ঘুমতে দেখিয়েসে।

তখন কি প্রায় বারোটা হবে?

জী হুজুর। তিন নম্বরকো পাশ আসিয়েসে, বারা বাজ গেল, দরজাকা নগিজমে গিয়েসে, ব্যস, কালা দানা কাঁহা মিলিয়ে গেল। হামার মালুম হোল কি উও স্টুডিয়োকা অন্দরমে ঢুকিয়েসে। হামি ভি ভিতর ঘুষব, শেখরবাবু চিল্লোতে শুরু করলেন...।

তিনি কি প্রায়ই এরকম করেন?

জী হুজুর। ভালা মুখে আমাদের সাথ উনি বাত কভি নেহি বলতা। ভগবান ভালা করে। উসকে বাদ ফটকে হামি গিয়ে বাহাদুরকো সাথ বাত বোলেসে। এই বকৎ শেখরবাবু বিলাসবাবুকো লিয়ে মোটরমে বাহার হয়ে গেল। দোনো আদমি আমাদের সাথে কথা কইয়েসে। বিলাসবাবু হরবকৎ বলতা হ্যায় লেকিন শেখরবাবু কক্ষনো বলেন না...।

প্রতুল ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক বলতে পারো, ওই সময় শেখরবাবু আর বিলাসবাবু একসঙ্গে স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে গেলেন?

আপনা আঁখসে দেখিয়েসে বাবুজী।

বেশ, তারপর আর সেই কালো মূর্তিকে দেখেছ?

চিল্লানো বাদ একজনকে হামি তিন নম্বরের দিকে যেতে দেখিয়েসে।

তুমি পাহারাদার। এসবের খোঁজখবর নিলে না কেন?

লিব তো ভাবিয়েসিলুম হুজুর; লেকিন বাহাদুরকে বলতে সে ঠাট্টা করল। বলল, অলকামায়ী ছাড়া দোসরা কোই আওরৎ স্টুডিয়োমে ঘুসেনি, আমার বাত হেসে উড়িয়ে দিল...।

প্রতুল জিগ্যেস করল, তা হলে বলো সে তোমাকে খোঁজ নেবার জন্যে কোনওরকম উৎসাহ তো দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে?

জী হুজুর, হামি হামার সাথ আসতে বললুম, আমাকে জংলি বলে উড়িয়ে দিলে...।

আচ্ছা, শেষকালে যে মূর্তিটাকে দেখেছ, সে কে বলে তোমার মনে হয়?

আঁধার ছিল, ভালো দেখতে পাইনি; তবে হামার মনে লিচ্ছে কি উও বাহাদুরের লেড়কী উলকি। উসি লিয়ে আগাড়ি বাহাদুরকে যখন দানার কথা বললুম, এত্ত গোসা করল।

তুমি কি তাকে বলেছ যে তার মেয়ের মতো মনে হল?

নাম করিনি, তবে বুঝিয়েসে—।

উলকি আর বিলাসবাবু সম্বন্ধে কোনও কিছু শুনেছ কখনও?

গঙ্গারাম এই প্রথম হেসে ফেলল; বলল, কেতনা রাত আপনা আঁখসে দোনোকো দেখিয়েসে হুজুর...।

নাগরমল চিৎকার করে উঠল, আমার স্টুডিয়োর ভেতরে এইসব কাণ্ড...।

প্রতুল আবার জিগ্যেস করল, বাহাদুর যখন অত চটে উঠেছিল, তখন মনে হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে তার মেয়ের নাম শোনাটা সে পছন্দ করত না, কী বলো?

জী হুজুর। কত রোজ আমাদের বলিয়েসে, বিলাসবাবুকে পাকড়াও করতে পারলে সে জান লিয়ে লেবে...।

তাই নাকি! তুমি নিজে শুনেছ?

হামি নয় হুজুর, স্টুডিয়োর আউর বহুৎ আদমি শুনিয়েসে...।

BanglaBook.org

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আর তোমায় উপস্থিত কিছু জিগ্যেস করার নেই। এখন যেতে পারো তুমি।

গঙ্গারাম বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রতুল প্রশ্ন করল, আচ্ছা গঙ্গারাম, তুমি যখন রোঁদে ঘোরো, তখন বাহাদুর এমনভাবে ফটক ছেড়ে তিন নম্বরের কাছে যেতে পারে কি—যাতে তোমার নজরে পড়বে না?

জী হুজুর।

নাগরমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রতুলের পানে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি কী করে জানলেন প্রতুলবাবু, যে, গঙ্গারাম মেয়েছেলের চিৎকার শুনতে পেয়েছে?

হেসে প্রতুল জবাব দিল, এ তো সোজা কথা নাগরমলবাবু। যে মেয়ে অত ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে ক্যানভাসের দেওয়ালে আর দরজায় আঙুলের ছাপ রেখে গেল, সে যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবে এটা ভেবে নেওয়া আর শক্ত কী?

নাগরমল মাথা চুলকে বলল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে কোনওরকমে মেয়েটি নিজের আঙুল নিজে কেটে ফেলে। শেখরবাবুর কথায় আমরা জানতে পারলুম যে, গঙ্গারাম যখন আওরতের চিল্লোনো শুনেছিল, তখন তাদের কেউই স্টুডিয়োতে ছিল না; তবে কী করে বিলাসবাবুর খুন দেখে আওরৎটি চিল্লোতে পারে! ওদের বাত যদি সাচ বলে বিশ্বাস করতে হয়, তবে আপনি যে-সময় বিলাসবাবু খুন হয়েসে বলে মনে করলেন, সে-সময়ে তিনি নিজের মোকামে বসিয়ে আছেন...।

প্রতুল চিন্তিত কণ্ঠে বলল, এইখানেই একটা গলদ থেকে গেছে সময়ের। সেইটাই একবার দেখতে হবে। একবার বাহাদুরের সঙ্গেও বোঝাপড়া করা দরকার; বিশেষত তার মেয়ে যখন...।

নাগরমল চট করে বলে উঠল, বড় ভালা লেড়কী। আমার কমিক ছবিতে একটা ছোট পার্ট করেসে। হামি বিশওয়াস...।

বাহাদুরের মেয়ে...। বলে প্রতুল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাগরমল ইতস্তত করে বলল, বাহাদুর ভি বড় ভালা আদমি। লেকিন ও একটু-একটু...।

৮

প্রতুল একলাই স্টুডিয়ো ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে আনন্দ—হাসি; বেশ একটা মাদকতা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হল তার, চিত্রজগতে জাত-বিচার দেখে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ হয়তো নেই, কিন্তু ছোট-বড়য় এতখানি পার্থক্য সে আর কোথাও দেখেছে বলে মনে হল না; নামজাদা অভিনেতা বা অভিনেত্রী সাধারণের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, মুখের একটা কথা খসাতেও যেন একান্ত নারাজ।

আরও অনেক কথাই তার মনে জাগছিল; হঠাৎ একটি ছেলে হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বলল, আপনার নাম প্রতুলবাবু? ফোনে ডাকছে আপনাকে।

অফিসে এসে প্রতুল রিসিভারটা তুলে নিতেই রাখালের গলা শোনা গেল : প্রতুলবাবু... ও! আমি রাখাল। বাহাদুরকে কোনওরকমে ধরেছি। নিয়ে যাচ্ছি।

কী জন্যে তাকে দরকার—সে কি জানতে পেরেছে কিছু?

না, বাড়িতে মশগুল হয়ে সে তখন সবুজ চা খাচ্ছিল...।

BanglaBook.org

বেশ, তাকে কিছু ভেঙো না এখন। আমি এখুনি নাগরমলবাবুর ঘরে যাচ্ছি; সেখানে নিয়ে এসো।

চেহারা দেখেই প্রতুল বুঝতে পারল, এবার তাকে ভিন্ন ধাতুর লোক নিয়ে কারবার করতে হবে।

বাহাদুর পাহাড়ি হলেও লম্বায় সমতলভূমির কোনও জাতের লোকের চেয়েই খাটো নয়। পেশিবহুল বলিষ্ঠ গঠন, বুকখানা বিশাল, ছোট-ছোট চোখ দুটো সদা আরক্ত।

তাকে দেখেই প্রতুল বলে উঠল, আগে বোধহয় সৈন্যবিভাগে কাজ করতে, না বাহাদুর?

হ্যাঁ হুজুর, অনেক দিন করেছি। আপনি কি আমার সঙ্গে...

নাগরমল বলে উঠল, প্রতুলবাবু তোমাকে দু-একটা কথা জিগ্যেস করতে চান।

উত্তরে বাহাদুর শুধু একবার বিচিত্র মুখভঙ্গি করল।

প্রতুল বলল, সকালে ডিউটি সেরে তুমি তো চলে যাও রোজ, কাজেই জানো না বোধহয় যে, গত রাতে স্টুডিয়োতে একটা খুন হয়ে গেছে?

বাহাদুর যে একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, সেটা প্রতুলের দৃষ্টি এড়াল না। একটুখানি চুপ করে থেকে বাহাদুর জিগ্যেস করল, কে খুন হয়েছে?

বিলাসবাবু।

বিলাসবাবু! বিলাসবাবু তো কাল রাতে শেখরবাবুর সঙ্গে একইসময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান! রাতে তো আর ফিরে আসেননি!

সেইটেই তো জানতে চাই আমরা। তুমি বলছ, তিনি আর ফিরে আসেননি। অথচ আজ সকালে মৃতাবস্থায় তাঁকে তিন নম্বরে পাওয়া গেছে। কাজেই বুঝতে পারছ তো, ফিরে তিনি এসেছিলেনই। কথাশেষে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাহাদুরের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বাহাদুর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কিন্তু আসলেও, গেট দিয়ে যে আসেননি, তা আমি জোর করে বলতে পারি।

অন্য কোনও পথ দিয়ে তাঁর আসার সম্ভাবনা আছে?

কই, সে রকম কোনও পথ তো দেখছি না হুজুর।

প্রতুল একটু ভেবে নিয়ে বলল, আচ্ছা, গঙ্গারামের সঙ্গে মাঝে-সাঝে চা-টা খেতে যাও না? এমন শীতের দিন...।

মাঝে-সাঝে যাই না হুজুর, তবে কাল রাত্রিতে গেছলুম; জবর ঠাণ্ডা ছিল কাল, তার ওপর বৃষ্টি। একটু গরম না হয়ে আর...।

যখন চা খেতে গেছলে, গেটে কি তখন চাবি দিয়েছিলে?

বাহাদুর জবাব দিল, গেলে চাবিই দিয়ে যাই, তবে কাল রাতে তখনও সেটে লোক ছিল বলে বন্ধ করিনি—যদি কোনও সময় কারও যাওয়ার-আসবার দরকার লাগে। বড় দরজা বন্ধ করে লোক ঢোকবার ছোট দরজাটা খুলেই রেখেছিলুম।

কে-কে স্টুডিয়োতে ছিল তখন?

অলকাদেবী আর বিনয়বাবু।

আর কেউ নয়? অন্য কোনও স্ত্রীলোক?

বাহাদুর স্থিরদৃষ্টিতে প্রতুলের চোখের পানে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, হাসপাতালের নার্স।

প্রতুল বলল, তোমায় খাতায় টোকা আছে দেখেছুম, অলকাদেবী একটার পর স্টুডিয়ো থেকে যান, তারও খানিকটা পরে বিনয়বাবু...।

ঠিক বলেসেন হুজুর।

তাহলে বলো যে, তুমি তাঁদের স্টুডিয়ো থেকে যেতে দেখনি? তুমি বোধহয় তখন চা খেতে

BanglaBook.org

গেছলে?

না হুজুর, দেখিনি।

পথের দিকে তুমি পিছন ফিরে বসেছিলে? আর কেউ গেটের কাছে আসলে, তোমার পিঠে কি আর একটা চোখ গজিয়ে ওঠে?

বাহাদুর ভেবে পেল না, হঠাৎ কী উত্তর দেবে; তারপরই কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, আমার কী ডিউটি, এতদিন মিলিটারি কাজ করে আমি কি তা শিখিনি ভেবেছেন? যতক্ষণ চা খাচ্ছিলুম, তার মধ্যে একবারও গেটের দিক থেকে আমার চোখ সরাইনি।

তার মধ্যে কেউ কি গেট দিয়ে বেরোয়নি বলতে চাও?

না, হুজুর।

প্রতুল ঘুরিয়ে আবার প্রশ্ন করল, কাউকে যদি গেট দিয়ে বেরোতে না দেখে থাকো, তা হলে কেউ ঢুকল কি না কী করে জানতে পারবে? আসল কথা হচ্ছে, সেখান থেকে ঝড়-জলে তোমার নজরটা ঠিকমতো চলেনি।

বাহাদুর নীরস কণ্ঠে বলল, যদি তাই বলতে চান, তবে তাই।

প্রতুল প্রশ্ন করলে, এ-পর্যন্ত শেখরবাবুর কথাতেই আমরা পেয়েছি যে, বিলাসবাবুকে তিনি বাড়ির কাছে নামিয়ে দেন। ধরো, যদি সেখান থেকেই তিনি ফিরে এসে থাকেন, আর স্টুডিয়োর ভেতরে তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে—।

কথাটা বলে প্রতুল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। দেখতে-দেখতে বাহাদুরের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি দুটো শাণিত অস্ত্রের মতো চকচক করতে লাগল। হাত দুটো মুঠো করে একবার সে নড়েচড়ে উঠল, তারপর অনেকক্ষণ বাদ যখন সে কথা কইল, তখন আত্মদমন করে ফেলেছে; বলল, আমার মেয়েকে এ-ব্যাপারে টানবার কোনও অধিকারই নেই আপনার। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, বিলাসবাবুকে বাড়ির কাছে শেখরবাবু নামিয়ে দিতে পারেন, তিনি আবার ফিরেও আসতে পারেন, কিন্তু কেন এসেছিলেন সে-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

প্রতুল তার চোখের দৃষ্টি কিন্তু বাহাদুরের মুখের ওপর থেকে সরাল না। এ-লোকটিকে সহজে পরাস্ত করা সম্ভবপর হবে না ভেবেই সে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আচ্ছা বাহাদুর, চা খেয়ে ফেরবার পর তুমি যদি তিন নম্বরে যেতে, তা হলে গঙ্গারাম কি সেখান থেকে তোমায় দেখতে পেত?

আলোটা ঠিক করবার জন্যে গঙ্গারাম নিজেই তক্ষুনি তিন নম্বরের দিকে যায়, তারপর সে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে যায় একটা নতুন বালব আনবার জন্যে। তখন যদি আমি তিন নম্বরের দিকে যেতুম, তাহলে সে না-ও দেখতে পেত।

প্রতুল সহজ কণ্ঠে বলল, আমিও তাই ভেবেছিলুম। এই জুতো-জোড়াই কি কাল রাতে তোমার পায়ে ছিল?

না, কাল রাতে বৃষ্টি দেখে রবারের তলাওয়ালা জুতোটা পরে এসেছিলুম।

নাগরমল উত্তেজিত হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, চোখের ইশারায় প্রতুল তাকে সতর্ক করে দিয়ে আবার বলল, বাহাদুর, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিলাসবাবুর মৃতদেহের পাশে একজন রবারের জুতোওলা লোক দাঁড়িয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি; সে মৃতদেহ ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তার পায়ের রক্তমাখা অনেক ছাপও পাওয়া গেছে।

বাহাদুর একটুও না দমে চট করে জবাব দিল, সেটা আপনাদের সূত্রও হতে পারে, আবার কারও সাজানো হতে পারে?

পারে যে তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু যতক্ষণ না সাজানো বলে সেটা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ সূত্র বলেই ধরব। কাল রাতে তুমি যে জুতো-জোড়াটা পরেছিলে, আমি সেটা একবার দেখতে চাই।

BanglaBook.org

নিশ্চয় দেখতে পাবেন।

আচ্ছা, গঙ্গারাম যখন কাল রাতে কী সব ছায়ামূর্তি দেখেছে বলে খোঁজ নেবার জন্যে তোমার সাহায্য চায়, তুমি তখন তার সঙ্গে যেতে রাজি হওনি কেন?

বাহাদুর ঘৃণা-মাখা মৃদু হেসে বলল, গঙ্গারামকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি ভালোই চিনি। যে যাহোক, তার সঙ্গে যেতে তো অস্বীকার করিনি আমি; কারণ তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে মোটে বলেইনি সে আমায়। আর তা ছাড়া তার সব পাগলামি যদি শুনতে হয়...।

বুঝলুম। তার দেখা একটা মূর্তিকে তুমি বিনয়বাবু বলেছিলে; আর দুজনের কথা কিছু বলইনি। চিৎকার শোনার পর গঙ্গারাম যে-মূর্তিটাকে দেখে, আমার বিশ্বাস সে তোমার মেয়ে।

বাহাদুর কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, আমার মেয়ে কাল স্টুডিয়োতেই ছিল না।

প্রতুল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি বোধহয় তার নামটা খাতাতে লেখইনি?

বাহাদুর জ্বলে উঠল; রুষ্টকণ্ঠে বলল, আপনি কি বলতে চান, বাপ হয়ে আমি নিজের মেয়েকে বিলাসবাবুর মতো লোকের সঙ্গে রাতে একলা দেখা করতে দেব? আবার সেটা ঢাকবার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে? আমি তাকে রাতে স্টুডিয়োতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি।

তার কথার মধ্যে যে-বেদনা আর ঋজু আত্মসম্মানের সুরটুকু ফুটে উঠল, তাতে প্রতুল বুঝতে পারল, মেয়ের জন্যে কী গভীর স্নেহ এই বলিষ্ঠ-গঠন লোকটার কঠিন বুকের ভিতর সঞ্চিত আছে। গলাটা কোমল করে সে বলল, খুনের তদন্ত করতে গেলে আমায় অনেক কিছুই ঘাঁটতে হবে বাহাদুর, তাতে মনে তোমার যতখানিই আঘাত লাগুক না কেন। কাল রাতে তোমার মেয়ে কোথায় ছিল?

এক লহমার জন্যে ইতস্তত করে বাহাদুর জবাব দিল, জানি না।

আজ সকালে যখন বাড়ি ফিরলে, তখন সে কোথায় ছিল?

ছোট-ছোট কমিক বইতে মাঝে-মাঝে সে দু-একটা খুচরো পার্ট করে, তাই একটু সকাল করেই স্টুডিয়োতে চলে এসেছিল, আমি গিয়ে দেখতে পাইনি।

তোমার কি তাই বিশ্বাস?

না বিশ্বাস করার তো কোনও কারণ নেই হুজুর।

ওটা আমাদের একবার জানা দরকার, নাগরমলবাবু।

নাগরমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তার জন্যে আর কী? আমি এক্ষণে আমার সেক্রেটারিকে ডাকিয়ে সব বন্দবস করিয়ে দিস্‌সি...।

প্রতুল ফিরে তাকাতেই দেখল, বাহাদুরের মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে উঠেছে। বলল, তুমি খাতায় লিখেছ অলকাদেবী একটার পর আর বিনয়বাবু তারও মিনিট পনেরো পর স্টুডিয়ো থেকে যান। অত রাত অবধি ওঁরা স্টুডিয়োতে কী করছিলেন বলতে পারো?

অলকাদেবী তাঁর নতুন বইয়ের পার্ট পড়তে এসেছিলেন; বোধহয় নিজের ঘরে বসে-বসে পড়ছিলেন; আজকেই তাঁর শেষ করে দেওয়ার কথা ছিল। তবে বিনয়বাবুর অত দেরি করে যাবার কী কারণ থাকতে পারে জানি না; তিনি তাঁর সিনারিও খাতাখানা সেটে ফেলে গেছলেন, তাই নিতে এসেছিলেন। শেখরবাবু সেটে কাজ করছিলেন, মাঝে-মাঝে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না সেখানে, তাঁর সহকারীকেও না; তাই বিনয়বাবুকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরে হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তার পরেও কেন ছিলেন বলতে পারব না।

বেরিয়ে যাবার সময় দুজনের কারও মধ্যে তুমি কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলে?

অলকাদেবী সবসময়েই একটু হাসি-খুশিভাবে থাকেন; সকলের সঙ্গে ডেকে-ডেকে কথা বলেন। কালকে, যেন একটু দমে যাওয়া মতন মনে হল। ভালো কথাবার্তা বলেননি। তবে সেটা অতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পার্ট পড়ে হয়েছিল কি না বলতে পারব না।

BanglaBook.org

আর বিনয়বাবু?

বিনয়বাবুর কোনও তফাৎ দেখিনি হুজুর; খালি মনে হয়েছিল, তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সারাদিন শেখরবাবুর সঙ্গে কাজ করে ওরকম হওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। তাঁর সঙ্গে যে কাজ করেছে, সে-ই স্বীকার করবে।

প্রতুল এতক্ষণ তার সামনে খোলা খাতাটার পানে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একসময় মুখ খুলে বলল, আচ্ছা বাহাদুর, অলকাদেবী কাল রাতে সবসময় তাঁর ঘরে ছিলেন কি না, ঠিক করে বলতে পারো? গঙ্গারাম যে তাঁকেই সিঁড়ি দিয়ে বিলাসবাবুর ঘরের দিকে ছুটে যেতে দেখেনি, সে-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না হুজুর।

বিনয়বাবু সবসময় তাঁর অফিসে ছিলেন কি না, বলতে পারো?

না হুজুর, তাও বলতে পারি না।

তোমরা যখন চা খাচ্ছিলে, বিলাসবাবু তখন ফিরে এসেছিলেন কি না, তাও জোর করে বলতে পারো না?

না, পারি না।

ফিরে এসে তুমি যে তিন নম্বরে যাওনি, গঙ্গারামের পক্ষে তাও জোর করে বলা বোধহয় সম্ভবপর নয়?

যদি না নজর রাখব বলে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে—আমার মনে হয়, তা সে করেনি—তাহলে বলা সম্ভবপর নয়।

প্রতুল জিগ্যেস করল, কেন তোমার মনে হয় যে, সে করেনি?

আমার বলা ভুল হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তা সে করবে না।

তিন নম্বর থেকে যখন চিৎকারটা আসে, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

এমন কোনও চিৎকারই আমি শুনিনি।

এইসময় নাগরমলের সেক্রেটারি ঘরে প্রবেশ করল; বলল, উলকি কাল বিকেলে শরীর খারাপ বলে স্টুডিয়ো থেকে চলে যায়। তারপর আজ মোটেই আসেনি।

৯

রাখালের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় যেটুকু অংশমাত্র সে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল, সেটা অম্লান মুখে তৎক্ষণাৎ বিনয় গলাধঃকরণ করে ফেলল। তার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল অলকার নত দেহটা সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিলাসের ঘরে টেবিলের ওপর চিঠিখানা রেখে দিচ্ছে। কাজটা সে ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিল; পরক্ষণে এর নিরর্থকতাটা বুঝতে বাকি রইল না তার। স্বাক্ষর বা শিরোনামা চিঠিতে থাক আর না-ই থাক, চিঠিটুকু পেলেই পুলিশে সত্য কথাটা আবিষ্কার করে ফেলবেই। গতকালও যদি তাকে কেউ এরকম নির্বুদ্ধিতার কোনও কাহিনী শোনাত, তা হলে বিদ্রূপভরে সে নিশ্চয়ই হেসে উঠত। আর আজ? চিঠির শেষ অংশটুকু যেন আর তার গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না।

নিজের ওপরই অকারণ ক্রোধে বিনয় ঘরময় ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল; যে-ভুলটুকু সে করে ফেলেছে, সেটাকে সংশোধন করে নিতেই হয়তো এখন তার সমস্ত ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিটুকু নিয়োজিত করতে হবে।

অন্যমনস্কের মতো দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ছবিগুলোর পানে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

BanglaBook.org

কাল এগুলোর দাম ছিল তার কাছে, আর আজ? আজ ওগুলো শুধু তার অতীত জীবনের সাক্ষ্য দেবে। অদূর ভবিষ্যতে ঘনিয়ে উঠেছে ঘন কালো যবনিকা। হত্যার সন্দেহে আজ সে নিজের ঘরেই নজরবন্দি—বাইরের পদচারণারত পুলিশ প্রহরীটি অনবরত এই কথাটাই বিঁধে থাকা কাঁটার মতো তাকে খোঁচা দিতে লাগল।

বিলাসের জন্যে কোথাও তার দুঃখ করার মতো কিছু নেই; দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা যা কিছু—তা শুধু অলকাকে ঘিরেই। তার পেলব তনুটাই বারে-বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে—অপূর্ব ভঙ্গিতে টেলিফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মনে পড়ল তার নুটুর কথা। সকালে স্টুডিয়োতে পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে যে-দৃশ্যের অভিনয় হয়।

নুটু শেখরনাথকে বিশেষ সুনজরে না দেখলেও, বিনয়কে সে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত।

বিনয় যখন স্টুডিয়োতে এল, নাগরমলের অফিস-ঘরের পাশে তখনও সে মুহ্যমানের মতো বসে। তার কাছে গিয়ে বিনয় রহস্যতরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে নুটু? এখানে বসে?

কিছু হয়নি।

বিনয় হেসে বলল, দেখে মনে হচ্ছে যেন বেজায় অসুখ। উচিত তোমার হাসপাতালে গিয়ে একদাগ জোর জোলাপ মেরে দেওয়া।

নুটু করুণ মুখভঙ্গি করে বলল, সত্যি বলছি হুজুর, আমার কিচ্ছু হয়নি। আর কোনও মিথ্যা তার মুখে জোগাল না।

বিনয় এগিয়ে এসে খপ্ করে তার একখানা হাত ধরে ফেলে বলল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। ছিঃ, আমার কাছেও লুকোচ্ছিস?

নুটু প্রায় কেঁদে ফেলল। হায়, সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবে না বলে। কাতর কণ্ঠে বলল, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর। আমার যে বলতে বারণ—

বিনয় শুধু বলল, বেশ তো, তা হলে বোলো না—

কথাটা ছোট, কিন্তু নুটুর মনে হল কে যেন তাকে ঘা কয়েক চাবুক কষিয়ে দিলে। কোনও কথা প্রকাশ করবে না বলে নুটু কিছু নাগরমলের কাছে শপথ করেনি, জানতে পারলে বড়জোর না হয় চাকরি যাবে; কিন্তু বিনয়ের কাছে এই সেদিনও সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বকশিস পাওয়া পয়সায় সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আর কোনওদিন বিড়ি কিনে খাবে না।

মনস্থির করে নিয়ে একনিশ্বাসে সে বলে ফেলল, বিলাসবাবু তিন নম্বরে খুন হয়ে পড়ে আছেন; আমিই আগে তাঁকে... কথাটা সে শেষ করতে পারল না। অকস্মাৎ তার হাতের ওপর বিনয়ের মুষ্টিটা বজ্র হয়ে উঠতেই, থেমে পড়ে হাঁ করে সে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মরা মানুষের মতো সেটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো দিয়ে বেরোচ্ছে আগুন। অকস্মাৎ তার হাত দুটো ঠেলে দিয়ে বিনয় যে-পথে এসেছিল, সে তার বিপরীত পথে ছুটল।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই নাগরমল তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিল, প্রতুল বসে-বসে শুনতে লাগল তার পারিবারিক ইতিহাস।

না, না, এখন আমি ভয়ানক ব্যস্ত আসি ভেইয়া। হামার কাসে বসে আসেন প্রতুলবাবু...হ্যাঁ, পুলিশের গোয়েন্দা। ...ভয় পাবার কী আসে? আরে ছোঃ, এখন মোকাম যেতে পারব না। আজ পারব কি না সন্দেহ। ...দুর্গা আসে? ...আজ কোঠী যেতে পারব না মাইয়া। ...হ্যাঁ, কাল যাব। তুমি নিদ যাও।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রতুল জিগ্যেস করল, অলকাদেবী কোথায়, কোনও খবর

BanglaBook.org

পেয়েছেন?

হাঁ, হাঁ, আজ কোনও কাম নেই বলে এক বন্ধুর সাথ তিনি ডায়মন্ডহারবারে ঘুমনে গিয়েসেন। আমি লোক পাঠিয়েসে, আট বাজে এখানে চলিয়ে আসবেন বলে পাঠিয়েসেন। সাত বেজে গিয়েসে, আর একটু বাদ...

প্রতুল বলল, তার আগে বিনয়বাবুকে আমি গোটা কয়েক কথা জিগ্যেস করে নিতে চাই। একটু চা পেতে পারি কি তার আগে?

জরুর। হামি আভি বলিয়ে দিসসে।

চা-পান করতে-করতে নাগরমল প্রশ্ন করল, বাহাদুরের কথা শুনে আপনার কী মালুম হল প্রতুলবাবু?

দলের মধ্যে সে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী।

বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত শব্দ মুখ দিয়ে বার করে নাগরমল প্রতুলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

অবাক হবার কিছু নেই নাগরমলবাবু। এমন অনেক জিনিস সে জানে, অথচ কিছুতেই বলছে না। যে-মুহূর্তে আমি খুনের দায়টা তার মেয়ের কাঁধে চাপাব, সেই মুহূর্তেই সে এমন একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে যে আদত দোষীকে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

হয়তো তার লেড়কী এ-কাজ করেনি!

হতে পারে। এমন কথা তো আমি কিছু বলিনি যাতে সে এ-কাজ করেছে প্রমাণ হয়। মুশকিল হচ্ছে যত সাক্ষী-প্রমাণ পাচ্ছি, সূত্রও তত পাওয়া যাচ্ছে—সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গোলমেলে কথা।

নাগরমল কুণ্ঠিতস্বরে বলল, বাহাদুর কিন্তু খুন করার আদমি নয়।

না, খুন করার নয়—মারার।

তার মানে?

মানে আমিও হত্যাকারী নই, তবে দরকার হলে এখনই মেরে ফেলতে পারি। ধরুন, পথে একটা সাপ পড়ে আছে। এমন একদল লোক আছে যারা অম্লান মুখে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে; আর একদল লোক আছে, যারা সাপটাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত যেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। বাহাদুর যেমন চালাক, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে জানে, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে; কী করতে হবে না হবে, ভেবেও রেখেছে সেই মতো; আইন-কানুনও ভালোমতোই জানে।

চায়ের কাপটা শেষ করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে আবার বলল, যদি কিছু মনে না করেন, বিনয়বাবুকে এবার তা হলে ডেকে পাঠাই। অলকাদেবী এসে পড়ার আগেই তাঁর কাছ থেকে যা কিছু জানবার আমি জেনে নিতে চাই।

জরুর। বলেই নাগরমল টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

BanglaBook.org

বিনয় দেখতে সুশ্রী। গভীর কালো চোখে একটা স্বচ্ছ সরলতা খেলা করতে দেখা যায়।

তাকে দেখেই প্রতুল আপনমনে বলে উঠল, হুঁ, ইনি দেখছি যা জানেন, তার অনেক কিছুই বলতে রাজি নন। অকস্মাৎ তার ব্যবহার এমনই রুক্ষতায় নির্মম হয়ে উঠল যে, নাগরমল আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে প্রতুল তাকে থামিয়ে দিল। নাগরমল আর কিছু বলতে সাহস পেল না বটে, কিন্তু এই লোকটির স্টুডিয়োয় পদার্পণের ক্ষণটিকে মনে-মনে অভিশাপ না দিয়ে পারল না।

প্রতুল কঠোর কণ্ঠে বলল, আপনি বলতে চান, সিনারিও খাতাখানার জন্যেই আপনি সেটের দিকে যান? তাতে কি আপনার দু-ঘণ্টা লেগেছিল?

বিনয় শান্ত কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, খাতা নেবার পর কী করেছি না-করেছি, সেটা আমার ব্যক্তিগত কথা।

ভুল কথা। আশাকরি, হাজতে এক রাত্তির থাকলেই আপনার বুদ্ধির বন্ধ চোখটা একটু খুলবে।

আমার বিরুদ্ধে আশাকরি, আপনি এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাননি, যাতে এখনই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

আপনাকে ঢের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাখাল সেটা করেছে। কথা হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে আমরা এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাইনি—যাতে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।

বুঝলুম; কিন্তু মুখে যা বলছেন, কাজে তো তা প্রমাণ করতে হবে?

হবে বইকী। শেখরবাবু আর বিলাসবাবু স্টুডিয়ো থেকে চলে যাওয়ার পর অলকাদেবী কোথায় ছিলেন?

বিনয় চুপ করে রইল।

প্রতুল আবার বলল, আচ্ছা, ওটার উত্তর না দিলেও এটার দিতে আশাকরি, কোনও আপত্তি হবে না। শেখরবাবুরা চলে যাওয়ার পর যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আপনার—কে সে?

কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গেই আমি কথা কইনি।

প্রতুল কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু আমি একজন স্ত্রীলোকের রক্তমাখা আঙুলের ছাপ সেটের ক্যানভাসের দেওয়ালে পেয়েছি।

বিনয় শিউরে উঠল। তার এই কম্পনটা অতি স্থূলদৃষ্টি লোকেরও চোখ এড়াত না। প্রতুল বুঝল, এ রকম প্রশ্নের জন্য এই লোকটি প্রস্তুত ছিল না। বলল, ওই আঙুলের ছাপগুলো, আর অলকাদেবীর লেখা চিঠির ছাপ—যেটা আপনি অমন সযত্নে খেয়ে ফেলে বাঁচতে চেয়েছিলেন—এই দুটো মেলালেই বুঝতে পারব, আঙুলের ছাপটা কার। বাহাদুরের লেখা খাতামতো দেখা যায়, অলকাদেবী ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোকই কাল রাতে স্টুডিয়োতে আসেননি, কাজেই...।

বিনয়ের মনে হল, একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত ক্রমাগত যেন তাকে তলের দিকে টানছে; নিজেকে আর সে কোনওমতে স্থির রাখতে পারছে না। মুখ-চোখ তার আরও শুষ্ক হয়ে উঠল।

প্রতুল এ-সুযোগ ছাড়ল না। বলল, অলকাদেবীর সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ—সেটা আমাদের অজানা নেই। চিঠিতে তিনি হত্যাটা স্বীকার করা ছাড়া আর বড় বেশি কিছু বাকি রাখেননি। চিঠিটা পড়েছেন বোধহয়? সময় পাননি? খালি তলায় তাঁর নামের স্বাক্ষরটা দেখেই ছোঁ মেরে সরিয়ে ফেলবার সাধ জাগল? পড়লে হয়তো আপনি জানতে পারতেন...।

দয়া করে থামুন আপনি। আমি সব স্বীকার করছি; আমিই করেছি এ-কাজ।

প্রতুলের মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র একটা হাসি।

নাগরমল একান্ত শ্রান্তভাবে হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল। একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি করিয়েস বিনয়বাবু? কেন করলে এমন কাজ? বিলাসবাবু পয়লা নম্বর বদমাশ ছিল। তার জন্যে তুমি কেন এইসা কাম করলে?

বিনয় ম্লানভাবে মৃদু হেসে বলল, ব্যস্ত হবেন না নাগরমলবাবু! যা হয়ে গেছে, তার তো আর কোনও চারা নেই।

বিনয়বাবু, হাতে—হাতে আপনার হাতকড়া কেন?

ঘরের সকলে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখে অলকা। দীর্ঘপল্লব চোখের পাতে গভীর আতঙ্কের ছায়া, রাঙা ঠোঁট দুটো মৃদু-মৃদু কাঁপছে।

নাগরমল উঠে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে বলল, ঘাবড়ো মত লেড়কী।

অলকা নিজের হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে বলল, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না নাগরমলবাবু।

BanglaBook.org

আমি ঠিক আছি। শুধু আদত ব্যাপারটা আমি জানতে চাই বিনয়বাবু! স্টুডিয়োয় ঢোকবার মুখেই আমি শুনেছি যে, বিলাসবাবু খুন হয়েছেন। আপনি—আপনি বলুন... চোখ ছেপে তার জল এল।

প্রতুল সংযত কণ্ঠে বলল, উনি স্বীকার করেছেন যে, এ-কাজ ওঁরই...

বিদ্যুতের বেগে অলকা তার পানে ঘুরে দাঁড়াল। ঝড়ের মতো একনিশ্বাসে বলে চলল, উনি স্বীকার করেছেন? আপনি না গোয়েন্দা? বাজারে না আপনার প্রশংসা ধরে না? আপনি ওঁর কথা বিশ্বাস করে স্বচ্ছন্দে ওঁর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিলেন? বাঃ! আমাদের দেশ বলেই তাই—অন্য কোনও দেশ হলে...।

ধীরকণ্ঠে প্রতুল বলল, আমি জানি অন্য দেশে পাকা গোয়েন্দার অভাব নেই, কিন্তু কী করব? নিজে স্বীকার করলে অন্য কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ-ব্যবস্থা করতে বাধ্য আমরা।

বাধ্য আপনারা? জিগ্যেস করি, নিজের মুখের দুটো বাজে কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা?

একটা প্রমাণ হল—বিলাসবাবুর ঘরে ঢুকে ইনি আপনার লেখা একখানা চিঠি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন...।

অলকা ঘৃণার হাসি হেসে বলল, আর সেইটে অবলম্বন করেই আপনারা এঁকে ভাবতে বাধ্য করেছেন যে এ-কাজ আমারই। কাজেই উনি স্বীকার করেছেন অপরাধটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে। জিগ্যেস করি, এমন ব্যাপার কি এর আগে আর কেউ কোনওদিন করেনি? আপনারা বিশ্বাস করলেন এ-কথা? বিনয়বাবু, দোহাই আপনার, আমার জন্যে মিথ্যে বলবেন না, পরের জন্যে নিজের সর্বনাশ টেনে আনবেন না। সত্যি ঘটনাটা এঁদের খুলে বলুন।

অলকা। —একটা কী বলতে গিয়ে বিনয় আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। কী বলবে সে? বলবার আছেই বা কী? সত্যি ঘটনা প্রাণান্তেও সে প্রকাশ করতে পারবে না।

অলকা স্থিরদৃষ্টিতে প্রতুলের মুখের পানে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, বেশ, সত্যি কথা তা হলে আমিই বলছি। বিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কাল রাতে আমি স্টুডিয়োতে ইচ্ছে করেই এসেছিলুম প্রতুলবাবু, কারণ তার কাছে আমার লেখা কতকগুলো চিঠি ছিল—

অলকা—অলকা, দোহাই তোমার—থামো, থামো...।

না, থামব না আমি। আমি...।

বিনয় প্রতুলকে বলল, উনি যা বলছেন, সব আমাকে বাঁচাবার জন্যে। ও-সব শুনে আপনার তদন্তের কোনও সাহায্য হবে না। আপনার যা জিগ্যেস করবার আছে, স্বচ্ছন্দে আমাকে করুন; আমার অপরাধের প্রমাণ পাবার চেষ্টা করুন। সেটে আমি কাল রাতে গিয়েছিলুম। আমার আঙুলের ছাপও ক্যানভাসের দেওয়ালে পাবেন—এটা আপনার মস্ত বড় প্রমাণ।

প্রতুল বলল, সেটা আমি বুঝি। আপনার পায়ে কি কাল রাতে রবারের জুতো ছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

প্রতুল উঠে গিয়ে নাগরমলের টেবিলের ওপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিল। খুলতেই দেখা গেল, ভেতরে লাল কাদার ছাপ। বলল, পা থেকে জুতোটা আপনার খুলে ফেলুন বিনয়বাবু।

না, না, দোহাই আপনার বিনয়বাবু! অবরুদ্ধ অশ্রুবেগে ফুলতে-ফুলতে অলকা বলে উঠল।

প্রতুল বিনয়ের জুতোটা পা থেকে খুলে নিয়ে একটা ছুরি দিয়ে গোড়ালি থেকে কতকটা ধুলো বার করে নিল। পাশের কাদাটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। আপনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে বিলাসবাবুর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিনয়বাবু, যার ফলে রক্তটা বেশ করে আপনার জুতোর গোড়ালির গর্তে প্রবেশ করেছে, মেঝেতেও বেশ স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—।

BanglaBook.org

অলকা আকুল ক্রন্দনে লুটিয়ে পড়ল একখানা চেয়ারের ওপর। নাগরমল হতবুদ্ধির মতো বিনয়ের পানে তাকিয়ে শুধু বসে রইল।

প্রতুল বলল, এর পরেও আপনার স্বীকার করার মতো আর কিছু আছে বিনয়বাবু?

বিনয় হাতটা একবার তার উষ্ণ কপালের ওপরে বুলিয়ে নিল। একটা কী জিগ্যেস করবার জন্যে ঠোঁট দুটোও তার স্ফুরিত হয়ে উঠল; কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে অতি ধীর এবং স্পষ্টভাবে বলল, না, আর কিছু নেই...।

১০

দু-হাতে চেয়ারখানা শক্ত করে ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে অলকাদেবী বলে উঠল, আপনারা—আপনারা সকলেই কি পাগল হয়েছেন?

রাখাল একটু আগেই ঘরে ঢুকেছিল। ঘরের দৃশ্যটা যে উপভোগের সে-বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। প্রতুলের আহ্বানে সচেতন হয়ে উঠে সে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, কী বলছেন স্যার?

শেখরবাবুর কথা সত্যি কি না জেনেছ?

হ্যাঁ স্যার। তাঁর সোফার বলল, শেখরবাবু ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে বই পড়তে বসেন।

দৃষ্টিটা তার ঘুরে-ফিরে ঘন-ঘন বিনয়ের ওপর পড়ছে দেখে প্রতুল মৃদু হেসে বলল, উনি সব স্বীকার করেছেন।

ও। —বলে রাখাল এমনভাবে মুখভঙ্গি করল, যেন এত সহজে শিকার করতলগত হওয়ায় সে মোটেই সুখী হতে পারেনি। বিনয়ের হাতকড়া ধরে টানতে-টানতে আপনমনেই সে বলে উঠল, নাঃ, হাত এখনও পাকেনি দেখছি। গায়ের ঝালে পড়ে কাজটা করে ফেলেছে...

বিনয়ের ইচ্ছে করছিল, বজ্রমুষ্টিতে লোকটার দাঁত ক'টা সব উপড়ে আনতে। হাতকড়া-বদ্ধ হাত দুটো অতর্কিতে একবার শূন্যে উঠলও; কিন্তু এরকম সম্ভাবনার জন্যে রাখাল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। চকিতের মতো এক-পা পিছু হটে গিয়ে, সবলে ধাক্কা দিয়ে সে বিনয়কে চেয়ারে বসিয়ে দিল। ভারিক্কি চালে বলল, ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। সুড়সুড় করে ভালোমানুষের মতো যদি আসো তো তোমারই মঙ্গল, নইলে মাথাটা ছাতু বানিয়ে লঙ্কা মেখে খেয়ে ফেলব।

প্রতুল কঠিন কণ্ঠে ডাকল, রাখাল!

রাখালের অত বীরত্ব-দর্পে কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। বলল, দেখুন না স্যার, কেউটের মতো আবার ছোবল তোলে! তারপর বিনয়ের দিকে ফিরে, হাতকড়াতে একটা প্রবল টান দিয়ে বলল, চল হে গোঁসাইঠাকুর—

বিনয়ের চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতুলকে বলল, এগুলো আমার হাত থেকে খুলে নিতে বলুন; নইলে কারও সাধ্য নেই, এখান থেকে আমায় এক-পা-ও নড়ায়! সুন্দর তদন্তের কায়দা আপনাদের। একদিন স্টুডিয়োতে পদার্পণ করেই শিকারের তাক করলেন একটি অসহায়া স্ত্রীলোকের ওপর। কে আপনাদের বলল, কাকে কান নিয়ে গেছে, আর হস্‌সি-দীঘ্‌ঘি জ্ঞান হারিয়ে অমনি ছুটলেন আপনারা কাকের পেছন-পেছন। খুনি আসামি পাকড়াবার চমৎকার ব্যবস্থা বটে! জানেন আমি স্বীকার করবই, তা করেওছি; কিন্তু তাই বলে এরকম একটা ফেউকে পেছনে ছেড়ে দেবার কোনও অধিকারই নেই আপনাদের। হাতকড়া খুলে দিতে বলুন। যদি যেতেই হয়, ভদ্রলোকের মতো যাব। এরকম জানোয়ারের সঙ্গে যাবার কোনও অভিরুচিই নেই আমার।

BanglaBook.org

প্রতুল ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, রাখাল, বাইরে গিয়ে হরেনকে পাঠিয়ে দাও।

রাখাল আর দ্বিতীয় কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু যাবার সময় দু-চোখের অগ্নিশিখায় বিনয়কে দগ্ধ করে যাবার চেষ্টা করতে ভুলল না। পৌরাণিক যুগ হলে হয়তো বিনয়ের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ওইখানেই সমাপ্ত হয়ে যেত।

হরেন আসতেই প্রতুল বলল, হরেন, বিনয়বাবুকে নিয়ে যাও হাজতে। তোমার কড়া নজর রাখবার দরকার নেই। পালাবার কোনও চেষ্টাই উনি করবেন না।

হরেন মাথা দুলিয়ে বলল, আচ্ছা স্যার। আপনি তা হলে চলুন বিনয়বাবু—

সম্বিৎহারার মতো অলকা কতক্ষণ চেয়ারে পড়ে রইল, তার চোখের সামনে দিয়েই বিনয় ধীরে-ধীরে হরেনের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কতক্ষণ পর অকস্মাৎ সচেতন হয়ে সে প্রতুলের দিকে ফিরে বলল, আপনি... আপনি জানেন, উনি করেননি, তবু ওঁর ভাগ্যে এই লাঞ্ছনা জুটল। ভেবেছেন এর কি কোনও প্রতিফল নেই? এর চেয়ে ঢের বেশি শাস্তি ভগবানের কাছে তোলা আছে আপনাদের জন্যে।

প্রতুল মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনি একটু ভুল করছেন; ভগবানের হাত থেকে পাওনা শাস্তি নিতে কোনওদিনই আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু এ-হত্যা-রহস্যের এখনও আমি কিছুই জানি না।

নাগরমল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আহা বেচারা! কিন্তু বিনয় স্বীকার করার সঙ্গে-সঙ্গে যদি সব গোল মিটিয়ে যায়, আমার জানটা বাঁচে। কিন্তু ছোকরা বড় ভালো লোক আসিল।

অনেকটা রাত।

গঙ্গারাম স্টুডিয়োর পেছন দিকে রোঁদে গেছে।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানতে-হানতে বাহাদুর ছোট হাসপাতাল-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল এবং বন্ধ দরজায় করাঘাত করার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা খুলে গেল, কারণ নার্স লতিকা তারই প্রতীক্ষা করছিল।

ভেতরে ঢুকেই বাহাদুর পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, উলকি যে এইখানেই আছে, এ-কথা আমাকে আগে জানাননি কেন?

লতিকা তেমনিই দীপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, বেচারা তোমার ভয়েই কাঁটা; তোমাকে খবর দিতে তার মানা ছিল।

কাল রাতে সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল?

লতিকা বলল, তা বলতে পারব না; কাল রাতে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যাই; আজ সকালে এসে দেখি না ভুল বকছে; মাথার বোধহয় কী গণ্ডগোল হয়েছে।

তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পাব না?

উলকির অসুখ ভারি বলেই মনে হয়। তার ওপর মাথার গোলমাল। যদি ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা বলো তো রাজি আছি, নইলে ডাক্তারবাবুকে সব বলতে আমি বাধ্য হব।

বাহাদুর আর কোনও কথা না বলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লতিকা কতক্ষণ সেদিক পানে তাকিয়ে থেকে, আপনামনেই বলে উঠল, আমি আর কী করতে পারি? ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই! যদি বাহাদুর বাঁচায়, তবেই... ঘুরে সে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

বিছানার ওপর রোগ-মলিন-মুখে উলকি পড়েছিল; চোখের কোণে তখনও তার জলের রেখা। কিন্তু জ্ঞান ছিল না।

BanglaBook.org

বাহাদুর স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; মা-মরা এ-মেয়েটি আজ নতুন করে তার বুকে বেদনা জাগাল। কত যত্নে—কত আদরেই না সেই ছোট্ট মেয়েটিকে সে আজ এতবড় করে তুলেছে। চোখে তার জল এসে গেল।

চেয়ারের ওপর একখানা শাড়ি পড়েছিল, বাহাদুরের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই সন্দিগ্ধের মতো গিয়ে সে কাপড়খানা তুলে নিল; না, সন্দেহ তার মিথ্যে নয়। রক্ত—শুষ্ক রক্ত জমাট বেঁধে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি কাপড়টা ভাঁজ করে সে তার মোটা কোটটার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

১১

করোনারের তদন্ত নিয়ে সংবাদপত্রগুলোর মাতামাতির আর সীমা রইল না।

বাংলায় চিত্র-প্রতিষ্ঠানের পরমায়ু খুব বেশিদিনের নয়; তাকে ঘিরে আজও সাধারণ নর-নারীর মনে বেশ একটু কৌতূহল জমা হয়ে আছে। নামজাদা তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেন একটা বিশেষ জগতের জীব। তাই তাদেরই একজনের এই রহস্যজনক মৃত্যু যে পাঠকবর্গকে বেশ একটা সরস খোরাক জোগাবে—এটা ভেবে নিতে সংবাদপত্রজীবীদের বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি।

পরদিন প্রভাতে বড়-বড় হরফে প্রত্যেক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হল ঃ

অভিনেতা হত্যার মামলায় তিনজনের স্বীকারোক্তি

এই রহস্যজনক মৃত্যুতে বিশেষজ্ঞদের মত—সমস্ত চিত্র-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জুবিলী স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ কী বলেন? এই মৃত্যু-রহস্য অপ্রকাশ রাখায় তাঁদের কোনও হাত নাই তো?

তারপরই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। একটি সংবাদপত্রে দেখা গেল ঃ

গতকল্য করোনারের তদন্ত অভিনেতা বিলাসবাবুর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে শুরু করিয়াছে। যতদূর জানা যায়, এরূপ নৃশংস হত্যা বাংলাদেশে খুব বেশি পরিমাণে সংঘটিত হয় নাই।

অন্ধকার সেটের মাঝে, ক্যানভাসের প্রাচীরের অন্তরালে হতভাগ্য অভিনেতা বিলাস রায়কে গতকল্য প্রাতে একখানা রক্তমাখা ছোরা হাতে নিহতাবস্থায় দেখা যায়। সকলের অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় যে, তাঁহার প্রাণহীন নকল মূর্তিটি আগের দিন যে-অবস্থায় শায়িত ছিল, তাঁহাকেও ঠিক সেই অবস্থাতেই আবিষ্কার করা হয়।

সুবিখ্যাত গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী তদন্ত করিতে গিয়া বহু সূত্রেরই সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু কোনওটার সহিত কোনওটার মিল নাই।

আজ পর্যন্ত যে-সকল চমকপ্রদ ঘটনা এই হত্যা উপলক্ষে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সহকারী পরিচালক বিনয় মজুমদারের স্বীকারোক্তি অন্যতম। সেটের মাঝে যে-রক্তাক্ত পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, তাহা বিনয় মজুমদারেরই; তবে প্রাচীন-গাত্রে আঙুলের ছাপ কোনও স্ত্রীলোকের। রাতের প্রহরী গঙ্গারাম পূর্বদিন রাত্রে স্ত্রীলোকের আর্তধ্বনিও শুনিতে পায়। আবার স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা ঃ

আজ থেকে আমাদের মধ্যকার সব সম্বন্ধ শেষ...

BanglaBook.org

এই চিঠি—প্রকাশ, জুবিলী স্টুডিয়োর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুন্দরী অলকাদেবীর এবং জানা গেল, ইহারই প্রেমে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে বিনয় মজুমদার প্রেমের পাত্রীকে রক্ষা করিবার জন্যই নাকি স্বীকারোক্তি দিয়াছে।

ব্যাপারটার জটিলতার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বিয়োগান্ত নাটকটির এই অঙ্কে দ্বিতীয় একটি রহস্যময়ী নারীর প্রবেশ।

কে সে?

পরিচালক শেখরনাথই বিলাস রায়কে সর্বশেষ দেখেন। তিনি বলেন ১২-১৫ মিনিটে বিলাসবাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্টুডিয়ো হইতে বাহির হন এবং বিলাসবাবুর বাড়ির অনতিদূরে নামাইয়া দেন। দ্বারবান বাহাদুরের খাতা মিলাইয়া তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

তবে বাহাদুর এবং গঙ্গারাম উভয়ে মিলিয়া কি প্রকৃত অপরাধীকে গোপন করিতেছে?

ইহার পর যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আরও রোমাঞ্চকর।

করোনারের বিচার-কক্ষে দেখা গেল, দুইটি নর-নারী বসিয়া আছে। পুরুষটির মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ হইলেও স্থির, গম্ভীর; কিন্তু সুন্দরী তরুণীটির বৃহৎ চোখ দুইটিতে আতঙ্কের ছবি; রক্তহীন ঠোঁট দুইটি ঘন-ঘন কাঁপিতেছিল।

ইহারা বিনয় এবং অলকা।

করোনার তাঁহার তদন্ত শেষ করিতেছিলেন। গঙ্গারাম, বাহাদুর প্রভৃতির জবানবন্দি লওয়া শেষ হইলে অবশেষে বিনয় মজুমদারের বিবৃতি লইবার সময় অকস্মাৎ দেখা গেল, অলকার চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে; ললাটদেশে স্ফীত শিরা এবং ঘন-ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিয়া মনে হইল, বুকের ভিতর তাহার তুমুল ঝড় বহিয়া চলিয়াছে।

ইহার পর বিনয় মজুমদার সিনারিও খাতা আনিতে একাকী সেটের ভিতর গিয়াছিল—যখন প্রমাণিত হইল, সেই সময় অলকা অকস্মাৎ তাহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করোনারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনারা বিচারপতি; এ-ব্যাপারের ফলাফল নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। তাই আমার প্রার্থনা, আমার বক্তব্যটা আপনারা দয়া করে শুনুন। প্রথমটা আপনারা বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কিন্তু সবটা শুনলে প্রকৃত ঘটনাটা বুঝতে পারবেন বলেই আমার মনে হয়। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, একসময় বিলাসবাবুকে আমি—আমি—মানে—একটু সুনজরেই দেখেছিলুম। কিন্তু তাই বলে সত্যিকার ভালো আমি তাঁকে কোনওদিনই বাসিনি। তাঁকে নিয়ে শুধু একটু খেলা করারই ইচ্ছা ছিল আমার; কারণ স্টুডিয়োতে পা দিয়েই শুনেছিলুম, বিলাসবাবু নাকি এর আগে অনেক রমণীর প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন। কাজেই তাঁকে জয় করবার, তাঁকে নিয়ে ঠিক সেইরকমভাবে খেলা করার যে একটা বাসনা জাগবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

একটুখানি দম লইয়া অলকা একবার চারিদিকে তাকাইয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, কিন্তু তিনি যে অতবড় শয়তান, তা আমি কোনওদিন কল্পনা করিনি। খেলা করতে গিয়ে যেদিন দেখলুম, নিজেরই পাতা জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি, সেদিন আমার খুব ভয় হল; কিন্তু দিনরাত তাঁর উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি ছিল না।

আবার স্তব্ধ হইয়া গিয়া অলকা একবার সপ্রেম দৃষ্টিতে বিনয়ের পানে তাকাইয়া শুরু করিল, তাঁর উৎপাত আমার আরও অসহ্য হল সেইদিন থেকে, যেদিন বুঝলুম, নিজের অজ্ঞাতেই আর-একজনের পায়ের তলায় মন আমার ডালি দিয়েছি। ভয় ছিল আমার সেইজন্যেই, পাছে আমার মনের দেউলের নতুন দেবতা বিরূপ হন।

অলকা চুপ করিতেই সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি গিয়া পড়িল বিনয় মজুমদারের ওপর। অলকা সমস্তই বুঝিল; কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠে নিজের কাহিনী বলিয়া চলিল, বিলাসবাবুও যে আমার এই পরিবর্তন বুঝতে পারেননি তা নয়। আমার খানকয়েক চিঠি তাঁর কাছে ছিল; তিনি ক্রমাগত আমায়

BanglaBook.org

ভয় দেখাতে লাগলেন—যদি আমি মত পরিবর্তন না করি, তা হলে চিঠিগুলো তিনি বিনয়বাবুকে দেখাবেন। অথচ তাঁর আগে আর কোনও পুরুষকে আমি সত্যিকার কোনওদিন ভালোবাসিনি, এ-কথা বিনয়বাবুকে কতদিন বলেছি, চিঠি দেখার পর আর কি তিনি আমার কোনও কথা বিশ্বাস করবেন? কাজেই বাধ্য হয়ে ওই দিন রাত্রে চিঠির জন্যেই আমি স্টুডিয়োতে গেছলুম। বিলাসবাবু বলেছিলেন, চিঠিগুলো সবসময় সঙ্গে করেই তিনি স্টুডিয়োতে আসেন। বিলাসবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখলুম। ইচ্ছে ছিল, তারপর আমার চিঠিগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাব, কিন্তু সেগুলো কোথাও খুঁজে পেলুম না। কাজেই বাধ্য হয়ে আমায় অপেক্ষা করতে হল। কারণ আমি জানতুম, কাজ শেষ হলে জামাকাপড় ছাড়বার জন্য তিনি ঘরে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না। কতক্ষণ কেটে গেল। তখন বাধ্য হয়ে সেটের দিকে চললুম; ভয় ছিল পাছে শেখরবাবু দেখে ফেলেন। কাজের সময় বাধা পেলে তিনি ভয়ানক চটে যান। তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত স্টুডিয়োর পেছনে ফুলগাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রইলুম। বিলাসবাবু কিন্তু ঘরের দিকে না এসে, শেখরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলুম, কিন্তু দেখবার ভরসা হল না আমার। কী করব ভাবছি—দেখি না বিলাসবাবু সেদিকে আসছেন। সেটে ঢুকে তিনি একটু পরেই আবার চলে গেলেন; খানিক পরে আবার ফিরে এলেন—কেন তা বলতে পারব না। আস্তে-আস্তে তাঁর পেছন-পেছন সেটে গিয়ে দেখি, তিনি 'পড়া'টা রিহার্সাল দিচ্ছেন। খড়ি দিয়ে দাগ কেটে যে-জায়গায় ডামিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, বিলাসবাবুকে ঠিক সেই জায়গায় পড়তে হবে। আগের দিন শেখরবাবু অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিলাসবাবু কিছুতেই পারেননি। রাত্রে ফিরে এসেই তাই তিনি আবার রিহার্সাল দিচ্ছেন। আমি গিয়ে চিঠিগুলো চাইতেই তিনি হেসে উঠলেন; আবার চিঠির কথা বলতেই...।

পুনরায় অলকা স্তব্ধ হইয়া গেল। বোঝা গেল, দুঃসাহসিকা হইলেও ইহার পরের অংশটুকু প্রকাশ করিতে সম্ভ্রমে তাহার বাধিতেছে। কতক্ষণ পর বোধকরি কতকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া সে আবার কহিল, হঠাৎ বিলাসবাবুর মূর্তি গেল বদলে; তারপর যেসব কথা আমাকে বলতে লাগলেন, তা আপনাদের কাছে বলবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলুম; পালাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার আগেই বিলাসবাবু আমাকে ধরে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে জোরে পারব কেন? তাই মুক্তি পাবার জন্যে আঁচড়াতে—কামড়াতে—হাত-পা ছুড়তে লাগলুম। বিলাসবাবু দৈত্যের মতো ততই হাসেন আর আমাকে বলেন, কাল আর তোমার এ-আপত্তি থাকবে না।

তাহার দুঃখের কাহিনীতে সারা ঘরখানা থমথম করিতেছিল; বহু শ্রোতার চোখে দেখা গেল সমবেদনার অশ্রু। ঘরের চারদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া অলকা ভগ্ন কণ্ঠে কহিতে লাগিল। এরপর অলকা সাজল হিংস্র পশু; রক্তে সিক্ত করল তার হাত। কোনওরকমে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই আমি তাড়াতাড়ি আর-একখানা যে-ছোরা পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে ভয় দেখালুম—যদি আর এক পা-ও তিনি এগিয়ে আসেন, তা হলে তাঁকে খুন করতেও ইতস্তত করব না আমি। আমার কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন; বললেন, এ-কাজ আমি করতেই পারি না। কিন্তু বিলাসবাবু ভুল করেছিলেন। ছেলেবেলায় স্কুলে ছোরাখেলায় আমি যে বরাবরই সবচেয়ে ভালো ছিলুম, তা তিনি জানতেন না। তারপর—তারপর বাধ্য হয়েই আমাকে ছোরাখানা তাঁর বুকে...।

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অলকাদেবী জ্ঞান হারাইয়া চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। শ্রোতাদের ভিতর একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, এইসময় জুবিলী স্টুডিয়োর দ্বারবান বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল, নির্দোষ লোক যাতে না অনর্থক শাস্তি পায়, সেইজন্যে হুজুরের কাছে এটা পড়ে দেখার প্রার্থনা জানাচ্ছি আমি।

করোনার কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সকলে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনি পড়িলেন ঃ

১১ই পৌষ রাত্রে আমি, বাহাদুর রাণা, জুবিলী স্টুডিয়োর অভিনেতা বিলাস রায়কে হত্যা করিয়াছি। আমার এই স্বীকারোক্তি আমি সুস্থ দেহ ও মনে করিতেছি এবং আমার স্বাক্ষর ও টিপসহি দিতেছি।

ইহার পর ঘরের মাঝে যে দৃশ্যের অবতারণা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সকলেরই মুখে এক কথা। প্রকৃত অপরাধী কে? কতদিনে এ-রহস্যের মীমাংসা হইবে? গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী ইহার জবাব দিবেন কি?

সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে প্রতুল হাসতে লাগল।

হরেন কী একটা সংবাদ দিতে একটু আগে ঘরে ঢুকেছিল; বলল, ওদের আর দোষ কী বলুন। আমরাই ঘাবড়ে যাচ্ছি কে খুনি তার হিসেব কষতে। আপনার কী মনে হয়?

প্রতুলের চোখ দুটো ছিল খবরের কাগজের পাতার ওপর। তেমনিভাবেই বলল, আমার মনে হয়, সবকটাই মিথ্যেবাদী।

হরেন চোখ দুটো বড়-বড় করে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

প্রতুল বলল, তিনজনের মধ্যে অলকাদেবীর স্বীকারোক্তির গল্পটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু চোখ যাদের আছে, তারা দু-বার এটা পড়লেই বুঝতে পারবে গলদ কোথায়।

কেন স্যার?

প্রতুল হেসে ফেলল। বলল, বিয়ে হলে কথাটা আমার বুঝতে পারবে। পৃথিবীতে এমন মেয়ে কম দেখা যায়, যারা জন্ম-অভিনেত্রী নয়। তার ওপর অলকাদেবী তো পেশাদার। নাগরমলের মতো পাকা ব্যবসায়ী কি বলতে চাও, না বুঝেই ওঁর পেছনে মাসে-মাসে অতগুলো করে টাকা ঢালছেন? যাক, তুমি শেখরবাবুর ওখানে কদ্দুর কী করে এল বলো।

তিনি যা বলছেন সবই সত্যি, স্যার। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে তিনি একবার থেমেছিলেন না? আমি খবর নিয়েছি, সেটা মিথ্যে নয়। মোড়ের কাছেই একটা চেনা দোকানদারের কাছ থেকে তিনি এককৌটো সিগারেট কেনেন।

দোকানদার শপথ করে বলতে পারে?

হ্যাঁ, স্যার। বিলাসবাবুকেও সে দেখেছে। তিনিও এককৌটো সিগারেট চান। দোকানদার তার ছোকরা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেটা গিয়ে পেছনের সিটে সিগারেটটা দিলে তিনি তাঁর নামে লিখে রাখতে বলেন।

প্রতুল বলল, অলকাদেবীর কথা যে মিথ্যে, আশাকরি তা বুঝতে পেরেছ? চিৎকার শোনার কোনও কথাই তিনি উল্লেখ করেননি; সেটের মধ্যে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই আমরা পাইনি; অথচ তিনি বললেন, বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়েছিল। তিনি বলেছেন, বিলাসবাবু একটু পরেই ফিরে আসেন। অথচ বাহাদুর বলে, আসেননি তিনি। অথচ খুন যখন হয়েছেন, তখন এসেছিলেন, তাতে আর কোনও ভুল নেই। কিন্তু কী করে এসেছিলেন—সেইটে জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে আমাদের। তারপর ধরো বিনয়বাবুর কথা। তাঁর খুন করার উদ্দেশ্য অবশ্য একটা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু অলকাদেবীকে বাঁচানোর চেষ্টাটাও তুমি বাদ দিতে পারো না। দেখতে নিরীহ প্রকৃতির লোক হলেও, সত্যিকার কাদা যে তিনি নন, সেদিন রাখাল ইচ্ছে করে উস্কে দিতেই আমি তা আবিষ্কার করেছি। তা ছাড়া ভাববার ক্ষমতাও তাঁর তীক্ষ্ণ।

হরেন মাথা চুলকে বললে, তাই তো, বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। আপনি তো একে-একে সবাইকেই বাদ দিচ্ছেন। রইল তো একা বাহাদুর। সে-ও কি—

BanglaBook.org

প্রতুল বলে উঠল, তার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি আমি যে, সে একটা কিছু গোপন করতে চায়; অথচ সেটার হদিস পায় প্রথম আমার কথাবার্তাতেই। আমি ইচ্ছে করেই সেটা তার কাঁধে চাপিয়েছিলুম। খুব নিকট একজনকে সে বাঁচাতে চায়; নিজের মেয়ে ছাড়া আর কে হবে? নইলে দুজনের স্বীকারোক্তির পর আবার তার স্বীকারোক্তির কোনও মানেই হয় না।

হরেন হতাশার মুখভঙ্গি করে বলল, আপনি যে সকলের কথাই উড়িয়ে দিচ্ছেন স্যার, কিন্তু একজন কেউ তো এ-কাজ করেছে?

প্রতুল অন্যমনস্কভাবে বলল, হ্যাঁ, তা করেছে বইকী, যদি ছোরাখানা বিলাসবাবু নিজেই না নিজের বুকে বসিয়ে থাকেন। আচ্ছা, তোমার সিগারেটের দোকানদার ক'টার সময় শেখরবাবু আর বিলাসবাবুকে দেখেছে বললে?

সে বললে সাড়ে বারোটা নাগাদ।

আচ্ছা, অলকাদেবী, বিনয়বাবু—এঁদের হাতে দস্তানা ছিল কি না জেনেছ?

ছিল স্যার!

প্রতুল আর কোনও কথা না বলে গভীর দৃষ্টিতে বাইরের পানে চেয়ে বসে রইল।

১২

পরদিন। উপরওয়ালার সঙ্গে প্রতুলের কথা হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, স্টুডিয়ো খুনটার কতদূর কী হল মিস্টার লাহিড়ী?

এখনও পাকাপাকি অবশ্য কিছু হয়নি; তবে অনেকটা...।

কমিশনার সাহেব তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, দেখবেন আবার আলিপুরের সেই কেসটার মতো না হয়!

একটা দামি চুরুটের শেষ প্রান্তটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে-ফেলতে প্রতুল বলল, এ-খুনটা হচ্ছে ঠিক এই চুরুটটার মতো দামি, তৃপ্তিপ্রদ, অথচ বেশ একটু কড়া। হত্যাটা যে-ই করুক, তার রহস্যজ্ঞানটা যে বেশ তীক্ষ্ণ তা অস্বীকার করা চলে না। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুঝি কোনও ছেলেমানুষের কাণ্ড। চারদিকে সূত্রের ছড়াছড়ি, কিন্তু সবগুলো মিলে এমন একটা জট পাকিয়ে তুলেছে যে মনে হয়, এর নিরাকরণ কোনওদিনই সম্ভব নয়। কাজেই বাধ্য হয়েই আমায় আদত ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বাইরের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কদ্দিন যে লাগবে...

কমিশনার সাহেব উঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, দেরি যদ্দিনই হোক, রহস্যের কিনারা আপনাকে করতেই হবে; নইলে বুঝছেন তো লোকের কাছে অবস্থাটা আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে? আপনার যা সাহায্যের দরকার, আমাকে জানাবেন, আমি যেমন করেই হোক তার ব্যবস্থা করে দেব। এটা পড়ে দেখলেই আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন।

প্রতুল তাঁর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়ল ঃ

হত্যাকারী কি এতই দুর্ধর্ষ?

সে কি চিরদিন আইনের কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া নির্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইবে?

পুলিশ এবং স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ কি ইহার পরও তাকে সর্ষপ তৈল দিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকিবেন?

কমিশনার মৃদু হেসে বললেন, শুনতে নিশ্চয়ই মিষ্টি লাগে না?

তা হয়তো লাগে না, কিন্তু অপরকে বলতে যত মিষ্টি লাগে, কাজের সময় নিজেকে হাতে-কলমে করতে হলে আবার ঠিক ততটা মিষ্টি লাগে না।

BanglaBook.org

কমিশনার সাহেব খুশি হলেন। এরপর অবিলম্বে প্রতুলের কাছ থেকে একটা কিছু মীমাংসার আশা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুখে প্রকাশ করে বললেন, বাহাদুরের মেয়ের কোনও খবর পেলেন?

প্রতুল জবাব দিল, হ্যাঁ, কাল রাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাহাদুরকে হাসপাতালের দিকে যেতে দেখে রাখাল তার অনুসরণ করে। একটু বাদেই তার কাছ থেকে পাকা খবর আশা করছি।

আচ্ছা, রাখাল ফিরলে আমার কাছে নিয়ে আসবেন; আমিও শুনব।

একটু পরেই রাখাল হাজির; চোখে-মুখে তার একটা গর্বের ছাপ।

প্রতুল প্রশ্ন করল, ধরতে পেরেছ ওদের?

রাখালের মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; বলল, আপনি কি আমাকে ওদের ধরবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন স্যার? তবে পেয়েছি ওদের। কথা শেষে সে একখানা খাম প্রতুলের হাতে দিয়ে বলল, কোণের দিকটা ধরবেন।

খামের ওপর লেখা ছিল ঃ

শ্রীমতী উলকি রাণা

রাখাল বলল, এতেই মনে হয় অনেক কাজ হবে, স্যার।

প্রতুল বলল, তা হবে বটে, তবে এটা আরও অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে পাওয়া উচিত ছিল রাখাল। তুমি উলকির সন্ধান কোথায় পেলে?

রাখাল একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে কমিশনারের পানে তাকিয়ে নিয়ে বলল, সে বড় মজার কথা, স্যার! উলকি এতদিন বরাবর স্টুডিয়োর হাসপাতালেই ছিল। দিনের খাতাখানা হাঁটকাতে-হাঁটকাতে দেখি, উলকির আসাটা খাতায় লেখা আছে, কিন্তু যাওয়াটা নেই। তবে স্যার, বাহাদুরের এতে কোনও কারসাজি নেই। সে দিনে থাকে না কিনা! কাজেই রাতে তাকে যেতে দেখেনি বলে...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, তার কাছ থেকে কী জানতে পেরেছ, আগে তাই বলো।

সে বেচারা নির্দোষ, স্যার। আপনারা যা মনে করেছেন, মোটেই তা নয়। একেবারে ছেলেমানুষ, স্যার। তার ওপর আবার ভয়ানক অসুখ...।

কমিশনার ধমক দিয়ে উঠলেন, আমরা কী মনে করি না-করি সে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অসুখ তার কোনও দুশ্চিন্তার জন্যেও হতে পারে। যা জেনেছ সেইটুকুই বলে যাও।

রাখাল থতমত খেয়ে বলল, না স্যার, তাই বলছি। সকালে তো গেলুম। নার্স বেটি স্যার, শক্ত ঝানু। ঢুকতে কিছুতেই দেবে না। শেষকালে আমাদের চিহ্নটা দেখিয়ে একরকম জোর করেই ঢুকলুম। চোখের তার কী দৃষ্টি! পিঠটা মনে হল যেন আমার চিড়বিড় করছে। আহা, উলকি বেচারা জানে না যে, তার বাবা খুনের কথা স্বীকার করেছে। আমাকে দেখেই তো ভয়ে বিছানার মধ্যে যেন সেঁধিয়ে গেল। এমন কাঁপছিল স্যার, যখন খামখানা তার হাতে দিলুম, খামখানা খুলেই দেখল, ভেতরে কিছুই নেই। তখন এমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। পাছে আমাদের উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলে, তার আঙুলের ছাপটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি খামখানা তার হাত থেকে নিয়ে নিলুম। চোখ-মুখ তার কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল; বলল, কেন এসব করছেন? কী আর বলি? বললুম, তোমার আঙুলের ছাপটা দরকার আমাদের। ভয় নেই কিছু—বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে বলল, আঙুলের ছাপ? হা ভগবান!

রাখাল অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কমিশনার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তারপর বলে যাও রাখাল।

মুখটা তার আরও সাদা হয়ে গেল—আরও...।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করে কমিশনার বলে উঠলেন, অসম্ভব। বারবার সে সাদাই হয়ে উঠতে লাগল?

রাখাল সচকিত হয়ে উঠে বলল, না স্যার! তারপরই সে কাঁদতে লাগল, সারা গা-টা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। আপনি স্যার, দেখেছেন কি না জানি না, ঠিক যেন কালীঘাটের বলি দেবার জন্যে নিয়ে আসা পাঁঠা। আমি স্যার, অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলুম যাতে একটু সুস্থির হয়ে মুখ খুলতে পারে...।

প্রতুল তার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেছিল; বলল, তোমার সান্ত্বনা না দিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন আদত ব্যাপারটা বলে ফ্যালো।

রাখাল বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, কী আর করি বলুন, স্যার। যাই হোক, অনেকক্ষণ বাদে সে থামল; তারপর বলল... কী বলল স্যার?

সেইটেই তো তোমার কাছ থেকে এতক্ষণ ধরে শুনতে চাইছি...।

রাখাল ঈষৎ গর্বিতভাবে উভয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, বিছানার চাদরটা চোখের ওপর চাপা দিয়ে সে কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল, হায় ভগবান, কেন যে পুরুষ জাতটাকে সৃষ্টি করেছিলে?

প্রতুল জিগ্যেস করল, শুনে নিশ্চয় তোমার রাগ হল?

না স্যার! তার কথা শুনে আমি স্যার, বেশ বুঝতে পারলুম, বিলাসবাবুকে সে খুব ভালোবাসত। যাক, তারপর ওর বাপের কথাটা আস্তে-আস্তে শোনালুম। হলে কী হবে? আমি জোর করে বলতে পারি স্যার, বাবার স্বীকার করার কথা সে কিছুই জানে না। আমি বেশ ভালোভাবেই তার দিকে চেয়েছিলুম; দেখলুম, শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল...।

কমিশনার শ্লেষভরা কণ্ঠে বললেন, আরও সাদা হয়ে গেল না?

রাখাল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, হয়েছিল বইকি স্যার! তারপরই বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে সে কী কান্না! মনে হল, বুকের শিরগুলো তার যেন ভাঙা বেহালার তারের মতোই সব ছিঁড়ে গেছে...।

প্রতুল প্রশ্ন করল, কিছু বললে সে?

বলবার সময় পেল কোথায়, স্যার! তক্ষুণি রাক্ষসীর মতো নার্স বেটি ছুটে এল। আমাকে এই মারে তো এই মারে। উলকির নাড়ী-টাড়ী টিপে আমার মুখের কাছে এসে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলল, দেখো, তোমার পুলিশ-টুলিশ বুঝি না; যদি এর ভালো-মন্দ কিছু হয়, দুনিয়ার রাজা এসেও তোমায় বাঁচাতে পারবে না।

একবার কমিশনারের দিকে আর একবার প্রতুলের দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে নিয়ে রাখাল আবার শুরু করল, ঘর থেকে আমাকে জোর করেই একরকম তাড়িয়ে দিলে। বললে, আর যদি কিছু জানবার থাকে, তা হলে উলকি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। কী অসুখ হয়েছে তার—তা জানি না স্যার, তবে নার্স বললে, এরপর যদি উলকি আর উত্তেজিত হয় কোনও কারণে—তা হলে শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে।

কী হয়েছে তা জানতে পারলে না?

না স্যার! অসুখ হয়েছে তার, এটা যেমন সত্যি—তেমনি সে যে নির্দুষী—সেটাও তেমনি সত্যি। আমি হলঘরে বসে-বসেই শুনতে পেলুম, ছোট্ট মেয়ের মতোই বাপের জন্যে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে সে। দু-একটা কথা তার বুঝতে পারলুম, 'ওরা বাবাকে ফাঁসি দেবে—বাবাকে মেরে ফেলবে। কেন মরতে আমি এ-কাজ করতে গেলুম!'

কমিশনার একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতুলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ঠিক বলছ তুমি, এ-কথাগুলোই বলেছে সে?

BanglaBook.org

আমি যে নিজের কানে শুনলুম স্যার! কিন্তু তাই বলে ওরকম মেয়ে খুন করতেই পারে না স্যার! ভারি ভালো মেয়ে স্যার!

কমিশনার ধমক দিয়ে উঠলেন, খুব হয়েছে। এখন যাও এখান থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাখাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কমিশনার বললেন, আপনি গিয়ে মিস্টার লাহিড়ী, মেয়েটির কাছ থেকে স্বীকারোক্তিটা নিয়ে নিন।

প্রতুল কতক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, তা হলে স্বীকারোক্তিটা হবে চারজনের। বায়োস্কোপের গল্প হিসেবে ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়ায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকটাও ভেবে দেখবেন। একজন অসুস্থ মেয়ের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি নেওয়াটা...।

কমিশনার চুপ করে রইলেন।

প্রতুল আবার বলল, আর নিয়ে বিশেষ লাভ হবে না। বাহাদুর 'তার মেয়ে অসুস্থ, মাথার ঠিক নেই এখন' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। নার্সটিও যা শুনলুম, তাতে মনে হয় এ-ব্যাপারে ওদের সাহায্য করবে।

কমিশনার বললেন, ঠিক। আর স্বীকারোক্তি নেওয়ার দরকার নেই! যথেষ্ট হয়েছে। এখন দরকার আমাদের প্রমাণ। আপনি বরং স্টুডিয়োতে গিয়েই মাল-মশলার চেষ্টা করুন। হাসপাতালের জন্যে যদি পাহারার দরকার হয়, অন্য যত লোক বা টাকা লাগে আমি ব্যবস্থা করব। মনে রাখবেন, আপনার ওপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করছি।

প্রতুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরই আপনি করতে পারেন।

১৩

বাহাদুরকে সন্দেহের অব্যাহতিতে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করে প্রতুল পরদিন সকালে স্টুডিয়োর পেছনে এসে দাঁড়াল।

স্থানটা নির্জন। আগের দিন বোধহয় কোনও শহরের পথের দৃশ্য তোলা হয়ে থাকবে। কৃত্রিম বড়-বড় বাড়ি, গ্যাসপোস্ট ইত্যাদিতে অনেকটা জায়গা জুড়েছিল। তারই ভেতর দিয়ে প্রতুল একলা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সামনের দেওয়ালের গায়ে ঈষৎ হলদে একটু কাপড়; সেটা যে কারও জামা থেকে ছিঁড়ে ওইখানটায় আটকে গেছে, তাতে আর কোনও ভুল নেই। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রতুল কাপড়ের টুকরোটা পকেটে ভরে নিল।

হত্যাকাণ্ডের অনেকটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। চিন্তাটা সরল পথে চালিত করার চেষ্টায় সে আপনমনেই কতক্ষণ ঘুরে বেড়াল।

ব্রিজনাথ প্রবলবেগে মাথা নেড়ে জানাল, না, জোর করে ভেঙে না গেলে, কেউই স্যুইচবোর্ডের কাছে যেতে পারে না।

নাগরমল প্রতুলকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি যখন দেখসিলেন, বাক্সটা কি ভাঙা ছিল?

প্রতুল ঘাড় নাড়ল : না।

নাগরমল গম্ভীর ভাবে বলল, ভাঙুক আর নেই ভাঙুক, একজন কেউ স্যুইচের বাক্সটার কাছে গিয়েসিল ব্রিজনাথ।

BanglaBook.org

ব্রিজনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। নাগরমল আবার বলল, চাবি সব তো আসে?

ব্রিজনাথ বলল, না, সব চাবি তো নয়। মাত্তর একটা চাবিই আছে।

একটা চাবি? যদি হারিয়ে যায়? কী বলস তুমি ব্রিজনাথ? তোমার মাথা কি খারাপ হইয়ে গিয়েসে?

ব্রিজনাথ জবাব দিল, মাথা আমার মোটেই খারাপ হয়নি, নাগরমল। আপ্তে কাম ছেড়ে দিয়ে বোম্বে চলে যাবার সময় একটা চাবি ভুলে নিয়ে গিয়েসে। আর-একটা খুঁজে পাওয়া যাসসে না। বহুৎ রোজ আগেই সেটা হারিয়ে গিয়েসে।

প্রতুল প্রশ্ন করল, আর-একটা যে চাবি, সেটা থাকে কার কাছে?

নাগরমল বলল, আমার ইলেট্রিশিয়ানের কাসে...।

বেশ, তাঁকে একবার ডাকান এখানে।

ইলেকট্রিশিয়ান লোকটা যে মিথ্যে বলছে না, প্রতুল তা বুঝল। চাবি—সে জানাল, বরাবর তার কাছেই আছে; কোনও সময়ের জন্যে খোয়া যায়নি বা অন্য কাউকে দেয়নি।

লোকটা বিদায় নিলে প্রতুল উঠে দাঁড়াল। নাগরমল সতৃষ্ণ নয়নে তার পানে তাকিয়ে বলল, আজ সকালে ভারি খুশি হয়েসিলুম প্রতুলবাবু। মনে করেসিলুম, এবার খুনি ধরা পড়বে। লেকেন জান তো আর বাঁচে না। আমার ব্যবসা ভি মাটি হতে বসিয়েসে।

প্রতুল সস্নেহে তার পিঠে চপেটাঘাত করে বলল, ঘাবড়াবেন না নাগরমলবাবু! আমি যখন ভরসা দিচ্ছি আপনাকে, তখন আবার ঘাবড়াবার কী আছে?

নাগরমল ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলল, স্যুইচবক্সের চাবিটা দিতে পারলুম না বলে কুছু মনে করবেন না প্রতুলবাবু।

কিচ্ছু না। আমার যা জানবার, হলদে কাপড়ের টুকরোটুকুই আমায় তা জানিয়েছে। অবশ্য ইলেকট্রিকের বাক্সটা কে খুলেছে আমি তা জানতে চাই; রসটুকু নিংড়ে নিয়ে বাক্সটা আবার বেমালুম বন্ধ করে রেখেছে। ...অবশ্য কাল সবই জানা যাবে।

নাগরমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁসালেন প্রতুলবাবু।

তিন নম্বর স্টুডিয়োতে ঢোকবার সময় রাখাল আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। একগাল হেসে বলল, এরা সব আপনাকেও হার মানিয়েছে স্যার! ওই যে ঢকঢকে বুড়োটা দেখছেন না, ওর দাড়িগুলো গজাতে কতদিন লেগেছে বলুন তো?

প্রতুল তাকিয়ে দেখল, অনতিদূরে একটা সেটের মাঝে বসে বৃদ্ধবেশী একজন লোক হরদম কাশছে। লোকটার রূপসজ্জার বাস্তবিকই প্রশংসা করতে হয়। সে হেসে বলল, তা অন্তত ঘণ্টাখানেক তো বটেই...।

রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, দু-ঘণ্টা স্যার! আমি জিজ্ঞেস করলুম, বয়েস কত হবে বলে আপনার মনে হয়?

প্রতুল জবাব দিল, এদিকে সাতানব্বই বলে মনে হলেও মোটমাট সাতাশের বেশি নয়।

রাখাল চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, কী করে জানলেন স্যার? আমি জিগ্যেস করেছি—ঠিক সাতাশ।

প্রতুল স্টুডিয়োর দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, প্রপার্টি বয়টা বোধহয় আজ থেকে আবার কাজ শুরু করেছে। তুমি তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ভেতরে অর্ধ অন্ধকার। মাথার ওপর শুধু অনুজ্জ্বল আলো একটা জ্বলছিল। তাতে সেটের সব জায়গা থেকে অন্ধকারটা দূরীভূত হয়নি, বরং স্থানে-স্থানে আরও যেন জমাট বেঁধে উঠেছে।

BanglaBook.org

শেখরের চেয়ারটায় গিয়ে প্রতুল অলসভাবে বসে পড়ল। চোখ দুটো একসময় তার মুদেও এল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাজের চাপটা যখন দেহ ছেড়ে মাথার ভেতর গিয়ে বাসা বাঁধে, তখনই চোখ দুটো মুদে আসে তার গভীর চিন্তায়। মাঝে-মাঝে চোখ মেলে সে একান্ত শ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাচ্ছিল, আর যতবারই তাকাচ্ছিল, সম্মুখে রক্ষিত ক্যামেরাটা ততবারই তার নজরে পড়ছিল।

কেমন যেন অস্বস্তি একটা সে বোধ করতে লাগল। সে জানে—ভালোমতোই জানে, আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলায় গড়ে ওঠে রূপ, রস, যা কিছু। চিত্রজগতের সে-রূপের ছবি লোকের চোখের সামনে ধরে ক্যামেরা। তার অবস্থিতির ওই বিশেষ ভঙ্গিটুকু যেন কী একটা নির্দেশ করতে চায়। কিন্তু কী নির্দেশ করতে চায়? যার বুকের ভেতর দিয়ে এরকম শত-সহস্র হত্যালীলা অভিনীত হয়ে গেছে, আজ তারই কাছ থেকে বিশেষ একটা হত্যা-রহস্যের কী নির্দেশ পাওয়া যাবে?

প্রপার্টি বয়কে নিয়ে রাখাল প্রবেশ করতেই প্রতুল সচকিত হয়ে উঠে বসে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

আজ্ঞে, রামচন্দর জানা।

আচ্ছা, আমি শুনেছি, শেখরবাবু নাকি সেদিন তোমাকে মারধোর করেছিলেন? তুমি চুপ করে গেলে কেন? তোমাকে মারবার কোনও অধিকার তো নেই তাঁর?

হ্যাঙ্গাম করে শুধু-শুধু চাকরি খুইয়ে কী লাভ হুজুর! আমার এ-লাইনের চাকরি খুব ভালো লাগে। একবার বদনাম নিয়ে গেলে আবার কোথাও জোগাড় করা শক্ত। তা ছাড়া আমরা জানি, সবসময় ওঁর মাথার ঠিক থাকে না। মেজাজ বেগড়ালে একবার কী যে করেন আর না করেন, তার ঠিক নেই।

তাঁর কি সত্যিই মাথার ঠিক নেই বলতে চাও?

এ-কথা তো সক্কলেই জানে হুজুর! তা ছাড়া একটু পরেই তিনি দশটা টাকা বকশিস দেন আমাকে। তারপর আবার মিথ্যে ধোঁয়ার পেছনে দৌড়োদৌড়ি করে লাভ কী?

ক'বছর শেখরবাবুর সঙ্গে কাজ করছ তুমি?

রামচন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে, তা বছর দুই হবে বইকী।

এর আগে তিনি কোনওদিন তোমার গায়ে হাত তুলেছিলেন?

না, কক্ষনও না।

প্রতুল জিগ্যেস করল, সাধারণত লোকের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেন তিনি?

মারধোর করেন না বটে, তবে ধরে ঝাঁকানি-টাকানি দেন। একবার তো বেলা দিদিমণিকে নিয়ে কী নাড়াচাড়া দিলেন! উনিও ছাড়বেন না, বেলা দিদিমণির চোখ দিয়েও পোড়া ছাই কিছুতেই একফোঁটা জল বেরুবে না।

প্রতুল হেসে উঠে বলল, আচ্ছা, এবার সেটের চারদিকটা একবার আরিয়ে দেখো তো, খুনের আগের দিন যেমন সাজিয়ে রেখেছিলে, ঠিক তেমনি আছে কি না?

সতর্ক দৃষ্টিটা একবার চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে ছোকরা বলল, উল্টোনো চেয়ারটার মুখ ছিল এদিকে; তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই...।

ছোরাগুলো?

শেখরবাবুই বলেন, ওগুলো সেটে রেখে দিয়ে যেতে—রাত্তিরে রিহার্সাল দেবেন বলে।

তাহলে ওঁর কিছু নিজে থেকে আনবার দরকার হয়নি?

হলেই বা পাবেন কী করে? বাক্সতে তো চাবি দেওয়া থাকে। আর চাবি মাস্তর দুটো।

তার একটা ডিরেক্টারের কাছে থাকে, না?

তার এই অজ্ঞতা দেখে প্রপার্টি বয় হেসে ফেলল। বলল, কী দরকার থাকার? থাকে আমার

BanglaBook.org

কাছে একটা, আর একটা ব্রিজনাথবাবুর কাছে।

প্রতুল গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, বেশ। একটু আগেই তুমি আমাকে বললে যে, ক্যামেরাম্যান শিবেনবাবু বিলাসবাবুর মূর্তি থেকে ডামিটার ডিজলভ করেন সবচেয়ে শেষে—শেখরবাবু তখন উপস্থিত ছিলেন?

না, ওরকম টুকরো-টাকরা কাজের সময় শেখরবাবু প্রায়ই থাকেন না। শিবেনবাবুর মেজাজও আবার অনেকটা শেখরবাবুর মতোই। ছবি-টবি গুনতে পাছে ভুল হয়ে যায়, সেইজন্যে কাজের সময় একলা থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

ডিজলভের সময় ক্যামেরা হাতে ঘুরিয়েছিলেন, না মোটরে?

বলতে পারব না; তার আগে আমাকে সেট থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তিনি আবার ডিরেক্টারকেও পোঁছেন না কিনা। বলেন, ডিরেক্টারের আবার কেরামতি কী? কেরামতি ক্যামেরার।

প্রতুল গিয়ে প্ল্যাটফরমটার ওপর উঠে ক্যামেরার ভেতর তার কৌতূহলী দৃষ্টিটা চালিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলল, তোমার প্রপার্টি বাক্সটা একবার দেখব, চলো।

প্রপার্টি বয় বলল, যদি জিনিস-পত্তর যা ব্যাভার করা হয়েছে দেখতে চান, তা হলে এখানেই পাবেন; কারণ প্রপার্টি ঘরটা অনেক দূরে বলে দরকারি জিনিসপত্তরগুলো এনে স্টুডিয়োরই ভেতর একটা ছোট কাঠের ঘরে রাখা হয়।

সেদিকে যেতে-যেতে প্রতুল জিগ্যেস করল, আচ্ছা, খড়ির দাগগুলো কেন বলতে পারো?

পারি। বিলাসবাবু যে জায়গায় পড়বেন, ঠিক সেই জায়গাতেই দাগ দিয়ে ডামিকে শোয়ানো হবে, যাতে ডিজলভ করার সময় কোনও গণ্ডগোল না হয়।

ছোট একটা কাঠের ঘরের দরজা খুলে ছোকরাটি ডাকল, ভেতরে আসুন।

প্রতুল ভেতরে পদার্পণ করেই দেখল, একটা কাঠের বাক্সের ওপর বিলাসের নকল মূর্তিটা শোয়ানো আছে। মুখে তেমনই অকথ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। হঠাৎ দেখলে আসল-নকল চেনা যায় না।

ঝুঁকে পড়ে প্রতুল কতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ডামির আপাদমস্তকে বুলিয়ে নিল; একটা জিনিস তার দৃষ্টি এড়াল না যে, ডামির অঙ্গে যে-বেশভূষা—তার কোথাও কোনও ছেঁড়া বা কাটা নেই। জিগ্যেস করল, আচ্ছা, ডামির কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?

না।

এখান থেকে সরানো হয়েছিল কি না ঠিক করে দেখে বলো।

প্রপার্টি বয় দেখে বলল, না স্যার। নড়ানো হয়নি। আমি এনে শুইয়ে দেবার সময় মাথার পরচুলোটা একটু সরে যায়। দেখুন, ঠিক তেমনই আছে।

আর কোনও জিনিস কেউ ছুঁয়েছে বলে মনে হয়?

না স্যার। কেউ না। আর ছোঁবেই বা কে আমি ছাড়া? আর একটা চাবি তো ব্রিজনাথবাবুর কাছেই থাকে। তিনি না দিলে কারও পাবার উপায় নেই।

১৪

সংবাদপত্রে উলকির যে ফটোটা ছেপেছিল, ঘরে বসে-বসে রাখাল সেইটেই দেখছিল; এমনসময় প্রতুল ঘরে ঢুকে বলে উঠল, ওটা মন দিয়ে দেখলেই কি খুনের কিনারা হবে?

রাখাল থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রতুল বসে জিগ্যেস করল, উলকির সঙ্গে দেখা করার কী হল?

BanglaBook.org

রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নার্স বেটি স্যার, বড় ঝামেলা বাধাচ্ছে। বলে, ডাক্তারের হুকুম নইলে উলকির সঙ্গে কেউ দেখা করতে পাবে না। এ-অবস্থায় উত্তেজনা যদি কোনওরকমে হয়, তা হলে বাঁচানো একেবারে অসম্ভব।

নার্সের কাছ থেকে কিছু জানতে পারার সম্ভাবনা আছে?

রামঃ। ও বেটি একেবারে ঝানু; তার ওপর আবার উলকির বন্ধু!

প্রতুল ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, আর কিছু খবর আছে?

নার্স বেটি তো মহা খাপ্পা। বলে, বিলাসবাবুকে ভালোবাসাটা কি এমন মহাপরাধ? ওদের পয়সা আছে, তাই সবাই সরে গিয়ে, তাল ফেলল বেচারা উলকির ওপর...।

প্রতুল কতকটা আপনমনেই বলে উঠল, মনে হচ্ছে সে-রাতে উলকি কী করেছে না-করেছে নার্স তা জানে।

এইসময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। কথাবার্তা কয়ে ফিরে এসে প্রতুল বলল, বিলাসবাবু মারা যাবার আগে, শেখরবাবু যে-ছবি তোলেন, দেখবে নাকি?

রাখাল লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দ্বিতলের অন্ধকার প্রজেকশন ঘরে নাগরমলের পাশে প্রতুল এসে বসতেই সে বলল, আপনি এসে ভালোই করেসেন। শেখরবাবুর সঙ্গে শেষ দৃশ্যটা লিয়ে আমার থোড়া ঝোগড়া আসে।

কীরকম?

আমি বলি ঠিক আসে। উনি বোলসেন, না, বিলকুল ভুল। আপনি আঁখসে দেখুন। বলুন কী হোবে?

অন্ধকারের মাঝেই প্রতুলের মনে হল, আরও কেউ যেন ঘরে প্রবেশ করেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, স্টুডিয়োরই একজন কর্মচারী কাগজ-পেন্সিল হাতে তাদের পাশে এসে বসল, কিন্তু বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার বিশাল-বপু ক্যামেরাম্যান শিবেন কর। সেই প্রায়-অন্ধকারের মাঝে তাকে একটি বিরাটকায় দৈত্যের মতোই মনে হচ্ছিল।

নাগরমল পরিচয় করিয়ে দিতে শিবেন প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, বাইরের পেশা আমাদের আলাদা হলেও মিস্টার লাহিড়ী, ভেতরের কথা প্রায় একই। দুটোতেই চাই তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

প্রতুল উত্তরে শুধু একটু হাসল। নাগরমলকে বলল, আপনার সব তৈরি? তা হলে আমি যেখানে হাত তুলব, সেখানেই আপনি থামাতে বলবেন।

ঘর ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল। রাখাল গভীর অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসে প্রতুলের কানে-কানে বলল, গা-টা কেমন-কেমন করছে স্যার! এই অন্ধকারের মধ্যে বসে মরা মানুষের ছবি দেখা...

প্রজেকশন ঘর থেকে অস্ফুট একটা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই আলোকরশ্মি একটা সাদা পর্দার গায়ে গিয়ে পড়ল। চোখের সামনে ফুটে উঠল তিন নম্বর স্টুডিয়োর মাঝের পরিচিত সেটটা। একখানা ঘরের দৃশ্য। নায়িকা-বেশি অলকা আগে থেকেই ঘরে ছিল, দেখা গেল বিলাস ঢুকছে। অলকা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। যদিও এটা ছবি, তবু প্রতুলের মনে হল, এর মধ্যে সত্যের আমেজও আছে। বিলাসকে অলকা সত্যিকারই ঘৃণা করে। হঠাৎ দেখা গেল, অলকা একখানা ছোরা তুলে নিয়েছে। চোখের পাতে জ্বলে উঠল তার প্রতিশোধ গ্রহণের অত্যুগ্র দীপ্তি একটা।

প্রতুল ভেবে পেলে না, এটা অভিনয় হচ্ছে, না বাস্তব ঘটনা। অকস্মাৎ একসময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : আপনাদের ছবিতে অলকাদেবী যে বিলাসবাবুকে ছোরা মারছেন—আছে, তা

BanglaBook.org

তো জানতুম না!

নাগরমলের চোখটা পর্দার ওপরেই ছিল। সেইভাবে থেকেই সে জবাব দিল, অলকাদেবী ছোরা খেলতে জানেন বলেই আমরা ওটা লাগিয়ে দিয়েসে।

বিলাসের মৃত্যু-দৃশ্য এসে গেল। নায়ক এইসময় ঘরে প্রবেশ করে প্রেমাস্পদাকে দুর্বৃত্তের হাতে বিপন্না দেখে ছোরাখানা তার হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর আমূল বসিয়ে দিল বিলাসের বুকে।

যন্ত্রণায় বিলাসের সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল অকথ্য যন্ত্রণার ছবি। ঠিক যেমন ছবি মৃত বিলাসের মুখে দেখা গিয়েছিল।

ছবি শেষ হয়ে গেল। একজন সহকারীর হাতের শ্লেটে লেখা আছে দেখা গেল ঃ

কাঁটা ও ফুল। সিন নং ২১৬; টেক নং ৫।

তারপরই ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, এই শেষ?

শিবেন বলে উঠল, না, এরপর ডিজলভটা আছে। দেখবেন? ক্ষতি কী?

শিবেন উঠে প্রজেকশন ঘরে গেল। একটু পরেই পর্দায় আবার ফুটে উঠল বিলাসের মাটিতে লুণ্ঠিত দেহটা। একটুখানি ক্লোজ-আপ। তারপর বিলাসের শত্রু ঘরে প্রবেশ করে ছোরাখানা বারংবার তার বুকে বিদ্ধ করতে লাগল।

প্রতুল হেসে বলল, আপনাদের ছবি নেওয়ার প্রশংসা করতে হয়। কোনটা আসল বিলাস আর কোনটা নকল বিলাস বোঝা মুশকিল। শিবেনবাবু, মিনিট দশেক পরে আপনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর রাখালকে সে একরকম জোর করেই ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল।

বাইরে আসতেই রাখলের উদ্‌গত বাক্যস্রোতকে আর ধরে রাখা গেল না। বলল, না, এ স্যার ষড়যন্ত্রের ফল। সব্বাই মিলে ছবি নেবার জন্যে বেচারাকে খুন করে এখন ঢাকার চেষ্টা করছে। নাগরমলবাবু সুদ্ধু এর ভেতর আছেন।

তোমার কি এই মত রাখাল?

হ্যাঁ, স্যার। এর আর ভুল হতে পারে না। হয়তো ওই লোকটা—বিলাসবাবুর শত্রু ছবিতে যে সেজেছে—সেই খুন...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, না স্যার, খুন তখন হয়নি। এইসময় শিবেনকে আসতে দেখে সুর বদলে সে বলল, কিন্তু সাবধান, তোমার সন্দেহের কথা নিয়ে যেন কোনও হইচই করো না।

প্রতুলের প্রশ্নের উত্তরে শিবেন জবাব দিল, না, ক্যামেরা আমি এখানে বসিয়ে যাবার পর কেউ-ই নড়ায়নি।

রাত্তিরে কি ক্যামেরা এইভাবে আপনি সেটেই রেখে যান?

না, তবে মৃত্যু-দৃশ্যটা শেখরবাবু আবার নেবেন বলায় ফোকাস ঠিক করে ওই জায়গাতেই বসিয়ে রাখি।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, যদি সম্ভব হয়, তাহলে খুনের আগের দিন আপনি যতটা ফিল্ম তোলেন, সেটা আমি একবার দেখতে চাই।

সেটা অসম্ভব কিছু নয়, তবে একটু দেরি হবে। ফিল্ম ভরবার সময় ক্যামেরা বেধে যাওয়ায় মাঝে-মাঝে অনেকটা ফিল্ম যায়। সেটা হিসেব করে বলতে হবে।

BanglaBook.org

ও-দিনেও কি ওসব ঘটেছিল?

হ্যাঁ।

কতবার?

তা বলা মুশকিল।

আচ্ছা, আমি এখানেই অপেক্ষা করব। আপনি দয়া করে আমায় হিসেব করে যদি ফিল্মের হিসেবটা বলেন...।

শিবেন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে একটুকরো কাগজ প্রতুলের হাতে দিল। প্রতুল পড়ে দেখল ঃ

কাঁটা ও ফুল। ফিল্ম ৮০০ ফিট। প্যানক্রোম্যাটিক ৪০০ ফিট। প্রিন্ট হয়েছে ৬০০ ফিট। এন. জি. ৫০০। বাদ ১০০।

প্রতুল কতক্ষণ কী একটা ভাবল; তারপর বলল, আচ্ছা, যাবার সময় ক্যামেরাটা আপনি কী অবস্থায় রেখে যান? ইচ্ছে করলে কি তখন ছবি তোলা যেত?

হ্যাঁ, যাবার একটু আগেই আমার সহকারি নতুন ফিল্ম ভর্তি করেছিল।

আচ্ছা, তাহলে ম্যাগাজিনটা এখন ক্যামেরায় নেই কেন?

শিবেন বিস্ময়ের সুরে বলল, ও, আপনি ক্যামেরাও দেখে নিয়েছেন? আচ্ছা, একবার দেখে নিয়ে বলছি...।

ক্যামেরাটা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে শিবেন বলল, আপনার ধারণাই ঠিক। কিন্তু কেন নেই, তা আমি বলতে পারব না। হয়তো আমারই ভুল।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আর-একটা ক্যামেরা আপনি আনতে পারেন এখানে?

নিশ্চয়ই। —বলে শিবেন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা ক্যামেরা এনে যথাস্থানে বসিয়ে কুলিরা বিদায় নিতেই প্রতুল বলল, এইবার ম্যাগাজিন বদলাবার কৌশলটা একবার আমায় দেখান।

শিবেন ম্যাগাজিন বক্সের পেছনের অংশটা চেপে ধরে একটা স্ক্রু খুলতে-খুলতে বলল, স্ক্রুটা খুলে নিয়ে এই চেনটাও খুলে ফেলবেন; তারপর নতুন বাক্সটা বসিয়ে আবার সেগুলো এঁটে দিলেই ব্যস...।

প্রতুল কৌতূহলীর ভঙ্গিতে বলে উঠল, যতটা মনে করেছিলুম, জিনিসটা তত শক্ত নয়। আর দু-একবার দেখিয়ে আমাকে ফিল্ম খোলার কায়দাটা শিখিয়ে দিন—।

ক্যামেরার পাশের দিকে ছোট কপাট একটা খুলে ফেলে শিবেন প্রতুলকে কাছে ডাকল। ফিল্ম বদলাবার কৌশলটা দেখবার পর প্রতুল জিগ্যেস করল, আচ্ছা, পাটে আটকে যায় বলে ক্যামেরা পরিষ্কার করেন আপনারা নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, প্রথমে ঝেড়ে তারপর আস্তে-আস্তে মুছতে হয়—।

শেষ যে-ক্যামেরাটা ব্যবহার করেছিলেন, তখনই কি সেটা মোছা হয়েছিল?

নিশ্চয়।

আচ্ছা, ধন্যবাদ। এবার আপনি যেতে পারেন।

রাখালকে ডেকে প্রতুল তার গাড়িখানা তিন নম্বর স্টুডিয়োর গায়ে আনতে বলল। গাড়ি এলে কালো বনাতে ক্যামেরা ঢেকে নিয়ে প্রতুল সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিল।

সেটে ঢুকল ব্রিজনাথ। গভীর বিরক্তির সঙ্গে প্রতুলের পানে তাকিয়ে বলল, ওটা কি মোশাই?

একটা ক্যামেরা আছে; কিনবেন?

আপনি কি নিয়ে যাসসেন নাকি? আরে না, না, আমার অর্ডার না নিয়ে কেইসে আপ লে

BanglaBook.org

যাতা হ্যায়?

তার কথা বলার বহর শুনে প্রতুল বুঝল, ব্রিজনাথ মর্মান্তিক চটেছে। ক্যামেরাটা গাড়ির ওপর তুলে দিতে-দিতে সে হেসে বলল, যেইসা আপ দেখতা হ্যায়—।

ব্রিজনাথ রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠল, ঠাট্টা-তামাশাকা বাত ছেড়ে দিন। লিখাপড়া বেগর আমি স্টুডিয়োসে কুছু লিয়ে যেতে দিতে পারবে না।

গাড়িতে উঠে বসে প্রতুল বলল, যা-লেখবার লিখে রাখবেন।

অসহায়ের মতো একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্রিজনাথ বলল, ও আপনি ঘুরাতে সেকবেন না। আপনি জানেন না কেতনা রুপেয়াকা মাল...।

প্রতুল গাড়ি চালাতে আদেশ দিয়ে বলল, আপনিও জানেন না বোধহয় কেতনা রুপেয়াকা খুন...।

১৫

সুদীর্ঘ দিন প্রবাসবাসের পর ডাঃ অমলকিশোর দত্ত সবেমাত্র কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে সন্ধ্যাবেলা তিনি কয়েকটা প্রয়োজনীয় নতুন সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা করছেন, এইসময়ে প্রতুল সোজা ঘরে ঢুকে ক্যামেরাটা টেবিলের ওপর রাখল।

অমল সাদরে তার করমর্দন করে রহস্য-তরল কণ্ঠে বললেন, পেশাদারীভাবে এসেছেন, না বন্ধুভাবে? ওটা কী? দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটায় কিছু খোরাকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আপনার মতন ভোজন-বিলাসীর কাছে খোরাক মিলবে আশাতেই তো আমি এসেছি।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে অমল বললেন, বলুন এবার।

প্রতুল বিলাসের হত্যাকাণ্ডটা খুলে বলে জিগ্যেস করল, এই যন্ত্রটার ভেতর থেকে আঙুলের ছাপগুলো পাওয়া কি অসম্ভব হবে?

কতগুলো আঙুলের ছাপ আছে বলে মনে হয়?

ধোয়া-মোছার পরে আমার মনে হয়—অবশ্য নিছক আমার ধারণা, দুজন লোক ছুঁয়েছে এটা; হয়তো তিনজন। অবশ্য খুনির হাতে যদি দস্তানা পরা থাকে, তা হলে নিরুপায়; তবু একটা আশা...।

অমল মৃদু হেসে বললেন, দস্তানাতেও আজকাল আটকায় না প্রতুলবাবু! দস্তানার তলায় যেটুকু ফাঁক থাকে, আজকাল সেইটুকুই যথেষ্ট। এই নিয়ে গবেষণা করতেই গেছলাম আমি।

প্রতুল বলল, পরীক্ষার ফলটা জানতে পারব কখন?

ফোন করে জানাব। দেরি বেশি হবে না।

বিদায় নিয়ে প্রতুল বাড়ি ফিরল; কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ মিলল না। ফোনের পর ফোন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। অবশেষে নাগরমল ফোন করল, কী হল প্রতুলবাবু? কোঠী থেকে আমি বাহার হতে পারি না।

প্রতুল সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শিগগিরই আপনার শাপ-বিমোচন হবে সিন্ধিয়া সাহেব। কাল যাচ্ছি ওখানে...।

রিসিভার রাখতে না-রাখতে আবার বেজে উঠল। শিবেন করছে। বলল, ফিল্মের যতটুকু মিলছিল না তার হদিস পাওয়া গেছে...।

প্রতুল জবাব দিল, আচ্ছা, কাল সকালেই যাচ্ছি আমি।

তারপরই ডাঃ অমল দত্ত। তাঁর বক্তব্যটা প্রতুল শুনে নিয়ে বলল, ফোনে এসব কথাবার্তা

BanglaBook.org

না হওয়াই ভালো। ঘণ্টাখানেক-দুই বাদে আপনার ওখানেই যাচ্ছি...।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতুল ফিল্ম বিক্রয় করে যারা—এরকম একটি বৈদেশিক অফিসে এসে বলল, আপনার কাছ থেকে কিছু জানবার আছে। কিন্তু জিগ্যেস যা করব, তা চটপট ভুলে যেতে হবে...।

ম্যানেজার হেসে বললেন, এরকম মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করেই ভুলে যেতে হয় আমাদের...।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, যত ফিল্ম আপনারা বেচেন বা যদ্দিন সেগুলো ভালো থাকবে, তার একটা রেকর্ড রাখেন আপনারা নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, থাকে।

আচ্ছা, এরকম কোনও পার্টিকে গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনও ফিল্ম...।

আচ্ছা, আমি দেখে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ম্যানেজার বললেন, না, আমরা বেচিনি, তবে আর-একটা কোম্পানি আছে, আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে খোঁজ করে দেখুন...।

বিদায় নিয়ে প্রতুল দ্বিতীয় কোম্পানিতে এল এবং তার জ্ঞাতব্য বিষয়টার সন্ধানও পেতে বিলম্ব হল না।

ডাঃ দত্তের সঙ্গে প্রতুল দেখা করতেই তিনি বললেন, ক্যামেরার ভেতর যাঁর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, দেখে মনে হল তিনি সেটা ইচ্ছে করেই গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সকলের হাতের ছাপ তো পাইনি আমি, তাই কার সেটা বলতে পারব না।

প্রতুল বলল, এবার স্টুডিয়োতে গিয়েই আমি সেটা ঠিক করে নেব। আপনি দয়া করে প্রকাশ করবেন না কারও কাছে।

স্টুডিয়োতে এসে প্রতুল সোজা হাসপাতালে গিয়ে উঠল; ডাক্তারের আদেশ নিয়ে দেখা করল উলকির সঙ্গে। জিগ্যেস করল, আলো নেভবার পর তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে বিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু দেখা না পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলে, ভেবেছিলে নিজের ঘরে তিনি পোশাক ছাড়তে গেছেন?

হ্যাঁ।

তারপর বিলাসবাবু ফিরে আসেন; কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই আর-একজন তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে, পাছে তোমায় দেখতে পায়, তাই তুমি উল্টোনো বড় চেয়ারটার আড়ালে লুকিয়েছিলে?

উলকি মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

প্রতুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তারপরই তুমি দেখলে বিলাসবাবু খুন হলেন...

না, আমি তাঁকে খুন হতে দেখিনি।

পকেট থেকে একখানা তোয়ালে বার করে প্রতুল বলল, হাতের রক্তটা তুমি এখানে এসে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করো; কিন্তু তার আগে তোয়ালেতে হাত মুছেছিলে? তোমার নার্সের উচিত ছিল এখানা পুড়িয়ে ফেলা...

উলকির চোখে জল এসে গেল; রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, লুকোবার চেষ্টা করে আর লাভ নেই। বাবাই...

বাধা দিয়ে প্রতুল জিগ্যেস করল, তোমার বাবাকে তুমি খুন করতে দেখেছ?

না। তবে আমি বুঝতে পেরেছি এ-কাজ তাঁরই, কারণ তিনি জীবনে কখনো মিথ্যে বলেননি...।

BanglaBook.org

না বলতে পারেন, কিন্তু তোমাকে বাঁচাবার জন্যে জীবনে হয়তো এই প্রথম বললেন, এমনও তো হতে পারে?

উলকি চট করে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমাকে বাঁচাবার জন্যে? তার মানে?

মানে তোমার বাবার বিশ্বাস যে, তুমিই খুন করেছ।

উলকি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি—আমায় বিশ্বাস করুন—এ-কাজ করিনি আমি; আমি শুধু বিলাসবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে গেছলুম, বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমার উপায় ছিল না। ইচ্ছে না থাকলেও তাঁর সঙ্গে বিয়ে না হলে...

প্রতুল কোমল কণ্ঠে বলল, থাক, বুঝেছি। তারপর?

উলকি বলল, আমি দাঁড়িয়ে আছি তাঁর জন্যে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলুম। দেখি বিনয়বাবু। এদিক-ওদিক খুঁজতে-খুঁজতে চেয়ারের ওপর থেকে খাতাখানা নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তারপরই গেটের দিক থেকে মনে হল যেন কে আসছে। বাবা মনে করে লুকোবার জন্যে অন্ধকার সেটের দিকে ছুটলুম। এখানে দেখতে পেলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখতেন না। অন্ধকারের মধ্যে কিসে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। দেখি—বিলাসবাবু মরে পড়ে আছেন...

প্রতুল বলল, তাইতেই বোধহয় রক্তটা হাতে লেগেছিল?

হ্যাঁ, আমার প্রথম মনে হয়েছিল, বিলাসবাবু বেঁচেই আছেন। তাই মুখে-চোখে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিলুম।

প্রতুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলছ বিনয়বাবু ছাড়া আর কেউ সেটে যায়নি; অথচ বিনয়বাবুও খুন করেননি?

না, না, বিনয়বাবু খুন করেননি।

আচ্ছা, গঙ্গারাম যে-চিৎকারটা শুনেছিল, সেটা কার?

আমিই চিৎকার করেছিলুম। বিলাসবাবুকে মরে পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে আমিই কখন যে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, প্রথমটা নিজেই তা বুঝতে পারিনি।

প্রতুল আর কোনও কথা না বলে অন্যমনস্কের মতো বিদায় নিল।

মোটরখানা রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে থামিয়ে প্রতুল সিগারেটের দোকানটায় গিয়ে বলল, বিলাসবাবুর খুনের কথাটা নিশ্চয়ই আপনারা কাগজে পড়েছেন? সেদিন রাতে শেখরবাবুর সঙ্গে মোটরে করে বিলাসবাবুও কি এসেছিলেন?

দোকানদার বলল, হ্যাঁ। শেখরবাবু সিগারেট নিলেন, তারপর গাড়ি ছাড়বার সময় বিলাসবাবুও সিগারেট চাইতে আমার বয় গিয়ে ছুটতে-ছুটতে তাঁকে এককৌটো সিগারেট দিয়ে এসেছিল।

আরও দু-এক জায়গায় খবর নিয়ে প্রতুল জানতে পারল, শেখরনাথ মিথ্যা বলেনি। বিলাসকে সকলেই তারা সে-রাতে শেখরের সঙ্গে দেখেছে।

স্টুডিয়োয় ফিরে এসে প্রতুল শুনল, নাগরমল কোথায় বেরিয়েছে। তার অফিস-ঘরে বসে-বসে সে কতগুলো পুরোনো কাগজ উল্টে দেখতে লাগল, হঠাৎ একজায়গায় এসে তার দৃষ্টি আটকে গেল। আগ্রহের সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ে সে পড়তে লাগল ঃ

সমস্ত ইয়োরোপ, আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন, স্টেজেও অভিনয় করেন। বছর দশেক হল চিত্রজগতে যোগ দেন।

প্রতুলের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; শ্বাস-প্রশ্বাসও তার সঘন হয়ে উঠল। পড়ে চলল ঃ

সামাজিক আবহাওয়া কোনওদিনই তাঁর ভালো লাগে না। পরলোকতত্ত্ব এবং আজও পর্যন্ত মানুষের কাছে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে, সেইসব আবিষ্কারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

BanglaBook.org

এরকম অনেক সম্প্রদায়েরই সভ্য তিনি। শোনা যায়, নিজের বাড়িতেও এ-সম্বন্ধে তাঁর অনেক বই আছে।

প্রতুল নিজের মনেই বলে উঠল, পেয়েছি। এতক্ষণে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না।

ঠিক সেই সময় নাগরমল ঘরে ঢুকছিল। বলে উঠল, কী হইয়েসে প্রতুলবাবু?

প্রতুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, আপনার খুনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কী করতে হবে বলছি, কিন্তু তার জন্যে হয়তো আপনার মোটামুটি কিছু খরচ হতে পারে।

নাগরমল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, আমার ব্যবসাটা মাটি হতে বসিয়েসে, এত লাখ রুপেয়া পানিতে পড়তে চলিয়েসে, দু-চার-দশ-বিশ হাজারে কী যাবে আসবে?

খুশিমুখে প্রতুল বলল, বেশ। তা হলে কী করতে হবে বলি, শুনুন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রতুল নাগরমলকে বোঝাতে লাগল। আনন্দে নাগরমল আর একটু হলেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিল। এমনসময় দরজায় করাঘাত হল।

প্রতুল গিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল, বাইরে দাঁড়িয়ে শেখরনাথ।

শেখরনাথ বলে উঠল, ও, আমার ধারণা ছিল, এত রাতে আমি একলাই কাজ করছি। মাপ করবেন, না জেনে আপনাদের কথাবার্তায় বাধা দিলুম। তারপরই ধীরে-ধীরে সে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

১৬

আবার ঝড়-জলের রাত্রি। যেন সেইদিনকারেরই পুনঃ সূচনা। স্টুডিয়োর ভেতরেও প্রতুলের আদেশ মতো সেইদিনকার অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

ফটকে বাহাদুর আর গঙ্গারামের সেই সুখদুঃখের কথা, জল্পনা-কল্পনা। তার মধ্যেই জলকাদা ছিটোতে-ছিটোতে একখানা মোটর স্টুডিয়োর ভেতর থেকে এসে গেটের কাছে থামতেই বাহাদুর দরজা দুটো খুলে দিল।

যে-প্রাণীটি গাড়ি চালাচ্ছিল, সে বলে উঠল, চললুম বাহাদুর! তার পাশেই যে লোকটি বসেছিল সে হাত তুলে বলল, এমন দুর্যোগের রাতে তোমাদের অনেকখানি কষ্ট দিলুম বাহাদুর।

গাড়িখানি ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল।

গঙ্গারামের দাঁতে দাঁত ঠেকে যেতে লাগল। ভাঙা গলায় সে বলল, রাম, রাম, রাম, রাম! দেখলে বাহাদুর, বিলাসবাবু! ভূত হইয়েছে! আমি কালই স্টুডিয়োর কাম ছেড়ে দোব।

বাহাদুর কোনও জবাব না দিয়ে তার খাতায় লিখল ঃ

শেখরবাবু আর বিলাসবাবু ১২-১৫ মিনিটের সময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান।

গঙ্গারাম রাতের পাহারা সেরে ভাবতে লাগল, কখন নাগরমলকে ধরে কাজের ইস্তফা দেবে।

নাগরমল তখন প্রতুলের সঙ্গে তার অফিস-ঘরে বসেছিল, এ-কথা কেউই জানত না। প্রতুলের হাত দুটো চেপে ধরে আনন্দচপল কণ্ঠে সে বলছিল, আপনার বাহাদুরি আসে প্রতুলবাবু! যেমন আপনার মেক-আপ করার ক্ষমতা, বিশুবাবুরও তেমনি গলা নকল করবার ক্ষমতা। কেউ সন্দেহ করতেই পারল না।

উত্তরে প্রতুল শুধু একটু হাসল।

BanglaBook.org

পরদিন খুব সকালেই প্রতুল স্টুডিয়োয় এসে হাজির হল, হাতে তার একটা চারচৌকো বাক্স।

নাগরমল জিগ্যেস করল, ওটা কী?

পরে বলব। আপনার আর-সবাই তৈরি আছে?

হ্যাঁ। পেছনের ঘরে চাবি দেওয়া।

বেশ। এটা কতক্ষণের মধ্যে ডেভলপ করা, প্রিন্ট করা হতে পারে বলুন তো?

বড়জোর দু-তিনঘণ্টা।

প্রতুল গম্ভীরভাবে বলল, কিন্তু যাকে-তাকে দিয়ে এটা করাতে পারি না। আপনার ল্যাবরেটরি-ইনচার্জ যে, সে আর আমি থাকব সে-ঘরে। আর-একটা কথা, বিকেলের দিকে এইসব লোককে আপনি প্রজেকশন ঘরে হাজির থাকতে বলবেন। আমার অনুচর রাখাল আর হরেনকে যেন কেউ কোনও কাজে বাধা না দেয়। আর অপারেটরকে বলে দেবেন, কোনওরকম শব্দ যেন সে না করে বা কোনও লোককে ঘরে ঢুকতে না দেয়, তা হলে তাকেই খুন করব আমি। তারপর আপনি হরেনকে নিয়ে গিয়ে পেছনের ঘর থেকে সেটা বার করে নিয়ে আসবেন। কথাশেষে একটা নামের তালিকা সে নাগরমলের হাতে দিল।

অন্ধকার প্রজেকশন ঘর।

যেসব লোক এসে জমেছিল, তাদের অনেকেই জানে না, কেন তাদের এখানে ডাকা হয়েছে। বিনয় এসেছিল শুষ্ক মুখে; তার পাশেই অলকা—চোখে-মুখে তার রক্ত ছিল না। গম্ভীর বাহাদুর আর তার পাশে ভীত গঙ্গারাম দাঁড়িয়েছিল।

প্রতুলের পাশে বসেছিল শেখরনাথ আর ক্যামেরাম্যান শিবেন।

প্রতুল বলল, ছায়া-জগতের রূপালি পর্দার সঙ্গে আপনাদের সবাইয়ের পরিচয় ভালোমতোই আছে। তারই সাহায্যে আমি আপনাদের আজ দেখাব, কী করে বিলাসবাবু হত হন। আমাদের সিনারিও আরম্ভ হল তিন নম্বর সেট থেকে—বিলাসবাবুর মৃত্যু-দৃশ্যের পর। আমার বন্ধু বিশু পার্ট করেছে শেখরবাবুর; আর বিলাসবাবুর পার্ট যিনি করেছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আপনাদের কোনও সম্বন্ধ নেই বলেই পরিচয়টা তাঁর দিলাম না। নাগরমলবাবু, সব যদি প্রস্তুত থাকে, তা হলে এবার আপনি আরম্ভ করতে পারেন।

ছবি আরম্ভ হল। তিন নম্বর সেট—বিলাস মেঝের ওপর পড়ে আছে। মুখে-চোখে তার অকথ্য যন্ত্রণার ছাপ। তারই দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে শেখরনাথ। চোখে-মুখে গভীর বিরক্তির চিহ্ন। টাইটেল ফুটে উঠল :

দীর্ঘদিন পরিশ্রমের পরও শেখরনাথ হতাশ হইলেন।

হাতের ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শেখরনাথ ঘরের চারদিকে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। বিলাসকে উঠতে বলে নিজে একবার তার জায়গায় শুয়ে পড়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার বিলাসের পালা। বিলাস আগের জায়গায় শুয়ে পড়তেই শেখরনাথ ক্যামেরার কাছে গিয়ে ম্যাগাজিন বাক্সটা বদলে দিল। ফিল্মটা পরানো হতেই বিলাসকে আদেশ দিল অভিনয় করতে। আবার বিলাসের মুখে ফুটে উঠল সেই যন্ত্রণাকাতর ছবি। প্রসারিত হাত দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শেখরনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্যামেরা ঘোরাবার মোটরটা চালিয়ে দিল। বিলাসের কাছে ফিরে এসে আদেশ দিল মুখের অভিব্যক্তিটা আরও সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। ছোরাখানা তার বুকের ওপর বসিয়ে ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগল। তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রখানা গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেল বিলাসের বুকের মাঝে। তবু হতভাগা অভিনেতার নিষ্কৃতি নেই, তখনো পরিচালকের মুখের পানে তাকিয়ে আছে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে!

ঘরের সকলের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের গতি মনে হল বুঝি তখনই স্তব্ধ হয়ে

যাবে। নিশ্বাস নিতেও মনে হল যেন তাদের কষ্ট হচ্ছে।

বিলাসের ক্রোজ-আপ। বুকের ওপর উদ্যত ছোরাখানা সবেগে তার বুকের মাঝে প্রোথিত হয়ে গেল। সাদা দস্তানা-পরা হাত একখানা বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উঠল...।

প্রতুল চিৎকার করে বলল, এইবার বিলাসের মৃত্যু-দৃশ্য—সত্যকার বিলাসই যা অভিনয় করেছে।

বিশ্বাস যার ওপর করেছিল, তার কাছ থেকে এই আঘাত পেয়ে বিলাসের মুখে-চোখে ফুটে উঠল একটা অসহায় কাতরতা। ভীত করুণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল শেখরনাথের মুখের দিকে। ছোরাখানা খুলে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসবার একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে আবার লুটিয়ে পড়ল।

উলকি চিৎকার করে উঠল, বন্ধ করতে বলুন প্রতুলবাবু, আর দেখা যায় না...

ছবি বন্ধ হল। আলো জ্বালবার আগেই শেখরনাথ দস্তানাটার ভেতর থেকে কী একটা বার করে ক্ষিপ্রহস্তে মুখে ফেলে দিল। তার দিন যে ঘনিয়ে এসেছে, সেটা বুঝতে বাকি ছিল না।

প্রতুল বলে উঠল, নড়বার চেষ্টা করবেন না শেখরবাবু। ঘরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। কেউ একজন আলোটা জ্বেলে দাও।

আলো জ্বালবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল, উদ্যত পিস্তল হাতে বিশু শেখরনাথের পেছনে দাঁড়িয়ে।

মাতালের মতো টলতে-টলতে শেখরনাথ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

প্রতুল বলল, ওঠবার চেষ্টা করবেন না।

হো-হো করে হেসে উঠে শেখরনাথ বলল, আমাকে আর ভয় দেখিয়ে লাভ কী? চোর-চোর খেলতে গিয়ে বুড়ি কখন ছুঁতে হয়, আমি তা জানি। আপনাদের অনেকেরই ধারণা, আমি পাগল। হয়তো তাই। সফলতার কোনও দাম আমি জীবনে দিইনি; তবু ব্যর্থতার বেদনা বুকে বড় বাজে... তারপরই সে পাশের কোচটার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

প্রতুল বলল, শেখরবাবু আত্মহত্যা করে আইনের হাত এড়িয়েছেন। তাঁর অপরাধের যথার্থ প্রমাণ তো আপনারা পেলেন?

নাগরমল জিগ্যেস করল, কিন্তু ওই ক্রোজ-আপের ছবিটা কোথায় পেলেন আপনি? আমরা তো ওটা তুলিনি!

না। ওটা শেখরবাবু নিজেই তোলেন। বিলাসবাবুর আসল মৃত্যু-দৃশ্য—অবশ্য আপনাদের জন্যে নয়। ওঁর নিজের জন্য। ক্যামেরায় ওঁর হাতের ছাপটা পেয়েই আমার সন্দেহ হয়। খুঁজতে-খুঁজতে এই ফিল্মের টুকরোটা ওঁর ঘর থেকেই আবিষ্কার করি। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে শেখরবাবু বহু গুপ্ত সভার সদস্য। তাদেরই একটাতে তিনি এই ফিল্মটা পাঠাবার মতলবে ছিলেন। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার কী হয়, এইসব সভার সভ্যরা তারই গবেষণা করেন।

গঙ্গারাম বলে উঠল, কিন্তু হামি যে আপনা আঁখসে বিলাসবাবুকে ফেরে দেখিয়েসে?

হেসে প্রতুল বলল, সেটা ডামি। শেখরবাবু তাকে বিলাসের পোশাক পরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে কথাটা বিলাসের গলা অনুকরণ করে তিনিই বলেন।

নাগরমল উঠে পড়ে বলল, নাঃ, স্টুডিয়ো হামি এখন কয়েক রোজ বন্ করিয়ে রাখবে। হামার লাখো লাখো রুপেয়া...।

BanglaBook.org

রহস্যের আলো-ছায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মুখপাত

গোয়েন্দা-কাহিনীর জন্ম বোধহয় ইতিহাস-পূর্ব যুগে। অন্তত খ্রিস্টানদের প্রাচীন রচনা 'আপক্রিয়া'র মধ্যেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অভাব নেই।

কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীকে সর্বপ্রথম আর্টের রাজ্যে দেখতে পাওয়া গেছে আধুনিক যুগে। এটা সর্বাগ্রে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালেন পো-র প্রতিভার প্রসাদে। তারপর অল্পবিস্তর তাঁরই পদানুসরণ করে দেখা দিয়েছেন স্যার কন্যান ডইল ও ডাঃ অস্টিন ফ্রিম্যান প্রমুখ।

বিলাতের একটি বিখ্যাত অতি-আধুনিক রচনা অবলম্বন করে আমরা এই গোয়েন্দা-কাহিনীটি পাঠকের হাতে উপহার দিলুম।

এটি একটি বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভের গল্প। এর প্রধান নূতনত্ব ও বিশেষত্ব হচ্ছে, লেখক অপরাধীকে লুকিয়ে রেখে সর্বশেষে পাঠকদের চমকে দেবার জন্যে গভীর রহস্য সৃষ্টি করতে চাননি। অপরাধের দৃশ্যপট উজ্জ্বল রেখায় খুলে রাখা হয়েছে সকলের চোখের সামনেই। আধুনিক পুলিশকে ঠকাবার জন্যে অপরাধী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাও গোপন করা হয়নি।

তারপর দেখানো হয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ কী অপূর্ব কৌশলে অপরাধীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন এবং অপরাধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কত তুচ্ছ সূত্রকেও করে তুলতে পারে কতখানি মূল্যবান।

এটি গল্প বটে, কিন্তু য়ুরোপের সত্যিকার ডিটেকটিভরা আজকাল ঠিক এই পুস্তকে বর্ণিত উপায়েই কাজ করে থাকেন। সুতরাং গল্পটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম অংশ

অপরাধের কলাকৌশল

প্রথম

অক্ষয়কুমার চৌধুরী পণ্ডিতদের একটি মস্তবড় উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে। পণ্ডিতরা বলেন, 'মানুষের মুখ হচ্ছে মনের আয়না।'

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের পানে তাকিয়ে তার চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে, এমন লোক কেউ আছে বলে জানি না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পণ্ডিতদের মুখ হবে বন্ধ।

কী হাসি-হাসি সরল মুখ তার! সে-হাসির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন সদাশয়তা আর ন্যায়পরায়ণতা! বসুধার সবাই যেন তার কুটুম্ব!

কিন্তু অক্ষয় নিজেই জানে, কেউ যদি তাকে চোর, জুয়াচোর, অসাধু বা দাগাবাজ বলে ডাকে, তবে একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

তার ছোট বাড়িখানিতে থাকে একটি মাত্র আধবুড়ো লোক—একাধারে সেই-ই হচ্ছে পাচক ও বেয়ারা। নাম রামচরণ। সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায়, 'আমার মনিবের মতন সৎ, আমুদে আর ভালোমানুষ লোক আর দেখা যায় না। মুখে তাঁর গান আর মিষ্টি কথা লেগেই আছে।'

কিন্তু রামচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারত, অক্ষয় তার মাইনের টাকা জোগাড় করে বড় বিদ্যা চুরি-বিদ্যার দ্বারা, তা হলে ব্রহ্মাণ্ডেও তার প্রকাণ্ড বিস্ময়ের স্থান-সংকুলান হত না।

চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। এ-সত্য অক্ষয়ের অজানা ছিল না। চোরের পক্ষে কেউ নেই—বিপক্ষে সবাই।

কিন্তু অক্ষয় এ-ও জানে, মাথা খাটাতে আর অতি-লোভ সামলাতে পারলে, চুরি-বিদ্যাও লাভজনক হতে পারে।

অক্ষয় অতি-লোভী নয়। তার মাথাও আছে। তার দলবল নেই—সে একলা চুরি করে। তার বিরুদ্ধে কেউ 'রাজার সাক্ষী' হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে ঘন-ঘন চুরি করে না। অনেক বুঝে-সুঝে ফন্দি এঁটে মাঝে-মাঝে চুরি করে, তারপর চোরাই মাল বেচে যে-টাকা পায়, তা নানাবিধ বৈধ উপায়ে খাটায়। আমাদের অক্ষয় চৌধুরী ভারি হুঁশিয়ার লোক। পুলিশ তার কাছে হার মেনেছে।

সে প্রকাশ্যে জহুরীর কাজ করত। কিন্তু তার কোনও-কোনও সম-ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়ের কারবার নাকি চোরাই পাথর নিয়ে। তবে এ হচ্ছে সন্দেহ মাত্র। কেউ তাকে হাতে-নাতে ধরতে পারেনি। কাজেই অক্ষয় হাসিখুশি অম্লানই আছে আজ পর্যন্ত।

সুবিধা পেলেই সে চোরাই হীরা-পান্না-মুক্তা নিয়ে কাজ গোছাতে ভোলে না।

গল্পের আরম্ভেই দেখতে পাবেন, অতি-গুণধর অক্ষয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করছে বাড়ির সামনেকার বাগানে।

এটি একটি গ্রামের বাড়ি। গ্রামের আসল নাম বলব না, আমরা চাঁদনগর নামেই ডাকব। এখান থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়।

বাড়িতে অক্ষয় আজ একলা। রামচরণ ভিন-গাঁয়ে কী কাজে গেছে, ফিরবে বেশি রাতে। অক্ষয়কে যখন-তখন হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে যেতে হত, তাই সে বাড়ির সদরের চাবি করেছিল দুটি। একটি থাকত তার নিজের কাছে, আর একটি থাকত রামচরণের জিম্মায়। যে যখন আসত, তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকত। আজও রামচরণ জেনেই গিয়েছে যে, রাত্রে বাড়িতে এসে সে তার মনিবকে দেখতে পাবে না। অক্ষয়কে খানিক পরেই কলকাতায় যেতে হবে।

BanglaBook.org

উদ্দেশ্য, খানকয় ছোট-বড় হীরা বেচা। সেগুলি চোরাই বলে অক্ষয়ের মানহানি করব না। কিন্তু সে হীরাগুলি কোথায় আছে জানেন? তার জুতার গোড়ালির ভিতরে!

অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অক্ষয়ের একপাটি জুতার গোড়ালি হচ্ছে দেরাজের পুঁচকে সংস্করণ। কৌশলে টানলে তার একটি অংশ 'টানা'র মতন বেরিয়ে আসে। এই উপায়ে পকেট-কাটার ও পুলিশের অন্যায় জব্দ হয়।

সন্ধ্যা। বাতাসে বন্য গন্ধ, অন্ধকারের গায়ে চুমকির মতন জোনাকি। চারিদিক নিঃসাড়। অক্ষয় বাইরে যাবার পোশাক পরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও ট্রেনের সময় হয়নি।

হঠাৎ অদূরে রাস্তায় জাগল কার পায়ের শব্দ।

অক্ষয় ভাবতে লাগল। কোনও অতিথি আসছে না কি? কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি আসে তো কালেভদ্রে! ...এখানে কাছাকাছি অন্য কারুর বাড়ি নেই। তার বাড়ির পরেই হচ্ছে পোড়ো জমি —একটা অর্ধ-নির্মিত রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়েই। এ-নতুন পথে তো গাঁয়ের লোক আসে না!

বাগানে ঢোকাবার মুখেই ছিল একটি বেড়া। কৌতূহলী অক্ষয় তার উপরে ঝুঁকে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে।

অন্ধকারের বুকে জ্বলল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দেখা গেল একখানা মুখ, অস্পষ্ট দেহ। আগন্তুক সিগারেট ধরাচ্ছে।

অক্ষয় শুধোলে, 'কে?'

আগন্তুক এগিয়ে এল। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই পথ দিয়ে কি চাঁদনগর জংশনে যাওয়া যায়?'

অক্ষয় ইংরেজিতে বললে, 'না; স্টেশনে যাওয়ার অন্য রাস্তা আছে।'

'আবার অন্য রাস্তা! রক্ষে করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কে এক বোকা আমায় এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, ঘুরে-ঘুরে পায়ের নাড়ী ছিঁড়ে গেল।'

'মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে এসেছিলুম এখানকার জমিদার-বাড়িতে। যাব আবার কলকাতায়। এখন পথ হারিয়ে অন্ধের মতন ঘুরে মরছি। একে আমি চোখে খাটো, তায় এই অন্ধকার। আর পারি না!'

'আপনি ক'টার ট্রেন ধরতে চান?'

'সাড়ে আটটার।'

'তাই নাকি? আমিও ওই ট্রেনে আজ কলকাতায় যাব। কিন্তু এখন সবে সাতটা, আমি আটটা-পনেরোর আগে বাড়ি থেকে বেরুব না। আপনি যদি আমার বৈঠকখানায় এসে খানিকক্ষণ বসেন, তা হলে আমরা একসঙ্গেই স্টেশনে যেতে পারি। স্টেশন এখান থেকে আধ মাইলের বেশি হবে না।'

মুখখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে চশমা-পরা চোখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ।'

অক্ষয় বেড়ার দরজা খুলে দিলে। আগন্তুক একটু ইতস্তত ভাব দেখালে। তারপর মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়

বৈঠকখানা অন্ধকার ছিল। অক্ষয় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করল।

এতক্ষণ পরে দুজনেরই দুজনকে ভালো করে দেখবার সুবিধা হল।

অক্ষয় সচমকে নিজের মনে-মনে বললে, 'ও হরি, এ যে দেখছি জরুরী মণিলাল বুলাভাই! হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে চেনে না।'

প্রকাশ্যে বললে, 'বসুন মশাই, আরাম করে বসুন। অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন, একটু চা-টা ইচ্ছা করেন?'

মণিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার পরনে কোট-পেন্টুলুন। মাথায় ধূসর রঙের নেমদার টুপি—অর্থাৎ 'ফেল্ট হ্যাট'। সে টুপিটা ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপরে রাখলে এবং হাতের ছোট ব্যাগটা রাখলে একটা টেবিলের উপরে। ছাতাটাও তার গায়ে ঠেসিয়ে দাঁড় করিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল।

বৈঠকখানার একপাশে রান্নাঘর। উনুনে আগুন ছিল। চায়ের জল গরম করতে দেরি লাগল না। চা তৈরি করে অক্ষয় আবার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। চায়ের ট্রে-খানা টেবিলের উপরে রাখলে। একখানা থালায় দুটি রসগোল্লা ও আর একখানা থালায় খানদুই ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট দিতেও ভুলল না।

একটি তারা-কাটা দামি কাচের গেলাসে জল ঢেলে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে আপাতত আর কিছু খাবার খুঁজে পেলুম না।'

মণিলাল বলল, 'সঙ্কোচের কারণ নেই। যে-দুটি খাবার দিয়েছেন, ও-দুটিই আমি ভালোবাসি' —বলেই একটি রসগোল্লা তুলে মুখের ভিতর ফেলে দিলে।

মণিলাল যে কেন জমিদার-বাড়িতে গিয়েছিল, এ-কথা জানবার জন্যে অক্ষয়ের মনে আগ্রহ হল। কিন্তু অক্ষয় এ-সম্বন্ধে তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না বরং মণিলালও প্রায় নীরবেই নিজের চা ও খাবার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অক্ষয় ভাবতে লাগল ঃ মণিলাল বুলাভাই হচ্ছে একজন নামজাদা জহুরী। সে যখন নিজে জমিদার-বাড়িতে এসেছে তখন কাজটা নিশ্চয়ই জরুরি!

কিন্তু কীরকম জরুরি...? হুঁ, বোঝা গেছে।

দিন দশ পরে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে। এতবড় ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না জানি কত হাজার টাকার জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়া হবে। মণিলাল নিশ্চয়ই রাশি-রাশি হীরা-চুনি-পান্নার নমুনা নিয়ে এসেছে। ওর জামার আর ব্যাগের ভিতরে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো লক্ষপতির ঐশ্বর্য!

অক্ষয় ছিঁচকে চোর নয়। তার মূলমন্ত্র—মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার! সোনা-দানা সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু হীরা-পান্নার দিকেই ঝোঁক তার বেশি। হীরা-পান্না বড় ভালো জিনিস; ভার নয়, মস্ত নয়, হাতের মুঠার ভিতরে লুকিয়ে রাখা যায় দস্তুরমতন সাত রাজার ধন।

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলালের কাছে কত টাকার পাথর আছে?

মণিলাল বললে, 'আজ ভারি শীত পড়েছে!'

অক্ষয় বললে, 'হ্যাঁ, বড্ড।' তারপর আবার ভাবতে লাগল ঃ কত টাকার পাথর আছে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? ...উহুঁঃ তার চেয়েও বেশি! জমিদার যত টাকার পাথর কিনবেন, তাঁকে দেখাবার জন্য মণিলাল নিশ্চয়ই তার ঢের-ঢের বেশি টাকার জিনিস এনেছে। নইলে ও নিজে আসত না। ওর কাছে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে।

অক্ষয় কেমন অস্থির হয়ে উঠল। নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বলল, 'আপনি ফুলের বাগান ভালোবাসেন?'

মণিলাল শুষ্কস্বরে বলল, 'মাঝে-মাঝে পার্কে হাওয়া খেতে যাই। আমি কলকাতায় থাকি কি না।'

BanglaBook.org

আবার সে বোবা। এইটেই স্বাভাবিক। অক্ষয় বুঝল, মণিলাল বেশি কথা কইতে নারাজ, হাজার-হাজার টাকার সম্পত্তি যার সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে, মুখরতা তার সাজে না।... 'ধরলুম, ওর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে। পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আধ লক্ষ টাকা! ও-টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনলে মাসে কত টাকা আয় হয়? তার সঙ্গে যদি আমার জমানো টাকা যোগ করি—তা হলে? ওঃ! তা হলে আর আমাকে চুরি-চামারি করতে হয় না—সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে-বসে খেতে পারি।'

অক্ষয় একবার আড়চোখে মণিলালের দিকে তাকিয়ে চট করে আবার নজর ফিরিয়ে নিলে। তার মনের ভিতরে জেগে উঠছে একটা বিশ্রী ভাব—একে দমন করতেই হবে! 'আমি চুরি করি বটে, কিন্তু খুন? না, না, এ হচ্ছে ভয়াবহ পাগলামি! ...হ্যাঁ, একবার শ্যামবাজারের একটা পাহারাওয়ালাকে ছোরা মারতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো হচ্ছে তার নিজেরই দোষ! তারপর হাটখোলার সেই বুড়োটা। তার মুখ বন্ধ না করলে উপায় ছিল না, আমাকে দেখে সে যা ষাঁড়ের মতন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল! এ-দুটো হচ্ছে দৈব-দুর্ঘটনা—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। এজন্যে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই। কিন্তু স্বেচ্ছায় নরহত্যা! খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া! উন্মত্ত না হলে এমন কাজ কেউ করে...!'

'তবে এ-কথাও ঠিক, আমি যদি খুনি হতুম এমন সুযোগ আর পেতুম না। এত টাকার সম্পত্তি, খালি বাড়ি, পল্লীর বাইরে নির্জন ঠাঁই, রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকার...।'

'কিন্তু এই লাশটা! খুনের পরে যত মুশকিল বাধে এই লাশ নিয়ে। লাশের গতি করা বড় দায়—।'

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির পিছনকার পোড়ো জমির ওপাশ দিয়ে লাইন যেখানে মোড় ফিরে গিয়েছে, গাড়ি আসছে সেইখান দিয়ে।

অক্ষয়ের মাথার ভিতর দিয়ে ধাঁ-করে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল! সেই চিন্তা-সূত্র ধরে তার মন হল অগ্রসর এবং তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল মণিলালের দিকে—সে নিজের মনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে মাঝে-মাঝে।

অক্ষয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে মণিলালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন যেন বললে—'অক্ষয়, শিগগির বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাও!'

যদিও অক্ষয়ের দেহ হয়ে উঠেছিল তখন উত্তপ্ত, তবু তার বুকের ভিতরে জাগল যেন শীতের কাঁপন! মাথা ঘুরিয়ে দরজার পানে তাকিয়ে সে বলল, 'কী কনকনে হাওয়া! আমি কি ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিইনি?' এগিয়ে গিয়ে দু-হাট করে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারল। তার ইচ্ছা হল দৌড়ে খোলা বাতাসের কোলে গিয়ে পড়ে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই আকস্মিক খ্যাপামির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'এইবার স্টেশনের দিকে পা চালালে কেমন হয়, তা-ই ভাবছি।'

মণিলাল চায়ের শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে মুখ তুলে বললে, 'আপনার ঘড়ি কি ঠিক?'

অক্ষয় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।'

মণিলাল বললে, 'স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বড়জোর দশ মিনিট।'

'এই তো সবে সাতটা-বিশ! এখনও একঘণ্টারও বেশি সময় আছে। বাইরের ঠাণ্ডায় অন্ধকারের চেয়ে এ-ঘর ঢের ভালো। মিছে তাড়াতাড়ি করবার দরকার আছে কি?

'কিছু না, কিছু না।' অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর খানিক খুশি, খানিক বিষাদমাখা। আরও খানিকক্ষণ

BanglaBook.org

সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—কালো রাত্রির মধ্যে দুই চোখ ডুবিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে, নিঃশব্দে।

তারপর সে নিজের চেয়ারে বসে বাক্যব্যয়ে নারাজ মণিলালের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কথাগুলো হল কেমন যেন বাধো-বাধো, অসংলগ্ন! সে অনুভব করলে, তার মুখ যেন ক্রমেই তপ্ত, তার মস্তিষ্ক যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তার কান যেন করছে ভোঁ-ভোঁ! তার চোখ যেন কী এক ভয়াবহ একাগ্রতার সঙ্গে মণিলালের দিকে নজর দিতে চায়! প্রাণপণে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আরও ভয়ানকভাবে আবার তার দিকেই তাকাতে বাধ্য হল এবং তার মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই চলাফেরা করতে লাগল—এমন অবস্থায় পড়লে অন্য কোনও খুনি কী করত, কী করত, কী করত? ...দেখতে-দেখতে সে ধীরে-ধীরে প্রত্যেক দিক থেকে নিজের ভীষণ সংকল্পকে পরিপূর্ণ করে তুললে,—কোনও দিকেই কোনও ছিদ্র রাখল না।

তার মনে জাগল অস্বস্তি। মণিলালের দিকে খর-নজর রেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে যার অতুল ঐশ্বর্য তার সুমুখে সে আর বসে থাকতে পারল না। সভয়ে অনুভব করল, তার মনের ঝোঁকটা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। এখানে বসে থাকলে সে হঠাৎ নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর—।

তারপর যা হতে পারে সেটা ভাবতেই অক্ষয়ের সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু সেইসঙ্গে রত্নের পুঁজি হাতাবার জন্যে তার হাত যেন নিশপিশ করতেও লাগল।

হাজার হোক, অক্ষয় অপরাধী ছাড়া কিছুই নয়। এইসব কাজেই অভ্যস্ত। সে হচ্ছে শিকারী বাঘ! সৎপথে কোনওদিন অর্থোপার্জন করেনি—তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংস্র। সুতরাং এমন সহজলভ্য ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তার হতেই পারে না। এত হীরা-পান্না তার হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়িয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা অক্ষয়ের চিত্তকে ক্রমেই বেপরোয়া করে তুলতে লাগল।

এই বিষম লোভের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আর-একবার শেষ চেষ্টা করবে স্থির করল, যতক্ষণ-না ট্রেনের সময় আসে ততক্ষণ মণিলালের সামনে থাকবে না।

অক্ষয় বলল, 'মশাই, আমি জামা-জুতো-কাপড় বদলে আসি। যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, এ-পোশাকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

মণিলাল বললে, 'নিশ্চয়ই নয়। অসুখ হতে পারে।'

বৈঠকখানার একপাশে ছিল দালান, ঘর থেকে বেরিয়ে অক্ষয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার জামা-কাপড় বদলাবার দরকার নেই—ওটা বাজে ওজর মাত্র। তবু সে আলনার কাছে গিয়ে অকারণেই পোশাক পরিবর্তনে নিযুক্ত হল। ভাবলে, এইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—অস্বস্তির! 'ওঃ, ও-ঘর হচ্ছে অভিশপ্ত—ওখানকার বাতাস বিষাক্ত। ওখান থেকে পালিয়ে এসে বাঁচলুম—নইলে এখনি হয়তো কী করতে গিয়ে কী করে ফেলতুম! এখানে থাকলে প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না।'

তৃতীয়

'এখানে থাকলে হয়তো প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না—হয়তো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে মণিলাল নিজেই চলে যাবে। হ্যাঁ, সে একলা চলে গেলেই খুশি হই, তা হলে সমস্ত আপদই চুকে যায়—অন্তত এই ভীষণ সুযোগ বা সম্ভাবনার দায় থেকে আমি রেহাই পাই—আর ওই হীরা-পান্নাগুলো—।'

একজোড়া নতুন জুতো পরতে-পরতে অক্ষয় ধীরে-ধীরে মাথা তুললে...।

BanglaBook.org

খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মণিলাল। কাগজ আর তামাক দিয়ে আপন মনে সে নতুন সিগারেট পাকাচ্ছে।

অক্ষয় আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার জুতো পরা আর হল না। মণিলালের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল সে মূর্তির মতো, তারপর দৃষ্টি না ফিরিয়েই পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেললে।

মণিলাল নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট পাকিয়ে তামাকের রবারের থলিটা পকেটের ভিতরে রেখে দিলে। তারপর জামার উপর থেকে তামাকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দেশলাই বার করল।

আচম্বিতে কী এক প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় অক্ষয় চট করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং চোরের মতন গুড়ি মেরে পা টিপে-টিপে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পায়ে এখন জুতো নেই, কোনও শব্দ হল না। বিড়ালের মতন চুপিচুপি সে এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে। তার মুখ চকচকে, তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত এবং নিজের কানে সে শুনতে পেলে ধমনীর রক্ত-চলাচল-ধ্বনি।

মণিলাল দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল এবং তারপর ধূমপান করতে লাগল।

ধাপে-ধাপে নিঃশব্দে এগিয়ে অক্ষয় গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মণিলালের চেয়ারের পিছনে। পাছে তার নিঃশ্বাস মণিলালের মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিল। এইভাবে কেটে গেল আধমিনিট। সে যেন সাক্ষাৎ হত্যার মূর্তি—বলির জীবের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়াল প্রদীপ্ত চক্ষে, উন্মুক্ত মুখবিবর দিয়ে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে নীরবে, দুই হাতের আঙুলগুলো যেন ধড়ফড় করছে বহুমুখ সর্পের মতো।

তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দেই অক্ষয় ফিরে গেল দালানের দিকে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল। 'একটু হলেই হয়েছিল আর কী! মণিলালের জীবন ঝুলছিল একগাছা সরু সুতোর ডগায়! সত্যিকথা বলতে কী, আমি যখন চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন যদি আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকত,—এমনকী একটা হাতুড়ি বা একখানা পাথর—'

হঠাৎ অক্ষয়ের চোখ পড়ল দালানের কোণে। সেখানে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লোহার গরাদে। বাড়ির জানলা থেকে এটা কবে খুলে পড়েছিল, ভৃত্য রামচরণ এখানে এনে রেখেছিল? 'একমিনিট আগে এইটেই যদি আমার হাতে থাকত!'

অক্ষয় লোহাগাছা তুলে নিলে। হাতের উপরে রেখে তার ভার পরীক্ষা করল... 'হুঁ, এটা হচ্ছে দস্তুরমতো অস্ত্র, ব্যবহার করবার সময় বন্দুক বা রিভলভারের মতন চিৎকার করে পাড়া জাগায় না। আমার কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু না, না, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ভালো নয়। এটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়াই উচিত!'

কিন্তু লোহার ডান্ডা সে রেখে দিলে না। উঁকি মেরে দেখলে, মণিলাল তখনও সেইভাবে বসেই সিগারেট টানছে।

আবার অক্ষয়ের ভাব-পরিবর্তন হল। আবার তার মুখ হয়ে উঠল রাঙা-টকটকে ও ভ্রূকুটিকুটিল এবং গলার উপরে ফুলে উঠল একটা শির এবং পায়ে-পায়ে আবার সে এগিয়ে এল বৈঠকখানার ভিতরে।

মণিলালের চেয়ার থেকে কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সে মাথার উপরে তুললে লোহার ডান্ডা। একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। ডান্ডাটা যখন নিচে নামছে, মণিলাল হঠাৎ ফিরে দেখল। তাইতেই অক্ষয়ের লক্ষ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—ডান্ডাটা মণিলালের মাথার উপরে না পড়ে একপাশ ঘেঁষে নেমে গেল, একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য রকম আঘাত দিয়ে।

ভয়ার্ত বিকট চিৎকার করে মণিলাল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রাণপণে চেপে ধরল অক্ষয়ের দুই হাত।

তারপর আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি। দুজনেই দুজনকে চেপে ধরল সাংঘাতিক আলিঙ্গনে এবং দুজনেই কখনও দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, কখনও এগিয়ে বা কখনও পিছিয়ে যায়। চেয়ার

BanglaBook.org

পড়ল উল্টে, টেবিলের উপর থেকে ঠিকরে পড়ল একটা কাচের গেলাস, মণিলালের চশমারও হল সেই দশা, দুজনের পায়ের চাপে গেলাস ও চশমা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এবং তারপরেও আরও বার-তিনেক জাগল মণিলালের সেই বিকট চিৎকার—বিদীর্ণ করে রাত্রির স্তব্ধতা! সেই উন্মাদগ্রস্ত অবস্থাতেও অক্ষয়ের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। যদি কোনও পথিক দৈবগতিকে এদিকে এসে পড়ে, যদি সে শুনতে পায়?

নিজের দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অক্ষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে নিয়ে টেবিলের উপর ফেলে চেপে ধরল এবং টেবিলের আচ্ছাদনের এক অংশ তুলে পুরে দিল তার মুখের ভিতরে। এইভাবে তারা নিশ্চল হয়ে রইল পূর্ণ দুই মিনিট ধরে—সে এক ভয়াবহ নাটকীয় দৃশ্য!

দেখতে-দেখতে মণিলালের দেহ পড়ল এলিয়ে, ক্রমে-ক্রমে তার মাংসপেশির সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল। তখন অক্ষয় তাকে ছেড়ে দিল, মণিলালের জীবনহীন দেহটা মাটির উপরে এলিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যা হবার তা হয়ে গেল। এতক্ষণ যে-সম্ভাবনাকে অক্ষয় ভয় করছিল, তা পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে! যাক, এ-বিষয় নিয়ে আর অনুতাপ করা মিথ্যা। অনুতাপের দ্বারা মড়াকে আর করা যাবে না জীবন্ত।

চতুর্থ

অক্ষয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। শীতকালেও সে ঘেমে উঠেছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ির দিকে তাকাল।

সবে সাড়ে সাতটা!

এই ক'মিনিটের মধ্যে এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল! এতক্ষণ প্রত্যেক মিনিটই ছিল যেন একঘণ্টার মতন দীর্ঘ।

সাড়ে সাতটা! ট্রেন আসবে সাড়ে আটটায়, হাতে সময় আছে আর-একঘণ্টা! এর মধ্যেই বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তা একঘণ্টা সময় নিতান্ত অল্প নয়।

অক্ষয়ের ভাবভঙ্গি এখন শান্ত। তার একমাত্র দুর্ভাবনা, মণিলালের চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছে কি না! কেউ যদি না শুনে থাকে, তা হলে তাকে আর পায় কে!

সে হেঁট হয়ে মৃতব্যক্তির দাঁতের ভিতর থেকে টেবল-ক্লথখানা আস্তে-আস্তে টেনে বার করে নিল। তারপর তার জামাকাপড় খুঁজতে আরম্ভ করল। বেশিক্ষণ লাগল না যা খুঁজছিল তা পেতে।

একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্সের ভিতরে আলাদা-আলাদা কাগজের মোড়কে রয়েছে হীরা, চুনি, পান্না ও মুক্তা প্রভৃতি অনেক দামি জিনিস। তা হলে তার শ্রম সার্থক! মানুষের প্রাণবধ করেছে বলে তার মনে আর কোনওরকম অনুশোচনার সঞ্চার হল না। বরং নিজেই নিজেকে দিতে লাগল অভিনন্দন।

তারপর সে সুপটু হাতে কর্তব্য-সম্পাদনে নিযুক্ত হল। টেবল-ক্লথের উপরে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা রক্ত। লাশের মাথার তলায় কার্পেটেরও উপরে লেগেছে রক্তের ছোপ। জল ও ন্যাকড়া এনে সে আগে সাবধানে রক্তচিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে ফেলল। তারপর লাশের মাথার তলায় একখানা খবরের কাগজ রেখে দিল—নতুন রক্ত লেগে যাতে আর কার্পেট কলঙ্কিত না হয়।

তারপর টেবিল-কাপড়খানা আবার টেবিলের উপরে পেতে দিল, উল্টানো চেয়ারখানা দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা করে।

কার্পেটের উপরে পড়েছিল একটা পায়ের চাপে চ্যাপ্টা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ও একটা

BanglaBook.org

দেশলাইয়ের কাঠি। সে দুটো তুলে ছুড়ে দালানের দিকে ফেলে দিলে। কার্পেটের উপরে একরাশ কাচের গুঁড়ো পড়েছিল। সেই তারামার্কা গেলাসের ও মণিলালের চশমার ভাঙা কাচ। সেগুলো তুলে আগে সে একখানা কাগজের উপরে জড়ো করলে। তারপর যতদূর সম্ভব যত্ন করে বেছে-বেছে চশমা-ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আর একখানা কাগজের উপরে তুলে রাখল। চশমার ফ্রেম ও কাচের চূর্ণগুলো মোড়কে পুরে রাখল নিজের পকেটের ভিতরে। যেগুলোকে গেলাসের ভাঙা কাচ বলে মনে হল, সেগুলো কাগজে করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির খিড়কির দিকে গেল। সেখানে একটা আঁস্তাকুড় ছিল—কাগজে-মোড়া কাচগুলো তার ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে এল।

এইবারে আসল কাজ। টেবিলের টানার ভিতর থেকে সে একটা ফিতার কাঠিম বার করল। খানিকটা ফিতা ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের ছাতা ও ব্যাগটা বেঁধে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর ভূমিতল থেকে মৃতব্যক্তিকে টেনে তুলল আর-এক কাঁধের উপরে। মণিলাল ছোটখাটো মানুষ, তার দেহও ভারি নয় এবং অক্ষয় হচ্ছে দীর্ঘদেহ, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান ব্যক্তি—সুতরাং তার পক্ষে বড়জোর একমণ পনেরো বা বিশ সের ওজনের একটা দেহের ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

শীতার্ত অন্ধ রাত্রি—চারিদিক নিঝুম।

অক্ষয় খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পোড়ো জমির উপরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশায় অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে—চোখ চেয়েও কিছু দেখা যায় না।

অক্ষয় খানিকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভীত শিয়াল বা কুকুরের দ্রুত পদশব্দ ছাড়া আর জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

অক্ষয় তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হল। পোড়ো জমিটা এবড়ো-খেবড়ো ও কাঁকর-ভরা হলেও আঁধার রাতে তার খুব অসুবিধা হল না—কারণ এ-মাঠ তার বিশেষ পরিচিত।

ঘাসের উপর তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেই সূচিভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর ছাতা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে তুলছিল একটা বিরক্তিজনক আওয়াজ। মণিলালের দোদুল্যমান মৃতদেহের চেয়ে সেই ব্যাগ ও ছাতাকে সামলাবার জন্য অক্ষয়কে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই পোড়ো জমির পাশেই রেল-লাইন। সাধারণত জমিটুকু পার হতে তিন-চারমিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পিঠে একটা মড়া নিয়ে অতি সাবধানে চারিদিকে চোখ ও কান রেখে, চলতে-চলতে মাঝে-মাঝে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হতে গিয়ে অক্ষয়ের প্রায় আট-নয়মিনিট লাগল।

তারপর পাওয়া গেল রেল-লাইনের তারের বেড়া। আবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজতে লাগল কোনও জীবন্ত ছায়া, তার কান খুঁজতে লাগল কোনও জীবনের সাড়া। কিছু নেই। খালি অন্ধকার, খালি নীরবতা।

হঠাৎ দূর থেকে জেগে উঠল চলন্ত রেলগাড়ির চাকার গড়গড় আওয়াজ—তারপর অতি-তীব্র বাঁশির চিৎকার!

অক্ষয় সজাগ হয়ে উঠল—আর দেরি নয়! সে তাড়াতাড়ি তারের বেড়া পার হল। তারপর যেখানটায় লাইন বেঁকে মোড় ফিরেছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। লাশটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে উপুড় করে রাখল, যাতে দেহের কণ্ঠদেশটা পড়ে ঠিক লাইনের উপরে।

তারপর সে পকেট থেকে ছুরি বার করে ছাতা ও ব্যাগের ফিতা কেটে ফেলল। ছাতা ও ব্যাগটাকে রাখলে ঠিক লাশের পাশে। সযত্নে ফিতাটাকে আবার পকেটে পুরল, লাইনের কাছে পড়ে রইল কেবল ফিতার কাঁসটুকু। সেটা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

গাড়ির শব্দ কাছে এগিয়ে এসেছে। এখানা নিশ্চয়ই মালগাড়ি।

অক্ষয় শীঘ্রহস্তে পকেট থেকে কাগজের মোড়কটাকে বার করল। চশমার তোবড়ানো ফ্রেমটা রেখে দিলে মৃতের মাথার পাশে। এবং কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিল তারই চতুর্দিকে।

BanglaBook.org

ইঞ্জিনের ধূম্র-উদিগরণের ভোঁস-ভোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে অতি নিকটে। অক্ষয়ের ইচ্ছা হল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্বচক্ষে দেখে যায়, যবনিকা-পতনের পূর্বে এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা—কেমন করে নরহত্যা পরিণত হয় আত্মহত্যায় বা দৈব-দুর্ঘটনায়।

কিন্তু না, এখানে তার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তা হলে হয়তো অদৃশ্য হবার আগে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। চটপট সে আবার বেড়া পার হল, দ্রুতপদে পোড়ো জমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল—পিছনে যথাস্থানে আগতপ্রায় রেলগাড়ির বজ্রধ্বনি শুনতে-শুনতে।

রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে!

শ্বাস রুদ্ধ করে ভূপ্রোথিত মূর্তির মতন স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তেকের জন্যে। তারপর সে প্রায় দৌড়ে নিজের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীরবে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

সে ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী? গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই লাশটা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু, এখন কী হচ্ছে ওখানে? ওরা কি তার বাড়িতে আসবে? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। হয়তো এখনই কেউ এসে তার দরজার কড়া নাড়বে।

বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে সে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে। সমস্তই বেশ গোছালো।

কিন্তু লোহার ডান্ডাটা এখনও ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে।

সে ডান্ডাটা তুলে নিয়ে ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে। তার উপরে কোনও রক্তের দাগ নেই। কেবল দুই-একগাছা চুল লেগে আছে।

রেলগাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কের মতন সে টেবিল-কাপড় দিয়ে ডান্ডাটা একবার মুছে ফেললে।

সেটাকে নিয়ে আবার বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ে গেল। পাঁচিলের উপর দিয়ে ডান্ডাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সেটা পড়ল গিয়ে পোড়ো জমির বিছুটির ঝোপের ভিতরে।

ডান্ডাটার ভিতরে তাকে ধরিয়ে দেবার মতন কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সেটাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অক্ষয়ের চক্ষে তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

সে বুঝল, এইবার তার স্টেশনের দিকে যাত্রা করা উচিত। যদিও এখনও গাড়ির সময় হয়নি তবু আর বাড়ির ভিতরে থাকতে তার ভরসা হল না। সে চায় না, এখানে এসে কেউ তাকে দেখতে পায়।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার আয়োজন সেরে নিলে। তারপর একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল।

কিন্তু আবার ফিরে এল ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেওয়ার জন্যে।

আলো নেবাবার জন্যে হাত তুলেছে—হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলঘরের একদিকে। কী সর্বনাশ!

পঞ্চম

মণিলালের টুপিটা তখনও পড়ে রয়েছে চেয়ারের উপরে!

তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেল—একেবারে জড়ীভূত! সে মারাত্মক আতঙ্কে ঘেমে উঠল।

আর একটু হলেই তো সে আলো নিবিয়ে চলে যাচ্ছিল—পিছনে তার বিরুদ্ধে এতবড় প্রমাণ ফেলে রেখে! বাইরের কেউ যদি এসে এই টুপিটা এখানে দেখতে পেত, কী হত তা হলে?

চেয়ারের কাছে গিয়ে নেমদার টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করে শিউরে উঠল।

BanglaBook.org

টুপিটা না দেখে চলে গেলে কি আর রক্ষে ছিল? এখনই যদি কারা এসে পড়ে, তার হাতে বা ঘরে এই টুপিটা দেখতে পায়, তা হলে কেউ তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই কথা ভেবেই সে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু দারুণ আতঙ্কে বুদ্ধি হারাল না।

রান্নাঘরের উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখল, আগুন নিবে গেছে। তখনই কতকগুলো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে এনে অক্ষয় আবার অগ্নি সৃষ্টি করল। তারপর ছুরি দিয়ে টুপিটা খণ্ড-খণ্ড করে কেটে সমর্পণ করল আগুনের কবলে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও যেন দুপ-দুপ করে লাফিয়ে উঠছে। যদি কেউ এসে পড়ে—যদি কেউ এসে পড়ে! তার হাতের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না—এখনই এত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আর কী!

নেমদা বা 'ফেল্ট' সহজে পোড়বার জিনিস নয়। টুপির খণ্ডগুলো ধিকি-ধিকি করে আস্তে-আস্তে পুড়ে প্রচুর ধোঁয়ার জন্ম দিয়ে অঙ্গারের মতন হয়ে যাচ্ছে—সত্যিকার ভস্মে পরিণত হচ্ছে না। তার উপরে চুল-পোড়া গন্ধের সঙ্গে রজনের গন্ধ মেশানো এমন একটা বিষম দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল যে, অক্ষয় ভয় পেয়ে রান্নাঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হল।

তখনও সে কান পেতে শুনছে আর ভাবছে, বাইরে বুঝি জাগল কার পদশব্দ, ওই বুঝি নড়ে ওঠে সদরের কড়া, ওই বুঝি আসে নিয়তির নিষ্ঠুর আহ্বান!

ওদিকে সময়ও আর নেই। সাড়ে আটটা বাজতে বাকি আর বিশ মিনিট মাত্র! আর মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে ট্রেন ধরা অসম্ভব হবে!

আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, টুপির খণ্ডগুলোকে আর চেনা যায় না। তখন সে একটা লোহার শিক নিয়ে অঙ্গারগুলোর উপরে সজোরে আঘাত করতে লাগল। পোড়া কাঠ ও কয়লার সঙ্গে টুপির দগ্ধাবশেষ নেড়ে-নেড়ে এমনকরে মিশিয়ে দিলে যে, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়বার উপায় আর রইল না। এমনকী ভৃত্য রামচরণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব, সে যখন ফিরে আসবে অঙ্গার তখন ভস্মে পরিণত হবে। অক্ষয় ভালো করেই দেখে নিয়েছে, টুপির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরি এমন কোনও বস্তু নেই, আগুনের কবলেও যা নষ্ট হবার নয়।

আবার সে ব্যাগ তুলে নিল, আবার সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে বৈঠকখানার চতুর্দিক পরীক্ষা করল, তারপর ঘর ছেড়ে বাড়ির বাইরে গেল। সদর দরজার কুলুপে চাবি লাগাল। তারপর হনহন করে চলল স্টেশনের দিকে। কিন্তু এবার সে ভুলে গেল, বৈঠকখানার আলো নিবিয়ে দিতে!

ট্রেন আসবার আগেই অক্ষয় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল। টিকিট কিনল। তারপর যেন নিশ্চিন্তভাবেই প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগল।

সে আড়চোখে বেশ লক্ষ্য করল, ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে দলবেঁধে রেল-লাইনের একদিকেই দূরে তাকিয়ে আছে।

সঙ্কোচ-ভরা কৌতূহলের সঙ্গে অক্ষয় সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে-পায়ে।

অন্ধকার ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করলে দুইজন লোক। প্ল্যাটফর্মের ঢালু প্রান্ত দিয়ে উপরে উঠে এল। তারা তের্পলে ঢাকা স্ট্রেচারে করে কী যেন বয়ে আনছে।

সেটা যে কী, তা বুঝতে অক্ষয়ের দেরি লাগল না। তার বুক করতে লাগল ছাঁৎ-ছাঁৎ।

তের্পলের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট দেহের গঠন ফুটে উঠছে—যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট, নির্বাক চোখে।

বাহকরা চলে গেল। পিছনে-পিছনে আসছিল একটা কুলি। তার হাতে একটা ব্যাগ আর ছাতা।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে-লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

BanglaBook.org

কুলি বললে, 'হাঁ বাবু!' ছাতাটা সে ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরল। দামি ছাতা। তার হাতলটা বিশেষ ধরনের রুপো দিয়ে বাঁধানো।

ভদ্রলোক সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বল কী?'

তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর-একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। তিনি শুধোলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ-কথা বলছেন কেন?'

বসন্তবাবু বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দ্বিতীয় অংশ

অপরাধ আবিষ্কারের কলাকৌশল

প্রথম

ডাক্তার দিলীপ চৌধুরীর এত নামডাক ডাক্তারির জন্যে নয়। তিনি সুবিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ। এবং তাঁর আসল খ্যাতির কারণ, বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচিত্র উপায়ে তিনি বহু কঠিন ও রহস্যপূর্ণ পুলিশ-কেসের কিনারা করেছেন। শ্রীমন্ত সেন হচ্ছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। নিচেকার অংশ শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি থেকে তুলে দেওয়া হল।

সকলেই জানেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেখানে পুলিশের মাথাওয়ালারা আমার বন্ধু ডাক্তার দিলীপ চৌধুরীর সাহায্য লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার বিখ্যাত জহুরী মণিলাল বুলাভাইয়ের মৃত্যুরহস্যের মধ্যে বন্ধুবর দিলীপের কৃতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর ওই Medico-legal পদ্ধতির কোনও-কোনও বিশেষত্ব পুলিশকে খুশি করতে পারেনি। বিশেষত্বগুলি যে কী, যথাস্থানে দিলীপের মুখেই তা প্রকাশ পাবে। আপাতত, কেমন করে আমরা এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম, গোড়া থেকে সেই কথাই বলব।

শীতের কুয়াশামাখা সন্ধ্যা যখন অন্ধকারে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আমাদের ট্রেন গতি কমিয়ে ধীরে-ধীরে চাঁদনগরের ছোট স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দিলীপ কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আরে-আরে, বসন্তবাবু যে!'

সঙ্গে-সঙ্গে একটি সহজে-উত্তেজিত-হওয়ার-মতন চেহারার ছোটখাটো, চটপটে অথচ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আমাদের কামরার কাছে এসে বললেন, 'অ্যাঁ! দিলীপবাবু? জানলার ধারে আপনার মুখ দেখেই চিনেছি! ভারি খুশি হলুম মশাই, ভারি খুশি হলুম। কিন্তু আপনারা হচ্ছেন মস্তবড় বিজ্ঞ লোক, আমাকে আপদ ভাববেন না তো?'

দিলীপ হেসে বললেন, 'আপনার দীনতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি! কিন্তু যাক সে-কথা। এখানে আপনি কী করছেন বলুন দেখি?'

'আমার ছোটভাই এখান থেকে কিছুদূরে একটা জমি কিনেছে। আমি তাই দেখতে এসেছিলুম। এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব?' বলেই বসন্তবাবু দরজা খুলে কামরার ভিতরে উঠে এলেন, তারপর

BanglaBook.org

বসে পড়ে বললেন, 'কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে ওই রহস্যময় ছোট বাক্সটিও এনেছেন দেখছি! ও বাক্সটি দেখেই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি! আমার কাছে ওটি হচ্ছে ম্যাজিক-বাক্স!'

দিলীপ বললেন, 'ও-বাক্সটি সঙ্গে না নিয়ে আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াই না। হঠাৎ কখন কী দরকার হতে পারে কে জানে? ছোট বাক্স, বইতে কষ্ট নেই, কিন্তু দরকারের সময়ে ওটিকে হাতের কাছে না পেলে নাকালের একশেষ হতে হয়!'

বাক্সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসন্ত বললেন, 'সেই ব্যাঙ্কে খুনের মামলায় ওই বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনি যে-আশ্চর্য ভেলকি-বাজি দেখিয়েছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স! ওর মধ্যে কী জাদু আছে, কে জানে!'

দিলীপ মৃদু হেসে সস্নেহে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে তার ডালা খুলে ফেললেন। একরত্তি বাক্স —চৌকো একফুট মাত্র। দিলীপ এটিকে বলেন, 'আমার পকেট-রসায়নশালা!' এর মধ্যে ক্ষুদে-ক্ষুদে যে-জিনিসগুলি আছে, তার সাহায্যে যে-কোনও রসায়নতত্ত্ববিদ অনায়াসেই প্রাথমিক পরীক্ষা-কার্য সম্পাদন করতে পারেন।'

'অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স!' —বলে বসন্তও মুগ্ধচোখে তার ভিতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভিতরে যা-কিছু আছে সব এতটুকু-এতটুকু—যেন গলিভারের ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত কড়ে-আঙুলের মতন ছোট্ট মানুষের দেশ লিলিপুটের ব্যবহারযোগ্য, অথচ তার মধ্যে নেই কী? নানা রাসায়নিক তরল পদার্থে ভরা 'পরীক্ষক'-শিশি, কাচনল, 'স্পিরিট-ল্যাম্প,' অণুবীক্ষণ প্রভৃতি!

বসন্ত বললেন, 'এ যেন পুতুল-খেলার বাক্স! কিন্তু মশাই এত ছোট-ছোট জিনিস নিয়ে কী কাজ করা যায়? ধরুন, ওই অণুবীক্ষণটি—।'

দিলীপ বললেন, 'ওটিকে খেলনার মতন দেখতে বটে, কিন্তু ওটি খেলনা নয়। ওর বীক্ষণ-কাচ ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য বড় যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় বেশি, কিন্তু পথে-বিপথে যেখানে বড় যন্ত্র পাওয়া অসম্ভব, সেখানে তার অভাব এর দ্বারা যথাসম্ভব পূরণ করা চলে। এগুলি হচ্ছে মধুর অভাবে গুড়ের মতো—কিচ্ছু-নেইয়ের মধ্যে তবু-কিছু!'

বসন্ত হাত দিয়ে এক-একটি জিনিস তোলেন, আর বালকের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তাঁর অসীম কৌতূহল চরিতার্থ করতে-করতে গাড়ি এসে পড়ল চাঁদনগর জংশনে।

বসন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও দিলীপবাবু, এইখানেই আমাদের গাড়ি-বদল করতে হবে না?'

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমরা তিনজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। এবং নেমেই বুঝলুম, এখানে কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে। যাত্রী এবং স্টেশনের লোকজনরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে সমবেত হয়েছে—চারিদিকেই যেন কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব।

স্টেশনের একটি লোককে ডেকে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী মশাই?'

'লাইনের ওদিকে একটি লোক রেলগাড়ি-চাপা পড়েছে। দূর থেকে ওই যে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভব স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমরা যখন সেই অন্ধকারে দোদুল্যমান আলোটার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন টিকিট-ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুই কারণে। প্রথমত, তার মুখ হাসিখুশিমাখা হলেও কেমন যেন বিবর্ণ এবং তার চক্ষে ছিল একটা বন্য ভাব। দ্বিতীয়ত, সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে রেল-লাইনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কারুকে কোনও প্রশ্ন করছিল না।

দুলন্ত আলোটা কাছে এগিয়ে এল। তারপর দেখা গেল, দুজন লোক তের্পলে ঢাকা একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্লাটফর্ম-এর ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তের্পলের তলায় যে একটা মনুষ্যদেহ আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারলুম।

BanglaBook.org

একটা ছাতা ও একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল একজন কুলি। বসন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি ছাতাটা তুলে ধরে বললে, 'হ্যাঁ বাবু!'

বসন্ত সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ-কথা বলছেন কেন?'

বসন্ত বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি ওর বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দিলীপ বললেন, 'জহুরী মণিলাল বুলাভাই?'

বসন্ত বললেন, 'হ্যাঁ। মণিলালের একটা অভ্যাস ছিল, টুপির তলায় নিজের নাম লিখে রাখা। ওহে বাপু কুলি, লাশের টুপিটা একবার দেখাও দেখি!'

কুলি বললে, 'কোনও টুপি পাওয়া যায়নি। স্টেশনমাস্টার আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

স্টেশনমাস্টার এসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

বসন্ত বললেন, 'এই ছাতা আর এর মালিককে আমি চিনি।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তা হলে একবার আমার সঙ্গে আসুন, লাশটাও শনাক্ত করতে পারেন কি না দেখি!'

বসন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা!!'

'ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'রেলে কাটা পড়ে মণিলালের চেহারা কীরকম বিশ্রী হয়েছে, কে জানে!'

'চেহারা মোটেই ভালো হয়নি, ছ'খানা মালগাড়ির চাকা বেচারার ওপর দিয়ে চলে যাবার আগে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারেনি। ধড় থেকে মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

খাবি খেতে-খেতে বসন্ত বললেন, 'বাপ রে, কী বীভৎস কাণ্ড! মাপ করবেন মশাই, ও-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। হ্যাঁ দিলীপবাবু, আপনি কী বলেন?'

'আমি বলি, তাড়াতাড়ি দেহ শনাক্ত করতে পারলে পুলিশের খুব সুবিধা হয়।

বসন্ত ম্লানমুখে বললেন, 'তা হলে আর উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে।'

স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে বসন্ত একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন—যার-পর-নাই অনিচ্ছুকভাবে। কিন্তু একমিনিট যেতে না-যেতেই তিনি দৌড়তে-দৌড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ-চোখ ভীত, উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

দিলীপের কাছে ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিলাল বুলাভাই-ই বটে! হায় রে বেচারা! ভয়ানক, ভয়ানক!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিলালের সঙ্গে কোনও দামি পাথর-টাথর ছিল?'

(এই সময়ে একটু আগে আমি যে-হাসিমুখ অথচ ছন্নছাড়ার মতন লোকটাকে লক্ষ্য করেছিলুম, সে একেবারে আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল।)

বসন্ত বললেন, 'দামি পাথর? থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না, তবে মণিলালের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে।... হ্যাঁ, একটি কথা আমার রাখবেন?'

'বলুন।'

'যদি আপনার সময় থাকে, এই মামলাটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে পারবেন? মণিলাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।'

'বেশ বসন্তবাবু, তাই হবে। আমার হাতে আজ আর কোনও কাজ নেই, আমি না-হয় কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব। কী হে শ্রীমন্ত, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তো?'

'কিছু না।'

বসন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। ওই কলকাতার গাড়ি এসে পড়েছে। কাল দেখা হলে অন্য সব কথা।'

BanglaBook.org

'কালকেই আপনি সব খবর পাবেন।'

সেই যে-অদ্ভুত লোকটা আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, দিলীপের মুখের দিকে সে একবার অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাকাল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তবাবুর পিছনে-পিছনে কলকাতার গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

কলকাতার গাড়ি চলে যাবার পর দিলীপ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে জানালেন, বসন্তবাবু তাঁর উপরে কোন ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এবং সেইসঙ্গে বললেন, 'অবশ্য পুলিশ না-আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। পুলিশ খুব শীঘ্রই এসে পড়বে। পুলিশকে আপনার কথা জানাব।' স্টেশনমাস্টার এই বলে চলে গেলেন।

আমি আর দিলীপ প্ল্যাটফর্ম-এর উপরে পদচারণা করতে লাগলুম।

দিলীপ বললেন, 'এ-ধরনের মামলায় তিনরকম ব্যাখ্যা থাকে। দৈব দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, হত্যা। আর এই তিনরকম তথ্যের সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদের একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছতে হবে। প্রথম, মামলার সাধারণ তথ্য; দ্বিতীয়, দেহ পরীক্ষা করে যে-সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; তৃতীয়, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে জানা যাবে যে-সত্য। আপাতত, আমরা যে-সাধারণ তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই ঃ মৃতব্যক্তি হীরক-ব্যবসায়ী। নিজের ব্যবসার জন্যেই যে সে এমন জায়গায় এসেছিল, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি। হয়তো তার সঙ্গে ছিল দামি-দামি পাথর। এই তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যার বিরোধী। মনে সন্দেহ আনে, হয়তো এর মধ্যে হত্যাকারীর হাত আছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, এটা দৈব-দুর্ঘটনা কি না? তালে জানতে হবে, যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোনও লেভেল-ক্রসিং কি লাইনের কাছে কোনও রাস্তা আছে কি না? কিংবা ঘটনাস্থলে মৃতব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতির কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না? এসব তথ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এগুলি আমাদের জানা উচিত।'

আমি বললুম, 'যে-কুলিটা ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো! ওই দেখো, একদল লোকের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব সম্ভব আজকের ঘটনাই বর্ণনা করছে। আমাদের মতন নূতন শ্রোতা পেলে তার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠতে পারে!'

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার কথাই শুনব। দেখা যাক ও কী বলে!'

আমরা কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম—সত্য-সত্যই সে গল্পের ভার নামাবার জন্যে অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল বলতে পারো?'

সে বলল, 'ড্রাইভার যা বললে তা আমি শুনেছি। ওখানে এক জায়গায় লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। মালগাড়ি যখন সেই বাঁকের মুখে এসে পড়ে, ড্রাইভার তখন হঠাৎ দেখতে পায়, লাইনের উপরে কী যেন পড়ে আছে! সে তখনি বাষ্প বন্ধ করে দেয়, বাঁশি বাজায় আর ব্রেক কষে। কিন্তু জানেন তো মশাই, এত তাড়াতাড়ি মালগাড়ি থামানো সোজা ব্যাপার নয়। থামবার আগেই ছ-খানা গাড়ি লোকটার উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যায়!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা কীভাবে শুয়েছিল, ড্রাইভার সে-কথা কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হেড-লাইটে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা লাইনের ওপর গলা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। লোকটা ইচ্ছে করেই প্রাণ দিয়েছে মশাই!'

'সেখানে কোনও লেভেল-ক্রসিং ছিল?'

'না বাবু। সেখানে কোনও রাস্তা-টাস্তাও ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই মাঠের ভেতর দিয়ে এসে, তারের বেড়া টপকে লাইনের ওপরে এসেছিল। সে আত্মঘাতী হবে বলে পণ করেছিল।'

'এত কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

BanglaBook.org

স্টেশনমাস্টার আমাকে বলেছেন।'

দিলীপের সঙ্গে আমি ফিরে এসে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে পড়লুম।

দিলীপ বললেন, 'একদিক দিয়ে লোকটার কথা খুব ঠিক। এটা দৈব-দুর্ঘটনা নয়। তবে লোকটা যদি রাতকানা, কালা বা নির্বোধও হত হয়তো বেড়া ডিঙিয়ে লাইনে নেমে মারা পড়তেও পারত। কিন্তু মণিলাল বুলাভাই সে-শ্রেণীর লোক নয়। মণিলাল লাইনের উপরে গলা দিয়ে শুয়েছিল। এ-থেকেও আমরা দু-একটা অনুমান করতে পারি। হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে; নয়, মৃত বা অজ্ঞান অবস্থাতেই তার দেহ পড়েছিল লাইনের উপরে। যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার সুযোগ না পাব, ততক্ষণ এর বেশি আর কিছু জানতে পারা যাবে না। ...ওই দ্যাখো শ্রীমন্ত, পুলিশ এসে পড়েছে! চলো, ওরা কী বলে শোনা যাক।'

দ্বিতীয়

স্টেশনমাস্টার একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

দিলীপ ও আমাকে দেখেই তাঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং দুজনেই একবাক্যে জানালেন, এসব ব্যাপারে তাঁরা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

দিলীপ এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেননি। তিনি জানতেন, বাংলা দেশের যেসব পুলিশ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নন, তাঁরাও অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি তাঁর কার্ড বার করে ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন।

কার্ডখানা হাতে করে ইন্সপেক্টর নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল স্ট্রেচারটা রয়েছে মেঝের উপরে—সেইভাবেই তের্পল-ঢাকা। কাছেই একটা বড় বাক্সের উপরে রয়েছে ব্যাগ ও ছাতাটা। তাদের পাশেই একটা চশমার তোবড়ানো ফ্রেম, তার কাচ নেই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই চশমার ফ্রেমটা কি লাশের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। ফ্রেমটা ঠিক লাশের পাশেই ছিল আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা কাচের টুকরো।'

দিলীপ নোটবুক-এ কথাগুলো টুকে নিলেন।

এদিকে ইন্সপেক্টর লাশের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন তের্পলের আচ্ছাদন।

দৃশ্যটা ভীষণ, সন্দেহ নেই। মৃতদেহটা এলিয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপরে। বিচ্ছিন্ন মুণ্ড—ভাবহীন চোখদুটো দৃষ্টিহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। মুণ্ডহীন দেহ অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে—দেখলেই শরীর শিউরে ওঠে।

দিলীপ পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে নীরবে হেঁট হয়ে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন, ইন্সপেক্টর লণ্ঠনের আলো ফেললেন লাশের উপরে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শ্রীমন্ত, আমরা তিনটে অনুমানের ভিতরে দুটোকে বাদ দিতে পারি।'

ইন্সপেক্টর কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দিলীপের হাত-বাক্সের দিকে।

দিলীপ সেটি খুলে একজোড়া শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যবহার করবার মতো ছোট্ট সাঁড়াশি বার করলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদ করবার হুকুম আমরা পাইনি।'

BanglaBook.org

'আমি তা জানি মশাই! আমি কেবল মৃতের মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করব।' এই বলে দিলীপ সাঁড়াশি দিয়ে মুণ্ডের ঠোঁট টেনে তুললেন এবং মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখে একমনে দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার আতসী-কাচখানা একবার আমাকে দাও তো!'

দিলীপ কী করেন দেখবার জন্যে ইন্সপেক্টর লণ্ঠন নিয়ে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়লেন।

দিলীপ মৃতের অসমোচ্চ দাঁতের সারির উপর দিয়ে আতসী-কাচখানা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতের উপর থেকে সযত্নে খুব সূক্ষ্ম কী একটা জিনিস তুলে নিলেন এবং আতসী-কাচের ভিতর দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলেন।

অনেককাল দিলীপের সঙ্গে-সঙ্গে আছি, এরপর তাঁর কী দরকার হবে আমি জানি। আমি তখনি অণুবীক্ষণে ব্যবহার্য একখানা কাচের স্লাইড ও শব-ব্যবচ্ছেদের শলাকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। তিনি সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা স্লাইডের উপরে রেখে শলাকা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ততক্ষণে আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা প্রস্তুত করে রাখলুম।

দিলীপ বললেন, 'একফোঁটা Farrant আর-একটা Cover-glass দাও।'

দিলুম।

দিলীপ তাঁর অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আমি ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকালুম —তাঁর মুখে বিদ্রূপ-হাস্য! আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তিনি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন— বোধহয় ভদ্রতার অনুরোধেই!

অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, 'এসব আমার বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে মশাই! ভদ্রলোকটি মারা যাবার আগে কী খেয়েছিলেন, সেটা জেনে কিছু লাভ আছে কি? আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক কুখাদ্য খেয়ে মারা পড়েননি।'

দিলীপ সহাস্য মুখ তুলে বললেন, 'মশাই, এ-শ্রেণীর মামলায় কিছুই বাহুল্য নয়। প্রত্যেক তথ্যের কিছু-না-কিছু মূল্য আছে।'

ইন্সপেক্টর দমলেন না, বললেন, 'যার মুণ্ড কাটা গেছে, তার শেষ-খাবারের কথা জেনে কোনও লাভ নেই।'

'তাই নাকি? যে অপঘাতে মারা পড়েছে, তার শেষ-খাবারের কথাটা কি এতই তুচ্ছ? মৃতের ফতুয়ার গায়ে এই যে গুঁড়ো-গুঁড়ো কী জিনিস লেগে রয়েছে, দেখছেন? এ-থেকে আমরা কি কিছুই জানতে পারব না?'

ইন্সপেক্টর অবিচলিতভাবে বললেন, 'এমন কী আর জানতে পারবেন?'

দিলীপ প্রথমে নিরুত্তর হয়ে মৃতের ফতুয়ার উপর থেকে সাঁড়াশির সাহায্যে গুঁড়োগুলো একে একে তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এই জানা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোক মারা যাবার আগে ক্রিম-ক্রাকার বিস্কুট খেয়েছিলেন।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার মতে, ও-কথা না জানলেও চলত। মৃত কী খেয়েছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনওই দরকার নেই। এখানে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা মারা পড়েছে কেন? সে কি আত্মহত্যা করেছে? দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে? না কেউ তাকে খুন করেছে?'

দিলীপ বললেন, 'মাপ করবেন মশাই! একমাত্র যে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে, এই লোকটিকে খুন করেছে কে? আর কেনই বা খুন করেছে? অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে —অন্তত আমি পেয়েছি!'

ইন্সপেক্টর সবিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন—সে-দৃষ্টিতে ছিল অবিশ্বাসের ছায়াও।

BanglaBook.org

অবশেষে বললেন, 'মামলার কিনারা করে ফেলতে আপনার দেরি লাগেনি দেখছি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব।

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'দেরি লাগবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে খুনের মামলা। খুনের কারণ আন্দাজ করাও শক্ত নয়। মণিলাল বুলাভাই ছিলেন নামজাদা জহুরী আর খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে অনেক দামি পাথরও ছিল. আপনি বরং মৃতের পোশাক একবার খুঁজে দেখুন।'

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ হচ্ছে আপনার বাজে আন্দাজ। মৃত ব্যক্তি জহুরী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দামি পাথর ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে তিনি খুন হয়েছেন? এ-ও যুক্তি নাকি?'

তিরস্কার-ভরা কঠিন দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ দিলীপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললেন, 'মৃতের জামাকাপড় খোঁজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি সেইজন্যেই। মনে রাখবেন মশাই, এটা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা—খবরের কাগজের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা নয়।' বলেই তিনি সদর্পে আমাদের দিকে পিছন ফিরে লাশের পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং যা-যা পেলেন, বড় বাক্সটার উপরে ব্যাগের পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এদিকে দিলীপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন লাশের সমস্ত দেহটা নিয়ে। বিশেষভাবে আতসী-কাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতের পাদুকা। ইন্সপেক্টর মাঝে-মাঝে তাঁর দিকে তাকান আর তাঁর মুখ হয়ে ওঠে কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল।

তারপর নিজের কাজ সেরে ফিরে বললেন, 'আমি হলে মশাই, খালি চোখেই জুতোটা দেখতে পেতুম! (সহাস্যে স্টেশনমাস্টারকে ইঙ্গিত করে) তবে আপনি হয়তো খালি চোখে ভালো দেখতে পান না!'

দিলীপ কিছু বললেন না, মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি বড় বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মৃতের জামাকাপড়ের ভিতর থেকে কী-কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

মানি-ব্যাগ, পকেট-বুক, একখানা চশমা (বোধহয় লেখাপড়ার জন্যে), পকেট-ছুরি, দেশলাইয়ের বাক্স, তামাকের রবারের থলি ও কার্ড কেস প্রভৃতি ছোট-ছোট আরও দু-একটি জিনিস।

দিলীপ প্রত্যেক জিনিসটা ভালো করে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং ইন্সপেক্টর তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন কৌতুক ও অবহেলাপূর্ণ চোখে।

দিলীপ চশমার কাচ-দুখানা আলোর বিরুদ্ধে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা করলেন। থলি থেকে তামাকের গুঁড়ো তুলে দেখলেন। সিগারেট পাকাবার কাগজ ও দেশলাইয়ের বাক্সটাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াল না।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তামাকের থলি দিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন, ওর ভেতরে আপনি কী দেখতে চান?'

'তামাক। এর ভেতরে স্টেট-এক্সপ্রেস তামাক রয়েছে।'

'তাও বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। বাজারে যেসব তামাক চলে তা দেখলেই আমি বলে দিতে পারি সেগুলোর নাম কী? এ-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক পরীক্ষার পর।'

'আপনার বাহাদুরি আছে।'

'বিনয় দেখাবার জন্যে সেটা অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু আপনি দেখছি মৃতের পকেট থেকে দামি পাথর-টাথর কিছুই পাননি।'

'না। ওসব কিছু ছিল বলেও মনে হয় না। তবে দামি পাথর না পেলেও দামি জিনিস পেয়েছি বটে। সোনার ঘড়ি আর চেন. একটি গলাবন্ধের হীরার পিন. দুখানা একশো আর চারখানা দশ

BanglaBook.org

টাকার নোট। বুঝতেই পারছেন, খুন হলে খুনি এসবের মায়া ত্যাগ করত না। আপনার খুনের মামলা ফেঁসে গেল। কী বলবেন মশাই?'

দিলীপ বললেন, 'ওই ভেবে আপনি যদি খুশি হতে চান, খুশি হোন! কিন্তু আমার মত একটুও বদলায়নি। এইবারে কি ঘটনাস্থলটা দেখা উচিত নয়?'

'চলুন।'

'হ্যাঁ, আর-এক কথা। মালগাড়ির ইঞ্জিনটা কি ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। সামনের আর পিছনের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে।'

দিলীপ বললেন, 'দেখা যাক, রেল-লাইনেও রক্তের দাগ পাওয়া যায় কি না।'

স্টেশনমাস্টার বিস্মিত হয়ে কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইন্সপেক্টর তাঁকে আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—আমাদেরও পাত্তাড়ি গুটোতে হল।

দিলীপ নিজেও একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলেন। তাঁর হাতে রইল লণ্ঠন, আমার হাতে তাঁর বাক্স। ইন্সপেক্টর আর স্টেশনমাস্টার যেতে লাগলেন আগে-আগে।

আমি চুপিচুপি বললুম, 'দিলীপ, আমি এখনও অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ! এ-ব্যাপারটাকে তুমি আত্মহত্যা না বলে হত্যা বলছ কেন?'

দিলীপ উত্তরে বললেন, 'প্রমাণ খুব ছোট, কিন্তু অকাট্য। মৃতের বাঁ-রগের উপরে মাথার চাঁদিতে একটা ক্ষত আছে, তুমি দেখেছ? ইঞ্জিনের আঘাতে ওরকম ক্ষত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়েছে—আর অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছে। ক্ষত থেকে নেমে এসেছে দুটো রক্তের ধারা। দুই ধারার রক্তই ডেলা বেঁধে আর আংশিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ছিন্নমুণ্ড। আর এই ক্ষতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই মুণ্ডচ্ছেদের আসে, কারণ যেদিক থেকে ইঞ্জিনটা আসছিল, ক্ষতটা সেইদিকে নেই। তারপর ভেবে দেখো, ছিন্নমুণ্ডের ভিতর থেকে এ-রকম রক্তপাত হয় না। অতএব মুণ্ডচ্ছেদের আগেই এই ক্ষতের সৃষ্টি।

'ক্ষত থেকে শুধু রক্ত পড়েনি, রক্তের ধারা হয়েছে দুটি। প্রথম ধারাটি মুখের পাশ দিয়ে বয়ে জামার কলারকেও রক্তাক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষত থেকে চলে গিয়েছে মাথার পিছন দিকে। শ্রীমন্ত, নিশ্চয়ই তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম মানো? রক্ত যদি চিবুকের দিকে নেমে গিয়ে থাকে—প্রথম ধারায় যা হয়েছে—তা হলে বলতে হবে, মণিলাল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর রক্ত যদি সম্মুখ থেকে মাথার পিছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে থাকে—দ্বিতীয় ধারায় যা হয়েছে—তা হলে বলতে হবে, মণিলাল তখন উপর দিকে মুখ তুলে চিৎ হয়ে শুয়েছিল।

'এখন ড্রাইভারের কথা মনে করো। সে দেখেছে, মণিলাল মাটির দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে লাইনের উপরে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে রক্তের একটা ধারা বাঁ-গাল বয়ে কলার পর্যন্ত এবং আর একটা ধারা মাথার নিচে থেকে উপরে উঠে পিছন দিকে নেমে আসতে পারে না। আসল ব্যাপার কী হয়েছে জানো? মণিলাল যখন সোজা হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল, তখন কেউ আঘাত করেছিল তার মাথার উপরে—আর রক্তের প্রথম ধারা নেমে এসেছিল তার গাল বয়ে। তারপর সে চিৎ হয়ে মাটির উপরে পড়ে যায়, আর রক্তের দ্বিতীয় ধারা চলে যায় তার মাথার পিছন দিকে।'

'দিলীপ, আমি ভারি বোকা লোক! এসব কিছু ভাবতে বা লক্ষ করতে পারিনি।'

'অভ্যাস না থাকলে কেউ তাড়াতাড়ি অনুমান বা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে না।... আচ্ছা শ্রীমন্ত, মৃতের মুখ দেখে তোমার কোনও কথা মনে হয়েছে?'

'হয়েছে। মনে হয়, ও যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার দরুণ মারা পড়েছে।'

'ঠিক বলেছ। ও মুখ হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ-হওয়া মানুষের। তুমি বোধহয় আরও লক্ষ করেছ, ওর জিভ ফোলা-ফোলা, আর ওর উপর-ঠোঁটের ভিতরে দাঁত বসে যাওয়ার দাগ—তার কারণ, মুখের উপরে পড়েছিল প্রবল চাপ। এখন এইসব তথ্য আর অনুমানের সঙ্গে মাথার ক্ষতের কথা মিলিয়ে

BanglaBook.org

দ্যাখো। খুব সম্ভব, মণিলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হত্যাকারীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করেছিল, তারপর হত্যাকারী তার মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলে।'

আমি চমৎকৃত হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলুম!

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, 'মৃতের দাঁতের ভিতর থেকে তুমি সাঁড়াশি দিয়ে কী বার করে নিয়েছিলে? অণুবীক্ষণে সেটা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।'

দিলীপ বললেন, 'ও, সেটা তুমি জানতে চাও? তার দ্বারা আমাদের অনুমান আরও বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে একগোছা বোনা কাপড়ের অংশ। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখে বুঝেছি আলাদা-আলাদা তন্তুর দ্বারা তা বোনা হয়েছে, প্রত্যেক তন্তুর রং ভিন্ন। তার বেশিরভাগই হচ্ছে রাঙা পশমী তন্তু। সেইসঙ্গে তার মধ্যে আছে কাপড়ের নীলরঙা তন্তু, আর কতকগুলো হচ্ছে হলদে পাটের। এটা হয়তো কোনও মেয়ের রঙিন কাপড়ের অংশ। তবে পাট আছে বলে সন্দেহ হয়, হয়তো এটা কোনও পর্দা বা কম-দামি অন্য কিছুর অংশ।'

'এ-থেকে কী বুঝতে হবে?'

যদি এটা পরনের কাপড়ের অংশ না হয়, তবে বুঝতে হবে এটা এসেছে কোনও আসবাব থেকে। আর আসবাব মানেই বোঝায় গৃহস্থালী!'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'এ-যুক্তি অকাট্য বলে মনে হচ্ছে না!'

'না। কিন্তু এর দ্বারা আমার একটা মত রীতিমতো সমর্থিত হচ্ছে।'

'কী!'

'মৃতের জুতোর তলা দেখে আমি যে-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো করে জুতোর তলা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তাতে বালি, কাঁকর, মাটি বা টুকরো ঘাসের কোনও চিহ্নই পাইনি। অথচ মৃতকে রেল-লাইনের উপরে আসবার জন্যে নিশ্চয়ই এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে—কারণ ঘটনাস্থলের আশপাশে না কি কোনও রাস্তা নেই। তার বদলে জুতোর তলায় পেয়েছি তামাকের ছাই আর একটা পোড়া দাগ—যেন সেই জুতো দিয়ে কোনও জ্বলন্ত চুরোট বা সিগারেট মাড়ানো হয়েছে। জুতোর তলায় একটা পেরেক একটু বেরিয়ে পড়েছিল, তার ডগায় লেগেছিল একটুখানি রঙিন তন্তু—তা কার্পেটের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটি মারা পড়েছিল কোনও কার্পেট-পাতা ঘরের ভিতরে। তার জুতোর তলায় সেই ঘরে ঢোকবার আগে যে-সব দাগ ছিল, কার্পেট বা পাপোশের সংঘর্ষে সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে সে আর পায়ে হেঁটে বেরোয়নি, কারণ মৃত্যুর পর কেউ পায়ে হাঁটতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ তার মৃতদেহ বহন করে রেল-লাইনের উপরে রেখে এসেছিল।'

আমি একেবারে নীরব হয়ে রইলুম। দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, তবু যতবারই তাঁর সঙ্গে যাই, ততবারই আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন-নতুন বিস্ময়। অতি তুচ্ছ সব তথ্য থেকে তিনি সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এমন একটি সত্যিকার ও অপূর্ব গল্প খাড়া করে তোলেন, যা শুনলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না; মনে হয়, দিলীপ যেন মায়াবী।

অবশেষে আমি বললুম, 'যদি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তা হলে তো বলতে হয় আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কোনও বাড়ির ভিতরে আসল ঘটনাস্থল হলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক সূত্র পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন থাকল খালি একটা। সেই বাড়িটা কোথায়?'

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে এখন শুধু ওই প্রশ্নই জাগছে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। সেই বাড়িটার ভিতরে একবার উঁকি মারতে পারলে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যায়! কিন্তু উঁকি মারি কেমন করে? আমরা খুনের তদন্ত করছি বলে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে পারব না। আপাতত আমাদের সমস্ত সূত্রই এক জায়গায় এসে হঠাৎ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিন্নসূত্রের অপর অংশ আছে কোনও অজানা বাড়ির মধ্যে, আর আমরা যদি দুই সূত্রকে একসঙ্গে বাঁধতে না পারি

তা হলে সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না। কারণ, আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মণিলাল বুলাভাইয়ের হত্যাকারী, কে?'

'তা হলে তুমি কী করতে চাও?'

'এর পরের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনও বিশেষ বাড়িকে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। ওই দিকেই দৃষ্টি রেখে এখন আমাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আর সেই সব নিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই বাড়িখানাকে যদি আবিষ্কার করতে না পারি, তা হলে এদিক দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বেছে নিতে হবে আবার কোনও নতুন পথ।'

আমাদের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। আমরা যথাস্থানে এসে পড়েছি। স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। ইন্সপেক্টর লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেল-লাইন পরীক্ষা করছেন।

তৃতীয়

ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করে স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এখানে রক্ত পাওয়া গেছে অত্যন্ত কম। এটা বড়ই আশ্চর্য! এরকম আরও অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাটির উপরে আর ইঞ্জিনের গায়ে দেখেছি প্রচুর রক্ত। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছি।'

দিলীপ রেল-লাইনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ওখানে রক্ত আছে কি নেই, এ-প্রশ্ন তাঁর কাছে যেন নিরর্থক।

তাঁর লণ্ঠনের আলো পড়ল গিয়ে লাইনের পাশের জমির উপরে। কাঁকর-ভরা জমি এবং কাঁকরের সঙ্গে মিশানো রয়েছে খড়ি বা খড়ির মতন সাদা কীসের চূর্ণ।

ইন্সপেক্টর তখন হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়েছেন। তাঁর পায়ের জুতোর তলা দেখা যাচ্ছিল। আলোটা ইন্সপেক্টরের জুতোর উপরে ফেলে দিলীপ চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'দেখছ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। ইন্সপেক্টরের জুতোর তলায় লেগে রয়েছে ছোট-ছোট কাঁকর ও সাদা-সাদা চূর্ণের চিহ্ন। দিলীপের অনুমানই ঠিক। মণিলাল পদব্রজে এখানে এলে তাঁরও জুতোর তলায় থাকত সাদা দাগ ও কাঁকর।

হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে একটি ফাঁস-দেওয়া ফিতের মতন কী কুড়িয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টরকে ডেকে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মৃতের টুপিটা এখনও খুঁজে পাননি?'

'না! টুপিটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও পড়ে আছে।' তারপর দিলীপের হাতের দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আপনি দেখছি একটা নতুন প্রমাণ হস্তগত করেছেন!'

দিলীপ বললেন, 'হতেও পারে। এটা হচ্ছে কোনও দু-রঙা ফিতার ছোট্ট টুকরো—মাঝখানটা সবুজ, দু-পাশে খুব সরু সাদা রেখা। হয়তো পরে এটা কাজে লাগবে। অন্তত এটিকে আমি ত্যাগ করব না।' তিনি পকেট থেকে একটি ছোট টিনের বাক্স বার করলেন—তার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল খানকয় একরত্তি খাম। একখানা খামের ভিতরে ফিতার টুকরোটি পুরে খামের উপরে পেন্সিল দিয়ে কী লিখলেন।

করুণাপূর্ণ হাসিমাখা মুখে ইন্সপেক্টর দিলীপের কার্যপদ্ধতি লক্ষ করলেন। তারপর আবার নিযুক্ত হলেন রেলপথ পরীক্ষায়। এবারে দিলীপও যোগদান করলেন তাঁর সঙ্গে।

ইন্সপেক্টর চশমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁচচূর্ণের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'বেচারা চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পেত না। তাই ভুলে বিপথে এসে পড়েছিল।'

দিলীপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হবে।'

একখণ্ড স্লিপারের (যে কাঠের বা তক্তার উপরে রেল-লাইন পাতা হয়) উপরে ও তার

BanglaBook.org

পার্শ্ববর্তী স্থানে কাচচূর্ণগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপ আবার বার করলেন তাঁর টিনের বাক্স এবং আবার বেরুলো একখানা খাম।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আর-একবার সাঁড়াশিটা চাই। তুমিও আর-একটা সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।'

'কী সাহায্য?'

'এই কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে হবে।'

দুজনে সাঁড়াশি দিয়ে কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলুম।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'এই কাচের গুঁড়ো যে মৃতের চশমা থেকে পড়েছে, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ আছে নাকি? লোকটি যে চশমা পরত, তার নাকের দাগ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।'

'ও-তথ্য যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে কোনও দোষ নেই।' তারপর দিলীপ নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, 'কাচের প্রত্যেকটি কণা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করো।'

দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে কাচের কণা খুঁজতে-খুঁজতে বললুম, 'এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ বললেন, 'পারছ না? বেশ, টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। এদের মধ্যে কতকগুলো, আকারে বড়, কতকগুলো কণা-কণা। তারপর পরিমাণটাও লক্ষ করো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-অবস্থায় চশমাখানা ভেঙেছে, তার সঙ্গে এই কাচের গুঁড়োগুলো ঠিক মিলছে না। এগুলো হচ্ছে পুরু নতোদর (concave) কাচ, ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে ভেঙেছে? কেবল যে পড়ে গিয়েই ভেঙেছে তা মনে হয় না। তা যদি ভাঙত তা হলে এখানে মাত্র খানকয়েক বড় বড় টুকরো কাচ পাওয়া যেত। এগুলো ভারী মালগাড়ির চাকার চাপেও ভাঙেনি। কারণ তাহলে কাচগুলো হয়ে যেত পাউডারের মতন আর সেই পাউডার আমরা লাইনের উপরেও দেখতে পেতুম। কিন্তু লাইনের উপরে তার কোনও চিহ্নই নেই। সেই চশমার ফ্রেমখানার কথাও ভেবে দ্যাখো। সে-ক্ষেত্রেও এমনি অসঙ্গতি। কেবল পড়ে গেলে ফ্রেমখানা এত বেশি মুচড়ে ভাঙত না, আবার তার উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা চলে গেলে ফ্রেমখানার অবস্থা যত-বেশি শোচনীয় হত তা-ও হয়নি।'

'তা হলে তুমি কী বলতে চাও দিলীপ?'

'মনে হয়, চশমাখানা মানুষের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয়, তা হলে বলতে হবে, দেহটাকে যখন এখানে বহন করে আনা হয়েছে, চশমাখানাকেও আনা হয়েছে, সেই সময়ে। আর ভাঙা অবস্থাতেই। সম্ভবত, হত্যাকারীর সঙ্গে যখন মণিলালের ধস্তাধস্তি চলছিল চশমাখানা পদদলিত হয়ছিল সেই সময়ই, তারপর মৃতদেহের সঙ্গেই হত্যাকারী চশমার চূর্ণাবশেষও এখানে নিয়ে এসেছে।'

আমি বোধকরি বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু কেন?'

'এটুকু তোমার বুঝে নেওয়া উচিত। এখন দ্যাখো। আমরা যদি এখানকার প্রত্যেক কাচ-কণা কুড়িয়ে নিয়েও দেখি পুরো চশমার কাচ পাওয়া গেল না, তা হলে বুঝতে হবে বাকি কাচচূর্ণ আছে আসল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কাচের কণার দ্বারা যদি দুখানা পরকলা সম্পূর্ণ হয় তা হলে মানতেই হবে যে, চশমাখানা ভেঙেছে এইখানেই।'

আমরা যখন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করছিলুম, ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার তখন এক-একটা লণ্ঠন নিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অদৃশ্য টুপিটাকে দৃশ্যমান করবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় আতসী-কাচের সাহায্য নিয়েও আর-একখানা কাচও পাওয়া গেল না। স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্সপেক্টর তখন লাইন ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন—অন্ধকারের মুমূর্ষুকে তাঁদের হাতে ঝোলানো লণ্ঠন দুটো দেখাচ্ছিল নৃত্যশীল আলেয়ার মতো।

দিলীপ বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসবার আগেই এখানকার কাজ শেষ করে ফেলতে

হবে। তারের বেড়ার কাছে চলো। ঘাসের ওপরে হাত-বাক্সটা রাখো, আপাতত ওটাই হবে আমাদের টেবিল।'

বাক্সের উপরে দিলীপ আগে একখানা কাগজ পাতলেন, পাছে বাতাসে সেখানা উড়ে যায়, সেই ভয়ে চারখানা পাথর কুড়িয়ে কাগজের চার কোণে চাপা দেওয়া হলো। তারপর খামের ভিতর থেকে কাচের কণা ও চূর্ণগুলোকে কাগজের উপরে ঢেলে দিলীপ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত ভাব। নিজের কার্ডকেসের ভিতর থেকে তিনি দুখানা ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত বড় কাচের টুকরোগুলোকে একে-একে বেছে নিয়ে দুখানা কার্ডের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

চটপটে কৌশলী হাতে দুখানা কার্ডের উপরে তিনি ডিম্বাকারে কাচের কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গড়ে তুললেন প্রায়-সম্পূর্ণ দুখানা পরকলা। দিলীপের মুখের ভাব দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। বেশ বোঝা গেল, এখনি একটা কোনও নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা!

কাগজের উপরে তখনও অনেকখানি কাচের কুচি পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, তার দ্বারা আর কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

দিলীপ হাত গুটিয়ে বসে মৃদুস্বরে হাস্য করলেন।

তারপর বললেন, 'এতটা আমি আশা করিনি।'

আমি বললুম, 'কী?'

'তুমি কি দেখেও বুঝতে পারছ না? বড় বেশি পরিমাণে কাচ রয়েছে! আমরা দুখানা পরকলা প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছি, তবু এতখানি কাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হল না।'

চেয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই! যে চূর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়নি, তার দ্বারা হয়তো আরও দু-তিনখানা পরকলা তৈরি করা যায়। বললুম, 'ভারি আশ্চর্য তো! এর মানে কী?'

দিলীপ বললেন, 'আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করি, কাচের কুচিগুলোই হয়তো সঠিক উত্তর দেবে!'

দিলীপ কাগজ ও কার্ড দুখানা তুলে সাবধানে জমির ওপরে রাখলেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে বার করলেন অণুবীক্ষণ। তারপর একখানা স্লাইডের উপরে বাড়তি কাচচূর্ণগুলোকে রেখে, লণ্ঠনের আলোতে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'হুঁ, রহস্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল। এখানে কাচ দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি আর খুব কম। অর্থাৎ এর ভিতরে চশমার কাচ আছে মাত্র দু-এক টুকরো। এই দু-এক টুকরো গ্রহণ করলেও আমাদের পরকলা দুখানা সম্পূর্ণ হবে না; কারণ বাকি কাচচূর্ণগুলো চশমার নয়—তা হচ্ছে কোনও ছাঁচে তৈরি জিনিসের। ওগুলো কোনও নলাকার অর্থাৎ চোঙার মতন জিনিস থেকে ভেঙে পড়েছে—খুব সম্ভব কোনও গেলাসের অংশ।'

স্লাইডখানা দু-একবার সরিয়ে আবার বললেন, 'আমাদের বরাত ভালো শ্রীমন্ত! যা খুঁজছি, পেয়েছি, এক-একটা টুকরোর উপরে কোনও নকশার অংশ ক্ষোদা রয়েছে। এই যে আর-একটা টুকরো—এই উপরে নকশার বেশ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে! এইবার ধরতে পেরেছি! তারার নকশা-আঁকা কোনও কাচের গেলাস ভেঙে এই কাচচূর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত, তুমিও একবার দেখে নাও।'

আমিও অণুবীক্ষণে দৃষ্টি সংলগ্ন করতে যাচ্ছি, এমনসময়ে এসে পড়লেন ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার। কাচের গুঁড়ো, বাক্স ও অণুবীক্ষণ নিয়ে আমাদের চুপ করে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ইন্সপেক্টর উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

তারপর বোধকরি অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমি হেসে ফেললুম বলে কিছু মনে করবেন না, মশাই! পুলিশের কাজে চুল পাকিয়ে ফেললুম কিনা, কাজেই এসব

BanglaBook.org

যেন কেমন-কেমন লাগে! অণুবীক্ষণ ভারি মজার জিনিস বটে, কিন্তু এরকম মামলায় আপনাদের একধাপও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—পারবে কি?'

দিলীপ বললেন, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ও-কথা যাক। টুপিটা কোথাও খুঁজে পেলেন?'

ইন্সপেক্টরের মুখ যেন চুন হয়ে গেল। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'খুঁজে পাইনি।'

'আচ্ছা, তা হলে একটু অপেক্ষা করুন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।'

দিলীপ দুখানা কার্ডের উপরে ফোঁটা-কয়েক Xyloibalsam ফেললেন—পরকলায় কাচের কুচিগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয়। তারপর সমস্ত জিনিস বাক্সের মধ্যে পুরে স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে সবচেয়ে কাছে আছে কোন গ্রাম?'

'আধ-মাইলের ভিতরে কোনও গ্রাম নেই।'

'রাস্তা?'

'একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বটে। এখান থেকে একটু দূরে একখানা মাত্র বাড়ি আছে, রাস্তাটা তার সামনে দিয়েই গিয়েছে।'

'কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি আছে?'

'না। আধ-মাইলের মধ্যে ওইখানাই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি।'

'আচ্ছা, তা হলে বোধহয় ওইদিকেই যাওয়া উচিত। সম্ভবত মণিলাল ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়েই এদিকে এসেছিল।'

ইন্সপেক্টরও এই মতে সায় দিলেন।

চতুর্থ

পোড়ো জমি। কোথাও আদুড় মাটি, কোথাও বুনো ঘাস, কোথাও কচুবন, কোথাও বিছুটির জঙ্গল। পথ বা রাস্তা নেই। ঝিঁঝি ডাকছে আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে মাথার উপরে। চারিদিকে অন্ধকার—কেবল আমাদের সুমুখ ও আশপাশ থেকে অন্ধকার সরে-সরে যাচ্ছে—যেন আলো দেখে ভয় পেয়ে।

যেখানে ঝোপ পান, ইন্সপেক্টর তার ভিতরেই পা ছোড়েন, পদাঘাত করেন—যদি তার ভিতরে হারানো টুপিটা আত্মগোপন করে থাকে!

খানিকক্ষণ পরে আমরা একখানা বাড়ির পিছনদিকে এসে দাঁড়ালুম। চারিধারে তার নিচু দেওয়াল-ঘেরা বাগান।

বাগানের পিছনকার দেওয়ালের তলায় ছিল আর একটা বিছুটির জঙ্গল; ইন্সপেক্টর তারও এখানে-ওখানে পা ছুড়তে লাগলেন।

আচমকা আর্তনাদ শুনলুম—'ওরে বাপ রে, গেছি রে, উ-হু-হু!'

'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'

ইন্সপেক্টর একখানা পায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে কাতরস্বরে বললেন, 'কোন হারামজাদা, কোন রাস্কেল, কোন গাধা বিছুটির জঙ্গলে এটা ফেলে রেখেছে?'

দিলীপ হেঁট হয়ে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা লোহার গরাদ।... এর গায়ে মর্চে-টর্চে কিছুই নেই। তার মানে বিছুটির গাদায় এ বেশিক্ষণ থাকেনি।'

ইন্সপেক্টর গর্জন করে বললেন, 'বেশিক্ষণ কি অল্পক্ষণ আমি জানতে চাই না মশাই, কিন্তু আমার ঠ্যাং আর একটু হলেই খোঁড়া হয়ে যেত। ওই ডান্ডাটা যে ফেলেছে, তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাই!'

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টরের দুর্ভাগ্যে কোনওরকম সহানুভূতি প্রকাশ না করে দিলীপ একমনে ডান্ডাটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেবল সেই পরীক্ষাতেই তাঁর মন বোধকরি তুষ্ট হল না, কারণ তারপর তিনি আবার আতসী-কাচ বার করে ডান্ডাটাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাই দেখে ইন্সপেক্টর এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন যে, সে-দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশনমাস্টারও করলেন তাঁর অনুসরণ—ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, তিনি আমাদের অদ্ভুত জীব বলেই মনে করছেন। অল্পক্ষণ পরেই শুনলুম, বাড়ির সদরের কড়া ঘন-ঘন নড়ছে—সঙ্গে-সঙ্গে ইন্সপেক্টরের হাঁক-ডাক!

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, এককৌটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড দাও। এই ডান্ডার ওপরেও দেখছি গাছকয় তন্তু লেগে আছে।'

আমি কথামত স্লাইড, Cover-glass, সাঁড়াশি ও শলাকা এগিয়ে দিলুম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রাখলুম বাগানের নিচু দেওয়ালের উপরে।

অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিলীপ বললেন, 'ইন্সপেক্টরের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঝোপের উপরে তাঁর পা ছোড়াটা আমাদের পক্ষে হয়েছে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। একবার অণুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে বলো দেখি, কী দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে-দেখতে বললুম, 'রাঙা পশমী তন্তু, নীল কার্পাসসুতোর তন্তু আর কতকগুলো হলদে উদ্ভিজ্জ—বোধহয় পাটের তন্তু।'

দিলীপ প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। মনে আছে তো, মণিলালের দাঁতের ভিতরেও ঠিক এই তিনরকম তন্তু পাওয়া গিয়েছে? তা হলে বোঝা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই তন্তু এসেছে এক জায়গা থেকে। ব্যাপারটাও অনুমান করতে পারছি। যে কাপড় চাপা দিয়ে হতভাগ্য মণিলালের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, এই ডান্ডাটা মোছা হয়েছে বোধহয় সেই কাপড় দিয়েই। আচ্ছা, ডান্ডাটা আপাতত পাঁচিলের ওপরই তোলা থাক—যথাসময়ে এটা কাজে লাগবে। অতঃপর ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক, আমাদের ঢুকতে হবে এই বাড়ির ভিতরে। যে-ইঙ্গিত পেলুম, তাই যথেষ্ট। এসো।'

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

ইন্সপেক্টর বললেন, বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই, সদরে কুলুপ দেওয়া। এত ডাকলুম, এত কড়া নাড়লুম—কেউ সাড়া দিল না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী স্বর্গলাভ হবে, তা জানি না। টুপিটা নিশ্চয়ই রেল-লাইনের কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, কাল সকালের আলোয় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

দিলীপ কোনও কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আরও দু-চারবার কড়া নাড়লেন।

ইন্সপেক্টর বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি বলছি বাড়ির ভিতরে কেউ নেই, তবু আপনার বিশ্বাস হল না?' বলেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্টেশনমাস্টারের হাত ধরে চলে গেলেন।

দিলীপ হাসিমুখে লণ্ঠন তুলে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে-করতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

'শ্রীমন্ত, এটি হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ জিনিস।' এই বলে দিলীপ আমার সামনে যা তুলে ধরলেন, তা হচ্ছে একটা আধপোড়া সিগারেট।

'শিক্ষাপ্রদ জিনিস? এর দ্বারা তুমি কী জ্ঞানলাভ করবে?'

'অনেক। চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে হাতে-পাকানো সিগারেট। বাজারে হাতে-পাকানো সিগারেটের জন্যে যে জিগ-জ্যাগ কাগজ পাওয়া যায়, তাই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। মণিলালেরও পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে। এইবার দেখা যাক, সিগারেটের তামাক কোন শ্রেণীর।'

BanglaBook.org

দিলীপ একটি আলপিন দিয়ে সিগারেটের একপ্রান্ত থেকে খানিকটা তামাক বার করে নিয়ে দেখে বললেন, 'স্টেট-এক্সপ্রেস টোবাকো! চমৎকার! মণিলালের রবারের থলির ভিতরেও ঠিক এই তামাক পাওয়া গিয়েছে! কে বলতে পারে, মণিলালই এই সিগারেটটা নিজের হাতে পাকায়নি!... আরে, মাটিতে ওটা আবার কী পড়ে রয়েছে?' হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা দেশলাইয়ের কাঠি। শ্রীমন্ত, মণিলালের পকেট থেকে কোন মার্কার দেশলাই বেরিয়েছিল লক্ষ করেছিলে কি?'

'না।'

'Wimco-র Club Quality দেশলাই, উপরে ঘোড়ার মুখের ছবি। সে-দেশলাই কিঞ্চিৎ অসাধারণ, কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বিকোয় না, সাহেবরা খুব ব্যবহার করে। বাংলার পল্লীগ্রামেও সে-দেশলাই কেউ দেখেনি। তার কাঠিগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মোটা, Wimco-র অন্য কোনও মার্কার দেশলাইতেই অত মোটা কাঠি থাকে না। আমার হাতের কাঠিটিও তাই। এটাও যে মণিলালের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়েছে, পরে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ....শ্রীমন্ত, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে যে, মণিলালকে খুন করা হয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।'

আমরা আবার বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে হাজির হলুম।

সেখানে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর অসন্তুষ্টস্বরে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'চলুন, এইবারে ফিরে যাই। মিছে কাদা ঘেঁটে মরবার জন্যে কেনই-বা এখানে এলুম —আরে, আরে, ও কী! না, মশাই খবরদার!'

দিলীপ তখন লাফিয়ে উঠেছেন বাগানের নিচু পাঁচিলের উপরে। ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি ওপাশে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'বিনা হুকুমে পরের বাড়িতে আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।'

দেওয়ালের উপরে মুখ তুলে দিলীপ বললেন, 'শুনুন মশাই, শুনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মণিলাল বুলাভাই মৃত্যুর ঠিক আগেই এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন—আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো তাঁকে এই বাড়ির ভিতরেই খুন করা হয়েছে। সময় হচ্ছে মূল্যবান, দেরি করলে সমস্ত সূত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপাতত না দেখে-শুনে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে চাই না। এখানে দেখছি একটা আঁস্তাকুড় রয়েছে। আমি আগে ওই আঁস্তাকুড়টা পরীক্ষা করতে চাই।'

পঞ্চম

ইন্সপেক্টর চমকে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, 'আঁস্তাকুড়! আপনি আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে চান? বলেন কী মশাই? আপনার মতন আশ্চর্য লোক আমি জীবনে দেখিনি! ভালো, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে আপনার কী লাভ হবে শুনি?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই আঁস্তাকুড়ের ভিতরে আমি একটা তারার মতন-কাটা ভাঙা কাচের গেলাসের টুকরো পাব। আঁস্তাকুড়ে বা এই বাড়ির ভিতরে ওই গেলাসের টুকরো পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।'

ইন্সপেক্টর হতভম্বের মতন বললেন, 'ভাঙা গেলাসের টুকরোর সঙ্গে এ-মামলার কী সম্পর্ক, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে কি স্টেশনমাস্টারমশাই?'

স্টেশনমাস্টার বোকার মতন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু!'

'বেশ, দেখা যাক দিলীপবাবুর অবাক-কাণ্ড-কারখানা!' ইন্সপেক্টরও পাঁচিল ডিঙোলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সামনেই রয়েছে একটা আঁস্তাকুড়ের মতন জায়গা—তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব নোংরা জঞ্জাল।

BanglaBook.org

দিলীপ বাঁ-হাতে লণ্ঠন নিয়ে ডানহাতে একটা কাঠি দিয়ে মিনিটখানেক জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করে কতকগুলো ছোট-বড় কাচের টুকরো টেনে বার করে আনলেন।

তারপর ফিরে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন।'

স্পষ্ট দেখা গেল, দুই-তিনটে বড় টুকরোর উপরে রয়েছে নকশা-কাটা তারকা।

ইন্সপেক্টর প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর বললেন, 'কী করে যে আপনি জানলেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এরপর আপনি যে আরও কী ভেলকি দেখাতে চান, তাও বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ জবাব দিলেন না। নিজের মনেই আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে লাগলেন। সাঁড়াশি দিয়ে দুই-তিনটে কাচের কুচি তুলে, ভালো করে দেখে আবার ফেলে দিলেন। একটু পরে খুঁজে-খুঁজে আরও দুই-তিনটে কুচি বার করলেন, তারপর সেগুলো আতসী-কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, 'যা খুঁজছিলুম এতক্ষণ পরে তা পেয়েছি! শ্রীমন্ত, সেই কাচের কুচি বসানো কার্ড দুখানা বার করো তো!'

আমি সেই প্রায়-সম্পূর্ণ পরকলা বসানো কার্ড দুখানা বার করে দিলুম। তারপর তার দু-দিকে রেখে দিলুম দুটো লণ্ঠনও।

দিলীপ কিছুক্ষণ সেইদিকে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে-পাওয়া কাচের কুচি-কয়টা আর একবার পরীক্ষা করতে-করতে ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি স্বচক্ষে দেখলেন তো, এই কাচের কুচি আমি এইখান থেকে পেয়েছি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর কার্ডে বসানো পরকলার কাচ আমি কোথা থেকে পেয়েছি তাও জানেন তো?'

'হ্যাঁ মশাই। ওগুলো হচ্ছে মণিলালের চশমার কাচ। ওগুলো আপনি রেলপথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।'

'বেশ! এইবারে ভালো করে দেখুন।'

ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার আরও সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, সাগ্রহে।

কার্ডের একখানা পরকলার দুই জায়গায় ও আর-একখানা পরকলার এক জায়গায় ফাঁক ছিল।

দিলীপ হাতের তিনটে কাচের কুচি দুখানা পরকলার ফাঁকে-ফাঁকে বসিয়ে দিলেন—সঙ্গে-সঙ্গে কার্ডের চশমার কাচ দুখানা হয়ে উঠল একেবারে সম্পূর্ণ।

ইন্সপেক্টর রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'হে ভগবান, এ কী ব্যাপার? ওই কাচের কুচি যে এখানে পাওয়া যাবে, কেমন করে জানলেন?'

'সে-কথা পরে সব শুনবেন। আপাতত, আমি বাড়ির ভিতরে যেতে চাই। ওখানে গিয়ে আশাকরি আমি একটা পোড়া সিগারেট বা সিগারেটের খানিকটা দেখতে পাব। আরও কী-কী পেতে পারি জানেন? ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট, হয়তো Wimco-র ঘোড়ামুখওয়ালা Club Quality দেশলাইয়ের কাঠি এমনকী হয়তো মণিলালের হারানো টুপিটাও। এখনও বাড়িতে ঢুকতে আপনার আপত্তি আছে? মনে রাখবেন, আজ বাদে কাল এলে হয়তো আমরা জিনিসগুলোর কোনওটাই আর দেখতে পাব না।'

ইন্সপেক্টর পুলিশের সমস্ত আইন-কানুন বিলকুল ভুলে গেলেন। বিপুল আগ্রহে বাড়ির পিছনকার দরজার উপরে ধাক্কা মেরে বললেন, 'ভিতর থেকে বন্ধ। ঢুকতে গেলে ভাঙতে হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়।'

'তবে সদরের দিকে চলুন।'

'কিন্তু সেখানকার দরজায় তো কুলুপ লাগানো।'

BanglaBook.org

'আসুন না।'

সবাই আবার পাঁচিল টপকে সদরের দিকে এলুম। দিলীপ আমাদের দিকে পিছন ফিরে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নিলেন।

পর-মুহূর্তে দিলীপের হাতের ঠেলায় দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল। ইন্সপেক্টর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'অ্যাঁ!'

'ভিতরে আসুন।'

'দিলীপবাবু, আপনি যদি চোর হতেন—।'

'তা হলে আপনাদের চাকরি হয়তো থাকত না। এখন ভিতরে আসুন।'

দিলীপের পিছনে-পিছনে আমরা সবাই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ঢুকেই ডানদিকে একটি ঘর—বৈঠকখানা। একটা ঝোলানো ল্যাম্প জ্বলছে। নিচে কার্পেট পাতা। সোফা, কৌচ ও টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘরখানা সাজানো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

এক কোণে একটা তেপায়ার উপরে রয়েছে একটি বিস্কুটের বাক্স। তার উপরে বড়-বড় ছাপানো হরফে বিস্কুটের নাম—'ক্রিম-ক্র্যাকার'।

দিলীপ আঙুল দিয়ে সেইদিকে ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইন্সপেক্টর একেবারে থ। বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, 'অবাক কাণ্ড বাবা!'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এ-বাড়িতে যে ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাবে, এ-কথা কে আপনাকে বলল?'

'কেউ বলেনি।'

'তবে কী করে জানলেন?'

'খুব সহজে। শুনলে আপনি হতাশ হবেন।' বলেই দিলীপ এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘর ছেড়ে একটা দালানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে দুটো কী কুড়িয়ে নিলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কী পেলেন?'

'যা পাবার আশা করেছিলুম। একটা পায়ে থ্যাঁতলানো পোড়া সিগারেটের অংশ, আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'না মশাই, এইবারে আমি হার মানলুম। এমন ব্যাপার কস্মিনকালেও দেখিনি।'

দিলীপ বললেন, 'মণিলালের স্টেট-এক্সপ্রেস তামাকের থলি, জিগ-জ্যাগ সিগারেটের কাগজ আর কিঞ্চিৎ অসাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স আপনার কাছেই আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে তাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া এই জিনিসগুলি মিলিয়ে দেখুন।'

ইন্সপেক্টর কথামতো কাজ করে সচিৎকারে বলে উঠলেন, 'একই তামাক, একই কাগজ, একই দেশলাইয়ের কাঠি। দিলীপবাবু, আপনি কি জাদুকর? বাকি রইল খালি টুপিটা। সেটাও কি এখানে আছে?'

'জানি না। অন্তত, এ-ঘরে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখনও আমি হতাশ হইনি। আসুন, খুঁজে দেখি।'

ঘর থেকে গেলুম দালানে। সেখানেও টুপির চিহ্ন নেই।

পাশেই আর-একটি ঘর। দিলীপ উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'রান্নাঘর। একবার ঢুকেই দেখা যাক না।'

রান্নাঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে উনুনের কাছে গিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'উনুনের ভিতরটা দেখুন। ওগুলো কী?'

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর স্বহস্তে উনুনটা পরীক্ষা করতে-করতে বললেন, 'উনুনটা এখনও তপ্ত। একটু আগেও এর মধ্যে আগুন ছিল। কয়লার সঙ্গে এখানে কাঠও পোড়ানো হয়েছিল দেখছি। কিন্তু এগুলো কী? এই ডেলা-পাকানো কালো জিনিসগুলো কাঠও নয়, কয়লাও নয়। খুনি টুপিটা উনুনে পুড়িয়ে ফেলেনি তো? কে জানে? পুড়িয়ে ফেলে থাকলে আর উপায় নেই! আপনি কাচচূর্ণ দিয়ে পরকলা খাড়া করেছেন বটে, কিন্তু খানিকটা অঙ্গার থেকে একটা আস্ত টুপি তো আর গড়তে পারবেন না? অসম্ভব আর কেমন করে সম্ভব হবে বলুন!' তিনি একমুঠো কালো স্পঞ্জের মতন অঙ্গার তুলে দিলীপের সামনে ধরে দেখালেন। তারপর আবার বললেন, 'পারেন এ-থেকে একটা গোটা টুপি সৃষ্টি করতে?'

দিলীপ বললেন, 'আবার একটা টুপি সৃষ্টি করতে পারব না, সে-কথা বলাই বাহুল্য! তবে এটা কীসের অবশিষ্টাংশ, তা বলতে পারি! হয়তো ওর সঙ্গে টুপির কোনওই সম্পর্ক নেই। আসুন বৈঠকখানায়।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তিনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অঙ্গারের তলায় ধরলেন। অমনি সেটা বেজায় পট-পট শব্দ করে গলে যেতে লাগল এবং তা থেকে খুব ঘন ধোঁয়া উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে পাওয়া গেল একটা উগ্র গন্ধ।

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'গন্ধটা বার্নিসের মতো।'

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ। গালার গন্ধ। আমাদের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর পরের পরীক্ষায় কিছু সময়ের দরকার।'

তিনি হাত-বাক্সের ভিতর থেকে Marsh-এর আর্সেনিক-পরীক্ষার উপযোগী একটি ছোট ফ্লাস্ক একটি Safety Funnel, একটি Escape Tube, একটি দু-পাট তেপায়া, একটি স্পিরিট-ল্যাম্প ও একটি অ্যাসবেসটসের চাক্তি বার করলেন। ফ্লাস্কের মধ্যে সেই অঙ্গারীভূত জিনিসের খানিকটা ফেলে তা পরিপূর্ণ করলেন, অ্যালকোহলের দ্বারা। তারপর তেপায়ার উপরে অ্যাসবেসটসের চাক্তিখানা রেখে তার তলায় স্পিরিট-ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলেন।

দিলীপ বললেন, 'অ্যালকোহল গরম হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আর একটি সন্দেহ মিটিয়ে ফেলতে পারি। শ্রীমন্ত, আবার একফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড এগিয়ে দাও।'

দিলুম। দিলীপ টেবিলের ধারেই বসেছিলেন। একটা ছোট সাঁড়াশি দিয়ে টেবিলের আচ্ছাদনী থেকে একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এই কাপড়ের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি।'

কাপড়ের টুকরো স্লাইডের উপরে রেখে তিনি অণুবীক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক। এর সঙ্গে আমাদের আগেই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছে—নীল পশমী তন্তু, নীল কার্পাস, হলদে পাট। আচ্ছা, এবারের নমুনাকে নম্বর মেরে আলাদা করে রাখা যাক, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।'

ইন্সপেক্টর চমৎকৃত হয়ে দিলীপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনও অন্ধ হয়ে আছি, কিছুই দেখতে বা ভালো করে বুঝতে পারছি না। মণিলাল কেমন করে মারা পড়েছেন, আপনি কি তা আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার অনুমান হচ্ছে, হত্যাকারী মণিলালকে যে-কোনও অছিলায় ভুলিয়ে বাড়ির ভিতরে আনে, তাকে জলখাবার খেতে দেয়। মণিলাল হয়তো, আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, সেইখানেই বসেছিল। হত্যাকারী সেই লোহার গরাদ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আঘাতেই মণিলালকে বধ করতে পারেনি। তার সঙ্গে হত্যাকারীর ধস্তাধস্তি হয়, তারপর মণিলালকে সে টেবল-ক্লথ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। ...ভালো কথা, আর-একটা মীমাংসা এখনও হয়নি। আপনি এই ফিতার খণ্ডটি চিনতে পারেন?'

'হ্যাঁ, ওটি আপনি ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

BanglaBook.org

'আর সেইজন্যে আপনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন। যাক, আমি দুঃখিত হইনি। এখন টেবিলের টানার ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন। ওই ফিতার কাঠিমটা তুলে নিন। তারপর আমার হাতের এই ফিতার ফাঁসের সঙ্গে ওই কাঠিমের ফিতা মিলিয়ে দেখুন!'

ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি কাঠিমটা তুলে নিলেন। দিলীপ ফিতার ফাঁসটা রেখে দিলেন টেবিলের উপরে।

দুই ফিতা মিলিয়ে দেখে ইন্সপেক্টর বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'দুটো ফিতেই এক! মাঝখানটা সবুজ—দু'পাশে সরু সাদা রেখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড় প্রমাণ! দিলীপবাবু, না-জেনে আপনাকে ঠাট্টা করেছি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

দিলীপ হাসতে-হাসতে বললেন, 'ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। ওই নিয়ে খুনি কোন কার্যসাধন করেছিল, আন্দাজ করতে পারেন? তাকে একা লাশটা সামলাতে আর বইতে হয়েছিল। তাই হাত খালি রাখবার জন্যে নিশ্চয়ই সে ছাতা আর ব্যাগটা ফিতা দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'আপনি যেভাবে বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনিও নিজে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন! কিন্তু টুপির কী ব্যবস্থা করলেন?'

দিলীপ একটি ছোট্ট নল ও একখানা কাচের স্লাইড তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা মোটামুটি পরীক্ষা বোধহয় করতে পারব।'

তিনি নলিকাটি ফ্লাস্কের অ্যালকোহলে চুবিয়ে স্লাইডের উপরে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল পড়ল। তারপর তার উপরে Cover-Glass বসিয়ে স্লাইডখানা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন।

যন্ত্রে চক্ষু রেখে নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'মশাই, ফেল্ট বা নেমদ কী দিয়ে তৈরি, জানেন?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'না।'

'উচ্চশ্রেণীর ফেল্ট তৈরি হয় খরগোশের চুলে। গালার লেপন দিয়ে চুলগুলো বসানো হয়। যে অঙ্গার আমরা পরীক্ষা করছি তার মধ্যে গালা আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে বেশ কয়েক গাছা খরগোশের চুলও দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অঙ্গারগুলো হচ্ছে কোনও ফেল্ট-হ্যাটের দগ্ধাবশেষ। খরগোশের চুলগুলো যখন রং করা নয়, তখন এ-কথাও বলতে পারি, টুপিটার রং ছিল ধূসর।'

ঠিক এইসময়ে পদশব্দ শুনে আমরা চমকে উঠে ফিরে দেখি, ঘরের ভিতরে হয়েছে একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'কে আপনারা? কী করছেন এখানে?'

ইন্সপেক্টর একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা পুলিশের লোক। তুমি কে?'

পুলিশের নাম শুনেও লোকটা একটুও দমল না। বললে, 'আমি অক্ষয়বাবুর বেয়ারা।'

'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

'অন্য গ্রামে গিয়েছিলুম।'

'কখন?'

'বেকাল থেকেই আমি বাইরে আছি।'

'তোমার মনিব?'

'আজ সন্ধের গাড়িতে তাঁর কলকাতায় যাবার কথা।'

'কলকাতায় কোথায়?'

'জানি না।'

'তিনি কী কাজ করেন?'

BanglaBook.org

'তাও ঠিক জানি না। তবে তিনি বোধহয় জহুরী।'

'কখন ফিরবেন?'

'বলতে পারি না। সময়ে-সময়ে তিনি তিন-চারদিন বাড়িতে ফেরেন না।'

'এ-বাড়িতে আজ কোনও নূতন লোক এসেছিল?'

'আমি বাড়িতে থাকতে কেউ আসেনি।'

'কলকাতায় তোমার মনিবের কোনও বাসা নেই?'

'জানি না। তবে শুনেছি তিনি কলকাতার বড়বাজারে কোথায় গিয়ে ওঠেন।'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে ইন্সপেক্টারকে নিয়ে দালানে গেলেন।

চুপিচুপি বললেন, 'এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করবেন না, আসামী একেবারে গা-ঢাকা দিতে পারে। তার কার্যকলাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বিষম চতুর ব্যক্তি। অক্ষয়ের বেয়ারাকে নজরবন্দি রাখুন। বাড়িটা পুলিশের হেপাজতে থাকুক। এখান থেকে এককণা ধুলোও যেন না সরানো হয়। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যে আমরা থানায় খবর দিয়ে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। নমস্কার।'

আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

যেতে-যেতে দিলীপ বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস অক্ষয় কালকেই ধরা পড়বে। সে যখন জহুরী, তখন তার বড়বাজারের ঠিকানা জানা অসম্ভব হবে না। অক্ষয়ের সম-ব্যবসায়ীদের কেউ-না-কেউ তার ঠিকানা বলতে পারবে। ...তারপর শ্রীমন্ত, কর্তব্য তো শেষ হল। অতঃপর?'

আমি বললুম, 'অতঃপর? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এইবার তুমি তোমার হাত-বাক্সের জয়গান আরম্ভ করবে!'

'তাই নাকি? অসীম তোমার বোঝবার শক্তি! যাক। আপাতত ভেবে দ্যাখো, এই মামলা হাতে নিয়ে আমরা কী-কী শিক্ষালাভ করলুম? ...প্রথমত, একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর ঘণ্টা কয়েক পরে এলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেও আমরা আর কোনও সূত্রই খুঁজে পেতুম না—সমস্তই উপে যেত কর্পূরের মতো। দ্বিতীয়ত, খুব তুচ্ছ সূত্রকেও অগ্রাহ্য করতে নেই, তাকে অবলম্বন করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত চাও, যদি, ভাঙা চশমার কথা বলতে পারি। তৃতীয়ত, পুলিশের অনুসন্ধান-কার্যে একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য অত্যন্ত দরকারি এবং চতুর্থত, আমার এই হাত-বাক্সটি হচ্ছে অমূল্য নিধি, একে ছেড়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'অতএব, জয় হাত-বাক্সের জয়!'

শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি সমাপ্ত

অবশিষ্ট

বড়বাজারের একটা ছোট অন্ধকার রাস্তা—চার-পাঁচ হাতের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিন জনস্রোত যেন উপচে পড়ে। প্রত্যহ কত হাজার লোক যে সেখানি দিয়ে আনাগোনা করে, কেউ তার হিসাব রাখেনি।

রাস্তা সরু হলে কী হয়, দু'পাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই পাঁচ-ছয়তলার কম নয়। যেন নিচে আলোকের অভাব দেখে মুক্ত আকাশ-বাতাসকে খোঁজবার জন্যে তারা উপরে—আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যেক বাড়ির তলায়-তলায় যেন পায়রার খোপের পর খোপ সাজানো হয়েছে। এইসব খোপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না।

BanglaBook.org

অথচ এমনি একখানা মস্ত বড় বাড়ির সব চেয়ে উপরতলার একটি ঘরে চৌকির উপরে যে বসে আছে, সে আমাদের অক্ষয় ছাড়া আর কেউ নয়।

শহরে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেন যে সে বাসা বেঁধেছে তা বলা কঠিন। হয়তো তার অসাধু—কিন্তু সুচতুর মন বুঝেছে, চৌর্য-ব্যবসায় কোনওদিনই নিরাপদ নয়; বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; পুলিশকে ঠকাবার জন্যে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নেয়, তারা হচ্ছে নির্বোধ, কারণ পুলিশের দৃষ্টি সর্বাগ্রে তাদেরই আবিষ্কার করতে পারে; কিন্তু জনতাসাগরে হারিয়ে গেলে সহজে কেউই তার পাত্তা পাবে না!

এইটেই তার বড়বাজারে বাসা নেওয়ার একমাত্র কারণ কি না জানি না; কিন্তু সেই অন্ধকার রাস্তার এই ছ'তলা বাড়ির উপরতলায় সত্য-সত্যই বাসা বেঁধেছিল আমাদের অক্ষয়। কলকাতায় এলে সে এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত।

অক্ষয় চৌকির উপরে বসে আছে। ঘরের অন্য সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছে অপরাহ্নের রৌদ্রপীত আলো এবং বড়বাজারের বিপুল মানব-মধুচক্রের অশ্রান্ত গুঞ্জন।

তার সামনে একখানা কাগজের উপরে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের নানা আকারের রত্ন! হীরা, পান্না, চুনি, মকরত, মুক্তা প্রভৃতি। তাদের উপরে এসে দিনের আলো পড়ছে যেন ঠিকরে-ঠিকরে!

অক্ষয় বসে-বসে ভাবছে ঃ 'একে-একে হিসাব করে দেখলুম, এগুলোর বাজারদর ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আশা করেছিলুম আরও বেশি লাভ হবে, কিন্তু মানুষের সব আশা সফল হয় না।

'তবু যা পেয়েছি তার জন্যে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারি। নিজের বাড়িতে বসে মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ, এটা কল্পনার অতীত! যদিও মণিলালের উচিত ছিল, আরও বেশি দামের পাথর সঙ্গে করে আনা! এ তো সামান্য চুরি নয়, আমাকে দস্তুরমতন নরহত্যা করতে হয়েছে। নরহত্যায় আরও বেশি লাভ হওয়া উচিত। কারণ, নরহত্যায় নিজের জীবন বিপন্ন হয়।

'কিন্তু আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিকমতো মাথা খাটাতে পারলে নরহত্যার মতন সহজ ও নিরাপদ ব্যবসা আর নেই। খুনিরা ধরা পড়ে নিজেদের বোকামির জন্যেই। তেমন বোকামি করবার পাত্র আমি নই।

'পুলিশ কেমন করে আমাকে ধরবে? এমন কোনও সাক্ষী নেই যে বলতে পারে কাল সন্ধেবেলায় মণিলাল বুলাভাই এসেছিল আমার বাড়িতে। পুলিশ আমার বাড়িতে এলেও, আমাকে সন্দেহ করলেও এমন কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না, যার জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

'চারিদিকে দৃষ্টি রেখে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে আমি কাজ করেছি। সেই সর্বনেশে টুপিটা আর একটু হলেই আমার নজর এড়িয়ে যেত বটে, কিন্তু যায়নি! সেও এখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার আবার ভয় কী?

মণিলালের লাশ পাওয়া গিয়েছে—তা তো যাবেই। নির্বোধের মতন আমি তার লাশ লুকোবার চেষ্টা করিনি। রেলগাড়ির চাকার তলায় সে কাটা পড়েছে! মণিলালের সব জিনিসই—এমনকী ছাতা আর ব্যাগ থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত তার সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। অতি-লোভী মূর্খ চোরের মতন মণিলালের সোনার ঘড়ি, চেন, হীরার পিন আর নগদ দুশো চল্লিশ টাকাও আমি নেওয়ার চেষ্টা করিনি। পুলিশ নিশ্চয়ই স্থির করবে, মণিলাল মারা পড়েছে রেল-দুর্ঘটনায়। কিংবা সে আত্মহত্যা করেছে।

'আমি নিরাপদ। আমি সাধারণ খুনি নই।

BanglaBook.org

'কিন্তু স্টেশনে সেই ঢ্যাঙা লোকটা কে?

'সেই যার হাতে বসন্ত নামে লোকটা মামলা তদ্বিরের ভার দিল? লোকটা কি ডিকেটিভ? তার মুখ যতবারই মনে করি, ততবারই আমার বুক ধড়াস করে ওঠে কেন? সে আমার কী করতে পারে! যদিই সে এটাকে খুনের মামলা বলে ধরে নেয়, তা হলেই বা আমার ভয়টা কী? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? মণিলালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করবে কে?

'কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, আমার কোনও ভয় নেই! যা হওয়ার নয়, তাই যদি হয়, তা হলেই-বা আমাকে ধরবে কে? আমার কলকাতার ঠিকানা কেউ জানে না। তোড়জোড় করে তদন্ত শেষ করতেও পুলিশের বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। আর আমি কলকাতা থেকেও সরে পড়ছি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি তুলে নিয়েছি। দূর বিদেশে অদৃশ্য হব—এখন কিছুদিনের জন্যে। আমাকে ধরবে কে?

'সিঁড়ির ওপর অমন ভারি-ভারি পায়ের শব্দ কাদের? যেন অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে! উপরতলার ঘরগুলো তো খালি। নতুন ভাড়াটে আসছে না কি...?'

ঘরের দরজায় হল করাঘাত।

অক্ষয় সচমকে রত্নগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

'দরজা খুলুন।'

'কে আপনি?'

'দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি!'

কেমন যেন বেসুরো কণ্ঠস্বর! এখানে কোনও বাঙালিই তো তাকে ডাকতে আসে না!

অক্ষয় উঠল। একমুহূর্তে তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন—যেন সে নিয়তির আহ্বান শুনতে পেয়েছে!

'দরজা খোলো, দরজা খোলো।'

অক্ষয় দরজা খুলল না। দরজা থেকে তিন হাত তফাতে একটা জানলা ছিল। তারই একটা পাল্লা খুলে, বাইরে একবার উঁকি মেরেই দুম করে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।'

ইন্সপেক্টর! পাহারাওয়ালার দল!

অক্ষয় উদ্‌ভ্রান্তের মতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই।

দরজার উপরে দুমদাম পদাঘাত আরম্ভ হল। দরজা এখনি ভেঙে পড়বে।

দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষয় নিজের মনেই বললে, 'ধরা দেব? কখনও নয়, কখনও নয়।' তার মুখের ভাব হয়ে উঠল ঠিক সেইরকম—মণিলালকে খুন করবার জন্যে যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

দুম-দুম-দুম—দরজায় পদাঘাত!

ওদিকে রাস্তার ধারের বারান্দা—ওদিকেও বাইরে যাওয়ার জন্যেও একটা দরজা।

'না, না, পালাবার পথ আছে, ওই দরজা দিয়েই আমি পালাব—দরজা দিয়েই।'

দুম-দুম-দুম-দুম!

অক্ষয় উন্মত্তের মতন ছুটে গিয়ে ছ-তলা বারান্দার দরজা খুলে ফেলল।

দুম-দুম—হুড়মুড় করে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল!

এবং সঙ্গে-সঙ্গে অক্ষয় একলাফ মেরে বারান্দা ডিঙিয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয়ের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার আত্মা তখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

বেনীসংহার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প লেখানো আর চলছে না। একে তো তার ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনও চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি' 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই। পুস্তক প্রকাশকের কাজে যে-লেখকেরা মাথা গলিয়েছেন তাঁরা জানেন, একবার মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পেলে মা-সরস্বতীর দিকে আর নজর থাকে না। তা ছাড়া সম্প্রতি অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে; শিগগিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ি তৈরির তদারক করছে; গল্প লেখার সময় কোথায়?

দেখে শুনে অজিতকে নিষ্কৃতি দিলাম। এখন থেকে আমিই যা পারি লিখব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

সকালবেলা ব্যোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। শীতের সকাল, বেলা আন্দাজ আটটা। অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার, বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। পেয়ালার অবশিষ্ট চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে আবার কাগজ তুলে নিল। এবার খবর পড়তে হবে।

আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। ভূমিকম্প-জলোচ্ছ্বাস-অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি তো আছেই, তা ছাড়া মানুষগুলোও যেন খেপে গেছে। যুদ্ধ, বিপ্লব, অন্তর্বিবাদ, ধর্মঘট, ঘেরাও, বোমা, কাঁদানে গ্যাস, লাঠালাঠি। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই বোধহয় কারুর প্রাণে শান্তি নেই। যেখানে এত গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি সেখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

কাগজের পাতা ওল্টাতে হল না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পরশু রাত্রে খুন হয়েছে, কাল সকালে জানাজানি হয়, আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়; সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছুদূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে, তার কপালের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা—বেণীমাধব। ব্যোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে, কিন্তু বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কাগজ থেকে জানা গেল, বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে হত্যার বিবরণ পড়ল, তারপর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। পরশু রাত্রে পাড়াতে এমন একটা লোমহর্ষণ খুন হয়ে গেছে, অথচ সে খবর পায়নি! রাখাল এই এলাকার দারোগা, সে নিশ্চয় তদন্তের ভার নিয়েছে; কিন্তু ব্যোমকেশকে কিছু জানায়নি। হয়তো সোজাসুজি ব্যাপার, রহস্য বা জটিলতা কিছু নেই, তাই রাখাল আসেনি। আজকাল জটিল রহস্যও বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে—।

টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানের কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এল—'ব্যোমকেশদা? আমি রাখাল। আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'পড়েছি। বেণীসংহার?'

'কী বললেন—বেণীসংহার? ওঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেণীসংহারই বটে, তার সঙ্গে মেধরাজবধ। আমি অকুস্থল থেকে কথা বলছি।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার একটু প্যাঁচালো ঠেকছে। কাল সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছি। এখনও কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?'

'না।'

'তা হলে একবারটি এদিকে আসবেন? আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। বাড়ির নাম বেণীমাধব।'

'জানি।'

'কখন আসছেন?'

'অবিলম্বে।'

BanglaBook.org

দুই

বেণীমাধব চক্রবর্তী সরকারি সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্টরি কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার ওপর তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

বেণীমাধব সতর্কবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ঠিকেদারি করার ফলে মনুষ্য-জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্যে তাঁর হৃদয়ধর্ম সংকুচিত হয়নি। সংসারের এবং সেইসঙ্গে নিজের দোষত্রুটি তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

বেণীমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না। যৌবন উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন; পত্নী রেখে যান একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তারা বড় হলে বেণীমাধব তাদের বিয়ে দিলেন। ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধাড়ি; ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃস্কন্ধে আরোহণ করেছিল; বেণীমাধব আর তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতেন, বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্র-কন্যা মকরন্দ ও লাবণিকে নিয়ে। বেণীমাধব তার সংসারের খরচ দিতেন।

মেয়ের বিয়ে বেণীমাধব ভালোই দিয়েছিলেন; জামাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বড়মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল, সে রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বেণীমাধব মেয়ে-জামাই এবং দৌহিত্রী ঝিন্নীকে নিজের বাড়িতে তুললেন; ছেলেকে যেমন মাসোহারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্যেও তেমনি মাসোহারা বরাদ্দ হল।

বেণীমাধবের বাড়িটা তিনতলা, আগেই বলেছি। তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর, বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ। এই তেতলাটা বেণীমাধব নিজের জন্যে রেখেছিলেন, তিনি না থাকলে তেতলা তালাবন্ধ থাকত। দোতলায় আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা; এই তলায় বেণীমাধব তাঁর ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের হাঁড়ি-হেঁশেল অবশ্য আলাদা। দুই সংসারে মনের মিল ছিল না; কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারুর ছিল না। ছেলেমেয়ের প্রতি বেণীমাধবের স্নেহ ছিল; কিন্তু তিনি রাশভারি লোক ছিলেন, কড়া হতে জানতেন।

নিচের তলায় প্রকাণ্ড একটি হলঘর বিলিতি আসবাব দিয়ে ড্রয়িংরুমের মতো সাজানো; মাঝখানে নিচু গোল টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি-মোড়া ভারি চেয়ার, তা ছাড়া আরও কয়েকটি কেঠো চেয়ার দেওয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা। কিন্তু ঘরটি বড় একটা ব্যবহার হয় না, কদাচিৎ কেউ দেখা করতে এলে অতিথিকে বসানো হয়। বাকি পাঁচখানা ঘর আগন্তুক-অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকত।

কিন্তু বেশিদিন তালাবন্ধ রইল না। বেণীমাধবের দুই মামাতো ছোটবোন ছিল, বহুদিন মারা গেছে; তাদের দুই ছেলে সনৎ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার—পরস্পর মাসতুতো ভাই—কলকাতায় চাকরি করত; তাদের ভালোবাসা ছিল না, তাই বেণীমাধব তাদের নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নিচের দুটি ঘর নিয়ে তারা রইল।

দেখা যাচ্ছে, বেণীমাধবের ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী এবং দুই ভাগনে মিলে সাতজন পোষ্য। বাড়িতে চাকর নেই, দুটো দাসী দিনেরবেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধের সময় চলে যায়।

নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। শালা-ভগ্নীপতির বয়স প্রায় সমান, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ; কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা নেই, দুজনের আকৃতি-প্রকৃতি দু-রকম। অজয় সুশ্রী ও শৌখিন গোছের মানুষ, গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পালিশ-করা পাম্প-শু ছাড়া সে বাড়ির বার হয় না। রোজ সকালে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি, অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতিই বাজার করতে যায়। অজয় সন্ধের পর ক্লাবে যায়; শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ। অভিনয় ভালোই করে। ক্লাবটা শখের থিয়েটারেরই ক্লাব, প্রতি বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে।

BanglaBook.org

গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপালিক ধরনের; মুখে এবং দেহে মাংস কম, হাড় বেশি। চোখের দৃষ্টি খর। নিজের বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের স্কন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে। সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, সন্ধের পর লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন ফিরে আসে, তখন তার মুখ থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বের হয়।

ননদ-ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত সদ্ভাব ছিল, যাওয়া-আসা গল্পগুজবও চলত; কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাউকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না। গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল—'বউদি, আজ কী রান্নাবান্না করলে?'

আরতি রান্নার ফর্দ দিয়ে বলত—'তুমি কী রাঁধলে ভাই?'

গায়ত্রী বলল—'রান্না আর হল কই! ভাতের ফ্যান গেলে মাংস চড়াতে গিয়ে দেখি গরমমশলা নেই। জানো তো, তোমার নন্দাই শাক-ভাত খেতে পারেন না। ওঁর মাছ না হলেও চলে, কিন্তু রোজ মাংস চাই। তাই খোঁজ নিতে এলুম তোমার ভাঁড়ারে গরমমশলা আছে কি না। নইলে আবার ঝিকে বাজারে পাঠাতে হবে।'

আরতি বলল—'আছে বইকী, এই যে দিচ্ছি।'

গরমমশলা এনে দিয়ে আরতি হাসি-হাসি মুখে বলল—'নন্দাই মাংস ভালোবাসেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু ভাই, ও-জিনিসটা না খেলেই পারেন।'

গায়ত্রীর দৃষ্টি অমনি কড়া হয়ে উঠল—'কোন জিনিস?'

আরতি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল—'তোমার দাদা বলছিলেন, সেদিন সন্ধের পর নন্দাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তা নন্দাই-এর মুখ থেকে ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুল। নন্দাই-এর বোধহয় পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারেন না, কিন্তু কথাটা যদি বাবার কানে ওঠে—।'

গায়ত্রীর কঠিন দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, সে মুখে একটু বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল—'বাবার কানে যদি কথা ওঠে তা হলে তোমরাই তুলবে বউদি। কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? তোমরা মেয়ের জন্য নাচের মাস্টার রেখেছ তাতে দোষ নেই, কিন্তু লাবণি রাতদুপুর পর্যন্ত মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে, সেটা কি ভালো? লাবণি কচি খুকি নয়, যদি একটা কেলেঙ্কারি করে বসে তাতে কি বাবা খুশি হবেন?' গায়ত্রী আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি।

লাবণি মেয়েটি দেখতে ভালো; ছিপছিপে লম্বা গড়ন, নাচের উপযোগী চেহারা। একটু চপল প্রকৃতি, লেখাপড়া স্কুলের সীমানা পার হবার আগেই শেষ হয়েছে; নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ। অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্যে নাচের মাস্টার রেখেছিল। মাস্টারটি বয়সে তরুণ, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, নাম পরাগ লাহা; হপ্তায় দু-দিন লাবণিকে নাচ শেখাতে আসত। বাপ-মায়ের চোখের সামনে লাবণি নাচের মহলা দিত। কদাচিৎ পরাগ বলত—'একটা নাচ-গানের বিলিতি ছবি এসেছে, দুটো টিকিট কিনেছি রাত্রির শো-তে। লাবণিকে নিয়ে যাব? ছবিটা দেখলে ও অনেক শিখতে পারবে।'

গোড়ার দিকে আরতি রাজি হত না। পরাগ বলত—'থাক, আমি অন্য কোনও ছাত্রীকে নিয়ে যাব।'

ক্রমে আপত্তি শিথিল হয়ে আসে, লাবণি পরাগের সঙ্গে ছবি দেখতে যায়; দুপুর রাত্রে পরাগ লাবণিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

কালধর্মে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়।

লাবণির দাদা মকরন্দ কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়া নামমাত্র; কলেজে নাম লেখানো আছে

BanglaBook.org

এই পর্যন্ত। তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাদলি, দলগত প্রয়োজনে যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায়। তার চেহারা ভালো, কিন্তু মুখে-চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ। সে বাড়িতে বেশি থাকে না; বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর শোয়ার সম্পর্ক। মাঝে-মাঝে আরতির সংসার-খরচের টাকা অদৃশ্য হয়; আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। মকরন্দ তার থিয়েটার-বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে, অজয়ও ছেলের চালচলন পছন্দ করে না; দুজনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মকরন্দ যেন তার বাপ-মায়ের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি।

পাশের ফ্ল্যাটে সংসার ছোট; কেবল একটি মেয়ে ঝিন্নী। ঝিন্নী লাবণির সমবয়সী, লাবণির মতো সুন্দরী নয়, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো। চাপা প্রকৃতির মেয়ে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, অবসর পেলে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না।

এই গেল দোতলার মোটামুটি খবর।

নিচের তলার দুটি ঘরে সনৎ আর নিখিল থাকে। সনতের বয়স ত্রিশের ওপর, নিখিলের ত্রিশের নিচে। চেহারার দিক থেকে দুজনকেই সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সনৎ সংবৃতচিত্ত ও মিতবাক, বিবেচনা না করে কথা বলে না। নিখিলের মুখে খই ফোটে, সে চটুল ও রঙ্গপ্রিয়। দুজনেই সাংবাদিকের কাজ করে। সনৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার। নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতর নিউজ এডিটর-এর কাজ করে। সে নিশাচর প্রাণী। দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি। ঋষ্যশৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।

এরা কেউ বিয়ে করেনি। নিখিলের বিয়ে না করার কারণ, সে যা উপার্জন করে তাতে সংসার পাতা চলে না; কিন্তু সনতের সে রকম কোনও কারণ নেই। সে ভালো উপার্জন করে; মাতুলগৃহে তার বাস করার কারণ অর্থাভাব নয়, ভালো বাসার অভাব। তার বিবাহে অরুচির মূল অনুসন্ধান করতে হলে তার একটি গোপনীয় অ্যালবামের শরণ নিতে হয়। অ্যালবামে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে। ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সনৎ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক। সে যদি বিবাহের বদলে মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে, তা হলে তা সকলের অজান্তে।

এই সাতটি মানুষ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বেণীমাধব ন-মাসে ছ-মাসে আসেন, দু-দিন থেকে আবার দিল্লি চলে যান। দিল্লিই তাঁর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু।

হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। তাঁর শরীর বেশ ভালোই ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ভৃত্য এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রামভজনের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশিদিন খাড়া থাকতে পারলেন না। তিনমাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তাঁর টাকার দরকার ছিল না, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝোঁকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এখন দিল্লির অফিস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এল নতুন চাকর মেঘরাজ।

রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব মেঘরাজকে খাস-চাকর রেখেছিলেন। মেঘরাজ ভারতীয় সেনাদলের একজন সিপাহী ছিল; চীন-ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যায়। ভারতীয় সেনাবিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনশন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। সে বেণীমাধবের দিল্লির অফিসে দরোয়ানের কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিল; রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব তাকে খাস-চাকরের কাজ দিলেন। মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কড়া প্রকৃতির মানুষ; সে বেণীমাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের

BanglaBook.org

হাতে তুলে নিল; তাঁর দাড়ি কামানো থেকে জুতা বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ করে। তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ; বলিষ্ঠ চেহারা। কৃত্রিম পায়ের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

যাহোক, বেণীমাধব এসে কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন। তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল, কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছিল না। দু-চারদিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদার ধরেছিল—'বাবা, এবার আমি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখনই আসতে দাদার কাছে খেতে। আমরা কি কেউ নই?'

বেণীমাধব বলেছিলেন—'আমি তো একলা নই, মেঘরাজ আছে।'

'মেঘরাজ বুঝি নতুন চাকরের নাম? আহা, বুড়ো রামভজন মরে গেল! তা মেঘরাজকেও আমি খাওয়াব।'

বেণীমাধব বিবেচনা করে বললেন—'বেশ, কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে। আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরও দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

গায়ত্রী হেসে বলল—'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।' তার বোধহয় মনে-মনে এই মতলবই ছিল; সে মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পেত, এখন ন'শো টাকায় দাঁড়াল।

কলকাতায় এসেই বেণীমাধব তার পুরনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার অবিনাশ সেন নামকরা ডাক্তার, বয়সে বেণীমাধবের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তিনি একদিন বেণীমাধবকে নিজের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন; এক্স-রে, ই সি জি প্রভৃতি যান্ত্রিক পরীক্ষা হল। তারপর ডাক্তার সেন বললেন—'দেখুন, আপনার শরীরে সিরিয়াস কোনও ব্যাধি নেই, যা হয়েছে তা হল বার্ধক্যের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়। আমি আপনাকে ওষুধ-বিষুধ কিছু দেব না, কেবল শরীরের গ্রন্থিগুলোকে তাজা রাখবার জন্যে মাসে একটা করে ইনজেকশন দেব। আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করছিলেন। এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম; বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, রোজ বিকেলে একটু বেড়ান। এখনও অনেক দিন বাঁচবেন।'

বেণীমাধব ইনজেকশন নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর দিন কাটতে লাগল। গায়ত্রী নিজের হাতে থালা সাজিয়ে এনে বাপকে খাইয়ে যায়। অন্য সকলে আসা-যাওয়া করে। মকরন্দ বড় একটা আসে না, এলেও দু-মিনিট থেকে চলে যায়। নাতনীরা থাকে, বেণীমাধবের সঙ্গে গল্প করে। ঝিল্লী পড়াশুনায় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন; লাবণি নাচ শিখছে শুনেও তিনি অপ্রীত হন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও প্রাচীনপন্থী নন। সব মেয়েই যখন নাচছে, তখন তাঁর নাতনী নাচবে না কেন?

দিন কুড়ি-পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেণীমাধবের শরীর খারাপ হল; উদ্বাময়, পেটের যন্ত্রণা। ডাক্তার সেন এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—'খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে, খাওয়া সম্বন্ধে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হবে।'

বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। গায়ত্রী শুকনো মুখে বলল—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বাবাকে এমন কিছু খেতে দিইনি যাতে ওঁর শরীর খারাপ হতে পারে।'

ডাক্তার কোনও কথা বললেন না, ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পথ্যের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'কেমন থাকেন আমি টেলিফোন করে খবর নেব।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বেণীমাধব আরতির পানে চেয়ে বললেন—'বউমা, আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল।'

আরতি বিজয়োল্লাস চেপে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

তিন-চারদিনের মধ্যে বেণীমাধব সেরে উঠলেন, তাঁর পেট ধাতস্থ হল। পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন। আরতিই তাঁর জন্যে রান্না করে চলল।

BanglaBook.org

কিন্তু বেণীমাধবের মন শান্ত নয়। চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাজে দিন কাটিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। সকালে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেয়, তিনি স্নানাদি করে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তাতে ঘণ্টাখানেক কাটে। তারপর রেডিও চালিয়ে খানিকক্ষণ গান শোনেন। গান বেশিক্ষণ ভালো লাগে না, রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টান।

একদিন কলকাতার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাঁদের নাম বার করেন, টেলিফোন করে কাউকে পান না, কাউকে পান; কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হয়। এগারোটার পর আরতি ভাতের থালা নিয়ে আসে। আহারের পর তিনি ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রায় কাটান।

বিকেলবেলা ঝিন্নী কিংবা লাবণি আসে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন। লাবণিকে বলেন—'কেমন নাচতে শিখেছিস দেখা।'

লাবণি বলে—'আমি এখনও ভালো শিখিনি দাদু, ভালো শিখলে তোমাকে দেখাব।'

বেণীমাধব বলেন—'তোর মাস্টার ভালো শেখাতে পারে?'

লাবণি গদগদ হয়ে বলে—'খু-ব ভালো শেখাতে পারেন। এত ভালো যে—' লজ্জা পেয়ে সে অর্ধপথে থেমে যায়।

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'কত বয়স মাস্টারের?'

'তা কি জানি! হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। যাই, মা ডাকছে।' লাবণি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সূর্যাস্তের পর বেণীমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করেন। ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে লোকজনের মধ্যে খানিক বেড়িয়ে আসেন; কিন্তু তিনতলা সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই ছাদে বেড়িয়েই তাঁর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়।

রাত্রি ন'টার সময় আহার সমাপন করে তিনি শয়ন করেন। এই তাঁর দিনচর্যা। মেঘরাজ হামেহাল তাঁর কাছে হাজির থাকে; কখনও ঘরের মধ্যে, কখনও দোরের বাইরে। তিনি শয়ন করলে মেঘরাজ নিচে গিয়ে আহার সেরে আসে; বেণীমাধবের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে আগড় হয়ে বিছানা পেতে শোয়।

এইভাবে দিন কাটছে। একদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করে বেণীমাধবের মুখ গম্ভীর হল। টেলিফোন রেখে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'তুমি নিচে গিয়ে মকরন্দকে ডেকে আনো।'

কয়েক মিনিট পরে মকরন্দ এসে দাঁড়াল। চাকরের মুখে তলব পেয়ে সে খুশি হয়নি, অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন নিয়ে পিতামহের মুখের পানে চাইল। বেণীমাধব কিছুক্ষণ তার উসকোখুসকো চেহারার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিগ্যেস করলেন—'তুমি কলেজে ঢুকেছ, লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?'

মকরন্দর মুখ ভ্রূকুটি-গভীর হল—'হচ্ছে একরকম।'

বেণীমাধব বললেন—'শুনলাম, তুমি ক্লাসে যাও না, দল পাকিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াও, এ-কথা সত্যি?'

উদ্ধত স্বরে মকরন্দ বলল—'কে বলেছে?'

বেণীমাধব কড়া সুরে বললেন—'কে বলেছে সে-কথায় তোমার দরকার নেই। কথাটা সত্যি কি না?'

'হ্যাঁ সত্যি।' মকরন্দ চোখ লাল করে ঠাকুরদার পানে চেয়ে রইল।

'বটে!' বেণীমাধবের চোখেও রাগের ফুলকি ছিটকে পড়ল—'তুমি বেয়াদবি করতে শিখেছ! মেঘরাজ!'

মেঘরাজ দোরের বাইরে ছিল, ঘরে ঢুকল। বেণীমাধব আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই ছোঁড়ার কান ধরে গালে একটা থাবড়া মারো, তারপর ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

BanglaBook.org

মেঘরাজ সিপাহী ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে-খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা চাপা রইল না। অজয় আর আরতি ছুটে এসে বেণীমাধবের কাছে ক্ষমা চাইল। বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে রইলেন, শেষে বললেন—'বংশে একটা মাত্র ছেলে, সে বেল্লিক-বেয়াদব হয়ে উঠেছে। দোষ তোমাদের, তোমরা ছেলে-শাসন করতে জানো না।'

ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না।

তারপর একদিন বিকেলবেলা সনৎ এল মামার সঙ্গে দেখা করতে। সনৎ আর নিখিল মাঝে-মাঝে এসে মামার কাছে বসে, সসম্ভ্রমে মামার কুশল প্রশ্ন করে চলে যায়। আজ সনৎ তার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, বলল—'মামা, আপনার একটা ছবি তুলব।'

বেণীমাধব হেসে বললেন—'আমি বুড়োমানুষ, আমার ছবি তুলে কী হবে!'

সনৎ বলল—'আমার অ্যালবামে রাখব।'

'কিন্তু এখন আলো কমে গেছে, এ-আলোতে ছবি তোলা যাবে?'

'যাবে। আমি ফ্ল্যাশ বালব এনেছি।'

'বেশ, তোলো।' বেণীমাধব একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

সনৎ ছবি তোলার উপক্রম করছে এমনসময় নিখিল এসে দাঁড়াল। সনৎ এদিক-ওদিক ঘুরে শেষে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলল; বালবটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। নিখিল বলল—'সনৎদা, ছবি তৈরি হলে আমাকে একখানা দিও, আমি কাগজে ছাপব। মামা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছেন, খবরটা প্রকাশ করা দরকার।'

বেণীমাধব মনে-মনে ভাগনেদের ওপর খুশি হলেন।

পরদিন সনৎ ছবি এনে বেণীমাধবকে দেখাল। ছবিটি ভালো হয়েছে; বেণীমাধবের জরাক্রান্ত মুখ শিল্পীর নৈপুণ্যে শান্ত কোমল ভাব ধারণ করেছে। সনৎ যে কৌশলী শিল্পী, তাতে সন্দেহ নেই।

বেণীমাধব বললেন—'বেশ হয়েছে। এটাকে বাঁধিয়ে কোথাও টাঙিয়ে রাখলেই হবে।'

সনৎ বলল—'আমি এনলার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দেব। নিখিলকে এক কপি দিয়েছি, সে কাগজে ছাপবে।'

অতঃপর বেণীমাধবের কর্মহীন মন্থর দিনগুলি কাটছে। সনৎ বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে তাঁর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। এরকম অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। কিন্তু বেণীমাধবের মনে শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আসছে না। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সঙ্গে একটানা সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। পারিবারিক জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়ে যাঁরা দীর্ঘকাল একলা পথে চলেছেন তাঁদের বোধহয় এমনিই হয়।

ওদিকে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারেও সুখ নেই। গায়ত্রীর মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। গঙ্গাধর সারাদিন বসে একা-একা তাস খেলে, সলিটেয়ার খেলা; সন্ধের সময় চুপিচুপি বেরিয়ে যায়, আবার বেশি রাত্রি হওয়ার আগেই ফিরে আসে। অজয় ক্লাবে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাত কিংবা রিহার্সেল দিত; এটা ছিল তার জীবনের প্রধান বিলাস। এখন তাকে রাত্রি ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, কারণ কর্তার হুকুম—ন'টার পর সদর দরজা খোলা থাকবে না। ন'টার পর বাড়ি ফিরে দোর-ঠেলাঠেলি করলে তেতলায় শব্দ যাবে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেরই একটা চোখ এবং একটা কান তেতলার দিকে সতর্ক হয়ে থাকে। আরতি যদিও সর্বদাই শ্বশুরকে খুশি করবার চেষ্টা করছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

নিশ্চিন্ত আছে কেবল দোতলায় দুটি মেয়ে, লাবণি আর ঝিল্লী এবং নিচের তলায় সনৎ ও নিখিল। ঝিল্লী আর লাবণির বয়স মাত্র আঠারো, বিষয়বুদ্ধি এখানো পরিপক্ক হয়নি। সনৎ আর

নিখিলের বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম; মামা তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা মামার কাছে অর্থ-প্রত্যাশী নয়। সনতের গোপন নৈশাভিসারের কথা বেণীমাধব জানতে পারবেন এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। নিখিলের ওসব দোষ নেই, উপরন্তু কয়েক মাস থেকে সে এক নতুন ব্যাপারে মশগুল হয়ে আছে।

বেণীমাধব কলকাতায় এসে বসবার আগে একদিন নিখিল হঠাৎ ডাকে একটা চিঠি পেল, খামের চিঠি। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ নেই, সে একটু আশ্চর্য হয়ে চিঠি খুলল। একপাতা কাগজের ওপর দু-ছত্র লেখা আছে—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালোবাসি।

চিঠির নিচে লেখিকার নাম নেই।

নিখিল কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে গদগদ হাসি ফুটে উঠল। একটা মেয়ে তাকে ভালোবাসে! বা রে! ভারি মজা তো!

কিন্তু কে মেয়েটা?

নিখিল খামের ওপর পোস্ট অফিসের সীলমোহর পরীক্ষা করল; সীলমোহরের ছাপ জেবড়ে গেছে, তবু কলকাতায় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। কলকাতার মেয়ে। কে হতে পারে? চিঠিই বা লিখল কেন? ভালোবাসা জানাবার আরও তো অনেক সোজা উপায় আছে। মুখে বলতে লজ্জা হয়েছে, তাই চিঠি! কিন্তু নিজের নাম লেখেনি কেন?

নিখিল অনেক মেয়েকে চেনে। তার অফিসেই তো গোটা দশেক আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবের বোনেরা আছে। মেয়েরা তার চটুল রঙ্গপ্রিয় স্বভাবের জন্যে তার প্রতি অনুরক্ত, তাকে দেখলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কেউ তাকে চুপিচুপি ভালোবাসে বলেও তো মনে হয় না। আর এত লজ্জাবতীও কেউ নয়।

হাতে চিঠি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এইসব ভাবছে এমনসময় পিছন দিক থেকে লাবণির গলা শুনতে পেল—'কী নিখিল কাকা, কার চিঠি পড়ছ?'

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। ঝিল্লী আর লাবণি কখন দোতলা থেকে নেমে এসেছে; তাদের হাতে কয়েকখানা বই। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যায় বই বদল করতে।

নিখিল হাত উঁচুতে তুলে চিঠি নাড়তে-নাড়তে বলল—'কার চিঠি! একটি যুবতী আমাকে চিঠি লিখেছে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

লাবণি বলল—'যুবতী লিখেছে! কী লিখেছে!'

নিখিল বলল—'হুঁ-হুঁ, দারুণ ব্যাপার, গুরুতর ব্যাপার। লিখেছে সে আমাকে ভালোবাসে।'

লাবণি আর ঝিল্লী অবাক হয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, তারপর হেসে উঠল। লাবণি বলল—'কেন গুল মারছ নিখিল কাকা। তোমাকে আবার কোন যুবতী ভালোবাসবে?'

নিখিল চোখ পাকিয়ে বলল—'কেন, আমাকে কোনও যুবতী ভালোবাসতে পারে না! দেখেছিস আমার চেহারাখানা।'

'দেখেছি। এখন বলো, কার চিঠি।'

'বললাম না যুবতীর চিঠি!'

ঝিল্লী প্রশ্ন করল—'যুবতীর নাম কী?'

নিখিল মাথা চুলকে বলল—'নাম! জানি না। চিঠিতে নাম নেই।'

ঝিল্লী আর লাবণি আবার হেসে উঠল। লাবণি বলল—'তোমার একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় পাওনাদারের চিঠি।'

BanglaBook.org

'পাওনাদারের চিঠি। তবে এই দ্যাখ।' নিখিল চিঠিখানা তাদের নাকের সামনে ধরল।

দুজনে চিঠি পড়ল। লাবণি বলল—'হুঁ। কিন্তু চিঠি পড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমার মনে হয়, কেউ তোমার ঠ্যাং ধরে টেনেছে, মানে লেগ-পুলিং।'

নিখিল একটু গরম হয়ে বলল—'যা-যা, তোরা এসব কী বুঝবি! এসব গভীর ব্যাপার। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, শুনেছিস কখনও?'

'শুনেছি।' ঝিল্লী আর লাবণি মুখ টিপে হাসতে-হাসতে চলে গেল।

এরপর থেকে যখনই কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, নিখিল উৎসুক চোখে তার পানে তাকায় কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। তার মন আরও ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কে মেয়েটা? নিশ্চয় তার পরিচিত। তবে এমন লুকোচুরি খেলছে কেন?

মাসখানেক পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। এবার একটু বড়।

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না?

চিঠি পেয়ে নিখিলের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। লাবণি আর ঝিল্লী হাতের কাছে নেই, কিন্তু কাউকে না বলেও থাকা যায় না, তাই সে ঝোঁকের মাথায় সনতের ঘরে গেল।

সনতের ঘরটি বেশ বড়; এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চিত আছে। একপাশে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা; খাটের শিথানের কাঠের ওপর বিচিত্র জাফরির কারুকার্য। ঘরের অন্য পাশে জানলার সামনে দেরাজযুক্ত টেবিল, তার ওপর ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সাজানো; তিনটি হাতে-তোলা ক্যামেরা, তার মধ্যে একটি সিনে-ক্যামেরা। ঘরে একটি আয়নার কবাটযুক্ত আলমারিও আছে। ঘরটি ছিমছাম ফিটফাট, দেখে বোঝা যায়, সনৎ গোছালো এবং শৌখিন মানুষ।

নিখিল যখন ঘরে ঢুকল তখন সনৎ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করছিল, চোখ তুলে চেয়ে আবার কাজে মন দিল। নিখিল গম্ভীর মুখে বলল—'সনৎদা, গুরুতর ব্যাপার।'

সনৎ একবার চকিতে চোখ তুলল, বলল—'তোমার জীবনে গুরুতর ব্যাপার কী ঘটতে পারে! আমাশা হয়েছে?'

নিখিল বলল—'আমাশা নয়, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে।'

এবার সনৎ বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। শেষে বলল—'আমাশা নয়, দেখছি তোমার মাথার ব্যারাম হয়েছে। বাংলাদেশে এমন মেয়ে নেই যে তোমার প্রেমে পড়বে।'

নিখিল বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখো চিঠি। মাসখানেক আগে আর একটা পেয়েছি।'

চিঠি নিয়ে সনৎ একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল, প্রশ্ন করল—'মেয়েটাকে চেনো না?'

'না, সেই তো হয়েছে মুশকিল।'

সনৎ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'বুঝেছি। তোমার চেনা-শোনার মধ্যে কোনও কালো কুচ্ছিত মেয়ে আছে?'

নিখিল হেসে বলল—'বেশির ভাগই কালো-কুচ্ছিত সনৎদা।'

সনৎ বলল—'তা হলে ওই কালো-কুচ্ছিত মেয়েদের মধ্যেই একজন বেনামী চিঠি লিখে রহস্য সৃষ্টি করছে। তোমাকে তাতাবার চেষ্টা করছে। তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে ওদের এড়িয়ে চলবে।'

কিন্তু এড়িয়ে চলার ক্ষমতা নিখিলের নেই। তা ছাড়া কালো-কুচ্ছিত মেয়ের প্রতি তার বিরাগ

BanglaBook.org

নেই। তার বিশ্বাস কালো-কুচ্ছিত মেয়েরা ভালো বউ হয়। সে চতুর্গুণ আগ্রহে অনামা প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর বেণীমাধব এলেন, বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু নিখিলের কাছে নিয়মিত চিঠি আসতে লাগল। তৃতীয় চিঠিতে লেখা হয়েছে—

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু সুন্দর মেয়ে নই।

নিখিল ভাবল, সনৎদা ঠিক ধরেছে। কিন্তু সে দমল না। তার জীবনে এক অভাবিত রোমান্স এসেছে; একে তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

ওদিকে বেণীমাধব হপ্তা তিনেক পুত্রবধূর হাতের রান্না খেয়ে বেশ ভালোই রইলেন। তারপর একদা গভীর রাত্রে ওঁর ঘুম ভেঙে গেল; পেটে দারুণ যন্ত্রণা। যাতনায় ছটফট করতে-করতে মেঘরাজকে ডাকলেন। বেণীমাধব দু-হাতে পেট চেপে ধরে বসেছিলেন, বললেন—'মেঘরাজ, শিগগির ডাক্তার সেনকে ফোন করো, বলো, আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, এখনই যেন আসেন।'

মেঘরাজ ফোন করল, আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। পেটের প্রদাহ কিন্তু সহজে উপশম হল না; রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তির পর ব্যথা শান্ত হল। বেণীমাধব নির্জীব দেহে বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের পানে চাইলেন —'ডাক্তার, কেন এমন হল বলতে পারো?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চুপ মেরে রইলেন, তারপর অনিচ্ছাভরে বললেন—'নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। অ্যালারজি হতে পারে, শূল ব্যথা হতে পারে, কিংবা—'

'কিংবা—?'

'কিংবা বিষের ক্রিয়া। —আমি বলি কি, আপনি কিছুদিন আমার নার্সিংহোমে থাকবেন চলুন। চিকিৎসা-পথ্য দুই-ই হবে।'

বেণীমাধবের কিন্তু নার্সিংহোমে বিশ্বাস নেই; তাঁর ধারণা, যারা একবার নার্সিংহোমে ঢুকেছে তারা আর ফিরে আসে না। তিনি যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন—'না ডাক্তার, আমি বাড়িতেই থাকব।'

ডাক্তার উঠলেন—'আচ্ছা, এখন চলি। যদি আবার কোনও গণ্ডগোল হয় তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। কাল আর পরশু স্রেফ দই খেয়ে থাকবেন।'

মেঘরাজ ডাক্তারের সঙ্গে নিচে পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল, ডাক্তার চলে গেলেন। মেঘরাজ দরজা বন্ধ করে আবার ওপরে উঠে এল। বাড়ির অন্য মানুষগুলো তখনও ঘুমোচ্ছে, ডাক্তারের আসা-যাওয়া জানতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে বেণীমাধব তখন শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে চিন্তা করছিলেন। দুরূহ, দুর্গম চিন্তা। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি। একবার নয়, দু-দুবার এই ব্যাপার হল... ছেলে আর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে আমি কবে মরব... আমি মরছি না দেখে অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলে-মেয়ে-জামাই-পুত্রবধূ এমন কাজ করতে পারে? কেন করবে না, সংসারে টাকাই খাঁটি জিনিস, আর যা-কিছু সব ভুয়ো। ডাক্তারের মনেও সন্দেহ ঢুকেছে...।

সকাল সাতটার সময় বেণীমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিল। তারপর তিনি তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন—'যাও, বাজার থেকে দই কিনে নিয়ে এসো। এক সের ভালো দই।'

টাকা নিয়ে মেঘরাজ চলে গেল। সে সৈনিক, হুকুম তামিল করে, কথা বলে না। তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা যায় না।

সাড়ে সাতটার সময় আরতি এল, তার সঙ্গে ঝি ট্রে-র ওপর চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

ঘরে ঢুকেই আরতি চমকে উঠল; বেণীমাধব বিছানায় বসে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল—'বাবা—।'

বেণীমাধব ধীর স্বরে বললেন—'বউমা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ থেকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

আরতির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল—'কেন বাবা?'

বেণীমাধব গত রাত্রির ঘটনা বললেন। আরতি শুনে মুখ কালি করে চলে গেল।

কথাটা ঝিয়ের মুখে অচিরাৎ প্রচারিত হল। শুনে গায়ত্রী ছুটতে-ছুটতে বাপের কাছে এল —'বাবা, বউদির রান্না তোমার সহ্য হবে না আমি জানতুম। আজ থেকে আমি আবার রাঁধব।'

বেণীমাধব মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে কড়া সুরে বললেন—'না—।'

বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসে ডাকলেন—'মেঘরাজ!'

মেঘরাজ এসে দাঁড়াল—'জি।'

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'তোমার বউ আছে?'

মেঘরাজ ভ্রূ তুলে খানিক চেয়ে রইল, যেন প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে—'জি, আছে।'

'ছেলেপুলে?'

'জি, না।'

'স্ত্রী নিশ্চয় রসুই করতে জানে?'

'জি, জানে।'

'বেশ। এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো। নিচের তলায় খালি ঘর আছে, তার একটাতে তোমরা থাকবে। তোমার ঔরৎ আমার রসুই করবে। আমি তোমার মাইনে ডবল করে দিলাম। তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লি চলে যাও, বউকে নিয়ে যত শিগগির পার ফিরে আসবে; প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেব। কেমন?'

'জি।'

'বেশ; নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি যতদিন ফিরে না আসছ ততদিনের জন্যে আমার রসদ দরকার। এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে আরও সের দুই দই, কড়াপাকের সন্দেশ, গোটা দুই বড় পাঁউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙুর, আপেল—এইসব কিনে নিয়ে এসো, ফ্রিজে থাকবে। তুমি বাজারে যাও, আমি ইতিমধ্যে টেলিফোনে তোমার এয়ার-টিকিটের ব্যবস্থা করছি—।'

পরদিন মেঘরাজ চলে গেল। বেণীমাধব একলা রইলেন। দই এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক আহারের ফলে দু-তিনদিনের মধ্যেই তাঁর পেট সুস্থ হল। তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে কারুর যাওয়া-আসা নেই। দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

চতুর্থ দিনে মেঘরাজ ফিরে এল। সঙ্গে বউ।

বউ-এর পরনে রঙিন শাড়ি, মুখে ঘোমটা। মেঘরাজ বেণীমাধবের ঘরে গিয়ে বউ-এর মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল। বেণীমাধব দেখলেন, একটি মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ। রঙ ময়লা, কাজল-পরা চোখে যৌবনের মাদকতা। মেঘরাজের অনুপাতে বয়স অনেক কম, কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বউ দু-হাত দিয়ে বেণীমাধবের পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল।

বেণীমাধব প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বেশ-বেশ। কী নাম তোমার?'

বউ বলল—'মেদিনী।'

BanglaBook.org

অতঃপর বেণীমাধবের স্বাধীন সংসারযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। নিচের তলায় কোণের একটা ঘরে মেঘরাজ ও মেদিনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। তেতলায় একটা ঘর রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে, বাসন-কোসন এসেছে; সকালবেলা মেদিনী নিচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেণীমাধবের চা টোস্ট তৈরি করে দেয়। ইতিমধ্যে মেঘরাজ গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে। রান্না আরম্ভ হয়; তিনজনের রান্না। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মেদিনী নিচে নিজের ঘরে চলে যায়, মেঘরাজ ওপরে পাহারায় থাকে। বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব আরম্ভ হয়; রাত্রি আটটার সময় সকলের নৈশাহার শেষ হলে মেদিনী রাত্রির মতো নিচে চলে যায়; বেণীমাধব তুষ্ট মনে শয্যা আশ্রয় করেন, মেঘরাজ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে।

এই হল তাদের দিনচর্যা।

মেদিনীর দুপুরবেলা কোনও কাজ নেই, সেই অবসরে সে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট; বিশেষত পুরুষেরা। তার আচরণে শালীনতা আছে, সংকোচ নেই; তার কথায় সরসতা আছে, প্রগলভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে। গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতে মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে। কেবল মকরন্দ মেদিনীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন; মেদিনীর যখন অবসর মকরন্দ তখন বাড়িতে থাকে না।

বাড়িতে আস্তে-আস্তে সহজ ভাব ফিরে এল। বেণীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন। তবু তাঁর মনের ওপর যে-ধাক্কা লেগেছে, তার জের এখনও কাটেনি। গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে তিনি ভাবেন—আমার নিজের ছেলে, নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে! এ কী সম্ভব, না আমার অলীক সন্দেহ? অনেকক্ষণ জেগে থেকে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন, নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন, বাইরে মেঘরাজ দরজা আগলে ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান।

মেদিনী আসার পর আর-একটা সুবিধা হয়েছে। কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সবসময়েই বন্ধ থাকে, কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয়। আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দোর-ঠেলাঠেলি, হাঁকাহাকি করতে হত, এখন তা করতে হয় না। মেদিনীর ঘর সদর দরজার ঠিক পাশেই, রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলেই মেদিনী এসে দরজা খুলে দেয়।

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—হ্রদের প্রসন্ন উপরিভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য—।

নিখিল আবার অদৃশ্য নায়িকার চিঠি পেয়েছে—।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি হাসতে জানো, হাসাতে জান। আমাদের বাড়িতে কেউ হাসে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চিঠি পেয়ে নিখিল আহ্লাদে প্রায় দড়ি-ছেঁড়া হয়ে উঠল; চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে পাগলের মতো দাপাদাপি করল, তারপর সনতের ঘরে গেল। নিখিলের ঘরটা আকারে-প্রকারে সনতের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। তক্তপোশের ওপর বিছানাটা তাল পাকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ। দেখে বোঝা যায়—এ-ঘরে গৃহিণীর করস্পর্শের প্রয়োজন আছে।

সনৎ তখন ক্যামেরা নিয়ে বেরুচ্ছিল। নিখিল বলল—'এ কী সনৎদা, সজ্জিত-গুজ্জিত হয়ে চলেছ কোথায়?'

সনৎ বলল—'গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টি আছে। হাতে ওটা কী?'

BanglaBook.org

নিখিল চিঠি তুলে ধরে বলল—'আবার চিঠি পেয়েছি, পড়ে দ্যাখো। এ-মেয়ে কালো-কুচ্ছিত হোক, কানা-খোঁড়া হোক, একেই আমি বিয়ে করব।'

সনৎ চিঠি পড়ে বলল—'হুঁ, কানা-খোঁড়াই মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করতে চাও করো না, কে তোমাকে আটকাচ্ছে। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো!'

সনৎ নিজের ঘরে তালা বন্ধ করল। মেঘরাজের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল মেদিনী ঘরে রয়েছে। সনৎ একবার দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে। একটা পার্টিতে ফটো তুলতে যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি দোরে টোকা দিলে দোর খুলে দিয়ো।'

মেদিনী নিজের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। চোখ নিচু করে সে নম্রস্বরে বলল—'জি।'

সনৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল মেদিনীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'মেদিনী, তুম জানতা হ্যায়, একঠো লেড়কি হামকো ভালোবাসামে গির গিয়া। হাম উসকে শাদি করেগা।'

মেদিনীর চোখে কৌতুক নেচে উঠল, সে আঁচল দিয়ে হাসি চাপা দিতে-দিতে দোর ভেজিয়ে দিল।

মেদিনী আসার পর থেকে গঙ্গাধরের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। বয়সটা খারাপ; যৌবন বিদায় নেওয়ার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাধর যখন বিকেলবেলা বাইরে যায় তখন মেদিনীর দোরের দিকে তাকাতে-তাকাতে যায়, কদাচ মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয় না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; মেদিনী চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চোখ নিচু করে তার দৃষ্টিপ্রসাদ গ্রহণ করে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত।

অজয়ের ভাবভঙ্গি একটু অন্যরকম। সে যেন মেদিনীকে দেখে বাৎসল্য স্নেহ অনুভব করে; তার সঙ্গে পাটিচাটি গল্প করে, তার দেশের খবর নেয়। মেদিনী সরলভাবে কথা বলে, মনে-মনে হাসে।

মকরন্দ প্রথমদিকে কিছুদিন মেদিনীকে দেখেনি। একবার তিন-চারদিন সে বাড়ি ফিরল না; জানা গেল পুলিশ-ভ্যান লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার জন্যে পুলিশে ধরে দিয়ে গেছে। চতুর্থ দিন সে মুক্তি পেয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এসে বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। মেদিনী গিয়ে দোর খুলল। মকরন্দর চেহারা শুকনো, জামা ছেঁড়া, চুল উসকোখুসকো; সে তীব্রদৃষ্টিতে মেদিনীর পানে চেয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল—'তুমি কে?'

'আমি মেদিনী।'

'অ—মেঘরাজের বউ।' কুটিলভাবে মুখ বিকৃত করে সে মেদিনীকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। মেদিনী জানত মকরন্দ কে, সে মুখ টিপে হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

তিনমাস কেটে যাবার পরও যখন বেণীমাধবের পেটের আর কোনও গণ্ডগোল হল না, তখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন, তাঁর পেটের কোনও দোষ নেই, হজম করার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। পুত্রবধূ এবং মেয়ের প্রতি তাঁর সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হল। তারপর একদা গভীর রাত্রে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে তাঁর গলা কাটছে।

তারপর তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকি রাত্রিটা চিন্তা করে কাটালেন। মৃত্যুভয়-জড়িত ঐহিক চিন্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি তাঁর সলিসিটারকে টেলিফোন করলেন—'সুধাংশুবাবু, আমি উইল করতে চাই। বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, আপনি একবার আসবেন?'

বেণীমাধব পুরনো মক্কেল, মালদার লোক। সুধাংশুবাবু বললেন—'বিকেলবেলা যাব।'

বিকেলবেলা সুধাংশুবাবু এলেন। দোর বন্ধ করে দুজনে প্রায় দেড় ঘণ্টা উইলের শর্তাদি

BanglaBook.org

আলোচনা করলেন; সুধাংশুবাবু অনেক নোট করলেন। শেষে বললেন—'পরশু আমি উইল তৈরি করে নিয়ে আসব, আপনি উইল পড়ে দস্তখত করে দেবেন। দুজন সাক্ষীও আমি সঙ্গে আনব—।'

সন্ধের পর সনৎ আর নিখিল বেণীমাধবের কাছে এসে বসল, কুশল প্রশ্ন করল। মেদিনী পাশের ঘরে রান্না করছিল; বেণীমাধব ভাগনেদের চা ও আলুভাজা খাওয়ালেন।

ওরা চলে যাবার পর বেণীমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'দোতলা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলেই ছিল, সমন পেয়ে ছুটে এল। ঝিল্লী আর লাবণিও এল। বেণীমাধব খাটের ধারে বসেছিলেন, দুই নাতনীকে ডেকে নিজের দু-পাশে বসালেন, তারপর ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই-এর পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি উইল করতে দিয়েছি। উইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই।'

সকলে সশঙ্ক মুখে চেয়ে রইল। বেণীমাধব ধীরে-ধীরে বলতে লাগলেন—'আমার মৃত্যুর পর আমার নগদ সম্পত্তি তোমরা হাতে পাবে না। অ্যানুইটির ব্যবস্থা করেছি; তোমরা এখন যেমন মাসোহারা পাচ্ছ তেমনি পাবে। কোনও অবস্থাতেই যাতে তোমাদের অর্থকষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাসোহারার টাকার অঙ্ক ধার্য করেছি। বাড়িটা যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সমান ভাগ করে ভোগ করবে, বিক্রি করতে পারবে না।'

চারজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বেণীমাধব দুই নাতনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'ঝিল্লী আর লাবণির জন্যে আমি আগে থেকেই মেয়াদী বীমা করে রেখেছি, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। তা ছাড়া আমি ঠিক করেছি, ওদের বিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না। লাবণির জন্যে একটি ভালো পাত্র আছে: ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেনেন্ট। ঝিল্লীর জন্যে মনের মতো পাত্র এখন পাইনি, পেলেই একসঙ্গে দুজনের বিয়ে দেব।' তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব এসেছিল, আবার তা মুছে গেল; তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'মকরন্দকেও আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বড় অসভ্য বেয়াদব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিছু দেব না।'

বেণীমাধব চুপ করলেন, তাঁর শ্রোতারাও চুপ করে রইল; কারুর মুখে কথা নেই। শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে বলল—'আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে টাকার দর আজ একরকম কাল একরকম—'

গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারি গলায় বলল—'বাবা, তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব। উইল কি সই হয়ে গেছে?'

বেণীমাধব কারুর দিকে তাকালেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'উকিলকে উইল তৈরি করতে দিয়েছি, কাল-পরশু সই-দস্তখত হবে। হ্যাঁ, একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়নি। উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তা হলে তোমরা কেউ আমার একপয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এই কথা শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি হল। যথাসময়ে বেণীমাধব নৈশাহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন। মেঘরাজ ও মেদিনী পাশের ঘরে খাওয়াদাওয়া করল; মেঘরাজ সামনের দরজা ভেজিয়ে দরজা আগলে বিছানা পাতল, মেদিনী নিজের ঘরে গেল।

ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব। লাবণির নাচের মাস্টার এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে কারুর নাচের প্রতি রুচি নেই। পরাগ আর লাবণি আড়ালে কথা বলল, তারপর চুপিচুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল। কেউ তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল কি না সন্দেহ।

BanglaBook.org

নিখিল সন্ধের পরই কাজে চলে গিয়েছিল; সে নিশাচর মানুষ, সারারাত কাজ করে, সকালবেলা ফিরে আসে।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় সনৎ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল, মেদিনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আমি বর্ধমানে যাচ্ছি, কাল সকালে সেখানে একটা নাচগানের মজলিশ আছে। কাল বিকেলের দিকে কোনও সময় ফিরব। আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দোর খুলতে হবে না।' বলে একটু হাসল।

মেদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল—'জি।'

সনৎ চলে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্দ এল, মেদিনীকে কড়া সুরে বলল—'দোর বন্ধ করে দাও। রাত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে, বলবে আমি বাড়ি নেই।' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল। মেদিনী সদর দরজায় খিল লাগাল।

তারপর বাড়ির ওপর রাত্রির রহস্যময় যবনিকা নেমে এল।

পরদিন ভোরবেলা মেদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কবাট ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা। সে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর কবাট একটু ফাঁক করল; বাইরে নিখিলকে দেখা গেল, সে কাজ শেষ করে ফিরছে। মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে বলল—'তোমরা কাম শুরু হুয়া, হামরা কাম শেষ হুয়া। এবার খুব ঘুমায়গা।'

নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল। মেদিনী দরজা ফাঁক করে রাখল, কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর সে কর্তার চা তৈরি করার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলল।

মিনিটখানেক কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এল, তারপর ধপ করে শব্দ। নিখিল তার ঘরে গায়ের জামা খুলে গেঞ্জি খোলবার উপক্রম করছিল, তীব্র চিৎকার শুনে সেই অবস্থাতেই ওপরে ছুটল। দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল, সকলে প্রায় একসঙ্গে তেতলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বেণীমাধবের দোরের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঘরাজ বিছানার ওপর ঊর্ধ্বমুখে পড়ে আছে, তার গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কাটা; বালিশ এবং বিছানার ওপর পুরু হয়ে রক্ত জমেছে। মেদিনী তার পায়ের দিকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা সরল না, তারপর নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—'মামা—মামা বেঁচে আছেন তো?'

গায়ত্রী, আরতি এবং ঝিন্নী কেঁদে উঠল, অজয় এবং গঙ্গাধর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল; কারুর যেন নড়বার শক্তি নেই। নিখিল তখন মেঘরাজকে ডিঙিয়ে বন্ধ দোরে ঠেলা দিল। দোর খুলে গেল; খোলা দোর দিয়ে দেখা গেল, বেণীমাধব খাটের ওপর শুয়ে আছেন, তাঁর গলার নিচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে। মেঘরাজকে যেভাবে যে-অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে, বেণীমাধবকে ঠিক সেইভাবে সেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কান্নার একটা কলরোল উঠল। নিখিল ক্ষণিকের জন্য জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। প্রথমে নিজের সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করল, তারপর থানায়।

BanglaBook.org

তিন

ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, সদর দরজায় পুলিশ-পাহারা। কনস্টেবল ব্যোমকেশকে দেখে স্যালুট করল, বলল—'ইন্সপেক্টর সাহেব নিচের তলায় বসবার ঘরে আছেন।'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার এবং দুজন সাব-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন; মধ্য টেবিল ঘিরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যোমকেশ প্রবেশ করতেই রাখালবাবু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, করুণ হেসে বললেন—'জড়িয়ে পড়েছি ব্যোমকেশদা। বেণীসংহার নামটা আপনি ঠিকই দিয়েছেন। বেণীসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোঁপা বাঁধা; মেয়েরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে, তারপর বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধে। এ-ব্যাপারও অনেকটা সেইরকম; এমন জটিল কুটিল তার বাঁধুনি যে বেণীসংহার উন্মোচন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের মোটিভ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সন্দেহভাজন লোকের সংখ্যাও পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; তবু ঠিক কোন লোকটি এ-কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না।'

'এসো, বসা যাক।' দুজনে দুটো চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন—'এবার বলো।'

রাখালবাবু কাল থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ব্যোমকেশকে শোনালেন, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যোমকেশ বলল—'মোটিভ কী?'

'বুড়োর অগাধ টাকা। ছেলে এবং মেয়েকে মাসোহারা দিত, কিন্তু তাতে তাদের মন উঠত না। ডাক্তার অবিনাশ যেন সন্দেহ করেন, মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করছিল, তা যদি হয়, তা হলে ছেলে এবং জামাইয়ের মধ্যে ষড় আছে। যা দিনকাল পড়েছে, কিছুই অসম্ভব নয়।'

'মেঘরাজকে মারবার উদ্দেশ্য কী?'

'মেঘরাজ রাত্রে বেণীমাধবের দোরের সামনে বিছানা পেতে শুত। দোর ভেজানো থাকত, যাতে বেণীমাধব ডাকলেই সে ঘরে ঢুকতে পারে। সুতরাং তাকে বধ না করে ঘরে ঢোকা যায় না। তাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে সে জেগে উঠবে। তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল।'

'মারণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে ময়না তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল। একই অস্ত্র দিয়ে দুজনকে মেরেছে। অস্ত্রের এক টানে গলা দু-ফাঁক হয়ে গেছে।'

'হত্যার সময়টা জানা গেছে?'

'স্থূলভাবে রাত্রি বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হুঁ। সন্দেহভাজন পাঁচজন কারা?'

'অজয় ও তার স্ত্রী আরতি, গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর। এবং অজয়ের ছেলে মকরন্দ। মকরন্দকে মেঘরাজ একদিন বেণীমাধবের হুকুমে চড় মেরেছিল। ঝিল্লীকে বাদ দেওয়া যায়, সে ছেলেমানুষ, তার কোনও মোটিভ নেই।'

'মকরন্দ ছেলেটা করে কী?'

'পলিটিক্সের হুজুগ করে। কলেজে নাম লেখানো আছে, এই পর্যন্ত। সে রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় বাড়িতে এসেছিল, তারপর রাত্রেই কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি। তার নামে হুলিয়া জারি করেছি।'

'বাড়িতে এখন কে-কে আছে?'

'অজয়, আরতি, গঙ্গাধর, গায়ত্রী, ঝিল্লী, নিখিল, সনৎ, গোকুলি আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী। অজয়ের মেয়ে লাবণি সে-রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। নিখিল আর সনৎ রাত্রে কাজে বেরিয়েছিল, তারা পরদিন ফিরে এসেছে। যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছ নিশ্চয়।'

'তা নিয়েছি।'

'খানাতল্লাশ করে কিছু পেলে?'

BanglaBook.org

'সন্দেহজনক কিছু পাইনি।'

'বেশ; এবার জবানবন্দির নথিটা দেখি।'

'এই যে।' রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ব্যোমকেশকে দিলেন। এইসময় সদর দরজার কনস্টেবল এসে জানাল যে, সলিসিটার সুধাংশু বাগচী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। রাখালবাবু বললেন—'নিয়ে এসো।'

সুধাংশুবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, হাতে পাট-করা খবরের কাগজ। রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন—'আমি বেণীমাধববাবুর সলিসিটার। আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম—।'

'বসুন।'

সুধাংশুবাবু একটি চেয়ারে বসলেন। রাখালবাবু তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, ব্যোমকেশও এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'বেণীমাধববাবুর সঙ্গে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'পরশু। আমরা অনেকদিন ধরে তাঁর বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করে আসছি। পরশু তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, তিনি উইল করতে চান। আমি বিকেলবেলা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উইলে কী-কী শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি উইল তৈরি করে আজ তাঁকে দলিল দেখিয়ে সহি-দস্তখত করিয়ে নেব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর আজ সকালে কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম।'

রাখালবাবু চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চেয়ে বললেন—'উইলে কী-কী শর্ত আছে আমাদের বলতে বাধা আছে কি?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'অন্যসময় নিশ্চয় বাধা থাকত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাধা নেই। বরং আপনাদের সুবিধা হতে পারে।'

তিনি উইলের শর্তগুলি শোনালেন; অপঘাতে মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে-কথাও উল্লেখ করলেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি উঠলেন, বলে গেলেন—'যদি আমার কাছ থেকে আরও কিছু জানতে চান কিংবা উইল পড়ে দেখতে চান, আমার অফিসে খবর দেবেন।'

তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন—'মোটিভ আরও পাকা হল। বুড়োকে আর দু-দিন বাঁচতে দিলেই এতবড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। আমি এবার উঠব। কিন্তু আগে বেণীমাধবের ঘরটা দেখে যেতে চাই।'

'চলুন।'

দোতলার সিঁড়ির মাথায় একজন কনস্টেবল। তেতলায় বেণীমাধবের দরজায় তালা লাগানো, উপরন্তু একজন কনস্টেবল টুলে বসে পাহারা দিচ্ছে। মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন, দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর বিছানা নেই, আর-সব যেমন ছিল তেমনি আছে। ব্যোমকেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চোখ ফেরাল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'তোমরা অবশ্য সবই দেখেছ, তবু—।'

রাখালবাবু ঘাড় নাড়লেন—'অধিকন্তু ন দোষায়।'

'লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় ছিল?'

'লোহার সিন্দুকের গায়ে লাগানো ছিল। সিন্দুকের মধ্যে তিনখানা একশো টাকার নোট ছিল, পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট বা খুচরো টাকা-পয়সা একটাও ছিল না। মনে হয়, খুনি সিন্দুক খুলে টাকা-পয়সা নিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নম্বরী নোট নেয়নি।'

BanglaBook.org

'হুঁ। সিন্দুকে আর কী ছিল?'

'কিছু দলিলপত্র, কিছু রসিদ, ব্যাঙ্কের খাতা ও চেকবুক। দুটো ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সাকুল্যে প্রায় চল্লিশ হাজার। তা ছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও fixed deposit আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার। মালদার লোক ছিলেন। ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাতশো টাকা হিসেবে মাসোহারা দিতেন। তাঁর নিজের খরচ ছিল সাতশো টাকা, মেঘরাজকে মাইনে দিতেন আড়াইশো টাকা। চেকবুকের counter foil থেকে এইসব খবর জানা যায়।'

'সিন্দুকের ভিতরে কি বাইরে বেণীমাধব ছাড়া অন্য কারুর আঙুলের ছাপ আছে?'

'কারুর আঙুলের ছাপ নেই, একেবারে লেপা-পোঁছা।'

'হুঁ, আততায়ী লোকটি বেশ হুঁশিয়ার।' ব্যোমকেশ সিন্দুক খুলল না, ফ্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'ফ্রিজে কারুর আঙুলের ছাপ ছিল?'

'ছিল। বেণীমাধব, মেঘরাজ এবং মেদিনী—তিনজনের আঙুলের ছাপ ছিল। আর কারুর ছাপ পাওয়া যায়নি।'

হাতল ধরে ব্যোমকেশ ফ্রিজ খুলল, ভিতরে আলো জ্বলে উঠল; ফ্রিজ চালু আছে। ভিতরে নানা জাতের ফলমূল। সারি-সারি ডিম, মাছ, মাংস, দুধের বোতল রয়েছে। ব্যোমকেশ আবার দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরের পিছন দিকের দেওয়ালে একটা লম্বা ধরনের আয়না টাঙানো ছিল, তার নিচে তাকের ওপর চিরুনি, বুরুশ, চুলের তেল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুরটা সেফটি রেজর নয়, সাবেক কালের ভাঁজ-করা লম্বা ক্ষুর। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে খাপসুদ্ধ ক্ষুর তুলে নিয়ে বলল—'ক্ষুরটা বের করে দেখেছ নাকি?'

রাখালবাবু চক্ষু একটু বিস্ফারিত করলেন, বললেন—'না। বেণীমাধব নিজের হাতে দাড়ি কামাতেন না, মেঘরাজ রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে দিত।'

ব্যোমকেশ সাবধানে ক্ষুরটি খাপ থেকে বের করে দু-আঙুলে ধরে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। তারপর বিস্মিত স্বরে বলল—'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ ক্ষুরটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—'দেখো, কোথাও আঙুলের ছাপ নেই।'

ক্ষুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন, তারপর ক্ষুর ব্যোমকেশকে ফেরত দিয়ে তার মুখের পানে চাইলেন; দুজনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ব্যোমকেশ ক্ষুরটি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল, বলল—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কী করবেন?'

'দাড়ি কামাব।'

তেতলার অন্য ঘর দুটিতে দর্শনীয় কিছু ছিল না। তবু ব্যোমকেশ ঘর দুটিতে ঘুরে-ফিরে দেখল; তারপর নিচের তলায় নেমে এসে রাখালবাবুকে বলল—'আমি এখন চললাম। বিকেলবেলা আবার আসব। জবানবন্দির ফাইলটা দাও, বাড়ি গিয়ে পড়ব।'

রাখালবাবু বললেন—'আমাকে একবার থানায় যেতে হবে, চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কীরকম মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ মুচকি হেসে বলল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—।'

রাখালবাবু জবানবন্দির ফাইল ব্যোমকেশকে দিলেন, তাকে নিয়ে পুলিশ-ভ্যানে চলে গেলেন। দুজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন নিম্নতর কর্মচারী বাড়িতে মোতায়েন রইল।

বিকেল তিনটের সময় ব্যোমকেশ ফিরে এল। রাখালবাবু আগেই ফিরেছিলেন, তাঁকে ক্ষুর আর জবানবন্দির নথি ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে বসল। রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কেমন দাড়ি কামালেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'ভালো নয়।'

BanglaBook.org

'আর জবানবন্দি?'

'মেদিনীর জবানবন্দি সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ। তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে নিজের ঘরেই আছে।'

কিন্তু মেদিনীকে ডেকে পাঠাবার আগেই দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ কর্মচারী মকরন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মকরন্দর কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মুখে ধুলোবালি, চোখ জবাফুলের মতো লাল। বেশ বোঝা যায়, সে স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে পুলিশের হাতে ধরা দেয়নি। একজন সাদা পোশাকের পুলিশ বলল—'মকরন্দ চক্রবর্তীকে ধরেছি স্যার?'

রাখালবাবু মকরন্দর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'ইনিই মকরন্দ চক্রবর্তী! কোথায় ধরলে?'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে। রেস খেলছিল স্যার। পকেটে অনেক টাকা ছিল। এই যে।'

একতাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট। রাখালবাবু গুনে দেখলেন, পৌনে দু'শো টাকা। তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন—'তোমার নাম মকরন্দ চক্রবর্তী?'

মকরন্দ রক্তরাঙা চোখে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'তুমি পৌনে দু'শো টাকা কোথায় পেলে?'

উদ্ধত উত্তর হল—'বলব না।'

'যে-রাত্রে তোমার ঠাকুরদা খুন হন সে-রাত্রে ন'টার সময় তুমি বাড়ি এসেছিলে, তারপর শেষরাত্রে চুপিচুপি দোর খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে—।'

'মিছে কথা। মেদিনী মিছে কথা বলেছে।'

'মেদিনী বলেছে জানলে কী করে?'

মকরন্দ অধর দংশন করল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'কতরাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে?'

'বলব না।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে আসোনি কেন?'

'বলব না।'

রাখালবাবু তার খুব কাছে এসে বললেন—'একদিন বেণীমাধববাবুর হুকুমে মেঘরাজ তোমার কান ধরে গালে চড় মেরেছিল, গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

'মিছে কথা।'

'বাড়িসুদ্ধ লোক মিছে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

রাখালবাবু ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে বসলেন, গলা খাটো করে বললেন—'এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশও নিচু গলায় বলল—'যুগধর্মের নমুনা। ওকে বাড়িতেই আটক করে রাখো।'

'তাই করি।' রাখালবাবু উঠে গিয়ে মকরন্দকে কড়া সুরে বললেন—'যাও, দোতলায় নিজের ঘরে থাকো গিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করো না, চেষ্টা করলে হাজতে গিয়ে লপ্‌সি খেতে হবে। যাও।'

সাদা পোশাকের পুলিশ দুজন মকরন্দকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। রাখালবাবু বললেন—'মেদিনীকে ডেকে পাঠাই?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'না, চলো আমরাই তার ঘরে যাই। এখানে অনেক বাধাবিঘ্ন।'

মেদিনীর দোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল মেদিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুকে দেখে সে উঠে বসল। তার পরনে ধূসর রঙের একটা শাড়ি,

BanglaBook.org

কপালে সিঁদুর নেই, হাতে-গলায়-কানে গয়না নেই। মুখের ভাব একটু ফুলো-ফুলো; শোকের চিহ্ন এখনও মুখ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু শোকের অধীরতা দূর হয়েছে। সে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখে দুজনের পানে চাইল।

রাখালবাবু সদয় কণ্ঠে বললেন—'মেদিনী, ইনি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি তার ওপর ইনি আরও দু-চারটে সওয়াল করতে চান।'

মেদিনী ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—'জি।'

ব্যোমকেশ একদৃষ্টে মেদিনীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'কতদিন আগে মেঘরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

মেদিনী অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'পাঁচ বছর আগে।'

'তুমিই তার প্রথম স্ত্রী?'

'জি, না। আগে একজন ছিল, সে মারা গেছে।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চাইল। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে একটা তক্তপোশ, একটা কাঠের আলমারি এবং একটা খাড়া আলনা। তক্তপোশের তলায় গোটা দুই বড় তোরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকের জানালার পাটার ওপর একটা কাঠের চ্যাপটা বাক্স। পশ্চিমা মেয়েরা প্রসাধনের জন্যে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করে; বাক্সের মধ্যে সিঁদুর কৌটো, চিরুনি, তেল, কাজল প্রভৃতি থাকে, ডালা খুললে ডালার গায়ে আয়না বেরিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে নিতান্ত মামুলি পরিবেশ।

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে জিগ্যেস করল—'বাড়ির সকলকেই তুমি চেনো। কে কেমন মানুষ বলতে পারো?'

মেদিনী একটু চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল—'বুড়া বাবা বড় ভালো আদমি ছিলেন, দিলদার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে আর দামাদও ভালো লোক। মেয়ে আর পুতহু আমাকে পছন্দ করেন না। ঝিন্নী দিদি আর লাবণি দিদি ভারি ভালো মেয়ে।'

'আর মকরন্দ?'

মেদিনী চকিতে চোখ তুলেই আবার নিচু করল—'উনি আমাকে দেখতে পারেন না। ভারি কড়া জবান।'

'মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো?'

'জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।'

'নিখিল আর সনৎ?'

'নিখিলবাবু মজাদার লোক, খুব ঠাট্টা-তামাশা করেন। আর সনৎবাবু গম্ভীর মেজাজের মানুষ। কিন্তু দুজনেই খুব ভদ্র।'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। মেঘরাজ সৈন্যদলের সিপাহী ছিল, তার সিপাহী-জীবন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিশ্চয় তোমার কাছে আছে?'

'জি আছে, তার বাক্সের মধ্যে আছে।'

'আমি একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে চাই।'

'এই যে বার করে দিচ্ছি।'

সে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করল, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রাঙ্ক খুলতে লাগল। ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার ওপর প্রসাধনের বাক্সটা রাখা রয়েছে। ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করে বাক্সের ডালা তুলল। বাক্সের মধ্যে মেয়েলি প্রসাধনের দ্রব্য ও টুকিটাকি; আয়নার এককোণে মেদিনীর একটি ছবি আঁটা রয়েছে। পোস্টকার্ড আধখানা করলে যত বড় হয় তত বড় ছবি; মেদিনী খাটের ধারে বসে রয়েছে। নিতান্তই ঘরোয়া ছবি, মেদিনীর মুখের প্রাণখোলা হাসিটি

BanglaBook.org

ব্যোমকেশের গায়ে কাঁটার মতো বিঁধল। মেদিনীর বর্তমান চেহারা দেখে ভাবা যায় না, সে এমনভাবে হাসতে পারে। ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বাক্স বন্ধ করল।

মেদিনী ট্রাঙ্ক থেকে কাগজপত্র নিয়ে যখন ফিরে এল, তখন ব্যোমকেশ রাখালবাবুর কাছে ফিরে এসে নিম্নস্বরে কথা বলছে, মেদিনীর হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে সে মন দিয়ে পড়ল। রাখালবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে পড়লেন। তারপর কাগজ মেদিনীকে ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ মেদিনীকে বলল—'এগুলো যত্ন করে রেখে দাও, হয়তো পরে দরকার হবে। চলো রাখাল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকালেন—'কী মনে হল?'

ব্যোমকেশ বলল—'খুব ভালো। এবার বাড়ির বাকি লোকগুলিকেও একে-একে দেখতে চাই। সবাই বাড়িতেই আছে তো?'

'সবাই আছে, কেবল অজয়ের মেয়ে লাবণি ছাড়া। যে-রাত্রে খুন হয়, লাবণি সেদিন সন্ধের সময় তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে, এখনও তার সন্ধান পাইনি। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে আগে কাকে দেখতে চান?'

'আমার কোনও পক্ষপাত নেই। নিচের তলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

নিখিলের দোরে রাখালবাবু টোকা দিলেন, নিখিল এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার গালে সাবানের ফেনা, হাতে সেফটি রেজর; সে ফেনায়িত হাসি হাসল—'আসুন দারোগাবাবু।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রশ্ন করলেন—'বিকেলবেলা দাড়ি কামাচ্ছেন?'

নিখিল বলল—'আমি নিশাচর কিনা তাই বিকেলবেলা দাড়ি কামাই। যারা দিনেরবেলা কাজ করে তারা সকালবেলা দাড়ি কামায়।' তারপর সে ব্যগ্রস্বরে বলল—'দারোগাবাবু, একঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, একবারটি অফিস ঘুরে আসি। মাইরি বলছি, পালাব না। বিশ্বাস না হয় দুজন পেয়াদা আমার সঙ্গে দিন।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'অফিসে যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? বেশ তো আছেন।'

নিখিল বলল—'না দারোগাবাবু, বেশ নেই। কাজের নেশা আমাকে অফিসের দিকে টানছে, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কী?'

নিখিল একটু সলজ্জভাবে বলল—'অফিসে অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে একটাকে আমি খুঁজছি, পেলেই তাকে বিয়ে করব।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে।'

'ঠেকবেই তো। ঘোর রহস্যময় ব্যাপার।'

'ঘোর রহস্যময় যদি হয় তা হলে এঁর শরণাপন্ন হোন। ইনিই হলেন শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

নিখিলের গালে সাবানের ফেনা শুকিয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছিল, সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ব্যোমকেশের পানে তাকাল—'অ্যাঁ, আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।' সেফটি রেজরসুদ্ধ হাতজোড় করে বলল—'আমার রহস্যটা আপনাকে ভেদ করতেই হবে ব্যোমকেশবাবু। নইলে আমার প্রাণের আশা নেই।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

নিখিল তড়বড় করে একনিশ্বাসে তার রহস্য শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ বলল—'চিঠিগুলো দেখি।'

নিখিল বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের তলা থেকে কয়েকখানা খাম এনে ব্যোমকেশকে দিল। ব্যোমকেশ খামগুলি খুলে একে-একে চিঠি বার করে পড়ল, তারপর আবার খামের মধ্যে পুরে নিজের

BanglaBook.org

পকেটে রাখল—'এগুলো আমি রাখলাম। দেখি যদি সন্ধান পাই। আপনি আপাতত এই বাড়িতেই থাকুন, আমি আপনার অফিসে খোঁজ-খবর নেব। —ভালো কথা, আপনার বর্ষাতি আছে?'

'বর্ষাতি—ওয়াটারপ্রুফ? আছে একটা। কেন বলুন তো?'

'দেখি একবার।'

নিখিল সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে একটা পুরনো খাকি রঙের বর্ষাতি নিয়ে এল। ব্যোমকেশ সেটা রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এটাও আমরা নিয়ে চললাম। এটা আপনি শেষবার কবে ব্যবহার করেছেন?'

নিখিল কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে মাথা চুলকে বলল—'গত বর্ষাকালে, মানে পাঁচ-ছয় মাস আগে। আপনি যে ভেলকি লাগিয়ে দিলেন, ওয়াটারপ্রুফ থেকে আমার—মানে মেয়েটার ঠিকানা বার করবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ কেবল মুখ টিপে হাসল, বলল—'আপনি দেখছি সেফটি রেজর দিয়ে দাড়ি কামান।'

'তবে কী দিয়ে দাঁড়ি কামাব?'

'ঠিক কথা। আপনি যখন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছেন তখন সাবেক ক্ষুরের রেওয়াজ উঠে গেছে। আচ্ছা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে বক্র কটাক্ষপাত করল। রাখালবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন—'খেয়াল হয়নি। হওয়া উচিত ছিল। যে-লোক ছুরি কিংবা ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছে, সে জানে গলা কাটলে চারদিকে রক্ত উথলে পড়বে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। তার নিজের গায়েও রক্ত লাগবে। তাই সে বর্ষাতি কিংবা ওইরকম একটা কিছু গায়ে দিয়ে খুন করতে যাবে, যাতে সহজে রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়।'

এইসময় সদর দোরের কনস্টেবল এসে একখানা পোস্টকার্ড রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'পিওন দিয়ে গেল।'

রাখালবাবু নির্দ্বিধায় পোস্টকার্ড পড়লেন। অজয় চক্রবর্তীর নামে চিঠি, তারিখ আজ সকালের, ঠিকানা টালিগঞ্জ। চিঠিতে কয়েক ছত্র লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু মা,

কাল রাত্তিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমরা রাগ করো না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব ভালো লোক। পরশু রাত্রে আমি শাশুড়ির কাছে শুয়েছিলাম। দাদু অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাই আমরা লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

প্রণতা
লাবণি

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের হাতে চিঠি দিলেন। ব্যোমকেশ সেটা পড়ে ফেরত দিল। বলল—'বোধহয় ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পায়নি। যাক, বিয়ে করেছে ভালোই করেছে, নইলে—।'

চিঠি পকেটে রেখে রাখালবাবু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন—'এই বর্ষাতিটা রাখো। আরও বোধহয় জুটবে; সবগুলো জড়ো হলে পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে। এটাতে টিকিট সেঁটে রাখো—নিখিল হালদার।'

তারপর তিনি সনতের দোরে টোকা দিলেন। সনৎ এসে দোর খুলল; তার হাতে একটা ইংরেজি রহস্য উপন্যাস পাতা-ওল্টানো অবস্থায় রয়েছে। রাখালবাবুকে দেখে বলল—'ইন্সপেক্টরবাবু, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, একটিন আনিয়ে দেবেন? গোল্ড ফ্লেক।'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়। টাকা দিন, আনিয়ে দিচ্ছি।'

সনৎ একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে দিল। রাখালবাবু টাকা সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন—'একটিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট সামনের হোটেল থেকে আনিয়ে দাও।'

তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বলল—'আর কতদিন ঘরে বন্ধ করে রাখবেন? কাজকর্ম আটকে রয়েছে। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখানে আর থাকতে দেবে না, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে তো।'

'থাকতে দেবে না কী করে জানলেন?'

'আজ দুপুরবেলা গায়ত্রীর স্বামী গঙ্গাধর এসেছিল, বলল—এবার পাতাতাড়ি গোটাতে হবে।'

'তাই নাকি। বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না, দু-একদিনের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ইনি ব্যোমকেশ বক্সী, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী।'

সনৎ নির্লিপ্ত চোখে ব্যোমকেশের পানে চাইল, নীরস স্বরে বলল—'নাম শুনেছি, বই পড়িনি। বাংলা রহস্য-কাহিনী আমি পড়ি না। বসুন।'

ব্যোমকেশের চোখ ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে অলসভাবে বলল—'আপনার বর্ষাতি আছে?'

সনৎ ভ্রূ তুলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল—'আছে। এটা বর্ষাকাল নয়, তাই তুলে রেখেছি। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সনৎ আলমারি খুলে একটা প্লাস্টিকের মোড়ক বার করল। মোড়কের মধ্যে একটি শৌখিন স্বচ্ছ বর্ষাতি পাট করা রয়েছে। রাখালবাবু সেটি নিয়ে মোড়ক থেকে বার করলেন, তারপর লম্বা করে ঝুলিয়ে দেখলেন। দামি বর্ষাতি, প্রায় নতুন। তিনি সেটিকে পাট করে আবার মোড়কের মধ্যে রেখে বললেন—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি দু-দিন পরে ফেরত পাবেন। রসিদ দিচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলল—'রসিদ কী হবে! আপনাদেরই রাজত্ব, যা ইচ্ছে করুন।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আপনার জবানবন্দিতে দেখলাম, যে-রাত্রে বেণীমাধববাবু খুন হন সে-রাত্রে আপনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন। কোন ট্রেনে গিয়েছিলেন?'

সনৎ বলল—'রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেনে।'

'পরদিন ভোরের ট্রেনে না গিয়ে রাত্রির ট্রেনে গেলেন কেন?'

'ভোরের ট্রেনে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারতাম না। সকালবেলা মজলিশ ছিল।'

'বর্ধমানে আপনার কোনও আস্তানা আছে?'

'না, স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রাত কাটিয়েছি।'

'চায়ের স্টলে গিয়ে চা খেয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'চা আমি খাই না।'

'তা হলে আপনি যে সাড়ে দশটার গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন তার কোনও সাক্ষি-সাবুদ নেই?'

সনতের ভুরু আবার উঁচু হল—'সাক্ষি-সাবুদের কী দরকার? আপনাদের কি সন্দেহ আমি মামাকে খুন করেছি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তা নয়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধেই আমাদের নিঃসংশয় হওয়া দরকার।'

সনৎ শুকনো গলায় বলল—'মামাকে খুন করে যাদের লাভ আছে তাদের অ্যালিবাই খুঁজুন গিয়ে। তাতে কাজ হবে।'

'তা বটে। চলো রাখাল, এবার দোতলায় যাওয়া যাক।'

BanglaBook.org

প্রথমে ড্রয়িংরুমে গিয়ে রাখালবাবু সনতের বর্ষাতি সাব-ইন্সপেক্টরকে সমর্পণ করে বললেন —'টিকিট মারো—সনৎ গাঙ্গুলি।' তারপর ব্যোমকেশকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন।

অজয় সামনের ঘরে বসে সায়াহ্নিক চা-জলখাবার খাচ্ছিল, সশঙ্ক মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মুক্তকচ্ছ অশৌচের বেশ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। রাখালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন— 'আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' তিনি পোস্টকার্ড পকেট থেকে নিয়ে অজয়কে দিলেন।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট চোখে অজয়ের পানে চেয়ে ছিল; সে দেখল চিঠি পড়তে-পড়তে অজয়ের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত পরম্পরায় বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল ঃ আশঙ্কা—বিস্ময়—স্বস্তি —উৎফুল্লতা। তার মধ্যে স্বস্তির আরামই বেশি। অজয়ের মতো প্রকৃতির লোকের পক্ষে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক; বিনা খরচে বিনা ঝঞ্ঝাটে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তা হলে আনন্দ হওয়ারই কথা।

কিন্তু সে যখন মুখ তুলল তখন তার মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ ভাব, তাতে রঙ্গমঞ্চের আভাস পাওয়া যায়। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল—'মেয়ে! দারোগাবাবু, আমার একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় নিষ্ঠুর, বড় স্বার্থপর, তারা বাপ-মায়ের কথা ভাবে না। যাক, যা করেছে ভালোই করেছে। তবু যদি জাতের মধ্যে বিয়ে করত। যাক, ভালো হলেই ভালো।' সে আবার নাটকীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাখালবাবু বোধকরি অভিনয়ের পালা শেষ করার জন্যেই বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। বোধহয় নাম শুনেছেন।'

অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল; তার ভাবভঙ্গিতে ভয় কিংবা বিস্ময় কিংবা আনন্দ কোনটা প্রকাশিত হল ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে গদগদ স্বরে বলে উঠল—'নাম শুনিনি! বলেন কী আপনি, নাম শুনিনি! আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। ব্যোমকেশবাবু এসেছেন, এবার বাবার মৃত্যু-রহস্যের একটা কিনারা হবে।' সে অন্দরের দরজার দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল—'ওগো শুনছ, শিগগির দু-পেয়ালা চা নিয়ে এসো। বসুন-বসুন, আমি নিজেই দেখছি।' সে দ্রুত অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হল।

সমাদরের আতিশয্য দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবর পানে মুখ টিপে হাসল; দুজনে পাশাপাশি চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিরে এল, তার পিছনে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে আরতি; আরতির হাতে থালার ওপর দু-পেয়ালা চা এবং বিস্কুট। তার মুখ ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, সে থালাটি ব্যোমকেশের সামনে রেখেই ফিরে যাচ্ছিল, অজয় বলল,—'ওকী, চলে যাচ্ছ কেন? ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে কথা কও।'

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তার অবস্থা লক্ষ করে সদয় কণ্ঠে বলল—'না-না, উনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, ওঁকে আমার কিছু জিগ্যেস করার নেই।'

আরতি চলে গেল। অজয় আমতা-আমতা করে বলল—'আমার স্ত্রী বড় লাজুক, কিন্তু আমরা দুজনেই আপনার ভক্ত।' অজয় আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলল —'আপনার ছেলে মকরন্দ বাড়িতেই আছে তো?'

অজয় চকিত হয়ে বলল—'আছে বইকী। তাকে ডাকব?'

ব্যোমকেশ বলল—'ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না। সে কলেজে পড়ে, বর্ষাকালে নিশ্চয় তার বর্ষাতি দরকার হয়। তার বর্ষাতিটা একবার দেখতে চাই।'

অজয় একটু চিন্তা করে বলল—'বছর দেড়েক আগে তাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ কিনে দিয়েছিলাম। আছে নিশ্চয়, আমি দেখছি।'

অজয় অন্দরের দিকে চলে গেল। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে অজয় ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে বলল—'ওয়াটারপ্রুফটা খুঁজে পেলাম না। মকরন্দকে

BanglaBook.org

জিগ্যেস করলাম, সে বলল—জানি না।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা রেখে মুখ মুছতে-মুছতে বলল—'আপনার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আছে?'

'আছে। এনে দেব?'

'আপনার স্ত্রীর এবং মেয়ের ওয়াটারপ্রুফ?'

'মেয়েদের জন্যে একটাই মেয়েলি ওয়াটারপ্রুফ আছে।'

'দয়া করে ও-দুটো এনে দিন, আমরা নিয়ে যাব। দু-চারদিনের মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

'নিয়ে যাবেন, বেশ তো, তা এনে দিচ্ছি।'

অজয় অন্দরে গিয়ে দু-হাতে দুটি ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল। রাখালবাবু সে-দুটি পাট করে বগলে নিলেন, বললেন—'আচ্ছা, আজ উঠি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

অজয় কাঁচুমাচু হয়ে ব্যোমকেশকে বলল—'চললেন? একটা অনুরোধ ছিল, সাহস করে বলতে পারছি না—।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনার একটা ফটো তুলব। আমার ক্যামেরা আছে, যদি অনুমতি করেন একটা তুলে নিই। আপনার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'ফটো তুলবেন! তা—আপত্তি কী। আমার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখার আগ্রহ আজ পর্যন্ত কারও দেখা যায়নি।'

অজয় দ্রুত গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এল। সাধারণ বক্স-ক্যামেরা। সে বললে—'এখনও যথেষ্ট আলো আছে। আপনি জানলার কাছে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ জানলার পাশে পড়ন্ত আলোয় দাঁড়াল। ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হল।

'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!' শুনতে-শুনতে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দুজনের কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হলো; তারপর ব্যোমকেশ বর্ষাতি দুটো নিয়ে নিচে নেমে গেল. রাখালবাবু তেতলায় উঠে গেলেন। ওপরে কনস্টেবল টুলের ওপর বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে ঘরের দোর খুলে রাখালবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘুরলেন। তারপর দোরের বাইরে ফিরে এসে দেখলেন, মেদিনী ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'মেদিনী, তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি তাই ডেকেছি।'

মেদিনী ব্যায়ত বিহ্বল চোখে চাইল, তারপর চোখের ওপর আঁচল চাপা দিল। রাখালবাবু বললেন—'বলো দেখি, সেদিন সকালে তুমি যখন তোমার স্বামীর মৃতদেহ প্রথম দেখলে তখন সে কি চিৎ হয়েছিল?'

অবরুদ্ধ উত্তর এল—'জি, হাঁ।'

রাখালবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—'আচ্ছা-আচ্ছা, ও-কথা থাক। এবার একবার ঘরের মধ্যে এসো।'

মেদিনী চোখের জল মুছে থমথমে মুখ নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। রাখালবাবু চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন—'ঘরটা ভালো করে দেখো। তুমি আগে অনেকবার দেখেছ। কোথাও কোনও তফাত বুঝতে পারছ?'

মেদিনী বলল—'খাটের ওপর বিছানা নেই।'

'তা ছাড়া আর কিছু?'

মেদিনী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নাড়ল—'আর কোনও তফাত বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

'হুঁ। আচ্ছা হয়েছে, এবার নিচে চলো।'

মেদিনীকে নিয়ে রাখালবাবু নিচে নেমে গেলেন। মেদিনী নিজের ঘরে চলে গেল। রাখালবাবু ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দেখলেন ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে। দুজনের চোখাচোখি হল। ব্যোমকেশ বাঁকা হেসে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর খাড়া হয়ে বসে বলল —'শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল, এবার আমি বাড়ি ফিরব। তোমার কতদূর?'

রাখাল বললেন—'গঙ্গাধর ঘোষালকে দর্শন করবেন না?'

'ওহো তাই তো, গঙ্গাধরকে দর্শন করা হল না। আজ থাক, সন্ধে হয়ে গেছে, তিনি হয়তো ভূমানন্দে আছেন। কাল সকালে তাঁকে দর্শন করা যাবে।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নিখিলের চিঠিগুলি নিয়ে রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এগুলোতে মেয়েলি আঙুলের ছাপ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখো। আজ চলি।'

'চলুন, আমিও যাই। বর্ষাতিগুলো পরীক্ষা করতে হবে।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়ে দেখল, রাখালবাবু সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এবং সনতের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যোমকেশ যেতেই তিনি বললেন— 'শুনেছেন ব্যোমকেশদা, মেদিনীর ঘর থেকে একটা বাক্স চুরি গেছে, টয়লেটের বাক্স।'

ব্যোমকেশ ভুরু উঁচু করে বলল—'টয়লেট-বক্স। সে কী, কী করে চুরি গেল?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে কাল সন্ধেবেলা মেদিনীকে আমি তেতলায় ডেকেছিলাম, ওর ঘর খোলা ছিল, সেইসময় হয়তো কেউ সরিয়েছে। তাই এঁদের জিগ্যেস করছিলাম এঁরা কিছু জানেন কি না।'

সনৎ বলল—'আমি কী করে জানব বলুন। মেদিনীর ঘরের মধ্যে কখনও পদার্পণ করিনি, কোথায় কী আছে কোত্থেকে জানব?'

নিখিল বলল—'দোহাই দারোগাবাবু, আমি টয়লেট-বক্স চুরি করিনি। আমার ঘরে চুল বেঁধে টিপ পরার মানুষ নেই।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'মকরন্দকে জেরা করেছিলে?'

'করেছিলাম। তাদের ফ্ল্যাট আবার খানাতল্লাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।'

'এঁদের ঘর?'

'এইবার করব।' রাখালবাবু একজন জমাদারকে এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ডেকে বললেন— 'তোমরা এঁদের ঘর দুটো আবার ভালো করে খানাতল্লাশ কর, মেদিনীর চুল-বাঁধার বাক্সটা পাও কি না দ্যাখো। আমরা দোতলায় গঙ্গাধরবাবুর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল—'করুন, করুন, যত ইচ্ছে খানাতল্লাশ করুন, কিন্তু আমার দামি ক্যামেরাগুলো ভাঙবেন না।'

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

দোতলায় উঠে তাঁরা দেখলেন বারান্দার অপর প্রান্তে গঙ্গাধরের ফ্ল্যাটে সদর দরজা খুলে তার মেয়ে ঝিল্লী বেরিয়ে এল, দরজা ভেজিয়ে দু-পা এসে তাদের দেখে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাখালবাবু তার কাছে এসে ব্যোমকেশকে বললেন—'এর নাম ঝিল্লী, গঙ্গাধরবাবুর মেয়ে। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

ঝিল্লী সলজ্জ অস্ফুটস্বরে বলল—'মামিমা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ ঝিল্লীর সংকোচনম্র কমনীয় মুখের পানে চেয়ে হাসল—'আমাদের দেখে এত লজ্জা কিসের? আমরা বাঘ-ভাল্লুক নয়, কামড়ে দেব না।'

ঝিল্লী একটু হেসে চোখ তুলল। ব্যোমকেশ দেখল চোখ দুটি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাখালবাবু পরিচয় দিলেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী।'

BanglaBook.org

ঝিল্লীর চোখে উৎসুক আলো ফুটে উঠল, তারপর আস্তে-আস্তে তার মুখের ওপর অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ল। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে কিছু জানবার আছে।'

ঝিল্লী দাঁড়াল, কিন্তু ব্যোমকেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'লাবণির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধার পর ঝিল্লী ঘাড় নাড়ল।

'সে তোমাকে নিজের মনের কথা বলত, তুমি তাকে নিজের মনের কথা বলতে। কেমন?'

ঝিল্লী উত্তর দিল না, সতর্কভাবে অপেক্ষা করে রইল।

'লাবণি নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল, সে তার নাচের মাস্টার পরাগ লাহাকে ভালোবাসে।'

ঝিল্লী ঘাড় নিচু করে অস্ফুটস্বরে বলল—'বলেছিল।'

'সে পালিয়ে গিয়ে পরাগকে বিয়ে করবে বলেছিল?'

ঝিল্লী উৎফুল্ল চোখ তুলল—'লাবণি ওকে বিয়ে করেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি জানতে না।'

'না।'

'কিন্তু জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছ।'

ঝিল্লী হেসে ফেলল।

ঝিল্লীকে ছেড়ে গঙ্গাধরের দোরের দিকে যেতে-যেতে রাখালবাবু খাটো গলায় বললেন—'আপনার মন বিচিত্র কুটিল পথে চলেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গঙ্গাধরের দোরে টোকা দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর থেকে কড়া আওয়াজ এল—'কে? ভেতরে এসো।'

দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিল, তার সামনে চেয়ারে বসে গঙ্গাধর তাস নিয়ে সলিটেয়ার খেলছিল, রাখালবাবুর দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বলল—'আবার কী চাই?'

গঙ্গাধরের ভাবভঙ্গি এখন অন্যরকম। নিজের টাকাকড়ি উড়িয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হবার পর সে কচ্ছপের মতো হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর হালের আইন অনুযায়ী সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে এই অনিবার্য সম্ভাবনার ফলে সে আবার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে, তার আচার-আচরণে বনেদী বড়মানুষের মজ্জাগত আত্মম্ভরিতা আবার ফুটে উঠেছে।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর রাখালবাবু যখন বললেন—'ইনি আমার সহকারী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।' তখন গঙ্গাধর উদ্ধতকণ্ঠে বলে উঠল—'তাতে কী হয়েছে? So what?'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, সে গঙ্গাধরের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—'আপনার নাম গঙ্গাধর ঘোষাল, কয়েক বছর আগে আপনি রেস-কোর্সের এক জকিকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করার জন্যে আইনের হাতে পড়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আরক্ত চোখে গর্জে উঠল—'তাতে আপনার কী?'

ব্যোমকেশ আঙুল তুলে বলল—'আপনি দাগী আসামী, আপনাকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা যায়। আপনার শ্বশুর উইল দস্তখত করার আগের রাত্রে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে তাঁকে খুন করেছে?'

বেগবান ঘোড়া হোঁচট লেগে যেন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। গঙ্গাধরের দম্ভস্ফীত মুখ তুবড়ে গেল, সে ভীতস্বরে বলল—'আমি কী জানি! আমি কী জানি!'

ব্যোমকেশ এবার একটু ঠাণ্ডা হল, বলল—'বেণীমাধববাবুকে খুন করার স্বার্থ আপনারও আছে, অজয়বাবুরও আছে; কিন্তু আপনি জামাতা, দশম গ্রহ।'

BanglaBook.org

উত্তরে গঙ্গাধর দু-বার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তখন সহজ সুরে বলল—'আপনার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, বেশি তেজ দেখাবেন না।'

এই সময় গায়ত্রী ভিতর দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল। আঁচলটা কোমরে জড়ানো, চোখে তীব্র দৃষ্টি, যুদ্ধং দেহি ভাব। সে একটা চেয়ারে বসে ব্যোমকেশকে কড়া সুরে বলল—'কী জানতে চান আমাকে বলুন।'

ব্যোমকেশ গায়ত্রীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল—'আপনি বেণীমাধববাবুর মেয়ে গায়ত্রী দেবী। আপনাকেও কিছু প্রশ্ন আছে। আপনার বাবা উইল সই করবার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছে। কিন্তু তাঁর আগের কোনও উইল আছে কি না আপনি জানেন?'

এতক্ষণে গঙ্গাধর কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, সে বলে উঠল—'আমার শ্বশুর ইনটেসটেট মারা গেছেন।'

গায়ত্রী অমনি ধমক দিয়ে উঠল—'তুমি চুপ করো। আমার বাবার অন্য কোনও উইল নেই। তিনি যা রেখে গেছেন নতুন আইনের জোরে তার অর্ধেক আমি পাব।'

'বেণীমাধববাবু বিষয়ী লোক ছিলেন, এত বয়স পর্যন্ত তিনি উইল করেননি এ কি সম্ভব? হয়তো পুরনো উইল বেরুবে, যাতে তিনি অন্য কাউকে যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। হয়তো আপনার জন্য মাসোহারা বরাদ্দ করে বাকি সব টাকা অজয়বাবুকে দিয়ে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গায়ত্রী প্রায় চিৎকার করে উঠল—'না-না-না, বাবা কখনও আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি দাদার চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালোবাসতেন।'

'বসুন-বসুন। আমি বলছি না যে, বেণীমাধববাবুর অন্য উইল আছেই। কিন্তু তিনি ভাগনেদেরও ভালোবাসতেন, বাড়িতে এনে রেখেছিলেন; তাদের কি কিছুই দিয়ে যাননি?'

গায়ত্রী আবার চেয়ারে বসে বলল—'ওরা বাবার আসল ভাগনে নয়, মামাতো বোনের ছেলে। সনতের বাপ দুশ্চরিত্র ছিল, স্ত্রীকে খুন করে ফাঁসি যায়; নিখিলের বাপ সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল। ওদের কেন বাবা টাকা দিয়ে যাবেন?'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। বলুন দেখি, আপনার বাড়িতে ক'টা বর্ষাতি আছে।'

গায়ত্রী হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'দুটো আছে। একটা ওঁর, একটা ঝিন্নীর।'

'ও দুটো বার করে দিন, আমরা নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন! কেন?'

'দরকার আছে। দু-চারদিন পরে ফেরত পাবেন।'

গায়ত্রী আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেল, বলল—'কী দরকার জানি না। এনে দিচ্ছি।'

নিচে নেমে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করলেন—'এবার?'

ব্যোমকেশ বলল—'চলো আমার বাড়ি। নিভৃতে পরামর্শ করা যাক। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'চলুন।'

বাড়িতে এসে ব্যোমকেশ চায়ের ফরমাস দিল। সত্যবতী চা এবং আলুর চপ রেখে গেল। অতঃপর পানাহার এবং সিগারেট সহযোগে পরামর্শ শুরু হল।

একঘণ্টা পরে রাখালবাবু বললেন—'বেশ, এই কথা রইল। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার রাহাখরচ ইত্যাদি দেওয়া হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আজ বিকেলে পাকা খবর পাবেন।'

রাখালবাবু চলে যাবার পর সত্যবতী ঘরে ঢুকল, ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক

BanglaBook.org

স্বরে বলল—হ্যাঁ গা, কী তোমাদের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙল। —'আমাকে বোধহয় কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'তা কি জানি!'

'তুমি জানো না তা কি কখনো হয়। নিশ্চয় জানো।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল—'বেশ, জানি কিন্তু বলব না।'

সত্যবতী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেল চারটের সময় রাখালবাবুর ফোন এল—'সব ঠিক। আপনি একটা সুটকেস নিয়ে সটান থানায় চলে আসুন।'

ব্যোমকেশের অনুপস্থিতিকালে বেণীমাধবের বাড়ির কর্মসূচী আগের মতোই বলবৎ রইল। কারুর বাইরে যাবার হুকুম নেই। একজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন জমাদার এবং চারজন কনস্টেবল হামেহাল মোতায়েন রইল। রাখালবাবু দু-বেলা এসে পরিদর্শন করে যেতে লাগলেন। বেণীমাধবের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হল না। মেদিনীর সাজের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছিল, অদৃশ্যই রয়ে গেল।

একদিন লাবণি তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল। রাখালবাবু তাদের দেখা করতে দিলেন। বন্ধ দরজার অন্তরালে অজয়-পরিবার কীভাবে মেয়ে-জামাইয়ের সংবর্ধনা করল তা জানা গেল না। লাবণিরা যখন বেরিয়ে এল তখন লাবণির মুখে হাসি, চোখে জল। বারান্দায় ঝিল্লীর সঙ্গে লাবণির দেখা হল; দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর হাত-ধরাধরি করে নিচে নেমে এল। নিচের বারান্দায় নিখিল ছিল, সে নবদম্পতিকে দেখে হো-হো করে হেসে বলল—'এই যে পলাতক আর পলাতকা! দুজনে মিলে খুব নাচছ তো?'

পরাগ কপট বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ মুখভঙ্গি করে বলল—'দুজনে মিলে নাচা আর হচ্ছে কই? এখন আমি নাচছি, লাবণি নাচাচ্ছে।'

লাবণিরা চলে যাবার পর নিখিল ঝিল্লীকে বলল—'কী, তুমি আর দেরি করছ কেন? একজন তো নাচিয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল, এবার তুমি একটা গাইয়েকে নিয়ে কেটে পড়ো।

ঝিল্লী ভুরু বেঁকিয়ে নিখিলের পানে তাকাল—'আমি কেটে পড়ব না। কিন্তু তোমার খবর কী? যে তোমাকে চিঠি লেখে তাকে ধরতে পারলে?'

নিখিল বলল—'ধরিনি এখনও, কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। ব্যোমকেশবাবু বলেছেন শিগগির ধরে দেবেন। যেই ধরব অমনি পটাস করে বিয়ে করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মুচকি হেসে ঝিল্লী ওপরে চলে গেল।

পাঁচদিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হল, রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল—'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'

বিকেল চারটের সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, ড্রয়িংরুমে বাড়ির ন'জন লোক উপস্থিত আছে; অজয়-আরতি-মকরন্দ একটা সোফায় বসেছে, অন্য সোফায় বসেছে গঙ্গাধর-গায়ত্রী আর ঝিল্লী। সনৎ আর নিখিল দুটো চেয়ারে দূরে-দূরে বসেছে; আর মেদিনী মেঝের

BanglaBook.org

ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে উদাসভাবে বসে আছে। সকলের মুখেই বিরক্তি ও অবসাদের ব্যঞ্জনা। ড্রয়িংরুমের দোরে ও বারান্দায় পুলিশ গিজগিজ করছে। রাখালবাবু একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন।

ব্যোমকেশ পৌঁছুতেই রাখালবাবু তাকে বললেন—'সব তৈরি, এবার তবে আরম্ভ করা যাক।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'হিশ্মৎলাল?'

রাখালবাবু বললেন—'তাকে লুকিয়ে রেখেছি। যথাসময়ে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে।'

'বেশ, এসো তা হলে। তোমার হাতে ওটা—? ও বুঝেছি।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। সকলে নড়েচড়ে বসল, মকরন্দর মুখের ভ্রূকুটি গভীরতর হল। রাখালবাবু মাঝখানের নিচু টেবিলটাকে একপাশে টেনে এনে দুটো হাল্কা চেয়ার তার সামনে রাখলেন; হাতের সুটকেস টেবিলের ওপর রেখে ব্যোমকেশকে বললেন—'বসুন।' নিজে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল, বলল—'আপনারা শুনে সুখী হবেন বেণীমাধববাবুর হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে পেরেছি, আততায়ীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। আসামী এই ঘরেই আছে, এখনই তার পরিচয় পাবেন।'

সকলে সন্দেহভরা চোখে পরস্পর তাকাতে লাগল; বেশি দৃষ্টি পড়ল গঙ্গাধরের ওপর। ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলে চলল—'আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলাম, ভেবেছিলাম বেণীমাধববাবুই আসামীর প্রধান লক্ষ্য। ভুলটা অস্বাভাবিক নয়; বেণীমাধববাবু বড়মানুষ ছিলেন, তিনি এমন উইল করতে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল; মেঘরাজ ছিল বেণীমাধবের দ্বাররক্ষী, বেণীমাধবকে যে-ব্যক্তি মারতে চায় সে মেঘরাজকে না মেরে ঘরে ঢুকতে পারবে না তাই তাকে মেরেছে। মেঘরাজের মতো লোক যে হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

'আমি একদিন বেণীমাধববাবুর ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ক্ষুর রয়েছে; সাবেক কালের লম্বা ক্ষুর, যে-ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করে পরীক্ষা করলাম, তাতে কোথাও একটিও আঙুলের ছাপ নেই; কে যেন খুব সাবধানে ক্ষুরটি মুছে খাপের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তত মেঘরাজের আঙুলের ছাপ তাতে থাকা উচিত।

'সন্দেহ হল। সেই ক্ষুর দিয়ে আমি নিজে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখলাম ক্ষুর একেবারে ভোঁতা, তা দিয়ে দাড়ি কামানো দূরের কথা, পেন্সিল কাটাও যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই ক্ষুর দিয়েই দুজন লোকের গলা কাটা হয়েছে এবং তার ফলেই ক্ষুরটি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও প্রমাণ হল যে, ওই ক্ষুর দিয়েই দুজনের গলা কাটা হয়েছিল।

'কিন্তু ক্ষুর ছিল ঘরের মধ্যে, আসামী এসেছিল বাইরে থেকে ; ঘরে ঢোকবার আগেই সে ক্ষুর পেল কোথা থেকে? নিশ্চয় কেউ ক্ষুরটি আগেই ঘর থেকে সরিয়েছিল।

'কে সরাতে পারে? সেদিন সকালে মেঘরাজ ওই ক্ষুর দিয়ে বেণীমাধবের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল; তারপর সারাদিনে তাঁর ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ ক্ষুরের কাছে যায়নি। ও-ঘরে নিত্য আসে যায় কেবল দুজন : মেঘরাজ আর মেদিনী। মেঘরাজ নিজে গলা কাটবার জন্যে ক্ষুর চুরি করবে না। তাহলে বাকি রইল কে?'

সকলের দৃষ্টি মেদিনীর ওপর গিয়ে পড়ল। মেদিনী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আগের মতোই বসে আছে, মাথার ওপরকার আঁচলটা দু-হাতে একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ সনৎ কথা বলল—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। হত্যাকারী মামার ক্ষুর দিয়ে গলা

BanglaBook.org

কাটতে গেল কেন? অন্য অস্ত্র কি ছিল না?'

ব্যোমকেশ বলল—'আসামী লোকটা ভারি ধূর্ত। সে জানে যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় সে-অস্ত্রকে বেবাক লোপাট করে দেওয়া সহজ নয়। তাই সে মতলব করেছিল, বেণীমাধবের ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবার পর ক্ষুরটি ভালো করে মুছে যথাস্থানে রেখে দেবে, ওই ক্ষুর দিয়ে যে খুন হয়েছে এ-কথা কারুর মনেই আসবে না, পুলিশ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। এবার আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।'

ব্যোমকেশ আবার নির্লিপ্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল—'মেদিনী ছোটঘরের মেয়ে, কিন্তু পুরুষের চোখ দিয়ে যারা ওর পানে তাকিয়েছে তারাই জানে কী প্রচণ্ড ওর দেহের চৌম্বক শক্তি। সে সুচরিত্রা মেয়ে কি না তা আমরা জানি না। যদি কুচরিত্রা হয় তা হলে মনে রাখতে হবে যে, মেঘরাজ ও বৃদ্ধ বেণীমাধব ছাড়া বাড়িতে আরও পাঁচজন সমর্থ পুরুষ আছে। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আসক্তির ফলে অসংখ্য ট্র্যাজেডি ঘটেছে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'আমরা মেদিনীর ঘরে গিয়ে তাকে জেরা করেছিলাম; মেঘরাজের সৈনিক জীবনের দলিলপত্র থেকে তার দিল্লির ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। তারপর একটা প্রত্যাশিত জিনিস পেলাম। মেদিনীর একটি চুল-বাঁধার কাঠের বাক্স ছিল, তার ডালা খুলে দেখলাম আয়নার ওপর একটা ফটো আঁটা রয়েছে। মেদিনীর ফটো, সাম্প্রতিক ছবি। সে খাটের ধারে বসে হাসছে। আমি আবার বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম, মেদিনী কিছু জানতে পারল না। পরদিন শুনলাম বাক্সটা চুরি গিয়েছে।' ব্যোমকেশ ঘাড় তুলে রাখালবাবুর পানে চাইল।

রাখালবাবু টেবিলের ওপরে সুটকেসটা খুলতে-খুলতে অবিচলিত মুখে বললেন—'চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে বার করেছি।' তিনি সুটকেস থেকে প্রসাধনের বাক্সটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'ছবিটা আছে নিশ্চয়।'

রাখালবাবু ডালা খুলে বললেন—'আছে।' কে চুরি করেছিল, কোথায় পাওয়া গেল এ-সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। মনে হয়—চুরির ব্যাপারটা নিছক ধোঁকার টাটি।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। তারপর আমরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একে-একে দেখা করলাম। বাড়িতে যতগুলো বর্ষাতি ছিল সংগ্রহ করলাম; কেবল মকরন্দর বর্ষাতি পাওয়া গেল না। মকরন্দ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বেণীমাধবের হুকুমে মেঘরাজ তার গালে চড় মেরেছিল; অর্থাৎ দুজনেরই ওপর তার গভীর আক্রোশ। সে-রাত্রে ন'টার সময় সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর গভীর রাত্রে কখন চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। সে যখন রেস-কোর্সে ধরা পড়ল তখন তার পকেটে পৌনে দুশো টাকা ছিল। কোথা থেকে সে এত টাকা পেল তা বলতে চায় না।

'যাহোক, বর্ষাতি কেন সংগ্রহ করলাম সেই কথা বলি। যারা মতলব এঁটে ঘুমন্ত লোকের গলা কাটতে যায় তারা জানে এই উপায়ে নিঃশব্দে খুন করা যায় বটে, কিন্তু আততায়ীর নিজের কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত লাগার সম্ভাবনা। কাপড়-চোপড়ে রক্ত লাগলে সহজে ধোয়া যায় না, রক্তের দাগ থেকে যায়। তাই পাশ্চাত্য দেশে খুন করবার সময় খুনী গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নেয়; বর্ষাতির তেলা গায়ে যেটুকু রক্ত লাগে তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। পাশ্চাত্য রহস্য-রোমাঞ্চের বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই এ-কথা জানেন। আমরা বর্ষাতিগুলোকে মালিকের নামের টিকিট মেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলাম।

'তারপর আমি গেলাম দিল্লি। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আসামী কে, কিন্তু আরও পাকা প্রমাণের দরকার ছিল। দিল্লিতে গিয়ে যে-বস্তিতে মেঘরাজ থাকত, সেখানে খোঁজখবর নিতেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। মেদিনী মেঘরাজের স্ত্রী নয়। মেঘরাজ বিপত্নীক ছিল; বেণীমাধব যখন

BanglaBook.org

তাকে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এসো, তখন সে দিল্লি গিয়ে মেদিনীকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে এল। মেদিনীর স্বামী আছে, কিন্তু তার চরিত্র ভালো নয়; মেঘরাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল; সে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এল। বুঝে দেখুন, মেদিনী কীরকম মেয়েমানুষ।'

মেদিনীর চোখ আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—'না, না, ঝুট বাত।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে চোখ তুলল, তিনি দোরের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'হিম্মৎলাল!'

যে-পশ্চিমা যুবককে ব্যোমকেশ দিল্লি থেকে সঙ্গে এনেছিল সে ঘরে প্রবেশ করল; চুড়িদার পায়জামা ও শেরোয়ানি পরা ক্ষীণকায় যুবক। ব্যোমকেশ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেদিনীকে জিগ্যেস করল—'একে চিনতে পারো?'

মেদিনী তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভয়ার্ত চোখে হিম্মৎলালের দিকে একবার চেয়ে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

'হিম্মৎলাল, মেদিনী তোমার কে?'

'জি, মেদিনী আমার বিয়াহী ঔরৎ, আমাকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও।'

হিম্মৎলাল মেদিনীর পানে বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—'দেখা যাচ্ছে মেদিনীই যত নষ্টের গোড়া। সে স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এখানে এসে আর-একজন উচ্চতর বর্গের মানুষকে তার মোহময় কুহকজালে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেঘরাজ কড়া প্রকৃতির লোক, সে জানতে পারলে মেদিনীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে; তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু একলা মেঘরাজকে খুন করলে ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই মেঘরাজের সঙ্গে বেণীমাধবকেও খুন করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বেণীমাধবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরোধ যে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে তা মেদিনীর অজানা ছিল না।

'কিন্তু সত্যিই কি মেদিনী নিজের হাতে দুর্জনের গলা কেটেছে? ছোরা-ছুরি-ক্ষুর মেয়েদের অস্ত্র নয়, মেয়েদের অস্ত্র বিষ; বিষ খাওয়াবার সুযোগ থাকলে তারা ছোরা-ছুরি ব্যবহার করে না। মেদিনীর বিষ খাওয়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে বেণীমাধব ও মেঘরাজের খাবার নিজের হাতে রান্না করত।

'দেখা যাক, মেদিনীর সহকারী কে। মেদিনী, তোমার চুল-বাঁধার বাক্সে আয়নার গায়ে একটা ফটো লাগানো আছে। কে ফটো তুলেছিল?'

মেদিনী উত্তর দিল না, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ব্যোমকেশ তখন সনতের দিকে ফিরে বলল—'সনৎবাবু, আপনি ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ, দেখুন তো একবার ছবিটা।'

সনৎ ব্যোমকেশের পানে সন্দেহভরা ভ্রূকুটি করল, তারপর অনিচ্ছাভরে উঠে এল। রাখালবাবু বাক্সের ডালা খুলে ধরলেন। সনৎ সামনে ঝুঁকে ছবিটা দেখল; তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'মেদিনীর ছবি।'

ব্যোমকেশ বলল—'কে ছবি তুলেছে বলতে পারেন?'

'তা কী করে বলব!'

'ভালো করে দেখুন। মেদিনীকে খাটে বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, মেদিনীর পেছনে খাটের মাথায় কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। কার খাট চিনতে পারছেন না?'

সনতের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কী বলতে চান আপনি?'

BanglaBook.org

ব্যোমকেশ বলল—'আপনি নিজের ঘরে রাত্তির বেলা ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে মেদিনীর ছবি তুলেছিলেন। আপনি মেদিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী। মেঘরাজ যখন বেণীমাধবের দোরের সামনে শুয়ে ঘুমোত তখন মেদিনী আপনার ঘরে যেত।'

সনৎ কিছুক্ষণ জবাফুলের মতো লাল চোখে চেয়ে রইল, শেষে বিকৃত গলায় বলল—'তাতে কি প্রমাণ হয় আমি মামাকে খুন করেছি?'

'সনৎবাবু, আপনি মেদিনীর মোহে পড়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলেন, মেঘরাজকে খুন করে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার বোধহয় প্ল্যান ছিল খুনের মামলা মিটে গেলে মেদিনীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধবেন।'

'আমি খুন করিনি।'

'আপনার দেহে খুনীর রক্ত আছে, আপনার বাবা আপনার মাকে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন।'

'আমি খুন করিনি। খুন করেছে—ওই মেদিনী।'

মেদিনী ধড়মড়িয়ে হাঁটুর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—'নেহি-নেহি-নেহি—।'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিক কথা। মেদিনী নিজের হাতে খুন করেনি। খুন করেছেন আপনি।'

'প্রমাণ আছে?'

'ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। খুন করার পর আপনি বর্ষাতিটাকে খুব ভাল করেই ধুয়েছিলেন, কিন্তু পকেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রক্তটা বেণীমাধববাবুর ব্লাড-গ্রুপের রক্ত।'

মেদিনী বলে উঠল—'হাঁ-হাঁ, সনৎবাবু খুন করেছে, আমি কিছু জানি না, আমি বেকসুর।'

হঠাৎ সনৎ বুনো মোষের মতো ঘাড় নিচু করে চাপা গর্জন করতে-করতে মেদিনীর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দুজন সাব-ইন্সপেক্টর ইতিমধ্যে সনতের দু-পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা সনতকে ধরে ফেললেন। রাখালবাবু তার হাতে হাতকড়া পরালেন। সনতের ক্ষিপ্র উন্মত্ততা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুই প্রহরীর মাঝখানে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেদিনী আবার বলে উঠল—'আমি কিছু জানি না, আমি বেকসুর।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'না মেদিনী, তুমি বেকসুর নও। বেণীমাধববাবুর ক্ষুর চুরি করে তুমিই সনৎবাবুকে দিয়েছিলে। তারপর সে যখন গভীর রাত্রে ফিরে এসে সদর দোরে টোকা দিয়েছিল তখন তুমি দোর খুলে তাকে ভিতরে এনেছিলে; সে কাজ সেরে চলে যাবার পর তুমি দোর বন্ধ করে দিয়েছিলে। তোমরা দুজন সমান অপরাধী।'

মেদিনী আবার মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আসামী দুজনকে চালান করে দিয়ে রাখালবাবু বাড়ির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যা। রাখালবাবু সনতের ঘরে গিয়ে তার আলমারি খুলে অ্যালবামের সারি থেকে একটি-একটি অ্যালবাম খুলে পাতা উল্টে দেখছিলেন। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে-টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাখালবাবু অবশেষে একটি অ্যালবাম হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন, নিবিষ্ট মনে অ্যালবামের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি শিথিলবসনা তরুণীর ছবি। শিকারী যেমন বাঘ শিকার করে তার চামড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, সনৎ যেন প্রকারান্তরে তাই করেছে।

অ্যালবাম শেষ করে রাখালবাবু একটি নিশ্বাস ফেললেন, সিগারেট ধরিয়ে বললেন—'সনৎ গাঙ্গুলির রক্তে হয়তো পাগলামির বীজ আছে, কিন্তু সে যে একটি রসিক চূড়ামণি তাতে সন্দেহ নেই।'

BanglaBook.org

ব্যোমকেশ কাছে এসে অ্যালবামের পাতা উল্টে দেখল, তারপর বলল—'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। সনৎ নরকের অনেকগুলো দ্বার খুলেছিল, তাই শেষপর্যন্ত তার নরক-প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ল।'

'কিন্তু সনৎ মেদিনীর মতো মেয়ের জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাজ করল ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'রাখাল, মেদিনীর মতো মেয়েকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। যুগে-যুগে এই জাতের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছে—কখনও ধনীর ঘরে, কখনও দরিদ্রের ঘরে—পুরুষের সর্বনাশ করার জন্যে। দ্রৌপদী এই জাতের মহিলা ছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছেন দ্রৌপদী। ইলিয়ডের হেলেনও তাই। এ-যুগেও এই জাতের মেয়ের অভাব নেই। ওরা সকলেই যে চরিত্রহীনা তা নয়, কিন্তু ওদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকে—বিশেষত সনৎ-এর মতো দুশ্চরিত্র পুরুষকে—খেপিয়ে দিতে পারে, কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত করে তুলতে পারে। জ্যেষ্ঠ আলেকজান্ডার দুমা একটা বড় দামি কথা বলেছিলেন —cherchez la femme : যেখানে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেখানে মেয়েমানুষ খুঁজবে, মূলে মেয়েমানুষ আছে।'

'তা বটে।' রাখালবাবু উঠলেন—'দেখা যাচ্ছে বেণীমাধবের মেয়ে এবং পুত্রবধূ তাঁকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেনি, বৃদ্ধের জীর্ণ পাকযন্ত্রই দায়ী। চলুন, এবার যাওয়া যাক। সন্ধে হয়ে গেছে, এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

'চলো আমার বাড়িতে, তরিবৎ করে চা খাওয়া যাবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

ঘরের বাইরে এসে রাখালবাবু দোরে তালা লাগালেন, তারপর সদর দরজার দিকে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ঝিন্নী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার পিছনে প্রকাণ্ড ট্রে-র ওপর চায়ের সরঞ্জাম এবং কচুরি-নিমকির প্লেট নিয়ে দাসী আসছে। ব্যোমকেশ বলল—'রাখাল, তোমার প্রাণের কান্না ভগবান শুনতে পেয়েছেন। চলো, ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা যাক।'

রাখালবাবু সাবধানী লোক, বললেন—'দাঁড়ান, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

ঝিন্নী তাদের কাছে এসে সলজ্জ স্বরে বলল—'মা আপনাদের জন্যে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

'দেখলে তো?' সকলে ড্রয়িংরুমে গেল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল; ঝিন্নীও তার অনুগমন করছিল, ব্যোমকেশ বলল—'ঝিন্নী, আমরা বড় ক্লান্ত; তুমি আমাদের চা ঢেলে দাও, আমরা বসে-বসে খাই।'

ঝিন্নী ফিরে এসে টি-পট থেকে তাদের চা ঢেলে দিল, জলখাবারের প্লেট তাদের সামনে রাখল। ব্যোমকেশ অর্ধমুদিত চোখে কচুরি চিবোতে-চিবোতে দেখল, ঝিন্নী গুটি-গুটি দোরের দিকে যাচ্ছে।

'ঝিন্নী, শোনো, চলে যেয়ো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঝিন্নী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আস্তে-আস্তে ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়াল। ব্যোমকেশ সংকেতভরা চোখে রাখালবাবুর পানে তাকাল, রাখালবাবু অলসভাবে চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটি গানের কলি গুঞ্জন করতে-করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ঝিন্নী ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার যে বুক ঢিবঢিব করছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। ব্যোমকেশ খাটো গলায় একটু হাসল, বলল—'সম্পর্কে নিখিল তোমার মামা হয় বটে, কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক। আইনত বিয়ে আটকায় না।'

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা গেল না—ঝিন্নীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপর তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—'কী করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'বোকা মেয়ে! সবগুলো চিঠিতেই তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

BanglaBook.org

—আচ্ছা, তুমি এখন কোণের চেয়ারে গিয়ে বোসো। আরও কথা আছে।'

ঝিল্লী নেংটি ইঁদুরের মতো ঘরের অন্ধকার কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে যেন ব্যোমকেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে দু-জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। রাখালবাবু নিখিলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

'রাখাল, আলোটা জ্বেলে দাও।'

দোরের পাশে স্যুইচ। রাখালবাবু স্যুইচ টিপলেন, কয়েকটা উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলে উঠল। নিখিল কোনওদিকে না তাকিয়ে ব্যোমকেশের পাশে গিয়ে বসল, অনুরাগপূর্ণ চোখে তার পানে চেয়ে বলল —'ব্যোমকেশদা, আপনি ভেলকি জানেন। সনৎদা আমার মাসতুতো ভাই, তাকে সারাজীবন দেখছি, কিন্তু সে যে এমন মানুষ তা ভাবতেও পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিখিল, মুখ দেখে যদি মানুষের মনের কথা জানা যেত, তা হলে আইন, আদালত, পুলিশ, সত্যান্বেষী কিছুই দরকার হত না; তুমিও মুখ দেখেই বুঝতে পারতে কোন মেয়েটি তোমাকে বেনামী চিঠি লেখে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' নিখিল ব্যোমকেশের আর একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস করে বলল—'আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ হাসল—'আগে তুমি বলো দেখি, মেয়েটির সন্ধান যদি পাওয়া যায় তুমি কী করবে?'

নিখিলের চোখ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠল—'কী করব? বিয়ে করব। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাফ্রি হোক, হাবসি হোক, তাকে বিয়ে করব।'

ব্যোমকেশ বলল—'তাহলে সন্ধান পাওয়া গেছে। ঝিল্লী, এদিকে এসো।'

নিখিল চকিত হয়ে দোরের দিকে চাইল। ওদিকে ঘরের কোণে ঝিল্লীর সাড়াশব্দ নেই, সে চেয়ারের পিছনে লুকিয়েছে। নিখিল ব্যোমকেশের দিকে ফিরে উত্তেজিতস্বরে বলল—'কাকে ডাকলেন?'

'এই যে দেখাচ্ছি—' ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে ঝিল্লীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল, তাকে হাত ধরে নিখিলের কাছে এনে বলল—'এই নাও তোমার ঝিঁঝিঁপোকা। ঝিঁঝিঁপোকাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল ঝংকার শোনা যায়। আমরা কিন্তু ধরেছি।'

নিখিলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সে দু-হাত তুলে চিৎকার করল—'অ্যাঁ! ঝিল্লী—ঝিল্লী আমাকে চিঠি লেখে! ঝিল্লী আমাকে ভালোবাসে! কিন্তু—কিন্তু ও যে আমার ভাগনী!'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'ভয় নেই, ভয় নেই। ঝিল্লী ভারি সেয়ানা মেয়ে, অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করেনি। তোমাদের যা সম্পর্ক তাতে বিয়ে আটকায় না।'

ঝিল্লীর মুখ অবনত, ঠোঁটের কোণে ভীরু হাসির যাতায়াত। নিখিলের মুখে ক্রমে-ক্রমে একটি প্রকাণ্ড হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—'উঃ! কী সাংঘাতিক আজকালকার মেয়ে দেখেছেন ব্যোমকেশদা, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বিয়েটা হয়ে যাক—।'

এইসময় দোরের সামনে গঙ্গাধরকে দেখা গেল। লাঠি হাতে সে বোধহয় সায়াহ্নিক নিত্যকর্ম করতে বেরুচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকেছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে, সে রাখালবাবুকে লক্ষ্য করে কড়া সুরে বলল—'এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখনও এখানে রয়েছেন কেন?' রাখালবাবু উত্তর দেবার আগেই তার চোখ পড়ল ঝিল্লীর ওপর, অমনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বলল—'ঝিল্লী! তুই এখানে পুরুষদের মধ্যে কী করছিস?'

BanglaBook.org

বাপকে দেখে ঝিল্লী একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন চমকে উঠে ব্যোমকেশের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। গঙ্গাধর বলল—'ধিঙ্গি মেয়ে! পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব হয়েছে। চাবকে লাল করে দেব।'

নিখিল হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল, একলাফে গঙ্গাধরের সামনে গিয়ে বলল—'মুখ সামলে কথা বলুন। ঝিল্লীকে আমি বিয়ে করব।'

গঙ্গাধর প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর তারস্বরে চিৎকার ছাড়ল—'কী, আমার মেয়েকে বিয়ে করবি তুই, হতভাগা ছাপাখানার ভূত! ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব না!' সে লাঠি আস্ফালন করতে লাগল।

এইবার গায়ত্রী ঘরে ঢুকল, উগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'কী হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?'

গঙ্গাধর কর্ণপাত করল না, চেঁচিয়ে বলল—'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ছোট মুখে বড় কথা। আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি!'

ঝিল্লী ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল—'মা, তুমি যদি অমত করো আমি বিষ খেয়ে মরব।' চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঝিল্লীর মুখে কথা ফুটেছে।

গায়ত্রী একবার নিখিলকে ভালো করে দেখল, যেন আগে কখনও দেখেনি। নিখিল গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল—'দিদি, ঝিল্লীকে আমি—মানে আমাকে ঝিল্লী বিয়ে করতে চায়। ব্যোমকেশদা বলেছেন, সম্পর্কে বাধে না।'

গায়ত্রী ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করল—'সত্যি সম্পর্কে বাধে না?'

ব্যোমকেশ বলল—'না, ওরা first cousin নয়, সম্পর্কে বাধে না।'

গঙ্গাধর আরও গলা চড়িয়ে চিৎকার করল—'শুনতে চাই না, কোনও কথা শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ি থেকে, এইদণ্ডে বেরিয়ে যাও—।'

গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠল—'থামো তুমি। বাড়ি তোমার নয়, বাড়ি আমার। আমি সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি; বাবা উইল করার আগেই মারা গেছেন, আইনত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার, এ-বাড়িরও অর্ধেক আমার। তুমি বাইরে যেখানে যাচ্ছিলে যাও না। যা করার আমি করব।'

গঙ্গাধর পিন ফোটানো খেলনার বেলুনের মতো চুপসে গেল, তারপর ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

গায়ত্রী ঝিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে গলা ছাড়িয়ে তার হাত ধরে সোফায় বসল, নিখিলের দিকে চেয়ে হাকিমের মতো হুকুম করল—'কী কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ এবার বলো শুনি।'

নিখিল বলল—'আমি কিছু জানি না দিদি, ওই ওকে জিগ্যেস করো। ব্যোমকেশদা, চিঠিগুলো কোথায়?'

ব্যোমকেশ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিয়ে বলল—'রাখাল, চলো, এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। গায়ত্রী দেবী, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিখিল, তুমি যে-বউ পেলে অনেক ভাগ্যে এমন বউ পাওয়া যায়। ঝিল্লী, তুমিও কম সৌভাগ্যবতী নও। জীবনে যে-জিনিস সবচেয়ে দুর্লভ, সেই দুর্লভ হাসি তুমি পেলে। তোমাদের জীবনে হাসির ঢেউ খেলতে থাকুক। এসো রাখাল।'

BanglaBook.org

শাহী শিরোপা

প্রমথনাথ বিশী

এক

পঞ্চানন হঠাৎ এমন চিঠি লিখতে গেল কেন, তা-ও আবার পুলিশ হাজত থেকে, কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশে কেন তাকে ধরবে! চুরি-ডাকাতি তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে ধনী; সরকার-বিরোধিতাও অসম্ভব, সে ভালোমানুষ। তবে আর কী হতে পারে?

অনেকক্ষণ চিন্তার পরেও যখন হদিশ পেলাম না, ভাবলাম অনির্বাণের কাছে যাওয়া যাক। পঞ্চানন আমাদের দুজনেরই বন্ধু, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত একসঙ্গে আমরা পড়েছি।

উঠব-উঠব ভাবছি, এমনসময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর প্রবেশ করল অনির্বাণ রায় স্বয়ং।

এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম; এসেছ ভালোই হয়েছে, নতুবা আমাকেই যেতে হত।

তবেই দ্যাখো, প্রবাদগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। ইংরেজিতে বলে, শয়তানের কথা ভাবলেই এসে উপস্থিত হয় সে।

শয়তান না হোক অন্তর্যামী দেবতাকে এখন বিশেষ প্রয়োজন।

আরে শয়তানই কি কিছু কম অন্তর্যামী? কী হয়েছে বলো।

পঞ্চানন পুলিশ হাজত থেকে চিঠি লিখে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছে, তোমাকেও স্মরণ করেছে। দ্যাখো।

তারচেয়ে তুমি পড়ো, আমি শুনি। পাঠকের চেয়ে শ্রোতা হিসাবে আমি বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই বলে সে গরম চাদরখানা টেনে নিয়ে বেশ জমিয়ে বসল, এমনসময়ে গুপী দু'পেয়ালা গরম চা নিয়ে ঢুকল। গুপী অনেকদিন আছে আমার কাছে, কখন চা জোগাতে হবে জানে।

নাও পড়ো।

ভাই জগবন্ধু, পুলিশ-হাজত থেকে আমার এ-চিঠি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। কাল যখন আমাকে গ্রেপ্তার করল, আমিও কম অবাক হইনি। রাজার উত্তরাধিকারী হয়ে আজ আমি চুরির অপবাদগ্রস্ত। সবকথা লিখবার সময় নেই। এর মধ্যে কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে বলে আশঙ্কা। তুমি উকিল, সহজেই জামিন হতে পারবে, অন্য পরামর্শেরও দরকার। যদি হাতের কাছে পাও অনির্বাণকে এনো, পরের দায় বহন করাই তার পেশা, এ-ক্ষেত্রে দায়টা গুরুভার। ইতি—

পঞ্চানন রায়

চা শেষ হয়ে গিয়েছে, চুরুট ধরিয়েছে অনির্বাণ, জ্বলন্ত চুরুট প্রায় তার নিত্যলক্ষণ; বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, সার্থকনামা।

কী বুঝলে?

বুঝবার মতো কিছুই তো নেই চিঠিতে, তবে এ-কথা নিশ্চয়, পঞ্চাননের পক্ষে চুরি-ডাকাতি করা আর দিনেরবেলায় অমাবস্যার চাঁদ দেখা সমান সম্ভব। খুব সম্ভব ওর কথাই ঠিক, কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে নিশ্চয়।

এখন কী করবে?

যাব,—এই বলে সে উঠে দাঁড়াল। গুপীকে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দুজনে নিচে এসে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

অল্প আয়াসেই পঞ্চাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

আমি উকিল, পুলিশে-উকিলে একটু অলিখিত সন্ধি আছে। অনির্বাণকে নিয়ে হাজতে ঢুকে দেখলাম যে, একখানা বেঞ্চির একান্তে পঞ্চানন উপবিষ্ট, চোখমুখ ম্লান, গায়ের কাপড় একরাত্রি হাজতবাসেই মলিন।

বেশ বুঝতে পারা গেল সারারাত ওইভাবে বসে কাটিয়েছে।

আমাদের দেখে তার মুখে-চোখে ভরসার ভাব ফুটে উঠল। বলল, আমি জানতাম নিশ্চয় তোমরা আসবে।

আমি বললাম, আসব না এমন সম্ভাবনাও কি ছিল?

তিনজনেই গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম, কারণ লকআপে আরও দু-তিনজন লোক ছিল, একটু নির্জনতা আবশ্যক।

চুপ করে থাকলেই অস্বস্তির ভাব প্রবল হয়ে উঠবে, তাই ভূমিকা না করে একেবারেই ঘটনা বিবরণের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

কী ব্যাপার বলো তো!

লকআপে ধূমপানের নিয়ম না থাকায় অনির্বাণ এখন নিতান্ত নির্বাণ নীরব শ্রোতামাত্র।

পঞ্চানন আরম্ভ করল, ব্যাপার কিছুই জানিনে, হঠাৎ পরশুদিন বাসায় পুলিশ গিয়ে উপস্থিত, বলে, রংপুর থেকে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা এসেছে।

আমি শুধোলাম, কী চার্জ?

দারোগা বলল, জানি না।

আমি জামিনে খালাস চাইলাম, দারোগা বলল, নন বেলেবেল ওয়ারেন্ট, জামিন চলবে না। তখন একটুখানি সময় চেয়ে নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখে ডাকে দিলাম। তারপর এখন যেমন দেখছ সেইভাবে বসে আছি।

অনির্বাণ বলল, তুমি থাকো তো রংপুরে।

রংপুর জেলায় তাহেরগঞ্জে, সংশোধন করে দিল পঞ্চানন।

কলকাতায় ক'দিন এসেছ?

পাঁচ-ছ'দিন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওয়ারেন্ট আমার পিছু-পিছু রওনা হয়েছে।

ওখানে থাকতে কিছু বুঝতে পারোনি?

কিছুমাত্র না।

পঞ্চানন ও অনির্বাণের মধ্যে সংবাদ চলছিল, আমি শুনছিলাম।

কিছুমাত্র নয়?

এবারে তাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখা গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, স্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, কিছুকাল থেকে একটা কেমন যেন রহস্যের মতো অনুভব করছিলাম।

কীরকম খুলে বলো।

খুলেই যদি বলতে পারব তবে আর রহস্য বলতে যাব কেন?

তবু—।

তবে আমার পারিবারিক বিবরণের একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক।

এবারে আমি বললাম, আমি মোটামুটি জানি, অনির্বাণ অল্পই জানে, তাকে বলো ঃ আমার অজানা কিছু থাকলে ওর কাছে শুনে নেব।

কিন্তু তুমি চললে কোথায়?

তোমার জন্যে কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি, কাল থেকে খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি।

সেইসঙ্গে গোটা দুই ডাব এনো, একটা এখন খাব, একটা থাকবে। এখানকার জল অপেয়।

BanglaBook.org

পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, এ-ঘটনা সন্দেশ নিয়ন্ত্রণের অনেক আগের, ইংরেজ আমলের।

পঞ্চাননকে খাইয়ে জামিনের দরখাস্ত করতে গিয়ে শুনলাম যে, এখানে জামিন পাওয়া যাবে না। রংপুরের পুলিশের পরওয়ানাবলে গ্রেপ্তার হয়েছে আসামী, কলকাতার পুলিশ তাকে পাঠিয়ে দেবে রংপুরে—সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে জামিন দিতে পারেন।

আরও জানতে পেলাম যে, পঞ্চাননের বিরুদ্ধে চার্জ গুরুতর। চুরির চার্জ। তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'হ্যারলুম' মোতির হার চুরির অভিযোগ।

পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করতে যখন পরওয়ানা নিয়ে গিয়েছিল তখনই তার এ-খবর জানবার কথা। হয় জেনেছিল কিন্তু লজ্জায় আমাদের বলতে পারেনি, নয় গ্রেপ্তারি পরওয়ানা দেখে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, চার্জ জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে ছিল না, কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, অকস্মাৎ অবস্থা-বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে সব ভুলে গিয়েছে। যাই হোক, এখানে আর করণীয় কিছু ছিল না।

পঞ্চাননকে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে, এখানে জামিন পাওয়া যাবে না, তাকে রংপুর যেতে হবে। আমরাও রংপুর যাব বলে রওনা হলাম, হয়তো এক গাড়িতেই যাব। আরও জানালাম যে, আমরা গিয়ে একেবারে তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে উঠব, যা করবার সেখান থেকেই করতে হবে। তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে আমরা একেবারে অপরিচিত নই, আগে বার দুই পঞ্চাননের সঙ্গেই গিয়েছি।

বাসায় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। অনির্বাণকে বললাম, এখন বাসায় যেয়ো না, এখানেই খেয়ে নাও, আজ রাতেই নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে রওনা হতে হবে। গাড়িতে নিরিবিলি বসে শুনব, পঞ্চাননের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল তোমার।

যথাসময়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে সেকেন্ড ক্লাস কামরায় দুজনে উঠলাম।

ভাগ্যক্রমে গাড়িখানা ফাঁকা ছিল। পঞ্চাননকে পুলিশ নিয়ে এল কি না বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি ছেড়ে দিলে অনির্বাণকে বললাম, এবারে বলো কী কথা হল তোমার সঙ্গে।

অনির্বাণ বলল, তুমি বোধহয় লক্ষ করেছ যে, আমি এতক্ষণ বেশি কথা বলিনি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন? তুমি অবশ্য কম কথার মানুষ, কিন্তু এত বেশি নীরবতা তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

নিতান্ত মিথ্যে বলোনি, জগবন্ধু। পঞ্চানন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে মন্তব্য করেছিল যে, মস্ত একটা রহস্যের জালে সে ধরা পড়েছে, এ-গ্রেপ্তারি পরওয়ানা তারই একটা মোটা সুতো।

আমি বললাম, রহস্য। কথাটা আমি থাকতেই একবার বলেছিল, তোমার কাছে বিস্তারিত আর কী বলল?

অনির্বাণ গুছিয়ে বসে নিয়ে বলল, তবে শোনো। তুমি তো জানো যে, পঞ্চানন রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকারী দত্তকপুত্র।

ভাই অনির্বাণ, আমি এ-সমস্তই জানি, নূতন কিছু থাকে তো বলো।

নেহাত মন্দ বলোনি। যাই হোক, যদি জানো তবু আর-একবার শুনতে বাধা নেই, বারবার শুনতে-শুনতে রহস্য কিছু ফিকে হয়ে আসতে পারে।

BanglaBook.org

বরঞ্চ আমিই বলি। ওর পারিবারিক অবস্থা তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি, তুমি দেখো পঞ্চানন যা বলেছে তার সঙ্গে কোথাও গরমিল হয় কি না।

বেশ, তাই হোক, তুমি বলো আমি চেক করি।

আমি আরম্ভ করলাম।

তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুর কৃষ্ণবিলাস অপুত্রক, মৃতদার ও বৃদ্ধ। বৃহৎ ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকায় দরিদ্র এক বাল্যবন্ধুর পুত্র পঞ্চাননকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আইনত সে-ই উত্তরাধিকারী বটে। আর কেবল আইনত উত্তরাধিকারী বলে নয়, রাজাবাহাদুরের সমস্ত পুত্রস্নেহেরও সে অধিকারী। রাজবাড়িতে তার সুখ ও সম্মানের অন্ত নেই। সুখ রাজাবাহাদুরের কাছে, সম্মান আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীদের কাছে। সবাই জানে, পঞ্চানন হচ্ছে ভাবী মালিক ও রাজাবাহাদুর। ওই পদবীটা ওদের উত্তরাধিকারী সূত্রে চলে। কেমন, ঠিক হচ্ছে কি না?

চুরুটের আগুনে দীপ্ত মুখমণ্ডল অনির্বাণ উত্তর করল, বলে যাও।

সবাই প্রসন্ন মনে পঞ্চাননকে গ্রহণ করেছে। কেন না করবে? চেহারায় ও স্বভাবে সে রাজসম্মানের যোগ্য। এদিকে রাজাবাহাদুরও ক্রমে-ক্রমে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। পুরুষানুক্রমে ওঁদের সঞ্চিত সোনা-রুপোর অলঙ্কার ও তৈজস, হীরে-জহরত প্রচুর। আকবরি মোহর থেকে কুইন ভিক্টোরিয়ার মোহর, তার সংখ্যাও বড় কম নয়। রাজাবাহাদুরের ব্যাঙ্কের উপরে আদৌ বিশ্বাস নেই, সমস্তই থাকে রাজবাড়িতে চোরা-কুঠুরিতে। কেমন, অবিকল হচ্ছে তো?

হচ্ছে, তবে এখনও আসল দুটি প্রসঙ্গই বাকি।

দুটি কোথায়, একটি। জাহাঙ্গীরের দত্ত সেই মোতির মালা। সেটাও দেখেছে পঞ্চানন। সেটা দেখিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন, বাবা পঞ্চানন, এই শিরোপা-ই তাহেরগঞ্জের রাজপরিবারের বনিয়াদ। কতদিন আমি স্বপ্ন দেখেছি, মহাপুরুষ বলছেন, যতদিন এটা পুরুষানুক্রমে চলবে, হস্তান্তর না হবে ততদিন এই পরিবারের মান-সম্মান, ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, অন্য কারও হাতে গেলেই ধ্বংস শুরু হবে তাহেরগঞ্জ রাজপরিবারের। অনির্বাণ, এসব কথা তুমিও শুনেছ, আমিও শুনেছি পঞ্চাননের মুখে, তোমার চেয়ে আমাকেই বেশিবার শুনতে হয়েছে, আমার পাশেই তার তক্তপোশ ছিল।

পরপর চুরুটে অনেকগুলি টান দিয়ে সে বলল, আর-একটি প্রসঙ্গ যে বাদ দিলে—দেওয়ানজির কথা!

ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। বুড়ো দেওয়ানজি। হ্যাঁ, সেই বুড়ো দেওয়ানজি পঞ্চাননের উপর আদৌ সন্তুষ্ট নন। পঞ্চানন বলে, গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এখন রীতিমত প্রতিকূল হয়ে উঠেছেন।

কেন কিছু অনুমান করতে পারো কি?

পঞ্চানন কিছু অনুমান করতে পারেনি?

দ্যাখো, পঞ্চানন খুব সরল মানুষ, ওর মনে কিছুই আসেনি। তবে ওর দিকেও তো দু-চারজন আছে, তারা ওকে দেওয়ানজির অসন্তোষের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে। দেওয়ানজি হচ্ছেন, রাজাবাহাদুরের পিসতুতো ভাই, নিকট সম্বন্ধ, বয়সে কিছু বড়। রাজাবাহাদুর অপুত্রক, গত হলে তাঁরই সম্পত্তি পাওয়ার কথা। হঠাৎ দত্তকপুত্ররূপে পঞ্চানন এসে পড়ায় সেই আশায় ছাই পড়েছে। তিনি নাকি দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেকদিন বুঝিয়েছেন রাজাবাহাদুরকে। ওদিকে আবার জ্ঞাতিদের মধ্যে যাদের আক্রোশ দেওয়ানজির উপরে তারা, রাজাবাহাদুরকে দত্তক নিতে উৎসাহ দিয়েছে। অনেককাল কী করি কী করি চিন্তা করতে-করতে অবশেষে দত্তক গ্রহণ করলেন তিনি।

তাই বলো, এত কথা জানতাম না। এমন ক্ষেত্রে রাগ হতেই তো পারে দেওয়ানজির। তা হলে এই হল গিয়ে রহস্য।

BanglaBook.org

অনির্বাণ একটি নূতন চুরুট ধরাতে-ধরাতে বলল, যাই হোক, এর মধ্যে আর রহস্য কী আছে? এ তো মানব স্বভাবের নিত্যধর্ম। মুখের গ্রাস ছুটে গেলে কার না রাগ হয়!

কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল অনির্বাণ।

বাইরে অন্ধকারে রেলপথের দু'ধারে অস্পষ্ট জঙ্গলের মধ্যে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, রীতিমতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের হরির-লুঠ আর সেইসঙ্গে ভেসে আসছে পাট-পচানো স্নিগ্ধ গন্ধ।

দুজনেই নীরবে বসে আছি।

হঠাৎ অনির্বাণ বলে উঠল, কী ভাবছ বলব?

বলো দেখি।

সেবার পঞ্চাননের সঙ্গে এই রাতের গাড়িতেই তাহেরগঞ্জে গিয়েছিলাম সেই কথা।

ঠিক ধরেছ, বুঝলে কী করে?

অতি সহজ। Association of Ideas! সে-রাতেও এমনই জোনাকির চমক ও পাট-পচা গন্ধ ছিল। আজকের অভিজ্ঞতায় সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছে।

বোধহয় তাই। কিন্তু এখন মনস্তত্ত্ব থাক, পঞ্চাননের রহস্যের কথা বলো।

আরে সেটাও যে একটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার!

কীরকম?

পঞ্চাননের ধারণা হয়েছে, কিছুদিন থেকে—তা বছরখানেক হবে, ও যেন একটা রহস্যের মধ্যে বাস করছে। রাজবাড়িতে অসংখ্য ঘর, অধিকাংশই খালি পড়ে থাকে।

রাজবাড়ি আমার দেখা আছে, বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

আছে, নতুবা বাজে কথা বলতাম না। ও যে-মহলে শোয় সেখানে ওর পুরাতন খানসামা হারান ছাড়া আর কেউ থাকে না।

সে-ঘরটা আমার বেশ মনে আছে, সেবারে পাশের ঘরে আমাদের শুতে দিয়েছিল।

সে-ঘরটা যখন মনে আছে তখন নিশ্চয় মনে আছে যে, তার তিনদিকে টানা বারান্দা।

ও বর্ণনাটাও বাদ দাও। সেখানে চেয়ার পেতে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম, তুমি চুরুট টানতে আর রাজবাড়ির পরিত্যক্ত জীর্ণ মহলগুলোর দিকে তাকিয়ে উদ্ভট কল্পনার জাল বুনতে।

আশঙ্কা হচ্ছে পঞ্চাননের বিবরণটাও তোমার কাছে উদ্ভট মনে হবে।

উদ্ভট হলে অবশ্যই সে রকম মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কী আগে শুনি।

পঞ্চানন বলে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে অনেকদিন দেখেছে, একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই বারান্দায়।

এবারে ভুতুড়ে গল্প আরম্ভ করলে।

ভুলে যাচ্ছ কেন, এ আমার বানানো নয়, ওর কথিত বিবরণ।

পঞ্চাননের কি ধারণা ছায়াটা ভৌতিক?

ভৌতিক কি আধিভৌতিক কিছুই জানি না, যা দেখেছে তাই বলেছে।

কী দেখেছে শুনি?

একটা ছায়ামূর্তি প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। দু-তিন পাক দিয়ে চলে যায়।

এমন হতে পারে যে রাজবাড়ির রাত-পাহারা।

আমারও সে-সন্দেহ হয়েছিল। পঞ্চানন বলল, রাত-পাহারা আছে বটে, তবে তাদের এ-মহলে আসবার হুকুম নেই।

BanglaBook.org

ভূত যদি না হয়, মানুষ। কটাই বা মানুষ রাজবাড়িতে? চিনতে পেরেছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলে?

করেছিলাম। সে বলে, জ্যোৎস্নারাতে দেখিনি, দেখেছি অন্ধকার রাতে, তখন চিনতে পারিনি।

তবু তো একটা আন্দাজ করতে পারে? লম্বা কীরকম?

সে বলে, দেওয়ানজির মতো লম্বা।

রাজাবাহাদুরের মতোই বা নয় কেন? দুজনেই তো মাথায় সমান-সমান।

পাগল হলে জগবন্ধু, রাজাবাহাদুর আসতে যাবেন কেন?

তবে দেওয়ানজিই বা আসতে যাবেন কেন?

সে তো দেওয়ানজি বলেনি, বলেছে তাঁর মতো লম্বা।

আর কী বলেছে শুনি।

একদিন সেই মূর্তি তার ঘরে ঢুকেছিল।

দরজা খোলা ছিল?

সামনের দিকের দরজাটা বন্ধ করবার ভার হারানের উপর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হারান পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় আর-একটা ঘরে, যেখানে হারান শোয়।

হারানকে ডাকলে শুনতে পায়?

শুনতে পায়, দরকার হলে কখনও-কখনও ডাকে। তবে ছায়ামূর্তির প্রবেশে সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, হারানকে ডাকবার কথা মনে হয়নি। তা ছাড়া মূর্তি প্রবেশ করেই বেরিয়ে যায়।

তুমি বলতে চাও যে, ঘরে একটা লোক ঢুকল আর চিনতে পারল না!

যদি অচেনা লোক হয়?

রাজবাড়িতে গভীর রাতে অচেনা লোক আসবে কোথা থেকে?

আর চেনা লোককেই কি সবসময়ে অন্ধকারে চিনতে পারা যায়? জগবন্ধু, তুমি বাবলা গাছ ও আম গাছ দুই-ই চেনো। বলো দেখি বাইরে ওগুলো কী গাছ?

এই কি তা হলে রহস্য?

প্রায়।

তার মানে আরও আছে।

আছে, তবে এখন আর নয়। ঘুমের ঝোঁকে বলতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ো।

আমারও ঘুম পাচ্ছিল, শোওয়ার উদ্যোগ করছি এমনসময়ে ঝমঝম করে ঝঙ্কার তুলে গাড়ি পদ্মার পুলের উপরে উঠল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি গাড়ি পার্বতীপুর স্টেশনে থেমেছে।

গাড়ি বদলে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি দুজনে নেমে পড়লাম।

নামতেই দেখি পাশের এক ইন্টারক্লাস থেকে পঞ্চানন নামছে, সঙ্গে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আর দুজন কনস্টেবল। তারাও গাড়ি বদলাবে—রংপুরের লাইনে।

শেয়ালদায় পঞ্চাননকে চোখে পড়েনি। পঞ্চাননের কাছে গেলাম। ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। চা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইন্সপেক্টর পঞ্চাননের মর্যাদা জানে। কাজেই যখন বললাম, ইন্সপেক্টর, পঞ্চানন আর আমরা চা খাই, কী বলো, আপত্তি আছে? সে বলল, বেশ তো, খান না। আমরাও এই অবসরে চা খেয়ে নিই।

BanglaBook.org

তারা তিনজনে চায়ের দোকানে গেল। আমরা তিনজনের চা আনিয়ে নিয়ে নিরিবিলি একখানা বেঞ্চির উপরে বসলাম।

আমি বললাম, কেমন, রাতে ঘুম হয়েছিল?

পঞ্চানন বললে, বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব তার বেশি নয়।

তারপরে একটু থেমে বলল, তোমরা যে সঙ্গে আসছ এ-একটা মস্ত ভরসা।

জ্বলন্ত চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে অনির্বাণ বলল, কালকেই তো কথা হয়েছিল, আমরা আসব আর তাহেরগঞ্জ যাব। দেখা যাক, রাজাবাহাদুরের মন নরম হয় কি না।

পঞ্চানন বলল, রাজাবাহাদুর সহজেই রাজি হবেন, ভয় দেওয়ানজিকে।

তুমি কি মনে করো তোমার গ্রেপ্তারের পিছনে দেওয়ানজির হাত আছে?

ষোলো আনা।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের অমতে নিশ্চয় হয়নি।

তিনি এখন দেওয়ানজির হাতের পুতুল।

এমনকী ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও?

ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও।

তাঁর কী স্বার্থ?

তিনিই জানেন। তোমরা যদি আশা করে থাকো তাঁর মন গলাতে পারবে তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না।

অনির্বাণ বলল, আগে যাই তো, তারপরে দেখা যাবে।

এই বলে চুরুটে আচ্ছা করে গোটা দুই টান দিল।

আমি শুধোলাম, আচ্ছা, ওখানে কারও কাছে সাহায্য পেতে পারি?

দ্যাখো, একসময়ে অনেকেই আমার পক্ষে ছিল, এখন বোধকরি কেউ নেই। তবে গুপীবাবুকে বিশ্বাস করতে পারো, তিনি আমাকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

গুপীবাবুটি কে?

গুপীবাবু আমার গাঁয়ের লোক, আমার সঙ্গেই রাজবাড়িতে এসে কাজ নিয়েছেন, আমাকে বাল্যকাল থেকে জানেন।

তাঁর পুরো নামটা কী?

পুরো নাম বললে কেউ চিনবে না, গুপীবাবু বলেই সকলে জানে। কিন্তু তোমরা কী করবে ভাবছ?

প্রথমে গিয়ে জামিনের চেষ্টা করব।

জামিন কে হবে?

ধরো রাজাবাহাদুর।

তিনিই যদি হবেন তবে গ্রেপ্তার হলাম কেন?

ধরো গুপীবাবু।

তাঁর এমন কিছু মর্যাদা নেই যে, জামিন হতে পারেন, তা ছাড়া তিনি রাজসরকারের কর্মচারী —রাজার বিরুদ্ধে যাবেন কেন?

আচ্ছা, আমরা দুজনে যদি জামিন দাঁড়াই?

তোমাদের সেখানে চেনে কে?

তবে?

তবে আর কি—হাজতবাস।

তারপরে বলল, ওসব চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা প্রথমে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে চার্জটা

BanglaBook.org

কী জানতে চেষ্টা করবে। তারপরে কাজটা যে আমার পক্ষে অসম্ভব রাজাবাহাদুরকে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করো। তবে দেওয়ানজির সম্মুখে হলে পেরে উঠবে না।

রাজাবাহাদুরকে একলা পাব তো?

খুব আশা নেই, দেওয়ানজি বা তাঁর লোক সর্বদা ঘিরে থাকবে রাজাবাহাদুরকে। —তারপরে থেমে বলল, যাচ্ছ তো, কীরকম অভ্যর্থনা পাবে জানি না।

সেবার তো ভালোই পেয়েছিলাম।

সেবারে যে উত্তরাধিকারীর বন্ধু, এবারে বন্ধু আসামীর, অনেক প্রভেদ।

ইন্সপেক্টর কাছে এসে দাঁড়াল, এবারে গাড়ি ছাড়বে।

পঞ্চানন ও আমরা দুই আলাদা গাড়িতে চাপলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে তারা রংপুর স্টেশনে নেমে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে আমরাও স্টেশনে নামলাম। এখান থেকে তাহেরগঞ্জ যেতে হয়, পাকা সড়ক আছে, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়।

দুই

তাহেরগঞ্জের রাজবাড়ি একটা মস্ত ব্যাপার।

বাড়ি ঘিরে গড়খাই। গড়খাই বরাবর ঘুরে এলে মাইল দেড়েক হবে। গড়খাইয়ের পরে প্রাচীরের ঘের, প্রাচীর অনেক জায়গায় ভগ্ন।

চারদিকে চারটে দেউড়ি ছিল, এখন কেবল পুব দিকের দেউড়িটাই ব্যবহার হয়, বাকিগুলো ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেউড়ির সামনে গড়খাইয়ের উপরে ইঁটের পুল—গাড়ি-পালকি যেতে বাধা নেই।

রাজবাড়ির চারদিকে খোলা মাঠ, উত্তর দিকে কিছু দূরে একটা গ্রাম, এই গ্রামটাই তাহেরগঞ্জ। রাজবাড়ির তিনতলার ছাদে উঠে তাকালে উত্তর দিকে অনেকটা দূরে রেললাইনের খানিকটা অংশ দেখা যায়। আমরাও দেখেছি। ওইটুকু চোখে না পড়লে রাজবাড়িকে বিংশ শতকের না ভেবে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের বলে মনে করতে কোনও বাধা নেই।

বর্তমান কালকে ডান হাত দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে রেখেছে রাজবাড়িটা, যদিচ বাম হাতের অভ্যর্থনার চিহ্নও অপরিস্ফুট নয়।

বাড়িটা যেমন বিপুল তেমনই নানা যুগের চিহ্নবাহী। ইতিহাসের পরিভাষায় প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাক্ষী। প্রাচীনতম অংশ এখন অব্যবহার্য, মধ্যযুগীয় অংশ প্রায় অব্যবহার্য, তবে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক অংশটাতেই সকলে বাস করে। বাকি দুটো অংশ তাহেরগঞ্জ রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য ঘোষণার নকিব।

এসব আমাদের কাছে নতুন নয়, পঞ্চাননের কাছে আগে যখন এসেছি দেখে নিয়েছি; দেখার সঙ্গে শোনাও যুক্ত হয়েছে, কেন না, সেই ঘোর বর্ষাকালে সাহস করে প্রাচীনতম অংশে ঢুকতে পারিনি।

আমাদের গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছতেই দুজন কর্মচারী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে বৈঠকখানায় বসাল, চাকরেরা মালপত্তর নামাল, মালপত্তর সামান্যই ছিল।

রাজবাড়িতে অতিথি কেন এসেছে জিজ্ঞাসা বেদস্তুর, এসেছে এই যথেষ্ট। কার কাছে এসেছে, কেন এসেছে, অতিথি নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞাসা করবার নিয়ম নেই।

আগের বারে নবাবী কায়দার বিড়ম্বনা পোয়াতে হয়নি, পঞ্চাননের সঙ্গে এসেছিলাম।

BanglaBook.org

একজন কর্মচারী বিনীতভাবে নিবেদন করল, আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, জলযোগ প্রস্তুত।

আমরা তদুত্তরে জানালাম, আমরা পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছি, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করব।

আমাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে অধিকতর বিনীতভাবে বলল, আজ্ঞে, আগে জলযোগ...।

কাজেই জলযোগের জন্য উঠতে হল। বুঝলাম, আগে জলযোগ পরে রাজদর্শন, দস্তুর ভেঙে কোনও কাজ এখানে চলবে না।

কে একজন লেখক নাকি বলেছেন যে, মানুষ বুড়ো হলে সুন্দর হয়। সেইসঙ্গে তিনি বলতে পারতেন যে, সে-সৌন্দর্য মানুষের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায়।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে যখন আলাপ হচ্ছিল তখন এমন বিপুল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা অনুভব করছিলাম যে, ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না। আমি বেশি কথা বলতে পারিনি, নিতান্তই অভিভূতভাবে বসেছিলাম, কথাবার্তা চালাচ্ছিল অনির্বাণ।

রাজাবাহাদুর বলেছিলেন, বাবা, এ কেমন করে হল জানি না। আমি মনে-মনে নিশ্চয় জানি, এ-কাজ কখনও পঞ্চাননের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনির্বাণ বলেছিল, তবে আপনি থাকতে, অর্থাৎ আপনার এ-বিশ্বাস থাকতে, পুলিশ কী করে তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিল?

এখানে থাকলে কখনও সম্ভব হত না। কলকাতায় গেলে তাকে গ্রেপ্তার করল। রামসদয় (দেওয়ানজি) একদিন এসে জানাল যে, পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছে।

আপনাকে কিছু না বলেই?

বাবা, আগের সেদিন তো আর নেই, যখন আমার জমিদারিতে আমিই জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব তো দেখতে হবে।

সেসবের বিচার পুলিশ আর রামসদয়ের মধ্যে হয়েছে।

আর আপনি কিছুই জানতেন না?

আমি শুধু জানতাম যে, জাহাঙ্গীরদত্ত মোতির মালা চুরি হয়েছে। আমি সে-কথা রামসদয়কে জানিয়েছিলাম।

সে-মালার কথা কে জানত?

সবাই জানত। এ-রাজ্যের সবাই জানে যে, তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে জাহাঙ্গীরদত্ত মোতির মালা আছে, যার দাম আজকের বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা।

অনির্বাণ বলে, রাজাবাহাদুর, সে তো জনশ্রুতি। কলকাতায় বসে আমরাও জানতাম।

জানবে বইকী বাবা, শুনেছি ছাপা-বইয়ে আছে।

তাই তো বলছি জনশ্রুতি। কিন্তু এ-মালা আপনার বাড়িতে যে আছে সবাই জানলেও দেখেছে কয়জন?

দেখবে আর কে? আমার স্ত্রী দেখেছেন, তিনি আজ কয়েক বছর গত হয়েছেন। আর দেখেছে রামসদয়, আমিও অবশ্য দেখেছি।

পঞ্চানন?

হ্যাঁ, সে-ও দেখেছে। দত্তক হয়ে এ-বাড়িতে আসবার পরে ক্রমে-ক্রমে তাকে আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলাম। পঞ্চানন খুব বুদ্ধিমান বাবা, অল্পদিনেই জমিদারির কোথায় কী আছে সমস্ত বুঝে

BanglaBook.org

নিল। তারপরে তিনশো বছরের সঞ্চিত হীরে-জহরত-মণিমুক্তো, সেইসঙ্গে সেই মোতির মালা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ওসব বাড়িতে রাখতেন কেন? ব্যাঙ্কে জমা দিলেই তো সব চুকে যেত।

ব্যাঙ্কের উপরে আমার বিশ্বাস নেই। আমার জিনিস যদি আমি সামলাতে না পারি তবে ব্যাঙ্ক সামলাবে। ওসব হালফ্যাশানের মধ্যে আমি নেই। যাক্‌গে সে-কথা। অন্যান্য সমস্ত জিনিস দেখানো হয়ে গেলে সবশেষে দেখালাম জাহাঙ্গীরের নিজে হাতে দেওয়া সেই মোতির মালা।

এখানে আমি এক চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেললাম, শুধোলাম, কেন বাদশা এই মালা দিয়েছিলেন খুলে বলবেন, অবশ্য যদি আপনার কষ্ট না হয়।

কষ্ট! বিলক্ষণ। ও-গল্প হাজারবার বলেছি, আরও হাজারবার বলতে পারি, আদৌ কষ্ট হয় না। আনন্দ, আনন্দ, বাবা আনন্দ। কিন্তু সে-এক দীর্ঘ ইতিহাস, শেষ করতে কিছু সময় লাগবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আজ আর নয়। আগামীকাল হবে। তোমরা বিশ্রাম করো। —বলে তিনি উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, পঞ্চানন থাকলে কোনও কথা ছিল না, তোমাদের দেখাশোনার ভার সে-ই গ্রহণ করত। আপাতত গুপী সে-কাজ করবে। লোকটি বড় ভালো, পঞ্চাননদের গাঁয়ের লোক। গুপী—।

আজ্ঞে, বলে গুপীবাবু সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

এঁদের ভার তোমার উপরে রইল, কোনও ত্রুটি না হয় দেখো, এঁরা পঞ্চাননের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রাজাবাহাদুর ধীরে-ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন।

আমরাও গুপীবাবুর অনুসরণ করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চললাম।

সন্ধ্যার পরে গুপীবাবু এসে আমাদের কাছে বসলেন।

আমাদের বসবার ও শোওয়ার জন্যে দুখানি ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল দোতলার উপরে। আরও নাকি কয়খানি ঘর ছিল, সব খালি, বেবাক দোতলাটাই খালি। আমাদের ঘরের সম্মুখে টানা বারান্দা, সেখানে বসলে সামনে অনেকগুলো আঙিনা দেখা যায়। চকমিলানো অট্টালিকায় চলেছে আঙিনার পরে আঙিনা। সবগুলোই অন্ধকার—তাই জনশূন্য মনে হচ্ছে।

এসব রাজবাড়ির মধ্যযুগের অন্তর্গত, বোধকরি তার পিছনে প্রাচীন যুগের ভাঙা অট্টালিকার উপরে অশ্বত্থ গাছের ডগাগুলো এই আলো-আঁধারের মধ্যেও চোখে পড়ে।

বেশ বুঝতে পারা যায় এসব একসময়—রাজবংশের গৌরবের সময়ে—নর-নারী, দাস-দাসীতে পূর্ণ থাকত। আজ গৌরবে ভাঁটা পড়েছে, জনসমাগমেও। ফাঁকা মাঠ বা ঘন অরণ্য অনেকসময়ে মনে ভয় জাগায়, কিন্তু এই জনশূন্য ভগ্ন বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়।

মৃতদেহ ও পরিত্যক্ত সৌধ ভীতিকর, ওর আশেপাশে অতীতের প্রেত ঘুরে বেড়ায়।

গুপীবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখছেন?

এসব আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটের উপরে উত্তর এসে পড়ল, বললাম, ভাবছি ওই ভাঙা বাড়িগুলোর মধ্যে ভূত আছে কি না।

তিনি চমকে ওঠে শুধোলেন, হঠাৎ ভূতের কথা মনে পড়ল কেন?

তাঁর চমকটা আমার চোখ এড়িয়ে গেলেও অনির্বাণের চোখ এড়ায়নি। একমনে বসে চুরুট টানলেও তার চোখ-কান প্রভৃতি সজাগ থাকে। তার যে চোখ এড়ায়নি তা পরে জানতে পেরেছি।

বললাম, এই রকম সব ভাঙা বাড়ি ভূতের স্বাস্থ্যনিবাস বলে শুনতে পাই কিনা।

না, কই ভূত-টুত আছে বলে তো শুনিনি।...আচ্ছা, আজ রাত হয়েছে, আপনারা বিশ্রাম করুন।

BanglaBook.org

গুপীবাবু চলে গেলে অনির্বাণ মন্তব্য করেছিল, ভূতের কথাটা যেন চাপা দিয়ে গেলেন।

তুমি কি ভূতে বিশ্বাস করো নাকি?

মানুষে যখন বিশ্বাস করি ভূতেও বিশ্বাস করতে হয় বইকী।

কেন, মানুষ মরলে ভূত হয় বলে?

না, মানুষে ভূতের কল্পনা করেছে বলে, ওর মধ্যেও মানুষের প্রক্ষেপ আছে।

কিন্তু এখানে তার কী সম্বন্ধ?

কে বলতে পারে! পঞ্চাননের কথাটা ভুলো না, একটা রহস্য আছে বলেছিল।

তুমি কি বলতে চাও মোতির মালা ভূতে চুরি করেছে?

মানুষে না করলে অবশ্যই ভূতে চুরি করছে!

অর্থাৎ চুরির ব্যাপারটা রহস্যময়।

সে কোনও উত্তর না নিয়ে চুরুট টানতে লাগল।

গুপীবাবুকে বলেছিলাম, পঞ্চাননের সঙ্গে শেষ দেখা, পার্বতীপুর স্টেশনে, অবশ্য তার আগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল।

আমার কথা কিছু বলেছিলেন কি?

বিশেষ করে বলেছিল। বলেছিল যে, আপনি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছিল।

সে-যোগযোগ যে আপনাদের অনুরোধে না হয়ে রাজাবাহাদুরের আদেশে হয়েছে সে ভালোই।

কেন বলুন তো।

এ-বাড়িতে সবাই আমার উপরে খুশি নয়।

সবাইয়ের মধ্যে তো দেখলাম রাজাবাহাদুর আর দেওয়ানজি।

ওঁরাই সব। অবশ্য অন্যলোকের অভাব নেই, তবে তারা সবের মধ্যে নয়।

রাজাবাহাদুর তো আপনার উপর খুশি মনে হল।

রাজার চেয়ে মন্ত্রীর প্রতাপ বেশি।

বোধকরি এতটা বলে ফেলা উচিত হয়নি মনে করে গুপীবাবু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন, রাজাবাহাদুর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁরই আদেশে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদের গাঁয়েই তো আপনার বাড়ি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে পাশের বাড়ি বললেই চলে। ছেলেবেলা থেকে ওঁকে জানি, কোলেপিঠেও করেছি, তখন ডাকতাম পঞ্চা বলে।

অনির্বাণ কৌতুকের সুরে বলল, এখন?

পঞ্চাননবাবু। তবে অন্যদের দেখাদেখি যুবরাজবাহাদুর বললে বড় রাগ করেন।

শুধোলাম, আমরা তো শুনেছিলাম রাজাবাহাদুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন না। জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকেই কাউকে উত্তরাধিকারী করবেন।

আমারও শোনা কথা, যেমন শুনেছি বলতে পারি। মুশকিল হল, কাকে নেবেন! এক জ্ঞাতিপুত্রের কথা ভাবলে আর-একজন আপত্তি করে, আর-একজনের কথা ভাবলে অন্যপক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। ওদিকে দেওয়ানজি একজন দাবিদার হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি রাজাবাহাদুরের আপন পিসতুতো ভাই। রাজাবাহাদুর অপুত্রক-গত হলে তিনিই নিকটতম উত্তরাধিকারী। তিনি বোঝাতে লাগলেন, জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকে দত্তক নিলে অন্য সকলে জোট পাকিয়ে রাজবংশের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। আর অনাত্মীয় কারও পুত্রকে নিলে সেই মোতির মালা তাহেরগঞ্জ রাজবংশের বাইরের রক্তে চলে যাবে—তাতে বংশ ও সম্পত্তিনাশ।

সে আবার কীরকম, গুপীবাবু? শুধোলাম আমি।

BanglaBook.org

কেন, এ-প্রবাদটার কথা পঞ্চানন কখনও কিছু বলেননি আপনাদের?

কই, মনে তো পড়ে না। আপনি বলুন না কেন?

দরকার হবে না, রাজাবাহাদুর নিজেই বলবেন মোতিমালার ইতিহাসের সঙ্গে।

আচ্ছা, তাঁর কাছেই না হয় শুনব। এখন যা বলছিলেন বলুন।

আমাদের গাঁয়ের নাম তালপুকুর। পঞ্চাননের পিতা কাশীনাথবাবু গাঁয়ের মধ্যে সম্পন্ন লোক। রাজাবাহাদুর আর কাশীনাথবাবু বাল্যবন্ধু। কাশীনাথবাবু ধার্মিক ও সুশীল, তাই রাজাবাহাদুর তাঁকে বড় ভালোবাসতেন। কাশীনাথবাবুর দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চাননকে দেখে রাজাবাহাদুর স্থির করে ফেললেন, এই ধার্মিক বাল্যবন্ধুর পুত্রকেই দত্তক নেবেন।

অনির্বাণ বলল, কিন্তু সম্পত্তি যে অন্য বংশের রক্তে চলে যাবে।

সে-কথা অনেকেই বোঝাল। কাশীনাথবাবুও বোঝালেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল না। ওদিকে জ্ঞাতিরা দেওয়ানজির পথ বন্ধ করবার আশায় পণ্ডিতদের দিয়ে বোঝাল যে, শাস্ত্রমতে দত্তক গ্রহণ করলেই দুই রক্ত এক হয়ে যায়। অতএব দোষ নেই। যাই হোক, রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে দত্তক নিয়ে ফেললেন, বোধকরি জ্ঞাতিদের ও দেওয়ানজির ঝামেলা থেকে বাঁচবার আশাতেই। পঞ্চাননের সঙ্গে রাজাবাহাদুর নিয়ে এলেন আমাকে আর হারানকে।

হারান কে?

পঞ্চাননদের প্রজা ছিল। এখন রাজবাড়িতে পঞ্চাননের খাস খানসামা। দুজনেই আমরা দেওয়ানজির বিষ নজরে।

কেন?

কেন আর কী। আমরা যে পঞ্চাননের পক্ষের লোক!

তারপরে?

এমনসময় দেউড়িতে দশটার ঘড়ি বাজল। গুপীবাবু বললেন, এবারে আপনাদের কষ্ট করে উঠতে হবে—আহারের সময় এসেছে।

রাজার ঘরে মানুষ ঘড়ির ক্রীতদাস।

আহারান্তে দুজনে বারান্দায় বসে আছি, অনির্বাণের মুখে অনির্বাণ চুরুট, আমি চির-নির্বাপিত।

সম্মুখে রাজবাড়ির পরিত্যক্ত প্রাচীন অট্টালিকাগুলো আলো-আঁধারিতে ষড়যন্ত্রণায় নিযুক্ত, অশ্বত্থ গাছের পাতায় বাতাস লেগে কানাকানি করছে, চাঁদ যতই দিগন্তের দিকে হেলে পড়ছে অন্ধকার ততই এগোচ্ছে পায়ে-পায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অধিকার করে নেবে।

কাছেই কোথাও পাখির বাসার ধড়ফড় করে আওয়াজ হল। একটা বাদুড়জাতীয় নৈশপাখি সম্মুখ দিয়ে হুস করে উড়ে গেল, দূরে কুকুরের ডাক উঠল।

এমনই সমস্ত অসংলগ্ন এলোমেলো ঘটনাস্রোত আমার ইন্দ্রিয়গুলোর উপর দিয়ে আলগোছে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। দু-একবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ও কী ভাবছে জানি না—রহস্যের খেই খুঁজছে না আর কিছু। ও যখন নীরবতা অবলম্বন করে, পাথরের মূর্তি হার মানে। অবশেষে আর বসে থাকতে না পেরে, 'ঘুমোতে যাচ্ছি' বলে ঘরের মধ্যে চলে এলাম। সে শুধু বলল, আচ্ছা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঠেলা খেয়ে জেগে উঠলাম, শুনছ?

করুণ বুকভাঙা আর্তনাদ—যেন কার সুচির-সঞ্চিত আশাভাণ্ড মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

উঠে বসলাম, কী ব্যাপার?

অনির্বাণ বলল, তা জানি না।

কোথা থেকে আসছে?

রাজবাড়ির ভাঙা অংশের দিক থেকে—বুঝতে পারছ না?

তা-ই হবে।

কান্না বলে মনে হয়।

অসম্ভব নয়।

কে কাঁদে এত রাত্রে ওখানে?

কেমন করে জানব?

ভূত নাকি?

ভূত না হোক, ভৌতিক।

এই কি পঞ্চাননের রহস্য!

তা জানি না। আচ্ছা, লক্ষ করেছিলে রহস্যের কথা উঠতেই গুপীবাবু চমকে উঠেছিলেন? —শুধোল অনির্বাণ।

কথাটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

তবে এই সেই রহস্য!

অসম্ভব নয়। তবে এ-একপ্রকার নিশ্চিত যে, এ-বাড়ির অনেকেই ব্যাপারটা অবগত আছে।

ব্যাপার বলতে কী বোঝায়? ওই শব্দ?

আপাতত তাই বটে!

কান্না অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে, তারপরে চলছিল আমাদের সংলাপ। কথা বলতে-বলতে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

গায়ে ঠেলা দিয়ে অনির্বাণ ফিসফিস করে বললে, কিছু দেখলে?

কই না!

না দেখেছ ভালোই। জগবন্ধু, সংসারে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়।

যেটুকু স্বভাবতই খোলা তারচেয়ে বেশি রাখবার প্রয়োজন মনে করিনে।

প্রয়োজনমতো খোলাতে কাজ চলে, তার অতিরিক্ত না হলে রহস্যোদ্ধার চলে না, মনে রেখো।

অত ভণিতায় কাজ কী, কী দেখলে বলেই ফ্যালো না।

অনির্বাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমনসময় হারান এসে দেখা দিল, কাল রাতেও সে এসেছিল, রাতের বেলায় আমাদের পাশের ঘরে ঘুমোবার হুকুম, তবে রাত বেশি হওয়ায় আর আলাপ করতে পারিনি তার সঙ্গে। অথচ পঞ্চানন পরামর্শ দিয়েছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে।

বাবু, এখনও আপনারা ঘুমোতে যাননি! রাত যে অনেক হল!

অনির্বাণ বলল, হারান, তোমার জন্যেই জেগে আছি। কালকে তো কথাবার্তা হতে পারেনি।

হারানের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল, বলল, বাবু, আমি কি আপনাদের আলাপের যুগ্যি লোক? কিন্তু পঞ্চানন যে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

খোকাবাবু আমাকে খুব ভালোবাসে।

তুমিও তো তাকে খুব ভালোবাসো।

তা আর বাসব না, বাবু, সে যে মায়ের কোল থেকে আমার কোলে এসেছিল।

ভূমিকা অংশে বাদ দিয়ে অনির্বাণ শুধোলো, হারান, একটা কান্নার শব্দ শুনলুম। বোধহয় আশেপাশে কোনও মেয়েছেলে কাঁদছে।

BanglaBook.org

হারানও ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে বলল, মেয়েছেলের গলা নয়, বাবু, বুড়োমানুষের গলা।

তবে তুমি শুনেছ?

না শুনে উপায় কী? রাজবাড়ির সবাই শুনেছে।

কে কাঁদে বলতে পারো?

কেমন করে বলব, বাবু, সংসারে বুড়োমানুষ তো দু-চারজন নয়।

কেন কাঁদে বলতে পারো?

তাই বা কেমন করে বলব, সংসারে দুঃখ তো অল্প নয়।

তোমরা কখনও খোঁজ করোনি!

কী দরকার, বাবু।

মনে হল, হারান কিছু চাপা দিতে চায়। কাজেই অনির্বাণ বলল, তা বটে। তারপরে সে বলল, তোমাদের দেওয়ানজিকে তো এ পর্যন্ত দেখলাম না, ব্যাপার কী!

দেওয়ানজি ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়েছেন।

কেন, এখানকার নদীতে কি জল নেই?

বড়লোকের বেশি জল দরকার হয়, এখানকার নদী হাঁটুজল।

ব্রহ্মপুত্র তো কাছে নয়। প্রত্যহ যাতায়াত করলে ওতেই তো দিন কেটে যাবে।

প্রত্যহ যাবেন কেন, যোগপ্রযোগে যান, কালকে ভোরেই আসবেন।

এলে দেখা হবে নিশ্চয়?

হবে না আবার! আপনারা যুবরাজবাহাদুরের বন্ধু, ভালোকরেই দেখা হবে।

তার কথায় না হোক কথার সুরে মনে হল যে, দেওয়ানজি আমাদের দেখে খুব খুশি হবেন না। —শুধোলাম, কেন হারান? দেওয়ানজি যুবরাজবাহাদুরের উপর খুশি নয়?

খুশি হলে আর সম্পত্তির মালিককে জেলে দেয়?

জেল তো এখনও হয়নি।

হবে, দেখে নেবেন।

রাজাবাহাদুরের মত না থাকলে দেওয়ানজির সাধ্য কী?

দেওয়ানজির অসাধ্য কিছু নেই, বাবু।

তোমার উপরে কেমন ভাব?

রাঁধুনির যেমন লকড়ির উপরে ভাব সেইরকম। উনুনের মধ্যে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গান্তর করে অনির্বাণ শুধোলো, হারান, মোতির মালা কে চুরি করল? পঞ্চানন নিশ্চয় করেনি। তোমার কী মনে হয়?

দারোগা-পুলিশে মীমাংসা করতে পারল না, আমি কী করে জানব, বাবু!

তা বটে, তবে তুমি বাড়িতে আছ কিনা—তাই শুধোলাম।

না, বাবু, কিছু জানিনে।

এতক্ষণ সে বেশ কথা বলছিল, এবারে মুখ বন্ধ করল।

আমি তো উকিল, তবু আমার সমস্ত সতর্ক জেরা ব্যর্থ হল, হারান কিছু বলতে রাজি নয়। কাজেই বললাম, হারান, রাত হল, এবারে আমরা শুতে যাই।

ঘরে এসে অনির্বাণ বলল, জগবন্ধু, তোমার আইনের ডিপ্লোমা ফেরত দাওগে।

কেন?

কেন কী! কিছু বার করতে পারলে?

কিছু জানলে তো বার করব?

BanglaBook.org

ও অনেকখানি জানে, অন্তত কিছু একটা সন্দেহ আর অনুমান করেছে নিশ্চয়।

সে মীমাংসা না-হয় কালকে কোরো, এখন ঘুমোনো যাক।

অনেক রাতে জল তৃষ্ণা পাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল।

টর্চের আলোয় দেখলাম দুটো বাজে। টেবিলে জলের গেলাস থাকবার কথা, নেই।

ভাবলাম হারানের ঘরে দেখা যাক। পাশাপাশি তিনটে ঘর, দুটোয় আমরা দুজন, তৃতীয়টায় হারান, তিনটেরই দরজা খোলা থাকে। অনির্বাণের ঘরে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু হারানের ঘরে গিয়ে দেখি তার বিছানা খালি। তাই তো, এত রাতে গেল কোথায়! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, হারান ফিরল না।

তখন সন্দেহ হল, কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও হারানের অনুগৃহীতা কেউ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় হারানই তার অনুগৃহীত, সেখানেই তবে গিয়েছে। অগত্যা তৃষ্ণা নিবারণের আশা পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরছি, সহজ স্বাভাবিক স্বরে অনির্বাণ বলে উঠল, কী জগবন্ধু, না পেলে জল, না পেলে হারানকে।

জেগে আছ নাকি?

আমার নামই তো অনির্বাণ, আমার চুরুট ও চক্ষুর কোনওটাই কখনও নির্বাপিত হয় না।

কিন্তু জল ও হারানকে না-পাওয়া—জানলে কী করে?

নিতান্তই মামুলি, জগবন্ধু, নিতান্তই মামুলি।

কেমন!

ঘণ্টাখানেক আগে জেগে আমি জলের সন্ধান করেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম হারানের বিছানা খালি, গত রাত্রেও তার বিছানা খালি দেখেছি।

সন্দেহ হচ্ছে ও কোনও মেয়ের অনুগৃহীত।

অনুগৃহীত কি নিগৃহীত সে-মীমাংসা না হয় পরে কোরো, এখন রাত দুটো।

তিন

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ দেওয়ানজির কামরায় আমাদের ডাক পড়ল।

অনির্বাণ বলল, চলো, দেওয়ান-ই-খাসে যাওয়া যাক।

দেওয়ান-ই-খাসে গিয়ে দেখি দেওয়ানজি ফরাসের উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।

প্রথমেই চোখে পড়বার মতো রাজাবাহাদুর ও তাঁর চেহারায় মিল। দুজনেই সমান লম্বা, দুজনেরই রং ও বয়স সমান, মামাতো-পিসতুতো ভাইয়ে এমন বিরল নয়। দুজনেরই দীর্ঘ দেহ-যষ্টি বয়সের ভারে ঈষৎ নমিত। প্রভেদ কেবল চোখে। রাজাবাহাদুরের চোখ সুপ্তমীন সরোবর, শান্ত গভীর, দেওয়ানজির পুরু ভুরুতলে চোখ দুটো একজোড়া শ্বাপদের মতো শিকারের উপরে পড়বার জন্য উদ্যত।

দীর্ঘকাল দেওয়ানি উপলক্ষে মনুষ্য শিকার করতে-করতে চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের গুণ পেয়েছে।

আসুন, আসুন, আপনারা দু'দিন এসেছেন অথচ অভ্যর্থনা করতে পারিনি, ব্রহ্মপুত্রে স্নানে গিয়েছিলাম, প্রত্যেক অমাবস্যা-পূর্ণিমায় স্নানে যাওয়া অনেককালের অভ্যাস কিনা।

আমি বললাম, তাতে ক্ষতি হয়নি, গুপীবাবু আর হারান আমাদের দেখাশোনা করছে।

এসেই ওই দুজনের হাতে পড়েছেন, ওরা দুজনেই অপদার্থ।

BanglaBook.org

না, না, ওরা বেশ তদ্বির করছে।

তা হবে, আপনারা যে পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, আর কাউকে বড় গ্রাহ্য করে না ওরা।

এবারে অনির্বাণ আরম্ভ করল, আচ্ছা, পঞ্চানন যে চুরি করেছে এ কি নিশ্চয়?

বিচার শেষ না হলে কেমন করে বোঝা যাবে। তবে সন্দেহের উপরে নির্ভর করে ধরতে হয়।

সন্দেহের কী কারণ থাকতে পারে জানি না। দু'দিন বাদে সমস্তই যার হবে সে কেন চুরি করতে যাবে? তা ছাড়া রাজবাড়ির অন্য ধনরত্নের সঙ্গে মোতির মালাটা থাকত তোষাখানায়, যার দুটো চাবি—একটা আপনার কাছে, আর-একটা রাজাবাহাদুরের কাছে। পঞ্চানন চাবি পাবে কেমন করে?

একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললেন, একে-একে উত্তর দিচ্ছি। চুরি সন্দেহ করবার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ, আমাকে অপ্রস্তুত করা। ভাবটা এই যে, দেওয়ান বুড়ো হয়েছে, তেমন আর চৌকশ নেই, এখন ওকে বিদায় দিলেই ভালো। দ্বিতীয় কারণ, বয়স হয়েছে, টাকাপয়সার দরকার, বুঝতেই পারছেন। আরও কারণ চাই নাকি?

অনির্বাণ বলল, কিছু মনে করবেন না, দেওয়ানজি, আপনি বয়োবৃদ্ধ নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি তো দেখছি কোনও কারণটাই টেকসই নয়। চাবি থাকল আপনার কাছে। সে-চাবি নিশ্চয় সে পায়নি। তবে সিন্দুক খুলল কী করে? আপনি বলবেন, রাজাবাহাদুরের চাবি দিয়ে। সে-চাবিই বা পাবে কী করে? আর যদিই বা পায় অপ্রস্তুত হবেন তো রাজাবাহাদুর। আর দেখুন দ্বিতীয় কারণটা, আরও কমজোরি। বিক্রির জন্যেই যদি নেবে তবে অনায়াসে সোনা বা মোহর নিতে পারত, যা বাজারে নিয়ে গেলে ধরা পড়বার আশঙ্কা নেই। আরও দেখুন, ওই মোতির মালার সঙ্গে যে-কিংবদন্তী জড়িত তা নিশ্চয় সে জানে। ওই মালা বিক্রয় উপলক্ষে হস্তান্তর হয়ে গেলে রাজবংশের অবনতি হবে এ-কথা জেনেও কেন সে হস্তান্তর করতে যাবে বাস্তব মালাটাকে?

দাঁড়ান, এ-কথাটার উত্তর দিয়ে নিই। মোতির মালা তো হস্তান্তর হয়েই গিয়েছে।

কেমন?

দত্তক নিলেই কি রক্তের ঐক্য হয়।

ধরুন, আপনার কথাই যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তবু স্বীকার করতে হবে যে, এখনও রাজাবাহাদুর জীবিত, কাজেই মোতির মালা ভিন্ন রক্তে যায়নি।

ও একরকম যাওয়াই। তাই দেখুন না কেন এই বংশনাশকর অনাচার ভিন্ন রক্তের সন্তানের দ্বারাই হল।

দেওয়ানজি, ভুলে যাচ্ছেন যে, এখনও সেটা প্রমাণ হয়নি, অনুমান আর সন্দেহের ক্ষেত্রে আছে।

আমার কাছে অনুমান ও সন্দেহের অতীত।

বিচারক তো আপনি নন। এখনও মামলা বিচারাধীন।

তবে প্রশ্ন, মোতির মালা গেল কোথায়?

আমারও তো সেই প্রশ্ন—মোতির মালা গেল কোথায়?

আপনি যখন এতই জানেন আপনিই বলুন।

আমি জানলে অবশ্যই বলতাম, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, মোতির মালা হয় রাজবাড়ির মধ্যেই আছে, নয় এমন লোকে নিয়েছে যে পঞ্চাননকে চরম অপদস্থ করতে চায়।

তবে কি আপনি—।

কথা শেষ হতে পারল না, খাস খানসামা এসে বলল, দারোগাসাহেব এসেছেন।

আচ্ছা, নিয়ে এসো।

BanglaBook.org

দারোগা এসে মস্ত সেলাম করে দাঁড়াল।

কী তমিজ মিঞা, খবর কী?

তমিজ মিঞা একগাল হেসে বলল, হুজুর, সুখবর।

পেলে নাকি?

একরকম।

এই বলে সে থলি থেকে কাগজে মোড়া একটা বস্তু বার করল। তারপর সন্তর্পণে কাগজ খুলতেই বের হয়ে পড়ল মখমলের একটা বাক্স। সেটা দেওয়ানজির সম্মুখে ফরাসের উপর রাখল।

এই তো সেই শাহী শিরোপার বাক্স। বাদশাহী মোহরের ছাপ রয়েছে। তা হলে সত্যিই পেয়েছ—ব্যগ্রহস্তে খুলে ফেললেন বাক্সর ডালা। ভিতরটা বেবাক শূন্য।

এ কীরকম হল, তমিজ খাঁ?

হুজুর, খোলস যখন পাওয়া গিয়েছে, শাঁসও অবশ্য পাওয়া যাবে।

খোলসে আমার দরকার নেই, শাঁস কোথায় তাই বলো।

তা কী করে জানব, হুজুর?

ওদের মধ্যে যখন কথা চলছে আমরা বাক্সটা টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, বাদশাহী ব্যাপার বটে। ভিতরে বাইরে দামি মখমলে মোড়া, চারদিক ঘিরে সোনা দিয়ে মিনে করা, বাইরে মস্ত সোনালী বাদশাহী মোহরের ছাপ। ভিতরে যেখানে মোতির মালাটা থাকবার কথা, সেখানে প্রত্যেকটি মোতির জন্য একটি খাদ, এমন অনেকগুলো। পরে শুনলাম একশো আটটা মোতি এই মালায়।

কোথায় পেলে খুলে বলো।

হুজুর, রাজবাড়ির উত্তরে যে-গড়খাই আছে তার কাছে পড়ে ছিল।

কে নিল, কেমন করে গেল কিছু অনুমান করতে পারো?

বহুৎ খুব, হুজুর।

কেমন?

কাছেই একদল বেদে আস্তানা গেড়েছে, তারাই নেবে, আর কে নিতে আসবে, হুজুর।

খানাতল্লাশ করেছিলে?

তখনই।

পেলে?

আজ্ঞে না, ওরা বলে ও-বাক্সর খবর তারা জানে না। কেমন করে ওখানে এল জানে না। তখন তাদের মালমাত্তা তছনছ করে ফেললাম। নাঃ, কোথাও কিচ্ছু নেই।

তবে?

ওরা আসল শয়তান।

তারপর কী করলে?

আগে শুনুন হুজুর, শয়তানকে শায়েস্তা করবার মন্তর আমি জানি। আমি তমিজ মিঞা, আমার বাবা মস্ত গুণী ছিলেন কিনা।

তোমার বাবার খবরে আমার দরকার নেই।

সে কী হুজুর, আগে বাপ তারপরে তো ছেলে।

কী মুশকিলে পড়া গেল।

আপনি আর কী মুশকিলে পড়েছেন, হুজুর। মুশকিল তো ওদের। সবগুলোকে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান করে দিয়েছি।

BanglaBook.org

কিন্তু মালাটা ওরা কী করল, খেয়ে ফেলল নাকি?

খেয়ে ফেলবার মতোই জিনিস যে।

তুমি দেখেছ নাকি?

বাক্সর মধ্যে খাদগুলো দেখেই বুঝতে পারছি, এক-একটা মোতি যেন পায়রার ডিম।

দেওয়ানজি মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, শুধালেন, তমিজ মিঞা, তোমার মতো অফিসার আর কয়জন আছে সরকারের?

আমার মতো? একজনও নয়, তমিজ মিঞা দুটি হবে না।

তবু রক্ষা। আচ্ছা, এখন তুমি এসো।

তবে ওই বাক্সটা এখন আপনার কাছেই থাক, মামলা উঠলে এগজিবিটের জন্যে নিয়ে যাব।

এই বলে আর-এক প্রস্থ সেলাম ও হাসি ছড়িয়ে তমিজ মিঞা বিদায় নিল।

এবারে অনির্বাণ শুরু করল, দেওয়ানজি, এ তো সেই মোতির মালার বাক্স।

তাতে আর সন্দেহ নাই।

এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এ-কাজ পঞ্চাননের নয়।

কেন?

সে যদি নিত তবে বাক্সটা সুদ্ধুই নিত, ওটা ফেলে দিতে যাবে কেন?

প্রমাণ লোপ করবার উদ্দেশ্যে।

দেওয়ানজি, কোন প্রমাণটা বড়, মোতির মালা না বাক্স?

বাক্সটা, ওর উপরে যে বাদশাহী ছাপ আছে!

কিন্তু এমন দুর্লভ মোতির মালা বাজারে পড়লে যে জানাজানি হয়ে যাবে।

যাবেই তো। কলকাতা, বোম্বাই, আর-আর সব বড় শহরের জহরতের বাজারে জানিয়ে দিয়েছি। পুলিশেও জানিয়েছে, বাজারে পড়লেই, যে নিয়ে যাবে তাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিছু খবর পেয়েছেন?

কিচ্ছু না।

তার মানে যে-ই নিক সে এখনও বাজারে দেয়নি।

বাজারে দেবার উদ্দেশ্যেই পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছিল।

তার মালপত্তর তো পুলিশে নিশ্চয় তল্লাশ করেছে।

করেছে, কিন্তু পায়নি।

না নিলে পাবে কী করে!

ওইখানেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার তফাত। আপনারা ধরে নিচ্ছেন নেয়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি সে ছাড়া আর কেউ নেয়নি।

আচ্ছা, ওটা যে খোয়া গেছে জানলেন কী করে? থাকে তো তোষাখানায় সিন্দুকের মধ্যে।

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে দেওয়ানজি বলে উঠলেন, ভালো তাজরায় পড়লাম সকালবেলাতেই।

তবে না-হয় থাক।

থাকবে কেন? শুনে নিন। ওই শাহী শিরোপা বছরে একদিন বের করে রাজবংশের ইষ্টদেবতা রাধাগোবিন্দজিউর চরণে রাখা হয়। সেদিন সকালে সিন্দুক খুলে দেখা গেল শাহী শিরোপা উধাও। তার ঠিক দু'দিন আগে পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছে। এখন দুই আর দুইয়ে যোগ করে নিন, দেখুন চার হয় কি না।

BanglaBook.org

কিছু মনে করবেন না, দেওয়ানজি, কিন্তু দুই আর দুই পাচ্ছি কোথায়? আমি তো দেখছি দুটো শূন্য। মোতির মালা থাকল সিন্দুকের মধ্যে। চাবি থাকল আপনার কাছে আর রাজাবাহাদুরের কাছে, সে-চাবি কখনও বেপাত্তা হয়নি। পঞ্চানন নেবে কী করে?

তবে কি বলতে চান আমি নিয়েছি?

আরে ছিঃ-ছিঃ, এ কী বলছেন!

এমনসময় রাজাবাহাদুরের খানসামা এসে তলব করায় বেঁচে গেলাম। রাজাবাহাদুর আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুজনে নিরিবিলি হওয়ামাত্র বললাম, কিছু বুঝলে?

বুঝেছি বইকী।

তার মানে সিদ্ধান্ত করেছ।

নিশ্চয়।

আগ্রহের সঙ্গে বললাম, কী?

সিদ্ধান্ত এই যে, পঞ্চানন নেয়নি।

তবে নিল কে? দেওয়ানজিই হাত-সাফাই করলেন না কি?

অসম্ভব নয়, তবে এখনও সব সূত্রগুলো আমার হাতে আসেনি।

তাঁর স্বার্থ কী?

কী যে বলো! রাজাবাহাদুর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তিনি মারা গেলেই পঞ্চানন হাঁকিয়ে দেবে দেওয়ানজিকে, কাজেই সময় থাকতে যা হাতিয়ে নেওয়া যায়।

এ অসম্ভব। কতকালের পুরনো কর্মচারী, আবার আত্মীয়ও বটে।

তবে তোমার কথা অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে, স্বয়ং রাজাবাহাদুরই নিয়েছেন।

হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলাম।

যত খুশি হাসো, তবে প্রমাণের যে-অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ-মালা রাজবাড়ির বাইরে যায়নি।

কিন্তু বাক্সটা!

সে তো খোলস, শাঁসটা ভিতরেই আছে।

ভাই অনির্বাণ, এ যে রহস্যের ভিতরে রহস্য।

মিথ্যা নয়, জল অনেক।

রাজাবাহাদুরের খাস-কামরায় পৌঁছে অভিবাদন করে দুজনে আসন গ্রহণ করলাম।

রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে যখন ছুটি পেলাম তখন আমাদের গজভুক্তকপিত্থবৎ অবস্থা, ভিতরে আর সার পদার্থ বলে কিছু নেই। একটানা চারঘণ্টা বক্তৃতা, মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করেছি বটে আমি, ওই ভরসায় যে, বক্তৃতা থামতে পারে। অনির্বাণ কোন ভরসায় সে-ই জানে।

আমাদের পিছু-পিছু চলেছেন গুপীবাবু, তাঁর উপরেই আমাদের তদারকির ভার।

মানুষটি অত্যন্ত শিষ্ট, রাজবাড়ির কায়দাকানুনে অভ্যস্ত, জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলেন না। কথা বললেও যথাসম্ভব সংক্ষেপে। তাঁর একটি মুদ্রাদোষ এই যে, হাত দুখানা বুকের কাছে তুলে জোড় করে থাকেন, আর দুই হাতের আঙুল মোচড়াতে থাকেন, যেন অনুপস্থিত কোনও মনিবের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

গুপীবাবু, রাজাবাহাদুরের কি এইভাবে একটানা কথা বলে যাওয়া অভ্যাস?

আপনারা তো তবু অল্পে ছাড়া পেয়েছেন।

BanglaBook.org

তা বটে, খাওয়ার সময় হয়েছে বলে বোধকরি দয়া করে ছেড়ে দিলেন।

কতকটা তাই বটে।

সন্ধ্যাবেলা ধরলে বোধকরি সারারাত চালাতেন।

আজ্ঞে না, তখন অল্পেই ছাড়া পেতেন।

এমন সদয় কেন?

রাতের প্রথম প্রহরেই তিনি আসনে বসেন কিনা।

আসন আবার কিসের?

যোগসাধনা করেন কিনা।

সারারাত চলে?

সারারাত, তখন তাঁর মহলে কারও যাওয়ার হুকুম নেই।

এমন কতদিন চলছে? —এবারে প্রশ্নকর্তা অনির্বাণ।

আজ্ঞে রানিমা গত হওয়ার পর থেকেই।

কিংবা পঞ্চাননকে দত্তক নেওয়ার পর থেকে। ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভাববার আর কী আছে? রানিমা গত হওয়ার মাসখানেক আগে দত্তক হয়ে পঞ্চাননবাবু এলেন, সঙ্গে আমরাও এলাম।

'আমরা' কে-কে?

আমি আর হারান। তখন থেকেই দেখছি আসনে বসেন, তার আগের কথা জানিনে।

আচ্ছা, গুপীবাবু, দেওয়ানজি যোগ-টোগ করেন কি?

শুনেছি হুজুর তিনিও আসনে বসেন।

শুনেছেন, দেখেননি?

কেমন করে দেখব, তাঁর মহলেও কারও যাওয়ার হুকুম নেই রাতের বেলায়।

আমি হেসে উঠে বললাম, এ-রাজ্যের উন্নতি না হয়ে যায় না, রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই যখন যোগী।

আচ্ছা, গুপীবাবু, এ-যোগসাধনার তাৎপর্য কি অনুমান করতে পারেন?

এর মধ্যে আর তাৎপর্য কী আছে? বয়স হলেই ধর্মকর্মে মন যায়, দুজনেরই তো বয়স হয়েছে।

কে বড়?

রাজাবাহাদুর বছর দুয়েকের ছোট। একসঙ্গে এই বাড়িতেই দুজনে মানুষ হয়েছেন, দুজনে বড় সম্প্রীতি।

শুনেছি পঞ্চাননকে দত্তক না নিলে তিনি মালিক হতেন।

সেইরকমই তো শুনেছি।

পঞ্চানন দত্তক হয়ে আসায় দেওয়ানজি নিশ্চয় খুশি হননি।

গুপীবাবু নিরুত্তর। তাকিয়ে দেখি যে, তাঁর করতল মোচড়ানো বৃদ্ধি পেয়েছে, মুখের ভাবটা 'মুই অতি দীনহীন তোমার প্রেমের কী বা জানি'।

আমরা বুঝলাম যে, গুপীবাবু এবারে মুখ বন্ধ করেছেন, আর কোনও কথা বের করবার আশা নেই। রাজবাড়িতে মুখের যথাযথ ব্যবহার না জানলে টেঁকা ভার, এ-সত্য দেখতে পেলাম গুপীবাবুর আচরণে।

প্রসঙ্গান্তর করবার আশায় গুপীবাবু বললেন, হুজুর, পঞ্চাননবাবু আর কতকাল হাজতবাস করবেন?

যতকাল না মামলা ফয়সালা হয়—বলল অনির্বাণ।

BanglaBook.org

কতদিনে ফয়সালা হবে মনে হচ্ছে?

কেমন করে বলব।

লোকে তো বলছে, আপনারা তদন্তের ভার নিয়ে এসেছেন।

অনির্বাণ হেসে উঠল, দুর্লভ তার হাসি—আমরা কি পুলিশ না গোয়েন্দা!

অপ্রস্তুত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে ঘন-ঘন হাত কচলাতে লাগলেন গুপীবাবু।

চার

রাত্রে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করে রাজাবাহাদুর কথিত বিবরণের রোমন্থন করতে শুরু করলাম। অনির্বাণ এখনও ঘুমোয়নি, চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে বলে, সে কখনও ঘুমোয় না, তবে মাঝে-মাঝে চুরুটের গন্ধ পাওয়া যায় না কেন?

হারান এখনও শুতে আসেনি, এলে একবার ঘরে টহল দিয়ে যায়।

রাজাবাহাদুর বলেছেন, তাহেরগঞ্জ রাজবংশের আদি পুরুষ হরিনারায়ণ রায় অল্পবয়সেই আগ্রায় গিয়ে বাদশাহী ফৌজে ভরতি হন, তখন সিংহাসনে বাদশা আকবর। মানসিংহের ফৌজের সঙ্গে তিনি এলেন বাংলাদেশে। আপনি ভাবছেন, মানসিংহ কেন তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

আমি অবশ্য কিছুই ভাবিনে, অথবা ভাবছিলাম যে, যত শীঘ্র এ-কাহিনী শেষ হয় ততই সুবিধা।

—আরে হরিনারায়ণ রায় যে বাংলাদেশের লোক, এদেশের পথঘাট তাঁর সুবিদিত।

বুঝলাম, অনির্বাণ বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করছে, রাজাবাহাদুরের সামনে চুরুট টানা চলবে না।

এ-বিষয়ে তাকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল, যতটা অসুবিধা হওয়ার কথা ততটা হয় না।

কেন?

রাজাবাহাদুরের অম্বুরি তামাকের গন্ধে অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়। তবে চুরুটের কাছে কেউ নয়।

অনেক চেষ্টায় মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করলেন, হরিনারায়ণ রায় খুব বীরত্ব দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উল্লেখ করেননি।

বঙ্কিমের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বললাম, বোধহয় তাড়াহুড়িতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আরে না, না। বাঙালি বাঙালির ভালো দেখতে পারে না, তার চোখ টাটায়। এদেশের পাখি অবধি 'চোখ গেল, চোখ গেল' রব করে, পরের ভালো দেখতে পারিনে, চোখ গেল। না, না, বঙ্কিম ওটা ইচ্ছা করেই বাদ দিয়ে গিয়েছেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ্য করতে পারে না বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গৌরব।

বুঝলাম যে, চোরাবালুর উপর দিয়ে চলেছি, খুব সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে।

তা না পারুক আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। বাংলার বন্দোবস্ত করে যখন মানসিংহ ফিরবার মুখে, তখন খবর এল উত্তরবাংলায় ডাকাতরা রাজা-মহারাজা উপাধি নিয়ে লোকের উপরে অত্যাচার করছে। না তারা মানে গৌড়ের পাঠান নবাবকে, না মানে হিন্দু জমিদারদের। মানসিংহ স্থির করলেন, আগ্রায় ফিরবার আগে ও-দিকটা শাসন করে যেতে হবে। এ-কথা শুনে হরিনারায়ণ রায় সেলাম করে বললেন, মহারাজ, বান্দা থাকতে আপনি কেন যাবেন কতকগুলো ডাকাতকে শাসন করতে, রাজা বা নবাব হলেও হত।

মানসিংহ হেসে শুধোলেন, পারবে তুমি?

হরিনারায়ণ রায় বললেন, শির জামিন।

মানসিংহ বললেন, হ্যাঁ, তুমি পারবে।

তখন পাঁচশো শাহী ফৌজ নিয়ে হরিনারায়ণ রায় উত্তরবঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন, বলে গেলেন, মহারাজ, আপনি গঙ্গাস্নান করে বিশ্রাম করুন, আমি লড়াই ফতে করে ফিরে আসছি।

যে কথা সেই কাজ। তিনমাস অন্তে সেই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' রাজা-মহারাজাদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে এলেন হরিনারায়ণ রায়। তারা বাদশাহের জন্য কেউ এনেছে ভুটানী ঘোড়া, কেউ এনেছে গোয়ালপাড়ার হাতি, কেউ এনেছে চন্দন কাঠ, কেউ দামি পাথর। মানসিংহ খুশি হয়ে বাদশাহের নামে তাদের খেলাৎ দিলেন। যার-যার জমিদারিতে বহাল রেখে বাদশাহী খাজনা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

আর হরিনারায়ণ রায়কে কী দিলেন?

বংশগৌরবে জ্বলজ্বল করে ওঠে রাজাবাহাদুরের চোখ দুটো, আহা, সেই কথাতেই আসছি। হরিনারায়ণকে বললেন, তোমাকে বাদশা স্বহস্তে খেলাৎ দেবেন। হরিনারায়ণ ফিরে চললেন শাহী ফৌজের সঙ্গে আগ্রায়। ইতিমধ্যে আকবর বাদশার এন্তেকাল হওয়ায় সিংহাসনে জাহাঙ্গীর বাদশা। মানসিংহের মুখে বিবরণ শুনে হরিনারায়ণ রায়কে পদবী দিলেন সিংহ। হরিনারায়ণ রায় হলেন হরিনারায়ণ সিংহ রায়। সেই থেকে আমরা সবাই সিংহ রায়। আর যেখানে ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল তার ফতেহাবাদ পরগনা নামকরণ করে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে ইজারা দিয়ে রাজাবাহাদুর উপাধি দিলেন। পত্তন হল তাহেরগঞ্জ রাজবংশের।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বোধকরি ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এমনসময়ে তীব্র কণ্ঠের কান্নার শব্দে হকচকিয়ে জেগে উঠলাম।

সেই পরিচিত ক্রন্দন।

বেশ বুঝলাম, এ-নারীকণ্ঠের রোদন নয়, নারীর কান্না ব্যক্তিগত। এ যেন সমস্ত প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকাগুলোর বহুকালের চাপা দুঃখ কোন অতীতের গহ্বর থেকে কোন অজ্ঞাত রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসছে। ভাঙা অট্টালিকার বুকভাঙা দুঃখের বিলাপ।

সমস্ত গা শিউরে ওঠে।

শুনছ অনির্বাণ!

না শুনে উপায় কী!

কে কাঁদছে?

তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

এমন কতদিন চলছে?

শুনেছ যে অনেকদিন।

কতকাল আর এমন চলবে?

যে কাঁদছে বলতে পারে।

কে কাঁদছে?

মনে করো না কেন, ওই রাজপুরীর ওই প্রাচীন মহলগুলো।

কান্নার আওয়াজ মিলিয়ে গেল, এখন আর কিছুক্ষণ ঘুম হবে না। ভাবলাম, রাজাবাহাদুর-কথিত গল্পের খেই আবার অনুধাবন করা যাক।

কিন্তু তখনই, সেই মুহূর্তে আর-একটা বিকট আর্তনাদ উঠল, মনে হল, কোনও ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ যেন ফুকরে উঠল, কর্তা...।

BanglaBook.org

ব্যস, আর কোনও শব্দ নেই, যদি আর কিছু ওই অদৃশ্য কণ্ঠের থেকে থাকে তবে কণ্ঠনালীতেই চাপা পড়ে গিয়েছে।

ও আবার কী অনির্বাণ?

যা শুনলে।

শুনলাম, কে যেন আর্তনাদে বলে উঠল—কর্তা।

তবে তাই।

কে বলল, কাকে বলল, কেন বলল?

আমি তোমার পাশের ঘরে শুয়ে আছি, কেমন করে জানব!

হারানকে জিজ্ঞাসা করো না কেন, ঘুমোচ্ছে নাকি?

সে বিছানায় নেই।

কোথায় গেল?

আগের দু'রাত্রি যেখানে গিয়েছিল।

এত রাতে ও রোজ যায় কোথায়?

সে-কথা ও-ই বলতে পারে।

না, ভাই, প্রেতের পুরীতে আর নয়, কালকেই ফিরে চলো।

আর দু'দিন থাকো।

ওই কান্না আর সহ্য হয় না। একটা ছিল এখন আবার দুটো হল।

দ্যাখো না, হয়তো একটাও থাকবে না।

তুমি কী ভাবছ তুমিই জানো।

হয়তো ক্রমে তুমিও জানতে পাবে।

বলোই না।

অনির্বাণ নিরুত্তর—অযথা বাক্যব্যয় সে করে না।

ওই দুই বিকট আওয়াজের অবসানে রাজপুরী এখন দ্বিগুণ নীরব।

বুঝলেন, ওই পরগনা জায়গীর দিয়েই বাদশা ক্ষান্ত হলেন না। একদিন দেওয়ান-ই-আমে ভরা দরবারে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে আড়াই হাজারি মনসবদার পদবী দিয়ে স্বহস্তে গলায় পরিয়ে দিলেন শাহী শিরোপা এক মোতির মালা। দরবারীগণ কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ রব করে উঠল। এতদিন তারা শুনেছে মছলিখোর বাঙালি কাপুরুষ আর লড়াইয়ে নারাজ। এখন আর সে-কথা বলবার উপায় রইল না।

এতবড় বীরপুরুষের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বলে উঠলাম, বাঃ-বাঃ, চমৎকার! বাদশার যোগ্য বটে!

আর হরিনারায়ণ সিংহ রায়ের যোগ্য নয়!

অবশ্যই, অবশ্যই।

তবেই দেখুন, বাদশা কি যাকে-তাকে খেলাৎ আর শিরোপা দেন?

তারপর কী হল বলুন।

তার আগে কী হল শুনুন। বাদশা তাঁকে একশো আটটা আরবি ঘোড়া আর পাঁচটা হাতি বকশিস করলেন, বললেন, যাও তুমি, বাদশার নামে পরগনা শাসন করো গিয়ে। ওখানে যতটা তুমি জয় করতে পারবে—তোমার রাজ্য।

BanglaBook.org

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, হরিনারায়ণ সিংহ রায় ফিরে এসে ধীরে-ধীরে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর রাজত্বের সীমা দাঁড়াল উত্তরে ভুটান, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে বিহার আর দক্ষিণে মাত্রাই নদী।

বুঝলাম যে, ইতিহাস আর ভূগোল সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের কল্পনা নিরঙ্কুশ, তবে আপত্তি করা উচিত হবে না, তাতে কাহিনীর দৈন্য বাড়বার আশঙ্কা।

অনেকক্ষণ বলে ক্ষান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনি বিশ্রাম করুন, পরে আবার শুনব।

আরে না, না, পূর্বপুরুষের বীরত্ব-কথায় কি ক্লান্তি আসে!

হায়, হরিনারায়ণ সিংহ রায় তো আমাদের পূর্বপুরুষ নন, আমাদের ক্লান্তি আসতে বাধা কী?

আসল কথাটাই তো এখনও বলা হয়নি। একশো আটটি মোতি সেই মালায়, আপনারা যাকে বলেন মুক্তো, সাহেবরা বলে পার্ল। সবগুলো সমান আকারের, একটিও ছোট বড় নয়। প্রত্যেকটির আকার পায়রার ডিমের মতো। আর রঙ!

বললাম, দুধের মতো।

দুধেও একটু হলদে আভা থাকে, এতে তাও নেই। শাদা পাথরের থালায় কুয়োর জল থাকলে যেমন রঙ হয় তেমনি। নদীর জল রাখলে চলবে না, নদীর জলে ধুলো-বালু থাকে। প্রত্যেকটিতে মুখ দেখে নিতে পারেন। শাহী মোহরের ছাপ দেওয়া ইস্পাহানী কারিগরের সোনায় মিনা করা মখমলের খাপের মধ্যে সেই মালাটি দেখে লোভে মানুষের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। আকবর বাদশাকে এই মালা ভেট পাঠিয়েছিল পারস্যের বাদশা। সেই মালা অবশেষে এল, যেখানে আসা উচিত ছিল সেখানে, তাহেরগঞ্জ রাজবংশের আদি পুরুষ রাজাবাহাদুর হরিনারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরের হাতে।

বেরিয়ে এসে অনির্বাণকে বলেছিলাম যে, রাজাবাহাদুর গল্প বলতে জানেন বটে।

সে বলেছিল, কেবল থামতে জানেন না।

ক্রমে তাহেরগঞ্জে রাজবাড়ি তৈরি হল, মহলের মতন। একটা মহল পুরনো হয়, নূতন ফ্যাশানে আর-মহল গড়ে ওঠে। বাদশাহী আমল, নবাবী আমল, কোম্পানির আমল, মহারাণির আমল, নূতন আমলে নূতন মহল। পুরনো হলে ভাঙবার দস্তুর নেই, বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া কিনা। নূতন গড়ে নিতে হবে, পুরনো কালের নিয়মে ধীরে-ধীরে যখন ভেঙে পড়ে পড়বে।

এবারে তা হলে উঠি।

বিলক্ষণ। হরিনারায়ণ সিংহ রায় বছরে একটা শুভদিন দেখে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে যেতেন। এখনও সে-রেওয়াজ আমাদের পরিবারে আছে। প্রবীণ হয়ে পড়ায় আমি আর এখন যেতে পারি না, আমার হয়ে দেওয়ানজি যায়, তার শরীরেও রাজবংশের রক্ত আছে কিনা। এইরকম এক যোগে হরিনারায়ণ সিংহ রায় তো গিয়েছেন ব্রহ্মপুত্রে তীর্থস্নানে। স্নান সেরে উঠেছেন, এমনসময় দেখতে পেলেন কাঠের কী একটা বস্তু ভেসে আসছে। কৌতূহলী হয়ে সাঁতরে গিয়ে তুলে দেখলেন রাধাগোবিন্দজিউর দিব্যমূর্তি। আহা, কী গড়ন। দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা করে। সেই মূর্তি মাথায় বহন করে তিনি তো উঠলেন তীরে। এমনসময় সম্মুখে এক সন্ন্যাসী, চারদিকে লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া, তার মধ্যে কোথা থেকে সন্ন্যাসী এলেন কেউ বলতে পারে না।

রাজাবাহাদুর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, তুমি মহা ভাগ্যবান, আজ স্বয়ং ইষ্টদেবতা ভেসে এসে তোমার কাছে ধরা দিয়েছেন। এঁরাই তোমার কুলদেবতা। যাও, মন্দির তৈরি করে এঁর প্রতিষ্ঠা করো গিয়ে।

রাজাবাহাদুর করজোড়ে বললেন, প্রভু, আপনার পায়ের ধুলো কি পড়বে না আমার কুটিরে? সে-কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, শোনো, শাহী শিরোপা বলে যে-মোতির মালা পেয়েছ

তা সযত্নে রক্ষা করবে। রাসপূর্ণিমার রাতে একবার রাধাগোবিন্দজিউর চরণে স্পর্শ করাতে ভুলো না।

আমরা দুজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই প্রাচীন দিনের কাহিনী শুনছি। মনে হচ্ছে, আমরা যেন বিংশ শতাব্দী থেকে চলে গিয়েছি তিনশো বছর আগে, যখন সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-দৈবের সীমানা এমন অটল ছিল না। অনির্বাণও নীরব, তবে সে কী ভাবছে দেবতাদেরও দুর্বোধ্য।

প্রভু, মাপ করবেন, আপনি কী করে জানলেন যে, শাহী শিরোপা আমি পেয়েছি!

সন্ন্যাসী কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে বললেন, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। এই মোতির মালা তোমার সৌভাগ্যের চিহ্ন। যতদিন এ-মালা তোমার বংশে থাকবে, রক্তের সূত্রে পুরুষ পরম্পরায় চলে আসবে, ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। যদি কোনওদিন এ-মালা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় কিংবা ভিন্ন রক্তে চলে যায় তবে জানবে তোমাদের গৌরব-সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। মনে রেখো। এখন যাও, রাধাগোবিন্দজিউর প্রতিষ্ঠা করো গে, মোতির মালা রক্ষা করো গে।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজিউর জয়প্রণিপাত করলেন। কিন্তু মাথা তুলেই দেখলেন যে, সন্ন্যাসী অন্তর্ধান করেছেন। চারদিকে লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া, তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে কেমন করে বা এলেন আর কেমন করেই বা গেলেন!

কাছেই রাজপুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি মনে করিয়ে দিলেন, মহারাজ, সমস্তই দেবতার লীলা, এ নিয়ে চিন্তা করা অনুচিত। ওঁরা কামচর। যখন খুশি, যেখানে খুশি যাতায়াত করেন। আপনার মহাসৌভাগ্য একদিনে কুলদেবতা ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজিউর জয়ধ্বনি করে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

কিন্তু মন্তব্য করে বাধা দিলে গল্পের দুর্নিবার স্রোত থামতে পারে আশায় বললাম, এ সত্যই এক উপন্যাস।

উপন্যাস তো যে-কেউ লিখতে পারে, বঙ্কিম লিখেছে, দামোদর মুখুজ্জে লিখেছে, সে আর এমন কঠিন কী? এ সত্য। রাধাগোবিন্দজিউ এখনও মন্দিরে বিরাজ করছেন, আর...।

এই পর্যন্ত বলে অনেকক্ষণ অধোবদনে থেকে বললেন, শিরোপাও এতকাল ছিল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, কোথায় গেল, কেমন করে গেল, কে নিল বলতে পারেন? প্রত্যেক দিন রাধগোবিন্দজিউর চরণে মাথাকুটে মরি, প্রভু, বলে দাও, বলে দাও, মালা ফিরে না পেলে যে রাজবংশ লোপ পায়!

তাঁর ক্ষণিক নীরবতার সুযোগে বললাম, আর যে-ই নিক পঞ্চানন নেয়নি।

নিশ্চয় নেয়নি। সমস্তই তো তার হবে, তবে কেন সে নিতে যাবে!

তবে তাকে গ্রেপ্তার করালেন কেন?

সেসব কথা রামসদয় জানে, দেওয়ানের উপরে কথা বলা কি মনিবের উচিত?

তবে কি মনিবের উপরে দেওয়ান!

আরে দেওয়ান তো নামে, তার মতো প্রভুভক্ত, রাজবংশের হিতৈষী আর কে আছে?

তা হলে তাহেরগঞ্জের যুবরাজ জেলে যাবে?

এরূপ কঠোর প্রশ্নে হতচকিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে শুধোলেন, আচ্ছা, দত্তকপুত্র কি দত্তকগ্রহীতার সমরক্ত?

গোত্রান্তর হলেই সমরক্ত হয়, রক্ত অনুসারেই গোত্র।

নানা মুনির নানা মত, কার কথা বিশ্বাস করি বলুন।

তিনি যখন শাস্ত্র তুললেন অগত্যা আমাকেও শাস্ত্রনিক্ষেপ করতে হল, বললাম,

BanglaBook.org

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।

আমার মনের কথা বলেছেন—বলে বৃদ্ধ আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আচ্ছা, এখানে 'মহাজন' শব্দটা কী অর্থে নেব?

এসব বিষয় কি আপনাকে বোঝাবার যোগ্যতা আমার আছে! তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি, শাস্ত্রকার বলছেন—মতামত বিচারে যেয়ো না, থই পাবে না। দশজনে যা করছে করো।

দশজনে যা মানে, আমার জ্ঞাতিরা সবাই বুঝিয়েছিল যে, দত্তক নাও, দত্তক পুত্র পিতার সমরক্ত, কাজেই তাহেরগঞ্জের রাজবংশ ভ্রষ্টরক্ত হবে না।

আমি সমস্ত জানা সত্ত্বেও ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলাম যে, দত্তক গ্রহণ না করলে উত্তরাধিকারী কে হত?

রামসদয়, ও আমার পিসতুতো ভাই, কাজেই রক্তের যোগ আছে।

তবে বোধকরি দত্তক নেওয়াতে তিনি খুশি হননি।

না, না, ও খুব স্নেহ করে পঞ্চাননকে। তবে ওর ছেলেরা নিশ্চয় ওর কানভারি করেছে।

পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করাবার মূলে কি বাপের না হোক, ছেলেদের মন্ত্রণা নেই?

এ-প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ক'দিন হল?

বুঝতে পারলাম না কীসের হিসাব।

তখন তিনি নিজেই হিসাব করতে লাগলেন, আপনারা এসেছেন আজ তিনরাত, পথেও গিয়েছে একরাত, তারও আগে আর-তিনরাত, কাজেই সপ্তাহ হতে চলল, আরও কতদিন হবে কে জানে?

এতক্ষণ পরে অনির্বাণ প্রথম মুখ খুলল, বলল, জেল হলে অনেক রাত, অনেক দিন, অনেক বছর হবে।

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, জেল হতেই পারে না। তাহেরগঞ্জের যুবরাজের জেল হতেই পারে না, আমার পঞ্চাননের—।

আর বলতে পারলেন না, আর বলতে গেলে চোখের জল বাধা মানবে না। প্রাচীন অভিজাত পুরুষের পক্ষে অপরের সম্মুখে অশ্রুপাত জীবনপাতের মতো মর্মান্তিক। তবে ওই অর্ধোক্ত বাক্যে বুঝতে বাকি রইল না যে, পঞ্চানন তাঁর কত আদরের পাত্র। কেবল যুবরাজ বলেই নয়, পঞ্চানন বলেই। ভাবলাম, বৃদ্ধ কী কঠোর পরীক্ষাতেই না পড়েছেন! একদিকে রাজবংশের মঙ্গল ও স্থায়িত্ব, অন্যদিকে পঞ্চাননের প্রতি গভীর আকর্ষণ। পঞ্চাননকে ভালো না বেসে কেউ পারে না, তার দুই সাক্ষী আমরা। ভালোবাসা আকর্ষণ করবার সহজাত সৌভাগ্য নিয়ে কোনও-কোনও লোক জন্মগ্রহণ করে।

পাঁচ

নাক ডাকে কার?

হঠাৎ নাক-ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কার নাক ডাকে? অনির্বাণ কখন ঘুমোয়, কখন জাগে স্থির নেই, তবে তার নাক ডাকে না জানি। আর হারান তো রাতে শয্যাতেই থাকে না। তবে কার?

তখন মনে পড়ল ঘুমের পাতলা চাদরটার তলে আমারই যেন নাক ডাকছিল, তার শব্দে পাতলা চাদরটা সরে গিয়ে জেগে উঠছি।

BanglaBook.org

নিজের নাক-ডাকা শুনতে পাওয়া যায় না এ-সর্বৈব সত্য নয়।

রাজাবাহাদুরের কাহিনী চিন্তা করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমে-জাগরণে-স্বপ্নে মিলে এক দুঃস্বপ্নকর আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম।

সেই বুকফাটা কান্নার শব্দ, তার উপরে সেই আর্তনাদ মনে পড়ল। ভাবলাম, এ কোন ভূতুড়ে পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম!

স্থির করলাম, কালকেই ফিরব এবং ভোরবেলাতেই আমার সঙ্কল্প জানিয়ে দেব অনির্বাণকে।

কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম দেখি যে, অনির্বাণ ঠেলছে।

এত ভোরে?

ভোর কোথায়, বেশ বেলা হয়েছে, ওঠো, দেওয়ানজি তলব করে পাঠিয়েছেন।

দেওয়ানজির কামরায় গিয়ে দেখি তিনি সেই সকালেই স্নান-আহ্নিক সেরে তিলক-ফোঁটা কেটে বসে আছেন, তাঁর সম্মুখে সেই মোতির মালার মখমলের বাক্সটা।

এটা এল কোথা থেকে?—শুধোল অনির্বাণ।

খুব ভোরবেলাতেই তমিজ মিঞা এসে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কেন?

সে বলল, বেদের দলের কাছে ভালো করে তল্লাশ করেছে। কিছু পাওয়া যায়নি। তাই তাদের ছেড়ে দিয়েছে, আর ফেরত দিয়ে গিয়েছে এটা।

আমি বললাম, রহস্য যে ঘনীভূত হয়ে উঠল।

জগবন্ধুবাবু, এর মধ্যে রহস্য তো কিছু নেই। যে নিয়েছে সে-ই গড়খাইয়ের ধারে বাক্সটা ফেলে দিয়ে গিয়েছে।

কেন?

কেন আর কী? এর উপরে যে শাহী মোহরের ছাপ, লুকানো চলবে না, তাই ফেলে রেখে গিয়েছে।

আপনার কী মনে হয়—।

মনে হওয়ার তো কিছু নেই। সমস্ত ঘটনা পঞ্চাননের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে।

এমনসময়ে একজন চাকর ছুটে এসে বলল, হুজুর, পুরনো বাড়িতে বিষ্ণুমণ্ডপের গলির মধ্যে হারান মরে পড়ে রয়েছে।

হারান মরে পড়ে রয়েছে—কী বলিস?

হ্যাঁ, হুজুর, দেখে এলাম, পুজোর ফুল তুলতে গিয়েছিলাম।

অনির্বাণ ছাড়া আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। অনির্বাণ যদি বা বিস্মিত হয়ে থাকে মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। ওর ভাবগতিক সমস্তই অন্তঃসলিল।

চলুন, দেখে আসা যাক।

চাকরটির পিছু-পিছু আমরা তিনজন চললাম। পুরনো মহলের মধ্যে গিয়ে দেখলাম ঘাসের উপরে হারানের মৃতদেহ শায়িত, চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে।

কোনও একটা উৎকট আতঙ্কে তার মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে, চিনবার উপায় নেই, গায়ের কাপড় দেখেই হারান বলে বুঝলাম।

কিছুক্ষণ তিনজন নিস্তব্ধ।

দেওয়ানজি বললেন, কী করে হল?

অনির্বাণ বলল, রাতে যেন একটা আর্তনাদ শুনেছিলাম।

BanglaBook.org

কিছু বুঝেছিলেন?

আমি কথা বলতে উদ্যত হওয়া মাত্র অনির্বাণ বলে উঠল, দেওয়ানজি, পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিন, ডাক্তার ডেকে লাভ নেই, অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।

মনে হল, অনির্বাণ চায় না কী শুনেছিলাম প্রকাশ করি।

চলুন, ফিরে গিয়ে পুলিশেই খবর পাঠাই।

ঘরে ফিরে এসে বললাম, অনির্বাণ, আমি সঙ্কল্প করেছি আজই কলকাতা রওনা হব, এ-ভূতুড়ে পরিস্থিতির মধ্যে আর-একদিনও থাকতে রাজি নই!

অবশ্যই যেতে হবে।

অবশ্যই নয়, আজই।

আর-একটা দিন থাকো, কালকে নিশ্চয় রওনা হব।

বেশ, আর-একটা দিন থাকতে রাজি আছি, তুমি না যাও, আমি একাই যাব।

আরে না, না, দুজনে একসঙ্গে যাব।

তুমি এখানে এসে কেমন যেন চুপ মেরে গিয়েছ। একে তো মোতির মালার রহস্য, তার উপর আবার তুমি রহস্যময়, দুটো রহস্যের ভার অসহ্য।

জগবন্ধু, আমি চোখ-নাক-কান সমস্তই খুলে আছি, কালকে হয়তো মুখটাও খুলব।

তার মানে কিছু হদিস পেয়েছ?

অনির্বাণ উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল।

আরে আমাকে বলতে ক্ষতি কী? আমি তো তোমারই ওয়াটসন।

তবে ওয়াটসনের মতো ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করে থাকো।

রাতের বেলায় শুয়ে হারানের মৃত্যুর ঘটনা ভাবছিলাম। হঠাৎ অত রাতে ওখানে গেল কেন? এমন কী দেখল যে, আঁতকে উঠে মারা গেল? তবে কি সত্য-সত্যই ভূত আছে বাড়িটাতে? আর কিসে এমন ভয় পাওয়া যায় যে, একটা আস্ত জোয়ান লোক আঁতকে উঠে পড়ে মরে?

গা ছমছম করতে লাগল।

ভাবলাম, হারানের বিছানাটা গুটিয়ে দিয়ে আসি। শুতে আসবার সময় দেখেছিলাম যে, বিছানা পাতাই রয়েছে, তোলবার কথা কারও মনে পড়েনি।

হারানের ঘরে যেতে গিয়ে দেখি যে, অনির্বাণের শয্যা খালি। ও আবার কোথায় গেল? ওর আবার কিছু বিপদ না ঘটে। এ কোন অজগর পুরীতে এসে কী সঙ্কটেই না পড়লাম! ভাবলাম, হোক একবার ওর শিক্ষা। হারানের বিছানা পা দিয়ে গুটিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনেকখানি জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভাবলাম, অনির্বাণ না-ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কালো মখমলের মতো অন্ধকার, আকাশময় তারার ফুলঝুরি। এই ঘনান্ধকারে কোথায় গেল অনির্বাণ! কোথায় গেল?

হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন ঠেলা দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ভোরের আলো আর অনির্বাণ।

ওঠো, ওঠো, আজ কলকাতা রওনা হতে হবে।

সত্যিই তো, বলে উল্লাসে লাফিয়ে শয্যাত্যাগ করলাম।

ঠিক যাবে তো?

নিশ্চয়।

গাড়ি তো সেই রাতের বেলায়।

BanglaBook.org

তবে তখনই।

তবে চলো, গোছগাছ করে ফেলা যাক।

গোছগাছ পরে হবে, এখন মুখ-হাত ধুয়ে নাও, রাজাবাহাদুরের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

পঞ্চানন তা হলে হাজতেই পচবে?

অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডাতে পারে বলো!

কিছুই করতে পারলে না?

তাই তো দেখছি।

তখন দুঃখিত মনে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

ও কী, গায়ে আবার শাল চাপালে কেন?

বলো কী, রাজদরবারে যাচ্ছি, যোগ্য পোশাক পরতে হবে না!

এর আগে কি রাজদরবারে যাওনি?

আজ যে আনুষ্ঠানিক বিদায় গ্রহণ।

তবে আমিও আনুষ্ঠানিকভাবে পোশাক পরে নিই।

এই বলে একখানা শাল গায়ে দিয়ে বললাম, তা হলে পঞ্চানন হাজতেই থাকল?

কী আর করা যায়।

আমার মনে ভরসা ছিল, তুমি একটা বিহিত করতে পারবে।

আমি কি জাদু জানি নাকি?

অন্তত অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে ধারণা ছিল।

তবে সে-ধারণা বর্জন করো আর তোমার নোটবুকে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রাখো, অনির্বাণ রায় অসাধারণ নির্বোধ।

হঠাৎ বিনয় কেন? ও-গুণটি তোমার ছিল না তো।

ঘটনার মুখোমুখি পড়ে হয়েছে। নাও, চলো এখন।

দুজনে যখন রাজাবাহাদুরের খাস-কামরায় এসে উপস্থিত হলাম দেখলাম রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি দুজনেই উপস্থিত। তাঁরা আগেই জানতেন যে, আজ সকালে বিদায় নিতে আসব।

নমস্কার করে অনির্বাণ বলল, রাজাবাহাদুর, আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

আর দু-দিন থাকলে হত না? এ-দিকে অনেক কিছু দেখবার আছে। বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য, দেবীগড়, ব্রহ্মপুত্র নদী। কিছুই দেখলেন না।

এর পরে একবার এসে দেখে যাব। পঞ্চানন না থাকলে বেড়িয়ে আনন্দ নেই।

পঞ্চাননের প্রসঙ্গে রাজাবাহাদুরের চোখ ছলছল করে এল। বুঝলাম, আভিজাত্যের কঠোর আত্মসংযমের সঙ্গে চোখের জলের লড়াই চলছে। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বিচারে কী হবে জানি না—আপাতত হাজতেই থাকল।

অনির্বাণ বলল, হাজতে থাকবে কেন? ছাড়িয়ে নিয়ে আসুন।

পুলিশে ছাড়বে কেন?

ছাড়বে এইজন্যে যে, আদৌ চুরি হয়নি।

এবারে প্রথম দেওয়ানজি কথা বললেন, ও-কথা তো অনেকবার বলেছেন। শুধু অনুমান বা স্নেহের দাবি তো পুলিশে মানবে না।

তবে শাহী শিরোপাটা দেখিয়ে দেবেন।

শাহী শিরোপাটাই যদি থাকবে তবে এত জল ঘোলা হল কেন?

BanglaBook.org

কারও-কারও অভ্যাস জল ঘোলা না করে খায় না।

দেওয়ানজি বললেন, মিছা কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। যদি যাত্রা করাই স্থির করে থাকেন তবে স্নানাহার সেরে নিতে হয়।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ড অবলম্বন করে সেইভাবে রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, আপনি কি সত্যিই মনে করেন শাহী শিরোপা চুরি হয়নি?

ধীরভাবে অনির্বাণ বলল, আমি সত্যিই মনে করি।

কোথায় আছে? —দাবি করলেন দেওয়ানজি।

আরও ধীরভাবে অনির্বাণ বলল, যেখানে ছিল।

ছিল তো মখমলের বাক্সটায়।

তবে সেখানেই আছে।

সেটা তো কালকে দেখেছেন।

আবার দেখতে ক্ষতি কী?

দেওয়ানজি বললেন, মিছে সময় নষ্ট করছেন।

তদুত্তরে অনির্বাণ শুধোল, কোথায় আছে সেই বাক্সটা?

তোষাখানার সিন্দুকের উপরে।

উপরে কেন? ভিতরে নয় কেন? সাবধানে রাখা উচিত ছিল।

আমি তো তার ধীরতা দেখে ও কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। অনির্বাণ করছে কী?

সিন্দুকে খালি বাক্স রাখা নিরর্থক।

খালি কি ভরা একবার দেখুন না।

অনেকবার দেখেছি।

আমার অনুরোধে আর-একবার দেখুন।

চলোই না, রামসদয়, দেখাই যাক না।

চলুন, যাচ্ছি। সক্কালবেলাতেই সময় নষ্ট—বলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে তোষাখানার চাবি আনতে চললেন।

রাজাবাহাদুর সিন্দুকের চাবি আনলেন, দেওয়ানজিও।

আগেই বলেছি, সিন্দুকের দুটো চাবি দুজনের কাছে থাকত।

তারপর তাঁদের অনুসরণ করে আমরা চললাম তোষাখানার দিকে।

পুরনো মহলের দিকে তোষাখানা, একতলার পাকা ইমারত। একজন দারোয়ান তোষাখানার প্রকাণ্ড তালাটা খুলে ফেলল। অমনি পাওয়া গেল ভ্যাপসা গন্ধ। উপরের গোটা দুই কুলুঙ্গি দিয়ে বেশ আলো এসে পড়েছিল, অন্য জানলার বালাই নেই।

ভিতরে ঢুকতেই মনে হল দু-তিনশো বছর আগেকার যুগে পদার্পণ করলাম। পল্বলে যেমন জল আটকে থাকে তেমনই অষ্টাদশ শতক এখানে স্থির হয়ে আছে। পায়ের শব্দে গোটাকয়েক চামচিকে বিরক্ত হয়ে ফরফর করে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগল।

ঘরটার উত্তর দিকে দেওয়ালে গাঁথা মানুষ-সমান এক প্রকাণ্ড সিন্দুক। সিন্দুকের উপরেই চোখে পড়ল সেই শাহী শিরোপার মখমলের বাক্সটা। শূন্য বাক্স, ভিতরে রাখবার উদ্যম হয়নি।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ানজি বললেন, ওই দেখুন বাক্স, বিশ্বাস না হয় খুলে দেখতে পারেন।

অনির্বাণ বলল, সে না-হয় দেখলেই হবে। কিন্তু দেওয়ানজি, ছাদের এ কী অবস্থা, যে-কোনও দিন ধসে পড়তে পারে।

BanglaBook.org

আমি ছাদের দিকে তাকালাম, সত্যি, অবস্থা ভালো নয়। ছোট-ছোট টালির মতো ইঁটের সীমানাগুলো ফাঁক হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা জায়গায় চিড় খেয়েছেও বটে।

দেওয়ানজি ও রাজাবাহাদুর ছাদের দিকে নজর করতে লাগলেন।

রাজবাহাদুর বললেন, রামসদয়, এবার বর্ষার আগেই যা হয় করো, এখনই লোক লাগিয়ে দাও।

হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়, আর পূর্ব দিকের দেওয়ালে গোটা দুই পিলার গাঁথতে হবে, ওদিকে দেওয়ালটা কিছু জখম হয়েছে মনে হচ্ছে।

যা হয় তাড়াতাড়ি করো।

সকলেই বাড়িটার অবস্থা দেখে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, আমি তাঁদের উদ্বেগ লক্ষ করছি।

কিছুক্ষণ করে দেওয়ানজি বললেন, আচ্ছা, এবারে বাক্সটা খুলে দেখুন, অনির্বাণবাবু।

কষ্ট করে আপনিই খুলুন না।

সকালবেলাতেই এক বৃথা ঝামেলা জুটল বলে পণ্ডশ্রম করছেন মনে করে দেওয়ানজি অবজ্ঞাভরে মখমলের বাক্সটা খুলে দেখলেন।

খুলে দেখতেই ভিতরে কী একটা বস্তু জ্বলজ্বল করে উঠল। সেই মোতির মালা। একশো আটটা মোতি আলো-আঁধারি ঘরের সবটুকু আলো কুড়িয়ে নিয়ে স্থির দীপ্তিতে জ্বলতে লাগল।

আর যে-বিস্ময় অবিশ্বাসের অধিক, যে-আনন্দ আনন্দের অধিক, সেই বিশ্বাসে, আনন্দে জ্বলতে লাগল আমাদের তিনজনের চোখ।

কারও মুখে কথা জোগাল না, সকলেই চিত্রার্পিতবৎ বিস্ফারিত-নেত্র।

অনেকক্ষণ পরে প্রথমে চটকা ভাঙল রাজাবাহাদুরের।

আভিজাত্যের অভ্যস্ত সংযম ভুলে গিয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, রামসময়, এ-যে অসম্ভব সম্ভব হল!

রামসদয়ের অবিশ্বাসটাই সবচেয়ে বেশি ছিল। তা ছাড়া তাঁরই পরামর্শে পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাঁর অপ্রস্তুতের ঘোর তখনও পুরো কাটেনি, একবার স্পর্শ করে বুঝলেন, না, সত্যি মালাটা যথাস্থানে আছে।

মৃদু স্বরে বললেন, তাই তো, কেমন করে কী হল!

আমিও কম বিস্মিত হইনি, তবে বুঝলাম, মালা হারানোর রহস্যের চেয়ে মালা আবিষ্কারের রহস্য কম গভীর নয়।

ভাবলাম, এখন থাক, পরে অনির্বাণের কাছ থেকে শুনে নেব। এখন আসল কথা সে বলবে না।

দেওয়ানজি বললেন, অনির্বাণবাবু, আপনি কি জাদু জানেন নাকি?

আজ্ঞে না, জাদুবিদ্যা জানা নেই, তবে জানা আছে যুক্তিশাস্ত্রের একটা অব্যর্থ নিয়ম।

কী সেটা?

কোনও একটা বস্তুবিশেষের পক্ষে একইসঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা সম্ভব নয়। মোতির মালাটা যখন পঞ্চানন নেয়নি, আর অন্য প্রকারেও রাজবাড়ির বাইরে যায়নি, তখন নিশ্চয় রাজবাড়ির মধ্যেই আছে। আর রাজবাড়িতেই যখন আছে, তখন যথাস্থানেই থাকবে।

দেওয়ানজি বললেন, যথাস্থানে বলতে তো ওই বাক্সটা, সেটা তো শূন্য ছিল আপনি নিজেও দেখেছেন।

তবে সেই দেখাটাই ভুল ছিল, আজকের দেখা তো ভুল হতে পারে না।

রামসদয়, তর্ক রাখো। মোতির মালা ফিরে পেয়েছ এই কি যথেষ্ট নয়।

এই বলে সেই অভিজাত সংযমী বৃদ্ধ মালাটি বের করে নিয়ে একবার মাথায় রাখেন, একবার

BanglaBook.org

কপালে ঠেকান, একবার গলায় পরেন। নানাভাবে স্পর্শ ও ব্যবহার করে বস্তুটা যে মায়া নয়, যথার্থই পাওয়া গিয়েছে তাই যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেন।

রামসদয়, সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে আছে তো! এ-মালা হারালে তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেত। সে-ভয় আর নেই, সে-ভয় আর নেই। জয় রাধাগোবিন্দজিউ। রামসদয়, ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করো, আর তাঁদের চরণে এটা স্পর্শ করিয়ে ভালো করে সিন্দুকে তুলে রাখো। আর হ্যাঁ, পঞ্চাননকে হাজত থেকে আনিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করো। আজই, এখনই, আর দেরি নয়। বুঝতে পারছ, কত বড় ভুল, কত বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

রাজাবাহাদুর, যা কিছু হয়েছে সমস্তই তো রাজবংশের কল্যাণ কামনায় হয়েছে।

না, না, আমি কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি? তা নয়। কিন্তু এখন প্রমাণ হল যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাকে আনিয়ে নেওয়ার আয়োজন করো।

রামসদয় বললেন, আমি নিজেই যাচ্ছি।

আমাকেও যেতে হবে, বললেন রাজাবাহাদুর।

আমাদেরও—বলল অনির্বাণ।

আপনারা কোথায় যাবেন?

কলকাতায়। অমনই যাওয়ার পথে রংপুরে গিয়ে পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করে যাব।

আরে না, না, এমন আনন্দের দিনে আপনাদের ছাড়ছে কে? আপনারা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন বলেই তো মালাটা পাওয়া গেল। এতদিন তো অন্ধকারে হাতড়ে মরছিলাম অথচ যেখানকার জিনিস সেখানেই ছিল।

কণ্ঠস্বরে দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে অনির্বাণ বলল, মাপ করবেন, রাজাবাহাদুর। আমাদের যেতেই হবে। আরও এক কথা, পঞ্চাননকেও আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিন।

সে কি একটা কথা হল?

হল বইকী! যুবরাজের নামে এতবড় একটা অপবাদ, অবশ্য অপবাদ মিথ্যা, তবু তো অপবাদ, যতই চেপে রাখুন কিছু জানাজানি নিশ্চয় হয়েছে। অন্তত রাজবাড়ির লোকে নিশ্চয় জেনেছে। এ হেন সময়ে এখানে এসে সে খুব অস্বস্তি বোধ করবে! এখন কিছুদিন দূরে থাকাই ভালো, দু'দিনে সবাই ভুলে যাবে, তখন যুবরাজ সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করবেন রাজবাড়িতে।

কী বলো, রামসদয়, অনির্বাণবাবুর কথা তো মিথ্যা নয়।

আপনি যদি ভালো মনে করেন, তবে তাই হোক। সবাই মিলে রংপুরে গিয়ে তাঁকে খালাস করে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।

অনির্বাণবাবু, কী দিয়ে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব ভেবে পাচ্ছি না।

আশীর্বাদ দিয়ে, রাজাবাহাদুর, আশীর্বাদ দিয়ে।

আশীর্বাদ যে করে, না চাইতেই সে করে।

যদি সত্যি খুশি হয়ে থাকেন, তবে একটি প্রার্থনা আছে।

আপনাকে অদেয় আমার কী থাকতে পারে?

আপনার কাছে সিন্দুকের যে-চাবিটি আছে, সেটি দেওয়ানজিকে দিন। এখন থেকে দুটি চাবিই তাঁর কাছে থাকবে। হাজার হোক, আপনি প্রবীণ হয়ে পড়েছেন তো। ভুল-ভ্রান্তি—।

তার বাক্য শেষ হতে পারল না, রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, ভুল-ভ্রান্তি বলে ভুল-ভ্রান্তি, মালা যথাস্থানে আছে অথচ চারদিকে খুঁজে মরছি। এর কি ক্ষমা আছে? এই নাও, রামসদয়, এখন থেকে এ-চাবিটা তুমিই রাখো।

অনির্বাণের প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

এতদিন তার কথা শুনে মনে হয়েছিল দেওয়ানজিকেই সে চোর ঠাউরেছে—এখন আবার তাঁর হাতেই চাবি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব! অনির্বাণ ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে।

ছয়

সকালের দিকেই আহারান্তে সকলে রংপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রংপুর মাইল পনেরো।

রাজবাড়ির দুটি হাতি সজ্জিত হল, একটিতে রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি। অপরটিতে অনির্বাণ ও আমি।

হাতিতে উঠবার সময়ে দেওয়ানজি বললেন, আপনাদের মাহুতকে কিছু বলবার দরকার হলে গায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দেবেন। ও কানে একেবারে শুনতে পায় না, তবে ইশারায় সব বোঝে।

আগে রাজহস্তী, পিছনে আমাদেরটা, আগে-পিছে দশ-বারোজন ঘোড়সোয়ার। আমরা রংপুরে চলেছি। দেওয়ানজি আশ্বাস দিয়েছেন, ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

শীতের পূর্বাহ্ণ, রোদটি মধুর, দৃশ্যটি মনোরম।

বিশ্বপট যেন চিত্রকরের মমতা ও মাধুরী মিশিয়ে অঙ্কিত। রাজহস্তীটা এগিয়ে চলেছে, আমাদের হাতিটা অপেক্ষাকৃত মন্থর। হাওদার গদিতে হেলান নিয়ে দুজনে চুপ করে আছি। গত কয়েকদিন উদ্বেগের পর ভারি আরাম বোধ করছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, অনির্বাণ, এবারে বুঝিয়ে বলো তো কী করে কী হল? আমার কাছে যুক্তিশাস্ত্রের তর্ক তুলে আসল কথা চেপে গিয়ে লাভ নেই।

বেশ, তবে যুক্তিশাস্ত্র থেকেই শুরু করা যাক। এটা তো স্বীকার করো যে, কোনও একটা বস্তুর পক্ষে একসঙ্গে একাধিক জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

বললাম, এ-কথাটার উপরে এত জোর দেওয়ার দরকার? এ তো অত্যন্ত মামুলি সত্য।

বেশ, তবে এই মামুলি সত্য থেকেই শুরু করা যাক, বুঝতে গোল হবে না। জগবন্ধু, বেশ মন দিয়ে শুনে যেয়ো। কোথাও ঘটনার শৃঙ্খলে গিঁট আলগা থাকলে চেপে ধরতে ভুলো না। ওই মোতির মালা কে নিল? অর্থাৎ, কার-কার পক্ষে নেওয়া সম্ভব? রাজাবাহাদুর, দেওয়ানজি ও পঞ্চানন ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পঞ্চানন অবশ্যই নেয়নি।

কী করে বুঝলে?

পঞ্চাননকে জানি বলেই বুঝলাম। তা হলে বাকি থাকল রাজাবাহাদুর আর দেওয়ানজি। রাজাবাহাদুর কেন নিতে যাবেন? অতএব শেষ পর্যন্ত একজনমাত্র বাকি থাকলেন, দেওয়ানজি। কী, ঠিক হচ্ছে তো?

যুক্তিতে চমৎকার শৃঙ্খলা।

তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। এখনই দেখতে পাবে আমার মতো নির্বোধ ভূভারতে দ্বিতীয়টি নেই।

কেন?

যথাসময়ে টের পাবে। সমস্ত ঘটনার অঙ্গুলি দেওয়ানজির দিকে।

অথচ তাঁরই জিম্মায় দিলে রাজাবাহাদুরের চাবিটা।

BanglaBook.org

ধীরে, সজনী ধীরে। ধৈর্য ধারণ করে শ্রবণ করো। দেওয়ানজি যে নিয়েছেন, তার পক্ষে প্রমাণ সুপ্রচুর। তিনিই উদ্যোগী হয়ে পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন নিজের দোষ ঢাকবার আশায়। পঞ্চাননের কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি পঞ্চাননের উপরে খুশি নন। পঞ্চানন দত্তক হয়ে না এলে তিনি বা তাঁর পুত্রগণ তাহেরগঞ্জ রাজ্যের মালিক হতেন, আর মোতির মালাটাও শেষ পর্যন্ত সমরক্তের বাইরে যেত না। গুপীবাবু আর হারানের কথাতেও এর সমর্থন পেয়েছ। তবে তিনি যে মালাটা নিয়েছিলেন ঠিক লোভের তাড়নায় নয়। মালাটা তাঁর হাতে থাকলে সমরক্তে থাকত, তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেত না—অনেক পরিমাণে এই উদ্দেশ্য ছিল।

অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও এ-চুরিটা পরহিতায়।

সবটা নয়, অনেকটা।

বেশ, তারপরে।

এখানে আসবার আগেই একরকম স্থির করেছিলাম যে, একমাত্র দেওয়ানজির পক্ষেই এ-মালা নেওয়া সম্ভব। তারপর গুপীবাবু ও হারানের কথায় তা দৃঢ়তর হল। এবারে মনে করে দ্যাখো, রাতের অন্ধকারে আবছায়া মূর্তির পুরনো মহলে ঘোরাফেরা। রাজবাড়ির অনেকেই দেখেছে, তুমিও দেখেছ। তারা মনে করত কোনও অশরীরী সত্তা। হারান বলেছিল, এই অশরীরী মাথায় দেওয়ানজির মতো উঁচু। মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, বলে যাও।

তখন আমার পূর্ব ধারণা প্রত্যয়ে পরিণত হল যে, মালাটি দেওয়ানজি সরিয়েছেন, চুরি শব্দটা ব্যবহার না-ই করলাম। তাঁর রাতের অন্ধকারে পুরনো মহলের দিকে যাতায়াত দেখে বুঝলাম, মালাটা ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, রাতের বেলায় দেখে আসেন খোয়া গেল কি না। হচ্ছে?

এ-পর্যন্ত ঠিক হচ্ছে, কিন্তু ওই গভীর রাতে বুক ফেটে কান্না?

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজবাড়ির অধিবাসীদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানজির ওটা অভিনয়।

ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য?

যাতে ও-মহলটায় কেউ না যায়।

কিন্তু এমন বুকফাটা করুণ ক্রন্দন কি অভিনয় হতে পারে?

কেন হতে পারবে না? থিয়েটারে কি সীতা, শৈব্যা এদের কান্না শোনোনি?

পরে এ-থিওরি পরিত্যাগ করেছিলে?

হ্যাঁ!

আর হারানের মৃত্যু এবং অস্পষ্ট চিৎকার?

তার চিৎকার গোড়াতে অস্পষ্ট লেগেছিল বটে, তবে পরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

খুলে বলো।

দ্যাখো, ওই রাজবাড়ির সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র ওই হারান আঁচে-আন্দাজে খানিকটা বুঝেছিল।

তাই বুঝি সে রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে ওই মহলটায় যেত?

তাই তার মৃত্যু।

হত্যা?

মৃত্যু। এইসব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের রাই কুড়িয়ে তেল তৈরি হয়ে উঠল। আর আমার সন্দেহমাত্র রইল না যে, মালাটি দেওয়ানজি নিয়েছেন আর রাজবাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। এইজন্যেই বারে-বারে মনে করিয়ে দিয়েছি যে, কোনও বস্তুর পক্ষে একই সময়ে দুই জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু তিনি যদি মালাটা নিলেনই তবে বাজারে দিলেন না কেন?

BanglaBook.org

সর্বনাশ। ও-মালার পরিচয় দেশের সমস্ত জহুরি জানে। যে নিয়ে যাবে সে তক্ষুনি গ্রেপ্তার হবে।

তবে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

আগেই বলেছি, মালাটা সমরক্তে রাখা। সেই সন্ন্যাসীর উক্তিকে এরা সবাই বেদবাক্য মনে করত। আর-একটা উদ্দেশ্য পঞ্চাননকে জব্দ করা।

আচ্ছা, তারপরে বলো।

আমরা তো তিনদিন মাত্র হারানকে দেখেছি, চতুর্থ দিনে অর্থাৎ, চতুর্থ দিনের রাতের বেলায় তার মৃত্যু হল। হারান রাতে উঠে বের হয়ে যেত। তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে অভিসারে যায়। আমি লক্ষ করেছিলাম ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে যায় পুরনো মহলের দিকে। তখন ভেবেছিলাম যে, পরদিন রাতে আমি তাকে অনুসরণ করব। কিন্তু সে-সুযোগ আর পেলাম না, তার হঠাৎ মৃত্যু হল, অর্ধোক্ত চিৎকারে সে কী বলতে চেয়েছিল বুঝতে পারলে সুবিধা হত—

কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে যে, সে চিৎকার স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে।

তখনও হয়নি, পরে হয়েছে। পরের কথা পরে।

আচ্ছা তা হলে আগের কথা বলো।

পরের দিন রাতে নিয়মিত সময়ে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে-ধীরে পুরনো মহলের দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি অলক্ষ্যে সেইদিকে চললাম। রাতটা ছিল অন্ধকার, কাজেই ছায়ামূর্তির আমাকে দেখবার উপায় ছিল না। আর চাঁদের আলো থাকলেও আমাকে দেখতে পেত না। কারণ, কী করে সে ভাববে যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে, রাজবাড়ির সবাই তাকে অশরীরী মনে করে ভয়ে সরে থাকত।

অনির্বাণ তন্ময়ভাবে বলে চলেছে।

দিনেরবেলায় তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, আমি একবার ওদিকে গিয়ে গলি-ঘুঁজিগুলো দেখে এসেছিলাম। তাই পথ চলতে অসুবিধে হয়নি। কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে, আগে-পিছে ডাইনে-বামে কোনওদিকে নজর নেই। কেনই বা থাকবে? পথঘাট যার নখদর্পণে, লক্ষ্য যায় সুবিদিত, আর অনুসরণের ভয় যার মনে নেই, সে কেন এদিকে-ওদিকে তাকাবে!

আমিও অন্য কোনওদিকে লক্ষ করছি না, সেই ছায়া-শরীরীর দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে যে দেওয়ানজি, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র রইল না। অবশ্য আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, সেই শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথার সেই খাড়াই। এখন আমার একমাত্র লক্ষের বিষয় হল, কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং কী করে। সেই মালাটা যথাস্থানে লুক্কায়িত আছে কি না দেখতেই সে নিত্য রাত্রে ছায়া-শরীরীর অভিনয় করে থাকে বুঝলাম। আমিও পিছে-পিছে আর-একটি ছায়া-শরীরীর মতো তাকে অনুসরণ করতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে আকাশে কোথাও টুকরো চাঁদ উঠেছে, তারই আলো সেই ভাঙা বাড়ির ছাদ-প্রাচীর-থামের মধ্যে দিয়ে বেঁকেচুরে এসে পড়েছে, আমার নজর চলবার কিছু সুবিধা হল বটে। তবে যাতে নজরে না পড়ি সেইজন্য ছায়া ঘেঁষে থাম ও প্রাচীরের আড়াল রক্ষা করে চলছিলাম। আমি অতিথি হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছি এ অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই।

এমনসময় দেখলাম ছায়ামূর্তি একটা ভাঙা দেয়ালের কাছে গিয়ে থামল। অনেকক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দেয়ালের একটা কুলুঙ্গি থেকে একখানা ইঁট সরিয়ে কিছু বের করল। কী দেখবার উপায় ছিল না, আমি পিছন দিকে আছি কিনা। তবে শেষপর্যন্ত হতাশ হতে হল না। সেই বস্তুটা হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরল, অমনই তার উপরে পড়ল চাঁদের আলো। সেই মোতির মালা, পূর্ণিমার চাঁদ থেকে কুঁদে তৈরি প্রত্যেকটি দানা, এমনই শুভ্র এমনই স্বচ্ছ এমনই উজ্জ্বল। একবার সেটা নিয়ে গলায় পরল, একবার মাথায় রাখল, মনে হল একবার বুকে চেপে ধরল, এমন

BanglaBook.org

চলল কিছুক্ষণ। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দিয়ে সেটা যেন অনুভব করতে চায়, তার সত্যতা যেন পরীক্ষা করতে চায়। তারপরে, বেশ কিছুক্ষণ পরে, আবার সেটা কুলুঙ্গির মধ্যে সযত্নে রেখে কুলুঙ্গির মুখে ইঁট চাপা দিল।

এতক্ষণ সে অনড় ছিল, এবারে নড়ে উঠল। বুঝলাম, ফিরবে। পাছে মুখোমুখি হয়ে আমাকে চোখে পড়ে যায় আমি একটা থামের আড়ালে লুকোলাম, ভাবলাম, সবই তো দেখলাম, এখন আমাকে না দেখে ফেলে। স্থির করলাম, দেওয়ানজি খানিকটা এগিয়ে গেলেই মালাটা বের করে নিয়ে, চোরের উপরে বাটপাড়ি সমাধা করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ব।

মূর্তিকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না, তবে পায়ের সন্তর্পিত চলার শব্দ শুনে বুঝতে পারছি এ যেন স্বপ্নগ্রস্তের পদধ্বনি, জাগ্রতের নয়।

এবারে মূর্তিটা আমার কাছে এসে পড়েছে। আমি নিশ্বাস রোধ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমনসময়ে চাঁদের বাঁকা আলো তার মুখের উপরে এসে পড়ল।

এইবার অনির্বাণ থামল। আমি এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিলাম, বললাম, থামলে কেন?

সে বলে উঠল, জগবন্ধু, জগবন্ধু, আমি নির্বোধ, আমি নিরেট আকাট ভরাট নির্বোধ, সুয়েজ খালের পূর্ব দিকের জগতে এতবড় নির্বোধ আর নেই।

হঠাৎ কী হল? কী দেখলে?

কী দেখলাম বলো তো।—কিছুক্ষণ থেমে বলল, তুমি বলবে কী করে?

আহা, কী দেখলে বলোই না।

সে-মূর্তি দেওয়ানজির নয়।

সাগ্রহে বলে উঠলাম, তবে কে?

রাজাবাহাদুর।

রাজাবাহাদুর!

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না! তোমাকে দোষ দিই না, চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আলো-আঁধারিতে নিশ্চয় ভুল দেখেছ।

নিশ্চয় ভুল দেখিনি, হাত দুই দূর থেকে দেখেছি... কিন্তু সে কী মুখ!

কেন?

সে-মুখে যেন নিদারুণ প্রতিহিংসার মুখোশ পরানো।

একটু থামল, তারপরে বলে উঠল, সেই মুহূর্তে বুঝলাম, হারানের মৃত্যুর রহস্য।

মূর্তি কি তাকে খুন করেছে?

খুন করবার প্রয়োজন হয়নি। মুখের উৎকট বীভৎসতায়, অপ্রত্যাশিত সত্য উদ্ঘাটনে আঁতকে উঠে সে মারা গিয়েছে। মরবার আগে অজান্তে তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, কর্তা—বাকিটুকু আর শেষ করতে পারেনি।

আমি বললাম, এখন মনে হচ্ছে কর্তা বলেই সে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

হারানের মরা মুখটা মনে পড়ছে? তাতে ছিল নিদারুণ আতঙ্কের ছাপ।

ছিল বটে। যাক, কী দেখলে ভাই তুমি?

কী দেখলাম! দেখলাম পিশাচের মুখ।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মুখ তো প্রশান্ত, প্রসন্ন—দেবতুল্য মুখ।

দেবতা ও পিশাচ অবস্থাবিশেষে বড় কাছাকাছি।

এ যে মোতির মালা চুরির চেয়েও ঘনতর রহস্য।

নিতান্ত মিথ্যে বলোনি।

BanglaBook.org

তারপরে?

ওই শোনো, এই অঘ্রান মাসেও কোকিল ডাকছে। বাংলাদেশের কোকিল পঞ্জিকা মেনে চলে না।

ওসব কবি-কল্পনা এখন থাক।

থাকবে কেন? এখনই তো কবি-কল্পনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যে-কল্পনা কবিতা লেখায়, সেই কল্পনাই স্টিম এঞ্জিন উদ্ভাবন করে। যে-কল্পনা জীবন-রহস্য উদ্ধার করে, সেই কল্পনাই উদ্ধার করে মোতির মালা। দীপ জ্বালাতেও আগুন, আবার ঘর জ্বালাতেও আগুন।

বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, আবার অসহিষ্ণু শ্রোতাকে জ্বালাতেও আগুন। এখন দয়া করে রহস্যটাকে পরিষ্কার করো, হঠাৎ রাজাবাহাদুরের দেবমুখে পিশাচের মুখোশ কেন?

বলছি শোনো। জানো তো যে, মানুষের মনের দুটো অংশ—একটা জাগ্রত চৈতন্য, আর একটা মগ্ন চৈতন্য। একটাকে বলতে পারি চৈতন্যের উপর তলা, আর একটা নিচের তলা।

এসব দর্শনে পড়েছি।

তুমি দর্শনে পড়েছ আমি স্বচক্ষে দর্শন করলাম। এই দুইতলায় সবসময় বনিবনাও হয় না। মানুষ যখন রোগে, শোকে বা নিদ্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে তখন নিচের তলার চৈতন্য প্রবল হয়ে ওঠে, প্রবল হয়ে উঠে বের হয়ে আসে, আর জাগ্রত চৈতন্যকে অভিভূত করে ফেলে নিজের অধিকার কায়েম করে। তখন মানুষ এমন সমস্ত কথা বলে বা কাণ্ড করে বসে তাকে পাগলামি বলে মনে হয় কিংবা তার স্বভাবের ব্যভিচার বলে মনে হয়। তখন মানুষ যেন আর-একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যায়। সেই রাধামাধবপুরের জোতদারের ঘটনার কথা স্মরণ করে দ্যাখো। মনে আছে তো?

এতক্ষণ ছিল না, এবারে মনে পড়ছে।

সে-লোকটা রাতেরবেলায় নিজের গোলা থেকে ধান চুরি করত, আর দিনেরবেলায় হা হুতাশ করে মরত, কে ধান চুরি করল ভেবে।

এখানে তার অনুরূপ কোথায় দেখলে?

রাজাবাহাদুরের মুখের প্রতিহিংসার মুখোশে। এ-দুই মানুষ এক নয়, আবার ভিন্নও নয়। সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করো। যতদিন এই মোতির মালা তাহেরগঞ্জের রাজবংশের সমরক্তে থাকবে ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের ধারা থাকবে অক্ষুণ্ণ। কয়েক পুরুষের বিশ্বাসের ফলে এই ধারণা রাজবংশের রক্তধারায় গেঁথে গিয়েছে, ইচ্ছা করলেও তাকে বর্জন করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এই রাজবংশের লোকে, বর্তমানে রাজাবাহাদুর।

তাই যদি হয়, তবে পঞ্চাননকে দত্তক না নিলেই পারতেন।

ওইখানে জাগ্রত চৈতন্যের কারসাজি। কথাটা সে বিশ্বাস করে না। লোকে রাজাবাহাদুরকে মনে করিয়ে দিয়েছে দত্তক গ্রহণ না করতে, তা হলে মোতির মালা চলে যাবে বংশান্তরে। জাগ্রত চৈতন্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে মগ্ন চৈতন্যের লীলা।

কিন্তু পঞ্চাননকে দত্তক তো নিয়েছেন অনেককাল। এতদিন পরে কেন?

সেটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল দুই চৈতন্যে লড়াই চলেছে রাজাবাহাদুরের মনের মধ্যে। বিশেষ তখনও রাজাবাহাদুরের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শীঘ্র মারা যাবেন এমন আশঙ্কা ছিল না, কাজেই মগ্ন চৈতন্য তার দাবি সম্পূর্ণ কায়েম করতে পারেনি। তারপরে, ইদানীং যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, আর বেশিদিন জীবিত থাকবেন এমন আশা রইল না, সুযোগ পেল মগ্ন চৈতন্য। সে বাধ্য করল, রাজাবাহাদুরকে মোতির মালাটা চুরি করে লুকিয়ে রাখতে। সে বোঝাল, তা হলে মালাটা পঞ্চাননের হাতে পড়বে না।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মৃত্যু হলেই যে রাজবংশ লোপ পাবে, তখন অন্য বংশের লোকের হাতে মালাটা পড়া-না-পড়া সমান হয়ে যাবে না কি।

এত কথা বোঝে কে? মগ্ন চৈতন্যের যুক্তিশাস্ত্র আর জাগ্রত চৈতন্যের যুক্তিধারা এক নয়। দ্যাখো, জগবন্ধু, আমরা যে-লজিক পড়ি তা জাগ্রত চৈতন্যকে নিয়ে। কোনওদিন যদি মগ্ন চৈতন্যের লজিক লিখিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। জাগ্রত চৈতন্যে রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে সত্যই ভালোবাসেন আর মগ্ন চৈতন্যে তাকে পরম শত্রু বলে মনে করেন। রাতেরবেলায় সে-ই তাঁকে শত্রুতাসাধন করিয়েছে পঞ্চাননের বিরুদ্ধে।

অনির্বাণ, তোমার এই যুক্তিধারা সবাই মানবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে সেই বিভীষণ মুখ একবার দেখেছে বিশ্বাস না করে তার উপায় কী?

কীরকম দেখলে আর একটু বিস্তারিত করে বলো।

দেখলাম তো এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরে তিনি স্বপ্নচালিতের মতো অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

তবু—।

দেখে মনে হল, তাহেরগঞ্জের রাজবংশের বিগত দশ-বারো পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বংশরক্ষার উগ্র সঙ্কল্প ঘনীভূত হয়ে শাণিত ছুরি হাতে দেখা দিয়েছে রাজাবাহাদুরের মুখের প্রত্যেকটি মাংসপেশিতে। ও আর রক্তমাংসে গড়া নয়, ও যেন কঠিন ইস্পাতে নির্মিত। মানুষের মুখ যে এমন ধাতবগুণসম্পন্ন হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। অথচ এই মানুষটিই দিনেরবেলায় পঞ্চাননের হাজতবাস স্মরণ করতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হয়েছেন।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলে মগ্ন চৈতন্যের প্রেরণায় রাজাবাহাদুর খুন করে ফেলতে পারেন পঞ্চাননকে।

পারেনই তো। সেইজন্যেই প্রস্তাব করেছি পঞ্চাননকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার, অবশ্য তার অন্য কারণ দর্শিয়েছি।

আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে?

আট-দশ মিনিট লাগল অসম্ভবকে পরিপাক করতে। অপ্রত্যাশিতের চমক কাটলে একছুটে গিয়ে সেই কুলুঙ্গি থেকে মোতির মালাটা বের করে পকেটস্থ করলাম, তারপরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছ। আশা করি, এবারে ঘটনাশৃঙ্খল বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

কেবল একটা বিষয় ছাড়া—।

কী, বলো?

মালার সেই বাক্সটা গড়খাইয়ের ধারে পাওয়া গেল কী করে?

ওটা অপরিষ্কার থেকেই যাবে, কেননা, হারানের মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত। আমার মনে হয়, ওই কুলুঙ্গিতে বাক্সসুদ্ধ মালাটি ধরেনি, তাই রাজাবাহাদুর মালাটি কুলুঙ্গিতে রেখে বাক্সটা বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। হারান সেটা কুড়িয়ে পায়, তবে সেটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করেনি, তার কাছে পাওয়া গেলে পঞ্চানন যে মালা নিয়েছে এ-ধারণা নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হবে, তাই সে লুকিয়ে গিয়ে গড়খাই-এর কাছে ফেলে দিয়েছিল। হারান অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী। এমন ভৃত্য অনেক ভাগ্যে মেলে। আর কিছু জানতে চাও?

আপাতত আর কিছু নয়। ভাই অনির্বাণ, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে এটাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করো। শখের কবিতার চেয়ে শখের গোয়েন্দাগিরি অনেক লাভজনক। কবিতা লিখে কার কী লাভ হয়?

সেটাও যে গোয়েন্দাগিরির অংশ। কবিতা লেখায় বুদ্ধিতে শান পড়ে, তারপরে সেটা খাটাই গোয়েন্দাগিরিতে। আরে ওই শোনো, কোকিলটা এখনও ডেকেই চলেছে।

BanglaBook.org

ওটা অন্য কোকিল, ইতিমধ্যে রাজহস্তী অনেক পথ অতিক্রম করেছে।

পৃথিবীর সব কোকিলই এক। কীটসের নাইটিংগেল কবিতাটি মনে করে দ্যাখো।

পরিশিষ্ট

পঞ্চাননকে নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছি।

সে এখন আমার বাড়িতেই আছে।

বলা বাহুল্য, মোতির মালা চুরির রহস্য তাকে বলিনি। বলেছি যে, মালাটা যথাস্থানেই ছিল, বাকি সমস্তই দৃষ্টি-বিভ্রমজনিত। জানি না, ও বিশ্বাস করেছে কি না।

দিন পনেরো পরে পঞ্চাননের নামে টেলিগ্রাম এল, রাজাবাহাদুর হঠাৎ মারা গিয়েছেন। শীঘ্র এসো।

তিনজনেই রওনা হলাম, পঞ্চানন আমাদের ছাড়ল না।

তাহেরগঞ্জে গিয়ে শুনলাম যে, রাতেরবেলায় হঠাৎ তেতলার ছাদ থেকে পড়ে রাজাবাহাদুর মারা গিয়েছেন। অনির্বাণ আমাকে আড়ালে বলল, এরকম কিছু হবে বলেই আশঙ্কা করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে।

তাহেরগঞ্জ রাজ্যের আর সে-জৌলুস নেই, বড়-বড় অনেক পরগনা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে, আজ রাজবাড়িটা আর সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে যাতে কোনওরকমে দিনাতিপাত করা সম্ভব।

কালাশৌচ-অন্তে পঞ্চানন বিবাহ করল। এখন সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একজন অফিসার। কলকাতাতেই থাকে, কালেভদ্রে যায় তাহেরগঞ্জে।

ইতিমধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, অপরিবর্তিত কেবল অনির্বাণের চুরুট, যা সর্বদা অনির্বাণ ও সমান দীপ্তিমান।

BanglaBook.org

বর্মার মামা

শিবরাম চক্রবর্তী

এক : রহস্যময় অট্টালিকা

প্রথম দর্শনেই বাড়িটাকে ভালো লাগেনি শিশিরের, কীরকম একটা খটকা লেগেছিল। ওর মন বলেছে, উঁহু, এর লক্ষণ তো ভালো না! এখন এর আগাপাস্তলা লক্ষ করে—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতটা সুচারুরূপে দেখা সম্ভব—দেখে-শুনে ওর সেই সংশয় আরও দৃঢ়ই হল।

লিলিকে পাশে ডেকে স্পষ্টই ও জানিয়ে দিয়েছে : 'বাড়িটার হাবভাব ভালো নয়।'

দাদার কথায় লিলিরও মনে খটকা লেগেছে, বাড়িটার সম্বন্ধে তত নয়, কথাটার সম্বন্ধেই। দাদার কথাটা কেমন যেন হল না? বাড়ির আবার হাবভাব কী? নির্জীব প্রাণীর কখনও হাবভাব হয় নাকি? হতে পারে কখনও? কথাটার কোথায় যেন ব্যাকরণে বেধে গেছে।

লিলিও তার সংশয়টা ব্যক্ত করেছে।

'ঠিকই বলেছি।' শিশির আরও সুদৃঢ় : 'বাড়িটার গতিবিধি সুবিধের নয়।'

'গতিবিধি? তুমি কী বলচ দাদা? বারবার কী বলচ? ভারি বাড়াবাড়ি করচ তুমি।' লিলি ফের আপত্তি জানায় : 'বরং বলতে পারো যে গতিক-সতিক।'

'ও একই কথা!' শিশির বলে : 'দেখচিস না, কীরকম জরাজীর্ণ এই বাড়িটা! আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে হাজার বছর আগেকার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে। কত মণিমাণিক্য, হীরে-জহরত কোনও এক অন্ধকার কোণে চামচিকেদের সঙ্গে ঠাসাই হয়ে নির্বিবাদে বসবাস করছে। তা না হলে বাড়ির হালচাল এমন হয়?'

লিলি চোখ বড়-বড় করে চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। বলতে পারে না। হাঁ করে থাকে।

'আমি তাই বলি! কেন যে মামা অমন সাধের দেশ-ঘর ছেড়ে, এত দূরে, এই বিদেশে বর্মা মুলুকে এসে এতদিন ধরে এই বাড়ি কামড়ে পড়ে আছেন, এতক্ষণে বুঝলুম—!'

শিশির আরও কিছুক্ষণ হয়তো গবেষণা চালাত, আরও খানিক, তার সদ্যপ্রসূত আবিষ্কার, লিলির হাঁ-র ভেতর দিয়ে চালান দিত, কিন্তু এর মাঝখানে মামার হাঁকডাক এসে বাধা দেয়।

নেপথ্য থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে : 'এই বেলা! বেলা! বেলা না লিলি—শিশির, চা খাবি আয়! এই বেলা, আয়!'

চায়ের নাম শুনলে শিশির আর দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। চিরকালই তার এই অক্ষমতা। চা-র গন্ধ পেলে তো আর কথাই নেই—মাছের চার পাওয়ার মতন—আপনা থেকেই সে ধরা দেবে। এমনকী, লিলিও, এখনও পর্যন্ত যে দাদার বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও আর নিজেকে স্থগিত রাখতে পারে না। একমুহূর্ত দেরি না করে দাদার পিছনে-পিছনে দৌড় মারে!

দুমদাম করে তারা ছুটে চলে। টপাটপ সিঁড়ি টপকে হুড়মুড় করে উঠতে থাকে। কাঠের সিঁড়ি, পুরনো সাবেক কালের, তাদের পদভারে মচমচ করতে শুরু করে।

সেই মচমচানি ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি খচখচ করতে থাকেন : 'ঘর-দোর সব ভাঙল দেখচি! সারল দেখচি সব!'

চায়ের পাত্র হাতে আপনমনেই তিনি ঝঙ্কার দেন।

ছুটতে-ছুটতে উঠতে-উঠতে, সিঁড়ির মোড় ঘুরবার মুখে, রেলিংয়ের বাঁকের কাছে শিশির ধাক্কা খায়, হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় শিশির। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার ধারণা হয়, ধরণী যেন দ্বিধা হয়ে, তার একখানা পা—যে পা-টা অগ্রণী হয়ে গেছল, সেই পাখানাকেই হঠাৎ গ্রাস করে ফেলে।

শিশিরের মনে হল, পড়ে যেতেই, তার অধঃপতনের ভারে সিঁড়ির সেই জায়গাটা যেন ফাঁক হয়ে গেল, আর তার গর্তের মধ্যে তার একখানা পা হঠাৎ সেঁধিয়ে গেল—বেমালুম শূন্যের ভেতর দিয়ে গলে গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি আর কী!

BanglaBook.org

বিস্মিত শিশির দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। উঠে আরও বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। কোথায় গর্ত, কোথায় কী! তেমনি জমাট সিঁড়ি, কাঠমিলানো নিটোল দেহ নিয়ে তেমনি জমজমাট! পা ঠুকলে তেমনি খটখট করছে!

'অ্যাঁ? এ কী হল? এ আবার কী হল?' অস্ফুট কণ্ঠে বলল শিশির।

'কী হল দাদা?' লিলি পিছন থেকে জিগ্যেস করে ঃ 'খুব লাগল নাকি?'

'ও বাবা! এ-বাড়ির আরও গুণ আছে দেখছি।' শিশির জবাব দেয় ঃ 'ভুতুড়ে বাড়িও বলা যায়!'

'ভুতুড়ে—!' ভূতের নামে লিলি ডরিয়ে ওঠে।

'পদচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম আর কী! পাখানা গিলে বসেছিল আমার। বলব কী, এই সিঁড়িখানাই—বুঝলি লিলি! ভারি আশ্চয্যি!' শিশির বলে, তখনও তার কণ্ঠ বিস্ময়াবিষ্ট ঃ 'বাব্বাঃ, পাখানা হাতিয়ে নিয়েছিল আমার আরেকটু হলে!'

'ভূতে? ভূতে না কি?' লিলির নিজের পা কাঁপতে থাকে।

'বলব তোকে একসময়ে। আগে চ, চা জুড়িয়ে গেল।'

ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে এই বাড়ির মিলন আজকের নয়। বছর দশেক আগেকার কথা। এই রাজযোটকের গোড়ায় একটুখানি ইতিহাস আছে—এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলও খানিকটা জড়ানো।

বছর দশেক আগে, ব্রজেশ্বরবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি পদব্রজে ভূ-পর্যটন করবেন। যেমনি খেয়াল হওয়া, অমনি ঘরবাড়ি—সাধের ইস্কুলমাস্টারি—সব ফেলে, সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে ব্রজেশ্বর পদব্রজেশ্বর হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আসামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, গিরিবর্ত্ম ভেদ করে ব্রহ্মপুত্র সাঁতরে, সীমান্ত প্রদেশ পার হয়ে প্রায় প্রাণান্ত অবস্থায় তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে কত অ্যাডভেঞ্চার যে অবলীলায় অতিক্রম করে গেলেন, সে কহতব্যই নয়। বেশ মজাসেই করে গেলেন।

সব ভূ-পর্যটকেরই যা হয়ে থাকে। চলতি বরাতে যা না ঘটলেই নয়—যেসব দুর্ঘটনার বাঁধাধরা দস্তুর। ভূ-পর্যটনের ফাঁকে ব্রজেশ্বর বাঘের হাতে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর আকার-ইঙ্গিতে বাঘ তাঁকে ভূ-পর্যটক বলে টের পেয়েই খাওয়ার লালসা পরিত্যাগ করে লজ্জিত হয়ে চলে গেছে। সিংহরা তো ফিরেই তাকায়নি, হায়নারাও হায়-হায় করে ফিরে গেছে। ইয়া-ইয়া ভাল্লুক তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—কীরকম এক সঙ্কোচে; তাঁর একটা কথাও খসাতে হয়নি। এমনকী, বড়-বড় সব অজগর, যাদের ল্যাজের মোচড়ে লম্বাচওড়া শালগাছরাও দেশালাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়—অনিবার্যরূপেই হয়ে যায়—ব্রজেশ্বরকে দেখে, দেখবামাত্রই, ব্রীড়াবনত হয়ে মাথা নিচু করে চলে গেছে।

পাহাড়প্রমাণ হাতির পাল তাঁকে তাড়া করে এসেছিল। কিন্তু যেমন এসেছিল তেমনি তারা চলে গেল—বিনা বাক্যব্যয়ে। পরে দেখা গেল, তাড়া করে নয়, তাড়া খেয়ে, নিজেরাই তাড়িত হয়ে তারা ছুটছিল। একঝাঁক বোলতা, কী কারণে তাদের ঝোঁক হল বলা যায় না, হাতিদের পিছু নিয়েছিল—হাতাহাতি করবার মতলবেই হয়তো, কিন্তু কাপুরুষ হাতিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বেশ হাঁকডাক ছেড়ে, লেজ তুলে, বীরদর্পেই তারা পালিয়েছে—এমনকী ব্রজেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই। এবং বোলতারাও ওঁর প্রতি কোনও বোলচাল ঝাড়েনি, বলাই বাহুল্য। হস্তীযূথের পাশে নেহাত তাঁকে দেখা যায়নি বলেই কি না কে জানে!

এমনকী, নরখাদকরাও ওঁকে মার্জনা করেছিল! যে-দিবসে তিনি তাদের পাড়ায় গিয়ে পড়লেন, সেদিন যার ঝলসানোর পালা, সে নিজেই ব্রজেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছিল, বলেছিল, তার নিজের তুলনায় ব্রজেশ্বরের মাংস আরও বড়িয়া হবে, অতএব 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' হিসেবে ওকেই আজ টেস্ট করাটা মন্দ কী! এই বলে সুড়ুৎ করে জিভের ঝোল টেনে নিয়ে অভ্যাগতের দিকে

BanglaBook.org

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু করলে কী হবে, ব্রজেশ্বরের স্বাদ না পেয়েই, একজন আসামজাত বাঙালির আস্বাদ কেমন না জেনেই, সেই উচ্চাভিলাষ এ-জন্মের মতো মুলতুবি রেখে সে, বেচারীকে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই আর সকলের উদরস্থ হতে হয়েছে। এমনকী, ব্রজেশ্বরেরও।

প্রস্তাবটায় পালের গোদার তরফ থেকেই বাধা পড়েছিল। তিনি বললেন, 'উঁহু, ও-কাজটিও নয়। ইনি একজন ভূ-পর্যটক। এখন যদি ওঁকে গিলে ফেলি, তা হলে পরে যখন উনি নিজের সভ্য জগতে ফিরে যাবেন, আমাদের সভ্যতার অনেক নিন্দাবাদ রটাবেন—অনেক গালমন্দ দেবেন নিঃসন্দেহে। অতএব ওঁকে হজম করা সমীচীন হবে না।'

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে, সেই প্রতিবাদকারীকেই ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে), পরিতুষ্ট করে ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং ব্রজেশ্বরও নিমকহারাম নন। তিনিও সভ্য জগতে ফিরে এসে, এ-সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেননি। নিন্দাবাদ দূরে থাক—কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন, তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন মুখে?

তবে মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে, দাঙ্গা-ফ্যাসাদে, যুদ্ধবিগ্রহে এত-এত লোকক্ষয় হয়, নাহক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি, মানে, হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে গেলে, রেঁধে-বেড়ে সাবড়ে দেওয়ার কোনও উপায় থাকত তা হলে হয়তো নেহাত মন্দ হত না। সমস্ত ব্যাপারটার তা হলে একটা অর্থ হত, সদর্থই হত, একেবারে নিরর্থক হত না, এতখানি রক্তপাত নিতান্তই ব্যর্থ হত না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এখন এ যা হচ্ছে এ যে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোনও মানে হয়? অনর্থক বৃথা অপচয় বই তো না? ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশি উপাদেয়, ঢের সুস্বাদু,—এই কথাই ওঁর মনে হয়েচে। মনে হয়েচে আর উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন আর নিজের জিভ চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে- মাঝেই—এই যা! সেই নরখাদকের তার তিনি ভুলতে পারেন নি! তার কথা চিরদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এইসব উপদ্রব-উৎপাত অনায়াসেই তিনি এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে। কেটেকুটে না গেলেই হল। এবং ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণত সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখা যায়, তার কিছুতেই—কোনওখানেই তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেয়েছিলেন এবং পেরিয়েছিলেন—অবলীলাক্রমেই। কেবল এক ডাকাতরাই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, 'বাপু, তুমি একটি ভূ-পর্যটক। বলতে হবে না, দেখেই টের পেয়েছি। তা বাপু, তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়বে, অটোগ্রাফ ছাড়বে আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মারতে চাইনে, কেননা তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু—হিতৈষী উপকারক—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে-বেছে এই সব বিপজ্জনক পথে ভূ-পর্যটন করবে কারা? তোমাদের খতম করলে আমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরও দফারফা আর সেইসঙ্গে আমাদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেলব—এ যদি ভেবে থাকো তা হলে ভুল করেছ। যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েছ তেমনি প্রাণ হাতে করে ফিরে যাও। কেবল সম্মিলিত এক যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগের লাভ, সেইটা আগে ছাড়ো দিকি! তারজন্যেই তো এত কষ্ট করে, ঘাঁটি গেড়ে, মশার কামড় খেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওত পেতে বসে থাকা—কবে কালেভদ্রে তোমাদের এক-আধজন ছিটকে-ছিটকে এই পথে ভুলে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতোই এসে যাবে। তা নইলে আর কোন শিকারের আশায় এতখানি ত্যাগস্বীকার? বলো, তুমিই বলো!'

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বলবেন! মুখটি বুজে ওঁর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিলেন সবই সেই বনদস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন।

এত ফাঁড়া কাটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে, পথচারী পদব্রজেশ্বরকে, সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসতে হয়েচে।

লিলি হাঁ করে মামার ভোজন-বিলাসিতা দেখছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোস্ট গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয় এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি স্টেশন থেকে ওদের আনতে গেছলেন, সেই সময়ে রেলোয়ে কেবিনে একসঙ্গে জড়ো হয়ে আর্লি টি-র মারফতে ইতিমধ্যেই ওঁর আর একপ্রস্থ হয়ে গেছল—তারপরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নিজের বাড়িতে বসে বিশেষ তোড়জোড়ের সঙ্গে তাঁর এই দু-নম্বর ব্রেকফাস্ট।

লিলি হাঁ করে মামার খাওয়ার বাহাদুরি দেখছিল আর মাঝে-মাঝে একফাঁকে নিজের হাঁ-এর মধ্যে বিস্কুটের টুকরো ভেঙে-ভেঙে রপ্তানি করছিল, এমনসময়ে শিশির একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উঠল।

শিশির এতক্ষণ নিজের মনে কী যেন ভাঁজছিল, কোনওদিকে তাকায়নি, একটিও কথা বলেনি। যত রাজ্যের ভাবনা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম-গরম চাখছিল যেন। হঠাৎ যেন চা চলকে, চায়ের পাত্রে তুফান তুলে, একটা প্রশ্নের ঢেউ মাঝখান থেকে তার মর্মস্থল ভেদ করে উঠল।

'আচ্ছা মামা, তুমি কোনও নকশা পাওনি?' জিগ্যেস করল শিশির।

'নকশা? কীসের নকশা?'

'এই বাড়ির কোনও চোরকুঠরির? যেখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে?'

'এ-বাড়িতে চোরকুঠরি আছে কে বললে তোকে? তুই কী করে জানলি যে, এখানে ধনভাণ্ডার লুকোনো আছে?' ব্রজেশ্বর সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান।

'এই আন্দাজ করছি। এরকম থাকে কিনা।' শিশির কৈফিয়ত দেয় ঃ 'অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।'

'উঁহু, বইয়ে পড়ার কথা নয়।' মামা খুঁতখুঁত করেন তবু ঃ 'খুব খারাপ কথা। ভারি ভীষণ কথা এসব।'

'তুমি তা হলে কোনও নকশা পাওনি? তাই বলো।'

'কেন, তুই পেয়েছিস নাকি?' ব্রজেশ্বর শাণিত চোখে শিশিরকে বিদ্ধ করতে থাকেন।

'এখনও পাইনি, তবে পাব-পাব মনে হচ্ছে।' শিশিরের হাসি রহস্যময়।

দুই ঃ ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

'ওঃ, এখন পাসনি! পাব-পাব মনে হচ্ছে! তবু ভালো! তবু রক্ষে!' ব্রজেশ্বর এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ঃ 'আরে, আমি তো বারো বচ্ছর ধরেই পাব-পাব মনে করছি! মনে করায় আর পাওয়ায় ঢের দূর—ঢের ফারাক! হুঁঃ!'

শিশির কোনও জবাব দেয় না, আপনমনে কী যেন ভাবে আর প্যাঁচ কষে।

লিলি বলে ঃ 'মামা, ও কথা থাক! আসামের জঙ্গলে তারপর কী হল বলো। স্টেশন থেকে আসতে-আসতে যতখানি বলেছ তারপর থেকে শুরু করো—।'

'কদ্দুর বলেছি? পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই পর্যন্ত—না? আচ্ছা, তারপর থেকে বলি, শোন।'

ব্রজেশ্বর পুনরায় নিজের পর্যটন-কাহিনী শুরু করেন, নিজের মনে আর নিজের ভ্রমণে মশগুল হয়ে যান ঃ

BanglaBook.org

'সেই ডাকাতরা তো? বেজ'য় বজ্জাত। ভারি ফিচেল—আর ভয়ানক নাছোড়বান্দা। আমি যতই বোঝাই, যতই আপত্তি করি কিছুতেই কান দ্যায় না। যতই বলি যে, বনের পশুরাও ভূ-পর্যটক বলে খাতির করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, নরখাদকরাও আমার কেশস্পর্শ করেনি, আর ডাকাত হয়ে, ভালোমানুষ হয়ে, তোমাদের এ কী কাণ্ড? এ কীরকম অভদ্র ব্যাভার? ততই ওরা বলে, আমরা তো আর চারপেয়ে জন্তু নই যে, পেয়ে তোমাকে অমনি ছেড়ে দেব। ওসব কথায় আমরা কর্ণপাত করিনে। আর নরখাদকদের কথা তুলছ যে, তোমাকে হজম করে—সাবড়ে দিয়ে আমাদের কী লাভ? খেতে আর এমন কী তুমি খাসা হবে? তোমাকে খেয়ে-দেয়ে ছেড়ে দেব—এই যদি তুমি ভেবে থাকো—হুঁঃ! আমরা অতো বোকা নই। আর—তুমি তো একটা অখাদ্য!

'আমি একটা অখাদ্য? শুনে আমার এমন দুঃখ হল! তুমি একটা আসামের ডাকাত—ডাকাতির আসামী—অধম পাপী তুমি কী বুঝবে? তোমাদের এলাকায় একলা পেয়ে, অসহায় পেয়ে, অখাদ্য বলে আমাকে খুব কষে অপমান করে নিচ্ছ। নাও, নাও, নিয়ে নাও, কী আর করছি! কিন্তু সে—সেই সামান্য নরখাদক—সেও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, বহুগুণে উত্তম, আমি মুক্তকণ্ঠে বলব—আমি নিজেই ভালো করে চেখে দেখেছি। আমি কতখানি সুখাদ্য—কতটা সুস্বাদু, সে কিন্তু আমাকে না চেখেই বুঝেছিল—দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দর্শনেই, প্রলুব্ধ হয়ে সে আমাকে তার হৃদয়ে—হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গা তার উদরে আমাকে স্থান দিতে চেয়েছিল—তার অন্তরঙ্গ করতে চেয়েছিল আমায়!

'তার কথা ভেবে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। জিভ দিয়ে একটু জলও যে না পড়ে তা নয়। প্রথমে তার ওপরে আমার রাগ হলেও, সত্যি প্রথমে তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—অতটা সমঝদার বলে ভাবতে পারিনি। একটু ভুলই বুঝেছিলাম তাকে। আমাকে উদরস্থ করার তার উৎসাহটা আমি খুব ভালো মনে নিতে পারিনি গোড়ায়—কিন্তু বেশিক্ষণ সে-রাগ আমার ছিল না। তাকে মুখস্থ করার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার রাগ পড়ে গেছল—তাকে আত্মসাৎ করবার পরে আমার যা কিছু রাগ, জিভের জলের সঙ্গে এক হয়ে, একাকার হয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অন্তর্গত করবার পর থেকে, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ এখন তার উপর গিয়ে চড়াও হয়ে পড়েছে। সে আর আমি এখন অভিন্নাত্মা, এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না!

'কিন্তু একজন সামান্য ডাকাত, যার কেবলমাত্র পরধনে লোভ—পরস্মৈপদী সম্পত্তির লালসা—মানুষের মূল্য—যথার্থ মূল্য সে কী বুঝবে? তার সাধ্য কী? একটা খুনে হলেও বরং বুঝতে পারত। চোর-ডাকাতের কর্ম না! হ্যাঁ, ডাকাতের আবার খাদ্যাখাদ্য-বোধ!

'যাকগে, যেতে দাও, পৃথিবীতে সবাই কিছু সব জিনিসের সমঝদার হয় না। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" বলেই দিয়েছে। সবার রুচি কিছু সমান নয়! অধম কি আর উত্তম হবে? ধমাধম উত্তম-মধ্যম দিলেও না! আর কথা বেশি না বাড়িয়ে, আমার যথাসর্বস্ব যা ছিল সব সেই ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে কেবলমাত্র কালাজ্বর সম্বল করে, কাঁপতে-কাঁপতে, অবশেষে বর্মায় এসে পৌঁছলাম।

'জ্বর গায়ে জর্জর অবস্থায় একজন ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়ি অতিথি হলাম। লোকটি ভারি ভালো। না, না, সেরকম ভালো নয়—সেই নরখাদকের মতো ভালো সে-কথা বলছি না। সেরকম ভালো কি না জানব কী করে? সবাই কি আর গায়ে পড়ে নিজেদের চাখতে দিচ্ছে? আর চাখতে দিলেও, সে-লোকটি যেরকম বুড়ো আর জরাজীর্ণ—তাতে সেই নরখাদকের মতো ভালো হওয়ার তার সম্ভাবনা কম ছিল। সেরকম কচি নরখাদ্য খুব ক্বচিৎ মেলে!

'তবু লোকটি ভালো। কেননা, আমি-লোকটা ভালো কি না, তার বাড়িতে পেয়েও—হাতে-নাতে পেয়েও—জানবার চেষ্টামাত্রও সে করেনি। করলে, সেই কাহিল অবস্থায়, আমি তাকে আটকাতে পারতাম কি না সন্দেহ! বিনা বাক্যব্যয়ে অক্লেশে তার উদরসাৎ হয়ে যেতাম।

'যাহোক, দিন কয়েক জ্বর-জড়িত থেকে কোনও গতিকে সেরে-সুরে তো উঠলাম—আর সেই লোকটি—সেই বুড়ো গৃহস্বামীটি—'

BanglaBook.org

ব্রজেশ্বরবাবু বলতে-বলতে থেমে গেলেন।

লিলি বলে উঠল ঃ 'কী হল তার? কী হল মামা?'

'কী আবার হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা!'

'কবিতা! সে আবার কী?' শিশির জিগ্যেস করে।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাকে ধরল। সেই লোকটা নিজেই শেষে রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতা হয়ে বসল।'

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল সেই লোকটা? অ্যাঁ?' শিশির-লিলি ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে যায় ঃ 'সে আবার কী?'

'আমি সেরে উঠতে না-উঠতেই, বুঝলি কিনা—' ব্রজেশ্বরবাবু এবার সঠিক ব্যাখ্যা করে সমস্তটা জলবত্তরল করে দেন ঃ 'নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ'পরে।'

'ওঃ, তাই বলো! তাকেও কালাজ্বরে ধরল।' শিশির হাঁফ ছাড়ে। লিলিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'আর তুমি—তুমি বুঝি তাকে—' লিলি সভয়ে দু-চোখ বড়-বড় করে তাকায়, ওর বেশি ও এগুতে পারে না।

'দূর-দূর। আমি কি আর তাই করি? লোকটার প্রতি তো আমার একটুও ভালোবাসা হয়নি যে—তবে—তবে কেন?' ব্রজেশ্বরবাবু জবাবদিহি দেন ঃ 'লোকটার ওপর আমার কেমন একটা বৈরাগ্য ধরেছিল।'

'তাই বোধহয় ও বেঁচে গেল?' শিশির বলে। 'টিকে গেল এ-যাত্রা?'

'উহুঁ, বাঁচল না। মারাই পড়ল শেষটায়। মরবার সময় বলে গেল, মৌলমীনে তার একটা বাড়ি আছে, আর সেই বাড়ির মধ্যে একটা চোরকুঠরি রয়েছে, আর সেই চোরকুঠরির মধ্যে—'

'অগাধ ধনরত্ন!' শিশির নিশ্বাস ছাড়ে।

'তুই কী করে জানলি?' ব্রজেশ্বরবাবু রুখে ওঠেন ঃ 'কে বললে তোকে?'

'বলতে হয় না। এমনিতেই জানা যায়। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে পড়া গেছে। এরকম ঢের পড়েচি আমি।'

'কই সে-বই? সে-সব বই কই দেখি?'

'সঙ্গে আনিনি তো।' শিশির জবাব দেয়।

'মাথা কিনেচ আমার!' মামা আরও ক্ষেপে যান ঃ 'একটা যদি উপকার হয় কারুর দ্বারা, কথায় বলে, যম জামাই ভাগনে, তিন না হয় আপনে! এই তিনমূর্তি কক্ষনও আপনার হয় না। কথাটা দেখচি ঠিক।

'বাঃ আমি কী করে জানব যে সে-বই তোমার কাজে লাগবে?' শিশিরও একটু খাপ্পা হয় ঃ 'তুমি কি আনতে বলেছিলে?'

'না বললে কি আনতে নেই? ভাগনে তবে আর বলেচে কেন?'

লিলি মাঝখানে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয় ঃ 'আচ্ছা, আমি মাকে লিখে দেব'খন! মা ভি-পি করে পাঠিয়ে দেবে।'

মামা এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হন ঃ 'হ্যাঁ, লিখে দিস। যেন ফেরৎ ডাকেই পাঠায়। ভি-পি করে নয়, রেজেস্টারি করে পাঠায় যেন। এমন জরুরি দরকার যে কী বলব! যদি সেই সব বইয়ের ভেতরে কোনওরকম ফন্দিফিকির বাতলানো থাকে, হদিশ-টদিশ থেকে যায় কোনও। হ্যাঁ, তারপর, কী বলছিলাম! সেই বর্মী বুড়োটা! মরবার সময় মৌলমীনের সেই বাড়িটা আমাকে দিয়ে গেল। আর বলে গেল, "দিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি কখনও সে-বাড়িতে থেকো না।"

আমি জিগ্যেস করলুম ঃ "কেন, সে-বাড়িতে কী হয়েছে?"

pathagar.net

সে বললে ঃ "কেন, বুঝতে পারছ না? কোথায় আমি এই উত্তর ব্রহ্মে, আর কোথায় সেই সুদূর দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে মৌলমীন! মৌলমীন শহর ছেড়ে, সেই রাজার অট্টালিকা পরিত্যাগ করে কেন এখানে এসে, এই হিমালয়ের পাদদেশে, এমন কষ্টেসৃষ্টে বসবাস করছি! তাই থেকেই কি বুঝতে পারছ না?"

আমি বললুম ঃ "উঁহু! কিসসু না!"

বুড়ো বললে ঃ "সে-বাড়ি! সে-বাড়ি—ভারি ভয়ানক।" আর তারপরেই সে খাবি খেতে শুরু করল।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলুম ঃ তা তোমার সেই চোরকুঠরির সন্ধান পাব কী করে? তার কি কোনও নকশা-টকশা নেই? আছে? কোথায় সেই নকশা? বলো, বলো, বলে যাও। অমন করে খাবি খেয়ো না। ওইভাবে চলে যেয়ো না; ছলনা করে চলে যেয়ো না। আমি বারম্বার আবেদন করি, নিবেদন করি—সকাতর প্রার্থনা করি—তার অন্তিম দরবারে আমার ব্যাকুল আর্জি জানাই, আর সে ঘাড় নাড়ে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই তার সেই হাঁ-করা মুখ দিয়ে বার হয় না—হাঁ-ও না, হুঁ-ও না।'

শিশির বলল ঃ 'এমনিই হয়! ঠিক এইরকমটাই হয়ে থাকে—কী বলিস লিলি? ঠিক এই ধরনটাই হয় কি না?'

'হ্যাঁ, দাদা!' লিলি তার ছোট ঘাড়খানা নেড়ে সায় দেয়। 'সব বইয়েই ঠিক এইরকম।'

'তবে আমি জানি, আমি জানি বটে, কোথায় তোমার সেই নকশাটা আছে।' শিশির ব্রজেশ্বরবাবুর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে ঃ 'বুড়ো না বললেও, আমি তোমায় বলে দিতে পারি। বলে দেওয়া কেন, আমি বার করেই দিচ্ছি না হয়! এসো আমার সঙ্গে। এখনই বার করে দিচ্ছি।'

তিন ঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

শিশির যায় আগে-আগে, সাথে-সাথে লিলি। পিছনে-পিছনে ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বরের মুখে অবিশ্বাসের হাসি!

আশ্চর্য নয়! দীর্ঘ বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে বড়-বড় বিশ্বাসই টলে যায়। বারো বছর ধরে চেষ্টা-চরিত্র করে, বাড়াবাড়ি করেও, এমনকী, ভগবানের যদি দেখা না মেলে—তাঁর টিকিরও সন্ধান না পাওয়া যায় তা হলে বড়-বড়, বিরাট-বিরাট, ভক্তও নাস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। অগাধ ধনরত্ন তো তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর তো কোন ছার!

শিশির জিগ্যেস করে ঃ 'নকশাটা কোথায় রয়েছে, টের পেয়েছিস লিলি?'

'না তো!' লিলি ঘাড় নাড়ে।

'এত বই-পড়া সব তোর ব্যর্থ হয়েছে দেখছি! বাজেই অ্যাদ্দিন অ্যাডভেঞ্চারের বই তোকে পড়ালুম। কিচ্ছু লেখাপড়া হয়নি তোর। এখনও মানুষ হতে পারিসনি।' শিশির মুখখানা মুরুব্বির মতো বানায় ঃ 'মেয়েই রয়ে গেছিস। আস্ত একটা মেয়ে!'

কথাগুলো ঠিক মোরব্বার মতো নয়, লিলি মুখ কাঁচুমাচু করে থাকে। প্রতিবাদের একটা চেষ্টা করে ঃ 'বারে, আমি কী করে জানব! আমি কি ভূত গুনতে জানি?'

'আমার যদি একটা "টাইগার" থাকত, সেও যে বলে দিতে পারত রে!' শিশিরের অসন্তোষ সীমান্ত ছাড়িয়ে যায়।

'আমার থাকলে সেও বলতে পারত।' লিলিরও এবার একটু ধোঁয়া বেরোয় ঃ 'টাইগাররাই তো পারে। ওদেরই তো এই কাজ! ওরাই পারবে তো। ও তো মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু—

BanglaBook.org

কিন্তু—' তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না ভেবে লিলি একটু ইতস্তত করে ঃ 'কিন্তু টাইগার আর আমি পাচ্ছি কোথায়? তুমি তো আর টাইগার হতে পারবে না। অন্তত এ-জন্মে তো আর পারছ না!'

'এ-জন্মেই পারব। পারব না, কে বলেছে—কে?' শিশির গরম হয়ে ওঠে।

'অনেকেই বলে! তা বলে আর পারতে হয় না?' লিলিও টগবগ করতে থাকে ঃ 'ঘেউ ঘেউ করা সহজ, টাইগার হওয়া অত সহজ না!'

'এক্ষুনি পারব! চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিচ্ছি!' শিশির সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে ঃ 'দেখতে না-দেখতেই দেখতে পাবি!'

এই বলে, শিশির, সিঁড়ির সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেইখানে, যেখানে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল একটু আগেই।

শিশির জায়গাটার আগাপাস্তলা পা চালিয়ে, টিপে-টিপে দেখে। কিছু না! তারপর, সহসা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, একজন উঁচুদরের নাচিয়ের মতো দাপাদাপি লাগিয়ে দেয়! দেখতে না-দেখতেই আবার ধরণী দ্বিধান্বিত হয়েছে এবং সেই দ্বিধার অবকাশে, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে, শিশিরের একখানা শ্রীচরণ গলে চলে গেছে।

'এই যে! এই যে পেয়েছি! পেয়ে গেছি! কেল্লা মেরে দিয়েছি।' শিশির চিৎকার করে ওঠে।

ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসে আর সন্দেহে, বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে এতক্ষণ ওতপ্রোত হচ্ছিলেন, এবার তিনিও আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ 'ভাঙলি! ভাঙলি তো সিঁড়িটা! আমি তখনি জানি! এই তোমার নকশা বার করা?'

কিন্তু বলতে না-বলতে, শিশির, পায়ের সঙ্গে একখানা হাতও গলিয়ে দিয়েছে এবং হাতড়ে-মাতড়ে, তার অন্তঃস্তল থেকে, রুলের মতো করে পাকানো কাগজের কী একটা গুলতানি টেনেও বার করেছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলতেই—বেরিয়ে পড়ল পুরনো এক পার্চমেন্ট আর তার পিঠে কী সব মক্স করা।

'এই তো সেই নকশা!' শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ 'সেই নকশাই তো!'

শিশিরের মামা সিঁড়ির মাথায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কী যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, এইবার তিনি একলাফে, একটি মাত্র উল্লম্ফনে সব ক'টা সিঁড়ি এক নিমেষে টপকে এসে শিশিরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'দে—দে! আমার নকশা দে!' বলতে না-বলতে পার্চমেন্টটা তিনি শিশিরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

'বাঃ, আমি আবিষ্কার করলাম, আর তোমার নকশা কীরকম?' শিশির ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলতে গেছে।

'তোর নকশা! ভারি ইয়ার হয়েছেন!' এই বলে ব্রজেশ্বরবাবু ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন শিশিরের গালে ঃ 'বারো বছর ধরে আমি-ব্যাটা হাতড়ে মরছি, আর ওঁর কিনা নকশা হল! আবদার আর কী!'

এই বলে তিনি আর অযথা বাক্যব্যয় না করে অতিরিক্ত চড়-চাপড়ের প্রলোভন পর্যন্ত সম্বরণ করে দৌড়তে-দৌড়তে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিয়ে নকশার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

'খুব লেগেছে নাকি দাদা?' লিলির আবার শিশিরের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।

শিশির কিছু না বলে আহত গালে হাত বুলোয়।

'এ কীরকম মামা আমাদের?' লিলি অবাক হয়। 'বাবাঃ, কী বদরাগী!'

BanglaBook.org

'মামারা এই রকমই।' শিশিরের আপনমনে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস।

'আচ্ছা, মামা হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন দাদা?'

লিলি দাদার গালে হাত বুলোতে পারে না, ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না, একটু আগেই ওদের মধ্যে যে-বাকযুদ্ধ হয়ে গেছে সেই কথা মনে করেই ওর হাত ওঠে না। ভয় করে, তা হলে হয়তো শিশিরের হাত উঠে আসবে। নিজের গাল থেকে লিলির গালেই এসে পড়তে পারে চাই কি!

'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্!' শিশির উদাসীনের মতো জবাব দ্যায়। তার মুখপত্রে দার্শনিকতার বিজ্ঞাপন।

'এরকম হবে আমি ভাবতেও পারিনি।' লিলির কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

'আমি ভাবতে পেরেছিলাম।' শিশিরের গলায় নির্লিপ্ততার স্বর ঃ 'এই রকমটাই হয়। এই রকমই হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই আমি এ-সব ভেবে দেখেছি।' শিশিরের ললাটে ভূয়োদর্শনের প্রচ্ছদপট!

'থাক গে। যেতে দে। মামা তো খিল এঁটেছে। চোরকুঠরির হদিস না নিয়ে আর নড়ছেন না। চল, এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়ি, মৌলমীন শহরটা বেড়িয়ে-চেড়িয়ে দেখে নিই ততক্ষণ!'

বেড়াতে-বেড়াতে দুজনে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। শিশির ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ঃ 'মামা কীরকম চালাক দেখলি? দেখলি তো লিলি?'

মামার মূঢ়তা দেখেছে, রূঢ়তাও দেখা গেছে, মামা যে 'লাকি' সে-বিষয়েও ভুল নেই, অযাচিত—অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ির নষ্ট-কোষ্ঠী পুনরুদ্ধারেই সেটা প্রত্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু মামার চালাকি যে কোনখানে লিলি সেটা সহজে বুঝে উঠতে পারে না।

'আমাদের শিলং থেকে, অত লং ডিস্ট্যান্স থেকে ধরে-বেঁধে-ডেকে আনানোর কী মানে, বুঝতে পারলি নে?'

'না তো!'

'এইজন্যেই! চালাকি করে নকশাটা উদ্ধার করে নেওয়ার জন্যেই। আমাকে ছাড়া আর কারু দ্বারা হত না কিনা!' শিশির দুঃখের সহিত এবং একটু গর্বের সঙ্গেই বিবৃতি দেয়।

এ ছাড়া তাদের আনানোর আর কী কারণ থাকতে পারে, শিশির ধারণা করতে পারে না। কোথায় শিলং আর কোথায় মৌলমীন—কতখানি ফারাক! এবং যে-মামা বারো বছর আগে তাদের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছেন, সে-সময়ে তারা দু-তিনবছরের, সেই সময়েই যা কোলেপিঠে করে মানুষ করে—বা মানুষ করবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে (দুশ্চেষ্টায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই কি না কে জানে) তাদের পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন, এমনও হতে পারে যে তারাই মামার বৈরাগ্যের কারণ; মামার আকস্মিক বানপ্রস্থের, পরদেশ-আসক্তির, দেশান্তর-বিলাসিতার মূলে খুব সম্ভব তারাই; মামা হয়তো ভেবেছিলেন, এই শিশুদের, যারা কখন নায়েগ্রা আর কখন গন্ধমাদন তার কিছুই স্থিরতা নেই—কখন প্রপাত আর কখন বা উৎপাত বলা কঠিন, কখন যে খাদ্য (বেবল চুমুর দিক দিয়ে) আর কখন অখাদ্য কে বলবে, তখন যাবতীয় লাভক্ষতি খতিয়ে, তিনি ভেবে দেখলেন, এদের কোলেপিঠে করার চেয়ে সমস্ত ভূভার ধারণ করাও সহজ, (এবং ঢের বেশি নিরাপদ) এর চেয়ে, এই পরস্মৈপদী নন্দন-কানন বহনের চেয়ে, কস্তুরী মৃগসম নিজের গন্ধে উন্মাদ হয়ে, বনে-বনে, অরণ্যে-অরণ্যে, সারা ধরিত্রীময় ছুটোছুটি করে বেড়ানোও ঢের ভালো—ঢের-ঢের সুখের। সেই বিরাগী মামার হঠাৎ যে আবার এত অনুরাগ উথলে উঠবে, এমন মন-কেমন করতে লাগবে যে, তাদের দেখবার লালসায়, মার কাছে তার করে সামারভ্যাকেশনেই আমদানি করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন, এরকম সম্ভাবনার ভাবনাই করা যায় না। শিশির, ব্রজেশ্বরবাবুর মতলবটা, মনোগত অভিপ্রায়টা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চুল চিরে লিলির কাছে পরিষ্কার করে দেয়। সমুদয় রহস্য সূর্যোদয়ে কুয়াসার মতো বেবাক ফাঁক হয়ে যায়।

'তাই তো! তাই তো বটে!' লিলিও আর ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

'আমি অবশ্যি প্রথমে অন্য কথা ভেবেছিলাম—' বলতে-বলতে চেপে যায় শিশির।

'কী? কী কথা?'

'না, বলব না। বললে তুই ভয় খাবি।' শিশির বলে।

'না, বলো না? ভয় কিসের?' লিলি রীতিমতো নির্ভীক।

'আমি ভেবেছিলাম—মামার গল্প শুনতে-শুনতেই মনে হয়েছিল আমার। মামা সেই যখন বলল না যে, সেই নরখাদকটার তার এখনও তার মুখে লেগে রয়েছে—বলল না?'

'বলল তো! তার কী?'

'সেই ভুক্তভোগী নরখাদকটা মামার পেটে গিয়ে যে এখন বসবাস করছে!'

'করছেই তো! কী হয়েছে তার?'

'সে আর এখনও আছে কি? কবে হজম হয়ে গেছে! তাই মামা হয়তো তার শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে, তার অভাব-মোচনের অভিলাষেই, হয়তো—হয়তো—'

'হয়তো আমাদের—? অ্যাঁ?' লিলির দু-চোখ ভয়ে যেন ভুরুর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়।

'হ্যাঁ, তাই! মামা বলল কিনা যে, লোকটার তার এখনও তার মুখে লেগে রয়েছে। বলেই সুড়ুৎ করে মুখের ঝোল টেনে নিল আর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল—দেখলি না?'

'আর কেমন একটা অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকাল!' লিলি কম্পিতকণ্ঠে বলে : 'দেখেছি বইকী!'

'তবু তো সে-লোকটা খাসীই ছিল! ধেড়ে একটা খাসী ছাড়া আর কী? আমাদের মতো কচি পাঁঠা পেলে—?'

বাকিটা, বাকি অনির্বচনীয়ত্ব, শিশির অব্যক্তই রেখে দেয়।

'তা হলে চলো পালাই এখান থেকে। পরের ট্রেনেই পালিয়ে যাই। সোজা একেবারে রেঙ্গুনে—সেখান থেকে ফিরতি জাহাজে লম্বা এক পাড়ি!' লিলি লীলায়িত হয়।

'উঁহু, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্যন্ত না দেখেই যাব? গুপ্তধনের কিনারা না করেই? পাগল? তা ছাড়া, খেলেই অমনি হল কিনা! খাওয়া পথেই পড়ে আছে আর কী? হুঁ! আমরা হুঁশিয়ার থাকব না? তা ছাড়া, আরেকটা কথা—'

'কী? কী কথা?' আরও কী আশ্চর্য কথা শিশিরের আশ্চর্যতর মাথা থেকে বেরিয়ে আসে, লিলি সেজন্য উৎকর্ণ হয়।

'মামা বলল না, বলল না যে, ভয়ানক ভালোবাসা না হলে চাখবার কথা মনেই জাগে না। যেমন সেই বর্মীটার ওপর মামার তেমন ভালোবাসা হয়নি বলে—কেমন যেন একটু বৈরাগ্য হয়েছিল বলে—তাকে মুখে তোলবার কথা মামার মনেই হয়নি।'

'তুমি বলছ যে, মামা আমাদের তত ভালোবাসে না? অন্তত তত ভয়ানকভাবে নয়? তাই তেমন ভয় নেই বলছ?'

'ভালো যা বাসে তা তো এক চড়েই বুঝেছি!' এই বলে শিশির আবার নিজের গালে আরেকবার হাত বুলিয়ে নেয়। 'উঃ, যা জ্বলছিল!'

এতক্ষণে লিলি তবু কিছু ভরসা পায়। অমন কঠোর-হৃদয় মামার ভালোবাসার পাত্র হওয়া সহজ নয়, সে-কথা সত্যি। এবং ভালোই যদি না বাসেন, তা হলে, কেন আর মামা, অত কষ্ট করে তাঁর হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গায়, তাঁর উদার উদরের পরিধির মধ্যে অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যদের হটিয়ে, উপাদেয় চর্ব্য-চোষ্যদের বাদ দিয়ে তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে উদ্যত হবেন?

'তাই ভালো! যদি কেবল চড়ের ওপর দিয়েই যায়, সেও মঙ্গল!' লিলি বলে : 'চর্চড়ি না হতে হলেই হল!'

BanglaBook.org

চার ঃ প্যারাশুট-বাহিনী!

'দ্যাখ, দ্যাখ! চেয়ে দ্যাখ! নৈর্ঋৎ কোণ থেকে কী একখানা আসছে তাকিয়ে দ্যাখ।' আকাশের দিকে লিলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশির।

'একখানা এরোপ্লেন।' লিলির বুঝতে দেরি হয় না। 'সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে।'

'এরোপ্লেন তো বটেই, কিন্তু নৈর্ঋৎ কোণ থেকে উঁকি মারছে কিনা, দেখছিস নে? সেইটাই ভাবনার কথা।'

'ওটা নৈর্ঋৎ কোণ না কি? নৈর্ঋৎ কোণ, কোন কোণ, দাদা?'

'কে জানে! তবে খারাপ যা-কিছু সব ওই কোণ দিয়েই আসে। ঝড়-ঝাপটা-সাইক্লোন—সব! এরোপ্লেনও কি কম মারাত্মক আজকাল? সাইক্লোনের চেয়ে কিছু কম কি? আমাদের ওপরে বোমাই ফেলবে কি না কে বলতে পারে?'

'কিন্তু ওটাই যে নৈর্ঋৎ কোণ তা তো আর তুমি ঠিক জানো না।'

'জানি না মানে? হতে বাধ্য। মারাত্মক যা-কিছু, মন্দ যা-কিছু আর কোনদিক দিয়ে আসবে শুনি? তারা কেবল ওই এক কোণঠাসা হয়ে রয়েচে। নৈঋৎ কোণ।'

'ওটা যে বদ মতলবে আসচে কী করে তুমি বুঝলে?'

'ওর চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। ওর চালচলন দেখেই। ওর হাবভাবেই ধরা পড়চে। সমস্ত এই দূর থেকে দেখেই টের পেয়েছি। আমার দূর-দর্শন আছে এটা তো তুই মানিস? নইলে সেই নকশাটা বার করলুম কী করে?'

এ-কথার পর আর কোনও কথা চলে না। লিলি চুপ করে যায়। ভূয়োদর্শী লোকেরাই দূরদর্শী হয়ে থাকে, কে না জানে? যারা দূরের জিনিস দেখতে পায়, তারা ভূয়োও অনেক কিছু যে দ্যাখে, এ-কথাই বা কে অস্বীকার করবে? মনে-মনে এই সব খুঁটিয়ে-খতিয়ে, লিলি বেশি আর উচ্চবাচ্য করে না। এরোপ্লেনের রীতি এবং কোণের নৈর্ঋতি, যখন তার দাদার কাছে প্রাঞ্জল, জলের মতোই প্রাঞ্জল, তখন, একবাক্যে তার নিজের কাছেও পরিষ্কার—খুব ধবধবে পরিষ্কার না হলেও—মেনে নেওয়ার মতো মানানসই হতে বাধা কি?

'দ্যাখ-দ্যাখ, এরোপ্লেনটা কীরকম ডিগবাজি খাচ্ছে—দ্যাখ লিলি!'

'ঘুড়ির মতন অমন লাট খাচ্ছে কেন দাদা?' লিলিও জিগ্যেস করে।

'মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো! লাট খেতে-খেতে বেটপকা সমুদ্রে না পড়ে যায়। তা হলেই—তা হলেই—' অবরুদ্ধ নিশ্বাসে শিশিরের কণ্ঠরোধ হয়।

'তা হলে কী হবে?'

'কী আবার হবে! সলিল-সমাধি! যা হয়ে থাকে।'

শিশির মহাপুরুষ না হলেও, বয়ঃক্রমের অবিচারে এখনও না হতে পারলেও, মহাবালক তাকে বলতেই হয়। কেন না, সে কেবল দূরদর্শীই নয়, বেশ একটু বাকসিদ্ধও বইকী! বলতে না-বলতে, এরোপ্লেনটা ওল্টাতে-পাল্টাতে, একেবারে সমুদ্রের বুকের ওপর এসে খাবি খায়। কিন্তু তার আগেই—।

তার আগেই তার চালক, একমাত্র আরোহীই খুব সম্ভব, এরোপ্লেন গলে প্যারাসুট বগলে, ফাঁকা হাওয়ায় পদার্পণ করেচে। সুবিস্তৃত ছত্রাকার বস্তুটি অবলম্বনে শূন্যমার্গে ঝুলে পড়েচে।

আকাশ বিদীর্ণ করে আস্তে-আস্তে নামতে থাকে সে।

শিশির সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

'প্যারাশুট-বাহিনী!' তার মুখ থেকে খালি বেরোয়।

'প্যারাশুট-বাহিনী বলচ কি দাদা?' ভাষার এবম্বিধ লাঞ্ছনায় লিলি মৃদু আপত্তি না জানিয়ে পারে না ঃ 'শুধু একজন তো লোক! প্যারাশুটবাহী বলতে পারো বরং।'

BanglaBook.org

'লোকটা মেয়ে কি পুরুষ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি নাকি?' দূরদর্শী হয়েও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতে শিশিরের লজ্জা হয় না ঃ 'আর মেয়ে হলে বাহিনীই তো হবে, ব্যাকরণেই বলে দিয়েচে। যেমন সিংহবাহিনী? সিংহ-বাহিনী বলতে কী বোঝায়? একগাদা সিংহ কি? মোটেই না। সিংহবাহিনী মানে মা দুর্গা! তার মানে—' উদাহরণ দিয়ে বিশদ করে ব্যাখ্যা দ্বারা সে বিস্তৃত করে ঃ 'তার মানে মেয়েরা একাই একশো কিনা! একাই একটা বাহিনী!'

'তোমার মাথা!' লিলি, নিজে মেয়ে হলেও, এতখানি নির্জলা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

'এই যা, লোকটাও যে জলে পড়ল দেখছি। ভেবেছিলাম, উড়তে-উড়তে ডাঙায় এসে পৌঁছবে।'

'ডুবে গেল যে লোকটা!' লিলির অস্ফুট আর্তনাদ।

'এখানে তো আর কেউ নেই! কী মুশকিল দ্যাখো তো!' শিশির ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে ঃ 'আমাকেই গিয়ে বাঁচাতে হবে দেখছি।'

'তুমি? না, না—তুমি না!' লিলির স্বরে আবেগ। 'না দাদা!' সকাতর আবেদন!

'কেন, আমি কি সাঁতার জানিনে? ডুবন্ত লোককে বাঁচাতে পারিনে না কি আমি?'

'সমুদ্রে কখনও সাঁতার কাটোনি তো!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' লিলির জবাবে এই কথাটা বলতে গিয়ে শিশির থেমে যায়। উপমাটা ঠিক তার উপযুক্ত নয়—বীরত্বব্যঞ্জকও না—যথোচিত নয় তার পক্ষে। একটু ভেবে নিয়ে সে বলে ঃ 'কেন, যে খাতায় অঙ্ক কষে, সে কি ব্ল্যাকবোর্ডে কষতে পারে না?'

এই বলে শিশির মালকোঁচা মেরে তৈরি হয়ে নেয় ঃ 'লোকটাকে কেমন করে অবলীলাক্রমে উদ্ধার করে নিয়ে আসি তুই চেয়ে চেয়ে দ্যাখ।'

শিশির সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিলি চিৎকার করে বাধা দিতে যায়, কিন্তু তার আওয়াজ বেরোয় না। সমুদ্রের বুকে শিশির-সম্পাত—কাঠের পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। তার দু-চোখের উপকূল আরেক নোনাজলে ছাপিয়ে উঠে।

শিশির সাঁতরে কোনওরকমে মজ্জমানের কাছাকাছি যেতেই, তাকে হস্তগত করবার আগেই, লোকটিই শিশিরকে পাকড়ে ফ্যালে।

'এ কী! তুমি আবার কে হে? তুমি এখানে কেন?' পরিষ্কার বাংলাতেই প্রশ্ন করে সে। এবং দেখা যায় প্যারাশুট-বাহিনী নয়, লোকটা প্যারাশুট-বাহন।

'তোমাকে বাঁচাতে এলাম।' শিশির বলে, 'তুমি ডুবে যাচ্ছ।'

'আমাকে! আমাকে বাঁচাতে!' লোকটি না হেসে পারে না। 'কী সর্বনাশ! এক কাজ করো। আমার কাঁধ আঁকড়ে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে থাকো।' এই বলে সেই লোক, ডুবন্তরা যেমন করে খড়কুটো পাকড়ায়, ঠিক তেমনি করে শিশিরকে ধরে নিজের পিঠে জড়িয়ে নেয়—যেমন করে স্নানযাত্রীরা গামছা কাঁধে ফেলে আর কি।

উদ্ধার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শিশির নিজেই উদ্ধৃত হয়ে পড়ে।

শিশিরকে পৃষ্ঠসাৎ করে লোকটা যদৃচ্ছ সাঁতার কেটে কূলভূমির দিকে এগোতে থাকে।

'ঢেউয়ের কীরকম জোর দেখচ! আর কী ভীষণ আন্ডারকারেন্ট! আমি না থাকলে এতক্ষণ তলিয়ে কোথায় ভেসে যেতে!' লোকটি, শিশিরের বোঝা ঘাড়ে ফেলেই শিশিরকে বোঝাতে চায়।

শিশির কিন্তু ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের কোনও কারণ খুঁজে পায় না। কৃতজ্ঞতার কোনও বিজ্ঞাপন দেয় না।

'ডাঙায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে, ওই মেয়েটি কে?'

BanglaBook.org

'আমার বোন।' শিশিরের কাটা জবাব।

'ও আবার তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবে না তো? কিংবা আমাকেই হয়তো? তা হলেই তো আমি গেছি! আমার তো একটিমাত্র পিঠ!' লোকটি বলে।

'একমাত্র পিঠ তো কী হয়েছে?'

শিশির উসকে ওঠে, তার একটু উষ্মাই হয়। লোকটা নিজের পীঠস্থানের মাহাত্ম্য নিয়ে যে- রকম বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে, তাতে ওর পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে সলিল-সমাধিও শ্রেয়—ঢের শ্রেয় বলে শিশিরের ধারণা হতে থাকে। পৃষ্ঠে ধারণ করে লোকটা যেন ওর মাথা কিনতে চায়। কে ওকে অমন করে পিঠে ধরতে বলেছিল?

'একটি তো পিঠ, তাই নিয়ে আমি ক'জনের দ্বারা উদ্ধার হব? তাও আবার তুমিই এখন গ্রাস করেচ! পরহস্তগত পিঠ নিয়ে ক'জনের দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়? তুমিই বলো?'

'কে আবার তোমাকে উদ্ধার করতে আসচে?' শিশির জানতে চায়।

'বলা যায় না তো, ওই মেয়েটাও আসে যদি? তোমার যখন বোন, পরের জন্য—পরের প্রাণদানের জন্য নিজের প্রাণ দেবার বাতিক ওরও থাকতে পারে, বিচিত্র কী? তা হলে বাপু, আমি পারব না, পেরে উঠব না। তোমার নিজের পিঠেই ওকে স্থান দিতে হবে তা হলে। আগে থেকেই আমি বলে রাখচি কিন্তু।'

শিশির কিছু বলে না, চটেমটে চুপ করে থাকে। উপকার করতে এসে উপকৃত হলে, বড়-বড় বীররাই বিরক্ত হয়ে যায়—শিশিরেরও বিরক্তি ধরবে সে আর বেশি কী?

আস্তে-আস্তে ওরা উপকূলে পৌঁছায়—ডাঙায় এসে পরস্পরকে নামায়।

'উঃ!' লোকটা কপালের ঘর্মাক্ত জল মুছে ফ্যালে ঃ 'এই তোড় ভেঙে আর ঢেউ ঠেলে একটা লোককে টেনে নিয়ে আসা কি সোজা? প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়! বাপ!' লোকটি হাঁফ ছাড়ে ঃ 'মানে, তোমার দাদার কথাই বলচি! আমাকে উদ্ধার করতে বেচারি হিমশিম খেয়ে গেছে।'

'আমার দাদা ওইরকম!' দাদার গর্বে ও গৌরবে লিলি টইটম্বুর ঃ 'পরের প্রাণদান করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে ফেলে। কতবার!'

'তাই তো দেখচি। এরকম দাদা নিয়ে ঘোরাফেরা নিরাপদ নয়।'

'নয়ই তো! আরেকটু হলে আমি নিজেই তো জলে পড়েছিলাম! যদিও সাঁতার জানিনে তবু দাদার প্রাণ বাঁচাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হত!'

'উঃ, বড্ড বেঁচে গেছি দেখছি!' লোকটা অনেকখানি নিশ্বাস ফেলে দেয় ঃ 'মানে তুমিই! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছ আজ।'

কথা কইতে-কইতে তিনজনে শহরের মধ্যে এগোতে থাকে। শিশির খুব কমই কথা বলে। কী করে এরোপ্লেনের কল বেগড়াল, কব্জাগুলোকে কিছুতেই আর কায়দায় আনা গেল না, সবসমেত সমুদ্রগর্ভে তলাবার আগে কোন সতর্ক মুহূর্তে, মাথা এবং প্যারাশুট খেলিয়ে অধোগামী এরোপ্লেনের কবল থেকে, নাবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, শূন্যমার্গে, নিরুদ্দেশেই, নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছেন —এইসব কথা। কোথা থেকে আসছেন, কোনখানেই বা গন্তব্য, এবং কেনই বা নৈর্ঋৎ কোণকে এভাবে অগ্রাহ্য করে তাঁর এইসব অভ্রভেদী পঞ্জিকা-বিরুদ্ধ যাতায়াত—তার কোনও কথাই কিন্তু ভদ্রলোক পাড়তে দিচ্ছিলেন না।

লিলি উচ্চবাচ্য করে, শিশিরও উসখুস করতে থাকে—কিন্তু যেভাবেই শুরু হোক না কেন, প্রশ্নপত্র চেপে যাবার ভদ্রলোকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

অবশেষে তারা বেড়াতে-বেড়াতে শহরের বড় একটা বাড়ির পাশে এসে পড়ল। বাড়িটার গায়ে, সচিত্র এক বিজ্ঞাপনে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার একটা ঘোষণা জ্বলজ্বল করছিল।

BanglaBook.org

শিশির না দেখেই বলল ঃ 'ক্রসওয়ার্ড পাজল! বুঝেচি!'

লিলি এগিয়ে যায় ঃ 'কই দেখি!'

'ও দেখে কী হবে? কেউ সলভ করতে পারে না। পারতে গেলে, সহজ কথার জায়গায় শক্ত কথা, শক্ত কথার জায়গায় সহজ কথা হয়ে যায়—যা করবি ঠিক তার উল্টোটা হবে। তার মানে, উল্টোটাই হচ্ছে ঠিক। বুদ্ধি খাটিয়ে ফের যদি তার উল্টো করতে যাস, দেখবি, আবার তার উল্টো হয়ে গেছে। এন্ট্রি-ফি-ই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার।' শিশিরের কাছে স্পষ্ট কথা—শিশির ওসব দিকে ভুলেও আর ভ্রূক্ষেপও করবে না। অভিজ্ঞতাবান উদাসীন শিশির।

ভদ্রলোক কিন্তু একবার চোখ বুলিয়েই বিজ্ঞাপনটা আড়াল করে দাঁড়ান ঃ 'হ্যাঁঃ! এসব পুরস্কার কেবল ঘোষণা করাই সার! কে-ই বা পাচ্ছে, আর কে-ই বা নিতে যাচ্ছে! কাউকে পেতে দিলে তো!'

এই বলে ওদের সাথে হনহন করে আরেকটু এগিয়ে, চৌমাথায় পৌঁছেই, চলতি একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে তিনি চট করে উঠে পড়েন—এবং ওদের আর-একটি কথাও না বলে তীরবেগে তিরোহিত হয়ে যান। লোকটার আকস্মিক অন্তর্ধানে শিশির একটু বিস্মিতই হয়।

'চলো না দাদা, দেখে আসি পাজলটা। পারা যায় কি না দেখা যাক। বর্মার ক্রসওয়ার্ড হয়তো অতো শক্ত হবে না।'

'তোর ভারি টাকার লোভ! পাবিনে, তবুও। বলছিনে, আমার অনেক টাকা ওরা মেরে দিয়েছে। ওই ক্রসওয়ার্ডরা।'

শিশির আর লিলি আবার সেই বাড়িটার পাশে ফিরে আসে। আরে, এ-বাড়িটা তো শহরের একটা থানা বলে বোধ হচ্ছে? হ্যাঁ, থানাই তো! ইতস্তত লালপাগড়ি দেখা যায় যে! কিন্তু, এ আবার কীরকম ক্রসওয়ার্ড?

বিজ্ঞাপনের গায়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা ঃ "নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার। হংকং-এর জেল হইতে কিছুদিন পূর্বে পলাতক দুর্ধর্ষ বাঙালি দস্যু—বক্কেশ্বর আইচ—যে-কেহ ইহাকে ধরাইয়া দিলে বা সঠিক সন্ধান দিতে পারিলে, উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।"

তবে, ক্রসওয়ার্ড না হলেও পাজল যে, সে-বিষয়ে ভুল কি?

সেই বিজ্ঞাপনের অঙ্গে যে-ফোটো লাগানো, সেই ফোটোর সঙ্গে—সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত ওই ভদ্রলোকের ভয়ঙ্কর মিল! বেধড়ক মিল, যাকে বলে!

পাঁচ ঃ অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক

বাড়ি ফেরার পথে শিশির চুইংগাম কেনে। গোটাকতক নিজের এবং লিলির মুখে অর্পণ করে বাকিগুলো রেখে দেয়।

'মামার পায়ে লাগানো যাবে এগুলো।' শিশির বলে।

মুখের বদলে পায়ে কেন, লিলি ভেবে পায় না। 'কেন, পায়ে কেন? মুখ থাকতে—পায়ে?' সে জিগ্যেস করে।

'আন্দাজ কর দেখি! বুঝব তোর বুদ্ধি!' শিশিরের রহস্যময় চাহনি।

লিলি আন্দাজ করে ঃ 'মামা বুঝি ফের আবার ভূ-পর্যটনে বার হবে মনে করছ? তাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?'

চুইংগাম যেমন চর্বণের—চর্বিত চর্বণের অন্তরায়, তেমনি নিশ্চয় ভূ-পর্যটনকারীর পদে-পদে বাধার সঞ্চার করবে, তার নিজের রোমন্থনের মুশকিল দেখে এই পর্যন্ত লিলি অনুমান করতে পারে।

BanglaBook.org

'তোর মাথা! তোর কিচ্ছু মাথা নেই! তুই একটা গাধা!' শিশির সাদা বাংলায় বলে দেয়।

'মুখে লাগালেও মানে বুঝতুম! পাছে মামা প্ল্যানের খবর আর কারও কাছে ফাঁস করে দেন সেই কারণে মামার মুখ বন্ধ করার মতলবে—।'

'মোটেই না, মোটেই—না!' শিশির বাধা দিয়ে বলে ঃ 'কেন চুইংগাম কিনলাম বলি। মামা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথা খাটিয়ে প্ল্যানটার রহস্যভেদ করেচে। করেনি কি?'

'নিশ্চয়!' মামার কার্যকারিতায় লিলির অগাধ বিশ্বাস।

'আর আমি মামার পা খাটিয়ে তার সমস্ত জেনে নেব।' শিশির জানায়।

'পা খাটিয়ে? মামার পা?' লিলি আবার গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে, কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

'এই চুইংগাম এখনই গিয়ে মামার যাবতীয় জুতো আর স্লিপারের তলায় ভালো করে এঁটে দেব। তাদেরই একজোড়াকে পায়ে দিয়ে তো মামা সেই গুপ্ত কক্ষের সন্ধানে বেরুবে। আর যে-যে ঘরের ভেতর দিয়ে যেখান দিয়েই যাক না—মামার প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে চুইংগামের চিহ্ন থেকে যাবে। চুইংগামরা তো সহজ পাত্র নয়!'

লিলি অবাক হয়ে দাদার বুদ্ধির বহর দেখে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বাড়ি ফিরে লিলি আর শিশির জুতোদের খোঁজখবর নিতে যাবে, এমনসময়ে মামার রুদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর সোরগোল শুনতে পায়।

'তুমি তা হলে এই বাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি নও?' অপরিচিত কণ্ঠের বাজখাঁই আওয়াজ।

'নাঃ, কিছুতেই না।' মামার গলা।

'ভেবে দেখো, আমি কদ্দুর থেকে এসেছি? কীরকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে, প্রাণ তুচ্ছ করে—।'

'আমার বয়েই গেল!'

এ বাড়ি হাতে রেখে তুমি কী করবে? পুরনো পচা-বাড়ি—এর ভাড়াটেও পাবে না কোনওদিন। এর ইঁট-কাঠ-কড়ি-বরগারই বা কত দাম হবে! যদি চাও উচিত মূল্যের বেশি দিয়েও আমি এটা কিনে নিতে পারি।'

'হ্যাঁ, এই বাড়ি আমি বেচতে গেছি কিনা!' মামার জবাব শোনা যায় ঃ 'এ-বাড়ির দাম আমার জানা আছে। তোমাকে আর বেশি করে আমায় জানাতে হবে না।'

'হুম।' অপরিচিত গলার সুর এবার বদলায় ঃ 'হুম বুঝেচি। এই বাড়ির কোনওখানে গুপ্তধন লুকোনো আছে, তুমি ভেবেচ বোধহয়? যদি লুকোনোও থাকে, কোনওদিন তুমি তার সন্ধান পাবে না। তার প্ল্যানই খুঁজে পাবে না কোনওদিন। সারাজন্ম খুঁজলেও তোমার ও-হাঁদাবুদ্ধির কর্ম নয়!'

'পাব কি পাব না, পেয়েচি কি পাইনি—সে আমি বুঝব! মামা জানায় ঃ 'তোমাকে বলতে গেছি আর কি! কী আমার গুরুঠাকুর এলেন!'

'বটে? এই কথা? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যদি না দেখে নিই, তা হলে আমার নাম—আমার নাম—।'

বলতে-বলতে ঝাঁঝালো গলায় ভদ্রলোক দরজা খুলে তীরবেগে বেরিয়ে যান।

শিশির ও লিলি সিঁড়ির আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে দ্যাখে—তর্জন-গর্জনকারী নবাগতটি আর কেউ নন, তাদের সদ্যপরিচিত শ্রীমান বক্কেশ্বর আইচ।

সারাদিন শিশির আর লিলি ওত পেতে থাকে, মামার সবকটা জুতোর পরিচর্যা সেরে, মামাসুলভ গতিবিধির মাঝখানে, এখানে-সেখানে, মামার যাত্রাপথের সর্বত্র, প্রলোভনজনক করে ছড়িয়ে রেখে দেয়। যেদিকেই মামা পা বাড়াবেন, একজোড়া পাবেন—তাঁর পায়ে পড়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। জুতোর জন্যে মামাকে ইতস্তত করতে হবে না—পায়ের গোড়ায়—গোড়ালির

BanglaBook.org

আগায়—পায়চারির নাগালেই ওরা পড়ে রয়েচে।

কিন্তু সমস্ত বজ্র আঁটুনিরই ফসকা গেরো আছে—সারাক্ষণ মামার জুতোদের (এবং মামাও বাদ নয়) নজরে-নজরে রেখে, বিকেলের দিকে, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে পাঁপরভাজাওয়ালা ফিরি করে যাচ্ছে দেখে কেনার লোভ দমন করতে না পেরে শিশির আর লিলি যেই না দৌড়ে গেছে আর পাঁপর মুখে দৌড়ে এসেছে—আর এর মধ্যেই ফিরে দেখে—মামা নেই! মামার দরজা ফাঁক! মামার ঘর খালি! কোথায় গেল মামা? জানাশোনা সমস্ত ঘর আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হল—কোনও ঘরেই মামা নেই!

নিশ্চয় তবে—তা হলে—সেই রত্নসঙ্কুল গুপ্তকক্ষেই মামা বিরাজ করছেন এতক্ষণ?

তক্ষুনি মামার বত্রিশ জোড়া জুতোর হিসেব নেওয়া হল—গোনাগুনতি করে মিলিয়ে দেখা গেল, হ্যাঁ, ঠিক! একজোড়া কমই বটে। মামার পায়ে-পায়ে—মামার সাথে-সাথেই উধাও হয়েছে সেই মানিকজোড়!

এইবার চুইংগামের চাকচিক্য লক্ষ্য করে অন্বেষণের পালা! শিশির বিচক্ষণ গোয়েন্দার মতো খুঁটিয়ে দেখে আর খানিক এগোয়—লিলি যায় তার পিছনে-পিছনে। দাদা যা করতে বলে তাই করে। লিলির চোখ বড়-বড়, নিশ্বাস রুদ্ধ, আর বুকের মধ্যে টিপটিপুনি!

এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে—লম্বা ঘর, চওড়া ঘর, গোল ঘর অতিক্রম করে—একফালি ঘর, তিনকোণা ঘর, তেরছা ঘর পার হয়ে—দু-বার উপরে উঠে, তিনবার নিচে নেমে—অবশেষে সোঁদা-গন্ধ-ওলা, গুদামঘরের মতো, পোড়ো-ঝোড়ো চামচিকে-ওড়া একটা ঘরের নেপথ্যে চুইংগাম লাঞ্ছিত পদচিহ্নদের অনুসরণে ওরা গিয়ে উত্তীর্ণ হল।

নেপথ্য থেকেই জরাজীর্ণ জানলার আনাচ থেকে উঁকি মেরে দেখল, এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে সেই প্ল্যানখানা নিয়ে, সেই গুদামঘরের দেওয়ালে কী যেন খোঁজাখুঁজি করছেন মামা!

কী খুঁজচেন, বুঝতে দেরি হয় না শিশিরদের। ওরই মধ্যে কোনওখানে অর্থপূর্ণ দেরাজ—দেয়ালের অন্তর্গত হয়ে, দেওয়ালের সঙ্গে একাকার হয়ে ছলনা করছে তাকে আবিষ্কার করারই মামার অধ্যবসায়।

শিশির আর লিলি পা টিপে-টিপে গুদামঘরের মধ্যে সেঁধোয়—।

খুট করে আওয়াজ হয় একটু। অমনি তীব্র টর্চের আলো এসে ওদের মুখের উপর আছাড় খায়। 'কে? কে ওখানে?' মামার খনখনে গলার ভেতর থেকে ধারালো প্রশ্ন আসে—মামার পকেট থেকে ঝকঝকে পিস্তল বার হয়—একবারে যুগপৎ।

'আমি! আমরা। আমরা মামা।' শিশিরের কম্পিতকণ্ঠ।

'কে? কে তোমরা?' মামা চিনতে পারেন না—পিস্তল লক্ষ করেন।

'আমরা তোমার ভাগনে।' শিশির লিলিকে আড়াল করে দাঁড়ায়—গোলাগুলির যা কিছু ঝড়-ঝাপটা আসুক, ও নিজেই বুক পেতে নেবে। লিলি দাদাকে আঁকড়ে ধরে পিছন থেকে।

'ভাগনে?... ভাগনে!' মামার বিকট অট্টহাসি শোনা যায় : 'ভাগ্নে নেবার ভাগনে আমার!'

তারপর হাসি থামিয়ে, টর্চের আলোয়, উন্মুক্ত পিস্তলে, মামা এগিয়ে আসতে থাকেন—তাঁর দু-চোখে পৈশাচিক উল্লাস।

'সোজা হয়ে দাঁড়া! ঠিকঠাক হয়ে থাক। আমি একটার পর একটাকে সাবাড় করব। পিস্তলটা আজই কিনেছি! কোনও কাজের কি না এটা, তাও তো পরীক্ষা করা দরকার। আরেকটা কই, আরেকজন গেল কোথায়? দুটোকেই একসঙ্গে খতম করব—কোনও ওজর-আপত্তি শুনছিনে! কিচ্ছু না!'

এমনসময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। অভাবিত এবং অভাবনীয় কাণ্ডটা যে ঠিক এই রকম সময়েই ঘটবে তার আর আশ্চর্য কী? ওইসব কাণ্ডরা তো প্রায় ওত পেতে—এই ধরনেরই

BanglaBook.org

যুৎ খোঁজে।

গুদামঘরের পশ্চাৎ দিক থেকে আরেকটা প্রবলতর টর্চের আলো মামার পিঠের ওপর এসে পড়ে—মামার পশ্চাতে এসে সহসা যেন এক ধাক্কা লাগায়।

'অ্যাঁ? এধার থেকে আবার কে?' মামার অগ্র-পশ্চাৎবোধ লোপ পায়—মামা কোনদিকে ফিরে কোনটা সামলাবেন স্থির করতে পারেন না।

'যেমন আছ তেমনি থাকো। নোড়চোড় না! একটু এদিক-ওদিক হয়েছ কি মাথার খুলি উড়ে গেছে।' পেছনের টর্চার— (কিংবা টর্চারার) বাজখাঁই গলায় হুকুম লাগান।

মামা সেই অবস্থাতেই তথৈবচ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকটি আলোক হস্তে এগিয়ে এসে, মামার হাত থেকে প্ল্যান এবং পিস্তলটি কেড়ে নেয়।

'একি? মামা—তুমি? তুমিই মামা হয়ে ভাগনের সর্বনাশ করতে এসেচ? ফের এসেচ আবার?' ব্রজেশ্বরবাবুর কাতরকণ্ঠ থেকে বার হয়।

'সকালে যখন বললুম তখন হল না? এখন তো হল, কেমন?' বক্কেশ্বর আইচ হো-হো করে হাসেন—প্যাঁজ—পয়জার দুই-ই হল তো? এবার লক্ষ্মীছেলের মতো নিজের বিছানায় ফিরে যাও গে!'

'মামার হাতে ভাগনের মরণ—চিরদিনই জানি!' ব্রজেশ্বর বিদীর্ণকণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

শিশির পশ্চাৎবর্তিনীর কানে-কানে ফিসফিস করে: 'মামার ওপরেও মামা আছে! দেখছিস তো লিলি?'

বক্কেশ্বর টর্চটাও কেড়ে নেন ব্রজেশ্বরের হাত থেকে।

ছয়: মামার ওপরেও মামা আছে!

'মামার ওপরেও মামা আছে দেখছিস তো লিলি!' লিলির কানে-কানে শিশির বলে: 'মামার মামারা আরও কত ভয়ানক, ভেবে দেখ!'

'ভগবানও আছেন দাদা!' লিলি ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, ভগবানকে আর থাকতে হত না, আর-একটু হলেই গুলির চোটে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে হত। মামা যেমন করে রিভলভার তুলেছিল! ভাগ্যিস—এই অন্য মামাটা—মামার স্কোয়াররুটটা এসে পড়ল তাই রক্ষে!'

'লোকটা একটা জলজ্যান্ত বিভীষিকা! তাই না—দাদা?'

'বিভীষিকা? বিভীষিকা কেন? একটুও বিভীষিকা না! অন্তত আমার কাছে তো নয়! তবে হ্যাঁ, জলজ্যান্ত বটে! আমিই তো আজ সকালে ওকে জল থেকে জ্যান্ত বারেছি!'

'তোমার একটুও ভয় করেনি?'

'একটুও না।'

'তবে কাঁপছিলে কেন অমন করে?' লিলি জানতে চায়।

'আমি কাঁপছিলুম? আমি? আমি না তুই?' শিশিরের উল্টো চাপ।

'আমার তো হাত-পা কাঁপছিল!' লিলি সমস্ত দোষ অসহায় হাত-পা-র ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। 'পা-হাত কেবল।'

'তা হলেই হল! আর তুমি যদি আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে অমন করে কাঁপতে থাকো—তুমিই হও আর তোমার হাত-পা-ই হোক—তখন না কেঁপে আমি করি কী?' শিশির নিজের অনুকম্পার কারণ দেখায়: 'ভাগ্যিস তুমি কাঁপতে-কাঁপতে পড়ে যাওনি—তা হলেই হয়েছিল আর

BanglaBook.org

কী! আমাকেও চিৎপাত হতে হত সেইসঙ্গে!'

লিলির আনুকূল্যে শিশিরের যে অনিবার্য অধোগতি ঘটতে পারত, অথচ ঘটেনি—তার জন্যে লিলিকে দায়ী করায়, লিলির রাগ হয়ে যায়। যা ঘটেনি তার সে কী কৈফিয়ত দেবে? সে চুপ করে থাকে।

'কিন্তু যাই বল, গুলিটুলির চলাচলের সময়ে অত কাছাকাছি থাকা ভালো নয়। এমন করে আমার পিঠ লেপটে এক হয়ে থাকা তোর ঠিক হয়নি।' শিশির ভালো করে সমঝে দেয় ঃ 'আমার আড়ালে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হত।'

লিলি কিছু বলে না। তার অভিমান হয়ে যায়। তার কী দোষ? সে কি গায়ে পড়ে দাদার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গেছল? দাদাই তো তাকে আড়াল করে নিজের পৃষ্ঠরক্ষা করেছিলেন! সে-কথা এখন ওঁর মনে পড়ছে না! বা রে!

'যেমন পিঠ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলি, গুলি ছুঁড়লে মজাটা টের পেতিস! গুলিটা আমাকে ভেদ করে তোর ভেতরে গিয়ে সেঁধুতো! গুলিদের কি ভেদাভেদ-জ্ঞান আছে? মেয়েছেলে বলে একটুও খাতির করত না! সোজা ফুঁড়ে এস্পার-ওস্পার হয়ে বেরিয়ে যেত!'

যেত—যেত—লিলির যেত—দাদার কী? উনি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির যাতায়াতে কতটা বাধাসৃষ্টি করেছেন, শুনি? নেহাত সেই জলজ্যান্ত বিভীষিকাটা ঠিক সময়ে এসে পড়ল বলেই না? তাই বলেই না ফাঁড়াটা অত সহজে কেটে গেল—ভুল পথ দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল ফাঁড়াটা?

লিলি গুম হয়ে থাকে। কোনও জবাব দেয় না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের নিরন্ধ্রতা খানখান করে খনখনে আওয়াজ ফেটে পড়তে থাকে—।

তাদের মামার আর্তনাদ!

বক্কেশ্বর আইচ ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার হাত থেকে পিস্তল, প্ল্যান, পরিশেষে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে পলায়ন করার পর, এতক্ষণ পরে, তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হায়-হায় করে ওঠেন!

'যাক্, মামার কিছু হয়নি, বাঁচা গেল!' শিশির বলে ঃ 'এতক্ষণ ধরে মামার কোনও সাড়া না পেয়ে ভাবছিলুম মামাকে বুঝি সাবাড় করে গেছে! কিন্তু এতক্ষণে—প্রত্যক্ষ না দেখা গেলেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মামাকে।'

'হুম—একেবারে না মেরে ফেলতে পারলেও, মামাকে নিয়েও তো পিট্টান দিতে পারত লোকটা।'

'হ্যাঁ, মামা যা বহুমূল্য একটি রত্ন! কিন্তু লোকটার নিজের পিঠের ওপর টান আছে বলেই মামাকে নিয়ে পিট্টান দেয়নি। একটা মামার বোঝা তো বড় কম নয়!' শিশির হাসে। 'একবার পিঠে করে দেখ না!'

'তার কাছে তো ভাগনের বোঝা!' লিলি বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ 'মামা সেই লোকটার ভাগনেই তো!'

মামার কাতরোক্তি ক্রমশ বেড়েই চলে। অন্ধকারের কোনখানে দাঁড়িয়ে যে তিনি অনুশোচনা করচেন ঠিক ঠাওর হয় না, তবু ওরই মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে, শব্দের ধারা আর ক্রন্দনের ধারা অনুসরণ করে যার-পর-নাই বিলাপকারীর কাছাকাছি গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

'মামা! মামা!' ডাক ছাড়ে শিশির।

'আর মামা!' ব্রজেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন ঃ 'তোদের জন্যেই আমার এই সর্বনাশ আজ!

'আমাদের জন্যে? আমাদের জন্যে কেন?' শিশির একটু বিস্মিতই।

'একদিকে তোরা—ভাগ নেওয়ার ভাগনেরা। আরেক দিকে মামা—সাক্ষাৎ মামা! সর্বস্ব নেবার মামা! দু-দিকেই ভারি পাল্লা—কোনদিক আমি সামলাই?' বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ ব্রজেশ্বরের।

'তা—আমরা—আমরা কী করলাম?' শিশিরের বিমূঢ় প্রশ্ন।

BanglaBook.org

'তোরা আর কী করবি? কিছুই করতে পারলিনে। মামাই সর্বস্বান্ত করে চলে গেল!' ব্রজেশ্বরের আফসোস বাগ মানে না ঃ 'বাঘ এসে পড়লে বেড়ালরা কি কিছু করতে পারে? বেড়ালদের সুবিধা করতে দেবে—বাঘরা সে-পাত্রই নয়! তারা নিজেরাই সব সাবড়ে দিয়ে যায়, বেড়ালদের জন্যে ছিটেফোঁটাও রাখে না!'

'তা হলে আর আমাদের কী দোষ?'

'তোদের আর দোষ কী? টর্চ-ফর্চ কিছু আছে সঙ্গে?'

'কিচ্ছু না!'

'তবেই হয়েছে! তবে এই অন্ধকারের গর্ভ থেকে কী করে আমরা বেরুব?' মামার সকাতর কণ্ঠ। 'পিস্তল-টিস্তল আছে? তাও নেই? পিস্তল নেই, টর্চ নেই—বাছারা এসেচেন গুপ্তধনের সন্ধানে!' মামার হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে যায় ঃ 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। গুপ্তধন নেবেন? আবদার দ্যাখো না!'

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই, কাকে বলা যায় না, আস্পর্ধার সেই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দুটিকে অঙ্গুলি-নির্দেশে তিনি দেখাতে চান।

দেখাতে চান বটে, কিন্তু নিজে তিনি দেখতে পান না। নিদর্শন দুটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শন পেলে এইদণ্ডেই এইসা এক চড় কষিয়ে মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কার্পণ্য হত না।

সাত ঃ অন্ধকারের বিভীষিকা!

'কেন, পিস্তল না থাকলে কী হয়?' লিলি জানতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে ঃ 'পিস্তল থাকলে কী হত মামা?'

'চামচিকেরা এই অন্ধকারের মধ্যে কীরকম ফরফর করছে দেখচিসনে? না দেখলেও, শুনতে পাচ্ছিস তো? গায়ে-মুখে এসে ঝাপটা লাগালেই হল! পিস্তল থাকলে এক্ষুনি ওদের ফরফরানি বন্ধ করে দেওয়া যেত। একটি আওয়াজ করলেই—ব্যস! গুড়ুম শুনলেই, দুদ্দাড় করে পালিয়ে যেত সব। দিগ্বিদিকে উধাও হয়ে যেত। গুড়ুমকে ভয় করে সবাই। ওর নাম আক্কেল-গুড়ুম!'

'জানিস তো লিলি, ওরা ভারি চুল ছেঁটে নেয়, ওই চামচিকেরা! মাথায় এসে ঝাপটালেই বুঝবি খানিকটা চুল খুবলে নিয়ে গেছে—!' শিশিরও উড্ডীয়মান ওই দুরন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারে না—'নির্ঘাত নিয়েছে।'

লিলি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মাথায় হাত-চাপা দিয়ে নিজের কেশদাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। খুবলে নিলেই হল আর কী? চুলের দাম নেই? আঙুল-ঢাকা দিয়ে চুল বাঁচিয়ে লিলি মামার বিশাল বগলের তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চায়—এই অন্ধকারে ওই চক্রাকারে উড়ন্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ ছাড়া আর কী উপায়?

'এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা যাক, এসো মামা!' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু দরজাটা কোন দিকে, তোমার মনে আছে?'

'আরে তাই যদি মনে থাকবে তা হলে তো কোনকালে বেরিয়ে পড়তুম! তোদের জন্য অপেক্ষা করতুম নাকি? একমিনিটের জন্যেও দাঁড়াতুম না তা হলে?' মামা বলেন ঃ 'এই বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে কি একমিনিটও দাঁড়ানো যায়? কোনও ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে?'

একটু থেমে মামা আবার বলেন ঃ 'কেন, তোদের মনে নেই? তোরা তো এইমাত্র এলি? পথে দেখে আসিসনি? এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস? এই মেমারি নিয়ে কী করে যে তোরা পরীক্ষা পাশ করবি তাই আমি ভাবি!'

BanglaBook.org

'আমরা কি আর পথ দেখে এসেছি? আমি তো চুইংগামের চিহ্ন দেখতে-দেখতে এলাম।' শিশির জানায়।

'আর আমি তো দাদাকে দেখতে-দেখতে এসেচি।' বিনা জিজ্ঞাসাতেই লিলি নিজের জবাব দিয়ে দেয়—আগে থেকেই!

'মাথা কিনে নিয়েচ! এইজন্যেই না বলে যে যম জামাই ভাগনা তিন না হয় আপনা—মিথ্যে কথা বলে কি? ভেবে দেখলে, তিনটেই অপদার্থ!'

'বারে! তোমার নিজের বাড়ি! এর ঘর-দোর-রাস্তা সবই তোমার মুখস্থ—আর তাই যখন তোমার নিজেরই মনে নেই তখন আমরা তো আজকের ছেলে! আজকেই তো এই বাড়িতে পা দিলুম! আমাদের মনে থাকবে?'

'আমার কী করে থাকে, শুনি?' মামার ঝাঁঝালো জবাব ঃ 'এই ঘোরালো ঘরটা যে এই বাড়ির ভেতরেই ছিল তাই আমি জানতাম না। প্ল্যান দেখে-দেখে তো এলাম। তারপর যখন একমনে গুপ্তস্থানটা খুঁজে বার করছি তখন তোরা এসে গোলমাল বাধালি—তখনও হয়তো বার-পথের একটা আন্দাজ ছিল, তারপর সেই হতভাগা মামাটা এসে সব গুলিয়ে দিল। ক'বার এগুলাম, ক'বার পেছুলাম—কতবার ঘুরপাক খেয়েছি—কিছু কি ছাই মনে আছে? তারপর এখন তো ঘুটঘুট্টি আঁধার! মামাটা আবার এমন বেয়াক্কেলে যে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে।' ক্ষণেক থেমে আবার তাঁর আক্ষেপোক্তি হয় ঃ 'প্ল্যানটাও ছাড়েনি।'

'প্ল্যান নিলি-নিলি, বেশ করলি! টর্চটা আবার নিতে গেলি কেন?' লিলিও অনুযোগ করে ঃ 'আমরা অন্ধকারে বেরুব কী করে সে-হুঁশ নেই?'

'মামারা এমনিই বটে!' মামা তাঁর নিজের মামার নজির এনে নিজেদের জের টানেন।

'সেজন্য তুমি আপশোস কোরো না মামা! ওর খপ্পর থেকে তোমার প্ল্যান আমি উদ্ধার করে আনব! তোমায় এনে দেব, তুমি দেখে নিয়ো—দুঃখ কোরো না তুমি! কেবল একবার ওর দেখা পেলেই হয়।' শিশির ভরসা দ্যায় ঃ 'কিন্তু যাই বলো মামা, তোমার মামাটি গ্র্যান্ড।'

'গ্র্যান্ড? কেন, গ্র্যান্ড কেন? কিসের জন্যে গ্র্যান্ড—শুনি?' মামা ভারি খাপ্পা হয়ে যান।

'মামার মামা তো এমনিতেই গ্র্যান্ড মামা, তাই নয় কি? আপনা থেকেই তো গ্র্যান্ড?' শিশির শুধরে নিতে চায় ঃ 'বাবার বাবারা যেমন গ্র্যান্ডফাদার!'

'হুঃ! মামারা কক্ষনও গ্র্যান্ড হয় না! মামার মামা হলেও না। ভারি বদ হচ্ছে এই মামারা, আমি বলে দিতে পারি।' মামা তৎক্ষণাৎ বলে দেন ঃ 'ভাগনেদের চেয়ে কোনও অংশে কিছু কম খারাপ নয়।' বলে দিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কুণ্ঠা হয় না।

মামার এই ব্যাখ্যানও বরং সহ্য হয়, কিন্তু চামচিকেদের ঝড়-ঝাপটা কতক্ষণ সওয়া যায়? শিশির অস্থির হয়ে উঠল—যে করেই হোক, এই অন্ধকারের চক্রব্যূহ থেকে বার হতেই হবে।

এই মুক্তির অভিযানে সে নেতৃত্বপদ নেয়, লিলি তার অনুগামিনী হয়—এবং মামাও শোক সম্বরণ করে তাদের পিছু নিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কিন্তু দরজা যে কোন ধারটায় তার হদিশ পাওয়া দায়! এ-কোণে ধাক্কা খেয়ে ও-কোণে ঢুঁ মেরে ইঁদুরদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দেওয়ালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, অবশেষে, একধারে উঁচু শান-বাঁধানো একটু জায়গা পেয়ে হতাশায় ক্লান্ত হয়ে ওরা বসে পড়ে। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'না, এই গোলকধাঁধা থেকে আজকে আর বার হওয়া যাবে না। রাত্রের মতো এখানেই থাকতে হবে দেখছি।

'তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন যে এ-দশা হবে, আগে থেকেই আমি জানি!' মামা গজগজ করেন।

'এই জায়গাটা একটু উঁচু রয়েছে! শান-বাঁধানো আবার! ইঁদুররা এতদূর উঠতে পারবে না আমার ধারণা। আয় লিলি, শুয়ে পড়া যাক। গা গড়িয়ে জিরিয়ে নেওয়া যাক একটু।'

BanglaBook.org

'আমার চোখ জড়িয়ে আসচে দাদা!' বসতে না-বসতে তার ঘুম পায়—শুতে পেলেই সে বাঁচে।

'ঘুমোতে পারিস। আমি পাহারায় জেগে থাকলাম। মামা, তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো। কোনও ভয় নেই।'

'হ্যাঁ, ভয়ে তো আমি কাঠ হয়ে রয়েছি, তা আর বলতে!' বলতে-বলতে মামা লম্বা হয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাকতে থাকে। লিলিরও নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে।

শিশিরের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে-শুয়ে জেগে-জেগে আজকের সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সে ভাবে। প্ল্যান উদ্ধার থেকে প্ল্যান হারানো পর্যন্ত...! আর সেই জলজ্যান্ত লোকটার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা...! থানার গায়ে লটকানো সেই পুরস্কার-ঘোষণার নোটিশ...! একটার পর একটা সমস্ত তার মানসপটে উদিত হতে থাকে।

পকেট থেকে বার করে মাঝে-মাঝে চুইংগাম মুখস্থ করে আর কী করে দুর্ধর্ষ বক্কেশ্বর আইচের কাছ থেকে প্ল্যানটার পুনরুদ্ধার করবে, এই নিয়ে সে মাথা ঘামায়।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—হঠাৎ একটু খুট! ইঁদুররাই হয়তো। শিশির আমল দেয় না। কিন্তু একটু পরেই আবার খট—খটাখট!

শিশিরকে উঠে বসতে হয়। ইঁদুরদের খটখটি তো এত জোর হবার কথা নয়! অন্য কারও নটখটি হবে। ভূত—ভূতরাই নাকি তবে?

শিশির সভয়ে অন্ধকারের চারিধারে ধারালো দৃষ্টি চালাতে থাকে। এধার-ওধার থেকে, অন্ধকার ফুঁড়ে, কালো-কালো ছায়ামূর্তিরা উঁকিঝুঁকি মারবে, হয়তো বা কঙ্কালদেহীরা দেহি-দেহি রবে এগিয়ে আসবে—পুনঃ-পুনঃ তাদের হি-হি হাসি শুনতে পাবে হয়তো, এইরকমটা প্রতি মুহূর্তেই সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু না, সে রকম কিছু দেখা যায় না।

অবশ্যি, একটু আগে সে, তন্দ্রার ঘোরে, তিনটি নরকঙ্কালকে করমর্দনের অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল—কিন্তু চটকাটা ভেঙে যেতেই চোখ মেলে দ্যাখে, সব ফাঁকা! ফাঁকি সব! কোথাও কিছু নেই!

এবারও দেখল, কোথাও কিছু নেই!

কিন্তু তথাপি সেই খুট—খাট—খুট! খুটখুটুনি বেড়েই চলে ক্রমশ—।

খুট—খাট—খটাৎ! কার এইসব খুঁটিনাটি?

এবার যেন দূরে—অতি দূরে—অন্ধকার বিদীর্ণ করে একফালি আলোর মতো কী যেন ঘোরাফেরা করছে বলে বোধ হয়!

আলেয়া নয় তো?

ভূতেরা—খুব সম্ভব মেয়ে-ভূতেরাই—অনেকসময়ে আলেয়ার ছদ্মবেশে আসে বলে শিশিরের শোনা আছে। সে নড়েচড়ে বসে। তার বুক দুরদুর করে! লিলির পায়ে পা ঠেকিয়ে ছুঁয়ে থাকে।

লিলির ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না, ভয় পেয়ে যাবে ছোট বোন—আর—আর মামার ঘুম ভাঙাতেও তার সাহসে কুলোয় না।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে ভূতের কার্যকলাপ লক্ষ করে।

সেই ভৌতিক আলোটা এবার এগিয়ে আসে। এসে এক জায়গায় থামে। চারধারে কী যেন খুঁজে ফেরে। এগোয়, একটু এগোয়, আবার থামে। অবশেষে একটা দেওয়ালের গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

দেওয়ালে-ধাক্কা-খাওয়া আলোর প্রতিচ্ছায়ার চারধারের আশপাশ ঈষৎ যেন আভাময় হয়ে ওঠে। তার আবছায়ায়, আলোর আড়ালের ছায়ামূর্তিটিকে এবার দেখা যায়। ছায়ামূর্তি হাত-পা নাড়ছে, বেশ স্পষ্ট করেই শিশিরের চোখে পড়ে এবার।

শিশিরের কৌতূহল এবার তার ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আলো হাতে, এ আবার কীরকম ভূত রে বাবা? ভূত, কিংবা ভূতের ছদ্মবেশে অন্য কোনও গুপ্ত-রত্ন-সন্ধানী? খোদার ওপর খোদকারি-

BanglaBook.org

করা গুপ্তধনের অভিলাষী দুঃসাহসিক আর কেউ?

জানবার অভিপ্রায়ে (এবং বাধাদানের মতলবেও), শিশির মুখের চুইংগামটা বার করে সেই ছায়ামূর্তিটিকে ছুড়ে মারে।

গায়ে লাগতেই ছায়ামূর্তিটি চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'ইস! এ আবার কী রে বাবা? কোত্থেকে এল? অ্যাঁ? কোনও ভুতুড়ে কাণ্ড না কি?'

ছায়ামূর্তিটি বিচলিত হয়। শিশির আরেকটা চুইংগামকে রসায়িত করে কশে লাগায়!

'ইস! কী এগুলো! ভারি ল্যাটপ্যাট করছে! টেনে ছাড়ানো যায় না—কী রে বাবা! চটচটে দেখছি আবার!'

ছায়ামূর্তিটি আপনমনেই মন্তব্য করে।

শিশির ক্ষান্ত হয় না, একটার পর একটা, অশ্রান্তভাবে লাগাতে থাকে!

ছায়ামূর্তিটি ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে। এগুলে গায়ে লাগে, পেছুলে পায়ে লাগে, কী করবে ভেবে পায় না। তার ওপরে যা চটচটে! চটাটটি করেও ছাড়ানো যায় না। ভারি মুশকিলে পড়ে যায় বেচারী! অথচ, কোত্থেকে যে ওইসব চট্টোপাধ্যায়রা আসছে, চটপট এসে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

যেখানেই পা ফ্যালে, চুইংগামে আটকায়—পা তোলা এবং তুলে পুনরায় ফেলা দুরূহ হয়ে পড়ে—যেদিকেই এগোয়, পা আটকাতে-আটকাতে চলে। অগত্যা এক পা তুলে ছায়ামূর্তিটি খানিকক্ষণ ভাবে (এক পা-ই তুলে রাখে, যতটুকু বাঁচোয়া! দু-পা তো একসঙ্গে তোলা যায় না!)— তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে ঃ "বুঝেছি! এ হচ্ছে যখের ধন! যক্ষেরা সব আগলাচ্ছে একে। রাত্তিরবেলা ওদের চোখের সামনে থেকে এ-চীজ বাগানো যাবে না। ইস! এবার একটা আমার নাকের ওপর এসে লেগেছে! যখন নাকে লেগেছে তখন আর না। নাক নিয়ে পালানো যাক!"

এই বলে আরও আক্রমণের অপেক্ষা না রেখে দুপদাপ করে অন্ধকারের মধ্যেই সে চোঁ চাঁ দৌড় মারে।

আট ঃ ছাগলের রাজপথ পেরিয়ে

যে-রকমটা ভাবা গেছল, শিশির যেটি আশা করেছিল, তাই ঘটে রয়েছে দেখা গেল। রাতারাতি একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এরকম দৈব সহায় না থাকলে বড়-বড় ডিটেকটিভকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এই জাতীয় আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে বলেই শার্লক হোমস, রবার্ট ব্লেক, শিশির প্রভৃতি গোয়েন্দারা সুবিধা করে নেয়, পদে-পদে বিপদ হানা দিয়েও কিছু করতে পারে না—যৎপরোনাস্তি বাধা পেয়েও শেষমেশ তারা কর্যোদ্ধার করে বসে।

স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের—ওই বদমাশদের বিরুদ্ধে। ওদের নিজেদের প্রকৃতি নয়—বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির কথাই বলা হচ্ছে।

তাই, ইতিমধ্যে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এবং শিশির অন্ধকার ব্যূহ থেকে বার হবামাত্রই দেখল, হ্যাঁ, যেমনটি তার প্রত্যাশা ছিল তাই বটে! বৃষ্টিও হয়েছে এবং তার ফলে ভেজা মাটির ওপরে বেশ গভীর হয়ে কার যেন পায়ের দাগ চেপে বসেছে।

পৃথিবীর ছোট-বড়-মেজ-সেজ সব ডিটেকটিভ যে-সুবিধা পেয়েছে, বরাবর পেয়ে আসছে, শিশিরও যদি তার ওপরে নির্ভরতা পোষণ করে থাকে, বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। এবং প্রকৃতিও

BanglaBook.org

যদি তার উপযুক্ত কাজ করে থাকে, কিছু অন্যায় হয় না। এ-স্থলে প্রকৃতি শিশিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি—প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ করেননি কিছু।

এবং সেই পায়ের দাগ, মোটা-মোটা পায়ের গোদা-গোদা ছাপ চলে গেছে—তাদের বাড়ির আনাচ পেরিয়ে, পাশের বাগানের কানাচ ঘেঁষে—সেই দাগরাজি, পথের সেই দাগী পৃষ্ঠাটি বরাবর চলে গেছে—।

কোথায় গেছে, সেইটাই তো শিশিরের এখন আবিষ্কার্য—তা ছাড়া আর কী?

শিশির মাথা নেড়ে, মুখ নেড়ে তার মামাকে জানিয়ে দিয়েছে ঃ 'কাল রাত্রে যে এসেছিল সে তোমার মামাই বটে। তোমার মামা ছাড়া আর কেউ নয়, মামা।'

'বাঃ, মামাই তো! মামা ছাড়া আবার কে হতে যাবে?' ব্রজেশ্বর বিকৃতমুখে জবাব দিয়েছেন ঃ 'মামাই তো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে প্ল্যানটা! নইলে আর কোনও মিঞার সাধ্য ছিল না!'

'উঁহু, তারপরেও ফের আবার এসেছিল যে!'

'ফের এসেছিল? তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি না কি?'

ব্রজেশ্বর এবার একটু বিস্মিতই হন ঃ 'ফের আবার কে আসবে? ফের কেন আসতে যাবে শুনি? প্ল্যান তো সে আগেই নিয়েছে—নিয়ে গেছে—এই হাত থেকেই হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছে! তবে?'

শিশির সে-কথার জবাব দেয় না, শুধু বলে ঃ 'এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো মামা! আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার প্ল্যান যদি না আমি উদ্ধার করে আনি তো কী বলেছি। সন্ধের মধ্যেই এনে দিচ্ছি তোমায়।'

'হ্যাঁ, সে-প্ল্যান আর উদ্ধার করতে হয় না।' ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসের হাসি হাসেন ঃ 'আমার মামাকে তুই তো চিনিস না! চিনি আমি! মামাদের খপ্পর থেকে জিনিস বাগানো সহজ নয়।'

'আমার তো আর মামা না! আমি পারব।' শিশিরের সুদৃঢ় আস্থা।

'মামার মামা—সে আরও বড় কঠিন ঠাঁই রে! বলে আমি যাই সেয়ানা তাই পেরে উঠলুম না, পেয়েও হারালুম—আর তুই তো কালকের ছেলে, সামান্য ভাগনে—ভাগনের ভাগনে মাত্র, তুই পারবি! হ্যাঁ, থাকত যদি আমার মামার মামা—পারত সে! কিন্তু—কিন্তু সে—সে কোথায়?'

আকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে ব্রজেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জন সেন।

'পারি কি না-পারি দেখে নিয়ো। লিলিকে সাথে নিয়ে এই আমি পা বাড়াচ্ছি।' উদাহরণ-স্বরূপ, তক্ষুনি-তক্ষুনি শিশির পাড়ি দেয়, মামার বাড়ির প্রাতরাশের জন্যেও প্রতীক্ষা করে না।

মাতুলালয়ের পাশ ধরে, বাগানের ধার ঘেঁষে, ভিজে মাটির পিঠে তাজা পায়ের দাগ লক্ষ করে শিশিররা এগিয়ে চলে। আরও সব কত বাড়ির গা ঘেঁষে, অনেকখানি পথ বেয়ে, আরেকটা বাগানের ভেতর দিয়ে অনেকদূর ওরা চলে যায়। যেতে-যেতে শহরের সীমান্তে গিয়ে ওরা পৌঁছয়।

এবং তখনও—তখনও ওদের চোখে পড়ে—সেই পায়ের দাগ। সেই শ্রীপাদপদ্ম-রেখা আরও—আরও দূরে চলে গেছে।

যাক, তাতে ওদের দুঃখ নেই। কেবল চিহ্ন রেখে গেলেই হল? পথে একটা রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু ওরা খেয়ে নিয়েছে—এখন পদচিহ্নের পথ ধরে—ওই পদাঙ্ক অনুসরণ করে—যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই। আর এই পায়াভারি ভদ্রলোক—পায়ের দাগের দাগী আসামী যেখানেই যান না কেন, যতদূরেই যান না, তাঁরও আর নিস্তার নেই ওদের হাতে—শেষ অবধি যদি তিনি পা বজায় রেখে গিয়ে থাকেন—পা তাঁর ক্ষয়ে গিয়ে কিংবা খোয়া গিয়ে না থাকে তা হলে তাঁকে ওরা পাকড়াও করবেই। নিশ্চয়ই।

'এ-ধারটায় ভারি ছাগলের আমদানি দেখা যাচ্ছে!' শিশির অদূরবর্তী অবশ্যম্ভাবী একপাল ছাগলের দিকে লিলির দৃষ্টি টানে।

BanglaBook.org

'আমরা শহরের বাইরে এসে পড়েছি দাদা!' আসন্ন ছাগপালের দিকে তাকিয়ে লিলি বলে ঃ 'কীরকম মেঠো-মেঠো এ-ধারটা, দেখচ না!'

'হ্যাঁ, মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে ছাগলদের। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ, আমরা পেরুবার আগে ওরা যদি এসে পড়ে তাহলেই পায়ের দাগের দফা রফা! —সব ওরা নিজের পায়ের ক্ষুরে কামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'ও বাবা! কত ছাগল! একশো—দুশো—তিনশো—না তারও বেশি?' ছাগ-সম্প্রদায়ের সেন্সাস নেওয়ার লিলির আগ্রহ দেখা যায়।

'একহাজারের কম না! চ, চ—চ বলছি—' কিন্তু বলতে-বলতে ছাগলের পাল এসে পড়ল। বাঁ-ধারের মাঠ থেকে, রাস্তা ডিঙিয়ে, ডানদিকের মাঠে গিয়ে পড়তে লাগল তারা—এই পারাপারের মুখে বিস্তর ছাগল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, মাঠে না নেমে, রাস্তার দু-দিকে রওনা দিতে চেষ্টা করল। তাদের এই উন্মার্গযাত্রায় নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা ছিলই—পালের সাথে-সাথে লাঠি হাতে কতকগুলি রাখালও রয়েছে দেখা গেল—তাদের দ্বারা পুনঃ-পুনঃ বাধা পেয়ে ব্যাহত হয়ে অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

রাখালদের যেমন হইহল্লা, ছাগলদেরও তেমনি চ্যাঁ ভ্যাঁ—সমস্ত মিলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে এমন এক বিপর্যয় বেধে রইল আর চারধার দিয়ে সেই উন্মত্ত ছাগস্রোত যেভাবে অট্টরোল করে ছুটে চলল, তাতে পাছে সেই ক্ষুরধার জনতার পায়ের তলায় পড়ে তারা নিজেরাই না শেষটায় চিহ্নমাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায় সেই ভয়ে শিশির আর লিলি একটা উঁচু পাথরের ঢিবির ওপর গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এবং যতক্ষণ না শেষ ছাগলটি ত্রিসীমানা থেকে নির্বিঘ্নে অন্তর্হিত হয়েছে—ততক্ষণ তারা সেই ঢিবির ওপর থেকে নামল না।

'দেখলি তো! সব পশু! কোথায় আর পায়ের দাগ? বেবাক চারধারে ক্ষুর বোলানো!' শিশির আফসোস করে।

'চলো, একটু এগিয়ে দেখা যাক।' লিলি আশার বাণী শোনায় ঃ 'ঘুরে-ফিরে দেখাই যাক না!'

'পায়ের দাগ যখন নেই তখন আর নাহক ঘুরে লাভ? কোনও সত্যিকার ডিটেকটিভ এমন বাজে কাজ করে না। চ ফেরা যাক—কিন্তু মামাকে মুখ দেখাব কী করে তাই আমি ভাবছি।'

'আমার ভারি জলতেষ্টা পেয়েচে দাদা!' লিলি বলে। আশার বাণীর পরেই তার মুখে তৃষ্ণার বারতা।

'সামনের ওই ছোট্ট বাড়িটাতে গিয়ে জল চাওয়া যাক।' শিশির লিলিকে নিয়ে এগোয়—'খুব দূরে নয় বোধহয়।'

খুব দূর বোধ না হলেও, ছোট্ট বাড়িটা বেশ একটু দূরেই। ওধারটা পাহাড়ের ঢালুর থেকে আস্তে-আস্তে উঠে গেছে, সেইজন্যে আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনোরম আর সন্নিকট বলে মনে হয়, আসলে বাড়িটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উতরে, চড়াই বেয়ে ওরা বাড়ির নিকটে গিয়ে পৌঁছয়, সটান ভেতরে গিয়ে চড়াও হয়। কিন্তু বাড়ির কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পা টিপে-টিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়ে-ভয়েই এগোয়!

সামনের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলার ফিসফাস ওদের কানে আসে ঃ 'পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে নিয়েছ তো?'

পিস্তলের কথা কানে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিটকে এসে ওদের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। অ্যাঁ? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?

BanglaBook.org

একটা আধবোজা জানলার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখে, টোকোনো একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের ওপর ছড়ানো কী একটা কাগজের ওপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেই পঞ্চপাণ্ডবের একজনকে দর্শনমাত্রই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না, তাদের সেই গ্র্যান্ড মামা!

নয় ঃ বেড়ালের ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ

টেবিলের ওপর শায়িত সেই কাগজখানাও আর কিছু না, দূর থেকে কটাক্ষ করেই তারা বুঝতে পারে, সেই মোক্ষম প্ল্যান। মামার ওপর টেক্কা মেরে, কেড়ে-নিয়ে-আসা গুপ্তধন আবিষ্কারের নির্ঘাত সেই নকশা!

শিশির লোলুপ নেত্রে প্ল্যানটার দিকে তাকায় আর লিলির কানে-কানে জানায় ঃ 'লোকগুলো কোনও কারণে একবার এ-ঘর থেকে সরলে হয়। আমি টেবিলের ওপর ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে আসি।'

'আমি ভাবছি ওদের কেউ যদি আবার এই বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—!' লিলি তার ভয়াবহ আশঙ্কাটা ব্যক্ত করে ঃ 'বেরুবার চেষ্টা পায় যদি—?'

'তা হলে ভাবনার কথা বটে!' ঘাড় নাড়ে শিশির। 'একটু ভাবনার কথাই বইকী!'

বাস্তবিক, এদিকটা ওর চোখে পড়েনি, পালাবার পথ পরিষ্কার রেখে তবে এগুবার দিকে ঝোঁক দিতে হয়—তা নইলে দুঃসাহসিকদের জীবনে আর দ্বিতীয়বার জয়যাত্রার অভিযানে বেরুবার সুযোগ আসে না—সেই প্রথম মহাযাত্রাতেই তাঁরা তলিয়ে যান!

'কোথ্ দিয়ে পালাব আমরা?' লিলির মুখে সেই জিজ্ঞাসা—মহা-মহা বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনের যা প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

'পালাব কেন? প্ল্যান না নিয়েই পালাব?' শিশিরের মৃদু আপত্তি ঃ 'প্রাণ দিয়ে যেতে হয় তাতেও রাজি, কিন্তু প্ল্যান না নিয়ে এক পাও নড়ছি নে!'

তাদের জানলাটার পরবর্তী জানলায় ঠেসানো একগাদা খালি প্যাকিং বাক্স খাড়া করা ছিল—সেই কাঠের বাক্সগুলোর চূড়ায় বসে একটা বেড়াল ঝিমুচ্ছিল বলেই মনে হয়।

'আমরা ছদ্মবেশে এলেই পারতাম!' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে লিলি জবাব দেয় ঃ 'ভালো হত তা হলে!'

'তুই কি বলতে চাস আরেক জন কেউ ছদ্মবেশে এখানে এসেছে?' শিশিরের অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠ ঃ 'ওই বেড়ালের ছদ্মবেশে ও কি অপর কোনও ডিটেকটিভ?'

শিশির লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্দিগ্ধ নেত্রে বেড়ালটার দিকে তাকায়।

শিশিরের প্রশ্নে লিলি ভালো করে লক্ষ করে এবার।

'বেড়ালটার হাবভাব কেমন যেন! ঘুমোনোটা যে ওর ফাঁকি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝিমুনোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখচ না, ও মাঝে-মাঝে চারধারে বেশ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর চেয়ে দ্যাখো দাদা, ওরও নজর ওই ঘরটার ভেতরে।'

'দেখেছি।' শিশির গম্ভীর গলায় বলে। অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি।'

'কিন্তু তা হলেও ওকে বেড়াল ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হয় না!' লিলি তার তদন্ত-কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

'আমারও তাই মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তা ছাড়া একটা ব্যাপারে দুটো গোয়েন্দা লাগা ঠিক হবে কি? আর তা লাগেও না কখনও।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমরা ওই বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? ওখান থেকে ঘরটার ভেতরেও নজর রাখা যায় আর বেশ লুকিয়েও থাকা যায়।'

এ-প্রস্তাব সমীচীন বলে মনে হয় শিশিরের। তারা দুজনে সেই প্যাকিং বাক্সগুলোর আবডালে গিয়ে খাড়া হয়।

বেশিক্ষণ ওদের দণ্ডায়মান থাকতে হয় না। তপস্যা বড়ই কি আর ছোটই কি, বরলাভ তাতে অব্যর্থ। অচিরেই তাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। নিজেদের রিভলবার বার করে, খুব সম্ভব ভরাট করবার মতলবেই ওরা পাশের ঘরে যায়। সেই পার্চমেন্ট কাগজের প্ল্যানটিকে টেবিলের ওপরে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই চলে যায় ওরা।

'লিলি, এই আমাদের সুবর্ণ-সুযোগ! দাঁড়া তুই!'

শিশির সেই জনবিরল ঘরে একক এগিয়ে আগে টেবিলটা হস্তগত করে—তারপরে প্ল্যানটাও ঠিক বাগিয়ে নিয়েছে—এমনসময়ে, অঘটন আর বলে কাকে?

শিশিরের আকস্মিক গৃহপ্রবেশে বেড়ালটা ততটা বিচলিত হয়নি, একটা চোখ খোলা এবং আরেকটা বোজা রেখেই, নিরুদ্বেগে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল, কিন্তু টেবিলের ওপরে শিশিরের হস্তক্ষেপ দেখবামাত্রই তার ভাবান্তর ঘটল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারি বিপর্যয় ঘটে গেল। প্যাকিং বাক্সের মাথা থেকে সে এক লাফ মারল—ঠিক লিলির মাথায় নয়—লিলির মাথা বাঁচিয়ে জানলার গোড়াতেই লাফটা দিল, কিন্তু তার এই কক্ষ-পরিবর্তনের তৎপরতায়—ধূমকেতুরা যেমন সুযোগ পেলেই সমাদরে পৃথিবীর ওপরে ল্যাজ বুলিয়ে দিয়ে যায়, সেও তেমনি লিলির মুখের ওপর নিজেরটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

লিলি হাঁউমাঁউ করে উঠল। এবং তার কেবল ওই চিৎকার ছাড়াই নয়, সেইসঙ্গে চতুর্দিকে এমন হাত-পা ছুঁড়ল যে, তার প্রতিক্রিয়ায় উঁচু করে খাড়া করা সমস্ত প্যাকিং বাক্স, যেন অকস্মাৎ ভূমিকম্পে, ভয়ানক শব্দে একটার-পর-একটা—এবং সবগুলো পিঠোপিঠি ধুপধাপ করে পড়তে শুরু করল।

কেবল হাঁউমাঁউই মানুষের গন্ধ পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তার ওপরে মানুষের শব্দ কানে যেতেই অন্য ঘরে রাক্ষসদের টনক নড়ল।

শিশির অবশ্যি ততক্ষণে খসড়াটা হাতিয়ে বেগে বেরিয়ে আসতে পেরেচে। বার হয়েই, লিলিকে সেই পতিত এবং পতনোন্মুখ প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে তিন লাফে পগারপারের দিকেই ছিল, কিন্তু এদিকেও তখন গ্র্যান্ড মামার দল, প্যাকিং বাক্সদের আর্তনাদ শুনে পিস্তলদের ভর্তি করে মার-মার শব্দে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে পড়েচেন।

'ওই—ওই পালাল! প্ল্যান নিয়ে পালাচ্ছে ওই!—' গ্র্যান্ড মামা নিজেই এবার আর্তনাদ করে ওঠেন।

অমনি সবার পিস্তল থেকে তাদের উদ্দেশে ঝমাঝম গুলিবৃষ্টি হতে শুরু হয়। কিন্তু হলে কী হবে, ততক্ষণে তারা রিভলভারের রেঞ্জের বাইরে।

'দেখচ কী! বন্দুক নিয়ে এসো! পালাল যে—পিস্তল হাতে ভাঁমাগঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখচ কী সব?' বক্কেশ্বর আইচ চিৎকার করে ওঠেন।

দেখতে-দেখতে বন্দুক এসে পড়ে।

'দুড়ুম—দুড়ুম—দুম!' বন্দুকেরা গর্জন করে ওঠে। একাদিক্রমে এবং একসঙ্গে দুমদাম লাগায়।

'লিলি, ঘাবড়াস নে। বন্দুকে আমাদের ভয় নেই।' দৌড়তে-দৌড়তে ছোটবোনকে আশ্বাস দেয় শিশির। 'ও-সব গুলি আমাদের কানের আশপাশ দিয়ে চলে যাবে। ছোঁবেও না আমাদের, তুই দেখে নিস। কেন, অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে তুই পড়িসনি?'

'হুম।' লিলি শুধু বলে। লম্বা-লম্বা পা ফেলতে হলে লম্বা-লম্বা কথা বলা যায় না।

BanglaBook.org

শিশিরের কথা মিথ্যে নয়—বন্দুকদের ওই দুড়ুম-দুড়ুম আওয়াজই সার!... ওদের আগাপাস্তলার কোথাও লাগা দূরে থাক—এক নম্বরের স্ফূর্তিবাজের মতো—গুলিগুলো ওদের আশপাশ ঘেঁষে শিস দিতে-দিতে চলে যায়। শিশিরের সীমান্ত কি লিলির সীমন্ত—কোথাও ছোঁয় না। ওদের এরূপ ব্যবহারে শিশির বিস্মিত হয় না একটুও।

গুলির উপদ্রব শেষ হলে, দুজনে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার পর লিলি বলে ঃ 'বুঝেচ দাদা, সেই বেড়ালটাই নষ্টের গোড়া! সেই তো আমাদের ধরিয়ে দিল! প্যাকিং বাক্সগুলোও ফেললে ওই তো।'

'হুঁ, এখন আমার বোধ হচ্ছে বেড়ালটা খুব সুবিধের ছিল না!' শিশির মাথা নাড়ে ঃ 'আসলে বেড়ালই ছিল কি না কে জানে!'

'তোমার কি ধারণা তা হলে কোনও ডিটেকটিভ?' পুনরায় ওদের পুরনো সন্দেহোদ্রেক ঃ 'ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোনও?'

'আমার তাই বিশ্বাস। আমি প্ল্যানটায় হাত দেবার সাথে-সাথে ও লাফ মেরেছিল। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে।'

'আমাকে এমন একটা ল্যাজের ঝাপটা লাগাল যে—!' লিলি নিজের নাকে হাত বুলায় ঃ 'যদিও ওটা ওর সত্যিকার ল্যাজ নয় নিশ্চয়। অনেকটা পরচুলার মতো পরল্যাজার ব্যাপার যদিও, কিন্তু তবু ভাবতেই এখনও আমার গা শিরশির করচে।'

'ও-লোকটা একটা পাকা ডিটেকটিভ। উঃ, কীরকম নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে! আর কী তীব্র লক্ষ্য! আমার কার্যকলাপের ওপর কীরকম আশ্চর্য নজর রেখেছিল। দেখেছিলি? এরকম প্রায় দেখা যায় না। ভাবতেও পারা যায় না।' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু ডিটেকটিভ হলেও ওদের দিকের ডিটেকটিভ—ডিটেকটিভের ওপরে ডিটেকটিভ।'

এমনসময়ে দূরে ঃ 'ভৌ—ভৌ—ভৌ—ঔ-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ—!' একাধিক কুকুরের সমবেত ঐকতান একসাথে শোনা গেল।

শিশির ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঃ 'দৌড়ো, দৌড়ো! ডালকুত্তাদের ছেড়ে দিয়েছে, দেখছিস কী! গন্ধ শুঁকে-শুঁকে আমাদের পিছু-পিছু ওরা ছুটে আসবে। হাতে পাওয়া মাত্রই ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে আমাদের। —ভারি ভয়ানক এইসব ডালকুত্তারা!'

এবং বলতে না বলতে—

দশ ঃ শিশিরের লম্ফঝম্ফ

এবং বলতে না বলতে—

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—ভো-ও-ও-ও-ও-ঔ।

সেই ডালকুত্তার দল ভয়ানক হইচই করে এগিয়ে আসতে লাগল।

এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিশির আর লিলির আবার ভোঁ-দৌড়!

'জানিস লিলি, যে-কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে সে কুকুর নাকি কামড়ায় না।' দৌড়তে-দৌড়তেই শিশির জানায়।

লিলি এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।

'এসব ডালকুত্তারা কামড়াবে কি না কে জানে!' শিশির বলে।

দৌড়তে-দৌড়তেই সন্দেহটা ব্যক্ত করে, দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখার তার সাহস হয় না। কুকুরদের মধ্যে যারা বাক্‌পটু, বিবৃতি দিতে বিশারদ, কামড়াবার তাদের উৎসাহ কম, এ-

BanglaBook.org

কথা অনেকদিনকার জানা কথা। কিন্তু সে-কথা কাজের কথা কি না, রচনার খাতায় ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগানো যায় কি না, এক সঙ্কটাপন্ন সুযোগে পরীক্ষা করে দেখতে তাদের ভরসা হয় না।

এরাও, এই সব কুকুররাও বক্তৃতা ছড়াতে-ছড়াতে ইস্তাহার বিলি করতে-করতেই আসছে বটে কিন্তু এদের মুখের কথায় কি আস্থা স্থাপন করা যায়? এরা যদি ততটা ভদ্রলোক না হয়?

'তুই কী বলিস লিলি? এই সব কুকুরদের—?'

এদের অভিভাষণে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না, এই কথাটাই শিশির জানতে চায়।

লিলি কিছুই বলে না, বলবার তার শক্তিই নেই কিংবা এ-বিষয়ে বলা বাহুল্যমাত্র, এই হয়তো তার বক্তব্য। সে আরও জোরে জোরে পা চালাবার চেষ্টা করে, যা বলবার, মুখে না বলে পায়ের সম্মুখেই ব্যক্ত করতে চায় বোধহয়।

'উঁহু, যেরকমধারা চেঁচাচ্ছে, এরা যেন কামড়ে দেবে বলে মনে হয়। এসব ডালকুত্তাদের কাছে ডাল গলানো যাবে না।' লিলির মতের অপেক্ষা না রেখেই শিশির নিজের অনাস্থা জ্ঞাপন করে।

'আর কামড়াতে আরম্ভ করলে—শুরু করলে একবার—বাব্বাঃ—!'

সেই ভয়াবহতা শিশির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তার মানসনেত্রের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়, তার প্রতি পদক্ষেপে, দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে, সেই একান্ত আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিলমের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে প্রকট হতে থাকে।...

এক ডজন বুভুক্ষু ডালকুত্তা খাইখাই করতে-করতে তাদের দুজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে — ছজন করে পার হেড—ভালো করে—খতিয়ে হিসেব করলে তিনজন করে পার লেগ—কেননা হাতের নাগালে পাওয়া মাত্রই ওরা পায়েই এসে কামড় বসাবে, পলায়নের যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করবে সব আগে—পা থেকেই উদরস্থ করতে শুরু করবে। তারপর পা থেকে হাতে—হাত থেকে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নাক-কান, চোখ-মুখও তারা বাদ দেবে না, অবহেলা করবে না নিশ্চয়, তাদেরকেও ছিঁড়েখুঁড়ে খুবলে-খাবলে পেটের মধ্যে পাচার করে দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওগুলো তারা খুব সম্ভব, শেষের দিকে, চাটনি কিংবা সন্দেশের মতো আস্তে-আস্তে তারিয়ে-তারিয়েই খাবে—ভোজনের প্রোগ্রামটা খাদ্যপরম্পরা এইভাবে অগ্রসর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছানো উচিত। তবে আহার্যবস্তুর অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে ডালকুত্তাদের কতটা বাছবিচার, খাদ্যদ্রব্যের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বিভেদে কার প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা বিধেয়—এই বিষয়ে কতখানি ওদের কর্তব্যজ্ঞান ও বোধশক্তি, ওদের সুরুচি বা শৌখিনতারই বা কদ্দুর দৌড় তার কোনওই ধারণা শিশিরের নেই। হয়তো ওরা প্রথমেই এসে, উঁচু দেখে, শিশিরের নাসিকাতেই ঘেউ করে এক কামড় দেবে, প্রথম দর্শনেই সাবড়ে দেবে এক কামড়ে—ঠিক আচারের মতো তার প্রতি আচরণ করবে কি না কে জানে!

কিন্তু কতক্ষণেরই বা ভাবনা? ওদের দুজনকে পিকনিক করে ফেলতে বারোজনার পক্ষে আর কতক্ষণ?

তারপর আহার সমাধা করে বিজয়গর্বে ওরা ফিরে যাবে—প্রত্যেকে এক-একখানা হাড় মুখে করে—ওদের দুই ভাই-বোনের ভগ্নাবশেষ! ওদের চোখে দীপ্ত চাহনি এবং হয়তো বা মুখের কোণে একটু মুচকি হাসি!

তখন নিঃশব্দে ওরা ফিরে চলেছে—যদিচ তখনও ওদের মুখে বিবৃতি—সেই হাড়!

সিনেমার একেবারে সীমানায় এসে, The End কল্পনা করতেই শিশিরের রোমাঞ্চ হয়।

ডালকুত্তারা তখন খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—তাদের হাঁকডাক প্রায় ওদের কান ধরে টান লাগাচ্ছে বলতে গেলে।

ভৌ—ভৌ—ভৌ।

BanglaBook.org

সংস্কৃত ভাষায় ওর মানে দাঁড়ায় ঃ 'ভো-ভো! ওহে—তোমরা! অত দৌড়চ্চ কেন? আরে শোনো, শোনো! একটু দাঁড়িয়ে যেতে কী হয়?'

শিশিরের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে তড়াক করে এক লাফ মারে—নিজে লাফিয়ে উঠে, তারপরে লিলিকে টেনে তুলে নেয়।

এগারো ঃ কুকুর আর মুকুর

উঁচু রোয়াকওয়ালা ছোট্ট একখানি ঘর। তাদের জন্যেই পথের ধারে অপেক্ষা করছিল যেন! একখানিই মাত্র ঘর, গৃহস্বামী কেউ নেই, হয়তো কোনও কাজেই কোথাও বেরিয়ে থাকবেন—তা যেখানে খুশি তিনি যান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার শিশিরদের কোনও অত্যাবশ্যকতা ছিল না। অন্তত তদ্দণ্ডেই ছিল না।

উঁচু রোয়াকটা দেখবামাত্রেই শিশির লাফিয়ে উঠেচে। একলাফে আগে নিজে উঠে, তার পর লিলিকেও সে টেনে তুলে নিয়েছে।

'উঃ! বাঁচা গেল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেওয়া যাক এবার।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করতে-করতে সে বলে।

লিলি শুধু বলে ঃ 'উঃ!' সে দম ছাড়ছে তখন।

'অবশ্যি, বাঁচা যেতই! মারা যেতুম না অবশ্যি।' হাঁফ ছেড়ে শিশির জানায় ঃ 'আমরা যে মারা যাওয়ার নই তা আমি জানতুম। কেবল কী করে যে বাঁচব এইটেই আমার জানা ছিল না।'

'তুমি বলো কী দাদা?' লিলি বিস্মিত না হয়ে পারে না। 'তুমি জানতে?'

'বাঃ! আমরা কখনও মরতে পারি? এত সহজে মারা যাব, বলিস কী? কেন, বন্দুকের ব্যবহারে তুই কী বুঝলি—কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে সব চলে গেল না? কুকুরের পেটের ভেতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ, এ কখনও ভাবতে পারা যায়?' শিশিরের ততোধিক বিস্ময় হয় ঃ 'কোনও অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এরকম পড়েছিস না কি? বইয়ের বীরবররা কখনও মারা পড়ে?'

'ওঃ, তাই বলো!' এতক্ষণে লিলির কাছে বক্তব্যটা বিশদ হয় ঃ 'কিন্তু এখন আমাদের বেঁচে উঠতে দেরি আছে দাদা! ডালকুত্তারা এসে পড়ল বলে! তুমি ভাবচ দরজায় খিল এঁটে বাঁচবে? যদি খিল ভেঙে ঢুকে পড়ে? ওরা অতগুলো আর আমরা দুজন! ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে কি আমরা পারব?'

'এই যে!' হঠাৎ শিশির চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আয়না রয়েছে দেখচি যে!' চেঁচানোর সঙ্গে-সঙ্গে এবার সে লাফাতে শুরু করে দেয় ঃ 'আর আমাদের পায় কে?'

'আয় দুজনে মিলে এটাকে ধরাধরি করে দোরের বাইরে রেখে দিয়ে তারপর ভেতর থেকে খিল এঁটে দিই!' শিশির বাতলায় ঃ 'তারপর মজা দেখিস। কী মজা!'

দুজনে মিলে সেই লম্বা চওড়া আয়নাটাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে এনে ওরা স্থাপিত করে—লম্বা আয়নাটাকে চওড়া করে দেওয়াল ঠেস দিয়ে রাখে দরজার ঠিক সুমুখটাতেই। তারপর ভেতরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে নিঃশব্দে ডালকুত্তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা এসে পড়ে। হইহই করে সব এসে যায়।

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—। (সাদা বাংলায় ওর মানে, সব ভোঁ-ভাঁ দেখছি যে! এর মধ্যেই ওরা সটকাল কোথায়?)

প্রশ্নপত্র মুখে করেই, ওরা রোয়াকের ওপর টকাটক লাফিয়ে উঠল এবং ওঠবামাত্রই ওদের

BanglaBook.org

চক্ষুস্থির! ওদের প্রশ্নের যে এতবড় প্রত্যুত্তর ওখানেই অপেক্ষা করে রয়েছে তা ওরা ভাবতেই পারেনি। অ্যাঁ, এ কীরে বাবা, ওদেরই সগোত্র আর একপাল ডালকুত্তা মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়!

ওদের পিলে চমকে গেল, জয়ধ্বনি সেইসঙ্গে থমকে গেল।

কেবল ওই পালের মধ্যে যে-মোড়ল গোছের, তার গলা দিয়ে বেসুরো এক আওয়াজ গলে এল ঃ 'ও-ও-ও-অ্যা-অ্যা-অ্যা—?'

অর্থাৎ কিনা, 'এ আবার কী হ্যা? এরা কারা হ্যা?'

দু ভাই-বোনে খড়খড়ির ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব—শিশির লিলির কানের গোড়ায় ফিসফিস করে ঃ 'দেখলি তো! দেখছিস তো! আর সে ঝাঁউঝাঁউ নেই! একেবারে মিউ-মিউ! মিউ-মিউ না হলেও ভ্যা-ভ্যা ডাক বেরিয়ে গেছে!'

'হুঁ-উ-উ!' লিলি এক সুরে সায় দেয়।

'ওদের মধ্যে দার্শনিক কেউ থাকলে এইসময় এদের আসল-নকল সমঝে দিয়ে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারত!'

'ঠিক পথ তো আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়া?'

'তা সে যাই হোক! দার্শনিকের কাজ হচ্ছে নিজের চোখ চালানো, পরের ঘাড় বাঁচানো তো নয়।' শিশির জবাব দেয়।

কুকুরদের ঘাবড়ে যাবার কথাই বইকী! নিজের আশেপাশে ওরা প্রত্যেকে মাত্র দুজনকে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু সামনে একেবারে অগণন—সে যে কতগুলো ওদের লাঙুলের ডগায় গোনা যায় না! অঙ্কের ভয়ে বা অন্য কোনও আতঙ্কে ওদের লেজ আপনা থেকেই নেমে এল।

এবং কী আশ্চর্য, প্রতিপক্ষরা দলে-বলে ভারি হয়েও, নিজেদের পতাকা নামিয়ে ফেলল। ওরাও তা হলে ভয় পেয়েছে—ও-ধারের ওরাও! এতক্ষণে এদের প্রাণে আবার সাহস ফিরল, আবার এ-ধারের জয়পতাকা খাড়া হতে লাগল একে-একে।

অন্যপক্ষের পুনরায় লাঙুল উঁচানো দেখে এবার এরা চটে গেল। অ্যাঁ, একি রসিকতা না কি! নতুন সাহসে, নবোদ্যমে, এরা ওদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল এবার। এবং সেকী ঘোরতর লড়াই! আঁচড়াআঁচড়ি—চেঁচামেচি—কামড়াকামড়ি—আয়নার ওপর সেকী ভয়ঙ্কর বায়না! এবং বলা বাহুল্য, আয়নার পক্ষও যুদ্ধ করতে কিছুমাত্র কসুর করল না!

খানিকক্ষণ সংগ্রামের পর ডালকুত্তারা কাতর হয়ে জিভ বার করে ফেলল। অপর পক্ষেরও সেই দুর্দশা দেখা গেল। পরস্পরের একই হাল দেখে এবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগল ওদের। সাময়িক সন্ধি-ঘোষণা করে, উভয় পক্ষের সামরিক ক্ষতির খতিয়ান নেওয়া শুরু হল তখন। দু-দলের মধ্যে মোটামুটি আলাপ আরম্ভ হল। আয়নারূপ দোভাষীর মধ্যবর্তিতায় সেটাকে প্রথম শান্তি বৈঠক বলা চলে।

'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!' লিলি এতক্ষণে কথা বলে। একটি প্রবচন দান করে এতক্ষণে।

'মুগুর? মুগুর কিরে, মুকুর বল! যেমন কুকুর তেমনি মুকুর। মুকুর মানে আয়না জানিস না?'

'কথাটা মুকুর নাকি? আমি জানতাম মুগুর!' লিলি নিজের এতদিনের অজ্ঞতায় একটু অবাক হয়।

'আরে মুগুরই তো! মুগুর আর মুকুর তো এক! আয়নায় নিজেকে দেখতে মিষ্টি লাগে না? গুড়ের মতো—ঠিক মুগুরের মতো মিষ্টি লাগে না কি? গুড় আর মুগুর কি আলাদা?' শিশির ব্যাখ্যা করে দেয়।

এই বিপদের মাঝখানেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলে ঃ 'ঠিক দাদা!' এবং

BanglaBook.org

সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিয়ে ভাবে, হায়, সামনে একটা আয়না নেই যে একফাঁকে নিজেকে একটু দেখে নেয় এখন।

'কিন্তু ভারি দুর্লক্ষণ! দেখেছিস! মুখ শোঁকাশুঁকি করে ওরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে! কনফারেন্স বসে গেছে দেখছিস না? এ-ধারের জানলা টপকে এইবেলা এখান থেকে পালাই চ।' শিশির বলে—ওর মুখে কোনও হাসি নেই।

বারো ঃ গন্ধ থেকে গন্ধমাদন

পিছনের জানলাটা আবার বহুদিনের অব্যবহারে এমন জং, ধরা যে-সহজে খুলতে চায় না! ছিটকিনিটাকে হটাতেই শিশির কাবু হয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে ধরে সাধাসাধি করলে অটলকেও টলতে হয়, সামান্য ছিটকিনি আর কতক্ষণ? খানিক পরে সেটা খটাৎ করে সরে গেল হঠাৎ।

শিশির টপকাল আগে। তারপর লিলির পালা। লিলি যদি বা কোনওরকমে জানলার ওপরে নিজেকে খাড়া করতে পারল, নামতে আর পারে না।

'আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়!' শিশির আবাহন জানায়, 'পড় না!'

লিলি খুব ভরসা পায় না। তার পতনবেগে, বীরোচিত তার ছোট্ট দাদাটি দাঁড়াতে পারবে কি না তার সন্দেহ হয়।

'ভয় কী? আমি তোকে ধরব।' শিশিরের নিরুদ্বেগে আহ্বান।

লিলি একটা পা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আরেকটা পা-কে কিছুতেই আর নামাতে পারে না। মূল্যবান মুহূর্ত সব অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, লিলির পায়ের পাশ দিয়ে কালস্রোত কলকল বেগে বয়ে যাচ্ছে, শিশিরের আর তর সয় না, পা ধরে হ্যাঁচকা টান লাগায়।

লিলি নেমে আসে, টানের সেই বিপাকে নির্বিঘ্নে পদচ্যুত হয়ে নিরাপদেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার ফ্রকের খানিকটা ছিন্ন হয়ে পশ্চাদবর্তী ছিটকিনিতে আটকে থেকে যায়।

'থাক গে!' শিশির ফ্রকের উপসংহারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে বলে ঃ 'আমাদের জয়পতাকার মতো উড়তে থাক।'

'পরাজয়ের নিশান বলো বরং।' লিলি বলতে চায়। কেবল অসত্য বলেই জয়-ঘোষণায় তার দ্বিধা নয়, ফ্রকের অসভ্যতায় সে বেশ চটে গেছে।

'পরাজয় কীসের? কেন, আমরা কি অ্যাকর্ডিং টু দি প্ল্যান পালাচ্ছি নে? ঠিক যেমন করে পালানো উচিত, পালাতে পারছি নে কী?' শিশির গর্বিত না হয়ে পারে না।

'তা পালাচ্ছি বটে! কুকুরের সামনে শেয়ালের মতো পালাচ্ছি বটে।' লিলি বলে।

'উঁহু। মোটেই তা নয়। পালানোটা সিংহের মতো কাজ। পলায়নের শেষের দিকেই লায়ন। লায়নে আর পলায়নে একবারে জড়াজড়ি।'

এই বলে, উদাহরণ স্বরূপই যেন সে আবার দৌড়তে শুরু করে দেয়। লিলি আর প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে দাদার পিছু নিতে হয়।

'বন্দুকগুলো তবু মানুষের মতো ছিল! এই ডালকুত্তারা মোটেই তা নয়।' দৌড়তে-দৌড়তে শিশির বলে।

লিলি শুধু বলে—'উঃ!' এতদ্বারা আপত্তি বা সম্মতি কী জানায় বলা কঠিন।

'গুলিগুলিও ভদ্রলোক! ওদের কর্তব্য ওরা করেছে। ওদের আর কাজ কী? কানের আশ-পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বেরিয়ে যাওয়া। তা ওরা চোঁ-চোঁ বেরিয়ে গেছে, স্পর্শও করেনি আমাদের।'

লিলি কোনও সাড়া দেয় না।

BanglaBook.org

'আমরাও আমাদের কর্তব্য করেছি। ওরাও যেমন আমাদের গায়ে হাত দেয়নি, আমরাও তেমনি বন্দুকের সামনে অম্লানবদনে বুক পেতে দিয়েছি। বুক অথবা পিঠ। আমরা তার কি কোনও অন্যথা করেছি?'

লিলি জবাব দিতে পারে না, শিশির যেমন পা আর মুখ, একসাথে, খরতর বেগে চালাতে পারে ওর পক্ষে তা অসাধ্য। পায়ের সঙ্গে-সঙ্গে শুধু ওর কান চলে। পা আর কান, পাল্লা দিয়ে, একসঙ্গে চালানো যায়।

'গুলির সামনে বুক পাততে আর কী? কী আর এমন? কান পাতলেই হয়। সোঁ-সোঁ করে চলে যাবে তাই কেবল শোনো। ভয়ের কিছু নেই।' শিশির নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞপ্তি দেয় ঃ 'কিন্তু এই ডালকুত্তারা! বাব্বা! একবার এরা হাতে পেলে আর রক্ষে আছে? সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত বসাবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে নির্ঘাত—!'

নির্ঘাত সাবাড়, বক্তব্যের এই কথাটা, সংবাদের শোচনীয় অংশটুকু বোনের মুখ চেয়ে শিশির উহ্য রাখতে চায়। লিলি এবার ঘাড় নেড়ে—যে- ঘাড়টা দৌড়নোর তালে-তালে আপনা থেকেই নড়ছিল তার সাহায্যে—দাদার কথায় সায় দেওয়ার চেষ্টা করে। হতাহতের তালিকায় তার স্থান যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে এ-কথা তার অজানা নয়, ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়।

ডালকুত্তারা এ-ধারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মুখেই একটা ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্মুখ-আলাপে অগ্রসর হতে দ্বিধা করেনি, অম্লানবদনেই মুখ বাড়িয়েছিল, ওদের সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে কি! কিন্তু তথাপি সে-আলাপের কেবল মৌখিকতাই সার! এতখানি সম্মুখীনতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কী যেন কোমলতা নেই, কেমন যেন জিনিসটা মিষ্ট নয়। ভাবের মধ্যে কীসের যেন অভাব!

আয়নায় মুখ শোঁকাশুঁকি করতে গিয়ে মুখ ঠোকাঠুকি করে, পুনঃ-পুনঃ ধাক্কা খেয়ে, হতাশ হয়ে পুনরায় যখন নিজেদের পরামর্শ বৈঠকে ফিরে এসেছে, তখন ওদের মধ্যে একজনের, অপেক্ষাকৃত ভুয়োদর্শী জনেকের মনে সন্দেহ জেগে উঠল—সমস্ত জিনিসটাই ভুয়ো নয় তো? স্রেফ আরেকখানা ভুয়ো-দর্শন নয় তো?

ঘাড় বেঁকিয়ে তথাকথিত শত্রুদের দিকে সে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছে। তারপর মাথা নেড়ে আপনমনেই বলেছে, 'হুঁ! সব মায়া। সমস্তই অসার! সবই ভগবানের লীলা! কিসুই কিসসু নয়! তা হলে—তা হলে আর বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?'

ভাবতে-ভাবতে তার মনে হল, ওধারে খট করে একটু আগে একটা আওয়াজ হয়েছিল না? তার মনে খটকা লাগল কেমন!

এটাকে যেমন চোখের ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে সেও কি তেমনি কানের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়?

যদি তা-ই হয়, তা হলেও সেই ভ্রমকে অনুসরণ করে—ঈষৎ লম্বা করে—পায়ের দিকে বাড়িয়ে একটু ভ্রমণ করে দেখতে ক্ষতি কী? কিঞ্চিৎ ঘুরফির করে দেখাই যাক না!

সেই ভুয়োদর্শীই সবার আগে একলা আবিষ্কার-যাত্রী হয়ে বেরিয়ে খোলা জানলার পাশে পতপত রবে উড্ডীয়মান সেই জয়পতাকা দেখতে পেল!

এবং সেই জয়পতাকার সঙ্গে জড়ানো পলাতকদের সৌরভ!

আবিষ্কারের মতন একখানা আবিষ্কার! অমনি সে ব্যস্তই হয়ে উঠে প্রত্যাদেশের মতো একটা আদেশ ছেড়েচে। হইচই করে, হাঁকডাক ছেড়ে সবাইকে একজোট করে ফ্যালে। ডালকুত্তাদের এমনি, একেবার একটু গন্ধ পেলেই হল! পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অমনি সেই গন্ধকে তাড়া করে তারা দৌড় লাগাবে।

এক্ষেত্রেও শিশির-লিলির পশ্চাদ্ধাবনে তাদের বিলম্ব হয় না!

শিশিররা লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছল, কুকুরে আর মুকুরে জড়াজড়ি

BanglaBook.org

করে একত্র হয়ে বেশ জব্দ হয়ে রয়েছে ভেবে খানিকটা নির্ভাবনাও যে না হয়েছিল তা নয়, এমন সময়ে আবার সেই চতুষ্পদী পয়ারে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ' না শুনে, পেছনে না তাকিয়েই কারা পিছু নিয়েছে অনুমান করতে তাদের দেরি হয় না।

কিন্তু এবার? এবার কী? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, খোলা বাড়ি দূরে থাক, একটা খোলার বাড়িও চোখে পড়ে না। চারধারেই ধু-ধু মাঠ। কদ্দুর দৌড়িয়ে কোথায় গিয়ে তারা রক্ষা পাবে?

আর কি তা হলে পরিত্রাণ নেই? এইখানেই শেষ? 'দি এন্ড?' কোনও অ্যাডভেঞ্চারের গল্পেই যা ঘটে না, কদাচ ঘটেনি, অন্তত তাদের পড়াশোনার মধ্যে মনে পড়ে না, মৌলমীনের এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে সেই অঘটন—সেই অঘটনীয় দুর্ঘটনা—সেই মৌলিক এবং অত্যন্ত মীন ব্যাপার—একান্তই ঘটে যাবে?

বন্দুকের হাতে বেঁচে—গুলিদের থেকে পদে-পদে খুলি বাঁচিয়ে—ডালকুত্তাদের হাতেই ঘাল হতে হবে শেষটায়?

শিশির আর লিলি প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। ডালকুত্তারাও ছেড়ে কথা বলে না—তারাও দৌড়ায়। অচিরেই তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

প্রায় তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপরে লম্বা-লম্বা লম্ফক্ষেপে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসতে থাকে।... আড়াইশো গজ... দুশো তেতাল্লিশ... একশো বিরাশি... একশো চৌত্রিশ... অন্তরায় কমে-কমে অবশেষে একশো এগারোয় এসে দাঁড়ায়। এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে না, আসতে-আসতে (আস্তে আস্তে নয়!) একেবারেই নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় এসে পৌঁছয়।

নিরানব্বই থেকে অষ্টআশি, ডালকুত্তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়। অষ্টআশি থেকে সাতাত্তর... সাতাত্তর থেকে সাঁইত্রিশ! সাঁই-সাঁই ব্যাপার! ভৌ-ভৌ ক্রমশই আরও ভয়াল হয়ে এগিয়ে আসে, কানের তালিতে এসে তালা লাগিয়ে দেয়।

এমনসময়ে—।

এমনসময়ে সেই ছাগলের পাল—।

অনেকক্ষণ আগে যারা ও-ধারে গেছল, তারা ও-ধারের চর্বণ সেরে, এ-ধারে বিচরণ করতে ফিরছে—ও-ধারের ভোজনপর্ব নিকেশ করে এ-ধারের চর্ব্য-চোষ্যে চড়াও হওয়ার মতলবেই তারা আসছিল।

'লিলি! লিলি! চটপট! ওই ছাগলদের আসবার আগেই! খুব ছোট! যেমন করে হোক ছাগলদের ও-ধারে গিয়ে পড়তে হবে।' রুদ্ধনিশ্বাসে শিশির চিৎকার ছাড়ে।

লিলি পারে না, তবু সে শেষবার মরিয়া হবার চেষ্টা করে। এমনিতেই সে দাদার থেকে তেরো হাত পিছিয়ে পড়েছিল, কুকুরদের সাড়ে ছ'গজ কাছিয়ে গেছল—কিন্তু তার পা আর উঠতে চায় না। শিশির নিজের গতি মন্দ করে লিলিকে আগিয়ে নিয়ে আসে, তারপরে তার হাত ধরে টান মেরে একসাথে দৌড় লাগায়।

একটু আগে যে-পাথরখানার উপরে তটস্থ হয়ে তারা ছাগস্রোত নিবারণ করেছিল, একটু পরে সেই পাথরখানার ওপরেই তারা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে।

আর তার পরমুহূর্তেই সেই ছাগলের পাল উল্কাবেগে ব্যাঁ-ব্যাঁ করতে-করতে এসে পড়ে। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অফুরন্ত উৎসাহে রাস্তা পারাপার করতে থাকে।

ডালকুত্তারা সেই ছাগলাদ্য সমারোহের সামনে এসে থকচকিয়ে থেমে যায়। কী করবে ভেবে পায় না, ওদের ভেদ করে এগোবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

শিশির-লিলি সেই পাথরের ওপরে দণ্ডায়মান হয়ে দ্যাখে—ছাগলদের—ছাগলদের পরপারে কুকুরদের—।

কুকুররাও যে তাদের দেখতে পায় না তা নয়।

BanglaBook.org

লিলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'কতক্ষণ আর! ছাগলরাও চলে যাবে, ওরাও এসে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

'হ্যাঁ, খেলেই হল!' শিশির বলে, তার নির্ভীকতা ফিরে এসেছে আবার! 'খেলেই হল আর কী!'

'কেন, খাবে না কেন? আমি আর দৌড়তে পারব না দাদা! তা বলে দিচ্ছি। পা তুলতেই পারচি নে!'

'দরকার নেই আর পা তোলার। ঠায় দাঁড়িয়ে দ্যাখ। কুকুররা আমাদের টের পেলে তো!'

'কেন, টের পাবে না কেন? জলজ্যান্ত ওইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে!' দাদার কথায় লিলি অবাক হয়ে যায়।

'দেখলেই বা! দেখে ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারে না, গন্ধ থেকেই টের পায়। আমাদের গন্ধ আর পেলে তো? এই বোকাপাঁঠারা যা গন্ধ ছড়িয়ে গেল!' শিশির নাক সিঁটকোয়। 'রামোঃ! এ-গন্ধ এখন এক শতাব্দী থাকবে! শিলঙে ফিরেও এর সৌরভ পাব!'

যমালয়ের দরজার প্রায় সামনে এসে প্রাণান্তকর প্রান্ত পর্যন্ত তারা এগিয়ে পড়েছে, এতক্ষণ লিলির এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দাদার কথায় গন্ধর্বলোক ঘুরে, সে আবার নতুন করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। দারুণ দুর্গন্ধ নাক ভরে পান করে সে পুনঃ-পুনঃ আরামের নিশ্বাস ছাড়ে—আঃ! বাস্তবিক, এমন মিষ্টি গন্ধ, এহেন সৌরভ, কোনও মূল্যবান এসেন্সের মধ্যেও সে এতদিন পায়নি।

শিশিরের আন্দাজই ঠিক! পাঁঠারা চলে যাওয়ার পর ডালকুত্তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল! কোন দিকে যে যাবে, কার গন্ধের ছুতো ধরবে—সে-এক ভারি সমস্যায় পড়ে গেল তারা। শিশিরদের কাছেও এল না যে তা নয়—সন্দিগ্ধভাবে দেখল খানিক, শুঁকেও দেখল কয়েকবার, কিন্তু নাসিকার সাহায্য নিয়েও, পাঁঠাদের সগোত্র ছাড়া আর কিছুতেই তাদের ভাবতে পারা গেল না।

'উঁহু, যা ভাবছ তা নয়! আমরা তারা নই, সেই পলাতকরা আমরা নই।' লিলি বলে, নিজের মনে-মনেই বলে—উচ্চারণ করে বলার তার সাহস হয় না!

'হে পাঁঠারা! তোমরাই ধন্য! নিজের মহিমায় আমাদের মহিমান্বিত করে—নিজেদের সৌরভে আমাদের সুরভিত করেই কেবল তোমরা যাওনি, আমাদের সাথে-সাথে এই দুর্দান্ত ডালকুত্তাদেরও পাঁঠা বানিয়ে গেছ!' শিশিরের সারা মন পাঁঠাদের লীলার মহিমা গানে মুখর হয়ে ওঠে।

'ভৌ-ভৌ? এরা কারা? এই দুটো উদ্‌বেড়াল যারা দাঁড়িয়ে আছে—এরা কি তারা? তাদের মতোই বটে কিন্তু তারা তো নয়! এরা কারা তবে? ভৌ—ঔ—ও-ও-ঔ?'

ডালকুত্তারা নিজেদের মধ্যে মুখ শোঁকাশুঁকি করে।

'এই! এই! পাঁঠার ডাক ছাড়!' শিশির বলে ওঠে ঃ 'শিগগির! দেখছিস কী?'

'ব্যা—ব্যা—ব্যা—!' লিলি ডাকাডাকি লাগায়।

শিশির বলে ঃ 'অররররররর...।'

গন্ধে মেলা সত্ত্বেও শিশিরদের আকারে-প্রকারে যাও বা ওদের সন্দেহাদ্রেক হয়েছিল, ছাগল বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হচ্ছিল, এখন লিলির ব্যা-করণে আর শিশিরের সংস্কৃত ভাষায়, ভাষার সাথে ব্যাকরণের নিখুঁত মিলন দেখে তা তীরবেগে তিরোহিত হয়ে গেল। মানুষের হাবভাবে ওরা যে পাঁঠাদের পাঠান্তর ছাড়া কিছু নয়, এ-বিষয়ে একমত হতে ওদের আর বাধা রইল না!

এবং তারপরেই নিজেদের ভোট শিশিরদের বিপক্ষে দিয়ে একে-একে তারা লাঙুল প্রদর্শন করতে লাগল। কুরুক্ষেত্র থেকে, কিছু না করেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে ফিরে চলল।

এখন আর ওদের সে-লম্ফঝম্ফ নেই! সে-উৎসাহ যেন কোথায় উপে গেছে! টুঁ শব্দটি নেই কারও। ধীর পদক্ষেপে নীরবে অধোবদনে ওরা ফিরে চলেছে!

'সবাই মুখটি বুজে চুপটি করে চলেছে! দেখেছ দাদা, ডালকুত্তাদের কারও মুখে কোনও রা

BanglaBook.org

নেই!' লিলি বলে।

'কর্তার কাছে কী কৈফিয়ত—কী জবাবদিহি দেবে—সেই কথাই ওরা ভাবছে—মনে-মনে তারই প্ল্যান ভাঁজছে এখন। কে জানে আজ হয়তো ব্যাটাদের ডালরুটি বন্ধ।'

এবার শিশির হাসে। এতক্ষণে ওর হাসি পায়।

তেরো ঃ হাতের স্বর্গ না বিসর্গ?

'এই নাও।' শিশির গিয়ে তার মামার হাতে প্ল্যানটা ছাড়ল।

মামা বিস্মিত হয়ে উঠলেন, আর পরমুহূর্তেই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর মনোভাবের আভাস ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে একমুহূর্তও না নষ্ট করে, একটুও না দাঁড়িয়ে, প্ল্যানটি পাওয়ামাত্রই বিদ্যুৎ-গতিতে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

যেমন তড়িৎ-বেগে তিনি গেলেন, খানিক পরে, তারচেয়েও, এমনকী, ততোধিক ত্বরিত বেগে ফিরে এলেন তিনি।

'কিছু নেই, কিছু নেই!' তাঁর মেঘলা মুখমণ্ডল থেকে যেন দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল!

'কিছু নেই, সে কি মামা?' লিলিরও খুব তাক লাগে।

'ন্যাঃ, সব সেই হতভাগা মামাটা নিয়ে সটকেছে। এর আগেই সটকান দিয়েছে। সেই কালনিমে অপয়াটা।'

'তা কী করে হবে?' শিশির বিশ্বাস করতে পারে না ঃ 'এর মধ্যেই নিয়ে পালাবে কেমন করে? আমি তো গ্র্যান্ড মামাকে কাল রাত্রে কিছু নিতে দিইনি! চুইংগাম চালিয়েই তো তাকে ভাগালুম!'

বাস্তবিক, কী করে তা সম্ভব হতে পারে? কালকের রাত্রে, ইতো নষ্ট স্তত ভ্রষ্ট—সেইসব নিক্ষিপ্তদের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে—চুইংগামদের চাটুকারিতায় চটে গিয়ে, চটচটে হয়ে সেই যে তিনি তীরবেগে প্রস্থান করেচেন তারপরে ফের কখন এলেন আবার? তারপরে সেই-তো—এই শিশিরই তো—কত না বীরত্ব দেখিয়ে উক্ত প্ল্যান উদ্ধার করে এইমাত্র ফিরল!

'দাও তো দেখি প্ল্যানটা আমায়!' শিশির বললে ঃ 'দেখি আমি চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে দেখা যাক একবার।'

ব্রজেশ্বর বড়ুয়া অম্লানবদনে—কিংবা অতিশয় ম্লান বদনেই, প্ল্যানটি শিশিরের হাতে পরিত্যাগ করেন। যে-প্ল্যানের পিছনে কোনও গুপ্তধনের কিনারা নেই তা রেখে লাভ? যার সমস্তটাই ফাঁকা—বেবাক ফাঁক—তা আর রাখা কেন?

নকশাটার সর্বস্বত্ব লাভ করে উল্লসিত হয়ে শিশির সেই গুপ্তকক্ষে গিয়ে হাজির হয়। পার্চমেন্টের ছকটাকে অনুসরণ করে, এগিয়ে-পেছিয়ে, ডান ধারে বাঁ-ধারে এঁকে-বেঁকে, দুবার লেফট আর চারবার রাইট টার্ন করে—রাইট কিংবা রংটার্ন তা কেবল সেই ছকেশ্বরই জানেন—অবশেষে নকশার উপদেশ মতো, তিনপাক ঘুরে চিহ্নিত একস্থানে গিয়ে সে উপস্থিত হয় এবং উপস্থিত হয়েই সে লাফাতে আরম্ভ করে (যদিও লাফাবার কোনও নির্দেশ সেই নকশার মধ্যে ছিল না)! কিন্তু না লাফিয়ে সে করে কী, একেবারে হুবহু সেই চিহ্নই যে! নকশার নিশানার সঙ্গে অবিকল একেবারে! একটা শক্ত আঁক এমনভাবে মিলে গেলে না লাফিয়ে কি থাকা যায়?

দুয়ে-দুয়ে যেমন চার হয়, (দুধও হয় নাকি, অনেকে বলে থাকেন) তেমনি অবলীলাক্রমে কতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

তারপর নকশার আদেশমতো তিনটি টোকা—চারটি নয়, দুটিও না—গুনে-গুনে তিনটি টোকা—সেই চিহ্নটির পৃষ্ঠদেশে! আর তিনবার টোকবার পরেই—।

ঠিক যেমনটি শিশিরের আশঙ্কা ছিল—।

চকিতের মধ্যে, কোত্থেকে কী সরে গিয়ে উন্মুক্ত আধারে, চকচকে কত কী সব বেরিয়ে পড়ল!

হাঁসের ডিমের মতো—কিন্তু আকারে হয়তো বৃহত্তম—তেমনি সাদা আর তেমনি সুচারু—থরে-বিথরে সাজানো কতকগুলি—।

কী ওগুলি? হীরে না জহরত? মণি না মাণিক্য? মুক্তো না গজমোতি? চুনী, পান্না, প্রবাল, মরকত—কী ওরা? রত্নতত্ত্বে শিশির খুব ওয়াকিবহাল ছিল না—ও-বিষয়ে ওকে প্রায় বিশেষজ্ঞই বলা চলে—তবু, বিশেষ অজ্ঞতা থাকলেও, যাই হোক, ওগুলো যে খুব দামি চীজ সে-সম্বন্ধে তার তিলমাত্র সন্দেহ রইল না।

একেকটি করে গুনে-গুনে দেখল শিশির—তেরোটি।

সাত রাজার ধন এক মাণিক—একমাত্র মাণিকে সাত-সাতটা রাজ্য কেনা যায়। কিন্তু এর একটায়—এহেন এক রাম-মাণিক্য দিয়ে ক'টা সম্রাটের ক'খানা সাম্রাজ্য কেনা যায় কে জানে!

বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে এইসব কথা শিশির ভাবছে—এমনসময়ে পেছন থেকে হেঁড়ে এক আওয়াজ এল ঃ 'হাত তোলো!'

'অ্যাঁ?' চমকে গিয়ে শিশির পিছন ফিরল। পিস্তল হাতে তার গ্র্যান্ড মামা।

'তুলে ফ্যালো! দেখছ কী আর?' বক্কেশ্বর আইচ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন।

'কেন, হাত তুলব কেন? কী হয়েছে?' শিশির বলে।

'হাত তুলবে কেন, বলছ বেশ।' বক্কেশ্বর কাষ্ঠহাসি হাসেন ঃ 'আমার হাতে এটা কী, দেখচ না?'

'দেখেচি। পিস্তল।' তাচ্ছিল্যভরে শিশির জানায়।

'হ্যাঁ, গুলিভরা ছ-নলা—দেখেচ তো?' গ্র্যান্ড মামা আরও বিশদ করে দেন ঃ 'এরকম একখানা দেখলেই লক্ষ্মীছেলের মতো হাত তুলতে হয়। গুলি করে দেব তা না হলে, তা বলে রাখচি। হাত না তুললেই গুলি করার নিয়ম।'

অগত্যা, শিশিরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেই নিয়মরক্ষা করতে হয়।

'হুঁ, যে-বিয়েতে যে-মন্ত্র! যে-কাজের যা-দস্তুর!' ঊর্ধ্ববাহু দেখে প্রসন্ন হয়ে বক্কেশ্বর বিবৃতি দেন ঃ 'তুমিও যদি এমনি একখানা রিভলভার নিয়ে পেছন থেকে আসতে আর আমি তোমার অবস্থায় পড়তুম—আমিও হাত তুলে ফেলতুম। বলতে না বলতেই—হুঁ!'

'আমার রিভলভার কই?' শিশির ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলে।

'সেই তো—নেই তো। সেইজন্যেই তো আমি সুবিধে করে নিচ্ছি। এসব কাজে এগুতে হলে রিভলভার নিয়ে এগুতে হয়। তাও জানো না?'

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ রিভলভার হাতে রত্নসম্ভারের দিকে গুটিগুটি অগ্রসর হন। ধীরে-ধীরে এগুতে থাকেন। এগুতে-এগুতে শিশিরের নাকে আর পিস্তলে ঠোকাঠুকি লাগে।

'একি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিছনে হটছ না কেন? পিছিয়ে যাও। পিছনে হটে পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসো। যাতে দরকার হলে তোমাকে আমি গুলি করতে পারি। নাকের ওপরে নল রেখে গুলি করা যায় না—তাতে পিস্তলের অপমান হয়।'

শিশির তথাপি নড়ে না। পিস্তলের নলে আর তার গালে ঠোকাঠুকি হতে থাকে।

'ছি ছি! ছবির মতো অমন দাঁড়িয়ে থেকো না, দোহাই তোমার! আমার কাজের বাধা হচ্ছে। অমন করলে, গুলি না দেগে এর ডাঁট দিয়েই এক ঘা সাঁটিয়ে দেব। নাক ফেটে রক্ত পড়লে আমার দোষ নেই তখন।' বক্কেশ্বর আইচের সতর্কবাণী শোনা যায়। 'পিছিয়ে যাও, ভালো কথাই বলছি।' তিনি পুনঃ-পুনঃ সাবধান করেন।

গুলিকে শিশির গ্রাহ্য করে না, কিন্তু নলাঘাতে তার ভয় আছে। অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়েই, কয়েক পা তাকে পিছুতে হয়।

বক্কেশ্বর রত্ন-ডিম্বগুলি নিরীক্ষণ করেন, সকৌতূহলে পর্যবেক্ষণ করেন সব। তারপরে, রুমালে

BanglaBook.org

বেঁধে ওগুলোকে করায়ত্ত করার তাঁর চেষ্টা হয়। কিন্তু একহাতে তাদের পাকড়ানো যায় না কিছুতেই।

'ইস! ভারি মুশকিল হল দেখচি! এই পিস্তলটাকে নিয়েই মুশকিল হল! কোথায় যে রাখি!'

'আমি ধরব?' শিশির প্রস্তাব করে—বেশ একটু সাগ্রহেই। 'পিস্তলটা আমি ধরব ততক্ষণ?'

'তুমি! তুমি ধরবে! তুমি ধরবে পিস্তল?' বক্কেশ্বরের দু-চোখ বিস্ময়ে কপালে গিয়ে ওঠে ঃ 'তুমি যদি পিস্তল ধরো তা হলে এই ডিমগুলো কি আর আমি ধারণ করতে পারব? পিস্তল যার, এগুলোও তার। বুঝেছ?'

আর অধিক বাক্যব্যয় না করে তিনি ডিম্বগুলিকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হন।

'হাত তুলে থাকতে পারছি না! ব্যথা করছে!' শিশির দুঃখের সঙ্গে জানায়।

'তা হলে এক কাজ করো। এগুলো আমার রুমালে বেঁধেছেঁদে আমার পকেটে ভরে দাও।'

গ্র্যান্ড মামার অনুজ্ঞায়, আর রিভলভারের অনুনয়ে, সেই গ্র্যান্ড রত্নগুলি শিশির রুমালের অন্তর্গত করে তাঁর পকেটস্থ করে দেয়।

'নাও, এইবার এই প্ল্যানটা নিতে পারো। নিয়ে যাও, খেলা করো গে। আমার আর এতে প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে তোমার মামাকেও এটা দিতে পারো—আমার সেই হতভাগা ভাগ্নেটাকে। তবু এখানা দেখলে খানিকটা শোক সামলাতে পারবে। অনেকে যেমন প্রিয়জন খোয়া গেলে তার ফোটো দেখে সুখী হয়।'

এই বলে গ্র্যান্ড মামা শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর আইচ, মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে মৃদুমন্থর গতি মিলিয়ে, একেবারে গদ্য কবিতার মতো মিলিয়ে দিয়ে, গদগদভাবে হেলতে দুলতে চলে যান।

চোদ্দো ঃ বিসর্গ থেকে অনুস্বর!

শিশির একছুটে সেই গুপ্তকক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পেছন থেকে ডাক ছাড়েন, 'কিরে পেলি কিছু?' কিন্তু শিশির আর ক্ষণমাত্র দাঁড়ায় না।

কাছেই একটা সাইকেলের দোকান সে দেখেছিল, সেখানে গিয়ে, পয়সা ফেলে, সাইকেল ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ ছুট লাগায়। তার অযথা কালক্ষেপ করার সময় নেই।

বক্কেশ্বর আইচের সেই আড্ডাখানার উদ্দেশে সে উধাও হয়। যেমন করেই হোক, গ্র্যান্ড মামার আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে নষ্টরত্নদের—না করে তার উদ্ধার নেই। বড় বড় মহাত্মারা যেমন পাপীতাপীদের সমুদ্ধার করে, সমুচিতভাবে উদ্ধৃত করে পরিশেষে নিজেরা উর্ধ্বলোকে যান, তেমনি ছোটখাটো একটা অবতার-স্বরূপ নিজেকে গণ্য করে শিশির। এবং এই নতুন অবতারণায় সে যখন সাইকেলে আর তার গ্র্যান্ড মামা পদব্রজে, তখন উদ্ধারের পথে পরিষ্কাররূপে সে যে অনেকখানি এগিয়েই রয়েছে, তার আর ভুল নেই।

মামার আড্ডাখানায় পৌঁছে, সাইকেলটাকে এককোণে লুক্কায়িত রেখে সে সেই উঁচু-করা বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গ্র্যান্ড মামাও সেখানে এসে হাজির! বক্কেশ্বরের সাড়া পেতেই তাঁর দলবলেরা হইহই করে এ-ঘর ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'কী হল কর্তা? কদ্দুর এগুলো? উদ্ধার হল কাজ?' এই ধরনের প্রশ্নপত্র মুখে করে ঘেরাও হয়ে সবাই এগিয়ে আসে।

'এই রে! ব্যাটারা সব বখরা নিতে আসছে! কর্তার ঢেঁকি, কেবল বখরা নেবার ওস্তাদ! বিনে পয়সায় বাগিয়ে নেবার ফিকিরে আছেন! দাঁড়া, দিচ্ছি বখরা। ভালো করেই দিচ্ছি।'

এই বলে—নিজের কানে-কানে এই কথা না বলে—বক্কেশ্বর আইচ ঝটিতি তাঁর পকেট থেকে রত্নগর্ভ রুমালটা বের করে খাড়া-করা বাক্সগুলোর আড়ালে ফেলে দেন।

মেঘ না চাইতেই জল। শিশির ওরই নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, ওত পেতেই ছিল বটে সে,

BanglaBook.org

কিন্তু এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না! গাছে না উঠতেই এককাঁদি, এইভাবে আপনা থেকেই, আকাশ ফুঁড়ে তার হাতে এসে পড়বে—কে ভাবতে পেরেছিল? যেমনি না রুমালের ঝুপ করে পড়া আর অমনি ওর নিঃশব্দে টুপ করে লুফে নেওয়া! ব্র্যাডম্যান বল হাঁকড়ালে কার্তিক বোস যেমন ক্যাচ ধরে থাকে ঠিক তেমনি!

দলবলরা এসে পড়তেই বক্কেশ্বর আইচ মুখ কাঁচুমাচু করে জানিয়ে দেন ঃ 'নাঃ, হল না, কিছুই হল না। ভাগনের খপ্পরে গিয়ে যখন পড়েছে তখন আর রক্ষে আছে—ভাগনেরা কি কম বিচ্ছু? এ তো আবার ভাগনের ভাগনে, একেবারে জলবিছুটি!'

'কী! প্ল্যানটা উদ্ধার করতে পারা গেল না?' দলবলরা বক্কেশ্বরের চেয়েও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

'আর প্ল্যান!—' বক্কেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন ঃ 'প্ল্যানও উদ্ধার করেছিলাম, গুপ্তধনের কিনারা করতেও বাকি ছিল না, কিন্তু হলে কী হবে? ভাগনের ভাগনে যেখানে পিছু নিয়েছে—পিছনে লেগেছে যে-ক্ষেত্রে—সেখানে উদ্ধার করলেই বা কি! আবার তার হাতে চলে গেছে সেসব।'

'অ্যাঁ? উদ্ধার করার পর—আবার চলে গেল?' সকলে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

'গেলই তো! মিথ্যে বলছি না, আমার যথাসর্বস্ব সমস্তই আবার সেই মহাভাগনের হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কবলেই সব এখন।'

মিথ্যে বলতে গিয়ে কতবড় একটা মহাসত্য, নিজের অজ্ঞাতসারেই, গ্র্যান্ড মামা উচ্চারণ করেছেন, ভেবে শিশিরের হাসি পায়। রুমাল আর রুমালের ভেতরের মাল সে মুঠোর মধ্যে চাপে—আদর করে নিজের গালে বুলোয়—আর অতিবড় মিথ্যাবাদীরাও কেমন করে সময়ে-সময়ে সত্য কথার ফাঁপরে পড়ে যায় ভেবে মনে-মনে বিস্মিত হতে থাকে।

দলবলরা সমবেত হয়ে হায়-হায় করে। হা-হুতাশ শেষ করে অতঃপর কিংকর্তব্য জানবার লালসা জানায়।

'কী আর করা? এবার চাটিবাটি গুটোতে হবে এখান থেকে। থানায় আমার ফোটো লটকানো আছে সেই বদ ছেলেটা তা জানে। এবার আলবত সে গিয়ে বলে দেবে। পুলিশে খবর পাবার আগেই এখান থেকে সরে পড়া, এই এখন আমাদের কাজ।'

'গুপ্তরত্ন উদ্ধার না করেই সরে পড়ব?' ওদের ভেতরে একজন বলে ওঠে।

'আমরাই বা একেকটা কী এমন কম রত্ন? আগে নিজেদের তো গুপ্ত রাখি। নিজেরা উদ্ধার পেলে, প্রাণে বাঁচলে, অনেক গুপ্তরত্ন উদ্ধারের সুযোগ জীবনে আসবে।'

এ-কথার পরে আর কথা নেই—সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। ঠিক হয়, বক্কেশ্বর আইচ সিঙ্গাপুরের দিকে পাড়ি দেবেন, আর দলবল সব রেঙ্গুন হয়ে অ্যাকীয়াবের দিকে রওনা হবে। পুলিশের সন্দেহ এড়ানোর জন্যই এই—কর্তা একদিকে কর্মরা অন্যমুখো উধাও হবার ব্যবস্থা, আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে অচিরে, পরে আবার মান্দালয়ে গিয়ে নতুন ক্রিয়ায় সম্মিলিত হলেই হবে। মৌলমীনের বন্দর থেকে পরশুদিন দু-ধারের জাহাজই ছাড়ছে—তাতেই টিকিট কাটবার জন্য দলবলকে তিনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার হুকুম দিলেন।

দলবলরা কেটে পড়তেই, বক্কেশ্বর আইচ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগ্রেট ধরালেন ঃ 'উঃ, এতক্ষণে একটু দম দিতে পারা গেল! বাপ!'

শিশির যে-মুহূর্তে, প্যাকিং বাক্সের আবডালে আনন্দে বে-দম, প্রায় তার কানের গোড়াতেই যেন তখন আওয়াজটা এসে লাগে—কে যেন ছুঁড়ে দেয় পিছন থেকে—।

'কই হে! দাও তো দেখি এবার!'

কে বলছে? কী বলছে? কাকে বলছে? শিশিরের চমক লাগে। এ তো তার গ্র্যান্ড মামার পেটেন্ট গলা—কিন্তু তার কানের গোড়ায় কেন?

'কী! "ফল ধরো রে লক্ষ্মণ" করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? হাতের সুখ তো যথেষ্ট

BanglaBook.org

হল, এখন দাও ওগুলো।'

অ্যাঁ! তাকেই ডেকে বলা হচ্ছে যেন না? শিশিরের কেমন একটু সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যে ওখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে এ. তো গ্র্যান্ড মামার জানার কথা নয়! কানের ভ্রম না কি তা হলে?

সন্দেহ দূর হতে দেরি হয় না। ঠক করে পিস্তলের বাঁটটা তার মাথায় এসে ঠোক্কর লাগায়।

'ইস! তুমি তো বড় বেকুব দেখছি হে! ভারি বোকা তো!' কাষ্ঠ-ঘোমটা ফাঁক করে গ্র্যান্ড মামা ওর মুখদর্শন করেন।

শিশির শুধু বলে : 'ইস!'

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাল মায় রুমাল সমেত গ্র্যান্ড মামার হাতে তুলে দেয়—নিজের অস্থাবর যা-কিছু অপরের হস্তান্তর করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে সম্পত্তিহারা শিশির, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচে।

পনেরো : গ্র্যান্ড মামার গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি

'তোমার আগমন বার্তা কী করে টের পেলুম ভেবে তোমার তাক লাগছে। তাই না? ঠিক নিউটনের নিয়মে—মাধ্যাকর্ষণের জোরেই জানতে পারলুম। রুমালটা বাক্সগুলোর ওধারে চালান করার সময়েই সব জানতে পারলুম। মালগুলোর নিঃশব্দ চালচলনেই সমস্ত পরিষ্কার হয়েছে। ওদের নিঃশব্দে গিয়ে পড়বার কথা তো নয়। মাধ্যাকর্ষণের জোরে মাটিতে গিয়ে পড়বে আর সশব্দে গিয়ে পড়বে। তাল পড়ে টিপ করে জানো তো? টিপ করে তাল পড়ে তাও বলা যায়। কিন্তু পড়ে আর আওয়াজ ছাড়ে নিউটনের নিয়মেই। কিন্তু আমার তাল টিপ না করতেই, কে যে ওখানে কোন তালে রয়েছে, বুঝতে আমার দেরি হয়নি। জিনিসটা যেন আশ্চর্যভাবে আলগোছে থেকে গেল ত্রিশঙ্কুর মতো ত্রিশূন্যে—ভারি জিনিসের এরকম ভুতুড়ে ব্যাভার ভালো নয় তো! তারপর এ-ধারে ও-ধারে তাকাতেই গাছের আড়ালে সাইকেলটা নজরে পড়ল! ব্যস—'তোমার কায়দা-কানুন জানতে আর বাকি রইল না! কেমন, এখন তো বুঝতে পারছ?'

বুঝতে শিশির অনেকক্ষণই পেরেছে, অনেক আগেই—মাথায় পিস্তলের ঠোক্কর খাবার সাথে-সাথেই তার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছল—তবে যেটুকু বুঝতে তবুও ওর বাকি ছিল এতক্ষণে বিশদ হল। মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে হাঁ করে ও বক্কেশ্বরের বকুনি হজম করে।

'এখন তুমি বন্দি আমার। বুঝেচ তো! সুড়সুড় করে লক্ষ্মীছেলের মতো আসবে—না, না? নইলে—নইলে দেখচ তো! পিস্তলের এই বাঁট দেখেচ? তোমার মাথায় এটা ভাঙতে হলে বিস্তর ক্ষতি হবে আমার। ও-পিস্তল তো আর এখানে সারানো যাবে না।'

ক্ষতির কথা আর বেশি করে খতিয়ে দেখাতে হয় না। বলতে না-বলতেই শিশির বক্কেশ্বরের পিছনে-পিছনে যায়। ছায়ার মতো অনুসরণ করে দোতলায় গিয়ে ওঠে।

'এই ঘরে তুমি বন্দি, বুঝেছ ভায়া?' বক্কেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন : 'কয়েদীশালার পক্ষে ঘরখানি তেমন খারাপ নয়। দেখে-শুনে কীরকম বুঝছ?'

শিশির ঘুরে-ফিরে ঘরখানাকে লক্ষ করে।

'তাকিয়ে দেখচ কী? তেমন অসুবিধাজনক ঘর নয়। পালাবার পক্ষে প্রশস্তই। চম্পট দেবার সুবিধা করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

গ্র্যান্ড মামা ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেচেন। তাঁর কথার ধাঁচে সেই কথার আঁচ পেয়ে শিশির লজ্জিত হয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

'পালানো আর এমন কঠিন কী? এই জানলায় শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধবে—বেঁধে লটকে পড়বে, ব্যস! তা বলে ভুল করে নিজের গলায় যেন বেঁধে বসো না—তাই বেঁধে লট্‌কো না যেন, সেটা কিন্তু ভারি খারাপ হবে আগেই বলে রাখচি।'

'সেই খারাপ একদিন তোমার বরাতে আছে।' শিশির রাগ করে বলে—মনে-মনেই বলে দেয় ঃ 'নির্ঘাত ফাঁসি রয়েছে তোমার অদৃষ্টে।'

'ওঃ, তাই তো! দড়ি কই? দড়ি তো নেই এ-ঘরে। দড়ি একটা চাই যে!'

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ তাকে দাঁড় করিয়ে দড়ির খোঁজে অন্য ঘরে যান। খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসতে একটু তাঁর দেরিই হয়।

'এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করোনি যে তাই ভালো! খোলা দরজা দিয়ে সোজা পিট্‌টান দেওয়া একদম বন্দিদশার দস্তুর নয়। যা দস্তুর—যেভাবে পালানো নিয়ম—যাদৃশ পলায়ন বন্দিদের পক্ষে গৌরবজনক তার পরাকাষ্ঠা হচ্চে এই।' এই বলে সপাৎ করে দড়াগাছটা শিশিরের ওপরে উনি ফেলে দেন।

'কী করে আমি পালাব সে তোমায় বলতে হবে না।' এতক্ষণে শিশির একটা জবাব দেয়। 'আর কষ্ট করে বলে দিতে হবে না তোমায়।'

'না, না, আমি কেন বলব! আমি বলবার কে? এসব তো পুঁথিপত্রে বিস্তারিত করে সব বলাই আছে। নেই বলা?'

'আছে কি না-আছে আমি বুঝব।'

'দড়িটা শক্ত করে জানলার গোড়ায় বেঁধে দিয়ে যাই। কী জানি বাঁধনের দোষে, যদি দড়ি সমেত ঝুলতে গিয়ে খুলে পড়ে হাত-পা ভেঙে ফেল! হাত-পা ভাঙলেই তো হয়েছে! একটা পিস্তল সারানোই আমার পক্ষে কঠিন, তার ওপর তোমাকে সারাতে হলেই গেছি!'

জানলার পাল্লায় তিনি দড়িটা মজবুত করে বেঁধে দেন।

'এইবার সবকাজই সহজ হয়ে রইল। এগিয়ে রইল অনেক। এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, আমি চলে গেলে—আমার সামনে সটকানো ঠিক উচিত হবে না—সুরুচিসঙ্গত হবে না—ঠিক আমার তিরোধানের পরে, ধীরেসুস্থে, ওই জানলা ধরে দড়ি বেয়ে সুড়ুৎ করে নিচে নেমে যাওয়া। আর নিচে পৌঁছতে পারলেই তো ফতে! পৌঁছলে কি পালালে! কিন্তু সাবধান, আগাগোড়া আমার নজর বাঁচিয়ে—এই চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না—তক্ষুনি গুলি ছুঁড়ব। নিয়ম তো সব মানতে হবে। মেনে চলতে হবে আইন-কানুন। যে-বিয়ের যে-মন্ত্র—শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে।'

'কী করে পালাতে হয় আমি জানি।' এককথায় শিশির জানিয়ে দেয়।

'জানবে বইকী! কার ভাগনের ভাগনে, সেটা তো বুঝতে হবে। সত্যিই যদি কেমালুম পালাতে পারো তা হলে সেটা খুব সুখের কথাই! তা হলে তেমন বাহাদুর ছেলেকে এক-আধটা দামি রত্ন উপঢৌকন দিতে আমার দ্বিধা নেই। এই দ্যাখো, এই দুটো রত্ন-ডিম্ব এখানে রইল, সযত্নে রেখে দিয়ে গেলুম। একটা তোমার, আর-একটা তোমার বোনের—পালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।'

'আমার মামার জন্যেও একটা দাও।' শিশির আবেদন করে।

'সেই আদেখলা ভাগনেটার জন্যে? অপদার্থটাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে না। তবে তুমি বলছ, তার জন্যেও একটা থাকল। তিন-তিনটে গেল, যাক, দুটোই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'একেশ্বর হয়েই আমরা খুশি।' শিশির হাসিমুখে জানায়।

'বেশ, ভালো কথাই। এইবার আমি বাইরে থেকে দরজায় তালাচাবি মেরে চলে যাই—আহারাদি করি গে। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে—অনেক কাজ—পরশুই এখান থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করচি তো! হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি বলতে—' যেতে-যেতে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন

BanglaBook.org

ফিরে তিনি বলে যান : 'আসল কথাই বলতে ভুলেছি।'

'কিচ্ছু বলার দরকার নেই। সব আমি জানি।' শিশির নিজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গ্র্যান্ড মামার অধিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না।

'সেই ডালকুত্তাগুলোর কথা মনে আছে কি? তোমাদের যারা কালকে তাড়া করে গেছল? বেচারাদের বেজায় শাস্তি হয়েচে। তাড়া করবার জন্য নয়। তাড়া করে তোমাদের ধরে আনতে পারেনি সেই কারণেই কাল থেকে ওদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে আছে।'

'উচিত শাস্তি দিয়েছেন।' শিশির অতিশয় উল্লসিত হয়।

'হ্যাঁ, আর তারা রয়েচে এই জানলার নিচেটাতেই—ঠিক যেখানে এই দড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে। কাল থেকে কিচ্ছুটি খায়নি বেচারীরা। যদিও নিতান্ত অনাহারী কাজ, তবু তোমাকে যদি ব্রেকফাস্ট করতে পায়—যদি তুমি করতে দাও—না কি, তোমার তাতে খুব আপত্তি আছে? তোমার টেস্ট তেমন সুবিধের হবে না তুমি বলতে চাচ্ছ?'

ষোলো : শিশির সাহায্যে শিশিরের উদ্ধার

শিশির রুদ্ধঘরে খানিকক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষোভ হওয়ারই কথা। নষ্টরত্ন স্বহস্তে লাভ করে, অভাবিত পুনরুদ্ধারের পর, আবার যদি তা সেই হাত থেকেই লোপ পায়—হাতে-হাতেই লোপাট হয় তা হলে কার না ক্ষোভ হবে? এবং কেবল খোয়া যাওয়াই নয়, তারপরে এই সব খোয়ার! শিশির অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে জানলার বাইরে গিয়ে মুখ বাড়ায়। এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারে, কই একজন কুকুরেরও তো লেজ দেখা যাচ্ছে না! গ্র্যান্ড মামার স্রেফ ধাপ্পা নয় তো? হ্যাঁ, খেতে না পেলে ওরা বসে থাকবার পাত্র নাকি! খাবারের সন্ধানে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে গেছে।

এহেন সুবর্ণ-সুযোগ—পরিত্রাণের এই অর্ধোদয়যোগ উপেক্ষা করবার নয়! শিশির সেই ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলন-যাত্রা করে বেরিয়ে পড়তে চায়। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না। গ্র্যান্ড মামার দেওয়া দুর্লভ ডিম তিনটে, শার্টের তিন পকেটে না পুরে, দড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে নামতে থাকে।

প্রায় ধরাতলে গিয়ে পৌঁছয় আর কী, অবতীর্ণ হয়-হয়, এমনসময়ে কোত্থেকে গন্ধ পেয়ে ডালকুত্তার দল হইহই করে ছুটে আসে।

'ওই রে! ওই-ওই!' তাদের ঘেউ-ঘেউ-এর মধ্যে ওই একটি কথাই শোনা যায়। একবাক্যে ওরা অভ্যর্থনা করে।

শিশির আর মাটিতে পা দেয় না, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যমার্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, তরতর করে দড়ি ধরে আবার সে রুদ্ধঘরে এসে ওঠে। বাব্বা, কক্ষাচ্যুত হওয়া কি সোজা? কেন যে চন্দ্র-সূর্যরা কক্ষভ্রষ্ট হতে চায় না এক্ষণে বোঝা গেল! আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী।

শিশির ভাবল, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিলির উদ্দেশে একখানা চিঠি লেখে। লিলি সেই চিঠি পেয়ে, পত্রপাঠ, যে করেই হোক, তাকে এসে উদ্ধার করবে।

পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার করে চিঠি লিখতে বসল শিশির। একটুও না ভাবতেই, সাঙ্কেতিক একটা ভাষাও আবিষ্কার করা তার পক্ষে কঠিন হল না—।

AE CTT AE TKNR MAK DB—

পত্রবাহক, সে যে-মিঞাই হোক, তার নির্দেশের জন্যে এইটুকু মাত্র লিখে—লিলিকে সে লিখল :

BanglaBook.org

AKNA SA J KEY BPD—HAVE READ—AME KEY
R BALL BOW—COST-A TK AC—AKN SO—SA—

দরজার ও-ধারে কী যেন খুট করল। শিশির কান খাড়া করল—সে নিজে উৎকর্ণ হল বটে কিন্তু তার লেখনী থামল না—।

OK—KLO—OKLO—ODK—?

এতখানি লিখে শিশির পড়বার চেষ্টা করে। এ কীরকম সাঙ্কেতিক ভাষা—এ যে একেবারে জলের মতো গড়গড় করে পড়া যাচ্ছে; বুঝতেও একটু দেরি লাগে না। কিন্তু—কিন্তু লিলি বুঝতে পারলে হয়! তাকে আবার বোঝাবার জন্যে শিশিরকে গিয়ে না পড়ে দিতে হয়।

শিশির আদ্যোপান্ত পড়ল ঃ

এই চিঠিটি এই ঠিকানার মেয়েকে দিবি—

এখানে এসে যে কী বিপদে—পড়েছি—আমি কী আর বলব—কষ্টে টিকে আছি—এখানে এস—এসে—ও কে? কে এল?—ও কে এল ওদিকে?

এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে ঃ এরপরে, তার মনে তখন থেকে যেসব ভাবের উদয় হচ্ছে, সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে তার আবেগ প্রকাশ করতে হলে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। পেনসিল থামিয়ে গালে হাত দিয়ে মাথা ঘামাচ্চে শিশির।

মাথা ঘামাতে-ঘামাতে তার মনে হল—ঘর্মবিন্দুর মতোই ভাবনাটা ফুটে উঠল—ভাষায় এলেই বা কী? না-হয় ভাষায় কুলিয়েই ওঠা গেল, কিন্তু সেই চিঠি—তার সেই সঙ্কেতধ্বনি—লিলির উপকূলে পৌঁছে দিচ্চে কে? আশেপাশে বাধিত করা তেমন বাধ্য গোছের লোক কই? থাকবার মধ্যে তো কতিপয় কুকুর—কুকুরের লেজে বেঁধে খবর পাঠানো চলে, এই ধরনের একটা কাহিনী পূর্বে তার কানে গেলেও এসব কুকুরের সম্বন্ধে সে-কথা ভাবতেই পারা যায় না। না, লেজ এদের থাকলেও, এরা সে-কুকুর নয়।

অগত্যা, চিঠি-লেখা ফেলে, পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে, অন্য পথে মুক্তির উপায় সে খুঁজতে লাগল!

আঁতিপাঁতি করে চারিধারে তাকিয়ে, ঘরের এককোণে, ছোট্ট এক কুলুঙ্গিতে হিমানীর শিশির মতো কী একটা তার চোখে পড়ল। হাতিয়ে নিয়ে দেখে—হিমানীর শিশিই বটে, কিন্তু হিমানী নেই—থাকলেও এ-সময়ে নিজের মুখে চুনকাম করার তার উৎসাহ হত কি না সন্দেহ। বরং তার গর্ভে যে-বস্তুটি দেখা গেল তার বর্ণ-পরিচয়ে যে-কথা বলে তস্য গন্ধ-বিবরণীতেও ঠিক সেই কথাটিরই—হ্যাঁ—হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—সাক্ষ্য দেয়। তার নাক আর শিশির মুখে এক বিজ্ঞাপন—নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়!

গ্র্যান্ড মামার সবই গ্র্যান্ড! যেমন পেল্লায় শরীর—তেমনি পেরকাণ্ড নাক—আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেমনি একখানা নস্যির ডিবে! তিনজনাই যার-পর-নাই—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে হাত-পা নেড়ে মাথা ঝেড়ে—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো।

হাঁচতে-হাঁচতে, মাথা পরিষ্কার হয়ে, তার বুদ্ধি খুলে যায়! এই তো স্বহস্তেই তো! নিজের সমুদ্ধারের যৎপরোনাস্তি সরল পথ। এই হিমানী মার্কা বৃহৎ ডিবিয়ার ভেতরেই তো সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে তার মুক্তির উপায়! এতক্ষণ কি সে-কথা তার নাকের মধ্যে সেঁধোয়নি...?

পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার করে মুখ মুছে তাতে বেশ ভালো করে এ-পিঠে ও-পিঠে নস্যি মাখিয়ে জানলা গলিয়ে ডালকুত্তাদের সম্মুখে ফেলে দিল শিশির। একে এই ডালকুত্তারা গন্ধর্বশ্রেণীর, তার ওপরে গতকাল থেকে বুভুক্ষু—রুমাল-পতনের সাথে-সাথেই ওদের একজন এসে শুঁকে দেখেছে। আর—আর যেই না শোঁকা—অমনি—অমনি না—যা-একখানা জিনিস হল তাকে অকথ্য না বলে উপায় নেই। কুকুরের হাঁচি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার বর্ণনার ভাষা নেই।

দেখতে না-দেখতে প্রত্যেকেই সেই রুমালটা এসে শুঁকেচে—।

আর তার ফলে যে অনির্বচনীয় দৃশ্য—অশ্রুতপূর্ব কোরাস—পরমাশ্চর্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তা আর কহতব্য নয়।

নস্যি-বোঝাই সেই রামডিবে পকেটফাই করে শিশির তরতর বেগে দড়ি বেয়ে নেমে যায় এবার!

সেই অধঃপতিত রুমালটি হস্তগত করে—বিদায়চ্ছলে সেই ডালকুত্তাদের মুখের ওপর সেটি নাড়তে-নাড়তে—যদি বা তাদের কেউ ওইরকম ব্যতিব্যস্ত অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে তাড়া করে আসে তা হলে তক্ষুনি তার মুখের ওপর সঙ্গে-সঙ্গে নেড়ে দেবে তার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই—সেই সমবেত ঐকতান ভেদ করে শিশির সীমান্তপ্রদেশ পার হয়।

কিন্তু না, কুকুররা তাড়া করে না, নিজেদের অন্তর্গত তাড়নাতেই তারা অস্থির হয়ে আছে—ভেতরের আবেগে এত কাবু যে তাদের বুলি পর্যন্ত বেরোয় না।

তাদের হাঁচাহাঁচি-নাচানাচির ভেতর দিয়ে সহাস্যবদনে শিশির বেরিয়ে যায়।

সতেরো ঃ 'একজনকে রোস্ট করব একজনকে টোস্ট করব'

সেখান থেকে শিশির একছুটে একেবারে মাতুল সমীপে।

'এই নাও মামা, তোমার হারানো ধন! গ্র্যান্ড মামার কবল থেকে আমি উদ্ধার করে এনেছি—সাত রাজার ঐশ্বর্য এক মাণিক!'

এই বলে একটা ডিম্বাকৃতি রত্ন মামার কোলের ওপরে ফেলে দেয়।

মামা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে রত্নটিকে—দুটি রত্নকেই একদৃষ্টে দেখেন! শিশির আর শিশিরের ডিম।

'অ্যাঁ, আনলি? আনতে পারলি তুই!' তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি হলে বেরোয় ঃ 'ধন্যি ছেলে তুই, সত্যি!'

'এখন নগদ কিছু টাকা দাও তো আমায়! সাইকেলওলাকে মিটিয়ে দিয়ে আসি। তার ভাড়া করা সাইকেলটা গ্র্যান্ড মামার আস্তানায় খুইয়ে এসেছি।'

মামা সে-কথায় কান দেন না—তাঁর কানেই যায় না সে-কথা। তিনি সেই অপূর্ব ঐশ্বর্যটিকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, লক্ষ করেন—আর তাঁর পর্যবেক্ষণের ফাঁকে-ফাঁকে শিশিরকে চকিতের জন্যে নিরীক্ষণ করে নেন।

'সাইকেলওলাটাকে ঠিকানা দিয়ে দাও না! সে-ই লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে আনবে।' লিলি পরামর্শ দেয়। 'তোমার নিজের যেতে চক্ষুলজ্জা হয় আমিই না-হয় একটা পোস্টকার্ড লিখে ফেলে দিচ্ছি। গ্র্যান্ড মামার বাড়ির ছক কেটে পথ বাতলে দিলেই হবে।'

'তাই দে তো ভাই!' শিশিরের ঘাড় থেকে যেন সাইকেলের পাহাড় নেমে যায়। সে আরামের নিশ্বাস ছাড়ে ঃ 'তোর বুদ্ধি খুব! সত্যি লিলি!'

দাদার কাছে, বিশেষত বিশল্যকরণী উদ্ধার-করে-আনা এরকম গৌরোচিত দাদার কাছ থেকে এহেন সার্টিফিকেট লাভ করে একগাল হেসে লিলি তক্ষুনি-তক্ষুনি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ছেড়ে দিয়ে আসতে যায়।

মামা স্থাবর রত্নটিকে ট্যাঁকস্থ করে হনহন করে দালানে পায়চারি করতে থাকেন—আর এককোণে দাঁড় করানো শিশিরের দিকে—তাঁর অস্থাবর রত্নটির দিকে মাঝে-মাঝে ফিরে তাকান। যে রকম লোলুপ নেত্রে দৃকপাত করেন তাতে মনে হয়, সম্ভব হলে সমাদরের আতিশয্যে তাকেও ট্যাঁকস্থ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অতবড় ধাড়ি ছেলেকে ট্যাঁকে আনা দূরে থাক—কায়দা করে কোলে করাই কঠিন!

BanglaBook.org

তিনি হনহন করে ঘুরপাক খান—আর ঝনঝন করে নতুন টাকার মতো কথার টুকরো তাঁর মুখ থেকে খসে পড়ে ঃ 'উঃ! এই মাণিকটা! কত দাম এর কে জানে! হয়তো বারো লাখ — কিংবা সাত লাখ সাতাত্তর হাজারই হবে হয়তো! এক ক্রোড় হলেই বা কে কী বলছে! এই দিয়ে বোধহয় একটা জমিদারি কেনা যায়। কিন্তু—কিন্তু—যদি এর দাম দশ-বিশ ক্রোড় হয়ে পড়ে—তা হলে—?'

এই সদ্যোজাত সমস্যা নিয়ে শিশিরের মুখোমুখি এসে তিনি দাঁড়ান ঃ 'তা হলে? তা হলে কী?'

প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত হয়ে শিশির উত্তর দেবার চেষ্টা করে ঃ 'তা হলে? তা হলে গোটা আসামটাকেই আমরা কিনে নেব। মায় ধুবড়ি—গোয়ালপাড়া—গৌহাটি—শিলং—শিলেট—শিলচর—লামডিং—নওগাঁ—শিলঘাট—জোড়হাট—শিবসাগর—তেজপুর—তিনসুকিয়া—ডিগবয়—সব সমেত।'

'সারা আসামটাকেই এই ট্যাঁকে?' প্রস্তাবটা যেন ব্রজেশ্বরকে ধাক্কা মারে—এতদূর—এতখানি তিনি ভেবে দেখেননি। কিন্তু ভেবে দেখে—আসামের মানচিত্র ভেবে-ভেবে আর দেখে-দেখে—প্রস্তাবটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরের কথাটা তাঁর মনঃপূত হয়—তিনি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ঃ 'গোটা আসামটাই এই ট্যাঁকের আসামী? তা—তা মন্দ কী?'

'মন্দ কী?' শিশিরেরও কথাটা খুব মন্দ লাগে না।

পুলকের আধিক্যে ব্রজেশ্বর শিশিরকে দু-হাতে উঁচু করে তুলে ধরেন ঃ 'ভ্যালা মোর ভাগনে!' তুলে ধরে গদগদ দৃষ্টিতে তাকান ঃ 'এমন চমৎকার ভাগনে প্রায় দেখা যায় না!'

বাহুগ্রস্ত শিশির লজ্জায় আর আনন্দে বিগলিত হয়ে ছটফট করে—মামার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাটিতে পা দিতে পারলেই বাঁচে।

মামা কিন্তু সহজে ছাড়েন না—ভাগনে আর ভাগনের প্রতি স্নেহ—দুই-ই তখন তাঁর মাথায় উঠেছে। শিশিরের এহেন মাতুল-ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রতিদান দেওয়ার তাঁর বাসনা হয়।

'নাঃ, সামান্য মৌখিক আদরে এই উপকারের ঋণ শোধ হবার নয়। এর সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে। ভাগনেরা যে মামাকে ভালোবাসতে পারে—এতদূর ভালোবাসতে পারে আমি তা জানতুম না!' ব্রজেশ্বরের চোখের কোণে শিশিরবিন্দুরা দেখা দেয়।

শিশিরের জামার হাতায় চোখ মুছে তিনি বলেন ঃ 'আয়! আমার সঙ্গে আয়। লিলি? লিলিটা গেল কোথায়? সেও আসুক।'

লিলি ততক্ষণে তার বক্তব্য ডাকবাক্সে পরিত্যাগ করে ফিরেছে, মামার হাঁকে তক্ষুনি এসে হাজির হয়।

'লিলিও আমার খুব চমৎকার মেয়ে!' মামার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বেয়ে স্নেহের ঝর্ণা নেমে আসে। দুজনকে সমাদর করে নিজের ঘরে তিনি নিয়ে যান।

'বোস, এই খাটের ওপরে বোস তোরা। ততক্ষণ বোস।'

তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে যান—তারপরে কী মনে করে ফের ফিরে এসে—ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।

'বেশি দেরি হবে না, আমি এই এলুম বলে।' এই বলে বোধহয় সান্ত্বনা-দানের ছলেই বাহির থেকে পুনরায় বলেন ঃ 'ভয় খাস নে! ভয়ের কী আছে? তোদের একজনকে রোস্ট করব—আরেকজনকে—।'

আরেকজনকে কী করা যায়, কীভাবে আপ্যায়িত করা যায়—কোন সুখাদ্যে পরিণত করতে পারলে বেশি সুস্বাদু হয়—একটু ভেবে ঠোঁট চেটে নিয়ে তিনি জানান ঃ 'আরেকজনকে টোস্ট করা যাক? কেমন, টোস্টই তো ভালো—তাই না?'

BanglaBook.org

আঠারো ঃ 'মামা, তোমার মনে এই ছিল?'

মামার বাণী শুনে শিশিরের সারা গা শিরশির করে ওঠে।

'আমাদের জন্যে রোস্ট আর টোস্ট আনতে গেল মামা, তাই না?' জিগ্যেস করে লিলি—'আমার ভাগে যদি টোস্ট পড়ে দাদা, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না। রোস্ট আর টোস্ট আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে খাব, কেমন?'

লিলির নিমন্ত্রণে শিশিরের উৎসাহ দেখা যায় না—সে শুধু বলে ঃ 'আমাদের আর খেতে হবে না। মামাই সারবে।'

'মামা একাই সমস্তটা খাবে? সবখানি রোস্ট আর—?'

পুনশ্চ যোগ করে সংক্ষেপেই শিশির জানায় ঃ 'উঁহু; মামাই খাবে আমাদের।'

'আমাদের খাবে—আমাদের? অ্যাঁ?' বিষয়টা ভালো করে বোধগম্য হওয়ার সাথেই লিলি ককিয়ে ওঠে।

'তা হলে শুনলি কী তবে? তারই বন্দোবস্ত করতে গেল, বলে গেল কী? দরজায় শেকল এঁটে গেছে দেখছিস নে?'

তাই তো—তাই-ই তো! মামার বিবৃতির সঙ্গে কার্যকলাপ জড়িয়ে দেখলে তাই মনে হয়! আর সেইসঙ্গে মামার প্রাচীন ইতিহাস—মামার পূর্ব-জীবনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সেই অখাদ্য নরখাদককে খাদ্য করার লালায়িত কাহিনী স্মরণ করে মিলিয়ে নিলে এ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

গ্র্যান্ড মামাকে পারা গেছল—মামার মামাকে হয়তো পারা যায়—সে তো আর সাক্ষাৎ মামা নয়—কিন্তু এই নিজের মামার স্নেহের ক্ষুধা থেকে নিজেদের বাঁচানো কী করে সম্ভব শিশির ভাববার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে! লিলি তো খাটে লম্বা হয়ে পড়েছে! ভয়ে হাতে-পায়ে খিল লেগে গেছে তার—মুখে কথা নেই।

'ভয় কী, আমি ঠিক উদ্ধার করব।' মনে-মনে দমে গেলেও লিলিকে সে দম দেয়—তার প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করে ঃ 'আমার একার হলে কথা ছিল না! আমি না-হয় মামার পেটে চলে যেতে পারতুম—হাসতে- হাসতেই চলে যেতুম! লোকে পরের জন্যে প্রাণ দেয়—মামা তো আর কিছু পর নয়। বৃষকেতু কার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল? নিজের অস্থি-মজ্জা-মাংস দিয়ে অতিথিসৎকার করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি—দাতাকর্ণের গল্পে পড়েছিস তো? বৃষকেতু কি আস্ত একটা বৃষ ছিল—গোরু ছিল একটা? আদৌ না। ঠিক কাজই করেছিল সে।'

'দাতাকর্ণ পড়েছি।' লিলি ঘাড় নেড়ে জানায়।

'হ্যাঁ কর্ণের মতো দাতা নেই। আগে পরের কথায় কান দিলেই, তারপরে আর না-দিয়ে পার নেই! শেষে নির্ঘাত প্রাণ দিতে হয়। এইজন্যেই পরের কথায় কর্ণদান করা নিষেধ। মামার কথা শুনে এ-ঘরে না এলে তো আমাদের এই ফাঁদে পড়তে হত না! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—সে-কথা যাক। আমি তো একা নই—একা হলে মরতে আমার বাধা ছিল না, তুই আছিস যে। যে করেই হোক, ছোট বোনকে আমার বাঁচাতে হবে।'

দাদার আশ্বাসে, ভয়ানক ভরসা পেয়ে, লিলি এতক্ষণে উঠে বসে। ওই ছোট্ট দাদাটির ওপর তার অগাধ আস্থা। 'কী করবে ভেবেচ?' সাগ্রহে সে জানতে চায়।

'দেখি কী করা যায়। মামাকে বলে-কয়ে দেখি—ওকে ছেড়ে দেয় যদি। আমারই আধখানা রোস্ট আর আধখানা টোস্ট করে—আমার ওপর দিয়ে চুকে যায় যদি!'

'না—না—না!' লিলি বলে ওঠে ঃ 'তা হয় না।'

'কেন হয় না, শুনি? একটা মামা, একলা মামা—কত খাবে?'

'উঁহু, তা হলে আমি বাদ যেতে রাজি নই।' লিলি ঘোরতর আপত্তি জানায়—শিশির যদি

BanglaBook.org

না বাঁচে তা হলে সেও সহমরণে যাবে। মামার উদর-পথে সেও তবে দাদার সহযাত্রী।

'আমি তোকে এই দুটো দিয়ে দেব।' শিশির লিলিকে ডিম দুটো দেখায়—'এর একটা তোর, একটা আমার—গ্র্যান্ড মামা দিয়েছে। আমারটাও তোকে দিয়ে দেব। তুই দেশে গিয়ে এই বেচে খুব বড়লোক হতে পারবি, কত যে চকোলেট কিনতে পারবি তার ইয়ত্তা নেই। আর ঘরভর্তি চীনেবাদাম!" শিশির লিলিকে লোভ দেখায়।

'না না—সে হয় না।' লিলি তথাপি ঘাড় নাড়ে।

'তা হলে তো ভারি মুশকিল হল! দুজনকেই দেখচি উদ্ধার করতে হবে আমায়। ভারি শক্ত কিন্তু।'

শক্ত তো বটেই—শিশির ঘাড় হেঁট করে ভাবে। একজনকে বাদ দেয়ানো যেত—কিন্তু দুজনকে বরবাদ করতে মামাকে রাজি করানো যাবে কি না সন্দেহ।

লিলির সহসা কৌতূহল হয় ঃ 'মামা হঠাৎ আমাদের খেতে চাইছে কেন? আমরা কী করেছি?'

'বাঃ, মামার ধনরত্ন উদ্ধার করে এনে দিলুম যে!'

'সে তো ভালোই করলুম মামার।'

'ভালোই তো! মামাও তো সেটা ভালোভাবেই নিয়েছে। আর তাতেই আমাদের হল কাল! মামা আমাকে ভালোবেসে ফেলল যে! আমার খাতিরে তোকেও আবার ভালোবাসল কিনা!'

লিলি শিউরে ওঠে—স্টেশন থেকে তাদের নিয়ে আসার সময়ে মামার গল্প তার মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের অভিধানে—সেই নরখাদক গলাধঃকরণের পর—সেই বনভোজনের পর থেকে—ভালোবাসার একটি মাত্র অর্থ! যাকে ভালোবাস তাকে ভালো জায়গায় বাসা দাও! আর হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে উদরের মতো এত উপাদেয় স্থল আর কোথায়?

ঘি গলবার কলকলধ্বনি ওদের কানে আসে। খড়খড়ি ফাঁক করে সন্তর্পণে ওরা দেখে, এরমধ্যেই মামা ইটের পাঁজা সাজিয়ে, দরজার অদূরেই প্রকাণ্ড একটা উনুন খাড়া করেছে। আর সেই উনুনের মাথায় পেল্লায় এক কড়াই—! এইমাত্র তলাকার শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হল—এ-ধারেও দাউদাউ করে উঠেছে আর ও-ধারেও কড়াইয়ের ওপরে ঘি কলকল করতে লেগে গেছে।

উনুনের একপাশে স্তূপীকৃত কাঠ—আর তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা ফাঁক! এরমধ্যেই মামা ইটে আর কাঠে, আর ঘৃতাহুতিতে তাঁর দক্ষযজ্ঞ অনেকখানি এগিয়ে এনেচেন!

ঘিয়ের কলকলধ্বনি শুনে আর জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে শিশিরদের চোখ তো ছানাবড়া!

'হায় মামা, তোমার মনে শেষে এই ছিল,' দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে-সাথে লিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঃ 'তুমি যে আমাদের হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করবে, তা ভাবতেও পারিনি!'

উনিশ ঃ প্রাণ নিয়ে টানাটানি লেন

ঘি যতই কলকল করে, লিলির চোখ ততই ছলছল করে। শিশির বলে ঃ 'ঘিটা ভালো নয়—শ্রীঘৃত নয়—বিশ্রী ঘি!'

লিলি কোনও জবাব দেয় না।

'চর্বির ভেজাল আছে, গন্ধে টের পাচ্ছিস নে?' শিশির পুনরপি বলে।

জ্বাল দেওয়ার সাথে-সাথেই জালিয়াতি জানা গেছল—দুর্গন্ধে মাত করে দিয়েছিল চারধার। কিন্তু চর্বির ভেজাল থাকলেই বা কী, খাঁটি ঘিয়ের তুলনায় তার ভাজবার ক্ষমতা কি কিছু কম? হাড়-মাস ভাজা-ভাজায় সেই বা কম যায় কীসে? আর চর্বির ভর্জিত হলেই বা মামার চর্বিতচর্বণের পক্ষে অসুবিধা কোথায়? বড় জোর ব্রজেশ্বরের অম্বল হতে পারে—গলা জ্বালা, পেটের অসুখ অবধিও

BanglaBook.org

গড়াতে পারে হয়তো—কিন্তু তাতে আর গরহজম-হওয়াদের কী সান্ত্বনা?

লিলি চুপটি করে থাকে। ঘিয়ের বিষয়ে কেন যে অত খুঁতখুতে হতে হবে সে ভেবে পায় না।

'মামা তো কই এখনও কাটছে না আমাদের?' শিশিরকে একটু যেন ব্যস্তই দেখা যায় ঃ 'আস্তই চাপিয়ে দেবে নাকি?'

'আস্তে-আস্তেই টের পাব।' লিলি বলে। দাদার এত ব্যগ্রতা তার ভালো লাগে না।

'কাটুক কি কুটুককি আগুনেই চাপাক, দরজাটা একবার খুললে হয়।' শিশির বলে ঃ 'একটা মতলব এঁটে রেখেছি।'

'কী মতলব!' লিলির এবার আগ্রহ দেখা দেয়।

'আমার কাছে সেই প্ল্যানখানা রয়েছে কিনা! মামাকে একটু ধাপ্পা মারতে হবে। মামাকে বলতে হবে যে, এই রত্নটি তো কেবল নমুনামাত্র! এরকম আরও বিস্তর সেই গুপ্তকক্ষে লুকোনো রয়েছে। এই প্ল্যান ধরে খুঁজে-পেতে বার করতে হবে। এই না শুনলে মামা নিশ্চয়ই লোভে পড়ে তক্ষুনি সেই ঘরে খুঁজতে যাবে—আমাদের রান্নাবান্না আপাতত স্থগিত রেখেই চলে যাবে। আর আমরা সেই ফাঁকে—।'

'বুঝেছি।' বাধা দিয়ে লিলি বলে ওঠে ঃ 'কিন্তু মামা ভারি হুঁশিয়ার, এমন তৈরি রোস্ট ফেলে রেখে—বেগুনি-ফুলুরির ফলার ফেলে—।'

'আরে, ভোজনের আগে দক্ষিণা পেলে কে না খুশি হয়? মামা তো মামা! দেখিস না কেন, কেমন দৌড় মারে—দেখিস তখন!'

মামার আগমনের প্রত্যাশায়—দ্বারোদঘাটনের অপেক্ষায়—গ্র্যান্ড মামার ফেরত দেওয়া প্ল্যানখানা পকেট থেকে বার করে শিশির। প্ল্যানটার পিছনে—অপর দিকে—এ আবার কীসের খসড়া? আরেকখানা নকশার মতো দেখা যাচ্ছে যে! এ আবার আরেক কোন গুপ্তকক্ষের হদিস?

শিশির বিস্মিত হয়ে নতুন নকশাটার ওপরে চোখ বুলোয়। যে-ঘরে তারা বন্দি রয়েছে, অনেকটা সেই ঘরের ছক মতন যেন। ছকের নির্দেশ মতো অনুধাবন করে—ঘরের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে একটা কোণে গিয়ে তারা হাজির হয়।

সেখানে কোণঠাসা হয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিশির ঘা লাগায়।

অবাক কাণ্ড! ঘা মারতেই জায়গাটা যেন নড়তে থাকে—তারপর আস্তে-আস্তে সরতে-সরতে অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়, সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক বেরিয়ে পড়ে। সুঁড়িপথ দেখা যায়।

'টেবিলের ওপর থেকে মামার টর্চটা নিয়ে আয় তো লিলি।'

গুহার মধ্যে আলো ফেলতেই যত দূর স্পষ্ট হয় তাতে সুড়ঙ্গ বলেই সন্দেহ হয় বটে! কিন্তু সুড়ঙ্গরূপী এই সন্দেহকে অনুসরণ করে এগুনো যায় কি না—এ-পথ গেছে কোনখানে? ইহাই প্রশ্ন!

সুড়ঙ্গটা যেমন নোংরা তেমনি আবার সন্দেহবাদী—কিন্তু যতই বিশ্রী হোক বিশ্রী ঘিয়ের পথ পরিত্যাগ করতে হলে এ ছাড়া সম্প্রতি অন্য পথ আর নেই, এই ভেবে টর্চ হাতে, ওরা সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়ায়।

সুড়ঙ্গটা সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে নেমে গেছে। কোনওরকমে মাথা হেঁট করে অধোবদনে নামা চলে। শিশির যায় আগে-আগে—লিলির হাত ধরে। যতই এগোয়, বিচ্ছিরি সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ওদের নাকে এসে কামড় লাগায়।

খানিক দূরে এগুতেই সিঁড়ি কাঁপতে থাকে—ইটের গাঁথনি হলেও, কেন বলা যায় না, তাদের পায়ের ভারেই যেন টাল খায়। সামনে-পিছনে—এ-ধার ও-ধার থেকে এক-আধখানা ইট খসে পড়ে।

'এই! পা টিপে-টিপে হাঁটছিস কী? তাড়াতাড়ি আয়। চারধার কাঁপছে, দেখছিস না?' শিশির তাড়া লাগায় লিলিকে।

'ভূমিকম্প না কি দাদা?' লিলি ভয় খেয়ে যায়! সুড়ঙ্গটা ওদের পিছু-পিছু পড়তে-পড়তে—

BanglaBook.org

ধরাশায়ী হতে-হতে আসছে বলে মনে হয়।

'তা হলেই তো হয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যেই ইঁদুর-মরা হতে হবে।

সুড়ঙ্গের পিছনের পথ অবরুদ্ধ —তাদের অনুসরণ করে বুজে এসেছে—ক্রমশই বুজে আসচে। টর্চ ফেলেই দেখতে পায় ওরা। লিলিকে সাপটে নিয়ে শিশির তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সুড়ঙ্গপথের গোটাকয়েক বাঁক ঘুরে, নিচের তলে নেমে, নালার মতন একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে আসে। বাইরের আলোতে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ে!

এ কী! সত্যিই তো! প্রকাণ্ড অত বড় বাড়িটা অমন করে কাঁপছে কেন? পায়ের মাটি স্থির অথচ—ভূমিকম্প তো নয়! কম্পান্বিত বাড়ির কাছ থেকে সভয়ে ওরা সরে এসে দূরে এসে দাঁড়ায়।

দেখতে-না-দেখতে সমস্ত বাড়িটা হুড়মুড় করে—হুইচই করে ভেঙে পড়ে—ইটে-কাঠে-কড়ি-বরগায় পুঞ্জীভূত হয়ে প্রত্যক্ষ বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

কুড়ি ঃ বিনা টিকিটের যাত্রী

'বাড়িটা ভারি ভয়াবহ, কেন যে সেই বর্মিজটা মামাকে এ-কথা বলেছিল বোঝা যাচ্ছে এখন।' শিশির বলে।

'তুমিও তো বলেছিলে বাড়িটার চালচলন ভালো নয়'—লিলি মনে করিয়ে দেয়।

'বলেছিলাম কি না? প্রথম দর্শনেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। 'শিশির নিজের কথার প্রমাণ লাভ করে পুলকিত হয় ঃ 'দেখলি তো চালচলনটা? আরেকটু হলে আমাদের ঘাড়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কী! নিজের চোখেই তো দেখলি!'

'হুঁ। এরকম গায়ে-পড়া বাড়ি ভালো না।' লিলি মুখ ব্যাঁকায়।

'কিন্তু মামা? মামা যে ঘিয়ের কড়াই নিয়ে ওর মধ্যেই থেকে গেল রে!' শিশির লাফিয়ে ওঠে ঃ 'চাপা পড়ে রইল যে! মামাকে তো উদ্ধার করতে হয়।'

'কিন্তু মামা যদি আবার খেতে চায়?' লিলির ভীতি প্রকাশ পায়।

'সে তখন দেখা যাবে। আগে তো মামাকে বাঁচাই।'

শিশির এক-একখানা করে ইট সরাতে আরম্ভ করে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় নব্বই-আশিখানা ইট সরিয়ে ফেলে—লিলিও তার সহযোগিতায় এগোয়—কিন্তু দুজনে মিলে উঠে পড়ে লাগলেও সে আর ক'খানা ইট! পর্বতপ্রমাণ ইটের পাঁজা তখনও তাদের সামনে স্তূপাকার। ধরাশায়ী অট্টালিকার নিঃশব্দ অট্টহাসির আকর্ণ-বিস্তারের সামনে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরও খান দশেক ইট হটিয়ে শিশির হাঁফ ছাড়ে ঃ 'এক শতাব্দীতে কি পেরে উঠব? এইসব ইট ঠাঁইনাড়া করতেই কলিযুগের বাকি ক'টা দিন কেটে যাবে।'

'মাগো! কম কি ইট!' লিলিও যোগ দেয় ঃ 'এই ক'খানা নাড়তে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল!' লিলি নিজের ফোসকানো হাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলে। স্নান ত্রিশেক সে নড়িয়েছিল—কিন্তু তাই নড়াতেই তার নড়াতে ব্যথা হয়ে গেছে।

'তা হলে—তা হলে আর কী হবে!' শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'এক-একখানা করে ইট সরিয়ে মামার কাছ অবধি গিয়ে পৌঁছতেই আমাদের চুল-দাড়ি সব পেকে যাবে। আমরা বুড়ো হয়ে যাব।'

দাড়ি-পাকার কথায় লিলির আপত্তি করার ছিল, শিশিরের দাড়িই হয়নি—এবং লিলির—লিলির কোনওদিনই হবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—ওটা পাকা কথা। তবু বয়স বাড়ার কথাটা মেয়েদের কাছে পছন্দসই কথা নয়, লিলিকে কাজেই চেপে

BanglaBook.org

যেতে হয়।

'আর ততদিনে কি ওই ইষ্টক-সমাধির মধ্যে মামা বেঁচে থাকবে?' শিশির নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে ঃ 'আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

'এতক্ষণই বেঁচে আছে কি না কে জানে!' লিলি সদুত্তর দেয় ঃ 'মামা পিষ্টক হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়! ছাত-চাপা পড়লে ছাতু না-হয়ে যায় না।'

'তাহলে তো হয়েই গেছে! তবে তো বৃথা চেষ্টা! তা হলে আর এ-কাজে হস্তক্ষেপ করা কেন?' শিশির ইটের পিঠ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

'মামার কোনও দোষ ছিল না। সেই বুনো জংলিটাই অনর্থক মামার পেটে গিয়ে মামার স্বভাব বিগড়ে দিয়েছিল। সে-ই যত নষ্টের গোড়া।'

এতক্ষণে লিলির মুখে তবু একটু মামার গুণকীর্তন শোনা গেল। পরলোকগত মাতুলের জন্যে শোকপ্রকাশের সুযোগ এল তার।

'হুঁ! মামা-লোকটা ভালোই ছিল রে। দোষে-গুণে মানুষ।' শিশিরও মামার জন্য আফসোস করে ঃ 'মামা হলে কী হবে, ভালোবাসতে জানত!'

'ভয়ানক।' বলতে না-বলতে লিলির চোখ-মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে আসে ঃ 'এখানে আর দাঁড়িয়ো না দাদা! আমার ভারি কান্না পাচ্ছে।'

'চল, আমরা এখান থেকে যাই। এই মৌলমীন থেকেই চলে যাব। এখানে আর কী জন্যে? আজই যে-জাহাজ ছাড়বে তাইতে চেপে বাড়ির দিকে পাড়ি দিই চ।'

জাহাজঘাটার দিকে ওরা পা চালায়। লোকের মুখে-মুখে পথের বার্তা নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলে।

'বাঘকে কেন যে মামা বলে এতদিনে জানলাম।' যেতে-যেতে জানায় শিশির ঃ 'আমাদের মামাকে দেখেই জানা গেল। কিন্তু যাই বল লিলি, মামার মতোই মামা ছিল আমাদের। অমন বাঘা মামা প্রায় হয় না।'

মামার গৌরবে শিশির গর্ববোধ করে।

'তা ঠিক।' লিলিও গর্বিত হয় ঃ 'কিন্তু আবার চাঁদকেও তো মামা বলে থাকে।'

'সে তোদের বেলা। যে-মামা আমাদের ভাগনেদের বেলা বাঘা-মামা, কেবল আমাদের তাড়া করে ফেরে, সেই মামাই আবার তোদের ভাগনীদের বেলায় চাঁদা-মামা—কথায়-কথায় কেবল চাঁদা দেয়।'

লিলি সলজ্জ হয়ে চুপ করে থাকে। ভাগনী-সুলভ অভিজ্ঞতায় এ-কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

'কিন্তু আমাদের এই মামার বেলা সে-কথা বলা চলে না।' শিশির বুক ঠুকে মামার সমর্থন করে ঃ 'আমাদের মামাকে অমন পক্ষপাতী বলতে পারবে না কেউ। একদম একচোখোপনা ছিল না—দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই না রে লিলি?'

এ-কথাও অস্বীকার করা কঠিন। মামার সমদৃষ্টির কথা মনে পড়তেই লিলি শিউরে ওঠে।

জাহাজঘাটায় গিয়ে জানা যায়, রেঙ্গুনের জাহাজ ঠিক তক্ষুনি ছাড়বে। টেনাসেরিম থেকে আসা জাহাজ, সেখান থেকে ছেড়ে, রেঙ্গুন, একীয়াব, চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে।

টিকিট করার সময় ছিল না—জাহাজের পাটাতন ওঠাচ্ছিল—ছুটোছুটি করে গিয়ে ওরা উঠে পড়ে। ওরাও ওঠে, পাটাতনও ওঠানো হয়। জাহাজও সঙ্গে-সঙ্গে ভোঁ দিয়ে সরতে থাকে।

জাহাজের টিকিট-চেকার যাত্রীদের টিকিটের খোঁজ নিয়ে ফিরছিলেন। ঘুরতে-ঘুরতে শিশিরদেরও কাছে আসেন—তাড়াতাড়িতে টিকিট করা হয়নি—জানাতে বাধ্য হয় শিশির। তা ছাড়া—টিকিট কেনার টাকাও তো তাদের কাছে ছিল না।

BanglaBook.org

'অ্যাঁ? একি তোমরা সরকারি রেলগাড়ি পেয়েছ নাকি, যে বিনা টিকিটে লম্বা দেবে?' ব্যাপার দেখে জাহাজের কর্মচারীটির আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায়।

শিশির হাতের আংটি খুলে দেয় ঃ 'এতে আমাদের টিকিট হয় না? কলকাতা পর্যন্ত টিকিট?'

'এতেও যদি না হয়, আমার সোনার দুল আছে!' লিলি কানের দুল নেড়ে বলে। বলতে গিয়ে দুলের দোলনা লেগে ওর সোনালী মুখ লাল হয়ে ওঠে।

একুশ ঃ রেঙ্গুনী জাহাজের দরদস্তুর

জাহাজের কর্মচারী আংটিটা অঙ্গুলিগত করে বললেন, 'তোমাদের কিন্তু তলাকার ডেকে থাকতে হবে। তোমাদের টিকিট নেই কিনা!'

'খুব রাজি।' ঘাড় নেড়ে জানাল শিশির।

জাহাজের ওপরের ডেকে যত ডেক-প্যাসেঞ্জার—সাধারণ যাত্রী যত। তার থেকে একটা থাক আলাদা-করা—বেশি-ভাড়ার যাত্রীদের জন্যে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের সারি। আর নিচের ডেকটায় যত মালপত্র বোঝাই।

সেই মালঝোর অন্তরালে—মালের সামিল হয়ে এককোণে শিশির ও লিলির জায়গা করে দেওয়া হল।

'এইখানে তোমরা লুকিয়ে থাকবে, বুঝলে? সাবধান, ওপরের ডেকে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরো না যেন।' কর্মচারীটি বিশেষ করে ওদের বলে দিলেন। গতিবিধির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে যদি ইতরবিশেষ ঘটে, যদি ওরা ধরা পড়ে ফের, তখন আর উনি ঝুঁকি নিতে পারবেন না, সে-কথাও বাতলে দিতে কসুর করলেন না।

'না না। উঁকিঝুঁকি মারব কেন?' বলল লিলি ঃ 'ওসব খারাপ কাজে আমরা নেই।'

অলঙ্কৃত আঙুলটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কর্মচারী বললেন ঃ 'এ তো গেল তোমাদের রেঙ্গুন পর্যন্ত যাবার ভাড়া। তারপর রেঙ্গুন থেকে একীয়াব—আচ্ছা, সে তখন রেঙ্গুনে গিয়ে দিলেই হবে।'

এই বলে লোকটি লিলির কানের দিকে প্রলুব্ধ চোখে তাকান।

'আমার দুল তো আছেই। তাই দেব।' পরবর্তী ভাড়ার ভার লিলি নিজের স্বকর্ণে অর্পণ করে।

'হ্যাঁ, তোমার দুল তো রয়েছেই! আমি সেই কথাই বলছিলাম।' কর্মচারীটির খুশি-খুশি মুখ হাসি-হাসি হয়ে ওঠে ঃ 'তোমাদের মতো ভালো ছেলেমেয়েদের কাছে আবার ভাড়ার জন্য ভাবনা!'

'কেন, দুল কেন? আমার ফাউন্টেনপেন নেই?' শিশির নিজের ফাউন্টেনপেন দেখায়।

ফাউন্টেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে লোকটি বলে ঃ 'উঁহু, এই কলমে রেঙ্গুন থেকে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পোষাবে না। এ কী কলম? এ তো পার্কার নয়। শেফারও নয় তো! এ তো দেখছি আড়াই টাকা দামের জাপানি পাইলটপেন। পার্কার ডু ফোল্ড হলেও না-হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।'

'আমার হাতঘড়ির বদলে হয় না?' শিশির নিকেলের রিস্টওয়াচটা স্বহস্তে তুলে ধরে। হাত ঘুরিয়ে উঁচু করে ঘড়িটা দেখায়।

'হ্যাঁ, ওটা পেলে হয়তো তোমাদের একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তা হলে তোমাদের আরও নিচে যেতে হবে। এর তলায় ইঞ্জিন-ঘরের পাশে কয়লার ভাঁড়ারে থাকতে হবে তা হলে। তোমাদের তাতে একটু কষ্ট হতে পারে হয়তো। অবশ্যি এখান থেকে না, রেঙ্গুন থেকেই বলছি।

BanglaBook.org

'বারে! তা কেন, আমার দুল আছে তো!' লিলি আবার দুলে ওঠে।

'থাকলই বা! দুল নিয়ে অত টানাটানি কীসের?' শিশির লিলির দাতাকর্ণতায় বাধা দেয় ঃ 'আচ্ছা, যদি আমার ঝরনাকলম আর হাতঘড়ি দুটোই দিই—আর—আর যদি—। না, তা হয় না।'

'হ্যাঁ, তা হলে হয়।' কর্মচারীটি জানায়।

'তাই বলছিলাম, লিলি ওপরে এই ডেকে থাক আর আমি যদি নিচে কয়লার ঘরে যাই—?'

'না না না!' লিলি চিৎকার করে ওঠে।

'তাই তো বলছিলাম, তা হয় না। লিলি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আমি পারি, হ্যাঁ, আমি খুব পারি। কিন্তু আমি একলা থাকতে পারলেও ওর মন কেমন করবে কিনা! ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আর আমিও চাই না যে, ও আমাকে ছাড়া কখনও থাকে। তা হলে?'

'তা হলে তোমরা দুজনেই একসাথে থাকো। তাতে আমার আপত্তি নেই। রিস্টওয়াচ আর ফাউন্টেনপেন দুটো পেলে আমি তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তারপরে?'

'তারপরে? তারপরে তো আর কিছু নেই।' শিশির বিষণ্ণ গলায় বলে।

'কিন্তু তারপরেও, একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম রয়েছে।'

'আর আমার দুলজোড়া রয়েছে কী জন্যে?' লিলি গরম হয়ে ওঠে। 'শুনি একবার?'

'লিলি? ওগুলো মার দেওয়া—তোমার জন্মদিনের উপহার। মনে আছে?'

'মার কাছ থেকে কি আর আমি পাব না?' আমার সব জন্মদিন কি ফুরিয়ে গেছে? আমার আরও কত জন্মদিন আসবে।'

'ছিঃ, লিলি! অমন কথা মুখেও আনিসনে।'

'মানে? আমার জন্মদিন আসবে না, তুমি বলতে চাও?'

'না না, ওই দুল দেওয়ার কথা। আর যেন ও-কথা না শুনি।'

'তা হলে—একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তার কী হবে?' লোকটা মনে করিয়ে দেয়। (মেমরি তার ভারি ভালো)

'দেখুন, আমার জুতো! খুব দামি জুতো। বাবার কিনে দেওয়া। আর আমার শার্টটাও কেমন চমৎকার দেখুন! খুব দামি সিল্ক। এগুলো দিলে হয় না?'

'ওগুলো?' লোকটা ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে তাকায় ঃ 'তা হলেও হতে পারে। খুব কষ্টসৃষ্টেই হবে। আমার সেজ ছেলেটা মাথায় অনেকটা তোমার সমান। সে পরতে পারবে। হাফপ্যান্টটাও দেবে তো? ওটা তোমার তত মন্দ না।'

'নাঃ, হাফপ্যান্ট দেওয়া যায় না।' শিশির সলজ্জ দৃঢ়তার সহিত বলে।

'আমি তোমাকে একটা গামছা দেব না হয়।'

'তা হলে হয়তো হতে পারে।' শিশির প্রস্তাবটা পুনর্বিবেচনা করে দেখে ঃ 'বেশ পরিষ্কার গামছা?'

'পরিষ্কার বইকী!' লোকটা প্রলোভনের সামগ্রীটির চতুর্দিক উন্মুক্ত করে ঃ 'একটু আধময়লা এই যা! সারেংদের গা-মোছা কিনা! তা বলে কয়লাঝাড়া ঝাড়ন নয় কিন্তু।'

ততটা নিন্দনীয় নয় জেনেও শিশির চুপ করে থাকে—গামছার বাঞ্ছনীয়তাটাই চিন্তা করে বোধহয়।

লিলি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না ঃ 'দাদার প্যান্টের বদলে আমার জুতো দিলে হয় না? ওই পচা প্যান্টের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশি! আপনার ছোট মেয়ে পরতে পারবে।'

লোকটি লিলির শৌখিন জুতোর দিকে কটাক্ষ করে। পাছে লোকটা 'না' বলে বসে কিংবা দাদার দিক থেকে বাধা এসে পড়ে লিলি তাই তক্ষুনি-তক্ষুনি জুতো খুলে ফেলে—সেই দণ্ডেই ওদের

BanglaBook.org

পদচ্যুত করে দেয়।

জুতোজোড়া হস্তগত করে লোকটা ভ্রূক্ষেপ করে ঃ 'বাঃ, বেশ বাহারি জুতো তো! মেয়ে কেন—আমার বউই পায় দেবে'খন! আমার বর্মী বউ—তার খুদে-খুদে পা!'

'তা হলে আর তাকে পায় কে!' লিলি হেসে ফেলে। 'এই জুতো-পায় দেখবেন কেমন খুর-খুর করে চলচে।'

'হ্যাঁ, তা হলে তুমিও রিস্টওয়াচ ফাউন্টেনপেন—জুতো-জামা সব দিয়ে দাও। নিয়ে রাখি এখুনি।'

'এখুনি? এখুনি কেন? এখন তো আমরা রেঙ্গুনেই পৌঁছয়নি। রেঙ্গুন থেকে একীয়াব। একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তখন তো! তখনই দেব।' শিশির বলে।

'তা কি হয়? টিকিট লোকে গোড়াতেই কাটে। তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষরা ভারি ছটফটে। তোমরা ঠিক ওপর-নিচ করবে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এ-ধারে ও-ধারে উঁকি ঝুঁকিও মারবে, আমি জানি। আর ধরাও পড়ে যাবে সেটাও ঠিক।'

'বাঃ, তা কেন করব? ধরা পড়তে যাব কেন? তাতে তো আমাদেরই সর্বনাশ।'

'আর আমারই বা কী পৌষ মাসটা শুনি? তোমরা ধরা পড়ো তাতে ক্ষতি নেই—তোমরা গোল্লায় যাও না! কিন্তু ওই জিনিসগুলো সেইসঙ্গে ধরা পড়লে সমস্তই তো গেল! তাতে আমার লাভ? আর কি তখন ওগুলো আমার হাতে আসবে? কার হাতে যাবে কে জানে! তখন আমায় ক্ষতিপূরণ কে দেবে, শুনি?'

অগত্যা শিশিরকে তখনই জামা-জুতো, হাতঘড়ি আর ঝরনাকলম হাতছাড়া করতে হয়। শিশিরের থাকে কেবল সেই হাফপ্যান্ট আর একটা সামারকুল। জালি-দেওয়া গেঞ্জিটার ওপরেও তার নজর পড়েছিল, কিন্তু একটু পরীক্ষা করেই সে ওটাকে বরখাস্ত করে দিল—'নাঃ, অনেক কালের গেঞ্জি! তা নইলে এত ফুটো-ফুটো কেন? গেঞ্জিটার আগাপাস্তলা ছেঁদা হয়ে গেছে—হাঁড়-পাঁজরায় ঝাঁঝরা—'

অপদার্থটিকে বাদ দিয়ে বাকি পদার্থগুলিকে কুক্ষিগত করে লোকটি সহাস্য হয়ে উঠল—'বেশ-বেশ! তোমরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছলে আমাদের জাহাজ কিন্তু কলকাতায় যাবে। তোমরাও তো কলকাতাতেই নামবে। তাই না? তা হলে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার ভাড়া?'

সর্বস্বান্ত শিশিরের ওপর দ্রুত বিচরণ করে লোকটার লোলুপ চাহনি লিলির কানের গোড়ায় গিয়ে আটকে যায়। লিলির দুলের সঙ্গে দোল খেতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আরও দূর—তার মনে আরও দুরাশা।

'আমার দুল?' লিলিও দোদুল্যমান!

'তুই থাম। তোকে কর্তাত্বি করতে হবে না। তা হলে মশাই, চট্টগ্রামেই আমাদের নামিয়ে দেবেন।'

'চট্টগ্রামেই নেমে যাবে?' লোকটা অবাক হয়।

হ্যাঁ, সেখানেই নামিয়ে দেবেন দয়া করে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আমরা বাড়ি যাব।'

'পায় হেঁটে? চাটগাঁ থেকে আসাম?' লিলি আকাশ থেকে পড়ে—পড়বার সাথে-সাথেই তার পা ব্যথা করতে থাকে। বর্মার এত দৌড়ঝাঁপের পর আবার আরেক দফা হাঁটাহাঁটি—চট্টগ্রাম থেকে তাদের অট্টালিকা কদ্দুর কে জানে! ব্যাপারটা তার একেবারেই ভালো লাগে না।

'পারবি না? এমন কী দূর?' শিশির ওকে উৎসাহ দেয় ঃ 'আমাদের মামা যদি আসাম থেকে পদব্রজে বর্মা আসতে পারে তা হলে আমরা কি চট্টগ্রাম থেকে হাঁটন দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না? খুব পারব। একহাঁটায় মেরে দেব—দেখে নিস।'

'হাঁটতে হবে না!' লিলি বলে ঃ 'সেখান থেকে রেলগাড়ি করেই আমরা বাড়ি ফিরতে পারব! চাটগাঁয় আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে। সে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে!'

BanglaBook.org

'চাঁটগাঁয় বন্ধু আবার তুই কোত্থেকে পেলি?' শিশিরের তাজ্জব লাগে।

'চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে।... পেনফ্রেন্ড বলছিনে?' লিলি বলে।

'পেনফ্রেন্ডরা কিছু না! বলে প্লেজার-ফ্রেন্ডরাই কোনও কাজে লাগে না তো পেনফ্রেন্ড! "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায়-হায় কেহ কারও নয়।" তোর অভাবের সময়ে কোনও বন্ধুই নেই—বইয়ে পড়িসনি?'

'আমার বন্ধু সেরকম নয়।' লিলি নিজের বন্ধুর গুমোরে গুমরে ওঠে।

'বই ধার চাইলেই বন্ধুত্ব চলে যায়! বই ধার দিলেও যায়—কিন্তু সেইসঙ্গে বইও যায়। আমারও পেনফ্রেন্ড ছিল রে! আমিও তাকে দু-একটা ভাবের কথা লিখেছিলাম, তাইতেই সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে! অভাবের কথা কিছু লিখিনি, তবু সে কী ভাবলে কে জানে—হয়তো ভাবলে ভাব জমিয়ে বই-টই কিছু ধার নেবার মতলবে আছি।'

'ছেলেরা আবার বন্ধুত্ব করতে জানে? দূর দূর!' লিলি এক ফুৎকারে যাবতীয় বালকসুলভ বন্ধুত্ব উড়িয়ে দেয়।

'তোর মেয়েবন্ধু না বেঁকে দাঁড়ায় শেষটায়! পেনফ্রেন্ড শেষে পেনফুল ফ্রেন্ড না হয়ে ওঠে।'

'হয় তো বয়েই গেল। আমার কানে কি কিছু নেই? চাটগাঁতেই এটা আমি বেচে দেব তা হলে। আর কারু কথা তখন শুনব না। পা আমার মাথায় থাক! হাঁটাহাঁটি আমার পোষায় না বাপু।'

বাইশ ঃ ছাগলের ভাসমান রাজ্য

দুরাশাপরবশ ব্যক্তিটি হতাশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামের উপকূলে (ভবিষ্যৎ বাচ্যে), পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর শিশির-লিলি তাদের এলাকার এধারে-ওধারে ঘুরে-ফিরে দেখতে বেরুল।

শিশির লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওপরে না গেলেই হল। উন্নতির মূল ওই যে সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে ওতে পদার্পণের লোভ সম্বরণ করলেই যথেষ্ট, তা হলেই নিশ্চিন্তি। ওপর থেকে কেউ আর এখানে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাদের দর্শন দিতে আসছে না নিশ্চয়।

হাঁটাহাঁটি লিলির ততটা না পোষালেও এক জায়গায় পা জড়িয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? তা ছাড়া, লম্বা-লম্বা পা ফেলে ছোটখাটো হন্টন লিলির ভালোই লাগে।

একধারে প্যাক-করা একগাদা পার্শেলের বাক্স—আরেক-ধারে যত রাজ্যের ফলের ঝুড়ির ডালা উন্মুক্ত, উন্মুখ হয়ে কত রকমের ফল ওদের অভ্যর্থনা করছিল। তাদের দু-একজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে—এবং তাদের বাঁচিয়ে ডিঙি মেরে-মেরে ওদের চলতে হচ্ছিল। শিশির লিলিকে বলল, 'বুঝেছিস তো! এরাই আমাদের এই ক'দিনের ফলার। এই সিঙ্গাপুরের কলারা। চট্টগ্রাম অবধি অভিযানের রসদ।'

লিলি বলল ঃ 'যাওয়ার ভাবনাতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি।'

'কর্ম করলেই তার ফল আছে, বাবা বলেন না? তেমনি ফল থাকলে তার কর্মও থাকবে। তবে মুশকিল এই—এত ফল, আর চারটি মাত্তর হাত! বেশি কর্ম করে উঠতে পারব না। এই দুঃখ!'

এক জায়গায় আবার বস্তার পাহাড়! বস্তাবন্দি হয়ে সারি-সারি কী বস্তুরা দাঁড়িয়ে আছে—শিশিররা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। যাই থাক, বস্তা ফাঁক করে দেখার তাদের সাহস হয় না। তাদের নিজেদের যে-অবস্থা, তা হলে হয়তো সেই পাপে নিচের কয়লার ঘরেই নির্বাসিত হতে হবে। এবং সেখানে খুব যে সুবিধে হবে না, তা বলাই বাহুল্য! কয়লারা কেবল যে দৃষ্টিকটু তা-ই নয়—তার ওপরে—যার-পর-নাই অখাদ্য! এমন ফলতা ছেড়ে কয়লাঘাটায় কে যায়?

BanglaBook.org

মোটা-মোটা কাছির দড়া তালগোল-পাকানো—এখানে-ওখানে-সেখানে কুণ্ডলী করে রাখা। লাফ মেরে-মেরে ওরা চলছিল। ডেকের ধারটায় পৌঁছতেই দু-একটা চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে এল।

'অর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌...' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

'পাঁঠা নাকি?' বলল লিলি।

'পাঁঠা তো নিশ্চয়!' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু দুপেয়ে না চারপেয়ে?'

কৌতূহলী হয়ে কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে আর একটু এগুতেই—ব্যা—ব্যা—ব্যা! পরিষ্কার ভাষায় ছাগলাদ্য ব্যাকরণ ওদের কানে এল—এবং তারপরেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হতে সংশয়ের তিলমাত্র অবকাশ রইল না।

ছাগলের পাল তাদের চোখের সামনে।

'ওমা! এত ছাগল কেন এখানে?' লিলি গালে হাত দ্যায়।

'জাহাজে করে রপ্তানি হচ্ছে বোধহয়।' শিশির বলে।

ডেকের সে-ধারটা বেড়ার মতো করে ঘেরাও করা—তার ভেতরে অগুনতি ছাগল। ওই অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাসাঠাসি বন্দিদশায় বেচারীরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। লম্ফঝম্ফ দূরে থাক, স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচির পর্যন্ত কারও উৎসাহ ছিল না। কেবল ওদের মধ্যে দু-একজন—নেতৃস্থানীয়ই বোধহয়—বিশুদ্ধ ব্যাকরণে মাঝে-মাঝে অসন্তোষ প্রচার করছিল। মুখপত্র কিংবা মুখপাত্র হিসাবে প্রেরণাদানের কর্তব্যপালনমাত্র।

'কোথায় এদের ধরে-বেঁধে চালান দিচ্ছে দাদা?'

'আমিও তো তাই ভাবছি। কোথায় আবার ছাগল নেই? কোন মুলুকে ছাগলাভাব? সব দেশেই তো দেদার পাঁঠা—খেয়ে ফুরোনো যায় না?'

'মাগো? কী বিচ্ছিরি গন্ধ!' লিলি নাকে রুমাল দেয়।

'ছিঃ! পাঁঠা বলে ওদের অবজ্ঞা করিসনে। পাঁঠা বলে কি মানুষ নয়? একবার ওরাই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পাঁঠারা অতি নমস্য ব্যক্তি।' শিশির নমস্কারের দ্বারা নিজের কথায় সায় দেয়।

'দক্ষযজ্ঞের গল্প শুনিসনি বাবার কাছে? দক্ষ তার যোগ্যতার কী পুরস্কার পেয়েছিল শিবের হাতে? পাঁঠার মাথা। তার মানে কী? পাঁঠার মতো দক্ষ লোক দুনিয়ায় আর নেই। প্রত্যেক যোগ্য লোককে ভালো করে যাচিয়ে দেখ—দেখবি আসলে একটা পাঁঠা। বাবা-ই এ-কথা বলে—এবং আমি বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত। আমি তো পাঁঠার মাংস পেলে আর কিছু পেতে চাইনে, অমন নিঃস্বার্থপর পরোপকারী জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা ওদের বলিদান করি—তার বদলে ওরা আমাদের বলদান করে।'

'পাঁঠা নয় তো বলদ!' লিলি এককথায় বলে দেয়।

'বলতে পারিস, গোরুরা যদি আপত্তি না করে। বাবা বলেন, পাঁঠারা সামনা-সায়। পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ডকারখানা কারা চালায়—যুদ্ধ-বিগ্রহ যত কারা বাধিয়ে রাখে? পৃথিবীর বড়-বড় কাজ কারা করে? পাঁঠারা। ছোটখাট কর্তৃত্বের চূড়া থেকে বড়-বড় শাসনচক্রের চূড়াতে কারা বসে আছে? হয় একটি—নয় একদল—সেই পাঁঠা। পাঁঠাদের লীলা বোঝা ভার। এক মুখে ওদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা যায় না।' শিশিরের গম্ভীর মুখে প্রবীণের বুলি।'

'মানুষের তা হলে মানুষ হওয়ার এখনও ঢের দেরি আছে, কী বলো দাদা? এখন ওদের পাঠ্যাবস্থা চলচে তা হলে?' লিলিও বাবার মুখ থেকে শোনা শক্ত একটা কথা উচ্চারণ করে দেয়।

'ফলের ঝুড়ির ওখান থেকে কটমট করে আমাদের দিকে চাইছে ও-লোকটা কে রে?' শিশির চকিত হয়ে ওঠে।

'এইমাত্র ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল না?'

BanglaBook.org

'হুঁ। "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে!" শিশির রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দিয়ে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করে।

'গ্র্যান্ড মামার আড্ডায়।' লিলির মনে হয়।

'ঠিক ধরেছিস। গ্র্যান্ড মামাদের দলের কোনও লোক। তা না হয়ে যায় না। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে মনে হচ্ছে।'

'তা হলে—তা হলে কী হবে?' লিলি শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয় ও একা নেই এখানে। গ্র্যান্ড মামার দলবল সবাই এই জাহাজেই যাচ্ছে তা হলে। ওদের তো পরশুদিন পাড়ি দেবার কথা শুনেছিলাম—তা হলে আজকেই—এই জাহজেই—চলল কেন? অ্যাঁ?'

'আমাদের ধরবার জন্যে নাকি?'

'নিজেরা ধরা পড়বার ভয়ে। পুলিশের তাড়ায় বোধহয়। গ্র্যান্ড মামাও নিশ্চয়ই এই জাহাজে চলেছে।'

'কিন্তু লোকটা অমন রেগেমেগে তাকাচ্ছে কেন দাদা?'

শিশিরকে এর উত্তর দিতে হয় না—লোকটা নিজেই, প্রকাণ্ড একটা ছোরা হাতে, বোধহয় সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশ্যেই ওদের দিকে এগুতে থাকে।

তেইশ ঃ পাঁঠায়-পাঁঠায় হল ধূল পরিমাণ!

লোকটা ছুরিকা হস্তে, রজনীর মতো, ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে। শিশির আর লিলি চারিধার অন্ধকার দেখে—সেই আঁধারের মধ্যে কেবল সেই ছুরিখানার চাকচিক্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

'কই? কই সেই গুপ্তধন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বের কর!'

লোকটার প্রথম কথাই কাজের কথা। বাজে কথার লোক সে নয়, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় তার বিরল—ছুরির ইঙ্গিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ সে দেয়।

'এই তো।' হাফপ্যান্টের দুই পকেট থেকে রত্নডিম্ব দুটিকে উদ্ধৃত করে তুলে ধরে শিশির।

'এই দুটো? দুটো কেবল? আর সব কই?'

'আর! আর তো সব গ্র্যান্ড মামার কাছে।'

'গ্র্যান্ড মামা? সে আবার কোন ছুঁচো?'

'ছুঁচো কি না জানিনে—তার নাম বক্কেশ্বর আইচ।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? তিনি তো আমাদের দলের সর্দার! তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক তোদের?' খেঁকিয়ে ওঠে লোকটা।

'মামাতুতো সম্পর্ক। তিনি আমাদের মামার মামা। তিনিই তো এই দুটো আমাদের প্রেজেন্ট দিয়েচেন।'

'প্রেজেন্ট দিয়েছেন !' হাতের ছুরিখানা আমূল নিজের বুকে বিদ্ধ হলেও লোকটা বোধকরি এতখানি আহত হত না। 'তিনি প্রেজেন্ট দিয়েছেন তোমাদের।' নিমূঢ় কণ্ঠে সে বলে। তার হাতের ছুরিখানা—না, হাত থেকে নয়—হাত সমেত খসে পড়ে। হাত লাগাও হয়ে হাঁটুর কাছে ঝুলতে থাকে।

'তিনি ছাড়া আবার কে দেবে! কার দেওয়ার ক্ষমতা?' বলে শিশির।

সে-কথাও তো মিছে নয়! তাদের কর্তা ছাড়া এই ব্যাপারে ক্ষমতাবান আর কারও কথা সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে—স্বহস্তে—এই লোভনীয় মণিরত্ন, নিজের কাছে না রেখে, নিজের অনুচরদের না দিয়ে—কোথাকার কোন ভাগনের ভাগীদারদের ডেকে বিলিয়ে

BanglaBook.org

দেবেন এমন পরমাশ্চর্য কথাও তো ধারণা করা কঠিন। কিছুটা বিশ্বাস—কিছুটা অবিশ্বাস—আর সমস্তটাই বিস্ময় ওতপ্রোত হয়ে সে বলে ঃ 'তবে যে তিনি বললেন তোমরা বাগিয়ে নিয়ে পালিয়েছ!'

'তা কী করে হয়?' লিলি বলে ওঠে এখন ঃ 'আমাদের গ্র্যান্ড মামা কত বড় আর কী জোয়ান—আর আমার দাদা কত ছোট্ট—কতটুকু! সে কি কখনও তাঁর হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে?'

সেও তো একটা কথা। লোকটার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন আরও বেশি মর্মাহত হয়েচে। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ আসে না।

শিশিরের মুখ থেকে আসে ঃ 'তুই যে কী বলিস লিলি! আমি বুঝি বড় হইনি? আমি বুঝি জোয়ান নই? কী যে বলিস তুই!'

'তা হলেও, আমার দাদা ছোট জোয়ান তো!' লিলি দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে—দাদার অভিমান এবং দাদা—দুই কূল বাঁচিয়ে রাখতে চায় ঃ 'সেটা তো তুমি মানবে। একটা ছোট জোয়ান—তা সে যত বড়ই জোয়ান হোক—আসল একটা বড় জোয়ানকে কি গায়ের জোরে হারিয়ে দেবে?'

'দেবেই তো! দিয়েছেই তো!' শিশির বক্ষের বিস্তৃতির ওপরে বাহুর স্ফীতি আমদানি করে আনে, হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বলে ঃ 'তা না হলে এগুলো এই শ্রীহস্তে এল কী করে—শুনি?'

এই অযাচিত বীরত্ব লিলির ভালো লাগে না—ঝুলন্ত ছুরিখানা থেকে তখনও আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অকালযৌবনের ফলে, অকালবার্ধক্যের আগেই দাদার অকালমৃত্যু না ঘটে যায় এই ভয়ে সে সিঁটিয়ে ওঠে ঃ 'আহা, তুমি গ্র্যান্ড মামাকেই গিয়ে জিগ্যেস করো না বাপু—তিনিই এগুলো দাদাকে প্রেজেন্ট দিয়েছেন কি না! তা হলেই তো ফুরিয়ে যায়। তিনিও এই জাহাজেই প্রেজেন্ট আছেন তো!'

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে লোকটার মনে গুমরে-গুমরে উঠছিল—এই সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা—আলপিনের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—ছুরির চেয়েও মর্মভেদী—এই উপলব্ধি! সর্দার হয়ে নিজের দলবলের সঙ্গে তিনি ছলনা করবেন—তাদের ন্যায়সঙ্গত ভাগ, ন্যায্য ভাগ্য থেকে বেদখল করে এভাবে বরখাস্ত করবেন; এই আইডিয়া বরদাস্ত করতেই তার প্রাণে ব্যথা লাগছিল। অন্তরঙ্গদের সাথে এই ধরনের রঙ্গ, নেতৃস্থানীয় তাঁর কাছ থেকে অন্তত আশা করা যায় না। এই কি তাঁর নেতৃসুলভতা?

লাঞ্ছিত কুকুর যেমন করে লেজ গুটিয়ে নেয়, সেইভাবে ছুরিখানাকে নিজের অন্তর্গত করে লুকিয়ে নিয়ে ম্লানমুখে লোকটা উন্নতির পরাকাষ্ঠা সেই সিঁড়িটা ধরে ওপরের ডেকে রওনা হয়।

একটু পরেই গ্র্যান্ড মামা—অধোগতির উপায়—সেই সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

'তোমরা করেছ কী!' হাঁফাতে-হাঁফাতে তিনি বলেন ঃ 'কী সর্বনাশ করেছ বলো দেখি?'

'সর্বনাশ! কেন, কী হয়েছে?' ওদের চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে ঃ 'আপনাকেও ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে নাকি?'

'আমাকে! আমাকে আর তাড়া করতে হয় না। তারা দল বেঁধে তোড়জোড় করে তোমাদের তাড়া করতেই আসছে, তবে তোমাদের কাছে হতাশ হলে—হয়তো আমাকেও তাড়া করতে পারে বলা যায় না।'

'তা হলে তো মুশকিল!' ওদের কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি।

'মুশকিল বইকী! তোমাদের কাছে মোটে দুটি রত্ন—আর আমার রত্ন অনেকগুলি! দুটি নিয়ে কি তারা তুষ্ট হবে? তখন চটেমটে কী করে বসে বলা যায় না, তোমরা এক কাজ করো, ও-ধার দিয়ে—ও-ধারেও একটা সিঁড়ি আছে—তাই ধরে গা-ঢাকা দিয়ে আমার কেবিনে চলে এসো। দশ

BanglaBook.org

নম্বর কেবিন—ওপরে বাঁ-ধারে। সেখানে এই ক'দিন তোমাদের লুকিয়ে রাখব। হাজার হোক, তোমরা আমার ভাগনের ভাগনে। যতই বজ্জাত হও, বংশলোপ হতে দিতে পারিনে তো।'

'আমি পালালুম। তারা এসে পড়ল বলে। তোমরা ও-ধার দিয়ে চলে এসো চটপট।' এই বলে গ্র্যান্ড মামা সিঁড়ি দিয়ে সরসর করে উঠে গেলেন।

'যাই বল, গ্র্যান্ড মামা লোকটা যতই দুষ্টু হোক, আসলে কিন্তু খুব ভালো।' শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানায়।

ও-ধারের উক্ত উন্নতির সোপান ঘেঁষতে গিয়েই দেখা যায়, সেই পথেই গ্র্যান্ড মামার রত্নগুলি দুদ্দাড় করে নেমে আসছে। লিলিরা আর কোথায় পালাবে—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর ওপরে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর যা-একমাত্র উপায়।

'নেপোলিয়ন কর্সিকা থেকে লম্বা এক সাঁতারে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন—না রে?' জিগ্যেস করে শিশির।

লিলি চুপ করে থাকে—শিশির যে নেপোলিয়ন নয়, সে-কথা জানানোর তার সাহস হয় না। তাহলে চাই কি, সেই দণ্ডেই হয়তো শিশির, অন্তত জলযুদ্ধে, নিজেকে নেপোলিয়ন প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত হবে।

'মৌলমীন থেকে আমরা কতটা এসেছি? ক'মাইল বল তো? এখান থেকে রেঙ্গুন সাঁতরে যাওয়া যায় না কি?'

লিলি একেবারে নিরিবিলি।

'গেলে তোকে অবশ্যি পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব, তুই ভাবিসনে। তোকে ফেলে যাব না নিশ্চয়।' শিশির ওর ভাবনার কারণ দূর করে ঃ 'আমি কি ভালো সাঁতার জানিনে না কি? বলি, গ্র্যান্ড মামাকে সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করেছিল কে? কে শুনি?'

লিলি ভরসান্বিত হয় কি না বলা যায় না, কিন্তু মতামত প্রকাশের আগেই ডাকাতরা ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

'দেখো, তোমরা যদি আর এক পা এগিয়েছ, আমি তা হলে এক্ষুনি—আমার হাতে এ দুটো কী, দেখছ তো? এক্ষুনি এগুলি ছুঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব।' শিশি বেঁকে দাঁড়ায়।

'সাত রাজার ধন এক মাণিক!' সবিস্ময়ে সমস্বরে ওরা বলে উঠে।

'এক নয়, দুই মাণিক!' শুধরে দেয় শিশির। মাণিকজোড় বলতে পারো বরং।'

'জলে ফেলে দেবে?' ওরা চমকে যায়—যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না—তবু ওরা থমকে দাঁড়ায়। আর এক পা এগোয় না।

'একেবারে জলাঞ্জলি দেব।' শিশিরের কণ্ঠে কুণ্ঠার লেশ নেই।

'তা হলে? তা হলে তোমাদের ধরতে না পারলে আমরা ওগুলো পাব কী করে? হাতাব কী করে শুনি?... এ-কীরকম কথা?'

'তার আমি কী জানি!' শিশির যেন তাদের নাগালের বাইরে এক সামুদ্রিক চড়ায় গিয়ে চড়াও হয়েছে—এমনি তার চড়া গলা।

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' ওদের মধ্যে মোটাসোটা গোছের একজন এক উপায় বাতলায় ঃ 'তার চাইতে তুমি মাণিক দুটো আমার হাতে দাও—আমি না-হয় তোমাদের দুজনকে তুলে জলে ফেলে দিচ্ছি। তা হলে হয় না? জলে ফেলা নিয়ে তো কথা?'

'ইয়ার্কি পেয়েছ?' ধমকে দেয় শিশির।

'তা হলে কি অনন্তকাল ধরে আমরা এইরকম স্থির হয়ে এইরূপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকব?' একটু আগে যে ছুরি বাগিয়ে আগিয়ে এসেছিল তারই ক্ষুব্ধকণ্ঠ থেকে এই প্রশ্ন বেরোয়।

'বেশিক্ষণ নয়, এই যতক্ষণ পুলিশ অথবা রেঙ্গুন এই দুটোর একটা না এসে পড়ছে ততক্ষণ

BanglaBook.org

একটু কষ্ট করে দাঁড়াতে হবে বইকী!' শিশির বলে। 'কিন্তু কতক্ষণ আর?'

'পুলিশ!' নামোচ্চারণেই ওদের মধ্যে শিহরন খেলে যায়—দেহে-মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

'অথবা রেঙ্গুন।' শিশির ওদের আশ্বস্ত করতে চায় ঃ 'রেঙ্গুনও আসতে পারে। যদিও কোনটা আগে আসবে বলা কঠিন।'

চব্বিশ ঃ বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ

কিন্তু ততক্ষণই বা কী করে ওই সব বদ্‌খৎ মুখ নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সহ্য করা যায়? আর অতক্ষণ ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকাও তো চাট্টিখানি নয়! ঘুম পেলে?

'দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তোমরা চি-বুড়ি খেলা জানো?' সে জিগ্যেস করে।

ঘাড় নাড়ে তারা! বুড়ি জিনিসটা তাদের জানা বটে—মেয়েরা বুড়ো হলে যা হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু তা তো খেলাধূলার বাইরে।

'উঁহু, সে বুড়ি নয়। ভেবে দ্যাখো, আমার হাতে এই দুটি মাত্র মাণিক—আর তোমরা এতগুলি সৎপাত্র। কাকে রেখে কাকে দেওয়া যায়? তারচেয়ে এক কাজ করা যাক—খেলাটা তোমাদের আমি সমঝিয়ে দিচ্ছি। এই লিলি হল গিয়ে বুড়ি—ওই সিঁড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াক। আর তোমরা ওই ধার থেকে—যে-ধারটায় ছাগলরা আটকানো আছে—ওখান থেকে এক-একবারে একজন করে চি-দিয়ে আমাকে ছুঁতে আসবে। আমি পালিয়ে-পালিয়ে যাব—যে একদমের মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারবে এই মাণিক দুটো তার হবে। আর দম ফুরিয়ে গেলে আমি যদি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারি তা হলে সে মরা। তার খেলা ফুরিয়ে গেল, সে আর মাণিক পাবে না। কেবল আমি ছোঁওয়ার মুখে যদি সে ছুটে গিয়ে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবেই তার বাঁচোয়া। পালিয়ে নিজের কোঠায় পৌঁছে গেলেও অবশ্যি বেঁচে গেল! তখন সে আবার চি দিতে পাবে। চান্স পাবে আবার। কেমন এতে তোমরা রাজি আছ?'

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে দৌড়াদৌড়ি ভালো—ঢের বেশি মজার, এককথায় তারা রাজি হয়ে গেল। আর তা ছাড়া, এভাবে মাণিকটা হাতে এলে অপর কারও সাথে ভাগবখরা করতে হবে না—ঢের ফ্যাসাদ বেঁচে যাবে—সেও এক মস্ত সুবিধা।

চি-বুড়ি খেলা শুরু হতে দেরি হয় না।

প্রথম একজন চি দিয়ে তার গণ্ডি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—কিন্তু শিশির খুব হুঁশিয়ার! দৌড়ে ধরা তাকে সহজ নয়। ফলের ঝুড়ি—পার্শেলের বাক্স সে লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হয়—বস্তাদের ওপর দিয়ে টপাটপ চলে যায়—আর চি-ওয়ালা তীক্ষ্ণ সুরে শুরু করে বটে কিন্তু শেষটায় চিঁচিঁ করতে থাকে—ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে তার স্বর বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন আবার শিশিরের উল্টে তাড়ার পালা আসে। শিশিরের তাড়নায় তার তখন পালানোর পথ নেই। কেউ বা ফলের খোসায় পিছলে পড়ে, কারও বা পার্শেলের বাক্সে ধাক্কা লাগে, কেউ বা ঝুড়ির ঠক্করে জখম হয়ে বস্তার পাহাড়ে গিয়ে আটকে যায়। আর ধরা পড়লেই মরা!

একে-একে ওদের সাতজন এইভাবে শিশিরের হাতে মারা পড়ল। ম্লানমুখে পাঁঠাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা—পাঠশালার বেড়া ঠেসান দিয়ে। নিজেদের বাদবাকিদের মৃত্যু-কামনা ছাড়া আর কোনও কামনা তাদের মনে নেই।

বাকি সাতাশ জনেরও সেই দশা হল। পূর্বগামীদের আন্তরিক প্রার্থনাতেই কি না বলা যায় না।

BanglaBook.org

আর-একজন কেবল তখনও বেঁচে—পেল্লায় রকমের নাদুসনুদুস একজন। বেচারা দু-একবার এর মধ্যে চি দিয়ে এসেছিল—কিন্তু ওর চি বেশি দূর এগোয়নি। ও নিজে তারচেয়ে আরও কম এগিয়েছে।

সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বলে ঃ 'আমি অত দৌড়তে পারব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া আমার পোষাবে না বাপু! আমি বাঁশ দিয়ে ছোঁব। এই লম্বা বাঁশটা দিয়ে।'

এই বলে শিশির তার প্রস্তাবে রাজি কি না জানবার আগেই, শত্রু-মিত্র কারও প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ছাগলদের বেড়ায় বিলম্বিত একখানা বাঁশ সে খুলে নিল। তারপরে সেই বাঁশখানা স্বহস্তে ধরে—শিশিরের দিকে বাড়িয়ে—চি-দানের উপক্রম করল সে। কিন্তু উপক্রমের সূত্রপাতেই হুলুস্থুল।

'এই লিলি, দেখছিস কী! সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়—চটপট। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছে দেখছিস নে?' শিশিরের চিৎকার শোনা যায়।

মুক্তি পেতেই, ছাগলের পালের উৎসাহ দেখে কে! ডেকের ওপর দিয়ে ছাগলের তরঙ্গ যেন ছুটে আসতে লাগল। আর গোড়ার ধাক্কাতেই বেড়ায় ঠেসান দেওয়া বীরেরা ভেসে গেলেন প্রথমে। লিলি ও-ধারের সিঁড়ির ওপরে উঠে দাঁড়িয়েচে—শিশির এ-ধারের।

ছাগলের খরস্রোত চারধার প্লাবিত করে চলল। ফলের ঝুড়ি তছনছ করে—প্যাকিং বাক্সদের ভেঙেচুরে—বস্তাদের দুরবস্থায় ফেলে—দিগ্বিদিক ভাসিয়ে দিয়ে চলল। আর গ্র্যান্ড মামার দলবল—মায় সেই বংশধারী স্থূলকায় পর্যন্ত—সেই স্রোতের মুখে বেকায়দায় পড়ে ভাসতে-ভাসতে চলল। ঢেউয়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতোই।

তাদের কেউ-কেউ যে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু তোড়ের মুখে পারবে কেন? দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই গুঁতো মেরে ফের তাদের শুইয়ে দিয়েছে। কাত হয়ে, চিত হয়ে, উপুড় হয়ে—ওল্টাতে-পাল্টাতে—নানারকমে তারা ভেসে চলেচে। বাঁশ-হাতে সেই মোটা লোকটিও ভাসতে দ্বিধা করছে না। তীরবেগে ভেসে যেতে-যেতে-যেতে অবশেষে—তারা—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর কিনারায়—।

'সর্বনাশ হল!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

'এই যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?' শিশির উচ্ছ্বাসে আনন্দমঠ হয়ে ওঠে ঃ 'হরে মুরারে—হরে মুরারে!'

বঙ্কিম কটাক্ষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' তার মনে পড়ে।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' লিলিও আওয়াজ ছাড়ে—সেও কিছু কম যাওয়ার মেয়ে নয়।

রেলিংয়ের কিনারায় এসে সে-এক দারুণ সংঘর্ষ—ও-ধারে সমুদ্রের দুর্দান্ত কল্লোল—এ-ধারে ছাগলদের উত্তাল তরঙ্গ—মাঝখানে ছত্রভঙ্গ গ্র্যান্ড মামার দলবল! ছাগলাদ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় রেলিংয়ের ওপরে গিয়ে বারংবার তারা আছড়ে-আছড়ে পড়ছে—।

দেখতে-দেখতে রেলিংয়ের খানিকটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। এবং তারপরে আর দেখতে হল না। পঁয়ত্রিশটি বীরের একজনেরও আর টিকি দেখা গেল না। সবাই হুড়মুড় করে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে পড়ল! পিছনে-পিছনে পাঁঠারাও প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে লাগল। একটাও পিছু ফিরে তাকাল না। রক্ষা পেল না কেউ। এমনকী, সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লোকটি পর্যন্ত সবংশে লোপ পেয়ে গেল।

BanglaBook.org

সোনার হরিণ

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

এক ঃ দুখানা চিঠি

কলিকাতার কিছু দূরে গঙ্গার উপর একখানি গণ্ডগ্রাম, নাম শ্রীপুর। গ্রামখানাকে কেন্দ্র করিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নানাদিকে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দিয়াছে, স্টিমার কোম্পানিও অনেক পয়সা খরচ করিয়া সেখানে একটা পোক্ত রকমের আড্ডা গাড়িয়াছে। এত আড়ম্বরের কারণ বড়দরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলিয়া শ্রীপুরের বেশ খ্যাতি আছে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ীর বাস এই শ্রীপুর গ্রামে। এই ধনীদের মধ্যেই আবার 'ধনকুবের' বলিয়া যিনি পরিচিত, তাঁর নাম দ্বারকানাথ বসু। শ্রীপুরের প্রকাণ্ড চিনির কলের তিনিই মালিক, তা ছাড়া বাংলা দেশের বহু জায়গায় কারবারে তাঁর অজস্র টাকা খাটিতেছে। দ্বারকানাথের ধনদৌলত ও-অঞ্চলে প্রবাদ-বাক্যের মতো।

গঙ্গার উপর অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া নানারকম ফল-ফুলের বাগান, পুকুর, আর তারই মাঝখানে দ্বারকানাথের বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকারই নদীর দিককার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রৌঢ় দ্বারকানাথ শূন্য মনে জেলেদের মাছধরা দেখিতেছিলেন। প্রথম জীবনে বড় বেশি পরিশ্রম করার ফলে এরই মধ্যে তাঁর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, নিত্য নূতন অসুখ দেখা দিতেছে। ডাক্তারদের তাই নির্দেশ, তিনি যতদূর সম্ভব মানসিক পরিশ্রম, লেখাপড়া প্রভৃতি কমাইয়া গঙ্গার মুক্ত বাতাস সেবন করিবেন।

এই বয়সেও দ্বারকানাথের গায়ের রং চাঁপাফুলের মতো উজ্জ্বল; কপালটা এতখানি চওড়া যে, সচরাচর সে রকম চোখে পড়ে না; মুখে কিন্তু তাঁর কোমলতার আভাস বড় বেশি নাই, বরং একটা কঠোর—পরুষ ভাব। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়া দুই চোখের রুক্ষ দৃষ্টি যেন মানুষের অন্তর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

যে-বারান্দাটির উপর ইজিচেয়ারে দেহভার এলাইয়া দিয়া দ্বারকানাথ গঙ্গার শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছিলেন তারই অপরদিকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। তার উপর নজর পড়িতেই দ্বারকানাথ বলিলেন, 'ওহে সলিল, অহিভূষণের খবর জানো?'

অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু যুবকটি কেন যেন সামান্য একটু চমকাইয়া উঠিল; কোনওমতে আমতা-আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ্ঞে—আজ্ঞে, কী বলছেন?'

'কাল অহিভূষণ বাড়ি ফেরবার সময় তাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, আজ সকাল করে বেলা আটটার ট্রেনেই সে যেন অবশ্য এসে পৌঁছায়, অনেকগুলো জরুরি কাজকর্ম পড়ে আছে। সে এসে পৌঁছেছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। এ-গাড়িতে না এলে দশটার আগে আসবার তো আর উপায় নেই।'

সামান্য একটু চাঞ্চল্য যুবকের যাহা দেখা দিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল; কণ্ঠস্বরে খুব খানিকটা ঔৎসুক্য মাখাইয়া সে বলিল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না। তার আপিস-ঘরে গিয়ে দেখে আসব?'

'দরকার নেই; সন্তোষকে জানতে পাঠিয়েছি—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। বোধহয় আসেনি, এলে নিশ্চয়ই খবর পেতাম।'

এখানে সামান্য একটু টীকার প্রয়োজন। ইদানিং দ্বারকানাথের শরীর ক্রমশই খারাপ হইয়া পড়ায় কাজকর্মের সাহায্যের জন্য মাস তিনেক হইল তিনি একজন সেক্রেটারি রাখিয়াছেন, তারই নাম অহিভূষণ। লোকটি যেমন পরিশ্রমী, তেমনি বিনয়ী ও বিশ্বাসী। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সে দ্বারকানাথের প্রধান সহায় বলিতে গেলে একরকম ডান হাতের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। তার বাড়ি কলিকাতায়, সেখান হইতেই রোজ আসা-যাওয়া করে।

সলিল চলিয়া গেল এবং তার একটুকাল পরেই সন্তোষ ফিরিয়া আসিল, বেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন মুখেই। দ্বারকানাথকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, 'অহিভূষণবাবুকে তাঁর আপিস-ঘরে বা বাড়ির

BanglaBook.org

অন্য কোথাও দেখতে পেলাম না; তবে তিনি যে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কেননা রোজই বাড়ি যাওয়ার সময় সমস্ত খাতা-পত্তর তিনি তাঁর টেবিলের টানার ভেতর তালাবন্ধ করে রেখে যান, কাজে এসে সেগুলোকে ফের বার করেন। তাঁর আপিস-ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর অনেকগুলি খাতা খোলা অবস্থায় পড়ে—যেন কাজ শুরু করেই কোথাও উঠে গেছেন।' তারপর গলার স্বর খাটো করিয়া বলিল, 'ওঁর ঘর ঝাঁট দিয়ে কালীচরণ জঞ্জালগুলো বাইরে বারান্দার একপাশে জড় করে রেখেছিল, পরে বাইরে ফেলে দেবে বলে। হঠাৎ সেই আবর্জনাস্তূপের ভেতর একখানা মুখ-খোলা খাম দেখতে পেয়ে কাজের ভেবে সেটা তুলে নিয়েছিলাম। খাম খুলে দেখি ভেতরে এক অদ্ভুত চিঠি। তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে আপনার কাছে সেখানা নিয়ে এসেছি।'

দ্বারকানাথ সন্তোষের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিলেন, 'কই, দেখি কী চিঠি?' তারপর চশমার খুব সম্মুখে আনিয়া মনে-মনে সেখানা পড়িতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন এতক্ষণ শুইয়া, চিঠি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ উত্তেজনার ঝোঁকে ইজিচেয়ারের উপর মাটামভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। অহিভূষণকে উদ্দেশ করিয়া কোনও অজানা লোক পত্রখানা লিখিয়াছে, ভাষাটা এই রকম—

'অহিভূষণ,

এই তোমাকে শেষ সুযোগ দিতেছি। আজ দিনের মধ্যে যদি আমাদের আদেশ পালন না করো তবে, চোখ ভরিয়া পৃথিবীর আলো দেখিয়া নাও, সে-আলোর সঙ্গে আজই তোমার শেষ সাক্ষাৎ। ন্যায়-অন্যায়ের বক্তৃতা অনেকদিন ধরিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু আর না। তোমার কর্তব্য স্থির করার আজই শেষ দিন। ইতি—

পুনশ্চ—আমাদের চিঠিপত্র পুলিশ কি দ্বারকাবাবুর নিকট প্রকাশ না করিয়া তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। আমাদের সতর্ক চক্ষু সর্বদাই তোমার উপর খরদৃষ্টি রাখিতেছে। রহস্য ব্যক্ত হইলে তোমার অদৃষ্টে কী আছে তা তুমি ভালো করিয়াই জানো, তাই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া তার আর উল্লেখ করিলাম না।'

চিঠিতে ঠিক আগের দিনকার তারিখ।

দ্বারকানাথকে ঝড়-ঝাপটা জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, কোনও ব্যাপারেই হঠাৎ তিনি বড় একটা আকুল হইয়া পড়েন না। কিন্তু চিঠিখানার ভাষায় এমনি একটি রহস্যময় আতঙ্ক লুকানো আছে যে-সেখানা পড়ার পর যে-কোনও লোকের পক্ষেই বোধকরি ঠিক থাকা শুধু কঠিন নয়, সুকঠিন। দ্বারকানাথ যেন অকূল সমুদ্রের মধ্যে পড়িলেন, অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল।

সন্তোষকে নানাভাবে জেরা করা হইল; সে দ্বারকানাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাঁরই চিনির কলে কাজ করে এবং ছেলেবেলা হইতে তাঁরই কাছে এ-বাড়িতে মানুষ। বিশেষ কোনও খবরই দিতে পারিল না, অহিভূষণের কাছে ইদানিং বাহিরের কোনও লোক আনাগোনা করিতেছে কি না সে-খবরও সে রাখে না দেখা গেল। তবে আজ সকালে অহিভূষণ যে আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেলা বাড়িয়া ক্রমে দুপুর হইল, তখনও অহিভূষণের খোঁজ নাই। দ্বারকানাথ এইবার দস্তুরমতো ভয় পাইয়া গেলেন—ভীষণ একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই, নতুবা এ-বাড়িতে ঢুকিয়াও অহিভূষণ ইচ্ছা করিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেছে না, এ অসম্ভব।

অধীর দ্বারকানাথ কী করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন এমনসময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, 'কলকাত্তাসে অবিনাশবাবু আয়ে হেঁ।'

অবিনাশবাবু দ্বারকানাথের অ্যাটর্নি, সকলরকম বিষয়কর্মে তিনিই তাঁকে পরামর্শ দেন। হঠাৎ

BanglaBook.org

কোনও খবর না দিয়া এই অসময়ে শ্রীপুরে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন খুবই, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে একটু যেন স্বস্তির ভাবও অনুভব করিলেন, যাক, পরামর্শের জন্য একজন বন্ধু তো পাওয়া গেল! চাকরকে হুকুম দিলেন, 'যাও, হিঁয়া পর লে আও।'

দ্বারকানাথের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কথা কহিলেন অবিনাশবাবু, বলিলেন, 'আপনার চিঠি পেয়ে সেই সঙ্গে-সঙ্গেই অহিভূষণবাবুর কাছ থেকে রসিদ রেখে আপনার সোনার হরিণ তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি দ্বারিকবাবু।' তারপর গলার স্বর একটু নিচু করিয়া বলিলেন, 'জানি অহিভূষণবাবু আপনার পরম বিশ্বাসী। তবু হাজার হোক, অত টাকা দামের জিনিসটা তো, দেওয়ার পরই মনটা খচখচ করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না পেরে সটান আপনার কাছেই চলে এলাম—পেয়েছেন তো আপনার জিনিস ঠিকমতো? ও কী, আপনি অমন বিহ্বলের মতো তাকাচ্ছেন কেন?'

দারুণ বিস্ময়ে দ্বারকানাথ স্তম্ভিত, অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তিনি বিহ্বলের মতো বলিয়া উঠিলেন, 'আমার চিঠি? অহিভূষণকে সোনার হরিণ দিতে লিখেছি? আপনি এ কী বলছেন অবিনাশবাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

ততোধিক বিস্মিত হইলেন অবিনাশবাবু, বলিলেন, 'সে কী?' তারপর পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, 'এ-চিঠি কি আপনার নয়? কিন্তু নাম-সই তো স্পষ্ট আপনার!'

স্বপ্নাবিষ্টের মতো দ্বারকানাথ চিঠিখানা বারতিনেক পড়িয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন, আমি তো এ-চিঠির বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানি না, অবিনাশবাবু! হয় আমি ঘুমের ঘোরে চিঠিতে সই দিয়েছি, আর নয় তো এ-সই জাল। কিন্তু... কিন্তু জাল সই বলে তো মনে হচ্ছে না, এ-সই যেন আমারই। এ কী রহস্য অবিনাশবাবু?'

দুই হতবুদ্ধি প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিরিবিলিতে বসিয়া যখন এই ধরনের আলাপে ব্যস্ত তখন তাঁদেরই পিছনে আর-একটি লোক দুই কান খাড়া করিয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া দুজনার কথাবার্তা শুনিতেছিল। তার দুই চোখে বাজপাখির মতো দৃষ্টি, কিন্তু মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার। সে আমাদের পূর্বপরিচিত—সলিল।

দুই ঃ বিশেষজ্ঞ-যুগল

তিনদিন পরের ঘটনা, ঘটনাস্থল কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চল। ছোট্ট অথচ আধুনিক রুচিসম্পন্ন একখানি বাড়ির বৈঠকখানায় দুইটি যুবক বসিয়া গল্প করিতেছিল—একজন বাড়ির মালিক, অপরটি তারই এক আগন্তুক বন্ধু। বাড়ির মালিকের নাম দুর্গাপ্রসন্ন; বিলাত হইতে সে হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ (handwriting expert) হইয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং সরকারি অফিসে মোটা মাহিনার চাকরি করিতেছে। আর তার বন্ধুটি? দুশো কুড়ি গজ, চারশো চল্লিশ গজ, আটশো আশি গজ, এক মাইল প্রভৃতি হরেকরকমের দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে, একবার নয়, একাধিক্রমে অনেকবার, সে প্রথম হইয়াছে। হাই জাম্প, লং জাম্পে এখনও তার 'রেকর্ড' এদেশে কেহ ভাঙিতে পারিয়াছে কি না জানি না। তার সাঁতারের কৌশল দেখিয়া এক সাহেব বলিয়াছিল—লোকটা 'ম্যান-ফিশ'; এতবড় চৌকস খেলোয়াড় নাকি এদেশে কমই জন্মিয়াছে। নাম রণজিৎ।

দুই কাপ চা নিঃশেষ করিবার পর দুর্গাপ্রসন্ন সশব্দে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কী এক প্রয়োজনে নাকি তাকে বাড়ির বাহির হইতে হইবে। চেয়ারের উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া জুতার ফিতা আঁটিতে-আঁটিতে সে কহিল, 'বাই-দি-বাই, রণজিৎ, সেদিন বলছিলে তোমার গুরুদেব নাকি আক্ষেপ করছেন যে, তেমন জটিল রহস্য আর তাঁর কাছে আসে না। কলকাতার খানিকটা দূরে কিন্তু বেশ একটু রহস্য চাক বাঁধতে শুরু করেছে, এরই মধ্যে একটু-একটু গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছেছে।'

রণজিতের 'গুরুদেব' বলিয়া দুর্গাপ্রসন্ন যে-ভদ্রলোকটির ইঙ্গিত করিল তিনি আর কেহই নন—সুপ্রসিদ্ধ জাপানি ডিটেকটিভ হুকা-কাশি। রণজিৎ যে হুকা-কাশির বিশেষ গুণগ্রাহী ভক্ত সে-কথা দুর্গাপ্রসন্ন জানিত, তাই রণজিতের সম্মুখে তাঁর উল্লেখ করিতে হইলেই ঠাট্টার ছলে বলিত 'তোমার গুরুদেব'।

রণজিৎ বলিল, 'হ্যাঁ, মিস্টার হুকা-কাশি সে-কথা বলছিলেন বটে। ঘোষ-চৌধুরীর ঘড়ির কিনারা করবার পর থেকে তাঁর কাছে যেসব "কেস" আসছে, সেগুলো নাকি একেবারেই ছেলেখেলার ব্যাপার। দু-একদিন মাথা ঘামালেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। দস্তুরমতো ঘোরালো কোনও ব্যাপার না পেলে ওঁর মগজের যে আসল খোরাক জোটে না, সে-কথা ভাই আমিও বুঝি। হ্যাঁ, কলকাতার কাছে কোথায় কী ঘটেছে বলছিলে?'

জুতার ফিতা-আঁটা হইয়া গিয়াছিল, দুর্গাপ্রসন্ন কাপড়ের খুঁট দিয়া চেয়ারটা একটু ঝাড়িয়া নিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, 'শ্রীপুর বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক গঙ্গার ওপরেই তো? একবার এক বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম; মস্তবড় একটা চিনির কল আছে, না?'

'অনেক খবরই রাখো দেখছি। সেই চিনির কলের মালিকের কথাই বলব। ভদ্রলোকের নাম দ্বারিক বোস—অতিশয় ঘুঘু লোক, ছেলেবেলা থেকেই ওঁদের চিনি কিনা! বিস্তর পয়সা, আর পয়সা বাড়াবার ফিকির-ফন্দিও নানারকমের জানা আছে। দিনকতক আগে কোত্থেকে কে এসে চুপিচুপি ওঁকে জানিয়ে গেছল সুন্দরবন-অঞ্চলে ছোটখাটো একটা জমিদারি মাটির দরে বিক্রি হচ্ছে; আসল দর তার পাঁচ লাখের কম নয়, তবে কমিশন বাবদ লোকটাকে কিছু দিলে এক লাখেই দ্বারিক বোসকে সে তা পাইয়ে দিতে পারে। বুঝতেই পারছ, কীরকম মোটা রকমের দাঁও। দ্বারিকবাবু হেন ব্যক্তি কথাটাকে পাঁচকান হতে দিতে পারেন না, দু'দিনের মধ্যেই সম্পত্তি কেনবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললেন। এখন কথা হচ্ছে, হাজার বড়লোক হোক, ব্যবসাদার তো বটে, পাঁচ জায়গায় টাকা লাগানো রয়েছে, অত অল্পসময়ের মধ্যে লাখ টাকা একত্রে জোগাড় করা একটু কষ্টকর বইকী! ঠিক করলেন, আপাতত কোনও ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নিয়ে উপস্থিত কাজ চালিয়ে নেবেন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিতে গেলে কিছু সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া দরকার; জমিদারি অথবা বাড়ি বন্ধক দিতে গেলে হাঙ্গামা অনেক, আর তা ছাড়া ব্যাপারটা যে জানাজানি হয়ে পড়বে না, তা-ই-বা কে বলবে? অনেক ভেবে দ্বারিকবাবু তাঁর তোষাখানা থেকে এমন একখানা জিনিস বার করলেন যা প্রায় লাখ দুই টাকার মাল। আমরা তখন খুব ছোট—প্রায় বছর পনেরো আগেকার ঘটনা—দেনার দায়ে ইক্লিস্‌পুরের রাজার অনেক ধনরত্ন নিলামে চড়েছিল। দ্বারিক বোস সেই নিলামে স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিজে পছন্দ করে একটা সোনার হরিণ কিনে এনেছিলেন। শুনেছি সেটা নিরেট সোনার, শিং দুটি স্ফটিকের, আর গায়ের ছিট-ছিটগুলোর জায়গায় এক-একখানি চোখ-ঝলসানো-হীরা বসানো। দ্বারিকবাবু তাঁর অ্যাটর্নি অবিনাশ দত্তের মারফত সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা আনালেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই লাখ টাকার জোগাড় দ্বারিকবাবু করে ফেললেন। অবিনাশবাবুর ওপর ভার পড়ল ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে সোনার হরিণটি খালাস করে আনবার। টাকা জমা দিয়ে অবিনাশবাবু হরিণ ছাড়িয়ে এনেছেন, দু-একদিনের মধ্যেই দ্বারিকবাবুর কাছে সেটা পৌঁছে দেবেন, ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। দ্বারিক বোসের প্রাইভেট সেক্রেটারি অহিভূষণ তাঁর নামের একখানা চিঠি দেখিয়ে অবিনাশবাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণটি হাত করে উধাও হয়ে গেছে।'

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওঃ, এই তোমার রহস্য? তা, এ-রহস্য ভেদ করবার জন্য আর হুকা-কাশির কাছে ছুটবার দরকার নেই, আমিই হদিস বাতলে দিচ্ছি। সেই জোচ্চোরটার

ফটো থাকে তো একখানা ফটো, আর তা না হলে চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ খবরের কাগজে ছাপিয়ে সেইসঙ্গে একটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে দাও, এদিকে পুলিশেও খবর দেওয়া থাক—দু-দিন বাদে দেখবে হিড়হিড় করে তাকে টেনে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। লুকিয়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে হে?'

'তিষ্ঠ বৎস, তিষ্ঠ, ব্যাপার অত সহজ নয়। প্রথমত, তুমি যাকে জোচ্চোর ঠাউরে বসে আছ সে স্বেচ্ছায় এ-কাজ করেনি, করেছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। কী কারণে জানি না, একদল ষড়যন্ত্রকারীর কাছে লোকটা ঠেকে পড়েছিল—একেবারে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তারাও সুবিধে পেয়ে যন্ত্রের মতো ওকে চালিয়েছে। এ-কাজটি হাসিল করবার জন্যে তারা অনবরত ওর ওপর চাপ দিচ্ছিল, অনেক দিন ও যুঝেছে; তারপর বোধকরি ভাবলে, রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে, যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ সেটাই বরং বেছে নেওয়া যাক! ...কিন্তু এর চাইতেও বড় রহস্য হচ্ছে চিঠিখানা। দ্বারিকবাবু বারবার বলছেন, ও-চিঠির সই কক্ষনও তাঁর নিজের হাতের নয়। সইটা জাল কি না পরীক্ষা করবার জন্য চিঠিখানা আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, সই আদপেই জাল নয়, স্পষ্ট দ্বারিকবাবুর নিজের হাতের লেখা। জালিয়াত আস্তে-আস্তে ধরে-ধরে মানুষের হাতের লেখার অবিকল নকল করতে পারে বটে, তার ওপর কালির দাগ বুলিয়ে সাধারণ লোকের চোখে ধুলোও দিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। আস্তে-আস্তে ধরে-ধরে যে-দাগ টানা হয় তার রেখা হয় ক্ষীণ, জায়গায়-জায়গায় তা আবার কেঁপেও যায়। কালির দাগ বুলোলে সাদা চোখে সেসব ধরা পড়ে না সত্যি, কিন্তু তেমন পাওয়ারফুল মাইক্রসকোপের নিচে ফেললেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়, ক্ষীণ রেখা, কাঁপুনির আভাস সমস্তই সুস্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া "আলট্রা-ভায়োলেট রে"ও এসব ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করে। আমি আলট্রা-ভায়োলেট রে ফেলেও পরীক্ষা করেছি, এ-একটানা সই—চেষ্টা-চরিত্র করে আঁকা নয়। লেখার ধাঁচও অবিকল দ্বারিক বোসেরই মতো।'

'তবে তোমার দ্বারিক বোসকেই ভালো করে ভেবে দেখতে বলো গে—ফাইল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে মনের ভুলে বুড়ো কখন কী করে বসেছে!'

'তাও বলেছিলাম হে বন্ধু—বলেছিলাম, "আপনার দৃষ্টিশক্তি কম, তাতে চোখে ছানি পড়ে এসেছে, বোধকরি চিঠিখানা ভালো করে পড়তে পারেননি—উপুর-উপুর দেখেই সই করে দিয়েছেন।" শুনে বুড়ো ক্ষেপেই অস্থির, বলে, "হ্যাঁ, বুড়ো হলে তোমাদের ওই দশাই হবে তা জানি, তবে আমরা আলাদা কাঠামোয় তৈরি, আমাদের এরকম ভুল হয় না যে চিঠি না পড়েই সই করে দেব। তোমাদের মতো হলে আর করে খেতাম না।" লোকটা বৃথাই এতকাল চিনির কারবার করলে হে, কারবার করা উচিত ছিল কুইনিনের; কথার চিনির আভাসমাত্র নেই। উঠি এইবার, পরীক্ষার ফলটা একবার জানিয়ে আসি গে।'

পরদিন সকালবেলা রণজিৎ বাড়ির বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানা ইংরেজি উপন্যাস পড়িতেছিল। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, শরীরে কেমন একটা জড়তা আসিয়াছিল, তার উপর বইখানায় মনও বসিয়াছিল খুব, রণজিৎ তাই স্থির করিল এ-বেলা আর বাড়ির বাহির হইবে না। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন, অল্প একটু পরেই প্রকাণ্ড একখানা মোটরগাড়িতে দুর্গাপ্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত, তার সঙ্গে একটি রুগ্নকায় ভদ্রলোক। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই পরিচয়াদির পালা শেষ হইয়া গেল; সঙ্গের ভদ্রলোকটি দ্বারকানাথ, হুকা-কাশির সাক্ষাৎপ্রার্থী—রণজিৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁর নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে আসিয়া হুকা-কাশির বাড়ির ফটকের ভিতর ঢুকিলেন। বাড়ির বেহারা রণজিৎকে ভালোমতোই চিনিত,

BanglaBook.org

স্মিতমুখে অভিবাদন করিয়া সে সকলকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইল, তারপর সবিনয়ে জানাইল, কর্তা স্নানের ঘরে আছেন, সেখান হইতেই বেশ পরিবর্তন করিয়া খবরের কাগজ পড়ার উদ্দেশ্যে এই ঘরেই ঢুকিবেন, কাজেই খবর দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

সকলে অল্প একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিতরদিককার দরজায় খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং ঠিক পরের মুহূর্তে হুকা-কাশি ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চকিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তিনি চাহিলেন, তারপর রণজিতের দিকে ফিরিয়া একটু সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'রণজিৎবাবু যে, কতক্ষণ?' চেয়ারে বসিতে-বসিতে ঘাড় বাঁকাইয়া ফটকের সম্মুখটা একটু দেখিয়া নিয়াই আবার বলিলেন, 'যাক, গাড়ি বিদেয় করে দিয়েছেন, ওঠবার জন্যে তা হলে এখুনি তাড়াহুড়ো করছেন না নিশ্চয়ই!'

দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন; তাঁর গাড়িখানার প্রচুর দাম, চলিবার সময়ে একেবারেই আওয়াজ হয় না বলিয়া মনে-মনে তাঁর গর্বও আছে যথেষ্ট। হুকা-কাশি ছিলেন এতক্ষণ বাড়ির ভিতর স্নানের ঘরে, কেউ তাঁকে তাঁদের আসিবার খবর দেয় নাই, অথচ গাড়ির শব্দ তাঁর কানে গিয়া পৌঁছিল কী ভাবে? লোকটার শ্রবণ-শক্তি কি তবে অসাধারণ নাকি? মনের ঔৎসুক্য মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি বাহির করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'আপনি বাড়ির ভেতর থেকেও আমাদের গাড়ির আওয়াজ কী করে শুনতে পেলেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি!'

'গাড়ির আওয়াজ? কই, তা তো আমি পাইনি!'

'তবে? আমাদেরকে বাড়িতে ঢুকতেও তো আপনি দেখেননি! কী করে আঁচলেন আমরা হেঁটে আসিনি, গাড়িতে এসেছি?'

হুকা-কাশি অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, 'একটু আগে আপনাকেও তো আমি দেখিনি! তা সত্ত্বেও কী করে এখন বলছি যে, খানিকটা আগে আপনি হ্যাট-কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?'

দ্বারকানাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই, রণজিতের বাড়ি রওনা হইবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে স্যুট পরিয়া নানা জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে-খবর এ-লোকটি পাইল কোথায়? জ্যোতিষ জানা আছে না কি?

দ্বারকানাথের মনের ভাব হুকা-কাশি বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, 'আশ্চর্য হওয়ার খুব বেশি কিছু কিন্তু নেই এর ভেতর। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার! আমাদের এদিকে পিচের রাস্তা হয়নি, খোয়ার রাস্তা, বৃষ্টি হবার ফলে সেখানে কীরকম কাদা হয়েছে দেখছেন তো! এবার আপনাদের জুতোগুলোর দিকে তাকান দেখি—তকতকে ঝকঝকে, কাদার বাষ্পও ওতে লেগে নেই। যে-মেঝের ওপর দিয়ে আপনারা হেঁটে এসেছেন, সেইটেও পরীক্ষা করুন, কাদার সামান্য ছোপও চোখে পড়ছে কি? আপনারা ও-রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে এসব ব্যাপার কি কখনও সম্ভব হত? বুঝলাম, নিশ্চয়ই আপনারা গাড়িতে এসেছেন। কোনও গাড়িই ফটকের আশপাশে দেখতে পাচ্ছি না, কাজেই আপাতত সেটা নিশ্চয়ই বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে।'

রণজিৎ ছাড়া আর সকলেই হুকা-কাশির পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। দ্বারকানাথ বলিলেন, 'কিন্তু এখানে আসবার আগেই স্যুট বদলে ধুতি পরে এসেছি সে-খবর কী করে জানলেন? গায়ে তো আর স্যুটের দাগ লেগে নেই?'

হুকা-কাশি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তাও আছে। আপনার চুল অনেক দিন ছাঁটা হয়নি, বেশ বড় হয়ে পড়েছে; তার ওপর টুপিটা একটু আঁট হয়েছিল, ফলে চুলের ওপর একটু গোল দাগ এখনও নজরে পড়ছে। কপালও একটু লালচে হয়ে আছে। বেশি আগে টুপি খোলেননি, তা হলে এগুলো মিলিয়ে যেত নিশ্চয়ই। আপনি বাঙালি, কাজেই ধুতির ওপর যে টুপি পরেননি, স্যুট পরেছিলেন এ-কথা আঁচা আর শক্ত কী?'

দ্বারকানাথ এবং দুর্গাপ্রসন্ন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

BanglaBook.org

তিন : খগেনের সন্দেহ

বেলেঘাটার খাল হইতে অল্প কিছু দূরে গলির মধ্যে একখানা বাড়িতে কয়েকটি লোক রবিবারের আনন্দময় সকাল যাপন করিতেছিল। লোকগুলি সংখ্যায় যে খুব বেশি তা নয়, বোধকরি জনা পাঁচ-ছয় হইবে, আর সকলেই যে সমবয়সী তাও বলা চলে না, যুবকের ভাগই বেশি তবে প্রৌঢ়-বয়সীও দু-একজন আছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলে কয়টি ঘরের এককোণে সতরঞ্চি পাতিয়া ভাগাভাগি করিয়া একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আর অপর কোণে দুই জন বয়স্ক ব্যক্তি খাটোগলায় একটা গোপন পরামর্শে নিমগ্ন ছিল। তাদের আলোচনাটা চলিতেছিল এই ধরনের; একজন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, 'সবই তো ভালোয়-ভালোয় কাটিয়ে ওঠা গেল, খগেনবাবু কত রকমের বাধা-বিপত্তি ভেবে মাথা গরম করছিলেন, কোনওটাই আমাদের আটকে রাখতে পারেনি। অহিভূষণ চৌধুরীকেও ওরা খুঁজে বার করেছে, আর সোনার হরিণও উদ্ধার করেছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। যার জন্য এত কাণ্ড সেই আসল ব্যাপারটায় এবার হাত দেওয়া যাক—সে-কাজটাও তো বড় সহজ নয়।'

'খগেনবাবু' বলিয়া যে-লোকটিকে সম্বোধন করা হইল, ভাবে বোধ হইল সে-ই এ-দলের প্রধান সহায়, সম্বল এবং পরামর্শদাতা। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। চোখ দুইটি দেখিলে মনে হয় ধূর্ততায় সে ধুরন্ধর। সঙ্গীর কথার জবাবে সে কহিল, 'আপাতত ও-সমস্ত মতলব শিকেয় তুলে রাখুন, অশনিবাবু, বছর তিন-চারের মধ্যে ও-ব্যাপারে হাত দেওয়া অসম্ভব।'

'তি-ন চা-র ব-ছ-র।' অশনিকান্তের চক্ষু কপালে উঠিল, 'কিন্তু খগেনবাবু—'

খগেন অশনিকান্তের উৎকণ্ঠা আমলেই আনিল না, অন্য এক চিন্তা তখন তার মাথায় ঘুরিতেছে। একটু কাল নীরব থাকিয়া সে কহিল, 'শ্রীপুরের একটি লোকের কথা ভেবে-ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরকার রহস্যের বিন্দু-বিসর্গও যদি কেউ টের পেয়ে থাকে তবে সে-ই তা পেয়েছে।'

'সে কী কথা! কে সে লোকটা?'

খগেন তার সন্দেহ-পাত্রের নাম করিল।

ঠিক এমনই সময় ঘরের ওদিককার কোণটাতে একটা কলধ্বনি উঠিল, খবরের কাগজের একখানা পৃষ্ঠা সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া এ উহার আগে পড়িতে চাহিতেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করিয়া খগেন এবং অশনিকান্ত উভয়েই উদ্‌গ্রীবভাবে সেদিকে আগাইয়া গেল। তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একজন যুবক বলিয়া উঠিল, 'অহিভূষণ চৌধুরীর সন্ধানের জন্য খবরের কাগজে নোটিস ছাপানো হয়েছে, দেখেছেন? দু-একটাকা নয়, একেবারে টাকার আণ্ডিল! তিন-তিন হাজার টাকা পুরস্কার!'

কোনওপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া খগেন কাগজখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল, দেখিল, বিজ্ঞাপনে অহিভূষণের চেহারার একটা বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—'বয়স পঁয়ত্রিশ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ডানদিকের গালে একটা আঁচিল, মাথার ঘন কৃষ্ণ চুল ব্যাকব্রাশ করিয়া পেছনের দিকে ফেরানো, একটা চোখ কিছু ট্যারা, সেটিকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে বেশিরভাগ সময়েই চশমা ব্যবহার করে... ইত্যাদি। যে কেহ সন্ধান দিতে পারিলে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

বিজ্ঞাপনটি পড়িবার সময়ে খগেনের মুখে এতটুকু আতঙ্কের বা অস্বস্তিরও ছায়াপাত হয় নাই, কিন্তু সর্বশেষে নাম-স্বাক্ষরটি পড়িয়া সে বার কয়েক দাড়ি চুলকাইল, কহিল, 'এ কী, এ দেখি রণজিতের নাম! তাই তো, তার নামে এ বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে কেন? নাঃ, একটু ভাবালে দেখছি।'

অশনিকান্ত বলিল, 'রণজিৎ বলতে কার কথা বলছেন বুঝছি না, সেই খেলোয়াড়ের? তা

BanglaBook.org

হয়ই বা যদি সে, তাকে ভয় করবার কী আছে? সে অহিভূষণ চৌধুরীর খবর জানতে পারবে এ-ধারণা আপনার কী থেকে হল?'

'রণজিৎ ছেড়ে রণজিতের ঠাকুরদাদারও ক্ষমতা নেই যে, এ-ব্যাপারে দন্তস্ফুট করে; সেজন্য আমি ভাবি না, আমি দেখছি রণজিতের আড়ালে আর একটি ছবি—সে বড় ভয়ঙ্কর চীজ।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ হুকা-কাশি।'

কথাটা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই অশনিকান্তের হাতে একটা আচমকা হেঁচকা টান মারিয়া খগেন জানালার ধার হইতে সরিয়া আসিল, তারপর কম্পিত হস্তে আঙুল দিয়া গলির ওধারে অল্প দূরের একটা দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করিল। এক যুবক অপর একটি লোকের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া কী কথা কহিতেছে আর মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। অশনিকান্ত একবার মাত্র সেদিকে তাকাইয়াই যুবকটিকে চিনিয়া ফেলিল; ইহার কথাই খগেন একটু আগে উল্লেখ করিয়াছিল। সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ তখন তারও মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

চোখের ইশারায় সকলকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিয়া খগেন স্তব্ধভাবে ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। খবরের কাগজখানা তখনও তার হাতেই রহিয়াছে। সেখানার প্রতি অতর্কিতে আর একবার তাকাইতেই কিন্তু তার মুখ হইতে অন্ধকার কালো মেঘখানি ধীরে-ধীরে মুছিয়া গেল, আর তার জায়গায় দেখা দিল প্রসন্ন ভাব। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, 'আমাদের সন্দেহ একেবারেই অমূলক অশনিবাবু, এখন না দেখে যদি আর আধঘণ্টা আগে ওকে দেখতাম তা হলে ভাবনার অন্ত থাকত না। বুঝতে পারছেন কেন এ-কথা বলছি?'

অশনিকান্ত ভ্রূ কুঁচকাইয়া কী কারণ তাহাই ভাবিতে লাগিল, তারপর হঠাৎ কোনও কথা মানুষের মনে আসিলে সে যেমনভাবে শব্দ করিয়া ওঠে ঠিক তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিল, 'হোঃ হোঃ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এখন আর ভাবনার কোনও কারণ নেই। বাস্তবিক, বিপদের গন্ধ পেলে মাথাটা কেমন চন্ করে ওঠে আর সোজা জিনিসগুলোও সব গুলিয়ে যায়।'

খগেন আবার বলিল, 'কলকাতার যে-কোনও রাস্তায় যে-কোনও লোকের যখন-তখন প্রয়োজন থাকতে পারে; কাজেই যাকে এ-অঞ্চলে দেখবার মোটেই আশা করি না তাকে যদি কোনওরকমে দেখতেও বা পাই তা হলেও ভয়ে শিউরে ওঠবার কোনও কারণ নেই।' কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া জানালার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিতে লাগিল—যুবকটি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছে, না চলিয়া গেছে। দেখা গেল, চলিয়া সে যায় নাই, তখনও সেই অপরিচিত লোকটির সহিত বাক্যালাপেই মগ্ন।

'দেখুন অশনিবাবু', খগেন পুনরায় কথা আরম্ভ করিল, 'সাবধানের বিনাশ নাই। আপনি ওকে চিনলেও ও আপনাকে চেনে না নিশ্চয়ই। আমি বলি, আপনি এই মুহূর্তেই পিছু-পিছু ওকে অনুসরণ করুন। ও কোথায় যায়, কী করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে ফিরবেন।'

বেলা আড়াইটা বাজিয়া গেল, অশনিকান্ত তখনও গোয়েন্দাগিরি করিয়া ফেরে নাই। হয়তো শ্রীপুর পর্যন্ত পাড়ি দিতে হইয়াছে মনে করিয়া খগেনও বড় বেশি চিন্তিত হয় নাই, কিন্তু তিনটা যখন বাজিবার উপক্রম হইল তখন বাস্তবিকই চিন্তার কিছু কারণ ঘটিল বইকী! উদ্বিগ্নভাবে বেশিক্ষণ কিন্তু কাটাইবার দরকার হইল না, বারকতক ঘর-বার করিবার পরই দেখা গেল অশনিকান্ত এমুখো হইতেছে। আজ বেচারার শাস্তি বড় কম হয় নাই, খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, সকাল হইতে শুরু করিয়া এই দুরন্ত রৌদ্র মাথায় এতটা বেলা পর্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছে। বয়সেও সে তো আর নবীন যুবা পুরুষটি নয়!

অশনিকান্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই খগেন সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, 'কী দেখে এলেন অশনিবাবু? সব মঙ্গল তো—আমার ধারণা অভ্রান্ত তো?'

'হ্যাঁ, মানে এদিক থেকে ভয় পাবার কোনও কারণ দেখলাম না। যেতে হয়েছিল কিন্তু একেবারে শ্রীপুর পর্যন্ত তেড়ে। শ্রীপুর পৌঁছে ও যখন সোজা গিয়ে চিনির কারখানায় ঢুকল তখনই বুঝলাম ব্যাপার বেশি গুরুতর নয়। বেলেঘাটায় এসে আমাদের আঁচতে পেরে থাকলে ও কি একবার দ্বারিকবাবুর সঙ্গে দেখা না করেই কারখানায় ঢুকত? আমার তো একবারও মনে হয় না। ভালো কথা, সেই বিজ্ঞাপন দেনেওয়ালা খেলোয়াড়টিকে যে শ্রীপুরে দেখে এলাম। সঙ্গে আর-এক ভদ্দরলোক, কে তা চিনি না, দ্বারিকবাবুর চাকর কালীচরণটাকে কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

'কালীচরণকে জিজ্ঞাসাবাদ? আপনি ঠিক চিনেছেন কালীচরণ? মানে আর কেউ নয়?' আর্তের মতো খগেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তে সে তখন হুকা-কাশির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছে —বুক তার ঢিবঢিব করিতেছে।

চার ঃ চাদর-তত্ত্ব

অহিভূষণের অন্তর্ধানের পর হইতেই শ্রীপুর সুগার-মিলে কাজকর্মে যে বেশ একটু ঢিল পড়িয়াছে কারখানার বেয়ারা-আরদালি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কর্মচারীই তা কিছু-না-কিছু টের পাইতেছিল। প্রতিদিন যে পরিমাণ চিনি কল হইতে বাহির হইবার কথা, এ-ক'দিনে বোধকরি তার অর্ধেকটাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। চিনি সরবরাহের জন্য নানা জায়গার পাইকারদের কাছ হইতে অর্ডারের পর অর্ডার আসিতেছে, সময়মতো মাল না পাওয়ায় তারা তাগিদের উপর তাগিদ দিতেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও সুবন্দোবস্তেরই লক্ষণ নাই। অহিভূষণের কাজকর্ম ছিল ঘড়ির কাঁটার মতো সুনির্দিষ্ট; ঠিক সাড়ে দশটার সময় সে আসিয়া দ্বারকানাথের বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে উপস্থিত হইত। জরুরি চিঠিপত্র-পাঠ এবং সেগুলির কী জবাব দেওয়া হইবে তার খসড়া তৈরি করাই ছিল এ-সময়কার প্রধান কাজ। দ্বারকানাথের কড়া হুকুম জারি করা ছিল, এ-সময় কেহ গিয়া আধমিনিটের জন্যও তার সময় নষ্ট করিতে পারিবে না। বেলা বারোটা বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গে কাগজপত্র গুছাইয়া অহিভূষণ কারখানায় চলিয়া আসিত। ঠিক তার দেড় ঘণ্টা পরে দ্বারিকবাবর বাড়ি হইতে তার জন্য কারখানাতেই খাবার যাইত। সুদক্ষ সেনাপতি যেমন সামনে একখানা নকশা রাখিয়া বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করেন, অহিভূষণও তেমনি অফিস-ঘরের টেবিলের উপরেই নিজের প্রয়োজনীয় একটা খসড়া রাখিয়া কেবলমাত্র কাগজ, পেন্সিল আর স্লিপের সাহায্যেই এতবড় কারবারটা চালাইয়া দিত। অনাবশ্যক হুঙ্কার, অনাবশ্যক ছুটাছুটি করিতে কেহ তাকে কখনও দেখে নাই, বেশি কথার লোকও সে ছিল না, অথচ যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকটি কাজ বিনা বাধায় উঠিয়া যাইত।

অহিভূষণের অভাবে দ্বারকানাথকে আপাতত চিনির কল চালাইবার ভার দিতে হইয়াছে তাঁর ছোটভাই সলিলের উপর। কিন্তু সলিল যে এ-কাজের পক্ষে কতটা অনুপযুক্ত এ-ক'দিনের মধ্যেই সকলে তা টের পাইয়াছে—বিশেষ করিয়া সন্তোষ। থাকিয়া-থাকিয়া মাঝে-মাঝে কোথায় যে সে গা-ঢাকা দিয়া বসে, সন্তোষ ভাবিয়া কূলকিনারা পায় না। সোনার হরিণটি খোয়া যাওয়ার পর হইতে সলিলের যে বেশ একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে আর কারও নজরে না আসিলেও সন্তোষের সতর্ক চক্ষুতে তা এড়ায় নাই। অন্তত বিশবার তার মনে হইয়াছে ব্যাপারটা দ্বারকানাথের গোচর করে, কিন্তু প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে দ্বিধা আসিয়া পড়িয়াছে এই ভাবিয়া—পাছে তিনি মনে করিয়া বসেন যে-সলিলের প্রতি সে ঈর্ষাভাবাপন্ন। বাস্তবিকই তো সলিল ছাড়া আপনার জন বলিতে এ-জগতে আজ আর তাঁর আছে কে? একটি ভাগিনেয় ছিল—পরম আদরের ভাগিনেয়—দ্বারকানাথের স্বর্গতা ভগিনীর একমাত্র পুত্র। একদিন সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ তাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়াছেন। সলিলের বড় তাঁর আর-একটি ভাই ছিল, সেও আজ আট-দশ বছরের উপর সুদূর আমেরিকায়

পড়িয়া আছে। ছেলেবেলা হইতেই সে-বেচারার একটু যাত্রা-থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল, বড় হইয়া সে একদিন কলিকাতায় কোনও এক পেশাদারি থিয়েটারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, ব্যস, সেই হইতে দ্বারকানাথের বাড়ির দরজা তারও নিকট বন্ধ, এবং বোধকরি চিরকালের জন্যই বন্ধ। এহেন সর্বনেশে বুড়াকে ঘাঁটানো আর খোঁচাইয়া ঘা তৈরি করা তো একই কথা। সন্তোষ দেখিতে গোবেচারা, মনে হয় বুঝি সাত চড়ের পরেও সে কথা কহিতে পারিবে না, কিন্তু আসলে সে বোঝে অনেক—অনেকখানি।

কয়েকজন বিশিষ্ট পাইকারের সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার উদ্দেশ্যে আজ সকালের দিকে সন্তোষকে একবার কলিকাতা পাঠানো হইয়াছিল; সে আলোচনার ফলাফল সলিলকে জানানো দরকার, কেননা ব্যাপারটা একটু প্রয়োজনীয়। কারখানায় ঢুকিয়া কিন্তু সে শুনিতে পাইল সলিল সেখানে নাই; বেলা অনেকটা গড়াইয়াছে, আহারাদির সময় হইয়াছে, বোধহয় সেই কারণেই সলিল অনুপস্থিত, এইরূপ মনে করিয়া সন্তোষও বাড়ির পথেই হাঁটা দিল। সে যখন বাড়ির ফটকের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তার নজরে পড়িল, দুটি ভদ্রলোক গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতেছেন। সন্তোষ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল; শুধু দুপুর বলিয়া নয়, আজকাল কোনও সময়েই দ্বারকানাথ বড় একটা বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না। তার উপর দূর হইতে যতটা মনে হয় লোক দুইটি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অসময়ে এই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আকস্মিক আগমনের কী হেতু হইতে পারে?

সাধারণত যতটা জোরে সে বরাবর পথ চলিতে অভ্যস্ত তার চাইতে অনেক বেশি জোরে—একরকম ছুটিতে-ছুটিতেই—অগ্রসর হইয়া সন্তোষ লক্ষ করিল, সম্মুখে বিরাট চত্বরটি পার হইয়া আগন্তুকদ্বয় ধীরে-ধীরে বাড়ির বারান্দায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। একটু পরেই ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁদের সম্মুখীন হইল, প্রশ্ন করিল, 'কাকে চান আপনারা?' আগন্তুকদের মধ্যে একজন বয়সে যুবক, অপরটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। যুবকটিকেই উদ্দেশ করিয়া সন্তোষ প্রশ্ন করিয়াছিল।

'দ্বারিকবাবুর বাড়ি এইটে তো?'

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

যুবকটি এ-প্রশ্নের সহসা কোনও জবাব দিল না, আড়চোখে তার সঙ্গীর মুখের পানে একবার তাকাইল মাত্র। এ-ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে তার সঙ্গী কোনওরকম ভুল করিলেন না, কথাবার্তা চালাইবার ভার নিজের উপর লইয়া বলিলেন, 'দ্বারিকবাবু আমাদের প্রত্যাশা করছেন, তাঁকে এই খবরটুকু দিলেই চলবে।'

সন্তোষ একটু সন্দিগ্ধ ভাবে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিয়া গেল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই মহা-ব্যস্তভাবে একসঙ্গে তিন-চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে-লাফাইতে নামিয়া আসিল। তার হাতে একটা চাবি, তারই সাহায্যে পাশের একটা কামরা খুলিয়া দিতে-দিতে সে সসম্ভ্রমে বলিল, 'কর্তা এলেন বলে, আপনারা এই ঘরে ততক্ষণ বসুন এসে।'

তার কথা শেষ হইতে না-হইতেই সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল, অসুস্থ দ্বারকানাথ লাঠি ভর দিয়া নামিতেছেন। প্রত্যেকটি সিঁড়ি লাঠি ভর দিয়া বেশ করিয়া অনুভব করিতে-করিতে তিনি নামিতেছিলেন, অভ্যাগতদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'সাড়ে এগারোটার গাড়িতেও যখন এলেন না, তখন মনে করেছিলাম আজ বুঝি তবে আর আপনারা এলেনই না মিস্টার হুকা-কাশি।'

'আজ্ঞে ট্রেনটা মিস করার দরুণ স্টিমারে আসতে হল কিনা, তাই পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেছে...। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর চোখে দেখতে অসুবিধে হয়, কষ্ট করে নিচে নামবার কী দরকার ছিল? আমরাই তো ওপরে উঠে আপনার কাছে যেতে পারতাম।'

যে-ঘরটা সন্তোষ খুলিয়া দিয়াছিল কথা বলিতে-বলিতে সকলে সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, 'এ-রুমটা অন্যান্য রুমের চাইতে একটু অন্ধকার হলেও, এমন নিরিবিলি জায়গা এ-বাড়িতে নেই বললেই চলে। দরজার পাশেই কামিনী ফুলের ঝাড় আর হাসনুহানার বেড়াটা পড়েছে

কিনা, তাই আলো একটু কম আসে; কিন্তু নির্জন বলে আমার সেক্রেটারি অহিভূষণের ভারি পছন্দসই ছিল এ-রুমটা। তার সমস্ত কাজকর্ম সে এখানে বসে করত...আঃ, বেজায় ধুলো জমেছে তো দেখছি, ক'দিন ধরে এ-ঘরটায় আর ঝাঁড়-পাঁড়ও পড়েনি বুঝি? এ-ঘর পরিষ্কারের ভার কার ওপর হে সন্তোষ, ভজুয়ার?'

'আজ্ঞে না, কালীচরণের।'

'ডাক তো সে-হতভাগাটাকে, কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার!'

কাজের গাফিলতির জন্য স্বয়ং কর্তা তলব করিয়াছেন খবর পাইয়া কালীচরণ বেচারার মুখের চেহারাটা বড়ই বিশ্রী হইয়া গেল; বৈশাখ মাসের কমলালেবুর মতো শুকনো মুখে সে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। দ্বারকানাথ রাগতভাবে কী বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ইশারায় নিরস্ত করিয়া প্রথমেই কথা পাড়িলেন হুকা-কাশি। ভয়ে মৃতপ্রায় সেই বেচারার মুখের উপর দুই চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় রেখেছো সে-চাদরটা?'

'আজ্ঞে? আজ্ঞে চাদর...।'

'হ্যাঁ—গো, সেদিনকার সেই চাদরটার কথা জিজ্ঞাসা করছি। কোথায় সেটা?'

'আজ্ঞে, আছে তো আমার ঘরেই।'

'তোমার ঘরে, বটে? নিয়ে এসো তো।'

যদি বলা যায় এই ব্যাপারে দ্বারকানাথ এবং সন্তোষ বিশেষ আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, তবে খুবই কম বলা হইল। বাস্তবিক যে-ব্যাপার ঘটিয়া গেল তা তাঁরা কানে শুনিয়া এবং চোখে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে-ব্যক্তি এ-বাড়িতে জীবনে আজই প্রথম পদার্পণ করিল, একটু আগে পর্যন্ত কালীচরণকে চর্মচক্ষে দেখা দূরে থাক, নাম পর্যন্ত শোনে নাই, তার সঙ্গে কালীচরণের এহেন কথাবার্তা শুনিলে বাস্তবিকই লোকে যে শুনিতে ভুল করিয়াছে মনে করিবে তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল না কেবল রণজিৎ। এ-কথার অর্থ এ নয় যে, সে-ও ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তবে অনেক দিন ধরিয়া হুকা-কাশির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, এ-অদ্ভুত লোকটিকে যাদুকরের মতো অভাবনীয় অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইতে এত বেশিবার সে দেখিয়াছে যে, এখন আর এঁর কোনও কথায় বা কোনও কাজেই সে বিস্ময় প্রকাশ করে না। আপাতদৃষ্টিতে যতই হেঁয়ালিজনক মনে হউক না কেন, হুকা-কাশির প্রত্যেকটি কাজেরই যে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, এতদিনের অভিজ্ঞতায় রণজিৎ তা মর্মে-মর্মে বুঝিতে পারিয়াছে।

দ্বারকানাথের অট্টালিকা হইতে খানিকটা দূরে চাকরদের থাকিবার সারিবদ্ধ ঘর—যেমন সাধারণত সাহেব-সুবাদের বাড়িতে হইয়া থাকে। বাড়ির অনেকখানি কমপাউন্ড পার হইয়া তবে এ-ঘরগুলিতে পৌঁছিতে হয়। সকলে দেখিতে পাইল, কালীচরণ মাঠ পার হইয়া তার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে আগাইতেছে। হুকা-কাশি হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোজা মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন। দেখা গেল, কালীচরণকে মাঝপথে থামাইয়া তিনি কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন। সন্তোষ গলা বাড়াইয়া ব্যাপার লক্ষ করিতেছিল হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সলিল একদৃষ্টে হুকা-কাশির পানে তাকাইয়া আছে—তার সমস্ত শরীর একটা দেয়ালের আড়ালে লুক্কায়িত।

BanglaBook.org

পাঁচ ঃ কাশী বনাম কলিকাতা

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে বড় রাস্তা ধরিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের দিকে আগাইতে বাঁ-হাতে একখানি পানের দোকান পড়ে; বিদেশি যাত্রী, বিশেষত বাঙালি বাবুদের ভিড় সেখানে লাগিয়াই আছে। পানের জন্য যতটা না হউক, বিখ্যাত জর্দা এবং সুর্তির জন্য এ-দোকানখানি কাশীধামে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।

দোকানের মালিক ধনপৎ কাজেরিয়া একটা ফিনফিনে কাপড়ের টুপি মাথায়, গোঁফে তা দিতে-দিতে সম্মুখের জনসমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে, বোধকরি 'ভারিগোছে'র খরিদ্দার কে হইতে পারে মনে-মনে তারই গবেষণা করে। গত কুড়ি বছর ধরিয়া কাশীবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক ধনপৎকে ঠিক এই একইভাবে দেখিয়া আসিতেছে।

তিনটি বাঙালি ছোকরা আসিয়া দোকানখানির সামনে দাঁড়াইল। একটু মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা শুনিলে এটা বুঝিতে কারওই কষ্ট হইত না যে, কাশীতে তারা এই সবে প্রথম আসিয়াছে। কোন-কোন জায়গা দেখা হইল, কোন-কোন স্থান দেখিতে এখনও বাকি, আজ বিকালের প্রোগ্রাম কী করা হইবে—আলাপটা চলিতেছিল সেই সব সম্পর্কেই। একজন তাদের মধ্যে ধনপতের সামনে আসিয়া কহিল, 'দেখি হে পয়সা তিনেকের পান—বেশ ভা—লো করে মশলা-টশলা দিয়ে আমাদের সামনে সেজে দাও দেখি!'

ধনপৎ পান বিক্রি করে একখানা টুলের উপর বসিয়া; তার সামনে হালফ্যাশান-দুরস্ত দোকানের মতো একটি কাউন্টার রহিয়াছে; ফলে রাস্তা হইতে নজরে আসে কেবল তার ভুঁড়িটুকু পর্যন্ত—শরীরের আর সমস্ত অংশই কাউন্টারের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। আগন্তুক ছেলে তিনটির বোধহয় লক্ষ্যে আসিল না যে ধনপৎ কাজেরিয়া দুই হাতে পানের মশলা নাড়াচাড়া করিতে-করিতে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে বোতামের মতো ছোট অথচ উঁচু কী একটা জিনিস বার তিনেক টিপিয়া ছাড়িয়া দিল। তারপরেই পান সাজিতে সে হঠাৎ অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আরও-একজন নূতন খরিদ্দার আসিয়া জুটিয়াছে; এ-ব্যক্তিটিও বাঙালি, তবে বয়স্ক এবং বহুদিন কাশীবাসের ফলে বেশভূষায় একটু হিন্দুস্থানী ভাব লক্ষ করিবার বিষয়। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'মিঠ্‌ঠা-খোসবী সূর্তি হ্যায় শেঠজি?'

'কত লিবে?'

'পা'ভর।'

চোখের তারা দুইটি উপরে তুলিয়া ধনপৎ মনে-মনে একটু ধ্যান করিল, তারপর কহিল, 'বোলনে নেই শকতা! দেখনে হোগা হ্যায় কি নেহি।' যে-ছেলেটি পান চাহিয়াছিল তার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'মেহেরবানি করকে একমিনিট মাফ কীজিয়ে বাবুসাব।'

দোকানঘরটিকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করিয়া মধ্যখানে একখানি কাঠের পার্টিশন, তার অপর দিকে ধনপতের জর্দা-সূর্তির ভাণ্ডার। ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে ধনপৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, 'অন্দরমে আ কর সূর্তিকা ওজন দেখ লিজিয়ে।'

আহ্বান শুনিয়া নবাগত খরিদ্দারও ধনপতের অনুসরণ করিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই জন একত্র হইতেই খরিদ্দার ফিস-ফিস করিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কী সর্দার, কলিং বেল টিপে ডেকে পাঠালে যে! অশনিবাবুর চিঠি...।'

সর্দারের ললাটে তখন চিন্তার চিহ্নস্বরূপ তিনটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে কহিল, 'কলকাতার কথা পরে হোবে রামদয়াল—রাৎরে; আগে হাঁথের চিড়িয়াটা পাকড়া। টিকা কোথা? ফুকন সিং কী করিয়ে এল?'

'ফুকন সিং তো তোমার হুকুমমতো ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারিটাকে নিয়ে সারনাথ দেখাতে গেছে, এখনও ফেরেনি তো। অবশ্য ফেরবার সময়ও হয়নি।'

'আচ্ছা, এক্কা ঠিক আছে? শিউরতনকে বোলিয়ে দিতে পারবি।'

'তা বরং সম্ভব।'

'বহুৎ আচ্ছা। হামার দুকানে যে তিনঠো বংগালি বাবু পান বিক্রির লেইগে দেঁড়িয়ে আছে তুই ভালু করে ওদের চিনহিয়ে রাখ। বেলা পাঞ্চটার সময় ওরা রামকিষেণ মিশন থেকে আনওয়ারসিটি

BanglaBook.org

দেখতে নাগোয়া যাবে। পাঞ্চটার সময় শিউরতন ওহি জায়গায় হাজির থাকবে, ওদের সওয়ারী করে লেবে। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আনওয়ারসিটি দেখলাবে, ঘোঁড়াকে দানাপানি খিলাবে, সাড়ে আটটার আগে আনওয়ারসিটির ফটকসে বাহার হোবে না। নওটার কুছ আগে তুই পাঁচ-সাতটা আদমি লিয়ে রাস্তার মধ্যি লুকিয়ে থাকবি, এক্কা হাজির হলেই ছোরা দেখলায়ে ওদের সব চীজ কেড়ে লিবি। পিঢ়হানে সোনার বোতাম আছে, হাথে দামি ঘড়ি আছে, আংটি ভি আছে। কারে বাক্কা চশমাগুলো বিলকুল রোলগোল—তবু ছিনিয়ে লিবি, আঁখুসে কুছু দেখতে পাবে না। হোটেলে উঠেছে, রূপেয়া উপেয়া লোট-উট সমুচয় পাকিটে-পাকিটেই ঘুরবে।'

শিষ্যকে যথোচিত উপদেশ দিবার পর ধনপৎ ঠোঙায় মোড়া খানিকটা ভাঙ তার হাতে তুলিয়া দিল, কয়েকটা টাকাও দিল—উদ্দেশ্য বাহিরের লোকে বুঝিবে রামদয়াল ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকান হইতে মিঠ্‌ঠা-খোসবী সূর্তি কিনিয়া বাহির হইতেছে। টাকাটা রামদয়াল দোকান হইতে বাহির হইবার সময় মূল্যস্বরূপ ধনপতের হাতেই ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। কাশীতে এই ধরনের খরিদ্দার ধনপতের আরও অনেক আছে।

রাত্রি এগারোটার সময় দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া ধনপৎ যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল সেটাকে তার বাড়ি বলিলে যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হইবে না, বলা উচিত আস্তানা।

কাশীর গলির তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করিবেন, তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, এ-আস্তানাটি যে-অঞ্চলে, সেখানকার গলির উপমা পৃথিবীতে নাই। একটা গোলক-ধাঁধা বলিলেই হয়, এরোপ্লেন হইতে ফটো তুলিয়া মাসিকের ধাঁধা বিভাগে ছাপাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যারা কাশীতে আজন্ম কাটাইয়াছে তাদেরও কয়েকজনকে এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে সারাদিনেও পথ খুঁজিয়া পাইবে কি না, ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

আস্তানাটি একটা বহু পুরাতন বাড়িতে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যখন কাশীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেইসময় তাঁরই কোনও প্রজা এটি তৈরি করিয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় সমস্তটা জায়গা জুড়িয়া ফরাস পাতা, তারই উপর দশ-বারোজন লোক—কেউ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে, কেউ বা ঘুমাইতেছে, বাকি কয়জন হামানদিস্তার মতো বিরাট পাত্রে একমনে সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, ধনপৎ বারকয়েক করাঘাত করিল। এ-করাঘাতের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যাহাতে ভিতরের লোকে বুঝিতে পারে যে-আগন্তুক তাদেরই গোষ্ঠীর কেউ, দরজা নির্ভাবনায় খোলা যাইতে পারে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ধনপৎ ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল; ফরাসের একধারে অনেকগুলি টাকা ও নোট স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, তারই পাশে একটু দূরে কতকগুলি সোনা ও রূপার অলঙ্কার। এগুলি আজ সারাদিনের লুণ্ঠিত 'লভ্য'। ধনপৎ মনে-মনে খুশি হইয়া একজন সাগরেদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রামদয়াল কোথা রে?'

যাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, সে রামদয়ালেরই কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল, উত্তর করিল, 'দাদা তো ফেরেনি এখনও সর্দারজি!'

'আভিতক ফিরল না? নওটার সময় নাগোয়ামে লুঠ সারার কথা, বাড়ে গ্যারা হয়ে গেল যে!' ধনপৎ বিস্মিত, একটু বুঝি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, 'শিউরতন? উঁ কোথায়?'

'সে তো ফেরেনি!'

ঠিক এইসময় দরজায় আবার করাঘাত পড়িল, পরিচিত, কিন্তু একটু যেন দুর্বল করাঘাত। ধনপৎ নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে উঠিয়া গেল কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—রামদয়াল টলিতে-টলিতে কোনওমতে ঘরে ঢুকিতেছে, তার পরনের জামা-কাপড়গুলি কে যেন কাদা-গোলা জলে ছোপাইয়া দিয়াছে, ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে রক্তের দাগ, আর কপালটি ফুলিয়া হইয়াছে ঠিক যেন একটা দু'পয়সা দামের মার্বেল। তার পিছনে শিউরতনের অবস্থাও খুব সুবিধাজনক নয়, সেও খোঁড়াইতেছে।

BanglaBook.org

ধনপৎ প্রথমে মনে করিল, রামদয়াল বোধহয় টাকা হাতে পাইয়া একটু অতিরিক্ত রকম নেশা করিয়াছে, তারই ফলে ড্রেনে গড়াইয়া পড়িয়া তার এ-অবস্থা। কিন্তু ভালো করিয়া লক্ষ করিতেই বুঝিল তার সে-অনুমান ঠিক নয়—রামদয়ালের কথায় জড়তা বা চলনে মত্ততা নাই, আছে কেবল প্রচুর অবসাদ। ঘরে ঢুকিয়াই সে মেঝের এককোণে বসিয়া পড়িল, কহিল, 'ডাকাত, সর্দার, স্রেফ ডাকাত—একেবারে শয়তানের চেলা! আমাদের সব ক'জনাকেই মেরে পাট-পাট করে দিয়েছে!''

'ওই তিনঠো বংগালি ছোকরা কাশীর গুণ্ডাদের ঠুকে লাট-পাট করিয়ে দিল!'

'শুধু তিনজন হলে তো ভাবনাই ছিল না, সর্দার, দলের ভেতর ছিল আরও জনা পঞ্চাশেক। একেবারে বাছা-বাছা জোয়ান, অসুরের মতো কব্জির জোর। ব্যাপারটা কীরকম ঘটল বলি শোনো। ঝোপের আড়ালে আমরা ওত পেতে বসে আছি, ঠিক ন'টার সময় শিউরতন এক্কায় করে ওদের এনে হাজির করল। আমি লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার রাশ চেপে ধরলাম, গিরিধারী ছোরা বার করে এগিয়ে যেতেই ওরা চিৎকার করে উঠল। তারপরেই ঘটল একেবারে অবাক কাণ্ড! প্রথমে শুনলাম ঝড়ের মতো একটা হু-হু শব্দ, তারপরেই চেয়ে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙালি ছোকরা সাইকেল হাতে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে আর কিছু নেই, শুধু এক-একটা করে সাইকেলের পাম্প। বিষ্টির ফোঁটার মতো সেই পাম্পের বাড়ি অনবরত আমাদের মুখে, কপালে, ঘাড়ে পড়তে লাগল—উঃ, ব্যাটাদের কব্জি নিশ্চয়ই ইস্পাতের তৈরি—গিরিধারীর হাতে এক মোচড় দিয়ে কীভাবে ছোরাটা ছিনিয়ে নিলে! দ্যাখো সর্দার, কী অবস্থা করেছে!' বলিয়া রামদয়াল ললাটের স্ফীতি, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

'আমরা বুঝলাম,' রামদয়াল আবার কহিতে লাগিল, 'এখানে বাধা দেওয়ার মানে নির্ঘাত মারা পড়া, তাই যে যেদিকে পারি ছিটকে পড়লাম। ''ডাকু''গুলো তবু কি রেহাই দেয়? পেছন-পেছন তেড়ে এল। জঙ্গলে ঢাকা একটা খানা দেখতে পেয়ে তারই ভেতর তখন নিজেকে টান-টান শুইয়ে দিলাম। সেই নোংরা গন্ধ-ধরা পাঁকের ভেতর একঘণ্টা নরকবাস করে যখন দেখলাম গণ্ডগোল থেমে গেছে তখনই কেবল বাড়িমুখো রওনা হতে পেরেছি। তবু সোজা পথে আসতে ভরসা পাইনি, কী জানি, ব্যাটারা যদি থানা-পুলিশ কাণ্ড করে থাকে! অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে-ঘুরে তবে এসেছি।'

শিউনন্দন কহিল, 'ম্যায়নে তো হল্লা দেখ কর, গাছ পর চঢ় গয়া, উৎরানেকো বখৎ গির গয়া!'

ধনপৎ শিউনন্দনের ক্রন্দন কানে তুলিল না, রামদয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'রাত নওটার সময় নাগোয়ার পথে পচাশঠো সাইকেল! এ তো তাজ্জব কথা আছে রে রামদয়াল!'

রামদয়াল সংশোধন করিয়া কহিল, 'তাজ্জব নয় সর্দারজি, ভয়ের কথা। ঘোড়ার রাশ ধরবার সময় সওয়ারীদের আলাপ আমার কানে এসেছে—ওদের মুখে অশনিবাবুর নাম শুনেছি।... তোমার দোকানে পান কেনবার সময় যত ন্যাকা ওদের ঠাওরেছিলে আসলে তত ন্যাকা ওরা নয়। সোনার হরিণ নিয়ে তলে-তলে মস্ত একটা ব্যাপার চলছে।'

'তবে তো আমাকে, তোকে, সব চিনহিয়ে রেখেছে।'

'খুব সম্ভব। আমাদের বোধহয় এখন পিছিয়ে পড়াই ভালো।'

ধনপৎ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না—সোনার হরিণের জ্যোতির্ময় রূপ স্মরণ করিয়া লোভীর দুই চোখ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল, কহিল, 'চিনহিয়েছে তো চিনহুক, হামিও চালবাজি কুছু কম জানি না। হামার নাম ধনপৎ কাজেরিয়া—দেখি কাশীবালা গুণ্ডাই বড় না কলকাত্তাবালাই বড়!'

BanglaBook.org

ছয় ঃ মেধাবী ছাত্র

প্রথম যেদিন হুকা-কাশি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকানাথের বাড়ি যান, সেদিন অত্যধিক বেলা হইয়া পড়ায় তাঁর যত কিছু জ্ঞাতব্য ছিল সমস্তই জানা সম্ভব হয় নাই। দিনকয়েক পরে খবর পাঠাইয়া আবার তাই একদিন তিনি শ্রীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্তোষের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন ধরিয়া কারখানার অফিসঘরগুলি পরিষ্কার করা হইতেছিল। এতবড় একটা কারবার যে চালাইতেছিল সেই অহিভূষণ চৌধুরী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তর্হিত হইয়া পড়ায় কিছুই তার নিকট হইতে বুঝিয়া লওয়া যায় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় কীভাবে আছে ঠিক-ঠিকানা নাই, কর্মচারীদের প্রতি তাই আদেশ দেওয়া ছিল যেন কুটাটি পর্যন্ত কেহ নষ্ট না করে। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী এ-ক'দিন ধরিয়া ম্যানেজারের টেবিলের উপর জমা হইতেছে; সলিল এবং সন্তোষ পরীক্ষা করিয়া যেগুলি আবশ্যক বোধ করিবে, তুলিয়া রাখিবে, বাকিগুলি আবর্জনার স্তূপে বিসর্জন দেওয়া হইবে।

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিতে সর্বপ্রথমেই টেবিলের উপরকার এই অভিনব 'মিউজিয়াম'টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; নানারকম জিনিস পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে, একটির সহিত অপরটির কোনওই কারণগত সম্পর্ক নাই। হুকা-কাশি সেগুলির দিকে একবার শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ তার মধ্য হইতে, বোধকরি কৌতূহলবশতই, একটা জিনিস হাতে তুলিয়া লইলেন—একখানা সবুজ রঙের বাঁধানো মোটা একসারসাইজ বুক, তার চারিদিকের অনেকটা অংশ আগুনের আঁচে পুড়িয়া গেছে। খাতাখানি হাতে লইয়া একমনে পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে সলিলকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'আপনাদের কারখানায় কি পাঠশালা বসে না কি সলিলবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'জিজ্ঞাসা করছি, ছোটছেলের লেখা ইংরেজি ফার্স্টবুকের কপি চিনির কারখানায় এল কোত্থেকে? মজুরদের জন্যে কি এখানে নাইট স্কুলের বন্দোবস্ত আছে না কি?'

'না তো!' পরম বিস্ময়ে সলিল এবং সন্তোষ একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িল, দেখিল হুকা-কাশি ঠাট্টার ছলে কিছুই অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন নাই, বাস্তবিকই খাতাখানি একটি অল্পবয়সী ছাত্রেরই বটে, বিশেষ যত্নের সহিত ধরিয়া-ধরিয়া গোটা-গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে 'গরুর গল্প' লিখিয়াছে। দুইজনেই যথার্থ বিস্ময়ের সহিত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু হুকা-কাশির সেদিকে কোনও লক্ষ্যই দেখা গেল না, অখণ্ড মনোযোগ সহকারে একটি-একটি করিয়া খাতাখানার সবগুলি পৃষ্ঠা তিনি উল্টাইয়া অবশেষে কহিলেন, 'অদ্ভুত মেধাবী এ-ছাত্রটি; এরকমটি আর কোথাও দেখিনি। এ-খাতাখানার সন্ধান কোথায় মিলল একটু খোঁজ নিয়ে জানাতে পারেন কি?'

সন্তোষ উঠিয়া গিয়া অনুসন্ধান লইয়া আসিল। মাঝে-মাঝে কাজকর্মের অত্যধিক চাপ পড়িলে কারখানা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয়, চা এবং জলখাবার তৈরির উদ্দেশ্যে তাই একটা স্বতন্ত্র ঘর আছে। তারই উনুনের মধ্যে খাতাখানির সন্ধান নাকি মিলিয়াছে। চিনির কারখানায় ছোটছেলের লিখিবার খাতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্যজনক, উনুনের মধ্যে তাহার আবিষ্কার-কাহিনী ততোধিক অভাবনীয়। এ-বিস্ময়কর রহস্যের কোনওই কূলকিনারা করিতে না পারিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল হুকা-কাশি ধ্যানস্থের মতো অর্ধনিমীলিত-নেত্রে ভূতিনটিপ নস্য লইলেন।

'আপনাদের আপিসের কাজে মাস-মাস মনিহারী জিনিস—স্টেশনারি—যেসব কেনা হয় তার একটা হিসাব নিশ্চয়ই আছে?' হুকা-কাশি হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্নটি সকলের কানেই নিতান্ত অবান্তর বলিয়া বোধ হইল; সোনার হরিণের পুনরুদ্ধারে অফিসের স্টেশনারির—দোয়াত-কলম-কালি-পেন্সিলের—হিসাব যে কী প্রয়োজনে আসিতে পারে তার অণুমাত্রও কারও বোধগম্য হইল না। হুকা-কাশি ব্যতীত অপর কেহ এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্তোষ

নিশ্চয়ই অপাঙ্গে তার হাতঘড়িটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিত—দেখিত কতখানি সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ-লোকটির নাকি সবই অদ্ভুত, কোন তুচ্ছ প্রশ্ন ভবিষ্যতের কোন দুরূহ সমস্যার যে সমাধান করিবে তা নাকি কেহই বুঝিতে পারে না। সে কেবল একবার সলিলের দিকে তাকাইল, অর্থাৎ ইঙ্গিতে তাকে ড্রয়ারের ভিতর হইতে হিসাবের খাতাখানি বাহির করিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

হিসাবে খাতা আসিলে হুকা-কাশি কিছুক্ষণ বেশ করিয়া সেখানা পরীক্ষা করিলেন, তারপর খোলা পাতার এক জায়গায় ডান হাতের তর্জনী আঙুলটি রাখিয়া সলিলকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'এই ফিতেটা বড্ডই ঘন-ঘন এসেছে, না?'

সলিল প্রথমটা এ-প্রশ্নের হেতু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু ক্রমেই যেন তার মুখে ভাবান্তর ঘটিতে শুরু করিল—একটু পূর্বের নির্লিপ্ত ভাব কোথায় উবিয়া গেল। এতক্ষণ সে ছিল হুকা-কাশির পাশে দাঁড়াইয়া, এইবার ধীরে-ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার ভ্রূ পুনরায় কুঞ্চিত হইয়াছে—আষাঢ়ের কালো মেঘ আবার মুখে নামিয়া আসিতেছে। হুকা-কাশি খাতা-পরীক্ষার ছলে আড়চোখে একবার তার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, সন্তোষ গম্ভীরভাবে জানালার ধারে উঠিয়া গিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

যেদিন প্রাতঃকালে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটে, সেদিনকারই সন্ধ্যার পরের কথা বলিতেছি।

খগেন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাসাবাড়িতে রাত পৌনে আটটার সময় সকলে আহারে বসিয়াছে। 'চিত্রা'য় একখানা নূতন ছবি আসিয়াছে, বায়োস্কোপ-রস-রসিকদের সেখানে বেজায় ভিড়। অশনিকান্তের এ-বিষয়ে বড়ই উৎসাহ, সে পূর্বাহ্নেই গিয়া কয়েকখানা টিকেট কিনিয়া আনিয়াছে। কেবলমাত্র গুর্খা দরোয়ানটার পাহারায় বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়া সকলের একসঙ্গে বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়, তাই খগেন্দ্রনাথ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছে এ-যাত্রা সে বাড়িতেই রহিয়া যাইবে, ছবিখানা যদি বাস্তবিকই সকলের চোখে ভালো লাগে তবে কাল সে একা গিয়া দেখিয়া আসিবে। ঠাকুরকে বলা হইয়াছে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলে খগেনের শোয়ার ঘরে তার জন্য ভাত ঢাকা দিয়া সে যেন বাড়ি চলিয়া যায়।

একটু পরে সাজসজ্জা করিয়া সকলেই বাড়ির বাহির হইয়া গেল। এই অবসরে নিরিবিলিতে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খগেন কাগজ-কলম লইয়া বসিল, কিন্তু অনেক কাটাছাঁটার পরেও চিঠিখানার ভাব ও ভাষা কোনওটাই যখন তার মনঃপূত হইল না, তখন বিরক্ত চিত্তে লেখার সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিয়া সে আহারে বসিল। আজ সারাদিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, বাতাসের লেশমাত্র নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর খগেন্দ্রনাথ বসিবার ইজিচেয়ারটাকে বারান্দার কাছে ঠিক জানালার সম্মুখে টানিয়া আনিল, খোলা জায়গায় চিৎ হইয়া যদি কিছু আরাম পাওয়া যায় সেই ভরসায়। ইজিচেয়ারের পাশে টিপয়ের উপর রহিল গুলিভরা একটা পিস্তল। আজকাল সন্ধ্যার পর একমুহূর্তের জন্যও খগেন এ-অস্ত্রটিকে কাছছাড়া করে না।

সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের পর এতক্ষণে ঝিরঝির করিয়া একটু বাতাসের আভাস দেখা দিয়াছে, ইজিচেয়ারের উপর দেহভার এলাইয়া দিতে খগেন যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস লইয়া বাঁচিল। ঘুমের উপর যাদের এতটুকু আধিপত্য নাই খগেন সে-শ্রেণীর লোক না, ইচ্ছা করিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু গ্রীষ্মের রাত্রিতে কলিকাতার দক্ষিণের বাতাসে কী যে সম্মোহনী শক্তি আছে জানি না, ধীরে-ধীরে খগেনের দুই চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ঠিক কতক্ষণ এভাবে কাটিয়াছে সে-সম্বন্ধে খগেনের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, হঠাৎ খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় সে সচকিত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। ইজিচেয়ারে শুইবার আগে ইলেকট্রিক আলোর প্রখর রশ্মিতে সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল, সে আলো এত মৃদু এবং ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে যে ঘরের সম্পূর্ণ অংশও আর চোখে পড়ে না। পরমুহূর্তেই

BanglaBook.org

আলোর রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু সমস্ত ঘরখানা জুড়িয়া নয়, কেবল একটা কোণ হইতে মনে হইল যেন অসংখ্য নক্ষত্রের তীব্র দ্যুতি তীরের ফলার মতো তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত খগেন চোখ রগড়াইয়া ভালো করিয়া আর-একবার তাকাইতেই আতঙ্কে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—কালো দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার একটা লোক তারই দেওয়াল-আলমারির সামনে দাঁড়াইয়া—তার হাতে দ্বারকানাথের সোনার হরিণ আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো খগেন্দ্রনাথ পাশের টিপয়টির উদ্দেশে হাত বাড়াইল, কিন্তু ইতিপূর্বেই সেটি স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেছে। সে ধড়মড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু ইস্পাতের মতো কঠিন একখানা হাত পিছন হইতে এমনই জোরে তার কণ্ঠটি চাপিয়া ধরিল যে, সে না পারিল নড়িতে, না বাহির হইল তার মুখ দিয়া এতটুকু স্বর। সেই মুহূর্তে সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল, যমদূতের মতো চারিটা লোক চারিখানি খোলা ভোজালি তার গায়ে ঠেকাইয়া নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যে-লোকটা পিছন হইতে খগেনের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল সে তার দূরবর্তী সঙ্গীটিকে লক্ষ করিয়া বলিল, 'মাল পাওয়া গেছে তো? তবে এবার এটাকে গলা টিপে এখানেই সাবড়ে দিই, কী বল?' ভোজালিধারীদের মধ্যে একজনের বোধকরি কথাটা তেমন মনঃপূত হইল না, সে কহিল, 'হাত নষ্ট করতে যাবে কেন দাদা? ভোজালি রয়েছে কীসের জন্যে?'

খগেনের মনে হইল গলার চাপুনি একটু যেন কমিয়াছে, সে অতিকষ্টে বলিল, 'তোমরা তবে হুকা-কাশির লোক? আমার বিশ্বাস ছিল তার কাজকর্মের ধারা অন্যরকমের। সবাই দেখছি তবে এক!'

'হুঁকা? হুঁকা আমরা কেউ টানি না, আমাদের কাশিও হয় না। তবে তুমি যদি ফের মুখ খোলো তবে তোমাকে যে ফাঁসি দেব তাতে ভুল নেই। আরেঃ, নিচে টর্চ হাতে ঘুরছে ও কে রে?' লোকটার শেষ কথাগুলি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

একজন তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে দেখিয়া আসিতে গেল, কিন্তু কিছুই তার নয়নগোচর হইল না; কহিল, 'তোমার বাপু একটু স্বপ্ন দেখার স্বভাব আছে! কই, কোথায় পেলে তুমি টর্চ-হাতে মানুষ? দরোয়ানটার কি আর ওঠবার অবস্থা রেখেছি?'

'না-না, দরোয়ান নয়, অন্য লোক, আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। তোরা যা, শিগগির নিচে গিয়ে কী ব্যাপার দেখে আয়। আমি এদিক সামলাচ্ছি।'

সাত ঃ অদৃশ্য শত্রু

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে কাশীতে ধনপৎ কাজেরিয়ার নিকট রেজিস্টার্ড খামে মোড়া একখানি চিঠি আসিল। চিঠিখানা হিন্দিতে লেখা, বানান আর ব্যাকরণের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া বাংলায় তরজমা করিলে সেখানা এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

'সর্দারজি,

তোমার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালা হয়েছে আর তার ফলে যে উদ্দেশ্যে আমাদের কলকাতা আসা সে-কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। তবে "সু" সম্পন্ন হয়েছে কি না তা এখনও ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাতেই কেমন যেন একটা অজানা রহস্যের ছায়া দেখছি। এই নির্জন জায়গায় বসে তোমার কাছে চিঠি লিখতেও মাঝে-মাঝে গা'টা যেন ছমছম করে উঠছে, মনে হচ্ছে অলক্ষে আমার পেছন থেকে উঁকি মেরে একজোড়া চোখ বুঝি গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

আমরা এখানে রওনা হয়ে আসবার আগে তুমি বুক ঠুকে বলেছিলে, "দেখি,

BanglaBook.org

কাশীবালা গুণ্ডাই বড়, না কলকাত্তাবালাই বড়।" কথাটায় তখন আমাদের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে এখন যেন বুঝতে পারছি কী ভয়াবহ জীব এরা। এদের কাজের ধারা প্রত্যক্ষ করলে মনে হয় সেই ছেলেবেলার গল্পে শোনা একদল "জিন" বুঝি এদের হুকুম তামিল করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে—তারা যেন সর্বজ্ঞ, আমাদের সমস্ত মতলবই টের পায়; যে-কোনও জায়গায় হাওয়া ফুঁড়ে ইচ্ছামতো তারা বার হতে পারে, আবার যখন-তখন হাওয়াতেই মিলিয়ে যেতে পারে। কাশীতে নাগোয়ার পথে ঝড়ের মতো হঠাৎ উড়ে এসে পঞ্চাশ জন শয়তানের চেলা যখন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তখন আশ্চর্য আমরা যতই হই না কেন, তারা যে আমাদেরই মতো রক্তমাংসের জীব অন্তত সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু অশনিবাবুদের বাড়ি থেকে সোনার হরিণ লুটে আনবার পর আমাদের চোখের সামনে এমন সব ধাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে যে, তারা বাস্তবিকই মানুষ না অন্য কোনও অশরীরী জীব তা নিয়ে আমাদের মধ্যে নিয়তই আলোচনা চলছে। আমার এ-চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লেই বুঝতে পারবে কেন আমি এ-কথা বলছি।

'অশনিবাবুদের বাড়ির প্রায় সবাই রাত্তিরের শো'তে বায়োস্কোপ দেখতে যাবে খবর পেয়ে সেদিনই তোমার উপদেশ মতো আমরা আমাদের বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম। গুর্খা দরোয়ানটার পেটে ওষুধ পড়তে সে এমনই অকাতরে ঘুমোতে শুরু করে দিল যে, বিহার বা কোয়েটার মতো বড়রকমের একটা ভূমিকম্প না হলে সে যে তার চারপায়া ছেড়ে উঠবে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। টুক করে তার কোমর থেকে কুকরিটি তুলে নিয়ে কেষ্ট খাটিয়ার সঙ্গেই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চাদর চাপা দিয়ে রাখল—যেন নিমতলায় বয়ে নিয়ে যেতেই যা বাকি। কিন্তু সর্দারটি ওদের যে বিশেষ ঝানু তা স্বীকার করতেই হবে। আলমারির গায়ে ছেনির ঠকাঠক শুরু হতেই তার তন্দ্রা ছুটে গেল, ধড়মড়িয়ে ইজিচেয়ারের ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আমি তার গলা টিপে ধরলাম, আর সামনে থেকে কেষ্ট আর ফুকন সিং ভোজালি উঁচিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখল। মনে-মনে একটু খুশি হলাম এই ভেবে যে, অতি সহজেই সব গোল চুকে গেল, মারামারি, রক্তপাতের দরকার হল না। হঠাৎ কিন্তু একতলার দিকে নজর পড়তেই আমার চক্ষুস্থির! ছিপছিপে, ছায়ার মতো কালো একটা মূর্তি মাঝে-মাঝে টর্চ ফেলে আনাচে-কানাচে উঁকি মেরে কী দেখছে। নাগোয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল; বিদেশে ঝড়ের-মতো-আসা সে-দলটা সেবার অন্তত আমাদের প্রাণটা রেহাই দিয়েছিল, আজ নিজের দেশে মুঠোর মধ্যে পেয়ে সবাইকে টুকরো-টুকরো করে রেখে গেলেই বা প্রতিরোধ করবার কে আছে? সে-স্থানটা আবার এমনি যে, সন্ধ্যার পর বাড়ির মধ্যে ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেলেও প্রতিবেশীরা যে তার কোনও সাড়াশব্দ পাবে সে-আশা নাই। কী করে এরা আমাদের সমস্ত মতলব আগে থেকে টের পেয়ে ঠিক সময়মতো এসে উপস্থিত হয় তা এক ভগবানই জানেন। তাড়াতাড়ি, কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য; আর নিজে খাপানের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে, পাশে বাক্স-প্যাঁটরা রাখবার ছোট্ট একটা যে গুদাম ছিল, তারই মধ্যে ওকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলাম। ততক্ষণে কেষ্ট ফিরে এসেছে, বললে সে আর ফুকন সিং সমস্ত বাড়ির আশপাশটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, কোথাও কোনও টর্চওয়ালা শত্রুর সন্ধান মেলেনি। আমাদের এদিককার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল; আর অপেক্ষা করবার কোনও দরকার ছিল না, সবাই তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে

মোটরে চেপে বসলাম। আসবার সময় মোটরটা চালিয়ে এনেছিল ফুকন সিং; তাকে বলে দিলাম, ধারে কাছে শত্রু থাক বা না থাক, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বড়বাজারের "বাসায়" গিয়ে পৌঁছুতে হবে। ওপরের বন্ধ গুদাম থেকে খগেন তখনও চিৎকার করে মরছিল; তার গলার ক্ষীণ, অস্পষ্ট আওয়াজ মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম।

'সে-রাত্রে সবাই যে বেশ উদ্বিগ্ন মনেই বাসায় ফিরে এলাম তা বোধকরি না বললেও বুঝতে পারছ। পরদিন সারাক্ষণ শঙ্কিত মনেই কাটালাম; দিনেরবেলাটা ভালোয়-ভালোয়ই কাটল বটে, কিন্তু রাত্রে যে ব্যাপার ঘটল তা একাধারে বীভৎস, রহস্যময়, অচিন্তনীয়! রাত তখন বোধকরি একটা হবে; সমস্ত কলকাতা শহর ঘুমন্ত দৈত্যের মতো নিঃসাড়ে পড়ে আছে, শুধু আমরা কয়টি প্রাণী তেতলার একটা কুঠুরীতে মোমবাতি জ্বেলে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত। ঘরের দরজা বন্ধ, শুধু বারান্দার দিকে বাতাস চলাচলের জন্য লোহার শিক দেওয়া একটা জানালা খোলা রয়েছে। পরদিনই আমাদের কাশী রওনা হয়ে পড়া উচিত, না কি কলকাতায় আরও কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই কর্তব্য, কাশী যেতে হলে ঠিক সোজা রেলের পথে না গিয়ে কোন পথে গেলে ভালো হয়—এইসব নানা বিষয়ে আস্তে-আস্তে আলোচনা হচ্ছে এমনসময় কেষ্ট হঠাৎ 'বাবাগো!' বলে আমার হাত চেপে ধরল। চমকে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাইতেই জানালার ওধারে যা দেখলাম তা ভাবতে এখনও আমার গা শিরশির করে, শরীরের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। যে-প্রাণীটি আমাদেরই মাত্র কয়েক হাত দূরে শিকের পেছনে দাঁড়িয়ে, কী বলে তার বর্ণনা দেব? শ্মশানের চুল্লী থেকে আধপোড়া অবস্থায় সে যেন উঠে এসেছে। নাকটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে—চিহ্নমাত্র নাই—আছে কেবল তারই জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত। শুধু নাক নয়, ওপরের চোয়ালেরও অনেকখানি পোড়া; তার ফলে মাড়িসুদ্ধ দাঁতগুলো বার হয়ে পড়েছে—উঁচু-নিচু জঘনা একসারি দাঁত। চোখের জায়গায় দুটো গভীর খোঁড়ল দেখা গেল বটে, কিন্তু তার ভেতর বাস্তবিকই কোনও তারা আছে কি না নজরে এল না। ঘোড়ার মতো লম্বাটে মুখের গাল দুটো তোবড়ানো, হাড় বেরিয়ে আসছে, আর সমস্ত মুখখানা আগুনে পুড়ে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'পলকের জন্য আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমরা যে, তার শরীর বলে কোনও বস্তু আছে কি না লক্ষ করিনি। সকলে ভয়ে পেছিয়ে এসেছিল, কেবল আমি একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি জীবটার পেট ফুঁড়ে কেমন একটা অদ্ভুত আলোর রেখা ফুটে বার হয়ে এল—উগ্র—অতি উগ্র সে আলো, সাধারণ মানুষের চোখে সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি সকলেই একসঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম, আর তার পরক্ষণেই শুনতে পেলাম হা-হা করে বিকট একটা অট্টহাসি। চোখ খুলে দেখি, সেই মূর্তিমান বিভীষিকা জানালা ছেড়ে থপথপ করতে-করতে বারান্দার পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। কী যে আমাদের কর্তব্য কিছুই ঠাহর করতে না পেরে আমরা ক'টি প্রাণী শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। জানি, তুমি আমাদের ভীরু অপবাদ দেবে, কিন্তু তবুও স্বীকার না করে উপায় নাই যে, দরজা খুলতে আমাদের ভরসা হল না, কেননা, বারান্দার পশ্চিম দিক দিয়ে কারোরই কোনওদিকে বার হবার জো নাই; ওটা নির্ঘাত ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'আট-দশ মিনিট কেটে গেল; বাইরে কোনও সাড়াশব্দ নাই দেখে আমাদের সাহসও যেন একটু-একটু করে ফিরে এল। হাজার হোক, দলে তো আমরা একেবারে

পাতলা নই! নিঃশব্দে দরজা খুলে, ডান হাতের সবল মুষ্টিতে ছোরা ধরে একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে এলাম। বারান্দা ধরে পশ্চিমের দিকে কয়েক পা এগুতেই তো আমাদের চক্ষুস্থির! কোথায় অন্তর্হিত হল সে-মূর্তিটা? বারান্দার দক্ষিণে যে-ঘরটা সেটা বার থেকে তালা বন্ধ, ভিতরে পিঁপড়া পর্যন্ত ঢুকতে পারে না; পূর্ব দিক আমরা আগলে বসে আছি; উত্তর আর পশ্চিম দিকে ঘোরানো রেলিং থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে রেখেছে। রেলিং-এর নিচেই দেওয়াল একতলা অবধি নেমে গেছে—মসৃণ দেওয়াল—তার গায়ে কোনও অবলম্বন নেই। তেতলা থেকে লাফ দিয়ে কেউ নিচে পড়লে যতই ওস্তাদ হোক না কেন সে, মৃত্যু অনিবার্য। আর তা ছাড়া সেক্ষেত্রে শব্দও তো একটা হত; কারও কানে এতটুকু শব্দও তো আসেনি!

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে-ভেবে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তোমার পত্রোত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে বসে রইলাম।

ইতি—রামদয়াল'

আট ঃ ফটো রহস্য

চিনির কারখানায় সেদিন যে আধ-পোড়া, বাঁধানো মোটা খাতাখানার সন্ধান মিলিয়াছিল তারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি প্রসন্নমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন। তাঁর হাতে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস—অতবড় শক্তিশালী লেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। তারই সাহায্যে মাঝে-মাঝে কতকগুলি কাগজপত্র তিনি দেখিতেছিলেন, এবং ভাবে মনে হয় দেখিয়া খুশিই হইতেছিলেন। টেবিলের উপর ঠিকানা লেখা, টিকেট-আঁটা একখানা খাম ডাকে যাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে, শিরোনামায় দেখা যাইতেছে দুর্গাপ্রসন্নের নাম।

অমৃত আসিয়া সকালবেলার ডাক টেবিলের উপর রাখিয়া গেল; হুকা-কাশি তখন খাতাপত্র পাশে সরাইয়া সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেন। দুখানা চিঠি পড়ার পর তৃতীয়খানায় আসিতেই তাঁর মুখে কি না জানি না—কেননা সে-মুখে জোয়ার-ভাঁটার খেলা বিশেষ দেখা যায় না—মনে রীতিমতো ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি দস্তুরমতো চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া-থাকিয়া সন্দেহের কালো ছায়া তাঁর চোখের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল, অন্যমনস্কভাবে হাতের লেন্সখানা দোলাইতে দোলাইতে তিনি নিজের মনে কী যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ধড়মড়াইয়া চেয়ারের উপর একেবারে সোজা হইয়া তিনি বসিলেন। এইমাত্র ডাকে যে-চিঠিখানা আসিয়াছে মুখ-খোলা অবস্থায় তার খামখানা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, সেটি তিনি হাতে তুলিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সংশয়ের যে-পর্দাটা এতক্ষণ চোখের সামনে ঝুলিতেছিল হঠাৎ সেটি অনেকখানি স্বচ্ছ হইয়া আসিল, মনে-মনে একটু হাসিয়া তিনি ভিতর হইতে দরজার খিলটি আঁটিয়া দিলেন।

যে-ঘরটিতে বসিয়া হুকা-কাশি এতক্ষণ কাজকর্ম করিতেছিলেন, তারই সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত আর-একটা যে ছোট্ট কুঠরী ছিল, সাধারণের চোখে ধরা পড়িবার তার কোনওই উপায় ছিল না। বড়ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া তিনি এইবার সেই ছোট্ট কুঠরীটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর খানিকক্ষণ ধরিয়া তাঁর আর কোনওই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে আবার তিনি বাহির হইলেন, রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া দেওয়ালের উপরকার একটা ইলেকট্রিকের বোতাম টিপিয়া ধরিলেন, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চাকরদের ঘরের কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত পরে ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই হুকা-কাশি বলিলেন, 'আমার স্নানের জল

BanglaBook.org

ঠিক করো, একঘণ্টার মধ্যেই আমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। এর ভেতর যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো তাঁকে বলে দেবে, সন্ধ্যার আগে আমার বাড়ি ফেরবার সম্ভাবনা নেই, ইচ্ছা করলে তিনি নাম-ঠিকানা রেখে যেতে পারেন, বুঝলে?'

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, হুকা-কাশি ইঙ্গিতে তাকে থামিতে বলিলেন, তারপর একটু ভাবিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া একখণ্ড কাগজের উপর পেন্সিলে খসখস করিয়া কয়েকটা কথা লিখিয়া ফেলিলেন। তারপর কাগজখানা খামে মুড়িয়া চাকরের হাতে দিয়া কহিলেন, 'অমৃতকে বলবে বারোটার ভেতর রণজিৎবাবুকে যেন এটা দিয়ে আসে।'

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় শ্রীপুর স্টেশনে একখানা ডাউন স্টিমার আসিয়া থামিল; বহু লোকজন এবং মালপত্র নামিয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে নামিলেন হুকা-কাশি। আজ ছুটির দিন নয়, অফিস-আদালত, কলকারখানা সমস্তই খোলা, কাজেই এই ভরদুপুরে দ্বারকানাথের বাড়ি গেলে হয়তো সেই অসুস্থ ভদ্রলোকটি ছাড়া আর কারওই সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না, মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হুকা-কাশি সোজা চিনির কলের দিকেই রওনা হইলেন। কারখানার দরোয়ানটা হুকা-কাশিকে ইতিপূর্বে আরও দু-একবার দেখিয়াছে, এবং এ-ভদ্রলোকটি কে সে সম্বন্ধে তার খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও ইনি যে একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তা জানিতে তার বাকি ছিল না। সে সামনে আসিয়া প্রকাণ্ড একটা সেলাম জানাইয়া কহিল, 'আইয়ে হুজাউর, ছোটবাবু ঔর সন্তোষবাবু অফিস-কামরামে হই; খবর ভেজেঙ্গে?'

হুকা-কাশির নির্দেশ অনুযায়ী খবর 'ভেজা' হইল, এবং অল্পসময়ের মধ্যেই সন্তোষ ও সলিল আসিয়া পরম আপ্যায়নের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করিল। নিয়মিত শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ হইলে প্রথমেই আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করিল সন্তোষ, কহিল, 'এখানে আসবার আগে কর্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে না কি? আজ সকালেই আপনার কথা উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন।'

'কী বলছিলেন?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'না তেমন কিছু নয়—এই অহিভূষণবাবুর খোঁজখবর কিছু পাওয়া গেল কি না, সোনার-হরিণের কিনারা কতটা কী হল, এই সব।'

কথা বলিতে-বলিতে সকলে ততক্ষণে অফিস-কক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হুকা-কাশি চেয়ারে বসিয়া নতমুখে নিজের দুই চোখের উপর বারকতক হাত বুলাইলেন, তারপর মনস্থির করিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, 'দেখুন সন্তোষবাবু, কর্তাকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা অহিভূষণবাবুকে এ-জীবনে আর দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের খুবই কম।'

'অ্যাঁ! বলেন কী, গুণ্ডারা তাঁকে মেরে ফেলেছে?' আতঙ্কে সন্তোষ একেবারে শিহরিয়া উঠিল। সলিলের মুখ দিয়া কোনও শব্দই বাহির হইল না, সে কেবল ফ্যালফ্যাল করিয়া একদৃষ্টে হুকা-কাশির মুখের পানে চাহিয়া রহিল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসে জড়িত সে-এক অদ্ভুত দৃষ্টি।

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, 'অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না, তবে চৌদ্দআনা সম্ভাবনাই হচ্ছে তাঁকে আর ফিরে না পাওয়ার এবং সেজন্যেই আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। তবে আমার অনুরোধ, এ-খবরটা দ্বারিকবাবুকে এখন দেবেন না, তাঁর শরীর অসুস্থ, হয়তো মনে হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে বসতে পারেন।'

সন্তোষ মলিন মুখে নতশিরে চেয়ারের উপর ঠায় বসিয়া রহিল, কিন্তু সলিল ক্রমাগত উসখুস করিতে লাগিল, মুখে তখন তার একটা অসহ্য অস্বস্তির ভাব। অহিভূষণ চৌধুরী লোভে পড়িয়া নিজেই দ্বারকানাথের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে, না অপর কেউ বাগে পাইয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী যন্ত্রের মতো তাকে চালাইয়াছে—সে-সমস্ত খবর এখনও গভীর রহস্যে আবৃত; কিন্তু দোষ যদি তার থাকিয়াও থাকে তবুও যে-লোকটা এতদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া চিনির কারখানাটি দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, তার মৃত্যুতে শ্রীপুরে বোধকরি কেহই খুশি হইতে পারিত না।

BanglaBook.org

হুকা-কাশি আড়চোখে দুজনারই মুখের ভাব লক্ষ করিলেন, তারপর কহিলেন, 'যাক, ওর জন্যে মন খারাপ করে কী আর করবেন, হবার যা তা তো হয়েইছে। যে-জন্যে আজ আমার শ্রীপুরে আসা তা এখনও বলা হয়নি। সেদিন এখানে বসে একটা হিসাবের খাতা আমি দেখতে চেয়েছিলাম, মনে আছে? আর-একবার সে খাতাটার দরকার পড়েছে—দু-একদিনের জন্যে সেটা আমায় একবার দিতে পারবেন?'

সন্তোষ বলিল, 'একদিন কেন, যত দিন খুশি তত দিনই রাখতে পারেন। পরশু থেকে আমাদের নতুন খাতা খোলা হয়েছে, ও-পুরানো খাতার দরকার আর রোজ-রোজ পড়বে না।'

'তা হলে তো ভালোই হল', বলিয়া একটিপ নস্যি নেওয়ার উদ্দেশ্যে হুকা-কাশি জামার পকেটে হাত দিলেন। হাত দিয়াই কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন—বিশেষ ব্যস্তভাবে জামায় যে-কয়টা পকেট ছিল পরপর সবগুলি হাতড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে মুখ তাঁর বিবর্ণ, পাণ্ডুর হইয়া গেল।

সন্তোষ এবং সলিলের বিস্ময়ের যেন আর অবধি রহিল না। হুকা-কাশি চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়াছেন দেখিয়া সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন ব্যস্ত ভাবে কী খুঁজছেন মিস্টার হুকা-কাশি, কোনও কিছু হারিয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ; অথচ কী করে হারাল তা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

'কী সে জিনিসটা?'

'ছোট একখানা ফটো।'

'আপনি ঠিক জানেন, আপনার পকেটেই সেটা ছিল?'

'সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই, সন্তোষবাবু! আপনাদের কারখানায় ঢোকবার মুখেই আমি একটিপ নস্যি নিই—নস্যির কৌটো বার করবার সময়ও স্পষ্ট টের পেয়েছি ওটা আমার পকেটেই রয়েছে। অথচ এইটুকু পথ আসবার ভেতর কী করে সেটা উড়ে গেল ভেবে পাচ্ছি না! কারখানার চারধারটা সবাইকে একবারটি খুঁজে দেখতে বলুন না, যদি পকেট থেকে ফটোটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে—আমি নিজেও সঙ্গে যাচ্ছি। অবশ্য দামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে-জিনিসটা কিছুই নয়, কিন্তু তবুও ওটা হারিয়ে গেলে আমার কী যে ক্ষতি তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই। কোয়ার্টার সাইজের ফটো, পেছনের রবার স্ট্যাম্পে ছাপ মারা আছে—K.P.C।'

তৎক্ষণাৎ কারখানায় যতগুলি লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইল, সবাইকে সঙ্গে লইয়া সন্তোষ এবং সলিল ফটকের সম্মুখ হইতে শুরু করিয়া গোটা কম্পাউন্ডটা খুঁজিতে আরম্ভ করিল; হুকা-কাশিও সমস্তটাক্ষণ সেই সঙ্গে-সঙ্গেই রহিলেন, উদ্বেগের আজ আর তাঁর সীমা নাই। কিন্তু কোনও ফলই দর্শিল না, পুরা দেড়টি ঘণ্টা ধরিয়া সমস্তটা মাঠ চষাই কেবল সার হইল। হুকা-কাশি বড়ই মুষড়াইয়া পড়িলেন। অথচ সন্ধ্যার পর কলিকাতায় বহু কাজ পড়িয়া, শীঘ্রই ফেরা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নাই। সলিলকে উদ্দেশ করিয়া তাই তিনি বলিলেন, 'এঁরা বরং আর একটু খুঁজে দেখুন—ভরসা খুবই কম, তবু যদি সন্ধান মিলে যায়! আপনি আমায় সঙ্গে করে একবারটি দ্বারিকবাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই। ফিরতি স্টিমারের সময় হয়ে এল।'

আন্দাজ প্রায় সাতটা সাড়ে-সাতটার সময় হুকা-কাশি কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। অমৃতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও খবর আছে?'

'এজ্ঞে আধঘণ্টাটাক আগে শিরীষপুর না কোত্থেকে যেন ফোনে একবার ডেকেছিল।'

'শিরীষপুর! ও বুঝেছি শ্রীপুর! ফোন করেছিল? কী বললে?' পরম আগ্রহের সঙ্গে হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন।

'এজ্ঞে আমায় কিছু বলেননি, কেবল শুধোলেন, "বাবু ফিরেছেন?" আমি বললুম, "তেনার ফিরতে দেরি হবেন, নাগাদ আটটা সাড়ে-আটটায় ফের ডেকে দেখবেন"।'

BanglaBook.org

'বেশ করেছ'—বলিয়া হুকা-কাশি বাড়ির ভিতর ঢুকিলেন। আজ সারাদিনে ক্লান্তি নিতান্ত কম হয় নাই, জামা-কাপড় ছাড়িয়া একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ইজিচেয়ারের উপর দেহটা তিনি এলাইয়া দিলেন বটে কিন্তু মন তাঁর সম্পূর্ণভাবেই পড়িয়া রহিল টেলিফোনটার দিকে। একটু পরেই ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, হুকা-কাশি তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলিয়া বলিলেন, 'হ্যালো! কে, সলিল বাবু? ব্যাপার কী? আমি চলে আসবার পর ফটোটা খুঁজে পেয়েছেন? বাঁচালেন, একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালেন। কোথায় পেলেন? ফটকের বাইরে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়টার ভেতরে? দেখুন দেখি, কী আশ্চর্য, কতবার আমরা গেটটার আশ-পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি! হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন কালই; একজন বিশ্বাসী লোকের হাতে পাঠাবেন কিন্তু। আপনি নিজেই দিয়ে যাবেন? তা হলে তো আর কথাই নেই! আচ্ছা নমস্কার।'

রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াই হুকা-কাশি উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, 'অমৃত! অমৃত!'

অমৃত সাড়া দিয়া নিকটে আসিতেই তিনি কহিলেন, 'রণজিৎবাবুর কাছে গেছলে?' স্বরে ব্যস্ততা আছে বটে কিন্তু চিন্তার লেশমাত্র নাই, আছে কেবল প্রচুর উৎসাহ।

'এজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কাল সকালেই আসবেন বলে দিয়েছেন।'

'ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো, রুটি হতে আর কত দেরি।'

নয় ঃ ভগ্ননীড়

পরদিনকার ঘটনা। বেলা সাড়ে-ন'টা বাজিয়া গেছে, নক্ষত্রবেগে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া জগন্নাথ ঘাটের সম্মুখে খশ্-শ্-শ্ শব্দে একেবারে নিশ্চল হইয়া থামিয়া পড়িল। গাড়িখানা আসিতেছিল এমনই দুরন্ত বেগে এবং ড্রাইভার ব্রেক চাপিয়া ধরিয়াছিল এমনই অতর্কিতে যে, ভিতরে যে একটি মাত্র আরোহী ছিল কোনওগতিকে ড্রাইভারের ঘাড়ের উপর হুড়মুড় খাইয়া পড়িতে-পড়িতে অতিকষ্টে আপনাকে সে সামলাইয়া লইল। কিন্তু সেদিকে তখন তার দৃকপাতও নাই, সমস্ত শরীরে তার কী এক অপূর্ব উন্মাদনা, চোখে শিকারী শ্যেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রয়োজন পড়িলে এবং সম্ভব হইলে সে যেন ডানা মেলিয়া আরও দুর্বার বেগে শূন্যের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেও প্রস্তুত। আরোহীটি আমাদের রণজিৎ।

গাড়িখানা যেখানে আসিয়া হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গেল ঠিক তারই সম্মুখে ছিল আর-একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। ছয়জন লোক—তারা সকলেই রণজিতের অপরিচিত—তখন সবেমাত্র সেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কুলির মাথায় লটবহর চাপাইয়া, টিকেট-ঘরের দিকে রওনা হইতেছে। এ-ক'বছর ধরিয়া হুকা-কাশির শাগরেদি করার ফলেই কি না জানি না, রণজিতের চোখ আজকাল অসম্ভবরকম খুলিয়া গিয়াছে। সামনের ও লোক কয়টি যে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেদের ভোল সম্পূর্ণরূপেই বদলাইয়া ফেলার চেষ্টা পাইয়াছে এ-তথ্যটুকু বোধকরি উপস্থিত আর সকলের কাছেই লুকানো ছিল, ছিল না কেবল রণজিতের অভ্যস্ত চোখের কাছে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া সে ওই সন্দেহভাজন লোক কয়টিকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু এক বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল ঠিক তার সম্মুখেই। স্টিমার-স্টেশনের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তখন মেরামতের কাজ চলিতেছিল; যাত্রীদের টিকেট-ঘরের দিকে আগাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল অল্প পরিসর একটা সাময়িক ফটকের ভিতর দিয়া। অল্প জায়গায় বেশি লোক জড় হইলে যে-বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় সেইটুকুর সুযোগ নিয়া এক পকেটমারের বাছা যাত্রীদের পকেটের অনাবশ্যক ভার লাঘবের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পারে নাই, এক অতি চতুর লোক হাতিয়ার সমেত তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়াছে। তারপর সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। দেখিতে-দেখিতে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, আর

শ্রাবণের ধারার মতো অনবরত চড়-চাপড় বর্ষিতে শুরু হইল পকেটমার-নন্দনের মাথার উপর, পিঠের উপর। রাস্তা দিয়া অনেক পথচারী লোক নিজের-নিজের কাজে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তাদের জ্ঞানপিপাসা অসম্ভবরকম বাড়িয়া গিয়াছে, আসল ব্যাপারটির সম্বন্ধে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তারাও একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিড় জমাইয়াছে। রণজিৎ অস্থির হইয়া উঠিল, এসব ব্যাপারে তার এখন আদৌ উৎসাহ নাই—সে চায় কোনওরকমে ভিড় কাটাইয়া লোক কয়টির পিছন লইতে। কিন্তু সামনের ব্যূহ ভেদ করা তখন স্বয়ং নেপোলিয়ানেরও অসাধ্য, সে তো কোন ছার! তার বুক ঢিবঢিব করিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সে শুরু করিল কেবল ঘামিতে।

রণজিতের মনের বর্তমান অবস্থা পাঠক-পাঠিকারা হয়তো সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিবেন না, যদি না গোড়ার দিকের কয়েকটা ঘটনা এই সময়ে তাঁদের বলিয়া দিই। শ্রীপুর রওনা হইয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে হুকা-কাশি অমৃতের মারফত রণজিৎকে যে-একটা জরুরি খবর পাঠাইয়া ছিলেন, পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে; তারপর শ্রীপুর হইতে ফিরিয়াই বেহারাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথাসময়ে রণজিৎকে তার চিঠি দেওয়া হইয়াছিল কি না। জবাবে অমৃত যা বলিয়াছিল তার মর্মার্থ এই যে, আজ সকালেই রণজিৎ তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিবে। রণজিৎ তার কথামতো বাস্তবিকই ভোরবেলায় হুকা-কাশির বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল; হুকা-কাশি তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া কহিলেন, 'সূরযমল নগরচাঁদের লেন কোথায় আপনি জানেন রণজিৎবাবু?'

'না তো!'

'আমারও ঠিক জানা নেই, তবে নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। বোধহয় মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, বারাণসী ঘোষের স্ট্রিট—ওই সব অঞ্চলেরই কাছাকাছি। ডিরেকটরিটা দেখলেই জানতে পারব। আমাদের দরকার—নম্বরের বাড়িটা।'

'কেন? সোনার হরিণ কি সেখানে নাকি?' রণজিৎ সোৎকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

'কতকটা সেইরকমের আঁচ পাচ্ছি বটে, তবে খাঁটি জবাব নির্ভর করছে একটা ভৌতিক-কাণ্ডের সত্যাসত্যের ওপর। যতক্ষণ সেটি না সঠিক জানতে পারছি, ততক্ষণ হ্যাঁ-না কিছুই জোর গলায় বলা চলে না রণজিৎবাবু! ও-ব্যাপারটার মীমাংসা করাই হচ্ছে এখন আমার প্রথম কর্তব্য, আর তারই জন্যে দিন কয়েক এখন আমায় খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। অথচ যে-আভাসটুকু পাওয়া গেছে তার সুযোগ না নেওয়াও মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কথাগুলো বড়ই হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে, না? কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যখন একে-একে খুলে বলব তখন দেখবেন, হেঁয়ালির নামগন্ধও এতে নেই—জলের মতো সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, অবশ্যি ও-বাড়িটার ত্রিসীমানায়ও আমি জীবনে কখনও ঘেঁষিনি, তবু যত দূর মনে হয় ছ'জনের বেশি লোক বোধকরি ওখানে নেই। সেই লোক ছ'টির গতিবিধির ওপর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এটুকুর জন্য আপনার ওপর আমি নির্ভর করতে পারব কি রণজিৎবাবু? একটা কথা কিন্তু গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার—কাজটা বড়ই বিপজ্জনক। ওদের নজর পূর্ণভাবে এড়িয়ে প্রতিটি পদে আপনাকে চলতে হবে, যাতে করে সন্দেহের বাষ্পটুকুও আপনার ওপর পড়তে না পারে। বাস্তবিকই সন্দেহ ওদের জেগে উঠলে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা মারাত্মক রকমের ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে। ও-খুনেগুলো কিছুতেই পিছপা নয়—মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই ওদের বরাবরকার অভ্যাস, দরকার পড়লেই নির্বিচারে আপনার বুকে ওরা ছুরি বসিয়ে দেবে, হাত তাতে এতটুকুও কাঁপবে না ওদের। ও সত্যি-সত্যিই আগুন নিয়ে খেলা, মনে যথার্থ ভরসা না পেলে আমি কিছুতেই এ-ব্যাপারে নামবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে পারি না।'

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিল, কহিল, 'বিপদের নাম শুনে আপনি আমায় আঁৎকে উঠতে কি কখনও দেখেছেন না কি মিস্টার হুকা-কাশি? পদ্মরাগ-উদ্ধারের সময় সেই মোটর-রেসের কথা আপনার মনে পড়ে? খুব বেশি ভীরুতার পরিচয় কি তখন পেয়েছিলেন?'

BanglaBook.org

হুকা-কাশি লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'না-না-না, সেভাবে তো কথাটা আমি বলিনি রণজিৎবাবু, কেন আমায় মিছে লজ্জা দিচ্ছেন? এই বেপরোয়া দস্যুগুলোর সঙ্গে লাগতে হলে খুব সাবধানী হয়ে চলতে হয়, এই কথাটা বলাই আমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল, নইলে সাহসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলতে পারে এমন লোক তো আজ পর্যন্ত এতটা বয়সেও কই আমার চোখে পড়ল না!... যাক, এদিককার ভার তবে আপনার ওপর দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমার সঙ্গে আসুন, একটা জরুরি জিনিস আপনাকে দেখাবার আছে।' বলিয়া হুকা-কাশি রণজিতের হাত ধরিয়া আমাদের পূর্বপরিচিত সেই গুপ্ত কুঠুরীটুকুর মধ্যে ঢুকিলেন। তারপর বাহির করিলেন কল্যকার সেই ফটোটি।

মিনিট পাঁচেক পরে দুজনাই হাসি-হাসি মুখে বাহির হইয়া আসিলেন, রণজিৎকেই যেন একটু বেশিমাত্রায় উৎফুল্ল দেখা গেল; ডিরেকটরি হইতে সূরযমল নগরচাঁদ লেনটি কোথায় জানিয়া লইয়া সেই মুহূর্তেই সে বিদায় লইল। ওই লেনের উদ্দেশে এখনই তাকে রওনা হইতে হইবে।

গলিটি কোন অঞ্চলে ডিরেকটরি হইতে সে-বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, অল্পক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই সেটির সন্ধান মিলিল। তারপর, এক-এক করিয়া নম্বর গুনিতে-গুনিতে নির্দিষ্ট বাড়িখানার সম্মুখে আসিয়াই কিন্তু সে শুধু স্তব্ধ নয়, হতভম্ব, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। যে-দৃশ্য দেখিতে পাইল সেইজন্য একেবারেই সে প্রস্তুত ছিল না, তা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। দুয়ারে একখানা সিডান বডির ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, তার ছাদের উপর স্ট্র্যাপে বাঁধা বিছানা ও গুটিকয়েক সুটকেস—এককথায়, বিদেশ-যাত্রার যাবতীয় সরঞ্জাম। ইতিপূর্বেই তিনজন আরোহী গাড়ির মধ্যে বসিয়া ছিল, রণজিতের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আরও তিনজন আসিয়া জুটিল, এবং পরক্ষণেই সকলকে কুক্ষিগত করিয়া সেই বিশাল যন্ত্রদানবটা রাস্তাঘাট কাঁপাইয়া সগর্জনে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রণজিৎ কেবল ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিল—তারই চোখের সম্মুখ দিয়া পাখি নীড় ভাঙিয়া পালাইতেছে।

একবার ভাবিল, 'চোর-চোর' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সে চিৎকার করিয়া ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই হুকা-কাশির কথা মনে পড়িয়া গেল; তিনি কহিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া হ্যাঁ-না বলার সময় এখনও আসে নাই। অযথা চিৎকার দিয়া শেষে কি নিজেই সে বিপদে পড়িবে? আর তা ছাড়া আরও একটা বিষয় ভাবিবার আছে—ক্ষুরধারবুদ্ধি হুকা-কাশি জাল ছড়াইয়া এখন সযত্নে সেটিকে নিজের দিকে গুটাইতেছেন; এমনসময় আনাড়ির মতো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিলে হয়তো সে জাল ফাঁসিয়া যাইবে, গভীর জলের মাছগুলি আবার গভীর জলেই আশ্রয় লইবে, লোকচক্ষুর সম্মুখে তাদের বাহির করিবার আর কোনও উপায়ই অবশিষ্ট থাকিবে না।

মানুষের সৌভাগ্য বলিয়া যে-একটা কথা আছে আকছার হয়তো সেটির সহিত পরিচয় ঘটে না, তবে একেবারেই যে ঘটে না এমন কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেননা তা হইলে ও-শব্দটার সৃষ্টি হইবে কেন? ও-বস্তুটির কল্পনাও যখন আমরা করিতে পারিতেছি না এমনই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে হয়তো তাহার সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল! রণজিতের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল ঠিক এইরকমেরই একটা শুভমুহূর্ত—সে দেখিতে পাইল খালি গাড়ি লইয়া এক শিখ ড্রাইভার তার পাশ কাটাইয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পলকের মধ্যে রণজিৎ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল—ও-লোক কয়টি কোথায় গা-ঢাকা দিবার মতলব করিতেছে সে তা বাহির করিবেই, তাতে যত বড়ই না কেন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ট্যাক্সিখানা থামাইয়া চালককে সে কহিল, 'ওই যে সিডান গাড়িটা মোড়ে বেঁকছে দেখছ, ওখানা যেখানে থামবে, আমাকেও সেখানে নামিয়ে দিতে হবে; যদি পারো, ভাড়া তো মিলবেই উপরন্তু একটা মোটারকমের বকশিসও দেব। কী বলো, পারবে?'

'উঠিয়ে তো বাবুসাব!' বলিয়া শিখ ড্রাইভার বিদ্যুৎ-গতিতে ট্যাক্সি ছুটাইয়া দিল।

BanglaBook.org

দশ ঃ হান্টার-পর্ব

অল্প একটু পরেই বীটের কনস্টেবল আসিল, পকেটমার প্রভুকে গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে চলিল; 'তামাশা' শেষ হইয়া গেছে; অধিকাংশ লোকই তাই যেমন হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, তেমনি আবার নিমেষে হাওয়াতেই মিলাইয়া গেল। বাকি রহিল কেবল কয়েকজন অপূর্ব অধ্যবসায়ী, তারা থানা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া নিঃশেষে সমস্তখানি জ্ঞান আহরণ করিবে, তবে নিরস্ত হইবে।

সম্মুখের রাস্তা ফাঁকা হইয়া যাওয়ায় এতক্ষণে রণজিৎ আবার অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। তাড়াতাড়ি খানিকটা পথ আগাইয়া গিয়া সে দেখে তার সন্দেহের পাত্র সেই লোক কয়টি টিকেট-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে টিকেট কিনিতেছে। আগে হইতেই সে ঠিক করিয়াছিল যতটা সম্ভব ইহাদের সহিত ব্যবধান রাখিয়া চলিবে, কিছুতেই নিজের উপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়িতে দিবে না। বাছিয়া-বাছিয়া সে তাই এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে অনায়াসেই সে ইহাদের কার্যকলাপ দেখিতে পারে অথচ তার সম্বন্ধে কাহারও অহেতুক কৌতূহল না জন্মে।

যে-লোকটা অপর সকলের মুখপাত্র হইয়া টিকেট কিনিতেছিল সে টাকার জন্য জামার পকেটে হাত দিল—রণজিৎ সযত্নে লক্ষ করিল সে কত টাকা বাহির করিতেছে। ছয়খানি টিকেট সে খরিদ করিল, রঙ দেখিয়া রণজিৎ বুঝিতে পারিল কোন শ্রেণীর টিকেট সেগুলি। এ-লাইনে মাঝে-মাঝে যাতায়াত সে করিয়াছে, কোন শ্রেণীতে কী হারে ভাড়া দিতে হয় তা সে জানে। মনে-মনে হিসাব করিয়া সে ঠাহর করিল, টিকেট ক'খানা হুগলি অথবা তারই আশপাশের কোনও স্টেশনের হইবে। স্টিমার ছাড়িবারও বড় বেশি দেরি নাই, এবার তাকেও টিকেট কাটিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু উহাদের সহিত একই স্টেশনে একই জায়গায় নামাটা কি যুক্তিযুক্ত হইবে? বোধহয় না। এ-লোক কয়টির মন যেন স্বভাবতই কিছু সন্দিগ্ধ; ওরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখিলে তার উপর সন্দেহের রেখাপাত না হওয়া অসম্ভব। তার চেয়ে ট্রেনে কয়েকটা স্টেশন পার হইয়া মাঝামাঝি কোনও জায়গায়—যেমন উত্তরপাড়ায়—স্টিমার ধরিলেই বোধহয় ভালো হয়। উহারা এখনও তাহাকে লক্ষ করে নাই বেশ বোঝা যাইতেছে।

মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রণজিৎ হাওড়া স্টেশনের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ মাঝ-পথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সাশ্চর্যে সে দেখিল, সন্দেহভাজন লোক কয়টার গতিবিধি সে একাই কেবল লক্ষ করিতেছে না, আরও কে একজন পরম ঔৎসুক্যের সহিত ওই দিকেই তাকাইয়া আছে। ঔৎসুক্য তার প্রবল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চেয়েও প্রবল বোধহয় তার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিবার প্রচেষ্টা। একটি মুহূর্তের তরেও সে সুস্থির নাই, অনবরত আশেপাশে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিতেছে; সর্বদাই ভয়, পাছে কেউ তাকে দেখিয়া ফেলে। লোকটি আধাবয়সী, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চেহারাটা কিন্তু গোলগাল হইয়া উঠিয়াছে, রণজিতের ক্রমাগতই মনে হইতে লাগিল ইতিপূর্বে আরও কোথায় সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

সামনা দিয়া এক ভদ্রলোক একখানা ই.আই.আর-এর টাইম-টেবল দেখিতে-দেখিতে যাইতেছিলেন, রণজিৎ সহসা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, 'ওটা কি ই. আই. আর.-এর টাইম-টেবল না কি মশাই? উত্তোরপাড়ার গাড়ি ক'টায় ছাড়বে যদি একবার দয়া করে দেখে বলতেন!'

প্রৌঢ়বয়সী যে-লোকটা আড়ালে দাঁড়াইয়া টিকেট-ঘরের পানে তাকাইয়া ছিল এতক্ষণ সে রণজিৎকে লক্ষ করে নাই—এইবার গলার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এদিকে তাকাইল। সঙ্গে-সঙ্গেই সাপের গায়ে পা দিলে লোকে যেভাবে শিহরিয়া উঠে ঠিক সেইভাবে চমকাইয়া সে কয়েক

BanglaBook.org

পা পিছাইয়া গেল। ব্যাপারটা রণজিতের নজরে আসে নাই, নইলে এ-দৃশ্য দেখিবার পর সে আর টাইম-টেবলের পাতা উল্টাইত কিনা সন্দেহ। রণজিতের প্রতি দু-চোখের নজর আবদ্ধ রাখিয়া সে একটু-একটু করিয়া পা টিপিতে-টিপিতে শেষটায় একেবারেই সরিয়া পড়িল। টাইম-টেবলের পৃষ্ঠা হইতে রণজিৎ যখন চোখ উঠাইয়াছে ততক্ষণে সে আর তল্লাটের ধারে-পাশেও নাই।

অল্প একটু বাদেই পরপর দুইবার বাঁশি বাজাইয়া স্টিমারখানা দুলিয়া উঠিল—ছাড়িবার সময় হইয়াছে। রণজিৎ আড়াল হইতে দেখিতে পাইল, লোক ছয়টি দোতলার ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যেই কীসব আলোচনা করিতেছে।

স্টিমার ছাড়িবার পর হাওড়া স্টেশনে রওনা হওয়ার উদ্দেশে সে সবেমাত্র জেটি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় উঠিয়াছে এমনসময় দেখা গেল সেই রাস্তারই উপর মাত্র দু-তিনশো গজ দূরে এক তুমুল হই-হই কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ঢুকিবার মুখে যে-ভিড় জমিয়াছিল এখনকার ভিড়ের তুলনায় সে কিছুই নয়। রণজিতের মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল—সৃষ্টিছাড়া শহর এই কলিকাতা, লোকগুলির খাইয়া-দাইয়া বোধহয় আর কাজ নাই, চব্বিশ ঘণ্টা হুজুগেই মাতিয়া আছে।

একটু আগাইতেই সে শুনিতে পাইল ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলিতেছে, 'বাহাদুর ছেলে কিন্তু বাবা বলতেই হবে! কলকাতার রাস্তা, হরদম লোকজন, গাড়িঘোড়ায় ভর্তি তারই মধ্যে দিব্যিসে হান্টার চালিয়ে গেল—স্রাক, স্রাক, স্রাক! কেউ ধরবার ফুরসুত পেলে না, অ্যাঁ? ঝড়াকসে মোটর হাঁকিয়ে গেল!'

অপর একজন বলিল, 'বেঁচে আছে তো লোকটা? কিছুই বিচিত্র নয় মশাই—চোখে, মুখে, কপালে যেভাবে হান্টারের বাড়িগুলো মেরেছে!'

ভিড়ের সম্মুখ হইতে আর-একজন পিছন ফিরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'আরে সুবোধ, ইদিকে আয় একবারটি! ইনি আমাদের অশনিবাবু, অশনি মিত্তির!'

অশনি মিত্তির? রণজিৎ সচকিত হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, বটেই তো তাই! একটু আগে সে তো অশনিকান্তকেই টিকেট-ঘরের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছে—চিনি-চিনি করিয়াও সে তখন তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কলিকাতায় রণজিৎ যেমন অনেক লোকের কাছে পরিচিত, অশনিকান্ত ঠিক অতটা না হইলেও অনেকটা সেই রকমই বটে। দু-হাতে ভিড় ঠেলিয়া রণজিৎ সামনের দিকে আগাইতে লাগিল; কাছে গিয়া দেখে বাস্তবিকই অশনিকান্ত অসহায় অবস্থায় নালার উপর লুটাইতেছে, হান্টারের লম্বা-লম্বা লাল দাগগুলি তার মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকমের বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে। রণজিতের মনে হইল, সে যেন এক রহস্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে; কী জন্যই বা অশনিকান্ত স্টিমার-স্টেশনে অমনভাবে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর কে-ই বা দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় তার উপর এই অকথ্য অত্যাচার করিয়া পালাইল, তার বিন্দুবিসর্গও সে আঁচিতে পারিল না।

কিন্তু ভগবান সেদিন আরও অনেকখানি বিস্ময় তার জন্য জমা রাখিয়াছিলেন। ট্রেনের সময় বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া রণজিৎ বেশিক্ষণ অশনিকান্তের কাছে ব্যয় করিতে পারিল না, চটপট তাকে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিতে হইল। যথাসময়ে উত্তরপাড়াতেও সে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রায় যথাসময়েই স্টিমারখানাও ঘাটে আসিয়া দর্শন দিল। কোনওরকম বাহ্য আড়ম্বর না দেখাইয়া নিতান্ত নিরীহ গোবেচারি যাত্রীর মতো ধীরে-ধীরে সে স্টিমারে উঠিল বটে, কিন্তু কোথায় সে-লোকগুলি? তন্নতন্ন করিয়া সারা স্টিমার খোঁজা সত্ত্বেও ছ'জন তো দূরের কথা, একজনেরও কোনও চিহ্ন মিলিল না। অথচ এ-কথা ধ্রুব সত্য যে একটিবারের তরেও তাদের কেউ রণজিৎকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং তাকে এড়াইবার জন্যই যে আগের কোনও স্টেশনে তারা নামিয়া গিয়াছে এ-কথা রণজিৎ কীভাবে বিশ্বাস করিবে? তবে কি কোনও অদৃশ্য শক্তি যাদুমন্ত্রে তাহাদের উড়াইয়া লইল? কে এই রহস্যের সমাধান করিয়া দিবে?

BanglaBook.org

এগারো : ব্যান্ডেলী কাণ্ড

গঙ্গার বিশুদ্ধ 'বায়ু-ভক্ষণ' ছাড়া স্টিমারে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার কোনওই যে সার্থকতা ছিল না রণজিৎ তাহা বুঝিল। লোক কয়টা তার চোখে ধুলা দিয়া একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে, পিছনে এমন একটু সূত্রও রাখিয়া যায় নাই যেটুকু অবলম্বন করিয়া আবার সে তাদের অনুসরণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর কী উপায় থাকিতে পারে? কিন্তু দিনটা ছিল রবিবার; রণজিৎ খবর লইয়া জানিল, শ্রীরামপুরের আগে আর কোনও স্টেশনেই সেদিন স্টিমার ভিড়িবে না। সেখানে পৌঁছিতেই বেলা বারোটা বাজিয়া যাইবে; আজকালকার মতো তখন বাসের এত ছড়াছড়ি হয় নাই, ওসব অঞ্চল হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতে হইলে নির্ভর করিতে হইত সাধারণত ট্রেনেরই উপরে। রবিবারদিন শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা পৌঁছিবার লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বড়ই কম, সকালের দিকে খুব ঘন-ঘন কয়েকটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু পৌনে বারোটার সময় যে-গাড়িখানা ছাড়িয়া যায় সেখানা না ধরিতে পারিলে অপেক্ষা করিতে হয় বিকাল সেই সাড়ে চারিটা পর্যন্ত। পৌনে বারোটার ট্রেন ধরা তার পক্ষে অসম্ভব; কাজেই শ্রীরামপুরে নামিলে সন্ধ্যার আগে বাড়ি গিয়া পৌঁছিবার ভরসা তো নাই-ই, উপরন্তু সারাদিন হয় অনাহারে, আর নয়তো দোকানের কদর্য খাবার খাইয়াই কাটাইতে হইবে। আর তা ছাড়া স্টেশনে চার-পাঁচঘণ্টা ঠায় বসিয়া থাকিবার ধৈর্যও তার নাই। এদিকে হুগলি পর্যন্ত টিকেট তার করা আছে; হুগলিঘাট হইতে মাত্র মাইল কয়েক দূরেই তার মামাবাড়ি। সেখানে ভরদুপুরে গিয়া উপস্থিত হইলে চর্ব্য-চোষ্য না জুটিলেও সুব্যবস্থা যে একটা হইবেই সেটা ঠিক, যত্ন-আত্তি হইবে সেটা আরও ঠিক। তার মামাবাড়ির গ্রাম হইতে অল্প কিছু দূর গেলেই প্রকাণ্ড স্টেশন ব্যান্ডেল জংশন—কলিকাতা ফিরিবার ট্রেন সেখানে প্রচুরই মিলিবে।

রণজিৎ অতর্কিতে মামাবাড়ি গিয়া উপস্থিত হইবার ফলে নাতিকে দেখিয়া তার বুড়া দাদামশায় দাড়িতে কয়বার হাত বুলাইলেন বা গড়গড়ায় কয়টা সুখ-টান দিলেন, দিদিমার কয় পাটি ফোকলা দাঁত বাহির হইয়া পড়িল, পুকুরের কতগুলি মাছ বন্ধুহীন হইল, সে-সমস্ত খবর অত্যন্ত রসালো হইলেও আমাদের গল্পের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই সে-ইতিহাস উহ্য রাখিয়া তার ব্যান্ডেল পৌঁছিবার পর হইতেই আমরা আবার আমাদের গল্প বলা শুরু করিব।

বিরাট স্টেশন ব্যান্ডেল জংশন—অনবরত ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে; ভিন্ন-ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নানা জায়গার গাড়ি দাঁড়াইয়া। যাত্রীদের বসিবার জন্য রেল কোম্পানি খানিকটা অন্তর-অন্তর বেঞ্চি পাতিয়া দিয়াছে, তারই একটার উপর রণজিৎ বসিয়া। কলিকাতার ডাউন গাড়ি আসিবার তখনও কিছু দেরি আছে, বসিয়া-বসিয়া সে কেবল আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হুকা-কাশির সহিত তার দেখা হইবে, সে যে বুদ্ধির দাবাখেলায় প্রথম চাল দিতে-না-দিতেই বিপক্ষ-দল ব্যাজমাত করিয়া দিয়াছে সে-কথা ধরা পড়িয়া যাইবে। মুখে তিনি কোনও কথাই বলিবেন না বটে, কিন্তু তাঁর দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়া হয়তো একটা অবজ্ঞার চাপা হাসি খেলিয়া যাইবে; সে-হাসি যেন তাকে বলিতে থাকিবে—বুঝিয়াছি তোমার কেরামতি, একশো-গজী ফুটবল মাঠটুকুর মধ্যেই তোমার যত লম্ফ-ঝম্ফ, তার বাহিরে গেলেই তুমিও যা, পাঁচবছরের শিশুটিও তাই। —এ চিন্তা অসহ্য—অথচ...।

হঠাৎ সজোরে রাশ টানিয়া ধরিলে ঘোড়া যেমন চলিতে-চলিতে আচমকা থামিয়া যায়, রণজিতের চিন্তাস্রোতও তেমনি মুহূর্তে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। ওই যে একটু দূরে একটা কুটিল চেহারার লোক কলের কাছে দাঁড়াইয়া কুঁজায় জল ভর্তি করিতেছে, ও কে? ও-মূর্তি তো রণজিতের অপরিচিত নয়, তার সমস্ত চিন্তার মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া এই ধরনের এক ব্যক্তিই যে ক্রমাগত

BanglaBook.org

উঁকি মারিতেছে। না-না, জগন্নাথ ঘাটে ঠিক এ-মূর্তির দেখা সে পায় নাই; শুধু জগন্নাথ ঘাট বলিয়া নয়, আজ পর্যন্ত চর্মচক্ষে এ-মূর্তি কোথাও সে দেখে নাই, অথচ তার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো এ-চেহারা যে ছেঁকা দিতেছে সে-কথাও সত্য।

জামার উপর দিয়াই তাড়াতাড়ি সে ডানদিকের পকেটটা একবার অনুভব করিয়া লইল, তারপরেই উঠিয়া গিয়া প্লাটফর্মের এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে ও-লোকটা তার কার্যকলাপ কিছুই দেখিতে না পারে অথচ তার নিজের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে। হাওড়া স্টেশনে ইতিপূর্বেই সে একখানা টাইম-টেবল সংগ্রহ করিয়াছিল, চট করিয়া তার যে পাতাখানা হাতে আসিল তাহাই সে খুলিয়া ফেলিয়া আড়চোখে চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ডান পকেটে হাত দিয়া কী একটা কাগজ সেই খোলা পাতার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া এমনইভাবে টাইম-টেবলখানা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, যেন সে ট্রেনেরই সময় দেখিতেছে, সে-কাগজখানা নয়।

রণজিৎ দেখিতেছিল একখানি ফটো—আজ সকালে হুকা-কাশির বাড়ি হইতে 'অ্যাডভেঞ্চারে' বাহির হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁর গুপ্ত কুঠুরীটুকুর মধ্যে রণজিৎকে ডাকিয়া লইয়া এই ফটোখানা দিয়াছিলেন। মুখে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই ফটোতে তোলা চেহারার বাস্তব মূর্তি তার চোখে পড়িতেও পারে, নাও পারে; কিন্তু পড়িলে তাকে বিশেষ সাবধানের সঙ্গে চলিতে হইবে; হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় কোনও কাজ যেন সে না করিয়া বসে, কেননা তাহা হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর-একটা কথা, ফটোখানা যে তার সঙ্গে রহিয়াছে ঘুণাক্ষরেও সে কথা যেন বাহিরে কারও কাছে প্রকাশ না পায়। সেই অবধি ফটোখানা তার চিন্তার সমস্ত ফাঁক জুড়িয়া রহিয়াছে। হুকা-কাশি কী করিয়া যে এ-ছবিখানা করায়ত্ত করিলেন রণজিৎ তা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই, কেননা এই অদ্ভুত শক্তিশালী জাপানি ডিটেকটিভটির প্রত্যেকটি কাজ এমনই জটিল, এমনই হেঁয়ালিতে ভরা যে-ইতিপূর্বে অনেকবার সে তার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া কেবল ভোঁতা-মুখে ফিরিয়াই আসিয়াছে। সে শুধু এইটুকু বুঝিল যে, জলের কুঁজা হাতে এই লোকটার নাড়ি-নক্ষত্র তাকে জানিতেই হইবে এবং সেজন্য যদি পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত তাকে ছুটিতে হয় তাতেও সে প্রস্তুত।

লোকটার কুঁজায় জল ভরা হইয়া গিয়াছিল, লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সে নিজের গাড়িতে ফিরিয়া আসিল। এ-অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিতে হইলে ঠিক যতটা তফাতে থাকা দরকার ঠিক ততটা দূর হইতেই রণজিৎ লক্ষ করিল সে একখানা থার্ডক্লাস কামরায় উঠিতেছে। সে-কামরাটা একেবারে নির্জন ছিল না বটে—কোনও থার্ডক্লাস গাড়িই একেবারে নির্জন থাকে না—কিন্তু অন্যান্য যাত্রীদের প্রতি নজর করিলে এটা বুঝিতে কারওই কষ্ট হইবার কথা নয় যে-তাদের সহিত ওই ক্রূর চেহারার লোকটার কোনওই সম্বন্ধ নাই, সে সম্পূর্ণ একা। দেখিয়া রণজিৎ অনেকটা আশ্বস্ত হইল; অবশ্য হুকা-কাশির সতর্কতা সে অক্ষরে-অক্ষরে মানিয়া চলিবে, কিন্তু দৈবের ব্যাপার কিছু বলা যায় না, শক্তির একটা পরীক্ষা যদি নিতান্তই ঘটিয়া যায়, তবে একটিমাত্র আক্রমণকারীকে সে অনায়াসেই মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারিবে। নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস তার আছে। থার্ডক্লাস কামরাটির গায়েই একখানা ইন্টারক্লাসের গাড়ি—মধ্যে মাত্র একখানা পাতলা কাঠের ব্যবধান। রণজিৎ নিকটে গিয়া সানন্দে আরও লক্ষ করিল, সেই দেওয়ালটির গায়ে তারের জাল দেওয়া জানালার মতো ছোট্ট একটু ফাঁকও রহিয়াছে—অর্থাৎ এক গাড়ি হইতে অপর গাড়ির ভিতর নজর রাখা চলে। 'সৎকার্যে সুযোগের অভাব কখনওই হয় না'—এই মহা-বাক্যটি স্মরণ করিয়া একখানা ইন্টারক্লাসের টিকেট কিনিবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বুকিং-অফিসের দিকে আগাইয়া গেল।

BanglaBook.org

বারো : ছায়া পূর্বগামিনী

টিকেট কিনিয়া ইন্টারক্লাস গাড়িতে ঢুকিতেই রণজিৎ দেখিল কামরাটি খুব ছোট, মাত্র তিনখানি বেঞ্চি রহিয়াছে। তার একটা বেঞ্চিতে বছর কুড়ি-বাইশের এক সুবেশ যুবক জানালায় ঠেসান দিয়া অর্ধশয়ানভাবে একখানা ছ'পেনি দামের ইংরেজি নভেল পড়িতেছিল। গাড়ি তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। রণজিৎকে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা সে পাশে সরাইয়া রাখিল, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারবার রণজিতের আপাদমস্তক দেখিতে শুরু করিল। ট্রেনে একজন নূতন যাত্রীর আবির্ভাব হইলে সকলেই একবার তার দিকে তাকাইয়া দেখে বটে, কিন্তু সে-ধরনের অনাসক্ত দৃষ্টি এ নয়, ভিতরে আরও যেন কোনও অর্থ আছে বলিয়া রণজিতের মনে হইতে লাগিল। যুবকটি হুঁশিয়ার, তার সঙ্গোপন চাহনি যে রণজিৎ বিশ্লেষণের চোখে দেখিতেছে সে তা বুঝিতে পারিয়া বইখানা আবার চোখের সামনে খুলিয়া ধরিল। কিন্তু দৃষ্টি তার বই-এর অক্ষরের দিকে ছিল না; বইখানা ছিল আবরণ মাত্র, তার আড়াল হইতে সে শুধু দেখিতেছিল রণজিৎকেই।

একটু পরে একটা হাই তুলিয়া সে বই বন্ধ করিল, তারপর নাক ঝাড়িবার উপলক্ষ করিয়া অন্যদিকের জানালার দিকে আগাইয়া গেল। রণজিৎ লক্ষ করিল, যাইবার সময় দুই গাড়ির মধ্যকার জালের জানালাটার ভিতর দিয়া সে একবার উঁকি মারিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের বেঞ্চিতে বসিবার পর সে-ই প্রথম গাড়ির নীরবতা ভঙ্গ করিল, কহিল, 'চাকরটাকে তুলে দিয়েছি পাশের থার্ডক্লাস কামরাটাতে; ভেতরের এই জানালাটুকু থাকায় ভারি সুবিধে হয়েছে, মাঝে-মাঝে প্রায়ই উঠে গিয়ে তত্ত্বতালাশ করতে পারছি। একেবারে দেশ থেকে সদ্য আমদানি কিনা, বেজায় নার্ভাস।'

রণজিৎ কোনও জবাব দিল না, একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরুদুরু করিতেছিল। মনে-মনে বলিল, 'চাকরকে দেখতে গেলে, না কি নিজের সঙ্গী ঠিক আছে কি না খোঁজ নিয়ে এলে, তা তো ঠিক বুঝছি না বাপধন! তোমার হাবভাব যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকছে!'

যুবক ছ'পেনি দামের যে পাতলা ইংরেজি নভেলখানা পড়িতেছিল জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সে বেঞ্চির উপরই ফেলিয়া রাখিয়াছিল; হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া বইখানার মলাট উলটাইয়া দিল আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চকিতে রণজিৎ দেখিতে পাইল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে 'সলিল বোস, শ্রীপুর।' সাধারণ ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না, কেননা আমি যে-লোককে চিনি এ-পৃথিবীতেও তার যে আর দ্বিতীয় কোনও পরিচিত বন্ধু থাকিবে না তার কী হেতু আছে? কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসেরই অর্থ ভিন্নরকম হইয়া দাঁড়ায়। রণজিৎ যে 'দাগী' লোকটির সন্ধানে ফিরিতেছে, ঠিক পাশের কামরাটিতেই সে বসিয়া; এ-গাড়িতে ওঠা অবধি যুবক তার দিকে একটু ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে, একবার উঠিয়া গিয়া জানালার পথে সে ও-কামরায় উঁকি পর্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; এ-অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা তার চোখে খুব সাধারণ বলিয়া মনে না-হওয়ারই তো কথা। কিন্তু অন্যদিকেও ভাবিবার বিষয় আছে। সোনার হরিণের মালিক স্বয়ং দ্বারকানাথের ছোট ভাই সলিলের একখানি বই এ-যুবকের হাতে। যে-ফটোখানার উপর নির্ভর করিয়া একটা অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত স্রোতের মুখে আজ সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত, হুকা-কাশির মুখে শুনিয়াছে কাল-নাকি সেখানা শ্রীপুরের কারখানায় হারাইয়া গিয়াছিল, সলিলই সেটি উদ্ধার করিয়া আজ প্রাতে তাঁকে দিয়া গিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ছবিখানা সলিলের কাছে অপরিচিত নয়। এমনও তো হইতে পারে যে, ফটোটি ফেরত দিবার পরই ওই দাগী লোকটা তার নিজের মতো সলিলেরও চোখে পড়িয়া গিয়াছে—সলিল নিজে অপারগ হওয়ায় তার কোনও সাহসী অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লোকটার পিছনে লাগাইয়া দিয়াছে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রকৃত নেশা যার আছে তার পক্ষে এ-লোভ সংবরণ করা একটু কষ্টকর বইকী! বাস্তবিকই এমন একটা কাণ্ড যদি ঘটিয়াই থাকে

তবে এ-যুবক তার শত্রু না হইয়া বন্ধুই হইয়া দাঁড়াইবে, কেননা দুজনার উদ্দেশ্যই যে এক। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা কী, কী করিয়া জানা যায়?

হঠাৎ রণজিতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল; বইখানা বেঞ্চির উপর পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেখানাকে হাতে তুলিয়া লইয়া সে কহিল, 'রেলে সময় কাটাবার জন্য খোরাকটি সংগ্রহ করেছেন ভালোই।' কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে মলাটের পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া ফেলিল; তারপর সবে যেন এইমাত্রই লেখাটা দেখিতেছে এমনই ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্রীপুর? শ্রীপুর জায়গাটা কোথায় বলুন তো?'

ফ্যালফ্যাল করিয়া বড়-বড় চোখে যুবক মুহূর্তকাল রণজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'আপনি জানেন না তা?'

ঠিক এই ধরনের জবাবের জন্য রণজিৎ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, একটু থতমত খাইয়া সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, একটা শ্রীপুর জানি বটে। আচ্ছা, এ-সলিল বোসটি কে?'

মনে হইল, একটা যেন চাপা হাসির রেখা যুবকের ঠোঁটের পাশ দিয়া ক্ষণিক বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল, চোখ দুটিকে একটু মিটি-মিটি করিয়া সে কহিল, 'সে-খবরও তো আপনার অজানা নয়, রণজিৎবাবু!'

রণজিৎ বুঝিল ইহাকে আর ছলনা করা বৃথা, তার সমস্ত নাড়ি-নক্ষত্র ইহার নখদর্পণে, নামটি পর্যন্ত অজ্ঞাত নয়। বলিল, 'দ্বারিকবাবুর ভাই সলিলবাবু আর ইনি একই লোক কি না সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিও তো দেখছি আমার মতো সব খবরই রাখেন! দ্বারিকবাবু কেউ হন না কি আপনার?

বোধহয় রণজিৎ টের পাইল না, তার এই প্রশ্নে যুবকের মুখ পলকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মাত্র পলকের জন্যই; মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, 'না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনওই সম্বন্ধ নাই।'

'তবে সলিলবাবু বুঝি আপনার বন্ধু?'

এ-প্রসঙ্গটাই যুবকের অত্যন্ত রকমের অস্বস্তিকর, কোনওরকমে চাপা পড়িলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। দায়সারা গোছের সে একটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তা যা-ই বলুন!' তারপরেই বিষয়টা এড়াইবার জন্য সে পাড়িয়া বসিল একেবারে অন্য কথা। কহিল, 'বড়কর্তার শরীরের যে রকম গতিক দেখছি, এ-অবস্থায় চিনির কল চালিয়ে নেওয়াই তো একটা সমস্যা। সলিলবাবুর সে ক্ষমতা নেই, ব্যবসাবুদ্ধির ওঁর একেবারেই অভাব। সে ছিল মেজকর্তার।'

'দ্বারিকবাবুর মেজভাইয়ের কথা বলছেন বুঝি? সেই যিনি আমেরিকায় না কোথায় থাকেন?'

'হ্যাঁ, আট-দশবছর সেখানেই আছেন বটে। তবে তাঁকে দেশে ফিরতে লেখা হয়েছে; বোধহয় অল্প কিছুদিনের মধ্যে এসে পড়বেন। ভালো কথা, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট কে হল আজকের খবরে কাগজে সে-খবর বার হয়েছে কি? আজকের কাগজ দেখবার সময় পাইনি।' কৌশলে দ্বারিকবাবুর পারিবারিক সম্পর্ক হইতে যুবক আলাপের ধারাটাকে একেবারে সাধারণ আলোচনায় আনিয়া ফেলিল।

এইভাবে এককথা, দু-কথা হইতে-হইতে হু-হু করিয়া সময় কাটিয়া চলিল, ক্রমে সন্ধ্যা এবং পরে রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ-সমস্তের মধ্যেও রণজিৎ তার আসল কাজে অবহেলা করে নাই, প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ি থামিলেই সে কৌশলে লক্ষ করিয়াছে তার 'মার্কামারা' লোকটি সটকাইয়া পড়িতেছে কি না।

কিন্তু আজ সারাদিনে অবসাদ এবং উত্তেজনা গিয়াছে প্রচুর, শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ যেন তার মাঝে-মাঝে ভারি হইয়া বুজিয়া আসিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ চোখ দুইটি কখন যে একেবারে বুজিয়া গেল সে তা টেরই পায় নাই। রাত্রি আন্দাজ দেড়টার সময় সে ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিল, সমস্ত গাড়িখানা তখন নিঝুম অন্ধকার। বিদ্যুৎ-গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সে ইলেকট্রিক স্যুইচটা টিপিয়া

BanglaBook.org

ধরিল; দেখিল, সামনের বেঞ্চির উপর যুবকের একটি শতরঞ্চি আর বালিশ পড়িয়া আছে, কিন্তু তার নিজের কোনওই চিহ্ন নাই। উন্মাদের মতো রণজিৎ তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াই একেবারে গাড়ির মেঝের উপরই বসিয়া পড়িল—ফটোখানি তার পকেট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতে রণজিতের কিছু সময় লাগিল; এ-অবস্থায় সাধারণ লোক যে-কাজটিকে প্রথমেই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করে, অভিভূত সে তা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সহযাত্রী সুদর্শন যুবকটিই যে-ফটোখানা সরাইয়াছে এ-ধারণা মনে তার এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পাশের কামরার সেই দুশমন চেহারার লোকটা গাড়িতেই আছে কি না সেটা লক্ষ করার প্রয়োজনও সে এতক্ষণ বোধ করে নাই। কিন্তু সে-অনুসন্ধান লওয়া যে প্রয়োজন এইবার তার মনে হইল—তাড়াতাড়ি দেওয়ালের জানালাটিতে চোখ রাখিয়া দেখে, যুবকটির মতো সে-ও নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে। দুইজনে যে একযোগে কাজ সারিয়াছে সে-বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে একবার ভাবিল, শিকল টানিয়া গাড়িখানাকে দাঁড় করায়, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল তাতে লাভ হইবে না কিছুই, উপরন্তু খানিকটা ক্ষতিরই সম্ভাবনা; কেননা ব্যাপারটি তা হইলে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে; কিন্তু রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হুকা-কাশির বোধহয় মনঃপূত হইবে না। বাহিরে তখন নিশাদেবীর পূর্ণ রাজত্ব চলিতেছে, গাঢ় অন্ধকার হানা পাতিয়া বসিয়া আছে। সূর্য উঠিবার পূর্বে কিছুই আর করার নাই, তাই রণজিৎ ভোরের প্রতীক্ষায় বেঞ্চির উপর ঠেসান দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

অন্ধকারের ঘোর ক্রমেই কাটিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরেই আবিরের রঙে দিগ্বিদিক রাঙাইয়া ভোরের আলো রণজিতের মুখে-চোখে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। তার মনে হইল, দূর হইতে বহু লোকের একটা ব্যস্ততাপূর্ণ কোলাহল যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। মুখ বাড়াইয়া সে দেখে ট্রেনখানা একটা বিরাট স্টেশনের আঙিনায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে। স্টেশনটা কী হইতে পারে ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই প্ল্যাটফর্মের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড লেখাগুলি জানাইয়া দিল যে, গাড়ি মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চিন্তাকুল মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া রণজিৎ ধীরে-ধীরে রিফ্রেশমেন্ট রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, উদ্দেশ্য এককাপ চা খাইয়া মস্তিষ্কটাকে একটু সবল এবং সজীব করিয়া তুলিবে। কয়েক পা আগাইয়াই কিন্তু হঠাৎ সে এমনই ভাবে থামিয়া পড়িল যে, মনে হইল, কেহ যেন তাকে স্ক্রু দিয়া মাটির সঙ্গে আঁটিয়া দিল। সে নির্নিমেষে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল, নিজের চক্ষুকেও সে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এও কি সম্ভব? রণজিৎ এ-গাড়িতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ জানিয়াও কোন ভরসায় প্রকাশ্য দিবালোকে এ-লোকটি প্ল্যাটফর্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল! মাথায় বিশাল পাগড়ি, মোটা একখানি উড়ুনি চিবুক ঢাকিয়া গলার চারিপাশে কয়েকটা পাক খাইয়াছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রণজিতের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, যে-লোকটার অনুসরণে কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচশো মাইল সে ছুটিয়া আসিয়াছে, ব্যান্ডেল জংশনে যে-ব্যক্তি জলের কুঁজা ভর্তি করিয়াছিল, এ সে-ই। রিফ্রেশমেন্ট রুমটি ছিল অতি নিকটেই, চট করিয়া সরিয়া আসিয়া রণজিৎ তাহারই একখানা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইল।

লোকটা একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে অপরে-না-শুনিতে-পায় এমনই খাটো গলায় কথা কহিতেছিল। হিন্দুস্থানীটির চোখে-মুখে একটু অস্বস্তির ভাব; সে কহিল, 'তুই একলা আইসে পড়লি, রামদোয়াল, আর সকুলে কুথা গেল?'

'সব ঠিক আছে সর্দারজি, দু-চারদিনের ভেতরে সকলেই আলাদা-আলাদা রাস্তায় এসে তোমার আড্ডায় জমা হবে; একসঙ্গে আসবার কি জো আছে—পেছনে ফেউ লেগেছিল যে!'

রুদ্ধকণ্ঠে 'সর্দারজি' কহিল, 'তারপর?'

রামদয়াল চোখ দুটিকে একটু মিটিমিটি করিয়া অর্থপূর্ণ এক হাসি হাসিল: রতনে রতন চেনে,

BanglaBook.org

সর্দার সে-হাসির অর্থ বুঝিয়া মনে-মনে নিশ্চিন্ত হইল, বলিল, 'তুই খুব হুঁশিয়ার আদমি আছিস রামদোয়াল।' তারপর বারকতক এদিক-ওদিক তাকাইয়া আরও নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'সোনেবালা হরিণ? সেটা কুথা রাইখেছিস?'

'ঘাবড়িও না সর্দার, সব ঠিক আছে; এতদিন শুধু নামেই ছিলে 'ধনপৎ' এবার কাজেও হবে ধনপৎ। কিন্তু আর নয়, এবার একটু আড়ালে যাও; আমরা সব স্বনামধন্য পুরুষ কি না, এখানে একসঙ্গে দুজনাকে গুলতানি পাকাতে দেখলে পুলিশের দৃষ্টি পড়বার ভয় আছে। আর-একটা কথা —এ-গাড়িখানায় কাশী ফিরো না; পরের কোনও একটা ট্রেন ধরবে, আর বেনারস ক্যান্টনমেন্টে না নেমে রাজা-ঘাটেই নেমে পড়বে।'

প্ল্যাটফর্মের অপর পারে আর-একখানা ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল, মুটের মাথায় মালপত্র চাপাইয়া রামদয়াল গজেন্দ্রগমনে তাহাতেই গিয়া চাপিয়া বসিল। ধনপতের সহিত এতক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহার কী কথা হইয়াছে রণজিৎ অবশ্য তাহা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু লোকটির গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছে সে বরাবর। এইবার তাকে গাড়ি বদল করিতে দেখিয়া সে খোঁজ লইয়া জানিল ওটি বেনারস লাইনের ট্রেন। তাহাকেও এই ট্রেনেরই যাত্রী হইতে হইবে; তবে ট্রেনটি ছাড়িবার তখনও বেশ কিছু দেরি আছে, ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া লওয়া চলে। রিফ্রেশমেন্ট রুমের ভিতরে ঢুকিয়া সে তখন একবাটি চা, কিছু কেক ও ডিমের ফরমাস করিল।

রণজিতের কাশী-যাত্রা দেখিয়া আমরা একবার হুকা-কাশির খবর লইয়া আসি।

তেরো : চিঠির অংশ

হুকা-কাশি সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িখানার উপর রণজিৎকে কেবল দৃষ্টি রাখিতেই বলিয়াছিলেন; ও-বাড়ির লোক কয়টি যে সেদিনই বাসা ভাঙিয়া পালাইবে এবং তাদের অনুসরণে রণজিৎ যে কাশী পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবে, তা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। সেইদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও যখন রণজিৎ ফিরিয়া আসিল না, অথবা তাঁকে কোনও সংবাদ পাঠাইল না তখন তিনি বাস্তবিকই একটু ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দেখিতে-দেখিতে পরের দিনটাও কাটিয়া গেল, তথাপি রণজিতের কোনও সংবাদ নাই। হুকা-কাশি এবার রীতিমতো উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই তিনি বেহারা অমৃতকে রণজিতের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন; ঘণ্টাখানেক বাদেই সে ফিরিয়া আসিল—বাড়ির কেহই রণজিতের খবর বলিতে পারে না—দু-দিন আগে সকালে সে চা খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, তারপর হইতেই সে নিরুদ্দেশ। বিষম উৎকণ্ঠার সহিত হুকা-কাশি সময় কাটাইতে লাগিলেন, ডাক আসিবার সময় হইতেই প্রতিবার সোৎসুকভাবে খোঁজ লইতে লাগিলেন, রণজিৎ কোনও খবর পাঠাইয়াছে কি না, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁকে নিরাশ হইতে হইল।

তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমনসময় অমৃত আসিয়া বলিল, 'এক ল্যাংড়া বাবু এয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে; তেনার হাতে একটা কাগজের বান্ডিল রয়েছেন।'

কে এই 'বান্ডিলবাহী' ল্যাংড়া বাবু, দেখিবার জন্য হুকা-কাশি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সোফার উপর একটি যুবক বসিয়া, চেহারায় সলিলের সঙ্গে অনেকটা মিল, তবে বয়সে কিছু ছোট। 'আপনি কি দ্বারিকবাবুর কোনও আত্মীয়?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'না, দ্বারিকবাবুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।' যুবকের গলার স্বর গম্ভীর।

'ওঃ, আমার তবে ভুল হয়েছে; সলিলবাবুর সঙ্গে আপনার চেহারার একটু মিল আছে, তাই ও-কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

একটু ইতস্তত করিয়া যুবক বলিল, 'মিল থেকে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই; তিনি আমার মামা হন।'

BanglaBook.org

'কীরকম? সলিলবাবু আপনার মামা, অথচ দ্বারিকবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই বলছেন যে!'

'দেখুন, এ-প্রশ্ন আপনি ছাড়া আপনার পরিচিত আরও একজন ভদ্রলোক আমাকে করেছিলেন, কিন্তু আমি তখন জবাব না দিয়ে কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম; দ্বারিকবাবুর সঙ্গেও আমার ওই একই সম্পর্ক ছিল; কিন্তু তিনি বিনা দোষে আমাকে তাঁর বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন, এ-জীবনে আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন। আমিও তাই তাঁর আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, আমার দুই মামা।'

হুকা-কাশির এ-পুরনো ইতিহাস জানা ছিল, মনে-মনে হাসিয়া ভাবিলেন, অভিমানী বালক! মুখে বলিলেন, 'দ্বারিকবাবু আপনার ওপর রূঢ় হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন বোধহয় সে অভিমান আপনার ভোলাই ভালো। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এবং অসুখে ভুগে-ভুগে তাঁর স্বভাব অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছে। আপনার মেজমামাকে তো আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে দ্বারিকবাবুই লিখে পাঠিয়েছেন।'

'অভিমান উচিত কি অনুচিত সে হল তর্কের কথা,... কিন্তু সে-কথা থাক। যে-জন্য আপনার কাছে আসা তা-ই বলি; দেখুন তো এ-ফটোখানা কি আপনি চেনেন?'

হুকা-কাশি দেখিলেন রণজিৎ 'অভিযানে' বাহির হইবার পূর্বে তার হাতে তিনি যে-ফটোখানা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন এ সেই ফটো। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'এ কী, এ-জিনিস আপনি পেলেন কোথা?'

'ট্রেনে; সবকথা বলছি শুনুন। একটা ফুটবল ম্যাচে দেওঘর যাচ্ছিলাম, সঙ্গে ছিল ছোটমামাদের বাড়ির এক চাকর; তাকে মাঝপথে গিরিধির গাড়িতে তুলে দিতে হবে। হাওড়ায় গাড়িতে উঠে বেজায় ভিড় পেয়েছিলাম, শ্রীরামপুর আসতেই কিন্তু অনেকটা হাল্কা হয়ে এল; তারপর চুঁচড়োয় যখন পৌঁছেছি তখন গাড়িতে প্যাসেঞ্জার শুধু আমি একা। চাকরটাকে পাশের থার্ডক্লাস কামরায় তুলে দিয়েছিলাম —একেবারে অজ-পাড়াগেঁয়ে, বাড়ি ছেড়ে কোনওদিন কোথাও বেরোয়নি—দু-গাড়ির মাঝখানে একটা জানালা ছিল, তারই সামনে দাঁড়িয়ে ওকে মাঝে-মাঝে দেখছিলাম। ও ঝিমোচ্ছিল—অনেকেরই প্রায় সেই অবস্থা—শুধু একটা লোক চাদরে মুখ ঢেকে ঠায় বসেছিল, আর যতবার আমি জানালার গায়ে চোখ লাগাচ্ছি ততবারই মিটমিট করে আমার পানে চেয়ে দেখছিল। একটু বাদেই ব্যান্ডেল এসে পড়ল, দেখি লোকটা জলের কুঁজো হাতে নামছে—আমার দিকে পেছন ফিরে।

'গাড়ি প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে এমনসময় কোত্থেকে রণজিৎবাবু এসে আমার কামরায় উঠে পড়লেন। ময়দানে অনেকবার 'ইন্টারন্যাশানালে' নামতে দেখেছি, ওঁকে চিনি ভালোমতোই। ক্রমে ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হল—দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা, তারপর রাত্তির ঘোর হয়ে এলো। রণজিৎবাবু শুয়ে পড়লেন, আমিও আলো নিভিয়ে একটু গড়াগড়ির চেষ্টা দেখলাম। কিন্তু আমার বার্থটাতে ছিল অসম্ভবরকম ছারপোকার উপদ্রব, তাই খানিকটা বাদে উঠে রণজিৎবাবুর বেঞ্চি ডিঙিয়ে ও-পাশের আর-একটা বেঞ্চিতে গিয়ে গা ঢেলে দিলাম।

'অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছি, তন্দ্রার ঘোরে চোখ বুঁজে আসছে, এমনসময় টের পেলাম সেই চলতি গাড়ির মধ্যে কে একজন আমাদের কামরায় ঢুকেছে। গোড়াতে আমি যে-বেঞ্চিটাতে শুয়েছিলাম লোকটা প্রথমত সেইদিকেই এগোচ্ছে দেখতে পেলাম। তারপর হঠাৎ ঘুরে রণজিৎবাবুর দিকে পিছিয়ে এসে তাঁর জামার ওপর আস্তে-আস্তে হাত রেখে কী যেন সে দেখতে লাগল। ঠিক তার পরের মুহূর্তেই দেখি কিনা পকেটমারের মতন নিপুণ হাতে কী একটা জিনিস ওঁর জামার ভেতর থেকে ও টেনে বার করছে। ভাবে-ভঙ্গিতেই লোকটার স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলাম, ও-জিনিসটা যে রণজিৎবাবুর মানিব্যাগ সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই রইল না। আর দেরি করা উচিত হবে না মনে করে আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে হেঁচকা টানে ওর হাত থেকে রণজিৎবাবুর জিনিস কেড়ে নিলাম; তারপরেই ধরলাম

প্রাণপণে ওকে জাপটে। বেশ বুঝলাম, লোকটা দারুণ চমকে গেছে। কিন্তু সে শুধু এক নিমেষের জন্য। পরমুহূর্তেই বেড়াল যেমন নেংটি ইঁদুরকে অক্লেশে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, ঠিক তেমনিভাবেই আমাকেও ঝেড়ে ফেলে, লোহার সাঁড়াশির মতো পাঁচটা আঙুল দিয়ে সবলে আমার টুঁটি চেপে ধরল। গলা দিয়ে রা বার করব কী, মনে হল সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে আসছে। অন্ধকারের ভেতর বাঘের চোখের মতো ওর চোখ দুটো তখন ধক-ধক জ্বলছে। বাঁ-হাতে একটা টর্চ জ্বেলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো; আমার চোখ ধেঁধে গেল, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললাম। তারপরেই লোকটা খোলা দরজার সামনে আমায় ঠেলে এনে এক ধাক্কায় চলতি ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দিল।

ছিটকে গিয়ে তারের বেড়ার ওপর পড়লাম, এইটুকু শুধু মনে আছে, তারপর পাঁচ-সাত মিনিট যে কী করে কেটে গেল সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। ঘোরের ভাবটা একটু কমে এলে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, এখনও বেঁচে আছি। পৃথিবীতে রোজই কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে লোকের মুখে শুনতে পাই, খবরের কাগজেও হামেশা পড়ি, কিন্তু নিজের জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা এই আমার প্রথম। চলতি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে এত সামান্য চোটও মানুষে পায়! শরীরের অনেকখানি ভার তারের ওপর পড়াতে গা-টা কিছু জখম হয়েছে বটে, কিন্তু সামনেই একটা কাদার ডোবা থাকাতে গুরুতর কিছু হয়নি। অবশ্য পায়ের জখমও কম নয়—দাঁড়াতে গিয়ে পা চেপে একদম বসে পড়তে হল। সারারাত রেললাইনের পাশে পড়ে কাতরাতে লাগলাম; সকালে রেল কোম্পানির এক সাহেব ট্রলি চেপে যাচ্ছিল, আমায় দেখতে পেয়ে তুলে নিলে; সবকথা শুনে বললে, "তোমার এখন ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে সব চাইতে দরকার। তারপর রেলওয়ে এ-ব্যাপারে তদন্ত করবে। কাছেই মধুপুর স্টেশন, চলো, আপাতত সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মধুপুরের হাসপাতালে দেড়দিন থেকে ছাড়া পেয়েছি। যে-জিনিসটাকে গোড়ায় অন্ধকারে রণজিৎবাবুর মনিব্যাগ বলে মনে করেছিলাম, সেটা কিন্তু মানিব্যাগ নয়—এই ফটোখানা। চোর ব্যাটারও বোধহয় আমার মতোই ভুল হয়েছিল। হাওড়ায় নেমে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ মনে হল রণজিৎবাবুর ঠিকানা যখন জানি না তখন তাঁর ফটো আপনার কাছেই পৌঁছে দিয়ে যাই—তিনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু তা শ্রীপুরে ছোটমামার কাছেই শুনেছি। আচ্ছা, নমস্কার। আমি এখন চলি, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের পাড়াতেই অমলেন্দুবাবুর বাড়ি আপাতত আমি উঠছি। না, না, সাহায্যের দরকার নেই, লাঠি ভর দিয়ে নিজের গাড়িতে উঠতে পারব।'

যুবক চলিয়া গেলে হুকা-কাশি সোফার উপর বসিয়া-বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি ভাবিতে লাগিলেন। কী সাংঘাতিক এই দস্যুদল! রণজিৎ সামান্য একটু অসতর্ক হইয়া পড়িলে কি আর রক্ষা আছে? ভাবনার স্রোতে আরও কতদূর ভাসিয়া চলিতেন জানি না, কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়িল, বেহারা আসিয়া তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিল। ঠিকানার উপর নজর পড়িতেই রণজিতের হস্তাক্ষর তিনি চিনিতে পারিলেন; তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া ফেলিলেন।

সুদীর্ঘ পত্র। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যান্ডেলের ঘটনা, মধ্যরাত্রে ফটোচুরির ইতিহাস, মোগলসরাইয়ের অভিজ্ঞতা—সমস্তই ধারাবাহিকভাবে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। জগন্নাথ ঘাটে অশনিকান্তের আবির্ভাব ও তাঁর লাঞ্ছনা, ব্যান্ডেল ছাড়াইবার পর অপরিচিত যুবকের সহিত পরিচয় প্রভৃতিও বাদ পড়ে নাই—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেসবেরও বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকার নিকট এসব তথ্য অজ্ঞাত নয়, কাজেই রণজিতের চিঠি হইতে এই অনাবশ্যক অংশটুকু বাদ দিয়া মোগলসরাই পৌঁছিবার পর কী-কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে কেবলমাত্র সেইটুকুই উদ্ধৃত করিব।

'...রিফ্রেশমেন্ট রুম থেকে বার হয়ে কাশীর গাড়িতে গিয়ে চড়লাম। একটা লোক চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে ওদিকের জানালায় ঝুঁকে পড়ে কী দেখছিল, আমি ঢোকার প্রায় দু-তিনমিনিট বাদে এদিকে ফিরে চাইলে। চমকে উঠে পরের মুহূর্তেই

BanglaBook.org

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ইনিই আমার জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, অর্থাৎ ব্যান্ডেল প্ল্যাটফর্মের জলার্থী সেই ব্যক্তিটি। ও এ-কামরায় উঠেছে জানলে আমি অবশ্যই এটাতে উঠতাম না, কিন্তু তখন আর গাড়ি বদলির সময় নেই, গার্ডসাহেব সিটি বাজিয়েছে, গাড়ি মোশান দিয়েছে।

'আমার মনে-মনে একটা বদ্ধ ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, মাঝরাত্রে সে-যুবকটি যখন ফটোখানা সরিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায় তখন সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে এ-লোকটাও লিপ্ত ছিল নিশ্চয়ই। আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে একটু ছিপছিপে গড়নের বোধ হলেও একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায় কী অসম্ভব শক্তিশালী সে। লোহার মতো পেটা শরীর, হাতের কব্জি দুটো অসম্ভবরকম চওড়া আর আঙুলগুলো বেরিয়ে আসছে যেন পাঁচটা ইস্পাতের সাঁড়াশি। সে-গাড়ির আরোহী ছিলাম মাত্র আমরাই দুজন, কাজেই বুঝলাম এ-নির্জনতার সুযোগ নিতে ও নিশ্চয়ই কসুর করবে না। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে, এ-আশঙ্কায় আমিও প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু একটু বাদেই লোকটার রকম-সকম দেখে আমাকে রীতিমত হতভম্ব হয়ে যেতে হল। সত্যি কথা বলতে কী, আমার সমস্ত চিন্তাশক্তিই যেন তালগোল পাকিয়ে গেল, কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটার যে-ছবি আমি এঁকে নিয়েছিলাম বাস্তবের সঙ্গে তার আর যেন এতটুকু মিল রইল না। লোকটা শান্ত মনে আমারই সামনে বসে, আমার ওপর তার যে সন্দেহের বাষ্পটুকুও রয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া গেল না। আমার উপস্থিতিতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, প্রসন্নচিত্তে নিজের মনেই গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। মনের সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে যে-কোনও লোকের পক্ষেই ওভাবে গান গাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

'বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গাড়ি এসে থামবার পরও লোকটার কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। আমি গাড়িতেই থেকে গেলাম, না কি নামলাম সেদিকে লক্ষ পর্যন্ত না করে সে সোজা ফটক পার হয়ে এক্কাওয়ালাদের এলাকায় এসে হাজির হল, আর তার মিনিট কয়েক পরেই একখানা এক্কা ভাড়া করে বেরিয়ে গেল। যত শিগগির সম্ভব আমিও একখানা টঙ্গা নিয়ে তার পিছন-পিছন রওনা হলাম, কিন্তু খানিকটা পথ এগোবার পরই সামনের গাড়িখানা মোড় ফিরে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, হাজার অনুসন্ধানেও তার আর কোনও কিনারা করা গেল না।

'গোধুলিয়া থেকে খানিক দূরে আমার আলাপী এক ভদ্রলোক কিছুদিন হল একটা হোটেল খুলেছেন; ইতিপূর্বে বার দুই তাঁর অতিথি হয়েছিলাম, মালপত্র নিয়ে তাঁরই ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। এ দু-দিনে শরীরের ওপর দিয়ে একটা যেন ছোটখাটো ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা দিয়ে উঠতে উপদেশ দিলেন। তারপরেও ক্লান্তি যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে সন্ধ্যার পর একখানা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার বুকের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে নিশ্চয়ই তা একেবারে উবে যাবে। দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাড়াটে নৌকোর অভাব কোনওকালেই হয় না, আর দরেও অন্যান্য ঘাটের চাইতে সেখানেই কিছু সুবিধা।

'সন্ধ্যার পর হাঁটতে-হাঁটতে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতেই সাড়া পেয়ে মাঝির দল পঙ্গপালের মতো এসে আমায় ছেঁকে ধরল—যেন আমি ওদের একটা বহু-আকাঙ্ক্ষিত পণ্যের সামগ্রী। ওদের ব্যগ্রতা দেখে মনে হল, অন্যান্য ব্যবসার গতি যে-দিকেই হোক না কেন, মাঝির ব্যবসায়ে সম্প্রতি বড়ই মন্দা পড়েছে; প্রতিযোগিতার পাকে পড়ে দর হু-হু করে নেমে চলল। তারই মধ্যে একজন মাঝি

বড়ই সু-ব্যবসায়ী, নিরর্থক কথা কাটাকাটিতে সময়ক্ষেপ না করে সে একরকম বগলদাবা করেই আমায় তার নৌকোর দিকে নিয়ে এল। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "আরে বাপু রোসো, কী ভাড়া চাও সেইটেই তো এখনও খোলসা হল না।" সে পরম ঔদাস্যের সঙ্গে জবাব দিলে, "উসসে ক্যা জরুরৎ হই বাবুজি, চড়িয়ে তো আপ নাও পর, পিছে যো আপ কি মর্জি দীজিয়ে, ম্যায় খুশিসে লে লেঙ্গে।"

'গলুইয়ের উপর ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়লাম; তারপর সামনের দিকে আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পাথরের মতো ভারি কী একটা জিনিসে হোঁচট খেয়েই দড়াম করে এক আছাড়! লোকটার অবিমৃষ্যকারিতায় মর্মান্তিক চটে গিয়ে ধমকে সাধ্যমতো হিন্দিতে বলে উঠলাম, "কোথাকার উজবুক হাঁদা রে তুই, সওয়ারী তুলতে এমনি মত্ত যে নৌকোর মালপত্তরগুলোও সামলে রাখতে পারিসনি? জলে যদি পড়ে যেতাম!"

'লোকটা মহা অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি হিন্দিতে কতকগুলি কথা উচ্চারণ করে গেল, আমি শুধু তার ভেতর "কসুর" কথাটা বুঝতে পারলাম। তারপর নিজের মনেই কী সব বিড়বিড় করতে- করতে পাটাতনের তক্তা তুলে জিনিসটাকে ঠেলে ভেতরে ফেলে দিয়ে আবার পাটাতন বন্ধ করে দিলে।'

'বাতাসের দিকে উল্টোমুখ করে ধীরে-ধীরে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলতে লাগল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, গঙ্গার প্রশস্ত বুকে রূপালী ঢেউগুলি লুকোচুরি খেলছে, আর অসংখ্য আলোর মালা গলায় পরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী জলের ভেতর নিজেরই যেন ছবি দেখছে। সত্যিই পৃথিবীর আর সমস্ত জিনিসই আমি তখন ভুলে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ এমনই তন্ময়ভাবে কেটে গেল জানি না, হঠাৎ দেখি, অসি ঘাট ছাড়িয়ে প্রায় মাইলটাক পথ চলে এসেছি। এইবার ফেরা দরকার মনে করে মাঝিকে নৌকোর মুখ ঘোরাতে হুকুম দিলাম; সে ছপাৎ করে দাঁড় তুলে নিলে, তারপরেই পাটাতনের তক্তাগুলো সরাতে আরম্ভ করল। মুহূর্ত পরে দেখি, দশাশ্বমেধ ঘাটে যে ভারি জিনিসটাতে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম সেইটে পাটাতনের ভেতর থেকে ওপরে চলে এসেছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় নৌকোর চারধার প্রায় দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, তারই সাহায্যে লক্ষ করলাম ওটা একটা ভারি পাথর। সেটাকে ফুটো করে কে দিব্যি একটি দড়ি গলিয়ে রেখেছে—মালা গাঁথবার সময় ঠিক যেমন পুঁতির ভেতর দিয়ে সুতো পরানো হয়। নৌকো চালাবার ব্যাপারে এ-জিনিসটার কী প্রয়োজন হতে পারে সেইটে আমি ভাবতে যাচ্ছি, এমনসময় আমার মাঝি বিকট কণ্ঠে একটা অট্টহাসি হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, "এ-মালাগাছটা গলায় একবার পরে নাও তো রণজিৎবাবু!"

'একমুহূর্তে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, একান্ত অজ্ঞাতসারে সেই ডাকাত দলেরই ফাঁদে পা দিয়েছি; নইলে আমার পরিচয় এরা পেলে কোথায়? নির্জন স্থানে ভুলিয়ে এনে গলায় পাথর বেঁধে এখন এরা আমায় নদীতে ডুবিয়ে মারতে চায়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানকে একবার ধন্যবাদ না দিয়েও থাকতে পারলাম না—ভাগ্যিস এ-কাজের ভারটা ওরা মাত্র একজন লোকের ওপর দিয়েছে! হয়তো যত সহজ ওরা ভেবেছে, আসল ব্যাপারটা তত সহজে সমাধা হবে না। মাথা তুলে আড়চোখে আর-একবার লোকটার দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম হাতখানেক লম্বা একখানা ভোজালি তার হাতে চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। সেখানা একটু দুলিয়ে নিয়ে সে ব্যঙ্গচ্ছলে বললে, "ব্যান্ডেল থেকে কাশী পর্যন্ত ছুটে এয়োছ, একবার গঙ্গাদর্শনটা হবে না? সেও কি হয়?"

BanglaBook.org

'আত্মরক্ষার সব চাইতে বড় উপায় যে আক্রমণ তা আমার জানা ছিল; নিমেষমাত্র চিন্তার সময় না দিয়েই আমি ছোরাসুদ্ধ ওর ডানহাতের কব্জিটা সবলে চেপে ধরলাম আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেহের সমস্ত ওজন এমনভাবে ওর বাঁ-হাতের ওপর চেপে দিলাম যে-কোনওমতে সে সেখানা মুক্ত করতে না পারে। তারপর কব্জিতে মোচড় দিতেই ওর হাত শিথিল হয়ে এল; মুখ দিয়ে যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা শব্দ করে ছোরাখানা ও জলে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমার চোখের আধ আঙুল ওপরে, ঠিক ভুরুর মধ্যে, একটা গোখরো সাপে যেন ছোবল মেরেছে। চমকে মাথাটা একটু সরিয়ে নিতেই ছপছপ করে কপালের ওপর আরও দুটো ছোবল। চোখ তুলে সামনের দিকে চাইতে যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত হিম হয়ে এল—আমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে পাঁচ-সাতজন লোক বিপুলবেগে আর-এক নৌকো চালিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আর ছোট-ছোট ছেলেরা গুলতি ছুঁড়ে যেভাবে পাখি শিকার করে, ঠিক তেমনিভাবে ওদেরই একজন আমার চোখ দুটি লক্ষ করে ক্রমাগত গুলতি ছুঁড়ছে। অব্যর্থ তার সন্ধান, চোখ দুটিকে না গেলে সে বোধকরি নিরস্ত হবে না।

'দেখতে-দেখতে দ্বিতীয় নৌকোখানা একেবারে কাছে এসে পড়ল, ভেতরে আরোহীদের স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেলাম। এতগুলো লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া আর গোঁয়ারের মতো কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো একই কথা। "সুইমিং চ্যাম্পিয়ান" রণজিতের কাছে এ-ক্ষেত্রে যেটি আপনি প্রত্যাশা করতেন, তাই আমার কর্তব্য বলে ঠিক করে ফেললাম।

'গঙ্গা তখন খরতোয়া। চারপাশে জন-মনুষ্যের সাড়া-শব্দ নেই, আততায়ীর নৌকো দৈত্যের মতো হাত বাড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে। মাতৃনাম স্মরণ করে ঝপ্ করে জাহ্নবীর বুকে লাফিয়ে পড়লাম—একেবারে দশ-বারোহাত জলের নিচে। কাশীর গঙ্গা উত্তর-বাহিনী তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে; প্রবল টান হু-হু করে আমায় দশাশ্বমেধের দিকে নিয়ে চলল, আর তার সঙ্গে যোগ হল হাতের নৈপুণ্য। মাঝে-মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্য মাথা তুলতে হচ্ছিল, সেই অবসরে দেখছিলাম ওরা তখনও হাল ছাড়েনি, তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত নদী চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জলের ভেতর কুমিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যদি অসাধ্য ব্যাপার হয়, তবে রণজিৎ রায়ের সন্ধানও তার চাইতে বিশেষ কিছু সুসাধ্য মনে করবার কারণ নেই...।'

হুকা-কাশি চিঠি পড়া শেষ করিয়া ধীরে-ধীরে সেটি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, তারপর মনে-মনে কী একটু চিন্তা করিয়া আস্তে টেলিফোনের হাতলটি তুলিয়া লইলেন; সলিলের সঙ্গে তিনি একটু বাক্যালাপ করিতে চান।

'হ্যালো, শ্রীপুরের চিনির কারখানা এটা? সলিলবাবু আছেন?' হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ওধার হইতে উত্তর আসিল—হুকা-কাশির মনে হইল স্বরটা যারই হোক, একটু উদ্বেগাকুল —'না, আপনি কোথা থেকে কথা কইছেন?'

'ডাফ স্ট্রিট থেকে।'

'তিনি তো... খানিক আগে... আপনার দরকারটা কী বলুন তো? ব্যবসা সম্বন্ধে?'

'ওঃ, তিনি নেই তা হলে। আচ্ছা, ফিরলে বলবেন ডাফ স্ট্রিট থেকে ফোনে ডেকেছিল, তা হলেই হবে।' বলিয়া আর কোনও জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই হুকা-কাশি টেলিফোনের হাতল নামাইয়া রাখিলেন।

BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে অমৃত আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল, 'এজ্ঞে শিরিষপুর থেকে সন্তোষবাবু এয়েচেন, তেনার সঙ্গে আর-এক বাবু রয়েচেন। ওনাদের চেহারাটা কেমন বেজার-বেজার আর কাহিল-কাহিল ঠেকচেন। বললেন, আপনার সঙ্গে নাকি ভয়ঙ্কর দরকার।'

'আচ্ছা বাইরের ঘর খুলে তাঁদের বসতে দাও গে, আমি এক্ষুনি আসছি।'

চৌদ্দ : মেজাজী পার্শী

বাহিরের ঘরে আসিয়া হুকা-কাশি দেখিলেন, সন্তোষ এবং অপর একটি অপরিচিত ভদ্রলোক সোফার উপর বসিয়া আছেন; উভয়েরই মুখের ভাব উদ্বেগপূর্ণ। তাঁকে ঢুকিতে দেখিয়া দুজনেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্তোষ পরিচয় করাইয়া দিল, 'ইনি আমাদের কর্তার মেজভাই। আমেরিকা থেকে আজই দেশে এসে পৌঁছেছেন...।'

সে আরও কী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হুকা-কাশির সৌজন্যের বন্যায় তা ভাসিয়া গেল; তিনি আন্তরিকতার সহিত নবাগতের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করিতে-করিতে বলিলেন, 'লেট মি ওয়েলকাম ইউ ইন ইওর ওন মাদার কানট্রি, মিস্টার বাসু। একযুগ পরে নিজের দেশে ফেরায় যে কী আনন্দ তা আমি কিছু-কিছু জানি—আমার নিজের জীবনেও ও-জিনিসটা দু-একবার ঘটেছে কিনা!' বিলাত অথবা আমেরিকায় গিয়া এখনও অনেক বাঙালি যে 'রায়'কে 'রয়', 'দাস'কে 'ডস' এবং বসুকে 'বাসু' নামে চালান হুকা-কাশি তা জানিতেন এবং নবাগত ভদ্রলোকটিও যে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম নন ইতিপূর্বেই তিনি তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

মিস্টার বাসু বলিলেন, 'বাস্তবিক, দেশের মাটিতে পা দিতেই আনন্দ যা হয়েছিল তা অপরিসীমই বটে, কিন্তু ভগবান অবিমিশ্র আনন্দ বোধহয় কারও কপালেই লেখেন না। বাড়ি এসেই দেখলাম, রোগে আর চিন্তায় বড়দার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে; তারওপর আজ আবার আমার ছোটভাই সলিলকে পুলিশ এসে থানায় নিয়ে গেল। বড়দা তাই তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।'

হুকা-কাশি একটু যেন চমকাইয়া উঠিলেন, সন্তোষকে লক্ষ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'থানায় নিয়ে গেছে? কিন্তু কেন?'

সন্তোষ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল, বারকয়েক ইতস্তত করিল, তারপর বলিল, 'আপনি কি বাস্তবিকই বুঝতে পারছেন না মিস্টার হুকা-কাশি? সোনার হরিণ চুরি যাওয়ার কথা যে চাপা নেই তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সমস্ত দেশময় তা ছড়িয়ে পড়েছে—নানা জায়গায় পুলিশের কর্তাদের কানে তা তোলা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে কোনও বা বার হয়নি, হয়তো এখনও বার হওয়া শোভন হচ্ছে কি না জানি না, কিন্তু তবুও কর্তব্যের খাতিরে আজ আর এ-কথা না জানিয়ে থাকতে পারছি না যে, এই চুরির পর থেকেই সলিল যেন—যেন—কেমন একটু আলাদা মানুষ হয়ে গেছে; তার ধরন-ধারণ যেন—এ—ইয়ে—কেমন একটু অস্বাভাবিক মতো হয়ে পড়েছে। এ-ক্ষেত্রে পুলিশ যদি...।'

সন্তোষ কথাটা শেষ করিল না বটে, কিন্তু তার ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। এই চুরির ব্যাপারে সলিল যে নিতান্ত সাধুপুরুষটি নয় ইহাই যেন সে ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝাইতে চায়। হুকা-কাশি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এ-ছেলেটির পা হইতে মাথা পর্যন্ত বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কোনও কথা বলিলেন না। কিন্তু ধৈর্য হারাইলেন মিস্টার বাসু। সোনার হরিণের সমস্ত কথাই তিনি শুনিয়াছেন, সলিল—তাঁরই নিজের ছোটভাই, নির্মল, নিষ্কলুষ সলিল—তার বিরুদ্ধে এ কী জঘন্য অভিযোগ! রাগে তাঁর চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সন্তোষের দিকে ফিরিয়া কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, 'একমাত্র তোমার অনুমান ছাড়া সলিলের বিরুদ্ধে কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ সন্তোষ, যাতে করে এতবড় একটা

BanglaBook.org

দুর্নামের বোঝা তার ওপর চাপাতে সাহস করছ? সলিলকে আমরা চিনি, তোমার চেয়ে ঢের বেশি চিনি; আর চিনি বলেই জোর করে বলতে পারি—তার মতো সৎ ছেলে লাখে একজনও মেলে না। তুমি অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, নিশ্চয়ই তার প্রতি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছ, কাজেই তার ঘাড়ে এতবড় একটা বদনামের বোঝা চাপাতে উঠে পড়ে লেগেছ। কিন্তু দাঁড়াও, আমিও সহজে তোমায় রেহাই দিচ্ছি না; আজই বড়দাকে গিয়ে জানাব, দুধ-কলা দিয়ে কী কালসাপ তিনি ঘরের ভেতর পুষছেন!' উত্তেজনায় তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন, আর তাঁর চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল ঠিক যেন দুই খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা।

সন্তোষ বেচারা একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিল। আজ এ-বাড়িতে ঢুকিবার অব্যবহিতকাল পূর্বেও সে একটি বারের তরেও ভাবিতে পারে নাই যে, যে-কথাটা এতদিন ধরিয়া তার মনের আনাচে-কানাচে অনবরত উঁকি মারিতেছিল আজ এমনই ভাবে বাহিরে তা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হুকা-কাশি ওভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া না বসিলে কথাটা যে প্রকাশও পাইত না, তাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু নিজের মনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে এমন লোক পৃথিবীতে কয়জনই বা মেলে? ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সন্তোষের যেন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

হুকা-কাশি এতক্ষণ ভালো-মন্দ কোনও কথাই বলেন নাই, এইবার সন্তোষের দিকে তাকাইয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, 'থানায় নিয়ে গেছে বলছেন, কোন থানায়?'

সন্তোষ ম্লানমুখে বলিল, 'তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কারখানা থেকে একজন বেয়ারা ছুটে এসে খবর দিয়ে গেল—"ছোটবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।" খবর শুনে তাড়াতাড়ি কারখানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, একজন অফিসার আর একজন জমাদার এসেছিল। জমাদার বেঙ্গল পুলিশেরই বটে, কিন্তু অফিসারটি রেলওয়ে পুলিশের। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীপুর থানায় চলে গেলাম, গিয়ে দেখি দারোগাবাবু নেই, মফস্বলে কোনও এক তদন্তে বেরিয়েছেন; আর যারা রয়েছে তারা কোনও খবরই দিতে পারলে না। ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকল, বাড়ি ফিরে কর্তাকে সবকথা বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

সন্তোষের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই হুকা-কাশির মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'আর এর ভেতর "কেমন-কেমন" কিছু নেই, সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনারা নিরর্থক চিন্তিত হচ্ছেন মিস্টার বাসু, সলিলবাবুকে পুলিশে মোটেই গ্রেপ্তার করেনি। রেলওয়ে পুলিশের অফিসার এসেছিল ওঁর কাছে এক তদন্তে, আর তারই ফলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উনি বেরিয়ে পড়েছেন অন্য এক ব্যাপারের তদন্তে। যাওয়ার সময় ওঁর মন এমনই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল যে, কারখানায় বা বাড়িতে যে কিছু বলে যাওয়া দরকার তা পর্যন্ত খেয়ালে আসেনি। হঠাৎ অভাবনীয় একটা কিছু ঘটেছে জানতে পারলে এরকম ভুল মানুষের প্রায়ই হয়ে থাকে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, আপনারা বাড়ি গিয়ে দেখবেন সলিলবাবু ফিরে এসেছেন।'

হুকা-কাশির কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তপরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল সলিল। মিস্টার বাসু এবং সন্তোষ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন।

হুকা-কাশি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কী, ভাগ্নের খবর কিছু মিলল?'

এবার বিস্ময় প্রকাশের পালা সলিলের। কহিল, 'না, তার সন্ধান পেলাম না; কিন্তু আপনি সে-কথা জানলেন কোত্থেকে মিস্টার হুকা-কাশি?'

এই বিশেষ 'আবিষ্কার'টায় তাঁর নিজের যে কিছুই কৃতিত্ব নাই, একটু আগে 'ভাগিনেয়' স্বয়ং আসিয়াই যে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গিয়াছিল, হুকা-কাশি সে-কথা ভাঙা আবশ্যক বোধ করিলেন না, বরং একটু ঘোরালোভাবে কহিলেন, 'আমাদের যে অনেক কিছু জানতে হয় সলিলবাবু—অনেক কিছু!' এই শেষের কথাটা বলিবার সময় মনে হইল তাঁর চোখে যেন একটু

BanglaBook.org

রহস্যময় হাসি খেলিয়াই আবার মিলাইয়া গেল। এটুকু সলিলের দৃষ্টি এড়াইল না, মনে-মনে সে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল যেন।

সন্তোষ এবং মিস্টার বাসুও কম আশ্চর্য হন নাই; মিস্টার বাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু সলিলকে বাস্তবিকই পুলিশে গ্রেপ্তার করেনি, ঘরে বসে এ-কথা আপনি কী করে জানলেন?'

'এটা জানতে বাইরে বেরুবার মতো জটিলতা কোথাও তো কিছু ছিল না।... আপনার ভাগ্নের একটা রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাকসিডেন্ট বললে ঠিক বলা হল না, চলন্ত গাড়ি থেকে এক গুণ্ডা তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।'

মিস্টার বাসু এবং সন্তোষ যুগপৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—'উঃ! বলেন কী?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা; কিন্তু আপনারা বিচলিত হবেন না, খুব অল্পের ওপর দিয়েই গেছে, আপনার ভাগ্নে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ই-আই-আরের একজন সাহেব কর্মচারী লাইনের পাশে ও-অবস্থায় ওঁকে পড়ে থাকতে দেখে নিজের ট্রলিতে উঠিয়ে মধুপুরের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এটা "অ্যাটেম্পটেড্ মার্ডার" কেস, কাজেই রেলওয়ে পুলিশ এ-সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করবে—এ-কথা তিনিই আপনার ভাগ্নেকে বলে দিয়েছিলেন। আপনার ভাগ্নে শ্রীপুর থেকে রওনা হয়েছিলেন, কাজেই শ্রীপুরের ঠিকানা যখন পুলিশ চাইল, তখন তিনি C/o. সলিল বোস-ই বললেন, C/o. দ্বারিক বোস বললেন না নিশ্চয়ই, কেননা, আপনারা পারিবারিক সব ঘটনাই জানেন—দ্বারিকবাবুর সম্পর্ক তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।' হুকা-কাশি মৃদু হাসিলেন।

'যখন শুনলাম,' হুকা-কাশি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'যে এঁর কাছে রেলওয়ে পুলিশের অফিসার এসেছিল, তখনই আমার মনে সন্দেহ হল। তারপর যখন আপনারা আরও বললেন যে, শ্রীপুরের থানায়ও আপনারা খবর নিয়ে এসেছেন—সলিলবাবু কোথায় সে-সম্বন্ধে থানার লোক কিছুই জানে না, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি নিশ্চয়ই, কেননা শ্রীপুরের সব চাইতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনও ছেলে গ্রেপ্তার হবে, অথচ থানার লোকজন তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারবে না, এটা খুবই অস্বাভাবিক। অথচ এদিকে আমার জানা আছে যে, যে-অফিসারটি সলিলবাবুর কাছে এসেছিলেন তিনি রেলওয়ে পুলিশের—মানে, রেলওয়ের এলাকার মধ্যে পুলিশ-গ্রহণযোগ্য কোনও কিছু ঘটলে তখনই তাঁদের কাজকর্ম শুরু হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল—"এরপর রেলওয়ে পুলিশ এ-ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করবে।" মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, আপনাদের ভাগ্নের "অ্যাকসিডেন্ট" অথবা "অ্যাটেম্পটেড্ মার্ডার" যাই বলুন—সে-সম্বন্ধেই রেলওয়ে পুলিশ তদন্তে এসেছিল সলিলবাবুর কাছে। ভাগ্নে সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ঙ্কর খবর পেলে সবারই পিলে চমকে ওঠে, কাজেই সলিলবাবু যখন অফিসারের কাছে শুনতে পেলেন যে, ওঁর ভাগ্নে খুব সম্ভবত কলকাতাতেই ফিরে এসেছেন, তখন সেই অবস্থায় 'একবস্ত্রে' ওঁর সঙ্গেই কলকাতা রওনা হয়ে এলেন। মনের ওরকম অবস্থায় বাড়িতে একটা খবর পাঠানো যে দরকার তাও ওঁর খেয়ালে আসেনি। কেমন সলিলবাবু, বিশ্লেষণটা ঠিকমতো হয়েছে তো?'

'অবিকল! কোথাও এতটুকু ভুল হয়নি।' তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় বিজড়িত।

মিস্টার বাসুর সম্ভ্রমও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি কহিলেন, 'আমি এসে পৌঁছবার পর বড়দার মুখে আপনার শক্তির কথা অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছি। রাজা শশাঙ্কশেখরের পদ্মরাগ মণি কেমন সুকৌশলে আপনি উদ্ধার করে দিয়েছিলেন, নলকোথার ভূপেশ ঘোষচৌধুরীর ঘড়ির রহস্য কেমন নিখুঁতভাবে ভেদ করে দিয়েছিলেন—সবই তিনি আমায় বলেছেন। আপনার কাজের ধারা কীরকম তা আগেই শুনেছিলাম, এখনও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করলাম—লাঠির সাহায্য নেই, মাংসপেশীর অনাবশ্যক চালনা নেই, কথায়-কথায় পিস্তল ছোঁড়া আর রক্তারক্তি কাণ্ড নেই—শুধু যুক্তিতর্কের সাহায্য আর মস্তিষ্কের ব্যবহার। বাস্তবিক এ একটা শিক্ষার, একটা অনুপ্রেরণার বিষয়। আমি জোর করে বলতে পারি, আমেরিকা হলে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের ভেতর আপনার জীবনচরিতকার হওয়ার জন্য দস্তুরমতো রেষারেষি পড়ে যেত। প্রত্যেকটি অ্যাডভেঞ্চারে আপনার

নিত্যকার সঙ্গী হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ঘটনা পর-পর তারা লিখে রাখত, তারপর অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে গেলে বই-এর আকারে তা প্রকাশ করে সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনার প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হত! অবশ্য এই বয়সে আর সম্ভব নয়, নইলে আমার নিজেরই যেন উৎসাহ হচ্ছে!'

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ তো, নেমেই পড়ুন না তা হলে! বয়স আর আপনার এমন কী-ই বা হয়েছে? আমার চাইতেও কি বড় হবেন?'

'অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছি, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে বাস করতে ইচ্ছে করে বইকী! কিন্তু তা হোক, বড়দার সোনার হরিণের কিনারা করতে একটুও যদি আপনার কাজে লাগতে পারি তবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যটা না-হয় না-ই দেখলাম! আমি রাজি।'

হুকা-কাশি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু গোড়াতে একটা কথা পরিষ্কার করে আপনাকে বলা দরকার বোধ করছি; আমাদের বোঝাপড়া চলবে কিন্তু অতি দুর্দান্ত বেপরোয়া এক দস্যুদলের সঙ্গে। এ-দলটা কতখানি পুরু তা এখনও আমি ভালো করে ঠাহর করে উঠতে পারিনি, কাজেই আমার নিজেরও একটু দলবৃদ্ধি করে নেওয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগদানে বিপদের সম্ভাবনাটা যে কতখানি তা প্রথমেই বলে রাখা ভালো; মানুষের প্রাণকে কিন্তু এরা প্রাণ বলেই গ্রাহ্য করে না—পিঁপড়ের মতো মানুষকেও টিপে মারতে এরা সর্বদাই অভ্যস্ত। ছোরা চালাতে এবং পিস্তল ছুঁড়তে এদের কিন্তু একেবারেই বাধে না।'

হুকা-কাশির এ-কথায় সলিলের মুখ প্রায় পাংশু হইয়া উঠিল, কিন্তু মিস্টার বাসু তা লক্ষও করিলেন না। হাসিয়া কহিলেন, 'সে-ভয় আমায় কী দেখাচ্ছেন, মিস্টার হুকা-কাশি? পাঁচ বচ্ছর আমি আমেরিকার শিকাগো শহরে কাটিয়ে এসেছি; শিকাগোর গুণ্ডাদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের দস্যুরই কি তুলনা চলে? এখানকার দস্যুদের তো ছ্যাঁচড়া বললেই হয়, বুদ্ধির কোনও বালাই-ই নেই। সেখানে তারা চলে পদে-পদে বিজ্ঞানের সাহায্যে। বেপরোয়া দস্যু যদি বিজ্ঞানের বলে বলী হয়, তবে সমাজের যে তারা কী ভীষণ অভিশাপস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা প্রত্যক্ষ করেছি শিকাগোতে—কিলিঞ্জার প্রভৃতির লীলাভূমি শিকাগো শহরে।'

হুকা-কাশি প্রসন্ন হইলেন। বলিলেন, 'বেশ, তা-ই তবে কথা রইল, সময় হলেই আপনাকে খবর দেব।'

দরকার মিটিয়া গিয়াছিল, সকলে এইবার উঠিবার উপক্রম করিল; সলিল একটু কাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে প্রশ্ন করিল, 'আমার সঙ্গে আপনার কি কোনও দরকার আছে, মিস্টার হুকা-কাশি?'

'সে-কথা আপনি জানলেন কী করে? শ্রীপুর হয়ে তবে আসছেন নাকি?'

'না, বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে দেখে একটু আগে কারখানায় ফোন করেছিলাম যে, আমার ফিরতে রাত হতে পারে—কেউ যেন ভাবনা না করে। তারা সব ঘটনা খুলে বললে, তারপর জানালে যে মেজদারা রওনা হয়ে আসবার কিছু পরে আপনি ফোনে আমায় ডেকেছিলেন।'

'তারা ঠিক খবরই দিয়েছে। কাল বেলা ঠিক দুটোর সময় আমার এখানে আসবার একটু সুবিধা হবে কি আপনার?'

সলিল সন্দিগ্ধভাবে খানিকক্ষণ হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইল, তারপর আস্তে-আস্তে বলিল, 'বেশ আসব।'

পরদিন বেলা দুইটা বাজিতে-না-বাজিতেই সলিল হুকা-কাশির বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে জানিত, পূর্ব হইতে কারও সঙ্গে দেখা করিবার কোনও সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় তা তিনি পালন করেন। কিন্তু আজ বাড়ির ফটকে ঢুকিতেই বেহারা তাকে

BanglaBook.org

সেলাম জানাইয়া কহিল, বাবু তাঁর কোনও জরুরি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন—সলিল আসিলে বৈঠকখানা ঘরে তাকে বসাইবার জন্য তার উপর নির্দেশ রাখিয়া। বেহারা অমৃতের পিছন-পিছন সে আসিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে কিন্তু বিশেষ একটু আশ্চর্যান্বিত হইল এই দেখিয়া যে, সে ছাড়া আরও এক ভদ্রলোকের সহিত ইতিপূর্বেই হুকা-কাশি এনগেজমেন্ট করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই লোকটিও তাঁরই অপেক্ষায় বসিয়া-বসিয়া এইবারে রীতিমতো উসখুস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লোকটি একজন আধা-বয়সী পার্শী, দেখিলে মনে হয় বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যবসাদার। সলিল ঘরে ঢুকিতেই সেই পার্শী ব্যবসাদারটি আড়চোখে একবার তার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু কোনও কথা কহিল না।

দেখিতে-দেখিতে আরও প্রায় পনেরো মিনিট সময় কাটিয়া গেল, পার্শী ব্যবসাদারটির মুখে বিরক্তির চিহ্ন এইবার যেন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, বাহিরেও সেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সে হাঁকিল, 'বেয়ারা, এ বেয়ারা, ইধার আও। সাহেব কা ঘুমনেমে আউর কেৎনা দের হোগা? পঁচিশ মিনিট তো কব্‌হি বিত গিয়া, আউর কেৎনা ঠারেঙ্গে?'

লোকটার কণ্ঠস্বরে কানে যেন পীড়া দেয়, মনে হয়, কেহ যেন সজোরে একটা ভাঙা কাঁসর বাজাইতেছে। তার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া অমৃত আগাইয়া আসিল, কুণ্ঠিতভাবে দুই হাত কচলাইতে-কচলাইতে জানাইল, আজিকার এ-ব্যাপার বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কেননা তার মনিবকে বহুদিন যাবৎ সে জানে, কথায় এবং কাজে মিল রাখিতে এরূপ লোক বাস্তবিকই দেখা যায় না। কেন যে তিনি কথা দিয়া আজ তা রাখিতে পারিতেছেন না, তা তার কল্পনারও বাহিরে।

নীরবে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল; পার্শী সাহেব বোধকরি একবার ইতস্তত করিল, তার পরেই সলিলকে লক্ষ করিয়া ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাপ করবেন, আপনার নামই কি সলিলবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বিস্মিত সলিল জিজ্ঞাসুভাবে তার মুখের পানে তাকাইল।

'ওঃ, আমাকে আর আপনাকেই তবে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার হুকা-কাশি ডায়মন্ড করপোরেশনে যাবেন, কথা ছিল।'

'কোথায় যাবেন?' অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সলিল প্রশ্ন করিল।

'ডায়মন্ড করপোরেশনে। কেন, ও-জায়গাটার নাম এর আগে আপনি আর শোনেননি না কি?'

'এই আপনার কাছেই প্রথম শুনছি।'

'বাঃ মিস্টার হুকা-কাশি যে বললেন, সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার বিশেষ জানাশোনা আছে! মিস্টার এ—এ—কী তো যেন নামটা?'

'কী করে বলি বলুন, জায়গাটার নামই জানি না শুনছেন, তা ম্যানেজারের নাম জানব কী করে?'

'ওঃ, কেন তবে অমন কথা হুকা-কাশি বললেন তিনিই জানেন। কিন্তু কী আনপাংচুয়াল লোক বলুন দেখি! পৌনে দুটোর এনগেজমেন্ট করে... বেয়ারা! বেয়ারা! এ বেয়ারা!!'

নাঃ, লোকটা জ্বালাইল দেখিতেছি, গলার আওয়াজে মাথার পোকা বাহির হইয়া আসিতে চায়! সলিল অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিল। তার এ-বিরক্তির ভাবটা কিন্তু পার্শী সওদাগরের নজর এড়াইল না, সলিলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, 'সত্যিই আমার গলার আওয়াজটা ভারী কনকনে, কিন্তু আপনি কি সত্যিই বলতে চান, সলিলবাবু, যে এইরকম গলার আওয়াজ বাস্তবিকই আর কখনও আপনি শোনেননি!' তার চোখের কোণে একটু ধূর্ত চাহনি আর ঠোঁটের পাশ দিয়া একটু বাঁকা হাসি যেন খেলিয়া গেল।

একমুহূর্ত সলিল যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ঠিক তার পরক্ষণেই কী ভাবিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল—আতঙ্কের একটা ছাপ তখন তার মুখে স্পষ্ট ছাপা হইয়া গেছে।

পনেরো : সলিল-চরিত

সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ি ফিরিয়া সলিল দেখিতে পাইল মিস্টার বাসু খুব ব্যস্তভাবে নিজের সুটকেসে কাপড়-জামা, আয়না, চিরুনি, সাবান প্রভৃতি গুছাইতে লাগিয়া গিয়াছেন—যেন এখনই কোথায় বাহির হইয়া পড়িবেন, মরিবারও ফুরসুত নাই। সলিল ঘরে ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে সলিল এসেছিস? ভালোই হল, আমি মনে করছিলাম হয়তো যাওয়ার আগে তোর সঙ্গে আর দেখাই হবে না। একটু আগে মিস্টার হুকা-কাশি ফোন করেছিলেন, ঠিক ন'টার সময়ে হাওড়ার সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাল্পতল্পা নিয়ে আমায় হাজির থাকতে; আজকে রাত্রেই নাকি আমাদের বেনারস বেরিয়ে পড়া দরকার। দুপুরবেলা তোর সঙ্গে যে-এনগেজমেন্ট করেছিলেন তা রাখতে না পারায় মাফ চেয়েছেন। তাঁর বিশেষ দোষ নেই এতে, কেননা ওঁদের কাজের ধরনটাই এই রকম কিনা! যে-কাজে হাত দিয়েছেন দৈবাৎ হয়তো তার একটা সূত্র মিলে গেল; তখন আর সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড করে তক্ষুনি সেই সরু সুতোটুকু ধরে-ধরে এগোনো ছাড়া তাঁর উপায় থাকে না। এইরকমই একটা সূত্র মিলে যাওয়ায়—ওকী, তুই অমন করছিস কেন?'

বাস্তবিক সলিলের চোখ-মুখের অবস্থা যেন আর স্বাভাবিক ছিল না। পার্শী সওদাগরের কথায় ইতিমধ্যেই তার বুকের ভেতর তুফান উঠিয়াছিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়াই যখন শুনিল মিস্টার বাসু হুকা-কাশির সহিত একযোগে সোনার হরিণ উদ্ধার করিতে কাশী রওনা হইয়া যাইতেছেন তখন সাহসী বলিয়া সচরাচর পরিচিত সলিলও যেন একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল।

মিস্টার বাসু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'তোর কি কোনও অসুখ করেছে সলিল?'

'না।' তারপর একটু থামিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'তুমি এ-ব্যাপারের মধ্যে যেয়ো না মেজদা! এ দস্তুরমতো আগুন নিয়ে খেলা। পদে-পদে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।'

মিস্টার বাসু হাসিলেন, 'না রে, না, তুই নিশ্চিত থাক। এ ছ্যাঁচড়া গুণ্ডাদের সাধ্য কি আমার কোনওরকম ক্ষতি করে? শিকাগো-ফেরতা আমি সেটা ভুলে যাচ্ছিস? আর তা ছাড়া ভেবে দেখ, আমরা সব জলজ্যান্ত উপস্থিত থাকতে শুধু ধাপ্পাবাজির জোরে কেউ দাদার এত সাধের জিনিসটা বেমালুম হজম করে ফেলবে, একি সহ্য করা সম্ভব! অহিভূষণ চৌধুরী বাস্তবিকই নিজে থেকে দাদার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, না কি তার পেছনে দাঁড়িয়ে অন্য কোনও মাথাওয়ালা লোক কলের পুতুলের মতো তাকে চালিয়েছে, সে-সমস্ত খুঁটিনাটি একটি-একটি করে বার করে তবে আমি ছাড়ব। জানিস তো আমার গোঁ!'

সলিলের মুখে একঝলক রক্ত হঠাৎ আসিয়াই আবার যেন মিলাইয়া গেল। মিস্টার বাসু তার এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর স্পষ্ট লক্ষ করিলেন, গুণ্ডার কবলে পড়িবার তাঁর সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য ভাইয়ের একটা স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি শুধু তা-ই? তা হইলে বিশেষ করিয়া তাঁর শেষ কথাগুলি শুনিবার পরই সলিলের মুখে অমন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব ফুটিয়া উঠার মানে কী? যেমন করিয়াই হোক অহিভূষণ চৌধুরীর রহস্য তিনি ভেদ করিবেন—এ-কথা বলায় অমন ধারা আঁতকাইয়া ওঠার কী আছে? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বারকয়েক সলিলের পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিয়া লইলেন, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাইলেন। সলিল কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ।

'ডক্টর মৈত্র কাল বেলা তিনটের সময় আসবেন বলেছেন, না?' মিস্টার বাসুর দিকে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিস্টার বাসু সুটকেসে আবার হাত দিয়াছিলেন, জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সেইরকমই কথা আছে বটে, তবে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপারেশনটা বন্ধ রাখতে হবে—সন্তোষকে সব বুঝিয়ে বলে রেখেছি।'

BanglaBook.org

'বুঝিয়ে বলে রেখেছিস? তার মানে তুই কোথাও বাইরে বেরোচ্ছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, একবার কাশী যেতে হবে।'

'কাশী যেতে হবে কেন?'

অসুখে মানুষের মনের তেজ অনেকখানি নিভাইয়া আনে; তাঁর এই অসম্ভব রকমের তেজী দাদাটি যে বহুদিন রোগে-ভুগিয়া ভুগিয়া বর্তমানে খানিকটা 'ভেতো' স্বভাব পাইতে বসিয়াছেন, দেশের মাটিতে পা দিয়াই বোধকরি মিস্টার বাসু তাহা বুঝিয়াছিলেন। পাছে গুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা শুনিয়া তিনিও ভড়কাইয়া যান এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি কহিলেন, 'হুকা-কাশি সঙ্গে নিতে চাইছেন, আমি গেলে তাঁর নাকি কিছু উপকার হবে। ডক্টর মৈত্র বলেছেন, অপারেশনের খুব বেশি তাড়াতাড়ি নেই, কাজেই আমি ফিরে এলেও তা হতে পারবে। যাতে খুব বেশিদিন বাইরে থাকতে না হয় তারই চেষ্টা করা যাবে'খন।' শেষের কথাটুকু অবশ্য তিনি যোগ করিলেন দ্বারকানাথকে প্রবোধ দিবার জন্য।

হাওড়া স্টেশনে আসিয়া মিস্টার বাসু যখন পৌঁছিলেন ট্রেন ছাড়িবার তখন মাত্র মিনিট পনেরো দেরি আছে। ভিতরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি তিনি এধার হইতে ওধার পর্যন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা একবার ঘুরিয়া লইলেন, তারপর প্রত্যেকটি কামরার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া-মারিয়া দেখিতে লাগিলেন—নাঃ, মিস্টার হুকা-কাশি এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে 'বার্থ' যথারীতি রিজার্ভড হইয়াছে বটে।

যে-গাড়িখানায় 'বার্থ রিজার্ভ' হইয়াছিল তারই সামান্য একটু দূরে প্ল্যাটফর্মে আঁটা রেল-ওয়ের একটা বেঞ্চি দেখিতে পাইয়া মিস্টার বাসু সেইখানে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চিটা যে একেবারে খালি ছিল তা নয়, অপর প্রান্তে আর-একটি লোক বসিয়া ছিল; পরনে তার খাকি রঙের শর্টস এবং শার্ট, পায়ে স-পট্টি বুট, হাতে সুপুষ্ট লাঠি। সবচেয়ে প্রধান লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, সে তার মাথার ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে প্রায় ভ্রূর কাছাকাছি পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মিস্টার বাসু জানিতেন, এভাবে টুপি পরে সাধারণত কেবল তারাই, যারা কোনও কারণে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখিতে চায়। স্বভাবতই তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন; অস্বস্তির ভাব তাঁর ক্রমে বাড়িয়া গেল যখন তিনি স্পষ্ট টের পাইলেন যে, লোকটা টুপির আড়াল হইতে তাঁর পানে ঘন-ঘন চোরা কটাক্ষ হানিতেছে।

এদিকে গাড়ি ছাড়িবার সময়ও কাছাইয়া আসিল—ঢং-ঢং করিয়া পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িয়া গেল—অথচ হুকা-কাশির তখন পর্যন্ত দেখা নাই। মিস্টার বাসু এইবার দস্তুরমতো চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কী যে তাঁর কর্তব্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ দেখেন শার্ট-পরা সেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তারপর মিস্টার বাসুর একেবারে কাছে আসিয়া খাটোগলায় তাড়াতাড়ি সে বলিল, 'কোনও জবাব না দিয়ে সটান গাড়িতে উঠে পড়ুন গে'। গাড়ি মোশান দিলে তবে আমি চাপব। অন্যান্য কথা পরে হবে—আমি হুকা-কাশি।'

গাড়ি ছাড়িয়া দিলে পর মিস্টার বাসু বলিলেন, 'কৌতূহলে মারা যাচ্ছি মিস্টার হুকা-কাশি, আমায় শিগগির খুলে বলুন হঠাৎ আপনার এরকম ভোল বদলাবার মানে কী? আমি তো দূরের কথা, আপনার মা জীবিত থাকলে তিনি পর্যন্ত এ-বেশে আপনাকে চিনতে পারতেন কি না বিশেষ সন্দেহ।'

দুইজন সাহেব ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিল না, হুকা-কাশি তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, 'অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে এছাড়া আর কী উপায় আছে বলুন! যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি কৌশলের জালে ফেলে তাকে কাবু করে আনা সম্ভব, কিন্তু যে-শত্রু কেবল ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়াল থেকেই বাণ ছোঁড়ে তাকে বাগে আনতে হলে নিজেকেও মেঘের আড়ালে নিয়ে যাওয়া দরকার নয় কী?... আজকে সারাদিনে আমার ওপর ক'বার আক্রমণ হয়েছে

BanglaBook.org

জানেন? দু-দুবার।'

মিস্টার বাসু সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ। আক্রমণের উদ্দেশ্য অবশ্যি প্রাণে মারা নয়, যাতে আমি মাসখানেকের ভেতর কিছুতেই কলকাতা শহর ছেড়ে যেতে না পারি তারই ব্যবস্থা করা। তাদের চোখে খুব জোর ধুলোটা দেওয়া গেল, কী বলেন?'

'তা বটে, কিন্তু আপনার ওপর ওরা যদি খুব কড়া নজর রেখে থাকে তবে তো কালকেই টের পাবে যে-পাখি শিকলি কেটে উড়ে গেছে!'

'না, তা পাবে না।'

'পাবে না?'

'না। আমার বাড়ির সামনে উপস্থিত হলে তারা দেখতে পাবে অমৃত ওষুধের শিশি, তুলো-ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘন-ঘন ঘর-বার করছে, ডাক্তারের পোশাকে একজন দিনে দুবার করে আসছেন—মোটর থেকে নামবার এবং মোটরে ওঠবার সময় তাঁর স্টেথসকোপ আর ব্যাগটা যাতে কারও নজরই না এড়ায় সেরকম উপদেশও দেওয়া হয়েছে। সকালে-বিকেলে উদ্বিগ্ন মুখে দু-চারজন বন্ধুবান্ধবও খবরাখবর নিতে আসবে; এককথায়, পাড়াময় রটে যাবে, কাল রাত্তিরে হুকা-কাশির একটা সাংঘাতিক মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি এখন শয্যাশায়ী। অমৃত খুব হুঁশিয়ার আছে, সব ঠিকমতো ম্যানেজ করে নেবে।' বলিয়া হুকা-কাশি চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

মিস্টার বাসুও হাসিলেন। কহিলেন, 'রহস্য তবে খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে বলুন!'

'দারুণ। কিন্তু আর কথা নয়, এবার শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন। কালকে কত ঝড়-ঝাপটা সইতে হবে, ঘুমোবার সময়ই আদপে পাবেন কি না, কে জানে? কাজেই আজকে যেটা সহজলভ্য সেটাকে মাটি করবার কোনও মানে হয় না; শুয়ে পড়ুন।'

পরদিন বেনারস ক্যান্টনমেন্টে তাঁরা পৌঁছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন স্টেশনে একখানিও ট্যাক্সি ছিল না, অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া শেষে তাঁরা একটি টঙ্গা লইলেন। আপাতত ভেলুপুরার 'সুমিত্র নিকেতনে' তাঁরা উঠিবেন, কাজেই ভেলুপুরা যাইবার জন্যই টঙ্গাওয়ালাকে আদেশ দেওয়া হইল। গাড়ি মাত্র বিশ-পঁচিশ গজ গিয়াছে এমন সময় হাত তুলিয়া একটা লোক গাড়োয়ানকে থামিবার ইঙ্গিত করিল। গাড়োয়ান থামিলে তার সহিত লোকটার গুটিকয়েক কথা হইল; তারপরেই হুকা-কাশি দেখেন, টঙ্গার সামনে চালকের পাশে যে খালি আসনটুকু আছে লোকটা সেইখানে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। হুকা-কাশি টঙ্গাওয়ালাকে ধমকাইয়া উঠিলেন, গোটা গাড়ি তাঁরা ভাড়া লইয়াছেন, কেন সে 'জিয়াদা সোয়ারী' লইতেছে।

জবাবে সে হিন্দিতে কহিল, 'হুজুর, এ-লোকটা শিবালা যাবে, শেয়ারে গেলে ভাড়া অনেক কম পড়বে তাই উঠতে চায়; আর আমিও গরীব লোক, দুটো পয়সা যদি বেশি পাই... আপনাদের তো ''তকলিফ'' কিছু নেই!'

'তকলিফ-টকলিফ বুঝি না বাপু, শিগগির নামিয়ে দাও, ওসব চলবে না।'

খানিকক্ষণ বাদে ভেলুপুরা রোডে গাড়ি মোড় ফিরিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ যেন বিদ্যুতের খোঁচা খাইয়া হুকা-কাশি সজাগ হইয়া উঠিলেন। ব্যস্তবিক, বিস্ময়ের যেন তাঁর আর অবধি রহিল না। শিবালা যাইবে বলিয়া যে-লোকটা একটু আগেই টঙ্গায় উঠিতে চাহিয়াছিল, শিবালায় সে মোটেই যায় নাই, ভেলুপুরাতেই একটা গলির মোড়ে চোখ-কান সজাগ করিয়া ঠিক যেন ওত পাতিয়া আছে; তার পাশেই একটা বাইসিকেল। হুকা-কাশির সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই নিমেষের মধ্যে কোথায় যে সে মিলাইয়া গেল তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না।

ব্যাপারটা মিস্টার বাসুও লক্ষ করিয়াছিলেন, হুকা-কাশির গায়ে একটু মৃদু ঠেলা দিয়া তিনি

BanglaBook.org

বলিলেন, 'একটা জিনিস দেখতে পেলেন কি?'

হুকা-কাশি চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে শুধু বলিলেন, 'হুঁ।' হাজারো রকমের চিন্তা তখন তাঁর মনের কোণে উঁকি দিতেছিল। তাঁর সমস্ত চাতুরি, সমস্ত কৌশলই কি তবে ব্যর্থ হইয়া গেল? তা যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে লোকগুলি সর্বজ্ঞ, নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ।

'সুমিত্র নিকেতন' একটা বাঙালি-পরিচালিত বোর্ডিং-হাউস; সেখানে পৌঁছিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুজনে স্নানাহার সারিয়া লইলেন, তার পরেই হুকা-কাশি বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। মিস্টার বাসু প্রশ্ন করিলেন, 'এখন কোথায় যেতে হবে?'

'পাঁড়ের হাউলি।'

'কেন, সেখানে কী?'

'একটু বাদেই বুঝতে পারবেন।'

পাঁড়ের হাউলি অঞ্চলে পৌঁছিয়া নির্দিষ্ট-নম্বরের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হুকা-কাশি ঘন-ঘন কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর হইতে প্রশ্ন আসিল, 'কে?'

'একবার নিচে আসবেন?'

'কাকে চাই আপনার, বলুন না!'

'রণজিৎবাবু বাড়ি আছেন?'

মনে হইল একসঙ্গে তিন-চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে-লাফাইতে কে যেন নিচে নামিয়া আসিতেছে। একটু পরেই কুড়ি-বাইশ বছরের এক ছোকরা দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?' ঠিক সেই সময়ে এক বৃদ্ধা মহিলা গঙ্গাস্নান সারিয়া এই বাড়িরই দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রণজিৎবাবুকে ডেকে দিন, তিনি সমস্তই বুঝবেন।'

ছেলেটি সন্দিগ্ধভাবে একবার তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া শেষে কহিল, 'আপনি কি কোনও খবরই তবে জানেন না?... কাল বিকেল থেকে তাঁর কোনওই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী তিনি বেঁচে আছেন কি না—।'

ছেলেটির কথা শেষ হইতে পারিল না, উপস্থিত বৃদ্ধাটি একেবারে মড়াকান্না তুলিয়া দিলেন, 'ওরে রণজিৎরে, তুই কোথা গেলি রে! দিদিকে আমি কী বলব রে! কাল তুই কচুরি খেতে চাইলি, ঘরে ময়দা ছিল না রে! ওরে আমি হতভাগী কেন দোকানে ময়দা আনতে পাঠালুম না রে...!'

হুকা-কাশি রুমাল দিয়া ঘন-ঘন কপাল মুছিতে লাগিলেন, মিস্টার বাসু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ষোলো : বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

রণজিতের চিঠি পাইয়া পরদিনই হুকা-কাশি জবাব দিয়াছিলেন টেলিগ্রামে; তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে গোধূলিয়ার হোটেল তার পক্ষে আর আদৌ নিরাপদ হইবে না; পাঁড়ের হাউলিতে তার মাসিমার যে-বাড়ি আছে, পত্রপাঠমাত্র সেখানে চলিয়া যাইতে সে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে। যত শীঘ্র সম্ভব—দু-এক দিনের মধ্যেই—তিনি স্বয়ং কাশী রওনা হইয়া আসিতেছেন; তিনি আসিয়া না পৌঁছানো পর্যন্ত সোনার হরিণের ব্যাপারে সে যেন আর এতটুকুও অগ্রসর না হয়। রণজিৎ স্থান-পরিবর্তন করিয়া কোথায় যাইতেছে সে-কথা সে যে বাহিরে প্রকাশ করিবে না হুকা-কাশি তা জানিতেন। এইজন্যই 'সুমিত্র-নিকেতনে' উঠিবার পরই সর্বপ্রথম হুকা-কাশি পাঁড়ের হাউলিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ক্ষমতা এই দস্যুদলের। সকালে টেলিগ্রাম করিয়া রাত্রির গাড়িতেই তিনি রওনা হইয়া

BanglaBook.org

আসিয়াছেন, অথচ এই অতি অল্প সময়টুকুর মধ্যে তারা যে শুধু রণজিতের নূতন ঠিকানাই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে তা-ই নয়, কৌশলে তাকে নিজেদের খপ্পরে আনিয়া পর্যন্ত ফেলিয়াছে। রণজিৎ এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া পড়া হুকা-কাশির একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তবুও এই শেষের কথাটুকু ভাবিতে গিয়া তাঁর অন্তরটা যে একবারও কাঁপিয়া উঠিল না, এ-কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। মাথা নিচু করিয়া নির্বাকভাবে তিনি মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অবশ্য বেনারস পর্যন্ত দস্যুদলের পিছু ধাওয়া করিয়া আসিতে রণজিৎকে একবারও তিনি বলেন নাই, সূরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িখানার উপর একটু নজর রাখিতে বলিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তবুও বাস্তবিকই যদি এমন একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াই থাকে তবে নিজে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব এড়াইবেন কীভাবে?

'আপনি সুমিত্র-নিকেতনে ফিরে যান মিস্টার বাসু; আমার মানসিক অবস্থা বোধহয় কতকটা বুঝতে পারছেন, ফিরতে আমার কিছু দেরি হবে। তবে একটা কথা, আমি বোর্ডিং-এ ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে কোথাও বার হবেন না যেন! আর যাবেন খুব সাবধানে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে।' মিস্টার বাসুকে উদ্দেশ করিয়া হুকা-কাশি কহিলেন।

মিস্টার বাসু বিদায় লইলে হুকা-কাশি ধরিলেন সোজা গোধূলিয়ার রাস্তা। প্রসিদ্ধ মোড়টার কাছে আসিয়া সামান্য একটু জিজ্ঞাসাবাদের পরেই রণজিৎ বর্ণিত সেই হোটেলটির সন্ধান মিলিয়া গেল। হুকা-কাশি অফিসে ঢুকিলেন।

হোটেলের ম্যানেজার তখন টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া পরম আনন্দে একবাটি চায়ের রসাস্বাদন করিতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া এবং পোশাকপত্রে তাঁকে একটু সম্ভ্রান্তশ্রেণীরই ভদ্রলোক মনে করিয়া তাড়াতাড়ি পদযুগল নামাইয়া লইলেন; তারপর সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী চাই আপনার, বলুন!'

হুকা-কাশি ইহারই মধ্যে অপাঙ্গে সমস্ত ঘরটা দেখিয়া লইয়াছিলেন, ধারে-পাশে কোনও লোক আছে কি না সেদিকেও লক্ষ রাখিয়াছিলেন। কহিলেন, 'আমি রণজিৎবাবুর খোঁজে এসেছি।'

'তিনি তো এখানে নেই! উঠেছিলেন বটে আমাদেরই হোটেলে, কিন্তু কাল বেলা এগারোটার সময় সমস্ত পাওনা-পত্তর চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা কিছু বলে যাননি।'

'কিন্তু কাল তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না, সে-কথা জানেন কি?'

'সে কী কথা মশাই! জোয়ান-মরদ ব্যাটাছেলে কাশীর রাস্তা থেকে উবে গেল?' ম্যানেজারের চক্ষু গোলাকৃতি হইয়া উঠিল।

'দেখুন, আপনি রণজিৎবাবুর খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তা আমি জানি; তাই গুটিকয়েক প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আশাকরি তা'তে আপনি মনে কিছু করবেন না, অথবা বিরক্ত হবেন না!'

'না না, তা কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'রণজিৎবাবু যেদিন প্রথম কাশী এসে পৌঁছান, আমি খবর পেয়েছি সেদিনই তিনি সন্ধ্যার সময় নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কখন তিনি ফিরে এলেন এবং কী অবস্থাতেই বা ফিরে এলেন?'

'তা ফিরতে রাত হয়েছিল বেশ! যখন ফিরে এলেন, কাপড়-চোপড়, গা-মাথা—সমস্ত শরীরই দেখলাম তাঁর ভিজে। জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলেন, গঙ্গাঁয়ের কাছে বসে হাত ধুচ্ছিলেন, হঠাৎ নৌকো দুলে ওঠায় তাল সামলাতে না পেরে জলের ভেতর পড়ে গেছলেন।'

'আচ্ছা, আর-একটা কথা। সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কে?'

'সেটা বলেছিলাম আমিই; উনি যখন হোটেলে এসে পৌঁছুলেন, গা-হাত-পা তখন যেন ওঁর

BanglaBook.org

এলিয়ে পড়ছে। রাত্তিরে বোধহয় ট্রেনে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল, ঘুমোনো তো দূরের কথা বসবারও জায়গা বোধহয় পাননি। তাই আমি বললাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, সন্ধ্যার সময় বরং দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় একটু বেড়িয়ে আসবেন।'

'হুঁঃ। তারপর তিনি খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার পর বাইরের এই অফিসঘরে আর-একজন অতিথির আবির্ভাব হল এবং কোনওরকমে সে এই খবরটি সংগ্রহ করলে যে, সন্ধ্যার সময় নৌকো ভাড়ার উদ্দেশ্যে রণজিৎবাবু দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হবেন! কেমন, ঠিক বলিনি?'

'আপনি দেখছি সব ঘটনাই তবে জানেন! বাস্তবিকই তা-ই। আমায় একবার জানতে হবে, কাশীর গাড়িগুলোতে সেদিন এমন কী কাণ্ড ঘটেছিল যাতে সব ক'টি যাত্রীই অমন হেদিয়ে পড়ল। রাত জেগে যাওয়া-আসা আমরাও তো হরদম করছি, কিন্তু কই, এমনধারা তো হয় না! রণজিৎবাবু তো তবু পদে ছিলেন, এ-নতুন লোকটির মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না! তাকেও ওই একই পরামর্শ দিলাম—আপাতত খেয়ে-দেয়ে ঘুম। তারপর সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে খানিকটা বেড়ানো। কথাটাতে জোর দেওয়ার জন্য আরও জানিয়ে দিলাম যে, খানিক আগে কলকাতা থেকে আমার এক পরিচিত বন্ধু এসেছেন, সন্ধ্যার সময় তিনিও ওই উদ্দেশ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন। ইচ্ছে হলে তাঁর সঙ্গে একত্রও যেতে পারেন।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আপনার হোটেলে ভর্তি হল না, আপনার রেট বড় বেশি—এই ছুতো ধরে চলে গেল; নয় কী?'

'সে-খবরও আপনার কানে উঠেছে? কিন্তু রেট আমার সত্যিই বেশি নয়। দু-বেলা চা-জলখাবার আছে, রাত্রে লুচি দিচ্ছি; তা ছাড়া যে-মাগ্যির বাজার—চাকর-বাকরের মাইনে আছে, বাড়ি ভাড়া...।'

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ক্রন্দনে একেবারেই কান দিলেন না, নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, 'লোকটির চেহারা বেশ সুন্দর, যাকে বলে সুপুরুষ, কেমন?'

'তা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে।'

'মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া?'

'সবই যখন জানেন তখন অনর্থক কেন আর প্রশ্ন করছেন?'

হুকা-কাশি এ-কথা বলিলেন না যে, এতক্ষণ যে-কথাগুলি তিনি বলিয়া গেলেন তার কিছুই প্রায় তাঁর জানা ছিল না, সমস্তই একটির পর একটি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাহির করিতে হইয়াছে। এহেন সরল প্রকৃতির ভালোমানুষের কাছে সবকথা খুলিয়া বলিতে নাই; সোনার হরিণ উদ্ধারের মতো জটিল ব্যাপারে তা হইলে নানাপ্রকারের বাধা জন্মিতে পারে। তাই আগের কথাটারই জের টানিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'গায়ের রংটা ফুটফুটে ফর্সা, নয় কি?'

'হুঁ।'

'নাকের ডগাটি টিকলো, আর ডান ভ্রূর ওপরে মস্ত একটা তিলের মতন কী রয়েছে; লক্ষ করেছেন তা?'

'যতদূর মনে পড়ে আছে বলেই তো আমার ধারণা। তবে জীবনে একবারটি কয়েক মিনিটের জন্য দেখা বই তো নয়, ভুল হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, সে তো বটেই, তাকে আর দেখবেন কোত্থেকে! সে তো আর কাশীর লোক নয়। আচ্ছা, তাহলে উঠি আজ, খানিকটা বিরক্ত করে গেলাম, মনে কিছু করবেন না। দরকার পড়লে হয়তো আবারও আসতে হতে পারে।' বলিয়া হুকা-কাশি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক পা আগাইয়া হঠাৎ কী মনে করিয়া আবার তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিলেন, 'এখানে বায়স্কোপ মোট ক'টা আছে বলতে পারেন? সামনেই তো দেখছি একটা। নতুন একখানা বই আজ থেকে দেখানো হবে—বাজনা বাজিয়ে তাই শহরময় জানিয়ে দিচ্ছে—আপনার এখানে আসবার সময় পথে দেখে এলাম।'

BanglaBook.org

'কী জানি মশাই, বায়োস্কোপ-মায়োস্কোপের ধার ধারিনে। যে-মাগ্যির বাজার, ছাপোষা লোক আমরা, কোনওমতে খেয়েপরে দিন কাটাতে পারলেই বেঁচে যাই, তা আবার বায়োস্কোপ।'

মুখে কোনওরূপ ভাবপ্রকাশ না করিলেও মনে-মনে এ-জবাবে হুকা-কাশি খুশিই হইলেন। ছোট্ট একটু নমস্কার করিয়া তিনি ম্যানেজারের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন একটা বাড়ির ফটকের সম্মুখে। ফটকটি সেই সিনেমা-হলের; যেটির কথা একটু আগেই ম্যানেজারকে তিনি বলিতেছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র রণজিৎ আজ দু-দিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ, বাঁচিয়া আছে কি না তা পর্যন্ত জানা নাই, অথচ হুকা-কাশি করিতেছেন সিনেমায় ঢুকিবার উপক্রম! পাঠক-পাঠিকারা বিস্মিত হইতেছেন বিশেষ সন্দেহ নাই। হুকা-কাশির চরিত্র বাস্তবিকই বড় দুর্জ্ঞেয়—সংস্কৃত ভাষায় বলিতে গেলে 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?'

ফটক পার হইয়া কয়েক পা যাইতেই কিন্তু তিনি একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন—এতটা তিনি আশা করেন নাই, সত্যই করেন নাই। যে-কদাকার গুণ্ডা প্রকৃতির লোকটাকে ফটোতে দেখিতে পাইয়া রণজিৎ এতখানি কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে, সিনেমা-চত্বরের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই লোকটাই অপর একজনের সহিত নিভৃত আলাপ করিতেছে। আর এই দ্বিতীয় লোকটিও হুকা-কাশির একেবারে অপরিচিত নয়, পূর্বে ইহাকেও তিনি দেখিয়াছেন। দুজনে কথাবার্তায় এমনই নিমগ্ন যে-কোনও কিছুরই হুঁশ নাই।

অপরে আমাকে দেখিতে পাইবে না, অথচ আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তার সমস্ত কথাবার্তাই শুনিয়া লইব এভাবে দাঁড়াইতে পারা যে একটা উঁচুদরের 'আর্ট', তা অস্বীকার করি না; কিন্তু হুকা-কাশিও তো 'আর্টিস্ট' বড় কম নন! কাজেই তিনি শুনিতে পাইলেন দুজনার কথাবার্তা হইতেছে এই ধরনের—দ্বিতীয় লোকটা বলিল, 'কাল স্টেশনে গাড়ি থেকে ওকে নামতে দেখে আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ও যে কাশী এসে পৌঁছোতে পারবে এ আমি ভাবতেও পারিনি।'

'আরে আনে দেও! ও যদি হয় বুনো ওল তবে আমরাও বাঘা তেঁতুল, সেটি ভুলো না।'

'আচ্ছা রামদয়াল, সঙ্গের ওই অন্য লোকটা কে? ওকে তো কখনও দেখিনি আর! ওটা এসে আবার কে জুটল? চেহারাটাও ভালো করে চিনে রাখা হয়নি। হুকা-কাশির...।'

'আরে হতে দাও যে খুশি সে। কল পেতে এসেছি; যেই হোন কলে ধরা পড়বেনই।'

'যাক, সকালেই তা হলে তুমি আসছ?'

'উঁহু, সকালে হয়ে উঠবে না। এক পুরানো যাত্রী এসেছে, তাকে একবার বাবার মন্দিরটা দেখাতে হবে।'

নিভৃত আলাপে মন্দা পড়িয়াছে লক্ষ করিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না, গুটিগুটি ফটক পার হইয়া প্রথমে রাস্তায় এবং পরে একেবারে ভেলুপুরার হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখেন মিস্টার বাসু একমনে চিঠি লিখিতেছেন।

'কোথায় চিঠি লিখছেন, বাড়িতে?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'হ্যাঁ,' বলিয়া মিস্টার বাসু চিঠিখানি হুকা-কাশির হাতে বাড়াইয়া দিলেন।

হুকা-কাশি চিঠিখানার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়াই সেখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মুখে বলিলেন, 'খুব সাবধানী তো দেখছি আপনি। পোস্টকার্ডে চিঠি লিখছেন! ফিরে লিখুন খামে, আর বাড়ির লোকদের জানিয়ে দিন, দু-দিন অন্তর আপনার কুশল-সমাচার তাঁরা পাবেন, কিন্তু আপনাকে যেন কেউ চিঠি না লেখেন। এখানকার ঠিকানা তাঁদের দিয়ে কাজ নেই। আমার সঙ্গে আবার আপনি কে এসে জুটলেন, এই তথ্যটি বার করবার জন্য শত্রুপক্ষে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গেছে সে-খবর রাখেন? তারা নাকি কী কল পেতেছে!'

সতেরো ঃ মানুষ-কল না জাঁতি-কল?

হুকা-কাশির কথামতো মিস্টার বাসু আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিলেন; তারপর সেখানা খামে ভরিতে-ভরিতে বলিলেন, 'চিঠি পোস্ট বোধহয় আমাদের নিজের হাতেই করা উচিত হবে! কী বলেন?'

'নিশ্চয়, সে-বিষয়ে কি আর মতদ্বৈধ আছে? কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই; একটু কষ্ট করে দরজাটা একবারটি ঠেলে দেবেন কি?'

মিস্টার বাসু পা বাড়াইয়া দরজার পাল্লাটা জোরে ঠেলিয়া দিলেন, খট করিয়া কপাট বন্ধ হইয়া গেল। এ-হোটেলের সমস্ত দরজাই প্রায় সাহেববাড়ির অনুকরণে তৈরি; একখানা করিয়া প্রকাণ্ড পাল্লা—মোটরগাড়ির দরজার মতো জোরে ঠেলিয়া দিলেই সেখানা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আবার হাতল ঘুরাইয়া খুলিতে হয়। ল্যাচ কী-র বন্দোবস্ত আছে—ভিতর বাহির দু-দিক হইতেই চাবি ঘুরাইয়া কপাট বন্ধ করা চলে।

ঘরের চারিদিক বেশ নিরাপদ হইয়াছে দেখিয়া এইবার হুকা-কাশি তাঁর সুটকেশ খুলিয়া চৌকামতো একখানা কার্ডবোর্ড বাহির করিলেন, তারপর সেখানা মিস্টার বাসুর হাতে দিয়া কহিলেন, 'বেশ করে এটা একবার দেখুন দেখি!'

মিস্টার বাসু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানানভাবে সেটিকে দেখিয়া নিয়া কহিলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে এটা তো দেখছি একখানা ফটো! অদৃশ্য আর কিছু লুকোনো আছে নাকি এতে? সামনে একটা বড় লোককে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার আশপাশে বড়-বড় মুখ-বাঁধা বস্তার মতো ওগুলো কী?'

'ওগুলো লক্ষ করবার কোনও দরকার নেই আপনার, যেটা দেখতে পাচ্ছেন বলে বলছেন, সেইটের দিকেই আরও ভালো করে নজর দিন, কেননা...।'

হুকা-কাশির সবগুলি কথা মিস্টার বাসুর কানে বোধহয় ঢুকিল না—দেখিতে-দেখিতে তাঁর চোখের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'মিস্টার হুকা-কাশি, এ-লোকটি যে আমার একেবারে অচেনা, তা তো নয়, একে তো আমি দেখেছি—আজই—এই বেনারস শহরেই।'

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, 'তাতে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই মিস্টার বাসু। যে সব মহাবীরের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-ঘোষণা করেছি ইনি তাঁদেরই একজন। ওদের পরিচয় পেতে আমাদের যেমন আগ্রহ, আমাদের খবরাখবর পেতেও ওদের যে তার চাইতে কিছুমাত্র কম আগ্রহ নেই, তা তো এরই মধ্যে টের পেয়েছেন! তা, কোথায় দর্শন মিলল এ-পুণ্যাত্মাটির?'

'এই বাড়িরই সামনেকার রাস্তায়। রণজিৎবাবুর দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আপনি তো আমার হোটেলে ফেরবার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লেন! আমি ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলাম, কিন্তু মনে অশান্তি, বিছানা ভালো লাগল না; পায়চারি করবার উদ্দেশ্যে বারান্দায় উঠে গেলাম। খানিক বাদেই দেখি, এই মহাপ্রভু হোটেলের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছেন। ভেতরে ঢোকবার ইচ্ছা পুরোমাত্রায়, অথচ ভরসা পেয়ে উঠছেন না। আঃ, তখনই গিয়ে যদি ধরতাম ব্যাটার টুঁটি চেপে! কী ভুলই না হয়ে গেছে!'

'দোহাই মিস্টার বাসু, ও-কাজটি কখনও করবেন না, কক্ষনও নয়। রণজিৎবাবুর বেঁচে থাকবার আশা যদি বা কিছু থেকে থাকে এরপর তা হলে আর তাঁকে কোনওরকমেই ফিরে পাব না। আর তা ছাড়া আপনার দাদার সোনার হরিণ উদ্ধারের আশাও একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হবে। সেটাকে হজম করতে যদি এরা নাও পারে, গঙ্গার জলে যে ফেলে দেবে সে-কথা নিশ্চিত জানবেন। আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন কী প্রমাণ আছে আপনার এদের বিরুদ্ধে বলুন দেখি!'

মিস্টার বাসু কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ চোখ টিপিয়া তাঁকে থামিতে বলিয়াই হুকা-কাশি উচ্চস্বরে হাঁকিলেন, 'কে?'

হুকা-কাশি এতক্ষণ কথা বলিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু চোখ দুইটি তাঁর সারাক্ষণই পড়িয়া

BanglaBook.org

ছিল দরজার গায়ে চাবি গলাইবার ছোট্ট ফোকরটির উপর। সেই ফাঁক দিয়া এতক্ষণ বাহিরের আলো দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ সে-আলো ঘুচিয়া গেল, পরিবর্তে দেখা দিল অন্ধকার। স্পষ্টই বোঝা গেল, বাহিরের কোনও লোক রন্ধ্রপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা পাইতেছে। অবশ্য, ইচ্ছা করিলে সে-পথে চাবি লাগাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখার একমাত্র পথটুকু আগে হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই হুকা-কাশি এ-চাতুরীটুকু খেলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই রন্ধ্রপথে কোনও লোক উঁকি দিতে আসে কি না সেইটিই পরীক্ষা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকার চলিয়া গেল, দেখা দিল আবার আলোর রেখা। দু-তিনমিনিট কাল চারিদিক নিস্তব্ধ, তারপরেই দরজায় ধীরে-ধীরে কয়েকটি ঘা পড়িল। হুকা-কাশি উঠিয়া গিয়া আস্তে-আস্তে দরজাটা খুলিয়া দিয়াই একেবারে অবাক হইয়া গেলেন—হোটেলের যে-চাকরটার উপর তাঁদের খবরদারি করার ভার পড়িয়াছিল, ঘরে সে-ই ঢুকিতেছে—তার হাতে একটা জাঁতি-কল। মিস্টার বাসু কিছুই টের পাইলেন না, কিন্তু হুকা-কাশির অভ্যস্ত চক্ষু আরও লক্ষ করিল, কোনও একটা অপকর্ম করিতে আসিয়া হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেলে লোকের মুখে যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়া ওঠে, চাকরটার মুখে তার স্পষ্ট আভাসই রহিয়াছে।

হুকা-কাশি বাহিরে কিন্তু কোনওই বিরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন না বরং সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—অবশ্য হিন্দিতে—'কী চাই হে? জাঁতিকলে কী হবে?'

চাকর হিন্দুস্থানী ভাষায় উত্তর দিল, 'হুজুর, এ-ঘরটায় বড় ইঁদুরের উৎপাত, তাই এ-কলটা পেতে রাখতে এসেছি; নইলে আপনাদের জিনিসপত্র সব কেটেকুটে একাকার করে দেবে।'

'ও, ম্যানেজারবাবু বুঝি তাই কল পেতে রাখতে বলে দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না, তিনি নতুন করে কিছুই বলেননি। এ-ঘরে যখনই কোনও যাত্রী আসে তখনই আমরা ইঁদুর-মারা কল পেতে রেখে যাই। বরাবরই এরকম ধারা চলে আসছে।'

'আচ্ছা, পেতে রাখো, কল কোথায় পাতবে।'

চাকর কল পাতিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হুকা-কাশি একটু হাসিয়া মিস্টার বাসুকে বলিলেন, 'কেমন, একটু আগেই বলছিলাম না যে আমার সঙ্গে আপনি কে এলেন সে-খবর বার করবার জন্য ওরা কী একটা কল পাতবার কথা বলাবলি করছিল! দেখলেন তো সে কলের নমুনা?'

'কী, এ জাঁতি-কলটির কথা বলছেন? এরই সাহায্যে আমার নাম-ধাম, গোত্র-বৃত্তান্ত সব জেনে ফেলবে? বেজায় সায়েন্টিফিক শত্রু বলুন!' মিস্টার বাসু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'রসুন, জাঁতি-কল কি মানুষ-কল, আসল কল কোনটা তা জানতে এখনও বাকি আছে। উঠে পড়ি, চায়ের অপেক্ষায় বসে থাকলে আর চলবে না, এক্ষুনি একবার বেরিয়ে পড়তে হবে। বাস্তবিক, রণজিৎবাবুর একটা খোঁজ না মেলা পর্যন্ত কোনও কাজেই যেন আর মন বসতে চাইছে না!'

আঠারো ঃ পুনশ্চ

হোটেলে ফিরিয়া আসিতে হুকা-কাশির বেশ কিছু রাত হইল। শরীর এবং মন কোনওটার অবস্থাই তখন তাঁর বিশেষ সুবিধার নয়। রণজিতের সন্ধানে বাহির হইয়া এক নূতন সন্দেহের আভাস তিনি পাইয়া আসিয়াছেন, সেইকথাই নানানভাবে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছে। তা ছাড়া দেহে শ্রান্তিরও সীমা নাই। রাত্রে যৎসামান্য কিছু খাইয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন, ঘুম ভাঙিল পরদিন বেলা আটটায়। মুখ হাত ধুইয়া এককাপ চা খাওয়ার পরও শরীর বেশ সুস্থ হইল না, ইজিচেয়ারের উপর চুপচাপ তিনি পড়িয়া রহিলেন।

BanglaBook.org

দুপুরে আঁচাইয়া উঠিয়া একটা চুরুট ধরাইতে-ধরাইতে বাসু বলিলেন, 'আপনার হল কী মিস্টার হুকা-কাশি, সেই সকাল থেকে পড়ে-পড়ে খালি ঝিমুচ্ছেন; নাইলেন না, ভাতও খেলেন না, ব্যাপার কী? জ্বর-টর হয়নি তো?'

হুকা-কাশি ঘরের কোণ হইতে জাঁতি-কলটি আনিয়া নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেটি দেখিতেছিলেন। জবাব দিলেন, 'না, বিকেলবেলার দিকেই সুস্থ হয়ে উঠব আশাকরি। কলটায় কোনও জাদুমন্ত্র পড়া আছে নাকি ভাবছি।'

মিস্টার বাসু চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে 'দেখি' বলিয়া জাঁতি-কলটা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই এক বিষম বিপত্তি ঘটিয়া গেল; কলের মধ্যে যেখানে খাবার রাখিয়া ইঁদুরকে প্রলুব্ধ করা হয়, আলগোছে সেখানে যেই তিনি একটুখানি আঙুল ঠেকাইয়াছেন, অমনি দু-ধার হইতে জাঁতি-কলের দুইটি ধার আসিয়া তাঁর হাতখানা অসম্ভব জোরে চাপিয়া ধরিল।

'উঃ হুঃ হুঃ' বলিয়া মিস্টার বাসু যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন; দরদর করিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। হুকা-কাশি লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জাঁতি-কলের দুই ধার দু-হাতে ফাঁক করিয়া ধরিলেন, মিস্টার বাসু হাত উঠাইয়া আনিলেন।

পকেট হইতে পরিষ্কার রুমাল বাহির করিয়া বাসুর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধিতে-বাঁধিতে হুকা-কাশি বলিলেন, 'কী ভীষণ অবস্থাতে কলটা রয়েছে দেখেছেন, হাত ছোঁয়াতে-না-ছোঁয়াতে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার! রাত্রে বেশ যন্ত্রণা হবে। তা ছাড়া হোটেলের কল, কত ইঁদুর মারা পড়েছে কে জানে? তাদের রক্তও সব সময়ে ঠিকমতো ধোয়া হয়েছে কি না তাই বা কে বলবে? এ-অবস্থায় কোনও ডিসপেন্সারিতেই একবার যাওয়া উচিত মনে করছি; চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

ডিসপেন্সারি হইতে ফিরিবার সময় সারাটি পথই হুকা-কাশিকে বিশেষ চিন্তামগ্ন বলিয়া মনে হইল। বেলা একেবারে পড়িয়া আসিতেছিল, হোটেলে ফিরিয়াই তিনি বলিলেন, 'সন্তোষবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দেব মনে করছি সলিলবাবুর সম্বন্ধে।'

'কেন, সলিলের কী হয়েছে? তার সম্বন্ধে সন্তোষের কাছে চিঠি কেন?' মিস্টার বাসু সাশ্চার্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

'আমার কেমন মনে হচ্ছে—হয়তো সলিলবাবু হঠাৎ একদিন সশরীরেই এখানে এসে উপস্থিত হয়ে পড়বেন। তাই সন্তোষকে লিখে দেওয়া—পাঁচ-সাতদিন আমাদের কোনও খবরাখবর না পেলেও ওখানে কেউ যেন ব্যস্ত না হয়ে ওঠেন। বেশ, আমি না লিখলাম, আপনার জবানীতেই চিঠি লিখে দেওয়া যাক, অর্থাৎ আমি লিখে দিই, আপনি সই করে দেবেন'খন।'

শেষের এই প্রস্তাবটি কিন্তু মোটেই কার্যকারী হইল না, কেননা মিস্টার বাসু বাঁ-হাতে নাম লিখিতে গিয়া এমনই চমৎকার লিখিলেন যে হুকা-কাশি হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে-ফেলিতে কহিলেন, 'ও-চিঠি না পাঠানোই ভালো; বাড়িতে সবাই ভাববে আপনার হাতখানা এবার বারুদ দিয়েই উড়িয়ে দিয়েছে। তার চাইতে আমিই লিখি।'

হুকা-কাশি আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠির শেষে কেবলমাত্র সন্তোষেরই উদ্দেশে একটা নিতান্ত গোপনীয় 'পুনশ্চ' রহিল। এই 'পুনশ্চ'টুকু এতই গোপনীয় যে, মিস্টার বাসুর কাছেও সেটুকু প্রকাশ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। চিঠিখানা খামে মুড়িয়া কহিলেন, 'আমি যাই, এখানা নিজে হাতে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসি গে। আপনি ইচ্ছে করলে একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারেন, কিন্তু সর্বদা মূল কথাটি মনে রাখবেন—গলিঘুঁজি এড়িয়ে সর্বদা বড়রাস্তায় চলতে হবে, এটি ভুলবেন না। ছ্যাঁচড়া গুণ্ডা বলে এদের অবজ্ঞা করবেন না একেবারেই। মাথাওয়ালা লোক যে এদের চালাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আর বাইরে না বেরিয়ে যদি পারেন সে তো ভালোই; ম্যানেজারবাবু সময় কাটাবার জন্য কতগুলো বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওই শেলফের ওপর সেগুলো আমি তুলে রেখেছি—ইচ্ছে করলে ওগুলো ওল্টাতে পারেন। কিন্তু—' হুকা-কাশি গলার স্বর খাটো করিয়া আনিলেন, 'জাঁতি-কলবাহী চাকর নাথনি সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার।'

হুকা-কাশি ফিরিলেন খুবই তাড়াতাড়ি। ঘরের কবাট বন্ধ ছিল। নাথনি-প্রভুর আবির্ভাব হয় নাই তো! চাবি গলাইবার ফোকরে তিনি চোখ লাগাইলেন—তা নয়, মিস্টার বাসু একাই ঘরে রহিয়াছেন। একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি দরজায় ঘা দিলেন, মুখে বলিলেন, 'দোর খুলুন মিস্টার বাসু, আমি হুকা-কাশি। খুব জরুরি একটা খবর আছে।'

ঘরে ঢুকিয়াই হুকা-কাশি অতিমাত্রায় ব্যস্ততার সহিত বাসুকে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এক্ষুনি একবার বার হতে পারবেন মিস্টার বাসু, এই মুহূর্তেই, কাপড়-জামা যেমন পরা আছে সেই অবস্থাতেই?'

'নিশ্চয়ই, কেন পারব না?'

'তবে চলে আসুন'—বলিয়া বাসুর হাত ধরিয়া তিনি একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া খুব আস্তে-আস্তে বলিলেন, 'দুজনার একসঙ্গে বার হওয়া চলবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানদিকে যে তৃতীয় ল্যাম্পপোস্টটা পড়বে তারই তলায় আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন গে; মিনিট পাঁচেকের ভেতরই কোনও ছুতোয় আমি বেরিয়ে আসছি।'

মিস্টার বাসু সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন; হুকা-কাশি দরজা বন্ধ করিয়া মিনিট দুই কাল চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর নিচে নামিয়া এমন একটা ভাব দেখাইলেন যাতে হোটেলের সকলে মনে করিতে পারে, বুঝি তিনি বাড়ির বাহির হইয়া গেছেন। আসলে কিন্তু তখনই তিনি বাড়ির বাহির না হইয়া সিঁড়ির পিছনে জুতাজোড়া খুলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

কিন্তু উপরে আসিয়া কী দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁদের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা, ভিতরে পুরামাত্রায় অন্ধকার, তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া চাকর নাথনি বইয়ের শেলফের ওপর ঘন-ঘন টর্চের আলো ফেলিতেছে। হুকা-কাশি মনে-মনে হাসিলেন, নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, 'বাছা, কোন বইয়ের সন্ধানে তুমি এসেছ তা আমার অজানা নেই—উঁহু, উঁহু, ওটা নয়, ওই লালটা; হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে এবার।'

নাথনিও লাল বইয়ে হাত দিল, সঙ্গে-সঙ্গে হুকা-কাশিও তার ঘাড়ে হাত রাখিলেন। হঠাৎ ভূতের স্পর্শ পাইলে লোকে যেমন চমকাইয়া ওঠে ঠিক সেইভাবেই একটা অস্ফুট চিৎকার করিয়া নাথনি ধপাস করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

বড়ই জটিলতার সৃষ্টি হইল দেখিতেছি!

উনিশ ঃ ঘোড়া-চরিত্র

সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু হুকা-কাশি একেবারে চাপিয়া গেলেন, ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় কোনও প্রাণীকে কিছু জানিতে দিলেন না, মিস্টার বাসুকেও না। দুপুরবেলা বাসুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেনারসী কাপড়চোপড় কিছু আছে আপনার সুটকেসে?'

'তার মানে?' বাসু সাশ্চর্যে প্রশ্ন করিলেন।

'মানে বিশেষ কিছু শক্ত নয়। বিলাত-ফেরতই হোন আর যা-ই হোন, আপনি হিন্দু তো বটেন? কাশীতে এসে কোনও হিন্দু বিশ্বনাথ দর্শন না করে যে ফিরে যেতে পারে এ আমি বিশ্বাসই করি না। তা দেবদর্শনের উপযুক্ত কাপড় তো চাই!'

'ওঃ, সেই কথা? ভণিতা শুনে মনে হচ্ছিল কতই না জানি গূঢ় রহস্য রয়েছে বেনারসী কাপড়ের ভেতর। যেরকম তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বার নোটিস দিলেন তাতে আর পারলাম কই

BanglaBook.org

দেবদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বার হতে? একজোড়া পুরনো তসর হয়তো থাকতে পারে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে।'

'দিন তো তা হলে সেটা একবারটি বার করে, একটু ঘুরে আসি।'

মিস্টার বাসুর দেওয়া তসরের জোড় পরিয়া হুকা-কাশি একটা বিশেষ দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমশাই ভেতরে আছেন কি? রামদয়াল ঠাকুর মশায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

রামদয়াল যে সে-সময়ে দোকানে অনুপস্থিত থাকিবে হুকা-কাশি তা ভালো করিয়াই জানিতেন; ছোটভাই কৃষ্ণদয়াল উপস্থিত ছিল, চোখ দুইটি একটু কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবুর কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'আসছি তো মশাই বাংলাদেশ থেকেই; আমার খুড়োমশাই ওনার নাম বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু খুঁজে কি আর নিতে পারি? সেই কাল সক্কাল থেকে...।'

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং করিয়া কলিংবেলের মতো কী একটা বাজিয়া উঠিল, অমনি কৃষ্ণদয়াল তাড়াতাড়ি হুকা-কাশির বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এলাম বলে।' অল্প দূরে আর একটি দোকান, হুকা-কাশি দেখিলেন 'কেষ্ট' সেই দোকানে ঢুকিতেছে।

কালবিলম্ব না করিয়া হুকা-কাশি দোকানটার সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অবশ্য দাঁড়াইলেন এমন একটা জায়গা বাছিয়া যাতে হঠাৎ তাঁর উপর কারও নজর না পড়িতে পারে—অন্তত পড়িলেও দোকানের উপর তাঁর যে কোনওরকম লক্ষ আছে এ-সন্দেহ ভুলিয়াও কারও মনে না জাগে। কতকগুলি জিনিস একই সঙ্গে তাঁর নজরে আসিল—দোকানটা পান, জর্দা এবং সূর্তির; কৃষ্ণদয়াল ঘণ্টার সঙ্কেত পাইয়া হঠাৎ খরিদ্দার সাজিয়া সূর্তি চাহিতেছে; দোকানের সামনে আরও দুইটি শৌখিন বাঙালি যুবক দাঁড়াইয়া; তাদের পরস্পরের আলাপ হইতে আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু বুঝা যাইতেছে যে, আজ বেলা সাড়ে পাঁচটায় তারা কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় যাইবে। হুকা-কাশি আরও লক্ষ করিলেন সূর্তি দিবার অছিলায় দোকানী কৃষ্ণদয়ালকে ভিতরে ডাকিয়া নিল।

একটু বাদেই দোকানদারের সহিত কৃষ্ণদয়ালকে আবার বাহিরে আসিতে দেখিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, আবার দোকানটিতেই ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে বসিয়া-বসিয়াই তিনি লক্ষ করিলেন কৃষ্ণদয়াল সূর্তির দোকান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা গোধূলিয়ার বিখ্যাত গাড়ির আড্ডাটায় ঢুকিয়া পড়িল, তারপর এক টঙ্গাওয়ালাকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া কী সব কথা বলিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে সেই শৌখিন যুবক দুইটির পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেতও চলিতেছিল। সমস্ত খণ্ড-খণ্ড ঘটনাগুলি একত্র করিয়া হুকা-কাশি ব্যাপারটার আসল অর্থ মুহূর্তেকের মধ্যেই বাহির করিয়া ফেলিলেন। সে-অর্থটা যে কী সে-সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের পূর্বেরই অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই এ-বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণদয়াল দোকানে ফিরিয়া আসিলে হুকা-কাশির সঙ্গে অল্প কিছুকাল ধরিয়া তার কথাবার্তা হইল—কখন আসিলে রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে প্রধানত সেই আলোচনা। তারপরেই দোকানের প্রকাণ্ড তালাটায় চাবি লাগাইতে-লাগাইতে কৃষ্ণ জানাইল, আজ তাকে একটু সকাল-সকালই দোকান বন্ধ করিয়া বাহির হইতে হইবে, কেননা এক যজমানের কাছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকটা সম্পূর্ণরূপে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত হুকা-কাশি সে জায়গাটিতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন গোধূলিয়ার দিকে, গাড়ির আড্ডার উদ্দেশে। এরই মধ্যে মনে-মনে তিনি সঙ্কল্প ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—আজ এক ঢিলে দুই পাখি মারিবেন।... দেখা যাক, কী ধরনের ঢিল সেটা!

কৃষ্ণদয়ালের সহিত টঙ্গাওয়ালা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিল তখন হুকা-কাশি ভালো করিয়াই

গাড়িখানা নিশানা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাই সেটি খুঁজিয়া বাহির করিতে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোকটার কাছে গিয়া পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে তিনি কহিলেন, 'বাঃ তোমার ঘোড়াটা তো চমৎকার দেখছি হে!... আমায় একটু হাওয়া খাইয়ে আনতে পারবে? আমি কিন্তু ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দেব—রাত আটটা পর্যন্ত চুক্তি। দেখ!'

'না হুজুর, আটটা পর্যন্ত আমি ভাড়া খাটতে পারব না, পাঁচটার পরেই জোয়াল খুলে দিতে হবে, নইলে ঘোড়ার বড্ড "তকলিফ" হবে; আজ সারাটা দিনই দৌড়ের ওপর আছে কিনা!'

আশপাশ হইতে অন্তত দশজন টাঙ্গাওয়ালা হুকা-কাশিকে ছাঁকিয়া ধরিল—'আসুন হুজুর, আমার গাড়িতে, আটটা কেন, চান তো রাত দশটা পর্যন্ত আপনাকে হাওয়া খাইয়ে আনব। চলে আসুন!'

হুকা-কাশি কিন্তু বারবারই ঘোড়াটার উপর এমনই সলোভ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল ওই ঘোড়াটাই বাবুর বিশেষ পছন্দ হইয়াছে, সহজে ওটিকে বেহাত হইতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা নয়। মুখের কথাতেও সেই আভাসই তিনি দিলেন, কহিলেন, 'আচ্ছা বাপু, পাঁচটা-পাঁচটাই সই, তারপর না-হয় অন্য আর-একটা গাড়ি ধরা যাবে। খা—সা ঘোড়াটি তোমার বাপু, যাই বলো! এটা আবার কী, পা-দানের কাছে একটা পচা দড়ি ফেলে রেখেছ কী জন্য?' গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

এ-কথায় গাড়োয়ান কিছু ক্ষুন্ন হইল, ঘোড়ার মতো দড়িটাকেও প্রশংসা করিলে বোধকরি সে খুশি হইত; একটু অনুযোগ-মাখা স্বরে বলিল, 'হা বাবুজি, পচা দড়ি? পাঁচজন জোয়ান মরদ একে ছিঁড়তে পারবে? আমার এ-ঘোড়াটাকে এই দিয়ে আমি বেঁধে রাখি, আর আপনি বলছেন পচা দড়ি!'

'আচ্ছা-আচ্ছা বাবা, ঘাট মানলাম, খুব শক্ত দড়িই বটে। গোড়ায় একবার চকের দিকে নিয়ে চলো তো, একটু কেনাকাটি করবার আছে।'

চকে পৌঁছিয়া হুকা-কাশি একখানা মোটা চাদর কিনিলেন—কেন তিনিই জানেন—ধূসর রংয়ের চাদর, নিতান্ত খেলো কম দামি জিনিস। তারপর টঙ্গাওয়ালাকে হুকুম করিলেন, 'শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে নিয়ে চলো তো বাবা, যেখানে লোকজনের আনাগোনা হই-চই একেবারে নেই; উঃ, হট্টগোলে সকাল থেকে মাথাটা একেবারে ধরে আছে।'

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা শহরের বাহিরে সম্পূর্ণ নির্জন একটা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়োয়ানের মেরজাইয়ের পকেটে একটা বড় ঘড়ি ছিল, হুকা-কাশির অলক্ষ্যে সেটি দেখিবার জন্য সবে একবারটি সে ঘাড় হেঁট করিয়াছে, অমনি তার মনে হইল কোথা হইতে একটা অদৃশ্য লোহার নিগড় আসিয়া হঠাৎ যেন সজোরে তার গলার উপর চাপিয়া বসিল, শ্বাস বন্ধ করিয়া আনিল। হুকা-কাশি জাপানি ঢিল ছুড়িয়াছেন, যুযুৎসুর প্যাঁচ কষিয়াছেন।

মুহূর্তের মধ্যে ভিতরের ব্যবধানটুকু ডিঙাইয়া হুকা-কাশি পিছন হইতে একেবারে সামনের আসনে চলিয়া আসিলেন, ক্ষিপ্রহস্তে গাড়োয়ানের কোমর হইতে লুকানো ছোরাখানা গাড়ির পা-দানের উপর ফেলিয়া দিতে-দিতে বলিলেন, 'গলার প্যাঁচ আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসে এটা যদি না চাও, তবে এক্ষুনি আমার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।' গাড়োয়ান সভয়ে দেখিল তাঁর হাতে সেই দড়িটি—অল্প কিছুক্ষণ আগেই যার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সে খুব উঁচু মত জাহির করিতেছিল। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া—সে ক্ষমতাও তার ছিল না—হুকা-কাশির হুকুমমতো তাঁর সঙ্গে সে মাটিতে নামিয়া আসিল।

রাস্তার পাশে একটা তালগাছ ইতিপূর্বে হুকা-কাশি লক্ষ করিয়াছিলেন। দাঁতের সাহায্যে দড়িটি চাপিয়া ধরিয়া লোকটাকে সেই গাছের কাছে তিনি টানিয়া আনিলেন; তারপর দু-দিক হইতে তার দুইটি হাত গাছের পিছনে আনিয়া দড়ির সাহায্যে বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিলেন, 'সম্পূর্ণ বিদেশি পেয়ে

BanglaBook.org

ছোঁড়া দুটোর সর্বস্ব লুঠে নেওয়ার মতলব ফেঁদেছিলে বাবা, এখন সে-পাপের খানিকক্ষণ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করো। সরকারি রাস্তা যখন রয়েছে তখন লোকও কিছু-না-কিছু এ-পথে আনাগোনা করবেই। সময় হলে তখন ছাড়া পাবে।'

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বলিয়া বাংলায় একটা কথা আছে; ঘোঘ জানোয়ারটা বাস্তবিক যে কী তা আমার জানা নাই তবে খুব সম্ভবত বাঘের চাইতে সে বেশি সেয়ানা। যদি আমার এ-অনুমান সত্য হয় তবে হুকা-কাশির এখানে একটু ভুল হইল, কেননা ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকানের সম্মুখে খরিদ্দারবেশী যুবক দুইটিকে যখন নিতান্ত 'নিরামিষ' জীব বলিয়া তিনি ঠাওরাইয়াছিলেন তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবিকই তিনি বুঝিতে পারেন নাই; তলে-তলে তারা যে কী গভীর চক্রান্ত পাকাইয়া কাজে নামিয়াছে, বাঘের ঘরে কৌশলের ফাঁদ পাতিয়াছে, তখন পর্যন্ত তা তিনি টের পান নাই। কাজেই ভাবিলেন, নির্দিষ্ট সময়ে টঙ্গাওয়ালা যখন তাদের তুলিয়া নিতে পারিল না, তখন 'বেচারারা' বোধহয় এ-যাত্রা পার পাইয়া গেল।

এইবারে হুকা-কাশি তাঁর দ্বিতীয় চাল চালিলেন, কাশীর চকে কেনা চাদরটিতে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া কেবলমাত্র মুখটুকু বাহিরে রাখিয়া টঙ্গার পিছনকার আসনটিতে লাগাম হাতে বসিলেন—ঠিক যেমন টঙ্গার গাড়োয়ানেরা সোয়ারী না থাকিলে রাস্তার উপর দিয়া হামেশা গাড়ি হাঁকাইয়া আনাগোনা করে। শুধু মানুষের চরিত্রে নয় 'ঘোড়া-চরিত্রে'ও হুকা-কাশির বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল; তিনি জানিতেন লাগামে ঢিল দিয়া গাড়ির ঘোড়াকে যদি তার ইচ্ছামতো চলিতে দেওয়া যায় তবে সে-ঘোড়া আস্তাবলেই ফিরিয়া আসে—এ-নিয়মের প্রায়ই বড় একটা নড়চড় হয় না। আস্তাবলের সন্ধান মিলিলে গাড়োয়ানের আস্তানারও সন্ধান পাইতে বেশি বেগ পাওয়ার কথা নয়! রামদয়াল যে গভীর জলের মাছ সে-খবর তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন এবং ধনপতের হাবভাবে সে-ও যে বড় অগভীর জলে বিচরণ করে তা তো মনে হয় না। তাদের খেলাইয়া ডাঙায় তোলার চাইতে মোটাবুদ্ধি একটা টঙ্গাওয়ালাকে খেলাইয়া তোলা অনেক—অনেক সোজা। রণজিৎ-উদ্ধারের হয়তো একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার হইতে পারে।

হুকা-কাশির হিসাবে কিছুমাত্র গোল হয় নাই, ঘণ্টাখানেক বাদে ঘোর সন্ধ্যাবেলায় বাস্তবিকই ঘোড়া আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হুকা-কাশি চকিতদৃষ্টি হানিয়া অমনি চারিদিক একবার দেখিয়া লইলেন—নাঃ, ধারে-পাশে এমন কেহই নাই যার নিকট কোনও জবাবদিহি দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। কেবল পাশের একটা মেটে ঘরের দাওয়া হইতে একটি ছোট ছেলে 'বাবুজী আ গিয়া' বলিয়া তাঁর দিকে ছুটিয়া আসিল। হুকা-কাশি মনে-মনে প্রসন্ন হাসি হাসিলেন—যাক, কষ্ট করিয়া গাড়োয়ানের বাসস্থান আর খুঁজিতে হইবে না, সেটিরও সন্ধান মিলিয়া গেল। আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গলিপথে তিনি গা ঢাকা দিলেন। পৃথিবীর সর্বাঙ্গে রাত্রি তখন গাঢ় যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

আধঘণ্টাটাক এ-গলি সে-গলি দিয়া চলিতে-চলিতে হঠাৎ হুকা-কাশি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—দপ-দপ করিয়া পেছনে যেন অনেকগুলি লোকের একত্র পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। মুহূর্ত পরেই চার-পাঁচজন লোক বিদ্যুৎগতিতে তাঁর পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া গেল। আচমকা অন্ধকারে তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না যে, তাদেরই মধ্যে একজন কৃষ্ণদয়াল। কয়েক মিনিট পরে আবার ঠিক সেইরকমেরই শব্দ—পায়ের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে এবার গলার আওয়াজও রহিয়াছে। পুনরায় পিছনপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই তিনি দেখিলেন, আর-একদল লোক ঠিক পূর্বের দলের মতোই তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে; সংখ্যায় তারা ঢের বেশি। এবার আর তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হইল না, এ-দলের একজনকে তিনি যথার্থই চিনিলেন। ব্যাপার কী? এ এখানে কেন?

হুকা-কাশি ঠিক করিলেন একটু আগাইয়া ব্যাপারটা কী দেখিবেন, কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন; একটি প্রকাণ্ড খাঁটি বেনারসী ষণ্ড পাশের গলি হইতে বাহির হইয়া এমনিভাবে সমস্ত রাস্তাখানি জুড়িয়া দাঁড়াইল যে, পাশ দিয়া একটা মাছিও যদি গলিতে পারিত তো তাকেও বাহাদুর বলিতাম।

ষাঁড়টির আবার বারাণসীসুলভ নিরামিষত্বেরও নিতান্ত অভাব; হুকা-কাশি পাশ কাটাইবার সামান্য একটু চেষ্টা করিতেই এমনি ভয়াবহভাবে তিনি তাঁর নধর শিং দুইটি দুলাইয়া উঠিলেন যে, চাণক্য ঋষির কী একটা বচন তাঁর স্মরণে আসিয়া গেল—আর অগ্রসর হওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। শুধু এইটুকু তিনি বুঝিলেন যে, পিছনের দল সামনের দলটিকে তাড়া করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু হুকা-কাশি আগাইতে না পারিলেও পাঠক-পাঠিকার আগাইতে কোনও বাধা নাই; লেখক সঙ্গে থাকিলে তাঁরা না যাইতে পারেন এহেন স্থান পৃথিবীতে আছে নাকি? আগাইতে আপত্তি না থাকিলে তাঁরা দেখিতে পাইতেন, তাড়া খাইয়া সামনের দল হঠাৎ একটা বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। একটু ইতস্তত করিয়া পিছনের দলও ভিতরে ঢুকিল। তারপরেই একেবারে অবাক কাণ্ড—ভেল্কি বলিলেই চলে! যে-দরজা দিয়া সকলে ভিতরে ঢুকিয়াছিল সেটি ভিন্ন গোটা ঘরটিতে দ্বিতীয় জানালা বা দরজা নাই, অথচ দেখা গেল, সামনের দলের সবগুলি লোক বায়োস্কোপের 'ইনভিজিবল ম্যানের' মতোই চকিতে বোধকরি শূন্যেই মিলাইয়া গেছে। কেবল এক অপরিচিত বুড়ো ঘরে বসিয়া খকখক করিয়া অনবরত কাশিতেছে।

কুড়ি ঃ সুমিত্র-নিকেতনে অমিত্র

রাত্রে হোটেলে ফিরিয়াই হুকা-কাশি বাসুকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে স্যুট আছে মিস্টার বাসু?'

'ব্যাপার কী বলুন তো, ও-বেলা চাইছেন তসরের জোড়, এ-বেলা চাইছেন স্যুট, কাপড়ের ব্যবসায়ে নামবার মতলব করলেন নাকি?'

'না-না, ঠাট্টা নয়, সত্যি-সত্যিই আছে না কি জিজ্ঞাসা করছি।... অবশ্য আপনাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য আমার একেবারেই নেই, কিন্তু তবুও আসল ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন করাও বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সত্যি বলতে কি, ব্যাপার বাস্তবিকই বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার পরিচয় যে আর একটুও চাপা নেই তার স্পষ্ট প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে।'

বাসু বাহিরে কোনওরূপ ভাবান্তর দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ভিতরটা তাঁর যেন কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আল-কেপুন ও ডিলিঞ্জারের লীলাভূমি শিকাগো শহরে এতকাল যিনি কাটাইয়া আসিয়াছেন, নেটিভ গুণ্ডার উল্লেখে তাঁর তরফ হইতে কিছুমাত্র ভয়ের ভাব দেখানোও যে অশোভন তা জানি, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রণজিতের অবস্থার কথাও ভুলিতে পারি কই?

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, 'আমার নিজের জন্য ততটা ভাবি না, আর তা ছাড়া আত্মবিশ্বাসও যে একেবারে নেই তাও নয়; কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ধরতে গেলে এ-কাজে আপনাকে নামতে উৎসাহ দিয়েছি আমিই; কাজেই আপনাকে নিরাপদ না করে আমি কোনওমতেই সুস্থির হতে পারছি না। এক রণজিৎবাবুর কথা ভেবেই আমার...।'

তাঁর কথা শেষ হইতে পারিল না, বাসু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমাকে কি আপনি এমনই অপদার্থ পেলেন মিস্টার হুকা-কাশি, যে, আপনাকে এই বিপদের ভেতর একা ফেলে দিয়ে আমি সরে পড়ব? সে-শিক্ষা তো ছেলেবেলা থেকে কখনও পাইনি!'

হুকা-কাশি মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, 'সরে পড়তে তো আপনাকে বলিনি, শুধু বলেছি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুলব। সেইজন্যেই স্যুটের খোঁজ করছিলাম; আমার কাছে সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই রয়েছে, মিনিট দশেকের মধ্যেই আপনাকে একটি খাঁটি ট্রান্স-ফিরিঙ্গি বানিয়ে ছাড়ছি! তারপর আজ রাত্রেই আপনি এই হোটেল ছেড়ে—আমার সঙ্গ ত্যাগ করে—বেনারসের ডাকবাংলোতে গিয়ে উঠবেন। বিপদের গন্ধ পাওয়ামাত্রই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছি। এরপর কখন কী

করতে হবে সে-হদিস ডাকবাংলোতে বসেই আপনি পাবেন—পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত আমিই করব। আপনি শুধু কাঁটায়-কাঁটায় সেগুলো করে যাবেন, তা হলেই আমার কাজ বারোআনা পরিমাণ এগিয়ে যাবে। আচ্ছা... আমি তবে এবার দরজা আটকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসি।'

হুকা-কাশির কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়; বাসু বুঝিলেন প্রতিবাদ করিয়া কোনওই ফল হইবে না।

মিনিট পনেরো পরে একটি নিখুঁত চিনাবাজারি ফিরিঙ্গি সকলের অলক্ষ্যে হোটেলের ফটক পার হইয়া একখানা ট্যাক্সিতে গিয়া চাপিয়া বসিল। আরও মিনিট পনেরো পরে হুকা-কাশি টেবিলের সামনে গিয়া বসিলেন, চিঠি লেখার আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি লইয়া পর-পর দুখানা চিঠি লেখা হইল, তার মধ্যে 'বিশেষ গোপনীয়' মার্কা পড়িল যেখানার উপর, সেখানি যাইবে সন্তোষের কাছে—শ্রীপুরে।

চিঠি লেখা শেষ হইলে হুকা-কাশি ঘড়ি খুলিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর নয়, আহারাদি চুকাইয়া রাত্রির মতো এইবার বিশ্রামের আয়োজন করা দরকার। একটা হাই তুলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তারপর তিন-চারঘণ্টা পরের কথা, দুপুর রাত; বহু পূর্বেই প্রকাণ্ড বাড়িটা নীরব, নিঝুম হইয়া গেছে, যে যার ঘরে অঘোরে ঘুমাইতেছে। হুকা-কাশির পাশের ঘরটা লোকাভাবে প্রায় দুই মাস যাবৎ খালি পড়িয়া ছিল, হঠাৎ সেই ঘর এবং হুকা-কাশির ঘরের ভিতরকার দরজায় ধীরে—অতি ধীরে খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং তার পরমুহূর্তেই ছায়ার মতো একটা মূর্তি আস্তে-আস্তে পা ফেলিয়া ও-ঘর হইতে এ-ঘরের দিকে আসিতে লাগিল। দুপুররাত্রে তো কথাই নাই, দিনেরবেলায়ও বোধহয় সে-মূর্তি দেখিয়া যে কোনও লোক শিহরিয়া উঠিবে—পা হইতে মাথা অবধি একটা ভাপসা কালোর আভাসই মাত্র পাওয়া যাইতেছে। চলনে তার অতি সামান্যমাত্রও শব্দ নাই।

পাশাপাশি দুখানি খাট, একখানা হুকা-কাশির, অপরটা বাসুর। বাসু যে হোটেল ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন, এক ম্যানেজার ছাড়া আর কাহাকেও এ-পর্যন্ত সে-খবর জানানো হয় নাই, কাজেই চাকর তাঁর খাটেও মশারি ফেলিয়া দিয়া গেছে। আস্তে-আস্তে পা ফেলিতে-ফেলিতে মূর্তিটা প্রথমে বাসুর খাটের দিকে আগাইতে লাগিল। খাটে পৌঁছিয়া একবার সে নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া নিল, তার পরেই সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া ভিতরে হাত দিল। পরক্ষণেই বুঝিল সেখানে কেউ নাই, বিছানা শূন্য। বাসুর খাট ছাড়িয়া সে তখন চলিল হুকা-কাশির বিছানার দিকে। মশারি তুলিয়া এখানেও অল্প একটু হাতড়াইবার পরই সে দস্তুরমতো চমকিয়া উঠিল—এ-বিছানাটাও যে ওখানার মতোই শূন্য। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হইতেই সে যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া উঠিল কি না আজ এতদিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না; তবে এটা সত্য যে, উন্মত্তের মতো দরজা খুলিয়া সে রাস্তার দিকের বারান্দার পানে ছুটিয়া গেল এবং পরের মুহূর্তেই একেবারে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া দোতালার বারান্দা হইতে সোজা কঠিন রাস্তার উপর লাফ মারিয়া পড়িল। অথচ কেন যে সে এতটা ভয় পাইল সে-ই জানে, তাকে ধরিবার অথবা তাড়া দিবার জনপ্রাণীও তখন জাগিয়া ছিল না। কেবল দূরে একজন পাহারাওয়ালা চেঁচাইতেছিল, 'জুড়িদার, জুড়িদার হো!'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ডাকবাংলোতে বসিয়া মিস্টার বাসু একখানি লেফাফায় মোড়া চিঠি পাইলেন; সাইকেলে চড়িয়া একজন অচেনা লোক চিঠিখানা দিয়া গিয়াছে। বাসু ক্ষিপ্রহস্তে খাম খুলিয়া পড়িলেন—

'কাল রাত্রেই আপনাকে ডাকবাংলোয় স্থানান্তরিত করাটা যে কত বড় সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল আজ ভোর হতে না-হতেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনি শুনে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, দুপুররাত্রে আমাদের শোবার ঘরে

BanglaBook.org

কাল বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয় লোকের শুভাগমন হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা অনুমান করা বোধহয় খুব বেশি শক্ত নয়, কেননা ও-সময়টাকে বন্ধুত্ব পাতাবার ঠিক উপযোগী সময় বলে কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

'শুধু একটা বিপদের আভাস মাত্র পেয়েছি—এইটুকুই কাল আপনাকে জানিয়েছিলাম, এর বেশি আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। হ্যাঁ, সত্যিই স্বীকার করছি, আমার মনে ভয় ছিল, সবগুলি কথা খুলে বললে হয়তো আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই, কাল এই কাশীরই রাস্তায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে যাকে দেখবার পর হতেই অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার যুক্তিটা বারবার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। অন্তত "সুমিত্র-নিকেতনে" আর একদিনও নয়। একরকম জোর করেই আপনাকে ডাকবাংলোয় পাঠলাম। দুখানা চিঠি লেখবার ছিল, শেষ করে নিচে ম্যানেজারের ঘরে নেমে এলাম, তাকে বুঝিয়ে বলতে যে, অন্তত আজকের রাতটার মতো তার নিজের ঘরেই আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, কেননা রাত্রিবাসের পক্ষে আমার ঘর আর-একমুহূর্তও নিরাপদ নয়। লোকটা একেবারে হাউহাউ করে উঠল—এই বুঝি চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো করে! অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করা গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে এসে প্রথমেই টয়লেট পাউডারের কৌটোটা খুলে মুঠো-মুঠো পাউডার ঘরের সমস্ত মেঝেটাতে ছড়িয়ে দিলাম। হোটেলের সবাই রাত্রির মতো যে যার ঘরে কখন শুতে চলে যায় মোটামুটি তার একটা ধারণা ছিল; সেটুকু সময় ঘুমের ভান করে ওপরের নির্দিষ্ট ঘরটাতেই কাটিয়ে, তারপর নিঃশব্দে দোরে চাবি এঁটে চুপিচুপি চলে এলাম ম্যানেজারের রুমে। যার যে-প্রশংসাটুকু প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত করব না, ভদ্রলোক বাস্তবিকই দরজা ভেজিয়ে রেখে আমার জন্য ঘরের ভিতর অপেক্ষা করছিলেন।

'তারপর সকালবেলা নিজের ঘরে ফিরে আসতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। বারান্দার দিকের দরজাটি একেবারে খোলা, যেটি যাওয়ার আগে আমি ভালো করেই বন্ধ আছে দেখে গেছি। কার শ্রীকরস্পর্শে এটি সম্ভব হয়েছে জানতে বাকি রইল না; দুটো মশারিরই এক-একটা ধার ওপরপানে তোলা দেখে সে-ধারণার অনুকূলে দ্বিতীয় যুক্তিও মিলে গেল।

'মেঝের দিকে চেয়ে দেখি পাউডারগুলো আমার একেবারেই বিফলে যায়নি, সমস্ত ঘরময়ই কার যেন গোদা-গোদা পায়ের দাগ সযত্নে বুকের ওপরে তারা ধরে রেখে দিয়েছে। অতিশয় ঝানু যে সে-"নিশাচর"টি তাও বোঝা গেল, যখন একটিমাত্র রেখার সন্ধানও সে-পায়ের দাগের ভেতর দেখতে পেলাম না। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন বোধহয়—হয় রবারের জুতো পরে, আর নয় তো রবারের পট্টি পায়ে জড়িয়ে সে কাজে নেমেছিল, যাতে পায়ের দাগ কোনওমতেই কেউ আঁচতে না পারে—কোনওরকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই যেতে না হয়।

'কীরকম শক্ত লোকের পাল্লায় আমরা পড়েছি তা-ই জানাবার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই ক'ছত্র লেখা। আপনাকে সাবধান করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, ভয় দেখানো নয়। "সুমিত্র নিকেতন" ছেড়ে অন্য একটা আস্তানার সন্ধানে আজই আমায় বার হতে হবে। আস্তানার ব্যবস্থা হলেই আপনাকে সংবাদ দেব।'

হুকা-কাশি

একুশ : পার্শী সাহেবের অর্ডার

তিন-চারিদিন পরের কথা, সন্ধ্যার পর কাশীর একটা উচ্চশ্রেণীর 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক' হোটেলের সম্মুখে হুকা-কাশিকে দেখা গেল। সদর দরজার সামনে এক নেপালী দরওয়ান বসিয়াছিল। হুকা-কাশি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পার্শী সাব কৌন কামরামে রহতা?'

'জি তেরা লম্বারমে, দোতল্লা'পর।'

'আউর কলকাত্তাবালা বংগালি—' হঠাৎ কী ভাবিয়া হুকা-কাশি থামিয়া গেলেন, প্রশ্ন পাল্টাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সিঁড়ি কিধার, বাতলাও।'

প্রায় আধঘণ্টারও বেশি সময় উপরে কাটাইয়া হুকা-কাশি আবার যখন নিচে নামিয়া আসিলেন তখন পৃথিবীর বুকে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। রাস্তায় নামিয়াই তিনি একখানা ট্যাক্সি ধরিলেন, চালককে হুকুম দিলেন, 'ডাকবাংলো।'

মিস্টার বাসু ইজিচেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিয়া একখানা ইংরেজি বই পড়িতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই স-কলরবে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিলেন; একটু অনুযোগের সুরে বলিলেন, 'বেশ যা হোক, একখানা স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েই তিন-চারদিন একেবারে ডুব! আমি বেঁচে রইলাম, না কি গুণ্ডার হাতেই নিপাত গেলাম সে-খবরটুকু পর্যন্ত নিলেন না!' হুকা-কাশির চিঠিখানা পাওয়ার পর নেটিভ গুণ্ডাদের প্রতি বোধহয় 'শ্রদ্ধা'টা তাঁর কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, কেননা ফিরিঙ্গি-বেশ ত্যাগ তো তিনি করেনই নাই, বরং সেটিকে আরও একটু বাড়াইয়া তোলারই চেষ্টা করিয়াছেন।

হুকা-কাশি একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'বাড়ি বদল, তার ওপর শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে অজ্ঞাতবাস—দুটোতেই এমন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, নিজে এসে বাস্তবিকই দেখা করতে পারিনি, কিন্তু তাই বলে আপনার সংবাদ নিইনি এ-কথা বললে কিন্তু সত্যিই আমার ওপর অবিচার করা হবে। লোকের মুখে অন্তত রোজ একবারও খবর নিয়েছি, বাস্তবিকই আপনি সুস্থ মনে, বহাল তবিয়তে রয়েছেন কি না।'

'নতুন আস্তানা গাড়লেন কোথায়?'

হুকা-কাশি এদিক-ওদিক তাকাইয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আস্তে। একেবারে বাঙালি-টোলার ভেতরে—দেবনাথপুরা। ব্যাটারা যত হুঁশিয়ারই হোক না কেন, এবার আর সহজে আঁচতে হচ্ছে না। কিন্তু আর-এক মুশকিল বাধিয়েছে এক ব্যাটা পার্শী ব্যবসাদার—ব্যাটার বায়নার যেন আর অন্তই নেই। অথচ আমল না দিয়েও পারি না, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। এইমাত্র তার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার এখানে আসছি। আমায় বলে কিনা, 'আপনি জাপানি, সস্তায় কী করে কিস্তি মারতে হয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—আমায় বিদেশ থেকে অল্প কিছু—লাখ দু'তিন টাকার—কলকব্জা আনিয়ে দিতে হবে।' যত বলছি জাপানি মাত্রেই ব্যবসাদার নয়, ব্যবসার কোনও ধারই আমি ধারি না, তবু কে কার কথা শোনে! শেষটায় তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য চলে এলাম। আপনি তো প্রায় দশ-বারো বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, জানাশোনা এমন কোনও লোক আছে যার ওপর এ-ভারটা দিয়ে দেওয়া যায়? অবশ্য ন্যায্য কমিশন সে পাবে। তবে খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া দরকার, একরকমের জিনিস তো নয়, শেষে মাথায় বাড়ি না দিয়ে দেয়! আছে এমনধারা লোক? শুধু একটা পরিচয়-পত্র দিয়ে দেওয়া, তারপর ওরা দুজনে যা হয় বোঝাপড়া করুক গে। বেশি ঝুঁকি আমরা নিতে যাচ্ছি না, যেটুকু না করলে নয় সেইটুকু—আসল কথা, লোকটাকে হাতে রাখা উদ্দেশ্য।'

মিস্টার বাসু একটু চিন্তা করিয়া শেষে তাঁরই জানাশোনা এক আমেরিকান সাহেবের নামে একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। সে-লোকটা না কি নানা বিষয়ে দালালি করে।

চিঠি লিখিয়া মিস্টার বাসু বলিলেন, 'সেদিন সেই যে ফটো দেখাচ্ছিলেন না, তার সঙ্গে কাল বিকেলে একেবারে মুখোমুখি দেখা।'

BanglaBook.org

হুকা-কাশি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলেন কী? আপনাকে চিনতে পেরেছিল?'
'উঁহু, কিন্তু সে শুধু আপনারই এই ফিরিঙ্গি পোশাকের দৌলতে!'
'আচ্ছা, তবে আরও একটু খবর দিয়ে রাখি; মনে রাখবেন সে-লোকটার নাম রামদয়াল।'

বাইশ ঃ কল্পনারও অতীত

হুকা-কাশির চোখে ধূলা দিয়া তাঁরই গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে এমন লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আমার অজ্ঞাত এহেন কোনও ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থানে আজ ক'দিন ধরিয়াই তিনি হামেশা আসা-যাওয়া করিতেছেন, অবশ্য নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া। স্থান দুইটির মধ্যে একটি একখানি পানের দোকান, গঙ্গার প্রায় উপরেই; পান ছাড়া বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতিও অল্পস্বল্প সেখানে পাওয়া যায়, তবে দোকানের আয়তন তেমন বড় নয়। দ্বিতীয় স্থানটি একখানা মেটে বাড়ি, বাহির হইতে নিতান্তই দরিদ্রের সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে উঁকি মারিবার সুযোগ পাইলে মালিক যে খুবই হীন অবস্থার লোক তা মনে হয় না।

রাত প্রায় এগারোটা বাজিয়া গেছে, তখনও হুকা-কাশি পানের দোকানেরই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া। একজন বলিষ্ঠ চেহারার হিন্দুস্থানী দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল; হুকা-কাশি দেখিলেন, যে-লোকটা এতক্ষণ পান বেচিতেছিল, সে দোকান ছাড়িয়া নিচে নামিয়া আসিল, আর তার পরিত্যক্ত 'গদি' দখল করিয়া বসিল নবাগত হিন্দুস্থানীটি। ভিতরে ছোট্ট একখানি চারপায়া পাতা আছে, আরও খানিকটা রাত হইলে দোকান বন্ধ করিয়া সে শুইয়া পড়িবে।

পরদিন এবং তারও পরদিন হুকা-কাশিকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত দেখা গেল, বাসুর সঙ্গে পর্যন্ত একবার দেখা করিবার ফুরসুত পাইয়া উঠিলেন না—নানা জায়গায় নানা কাজে অনবরত ছুটাছুটি করিয়া তাঁর সময় কাটিয়াছে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে যখন তিনি ফিরিলেন তখন ক্লান্তি এবং অবসাদ হয়তো তাঁর প্রচুরই হইয়াছিল কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রসন্নতারও অভাব ছিল না।

ঘরে ঢুকিয়াই পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন; পড়া শেষ হইলে কুচিকুচি করিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর সেই ছেঁড়া কাগজের প্রত্যেকটি টুকরা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁর নিজের মুখের একটি মাংসপেশীতেও কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের যদি সেরূপ কিছু হইয়া থাকে তবে তাঁদের সে-কৌতূহল মিটাইবার জন্য চিঠিখানার ভাষা শুনাইয়া দিতেছি—

নীলকুঠি, আসানসরাই

'প্রিয় বন্ধু,

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে রত্নটির দাম যাচাই করিয়েছি—তাঁরা যে-দাম বলছেন তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে নতুন এক বিপদ—আভাস যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ব্যাপারটা খুব বেশি চাপা নেই, কোনও-কোনও জায়গায় বেশ কিছু জানাজানি হয়ে পড়েছে—বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই কি না তা অবশ্য জানি না। এ-ক্ষেত্রে আসানসরাই-এর মতো ছোট্ট অরক্ষিত গ্রামে ওটি আমার কাছে রাখতে আদৌ ভরসা পাচ্ছি না, তবে পরশুর আগে ওটিকে স্থানান্তরিত করাও আমার পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব হবে না। এ দু-দিন আমার লোহার সিন্দুকের ওপর আস্থা স্থাপন ছাড়া আর গত্যন্তর কী? যদি সময় করতে পারো, একবার আসবে। ইতি—'

BanglaBook.org

নিচের স্বাক্ষরটি বুঝিবার উপায় নাই, এমনই জড়ানো।

এগারোটা বাজিতে তখন মিনিট পনেরো বাকি—দিন নয়, রাত্রি—হুকা-কাশির নূতন বাড়ির সম্মুখে যে-যুবকটি আসিয়া দাঁড়াইল সে বিলক্ষণ বলশালী। দিন কয়েক পূর্বে কাশীর এক 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক' হোটেলের ফটকে দরওয়ানের নিকট হুকা-কাশিকে জনৈক 'বংগালি বাবুর' অনুসন্ধান লইতে দেখা গিয়াছিল, এ-সেই 'বংগালিবাবু'; নাম তারকেশ্বর।

ঠকঠক করিয়া দরজায় কয়েকটি মৃদু করাঘাত পড়িতেই হুকা-কাশি স্বয়ং নামিয়া আসিলেন, দুয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, 'ভেতরে চলে এসো।' তারপরেই আবার তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবসুদ্ধ ক'জন বেরুল শুনেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তেইশ জন।'

'বাঃ, চমৎকার! সন্তোষবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার বেহারা অমৃতকে সঙ্গে করে কাল তিনি এসে পৌঁছেছেন, ওপরেই আছেন। আর তোমরাও দলে আছ তিনজন। প্রায় ডবল হল। কিন্তু তোমার বন্ধু দুজনা কোথায়?'

'মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে; ও-বেলাই আমি তাদের এ-বাড়ি চিনিয়ে রেখেছি।'

'সাড়ে বারোটা আন্দাজ বন্ধ হয়ে যাবে—তার খানিক আগেই ওখানে আমাদের গিয়ে পৌঁছানো দরকার।... এই যে আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই সন্তোষবাবু, আর এ হচ্ছে আমাদের তারকেশ্বর রায়, যার কথা আজ সকালেই আপনাকে বলছিলাম।'

দেখিতে-দেখিতে আরও আধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল, তারকেশ্বরের বন্ধুদ্বয় ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। হুকা-কাশি পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, 'চলুন, আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে; সন্তোষবাবু, আপনি কিছুমাত্র নার্ভাস হবেন না; শিগগিরই হয়তো এমন সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবেন, যা আপনার কল্পনারও অতীত। কিন্তু ভগবানে নির্ভর রাখুন, সৎকার্যে তিনি যে সর্বদাই আমাদের সহায় এই বড় কথাটা ভুলবেন না।'

তখন সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ কাশীর এক নির্জন, সঙ্কীর্ণ গলির বুকে নামিয়া পড়িল। আমার এ-গল্পের পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইতেন—যেখানে সকলে আসিয়া থামিলেন তার কয়েক হাত দূরে তাঁদেরই পরিচিত সেই পানের দোকান, যার আনাচে-কানাচে এ-কয়দিন হুকা-কাশিকে অবিরত ঘুরিতে দেখা গিয়াছে।

সকলেই থামিয়াছে, কেবল হুকা-কাশি আগাইয়া গিয়া দোকানীর নিকট একপয়সার মিঠা খিলি চাহিলেন। তারপর পান সাজিবার উদ্দেশ্যে লোকটা উবু হওয়ামাত্র ব্যাঘ্রবিক্রমে তিনি তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কণ্ঠের উপর চাপিয়া বসিল লোহার নিগড়ের চেয়েও কঠিন একখানি বাহু। ততক্ষণে হুকা-কাশির আর সঙ্গীরাও আসিয়া পড়িয়াছে। তারকেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে ঝাঁপ ফেলিয়া ভিতর হইতে দোকানের দরজা আঁটিয়া দিল; একসঙ্গে পাঁচটি টর্চ জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই আলোয় অমৃত দড়ির সাহায্যে লোকটার হাত-পা এমনই শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যে, বেচারার আর এতটুকু নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। মুখ-চোখও বাদ গেল না, শক্ত কাপড়ে আচ্ছাদিত হইল।

'এবার মাদুরটা উঠিয়ে ফেল, ম্যানহোলের মুখ সরাতে হবে।' হুকা-কাশি বলিলেন।

ঘরের মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো ছিল, সেটি সরাইতেই ম্যানহোল সকলের নজরে আসিল। হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর ধরাধরি করিয়া ঢাকনিটা তুলিয়া ফেলিলেন; দেখা গেল ঢাকনির নিচে মোটা লাঠির মতো একটি লোহার ডান্ডা লাগানো রহিয়াছে—সমস্ত জিনিসটা দেখিতে ঠিক একটি খোলা বার্মিজ ছাতার মতো। হুকা-কাশি তারকেশ্বরের দিকে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'ডান্ডার মানে বুঝতে পেরেছ বোধকরি! চলো, ভেতরে ঢোকা যাক।'

ম্যানহোলের মুখে টর্চের আলো পড়িতেই সকলে—অবশ্য হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর বাদে—বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল; ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি একটা বিশেষ দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বিস্ময়

হুকা-কাশির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইল না, সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, 'যা ভাবছেন তাই, সুড়ঙ্গই বটে এটা। এরই ভেতর আমাদের ঢুকতে হবে এবং সেইজন্যেই এতগুলো টর্চের ব্যবস্থা। চলুন, নেমে পড়া যাক।' রজ্জুবদ্ধ দোকানীকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এ-চাঁদটিকেও এখানে ফেলে যাওয়া নিরাপদ নয়, সঙ্গে করে নিচে নেওয়াই শ্রেয়।'

অতি ধীরে-ধীরে, সতর্কভাবে সিঁড়ি বাহিয়া সকলে নামিতে লাগিলেন। অল্প খানিকটা আসিয়া সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, তারপর আরম্ভ হইয়াছে সরু গলি; আরও খানিকটা আগাইতেই দেখা গেল সে গলি শেষ হইয়াছে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া।

ঘরের দরজা ভেতর হইতে ভেজানো ছিল, ধাক্কা মারিতেই কোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই দুয়ার খুলিয়া গেল এবং সেইসঙ্গেই দেখা গেল ভিতরে কে একজন লোক মেঝের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ ভিতর হইতে দরজার গায়ে ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছিল, তাই ধাক্কার বেগ সামলাইতে পারে নাই, হুড়মুড় খাইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে টর্চ-হাতে হঠাৎ এতগুলি লোকের আবির্ভাব বাস্তবিক এমনই বিস্ময়জনক যে, লোকটা সহসা নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, মনে করিল, বোধহয় সে জাগিয়া-জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু ডাকু বড় ঝানু চীজ, যে কোনও অবস্থার জন্যই সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে; মুহূর্তের মধ্যে বিপরীত দিকের দেয়ালের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটা সূক্ষ্ম বোতামের মতো কী সে টিপিয়া ধরিল, আর সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল এতক্ষণ নিরেট দেওয়াল বলিয়া যেটিকে তারা মনে করিয়া আসিতেছিল তারই মধ্যে পরিষ্কার একটি কাঠের দরজা খুলিয়া গেছে। কিন্তু রঙ ফলাইবার কী আশ্চর্য বাহাদুরি! কার সাধ্য দেয়ালের গায়ে দরজার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারে! হুকা-কাশি তারকেশ্বরের পানে তাকাইয়া আবার একটু হাসিলেন, ঠিক প্রথমবারের মতোই অর্থপূর্ণ হাসি—কিন্তু ততক্ষণে তারকেশ্বর 'ডাকুর-পো'কে মারাত্মকভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। হুকা-কাশি বলিলেন, 'তুমি এই দরজা আগলেই থাকো, কেউ যেন না ঢোকে।' তারপর অমৃতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে অমৃত!'

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে ভৃত্যের বিলম্ব হইল না; অল্প একটু পরেই উপরে দোকানীর যে-দশা হইয়াছিল, ঠিক সেই দশাই হইল এ-লোকটিরও—অর্থাৎ 'নাগ-পাশে' আবদ্ধ।

'কোণের ওই পেট-মোটা সিন্দুকটার চেহারা বড়ই সন্দেহজনকে মনে হচ্ছে। অক্সি-এসিটিলিনের সরঞ্জামটা এগিয়ে দিন তো সন্তোষবাবু!' হুকা-কাশি কহিলেন।

এ-সামগ্রীটির সহিত যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের হয়তো একটু বুঝাইয়া বলা দরকার কী এ-জিনিসটা। কলিকাতায় ট্রামরাস্তা মেরামত করিতে বসিয়া মিস্ত্রিরা অতি উজ্জ্বল আলোর মতো একটা জিনিস ব্যবহার করে তা অনেকেই হয়তো লক্ষ করিয়াছেন। উহাই অক্সি-এসিটিলিন গ্যাস। লোহা যত শক্তই হোক না কেন, ইহার সংস্পর্শে আসিলে তরল হইয়া যায়।

সন্তোষ সরঞ্জামটা হুকা-কাশির কাছে আনিয়া দিল, তিনি আগাইয়া সিন্দুকের কাছে গিয়া বসিলেন। সকলে শব্দ শুনিল—হিসস, হিসস, ব্যস, সিন্দুকের তালা ক্রমশ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মুহূর্তে পরেই হুকা-কাশির বুকের মধ্য দিয়া ঠিক যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলিয়া গেল—তাঁর সাধনার ধন, এতদিনের পরিশ্রমের মূল শ্রীপুরের সোনার হরিণ ভিতর হইতে আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে। অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সবে তিনি সেটি বাহিরে আনিবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সব কয়টি সঙ্গী সমস্বরে এক বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল—নিদারুণ ভয়ব্যঞ্জক এক ধ্বনি! চমকিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সেই অতি-বড় সাহসী পুরুষটিরও বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল—তাঁর নিকট হইতে মাত্র কয়েক আঙুল দূরে প্রায় তার গা ঘেঁষিয়াই দাঁড়াইয়া আছে বীভৎস হিংস্র চেহারার একটা ভালুক পিছনের দুটি পায়ে ভর রাখিয়া। আগুনের গোলার মতো তার দুই ক্রুদ্ধ চোখে সে কী ক্রুর দৃষ্টি, যেন এখনই নখে ছিঁড়িয়া সে তাঁকে কুটিকুটি করিয়া ফেলিতে চায়!

BanglaBook.org

আত্মরক্ষার জন্য হুকা-কাশি সঙ্গে অস্ত্র আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন তার ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। দু-একটা গুলিতে এ-লোমশ জীবের হয়তো কিছুই হইবে না, বরং যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইতে সে মরিয়া হইয়া উঠিবে। আক্রান্ত না হইলে কিছুতেই তিনি আক্রমণ করিবেন না, মনে-মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তিনি তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁর সঙ্গীরা দেখিতে পাইল, তিনি ধীরে-ধীরে ভালুকের গায়ে নিজের হাতখানি রাখিতেছেন। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল—ভদ্রলোকের কি বন্য জন্তু সম্মোহনের বিদ্যাও জানা আছে নাকি!

হঠাৎ একটা অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া হুকা-কাশি দুই হাতে ভালুকটাকে জাপটাইয়া ধরিলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'অমৃত, শিগগির দড়ি দিয়ে পা দুটো এর বেঁধে ফেলো। আহা, কেন ভয় পাচ্ছ? আক্রমণের শক্তি এর নেই। দেখছ কী?'

এ-আদেশ অমান্য করা অমৃতের পক্ষে অসম্ভব, যন্ত্রচালিতের মতো দড়ি-হাতে ভালুকের দিকে সে কয়েক পা অগ্রসর হইল। কিন্তু মনের উপর তো আর মানুষের জোর নাই, পা হইতে মাথা অবধি সমস্ত শরীর তার কাঁপিতে লাগিল—ঠিক ঝড়ের মুখে কলার পাতার মতো। বেচারার এই সকরুণ ভাব হুকা-কাশির দৃষ্টি এড়াইল না, অভয় দিয়া তিনি আবার কহিলেন, 'অত কেঁপো না অমৃত; বারবার বলছি ভয়ের কিছুই নেই এখানে; এমন জ্বলজ্বলে দুটো চোখ থাকতেও এ কিছুই চোখে দেখতে পায় না—কানে শুনতে পায় না, হাত নাড়বারও শক্তি নেই। যা কিছু আছে ওই পা দুটোই, কিন্তু ভালুকের জোর এ-পায়ে আসবে কোত্থেকে? এ তো ভালুক নয়!'

'ভালুক নয়?' সন্তোষ এবং তারকেশ্বর একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল।

'না; ইনি আমাদের রণজিৎবাবু।'

হঠাৎ মাথার উপরকার ছাতটা ধসিয়া পড়িলেও বোধহয় কেউ অধিকতর বিস্মিত হইত না। বিমূঢ়ের মতো সকলে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। হুকা-কাশি বলিলেন, 'মানুষ যে কীরকম কল্পনাতীত নিষ্ঠুর হতে পারে একটু পরেই তা জানতে পারবেন। কিন্তু তার আগে এই সাক্ষাৎ নরক থেকে বার হওয়া দরকার। আমাদের দুটো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে—রণজিৎবাবু এবং সোনার হরিণ দুয়েরই উদ্ধার। সন্তোষবাবু, এই আপনাদের সোনার হরিণ!'

হুকা-কাশি রত্নটি বাহির করিতেই সকলের চোখ একসঙ্গে ঝলসিয়া উঠিল—যেন একটা প্রদীপ্ত সূর্য লক্ষধারায় কিরণের ছুরি হানিতেছে! স্থান, কাল সমস্তই ভুলিয়া নির্নিমেষে সকলে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। ইহার জন্য লোকে পাগল হইয়া উঠিবে, তাতে আর কথা কী!

কিন্তু হুকা-কাশি সকলের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন, কহিলেন, 'ওহে তারকেশ্বর, অবাক হওয়ার সময় এখন নয়, সে-সময় ঢের পাওয়া যাবে; এখন চাই সক্রিয় হওয়া। যে-পথে যেভাবে সকলে ঢুকেছি অবিকল সেইভাবে বেরুব, শুধু রণজিৎবাবু আমার কাঁধে থাকবেন, এই যা তফাত। আমাদের উপস্থিতি কিছুই ইনি টের পাচ্ছেন না—কাঁধে তুলে চলতে শুরু করলে স্বভাবতই একটু চঞ্চল হওয়ার সম্ভাবনা; কাজেই পা দুটো বেঁধে নেওয়া হল। অমৃত, ওই তাকের ওপর ওটা কী, বিছানার চাদর বুঝি! দাও তো, ওঁকে একদম ঢেকে ফেলা যাক।'

যে দুটি 'মহাত্মা'কে দড়ির সাহায্যে বন্দী করা হইয়াছিল তাদের যাতে এখন অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা বেশ 'ঠাণ্ডা' থাকে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া সকলে সুড়ঙ্গ পথে ফিরিবার উপক্রম করিলেন। উপরে উঠিয়া ম্যানহোলটি পরিপাটিরূপে বন্ধ করা হইল, তারপর সকলে মিলিয়া বাহির হইতে দোকানের দরজাটা এমনিভাবে ভেজাইয়া দিলেন যাতে হঠাৎ কাহারও মনে কোনওরকম সন্দেহই জাগিতে না পারে। দোকান হইতে কয়েক পা আগাইলেই গঙ্গা; একখানা বড় পানসি নৌকো সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সকলে গিয়া তাতে চড়িয়া বসিলেন, হুকা-কাশি তৎক্ষণাৎ মাঝি-মাল্লাদের নৌকো ছাড়িতে আদেশ দিয়া 'ভালুকের' মাথার পিছন দিকে বড়-বড় লোমগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে

BanglaBook.org

লাগিলেন; হাতে ঠেকিল গুটিকয়েক লোহার বল্টু। ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি খুলিয়া ফেলিতেই কঠিন ইস্পাতের-উপর-রোঁয়া-বসানো, চোখ-মুখ-কান-ঢাকা মুখোসটাও খুলিয়া আসিল, দেখা দিল রণজিতের নিজস্ব মূর্তি—উঃ, সে-চেহারা দেখিলে বোধকরি অতিবড় পাষাণেরও হৃদয় গলিয়া যায়।

ফ্যালফ্যাল করিয়া রণজিৎ চারিদিকে তাকাইতে লাগিল—সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তারপর হুকা-কাশির সহিত চোখাচোখি হইতেই সে কেমন এক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই হুকা-কাশি দুই হাতে তার মাথাটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। সেও নিতান্ত নির্ভরশীল ছোট ভাইটির মতোই হুকা-কাশির বুকের উপর মাথা লুটাইয়া দিল। অপার্থিব দৃশ্য!

রণজিৎ ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সন্তোষ হুকা-কাশিকে প্রশ্ন করিল, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'সূর্য ওঠা অবধি নৌকোয় করে যতটা পারি এগিয়ে যাব; তারপর ভোর হলে পরে সব চাইতে কাছাকাছি স্টেশনে কলকাতার গাড়ি ধরতে হবে। আসানসরাই থেকে রামদয়ালদের শেষ রাত্তিরেই ফেরার কথা; তারা এসে শূন্য ডেরা দেখবার আগেই কাশী ছেড়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাই।'

'কিন্তু মেজকর্তা যে কাশীতেই পড়ে রইলেন!'

'কে? মিস্টার বাসু? তিনি খুব নিরাপদেই আছেন, কোনও অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নেই।'

'আর অহিভূষণ চৌধুরী? তার কোনও কিনারা করতে পারলেন কি?'

'হুঁ, তাও করেছি।'

'বটে নাকি? প্রাণে বেঁচে আছেন তিনি? কেন তিনি সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছলেন?'

'সরিয়ে নিয়েছিলেন নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক বলে; হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন বইকী—তবে অহিভূষণ চৌধুরী নামে নয়, ও-নামের আর দরকার নেই, ভিন্ন নামে।'

'সে আবার কী? কী নামে?'

'যেটা তাঁর আসল নাম সেই নামে, অর্থাৎ মিস্টার বাসু নামে—মিস্টার খগেন্দ্রনাথ বাসু, দ্বারিকবাবুর মেজভাই।'

'অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ? দূর, তাও কী হয়, কী বলছেন আপনি?'

'আমি ঠিকই বলছি; মিস্টার বাসু আর অহিভূষণ চৌধুরী একই ব্যক্তি।'

তেইশ ঃ হীরার টুকরো

কিছুক্ষণ সন্তোষ সম্পূর্ণই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু কথাটাকে কোনওক্রমেই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কহিল, 'তা কী করে হবে মিস্টার হুকা-কাশি? সোনার হরিণের অন্তর্ধান, অহিভূষণ চৌধুরীর ব্যাপার—সে তো কতদিনের কথা! তখন মেজকর্তা এ-দেশে কোথা, তিনি তো আমেরিকায়! এই তো সেদিন সবে এলেন!'

'মিস্টার বাসু আমেরিকা থেকে ক'দিন ফিরেছেন বলে আপনার ধারণা?'

'আপনি কাশী রওনা হয়ে পড়বার মাত্র দু-দিন কি তিনদিন আগে। আমরাই তো হাওড়া-স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলুম।'

'হ্যাঁ, লোক-দেখানো দেশে-ফেরার তারিখ ওইটাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসেছেন উনি তার ঢের—ঢের আগে'—হুকা-কাশি বলিলেন।

'কিন্তু তাই বা বলি কী করে? অহিভূষণবাবু যখন কর্তার প্রাইভেট সেক্রেটারিভাবে কাজ করছেন তখনও যে আমরা আমেরিকা থেকে মেজকর্তার চিঠি পেয়েছি; একেবারে খোদ তাঁর নিজের

BanglaBook.org

হাতে লেখা চিঠি, টিকেটের উপর পরিষ্কার আমেরিকার ডাকঘরের ছাপ মারা। চান তো সে-চিঠি এখনও আপনাকে দেখাতে পারি।'

হুকা-কাশি জবাবে শুধু একটু হাসিলেন; তারপর পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া বলিলেন, 'এই তারটা একবার পড়ুন তো!'

বিস্মিত সন্তোষ টেলিগ্রামখানা চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিল; তাতে যা লেখা আছে তার অনুবাদ—

'খামে মোড়া তোমার প্রত্যেকটি চিঠিই পেয়েছি এবং নির্দিষ্ট দিনে সেগুলো পোস্টও করা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমার কোনও ভুল হয়েছে এমন ধারণা তোমার কী জন্য হল বুঝলাম না। যা হোক, আমার কোনও ভুল হয়নি।

—মর্নিংটন।'

টেলিগ্রাম পড়া শেষ হইলে সন্তোষ কহিল, 'আপনি বোধহয় বলতে চান মেজকর্তা আমেরিকা ছেড়ে আসবার আগে মর্নিংটন নামে ওঁর আলাপী এক মার্কিন সাহেবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, এখান থেকে উনি আমাদের নামে চিঠি লিখে খামসুদ্ধ সেই চিঠি সাহেবের কাছে পাঠাবেন, আর সাহেবও ঠিক-ঠিক তারিখ মিলিয়ে সেগুলো আমেরিকার কোনও ডাকঘরে ছেড়ে দেবে। সে-চিঠি পড়ে আমরা স্বভাবতই মনে করব যে-মেজকর্তা আমেরিকাতেই রয়েছেন—তিনি যে দেশে ফিরে এখানেই বাস করছেন এ-সন্দেহ কারও মনে ভ্রমেও জাগবে না—এই তো?'

'সমস্ত ব্যাপারটা আপনি জলের মতো বুঝে ফেলেছেন, সন্তোষবাবু! আপনার বোঝবার শক্তির আমি বাস্তবিকই তারিফ করছি।'

'কিন্তু এ-লোকটার খবর সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে?'

'কার? মিস্টার বাসুর প্রাণের বন্ধু মর্নিংটন সাহেবের? বঁড়শিতে টাকা বিঁধে জলে ফেলতে হয়েছিল; টাকার লোভে মিস্টার বাসু অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে টপ করে তাই গিলে ফেলেছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে বঁড়শিতেও গেছেন আটকে। আসলে কথা কী জানেন, কোনও জটিল অপরাধের অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হলে ঠিক অঙ্ক-কষার মতো ধাপে-ধাপে এগোতে হয়। যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঠিক বৈজ্ঞানিকের মতো অগ্রসর হতে পারলে শেষপর্যন্ত ফল আপনার মিলবেই। এইভাবে এগোবার ফলে আমি দেখতে পেলাম—কী করে পেলাম তা পরে জানবেন যে, যে-অপরাধীর সন্ধানে আমরা ফিরছি সে আর আমাদের মিস্টার বাসু-মশাই অভিন্ন ব্যক্তি। আমার এ-সিদ্ধান্তে যদি কোনওরকম ভুল না থেকে থাকে তবে ওই সময়টাতে মিস্টার বাসুর পক্ষে আমেরিকায় বাস এবং আমেরিকায় বসে চিঠি লেখা একেবারেই অসম্ভব। অথচ চিঠি যে সত্যিই আপনারা পেয়েছেন তাও জানি। কাজেই এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান হতে পারে এই যে, আমেরিকায় ওঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসী কোনও লোক আছে যার মারফত নিয়মিত ও-চিঠিগুলো আপনাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় থাকা সম্ভব কি? আচ্ছা দেখা যাক, বাস্তবিকই সে রকম বিশ্বস্ত কোনও বন্ধু আছে কি না!

'বঁড়শিতে টাকা গেঁথে জলে ফেলে দেওয়া গেল'—অর্থাৎ মিস্টার বাসুকে বললাম, আমার পরিচিত একজন ধনী পার্শী সওদাগর আমেরিকার বাজারে আপাতত লাখ তিনেক টাকার যন্ত্রপাতি কিনতে চান; কিন্তু এত দূর দেশ থেকে বেছে নিজে যাচাই করে মাল কিনতে গেলে তাতে পদে-পদে লোকসানের সম্ভাবনা। তিনি তো বহুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর জানার ভেতরে পাকা অথচ বিশ্বস্ত এমন কোনও লোক আছে কি, যে এই ব্যাপারে পার্শী সাহেবের সাহায্যে আসতে

BanglaBook.org

পারে? অবশ্য এর জন্য বাজার-চলিত ন্যায্য দালালি কমিশন যা, তা তিনি অবশ্যই দেবেন।

'তিন লাখ টাকার ওপর কমিশন একেবারে হেলাফেলার বস্তু নয়, তার ওপর ভবিষ্যতে আরও অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মিস্টার বাসুর চরিত্র আমি জানি, মোটা টাকার ওপর বখরা বসাবার এতবড় সুযোগ ছাড়বার পাত্র তিনি মোটেই নন। অর্থাৎ টোপ তিনি গিলবেনই। আর এও সত্যি যে, যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারেন দালাল হিসেবে তার নাম কিছুতেই তিনি করবেন না, কেননা এসব যে মবলগ টাকাকড়ির ব্যাপার—দালাল যদি শেষে কমিশনের বখরা দিতে অস্বীকার করে বসে! কাজেই এরকম ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সম্ভাবনাই হচ্ছে এই যে, নিতান্ত গোপনীয় চিঠি পাওয়ার মতো কাজ যে-অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওপর পড়েছে, দালালের নাম করতে গিয়েও তার নামই মিস্টার বাসুর মুখ দিয়ে বার হয়ে আসবে—আমেরিকায় সে-ই তাঁর সব চাইতে বিশ্বাসের পাত্র কিনা!

'মিস্টার বাসু উল্লেখ করলেন মর্নিংটন নামে এক মার্কিন সাহেবের নাম, আর তার নামে একটা পরিচয়-পত্রও লিখে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পেয়ে গেলাম সে-সাহেবের ঠিকানা। ব্যস, বাড়ি এসেই সাহেবের কাছে এক টেলিগ্রাম—অবশ্য বাসুর জবানিতে অর্থাৎ যাতে করে সে মনে করে মিস্টার বাসুই টেলিগ্রামখানা পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামে লেখা হল যে, যেসব চিঠি তাকে পাঠানো হয়েছে তার সবগুলোই শ্রীপুর ফিরে এসেছে কি না অবিলম্বেই "তার" করে সে যেন জানায়। এর জবাবে সে যদি ফিরে টেলিগ্রাম করত—তোমার টেলিগ্রামের অর্থ কিছুই বুঝলাম না, তা হলে আমাকেও বুঝতে হত হিসাবে কোনও গোল হয়েছে—আমার অনুমান ভুল। কিন্তু সে-ধরনের টেলিগ্রাম সে মোটেই করেনি, বরং উল্টে কী করেছে তা তো আপনি এক্ষুনি দেখলেন। আমার সিদ্ধান্ত যে একেবারেই নির্ভুল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।'

সন্তোষ এতক্ষণ হাঁ করিয়া হুকা-কাশির কথাগুলি শুনিতেছিল, তিনি থামিতেই কপালের উপর আসিয়া-পড়া চুলগুলিকে পিছন দিকে সরাইয়া দিতে-দিতে সে কহিল; 'আচ্ছা, সলিল সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? আমার কিন্তু মনে বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জেগে আসছে যে, ভেতরকার রহস্য সে সব জানে।'

'আপনার সন্দেহ নির্ভুল; বাস্তবিকই আসল রহস্য সলিলবাবুর অজানা নেই।'

'অথচ সমস্ত জেনে-শুনেও কর্তার কাছে কোনও কথা ঘুণাক্ষরেও সে প্রকাশ করেনি! একেবারে হীরের টুকরো ভাই বলুন!'

'এবারও আপনার মুখ দিয়ে সত্যিকথাটাই বেরিয়ে পড়েছে সন্তোষবাবু,' হুকা-কাশি কহিলেন, 'বাস্তবিকই ভাই হিসাবে সলিলবাবুর তুলনা পাওয়া শক্ত। কিন্তু আপনার ও-ইঙ্গিতটা সত্যি নয়। বিদ্রূপভরে নয়, সত্যি-সত্যিই আমি বলছি, সলিলের মতো স্নেহময় ভাই একান্তই দুর্লভ। সোনার হরিণ উদ্ধার করতে সে আপনার অথবা রণজিৎবাবুর চাইতে কিছুমাত্র কম চেষ্টা করেনি; এমনকী প্রকারান্তরে তার সাহায্য না পেলে এত সহজে সোনার হরিণ আমি ফিরে পেতাম কি না, তাও জানি না। অথচ আত্মপ্রচারের লোভ একবারও তার মনে উঁকি মারেনি। দ্বারিকবাবুর ছেলেপিলে নেই, মিস্টার বাসু যে-অপরাধ করেছেন তাতে তাঁর সিকি পয়সাও পাওয়া উচিত নয় এবং দ্বারিকবাবুর কানে সবকথা পৌঁছুলে তা যে তিনি পাবেনও না, এ-কথাও নিশ্চিত। অথচ, পাছে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, পাছে মিস্টার বাসুকে অর্থাভাবে পথে বসতে হয় এই ভয়ে স্নেহময় সলিল—নিঃস্বার্থপর সলিল—নিজের পাখা দিয়েই যেন আগাগোড়া তাঁকে ঢেকে রেখেছে। সে যে প্রকৃত রহস্য জানে, মিস্টার বাসুকে পর্যন্ত তা টের পেতে দেয়নি। ব্যাপারটা বাস্তবিক কী ঘটেছিল আগে সংক্ষেপে তা-ই বলে নিই, আমি কী করে ধীরে-ধীরে সমস্ত টের পেয়েছি—সেটা বরং পরে বলা যাবে।

'ভাইদের ভেতর দ্বারিকবাবুরা বর্তমানে তিনজন বেঁচে আছেন—তিনি স্বয়ং, খগেন্দ্র অর্থাৎ

BanglaBook.org

আমাদের মিস্টার বাসু আর সলিলেন্দ্র। আরও কয়েকটি ভাই ছিল, তবে তারা অল্পবয়সেই মারা গেছে। বোধহয় ঠিক এই কারণেই ছেলেবেলায় খগেনবাবুর রীতিমতো শাসন হয়নি; লেখাপড়ায় তাঁর আদৌ মন বসল না, বছরের পর বছর কেবল ফেলই হতে লাগলেন। তারপর কষ্টেসৃষ্টে কোনওরকমে ফার্স্টক্লাশ পর্যন্ত উঠেই মা সরস্বতীর কাছে তিনি বিদায় নিলেন; পাড়ায়-পাড়ায় থিয়েটার আর যাত্রার আসরে ক্রমাগত তাঁকে রাজা-উজিরের পার্টে নামতে দেখা গেল। দ্বারিকবাবু অতিশয় কড়া মেজাজের লোক, এসব তাঁর বরদাস্তের বাইরে। তবুও যা হোক, মা-বাপ-হারা ছোটভাইয়ের খেয়াল কিছুদিন তিনি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু খগেনবাবু যেদিন কলকাতায় গিয়ে এক পেশাদারি থিয়েটারে নাম লিখিয়ে এলেন সেদিন তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল—বাড়ি থেকে দিলেন তাঁকে দূর করে।

'বেপরোয়া খগেন্দ্র সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকা চলে গেলেন—মনে-মনে এই ধারণা নিয়ে যে, তাঁর অভিনয়-কলার একমাত্র সমঝদার হচ্ছে আমেরিকা; বায়স্কোপের অভিনেতা-হিসাবে হলিউডে ঢুকে তিনি জগৎজোড়া নাম কিনবেন। এদেশ থেকে রওনা হওয়ার আগে এই কথাই তিনি বলে গিয়েছিলেন এবং আরও জানিয়ে গিয়েছিলেন যে কোটিপতি না হয়ে এদেশমুখো আর হচ্ছেন না।

'কিন্তু ক্রোড়পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা যত সহজ, সে-স্বপ্নকে কাজে পরিণত করা যে ঠিক ততটা সহজ নয়, কিছুদিন আমেরিকায় বাস করবার পরই বাসু তা বুঝতে পারলেন। তাই বছর দশেক পরে ফের তাঁকে শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশেই ফিরে আসতে হল—দেশের ওপর মমতায় বুকটা তাঁর টনটন করে উঠছিল বলে নয়, বুকের নিচেই যে স্থূলতর জিনিসটি রয়েছে সেটা খাদ্যাভাবে সর্বদাই চনচন করছিল বলে।

'বাংলাদেশে তখন সিনেমা-শিল্পের যুগ চলেছে, লাভজনক নতুন একটা ব্যবসার সন্ধান এখানে বহু লোক পেয়ে গেছে। যে-ব্যক্তি হলিউডে জীবনের আট-দশটি বছর কাটিয়ে সিনেমা-বিশারদ হয়ে এসেছে তার পক্ষে এটা বাস্তবিকই এক অপ্রত্যাশিত রকমের শুভ সময়। দেশে ফিরেই দেখতে-দেখতে প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং সিনেমা-ডিরেক্টর অশনিকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল—অশনিকান্ত তখন দু-চারজন উৎসাহী যুবক জুটিয়ে 'ডায়মন্ড করপোরেশন' নামে ছোট্ট একটি ফিল্মের কারবার গড়ে তোলায় মন দিয়েছেন। সকলের সমবেত পরামর্শে ঠিক হল, বেশ কিছু টাকার জোগাড় করে ব্যবসাটাকে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে—মিস্টার বাসু তাঁর এদেশে ফেরার কথা আত্মীয়স্বজন কারও কাছেই প্রকাশ করেননি, কেননা প্রকাশ করবার মুখ তখন তাঁর ছিল না।

'ঠিক এই সময়ে দ্বারিকবাবুর অসুখ, বিশেষ করে চোখের অসুখ খুব বেড়ে ওঠায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বার হল—তাঁর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি চাই। মিস্টার বাসু হঠাৎ যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। বড়দার অগাধ সম্পত্তি রয়েছে কেন, যদি না তা থেকে কিছু লুটে নিয়ে সিনেমা-ব্যবসায়ে তিনি ঢালতে পারেন! একটা কল্পিত নাম নিয়ে নিজেই তিনি এই প্রাইভেট সেক্রেটারির পদের জন্য প্রার্থী হবেন; তারপর একবার ঢুকতে পারলে সুযোগের অভাব হবে না—দাদার তহবিল থেকে মোটা রকমের কিছু সরাবার সুযোগের কথা বলছি। লন্ড চ্যানির লীলাভূমি হলিউডে বৃথাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণের আর্ট এতদিন ধরে শিখে এসেছেন যদি না সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে দেখেনি, তাঁর চেহারার পরিবর্তন সম্বন্ধে কোনও খবরই রাখে না, তাদের সাধ্য কী তারা তাঁর ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করতে পারে! দেখতে-দেখতে টাকের ওপর ব্যাক-ব্রাশ করা চুল দেখা দিল, চোখে চশমা উঠল, মুখে নানারকমের অদল-বদল ঘটল—ব্যস, অহিভূষণ চৌধুরী নামে সম্পূর্ণ একটি নতুন লোকের ভূমিকায় মিস্টার বাসু দ্বারিকবাবুর দরজায় এসে চাকরির উমেদার হলেন।

'দ্বারিকবাবুর রুচি, পৃথিবীর নানান বিষয়ে তাঁর নানারকমের মত—প্রভৃতি খুঁটিনাটি কোনও খবরই মিস্টার বাসুর অজানা ছিল না; তার ফলে অল্পক্ষণের আলাপেই দ্বারিকবাবুর মনে হল, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত লোক ইনিই। অহিভূষণ-বেশী মিস্টার বাসু কাজে বহাল হয়ে গেলেন। তারপর দ্বারিকবাবুর চোখের ব্যামো যতই বাড়তে লাগল, মিস্টার বাসুরও কারবারের ওপর আধিপত্য ততই বেড়ে চলল। এককথায়, দ্বারিকবাবুর তিনি ডান হাত হয়ে দাঁড়ালেন, এবং সে-কথাও কারওরই জানতে বাকি রইল না।

'এইবারে মিস্টার বাসু মন দিলেন নিজের কার্যোদ্ধারে এবং শিগগিরই চমৎকার একটি সুযোগ জুটে গেল। দ্বারিকবাবু খুব তাড়াতাড়ি একটা জমিদারি কিনে ফেলবার মতলবে ছিলেন, তাই হঠাৎ একসঙ্গে অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়ল। ব্যবসায়ীদের টাকা সবসময়ে হাতে থাকে না, ব্যবসায়ে খাটে। তাই আপাতত তিনি তাঁর সোনার হরিণ ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকা ধার করলেন; তারপর টাকা-শোধের বন্দোবস্ত করে নিজের অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুকে উপদেশ দিলেন ব্যাঙ্ক থেকে সোনার হরিণটি খালাস করে আনতে। অবিনাশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে রত্নটি ছাড়িয়ে এনেছেন—তখনও দ্বারিকবাবুর হাতে তা ফিরিয়ে দেননি, ঠিক এই সময়টুকুর মধ্যেই মিস্টার বাসু চরম ধূর্তের মতো একটি চাল চেলেই বাজিমাত করে দিলেন। টাইপ-রাইটারের সাহায্যে একখানা কাগজে তিনি দ্বারিকবাবুর জবানিতে একখানা চিঠি লিখলেন; তার মর্ম—"আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি অহিভূষণ চৌধুরীকে আপনি অবশ্যই চেনেন—তার হাতে সোনার হরিণটি ফেরত পাঠালে সুখী হব।" তারপর চওড়ায় ঠিক সমান-সমান, অথচ লম্বায় খানিকটা খাটো আর-একখানা কাগজে ব্যবসা-সংক্রান্ত একখানা চিঠি লিখলেন—সবটা কাগজ জুড়ে। এইবার একটা ফ্ল্যাট-ফাইলের ওপর প্রথম কাগজখানা রেখে, খালি চোখে নজরে আসে না, এমনি একরকম হাল্কা আঠার সাহায্যে দ্বিতীয় কাগজের নিচের প্রান্তটুকু প্রথম কাগজের গায়ে এঁটে দিলেন। প্রথম কাগজখানা লম্বায় বড় থাকায় তার খানিকটা অংশ নিচের দিকে বেরিয়ে রইল। দ্বারিকবাবু চোখে খুবই কম দেখেন, তাতে আবার সময়টা রাত্রি, কাজেই জোড়ার দাগটাতে খুব যত্নের সঙ্গে খড়ি বা সাদা কোনও রাসায়নিক পদার্থ ঘষে দিলে কিছুই তাঁর নজরে আসা সম্ভব নয়—অর্থাৎ একটা কাগজের ওপর আর একটা কাগজ যে চাপানো হয়েছে তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না—মনে ভাববেন একটাই বুঝি কাগজ। ফ্ল্যাট-ফাইলের ওপর কাগজ ধরে রাখতে অনেক সময় ফাইলের দুধারে স্ট্র্যাপও দেওয়া হয়, মিস্টার বাসু একটা স্ট্র্যাপকে সরিয়ে জোড়ার দাগের ওপর নিয়েও থাকতে পারেন—তবে দ্বারিকবাবুর মতো ক্ষীণদৃষ্টি লোকের কাছে তার কোনও দরকার ছিল না।

'দ্বারিকবাবু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রথম চিঠির বেরিয়ে-আসা অংশের ওপর সই করে দিলেন—অর্থাৎ তাঁর সই পড়ল মিস্টার বাসুর লেখা প্রথম চিঠিখানায়—দ্বিতীয়খানায় নয়। ব্যস, সেই চিঠি অবিনাশবাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ নিয়ে অহিভূষণরূপী মিস্টার বাসু ভেগে পড়লেন। তারপর থেকেই অহিভূষণ চৌধুরী পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার জায়গায় দেখা দিল খগেন্দ্রনাথ বাসু, যার সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীর চেহারার আর এতটুকুও মিল নেই। খুঁজে মরো এবার অহিভূষণ চৌধুরীকে! কিন্তু যাবার আগে মিস্টার বাসু আরও একটা চাল চেলে গেলেন। পাছে দ্বারিকবাবু বাঘা ডিটেকটিভ লাগিয়ে অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্ধান-রহস্যটার কিনারা করতেই বেশিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সেই ভয়ে তাঁদের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মে দেবার জন্য—তাঁদের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারবার উদ্দেশ্যে—এমনি একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, যাতে সকলের মনে হয়, তিনি কতকগুলো ভীষণপ্রকৃতি লোকের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন—তারাই তাঁকে যন্ত্রের মতো চালিয়েছে। এই ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারলে স্বভাবতই দ্বারিকবাবুদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়বে সেই মিথ্যে দলটারই সন্ধান করা; মরুক তারা মরীচিকার পেছনে ঘুরে।

কী করে ঘরের জঞ্জালস্তূপের ভেতর তাঁর কাছে লেখা "ডাকাত-দলের" চিঠি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত হল, কী করে তিনি ঘরের ভেতর কাজ করতে-করতে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন বলে ধারণা জন্মাল—একে-একে সবকথাই বলব।'

চব্বিশ : এক গ্রামের লোক

পরদিন ভোরবেলায় সকলে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নৌকোর ভিতর হুকা-কাশি তাঁর গল্প শেষ করেন নাই; ইচ্ছা করিয়াই যেন অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন। ট্রেনে ওঠার পরও সেখানে এমনই অসম্ভব ভিড় দেখা গেল যে, সকলে জটলা পাকাইয়া এক জায়গায় বসিবে এমন সম্ভাবনাই রহিল না। হাওড়ার স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া সলিল। পরে জানা গেল, হুকা-কাশিই টেলিগ্রাম করিয়া তাহাকে আনাইয়াছেন।

গাড়ি হইতে জিনিসপত্র নামাইতে-নামাইতে হুকা-কাশি বলিলেন, 'এখন আর কোনও কথা নয়, সটান বাড়ি গিয়ে সকলেরই বিশ্রাম। কথাবার্তা যা বলবার সে ফের কাল সকালে হবে। শরীরের ওপর দিয়ে ঝড়টা তো আর মন্দ যায়নি! অমৃত, তুমি এগিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি দ্যাখো তো! রণজিৎবাবু আর সলিলবাবু, আপনারা কিন্তু আমারই সঙ্গে যাবেন।'

পরদিন সকালেই সন্তোষ আসিয়া হুকা-কাশির বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল; দেখা গেল, তারকেশ্বরের কৌতূহলও বড় কম নয়, সে সন্তোষেরও আগে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। আর সলিল এবং রণজিৎ তো কাল হইতে হুকা-কাশিরই বাড়িতে অতিথি। উপস্থিত সকলের জন্যই চা এবং জলখাবার তৈরির হুকুম দিয়া হুকা-কাশি আবার তাঁর গল্প বলিতে বসিলেন :

'সোনার হরিণ করায়ত্ত করে মিস্টার বাসু আবার তাঁর স্বাভাবিক বেশে নিজের "বন্ধুদলে" ভিড়ে পড়লেন অর্থাৎ অশনিকান্তদের দলে। ডায়মন্ড করপোরেশনটিকে জাঁকিয়ে তুলে একটা বড় রকমের ফিল্ম-কোম্পানি এবার গড়ে তুলতে হবে, আদত যে-জিনিসটির দরকার সেই টাকার সমস্যাই যখন চুকে গেছে। কিন্তু কখন কীভাবে টাকাটা খরচ করা হবে সেইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে হয়তো তাঁর সঙ্গে অশনিকান্তের মতের অমিল হয়ে থাকবে, অথবা হয়তো অশনিকান্ত ব্যবসা-ট্যবসা ছেড়েছুড়ে একটা মোটা রকমের নগদ টাকা ট্যাকস্থ করবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবে—ঠিক কী কারণে এখনও বলতে পারছি না, অশনিকান্ত কিন্তু মনে-মনে আগেকার সমস্ত মতলবই পাল্টে ফেললে। রামদয়াল নামে তাদের গাঁয়ের একজন লোক বহুদিন ধরে কাশীবাসী হয়ে, প্রকাশ্যে বাবার মন্দিরের পাণ্ডা, অথচ আসলে কাশীধামের গুণ্ডাগিরি করে দিন গুজরান করছিল। এসব তথ্য অশনিকান্তের অজানা ছিল না। এবার সে তারই শরণ নিলে। রামদয়ালের কাছে চিঠি গেল—"তুমি ধারণায়ও আনতে পারো না এমনি দামি একখানা রত্ন আমার শুধু খোঁজে নয়, একেবারে হাতের মুঠোর ভেতর রয়েছে। আমায় যদি ন্যায্য বখরা দিতে রাজি থাকো, পত্রপাঠমাত্র তৈরি হয়ে কলকাতায় চলে এসো।" দলবলসুদ্ধ রামদয়াল চলে এল কলকাতায়; দেনা-পাওনার কথা পাকাপাকি হয়ে যেতেই একদিন রাত্তিরবেলায় অশনিকান্ত কোনও ফিকিরে তাদের বেলেঘাটা বাসা-বাড়ির অধিকাংশ লোককেই বাইরে নিয়ে গেল, যাতে করে রামদয়াল নির্বিবাদে সোনার হরিণটি লুটে আনতে পারে।

'রামদয়াল সোনার হরিণ লুটে আনল বটে, কিন্তু কাজটা সে যে একদম নির্বিবাদেই সারতে পারলে এ-কথা বলা চলে না; তার কাণ্ডকারখানা একজনের চোখে পড়ে গেল—আমাদের সলিলবাবুর।

'অহিভূষণ চৌধুরী সরে পড়বার দিন কয়েক আগে থেকেই কয়েকটা ব্যাপারে সলিলবাবুর

মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে—বোধহয় দ্বারিকবাবুর এই নতুন সেক্রেটারি এবং তাঁর মেজভাই একই ব্যক্তি—দ্বারিকবাবুর ভয়ে নিজের আসল পরিচয় দিতে তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না, এইভাবেই নিজের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। ভগবান "দিন" দিলে —দ্বারিকবাবুকে নিজের কাজে খুশি করতে পারলে—তখন ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে আপনা থেকেই পরিচয় দেবেন। কিন্তু দু-দিন বাদেই যখন সোনার হরিণ উধাও হয়ে গেল এবং প্রকাশ পেল যে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীও নিখোঁজ হয়ে পড়েছে তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ওঁর কাছে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে এল। জঘন্য একটা মতলব নিয়ে ইচ্ছে করেই যে ছদ্মবেশে মিস্টার বাসু এ-বাড়িতে ঢুকেছিলেন সে-সম্বন্ধে ওঁর আর কোনও সন্দেহই রইল না। সেই সঙ্গে-সঙ্গে সলিলবাবু নিজের কর্তব্যও ঠিক করে ফেললেন—বড়দার এত সাধের ধন সোনার হরিণ, যে করেই হোক, উদ্ধারের ব্যবস্থা উনি করবেনই। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে মেজদাকেও বাঁচাতে হবে; দুনিয়ার কাছে শেষপর্যন্ত তিনি যে একটা ইতরশ্রেণীর বাটপাড় বলে প্রমাণিত হবেন, তা-ই বা উনি সহ্য করেন কোন প্রাণে? ওঁর কথাবার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও এমন কোনও ইঙ্গিত প্রকাশ পেলে চলবে না যাতে করে কারুর মনে একবারও সন্দেহ জাগতে পারে যে, মিস্টার বাসুই অহিভূষণ চৌধুরী।

'বেলেঘাটার দিকে কোনও বাড়িতে মিস্টার বাসুর দল আড্ডা গেড়েছে, এইরকম সন্দেহ করবার একটা কারণ ঘটায় শহরের ওই অঞ্চলটাতে সলিলবাবুকে দিনকতক খুব ঘন-ঘন ঘোরাফেরা করতে হল। শেষে একদিন সন্ধ্যার পর বাড়িটাও উনি এঁচে ফেললেন; কারও সাড়া-শব্দ নেই বাড়িতে, চারিদিক অন্ধকার, শুধু ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। হাতে টর্চ ছিল, সদর দরজায় উঁকি মারতেই তো ওঁর চক্ষুস্থির! সামনের ঘরটাতেই একটা চারপেয়ের ওপর চাদর-চাপা-দেওয়া এক নেপালী দরওয়ান চোখ বুজে পড়ে আছে, তার সারা শরীর খাটিয়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গুরুতর রকমের একটা কিছু ঘটেছে আন্দাজ করে চট করে ওপরে উঠে যাওয়াটা উনি ভালো মনে করলেন না, নিচে থেকেই টর্চের আলোতে আর কিছু আঁচা সম্ভব কি না দেখতে লাগলেন। হঠাৎ ওপরের কথাবার্তা কানে এসে যেতেই প্রকৃত ব্যাপারটা সলিলবাবু বুঝে ফেললেন—চোরের ওপর বাটপাড়ির বন্দোবস্ত হচ্ছে—সোনার হরিণের হাতবদলি হচ্ছে। একদৌড়ে অমনি উনি বাইরে চলে এলেন, যদি কোথাও কোনও সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু ও-পাড়াটা যে একেবারেই নিরিবিলি! প্রায় পরের মুহূর্তেই গুটিকতক লোক ওই বাড়িটা থেকেই বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তার ধারে একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই তাতে চেপে বসল। একজনের হাতে, সলিলবাবু দেখতে পেলেন, একটা বড় পুলিন্দা। বাড়ির ভেতর থেকে মিস্টার বাসুর গলার আওয়াজ তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—যাক, প্রাণে মারেনি তা হলে। সেখানে দাঁড়িয়েই সেই মুহূর্তে সলিলবাবু ওঁর যথাকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন; অন্য কিছু করবার আগে সর্বপ্রথম কর্তব্য ওই "ডাকাতে গাড়ি"টা কোথায় যায়—সেইটে জেনে নেওয়া। কাজটা ওঁর পক্ষে শক্ত বলে মনে হল না এইজন্য যে, মিস্টার বাসুদের ভাড়াটে বাড়িটার অল্প কিছু দূরে, একটা গাছের আড়ালে অন্ধকারে ওঁর টু-সিটার গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল। "ডাকাতে গাড়ি"টা রওনা হয়ে পড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সলিলবাবুর টু-সিটারও পিছু-পিছু ছুটল। রাস্তায় চিৎকার করে অততায়ীদের গাড়িখানা থামাবার চেষ্টা উনি একবারও করেননি, কেননা গাড়িখানা বাস্তবিকই থামাতে পারলে সোনার হরিণ উদ্ধার হতো বটে, কিন্তু মিস্টার বাসুকে বাঁচানো আর সম্ভব হতো না। আর তা ছাড়া যে-গাড়ি রাতের বেলায় অত জোরে ছুটে চলেছে তাকে আদৌ থামানো সম্ভব হতো কি না কে জানে!

'অনেকটা পথ চলে আসার পর সলিলবাবু দেখলেন সূরযমল নগরচাঁদ লেনের একটা বাড়ির সামনে এসে "ডাকাতে গাড়ি"খানা থেমে গেছে। উনি বেশ করে লক্ষ করলেন, ও-গাড়ির আরোহীরা সবাই একে-একে নেমে পড়ল, শুধু একজন বাদে; সে-লোকটিকে নিয়ে গাড়ি ফের কোথায় রওনা হয়ে পড়ল; বোধহয় সোনার হরিণটাকে আরও নিরাপদ জায়গায় রেখে আসতে। রাস্তা নির্জন

BanglaBook.org

হয়ে পড়তেই উনি তখন টু-সিটার থেকে নেমে এলেন; দেখলেন, ওপরের একটা ঘরে হঠাৎ ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোতে স্পষ্ট টের পাওয়া গেল যে, ওই ঘরটাই ডাকাত-দলের সাময়িক আড্ডা।

'এইবার সলিলবাবু বাস্তবিকই পড়ে গেলেন দারুণ দ্বিধায়। সোনার হরিণ ফিরে পেতে হলে আমায় এই ডাকাত-দলের সন্ধান দেওয়া নিতান্তই দরকার, অথচ নিজে উনি এ-বিষয়ে কোনওই উচ্চবাচ্য করতে পারেন না, কেননা তা হলে এমন সব জবাবদিহির ভেতর পড়ে যাবেন যাতে মিস্টার বাসুর রহস্য আর কোনওরকমেই চেপে রাখা সম্ভব হবে না। ঠিক সেই কারণেই পুলিশে খবর দেওয়াও অসম্ভব। আপনারা হয়তো বলবেন, কেন, আমার নামে একটা বেনামী চিঠি লিখে সেই চিঠিতে এ-বাড়ির নম্বরটা দিয়ে দিলেই তো হতো! হয়তো হতো, কিন্তু সলিলবাবু মনে-মনে বিবেচনা করলেন, সে-চিঠি পেয়ে আমি এদিকে আসবার আগেই হয়তো ব্যাটারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর-কোথাও চম্পট দেবে। তাই শেষপর্যন্ত উনি ঠিক করলেন—এমন একটা সূত্র আমার হাতে গুঁজে দেবেন, যাতে করে ডাকাতগুলো ভেগে পড়লেও ফের তাদের টেনে বার করতে আমায় বেগ পেতে না হয়। ওঁর ছোট ক্যামেরাটা নিয়ে বাড়িটার আশপাশে পরদিন সমস্তক্ষণ উনি ঘুরে বেড়াবেন, যখনই ডাকাত-দলের কেউ কোনও দরকারে একবার বাড়ির বার হবে, অমনি লোকটার সম্পূর্ণ অজানতে তার চেহারা ক্যামেরায় তুলে ফেলবেন। মতলবটা মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনওই কাজে এল না; ও-ব্যাটারা আসল ঘুঘু, লোকের চোখে ধুলো দেওয়াই হল ওদের ব্যবসা। সামান্য কারণে রাস্তায় বেরোবার দরকার হলেও চেহারা এমনি বদলে আসে যে, আসল চেহারা—যা আগের দিনে উনি দেখেছিলেন—তার সঙ্গে নকলের আর এতটুকু মিল থাকে না। আসল চেহারা যেটা, তার ফটো নেওয়ার সুযোগ আর মেলেই না। সলিলবাবু বুঝলেন, ফটো নিতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ওঁকে এগুতে হবে—সে-পথ বড়ই মারাত্মক, বড়ই বিপজ্জনক, সে-পথে যেতে হলে মনে চাই দুরন্ত সাহস। ওঁকে তারিফ না করে পারছি না, কেননা এ-কাজটা উনি সমাধা করলেন বাস্তবিকই নিখুঁতভাবে।

'শ্মশানের চুল্লি থেকে আধ-পোড়া অবস্থায় উঠে এলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন ধারা হয়, ঠিক সেই রকমের একটা মুখোস আর তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরও দু-একটা সরঞ্জাম সেদিন বিকেলবেলাতেই সমস্ত টেরিটিবাজার আর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ঘুরে-ঘুরে সলিলবাবু সংগ্রহ করে ফেলেন। আর সংগ্রহ করলেন একটা দড়ির মই। তার মাথার দিকে দুটো লোহার ডান্ডা এমনি গোলভাবে বাঁকানো রয়েছে যে, তাগ করে ছুঁড়ে ফেলতে পারলে কাঠের রেলিংয়ের ওপর সে-দুটো চমৎকার আটকে যায়; তখন খুব ভারি মানুষও যদি মই বেয়ে ওপরপানে উঠতে থাকে তা হলে হড়কে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। সমস্ত সাজ-সরঞ্জামে তৈরি হয়ে গভীর রাতে সলিলবাবু সুরযমল নগরচাঁদ লেনে এসে হাজির হলেন—কোমরে আঁটা ক্যামেরা, হাতে অসম্ভব পাওয়ারফুল টর্চ, যার আলোতে স্বাভাবিক মানুষের চোখ ধেঁধে যায়। ডাকাত-দলের খোঁদ আস্তানায় ঢুকে একেবারে খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উনি তাদের স্বাভাবিক চেহারা ক্যামেরায় বন্দি করে নেবেন; তা ছাড়া আর কী উপায় আছে? যে-জায়গাটিতে আসা দরকার, দড়ির মইয়ের সাহায্যে ঠিক সেই জায়গায় এসে উনি উপস্থিত হলেন।

'মনস্তত্ত্বের ওপর সলিলবাবুর যে দস্তুরমতো অধিকার আছে, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অত রাত্রে ডাকাত-দল যদি ঘুমিয়ে থেকে থাকে তবে ওঁর কাজটা অনেকখানিই সোজা হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতটা সৌভাগ্য বাস্তবিকই উনি প্রত্যাশা করেননি। কেউ-না-কেউ তাদের মধ্যে সতর্ক হয়ে জেগে থাকবে, এইটে ধরে নিয়েই উনি কাজে নেমেছিলেন, আর সেইজন্যেই নিজের তরফ থেকে ওঁর এতখানি সতর্কতা। মোটামুটি ওঁর কাজের প্রোগ্রামটা হল এইরকম—ভূতুড়ে মুখোস এঁটে, বীভৎস চেহারা নিয়ে জানালার পাশে এসে উনি দাঁড়াবেন; ভেতরে যারা জেগে আছে তারা আচমকা ও-মূর্তি দেখে ভয়ে শিউরে উঠবে; ঠিক সেই মুহূর্তে উনি একহাতে টিপে ধরবেন টর্চের

BanglaBook.org

বোতাম, অন্য হাতে ক্যামেরার কল... ব্যস, ফটো উঠে যাবে। আপনারা হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, ভূতের অস্তিত্বে সকলেই তো আর বিশ্বাস করে না—এমনও তো কেউ ওদের দলে থাকতে পারত যে মোটেই ভূত মানে না। সলিলবাবুর আবির্ভাবে ভয় না খেয়ে, পাল্টে সে যদি ওঁকেই আক্রমণ করে বসত? কিন্তু আগেই বলেছি, মনস্তত্ত্বে সলিলবাবুর সত্যিই দখল আছে। বাস্তবিকই যারা ভূত মানে না তারাও দুপুররাত্রে ও-রকমের মূর্তি দেখতে পেলে সাময়িকভাবে কিছু বিচলিত হয়ে পড়ে—অন্তত তক্ষুনি সিংহবিক্রমে তার উপর ঝাঁপিয়ে যে পড়ে না সেটা সত্যি। আসল বস্তুটা কী সেটা জানবার জন্যে তাদের ঔৎসুক্য হওয়া সম্ভব বটে, তবে তারা এগোয় আস্তে-আস্তে, চারদিককার আটঘাট বেঁধে, নিজেদের বাঁচিয়ে, তারপর। যেটুকু সময় তাতে যাওয়ার কথা, দড়ির মই বেয়ে নিচে নেমে সটকে পড়ার পক্ষে তা যে যথেষ্ট, সলিলবাবুর সে-কথা জানা ছিল। আর বাস্তবিক ঘটলও সত্যিই তা-ই।

'এইবারে সলিলবাবু ফটোখানা বেনামীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; একটা লোক বোধকরি জানলার কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, ফটোতে তার চেহারাটাই খুব স্পষ্ট উঠেছে, বাকি কয়েকজনের একটু ঝাপসা-ঝাপসা—তারা পেছনে রয়েছে। সেইসঙ্গে টাইপ-রাইটারে লেখা একটা চিঠিও ছিল—মিস্টার বাসুকে বাঁচিয়ে এই নতুন দস্যুদলের বিষয় যেটুকু খবর নির্ভয়ে দেওয়া চলত সেটুকু খবর ওই চিঠিতেই দেওয়া ছিল। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, আমাকে সত্যিই সাহায্য করবার জন্য এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে, না কি উল্টে সম্পূর্ণ বিপথে চালাবার মতলবে। যাই হোক, সূরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িটার ওপর একটু নজর রাখা দরকার মনে করলাম। সে-ভারটা আপাতত দেওয়া গেল রণজিৎবাবুর ওপরে। উনি সে-ঠিকানাটার কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলেন, ওরা কলকাতা ছেড়ে ভেগে পড়বার মতলব করছে—অবশ্যি ছদ্মবেশে। সঙ্গে-সঙ্গে উনিও ট্যাক্সি নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। ওরা গিয়ে উঠল জগন্নাথ ঘাটে; সোজা রেলের পথে না পালিয়ে খানিকটা পথ স্টিমারে এগিয়ে পরে রেল ধরবে—এই মতলব।

পঁচিশ : বিশ্লেষণ

'জগন্নাথ ঘাটে ঢুকে রণজিৎবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর টিকেট কেনা দেখতে লাগলেন; বুঝলেন, অন্তত হুগলি পর্যন্ত এই স্টিমারে এগোনোই ওদের মতলব। আরও বুঝলেন, ওদের সন্দেহ এড়াতে হলে জগন্নাথ ঘাটেই স্টিমারে ওঠাটা ওঁর উচিত হবে না, উচিত হবে হাওড়া থেকে ট্রেনে উত্তরপাড়া পর্যন্ত এগিয়ে, সেখানে এই স্টিমার ধরা। ই.আই.আর-এর টাইম-টেবল হাতে একজন ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করে নিলেন উত্তরপাড়ার গাড়ি ক'টায়। প্রকাশ্যে ওই ধরনের প্রশ্নটা করাই হল ওঁর প্রথম ভুল, কেননা ওঁর অজান্তে ওটা গিয়ে এমন একজন লোকের কানে পৌঁছাল, যে নাকি শেষপর্যন্ত ওঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল হয়ে দাঁড়াল। অশনিকান্তের কথা বলছি।

'সলা-পরামর্শ আগে থেকেই সব ঠিক ছিল, অশনিকান্ত এসেছিল তাই বন্ধুদের নিজে উপস্থিত থেকে স্টিমারে তুলে দিতে—তারা কলকাতা ছেড়ে গেছে, নিজে চোখে এটা দেখে তবে সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বে। হঠাৎ রণজিৎবাবুকে ওখানে দেখে আর তাঁর প্রশ্ন শুনে ওঁর আসল উদ্দেশ্য অশনিকান্তের চোখে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল—হাজার হোক, চালাক লোক তো! চুপিসাড়ে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে সে উপদেশ দিয়ে এল—তারা যেন পরের স্টেশনেই নেমে পড়ে, পিছনে ফেউ লেগেছে। তারপর স্টিমার বাঁশি বাজাতেই হাল্কা মনে সে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার পাপের প্রথম দফা প্রায়শ্চিত্ত জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সামনেই অপেক্ষা

BanglaBook.org

করছে।

'আপনাদের বোধহয় আগেই এ-কথা বলেছি যে, অশনিকান্ত ছাড়া মিস্টার বাসুর অন্তরঙ্গদের ভেতর আরও জনা দু-তিন অল্পবয়সী ছোকরা ছিল, আর তারাও সকলেই ডায়মন্ড কর্পোরেশনের চাঁই মেম্বার। সোনার হরিণ লুঠ হয়ে যাবার পর আগাগোড়া তারা অশনিকান্তের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখল—নিশ্চয়ই এর ভেতরে তার কোনও ছলাকলা রয়েছে! সে-ই তো একটা ছুতো করে সবাইকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে লুঠের পথ সহজ করে দিয়েছে! অশনিকান্তের পরের ব্যবহারও নিশ্চয়ই তাদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। একে গরম রক্ত, তার ওপর আশাভঙ্গ, প্রতিশোধ নেবার সুযোগে রইল তারা। কী উদ্দেশ্যে তা অবশ্য আঁচতে পারেনি, তবে জগন্নাথ ঘাটে অশনিকান্ত যে সেদিন সকালবেলায় গেছে, সেটা তারা বার করে ফেললে। ব্যস, তারপর অশনিকান্তও ফটক থেকে বার হয়েছে, তারাও হান্টার দিয়ে তাকে চাবকে লাল করে দিল।

'এদিকে রণজিৎবাবু তো উত্তরপাড়ার ঘাট থেকে স্টিমারে উঠেই একদম বেকুব—বাবাজিদের চিহ্নমাত্র নেই। পরের সব ঘটনা খুঁটিয়ে বলবার দরকার নেই, আপনাদের বোঝবার পক্ষে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে উনি যখন কলকাতায় ফিরে আসবার উদ্যোগ করছিলেন হঠাৎ তখন প্ল্যাটফর্মের ওপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে রামদয়ালের দেখা পেয়ে গেলেন। ইনিই যে সেই স্টিমার থেকে অদৃশ্য-হওয়া বাবাজিটি তা অবশ্য রণজিৎবাবু বুঝতে পারেননি, কেননা স্টিমারে ওঠার সময় ছিল তার ছদ্মবেশ, আর এখন ফুটে উঠেছে একেবারে আদি অকৃত্রিম চেহারা! ট্রেনের ভেতরেই এ-রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু তবুও যে রণজিৎবাবু প্রতারিত হলেন না, সেই গাড়িতেই তাকে অনুসরণ করলেন, তার কারণ হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফখানা। সলিলবাবুর তোলা মূল ফটোটা ওঁর হাতে দিইনি, সেটা আমার কাছে এখনও রয়েছে; পেছনের লোকগুলোর চেহারা তাতে খুব ঝাপসা রকমের উঠেছিল, তা থেকে জীবন্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট উঠেছিল শুধু রামদয়ালেরই চেহারাটা, তাই আমি আমার নিজস্ব ডার্করুমে বসে রামদয়ালের চেহারাটাই এনলার্জ করে নিয়েছিলাম, অন্য চেহারাগুলো একদম উড়িয়ে দিয়ে। রণজিৎবাবুকে সূরযমল নগরচাঁদ লেনে পাঠাবার সময় এই দ্বিতীয় ফটোখানা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম ফটোর লোকটার উপর একটু বেশিরকম নজর রাখতে। তাই ব্যান্ডেলে এসে প্রথম সেই মূর্তির দর্শন পেয়েই উনি অতটা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন।

'গাড়িতে কী-কী ঘটনা ঘটেছিল এবং শেষপর্যন্ত কাশী এসে গুণ্ডার দল নানান রকমে রণজিৎবাবুকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে শেষটায় কীভাবে একদিন বাগে পেয়ে বন্দি করে ফেলল সে-সবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কথা বাড়াতে চাইনে, তবে এটুকু জানবেন যে, ট্রেনের ভেতর কিন্তু ওঁর ওপর রামদয়ালের কোনও সন্দেহ হয়নি, হয়েছিল ওঁরই কামরার আর-একজন যাত্রীর ওপর; তিনি সলিলবাবুদেরই ভাগনে। দুপুররাত্রে গাড়িতে ঢুকে রামদয়াল তাকেই চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়, অথচ রণজিৎবাবুকে ঘুমন্ত পেয়েও ওঁর কোনও অনিষ্ট করেনি!'

সকলে অভিভূত হইয়া হুকা-কাশির এই চমকপ্রদ বর্ণনাগুলি গেগ্রাসে গিলিতেছিল, হঠাৎ সন্তোষ কথার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, 'মাফ করবেন, মিস্টার হুকা-কাশি, একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারছি না। এ-সমস্ত জটিল তথ্যগুলি কি আপনি শুধু বিশ্লেষণ করেই বার করে ফেলেছেন? এ যে জ্যোতিষীদেরও ক্ষমতার বাইরে!'

হুকা-কাশি হাসিলেন, কহিলেন, 'আগেই তো আপনাকে বলেছি, এ ঠিক অঙ্ক কষার মতো; নির্ভুলভাবে ধাপে-ধাপে অঙ্ক করে যেতে পারলে শেষপর্যন্ত ফল আপনার মিলবেই। রহস্যের সাড়ে পনেরো আনা সন্ধান সেইভাবেই আমি পেয়েছি, খুঁটিনাটি সামান্য যেটুকু জানবার ছিল কাল রাত্রে সলিলবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সম্পূর্ণ গল্পটি তৈরি হয়ে গেছে। শুধু এইজন্যেই নৌকোর ভেতর আমি আমার বক্তব্য শেষ করিনি, সলিলবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কীভাবে একটু-একটু করে

BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে গোটা রহস্যটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল তা জানতে আপনাদের যদি কৌতূহল হয়ে থাকে তবে তা মেটাতে এখন আর কোনও বাধা নেই। শুনুন—

'প্রথমে খবর পেলাম, দ্বারিকবাবুর সই-করা একখানা চিঠি দেখিয়ে অহিভূষণ চৌধুরী অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছে—অথচ দ্বারিকবাবু দৃঢ়স্বরে বলছেন তিনি কখনওই ও-চিঠিতে সই দেননি। হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ দুর্গাপ্রসন্নবাবু কিন্তু আবার তেমনি দৃঢ়স্বরেই বলছেন যে, ও-সই জাল নয়, নির্ঘাত দ্বারিকবাবুরই হাতের অক্ষর। তবে এ-ব্যাপারের মানে কী? এ-কথা আমায় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বারিকবাবু সম্প্রতি চোখের অসুখে বড়ই ভুগছেন, দৃষ্টিশক্তি বেজায় কমে এসেছে। তবে কি তাঁর ক্ষীণদৃষ্টির সুযোগ নিয়েই অহিভূষণ চৌধুরী কোনও চাতুরী খেলল না কি? আপনারাই বলুন, ঠিক এই ধরনেরই একটা সন্দেহ সকলের মনে আসা উচিত ছিল কি না, আশ্চর্যের বিষয় কারও মনেই তা আসেনি। টাইপ-করা চিঠিখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের নিচে ফেলতেই দেখলাম, যা ভাবা গেছে অবিকল তা-ই। বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বিষয়টা বেশ ভালো বোঝেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে একটু বিশেষ অজ্ঞই থেকে যান। দুর্গাপ্রসন্নবাবু যদি সইটা নিয়েই উঠে পড়ে না লেগে সই-এর ওপরেও একটু দৃষ্টি দিতেন তবে তাঁর ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস নিশ্চয়ই তাঁকে দেখিয়ে দিত যে, সেখানে পাশাপাশি সমস্ত কাগজটা ব্যেপে বেশ একটা অস্পষ্ট দাগের ছাপ রয়ে গেছে। খালি চোখে কিছুই নজরে আসে না সত্যি, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইরেজার দিয়ে কী একটা জিনিস আগাগোড়া ঘষে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। চিঠির রহস্য তখন ভেদ হয়ে গেল—অহিভূষণ চৌধুরী নিশ্চয়ই কাগজে চিঠিখানা টাইপ করে, লম্বায় ছোট অথচ চওড়ায় ঠিক ওই মাপেরই আর একখানা কাগজ হাল্কা আঠায় তার ওপর জুড়ে দিয়েছিল—প্রথম চিঠির নিচের অংশ বাইরে রেখে। দ্বিতীয় চিঠিখানায় লেখা হয়েছিল ব্যবসা-সংক্রান্ত অন্যান্য সব কথা—দ্বারিকবাবু সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিচে সই করেছেন, আর সে-সই পড়েছে গিয়ে প্রথম চিঠির ওপর। তাই দেখিয়ে অহিভূষণ সোনার হরিণ আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া আর কী অর্থ হতে পারে ও-দাগটার আমায় আপনারা বুঝিয়ে দিন।

'তারপর অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্ধানের কথা। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে অনেকেরই ধারণা, ঘরে বসে কাজ করতে-করতে সে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেননা তার টেবিলের খোলা খাতা, কাগজ-পত্র, লাল-নীল পেন্সিল সমস্তই পড়ে রয়েছিল। কলকাতা ফেরবার সময় ওগুলো রোজই সে ড্রয়ারে বন্ধ করে যেত। সেদিন দিনের শেষে সে বাড়ি ফিরে যাবার পর কই ওগুলো তো কেউ টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেনি! তবে পরদিন সে কাজে বাস্তবিক না এসে থাকলে ড্রয়ার থেকে ওগুলো কে বার করলে? তার ড্রয়ারের চাবি তো আর অপর কারও কাছেই থাকে না! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, পরের দিন সে আদপেই দ্বারিকবাবুর বাড়ি আসেনি, শুধু তার অন্তর্ধান সম্বন্ধে লোকের মনে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে ধারণা জন্মিয়ে তাদের ভুল পথে চালানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক অহিভূষণ সেদিন সকালে এসেছিল, কি আসেনি, তা কিন্তু অতি সহজেই পরখ করা চলতে পারে। আসলে না-এসেও লোকের চোখে ধুলো দিতে হলে তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিল একটি; আগের দিনে বাড়ি ফেরবার সময় জরুরি খাতা-পত্তরগুলি খোলা-অবস্থায় টেবিলের ওপর রেখে, টেবিলটাকে একটা গাঢ় রঙের চাদরে ঢেকে রেখে যাওয়া! তার ঘরখানি এমন জায়গায় যে-দুপুরের খটখটে রোদেও সেখানে যেন একটু ভুতুড়ে-অন্ধকার-অন্ধকার ভাব লেগেই আছে, বেলার শেষে তো কথাই নেই। এ-অবস্থায় বেলা পড়ে এলে ঘোর রঙের একখানা চাদরে যদি টেবিলের ওপরকার খোলা খাতা-পত্তরগুলো ঢেকে রেখে যাওয়া যায়, তবে কারওরই নজর সেদিকে পড়বার কথা নয়। যে-চাকরটা সে-ঘর পরিষ্কার করে, যাবার সময় তাকে বলে গেলেই হল যে, সকালবেলা এসেই চারদখানা সে যেন সরিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য এ ছাড়া আরও একটা পন্থা যে ছিল না, তা নয়। চাকরটাকে কিছু বখশিশ করলে তারই হাতে ড্রয়ারের চাবিটা সে রেখে যেতে পারত, বন্দোবস্তটা

BanglaBook.org

হতো এই যে, সকালবেলা এসে ড্রয়ার খুলে খাতা-পত্তরগুলো সে-ই টেবিলে ওপর খুলে রেখে দেবে। কিন্তু শেষের চাইতে আগের মতলবটাই যে বেশি সোজা তা বোধহয় আপনারা স্বীকার করবেন। চাকরটার হাতে "পান খেতে" আনা-চারি পয়সা দিয়ে আমি যদি বলি, "ওরে, কাল আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে, আর সবাই কিছু টের পাবার আগে তুই টেবিলের ওপরকার এই চাদরটা সরিয়ে নিয়ে যাস তো!" তা হলে তার মনে গুরুতর রকমের কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়—বড়জোর ভাববে, কর্তা কড়া লোক, বাবু দেরি করে এসেছেন শুনলে হয়তো রাগ করবেন, তাই তাকে ও-কাজ করতে বলা হচ্ছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে তিনি সময়মতো এসেই কাজে বসেছিলেন, হঠাৎ কোথায় উঠে গেছেন। কিন্তু তার হাতে জরুরি দলিল-পত্রের চাবি দিয়ে গেলে স্বভাবতই মনে তার বিশ্রী রকমের সন্দেহ এসে যাবে, হয়তো ভবিষ্যতে বিপদে পড়বার ভয়ে চাবি নিতেই সে রাজি হবে না, উল্টে পাঁচজনের কাছে তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে দেবে। আর তা ছাড়া কর্তার গোপনীয় কাগজপত্র যে-ড্রয়ারে রয়েছে তার তালায় সে চাবি লাগাতেই বা যাবে কোন ভরসায়, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে যে একদম শ্রীঘর-বাস। অহিভূষণ চৌধুরী তখন তার হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে নাকি? রামচন্দ্রঃ!

'এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক করলাম, আমার এ-অনুমান ঠিক কি না গোড়াতেই সেটা পরখ করে দেখতে হবে; অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে অন্ধকারের ভেতর অনেকটাই আলোর রেখা যে ফুটে উঠবে তা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। অনুমান মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলে, অবশ্য অন্য পথে এগোনো দরকার হয়ে পড়বে।

'যে-ঘরটায় বসে কাজ করতে-করতে অহিভূষণ চৌধুরী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলে প্রকাশ, আমরা তখন সেই ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে—আমি, রণজিৎবাবু, দ্বারিকবাবু আর আপনি সন্তোষবাবু, মনে পড়ে? হঠাৎ দ্বারিকবাবু এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন যাতে আমার কাজ অর্ধেক এগিয়ে গেল। ক'দিন ধরে ঘরটায় ঝাট পড়েনি, মেঝেতে তাই বেজায় ধুলো জমে রয়েছিল, তিনি রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-ঘর পরিষ্কারের জিম্মা কার ওপর?" জবাব পেলেন—চাকর কালীচরণের ওপর। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "ডাক সে-হতভাগাকে আমার আছে।"

'দূর থেকে কালীচরণকে আসতে দেখেই আমি মনে-মনে আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম—লোকটাকে ভাববার জন্য একটুও সময় দেওয়া হবে না; কাছে আসতেই এমনি দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করে বসব যাতে সে মনে-মনে বুঝতে পারে আমি সবকথা আগাগোড়া জানি, আমার কাছে কোনও জিনিস চেপে রেখে ফল হবে না। সে ঘরে ঢুকতেই তীব্রভাবে তার মুখের পানে তাকিয়েই একেবারে সোজা প্রশ্ন করে বসলাম, "কোথায় রেখেছ সে-চাদরটা?" কালীচরণ থতমত খেয়ে গেল, কিছুই অস্বীকার করতে সাহস পেলে না, বললে, "আছে, আমারই ঘরে।" যাক, আমার অনুমান তা হলে মিথ্যে হয়নি, অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে, ফল মিলে গেছে; তাকে বললাম, "যাও সেটা নিয়ে এসো গে।" আসলে কিন্তু চাদরটার চেহারা দেখবার জন্যই যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল, তা নয়; অন্য মতলব ছিল। তাকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে আরও গুটিকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার ছিল। চাদর আনবার জন্য যেই সে বাইরে এসেছে অমনি আমিও তার পিছু-পিছু এসে প্রশ্ন করলাম, "সেদিন অহিভূষণবাবু তাঁর টেবিলের নিচে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন, এগুলো খবরদার ফেলে দিয়ো না, এই ঘরের দরজায় জমা করে রেখো, কেমন ঠিক নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবুমশাই।"

"আর সেই ছেঁড়া কাগজের জঞ্জালের ভেতর একটা মুখ-খোলা আস্ত খামও ছিল, কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও ছিল, মনে পড়ছে।"

'ব্যস, আরও খানিকটা আলোর সন্ধান পাওয়া গেল, অহিভূষণের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা গেল। কেউ তাকে শাসিয়ে কোনও চিঠিই লেখেনি, সে নিজেই দ্বারিকবাবুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে, সোনার

BanglaBook.org

হরিণ গাপ করেছে; তারপর যাতে কাল্পনিক একটা দলের ওপর সকলের সন্দেহ পড়ে সেই মতলবে ওই ভয়-দেখানো চিঠিখানা লিখে সেটাকে এমন জায়গায় রাখবার বন্দোবস্ত করে গেছে যাতে তার খোঁজ করতে গেলেই চিঠিখানা নজরে আসে। নতুবা শুনেছেন কখনও যে, ও রকম চিঠি মানুষ অত তাচ্ছিল্য করে ফেলে দেয়? ঘরের দোরে পাওয়া গেছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ওটা ইচ্ছাকৃত।

ছাব্বিশ ঃ টাইপ-রাইটার যন্ত্র

'শ্রীপুরে অহিভূষণ চৌধুরীর কর্মস্থল ছিল দুটি, প্রথম—দ্বারিকবাবুর সেই বিশেষ ঘরখানা, দ্বিতীয়—চিনির কারখানা। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে যা কিছু দেখবার সমস্তই দেখা হয়ে গেছল, কাজেই দিন দুই পরে রণজিৎবাবুকে সঙ্গে করে একদিন চিনির কারখানায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল।

'আপনাদের বোধকরি মনে আছে, সে-সময়টাতে কারখানার সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে যেখানে যা কিছু খুঁটিনাটি জিনিসপত্তর পাওয়া যায় সবই এনে অফিসের টেবিলটার ওপর জমা করা হচ্ছিল। হঠাৎ সেই 'মিউজিয়ামের' স্তূপে একটা আশ্চর্য বস্তু লক্ষ করলাম—সবুজ রঙের বাঁধানো একটা একসারসাইজ বুক, কিন্তু অর্ধেকটা তার আগুনে পুড়ে গেছে। খুলে দেখি, ফার্স্টবুক-পড়া এক কচিছেলের হাতের লেখার খাতা ওখানা, শুনলাম পাওয়া গেছে অহিভূষণ চৌধুরীরই বসবার ঘরের কাছে একটা উনোনের ভেতর। ভালো করে খানিকক্ষণ লেখাগুলোর ওপর তাকিয়ে থাকতেই চোখ আমার খুলে গেল। এ তো ছোটছেলের লেখা নয়, দস্তুরমতো ইংরেজি-জানা কোনও বয়স্ক লোকের হাতের অক্ষর! ছোটছেলেরা যখন প্রথম লিখতে শেখে তখন তাদের হাতের অক্ষর থাকে গোটা গোটা, লেখার প্যাঁচ আয়ত্ত করা তখন তাদের একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ-লেখা কাঁচা হাতের হলেও মাঝে-মাঝে অভিজ্ঞ লোকের লেখার মতো প্যাঁচ রয়েছে এতে। ছোটহাতের "d" গুলোর সামনের দিকটা কোথাও লেজের মতো নিচের দিকে নেমে আসেনি, বরাবর টিকির মতো মাথার দিকে উঠে গেছে। ছেলেরা ওভাবে "ডি" লেখে না! কথার মাঝখানকার "e" গুলো দেখলাম অনেক জায়গাতেই বড় হাতের—ও-অভ্যাসও বয়স্কদের মধ্যেই দেখা যায়, ছেলেদের ভেতর কক্ষনও না! বড়দের মধ্যে অনেকে ক্যাপিটাল "M" প্রায় লেখেই না, ফুলস্টপের পরেও ছোট হাতের "m" লেখাই তাদের অভ্যাস। এ-লেখাতেও তাই রয়েছে—ফুলস্টপের পর সব অক্ষরই ক্যাপিটাল, কিন্তু "m" গুলো আগাগোড়া ছোট হাতের। কচিছেলেরা অতশত জানে কি? আরও একটা বিশেষ লক্ষ করবার জিনিস এই যে, প্রথম পৃষ্ঠার লেখায় আর শেষ পৃষ্ঠার লেখায় একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা দস্তুরমতো পেকে এসেছে। ছেলেদের লেখা পাকতে ঢের বেশি দেরি হয়; ওটা কতকটা নির্ভর করে ইংরাজি-জ্ঞানের ওপর কি না।

'ব্যাপারটা তখন অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল—একজন বয়স্ক লোক চুপিচুপি কারখানায় বসে বাঁ-হাতে লেখা অভ্যাস করছিল; তারপর লেখা অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে দেখে খাতাখানা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত উনোনে সেটা ফেলে দেয়। কিন্তু কে এ-লোকটি? অহিভূষণ চৌধুরী নয় তো? গোটা কারখানার ভেতর শুধু তারই একখানা একলাই নিজস্ব বসবার ঘর আছে, কাজেই কারখানার ভেতর বসে গোপনে কোনও কাজ করবার সুযোগ তারই সবচাইতে বেশি। আর তা ছাড়া অন্য সবাই শ্রীপুরেরই লোক, গোপনে লেখা পাকাতে হলে তাদের নিজেদের বাড়ি আছে, সকাল-সন্ধ্যা আছে—সেসবের সুযোগ না নিয়ে কারখানায় তারা মরতে আসবে কী জন্য? কেবল 'অহিভূষণ'ই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, কলকাতায় ফেরে রাত দশটা সাড়ে দশটায়, আবার সকাল হতে-না-হতেই বেরিয়ে পড়ে। কলকাতার মেসের বাসায় তার অবসর কোথা?

BanglaBook.org

'অহিভূষণ বেশিদিন হল দ্বারিকবাবুর কাজে ঢোকেনি; যদি হাতের লেখার মক্স বাস্তবিক সে-ই করে থাকে, তবে খুব সম্ভব তার মতলব ছিল এখানকার লেখাপড়ার সমস্ত কাজ সে বাঁ হাতেই চালাবে। তাই যদি হয় তবে যতদিন না লেখা বেশ রপ্ত হয়ে এসেছে, ততদিন সে নিশ্চয়ই টাইপ-রাইটারের সাহায্যেই কাজকর্ম চালিয়ে এসেছে—আজকাল এ-অভ্যাস অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আশ্চর্য হবার কিছুই নাই এতে। তা হলে টাইপ-রাইটারের ফিতে অবশ্যই তাকে একটু বেশি-বেশি পাল্টাতে হয়েছে, কেননা অফিসের কাজকর্ম তো বড় কম নয়। সত্যিই তাই কি না সেটা ঠিক সোজা আপনাদের জিজ্ঞাসা না করে মনিহারী জিনিসের হিসাবটা একবার দেখতে চাইলাম। যা ভাবা তা-ই, টাইপ-রাইটারের ফিতে সত্যিই খুব ঘন-ঘন এসেছে দেখা গেল। অঙ্ক আবার শুদ্ধ হয়েছে।

'এবার মনে প্রশ্ন জাগল—হঠাৎ অহিভূষণের বাঁ-হাতে লেখার বাতিক মাথায় ঢুকল কেন? ডান হাতে লেখায় ক্ষতি ছিল কি? ডান হাতে লিখলে পরিচিত লোকে চিনে ফেলবে, এই ভয়েই তো লোকে বাঁ-হাতে লেখে জানি! তবে কি অহিভূষণের ডান হাতের লেখা আপনাদের সকলেরই পরিচিত? অহিভূষণ চৌধুরী কি তবে দ্বারিকবাবুরই পূর্ব-পরিচিত কোনও লোক—নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে নতুন সেক্রেটারি সেজে বসেছে? হু-হু করে নতুন ধরনের এক চিন্তা মাথায় এসে ঢুকল। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে অহিভূষণের ঘরখানার কথা মনে পড়ে গেল; অন্ধকার ঘর, তার ওপর লোকজনের যাতায়াত সেদিকে নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, ছদ্মবেশধারীর পক্ষে এই ধরনের ঘরই যে খুব প্রিয় হবে তাতে আর কথা কী! শুনেছি, লোকজনের সঙ্গ সে আদৌ পছন্দ করত না; কি দ্বারিকবাবুর বাড়িতে, কি কারখানায়, নিজের ঘরটিতে নিরিবিলি আপনার মনে কাজ করে চলে যেত। চেনা লোকের ভেতর যে আসল পরিচয় গোপন রাখতে চায় তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এটা বরং এর উল্টো হলেই আশ্চর্য হবার কথা ছিল। ট্যারা চোখের ছুতো নিয়ে আসল দৃষ্টি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাও লোকের মনে ওই একই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। একটা-একটা করে সমস্ত লক্ষণই হুবহু মিলে গেল; মনে মনে স্থির বুঝলাম, "অহিভূষণ চৌধুরী" বলে কোনও লোকই কোনও জন্মে ছিল না, ওটা শুধু একটা বানানো ছদ্মনাম। দ্বারিকবাবুর এবং আপনাদেরই চেনা কোনও লোক ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার কুমতলবে ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে, সেক্রেটারি হয়ে আপনাদের পরিবারের ঢুকেছিল, কাজ হাসিল করে এখন সটকে পড়েছে। নকল চেহারা ছেড়ে দিয়ে এখন সে ধরেছে তার আসল মূর্তি—মর সবাই এখন সেই মিথ্যে লোকের, আর তার চাইতেও মিথ্যে "চক্রান্তকারী"-দের পেছনে ঘুরে।

'কে এই পরিচিত লোকটি? বড়ই জটিল, দুরূহ প্রশ্ন—কোনওমতে কোনওদিকে ধরা-ছোঁয়া দেবার এতটুকু ফাঁক সে রেখে যায়নি।

'দিন দুই পরের ঘটনা। "অহিভূষণ" যে বাজে চিঠিখানা অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সেইটে দুর্গাপ্রসন্নবাবুকে ফেরত পাঠাব; কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় অমৃত এসে লেফাফায় মোড়া একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খাম খুলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম—অদ্ভুত একটা বেনামী চিঠি! তাতে লেখা আছে—

"সোনার হরিণ যারা সরিয়ে নিয়েছিল তাদের কাছে ও-বস্তুটি আর নেই। একদল গুণ্ডা গায়ের জোরে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গভীর রাত্রে ভূতুড়ে মুখোশ পরে কোনও লোক তাদের—নং সুরযমল নগরচাঁদ লেনের আস্তানায় হাজির হয়ে ফ্ল্যাশ লাইটে সেই দস্যুদের একখানা ফটো তুলে এনেছিল; সেটা সে এইসঙ্গে আপনার কাছে পাঠাল—এই ভরসায় যে, হয়তো আপনার দিক থেকে সোনার হরিণ উদ্ধারের কিছু সাহায্য তাতে হতে পারে। ইতি..."

BanglaBook.org

'সে ফটোখানাও চিঠির সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটা যে শুধু বেনামী তা-ই নয়, লেখকের হাতের অক্ষর পর্যন্ত তাতে দেওয়া নেই, আগাগোড়া ইংরেজি টাইপ-রাইটারে লেখা। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম; হঠাৎ মনে হল, ধীরে-ধীরে চোখের সামনে একটা কালো পর্দা যেন সরে যাচ্ছে, পরিষ্কার আলোর রেখা ফুটে বার হচ্ছে। এ-কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কোনও টাইপ-রাইটার যন্ত্র পুরোনো হলে তার সবগুলো হরফ আর কিছু একই রকমের থাকে না। কোনও কোনও অক্ষরের ওপর বেশি চাপ পড়ায় সেগুলোর একটা ধার হয় একটু বেশি ক্ষয়ে আসে, নয়তো বা ভেঙে যায়; কাজেই সেই-সেই অক্ষরের ছাপ কাগজের ওপর ওঠে আর-আর অক্ষরের চাইতে একটু বেশি অস্পষ্ট ভাবে। এইরকম একটা পুরোনো যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় একই সময় যতগুলি চিঠি লেখা হবে তার সবগুলোতেই "দাগী" অক্ষরগুলোর ছাপ একই রকম ভাবে উঠবে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হবে না। একটু আগেই আমি দেখছিলাম অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর কাছে পেশ করা "অহিভূষণের" চিঠিখানা, আর তার অব্যবহিত পরেই এল এই নতুন চিঠি। অবাক হয়ে দেখলাম, আগের চিঠিখানার যে-যে অক্ষরে ঠিক যে-যে রকম খুঁৎ, শেষেরখানায়ও সেই-সেই অক্ষরে অবিকল সেই রকমেরই খুঁত—বিন্দুমাত্র তফাত নেই! মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম, বেনামী চিঠির লেখক শ্রীপুরের চিনির কলেরই কোনও লোক, কেননা অফিসেরই টাইপ-রাইটার যন্ত্রে প্রথম চিঠিখানা লেখা হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে—দ্বিতীয়খানাও লেখা হয়েছে। কে এই বেনামী চিঠির লেখক সেইটে প্রথম খুঁজে বার করতে হবে—নিশ্চয় সে আসল ব্যাপারের কিছুটা রহস্য জানে!'

কথা কয়টি বলিতে-বলিতে হুকা-কাশি সলিলের দিকে তাকাইয়া একবার একটু মৃদু হাসিলেন, তারপর আবার বলিতে শুরু করিলেন, 'সেদিনই রওনা হয়ে পড়া গেল শ্রীপুরে, সোজা চিনির কারখানায়।...সেখানে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে এমনি একটা ভাব প্রকাশ করলাম যেন আমার জরুরি একটা কিছু হারিয়ে গেছে। কী হারিয়েছে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব দিলাম, "একটা ফটো, কিন্তু বড়ই দরকারী সেটা।" আসলে কিন্তু ফটোখানা মোটেই হারায়নি; দিব্যি বহাল তবিয়তে আমারই ডেস্কের ভেতর বিরাজ করছিল। আমার এ-লুকোচুরির মধ্যে একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য ছিল; আমি জানতাম, যে-লোক ফটো পাঠিয়েছে, সে কারখানাতেই আছে। ফটো হারিয়েছে শুনে সে মোটেই খুশি হবে না, কেননা তার আন্তরিক ইচ্ছা ওটার ওপর নির্ভর করেই আমি সোনার হরিণের খোঁজে নেমে পড়ি। ফটো যখন সে তুলেছে তখন সে-ফটোর নেগেটিভ প্লেটখানাও অবশ্যই তার কাছে আছে। যখন সে দেখবে হারানো ফটো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেই প্লেট থেকে আর-একখানা ফটো তুলে সে-ই আবার আমার কাছে পাঠাবে, মুখে বলবে হারানো ছবিই খুঁজে পাওয়া গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও টের পেয়ে যাব ফটোর মালিক কে, কে আমার বেনামী চিঠির লেখক!

'যে রকম ভেবেছিলাম, অবিকল তাই ঘটল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন ফটো-উদ্ধার হল না, তখন আমি কলকাতায় রওনা হয়ে এলাম। আসবার সময়ে বলে এলাম, যদি কেউ ওখানা খুঁজে পায়, আমায় যেন পাঠিয়ে দেয়, কেননা ওটা আমার বড়ই দরকারী। বাড়ি ফিরতেই সলিলবাবুর টেলিফোন—জানালেন, ফটো উনি খুঁজে পেয়েছেন। আমি জানলাম সলিলবাবু আমার বেনামী চিঠির লেখক, রহস্যের খানিকটা সন্ধান তিনি রাখেন।'

সলিল লজ্জায় রাঙা হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'অতি কঠিন লোক আপনি।' হুকা-কাশি বলিলেন, 'হ্যাঁ; কিন্তু আপনার ওপর গোড়া থেকেই আমার একটু নজর ছিল, সলিলবাবু! কালীচরণকে যখন গোপনে প্রশ্ন করি তখন আপনাকে বড়ই উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম, আবার যখন টাইপ-রাইটারের ফিতে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি তখনও আপনি অকারণেই ঘেমে উঠেছিলেন। এখন সে-সন্দেহটা বেশ দৃঢ় হল। হয় আপনি তথাকথিত অহিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে সাঁটে আছেন, আমাকে একটা বাজে চাল দিয়ে বিপথে চালাবার চেষ্টা পাচ্ছেন, আর নয়তো আপনি অহিভূষণের আসল পরিচয় জানেন, কিন্তু

BanglaBook.org

তাকে ধরিয়ে দিতে চান না; শুধু সোনার হরিণটাই দ্বারিকবাবুকে ফিরিয়ে দিতে চান। নইলে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে দেখা না করে অমন উড়ো চিঠি দেওয়ার মানে কী? এখন কথা হচ্ছে, কোন অনুমানটা ঠিক? প্রথমটা না দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয় অনুমানই যে ঠিক তা বোঝা গেল যখন দু-দিন পরেই টের পেলাম ফটোর লোকগুলি বাস্তবিকই বেপরোয়া দস্যু, রণজিৎবাবু যে সোনার হরিণ উদ্ধারে নেমেছেন তা তারা জানে; এবং সেইজন্য তাঁকে হত্যা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

'ব্যাপারটা বোঝা গেল এইভাবে ঃ

'সলিলবাবুর উড়ো চিঠি পেয়ে একখানা এনলার্জড ফটো হাতে রণজিৎবাবুকে আমি সূরযমল নগরচাঁদ লেনে ওই লোকগুলোর ওপর একটু নজর রাখতে পাঠিয়েছিলাম। তারপর আর রণজিৎবাবুর কোনও খোঁজ নেই। বড়ই ভাবনা হল, কিন্তু ক'দিন বাদেই ওঁর একখানা চিঠি পেলাম, বেনারস থেকে উনি লিখছেন। সেই চিঠির মধ্যে দরকারী যেসব খবর ছিল সেগুলো হচ্ছে এই—সূরযমল নগরচাঁদ লেনে উপস্থিত হতেই উনি দেখলেন বাড়ি খালি করে সে-বাড়ির লোকগুলো গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে সটকে পড়ছে; তারা জগন্নাথ ঘাটে পৌঁছে স্টিমারে হুগলির টিকেট করলে; অশনিকান্ত খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাদের রওনা হয়ে যাওয়া দেখছিল; হাওড়া থেকে উত্তরপাড়ায় গাড়ি ক'টায় ছাড়বে এই প্রশ্ন প্রকাশ্যে রণজিৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন এক টাইম-টেবলওলা ভদ্রলোকের কাছে—অবশ্য ডাকুগুলো তখন দৃষ্টি-সীমানার বাইরে ছিল। জগন্নাথ ঘাটের বাইরে এসে উনি দেখলেন অশনিকান্ত রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, দুজন যুবক নাকি ফটকের বাইরে তাকে হান্টার-পেটা করে পালিয়েছে; উত্তরপাড়ায় স্টিমারে উঠে রণজিৎবাবু হতবুদ্ধি হলেন এই দেখে যে সব ক'টা ডাকু ইতিমধ্যেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে; যে-লোকটার ফটো ওঁর হাত গুঁজে দিয়েছিলাম তার দেখা পেলেন রণজিৎবাবু ব্যান্ডেলে; ট্রেনের ভেতর লোকটা রণজিৎবাবুকে আদৌ চিনতে পারেনি; মোগলসরাইতে মাত্র ওঁরা দুজনই গাড়ির একটা কামরা দখল করে বসেছিলেন, অথচ রণজিৎবাবুর চেয়ে ঢের বেশি পালোয়ান হওয়া সত্ত্বেও সে ওঁর কোনও অনিষ্টের চেষ্টা করেনি—অনিষ্ট করা দূরে থাক চিনতেই পারেনি; কাশীর স্টেশনেও সেই অবস্থা; রণজিৎবাবু ওখানে গিয়ে হোটেলে ওঠার পরই কিন্তু ওরা ওঁকে চিনে ফেলে, গঙ্গায় বেড়াবার সময় ফাঁদ পেতে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করে।

'চিঠি পড়েই অঙ্ক কষতে শুরু করলাম। ডাকুর দল জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎবাবুকে চিনতে পারেনি, উনি যে ওদের পিছু নিয়েছেন সে-খবরও তাদের অজানা, তবে তারা হুগলি পর্যন্ত যাওয়া ঠিক করা সত্ত্বেও মাত্র দু-এক স্টেশন এগিয়েই নেমে পড়ল কী জন্য? নিশ্চয়ই তবে ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী কোনও লোক জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎবাবুকে দেখতে পেয়ে ওদের গিয়ে জানিয়ে এসেছিল—"সাবধান! পিছনে ফেউ লেগেছে।" এ ছাড়া এ-ব্যাপারের আর কী সমাধান হতে পারে বলুন দেখি। তারপর কাশী পর্যন্ত ওরা রণজিৎবাবুকে চিনলে না, অথচ কাশী যাওয়ার পরই ওদের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল এই-বা কী করে সম্ভব হতে পারে? নিশ্চয়ই ওদের সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" ব্যক্তিটি সেদিনই অন্য কোনও দ্রুতগামী গাড়িতে কাশীর দিকে রওনা হয়ে পড়েছিল, রণজিৎবাবুকে বেনারসে দেখেই ওঁর অনুসরণ করেছে। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাদের এখানে বলা দরকার; আমি জানতে পেরেছিলাম যে, সলিলবাবুর ভাগ্যে সম্পূর্ণ দৈবাৎ রণজিৎবাবুর সঙ্গে একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন, ফটোয়-ধরা-পড়া গুণ্ডাটা তাঁকেই তার অনুসরণকারী মনে করে গভীর রাত্রে চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে ফেলে দেয়। কাজেই লোকটার বরাবরই ধারণা ছিল—ফেউ যদি পিছনে কেউ লেগেই থাকে তো সে তাকে ইতিমধ্যেই নিপাত করে ফেলেছে। হঠাৎ তার সে ধারণা ওল্টাল কেন? এ-প্রশ্নের শুধু একই জবাব সম্ভব; নিশ্চয়ই সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" লোকটি কাশী গিয়ে উঠেছে, তারপর রণজিৎবাবুর অজান্তে ওঁর হোটেলে গিয়ে কৌশলে এই খবরটি সংগ্রহ করেছে যে, উনি ও-দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াতে যাবেন। ব্যস, দলকে গিয়ে খবরটি দেওয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমৎকার একটি ফাঁদের পত্তন।

'এই "হিতাকাঙ্ক্ষী" লোকটি যে অশনিকান্ত মিত্র ছাড়া আর কেউ নয় সেটা বার করে

ফেললাম এইভাবে; জগন্নাথ ঘাটে ওই ডাকুগুলোর স্টিমারে চড়া শুধু পথচারী লোকের দৃষ্টি দিয়ে নয়, নিতান্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে যে কেবলমাত্র সে-ই লক্ষ করছিল, সেটা রণজিৎবাবুরও চোখ এড়ায়নি, চিঠিতে স্পষ্ট উনি তা লিখেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, অনবরত সে নিজেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করছিল, আশপাশে বারবার সন্দিগ্ধভাবে চাইছিল—এ-কথাও রণজিৎবাবু জানাতে ভোলেননি। রণজিৎবাবুকে নিশ্চয়ই সে চেনে—অনেকবার ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে খেলতে দেখেছে; উনি আমার "জুড়িদার" তাও অজানা নেই, কেননা আমার ধারণা—কালীচরণের সঙ্গে আমি যখন কথা কই তখন অশনিকান্তকেই যেন শ্রীপুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। রণজিৎবাবু যখন উত্তরপাড়া যাওয়ার গাড়ি সম্বন্ধে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন অশনিকান্ত তখন ঠায় দাঁড়িয়ে তা শুনেছে, কিন্তু ঠিক তার পরের মুহূর্তেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! তারপর যখন শুনলাম জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সুমুখেই সে অকারণে হান্টার-পেটা হয়েছে তখন সব মিলে দস্তুরমতো একটা সন্দেহের ভাব তার বিরুদ্ধে জেগে উঠল। ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে। অশনিকান্ত বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেতা, তার ওপর খবরের কাগজে পড়েছি কিছুদিন ধরে "ডায়মন্ড কর্পোরেশন" নামে একটা ফিল্ম কোম্পানি গড়ে তুলতেও সে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই এহেন লোকের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না। ঠিকানা খুঁজে সে-বাড়িটায় গিয়ে উঠতেই তার বড়ছেলে নেমে এল, জিজ্ঞাসা করলে "কী চাই?" জবাব দিলাম, "অশনিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"তিনি তো নেই, ক'দিন হল কলকাতায় বাইরে গেছেন!"

"কবে গেলেন?"

'যে-তারিখটার কথা শুনলাম, মনে-মনে মিলিয়ে দেখি সেদিনই জগন্নাথ ঘাটের কাণ্ডগুলো ঘটেছে!

'এবারে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

'কপাল ঠুকে বলে দিলাম, "ডায়মন্ড করপোরেশন থেকে।"

'কথা ক'টা শোনবামাত্র ছেলেটির মুখের ভাব কেমন যেন হয়ে গেল; তাতে ভয়, রাগ দুটোই ছিল। হঠাৎ কয়েক পা পেছিয়ে সে একেবারে দেওয়ালের কোণটিতে চলে গেল; সেখানে ছিল একগাছা লাঠি ঠেসান দেওয়া, চেয়ে দেখি শক্ত মুঠোয় সে সেটা চেপে ধরেছে। তাকে আর না ঘাঁটিয়ে মনে-মনে হেসে আমি চলে এলাম। দুটো সমস্যারই তখন মীমাংসা হয়ে গেছে—প্রথম, অশনিকান্ত বাস্তবিকই সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" বন্ধু, ঘটনার দিনই সে কাশী রওনা হয়ে গেছে; দ্বিতীয়, যে-যুবক দুটি সেদিন তাকে হান্টার-পেটা করেছিল তারা ডায়মন্ড করপোরেশনের লোক। নইলে ও-নাম শুনেই ছেলেটার অমন পরিবর্তন দেখা গেল কেন?

সাতাশ : বাসু কাত!

'বাড়ি ফিরেই মনে-মনে আমি আমার থিয়োরি খাড়া করে ফেললাম। সলিলবাবু তাঁর উড়ো চিঠিতে লিখেছিলেন—"সোনার হরিণ যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল," "যে ছিনিয়ে নিয়েছিল" নয়। "যারা" শব্দটা বহুবচন, তার মানে দ্বারিকবাবুর মাথায় হাত বুলিয়েছে অহিভূষণ চৌধুরী একা নয়, জনাকয়েক একসঙ্গে জোট বেঁধে। তার মাথায় আবার হাত বুলালো রামদয়াল কোম্পানি। এর পরেই দেখতে পাচ্ছি, খুব চুপিচুপি সন্ত্রস্তভাবে রামদয়ালকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে সাহায্য করছে অশনিকান্ত, আর অশনিকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—ডায়মন্ড কর্পোরেশনের মেম্বাররা—প্রতিহিংসা নিচ্ছে ওরই ওপর। তারপর যখন মনে পড়ল, সুদূর শ্রীপুর গাঁয়ে দ্বারিকবাবুর বাড়িতে কালীচরণকে নিরিবিলি প্রশ্ন করবার সময় এই অশনিকান্তকেই আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছি, তখন সে-ব্যাপারটাকে আর

BanglaBook.org

"দৈবের ঘটনা" বলে ঠেলে ফেলতে পারলাম না। মনে-মনে বদ্ধ ধারণা জন্মাল যে, সলিলবাবুর "যারা" কথার অর্থ ডায়মন্ড কর্পোরেশনের সভ্যেরা, আর সেই সভ্যদের মধ্যে একজনা আমাদের তথাকথিত "অহিভূষণ চৌধুরী" আর-একজনা অশনিকান্ত মিত্র। অহিভূষণ বটপাড়ি করে সোনার হরিণ জোগাড় করেছে, খুব সম্ভব ডায়মন্ড কর্পোরেশনটাকেই জাঁকিয়ে তোলবার জন্য, আর অশনিকান্ত লোভে পড়ে গুণ্ডার দল ডেকে এনেছে, মোটা নগদ টাকা ট্যাঁকে গুঁজবার উদ্দেশ্যে। এই ডায়মন্ড কর্পোরেশনের কতখানি রহস্য সলিলবাবুর জানা আছে সেটা বার করবার জন্য ওঁকে আরও একটু নাড়াচাড়া দেবার দরকার বোধ করলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, রহস্য জানা তো দূরের কথা, ও-নামে যে একটা কারবার আছে তাই উনি জানেন না। আপনার মনে পড়ে সলিলবাবু, একদিন এনগেজমেন্ট করে সে-এনগেজমেন্ট আমি আর রাখিনি। আপনারই পাশে বসে এক পার্শী ব্যবসাদার তিতিবিরক্ত কণ্ঠে বারবার জানাচ্ছিল যে, হুকা-কাশির কথায় আর কাজে যে এমন গরিমল তা তার জানা ছিল না! তারপর আপনার সঙ্গে সে আলাপ শুরু করে দিলে। সে-পার্শী ব্যবসাদারটি কিন্তু স্বয়ং আমি-ই। আমায় মাফ করবেন, নিতান্ত দায়ে পড়েই এ-ছলনাটুকু আমায় করতে হয়েছিল—আপনার দাদার কার্যোদ্ধারের জন্য।

'ঠিক এই ঘটনারই আগের দিনে মিস্টার বাসু আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, জানলাম। আমি গুণ্ডাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেনারস রওনা হচ্ছি শুনে তিনিও আমার সঙ্গ নিতে চাইলেন, আর আমিও খুশি হয়েই তাতে রাজি হয়ে পড়লাম। তখন ওঁর সত্যিকার মতলব কিছুই টের পাইনি, বরং দাদার ওপর টান দেখে মনে-মনে তাঁকে প্রশংসাই করেছি। এখন অবশ্যি বুঝতে পারছি আসল উদ্দেশ্য ওঁর কী ছিল। অশনিকান্তকে যে অবস্থায় ফেরে বেনারসে আসতে হবে তা তাঁর চিন্তায় আসেনি, ভেবেছিলেন অমন দামি জিনিসটা অ-দানে অ-ব্রাহ্মণে যায় কেন, তার চাইতে সেটার উদ্ধার করে দ্বারিকবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে আখেরে হয়তো কাজ দেবে। তার চাইতেও ওঁর বড় উদ্দেশ্য হল এই যে, পদে-পদে আমার প্রত্যেকটি কাজের ওপর খরদৃষ্টি রাখবেন আর নিজের কুকীর্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখলেই আড়াল থেকে সব ভেস্তে দেবেন।

'দুজনা কাশী এসে পৌঁছালাম। আমি জানতাম রণজিৎবাবুর ওপর যখন অশনিকান্তের দৃষ্টি পড়েছে তখন আমার সম্বন্ধেও সে আর উদাসীন নেই; নিশ্চয়ই আমার ওপরও কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা হবে—যাতে কোনওক্রমেই না আমি কাশী এসে পৌঁছাতে পারি। চালাকির আশ্রয় তাই আমাকেও নিতে হয়েছিল, কিন্তু কাশীর মাটিতে পা দিয়েই বুঝলাম সে-সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে; অর্থাৎ আমার আসবার কথা অশনিকান্তের কাছে আর চাপা নেই। শুধু তা-ই নয়, "সুমিত্র নিকেতন" নামে ভেলপুরার যে-বোর্ডিং হাউসটায় আমরা আস্তানা গাড়ব বলে ঠিক করে এসেছিলাম সেটাও তারা এঁচে ফেলল। প্রথম চোটেই ধাক্কা খেয়ে মনটা একটু খিঁচড়ে গেছল অস্বীকার করব না, কিন্তু তারপরেই ফের যে-ধাক্কা খেলাম তার তুলনায় আগের ওটা কিছুই নয়—নগণ্য বললেই চলে। রণজিৎবাবু নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি, কোথায় রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এ-ব্যাপারের মূলেও যে অশনিকান্তেরই হাত তা আন্দাজ করতে অবশ্য দেরি হল না; চলে এলাম গোধূলিয়ার মোড়ের সেই হোটেলটাতে যেখানে রণজিৎবাবু প্রথম এসে উঠেছিলেন। ম্যানেজারের সঙ্গে দু-চার কথা কইতেই দেখি কিনা কলকাতায় বসে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি যেমন-ধারা এঁচেছি ঠিক তেমনিটিই ঘটেছে। সত্যিই রণজিৎবাবু ওখানে গিয়ে ওঠবার পর অশনিকান্তও নাকি এসে জোটে, তারপর কথার ফেরে ভালোমানুষ ম্যানেজারটির কাছ থেকে এই খবরটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যায় যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলাই উনি, মানে রণজিৎবাবু, দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে জল-বেড়াতে বেরোবেন। অশনিকান্তের চেহারার একটু বর্ণনা দিতেই ম্যানেজার বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকমই বটে সে-লোকটা দেখতে।'

'হোটেলে আসবার সময় রাস্তার একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম, যেটা আমার কাজে লাগল ভালো; খুব ধুম-ধাড়াক্কা করে, বাজনা বাজিয়ে, বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন বিলি হচ্ছিল—"মেঘপুষ্প" নামে বাংলা ছবিখানা সেদিনই নাকি প্রথম কাশীতে দেখানো হবে। কিছুদিন আগে কলকাতায় ও-ছবিখানা আমি দেখেছিলাম—কী একটা ভূমিকায় যেন অশনিকান্ত ওতে নেমেছে। আজ সে কাশীতে সশরীরে উপস্থিত। কাজেই নিতান্ত অসুবিধা না ঘটলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আর-একবার নিজের অভিনয় দেখতে সে বায়োস্কোপে উপস্থিত হবেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমিও তাই রওনা দিলাম সেদিক পানেই। আধুনিক ভাষায় আপনারা যাকে "প্রেক্ষাগৃহ" বলেন তার ভেতরে ঢোকবার আর প্রয়োজন হল না, দেখা গেল, বাইরে দাঁড়িয়েই শ্রীমান অপর এক বন্ধুর সঙ্গে দিব্যি গল্পে মেতে গেছেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, তার এই প্রাণের বন্ধুটি রামদয়াল, যার ফটো আমায় নিজে হাতে এনলার্জ করতে হয়েছিল। বন্ধুযুগলের আলাপও কিঞ্চিৎ কানে এল—আমার আর মিস্টার বাসুর মধ্যে একজনকে তো তারা চেনে এবং যে-কোনও মুহূর্তে কাশী এসে পড়তে পারে প্রত্যাশাও করছিল, কিন্তু অপরজনা কে তাই নিয়েই গবেষণা চলছিল। তাড়াতাড়িতে তার মুখটা ভালো করে চিনে রাখা যায়নি বলে ওদের মনে দুঃখ হয়েছে, দেখলাম। রামদয়ালের কথায় আরও টের পাওয়া গেল যে, কাশীতে সে যজমানি ব্যবসা করে অর্থাৎ সোজা কথায় প্রকাশ্যে সে কাশীর পাণ্ডা।

'নাথনি নামে সুমিত্র নিকেতনের একটা চাকর রামদয়ালদের টাকা খেয়ে আমাদের ওপর বেজায় গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছিল। ব্যাটার টিকির গোছা মোটা হলেও বুদ্ধিটা যে সরু তা বলতেই হবে; একটা-না-একটা জিনিস সর্বদাই ওর হাতে থাকত, যাতে ধরা পড়লেই সেটা দেখিয়ে অনায়াসে বলতে পারে যে, আমাদেরই কোনও কাজে এদিকপানে এসেছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ে, সেদিন ওর হাতে দেখলাম একটা জাঁতি-কল—বললে, ইঁদুর মারবার জন্যে ওটা না কি আমাদের ঘরে পাততে হবে। ও কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, জাঁতি-কলটা শেষপর্যন্ত ওর কোনও কাজে আসবে না, আসবে আমারই কাজে, আর তাতে ইঁদুর ধরা পড়বে না, ধরা পড়বেন সশরীরে মিস্টার বাসু। ঘটনাটা এবারে খুলে বলি শুনুন—

'রণজিৎবাবুর খোঁজে সেদিন আমি একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম, চা খাওয়া অবধি অপেক্ষা করিনি। পথে সেটা সেরে নেবার উদ্দেশ্যে এক চায়ের দোকানে ঢুকেই কিন্তু আমি একদম থমকে গেলাম—আমার ঠিক সুমুখেই রামদয়াল আর অশনিকান্ত হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। আমার দিকে তারা একবার ক্ষণিক দৃষ্টিতে চাইল বটে, কিন্তু আলাপ বন্ধ হল না, নাথনি যে সে-রাত্তিরেই ওদের সঙ্গে দেখা করবে সেই কথাই বলাবলি করতে-করতে চা খেয়ে চলল। বুঝলাম, আমায় ওরা চিনতে পারেনি। অবশ্য স্বাভাবিক চেহারায় কাশীধামে আমি নামিনি, কিন্তু তা হলেই বা কী, স্টেশনে নামামাত্রই তো ওরা আমায় এঁচে ফেলেছে, সেই চেহারাই এখন ওদের ভুলে যাওয়ার হেতু কী? তবে কি অশনিকান্ত স্টেশনে আমায় সেদিন মোটেই চিনতে পারেনি, চিনেছিল মিস্টার বাসুকে? তাঁকেই ওদের প্রধান শত্রু বলে ঠাউরে নিয়েছে—আমার দিকে তত্টা লক্ষ না রেখে? বায়োস্কোপে সেদিন এরা দুজন যে "অপর লোকটি" কে তাই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল, আর তার চেহারাটা ভালো করে চিনে রাখা হয়নি বলে আফসোস করছিল—আমিই কি সেই "অপর লোকটি", বাসু নয়? নিশ্চয়ই তাই, নতুবা এ-ব্যাপারের যে আর অন্য কোনও মানেই হয় না!

'কিন্তু মিস্টার বাসুকেই বা অশনিকান্ত কীভাবে চিনতে পারে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। অশনি মিত্তির বেনারস রওনা হয়ে আসার দু-তিনদিন পরে উনি প্রথম দেশে ফেরেন, পুরো দশ-দশটি বৎসর আমেরিকায় কাটিয়ে। অথচ সেদিন বায়োস্কোপে ওদের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি, তিনি যে-কোনও মুহূর্তে কাশী এসে পৌঁছোবেন বলে ওদের আতঙ্ক হচ্ছিল এবং কড়া পাহারারও বন্দোবস্ত হয়েছিল সেইজন্যেই। উনি যে কাশী আসবেন সে কথা আমি, সলিলবাবু আর সন্তোষবাবু ছাড়া আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এত লোককে বাদ দিয়ে যার ওপর সন্দেহ হওয়ার

BanglaBook.org

কথা কেউ ভাবতে পারে না, তার ওপর সন্দেহই বা হল কেন, আর স্টেশনে নামবামাত্র অশনিকান্তই বা তাকে চিনে ফেলল কীভাবে? তবে কি—তবে কি মিস্টার বাসু সবাইকে যা বলছেন তা ঠিক নয়, অর্থাৎ তাঁর লোক-দেখানো আসার তারিখটা প্রকৃত আসার তারিখ নয়, ওর ঢের আগেই গোপনে তিনি দেশে ফিরেছিলেন এবং ফেরার পরই অশনিকান্তের সঙ্গে কোনও সূত্রে ওঁর আলাপ ঘটে গেছল? এ ছাড়া এ-ব্যাপারের আর কোনও অর্থ করাই যে শক্ত! কিন্তু কেন? মিস্টার বাসুর এ-লুকোচুরি খেলার কারণ কী? সোনার হরিণ অথবা "অহিভূষণ চৌধুরী"-র সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই তো?

'মনের ভেতর এই ধরনের বিশ্রী একটা চিন্তা পুষে সুমিত্র নিকেতনে ফিরে এলাম। ঠিক তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল; মিস্টার বাসু নাথনির রেখে-যাওয়া জাঁতি-কলটা নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছিলেন, হঠাৎ ওঁর ডান হাতের তিনটে আঙুল কলের মধ্যে আটকে গেল—একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! ঠিক সেই মুহূর্তেই আমারও মাথায় চমৎকার একটা মতলব ঢুকল; "অহিভূষণ চৌধুরী" বাঁ-হাতে লিখে-লিখে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল, মিস্টার বাসু বাঁ-হাতে লিখতে পোক্ত কি না একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কী? মিস্টার বাসুরই জবানীতে সন্তোষবাবুর নামে এক চিঠি লিখে সই নেবার জন্যে ওঁর সামনে সেটা বাড়িয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় ডান হাত উনি নাড়তে পারেন না, সই হলে বাঁ-হাতেই করতে হবে। কিন্তু শিকাগো-ফেরতা লোক, ধড়িবাজিতে ওঁর নাগাল পাওয়া শক্ত; ন্যাকামি করে এমনি একখানা সইয়ের নমুনা দেখালেন যে, বাঁ-হাতে লেখা কস্মিনকালেও যে ওঁর আসে, কারও মনেই সে-সন্দেহ না জাগতে পারে। কিন্তু অতি চালাকেরও যে মাঝে মাঝে "নাকে দড়ি" পড়ে সে-সম্বন্ধে আপনাদের দেশেই প্রবচন আছে, এ-ক্ষেত্রেও হল তা-ই। চিঠিখানা ডাকঘরে না ফেলে সামনেরই একটা লেটার বক্সে ফেলে খুবই তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি কপাট ভেতর থেকে বন্ধ; তখন চাবির ফোকরে চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার রহস্য ষোলোআনাই ভেদ হয়ে গেল—যিনি বাঁ-হাতে লিখতে পারেন না বলে মাত্র মিনিট দশেক আগেই ন্যাকামির চূড়ান্ত করছিলেন এখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তিনিই দিব্যি তরতর করে বাঁ-হাতেই একখানা চিঠি লিখে যাচ্ছেন—নিবিষ্ট মনে। এতদিনের চেষ্টায় তা হলে অহিভূষণ চৌধুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল! আর সলিলবাবুও পাঁচজনের সন্দেহ-দৃষ্টি থেকে কাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে আসছেন তাও বোঝা গেল। মনে-মনে হেসে আমি দরজায় বার কয়েক ঘা দিলাম, তারপরেই আবার ফোকরে চোখ রেখে দেখতে লাগলাম কী-কী পরিবর্তন ঘটে ঘরের ভেতরটাতে। প্রথম পরিবর্তন দেখা গেল মিস্টার বাসুর মুখে, সাদা মুখ একেবারে কালো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটল তাঁর ব্যবহারে, সেই মুহূর্তে লেখা বন্ধ করে শেলফের কাছে এগিয়ে একটা বইয়ের ভেতর তিনি চিঠিখানা রেখে দিলেন; তারপর মুখখানাকে যতদূর সম্ভব সহজ অবস্থায় এনে তাড়াতাড়ি দোর খুললেন। আমিও বুঝলাম, অবিলম্বে ও-চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়া চাই-ই, কেননা যে-ব্যক্তি সোনার হরিণ সরিয়েছে এখন আবার কার কাছে তার গোপনীয় চিঠি পাঠাবার দরকার পড়ল সেটা জানতে হবে বইকী! হঠাৎ যেন একটা বিশেষ জরুরি কাজ পড়ে গেছে এবং তারই জন্যে আমাদের দুজনারই তৎক্ষণাৎ বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া দরকার—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে মিস্টার বাসুকে একেবারে রাস্তায় নিয়ে এলাম। তারপর "দাঁড়ান, ম্যানেজারের ঘর থেকে আসছি" বলে আবার ভেতরে ঢুকে এমনি একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটুকাল দাঁড়ালাম যাতে আমার ওপর কারও নজরই না পড়তে পারে। যখন দেখলাম চারদিক একদম নিরিবিলি তখন আস্তে-আস্তে পা টিপে ওপরে আসতে আর কোনও বাধা রইল না। আমাদের রুমটার সামনে গিয়েই দেখি কিনা নাথনি শেলফের কাছে দাঁড়িয়ে সেই বইখানা খুঁজছে। আমায় দেখেই তো তার মূর্ছা হওয়ার গতিক, আমিও তাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে, বই খুলে চট করে চিঠিখানা দেখে নিলাম। ছোট্ট স্লিপের কাগজে লেখা, আর সে-লেখাও সবে শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। কাজেই খবর বিশেষ কিছু পাওয়া গেল

না। তবে ও-পক্ষের উদ্দেশেই যে চিঠি পাঠানো হচ্ছিল তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, নইলে নাথনি এটার উদ্ধারে আসবে কেন? চিঠি লিখবার সময় সে যে ঘরের ত্রিসীমানায়ও ছিল না তা তো নিজের চোখেই দেখেছি। সমস্ত মিলে এবার থিওরিটা দাঁড়াল এই—আমার অগোচরে ইতিমধ্যেই—খুব সম্ভব সেইদিনই—মিস্টার বাসুর সঙ্গে অশনিকান্তের দেখা হয়ে গেছে। অশনিকান্ত তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সে চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু বাসু যদি তাকে ফাঁসাবার মতলব করে থাকেন তবে তিনি নিজেও বাদ পড়বেন না। অর্থাৎ, মরবার আগে বাসুকেও তিনি মেরে যাবেন, অহিভূষণ চৌধুরীর আসল রহস্য ফাঁক করে দেবেন। তখন দুজনের মধ্যে আপোসে রফা হয়ে গেল—ফিফটি-ফিফটি! ব্যস, বাসু ও-দলে চলে গেলেন, আমার সঙ্গে রইলেন শুধু পদে-পদে প্রত্যেকটি কাজ ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য। এরপরই নাথনিকে শিখিয়ে দেওয়া হল মিস্টার বাসুর প্রত্যেকটি হুকুম যথাযথভাবে তামিল করতে। আমি ম্যানেজারের ঘরের দিকে সরে যেতেই নাথনিকে ডেকে মিস্টার বাসু কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা বোধকরি আর আপনাদের বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই!

'রহস্য তো ষোলোআনাই ভেদ হল, কিন্তু এখনও যে বড়-বড় দুটো কাজই বাকি—রণজিৎবাবুর উদ্ধার আর দ্বারিকবাবুর জিনিস তাঁর নিজের হাতে সঁপে দেওয়া। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে নেমে পড়লাম ও-দুটো কাজে। জানা ছিল রামদয়াল কাশীর পাণ্ডা, কাজেই তার "অফিস" খুঁজে বার করতে গোল হল না; পরদিন সক্কালেই তসরের কাপড় পরে তীর্থযাত্রীর বেশে তার দোকানটিতে এসে হাজির হওয়া গেল। সে তখন দোকানে ছিল না, ছিল তার ছোট ভাই। দুজনে কথা কইছি, হঠাৎ দোকানের ভেতরেই কেমন একটা কলিংবেল যেন বেজে উঠল, আর সেও অমনি আমায় একটু অপেক্ষা করতে বলে শশব্যস্তে চলে গেল সামনেরই একটা পানের দোকানে। একটু বাদেই স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে, এ-দোকান দুটো আর কিছুই নয়, ওদেরই শিকার ধরবার ফাঁদ। কাশীতে কারা নতুন আসছে দু-কথাতেই ওরা বুঝে নেয়, তারপর কৌশলে কখন তারা কোথায় বেড়াতে যাবে জেনে নিয়ে লুঠের ব্যবস্থা করা। এ-কাজের জন্য ওদের নিজস্ব টঙ্গা, গাড়োয়ান সবই ঠিক আছে। সম্প্রতি দুটি বাঙালি ছোকরা শিকার জুটেছে, তাদের "ব্যবস্থা" করবার জন্যই কলিংবেলটি বেজেছিল। সবকথা বিতং দিয়ে বলবার দরকার নেই, আপনাদের শুধু এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে ওদের গাড়োয়ানটাকে সেদিন আমি কৌশলে শহরের বাইরে এনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম; ছোকরা দুটিও রক্ষা পেল, আর ফেরবার সময় ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দেওয়ায় সেও তার আস্তাবলে ফিরে এল, অর্থাৎ আস্তাবলটি আমায় চিনিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময়েই ওই গাড়োয়ানের এক ছোট্ট ন্যাংটা ছেলে পাশেরই একটা মেটে ঘর থেকে দৌড়ে এসে বললে, "বাবা এসে গেছে।" ব্যস, গাড়োয়ানের বাড়িটারও একটা হদিস পাওয়া গেল। এ-গাড়োয়ানটা আর কিছু রামদয়ালদের মতো "উচ্চশ্রেণীর জীব" নয়, কাজেই ওর অল্পবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো সম্ভব হবে মনে করে আমি খুব খুশিমনেই ফিরছিলাম, পথে একটা মজার ব্যাপার ঘটায় অতি অক্লেশেই রণজিৎবাবুর উদ্ধার সম্ভব হয়ে গেল, সোনার হরিণও হাতে ফিরে এল।

'ব্যাপারটা এই—অন্ধকারে গলিপথে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি একদল লোক সামনের ছোট্ট আর-একদল লোককে তেড়ে চলেছে, আর পেছনের দলে রয়েছে আমাদের এই তারকেশ্বর ভায়া—আমার বহুকালের চেনা বন্ধু। অবাক হয়ে গেলাম—তারকেশ্বর এখানে কেন? তারপরেই মনে পড়ল—ওঃ হোঃ, ও-ই তো "মেঘপুষ্প" ছবিখানার ডিরেক্টর, নিশ্চয়ই ফিলমের কাজে কাশী এসেছে। কিন্তু বায়োস্কোপের আর্ট ছেড়ে সত্যকারের বীরের পার্টও কেন নিলে সেটা জানবার ইচ্ছা থাকলেও তখন আর জানা গেল না, বাবা বিশ্বনাথের একটি সুপুষ্ট বাহনের কৃপায়।

'বাড়ি ফিরে এলাম; ঠিক জানতাম আজ যে-সব কাণ্ড করে এসেছি তারপর রামদয়াল, অশনিকান্ত এবং বাসুর দল আর সহজে আমায় নিষ্কৃতি দিচ্ছে না। বাসুর সঙ্গে এরপর থেকে একঘরে

রাত কাটানো আমার পক্ষে "সসর্পে চ গৃহে" বাসের-ই সামিল হবে, তাই সেইরাত্রেই ওঁকে ডাকবাংলোয় চালান করে, নিজেও গোপনে চলে এলাম ম্যানেজারের কামরায়। আপনারা শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, সেইরাত্রেই আমার "লীলা-খেলা" ঘোচাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু যাক—সে অন্য কথা।'

'পরদিনই সিনেমা-হাউসে খবর নিয়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে তাঁর হোটেলে গিয়ে দেখা করা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল সন্ধ্যার পর জনাকয়েক লোককে খুব জোরসে তাড়া করে যাচ্ছ দেখতে পেলাম। কেন হে?"

'তারকেশ্বর বললে, "ওঃ, দেখেছেন নাকি আপনি? একটা পুরানো অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল, তাই।"

'উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী রকম? প্রতিশোধটা কীসের?"

"আরে মশাই, সে আজ কিছুদিন আগেকার ঘটনা, জীবনে সেই প্রথম কাশী এসেছি; একটা পানের দোকানের সামনে—আমি আর আমার দুই বন্ধু পান কিনতে-কিনতে আলাপ করছি—আজ অমুক-অমুক জায়গা দেখতে হবে—রামকৃষ্ণ মিশন, ইউনির্ভাসিটি ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে এক টঙ্গাওয়ালা পাকড়াও করল, আমাদের সোয়ারী করে সে সবকিছু দেখিয়ে দেবে। লোকটার হাবভাব কেমন সুবিধার ঠেকল না, তবু তিন-তিনজন জোয়ান মরদ, ভয় খাব কেন, ওরই গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। ইউনির্ভাসিটি ঘুরে-ঘুরে দেখবার পর মনে হল গাড়োয়ানটা যেন ইচ্ছে করেই শুধু-শুধু দেরি করছে, অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে না আসা পর্যন্ত ওর যেন বাড়িমুখো হবার মতলবই নেই।

"দিব্যি রাত হয়েছে; নির্জন রাস্তা দিয়ে আমরা টঙ্গা চড়ে বাড়ি ফিরে আসছি—আমি আর আমার সেই দুই বন্ধু। 'মেঘপুষ্প' ছবিখানা সম্বন্ধে আলোচনা করতে-করতে এগোচ্ছি, অশনিবাবুর অভিনয় কেমন সুন্দর হয়েছে সেই কথাই বলছি, হঠাৎ কে একজন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার রাশ চেপে ধরল, আর সেই মুহূর্তেই চেয়ে দেখি অনেকগুলো লোক ছোরা হাতে আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। যে-লোকটা ঘোড়ার রাশ চেপে ধরেছিল, দেখা গেল সে আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা নয়—সকালে আমাদের পান কেনবার সময় হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে দোকানীর সঙ্গে ভেতরে একত্র কিছুটা সময় কাটিয়ে গেছল। আর আমাদের গাড়োয়ানটার ব্যবহারেও মনে হল, এই ঘটনাটির জন্য এতক্ষণ সে শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে যেন উদ্‌গ্রীবই হয়ে রয়েছিল। বুঝলাম, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রকাণ্ড চক্রান্তের ফল, আর সেই চক্রান্তের হেড-অফিস হচ্ছে গোধূলিয়ার ওই পানের দোকানটি। সাবাড় আমরা তক্ষুনি হয়ে যেতাম, কিন্তু রাখে হরি মারে কে? জানেন বোধহয় যে-বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটিতে বহু বাঙালি ছাত্র পড়ে—আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হপ্তায় একদিন তারা বায়োস্কোপ দেখতে শহরে আসে, এক-একদলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন ছেলে—সব বাইকে চড়ে। সেদিন ছিল এমনই একটা দিন, বায়োস্কোপ দেখে ওরা হোস্টেলে ফিরে আসছিল, পথে গুণ্ডার অত্যাচার দেখে একসঙ্গে সবাই নেমে পড়ল। তারপর মশাই, বাইক থেকে পাম্প খুলে নিয়ে ব্যাটাদের যা পিটুনি! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাতুড়িপেটা শরীর, দু-মিনিটে বাছাধনদের সর্ষে ফুল দেখিয়ে তবে ছাড়লে!"

'ওঃ, এই অত্যাচারেরই প্রতিশোধ? তাই বুঝি কাল ওদের ফাঁদে ফেলবার মতলব আগে হতে সব আটঘাট বেঁধে দুটি শাগরেদকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে পান কিনতে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তারকেশ্বর হেসে জবাব দিল, "হ্যাঁ, কিন্তু ফল বড় বেশি পাওয়া গেল না। তাড়া খেয়ে ওরা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু তারপরই যেন কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাস্তার ধারে সদর দরজাটা ভিন্ন সে-ঘরে আর দ্বিতীয় জানলা-দরজা যে ছিল না তা আমরা বেশ করে লক্ষ করেছি।'

BanglaBook.org

'হু; আচ্ছা অশনি মিত্তির কাশী এসেছে জানি, সে কোথায় আছে বলতে পারো?'

'শুনেছি তার দেশের কে একজন এখানে নাকি পাণ্ডাগিরি করে, তারই বাড়িতে অতিথি আছে। তবে সেটা কোথায় তা বলতে পারি না, পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে আমার তো আর কোনওদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি।'

'বাড়ি ফিরে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে বসলাম। রাস্তার দিককার সদর দরজাটা ছাড়া ঘরে আর কোনও দোর-জানলা নেই, তারকেশ্বর বলেছে। তা হলে লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল কোন পথে? হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি অবশ্যই। নিশ্চয়ই তা হলে ঘর থেকে গোপনে সরে পড়বার কোনও একটা গুপ্ত ব্যবস্থা আছেই। বাইরের কোনও লোকের তা ধরবার উপায় নেই, আর সে-সঙ্কেত জানাও বাইরের কারও পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত রহস্যটার শুধু এই একমাত্র সমাধানই হতে পারে। আর সবদিক ভেবে দেখতে গেলে এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা থাকার কথাও বটে! যে সাধু ব্যবসা এতদিন ধরে শহরের বুকে ওরা চালিয়ে আসছে তাতে, যে-কোনও মুহূর্তে পুলিশের লোকের পক্ষে বাড়ি ঘেরাও করা সম্ভব এটা কি আর ওরা ভেবে দেখেনি? সে-ক্ষেত্রে পলায়নের একটা ব্যবস্থাও কি আর করে রাখেনি? নিশ্চয়ই তা হলে অন্য কোনও গলির সঙ্গে এ-ঘরটার সংযোগ আছে; আমার উচিত হবে সেদিকেই নজর রাখা।

'গাড়োয়ানটার আস্তানার সন্ধান নিয়ে বাস্তবিকই কাজ আমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছিলাম। তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেই টের পেলাম, রোজই সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে একটা পানের দোকানে সে এসে উপস্থিত হয়, তারপর আর-একজনার কাছ থেকে দোকানের জিম্মা নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে। রাত বারোটা-একটার সময় আবার তাকে ছুটি দিয়ে দোকানে বসে এসে আর-একজন। অতরাত্রে ও-তল্লাটে একটি খদ্দেরকেও দোকানের দিকে ঘেঁষতে দেখিনি; দু-পয়সা দামের দোকান, চুরির ভাবনাও নেই, অথচ তা সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ অষ্টপ্রহরই সেখানে পাহারা রয়েছে। মনে-মনে কেমন একটা খটকা লাগল—এটা কি ঘাঁটি আগলাবার বন্দোবস্ত অর্থাৎ প্রধান আড্ডা থেকে রাস্তায় বেরোবার এটাই কি গুপ্ত দরজা? দু-দিন বাদেই আমার সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেল; আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দোকানটির দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ভেতরে দ্বিতীয় একটি লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমার সুমুখ দিয়ে সে ভেতরে ঢোকেনি, তবে এল কোত্থেকে? অনেকটা কাছে এগিয়ে দেখি, মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো, আর তার একপাশ দিয়ে ম্যান-হোলের ঢাকনির একটা অংশ উঁকি মারছে। সমস্ত রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সেদিনই তারকেশ্বরের হোটেলে গিয়ে আমি আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করলাম। একখানা চিঠি তৈরি করা হল—আসানসরাই এর "নীলকুঠি" থেকে কেউ যেন আমায় খবর দিচ্ছে যে, তার জিম্মায় যে বিশেষ দামি জহরতটা আছে সেটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার, কেননা যে কোনও মুহূর্তে সেটা লুঠ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা দাঁড়িয়েছে। আসলে কিন্তু এ-সমস্তই একেবারে ভুয়ো—আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একটা ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। ডাকে এ-চিঠিখানা যখন আমার নামে সুমিত্র নিকেতনের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছবে তখন নাথনি নিশ্চয়ই ওখানা করায়ত্ত করতে ভুলবে না; তাকে ওইরকমই শিখিয়ে দেওয়া আছে কিনা। আর চিঠি নাথনির হাতে পড়ার মানেই রামদয়ালদের হাতে পড়া; তারা আলগোছে ওখানা খুলে খবরটুকু জেনে নেবে, আমার হাতে চিঠি এসে পৌঁছবার অনেক আগেই। ওদের চরিত্র আমার খুব ভালোমতোই জানা আছে; এ-লোভ সম্বরণ অসম্ভব—চিঠি পড়বার পর যত শিগগির সম্ভব দলবল নিয়ে ওরা নির্ঘাৎ আসানসরাই রওনা হয়ে যাবে "নীলকুঠি" লুঠ করে জহরৎটি ট্যাকস্থ করবার সদভিপ্রায়ে। যে ক'টি লোককে আড্ডা পাহারার জন্য এখানে না রেখে গেলেই নয়, তারাই শুধু থেকে যাবে কাশীতে। সেই সুযোগে পেছন দিককার গুপ্ত পথে, অর্থাৎ পানের দোকান দিয়ে, ওদের আস্তানায় গিয়ে পৌঁছতে আমাদেরও আর

কোনও বেগ পেতে হবে না। বাস্তবিকই যে বেগ বেশি পেতে হয়নি তা আপনারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছেন।'

হুকা-কাশি থামিলেন। তারকেশ্বর একটু চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, 'আপনি ওদের বলেন ধড়িবাজ, কিন্তু সত্যিকার ধড়িবাজিতে আপনি যে ওদের শ্রীগুরুদেব!'

হুকা-কাশি হাসিলেন, বলিলেন, 'শেষদিকটায় কিন্তু শ্রীগুরুদেবও প্রায় ফেল মেরেছিলেন আর কী! ভালুক দেখে বাস্তবিকই আমি ভড়কে গেছলাম, রণজিৎবাবু বলে গোড়াতে চিনতেই পারিনি; মানে, মানুষ যে মানুষকে অমন পিশাচের মতো যন্ত্রণা দিতে পারে তা ভাবতে পারিনি। মাত্র দু-হাত দূরে ও-মূর্তি দেখে সত্যিই স্বীকার করছি আমার বুকের ভেতরটা একদম বসে গিয়েছিল। শুনেছিলাম—অবশ্য কখনও পরীক্ষা করিনি যে, বুনো জানোয়ারের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাইতে পারলে ওরাও বেশ একটু ঘাবড়ে যায়। সে চেষ্টা করতে গিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম —ভালুকের চোখ দুটোতে পলক বলে কোনও জিনিস নেই, তারা দুটো একেবারে স্থির, কোনওদিকেই তাদের গতি নেই—ঠিক যেন কাচের চোখ! আস্তে-আস্তে হাতদুটোর পানে তাকিয়ে দেখি, নিতান্ত অসাড়ের মতো সে দুটো ঝুলছে, এদিক-ওদিক কোনও দিকেই তিলমাত্র নড়ছে না। হাত দিতেই বোঝা গেল এও কৃত্রিম হাত! কেবল পা দুটো বাস্তবিকই ঠিক আছে। তৎক্ষণাৎ আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল—নকল ভালুকের কাঠামোর ভেতর একটি আস্ত মানুষকে পুরে রাখা হয়েছে। তার চোখ বন্ধ, কান বন্ধ, মুখ বন্ধ এবং যত দূর মনে হয়, হাত দুটোও দড়িতে বাঁধা। দিনের পর দিন এইভাবে চলেছে—ভাবুন দেখি, কী ভীষণ শাস্তি! বুঝলাম, এই আমাদের রণজিৎবাবু। শয়তানগুলোর মাথা আছে স্বীকার করতেই হবে, দরকারমাফিক ওঁকে আর কোথাও পাঠাতে হলে এই তো সেরা ব্যবস্থা—গোলমাল চেঁচামেচির এতটুকু আশঙ্কা নেই, বাইরের কারও মনে এতটুকু সন্দেহ ঘটবার হেতু নেই, কেননা ব্যবসার খাতিরে নাচ দেখিয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে ভালুক তো লোকে হরদমই পুষে থাকে, তাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নেওয়া হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? কী পাষণ্ডের কবলেই না আপনি পড়েছিলেন রণজিৎবাবু!... ভালো কথা, সলিলবাবু, সন্তোষবাবু, আপনারা তো শ্রীপুরে ফিরে যাচ্ছেন, সোনার হরিণটা আপনাদের সঙ্গেই দিয়ে দিই না কেন?'

'না না না, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; কর্তা আপনাকে দেখবার জন্য কাল থেকে আকুলি-বিকুলি কচ্ছেন।' সন্তোষ জবাব দিল।

'ওঃ, মিস্টার বাসুর কথা তাঁকে বলেছেন নাকি?'

'না, এখনও তা বলা হয়নি।'

হুকা-কাশি একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, 'আর বলেই বা কী হবে, বাসুকে কি আর দেখতে পাবেন বলে আশা করেন? একে শিকাগো-ফেরত লোক, তাতে আবার নাকি হলিউডে থেকে পাকা ওস্তাদদের কাছে ছদ্মবেশ ধরার আর্ট শিখে এসেছে; শেষরাত্রে ওদের কাছে যেই সমস্ত ব্যাপার শুনতে পাবে অমনি হয়তো এক লোটা-কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে কোথাও সরে পড়বে—তাকে চেনে কার সাধ্যি! তারপর হয়তো কিছুদিন বাদে আবার আমেরিকা—আবার ভাগ্যান্বেষণ!'

'আর বাদ বাকি গুণ্ডাগুলো? অশনিকান্ত?'' সন্তোষ সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

'বেনারস-পুলিশের কাছে তো তার করে দিয়েছি, দেখা যাক কদ্দুর কী হয়।... কে ও, অমৃত নাকি? বাবুদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করছ তো! এঁরা কিন্তু এ-বেলা এখানেই খেয়ে যাবেন।'

BanglaBook.org

গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা

BanglaBook.org

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ সে র উ ৭৪

এক

পরাশরের একটি বিশিষ্ট নতুন কাহিনী প্রকাশ করে অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হব জানি, কিন্তু এই কাহিনীটিই যে আমার গভীর শিরঃপীড়ার কারণ তাও জানিয়ে রাখা দরকার। শিরঃপীড়া যে কেন তা যথাস্থানে প্রকাশ করব।

পরাশরের এই বিচিত্র কাহিনীটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংশ্রব শুধু এইটুকু যে, অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসে পড়বার পর এটি পরিবেশনের ব্যাপারে আমিই প্রথম উৎসাহিত হয়েছি। নইলে এ-কাহিনীতে আমার যৎসামান্য ভূমিকাও যেমন নেই, এটির রচনাও তেমনি আমার নয়। এ-কাহিনী আমার হাতে এসে পড়ে একটু আচমকা ও অদ্ভুতভাবে।

পূজাসংখ্যা বার হওয়ার আগে সাধারণ কাগজের অফিসের কী হাল যে হয়, সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই তাঁরা আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

হোমরা-চোমরা কাগজের অফিসের কথা জানি না। সেখানে হয়তো অমন পঞ্চাশ জোড়া হাত থাকে, ঝামেলা আর ঠেলা সামলাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের মতো মাঝারিদেরই দিশাহারা অবস্থা। এক কূল সামলাতে আর-এক কূল ধসে ভেসে যায়। কিংবা বলা উচিত, একদিকের বোঝা হালকা করতে না-করতে আর-একদিকে কাজের বা কাগজের পাহাড় জমে যায়।

এই কাগজের পাহাড়ের মধ্যে যা সব থাকে, বেশিরভাগই তার আবর্জনা হলেও দু-একটা একেবারে ফেলনা নয়। অন্তত কৌতুকের খোরাক তার মধ্যে পাওয়া যায়।

যত হেলায়-ফেলায় হোক, নিজে একবার চোখ না বুলিয়ে তাই কোনও চিঠিপত্র বা ডাকে-পাঠানো লেখাই আমি ফেলতে দিই না। আমদানি-মার্কা বেশ ঢাউস তারের ট্রেটা চিঠিতে, কাগজে বোঝাই হয়ে উপচে পড়লেও আমার ফুরসত না হওয়া পর্যন্ত টেবিলের শোভাহরণ করেই বিরাজ করে।

পুজোর কাগজ বার করবার চাপটা সেদিন একটু হালকা হয়েছিল। সে-সংখ্যার কাগজে কী-কী যাবে মোটামুটি তার একটা ছক তখন করে ফেলেছি। কয়েকটা দামি লেখা হাতে পেয়ে কম্পোজ ধরানোও হয়ে গেছে।

একটু ফাঁক পেয়ে তাই জমানো চিঠি ও কাগজপত্রের স্তূপের যতটা পারি গতি করবার চেষ্টায় লেগেছিলাম।

কাগজের পাহাড়ের বেশিরভাগই খামের ভেতর পাঠানো কবিতা আর তা ছাপাবার জন্যে অনুরোধ।

দু-একটা মোটা প্যাকেট তার ভেতর যা মাঝে-মাঝে থাকে, তা অবশ্য উপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনীর পাণ্ডুলিপি। সে-উপন্যাস আর ভ্রমণকাহিনীর বিষয়বস্তু কিন্তু বেশিরভাগ না পড়েই বলে দেওয়া যায়।

উপন্যাস হলেই তা হবে ঐতিহাসিক, আর ভ্রমণকাহিনী হলেই হিমালয়ের কেদারবদরী, পশুপতিনাথ যদি না হয়, তা হলে অন্তত ঋষিকেশ, লছমনঝোলা হবেই।

ইদানীং মানে খুব সম্প্রতি আর-এক জাতের লেখাও এক-আধটা মাঝে-সাঝে হানা দিচ্ছে। এসব লেখাও উপন্যাস, তবে দুঃসাহসিকভাবে অসাধারণ, অত্যাচার ও অনন্য।

এমন অসাধারণ ও অনন্য আমার যে ক'টি লেখা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের একটির সঙ্গে আর-একটির কোনও তফাতই নেই। সব লেখাই যেন হঠাৎ এক আশ্চর্য আবিষ্কারের গর্বে ডগমগ। মানুষের ভাষাতে যে খিস্তি-খেউড় আছে, এইটেই হল আশ্চর্য আবিষ্কার। যে-লেখাই পড়া যাক, দেখা যাবে, পাত্রপাত্রী যে যেখানে পারে মনের সুখে অশ্লীল গালমন্দ আর খিস্তি চালাচ্ছে।

BanglaBook.org

আর সেইসঙ্গে গল্প যেমন জোরালো তেমনি আগুয়ান। পিছিয়ে-পড়া যুগের সেকেলে সব ল্যাট্রিন যেন নিজেদের কাঁচা দুর্বল কল্পনার লজ্জায় মানে-মানে চুনকাম হয়ে এই দুঃসাহসীদের পথ ছেড়ে দিয়েছে।

এবারের জমানো কাগজের গাদায় একটিমাত্রই ভারি রেজিস্ট্রি-করা প্যাকেট দেখতে পেয়েছিলাম। ঐতিহাসিক বা অনন্য কিছু হবে ভেবেই সাহস করে সেটি আগে খুলতে পারিনি। তার বদলে অন্য চিঠিপত্রগুলির ওপরই চোখ বোলাচ্ছিলাম প্রথমে।

সত্যিই প্রায় সবগুলিই কবিতা-সংক্রান্ত।

যেমন সব কবিতা, তেমনি তা ছাপাবার জন্যে অনুরোধের ভাষা।

কেউ লিখেছেন, বিনীতভাবে—'আমি জীবনে কখনও কবিতা লিখি নাই। কিন্তু সেদিন অফিস-টাইমে গুড়ের নাগরীর মতো ঠাসা অবস্থায় রড ধরিয়া বাদুড়-ঝোলা ঝুলিতে-ঝুলিতে অদূরবর্তিনী একটি মেয়েকে দেখিয়া হঠাৎ মনে যেন কবিতার বান ডাকিয়া গেল। অদূরবর্তিনীর মুখ দেখিতে পাই নাই। ভিড়ের ফাঁকে তাঁহার মাথার কবরীর একাংশমাত্র চোখে পড়িয়াছে। তিনিও আমায় দেখিতে পান নাই। দেখিবার উপায় ছিল না। তবু এই খণ্ডিত দেখার অসীম রহস্য আমার মনের মধ্যে কবিতার ছত্রগুলি যেন আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অফিসে পৌঁছাইতে যথারীতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। টেবিলে তখন রাজ্যের কাজ জমা হইয়া আছে। তবু প্রথমেই লেজারের বদলে একটি কাগজ টানিয়া লইয়া কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলাম। কবিতাটির নাম দিয়াছি, "দেখার ভগ্নাংশ"। ছন্দ ও মিলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো থাকিতে পারে, তবু এমন স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্রেরণার কবিতার মর্যাদা দিতে আপনারা কার্পণ্য করিবেন না, এ-বিশ্বাসে কবিতাটি আপনাদের পাঠাইতেছি। আশা করি, আপনাদের পূজাসংখ্যায় কবিতাটিকে মুদ্রিত দেখিতে পাইব।'

আমাদের কাগজের ঠিক পূজাসংখ্যা বলে কিছু নেই। সাধারণ সংখ্যাই কলেবরে একটু বাড়ে মাত্র। কিন্তু সেটুকু খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনমাত্র বোধ না করে কাগজ থাকলেই অতিকায় পূজাসংখ্যা থাকবে বলে ধরে নিয়ে কবিতাই বেশিরভাগ লেখক পাঠিয়েছেন।

বিনীত যেমন তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিও আছে।

কোনও একজন লিখেছেন—'কবিতা একটা পাঠালাম। বুঝতে পারবেন না জানি। কিন্তু নিজের বোধশক্তির ওপর নির্ভর না করে কবিতাটি পূজাসংখ্যায় ছাপবেন। কবিতা না বুঝে ছাপবার জন্যে আপনার দ্বিধার কোনও কারণ নেই। যেসব কবির নামে আপনারা গদগদ তাদের কতটুকুই বোঝেন? আমি আপনাদের জপমালার সেইসব কবির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চশ্রেণীর। তাঁরা ম্যালার্মে, বোদলেয়ার, আয়ান ভ্যালেরী কি ইয়েটস, এলিয়ট, পাউন্ড, স্পেন্ডার, ডাইলান টমাস ইত্যাদি যে ক'জন কবির কাছে দাসখত লিখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কবির কবিতা আমি মক্স করেছি। সেইসব কবিতার অনুপান মিশেল করে আমি যা বানিয়ে তুলেছি তা অনবদ্য। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে প্রুফ পাঠাবেন।'

আর-একজনের আবার এই প্রুফ পাঠানোতেই আপত্তি।

তিনি লিখেছেন—'অনুগ্রহ করে প্রথম কম্পোজের পর যা পাঠাবেন প্রুফ সংশোধন না করেই তা ছাপবেন। আমার বহু শ্রেষ্ঠ কবিতায় কম্পোজিটারগণের বিশেষ অবদান আছে।'

চিঠি ও কবিতাগুলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলব না বন্ধুবরের জন্যে রেখে দেব ভাবতে-ভাবতে প্যাকেটটা একটু অবহেলাভরেই খুলেছিলাম, কিন্তু খোলবার পর একটু পড়ে সত্যিই অবাক এবং বেশ উদ্‌গ্রীব হতে হল।

প্যাকেটের ভেতর পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা একটি বেশ মোটা পাণ্ডুলিপির তাড়া। তা কিন্তু হিমালয় ভ্রমণ বা ঐতিহাসিক উপন্যাস তো নয়ই, এমনকী দুঃসাহসী সাহিত্যে-যুগান্তর-আনা খেউড়-কীর্তনও নয়।

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ অন্য এবং অপ্রত্যাশিত কিছু।

লেখাটা আরম্ভ হয়েছে চিঠি হিসেবে আর চিঠিটা আমাকে উদ্দেশ করেই লেখা। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লিখছেন—

কৃত্তিবাসবাবু,

আপনি কাগজে পরাশর বর্মার কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করেছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। আপনার প্রকাশিত কাহিনীগুলি পড়েই এ-লেখাটি পাঠাতে উৎসাহিত হলাম।

পরাশর বর্মার গোয়েন্দাগিরির অনেক বাহাদুরির কথাই আপনি লিখেছেন, কিন্তু কেন, কখন, কীভাবে পরাশর বর্মা প্রথম গোয়েন্দাগিরিতে আকৃষ্ট হল তা বোধহয় জানেন না। পরাশর বর্মার অনুরাগীদের জন্যে সে-আখ্যান প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে মনে করি।

দুই

এই পর্যন্ত পড়েই ব্যস্ত হয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা হাতড়াতে হল। রেজিস্টার্ড প্যাকেটের ছেঁড়া মোড়কটা হেলাভরে সেখানেই ফেলে দিয়েছিলাম।

মোড়কটা উদ্ধার করে তা থেকে জানলাম, কাছাকাছি কোথাও না, দক্ষিণের সুদূর জলারপেট বলে এক শহর থেকে লেখাটি পাঠানো হয়েছে। লেখকের নাম শ্রীজলধর রায়।

নামটা দেখে একটু অবাকই হলাম।

পরাশরের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় এখন গভীর অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছে বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু তার মুখে এ-নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

পরাশর বর্মার প্রথম গোয়েন্দাগিরিতে আকৃষ্ট হবার বিবরণ যিনি দিতে যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে পরাশরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ছিল বলে অনুমান করা স্বাভাবিক। কথায়-কথায় এ-নাম তাই পরাশরের মুখে এক-আধবারও না শোনায় একটু যেন খটকা লাগে।

পরাশর অবশ্য নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীরব বললেই চলে। তার নিজের জীবনের কথা অনেক খুঁচিয়েও একটু-আধটুর বেশি বার করা যায় না। সেদিক দিয়ে দেখলে জলধর রায় বলে কারুর নাম তার মুখে কখনও না শোনা খুব একটা অদ্ভুত কিছু নয়।

যা দুর্বোধ লাগছে তার হদিশ হয়তো জলধর রায়ের বিবরণেই পাব আশা করে সাগ্রহে তা পড়তে শুরু করলাম।

খুব নিরাশ হতে হল না। জলধর রায় পরাশরের ছেলেবেলার কথা দিয়েই তাঁর কাহিনী শুরু করেছেন। লিখেছেন—

পরাশর বর্মা ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় উৎসাহী। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির কোনও অভিলাষ তার ছিল না।

আপনি বোধহয় জানেন যে, পরাশর বর্মা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। ইদানীং যা পূর্ব পাকিস্তান সেখানকার একটি কলেজে আমি তাঁর সহপাঠী ছিলাম। শুধু সহপাঠী নয়, বন্ধুও।

সে-বন্ধুত্ব আমাদের অটুট থাকবারই কথা। কিন্তু জীবিকার্জনের দায়ে বহুদিন আমাকে দেশছাড়া হয়ে থাকতে হওয়ার দরুন তার সঙ্গে যোগাযোগটা অনেককাল ধরে আর রক্ষা করতে পারিনি।

তা ছাড়া, যে-ঘটনার কথা বিবৃত করতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে একটু অপ্রিয় স্মৃতি জড়িত আছে বলেও হয়তো পরাশর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিশেষ চেষ্টা করেনি।

pathagar.net

পরাশরের প্রথম গোয়েন্দাগিরির এ-বিবরণ পড়লে শুধু যে এই বিভাগে তার সুপ্ত প্রতিভার আদি স্ফুরণের কথাই জানতে পারবেন তা নয়, কেন যে সে আজ পর্যন্ত অকৃতদার তাও হয়তো স্পষ্ট হবে।

তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি পরীক্ষা দিয়েছি।

পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরি আছে, তাই ছুটির সুযোগে দুই বন্ধু ক'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি বেড়িয়ে যেতে। আমি উঠেছি গ্রাম সম্পর্কে এক মামার মেসে অতিথি হয়ে, আর পরাশর উঠেছে শিয়ালদার কাছে একটা সস্তা হোটেলে।

প্রতিদিন সকালে হয় পরাশর আমার মেসে আসে, নয় আমি তার হোটেলের ঘরে গিয়ে হাজির হই। তারপর যেদিন যেমন খুশি চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বোট্যানিক্স, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তো বটেই, স্টিমারে কি ট্রেনে চড়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, ডায়মন্ডহারবার, ব্যান্ডেল, তারকেশ্বরও ঘুরে আসি।

বিকেলবেলাটা বরাদ্দ থাকে সাধারণত থিয়েটার-বায়স্কোপের জন্যে। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কোনও থিয়েটার বায়স্কোপের নতুন নাটক বা ছবিই বাদ দিই না।

সেরকম কিছু না থাকলে কার্জন পার্ক কি গড়ের মাঠে বসে গল্প করে আর পরাশরের কবিতা শুনে বেশ রাত পর্যন্ত কাটিয়ে যে যার আস্তানায় ফিরি। পরাশর তখন প্রতিদিন রাশি-রাশি কবিতা লিখছে।

কলকাতায় ছুটির মেয়াদ ও রসদ দুই-ই যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন একদিন সকালে তার পালা মাফিক পরাশর আমার মেসে না আসায় একটু চিন্তিত হলাম।

সারা সকাল অপেক্ষা করে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই তার হোটেলে গেলাম খোঁজ করতে। না, যা ভয় করেছিলাম সেরকম কিছু নয়। অসুখ-বিসুখ তার করেনি। তবে সে হোটেলেই নেই। তার কামরার দরজার তালা বন্ধ। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জানলাম, সকালবেলাতেই সে নাকি বেরিয়ে গেছে খাওয়া-দাওয়ার আগে, এখনও ফেরেনি।

সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমায় কিছু না জানিয়ে এরকম একা বেড়াতে যাওয়াতে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই নিজের মেসে ফিরলাম। গিয়ে দেখি, পরাশর সেখানেই আমার অপেক্ষায় বসে আছে। মেসের চাকরকে দু-কাপ চা আনতে পাঠিয়ে পরাশরকে হোটেল ছেড়ে সকালেই এমন উধাও হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাব, তার আগেই সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল—তোমার মাসি-পিসি কেউ আছেন?

প্রশ্নটা হঠাৎ অন্য যে-কেউ করলেই অদ্ভুত লাগত, কিন্তু পরাশর বর্মা এ-প্রশ্ন করলে বেশ একটু বিমূঢ় হতে হয় নিশ্চয়।

উত্তর না দিয়ে তাই সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকালাম।

পরাশরের কবিতা লেখাই বাতিক জানতাম। তার ওপর আবার কুলজি নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে নাকি আজকাল! তা কুলজি হলেও প্রথমে বাবা-পিতামহ ছেড়ে মাসি-পিসির খোঁজ কেন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম—হঠাৎ মাসি-পিসির খোঁজ কেন?

আহা, আগে বলোই না আছে কি না?

না, মাসি-পিসি কেউ নেই। —বাধ্য হয়ে জানাতেই হল—মা ছিলেন মাতামহের একমাত্র সন্তান, আর বাবার দিকে জ্যাঠা-খুড়ো থাকলেও পিসি কেউ নেই।

তা হলে তুমি বুঝবে না!—পরাশর যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কী বুঝব না! —একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম—মাসি-পিসি না থাকলে কবিতা বোঝা যায় না নাকি?

কবিতার কথা কোথা থেকে আসছে! পরাশর বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলে—কবিতা

BanglaBook.org

ছাড়া আমার আর কি কোনও ভাবনা নেই।

আছে নাকি? সেটা কি মাসি-পিসির ভাবনা? তাইতেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছলে?

আমার ব্যঙ্গটা গায়ে না মেখে পরাশর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—হ্যাঁ, তাই বলতে পারো। মাসি নয়, পিসির। আমার একমাত্র পিসির। ছেলেবেলা থেকে একমাত্র যিনি আমার কবিতার সমঝদার আর আমার জীবনযাত্রার সমালোচক ও পথনির্দেশক, বাবা-মা বেঁচে থাকতেই যিনি আমার অভিভাবকত্ব নিয়েছিলেন আর বিধবা হয়ে বৃদ্ধা বয়সে কাশীবাস করেও যিনি প্রতি হপ্তায় নিয়মিত চিঠি লিখে আমার জীবন রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে আসছেন।

পরাশর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বললাম—তা হলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ তো তোমার গা-সওয়া। নতুন করে ভাবনার কী আছে তাতে?

আছে! সাংঘাতিকভাবে আছে—পরাশরের মুখটা করুণ হয়ে উঠল—তিনি এবার যা হুকুম পাঠিয়েছেন তাতে আমার স্বাধীন জীবনের দফারফা। ডানা দুটি কেটে এবার খাঁচার মধ্যে বন্দি হতে হবে।

পরাশরের কবিত্বের ভাষার মর্মার্থটা বুঝে একটু হেসে বললাম—হুকুমটা কীসের? বিয়ে করে সংসারী হওয়ার?

সরাসরিভাবে ঠিক তা নয়, পরাশর বিরস মুখে বললে—কিন্তু তার মধ্যে ওই বিপদটাই প্রচ্ছন্ন।

বুঝতে পারলাম না।

পরাশর আমার বোধশক্তির দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তার বদলে সে সহজভাবেই বললে—না বোঝবারই কথা। তবে বোঝাবার জন্যে একটু ইতিকথা জানাতে হবে। আমার পিসিমার একটি মাত্র মেয়ে শর্মিলা। মেয়ে না হয়ে কিন্তু তার ছেলে হওয়াই উচিত ছিল।

কেন? —প্রসঙ্গটা হালকাসুরে রাখবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম—অলিম্পিক-এর ডিসকাস ছোড়ার চ্যাম্পিয়ান গোছের চেহারা না কি টামারা প্রেস-এর ভগিনী জাতীয়?

না। পরাশর ঠাট্টার সুরটাকে আমলই না দিয়ে বললে—চেহারার কথা বলছি না। চেহারায় তাকে বেশ সুন্দরীই বলা চলে। কমনীয়তারও অভাব নেই। শুধু চালচলনে মেয়েলিপনার ধার দিয়েও সে যায় না। যেমন স্বাধীন তার প্রকৃতি, তেমনি সে খেয়ালী। পিসিমা সেকেলে বুড়োমানুষ, কাশীবাস করেন ধর্মগত সংস্কারে। তবু অনেক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় আধুনিকতার দিকেই তাঁর পক্ষপাত দেখেছি। কিন্তু শর্মিলা সম্পূর্ণ আর-এক অর্থে আধুনিকা।

আধুনিকা আবার নানান অর্থে হয় নাকি? কৌতুকের সঙ্গে কৌতূহল মিশল আমার জিজ্ঞাসায়, —আধুনিকা মানে তো সেকেলে সবকিছু বাতিল-করা একেবার হালফ্যাশানের সাহসিকা।

শর্মিলা সে ধরনের আধুনিকা নয়—বোঝাবার চেষ্টা করলে পরাশর, তার খোশাকে-আসাকে কোনও উগ্র বিদ্রোহ নেই শুধু নয়, সে-বিষয়ে সে অত্যন্ত সংযত-সেকেলে। তার বিদ্রোহ মেয়েদের সাধারণ বাঁধাধরা জীবনধারার ছকের বিরুদ্ধে। পিসিমা তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শর্মিলা তখন সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। সেসব কথা সে গ্রাহ্যই করেনি। নাম লিখিয়েছে এক রাজনৈতিক দলে। মাসকয়েক তাদের সভায় বক্তৃতা দিয়েছে, মিছিলে পাণ্ডা হয়েছে, তারপর বিরক্ত হয়েই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভর্তি হয়েছে আর্ট কলেজে। সেখানে বছরখানেক মাত্র থেকেই আবার ছেড়ে দিয়ে, এখন 'খাদ্য বাড়াও' ব্রত নিয়ে অন্নপূর্ণা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গেছে কোনও পাণ্ডববর্জিত ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে।

পরাশর একটু দম নেওয়ার জন্যে থামতেই বললাম—এ তো তোমার পিসতুতো বোনের চরিত্র বর্ণনা শুনলাম। তার মধ্যে তোমার বিপদটা কোথায়? আমাদের সমাজে কাজিন ম্যারেজের চল অন্তত নেই। সমস্যাটা আশাকরি তা নয়?

আরে না, না! পরাশর অধৈর্যের সঙ্গে বললে—শোনোই না সবটা। সমস্যাটা শর্মিলাকে নিয়ে নয়। বয়সে সে আমার দু-বছরের ছোট হলেও মুরুব্বিয়ানায় আমার ঠাকুমা। পিসিমার চেয়ে তাকে সমীহ করে চলতে হয়। সমস্যাটা তার শিষ্যা ও সহকারিণীকে বিনিকে নিয়ে।

বিনি আবার কে?—কথার মাঝখানে বাধা না দিয়ে পারলাম না।

ভালো নাম তার বিনতা, ডাক নাম হয়েছে বিনি। —পরাশর বললে, পিসিমার কাশীর এক তীর্থধর্মের সঙ্গিনী ও বান্ধবীর মেয়ে। পিসিমা শর্মিলার সম্বন্ধে আশা-ভরসা ছেড়েই দিয়েছেন। তাকে শাসন করে, হুকুম করে কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের যখনকার যা-গোঁ তা যে ছাড়ানো যাবে না তা তিনি ভালো করেই জানেন। শর্মিলা সম্বন্ধে ভয়-ভাবনাও তাঁর তেমন কিছু নেই। মেয়ে হয়ে সে অনেকদিকে পুরুষের ওপর টেক্কা দেয়, আর যে-কোনও অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যে তার আছে তা তাঁর জানা। তাঁর যা কিছু ভাবনা বিনিকে নিয়ে। বিনি নেহাত সাধারণ, মিষ্টি, নিরীহ একটি মেয়ে। শর্মিলার সঙ্গেই একসঙ্গে পড়ত। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজেও ঢুকেছিল। কিন্তু পড়াশুনা তারও আর হয়নি। শর্মিলা রাজনৈতিক দল ছেড়ে আর্টকলেজে ঢোকবার আগে একবার কাশীতে যায় মার সঙ্গে দেখা করতে। বিনির শর্মিলার ওপর অন্ধ ভক্তি স্কুল থেকেই ছিল। এবার কিছুদিন সঙ্গ পেয়ে বিনি শর্মিলার একেবারে অনুগত শিষ্যা হয়ে ওঠে। শর্মিলার সঙ্গে সেও কলেজ ছেড়ে আর্ট কলেজে পড়তে এসেছিল। আবার আর্ট কলেজে ছেড়ে অন্নপূর্ণা আশ্রমেও গেছে তার সঙ্গে।

এ-অন্নপূর্ণা আশ্রমটি কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম।

নাম সত্যিই অন্নপূর্ণা আশ্রম নয়,—পরাশর একটু হাসল, আমি ঠাট্টা করে অন্নপূর্ণা আশ্রম বলি। আসল নামটা গালভারি—গ্রামলক্ষ্মী সমবায়। তাতে পোলট্রি, ডেয়ারি, তাঁত—সবকিছুরই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে বলে শুনি। নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। জায়গাটা পাণ্ডববর্জিত বলা ঠিক নয়, ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, কিন্তু এখন ধ্বংসস্তূপের দেশ। কলকাতা থেকে প্রায় সওয়া একশো মাইল দূরে চিরতী বলে একটা গ্রাম। সেই গ্রামেরও বাইরে একটা ধ্বংসপুরী গোছের পোড়ো বাড়ি আর তার চারধারের লালমাটির ডাঙা নিয়ে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পত্তন করা হয়েছে।

বলো কী! —অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল—ওই দুটি মেয়ে ওই খাঁ-খাঁ তেপান্তরের মধ্যে পোড়ো একটা বড়িতে সঙ্গী-সহায় ছাড়া একলা থাকে! কত আর বয়স হবে দুজনের? বড় জোর কুড়ি-একুশ?

বয়সটা ঠিকই ধরেছ। পরাশর বললে, শর্মিলার একুশ আর বিনির কুড়িই হবে। তবে ঠিক সঙ্গী-সহায় ছাড়া নয়। চিরতী গ্রামের বাইরে ওই পোড়ো ভিটে আর তার আশপাশের জমিজমা ছিল পিসিমার এক নন্দাইয়ের। তাঁদের বংশ প্রায় লোপই পেয়েছে। সিংহরায় তাঁদের পদবি। এককালে ক্ষুদে রাজা হিসেবে ও-অঞ্চলে সিংহের মতোই তাঁদের প্রতাপ ছিল। কিন্তু ধীরে-ধীরে সে-প্রতাপ অস্তে গেছে। বংশধারাও এসেছে শুকিয়ে। পিসিমার নন্দাই আর তাঁর ছোটভাই ছিলেন সিংহরায়দের শেষ বংশধর। পিসিমার নন্দাই আর ননদ নিঃসন্তান অবস্থাতেই বিদেশে মারা গেছেন। তাঁর ছোটভাই বিক্রম সিংহরায়ও বিদেশে মানে বর্মায় কাজ করতেন। সেখান থেকে শেষ বয়সে বর্মার নতুন আইনে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে দেশে ফিরে ওই পুরনো ভিটেতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বিয়ে-থা-ই করেননি। শর্মিলা যখন আর্ট কলেজে পড়বার আগে কাশীতে ছিল কিছুদিনের জন্যে, বিক্রম রায় তখন একবার কাশী বেড়াতে গিয়ে পিসিমার সঙ্গে দেখা করেন। শর্মিলা তাঁর কাছেই তখন ওই জায়গার বিবরণ শোনে। মাথার মধ্যে কথাটা তার ছিল। ছবি আঁকা শিখতে-শিখতেই গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পরিকল্পনাটা তার মনের মধ্যে বোধহয় পাকিয়ে ওঠে ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে। তারপর বিনিকে নিয়ে হঠাৎ একদিন সেখানে গিয়ে হাজির—মুরগি, হাঁস, গরু, ছাগল পুষে আর তার সঙ্গে তাঁত বসিয়ে গ্রামের

অর্থনীতির সংস্কার করবে বলে। একেবারে নিঃসঙ্গ-নিঃসহায় তাই ওরা নয়। বৃদ্ধ বিক্রম সিংহরায় নাম-কে-ওয়াস্তে হলেও পাহারাদার ও অভিভাবক হিসেবে আছেন।

পরাশর থামবার পর একটু কৌতুকের স্বরে বললাম—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়েও তোমার সংকটটা কী তা কিন্তু বোঝাতে পারলে না। তোমার পিসিমার হুকুমটা কী, যাতে তুমি এত বিচলিত? ওই চিরতীতে গিয়ে গরু-ছাগল-মুরগি আর তাঁতের খবরদারি করা?

না,—পরাশরের মুখে যেন আশঙ্কার ছায়া পড়ল—হুকুম ওখান থেকে বিনিকে উদ্ধার করে কাশীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসা। নিজের মেয়ের ওপর তাঁর কোনও হাত নেই তিনি জানেন। তার জন্যে ভাবনাও ছেড়ে দিয়েছেন বলেন। কিন্তু তাঁর তীর্থের পাতানো দিদির মেয়ে বিনির শর্মিলার পাল্লায় পড়ে আখেরটা নষ্ট হচ্ছে এই ভাবনাতেই তাঁর শুয়ে-বসে শান্তি নেই। আমাকে তাই লিখেছেন, যেমন করে হোক, বিনিকে ওখান থেকে নিয়ে তাকে কাশীতে পৌঁছে দিতেই হবে। চিঠিটা লিখেছিলেন ঢাকার ঠিকানায়, সেখান থেকে কাল সকালে হোটেলে এসে পৌঁছেছে।

এতে এত বিচলিত হওয়ার কী আছে তা তো বুঝতে পারছি না! সত্যি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটিকে ওখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়!

শক্ত কাজ নয়! —পরাশর আমার ওপরই একটু যেন চটে উঠে বললে—প্রথমত, আমি গিয়ে আঙুল নেড়ে ডাকলেই বিনি চলে আসবে কেন আমার সঙ্গে? আর দ্বিতীয়ত, যদি বা কাশী ফিরে যেতে রাজি হয় তা হলে তাকে কাশীতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে আমি কি আর ফিরতে পারব?

কেন? না পারার কারণ?

কারণ এই যে,—পরাশর ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—পিসিমা তা হলে আর আমায় স্বাধীনভাবে ফিরতে দেবেন না। এই বিনির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা মনে-মনে অনেকদিন থেকেই তিনি ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। এতদিন শুধু নাগালের মধ্যে পাননি।

তা স্বাধীনতা না-হয় বিসর্জনই দিলে! মুচকে হেসে বললাম—দিতে তো হবেই একদিন। বিনি মানে বিনতা দেবী দেখতে-শুনতে কেমন? হতকুচ্ছিত-টুচ্ছিত নয় নিশ্চয়!

হতকুচ্ছিত! পরাশরই জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানালে—অমন মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায় না। যেমন চেহারায় তেমনি স্বভাবে। কিন্তু আমি যে স্বাধীনতা খোয়াতে কিছুতেই পারব না।

তবু তোমার মনে একটু দুর্বলতা যে আছে তা তো লুকোতে পারছ না! কৌতুকের সঙ্গেই বললাম—শুধু পিসিমার উদ্দেশ্য বুঝেই নয়, নিজের দুর্বলতার জন্যেই তুমি বিনির কাছে ঘেঁষতে চাও না। কেমন তাই না?

তা একেবারে মিথ্যে নয়! পরাশর স্বীকার করলে, মানুষের মনকে তো বিশ্বাস নেই। শক্ত রাশও হঠাৎ ছিঁড়ে যায়।

তা হলে এক কাজ করো না! —সুপরামর্শই দেওয়ার চেষ্টা করলাম—চিঠিটা তো ঢাকা থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এ-হোটেলে এসেছে। যেন ডাকের গোলমালে চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছোয়নি এইভাবেই চেপে যাও না।

চেপে যাব! —পরাশর প্রায় স্তম্ভিত—পিসিমার চিঠি পেয়েও যেন পাইনি বলে বোঝাব তাঁকে!

পিসিমার প্রতি মনের মধ্যে গাঁথা ভয়-ভক্তিটা পরাশরের মনের মধ্যে কত গভীর তা তার মুখের ভাবেই বুঝলাম।

তাই এবার বললাম—তা হলে তো আর উপায় নেই? এক কাজ শুধু করতে পারি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারি সেখানে, তোমার কী বলে ভ্যাকুয়াম ব্রেক হিসেবে। বলো, আপত্তি আছে?

BanglaBook.org

আপত্তি! পরাশর যেন অকূলে কূল পেল—তুমি যদি যাও তো তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

পরাশরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললাম—ঋণী-টিনি কিছুই তোমার থাকতে হবে না। অভিজ্ঞতার একটু মুখবদল করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজের খুশিতেই যাচ্ছি।

সে-অভিজ্ঞতা যে কী তখন যদি জানতাম!

তিন

এই ব্যবস্থাই পাকা করে পরের দিন ভোর সাড়ে ছ'টায় হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরলাম।

ট্রেন নয়, যেন গরুর গাড়ি।

সকাল সাড়ে ছ'টায় ট্রেনে উঠেও টিকোতে-টিকোতে গন্তব্য স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলাম বেলা একটায়।

যেমন রেললাইন, স্টেশনেরও তেমনি ছিরি।

শুকনো বাঁকা লাল কাঁকরের দেশ। দুপুরের রোদে চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

একটিমাত্র অত্যন্ত নিচু প্ল্যাটফর্ম। নেহাত পাথরের একটা সাইনবোর্ড না থাকলে স্টেশন বলে চেনাই যেত না।

ইটের গাঁথুনি আর করোগেটের টিনে-ছাওয়া একটা বড় গোছের ঘরেই স্টেশনের যাবতীয় কাজ হয়।

স্টেশনমাস্টার আর-একজন খালাসী ছাড়া স্টেশনে আর কেউ কাজ করে বলে মনে হল না।

আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটারই জাত-কুল কিছু নেই। কিন্তু সেও যেন এই অখদ্দে স্টেশনটাকে তাচ্ছিল্য করে একটু ঘৃণাভরে থেমে আমরা নামতে না-নামতেই ছেড়ে দিলে।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাই ফাঁকা।

আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী নামেনি বা ওঠেনি।

নতুন অজানা জায়গায় খোঁজখবর কারুর কাছে না নিলে নয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীল কোর্তাপরা রেলের খালাসীকে স্টেশনের ঘরের দিকে যেতে দেখে তাকেই ডাকলাম।

ও ভাই, শুনছ!

মানুষটি কালা বা অন্যমনস্ক যা-ই হোক, সে-ডাক অগ্রাহ্য করে স্টেশনের ভেতরেই চলে গেল।

অগত্যা তার পিছু-পিছু সেখানেই গিয়ে ঢুকতে হল।

খালাসীটিকে সেখানে দেখতে পেলাম না। আমরা পৌঁছোবার আগেই ওদিকের দরজা দিয়ে স্টেশনের পিছন দিকে সে বেরিয়ে গেছে বোধহয়।

ঘরটায় আর কেউ আছে বলেও মনে হল না প্রথমে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শুধু দূরের কোনও বার্তা নিয়ে একঘেয়েভাবে বেজে যাচ্ছে।

এদিক-ওদিক চেয়ে কী করব ভাবছি, এমনসময় ভারি গম্ভীর গলার আওয়াজ পেলাম পিছনেই।

কী চাই আপনাদের?

চমকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাকই হলাম। অমন ভারি বাজখাঁই আওয়াজ যাঁর গলা থেকে বেরিয়েছে সে-মানুষটি নেহাত ছোট্টখাট্ট, বামন বললেই হয়।

BanglaBook.org

এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয় বলে বিস্ময় প্রকাশ করবার মতোই চেহারা।

গায়ের কোটটা দেখেই বুঝলাম, তিনিই স্টেশনমাস্টার। পিছন দিকের দরজা দিয়ে সবে এসে ঢুকেছেন।

আমরা কিছু বলবার আগেই তিনি নিজে থেকে আবার বললেন—ট্রেন তো এইমাত্র ছেড়ে গেল। সন্ধে ছ'টা আটচল্লিশের আগে তো আর ট্রেন পাবেন না।

সবিনয়ে বলতে যাচ্ছিলাম—না, আমরা...।

তিনি তার আগেই বাধা দিয়ে বললেন—ও, আপনারা ডাউনে যেতে চান? তা সে-ট্রেনও বিকেল সাড়ে তিনটেয়।

স্টেশনমাস্টারের কর্তব্য শেষ করে তিনি কাঠের রেলিংয়ের কাটা দরজাটা খুলে তাঁর অফিসের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

বিনীতভাবে এবার নিবেদন করলাম—আমরা আপ-ডাউন কোনওদিকেই যাব না। এইমাত্র এই স্টেশনেই আমরা গাড়ি থেকে নেমেছি। এখন...।

ও নেমেছেন!— আবার বাধা দিলেন স্টেশনমাস্টার মশাই—আপনাদের টিকিট?

টিকিট দুখানা হাতেই ছিল। সে দুটো তাঁকে দিলাম।

আমাদের বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সন্দেহ করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু টিকিট দুটো হাতে পেয়েই স্টেশনমাস্টারের মুখের চেহারা যেন বদলে গেল।

তাঁর ক্ষুদে চেহারার পক্ষে অফিসের টেবিলটা বেশ উঁচু। দুখানা ইট তলায় দিয়ে বসবার চেয়ারটাকে যথেষ্ট উঁচু করতে হয়েছে, তাও বেশ একটু যেন কসরত করেই তাতে উঠে বসে ভদ্রলোক এবার প্রসন্ন মুখে বললেন—ও, আপনারা বেড়াতে এসেছেন এখানে। বেশ! বেশ! বসুন, বসুন।

বসবার জায়গা একটা ভাঙাগোছের তেপায়া বেঞ্চি। সেটা একদিকে পায়ার বদলে ইট সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

নিজেদের গরজেই সেখানে বসে বলবার চেষ্টা করলাম—আমরা এখানে এই প্রথম...।

এবারও কথাটা শেষ করা গেল না।

স্টেশনমাস্টার মশাই তার মাঝখানেই বললেন—আহা, প্রথম বুঝতেই পারছি। প্রথম নয় তো বারবার কেউ কি আর এখানে সাহস করে আসে! তবে প্রথম একবার আসবার মতো জায়গা। য়ুয়ান চোয়াঙ-ও এসেছিলেন।

মাস্টারমশাইয়ের গলায় এবার উৎসাহের উচ্ছ্বাস। তবু য়ুয়ান চোয়াঙ শুনে আমরা বেশ একটু থ' হয়ে গেছি।

পরাশর নিজের দরকারটা ভুলে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে—য়ুয়ান চোয়াঙ মানে সেই চীনা পর্যটক এখানে এসেছিলেন?

এসেছিলেন বইকী!— স্টেশনমাস্টার সোৎসাহে জানালেন—এখানেই তিনি লো-টো-বী-চী মানে রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনা করে গেছেন। এ-জায়গাটা তো হল সেই আদিকালের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। শ'দুই বছর আগেও এখানকার নাম ছিল কানসোনা। সে-রাজধানীই ছিল চার মাইল লম্বা-চওড়া আর রাজ্য ছিল প্রায় তিনশো মাইল এদিকে-ওদিকে। এখানে হুয়েন সাং বা এখন আপনাদের পণ্ডিতেরা যাঁকে বলেন য়ুয়ান চোয়াঙ, তিনি সম্রাট অশোকের বসানো কয়েকটা চৈত্যও দেখেছেন। এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামই তো ছিল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা। বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত সম্প্রদায়েরও ছিল তিনটে সঙ্ঘারাম আর হিন্দু মন্দির অন্তত পঞ্চাশটা। সেসবের চিহ্নও আজকাল অবশ্য খুঁজে পাওয়া দায়।

স্টেশনমাস্টার সেই অতীতের দুঃখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—এসে ভালোই

BanglaBook.org

করেছেন। আপনাদের বয়স থেকেই তো এসব বিষয়ে আগ্রহ থাকা দরকার। তবে এসেছেন বড় অসময়ে। এই গরমের দিনে এ-অঞ্চল তো একেবারে আগুনের খোলা। দিনেরবেলা ঘুরে-ফিরে দেখতেই পারবেন না।

এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের নগণ্য একটা স্টেশনে, মাথায় হাত-আড়াই মাত্র এমন একটি বালখিল্য প্রত্নতত্ত্ববিশারদ স্টেশনমাস্টারের দেখা পাব কল্পনা করতেও পারিনি।

আমাদের এ-স্টেশনে নামার উদ্দেশ্য তিনি যা বুঝেছেন তার প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে হল না এখন।

তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা আগে যা ছিল সেটা একটু বিস্তৃত করে নিয়ে তার মধ্যে এসব পুরাকীর্তির সন্ধান নেওয়া ঢুকিয়ে দিলে ক্ষতি কী?

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের কথার যেন জের টেনেই পরাশর তাই বললে—এ-সময়ে এদিকে এসব দেখতে বড় কেউ তা হলে আসে না?

অন্য সময়েই বা বেশি আসে নাকি? স্টেশনমাস্টার মশাই তাঁর দুঃখটা প্রকাশ করলেন—আমরা দিল্লি-আগ্রা জয়পুর দেখতে যাই বুঝেছেন, বাংলাদেশে কী ছিল না-ছিল তার জন্যে ক'জন মাথা ঘামায়। আপনারা যে এসেছেন তাই যথেষ্ট। আপনাদের এ-বয়সে আর গরম-ঠাণ্ডা কি গ্রাহ্য করবার জিনিস নাকি। তবে এখানে থাকবার একটা ব্যবস্থা দরকার। তা...।

ওই পর্যন্ত বলেই মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের। উঁচু চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে একটু উত্তেজিতভাবেই আবার বললেন—যাক, মেঘ না চাইতে জল পেয়ে গেছেন মশাই। আপনাদের এখানে থাকার সমস্যা মিটে গেছে। আসুন, আসুন, চৌধুরীমশাই।

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা আগেই বাইরের দরজায় নূতন আগন্তুককে দেখেছি।

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের গলায় যে-সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে তারই যোগ্য সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন চেহারা চৌধুরীমশাইয়ের। স্টেশনমাস্টার যেমন একরত্তি মানুষ, চৌধুরীমশাই তেমনি দশাসই, বিরাট, বলিষ্ঠ সুপুরুষ। বয়সটা যৌবন-সীমান্ত ছুঁই-ছুঁই করছে বটে, কিন্তু শরীরের সামান্য মেদবৃদ্ধি আর জুলফির চুলের একটু পাক তাঁর আভিজাত্যকে যেন আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

মুখের হাসিটি তাঁর অমায়িক। স্টেশন-ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি একটু বুলিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ আপনার অভ্যর্থনাটা যেন একটু বেশি সাদর মনে হচ্ছে! ব্যাপার কী বক্সীবাবু?

আপনার অভ্যর্থনা সব জায়গাতে সবসময়েই সাদর। হেসে বললেন স্টেশনমাস্টার বক্সীবাবু—তবে আজ একেবারে প্রার্থনাপূরণের মতো যথাসময়ে আবির্ভাবটা আপনার হয়েছে বলে উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি জানিয়ে ফেলেছি। এইমাত্র আপনার কথাই ভাবছি, আর আপনি সশরীরে এসে হাজির। এঁরা দুজন এখানকার সব পুরনো আমলের জিনিস দেখতে আজ দুপুরের ট্রেনে এখানে নেমেছেন। আপনার কাছেই আতিথ্য নিতে এঁদের পাঠাতে যাচ্ছিলাম। তা ওঁদের চিঠি দিয়ে পাঠাবার আর দরকার হল না।

চৌধুরীমশাই প্রসন্ন দৃষ্টিতে আবার আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন বক্সীবাবুকেই—আপনার আত্মীয় বুঝি?

আত্মীয়। বক্সীবাবু এবার অপ্রস্তুতভাবে বললেন—না আত্মীয়-টাত্মীয় নয়।

আমাদের নামধামটুকুও যে তাঁর জানা হয়নি সেটা এতক্ষণে খেয়াল করে বললেন—আমিও ওঁদের চিনি না। রাঙামাটির পুরাকীর্তি দেখতে এসেছেন বলেই ওঁদের থাকবার ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম। সত্যি, আপনাদের নামগুলোই তো এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

পরাশর ও আমি এবার আমাদের নাম-ধাম যথাসম্ভব সংক্ষেপে বললাম।

BanglaBook.org

চৌধুরীমশাই নিজেই এবার উৎসাহভরে খুশি মুখে বললেন—সেই ঢাকা থেকে এতদূর এসেছেন রাঙামাটির সেকেলে কীর্তি দেখতে? এসেছেন কি ইতিহাস পড়ে, না কারুর কাছে শুনে?

এবার সত্য কথাটা জানাবার সুযোগ পাওয়া গেল।

পরাশর একটু ইতি গজ করে বললে—আমরা, সত্যি কথা বলতে গেলে, শুধু এইসব দেখতেই আসিনি। এখানে সিংহীর জাঙালবাড়ি কোথায় জানেন বোধহয়। সেইখানে আমাদের একটু কাজও আছে।

আপনারা জাঙালবাড়িতে যাবার জন্যে এসেছেন!

বক্সীবাবুর মুখে এবার স্পষ্ট একটু উদ্বিগ্ন বিস্ময়ের ছায়া দেখা গেল।

তিনি একটু চুপ করে থেকে একটু যেন ক্ষুণ্ণস্বরে আবার বললেন—কই আগে বলেননি তো!

না, মানে—বলবার ঠিক সুযোগ পাচ্ছিলাম না। লজ্জিতভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলে পরাশর—সিংহীদের জাঙালবাড়িটায় যাবার রাস্তা জানতেই আপনার এখানে ঢুকেছিলাম।

জাঙালবাড়িই যে আমাদের গন্তব্য সে-কথাটা আগে না জানাবার ত্রুটিটা যে বক্সীবাবুর কাছে বড় নয়, তাঁর পরের কথাতেই তা বোঝা গেল। বিষণ্ণ সহানুভূতির স্বরে তিনি যা জিজ্ঞাসা করলেন তাতে আমরা কিন্তু বিমূঢ়।

বক্সীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—জাঙালবাড়ির দুঃসংবাদটা পেয়েই তা হলে আপনারা আসছেন?

দুঃসংবাদ! কী দুঃসংবাদ? —পরাশর অস্থির উদ্বেগের সঙ্গে বললে—সু বা কু কোনও খবরই তো আমরা জানি না! কী হয়েছে কি সেখানে?

আপনারা কিছু না জেনেই এসেছেন! —এবার চৌধুরীমশাই বিস্ময় প্রকাশ করলেন—আশ্চর্য তো!

পরাশর দুর্ভাবনায় উদ্বেগে একটু রূঢ়স্বরেই এবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু ব্যাপারটা কী একটু দয়া করে খুলে বলবেন আপনারা? কী হয়েছে জাঙালবাড়িতে? শর্মিলা আর বিনতা বলে যে দুটি মেয়ে ওখানে থাকে তাদের কার কী হয়েছে?

তাদের কারুর কিছু হয়নি। —শান্ত স্বরে চৌধুরীমশাই-ই এবার জানালেন—কিন্তু যাঁর ভরসায় ওঁরা এখানে আছেন, সেই ওঁদের পিসেমশাই বিক্রম সিংহরায় আজ তিনদিন হল নিরুদ্দেশ।

নিরুদ্দেশ! পরাশরের ব্যাপারটা বুঝতেই যেন দেরি লাগল।

অবিশ্বাসের সুরে সে বললে—কিন্তু তিনি তো প্রায় বৃদ্ধ লোক। নিজের শেষ বয়সের আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবেন কেন? তাঁর বাড়িতে এমন সোনাদানা-হীরে-মানিকও ছিল না যার জন্যে কেউ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। নাম সিংহীদের জাঙালবাড়ি, কিন্তু একটা মান্ধাতার আমলের পোড়োভিটে বলেই তো শুনেছি। শর্মিলা যার নাম সে আমার পিসতুতো বোন। তার বান্ধবী বিনতাকে নিয়ে কোনওরকমে পোড়োভিটের খানিকটা যৎসামান্য মেরামত করেই আছে বলে তো জানি। ওখান থেকে সিংহরায়ের মতো বৃদ্ধ লোকের লোপাট হবার কোনও কারণ তো নেই।

ঠিকই বলেছেন—সহানুভূতির স্বরে বললেন চৌধুরীমশাই—আমরা এখানকার সবাই তো এ-ব্যাপারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। এটা অজ তেপান্তরী মফঃস্বল বটে কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড কখনও এখানে ঘটেনি। ভাবনা হয়েছে আমাদের ওই মেয়ে দুটির জন্যেই। বুড়োই হন, আর অথর্বই হন, মাথার ওপর অভিভাবক হিসেবে তো সিংহরায়মশাই ছিলেন। এখন মেয়ে দুটির এখানে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহস অবশ্য ওদের যথেষ্ট! —বক্সীবাবু প্রশংসার সুরে বললেন—বিশেষ করে ওই শর্মিলা মেয়েটির। আমার কাছে ইদানীং রাঙামাটির পুরনো ইতিহাস শুনতে আর তেমন কিছু পুরনো জিনিস পেলে দেখাতে আসে মাঝে-মাঝে। আমিও ছুটিছাটা পেলে জাঙালবাড়ি যাই। মেয়েটির সঙ্গে কথা

BanglaBook.org

বলে, তার সাহস আর মনের বল দেখে অবাক হয়েছি। দিনকাল অনেক বদলেছে, তবু দুটি ওই বয়সের যুবতী মেয়ের ওই গ্রামের বাইরে খাঁ-খাঁ করা পোড়োভিটেতে শুধু একজন বুড়োর ভরসায় থাকা তো চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু এখন সে-ভরসাও নেই। তাই আগে মনে-মনে যত বাহবাই দিয়ে থাকি এখন আর ওদের ওখানে থাকা কোনওমতেই উচিত নয় বুঝতে পারছি। যাক, খবর কিছু না জানলেও আপনারা যে ঠিক এই সময়েই এসেছেন এটাও ভাগ্য বলতে হবে। ভগবানই আপনাদের পাঠিয়েছেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখন ওদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

বক্সীবাবু একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে একটু হাঁফিয়ে মিনতিভরে আমাদের দিকে তাকালেন।

পরাশর তাঁকেই যেন আশ্বাস দিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় কী!

একটু থেমে তারপর আবার বললে—এখন জাঙালবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা একটু যদি বুঝিয়ে দেন।

রাস্তা বোঝাতে হবে কেন! চৌধুরীমশাই উদারভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন—আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

না, আপনাকে মিছিমিছি কেন কষ্ট দেব! —আমরা একটু প্রতিবাদ করতে গেলাম।

কিন্তু চৌধুরীমশাই সে-প্রতিবাদ হেসেই উড়িয়ে দিলেন—আরে কষ্ট কী মশাই। আমি তো আপনাদের অতিথি হিসেবেই পেতে চাইছিলাম। এখনও যদি ইচ্ছে করেন তো আমার ওখানেই উঠতে পারেন।

অনেক ধন্যবাদ! —আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবিনয়ে বললাম—কিন্তু এখন যা অবস্থা হয়েছে তাতে জাঙালবাড়ি ছেড়ে আপনার আতিথ্য নেওয়া উচিতও হবে না বোধহয়।

তা অবশ্য হবে না।— চৌধুরীমশাই স্বীকার করে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, আমি তো শর্মিলাদেবী আর বিনতাকেও এ-ব্যাপারের পরে আমার বাড়িতে এসে থাকবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলাম। আমার মেয়ে তো ওদেরই বয়সী, অসুবিধে কিছু ওদের হত না। কিন্তু বড় একগুঁয়ে মেয়ে ওই আপনাদের শর্মিলা। কিছুতেই রাজি হয়নি। কী আর করব, তাই আমারই দুজন পাইককে পাহারায় থাকতে হুকুম দিয়েছি দিনরাত।

একটু হেসে চৌধুরীমশাই আবার বললেন—তাও জানলে হয়তো মানে লাগবে বুঝে লুকিয়েই এ-ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপনারা ফাঁস করে দেবেন না যেন।

না, তা করব না। পরাশর আশ্বাস দিয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, সিংহরায়মশাইয়ের এ নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে এখানকার থানা-পুলিশ কিছু করেনি?

বলছে তো যা করবার করেছে! —চৌধুরীমশাই বেশ একটু অপ্রসন্ন অনুযোগের সুরে বললেন—কিন্তু পুলিশ বিশেষ করে এইরকম অজ থানার পুলিশ কতখানি উৎসাহী আর কাজের হয় তা তো জানেন। এদিক-ওদিক একটু খোঁজখবর করে তারা বরং একটু উল্টোকথারই আভাস দিয়েছে।

উল্টোকথাটি কী? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

বলছে, নিজেই হয়তো রাগারাগি করে কোথাও চলে গেছেন। মেয়ে দুটির সঙ্গে ওই গ্রামলক্ষ্মী সমবায় নিয়েই দু-দিন আগে তাঁর কী ঝগড়াঝাটির কথা নাকি পুলিশ ও-বাড়ির এক মুনিশের কাছ থেকে বার করেছে।

না। এ অসম্ভব! পরাশর তীব্র প্রতিবাদ জানালে।—বিক্রম সিংহরায় সে-ধরনের মানুষই নন বলে আমি জানি। শর্মিলাকে তিনি নিজে সাদরে এখানে ডেকে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করতে উৎসাহ, সাহায্য—সব দিয়েছেন।

তা কি আর আমরা জানি না? চৌধুরীমশাই পরাশরের কথায় সায় দিয়ে বললেন—এ শুধু

BanglaBook.org

পুলিশের দায় এড়াবার একটা ফিকির। যাক, আপনারা তো এখন জাঙালবাড়িতেই যাচ্ছেন, ওদের মুখ থেকে আরও ভালো করে সব শুনতে পাবেন।

একটু থেমে কিছুটা যেন কুণ্ঠিতভাবে বক্সীবাবুর দিকে ফিরে চৌধুরীমশাই এবার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনাকে এটা দিতেই এসেছিলাম বক্সীবাবু। আমার তো দামি কিছু বলেই মনে হচ্ছে। তবে মুখ্খু আনাড়ি তো। শালুককে পদ্মফুল ভেবে না হাস্যাস্পদ হই। আপনার রায় পেলে সাহস করে কর্তাদের কাছে পাঠাতে পারব। একটু দেখে রাখবেন।

নিশ্চয় দেখব। বলে বক্সীবাবু সোৎসাহে কাগজের মোড়কটা নেওয়ার পর চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

চার

পুরনো হুডখোলা একটা মরিস গাড়ি। চৌধুরীমশাই নিজেই তা চালান।

পরাশর সামনে তাঁর পাশে বসেছে। আমি আমাদের সামান্য মালপত্র নিয়ে বসেছি পিছনের সিটে।

জায়গাটার নাম রাঙামাটি নাকি ছিল। তার বদলে পোড়ামাটি রাখলেই বুঝি ভালো হত। প্রথম গ্রীষ্মের রোদে চারিদিক যেন তেতে আগুরা হয়ে আছে মনে হয়েছে।

রুক্ষ রাঙা মাটি বলেই কাঁচা রাস্তাটা তেমন অবশ্য খারাপ নয়।

স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই দূরের গ্রামটা দেখা গেছে। তার মধ্যে কয়েকটা পাকা বাড়ি ও মন্দিরের চুড়ো খড়ো সব মাটির বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি বাড়ি তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। দূর থেকেই প্রাধান্যটা বোঝা যায়। শুনলাম সেইটেই চৌধুরীমশাইয়ের পৈতৃক বাড়ি। আগেই অবশ্য সেইরকমই অনুমান করেছিলাম।

গাড়ি কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গেল না। গ্রামকে একধারে ফেলে একটা ঢেউ খেলানো বাঁজা ডাঙার ওপর দিয়ে চলল।

আমাদের কৌতূহল অনেক। যেতে-যেতে চৌধুরীমশাইয়ের কাছে যতদূর সম্ভব মেটাবার চেষ্টা না করে পারিনি।

গাড়িতে ওঠবার খানিক বাদেই পরাশর জিজ্ঞাসা করেছিল—বক্সীবাবুকে কাগজের মোড়কে কী দিলেন? প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কিছু?

হ্যাঁ। গাড়ি চালাতে-চালাতে চৌধুরীমশাই বলেছেন একটু যেন লজ্জিতভাবে হেসে—দুটো পুরনো মুদ্রা গোছের সেদিন এক জায়গায় খুঁড়তে-খুঁড়তে পেয়েছি। এখানে কুষাণ আর গুপ্ত যুগের কয়েকটা মুদ্রা আগে পাওয়া গেছে। নিজে দেখে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই বক্সীবাবুকে দিয়ে এলাম পরীক্ষা করতে।

বক্সীবাবু এসব ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ নাকি! —জিজ্ঞাসা করেছি আমি, করেন তো স্টেশনমাস্টারি।

স্টেশনমাস্টারি করেন তো শুধু পেট চালাতে। চৌধুরীমশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন বক্সীবাবুর গুণকীর্তনে—নইলে এই প্রত্নতত্ত্বই ওঁর নেশা আর ধ্যানজ্ঞান। বিয়ে-থা করেননি, অন্য কোনও দায় নেই। শুধু এই এক নেশা নিয়েই মত্ত হয়ে আছেন। এ-স্টেশনে আছেন প্রায় বারো বছর। প্রোমোশন নেননি এখান থেকে বদলি হবার ভয়ে। সেরকম কোনও কথা উঠলে ওপরওয়ালাদের হাতে-পায়ে ধরে বদলি ঠেকিয়েছেন। এ-অখদ্দে স্টেশনে সাধ করে কেউ তো আর আসতে চায় না। তাই এ নিয়ে বিশেষ কিছু অসুবিধেও হয়নি।

BanglaBook.org

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ওঁর এত উৎসাহ হল কোথা থেকে?— জিজ্ঞাসা করলে পরাশর— উনি কি আর্কিওলজির ছাত্র ছিলেন?

না, না, সেসব কিছু নয়। হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই—তখনকার দিনে ম্যাট্রিকটা কোনওরকমে পাশ করে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ঘষতে-ঘষতে কিছুদূর পর্যন্ত উঠে প্রথম ভার পেয়েছিলেন এই স্টেশনের। তখন এটা একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন মাত্র। এখানে আসবার পর রাঙামাটির পুরনো সত্য-মিথ্যা গল্পগুজব সেকেলে লোকেদের মুখে কিছু-কিছু শুনে আর দু-একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে এ-বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বইপত্র সাধ্যের অতিরিক্তও কিনে পড়াশুনা করতে শুরু করেন তখন থেকেই। পণ্ডিত বলে নাম কেনবার কোনও লোভ কিন্তু নেই। এই নিয়ে মেতে থেকে যখন যা-কিছুর সন্ধান পান তা প্রত্নদপ্তরেই পাঠিয়ে দেন বেশিরভাগ। শুধু সেসব জিনিস পরীক্ষা করে তার পাঠোদ্ধার বা যথার্থ মূল্য নির্ণয় যে তিনি করতে পেরেছেন চিঠিপত্রে তাদের কাছে এইটুকু তারিফ পেলেই উনি খুশি। আমি তো এখানেই জীবন কাটালাম। এই বয়সে আমাকেও এ-নেশা উনিই ধরিয়েছেন।

আপনারা তেমন দামি কিছু এখানে পেয়েছেন কি এ-পর্যন্ত?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, তেমন কিছু গর্ব করবার মতো এখনও পাইনি। —চৌধুরীমশাই একটু যেন ইতস্তত করে বলেছেন—মুশকিল হয়েছে কী জানেন, আমাদের মতো শখ করে প্রত্নতত্ত্ব যারা চর্চা করে তাদের তো আর সরকার বিভাগে হুকুমনামা নেই। এখানে-সেখানে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পাই তা-ই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সামনে রাস্তার মধ্যে একপাল গরুর জন্যে চৌধুরীমশাইকে গাড়ি একটু সাবধানে ধীরে-ধীরে চালাতে হয়েছে। আর সেইখানেই, আমার জীবনের রঙ যে বদলে দেবে, আমার সেই স্বপ্নের মেয়েকে হঠাৎ সেই গরুর পালের ক্ষুরে-ক্ষুরে লাল ধুলো ওড়ানো রাস্তায় আমি দেখেছি।

মেয়েটি প্রায় ছুটেই আসছিল। আমাদের গাড়িটা দেখে সে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে।

চৌধুরীমশাইও তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে গাড়িটা থামিয়েছেন।

মেয়েটি গাড়ির বাঁ-ধারেই একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। স্থান-কাল ভুলে আমি তখন অভিভূতের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছি।

সুন্দরী তাকে হয়তো বলা চলে। কিন্তু আলুথালু বেশে লাল ধুলো মাখা চুল ও মুখের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় সে-সৌন্দর্য চাপাই পড়ে গেছে তখন। আমি তার ওপর থেকে যে চোখ ফেরাতে তখন পারিনি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বুঝি কবিত্ব করা ছাড়া উপায় নেই। মনের মধ্যে নিজের অজান্তে এঁকে রাখা একটা কল্পনার ছবিই যেন আমি হঠাৎ সামনে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখে বিহ্বল হয়ে গেছি।

অতি দীর্ঘ মনে হলেও এ বিহ্বল আচ্ছন্নতা দু-এক সেকেন্ডের মাত্র।

পরাশরের কথায় আমার চমক ভেঙেছে।

একি বিনু! কোথায় যাচ্ছ তুমি? হয়েছে কী? উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

এই তাহলে বিনু মানে বিনতা? মনের ভেতর একটা অদ্ভুত বিদ্যুতের ঝিলিক যেন অনুভব করেছি। বিনতা পরাশরের মুখের দিকে কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে প্রথমটা কোনও উত্তর দিতে পারেনি। পরাশরকে ওখানে দেখাটা যেন তার কাছে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে হচ্ছে।

চৌধুরীমশাই ততক্ষণে গাড়ির মোটর বন্ধ করে ডানদিক দিয়ে নেমে পড়েছেন। মোটরের সামনে দিয়ে ঘুরে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনিও উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন—এ-সময়ে তুমি এমনভাবে ছুটে কোথায় যাচ্ছিলে বিনতা?

বিনতা এতক্ষণে যেন নিজেকে খানিকটা সামলাতে পেরেছে। একবার পরাশর আর-একবার চৌধুরীমশাইয়ের দিকে একটু থতমত খেয়ে বলেছে—স্টেশনেই যাচ্ছিলাম। বক্সীবাবুর কাছে।

BanglaBook.org

স্টেশনে? বক্সীবাবুর কাছে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন চৌধুরীমশাই—তা এই রোদের মধ্যে অমন ছুটতে-ছুটতে কেন?

শর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না! বিনতা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

পাওয়া যাচ্ছে না মানে? তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর—কখন থেকে?

সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। যাওয়ার সময় আমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে বলে গিয়েছিল।

বিনতার উদ্‌ভ্রান্ত গলার স্বরটা যেন আমার বুকের ভেতর গিয়ে আঘাত করেছে। নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে না পেরে এবার গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে-আসতে জিজ্ঞাসা করেছি —তিনি মানে শর্মিলাদেবী ভোরবেলা কোথায় যাচ্ছেন তা কিছু বলে গেছেন?

বিনতা আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছে নেহাত যান্ত্রিকভাবে। আমাকে আলাদাভাবে লক্ষ করবার মতো অবস্থা যে তার নয় তা বুঝেছি। যেন দৃষ্টিহীনের চাউনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে—স্পষ্ট করে কিছু বলে যায়নি। তবে পিসেমশাইয়ের কিছু একটা হদিশ পেয়ে তাঁরই সন্ধানে যে গেছে তা বুঝেছিলাম।

এখন তো তা হলে থানাতেই যাওয়া দরকার। বলেছি আমি।

কিন্তু পরাশর মাথা নেড়েছে। বলেছে—না, এখুনি থানায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই। আমার পিসতুতো বোনকে আমি চিনি। সাধারণ কোনও বিপদ হলে তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা সে রাখে। সে যদি এখনও না ফিরে থাকে তার একটা উপযুক্ত কারণ নিশ্চয় আছে। আর তার এখনও না ফেরার মধ্যে সাংঘাতিক কোনও শয়তানী কারণ যদি থাকে তাহলে এখুনি এখানকার থানায় গিয়ে তার প্রতিকার করা যাবে না। আগে জাঙালবাড়িতেই চলো। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার।

সেই বয়সেই এত সহজে এই বিপদের মধ্যে পরাশর যে সমস্ত ব্যাপারটার কর্তৃত্ব নিয়েছে তাতে আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনের তখন সে-অবস্থা নয়।

পরাশরের নির্দেশ মতোই আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসেছি।

পরাশর আগের মতোই চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে সামনে বসেছে, বিনতা বসেছে পেছনে আমার পাশে।

কার পাশে কোথায় বসেছে, বিনতা তা তখন খেয়ালও করেনি নিশ্চয়।

কিন্তু আমি সেই শঙ্কিত উদ্বেগের মধ্যেই আমার পাশে তার উপস্থিতিটুকুতেই যেন ধন্য হয়ে গেছি।

পাঁচ

আর কিছুদূর যাওয়ার পরই একটা নিচু গোছের টিলা পার হতে জাঙালবাড়ির আয়তনটা দেখা গেছে।

দূর থেকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়েছে আমার।

দু-ধারে নিচু পাথুরে দেওয়াল তোলা একটা পাথরে বাঁধানো লম্বা পোলের মতো রাস্তায় সেখানে যেতে-যেতে জাঙাল নামটার সার্থকতাও বুঝেছি।

বাঁধানো পোলের মতো রাস্তাটার নিচে নাবাল জমি। এককালে সেখানে ঝিল গোছের কিছু নিশ্চয় ছিল। এখন তা শুকিয়ে বুজে এসে প্রায় রাস্তার নাগালই ধরে ফেলেছে। কোনও বাঁধ-টাঁধের জন্যে নয়, জাঙালবাড়ি নামটা এই পাথুরে পোলটুকুর জন্যেই এককালে দেওয়া হয়েছিল মনে হয়েছে।

BanglaBook.org

পাথুরে পোলটা পার হয়ে জাঙালবাড়ির এলাকার মধ্যে ঢোকবার পর দেখা গেছে যে, সবটাই তার ধ্বংসস্তূপ নয়। একদিকটা ধসে পড়া গড়ের মতো হলেও অন্যদিকটা মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

কোথাও পুরনো দেওয়ালের অবশেষ আর কোথাও নতুন শালের খুঁটি বেড়া দেওয়া বাইরের জায়গাটুকুর মধ্যে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের কিছু চিহ্নও বর্তমান। একদিকে তারের জাল দেওয়া ও ভাগ ভাগ করা ক'টা মুরগির ঘর। আর-একদিকে টিনের শেড দেওয়া একটা গোয়াল। সেখানে গরু মাত্র দুটি হলেও তাদের ব্যবস্থায় আধুনিক গোপালন পদ্ধতির ছাপ আছে। বসতবাড়ির একধারে তাঁত-ঘরও একটি বর্তমান। সেখানে তাঁত একটি আছে বটে, তবে চালাবার লোক অভাবে সেটি অচল। বাড়ির অদূরে একটি বৃহৎ ইন্দারায় লাটা দিয়ে জল তোলবার ব্যবস্থা আছে। ইন্দারার চারিপাশে এই গ্রীষ্মের মধ্যেই কিছু তরিতরকারির চাষ চোখে পড়ে।

এতসব খুঁটিয়ে অবশ্য সেই প্রথম আসার সময় দেখিনি। জাঙালবাড়ির রহস্য আর আমার পাশে বিনতার উপস্থিতিই তখন সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে আছে।

জাঙালবাড়িতে পৌঁছে অবশ্য একটা সমস্যার সমাধানের সঙ্গে আমাদের বিস্মিত হতে হল।

গাড়ি থামবার আগেই ইন্দারার ধারে লাটা দিয়ে যে জল তুলছিল সেই মুনিশটি ছুটে এল আমাদের কাছে।

তার উত্তেজিত সম্ভাষণ শুনে আমরা যেমন বিস্মিত হলাম তেমনি স্বস্তির নিশ্বাসও ছেড়ে বাঁচলাম।

পরাশরের অনুমানই ঠিক। মুনিশটির কথায় বোঝা গেল শর্মিলা খানিক আগেই ফিরে এসেছে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার পর তার দর্শনও পাওয়া গেল।

মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি নিয়ে সে তখন বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেউ কিছু বলবার সুযোগ পাওয়ার আগেই বিনতা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

কোথায় ছিলি বল তো!

অভিযোগে গলাটা তীক্ষ্ণ কঠিন করবার চেষ্টার সঙ্গে বিনতার মুখের সে উচ্ছ্বসিত আনন্দ সত্যিই উপভোগ করবার মতো।

কিন্তু আমার মতো শুধু সেদিকে দৃষ্টি তখন আর কার আছে।

পরাশরের সঙ্গে চৌধুরীমশাইও ব্যস্ত হয়ে শর্মিলার কাছে এগিয়ে গেছেন।

সত্যি কোথায় গেছলি শমি?—একটু ভর্ৎসনার সুরে জিগেসা করেছে পরাশর।

এতদিন বাদে এখানে কি শাসন করতেই এলে নাকি পরাশরদা।—কৌতুকের ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেও শর্মিলা গলাটা যেন একটু ভারি হয়ে উঠেছে।

শাসন আপনাকে কারুর করা কিন্তু দরকার শর্মিলাদেবী। হালকা সুরে একটু হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই—এতক্ষণ এমন নিপাত্তা হয়ে থাকলে আপনার সখীটির অবস্থা কী হতে পারে তা কি বুঝতে পারেননি। বিনতা যে রকম উন্মাদিনী অবস্থায় মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটছিল আমি তো সত্যি আঁৎকে উঠেছিলাম।

বিনতাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেও শর্মিলার বেলা চৌধুরীমশাই যে আপনি ব্যবহার করেন সেটা তখনই লক্ষ্য করেছিলাম।

সেটা শর্মিলার ব্যক্তিত্বের জন্যে কি না তখন অবশ্য বিচার করে দেখিনি।

চৌধুরীমশাইয়ের কথায় শর্মিলা একটু স্নেহভরেই হেসে বিনতার দিকে চেয়ে বলেছে—এত ভয় পাওয়ার কী হয়েছিল? আমিও কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি ভেবেছিলি?

বিনতা কিছু বলেনি। তার বদলে পরাশর একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছে—এ সত্যি হাসি-তামাশার সময় নয় শমি। কিছুটা আমি চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে শুনেছি, বাকিটা তোমার

BanglaBook.org

কাছে শুনতে চাই।

বেশ তো সবই শুনবে। —এবার গম্ভীর হয়ে বলেছে শর্মিলা—সারাদিন ট্রেনে হয়রান হয়ে তেতেপুড়ে এসেছ। এখন একটু বিশ্রাম করো, সবই তারপর বলব। শুনেই এখুনি ছুটে গিয়ে কিনারা করে ফেলবে এমন সমস্যা এটা বোধহয় নয়।

পরাশর না পাক আমরা এ-কথায় একটু লজ্জা পেয়েছি।

চৌধুরীমশাই একটু কুণ্ঠিতভাবে আমাদের সকলকে উদ্দেশ করে বলেছেন, আমি তা হলে এখন চলি।

একটু থেমে বিশেষভাবে শর্মিলার দিকেই চেয়ে আবার বলেছেন, যদি উচিত মনে করেন আপনার এতক্ষণের অন্তর্ধান রহস্যটা আমায় পরে জানাবেন। আর আগে যা বলেছি আবার সেই অনুরোধই করে যাচ্ছি। যদি কিছু দরকার হয় বলবেন, বিশ্বাস রাখবেন যে, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে সবসময়ে প্রস্তুত।

ধন্যবাদ! বলেছে শর্মিলা। কিন্তু চৌধুরীমশাইয়ের তা যেন কানে যায়নি।

কথাগুলো বলে তিনি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে সোজা জাঙালবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠবার সময় বিনতার এই উদ্বেল উত্তেজনার মধ্যেই শর্মিলার দিকে চেয়ে ঈষৎ কৌতুকের হাসিটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আর তাহলে এখানে কেন? ভেতরে এসো। —বলে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে শর্মিলা একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছে!

ও, পরিচয়টা এখনও দেওয়া হয়নি।— এবার সহজভাবে হেসে বলেছে পরাশর, তা পরিচয় দেওয়ার সময়ই পেলাম কোথায়!

পরিচয় সারা হওয়ার পর আমরা সবাই ভেতরে গিয়েছি। বাইরের বসবার ঘর হিসেবে সেটা বোধহয় কাছারিবাড়ি গোছের কিছু ছিল। দেওয়াল, ছাদের ফাটলগুলো এখন দাগরাজি করা। ঘরটি কিন্তু যেমন প্রশস্ত তেমনি আগের আমলের পুরু গাঁথুনির জন্যে চমৎকার ঠাণ্ডা।

ঘরে বিলাসের সাজসরঞ্জাম না থাকলেও সাদাসিধে দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো।

স্নান খাওয়া-দাওয়া সারতে সেদিন বিকেল হয়ে গেছে।

তখনও পর্যন্ত জাঙালবাড়ির রহস্য সম্বন্ধে ইচ্ছেকরেই কেউ কোনও কথা তোলেনি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করবার আগ্রহ কিন্তু দেখা যায়নি কারুরই। সেই বসবার ঘরটিতেই আমরা আবার সবাই সমবেত হয়েছি।

প্রথমে অবশ্য আসল প্রশ্নটাকে দূরে রেখে সাধারণ আলাপই একটু চালানো হয়েছে।

তারপর হঠাৎ কী মনে করে তোমার উদয় বলো তো পরাশরদা! শর্মিলা সহজ পরিহাসের সুরে বলেছে—এই অজ পাড়াগাঁয়ে শখ করে বেড়াতে এসেছ বলে তো মনে হচ্ছে না! এতটা ভগিনী-প্রীতি তোমার তো কখনও দেখিনি।

প্রীতিটা চোখে দেখবার বস্তু নয় বলেই জানি। পরাশরও হেসে পাল্টা জবাব দিয়েছে, তবে সত্যিই প্রীতির টানে আসিনি স্বীকার করছি। এসেছি পিসিমার হুকুমে।

হুকুমে এসেছ! শর্মিলা একটা ভুরু একটু তুলেছে, কী হুকুম আবার মার?

হুকুম হয়েছে বিনুকে এখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়ার। পরাশর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যেই বিনতা ও শর্মিলার দুজনের দিকেই চেয়েছে।

বিনতা কেমন একটু অসহায়ভাবে তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে। শর্মিলা কিন্তু হেসে বলেছে—তা নিয়ে যাও না। সত্যি এখন আর এরকম গোলমেলে জায়গায় ওর থাকা উচিত নয়।

BanglaBook.org

আর তোমার থাকা উচিত। —প্রায় ধমকের স্বরে বলেছে পরাশর—তোমাদের কারুরই আর এখানে থাকা চলবে না। আমাদের সঙ্গে তোমাদের দুজনকেই কাল এখান থেকে যেতে হবে। গোছগাছ যা করবার করে নাও।

তা হয় না পরাশরদা।

শর্মিলার স্বরের দৃঢ়তায় পরাশর যেন চমকে গেছে। তবু কঠিন স্বরে বলেছে—কেন হয় না! সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত শমি। এরকম একটা বিপদের জায়গায় জেদ করে তোমার থাকার কোনও মানে হয় না। এখানে এমন কিছু রাজত্ব তুমি পেতে বসোনি যা ছেড়ে গেলে তোমার সর্বনাশ হবে!

রাজত্ব হলেও তা ছেড়ে যেতে পারতাম হয়তো। শর্মিলার স্বর যেন বজ্রকঠিন, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কেউ আমায় এ-জায়গা ছাড়াবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

ভয় দেখিয়ে জায়গা ছাড়াবে! পরাশর এবার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ভয় আবার তোমায় কে দেখাচ্ছে?

কে দেখাচ্ছে জানি না, কিন্তু গত দু-মাস ধরে এমন কিছু সব অদ্ভুত ব্যাপার এই জাঙালবাড়িতে ঘটছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়ানো বলে আমি মনে করি। একজন প্রৌঢ় দুর্বল পুরুষ আর দুটি আমাদের মতো অল্পবয়সী মেয়ে যাতে আতঙ্কে দিশাহারা হয় এমন কোনও কৌশলই বাকি নেই। ভয়ে আমার মজুর-মুনিশ-চাকররা বেশিরভাগ কাজে আসা বন্ধ করেছে, তবু আমরা হার মানিনি বলে শেষ পর্যন্ত পিসেমশাইকে লোপাট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতেই আমি সব ছেড়ে পালাব যদি কেউ ভেবে থাকে তার ভুল আমি ভাঙব। এ-রহস্যের একেবারে মূল না খুঁড়ে বার করে আমি যাব না। তা ছাড়া পিসেমশাইয়ের কী হয়েছে না জেনে শুধু নিজেকে নিরাপদ করতে তুমিই কি আমায় যেতে বলো!

শর্মিলা উত্তেজিতভাবে তার বক্তব্য শেষ করবার পর ঘরটা কয়েক মুহূর্ত একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শর্মিলার উত্তেজনা তখন আমাদের ভেতরও সংক্রামিত।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পরাশরই প্রথম শর্মিলাকে সমর্থন করে বলেছে, না, তা যেতে তোমায় বলি না। এ-রহস্যের মীমাংসা না করে আমিও এখান থেকে যাব না ঠিক করলাম। এখন তোমার মুখে গোড়া থেকে যা-যা হয়েছে তা শুনতে চাই।

শর্মিলার কাছে সেই বিবরণ এবার শোনা গেছে। সত্যিই বেশ জটিল, গোলমেলে, ভয়াবহ রহস্যে জড়ানো দীর্ঘ একটা ইতিহাস।

ছয়

শর্মিলারা জাঙালবাড়িতে এসে তাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করে প্রায় বছরখানেক আগে।

প্রথমেই অতবড় গালভরা নাম দিয়ে তাদের কাজ অবশ্য তারা শুরু করেনি। তখন সবে বর্ষা শেষ হয়ে শরতের শ্রী এই বন্ধ্যা পাথুরে মাটির দেশেও দেখা দিয়েছে। জায়গাটা তাদের এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে, নানান অসুবিধা সেখানে থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য করেনি। সেখানেই তাদের স্বপ্ন সফল করবে বলে সঙ্কল্প করেছে।

তারা মানে অবশ্য শর্মিলা একাই। হ্যাঁ করতেও সে, না করতেও। সে যা ঠিক করবে বিনতার সায় তাতে থাকবেই।

শুধু বিনতা নয়, প্রৌঢ় বিক্রম সিংহরায়ও শর্মিলার উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে এ-কাজে মেতে উঠেছেন।

BanglaBook.org

জাঙালবাড়ি তখন প্রায় সমস্তটাই ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবি। তার সামান্য যে-অংশটুকু সারিয়ে বিক্রম সিংহরায় থাকতেন তারই লাগাও আরও বৃহৎ একটা অংশ শর্মিলার নির্দেশমতো তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে সংস্কার করিয়েছেন। হাঁস-মুরগি কিনে পোলট্রির পত্তন করা, টিনের চাল দিয়ে গরু রাখবার উন্নত ধরনের গোয়াল তৈরি করা, তাঁত-ঘর বসানো—সব কাজই ছোটখাটো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে।

বাধা-বিপত্তি গোড়ার দিকে ছিল বেশিরভাগ একদিক দিয়ে। এ-অঞ্চলের লোকেদের কোনও কিছুতেই গা না-লাগাবার স্বভাবই যত গোল বাধিয়েছে। কুঁড়েমি এদের মজ্জাগত। কোনও কাজ সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ তো নেই-ই, দায়িত্ববোধেরও অভাব। ঠিকমতো কেন, আগাম মাইনে-মজুরি নিয়েও যথাসময়ে তারা কাজে আসে না। মাঝে-মাঝে একেবারেই ডুব মারে।

খবর নিতে গিয়ে কিন্তু জানা যায় যে, টাকা ফাঁকি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য মোটেই নয়। এক-আধদিন কাজ কামাই করাটা তারা দোষের বলেই মনে করে না। এ-ধরনের কথার খেলাপ তাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অজুহাতও তাদের একেবারে জিহ্বাগ্রে। নিজের জ্বরজারি ব্যায়রামের ছুতো তো আছেই, তার ওপর মরা বাপ কি মার নতুন করে গঙ্গাজলির বা না-জন্মানো ছেলের মুখেভাতের দোহাই দিতে তাদের বাধে না।

বিক্রম সিংহরায় জাঙালবাড়ির মালিক হলেও এ-অঞ্চলের খুব বেশিদিনের বাসিন্দা নন। ছেলেবেলা কিছুকাল তাঁর এখানে কেটেছিল মাত্র। তারপর জীবনের বেশিরভাগ তিনি বিদেশে, বিশেষ করে বর্মাতেই কাটিয়েছেন। বছরকয়েক আগে সেখান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসে এই ভিটেতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেও এখানকার মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় তাঁর অত্যন্ত অল্প। তাঁর একার তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়নি। দু-একজন মুনিশ, পাহারাদার দিয়েই তাঁর চলে গেছে। শর্মিলাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের জন্যে লোকজন জোগাড় করে কাজে লাগাতে গিয়েই তিনি তাদের গুণপনা টের পেয়েছেন।

এইসব দায়িত্বহীন মানুষজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে শর্মিলাদের সত্যিই এক-একসময়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেই অসুবিধার সূত্রেই তাদের চৌধুরীমশাই অর্থাৎ দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম ভালো করে পরিচয়।

দেবপ্রতাপ চৌধুরী এ-তল্লাটের প্রধান গ্রাম দশানিপাড়ার সত্যিকার মাতব্বর ব্যক্তি। এ-অঞ্চলের বড় জমিদার হিসাবে পয়সা, প্রতিপত্তি তাঁর যথেষ্ট, তার ওপর প্রাচীন বনেদী বংশের আভিজাত্যের ছাপের দরুন নয়, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র আর ক্ষমতার জন্যেও সবাই তাঁকে সমীহ করে।

সমীহটা প্রায় ভয়ের সামিল বলেই শর্মিলাদের ব্যাপারে মনে হয়েছিল। দেবপ্রতাপ চৌধুরী তাদের সে-সময়ে সাহায্য না করলে তাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের গোড়াপত্তনই বোধহয় হত না।

মজার কথা এই যে, চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগটা বেশ একটু রাগারাগির ভেতর দিয়েই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মহিন্দর নামে তাঁত-ঘরের নতুন কাজে-লাগা একটি লোককে নিয়েই ব্যাপারটার সূত্রপাত। লোকটা সত্যিই গুণী। এ-অঞ্চলে রেশমের তাঁত চালাবার মতো ওস্তাদ কারিগর তখন প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। বাংলায় রেশমের নতুন করে চাহিদা তখনও শুরু হয়নি। বেশিরভাগ কারিগর খেতে না পেয়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। রেশমের তাঁত-শিল্পই জন লোপ পাওয়ার অবস্থা। শর্মিলা মহিন্দরকে দিয়ে সেই রেশমের শিল্পই আবার জাগিয়ে তুলবে আশা করে তার ওপর সব ভার দিয়েছিল। সেইসঙ্গে একমাসের মজুরি আগাম।

কিন্তু মহিন্দর আগাম নেবার পরদিন থেকে সেই যে ডুব দিলে তার আর দেখা নেই। সমবায়ের অন্য লোকজন পাঠিয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে কিছুই সঠিক জানা গেল না। কখনও শোনা গেল তার অসুখ, কখনও বা শোনা গেল যে, সে গাঁ ছেড়েই চলে গেছে। এর মধ্যে বিক্রম সিংহরায়ের

BanglaBook.org

পুরনো বিশ্বাসী পাহারাদার দশরথ একদিন নিজে খোঁজ নিয়ে এসে যা খবর দিলে তাতে অবাক শুধু নয়, মেজাজ গরম হওয়ারই কথা।

মহিন্দর দশরথের কাছে সাফ বলে দিয়েছে যে, জাঙালবাড়িতে কাজ করতে আসতে সে পারবে না। আগাম যা টাকা নিয়েছে তা সে ফেরত দিয়ে দেবে। তবে আপাতত টাকাটা তার খরচ হয়ে গেছে, তাই রাজাবাবুর সামনে সে টাকা ফেরত দেওয়ার কড়ার লিখে দিতে রাজি।

রাজাবাবুটা কে সে প্রশ্ন করবার আগে কেন মহিন্দর জাঙালবাড়িতে কাজ করতে নারাজ জানতে চেয়েছে শর্মিলা।

দশরথের মুখে মহিন্দরের অজুহাত যা শোনা গেছে তা অদ্ভুত।

জাঙালবাড়িতে নাকি অপদেবতা, যখ পাহারায় আছে। সবাই তাকে ওখানে কাজ নিতে মানা করেছিল। তবু গোড়ায় সে কারুর কথা শোনেনি। কিন্তু জাঙালবাড়িতে কাজ নেওয়ার প্রথম দিনই ফেরবার সময় সে নিজের চোখে যখকে পোড়ো গড়মহলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

তা যখ দেখে সে চুপ করে থেকেছে কেন?—দশরথই জিজ্ঞাসা করেছিল মহিন্দরকে—চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি করলেও তো জাঙালবাড়ি থেকে কেউ-না-কেউ যেতে পারত তার কাছে।

হ্যাঁ, চেঁচামেচি করলে কেউ তা শুনে আসত ওই ভরসন্ধের সময়ে জাঙালবাড়ির গড়মহলের দিকে! —মহিন্দর মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তার অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেছিল আর সেইসঙ্গে জানিয়েছিল যে, চেঁচামেচি করবার মতো অবস্থাই তার ছিল না। কারণ, ওই বিদ্‌ঘুটে জায়গায় হঠাৎ যখকে বার হতে দেখেই সে না কি দাঁতকপাটি লেগে বেঁহুশ হয়ে যায়। নেহাত গুরুবল ছিল বলে শেষপর্যন্ত এক ভালোমানুষের পো-এর নজরে পড়ে সে-যাত্রা তার প্রাণ বেঁচেছে; নইলে বেঁহুশ অবস্থাতেই যখ তাকে কোন পাতালে পুঁতে ফেলত কে জানে।

দশরথের কাছে এ পর্যন্ত বিবরণ শুনে বিক্রম সিংহরায়ই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—এই ভালোমানুষের পো-টি কে?

মহিন্দর বলে চেনা-চেনা লাগলেও ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।—জানিয়েছে দশরথ।

না চেনা, না অচেনা একজন মানুষ ওখানে হঠাৎ কেমন করে উদয় হয়ে মহিন্দরের প্রাণ বাঁচালেন দশরথ তা অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কারণ, মহিন্দর যা তাকে বলেছে তার বেশি কিছু সে আর কোথা থেকে জানবে!

অজুহাত যা দিয়েছে তা যত অদ্ভুতই হোক, মহিন্দর যে জাঙালবাড়িতে কাজ করতে চায় না এই মোদ্দা কথাটা ভালো করেই বোঝা গেছে।

কিন্তু হঠাৎ তার এ-আপত্তির কারণ কী! শর্মিলা-বিনতা তো বটেই, বৃদ্ধ সিংহরায়মশাই নিজেই এ-আপত্তির কোনও কারণ খুঁজে পাননি।

লোকটা আগ্রহভরেই এ-কাজ নিতে এসেছিল। শর্মিলা আর সিংহরায়মশাইয়ের কাছে কাজ আর অগ্রিম মাইনে বুঝে নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে তার কথাবার্তায় কি চালচলনে মতলব যে তার এমন পাল্টে যেতে পারে, তার এতটুকু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। জাঙালবাড়ির গড়মহল সম্বন্ধে এ-অঞ্চলে নানা ভুতুড়ে গল্প চলতি থাকা স্বাভাবিক। মহিন্দরের সেসব অজানা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া লোকটা সম্বন্ধে আর কিছু না জানা যাক, ঠগবাজ যে সে নয় এটুকু খোঁজখবর নিয়ে ভালোভাবেই জানা গেছে। মিথ্যে স্তোক দিয়ে ফাঁকি দিয়ে টাকা নেওয়ার ফিকির সে নিশ্চয়ই করেনি। তার এ-মতবদলের একটা সত্যিকার কারণ তা হলে আছে।

সে কারণ কি সত্যিই সে যা বলেছে তাই? ওইরকম আজগুবি ভুতুড়ে গোছের কিছু সে গড়মহলে সত্যিই দেখেছে!

শর্মিলা তো নয়ই সিংহরায়মশাইও তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

BanglaBook.org

জাঙালবাড়ি থেকে নিজেদের গাঁয়ে যেতে মহিন্দরের তো গড়মহলের দিকে যাওয়ারই কথা নয় ওই ভরসন্ধেবেলা। গড়মহলের দিক দিয়ে গাঁয়ে যাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু সে তো সত্যিকারের দুঃসাহসিক ব্যাপার। গড়মহল ছাড়ালেই মজা বাঁওড়ের বিরাট দিগন্ত-ছোঁওয়া জংলা জলা। যত না অপদেবতার, সাপখোপের ভয় সেখানে তারচেয়ে বেশি।

সেদিক দিয়ে সাহস করে যদি গিয়েই থাকে তা হলেও ভুতুড়ে মূর্তি দেখে বেঁহুশ হওয়ার পর চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে তার সাড় ফিরিয়েছে কে, মহিন্দর যাকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারেনি?

অসময়ে অমন বেপোট জায়গায় ঘোরাফেরাই বা সে লোকটি করছিল কেন?

না, ও ভুতুড়ে গল্পটল্প সব বানানো অজুহাত।—জোর দিয়ে বলেছেন সিংহরায়মশাই—এখানে কাজ করতে না আসার অন্য গুরুতর কারণ আছে। কেউ মহিন্দরকে মানা করেছে এ-কাজ নিতে, হয়তো ভয় দেখিয়েছে।

সেরকম লোক কে হতে পারে? বলে নিজের সংশয়টা প্রকাশ করেই শর্মিলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে—আচ্ছা, ওই রাজাবাবুটি কে, টাকা ফেরৎ দেওয়ার কড়ার করতে মহিন্দর যাঁকে জামিন রাখবার ভরসা পায়।

রাজাবাবু মানে দেবপ্রতাপ চৌধুরী। আসলে রাজা-টাজা কিছু নয়, পয়সা, প্রতিপত্তি আছে বলে এখানকার লোকে, বিশেষ করে, গরীব-দুঃখীরা রাজাবাবু বলে। সিংহরায়মশাই একটু অপ্রসন্ন স্বরেই বলেছেন, তা বনেদী জমিদার বংশ বটে। এককালে ওই চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের সিংহরায়দের খুব রেষারেষি আকচা-আকচি ছিল বলে শুনেছি। বাঁওড় নিয়েই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে অনেক।

সিংহরায়মশাইয়ের কথায় তারপর জানা গেছে যে, তাঁর সঙ্গে রাজাবাবু অর্থাৎ দেবপ্রতাপ চৌধুরীর বিশেষ পরিচয় নেই। বর্মা থেকে এসে এখানে বাসা বাঁধবার পর সামান্য দু-চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল মাত্র। শর্মিলারা এখানে এসে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করবার পর কাছের গ্রাম থেকে দরকারি জিনিসপত্র ও মানুষজন জোগাড় করার ব্যাপারে দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে আর একটু বেশি যোগাযোগ হয়েছে। চৌধুরী গাঁয়ের মাথা ও এ-অঞ্চলের মাতব্বর ব্যক্তি। তাঁর সাহায্য, পরামর্শ তাই মাঝে-মাঝে না নিয়ে পারা যায়নি।

দেবপ্রতাপ চৌধুরী কিন্তু গোড়া থেকেই মেয়েদের এই পুরুষালি প্রচেষ্টা একটু যেন বাঁকা চোখে দেখেছেন বলে সিংহরায়মশাইয়ের ধারণা। অন্তত তাঁর মুখে হাসি-ঠাট্টা একটু-আধটু যা শোনা গেছে তাতে এ-ব্যাপারে তাঁর সমর্থন নেই বলেই মনে হয়েছে।

প্রথমবার শর্মিলাদের ডেয়ারির জন্যে গাঁয়ে গরু কিনতে গিয়ে সিংহরায়মশাইকে দেবপ্রতাপ চৌধুরীরই শরণ নিতে হয়েছিল। গাঁয়ের বেচবার মতো ভালো গরু কারুর নেই। সবাই দেবপ্রতাপ চৌধুরীর কাছেই যেতে বলেছিল। চৌধুরীবাড়ির গোয়ালে নাকি একেবারে সেরা জাতের সব গরু আছে।

বিক্রম সিংহরায় তাই গেছলেন। সব শুনে চৌধুরীমশাই উদার হয়ে বলেছিলেন—তা নিয়ে যান না, যে ক'টা গরু দরকার। গোটা দশেক হলেই হবে তো?

না গোটা দশেক নয়, দুটো হলেই হবে—বলেছিলেন সিংহরায়।

মোটে দুটো!— দেবপ্রতাপের গলার স্বরে আর চোখে-মুখে পরিহাসের ভাবটা এবার লুকনো থাকেনি।

সেটা গ্রাহ্য না করেই সিংহরায়মশাই দামের কথা তুলেছিলেন।

দাম? দাম আবার কী দেবেন! স্পষ্টই হেসে উঠেছিলেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী—দাম আপনাদের দিতে হবে না।

তা কী করে হয়? বলতে গেছলেন সিংহরায়।

BanglaBook.org

কিন্তু দেবপ্রতাপ তার আগেই ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন—দু-দিন বাদেই তো গ্রাম-গ্রাম খেলার শখ আপনার ভাইঝিদের মিটে যাবে। তখন জলের দরে আমার কাছেই সব বেচতে আসতে হবে। অবলা বধ করে সেই লাভটা আর করতে চাই না। তারচেয়ে এমনি ক'দিন গরু দুটো ভাড়া নিয়ে যান। খেলাধুলো শেষ হলে চলে যাওয়ার সময় না-হয় ভাড়া হিসাবে কিছু ধরে দিয়ে যাবেন।

সিংহরায়মশাইয়ের কাছে এই পর্যন্ত শুনেই শর্মিলা আগুন হয়ে উঠেছে। মুখ-চোখ রাঙা করে বলেছে—আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার এই চৌধুরীমশাইয়ের! এসব কথা আগে তো কিছু বলেননি পিসেমশাই!

পিসেমশাই স্বীকার করেছেন যে, তখনও হাসি-ঠাট্টাটা তেমন দোষের মনে করেননি। গাঁয়ে দেশের লোকের মন একটু গোঁড়া সেকেলে হয়েই থাকে। দুটি অল্পবয়সী কুমারী মেয়ের এরকম একটা কাজ নিজেরাই চালাবার চেষ্টায় তাদের একটু মজা পাওয়া তাই স্বাভাবিক।

চৌধুরীমশাইয়ের শেষ ঠাট্টাটাই অবশ্য একটু মাত্রাছাড়া মনে হয়েছিল পিসেমশাইয়ের।

তখন অন্য কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। পিসেমশাইয়ের পীড়াপীড়িতে চৌধুরীমশাই গরু দুটির যৎসামান্য দাম নিতে রাজি হয়েছেন। একজন রাখাল দিয়ে গরু দুটি পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করে পিসেমশাইকে বিদায় দেবার সময় হঠাৎ হেসে উঠে চৌধুরীমশাই বলেছিলেন—ও-গরু দুটো তো আমার কাছেই আবার ফেরত আসবে জানি। আপনার ওই জাঙালবাড়িও শেষ পর্যন্ত গ্রামলক্ষ্মীর কৃপায় আমাকেই কিনতে হবে। বলেন তো এখন থেকেই বায়না দিয়ে রাখি। ও-পোড়োভিটের দাম আমার চেয়ে বেশি কেউ দেবে না।

মনে-মনে চটলেও সিংহরায়মশাই ঠিক উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাননি। 'আচ্ছা বিক্রি যদি করি তখন দেখা যাবে' গোছের কী একটা বলে ভেতরে-ভেতরে গজরাতে-গজরাতে চলে এসেছিলেন।

সে-ঘটনা স্মরণ করে এতদিন বাদে পিসেমশাই একটু সন্দিগ্ধই হয়ে উঠেছেন বিশেষ শর্মিলার তাতে সমর্থন পেয়ে।

সব কথা শুনে শর্মিলার তখন বেশ দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, দেবপ্রতাপ চৌধুরী বা রাজাবাবু মানুষটি সুবিধের নয়। গ্রামলক্ষ্মী সমবায় বিফল হওয়ায় যেন তাঁর বেশ কিছু স্বার্থ আছে মনে হয়। কে জানে জাঙালবাড়িটা দাঁও মেরে সস্তায় কেনবার ফিকিরেই হয়তো শর্মিলাদের কাজে তিনি এই রকম লুকিয়ে বাগড়া দিচ্ছেন। তাঁত-ঘরের মহিন্দর তো বটেই, তাদের অন্য লোকজনও বেশিরভাগ রাজাবাবুরই তাঁবেদার। মহিন্দর তাঁর গোপন প্ররোচনাতেই হয়তো কাজ একবার নিয়েও তা ছেড়ে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলতে সাহস করেছে।

হয়তো থেকে সন্দেহটা নিশ্চিত হয়ে উঠেছে ক্রমশ, আর রাগে, উত্তেজনায় শর্মিলা পিসেমশাইকে নিয়ে নিজেই রাজাবাবুর সঙ্গে পরের দিন বোঝাপড়া করতে যাবে বলে ঠিক করেছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, ঠিক যেন অন্তর্যামীর মতো তাদের মনের কথা বুঝে দেবপ্রতাপ চৌধুরী তার পরদিন সকালেই তাঁর মোটরে জাঙালবাড়িতে এসে হাজির।

একা নয়, সঙ্গে আবার স্টেশনমাস্টার বক্সীবাবু। দেবপ্রতাপ চৌধুরী বা বক্সীবাবুর সঙ্গে শর্মিলা আর বিনতার কোনও পরিচয়ই ছিল না। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যা ছিল তা-ও যৎসামান্য।

হঠাৎ দুজনের এভাবে দেখা করতে আসায় শর্মিলারা তাই বেশ একটু অবাক হয়েছে। দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা তাঁকে বাড়িতে পেয়েও প্রথমটা শুরু করতে পারেনি।

বাইরের দিক দিয়ে এ-অঞ্চলের রাজাবাবুর ব্যবহারে ধরবার মতো কোনও ত্রুটি নেই।

তিনি প্রথমেই বক্সীবাবুর পরিচয় দিয়ে হালকাসুরে হলেও একটু যেন কুণ্ঠিতভাবে পিসেমশাইয়ের বদলে শর্মিলাকেই উদ্দেশ করে বলেছেন—আপনারা আমাদের এ-অঞ্চলের অতিথি। আপনাদের সঙ্গে অনেক আগেই আলাপ করতে আসা উচিত ছিল। কিন্তু একা-একা আসতে ঠিক সাহস করছিলাম না।

শর্মিলা বড় মুখফোঁড় মেয়ে, তার ওপর মেজাজটা তার গরম হয়েই ছিল। নতুন আলাপ আর মানী লোক বলে সে রেয়াত করেনি। খোঁচা দেওয়ার সুযোগটা পেয়ে রাজাবাবুর চেহারাটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে বলেছে—হ্যাঁ, যেরকম বিপদের জায়গা, শুধু সঙ্গী নয়, তলোয়ার-বন্দুক নিয়েও আসা উচিত ছিল।

সকলে এ-কথায় হেসে উঠেছে। বিনতাই বুঝি সবচেয়ে বেশি। চৌধুরীমশাই কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়ার বদলে যেন খুশিই হয়েছেন। শর্মিলার পাল্টা জবাবে হাসিমুখেই বলেছেন—তাতেও ভয় কাটত না। আসল কথা কী জানেন, আমরা বেশ একটু গাঁইয়া মানুষ তো। যতই বনগাঁয়ে শেয়ালরাজা হই, আপনাদের মতো শহুরে সভ্য একেলে মেয়েদের সামনে এলেই ভড়কে যাই।

এর পরই শর্মিলা হয়তো সত্যিই বলে ফেলত—তাই বুঝি দূরে আর পিছনে থেকে আমাদের কাজে বাদ সাধছেন।

কিন্তু সে-কথা বলবার সুযোগই হয়নি। দেবপ্রতাপ চৌধুরী সব অভিযোগের জবাব যেন আগে থাকতেই তৈরি করে নিয়ে এসেছেন।

জাঙালবাড়ির বড় উঠোনটা পেরিয়ে শর্মিলাদের বসবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে কথা হচ্ছিল। তাঁর কথার উত্তরে অন্য কেউ কিছু বলার আগেই চৌধুরীমশাই চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলেছেন—আপনাদের কাজকর্ম তো সব বন্ধ দেখছি। আগাম টাকা নিয়ে লোকজন বেইমানি করছে শুনলাম। তাই শুনেই আরও আসতে হল।

তাই শুনেই এলেন! —সিংহরায়মশাই এরপর কড়া একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চৌধুরীমশাই তাঁকে সে-সুযোগ তো দেনইনি, শর্মিলাদেরও হতভম্ব করে দিয়ে বলেছেন—হ্যাঁ, ব্যবস্থাও একেবারে না করে আসিনি। আমাদের গাঁয়ের মহিন্দরই বেয়াড়াপনা করছিল তো? আপনাদের আর ভাবনা নেই। মহিন্দর অন্তত আর গোলমাল কিছু করবে না। আজই সে কাজে আসছে।

পিসেমশাইয়ের জন্যে বরাদ্দ বাইরের ঘরে সবাই তখন গিয়ে বসেছে। পিসেমশাই বা শর্মিলা দুজনেরই মুখে বিরক্তি হঠাৎ বিস্ময় হয়ে ওঠায় প্রথমটা কোনও কথা বার হয়নি। বিনতাই সোজা সরল বলে সবার আগে সামলে উঠে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—মহিন্দর সত্যিই আসছে? ভূত দেখা-টেখা তাহলে সব তার বানানো ছুতো?

চৌধুরীমশাই আবার একবার সকলকে চমকে দিয়ে বলেছেন, না, বানানো ছুতো নয়।

তার মানে সত্যিই সে ভূত দেখেছে বলছেন! —শর্মিলার গলা সন্দেহের তীক্ষ্ণতায় ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই—তার ভূতের ভয় তা হলে কাটল কী করে? আপনিই কাটালেন নাকি!

হ্যাঁ, আমার ছাড়া আর কারুর কথা সে মানতে চায় না। —বেশ একটু যেন দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী।

কিন্তু আপনার কথাই মানল কী করে? —শর্মিলার জেরা থামেনি—আপনি বুঝি বললেন ভূত-টুত মিথ্যে আর অমনি মহিন্দর তা সোনামুখ করে মেনে নিলে!

শর্মিলার কথার খোঁচাটা অস্পষ্ট না হলেও রাজাবাবু তা গ্রাহ্যই করেননি। হেসে বলেছেন, —ভূত-টুত এমন জিনিস নয় যে, আমি বললেই মেনে নেবে। সে যা দেখেছে তা যে ভূত নয় প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝিয়েছি, তবে না মেনেছে আমার কথা।

প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে ভূত নয়। —শর্মিলা এবার বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে—কী প্রমাণ?

প্রমাণ এই যে আপনাদের সামনে!

বক্সীবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে চৌধুরীমশাই এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠেছেন। সবাই তখন একবার বক্সীবাবু আর-একবার চৌধুরীমশাইয়ের দিকে বোকার মতো তাকাচ্ছে।

বক্সীবাবু রহস্যটার সরল ব্যাখ্যা এবার তাদের শুনিয়েছেন। তাঁর কথায় জানা গেছে যে,

BanglaBook.org

মহিন্দর সত্যিই সেদিন গড়মহলের ভেতর থেকে ভরসন্ধ্যার আবছা আলোয় ভূতের মতো কাউকে বার হতে দেখেছিল। তবে ভূত নয়, বক্সীবাবুই তখন ওখান থেকে বার হয়েছিলেন। জাঙালবাড়ি আর গড়মহল সম্বন্ধে আতঙ্ক মেশানো কয়েকটা ধারণা এ-অঞ্চলের লোকের মজ্জাগত। মহিন্দর তাই অন্ধকারে বক্সীবাবুকে ওই ভুতুড়ে জায়গা থেকে বার হতে দেখেই চিৎকার করে উঠে ভয়ে ভির্মি গেছে। বক্সীবাবুকেই তখন গিয়ে তাকে নাড়াচাড়া দিয়ে চাঙ্গা করতে হয়েছে। মহিন্দরকে অবশ্য বক্সীবাবু চিনতেন না। পরিচয় নেওয়ার সুযোগও তাঁর হয়নি। কারণ চাঙ্গা হবার পরও মহিন্দরের অবস্থা আগেরই মতো। তখন অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। বক্সীবাবুর দিকে ভালো করে একবার তাকাতেও সাহস না করে সে পড়ি কি মরি করে ছুট দিয়েছে পুরনো পাথুরে পোলটার দিকে। কোনও লাভ নেই বলে বক্সীবাবু আর ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করেননি।

তন্ময় হয়ে সবাই এ-বিবরণ এতক্ষণ শুনেছে। তারপর শর্মিলা সন্দিগ্ধভাবে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছে—কিন্তু বক্সীবাবু ওই গড়মহলে ভরসন্ধের সময় কী করতে গেছলেন?

গেছলেন, যে জন্যে প্রায় উনি ওখানে যান। —হেসে বলেছেন রাজাবাবু—তবে তখন উনি যাচ্ছিলেন না, ফিরছিলেন।

ফিরছিলেন তো বুঝলাম, কিন্তু তার আগে গেছলেন কেন?—শর্মিলা আবার একটু রুক্ষস্বরে বলেছে—ওটা তো বেড়াবার জায়গা নয়।

আর কারুর না হোক বক্সীবাবুর বেড়াবার জায়গা!—আগের মতো হেসে বলেছেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী—কখনও-কখনও আমারও বটে!

তার মানে?—পিসেমশাই, বিনতা, শর্মিলা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়েছে রাজাবাবুর দিকে। তখনও জাঙালবাড়ি ও গড়মহলের পুরাতত্ত্বের কথা তারা কেউ জানে না।

বক্সীবাবুই এবার সকলকে আসল ব্যাপারটা খুলে বলেছেন। অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস শুনিয়ে কেন যে সময় সুযোগ পেলে তিনি এখানে পুরাকীর্তির নিদর্শন খুঁজতে আসেন, তা বুঝিয়েছেন এবং শেষকালে সিংহরায় আর জাঙালবাড়ির নতুন পরিচালিকাদের কাছে মাঝে-মাঝে ওই ধ্বংসস্তূপে এসে খোঁজাখুঁজি করার অনুমতি চেয়েছেন তাঁর ও চৌধুরীমশাইয়ের হয়ে।

সে-অনুমতি তাঁদের সানন্দেই দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে শর্মিলা ও বিনতা পুরাকীর্তির নিদর্শন খোঁজার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে তার অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছে।

বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব বক্সীবাবুই দিয়েছেন; কিন্তু সেইদিনই বিনতার চোখে পড়েছে যে, শর্মিলার প্রশ্নের বেলায় উত্তর দেওয়ার ব্যাকুলতা চৌধুরীমশাইয়ের একটু বেশি।

সেদিন যে-পরিচয় শুরু হয়েছিল ক্রমশ তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বক্সীবাবু স্টেশন ফেলে সবসময়ে আসতে পারেন না, কিন্তু দেবপ্রতাপ চৌধুরীকে প্রায়ই তাঁর পুরনো হুডখোলা মরিস গাড়িটায় জাঙালবাড়িতে আসা-যাওয়া করতে তখন দেখা গেছে।

জাঙালবাড়ির গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের অনেক সমস্যার তিনি সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ পেয়ে শর্মিলারা অনেক হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়েছে।

শুধু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের নেশাতেই চৌধুরীমশাই জাঙালবাড়িতে এত ঘন-ঘন যাতায়াত করেন, বা গড়মহলে খুশিমতো ঘোরাফেরার অধিকারের জন্যে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পরিচালিকাকে একটু বেশি তোয়াজ করবার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। মনে হয়, একদিন গ্রামলক্ষ্মী সমবায় যাঁর কাছে হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ছিল, তাঁর এ-পরিবর্তনের মূলে আরও কিছু আছে।

বিনতার অন্তত তখন থেকেই ধারণা, রাজাবাবু শর্মিলাকে প্রথম দেখার পরই কাবু হয়েছেন।

হপ্তায় অন্তত তিনদিন তখন বিকেলে প্রত্নতত্ত্ব-সন্ধানীদের মজলিশ বসে। বক্সীবাবু আসুন বা না আসুন, চৌধুরীমশাই প্রত্যেকটিতেই হাজির থাকেন। শর্মিলাও উপস্থিত থাকে, তবে শুধু প্রত্নতত্ত্বেরই

BanglaBook.org

আকর্ষণে। উৎসাহ না থাকলেও বৃদ্ধ সিংহরায়মশাই এ-মজলিশে যোগ দেন।

তাঁর কাছে অবশ্য ক্রমশ প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহের এ-হুজুগ বেশ বিরক্তিকর হয়েই উঠছে মনে হয়। সে-বিরক্তি তিনি গোপনও করেন না।

শর্মিলাকেই একদিন তিনি বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের সবকথা সরল বিশ্বাসে মেনে নেওয়া সম্বন্ধে সাবধান করেন।

ঠাট্টার সুরেই বলেন—গ্রামলক্ষ্মী ছেড়ে তোমরা কি শেষপর্যন্ত বাক্সলক্ষ্মীর যখের ধন খুঁড়ে বার করতেই মাতবে নাকি!

শর্মিলা তাঁকে পালটা ঠাট্টা করে বলেছে—তা মাতলে ক্ষতি কী?

একটু থেমে আবার বলেছে—দুটো ইট-পাথর নেড়ে আর একটু মাটি খুঁড়ে যদি হীরে-মোহর পাওয়া যায় তাহলে গ্রামলক্ষ্মীর পেছনে অত ছোটাছুটি হয়রানির দরকার কী! সেদিন যে-তাম্রশাসনের টুকরো পাওয়া গেছে তাতে কী ইশারা আছে জানেন? ওই গড়মহলের তলায় কুবেরের ভাণ্ডার লুকনো আছে। ঠিক হদিশটি শুধু পাওয়ার ওয়াস্তা।

সিংহরায়মশাই এবার সত্যি রেগে উঠেছেন, একটু বকুনির সুরে বলেছেন—মুখেই ঠাট্টা করছ কিন্তু ওই বাজে হুজুগের নেশা সত্যিই মনে তোমাদের লেগেছে বলে ভয় হচ্ছে। এ-নেশা যারা ধরিয়েছে সেই বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের ওপরই রাগ হচ্ছে আমার। তাঁদের এই বেয়াড়া খেয়াল নিয়ে বাড়াবাড়ি বন্ধ করাই উচিত মনে হচ্ছে।

আপনার কোনও ভয় নেই পিসেমশাই! —এবার হেসে শর্মিলা সিংহরায়মশাইকে আশ্বস্ত করেছে—পুরাতত্ত্ব নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মজা পাই বলে তার জন্যে নিজেদের আসল কাজ ভুলব এমন আহাম্মক আমরা নই। এ আমাদের একরকম ছেলেখেলা মনে করুন না।

পিসেমশাই কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হননি। বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন—এই ছেলেখেলাই আমার ভালো লাগে না। কোথা থেকে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে? সেকেলে কিছু যদি থাকেও এখানে তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে কোনও শাপমন্যি যে লাগবে না, তাই বা কে জানে!

শর্মিলারা এ নিয়ে আর তর্ক করেনি। দেশ-বিদেশ-ঘোরা মানুষ হলেও পিসেমশাইয়ের মনের কুসংস্কার দেখে নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করেছে।

তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক মজলিশেও পিসেমশাইয়ের অনুপস্থিতিতে একদিন বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইকে শর্মিলা একটু সাবধান করে দিয়েছে।

বলেছে—পিসেমশাইয়ের সামনে গড়মহলের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বেশি উৎসাহ দেখাবেন না আপনারা।

কেন?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন বক্সীবাবু—ওঁর তো এ-ব্যাপারে বেশ আগ্রহই আছে মনে হয়। এই তো কিছুদিন আগে তাম্রশাসনের টুকরোটা পাওয়ার পর যখন সেটা নিয়ে আলোচনা করি তখন তো বিরক্তি-টিরক্তি কিছু দেখিনি।

তখন বিরক্তি ছিল না কিন্তু এখন হয়েছে। —বলে শর্মিলা পিসেমশাইয়ের এখনকার মনোভাবটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

চৌধুরীমশাই হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করেছেন—তার মানে জায়গাটায় কোনও যখ-টখ গোছের অপদেবতার রাজত্ব আছে বলে মনে করেন সিংহরায়মশাই? তার সম্পত্তি খোঁজাখুঁজি করলে ঘাড় মটকে দেবে বা অনিষ্ট করবে ওইরকম কিছু?

ধারণাটা প্রায় ওইরকম! —বলেছে শর্মিলা। সবাই হেসেও উঠেছে।

তা হলে কাজ কি অপদেবতাদের ঘাঁটিয়ে। —দেবপ্রতাপ চৌধুরীর গলার স্বরে কৌতুকের চেয়ে আন্তরিকতাই যেন ফুটে উঠেছে—আপনাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায় এই অভিশাপের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে চলুন না অন্য কোথাও। এই খাঁ-খাঁ শূন্য ভুতুড়ে তেপান্তরের চেয়ে অনেক ভালো জায়গা

BanglaBook.org

এখুনি আপনাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

বিনতার চোখে-মুখে কৌতুকের দুষ্টুমি আর চাপা থাকেনি। মুখে অবশ্য সরলতার ভান করে সে জিজ্ঞাসা করেছে—জায়গাটা কোথায়? আপনার বাড়ির কাছাকাছি না হলে কিন্তু চলবে না। আর দাম-টামও সস্তা হওয়া দরকার। এখানে আমাদের পয়সাই লাগে না জানেন তো!

পয়সা সেখানেই লাগবে নাকি!— চৌধুরীমশাই ব্যস্ত হয়ে জানিয়েছেন—সে জমি অমনি...।

শর্মিলা কিন্তু তাঁকে কথাটা শেষ করতে দেয়নি। গম্ভীর মুখে তাঁকে একটু দমিয়ে দিয়েই বলেছে—আচ্ছা, আপনার এ উদার প্রস্তাবের কথা পরে ভাবা যাবে। এখানকার অপদেবতা আগে তাঁর কোপ-টোপ দেখান, তারপর।

শর্মিলা ঠাট্টা করে যা বলেছিল তা অমন নিদারুণ সত্য হয়ে উঠবে সত্যিই কেউ ভাবতে পারেনি।

ব্যাপারটা শুরু হয় অদ্ভুতভাবে।

সাত

মাস দুই আগে প্রথম একদিন গভীর রাত্রে তারা কাতর আর্তনাদের মতো অমানুষিক এক চিৎকার শুনতে পায়।

শর্মিলা ও বিনতা ভেতরের একটি ঘরে শোয়, পিসেমশাই শুতেন এই বাইরের ঘরে।

সেদিন মাঝরাত্রে পিসেমশাই দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগান।

বাইরের ঘরে একটি লণ্ঠন সারারাত পলতে নামিয়ে জ্বালানো থাকে। দরজা খোলবার পর তিনি সেইটি হাতে করে যেরকম কাঁপতে-কাঁপতে তাদের ঘরে ঢোকেন, তাতে তারা প্রথমটা একটু অবাকই হয়। অবাক হয় লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের চেহারা দেখেও। বৃদ্ধ হলেও বিক্রম সিংহরায়কে সাহসী বলেই তারা জানে। কিন্তু সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে যেন সিঁটিয়ে উঠেছে তখন।

কী, হয়েছে কী পিসেমশাই! —ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে শর্মিলা।

পিসেমশাই প্রথমটা কিছু বলতে পারেন না। তারপর অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বলেন, শুনতে পাচ্ছ?

শুনতে তারা তখন পেয়েছে। বাইরে ঠিক যেন তাদের ইন্দারার কাছ থেকে কেউ যেন কাউকে গলা টিপে হত্যা করছে এমনি একটা কাতর আর্তনাদ দু-বার রাত্রির অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে থেমে যায়।

প্রথম কিছুক্ষণ শর্মিলা ভয়ে কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে ছুটে বার হতে যায়।

বিক্রম সিংহরায় ও বিনতা দুজনেই তাকে ধরে কোনওরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে।

ভোর না হতেই শর্মিলা খোঁজ করতে বার হয় ব্যাপারটার। পিসেমশাই ও বিনতা যান তার সঙ্গে।

বাইরে ইন্দারার কাছে বা আর কোথাও গত রাত্রের ঘটনার কোনও চিহ্নই কিন্তু দেখা যায় না। শুধু বাইরের তাঁত-ঘরে রাত্রের পাহারাদার হিসাবে যে-দুটি লোক থাকে তাদের কারুরই পাত্তা নেই।

দিনেরবেলা তাদের বাড়িতে খোঁজ করতে পাঠিয়ে যে-খবর পাওয়া যায় তা অদ্ভুত। সে দুটি লোক আগের রাত্রেই নাকি তাদের ঘরে ফিরে এসেছিল। তারপর সকাল না হতেই তারা কোথায়

BanglaBook.org

গেছে কেউ জানে না।

রাত্রের ঘটনার কথা কোথাও চাউর না করে শর্মিলা, বিনতা ও পিসেমশাই পরের রাত্রে বেশ একটু প্রস্তুত হয়েই থাকে। গ্রামের স্টেশনারি দোকান থেকে একটি জোরালো টর্চ তারা কিনে আনে পলাতক পাহারাদারের জায়গায় আরও দুটি লোককেও বহাল করে রাত্রে জাঙালবাড়িতে শোওয়ার জন্যে।

সেই অমানুষিক আর্তনাদ কিন্তু সেদিনও মাঝরাত্রে শোনা যায়। এবার ইন্দারার কাছ থেকে নয়, বাড়ির যে অংশটি ভগ্নস্তূপ, সেইদিক থেকেই যেন।

পাহারাদারদের সঙ্গে শর্মিলা, বিনতা ও পিসেমশাইকে নিয়ে টর্চের আলোয় যতখানি সম্ভব সেই পোড়োবাড়ির অংশটা পরীক্ষা করে দেখে সেই রাত্রেই। কিন্তু কোনও হদিশই পাওয়া যায় না এ-রহস্যের।

এরপর থেকে উপদ্রব আরও বাড়তে থাকে। এবার আর শুধু ভয় দেখানো অমানুষিক চিৎকার নয়। তার সঙ্গে আরও অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নানা ঘটনা।

একদিন সকালবেলা উঠে ইন্দারার চারিধারের বাঁধানো চত্বরে রক্তমাখা পায়ের কয়েকটা ছাপ দেখা যায়।

যে দুজন পাহারাদার এতদিন পর্যন্ত কোনওরকমে টিঁকে ছিল তারা সেইদিন থেকেই হাওয়া। গোয়ালে, বাগানে ও তাঁত-ঘরে যারা কাজ করে তারাও এখন বিকেল হতে না-হতেই কাজ ছেড়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত।

জাঙালবাড়ির ওপর অপদেবতার কোপের কথা সারা গাঁয়েই তখন রটে গেছে। এরই মধ্যে একদিন রাত্রে পেছনের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে গভীর রাত্রে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

সকালবেলা খোঁজ করে দেখা যায়, সেখানে একরাশ খড় কোথা থেকে কে জড় করে আগুন দিয়েছিল। গাঁয়ের লোককে সে-কথা কিন্তু বিশ্বাস করানো যায় না। তারা রাত্রে গাঁ থেকে সেই অদ্ভুত আগুন আর ধোঁয়া দেখেছে। ব্যাপারটা যে ভৌতিক এ-বিষয়ে কারুর কোনও সন্দেহ আর নেই।

চৌধুরীমশাই এসব কথা শুনে অবশ্য নিজে থেকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর বন্দুক আছে। সেই বন্দুক নিয়ে রাত্রে জাঙালবাড়িতে পাহারায় থাকার প্রস্তাব তিনি করেন, কিন্তু শর্মিলাই তাতে আপত্তি জানায়।

কিছুদিনের মতো তাঁর বাড়িতে বিনতাকে নিয়ে থাকার অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। এ-অনুরোধ করবার জন্যে শর্মিলাদের সমবয়সী দুজন ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন চৌধুরীমশাই। কিন্তু শর্মিলা তাদের শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত বিবরণ শুনে পরাশর ও আমি দুজনেই সত্যি একটু অবাক হই।

পরাশর আমার প্রশ্নটাই তোলে—চৌধুরীমশাইকে পাহারা দিতে দিলে না কেন? তাঁর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থাকলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

শর্মিলা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

বিনতার মুখে এ-কথায় একটু হাসির আভাস দেখে পরাশর একটু বিরক্তির সুরে তাকেই জিজ্ঞাসা করে—এতে হাসির কী আছে তা তো বুঝতে পারছি না।

বিনতা ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়েই এবার কথাটা বলে ফেলতে বাধ্য হয় বোধহয়।

সলজ্জ কৌতুকের সঙ্গে বলে—হাসছি মানে চৌধুরীমশাইয়ের অবস্থাটা ভেবে। ভদ্রলোক কত চেষ্টাই করেন আমাদের সাহায্যে করবার, কিন্তু শমি ওঁকে পাত্তাই দেয় না।

কেন? চৌধুরীমশাই কি লোক ভালো নন? —আমিই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

আমার তো ভালো লোক বলেই মনে হয়। —বিনতা শর্মিলার দিকে কৌতুক-কটাক্ষ করে

BanglaBook.org

বলে—শমির জন্যে উনি তো জান দিতে প্রস্তুত।

তুই থাম তো! —শর্মিলা ধমক দেয় বিনতাকে।

বিনতা থামলেও ব্যাপারটা অনুমান করে পরাশর এবার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—শমির ওপর ওঁর দুর্বলতা আছে না কি? উনি তো বয়স্ক লোক। ওঁর মেয়েরাই তোমাদের বয়সী শুনলাম।

মেয়ে কোথা থেকে থাকবে! এবার হেসে ফেলে বিনতা—উনি বিয়েই করেননি। ওঁর বয়সও এমন কিছু হয়নি। বাপ-মা মরা ভাইঝিদের মানুষ করেছেন বলে তাদেরই মেয়ে বলেন।

আচ্ছা, খুব ওকালতি হয়েছে!—শর্মিলা এবার বিনতার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে ঝঙ্কার দেয়—অত যদি পছন্দ তো নিজেই স্বয়ম্বরা হও না। এখন আসল কথা বলব, না এইসব বাজে হাসি মশকরা চলবে?

না, না আসল কথাই শুনি।—পরাশর শর্মিলাকে শান্ত করে।

আসল কথা তারপর আর বেশি কিছু নেই।— শর্মিলা বলে যায়—চৌধুরীমশাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে যেদিন ভাইঝিদের নিয়ে এসে অনুরোধ করে যান তার পরের দিনই বিকেলবেলা বক্সীবাবু আসেন স্টেশন থেকে আমাদের খোঁজ নিতে। আগেই শুনেছ তাঁর সঙ্গে এখানে আসবার কিছুদিন পর থেকেই আলাপ হয়েছে। প্রথমে তিনি চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গেই এসেছিলেন। তারপর অনেকবার নিজে থেকে এসে আলাপ করে এ-জায়গার প্রাচীন ইতিহাসের গল্প করে গিয়েছেন। আমরা সেকালের কোনও কিছু নিদর্শন যদি পাই তা তাঁকে দেখাতেও অনুরোধ করেছেন বারবার। নতুন করে সবজি বাগানের মাটিটা চষবার সময় পুরনো ভাঙা একটা তামার টুকরো পাওয়া যায়। তাতে কয়েকটা অক্ষর যেন খোদাই করা। সে টুকরোটা পেয়ে বক্সীবাবু দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ওই খোদাই করা তামার টুকরো কোনও সেকালের মন্দিরের জন্যে জমির দানপত্রের তাম্রশাসনের অংশ বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি আমাদের এ-জায়গার ওপর ভালো করে নজর রাখতে বলেন। হয়তো অত্যন্ত দামি কিছু এখানেই আমরা পেতে পারি সে-আশ্বাসও দেন। তেমন কিছু অবশ্য পাইনি এ-পর্যন্ত। শুধু একদিন গোয়ালঘরটা বাড়াবার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আমাদের মুনিশ গোটা দুই পুরনো মুদ্রা গোছের পায়। সেগুলো বক্সীবাবুকে দেখবার জন্যে দিয়ে এসেছিলাম তারপরই। কিছুদিন বাদে উনি অবশ্য জানান যে, সেগুলো সত্যিকার মুদ্রা নয়।

সেদিন আমাদের এখনকার বিপদের কথা চৌধুরীমশাইয়ের মুখে শুনেই তিনি খোঁজ নিতে এসেছিলেন। ব্যাপারটার মানে তিনিও কিছু বুঝতে পারেননি। সন্ধ্যা হতে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়েই আলোচনা করতে-করতে তিনি পাথুরে পোলের রাস্তায় স্টেশনে ফিরে যান। পিসেমশাই তাঁকে পাথুরে পোলের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মনে আছে। পিসেমশাই কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই নিরুদ্দেশ।

সন্ধ্যে পার হয়ে রাত হতেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। পিসেমশাই ভিতু আগে ছিলেন না। কিন্তু এইসব উপদ্রবের পর থেকে সন্ধের পর তিনি আর বাড়ির বাইরে পর্যন্ত বার হন না। তাঁর এত রাত পর্যন্ত না ফেরার কোনও কারণ না পেয়ে আমরা ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠেছি।

সেদিন নতুন বহাল করা পাহারাদারটাও বাড়ি থেকে দূরে একবার ঘুরে আসবার নাম করে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি।

তা সত্ত্বেও রাত যখন দশটা তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি—বলেছে শর্মিলা—টর্চ নিয়ে আর বিনিকে সঙ্গে করে বাইরে খুঁজতে বেরিয়েছি। পাথুরে পোল পর্যন্ত তো দেখে এসেছি-ই, পেছন দিকের পোড়োগড়টারও এদিক-ওদিক খুঁজেছি। তারপর গিয়েছি পশ্চিম দিকে গঙ্গার চর পর্যন্ত প্রায়। বিনির অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। আমারও সমস্ত শরীর যেন ভয়ে অবশ।

BanglaBook.org

তবু মরিয়া হয়ে মনের জোরে কোনওমতে নিজেকে খাড়া রেখেছি। চিৎকার করে ডেকে আর এত ঘুরে-ঘুরেও পিসেমশাইয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি আবার বাড়িতে। সেইখানেই বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেছে আতঙ্কে। যাওয়ার সময় দরজায় নিজে হাতে তালা দিয়ে গেছলাম। সে তালা খোলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চের আলোয় সেই রক্তমাখা পায়ের দাগ দেখেই বিনি চিৎকার করে উঠেছে। আমারও তখন সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে টলে পড়বার অবস্থা।

পায়ের ছাপটা কী ধরনের? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর—বেশ বড় জোয়ান লোকের পায়ের ছাপ? ভেতরের দিকে যাওয়ার না বাইরে বেরুবার মুখে পড়েছে মনে হয়?

শর্মিলা এক-এক করে সব ক'টা প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে জানিয়েছে—ছাপটা বড় জোয়ান পুরুষের নয়। ইঁদারার কাছে যেমন দেখা গেছল তেমনি যেন কোনও ছোট মেয়ের পায়ের। দুটি মাত্র ধ্যাবড়া অস্পষ্টগোছের ছাপ ঘর থেকে বার হয়ে যাওয়ার সময় যেন পড়েছে।

রক্তটা কীরকম লক্ষ্য করেছিলে? পরাশর আবার জিজ্ঞাসা করেছে—জমাট বাঁধা কি? রক্ত কিছুক্ষণ পড়ে থাকলে যেমন হয়?

হ্যাঁ, জমাট বাঁধা-ই! বলেছে শর্মিলা—কিন্তু রক্ত কি না তা আমারও সন্দেহ হয়েছে। আমার তো লালচে গাঢ় কোনও রঙ বলেই মনে হয়েছিল। তাইতেই মনে যেন একটু সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু সে-সাহসের আর দাম কী? রক্তের বদলে রঙ-ই যদি হয় তা হলেও কেউ এই জাঙালবাড়িতে লুকিয়ে থেকে এসব করছে এ-বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কে সে হতে পারে সেইটেই তো গভীর রহস্য।

আচ্ছা, পিসেমশাইকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে দরজার তালাটা ভাঙা না খোলা দেখেছিলে?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, ভাঙা, নয়, খোলাই দেখেছিলাম। এবার বিনতাই বলেছে—তাই দেখে তো প্রথমে একটু আশা হয়েছিল যে, পিসেমশাই হয়তো ফিরে এসেছেন। তারপর ঘরে ঢুকতেই মেঝের ওপর ওই পায়ের দাগ দেখে আমারও প্রায় হার্টফেল-এর অবস্থা। শমিকে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড বোধহয় বেহুশই হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন কিন্তু আপনাকে দেখে ততটা ভিতু মনে হচ্ছে না!—বিনতার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ নিয়েছি আমি।

এখন যে আপনারা এসে গেছেন!—হেসে বুকটা আমার যেন অবশ করে দিয়ে বিনতা বলেছে—তাছাড়া মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর সবকিছুই বোধহয় খানিকটা সয়ে যায়। সে-রাত্রে বাইরের দরজাগুলোর শুধু খিল লাগাইনি তাতে চেয়ার-টেবিল লাগিয়ে, সহজে যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়, তার ব্যবস্থা করেছি। তারপর সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে নিয়ে জল দিয়ে ওই রক্ত না রঙ, যাই হোক ধুয়ে ফেলে যখন শুয়েছি তখন সে দিশেহারা আতঙ্কটা অনেকখানি যেন কেটে গেছল। আজ দুপুর পর্যন্ত শমি না ফেরায় অবশ্য আবার দিশেহারাই হয়ে গেছলাম।

আট

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুমোতে কিন্তু পারিনি।—শর্মিলা আবার তার বিবরণ শুরু করেছে—বিনি একদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো। ও ভয়ও যেমন বেশি পায় তেমনি ভুলে যেতেও ওর দেরি লাগে না। ও খানিকবাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকেই জেগে থাকতে হয়েছে সারারাত। সেই রাত্রে আরও সব বিশ্রী উপদ্রব হয়েছে। জানলাগুলো সব বন্ধ করে শুয়েছিলাম।

BanglaBook.org

একবার এদিকে একবার নানা জানলায় কিসে যেন অনেকক্ষণ আঁচড়েছে। আমি তা অগ্রাহ্য করে শুয়ে থেকেছি। তারপর আবার সেই গলাটিপে-ধরা আর্তনাদ শোনা গেছে একেবারে যেন বাড়ির ঠিক বাইরে। সেইসঙ্গে শাবল বা ওইরকম কিছু নিয়ে দেওয়ালে ঘা মারবার শব্দ।

বিনিকে না জানিয়ে তখন আমি উঠে পড়ে একবার যেখানে শব্দ হচ্ছিল সেই দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শব্দটা সেদিকে থেমে গিয়ে আর-একদিকে শুরু হয়েছে। এবার আমি তা গ্রাহ্য না করে মনটাকে শক্ত করে বিছানায় এসে রাতটা কাটিয়েছি। ভোর হতে না-হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছি বিনিকে নিয়ে। দেখি, আমাদের দারোয়ান হিসেবে যাকে রেখেছিলাম সে লোকটা ফিরে এসেছে। বাড়িতে বাচ্চার অসুখের জন্যে রাত্রে আসতে পারেনি বলে সে কৈফিয়ত দিয়েছে। তাই মেনে নিয়ে তাকে ইচ্ছেকরেই কিছু জানাইনি। কিন্তু অবাক হয়েছি বেলা একটু বাড়তে না বাড়তেই চৌধুরীমশাই তাঁর গাড়িতে বক্সীবাবুকে নিয়ে এসে পড়ায়।

তাঁরা এসে ব্যস্ত হয়ে পিসেমশাইয়ের খোঁজ করেছেন। খবরটা এবার তাঁদের জানাতে হয়েছে। হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে পিসেমশাইয়ের খোঁজে আসার কারণটা জিজ্ঞাসা করেছি সেইসঙ্গে। তাতে তাঁরা যা বলেছেন তা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়েছি। পিসেমশাই নাকি আগের দিন সন্ধ্যার সময় বক্সীবাবুকে পোল পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার সময়ে তাঁকে বিশেষ করে পরের দিন সকালে চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে সকাল আটটার মধ্যে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবুকে অত্যন্ত দরকারি কী একটা গোপনীয় কথা তাঁর নাকি না জানালে নয়। সেই কথাটা জানিয়ে তারপর পুলিশে যাওয়া উচিত কি না সে-বিষয়ে পরামর্শ করা না কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। পিসেমশাই তখনও গিয়ে না পৌঁছোনোতে একটু চিন্তিত হয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন তারপর। কারণ, পিসেমশাই বক্সীবাবুকে যেরকম ব্যাকুলভাবে গোপন কথাটা জানাবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর ওঁদের সঙ্গে সময়মতো গিয়ে দেখা না করাটা বেশ অস্বাভাবিক।

পিসেমশাইকে সেই সন্ধ্যার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না শুনে, এ-কয়দিনের সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো উচিত বলে বক্সীবাবু ও চৌধুরীমশাই দুজনেই মত প্রকাশ করেছেন। চৌধুরীমশাইয়ের জেদে তাঁর গাড়িতেই থানায় গিয়েছি তারপর। দারোগাবাবু সব শুনে দুজন পুলিশ নিয়ে একবার সরেজমিনে তদন্ত করতেও এসেছেন। কিনারা কিছুই অবশ্য করতে পারেননি। আমাদের মতো দুজন অল্প বয়সের মেয়ের এরকম নির্জন বাড়িতে থাকা উচিত নয় বলে উপদেশ দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের ভীত মনের কল্পনা এইরকম একটা ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন।

পিসেমশাইয়ের অন্তর্ধান হওয়াটা তো আর কল্পনা নয়।—শর্মিলা একটু থামবার পর বলেছে পরাশর—সে-বিষয়ে দারোগাবাবুর ধারণা কী?

দারোগাবাবুর নাকি ধারণা পিসেমশাই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের কাছে যারা কাজ করে তাদের অনেকের কাছে এজাহার নিয়ে কার কাছে না কি তাই শুনেছেন।

ঝগড়া কি কিছু হয়েছিল কখনও?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ঝগড়া নয়, তবে একটু মতান্তর ইদানীং দু-একবার হয়েছে অবশ্য, স্বীকার করেছে শর্মিলা। —এইসব আজগুবি উপদ্রবে পিসেমশাই শেষদিকটায় বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যি। তাঁর ভেতরকার কুসংস্কার একটু বোধহয় চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাঁর কেমন ধারণা হয়েছিল, এতকালের পুরনো পোড়োভিটেয় আবার চাষ-আবাদ আর খোঁড়াখুড়ি করে আমরা এখানকার কোনও বাস্তু দেবতার কোপে পড়েছি। আমাদের জন্যেই উনি ভয় পেয়েছেন। গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের মতো কাজ আমাদের বয়সী মেয়েদের দিয়ে এখানে হওয়ার নয় তাই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাঝে-

BanglaBook.org

মাঝে। তাতে দু-একসময়ে একটু হয়তো ধৈর্য হারিয়ে তাঁর অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে কড়া কথা কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু সেসব কথা তিনি গায়েও মাখেননি।

আচ্ছা, যেদিন সন্ধ্যায় তিনি নিরুদ্দেশ হন—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে—সেদিনই বক্সীবাবুকে পাথুরে পোল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার সময় পরের দিন চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে দেখা করতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছু কি তিনি বলেছেন? বক্সীবাবুর কাছে সে-বিষয়ে কিছু শুনেছ?

হ্যাঁ, শুনেছি। বলেছে শর্মিলা—পিসেমশাই প্রথমে নাকি বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইকেই দোষ দিয়েছেন এই জায়গার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আমাদের ক্ষেপাবার জন্যে। গ্রামলক্ষ্মী নয়, আসলে এখানকার সেকালের কোনও দামি জিনিস খুঁড়ে পাওয়ার লোভেই আমরা এখানে জেদ করে আছি আর তাইতে কোনও অপদেবতার কোপে পড়েছি বলে তাঁর ধারণার কথা পিসেমশাই বক্সীবাবুকে জানিয়েছেন। আমাদের মিথ্যে আশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যি কথা বলে এ-অভিশাপের জায়গা ছাড়াবার চেষ্টা করতেই অনুরোধ করেছেন তাঁকে।

কী বলেছেন তাতে বক্সীবাবু?

তিনি আর কী বলবেন। পিসেমশাইয়ের অদ্ভুত ধারণার কথা তো তাঁর অজানা নয়। মনে-মনে তাই হেসেছেন। তবে অপদেবতার কোপ বা যাই হোক, এসব অদ্ভুত ব্যাপার যখন ঘটছে তখন আমাদের মতো মেয়েদের এখানে না থাকাই ভালো এই মতই প্রকাশ করেছেন।

সেকালের যখের ধন-টন পাবার লোভ সত্যি আপনাদের আছে নাকি?—এবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

পেলে আপত্তি করব না, কিন্তু লোভ কিছু সত্যিই নেই।— হেসে বলেছে শর্মিলা।

এ-পর্যন্ত কিছু তেমন পেয়েছ কি? জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ওই তো বললাম, একটা খোদাই করা তাম্রশাসনের টুকরো, আর ক'টা মুদ্রা গোছের। সেগুলো সেকালের সোনার দিনার কি রুপোর দ্রম্মা ভেবেছিলাম। কিন্তু বক্সীবাবু তো বলেছেন তা নয়। তবে এখানে কুষাণ আর গুপ্তযুগের মুদ্রা তো বটেই, এমনকী অঢেল সোনা-দানা পাওয়া আশ্চর্য নয়, বক্সীবাবুই একবার স্বীকার করেছেন। তাম্রশাসনের ভাঙা টুকরোতে তারই না কি ইঙ্গিত আছে।

শর্মিলার কথা শেষ হবার পর খানিকক্ষণ কেউ আর কিছু আমরা বলিনি।

পরাশর গভীরভাবে কী যেন একটা ভাবতে-ভাবতে একবার প্রায় নিজের মনেই বলেছে —লোভ! লোভ! সমস্ত রহস্যের মূল হল লোভ!

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে—চৌধুরীমশাই তোমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করতে আসেন কবে?

সেইদিনই! —বলেছে শর্মিলা—থানা থেকে আমাদের প্রথম এখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যান। বিকেলবেলাই আবার তাঁর দুই ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন আমাদের তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে বলতে।

তোমরা রাজি না হওয়াতে একটু দুঃখিত হয়েছেন, না?—পরাশর কেমন অদ্ভুতভাবেই যেন তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে।

একটু নয়, খুব! —হেসে উত্তরটা বিনতাই দিয়েছে—আমি কাছে না থাকলে বোধহয় কেঁদে-ককিয়ে সাধাসাধি করতেন।

থামবি তুই! —শর্মিলা বিনতার পিঠে আবার একটা চাপড় দিয়েছে।

আমি থামলে সত্যি কথাটা তো আর মিথ্যে হবে না! —বলে বিনতা হাসতে-হাসতে শর্মিলার কাছ থেকে উঠে আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসেছে।

সত্যি, আপনাদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। —শর্মিলাকে উদ্দেশ করেও বলেছি বিনতার দিকে চেয়ে।

BanglaBook.org

আমার সাহস-টাহস নেই। —হেসে বলেছে বিনতা—আমি যা কিছু করেছি ওর ভরসায়। তবে সে-রাত্রে কিন্তু ভয়টয় পাওয়ার মতো কিছু বোধহয় হয়নি।

না,—শর্মিলা সায় দিয়েছে বিনতার কথায়—সে-রাত থেকে কেন জানি না সব উপদ্রব যেন থেমে গেছে।

তা হলে সেটা চৌধুরীমশাইয়ের জন্যে। —হেসে বলেছে পরাশর।

চৌধুরীমশাইয়ের জন্যে! —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা,—তিনিই সব থামিয়েছেন না কি?

তিনি তো তাই বলেন। —পরাশর জানিয়েছে—তিনি নাকি তোমাদের একগুঁয়েমিতে নিরুপায় হয়ে দিনে-রাতে একজন করে পাহারাদারের ব্যবস্থা করেছেন।

মিথ্যে কথা!—শর্মিলা হঠাৎ তীব্র প্রতিবাদ করেছে—পাহারাদার নয়, বোধহয় চর লাগিয়ে রেখেছেন আমাদের ওপর নজর রাখবার আর নিজের কোনও মতলব হাসিলের জন্যে। আমি আজই তার প্রমাণ পেয়েছি।

কী প্রমাণ?—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে উত্তেজিতভাবে।

প্রমাণ প্রথমত, ওদিকের পোড়োমহলের এক জায়গায় লুকনো একটা টর্চ, একটা মাপবার হুইল ফিতে আর একটা ছোট গ্রামোফোনের চোঙার মতো জিনিস। পাহারা দিতে এসব জিনিসের নিশ্চয় দরকার হয় না! তা ছাড়া ওঁর পাহারাদার গ্রাম থেকে আসা-যাওয়া না করে ডিঙিতে গঙ্গা পার হয়ে যাতায়াত করে কেন? পাহারাদারের নামে ওঁর চর একজন নয়, অন্তত দু-তিনজন গত কয়েকরাত ধরে এখানে আসছে।

এসব তুই কী বলছিস!—ভয়ে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে বলেছে বিনতা।

যা দেখেছি তাই বলছি। উত্তেজিতভাবে বলেছে শর্মিলা—আজ ভোরবেলা উঠে, পিসেমশাইয়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্যের অন্য কোনও দিকের হদিশ পাওয়া যায় কি না দেখতে আমি পশ্চিমের গঙ্গার দিকটায় একলা গেছলাম। এখন গরমের দিনে এ-দিকটায় চড়া পড়ে গঙ্গা অনেক দূর সরে গেছে। সে-চড়ার মাটি কিছুদূর পর্যন্ত শক্ত, তারপর নরম কাদা। সেই নরম কাদার চরের কাছাকাছি গিয়ে তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এদিকটার নদীর পাড় এমন নির্জন যে ভুলেও কেউ কখনও আসে না। এখানে এতগুলো পায়ের দাগ তাহলে কোথা থেকে পড়ল? পায়ের দাগগুলো যে সদ্য-সদ্য আগের রাত্রেই পড়েছে তার প্রমাণও পাই। শক্ত পাড়ে জুতো খুলে রেখে আমি সেই পায়ের দাগ ধরে একেবারে গঙ্গার জলের ধারা যেখানে বইছে সেখান পর্যন্ত চলে যাই তারপর। সেখানে নরম বেলেকাদায় একটা ডিঙি যে তুলে রেখে আবার ঠেলে জলে ভাসানো হয়েছে তার স্পষ্ট চিহ্ন পড়ে রয়েছে।

গঙ্গার ধার থেকে ফিরে এসে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি, পায়ের দাগ ক্রমশ শক্ত জমিতে অস্পষ্ট হয়ে এলেও ভাঙা গড়-বাড়িটার দিকেই গেছে। গড়-বাড়িটার ভেতর ঢোকবার পর পায়ের দাগ না পেলেও এখানে-সেখানে গঙ্গার কাদার ছিটে লেগে থাকতে দেখে কোনদিকে লোকগুলো গেছে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

সেই কাদার ছিটে ধরে এদিকে-ওদিকে একটু খোঁজ করতেই লুকনো ওই জিনিসগুলো একটা ভাঙা কুলুঙ্গির মধ্যে দেখতে পাই। চৌধুরীমশাইয়ের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করার মানে বুঝতে পারছ এবার?

কিন্তু এসব চৌধুরীমশাইয়েরই কাজ ভাবছ কেন? পরাশর একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে।

ভাবছি তিনি পাহারার বড়াই হঠাৎ বোধহয় মুখ ফস্কে তোমার কাছে করে ফেলেছেন শুনে। শর্মিলা ঝাঁঝালো গলায় বলেছে—প্রথমে একটু অস্পষ্ট সন্দেহই আমার ছিল, কিন্তু ওঁর লোক পাহারায় আছে, শোনবার পর নিশ্চিত বুঝতে পারছি, এসবের পেছনে উনি আছেন।

BanglaBook.org

জিনিসপত্রগুলো যেমন ছিল তেমনিই রেখে দিয়েছ না নাড়াচাড়া করেছ?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

আমি কি অত আহাম্মক! শর্মিলা একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছে—ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

তা হলে—পরাশর খুশি মুখে বলেছে, দু-চারদিনের মধ্যে এ-রহস্যের মীমাংসা হয়তো হতে পারে।

নয়

সে-রাত্রে পিসেমশাইয়ের ঘরেই আমার আর পরাশরের শোওয়ার ব্যবস্থা হল।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে পরাশরের সঙ্গে জাঙালবাড়ির রহস্যটাই ভালো করে আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরাশরের তেমন কোনও উৎসাহই দেখলাম না। সে যেন ঘুমোতে পারলেই বাঁচে।

সারাদিন আমাদের অত্যন্ত ধকল গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এইরকম একটা ভয়াবহ রোমাঞ্চকর ব্যাপার জানবার পর সেই জায়গাতেই রাত কাটাতে হলে ঘুম কি সহজে আসে।

তখন সমস্ত রহস্যটার অনেকরকম ব্যাখ্যাই আমার মাথায় আসছে, সেইসঙ্গে প্রশ্নও নানারকম।

পরাশরকে তাই আমি সহজে রেহাই দিলাম না।

যে-প্রশ্নটা সবচেয়ে আমায় খোঁচা দিচ্ছিল সেইটে পরাশরের মনেও উঠেছে কি না জানতে চাইলাম প্রথমে।

বললাম—বৃত্তান্ত যা শুনলাম, আর শর্মিলাদেবী যা বললেন তাতে ভয় দেখিয়ে কেউ ওঁদের এ-জায়গা ছাড়াতে চাইছে, এইরকমই যেন ধারণা হয়, কী বলো?

পরাশরের কাছ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না।

দ্বিতীয়বার, আবার প্রশ্নটা তাকে শোনাতে হল তাই। তার উত্তরে সে ঘুমে জড়ানো গলায় শুধু বললে—হুঁ।

হুঁ কী!—বিরক্ত হয়ে উঠলাম পরাশরের ওপর—তোমার কী মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করছি। কেউ ওদের ভয় দেখিয়ে জাঙালবাড়ি থেকে তাড়াতে চাইছে, এই কি তোমার মত?

হুঁ।

এ হুঁ-টার তবু একটু অর্থ হয়।

তারপরের প্রশ্ন তাই তুললাম—কিন্তু শর্মিলাদেবীরা গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করবার বেশ কিছুকাল আগে থাকতেই পিসেমশাই তো এখানে আছেন। তখন তাঁকে তাড়াবার কোনও উপদ্রব হয়েছিল কি না শর্মিলাদেবীর কথায় কিন্তু জানা গেল না।

পরাশর 'না' বললে, না, তার একটু নাসিকাধ্বনি হল ঠিক বোঝা গেল না।

গলা চড়িয়ে তাই বললাম—কী বলছি শুনতে পাচ্ছ পরাশর?

এবার চটপট জবাব এল—হ্যাঁ।

ধরো, আগে যদি কোনও উপদ্রব না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ কিছুদিন আগে তা শুরু হবার কারণ কী? পিসেমশাইয়ের চেয়ে শর্মিলাদেবীদের তাড়াবার গরজই কারুর বেশি, না, নতুন কিছু প্রচ্ছন্ন ঘটনা এর পেছনে আছে?

প্রশ্নটা বৃথাই করলাম। যাকে করলাম সে তখন ঘুমে অসাড়। না হলে অন্তত এরকম একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপেক্ষা করে নীরব থাকতে পারত না বলেই আমার ধারণা।

পরাশরের সঙ্গে রহস্যটা খুঁটিয়ে বিচার করতে পারলে ভালো হত। তা যখন হল না তখন

BanglaBook.org

নিজেই সমাধানের সূত্রটা আমায় বার করতে হবে। তা যে পারব সে-বিষয়ে খুব বেশি সংশয় আমার তখন নেই। এ-রহস্যভেদ যত কঠিনই হোক, নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই তাতে আমায় সফল হতে হবেই। পরাশরের কাছে এ-বিষয়ে হার মানতে আমি পারব না। তার সঙ্গেই আমার রেষারেষি।

পরাশর আলোচনাটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ায় খুব দুঃখিত তাই আমি হইনি। পরাশর এরকম উদাসীন থাকলেই বরং আমার সুবিধে।

সুবিধেটা যে কী নিজের কাছে স্বীকার করতে তখন আর আমার দ্বিধা নেই। বিনতাকে অবাক ও মুগ্ধ করাই আমার আসল ও একমাত্র লক্ষ্য। পরাশরের সঙ্গেই বিনতার বিয়ে হওয়ার একটা কথা ছিল। পরাশর অবশ্য এ-বিয়েতে নিজেকে জড়াতে চায় না বলেছে, আমাকে সঙ্গেও এনেছে শুধু রক্ষক হিসেবে তাকে সামলাবার জন্যে।

তবু পরাশরের মুখের কথায় বিশ্বাস রাখতে আমি পারছি কই! বিনতার মতো মেয়েকে পাওয়ার আশা থাকলে কেউ যে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে। তাও দূরে চোখের আড়ালে যখন ছিল তখন যা বলেছে—বলেছে বাহাদুরি দেখাতে। এখন চোখের সামনে বিনতাকে দেখে সে কথা ভুয়ো হয়ে যেতে বাধ্য।

না, পরাশর আলোচনাটা না শুনে ঘুমিয়ে যে পড়েছে, ভালোই হয়েছে তাতে।

ভেবে-চিন্তে রহস্যের যেসব খেই আমি বার করছি পরাশরকে তা জানাবার দরকার কী!

তার আগেই মীমাংসাটা, যেমন করে হোক আমায় একাই করে ফেলতে হবে।

জাঙালবাড়ির রহস্য আর সেইসঙ্গে বিনতার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

রাতের শেষ প্রহরে দূরে শেয়ালের ডাকেই বোধহয় ঘুম ভেঙে গেল।

একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলতে নামিয়ে মিটমিটে করে ঘরের কোণে রাখা ছিল। তারই আলোয় পরাশরের বিছানার দিকে চেয়ে অবাক হলাম, সে বিছানায় নেই।

ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার দরজাটা ভেজানো দেখে বাইরেই সে গেছে বুঝলাম। কিন্তু এখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। এ-সময়ে বাইরে যাওয়ার আগে আমায় একটু জাগিয়ে যাওয়া তার কি উচিত ছিল না?

যা-সব ব্যাপার এখানে ঘটে গেছে তাতে রাতের অন্ধকারে একলা এভাবে বাইরে যাওয়া নির্বোধ গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু নয়।

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই তার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু কোথায় পরাশর? ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়ে বাইরের অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে তখন, তবু পরাশরের দেখা নেই।

এবার সত্যি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আরও উদ্বিগ্ন হলাম পরাশর বেশ তৈরি হয়েই বেরিয়েছে জেনে। যা পরে সে শুয়েছিল সে-জামাকাপড় ছেড়ে পরাশর বাইরের পোশাকেই বেরিয়েছে। যে-টর্চটা আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম ও রাত্রে যেটা আমার মাথার বালিশের কাছে ছিল, সেটাও সে নিয়ে গেছে।

টর্চটা নেওয়ার সময় আমার বিছানা তাকে হাতড়াতে হয়েছে, তবু আমায় সে ডাকা দরকার বোধ করেনি।

পরাশরের জন্যে ভাবনা যেমন হচ্ছিল তার ওপর রাগও তেমনি।

পরাশর যে রহস্যভেদের বাহাদুরির জন্যেই এমন আহাম্মকের মতো বেপরোয়া হয়েছে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন আমার নেই। আমার ওপর টেক্কা দেওয়ার জন্যেই রাত না পোহাতে তার একা বার হওয়ার এই দুঃসাহস।

BanglaBook.org

যেন তাইতেই ভোর হতে না-হতে সে সবকিছু মীমাংসা করে আসবে।

রাগ যতই হোক এতক্ষণেও তাকে ফিরতে না দেখে নিশ্চিন্তে মনে আবার ঘুমনো তো আর যায় না। তার খোঁজখবর নিতে বাইরে একবার যেতেই হয়।

পোশাক বদলে সেইজন্যেই বার হতে গিয়ে শর্মিলাদের জানিয়ে যাওয়া উচিত কি না ভাবছি এমনসময়ে ও-পাশের করিডর থেকে শর্মিলারই গলা শুনতে পেলাম।

ঘুম ভেঙেছে পরাশরদা? দরজাটা একটু খুলবে।

দরজাটা খুললাম। আমাদের ঘরের ওদিকেই একটা লম্বা করিডর চলে গেছে শর্মিলাদের ঘর ছাড়িয়ে ওদিকে রান্না ও ভাঁড়ার পর্যন্ত। শর্মিলা ও বিনতা যেরকম সাজপোশাকে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হল তারা হঠাৎ ঘুম ভেঙে আসেনি, অনেক আগে উঠে সাজপোশাক প্রসাধন সব সেরেছে।

দরজা খুলতেই ভেতরে এসে শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—কই, পরাশরদা কোথায়?

পরাশরের অন্তর্ধান-বৃত্তান্ত এবার বললাম।

শুনে যতটা বিস্মিত বা বিচলিত হবে বলে অনুমান করেছিলাম তা কিন্তু শর্মিলা হল না। একটু ভুরু কুঁচকে বললে—রাতদুপুরে বেরুবার কী দরকার ছিল! চলুন দেখি।

শর্মিলার প্রায় নির্বিকার ভাব দেখে বুঝলাম মামাতো ভাইটির মাথা যে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তা তার অজানা নয়।

বিনতা কিন্তু উদ্বিগ্নভাবে যা বললে তা আমারই মনের কথার প্রতিধ্বনি হলেও বুকে একটু বাজল।

আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে শমি—বিনতা শর্মিলাকেই বললে বাড়ি থেকে বাইরে এসে—সেই রাত্তিরে বেরিয়ে এখনও পরাশরবাবু ফেরেননি। কোনও বিপদ হয়নি তো!

বিনতার এ-দুর্ভাবনাটুকু স্বাভাবিক কিন্তু তার মধ্যে আরও গভীর কোনও ব্যাকুলতা হয়তো আছে ভেবে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল।

শর্মিলা কিন্তু তার ভ্রাতা সম্বন্ধে প্রায় নির্বিকার। সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে বললে—কচি খোকা তো নয়। নিজের মতলবে বেরিয়েছে। তাতে যদি বিপদ হয় তো কে কী করতে পারে! মাঝে থেকে আমাদের কাজটা মাটি।

শর্মিলা ও বিনতা যে এই ভোরেই কোথাও যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে বেরিয়েছে সে-কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কোথাও যাবেন ঠিক করেছিলেন, না?

হ্যাঁ—বিনতাই জানালে—শমি কাল রাত্রেই ঠিক করেছিল আজ সকালে উঠেই স্টেশনে যাবে।

স্টেশনে!—একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলাম—আজই এত সকালে স্টেশনে কেন? অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে নিশ্চয় নয়!

না, অন্য আবার কোথায় যাব!—শর্মিলাই জবাব দিলে ঈষৎ অধৈর্যের সঙ্গে—স্টেশনেই যাচ্ছিলাম বক্সীবাবুর কাছে কয়েকটা কথা আলোচনা করে জানবার জন্যে।

আমার বিমূঢ় ভাবটা লক্ষ্য করে শর্মিলা একটু থেমে আবার বললে—কী ভাবছেন বুঝতে পারছি। ভাবছেন, আজই এত সকালে বক্সীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবার এত তাড়া কেন। তাড়ার কারণ আছে। যা জানতে চাই আর দেরি হলে বক্সীবাবু তা ভুলে যেতে পারেন বলে সন্দেহ আছে আমার। এখনই হয়তো বেশি দেরি হয়ে গেছে।

শর্মিলা ব্যাপারটার সব রহস্য ভাঙতে চায় না মনে করে এ-বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করছিলাম, বিনতাই আমার হয়ে কৌতূহলটা প্রকাশ করে দিল।

অভিমানের সুরে বললে—কী এমন দরকারি কথা আজ না জিজ্ঞাসা করলেই বক্সীবাবু ভুলে

BanglaBook.org

যাবেন আমি তো বুঝতে পারছি না। তাই যদি হয় তা হলে, বক্সীবাবুর সঙ্গে আগেও তো কতবার দেখা হয়েছে। তখন সে-কথা জিজ্ঞাসা করা যেত না!

না, যেত না।—শর্মিলা এবার একটু হেসে বললে—কারণ, জিজ্ঞাসা করবার কথাগুলো আগে মাথাতেই আসেনি। কালই রাত্রে ভাবতে-ভাবতে প্রশ্নগুলো হঠাৎ জরুরি মনে হল। আজ সকালে উঠেই বক্সীবাবুর কাছে তাই যাব ঠিক করেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, পরাশরদার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেব, কিন্তু তিনি তো রাত থেকেই উধাও। এখন পরাশরদা না ফেরা পর্যন্ত যেতেও পারছি না। আর পরাশরদা ফিরতে-ফিরতে কত বেলা হবে কে জানে!

পরাশরের দেরি করে ফেরার সম্ভাবনায় একটু বিরক্ত হওয়া ছাড়া তার নিরাপদ থাকা সম্বন্ধে শর্মিলা যেরকম নিশ্চিন্ত মনে হল, আমি কিন্তু তখন আর তা থাকতে পারছি না।

ইতিমধ্যে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বাড়ির বাইরে এসে এদিক-ওদিক যেটুকু আমরা ঘুরেছি তার মধ্যে পরাশরের কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি।

শর্মিলাদের বেশিরভাগ লোকজন এইসব উপদ্রবের পর এধার আর মাড়ায় না। ইঁদারায় জল তোলা, বাসন-কোসন মাজা আর গরু-বাছুরের তদারকের জন্যে জন দুই মুনিশ শুধু সকালবেলা এসে বিকেল না হতে-হতেই চলে যায়।

সেই মুনিশদেরই একজনকে বাঁধানো জাঙাল দিয়ে আসতে দেখে, শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—পথে এদিক থেকে কাউকে যেতে দেখেছ গোবর্ধন, কোনও বাবুকে?

না, গোবর্ধন কোনও মানুষজন তো নয়ই, একটা শেয়াল কুকুরকেও এ-পথে যেতে আসতে দেখেনি জানা গেল।

সত্যি, তা হলে পরাশর কোথায় যেতে পারে!

গোবর্ধন নিজের কাজে চলে যাওয়ার পর চিন্তিত হয়েই শর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই জাঙালের পথে স্টেশন কি গাঁয়ে না গেলে আর কোন পথে কোথায় যাওয়া পরাশরের পক্ষে সম্ভব?

সম্ভব গড়মহলের গোলকধাঁধায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া।—পরাশরের আহাম্মকিতে অপ্রসন্ন হয়েই যেন বললে শর্মিলা—কিন্তু গড়মহলের ধ্বংসস্তূপ দেখবার জন্যে শেষরাতে একা যাওয়ার তো কোনও দরকার ছিল না। আজ দিনেরবেলায় আলোয়-আলোতেই অনায়াসে যেতে পারত। তা ছাড়া আপনারা আসার দরুন কি না বলা যায় না, কাল রাত্রে কোনও উপদ্রব হয়েছে বলে তো টের পাইনি। বাইরেও কোনও চিহ্ন-টিহ্ন দেখছি না। সুতরাং হঠাৎ শেষরাতে তার বার হয়ে যাওয়ার কোনও মানেই বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, কাল যেখানে তুমি চরের ওপর নৌকোর দাগ দেখেছিলে পরাশরবাবু সেদিকে যেতে পারেন না?—বিনতা জিজ্ঞাসা করল।

সেদিকে!—শর্মিলা একটু কী যেন ভেবে নিয়ে বললে—বেশ, সেদিকটাই একবার দেখে আসি তা হলে।

জাঙালবাড়ির পেছনে পুবদিকে বেশ বিস্তৃত খানিকটা পাথুরে বাঁজা মাঠ, তারপরে প্রকাণ্ড পলিপড়া চর।

সেদিকে বেশিদূর কিন্তু যেতে হল না। হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার শুনে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চিৎকারটা কোনদিক থেকে ও কার যখন বুঝলাম তখন সত্যিই একেবারে হতভম্ব। উত্তর দিকে দূরের গড়মহলের পাহাড়ি গোছের সব ঢিবি ঘুরে পরাশর আমাদেরই ডাকতে-ডাকতে একরকম ছুটেই আসছে।

সে কাছে আসতে তাকে দেখে যত না অবাক হলাম তার হাতের বস্তুটিকে দেখে তারচেয়ে

BanglaBook.org

কম হলাম না।

তার হাতে সুতো দিয়ে ঝোলানো দুটো বড়-বড় শোলমাছ!

বাহাদুরির সঙ্গেই কানকোর ভেতর দিয়ে সুতো গলিয়ে ঝোলানো মাছ দুটোকে আমাদের মুখের ওপর তুলে ধরে পরাশর বললে—কীরকম তাগড়া পুরুষ্টু শোল দেখছ! পাঁঠার মাংসকে হার মানায়। মেয়েদের গলগ্রহ না হয়ে, নিজেদের খাওয়ার সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছি।

এতক্ষণ সবাই আমরা হাঁ হয়ে ছিলাম। কারুর মুখ দিয়েই কোনও কথা বার হয়নি।

এবার আমিই প্রথম অনুযোগের সুরে রুক্ষভাবে বললাম—তুমি কি এই মাছ ধরতে শেষরাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলে কাউকে কিছু না জানিয়ে? এদিকে আমরা ভেবে সারা। মিছিমিছি তোমায় খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

ও, তোমরা আমাকেই খুঁজতে এদিকে যাচ্ছিলে নাকি?—পরাশর যেন আমাদের বোকামিতে ক্ষুণ্ণ—আমায় খোঁজবার কী দরকার ছিল?

সত্যিই দরকার কিছুই ছিল না।—ভাইয়ের কথার উপযুক্ত জবাব এবার ভগিনী শর্মিলাই দিলে—অজানা নতুন জায়গায় রাত চারটের সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ যদি ঘর ছেড়ে চুপিচুপি বেরিয়ে যায়, তাহলে ধরে নেওয়াই উচিত যে, তাগড়া আর পুরুষ্টু দুটো শোলমাছ ধরতেই গেছে! এখন শোলমাছ দুটো পেলে কোথায় শুনি!

যেখানে ইচ্ছে করলে রোজ পাওয়া যায়। —পরাশর এমনভাবে বললে যেন কাছেপিঠেই নিত্যকার বাজার থেকে মাছ দুটো সে কিনে এনেছে!

যেখানে রোজ পাওয়া যায়!—আমিই এবার অধৈর্যের সঙ্গে বললাম, এখানে কোথায় কী পাওয়া যায় তুমি জানলে কী করে, তুমি তো কাল দুপুরে আমারই সঙ্গে এসেছ?

হ্যাঁ, তা এসেছি বটে! পরাশর যেন বাধ্য হয়ে স্বীকার করল—তাই তো একটু বেশি হাঙ্গামা পোয়াতে হল। অথচ এ-মাছ না পেলে সমস্ত ধাঁধাটার মীমাংসায় একটা বড় ফাঁক থেকে যায়।

পরাশর বলে কী! শর্মিলা তার মামাতো ভাইকে ভালোমতোই চেনে। কিন্তু আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে তার মুখ দিয়ে কোনও বিদ্রূপ কি বকুনি আর শোনা গেল না। পরাশরের এ-হেঁয়ালি শুধু ভুয়ো ধাপ্পা না তার সত্যিকার কোনও অর্থ আছে বুঝতে না পেরে শর্মিলা শুধু একটু সন্দিগ্ধ সুরে বললে—এখানকার সব রহস্যের জট ছাড়াতে ওই মাছ দুটোও খেই তুমি বলতে চাও?

নিশ্চয়!—পরাশর অবিচলভাবে জানালে—এই মাছ পেয়েই তো একটা মস্ত গোলমেলে ব্যাপারের মানে পেলাম।

কিন্তু মাছটা কোথায় পেলে তা তো বলছো না। বিনতার সামনে পরাশরের বাহাদুরিটা সহ্য না করতে পেরে রূঢ়ভাবেই আমি বললাম—খানিক আগে গোবর্ধন জাঙালের রাস্তায় এসেছে। সে তো তোমায় দেখেনি।

না, সে দেখবে কী করে!—পরাশর মাছ কোথা থেকে পেয়েছে সে-প্রশ্নটা যেন ইচ্ছে করে এড়াবার জন্যেই হঠাৎ চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে বললে—তোমাদের লোকজন তো মাত্র এখন দুটি, ওই গোবর্ধন আর কী যেন নাম কাল শুনলাম, রঘু। এদেরও এখানে রাখা কিন্তু মুশকিল হবে। আমার তো ভয় হচ্ছে ওরা আজ সকালেই না হাওয়া হয়।

কী বলছ তুমি! আজ সকালেই ওরা হাওয়া হবে! অমনি বললেই হল!

শর্মিলার ধমক-দেওয়া গলায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরাশরের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমাদেরই মতো তার রীতিমতো সন্দেহ জেগেছে।

পরাশর এ-ধমকে একটু কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে বললে—সাধ করে কি কু গাইছি অমন। ওরা

BanglaBook.org

না যদি যায় খুব ভালো, কিন্তু...

পরাশরকে কথাটা আর শেষ করতে হল না।

আলাপ করতে-করতে আমরা জাঙালবাড়ির পশ্চিমেই তখন পৌঁছে গেছি। আমাদের সামনে বড় ইঁদারা থেকে গোবর্ধন লাটা দেওয়া বালতিতে জল তোলবার আয়োজন করছে, তাও আমাদের চোখে পড়েছে।

পরাশরের কথা ওই পর্যন্ত পৌঁছোতেই গোবর্ধনের একটা অমানুষিক চিৎকারে আমাদের বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

গোবর্ধন লাটায় বাঁধা দড়ি ধরে বালতিটা ইঁদারার পাড় পর্যন্ত তুলে ঢালতে গিয়েই ওই আতঙ্কের চিৎকার ছেড়েছে।

আমরা যতক্ষণে সাড় ফিরে পেলাম তার আগেই সুতোয় বাঁধা মাছ দুটো একধারে ফেলে পরাশর ইঁদারার কাছে ছুটে গেছে।

ভয়ে ফ্যাকাশে গোবর্ধন কাঁপতে-কাঁপতে তখনও বালতিটা ধরে আছে।

পরাশর তার হাত থেকে বালতিটা দড়িসুদ্ধ টেনে নিয়ে নিজে এবার তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কয়েক সেকেন্ড নিস্পন্দ হয়ে থাকবার পর আমরাও ছুটে গিয়ে গোবর্ধন যা দেখে আর্তনাদ করে উঠেছে ও পরাশর একাগ্রভাবে যা দেখতে তন্ময়, সেই জলভরা বালতিটা দেখলাম।

জল নয়, তার সঙ্গে বালতিতে গাঢ় রক্ত কে যেন গুলে দিয়েছে।

কিন্তু এ-কি রক্ত না রং?

আমার মতো শর্মিলারও একই সন্দেহ হয়েছিল। পরাশরের হাত থেকে বালতিটা টেনে নিয়ে কাৎ করে একটুখানি জল সে গড়িয়ে দেখে বললে—রক্ত কোথায়। এ তো রং। গাঢ় লাল রং কে ইঁদারায় গুলে ফেলেছে।

না, শমি—পরাশর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে—রং নয়, আজ ইঁদারায় যা ফেলা হয়েছে তা সত্যিই রক্ত। বালতির গাটা দ্যাখো, দ্যাখো কুয়ার কিনারাটা। কিছু রক্ত সেখানে জমাট বেঁধে লেগে আছে।

রক্ত! সত্যি রক্ত!

বিনতার শিউরে উঠে কাগজের মতো শাদা হয়ে যাওয়াটা চোখের ওপর দেখলাম। বুকের ভেতরটা তখন আকুল হয়ে উঠেছে, হাতটা বাড়িয়ে তার কম্পিত হাতটা ধরে একটু সাহস দেওয়ার। কিন্তু সাহস বা স্পর্ধা যাই বলি, তা আমার নেই।

বিনতা একটু টলে গিয়ে শর্মিলার হাতটাই জোর করে চেপে ধরল দেখলাম। পরাশর তার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এরকম দিশাহারা মুহূর্তেও পরাশরের দিকে সে যে ভুলেও হেলে পড়েনি এইটুকুই তখন আমার সান্ত্বনা।

সত্যিই প্রেমে পড়লে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

ইঁদারার মধ্যে সত্যিকার রক্ত ঢালা হয়েছে জানবার পর আমি শুধু বিনতার কথাই যে ভাবছি, কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে-হুঁশ হলে বেশ একটু লজ্জিত হলাম।

সামনের ভয়ঙ্কর রহস্যটাতেই সমস্ত মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানকার লোকজন আজই হয়তো থাকবে না যখন বলেছিলে তখন কি এইরকম একটা কিছুর আভাস পেয়েছিলে তুমি!

আভাস?—পরাশরকে একটু অন্যমনস্ক মনে হল—না, আভাস কেন, প্রমাণটাই পেয়েছিলাম তখন।

প্রমাণটা কী জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পরাশর দিলে না। নিজেই আবার চিন্তিতভাবে বললে —এবারের শয়তানিটা বেশ সাংঘাতিক গোছের। খাবার জলের জন্যে তোমাদের এই ইঁদারাটি ছাড়া

BanglaBook.org

আর তো কোনও ভরসা নেই। এ-ইঁদারার জল পরিষ্কার করা এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ জলের সমস্যা না মেটাতে পারলে এখনকার পাট তোমাদের ওঠাতেই হবে।

না, কিছুতেই না!—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়, শান্ত দৃঢ়স্বরে বললে শর্মিলা—আগেই তো বলেছি ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবার আনন্দ কাউকে কিছুতেই দেব না। ইঁদারার জল নষ্ট হয়ে থাকে তো এখান থেকে একমাইল হেঁটে গিয়ে নদীতে স্নান করে আসব, সেখান থেকে জল বয়ে এনে ফুটিয়ে খাব, তবু হার মানব না। পুলিশকে আর-একবার এ-ব্যাপার জানিয়ে দেখব। তারা কিছু করে ভালো, না করে নিজেরাই যা করবার করব।

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে শর্মিলা আমাদের দিকে ফিরে পরাশরকেই উদ্দেশ করে বললে —এখন জানতে চাই তুমি এই বিপদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি আছ কি না। জলধর-বাবুকে অবশ্য আমাদের জন্যে এইসব বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে না জড়াতেই আমি অনুরোধ করব...।

শর্মিলাকে তার কথা শেষ না করতে দিয়ে পরাশর কিছু বলার আগেই উত্তেজিত গলায় আমি বললাম—আপনার সে-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না শর্মিলাদেবী। পরাশর থাকতে রাজি হোক বা না হোক, এ-রহস্যের মীমাংসা আর শয়তানির শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি জানবেন।

কথাটা শর্মিলাকে বললেও দৃষ্টিটা যে আমার বিনতার ওপরই নিবদ্ধ বিনতার একটু লাল হয়ে মুখ নামানোতে তা বুঝলাম।

মনে হয়, আর কেউ তা লক্ষ্য করেনি, কারণ, পরমুহূর্তেই পরাশর এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—এই তো পুরুষের মতো—বন্ধুর মতো কথা। তোমার কাছে আজ যে আমি কতখানি ঋণী হলাম জলধর, তা বলতে পারি না।

আমার সম্বন্ধে পরাশরের উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু হঠাৎ আমার কাছে তার ঋণী হওয়ার কথাটা কোথা থেকে আসে ঠিক অবশ্য বুঝতে পারলাম না।

তবে পরাশরের অনেককিছুরই যে মানে পাওয়া যায় না, তা আমার জানা।

পরাশর ও শর্মিলা তো বটেই বিনতাও যেন আমার সঙ্কল্প জানবার পর বেশ একটু খুশি বলে মনে হওয়ায় আমি তখন উল্লাস-উৎসাহের সপ্তম স্বর্গে উঠে গেছি।

বাইরে তবু যথাসম্ভব নিজেকে সামলে গম্ভীর হয়ে বললাম—এসব উচ্ছ্বাসের কোনও দরকার নেই পরাশর। এখন বেশ ভেবে-চিন্তে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কী আমাদের এখন করা দরকার তাই ঠিক করে ফেলতে হবে এখুনি।

হ্যাঁ, প্রথম গোবর্ধনকে...এই পর্যন্ত বলেই পরাশর থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল।

সত্যি, কোথায় গোবর্ধন! আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত তখনই সে নিঃশব্দে এ-সাংঘাতিক জায়গা পরিত্যাগ করেছে। তার এভাবে পালানোটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। কুয়োর জলে টাটকা রক্তের মতো সর্বনাশা ব্যাপারের পর কোন ভরসায় আমাদের মতো ক'জন আহাম্মক বাইরের লোকের সঙ্গে সে থাকবে!

প্রথম গোবর্ধনকে কী জন্য খুঁজছিলে?—এই নতুন পরিস্থিতিতে একটু তিক্তভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করলে শর্মিলা।

খুঁজছিলাম ওদের রাজাবাবুকে একটু খবর দেওয়ার জন্যে।—বললে পরাশর।

সবার আগে তাঁকে খবর দেওয়ার কথা মনে হল কেন?—শর্মিলা বেশ একটু বিদ্রূপের স্বরে বললে মনে হল—তিনি এলেই সব সমস্যা মিটে যাবে?

না, তা নয়!—পরাশরের গলার সুরটা একটু কৌতুকের কি না বুঝতে পারলাম না—এমনিই তোমাদের হিতৈষী হিসেবে তিনি ব্যাপারটা এসে দেখে কী বলেন জানতে চাইছিলাম। তা তোমার

BanglaBook.org

যখন আপত্তি তখন তাঁকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। আর খবর দেওয়ার লোকই তো হাওয়া। আমি অবশ্য একবার দশানি গাঁয়েই যাচ্ছি।

তুমি গাঁয়ে যাচ্ছ কেন? আমি জিজ্ঞাস করলাম।

যাচ্ছি, ওখানকার মনোহারী দোকানে ক'টা জিনিসের খোঁজ করতে।

এখন তোমার মনোহারী জিনিস কেনার দরকার পড়ল? বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তিটা না প্রকাশ করে পারলাম না,—তার আগে জলের সমস্যা মেটাবার কথাটা ভাবলে হত না। সত্যিই কি দু-বেলা একমাইল দূরের নদী থেকে জল বয়ে এনে দিনের পর দিন কাটানো সম্ভব?

না, তা কেন? জলের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।— পরাশর আমাকে সমর্থনই করে বললে, —কিন্তু গাঁয়ে একবার এখুনি না গেলে নয়।

বেশ তাই যাও।—বললে শর্মিলা, আমরাও যে জন্যে বেরুচ্ছিলাম বক্সীবাবুর কাছে, সে-কাজটা সেরে আসি। এখন না গেলে পরে যাওয়ার আর কোনও মানে থাকবে না।

কী এমন জরুরি কাজ বক্সীবাবুর কাছে যে এখুনি না সারলে নয়।—জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

জরুরি কাজ হল বক্সীবাবুর কাছে ক'টা কথা জানা।—শর্মিলা পরাশরের মতোই একটু যেন হেঁয়ালি করে বললে—কথাগুলো এখুনি না জানলে নয়।

হুঁ, এখন? কী কথা জানতে পারি?—পরাশর একটু কৌতুকের স্বরেই প্রশ্ন করল।

পারো। তবে দোহাই তোমার। কৌতূহলটা যদি আমার অন্যায় বা বাজে মনে হয় তাহলে সে-বিষয়ে আর আলোচনা করবার চেষ্টা কোরো না।—একটু থেমে আমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে যেন তৈরি হয়ে নিয়ে শর্মিলা বললে—বক্সীবাবুর কাছে যা জানতে চাই তার প্রথমটা হল, গাঁয়ের চৌধুরীমশাই কবে থেকে এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েছেন। আর দ্বিতীয়টা হল, নিখোঁজ হবার আগে বক্সীবাবু না চৌধুরীমশাই, কার কাছে পিসেমশাই গোপন জরুরি কিছু জানাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। ওঁরা দুজনে সেদিন চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে পিসেমশাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে তারপর তাঁর খোঁজে এখানে এসেছিলেন। পিসেমশাই বক্সীবাবুকেই কথাটা জানিয়ে চৌধুরীমশাইকে খবরটা দিতে বলেছিলেন, না চৌধুরীমশাইকে খবরটা দিয়েছিলেন বক্সীবাবুকে তাঁর বাড়িতে ডাকিয়ে এনে অপেক্ষা করার জন্য।

শর্মিলা জটিল মানসাঙ্কের মতো তার বক্তব্যটা শেষ করবার পর পরাশরের মুখে একটু ঠাট্টার হাসি হয়তো ফুটে উঠবে, অনুমান করেছিলাম। তা কিন্তু ফোটেনি। বরং অত্যন্ত গম্ভীরই সে হয়ে গেল। খানিক সেইভাবে চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, বক্সীবাবু কী বলেন জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। তোমরা স্টেশন থেকে ফিরে এসো। তার আগেই জলধরের সঙ্গে গাঁ থেকে ফিরে আসতে পারব আশা করছি। হ্যাঁ, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই। সে-ব্যবস্থা আমরাই করব। আমরা এগোচ্ছি। তোমরাও ঘর-দোরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

পরাশর আমায় একরকম টেনে নিয়েই চলল এবার।

একে এই সাংঘাতিক রহস্য, তার ওপর পিসতুতো বোন আর মামাতো ভাই মিলে আমাকে যে হেঁয়ালিতে জড়িয়েছে তাতে আমার মাথাটা তখন রীতিমতো গুলোচ্ছে।

যেতে-যেতে বিনতার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বুঝলাম, তার অবস্থাও তথৈবচ।

দশ

পরাশরের সঙ্গে চৌধুরীমশাইয়ের গ্রামে গেলাম।

গ্রামটা খুব খারাপ লাগল না। খুব ছোটখাটো নয়, প্রায় যাকে গণ্ডগ্রাম বলে তাই। গ্রামটা

BanglaBook.org

প্রাচীনও বটে। কিন্তু প্রাচীন বলে নোংরা জরাজীর্ণ গোছের কিছু নয়।

রুক্ষ লালমাটির দেশ। এ-অঞ্চলে মাটির ঘর পাকা ইটের কোঠার মতো শক্ত মজবুত হয়, শুধু যদি মাটিতে জল না লাগে। পুরু মাটির দেওয়াল দেওয়া দোতলা মাঠকোঠাও দেখলাম অনেক। ওপরে ঘন করে খড়ের ছাউনি দেওয়া।

পাড়াগাঁর যা দস্তুর সেই ঘিঞ্জি বসতি এখানে নেই এমন নয়, সরু আঁকাবাঁকা গলি গোছের পথও আছে এখানে-সেখানে, কিন্তু সব জায়গাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগল। পচা এঁদো পুকুর ডোবা তো একটাও দেখলাম না।

পরাশর যে মনোহারী দোকানে যাওয়ার জন্যে এসেছিল সেটি খুঁজে বার করতে চৌধুরী-কুঠির কাছ দিয়েই যেতে হল। চৌধুরীরা যে গাঁয়ের মাথা, তা সেই কুঠি দেখলেই বোঝা যায়। কুঠি না বলে ছোটখাটো প্রাসাদ বললেই হয়। চেহারাটা মোটের ওপর সেকেলে চকমেলানো বাড়ির ধরনের হলেও নতুন অদলবদলের চিহ্ন তার ওপর পড়েছে।

গ্রামের এইদিকটা অনেক বেশি ছিমছাম। এখানে অশথ, বট, শিরীষের ছায়াঢাকা বেশ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা, চারদিকে বাঁধানো ঘাটের টলটলে জলের দীঘি, শান্ত পবিত্র ক'টি মন্দির মিলে এমন একটি মধুর শ্রী ও আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, বাইরে থেকে যা কল্পনাও করা যায়নি।

মনোহারী দোকানটাও যা অনুমান করেছিলাম তারচেয়ে অনেক বড় ও উঁচুদরের দেখলাম। মুদিখানা ও মনোহারী দোকান একসঙ্গে মেলানো। ভেতরে একবার চোখ বুলোতেই দোকানের সওদা যে খুব তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়, তা বোঝা গেল।

আমাদের নতুন মুখ দেখে দোকানি একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরই অনুরোধে দোকানের সামনে পাতা হেলান-দেওয়া বেঞ্চিটিতে বসলাম।

দোকানির বয়স তেমন বেশি নয়। জুলপির কাছে সামান্য একটু পাক ধরা ছাড়া মাথায় সব চুল কাঁচাই আছে। মুখেও ভাঁজ পড়েনি।

বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না।

ভারিক্কি হাবভাবটা কিন্তু প্রায় ষাট-সত্তরের। ভারিক্কি মানে গোমড়া গোছের কিছু নয়, ভঙ্গিটি বেশ প্রসন্ন। কথা বলতে ভালোবাসেন। শুধু তাঁর যে একটা ওজন আছে কথাবার্তার ধরনে তা বুঝিয়ে দেন।

আমাদের বসতে বলে নিজে থেকেই তিনি বললেন—আপনারাই তো জাঙালবাড়িতে এসে উঠেছেন, না?

এ-কথায় অবাক খুব হলাম না। জাঙালবাড়ির গল্প যে পাশের গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছোবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু কীভাবে কতটুকু পৌঁছেছে সেইটেই জানবার।

পরাশর মাথা নেড়ে দোকানি মশাইয়ের অনুমান সমর্থন করবার পর তিনি যা বললেন তাতে যা বুঝলাম, তা কিন্তু একটু অবাক করবারই মতো।

জাঙালবাড়ির রহস্যটার ভয়াবহ দিকটা এখানকার একেবারেই অগোচর। যেটুকু এখানে প্রচারিত, তা শুধু একটু নির্দোষ কৌতূহলের বেশি জাগাবার মতো নয়।

তা না হলে আমরা জাঙালবাড়িতে উঠেছি বলে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর দোকানি শুধু, 'সিংহরায়মশাই ফিরেছেন?' এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করে ক্ষান্ত হতেন না।

না, আজ সকালেও তো ফেরেননি।—বলে পরাশর যেভাবে একটু হাসল, তার সোজা অর্থ এই যে, ব্যাপারটা সামান্য একটু কৌতুক বোধ করবার মতো নিতান্ত তুচ্ছ।

গ্রামে সেইভাবেই যে ঘটনাকে বোঝা হয়েছে, একটিমাত্র যে খদ্দের দোকান থেকে একটা

BanglaBook.org

বার সোপ কিনতে এসে দাম চুকিয়ে সওদা নিয়েও আমাদের দেখে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কথাতেও বোঝা গেল।

তিনি প্রথমটা আমাদের কৌতূহলভরে শুধু লক্ষ্য করছিলেন। পরাশরের কথায় সিংহরায়মশাই আজ সকালেও ফেরেননি জেনে নিজে থেকে একটু হেসে বলে গেলেন—কিছু ভাববেন না, শনি গেছে, রবি গেছে, আজ সোমবার। বুড়ো আজই বিকেলের মধ্যে যদি না ফেরে তো কাল সকালে ফিরবে নির্ঘাৎ। বুড়োর স্বভাব আমার ভালো করে জানা। ঝগড়ার ছুতো করে ও নিজের মতলবটি হাসিল করে আসছে। তবে মেয়ে দুটিকে এভাবে বিপদে ফেলে যাওয়া খুব অন্যায় হয়েছে, একশোবার বলব।

ভদ্রলোক আশ্বাস দিতে গিয়ে এতখানি হতভম্ব করে দেবেন ভাবতে পারিনি। পরাশরের অবস্থা আমারই মতো।

দ্বিধা-সংকোচ না করে সে কিন্তু খোলাখুলি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে—ভদ্রলোক যে মাথাটা গুলিয়ে দিয়ে গেলেন মশাই। শনি, রবি সোম, ঝগড়ার ছুতোয় মতলব হাসিল, কীসব বললেন কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। অথচ ওঁর কথায় মনে হল বোঝা আমাদের উচিত ছিল।

না, আপনারা নতুন লোক, আপনারা কেমন করে বুঝবেন! দোকানি আমাদের প্রতি সহানুভূতির হাসিই হাসলেন—সিংহরায়মশাইয়ের মজার রোগটুকুর কথা যারা জানে, তারা ছাড়া কেউ বুঝবে না। সে-রোগের খবর এ-গাঁয়েরই বা ক'জন জানে!

মজার রোগটা কী?—বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন না করে পারলাম না।

মজার রোগ হল ওঁর এই এত বয়সেও থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশা। জাঙালবাড়িতে ওঁর ভাইঝিরা আসবার আগে তো শনি-রবিবার সদরে গিয়ে কাটানো ওঁর বাঁধা ছিল।

বলেন কী!—পরাশরের কাছে ব্যাপারটা যে বেশ অবিশ্বাস্য তার গলার স্বরে লুকনো রইল না—কিন্তু থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতেই যে শনি, রবি সদরে কাটাতেন তা জানলেন কী করে?

জানলাম—দোকানি হেসে বললেন—হাতে-হাতে ধরে ফেলে। কাছারির কাজে মাঝে-মাঝে সদরে যেতে হয় তো! এইমাত্র যিনি গেলেন সেই পাঠকমশাইয়ের সঙ্গে সেবার ট্রেনে যেতে সিংহরায়ের সঙ্গে দেখা। তিনিও কাছারির কাজে যাচ্ছেন শুনলাম। কাছারির কাজ সেরে ফিরতি ট্রেন একসঙ্গেই ধরব জানি। কিন্তু সিংহরায়মশাইয়ের আর দেখা নেই।

কোথায় গেলেন বুঝতে না পেরে পাঠকমশাইকে নিয়ে আমি ওখানকার খাসবাজারে ক'টা সওদা করে স্টেশনের দিকে যাবে হঠাৎ দেখি বাজারের মাঝখানকার বড় সিনেমা হলটার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহরায়মশাই বিড়ি টানতে-টানতে একটা দেওয়াল-ছবি তন্ময় হয়ে দেখছেন। কাছে গিয়ে ডাকতে চমকে উঠে প্রথমে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, তারপর একটু কাঁচুমাচু হয়ে স্বীকার করলেন যে, আসলে সিনেমার ছবি দেখতেই তাঁর সদরে আসা। শুধু সিনেমার ছবি নয়, থিয়েটারেরও শখ আছে। শনিবারের পর রবিবার একটা কলকাতার পার্টি কী থিয়েটার করতে আসছে, সেটাও দেখে তবে ফিরবেন। পরে জেনেছি কি শনি-রবি তখন এই ছিল তাঁর রুটিন।

কি শনি-রবিবারই যেতেন!—পরাশর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হত বুঝি?

না, আমার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হবে কেন?— দোকানি পরাশরের ভুল অনুমান শোধরালেন, আমার তো আর হপ্তায়-হপ্তায় সদরে যেতে হয় না। কিন্তু সিংহরায়মশাই যে যান, বেস্পতি কি শুক্রবারে ওঁর বাড়তি ক'বাণ্ডিল বিড়ি কেনা থেকেই বুঝতে বাকি থাকত না।

BanglaBook.org

বিড়ি কেনা থেকে!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বিড়ি কেনা থেকে সদরে যাওয়া বুঝতেন!

হ্যাঁ, বলে হেসে দোকানি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

আমাদের দশানির এক স্পেশ্যাল বাঁধা বিড়ি, শুধু আমার দোকানেই থাকে। এখানে আসার পর সে বিড়ির স্বাদ পেয়ে সিংহরায়মশাইয়ের আর কোনও বিড়ি মুখে রোচে না। দু-দিন বাইরে গিয়ে থাকবার জন্যে তাই তিনি বেশি করে কয়েক বান্ডিল বিড়ি কিনে নিয়ে যেতেন। একদিন না দু-দিন সদরে থাকবেন তাও ওই বান্ডিল কমবেশি দেখে বুঝতে পারতাম।

এবারে বেশ ক'বান্ডিল নিয়ে গেছেন তা হলে?—পরাশর নিতান্ত সরলভাবে প্রশ্ন করলে।

দোকানি কিন্তু একটু চিন্তিতভাবেই মাথা নাড়লে—না, বিড়ি কিনতেই আসেননি। সেইটেই আশ্চর্য। সিংহরায়মশাইয়ের অন্তর্ধান হওয়ার খবর শুনে আমি আর পাঠকমশাই ধরে নিয়েছি যে, উনি নির্ঘাত সদরে সরে পড়েছেন। ভাইঝিরা আসবার পর অনেকদিন ও-পাট হয়নি বলে বোধহয় ছটফট করছিলেন ভেতরে-ভেতরে, ঝগড়ার ছুতো একটা পেয়েই পালিয়েছেন। কিন্তু ওই বিড়ি না কিনে খাওয়ার জন্যেই পাঠকের না হোক আমার একটু কেমন খটখা লাগে।

আপনার এ স্পেশ্যাল বিড়ি তাহলে খুব বিক্রি!—পরাশর হঠাৎ আসল প্রসঙ্গ থেকে কেন সরে গেল বুঝতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তা খুবই ভালো বিক্রি বলতে হয়।—দোকানি গর্বভরেই জানালেন।

দুটি ফ্রক পরা ছোট মেয়ে দোকানে গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট আর চিনি কিনতে এসেছিল। তাদের সওদা দিয়ে বিদায় করে দোকানি আবার বললেন—শুধু এ-অঞ্চলেই নয়, বাইরে থেকেও এখন এ-বিড়ির অর্ডার আসতে শুরু করেছে, বুঝেছেন। দেখবেন একটা পরীক্ষা করে, দোকানি দুটি বিড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

নেহাত ও-রসে বঞ্চিত!—পরাশর হাতজোড় করে প্রত্যাখ্যান করে বললে—না হলে আপনার স্পেশ্যাল বিড়ি নিশ্চয়ই একবার পরীক্ষা করে দেখতাম। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না, এবার আমাদের সওদাটা দিয়ে বিদেয় করুন।

না, না, সময় নষ্ট কী!—দোকানি আন্তরিক প্রতিবাদই জানালেন মনে হল—আপনাদের মতো লোক পেলে তবু তো দুটো কথা বলে বাঁচি। হ্যাঁ, বলুন কী চাই?

পরাশর যা চাইল তা শুনে সত্যিই প্রায় বেঞ্চি থেকে পড়ে যাবার অবস্থা। এরকম একটা অদ্ভুত আজগুবি ফরমাস আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

ভালো তরল আলতা ক'শিশি চাই।—বললে পরাশর।

তরল আলতা!

তাও এক নয়, ক'শিশি!! আমার চোখ তো তখন কপালে উঠেছেই, দোকানিও বেশ একটু হতভম্ব মনে হল। তবু দোকান করতে হলে খদ্দেরদের অনেক খেয়ালই মুখবুজে সইতে হয় বোধহয়। দোকানি তাই দু-বার মাত্র ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলেন—ক'শিশি বলুন?

এই গোটাদশেক হলেই চলবে।—বলতে পরাশরের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

না, অত তো হবে না!—দোকানি বিমূঢ় হলেও দুঃখের সঙ্গে জানালেন—নতুন চালান এখনও আসেনি। আগে যা এসেছিল ফুরিয়ে এসেছে। তবু দেখছি।

এবার দোকানদার দোকানের মনিহারি দিকটায় উঠে গিয়ে একটা তাকের পেছনে খানিক হাতড়ে একটিমাত্র শিশি বার করে এনে একটু যেন লজ্জিতভাবে বললেন—এই একটিই আছে।

মোটে একটি!

দোকানি যদি দুঃখিত লজ্জিত হয়ে থাকেন পরাশর একেবারে হতাশ। হতাশাটা বেশ জোর

BanglaBook.org

করে যেন কাটিয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণস্বরে আবার বললে—একদফা চালানে আলতা তা হলে আপনার খুব কমই আসে। অবশ্য পাড়াগাঁয়ের ছোট দোকান, দু-চারটের বেশি আনবেনই বা কোন ভরসায়!

দু-চারটে আনাই!—দোকানি যেন আঁতে ঘা খেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সামনের দিকে এসে ক্যাশবাক্সের পাশে রাখা একটা খেরো খাতা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন—এই দেখুন, ঠিক দু-মাস আগে এক দফায় তিন ডজন আলতা এসেছে।

দোকানি খেরো খাতাটা পরাশরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

সেটা নেওয়ার কোনওরকম উৎসাহ না দেখিয়ে পরাশর যেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বললে—তিন ডজন আলতা! আর এই দু-মাসেই তা শেষ হয়ে একটিতে ঠেকেছে! আপনাদের গ্রাম তো প্রায় শহর-ই বলতে হয় মশাই।

না, অতটা নয়। এক-আধবার একটু বেশি বিক্রি হয়, যেমন এবারে!—দোকানি ন্যায্যের বেশি বাহাদুরি নিতে রাজি হলেন না।

কিন্তু এত আলতা কেনে কে মশাই? —পরাশর আবার সন্দিগ্ধ কৌতূহল দেখালে, এ সরেস আলতার তো দাম বেশ বেশি!

সরেস ছাড়া আমার দোকানে কিছু রাখি না।— দোকানি গম্ভীর হয়ে গর্বটুকু প্রকাশ করে খেরো খাতার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বললেন—কে কেনে জিগ্যেস করছেন? এই, এই দেখুন...।

একটা পাতা খুলে তার ওপর আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দোকানি আবার বললেন—এই তো দক্ষিণ পাড়াতেই ক'ঘরে একটা-একটা করে গেছে দশটা। বাঁধখোলাতেও গেছে গোটা আষ্টেক আর চৌধুরীবাড়িতেই পাঁচটা। তা ছাড়া খুচরো নগদ বিক্রি আছে।

এবার দোকানির হাত থেকে খাতাটা নিতে পরাশরের আপত্তি দেখা গেল না। পাতাটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে অবশ্য একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললে—বাইরের মানুষ! এদিকের কিছু তো জানি না। এ গাঁয়ে পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক তা হলে অনেক আছেন!

তা আছেন।—খেরো খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে পরাশরের কথায় ঈষৎ প্রতিবাদ জানালেন দোকানি—তবে শুধু ভদ্রলোকেরাই নয় মশাই, আজকাল চাষী-কলু-কামারদেরও তো পয়সা হয়েছে, সেইসঙ্গে শখও। তারাও গাদা-গাদা শৌখিন জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

এ-প্রসঙ্গ আর যেন চালানো যায় না বলেই পরাশর এবার উঠে পড়ে বললে—তা হলে আর কী করা যাবে! একটামাত্রই যখন আছে তখন ওইটেই দিন, নিয়ে যাই।

দোকানি আলতার শিশিটা দিয়ে পরাশরের দেওয়া নোটটার ভাঙানি দেবার সময় পরাশর আবার হঠাৎ যেন ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বললে—আপনাদের গাঁ-দেশের দোকানের দস্তুর দেখলাম ভালো। খাতায় লেখা মানেই তো ধার, আর বেশিরভাগই তাই। এমনকী চৌধুরীবাড়িরও।

হ্যাঁ, এখানে ধারের কারবার তো করতেই হয়।—দোকানির মুখটা এবার খুব প্রসন্ন মনে হল না।

আদায় হয় তো সব? —পরাশরের একটু বেশি আসকারা দেওয়া প্রশ্ন।

দোকানি দোষ ধরে অসন্তুষ্ট হতে পারতেন, কিন্তু তাঁরও গোপন কিঞ্চিৎ ক্ষোভ মনের মধ্যে আছে মনে হল। একটু ক্ষুব্ধ গলাতেই বললেন—সব কি আর হয়? তবে আশা করে থাকা ছাড়া উপায় কী?

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ একেবারে বদলে দিয়ে পরাশর বললে—আপনাদের গ্রামটি কিন্তু চমৎকার লাগল মশাই। এমন গ্রাম আজকাল চোখেই পড়ে না। দেখে মনে হল, আপনাদের রাজাবাবু মানে দেবপ্রতাপ চৌধুরীই সবকিছুর পেছনে আছেন।

হ্যাঁ, তা আছেন। তিনি ছাড়া থাকবেনই বা কে!—দোকানির গলায় উৎসাহ উচ্ছ্বাসের বদলে

BanglaBook.org

কেমন একটু সমালোচনার সুরই যেন আছে সন্দেহ হল—এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান-টেয়ারম্যান হবেন বোধহয়, আর রায়সাহেব-টাহেব। কিন্তু গাঁয়ের পেছনে টাকা ঢালতে যদি চৌধুরীবাড়ি নিলেমে ওঠে সেটা কি লজ্জার কথা হবে না?

সেরকম কিছুর ভয় আছে না কি?—পরাশর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললে—দেখে তো মনে হয় না।

দেখে আর কী মনে হবে। ওপরের খোসা দেখে ভেতর ফোঁপরা কি বোঝা যায় সবসময়ে? আচ্ছা নমস্কার।

হঠাৎ যেন যতখানি উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছেন হুঁশ হওয়ায় দোকানি একটু যেন অভদ্রভাবেই নমস্কার করে আলাপটায় ছেদ টানলেন।

এগারো

দোকান থেকে বেরিয়ে খানিক দূর নীরবেই পাশাপাশি হাঁটলাম। দোকানের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে চৌধুরীবাড়ি ছাড়িয়ে জাঙালবাড়ির পথ ধরবার পর কৌতূহল আর বিরক্তি দুটোর কিছুই আর চাপতে পারলাম না।

প্রায় রুক্ষস্বরে বললাম—তুমি গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলা শুরু করেছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু তার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

কেন? কেন? পরাশর অবাক ও দুঃখিত হবার ভান করলেও কৌতুকের সুরটা তার ভেতর দিয়ে বেশ একটু ফুটে উঠল যেন।

তাইতে আরও জ্বলে উঠে বললাম—কেন তুমি জানো না। মনোহারী দোকানে গিয়ে ওই তরল আলতা কেনবার ভড়ং করে অতখানি সময় নষ্ট করবার কিছু দরকার ছিল?

বাঃ, একটা কিছু না কিনলে আলাপ জমানো যাবে কী করে!—পরাশর কৈফিয়ত দিলে।

তাইজন্যে তরল আলতা! আর একটা নয়, একেবারে এক ডজন। দোকানির কাছে আমাদের মাথাখারাপ প্রমাণ করার কিছু দরকার ছিল?

আরে তাই তো ছিল!—পরাশর আমাকে একেবারে থ' করে দিয়ে জবাব দিলে—মাথাখারাপ মনে করলে লোকে তবু বেশি সাবধান না হয়ে দু-চারটে গুহ্য কথা বলে ফেলে। আমাদের একটু ছিটেল না ভাবালে অত কথা ওর পেট থেকে বার করতে পারতাম?

নিজেদের পাগল-ছাগল সাজিয়েও কী এমন দামি কথা বার করতে পেরেছ শুনি!—ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম—যা জেনেছি তাতে আমাদের রহস্যের কোনদিকের কিনারা হবে? আমরা জেনেছি যে, পিসেমশাইয়ের বায়স্কোপ-থিয়েটারের নেশা আছে। সে-নেশার টানে তিনি আগে সদরে গিয়ে দু-একদিন কাটিয়ে আসতেন। আর জেনেছি, তিনি এখানকার এক স্পেশ্যাল বিড়ির দারুণ ভক্ত। বাইরে কোথাও গেলেও সে-বিড়ির বান্ডিল কিনে নিয়ে যান। এইসব জেনে পিসেমশাইয়ের নিখোঁজ হওয়াটার মানে বোঝা গেছে। তুমি কি মনে করো পিসেমশাই সদরে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখার লোভে পালিয়ে লুকিয়ে আছেন?

না, তা আর কী করে মনে করি?—পরাশর বাধ্য হয়ে স্বীকার করলে।

পিসেমশাইয়ের রহস্য তা হলে যেমন তেমনই রইল।—পরাশরের ওপর টেক্কা দিতে পেরে কতকটা বক্তৃতার সুরেই বললাম—আর যা জেনেছ, তার দামটা কী? জেনেছ, রাজাবাবু অর্থাৎ চৌধুরীমশাইয়ের ওপর দোকানি ভদ্রলোক হয় তেমন সন্তুষ্ট নন, নয় তাঁর অত্যন্ত হিতৈষী। এত

BanglaBook.org

হিতৈষী যে গাঁয়ের ভালো করতে চৌধুরীমশাই নিজের ক্ষতি করেন, এ তিনি চান না। তাঁর কথা যদি বাড়ানো নাও হয় তবু তাতে চৌধুরীমশাইয়ের অবস্থা হয়তো যা মনে হয় তার চেয়ে খারাপ, এর বেশি আর কী জানা গেছে?

তখন না যাক, চৌধুরীমশাই সম্বন্ধে এখন আরও দামি কথা কিছু জানা যাবে মনে হচ্ছে।

আমার সব গুরুগম্ভীর বক্তব্য যেন তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়ে পরাশর সামনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে কী দেখালে।

দশানি গ্রাম ছাড়িয়ে তখন আমরা পাথুরে ডাঙার মেঠো রাস্তায় পড়েছি। কিছুদূর গিয়েই এ-রাস্তাটা স্টেশনের রাস্তার সঙ্গে মিলেছে।

পরাশরের নির্দেশ মতো সামনে দূরের দিকে যা দেখলাম, প্রথমটা তাতে কিছু বুঝতে পারলাম না।

স্টেশনের রাস্তার প্রায় কাছাকাছি জনচারেক ভারী কাঁধে ভারা নিয়ে আসছে। ভারায় বাঁধা বড় কেরাসিনের টিনগুলো যে খালি তা তাদের কাঁধে ভারা নেওয়া আর হাঁটার ধরনেই বোঝা যায়।

ভারী ক'জন আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছোবার আগেই অবশ্য ব্যাপারটা আমি আঁচ করে ফেলেছি। পরাশর তাদের যা জিজ্ঞাসা করলে তাতে আমার অনুমান সমর্থিত হল শুধু।

পরাশর এর মধ্যেই এখানকার কথার আঞ্চলিক টান একটু রপ্ত করে ফেলেছে। সেই টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—কী গো ভালোমানুষের পো-রা! জাঙালবাড়িতে জল দিয়ে ফিরছ, কেমন?

লোকগুলি একটু অবাক হলেও হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!

ওখানে দেখলে কাউকে?—জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

আজ্ঞে না বাবু! ভারীদের মধ্যে মুরুব্বি গোছের একজন বললে—দিদিমণিরা কেউ ছিলেন নাই। দরজায় তালা দেওয়া। খালি একজন মুনিশ ওই বাইরে ইঁদারা পাড়ে বসেছিল। বললে, ইঁদারার জলে ইঁদুর মরে পচে গেছে। তাই জল খারাপ।

ইঁদুর পচেছে বললে বুঝি?—পরাশর হেসে তারপর জিজ্ঞাসা করলে—তা জল ভালো করে রেখেছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ!—ভারীরা আশ্বস্ত করলে—ওই মুনিশই যেখানে রাখবার দেখিয়ে দিল।

বেশ, তা হলেই হল।—বলে পরাশর তাদের বিদায় দিলে।

ভারীরা চলে যাওয়ার পর আবার হাঁটতে-হাঁটতে এই জল পাঠানোর ব্যাপারে আশ্চর্য ও কৃতজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে জাঙালবাড়ির দুরবস্থার কথাও ভাবছিলাম। একজনও মুনিশ যে বাড়িতে উপস্থিত ছিল তাতেই আশ্চর্য হলাম অবশ্য। বুঝলাম, সে দামু ছাড়া আর কেউ নয়। এক-এক করে আর সকলের পরে পিসেমশাইয়ের একান্ত বিশ্বাসী দশরথও পাহারার কাজ ছেড়ে পালাবার পর পিসেমশাই কোথা থেকে এই দামুকে জোগাড় করে এনেছিলেন শুনেছি। দামুই একমাত্র এখনও টিকে আছে। অবশ্য রাত্রে সে জাঙালবাড়িতে থাকে না। বিকেলবেলাই ঘরে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এই দামুও আর ক'দিন থাকবে কে জানে! সে না থাকলে আজ এত কষ্টের পাঠানো জলও হয়তো বরবাদ হত ভেবে জাঙালবাড়ির রহস্যভেদ করতে ওখানে টিকে থাকতে পারা সম্বন্ধেই মনে-মনে একটু যে হতাশ বোধ করছিলাম সে-কথা লুকিয়ে লাভ নেই।

হঠাৎ পরাশর জিজ্ঞাসা করলে—কী বুঝলে এই জল পাঠানোর ব্যাপারে?

ভারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় আর জাঙালবাড়ির দুর্দশার ভাবনায় পরাশরের কিছুক্ষণ আগের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললাম—এতে আর বোঝাবুঝির কী আছে?

কিছু নেই।—পরাশর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কে জল পাঠিয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝেছ?

সেটা বোঝার জন্যে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার বটে।—এবার বিদ্রূপ না করে পারলাম না—দশানি থেকে ভারীরা জাঙালবাড়িতে জল বয়ে দিয়ে আসছে দেখলে হুকুমটা যে চৌধুরীমশাইয়ের সে-কথা ভাবা তো অসম্ভব!

এ-বিদ্রূপের খোঁচা যেন গ্রাহ্যই না করে পরাশর তেমনি গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু এই জল পাঠানো মানে জাঙালবাড়িতে চৌধুরীমশাইয়ের চর থাকা, সেটা ভেবে দেখেছ?

চর থাকা!—সত্যিই বিমূঢ় হয়ে বললাম।

হ্যাঁ—পরাশর যেন অঙ্ক কষে বোঝালে—আমাদের ইঁদারার জলে রক্তের কথা আমরা গাঁয়ে এসে ঘুণাক্ষরে কাউকে জানাইনি। শর্মিরাও স্টেশনে গিয়ে তা বক্সীবাবুকে জানায়নি আশাকরি। আর জানালেও স্টেশন থেকে চৌধুরীবাড়িতে টেলিফোন যখন নেই তখন সে-খবর রানার ছুটিয়েও আধঘণ্টার আগে চৌধুরীমশাইয়ের কাছে পাঠানো সম্ভব নয়। চৌধুরীমশাই কিন্তু অনেক আগেই যে খবর পেয়েছেন, এখান থেকে ভারীদের জাঙালবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে জল দিয়ে এতখানি ফিরে আসা থেকেই তা বোঝা যায়। খবর তিনি একমাত্র গোবর্ধনের কাছেই পেতে পারেন। আর গাঁয়ে কোনও খবর যখন রটেনি, শুধু চৌধুরীমশাই একাই জেনেছেন, তখন গোবর্ধন চৌধুরীমশাইয়েরই চর।

মাথাটা সত্যিই গুলিয়ে গেছল। কতকটা নিজের মনেই বললাম, কিন্তু চর লাগাবার উদ্দেশ্যটা তাঁর কী?

পরাশরের উত্তরটা শোনবার আর সুযোগ হল না। পেছনে হর্নের আওয়াজে ফিরে তাকিয়ে দেখি চৌধুরীমশাই স্বয়ং তাঁর হুডখোলা মরিস গাড়িটা চালিয়ে আসছেন।

জাঙালবাড়ি পর্যন্ত আর হাঁটতে হল না। তাঁর গাড়িতেই গেলাম।

বারো

চৌধুরীমশাই আমাদের দেখেই গাড়ি থামিয়েছিলেন। সামনে তাঁর পাশে পরাশর বসল আর আমি পেছনের সিটে।

পেছনের সিটে একটু আড়ষ্ট হয়েই বসতে হল। কারণ শালপাতামোড়া দিয়ে বাঁধা একটা বড় ঝুড়ি সেখানে বেশিরভাগ জায়গা নিয়ে আছে।

এরকম সুযোগ পেয়ে পরাশর জল পাঠানোর কথাটা তুলতে দেরি করবে না ভেবেছিলাম, কিন্তু পরাশরের সেরকম কোনও লক্ষণই দেখলাম না।

সে যেন হঠাৎ এখানকার নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি বেশিরকম আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত পরাশরের মুখ খোলার জন্যে অপেক্ষা করে নিজেই কথাটা তুলব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু চৌধুরীমশাই লোকটি সত্যিই যেন মনের কথা টের পাওয়ার মতো তুকতাক কিছু জানেন।

আমি কিছু বলার আগেই নিজে থেকে বললেন—ভাগ্যি, সকালেই গোবর্ধনের সঙ্গে আমার এই রাস্তায় দেখা। নইলে ওঁদের আরও কতক্ষণ এ-দুঃখ সইতে হত কে জানে!

এবারও পরাশরই কিছু বলবে আশা করেছিলাম, কিন্তু সে যেন এ-জগতেই নেই। আমার তাই জিজ্ঞাসা করতে হল—গোবর্ধনের সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছে? এই রাস্তাতেই?

হ্যাঁ, চৌধুরীমশাই রাস্তার একটা খোদলকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে বললেন—আমরা

BanglaBook.org

সকালে আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম যে, আপনাদের সুবিধে-অসুবিধে কী হল না-হল খোঁজখবর নিতে। সিংহরায়মশাই যখন নেই তখন এখানকার অতিথি হিসেবে আপনাদের একটু দেখাশোনা আমাদের কাউকেই করতে হয়।

সাতসকাল বেলায় আমাদের খোঁজখবর নিতে দশানি থেকে জাঙালবাড়ি যাওয়ার কাহিনীটা বেশ দুর্বলই মনে হল। সেইজন্যই বোধহয় ওই ভুয়ো কৈফিয়তটা দেবপ্রতাপ চৌধুরী অত বিস্তারিত-ভাবে দিয়ে তারপর আসল কথায় পৌঁছলেন।

তাঁর বিবরণ অনুসারে ব্যাপারটা হল এই যে, এই রাস্তাতেই মোটর নিয়ে যেতে-যেতে গোবর্ধনকে ভয়ে প্রায় দিশাহারা অবস্থায় ছুটে আসতে তিনি দেখেন। তাকে দাঁড় করিয়ে বেশ ধমক-টমক দিয়ে তারপর জাঙালবাড়ির ইঁদারায় রক্তের ব্যাপারটা তাঁকে জানতে হয়। সেটা জানবার পর জলই আমাদের আপাতত সবচেয়ে জীবন-মরণ সমস্যা বুঝে তিনি তৎক্ষণাৎ গোবর্ধনকে গাড়িতে তুলে নিজের বাড়িতে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারী দিয়ে জল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আর গোবর্ধনকে শাসিয়ে বলে দেন, ঘুণাক্ষরে এসব কথা গাঁয়ের কাউকে কিছু না জানাতে।

বিবরণের শেষে চৌধুরীমশাই একটু আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জানালেন, আমি আগে থাকতেই অবশ্য এদিক দিয়ে সাবধান হয়েছি। এখানকার দারোগাও আমার সঙ্গে একমত হয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। সিংহরায়মশাই যেন ঝগড়াঝাটি করে বা অন্য কোনও তুচ্ছ কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, এর বেশি এখানকার কেউ কিছু জানে না। মহিন্দর তার ভয় পাওয়ার কথা গোড়ার দিকে একটু চাউর করেছিল, কিন্তু এখানকার লোকের কাছে সেটা কিছু নতুন নয়। জাঙালবাড়ি আর গড়মহল ভয়ের জায়গা এ তারা অনেককাল থেকে জানে। তা ছাড়া মহিন্দর নিজেই ক'মাস গাঁ ছাড়া। সুতরাং সেদিক দিয়ে আর কোনও ভাবনা নেই।

সত্য মিথ্যা যাই হোক, এ-বিবরণ শেষ করে চৌধুরীমশাই, যা ভয় করছিলাম, সেই প্রশ্নই তুলে বসলেন।

আচ্ছা, আপনারা তো গাঁয়ে আমার খোঁজেই এসেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু বাড়িতে দেখা না করে ফিরে যাচ্ছিলেন যে?—চৌধুরীমশাই একটু ভ্রূকুটিভরেই জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব দেওয়ার মতো কোনও মিথ্যে কৈফিয়তই চটপট বানাতে না পেরে তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল।

পরাশরই এবার তার প্রকৃতি-ধ্যান থেকে হঠাৎ জেগে উঠে মুখরক্ষা করলে। বললে—পথে আপনার পাঠানো ভারীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যে। এ-জল আপনি ছাড়া আর কেউ যে পাঠায়নি তা বুঝে আপনাকে আর বিরক্ত না করে গ্রামটাই একটু ঘুরে দেখে এলাম।

তা বেশ করেছেন! আর-একদিন কিন্তু আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেওয়া চাই।

চৌধুরীমশাই অতি সহজেই আমাদের কৈফিয়তটা মেনে নিয়ে ভদ্রতা করে যে নিমন্ত্রণ জানালেন পালটা সৌজন্য দেখিয়ে তা গ্রহণ করতে দেরি করলাম না। বললাম—নিশ্চয়ই! এখানে এলে আপনার বাড়ি না দেখে গেলে তো আমাদেরই লোকসান।

রাস্তায় এদিকের মার্কামারা শীর্ণ বালখিল্য গোছের একপাল গরুর ভেতর দিয়ে অনবরত হর্ন বাজিয়ে সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে চৌধুরীমশাই সৌজন্যের পাল্লা আর চালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন না বলে রক্ষে। নইলে আরও অনেকক্ষণ 'আপ উঠিয়ে'র পালা বোধহয় চলত।

সত্য কথাটাই ঈষৎ ঘুরিয়ে 'ইতিগজ' করে বলে দায়টা তখনকার মতো সামলাবার জন্যে আমি তখন পরাশরের কাছে কৃতজ্ঞ। চৌধুরীমশাই তাঁর ভারীদের জেরা করে কখন আমাদের সঙ্গে

BanglaBook.org

দেখা হয়েছে আশাকরি জানতে চাইবেন না। তা করে সত্য কথাটা জানলে আমাদের সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন কে জানে!

জাঙালবাড়ি পৌঁছে দেখলাম শর্মিলা ও বিনতা আগেই ফিরে এসেছে। গাড়ির শব্দে তারা দুজনেই ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

যিনি এত কষ্ট করে তৃষ্ণার জল পাঠিয়ে নিজে আবার খোঁজ নিতে এসেছেন সেই হিতৈষী ভদ্রলোকের অভ্যর্থনাটা কিন্তু যথোচিত হল না।

আমার বসবার অসুবিধা করবার কারণ-স্বরূপ শালপাতা-ঢাকা ঝুড়িটার রহস্য এবার বোঝা গেল।

চৌধুরীমশাই গাড়ি থামিয়ে পেছনের দরজা খুলে নিজেই ঝুড়িটা বার করে শর্মিলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা তখন কৌতুক-মিশ্রিত কৌতূহলে ব্যাপারটা দেখছি।

চৌধুরীমশাই কাছে যেতে শর্মিলা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কী?

অত বড় জোয়ান বীরপুরুষের মতো চেহারার মানুষটা যেন চোরের মতো এতটুকু হয়ে গেল। অত্যন্ত অপরাধীর মতো চৌধুরীমশাই বললেন, এতে এই সামান্য কিছু খাবার-দাবার আছে।

শর্মিলার চোখের দৃষ্টি তাতেও নরম হতে না দেখে একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ত দিলেন আবার— ভোরবেলাই ইঁদারার ওই অবস্থা শুনে রান্নাবান্নার অসুবিধা হবে বুঝলাম কি না, তাই কিছু লুচি-তরকারি আর মিষ্টি এনেছি!

শর্মিলার মন কতক্ষণে গলত বলা যায় না, কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা না করে পরাশরই এবার বললে, তা বেশ করেছেন! খুব ভালো করেছেন। কাল রাত্তির থেকে এখনও পর্যন্ত পেটে কিছু না পড়ে খিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়। যা উপকার করেছেন তাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার তাই ভাষা নেই।

শর্মিলা আর বিনতার দিকে ফিরে প্রায় হুকুমের স্বরেই পরাশর তারপর বললে—চলো, চলো, আর তর সইছে না। ভেতরে গিয়ে খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক আগে। আপনিও আসুন চৌধুরীমশাই!

আমি! না, না! —চৌধুরীমশাই সত্যিকার বিস্ময় ও আপত্তি জানালেন।

কিন্তু পরাশর শুনলে না।

বাঃ! আপনি না থাকলে হয়! —বলে একরকম জোর করেই চৌধুরীমশাইকে ধরে নিয়ে গেল।

চৌধুরীমশাই খাবার যা এনেছিলেন তা আমাদের তিনবেলা খেয়েও ফুরোবার নয়। বিপদের দিনে ভোজটা ভালোভাবেই হল। চৌধুরীমশাইকেই যেন মনে হল সবচেয়ে কৃতার্থ। সেটা শর্মিলার পাশে বসতে পাওয়ার জন্যে কি না বলা অবশ্য শক্ত।

কথায়-কথায় তাঁর সেই পুরনো আর্জিটাই তিনি আবার একবার জানালেন শর্মিলার কাছে —এত কষ্ট করার চেয়ে ইঁদারাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অন্তত আমাদের ওখানে ক'দিন থাকবেন চলুন না।

আমাদের এ-বাড়ি ছাড়াবার এত যখন আগ্রহ—শর্মিলা কিন্তু কঠিন মুখেই জবাব দিলে, তখন অমন একটা ভুল করা আপনার উচিত হয়নি।

কী ভুল! চৌধুরীমশাই অবাক ও একটু সন্ত্রস্ত হয়ে শর্মিলার দিকে তাকালেন।

ভুল, ভারীদের দিয়ে অত কষ্ট করে এখানে জল পাঠানো।— শর্মিলা নীরস গলায় বললে— জল না পেলে আমরা নিজেরাই হয়তো ব্যস্ত হয়ে আপনার অনুগ্রহের জন্যে ছুটতাম।

BanglaBook.org

সবার আগে জোর করে গলা ছেড়ে হেসে উঠে পরাশরই হাওয়াটা হালকা না করে দিলে কথাগুলো ঠাট্টা বলেই চালিয়ে দেওয়া একটু বোধহয় কঠিন হত।

চৌধুরীমশাই আমাদের সঙ্গে হেসেছেন শেষপর্যন্ত, কিন্তু তেমন প্রাণ খুলে বোধহয় নয়।

তেরো

চৌধুরীমশাই খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরেই বিদায় নিয়ে গেছেন। মনে যাই থাক, বাইরে বিশেষ কিছু ভাবান্তর তিনি বুঝতে দেননি। যাওয়ার আগে ইঁদারার জল তুলে পরিষ্কার করবার জন্যে পাম্পের ব্যবস্থা যে আগেই করে এসেছেন ও আগামীকাল থেকে সে-কাজ যে আরম্ভ হবে তাও জানিয়ে গেছেন।

চৌধুরীমশাই চলে যাওয়ার পর বিনতাকে এই প্রথম আর-এক মূর্তিতে দেখে আমি তো একেবারে অবাক। শর্মিলার ছায়া হিসেবেই যাকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি তার চোখে সে কী তেজ আর মুখে সে কী বকুনির খইফোটা! বকুনি আবার অন্য কাউকে নয়, শর্মিলাকেই।

শর্মিলা অকারণে কেন চৌধুরীমশাইকে এত হেনস্থা শুধু নয়, অপমান পর্যন্ত করে এই নিয়েই বিনতার রাগ। ভদ্রলোক যদি তার দু-চক্ষের বিষ হন তা হলে মুখে অন্তত তাঁর সঙ্গে ভদ্রতা তো রাখা যায়। তাদের ইঁদারার জল নষ্ট হয়েছে জেনে ভদ্রলোক যেমন করে হোক জলের ব্যবস্থা করেছেন, আর তাদের খাওয়ার অসুবিধের কথা ভেবে নিজে সঙ্গে করে রাজভোগের যুগ্যি খাবার নিয়ে এসেছেন এই তো তাঁর অপরাধ! তার জন্যে তাঁকে অপমান করে আঁতে ঘা দিয়ে অমন কটু কথাগুলো না শোনালে হত না!

বিনতার বকুনি প্রথমটা শর্মিলা অন্যসময়ের মতো হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ঠাট্টা করে বলেছে, তুই একেবারে এত হাবুডুবু খাচ্ছিস তা কি জানি! তাহলে মুখে মধু মেখে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতাম।

কিন্তু বিনতার মেজাজ আজ অন্যরকম। এসব ঠাট্টায় তাকে থামানো যায়নি। শেষপর্যন্ত তার ভর্ৎসনার তোড় সহ্য করতে না পেরে শর্মিলাকেই পিটটান দিতে হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।

শর্মিলা চলে যাওয়ার পরই কিন্তু বিনতার মুখের ভাব যেন ম্যাজিকে বদলে গিয়ে সেখানে হাসি ফুটে উঠেছে।

তার দিকে চেয়ে পরাশরও হেসে বলেছে—আমিও তাই ভেবেছিলাম। তবে খুব ভালো করেছ অমন করে কথাগুলো শুনিয়ে। শমির একটু নাড়া খাওয়া দরকার ছিল। তোমার কাছে খেয়েছে বলে একটু বেশি কাজ হবে।

ছাই হবে! —বিনতা হেসে বলেছে—আসলে ও নিজের মনটাকে চিনতে চাইছে না, তাই এত বেয়াড়া বদমেজাজ।

তার মানে আপনি কি বলতে চান—আমি বুঝে-সুঝে বোকা সেজে বিনতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্যে জিজ্ঞাসা করেছি—চৌধুরীমশাই সম্বন্ধে শর্মিলাদেবীর কিছু দুর্বলতা আছে ভেতরে-ভেতরে!

যা আছে তাকে 'কিছু দুর্বলতা' বলে না! —বিনতা হেসে ওঠবার উপক্রম করেছে।

কিন্তু—এবার আমার আগেই পরাশর তাকে থামিয়ে বলেছে—যেটা দুর্বলতা মনে করছ সেটা সন্দেহ আর তার জন্য বিরাগের প্রকাশও তো হতে পারে। শমি চৌধুরীমশাইকে সন্দেহ করে এটা তো ঠিক।

BanglaBook.org

সে তো শখের সন্দেহ!—বিনতা হেসে বলেছে—কিংবা নিজের মনের আসল কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে মিথ্যে সন্দেহের ফিকির মাত্র। অবশ্য ওর মন নিজের অজান্তেই নিজেকে ঠকাচ্ছে।

হুঁ, মনস্তত্ত্বের এরকম জটিলতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায় বটে—পরাশর গম্ভীর হয়ে বলেছে—কিন্তু চৌধুরীমশাইকে সন্দেহ করার যথার্থ কারণ যে প্রচুর।

চৌধুরীমশাইকে সন্দেহের প্রচুর কারণ আছে!—বিনতার গলার স্বরেই বোঝা গেছে এ-কথাটা তার কাছে অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, সত্যিই প্রচুর।—পরাশর যেন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছে।

কী সেগুলো, শুনি! —কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা।

বলছি, কিন্তু তার আগে তোমরা বক্সীবাবুর কাছে যে জন্যে গিয়েছিলে তার কী হল বলো। কী উত্তর পেলে তোমাদের প্রশ্নের? পরাশরের মুখে যেন একটু কৌতুকের আভাস দেখা গেছে।

কোনও উত্তরই পাইনি।—বলেছে এবার বিনতা।

তার মানে তিনি স্টেশনেই ছিলেন না—পরাশরের মুখের কৌতূহলটা আরও স্পষ্ট হয়েছে —তাঁর জায়গায় আর-একজনকে কাজ করতে দেখেছ! কেমন?

বিনতা মাথা নাড়তেই পরাশর ভারিক্কি চালে বলেছে—আমি তাই ভেবেছিলাম!

তাই ভেবেছিলে!—বিনতার কাছে পরাশরের এ-বাহাদুরিতে একটু ঘা না দিয়ে পারলাম না—কেন, কী করে ভেবেছিলে তোমায় আগে বলতে হবে। তোমার গোয়েন্দাগিরির ভড়ং একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ঠিক বলেছেন জলধরবাবু!—শর্মিলা কিছুক্ষণ আগেকার বকুনির জ্বালা ভুলে হাসিমুখে এসে বিনতার পাশেই বসেছে। খানিক আগে কখন সে বসবার ঘরে ফিরে এসেছে লক্ষ্য করিনি।

শর্মিলার সমর্থন পেয়ে এবার আরও জোর দিয়েই পরাশরকে আক্রমণ করেছি। বলেছি—সাহিত্যের নামকরা সব গোয়েন্দার মতো এই দু-দিনেই অনেকগুলি ধাঁধার প্যাঁচ তুমি ছেড়েছ। সব তোমার এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে!

যেমন?—পরাশর তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।

কিন্তু তাতে না ভড়কে বলেছি—যেমন, আজ সকালবেলার ওই মাছ দুটো! সে দুটো কোথায় কেমন করে পেলে, আর সেই মাছই এখানকার রহস্যের একটা খেই বলে আমাদের ধোঁকা দিলে কেন জানতে চাই। তারপর...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও! পরাশর মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলেছে—একটা-একটা করে উত্তর শোনো। নইলে গুলিয়ে ফেলবে। প্রথম, মাছটা কোথায় পেয়েছি? পেয়েছি গড়মহলের উত্তর দিকের একটা ডোবাতে। নদীর বাঁওড় মজে গিয়ে ওখানে জলা-জংলা হয়েছে তোমরা জানো। সেই মজা জলা-জংলার মাঝে ছোটখাটো দু-একটা এমন ডোবা আছে। একটা আছে একেবারে গড়মহলের লাগাও। ভূতের ভয়ে গাঁয়ের লোক পারতপক্ষে এদিক মাড়ায় না। দু-একজন ভরসা করে দিনেরবেলা শাল-শোল ধরবার জন্যে ন্যাটা-খলসে বঁড়শিতে গেঁথে তার সুতো পাড়ের পোঁতা বাঁশটাশে বেঁধে দিয়ে যায়। এ-মাছ ধরবার জন্যে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয় না। মাছ গাঁথলে তার পরের দিন দিনের বেলায় কোনওসময়ে এসে নিয়ে গেলেই হল।

তোমার কাছে মৎস্যশিকার বিদ্যা শিখতে চাইনি—ব্যঙ্গ করে বলেছি—ওখানে এরকম মাছ পাওয়া যায় তুমি জানলে কী করে বলো?

জানলাম মহিন্দরের কীর্তি থেকে।—আমাদের হতভম্ব ভাবটা উপভোগ করে পরাশর তারপর বলেছে—মহিন্দর কোথায় ভির্মি গিয়েছে তা শুনেছ! কিন্তু মহিন্দর এত জায়গা থাকতে গড়মহলের ওই জায়গায় দাঁতকপাটি লাগতে গেল কেন সেটা কি ভেবে দেখেছ কেউ? ওখানে না গেলে তাকে তো আর গড়মহলের ভূত দেখতে হয় না! মহিন্দরের প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহ নেই বক্সীবাবু কি

BanglaBook.org

চৌধুরী-শাইয়ের মতো। সুতরাং তার মতো গাঁইয়া সাধারণ মানুষের ওদিকে যাওয়ার খুব সাধারণ একটা কারণ থাকা উচিত। সেই কারণটা কিছুটা অনুমান করে তা খুঁজতেই আজ ভোরে ওদিকে গিয়ে ওই ডোবা ও বঁড়শিতে গাঁথা শোল দুটোকে দেখতে পাই। মহিন্দর এদিকে ডোবাগুলোর কথা জানে। এখানে কাজ নিয়ে এসে সে রথদেখার সঙ্গে কলাবেচার মতো মাছ ধরাটাও উপরি লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সন্ধেবেলা এমনিতেই ভয়ে-ভয়ে ওদিকে যাওয়ার পর বক্সীবাবুকে গড়মহলের অন্ধকার থেকে বেরুতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। বক্সীবাবুর নাড়া খেয়ে হুঁশ হওয়ার পর আর তার সাহস হয়নি মাছ দুটো খুলে নিয়ে যেতে। এই মাছ দুটোয় সুতরাং মহিন্দরের ভির্মি যাওয়ার রহস্য যেমন বোঝা যাচ্ছে তেমনি বক্সীবাবু সেদিনের বিবরণ যা দিয়েছেন তাও সত্যি বলে জানা যাচ্ছে। সব রহস্যের একটা স্পষ্ট খেই ওখানে তাহলে পাচ্ছি।

তুমি পাচ্ছ, কিন্তু আমি তো সত্যি পাচ্ছি না। তবু সে-কথা এখন থাক।—বলে পরাশরকে আবার প্রশ্ন করেছি—সকালে ইঁদারার জলে রক্ত দেখে, এরকম একটা কিছু হয়ে লোকজন এখান থেকে পালাবে তার আভাস নয় একেবারে প্রমাণ আগেই পেয়েছ বলে বাহাদুরি করেছিলে কেন? কী প্রমাণ পেয়েছিলে?

প্রমাণ? পরাশর এবার হেসেছে—রক্ত থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই পেয়েছিলাম অর্থাৎ প্রমাণ পেয়েছিলাম খুনের।

চোদ্দো

আমরা উত্তেজিতভাবে কিছু বলার আগেই পরাশর আবার বলেছে—খুন অবশ্য মানুষকে নয়, একটা হাঁসকে। কিন্তু শয়তানি মতলবে হত্যা করলে একটা হাঁস মারাও খুন। যে-ডোবায় মাছ দুটো পেয়েছিলাম তারই পাশে সব আগাছার জঙ্গলে পালকগুলো পড়েছিল। পালকগুলো দেখেই বুঝেছিলাম সেগুলো খুব বেশি আগে মারা হাঁসের নয়। তা ছাড়া ওই হাঁসের আর্তনাদেই রাত্রে আমি জেগে উঠে বাইরে বেরোই।

হাঁসের আর্তনাদ শুনে বেরোও? কখন?—শর্মিলা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছে।

তখন রাত প্রায় চারটে।—বলেছে পরাশর, ঘুম আমার অবশ্য আগেই ভেঙেছিল। আসলে প্রথম রাতটা আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম শেষরাতটা জাগব বলেই। আমরা আসার দরুন একটা নতুন শয়তানি কিছু হবে আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। শেষরাতের দিকে তা হওয়া সম্ভব বলে সজাগও ছিলাম। হাঁসের আওয়াজটা শুনে প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ডাকটা পাখির তা বুঝেছিলাম, কিন্তু এ-অঞ্চলের সব পাখি তো আমার জানা নেই। আমার অজানা কোনও পাখির ডাক হতে পারে ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকেছিলাম। বার দুয়েকের পর আর সেরকম ডাক না শুনে অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় একটা থামের আড়ালে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যি কথা স্বীকার করছি, ইঁদারার দিকটায় আমার নজর ছিল না। শয়তানি হিসেবে শর্মিলা ও বিনতাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাদের ঘরের কাছেই কিছু হবে ভেবে নিয়ে সেইদিকেই আমি নজর রেখেছিলাম। সেইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। আমি যতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তার মধ্যেই হয়তো ইঁদারায় রক্ত ঢালার কাজ সারা হয়ে গেছে। আকাশে একটু আলো ফুটতে দেখে আর পাহারার কোনও দরকার নেই বুঝে মহিন্দরের রহস্যটার সমাধান করতে আমি গড়মহলের উত্তরে গেছি। সেখান থেকে ফেরবার মুখেই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা।

BanglaBook.org

পরাশরের দীর্ঘ ব্যাখ্যাগুলোকে কিছুটা মানতে বাধ্য হলেও শেষ প্রশ্নটা একটু কড়া গলাতেই করেছি—শর্মিলা আর বিনতাদেবী স্টেশনে গিয়ে বক্সীবাবুকে পাবেন না—তার বদলে আর-একজনকে সেখানে কাজ করতে দেখবেন, এ নির্ভুল গণনা তুমি আগে থাকতে করলে কেমন করে? তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে বলে তো জানি না।

দিব্যদৃষ্টি নয়, শুধু একটু সজাগ কান—পরাশর আমাকে বেশ অপ্রস্তুত করে বলেছে—তা থাকলে, এ নির্ভুল গণনা তুমিও করতে পারতে।

তোমার সজাগ কানটা কখন কোথায় এই বেতার-সংবাদটা ধরল, একটু বলবে?—একটু নরম হয়েই বলেছি।

যখন ধরল তখন তুমিও পাশেই ছিলে—হেসে বলেছে পরাশর, মোটরে আমাদের তুলে এখানে আসবার সময় চৌধুরীমশাই কী বলেছিলেন একটু মনে করে দেখো, বলেছিলেন—আমরা সকালে জাঙালবাড়িই যাচ্ছিলাম। এ 'আমরা' বলতে কাদের বোঝাতে পারে? চৌধুরীমশাই ওই সাতসকালে তাঁর ভাইছিদের নিয়ে নিশ্চয় এখানে আসছিলেন না, অন্য যাকে-তাকে সঙ্গে নিয়েও জাঙালবাড়িতে আসবার লোক তিনি নন। সুতরাং 'আমরা' বলে উল্লেখ থেকে তাঁর সঙ্গে বক্সীবাবুই ছিলেন নিশ্চিত ধরা যেতে পারে। কিন্তু ডাউনের একটা প্যাসেঞ্জার ওই সকালেই আসে। সে-সময়ে স্টেশনমাস্টার হিসেবে বক্সীবাবু স্টেশনে থাকতে বাধ্য। তা না থাকলে তাঁর জায়গায় আর কেউ নিশ্চয় কাজ করছে বুঝতে হবে।

পরাশরের যুক্তিগুলো অস্বীকার করতে না পারলেও প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু বক্সীবাবু হঠাৎ কাজের সময় স্টেশন ছেড়ে যাবেন কেন? তাঁর জায়গায় কাজ করবার অন্য লোক তিনি পেলেনই বা কী করে?

পেলেন কাজ থেকে ছুটি নেবার দরুন কিংবা চাকরি যাওয়ার জন্যেও হতে পারে।—বলে পরাশর আমাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছে প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যেই বোধহয়।

কিন্তু চাকরি গেলে বক্সীবাবু করবেন কী!—শর্মিলা সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে—এ-জায়গা ছাড়তে হলে উনি তো বাঁচবেন না!

স্টেশন ছাড়লেও এ-জায়গা থেকে যাওয়ার দরকার নাও হতে পারে। পরাশর আশ্বাস দিয়েছে—হয়তো চৌধুরীমশাইয়েরই অতিথি হয়ে থাকবেন।

কিন্তু আপনি যে-কালির ছোপে ওঁকে আঁকছিলেন তাতে চৌধুরীমশাইয়ের ওরকম উদার হওয়ার তো কথা নয়।—বলেছে বিনতা।

না, কালির ছোপে আঁকিনি—পরাশর প্রতিবাদ করেছে—আমি শুধু বলছিলাম যে, চৌধুরীমশাইকে এখানকার রহস্যের ব্যাপারে সন্দেহ করবার কারণ প্রচুর।

কী সেগুলো শুনি!—বিনতার আগে শর্মিলাই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছে এবার।

সেগুলো শুনবে!—পরাশর একটু দ্বিধা করে বলেছে—তোমাকেই শোনাতে চাইছিলাম না। তবু যখন এসে পড়েছ শোনো। প্রথম, এই জাঙালবাড়ি আর গড়গ্রহলের ক্ষতি চৌধুরীমশাইয়ের লোভের কথা অনেক আগেই জানা গেছে যখন পিসেমশাইয়ের কাছে ঠাট্টার ছলে এ-জায়গা তিনি কিনতে চান। এ-জায়গার প্রতি লোভ শুধু ওঁর নয়, চৌধুরীদেরই বংশগত। ওই মজা বাঁওড়ের দখল নিয়ে চৌধুরীর পূর্বপুরুষরাই সিংহরায়দের সঙ্গে লড়েছেন। দ্বিতীয়, এখানে যারা কাজ করতে এসেছে ও পরে বেয়াড়াপনা করেছে কি বাদ সেধেছে তারা প্রায় সবাই চৌধুরীমশাইয়েরই প্রজা। তারা তাঁর চর হিসেবে এখানকার খবর তাঁকে দেয় এ-রকম সন্দেহ করবারও কারণ হয়েছে। তৃতীয়, এখানকার পাট তুলে দিয়ে যাতে তোমরা চলে যাও তারজন্যে তাঁর আগ্রহ তিনি স্পষ্টই জানিয়ে ফেলেছেন, এমনকী এখানকার চেয়ে ভালো জায়গা দেওয়ার

BanglaBook.org

লোভও তোমাদের দেখিয়েছেন। চতুর্থ, গ্রামের প্রতি সত্যিকার টানে কিংবা নাম কেনবার জন্যে, যে কারণেই হোক, এখানকার উন্নতির জন্যে প্রচুর খরচ করে তিনি প্রায় দেউলে হতে বসেছেন এরকম ধারণাও অনেকের আছে।...

যা বলছ সেসবের সঙ্গে এখানকার রহস্যের সম্পর্ক কী?—শর্মিলা পরাশরকে বাধা দিয়ে থামিয়ে একটু উষ্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করেছে—উনিই মুখে সহানুভূতি দেখানো আর ওপরে-ওপরে সাহায্য করবার ভান করে তলে-তলে আমাদের তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাবার সব ষড়যন্ত্র করছেন বলতে চাও? উনি তা করতে যাবেন কেন?

উনিই করছেন, এমন কথা বলছি না।—পরাশর যেন সুর একটু নামাতে চেয়েছে—তবে করবার কারণ ওঁর আছে বইকী। বক্সীবাবুর কাছ থেকে প্রত্নতত্ত্বের নেশা ধরার সঙ্গে ওঁর মনে এখানকার গুপ্তধন উদ্ধারের লোভ হওয়া খুব আশ্চর্য কিছু নয়। সেরকম গুপ্তধন পেলে ওঁর সব আর্থিক সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু সে-গুপ্তধন পাওয়াও চাই গোপনে। আর কেউ তাতে দাবি-দাওয়া যাতে না করতে পারে। একা সিংহরায়মশাই থাকলে তেমন কোনও ভাবনা ছিল না কিন্তু তোমরা এখানে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় ছড়িয়ে বসলে ওঁর দারুণ অসুবিধে। তাই তোমাদের তাড়াবার আগ্রহ ওঁর তো হতেই পারে।

শুধু ওঁরই হতে পারে!—শর্মিলার গলায় বেশ রাগের ঝঙ্কার শোনা গেছে—বক্সীবাবুর হতে পারে না কেন?

তাও পারে হয়তো।—পরাশর স্বীকার করেছে।

হয়তো নয়, খুব বেশিরকম হতে পারে। বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছে শর্মিলা—প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যিকার দারুণ আগ্রহ তাঁরই। তিনি এ-বিষয়ে পাগল বললেই হয়। ঘর-সংসার, চাকরির উন্নতি সবকিছু তিনি বিসর্জন দিয়েছেন এর জন্যে। তাঁর কিন্তু সব আশায় হয়তো ছাই পড়বার উপক্রম হয়েছে। তুমি যা বলছ তাতে হয় তিনি বদলি হয়েছেন বা তাঁর চাকরি গেছে মনে হচ্ছে। এ-খবর নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই তিনি জেনেছেন। তাই যেমন করে হোক, এখানকার গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন। মহিন্দর তাঁকে দেখে যেদিন ভয় পায় সেদিন ওই সন্ধ্যার অন্ধকারেও গড়মহলে ঘোরাফেরা করতে তাঁর বাধেনি। হয়তো ইতিমধ্যে বেশ স্পষ্ট কোনও হদিশ তিনি পেয়ে গেছেন। তাই আমাদের, যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাড়ানো তাঁর অত্যন্ত দরকার। তাই পিসেমশাইকে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখে তিনি আমাদের ভয় দেখাবার ব্যবস্থা করছেন।

শর্মিলা থামবার পর খানিক চুপ করে থেকে যুক্তিগুলো যেন মনে-মনে বিচার করে নিয়ে পরাশর কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বলেছে—হ্যাঁ, তোমার যুক্তিগুলোও হেলাফেলা করবার নয়। তোমার কথা শুনতে-শুনতেই আরও কয়েকটা কথা আমার মাথায় এল। তাতেই মনে হচ্ছে যে, এ-রহস্যের মীমাংসার বোধহয় আর দেরি নেই।

আর দেরি নেই!—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে ঔৎসুক্যটুকুও লুকোতে পারিনি—তুমি তাই বলছ! কিন্তু কী থেকে?

কী থেকে?—পরাশর আবার একটু হেঁয়ালি করেছে। অনেক কিছু থেকে, যেমন ধরো দশানির স্পেশ্যাল বিড়ি থেকে।

সে আবার কী!—জিজ্ঞাসা করেছে শর্মিলা।—কী বলছো কী?

ঠিকই বলছি!—পরাশর গলার জোরেই প্রশ্নটা চাপা দিয়ে বলেছে—রহস্যের মীমাংসা হবেই, শুধু আমার একটা কথায় যদি তোমরা রাজি হও।

কী কথা?—জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা আর শর্মিলা।

BanglaBook.org

আমাদের স্তম্ভিত করে পরাশর বলেছে—কালই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কী!—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শর্মিলার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের গলা।

আহা, চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা মানেই তো চলে যাওয়া নয়। পরাশর আশ্বস্ত করেছে শর্মিলাকে—আমার কথাটা একদিনের জন্যে রেখে দেখো না! রহস্যের মীমাংসা হয় কি না তা জানতে তো কাল বাদে পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

পরশুর মধ্যেই রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে বলছ?—শর্মিলা অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে।

হ্যাঁ হবে, যদি আমার কথা রাখো।—দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছে পরাশর।

বেশ তাই রাখব।—কথা দিয়ে শর্মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—ও কী, যাচ্ছ কোথায়?

পরাশর তখন দরজার বাইরে। সেখান থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলেছে—বাঃ! আমার সব ব্যবস্থা করতে হবে না?

কী ব্যবস্থা করতে কে জানে, পরাশর সেই যে গেছে, রাত ন'টার আগে ফেরেনি। তার জন্যে বেশ একটু চিন্তিতই আমরা হয়ে উঠেছিলাম।

ইতিমধ্যে বিনতাকে একবার একলা পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বলবার এত কথা থাকতেও কী বলব ঠিক করে উঠতে পারিনি।

শুধু পরাশরকে নিয়ে একটু ঠাট্টার চেষ্টা করে বলেছি—পরাশর তো আর একদিনেই সব রহস্যের মীমাংসা করে ফেলছে। আপনি খুশি নিশ্চয়।

মীমাংসা করলে নিশ্চয় খুশি হব।—আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা—কেন, আপনি হবেন না?

এ-সুযোগটা নষ্ট হতে দিইনি। গম্ভীর মুখে বলেছি—না।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাসটা চেপে বলেছি—মীমাংসা হলেই তো আমাদের এখানকার পালা শেষ।

আর কিছু বলবার সুযোগ পাইনি, বিনতা কথাটা কীভাবে নিলে তা জানবারও। শর্মিলার ডাকে বিনতাকে তখনই চলে যেতে হয়েছে।

পরের দিনটা সত্যিই কেটেছে যাওয়ার আয়োজন নিয়ে। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ।

চৌধুরীমশাই এসে আমাদের যাওয়ার কথা জেনে গিয়েছেন। পরের দিনই ইঁদারা পাম্প করে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা চলে যাচ্ছি বলে দুঃখ করেছেন। খবর পেয়ে বক্সীবাবুও এসেছেন একবার। তাঁর মুখেই শোনা গেছে যে, তিনি এখন ছুটিতে আছেন। আছেন চৌধুরীবাড়িরই অতিথি হয়ে।

সন্ধের পর গাড়ি। চৌধুরীমশাই নিজে বিকেলে গাড়ি নিয়ে আসবেন কথা দিয়েছেন আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে। মালপত্র নিয়ে যাওয়ার লোকের ব্যবস্থাও তিনি করবেন আশ্বাস দিয়েছেন। বেশিরভাগ মাল যাবে লগেজে। আমাদের সঙ্গে যাবে সামান্যই। কী-কী যাবে পঞ্চাশবার তাই গোনা হয়েছে। লোকজন বলতে মাত্র দুজন। চৌধুরীমশাইয়ের কথায় ফিরে-আসা গোবর্ধন আর দামু। তাদের দিয়ে মালপত্র বাঁধা-খোলা কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই। অবশ্য মোটা বকশিসও তাদের দেওয়া হয়েছে আগে থাকতে।

BanglaBook.org

সেইসঙ্গে তাদের সঙ্গে পরাশরের অত বকবকানি আমার ভালো লাগেনি। বিশেষ করে পরাশর অসাবধান হয়ে একটু আহাম্মকি করে ফেলেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

আমরা চলে যাচ্ছি এই কথাটাই সকলকে জানাবার। তার জায়গায় একবার কানে গেছে মুনিশ দুজনের সঙ্গে বকবক করতে-করতে পরাশর বলছে—তোদের কোনও ভাবনা নেই রে! যাচ্ছি বটে ওদের সকলকে জোর করে তুলে নিয়ে। কিন্তু এ-জায়গার মায়া ছেড়ে ক'দিন থাকতে পারবে! দিদিমণিরা ক'দিন বাদে ঠিক ফিরে আসবে দেখিস।

কিছুক্ষণ বাদে পরাশরকে আলাদা ডেকে শর্মিলা আর বিনতার সামনেই অভিযোগ করেছি—ওদের ওসব কথা বলার তোমার কী দরকার ছিল? এমনই আহাম্মকি করে আজ রাত্রের মধ্যে তুমি রহস্যের মীমাংসা করবে!

শর্মিলাও আমায় সমর্থন করেছে।

পরাশর মুখে যেন দোষীর মতো বলেছে—তাই তো! ওদের বেফাঁস কথাগুলো বলা উচিত হয়নি, না?

সেইসঙ্গে তার চোখের হাসিহাসি ভাবটা কিন্তু ভালো লাগেনি।

পরাশর অবশ্য জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছে—যাক, কোনও ভাবনা নেই। ওরা তো বিকেল হলেই চলে যাবে। তারপর আমরা কী করছি না-করছি জানবে কোথা থেকে? আমি বলে দিচ্ছি এ রহস্য-নাটকের আজই শেষ রজনী। মীমাংসা যা হওয়ার আজ হবেই!

পনেরো

মীমাংসা হয়েছে সত্যিই। কিন্তু তার আগে সকলের ভোগান্তি যা হয়েছে তা বড় কম নয়।

সে-দুর্ভোগ শুধু আমার কাছেই সৌভাগ্যের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্যভেদের যে-প্ল্যান হয়েছে তাতে ঠিক হয়েছে দুটি দলে ভাগ হয়ে সমস্ত রাত আমরা গোপনে দু-ধার থেকে গঙ্গার তীরের দিক ও পোড়ো গড়মহলের ওপর নজর রাখব। আমার সঙ্গে আছে বিনতা ও পরাশরের সঙ্গে শর্মিলা।

আমাদের ওপর ভার পড়েছে নিঃশব্দে ওই পোড়োবাড়ির কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে পাহারা দেওয়া।

পরাশর আর শর্মিলা গিয়েছে গঙ্গার দিকে।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, চৌধুরীমশাই তাঁর কথামতো আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে আসেননি। এমনকী গাড়িটা পাঠিয়ে দিতেও ভুলে গেছেন। একটু অদ্ভুত লাগলেও এ-ভুলের গভীর তাৎপর্য তখনও বুঝতে পারিনি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। একাদশী কি দ্বাদশী হবে, কারণ প্রায় সমস্ত রাতই অন্ধকার থাকবে, বলে দিয়েছে শর্মিলা পিসেমশাইয়ের পাঁজি দেখে।

রাত দশটা বাজবার পর নিঃশব্দে শুধু একটি করে টর্চ আর ছোট একটা করে লাঠি নিয়ে আমরা দু-দল জাঙালবাড়ি থেকে বেরিয়ে আলাদা-আলাদা পথ ধরেছি। বিনতার হাতে টর্চটা দিয়ে লাঠিটা অবশ্য রেখেছি নিজের কাছে।

বিনতা ও শর্মিলাকে সঙ্গে রাখবার ইচ্ছে অবশ্য পরাশরের প্রথমে ছিল না। ওরা দুজনে বাড়িতেই দরজা বন্ধ করে থাকবে, আর আমরা দুজনে দু-দিকে পাহারা দেব এই প্রস্তাবই সে করেছিল।

কিন্তু শর্মিলা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে-ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়েছে।

BanglaBook.org

বলেছে—এতদিন সব ধকল আমরাই সইলাম আর একরাত্রে পৌরুষ দেখিয়ে তোমরা আসল বাহাদুরিটুকু নেবে, সে হবে না। আমি অন্তত তোমাদের সঙ্গে থাকবই!

আর আমি একলা এই বাড়িতে থাকব নাকি!—বিনতা শঙ্কিত গলায় বলেছে—সে আমি পারব না।

দল ভাগাভাগি তারপর হয়ে গেছে। বিনতা যে আমার দলে পড়েছে তাও শর্মিলারই ব্যবস্থায়।

গঙ্গার দিকে পাহারায় থাকাটা শুধু বেশি জরুরি নয় বিপদের সম্ভাবনাও সেখানে থাকতে পারে।

পরাশর সেই ভারটা নিতে চাওয়ায় শর্মিলা আপত্তি করেনি। শুধু বলেছে, তাহলে তোমার সঙ্গেই আমায় থাকতে হবে।

কেন? আমায় ভরসা দিতে?—পরিহাস করেছে পরাশর।

তাই বা নয় কেন?—জবাব দিয়েছে শর্মিলা—তা ছাড়া তুমি যত বীরপুরুষই হও, এখানকার অন্ধিসন্ধি তো কিছু জানো না। কোথা দিয়ে ওরা আসে, কোনদিকে যায় আমি সঙ্গে না থাকলে বুঝবে কী করে? আমরা নদীর দিকে থাকব আর এরা পাথুরে পোলের কাছ থেকে গড়মহল আর পাথুরে পোল দু-দিকেই নজর রাখবে।

সেই ব্যবস্থা মতোই বিনতার সঙ্গে পাথুরে পোলের খানিক দূরে ক'টা খেজুরগাছের জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সত্যি গা-ছমছম করা রাত। চাঁদ না থাকলেও আকাশে তারার যেন ফুল ফুটেছে আর তার মৃদু আলোয় চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আবছাভাবে সবকিছু দেখাও যাচ্ছে।

সেই আবছাভাবটাই যেন আতঙ্ক-মাখানো রহস্যটা আরও গাঢ় করে তুলেছে।

গড়মহলের ধ্বংসস্তূপটা দিনেরবেলাতেই কেমন একটু ভুতুড়ে গোছের লেগেছিল। ঈষৎ তরল অন্ধকারে সেটা যেন একটা বিভীষিকার সঙ্কেত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি চুপ করেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

বহুদূরে গ্রামের কোনও একটা মন্দিরের কী পুজোর জানি না ঘন্টা-কাঁসরের ধ্বনি মাঝখানের তেপান্তর পার হয়ে ক্ষীণভাবে কানে বাজছিল।

সেটা থেমে যেতে নিস্তব্ধতাটা যেন বিরাট ঢাকনার মতো আমাদের ওপর নেমে এল।

ও কী!—বলে হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে শিউরে উঠে বিনতা আমার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

শিউরে আমিও উঠেছিলাম। তারপর অবশ্য লজ্জিত হয়ে হেসে ফেললাম।

আচমকা একটা হাওয়ার দমকে খেজুর গাছের পাতাগুলো দোলা খেয়ে মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটায় কিন্তু গা শিরশির করে উঠেছিল।

নিজের ভয় পাওয়াটা গোপন করে বিনতাকে একটু কৌতুকের স্বরে বললাম—ওটা কিছু নয়। খেজুরের পাতাগুলো হাওয়ায় নড়ছে। কিন্তু এখন ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোলেই ভালো হত মনে হচ্ছে নিশ্চয়!

মোটেই না!—দেখতে না পেলেও বিনতার ঠোঁট ওল্টানোটা যেন আমি অনুভব করলাম—ঘরে থাকলে ভয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

যাক! বাইরে অজ্ঞান হওয়ার তা হলে ভয় নেই!—হালকা আলাপটা চালিয়ে যেতে চাইলাম।

অজ্ঞান হলে তো আপনি আছেন!—বলে বিনতা একটু হাসল।

উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না।

চুপ!—বিনতা চাপা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল—দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখতে আমিও পেয়েছি। পোড়ো গড়মহলের পেছন দিকে একনিমেষের জন্যে একটা আলোর চমক। কেউ টর্চটা টিপেই যেন নিভিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

পরাশর আর শর্মিলাই টর্চটা জ্বেলেছে ভাবতে পারতাম। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তারা স্পষ্ট করে বলে গেছে যে, গড়মহলের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গঙ্গার চড়ার দিকেই তারা থাকবে। যদি কোনও কারণে এদিকে তারা আসতে বাধ্যও হয়ে থাকে তা হলেও টর্চ জ্বেলে সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হয়নি। সেরকম কোনও গুরুতর কারণ উপস্থিত হলে আমরা সজোরে শিস দিয়ে পরস্পরকে ডাকব এই কথাই আছে।

হঠাৎ এ-টর্চ তা হলে কার হাতে জ্বলে উঠতে পারে?

চাপা উত্তেজিত গলায় বিনতাকে জিজ্ঞেস করলাম—এই পাথুরে পোল দিয়ে ছাড়া জাঙালবাড়িতে তো অন্য রাস্তাতেও আসা যায়!

আসা তো যে কোনও দিক দিয়ে যায়। তবে গাড়ির রাস্তা এই একটাই।—বললে বিনতা—পুবদিকে তো গঙ্গার চড়া আগেই দেখেছেন, উত্তর-দক্ষিণেও শুনেছেন যে, এককালে বাঁওড় ছিল, এখন আধশুকনো জলা হয়ে আছে। পারতপক্ষে সেদিক দিয়ে কেউ আসে না।

যার না এলে নয় তেমন কেউই এসেছে মনে হচ্ছে। আসুন, ব্যাপারটা দেখতে হবে।

সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার বললাম—সাবধানে আসবেন কিন্তু। অন্ধকারে ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়।

বাঁ-কাঁধের স্পর্শটুকুর রোমাঞ্চ বুঝিয়ে দিলে বিনতা আমার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এসেছে।

কিছুদূর পর্যন্ত সমতল মাঠের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নেই যেতে পারলাম। গড়মহলের কাছাকাছি যেতেই অসুবিধে শুরু হল।

এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু জমি। এখানে সেখানে পোড়ো বাড়ির নানা ভাঙা চাঙড়া পড়ে আছে। জংলা কাঁটাগাছের ঝোপও হয়েছে অনেক জায়গায়।

টর্চ জ্বালবার উপায় নেই। অতি সাবধানে এইসব বাধা এড়িয়ে যখন গড়মহলের উত্তর দিকটায় পৌঁছোলাম তখন এতখানি কষ্ট করা বৃথাই হয়েছে মনে হল।

দৈত্যাকার গড়মহলের ধ্বংসস্তূপের দরুনই জায়গাটায় তারার আলোর ক্ষীণ দ্যুতিও নেই। সব যেন জমাট অন্ধকার।

এখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া নেহাৎ দৈব সহায় না হলে অসম্ভব।

সেই দৈবের সাহায্যই পাব ভাবতে পারিনি।

এদিক-ওদিক একটু খুঁজে আবার পাথুরে পোলের দিকেই ফিরে যাব ভাবছি, এমন সময় বিনতা আমার হাতটা চেপে ধরল।

তারপর কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করে উত্তেজিতভাবে বললে—বাঁ-দিকটায় চেয়ে দেখুন।

দেখলাম এবং দেখে অবাক হলাম। গড়মহলের একটা ধসে পড়া ছাদের ধার দিয়ে তারাভরা আকাশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

সেই তারাছিটোনো কালিবরণ আকাশের পশ্চাৎপটে একটি না দুটি যেন ছায়া দিয়ে গড়া মূর্তি দাঁড়িয়ে।

একজন বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান মনে হয় আকার দেখে। তার পাশে একটা ছোটছেলেই মনে হল।

মূর্তি দুটো কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিকেই এগিয়ে গেল।

যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে তাদের অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন, বাইরের তারাভরা আকাশের ফালিটুকু পেছনে থাকায় তাদের সামান্য যেটুকু দেখা গিয়েছিল গড়মহলের ভেতর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর গাঢ় অন্ধকারে তাও আর পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

কিছুটা আন্দাজে কিছুটা থেমে-থেমে পায়ের শব্দ ধরে খানিকদূর পর্যন্ত তবু কাছাকাছিই থাকতে পারলাম।

মূর্তি দুটো সম্বন্ধে অনেক ভাবনাই তখন মনের মধ্যে খেলে যাচ্ছে। ছোটছেলের মতো যাকে দেখেছি, ইঁদারার ধারে ও ঘরের মেঝেয় এরই কি পায়ের রক্তাক্ত ছাপ পড়েছিল?

অনুসরণের অসুবিধের দরুন এরা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে শিস দিয়ে পরাশর ও শর্মিলাকে ডাক দেব কি না যখন ভাবছি তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা আলগা ইটের চাপড়ার ওপর পা দিয়ে ফেলে অস্ফুট চিৎকার করে কাৎ হয়ে পড়ে যাবার আগেই বিনতাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম বটে কিন্তু তখন সামনের অন্ধকারই যেন বজ্রস্বরে হাঁক দিয়ে উঠল।

কে ওখানে? খবরদার! নড়লেই গুলি করব!

সেইসঙ্গে টর্চের জোরালো আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল আর তৎক্ষণাৎ অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনিও শুনলাম—এ কী! আপনারা!

টর্চ নিয়ে মূর্তি দুটি এগিয়ে আসবার পর তাদের দেখে আমরাও বিমূঢ়!

একজন চৌধুরীমশাই আর অন্যজন বক্সীবাবু।

দুজনেরই পরনে গাঢ় রঙের শার্ট-প্যান্ট। বক্সীবাবুর হাতে টর্চ আর চৌধুরীমশাইয়ের হাতে একটা পিস্তল। নেহাত বেঁটেখাটো বামন গোছের চেহারা বলেই বক্সীবাবুকে ছোটছেলে বলে ভুল হয়েছিল।

চৌধুরীমশাই কাছে এসে হেসে যা জিজ্ঞাসা করলেন, মনে-মনে আমি তাঁদের সম্বন্ধে তখন তারই জবাব খুঁজছি।

আপনারা এখানে কী করছেন?— হাসিমুখে হলেও একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরীমশাই।

এই আপনাদের ওপর নজর রাখছিলাম! —মুখ দিয়ে কথাটা যেন ফসকে বেরিয়ে গেল।

বেশ! বেশ! —চৌধুরীমশাই কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবে নেওয়ারই যেন ভান করে বললেন—পরস্পরের দিকে নজর রেখে আরও উপাদেয় কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় কি না দেখি আসুন।

নিরুপায় হয়ে তাঁর কথাই এবার মানতে হল।

আমি বিনতাকে নিয়ে তাঁদের পেছনে থাকবার চেষ্টা করলাম একবার। কিন্তু চৌধুরীমশাই একটু শক্ত গলাতেই বললেন—না, না, পেছনে নয়, আমাদের সামনে চলুন।

আদেশটার যেন কৈফিয়ত হিসেবেই বললেন সেইসঙ্গে—এখানে সামনে, পিছনে দু-দিকেই বিপদের সম্ভাবনা। তবু পিস্তলটা যখন আমার হাতে তখন আমি পেছনে থাকলেই আপনাদের অন্তত পাহারা হবে।

এই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়ে বিনতাকে নিয়ে তাঁদের আগে—আগে যেতে হল।

আমাদের হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর টর্চ জ্বালা সম্বন্ধে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর সাবধানতাটা একটু শিথিল হয়েছে দেখলাম।

গড়মহলের ধ্বংসস্তূপে পথ বলে কিছু নেই। এখানে ধসা ছাদ, ওখানে হেলা দেওয়াল কি থামের আশপাশ দিয়ে বড়-বড় ইট-পাথরের ঢিবি ডিঙিয়ে কোনওরকমে কখনও মাথা নুইয়ে, কখনও কাৎ হয়ে যেতে হচ্ছে।

মনে-মনে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর এ-রহস্যনাটকের ভূমিকা তখন আমি সঠিকভাবেই বুঝে ফেলেছি।

পরাশর ঠিকই অনুমান করেছিল। ভুতুড়ে ব্যাপার এতদিন যা ঘটেছে লোভই সে-রহস্যের মূলে আছে। এই ধ্বংসপুরীতে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পাওয়ার আশাতেই দুজনে শর্মিলা ও বিনতাকে

BanglaBook.org

এখান থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়েছেন। বাধা হিসাবে পিসেমশাইকে সরাবার ব্যবস্থা হয়েছে আগেই। তাঁকে একেবারে শেষই করে দেওয়া হয়েছে হয়তো। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোথাও অসহায়ভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

এঁদের সব শয়তানি আজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর আমাদের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা এঁরা করবেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। এই ধ্বংসপুরীর কোথাও আমাদের গুমখুন করে পুঁতে রাখলে যুগ-যুগান্তরেও তো কেউ তা জানতে পারবে না।

এখনি পেছন থেকে পিস্তল ধরে আমাদের সেইরকম কোনও গুপ্ত কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না কে জানে।

অসম্ভব জেনেও এঁদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার শেষ চেষ্টা তাই করতেই হবে।

একটু সময় নেওয়া ও এঁদের বর্তমান মতলবটা বোঝবার চেষ্টায় যেতে-যেতে গলাটা সহজ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনারা এলেন কোনদিক দিয়ে। পাথুরে পোল দিয়ে অন্তত আসেননি।

ও, সেইদিকেই আপনারা পাহারায় ছিলেন বুঝি! বক্সীবাবু কেমন বিশ্রীভাবে হাসলেন মনে হল, আপনাদের কথা ভাবিনি, তবে ওদিকে কারুর নজর থাকবে অনুমান করে মাঠ জলা ভেঙে আমাদের বেশ কষ্ট করেই আসতে হয়েছে।

কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? কী খুঁজছেন আপনারা? আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

সাপের গর্ত! বলে হাসতে গিয়ে হাসিটা যেন চৌধুরীমশাইয়ের গলায় আটকে গেল।

একটা ভাঙা দেওয়ালের হাঁ করা ফোকরের ভেতর দিয়ে পা বাড়িয়ে বক্সীবাবুর হাতের টর্চের আলোয় যা তখন দেখেছি তাতে আমরাও নিষ্পন্দ নির্বাক।

ঘরের রাবিশ ছড়ানো ভাঙা মেঝের ওপর একটি শীর্ণ গোছের মানুষ পড়ে আছে।

পিসেমশাই!—বলে বিনতার ব্যাকুল চিৎকারে তাঁর পরিচয় বুঝতে দেরি হয়নি।

সুযোগ বুঝে সেই মুহূর্তে আমি অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আমাদের পেছনে তখন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছেন।

আচমকা পেছনে ফিরে সজোরে ছোঁ মেরে চৌধুরীমশাইয়ের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে একলাফে অন্যদিকে সরে যেতে-যেতে আমি মুখের ভেতর বাঁ-হাতের ক'টা আঙুল ঢুকিয়ে প্রাণপণে শিষ দিলাম।

তারপর চিৎকার করে বললাম—আমার দিকে সরে এসো বিনতা। টর্চটা ধরে থাকো ওঁদের ওপর।

উত্তেজনার মাথায় আপনি থেকে যে বিনতাকে তুমি করে ফেলেছি সে-খেয়াল তখন নেই।

ওঁদের দুজনকেও সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান করে হুঙ্কার দিলাম—সাবধান! যেমন আছেন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন, নড়বার চেষ্টা করলেই বিপদ জানবেন।

বিনতা তখন আমার নির্দেশ মতো আমার কাছে সরে এসে তাঁদের ওপর টর্চ জ্বেলে ধরেছে।

তার আলোয় চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর হতভম্ব হওয়ার ভঙ্গিটা বেশ নিখুঁত মনে হল।

আমার দিকে যেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে তিনি বললেন—আপনি করছেন কী মশাই! পাগল হয়ে গেছেন নাকি! পিস্তলটা নামান, আপনার হাত যা কাঁপছে তাতে হঠাৎ গুলি ছুটে যেতে পারে।

পারেই তো!—তীব্রস্বরে বললাম—আর সেই বুঝেই নড়বার চেষ্টা করবেন না। পরাশর আর শর্মিলাদেবী এখুনি আসছেন। তাঁরা এলেই আপনাদের যা ব্যবস্থা করবার করছি।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই পরাশর আর শর্মিলা সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ব্যস্তভাবে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে আর যারা ঢুকল তাদের দেখেই আমি অবাক।

BanglaBook.org

পোশাক দেখেই বুঝলাম থানার দারোগাবাবু ও দুজন পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে আবার পিছমোড়া করে বাঁধা মুখে কালিঝুলি মাখা দুশমন গোছের একটা লোক।

বিনতা তাকে দেখে বলে উঠল—আরে! এ তো আমাদের সেই পুরনো পাহারাদার দশরথ! কাজ ছেড়ে যে পালিয়েছিল।

আমার কিন্তু তখন সেসব দিকে মন দেওয়ার সময় নেই।

উত্তেজিতভাবে বললাম—শোনো পরাশর, শুনুন দারোগাবাবু, সমস্ত চক্রান্তের মূল দুজন ওই সামনে দাঁড়িয়ে। চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবু! হাতেনাতে আজ ওঁদের ধরেছি!

পরাশর ও দারোগাবাবু দুজনেই এবার হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর দারোগাবাবু কেন বুঝলাম না হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন—তাই নাকি! কিন্তু আপনার হাতের পিস্তলটা এবার নামান। আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর ভাবনা নেই!

বাধ্য হয়েই পিস্তলটা তখন নামাতে হল।

পরাশর তখন যা করছে তা দেখেই আমার প্রায় চক্ষুস্থির।

চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে গিয়ে তাঁদের ডান হাত দুটো ধরে নাড়া দিয়ে সে বলছে—সকলের তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা দারোগাবাবুকে নিয়ে এভাবে সাহায্য করতে না এলে এ-রহস্যের মীমাংসা আজও হত না।

শর্মিলার কাণ্ড দেখে আরও আমি হতভম্ব।

কোথায় সেই তেজ আর বেপরোয়া সাহসের কঠিন ভঙ্গি। সে যেন হঠাৎ সলজ্জ সঙ্কুচিত গ্রামের মেয়ে হয়ে গেছে।

চৌধুরীমশাইয়ের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে লজ্জাজড়িত স্বরে তাকে বলতে শুনলাম—সম্পূর্ণ ভুল করে অন্যায়ভাবে আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম। আমায় মাপ করবেন।

মাপ অত সহজে হয় না। খেসারৎ না পেলে মাপ নেই।

হঠাৎ শর্মিলার হাত দুটো ধরে ফেলে চৌধুরীমশাইয়ের ওই মোটা রসিকতা মার্কা জবাব আর তাইতেই শর্মিলার সলজ্জ খুশির হাসি দেখে মাথাটাই তখন আমার ঘুরতে শুরু করছে।

দারোগাবাবুই এসব নাটকে যবনিকা ফেলে বললেন—আচ্ছা, আপনারা তা হলে এগোন, আমি এই দশরথ বাহাদুরকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমাকেও কি থানায় নিয়ে যাবেন?

পিসেমশাই ইতিমধ্যে যে মেঝের ওপর উঠে বসেছেন তা কেউ বোধহয় লক্ষ করেনি। তাঁর কাতর আক্ষেপ শুনে সেদিকে দৃষ্টি গেল।

দারোগাবাবু হেসে বললেন—না, আপনাকে আর থানায় নেব না। বুড়োবয়সে লোভের যে শাস্তি আপনি পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। আপনাকে স্ট্রেচারে করে বাড়িতে পাঠাবারই ব্যবস্থা করছি। এ-বয়সের ভাঙা পা আর বোধহয় জোড়া লাগবে না। শেষ ক'টা দিন তাই আপনার কাশীবাস করাই বোধহয় ভালো।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনও আমার কাছে ধাঁধার মতো। বিমূঢ়ভাবেই বিনতাকে নিয়ে পরাশর ও শর্মিলার পিছু-পিছু ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সমস্ত রহস্যটা তারপর পরাশরের কাছে শুনে বুঝেছি, পিসেমশাই সিংহরায়মশাই বুড়ো বয়সে গুপ্তধনের লোভে পড়েছিলেন বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের আলাপ শুনে। শর্মিলা আর বিনতাকে নিজেই ডেকে এনে জায়গা দিলেও তখন তিনি তাদের সরিয়ে দিয়ে গুপ্তধন একলা খোঁজবার জন্যে ব্যাকুল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের রাজি না করাতে পেরে পুরনো পাহারাদার দশরথের সাহায্যে তিনি শর্মিলাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার ফন্দি আঁটেন। আগে দশরথ যেন কাজ ছেড়ে চলে যায়, তারপর তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার ভান করেন সেইজন্যেই। দশরথের

BanglaBook.org

গাঁ গঙ্গার ওপারে। তারই ডিঙিতে তিনি প্রথম ওপারে তারই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তারপর রোজ রাত্রে তার ডিঙিতে আসতেন এপারে শর্মিলাদের ভয় দেখাতে। দশরথ যাওয়ার পর দামুকে তিনি কাজ দেন খুঁজে-পেতে। দামু দশরথেরই শাগরেদ এবং পিসেমশাইয়ের চর। শেষদিন ইচ্ছে করেই পরাশর তাকে আমাদের ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা শোনায় যাতে পিসেমশাই সেই রাত্রি থেকেই কাজ সারবার জন্যে ব্যস্ত হন। দশরথ অনেক টাকাকড়ির আশায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এ-পর্যন্ত তার কিছু না পেয়ে সে সিংহরায়মশাইয়ের ওপর খাপ্পা হয় ও ঝগড়ার মধ্যে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডিঙি করে ওপারে পালাবার চেষ্টা করে। দারোগাবাবু ও পরাশরের সতর্কতায় ধরা পড়ে সে সেইখানেই। পড়ে গিয়ে সিংহরায়মশাইয়ের তখন পা ভেঙে গেছে। আমরা সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখতে পাই।

পিসেমশাইয়ের ওপর সন্দেহটা পরাশরের মনে একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছিল। শর্মিলাদের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে তাঁর কয়েকটা ব্যবহার বেশ দুর্বোধ লেগেছিল প্রথম থেকেই। যেমন, নিজে থেকে শর্মিলাদের ডেকে এনে জায়গা দিয়ে হঠাৎ অপদেবতার ভয়ে ভীত হয়ে উঠে সেই অজুহাতে তাদের এখান থেকে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পাট তোলাবার চেষ্টা। যেদিন নিরুদ্দেশ হন ঠিক তার আগের দিনই বক্সীবাবু ও চৌধুরীমশাইকে গোপন কিছু জানাবার কথা দিয়ে পরের দিন সকালে চৌধুরীবাড়িতে অপেক্ষা করতে বলাও পিসেমশাইয়ের ধরনধারণের সঙ্গে যেন খাপ খায় না। সুতরাং হয় চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবু দুজনেই একসঙ্গে মিথ্যে বলেছেন ধরতে হয়, নয় বুঝতে হয় যে, বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের কথাটাই সত্যি আর পিসেমশাই কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কাজটা করেছেন।

পিসেমশাই মানুষটা কেমন সে-বিষয়েও নতুন কয়েকটা তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, তাঁর অদম্য থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশার কথা। আর তাইতে পরাশরের মনে হয়েছে যে, বুড়ো হতে চললেও প্রাণে তাঁর শখ এখনও যথেষ্ট। এ-ধরনের লোকের টাকার প্রতি বেশিরকম লোভ থাকতেই পারে। তা ছাড়া বর্মা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যিনি এসেছেন, গড়মহলে অবিশ্বাস্যরকম গুপ্তধন আছে বলে ইঙ্গিত পেয়ে আবার বড়লোক হওয়ার জন্যে লালায়িত হওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

তাঁর নিখোঁজ হওয়াটাও কেমন যেন বেশি সাজানো মনে হয়েছে। তাঁর ফন্দিটা বেশিরকম ফাঁস হয়ে গেছে অবশ্য দশানির স্পেশ্যাল বিড়ির দরুন। সেই বিড়ির টানই একদিক দিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। অন্য-অন্যবার ক'দিনের জন্যে বাইরে যেতে হলে বাড়তি বিড়ির বান্ডিল তিনি কিনে নিয়ে যান। এবার তা করেননি। কারণ, তাতে সন্দেহ জাগবার সম্ভাবনা। দশানির দোকানে খোঁজ করে জানা গেছে যে, পিসেমশাই নিরুদ্দেশ হবার আগে বাড়তি বিড়ির বান্ডিল কেনেননি, কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা খবরও জানা গেছে যা একটু আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। দোকানি গর্ব করে বলেছেন যে, সম্প্রতি হঠাৎ বাইরে থেকেও বিড়ির অর্ডার আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ বাইরের এই চাহিদা থেকেই পরাশরের সন্দেহ হয়েছে যে, বাইরের এ-অর্ডারের স্বয়ং পিসেমশাই ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসন। তা না হলে অর্থাৎ সত্যিই শয়তানি মতলবে কেউ তাঁকে গুম করে থাকলে তাঁর শখের বিড়ি তাঁকে খাওয়াতে এত ব্যস্ত হত না।

সমস্ত দিক দিয়ে বেশিরভাগ ঘটনা তার বিচারে যেন আঙুল তুলে পিসেমশাইকে নির্দেশ করেছে বলেই পরাশর অত জোর করে অবিলম্বে রহস্য-সমাধানের আশ্বাস দিতে পেরেছিল।

জাঙালবাড়ির রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। তারসঙ্গে আরও অনেক কিছু হয়েছে।

কার ভেতর যে কী থাকে, তা কে বলতে পারে? যা লোহার চেয়ে শক্ত মনে হয় তাও গলে যায় মোমের মতো। শর্মিলা অন্তত তাই গেল দেখলাম। সেই স্বাধীন, স্বাবলম্বী, জবরদস্ত, যুদ্ধং

BanglaBook.org

দেহি গোছের ভঙ্গির আড়ালে অমন একটি লতানে কোমল মেয়ে লুকিয়েছিল কে জানত? যাঁর বিরুদ্ধে বাইরে অত বিরাগ আর সন্দেহ, নিজের অগোচরে মনে-মনে শর্মিলা তাঁরই প্রতি একান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চৌধুরীমশাই নিজেও অবশ্য তাই। তবে তাঁরটা প্রকাশ্যে। সারাজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে কাটাবার প্রতিজ্ঞা তাঁর শর্মিলাকে প্রথম দেখার পরই টলমল করেছে। তারপর কয়েকদিন শর্মিলার সঙ্গ পেয়েই তা চুরমার হতে দেরি হয়নি। শর্মিলা ওখানেই আছে স্বেচ্ছায়, সানন্দে, চৌধুরীমশাইয়ের ঘর আলো করে। বিনতাকে বিয়ে করে আমি বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে গেছি। মুখে কিছু না বলুক পরাশর মনে-মনে বোধহয় একটু আহত হয়েছে। বিনতার প্রতি দুর্বলতার কথা নিজেই সে একসময়ে আমার কাছে স্বীকার করেছিল।

বিবরণটা পড়ে ফেলে কাগজের এতদিনের নিয়মটা না ভেঙে পারলাম না। পুজোসংখ্যায় এ-ধরনের বড় লেখা দেওয়া আমার কাগজের দস্তুর নয়। এ-লেখাটা কিন্তু ছাড়তে না পেরে তখুনি পাঠিয়ে দিলাম কম্পোজ করতে।

কম্পোজ হওয়া মেক-আপ প্রুফটা নিজেই দিয়ে এলাম পরাশরকে দেখবার জন্যে।

পরের দিনই বাড়িতে এসে পরাশর আমাকে এই মারে তো সেই মারে।

কীসব আবোল-তাবোল ছেপেছ আমার নামে? —গনগনে গলায় সে জানতে চাইলে।

কেন তোমার প্রথম গোয়েন্দাগিরির গল্পই তো ছাপছি! —অবাক হয়ে বললাম।

আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি! —পরাশর বলে উঠল—সব মিথ্যে, বানানো গল্প। আমার জ্যাঠা, কাকা, পিসি, মাসি কেউ নেই। আমার বাবা ছিলেন বংশের একমাত্র সন্তান! আমিও তাঁর সবেধন নীলমণি ছেলে। আমার মা-ও ছিলেন বাপ-মার একমাত্র মেয়ে। তা ছাড়া ঢাকায় আমি কখনও পড়িনি, পড়েছি গৌহাটি আর লক্ষ্ণৌতে। রাঙামাটিতে কোনও জন্মে আমি কখনও যাইনি। খবর নিয়ে জানলাম, সে-জায়গার একটু-আধটু সঠিক খবরের সঙ্গে আগাগোড়া কল্পনার ভেজাল দিয়ে ওই জাঙালবাড়ির ব্যাপার সাজানো হয়েছে।

তা হলে এখন উপায়! —আমি একেবারে অকূল পাথারে পড়ে বললাম—তোমার সম্বন্ধে লেখা বেরুবে বলে আমি বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছি। তোমার সম্বন্ধে না হলে তোমার নামে একটা লেখা অন্তত চাই। তুমি তাহলে একটা কবিতাই দাও। ছেপে মুখরক্ষা করি।

বেছে নাও। —পরাশর টেবিলের ওপর মোটা বাঁধানো খাতাটা রাখলে।

একটু চমকে তার মুখের দিকে তাকালাম। আগে থেকেই সব আঁচ করে সে কি তৈরি হয়ে এসেছিল?

BanglaBook.org

উদাসীবাবার আখড়া

BanglaBook.org

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ক ৪ উ ৮২

এক

কলকাতা থেকে মাইলসাতেক দূরে, জায়গাটার নাম করতে আমি চাই না, বহুদিন থেকে একটা বিরাট জলা জায়গা পড়েছিল। কিন্তু, কলকাতার জমির দরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই জলা মাঠের মধ্যে দেখতে-দেখতে এক-আধখানা বাড়ি গড়ে উঠতে লাগল। দেখতে-দেখতে বছর খানেকের মধ্যে সেখানে একটা সুন্দর 'কলোনি' গড়ে উঠল।

সেই কলোনির একধারে কখন যে নিঃশব্দে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর গড়ে উঠেছিল তা কারুরই নজরে পড়েনি। দেখতে-দেখতে ছিটেবেড়ার আড়ালে একটির জায়গায় আরও দুটি কুঁড়েঘর পাশাপাশি গড়ে উঠল। গাছের শুকনো ডাল আর পাতা দিয়ে বেড়াটা ঘেরা হল। ঘেরার ভেতরে অনেকখানি খালি জায়গা। সেই খালি জায়গাটার সামনে তিনটি সামান্য কুঁড়েঘর।

দেখতে-দেখতে সেই বেড়াকে জড়িয়ে নানারকমের ফুলন্ত বুনোলতা গজিয়ে উঠল। খালি উঠোনটার মাঝখানে একটা সুন্দর তুলসী-মঞ্চ তৈরি হল। সন্ধ্যা হলেই একদল একবস্ত্র সন্ন্যাসী সেইখানে একত্র বসে আপনার মনে নাম-গান করে। সেই নিস্তব্ধ পল্লী—সন্ধ্যার মুখে তাদের নাম-গানে মুখরিত হয়ে উঠত। এতদিন যাদের প্রতি কারুরই দৃষ্টি পড়েনি, ক্রমশ সেই নিয়মিত সান্ধ্যভজনার শব্দে সকলের দৃষ্টি তাদের ওপর গিয়ে পড়ল।

কেউ বললে, ভণ্ডের দল। কেউ বললে, বোষ্টমের আখড়া। কেউ-কেউ বললে, সাধু-বেশে চোরেদের আড্ডা। কেউ-কেউ বললে, হতেও-বা পারে, সাধু-সন্ন্যাসী!

কিন্তু সেই ছিটেবেড়ার আড়ালে, সেই তিনখানি কুঁড়েঘরে যারা থাকত, তাদের ব্যবহারে কলোনির লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে বলবার কোনও কিছুই পেল না। তারা তাদের সেই বেড়ার বাইরে বড় একটা কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করত না। তবে প্রতি রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সেই খালি জায়গাটা ভিখিরিতে ভরে যেত, বাইরে থেকে দেখা যেত, মাটির বড়-বড় হাঁড়ি করে একবস্ত্র সেই সাধুর দল শালপাতায় খিচুড়ি পরিবেশন করছে। তৃপ্ত ভিখিরির দল খাওয়া সেরে, জয়—উদাসীবাবার জয়। বলে দলে-দলে বিদায় হত, আবার দলে-দলে আসত।

পাড়ার লোকেরা জানল, সেই আশ্রমের যিনি কর্তা, তাঁর নাম উদাসীবাবা, আর আশ্রমে যারা আছে তারা সব তাঁরই চেলা।

ক্রমশ-ক্রমশ রবিবার দিন কিংবা অন্য কোনও ছুটির দিনে শহর থেকে দু-একজন করে ভদ্রলোক সেই ছিটেবেড়া পেরিয়ে উঠোনে দেখা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার নাম-গানের আসর ক্রমশ বেশ জেঁকে উঠল এবং আরও কিছুদিন গেলে সেই সামান্য পর্ণকুটিরের দ্বারে দু-একখানা করে মোটরগাড়িও দাঁড়াতে আরম্ভ করল।

পাড়ার লোকেরা বুঝল, উদাসীবাবার ভক্তের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে এবং কানাকানি থেকে এ-কথা ক্রমশ জানাজানি হয়ে গেল যে, উদাসীবাবার ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলকাতা শহরের কোনও-কোনও বড় অধ্যাপক, উকিল এবং ব্যারিস্টারও আছেন। সুতরাং উদাসীবাবা এবং তাঁর চেলাদের আর উপেক্ষা করা চলে না। ক্রমশ পাড়ার লোকেরাও একে-একে সেই ছিটেবেড়া-ঘেরা উঠোনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন। যাঁরা প্রবেশ করে প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন তাঁরা ফিরে এসে উদাসীবাবার গুণগানই করলেন এবং তার ফলে সেই নবগঠিত কলোনির ঘরে-ঘরে ক্রমশ উদাসীবাবার নাম এবং সেইসঙ্গে কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল।

আমাদের বাঙালি জাতির স্বভাবই এইরকম যে, যাকে আমরা দেখতে পারি না, তাকে বিনা বিচারে চোর বলতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না, আর যাকে আমাদের ভালো লেগে গেল, তাকে নিঃসঙ্কোচে দেবতা বলতেও আমাদের একমুহূর্ত দেরি লাগে না। দেখতে-দেখতে উদাসীবাবা পাড়ার লোকদের কাছে দেবতা হয়ে উঠলেন।

BanglaBook.org

তবে এক্ষেত্রে পাড়ার লোকেরা যে উদাসীবাবাকে বিনা বিচারেই একেবারে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে লাগল, ঠিক তা নয়। দিনের পর দিন তাঁর অসাধারণ শক্তির আভাস-ইঙ্গিত যা পাড়ার লোকের চোখে পড়তে লাগল, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে বিমুখ থাকা যায় না।

ধর্ম-ব্যাপারে তাঁরা যে কোন সম্প্রদায়ের লোক, তা কেউ কিন্তু জানত না। কৌতূহলী হয়ে যারা উদাসীবাবাকে এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করত, তারাও কোনও স্পষ্ট জবাব পেত না। তিনি হেসে বলতেন, সকল পথের পথিক আমি, আমার কোনও আলাদা পথ নেই। সব পথই আমার পথ।

কী যে তাঁর ধর্মমত, তাও পাড়ার লোকেরা জানতে চেষ্টা করে জানতে পারেনি। তবে পাড়ার লোকেরা একটা বিষয় বুঝেছিল যে, তিনি সহজে, সাধারণ গুরুর মতন কাউকে দীক্ষা দিতেন না। তাঁর যে কয়েকজন ভক্ত তাঁর সঙ্গে সেই আশ্রমে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, তারাই নাকি কিছুকাল পরে, অর্থাৎ তাদের শিক্ষানবিশীর কাল সম্পূর্ণ হলে, দীক্ষা পাবে। এখনও তারা দীক্ষা পায়নি অথবা দীক্ষা পেয়েছে তার খবর বাইরের কোনও লোক জানত না। বিশেষ করে, তাঁর চেলাদের কাছ থেকে কোনও কিছু জানবার উপায় কারুর ছিল না, কারণ উদাসীবাবার নির্দেশ অনুসারে তারা সকলেই মৌনী। অন্তত, বাইরের লোকজন যখন থাকত, তখন তাদের কাউকেই কথা বলতে কেউ দেখেনি। বিশেষ প্রয়োজন হলে তারা ইঙ্গিতেই কাজ সারত এবং বাইরের কোনও লোকজন এলে তারা মৌনভাবেই তাঁদের অভ্যর্থনা করত। একমাত্র নাম-গানের সময়, বাইরের লোকেরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারত যে, আর যা-ই হোক তারা বোবা নয়।

ক্রমশ একজন-দুজন করে পাড়ার লোকেরাও উদাসীবাবার আখড়ায় যোগদান করতে লাগল। দেখতে-দেখতে শহরের প্রান্তদেশে সেই পরিত্যক্ত জলাভূমিতে সেই নবগঠিত কলোনির সঙ্গে-সঙ্গেই উদাসীবাবার আখড়াও বেশ জমজমাট হয়ে উঠল।

দুই

এইসময়ে বিশেষ একটি ব্যাপারে উদাসীবাবার নাম ও খ্যাতি সহসা বিশেষভাবে বেড়ে গেল।

কিছুদিন থেকে তাঁর আশ্রমে কলকাতা থেকে এক বিশেষ ধনী আসা-যাওয়া করছিলেন। লোকমুখে উদাসীবাবার গুণের কথা শুনে তিনি তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু উদাসীবাবা কিছুতেই তাঁর কাছে ধরা দিতে চান না। তাঁর যে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা তিনি স্বীকার করতে চান না। অথচ স্পষ্টত যে অস্বীকার করেন তাও নয়। বিশেষ পীড়াপীড়ি করে ধরলে তিনি শুধু হেসে বলতেন, দৈবী ক্ষমতা থাকা না-থাকা, সেসব তাঁরই দয়া! সকলেই কি তাঁর দয়া পেতে পারে?

বিশেষভাবে এই ব্যাপারে তাঁকে দুজন খুব ধরে বসল। একজন হলেন কলকাতার সেই ধনী ভদ্রলোকটি, দ্বিতীয়জন হলেন, সেই কলোনির যিনি মাথা—কপিলেশ্বরবাবু। কপিলেশ্বরবাবু রেলের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে বড়বাবু ছিলেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোটা টাকা নিয়ে তিনি এখন 'রিটায়ার্ড' হয়েছেন। তিনিই এই কলোনিতে প্রথম মাটি খুঁড়ে বাড়ি তোলেন, সেইজন্য পথ-প্রদর্শকের প্রাপ্য খাতির সকলেই তাঁকে দেয়। চাকরিতে থাকতে-থাকতেই তাঁর দুই ছেলে এবং জামাইকে অফিসে বসিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই এখন পরম নিশ্চিন্ত মনে, তাঁর আজীবনের সাধ দুটি বিষয়ে ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলেন। একটি হল—জ্যোতিষ, আর একটি—প্রেততত্ত্ব।

এখানে কলকাতা থেকে আগত ধনী ব্যক্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। তাঁর নাম হল—নিবারণচন্দ্র দালাল। পাটের কারবার করে একদা প্রভূত অর্থ তিনি করেছিলেন, কিন্তু ইদানীং কয়েক বৎসর হল, বাজার মন্দা যাওয়ার দরুন অর্থাগম তেমন সুবিধামতো আর হচ্ছিল না। লেখাপড়া বিশেষ কিছু তিনি জানেন না, কিন্তু সে-কথাটা তিনি প্রাণপণে গোপন রাখবারই চেষ্টা করেন। ইংরেজি

সইটা তিনি নকল করে-করে একরকম 'মুখস্থ' করে ফেলেছিলেন, তার বেশি ইংরেজি লেখা তাঁর হাত থেকে বড়-একটা কেউ দেখেনি। সম্প্রতি তিনি একটি পাহাড়ে জায়গা কিনেছেন, সেখানে 'মাইকা' থাকার সম্ভাবনা। তাঁর প্রায় সমস্ত টাকাই তাতে ফেলেছেন এবং একজন শিক্ষিত ব্যারিস্টার তাঁর পার্টনার হতে সম্মত হয়েছেন। এ-ব্যাপারটা তাঁর দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেউই জানে না এবং নতুন সঙ্গীর সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসায়ে হাত দিতে তাঁর মনে বড়ই শঙ্কা হচ্ছিল। বিশেষ করে, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেদের তিনি মনে-মনে বড়ই ভয় করতেন। এই সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎ ফলাফল জানবার জন্যই তিনি উদাসীবাবার শরণাপন্ন হয়েছেন। উদাসীবাবাকে তিনি কোনও কথাই প্রকাশ করে বলেননি, কারণ, তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান, সত্য-সত্যই সাধুর দৈবশক্তি কতখানি।

কিন্তু উদাসীবাবা দিনের পর দিন তাঁকে শুধু এড়িয়ে চলেন। হাত-দেখা বা ভবিষ্যৎ-বিচারের কথা উঠলেই উদাসীবাবা একান্ত বিনয়ের সঙ্গে সে-প্রসঙ্গ বাদ দেন।

নিবারণবাবু প্রত্যেকদিন যাওয়ার সময়ে একটি করে গিনি প্রণামী দেন, কিন্তু উদাসীবাবা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করেন না। একান্ত আহত হয়ে তিনি বলেন, আমার কাছে যখন আসবেন, অনুগ্রহ করে শুধুহাতেই আসবেন। আমি ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করি না।

লজ্জিত হয়ে নিবারণবাবু গিনিটি তুলে নেন। কিন্তু সেইসঙ্গে উদাসীবাবার ধার্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে।

অবশেষে একদিন উদাসীবাবা ধরা দিলেন। ঘরে শুধু নিবারণবাবু আর কপিলেশ্বরবাবু ছিলেন। ভেতর থেকে তিনি ঘরের খিল বন্ধ করে দিলেন। বাবার দয়া হয়েছে মনে করে নিবারণবাবুর অন্তর আনন্দে দুলে উঠল। উদাসীবাবা নীরবে তাঁর আসনে বসে, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালালেন। সেই প্রদীপের সামনে এক আসনে নিবারণবাবুকে বসতে দিলেন।

কপিলেশ্বরবাবু নিবারণবাবুর হাত ধরে বললেন, সত্যিই নিবারণবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক!

প্রসন্ন হাসি হেসে নিরারণবাবু উদাসীবাবার দিকে চেয়ে বললেন, বাবার দয়া কি আপনার ওপর নেই, তা আপনি বলতে পারেন?

কপিলেশ্বরবাবুর বুক থেকে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

নিবারণবাবুকে আসনে বসতে বলে, উদাসীবাবা আদেশ করলেন, আচ্ছা, আপনি কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে থাকুন আর ভাবতে চেষ্টা করুন, আপনার কপালের মাঝখানে আর-একটা চোখ আছে!

নিবারণবাবু চোখ বুজে বসলেন, কপিলেশ্বরবাবু নিশ্বাস আটকে ঘরের এককোণে চুপটি করে বসে দেখতে লাগলেন। উদাসীবাবা ধ্যানে বসলেন। তারপর ধ্যানস্থ-অবস্থায় নিবারণবাবুকে একবার স্পর্শ করলেন। সে-স্পর্শে নিবারণবাবুর চোখ খুলে গেল। তিনি আবার চোখ বুঁজে বসবেন কি না, এই ভাবছেন, এমন সময় উদাসীবাবা বললেন, আর প্রয়োজন নেই। এখন বলুন, আপনার কী জানবার দরকার!

নিবারণবাবু অনেক সাধু-সন্ন্যাসী জীবনে ঘেঁটেছেন, তাই তিনি একটু পরীক্ষা না করে, কোনও কথাই প্রকাশ করতে রাজি নন। তাই প্রশ্ন করতে গিয়ে একটু ইতস্তত করছিলেন।

উদাসীবাবা তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে নিজেই শুরু করলেন, আমাকে যাচাই করে নিতে চাস, না? তা ভালো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, গুরুকেও বাজিয়ে নিবি! কাল সকালে যে কাণ্ডটা ঘটেছে, তার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে?

নিবারণবাবু চমকে উঠে সোজা উদাসীবাবার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, তোর ভয় নেই, ছেলেটা মারা যাবে না। হাসপাতাল থেকে সেরে উঠে বাড়ি যাবে।

কপিলেশ্বর বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার নিবারণবাবু?

BanglaBook.org

উদাসীবাবা অর্ধনিমীলিত চোখে বললেন, নিবারণের বদলে আমিই বলছি...কাল নিবারণ একটা কুলি-কামিনের ছেলেকে মোটর চাপা দিয়েছে।

নিবারণবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, আপনি, আপনি কী করে জানলেন? সত্যি কাল এ-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে...বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

—কিছু ভয় নেই...ছেলেটা সেরে উঠবে...তুমি ইত্যবসরে তার মাকে কিছু টাকা দিয়ে দাও...। তবে...দেখি হাতখানা?

এই বলে তিনি নিবারণবাবুর হাতটা একটু টেনে নিয়ে কী দেখলেন, তারপর ঘাড় তুলে বললেন, তুমি মনে-মনে যে বাসনা ঠিক করে রেখেছ...।

নিবারণবাবুর মুখ শুকিয়ে এল...কপিলেশ্বরবাবু আপনার অজ্ঞাতে কোণ থেকে এগিয়ে এলেন।

—সেটা আমার কথামতো বন্ধ দেওয়া উচিত।

—আপনি কোন বিষয়ে বলছেন?

—তোমার ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় নয়। তা ছাড়া আর একটা বিশেষ গোপন জিনিস তোমার মনকে ইদানীং তোলপাড় করছে, না?

—গুরুদেব! বলে কাতরভাবে নিবারণবাবু উদাসীবাবার পা জড়িয়ে ধরলেন।

উদাসীবাবা শান্তকণ্ঠে বললেন, কপিলেশ্বরবাবু আমাদের আপনার লোক, তাঁর কাছে লজ্জা করে লাভ নেই...তুমি এই বয়সে বিয়ে করবার যে-সঙ্কল্প করেছ, সেটা পরিত্যাগ করো!

কপিলেশ্বরবাবু নিবারণবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ ভায়া, সত্যি নাকি!

শুধু অস্ফুটস্বরে নিবারণবাবু বললেন, সত্যি!

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির জন্যে...।

নিবারণবাবু আর তাঁকে বলতে দিলেন না, দোহাই বাবা! আমি বুঝেছি, আর বলতে হবে না...আমার অপরাধ হয়েছিল, আপনার মতো দৈবজ্ঞ লোককে আমি মনে-মনে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম...আমার অপরাধ নেবেন না।

এই বলে নিবারণবাবু উদাসীবাবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন।

তিনি হাত ধরে তাঁকে তুলে বললেন, তার জন্যে তোমাকে কিছুই লজ্জিত হতে হবে না...আজকে আমাদের দেশে ধর্মের নামে যেরকম ভাবে ব্যবসা চলছে, তাতে পরীক্ষা না করে মানুষকে গ্রহণ করাই উচিত নয়। হ্যাঁ, এখন আসল কথা, তুমি যা জানতে চাও...আমিই বলি...কেমন?

নিবারণবাবুর সমস্ত দেহে তখন আনন্দের শিহরন বইছিল...যেন কলম্বাস নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেল...যেন খ্যাপা পাথর বাছতে-বাছতে পরশমণির সন্ধান পেল...।

—তুমি নতুন যে পাহাড়টা কিনেছ, তা নিয়ে তুমি মিঃ দত্তের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে চলেছ...আমার কাছে জানতে চাও, তা তোমার পক্ষে ভালো হবে, না, মন্দ হবে, এই তো?

নিবারণবাবু যেন সহসা বোবা হয়ে গেলেন...এ-খবর...মিঃ দত্ত...পার্টনারশিপ...এই আশ্রমে বসে-বসে তিনি জানলেন কী করে? তিনি যে কোথায় থাকেন, তা পর্যন্ত কোনওদিন তিনি উদাসীবাবাকে বলেননি! ধন্য! ধন্য!

আনন্দে নিবারণবাবুর মুখ থেকে আর কথা বেরুচ্ছিল না। আনন্দ-গদগদকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, বাবা, আমি জানতাম...আমি জানতাম...তাই আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেও আমি আপনাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

কপিলেশ্বরবাবুর মুখে কথা ছিল না। তাঁর শুধু দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

সহসা [illegible] দত্ত [illegible] উদাসীবাবা আবার ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তিনি বললেন, নিবারণ, এ-কাজে তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আমি দেখছি, বহু বিঘ্ন আছে। তোমাকে বিঘ্ননাশক কিছু ধারণ করতে হবে।

BanglaBook.org

—বলুন, আপনি যা বলবেন, তা-ই করব...যত খরচ লাগে...।

উদাসীবাবা বাধা দিয়ে বললেন, খরচের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই...সে-জিনিস আমার কাছে নেই।

শেষের কথাগুলো শুনে নিবারণবাবু প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো হলেন।

—তা আমি শুনছি না বাবা! যত টাকা লাগে, আপনাকে তা জোগাড় করে দিতে হবে!

—আমি বলি শোনো, এ কিন্তু খুব গুহ্য কথা। তোমরা দুজনেই শুধু জানবে। হিমালয় থেকে মৌনীবাবার প্রতিনিধি হয়ে দুজন সাধু এখন ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা এসেছেন অর্থ-সংগ্রহের জন্যে...মানস-সরোবরের ধারে এক বিরাট মন্দির হবে এবং সেখানে এই কলিকালে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে। এ-সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। সেই সাধুর একজন এখন কাছাকাছিই আছেন, তাঁর কাছে একটি শিকড় আছে, তাঁকে সন্তুষ্ট করে যদি সেই শিকড়টি আনতে পারো...।

—কিন্তু কীভাবে তাঁর দর্শন পাব? আর তিনি আমার সঙ্গে কথাই-বা বলবেন কেন?

—তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি!

এই বলে তিনি উঠে একটা তামার আংটি নিয়ে এলেন। আংটির গায়ে বিচিত্র দাগ কাটা।

—এই আংটিটি তাঁকে দেখালেই তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু কোনও কথা তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, এ-প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে। তিনি কোনও টাকা চাইবেন না, তোমার যা দেবার তা একটা থলিতে করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে শুধু বলবে, প্রভু, বিঘ্নবিনাশী-শিকড়ের জন্যে আমি এসেছি।

—কিন্তু কী অর্থ তাঁকে দেব?

—আজ তোমার বাড়িতে নেমে প্রথম যে সংখ্যা তোমার চোখে পড়বে, সেই সংখ্যার টাকা তাঁকে দিতে হবে! যদি ১ দেখ, একটাকাই দেবে!

—বাবা, সত্যি আপনার দয়ার অন্ত নেই—আমি কী করে আপনার ঋণ শোধ করব? কিন্তু, কোথায় তাঁর দর্শন পাবো?

—তুমি দেবতা সাক্ষী করে এ-সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখতে সম্মত আছ তো?

—আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি...।

—সামনেই অমাবস্যা। তুমি সন্ধ্যার পর হুগলির বাঁধাঘাট ধরে কিছুদূর এগুলেই দেখতে পাবে, এক বৃহৎ বটগাছের তলায় গঙ্গার ধারে তিনি বসে আছেন। তাঁর মাথায় অসংখ্য জটা, জটাগুলো ছড়িয়ে তাঁর কোলের ওপর পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে এই আংটি দেখালেই তিনি তোমাকে বসতে বলবেন।

আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে নিবারণবাবু এবং কপিলেশ্বরবাবু সেদিন গভীর রাত্রিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরলেন। সেই দুটি লোক সেদিন এই মনে করে যে-যাঁর বাড়ি ফিরলেন যে, জগতে তাঁদের দুজনের মতো সৌভাগ্যশালী লোক আর নেই নইলে এতবড় শক্তিমান সাধুর দর্শন...দর্শন শুধু নয়, তাঁর কৃপা কি সহজে মেলে?

তাঁরা চলে গেলে একজন শিষ্য সদরের দরজা ভেতর থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে এল।

উদাসীবাবা শিষ্যদের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন, ঘটি, সব ঠিক আছে তো?

ঘটি নামধারী ব্যক্তিটি উত্তর দিল, হ্যাঁ কত্তা।

উদাসীবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কত লিখে রেখে এসেছিস?

—আপনি যা বলে দিয়েছিলেন, একের পিঠে তিনটে শূন্য।

BanglaBook.org

—তোর যেমন কাণ্ড, সেবার একটা বড় মক্কেল তোর বোকামিতে হাতছাড়া হয়ে গেল!

—সাদা গেটের গায়ে লাল খড়িতে বড় করে একহাজার লিখে রেখে এসেছি।

—বেশ। ঘণ্টা, তুমি অমাবস্যার দিন বেশ ভালো 'মেক্‌আপ' করে হুগলির ঘাটে গিয়ে বসবে...বাজে কোনও প্রশ্ন করলে, কোনও উত্তর দেবে না। চলে গেলে, ঘাটে নেমে সামনেই নৌকো থাকবে, সেই নৌকোতে চলে আসবে।

ঘণ্টেশ্বর ওরফে ঘটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

উদাসীবাবা আর-একজনকে ডেকে বললেন, পচা, কাল যে-লোকটা এসেছিল তার মোটর-নম্বর টুকে রেখেছিস তো?

—আজ্ঞে—হ্যাঁ।

—নম্বারের ইন্‌ডেক্‌স্‌ওয়ালা মোটর-গাইডটা থেকে তার নাম-ঠিকানা সমস্ত বার করেছ তো?

—ওই নম্বরের গাড়ির যে মালিক, তার নামের সঙ্গে ওর নাম তো মিলছে না! বোধহয় গাড়ি ওর নিজের নয়, চেয়ে নিয়ে চড়ে এসেছিল!

—তবে বাদ দাও। হ্যাঁ, ঘটি, তুমি কিন্তু নিবারণবাবুর পিছু ছেড়ো না! ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে! তুমি যে এত শিগগির-শিগগির ওর সম্বন্ধে information জোগাড় করতে পারবে, তা আশা করিনি। ওর নামে একটা আলাদা ফাইল করেছ তো? সব detail লিখে-লিখে যাবে... memory-র ওপর কিছু ফেলে রাখবে না...আমার এতদিনের সাধনার ফলে আমি এই ব্যবসায়কে এক proper scientific basis-এ এনেছি...দেখবে, পাঁচবছরের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই লক্ষপতি হয়ে গিয়েছি...science আর psychology...ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে, টাকা মারে কে? কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি...সেই তিনটে খুনের ব্যাপারের জন্যে পুলিশ এখনও আমার সন্ধানে ঘুরছে...আমার plan-এর next step হচ্ছে, পুলিশের দু-একজন বড়-বড় কর্তাকে আমাদের আশ্রমে এনে ফেলা। যারা young officer তাদের পারবে না, যাদের একটু বয়স হয়েছে, পেছনের জীবনের জন্যে যাদের মনে একটু অনুতাপ হয়েছে এমন লোক বেছে-বেছে আনতে হবে। তারজন্যে তুমি এখন থেকে শুধু Informarion সংগ্রহ করতে থাকো। এখন তুমি বিশ্রাম করোগে...হ্যাঁ, নতুন যে-লোকটা এসেছে, তাকে একবার ডেকে দিয়ে যাও!

ঘটি আশ্রমের ভেতর থেকে অনুসন্ধান করে খবর দিল যে, শিবু নেই। উদাসীবাবার বিনা অনুমতিতে শিবু মাঝে-মাঝে রাত্রিতে অনুপস্থিত হত। উদাসীবাবার বিশেষ নিষেধ ছিল যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই আশ্রমের বার হবে না—শিবুর এই অবাধ্যতায় তিনি মনে-মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু একবার তিনি এই আশ্রমের অন্তরঙ্গমহলে স্থান দিয়েছেন, এখন তাকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। নতুন লোকটির আসল কী নাম ছিল তা জানবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আখড়ায় তার নাম হয়েছিল—শিবু।

আজ প্রায় ছ-মাস হল সে এই দলে যোগদান করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উদাসীবাবা তাকে আসল মন্ত্রে দীক্ষা দেননি। সেইজন্য তিনি ইদানীং লক্ষ করছিলেন যে, শিবু আর যেন ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। তাই তিনি স্থির করলেন, তাকে আর বসিয়ে না রেখে এবার কাজে দেবেন।

এমনসময় বাইরে অন্ধকারে খুট করে আওয়াজ হল।

উদাসীবাবা ডাকলেন, শিবু!

শিবু কাঁপতে-কাঁপতে উদাসীবাবার সামনে এসে দাঁড়াল। আজ ছ-মাস ধরে এই আখড়ায় থেকে সে বুঝেছিল, উদাসীবাবা ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নেই! সে নিজে চোখের সামনে দেখেছে, তারই মতন একজন অবাধ্য লোককে তিনি রাতারাতি নিজের হাতে কেটে ফেলে এই আখড়ার মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন। কিন্তু তার আজীবনের অভ্যেস চুরি করা, বসে থাকতে-থাকতে সে

BanglaBook.org

যেন ক্ষেপে উঠত আর সেই সময় বেরিয়ে গিয়ে এই কলোনির গেরস্তবাড়ি থেকে যা পারত তাই সরাত।

উদাসীবাবার সামনে আসতে তিনি আপাদমস্তক একবার শিবুকে দেখে নিলেন। সে-দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে এল।

চাপা অথচ গম্ভীরকণ্ঠে উদাসীবাবা বললেন, বসো।

শিবু যন্ত্রচালিতের মতো বসল।

—তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?

—হ্যাঁ ঠাকুর!

—আমার অবাধ্য হলে তোমার কী পরিণাম হবে, জানো?

—জানি প্রভু!

—বারবার তোমাকে বলেছি, সামান্য একটি ঘটি, কি খানকতক থালা চুরি করবার জন্যে আমি এই বিরাট আয়োজন করিনি! তোমাদের বারবার বলেছি, তোমাদের প্রত্যেককে দিয়েই আমি বড়-বড় কাজ করিয়ে নেব...পুলিশের বাবার সাধ্য থাকবে না যে, তোমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়! কিন্তু আমার কথা না শুনে যদি এখনও এমনি ছিঁচকে চুরি করবার প্রবৃত্তি তোমার থাকে, তবে সেদিন দীক্ষা নেবার সময় মাকালীর খাঁড়া ছুঁয়ে শপথ করেছিলে কেন?

শিবু কাঁপতে-কাঁপতে বললে, ঠাকুর, এবারের মতন আমাকে রক্ষে করুন! আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারছি না!

—আজ কার বাড়িতে হানা দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে, কপিলেশ্বরবাবুর বাড়ি।

—কী এনেছ?

—প্রায় খান-তিরিশেক বাসন!

—হতভাগা ছিঁচকে চোর! বলেছি না, যেখানে থাকবে, সে-থানার এলাকার মধ্যে কারও বাড়িতে হানা দেবে না! আমার এই আখড়ার এইটেই হল প্রথম নিয়ম, তোমরা কেউই কখনও কোনও প্রলোভনে এই কলোনির কোনও বাড়ি থেকে একটি খড় পর্যন্ত সরাবে না। বুঝলে? সে-বাসনগুলো কোথায়?

—পাশের বাগানে পুঁতে রেখে এসেছি।

—হতভাগা কোথাকার! যাও, এক্ষুনি গিয়ে বাসনগুলো নিয়ে, সামনে যে ডোবাটা খোঁড়া হয়েছে, ওর পশ্চিম-পাড়ে গর্ত করে রেখে দিয়ে এসো। আর আমি ঘটিকে তোমার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি, তার কাছ থেকে শুনে নিয়ো, তোমাকে কী করতে হবে...তবে, এই শেষবার তোমাকে সাবধান করে দিলাম, যেন, কখনও নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করতে যেয়ো না। আমি যা বলে দেব, ঠিক সেইমতো কাজ করে যাবে...যাও এখন!

তিন

এধারে নিবারণবাবু বাড়ি ফেরবার পথে দু-চোখ বার করে খুঁজতে-খুঁজতে চলেছেন, কোথায় কোন সংখ্যা তাঁর চোখে পড়ে। আজ তাঁর মন এক অপূর্ব শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে তিনি একজন সত্যিকারের দৈবশক্তিসম্পন্ন লোকের সন্ধান পেয়েছেন। এ-সৌভাগ্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে!

মোটর তাঁর বাড়ির দরজায় থামতেই তিনি গাড়ি থেকে নেমে ফটকে ঢুকতে দ্যাখেন, কী আশ্চর্য! দেওয়ালের গায়ে কী একটা সংখ্যা লেখা! তিনি কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলেন, ১০০০।

BanglaBook.org

সংখ্যাটা দেখে তাঁর মন হঠাৎ একটু মুষড়ে পড়ল...একেবারে একহাজার টাকা! কিন্তু তার পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! কোথা থেকে তাঁর বাড়ির দেওয়ালে এই সংখ্যা এল? আর এইরকম যে একটা সংখ্যার দেখা তিনি পাবেন, উদাসীবাবা তা জানলেনই-বা কী করে? এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আর কেই-বা তা জানবে? তিনি এসেছেন মোটরে...নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভগবানের কোনও শুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। তিনি যতই ভাবতে লাগলেন, ততই তাঁর মন বিস্ময়ে ভরে যেতে লাগল এবং সেইসঙ্গে উদাসীবাবার অদ্ভুত দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন পেয়ে তিনি মনে-মনে স্থির করলেন, জগতে আর যাই-ই হোক, তিনি উদাসীবাবাকে ছাড়ছেন না! হাজার টাকা তাঁর কাছে এমন আর কী? যদি সন্ন্যাসীদের কাজে তাঁর এই টাকাটা লাগে, সে তো তাঁর সৌভাগ্যের কথা! তিনি স্থির করলেন, কালই তিনি হুগলি যাত্রা করবেন।

পরের দিন সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি বাড়ি থেকে রওনা হবার জন্যে যেই বেরিয়েছেন, অমনি একদল কলেজের ছেলে তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। তাদের দলপতিরূপে যে যুবকটি এগিয়ে নিবারণবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এল, তাকে তোমরা বেশ ভালো করেই চেনো...'বিজয়-অভিযানে' রাঁচীর কাঁকর-ভরা পথে তাকে তোমরা দেখেছ—বিনয়...তাকে নিশ্চয়ই তোমরা ভোলোনি!

বিনয় নিবারণবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সম্পর্কে সে নিবারণবাবুর ভাইপো। নিবারণবাবুকে সে কাকা বলেই ডাকে। আজ পাঁচদিন ধরে ছেলের দল একটা ক্লাব তৈরি করবার চাঁদার জন্যে নিবারণবাবুর পিছু-পিছু ঘুরছে, কিন্তু কিছুতেই নিবারণবাবুকে তারা ঘায়েল করতে পারছিল না। তাই তারা আজ বিনয়কে সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছে। তারা নিবারণবাবুর সঙ্গে বিনয়ের আত্মীয়তার কথা জানত এবং তারচেয়ে বেশি জানত যে, বিনয়কে ফেরত দিতে পারে এমন লোক খুব কমই আছে।

নিবারণবাবুকে দেখেই বিনয় সেই পথের মাঝখানে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ঘাড় নিচু করল। সে বেশ ভালো রকমই জানত যে, কঠিন সংসারী লোকদের মন নরম করবার পক্ষে ভক্তির এই রসায়নের চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই।

নিবারণবাবু বিনয়কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং নিজে লেখাপড়া জানতেন না বলে, এই ভাইপোটির লেখাপড়ার খ্যাতি শুনে তিনি মনে-মনে একরকম তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

বিনয়কে হাত ধরে তুলে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, আহা বিনয়, করো কী! তোমার কাণ্ডই আলাদা! দেখা হলেই কি পায়ের ধুলো নিতে হয়? তুমি দেখছি, আজকালকার ছেলেদের মুখ পোড়ালে!

বিনয় অট্টহাস্য করে উঠল—।

—কিন্তু কাকাবাবু, বুঝছেন তো, আমরা কেন এসেছি...আজ আর শুধুহাতে ফিরছি না।

—দেখ বাবা, সত্যি কথা বলতে কি, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কোথায় কী ক্লাব করবে, তাকে টাকা দিয়ে কি শেষকালে ফ্যাসাদে পড়ব?

—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কাকাবাবু, এর মধ্যে যে আমি আছি!

—কিন্তু বাবা, এখন আমার বড্ড তাড়াতাড়ি...আমাকে একবার বিশেষ দরকারে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিনয় দেখল, এরকম করে ছেড়ে দিলে চলবে না। সে বলে বসল, বেশ তো, আপনার গাড়িতেই আমি যাচ্ছি...চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে নিবারণবাবু বললেন, তা এসো, এ-ট্রেনটা ছাড়বার আর বেশি সময় নেই!

সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়ে বিনয় নিবারণবাবুর সঙ্গে মোটরে চড়ে বসল।

গাড়ি ছাড়তেই নিবারণবাবুর মাথায় হঠাৎ যেন একটা কী মতলব এল। তিনি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা বিনয়, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে?

banglabook.org

—কেন বলুন তো কাকাবাবু?

—আমি যেখানে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে যাবে?

সকাল থেকেই নিবারণবাবু ভাবছিলেন যে, একা না গিয়ে যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন, তা হলে ভালো হত। একে তো সঙ্গে অতগুলো নগদ টাকা, তার ওপর রহস্যময় ব্যাপারে নিজেকে লিপ্ত করতে কেমন যেন তাঁর মনে একটা অজানা আশঙ্কাও জাগছিল। বিশেষ করে তিনি নিজে যে একজন খুব সাহসী লোক, তা মোটেই ছিলেন না। তাই হঠাৎ বিনয়ের দেখা পেয়ে তাঁর বড় ইচ্ছা হল যে, বিনয়কে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে সেই ঘটনাটা কাউকে বলতে না পেয়েও তাঁর মনের ভেতর কেমন যেন পাক খাচ্ছিল। তাই তিনি বিনয়কে বিশেষ অনুরোধ করে বললেন, চলো, একটু না-হয় বেড়িয়েই আসবে।

নিবারণবাবুর আগ্রহ দেখে বিনয় জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু, কোথায় যাচ্ছেন, তা তো এখনও পর্যন্ত জানতে পারলাম না—দিল্লি, না লাকনাউ, না সিমলা, কতদূর যেতে হবে আমাকে, সেটা না জেনে কী করে 'হ্যাঁ' বলি!

—না হে বাপু, দিল্লি-সিমলে নয়।

তখন তিনি বিনয়কে সবকথা খুলে বললেন।

—কিন্তু মাপ করবেন কাকাবাবু, আপনাকে আমি একজন বেশ পাকা হিসেবী লোক বলে জানতাম...আজ দেখছি আপনিও...।

—তুমি বুঝবে না হে! তোমার মতন বয়েসে আমিও এসব কিছু তোয়াক্কা করতাম না। কিন্তু আজ আর আমি অবিশ্বাস করতে পারি না!

—আমাকে একবার আপনার সেই সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

—বেশ তো!

নতুন কিছু, মজার কিছু পেলেই বিনয়ের মন তাতে আপনা থেকেই সাড়া দিয়ে উঠত। তা ছাড়া টাকাটা তো তাকে আদায় করতে হবে! সে আর বিশেষ আপত্তি না করে নিবারণবাবুর সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল।

হুগলির বাঁধাঘাটের কাছে এসে গাড়িটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গঙ্গার পাড় ধরে তাঁরা দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তখন অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, পথে লোকজন কেউই নেই। মাঝে-মাঝে গঙ্গার বুক থেকে মাঝিদের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে।

নিবারণবাবু বিনয়কে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে বললেন, দেখো বাবা, তুমি যেন কোনও কথা বোলো না!

—আগে দেখুন, আপনার সেই সাধুর দেখা আপনি পান কি না?

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁরা দেখলেন, সামনে গঙ্গার ধারে যেন ধুনির আলো জ্বলছে। আবেগে নিবারণবাবুর বুক দুলে উঠল। বিনয়কে ডেকে তিনি বলে উঠলেন, দেখছ, নিশ্চয়ই ওখানে তিনি আছেন। উদাসীবাবার কথা কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

সরকারি পথ থেকে একটু সরে গঙ্গার পাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, এক বটগাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন।

নিবারণবাবু বিনয়ের হাত ধরে সেই ধুনির সামনে মাটিতে গিয়ে নীরবে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইলেন।

সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইতেই নিবারণবাবু তাঁর হাত থেকে উদাসীবাবার দেওয়া সেই আংটিটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে গদগদকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমি এসেছি।

BanglaBook.org

সন্ন্যাসী নীরবে আংটিটি তুলে নিয়ে ধুনির আগুনের আলোয় বেশ করে দেখলেন, তারপর স্মিতমুখে নিবারণবাবুর দিকে চেয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। নিবারণবাবু সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। বিনয় দেখল, এক্ষেত্রে নিস্পৃহ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইচ্ছা না থাকলেও সে ঘাড় হেঁট করে শুধু নমস্কার করল।

উদাসীবাবার নির্দেশমতো নিবারণবাবু বললেন, বাবা, বিঘ্নবিনাশী শিকড়ের জন্যে আপনার কাছে এসেছি...যৎসামান্য প্রণামী এনেছি, যদি দয়া করে নেন—।

এই বলে কোটের ভেতরের পকেট থেকে গিনি-ভরা একটা থলে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রাখলেন। বিনয়ের একবার মনে হল, জোর করে সে-থলিটা যেন সেখান থেকে সে তুলে নেয়। অকারণে এতগুলো টাকা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় লোকটা এই অজানা লোকটার পায়ের তলায় ঢেলে দিল? কিন্তু নিবারণবাবুর কাছে সে কথা দিয়েছিল, কোনও কথাই সে বলবে না। তাই নীরবে সে সমস্ত ব্যাপারটা শুধু দেখে যেতে লাগল।

সন্ন্যাসী কোনও কথা না বলে পায়ের কাছে থলিটা একবার দেখলেন। তারপর তেমনি নীরবে পাশ থেকে একটা বড় থলি তুলে নিয়ে, তার মুখটা খুলে নিবারণবাবুকে ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁর থলিটা এই থলির ভেতরে ফেলে দিতে। নিবারণবাবু বুঝলেন, সন্ন্যাসী নিজের হাতে সেই টাকা স্পর্শ করতে চান না।

সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতমতো নিবারণবাবু তাঁর থলিটা সন্ন্যাসীর থলির ভেতর ফেলে দিলেন। গিনিগুলো ঠনঠন শব্দ করে উঠল। বিনয়ের বুকে কে যেন তখন হাতুড়ির ঘা মারছিল।

থলিটা তেমনি পাশে ফেলে রেখে সন্ন্যাসীঠাকুর ধুনির ছাই থেকে আঙুলে একটু ছাই তুলে নিবারণবাবুর কপালে ঘষে দিলেন। নিবারণবাবুর সর্ব-দেহে যেন রোমাঞ্চ জেগে উঠল। তিনি নিজে বিনয়ের ঘাড়টা ধরে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বিনয়ের কপালেও সন্ন্যাসীঠাকুর ছাইয়ের টিপ পরিয়ে দিলেন—সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ।

তারপর মাথার জটা থেকে একটা ছোট্ট শেকড় বার করে নিবারণবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, ভালো দিন দেখে ডান হাতে পরে থাকবি বেটা...কেউ আর তোকে কিছু করতে পারবে না.....যা বেটা, তোর বরাৎ খুব ভালো।

বিনয় কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় নিবারণবাবু তাকে বাধা দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন, বাবা, আপনাকে আর বিরক্ত করব না, এবার আমরা যাই!

—জয়স্তু! বলে সন্ন্যাসী তেমনি হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

পাছে বিনয় কোনও গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলে, নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। ঘাটে তখনও গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। বিনয় সারাপথ গুম হয়ে বসে রইল। নিবারণবাবু আপনার মনে কত কথা বলে যেতে লাগলেন, তার একটারও উত্তর বিনয়ের কাছ থেকে এল না। শেষে নিবারণবাবু বললেন, বাবা বিনয়, তুমি ভাবছ, এইসব সন্ন্যাসীরা ধর্মের ভোল দেখিয়ে আমাদের ঠকিয়ে নিচ্ছে! কিন্তু তা ঠিক নয়। আমাদের মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না। একদিন তুমিও জানতে পারবে যে, মানুষের শক্তির বাইরে একটা দৈবশক্তি আছে, তার ক্রিয়া আমরা সাধারণ লোকে বুঝতে পারি না। পারেন সাধু-সন্ন্যাসীরা।

বিনয় 'হ্যাঁ', 'না',—কোনও কথাই বলল না।

বাড়িতে ফিরে এসে প্রাপ্য চাঁদা আদায় করে চলে যাওয়ার সময় বিনয় শুধু বললে, কিন্তু কাকাবাবু, আমাকে একদিন আপনার সেই উদাসীবাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

নিবারণবাবু সম্মতি জানালেন, কিন্তু সেইসঙ্গে বললেন, কিন্তু বাবা, সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শনে যেতে নেই।

নিবারণবাবুর মনের কথা বুঝতে পেরে বিনয় বললে, ভয় নেই কাকাবাবু, আমি সেখানে গিয়ে এমন কোনও কাজ করব না, বা কথা বলব না, যাতে আপনার মনে আঘাত লাগতে পারে।

BanglaBook.org

চার

এধারে ভোর না হতেই কপিলেশ্বরবাবু হন্তদন্ত হয়ে উদাসীবাবার আশ্রমে এসে উপস্থিত।

অত সকালবেলায় সেইভাবে কপিলেশ্বরবাবুকে আসতে দেখে উদাসীবাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে, কপিলবাবু! এত সকালে আপনি? আপনার মুখ-চোখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনার কী যেন হয়েছে!

কপিলেশ্বরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাসন আমার চুরি গিয়েছে। কাল বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন, তাই ভালো-ভালো পুরোনো বাসনগুলোও বার করা হয়েছিল...সকালে দেখছি সব চুরি হয়ে গিয়েছে!

—এখন উপায়?

—আপনি তো সর্বজ্ঞ, প্রভু!

উদাসীবাবা হেসে উঠলেন। বললেন, বসুন! বসুন!

—বসব না। একবার থানায় তো খবরটা দিয়ে আসি! শুধু আমার বাড়ি নয়, আজ ক'দিন ধরেই এই কলোনির কারুর না কারুর বাড়ি থেকে চুরি যাচ্ছে...ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়।

—এসব হচ্ছে বাড়ির চাকর-বাকরদের কাজ। আজকাল খুব সাবধানে চাকর-বাকর রাখতে হয়।

—তা যা বলেছেন! কিন্তু আমার একেবারে কলাপাতার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছে!

উদাসীবাবা হেসে বললেন, সেদিন আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে, এই একই ব্যাপার। নাছোড়বান্দা—বলেন, চোর কোথায় বলে দিতে হবে। আমি যেন গোয়েন্দা...।

বলেই উদাসীবাবা অট্টহাস্য করে উঠলেন। কিন্তু তিনি যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথাগুলি বললেন, কপিলেশ্বরবাবুর মনে গিয়ে তা অব্যর্থ লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, বাবা, আমাকেও উদ্ধার করতে হবে। অনেকগুলো বাসন। শুনেছি, আপনারা চেষ্টা করলে সব বলে দিতে পারেন!

—বসুন! বসুন! কপিলেশ্বরবাবু, অত ব্যস্ত হবেন না।

—আমি আপনার প্রতিবেশী। আপনি হলেন একরকম এ-পাড়ার মাথা। আপনি থাকতে যদি এসব অনাচার হয়, সে আপনারই অসম্মান।

উদাসীবাবা তেমনি স্মিতহাস্যে কপিলেশ্বরবাবুকে বললেন, বসুন! বসুন! দেখি আপনার হারানো জিনিসের উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না!

এই বলে তিনি আশ্রমের একজনকে ডেকে বললেন, নকড়ি, খড়িটা একবার নিয়ে আয় তো বাবা!

নকড়ি খড়ি নিয়ে এল, উদাসীবাবা একটা কুশাসন পেতে কপিলেশ্বরবাবুকে বললেন, আপনার বাড়ির দরজা কোনমুখো বলুন তো?

—আজ্ঞে, পূর্বদ্বারী।

—বেশ, তা হলে পূর্বদিকে মুখ করে এই আসনে বসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন কপিলেশ্বরবাবু সেই আসনে পূর্বমুখী হয়ে বসলেন। উদাসীবাবাও তাঁর সামনে আর-এক আসনে বসলেন। খড়িটা নিয়ে মাটিতে তিনি একটা ছক কাটলেন।

—আপনার এখন বয়স হল কত?

—৫৭।

—ভালো! কোন বারে আপনার জন্ম?

BanglaBook.org

—শনিবার।

উদাসীবাবা মনে-মনে কী হিসেব করে ছকের তিনটে ঘরে তিনটে সংখ্যা বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বলছেন কাল চুরি গিয়েছে—কাল গিয়েছে সোমবার।

তারপর আবার মনে-মনে কী হিসেব করে আরও দুটো সংখ্যা বসালেন।

—এইবার চোখ বুঁজে আপনি একটা ফুলের নাম মনে করুন। প্রথমেই যে ফুলটার চেহারা মনে পড়বে, সেইটে বলবেন—বলুন?

—পদ্ম।

—ভালো। এইবার আপনার কপালটা একটু তুলুন দেখি? হ্যাঁ...এক, দুই, তিন, চার...।

উদাসীবাবা কপাল দেখে কী গুনলেন, তিনিই জানেন। তারপর আবার মনে-মনে কী হিসেব করে নিয়ে ছকের দুটি খালি ঘরে সংখ্যা বসালেন। তারপর সংখ্যাগুলো মনে-মনে বোধ হল যেন যোগ করলেন। কপিলেশ্বরবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখছিলেন, বৈজ্ঞানিক যেরকম বিস্ময়ে নতুন কোনও গ্রহের আবির্ভাব আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন জপ করলেন। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, ১,২,৩,৪। ৩ যখন বেরিয়েছে... তখন পশ্চিম...বাঁ-দিকের ঘরে আছে পাঁচ...পাঁচ হল...আচ্ছা কপিলেশ্বরবাবু, আপনার বাড়ির পশ্চিমদিকে কি কোনও পুকুর আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।

—বেশ। আমি লোক দিচ্ছি—এই শিবু, তুই কপিলেশ্বরবাবুর সঙ্গে যা দিকি! আপনি এখুনি সেই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গিয়ে খোঁজ করুন—যে চুরি করেছে, সে সেইখানেই আপনার বাসনগুলো পুঁতে রেখে এসেছে...যান...বিলম্ব করবেন না।

কপিলেশ্বরবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। শিবু তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আসতেই শিবু বলে উঠল, এই দেখুন কত্তা, পায়ের দাগ...এখানকার মাটিটা খোবলানো রয়েছে...নিশ্চয়ই এখানে আছে।

শিবু হাতে করে একটা লোহার শাবল নিয়ে এসেছিল। দু-এক কোপ বসাতেই পুকুরের পাড়ের নরম মাটি উঠে এল। এবং তার ভেতর ঠং করে আওয়াজ হল।

কপিলেশ্বরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, ওই...ওই...

শিবু হাত দিয়ে একে-একে সেই বাসনগুলোকে কাদার ভেতর থেকে বার করল। তখন যদি কেউ কপিলেশ্বরবাবুর মুখের চেহারা দেখত, তা হলে বুঝতে পারত, ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ডিউক-অফ-ওয়েলিংটনের মুখের চেহারা কীরকম হয়েছিল...বুঝতে পারত, যেদিন আর্কিমিডিস প্রথম 'ইউরেকা' বলে উঠেছিলেন, সেদিন তাঁর মুখের চেহারা কীরকম ছিল!

কপিলেশ্বরবাবুর অন্তরাত্মা, দেহের সমস্ত লোমকূপ যেন বলছিল ইউরেকা, ইউরেকা, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি!

এ শুধু হারানো বাসন ফিরে পাওয়ার আনন্দ নয়, এ-আনন্দের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে, আর-এক বৃহত্তর আনন্দ, উদাসীবাবার মতো একজন মহাঋষির সন্ধান পাওয়ার আনন্দ! শুধু সন্ধান পাওয়া নয়, তার স্নেহ পাওয়ার সুদুর্লভ সৌভাগ্য! ধন্য আর্যঋষি! ধন্য তোমার মন্ত্রতন্ত্র! ধন্য উদাসীবাবা!

কপিলেশ্বরবাবু তাঁর বয়স ভুলে, ভাবে গদগদ অবস্থায় একরকম নাচতে-নাচতে সোজা উদাসীবাবার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লেন।

দ্যাখেন, তাঁর আগে...ঠিক তাঁরই মতো অবস্থায় নিবারণবাবুও এসে তাঁর শ্রীচরণে পড়েছেন।

দুজনের মুখ থেকে শুধু অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে বেরুল, জয় গুরু! জয় গুরু!

সেই জোড়া-ভক্তের পেছনে দাঁড়িয়ে, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে, একটি তরুণ যুবক নির্বাক-বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখছিল—সে বিনয়।

BanglaBook.org

পাঁচ

মিঃ গুপ্ত সামান্য সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিশ-বিভাগে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু নিজের 'মেরিট'-এ তিনি এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শহর থেকে চুরি, ডাকাতি এবং গুণ্ডামি যে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় দূর হয়েছে, এ-কথা ভেবে তিনি নিজে যেমন গর্ব অনুভব করেন, শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও তেমনি তাঁর প্রশংসাও করেন। তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ সরকার থেকে তিনি 'রায়সাহেব' খেতাব পেয়েছেন এবং এ-কথা প্রায় জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে, সামনের রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে উপাধি-বিতরণ উৎসবে 'রায়বাহাদুরের' তালিকায় তাঁর নাম আছে।

সম্প্রতি একটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। আজ প্রায় বছরখানেক হতে চলল, তিনি দুটো বড়-বড় খুনের কোনওই হদিস বার করতে পারছিলেন না। একটি দুর্ঘটনা ঘটে ট্রেনে...সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। এক ধনী মাড়োয়ারি একাকী সেই কম্পার্টমেন্টে আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে দশহাজার টাকার কারেন্সী নোট ছিল। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে দেখা গেল যে, তাঁর মৃতদেহ গাড়িতে পড়ে আছে...কে বা কারা তাঁকে যেন গলা টিপে মেরে ফেলেছে। ট্রেনের গদির একধারে ধুলো জমেছিল, সেই ধুলোর ওপর শুধু একটা হাতের ছাপ মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেই ছাপের X-Ray ফটো নেওয়া হয়। তাতে দেখা যায়, লোকটার হাতে পাঁচটা আঙুলের বদলে বড়ে আঙুলের পাশে আর-একটা ছোটো আঙুল আছে। যে-মাড়োয়ারিটি নিহত হয়েছিল, এ তার হাতের ছাপ নয়, কারণ তার কোনও হাতেই কোনও বাড়তি আঙুল ছিল না। নিশ্চয়ই এ আততায়ীদের মধ্যে কারুর হাতের ছাপ। দ্বিতীয় খুন, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঘটে। তার কিছু বিবরণ জানতে পারা যায়। দুপুরবেলা, ফিরিওয়ালার সাজে একদল লোক বাড়ির ভেতর ঢুকে, দরজায় চাবি দিয়ে, মেয়েদের গা থেকে এবং সিন্দুক থেকে সমস্ত গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। সেই বাড়িতে তখন একটি ছেলে রোগে শয্যাশায়ী ছিল। ডাকাতরা তার ঘরে এসেও উৎপাত করে এবং সে চেঁচাবার উপক্রম করলে, ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। ছেলেটি সেই উৎপাতের ফলে মারা যায় এবং মৃত্যুকালে সে যে-জবানবন্দী দিয়ে যায়, তাতে সে বলে যে, যে-লোকটা তার মুখ চেপে ধরেছিল, তার হাতে যেন ছ'টা আঙুল ছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে মাত্র ওইটুকু যোগসূত্র ছিল। কিন্তু মিঃ গুপ্ত এত চেষ্টা করেও আততায়ীদের কোনও সন্ধান বার করতে পারেননি। সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কারুরই কোনও হাতে পাঁচটা ছাড়া ছ'টা আঙুলের কোনও চিহ্নই ছিল না। এই দুটি ঘটনার তদন্ত নিয়ে আজ একবছর ধরে মিঃ গুপ্ত কম পরিশ্রম করেননি, কিন্তু সে-অনুপাতে কোনও ফললাভই তিনি করতে পারেননি। এই পরাজয়ে ভেতরে-ভেতরে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখিত হয়েই ছিলেন, কারণ পুলিশ-কর্মচারী হিসেবে তাঁর গোপন গর্বে এই দুটি ঘটনা কুশাঙ্কুরের মতো বিঁধত।

তাঁর কর্মজীবনের পিছনে কিন্তু ছিল তাঁর সাংসারিক জীবনের নিদারুণ ব্যথা।

বাইরের দিক থেকে পদোন্নতি হলেও মিঃ গুপ্তের মনে কিন্তু একটুও শান্তি ছিল না। যেদিন তিনি প্রথম চাকরিতে 'লিফ্‌ট' পেলেন, সেদিন তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়ী হন এবং বছরদিন রোগশয্যায় শক্তিহীনভাবে থেকে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তার পরের বছরেই তাঁর প্রথম কন্যা বিধবা হয়ে তাঁরই আশ্রয়ে চলে আসে। পুলিশের কাজের মধ্যে তিনি প্রথম জীবনে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দুই ছেলের লেখাপড়ার দিকে কোনও নজরই দিতে পারেননি। বড় ছেলেটি দুবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করে বাড়িতে বসেছিল। ছোট ছেলেটির ওপর তাঁর সব ভরসা গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দৈবের নির্মম আঘাতে সেই ছেলেটিই আজ দু-বছর হল টাইফয়েড রোগে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন ঠিক করেন এবং সেইখান থেকেই তিনি জীবনের শেষ আশ্রয়স্বরূপ ধর্মকাজে মন দেন। যেখানেই

BanglaBook.org

যে সাধু-সজ্জনের সন্ধান পেতেন, আকুল অন্তরে সেখানে গিয়ে পড়তেন, যদি তাঁর কৃপায় অন্তরে কিছু শান্তি তিনি পান। একদিন নাস্তিক বলে নিজেকে জাহির করতে তিনি গর্ব অনুভব করতেন এবং আচার-অনুষ্ঠান দেখলেই নাক সেঁটকাতেন। কিন্তু আজ দৈবের উপর্যুপরি নিষ্ঠুর আঘাতে তিনি প্রাণপণে আবার সমস্ত অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরেছেন, ডুবে-যাওয়া লোক যেমন স্রোতের মধ্যে যা পায় তা-ই আঁকড়ে ধরতে যায়।

এহেন মানসিক অবস্থায় তিনি দুটি 'কেস' নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুতেই সে দুটি খুনের কোনও হদিসই তিনি বার করতে পারছিলেন না, অথচ উপর থেকে এই নিয়ে রীতিমতো চাপ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। তার ওপর কয়েকমাস ধরে শহরে এবং শহরের আশেপাশে এক নতুন ধরনের ডাকাতি শুরু হয়েছে, ডাকাতির বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, একদল লোক রীতিমতো দল বেঁধে এই কাজ করে চলেছে এবং সেই দলের মাথা হিসেবে একজন রীতিমতো মাথাওয়ালা লোক আছে।

এইসব ব্যাপার নিয়ে সেদিন তাঁর অফিস-ঘরে বসে তিনি ভাবছেন, এমনসময় তাঁর টেলিফোন বেজে উঠল—।

—হ্যাঁ, বলুন। ডাকাতি হয়েছে...? চাকরের ওপর সন্দেহ করছেন? আপনি এখুনি থানায় চলে আসুন!

কয়েকমিনিট পরে থানায় একটি মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি থানার ভেতর ঢুকলেন। পুলিশের লোকেরা তাঁকে মিঃ গুপ্তের ঘরে নিয়ে গেল।

—বসুন! হ্যাঁ, বলুন দেখি, ব্যাপারটা কী?

—আজ মাস-তিনেক হল আমার বাড়ির সামনে একটা লোক শুয়েছিল। দু-দিন নাকি তার খাওয়া হয়নি। লোকটির কথাবার্তা শুনে আর তার হাবভাব দেখে, তার ওপর আমার দয়া হল। সে চাকরি চাইতে আমি তাকে বাড়িতে থাকতে দিলাম। সে শুধু ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেত, টিফিনের সময় তাদের খাবার নিয়ে যেত। কিন্তু অবসর সময়ে, দেখতাম, সে অন্য চাকরদেরও কাজ করে দিত। চাকরগুলোর মজা হল। তারা শক্ত কাজ পড়লেই লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। লোকটা বিনা আপত্তিতে হাসিমুখে তাদের সব কাজ করে দিত। দেখতে-দেখতে সে বাড়ির সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। তার ব্যবহার দেখে, তার কাজকর্ম দেখে, আমারও মনে আনন্দ হল। সত্যি-সত্যি একটা ভালো চাকর পাওয়া গেল, টাকাপয়সার ব্যাপারেও লক্ষ করতাম, একটা আধলা সে এদিক-ওদিক করত না। মাইনের জন্যে কোনওদিন কিছু বলত না। এইভাবে লোকটা বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে দরকারি লোক হয়ে উঠল।

—তারপর, আসল কথাটা বলুন।

—কাল রাত্তিরে আমার বাড়িতে সব চুরি হয়ে গিয়েছে এবং এমন অদ্ভুত উপায়ে হয়েছে যে, জানতেও পারিনি। আমরা সকালে উঠে দেখি, যেসব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকত, সেইসব দরজার সামনে খড়ি দিয়ে দাগ কাটা! এমনভাবে দাগ কাটা যে, সেই দাগ ধরে কাটলেই ভেতর থেকে তালাটা খুলে যাবে...এইরকম নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সিন্দুকের গায়ে, দেরাজে সর্বত্র রয়েছে।

—ঠিক এইরকম আরও দুটো কেস এসেছে। এরা একজনকে প্রথমে চাকর সাজিয়ে বাড়িতে ঢোকায়। সে-লোকটা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে বাড়ির গোপন কলকব্জা সব জেনে নেয়, কোন তালার কীরকম চাবি তার ছাঁচ পর্যন্ত তৈরি করে ফেলে। তারপর ডাকাতির দিন, সেইসব জায়গায় এমনভাবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে রাখে যে, বাইরে থেকে অন্য লোক এসে যন্ত্র দিয়ে একঘন্টার কাজ পাঁচ মিনিটে হাসিল করে পালায়। আপনার বাড়িতে সেই দলের লোকেরাই কাল উৎপাত করেছে।

—তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু উপায় কী? আমার যে যথাসর্বস্ব কাল চুরি হয়ে গিয়েছে...আমার আজীবনের সঞ্চিত সব...।

—লোকটির নাম-ঠিকানা কিছু জানা আছে?

—নাম বলেছিল পাঁচু। ওই পর্যন্তই! বাড়ি বলেছিল বীরভূম জেলায় কোনও গ্রামে, সে আর কে খোঁজ করতে গিয়েছিল বলুন?

—এখানে তার জানাশোনা কেউ আছে, আপনার চাকরেরা জানে?

—সে বড় একটা কোথাও যেত না! মাঝে-মাঝে গঙ্গাস্নান করতে যেত...এই পর্যন্ত। তা ছাড়া তো কেউ কিছু জানে না।

—তার জামা-কাপড় কিছু পড়ে আছে?

—যে-বাক্সটায় চাকরদের ঘরে তার জিনিসপত্র থাকত, সে-বাক্সটা খালি!

—চলুন, একবার দেখে তো আসি!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে উদাসীবাবার আখড়ায় উদাসীবাবার সমস্ত ভক্তরা এক জায়গায় হয়েছে। উদাসীবাবা তাদের সকলকে ডেকে বলছেন, কিন্তু এই সময়ই তোমাদের সবচেয়ে সাবধানে থাকতে হবে...দল ভেঙে বা দল ছেড়ে কেউ কিছু করতে যেয়ো না, তা হলেই মরবে...মনে রেখো, কলিকালে দলই হল শক্তি। আজ যে-জন্যে তোমাদের সকলকে একসঙ্গে ডেকেছি, বলছি শোনো।

শেষ কাজটা তোমরা যেভাবে হাসিল করেছ, তাতে সত্যি তোমাদের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু এ-পথ আর নয়। বিশেষ করে ঘণ্টাকে আর আমি কিছুদিন বেরুতে দেব না...ঘণ্টা, তুমি সর্বদাই ওই দাড়ি-গোঁফ পরে থাকবে...আজ থেকে তোমার কাজ হবে আমার পাশে-পাশে থাকা...হ্যাঁ, এবার থেকে আমরা নতুন কায়দায় কাজ আরম্ভ করব। আমার এই 'স্কীম' সফল হলে, এখানকার ডেরা আমরা তুলে ফেলব...কিন্তু তার আগে আমি প্রথমে একটা কাজ করতে চাই। সেদিন যে-ছোকরাটা এসেছিল, তার সম্বন্ধে তুমি কী খবরাখবর এনেছ, গণেশ?

—ছেলেটির নাম বিনয়। আমাদের নিবারণবাবুর আত্মীয়। কলেজের পড়া তার শেষ হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু ছেলেটি কী করে?

—খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তাতে ছেলেটিকে খুব সাংঘাতিক বলে মনে হয়। শুনলুম নাকি, সে একজন শখের গোয়েন্দা।

—তার শখ আমি দু-দিনে ঘুরিয়ে দিচ্ছি! ভেবেছিলাম, আর মানুষের গায়ে হাত তুলব না, কিন্তু সেদিন ছোঁড়াটার ভঙ্গি দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেল! ওকে সরাতেই হবে...তারপর অন্য কাজ! আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে ওকে লোপাট করতে হবে...তুমি ওর পিছু ছাড়বে না...কোথায় যায়, কী করে, সব খবর নিয়ে কাল রাত্তিরে আমাকে দেওয়া চাই-ই, তারপর আমি দেখছি ওর শখের গোয়েন্দাগিরি!

এমনসময় বাইরে মোটরের শব্দ হতে, আখড়ার ভেতরে সকলেই সচকিত হয়ে উঠল।

ঘণ্টা ঘর থেকে বেরিয়ে খবর নিয়ে এল, নিবারণবাবু এসেছেন, সঙ্গে নতুন লোক আর সেই ছোঁড়াটা।

বলতে-বলতে নিবারণবাবু এগিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে থেকে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে ডাকলেন, বাবা!

—কে নিবারণ নাকি? এসো, এসো, বাবা!

নিবারণবাবু ঘরে ঢুকেই বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।

—বাবা, আজ আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। মিঃ গুপ্ত—পুলিশের একজন বড় অফিসার...আর একে তো জানেনই...বিনয়! বসো, বিনয়, বসো।

BanglaBook.org

মিঃ গুপ্তের নাম শুনে হঠাৎ উদাসীবাবার দেহের ভেতরে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল, কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশই পেল না। আনন্দে বিহ্বল হয়ে তিনি শিষ্যদের ইঙ্গিত করতেই, তারা একটা আসন পেতে দিল। তারপর মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বললেন, বসুন, মিঃ গুপ্ত!

মিঃ গুপ্ত আসনে বসতে-বসতে একান্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমাকে আর আপনি 'মিঃ গুপ্ত' বলে ডাকবেন না...আমি এসেছি আপনার একটু করুণা পাবার জন্যে।

মৃদু হেসে উদাসীবাবা বললেন, করুণা একমাত্র তিনি করতে পারেন, সকল করুণার মহাপারাবার যিনি!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দুটি চোখ যেন আপনা থেকেই বুজে এল। পাশেই একখানা হাতপাখা পড়েছিল। নিবারণবাবু সেখানা তুলে নিয়ে উদাসীবাবাকে বাতাস করতে লাগলেন। বিনয় 'একস-রে'-দৃষ্টি দিয়ে ঘরের সমস্ত কিছু দেখছিল। কিন্তু সে লক্ষ করেনি যে, সেই ঘরের আশে-পাশে চারিদিক থেকে জোড়া-জোড়া চোখ তাকেও ঠিক সেইভাবে দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে উদাসীবাবা চোখ খুলেই সোজা মিঃ গুপ্তের দিকে চাইলেন। মিঃ গুপ্তের মনে হল, সে-দৃষ্টি যেন তাঁর অন্তস্তল পর্যন্ত গিয়ে বিঁধছে। সহসা উদাসীবাবা বলে উঠলেন, আপনার ছেলের জন্যে আপনার বড় ভাবনা হয়েছে ইদানীং, না?

হঠাৎ তাঁর অন্তরের নিভৃততম ব্যথার কথা এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে এইরকম ভাবে শুনে মিঃ গুপ্ত একেবারে উতলা হয়ে পড়লেন। একদিন যাঁকে দেখে শহরের গুণ্ডারা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠত, সেই লোক সহসা শিশুর মতো হয়ে গেলেন।

মিঃ গুপ্ত আপনা-থেকেই তাঁর নিজের জীবনের কথা বলে যেতে লাগলেন। উদাসীবাবা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

মিঃ গুপ্ত কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি আপনার সন্তানতুল্য, আমাকে আপনি 'আপনি-আপনি' বলে কথা বলবেন না...আমার নাম হল হরিশ...আপনি আমাকে আমার নাম ধরে যদি ডাকেন, তা হলে খুশি হব।

এত শিগগির যে শিকার ধরা দেবে, তা উদাসীবাবা আশা করেননি। যেদিন থেকে তিনি শুনেছিলেন যে, মিঃ গুপ্তের হাতে পড়েছে তাঁর অতীত জীবনের কীর্তির সন্ধান, সেইদিন থেকে তিনি চেষ্টায় ছিলেন কী করে মিঃ গুপ্তকে তাঁর আখড়ায় বেঁধে ফেলা যায়, তা হলে পুলিশের সন্দেহের দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন। তাই তিনি মিঃ গুপ্তের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। আজ দৈবের কৃপায় সেই মিঃ গুপ্ত যে এমনভাবে নিজে এসে ধরা দেবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আনন্দের হিল্লোলে তাঁর সর্ব দেহ-মন ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। আর সেই লক্ষণ দেখে নিবারণবাবু সন্ন্যাসীর ভগবদ্‌ভাব স্ফুরণ মনে করে ভক্তিতে টলমল হয়ে উঠছিলেন।

উদাসীবাবা এতক্ষণ যেন ঘরে বিনয়কে দেখতেই পাননি, এমনিভাবে তিনি বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, এই যে বাবা, তোমার নামটা ভুলে যাচ্ছি, কিছু মনে করো না বাবা, বুড়ো মানুষ...।

নিজের শুষ্ক ভঙ্গিকে ঠিক করে নিয়ে বিনয় স্নিগ্ধভাবে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে উঠল, আজ্ঞে, এ-অধমের নাম—বিনয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিনয়। বিনয়। বসো, বসো বাবা।

বিনয় একটি আসনে নীরবে উপবেশন করল। উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা বাবা হরিশ, তোমার সেই দিনগুলো মনে করো দেখি, যখন তুমি ঈশ্বর মানতে না...।

মিঃ গুপ্ত যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন, এ-কথা আপনাকে কে বললে?

BanglaBook.org

—আমাকে আর কে বলবে বাবা! কার সঙ্গেই বা মিশি, যিনি খবর দেওয়ার, তিনি দয়া করে যেটুকু খবর দেন, সেইটুকুই জানতে পারি!

নিবারণবাবুর দুই চোখ দিয়ে তখন আনন্দের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। বিস্ময়ে তিনি তাঁর গুরুর দিকে চেয়ে আছেন।

বিনয় ঘরের কোণে একদিকে একটি আসনে নীরবে বসল। উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, আমি জানি বাবা, তোমার মনের অশান্তির কথা আমি সব জানি।

যে-লোক বেদনায় ভেতরে-ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে থেকে যদি কেউ তার সেই বেদনার জায়গায় সকরুণ হাতের স্পর্শ দেয়, আপনা-থেকেই তা গলে যায়। মিঃ গুপ্ত—পুলিশের উচ্চ কর্মচারী মিঃ গুপ্ত, সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদাসীবাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, মৃত্যুতে যে-আসন শূন্য হয়, মানুষের সাধ্য নেই সে-স্থান পূরণ করে।

এই বলে উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তের ডান হাতটি নিজের দিকে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ একমনে নিরীক্ষণ করলেন, তারপরে একে-একে মিঃ গুপ্তের জীবনের সবকথা বলে যেতে লাগলেন, যেসব কথা তাঁর চরেরা দিনের পর দিন সংগ্রহ করেছিল। মিঃ গুপ্ত উদাসীবাবার সেই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, এই লোকের কাছ থেকে তিনি তাঁর অন্তরের শান্তির খোরাক পাবেন, তাঁর ক্ষুধিত বঞ্চিত মন করুণার স্পর্শে অবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

সহসা উদাসীবাবা বলে উঠলেন, আমি জানি, সম্প্রতি তোমার কাজের ব্যাপারে তুমি বিশেষ উতলা আছ!

হঠাৎ এ-কথা ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ গুপ্তের মনে একটা কথা জেগে উঠল, শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি থাকে এবং নিবারণবাবুর কাছে তিনি যেসব কথা শুনেছেন এবং আজ তিনি নিজে যা প্রত্যক্ষ করলেন, তাতে উদাসীবাবার যে সে-ক্ষমতা নেই, তা বলা চলে না। আজ দু-বছর ধরে তিনি যে-কেসের কোনও হদিস বার করতে পারছেন না, উদাসীবাবা কি সেই কথাই তুলছেন! আশ্চর্য!

তবুও তিনি বাইরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি যদি আরও স্পষ্ট করে একটু বলেন...।

উদাসীবাবা হেসে বললেন, সেসব খুন-খারাবির কথা এত লোকের মাঝখানে আলাপ করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

খুনের কথা শুনেই মিঃ গুপ্তের বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি যে-কেস নিয়ে পড়ে আছেন, উদাসীবাবা ঠিক তারই কথা বলছেন।

নির্বাক বিস্ময়ে মিঃ গুপ্ত উদাসীবাবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, বাবা, আজ থেকে আমাকেও আপনার চরণে স্থান দিতে হবে।

সেদিন তাঁরা চলে যাওয়ার পর উদাসীবাবা আনন্দে নৃত্য করে বলে উঠলেন, আর আমাকে পায় কে? পুলিশের কর্তাকে এখানে করেছি মোতায়েন—আর পুলিশের সাধ্য কী আমাকে সন্দেহ করে!...কেল্লা ফতে!

BanglaBook.org

ছয়

পথে যেতে-যেতে মোটরে নিবারণবাবু বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কী হে, কেমন দেখলে?...কথা বলছ না যে? তোমার সন্দেহ বুঝি এখনও ভাঙল না?

নিবারণবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে, মিঃ গুপ্তকে ডেকে বিনয় বললে, মিঃ গুপ্ত, আপনি রাজি হয়েছেন, সেই দুটি খুনের কেসে আমার সাহায্য গ্রহণ করতে?

—নিশ্চয়ই!

—তা হলে জানবেন, আজ থেকে আমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

—কী বলছ তুমি, বিনয়?

—আরও স্পষ্ট করে বলবার সময় হলে আরও স্পষ্ট করেই বলব!

—কিন্তু তার সঙ্গে উদাসীবাবার কী যোগ যে, হঠাৎ তুমি এখানে সেই কথা তুললে?

—আপনারা যখন গল্প করছিলেন, ধর্ম নিয়ে মত্ত ছিলেন, তখন আমি আমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘরের অন্যসব লোকদের দেখছিলাম।

—কী দেখলে?

—ঘণ্টা বলে যে-লোকটি ছিল, তাকে লক্ষ করেছেন?

—কেন?

—তার ডান-হাতে ছ'টা আঙুল!

মিঃ গুপ্ত হেসে উঠলেন। বললেন, মাপ করো ভাই বিনয়! প্রথম-প্রথম যখন মানুষ গোয়েন্দাগিরি করে, তখন উৎসাহের আবেগে সব জিনিসেই সে clue দেখে।

—আজ্ঞে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের তাই তো রীতি!

—কিন্তু জগতে কত লোকের তো ছ'টা আঙুল থাকতে পারে!

—নিশ্চয়ই! সেজন্যে বলছিলাম, স্পষ্ট করে বলবার সময় আমার এখনও আসেনি।

—কিন্তু ওইটুকু অনুমানের ওপর নির্ভর করে, এতবড় একটা ধার্মিক লোকের আশ্রমের ওপর তুমি—।

—শুধু তাই নয়! এ-জায়গাটায় ধর্মের যে সঙ্কোচহীন আত্মভোলাভাব প্রকাশ থাকা উচিত, তার বদলে কীরকম একটা আড়ষ্ট মৌনতা আছে, সেইটেই আমাকে প্রথম দিন থেকে সতর্ক করে দিয়েছে। জানেন তো, এক-একটা প্রাণীর এক-একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, ইংরেজিতে যাকে instinct বলে, যার সাহায্যে সে বাতাসের গন্ধ পেয়েই বুঝতে পারে, কোনদিকে কী আছে। তেমনি আমার বিশ্বাস, আমার মনে সেই শক্তি আছে, যার সাহায্যে আমি বাতাসে গন্ধ পাই!

এতক্ষণ নিবারণবাবু চুপ করে বসেছিলেন। বিনয়ের কথা শুনে রাগে তাঁর সর্বশরীর ফুলে ফেঁপে উঠছিল! আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে না পেরে, গর্জন করে উঠলেন, বিনয়! দেখছি, আমারই ভুল হয়েছিল, তোমাকে এখানে আনা! কথায় বলে না, এঁটোপাতা কি স্বর্গে যায়? দু-পাতা ইংরেজি পড়ে, বাবুরা ভেবেছেন যে, দুনিয়া জয় করে ফেলেছেন! তুমি যা বুঝেছ তা তোমার নিজের থাক...আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, আমার সামনে ওরকম যা-তা কথা তুমি আর বলবে না।

বিনয় কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার হঠাৎ মনে হল, নিবারণবাবুকে চটানো যুক্তি-সঙ্গত কাজ হবে না। নিবারণবাবু হচ্ছেন, উদাসীবাবার আশ্রমে যাওয়ার তাঁর পাসপোর্ট! হয়তো তার অনুমান ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল হতে পারে বলে কোনও সম্ভাব্য প্রমাণকে উপেক্ষা করা বৈজ্ঞানিকতা নয়।

বিনয় নিবারণবাবুর দিকে চেয়ে দ্যাখে, নিবারণবাবু রাগে কাঁপছেন! তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বিনয় বলে উঠল, আমি আমার একটা অনুমানের কথা বলছি। আমি বলছি না যে, আমি যা বলছি তা-ই অভ্রান্ত সত্য।

—তোমার মুখ থেকে এ-সম্পর্কে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না...আর কোনওদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ওখানে যেতে পারবে না।

এমনসময় গাড়ি মিঃ গুপ্তের থানার সামনে এসে দাঁড়াল। মিঃ গুপ্তের সঙ্গে বিনয়ও থানাতে নামল।

BanglaBook.org

—কিছু মনে না করেন তো, সেই দুটো কেসের report-গুলো একটু দেখব এবং সেই হাতের printটা আর-একবার ভালো করে দেখতে চাই।

—ভালো কথা।...এসো ভেতরে!

নিবারণবাবু একবার বিনয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শফারকে গাড়ি চালাতে বললেন।

সেদিন থানা থেকে ফিরতে বিনয়ের অনেক রাত হয়ে গেল।

শীতের রাত্রি। পথ প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, ওই উদাসীবাবার আখড়ার ভেতরে ধর্ম ছাড়া যেন আরও কিছু রহস্যজনক ব্যাপার লুকিয়ে আছে এবং বাবার ঝোলাতে শুধু যে ভক্তদের কৃপা বা ভক্তির দান পড়ে, তা নয়।...পথ চলতে-চলতে সে যতই নিজের মধ্যে তর্কবিতর্ক করে, ততই তার নিজের সন্দেহটা যেন বড় হয়ে ওঠে। সে নিজের মধ্যে একজনকে খাড়া করে তাকে নিবারণবাবু সাজিয়ে তার সঙ্গে মনে-মনে তর্ক জুড়ে দিলে—

নিবারণবাবু বলে—ছিঃ, ধর্ম নিয়ে যেসব নিরীহ লোক সংসার থেকে আলাদা হয়ে আছে, তাদের ওপর এরকম হীন সন্দেহ করে?

বিনয়ের আসল মন বলে, ধর্মকে আবরণ করে মানুষ যে যুগে-যুগে অন্যায় করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই।

নিবারণবাবু বলে, কিন্তু ধর্মের আবরণে এইসব খুন-জখম!

বিনয়ের মন বলে, কেন, 'রাসপুটীন'-এর কথা কি ভুলে গিয়েছ?

নিবারণবাবু বলে, 'রাসপুটীন' ওদের দেশেই সম্ভব হয়।

বিনয়ের মন বলে, ভুল কথা! রাসপুটীন সব দেশেই জন্মায়। আর তা ছাড়া, ওদের দেশে কাল যা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশে আজ তা গজিয়ে উঠছে!

দেখতে-দেখতে পথে কখন ঝড় উঠেছিল বিনয়ের সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। শীতের দিনে এরকম ঝড় বড় একটা হয় না। একে তো সন্ধে থেকে এ-অঞ্চলে বেশি লোকজন চলা-ফেরা করত না। তার ওপর ঝড় ওঠাতে রাস্তা একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। বিনয়ের অবশ্য সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। কিন্তু উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে-দেখতে তীরের মতো বেগে বৃষ্টি নেমে এল। হঠাৎ সেই শীতের রাতে সেই বৃষ্টির ধারা গায়ে লাগাতে বিনয় সচকিত হয়ে উঠল। শীতের রাত্রিতে কে আর ভেজে। বিনয় রাস্তার থেকে উঠে ফুটপাথের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল—হয়তো সেই পথ দিয়ে কোনও গাড়ি, বা রিক্সা যেতে পারে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিনয় দু-তিনবার 'এই রিক্সাওয়ালা' বলে ডাকল। হঠাৎ মনে হল, যেন কিসের একটা আওয়াজ হল, গ্যাসের আলোয় গাছের ছায়াগুলো ঝড়ে দুলছিল! ফুটপাথের ভেতর দিকটা একেবারে অন্ধকার! ফুটপাথের সামনের রাস্তা—আলো-ছায়ায় ছক-কাটা। বিনয় একবার চারিদিক চেয়ে দেখল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। উদ্‌গ্রীব হয়ে তখন সে রিক্সার আগমন-আশায় সেইদিকে চেয়েছিল, কিন্তু শব্দটা এগিয়ে আসতে-আসতে ক্রমশ যেন দূরে সরে গেল—হয়তো সামনে এগিয়ে না এসে কোনও গলির ভেতর ঢুকে গেল। এমনসময় বিনয় শুনল, সামনে ফুটপাথের ভেতর দিকে কে যেন নড়ে উঠল! সেইদিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বিনয় দেখল, ফুটপাথের ভেতর দিক থেকে অন্ধকারে কে যেন আস্তে-আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু ভালো করে দেখতে সে বুঝতে পারল যে, সামনে যে-লোকটা আসছে সে কোনও ভিখিরি হবে। গায়ে টুকরো-টুকরো সব ময়লাকাপড় জড়ানো। কোনও কথা না বলে লোকটা অর্থহীন হাসি হেসে উঠল।...পাগল! অস্ফুট ভাষায় সে হাত পাতল—কিছু ভিক্ষে চায়। বিনয় পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়সা খুঁজে তার হাতে দিল। লোকটা খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর যেমন অন্ধকার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে এসেছিল, তেমনি আস্তে-আস্তে আবার অন্ধকারের মধ্যে

BanglaBook.org

ঢুকে পড়ল। এমনি কত লোক আশ্রয়হীন হয়ে এই মহানগরীর পথে-পথে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে!... তাদের কথা স্মরণ করে বিনয়ের বুক থেকে আপনা-হতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। এমনসময় গাছের ওপর থেকে ঠিক তার নাকের ডগা ছুঁয়ে কী-যেন পড়ল! বিনয় অজ্ঞাতে ঘাড় তুলে গাছের ওপরের দিকে চাইতে, তার মাথার ভেতর দিয়ে গায়ে কী-যেন একটা এসে পড়ল। গা-টা ঝাড়া দিতে কী-যেন একটা টান পড়ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিনয় বুঝল, তার গলায় ফাঁস পড়ে গিয়েছে! আত্মরক্ষার প্রথম চেষ্টায় নড়তেই ফাঁসটা কঠিনভাবে গলায় আটকে গেল, সেইসঙ্গে ঝুপ করে গাছ থেকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল। পেছন থেকে আর-একজন এসে সজোরে বিনয়ের মুখ চেপে ধরল। ফাঁসের টানে বিনয়ের চৈতন্য লোপ পাবার মতন হল। সেই অবস্থায় সে যেন শুনল, একটা মোটর এসে দাঁড়াল। কারা তাকে ধরাধরি করে মোটরে তুলল। তারপর কিছু শোনবার বা বোঝবার মতো কোনও চেতনাই তার আর রইল না।

সাত

বাড়ি ফিরে গিয়ে নিবারণবাবু সেদিন ভালো করে ঘুমুতে পারলেন না। বিনয়ের ওপর রাগে তাঁর সর্বশরীর জ্বলছিল এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আজকালকার সব ছেলেদের ওপর তাঁর যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল, তা যেন শতগুণ বেড়ে গেল। বিনয়ের চিন্তা মন থেকে একটু সরে যেতে না-যেতে তাঁর মনে হল, হয়তো উদাসীবাবা সমস্ত জানতে পারবেন। যখন জানতে পারবেন, তিনি কী মনে করবেন! হয়তো মনে-মনে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তিনিই বিনয়কে সঙ্গে করে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো সেই অপরাধে তিনি আর তাঁকে কৃপা করবেন না!...এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর আর ভালো করে ঘুম হল না। বিশেষ করে তাঁর এই ভয় হতে লাগল যে, বিনয়ের কথায় মিঃ গুপ্ত যদি সত্যি-সত্যি আশ্রমের লোকদের ওপর সন্দেহ করে কিছু করে বসেন! হাজার হোক, পুলিশের লোক...কিছু বলা যায় না!

ভোর না হতেই নিবারণবাবু গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে মিঃ গুপ্তের কাছে হাজির হলেন। মিঃ গুপ্ত তখন সবে ওপর থেকে নেমে তাঁর চেয়ারে এসে বসেছিলেন। এমনসময় নিবারণবাবু হন্তদন্ত হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, আরে ভাই, ওঠো একবার।

নিবারণবাবুর মুখের চেহারা দেখে মিঃ গুপ্ত মনে করলেন যে, নিবারণবাবু হয়তো কোনও বিপদে পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার নিবারণবাবু?

—একবার চলো ভাই, বাবার আশ্রমে...একবার বাবার শ্রীচরণ একটু দর্শন করে আসি... গাড়ি নিয়ে এসেছি, ওঠো!

নিবারণবাবুর আগ্রহ দেখে মিঃ গুপ্ত আর না বলতে পারলেন না। হাতের কাজ ফেলে রেখে তিনি উঠলেন। তীব্র বেগে মোটর কলকাতা ছাড়িয়ে উদাসীবাবার আখড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেই মোটরের দরজা খুলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। মিঃ গুপ্ত তাঁর পিছনে-পিছনে নামলেন। সারাপথ নিবারণবাবু মনে-মনে চিন্তা করছিলেন, বাবার কাছে কী করে ক্ষমা চাওয়া যায়, কী বলে এই অজানিত অপরাধের কথা উত্থাপন করা যায়...সবকথা কি খুলে বলবেন? না, এসব কথাই উত্থাপন করবেন না?

গাড়ি থেকে নেমে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নিবারণবাবুর মন কেঁপে-কেঁপে উঠল। বাবার সামনে গিয়ে কিছু না বলেই তিনি তাঁর পা জড়িয়ে ধরবেন...তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠতে হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল, আজ যেন কেমন লাগছে...বাবার শিষ্যরা কোথায়? সামনের ঘরে ঢুকে দেখেন কেউ নেই...ঘরটাও খালি...কী হল?

BanglaBook.org

ফিরে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে মিঃ গুপ্তের দিকে চাইলেন। দেখলেন, মিঃ গুপ্তের চোখেও সেই এক জিজ্ঞাসা...

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের একটা ঘর ছিল...সে-ঘরও খালি...কেউ কোথাও নেই...একটা দড়িতে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলছে...এধারে-ওধারে খালি শুকনো কলসী গড়াগড়ি দিচ্ছে...সমস্ত জায়গা পাতি-পাতি খুঁজেও কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলেন না...পরিত্যক্ত শূন্য আশ্রম...।

নিবারণবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

—এ-কী, গুপ্তভায়া...এ-কী হল! বাবা আমাদের এমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন? ...হায়-হায়!

নিবারণবাবু আপনার মনে বলে যেতে লাগলেন, আমি জানতাম, আমি জানতাম.....কাল আমার মন বলেছিল...অকারণে সাধু-পুরুষের নিন্দে! হায়! হায়! আর কি তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে?

মিঃ গুপ্ত এতক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করছিলেন। নিবারণবাবুর প্রশ্নে তিনি যন্ত্রচালিতের মতো বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হয়তো তাঁর দর্শন আর পাওয়া যাবে না!

নিবারণবাবু বালকের মতো কেঁদে বলে উঠলেন, তবে উপায়, মিঃ গুপ্ত? যেমন করেই হোক, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে...

তেমন স্থিরকণ্ঠে মিঃ গুপ্ত বললেন, নিশ্চয়ই! তবে খুঁজে বার-করা খুব সহজ কাজ হবে না।

উত্তেজিতকণ্ঠে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, যত টাকা লাগে মিঃ গুপ্ত, আমি খরচ করতে রাজি আছি...বাবাকে খুঁজে বার করতেই হবে...আপনি পুলিশের একজন বড় অফিসার...বহুলোক আপনার জানা, আপনি চেষ্টা করলেই হবে...

তেমনি স্থিরকণ্ঠে মিঃ গুপ্ত বললেন, আপনার টাকার চেয়ে যার টাকা ঢের-ঢের বেশি তার টাকা নিয়ে, আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে এতদিন চেষ্টা করেও তিনি আমার চোখের সামনে ধুলো দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন...এ কি কম আপসোসের কথা নিবারণবাবু? ইস! তখন যদি বিনয়ের কথা শুনতাম!

মিঃ গুপ্তের কথা শুনে নিবারণবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন, এ আপনি কী বলছেন মিঃ গুপ্ত? ছি-ছি, এ কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি নিবারণবাবু। নিজের জুতো খুলে নিজের পিঠে মারতে ইচ্ছা করছে। এখন চলুন তো একবার বিনয়ের কাছে!

বিনয়ের নাম শুনে নিবারণবাবু যেন ছিটকে পড়লেন।

—সেই হতভাগাটার জন্যেই তো...।

বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্ত বললেন, সেই হতভাগাটার কথা যদি শুনতেন, তা হলে আপনার হাজারটা টাকা জলে যেত না! এখন একবার চলুন তো বিনয়ের কাছে!

মুখ ভার করে নিবারণবাবু গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। শুধু একবার বললেন, মিঃ গুপ্ত, আমি বলছি, আপনিও ভুল করছেন...সাধু-সন্ন্যাসী মানুষদের এমন করে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে নেই।

মিঃ গুপ্ত বললেন, সাধু-সন্ন্যাসী কি না তা জানি না, কিন্তু আপনার গুরুদেবটিকে আমি মোটেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখছি না নিবারণবাবু! তাঁর মতো ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখিনি...একেবারে বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে তিনি এই বিদ্যা শিখেছেন এবং তাঁর চেলাদের শিখিয়েছেন।

নিবারণবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু হুঙ্কার করে উঠলেন, মিঃ গুপ্ত!

ইত্যবসরে গাড়ি বিনয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিনয় বাস করত। তার সংসারের মধ্যে ছিল তার বৃদ্ধা পিসিমা আর এক চাকর।

নিবারণবাবুর গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই চাকর রামহরি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

BanglaBook.org

গাড়ি থেকে নিবারণবাবু এবং মিঃ গুপ্ত দুজনেই নামলেন। রামহরি এগিয়ে গিয়ে দেখল, গাড়িতে শফার ছাড়া আর কেউ নেই।

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, দাদাবাবু? তিনি এলেন না?

—কেন? তোর দাদাবাবু কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি?

—না!

মিঃ গুপ্ত ও নিবারণবাবু দুজনে দুজনার মুখের দিকে চাইলেন। রামহরি বলতে লাগল, দিদিমা সারারাত জেগে আছেন...আমি সারা সকাল সব জায়গায় খুঁজে এসেছি...দাদাবাবু যেখানে-যেখানে যান...কোথাও কোনও খবর পেলাম না!

মিঃ গুপ্ত তাড়াতাড়ি নিবারণবাবুকে নিয়ে মোটরে উঠলেন, চলুন শিগগির থানায়!

থানায় এসে মিঃ গুপ্ত ফোনে থানায়-থানায়, হাসপাতালে খবর নিলেন, কোথাও কোনও খবর পাওয়া গেল না!

নিবারণবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ওর ওইরকম স্বভাব...না বলে-কয়ে শুনেছি ও মাঝে-মাঝে উধাও হয়ে যায়!

মিঃ গুপ্তের মুখ অন্ধকারে ভরে এল। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সেইদিনই কাগজে-কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন, বিনয়, তোমার জন্যে আমরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে আছি। যেখানে থাকো, এই বিজ্ঞাপন দেখলে অবিলম্বে খবর দেবে!

তারপর একদিন, দু-দিন, তিনদিন করে সপ্তাহ চলে গেল, সপ্তাহ ক্রমশ মাসে গিয়ে পড়ল। বিনয়ের আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। মিঃ গুপ্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

আট

বিনয়ের খবরের জন্যে আমাদের একটু পিছন দিকে আবার ফিরে যেতে হবে। বিনয়ের যখন জ্ঞান হল, তখন সে দ্যাখে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে সে শুয়ে আছে। পা নাড়তে চেষ্টা করল—পারল না। বুঝল, তার পা দড়ি দিয়ে একটা কিছুর সঙ্গে এমন করে বাঁধা যে, নড়বার আর উপায় নেই—হাতেরও সেই অবস্থা। সমস্ত মাথা এত ভারি যে, সেটা যে তার নিজের মাথা তা মনেই হচ্ছিল না। যতটুকু তার চেতনা হয়েছিল, তাই দিয়ে সে মনে করতে চেষ্টা করল, কোথায় কীভাবে কী ঘটেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ ভাববার পর সে দ্যাখে, তার সব ভাবনাগুলো যেন জলের দাগের মতো মিলিয়ে-মিলিয়ে যাচ্ছে! কিছু সে স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না, কিছুই তার স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না! অন্ধকারে চোখ চাইবার চেষ্টা করল, কিন্তু মনে হল, কীসের আঠায় যেন চোখ জুড়ে আছে, ভালো করে সে চাইতেও পারছে না।

এমনি অসহায় অর্ধচেতনভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর সে শুনতে পেল, কাছেই দুজন মানুষ যেন কথা বলছে। একজন বলছে,

—না, ওকে মেরে ফেলে কাজ নেই। আমি বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি...যেসব লক্ষণ এতক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি, ছেলেটার মধ্যে পুরোমাত্রায় সেসব লক্ষণ আছে।

—তা বেশ, আমার আপত্তি নেই...আমি জানি, আপনার হাতে যখন দিয়ে গেলাম তখন আমার আর কোনও ভয় নেই।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো...ও আর সভ্য মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে পারছে না...যেদিন ও আবার সভ্য মানুষের মধ্যে যাবে, সেদিন ও হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়, আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র!

BanglaBook.org

বিনয় সেই অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যে চমকে উঠল...এ-কী! তারই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে? একটা কথা শুনে তার বড় ভালো লাগল, তাকে মেরে ফেলা হবে না...সে বেঁচে থাকবে...কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, তাকে নিয়ে ওরা কী করতে চায়। একজনের গলা খুব পরিচিত বলে মনে হতে লাগল...সেই গলার স্বর শুনতে-শুনতে বিনয়ের সব মনে পড়ে গেল...একে-একে সব ঘটনা পরের পর তার মনে পড়তে লাগল।

—আমার ওষুধের গুণে আজকে আর ওর জ্ঞান হবে না...তুমি জেনে রেখো, আজ থেকেই আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি...আজ সন্ধেবেলায় তাকে আর-একটা ওষুধ খাওয়াব...সেই ওষুধের ফলে আস্তে-আস্তে তার ভাববার শক্তি একটু-একটু করে লোপ পাবে...ক্রমশ সে কলের মানুষ হয়ে যাবে...তখন তাকে যা করতে বলব তা-ই সে করে আসবে...আমি যাদের নিয়ে এ-পরীক্ষা করেছি...তাদের দেহের ও মনের কতকগুলো লক্ষণ না থাকার দরুণ আমার ওষুধ তারা বেশিদিন সহ্য করতে পারে না...গোড়ার দিকটা বেশ চলে...কিন্তু শেষের দিকটায় তারা পাগল হয়ে যায়!

সেই অন্ধকারের মধ্যে বিনয় ভয়ে চমকে উঠল—তাকে নিয়ে যে-পরীক্ষা হবে, তা শুনে সে শিউরে উঠল। এর চেয়ে মৃত্যু যে শতগুণে ভালো।

—বহু চেষ্টার ফলে আমি এই তন্ত্র উদ্ধার করেছি...এতে যেসব প্রক্রিয়ার কথা আছে তা যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়...আমার বিশ্বাস, তাতে আমি এই নতুন ধরনের মানুষ তৈরি করতে পারব...এই নতুন মানুষের যেসব গুণ হবে, তন্ত্রে বলেছে—তার গায়ে দানবের জোর হবে, তার নিজের মন বলে কোনও জিনিস থাকবে না, পশুর মতন নিজের মনিব ছাড়া সে কাউকে জানবে না...কোনও বিষ বা অস্ত্রের আঘাত আর তার দেহে কাজ করবে না এবং তার নিশ্বাসে মানুষ অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

বিনয়ের মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে...কিন্তু না, এ তো স্বপ্ন নয়! নিজের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনার কথা শুনতে-শুনতে বিনয়ের সর্ব দেহ-মন আবার ঝিমিয়ে আসতে লাগল। সে কোথায়? কাদের হাতে এসে পড়েছে সে? কী করেই-বা সে উদ্ধার পাবে? সেই ভয়ঙ্কর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু যে শতগুণে শ্রেয়!

—আমি একবার এখন এক নম্বর গুহায় যাচ্ছি...তুমি এখানে পাহারায় থাকো। ছেলেটার চেতনা ফিরে এলে আমাকে খবর দেবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করে এখানে স্থান দিয়েছি...আশা করি, তুমি বা তোমার চেলারা আমার সমস্ত নিয়ম মেনে চলবে।

—সে-কথা আর ভুলব না...আপনারই সেবার জন্যে আজ এই দীর্ঘকাল ধরে এই বিপুল অর্থ অর্জন করে এনেছি—শুধু এই বিদ্যা আপনার কাছে শেখবার জন্যে!

—বেশ! তুমি আমার সব কাজে আমার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকবে...কাল পাগলগুলো বড় উৎপাত করেছে...আজ সেগুলোকে সাবাড় করে দিয়ে আসি! পাহাড়ে শকুনগুলো অনেকদিন মাংস খায়নি!

বিনয় নিজের কানকে যেন আর নিজে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—তোমার চেলারা থাকবে পাহাড়ের তলায়...তাদের কাজ হবে শুধু লক্ষ রাখা, পাহাড়ের সেইদিকে কোনও মানুষ আসছে কি না। তুমি একমাত্র সেই গুহায় প্রবেশ-অধিকারী...এই নাও...এই আংটি না নিয়ে আমি ছাড়া আর কেউ সেই গুহায় ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে যদি দ্যাখো, ছেলেটির জ্ঞান হয়েছে, তা হলে এই শেকড়টা তার নাকে একটু শুঁকিয়ো...সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে...আমার ফিরতে দেরি হতে পারে—কারণ, একটা নয়, দুটো নয়, পঞ্চাশটা পাগলকে সাবাড় করে আসতে হবে।

তারপর অন্ধকারে নানারকমের বিচিত্র কী-যে সব শব্দ হল তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। বিনয় সেই অন্ধকারের মধ্যে মড়ার মতন পড়ে রইল...যেটুকু নড়াচড়া করবার শক্তি তার এসেছিল, সেই ভয়ঙ্কর কথাবার্তা শুনে তাও বন্ধ হয়ে গেল। এইমাত্র যে-কথা সে শুনল, মনে-মনে সেইসব

BanglaBook.org

কথার আড়ালে যেসব জিনিস ঘটে-ওঠার সম্ভাবনা, তা সে কল্পনা করতে লাগল। কী ভয়ঙ্কর কথা! এইমাত্র সে শুনল, পঞ্চাশটা লোককে অকারণে মেরে ফেলে শকুনিকে খাওয়ানো হবে। যদি তার ওপর পরীক্ষা সফল না হয়, তাহলে সে-ও একদিন এমনি পাগল হয়ে যাবে...এমনি একদিন তাকেও পাহাড়ের শকুনির পেটে যেতে হবে। সেই নিদারুণ ভবিতব্য—তার কথা স্মরণ করতে, বিনয় আপনা থেকে শিউরে-শিউরে উঠছিল...কিন্তু এই ভয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটা জিনিস বিনয় লক্ষ করল যে, তার মাথা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে...ভয়ের দরুণ ভেতরে-ভেতরে সে যতখানি সচকিত হয়ে উঠেছে, ততই—তাকে যে মাদক খাওয়ানো হয়েছিল, তার প্রভাব কমে-কমে এসেছে। ক্রমশ অন্ধকারে সে স্পষ্ট করে চোখ চাইতে পারল...মাথাটা একটু ঘুরিয়ে সে দেখল, তার পায়ের দিক থেকে সেই অন্ধকারে একটা তীরের ফলার মতো খানিকটা আলো বাইরে থেকে এসে পড়েছে। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে, সেই নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে সেই আলোর ফালিটুকু যেন তার কাছে আজ নিখিলের জীবনের প্রতীক। জগতের সমস্ত আশা যেন সেইটুকু আলোর রূপ নিয়ে এসেছে!

বেশি নড়াচড়া করলে পাছে যে-লোক তাকে পাহারা দিচ্ছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই বিনয় মড়ার মতন পড়ে রইল...কিন্তু কতক্ষণই বা সেইভাবে থাকা যায়! এতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে বিনয় তার মনের যে-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, ধীরে-ধীরে তার স্বাভাবিক সেই মনের শক্তি আবার ফিরে এল—এমনিভাবে শকুনির পেটে শেষকালে চলে যেতে হবে?

ভাবতে-ভাবতে বিনয় মরিয়া হয়ে উঠল...সেই আলোর টুকরোটুকুর দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে আবার আশা জেগে উঠল...বহুবার বহুভাবে সে মৃত্যুকে দেখেছে...দেখেছে, মৃত্যু তার পাশ দিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছে...কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু-গুহায় তিল-তিল করে মানুষের জগৎ থেকে, মানুষের চেতনা থেকে সরে থাকার নিদারুণ অস্তিত্বের কথা সে কখনও কল্পনাও করেনি! যদি কোনওরকমে এই ভয়ঙ্কর জীবনের হাত থেকে মুক্তি পেতে হয়, তবে আজই তাকে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে...বিলম্বে হয়তো লোকগুলো আবার ওষুধ খাইয়ে তাকে অচৈতন্য করে ফেলে রেখে দেবে...তারপর, তারাই জানে, কীভাবে ধীরে-ধীরে তাকে মানুষের রাজ্য থেকে সরিয়ে—যন্ত্রমানব করে তুলবে! কিন্তু কী উপায়? সে কোথায় আছে, মানুষের বাসস্থান থেকে কতদূরে...কাছে বা দূরে কোথাও কোনও সাহায্যের সম্ভাবনা আছে কি না, তাও সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে যখন জানবার কোনও উপায়ই নেই, তখন সে-সম্বন্ধে ভেবে আর কী লাভ? তার মনে পড়ল, এইমাত্র যেসব কথা সে শুনেছে, জ্ঞান হলেই তাকে আর-একটা কী শেকড় শোঁকাবার ব্যবস্থা আছে—এক্ষেত্রে সে কী করবে? এমনসময় মনে হল, তার হাতের বাঁধন যেন একটু শিথিল মনে হচ্ছে...হাতটা একটু এ-পাশ ও-পাশ করতেই তার মনে হল, কাছেই যেন একটা পাথর রয়েছে...হাতের স্পর্শ দিয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করল যে, পাথরের খনিকটা বেশ ধারালো। সেই অবস্থায় শুয়ে সে পাথরের ধারে হাতের দড়িটা ঘষতে লাগল। খানিকক্ষণ ঘষার পর হাতের দড়ি ছিঁড়ে গেল...হয়তো হাতের দড়িটা তত শক্তও ছিল না, কারণ, যারা তাকে অচৈতন্য করে সেখানে ফেলে রেখেছিল, তারা তার সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার মনে করেই হাতের দড়ি তত শক্ত করে বাঁধার প্রয়োজন মনে করেনি। বিনয় অসীম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করল। দেখতে-দেখতে তার হাতের দড়ি সে খুলে ফেলল। অতি সন্তর্পণে উঠে সে পায়ের দড়িও খুলে ফেলল। এমনসময় সে দেখল, অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেদিক দিয়ে আলোর ফালিটুকু আসছিল, সেদিকে কীসের যেন শব্দ হল, আলোর ফাঁকটা যেন একটু বেড়ে গেল। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠে সেইদিকে একেবার আলোর মুখের নিচে গিয়ে দাঁড়াল...দেখল, একটা সিঁড়ি দিয়ে কে একজন নেমে এল। যে নেমে এল, সে পরম নিশ্চিন্তমনেই নামছিল। তার হাতে টর্চ ছিল। কিন্তু সে-টর্চও সে তখনও জ্বালেনি। হয়তো এই লোকটার ওপরই ভার আছে, তাকে শেকড় শুঁকিয়ে আবার

অজ্ঞান করে ফেলার। লোকটা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক ধাপ অন্ধকারের মধ্যে এগোতেই, বিনয় বেড়ালের মতো সন্তর্পণে তার পিছন দিক দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে পড়ল। বাইরের আলোতে সিঁড়িটুকু তখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল—বিদ্যুৎবেগে বিনয় সেই সিঁড়ির ওপর দিয়ে, সেই আলোর ফাঁকের ভেতর দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠল...ওপরে উঠেই দ্যাখে, মস্তবড় একটা পাথরের চাঁই সেই ফাঁকের মুখে রয়েছে। কালবিলম্ব না করে সে সেটাকে ফাঁকের মুখে টেনে এলে ফেলে দিল...ভেতর থেকে কী-একটা তীব্র চিৎকার জেগে উঠল...সেদিকে লক্ষ না করে বিনয় এক-পা এক-পা করে সামনের দিকে এগুতে লাগল।

নয়

চারিদিকে নিথর মৌন পর্বতশিখর...কোনওরকম চিন্তা না করে সে নিচের দিকে নামতে লাগল। তবে সর্বদাই মনে হচ্ছিল, কে যেন তার পিছু-পিছু নামছে—পিছনে ফিরলেই হয়তো দেখতে পাবে, তাকে ধরবার জন্যে চারিদিক থেকে লোক ছুটছে। তাই সে আর পিছন দিকে একবারও চাইল না। কতক্ষণ সে এইভাবে ছুটতে-ছুটতে নেমে এসেছে তার কোনও ধারণা তার ছিল না। বহুক্ষণ নেমে আসবার পর সে খানিকটা সমতল জায়গা দেখতে পেল। সমস্ত শরীর তার তখন কাঁপছিল, অথচ একমুহূর্তের জন্য থামতেও তার মন চাইছিল না। কিন্তু শরীর তখন এতদূর অবসন্ন যে, বাধ্য হয়ে তাকে থামতে হল। এইবার সে একবার পিছন ফিরে চাইল...কোথাও কেউ নেই...কোনও শব্দ বা তার কোনও প্রতিধ্বনি পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে তার মনে হল, যেভাবে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে ছুটে চলে এসেছে, তাতে কোন পথ দিয়ে কীভাবে সে এসেছে তা মনে করে রাখবার কোনও উপায়ই নেই। কিন্তু আত্মরক্ষা করাই তখন তার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল, তারই আবেগে সে অন্য সমস্ত চিন্তা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে তো অপেক্ষা করে থাকা যায় না? সেই জনমানবহীন অপরিচিত পার্বত্য-দেশের পথ-ঘাট তার কিছুই জানা নেই...সেই সমতল-ক্ষেত্রের দু-পাশ দিয়ে দুটো সরু রাস্তা নিচের দিকে নেমে গিয়েছে...কোন রাস্তা সে ধরবে? ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সে ডানদিকের রাস্তা ধরে আবার নামতে আরম্ভ করল, কিছুদূরে একটা জীর্ণ কুঁড়েঘর রয়েছে। অসীম অকূল সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে অসহায় নাবিক যেমন একটুকরো কাঠ পেলে আশায় উদ্বেল হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে দু-বাহু বাড়ায়, তেমনি সেই কুঁড়েঘরখানি দেখে বিনয় পাগলের মতো সেইদিকে ছুটে চলল। ঘরের সামনে এসে দ্যাখে, একজন আধাবয়েসী লোক কাঠ জ্বালিয়ে রুটি তৈরি করছে। হঠাৎ বিনয়কে দেখে লোকটা যেন অবাক হয়ে গেল। বিনয় কীভাবে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে তা ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে বসল, আমার বড় খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?

বিনয় অবশ্য হিন্দিতেই কথা বলেছিল এবং উত্তরও তার এল হিন্দিতে।

—নিশ্চয়ই, এ-আর এমন কী কথা? দেখছ তো রুটি তৈরি...এসো, ভেতরে এসো।

বিনয়ের মনে তখন হাজার রকমের কথা, হাজার রকম সমস্যা একসঙ্গে তোলপাড় করে উঠছিল। কিন্তু সে-সমস্ত তার চাপা পড়ে গেল...তবু তার সামনে সে যাকে দেখছে সে তো একজন মানুষ! তার চারদিকে তার চিরদিনের চেনা সেই অপরাহ্ণের আলো, সেই পরিচিত মাটির পৃথিবী, এতদিন—কতদিন সে তা জানে না, সে যেন এক অসম্ভব ছায়ার রাজ্যে ছিল, জীবনহীন মৃত্যুর প্রেতপুরীর মধ্যে...তার মধ্যে সে যেন তার সত্তাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল...আজ একটা জ্যান্ত মানুষকে চোখের সামনে নড়তে-চড়তে কথা বলতে দেখে, বিনয়ের মধ্যে আবার তার নিজের সত্তা

BanglaBook.org

জেগে উঠল। এক অজানা ভয়ে সে যেন পঙ্গু হয়েছিল, আবার তার বুকে ফিরে এল তার বহু সাধনার যৌবন-দুঃসাহসিকতা...।

বিনয় এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর যেতেই লোকটা একটা কাঠের চৌকী-মতন জিনিস এগিয়ে দিল। বিনয় তার ওপর বসল।

লোকটি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বড় ক্লান্ত... ব্যাপার কী?

—আমি অনেকদূর থেকে আসছি, তাই বড় ক্লান্ত।

—কিন্তু এ-ধারে, এ-পথে তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

বিনয় দেখল, লোকটাকে প্রশ্ন করতে দিলে, সে উত্তর দিতে পারবে না। একবার মনে হল, লোকটাকে সব কথা খুলে বলে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে তাকে যেসব কথা বলতে হয়, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তাই বিনয় কায়দা করে তার প্রশ্ন এড়িয়ে, নিজেই প্রশ্ন করতে লাগল ঃ

—আমি পথ হারিয়ে গিয়েছি...এ-জায়গাটার নাম কী বলতে পারো?

কিন্তু বিনয় যে-উদ্দেশ্য প্রশ্ন করেছিল, দেখল, লোকটা সে-ফাঁদে পড়ল না...সে উল্টে আবার প্রশ্ন করল, কেন তুমি কি এ-অঞ্চলে আসোনি কখনও?

—না।

—তুমি কোথায় রয়েছ তা জানো না?

—না!

—বা রে, তবে এখানে এলে কীকরে?

যে-কথা বিনয় এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল, দেখল সেই কথার মধ্যে সে আবার পড়ে যাচ্ছে। তখন বেগতিক দেখে বিনয় বলল, সে অনেক কথা...তোমাকে পরে বলছি...তুমি এখন আমাকে কিছু খেতে দাও!

লোকটি আর কোনও প্রশ্ন না করে দুখানা রুটি আর খানিকটা ডাল বিনয়ের সামনে দিল। খিদেয় তখন বিনয়ের সর্ব-দেহ যেন চিৎকার করছিল—গোগ্রাসে সে খেতে আরম্ভ করল। একখানা রুটি শেষ করার পর বিনয়ের বড় তেষ্টা পেল।

—জল আছে?

লোকটি জল আনতে ঘরের বাইরে গেল। হঠাৎ সেইসময় বিনয় দেখল যে, তার সামনে একটা ছোট টিনের বাক্সের ওপর দুখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। ডিটেকটিভের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনয় চিঠি দুটো নিয়ে জামার ভেতরের পকেটে রেখে দিল। নিশ্চয়ই চিঠি দুটো এই লোকটার ঠিকানায় এসেছে এবং সেই ঠিকানা থেকেই বোঝা যাবে, এ-জায়গাটা কোথায় এবং এই লোকটিরই-বা নাম কী। সে যে কোথায় আছে, নিঃসন্দেহভাবে সে-খবর এই চিঠির ঠিকানার মধ্যে থাকে এবং এই-থেকে পরে সে মৃত্যু-গুহারও হদিস বার করতে পারবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটি একটি ঘটিতে জল নিয়ে এল। ঘটিটি হাতে নিয়ে বিনয় আকণ্ঠ পান করল। লোকটি তার সামনে এসে চুপটি করে বসল। বিনয় দ্বিতীয় রুটিখানা সদ্ব্যবহার করবার জন্য সেখানা ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়ে দ্যাখে, তার জিভটা কেমন যেন আড়ষ্ট ঠেকছে! শুকনো রুটিতে তেষ্টা আরও বাড়ে মনে করে, ঘটির বাকি জলটুকুও সে নিঃশেষে খেয়ে ফেলল। কিন্তু জল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে হল, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে গেল...চোখটা আপনা থেকে বুজে এল...ধীরে-ধীরে তার চোখের সামনে অপরাহ্ণের সেই সুন্দর আলো—আবছা হয়ে এল...শুনল, লোকটা যেন অট্টহাস্য করে উঠল...তার কথার শেষ রেশটুকু তার কানে গেল...

—বাবু, ভেবেছিলে খুব পালালে...হাঃ! হাঃ! হাঃ!

দ্বিতীয় রুটিখানি আর শেষ করা হল না। বিনয়ের অচৈতন্য দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

দশ

বিনয়কে নিশ্চিতভাবে এই জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে—এই আশা নিয়ে উদাসীবাবা আবার তাঁর কর্মক্ষেত্রের দিকে ফিরলেন। অজ্ঞান অবস্থায় বিনয় যে-দুজন লোকের কথাবার্তা শুনেছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন উদাসীবাবা। যেদিন কলকাতার রাস্তায় বিনয় অজ্ঞাত শত্রুর হাতে ধরা পড়ে, সেদিন উদাসীবাবা তাঁর আসর ভেঙে নৌকাযোগে গঙ্গা ধরে উত্তর-মুখো হন। বিনয়ের পকেট থেকে বিনয়ের যে হাতের লেখা পাওয়া যায় তাই নকল করে উদাসীবাবা নিবারণবাবুকে একখানা চিঠি লেখেন। বিনয়ের নিরুদ্দেশের দশদিন পরে সেই চিঠি নিবারণবাবুর হাতে এসে পড়ে। আলমোড়া থেকে বিনয় লিখছে ঃ

কাকাবাবু,

আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনার গুরুদেবের কথা উল্লেখ করে আপনাকে মনোকষ্ট দিয়েছি। আমি যে কেন এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি তা কাউকে বলে যেতে পারলাম না। যদি পারেন, পিসিমাকে দেখবেন। ইতি—

উদাসীবাবা যদিও তাঁর নিজের কাজেই নিজের পরিচয় বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন, তবুও তাঁর আর একটু পূর্ব-পরিচয় দেওয়া দরকার। উদাসীবাবা নিজে একটা-কিছু করবার জন্যে তাঁর এই আখড়ার পত্তন করেছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন এক অতি রহস্যময় গুপ্তদলের ভাড়াটে লোক! তাঁর কাজ ছিল, ছেলে সরবরাহ করা। এই সমস্ত ছেলে নিয়ে, কোনও সুদূর পার্বত্য-অঞ্চলের নির্জনতার মধ্যে এক অতি দুঃসাহসী তান্ত্রিক এক লুপ্ততন্ত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে, চেষ্টায় ছিলেন, নর-রাক্ষস তৈরি করবার। এই সমস্ত রাক্ষসের চেহারা ঠিক মানুষের মতোই হবে, বাইরের দিক থেকে তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু সন্দেহ করবার কোনও কারণ থাকবে না। কিন্তু আসলে তার মন, শক্তি এবং প্রকৃতি হবে সবই রাক্ষসের মতো। সেই বিলুপ্ত তন্ত্রের মতে, এইসব নর-রাক্ষস তাদের স্ব-স্ব প্রভু ছাড়া জগতে আর কারুর কোনও কথা শোনে না এবং জগতের কোনও বিষ বা আঘাত তাদের ওপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরা তখন অসাধ্য-সাধন করতে পারে। একদিন মানুষ যেমন দেবতা হবার জন্যে যোগ-যাগ, উপবাস ইত্যাদি বহুভাবে পালন করে এসেছে, এই বিলুপ্ত তন্ত্রের যিনি শাস্ত্রকার, তাঁর মতে, এইভাবে উল্টোদিকেও মানুষকে গড়ে তোলা যায়। মানব-সমাজ থেকে দূরে, মানুষকে নিয়ে এই ভয়াবহ পরীক্ষা সেদিন চলেছিল এবং বিনয়ের চরম দুর্ভাগ্য যে, সেই ভয়াবহ পরীক্ষার মধ্যে তার মতো ছেলে গিয়ে পড়ে।

উদাসীবাবা ফিরে এসে স্থির করলেন, যেখানে আখড়া ছিল সেইখানেই আবার ফিরবেন। তিনি তাঁর লোকদের পাঠিয়ে সমস্ত খবর নিলেন। নিবারণবাবুর কাছেও তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন...তাঁর অকস্মাৎ চলে যাওয়াতে নিবারণবাবু অত্যন্ত দুঃখিতই হয়েছেন এবং কৌশলে সে-লোকটি নিবারণবাবুর কাছ থেকে মিঃ গুপ্ত এবং বিনয় সম্বন্ধে সমস্ত খবর আদায় করে আনে। উদাসীবাবা সম্বন্ধে নিবারণবাবুর বিশ্বাস তেমনি আছে। মিঃ গুপ্ত প্রথম-প্রথম সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু এখন আর উদাসীবাবা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সন্দেহ নেই। তিনি একরকম ধরেই নিয়েছেন যে, বিনয় আত্মহত্যা করেছে...মিঃ গুপ্তের পরামর্শ অনুসারে সে-কথা তিনি গোপনে রেখেছিলেন, এ-সংবাদ উদাসীবাবা সমস্তই সংগ্রহ করিতে পেরেছিলেন। যার ওপর সন্দেহের দরুন বিনয়ের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল, সেই ঘণ্টাকে তিনি ফেরবার পথে নির্জন পথ-হারা অরণ্যে একা ফেলে আসেন...বাঘ আর ভাল্লুকের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, মানুষের জগতে ফিরে আসবার তার আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাকে

তিনি অন্য উপায়ে আরও নিশ্চিতভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু কোথায় কেমনভাবে কখন পাথরের বুকে শীর্ণ জলের রেখা লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না, সেইটুকু মায়ার দুর্বলতায় উদাসীবাবা ঘন্টাকে আর নিজের হাতে প্রাণে মারলেন না। তবে তিনি জানতেন, যে-অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে এসেছেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার কোনও সম্ভাবনাই ঘন্টার ছিল না।

এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে উদাসীবাবা সাহসে ভর করে আবার তাঁর সেই পুরনো আখড়াতেই ফিরলেন। তিনি জানতেন যে, সেইখানে ফিরে এলে লোকে আর তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

ফিরে এসে দ্যাখেন, পরিত্যক্ত কুঁড়েগুলি জীর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কলোনির লোকেরা একদিন সকালে বিস্মিত হয়ে দেখল যে, উদাসীবাবার আখড়ায় আবার মানুষের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে কথাটা উদাসীবাবার পূর্বতন ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, বাবার আবির্ভাব হয়েছে!

দরজার গোড়াতেই ছিলেন, কপিলেশ্বরবাবু। প্রথমে এলেন তিনি, চরণে প্রণাম করে বললেন, আমরা তো ভেবেই সারা! ভাবলাম, আমাদের ভাগ্যে নেই!

উত্তরে—উদাসীবাবা দূরের দিকে চেয়ে, গলায় একটু শব্দ করে মৃদু হাসলেন মাত্র।

নিবারণবাবুর কাছে সংবাদ পৌঁছতেই তিনি সোজা মিঃ গুপ্তের থানায় গিয়ে উঠলেন। আনন্দে তাঁর বিপুল কলেবর কাঁপছিল। কোনওরকম ভূমিকা না করেই তিনি মিঃ গুপ্তকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠলেন, বলেছিলাম মিঃ গুপ্ত! দেখুন, আমার কথা সত্যি হল কি না! আরে বাবা, মানুষ চরিয়ে এতবড় হলাম, আর আমি কিনা মানুষ চিনি না!

মিঃ গুপ্তও শুনেছিলেন, যে উদাসীবাবা ফিরে এসেছেন এবং তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, লোকটা যদি কোনও অসৎ দলের নেতা হবে, তবে আপনা থেকে সে সেই জায়গায় ফিরে আসবে কেন?

নিবারণবাবু বলে উঠলেন, কি মিঃ গুপ্ত? বলি যে-লোকটা পালিয়ে যায়, সে আবার নিজে এসে ধরা দেয় নাকি? ছি-ছি, আপনারা কী সব তখন ভেবেছিলেন বলুন দেখি? এখন চলুন!

মিঃ গুপ্ত নিজের মনে সত্যি-সত্যি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, আপনি যান নিবারণবাবু, আমি এখন আর যেতে পারছি না।

নিবারণবাবু নাছোড়বান্দা! আরে ভায়া, সাধু-স্থানে কি লজ্জা করতে আছে? আর, আমি তো আর উদাসীবাবাকে কোনও কথা বলছি না।

নিবারণবাবু মিঃ গুপ্তকে ছাড়লেন না। পথে যেতে-যেতে নিবারণবাবু মিঃ গুপ্তকে বললেন, দেখুন মিঃ গুপ্ত, বাবাকে বিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। সবাই তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে বলেই জানে, দেখা যাক, তিনি কী বলেন?

নিবারণবাবু ও তাঁর সঙ্গে মিঃ গুপ্তকে দেখে উদাসীবাবা বাইরে থেকে ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের গ্রহণ করলেন, যেন কোথাও কিছু হয়নি!

নিবারণবাবুর একান্ত ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, এতদিন আপনি কোথায় অন্তর্ধান করেছিলেন?

উদাসীবাবা হেসে বললেন, কোথায় আর যাব বাবা, এইখানেই ছিলাম। দেখছিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর তোমাদের কতখানি দরদ!

শেষের কথাগুলো নিবারণবাবুর বুকে গিয়ে যেন কাঁটার মতো বিঁধল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, যে সব সাধককে সংসারের সীমানায় থেকে সাধনা করতে হয়, তাদের বড় বিপদ বাবা! পদে-পদে লোকে তাদের ভুল বোঝে, অতি সন্তর্পণে তাই মানুষের সমাজে তাদের বাস করতে হয়। ভেবেছিলাম, কাল পূর্ণ হয়েছে...তাই চলে গিয়েছিলাম...কিন্তু যাঁর কৃপায় আমার এ-জীবন...তিনি আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলেন...এখনও কাল পূর্ণ হয়নি।

BanglaBook.org

শেষের কথাগুলো যে মিঃ গুপ্তকে লক্ষ করে ছোঁড়া হয়েছে, তা বুঝে মিঃ গুপ্ত বড়ই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। দোটানার মধ্যে পড়ে তাঁর মন তলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে উঠছে দেখে নিবারণবাবু অন্য কথা উত্থাপন করলেন...আপনি বিনয়ের কথা নিশ্চয়ই ভোলেননি?

—বিনয়! কে?

—আমার সঙ্গে যে-ছেলেটি আসত?

—ও হো-হো...হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছেলেটির মুখে তখন বাপু কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখেছিলাম, তোমাদের বলব-বলব করে আর বলা হয়নি।

নিবারণবাবু ও মিঃ গুপ্ত দুইজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাদের কোনও কথা বলার আগেই উদাসীবাবা নিজে জিজ্ঞাসা করলেন, বলি, ছেলেটি ভালো আছে তো?

নিবারণবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে তো আজ কয়েক মাস হল নিরুদ্দেশ! আপনি যেদিন চলে গেলেন, সেদিন থেকে তারও আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না!

উদাসীবাবা হেসে বলে উঠলেন, তাই থেকে তোমরা ধরে নিলে যে, আমিই বুঝি ছেলেটিকে চেলা করলাম! তা বাবা, ভালো জিনিস দেখলে আমাদের একটু-আধটু লোভ যে হয় না, তা নয়। ভালো খাবার, ভালো পোশাক দেখলে যেমন তোমাদের মন আনচান করে, তেমনি আসল মানুষ বা, তার একটা টুকরো দেখলেই আমাদের মনটাও কেমন আনচান করে ওঠে!

মিঃ গুপ্ত এতক্ষণে তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ আবার ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন...বিনয় সম্বন্ধে কোনও খবর আপনি দেন...।

কথা শেষ করবার আগে উদাসীবাবার দিকে মিঃ গুপ্তের নজর পড়তেই তিনি দ্যাখেন যে, বাবা ধ্যানস্থ! নিবারণবাবু তখন ইশারায় জানালেন যে, ভয় নেই। বাবা ধ্যানে বসেছেন, সত্যি-মিথ্যে এখুনি বলে দেবেন।

মিঃ গুপ্ত বা নিবারণবাবু—এঁরা ইচ্ছে করেই বিনয়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই চিঠিটার কোনও উল্লেখ করেননি। কিছুক্ষণ পর উদাসীবাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাইলেন।

নিবারণবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, বাবা!

মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বাবা বললেন, সে তো আর জীবিত নেই, মিঃ গুপ্ত! তার আত্মা দেখছি, হিমালয়-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে...বড় ব্যথিত...আত্মহত্যা করেছে কিনা!

মিঃ গুপ্ত এবং নিবারণবাবু দুজনেই আঁতকে উঠলেন! নিবারণবাবুর দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। বাবার অসাধারণ ক্ষমতার এরচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ নিদর্শন আর কী হতে পারে?

উদাসীবাবা বললেন, নিবারণ, তোর উচিত, তার প্রেতকৃত্যের একটা ব্যবস্থা করা।

নিবারণবাবু বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বড় ভালো ছেলে ছিল সে!

—তুমি নিজে গয়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করতে পারো কিংবা আমাকে যদি বলো, আমি লোক পাঠিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—সেই ভালো বাবা, আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি একটা লোক দিয়ে ব্যবস্থা করে দিন!

BanglaBook.org

এগারো

এ-ধারে বিনয়ের যখন প্রেতকৃত্যের ব্যবস্থা হচ্ছিল, ও-ধারে বিনয় তখনও প্রেতলোকে গিয়ে পৌঁছয়নি, তবে প্রেতলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে তার আত্মা কাঁপছিল!

বিনয়ের জ্ঞান হলে সে দেখল, তার সামনে এক দীর্ঘ জটাজুটধারী বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে! বৃদ্ধ বটে,

কিন্তু তাঁর দেহের কোথাও এতটুকু জায়গা যৌবনের সাবলীল ঋজুতাকে হারায়নি। দুটি চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে! দীর্ঘ-লম্বিত বাহু, সেই বাহুর শেষে আঙুলগুলিও বাহুর তুলনায় দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি বিনয়ের দিকে চেয়েছিলেন। একটু-একটু করে যখন বিনয়ের জ্ঞান ফিরে এল, বিস্ময়ে সে সেই অপরূপ ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর সেই অপরূপ বৃদ্ধটি বললেন, তুমি ভেবেছিলে, লোকটাকে পাথর চাপা দিয়ে খুব পালালে! দেখছ, পালাতে পারোনি?...যে একবার এখানে ঢোকে তার আর পালাবার কোনও উপায় নেই...সমস্ত পথঘাট বেঁধে আমি আমার এই সাধন-গুহা তৈরি করেছি...তুমি না দেখতে পাও, এর প্রত্যেকটি জায়গা, প্রত্যেকটি ছিদ্র আমি সতর্ক-প্রহরী দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি। অতএব, ফিরে যাবার আশা মন থেকে ত্যাগ করে দাও।

বিনয় চুপটি করে সব শুনল। হ্যাঁ কিংবা না...ভালো কিংবা মন্দ—কিছুই বলবার বা ভাববার শক্তি যেন তার ছিল না।

সেই বৃদ্ধটি তেমনি নিস্পৃহকণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন, তবে, তোমার জীবনের কোনও ভয় নেই। তুমি যদি আমার পরামর্শ মতো ভালোছেলের মতো চলো, তাহলে দেখবে, আমি তোমাকে এক নতুন মানুষ করে গড়ে তুলব...আর যদি বেয়াড়াপনা করো, তাহলে তোমার আগে যাদের নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম তাদের যে-দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে...তোমার বিশ্বাসের জন্যে আমি তোমাকে সে-দৃশ্য দেখাতে চাই।

এই বলে তিনি তিনবার কী নাম ধরে ডাক ছাড়লেন...বিনয় দেখল, পাহাড়ের এক কোণ থেকে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে এল, লোকটি আরও কাছে এলে...লোকটিকে যেন এর আগে সে কোথায় দেখেছে...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, উদাসীবাবার আখড়াতেই দেখেছে...এই সেই লোক, যার হাতে সে ছ'টা আঙুল দেখেছিল...উদাসীবাবার আখড়া থেকে এই অজানা পার্বত্য-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা সে যেন মনে-মনে গেঁথে ফেলল।

লোকটা কাছে আসতে দলপতি-বৃদ্ধ তার নাম ধরে ডেকে বললেন, ঘণ্টা, তোমার ওপর ভার দিলাম এই ছেলেটির...এটি তোমারই শিকার, সুতরাং তোমারই জিম্মায় একে রাখলাম! একে তুমি ৩নং গুহায় নিয়ে যাও...সেখানে একবার একে দেখিয়ে দাও—এর মতো যারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাদের কী অবস্থা হয়েছে...তারপর রাত্তিরে ওকে ৫নং গুহায় রেখে দেবে...বুঝলে?

বিনয় দেখল, ঘণ্টা তার দিকে এগিয়ে এল...একবার মনে হল যে, শিকারী-কুকুরের মতো লাফিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, বাঁচবার যদি কোনও সম্ভবনা থাকে, তবে তাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলে কী লাভ?

বিনয়ের দু-পাশ থেকে দুজনে এসে পিছমোড়া করে তার দু-হাত বেঁধে ফেলল, তারপর একটা পুরু কালো ন্যাকড়া দিয়ে তার দু-চোখ ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল। সেই অবস্থায় ঘণ্টা তাকে নিয়ে চলল।

কোথা দিয়ে, কীভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, সে তা কিছুই বুঝতে পারল না, শুধু বুঝতে পারল, তাকে বারকতক উঁচু আর নিচু ওঠা-নামা করতে হচ্ছে। পথে যেতে-যেতে বিনয়ও কোনও কথা বলে না, যে লোকটা তাকে নিয়ে চলেছিল, সে-ও কোনও কথা বলে না...।

তোমরা হয়তো ভাবছ, ঘণ্টা এখানে এল কী করে! তাকে তো উদাসীবাবা নিবিড় বনে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে ফেলে রেখে এসেছিলেন! আজ বারো বছর ধরে এই লোকটা উদাসীবাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছে, তাঁর সমস্ত পাপ-কাজে সেই-ই ছিল তাঁর প্রধান সহায়। সে যখন দেখল, নির্জন অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে তাঁরা চলে গিয়েছেন, তখন তার ক্রূর মনে সবচেয়ে বেশি রাগ জেগে

BanglaBook.org

উঠল তাঁর প্রতি, যাকে সে কুকুরের মতো এতদিন ধরে অনুসরণ করে এসেছে। এতদিন তার মনে যে-অনুরাগ, যে-প্রভুভক্তি ছিল, আজ তা তেমনি তীব্র প্রতিহিংসায় পরিণত হল। সে মনে-মনে স্থির করল যে, কোনওরকমে যদি সে একবার এই বন থেকে বেরুতে পারে, সে জানে কী করে এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ নিতে হয়! প্রথম দিন সূর্যের আলো থাকতে-থাকতে সে নিজের মনে একদিক ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু যত হাঁটে, বন ততই যেন গভীর হয়ে ওঠে। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। নিবিড় বনের মধ্যে সে-অন্ধকার যে কী ভয়ানক-মূর্তি হয়, তা যে ভুক্তভোগী সে-ই শুধু জানে।...তখন সে নিরুপায় হয়ে একটা গাছের ওপর চড়ে রাত কাটাবার মনস্থ করল, গাছের ওপর চড়ে সে যত শোনে বাঘের ডাক, ততই তার মনে পড়ে উদাসীবাবার চেহারা আর সেইসঙ্গে বন্য হিংস্র পশুর মতো সে ক্ষেপে ওঠে! উদাসীবাবাকে যদি পায় এইমুহূর্তে, সে যেন তাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফ্যালে! রাত প্রভাত হলে সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল! কিছু পথ হাঁটে আর গাছে চড়ে দেখে কোথাও খালি জায়গা কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। হঠাৎ দুপুরের দিকে এক উঁচু গাছে চড়ে দেখতে পেল, সে যেদিক ধরে যাচ্ছিল, তার বাঁ-দিকে আকাশে অসংখ্য শকুনি উড়ছে... শকুনিগুলো পাক খেয়ে-খেয়ে একই জায়গায় ঘুরছে...মনে পড়ে গেল সেই ভয়াবহ বৃদ্ধের কথা...সে নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছে...কীভাবে বন্দি ছেলেদের অসাড় মৃতদেহ শকুনিদের খাওয়ানো হতো। গাছ থেকে নেমে সে সেইদিকে রওনা হল। সন্ধ্যার মুখে পাহাড়ের সেই চটিতে এসে সে উপস্থিত... পাহাড় থেকে যে দুটি পথ নেমে গিয়েছে, তার দুই মুখে এইরকম দুটি চটি ছিল এবং তাতে একজন করে সেই বৃদ্ধের লোক পাহারায় থাকত। কোনও বন্দি যদি পালাবার চেষ্টায় সফল হত, তাহলে তাকে সেই চটিতে আসতেই হত...সেখান থেকে আবার তাকে বন্দি করে ভেতরে চালান দেওয়া হত। ঘণ্টাকে ফিরে আসতে দেখে, চটিদার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হে, তুমি ফিরে এলে যে?

ঘণ্টা বললে, উদাসীবাবা একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে ঘণ্টা তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য আবার সেই গুহার দেশে ফিরে এসেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—কীভাবে, উদাসীবাবার ওপর সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে।

বিনয়কে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল—এই ছেলেটিকে দিয়ে তো তার কাজ হাসিল হতে পারে! কিন্তু বৃদ্ধ যদি জানতে পারে?...সে স্থির করল, প্রথমে সর্বভাবে সে বৃদ্ধের বিশ্বাস অর্জন করবে, তারপর...

তাই হঠাৎ সে বিনয়ের দিকে চেয়ে বললে, জানো, তুমি কোথায় এসেছ?

—না।

—জানো, এখানে এলে আর কেউ ফিরে যেতে পারে না?

—শুনেছি।

—তুমি ফিরে যেতে চাও?

সেই নিশ্চিত মৃত্যুর দেশে হঠাৎ সেই আশার প্রশ্ন শুনে বিনয় থমকে দাঁড়াল!

—আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

—সত্যি পারো?

—হ্যাঁ।

—আমি যা বলব, ঠিক সেইমতো কাজ করে যাবে...।

—কিন্তু, আমাকে মুক্তি দিয়ে তোমার লাভ?

—আছে! পরে বলব।

আশায়, আনন্দে বিনয়ের বুক উদ্বেল হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

বারো

পরের দিন বৃদ্ধ ঘণ্টাকে ডেকে বললেন, দ্যাখো, তোমার এখন যাওয়া হবে না...ওই ছেলেটির ভার তোমার ওপর দিলাম। ১নং গুহায় ওকে সাতদিন রেখে দেবে এবং প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় এই শেকড়-বাটা জল ওকে খেতে দেবে। আটদিনের দিন ও যখন অচৈতন্য হয়ে পড়বে, তখন আমাকে খবর দেবে। আর, এর মধ্যে যদি দ্যাখো যে, গোলমাল করছে, তা হলে এই জিনিসটা একবার নাকের কাছে শোঁকাবে...তখুনি ও অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

এই বলে সেই শেকড়টি আর একটি বড়ির মতো নরম জিনিস তিনি তার হাতে দিলেন। দেওয়ার সময় বলে দিলেন, এই বড়িটি সম্বন্ধে তুমি নিজে খুব সাবধানে থাকবে, হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই এর কাজ আরম্ভ হবে...সেইজন্যে একে সর্বদাই ভালো করে মুড়ে রাখবে।

তিনদিন ১নং গুহায় থাকার পর ঘণ্টা আর বিনয় গোপনে সেই পাহাড়ে-পথ দিয়ে বেরুল। সেই চটির কাছাকাছি এসে বিনয়কে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে ঘণ্টা চটিদারের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে বলল, কাজ সাবাড়! চলে এসো।

ঘণ্টা আগে-আগে চলতে লাগল—বিনয় তার পিছনে-পিছনে চলল। আজ তার কাছে এই খুনে লোকটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়...কিন্তু তার কাছে রয়েছে সে-বড়ি! যতক্ষণ তার কাছে সেই বড়ি রয়েছে, বিনয়ের মনে সোয়াস্তি নেই!

তিনদিন হাঁটার পর, পাহাড়ে দেশ ছেড়ে তারা সমতল ক্ষেত্রে এসে পড়ল। পথে আসতে-আসতে বিনয় প্রত্যেক পথের মোড়ে একটা করে নিশানা রেখে দিয়ে আসছিল, প্রথমে ঘণ্টা তা লক্ষ করেনি। হঠাৎ তার নজরে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল, এটা কী হচ্ছে কত্তা?

—যদি কোনওদিন ফিরতে হয়...।

—তুমি কি মনে করো কত্তা, বুড়ো যখন জানতে পারবে আমরা পালিয়েছি...সে আর ওখানে থাকবে? সুতরাং বৃথা তুমি কষ্ট করছ... ও-বুড়োকে ধরার আশা তুমি ছেড়ে দাও...যদি তোমাদের শহরে পৌঁছতে পারি... তবে সেই পাজিটাকে শায়েস্তা করতে হবে...তবে, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ—।

—সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, ঘণ্টা! জগতে তোমার কথা কেউ জানতে পারবে না...কিন্তু তোমার ওই মারাত্মক বড়ি তোমাকে ফেলে দিতে হবে।

—এতবড় একটা দামি অস্ত্র ফেলে দিতে হবে? তারচেয়ে আমি এ-জিনিস তোমাকেই দিয়ে দিলাম। আমরা মরণকে নিয়ে খেলা করি...প্রয়োজন হলে আমরা যে-বিশ্বাস মনে আনতে পারি...তা তোমরা পারো না।

এই বলে সেই বড়িটা সে বিনয়ের হাতে দিয়ে দিল—একটা কৌটোতে সেটা ভরা ছিল—বিনয় কৌটোটা পকেটে রেখে দিল।

শেষ

ও-ধারে আজ উদাসীবাবার আখড়ায় খুব শোরগোল। নিবারণবাবু গয়ায় না গিয়ে, বিনয়ের প্রেতকৃত্যের ব্যবস্থা সেইখানেই সারবার ব্যবস্থা করেছেন। সকাল থেকে তিনি নিজে সেখানে মোতায়েন আছেন।

BanglaBook.org

কপিলেশ্বরবাবুও সেখানে আছেন। উদাসীবাবা নিজে পুরোহিতের কাজ করতে রাজি হয়েছেন।

মিঃ গুপ্ত কাজ সেরে সকাল-সকালই চলে আসবেন, কিন্তু ক্রমশ বেলা বাড়তে লাগল। নিবারণবাবু, মিঃ গুপ্তের আসতে দেরি দেখে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। নিবারণবাবু ঘড়ি ধরে আছেন। শুভকাজ সব লগ্ন-অনুযায়ী হওয়াই উচিত।

ঘড়িতে আর মিনিট দুয়েক বাকি আছে দেখে নিবারণবাবু উদাসীবাবাকে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে আহ্বান করে আনতে ভেতরে ঢুকলেন।

ক্ষণকাল পরেই উদাসীবাবা দেখা দিলেন। দিব্য ক্ষৌমবসন-পরা উদাসীবাবা গম্ভীর পদক্ষেপে পুরোহিতের আসনের দিকে অগ্রসর হলেন...।

এমনসময় বাইরে মোটরের শব্দ হওয়াতে সকলেই সেদিকে ফিরে চাইল। মোটর থামতেই মিঃ গুপ্ত নামলেন এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আরও দুজন লোক নামল।

শেষের দুজনকে দেখে নিবারণবাবু এবং উদাসীবাবা দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠলেন!

উদাসীবাবা আসনে বসতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন...কী মনে করে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরের দিকে ঢুকলেন...।

নিবারণবাবু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বিনয়...তার প্রেতাকার্য করতে আজ যাঁরা সবাই এসেছেন...তাঁরা সবাই বিস্ময়ে দেখেন যে, সেই বিনয়! তার নিজের শ্রাদ্ধে সে নিজে এসে উপস্থিত!

বিস্মিত জনতাকে বিমূঢ় করে বিনয় পিস্তল হাতে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল...সঙ্গে মিঃ গুপ্ত।

কালবিলম্ব না করে বিনয় বাঘের মতো লাফিয়ে উদাসীবাবার ঘাড়ের ওপর পড়ে সোজা তার বুকে পিস্তল বসিয়ে হুকুম করল ঃ

—সোজা বেরিয়ে এসো!

বিমূঢ় জনতা দেখল...উদাসীবাবা দু-হাত তুলে পিছু হটতে-হটতে বেরিয়ে আসছেন।

নিবারণবাবু বিমূঢ় বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, বিনয়!

বিনয়, উদাসীবাবার বুকের দিকে তেমনি পিস্তল লক্ষ্য করে হেসে বলে উঠল, অপরাধ নেবেন না, কাকা! আবার ফিরে এলাম...এবং আপনারই চোখের সামনে আপনার ইষ্টদেবতার হাতে এবার হাতকড়ি দিতে হবে।

বলতে-বলতে দুজন পাহারাওয়ালা এসে উদাসীবাবার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।

বিনয় নিবারণবাবুকে ডেকে বলল, অতি দুঃখের বিষয় কাকা, যে, আপনাকে এবার গুরু বদলাতে হবে এবং আপনার গুরু যে কী চিজ তা আপনার গুরুর একদা অনুচর—ঘণ্টার কাছেই সব শুনতে পাবেন।

উদাসীবাবা একবার অতি হিংস্রভাবে ঘণ্টার দিকে চাইলেন।

ঘণ্টা তেমনিভাবে সোজা তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিল, এমনি করেই একদিন পাপের শেষ হয়!

মিঃ গুপ্তের গাড়ি আসামীকে নিয়ে সবেগে থানার দিকে চলে গেল।

BanglaBook.org

কারাগারে কৃষ্ণা

BanglaBook.org

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক

তাড়াতাড়ি কলেজে বেরোবার মুখে যে-পত্রখানা কৃষ্ণার হাতে এসে পড়ল, সেখানা তখন পড়বার সময় না পেয়ে সে তার ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলে।

ক্লাস আরম্ভ হবার দু-মিনিট আগে সে কলেজে পৌঁছল এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বসল। তারপর পত্রের কথা তার আর মনেই রইল না সারাদিন।

বৈকালে বাড়ি ফিরেও সে ভুলেছিল...মনে পড়ল রাত্রে খাওয়ার সময়।...'তাই তো, কী যে ভুল আমার, সারাদিনটা গেল—পত্রখানার কথা মনেও পড়ল না একবার!'

খাবার টেবিলে বসে মামা প্রণবেশ গম্ভীরমুখে বললেন, 'কার পত্র? কে লিখেছে কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা হাসিমুখে বললে, 'সেইকথাই তো বলছি, মামা। চিঠিখানা না খুললে কেমন করে বুঝব যে, পাঠিয়েছে কে আর কোথা থেকে আসছে! মোট কথা, মোটেই সময় পাইনি পড়বার। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া যাক, কী বলো?'

প্রণবেশেরও ইচ্ছা তা-ই। তাঁকেও আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে হবে; কারণ, আজই লাইব্রেরি থেকে তিনি একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস এনে একনিশ্বাসে দু-ঘণ্টায় খান-তিরিশ পাতা পড়ে ফেলেছেন এবং বাকিটুকু যে আজ রাত্রেই শেষ করে ফেলবেন সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

পড়াটা তাঁর বরাবরই ধীর, এজন্য কৃষ্ণার অনুযোগের অন্ত নেই, কিন্তু মামা এককথায় সেরে দেন। তিনি নিজের সঙ্গে কচ্ছপের ও কৃষ্ণার সঙ্গে খরগোশের তুলনা দিয়ে গম্ভীরভাবেই বলেন, 'হলুমই-বা আমি কচ্ছপ, তবু যে-কোনও কাজে আমার নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আছে এ-কথা তো মানবি, কৃষ্ণা! তোর সব কাজ তাড়াতাড়ি—পড়াও তাড়াতাড়ি—একবার চোখ বুলিয়ে যাস বই তো নয়। কিন্তু আমি? আমি যতটুকু পড়ি, চিবিয়ে-চিবিয়ে পড়ি, কুড়ি বছর পরেও সে-পড়ার কথা আমার মনে থাকে—জানিস?'

তারপর আরম্ভ করে দেন ছোটবেলায় শেখা একটি কবিতা—'ও কল মাই ব্রাদার ব্যাক টু মি।' ...আর কবিতার এই লাইনটি আবৃত্তি করেই সগর্বে বলেন, 'দেখলি তো, সেই কোন ছোটবেলাকার কবিতা, আজও কেমন জলের মতো মুখস্থ বলতে পারি—কোথায় কমা, কোথায় ফুলস্টপ, কোথায় সেমিকোলন—কোনও জায়গা আমার ভুল হয় না—তবুও তুই বলতে চাস...'

কৃষ্ণা হাসে। মামার বুদ্ধির প্রশংসা করে...স্মরণশক্তির প্রশংসা করে।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে প্রণবেশ নিজের ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর আরাম করে বিছানায় শুয়ে বইখানা খুললেন।

'মামা, জেগে আছ? ...মামা?'

বলতে-বলতে ভেজানো দরজা ঠেলে প্রবেশ করলে কৃষ্ণা, তার হাতে একখানা খোলা পত্র, মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন!

বইখানা পাশে রেখে দিয়ে প্রণবেশ আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা বললে, 'এই দেখো, কী অদ্ভুত একখানা চিঠি এসেছে! নাঃ, যত সব ভেজাল বাপু, একেবারে জ্বালিয়ে খেলে! এতটুকু সুখ-শান্তি যদি পাওয়া যায়!'

কথা না বলে প্রণবেশ তার হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন; কৃষ্ণা বলে চলল ঃ 'পারব না ইচ্ছে করলেই হয় না, মামা, কোথা থেকে ফ্যাসাদ আসে দেখো। এই যে আমার পড়াশুনো—এসব এবার শিকেয় তুলতে হবে, নইলে দেখছি নিস্তার নেই। এখন ভাবছি,

BanglaBook.org

কেনই-বা মরতে শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গেলুম, হল বটে লোকের উপকার, কিন্তু এর ম্যাও সামলাতে আমার যে প্রাণ যায়!'

প্রণবেশ বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'চিঠিখানা আগে পড়তেই দাও বাপু, তারপরে যত পারো কথা বলো—'

প্রণবেশের পড়ায় যে কতটা সময়ক্ষেপ হয় তা অনুমান করে কৃষ্ণা চুপ করলে। সে তাকিয়ে রইল মামার মুখের দিকে।

পড়তে-পড়তে প্রণবেশের মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠল। প্রায় দশ মিনিট তিনি একাগ্রমনে পত্রখানা পড়লেন, তারপর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন—'উঁহু, বড় জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে কৃষ্ণা, এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো।'

প্রণবেশের সামনা-সামনি চেয়ারখানায় বসে কৃষ্ণা বললে, 'কিন্তু, আশ্চর্য দেখেছ মামা, তোমাদের সঙ্গে আবার এঁদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, মায়ের সেই সম্পর্ক ধরে এই মেয়েটি আমার মাসি হয় বলতে পারো। কিন্তু কই মামা, কোনওদিনই তো তোমাদের মুখে এই বোনটির কথা শুনিনি বাপু!'

প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'আমিও এঁদের বিশেষ চিনিনে, কৃষ্ণা। তবে বাবার মুখে একবার শুনেছিলুম, তাঁর এক ভাই নাকি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে যান, তারপর অনেক সন্ধান করেও তাঁরা সেই ভাইয়ের কোনও খোঁজ পাননি। এখন এই চিঠিখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি আগে মালয়ে, পরে আসামের ল্যাংটিংয়ে ছিলেন এবং সেখানেই বিবাহ করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরই এই মেয়েটি বিপদে পড়ে তোমায় পত্রপাঠ যাওয়ার জন্যে লিখেছে, এই তো?'

কৃষ্ণা বললে, 'হ্যাঁ, পড়লে তো, এর ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ পিতাকে ওদের শত্রুরা বন্দি করে রেখেছে...পুলিশের সাহায্য নিয়েও তাঁকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি, সেইজন্যে আমার সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি, এ-মেয়ে আমাকে চিনলে কী করে! আমি যে মাঝে-মাঝে শখের গোয়েন্দাগিরি করি তাই-বা জানলে কীভাবে, অবাক হয়ে শুধু সেই কথাই ভাবছি।'

একটু হেসে প্রণবেশ বললেন, 'খবরের কাগজের মারফতে তুমি যে কতখানি বিখ্যাত হয়ে পড়েছ, তা তো জানো না, কৃষ্ণা! মাকড়সার মতো আপনার জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও, বাইরের জগৎ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে। তারপর এই কিছুদিন আগে মিঃ সেনের মামলায় তোমার নামটা আরও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। যাক, এখন কী করবে তাই বলো দেখি?'

বিকৃতমুখে কৃষ্ণা বললে, 'আমার চেয়ে সে-ভাবনা তোমারই করা উচিত মামা। তোমার কাকা...তাঁর মেয়ে...বিশাল সম্পত্তিও যে সঙ্গে নেই তাই-বা কে বলতে পারে? মেয়েটি মানে, তোমার এই বোনটি যে খুব বিপদে পড়েই এ-চিঠি লিখেছে এটা তো বুঝছ!'

লজ্জিত প্রণবেশ ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ, বুঝেছেন তিনি।

কৃষ্ণা হাতের পত্রখানা নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'যাক, ঘরেই আসা যাক—কী বলো, মামা? বেশিদূর তো নয়; মানে, তোমার-আমার কাছে পথের দূরত্ব বেশি নয়। আর, আমার চেয়ে তোমারই আপনার লোক তো বটে!'

প্রণবেশ বাধা দিলেন, রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'ও-কথাটি বলো না, কৃষ্ণা। দেখছ তো এ-মেয়ে বাঙালি নয়, নাম রয়েছে রুমা। কোন জাত তাও জানিনে, তবু আমাকে তার নামগোত্র বলতে হবে এ হতেই পারে না। কোথাকার কে পথের মেয়ে, কোন একটা হারানো সম্পর্ক ধরে কিনা—।'

রাগে-রাগে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

তাঁর রাগ দেখে কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'যাকগে, ধরলুম তোমার কেউ নয়, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি অসহায় মেয়ে; তার বৃদ্ধ পিতা শত্রুর হাতে বন্দি, কেবল এইজন্যেই আমি তার কাজ করতে

BanglaBook.org

যাব। মেয়েদের বিপদে মেয়েরা না দেখলে কে দেখবে বলো? সেইজন্যেই আমার যাওয়া উচিত, তা ছাড়া যখন এসব ব্যাপারের কিছু-কিছু আমার জানা আছে।' একটু থেমে সে বললে, 'কাল সকালেই তুমি বরং দুখানা টিকিট করে নিয়ে এসো মামা, দেরি করো না। সামনে পুজোর ছুটি আসছে, একদিন বাদেই কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে, ছুটির অবকাশটা না-হয় ওধারটায় কাটিয়ে আসা যাবে—কী বলো?'

এ-প্রস্তাবে প্রণবেশ মোটেই খুশি হলেন না। পুজোর আনন্দটা যে তিনি বাংলার বাইরে গিয়ে নষ্ট করতে চান না, সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়; বললেন, 'পুজোটা বরং কেটে যাক, তারপর একদিন রওনা হলেই হবে, না কি বলো, কৃষ্ণা?'

হাতের পত্রখানার উপর চোখ রেখে কৃষ্ণা বললে, 'দেরি করেই বা লাভ কী, এখন গেলে, এ-মাসের মধ্যেই আবার ওখানকার কাজ সেরে ফিরে আসতে পারব।'

একটু ইতস্তত করে প্রণবেশ বললেন, 'পুজোর সময়টা কলকাতার বাইরে যেন কেমন-কেমন লাগে!'

কৃষ্ণা বললে, 'কী যে বলো মামা! আচ্ছা, তোমার বয়েস কত হলো বলো তো? আজও কি ছেলেমানুষ আছ, যে, পুজোর সময় নতুন জামা-কাপড় পরে নেচে বেড়াবে? না, না, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না মামা, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হও, নইলে কেউ তোমায় মানবে না। যাক, কাল সকালেই একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো, আমরা পরশু রবিবারে এখান থেকে রওনা হয়ে যাব।'

সে উঠে দাঁড়াল।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে প্রণবেশ বললেন, 'রবিবার না গিয়ে, সোমবার গেলেই তো হয়।'

কৃষ্ণা ফিরে দাঁড়িয়ে, বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'কেন, রবিবারে তোমার কোনও জরুরি কাজ—মানে, তোমাদের ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন না কি?'

প্রণবেশ ব্যায়াম-সমিতির একজন সভ্য। গোপনে-গোপনে তিনি যে শক্তিচর্চা করেন, কৃষ্ণার পরিহাসের ভয়ে তিনি এ-কথা কৃষ্ণাকে জানাননি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণা সে-কথা জানতে পেরেছে।

লজ্জিত প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'না-না, তা ঠিক নয়, কথাটা হচ্ছে—রবিবার, নিষ্ফলা বার কিনা...।'

'নিষ্ফলা বার!'

কৃষ্ণা হেসে উঠল। ...'নাঃ, পাঁজিপুঁথিও দেখতে শিখেছ মামা, এবার হাঁচি-টিকটিকি, কাশি-হাসি-কান্না সবকিছুই মানবে, আর আমাকেও মানাবে দেখছি। ওসব আশ্চয্যি বিধান একালে চলবে না, মামা...নিষ্ফলা হলেও আমার অধ্যবসায়ে আমি ওই নিষ্ফলা বারটাকেই সফলা করে তুলব। তুমি বাপু আর ফ্যাকড়া তুলো না, এখন একটু স্বস্তিতে কাজ করতে দাও আমায়।' বলেই বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা ভেজিয়ে দিতে-দিতে আবার বললে, 'ও ডিটেকটিভ-উপন্যাসখানা আজ তুলে রেখে দাও মামা, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমোও।'

তারপর আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

দুই

এত জায়গা থাকতে মায়ের কাকা যে আসামে গিয়ে পড়লেন কেন, আর সেখানেই-বা সংসার পেতে বসলেন কী জন্যে, কৃষ্ণা বুঝতে পারে না।

কিছুকাল আগে বিশেষ কাজের জন্যে তাকে একবার আসামে যেতে হয়েছিল। আসামের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত দু-দিনের জন্যে ভালো লাগলেও, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা যায় না বলেই তার বিশ্বাস।

BanglaBook.org

ট্রেনে বসে সে আর-একবার পত্রখানা পড়ল।

পত্রখানা পোস্ট হয়েছে গৌহাটি থেকে। পত্রের ভিতরে এককোণে গ্রামের নাম দেওয়া আছে—'মিয়াং', তার নিচে তারিখ দেওয়া। তারিখ দেখে বোঝা যায়, এ-পত্র লেখা হয়েছে, আজ থেকে ঠিক উনিশ দিন আগে।

অপরিচিতা মেয়েটি লিখছে ঃ

প্রথমে এই পত্রখানা হাতে পড়লেই ভাববে, কে ইনি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমি অপরিচিতা নই! তোমার মা আমার দিদি ছিলেন, সে-হিসাবে আমি তোমার মাসিমা।

আমার বাবা ভবতোষ চৌধুরী, তোমার মায়ের নিজের কাকা। ভাগ্যদোষে তিনি আজ এখানে তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হয়ে আছেন। তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে, এখানকার পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সে-সন্ধান পায়নি। জানি না এ-পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে কি না, কারণ, আরও যতবার এমনিভাবে পত্র দিয়েছি, কোনও পত্রই আমার বিশ্বাসী কেউ পোস্ট করেনি। আজ পাঁচটাকা পাওয়ার লোভে একটি গরীবের ছেলে এ-পত্র ডাকে দেবে বলেছে। যদি এ-পত্র পাও, একটুও দেরি না করে পত্রপাঠ চলে আসবে। গৌহাটিতে নেমে, ব্রহ্মপুত্রে নৌকায় আসতে হবে—ওখানে খোঁজ করলে এ-জায়গার সঠিক বিবরণ জানতে পারবে, আসা মুশকিল হবে না। ট্রেনের পথ নয়, মোটরে আসা চলে, কিন্তু মোটর নিতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে, আমায় হয়তো এরা সরিয়ে ফেলবে এখান থেকে। তোমরা নৌকা-পথে এসো। কাছারী-ঘাট থেকে দক্ষিণে চার মাইলের বেশি হবে না। এলে সব বলব।

—হতভাগিনী রুমা।

প্রণবেশ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন...ট্রেন আমিন-গাঁওয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে...স্টিমারে ওপারে পাণ্ডুতে পৌঁছে আবার ট্রেনে গৌহাটি যেতে হবে।

পত্রখানা ভাঁজ করে রেখে কৃষ্ণা মুখ তুললে। সন্ধ্যা হতে এখনো দেরি আছে। ট্রেন যত এগিয়ে চলে, দূরের পাহাড়শ্রেণী ততই কাছে আসছে দেখা যায়।

এদিককার স্টেশনের ব্যবধান বড় বেশি। কৃষ্ণা যখন পত্র পড়ছিল, সেইসময় একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতে, কত লোক নেমে গেছে, উঠেছেও কয়েকজন, কৃষ্ণার তখন সেদিকে খেয়াল ছিল না। এখন পত্রখানা রেখে দিয়ে মুখ তুলতেই সামনে সে যে-লোকটিকে দেখতে পেলে, তার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না...দীর্ঘ দেহ, গায়ের রং তামাটে, একটা চোখ নেই, চোখের সাদা অংশটা শুধু উঁচু হয়ে উঠেছে। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে আছে, পানের ছোপে সেগুলো লাল হয়ে গেছে, সমস্ত মুখে তার বসন্তের ছোট-ছোট চিহ্ন।

একটা চোখেই সে চেয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে, তার সে-দৃষ্টিতে বুকের ভিতরে রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায়, কৃষ্ণা অস্বস্তি বোধ করে।

লোকটার গায়ে বার্মিজদের মতো ঢিলে জামা, পরনে নীল-ডোরা লুঙ্গি, মাথায় খুব ঘন কোঁকড়া চুল...এক পলকের দৃষ্টিতেই কৃষ্ণা এগুলো দেখে নিলে।

তারপর প্রণবেশের দিকে সরে বসে আর-একবার তাকিয়ে দেখলে, লোকটা ততক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, বাইরের পানে তাকিয়ে আছে...জানলার দিকে খানিকটা সরেও গেছে।

এতক্ষণে ধ্যানমগ্ন প্রণবেশের বাহ্যিক-জ্ঞান ফিরে এল। তিনি কৃষ্ণার দিকে ফিরতেই কৃষ্ণা চাপা সুরে বললে, 'পথে-ঘাটে অতটা আত্মসমাহিত হওয়া উচিত নয় মামা, বাইরের সঙ্গে কিছুটা

BanglaBook.org

সম্পর্ক রাখা দরকার।'

প্রণবেশ বলতে যাচ্ছিলেন, 'কিন্তু—।'

কৃষ্ণা বাধা দিলে, 'থাক কিন্তু, তারচেয়ে এসো খানিকটা গল্প করা যাক, টাইমটেবলটা দেখো তো—গৌহাটিতে আমরা পৌঁছব কখন?'

প্রণবেশ টাইমটেবলের পাতা উল্টে দেখে বললেন, 'সন্ধের পরে পৌঁছব। কিন্তু তোমার মুখখানা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ হয়েছে না কি?'

তারপর কতকটা স্বগতোক্তি করলেন, 'তা আর হবে না? ছুটি হতে না-হতে আজ চলো আসাম, কাল চলো সীমান্তপ্রদেশে, পরশু চলো বিহার, তার পরদিন বম্বে! একটু বিশ্রাম নেই। শরীর আর কত সইবে!'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'কিন্তু মহাজনের বাণীটা স্মরণ করো, মামা—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়"। সেই মহাজনের নীতি অনুসারে চলো—শরীর হবে লোহার বলের মতো, যেদিকে গড়িয়ে দেবে, সেইদিকে চলবে।'

'তা বলে'...প্রণবেশ মুখ তুলে তাকাতেই একচক্ষু সেই লোকটির উপর চোখ পড়ে, তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না। সে-লোকটিও তাঁর পানে চেয়েছিল; হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আবার বাইরের দিকে চাইলে।

'বার্মিজ কিংবা অসমীয়া।' প্রণবেশ অস্ফুট উক্তি করেন।

কৃষ্ণা বললে, 'যাই হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না, মামা। আমাদের কাছে সবাই সমান। মোট কথা, বাংলার আমদানি নয়, আর মনে হয় যেন পরিচিত...ও-মুখখানা কিছুদিন আগের দেখা। ভোল ফেরালেও চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।'

সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে বর্মার স্মৃতি—মাতা-পিতার মৃত্যু-কাহিনী মনে পড়ে যায়। নির্দয় দস্যুদের হাতে একদিন তার পিতা-মাতা উভয়েই নিহত হয়েছিলেন; হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে, তবু বেদনা তার বুক হতে মেলায়নি। আসামের পার্বত্য অঞ্চল আজ তার মনে বর্মার স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিল...স্বর্গগত পিতা-মাতার কথা বিশেষ করে মনে-করিয়ে দিচ্ছিল।

প্রণবেশ স্নেহের ভাগিনেয়ীর অন্তরের ব্যথা বুঝলেন, তাই হাতখানা সস্নেহে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু মা, বাপ-মা কারও চিরকাল বেঁচে থাকে না এ-কথা তো জানো। আমিও কিছু ভুঁইফোড় ছিলুম না। আমি ছিলুম মায়ের কোলের ছেলে—মা তাই আমাকেই ভালোবাসতেন বেশি। সেই মা যখন মারা গেলেন, আমি বুঝতে পর্যন্ত পারলুম না, তাই মরা মাকেই বারবার ধাক্কা দিয়ে "মা! মা!" বলে ডাকতে লাগলুম—।'

তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; বললে, 'মা যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যেতেন, আমার দুঃখ থাকত না, মামা। কিন্তু মাকে যে হত্যা করা হয়েছে! বাবাকেও তা-ই। ডাকাতেরা সবাই প্রায় ধরা পড়েছে জানি, ওদেরই দলের সেই আ-চিন দস্যুটা এতদিন কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, আজ এই প্রথম ওকে দেখতে পেলুম। আ-চিনও যে আমায় প্রথমে চিনতে পারেনি, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে তা বুঝেছি—যখনই ও বুঝেছে যে, ওকে চিনতে পেরেছি, তখনই ও চোখ ফিরিয়ে সরে বসেছে। তা হলেও চোখটা কিন্তু ওর এইদিকেই আছে—দেখছ? ও ভাবছে, আমাদের কথার এতটুকু টুকরোও যদি ওর কানে যায়—'

প্রণবেশ সচকিত হয়ে ওঠেন, শশব্যস্তে বলেন, 'থাক-থাক, আর এসব কথাবার্তায় কাজ নেই বাপু, কে জানে, শুনতে পেয়ে আবার কী ফ্যাসাদ বাধাবে! ওইজন্যেই তো আমি—'

ভ্রূকুঞ্চিত করে কৃষ্ণা বললে, 'খেপেছ মামা, ট্রেনের যা শব্দ, এতে একহাত দূরের

BanglaBook.org

কথাও শোনা যায় না। আর আমাদের এসব কথার একটা বর্ণও যদি ও শুনতে পেয়ে থাকে, তবুও—।'

পিছনের বেঞ্চে একটা লোক এসে বসায় কৃষ্ণা চুপ করলে, হাতের টাইমটেবলটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে, 'যাক, আর দেরি নেই, বোধহয় এসে পড়েছে।'

আমিন-গাঁওয়ে ট্রেন থামতেই যাত্রীরা সব নেমে পড়ল।

সামনে ব্রহ্মপুত্র। স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ যাত্রী ওপারে যাবে, খুব কম লোকই আমিন-গাঁওয়ে থেকে গেল।

স্টিমারে ওঠবার সময় পিছন ফিরে কৃষ্ণা দেখলে, সেই একচক্ষু দস্যু আ-চিনও আসছে, সেও সম্ভবত ওপারে যাবে।

প্রণবেশ কেবিনের মধ্যে কৃষ্ণাকে বসিয়ে, বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালেন—তারপর রেলিংয়ে ভর দিয়ে সবেমাত্র ব্রহ্মপুত্রের সৌন্দর্য দেখছেন, সহসা...।

'বাবু কোনখানে যাবে?'

চমকে উঠে প্রণবেশ চেয়ে দেখলেন, তাঁর পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে...পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে আরাকানের লোক মনে হলেও, কথা শুনলে তাকে চট্টগ্রামের লোক বলে ধরা যায়।

লোক ভুল করেছে হয়তো। প্রণবেশ একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার জলের দিকে চাইলেন। তুফান-তরঙ্গে চঞ্চল কালো জল। এপারে-ওপারে পাহাড়...দিগন্ত-বিস্তৃত কেবল পাহাড়ের শ্রেণী। সেইসব পাহাড়ের গায়ে পটে-আঁকা ছবির মতো পাহাড়িদের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে...চমৎকার দৃশ্য!

লোকটা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, এবারে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কলকাতা থেকে আসছ বাবু? গৌহাটি যাবে, না কামিখ্যে যাবে?'

প্রণবেশ জবাব দিলেন; রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'যেখানেই যাই না, তোমার সে-খবরে দরকার কী বাপু? তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে! আমার খবরে তোমার দরকারটা কী বলো দেখি?'

লোকটি নিতান্ত নিরীহভাবে হাত কচলায়, খানিকক্ষণ অ্যাঁ-উঁ করে মাথা চুলকোয়, তারপর বলে, 'না বাবু, আমার এমন কিছু দরকার নয়। কলকাতায় আমার ছেলে থাকে কিনা; বড়বাজারের বেহারিবাবু গৌহাটিতে আসবেন, তাঁকে গৌহাটিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ছেলে আমায় চিঠি লিখেছে—আমি যেন আমিন-গাঁও থেকে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। সেইজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম বাবু, আমার নিজের কোনও দরকার নেই।'

'ও।' প্রণবেশ আশ্বস্ত হন। করুণার দৃষ্টিতে লোকটির পানে তাকিয়ে বলেন, 'না বাপু, আমার নাম বেহারিবাবু নয়, দেখো গিয়ে আরও জনকয়েক বাঙালি এসেছেন, ওঁদের মধ্যে কেউ যদি বেহারিবাবু থাকেন।'

বাবুর মিষ্টিকথা শুনে লোকটি কৃতার্থ হয়ে অভিবাদন করে অন্যদিকে চলে গেল।

BanglaBook.org

তিন

গৌহাটি পৌঁছেই পরিচিত লোক পাওয়া গেল। প্রণবেশের বন্ধু সুজন মিত্র এখানে পুলিশ-বিভাগে কাজ করেন, স্টেশনেই দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল।

'আরে, প্রণব যে! হঠাৎ এখানে?'

প্রণবেশ থমকে দাঁড়ালেন।

সুজন মিত্র যে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন নওগাঁ থেকে, তা তিনি জানতেন না। নওগাঁ থেকে তিনি কতবার প্রণবেশকে পত্র দিয়েছেন—প্রণবেশ যদি ওখানে বেড়াতে আসেন, কিন্তু প্রণবেশ বড় একটা কোথাও যেতে চান না। পত্র দিয়ে-দিয়ে বিরক্ত হয়ে শেষে সুজন পত্র দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, সেইজন্যেই প্রণবেশ জানতে পারেননি যে, সুজন এখানে কাজ করছেন।

প্রফুল্লমুখে তিনি সুজনের প্রসারিত হাতখানা চেপে ধরলেন—'আরে, তুমি এখানে! যাক, আর ভয় নেই কৃষ্ণা, সুজনের এখানেই ওঠা যাবে।'

'কৃষ্ণা!' বিস্মিত সুজন পিছনে তাকান—'তাই তো, কৃষ্ণাও এসেছে যে! তোমার বিরাট দেহের আড়ালে কৃষ্ণাকে দেখতে পাইনি। যাক, এখন কী মতলবে দুই মামা-ভাগনী হঠাৎ আসামে পদার্পণ করেছ বলো দেখি? বিনা উদ্দেশ্যে যে নয়, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার করলে, বললে, 'উদ্দেশ্যটা পরেই শুনবেন, এখন থাকবার মতো একটু জায়গা পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। অজানা দেশ, নির্ভর করবার মতো আশ্রয়ের অভাবে শেষে স্টেশনেই না রাত কাটাতে হয়!'

সুজন মিত্র শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তাই কখনো হতে পারে, যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে! যদিও আমি থানায় এখন একাই আছি, তবু সেখানেই তোমাদের জায়গা দিতে পারব, শুধু আজকের জন্যে নয়—যতদিন তোমরা এখানে থাকবে ততদিন স্বচ্ছন্দে আমার ওখানে থাকতে পারবে। তা ছাড়া যদি পুলিশের কোনও সাহায্য দরকার হয়, তাও পাবে।'

কৃষ্ণা বললে, 'ভগবান হয়তো সেইজন্যেই স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, থানাতেই চলুন, সেখানেই কথাবার্তা হবে।'

সামনেই ঠিকা-গাড়ির আড্ডা। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে প্রণবেশ ও কৃষ্ণা যখন উঠছিলেন, সেইসময় কৃষ্ণা দেখলে, ট্রেনের সেই সহযাত্রীটিও অদূরে একখানা গাড়ি ঠিক করছে।

থানায় পৌঁছে প্রণবেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, স্নানাদি সেরে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, 'ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন, বুঝেছ, কৃষ্ণা! এবারে অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারা যাবে।'

কৃষ্ণা শূন্য চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'তিনি যে মঙ্গলময় সে-বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটানোর জন্যে যে আমরা এখানে আসিনি, সে-কথাটাও মনে কোরো মামা!'

এ-কথা শুনে প্রণবেশ যেন ভাবরাজ্য থেকে ধূলার ধরণীতে ফিরে এলেন; লজ্জিত-হাস্যে বললেন, 'সে-কথা আমার খুব মনে আছে কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা বললে, 'সত্যি, একটা অনিশ্চিতের পিছনে ধাওয়া করে এসে, ভগবানের কৃপায় সুজন-মামাকে যে পেয়ে গেছি, এ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। উনি পুলিশের লোক, নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন, সেদিক থেকে ওঁর কাছে আমরা অনেক সাহায্য পাব।'

বাইরে সুজন মিত্রের কথা শোনা যায়। তিনি কৃষ্ণা ও প্রণবেশকে থানায় নিজের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে, তাদের ভার ভৃত্য শামুয়ার হাতে দিয়ে ডিউটিতে চলে গিয়েছিলেন, এইমাত্র ফিরলেন।

'ঘুমুলে নাকি প্রণবেশ!'

দরজার কাছে সুজন মিত্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণবেশ বললেন, 'এত সকাল-সকাল ঘুমের অভ্যেস নেই আমার, তুমি ভেতরে এসো, অনেক কথা আছে।'

ভিতরে আসতে-আসতে সুজন মিত্র বললেন, 'এই যে, শামুয়া উপযুক্ত অতিথি-সৎকার করেছে দেখছি। এইজন্যেই তো ওকে ছাড়তে চাইনে। শামুয়া?'

হাঁক পাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে এসে দাঁড়াল শামুয়া।

BanglaBook.org

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্না হয়ে গেছে?'

শামুয়া উত্তর দিলে, 'জী।'

সুজন বললেন, 'ঘণ্টাখানেক পরে সবাইকে একসঙ্গে খেতে দেবে—যাও, এখন বিশ্রাম করো গে।'

হুকুম পেয়েই শামুয়া অদৃশ্য হল।

কৃষ্ণা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'একে কোথায় পেলেন সুজন-মামা, এ তো এই দেশেরই লোক দেখছি।'

সুজন বললেন, 'সে বড় করুণ কাহিনী, মা! হ্যাঁ, এ-বেচারা এই আসাম অঞ্চলেরই লোক। আমি যখন বদরপুরে কাজ করি, সেইসময় একদিন একে এর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাই। জঙ্গলের ধার দিয়ে আসছিলুম, আমার সঙ্গে ছিল দুজন কনস্টেবল; সেইসময় একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে আমি কনস্টেবল দুজনকে নিয়ে গিয়ে দেখি, একে পাঁচ-সাতজন লোক চেপে ধরেছে, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা দড়ির ফাঁস, সেই ফাঁসটা সে এর গলায় পরাবার চেষ্টা করছে, আর শামুয়া প্রাণপণে চিৎকার করছে। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। কারণ, এইরকম মৃত্যুর কেস দুটো আমি হাতে পেয়েছিলুম—সোজাকথায়, গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা যাকে বলা চলে।'

রুদ্ধশ্বাসে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

সুজন বললেন, 'তারপর রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করতেই লোকগুলো শামুয়াকে ফেলে ছুটে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালাল...কাছে গিয়ে দেখলুম, বেচারা শামুয়া জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। তখন কনস্টেবলদের সাহায্যে তাকে নিয়ে এলুম আমার বাংলোয়, সেই থেকে আজ এই একটা বছর শামুয়া আমার কাছেই আছে।'

কৃষ্ণা বললে, 'তাদের সম্বন্ধে শামুয়া কী বলল?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'শামুয়া যা বললে তা আমাদের কাছে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হলেও, এদের ওসব নিত্যকার ব্যাপার। এদের তোমরা জানো না। এরা একদিক দিয়ে সরল হলেও, অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত বদরাগী। সোজাকথায় যাকে বলে—প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদের মধ্যে দলাদলি খুব বেশি। এই দলগত ব্যাপারে এদের ক্ষতিও বড় কম হয় না। শামুয়া ছিল একটা দলের সর্দার। এই দলকে অন্য দল সহ্য করতে পারত না—দুই দলে প্রায়ই মারামারি বাধত। সেই বিপক্ষ দলই একদিন সুযোগ পেয়ে শামুয়াকে ধরে ফেলেছিল—আর এইভাবে তাকে হত্যা করবার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'শামুয়ার আত্মীয়স্বজন আছে তো, তারা কোথায়?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'ছিল সবাই, কিন্তু এখন কেউ নেই। মাস-পাঁচেক আগে শামুয়া একদিন ওদের লুকিয়ে নিজের ঘর দেখতে গিয়েছিল, সেখানে দলের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জেনেছে, তার মা-বাপ-ভাই-বোন, সকলকে ওরা হত্যা করেছে, তার ঘরের চিহ্নমাত্র নেই।'

প্রণবেশ বিবর্ণমুখে বললেন, 'কী নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা! তবু তুমি তাদের সরল বলো, সুজন?'

সুজন হাসলেন; বললেন, 'সরল বইকী। আমাদের দেশের লোকের তুলনায় এরা অনেক সরল। এদের সঙ্গে ব্যবহার করলে জানতে পারবে, এরা যেমন প্রতিহিংসা নিতে জানে, তেমনি উপকারীর উপকারও কোনওদিন ভোলে না, প্রাণ দিয়েও এরা এদের উপকারীকে বাঁচায়।'

একটু থেমে তিনি বললেন, 'এদের আরও অনেক ব্যাপার আছে, সেসব কথা পরে শুনো, এখন তোমরা কীজন্যে হঠাৎ গৌহাটিতে এসেছ, ধীরে-সুস্থে এবার সেই কথাটা শোনা যাক।'

কৃষ্ণা বললে, 'বিশেষ কোনও কাজের জন্যেই যে এসেছি, তা তো বুঝতেই পারছেন। ক'দিন আগে হঠাৎ একখানা পত্র পেলুম—একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার মাসিমা হন—বড় বিপদে পড়েছেন

BanglaBook.org

তিনি, যে-কোনও রকমে তাঁকে আর তাঁর বাবাকে উদ্ধার করতে হবে।'

সুজন হেসে ওঠেন—তাঁর হাসি আর থামে না।

প্রণবেশ হুঙ্কার ছাড়েন—'আঃ, থামো, থামো বলছি সুজন, তোমার হাসির শব্দে যে ঘরখানা ভেঙে পড়বে!'

খানিকটা দম নিয়ে একটা সশব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে সুজন হাসি থামান, বলেন, 'এখান থেকে তিনি তোমায় খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে...ডিটেকটিভের কাজে খুব নাম করে ফেলেছ দেখছি।'

কৃষ্ণার মুখখানি লাল হয়ে ওঠে, সে একবার প্রণবেশের দিকে তাকায়, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'ভুল করছেন। আমি ডিটেকটিভ নই—আত্মীয়তা হিসাবে তিনি আমায় পত্র দিয়েছেন আর আমিও মামাকে নিয়ে সেইজন্যেই এসেছি। আমার মনে হয়, পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ এত কর্মতৎপর যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কিছু কিনারা করতে পারেনি।'

ফিরিয়ে আঘাত পেয়ে সুজন মিত্রের মুখখানা এবার লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'কেসটা শুনলে আমি বুঝতে পারব কীসের জন্যে তোমরা এসেছ। প্রণবেশকে বলছি, যদি সে—'

কৃষ্ণা বাধা দিলে—'না, মামার বলার চেয়ে, আমিই আপনাকে বলছি শুনুন।' বলে সে ব্যাগ খুলে নিজের ছোট ডায়েরিটা বার করে বললে, 'এই আসামে ল্যাংটিং স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে একটা ছোট গ্রামে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বহুকাল থেকে বাস করছিলেন, এ-অঞ্চলে অনেকগুলো চা-বাগান তাঁর ছিল, তা ছাড়া কমলালেবুর ব্যবসায়ও ছিল তাঁর—'

'রোসো, রোসো!'

সুজন তাড়াতাড়ি উঠে একখানা মোটা খাতা বার করে আনলেন, তারপর টেবিলে খাতাখানা রেখে তিনি তার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায় থামলেন ঃ

'হ্যাঁ, এই তো লেখা আছে—ভবতোষ চৌধুরী, ইনি কয়েকটা চা-বাগানের মালিক ছিলেন, অনেকগুলি কমলালেবুর বাগানও তাঁর ছিল। হাতিখালিতে তিনি বাস করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যা ছিল তাঁর জীবনের অবলম্বন। মনে হয়, তোমার দাদু ইনিই, আর তাঁর মেয়েটি হচ্ছেন তোমার মাসিমা।'

তিনি কৃষ্ণার পানে তাকালেন।

কৃষ্ণা বললে, 'তাঁর চিঠি পড়ে তাই তো মনে হয়।'

সুজন নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ ডায়েরির পাতা ওল্টাতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করো কৃষ্ণা, আজ তোমরা বড় ক্লান্ত। আমি কাল এ-সম্বন্ধে তোমাদের জানাব, আর তোমরা যদি সেখানে যেতে চাও তো তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' বলে তিনি ওঠবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু একটা কথা বলে যান যে, আপনারা তা হলে এঁদের ব্যাপার কিছু-কিছু জানেন।'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'শুধু জানি নয়, আমরা সত্যিই হয়রান হয়ে গেছি! এ-কেস আমারই হাতে আছে, তাই বলছি, সুবিধা এতে আমাদের উভয়পক্ষেরই হল। যে-কোনওদিন তোমাদের ওখানে নিয়ে যাব, অবশ্য গৌহাটি থেকে অনেকটা দূরে যেতে হবে, লামডিং পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন বদল করে আমাদের যেতে হবে—ল্যাংটিং। সেখানে পৌঁছে, ওখান থেকে দশ মাইল যেতে হবে। আমরা হাঁটতে পারলেও, তুমি সেই চড়াই-উতরাই ভাঙতে পারবে না কৃষ্ণা, তা আমি জানি। আবার একখানা ডুলির ব্যবস্থা করতে হবে কিনা—সেটা লামডিং-এ পৌঁছে একদিন থেকে করা যাবে।'

'চড়াই-উতরাই—প্রায় দশ মাইল!'

স্থূলদেহ প্রণবেশ একেবারে হাঁপিয়ে ওঠেন।

BanglaBook.org

কৃষ্ণা তাঁর পানে তাকিয়ে হেসে ওঠে, তারপর সুজনের দিকে ফিরে বলে, 'কিন্তু সুজন-মামা, কেবল একখানা ডুলি করলেই কি চলবে? তা হলে মামাকে এখানে রেখে যেতে হয় যে। নইলে আমি খানিকটা হাঁটব...মামা খানিকটা হাঁটবেন...এমনি করে আমাদের দশ মাইল আর দশ মাইল এই কুড়ি মাইল পথ চলতে হবে।'

'আবার দশ মাইল!'

প্রণবেশ যেন আকাশ হতে পড়েন...'কী আবোল-তাবোল বকছিস কৃষ্ণা? এক দশ মাইলের ঠেলায় অন্ধকার, আবার দশ মাইল এতে তুই যোগ দিচ্ছিস কোথা থেকে! এ দশ মাইল তুই পেলি কোথায়?'

কৃষ্ণা আবার হাসে—'বেশ বলছ মামা। আসবার সময় আবার ওই দশ মাইল আসতে হবে না হেঁটে?'

প্রণবেশ করুণ চোখে সুজনের দিকে তাকান, কিন্তু সুজনের মুখেও হাসি দেখে, লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেন।

সুজন বললেন, 'আচ্ছা, সেসব কালকের কথা কাল হবে, আজ তোমরা বিশ্রাম করো। প্রণব আর আমি পাশের ঘরে থাকব কৃষ্ণা, তুমি এই ঘরে থাকো। কিছু ভয় নেই, থানা সুরক্ষিত, বেশ নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারবে।'

তিনি অগ্রসর হলেন, প্রণবেশও উঠলেন।

চার

সকালবেলা প্রোগ্রাম ঠিক করার সময় কৃষ্ণা অপরিচিতা মেয়ে রুমার পত্রখানা বার করে সুজনের সামনে ধরল।

'আসল এই পত্রখানার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম সুজনমামা। এই পত্রখানা পেয়েই আমি এসেছি। এতে যে-জায়গাটার কথা লেখা আছে, সেটা আপনার এরিয়ার মধ্যে পড়ে—এই দেখুন পত্রখানা, একে এই গৌহাটির কাছে কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে, এখানে যাওয়ার পথের কথাও আছে দেখুন।'

সুজন ব্যগ্রভাবে পত্রখানা পড়তে লাগলেন। কৃষ্ণা দেখতে পেলে—পড়তে-পড়তে তাঁর মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠল।

পড়া শেষ করে কৃষ্ণার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে কেবলমাত্র বললেন, 'হুঁ।'

কৃষ্ণা পত্রখানা নিয়ে ব্যাগে রাখতে-রাখতে বললে, 'আমার মনে হয়, একটু তাড়াতাড়ি এখানে খোঁজ নিতে যাওয়া উচিত। চিঠিখানার তারিখ দেখুন, আজ থেকে ঠিক তেইশ দিন আগে এই চিঠিখানা কলকাতায় পৌঁছেছে, তার দু-তিনদিন পরে আমার কলেজের ছুটি হয়েছে, তারপর আমরা রওনা হয়েছি—।'

এবারে সুজন বাধা দিলেন—'অর্থাৎ সোজা কথা এই বলো যে, এতদিন এই মেয়েটিকে দুর্বৃত্তেরা ওখানে রেখেছে কি না। হ্যাঁ, এ-কথা সম্ভব, এঁকে এর মধ্যে ওখান হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। যাক, এখন আমরা যা খবর পেয়েছি সেটা আগে শোনো। ভবতোষ চৌধুরী ও-অঞ্চলে বেশ নামকরা লোক। তিনি ল্যাংটিংয়ের ওদিকে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করলেও, থাকতেন বেশিরভাগ ওইখানে, তাঁর মেয়ে রুমাদেবী ওইখানেই কলেজে পড়তেন।'

কৃষ্ণা অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তিনি কোথায় থাকতেন?'

সুজন বললেন, 'এখানে ভবতোষ চৌধুরী বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আমি তোমাদের এখন

BanglaBook.org

সেখানে নিয়ে যাব, বাড়িখানা তোমরা দেখতে পাবে। রুমাদেবী এখানে বি.এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, তাঁর জন্যেই ভবতোষ চৌধুরীকে বেশিরভাগ এখানে থাকতে হত। ইদানীং একবছর তিনি ল্যাংটিং-এ যাননি, সর্বদা এখানেই থাকতেন। সব বিষয়েই তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী—খেলাধুলা, গান-বাজনা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ, রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকেই তাঁর উৎসাহ দেখা যেত। অর্থ ছিল তাঁর প্রচুর, সবদিক দিয়ে তিনি দু-হাতে খরচ করতেন। তাঁর মতো লোককে সর্বদা এখানে পেয়ে—।'

প্রণবেশ মৃদু হেসে বললেন, 'এখানকার লোকেরা বেঁচে গিয়েছিল—কেমন?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'তা তুমি বলতে পারো। তাঁর পর্যাপ্ত দানই তাঁকে অনেক বড় করে তুলেছিল সাধারণের কাছে। তাঁর বাড়িতে সর্বদাই লোকজন আসত, কত দেশের গল্প-আলোচনা চলত। এরই মধ্যে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন ভবতোষ চৌধুরী নিজেই থানায় এসে হাজির...আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, এখানে থাকা তাঁর আর পোষালো না—তিনি কাল কিংবা পরশু কলকাতায় চলে যাবেন। এই দু-একদিনের জন্যে তিনি আমার কাছে জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ চান।'

'সশস্ত্র পুলিশ!!'

কৃষ্ণার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—'আপনি দিয়েছিলেন?'

বেদনার হাসি হেসে সুজন বললেন, 'ওপর থেকে অর্ডার না পেলে তো আমি দিতে পারি নে। এ-কথা তাঁকে বলায় তিনি খানিক চুপ করে বসে রইলেন। তাঁকে নীরব দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেন তিনি সশস্ত্র পুলিশ চান? তার উত্তরে তিনি কেবলমাত্র বললেন, তিনি সর্বদাই জীবনের আশঙ্কা করছেন, কেবল তাঁর নিজেরই নয়—তাঁর মেয়ে রুমার পর্যন্ত।'

প্রণবেশ ফোঁস করে উঠলেন, 'বেচারা! কিন্তু তুমি এ-কথা শুনেও অর্ডারের অপেক্ষা করলে সুজন, জনকতক পুলিশ দিতে পারলে না?'

সুজন মুখ বিকৃত করলেন—'না। কারণ, একটা থানার ভার আমার ওপর, বেশি কনস্টেবল তখন আমার হাতে ছিল না, কাজেই সেটা সম্ভব হয়ে উঠল না। থানায় আমায় কিছু লোক রাখতেই হবে।'

কৃষ্ণা কী ভাবছিল, মুখ তুলে বললে, 'তারপর কী হল?'

সুজন বললেন, 'তারপর যা হল তা আর না বললেও চলে। রাতটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলুম, গত রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা শুধু জিনিসপত্রই নিয়ে যায়নি, সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে গেছে বাড়ির মালিক ভবতোষ চৌধুরীকেও।'

রুদ্ধশ্বাসে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'আর রুমাদেবী?'

সুজন বললেন, 'রুমাদেবী পুলিশে খবর দিলেন, জোর এনকোয়ারি চলল, কিন্তু ভবতোষ চৌধুরীকে আমরা আর পেলুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রুমাদেবীও হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করলেন, তাঁরও কোনও খোঁজখবর পেলুম না আমরা। রুমাদেবী অনেক কথাই বলেছিলেন, তাঁর কথা যে সত্য তা বিশ্বাস করাবার জন্যেই তিনি হাতিখালি থেকে কাগজপত্র আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে আর ফেরেননি তিনি। শেষটায় আমাকেও যেতে হয়েছিল সেখানে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে।'

শান্তকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, 'আমার মনে হয়, এখানে কোনও বিপদাশঙ্কা করে হাতিখালি গিয়ে, তারপর তিনি সেখান থেকে সরে পড়েছেন। হয়তো এমন কোনও নিরাপদ জায়গাতে তিনি আছেন, যেখানে বিপদের—।'

সুজন বললেন, 'যেখানে বিপদের আশঙ্কা নেই সেখানে গেছেন বলছ তো? কিন্তু পুলিশের হাতে যখন তিনি এ-ভার দিয়েছেন, পুলিশই তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, এ-অবস্থায় তিনি

BanglaBook.org

পুলিশকে না জানিয়ে, একা চলে যেতে পারেন না—অন্তত্তপক্ষে আমার তাই বিশ্বাস। মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছেন, তাঁর যেসব শত্রু অনিষ্ট করছে, তারাই তাঁকে কোনওরকমে সরিয়ে রেখেছে, যাতে পুলিশ তাঁর কাছ থেকে কোনও সন্ধান না পায়।'

কৃষ্ণা এ-কথার কোনও উত্তর দিল না।

প্রণবেশ একটা হাই তুললেন, দীর্ঘ একটা আড়মোড়া ছেড়ে বললেন, 'এরই নাম "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো"। কোথায় সেই কলকাতা—পুজোর আনন্দে সেখানকার ছোটবড় সবাই আজ পাগল, আর আমরা কিনা আসামের এই থানায় বসে ভাবছি যতসব অবান্তর কথা—যত সব...।'

কৃষ্ণা মুখ তুললে, কঠিন কণ্ঠে বললে, 'আবার সেই পুরনো কথা। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ফিরে যাও মামা, এত কষ্ট স্বীকার করে যে-জন্যে এসেছি তা আমি করবই। তোমার বোন বলে নয়; একটি মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে এই ইচ্ছা নিয়েই আমি এখানে এসেছি।'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'মাথা খারাপ করো না হে প্রণব, কৃষ্ণার কথা খুব সত্যি। এসে পড়েছ যখন, থেকে যাও।'

প্রণবেশ জানলার দিকে মুখ করে বসলেন। খুশি যে তিনি মোটেই হননি তা তাঁর গম্ভীর মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

সুজন বললেন, 'যাই হোক, কথা-কাটাকাটি এখন থাক, এখনকার যা কাজ তাই হোক। কৃষ্ণাকে নিয়ে আজ আমি একবার ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে যাব, সেখানে গেলেই কৃষ্ণা অনেক কিছু জানতে পারবে।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সে-বাড়িতে এখন কে আছে?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'ভবতোষবাবুর অনেককালের পুরনো চাকর রতন আছে। লোকটা বাঙালি, বয়স প্রায় ষাট বছর হবে। বহুকাল থেকেই সে ভবতোষবাবুর কাছে আছে, তোমার অনেক-কিছু জানবার কথা তার মুখে শুনতে পাবে। তুমি তৈরি থেকো কৃষ্ণা, আমি বেলা তিনটে-নাগাদ ফিরে তোমায় নিয়ে যাব।'

প্রণবেশ সবেগে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'তার মানে? তুমি এখন কোথাও বেরোচ্ছ না কি?'

সুজন বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বেরুতে হবে বইকি! জানোই তো, ডিউটি ইজ ডিউটি,—চাকরি বজায় রাখতে এখনই যেতে হচ্ছে, কারণ কানপুরে ভীষণ একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তার এনকোয়ারি করতে হবে।'

উৎকণ্ঠিতভাবে কৃষ্ণা বললে, 'খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে দুপুরে আপনার?'

সুজন বললেন, 'ফিরে এসে যা হয় হবে। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ো, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। আমি তিনটের মধ্যেই এসে পৌঁছব।'

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

পাঁচ

যে-সময়ে ফেরবার কথা, তার অনেক পরে ফিরলেন সুজন মিত্র। কানপুরেই স্নানাহার শেষ করে এসেছেন তিনি, এখানে আর কোনও ঝামেলা পোহাতে হল না।

কৃষ্ণা প্রস্তুত হয়ে ছিল, প্রণবেশ এর মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন তাই মনটা তাঁর বেশ

ভালো আছে। পোশাক ছেড়ে, বসবার ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসতে-বসতে সুজন বললেন, 'পুলিশের কাজ সত্যিই বড় ঝকমারির কাজ, নিশ্চিন্ত হয়ে দু-দণ্ড বসবার যো-টি নেই। রাতদুপুরেও ঘুম ভেঙে উঠে বেরুতে হবে, "না" বলবার উপায় নেই।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ কী হল, সুজনমামা?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'সাংঘাতিক ডাকাতি যার নাম। কানপুরে কমলালেবুর বাগান আছে তো, সেখানকার ম্যানেজার জানকী রায়ের বাড়িতে এই সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। একজন লোক ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে অনেক পীড়ন করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।'

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'আমি প্রথমে যে সন্দেহ করেছিলুম, ওসব আ-চিনের কাণ্ড—এদের বর্ণনা শুনেও তাই মনে হয়।'

'আ-চিন!' কৃষ্ণা একেবারে বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রণবেশ নিজের মাথায় হাত বুলোন, 'আ-চিন?'

সুজন মিত্র সবিস্ময়ে বললেন, 'আশ্চর্য তো! তোমরাও আ-চিনকে চেনো দেখছি।'

প্রণবেশ শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'বার্মিজ ডাকাত আ-চিনকে না চেনে এমন লোক বোধহয় দুনিয়ায় নেই! কৃষ্ণার মা—আমার দিদি আর জামাইবাবু যে বর্মায় নিহত হন তা জানো তো? ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল, পালিয়েছিল কেবল ওই আ-চিন। এখানে আসার সময় আমরা ট্রেনে আমাদের কামরায় তাকে দেখেছি, আমার মনে হয়, এখানে এসেই সে তার দলবল নিয়ে কানপুরে গিয়ে ডাকাতি করেছে।'

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চিনলে কী করে আ-চিনকে? আগে কোনওদিন দেখেছিলে না কি?'

কৃষ্ণা বললে, 'না, মামা তাকে চেনেন না, আমি চিনি। বর্মায় থাকতে আমি তাকে দেখেছি, তার কুৎসিত চেহারা একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। এখানে আসবার সময় একটা ছোট স্টেশনে সে ট্রেনে উঠেছিল, আমিন-গাঁ পর্যন্ত তাকে দেখেছি, তারপর স্টিমারে উঠে আর দেখিনি। সে নিশ্চয়ই গৌহাটিতে এসেছে, এখান থেকে দল নিয়ে গিয়ে ডাকাতি করেছে। ওরকম শয়তান খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় সুজনমামা, কোনও বিপদকেই সে গ্রাহ্য করে না। যাক, ডাকাতি করে সে এবার কী পেলে, জেনেছেন তো?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'তা নিয়েছে অনেক। গতকাল একটা চা-বাগান বিক্রির মোটা টাকা পেয়েছিলেন জানকীরাম। টাকাটা আজ ব্যাঙ্কে জমা করে দেবেন ভেবে, সমস্ত টাকাই একটা ড্রয়ারে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য সন্ধানী আ-চিন দস্যুর গুপ্তচরেরা তাদের সর্দারের কাছে জানকীরামের এই টাকা পাওয়া আর ড্রয়ারে রাখার সংবাদ যথাসময়েই পৌঁছে দিয়েছে।'

সুজন পকেট থেকে ডায়েরিখানা বার করতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা বাধা দিলে, বললে, 'ও-সম্বন্ধে সন্ধ্যার পর আলোচনা করা যাবে সুজনমামা, এখন ডায়েরি নিয়ে বসলে আমার কাজ হবে না। আমাকে আপনি আগে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে চলুন, তারপর আপনার বিশ্রাম।'

সুজন আবার হাসলেন, বললেন, 'বিশ্রাম কথাটা আর বোলো না কৃষ্ণা, বিশ্রাম আমার জীবনে মিলবে কি না জানি নে। রুমাদেবীর এই কেস নিয়েই গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি, এর মধ্যে এসে জুটল আবার ডাকাতি কেস! উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ত দিতে-দিতে প্রাণান্ত হচ্ছে! যাক সে-কথা, তোমাকে নিয়ে যাই চলো, দেখি যদি তুমি ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারো!'

সুজনের সঙ্গে কৃষ্ণা এগিয়ে চলে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রণবেশ যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁদের বাড়িটা এখান থেকে কতদূর!'

BanglaBook.org

সুজন বললেন, 'যতদূরই হোক না, মোটরে যাবে-আসবে, বিশেষ কষ্ট হবে না।'

একখানা জিপে উঠলেন তিনজন।

ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁষে ওই সুন্দর বাংলোটি দূর থেকে দেখলে একখানি ছবি মনে হয়। বাংলোর তিনদিকে ফুলের বাগান, সামনে খেলার লন।

গেটের সামনে একজন কনেস্টবল পাহারা ছিল, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে সে গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল, সুজন জিপখানা ভিতরে নিয়ে গেলেন। লাল টালি-ছাওয়া বারান্দার নিচে গাড়ি দাঁড়াতেই সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়াল একটি বৃদ্ধ। সুজনের মুখে শোনা গেল, 'এরই নাম রতন, ভবতোষবাবুর অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য।'

কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে, জিজ্ঞাসুনেত্রে সে সুজনের দিকে চাইলে। সুজন পরিচয় দিলেন, 'এঁরই নাম কৃষ্ণাদেবী, যার কথা তোমায় বলেছিলুম। বাংলাদেশে এঁর প্রচুর নাম। বয়সে ছোট হলেও এই মেয়েটি ডিটেকটিভের কাজে এমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, যা নামজাদা গোয়েন্দারাও অনেকসময় পেরে ওঠেননি।'

কৃষ্ণা লজ্জিত হয়ে ওঠে, সুজনের কথার মাঝখানে বাধা দেয়, বলে, 'না না, তুমি সুজনমামার কথা শুনো না রতন, উনি অনেক বাড়িয়ে বলছেন।'

স্মিতমুখে বৃদ্ধ বলে, 'উনি না-হয় বাড়িয়ে বলতে পারেন, কিন্তু রুমা-মাও তো তোমার কথা বলছিলেন, মা! তোমার ঠিকানা অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। তারপর রুমা-মা যখন ল্যাংটিং গেলেন, সেইসময় হঠাৎ ঠিকানা পাওয়া গেল।'

সকলে ঘরে ঢুকলেন। উৎসাহিত হয়ে কৃষ্ণা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, 'আগে আমায় সব কথাগুলো বলো তো রতন, খাপছাড়াভাবে শোনার চেয়ে প্রথম থেকে শুনলে, পরে আমি অনেক কিছু জানতে বা করতে পারব যাতে আমার কাজের সুবিধা হবে।'

রতন খানিকটা চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'সে যে মস্তবড় গল্প হয়ে যাবে, মা!'

কৃষ্ণা বললে, 'তবু তার মধ্যে থেকেই আমার যা জানবার তা জেনে নিতে পারব।'

রতন বললে, 'সবই বলব, এখন আগে আপনারা চা খান, চা এনে দিই।'

বাধা দেওয়ার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সুজন ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, 'রুমাদেবীর মুখে যতদূর শুনেছি, তাতে রতনকে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বহুদিনের লোক, বয়সও অনেক। এ-বয়সে লোকে কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

প্রণবেশ সন্দেহজনক হাসি হাসলেন, বললেন, 'আমি যদি পুলিশের কাজ করতুম, আগে এই রতনকেই গ্রেপ্তার করতুম।'

কৃষ্ণা বললে, 'আর সঙ্গে-সঙ্গে ওকে হয় চিরকালের জন্যে জেলে পুরতে, নয়তো ফাঁসিতে লটকাতে—কী বলো মামা? এককথায় সব আপদের শান্তি হয়ে যেত, আমরাও বাঁচতাম, ওরাও বাঁচত।'

প্রণবেশ উত্তর দিলেন না। মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সুজন কী বলতে যাচ্ছিলেন, রতন এসে পড়ায় কিছু বলা হল না। একজন আসামী ভৃত্য এসে চা, বিস্কুট, কেক সামনে সাজিয়ে দিলে।

কৃষ্ণা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, 'এসব কী রতন? এত আয়োজন কে তোমায় করতে বললে, শুনি?'

রতন বেদনার হাসি হেসে বললে, 'এ তো সামান্যই। বাবু কি রুমা-মা থাকলে যা করতেন তা যদি দেখতেন! আপনারা সঙ্কোচ করবেন না, আমি খুব অল্পই এনেছি।'

BanglaBook.org

প্রণবেশই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন দেখা গেল। নিজের ডিশখানা টেনে নিয়ে বললেন, 'খাওয়ার নামে আবার চক্ষুলজ্জা! কৃষ্ণা যেন কী! বিকেল হয়ে গেছে, এ-সময় চা না খেলে কোনও কাজে নাকি মন বসে! তুমি বসো রতন, কথাগুলো বলো। আমরা ততক্ষণ খেতে আরম্ভ করি।'

রতন একখানা টুল টেনে নিয়ে বসল।

ছয়

রতন কাহিনী শুরু করল ঃ

বাংলাদেশের এক গ্রামের ছেলে ভবতোষ চৌধুরী।

ছোটবেলা থেকেই খুব ডানপিটে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে ওস্তাদ। এইজন্যে বড় ভাই আশুতোষের সঙ্গে একবার খুব বিবাদ হয় এবং আশুতোষ তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেন।

দারুণ অভিমানে ও রাগে ভবতোষ বাড়িছাড়া হয়ে গেলেন...তারপর নানা জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে দৈবাৎ রতনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল।

দুজনে মিলল ভালো। দরিদ্র রতনও ভাগ্যান্বেষণে বার হয়েছিল ঘর ছেড়ে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চললেন অজানা দেশের সন্ধানে।

ঘুরতে-ঘুরতে দুজনে গিয়ে পড়লেন সুদূর মালয়ে, সেখানেই তাঁদের অদৃষ্ট ফিরল।

মালয়ে এক রবারের কারখানায় ভবতোষ কাজ পেলেন। কারখানার মালিক বর্মার লোক, তিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাই বিদেশীদের সঙ্গে কারবার করতে খুব অসুবিধা হয়। এখন ইংরেজি-জানা বাঙালি ভবতোষকে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন এবং ভবতোষকে এই কাজের ভার দিলেন। ভবতোষ বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করে রবার বিক্রির ব্যবস্থা করতেন, তাই তাঁর বেতনও ছিল বেশি। রতন করত কুলিদের সর্দারি। মালয়ে প্রচুর রবার গাছ জন্মায় এবং সেই উৎপন্ন রবার বিভিন্ন দেশে চালান যায়।

মিঃ আউ-চি লিংয়ের অনেকগুলি বাগান ছিল; কারখানাও ছিল তাঁর অনেকগুলি। ভবতোষ সেখানে থাকতে হঠাৎ একদিন আউ-চি লিং ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরী হস্তগত করেন।

কীভাবে এই লক্ষ-লক্ষ টাকার বিপুল সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয় তা রতন জানে না। আউ-চি লিংয়ের একমাত্র পুত্র মাও-তুং তখন আমেরিকায় ছিল, শোনা গিয়েছিল যে, সে সেখানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বিবাহ করে বসবাস করছে। আউ-চি লিং তাকে দেশে ফিরে বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার জন্যে অনেকবার লিখেছিলেন, কিন্তু আসা তো দূরের কথা, সে কোনও পত্রেরই উত্তর দেয়নি।

রতন শুনেছিল, পুত্রের উপর রাগ করেই আউ-চি লিং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বস্ত কর্মচারী এই ভবতোষ চৌধুরীকে দিয়ে গেছেন উইল করে। রতন এতে খুব খুশি হয়েছিল।

কিছুদিন পরে ভবতোষের মুখে সে শুনতে পায়, তিনি এখানে আর থাকবেন না, এখানে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। নিত্য অসুখে ভোগার চেয়ে এখানকার বাগান-কারখানা সব বিক্রি করে দিয়ে ভারতে ফিরে তিনি ব্যবসা করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

এরপর সত্যি-সত্যিই একদিন তিনি সব বিক্রি করে দিয়ে আসামে চলে আসেন এবং লোকজনের ভিড় থেকে দূরে নির্জন স্থান ল্যাংটিংয়ের হাতিখালিতে স্থায়ীভাবে বাস করবার ব্যবস্থা

BanglaBook.org

করেন। বলা বাহুল্য, রতনও তাঁর সঙ্গে এখানে আসে।

মালয়ে থাকার সময় ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার একটি মেয়েকে সেখানকার নিয়মানুসারে বিবাহ করেছিলেন এবং রুমাও সেখানে জন্মেছিল। যখন তাঁরা ল্যাংটিংয়ে আসেন তখন রুমার বয়স পাঁচ-ছ'বছরের বেশি নয়।

ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ে অনেকগুলো চা-বাগান কিনে নিয়েছিলেন। রতন রুমাকে দেখা-শুনা করত আর চা-বাগানগুলোর তদারক করত। রুমার মা ল্যাংটিংয়ে আসবার কিছুদিন পরে মারা যান, তারপর থেকে রুমার ভার সম্পূর্ণ ভাবে রতনের উপর পড়ে এবং সম্পূর্ণ বাঙালির মতোই সে মানুষ হতে থাকে।

বেশ স্বচ্ছন্দে দিন যায়, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা পত্র পেয়ে ভবতোষ বড় বেশিরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

চিরদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও কর্মচারী রতন—তাকে তিনি কোনও কথাই গোপন করেননি। রতন ভবতোষ চৌধুরীর কাছে জানতে পারে যে, দীর্ঘকাল পরে মাও-তুং ফিরে এসেছে আর দীর্ঘকাল ধরে ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান করে সে জানতে পেরেছে যে, ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ে হাতিখালিতে বাস করছেন। সে জানিয়েছে, শীঘ্রই সে ল্যাংটিংয়ে আসছে, তার পিতার সম্পত্তি কীভাবে ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয়েছে সে সেই কথা জানতে চায়।

এরপর ভবতোষ চৌধুরী আর সাহস করে ল্যাংটিংয়ে থাকতে পারেননি, তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে তিনি চলে আসেন গৌহাটিতে।

তারপর একদিন এসেছিল মাও-তুং।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করার পর দেশে ফিরেই সে শুনেছে, বাঙালি ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার যথাসর্বস্ব হস্তগত করে শেষে এক ইংরেজ কোম্পানির কাছে সব বিক্রি করে কোথায় চলে গেছেন।

খোঁজ করে সে প্রথমে আসে ল্যাংটিংয়ে, তারপর আসে গৌহাটিতে। এখানে প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয় রতনের এবং সে ভবতোষ চৌধুরীকে খবর দেয়। বলা বাহুল্য, ভবতোষ চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করেননি এবং দারোয়ান দিয়ে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় মাও-তুং শাসিয়ে গেছে যে, সে প্রতিশোধ নেবে। তার পিতাকে হত্যা করে অসৎ উপায়ে ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করেছেন, সে নাকি তার প্রমাণ পেয়েছে এবং অতি শীঘ্র সে ভবতোষ চৌধুরীকে জানিয়ে দেবে যে, বার্মিজরা সরল, উদার এবং বিশ্বাসপরায়ণ হলেও, প্রয়োজন হলে তারা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে।

তারপর বছর-দুই মাও-তুংয়ের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তারপর একদিন রাত্রে...।

ভবতোষ চৌধুরী সেদিন কন্যা রুমা এবং রতনকে বলেছিলেন, তিনি শীঘ্রই কলকাতায় যাবেন। কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর একখানা বাড়ি কেনা হয়ে গেছে! তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি আগেই বাড়ির কথা লিখেছিলেন এবং টাকাও পাঠিয়েছিলেন; বন্ধু বাড়ি কিনে তাঁকে খবর দিয়েছেন এবং সেই পত্রানুসারে তিনি আগামী সোমবার দিন কলকাতায় যাত্রা করবেন।

প্রস্তাবটা রুমার ভালো লাগলেও, রতনের কাছে মোটেই চিত্তাকর্ষক হয়নি। কতকাল আগে সে বাংলা ছেড়ে চলে এসেছে! আজ বাংলায় সে একেবারেই অপরিচিত। তার আত্মীয়স্বজন কেউ বর্তমান নেই, বাড়িঘরেরও অস্তিত্ব নেই। আজ দেশের কেউ তাকে চিনবে না। যেখানে সে আছে, এ-দেশের ওপর তার একটা মায়া জন্মে গেছে, তাই এখান থেকে সে আর কোথাও যাবে না।

মনিবকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক নিন্দনীয় কথা শুনলেও সে কিছুই বিশ্বাস করে না। তার অমতে ভবতোষ চৌধুরী ভিন্ন-জাতের ভিন্ন-দেশের একটি মেয়েকে বিবাহ

BanglaBook.org

করেছিলেন—মনে আঘাত পেলেও সে তাঁকে অপরাধী করতে পারেনি; রুমাকেও সে ঘৃণা করতে পারেনি, অপত্য-স্নেহে তাকে বাঙালির মতোই মানুষ করে তুলেছিল।

যে-সোমবার কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন ঠিক হয়েছিল, তার আগের রবিবার রাত্রি থেকে ভবতোষ চৌধুরীকে আর পাওয়া যায়নি। রাত্রে কে বা কারা তাঁর ঘরের জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল এবং খুব সম্ভব, অচৈতন্যাবস্থায় তাঁকে সরিয়ে ফেলেছে। বাড়িতে অত সতর্ক প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বেমালুম গায়েব হয়ে গেছেন তিনি!

রুমা সকালেই পুলিশে খবর দেন এবং তদন্তে আসেন ইনি, এই সুজন মিত্র। এই তদন্তের জন্যেই সুজন মিত্রের সঙ্গে রুমা হাতিখালি গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে তিনি আর ফেরেননি। সেই থেকে রতন যক্ষের মতো এ-বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। যতদিন তাঁরা না আসবেন রতনের নিষ্কৃতি নেই।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতন চোখ মোছে।

সাত

সুজনের কাছে শোনা যায়, পরদিনই রুমা দেবীকে নিয়ে তাঁর গৌহাটি ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বড়সাহেবের কাছ থেকে জরুরি 'তার' পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই রাত্রেই ফিরতে হয়েছে। রুমাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি চারজন কনস্টেবলকে হাতিখালিতে রেখে আসেন। এখানে এসে আশ্চর্য হয়ে যান যে, সাহেব তাঁকে 'তার' করেননি।

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বললে, 'সে আমি আগেই বুঝেছি সুজনমামা, এ শুধু শত্রুর একটা চাল। আপনি নিজে পুলিশের লোক, চিরকাল এরকম ঘটনা দেখে আসছেন, তবু ওদের ছলনায় ভুলে...আশ্চর্য!'

এ-কথায় সুজন যে একটু অসন্তুষ্ট হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল; তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চিরকাল দেখে আসছি। কিন্তু তবু বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল কৃষ্ণা, কারণ, সাহেব এখানে না থাকায় আমি তাঁকে জানিয়ে যেতে পারিনি। অথচ কতকগুলো জরুরি রেকর্ড আমার জিম্মায় ছিল। 'তার' পেয়ে আমি ভাবলাম, সাহেব ফিরেছেন আর সেই রেকর্ডগুলো তাঁর তখনই চাই। সেইজন্যেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম।'

কৃষ্ণা বললে, 'তারপর আপনি কবে জানলেন যে, রুমাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'তার পরদিন সকালের ট্রেনে আমি সেখানে গিয়ে কনস্টেবলদের মুখে শুনতে পেলাম, সন্ধ্যায় সময় রুমাদেবীর সঙ্গে কে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল, সেই লোকটা চলে যাওয়ার পর রুমাদেবী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাস-দাসী সকলকে হুকুম দেন যে, রাত্রে যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। সকালবেলা দেখা গেল, তাঁর ঘরের দরজা খোলা...তিনি নেই!'

কৃষ্ণা খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর উঠে বললে, 'আপনারা বসুন; আমি রতনের সঙ্গে একবার বাড়িটা ঘুরে দেখে আসি।'

প্রণবেশ একটু হেসে বললেন, 'বাড়িতে কী-ই-বা দেখবে কৃষ্ণা! তারচেয়ে আমার মনে হয়, হাতিখালিতে গেলে বোধহয় কিছু সন্ধান পাওয়া যেত।'

সুজন বললেন, 'কৃষ্ণা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, পুলিশ তদন্ত করতে কিছু কম করেনি। এখনও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি আর ফল যে হবেই এ-বিশ্বাসও রাখি, তবু—।'

কৃষ্ণা বাধা দেয়, হাসিমুখে বলে, 'তা আমি জানি সুজনমামা, রুমাদেবীর কেসটার কিনারা

BanglaBook.org

করতে পারলে আপনার নাম হবে বড় কম নয়। আপনি যথেষ্ট করেছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে একবার দেখি না কেন, তাতে হয়তো আপনারও এতটুকু সাহায্য হবে।'

বলে হাসিমুখেই সে রতনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সুন্দর সুসজ্জিত ঘরগুলি গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। দেখে বোঝা যায়, ভবতোষ চৌধুরী মনের মতো করে বাড়িটিকে তৈরি করিয়েছেন আর পছন্দসই করে সাজিয়েছেন রুমাদেবী; সে-কথা রতনের মুখে শোনা গেল।

রতনের মুখে কৃষ্ণা আরও শুনলে, রুমাদেবী এখানে পড়তেন। এই ঘরে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বড় শান্ত মেয়ে—এখানে তাঁকে কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা যায়নি, বন্ধু-বান্ধব তাঁর কেউ ছিল না।

এই কথাবার্তার মধ্যে বাগানের দিকে খোলা জানলা-পথে একটা মুখ কৃষ্ণার পানে বারেক তাকিয়েই সহসা সরে গেল। কৃষ্ণার কিন্তু চোখ এড়াল না। সে জিজ্ঞাসা করল—'জানলা দিয়ে উঁকি দিলে কে রতন! এখানে কোনও মেয়ে আছে কি?'

রতন উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, ওর নাম সুমিয়া—মালয়ের একটি মেয়ে, মাস তিন-চার হল এখানে এসেছে। রুমা-মায়ের দেশের লোক—ওঁর মায়ের বিশেষ পরিচিত। এখানে আসার পরে চৌধুরীমশাই ওকে রাখতে চাননি, কিন্তু বোবা-কালা মেয়েটা কোথায় যাবে, তাই রুমা-মা ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'বোবা-কালা! বলো কী?' বিস্ময়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে।

রতন বললে, 'হ্যাঁ, কানেও শোনে না, কথাও বলতে পারে না। তবে ভাবে-ভঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে।'

কৃষ্ণা বললে, 'ওকে একবার ডাকতে পারো রতন? একবার ভালো করে দেখি...আলাপ-পরিচয় করি।'

'ডাকছি।'

রতন বাইরে চলে যায় এবং পরক্ষণেই একটি কালো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে; বলে, 'এই সুমিয়া। বয়স এর খুব বেশি নয়, আমাদের রুমা-মায়ের বয়েসী হবে। বেচারা—মানুষ হয়েও অমানুষ—বোবা, কালা, জগতের কিছুই জানল না।'

কৃষ্ণা সুমিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে; তারপর জিজ্ঞাসা করে—'তুমি সুমিয়া, মালয়ের মেয়ে?'

সে নিঃশব্দে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে কেবল হাসে, সাদা-সাদা বড়-বড় দাঁতগুলো তার আমূল বেরিয়ে পড়ে। কৃষ্ণা যত কথা বলে যায়, সে শুধু অ্যাঁ-উঁ শব্দ করে আর হাসে।

কৃষ্ণা হতাশ হয়ে পড়ে, তবু তার মনের সন্দেহ যায় না। এই মেয়েটির হঠাৎ এ-বাড়িতে আসাটাই যেন কেমন সন্দেহজনক মনে হয়। ভবতোষ চৌধুরী মালয় থেকে বহুকাল আগে চলে এসেছেন, সেখানকার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্কই নেই এখন। কোনকালে তিনি মালয়ে ছিলেন, সেই সম্পর্ক ধরে মালয়বাসিনী সুমিয়ার এখানে আসা সত্যিই সন্দেহের কারণ বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা সুমিয়াকে বিদায় দিলে। সে যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকিয়ে রতন আর কথা বলবার সাহস পায় না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সুমিয়া কি কোনওদিন হাতিখালিতে গেছে, রতন?'

রতন মাথা নেড়ে বললে, 'না। ও আসার পর বাবু কি রুমা-মা, হাতিখালি যাননি। বাবু যাওয়ার পর রুমা-মা সুজনবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলেন, সুমিয়া তখন এখানেই ছিল।'

কৃষ্ণা বললে, 'সুমিয়া এখানে আসার পর কোনওদিন কোনও লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে

BanglaBook.org

এসেছিল কি?'

রতন চিন্তা করে, তারপর মাথা নাড়ে 'কই, না। কেউ তো কোনওদিন আসেনি।'

একটু থেমে সে কী মনে করে বললে, 'কিন্তু মনে হয়, মেয়েটা যেন লেখাপড়া জানে। ...তা হতেও পারে, বোবা-কালাদেরও তো ইস্কুল আছে, সেখানে হয়তো পড়েছে।'

'পড়তে পারে?' বলে কৃষ্ণা রতনের পানে তাকাল।

রতন বললে, 'বোধহয় পারে। ওকে মাঝে-মাঝে বাবুর ইংরেজি কাগজ যা আসত তা পড়তে দেখেছি। হতে পারে—মালয়ে ইংরিজি কথাটা খুব চলে তো, কেউ হয়তো ওকে শিখিয়েছিল। হলই-বা বোবা-কালা, তবু ওইটুকুই যে শিখতে পেরেছে, সে-ও তো সাহেবদেরই দৌলতে। যাই বলো মা, সাহেবরা আমাদের দেশে এসে যত যা-ই করুক, উপকারও বড় কম করেনি।

কৃষ্ণা শুধু হাসল, কোনও উত্তর দিলে না।

উৎসাহিত রতন আরও কথা বলতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণার মুখে কোনও কথা না পেয়ে সে দমে যায়...সাহেব জাতের বিশেষ-বিশেষ গুণের কথা আর বলা হয় না।

আট

গৌহাটি পৌঁছে দু-দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে কৃষ্ণা প্রস্তাব করে 'ল্যাংটিং যাওয়া এখন স্থগিত থাক মামা, তার আগে আমাদের যেতে হবে, মিয়াংয়ে—যেখান থেকে রুমাদেবী পত্রখানা লিখেছেন। দেখেছেন তো, তিনি লিখেছেন, পত্রপাঠ যেন আমি ওখানে গিয়ে সন্ধান করি। দেরি করলে হয়তো আর তাঁকে এখানে পাওয়া যাবে না, অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে।'

চিন্তিত মুখে সুজন বললেন, 'কিন্তু, আমায় যে আজই আবার কানপুর যেতে হচ্ছে কৃষ্ণা, বড়সাহেব নিজে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে আমায় যেতে হবে, বিশেষ এনকোয়ারিতে।'

কৃষ্ণা বললে, 'বেশ তো, আপনি কানপুর যাচ্ছেন যান, আমাকে একজন বিশ্বাসী লোক দিন, যে নিয়ে যেতে পারে। স্থান নির্দেশ করাই আছে, শুধু পথটা...।'

বলতে-বলতে সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমাদেবীর পত্রখানা বার করে বললে, 'এই দেখুন না, "কাছারীঘাট থেকে নৌকোয় উঠে, দক্ষিণ দিকে মাইল-চারেক গেলেই এ-জায়গাটা পাবে"। এমন লোক দিন, যে এসব পথ-ঘাট চেনে, জানে। রুমাদেবী ম্যাপ এঁকে দিয়েছেন, শুধু পথ দেখালেই চলবে।'

প্রণবেশ বললেন, 'তোমার শামুয়া এসব জায়গা বেশ চেনে হে! কৃষ্ণা তাকে বলেছিল...তুমি হুকুম করলেই সে যেতে পারে, বললে।'

সুজন বললেন, 'সে যেতে পারে জানি, চিনবেও সব, কিন্তু কথা হচ্ছে, কেবল তাকে নিয়ে সেই অজ্ঞাত স্থানে তোমাদের—বিশেষ করে কৃষ্ণার যাওয়া উচিত হবে না। আমি সঙ্গে থাকলে তবু চলত, কিন্তু ধরো যদি বিপদ ঘটে?'

কৃষ্ণা বাধা দেয়, 'কোনও ভয় নেই সুজনমামা, আমি শামুয়াকে নিয়েই যাব, মামাও সঙ্গে থাকবেন। আমরা বেড়াতে এসেছি মাত্র, কেউ কোনও সন্দেহ করবে না।'

সুজন বললেন, 'তবু যদি বলো, না হয় দুজন কনস্টেবল সঙ্গে যেতে পারে।'

প্রণবেশ খুশি মুখে বললেন, 'ঠিক বলেছ, দুজন কনস্টেবল বরং সঙ্গে চলুক। ওদের কাছে তো রিভলভার থাকবে, যদিই কোনও বিপদ আসে, ওরা লড়বে।'

শক্ত মুখে কৃষ্ণা বললে, 'খেপেছ মামা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, সঙ্গে পুলিশ থাকলে সবাই সন্দেহ করবে যে। কী দরকার ওসব করে? আমরা এমনি বেড়াতে যাব, বেড়িয়ে আবার চলে আসব,

BanglaBook.org

এমন তো অনেকেই বেড়াতে যায় শুনেছি।'

সুজনকে অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হল।

শামুয়াকে ডেকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

শামুয়া নৌকো ঠিক করে আসে। তারপর আহারাদি শেষ করে কৃষ্ণা, শামুয়া ও প্রণবেশ কাছারী-ঘাটে এসে নৌকোয় উঠে বসেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে নৌকো ভেসে চলে সোজা দক্ষিণ দিকে।

শামুয়া এ-অঞ্চলের সব চেনে। চার-পাঁচ মাইলের দূরত্ব সে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'ওসব মাইল-টাইল আমি চিনি নে বাবু, মিয়াংয়ের কাছাকাছি নেমে পড়ে খুঁজতে-খুঁজতে যাওয়া যাবে এখন।'

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর শামুয়া থামবার আদেশ করে মাঝিকে—'এখানে নৌকো বাঁধো, এইখানেই নামব আমরা।'

দু-দিকে পাহাড়...মাঝখানে সরু পথ...গ্রামের লোক খুব সম্ভব এই পথে যাওয়া-আসা করে।

শামুয়া এগিয়ে চলে, পিছনে আসেন প্রণবেশ আর কৃষ্ণা।

দু-দিককার খাড়া পাহাড়শ্রেণীর পানে তাকিয়ে প্রণবেশের বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। মনে-মনে তিনি কৃষ্ণাকে গালাগালি করেন, মুখে কিছু বলতে সাহস পান না।

কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই। পাহাড়ি পথে চলতে প্রণবেশ রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠেন।

তাঁর অবস্থা দেখে কৃষ্ণা মাঝে-মাঝে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর আবার এগিয়ে চলে।

প্রায় মাইল-তিনেক পথ চলবার পর শামুয়া বললে, 'এই জায়গার নাম মিয়াং, বাবু।'

অল্প দূরে একটি লোককে এদিকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু এদের দেখে সে পাহাড়ের আড়ালে সরে যাওয়ার চেষ্টা করবার আগেই কৃষ্ণা তার সামনে গিয়ে পড়ে।

লোকটি অবাক হয়ে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে—কৃষ্ণা তাকে প্রশ্ন করে, কোনও কথারই সে উত্তর দেয় না। প্রণবেশ বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন, 'ছেড়ে দাও কৃষ্ণা, মনে হয় লোকটা বোবা-কালা, নইলে তোমার এত কথার একটা উত্তর ও দিত।'

কৃষ্ণা বলল, 'বোবাও নয়, কালাও নয় মামা, লোকটা জানে সব, অথচ কোনও উত্তর দিচ্ছে না, পাছে কোনও কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমি শামুয়াকে দিয়ে ওকে কথা বলাচ্ছি দেখো।'

শামুয়া আস্ফালন করে—'যা বলেছেন দিদিসাহেব, পাজির পা-ঝাড়া এই লোকটা। হতভাগ্যটাকে জব্দ করবার ভার আমায় দিন, আমরা যে পুলিশের লোক তা ও জানে না, তাই মুখ খুলছে না।'

এই কথা শুনে যে বীভৎস-দৃষ্টিতে লোকটা শামুয়ার মুখের দিকে চাইল, তাতে শামুয়া একেবারে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

সহসা বিকৃত হাসি হেসে উঠল লোকটা। তার সেই অট্টহাসিতে চমকে উঠে প্রণবেশ দুই পা পিছনে সরে গেলেন।

ততক্ষণে লোকটা পাহাড়ের ওধারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রণবেশ শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'থাকগে, আর দরকার নেই কৃষ্ণা, ফিরে যাওয়া যাক, কেমন?'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'তুমি শামুয়াকে নিয়ে নৌকোয় যাও মামা, আমি যা করতে এসেছি তা না করে এক পা-ও নড়ব না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণবেশকে তার সঙ্গে যেতে হয়। হাতের রিভলভারটা দেখিয়ে কৃষ্ণা বলে, 'ভয় নেই শামুয়া, যতক্ষণ হাতে রিভলভার থাকবে, কেউ তোমার এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

সঙ্গে যাওয়া ছাড়া শামুয়ার আর উপায় ছিল না, তাই ছায়ার মতোই সে কৃষ্ণার পিছনে-পিছনে রইল।

BanglaBook.org

জনমানবহীন পথ। মাঝে-মাঝে কেবল দু-একখানা ঘর দেখা যায়, শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। শামুয়ার কাছে শোনা গেল—এখানে কিছুদিন আগে কী এক জ্বর এসেছিল, অনেক লোক সেই জ্বরে ভুগে মারা যায়, বাকি যারা বেঁচেছিল তারা জ্বরের ভয়ে পালিয়ে গেছে ঘরের মায়া ত্যাগ করে।

বিফল হয়ে কৃষ্ণা ফিরল।

বেশ বোঝা গেল, রুমাদেবীকে যারা চুরি করে এনেছিল, তারা এখান থেকে সরে গেছে। কৃষ্ণার মনে হল, তারা একজায়গায় বেশিদিন থাকে না, পুলিশের ভয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়।

নৌকোয় উঠে শামুয়া একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলল, এতক্ষণে তার মুখখানা প্রফুল্ল দেখা গেল। সে কিছু না বললেও কৃষ্ণা বুঝতে পারে যে, আজও শামুয়ার শত্রুরা প্রতিহিংসা ভোলেনি। যারা একদিন শামুয়াকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছিল, মিয়াংয়ের পথে-দেখা সেই লোকটি তাদেরই দলের একজন। অথচ শামুয়া সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনও কথা বলে না।

নয়

মিয়াং থেকে ফেরবার কয়েকদিন পরের কথা। একদিন ল্যাংটিং স্টেশনে নেমে কৃষ্ণা বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

ছোট্ট স্টেশন—চারিদিকে উঁচু-নিচু পাহাড়ের শ্রেণী...পাহাড়তলির পাশে এখানে-ওখানে চায়ের বাগান। এ-অঞ্চলটা চা-বাগানের জন্যে বিখ্যাত।

সঙ্গে এসেছেন সুজন।

বন্ধুর দুর্গম পথের কথা ভেবে প্রণবেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কৃষ্ণা তাঁকে আশ্বস্ত করেছে—'থাক মামা, তোমায় আর যেতে হবে না। আমি আজ যাচ্ছি, কাল আবার ফিরে আসব, তোমায় নিয়ে গেলে কাল হয়তো ফেরা হবে না, দু-চারদিন আবার সেই হাতিখালিতে আমায় থেকে যেতে হবে।'

একদিক দিয়ে খুশি হলেও প্রণবেশ রাগ করে বললেন, 'তার মানে? আমি কি তোমার বোঝা হয়ে যাব, যে, আমার ভার বয়ে তোমায় দু-চারদিন ওখানে বিশ্রাম নিতে হবে?'

কৃষ্ণা সান্ত্বনার সুরে বললে, 'কথাটা বুঝতে পারছ না, মামা। হয়তো যাওয়ার সময় ডুলি পাব, ফেরবার সময় পাব না, মোটের ওপর হাঁটতে হবেই। পথের মাঝখানে গিয়ে তুমি হয়তো অচল হয়ে পড়বে, তখন উপায়? তারচেয়ে তুমি এখানেই থাকো—আরামে থাকতে পারবে, শামুয়া তোমায় হাতে-হাতে রাখবে, এতটুকু কষ্ট পেতে হবে না।'

বলা বাহুল্য, প্রণবেশ আসেননি, সুজনের সঙ্গেই কৃষ্ণা ল্যাংটিং রওনা হয়েছে।

সুজন আগে থেকে ডুলির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। উঁচুনিচু পার্বত্য পথে অন্য কোনও যান-বাহন চলতে পারে না; সুজনের জন্যেও একখানা ডুলি রয়েছে।

এখানকার ডুলি দেখে কৃষ্ণা হাসে।

সুজন বললেন, 'পাহাড়ি দেশের ডুলি এইরকমই হয়ে থাকে কৃষ্ণা, সভ্য জগতের বার্তা এরা পেলেও, সভ্য সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। যাই হোক, উঠে পড়ো ডুলিতে, দেরি করবার দরকার নেই।'

দীর্ঘ দশ মাইল পথ।

BanglaBook.org

বাহকেরা ডুলি নিয়ে কখনও চড়াই ভেঙে উঠছে, কখনও উতরাই পথে নামছে। পাহাড়ের উপর দূরে-দূরে মিকিরদের বস্তি দেখা যায়; মাঝে-মাঝে দু-একজন জংলি লোকের সঙ্গে দেখা হয়, বিস্মিতভাবে তারা ডুলির পানে তাকিয়ে থাকে।

পাহাড়ের পাশে-পাশে জঙ্গলে-ভরা গভীর খাদ...কৃষ্ণা ডুলির বাইরে মুখ বাড়িয়ে বাহকদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, বাহকেরা তার কথা বোঝে না।

পিছনে আসতে-আসতে সুজনের ডুলি মাঝে-মাঝে পাহাড়ের বাঁকে আড়াল পড়ে, আবার ঘুরে নিকটে আসে।

চলতে-চলতে সহসা বাহকেরা একসময় থেমে গেল।

সুজন বাহকদের কী জিজ্ঞাসা করেন এবং তার উত্তরে তারা যা বলে, কৃষ্ণা তা না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারে যে, কোনও বিপদের আশঙ্কায় তারা থেমে গেছে, আর এগুতে চাচ্ছে না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে—'ব্যাপার কী, সুজনমামা, এরা হঠাৎ থেমে গেল যে?'

সুজন সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখালেন...দূরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সারি-সারি হাতি চলেছে; বললেন, 'ওদিকে আর এগিয়ে যাওয়া মানে, মরণকে ডেকে আনা। ওদের দৃষ্টি একবার এদিকে পড়লে আর নিস্তার নেই, এখনি দলে-দলে ছুটে আসবে...আমাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না।'

কৃষ্ণা অবাক-বিস্ময়ে সেইদিকে চেয়ে থাকে! বর্মা-অঞ্চলের মেয়ে...অনেক জীবজন্তু দেখেছে সে, কিন্তু আসামের জঙ্গল-ভরা পার্বত্য পথে আজ যেমন সমারোহে হাতির দল যেতে দেখল, এরকম সে আর কখনও দেখেনি!

দূর থেকে সেই হাতি আর তাদের বাচ্চাদের দেখে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না—অপূর্ব... অ-দৃষ্টপূর্ব...মনোরম!

সুজন বললেন—'এরা এইভাবে মাঝে-মাঝে এইরকম জঙ্গলে চলাফেরা করে। এ-সময়ে সামনে কোনও মানুষ বা জীবজন্তু পড়লে এরা পায়ে চেপে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলে!'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহকেরা আবার এগিয়ে চলল।

দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের পথ অতিক্রম করবার সময় পরিশ্রান্ত বাহকেরা পথের মাঝে দু-চারবার ডুলি নামিয়ে বিশ্রাম করে নিল। এমনি করে হাতিখালিতে যখন তারা পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

হাতিখালির চারিদিকে চায়ের বাগান, মাঝখানে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ি। আসামের অধিকাংশ বাড়ি যেমন কাঠের তৈরি এ-বাড়িটিও তাই। চারিদিক-ঘেরা বিরাট উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ি।

ডুলি থামতেই সুজন মিত্র নেমে পড়লেন, কৃষ্ণাও নামল।

চারিদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বললে, 'ইস! কী সাংঘাতিক নির্জন জায়গা! এরকম জায়গাতেও মানুষ বাস করে? আশ্চর্য!'

সুজন বললেন, 'না, একেবারে নির্জন নয়। ওদিকে এইসব জংলিদের বস্তি আছে, এ-বাড়ির পেছনদিকে ভবতোষবাবু অনেক ঘর তৈরি করে তাঁর কর্মচারীদের রেখেছেন। আপদে-বিপদে তারাই এঁদের সহায়। ভেতরে চলো, দেখতে পাবে।'

মস্তবড় এই বাড়ির মধ্যে অসংখ্য ঘর। এখানে কেউ না থাকায় সব ঘরই চাবিবন্ধ ছিল। সুজনের কাছে চাবি ছিল, তিনি সামনের ঘরের তালা খুললেন।

তিনি এসেছেন খবর পেয়ে, ভবতোষ চৌধুরীর কর্মচারী ও দ্বারবান-ভৃত্যেরা উপস্থিত হল।

ম্যানেজার রামশরণ সিং—বিহারের অধিবাসী। শোনা গেল, ইনি ভবতোষ চৌধুরীর পরম বিশ্বাসী ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভবতোষ চৌধুরীর সমস্ত বৈষয়িক-ব্যাপারে ইনি জড়িত এবং তাঁর এইসব উন্নতির মূলে ছিল রামশরণ সিংয়ের ঐকান্তিক পরিশ্রম।

BanglaBook.org

কৃষ্ণাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। সুজনকে লক্ষ করে বললেন, 'কাল আপনার তার পেয়ে জেনেছি, আপনি কৃষ্ণাদেবীকে নিয়ে আসছেন। ঘরের চাবি আমার কাছে ছিল না বলে কিছুই পরিষ্কার করে রাখতে পারিনি, তাই আমার ঘরেই ওঁর থাকার ব্যবস্থা করেছি, ইন্সপেক্টার সাহেব।'

সুজন হাসিমুখে বললেন, 'তা আমি জানি রামশরণবাবু; বিশেষ করে, আপনার ভরসাতেই ওকে এখানে আনবার সাহস করেছি। রুমাদেবীর এখান থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান করার ব্যাপারটা আমাদের বড় বেশিরকম বিস্মিত করেছে কিনা; তাই এখানে আর-কাউকে আনবার ভরসা করিনি।'

অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে রামশরণ সিং বললেন, 'কিন্তু ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি তো জানেন, ব্যাপারটা কীরকম ভাবে ঘটল! এত পুলিশ পাহারা, আমরা নিজেরা সর্বদা সজাগ, তার মধ্যে এরকম একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরাও বড় কম লজ্জিত হইনি। বিশেষ, তিনি আমার মনিব এবং বন্ধুর কন্যা—এ বাড়িঘর সব তাঁরই। নিজের বাড়িতেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারলেন না—সত্যিই দুঃখের কথা।'

সে-রাত্রে কৃষ্ণা কিছুই করতে পারল না। অজানা দেশ। নিকষ কালো অন্ধকার রাত। রামশরণ সিংয়ের মহলে একখানা ঘরে তার শয্যা রচিত হয়েছিল। এ-মহলে কৃষ্ণা কোনও স্ত্রীলোককে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়িতে কোনও মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না সিং-সাহেব, কিন্তু মামা বলেছিলেন, মেয়েছেলে আছে। একটু আগেও তো জানতে পারিনি যে, এখানে কেউ নেই—মামাকেও বলেননি তো?'

রামশরণ সিং বললেন, 'ইন্সপেক্টার সাহেব সেবারে এসে আমার স্ত্রীকে দেখেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছি চিকিৎসার জন্যে, কৃষ্ণাদেবী! আজ দিন তিন-চার হল তিনি গেছেন। এখনও পৌঁছনোর খবর পাইনি। দেখছেন তো, কীরকম জায়গায় আমরা বাস করছি; ব্যায়রাম হলে ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, একফোঁটা ওষুধ পর্যন্ত আমরা পাই নে, তাই অসুখ-বিসুখ হলে এখানে আর থাকা চলে না।'

কৃষ্ণাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে উপদেশ দিয়ে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমোতে বলে রামশরণ সিং বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা দরজা বন্ধ করে খিল দিলে।

তারপর আলোটা খুব কম করে দিয়ে, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার খড়খড়ির পাখিগুলো খোলা থাকলেও, ছিটকিনি সে বন্ধ করে দিলে।

রামশরণ সিংকে সে সুজনের মতো এককথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। তার মনে হচ্ছে, এই লোকটি এইসব ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত আছে। গৌহাটির বাড়ি থেকে ভবতোষ চৌধুরীর অন্তর্হিত হওয়া এবং রুমাদেবীর এখান থেকে অকস্মাৎ বিলীন হওয়ার মূলে রামশরণ সিংয়ের সাহায্য সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পাশের ঘরে নাসিকা-গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। এ-নাসিকা-গর্জন তার পরিচিত। গত রাত্রে গৌহাটিতে সে সুজনমামার নাসিকা-গর্জন শুনেছে—দারুণ স্বস্তিতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার চোখে ঘুম আসেনি।

ওপাশে রামশরণ সিংয়ের ঘরের ঘড়িতে টং-টং করে বারোটা বেজে গেল। কৃষ্ণা আস্তে-আস্তে নিজের বিছানায় যাওয়ার উদ্যোগ করছিল, এমনসময় বাইরের দিকে দরজা খোলার শব্দ কানে আসায় সে আবার ফিরল।

BanglaBook.org

রামশরণ সিং অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে দিচ্ছেন—নিশ্চয়ই বাইরের কোনও লোক এসেছে। নিশ্বাস বন্ধ করে কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকে খড়খড়ির রন্ধ্র-পথে।

খোলা দরজা দিয়ে যে-লোকটি পা টিপে-টিপে ভিতরে ঢুকল, সে কৃষ্ণার অপরিচিত নয়। রামশরণ সিংয়ের হাতের টর্চের মৃদু আলোকে কৃষ্ণা তাকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে...।

কদম্বকেশরের মতো সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার...আ-চিন এসেছে।

দশ

রামশরণ সিংয়ের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ততক্ষণে কৃষ্ণা নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলে...সুজনকে জাগাতে হবে। যাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই আ-চিন এখানে স্বয়ং উপস্থিত। এখনকার প্রত্যেক মুহূর্তটি মূল্যবান...এইসময় যদি দস্যুটাকে গ্রেপ্তার করা যায়...।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সে হতাশ হয়ে পড়ে। এখানে তাদের সাহায্য করবার লোক কই? রামশরণ সিংকে সুজন কোনওদিনই অবিশ্বাস করেননি। নানারকম কাজের জন্যে রামশরণ সিং প্রায়ই গৌহাটি গেছেন, সুজন মিত্রের সঙ্গে তাঁর আজকের পরিচয় নয়। সুজন স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবতে পারেননি, যাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁর শত্রুপক্ষের লোক ছাড়া আর কিছু নন।

তাঁকে বিশ্বাস করে সুজন কৃষ্ণাকে শুধু এখানে নিয়ে এসেছেন নয়, রামশরণ সিংয়ের গৃহেই আশ্রয় নিয়েছেন।

আ-চিন এই মুহূর্তে এখানে এই বাড়িতে এসেছে সংবাদটা সুজনকে দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কে জানে, বিলম্বে তারও কোনও বিপদ ঘটতে পারে কি না! আ-চিন তাকে চেনে, কৃষ্ণার পিতা-মাতার মতো কৃষ্ণাকেও সে আজ হত্যা করতে পারে। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান...কোথায় কী আছে কৃষ্ণার অজ্ঞাত...কোন পথ দিয়ে কোন ঘরে পৌঁছে সুজনকে খবর দেবে সে? তা হলে?...

মনে পড়েছে। শোবার আগে কৃষ্ণাকে নিঃশঙ্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে, রামশরণ গেলেন বাঁদিকে আর ডানদিকে সুজনমামা। আলোটাকে বাড়াবার চেষ্টা না করে, বিছানার উপর বালিশের পাশে যে-রিভলভারটা রেখেছিল, সেটা হাতে নিয়ে সে নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেলল। তারপর খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে...।

এই যাঃ! দরজা খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সহসা কে তাকে চেপে ধরে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ তার মুখের ভিতর তারই কাপড়ের আঁচল গুঁজে দিলে।

লৌহমানব না কি? তার শক্ত হাতের নিষ্পেষণ থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে কৃষ্ণা... চিৎকার করবার উপায় নেই...তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে সামনের লোকটিকে পদাঘাত করে, একবার... দুবার...তিনবার...

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শক্তিশালী একজন পুরুষের সঙ্গে একটি তরুণী কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে?

চাপাকণ্ঠে কে আদেশ দেয়—'নিয়ে যাও...পেছনের দরজায় জিপ আছে...যত শিগগির পারো... তার জন্যে সময় দিলুম দু-মিনিট...।'

পরিষ্কার আ-চিনের কণ্ঠস্বর।

নিস্তব্ধে মূর্ছিতার মতো পড়ে থাকে কৃষ্ণা, তা ছাড়া উপায় কী?

আ-চিন বললে, 'সবুর! সাবধানের মার নেই। মূর্ছার ভান করে থাকে তো, সরানোর আগে ওকে ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ। মনে হয় ওর জ্ঞান আছে।'

রামশরণ সিং বললেন, 'না-না, আমার মনে হয়, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরকম করে গলা টিপে ধরলে কোনও মানুষের জ্ঞান থাকে না। আমার মতে অনর্থক ক্লোরোফর্ম করা হবে।'

BanglaBook.org

'অনর্থক?' আ-চিন হাসে, বলে, 'একে তুমি চেনো না রামশরণ, এ একেবারে জাত-কেউটের বাচ্চা। একবার একটু ছোবল দেওয়ার সুযোগ পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে জীবনান্ত। একে চিনতে আমার আর বাকি নেই। বাংলাদেশে এই বয়সে এই মেয়ে যা নাম করেছে, শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। ওই ইন্সপেক্টারটাকে আমি একদম গ্রাহ্য করি নে, ওদের দলকে আমি মশা-মাছির মতো মনে করি। কিন্তু এ-মেয়ে—এর তুমি জুড়ি পাবে না। মস্তবড় গোয়েন্দা এ-মেয়ে, একে চেনা সহজ নয়।'

'গোয়েন্দা!'

রামশরণ সিং আকাশ থেকে পড়েন—'এইটুকু মেয়ে, গোয়েন্দা?'

আ-চিন বলে, 'হ্যাঁ, মস্তবড় গোয়েন্দা। তোমার ওই ইন্সপেক্টার সাহেব এর কাছে কিছুই না। যা করছি শুধু দেখে যাও, যদি বাঁচতে চাও তো একটি কথা বোলো না—বুঝলে?'

উগ্র গন্ধটা নাকে আসতেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে। চোখ তার বাঁধা, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেওয়া, চিৎকার করা চলে না, দু-একবার হাত-পা নাড়বার চেষ্টা করে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

কয়েকজন লোকের সাহায্যে আ-চিন পিছনের দরজা-পথে কৃষ্ণাকে একখানা ডুলিতে তুলে দিয়ে, রামশরণ সিংয়ের ঘরে ফিরে আসে।

'হো-হো-হো-হো-হো-হো!'

সচকিতভাবে রামশরণ বললেন, 'চুপ-চুপ...আস্তে। ইন্সপেক্টার শুনতে পাবে।'

একটা চোখ অর্ধমুদ্রিত করে আ-চিন বললে, 'তোমার ইন্সপেক্টার আজ সারারাতের মধ্যে আর জাগছে না বাপু; ওর খাবার জলে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছে, আজ সারারাত ও ওইভাবেই ঘুমোবে। তোমায় যাতে সন্দেহ করতে না পারে সে-উপায় আমি করে যাচ্ছি, চিন্তা নেই।'

প্রায় আধঘণ্টা পরে আ-চিন যখন সেই বাড়ি থেকে বেরুল তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে।

সারারাত্রি একভাবেই কেটে গেল।

সকালের দিকে সুজন মিত্রের যখন ঘুম ভাঙল, নিজেকে বড় দুর্বল মনে করলেন তিনি। সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা, হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হয়। দশ মাইল পথ পার্বত্য পথে ডুলি করে আসা তাঁর কাছে আজ নতুন নয়, এই রামশরণ সিংয়ের নিমন্ত্রণেই তিনি আরও দু-চারবার হাতিখালিতে এসেছেন-গেছেন, কিন্তু কোনওবারই তাঁর এরকম হয়নি।

বহু কষ্টে তিনি বসলেন, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে খুলতে পারলেন না, টানাটানি করে বোঝা গেল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

এক মুহূর্তে তাঁর সমস্ত জড়তা কেটে গেল, অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি—'রামশরণবাবু! দেওদার! সাংলো!'

কোথায়-বা কে! অত হাঁকডাকেও কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বাংলোতে কেউ নেই না কি?

মনে পড়ে—পাশের ঘরে কৃষ্ণা আছে।

সুজন চিৎকার করে ডাকেন—'কৃষ্ণা!'

কিন্তু তারও সাড়া পাওয়া গেল না।

বিপদের আশঙ্কায় সুজন অভিভূত হয়ে পড়েন, কৃষ্ণার সাড়া না পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজায় সজোরে পদাঘাত করেন, দরজা ঝনঝন করে ওঠে, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণা? তবে কি...

BanglaBook.org

আবার পদাঘাত—উপর্যুপরি পদাঘাতে দরজা কাঁপতে থাকে। হাঁপিয়ে যান সুজন...খানিকটা বিশ্রাম...একটু সামলে নিয়ে আবার পদাঘাত—মড়-মড়-মড়...।

ক্রমাগত ধাক্কার ফলে দরজার কিছু অংশ খসে যেতে, দেখা গেল, কৃষ্ণার ঘর শূন্য—

বিমূঢ়ের মতো সুজন দাঁড়িয়ে থাকেন, ভাবেন, গেল কোথায় কৃষ্ণা! তবে কি শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছে সে? তাই বা কী করে হয়? কৃষ্ণার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই? তবে কি দরজা খুলে বাইরে এসেছিল সে আর সেই সুযোগেই শত্রুরা তাকে বন্দি করেছে! আমি উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণা এইভাবে অপহৃতা হবে! এ যে ভয়ানক লজ্জার কথা।

বাড়িতে তো আরও লোক ছিল—রামশরণ সিং কোথায় গেলেন? তাঁর কী হল?

রামশরণ সিংয়ের দরজা বাইরে থেকে শিকল বন্ধ। দরজা খুলে সজন দেখতে পেলেন, মুখ-হাত-পা বাঁধা নিরুপায় রামশরণ চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

তাড়াতাড়ি সুজন তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

রামশরণ বিছানায় উঠে বসলেন...অবসন্ন। তাঁর উপর দিয়েও যে ভীষণ উৎপীড়ন-নিপীড়ন চলেছে তা দেখেই বোঝা যায়।

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, রামশরণবাবু? কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছি নে, আপনাকে এরকম অবস্থায় দেখছি, বাড়ির আর-সব লোকজন কোথায়?'

রামশরণ সিং ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'কিছুই জানি নে আমি। একবার যেন মনে হল, কে আমায় চেপে ধরেছে, তারপর সব অন্ধকার! ঘুমিয়ে পড়েছিলুম খুব। কেউ নেই? গেল কোথায় সব?'

সুজন স্তব্ধ হয়ে থাকেন—যে উত্তর দেবে, উল্টে সে-ই তাঁকে প্রশ্ন করছে? ব্যাপার মন্দ নয়! কিন্তু গৌহাটি ফিরে গিয়ে প্রণবেশকে কী বলবেন তিনি?

এগারো

ঘটনার অপরাংশে ওদিকে কৃষ্ণার জ্ঞান ফিরে আসে।

প্রথমটায় সে বুঝতে পারে না সে কোথায়! চোখ মেলে সে এদিক-ওদিক তাকায়, বিস্মিতভাবে উঠে বসে, সমস্ত কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

আস্তে-আস্তে মনে পড়ে...কাল সে গৌহাটি থেকে ল্যাংটিং এসেছিল, সেখানে স্টেশনে নেমে, ডুলিতে চেপে দশ মাইল দূরে হাতিখালিতে গিয়েছিল, তারপর সেখানে রামশরণ সিংয়ের অভ্যর্থনা আদর-আপ্যায়ন...অবশেষে তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাবধানে থাকার উপদেশ...

সেই রামশরণ সিং আর তার চিরশত্রু দস্যু আ-চিন...

প্রথম থেকেই কৃষ্ণা রামশরণ সিংকে বিশ্বাস করতে পারেনি। লোকটার মুখ-চোখ দেখে মনে হয়েছিল, ধূর্তের শিরোমণি সে।

কিন্তু কোথায় এসেছে সে? হাতিখালি থেকে কতদূরে? অথবা হাতিখালিতে সেই বাড়িরই একটা ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে? কৃষ্ণা একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

এটা যেন ঠিক ঘর নয়; মনে হয়, পাহাড়ের একটা প্রায়ান্ধকার গুহা। কোনওদিকে জানলা নেই, উপরদিকে অনেক উঁচুতে খানিকটা জায়গা তারের জাল দেওয়া, সেখান থেকে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই এর অন্ধকার খানিকটা পাতলা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা দেখল—ঘরের মেঝেয় কতকগুলো খড়ের গাদায় কম্বল পড়ে আছে একখানা, তার উপরেই সে শুয়েছিল।

চারদিককার দেয়াল শক্ত পাথর কেটে তৈরি। মেঝেটাও তাই। একদিকে একটি মাত্র ছোট্ট

BanglaBook.org

দরজা, সে-দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসী, তার মুখে একটা মাটির গ্লাস। কলসীর কাছে মাটিরই একটা পাত্রে কী যেন ঢাকা দেওয়া আছে।

তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ! হয়তো ওই কলসীটাতে জল আছে। দস্যুদের বুদ্ধি আছে। রামশরণ সিং বা আ-চিন, যে-ই তাকে বন্দি করুক...এত যন্ত্রণা দেওয়ার পরে বন্দির যে পিপাসা লাগবে, এটা তাদের অজানা নেই...সাবাস! এত দুঃখেও কৃষ্ণার হাসি আসে।

কোনওরকমে এতক্ষণে সে উঠে বসল।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা...মনে হয়, দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে। কোনওরকমে হামাটানার মতন করে সে ঘরের কোণে কলসীর কাছে পৌঁছল,...কম্পিত-হাতে কলসীর মুখের গ্লাস নিয়ে একনিশ্বাসে দু-গ্লাস জল পান করে, তারপর মাথায় মুখে জল দিলে। ভরসা করে সে বেশি জল নষ্ট করতে পারে না...আর যদি না পায়?

এতক্ষণে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হল, পূর্বাপর ভাববার অবকাশ পেল।

মনে পড়ে অতীতের কথা...বন্দিনী সে আরও বহুবার হয়েছে, নিজের অধ্যবসায়ে প্রতিবারে মুক্তিও পেয়েছে, কিন্তু এবারে কোথায় তাকে আনা হয়েছে জানবার উপায় কী? উপায়...উপায়...চিন্তার শেষ নেই...।

মাটির থালার উপর ঢাকনাটার দিকে এবার তার চোখ পড়ে। ঢাকনাটা খুলে দ্যাখে—খান তিন-চার শক্ত মোটা রুটি...একপাশে খানিকটা গুড়...।

হাসি পায় কৃষ্ণার, রুটি-গুড়ের দিকে তাকিয়েই তার পেট ভরে গেছে মনে হয়—অখাদ্য! খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা দিয়ে রেখে সে নিজের তৃণশয্যায় ফিরে এসে ভাবতে বসে। যে জন্যে তার আসামে আসা, তার কিছুই হল না, লাভ থেকে সে নিজেই অপরিচিত লোকের হাতে বন্দিনী হল! শুধু রতনের মুখে যতটুকু জানতে পেরেছে...অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সেইটুকুই মাত্র সম্বল তার। হাতিখালির বাংলোয় হয়তো অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু সে-সুযোগ সে পেল না। মনে হয়, সুজন নিশ্চয় গৌহাটি ফিরে গিয়েছেন, তাঁর মুখে কৃষ্ণা-হরণের কথা শুনে বেচারা মামা...।

প্রণবেশের সেই অবস্থা কল্পনা করে কৃষ্ণা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এখন চাই মুক্তি। কিন্তু মুক্তিলাভের পথ কই?

অনেক ওপরে ওই জাল-আঁটা ভেন্টিলেটার, কিন্তু অত উঁচুতে ওঠবার কোনও উপায়ই নেই!

তবু কৃষ্ণা সাড়া নিতে চায়...বন্ধ-দরজায় আঘাত করে... 'বাইরে কেউ আছ কি?' লোহার কপাট শুধু ঝনঝন করে ওঠে। কৃষ্ণা আবার সজোরে ধাক্কা দেয়...।

কে যেন কর্কশ কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এই, চুপ করে থাক।'

তা হলে মানুষ আছে।

কৃষ্ণা নিজের মনেই খানিকটা হেসে নেয়...নিজের মনেই ধারণা করে...এতক্ষণ প্রণবেশ ও সুজন পুলিশ-প্রহরী নিয়ে হাতিখালিতে এসে পৌঁছেছেন...হাতিখালির বাংলো তাঁরা আতিপাতি করে খুঁজছেন...তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছেন, কৃষ্ণাকে আটক করে রাখা হয়েছে, ভৃত্যদের পাবেন, কিন্তু রামশরণ সিংকে তাঁরা পাবেন না। কৃষ্ণা বেশ বুঝেছে, ভবতোষ চৌধুরী ও রুমার ব্যাপারে প্রধান আসামী ওই রামশরণ। আ-চিনকে কৃষ্ণা সেখানে দেখলেও সে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই রামশরণের দলের একজন। রামশরণ সিং সকল সন্দেহের অতীত হয়ে দূরে হাতিখালিতে বসে থাকে, তার প্রধান পার্শ্বচর আ-চিন সব কাজ চালায়—কানপুরে ডাকাতির মূলেও আছে ওই রামশরণ সিং! কৃষ্ণার মনে প্রথম থেকেই যা সন্দেহ জেগেছে তা মিথ্যা নয়।

ঘরের ভিতরটা অল্পে-অল্পে অন্ধকার হয়ে আসে। কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বাইরের জগতে সন্ধ্যা নেমেছে।

BanglaBook.org

জ্ঞান ফেরবার পর থেকে জনপ্রাণীর মুখ দেখতে পায়নি সে। যারা তাকে বন্দি করেছে, তারাও নিশ্চিন্ত আছে যে, জল আর খাবার যখন দেওয়া আছে, তখন জ্ঞান ফিরলে কৃষ্ণা নিজেই খাবার নিয়ে খাবে।

দারুণ ক্রোধে কৃষ্ণা নিজের হাত কামড়ায়...।

সুচতুর রামশরণ সিং সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, তার সহৃদয়তায় সুজন মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু সে কেন মুগ্ধ হল—যখন তাকে দেখেই তার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল?

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায়!

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সেই মসি-মলিন অন্ধকার ঘরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন কৃষ্ণা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না!

বারো

অকস্মাৎ কৃষ্ণার ঘুম ভেঙে যায়।

অন্ধকার ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় সে দেখতে পায় তার শয্যার পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কে?'

শঙ্কিতভাবে কৃষ্ণা ধড়মড় করে উঠে বসে, দু-হাতে চোখ মুছে সে ভালো করে তাকায়—আ-চিনকে চিনতে তার দেরি হয় না।

'তোমায় আমি চিনি...তুমি আ-চিন।'

আ-চিনের একটা চোখ জ্বলজ্বল করে...শিকার আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে হিংস্র বাঘ যেমন তার ক্ষরিত রক্ত লেহন করবার জন্যে মুহুর্মুহু জিহ্বা সংকোচন-প্রসারণ করে, তেমনি নিজের সরস জিভটা বারবার অধরোষ্ঠে বুলোতে-বুলোতে আ-চিন বললে, 'হ্যাঁ, আমি আ-চিনই বটে। আজও দেখছি তুমি আমায় ভুলে যাওনি সুন্দরী! ঘটনাক্রমে কয়েকদিন আগে ট্রেনে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল! আমি তোমায় দেখা মাত্র চিনেছিলাম, দেখছি, তুমিও আমায় ভোলোনি—তাই না?'

ঘৃণায় কৃষ্ণার মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'হ্যাঁ, তোমায় আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। যেখানে দেখব তোমায় চিনতে পারব। বহুকাল তোমায় দেখিনি, ভেবেছিলুম আমার জীবনে আর কোনওদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। হঠাৎ আবার যে তোমায় এই অবস্থায় দেখতে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!'

কোমল কণ্ঠে আ-চিন বললে, 'সেটা নেহাৎ ভগবানের দয়া, কৃষ্ণাদেবী! আমি এ-পর্যন্ত তোমার খোঁজে বহুৎ জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি—শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় আছ, তাই কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম, সেখানে শুনলাম, তুমি আসাম রওনা হয়েছ। ভগবানের দয়ায় তুমি যে-ট্রেনে আসছিলে, আমিও ঠিক সেই ট্রেনেই...।'

'তোমার মুখে ভগবান! হ্যাঁ, ভগবানের দয়াই বটে।'

ঘৃণায় কৃষ্ণা আর কথা বলতে পারে না—তার মুখ দেখে আ-চিন বুঝতে পারে, বলে, 'আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা করো—কিন্তু ভগবানের দিব্য কৃষ্ণাদেবী, আমি ঘৃণার কাজ এমন কিছু করিনি, যাতে...।'

অকস্মাৎ কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—'থাক, থাক, আর ভগবানকে ডেকো না এর মধ্যে, ও-মুখে ও-কথা মানায় না। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে যত কথাই তুমি বলো না কেন, তোমায় আমি চিনি। তুমি—তুমি আমার পিতা-মাতার হত্যাকারী, তুমি...।'

BanglaBook.org

বলতে-বলতে অকস্মাৎ তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলে নেয় সে, তারপরে বলে, 'শুধু আমি নই, পুলিশও জানে তোমাকে, আজও তোমার নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে, আর তোমায় ধরে দেওয়া বা তোমার সন্ধান করে দেওয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা আছে, সে-কথাও তুমি জানো। হত্যাকারী-দলের সকলেই প্রায় ধরা পড়েছে, একমাত্র তুমিই গা ঢাকা দিতে পেরেছ, পুলিশ তোমায় খুঁজে পায়নি। সেদিন তোমায় দেখেই আমি বুঝেছিলুম, তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে নেই, বাংলায় না হোক, বাংলার বাইরে তোমার কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে। তুমি যে রামশরণ সিংয়ের সহকারী রূপে...।'

'রামশরণ সিংয়ের সহকারী?'

আ-চিন অট্টহাসি হাসে...দরজা-জানলা-বিহীন কারাগারের বদ্ধ-ঘরটা তার হাসির দমকে যেন কাঁপে...।

কৃষ্ণা দু-হাত কানে চাপা দেয়, রুক্ষকণ্ঠে বলে, 'তোমায় মিনতি করছি আ-চিন, এখান থেকে তুমি বিদায় নাও—আমায় একটু নির্জনে থাকতে দাও।'

স্নিগ্ধকণ্ঠে আ-চিন বললে, 'আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসিনি কৃষ্ণাদেবী, তোমায় শুধু একবার দেখতে এসেছি। দেখছি, এখানে ওরা যে-খাবার দিয়ে গেছে তা তুমি খাওনি, তেমনি ঢাকা পড়ে আছে।'

বলেই এগিয়ে গিয়ে ঢাকা খুলে খাবার দেখে আপনমনে সে গর্জন করে—'এ কী! এ-খাবার কি কেউ খেতে পারে? এই মোটা-মোটা পোড়া শক্ত রুটি আর একটু গুড়!' তারপর হাঁক দেয়—'পারিসানা...লতিফ!'

'জী, হুজুর!'

সসম্ভ্রমে দ্বারের প্রহরী সামনে আসতেই আ-চিন আবার গর্জন করে, 'এ-খাবার এখানে কে দিয়েছে?'

পারিসানা সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়, 'আউলেন দিয়ে গেছে হুজুর!'

আ-চিন আদেশ করে—'নিয়ে যাও। শিগগির চা আর টোস্ট নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পরে চা-টোস্ট এসে পড়ে।

আ-চিন বলে, 'খেয়ে নাও কৃষ্ণাদেবী, কাল থেকে কিছু খাওনি, দেরি কোরো না।

কৃষ্ণা বলে, 'ধন্যবাদ! দরকার নেই এসব, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো।'

আ-চিন বললে, 'না খেয়ে কতদিন থাকবে? একদিন-দু-দিন নয়, দিনের পর দিন, হয়তো চিরদিনই তোমায় এখানে থাকতে হবে, না খেলে কি চলে, সুন্দরী!'

কৃষ্ণা মুখ তোলে, বলে, 'তাই নাকি? কিন্তু আমাকে কোথায় এনেছ আগে সেই কথাটা দয়া করে জানাও। আচ্ছা, আমাকে বন্দি করবার কী প্রয়োজন ছিল তোমার? তোমার স্বার্থে কোনও আঘাত দিয়েছি আমি?'

আ-চিন বীভৎস হাসি হাসে। বলে, 'আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তো তোমায় এনেছি। মনে করো সেদিনের কথা, তখন তোমার বয়স চোদ্দো কি পনেরো। সেদিন তোমায় ভালোবাসা জানানোর অপরাধে তোমার বাবা পা থেকে জুতো খুলে আমায় মেরেছিলেন...আমায় চোর অপবাদ দিয়ে পুলিশে দিয়েছিলেন...তাঁর বন্ধু পুলিশ-অফিসার আমার একটি কথাও কানে নেয়নি...উঃ সে কী নির্যাতন সেদিন সইতে হয়েছিল, ভাবলে...যাক, আজ আমি তোমায় কী বলে সম্ভাষণ করব—প্রিয়তমে? না, ডার্লিং? তুমি কোনটা পছন্দ করো?'

আ-চিনের মুখ থেকে তার সরস জিভটা বেরিয়ে ঠোঁটের ওপর-নিচ ভেজাতে থাকে...।

'আ-চিন?'

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—'তুমি কি আমায় হাতের মধ্যে পেয়ে এমনি করে অপমান করতে চাও?'

BanglaBook.org

আ-চিন মাথা নাড়ে—'না—না—না। ভুল কোরো না কৃষ্ণাদেবী, আমি আজও তোমায় ভালোবাসি, আর ভালোবাসার পাত্রীকে কেউ অপমান বা নির্যাতন করতে পারে না। আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেই আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব, তোমায় রানি করে রাখব—মোট কথা, আমি তোমায় চাই। যাক, এখন খেয়ে নাও, আমার কথাগুলো আজ ভালো করে ভেবে দেখো...কাল, পরশু, যেদিন হোক আমি তোমার কাছ থেকে এর একটা উত্তর চাই।'

যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে সে আবার ফিরল—'হ্যাঁ, কোথায় তোমাকে আনা হয়েছে জানতে চাচ্ছিলে, না? এ-জায়গার নাম—'মায়'। পাহাড়ের মাঝখানে বলে এখানে জনমানবের যাতায়াত নেই—কেবল আমরাই আসি-যাই, থাকি। আচ্ছা, আজ বিদায়।'

আত্মপ্রসাদের বিজয়-হাসি হেসে সে বিদায় নিল।

তেরো

একদিন, দু-দিন, তিনদিন কেটে গেল, আ-চিনের দেখা নেই।

খাবার দিতে লোক আসে দুবার। বন্দিনী কৃষ্ণার বরাত ভালো—সকালে ভাত-তরকারি-মাছ...সন্ধ্যায় দিকে গরম-গরম খানকতক লুচি, তার সঙ্গে মাংস, দুধ, মিষ্টান্ন...।

মনে-মনে কৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে...যে লোক খাবার দিতে আসে, তাকে জিজ্ঞাসা করে—'আ-চিন কোথায়?'

কিন্তু জবাব দেবে কে? লোকটা শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে, তারপর কিছু বুঝেই বোধহয় ফিক করে হেসে, হাতের তর্জনী একবার মুখে আর একবার কানে ঠেকিয়ে ইশারায় জানায়—সে বোবা...সে কালা!

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা কৃষ্ণার ব্যথা-ভরা মুখখানাকে মুহূর্তের জন্য সুন্দর করে তোলে, মনে-মনে সে স্বীকার করে—হ্যাঁ, আ-চিনের লোক-নির্বাচন শক্তি আছে। সঙ্গে-সঙ্গে গৌহাটির সুমিয়ার কথা মনে হয়, সেও যেমন বোবা-কালার ভান করেছিল, এও বোধহয় তা-ই।

উপায় নেই—কোনও উপায় নেই তার। দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী...লোকটা যখন খাবার দিতে আসে, সে-সময়েও পালাবার কোনও উপায় নেই।

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায়—একা-একা বদ্ধ ঘরের মধ্যে চঞ্চলা সিংহীর মতো ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধিদেবীর আরাধনা করে—তুমি এসো মা, কণ্ঠে বাণী বাগ্‌বাদিনী! বাঙালী মেয়ের মৌন মুখে মুক্তির ভাষা দাও মা!

তিনদিন পরে—

দরজা খুলে প্রবেশ করে আ-চিন, বলে, 'খবর কী কৃষ্ণাদেবী! খাওয়া-দাওয়া...তোমার আদর-যত্নের নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি হয়নি?'

'আদর-যত্ন?'

এক মুহূর্ত থেমে সে উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, বন্দিনীর পক্ষে যতটা আদর-যত্ন পাওয়া সম্ভব তা আমি পাচ্ছি, সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এসবের মানে কী? এই আদর-আপ্যায়ন...এই অস্বাস্থ্যকর ঘর...এখানে বন্দি করে রেখে, বন্দিনীর কাছে মিষ্ট-মধুর প্রেমালাপের প্রলাপ বকে যাওয়া...তুমি চাও কী? কী তোমার বাসনা? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, দয়া করে আমায় বাইরে যাবার অনুমতি দাও যদি...।'

BanglaBook.org

আ-চিন বললে, 'আমি তো বলেছি প্রিয়তমে, আমার কথা শুনলেই আমি তোমায় মুক্ত করে দেব। আমার পাশে-পাশে তোমার যে-কোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার থাকবে—তুমি শুধু আমায় কথা দাও, আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে রাজি আছ—ব্যস। এই মুহূর্তে তোমায় মুক্ত করে দেব।'

'শয়তান!'

গর্জন করে উঠেই কৃষ্ণা ঝিমিয়ে পড়ে। আ-চিনের স্পর্ধা! কয়েক বৎসর পূর্বের কথা... আ-চিন বিদেশ থেকে যখন দেশে ফিরে আসে, তার পিতাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আ-চিন সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছিল, আশ্রয়দাতার কন্যা কৃষ্ণার হাত চেপে ধরে। সেদিন সহসা কৃষ্ণার হাত চেপে ধরার পর উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে পিতা আ-চিনকে পুলিশের হাতে দেওয়ার সময় সেই যে আ-চিন শাসিয়ে গেছল, তারপর থেকে...।

আত্মগোপন করে কৃষ্ণা। সে জানে—এখানে তার দম্ভের, তার অহঙ্কারের কোনও মূল্য নেই, বরং তার ফলে তাকে নির্যাতনই সইতে হবে। তা হলে? তা হলে? কৃষ্ণার মনে পড়ে যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার কথা। হ্যাঁ, নিজে মুক্তিলাভ করতে এবং যার জন্যে সে এসেছে সেই রুমাদেবী ও ভবতোষ চৌধুরীকে মুক্ত করতে তাকে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হবে। তাকে 'বিমলা'র ভূমিকা অভিনয় করতে হবে।

এতক্ষণে নিজের কর্তব্য সে ঠিক করে নিয়েছে।

শান্তকণ্ঠে সে বললে, 'আচ্ছা আ-চিন, আমার কাছে তুমি চাও কী?'

আ-চিনের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, 'তুমি জানো আমি তোমার কাছে কী চাই। আমি চাই তোমায় সহধর্মিণী রূপে পেতে।' সহসা নারীকণ্ঠের উচ্চহাসি মিহিসুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে —'সহধর্মিণী? তোমার দস্যু-ধর্মের অনুসঙ্গিনী! এত দুঃখ দিয়েও তুমি যে আমায় হাসাতে পারলে এখন, এর জন্যে তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় দস্যু।'

'দস্যু? কিন্তু বুদ্ধিমতী, ভেবে দেখো, তোমায় আমি কত ভালোবাসি! দস্যু হয়েছিলাম বলেই তুমি আজ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছ...আমি যে আজ দস্যু, সে-ও তো তোমারই জন্যে!'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার জন্যে। আজ যদি দস্যু আ-চিন সাধু আ-চিন বলে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করত, তাহলে তোমার স্থান কোথায় হত, বিদুষী তরুণী? তোমায় চিনত কে? তোমায় যে পরদানশিন লজ্জাবতী সরলা অবলা বাঙালি মেয়ে হয়ে রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে হত, গোয়েন্দা-রানি!'

'বাঃ! সুন্দর! বাংলা-ভাষা তোমার বেশ আয়ত্তে এসেছে দেখছি! এত বাংলা তত্ত্বকথা তুমি শিখলে কোথায়?'

'কেন, তোমার পিতার আশ্রয়ে থেকে। একটা বিরাট দলের সর্দারি করতে হলে শুধু বহুরূপী হলে হয় না, বহুভাষা-ভাষীও হতে হয়। এর জন্যে—শুধু তোমায় পাওয়ার জন্যে দস্তুরমতো বঙ্গ বাণীর আরাধনা করতে হয়েছে আমায়।'

আ-চিনের মুখে এইসব কথা শুনে কৃষ্ণা হাসে...।

কৃষ্ণার মৃদু হাসিতে আ-চিনের নিরাশ মনে আশার সঞ্চার হয়, সে ঠোঁটে জিভ বুলোতে-বুলোতে বলে, 'তা ছাড়া, তখন আর আমি দস্যু আ-চিন থাকব না। কৃষ্ণাদেবীর স্বামিত্ব লাভ করে আমি দেবত্ব পেয়ে যাব।'

কৃষ্ণা বলে, 'ওসব সাময়িক উত্তেজনার কথা। ওই ধরনের কথা শুনে-শুনে কান আমার বধির হয়ে গেছে...ওসব কথা আর কানে আসে না...এলেও শুনতে ভালো লাগে না। ওইরকম কথা বলে-বলে, আর-একজন আমায় মজিয়ে গেছে— ইস! কী ভালোই যে তাকে বাসতুম আমি ...কী ভালোই যে সে বেসেছিল আমায়...।'

ভালোবাসা-বাসির কথা—কৃষ্ণার মুখে? আ-চিনের সরস জিভটা মুহুর্মুহু সঞ্চালিত হয়ে

BanglaBook.org

ভিজিয়ে তোলে ওর শুকনো ঠোঁট দুটোকে...এতক্ষণে কৃষ্ণা লয়ে এসেছে...'কী-রকম, কী-রকম সে-ভালোবাসার ইতিহাস—বলতে বাধা আছে কী? অর্ধেক তো বলেই ফেলতে—বাকিটা কৃষ্ণাদেবী...শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। নির্জন বন্দিশালা...দীর্ঘ অবসর...এখানে শুধু তুমি আর আমি আর অলক্ষ্যে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী...সে ভাগ্যবানটি কে, কৃষ্ণাদেবী?'

বা রে আ-চিন! তোমার দস্যু-হৃদয়ের অন্তস্তলেও অতনুর আনাগোনা আছে তা হলে!

কৃষ্ণা বললে, 'না, আর বলতে বাধা কী? তাছাড়া শুনে তোমার লাভও আছে যথেষ্ট। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যখন তোমার হাত থেকে আর নিস্তার নেই, তখন বলেই যাই, কিন্তু আমার কাহিনীও ফুরুবে আর আমার হাতের এই আংটি দেখেছ? রিয়েল ডায়মন্ড! খাঁটি হীরে! একবার জিভে ঠেকালেই ব্যস! তারপর মাথার ওপর ওই অনন্ত মুক্ত আকাশ...মহাশূন্য...বায়ুস্তরে মিশিয়ে যাবে কৃষ্ণার অন্তরাত্মা!' বলেই কৃষ্ণা ডানহাতের তর্জনী আকাশের দিকে দেখাবার ভঙ্গিতে উপরের ভেন্টিলেটারের দিকে তুলে ধরতেই, মোহমুগ্ধ আ-চিন যেমন সেইদিকে চোখ ফিরিয়েছে, সেই মুহূর্তে আ-চিনের আলগা-হাতে ধরা রিভলভারটা ফস করে কৃষ্ণা নিজের হাতে নিয়ে নিলে! আ-চিন স্তম্ভিত! সে কিছু বলবার আগেই সহাস্যে কৃষ্ণা বললে, 'হাত পাতো...লুফে নাও।'

কৃষ্ণার হাতের রিভলভার অল্প শূন্যে উঠেই আবার আ-চিনের হাতে ফিরে এল। আ-চিন বুঝলে, আর যাই হোক, কৃষ্ণার উদ্দেশ্য খারাপ নয়...পাখি পোষ মেনেছে!

কৃষ্ণা বলতে শুরু করলে ঃ

'আমি তখন কলেজে থার্ড-ইয়ারে। যুবতী মেয়েদের রূপ থাকলে যা হয়, অনেকেই ফাঁদ পাতলে...শেষে ধরা পড়লুম যার কাছে, সে হুবহু তোমার মতো দেখতে...একটি বার্মিজ ছেলে। তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে, তাই এখনও বেঁচে আছি...নইলে মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য...এই আংটি দেখছ? আর বাঁচিয়ে রেখেছি তোমায়, নইলে ওই রিভলভার আর তোমার হাতে ফিরে যেত না। যাক, যে-কথা বলছিলুম, হ্যাঁ, তার প্রেমে পড়বার পর বুঝলুম সে একজন অ্যানার্কিস্ট। তারপর আর কী? দেশের জন্যেই হোক আর যে-জন্যেই হোক, রাজার বিরুদ্ধে গেলে চিরকাল যা হয়ে আসছে—বিচারে তার দণ্ড হল—আজ সে দ্বীপান্তরে। আজ যদি তোমার সঙ্গে প্রেম করি আ-চিন, যদি কোনওদিন সুদিন আসে, সে যদি ফিরে আসে—তখন? তখন কি সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বাধিয়ে দেব?'

সব কথা না বুঝলেও, আ-চিনের বুদ্ধিতে এটা এসে গেল যে, যদিও সে হতভাগাটা কোনওদিন ফিরে আসে—তখন কৃষ্ণাকে পাওয়ার সাধ আ-চিনের মিটে যাবে। সে শপথের প্রতিশ্রুতি দিলে; বললে, 'সে আর ফিরেছে, আর যদিই ফেরে, তখন...এই রিভলভারটা তোমায় দিয়ে দিলাম...আমার ভালোবাসার জামিন।' ...বলেই সে কৃষ্ণার একখানা হাত চেপে ধরে, আর-এক হাতে রিভলভারটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'এবার তুমি মুক্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পাশে-পাশে থাকতে হবে। কেমন, রাজি?'

কৃষ্ণা উত্তর দিলে, 'রাজি, কিন্তু এক শর্তে। আজ থেকে তিন মাস দশ দিন পরে আমার পিতার কালাশৌচ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করবে না—আমার সংস্পর্শে আসবে না। এই শর্তে রাজি হলেই তোমার ভালোবাসার মূল্য ফিরাতে আমার দেরি হবে না। যখন বাঁচতেই হবে, তখন এরকমভাবে বন্দিনী অবস্থায় চিরকাল কাটাবার চেয়ে আমি তোমার কাছে বাইরে থেকেই বাঁচতে চাই। তোমার ভগবানের দিব্য।'

আ-চিন হেসে ওঠে—'বেশ, তোমার শর্তেই রাজি আমি। মাত্র তিন-চারটে মাস তো? কী আর করা যাবে! কিন্তু আমার কোনও ভগবান নেই কৃষ্ণা—কাজেই তার নামে দিব্য করা একেবারে মিথ্যে বলেই মনে হয়।'

BanglaBook.org

খুশি-মুখে কৃষ্ণা বলল, 'আমারও। কারণ, আমি জানি, সবার উপরে মানুষই সত্য। শুধু শপথটা দৃঢ় করবার জন্যেই আমি ভগবানের নাম করেছি, নইলে...।'

দরজার কাছ থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—'এদিকে একবার দরকার আছে হুজুর!'

'এসো কৃষ্ণা, আমার সঙ্গে বাইরে এসো, আর একটা কথা মনে রেখো, এখানে যা-কিছু দেখবে, শুধু দেখেই যাবে, কোনও কথা বলতে পারবে না।'

আ-চিনের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণা বাইরে বেরিয়ে আসে।

অন্ধকার পার্বত্য-গুহা—এঁকে-বেঁকে ঘুরে গেছে। খানিকদূর গিয়ে তবে পাওয়া যায় মুক্ত দিনের আলো—'আ-আ-আঃ!'

বাইরের উন্মুক্ত আলোয় এসে কৃষ্ণা নূতন জীবন ফিরে পায়, প্রাণভরে সে নিশ্বাস গ্রহণ করে, তারপর তাকায় আশেপাশে—।

আ-চিনের দলভুক্ত কয়েকজন লোক যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল, বিস্মিত চোখে তারা কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে...।

দুর্বোধ্য ভাষায় আ-চিন তাদের কী বলে, হয়তো কৃষ্ণার সম্বন্ধেই কিছু জানায় তাদের—সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দে লোকগুলি কৃষ্ণাকে অভিবাদন করে, তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে যায় পাহাড়ের বাঁকে। ওদের মধ্যে একটি লোককে দেখে কৃষ্ণা চিনতে পারে। এ সেই লোক—যাকে সে ক'দিন আগে মিয়াংয়ে দেখে প্রচুর বিস্মিত হয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল।

যেমন করেই হোক, কার্যোদ্ধার সে করবেই...এই আ-চিনকে হস্তগত করেই সবকিছু করবে। ভীষণ প্রকৃতির এই লোকটিকে সে দারুণ ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণা যেন তার কোনও কাজে বা কথাবার্তায় না ফুটে ওঠে, সেদিকে কৃষ্ণা সতর্ক হয়।

চোদ্দো

অতি সতর্ক আ-চিন। কৃষ্ণা বেশ বুঝতে পারে, আ-চিন তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে না। মুক্ত আলোয় চলাফেরা করলেও কৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে তার নজরবন্দি হয়ে আছে।

মাঝে-মাঝে আ-চিন কোথায় যায়—সে-সময় কৃষ্ণার ভার থাকে আ-চিনের পরম বিশ্বাসী সতর্ক প্রহরিণী সুমিয়ার ওপর।

সুমিয়াকে কৃষ্ণা চিনেছে। গৌহাটিতে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বোবা-কালার অভিনয়ে সুদক্ষ সুমিয়াকে সে দেখেছিল। গতকাল টিটাগড় যাওয়ার সময় আ-চিন যখন কৃষ্ণাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে সুমিয়াকে এনেছে, তখনই সে সুমিয়াকে চিনেছে।

আ-চিন সুমিয়াকে আদেশ দিলে, 'এই মেয়েটি তোমার জিম্মায় রইল সুমিয়া—কোনওরকমে যেন এর কষ্ট না হয়, দেখবে। আমি দিনকয়েক পরেই ফিরব—এই সময়টুকু খুব সতর্ক থাকবে, কোনওরকম গাফিলতি না হয়—বুঝলে?'

কুর্নিশের ভঙ্গিতে সুমিয়া সেলাম করে—সে বুঝেছে। সে বোবা নয়—কালাও নয়। অথচ রতনের কাছে তখন কৃষ্ণা শুনেছিল, তিন-চারমাস সে গৌহাটিতে তাদের বাড়ি থাকার সময় সম্পূর্ণ বোবা-কালার অভিনয় করে এসেছে।

রতন বলেছিল, মেয়েটি লেখাপড়া জানে। সেদিন সে বিস্মিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই একে সন্দেহ করেছিল—নিশ্চয়ই এ গুপ্তচরের কাজ করতে এসেছে। তার ধারণা যে মিথ্যে নয়, তা আজ বুঝেছে।

BanglaBook.org

তবু সে কতকটা খুশি হল। যাই হোক, সুমিয়া মেয়ে, যে কোনওরকমে তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করে—'তোমায় গৌহাটিতে দেখেছিলাম না সুমিয়া...। ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে? আচ্ছা, সেখানে তুমি বোবা-কালা সেজেছিলে কেন?'

সুমিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে...উত্তর দেয় না।

কৃষ্ণার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে; বলে, 'তোমায় তখনই সন্দেহ করেছিলুম সুমিয়া, আ-চিন যে তোমায় সেখানে তার গুপ্তচর হিসেবে রেখেছিল, বুঝেছিলুম আমি। ...নয় কি?'

সুমিয়া উত্তর দেয়, 'ঠিক আ-চিনই যে রেখেছিল তা নয়, বরং আমিই তার কাজ করতে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলুম।'

কৃষ্ণা বললে, 'স্বেচ্ছায় হোক বা টাকা বেশি পাওয়ার জন্যেই হোক, তুমি গিয়েছিলে। শুনলুম, ভবতোষ চৌধুরী তোমায় জায়গা দিতে চাননি, কিন্তু রুমাদেবী তাঁর পিতার অমতে তোমায় স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর সেই বিশ্বাসের পরিবর্তে তুমি এতখানি কৃতঘ্ন হবে। আ-চিন তোমাদের, অর্থাৎ দলের লোকদের অনেক টাকাকড়ি দেয় জানি—।'

বাধা দিয়ে সুমিয়া বললে, 'টাকাকড়ির কোনও কথা এখানে ওঠে না কৃষ্ণাদেবী।'

কৃষ্ণা তার দৃপ্ত মুখখানার পানে তাকায়, বলে, 'তবে দলবদ্ধভাবে তোমরা এমনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো বুঝি? দলের সব লোকই তো আ-চিনের জন্যে প্রাণ দিতে পারে শুনেছি।'

সুমিয়া আবার হাসে; বলে, 'সে-কথা বলতে পারেন। আমরা আ-চিনের নিমক খেয়েছি...নিমক-হারামি আমাদের জাত কোনওদিন করেনি...করবেও না কোনওদিন। মহামান্য আ-চিনকে আপনি যতটা হেয়, ঘৃণ্য মনে করছেন, সত্যিই তিনি তা নন। কতখানি দুঃখ, কতখানি কষ্ট পেয়ে তিনি আজ ঘৃণ্য দস্যুসর্দারে পরিণত হয়েছেন তা যদি জানতেন, তা হলে তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে পারতেন না। তিনি যে কতখানি মহানুভব...কতখানি...।'

কথাটা সে শেষ করে না—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কৃষ্ণা তার মুখের দিকে তাকায়, সুমিয়ার চোখে স্পষ্ট জল দেখা যায়, তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে ফ্যালে।

না, সুমিয়া মেয়েটি মন্দ নয়। দিনরাতই সে কৃষ্ণার পাশে-পাশে থাকে, কত গল্প করে দেশ-বিদেশের। তার তেইশ-চব্বিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস...কত দেশ-বিদেশের কাহিনী...আ-চিনের সেই সময়কার উদারতার পরিচয়...।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল—'বাংলা দেশে কখনও গিয়েছিলে সুমিয়া?'

সুমিয়া উত্তর দিলে—'আমাদের সর্দারের সঙ্গে এই তো মাস-পাঁচেক আগে কলকাতায় গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশিদিন থাকা হয়নি কৃষ্ণাদেবী, দিন-সাতেক মাত্র ছিলুম। সর্দার আপনাদের বাড়ি দেখালেন...আপনি তখন পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন।'

বিস্মিত হয়ে যায় কৃষ্ণা। আ-চিন সুমিয়াকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে...তাদের বাড়িখানাও দেখিয়েছে একে। হবে, সে হয়তো সে-সময় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল, দূর থেকে আ-চিন তাকেও দেখিয়েছে—আশ্চর্য কথা বটে।

কৃষ্ণা বললে, 'হঠাৎ আমাদের বাড়ি আর আমাকে দেখানোর কারণ তো কিছু বুঝতে পারলুম না, সুমিয়া! যাক, সে নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি—আ-চিন মহৎ লোক, সবদিক দিয়ে সে শ্রেষ্ঠ, সে মহান। কিন্তু ভবতোষ চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে রুমাদেবীকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কারণ তো বুঝতে পারলুম না।'

সুমিয়ার চোখ দুটি জ্বলে, সে বলে, 'বড় জ্বালায়, বড় দুঃখে সর্দার ওঁদের সরিয়েছেন, কৃষ্ণাদেবী। আপনি যদি সবকথা শোনেন, তাহলে চৌধুরীকে আন্তরিক ঘৃণাই করবেন। অবশ্য,

BanglaBook.org

রুমাদেবীর অপরাধ নেই। তাঁকে সবকথা জানানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি সর্দারকে পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর সেইজন্যেই আজ তাঁকেও বন্দিনী হতে হয়েছে...অসম্ভব কষ্টে তাঁর দিন যাচ্ছে। তাঁর বাপের জন্যেই তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, এ-কর্মফল তাঁর নিজের—আ-চিনের নয়।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সে-সবকথা কি আমি শুনতে পাই না সুমিয়া?'

সুমিয়া উত্তর দিলে, 'সর্দার বললেই জানাব কৃষ্ণাদেবী, তাঁর অনুমতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারব না। তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন, তাঁর মুখেই সবকথা শুনতে পাবেন।'

কৃষ্ণা এ-সম্বন্ধে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে না, সুমিয়াও এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলে না।

দিনের পর দিন চলে যায়...।

কৃষ্ণা মনে-মনে অস্থির হয়ে ওঠে। কোথায় সে আছে, সত্যি এ-জায়গার নাম কী সে কিছুই জানে না—সুমিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে সে একই উত্তর দেয়—'সর্দার এলে সবই জানতে পারবেন।'

কেবল সুমিয়াই নয়, আরও পাঁচ সাত জন লোক এখানে থাকে। কৃষ্ণা স্বচ্ছন্দভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, পাশে-পাশে থাকে সুমিয়া।

সেদিন সুমিয়া আসতে পারেনি, সঙ্গে এসেছিল মিংলো—অল্পবয়সের একটি ছেলে, কৃষ্ণাকে সে বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত; কৃষ্ণার কোনও কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত।

প্রায়ই সে কৃষ্ণার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু সুমিয়ার সতর্কতার দরুন কোনওদিনই সে তার কাছে আসবার সুযোগ পায়নি। আজ কৃষ্ণার প্রহরীরূপে তার সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণা তার সঙ্গে গল্প জমায়...মিংলোর মুখ থেকে তার কাহিনী শোনে ঃ

মিংলোর দেশ—লখিমপুর থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে একটা গ্রামে। তার পিতা, মহামান্য আ-চিনের দলে আসবার সময় মাতৃহারা মিংলোকেও নিয়ে আসে, সেই থেকে আজ তিন বছর সে এখানেই আছে। পিতার কথা বলতে-বলতে তরুণ মিংলোর চোখে জল আসে। তার পিতা পাঁচ মাস আগে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, আজ আপনার বলতে জগতে মিংলোর আর কেউ নেই।

মিংলোকে সহসা সাথী পাওয়াটা, ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে হয়। চতুরা সুমিয়ার কাছ থেকে এতদিনের মধ্যে এদের কোনও কথাই কৃষ্ণা জানতে পারেনি; মিংলোর কাছ থেকে এখন তবু কিছু-কিছু জানা যাচ্ছে।

চলতে-চলতে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মিংলো, গৌহাটি থেকে যে আর-একটি মেয়েকে মাস দুই-তিন আগে আ-চিন নিয়ে এসেছে, তাকেও এখানে রাখা হয়েছে তো? কই, তাকে তো একদিনও দেখিনি এখানে!'

কৃষ্ণার প্রশ্ন বেশ মিষ্টি লাগে মিংলোর...সে আরামের হাসি হাসে; বলে, 'তাকে দেখবে কী করে? সে তো এখানে ছিল না; তাকে যেখানে রেখেছিল সেখানে পুলিশ হানা দেবে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনেছে। এই তো সবে কাল রাত্রে এসেছে সে...তারজন্যেই তো সুমিয়া আজ তোমার সঙ্গে আসেনি।'

রুমাকে কাল রাত্রে এরা এনেছে এখানে...।

কৃষ্ণার মুখখানা দৃপ্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমি যে ঘরে ছিলুম, তাকে বোধহয় সেই ঘরেই রেখেছে, তাই সুমিয়া আজ আসতে পারেনি...তাকে পাহারা দিচ্ছে।'

মিংলো বললে, 'তা আমি বলতে পারিনে। ওইরকম কোনও জায়গায় হয়তো তাকে রেখেছে; সুমিয়া তা জানে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।'

তখনকার মতো কৃষ্ণা চুপ করে যায়।

BanglaBook.org

পনেরো

গভীর রাত্রি। আস্তে-আস্তে কৃষ্ণা উঠল...।

ওদিকে গভীর ঘুমে ডুবে আছে সুমিয়া। নাক ডাকছে তার। ভয়াবহ নিঝুম অন্ধকার রাত। বন্দিশালার এই নিস্তব্ধ ভুতুড়ে আবহের মধ্যে জাগ্রত প্রাণী একা কৃষ্ণার গা ছমছম করে...হাজার হোক, মেয়ে তো? কিন্তু উপায় কী? মুক্তি যে তাকে পেতেই হবে...ছলে, বলে অথবা কৌশলে রুমাদেবীকে মুক্ত করতে হবে। যুক্তকরে মহাদেবী শক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা করে কৃষ্ণা পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলে...।

এখন চাই সে-ঘরের চাবি। চাবি নিশ্চয় সুমিয়ার কাছেই আছে। অন্য কোথাও রাখবার মেয়ে নয় সে। শয্যার সুমিয়ার মাথার শিয়রে, সম্ভব একটা টুলের ওপর অন্ধকারের বন্ধু একটা অতি মৃদু আলো যেন এইমাত্র মরা কোনও নির্যাতিত বন্দির নিষ্প্রভ চোখের মতো সকরুণ দৃষ্টিতে নিদ্রিতা-প্রহরিণীকে পাহারা দিচ্ছে।

সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোয় কৃষ্ণা দেখলে, ঘুমন্ত সুমিয়ার গায়ে-আঁটা নিমার পাশ থেকে ওর বুকের ওপর বেরিয়ে আছে একটা রঙিন রুমালের কিছু অংশ। পাশে পড়ে আছে একখানা বার্মিজ হাতপাখা। এক-হাতে সেই পাখা নিয়ে সুমিয়ার মুখের ওপর ভাসা-ভাসা বাতাসের দোল দিতে-দিতে, আর-এক সাবধানী হাত ধীরে—ধীরে—ধীরে—আ-আ-আঃ! এতক্ষণের বদ্ধ নিশ্বাসটা বেরিয়ে এসে যেন স্বস্তির বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেল কৃষ্ণার কাছে।

রুমালের এককোণে পাক-দিয়ে বাঁধা বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা চাবি। এরই জন্যে এত!

চাবিটা হস্তগত করে আবার পা টিপে-টিপে বেরিয়েই সে দরজার শেকলটা তুলে দিলে। ক'দিন বাইরে বেড়িয়ে কৃষ্ণা জেনেছে, এ-গুহার দিকে কেউই থাকে না, যে ক'জন পুরুষ আছে এখানে, তারা বিপরীত দিকের একটা গুহায় থাকে। সুমিয়ার ঘুম ভাঙবার পর সে চিৎকার করলেও এই বদ্ধ-গুহার মধ্যে সে-স্বর তাদের কানে পৌঁছবে না।

আগামীকাল আ-চিন আসবে। মিংলোর মুখে শুনেছে কৃষ্ণা, আ-চিন এসেই তাদের এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। পুলিশ এ-জায়গার সন্ধান করছে, হয়তো যে-কোনও দিন সদলবলে এসে ঘিরে ফেলবে। আ-চিন এবার বর্মায় ফিরবে...তার অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করে সে নিশ্চিন্ত হবে।

অপহৃত সম্পত্তি...বর্মা...।

কথাটা কৃষ্ণার মনে লাগে। রতনের কাহিনী মনে পড়ে—মালয়ের ব্যবসায়ী আওচি লিং, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুং। সুমিয়ার কথা-প্রসঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে দু-একটা আভাসও যেন সে পেয়েছিল।

আজকের প্রহরী—মিংলো।

কৃষ্ণা জানে, দিনে একজন আর রাত্রে একজন প্রহরী এখানে পাহারা দেয়। মিংলোর কাছে সে জেনেছে, আজ রাত্রে সে পাহারায় থাকবে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই, আজ হয়তো দ্বাদশী-ত্রয়োদশী হতে পারে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা—মিংলো এই পথেই ঘুরবে।

'কে ? কে দাঁড়িয়ে?'

অকস্মাৎ চমকে উঠে কৃষ্ণা দেখল, পাশে দাঁড়িয়ে মিংলো...গুলিভরা বন্দুকটা সে উঁচু করে ধরেছে। একটা হাত তোলে কৃষ্ণা—'আমি। মিংলো, আমি কৃষ্ণা।'

'তুমি? তুমি একা এই রাত্রে এখানে!'

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায় মিংলো...আস্তে-আস্তে সে উদ্যত বন্দুক নামিয়ে নেয়।

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে, মিংলোর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, আমি এসেছি মিংলো। নিশ্চয়ই তাতে তুমি অ-খুশি হওনি?'

BanglaBook.org

'অ-খুশি!' অসভ্য মিংলোর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুখখানা খুশির হাসিতে ভরে যায়। ...আ-আ। কী পেলব স্পর্শ!

'কিন্তু, তুমি একা এই কালো রাতে...তুমি কী সুন্দর! ...কী সুন্দর!!

তার হাতখানা নিজের কোমল দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কৃষ্ণা গদগদকণ্ঠে বলে ঃ

'আমাকে পাহারা দিতে তোমার খুব ভালো লাগে—না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে যাতে চিরকাল একসঙ্গে থাকতে পাও, সেই চেষ্টা করো না; আমাকে মুক্ত করে বাইরে...দূরে...খুব দূরে তোমার দেশে নিয়ে চলো না! একটু আগে আমি কী করে এসেছি জানো? সুমিয়াকে ঘরে শেকল দিয়ে এসেছি তার ঘুমন্ত অবস্থায়। এখন জাগলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না সে। পালাতে যদি হয় তো এই ঠিক সময়। চলো যাই, তোমার দেশে...তোমার ঘরে...।'

'আমার দেশে...আমার ঘরে!!'

তার হাতের উপর মৃদু একটা চাপ দেয় কৃষ্ণা...।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, লক্ষ্মীছেলে, তোমার দেশে...তোমার ঘরে...আমরা দুটিতে...তুমি আর আমি...।'

কদম্বকেশরের মতো মিংলোর সর্বাঙ্গে কাঁটা জেগে ওঠে...আনন্দে মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরোয় না।

কৃষ্ণা বললে, 'হ্যাঁ, আমি তোমার ঘরেই যাব মিংলো। কাল সকালে আ-চিন আসছে, সে এলেই তো আবার আরম্ভ হবে আমার নির্যাতন; সেইজন্যেই আমি এখন পালাতে চাচ্ছি। সেই কুৎসিত কদাকার লোকটার যত শক্তিই থাক, আমি কখনওই তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারব না, তাই তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমি জানি—যদি কেউ আমায় মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে পারে, সে একমাত্র তুমি —মিংলো।'

মিংলো আত্মহারা হয়ে পড়ে...চোখের খোলা-পাতা নেমে আসে...সঙ্গে-সঙ্গে বেহেস্তও নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে...ওর হাতের কাছে। নিঃশব্দে মিংলো কৃষ্ণার হাতের ওপর হাত বুলোয়— তারপর বলে, 'হ্যাঁ, তোমায় রক্ষা করব, তোমায় আমি নিয়ে যাব কৃষ্ণা। আ-চিনকে আমিও কোনওদিন ভালোবাসতে পারিনি; তার সর্বনাশ হোক এ-কামনা আমিও অনেকদিন থেকে করি। —চলো— আমরা দুজনে আজ এখনই চলে যাব, আ-চিন কাল ফিরে আসবার আগেই আমরা পালাব।'

সে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছিল।

কৃষ্ণা বুঝেছে, ওষুধ ধরেছে। এ-সময় মিংলোকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে...।

বন্দুকটা পিঠে বেঁধে নিয়ে মিংলো বললে, তা হলে এসো, আর দেরি কোরো না।'

দু-পা এগিয়ে গিয়েই কৃষ্ণা হঠাৎ থমকে থামে।

মিংলো বলে, 'কী হল, থামলে যে?'

কৃষ্ণা তার হাতখানা ধরে আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'আমার মাসিমাকে যে নিয়ে যেতে হবে মিংলো! ওঁর জন্যেই আ-চিন আমায় আটক করেছে...ওঁকে না নিয়ে যেতে পারলে তো আমি শান্তি পাব না। লক্ষ্মীটি মিংলো, ওঁকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে।'

মিংলো দাঁড়াল, চিন্তিত মুখে বলল, 'কিন্তু, চাবি তো আমার কাছে নেই...দরজায় যে তালা দেওয়া আছে।'

কৃষ্ণা হাতের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'চাবি আমি এনেছি, নিয়ে চলো।'

অবাক বিস্ময়ে মিংলো চাবিটা দেখে নিল, তারপর বললে, 'তোমার যাওয়া চলবে না, সেখানে পাহারা আছে, তোমায় দেখলেই চিনবে—গোলমাল করবে। তুমি এখানে এই ঝোপের মধ্যে দাঁড়াও, এখানে বাঘ-ভালুক নেই, আ-চিনের দাপটে তারা পালিয়েছে, সেজন্যে তোমার কোনও ভয় নেই। আমি পাহারাওয়ালাকে কোনও একটা অছিলায় কোথাও পাঠিয়ে, তোমার মাসিমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছি।'

BanglaBook.org

তার মধ্যে যে কোনও মন্দ মতলব নেই তা তার মুখ দেখেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বলে, 'বেশ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, যত শিগগির পারো, তুমি আমার মাসিমাকে নিয়ে এসো।'

একটা ঝোপের আড়ালে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল, চাবি হাতে নিয়ে, শিস দিতে-দিতে মনের আনন্দে মিংলো এগিয়ে চলল—কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখা গেল না।

সন্দেহ হয়, মিংলো বিশ্বাস রাখবে তো? হয়তো চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে সে এখানকার বর্তমান নেতা—আ-চিনের ডানহাত সাংগ্রোর হাতে দেবে...সবকথা তাকে হয়তো জানাবে...হয়তো...।

অনির্দিষ্ট কতদূরে কোথায় সমতল স্থান, কতদূর হেঁটে গেলে সেখানে পৌঁছনো যাবে তাই বা কে জানে! হয়তো এতক্ষণে সুমিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে...ঘরের মধ্যে সে চিৎকার করছে! বাইরের লোক কোনওরকমে যদি জানতে পারে তাহলে তার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবতে কৃষ্ণা ঘেমে ওঠে।

মিনিটপাঁচেক এইরকম অস্বস্তিতে কাটবার পরে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোতে দেখা যায় দূরে একজন লোককে, সে এইদিকেই আসছে...।

মিংলো কি?

কাছে না-আসা পর্যন্ত কৃষ্ণা নড়ে না, আড়ষ্টভাবে ঝোপের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা ক্রমশ কাছে এল...ঝোপের পাশ দিয়ে আবার চলেও গেল!

সর্বনাশ! ও তো মিংলো নয়! তবে কি যে-প্রহরীকে কৌশলে সরিয়ে দেবার কথা বলে গেল মিংলো, সেই লোকটা? বরাতে কী আছে কে জানে!

এর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই দেখা গেল, মিংলো আসছে আর তার পিছনে আসছে একটি মেয়ে। সে যেন আর হাঁটতে পারছে না। তবে দূর থেকে আন্দাজ করা যায়, মিংলো মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে জোর করে তাড়াতাড়ি চলতে বলছে।

তারা স্পষ্ট হতেই ঝোপের আড়াল থেকে কৃষ্ণা বাইরে আসে—।

এই রুমাদেবী! শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ...কৃশাঙ্গী একটি মেয়ে, কৃষ্ণার বয়সী বা তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। কৃষ্ণাকে সামনে দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দু-হাত বাড়ায়...কৃষ্ণা সযত্নে তার হাত দুখানা চেপে ধরে, 'তুমি রুমামাসি...তুমি আমার...।'

মিংলো ভয়ার্তকণ্ঠে বলে, 'তাড়াতাড়ি চলো কৃষ্ণা, পারিসানা এখুনি ফিরবে, আমি তাকে খেতে পাঠিয়েছি, ফিরে সে যখন দেখবে, বন্দিনী নেই—তখন সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। তাড়াতাড়ি ছুটে চলো, একটুও দেরি নয়।'

আগে-আগে মিংলো—তার পেছনে চলে কৃষ্ণা ও রুমা। যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে আরম্ভ করে ওরা। বেচারা রুমা যতবার পার্বত্য পথে পা পিছলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, ততবার কৃষ্ণা ওকে হাত ধরে তুলে খুব সাবধানে নিয়ে চলে।

ষোলো

দীর্ঘ পথ যেন আর ফুরোতে চায় না—শীর্ণ রুমা আর চলতে পারে না..। অবসন্নভাবে শুয়ে পড়ে...ওঠবারও ক্ষমতা থাকে না আর।

মিংলো ভয় পেয়ে বলল, 'পারিসানা যদি ফিরে এসে বন্দির ঘরের দরজা খোলে, তা হলেই সর্বনাশ! এতক্ষণ হয়তো চারিদিকে তাদের লোক ছুটেছে, বান্দরী-খালে আ-চিনের কাছেও খবর গেছে। বান্দরী-খাল এখান থেকে বেশি দূর নয়, আ-চিন সকালের মধ্যে এসে পৌঁছবে, যদি কোনওরকমে ধরা পড়ি তাহলে হয়তো তোমাদের কিছুই হবে না, কিন্তু আমায়—আমায় তারা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে মারবে...জীবন্ত আমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে...।'

BanglaBook.org

বলতে-বলতে সে শিউরে ওঠে।

কৃষ্ণা সে-কথা বিশ্বাস করে। আ-চিন যে প্রকৃতির লোক, জীবন্ত মানুষের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কোন দিকে চলেছি, মিংলো?'

মিংলো উত্তর দিলে, 'আমরা লামডিংয়ের দিকে যাচ্ছি। লামডিং পৌঁছতে পারলে তবু আশা আছে, ওখান থেকে ট্রেনে করে আমি লখিমপুরে যেতে পারি। কিন্তু লামডিং এখনও অনেক দূর, এখান থেকে তিন-চার ক্রোশ হবে! এতখানি পথ যাওয়া তোমার মাসিমার পক্ষে অসম্ভব!

ভোরের আর বিলম্ব ছিল না...পূর্ব-আকাশ আস্তে-আস্তে ফরসা হয়ে আসছে...।

এতক্ষণে রুমা চোখ মেললে।

কৃষ্ণা তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, 'এখন হাঁটতে পারবে, রুমামাসি? আর বেশি দূর নেই, লামডিংয়ের কাছে এসেছি, সকাল হতে-হতেই ওখানে পৌঁছতে পারব বলছে মিংলো।'

রুমা ওঠবার চেষ্টা করে, কৃষ্ণা ওকে সাহায্য করে।

বেচারা রুমা। পা দুখানা ওর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। দু-তিন মাস বন্দিনী অবস্থায় আ-চিনের দলের লোকের সঙ্গে ওকে এখানে-ওখানে নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে।

তবু রুমা হাঁটে, অতি কষ্টে কৃষ্ণাকে অবলম্বন করে চলে।

মিংলোকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু পরিশ্রান্ত কৃষ্ণার কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না।

চলতে-চলতে হঠাৎ মিংলো থেমে গেল...ভয়ার্তকণ্ঠে বলল, 'লুকোও—লুকোও কৃষ্ণা, আ-চিনের গলার স্বর শুনতে পেয়েছি, নিশ্চয় এই পথেই ফিরছে তারা।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা পাথরের আড়ালে সে কৃষ্ণা ও রুমাকে টেনে নিয়ে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বসে পড়ে। সরু পার্বত্য পথে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, কথা বলতে-বলতে তারা এগিয়ে চলেছে...

ও তো আ-চিনেরই কণ্ঠস্বর...আ-চিন ধমক দিচ্ছে—'আঃ, কি আস্তে-আস্তে হাঁটছ তোমরা? পেছনে পুলিশ আসছে, খেয়াল নেই? এখুনি ধরা পড়তে হবে...তারপর শাস্তির কথাটা ভাবো...ছুটে এসো...এখুনি আড্ডা ভেঙে দিতে হবে...ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিশ আসবে...কোনও ভুল নেই...।

খুব দ্রুত তারা ছুটে চলে।

ভগবান রক্ষা করেছেন, নইলে যদি ধীরভাবে যেত তারা—নিশ্চয়ই দেখতে পেত কৃষ্ণাদের। পুলিশ পিছনে আসছে...ধরা পড়বার সম্ভাবনায় আ-চিন ছুটে চলেছে...এদিক-ওদিক চাইবার অবকাশ নেই ওর...এও কি সম্ভব? কে বলে, ভগবান ঘুমিয়ে আছেন কলিকালে? এই তো সবে কলির সন্ধে... এরই মধ্যে? কৃষ্ণা শিক্ষিতা মেয়ে তাই রক্ষে, নইলে স্বৈরাচারী দস্যুর ত্রস্ত শঙ্কিত ভাব দেখে, প্রতিশোধ-নেওয়ার সাফল্যে 'হা-হা-হা-হা' অট্টহাস্য করে এইরকম সময়েই তো নির্যাতিত বন্দিরা আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে!

পদশব্দ দ্রুত মিলিয়ে যায়...কথাবার্তাও তাদের শোনা যায় না আর...তবু পনেরো-কুড়ি মিনিট কৃষ্ণা, রুমা, মিংলো সেখানে অপেক্ষা করে...সরে যেতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা বললে, 'ওঠো, এবার এগিয়ে চলা যাক। পুলিশ আসছে, আমাদের আর কোনও ভয় নেই, মিংলো।'

আনন্দে কৃষ্ণার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রুমাও অনেকখানি উৎসাহ পায়, শুধু বিমর্ষ হয়ে পড়ে মিংলো।

দুর্বল পায়ে চলতে-চলতে সে যা বলতে থাকে তার বাংলা করলে মানে এই হয় যে, 'রামে

BanglaBook.org

মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে, আমার কাছে দু-ই সমান। আ-চিন জীবন্ত-অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াবে...পুলিশ না হয় ফাঁসি দেবে... নয়তো দেবে দ্বীপ-চালান...তফাত শুধু এই।'

সে আর হাঁটতে পারে না।

কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দেয়—'না—না—না, ভুল করছ মিংলো, পুলিশ তোমায় রাজসাক্ষী করে নেবে, তোমায় কোনও শাস্তিই পেতে হবে না।'

মিংলো মনে-মনে হাসে, কৃষ্ণার সাহস দেওয়ার রকম দেখে। কিন্তু চোখ তার ক্রমেই ভিজে ওঠে...।

একটা বাঁক ঘুরতেই সশস্ত্র পুলিশ-দলের সামনে এসে পড়ে এরা তিনজন...।

তারা যুগপৎ বন্দুক উঁচু করে...সঙ্গে-সঙ্গে কার চিৎকার কানে আসে—'কে, কৃষ্ণা? আমাদের কৃষ্ণা?'

পরমুহূর্তে ছুটে আসেন সুজন মিত্র, তাঁর পিছনে প্রণবেশ।

'মামা!'

কৃষ্ণা ছুটে যায় প্রণবেশের কাছে, আত্মহারা প্রণবেশ তার মুখখানা দু-হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে ক্ষুদ্র বালকের মতো উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠেন।

বেচারা প্রণবেশ। এ-ক'দিন যে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তা তাঁর আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। সত্যি, প্রণবেশ আর আগেকার সেই সৌম্যমূর্তি প্রণবেশ নেই, আধখানা হয়ে গেছেন যেন।

কৃষ্ণা তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'চুপ করো মামা, যখন ফিরে এসেছি তখন আর কারও ক্ষমতা নেই যে, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবে।'

প্রণবেশ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এ-ক'দিনে তোর কী চেহারা হয়েছে কৃষ্ণা...দেখে চেনা যায় না...কেন তুই এমন জায়গায় এলি?'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'তোমার চেহারাটাই বুঝি আগের মতো আছে? রোগা আধখানা হয়ে গেছ যে একেবারে! হ্যাঁ, সুজনমামা, আগে আপনাকে একটা কথা জানাই—একটু আগে আ-চিন এই পথে গেছে। ঝোপের আড়ালে ওই মস্তবড় পাথরটার পেছনে আত্মগোপন করে থাকার সময় শুনেছি, আমাদের নিয়ে সে আজই বর্মায় চলে যাবে বলতে-বলতে যাচ্ছে। যাক, আর তাকে ভয় করবার কারণ নেই, যখন আপনারা এসে পৌঁছেছেন। ...এই দেখুন কাকে সঙ্গে করে এনেছি...ইনিই আমার রুমামাসি! বহু কষ্টে এঁকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছি শুধু এই মিংলোর সাহায্যে!' বলে মিংলোকে কৃষ্ণা দেখিয়ে দিলে।

মিষ্টি হাসিতে মিংলোকে তুষ্ট করে, তারপর রুমাকে অভিবাদন জানিয়ে সুজন বললেন, 'দুজন কনস্টেবল সঙ্গে দিচ্ছি, কৃষ্ণা, এঁদের নিয়ে তুমি লামডিংয়ে ফিরে যাও। প্রণবেশ, আমি আ-চিনের ব্যবস্থা করে যত শিগগির পারি ফিরে আসছি।'

পুলিশ-দল নিয়ে সুজন মিত্র দ্রুত সামনের দিকে ছুটলেন।

BanglaBook.org

সতেরো

লামডিং পৌঁছেই গৌহাটি ফেরবার ট্রেন পাওয়া গেল।

একখানা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লেন প্রণবেশ, রুমা ও কৃষ্ণা...কনস্টেবল দুজনও উঠে বসল।

'মিংলো...মিংলো কোথায় গেল?'

কৃষ্ণা এদিক-ওদিক তাকায়...মিংলো কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশভাবে কৃষ্ণা বসে পড়ে, বলে—'বেচারার কপালে অনেক লাঞ্ছনা আছে দেখছি। রামের হাতে মরলে তবু স্বর্গ পেত...রাবণের হাতে মরে ওকে অনন্ত নরকেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

রাগ করে প্রণবেশ বললেন, 'যাক না নরকে। চিরকাল ডাকাতি করে এসেছে, জানে, পুলিশের হাতে পড়লে দুর্গতির একশেষ হবে...শাস্তি পেতে হবে। তার চেয়ে পালাল, বেঁচে গেল। যাক, রুমাকে পাওয়া গেছে এই আমাদের সৌভাগ্য। ভবতোষবাবুকেও পাওয়া গেছে, ল্যাংটিংয়ে ওঁদের সেই বাড়িতে।'

'বাবা...বাবাকে পাওয়া গেছে!'

রুমা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—'কেমন আছেন তিনি ...খুব রোগা হয়ে গেছেন বোধহয় ভেবে-ভেবে...তা হোক, বেশ ভালো আছেন তো?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রণবেশ বললেন, 'তাঁর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। একে বৃদ্ধ—তার ওপর বহুদিন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলেন, এখন তিনি অত্যন্ত পীড়িত। তাঁকে গৌহাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি তোমার পথপানে চেয়ে আছেন রুমা..।'

এ-কথা শুনে রুমা যেন পাথর হয়ে যায়, নিঃশব্দে তার চোখের কোণ দিয়ে কেবল জল ঝরে পড়ে...।

ট্রেন গৌহাটিতে পৌঁছল। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে তাতে রুমা ও কৃষ্ণাকে উঠিয়ে, প্রণবেশ নিজেও উঠলেন।

অত্যন্ত অসুস্থ ভবতোষ চৌধুরী—বাঁচবার আশা নেই, শহরের বড়-বড় ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়েছেন।

রুমা গিয়ে পিতার কাছে বসল, কৃষ্ণা খানিক সেখানে থেকে রতনের নির্দেশমতো পাশের ঘরে গেল বিশ্রাম করতে।

তারপর স্নানাদি সেরে চা পান করতে-করতে কৃষ্ণা বলল, 'অনেক কথাই শুনেছি মামা...ভবতোষ চৌধুরী লোকটি বড় সুবিধের নয়, অনেক কীর্তিই করেছেন তিনি।'

উৎসুক প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী-রকম?'

কৃষ্ণা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তা বলতে শুরু করে ঃ

'ভবতোষ চৌধুরী একদিন রতনকে সঙ্গী করে চলে যান মালয়ে—তারপর সেখানে তিনি আউচি লিং নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি পেয়েছিলেন। আউচি লিং অত্যন্ত সহৃদয় লোক ছিলেন, ভবতোষ চৌধুরীকে তিনি খুব বিশ্বাসও করেছিলেন। আউচি লিং ছিলেন বিপত্নীক, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুংকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন শিক্ষার জন্যে।

ভবতোষ চৌধুরীই আউচি লিংকে জানান যে, মাও তুং এক আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম নিয়েছে। এরপর আউচি লিং হঠাৎ একদিন মারা যান...মাও তুং তারপর ফিরে আসে...কিন্তু তার অনেক আগে ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার রবার-বাগান, কারখানা সব বিক্রি করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে ল্যাংটিংয়ে চলে আসেন। মাও তুং কোনওরকমে জানতে পারে যে, তার পিতাকে ভবতোষ চৌধুরী হত্যা করেছেন এবং জাল উইলে প্রতিপন্ন করেছেন, এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক তিনিই। সেই দলিলের মধ্যে দেখা গেল যে, বিধর্মী পুত্রকে আউচি লিং এক পয়সাও দেননি। তাঁর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ভবতোষ চৌধুরীকেই তিনি স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

কপর্দকহীন মাও তুং আত্ম-নাম ও পরিচয় গোপন করে 'আ-চিন' নাম নিয়ে কৃষ্ণাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্মায় ফেরবার পর বসন্ত হওয়ায় তার বাঁচবার আশা ছিল না এবং তাতেই তার

BanglaBook.org

একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর মুখে অজস্র ক্ষত চিহ্ন হওয়ার ফলে মুখখানা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়।

সুমিয়ার পরিচয়ও কৃষ্ণা সংগ্রহ করেছে, মিংলোর কাছে...আ-চিনের উপযুক্ত সহধর্মিণী সুমিয়া। বসন্ত হয়ে যখন আ-চিন মরণাপন্ন, তখন এই মালয়ী মেয়েটি প্রাণপণ যত্নে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, যার ফলে আ-চিন জীবন ফিরে পেয়ে, কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে সুমিয়াকে বিবাহ করেছিল।

উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্নী সুমিয়া। স্বামীকে সে ভালোবাসত...নির্বিচারে তার ভালো-মন্দ সব কাজই প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করত। আ-চিনের অবর্তমানে সে-ই তার সমস্ত কাজ চালিয়েছে...দল পরিচালনা করবার শক্তি তার যথেষ্ট ছিল।

এরপর মাও তুং, প্রবঞ্চক ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান করতে থাকে। কপর্দকশূন্য মাও তুং অবশেষে দস্যুদল গঠন করে নিজে তাদের অধিনায়ক হয়। বর্মায় সে যে-দলে ছিল, সে-দল ধরা পড়ার পর ছদ্মবেশে সেই সময় ভারতের সমস্ত দেশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে ভবতোষ চৌধুরীকে। ল্যাংটিংয়ের হাতিখালিতে তার অবস্থানের খবর পেয়ে, দেখা করতে গিয়ে দেখা হয়নি...গৌহাটিতে গিয়ে অপমানিত মাও তুং ফিরে যায়।

প্রতিহিংসা সে নিয়েছে। ভবতোষ চৌধুরীর ম্যানেজার রামশরণ সিংকেই শুধু সে হস্তগত করেনি, তার দাসদাসী, কর্মচারীদের সকলকেই সে হাত করেছিল। রামশরণ সিং তার আদেশে সব-কিছু ঘৃণ্য কাজ করত এবং এদের সাহায্য নিয়েই একদিন রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীকে অচৈতন্য অবস্থায় গৌহাটির বাড়ি থেকে হাতিখালির বাড়িতে এনে বাড়ির যে-ঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত, সেই ঘরে বন্দি করে রেখেছিল।'

প্রণবেশের কাছে শোনা গেল, কৃষ্ণা অন্তর্হিত হওয়ার পর সুজন ফিরে এসে, পুলিশ নিয়ে সেই বাড়ি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু রামশরণ সিংকে সেখানে পাওয়া যায়নি। দু-দিন আগে সে নাকি নিজের দেশে যাত্রা করেছে, সম্ভব এতদিনে গ্রেপ্তারও হয়েছে। বাড়ি সার্চ করবার সময় চাবি-বন্ধ কুঠুরিটার মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় শুধু ভবতোষ চৌধুরীকে পাওয়া গেছে।

আ-চিন জাল দলিলপত্র সব নিয়ে গিয়ে রেঙ্গুন-কোর্টে দাখিল করেছে, শিগগিরই ভবতোষ চৌধুরীকে, মাও তুংয়ের সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে।

দস্যু-দলপতি হিসেবে আ-চিন ওরফে মাও তুংকে পুলিশ এখন ধরবার চেষ্টায় ফিরছে। সম্পত্তি উদ্ধার করে ভোগ করার পরিবর্তে তাকে হয়তো এখন আজীবনকালের জন্যে জেলের দুর্ভোগই ভোগ করতে হবে।

রুমাকে মাও তুং তার পিতার কথা জানিয়েছিল। রুমা পুলিশে খবর দিয়ে মাও তুংকে ধরাবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই বন্দিনী হয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছে। নইলে বেচারা রুমার ওপর মাও তুংয়ের কোনও রাগ ছিল না, রুমা নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে। উত্তেজিত প্রণবেশ তারপর বললেন, 'যাক, সব কাজই তো মিটে গেল...এবার কলকাতায় চলো...এখানে আর একটা দিন নয়...আমার মোটে ভালো লাগছে না...এখন কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি...এতে তুমি অমত কোরো না কৃষ্ণা...সত্যি আমার অবস্থাটা একবার বোঝো।' ...একনিশ্বাসে এতগুলো কথা বলবার পর নিশ্বাস নিতে প্রণবেশ থামলেন, তারপর অধীর আগ্রহে কৃষ্ণার মতামত জানবার জন্যে তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন।

কৃষ্ণা মাথা কাত করে বললে, 'তুমি ব্যাকুল হয়ো না মামা, আর দু-দিন অপেক্ষা করো, ওঁর অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় দেখি। যদি তেমন কিছু হয় রুমামাসিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে...ওঁকে তো আর এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না!'

প্রণবেশ মুখ ভারি করেন। রুমা মেয়েটির উপর তাঁর এতটুকু স্নেহ নেই, তাকে এড়াতে পারলে বাঁচেন তিনি।

BanglaBook.org

আঠেরো

জনকয়েক লোককে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন সুজন। মাও তুংকে ধরতে পারা যায়নি — সে কোন পথ দিয়ে সরে গেল, অশেষ নির্যাতন করেও দলের কোনও লোকের মুখ থেকে সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বার করতে পারা যায়নি।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে—'সুমিয়া কোথায় গেল, মাও তুংয়ের স্ত্রী?'

সুজন উত্তর দেন—'ও, সেই কালোমতো মেয়েটি তো? সে আত্মহত্যা করেছে।'

'আত্মহত্যা!...কেন?'

কৃষ্ণা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

সুজন বললেন, 'কারণ, সে মাও তুংয়ের সঙ্গে পালাতে পারেনি। সে-সময় খুবই অসুস্থ ছিল সে, নড়বার ক্ষমতা ছিল না তার। শুনলুম, অনেক মিনতি করে শেষে জোর করে সে মাও তুংকে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন পৌঁছলুম ঠিক সেই মুহূর্তে সে বিষপান করেছে। অনেক চেষ্টা করেছি...তাকে যদি বাঁচাতে পারি তবে মাও তুংকে কোনওদিন পাবার আশা থাকবে...কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে সে চলে গেছে।'

সুমিয়ার জন্যে কৃষ্ণা প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে...দুঃখিত হয়। নিজে সে জীবন দিয়েছে...তার স্বামীকে সে বাঁচিয়েছে...উপযুক্ত স্ত্রীর কাজ করেছে সে। সে আর-যাই হোক, সত্যিকারের সহধর্মিণী বটে। তার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে কৃষ্ণা মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

ভবতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কথা তাঁর বন্ধ হলেও ভেতরে জ্ঞান ছিল, হতজ্ঞান-প্রায় রুমাকে কৃষ্ণার হাতে তুলে দিয়ে, কপর্দকহীন ভবতোষ চৌধুরী সেদিন রাত্রে মহাপ্রস্থান করলেন।

বাধ্য হয়ে কৃষ্ণাকে আরও কয়েকটা দিন থাকতে হল।

গৌহাটিতে রুমা পিতার শেষকাজ সম্পন্ন করলে। বাড়িতে রতনকে পাহারায় রেখে একদিন রাত্রে চোখ মুছতে-মুছতে রুমা—কৃষ্ণা ও প্রণবেশের সঙ্গে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে বসল।

বাংলায় এই তার প্রথম যাত্রা।'

হয়তো চিরকালের মতোই গৌহাটি ত্যাগ করে যাওয়া...রুমা সজল চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে...শান্তভাবে ধীরে-ধীরে মাথাটা নত করে আবাল্যের লীলাভূমি গৌহাটিকে একটা প্রণাম জানায়...।

ট্রেন তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

BanglaBook.org

ভূতের মতো অদ্ভুত

BanglaBook.org

বুদ্ধদেব বসু

এক

নাম ব্রডওয়ে হোটেল, কিন্তু আসলে বৌবাজারে কেরানি ও বেকারবাবুদের একটি মেস। এই মেসে শীতের রবিবারের এক সকালবেলায় এ-গল্পের যবনিকা তোলা গেল।

চাকুরেদের পক্ষে—বিশেষত কলকাতার কেরানিদের পক্ষে রবিবার দিনটি সত্যই স্বর্গীয়। এই তো নরহরিবাবু, যিনি অন্য সব দিন এই শীতেও ভোর না হতে ওঠেন, তারপর শ্যামবাজারে ছেলে-পড়ানো চুকিয়ে, কোনওরকমে নাওয়া-খাওয়া সেরে ন-টা না বাজতেই আপিসে ছোটেন, তিনি আজ বেলা আটটাতেও লেপের তলায় পাশ ফিরছেন। এইমাত্র তাঁর ঘুম ভাঙল। গোটা দুই হাই তুলে তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা!' তারপর হাঁক দিলেন, 'দুর্গা!'

শেষের ডাকটি জগৎমাতাকে লক্ষ করে নয়। দুর্গা মেসের এক চাকর। একডাকে তার দেখা পাওয়া গেল না, তখন নরহরিবাবু গলা চড়িয়ে আবার ডাকলেন, 'দুর্গা—অ দুর্গা!'

গলার জোর আছে নরহরিবাবুর, কেরানি না হয়ে কলকাতার কলেজে প্রফেসর হলে তাঁকে মানাত। একতলার সিঁড়ির কাছে কলতলায় দুর্গা চায়ের পেয়ালা ধুচ্ছিল, তার কানে সে-ডাক পৌঁছল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে একটা চায়ের কেৎলি নিয়ে বেরিয়ে গেল, মিনিট পাঁচেক পরে কেৎলিতে চা, একটা প্লেটে দুখানা টোস্ট আর হাতে একটা চায়ের পেয়ালা ঝুলিয়ে উঠে এল তেতলায় নরহরিবাবুর ঘরে।

তাকে দেখেই নরহরিবাবু চটে উঠে বললেন, 'হতভাগা, তোকে এতক্ষণ ধরে ডাকছি, কোথায় থাকিস—।'

দুর্গা বললে, 'আপনার চা-টা একেবারে নিয়েই এলুম।'

নরহরিবাবু তক্ষুনি জল হয়ে গিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ। তোর বেশ বুদ্ধি আছে, দুর্গা। জীবনে তোর উন্নতি হবে।'

দুর্গা বললে, 'আমি তো জানি আপনি রবিবারে সকালে উঠেই প্রথমে এক পেয়ালা চা খান, তাই আপনার ডাক শুনে উপরে না এসে একেবারে চা আনতেই চলে গেলুম।'

চা নরহরিবাবু রোজই সকালে খান, তবে অন্যান্য দিন এমন আরাম করে খাওয়া হয় না, টিউশনি করতে যাওয়ার পথে দোকানে ঢুকে তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নেন। আজ আরাম করবার দিন, আজ সব ব্যবস্থাই অন্যরকম।

'বেশ, বেশ। চা-টা ঢেলে দাও তো বাবা। টোস্টও এনেছিস দেখছি। খুব ভালো। দুর্গা, তুই লেখাপড়া জানিস?'

তক্তপোশের পাশে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটি রেখে দুর্গা বললে, 'অল্প-অল্প জানি।'

'পাশ-টাশ করলে তোর ভালো চাকরি হত, দুর্গা।'

'আজকালকার দিনে তা কি জোর করে বলা যায়?'

লেপের তলায় আধশোওয়া অবস্থায় চা খেতে-খেতে নরহরিবাবু বললেন, 'তা যা বলেছিস। কত বি.এ., এম.এ. ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু তো গতর খাটাতে পারিস বলে খেতে পাচ্ছিস। বড্ড খাটুনি মেসে, না রে?'

'তা খাটতেই তো এসেছি।'

নরহরিবাবু হঠাৎ তাঁর বালিশের তলায় হাত দিয়ে একটি আনি বের করে দুর্গার হাতে দিয়ে বললেন, 'নে এটা। কিছু কিনে-টিনে খাস। এখানে আমাদেরই যা খাওয়ার ব্যবস্থা, তোরা যা খাস ভাবতেই ভয় করে।'

দুর্গা আনিটি তার জামার পকেটে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নরহরিবাবু প্রায়ই তাকে এরকম দু-চার পয়সা দিয়ে থাকেন। মানুষটি তিনি একটু শৌখিন গোছের। বোধহয় তাঁর রোজগারও

BanglaBook.org

ভালোই, তেতলায় আস্ত একটা ঘর নিয়ে থাকেন। তার উপর হৃদয়টাও তাঁর কোমল। মেসে যখনই যার দরকার, দু-চার টাকা ধার দিতে পরোয়া করেন না, সে-টাকা সবসময়ই যে ফেরত আসে তাও নয়। বেকার ছেলেদের চাকরির খোঁজখবর দেওয়া, তাদের অ্যাপ্লিকেশন নিজের আপিস থেকে টাইপ করিয়ে আনানো—এসব তিনি হামেশাই করে থাকেন। এসব কারণে মেসে সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, ম্যানেজার থেকে শুরু করে সকলেরই তিনি হরি-দা।

নরহরিবাবু বললেন, 'একখানা খবরের কাগজও যে চাই দুর্গা। তা না হলে চা জমে না।'

'নিয়ে আসব?'

'এক্ষুনি আবার এতগুলো সিঁড়ি ভাঙবি?'

'দিনরাতই সিঁড়ি ভাঙছি বাবু, ওতে আমাদের কিছু হয় না।'

দুর্গাকে নরহরিবাবু যেন বিশেষ একটু স্নেহের চোখেই দেখেন। তার কারণও আছে। দুর্গা ভারি ছেলেমানুষ, আঠারো-উনিশ মতো বয়েস। দেখতেও সুন্দর, হাত-পা তকতকে পরিষ্কার, দেখে ভদ্রলোকের ছেলে মনে হয়। কথাবার্তাও মার্জিত। এই মেসে সে নতুন এসেছে, পুরো একমাসও হয়নি। মেসের চাকরদের গালিগালাজ এমনকী মারধোর প্রায়ই সহ্য করতে হয় আর খাটতে হয় ভূতের মতো। দুর্গাকে দেখে মনে হয়নি, সে কাজ চালাতে পারবে। ম্যানেজারবাবুও বোধহয় তার সুন্দর মুখ দেখেই দয়া করে তাকে বহাল করেছিলেন! বাবুদের ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে তাকে রাখা হয়েছে। মেসের সব বাবুরাই তাকে যেন একটু-আধটু দয়া করেন—মাঝে-মাঝে এক-আধটু বকুনি দিলেও এ-পর্যন্ত চড়-চাপড় তার পিঠে পড়েনি। তবে এ-ও বলতে হয় যে, কাজকর্ম দুর্গা চালাচ্ছে ভালোই—শুধু তার সুন্দর মুখ দেখে নয়, তার কাজেও সকলে তার উপর খুশি।

নরহরিবাবু বালিশের তলা থেকে আর-একটা আনি বের করে দিয়ে বললেন, 'তা হলে যা একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আয়।'

'আনন্দবাজার?'

'না, না, বাংলা কাগজ আমি পড়িনে। জানিস, বিশ বছর আগে বি.এ. ফেল করেছিলুম, সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা এখনও আমার মগজে ঘুরছে। অমৃতবাজার আনবি। আর শোন, চারতলার বাবুকে একবার ডেকে দিবি—বলবি আমি তাঁকে তাস খেলতে ডেকেছি।'

প্রায় প্রতি রবিবারেই নরহরিবাবুর ঘরে তাসের আড্ডা বসে। দুর্গা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সরোজ ঘরে ঢুকে বললে, 'কী দাদা, আজ খেলা-টেলা হবে না?'

'হবে, হবে, বোসো। এই তো ঘুম থেকে উঠলুম। তুমি দেখছি এই সকালেই একেবারে ফিট-ফাট বাবু সেজেছ। বেরুচ্ছ নাকি কোথাও?'

'আর বলেন কেন—আজ আপিসের বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ে। দশটা থেকেই হাজিরা দিতে হবে। ভাবছি তার আগে দু-পিঠ খেলে যাই।'

'বেশ, লোকজন ডেকে আনো। আমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে আসি,' বলে নরহরিবাবু লেপের তলা থেকে উঠে পড়লেন। বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'গোবিন্দবাবুকেও খবর পাঠিয়েছি।'

'ওই বুড়োটাকে আবার কেন, দাদা?'

'বুড়ো তো আমিও।'

'হ্যাঁঃ, রেখে দাও—তোমার পঁয়তাল্লিশ হলেই খুব বেশি। সত্যি হরি-দা, ওই একচোখো গোবিন্দটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। ও এলে আড্ডাই মাটি হয়।'

'তোরা সকলে মিলে তাঁকে বয়কট করেছিস বলেই আমি মাঝে-মাঝে ওঁকে ডেকে পাঠাই। তিনি যে কানা সে তো আর ওঁর দোষ নয়, আর উনি যে কিপটে তাও ওঁর স্বভাবেরই দোষ। তাস খেলতে তিনি ভালোবাসেন, খেলেনও ভালো—এ-অবস্থায় একই মেসে থেকে তাঁকে না ডাকলে কি ভালো দেখায়?'

BanglaBook.org

সরোজ রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, 'রেখে দাও তোমার ভালো দেখানো! লোকটাকে এই মেস থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

'কী অপরাধে? তিনি কুচ্ছিত আর কিপটে, তাই বলে কি মানুষ নন?'

'মানুষ? ওকে তুমি মানুষ বলো হরি-দা! টাকার কুমির—এদিকে আমাদেরই মতো একটা মেসে পড়ে আছে—হেঁটো ধুতি আর হাফ-শার্ট পরে, বিড়ি ফোঁকে, মান্ধাতার আমলের একটা তেল-চিটচিটে বালাপোশ জড়িয়ে শীত কাটায়। ওর গায়ে দুর্গন্ধ, ওর দাড়িতে উকুন, ওর কাপড় এত ময়লা যে ওর পাশে বসতে ঘেন্না করে। অন্যের জন্যে কিছু না-হয় না-ই করল, যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্যেও যে একটা পয়সা খরচ করে না, তুমিই বলো তাকে কি মানুষ বলে!'

নরহরিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'বড্ড চটে গেছ দেখছি। ওর কাছে কিছু ধার-টার চাইতে গিয়ে জব্দ হয়েছিলে বুঝি?'

সরোজ মুখ লাল করে বললে, 'খেপেছ তুমি! পাথর ভাঙলে রক্ত বেরোবে, কিন্তু গোবিন্দ চাটুয্যের আঙুল গলে একটি পয়সা পড়বে না তা তো জানো!'

'বড্ড ছেলেমানুষ আছ এখনও, সরোজ। সব মানুষ একরকম নয়, এ-কথা এখনও মেনে নিতে পারো না কেন? এই যে দুর্গা এসেছে অমৃতবাজার নিয়ে। তুমি বসে-বসে একটু কাগজটা পড়ো, আমি আসছি। দুর্গা, চারতলার বাবুকে বলেছিলি আসতে?'

'তাঁর এখনও ঘুম ভাঙেনি। দরজা বন্ধ।'

সরোজ বলে উঠল, 'বুড়ো খুব ঘুমুচ্ছে তো আজ! থাক হরি-দা, ওকে তা হলে আর ডেকে কাজ নেই।'

এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে নরহরিবাবু হাত-মুখ ধুতে চলে গেলেন।

দুই

মিনিট দশেকের মধ্যে আরও কয়েকটি ছোকরা সে-ঘরে এসে জড়ো হল। সকলেই তাসের গন্ধে এসেছে; চারজন খেলবে—বাকি ক'জন দেখবে ও উৎসাহ দেবে, আবার খানিক পরে তারা বসবে অন্যেরা দেখবে। এইরকমই হয় প্রায় রবিবারে।

দুর্গা নরহরিবাবুর বিছানা ঠিকঠাক করে সুজনি দিয়ে ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল, তখন সেই বিছানার উপরেই গুলজার হয়ে বসল সবাই।

নরেশ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম করে বসে বললে, 'আঃ!' ওই একটি কথাতেই যেন ছ-দিনের খাটুনির পরে পুরো একটি দিনের বিশ্রামের আনন্দ ফুটে উঠল।

মনোহর বললে, 'বেশ কনকনে শীতটি পড়েছে আজ। এমন দিনেই তো আড্ডা জমে। শুধু-শুধু তাস নয় ভাই, আজ হরি-দাকে বলে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক।'

—'আর সেইসঙ্গে গরম সিঙাড়া,' বললে সরোজ। 'জানো তোমরা, সে-ব্যবস্থাও করেছেন হরি-দা।'

ফর্সা বেঁটে মতো একটি ছেলে এককোণে বসে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সে বলে উঠল, 'তা হরি-দা তো আড্ডা বসলেই চা খাওয়ান, আমাদেরই একদিন বিনিময়ে কিছু করা উচিত।'

'আরে শুধু কি চা—রীতিমতো ভোজ, ফিস্টি।'

নরেশ আর মনোহর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুরে! হুরে।'

সরোজ বলতে লাগল, 'বিরাট ভোজ দিচ্ছেন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!'

ওই নামটা শোনামাত্র সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল।

সরোজ বললে, 'হরি-দা আজ আবার ওই বুড়োটাকে ডেকেছেন। কী কাণ্ড দ্যাখো দেখি

BanglaBook.org

তোমরা। তা আমিও মনে-মনে ভেবে রেখেছি আজ বুড়োর কাছে খাওয়া আদায় করব তবে ছাড়ব।'

ফর্সা ছেলেটি বলে উঠল, 'গোবিন্দ বুড়ো খাওয়াবে! তাহলেই হয়েছে!'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার হাসির হররা।

হাসি থামলে পরে মনোহর বললে, 'ভালো করলে না, সরোজ, ওই সকালবেলা বিটকেল বুড়োটার নাম করে। কপালে কী আছে কে জানে।'

'আজ খাওয়া জোটে কি না দ্যাখো,' বললে নরেশ।

সরোজ বললে, 'না, না, আমি যা প্ল্যান করেছি করাই চাই। এমন চেপে ধরব বুড়োকে যে এ-আড্ডায় তাস খেলতে আর অন্তত আসবে না। তোমরা সব আছ তো আমার সঙ্গে?'

নরেশ বললে, 'হ্যাঁঃ, তুমি কি ভেবেছ ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠব? ওর কি একফোঁটা চক্ষুলজ্জা আছে!'

ফর্সা ছেলেটি বলে উঠল, 'তা ছাড়া একদিন জোর করে খাওয়া আদায় করে লাভই বা কী!'

সরোজ কৌতূহলী চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তবে? তোমার মতটা কী শোনা যাক, আনন্দ।'

আনন্দ বয়েসে ওদের সবার ছোট, তাকে ছেলেমানুষ বলা যায়। বেকার অবস্থায় আছে এই মেসে, চাকরির চেষ্টা করছে। চাকরি হওয়ার কোনও আশাই দেখা যাচ্ছে না, মেসের দেনা দু-মাস বাকি। অবস্থা তার সত্যি খুব খারাপ, পরনে ময়লা কাপড়, শীতেও একটা র‍্যাপার গায়ে নেই, নিচে একটা শার্ট তার উপরে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছে, সবসুদ্ধু এই দুটোই জামা তার। কোথা থেকে নানারকম বই জোগাড় করে এনে গোগ্রাসে পড়ে সে, আর সুযোগ পেলেই খুব চড়া ক্যানকেনে গলায় এমন সব বক্তৃতা করে যা শুনে মেসবাসীদের তাক লেগে যায়। কেউ তাকে বলে পাগল, কেউ বলে ইডিয়ট, কেউ বা এমনও সন্দেহ করে যে স্বদেশিওয়ালাদের সঙ্গে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত—তাকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক এমন প্রস্তাবও কেউ-কেউ এনেছে! কিন্তু মোটের উপর তার কথাবার্তা শুনতে সকলেরই বেশ মজা লাগে, অনেকে ইচ্ছে করেই তাকে বেশ খানিকটা আশকারা দেয়। আর সত্যি—বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে সে। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সকলেই, কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ব্রডওয়ে হোটেলে সে-ই সবচাইতে ভালো বক্তা আর পড়াশুনোও বোধহয় তারই সবচেয়ে বেশি।

আনন্দ হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, 'আমার মত! আমার যা মত তা আপনাদের সকলেরই মনের কথা। শুধু একজন গোবিন্দ চাটুয্যে তো নয়, এরকম দেশ ভরে জগৎ ভরে কত আছে। একজন বসে আছে রাশি-রাশি টাকা নিয়ে, সেসব টাকা হয় ব্যাঙ্কে পচছে, নয় নানা বদখেয়ালে উড়ছে। এদিকে হাজার-হাজার লোক খেতে না পেয়ে মরছে কিংবা ঠিক সেটুকু খেতে পাচ্ছে যাতে কোনওরকমে বেঁচে থাকা যায়। মেডিকেল কলেজের সামনে সেদিন দেখলুম একটা ভিখিরি মরে পড়ে আছে, কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় ডাস্টবিনের এঁটো নিয়ে ভিখিরি আর কুকুরে মারামারি চলেছে। আর আমি, আপনারা—আমরা সবাই—আমাদেরই বা কী অবস্থা! বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনাদের যা আয় তাতে কোনও ভদ্রলোকের চলতে পারে—না চলা উচিত! কলকাতার এই মেসের ফ্যান-মেশানো ডাল আর এক টুকরো করে পচা মাছ খেয়েই কত লোকের সারা জীবন কেটে যায়, তা তো জানেন! আর বেকার—তাই বা কত! কত ভালো ছেলে পড়াশুনো পর্যন্ত করতে পারে না, আর বড়লোকের পেটমোটা নাদুসনুদুস হোঁৎকা ছেলেগুলো ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই আমাকেই দেখুন—আমি জোর করেই বলতে পারি বিজ্ঞানে আমার মাথা খুব ভালো, সুযোগ পেলে হয়তো পৃথিবীতে একটা নাম রাখতে পারতুম। কিন্তু অভাবে আমার কিছুই হল না—একটা কুড়ি টাকার চাকরির জন্য পথে-পথে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার টাকা নেই—

আর টাকা আছে ওই কঞ্জুস গোবিন্দ চাটুয্যের, যার বেঁচে থাকারই কোনও মানে হয় না—' বলতে-বলতে আনন্দর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

'বাঃ, সাবাস ছেলে!' বলে উঠল নরেশ। 'আচ্ছা, বলো তো আনন্দ, এসব কথা কি তোমার মুখস্থ করা থাকে?'

'এসব আমার প্রাণের কথা,' গম্ভীরভাবে বললে আনন্দ।

ওই বেঁটে রোগা ছেলেটির মুখে এসব কথা শুনলে সত্যি হাসি পায়, কিন্তু আবার পায়ও না, কথাগুলো বোধহয় সত্য—এরকম একটা ধারণা কোথা থেকে এসে জুড়ে বসে।

মনোহর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি রীতিমতো একজন পাবলিক স্পিকার—তোমার বক্তৃতাগুলো পার্কে দাঁড়িয়ে দিলেই ভালো হয়, আমরা সামান্য কেরানি, অত বড়-বড় বিষয়ে চিন্তা করবার সময় আমাদের নেই।'

আনন্দ একটুও দমে না গিয়ে বললে, 'যদি আপনারা সবাই চিন্তা করতেন তা হলে তো হতই।'

সরোজ একটু সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এ নিয়ে মন খারাপ করে কী আর করবে—এই তো নিয়ম।'

'এই নিয়ম! কক্‌খনও না। এভাবে পৃথিবী চলতে পারে না। সাম্য চাই—সাম্য।'

সরোজ বললে, 'চাইলেই তো হবে না, ওই গোবিন্দ চাটুয্যের দল চিরকালই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'যারা পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, পথ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হবে,' মৃদুস্বরে অথচ খুব জোর দিয়ে এই কথা ক'টি বলে আনন্দ আবার তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মনোহর বললে, 'বাপরে, রক্ত একেবারে টগবগ করে ফুটছে যে। এসব ছাড়ো হে ছোকরা, শেষটায় একদিন বিপদে পড়বে—।'

নরেশ আলোয়ানটা কাঁধের উপর টেনে দিয়ে বললে, 'আর আমাদের সুদ্ধু জড়াবে।'

আনন্দ চোখ তুলে বললে, 'জানেন, ডস্টয়েভস্কির একটা বইয়ে আছে—।'

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই ব্যস্তসমস্তভাবে নরহরিবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই চমকে উঠল—এইমাত্র যেন তিনি ভূত দেখে এলেন।

সরোজ বললে, 'কী হয়েছে হরি-দা, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'গোবিন্দবাবুকে কে যেন খুন করে গিয়েছে,' বলে নরহরিবাবু কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়লেন।

মনোহর আর নরেশ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ!' আর সরোজের মুখ একদম কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। কিন্তু আনন্দর মুখের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না, সে মাথা নিচু করে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

তিন

গোবিন্দ চাটুয্যে গেল দশ বছর ধরে এই মেসের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে মেসের দু'বার হাত বদল হল, একবার নাম বদল হল, কত লোক এল কত লোক গেল, কিন্তু গোবিন্দবাবু ঠিকই আছেন। তাঁর জীবনযাপনের প্রণালী সত্যি একটু রহস্যময়। চারতলার যে-ঘরটিতে তিনি থাকেন সেটি আসলে ঘর নয়, চিলেকোঠা, অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওই ছোট্ট ঘরে মস্ত ছাদের মধ্যে একদম একলা থাকতে সাধারণত কেউই রাজি হয় না—ও-জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে—কিন্তু গোবিন্দবাবু ওই চিলতেটুকুই ভাড়া নিলেন মাসিক আড়াই টাকায়। মেসের ম্যানেজার ভাবলে, ও-ঘর তো আর-কেউ ভাড়া নেবে

BanglaBook.org

না, ভাড়াটে যে পাওয়া গেছে এই বেশি, সুতরাং আড়াই টাকাই বা মন্দ কী। গোবিন্দবাবুর খাওয়া খরচ মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, কারণ তিনি মেসে সকলের সঙ্গে খান না—সকালে একটু ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ আর সন্ধে হবার আগে খান দুই রুটি আর একটু ভাজা—এই তাঁর আহার। চাকর দু-বেলা তাঁর খাবারটা ঘরে দিয়ে আসে। এ ছাড়া আর কিছু তিনি খান এমন কখনও শোনা যায়নি।

এককথায় গোবিন্দবাবু একেবারে হাড়-কিপটে; লোকে বলে তাঁর মুখ দেখলে পাপ হয়, নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে ইত্যাদি। মেসে কেউ তাঁর সঙ্গে মেশে না। অবশ্য সেজন্য তাঁর একটুও আপশোস নেই, কারণ তিনি নিজে ঘোরতর অমিশুক। চারতলা থেকে তিনি কদাচিৎ নামেন, প্রায় সবসময়ই দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বসে থাকেন, সন্ধেবেলা ছাদে যখন পায়চারি করেন হঠাৎ দেখলে তাঁকে ভূত বলে ভুল হয়। কারণ চেহারাও তাঁর অতিশয় কদাকার! একটা চোখ কানা, লম্বা লম্বা চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে, নোংরা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা, কপালের উপর একটা মস্ত আঁচিল—ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলে হয়তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। চেহারা দেখে তাঁর বয়েস আন্দাজ করা সম্ভব নয়—চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সবাই বলে, গোবিন্দবাবু অনেক টাকার মালিক। সে যে কত টাকা, আর সে-টাকা তাঁর হাতে কেমন করে এল তা অবশ্য কেউ জানে না। তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব আছে বলে কখনও শোনা যায়নি, তাঁর কোনও চিঠি আসে না, কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে না। এদিকে তিনি তো কাজকর্ম কিছুই করেন না, চারতলার ওই চিলকোঠা ছেড়ে রাস্তায় নামতেও কেউ তাঁকে দেখেনি। লোকটি সত্যি রহস্যময়। অনেকে সন্দেহ করে যে, টাকাকড়ি তিনি ব্যাঙ্কে না রেখে নিজের ঘরেই রেখেছেন—আর জীবিত যখ হয়ে দিন-রাত সেই ঘর পাহারা দিচ্ছেন। এরকম সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ-পর্যন্ত কাউকেই তিনি তাঁর ঘরের ভিতর ঢুকতে দেননি—চাকরদের পর্যন্ত না। তাঁর খাবার নিয়ে চাকররা এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, তিনি বেরিয়ে এসে খাবারের থালা নিয়ে ভিতরে চলে যান, খাওয়া হলে নিজেই থালাটি বাইরে রেখে আবার দরজা বন্ধ করেন। এই নিয়মই বরাবর চলে এসেছে। এক মিনিটের জন্য ঘর থেকে বেরুলেও ঘরে তালা দিতে ভোলেন না; ম্যানেজারবাবু কি নরহরিবাবু—দুজন ছাড়া আর কেউই পারতপক্ষে তাঁর মুখদর্শন করতে রাজি নয়—তাঁর কাছে গেলে ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই আলাপ করেন, আর সে-আলাপও দু-চারটে কথাতেই শেষ হয়। তাঁকে দেখলে মেসের সকলেই খুব অস্বস্তি বোধ করত, লোকটা যেন একটা জ্যান্ত ভূত, এই পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই যেন নেই।

গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে আর-একটা প্রবাদ মেসে প্রচলিত, তিনি নাকি কখনও স্নান করেন না। স্নানের ঘরে তিনি অবশ্য একবার যান, কিন্তু তিনি যে স্নান করেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চুল তাঁর সব সময়েই রুক্ষ, এলোমেলো—বোধহয় চিরুনিও ব্যবহার করেন না—সমস্ত গা কেমন বিশ্রী নোংরা রকমের। লোকে বলে, গচ্ছিত অর্থ ফেলে বাথরুমে দশটা মিনিট কাটাতেও তাঁর প্রাণে সয় না, তাই তিনি স্নান করাই ছেড়েছেন। কেউ বা বলে, তা নয়, পাছে মনের ভুলে একদিন একখানা সাবানই মেখে ফেলেন সেই ভয়ে তিনি জলই ছোঁন না। ম্যানেজারবাবু না কি বলেন যে, তিনি গোবিন্দবাবুকে জিগ্যেস করে জেনেছেন যে ভদ্রলোকের কী একটা ব্যামো আছে যেজন্যে তাঁর স্নান করা বারণ। শুনে সবাই বলেছে—'হ্যাঃ, রেখে দিন ওসব কথা, ব্যামো না হাতি! এই গরম দেশেও যে স্নান করে না সে কি মানুষ! সে পিশাচ!'

সকলের ঘৃণিত এই লোকটার উপরে শুধু নরহরিবাবুই একটু সদয় ছিলেন। লোকটা যতই খারাপ হোক, লোকটা যে অসুখী তাতেও সন্দেহ নেই, নরহরিবাবুর কেমন দয়া হত। তিনি মাঝে-মাঝে চারতলায় গিয়ে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে যতটা সম্ভব আলাপ করে আসতেন। এমনকী কখনও-কখনও তাসখেলাতেও ডাকতেন তাঁকে। আশ্চর্যের বিষয় গোবিন্দবাবু তাসখেলার সে-নিমন্ত্রণ রক্ষাও করতেন। জীবনে যাঁর কোনও শখ, কোনও আনন্দ নেই, যাঁকে জীবিত না বলে মৃত বললেই যেন

ঠিক হয়, তাঁরও একটা শখ কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল—সে হচ্ছে তাসখেলার শখ। তাসের নাম শুনলে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন—এক-একদিন নিজের ঘর ছেড়ে এসে ঘণ্টাখানেক তাস খেলে যেতেন—সকলে অবাক হয়ে যেত। অবশ্য নির্দিষ্ট ওই একঘণ্টা হয়ে গেলেই তিনি আস্তে-আস্তে উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন। তিনি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেরই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ত। তবে তাস তিনি খেলতেন ওস্তাদের মতোই—যারা তাঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না তারাও মনে-মনে তারিফ করত। মুখে তাঁর হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা ছিল না—শুধু কোনওদিন কেউ যদি কোনও নাটক দেখে এসে থিয়েটার সম্বন্ধে কথা তুলত, তিনি মন দিয়ে সেসব কথা শুনতেন, এমনকী দু-একটা কথা বলতেন।

একদিন নরহরিবাবু না-বলে পারেননি, 'চাটুয্যেমশাই দেখছি থিয়েটারের খোঁজখবর একটু রাখেন।'

'হ্যাঁ, এককালে খুব নেশা ছিল।' গোবিন্দবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল খুব মোটা আর ভারি, অথচ খুব পরিষ্কার—শুনলে চমক লাগে।

এরপর নরহরিবাবু একটা অসম্ভব কথা বলেছিলেন, 'চলুন না, একদিন সবাই মিলে থিয়েটার দেখে আসি।'

কিন্তু গোবিন্দবাবু গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নেড়েছিলেন, কোনও কথা বলেননি।

যার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, লোকের কল্পনা তার সম্বন্ধেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে অনেকগুলি থিওরি মেসে প্রচলিত ছিল। কেউ বলত, লোকটা খুনি আসামি, ফেরার হয়ে আছে; কেউ বা বলত, তিনি নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ, দরজা বন্ধ করে যোগ-টোগ করেন; কেউ বা বলত, এঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে জলে ডুবে মারা যায়, তারপর থেকেই ইনি পাগল মতো হয়ে গেছেন, আর জলে এমন ভয় হয়েছে যে স্নান পর্যন্ত করেন না। এমনি যার যা মনে হত তাই বলত। তবে মোটের উপর মানুষটা নিরীহ—কারু কোনও ক্ষতি করে না আর তার অস্তিত্বও সহজেই ভুলে থাকা যায়, সেইজন্য এ নিয়ে কারু কোনও দুশ্চিন্তাও ছিল না। এমন সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি।

চার

মিনিটখানেক ঘরের সকলেই চুপ, তারপর নরেশ বললে, 'সত্যি?'

নরহরিবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'সত্যি নয় তো কী! আমি নিজের চোখে দেখে এলুম।'

'নিজের চোখে দেখে এলে!'

'হ্যাঁ। হাত-মুখ ধুয়ে ভাবলুম, যাই উপরে গোবিন্দবাবুকে ডেকেই আনি। দুর্গা যে বলে গেল বাবুর এখনও ঘুম ভাঙেনি—শুনে ভারি অবাক লেগেছিল, কারণ আমি জানি খুব ভোরেই গোবিন্দবাবুর ঘুম ভাঙে। মনে হল, হয়তো ছাদে-টাদে বেড়াচ্ছেন, দুর্গা দেখতে পায়নি। গেলুম উপরে ছাদে। কোথাও তিনি নেই, দরজা বন্ধ। ফিরে আসছিলুম—হঠাৎ কী মনে হল, ভাবলুম একটু ভালো করে দেখে যাই, কেমন একটু কৌতূহল হল। এতদিন আছি, কখনও তাঁর ঘরের ভিতরটা দেখিনি। ওঁর ঘরে ওই একটাই তো জানলা, তাও অনেকটা উঁচুতে। অনেক চেষ্টা করেও সে-জানলার কাছে মুখ নিতে পারলুম না। তখন আর কী করি, দরজাতেই আস্তে ধাক্কা দিলুম। অবাক হয়ে গেলুম যখন দেখলুম দরজাটা আস্তে খুলে গেল। তা হলে খোলাই ছিল দরজাটা! গোবিন্দ চাটুয্যে দরজায় খিল না এঁটে ঘুমুচ্ছেন এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যি—দরজা ফাঁক হয়ে আছে।

এই পর্যন্ত বলে নরহরিবাবু একটু থামলেন।

নরেশ রুদ্ধস্বরে বললে, 'তারপর?'

'কী-করি কী-করি ভেবে কয়েক সেকেন্ড কাটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘরের ভিতরে একটু উঁকি দেবার কৌতূহল কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। এই ঘর কতদিন ধরে একটা রহস্যপুরী হয়ে আছে, আজ হয়তো সে-রহস্যের কিছু সমাধান হবে, এই ভেবে ঘরের ভিতরে মুখ বাড়াতেই যে-দৃশ্য চোখে পড়ল—।'

বলে নরহরিবাবু দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

কয়েক সেকেন্ড ঘরের মধ্যে ভারি নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তারপর নরহরিবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'গোবিন্দবাবু মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, হাত দুটো, দু-পাশে ছড়ানো, চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসছে আর মুখটা বীভৎস। উঃ!'

আনন্দ জিগ্যেস করলে, 'ঘরের ভিতর আর কী দেখলেন?'

'কী যেন, তা তো মনে পড়ছে না।'

'রক্ত?'

'কই, না।'

আনন্দ খুব সহজভাবে বললে, 'তা হলে গলা টিপে মেরেছে।'

মনোহর বাঁকা চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি যেন খবরটা শুনে একটুও অবাক হলে না?'

আনন্দ বললে, 'তা এসব লোকের কপালে অপমৃত্যু লেখাই থাকে।'

খবরটা দেখতে-দেখতে সমস্ত মেসে—এমনকী সমস্ত পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, আর রবিবার সকালের আনন্দ মুছে গিয়ে মেসের আবহাওয়া অস্বাভাবিক থমথমে হয়ে উঠল। এতবড় একটা মেসে কারও গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজকর্ম সব বন্ধ।

ম্যানেজারবাবু নরহরিবাবুর ঘরে এসে বললেন, 'পুলিশে খবর দিয়েছি, ওরা এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছে। পুলিশ এসে তদন্ত করে যতক্ষণ চলে না যায় আপনারা কেউ মেস থেকে বেরোবেন না যেন। যে যেখানে আছেন বসে থাকুন। উপরের ঘরেও কেউ যাবেন না—বুঝলেন? ও-ঘরে যা যেমন আছে, পুলিশ না-আসা পর্যন্ত একচুল নড়চড় হতে পারবে না। চাকরদেরও সব বলে দিয়েছি—কারুর বেরুনো বারণ।'

হঠাৎ সরোজ বলে উঠল, 'কিন্তু আমাকে যে বেরোতেই হবে—আমাদের বড়বাবুর মেয়ের আজ বিয়ে—।'

'অসম্ভব।'

সরোজ আকুল হয়ে বলতে লাগল, 'ওখানে না-গেলে আমার চলবেই না—আমার চাকরি যাবে—না-খেয়ে মরব। আমায় ছেড়ে দিন, আমায় যেতে দিন—' বলতে-বলতে সরোজ দরজার কাছে ছুটে গেল, ম্যানেজারবাবু তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ, চুপ করে বসে থাকো।'

সরোজ কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'হরি-দা, তুমি একটু বলে দাও, আমাকে যেতেই হবে—আমার চাকরি থাকবে না—।'

নরহরিবাবু বললেন, 'অত ব্যাকুল হোয়ো না, সরোজ, চুপ করে বোসো। কিচ্ছু ভয় নেই।'

সরোজ হতাশভাবে বসে পড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তার ভাব দেখে মনে হয় তার যেন এক মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

আধঘণ্টার মধ্যেই নিচের ফুটপাথ লাল-পাগড়িতে ছেয়ে গেল; দুজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে মেসের ভিতরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত। সিঁড়ির ধারেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজারবাবুর নাম পশুপতি ঘোষ। দেশ বরিশালে, মেজাজ বেশ কড়া। একটানা পাঁচ বছর তিনি ব্রডওয়ে হোটেলের পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রতাপে ও প্রভাবে মেসের যথেষ্ট উন্নতি ও সুনাম হয়েছে—আর এর মধ্যে এ কী কাণ্ড! বিপদের মুখে ঘাবড়ে যাওয়ার লোক তিনি নন, মনে-মনে বরঞ্চ বেশ চটেই আছেন—কোন দুশমনের এত সাহস যে তাঁর মেসের মধ্যে একটা খুন করে গেল, তাঁর এত কষ্টে অর্জিত সুনামে কলঙ্কের কালি এঁকে!

'আসুন, ইন্সপেক্টরবাবু, আসুন। খুনি ব্যাটাকে কিন্তু ধরে দেওয়া চাই। ও ধরা না-পড়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই ছাড়ব না—হ্যাঁঃ, আমি বরিশালের লোক, সেটা জানেন তো!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'সেটা আপনার কথা শুনেই টের পেয়েছি। চলুন তো উপরে, দেখা যাক।'

গোবিন্দ চাটুয্যের পরিচয় দিতে-দিতে ম্যানেজারবাবু ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কেমন লোক ছিলেন গোবিন্দবাবু, অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল। খানকয়েক ডিটেকটিভ নভেল পড়া ছিল ম্যানেজারবাবুর, তা থেকে তাঁর জানা ছিল যে, কোনও খুন হলে নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে খবর নেওয়াই সকলের আগে দরকার। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও তৎপরতার উপর তাঁর এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সাহায্য ছাড়া যে এ-রহস্যের কোনও কূল-কিনারা হতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

তেতলায় এসে রণজিৎবাবু বললেন, 'এরপর কোনদিকে?'

'গোবিন্দবাবুর ঘর চারতলায়।'

রণজিৎবাবু চারতলা সিঁড়ির দিকে মাত্র পা বাড়িয়েছেন, এমনসময় নরহরিবাবুর ঘর থেকে দুর্গা বেরিয়ে এল কয়েকটা চায়ের পেয়ালা হাতে করে। তাকে দেখেই রণজিৎবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

দুর্গা পেয়ালাগুলো নিয়ে বেগে নেমে যাচ্ছিল, রণজিৎবাবুর দিকে চোখ পড়তেই সে-ও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পশুপতিবাবু এটা লক্ষ করে বললেন, 'কী হল? ওকে আপনি চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি বইকী,' বলে রণজিৎবাবু হেসে এগিয়ে গেলেন দুর্গার দিকে। বললেন, 'কী খবর চঞ্চল, কেমন আছ?'

দুর্গা—মানে, চঞ্চল—কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় পশুপতিবাবু দুজনের মাঝখানে এসে বললেন, 'আপনি ওকে বেশ ভালোই চেনেন, মনে হচ্ছে। দেখুন, ও যদি কোনও দাগি আসামি বা অন্য কিছু হয় তা হলে আমি কিন্তু দায়ী নই—ওকে আপনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন। ও নতুন এসেছে ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। বরং ওর হাবভাব দেখে আমার কেমন একটু সন্দেহই হয়।'

'ঠিক বলেছেন, সন্দেহ হওয়ারই কথা।'

'ওকে আপনি কী-একটা অন্য নামে যেন ডাকলেন না? ভাবছেন আমি শুনিনি? সব শুনেছি। এখন কথা হচ্ছে, যে-লোক ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে মেসের চাকরের কাজ করতে আসে, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তার উপর এই তো একটা অঘটন ঘটল। দ্যাখো ছোকরা, তুমি যতই চালাক হও, আমার সঙ্গে চালাকিতে তুমি পারবে না, তা জেনো। তোমার মতলবখানা কী, খুলে বলো দেখি। আর এই যে গোবিন্দবাবু খুন হলেন, সে-বিষয়েই বা তুমি কতদূর কী জানো, শুনি? সব বলতে হবে, কিছু গোপন করা চলবে না। ভালোয়-ভালোয় বলবে তো ভালো, নয়তো কী করে পেট থেকে কথা আদায় করতে হয় তা আমার ভালোই জানা আছে। হুঁ-হুঁ, আমি যে-সে লোক নই, দেশ আমার বরিশালে। আর দেখছ তো পুলিশের ইন্সপেক্টর সামনেই রয়েছেন—প্যাঁচ কষতে গেলে আরও বিপদে পড়বে।'

'ইন্সপেক্টরবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন না আমার কথা,' বললে চঞ্চল।

BanglaBook.org

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না, ওর ভার আমিই নিচ্ছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এর সঙ্গে আমি একটু কথা বলে নিই।'

পশুপতিবাবু গলা খাটো করে বললেন, 'ছোকরাকে অ্যারেস্ট করবেন তো? আমার মনে হচ্ছে ও তলে-তলে এর মধ্যে আছে। ওকে ছেড়ে রাখা কোনও কাজের কথা নয়।'

'না, না, ওকে ছাড়ব না। চোখে-চোখেই রাখব। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, একে জেরা করে দেখি—কিছু বেরোয় কি না।'

পশুপতিবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো। কার পেটে কী আছে কে জানে! আজকালকার দিনে কাউকেই বিশ্বাস নেই, মশায়। এই তো সেদিন আমাদের দেশের বাড়িতে...।'

পাঁচ

কিন্তু রণজিৎ সামন্ত পশুপতিবাবুর কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না। দুর্গা—অথবা চঞ্চলকে—একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'চঞ্চল, এ তুমি করেছ কী?'

হাত থেকে পেয়ালাগুলো নামিয়ে চঞ্চল বললে, 'কেন, কী করেছি?'

'শেষটায় এই মেসে—চাকরের কাজ করছ!'

চঞ্চল মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তা ছাড়া উপায় কী?'

'উপায় ছিল বইকি। তুমি যদি আমার কাছে আসতে—।'

'কী করে জানব আপনি আমাকে মনে রেখেছেন?'

'বাঃ, সেই 'কলকাতা হরকরা'র ব্যাপারে তুমি যেরকম সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলে—তোমাকে কি ভুলতে পারি! আমি বরং মনে-মনে ভেবেছি সে-ছোকরাটির হল কী? দেখা পেলে বেশ হত—কাজে লাগাতে পারতুম। তারপর—এ-ক'মাস তুমি কোথায় ছিলে, কী করলে সব বলো আমাকে।'

'বলবার বিশেষ কিছু নেই। 'কলকাতা হরকরা' উঠে যাওয়ার পর আমি একেবারে অকূলে ভাসলুম। তাই বলে খুব যে ঘাবড়ে গেলুম তা-ও নয়, এ তো আমার অভ্যেসের মধ্যেই—ছেলেবেলা থেকে এইরকমই তো চলছে। পকেটে একটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিল; খুচরোটা নিজে রেখে একটাকার চিনে সিঁদুর, চুলের কাঁটা, বেলুন-বাঁশি—এসব কিনে ফেললুম রাধাবাজার থেকে। তারপর তাই নিয়ে বালিগঞ্জে ফেরি করতে বেরোলুম। রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে বেশ কষ্ট হত, কিন্তু রোজগারও মন্দ হত না।'

'কত পেতে?'

প্রথমটায় দু-আনা দশ পয়সার বেশি হত না রোজ, কিন্তু তাই থেকে দু-চার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে আমার পুঁজি যখন একটু বাড়ল, তখন জিনিসের স্টক ক্রমেই বাড়াতে পারলুম—শেষের দিকটায় চার আনা ছ-আনা এমনকী আট আনা পর্যন্ত রোজগার হত।'

রণজিৎবাবু সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, 'তাতে তোমার চলত?'

'বলেন কী! চলবে না! রোজ চার আনা যে অনেক! পাইস হোটেলে দু-আনায় রীতিমতো ভোজ হয়ে যায় একবেলা। দু-পয়সায় এক পেয়ালা চা, আর ছ-পয়সা হাতে থাকে। চার আনা কি কম!'

রণজিৎবাবু হেসে উঠে বললেন, 'তুমি অবাক করলে, চঞ্চল, এত কষ্ট করতে সত্যি পারো তুমি?'

চঞ্চল বিনীতভাবে বললে, 'না, তা আর পারি কই! হাজার হোক, ভদ্রলোকের রক্ত তো

BanglaBook.org

বইছে শরীরে। ভদ্রলোকের কাজ তো জোটেই না, এদিকে কুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় পারি না—এই তো এখন আমাদের অবস্থা। জিনিস ফেরি করে একরকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুখ করেই আবার গোল বাধালে।'

'অসুখের আর দোষ কী! নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া কিছু-ই ঠিক নেই—রোদ-জল মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে—ওই তুমি যা বললে—এ কি আর ভদ্রলোকে সয়! আমি অবাক হচ্ছি এ-কথা ভেবে যে তুমি তক্ষুনি কোনও খবর-কাগজের আপিসে চেষ্টা করলে না কেন? ও-লাইনে তোমার তো অভিজ্ঞতা ছিল!'

'চেষ্টা করলেই যে হত তার তো মানে নেই। চাওয়া মাত্র কি আর কোনও চাকরি হয়! এদিকে আমার যে এখন-তখন অবস্থা—আজকে রোজগার না-করলে আজকেই উপোস। কাগজের আপিসে চেষ্টা করতে গেলে হাঁটাহাঁটিই হত সার। এদিকে আমার সেই একটাকা সাড়ে-সাত আনাও খামোখা খরচ হয়ে যেত। তা ছাড়া 'হরকরা' নিয়ে যেরকম এক কেলেঙ্কারি হল আমাকে হয়তো কেউ বিশ্বাস করত না, হয়তো সন্দেহ করত আমিও তলে-তলে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলুম। তা ছাড়া আমি যে 'হরকরা'য় কাজ করেছি তারই বা বিশ্বাস কী! একটা সার্টিফিকেট নেই, কিচ্ছু নেই! আপনিই বলুন, তারচেয়ে এই কি ভালো করিনি! চাকরির চেষ্টার চাইতে হাঁটাহাটি খুব বেশি হল না, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পয়সাও পকেটে এল—অবশ্যি আপনাদের অর্থে "দুটো পয়সা" হয় অভিধানের অর্থে।'

'তুমি তো দেখছি কথাবার্তাতেও বেশ তুখোড়, মিষ্টি করে জুতোও দিতে পারো,' মন্তব্য করলেন সামন্তমশাই।

'কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথাটা মুখে এসে পড়ল—।'

'সে যাকগে—যখন অসুখ করল, কী করলে তুমি?'

'কী আর করব—সোজা হাসপাতাল। টাইফয়েড হয়েছিল—আট-দশ দিন না কি স্রেফ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম। অসুখের কথা ভালো করে আমার মনেও পড়ে না—কেমন একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। এটা কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া—অতখানি কষ্ট সজ্ঞানে ভোগ করতে হলে আর উপায় ছিল না। দু-মাস পরে অত্যন্ত রোগা হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলুম। পকেটে একটি পয়সা নেই। যখন ফেরিওলা ছিলুম, চানাচুর চিবিয়ে ফুটপাতে ঘুমিয়ে দিব্যি দিনের পর দিন কেটে গেছে, কিন্তু এখন দুর্বল শরীরে মনে হল, একটা আশ্রয় পেলে ভালো হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল, চাকরের কাজ পেলে বেশ হয়, দু-বেলা খাওয়া জোটে, তা ছাড়া ঘুমোবার একটা নির্দিষ্ট জায়গাও পাওয়া যায়। বৌবাজার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা পানের দোকানে খবর পেলুম, ব্রডওয়ে হোটেলে একটা চাকরি খালি আছে। এক সেকেন্ডও দেরি না করে এই হোটেলে এসে হাজির হলুম। ম্যানেজারবাবু আমার সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলেই যেন খুশি হলেন—জানি না কী কারণে আমি তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলুম। সেই থেকে আছি।'

'কত মাইনে পাও?'

'পাঁচ টাকা। তা ছাড়া বাবুরা মাঝে-মাঝে বখশিশ দেন। মোটের উপর কাজটা ভালোই।'

'হ্যাঁ, ভালোই,' বলে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন।

'ভালো বইকী, পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরির চাইতে নিশ্চয়ই ভালো। কেরানিকে লোকে 'আপনি' বলে আর চাকরকে বলে 'তুমি'—এ ছাড়া এ দুই কাজে আর কোনও তফাৎ তো আমি দেখতে পাইনে।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'ওটাই তো মস্ত তফাৎ। ...কিন্তু যাই হোক, এভাবে আর কতকাল কাটাবে তুমি?'

'যতদিন এর চেয়ে ভালো কিছু না জোটে।'

BanglaBook.org

'জোটাবার চেষ্টা কিছু করছ কি?'

চঞ্চল চুপ করে রইল।

রণজিৎবাবু তার কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'সাবাস ছেলে তুমি, চঞ্চল, আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত, নিজেকে ধন্য মনে করতুম। এরকম আত্মনির্ভরশীল ছেলে বাংলাদেশে ক'টা আছে! এই তো চাই! তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আনন্দ যেমন হচ্ছে তেমনি মনটাও একটু খারাপ লাগছে এ-কথা ভেবে যে, এত দুঃখে পড়েও আমাকে তুমি একবার মনে করলে না! তোমার কি একবারও মনে হল না যে, আমি তোমার কোনও কাজে লাগতে পারি?'

চঞ্চল আমতা-আমতা করে বললে, 'মনে যে না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানা...।'

সামন্তমশাই হেসে উঠে বললেন, 'সে তো টেলিফোনের বই খুললেই পেতে। যতই তুখোড় হও না, এখনও একেবারে ছেলেমানুষ আছ দেখছি।'

চঞ্চল কিছু বললে না।

'একটা কথা তোমাকে বলি, চঞ্চল। এখান থেকে এবার তুমি ছুটি নাও। আমার ওখানে চলো—ভুল বুঝো না, তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতে বলছি না—যতদিন ভালো কোনও কাজ না জোটে আমার ওখানে থাকবে আর কি। আর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি জোটে সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আশা করি, এতে তোমার আপত্তি হবে না। বলো?'

চঞ্চল নিচু গলায় বললে, 'বেশ তো, আপনি যেরকম বলছেন তা-ই হবে।'

'পশুপতিবাবু তোমাকে আর রাখবেনও না এ তুমি ঠিক জেনো। একবার যখন তোমাকে সন্দেহ করেছেন...যেরকম জবরদস্ত লোক দেখছি!'

শেষের কথাটা বলে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন।—'চলো এবার, এই ব্যাপারটার কিছু হদিস করতে পারি কি না দেখি।'

'চলুন।'

রণজিৎবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'এবার চারতলায় যাওয়া যাক।'

পশুপতিবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওর পেটের কথা বের করতে পারলেন কিছু?'

'ওর জন্যে ভাববেন না, ওকে আমি ঠিক করে নেব। চলো হে চঞ্চল, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে চারতলায়।'

ছয়

এমনসময় চটি চটপট করতে-করতে নরহরিবাবু বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁকে দেখেই পশুপতিবাবু বলে উঠলেন, 'আসুন মশাই, শুনে যান আপনার পেয়ারের চাকরের কাণ্ড। আমি বরাবরই বলেছি—।'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, হয়েছে কী?'

'আরে মশাই, ও আসলে চাকরই নয়। দেখছেন না, কেমন সুন্দর চেহারা, পরিষ্কার হাত-পা। উনি ভদ্দরলোকের ছেলে, নাম ভাঁড়িয়ে বাসন মাজতে এসেছেন। ইন্সপেক্টরবাবু তো ওকে দেখেই চিনে ফেলেছেন। দাগি আসামি কিনা।'

নরহরিবাবু মনে-মনে শিউরে উঠে বললেন, 'সে কী কথা!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'দাগি আসামি তা তো আমি বলিনি।'

'আহা—আপনারা কি আর সবকথা খুলে বলবেন! যাই হোক, এর আসল নাম হচ্ছে—

BanglaBook.org

কী যেন তোমার নামখানি বাপু?'

'চঞ্চল নাগ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চঞ্চল নাগ—খাসা! অতি-আধুনিক নাম। তা এই তো ব্যাপার—এদিকে দেখছেন তো অবস্থা। আপনাদের সবাইকে বলে রাখছি, সাবধানে থাকবেন—যা দিনকাল পড়েছে, কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।'

নরহরিবাবু বললেন, 'তা ভদ্রলোকের ছেলে বিপাকে পড়ে চাকরের কাজ করতে এসেছে, এ এমন একটা অন্যায় কী।'

'থাক, থাক, আপনার সঙ্গে ওসব কথা পরে হবে, এখন সময় নেই। ইন্সপেক্টরবাবু, ইনিই আমাদের নরহরি-দা, ইনিই সকালবেলা চারতলায় গিয়ে ভীষণ দৃশ্য দেখে আসেন।'

'ও, আপনিই প্রথমে দেখেন। তাহলে আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার কথা শোনাও হবে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'বেশিদূর নয়, এই চারতলায়। তুমিও এসো, চঞ্চল।'

চারজনে গেলেন চারতলায়।

চারতলার প্রায় সমস্তটাই ছাদ, শুধু এককোণে ছোট্ট একটি ঘর, আসলে সেটি চিলেকোঠা। কার্নিশে ঘেরা এই মস্ত ছাদ কেউ বিশেষ ব্যবহার করে না। প্রায় সকলেই চাকুরে, সকলেরই সময়াভাব, ছাদে এসে হাওয়া খাওয়ার মতো বাবুগিরি কারুরই পোষায় না। তা ছাড়া গোবিন্দবাবুর অখ্যাতি সমস্ত মেসে এতই রাষ্ট্র যে কদাচ কারও শখ হলেও ওই দাড়িওলা অলক্ষুনে মুখ মনে করলেই ছাদে যাওয়র ইচ্ছে উবে যায়। ছাদটি বলতে গেলে গোবিন্দবাবুর একলারই দখলে ছিল।

ঘরে ঢোকবার আগে রণজিৎবাবু ছাদটি বার দুই ঘুরে এলেন। আশ্চর্য—ছাদটি একেবারে তকতকে পরিষ্কার, একটা কাগজের টুকরোও কোথাও পড়ে নেই। কার্নিশে ভর দিয়ে নিচের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন—জলের পাইপ বেয়ে উঠে আসা অবশ্য অসম্ভব নয়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বা ক্ষতি কী?

তারপর গেলেন ঘরের ভিতরে। কনেস্টবল দুজন সিঁড়ির কাছে রইল।

চারজন মানুষে ঘরটা যেন একেবারে ভরে গেল। দড়িতে ঝোলানো সামান্য দু-একটা জামাকাপড়, টিনের একটা ভাঙা তোরঙ্গ—জিনিস বলতে এই। আর মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন গোবিন্দ চাটুয্যে—মুখটা ফুলে বীভৎস হয়েছে, জিভ এসেছে বেরিয়ে, ভালো চোখটা এমন বড় যেন দৈত্যের চোখ, আর কানা চোখটা যেন আরও বুঁজে চামড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে—গলায় চাক-চাক মাংস উঠেছে লাল হয়ে ফুলে।

রণজিৎবাবু একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নৃশংস বলতে হয় এই হত্যাকারীকে। বুকের উপর হাঁটু চেপে বসে গলা টিপে মেরেছে। দেখছেন গলায় লাল-লাল দাগ?' বলেই তিনি মৃতদেহের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জামার পকেটে হাত ঢোকালেন।

পকেট থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর খোলা হল তোরঙ্গ।

প্রথমে বেরুল গোটা কয়েক পুরনো, পাতা-ছেঁড়া নাটকের বই, তারপর এককৌটো দাঁতের মাজন, তারপর একজোড়া নোংরা চিটচিটে তাস, তারপর—ব্যস, আর কিছু না। টাকাকড়ি? একটা আধলাও না।

গোবিন্দ চাটুয্যের পার্থিব সম্পত্তি দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

নরহরিবাবু বললেন, 'টাকার জন্যেই ভদ্রলোক প্রাণে মারা গেলেন। এই তোরঙ্গেই সব

BanglaBook.org

টাকাকড়ি রাখতেন নিশ্চয়ই—যে খুন করেছে সে নিয়ে সটকেছে।'

'কিন্তু তোরঙ্গ তো ভাঙা নয়,' বললেন ম্যানেজারবাবু।

'ভাঙবার দরকার কী—ওতে তো আর তালা ছিল না। আর তোরঙ্গটা এতই পুরনো যে তালা দেওয়া সম্ভবও ছিল না বোধহয়।'

'তা হলে কি আপনি বলতে চান গোবিন্দবাবু তাঁর সব টাকাকড়ি একটা ভাঙা তোরঙ্গে ফেলে রাখতেন? তিনি কি এতই অসাবধান?'

'কত আর সাবধান হবেন! ঘর ছেড়েই তো বেরোতেন না।'

'হয়তো কোনও গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন? কী হয়তো তাঁর টাকাকড়ি কিছু ছিলই না, সবই আমাদের অনুমান?' পশুপতিবাবুর ডিটেকটিভ নভেল-পড়া মগজে নানারকম থিওরি পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। তিনি একটা লাঠি দিয়ে দেওয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখলেন, কোথাও একটু ফাঁপা আওয়াজ হয় কি না। সমস্ত দেওয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে দেখলেন কোনও লুকোনো বোতাম বা হাতল হাতে ঠেকে কি না। লাথি মেরে-মেরে মেঝের সিমেন্ট প্রায় তুলে ফেললেন। কিন্তু এত করেও কোনও ফল হল না।

রণজিৎবাবু বললেন, 'নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির সন্ধান পেতে আপনি বড়ই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ম্যানেজারবাবু। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যে করতে পারল, সে কি আর টাকাকড়ির লোভ সামলাতে পেরেছে!'

পশুপতি বললেন, 'না, না, তা নয়—এই দেখছিলুম আরকি। ভদ্রলোকের সবই রহস্যময় ছিল কিনা। আপনার কী মনে হচ্ছে? কোনও ক্লু-টলু পেলেন?'

'আপাতত একেবারেই অন্ধকার।'

হঠাৎ! চঞ্চল বলে উঠল, 'এ তো ভারি আশ্চর্য!'

ঘরের এককোণে গোবিন্দবাবুর বিছানাটা জড়ানো পুঁটলি হয়ে পড়ে ছিল, এতক্ষণ কেউ তা লক্ষ করেনি। চঞ্চল গিয়ে সেটা টেনে খুলে ফেলেছে। বিছানা বলতে অবশ্য শুধু একটা কম্বল আর একটা ওয়াড়-ছাড়া চিটচিটে বালিশ। কিন্তু সেই কম্বলের মধ্যে জড়ানো একখানা মস্ত বড় ঝকঝকে দামি আয়না।

এই আয়নাটাই আশ্চর্য।

সবাই ঝুঁকে পড়ে আয়নাটা দেখতে লাগল। সোনালি রঙের ফ্রেম, আঙুল রেখে দেখা গেল কাঁচটা অন্তত এক ইঞ্চি পুরু। একটা পয়সা খরচ করতে যার প্রাণ বেরিয়ে যেত, তার এই দামি আয়নার আজগুবি শখ কেন? আশ্চর্যই বটে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'বুড়োর প্রাণে তো রস ছিল খুব! নিজের ওই অলক্ষুনে মুখখানাই বোধহয় দেখত বসে-বসে।'

'কেন, অলক্ষুনে মুখ কেন?' জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'কেন অলক্ষুনে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। খুন হয়ে ইনি অবশ্য দেখতে ভয়াবহ হয়েছেন, কিন্তু বেঁচে থেকেও যে এর চেয়ে বেশি সুশ্রী ছিলেন তা তো নয়। আচ্ছা, ওই বালিশটার ভিতরে নোট-টোট কিছু নেই তো?'

বলে পশুপতি বালিশটা তুলে নিয়ে একটানে খোলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সারা ঘরে তুলো ছড়িয়ে পড়ল, নোট একটিও বেরুল না।

চঞ্চল তখনও আয়নাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীব্র আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ঘরের ইলেকট্রিক বালবটা তখনও জ্বলছে। দিনের আলোয় কেউ তা এতক্ষণ লক্ষ করেনি।

রণজিৎবাবুকে ডেকে সে বললে, 'দেখছেন—কে বা কারা হাতের কাজ শেষ করে আলোটা

BanglaBook.org

নেবাতে ভুলে গিয়েছিল।'

রণজিৎ বললেন, 'তা-ই তো দেখছি।'

চঞ্চল বললে, 'আচ্ছা, আলোটা খুব বেশি উজ্জ্বল নয় কি? এই দিনের আলোতেও কেমন চোখে লাগছে।'

'হ্যাঁ, খুবই উজ্জ্বল, অন্তত একশো পাওয়ার হবে।'

'এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো! ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ ছিল?'

'তা লোকের কত রকমই খেয়াল থাকে,' বলে রণজিৎবাবু শিস দিতে-দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। ম্যানেজারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বালিশটা মিছিমিছি ছিঁড়লেন দেখছি। তা এখানে তো আর কিছু করবার নেই। চলুন, নিচে গিয়ে গল্প-টল্প করা যাক। —আহা, কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে লোকটাকে,' বলে তিনি মৃতদেহের কাছে গিয়ে মুখে-চুলে-দাড়িতে একটু হাত বুলোলেন।

পশুপতি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমাদের একটা কিন্তু ভুল হয়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হয়নি।'

রণজিৎ বললেন, 'ডাক্তারের দরকার হবে না। ইনি যে আত্মহত্যা করেননি সেটা নিঃসন্দেহ। এ ছাড়া আর যা জানবার তা ধরা পড়বে পোস্টমর্টেমে।'

'মৃতদেহ কি এখনই সরিয়ে নেবেন?'

'একটু পরেই। আপনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা আছে। চলুন নিচে।'

সাত

ম্যানেজারবাবু ইন্সপেক্টরকে নরহরি-দার ঘরে এনেই বসালেন। সেখানে মনোহর, সরোজ, নরেশ আর আনন্দ তখনও বসে আছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এদের কি বাইরে যেতে বলব?'

'না, না, আমার কথা কিছু গোপনীয় নয়। দু-একটা খোঁজখবর নেব শুধু। আচ্ছা, কাল রাত্রে আপনারা গোবিন্দবাবুকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

সকলেই বললে যে, রাত্রে কেউ তাঁকে দেখেনি, এমনকী বিকেলের দিকেই দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। পশুপতি বুঝিয়ে বললেন যে, গোবিন্দবাবু মানুষটা মোটেও মিশুক ছিলেন না, নেহাৎ দরকার না-হলে উপর থেকে নামতেন না, খাওয়া-দাওয়াও নিজের ঘরেই করতেন। তাঁর সঙ্গে মেসের পাঁচজনের দেখাশোনা বলতে গেলে হতই না, শুধু নরহরি-দার ঘরেই এক-আধ সময় আসতেন।

'আপনার ঘরে আসতেন? কেন?'

'আসতেন তাস খেলতে।'

'তাস খেলতে ভালোবাসতেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে ওই একটা জিনিসেই তাঁর একটু আসক্তি ছিল মনে হয়।'

'আর কিছু ভালোবাসতেন?'

'মনে তো হত না।'

'কথাবার্তা কীরকম বলতেন?'

'খুব কম।'

'কোনও বিশেষ বিষয়ে উৎসাহ ছিল?'

'কিছুমাত্র না।'

BanglaBook.org

'একটু ভেবে দেখুন।'

'যদি খুব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেন তা হলে বলতে হয় এক থিয়েটারের কথা উঠলে ভদ্রলোকের একটু উৎসাহ দেখা যেত।'

'অথচ তিনি থিয়েটারে কখনও যেতেন না?'

'কখনওই না। বাড়ির বাইরেই যেতেন না কখনও।'

'আচ্ছা। এবার আপনি বলুন ম্যানেজারবাবু, গোবিন্দবাবুর বিষয়ে কী জানেন।'

পশুপতি তাঁর ম্যানেজারির প্রথম দিন থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুরু করলেন। গোবিন্দবাবু কী করতেন, কী খেতেন, চাকরদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—কিছুই সে বর্ণনা থেকে বাদ গেল না। সব শুনে ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন ঃ

'তাঁর দেশ কোথায় ছিল?'

'তা তো জানিনে।'

'তাঁকে কখনও জিগ্যেস করেছেন?'

'অনেকবার করেছি, কোনও জবাব পাইনি। এটুকু মাত্র বলতে পারি যে, কথা শুনে চব্বিশ পরগনার লোকই মনে হত।'

'তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন...?'

'কারও কথা জানিনে।'

'কেউ দেখা করতে আসত তাঁর সঙ্গে?'

'কেউ না। আর এতদিনের মধ্যে তাঁর একটা চিঠি এসেছে বলেও জানা যায়নি।'

হঠাৎ আনন্দ বলে উঠল, 'কাল কিন্তু ওঁর নামে একটা চিঠি এসেছিল।'

'অ্যাঁ? চিঠি? ওঁর নামে!' পশুপতি রীতিমতো চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ওঁর নামে চিঠি।'

'তুমি জানলে কেমন করে?'

'কাল সকালে আমার কোনও চিঠি এসেছে কি না দেখবার জন্য আমি লেটারবক্স ঘাঁটছিলাম, নানা চিঠির মধ্যে গোবিন্দ চ্যাটার্জির নামে একটি পোস্টকার্ড চোখে পড়ল।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'ঠিক মনে আছে আপনার?'

'ঠিক মনে আছে। ওঁর নামে কখনও কোনও চিঠি আসে না, সেইজন্য ওটা লক্ষ করেছিলাম। কোনও জরুরি খবর এসেছে মনে করে আমি তখুনি সেটা চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম চারতলায়।'

ম্যানেজারবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কী ছিল সে-চিঠিতে?'

'তা জানিনে। পরের চিঠি পড়বার অভ্যেস আমার নেই।'

মনোহর বললে, 'তুমি তো খুব পরোপকারী ছেলে, আনন্দ, তক্ষুনি চিঠিটা চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।'

'তা দিয়েছিলুম, আপনাদের মতো টিপ্পনি কেটেই তো আমার দিন যায় না।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'থাক, থাক, তোমার আর ফাজলেমি করতে হবে না। কোন চাকর দিয়ে পাঠিয়েছিলে?'

'কেষ্টাকে দিয়ে।'

ডাকা হল কেষ্টকে। কেষ্ট বললে যে, হ্যাঁ, কাল সকালে একতলার বাবু তার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন বটে চারতলার বাবুকে দিয়ে আসতে।

'তুই সেটা তখুনি দিয়ে এসেছিলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিঠি পেয়ে চারতলার বাবু কিছু বললেন?' জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

BanglaBook.org

কেষ্ট মাথা নাড়ল।

'তাঁর মুখের চেহারা চিঠি পেয়ে কেমন হল?'

কিন্তু কেষ্ট আর-কিছুই বলতে পারলে না। চিঠি দিয়েই সে চলে এসেছিল।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'পোস্টকার্ডটা ঘরের মধ্যে পাওয়া গেলে একটু সুরাহা হত।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'সেইজন্যেই তো পাওয়া গেল না।'

'আপনি তা হলে মনে করেন পোস্টকার্ডটার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

মেসের আরও অনেককে জেরা করা হল, তা থেকে দুটো খুব বড়রকমের খবর বেরুল। দোতলার ললিতবাবু বললেন যে, কাল রাত প্রায় দুটোয় তিনি থিয়েটার দেখে ফিরেছিলেন। মেসের কাছে এসে তিনি দেখেছিলেন যে, সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শুধু চারতলার এককোণে আলো জ্বলছিল। তিনি মনে-মনে ভেবেছিলেন—বিটকেল বুড়ো এত রাতে আলো জ্বেলে কী করছে—সে-কথা তাঁর মনে আছে।

'আলোটা কি আপনার চোখে খুব বেশি উজ্জ্বল লেগেছিল?'

'তা তো বলতে পারব না। কার্নিশের ফুটো দিয়ে একটুখানি আলোই চোখে পড়েছিল।'

'তবে আলো দেখেছিলেন সেটা ঠিক মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আলো দেখেছিলুম ঠিকই।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কেউ কি কখনও লক্ষ করেছেন যে গোবিন্দবাবুর ঘরের আলোটা খুব বেশি জোরালো?'

এ-কথার কোনও জবাব কেউ দিতে পারলে না, কারণ গোবিন্দবাবুর ঘরের অভ্যন্তর সকলেরই অজ্ঞাত।

আর-একটা খবর দিলে মেসের ঠাকুর। সে বললে যে, গোবিন্দবাবু তাকে বলেছিলেন যে, তাঁর ভাই কাল দেশ থেকে আসছে, তার খাওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

'কবে বলেছিলেন?'

'কাল।'

'কখন বলেছিলেন?'

'দুপুরে তাঁর খাবার নিয়ে যখন যাই, তখন।'

'কী বলেছিলেন তোমাকে ঠিক করে বলো তো?'

ঠাকুর একটু ভেবে বললে, 'বাবু বললেন, "ঠাকুর, কাল সকালে আমার ভাই আসছে দেশ থেকে। তার খাওয়ার ব্যবস্থা কোরো। সে আমার মতো পেট-রোগা লোক নয়, বেশ খেতে-টেতে পারে। ওর জন্যে আলাদা করে একটু মাছ-তরকারি রান্না কোরো—বেশ ভালো করে রেঁধো—তোমাকে বখশিশ দেব।"

এ-কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। প্রথম নম্বর তাজ্জব কথা এই যে, ভূতের মতো অদ্ভুত ওই মানুষটারও পৃথিবীতে একজন ভাই আছে—এবং তার চেয়েও যা আশ্চর্য—সেই ভাইয়ের জন্য হাড়-কঞ্জুস গোবিন্দ চাটুয্যে রীতিমতো ভোজের ফরমাস দিয়েছিলেন—এমনকী ঠাকুরকে বকশিশ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন!

পশুপতি বললেন, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ওই পোস্টকার্ডে ভাইয়ের আসবার খবরই ছিল।'

'সেইরকমই তো মনে হয়', বললেন ইন্সপেক্টর।

রণজিৎবাবু তাঁর কথা মেনে নেওয়ায় পশুপতি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে বলতে লাগলেন—এটাও মনে হয় যে, এমন কেউ আছে ওই দু-ভাইয়ে দেখা হওয়ার সঙ্গে—অর্থাৎ না-হওয়ার সঙ্গে—যার গভীর স্বার্থ জড়িত। সে চায় না যে, গোবিন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের সাক্ষাৎ হোক। অতএব তারই এই কাজ। এখন এটুকু শুধু জানতে বাকি থাকে সেই লোকটি কে?'

BanglaBook.org

'বাঃ, বেশ বলেছেন। সমস্যাটা আপনি অনেকটা সরল করে এনেছেন সে-কথা মানতেই হয়।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুরকে আরও দু-একটা প্রশ্ন করলেন ঃ

'গোবিন্দবাবু তোমাকে আর কিছু বলেননি—না?'

'না, হুজুর।'

'রাত্রে যখন তাঁর খাবার দিতে গেলে?'

'না। আর কোনও কথাই বলেননি। তখন আমি তাঁকে দেখিওনি, দরজার বাইরে খাবার রেখে চলে এসেছিলুম। তাঁর ঘরের মধ্যে যাওয়ার হুকুম তো আমাদের ছিল না।'

'খাবারটা তিনি খেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। কেষ্ট খানিক পরে গিয়ে থালাটা নিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, রাত্রে তোমরা কোথায় শোও?'

'একতলায়—রান্নাঘরের দিকে।'

'কাল রাত্রে কোনওরকম শব্দ-টব্দ কিছু শুনেছিলে?'

'আমাদের তো শুতে-শুতেই একটা হয়।'

'তারপর?'

'না, মনে তো পড়ে না।... হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে একবার যেন কলতলায় জলের শব্দ শুনেছিলুম।'

পশুপতিবাবু ঠাকুরকে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'কলতলায় জলের শব্দের কথা কেউ শুনতে চায় না। কোনও চিৎকার-টিৎকার শুনেছিস?'

কিন্তু বেচারা ঠাকুর তো একতলায় কত দূরে শোয়—তার আর দোষ কী? সমস্ত মেসে একজনও এমন কথা বলতে পারলে না যে, গত রাত্রে সে এমন কোনও শব্দ শুনেছে যা কোনও বিপন্ন কি মরণোন্মুখ ব্যক্তির চিৎকার বলে ভুল করা যায়।

আট

পশুপতিবাবু ইন্সপেক্টরকে একটু আড়ালে ডেকে দিয়ে বললেন, 'ওই আনন্দ ছোকরাকে একটু লক্ষ করবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'ছোকরার মতিগতি ভালো নয়।'

'কীরকম শুনি?'

'বড্ড স্বদেশির দিকে ঝোঁক।'

'তাই নাকি?'

'বাসরে, কীসব গরম-গরম বক্তৃতা করে তা যদি শোনেন! বলে কিনা, একজনের বেশি টাকা থাকবে আর-একজনের কম থাকবে—এ না কি দারুণ অন্যায়! যাদের অনেক আছে তাদের টাকা কেড়ে নেওয়া উচিত, এই হল ওর মত। এসব কথা যারা বলে তারা গুণ্ডা ছাড়া আর কী, আপনিই বলুন। বড়লোক-গরিব নিয়েই তো সংসার।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'হুঁ।'

'আমার খুব সন্দেহ হয় যে, এর মধ্যে ওর কোনও হাত আছে। দেখছেন না—আর-সবাই ঘাবড়ে গেছে, অথচ ও দিব্যি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্রিমিনাল না হলে এত সাহস হয়!'

'ও তো বাচ্চা ছেলে, ওর পক্ষে কি...।'

BanglaBook.org

'আপনি পুলিশের লোক হয়ে কী বলছেন, সামন্তমশাই! বাচ্চা ছেলেরাই তো যত অঘটন ঘটায়। ওর ঘরটা অন্তত একবার সার্চ করুন—দেখুন না, কী বেরোয়।'

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'বেশ, চলুন।'

পরমুহূর্তে এক কাণ্ড! সরোজ ছুটে এসে একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললে, 'স্যার, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন স্যার—আজ বড়বাবুর মেয়ের বিয়ে—আমি ঠিক সময়ে হাজির না হলে ঠিক আমার চাকরি যাবে।'

ইন্সপেক্টরবাবু সরোজকে টেনে তুলে ধরে একটু কঠোরভাবেই বললেন, 'বিয়ে তো রাত্রে, এখন যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'আজ্ঞে, আমি তো নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছি নে, যাচ্ছি খাটতে। আপিসের সব ক'টি কেরানিই তাই। আজকের দিনের যত কাজ সব আমাদেরই করতে হবে। সবাই যাবে—আর আমি যাব না, তাহলে কি আর বড়বাবু আমাকে আস্ত রাখবেন! কোনও ওজর-আপত্তি শুনবেন না তিনি। এ-বাজারে একবার চাকরি গেলে আর চাকরি হবে না, স্যার না খেয়ে মরব, উপোস করে মরব। আমি মিছে কথা বলছি না, স্যার, বড়বাবুর বাড়িতে টেলিফোন আছে, আপনি এক্ষুনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন। ফোন নম্বর হল...।'

কিন্তু সরোজের কথা শেষ হবার আগেই পশুপতিবাবু প্রচণ্ড গলায় ধমকে উঠলেন, 'চুপ করো, সরোজ। আর-একটি কথা বলবে তো তোমাকে একদম হাজতে পুরে রাখা হবে। ভালো চাও তো চুপ করে বসে থাকো—এখন কোথাও যাওয়া হবে না তোমার।' তাঁর কথার ভাবে মনে হল যেন তিনিই পুলিশের বড় কর্তা।

তবু সরোজ আর-একবার বললে, 'আমাকে যেতে দিন, আমাকে...' কথা সে শেষ করতে পারলে না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আপনি যখন এত করে বলছেন তখন আপনাকে যেতে দেব, কিন্তু তার আগে আপনার ঘরটি একবার সার্চ করব।'

'অ্যাঁ! আমার ঘর! আমার ঘরে কিছু নেই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমার ঘরে কিছু নেই।'

'সে দেখা যাবে।'

এর পরে সরোজ আর-কিছু বললে না, বোধহয় কথা বলবার ক্ষমতাই তার চলে গিয়েছিল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে মেঝের উপরেই সে বসে রইল, থেকে-থেকে তার শরীর কেঁপে উঠতে লাগল, যেন দমকে-দমকে কান্না আসছে।

পশুপতিবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'আগে চলুন আনন্দর ঘরে।' তারপর চেঁচিয়ে আনন্দকে : 'ওহে আনন্দ, ইন্সপেক্টরবাবু তোমার ঘরটি একবার দেখতে চান।'

আনন্দ খুব সপ্রতিভভাবে বললে, 'বেশ তো, বেশ তো, আমার ঘরে আজ বড়লোকের পায়ের ধুলো পড়বে—কত ভাগ্য আমার! ওকে ঘর বললে অবশ্যি বেশি বলা হয়, মেসমা সেখানে বাস করে ইঁদুর, আরশোলা আর আনন্দ।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি আনন্দ, একতলার একটা এঁদো অন্ধকার কুঠরিতে ওর বাসা। জিনিসের মধ্যে ভাঙা একটা তক্তপোশ, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল আর একটা রংচটা তালা-ছাড়া স্টিল-ট্রাঙ্ক। সার্চ করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। কয়েকখানা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আর বাংলায় লেখা একখানা লেনিনের জীবন-চরিত—এ ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া গেল না।

বাংলা বইটার মলাট লাল। সেটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে পশুপতিবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'বইটা প্রোসক্রাইবড নয় তো?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'না। চলুন, এবার ওই কেরানিবাবুর ঘরটা দেখা যাক।'

উপরে এসে দেখা গেল সরোজ তখনও মেঝের উপর জবুথবু হয়ে বসে আছে। পশুপতিবাবু হাঁক দিলেন, 'ওহে ওঠো, একবারটি ঘরে যেতে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

কলের পুতুলের মতো সরোজ উঠে দাঁড়াল। তার মুখে একফোঁটা রক্ত নেই, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

পশুপতি বললেন, 'আপনিও চলুন নরহরি-দা।'

নরহরি বললেন, 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, সরোজ? তোমার যে কিছু দোষ নেই তা তো সবাই জানি।'

সরোজ নরহরিবাবুর দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকাল যে বলবার নয়।

কিন্তু নরহরিবাবুও অবাক হয়ে গেলেন যখন সরোজের ট্রাঙ্কের তলা থেকে পাঁচশো টাকা বেরুল—কড়কড়ে পাঁচখানা একশো টাকার নোট।

'এর মানে?' বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন পশুপতি, 'তুমি মাইনে পাও পঁচিশ টাকা, চালচুলোর খবর নেই, এত টাকা তোমার হাতে কেমন করে এল?'

সরোজ চুপ।

পশুপতি বলতে লাগলেন, 'এর একটা জবাবদিহি তো দিতে হচ্ছে, ভায়া!'

সরোজ জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে বললে, 'সত্যি কথাই বলব, যদিও জানি সে-কথা আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।'

'শুনি, শুনি, অবিশ্বাস্যটাই শুনি।'

'টাকাটা আমাকে গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন।'

'কী? কী বললে?'

'গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন। গোবিন্দ চাটুয্যে।'

'তার চেয়ে বললে না কেন আকাশের পরী ঘুমের মধ্যে তোমার বালিশের তলায় রেখে গেছে!'

'বানিয়ে বললে এমন কিছু বলতুম যা লোকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু সত্যি বলছি বলেই অবিশ্বাস্য বলতে হচ্ছে।' সরোজ এতক্ষণ একেবারেই নেতিয়ে ছিল, কিন্তু সত্যিকার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তার বুদ্ধিসুদ্ধি যেন খুলে গেল।

নরহরিবাবু বললেন, 'আহা, ও যে মিথ্যে বলছে তা তো এখনও প্রমাণ হয়নি। হতেও তো পারে। পৃথিবীতে কত কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আর এই কি হতে পারবে না!'

পশুপতি বললেন, 'আপনি থামুন নরহরি-দা, ক্রাইম হ্যান্ডল করা আপনার মতো ভালোমানুষের কর্ম নয়। কী ব্যাপার খুলে বলো, সরোজ—নয়তো কপালে দুর্ভোগ আছে।'

রণজিৎ সামন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওঁকে জিগ্যেস করছি সবকথা। এ-টাকা আপনাকে গোবিন্দ চাটুয্যে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধার?'

'না, আমার মতো গরিবকে ধার দেবে কে? আমাকে তিনি দান করেছিলেন।'

'তিনি তো ভীষণ কৃপণ ছিলেন—হঠাৎ এত দয়া কেন হল তাঁর?'

'কেন হল তা আমি কেমন করে বলব?'

'আপনি তাঁর কাছে চেয়েছিলেন?'

'চেয়েছিলুম। অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলুম।'

'কেন?'

'আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে—সেইজন্যে।'

'তারপর কবে পেলেন টাকাটা?'

'কাল।'

BanglaBook.org

'কাল কখন?'

'কাল সন্ধেবেলা—আপিস থেকে ফিরে।'

'কী বলে দিলেন তিনি?'

'ব্যাপারটা এইরকম। আমরা অত্যন্ত গরিব। মা বিধবা, এক বোন আছে, তার বিয়ে দেওয়া দরকার। টাকা ছাড়া বিয়ে হয় না। কোথায় পাই টাকা, সবসময় এই আমার ভাবনা। এই মেসে সকলেরই ধারণা যে, গোবিন্দবাবুর অনেক টাকা। সেই ধারণারই বশবর্তী হয়ে আমি অনেকদিন ধরেই গোবিন্দবাবুর কাছে কিছু সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছিলুম। আজ যেমন আপনার পায়ে ধরেছি তেমনি তাঁরও পায়ে পড়েছি অনেকবার। অনেক কেঁদেকেটে তাঁর মনটা বোধহয় একটু ভিজিয়ে এনেছিলুম।'

পশুপতি এখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা হলে তুমি তাঁর ঘরে প্রায়ই যেতে?'

'তাঁর ঘরে যেতুম বললে ভুল হয়, মাঝে-মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি বটে।'

'কিন্তু এ-কথা তো আগে কখনও বলোনি!'

'কথাটা কি বলবার মতো? বোনের বিয়ের জন্য ভিক্ষের চেষ্টা করছি এ-কথা কি পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবার মতো?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'গোবিন্দবাবুর মন তাহলে একটু ভিজেছিল?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তিনি বিশ-পঁচিশ কি বড় জোর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভিখিরি-বিদেয় করবেন। এদিকে দেশ থেকে মা চিঠি লিখেছেন বোনের একটি ভালো সম্বন্ধ উপস্থিত, কম-সে-কম শ পাঁচেক টাকা হলে শুভকার্য এ-মাসেই হয়ে যেতে পারে। তাই মরিয়া হয়ে ধন্না দিচ্ছিলুম গোবিন্দবাবুর কাছে। কাল সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরেই গেলুম তাঁর কাছে। ছাদে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই মুখ কটমট করে বললেন, "কী চাই?" আমি তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললুম, "বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ-যাত্রা আমাকে উদ্ধার না করলে চলবে না।" তিনি প্রথমটায় কিছু বললেন না, তারপর হঠাৎ অদ্ভুত একটু হেসে বললেন, "কত চাই?" আমি ধাঁ করে বলে ফেললুম, "পাঁচশো।" "একটু দাঁড়াও", বলে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকলেন, একটু পরেই বেরিয়ে এসে আমার হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।" নিচে এসে আমি অবাক হয়ে দেখি যে, তিনি পাঁচশো টাকাই দিয়েছেন, সত্যি-সত্যি পাঁচশো।'

কথা শেষ করে সরোজ হাঁপাতে লাগল।

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'তখন তাঁর ঘরে কি আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ। জ্বলছিল!'

'আপনি ঘরের ভিতরটা দেখতে পেয়েছিলেন?'

'তাঁর দরজা তো সবসময় ভেজানো থাকত।'

'কিচ্ছু দেখেননি? মনে করবার চেষ্টা করুন।'

সরোজ একটু ভেবে বললে, 'তিনি যখন টাকা আনতে ভিতরে যান, তখন ঘরের ভিতরটা আমার একটুখানি চোখে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, ঘরে যেন আর-একজন মানুষ বসে আছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল।'

'আচ্ছা, আপনি যখন টাকা চাইলেন তখন তিনি অদ্ভুত একটু হাসলেন, না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত সে-হাসি। অমন হাসি তাঁর মুখে আমি কখনও দেখিনি।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'মিছিমিছি ওকে জেরা করছেন, ইন্সপেক্টরবাবু, ওর সবকথাই বানানো। ও-টাকাটা গোবিন্দবাবুর সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি ওকে দান করেছেন এ একেবারেই অসম্ভব। থানায় নিয়ে চলুন, কিল-গুঁতো না খেলে সত্যি কথা বেরোবে না।'

নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, ও যা বলছে তা হতেও পারে। আমারও মনে হয় যে, গোবিন্দবাবুর বাইরেটা যতই রুক্ষ হোক, ভিতরের মানুষটা ঠিক ওরকম ছিল না।'

BanglaBook.org

পশুপতি বললেন, 'দেখুন নরহরি-দা, আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু যা বোঝেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না দয়া করে। তাহলে ইন্সপেক্টরবাবু...'

কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হল না। ঝড়ের মতো একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'এ কি সত্যি? যা শুনছি এ কি সত্যি? ...গোবিন্দবাবু...গোবিন্দবাবুকে...কে না কি...খুন করে গেছে!'

শেষের কথাটা চিৎকার করে বলে লোকটি কাঁপতে-কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তার চিৎকার এমন অমানুষিক যে, তা শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

নয়

আগন্তুক অপরিচিত। দাড়ি-গোঁফ কামানো সুন্দর চেহারা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর দামি শাল, বেশ একটু বাবুগোছেরই বেশবিন্যাস। দু-তিন মিনিট কেউ যেন ভেবে পেল না তাঁর সঙ্গে কে কথা বলবে, কী কথা বলবে। তারপর পশুপতি গেলেন এগিয়ে। জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কে?'

ভাঙা গলায় আগন্তুক জবাব দিলেন, 'আমি—আমি গোবিন্দবাবুর ভাই, আমার নাম ভুজঙ্গধর।'

'ও—আপনারই আজ আসবার কথা ছিল! আপনিই পোস্টকার্ড লিখেছিলেন!'

'সে-পোস্টকার্ড তিনি কি পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিলেন। তারপর...আজ সকালে উঠে তো আমরা দেখি এই কাণ্ড! কী আর করবেন, মশাই, সবই ভগবানের হাত।' পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে থেকে আগন্তুক বলতে লাগলেন, 'দশ বছর দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, দশ বছর তিনি দেশছাড়া। আর আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাও এলুম—' হাতের উল্টো দিক দিয়ে তিনি কপালে আঘাত করলেন, তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

ইন্সপেক্টরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এইমাত্র এসে পৌঁছলেন?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

'সঙ্গে কোনও জিনিস নেই?'

'আছে বইকী। একটা বিছানা আর স্যুটকেস। সেগুলো নিচেই ফেলে এসেছি। শেয়ালদায় নেমে একটা রিকশ নিয়ে এসেছি এখানে। কাছাকাছি এসেই দেখি চারিদিকে লাল পাগড়ি। দেখে তো আমার চক্ষুস্থির—বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। আমি মানুষটা একটু ভীতু গোছের, তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে থাকি—কোনওরকম হাঙ্গামাই ধাতে সয় না ...আমাকে একগ্লাস জল দিতে বলবেন?'

পশুপতি তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে কেষ্ট, ওরে কে আছিস, একগ্লাস খাবার জল নিয়ে আয়।'

জল আনা হল। এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার বলতে লাগলেন, 'রিকশ এসে দরজায় দাঁড়াতেই শুনলুম আশেপাশের লোক কী যেন বলাবলি করছে, তার মধ্যে "খুন" কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলুম। আমি গলা বাড়িয়ে একজনকে জিগ্যেস করলুম, "কী হয়েছে, মশাই?" সে বললে, "গোবিন্দ চাটুয্যে খুন হয়েছে।" সঙ্গে-সঙ্গেই আমার চোখে দিনের আলো নিবে গেল, পায়ের তলা থেকে মাটি গেল সরে। কেমন করে রাস্তায় নেমে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম তা আমি নিজেই জানিনে। দু-একটা লাল পাগড়ি বোধহয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। ওই দেখুন, রিকশভাড়াটা পর্যন্ত দিতে ভুলে গেছি। আর জিনিসগুলো

BanglaBook.org

রিকশতেই রয়েছে। দয়া করে ভাড়াটা পাঠিয়ে দেবেন,' বলে ভুজঙ্গবাবু পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগ বের করে একটা চকচকে সিকি টেবিলের উপর রাখলেন। সকলেই লক্ষ করলে যে, ব্যাগটা এতই ভর্তি যে, টাকার চাপে যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

পশুপতি বললে, 'আপনার জিনিসগুলোও উপরে আনতে বলি।'

'কোনও দরকার নেই। আমি পরের ট্রেনেই আবার ফিরে যাব। কলকাতায় যে-জন্য এসেছিলাম তা তো চুকেই গেল।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'একটু বসুন। একটু বিশ্রাম করুন। আপনাকে দিয়ে আমাদের একটু দরকার আছে।'

'আদেশ করুন।'

'আমি এই ব্যাপারটার তদন্তর ভার নিয়েছি। আপনার কাছে গোবিন্দবাবুর ইতিহাস শুনতে চাই, তাতে যদি আমাদের কোনও সাহায্য হয়। আপনি সেটুকু জানেন সেটুকুই বলবেন।'

'নিশ্চয়ই।' ভুজঙ্গধর আর-একঢোঁক জল খেয়ে নিলেন। সকলে চারিদিকে ঘন হয়ে দাঁড়াল। গোবিন্দ চাটুয্যের জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে—সকলেই শুনতে উৎসুক।

ভুজঙ্গধর বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশ জয়নগর লাইনে মোতিঝিল গ্রামে। আমরা দু-ভাই। দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। ছেলেবেলা থেকে দাদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, আমিও দাদার খুব ভক্ত ছিলুম। বাবা যখন মারা গেলেন আমার বয়েস তখন পঁচিশ। কুসংসর্গে পড়ে, কুলোকের পরামর্শে সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধালুম। দাদা অনেক বোঝালেন, অনেক সইলেন, মা-ও প্রাণপণ চেষ্টা করলেন আমার মতি ফেরাতে। হায়, তখন যদি তাঁদের কথা শুনতুম!'

ভুজঙ্গবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'তারপর?'

'এভাবে কিছুদিন কাটল। তারপর আমি এক ধূর্ত উকিলের সাহায্যে নানারকম আইনের প্যাঁচ কষতে লাগলুম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না—দাদাকে যখন-তখন যা-তা বলতুম, নানারকম অপমান করতুম। তারপর একদিন চরম হল। দাদাকে ঘাড় ধরে বাড়ির বের করে দিলুম। দাদা সেই যে বাড়ির বের হলেন আর ফিরলেন না। আমি একা বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলুম। দাদার শোকে মনমরা হয়ে মা-ও কিছুদিন পর মারা গেলেন। এদিকে আমারও মনে শান্তি ছিল না। যখনি মাথা ঠাণ্ডা হল, কুসংসর্গ ছাড়লুম, অনুশোচনায় হৃদয় জ্বলে যেতে লাগল—হায়, হায়, এ আমি কী করলুম! তারপর আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হল, এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত না-করলে আমি বাঁচব না। তাই আজ এসেছিলুম কলকাতায়—দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বিষয়-সম্পত্তি থেকে এতদিনে যত টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছে সব নিয়ে এসেছিলুম সঙ্গে—সে-টাকা তাঁকে দেব, তারপর তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আমার কপালে নেই।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরিয়েছেন কতদিন?'

'তা বছর দশেক হবে।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'ঠিক দশ বছরই তিনি এই মেসে আছেন।'

ইন্সপেক্টর আবার জিগ্যেস করলেন, 'এর মধ্যে তিনি আপনাদের খোঁজখবর নেননি?'

'না। তিনি বোধহয় পণ করেছিলেন বাকি জীবন অজ্ঞাতবাসে কাটাবেন, আমার মুখ আর দেখবেন না—সেজন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না।'

'আপনিও কোনও খবর নেননি?'

'অনেকদিন নিইনি। তারপর মা যখন মারা গেলেন, কলকাতায় এসে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি এই মেসে আছেন। কিন্তু দেখা করবার সাহস হল না—কিংবা ইচ্ছে হল না। একটা পোস্টকার্ড লিখে মা-র মৃত্যু সংবাদটা তাঁকে জানিয়ে দিলুম।'

BanglaBook.org

'সে আজ কতদিনের কথা?'

ভুজঙ্গবাবু একটু ভেবে বললেন, 'তা সাত বছর হবে।'

'সে-চিঠির তিনি কোনও জবাব দিয়েছিলেন?'

'না।'

'আর কোনও চিঠি লিখেছিলেন এই দশ বছরে?'

'না।'

'আপনি বললেন যে, আপনার মা-র মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে খোঁজ নিয়ে জানলেন আপনার দাদা এই মেসে আছেন। কার কাছে খোঁজ নিলেন।'

'কেন, তাঁর বন্ধুদের কাছে।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'সে কী কথা! তাঁরও বন্ধুবান্ধব ছিল তা হলে!'

'বলেন কী! ছিল না! তিনি অত্যন্ত দিলদরিয়া মিশুক মানুষ ছিলেন যে!'

এ-কথা শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যেই খুব একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। গোবিন্দ চাটুয্যে দিল-দরিয়া মিশুক মানুষ! এমন অসম্ভব কথা কেউ কি ভাবতে পারে!

পশুপতি বললেন, 'তাহলে শেষের দিকে তিনি একেবারে বদলে গিয়েছিলেন, বলতে হয়। আমরা তাঁকে দেখেছি—অত্যন্ত কৃপণ, অতি রুক্ষ মেজাজ, কারও সঙ্গে মেশেন না, কেমন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া গোছের মানুষ। এই মেসে তিনি একটা প্রবচন দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।'

আগন্তুক বললেন, 'বুঝেছি। মনের কষ্টে তাঁর ওরকম হয়েছিল। আর সে-কষ্ট আমিই তাঁকে দিয়েছিলুম।'

'তাঁর বন্ধুবান্ধব দু-একজনের নাম করতে পারেন? জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'পারব না কেন? অমর ঘোষ, বিপিন মুখার্জি—'

'কোন অমর ঘোষ? অ্যাক্টর?'

হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি।'

'তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হল কেমন করে?'

'বাঃ, তিনিও যে অ্যাক্টর ছিলেন।'

'অ্যাক্টর ছিলেন? থিয়েটারে অভিনয় করতেন।' পশুপতিবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'পয়সা নিয়ে করতেন না, শখে করতেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান শখ। তাঁর বন্ধুরা বলেন যে, স্টেজে টিঁকে থাকলে তিনি একজন উঁচুদরের অভিনেতা হতে পারতেন।'

'তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্টেজে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেননি?'

'চেষ্টা কি আর কম করেছেন! কিন্তু আমার উপর রাগ করে সমস্ত জীবনের উপরেই তিনি অভিমান করেছিলেন। বন্ধুবান্ধব এলে শেষটায় আর দেখাও করতেন না। অগত্যা তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁর কাছে কেউ আর আসতেন না, তিনি অবশ্য কোনওখানেই বেরোতেন না, ক্রমে লোকে তাঁর অস্তিত্বই ভুলে গেল।'

'তিনি বিয়ে করেছিলেন?'

'না। বিয়ে করলে কি আর নিজের উপর এত নিষ্ঠুর হতে পারতেন!'

হঠাৎ নরহরিবাবু বলে উঠলেন, 'তিনি অ্যাক্টর ছিলেন? তাই বলো! তাই থিয়েটারের কথা উঠলেই তাঁর যা একটু উৎসাহ দেখা যেত।'

'আর তাঁর ঘরেও কয়েকটা নাটকের বই পাওয়া গেছে তা তো জানেন।'

নরহরি বললেন, 'কিন্তু—আমি তো বলতে গেলে থিয়েটারের পোকা, গত বিশ বছর এই কলকাতা শহরের কোনও নাটকই প্রায় বাদ দিইনি। কিন্তু গোবিন্দ চাটুয্যে নামে কোনও অ্যাক্টর তো মনে পড়ে না।'

BanglaBook.org

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'স্টেজে যে তাঁর ছদ্মনাম ছিল। তাঁর মত ছিল যে, গোবিন্দ নামটা এত সেকেলে যেন স্টেজের মোটেও উপযোগী নয়। তাঁর স্টেজের নাম ছিল মণি দত্ত।'

নরহরি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মণি দত্ত! তাই বলুন। মণি দত্তের অভিনয় আমার মনে আছে বইকী! বছর পনেরো আগে সরস্বতী থিয়েটারে তাঁর কর্ণের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তারপর হঠাৎ মণি দত্তকে আর থিয়েটারে দেখা যায় না। আমি অনেক সময় ভেবেছি যে, লোকটার কী হল। অনেককে জিগ্যেসও করেছি—কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাইনি। কী আশ্চর্য, সেই মণি দত্তই এই গোবিন্দ চাটুয্যে! ...কিন্তু ...মণি দত্ত তো চমৎকার সুপুরুষ ছিলেন!'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান আমার দাদা দেখতে খারাপ ছিলেন?'

'মুখ-ভরা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, একটা চোখ কানা, কপালে মস্ত আঁচিল—এ চেহারাকে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না।'

ভুজঙ্গধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী জানি পরে হয়তো তিনি ওইরকম দেখতে হয়েছিলেন। আমরা তো তাঁকে ওরকম দেখিনি। হয়তো চোখের কোনও অসুখ করেছিল। দাঁড়ি-গোঁফ ইচ্ছে করেই রেখেছিলেন—এ-মানুষ যে সেই মানুষ সে-কথা নিজেও যেন ভুলে থাকতে পারেন।'

'এই দশ বছরের মধ্যে আপনি কি তাঁকে একবারও দ্যাখেননি?'

'না।'

'তাঁর এখানকার খরচ কী করে চলত অনুমান করতে পারেন?'

'কী করে বলব! হয়তো নিজের কিছু টাকা ছিল, সেটা নিয়ে এসেছিলেন, তাই দিয়েই চালাতেন।'

'খরচও তো ছিল তাঁর মাসে পাঁচ টাকার বেশি না, 'বললেন পশুপতি।'

ভুজঙ্গ বললেন, 'হয়তো বাধ্য হয়েই ওরকম চালে চলতে হত।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'অথচ এখানে এই ভদ্রলোক বলছেন যে, কাল সন্ধেবেলা তিনি এঁকে পাঁচশো টাকা দান করেছিলেন—বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য।'

ভুজঙ্গধর আস্তে-আস্তে বললেন, 'অসম্ভব নয়। তাঁর হাতে টাকা থাকলে তিনি অমনি করেই বিলিয়ে দিতেন, ওইরকমই তাঁর স্বভাব ছিল। আপনারা তাঁকে যত কৃপণ বলেই জানুন, আসল মানুষটা ছিলেন একেবারে উল্টো।'

সরোজ বললে, 'আমি হলফ করে বলছি এ-টাকা আপনার দাদা আমাকে দান করেছিলেন। আপনি যদি ফেরৎ চান এক্ষুনি ফেরৎ দেব, কিন্তু আমি যা বলছি তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়।'

ভুজঙ্গ বললে, 'আমি তো আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। আর আপনার টাকা আমি কেন ফেরৎ নেব? দাদাকে অনেক ঠকিয়েছি, তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় কাউকে কিছু দিয়ে থাকেন সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু আপনি যা বলছেন সে-অনুসারে তো তাঁর হাতে পাঁচশো টাকা থাকবার কথা নয়। যিনি পয়সার অভাবে অত কষ্ট করে থাকতেন, তাঁর পক্ষে অত টাকা দান করা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কেমন করে বলব? তাঁর হাতে ঠিক কত টাকা ছিল তা তো আমি জানি না, হয়তো ছিল কিছু টাকা।'

নরহরিবাবু ভুজঙ্গধরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনাদের দু-ভাইয়ের চেহারায় একটু মিল নেই। শুধু কপালের কাছটায় একটু যেন মেলে।'

পশুপতি বললেন, 'কিন্তু গলার স্বর একেবারে একরকম, তাই নয়?'

ভুজঙ্গধর ক্লান্তভাবে বললেন, 'ভাইয়ে-ভাইয়ে ওরকম হয়।'

BanglaBook.org

দশ

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, ভুজঙ্গবাবু। আপনি যেরকম সরলভাবে সমস্ত ঘটনা বললেন তা আমার সত্যি খুব ভালো লাগল। এখন চলুন, আপনার দাদাকে একবার দেখে আসবেন।'

এ-কথা শুনেই ভুজঙ্গবাবুর মুখ যেন এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল। অতি কষ্টে তিনি বললেন, 'আমার যাওয়া কি...একান্তই দরকার?'

'চলুন, একটু দেখবেন।'

'চলুন।' ভুজঙ্গবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে নরহরিবাবুর মনে হল যে, দুঃখময় হতাশার এমন মূর্তি তিনি কখনও দ্যাখেননি। ভুজঙ্গবাবুর চেহারা সত্যি ভালো; কিন্তু তাঁর নিখুঁত করে আঁচড়ানো চুল আর অমন পরিপাটি সাজসজ্জার ভিতর দিয়েও তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত, এমন দুঃখী দেখাচ্ছিল যে শুধু নরহরিবাবুর নয়, উপস্থিত অনেকেরই মৃত ব্যক্তির চাইতে এই অনুতপ্ত দোষী ভাইটির জন্য কষ্ট হচ্ছিল বেশি।

ইতিমধ্যে চাকর ভুজঙ্গবাবুর বিছানা আর স্যুটকেস ওই ঘরেই এনে রেখেছিল। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়ে ইন্সপেক্টরবাবু বলে উঠলেন, 'বাঃ! আপনার স্যুটকেশটা ভারি নতুন ধরনের তো!'

'হ্যাঁ, এটা নতুন কিনেছিলুম। আর এটাতে ভরে কী এনেছিলুম, জানেন? দাদার জন্যে কাপড়-চোপড়। এই দেখুন—' বলে ভুজঙ্গবাবু চাবি বের করে স্যুটকেস খুলে ফেললেন। ভিতরে দেখা গেল, পর-পর ভাঁজ করা অনেক কাপড়-জামা—দামি-দামি তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, গরম জামা—সবই আনকোরা নতুন। সেগুলোর উপর আস্তে একবার হাত বুলিয়ে ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'এই ক'বছরে যত পুজোর কাপড়, ষষ্ঠির কাপড় দাদার পাওয়া উচিত ছিল, সব একসঙ্গে কিনে এনেছিলুম, তা ছাড়া জামাও অনেকগুলো। ভেবেছিলুম তিনি ক্ষমা করবেন, ফিরে আসবেন। কিন্তু...।' ভুজঙ্গবাবুর কথা শেষ হতে পারল না, তাঁর গলা আটকে এল, টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল।

একটু চুপ করে থেকে রণজিৎবাবু বললেন, 'চলুন তা হলে একবার উপরে। আপনিও চলুন ম্যানেজারবাবু—আর নরহরিবাবু, আপনিও আসতে পারেন।'

উপরে যাবার সিঁড়ির কাছে হঠাৎ দেখা গেল চঞ্চলকে।

রণজিৎবাবু বললেন, 'চঞ্চল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'এখানেই তো ছিলুম।'

রণজিৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনারা এগোন, আমি আসছি।' তারপর চঞ্চলের সঙ্গে চুপিচুপি মিনিট দুয়েক কী কথা বললেন। তিনি যখন উপরে এলেন, চঞ্চলও এল তাঁর সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে দাদার বীভৎস মৃতদেহ দেখে ভুজঙ্গবাবু একেবারে আকুল হয়ে পড়লেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি, তাঁর অবস্থা দেখে নরহরিবাবুরও চোখে জল এল।

ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'অত অধীর হবেন না, ভুজঙ্গবাবু, একটু ধৈর্য ধরুন, একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন।'

কিন্তু ভুজঙ্গবাবু আরও ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। খানিক পরে অনেক চেষ্টা করে বললেন, 'আমি এখন যাই। এ-দৃশ্য আমি আর সইতে পারিনে।'

'আর একটু অপেক্ষা করুন। অন্যরকম একটা দৃশ্য দেখে যান,' বলে ইন্সপেক্টর চঞ্চলকে কী ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল যে-কাণ্ড করল তাতে নরহরি আর পশুপতি দুজনেই হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ বাধা দেওয়ার আগেই চঞ্চল মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মৃতদেহের গাল থেকে দাড়িগুলো পটপট করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল, তারপর ঘরের কোণ থেকে জলের বালতি, সাবান আর স্পঞ্জ নিয়ে এসে (এগুলি সে আগেই এনে রেখেছিল) মৃতদেহের

BanglaBook.org

মুখের উপর খুব জোরে স্পঞ্জ ঘষতে লাগল। উড়ে গেল কপালের আঁচিল, কানা চোখ ভালো হয়ে গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দাড়ি-গোঁফ-কামানো সুশ্রী একটি মুখ ফুটে উঠল, তাতে নিষ্ঠুর মৃত্যুর চিহ্ন তখনও স্পষ্ট, কিন্তু তাকে গোবিন্দ চাটুজ্যের মুখ বলে চেনবার কোনও উপায়ই আর নেই।

নরহরি আর পশুপতি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখলেন।

আর ভুজঙ্গ?

তাঁর মুখ ততক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুখের চেয়েও বীভৎস হয়ে উঠেছে। বড়-বড় চোখ যেন সমস্ত কপাল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। একবার তিনি দরজার দিকে তাকালেন—দরজা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত আগাগোড়া লাল-পাগড়িতে ভরা। আর একবার তাকালেন অন্যদিকে। ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্তর কঠোর দৃষ্টি তাঁর মুখের পর পড়ল।

ইন্সপেক্টরবাবু খুব স্পষ্ট উচ্চস্বরে বললেন, 'দেখুন আপনারা, এই আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আপনাদের চির পরিচিত গোবিন্দ চাটুয্যে; আর মেঝের উপর মরে পড়ে আছে তাঁর ভাই ভুজঙ্গধর। কাল রাত্রে গোবিন্দ চাটুয্যে তাঁর ভাইকে এই ঘরে গলা টিপে মেরে ফেলেন—গোবিন্দবাবুর সাধ্য থাকে তো এর প্রতিবাদ করুন।'

এই কথাগুলি শুনে নরহরি আর পশুপতির শরীর যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হল, আর ইন্সপেক্টরবাবু যাঁকে গোবিন্দবাবু বলে সম্বোধন করলেন তিনি কাঁপতে-কাঁপতে মেঝের উপর বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত বলতে লাগলেন ঃ

'গোবিন্দবাবু, আপনার অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিল। মেসে হঠাৎ এসে যখন ঢুকলেন তখন থেকে এ-ঘরে এসে মৃতদেহ দেখে কেঁদে ওঠা পর্যন্ত সবই অতি নিখুঁত হয়েছে। আপনি যে অতি নিপুণ অভিনেতা তা আপনি বলে না দিলেও আমরা বুঝতে পারতুম। আর আপনি যে কায়দা করে আপনার ব্যাগের টাকা আর নতুন স্যুটকেসের নতুন জামাকাপড়গুলি আমাদের দেখিয়ে দিলেন তার জন্যেও আপনাকে বাহবা দিই। আপনি ভেবেছিলেন যে, ওরকম করেই সন্দেহের হাত এড়াতে পারবেন। হয়তো পারতেন, কিন্তু তার আগেই আমি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলুম, যেটা আপনার পক্ষে মারাত্মক। প্রথম যখন আমরা এ-ঘরে আসি তখন আমি মৃতদেশের মুখে হাত দিতেই অল্প একটু রং আমার আঙুলে লেগে গিয়েছিল। আমি লক্ষই করিনি, এই চঞ্চলই সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনার মেক-আপ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা জায়গায় রংটা একটু কাঁচা ছিল। অবশ্য আঙুলে ওই একটু রঙের দাগ আমরা হয়তো গ্রাহ্য করতুম না, কিন্তু চঞ্চল কলতলায় গিয়ে দেখল, একটা ঘটির গায়েও একটু রং লেগে আছে। ঠাকুর বলেছিল, অনেক রাত্রে সে কলতলায় জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। আপনি তখন এই পৈশাচিক কর্ম সেরে হাত ধুচ্ছিলেন। তারপর আপনি ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় আলো নেবাতে ভুলে গিয়েছিলেন, দেখা গেল আলোটা অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল। এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো দিয়ে গোবিন্দ চাটুয্যের কী দরকার? আবার অত্যন্ত দামি একটি আয়নাই বা কেন? বাক্সে নাটকের বই, থিয়েটার সম্বন্ধে আলাপে উৎসাহ। এতে কী বোঝা গেল? এককালে হয়তো থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। হয়তো তিনি অভিনেতা ছিলেন। তা হলে মেক-আপের বিদ্যে নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে। যদিও আপনার রং-তুলি ইত্যাদি সরিয়েছিলেন, কিন্তু আয়নাটা ছিল, একশো পাওয়ারের আলো ছিল। গোবিন্দবাবুর চেহারাটা অতি বিকট, কিন্তু সেটা তাঁর সত্যি চেহারা তো? যেরকম রহস্যময় মানুষ, হয়তো কোনও কারণে অজ্ঞাতবাস করছেন, হয়তো ও-মুখ তাঁর মুখই নয়, মেক-আপ করা মুখোস। নকল দাড়ি পরে, নকল আঁচিল বসিয়ে, নকল কানা চোখ নিয়ে আছেন। সেইজন্য ঘরের মধ্যে কাউকে ঢুকতে

দেন না, ঠাকুর-চাকরকেও না। কখনও স্নান করেন না তাও একই কারণে। সবসময় মেক-আপ করে সেজে থাকা কষ্টকর, শুনতে অসম্ভব শোনায়, কিন্তু ওটাই তাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেমন, তা-ই নয়?'

গোবিন্দবাবু মুখ তুলে একবার তাকালেন, তারপর আবার চোখ নামালেন।

'তারপর এই খুনের ব্যাপার। আপনার ভাই আসবে এই খবর কাল পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সে কাল বিকেলেই এসে পড়েছিল, মেসের কেউ তা লক্ষ করেনি। সরোজবাবু যখন সন্ধেবেলা আপনার কাছে টাকা চাইতে যান, তখন ঘরে আপনার ভাই বসে ছিল—কেমন, তা-ই নয়? সরোজবাবু তাঁকে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনার ঘরে অন্য লোক থাকা এতই অসম্ভব যে, তিনি সেটা চোখের ভুল মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সরোজবাবুকে পাঁচশো টাকা আপনি কেন দিয়েছিলেন আপনিই জানেন। আবার তারই কয়েক ঘণ্টা পরে আপনার মায়ের পেটের ভাইয়ের বুকের উপর চড়ে বসে গলা টিপে তাকে হত্যা করলেন কেন তাও আপনিই বলতে পারবেন। মৃতদেহের মুখ ঠিক নিজের মুখের মতো করে মেক-আপ করলেন, তাকে পরালেন নিজের জামা-কাপড়, তারপর কলতলায় হাত ধুয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন। তারপর নতুন জামা-কাপড়-জুতো কিনলেন, চুল ছাঁটালেন, নতুন স্যুটকেসে নতুন কাপড় ভরে, নতুন হোল্ডলে নতুন বিছানা বেঁধে গোবিন্দবাবুর ভাই ভুজঙ্গধর সেজে এসে উঠলেন এই মেসে। ভাইয়ের আজ সকালেই আসবার কথা, সুতরাং কেউ কিছু সন্দেহ করত না। আর যারা আপনার মেক-আপ করা মূর্তি শুধু দেখেছে তাদের পক্ষে অবশ্য আপনাকে দেখে চেনা একেবারেই অসম্ভব। মৃতদেহের মেক-আপও পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ত না—দাড়িটা আসল না নকল তার বিচার করা পোস্টমর্টেমের উদ্দেশ্য নয়। আপনার সব চালই ঠিক হয়েছিল, তবু ধরা পড়ে গেলেন। নেহাৎই দৈবক্রমে, বলতে পারেন। আমার হাতে একটুখানি রং লেগে না গেলে এদিকে আমার কল্পনাই কখনও যেত না। আর, একবার যখন ওরকম একটা সন্দেহ হল তখন দেখলুম পর-পর সব মিলে যাচ্ছে—আয়না, জোরালো আলো, নাটকের বই, আপনার পরনে নতুন জামাকাপড়, আপনার অতি চমৎকার কথাবার্তা, নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি—জানেন, আপনার কথা শুনতে-শুনতে আমার ঠিক মনে হচ্ছিল নাটক দেখছি। অনেকদিন স্টেজে নামেন না বটে, কিন্তু আপনার শক্তি লোপ পায়নি, আজ যা অভিনয় করলেন আমি তো তা ভুলতে পারব না। গোবিন্দবাবুর ভাই বলে যিনি পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর যে কপালের কাছটায় গোবিন্দবাবুর সঙ্গে মিলবে আর গলার স্বর একেবারেই একরকম হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু এও ভাবতে হল যে, গোবিন্দবাবুর মুখ তো কপাল বাদ দিয়ে দাড়ি-গোঁফেই ঢাকা, অন্য কোথাও মিললেই বা বোঝা যাবে কেমন করে?

আমার যা বলবার তা তো বললুম। এখন আপনি বলুন, গোবিন্দবাবু কেন এই নৃশংস কাণ্ড করতে গেলেন।'

BanglaBook.org

এগারো

গোবিন্দ চাটুয্যের জবানবন্দি ঃ

'হাতকড়া? না, দরকার নেই। আমি পালাব না। আমি ফাঁসি যাব। বাঁচবার চেষ্টা করেছিলুম। তা যখন ব্যর্থ হল তখন আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন মরলেই বাঁচি।

'ভুজঙ্গধর সেজে আপনাদের যা বলেছিলুম তার অনেক কথাই সত্যি। আমাদের গ্রামের নাম ঠিকই মোতিঝিল। সত্যিই আমরা দু-ভাই। ভুজঙ্গ ছোট। বাবা মারা গেলেন অনেক টাকা রেখে।

সে-টাকায় আমাদের দু-ভায়েরই সমান অংশ। কিন্তু আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল, আমি ওকে ঠকিয়ে সব টাকা মেরে দিলুম। কেমন করে ঠকালুম সেসব না-ই বা শুনলেন।

'ভুজঙ্গ ছিল মিনিমুখো ভালোমানুষ। আমাকে কিছু বললে না, অভিমান করে চলে গেল আসামে চায়ের বাগানে চাকরি নিয়ে। মা-ও আমার উপর রাগ করে গেলেন ওর সঙ্গে। একা বাড়িতে বসে-বসে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, এ কী করলুম! সুখের সংসার ছারখার করে দিলুম!

'ভুজঙ্গকে চিঠি লিখলুম ফিরে আসতে। সে জবাব দিলে না। মাকে লিখলুম, তিনিও নীরব। তখন নিজের উপর ধিক্কার এল, তীব্র অনুশোচনায় হৃদয় জ্বলতে লাগল। কলকাতায় এসে কুসংসর্গে পড়ে অনেক টাকা ওড়ালুম। কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

'হ্যাঁ—আমার থিয়েটারে শখ ছিল, এককালে ছিলুম নামজাদা অভিনেতা। তা ছাড়া মেক-আপে আমার হাত খুব ভালো ছিল। টিঁকে থাকলে লন চ্যানির জুড়ি হতে পারতুম। আর-একটা শখ আমার ছিল—তাসের ব্রিজখেলা। একবার সমস্ত কলকাতার চাম্পিয়ন হয়েছিলুম, আমার জুড়ি ছিল অ্যাক্টর অমর ঘোষ।

'সেসব দিন আমার কী সুখেই কেটেছে! কিন্তু ভাইকে ঘরছাড়া করবার পর থেকে আমার মনে আর সুখ ছিল না। কোনও ভালো কাজে মন দিতে পারিনে—নিতান্ত বাজে খেয়ালে পয়সা ওড়াই। এভাবে যখন প্রায় অর্ধেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছি তখন মনে হলো আর না! আর যা আছে রেখে দেব ভুজঙ্গের জন্য; যদি কোনওদিন ও আমাকে ক্ষমা করে, যদি কোনওদিন ফিরে আসে তা হলে ওর হাতে তুলে দেব।

'পাপ করেছিলুম, এবার শুরু হল তার প্রায়শ্চিত্ত। উঃ, কী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন! মেক-আপ করে মুখটা যথাসম্ভব কুৎসিত করে উঠলুম এসে এই মেসের চারতলার চিলেকোঠায়, আমার সুন্দর মুখ আমাকে যেন সবসময় ব্যঙ্গ করত—যার অন্তর অত নোংরা, তার মুখ সুন্দর হওয়া কি উচিত? আমার বাইরের চেহারা আমার ভিতরের চেহারার মতোই ভয়াবহ হবে এই ছিল আমার পণ। আয়নায় নিজের বিকট মূর্তি দেখে খানিকটা যেমন ভালো লাগত। যতদিন প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ না হয়, এই আমার ছদ্মবেশ। এর জন্য কী কষ্টই না আমি করেছি! দশ বছরের মধ্যে একটা দিন ভালো করে নাইতে পারিনি। কারও সঙ্গে মিশতে পারিনি, কথা বলতে পারিনি, আমার অভিশপ্ত শুষ্ক জীবন নিয়ে একা পড়ে রয়েছি ওই চারতলায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল। বেঁচে মরে থাকা কাকে বলে তা বেশ ভালো করেই বুঝলুম।

'আমি, গোবিন্দ চাটুয্যে, অ্যাক্টর মণি দত্ত, একদা যে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছি, আমি অকস্মাৎ ঘোরতর কৃপণ হয়ে উঠলুম। মনে হত, একটা পয়সা বাঁচলে ভুজঙ্গের একটা পয়সা বাড়ল। গল্প নয়—সত্যি আমার মাসিক খরচ পাঁচটাকার বেশি ছিল না। টাকাগুলো সব নিজের কাছেই রাখতুম—ব্যাঙ্কে রাখতুম না, হঠাৎ মরে গেলে ভুজঙ্গ হয়তো সে টাকা আর খুঁজে পাবে না। তা ছাড়া কোনওদিন নিজে ওর হাতে সব টাকা তুলে দেব এও আমার একটা ইচ্ছে ছিল।

'একদিন ভুজঙ্গর একটা পোস্টকার্ড এল—মা মারা গেছেন। সুদ্ধ এই খবরটি—আর কিচ্ছু না। এই মেসের ঠিকানা আমিই অবশ্য ওকে জানিয়েছিলুম।

'বুঝলুম, মা আমাকে ক্ষমা না করেই চলে গেলেন। ভাইও পাষাণ। ক্রমে আমার অন্তর—মন সবই যেন বদলে যেতে লাগল। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে উঠলুম—হবই না বা কেন? এই পৃথিবীর আমি কে, এই জীবনের সঙ্গে কোনওখানে আমার একটা বন্ধন নেই। আত্মহত্যা করতে পারতুম—তা যে করিনি সুদ্ধ এই আশায় যে, হয়তো কোনওদিন আবার ভুজঙ্গর সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

'কিছুদিন আগে অত্যন্ত অনুনয় করে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম একবার আসতে। কাল

BanglaBook.org

সকালে হঠাৎ পোস্টকার্ড পেলুম, সে সত্যি-সত্যি আসছে। মন আনন্দে নেচে উঠল। এতদিনের অভিমান তা হলে ভাঙল। কালকের দিনটা যে কী রকম একটা অধীর আগ্রহে কাটিয়েছি তা কাউকে বোঝাতে পারব না।

'আজ সকালে আসবার কথা, হঠাৎ কাল সন্ধ্যার একটু আগেই সে এসে হাজির। মুগ্ধ চোখে তার দিকে রইলুম চেয়ে। সে আমাকে দেখে বললে, "দাদা, তুমি ওরকম চেহারা করেছ কেন?" আমি বললুম, "তোর জন্যে।"

'একটু পরেই সরোজবাবু গেলেন আমার কাছে টাকা চাইতে। দিয়ে দিলুম তাঁকে পাঁচশো টাকা। মনে-মনে বললুম, "ওরে গোবিন্দ, আজ থেকেই তোর নবজীবন শুরু হোক। কাল থেকেই তো তুই মুক্ত। কাল থেকে তুই আবার মানুষ, আবার জীবন্ত। সমস্ত পাপের বোঝা এবার নামিয়ে দেব। ভুজঙ্গকে সব টাকা গছিয়ে দিয়ে আমি আমার পথ ধরব, যে পথ মুক্তির, যে পথ আনন্দের।"

'ভুজঙ্গ অনেক ভালো-ভালো খাবার নিয়ে এসেছিল। ও তা-ই খেল। আমি মেসের খাবারই খেলুম। অনেকদিন ভালো খেয়ে অভ্যেস নেই, হয়তো হঠাৎ সইবে না, এই মনে করে ভুজঙ্গের অনেক পীড়পীড়ি সত্ত্বেও ও যা এনেছিল তার কিছুই খেলুম না, খাওয়ার পর আলো নিবিয়ে ওকে আমার প্রাণের সব কথা খুলে বললুম। ও বললে, "দাদা, কালই আমি চলে যাব, তুমিও যাবে তো আমার সঙ্গে?" আমি বললুম, "পাগল। আমি কাল, থেকে মুক্ত। আর আমি তোদের জড়াব না, তোরাও আমাকে আর জড়াসনে।" তবু সে বার-বার বলতে লাগল, "না, দাদা, তোমাকেও যেতে হবে। তুমি আমার কাছেই থাকবে এখন থেকে।" আমি হেসে বললুম—কতকাল পরে যে একটু হাসলুম,—"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।"

'ওই ছোট্ট ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে দুজনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়লুম। ও বিছানা আনেনি, আমার বিছানা ওকে দিলুম, আমি পড়ে রইলুম মাদুরে। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি ভুজঙ্গ অঘোর ঘুমে গভীর নিশ্বাস ফেলছে। মনে-মনে বলতে লাগলুম—কাল থেকে আমার নতুন জন্ম, কাল থেকে আমার নতুন জন্ম! আহা, যদি একেবারে নতুন হতে পারতুম, একেবারে নতুন হয়ে জন্মাতে পারতুম! এমন যদি হত যে গোবিন্দ চাটুয্যে বলে কেউ আর রইল না, অথচ আমি রইলুম, তা হলে কী চমৎকারই হত! ওই তো ভুজঙ্গ কেমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি যদি ভুজঙ্গ হতে পারতুম—যে কখনও কোনও অন্যায় করেনি, যার মনে কোনও পাপ নেই! তা কি সম্ভব হয় না? কোনওরকমেই সম্ভব হয় না?

'কথাটা ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল, আমি মাদুরের উপর উঠে বসলুম। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল। এর চেয়ে সহজ কিছুই নয়। মা মারা গেছেন, ভুজঙ্গ বিয়েও করেনি, আমাদের নিকট কোনও আত্মীয়ও আর নেই—কে জানবে যে, আমি ভুজঙ্গ নই! কে জানবে? কেউ না। এ আমার একরকম আত্মহত্যা—অদ্ভুত আত্মহত্যা বলতে পারেন। গোবিন্দ চাটুয্যেকে আমি হত্যা করব, তার নাম মুছে দেব জগৎ থেকে—কাল থেকে আমি, ভুজঙ্গধর চাটুয্যে, নির্মল নিষ্পাপ মুক্ত জীবনের অধিকারী হব। আনন্দে, উত্তেজনায়, নিষ্ঠুর সংকল্পে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

'তবু আমি অনেকক্ষণ ঘুমন্ত ভুজঙ্গের পাশে চুপ করে বসে রইলুম। হঠাৎ ঢং-ঢং করে কোথায় দুটো বাজল, সেই শব্দে চমকে উঠলুম। না—আর তো দেরি করা চলে না—রাত যে ফুরিয়ে এল। তখন আমি আস্তে-আস্তে উঠে ভুজঙ্গর বুকের উপর চেপে বসলুম। ঘুমের মধ্যে সে গোঁ-গোঁ করে উঠল। তারপর দু-হাতে তার গলা টিপে ধরলুম শক্ত করে। আমার গায়ে যত শক্তি আছে সব নেমে এসে ভর করল আমার দশটি আঙুলে। বড়-বড় বিকট চোখ মেলে সে তাকাল— সে কি ওই অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পেরেছিল? পেরেছিল নিশ্চয়ই। তখন তার মুখে যন্ত্রণায়, আতঙ্কে, ঘৃণায়, অভিযোগে মেশা যে ভীষণ ভাব ফুটে উঠেছিল তা আমি নরকে গিয়েও ভুলব না।

BanglaBook.org

'অনেকক্ষণ সে গোঁ-গোঁ করল, ধস্তাধস্তি করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমার দশটি আঙুলের একটিও মুহূর্তের জন্য শিথিল হল না। তারপর আস্তে-আস্তে তার ছটফটানি কমে এল—খানিক পরে হঠাৎ একটা গভীর ভীষণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল—তারপর চুপ।

'তখন আমি উঠে আলো জ্বালালুম। এতদিন নিজের মুখ যা দিয়ে কুৎসিত করে রেখেছি, সেই সব দিয়ে সাজালুম ওর মুখ। সেই দাড়ি, সেই আঁচিল, সেই কানা চোখ, সেই লম্বা-লম্বা আলুথালু চুল। কাজটি শেষ করতে পুরো একটি ঘণ্টা লাগল। নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা হল ওর মুখ—গোবিন্দ চাটুয্যের মুখ—কোনওখানে খুঁত নেই। তারপর আমার এই হেঁটো ধুতি আর খাটো পাঞ্জাবি ওকে পরালুম—আমি পরলুম ওর জামাকাপড়।

'মৃত গোবিন্দ চাটুয্যে পড়ে রইল ঘরে জীবন্ত ভুজঙ্গধর নিচে নেমে এসে কলতলায় হাত মুখ ধুল, তারপর রাস্তায়। ওকে রেখে এলুম মেঝেতে শুইয়ে যতদূর সম্ভব বীভৎস ভঙ্গিতে. বিছানাটা এক কোণে গুটিয়ে রাখলুম, তার মধ্যে রইল আমার এতদিনের অদ্ভুত প্রসাধনের সঙ্গী দামি আয়নাটি। মুখের ওপর ছবি আঁকার কাজ রাত্তিরেই করতে হত, তাই আলোটা ছিল খুব জোরালো—সেটা নেবাতে ভুলে গিয়েছিলুম, এখন মনে পড়ছে।

'আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ, আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ। কী আরাম, কী শান্তি!

'আমার রং-তুলির পুঁটলিটা হাতে করে নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খানিকটা এসে সেটা ফেলে দিলুম একটা ডাস্টবিনে। বলতে ভুলেছি—টাকা-পয়সা সব সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম। ও-টাকা তো ভুজঙ্গর, আমিই তো ভুজঙ্গ। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে রাত কাটিয়ে দিলুম। ভোর হল, লোকজনের চলাচল শুরু হল। কাছাকাছি একটা ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলুম। ডিম-রুটি দিয়ে চা খেলুম ভদ্রলোকের মতো। কতদিন পরে মানুষের মতো খাওয়া জুটল। তারপর বেরিয়ে রাশিরাশি, জামা-কাপড়, গরম জামা, শাল, বিছানা, বালিশ, হোল্ডল, স্যুটকেস সব কিনলুম। আর তো আমি হাড়কিপটে গোবিন্দ চাটুয্যে নই—আমি ভুজঙ্গধর, আমি মানুষ, এখন থেকে মানুষের মতো বাঁচব। নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল ছাঁটালুম, দাড়ি কামালুম। হোটেলে ফিরে এসে গরম জলে ভালো করে স্নান করলুম—দশ বছর পরে এই আমার প্রথম স্নান, জলের স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। আহা—যে-কোনও অভাজন যেসব সুখ থেকে বঞ্চিত নয়, আমি তা থেকে বঞ্চিত ছিলুম কোন প্রাণে! কিন্তু আর না— আর না— গোবিন্দ চাটুয্যে মরে গেছে, আমি ভুজঙ্গধর, আজ থেকে আমার মানুষের মতো জীবন-যাপন, জিনিসপত্র নিয়ে একটা রিকশ করে গেলুম শেয়ালদা স্টেশনে, সেখান থেকে আর-একটা রিকশ নিয়ে এই মেসে।

'এখানে আবার না এলেই হত, স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি ধরে যে-কোনও জায়গায় চলে গেলেই হত। কিন্তু এলুম কেন জানেন? আমি যে গোবিন্দ চাটুয্যে নই, আমি যে ভুজঙ্গধর, সেটা নিজের কাছে এবং সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে। আজ সকালে এই মেসে ভুজঙ্গর আসবার কথা। সে এল। সুন্দর চেহারা তার, চমৎকার ভদ্রলোক সে, পরিপাটি ফিটফাট তার সাজসজ্জা। তারপর তো আপনারা জানেন।

'ইন্সপেক্টরবাবু, আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ, আপনারা আমাকে দয়া করে দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না। আর বিচারের ব্যাপারটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে করবেন। যদি আজই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারতুম, তা হলে খুশি হতুম। বাঁচবার শেষ চেষ্টা করলুম, তা ব্যর্থ হল, এখন আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন আমি মরলেই বাঁচি।... আচ্ছা ইন্সপেক্টরবাবু, ফাঁসিতে খুব কি লাগে?'

BanglaBook.org

হায়নার দাঁত

BanglaBook.org

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এক

জীবনে ছোট-ছোট তুচ্ছ ঘটনা দিয়েই বৃহৎ নাটকের শুরু হয়। মনীষীরা বলেন, একটি সুতোকে কেন্দ্র করে যেমন মিছরির কুঁদো দানা বাঁধে, নাটকও তেমনি একটি প্রধান ভাবকেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির রেখে অল্পে-অল্পে দানা বেঁধে উঠবে। সেই কেন্দ্রটি বা সুতোটি থাকে নাট্যকারের হাতে। জীবনেও তাই। তফাতের মধ্যে, এর সুতোটা ধরে থাকেন ভগবান বা অদৃষ্টদেবতা—যা-ই বলুন না কেন, বিরাট একটা শক্তি—তাই, সে-নাটক আরও জমাট হয়ে ওঠে।

এমনটা আর কার জীবনে কতটা হয় কে জানে, নলিনাক্ষর জীবনে অন্তত বারবারই ঘটছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, সামান্য দু-একটা কথার টুকরো দিয়েই শুরু। কিন্তু তারপর? কী বিপজ্জনক নাটকই না অভিনীত হতে থাকে!

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে ওর।

দুপুরবেলা আপিস যাচ্ছিল। দুটোয় পৌঁছবার কথা, আড়াইটেয় পৌঁছলেও দোষ নেই। খবরের কাগজটা বড় ঠিকই, তবে তার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডর সঙ্গে ওর কোনও যোগ নেই। অর্থাৎ খবর অনুবাদ করতে হয় না। এমনিতেই কাজ কম, পৃষ্ঠাসংখ্যা কমেছে অনেক, যা আছে তারও সবটাই মূল্যবান বিজ্ঞাপনে ভরে যায়; অসার সংবাদ দিয়ে ভরাতে হয় না। নলিনের কাজ কলম লেখা—এখন সম্প্রতি একটু প্রমোশন পেয়েছে। এক-আধদিন সম্পাদকীয় লেখারও ভার পড়ে। দমকা এক-আধটা ফিচার লেখার হুকুম হয়—'বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া' কিংবা 'মৃতপ্রায় কাঁসার বাসনশিল্প'—এই ধরনের। তেমন দরকার পড়লে, বড়জোর 'কভারেজ' যাকে বলে সে ভারও নিতে হয়। তবে সেরকম দরকার মোট আড়াই পৃষ্ঠায় আর কত বা কতবার পড়ছে! তাই বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কোন কর্মচারী কখন যাচ্ছে না যাচ্ছে তা নিয়ে কর্তারা মাথা ঘামান না।

গ্রীষ্মের কামড় বেশ চেপে বসেছে কলকাতায়। বাতাসে আগুনের হলকা। রাস্তারও পিচে আর পাথরে খর রোদ পড়ে তার তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে চারদিকে, সে-তাপ এই বাস পর্যন্ত এসে আরোহীদের মুখ-চোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাস-এ বসে যেন আরও চিংড়িমাছ-ভাজা অবস্থা। এক-একবার নলিনাক্ষর মনে হচ্ছে, নেমে বাকি পথটুকু হেঁটেই যায়—কিন্তু পথচারীদের মুখ-চোখের অবস্থা ও ঘামে-ভেজা জামা দেখে সাহস হচ্ছে না।

রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে, হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটা। সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়, দু-দিকের ট্রাফিককেই এখানে অন্তত মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে হয়। গরমে এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই অসহ্য, আরও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু উপায়ই বা কী। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যেই বেশি করে পথের দিকে মন দিয়েছিল নলিনাক্ষ। তাইতেই চোখে পড়ল—একটা খোঁড়া ছেলে এই দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি-লরির ফাঁকে-ফাঁকে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। বছর তেরো-চোদ্দো বয়েস হবে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। এই বয়েসেই কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই যেন। খোঁড়া বললেও ঠিক বলা হয় না। একটা পা গোড়া থেকেই কাটা। তার ওপর ক্রাচও জোটেনি বেচারার। একটা লাঠির মতো জিনিসের ওপর ভর দিয়েই কতকটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছে। আর-একটু কাছে এলে দেখল, শুধু পা-ই নয়, ডান হাতের তিনটে আঙুলও কাটা। বাকি দুটো আঙুলে একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি আটকে ধরে ভিক্ষে করছে।

ভারি মায়া হল নলিনাক্ষর। কালো—মানে কুচকুচে সাঁওতালী রঙ নয়, শ্যামবর্ণ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই। কিন্তু কালো রঙেও সুন্দর হতে বাধে না; আমাদের দেশের মহাকবিরা ও পুরাণকাররা তা জানতেন, তাই আমাদের দুই মহানায়ক—সৌন্দর্যের প্রতীক রাম ও কৃষ্ণ—দুজনেই কালো। এরও

BanglaBook.org

মুখখানি ভারি সুন্দর, লাবণ্যে ভরা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, বড় টানা-টানা দুটি চোখ, টিকলো নাক, সাজানো সাদা দাঁত (এই শ্রেণীর ভিখিরিদের এই বয়েসেই বিড়ি খেয়ে দাঁতে ছোপ ধরে, এর তা ধরেনি)—এমনকী দুটি ঠোঁটের গঠনও ভারি সুঠাম। ভদ্রঘরের ছেলে হলে বহু মেয়ের মনে আগুন জ্বালাত।

কে জানে কাদের ছেলে। কী করে এমন দুর্গতিই বা হল! এর কি আর কেউ নেই যে একে দেখে!

অবশ্য ওই মুখখানা ছাড়া আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন আর পাঁচটা হয়—মার্কামারা ভিখিরি। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, একটা ছেঁড়া তালি-দেওয়া হাফ-প্যান্ট—ওর অনুপাতে অনেক বেঁটে ভাঙা লাঠি একটা। বস্তুত, লাঠিটা কোনও কাজেই আসছে না—ওই এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়েই চলছে। চারিদিকের দৈত্যাকার বাস-ট্রাম-গাড়ির ফাঁক দিয়ে এইভাবে চলা। কোনওদিন মরবে ছেলেটা! কষ্টই কি কম হচ্ছে, এই গরমে এইভাবে লাফিয়ে চলা—দরদর করে ঘামছে, মনে হচ্ছে কে বালতি করে জল ঢেলে দিয়েছে সর্বাঙ্গে—

কাছে আসতে হাতে যা উঠল দিয়ে দিল নলিনাক্ষ। বোধহয় সিকি-আধুলি কিছু ছিল। ছেলেটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বাটি সুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকাল। তবে তার দাঁড়াবার সময় নেই তখন, এদিকে সবুজ বাতি জ্বলায় সব গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু করে দিয়েছে; তাদেরও, আর অপেক্ষা করা কিংবা ওইসব ভিখিরিরা ঠিকমতো রাস্তা পার হতে পারছে কি না সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ভিখিরিও অসংখ্য, আর ওই চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাদের জীবিকা উপার্জন করতে হবে। ছেলেটাও ওই গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে, আশ্চর্য কৌশলে চাপা পড়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে ওইভাবেই লাফাতে-লাফাতে চলে গেল। নলিনাক্ষই বরং যেন নিশ্বাস রোধ করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল—ছেলেটা নিরাপদে পার হতে পারে কি না।

ভয়টা একেবারে অমূলকও নয়। ওদিকের একটা বাস থেকে কে একজন পাঁচ নয়ার মতো—তিনও হতে পারে, এতদূর থেকে ঠিক দেখা সম্ভব নয়—ছুঁড়ল, বাটিতে না পড়ে সেটা পড়ল রাস্তায়। একটা ঠোঁটকাটা গন্নাখ্যাঁদা ভিখিরি তীরবেগে সেটা লক্ষ করে আসছে, ছেলেটাও পয়সা ছাড়তে রাজি নয়। সে তারমধ্যেই লাঠিটা ফেলে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই গিয়ে বাঁ-হাতে পয়সাটা তুলে নিল। পিছন থেকে যে মিনিবাসটা আসছিল সে কোনওমতে বেঁকে গিয়ে ওকে বাঁচাল বটে কিন্তু লাঠিটা বোধহয় বাঁচল না। মড়মড় করে আওয়াজ হল—ভেঙেই গেল খুব সম্ভব।

সেই এক মুহূর্তের 'টেনশ্যন' যাকে বলে—তারই জের হিসেবে বহুক্ষণ পর্যন্ত বুক ঢিবঢিব করতে লাগল নলিনাক্ষর।

আপিসে এসেও ছেলেটার মুখ আর ওই কষ্টের, প্রাণসংশয়-করা উপার্জনের কথা ভুলতে পারল না নলিনাক্ষ। বরং নিজের নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘরে বসে—সারা তেতলাটাই ওদের 'বাতানুকূলিত', ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক—কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল ওর কথাটা মনে হয়ে।

কাজ কিছু ছিল না, মানে টেবিলে কোনও নির্দেশ ছিল না। কাজে মন দিলে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে যাবে ভেবে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ, সহযোগী সম্পাদক জয়ন্তবাবুই কাজ বিলি করেন, তাঁর সন্ধানে। তিনি হেসে সুসংবাদ দিলেন—'কাজ কিস্সু নেই, সময়টা কাটিয়ে চলে যান, আর কী! ছ'পাতার কাগজ, সাড়ে তিনপাতা বিজ্ঞাপন। থাকে আড়াইপাতা, অন্তত দুটো পাতা নিউজ না দিলে লোকে গাল দেবে যে। ...চা খাবেন?'

তাঁর ঘর থেকে ফেরার পথেই নিউজের হলটা পড়ে। সেখানেও তখন কাজ কম, নিউজ আসতে থাকে সন্ধ্যার পর থেকে, তাই সবাই এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। নলিনাক্ষর তখনই

BanglaBook.org

নিজের ঘরে যেতে ভালো লাগল না, সেও এসে সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিন্তু বসতে-বসতেই চোখে পড়ল ধীরেনের টেবিলে একখানা ছবি পড়ে, ছবি আর বিজ্ঞাপনের 'ম্যাটার' একটু। ওরই কে পরিচিত লোক বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে, টাকা আর 'ম্যাটার' ধীরেন বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাচ্ছে—চিঠি দিয়ে।

অলস কৌতূহলেই ছবিটা তুলে নিল নলিনাক্ষ। সাত বছরের একটি মেয়ে হারিয়েছে, তার বাবা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ভারি সুন্দর ফুটফুটে দেখতে মেয়েটি, দেখলেই কেমন মমতা হয়। খবরের কাগজের ছাপায় অবশ্য এর কিছুই বোঝা যাবে না—কিন্তু ওর ভারি মন-কেমন করতে লাগল। আহা, যাদের মেয়ে তাদের না জানি কী অবস্থায় দিন কাটছে, এই মেয়ে হারিয়ে!

ওর মুখ দেখেই বোধকরি মনের ভাবটা বুঝতে পারল ধীরেন, বলল, 'ভারি মিষ্টি মেয়েটি, না? ...কী যে হয়েছে আজকাল, দেখেছ পরপর কতগুলো নিরুদ্দেশ খবর বেরোল? আর এই এক এজগ্রুপ—ছ-সাত থেকে দশ-বারো। ছেলে মেয়ে দুই-ই। আশ্চর্য, এত হারায় কী করে।'

ভবেশ বলে উঠল, 'কী করে আবার! আজকালকার ইরেসপনসিবল মা-বাপ। বিশেষ করে মায়েরা। বেরুবে তো একেবারে বেহুঁশ—বিশেষ যদি বাজার করতে বেরোল তো কথাই নেই। শুধু যে শাড়ি কিনতে গেলেই পাগল হয় তাও নয় মশাই, আমি দেখেছি—যে কোনও জিনিস কিনতে গেলেই ওইরকম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়াও চাই—অথচ সেদিকে নজর রেখে বাজার করবে সে ক্যালিবার নেই।'

নলিনাক্ষ বলল, 'আচ্ছা, পুলিশ কিছু করতে পারে না! মিসিং স্কোয়াড তো খুব ভালো কাজ করে শুনেছি—।'

'সে তো একটু বড়, যারা পালায় তাদের ধরে,' ভবেশ বলল, 'এ হারানো, আর এইটুকু বাচ্চা। তাও ধরে বইকী। ...সেই মনে আছে, একটা বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে চোরাই হীরে পাচার করছিল—? সেটা খুব ধরেছিল কিন্তু।...এমনি তো বাচ্চাদের ধরার কোনও প্রশ্ন নেই, হারিয়ে যায় যারা—পথে-ঘাটে কেউ দেখল তো থানায় জমা দিয়ে গেল। তা করে, দুধ খাওয়ায়, ভাত খাওয়ায়, অনেক সময় অফিসাররা। বাড়ি নিয়ে যায়, একটা কেস তো জানি, থানার সিপাইরা চাঁদা করে মানুষ করছে।'

'সে তো দুগ্ধপোষ্য, দু-তিন বছরের ছেলেমেয়ে। এই এজগ্রুপের কেউ থানায় গেছে দেখেছেন? কই, আমার তো তেমন কোনও খবর চোখে পড়েনি।' ধীরেন উত্তর দিল।

সত্তবাবু এতক্ষণ ওদিকে বসে কাগজ পড়ছিলেন, এখন নাকটা একবার জোরে রগড়ে নিয়ে (এটা ওঁর মুদ্রাদোষ) যেন হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, এই যে সব এত বিজ্ঞাপন দেয়—এতে কি কোনও কাজ হয়? খুঁজে পায় কেউ? সে-খবর তো কেউ দেয় না আর! অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ! তুমিও যেমন। আবার এত পয়সা খরচ করে সে-কথা জানাতে যাচ্ছে—ওগো, তোমরা সব শোনো, বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খুব কাজ হয়েছে—আমি বাচ্চাকে খুঁজে পেয়েছি। কার উদ্বেগ দূর করার জন্যে করবে বলো! এত কার মাথাব্যথা। যা রেট হয়েছে তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের। কুনাল দত্ত তো আর মুফতে ছাপবে না!'

কে একজন ওদিক থেকে বলে উঠল, 'রেট এইরকম না হলে তোমাদের মতো গবেটদের এত মাইনে দিয়ে পুষত কী করে? মাইনের রেটটাও মনে করো। এখন নিউজ ট্রান্সলেট করা সাব-এডিটররা যা পাচ্ছে—শুনলে সেকালের নামকরা এডিটর—পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যের মতো ভেটারানরাও পাগল হয়ে যেত।'

নলিনাক্ষ আর সেখানে বসল না। তার মনের খাতায় সেই আঙুল-কাটা পা-কাটা ছেলেটার ছবি তো উঠেইছিল, তার পাশে এই মেয়েটার ছবিও যোগ হল। কী যেন নাম? পূর্ণিমা সমাদ্দার। বেচারি! ...আবারও ওই কথাটা মনে হল। অমন সন্তান হারিয়ে গেল—ওর বাবা-মার কী অবস্থা! গলা দিয়ে কি এরপর ভাত নামছে?

BanglaBook.org

দুই

বাড়ি ফিরে রাত্রে খেতে বসেছে—অন্যমনস্ক হয়েই খাচ্ছিল, কানে গেল বউদি বলছেন, 'আচ্ছা, আমাদের এই সামনের বাড়ির মিস্টার চাকলাদার—এত পয়সা পায় কোথায় বলতে পারো?'

অন্যমনস্কভাবেই নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'কেন? এত পয়সা দেখলে কী করে? খুব কি খাওয়াচ্ছে তোমাদের?'

'আহা! আমাদের খাওয়াতেই বুঝি অনেক খরচ হয়? কথার ছিরি দ্যাখো। আমি দেখব কী, তোমাদের চোখ নেই? ওই ঢাউস গাড়ি কিনেছে কোন কন্‌সালেটের, ছিয়াত্তর হাজার টাকা না কি দাম, জানি নে বাপু—বউ তো বলে বেড়ায়। তাতেও কুলোয় না, স্ত্রীর, ছেলেমেয়েদের সব আলাদা গাড়ি। স্ত্রীর গাড়িও অস্টিন কেম্ব্রিজ, পুরো এয়ার-কন্ডিশান করা। ...আর খাওয়ানোর ব্যাপারই বা কম কী! এই তো ছোট মেয়ে অঞ্জুর জন্মদিনে কেটারার ডেকে পাঁচশো লোক খাওয়ালে! ওই ডিশ, কোন না ষোলো টাকা করে নিয়েছে ওরা। তা ছাড়াও ধরো দই-মিষ্টি আছে। নাতনীর পুতুলের বিয়ে হল—সানাই বাজিয়ে যজ্ঞি করে। এতখানি বয়সে শুনিনি তখনও! ...এই তো জানলা থেকে দেখতে পাই, যখনই পকেট থেকে টাকা বার করে—গোছা-গোছা একশো টাকার নোট বেরিয়ে আসে!'

বউদি বেশ শব্দ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন। আবারও একটু পরে বলেন, 'আচ্ছা, লোকটা করে কী? কই সে-কথা তো কখনও শুনিনি—?'

'কে জানে!' নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'আমি কী করে জানব! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার দরকারই বা কী? করে একটা কিছু নিশ্চয়—ব্যবসা-ট্যবসা। চাকরিতে অত পয়সা হয় না।'

সত্যিই, কথাটা কিন্তু এতদিন ওর মাথায় যায়নি। কী করে—কীসের ব্যবসা যে, এত পয়সা? প্রায়ই তো বাইরে যায় দেখা গেছে। এই তো কিছুদিন আগেই সবাইকে নিয়ে সিমলে গিছল! এখান থেকে প্লেনে চণ্ডীগড় গিছল, সঙ্গে তিন-চারটে ঝি-চাকর সুদ্ধ। সে-খবরটা অবশ্য ওকে মিঃ চাকলাদারই দিয়েছেন, সেইসঙ্গে জ্ঞানও দিয়েছেন একটু, 'না মশাই, মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি আমি বুঝি না। আফটার অল, এভরিথিং কনসিডারড অ্যান্ড রেকনড—প্লেনেই সস্তা পড়ে। তিনদিন ধরে গাড়িতে গেলে এতগুলো লোকের খাওয়ার খরচাই কত পড়ত! তা ছাড়া শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যেত কতখানি ভাবুন তো! তা ছাড়া, আফটার অল, আমাদের সময়ের তো মূল্য আছে! বেকার কি লোফার তো নই!'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েই যেন নলিনাক্ষ বলে, 'কে জানে, বোধহয় ফাটকা-টাটকা খেলে। শেয়ার মার্কেট ছাড়া অত পয়সা কীসে হবে?'

বউদি ধিক্কার দেন, 'কে জানে আর কে জানে! অতবড় খবরের কাগজে কাজ করছ—এই খবরটুকু বার করতে পারো না?'

নলিনাক্ষ উত্তর দেয়, 'কে কী দিয়ে ভাত খাচ্ছে, কে ফাটকা কি রেস খেলে টাকা রোজগার করছে—এইসব খবর খুঁজে বার করাই বুঝি খবরের কাগজের কাজ! এমন তো লাখ-লাখ লোক রোজগার করে। কাগজের কী এত গরজ সে-খবর বার করা! খবর আসে যেটা সেটা ছাপা হয়। ...আর আমি তো কলম লিখি, রিপোর্টার তো নই, নইলে না-হয় একদিন ইন্টারভিউ নিতাম একটা! আর, আফটার অল—আমার গরজই বা কী?'

মিঃ চাকলাদারের কথাটা মনে করেই 'আফটার অল' বলে নলিনাক্ষ, ওই শব্দটা না বলে উনি থাকতে পারেন না।

বলে নিঃশব্দে খানিকটা হেসে নেয়—কথাটা মনে পড়ে।

BanglaBook.org

আপিসে যাতায়াতের পথে ওইখানটায় এসে প্রায়ই চেয়ে-চেয়ে দেখে নলিনাক্ষ। ছেলেটাকেই খোঁজে। কিন্তু এরপর বেশ ক'দিন আর দেখতে পেল না। বোধহয় জায়গা বদলে-বদলে ভিক্ষে করে, হয়তো এখানে চেষ্টা করে দেখেছে—প্রতিযোগিতা বেশি। হয়তো আর এদিকে আসবেই না। ...না দেখতে পেয়ে একটু যেন হতাশই হয়। ছেলেটাকে ওর দেখতেই ইচ্ছে করে—এমনি শুধুমাত্র কৌতূহল নয়।

দেখা মিলল একেবারে দিন সাতেক পরে। সেদিনটাও তেমনি অসহ্য গরম। তেমনি কেন—আরও বেশি। বেরোবার আগেই খবর পেয়েছে—১১০° উঠেছে, আগেকার হিসেবে। বেলা দেড়টা তখন। তাপটাও সেই সময়ই সবচেয়ে বেশি। ফলে রাস্তা কলকাতার হিসেবে জনবিরল। গাড়িতে-বাসে বসেও যেন খাবি খাচ্ছে লোক—রাস্তায় পিচ গলে তলতল করছে, গাড়ির চাকা আটকে আটকে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালারা যা হোক করে জুগো জোগাড় করে পরে নিয়েছে বেশিরভাগ, যে যা পেরেছে। একজন তো—লক্ষ করে দেখল নলিনাক্ষ, একজোড়া ছেঁড়া কেডস বোধহয় কুড়িয়ে পেয়েছে কোথাও থেকে, তার পায়ের চেয়ে অনেক বড়—সে দড়ি দিয়ে সে-দুটো পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে—পাছে খুলে-খুলে যায়—এত কাণ্ড করেছে ওই জন্যেই—তবু কোনওমতে পায়ের তলাটা তো বাঁচবে।

এরই মধ্যে চোখে পড়ল ছেলেটা।

সেই জ্বলন্ত আঙরার মতো রাস্তায় খালি পায়ে তেমনি লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে, আজ লাঠিও নেই একগাছা, এক পায়েই—যাকে ইংরিজিতে 'হপ' করা বলে—সেইভাবে চলছে। গলা পিচ লেগে পায়ের তলাটা জুতোর মতো হয়ে গেছে, তবু তাতে যে গরমটা লাগছে না তা নয়। সেদিনের মতোই দরদর করে ঘামছে। চুলগুলো রুক্ষ, নইলে মনে হত চান করে এসেছে কোথা থেকে। ছেঁড়া জিনের হাফ-প্যান্টটাও ভিজে উঠেছে; আজ গায়ে গেঞ্জি নেই, তার বদলে একটা ছেঁড়া ঝলঝলে জামা গায়ে—সেটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

ভারি মায়া হল নলিনাক্ষর। বাসটা দাঁড়িয়েই ছিল, এখন সিগন্যাল পেয়ে স্টার্ট দিতেই চট করে নেমে পড়ল। কোনওমতে তিন-চারটে গাড়ির ফাঁক দিয়ে গলে পশ্চিম দিকের পেভমেন্টে উঠে, ওরই মধ্যে একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে ইশারা করে ডাকল ছেলেটাকে।

সাগ্রহেই ছুটে এল ছেলেটা। নলিনাক্ষর আগে মনে হয়েছিল একটা পুরো টাকাই দেবে ওকে অবাক করে দিয়ে, বলবে, এই রোদে আর ভিক্ষে করতে হবে না, ঘণ্টাখানেক কোনও গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাকো। কিন্তু পকেটে হাত দিতে গিয়েও দিল না। চোখে পড়ল একটা আইসক্রিমের ঠেলাগাড়ি। কী ভেবে বলল, 'এই, আইসক্রিম খাবি?'

ছেলেটার সুন্দর চোখ দুটো লোভে জ্বলে উঠল। সেইসঙ্গে একটু অবিশ্বাসের ছায়াও যেন ফুটে উঠল—তার পাশাপাশি। তবে তারমধ্যেই প্রবল ঘাড় নাড়ল—খাবে।

আইসক্রিমওলাটাকে ডেকে স্টিক নয়, একটা কাপই দিতে বলল। কিন্তু প্রস্তুত সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল, এই গরম, এত ঘামের মধ্যে আইসক্রিম খাওয়া কি ঠিক হবে? যদি সর্দিগর্মি হয়ে যায়? গরিবের ছেলে ভিক্ষে করে খেতে হয়—জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে একফোঁটা ওষুধও জুটবে না তো। খেতেই বা দেবে কে? ছেলেটা বোধহয় ওর মুখের সেই ভাবান্তর, সেই সামান্য ইতস্তত ভাবটাও লক্ষ করেছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, আমার কিছু হবে না। এই তো—এই অবস্থায় গিয়ে ঠাণ্ডা জল খেয়ে এলুম এক জায়গা থেকে—'

নলিনাক্ষ দাম চুকিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী খোকা?'

'নাম!' একটু যেন ভুরু কোঁচকাল একবার। তারপর বলল, 'আপনি তো হিন্দু, না? আমার নাম প্রফুল্ল। আসলে আমাকে ডাকে কেলো বলে।'

'তা হিন্দু কি না জিগ্যেস করলে কেন?' নলিনাক্ষর কৌতূহল বেড়ে গেল।

'না, আমাকে বলে দিয়েছে, মুসলমান কেউ জিগ্যেস করলে হামিদ নাম বলতে। তা হলে তারা ভিক্ষে বেশি দেবে।'

BanglaBook.org

'কে এসব বলে দেয়? তুমি থাকো কোথায়? কে আছে তোমার?'

এবার স্পষ্টই বোঝা গেল ওর বিপন্ন ভয়ার্ত ভাবটা। মুখ শুকিয়ে উঠেছে, হাতের মধ্যে অতবড় আইসক্রিমের কাপটা থাকা সত্ত্বেও।

বললে, 'থাকি? ওই বেনেপুকুরের কাছে একটা বস্তিতে।'

'তা তোমার এমন হল কী করে?'

'অ্যাকসিডেন্ট।' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা। সাবধানেই উচ্চারণ করল শব্দটা। যেন কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। মনে করে-করে বলল।

নলিনাক্ষ বলল, 'তা তাতে তো সব ক'টা আঙুলই যাবে। কিংবা একধার থেকে। এমন মাঝের তিনটে আঙুল কাটল কী করে?'

কোনও জবাব দিল না ছেলেটা। ঘামছে তেমনি দরদর ধারে, মনে হল, বড়-বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে আইসক্রিমের ওপর।

'তা তোমার কে আছে, বাড়িতে? মা-বাপ নেই? তোমাদের মতো ছেলেদেরও তো শাস্ত্রকর্ম শেখাবার ব্যবস্থা আছে—সেসব শিখলে আর এত কষ্ট করতে হয় না? শিখবে? দ্যাখো, তা হলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

ছেলেটা যেন পাঙাস হয়ে উঠল একেবারে। একবার ভয়ে-ভয়ে ওদিকের ফুটপাথটার দিকে চেয়ে—বাকি সবটা আইসক্রিম একসঙ্গে মুখে পুরে যেন একলাফে একটা দোতলা বাসের আড়ালে চলে গেল। ঠিক সেই সময়ই উত্তর দিকের লাইন ছেড়েছে। পর-পর কতকগুলো বাস, মিনি-বাস, গাড়ি, কোম্পানির ভ্যান—সার-সার চলল—গিয়ে খোঁজা সম্ভব নয় সে অবস্থায়—আবার যখন গাড়ি দাঁড়াবার পালা এল, তখন আর কোথাও দেখা গেল না ছেলেটাকে। ভিক্ষেও করছে না, যেন বাতাসে উবে গেছে।

বেশ একটু অবাক হয়ে গেল নলিনাক্ষ। হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল কেন ছেলেটা? ওদিকে চেয়ে কী দেখল? কোনও লোককে দেখেই ভয় পেল না কি? সে শুনেছে এই সব ভিখিরিদের 'মেট' থাকে—তারাই এনে ছেড়ে দেয়, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ডেরায়, এ-ও সেই ব্যাপার না কি?

যেদিকে চেয়েছিল ছেলেটা, নলিনাক্ষও ভালো করে চেয়ে দেখল। কই, কেউ তো কোথাও নেই, পুব দিকের ফুটপাথটাই তো ফাঁকা। শুধু পানওলার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক বিড়ি টানছে। সাধারণ চেহারার, হিন্দুস্থানী মজুর বা দুধওলা—এইরকম শ্রেণীর লোক। সে এদিকে চেয়েও নেই, ওইদিকেই ফিরে বোধ হয় পানওলার সঙ্গে গল্প করছে। আর কোনও লোকই তখন চোখে পড়ল না ছেলেটা যাকে দেখে এত ভয় পেতে পারে।

আর মেট থাকলেই বা কী? তার জীবনের উন্নতিও বুঝল না ছেলেটা? নলিনাক্ষর ঠিকানাটাও তো জেনে নিতে পারত। কিংবা আবার কবে এখানে আসবে সেটা জানিয়ে দিতে পারত। কী বোকা ছেলেটা!

একটু ক্ষুণ্ণই হল নলিনাক্ষ। আসলে ছেলেটার কোনও উপকার করতে পারলে ভালো লাগত ওর। সেইজন্যেই কেমন যেন একটা অবুঝ অভিমানও বোধ হতে লাগল। তার আর কী, ও যদি নিজের ভালো না বোঝে নলিনাক্ষর কী এত মাথাব্যথা? গোল্লায় যাক। —এই কথাটা নিজেকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একেবারে বাসে উঠে লক্ষ করল—ওধারের ওই লোকটা পানওলার আয়নার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আয়নাটা বেশ বড় আর উঁচু; রাস্তার এদিকটা তাতে প্রতিবিম্বিত হতে কোনও বাধা নেই।

BanglaBook.org

তিন

বউদির শরীর খারাপ, অনেকদিন ধরেই বলছেন। মৃদু অনুযোগই করছেন বলতে গেলে, দেবরের হৃদয়হীনতায়। এবার আর কিছু না করলেই নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল দার্জিলিং। কিন্তু সেখানে পাঠানোর অসুবিধা অনেক। কাছাকাছি কোথায় পাঠানো যায় ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। ওর আপিসের নগেনবাবুর কে এক আত্মীয় বারোমাস পুরীতে বাস করেন। রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। অকৃতদার। একটি চাকর নিয়ে শুধু থাকেন। তিনি এবার তীর্থে যাবেন। বাড়িতে কাকে রেখে যান এই চিন্তায় পড়েছেন। লীজ নেওয়া বাড়ি। বারোমাস থাকেন বলে দুটো-একটা জিনিসও করেছেন। কেউ যদি না থাকে তো দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাবে! বুড়ো মানুষ—চাকরকে নিয়ে যেতে হবে। একা যেতে পারবেন না। তিনি ভালো একটি পরিবার খুঁজছেন, যারা মাসখানেক থাকবে অন্তত, আর ঘরবাড়ি নোংরা করবে না। ভাড়া তিনি চান না, তবে কেউ যদি দিতে চায় তো আপত্তিও করবেন না, যে যা দেয় খুশিমনেই তাই নেবেন। মোদ্দা ওই দুটি শর্ত, বাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই, আর কাচের বাসন ব্যবহার করা চলবে না। কাটগ্লাসের দামি জিনিস তাঁর, বিলিতি প্লেট, জিনিসপত্র নষ্ট না হয়। কেউ কি তেমন লোক আছে নলিনাক্ষর সন্ধানে? নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নলিনাক্ষর কাছে এটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হল। ততক্ষণাৎ কথা দিয়ে দিল একেবারে। তারপর বাড়িতে এসে বউদিকে খবরটা বলল। রাত্রে 'কনফারেন্স' বসিয়ে স্থির হল, নলিনাক্ষ বউদিকে পৌঁছে দিয়ে প্রথম দিকে দিন দশেক থেকে আসবে, দাদা মাঝে দিন দশ-বারো গিয়ে থাকবেন, শেষের দিকে বউদির ভাই গিয়ে আর দশ-বারো দিন থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরবে। মাসখানেক লাগবার কথা নগেনবাবুর সেই পিসেমশাইয়ের; কুণ্ডু স্পেশালে যাবেন, মাপা দিন ওঁদের—তবু যদি দৈবাৎ কলকাতায় এক-আধদিন আটকে যান, তাঁর ফেরা পর্যন্ত বউদি থাকবেন এই বন্দোবস্ত আছে।

বউদির তো উৎসাহের অবধি নেই। তিনি কখনও পুরী যাননি। এমনিও গত দু-বছরে নাকি কোথাও বেরোতে পারেননি—তিনি ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। নলিনাক্ষরও খারাপ লাগছিল না, চক্রতীর্থে প্রথম সারিতে বাড়ি। সোনার গৌরাঙ্গ আর রামকৃষ্ণ মঠের কাছে—বেশ জনবসতিও আছে, একেবারে নির্জন নয়।

কিন্তু পুরীতে পৌঁছে বউদির আনন্দ যেন একটু স্তিমিত হয়ে গেল। ওদের বাড়ি মাঝারি কেন, ছোটই, ওপরে দুটো নিচে দুটো ঘর। পিসেমশাইয়ের আর ওর চেয়ে বেশি লাগবেই বা কেন? নিচের ঘরটা তো অব্যবহার্যই পড়ে থাকে; কিন্তু ঠিক পাশেই এক বিরাট বাড়ি—কোনও এক মারোয়াড়ির—দেখা গেল তার পিছনে অতি পরিচিত এবং বউদির চোখের-বালাই খানি-তিনেক ঢাউস-ঢাউস গাড়ি দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মিঃ পরেশ চাকলাদাররা ইতিমধ্যেই সপরিবারে এসে গেছেন। দিন-চারেক আগে মোট-মাটারি নিয়ে রওনা হতে দেখেছে বটে—কিন্তু ওঁরা যে এত দেশ থাকতে এখানেই আসছেন তা কে ভেবেছিল? সাহেব মানুষ, অত ধনী—কাশ্মীর, নৈনিতাল পক্ষে দার্জিলিং কি শিলং যাবেন এই-ই ভেবেছে।

বউদি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আ গেল যা! মড়ারা এখানেও এসে জুটল। কোথায় ভাবলুম ক'টা দিন ওদের আর মুখ দেখতে হবে না, নিশ্চিন্তি থাকব—তা নয়। ঠিক এসে হাজির হয়েছে! ওই যে আমার মা ছড়া কাটেন না—"ওরে ও শাক-আলু কোন ঘাটে তুই পা ধুলি, আমি না আসতে তুই এলি।" তা এ-ও হল তাই! আপদ এসে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ল!'

নলিনাক্ষ হেসে বলল, 'তা তোমারই বা অত রাগ কেন ওদের ওপর? কী করেছে তোমার?'

'না বাপু। ওদের ওই অত চাল আমার সহ্য হয় না। তা যা-ই বলো আর যা-ই ভাবো।'

BanglaBook.org

গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে থিতিয়ে বসে বাজারের দিকে যাচ্ছে—পরেশ চাকলাদারের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, 'এই যে, বা! আপনারাও এসে গিয়েছেন। খুব ভালো হল। ক'দিন আছেন তো। তবু চেনাশুনো লোক—একটু গল্পসল্প করা যাবে। ভগবানের ব্যাপার দেখুন মশাই, ওখানেও প্রতিবেশী, এখানেও কেউ জানি না অপরে কোথা যাচ্ছে—ঠিক পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে গেল। আসবেন অতি অবিশ্যি। বিকেলের দিকে আসুন না, এখানেই চা খাবেন। বউদি-ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসুন—প্লিজ!'

তখনকার মতো 'হেঁ-হেঁ, দেখি, আসব বইকী—অবিশ্যি আসব—তবে আজ হবে কি না—হেঁ-হেঁ—' বলে কাটিয়ে চলে গেল নলিনাক্ষ।

বউদি শুনে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! এলুম দুটো দিনের জন্যে জিরুতে, আজই গিয়ে ওঁদের দরবারে হাজরে দিতে হবে। আসলে ওঁর গিন্নি চালের কথা শোনাবার লোক পাচ্ছে না বোধহয়, পেট ফুলে মরে যাচ্ছে। দু-চোখের বালাই—এইসব হঠাৎ-বড়লোক লোকগুলো।'

বিকেলে বেরিয়ে মন্দির ও বাজার ঘুরে এসে বউদি আর কোথাও বেরোতে চাইলেন না। সমুদ্র তো এখান থেকেই দিব্যি দেখা যাচ্ছে, কাছে গিয়ে বেশি কি হাত বেরোবে? তা ছাড়া এই ঘোর কৃষ্ণপক্ষ—কী এমন দেখবেই বা মাথামুণ্ডু! চাঁদনী রাত হলেও না হয় কথা ছিল। ছেলেমেয়েকেও ছাড়তে রাজি নন তিনি, সমুদ্রের ধারে অনেক কিছু থাকে, পোকামাকড়—আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কী-ই-বা বুঝবে সমুদ্রের?

কিন্তু নলিনাক্ষর ধারণা অন্য। সে এর আগে বহুবার পুরী এসেছে, গোপালপুর-ওয়ালটেয়ার গেছে, সমুদ্র সম্বন্ধে নিজেকে সে অথরিটি ভাবে। তার বিশ্বাস, চাঁদনী রাতের শোভা বরং কিছুটা একঘেয়ে, অন্ধকার রাত্রের বৈশিষ্ট্য বেশি। বিশেষ যদি একটু মেঘলা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে ঢেউ ভাঙার ফসফরাস দীপ্তি যখন সেই অন্ধকারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অগ্নিময় সর্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে—তখন তাকে ঈশ্বরেরই এক ভয়ঙ্কর রূপ মনে হয়।

বউদি অবশ্য ওকে যেতে বাধা দিলেন না, এক পেয়ালা চা খেয়েই টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ।

সমুদ্রতীর তখন একেবারেই জনবিরল। কেউ থাকবে তা সে আশাও করেনি অবশ্য। তার মতো পাগল কে আছে যে, এই অন্ধকারে বসে-বসে সমুদ্র দেখবে! আর তাতে সে দুঃখিতও নয়, এ গম্ভীর রূপ একা বসেই উপভোগ করতে হয়। তার কাছে কিছুই নেই, হাতঘড়িটাও বুদ্ধি করে খুলে রেখে এসেছে। চোর-ডাকাত ধরে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না! এক এই টর্চ—তা তার জন্যে কেউ রাহাজানি করবে বলে মনে হয় না।

তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, মন এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে সেই ভিখিরি ছেলেটা—প্রফুল্লর কথায় চলে গেল। নিত্যই উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু এর মধ্যে আর একদিনও দেখতে পায়নি তাকে। কে জানে কেন—ছেলেটা যেন তাকে কী মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—এলোমেলো চিন্তায়। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোনও হুঁশও ছিল না। দূরে মধুপুর হাউসের জোর আলোটার আভা এসে পড়েছে—তবে সেটা ওর এই শোভা উপভোগে খুব ব্যাঘাত করতে পারেনি। বরং ওর চারপাশের অন্ধকারটাকে যেন আরও গাঢ় করে তুলেছে। বসবার সময় বেছে-বেছে এইদিকটায় এসে বসেছে, রাঠোর-নিবাসের সামনের ঝাউগাছগুলোর আড়ালে। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে, মনে হচ্ছে, সে-অন্ধকার যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে ডুবে গেছে তার মধ্যে। এইসময় হঠাৎ মধুপুর হাউসের আলোটাও কে নিভিয়ে দিলে, আরও গাঢ়, আরও নিঃসীম হয়ে উঠল চারিদিক।

BanglaBook.org

অকস্মাৎ, যেন সেই অন্ধকারেরই একটা অংশ—অন্ধকার মহাশূন্য থেকেই কায়া সংগ্রহ করে—যাকে বলে মেটিরিয়ালাইজ করা—একেবারে তার পাশে এসে ঝুপ করে পড়ল।

কোনও জীবিত প্রাণী? মানুষ? খুনে ডাকাত?

এসব কোনও কিছু ভাববারও অবসর ছিল না। নিদারুণ চমকে উঠল নলিনাক্ষ, ভয়ই পেয়ে গেল সে, অজানা অথবা দেহের সহজাত একটা আতঙ্ক। আর সেই ভয়ে তার গলা দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত জান্তব আর্তস্বর বেরিয়ে এল আপনা-আপনিই।

যে এসে বসেছে, সে বোধকরি এ-অবস্থাটা আগেই অনুমান করে নিয়েছিল। জানত এটা হবে। মানব মনের এ স্থূল অনুভূতিটা তার জানা-ই। সে ওর এই স্বর বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় বলে উঠল, 'চুপ, আমি এককড়ি।'

এককড়ি। হ্যাঁ, গলার আওয়াজটা সেইরকমই বটে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই—ধড়ে প্রাণ আসা যাকে বলে—আশ্বস্তও হল একটু। ক'টা মুহূর্তেরই ব্যাপার, কিন্তু কখনও-কখনও শুধু ব্রহ্মারই নয়, মানুষেরও এক পলকে এক যুগ কেটে যায়, যুগান্তের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এবার ভরসা করে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারেই যতটা দেখা সম্ভব—কারণ যে এসেছে সে আগেই—নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গেই চাপা গলায় বলে দিয়েছে, 'টর্চ জ্বালবেন না, দোহাই।'

সি. বি. আই. ইন্সপেক্টর দেবীবাবু, দেবীপদ বসু। মাত্র কিছুদিন আগেই নলিনাক্ষর প্রাণরক্ষা করেছিল। সেদিনের সে-দুঃস্মৃতি মনে পড়লে আজও—কী হতে পারত ভেবে—ভয়ে যেন হিম হয়ে যায় বুকের মধ্যেটা। সেই থেকেই, সেই উপলক্ষ করেই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

এককড়ি নামটার মধ্যেও একটা রহস্য আছে। সেই ঘটনারই রহস্য। এখন সেটা কৌতুক রহস্যে পরিণত হয়েছে। ওর বন্ধু বরুণ একবার 'স্মাগলার'দের চক্রে পড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রেই এক লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়—এই দেবীপদ বোস ভেতরের খবর নেওয়ার জন্যে এককড়ি নাম নিয়ে বরুণের বাড়ি চাকরের কাজ নেয়। সেই থেকেই এককড়ি নামটা ওদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই সেটা উপভোগ করে। বরুণ সম্প্রতি চূড়ামণি বলে সাঁওতাল মেয়েটাকে বিয়ে করেছে—তাতে দেবীপদ উপহার দিয়েছে—'দাস শ্রীএককড়ি' এই সই করে।

চিনতে পারার পরই নলিনাক্ষ জড়িয়ে ধরেছিল দেবীপদকে, সেইভাবেই ধরে রেখে বলল, 'বাপরে, এমনভাবে ভয় পাইয়ে দিতে হয়? তা এখানে? আর এই অন্ধকারেই বা কেন, এমন ভূতের মতো?'

দেবীপদ বলল, 'কাজেই এসেছি। একটা খোঁজে। সেটা দিবাভাগে দৃশ্য নয়, আলোতেও নয়। তাই এই প্রেতাত্মার মতো অন্ধকারে ঘোরা।'

'কিন্তু যাদের দেখার জন্যে এত কাণ্ড—তারা জানে না আপনি পিছনে লেগেছেন?'

'জানে বইকী। এখনও আমরা এত সতর্ক হতে পারিনি যে, তাদের কাছে খবর পৌঁছবে না। সর্বত্রই পেড-ম্যান আছে ওদের। জানেন না, জহরলাল নেহরুর টাইপ-রাইটারের ব্যবহার করা কার্বন পেপারও চুরি যেত? তারাও আছে, আমরাও আছি। আমাদের পেছনে তারা আছে কি না তাও দেখার ব্যবস্থা আছে। ওই রামকৃষ্ণ মঠের ছাদে একজন আছে। এদিকের এক বাড়ির ছাদে আর-একজন, তাদের কাছে পাওয়ারফুল দূরবীন আছে। এই অন্ধকারেও আমাকে ফলো করছে তারা দূরবীন দিয়ে। ...তা আপনি হঠাৎ পুরীতে? বউদিও তো এসেছেন দেখছি।'

বলল নলিনাক্ষ কারণটা। বউদির চেঞ্জ দরকার, একটা বাড়িও পাওয়া গেল—ফার্নিশ্‌ড্—এসে পড়েছে। দিন দশেক থেকে ও চলে যাবে। দাদা আসবেন।

বলতে-বলতে মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিনেরই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, মানে

BanglaBook.org

কলকাতায় আগের দিন দেখে এসেছে—ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপন—কপালে কাটা দাগ, থুতনিতে একটা তিল আছে, সাত বছরের মেয়ে, ডাকনাম পারুল—আরও কী সব বিবরণ—খবর দিলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। এখানে এসে সেই কথাটাই ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গেই ভিখিরি ছেলেটার চিন্তায় চলে গিছল। কথার মধ্যেই তাই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা দেবীবাবু, আজকাল প্রায়ই যে এত ছেলেমেয়ে হারাচ্ছে—এর ব্যাপারটা কী বলুন দিকি? খবরের কাগজ খুললেই একটা না-একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সুনীতিবাবুর ভাষায়—হোয়াট ইজ বিকজ অফ ইট? ডঃ সুনীতি চাটুয্যের রসিকতা এটা—কোনও দক্ষিণ দেশিয় ভদ্রলোক বলতেন—শিক্ষিত ভদ্রলোক।'

অন্ধকারেই যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল এককড়ি। তারপর তেমনি হিসহিসে গলায় বলে উঠল, 'এই মরেছে! আবার বাঘের গর্তে পা দেবার তালে আছেন নাকি? এ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খুব সাবধান! আপনি বুঝি ফ্যাসাদ না বাধিয়ে থাকতে পারেন না?'

'না-না, সেসব কিছু নয়। এমনি, পর-পর বিজ্ঞাপনগুলো চোখে পড়ে কিনা—তাই হঠাৎই মনে এল কথাটা। আপনিই বা ওসব ভাবছেন কেন?'

এবার নলিনাক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায় আবারও, 'আচ্ছা দেখুন—আপনি তো ঘোরেন-টোরেন খুব, চৌরঙ্গী আর সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়ে যে সব ভিখিরি ট্রামে-বাসে-গাড়িতে ভিক্ষে করে—তাদের মধ্যে কালো মতো একটা ছেলে ছিল, তার নামও কেলো, তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস হবে—একটা পা কাটা, ডান হাতের তিনটে আঙুল নেই—তাকে আর মোটে দেখতে পাই না, আসা-যাওয়ার পথে চেয়ে-চেয়ে দেখেছি—দু-তিনদিন নেমে খোঁজও করেছি অন্য ভিখিরিদের কাছে, কেউই বলতে পারে না। আপনার চোখে পড়েছে কখনও? মনে পড়ছে এমন কারও কথা?'

দেবীপদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল যেন নিথর হয়ে গেল প্রসঙ্গটায়। হয়তো কিছুই না, মনে করারই চেষ্টা করছে। কিন্তু নলিনাক্ষর কেমন মনে হতে লাগল—এ নীরবতাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, দেবীপদ হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠেছে কথাটা শুনে।

প্রায় মিনিট দুই-তিন পরে সত্যি-সত্যিই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল দেবীপদ, 'কেন বলুন তো? তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? শেষ কবে দেখেছেন তাকে? জানাশুনো ছিল, না এই পথেই দেখেছেন? নামই বা জানলেন কেমন করে?'

'বাবা! আপনি যে পুলিশের লাইনে চলে গেছেন এককথায়। রীতিমতো জেরা। এর মধ্যেও কোনও ভয়ানক কথা আছে না কি? আপনাদের স্বভাবটাই খারাপ হয়ে যায় এই কাজ করে-করে—না? সবেতেই সন্দেহ জাগে।'

এই বলে নিজেই যেন প্রসঙ্গটা হালকা করে নিয়ে খুলে বলল সব। প্রথম দিন দেখে মায়া হওয়ার কথা, শেষের দিনে আইসক্রিম খাওয়ানো, তার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া—সব। ইতিহাস শেষ হলে বলল, 'অন্য কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার, জাস্ট হিউম্যান ইন্টারেস্ট। ছেলেটাকে দেখলে আপনিও বোধহয় ব্যস্ত হতেন তার কিছু ভালো করার জন্যে!'

'আপনিও বলার মানে? কথাটায় অত জোর দিলেন কেন? পুলিশে কাজ করলে কি ইনহিউম্যান হয়ে যায় বলে আপনাদের ধারণা?' হেসেই বলল দেবীপদ, কিন্তু তারপর আবারও গম্ভীর হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'হেস্টিংস-এর কাছে গঙ্গায় কাদার মধ্যে তার ডেডবডি পাওয়া গেছে দিন-দশেক আগে। কেউ গলা টিপে মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। কারণটা কী, ওইরকম ছেলেকে কে খুন করল ভাবছিলুম, এবার বুঝলুম। আপনিই কারণ!'

যেন গরম একটা কিছু ছ্যাঁকা দিল কে নলিনাক্ষকে। সে প্রায় চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি! আমি তার মৃত্যুর কারণ!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ওই আইসক্রিম খাওয়ানো আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই কাল হয়েছে বেচারার। কেন যে আপনারা এত পরোপকার করতে যান!' তারপরই বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'বলছিলেন জড়াননি। এই তো বেশ জড়িয়েছেন দেখছি। বাঘের গর্তে শুধু নয়, তার চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছেন একেবারে। ...না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'তার মানে?'

কিন্তু সে-প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যায় না। খুব চাপা, সামান্য একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া যায় কাছাকাছি কোথাও থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন অশরীরী কোনও প্রাণীর মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দেবীপদ।

যেমন ভাবে হাওয়া থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করার মতো এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন হাওয়া হয়ে যায় আবার।

চার

ইংরেজিতে bewilderment বলে একটা শব্দ আছে—তার মানেটা যেন এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল নলিনাক্ষ।

সে-রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা বা বিভ্রান্তি কিছুটা কাটতেই তিন-চারদিন সময় লাগল প্রায়। যত সে-কথা ভাবে, ততই যেন আরও গুলিয়ে যায় মাথাটা। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়। সত্যিই কি এককড়ি এসেছিল, না সারাদিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছে সে?

ওই ছেলেটার কথা যে বলে গেল? সেটা? ...আহা বেচারি! আচ্ছা, সত্যিই কি তার মৃত্যুর জন্যে নলিনাক্ষই দায়ী? ইস, কেনই বা দয়া করতে গিছল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর এ-বিপদের কী সম্পর্ক অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না। ওকে কোনও কাজ দিলে ভিক্ষে ছেড়ে দেবে এইজন্যে? ভিক্ষেতে কি এত রোজগার হয় সত্যি-সত্যিই?

অনুতাপও হয়—আবার ভাবে, যদি সত্যিই তাই হয়—এমন কষ্ট করে ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে বাঁচবে, তার ভেতরও এত শাসন, এত নিষ্ঠুরতা, এত চক্রান্ত থাকে তো তার মরাই ভালো হয়েছে, রেহাই পেয়েছে সে। এভাবে বেঁচে থেকে কী পেত সে জীবনে আর?

মুশকিল হয়েছে এই—কথাটা যে খোলসা করতে পারত সেই দেবীপদরও কোনও পাত্তা নেই আর। পথে-ঘাটে, মন্দিরে, বাজারে, সমুদ্রতীরে—কত চেয়ে-চেয়ে দেখে—কোথাও চিহ্নমাত্র দেখতে পায় না। সেই যে অন্ধকারে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেই কুকুর-কাঁদার শব্দে চমকে উঠে—একেবারেই যেন প্রেতমূর্তির মতোই মিলিয়ে গেল, লোক ও লোকালয় থেকে। কিছু বুঝিয়ে বলল না, পরিষ্কার করল না বক্তব্যটা—বরং আরও খানিকটা রহস্যেরই সৃষ্টি করে গেল। চাপা গলায় হিসহিস করার মতো শব্দে, ধমকের ভঙ্গিতেই বলে গেল, 'বাড়ি চলে যান এখনই। আর কোনওদিন এমনভাবে রাত্রে একা বেরোবেন না। উঠুন, উঠে পড়ুন। বেশিক্ষণ আপনাকে প্রোটেকশ্যন দিতে পারব না আর।'

এই কথাগুলো নিয়েই আরও বেশি ভাবছে। বাঘের চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছে বলে গেল। সে-ব্যাপারটাই বা কী? যাই হোক, সাবধানও হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গেলেও বেলা থাকতে-থাকতে ফিরে আসে। একাও যায় না আর।...

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় কেটে যেতেও যখন দেবীপদর কোনও খবর পেল না—তখন ব্যাপারটা একটু হাস্যকর বলেই মনে হল। হয় সে স্বপ্ন দেখেছিল, নয় তো দেবীপদই একটু তামাশা করে

BanglaBook.org

গেল, অন্ধকারে বসে ছিল বলে একটু মজা করে গেল ভয় দেখিয়ে। আর সেও এমন বুদ্ধু—এই ক'দিন ভয়ে-ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, কত কী ভাবছে। ছোঃ!

কিন্তু ঠিক যখন কথাগুলোকে নিতান্তই অবাস্তব, স্বপ্নদৃষ্ট বলে ভাবতে শুরু করেছে, সেইসঙ্গে মনের প্রশান্তি ফিরে পাচ্ছে একটু-একটু করে, একটি নিদারুণ খবর এসে আবার সব ওলোট-পালট করে দিল।

বউদির ভাইঝি দোলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিন পাঁচেক আগে স্কুল থেকে হারিয়ে গেছে। ইস্কুলের গাড়ি-ছাড়ার সময় তাকে পাওয়া যায়নি, ইস্কুলের ঝি ভেবেছে কোনও বন্ধুর সঙ্গে তার গাড়িতে আগেই চলে গেছে। এমন নাকি এক-আধদিন গেছেও—বিশেষ বিপাশা বলে এক ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব, তার বাবা যেদিন নিজে নিতে আসেন তখন তিনিই ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান—এর মধ্যে যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রশ্ন আছে, সেটা কারুরই মাথায় যায় না।

এদিকে বউদির দাদা রথীনবাবুরা ভাবছেন গাড়ির কোনও গোলমাল ঘটেছে—চাকা ফুটো হয়েছে বা স্টার্ট নিচ্ছে না—ফিরতে দেরি হচ্ছে। শেষে যখন সেসব সম্ভাবনার সময়ও কেটে গেছে তখন মেয়েরা পুরুষদের খবর দিয়েছে, তাঁরা আপিস থেকে ফিরে ইস্কুলে গিয়ে খবর নিয়েছেন—কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, দারোয়ান কিছু বলতে পারেনি। তারপর অবশ্য প্রিন্সিপ্যালকে পাওয়া গেছে, তিনি তখনই ইস্কুলে এসে ঝিকে, ড্রাইভারকে ডেকে পাঠিয়েছেন—কিন্তু কেউই কোনও খবর দিতে পারেনি, তাদের ধারণার কথা জানিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অতঃপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এতদিন তাঁরাও ব্যস্ত ছিলেন, তা ছাড়া শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে, মিছিমিছি উদ্বিগ্ন করে কোনও লাভ নেই বলেই সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেননি, কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয় ভেবেই এই খবর পাঠাচ্ছেন। ইত্যাদি—।

নলিনাক্ষর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছরের মেয়ে দোলা। সুন্দর দেখতে, তেমনি বুদ্ধিমতী। পড়াশুনোতেও ভালো। ভারি মিষ্টি স্বভাব। বউদির বাপের বাড়ির সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই দোলাই ওর সবচেয়ে প্রিয়। কতদিন এসে থেকে গেছে। যখন আরও ছোট ছিল, ওর বিছানাতেই এসে শুত, বলত, 'গল্প বলো না একটা নলিনকাকু, তুমি তো কত গল্প লেখো। নতুন গল্প বলতে হবে কিন্তু'—গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সে অস্থির হয়ে উঠল। বউদি কান্নাকাটি করছেন। সেজন্যও যত না হোক—নলিনাক্ষর নিজের মনের তাগিদও কম নয়। অথচ কী-ই-বা করবে তাও ভেবে পায় না। বউদি বলছেন, 'তুমি একবার যাও, তোমার কত জানাশুনো, তুমি গিয়ে চেষ্টা করলে পুলিশ আরও অ্যাকটিভ হয়ে উঠবে।'

কিন্তু সে-ধরনের চেষ্টায় কতটুকু বেশি ফল হবে তা বুঝতে পারে না নলিনাক্ষ। এদের ফেলে যাওয়াই কি ঠিক হবে! আঃ, এই সময় যদি দেবীপদকে পাওয়া যেত—।

ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ল কথাটা। একটা কথা বলেছিল, 'দিবাভাগে দৃশ্য নয়। রাত্রেই ঘোরে সেজন্যে।' যদি এখন পুরীতে থাকে রাত্রেই দেখা পাবে। আর, মুখে যাই বলুক, তেমন বিপদ বুঝলে ওর দিকেও নজর রেখেছে নিশ্চয়। বিপদে গিয়ে পড়লে অন্তত ধমক দিতেও সামনে আসবে।

সেদিন অমাবস্যা, আকাশে মেঘের ভাবও আছে, যাকে কবিরা সূচীভেদ্য অন্ধকার বলেন তাই। মূর্তিমান ব্যাঘাত হচ্ছে শুধু ওই মধুপুর হাউসের আলোটা। নলিনাক্ষ ওদিকটা এড়িয়ে, ছোট মন্দিরটাকে ডাইনে রেখে, একটা হেলে-পড়া বাড়ির পাশ দিয়ে নামল সমুদ্রের দিকে। টর্চ হাতে ছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই জ্বালেনি। বিপদ যদি সত্যিই কিছু থাকে, টর্চ জ্বেলে নিজের উপস্থিতি না জানানোই ভালো।

দেখা গেল, ওর হিসেবে বা অনুমানে কিছুমাত্র ভুল হয়নি।

বাড়িটার সবটা হেলে-পড়া নয়, শেষের দিকে একটা আউটহাউস মতো ছিল, সেইটেই

BanglaBook.org

হেলে পড়ে আছে দীর্ঘকাল, বসবাসের অযোগ্য হয়ে—কিন্তু ভেঙেও পড়ে যায়নি। বাড়িটা মাঝে মেরামত করিয়েছেন মালিক, এটায় হাত দেননি। ওরা যেদিন প্রথম আসে সেদিন এ-বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আজ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার। বোধহয় কেউ নেই, যারা ছিল কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওদিক দিয়ে নেমে ঠিক খোলা জায়গায় পড়েছে—সেই হেলে-পড়া ঘর থেকেই কে একজন নিঃশব্দে অথচ তীরবেগে বেরিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল।

ভয় পাওয়ার কথা নয়, এইটের জন্যেই তো বলতে গেলে আসা—তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি লাগে বইকী। সেটা বুঝেই যেন সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রায়-অদৃশ্য মূর্তি বলে ওঠে, 'আবার বেরিয়েছেন এইভাবে! বারণ করেছিলুম না।' অর্থাৎ দেবীপদ।

বিপদের মুখে 'আপনি'র দূরত্বটা আপনিই চলে যায়, ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে নলিনাক্ষ বলে ওঠে, 'তোমার খোঁজেই এসেছি ভাই। বাঁচালে। যেভাবে খুঁজেছি আর ভেবেছি তোমার কথা, জগন্নাথই দয়া করে বুঝি মিলিয়ে দিলেন।'

'শান্ত হোন, শান্ত হোন। বসুন এদিকটায়। পিছনে আমার লোক আছে, এখানে কিছু হবে না। ব্যাপারটা কী?'

খুলে বলল নলিনাক্ষ। দোলার হারানোর বিবরণ, এ-পর্যন্ত যা-যা খবর পাওয়া গেছে।

দেবীপদ চুপ করে বসে শুনল সব, কেবল দারোয়ান, ঝি আর ড্রাইভারের এজাহারগুলোর বেলায় দু-একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছিল, আর ইস্কুলের নামটা জেনে নিয়ে বলেছিল, 'ও, মিস দাশগুপ্ত? তাঁকে আমি জানি, অত্যন্ত রেসপনসিবল মহিলা!' —তারপর নলিনাক্ষর কথা শেষ হতে শুধু বলল, 'এগারো বছর বয়েস, সুন্দর দেখতে? তবু ভালো। কুয়ায়েট কি ওই রকম কোনও আরব কানট্রির আমিরের হারেমে চালান হয়েছে, নইলে বিক্রি করে দিত ক্রীতদাসী হিসেবে। আফ্রিকা কি ইটালীর কোনও খেতে বিনা মাইনেয় সারাদিন ভূতের মতো খাটতে হত—পাহারা আর চাবুকের মধ্যে—রাত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে শুতে হত।'

'সে কি! কী সব বলছ মাথামুণ্ডু? এখনও ক্রীতদাস কোথাও আছে নাকি?'

'আপনি না খবরের কাগজের লোক? ময়রারা সন্দেশ খায় না শুনেছি, তা এ-ও সেইরকম দেখছি যে।'

'তুমি বড্ড হেঁয়ালি করো ভাই।'

'আমি সত্যি আর স্পষ্ট কথা বলি, আপনাদের মন তৈরি নয় বলে বুঝতে দেরি হয়। আই অ্যাম পসিবলি এ লিটল অ্যাহেড অব ইউ। যা হোক, যা দরকার সব শুনে নিয়েছি, আপনি বাড়ি যান। আপনার জীবন আদৌ নিরাপদ নয়, এ জেনে রাখবেন। কে জানে দোলাকে অপহরণ আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই কি না! কেলোকে হারানোর শোধ!...যান, উঠুন।'

আর বসতে সাহস হল না নলিনাক্ষর। দেবীপদর সঙ্গেও কথা বলার সময় হল না। সে আগের দিনের মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

সমুদ্রের ধার থেকে উঠে আসবার পথটা চাকলাদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে। বাড়িটা পরিক্রমা করে নলিনাক্ষদের বাড়ি ঢুকতে হয়। উঠে আসতে-আসতেই দেখতে পেল, চাকলাদারের বড় ঢাউস গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। এত রাত্রে আবার কোথায় যাচ্ছে? নাইট-শো সিনেমায় না কি? বাজারহাট তো এতক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। সিনেমারও তো যেতে দেখে না বিশেষ—তবে?

গাড়িখানা দূরে চলে যাচ্ছে, নলিনাক্ষও নিজেদের বাসার দিকে মোড় ফিরছে—আর-একটা ব্যাপার খেয়াল হল। মনে হল, অনেকক্ষণ ধরেই শুনছে, কানে আসছে, অত লক্ষ করেনি—কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ। চেনা-চেনা। কীসের শব্দ এটা! শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছে, একটু পরে আর

BanglaBook.org

শোনা গেল না। গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গেই যেন যাচ্ছে শব্দটা...তবে কি গাড়িরই কোনও শব্দ উঠছে? ইঞ্জিনের—? আশ্চর্য, মনে হয় ঠিক যেন মানুষ গোঙাচ্ছে!

নিজেদের বাড়ি ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল নলিনাক্ষ।

কথাটা ভাসা-ভাসা ভাবেই মনে এসেছিল, কিন্তু সহজে ভেসে গেল না।

মানুষ? গোঙানি? সেইরকমই কিন্তু। চাপা গোঙানি একটা। মনে হচ্ছে যেন, গাড়ির কেরিয়ার থেকেই শব্দটা আসছিল।

না—বাতাসের শব্দ?

সমুদ্রের বাতাস বন্ধ দরজা-জানলায় বাধা পেয়ে এই রকম গোঙানির শব্দ করে বটে। এখানে ঠিক বোঝাও যায় না ছাই।

বাতাসেরই শব্দ নিশ্চয়।

কিন্তু, কিন্তু থেমে—যেন মিলিয়ে গেল কেন?

দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাতাসের শব্দ যদি হয়, সমুদ্রের হাওয়া তো এখনও সমান বেগে বইছে। দরজাও তো বন্ধ আছে, যেগুলো ছিল!

আর—মনে হচ্ছিল যেন, ওই গাড়িটার সঙ্গে-সঙ্গেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

কে জানে! অত আর মাথা ঘামাতে পারে না। আসলে এই সব ভেবে-ভেবেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে। নিজেরই ছায়াকে ভূত দেখছে। বাতাসের শব্দে গোঙানি শুনছে। হয়তো সাইলেন্সার পাইপে ফুটো হয়েছে কোথাও, তারই শব্দ ওটা। মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকলে আগেই বুঝতে পারত।

দেবীপদটা এমন ভয় দেখায়! মজা দেখে—না কি?

পাঁচ

পরের দিন বাজার থেকে ফিরে দেখল দাদা কমলাক্ষ পৌঁছে গেছেন। সেদিন ওঁর আসবার কথা নয়, এইজন্যই এসেছেন, দোলার ব্যাপারেই। তাঁরও বিশ্বাস, ভাইয়ের লেখক হিসেবে একটু নাম-ডাক হয়েছে, অতবড় কাগজে চাকরি করে—সে চেষ্টা করলে পুলিশ একটু বেশি মনোযোগ দেবে, আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

স্বামীকে দেখে বৌদি আরও কান্নাকাটি করছেন। 'এত দিন হয়ে গেল। সে কি বেঁচে আছে! দ্যাখো গে যাও, কোথায় কে মেরে পুঁতে দিয়েছে।'

কমলাক্ষ বারকতক বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'খামকা তাকে মেরে ফেলে কার কী লাভ বলো। গায়ে এক-গা গহনাগাঁটি থাকলেও বা কথা ছিল। বরং ওই নলিনের বন্ধু যা বলেছে সেই সম্ভাবনাই বেশি। কাবুলে কি জর্ডানে কি ইরানে চালান করে দিয়েছে—'

'সে তো মরারই সামিল হল, সে-বেঁচেথাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।'

বউদির কান্না বেড়েই যায়।

সেদিনই রাত্রের গাড়িতে যাবে কি না নলিনাক্ষ সেই আলোচনা হচ্ছে—হঠাৎ বাইরে মধুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'নলিনাক্ষবাবু আছেন না কি?'

বিরক্ত হলেও বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতে হল। কারণ 'আছেন না-কি'টা কথার কথা, জানলা থেকে দেখেই ডেকেছেন ভদ্রলোক।

মধুবাবু ওদের পিছন দিকে গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়ি ভাড়া এসেছেন। নিজে যেচে আলাপ করেছেন সেই প্রথম দিনটিতেই। তারপর থেকে প্রায় রোজই আসেন। সুবিধের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকেন না। দুটো-চারটে কথা বলে—খুব দ্রুত ওদের হাঁড়ির খবর নিয়ে চলে যান—আর, কখনও নিজের বাড়িতে

BanglaBook.org

যেতে বলেন না এদের। বউদি বলেন, 'বলবে কী! গেলে যদি চা খাওয়াতে হয়! লোকটা হাড়-কিপটে। আমি দেখেছি নুলিয়াগুলো মাছ নিয়ে যায়, দেখলেই ডাকে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও দিন নিতে দেখলুম না। ওই দর করেই সুখ।'

মধুবাবু ভেতরে এসে বিনা আমন্ত্রণেই চৌকিটায় বসলেন। বললেন, 'ইনি কে? দাদা বুঝি? মুখ দেখেই বুঝছি। আজকের গাড়িতে এলেন? তা হ্যাঁ মশাই নলিনবাবু, শুনলুম আপনাদের না কি একটি মেয়ে হারিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তা আপনি কোথা থেকে শুনলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে নলিনাক্ষ।

'বাড়িতে এঁয়ারা বলছিলেন। কোথা নাকি শুনেছেন। তাই বলি একবার সঠিক জেনে আসি।'

অগত্যা বলতে হল কথাটা। মধুবাবুর জেরায় সবই বলতে হল—হারানোর পূর্ণ বিবরণ।

'সর্বনাশ! হারানো কি বলছেন। এ তো চুরি। চুরি করেছে মশাই। নাকে ক্লোরোফর্ম বা অমনি কিছু দিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে গেছে, কিংবা তোমার কাকু দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ি নিয়ে এসেছে—এমনি কিছু বলেছে। তারপর মুখ চেপে ধরে জোর করে কোনও গাড়িতে তুলেছে। শুনেছি হিপনোটাইজ করেও নিয়ে যায় অনেক সময়। মনে আছে—একটা ষোলো বছরের ছেলে কলকাতা থেকে উধাও হয়, তাকে বর্ধমান ইস্টিশানে পাওয়া গেছল? কিছুই বলতে পারে না কী করে এল সেখানে! এ একটা বিরাট গ্যাঙ হয়েছে মশাই। তা হারিয়েছে তো কলকাতায়—না কি? কোথায় থাকত এরা?'

'এরা বোঁদেলের কাছে থাকত।' নলিনাক্ষকে বলতে হয়। ভালো লাগছে না কারুরই এই সব বকবকানি, কিন্তু উপায়ই বা কী? —'হারিয়েছে ইস্কুল থেকে, মানে ইস্কুলে এসেছিল, পুরো ক্লাসও করেছে। ইস্কুলটা ওর বালিগঞ্জে—দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।'

'তা হলে সে এখনও কলকাতাতেই আছে হয়তো। হইচই খোঁজখবরটা যাকে বলে, থিতিয়ে না গেলে ওরা বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। জানে তো, এখন চারদিকে চোখ রেখেছে পুলিশ। লুকিয়ে রাখতে গেলে, মশাই, নিরাপদ জায়গা এই কলকাতাই। আপনি যান নলিনবাবু, আপনি গেলে কাজ হবে। ...অতবড় কাগজে তো কাজ করেন—দিন খানকতক চিঠি ছেপে, নামে বেনামে—দেখেন না, একজন এককলম লিখলেন অমনি তার পোঁ ধরে পঁচিশখানা চিঠি অমনি ছাপা হয়ে গেল! কার এত গরজ মশাই? ওসব ওই আপিসে বসেই লেখা হয়, ওসব আমাদের জানা আছে। তা আপনিই বা সে অ্যাডভান্টেজ নেবেন না কেন? চিঠি ছাপুন, কলম লিখুন, এডিটোরিয়াল লেখান—ঠিক পুলিশের টনক নড়বে। বড় খবরের কাগজকে মশাই বোধহয়, ভগবান কেন—ভূতও ভয় করে। হ্যাঁ—যা বলছি, ভেবে দেখুন। কাগজ—ও বড় সাংঘাতিক জিনিস।'

আশ্চর্য! কাল থেকে নলিনাক্ষও ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছে। মধুবাবুকে প্রথম-প্রথম যতটা 'ফোরটোয়েনটি' সবজান্তা দাদা মনে হত—এখন তো ততটা মনে হচ্ছে না। জানেন অনেক কিছুই। কী করেন কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'কী করি? কী না করি তাই বলুন। যখন যা পাই—দু-পয়সা রোজগারের ধান্ধা। জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান—সেই অবস্থা আর কী!'

অবশ্য সেসব কথা এখন আর উঠিয়ে লাভ নেই। নলিনাক্ষ বলল, 'আমিও তো আজই যেতে চাই। কিন্তু টিকিট? যা ভিড় এখন চেঞ্জারবাবুদের। রিজার্ভেশ্যন পাওয়া যাবে সদ্য-সদ্য?'

মধুবাবুর অদম্য উদ্যম। বললেন, 'চলুন না দুজনেই স্টেশনে যাই। গিয়ে সিচুয়েশ্যনটা বুঝিয়ে বলি স্টেশনমাস্টারকে। তাতেও না পান—একটা রাত না হয় আনরিজার্ভড কামরাতেই চলে যাবেন। কী হয়েছে, ইয়ংম্যান, দাঁড়িয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি? সন্ধের বাস হয়েছে একটা—তাতেও যেতে পারেন। তাতে অবিশ্যি বসে যেতে পারবেন।'

BanglaBook.org

সত্যি-সত্যিই তিনি একরকম টানতে-টানতে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। বিশেষ সুবিধে হল না। রিজার্ভেশ্যন ক্লার্ক ঘাড় নাড়লেন। কোনও বার্থ এমনকী সিটও নেই। মধুবাবু তাতে দমবার পাত্র নন, হুড়মুড় করে স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেশ একটু উত্তেজিতভাবে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে একটা লেকচার দিলেন—যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ যখন একটা জীবনমরণ সমস্যা তখন তাঁদের উচিত অন্য কারও রিজার্ভেশ্যন ক্যানসেল করিয়ে নলিনাক্ষকে দেওয়া।

স্টেশনমাস্টার খুব সহানুভূতি জানালেন, কিন্তু তাতে আসল কাজের কিছু হল না। বললেন, 'দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, কোথায় কোন প্যাসেঞ্জারকে বঞ্চিত করব—সে হয়তো দেখুন কোনও রাজ্যের কোনও মিনিস্টার কিংবা এম.এল.-এর আত্মীয়। এক কথায় আমার সাজা হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু মশাই, বাবুলাল, সে জেনেশুনে মিছে বলেনি, দেখতেই ভুল হয়েছিল, এক প্যাসেঞ্জারকে বলে দিয়েছে স্লিপার বার্থ খালি নেই, তারপর বুঝি সেই প্যাসেঞ্জারেরই চেনা কে এসে পেয়েছে—এই কেস। লোকটি বুঝি কোন মিনিস্টারের কে, সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো-বোয়ের বোনঝি-জামাই, এক কথায় ডিমোশান হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ট্রান্সফার—লোকটার কেরিয়ারটাই ডুমড। না, সেসব পারব না। দেখি লাস্ট মোমেন্টে যদি কেউ আসে ফেরত দিতে, আমি আপনাকে খবর পাঠাব।'

তিনি সামনের ব্লটিং প্যাডে নলিনাক্ষর নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন।

মধুবাবুর উৎসাহ কিন্তু তবুও স্তিমিত হল না। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'না মশাই, এ কোনও কাজের কথা নয়। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ, যা হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে আমাদের। চলুন, একবার বাসটা দেখে যাই—।'

বাস-এ সিট ছিল। তবে রিজার্ভ করতে চাইল না। আসলে ওরা না কি এত আগে রিজার্ভ করে না। সাতটায় বাস ছাড়বে, পৌঁছোবে সকাল ছ'টায়। ছাড়বার একঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া হয়। যারা আগে এসে 'কিউ' দেবে তারাই পাবে।

সেইমতোই চলে আসছিল নলিনাক্ষ, না হয় চারটেতেই আসবে বাস-স্ট্যান্ডে—কিন্তু মধুবাবু ছাড়বার পাত্র নন। অনেক বড়-বড় বুলি ছেড়ে, স্পেশ্যাল কেস, এই রকম ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা উচিত বুঝিয়ে দিয়ে—তারপর, এসব মন্ত্রেও যখন কাজ হল না, তখন মধুবাবু ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লেন। 'কতবড় খবরের কাগজে কাজ করে তা জানেন? এডিটার। সম্পাদকীয় লেখেন। জরুরি কাজ, যদি আপনারা একটু কো-অপারেশন মানে সহযোগিতা না করেন—পরে পস্তাবেন। উনি হুড়ো দিলে তখন দেখবেন কলকাতা ভুবনেশ্বরের গভর্নমেন্ট আপনাদের নভুতো নছুতো করবে!'

তাতেই কাজ হল। মধুবাবু নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে জমা দিয়ে দিলেন, কথা রইল ছ'টার মধ্যে এসে বাকি টাকা জমা করে দেবে নলিনাক্ষ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা করতে হল না। চারটের সময় স্টেশন থেকে পোর্টার এল, 'এখনই কেউ টাকা নিয়ে আসুন—একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।'

এ খবরটা আর মধুবাবুকে দিল না নলিনাক্ষ। এতক্ষণের সাহচর্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে। ভারি নাছোড়বান্দা লোকটা, সবদিক দিয়েই। যেন কাঁঠালের আঠার মতো গায়ে লেপটে থাকে। আর—উনি যা বলবেন তাই করতে হবে, আর কেউ যেন কিছু বোঝে না। সেইটেই আরও অসহ্য। ওয়েলমিনিং হয়তো—কিন্তু ওয়েলমিনিং ফুল।

BanglaBook.org

ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ট্রেনের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। পরের দিন আপিসে গিয়ে খবর পেল পুরী থেকে কলকাতা আসার নাইট-বাস ভদ্রকের কাছে অ্যাকসিডেন্টে পড়েছে। কে বা কারা এক জায়গায় রাস্তার খানিকটা খুঁড়ে রেখেছিল—সেটা একটা বাঁকের মুখ, একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে

সেটা দেখতে পায় ড্রাইভার, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে পাশে ধানের ক্ষেতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তিনজন মারা গেছে, এগারোজন জখম—তার মধ্যেও তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মনে হচ্ছে জগন্নাথই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, স্টেশনমাস্টারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিয়ে।

ছয়

বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে একটু সকাল-সকালই আপিসের দিকে রওনা দিল নলিনাক্ষ। এখন গিয়ে অনেক কিছু করতে হবে—ম্যানিপুলেশ্যন যাকে বলে। দোলাকে যদি বাঁচাতে হয়—মৃত্যু বা তারও অধিক শোচনীয় ভাগ্যের হাত থেকে—তা হলে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিশকে আরও সক্রিয় করে তোলা। আর তা করতে হলে খবরের কাগজে 'আন্দোলন' করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। দেবীপদ সব জেনেছে ঠিকই, কিন্তু তারও নিজস্ব কাজ আছে—খুবই বিপজ্জনক কাজ, তার কথার ভাবে যা মনে হল—সে আর এদিকে কতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে?

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে—দেখল সামনেই মিঃ চাকলাদারের গাড়ি—গাড়িতে মালিক স্বয়ং। সেটাও ছাড়ছে তখন।

একটু অবাকই হল নলিনাক্ষ। তারপরেই মনে পড়ল সেদিনের কথা। গাড়িটা বেরিয়ে চলে আসা। ঠিক তো—কাল তো একবারও চোখে পড়েনি। তার মানে তখনই কলকাতা ফিরেছে।

চোখোচোখি হতে বলল, 'এ কী, আপনি? পুরী থেকে চলে এসেছেন বুঝি? কবে এলেন টের পেলুম না তো।'

'না-না,' ভদ্রতার প্রতিমূর্তি মিঃ চাকলাদার সৌজন্যে গলে গেলেন যেন, 'সেভাবে এলে আপনাকে বলে আসতুম বইকী। মাই ফ্যামিলি ইজ স্টিল দেয়ার। আমি একটা জরুরি কাজে এসেছিলুম। এই এখনই আবার ফিরে যাচ্ছি। তা আপনি যে এরই মধ্যে ফিরলেন?'

বলতে গিয়েও কারণটা বলল না নলিনাক্ষ। বলল, 'আমার অল্প দিনেরই মেয়াদ ছিল। আজ আপিসে জয়েন করতে যাচ্ছি। অবিশ্যি বউদিরা এখনও থাকবেন কিছুদিন।'

আপিসে গিয়ে অনেক কাজ করল। ওর ওই বিপদের কথা শুনে সকলেই যথেষ্ট আনুকূল্য করল। তিন-চারজনে বসে তিন-চারখানা চিঠি লিখে ফেলল, সেগুলোর লেখকের নামটামও দিয়ে দিল নিজেরাই। ওদের যে সাপ্তাহিক, তার সম্পাদককে বলতে তিনি এই নিয়ে একটা ফিচার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। নলিনাক্ষ নিজের কলমেও লিখল। সেদিন সম্পাদকীয় যাঁর লেখবার কথা, বরুণ চক্রবর্তী, তাঁকেও অনুরোধ করে এল। তিনি বললেন, 'আজ যদি নাও যায়, কাল ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সকাল-সকাল আপিসে গিছল কিন্তু সকাল করে ফেরা হল না। দু-একটা টেলিফোন সেরে—সে-খবরটা কোনওমতে দাদাকে পাঠানো যায় যাতে, সে-ব্যবস্থা করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে এক কনস্টেবল। দেখে ওরাকও যেমন হল একটু আশাও জাগল মনে। তা হলে কি কোনও খবর পাওয়া গেছে দোলার?

'কী ব্যাপার বলো তো? কোন থানা থেকে আসছ?'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনার নামই তো নলিনাক্ষবাবু?'

'হ্যাঁ—কেন? কোনও খবর আছে?'

হাতের তালুটা এতক্ষণ আধমুঠো করা ছিল সিপাইটির। সে এবার সেটা মেলে ধরল ওর সামনে, তাতে নলিনাক্ষরই একখানা ছোট ফটো।

BanglaBook.org

মুখে বলল, 'দেবীবাবু আজ রাত বারোটার সময় কলকাতা পৌঁছবেন। আপনাকে একবার ওঁর আপিসে যেতে হবে সেই সময়। উনি গাড়ি পাঠাবেন, ড্রাইভারের কাছে এই ফটো থাকবে, দেখে তবে সে-গাড়িতে উঠবেন।'

'দেবীবাবু—হঠাৎ?'

'তা জানি না। আমার ওপর যেটুকু হুকুম হয়েছে—আমি জানিয়ে গেলুম। তবে যা শুনলুম, আন্দাজ হয় আপনারই কোনও কাজে যাওয়া না কি দরকার। নমস্কার।'

মুখে নমস্কার বলেও স্যালিউট করে চলে গেল সে—পুলিশি কেতা-মতো।

লোকটা চলে যেতে নলিনাক্ষ দরজা বন্ধ করে ভেতরে এসে বসল। আশাও একটু হচ্ছে বইকী।

দেবীপদ যদি ওর কাজেই আসছে বলে থাকে—তা হলে দোলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। তার আর অন্য কী কাজ?...কিন্তু দেবীপদ এখানে না এসে ওখানে ডেকে পাঠাল কেন? আপিসেই বা ওকে ডেকে নিয়ে যাবার কী দরকার? কাউকে সনাক্ত করতে হবে?

ওদের কমবাইনড-হ্যান্ড রঘু চা দিয়ে গেল। 'আউর কুছ খাইবে বাবু' প্রশ্ন করল। 'কিছু খাবে না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল আবার।

চা খেতে-খেতে মনে পড়ল, পুরীতে একখানা চিঠি লেখা দরকার—টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে বটে—তবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায়নি কিছু—কী-কী করেছে সে, কতদূর—। তারচেয়েও যেটা দরকার ব্লেড নেই একখানাও। তাড়াতাড়ি আসার সময় ব্লেডের প্যাকেটটাই আনা হয়নি। আগে সেটা আনাতে বা আনতে হবে। নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে এখনই, কাল আটটার আগে পাওয়া যাবে না। এই এক উৎপাত হয়েছে আজকাল, সাড়ে-সাতটা না বাজতে-বাজতে ঝাঁপ ফেলা শুরু হয়ে যায় দোকানে-দোকানে। তবু ওদের মোড়ের দোকানটা দোর ভেজিয়ে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেচাকেনা করে, তাই রক্ষা।

অন্য দিন হলে রঘুকে পাঠাত। কিন্তু বৌদিরা কেউ নেই, রঘুই রান্না করছে। যেতে হলে ওকেই যেতে হবে। ভাগ্যে ধড়াচুড়ো ছাড়েনি এখনও। বাইরের কাজটা সেরে এসেই একেবারে জামা প্যান্ট ছেড়ে স্নান করে নিশ্চিন্ত হবে—

ব্লেড কিনে ফিরছে, অন্ধকারে একটা গাড়ির আলো এসে পড়ল সামনের বড় রাস্তায়—বহুদূর পর্যন্ত। আর তাতেই চোখে পড়ল আগে-আগে যাচ্ছে চাকলাদারের বড় গাড়িখানা—যেটা আজই পুরী চলে যাওয়ার—এবং এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

তবু সন্দেহ থাকতে পারত একটু—কিন্তু পিছনের গাড়িখানা আর একটু এগিয়ে গেছে। আরও জোর আলো গিয়ে পড়েছে সামনের গাড়িতে। না, ভুল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই গাড়িই। এমনকী ভেতরে পরেশ চাকলাদারের মাথাভর টাকটাও দেখা যাচ্ছে দিব্যি।

সকালেই যে পুরী যাচ্ছিল সে এখনও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মানে যাওয়ার কথাও ছিল না, ইচ্ছাও না। জেনেশুনেই মিছে কথা বলেছে লোকটা।

না, লোকটার চালচলন ক্রমশই যেন কেমন-কেমন হয়ে উঠছে।

বউদির ধারণা দেখা যাচ্ছে একেবারে অমূলক নয়। মেয়েরা মানুষ চেনে অনেক বেশি সহজে, নিজেদের সহজ বুদ্ধিতে চেনে বলে চেনাটাও সোজা—পুরুষেরা অনেক বিবেচনা ভদ্রতার পাকে বাঁধা থাকে বলেই দেরি হয়।

কিন্তু বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ওর একটা খটকা লাগল। গাড়ির নম্বরটায় তখন তত নজর দেয়নি, মনেও হয়নি কথাটা—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা চাকলাদারের সে-গাড়ির নম্বর তো নয়। তবে কি সে ভুলই দেখল? পরেশবাবুর গাড়ি নয় ওটা?...তাই বা কেমন করে হবে! ডান দিকে ওই যে একটু রং-ওঠা দাগ, মিঃ চাকলাদারের টাক—সবই তো মিলে যাচ্ছে। নম্বরটাই হয়তো কী

BanglaBook.org

দেখতে কী দেখেছে। অত তাড়াতাড়ির মধ্যে, তা ছাড়া নজরটা ছিল আরোহীর দিকেই—।

বাড়ি ফিরে স্নান করে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে বসতেই যেন রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে এল চোখে।

চোখেরও অপরাধ নেই, কাল রাত্রে ট্রেনে একটুও ঘুম হয়নি। স্লিপার নামেই, সারারাত দুটি মহিলা বকর-বকর করতে-করতে এসেছেন, নিজেদের বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি, জামাইরা মেয়েদের কত বাধ্য, আর বউগুলো ছেলেদের পর করে নিচ্ছে—মোটামুটি এ-ই বক্তব্য। এ ছাড়া একজনের ছেলের অসুখ; বাচ্চাটা সারারাত কেঁদেছে প্রায়।

একটা লোক—বোধহয় তার ঘুম হয় না রাত্রে—প্রত্যেক স্টেশনে দরজা খুলে নামছিল। কোনও কিছুই কেনার নেই। দেখারও না, অত রাত্রে কী-ই বা দেখবে? অথচ ট্রেন থামামাত্র সে এত ব্যস্ত হয়ে নামছে, যেন কী প্রচণ্ড দরকার। পাছে অবাঞ্ছিত কেউ উঠে পড়ে সেই ফাঁকে—নলিনাক্ষকেই ঘাড় তুলে লক্ষ রাখতে হচ্ছিল, কারণ তারই ভয়ের কারণ ছিল—দেবীপদর সতর্কবাণী তামাশা কি না সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। এইভাবেই কেটেছে সারারাত, তার ওপর আজ সকাল থেকে একটানা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বিশ্রাম দূরে থাক, একমিনিট স্থির হয়ে বসতে পারেনি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা বেজে গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে—স্থির হয়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গেই। যতক্ষণ মানসিক উত্তেজনা আর উদ্বেগ ছিল, সেই টানে কাজ করে গেছে, এখন মনের রাশ একটু আলগা হতেই স্নায়ু শিথিল হয়ে আসবে—সেটা স্বাভাবিক। এর ওপর পেটে খাবার পড়লে আর কোনওমতেই জেগে থাকা যাবে না।

ঘুমনো উচিতও—কিন্তু ওই এক ঝঞ্ঝাট রইল, রাত বারোটায় দেবীপদর গাড়ি। গাড়ি কেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বললে সে-ই তো যেতে পারত। ...কী যে ব্যাপার—সত্যিই কি তার এত বিপদের ভয় আছে? নইলে ড্রাইভার ছবি দেখালে তবে সে গাড়িতে উঠবে—এত সাবধান হবে কেন দেবীপদ? আশ্চর্য! সে কার কী অনিষ্ট করে বসল এত যে, তার প্রাণ নেওয়ার জন্যে এত আয়োজন চলছে! দেবীপদর আবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি—

তন্দ্রায় দেহের সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূতিগুলোও শিথিল হয়ে আসছে। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাই। আধ ঘুমে আধ সচেতনতাতেই দেবীপদর সতর্কতা থেকে মনটা চলে গেল ছবিখানায়। সিপাইয়ের হাতের ছবি। কবেকার ছবি! খুঁজে বারও করেছে বটে দেবীপদ—

অকস্মাৎ যেন একটা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো কথাটা আঘাত করল ওকে। মুহূর্তে মনটা সক্রিয় হয়ে উঠল আবার। সোজা হয়ে উঠে বসল চেয়ারে।

সত্যিই তো, এ-ছবি দেবীপদ কোথায় পেল? নলিনাক্ষর নিজের কাছেও তো নেই। একটা স্টুডিয়োতে তোলা। ও আর ওর এক বন্ধু সুরঞ্জন, একসঙ্গে তুলেছিল। সুরঞ্জনই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার কে এক আত্মীয়র স্টুডিয়ো, তারই শখ নলিনাক্ষর সঙ্গে ছবি তুলে রাখবে।

স্টুডিয়োতেই ছিল এককপি, সেটা মনে আছে, অনেক ছবির সঙ্গে একটা শো-কেস মতো ফ্রেমে বাঁধানো, ওদের কৃতিত্বের নমুনা-স্বরূপ। এমন কিছু ছবি না, সুরঞ্জনের আগ্রহে ও অনুরোধেই তাঁরা টাঙিয়ে রেখেছিলেন। ওকেও দিয়েছিল সুরঞ্জন এককপি, সে কোথায় কবে হারিয়ে গেছে, খেয়ালও নেই।

ছবিটা মনে পড়ছে ওই জামাটার জন্যে। বড়-বড় স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, মা কিনে দিয়েছিলেন, তারই পছন্দ করা। তাঁর জীবদ্দশায় ওর জন্য ওই শেষ জিনিস কেনা তাঁর। জামাটা তারপর বৃন্দাবনে বানরে ছিঁড়ে দেয়, ওর খুব আঘাত লেগেছিল তাতে, মায়ের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেল বলে।

সেই নেগেটিভ থেকে সুরঞ্জনকে বাদ দিয়ে কেউ ছবিটা প্রিন্ট করিয়েছে। নেগেটিভটা তারা এখনও রেখে দিয়েছিল তার মানে। কিংবা ছবিটা থেকেই কেউ নতুন করে নেগেটিভ করিয়েছে—

BanglaBook.org

কিন্তু দেবীপদ এত কাণ্ড করতে যাবে কেন?

পরশুই তো তার সঙ্গে দেখা হল। সে তো কখনও ওর কাছে ছবি চায়নি। এত কাণ্ড করার কী দরকার ছিল! এসব করলই বা কবে?

আর—আবারও বিদ্যুৎ-চমকের মতোই মনে পড়ে গেল, দেবীপদই তো গত বছরে ওর ছবি তুলেছে একখানা। তার কপিও দিয়েছে, বেশ ভালো ছবি। সেটা না পাঠিয়ে এত করে এ-ছবি জোগাড় করার মানে কী?

না, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

তবে কি দেবীপদর আশঙ্কাটাই ঠিক? এটাও ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ারই একটা ষড়যন্ত্র?

শুধু দেবীপদর নাম করলে যদি ওর সন্দেহ হয়, তাই আর একটু বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা? বেশি ঘাটঘাট বাঁধবার চেষ্টা—এত কাণ্ড করে একটা ফটো জোগাড় করা!

এই 'বেশি'টাই ভুল হয়ে গেল ওদের। জামাটা যে চিনতে পারবে, অত হিসেব করেনি।

ঘুম ছুটে গেল একেবারেই। খাওয়া-দাওয়ার পর হাত-পা মেলে বিছানাতেই শুয়ে পড়ল, কিন্তু তখন আর কিছুপূর্বের সে-তন্দ্রার জড়তা কি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। একটা বই পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা বর্ণও মাথায় ঢুকল না। ওর বিপদটা যে সত্যি—দেবীপদর কল্পনা নয়—এইটে বুঝে উত্তেজনা ও অস্বস্তি, সেইসঙ্গে একটু যেন নিজের সম্বন্ধে একটা বর্ধিত মূল্যবোধ—ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেনস অফ সেলফ ইম্পর্টেন্স'ও বোধ করছে। সে-অবস্থায় ঘুমনো কি অন্য কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

সাত

এমনকী সেই তথাকথিত পুলিশ-গাড়ি চলে যাওয়ার পরও ঘুমোতে পারল না আর। কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল—গা-ছমছম করা যাকে বলে।

ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে নিজে হাতে, ছাদের দোর, সদর দরজা ভেতর থেকে তালাবন্ধ করল। নিজের ঘরের দরজাও বন্ধ করে তাতে একটা ভারি চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল, যাতে কেউ বাইরে থেকে কোনও কৌশলে খিলটা খুলে নিঃশব্দে না ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। সকাল হলে রাত্রের এই ভয় পাওয়ার কথা মনে পড়ে লজ্জা করবে—তা জানে, কিন্তু এখন এই ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে যে বিন্দুমাত্র ঘুমের সম্ভাবনা থাকবে না, সেও সত্যি। সহজ সত্যকে সোজাসুজি মেনে নেওয়াই ভালো।

গাড়ি ঠিক রাত বারোটায় এসেছিল। একজন পুলিশের উর্দিপরা ড্রাইভার এসে দরজার বেল টিপে স্যালিউট করে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে সেই ছবি। নলিনাক্ষ যথেষ্ট আত্মীয়কভাবেই তাকে এসে ভেতরে বসতে বলেছিল। ইচ্ছে ছিল ভেতরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুলিশে খবর দেবে। সি.বি.আই. অফিসেও খোঁজ করবে দেবীপদ এসেছে কি না।

কিন্তু ড্রাইভারটি খুব হুঁশিয়ার, বোধহয় এ সমস্ত পরিস্থিতি অনুমান করেই তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। সে আর-একটা স্যালিউট করে বলেছিল, 'আজ্ঞে না, গাড়িতে কেউ নেই, গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই আমাদের। আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব—এইরকম ইন্সট্রাকশ্যন আছে আমার ওপর।'

তখন ভদ্রভাবেই বলতে হয়েছিল নলিনাক্ষকে, 'আমার শরীর খুব খারাপ, এত রাত্রে যেতে পারব না। সেই কথাটাই জানিয়ে চিঠি লিখে দিতাম। তা তুমি যখন বসতে পারবে না, মুখেই বলে

BanglaBook.org

দিয়ো।'

না, লোকটা অতঃপর রিভলভার কি ক্লোরোফর্ম প্যাড বার করেনি, অভিনয় সম্পূর্ণ করতে আর-একটা স্যালিউট করে চলে গিছল শুধু।

আরও সেইজন্যেই ঘুম আসেনি চোখে। কে এরা, তাকে জালে জড়াতে চায়, কী এদের মতলব, কতদূর পর্যন্ত তারা যেতে প্রস্তুত, সত্যিই তাকে খুন করবে কি না—এইসব এলোমেলো গা-শিরশির-করা চিন্তাতেই রাত কেটে গিছল।

সকালবেলার জন্য আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

চা খেয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে যাবে—ইদানিং-অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক এসে পৌঁছল, 'ভাই নলিনাক্ষবাবু, বাড়ি আছেন না কি? আমি মধুসূদন সমাদ্দার।'

অগত্যা দোর খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হল। তবে খুশি যে হল না কিছুমাত্র, সেটাও মুখভাবে গোপন করার চেষ্টা করল না। শুষ্ক বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ? হাতে ব্যাগ, স্টেশন থেকে সোজাই না কি?'

ওর মুখভাবের বা কণ্ঠের বিরসতার মতো তুচ্ছ জিনিস দিয়ে মাথা ঘামাবেন, মধুবাবু তেমন দুর্বলচিত্ত মানুষ নন। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা সাবধানে একপাশে রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ে 'ফোঃ' করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন, 'আর বলবেন না। আপনার বৌদি যা কান্নাকাটি করছেন, আর স্থির থাকা যায় না। ...হ্যাঁ, স্টেশন থেকে সোজাই, অন্য কোনও কাজ তো ছিল না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই—আজই আবার ফিরব—হেঁ হেঁ, ও-ব্যাগে একটা গামছা, লুঙ্গি, একখানা বিছানার চাদর আর একটা ফুলনো বালিশ—হেঁ হেঁ, একটু চা বলুন বরং, সোজাই আসছি তো—আজকাল এত ভোরে পৌঁছয়—পথেও কোথাও দাঁড়ায় না গাড়িখানা, চা-ফা আর জোটেনি—'

'তা বউদিই বা পাঠালেন কেন? আপনি এসে আর কী করবেন? এতদিনে যা কেউ পারল না, আপনি এসে তাই করে দেবেন?'

বিরক্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও।

'না-না। পাগল, তাই কখনও পারি। হেঁ হেঁ, এ তো আর ম্যাজিক নয় যে টুপির মধ্যে থেকে মেয়েটাকে বার করে দেব! না-না, বউদিও পাঠাননি ঠিক। ইনফ্যাক্ট আমিই এসেছি। আসলে আমি বড় টেন্ডার-হার্টেড—বুঝলেন না, মেয়েদের কান্না-ফান্না—।'

একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন মধুবাবু। কিন্তু তখন নলিনাক্ষর হাসিও ভালো লাগছে না। বিশেষ তার তখন মনে হচ্ছে সবটাই কৃত্রিম। সে আবারও তেমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আসল প্রশ্নে ফিরে এল, 'তা আপনি কী করতে চান এখন? আপনার কোনও প্ল্যান আছে?'

কিছু না। কিছু না। আমার এমনকী বিদ্যাবুদ্ধি বলুন যে, আপনারা এত মাথা-মাথা লোক যা পারছেন না, আমি অমনি একটা চটপট প্ল্যান বাৎলে তাই করব, আপনাদের ওপর টেক্কা দেব! ...আমি জাস্ট—যদি কিছু না মনে করেন, একটা টিপস দিতে চাই। বেলেপুকুর মরিয়া জানেন তো? কখনও গেছেন? ওই যে গ্যাস-ক্রিমেটোরিয়ামটা আছে—পার্ক সার্কাসেরই দিব্যটা আর কি—যাননি কখনও? ধুস মশাই, গেছেন নিশ্চয়, খবরের কাগজে কাজ করেন, সাহিত্যিক লোক—কত ঘোরেন।...ওইখানে কিছু ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি আর মুসলিম ব্যাদড়ের বাস। আছে কইকী, ভালো লোকও বিস্তর আছে, যত ভালো মিস্ত্রী সবই তো ওইখানে। খুব বিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত—তা নয়, ওইখানেই কোথাও, মশাই, এই ছেলে-চালানের কারবার হয়, আমি জানি। পারেন একটু তলে-তলে খবর নিতে? মানে খবর যে নিচ্ছেন তা যেন না কেউ জানতে পারে। গোখরো সাপ নিয়ে খেলা, মনে রাখবেন—'

BanglaBook.org

অসহিষ্ণুভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে নলিনাক্ষ বলল, 'এ-খবরটা আপনি জানেন, অথচ পুলিশ জানে না? আশ্চর্য তো!'

কণ্ঠের ব্যঙ্গটা প্রচ্ছন্ন থাকে না বলাই বাহুল্য।

ওই তো ব্রাদার! অবিশ্বাস করছেন, ভাবছেন আমি গুল ঝাড়ছি। আরে মশাই, মহাভারত পড়েছেন? ইটস এ গ্রেট বুক। পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় লেখা হয়নি এমন বই—হোলি স্যাংস্ক্রিটে যা হয়েছে—পড়েছেন তো? চক্রব্যূহ করে কৌরবরা রেডি—এসো, লড়ে যাও কে আসবে, বেগতিক দেখে অর্জুন ভায়া সরে পড়েছেন একদিকে—তা হোক, বলি এদিকেও তো মহা-মহা রথীরা ছিল, কই কেউ পারল? শেষে কার শরণাপন্ন হতে হল—না অভিমন্যুর, এ মিয়ার ল্যাড অফ সিকসটিন! দো ম্যারেড—হি'জ নাথিং বাট এ বয়। তাই না? করেক্ট্ মি ইফ আই অ্যাম রং! বলুন ঠিক কি না?'

'তা বেশ তো, পুলিশকেই এ সাজেসশ্যনটা দিয়ে আসি।'

'খেপেছেন! পুলিশের চোদ্দোগুষ্টিকে চেনে ওরা। সাদা পোশাকেই যাক আর খাকিতেই যাক,—পুলিশ ও পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে গেলেই ভোজবাজির খেলা হয়ে যাবে—উধাও। স্রেফ ইভাপোরেট করবে। বুঝলেন না? ...না-না, এ হল লখিন্দরের আয়রন রুম, সরু সুতোর মতো সেঁধুতে হবে, বড়-বড় কেউটে-গোখরোর কাজ নয়। বলি পড়েছেন তো বেউলোর ফেবলস? মনে আছে পরীক্ষিতের কথা—এগেন আই রেফার টু দ্য গ্রেট বুক—চারদিকে কড়া পাহারা, ফলের মধ্যে ঢুকে বসেছিল তক্ষক, কে ধরবে? ...না মশাই, শিশুর মতো ইনোসেন্ট অথচ ইনকুইজিটিভ—এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। পুলিশ-ফুলিশের কম্ম নয়, পারলে আপনি পারেন। কাউকে বলবেন না। জানাবেন না। মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ—"চন্দ্রগুপ্ত" নাটক দেখেছেন? গ্রেট ম্যান চাণক্য—তারই কথা। মন-মন-কাজে খোঁজ করতে শুরু করুন। তবে ওই যা বললুম, খুব সাবধান। ডেঞ্জারাস গ্যাঙ। সাপের চেয়ে সাংঘাতিক। শুনেছি ওর মধ্যে ইংরেজ আছে, ইহুদি আছে, মোসলমান, মারোয়াড়ি, বেহারি, জাপানি—সব আছে। মনে রাখবেন—ইউ হ্যাড বীন ওয়ার্নড, ডোন্ট সে দ্যাট আই ডিড নট এক্সপ্লেন টু ইউ দ্য পসিবিলিটি অব ডেঞ্জারস।'

এবার নলিনাক্ষ একটু নরম হল। লোকটা যা-ই বলুক, একটু যে জানে তাতে সন্দেহ নেই। সে বলল, 'বেশ তো, চলুন না, দুজনেই যাই?'

'আমি?' যেন আঁৎকে উঠলেন মধুবাবু, 'মশাই, আমি ছাপোষা লোক, জেনেশুনে ও বাঘের গর্তে পা বাড়াতে রাজি নই। বাপ রে! না-না, ও কাজে আমি নেই। ইয়েস আই অ্যাম এ কাওয়ার্ড, স্বীকার করছি। না-না, আমার গন্ধও না পায়। দোহাই আপনার—প্লিজ! উপকার করতে এসেছিলুম বলে আমার আবার নামটি করে বসবেন না। কারও কাছেই না—খুব আপনার লোকের কাছেও না। বাতাসে কান পেতে থাকে ওরা। টের পেলেই গলাটি কচ। কাটপ্রোট! কাটপ্রোট! ওরা কি মানুষ? ওরা সব পারে।

তারপর একটু থেমে, অকারণেই রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবারও একটা 'ফোঃ' শব্দ করে বললেন, 'শোনেননি, এই কালকের কাগজেই বেরিয়েছিল প্রতাপগড়ের কাছে এক জায়গায় একটা লোক হায়নার চামড়া পরে—? দেখেননি? বাচ্চাদের রক্ত বার করে নিয়ে বিক্রি করত! তারপর কামড়ে-খিমচে এমন করে রেখে যেত—সবাই ভাবত হায়নাই সেটের রক্ত খেয়ে গেছে। দাঁতের দাগ পর্যন্ত করে রাখত। ...এইখানে যতীনদাস রোডে আমার জানাশুনো এক পেয়ার—বোথ দ্য হাসব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, দুজনেই আপিস যেত—এই এক মেয়েদের আপিস করা হয়েছে মশাই, হোম-লাইফ ফ্যামিলি-লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাচ্চাটা থাকে ঝিয়ের কাছে, দিন-দিন রোগা হয়ে যায়। এরা বোঝে না, কেবল ভালো-ভালো টনিক খাওয়ায়, খাবার খাওয়ায়—কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে পাড়ার এক তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক বুড়ি লক্ষ করে যে—এরা বেরিয়ে গেলে

BanglaBook.org

দু-একদিন অন্তর কারা এসে রক্ত বার করে নিয়ে যায়, বিক্রি করে। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে—কী পিশাচ এরা ভাবুন তো! কাইন্ড-হার্টেড—চোর-ডাকাতেরা এদের কাছে মহাপুরুষ! আমেরিকায় শুনেছি আগে এক রক্তচোষা বাদুড় ছিল, তা তাদের খাদ্যই ওই, এরা মশাই টাকার লোভে—বুঝলেন না। এরা আরও খারাপ, আরও খারাপ।'

'তা জেনেশুনে আমাকে একা যেতে বলছেন?'

'সে আপনার রিস্ক। সেইজন্যেই তো সাবধান করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাঘের গর্তেই পা দেওয়া, বাঘের চোয়ালের মধ্যেও বলতে পারেন। আমি কিন্তু একা পুলিশ ছাড়া যেতে বলছি না। মাইন্ড ইউ—তবে এও বলছি, পুলিশ নিয়ে গেলে কিচ্ছু হবে না, পাত্তাই পাবেন না কারও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

শেষ মার যাকে বলে তাই দিয়ে—এই 'শেভিয়ান' হেঁয়ালিটি করে বিদায় নিলেন মধুবাবু। এতক্ষণ এত বকছিলেন বসে-বসে—কিন্তু এখন উঠেই চট করে ব্যাগটি হাতে নিয়ে অতি দ্রুত বাস-রাস্তার দিকে চলে গেলেন, একবার ওর দিকে আর তাকালেনও না।

দরজা বন্ধ করে ফিরতে-ফিরতে মনে পড়ল, এসেই চা চেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটাই খাওয়ানো হল না।

স্নান করতেই যাচ্ছিল বটে, মধুবাবু যখন ডাকলেন, কিন্তু এখন আর সে-কথা মনে রইল না। রঘুকে ডেকে এককাপ চা দিতে বলে স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ।

ও-লোকটা রীতিমতোই ভাবিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীও হতে পারে। এক-একজনের স্বভাব থাকে গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করা। উপকার করেই নিজের যে কিছু দাম আছে এ সংসারে, সেইটে নিজে অনুভব করে, খুশি হয়। আবার একশ্রেণীর 'সবজান্তা দাদা' থাকেন, তাঁদেরও সে-জ্ঞানটা লোককে জানানো দরকার, আর গায়ে-পড়ে না জানালে তাঁদের উপায় কী?

এও কি তাই, এই মধুসূদন সুমাদ্দারের ব্যাপারটা?

কিন্তু সেইজন্যে পয়সা খরচ করে পুরী থেকে ছুটে আসবেন? উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। কোনও বিশেষ মতলব ছাড়া মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে পরোপকার করে না।

সে-মতলবটা কী তা হলে?

ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া? সেদিন উনি জোর করে যে-বাসের টিকিট কাটালেন, সেই বাসটাই দুর্ঘটনায় পড়ল। কে বা কারা পাকা বাঁধানো রাস্তায় নালা কেটে রেখেছিল। ওই বাসটাই আসবে বলে এই কাজ করেছিল কি না কে জানে! সাধারণ লুটেরারা, গাড়ি বা লরি এই গাড্ডা দেখে থামলে লুটপাট করার জন্যেও করতে পারে, কিন্তু কই, আর তো কোনও গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে খবর বেরোয়নি কোনও কাগজে।

আবার, এই যে খবর দিতে এসেছেন—হ্যাঁ, ও-পাড়ায় ক্রিমিনালদের আড্ডা থাকা সম্ভব, তেমনি ওখানে সন্ধ্যার পর একা গিয়ে পড়লে, যদি তেমন কারও মতলব থাকে—সাবাড় করাও সোজা। একটা বিশেষ পাড়ার সন্ধান দিলে—চার ছড়িয়ে টোপ ফেলার মতো—ধরার সুবিধেও হয়। হয়তো সেইজন্যেই, ওই ফাঁদে ফেলার জন্যেই, এমন গায়ে-পড়ে খবর দিতে আসার গরজ। লোকটা হয়তো ওর সেই অদৃশ্য (এবং অকারণ, ও কার কী করেছে?) শত্রুদলের চর।

অনেক ভাবল, অনেক তোলাপাড়া, হিসেব করল মনে-মনে। যতই ভাবে ততই এই শেষের দিকের পাল্লাটাই ভারি বোধ হয়। গোড়া থেকেই লোকটাকে ভালো লাগেনি। অথচ এড়াবারও পথ পায়নি খুঁজে। খুব অভদ্রতা কি রূঢ় ব্যবহার করবে এমন অজুহাতও খুঁজে পায়নি ওঁর আচরণে।

BanglaBook.org

কিন্তু এবার যে রীতিমতোই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে ব্যাপারটা—তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। উনি এত কথা জানলেন কী করে, সেইটেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল! খুব ভুল হয়ে গেছে।

অপ্রসন্নতা ও অস্বস্তি বেড়েই যায়। ঘরের মধ্যে কোথাও বিষাক্ত সাপ আছে একটা, অথচ তাকে দেখা কি মারা যাচ্ছে না—এই অবস্থায় সেই ঘরে বাস করতে গেলে যেমন একটা সভয় অস্বস্তি থাকে—সেইরকম। অথচ কী করবে তাও ভেবে পায় না।

যথাসময়েই আপিসে গেল বটে, কিন্তু কে জানে কেন, এতটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে যেন সাহস হল না। রঘুকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়েই গেল। আপিসে পৌঁছে ধন্যবাদ দিতেই সময় কাটল। সহকর্মীরা অনেক করেছেন—চিঠিগুলো বেরিয়েছে সব, সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। ফলে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেখা করতে এলেন ওর সঙ্গে, আপিসেই। তাঁরা যে কী পরিমাণ সক্রিয় হয়েছেন—তারই একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানালেন, 'কলকাতার বাইরে চালান করার কোনও পথ রাখা হয়নি আর, অবিশ্যি যদি সেদিন সেই বিকেলের মধ্যেই চলে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা—এখন প্রত্যেকটি স্টেশন—শুধু এখানকারই নয়, ওদিকে আসানসোল এদিকে খড়্গপুর পর্যন্ত—এয়ারোড্রোম, সব ওয়াচ করা হচ্ছে, প্রত্যেক ট্রেনে লোক যাচ্ছে। আপনি তো আবার সি.বি.আই-কেও অ্যালার্ট করেছেন—'

বাধা দিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল নলিনাক্ষ, 'কীরকম? সেটা কে বললে?'

'আমরা স্যার সব খবর পাই। আপনার বন্ধু দেবীবাবু কোথা থেকে একটা নোট পাঠিয়েছেন এখানের আপিসে, টপ প্রায়রিটি দিতে ব্যাপারটাকে। আরও বলেছেন, আপনার বাড়িতেও একটু নজর রাখতে—কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা অর্থাৎ আপনার ওপর কোনও হামলা না হয়—।'

নলিনাক্ষ তখন আগের রাত্রের ঘটনাটা বিবৃত করে বলল, 'এটা আপনারা জানেন?'

ভদ্রলোক মুখে একটা 'ফিউ' ধরনের আওয়াজ করে বললেন (বোধহয় বিলেত থেকে শিখে এসেছেন এ-মুদ্রাদোষটা), 'আমার রিপোর্ট হচ্ছে, গাড়ি একখানা এসেছিল বটে, তা থেকে পুলিশের উর্দিপরা একজন লোকও নেমেছিল, তবে একমিনিট কথা বলেই চলে গেছে। আমরা ভেবেছি সি.বি.আই. থেকে কেউ এসেছিল। ...বাই জোভ! আপনি তো ভাবিয়ে দিলেন দেখছি! হাউ ভার, এটা বলে ভালো করেছেন। আমি চেক করছি ব্যাপারটা।'

তিনি যথারীতি নমস্কারাদি করে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবে বলে তৈরি হচ্ছে, লালবাজার থেকে আবার একটি ফোন।

'হ্যালো, নলিনাক্ষবাবু! আমি লালবাজার থেকে বলছি। মধুসূদন সমাদ্দার বলে কাউকে চিনতেন?'

'কেন বলুন তো? চিনতুম মানে—অল্প দু চারদিনের আলাপ। আমরা পুরী গিছলুম, পিছনের বাড়িতেই উনি ছিলেন। সেই সূত্রেই আজ সকালেও একবার দেখা করতে এসেছিলেন। কোনও বিশেষ পরিচয় ছিল না। কেন, কী ব্যাপার জানতে পারি না?'

'পারেন বইকী। সল্ট লেকের যে জমিগুলো রিক্লেমড হয়েছে, তারই একটা মাঠের মধ্যে তাঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে, একটু আগে। পকেটে একটা সাধারণ ধরনের নোটবই ছিল। তারই মধ্যে একটা কাগজের টুকরোতে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা—।'

'হ্যাঁ, আমিই লিখে দিয়েছিলুম পুরী থেকে আসার আগে। উনিই চেয়েছিলেন। তা ডেডবডি—মানে অ্যাকসিডেন্ট?'

'না, সেখানে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই। এক যদি হওয়ার পর কেউ এনে ফেলে দিয়ে না থাকে। মার্ডার বলেই সন্দেহ হচ্ছে।'

BanglaBook.org

আট

অতঃপর আর মধুবাবুর আন্তরিকতা—'বোনাফাইডি'তে সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকে না। যে বাঘের গর্তের কথা অত করে বলে সাবধান করে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক ওকে—তাঁরই ভাষায়—টিপস দিতে এসে—সেই গর্তে নিজেই যে পা দিচ্ছেন তা জানতেন না।

ওকে বাঁচাতে গিয়েই নিজের জীবনটি দিলেন হয়তো।

আসলে উনি কিন্তু সেই মেয়েটার কথাই ভেবে এসেছিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে তা জেনেও।

সেই কারণেই, তাঁর ইঙ্গিত দেওয়া পাড়ায় যেতে একটা ভয় করে। অমন ঘাগী লোকই ঘায়েল হয়ে গেল, তার মতো আনাড়িকে তো ছারপোকা মারার মতো মেরে ফেলবে। সবচেয়ে বড় কথা—শত্রু কে, কেন শত্রু, সেটা জানা থাকলেও সাবধান হওয়া যায়, সেইটেই যে বুঝতে পারছে না।

এধারে একটির পর একটি দিন কেটে যাচ্ছে, না ফিরছে দোলা, না পাওয়া যাচ্ছে তার কোনও খবর। রথীনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছেন একেবারে।

অনেক ভেবে আবার একদিন চৌরঙ্গী তালতলার মোড়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। আজকাল কোনও-কোনওদিন ট্যাক্সি করে আসে, এলেও খানিকটা এসে নেমে পড়ে, আবার বাস ধরে। কোনওদিন বা সবটাই বাসে আসে। আজও তাই এসেছে।

বাস থেকে নেমে নিজের অজ্ঞাতেই একবার যেন উৎসুকভাবে চায়, বুঝি সেই খোঁড়া ছেলেটাকে খোঁজে—বেঁচে নেই জেনেও। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাস্তায় নেমে আসে, চারিদিকে চেয়ে দেখে। পুরনো, মানে আগে দেখা ভিখিরিদের মধ্যে সেই গন্নাখ্যাঁদা লোকটা আছে আজ। নাকের কাছে বিরাট একটা গর্ত, ওপরের ঠোঁটও কাটা, বড়-বড় কটা দাঁত বেরিয়ে আছে সামনে—বীভৎস দৃশ্য। একটা হাতও কাটা লোকটার, কনুই থেকে। বাকি হাতটায় লোহার বালা একগাছা, মাথাতে সামান্য একটু চুল চুড়ো-বাঁধা, গালে অল্প-অল্প দাড়ি। দেখলে মনে হয়, শিখ সাজারই চেষ্টা আছে একটা।

সেও অমনি আধা-চলতি বা দাঁড়ানো গাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

নলিনাক্ষকে একটু নিরাপদ জায়গায়ে গিয়ে দাঁড়াতে হল। তার ফল হল এই যে, লোকটা এদিকে আর চায়ই না, তার সব নজরটাই গাড়ি আর গাড়ির আরোহীদের দিকে। যাই হোক, নলিনাক্ষও পকেট থেকে একটা দশ নয়া বার করে প্রস্তুত ছিল, একবার এদিকে চাইতেই সেটা দেখিয়ে ইশারা করল।

ছুটেই এল লোকটা। পয়সাটা হাত থেকে নিয়ে আবার ওদিকে ফিরছে, নলিনাক্ষ বলল, 'দাঁড়াও, আরও পয়সা দেব।'

একটু অবাক হয়েই এদিকে তাকাল লোকটা, এবার দৃষ্টিতে একটু সন্দেহের ছায়াও। অন্তত নলিনাক্ষর তাই মনে হল। সে এবার একটা টাকা বার করে দেখাল। বলল, 'এইটে দেব। তুমি আমার ক'টা কথার জবাব দেবে?'

সে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, 'আমাদের বাবু ছুটোছুটি করে ভিক্ষে করতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ তো কথা কইতে পারব না। কী বলবেন, চটপট বলুন।'

'এইখানে একটা কালো মতো খোঁড়া ছেলে ভিক্ষে করত, কেলো নাম—সে কোথায় গেল বলতে পারো?'

লোকটার বীভৎস মুখ ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠল। বলল, 'জানি না।' বলে চলেই যেত, কিন্তু একটা টাকার মায়াও কম নয়। তাই যেতে গিয়েও ইতস্তত করতে লাগল।

BanglaBook.org

সময় নেই বেশি তা নলিনাক্ষ বুঝল। সেও সোজা আসল প্রশ্নে চলে এল, 'তোমার এমন হাল হল কেন? কেউ করেছে, না অ্যাকসিডেন্ট!'

'ছোটবেলায় ঘা হয়েছিল। ডাক্তার কেটে দিয়েছে।'

'সে না হয় নাকে হতে পারে। হাতটা?'

'গাড়িতে কাটা গিছল।'

তারপরই হিসহিসিয়ে উঠল লোকটা, 'সরে পড়ো দিকি। এখান থেকে চলে যাও। আর এমনধারা শয়তানি করতে এসো না। নিজেও মরবে—আমাদেরও মারবে।

সে আর পুরো ওই একটা টাকার মায়াও করল না, প্রায় ছুটতে-ছুটতে গিয়েই ভিড়ে মিশে গেল।

অর্থাৎ সেই একটা আকারহীন পরিচয়হীন বিপদের ইঙ্গিত।

ভয় নয়—আজ যেন বিরক্তিই বোধ করতে লাগল নলিনাক্ষ। এমন করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করার থেকে বিপদকে চ্যালেঞ্জ করাই ভালো। তা-ই করবে সে।

আপিসে আসতে দেরি হয়ে গিছল এমনিতেই, তবু তখনই নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না। জানে কিছুই কাজ নেই। থাকলেও সে একঘণ্টার ব্যাপার। ঘুরতে-ঘুরতে নিউজ-রুম বা নিউজ-হলেই গিয়ে পড়ল।

সেখানে যে মুখরোচক বা উত্তেজক কোনও প্রসঙ্গর আলোচনা চলছে—তা বাইরে থেকেই টের পেয়েছিল, এখনও ঢুকতেই সকলে মিলে সেদিনের মতো 'এই যে!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নলিনাক্ষ জোর করেই হালকা হতে চেষ্টা করে। বলে, 'দেখি ধীরেনদা, একটা আপনার ওই গাঁজা-মার্কা সিগারেট। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

গৌরীবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমরা জানতুম স্মাগলারদের রাঘব-বোয়ালরা সব শহর বোম্বাইমে রহতা হ্যায়। এখানে থাকলেও চুনো-পুঁটি, বড় জোর খলসে। তুমি বাবা তোমার পাড়াতে এই চীজ জাইয়ে রেখেছিলে এতদিন ছিপায়কে-ছিপায়কে—তাও রাঘব-বোয়ালও নয়, একেবারে তিমিমাছ...হোয়েল।'

'কীরকম? সে আবার কী? তাও বলি তিমিমাছ জাইয়ে রাখা যায় না—কৈ-মাগুরই থাকে।'

'না বাবা। তিমি না হলেও হাঙর-কুমির তো বটেই।'

'কিন্তু মানুষটা কে—তাই যে শুনলুম না ছাই।'

'বলি পরেশ—পরেশ চাকলাদার, তোমার পাড়ায় থাকে তো—না কি?'

'তা থাকে। কিন্তু সে আবার কী করল?' এবার আর তামাশার সুর বজায় রাখতে পারে না নলিনাক্ষ। হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টেলিপ্রিন্টারের কাগজটার ওপর।

দেখল কথাটা ঠিকই। পরেশ চাকলাদার ধরা পড়েছে। ওই পরেশ চাকলাদারই যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঠিকানাও মিলে যাচ্ছে, তা ছাড়া অ্যারেস্ট করা হয়েছে, পুরী, চক্রতীর্থর কাছ থেকে। সেখানেই তার শোওয়ার ঘরে তিন লাখ টাকার মতো সোনা পাওয়া গেছে, সোনার বিস্কুট, বিদেশি ছাপ-মারা। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে গাড়ির লাইনিংয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য। চাকলাদারকে আপাতত ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সম্ভবত কলকাতায় আনা হবে।

লোকটাকে দেখতে পারত না, এ ঐশ্বর্য সোজা-রাস্তায় আসে না তাও জানে—তবু নলিনাক্ষ

BanglaBook.org

যেন একটা প্রচণ্ড হতাশা বোধ করে।

আসলে, যে-সন্দেহটাকে এতদিন মনে-মনে লালন করছিল, যেটাকে কেন্দ্র করে ওর তাবৎ জল্পনা-কল্পনা, সেইটেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। আবার নতুন করে সমস্ত প্রশ্নটা ভাবতে হবে।

দুটি লোককে সন্দেহ করছিল—দুটিই গেল। এখন কে?

শত্রু জানা থাকলে, দৃশ্য হলে তবু বোঝা যায়, অলক্ষ্যে থাকলেই ভয় বেশি।

দেবীপদটাও যদি এখানে থাকত। হয়তো সে-ই ধরাল পরেশবাবুকে। কিন্তু এখনও কী করছে সেখানে? আরও কেউ বাকি আছে? যাবে না কি আর-একবার পুরীতেই? সেখানে অন্ধকারে বিপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যদি সে ছুটে আসে। এখানেই বা কে থাকে, সেও তো একটা সমস্যা। রঘুর ওপর ভরসা করে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া দাদাকে জরুরি খবর দিয়ে না-হয় আনানো চলত —দাদা এলে তাঁকে রেখে সেইদিনই রওনা দেওয়া চলত—কিন্তু এ তো শুক্লপক্ষ চলছে। অত আলোয় দেবীপদ বেরোবে না।

কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না।

শূন্য ক্লান্ত মনেই বাড়ি ফিরল সে। সত্যিই কেমন একটা বিমূঢ় অবস্থা তার। কিছু ভাবতেও পারছে না গুছিয়ে। পরামর্শ করবে এমনও তো কেউ নেই। সকলকে সব কথা বলা যায় না।

শুধু এইটে বুঝতে পারছে—কোনও জ্ঞাত তথ্য থেকে নয়, যাকে ষষ্ঠানুভূতি বলে তাইতেই —যে, সময় আর মোটে নেই। যেন চারিদিক থেকে একটা জাল গুটিয়ে আনছে কে।

অদৃশ্য অথচ অনুভূতিগোচর চক্রান্ত ও অনিষ্টের জাল। হয়তো বা মৃত্যুরই ফাঁদ সেটা।

রাত্রে দাদা ফোন করলেন, তাঁর ছেলে অর্থাৎ নলিনাক্ষর আপন ভাইপোকে সেইদিনই সন্ধ্যায় মন্দির থেকে কে একজন সরিয়ে নিয়েছিল।

ওঁরা বিমলার মন্দিরে ঢুকেছেন, সে যে যায়নি ভেতরে অত কেউ লক্ষ করেননি—বেরিয়ে এসে দেখলেন নেই। চেঁচামেচি কান্নাকাটি পড়ে গিছল, একটা আধপাগলা ভিখিরি আনন্দবাজারে ঢোকার মুখে বসে ছিল, আপনমনে বিড়বিড় করে বকছিল—সেই-ই হঠাৎ উঠে একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিতে-দিতে এসে ওর দাদার হাতটা ধরে ইঙ্গিত করে—অতিরিক্ত অসংখ্য যেসব ছোট-ছোট মন্দির আছে বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঁচিলের ধারে—তারই একটার দিকে।

ছোট, মনে হয় বহুদিনের পরিত্যক্ত মন্দির। পাণ্ডার ছড়িদার যেতে চাইছিল না, ওর দাদা ছুটে গিয়ে দেখলেন একটা রোগামতো লোক ছেলেটাকে নিয়ে ওই মন্দির আর পাঁচিলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। এরমধ্যেই ছেলেটাকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। অতঃপর থানায়োর, পুলিশে দেওয়া, যা করবার সবই করা হয়েছে কিন্তু ওর বউদি খুব ভয় পেয়ে গেছেন, তিনি আর একা থাকতে চাইছেন না দাদাকে ছেড়ে। তাঁর যে ভাইয়ের যাওয়ার কথা ছিল, তার আর যাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়। অথচ গুহবাবু না এলে সকলে বাড়ি ছেড়ে আসাও উচিত মনে হচ্ছে না, 'ইট ইজ হেল্ড্ ইন ট্রাস্ট' দাদা বললেন।

অগত্যা দাদা আপিসে টেলিগ্রাম করছেন, ডাঃ দত্তকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়েও পাঠাচ্ছেন, 'সিক রিপোর্ট' যাকে বলে—অতিরিক্ত ছুটির জন্যে। নলিনাক্ষ ওঁদের জন্যে বেশি না ভাবে, যেন সাবধানে থাকে, যদি আপিস থেকে কোনও দারোয়ানকে কিছু দিয়ে রাত্রে বাড়িতে রাখতে পারে তো আরও ভালো। ইত্যাদি—

বক্তব্য শেষ করেও আর-একটি কথা বলেন দাদা। সেই পাগলটাকে বকশিশ-স্বরূপ দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি, গালাগাল দিয়েছে, ওঁর দিকে চেয়ে থুথু ফেলেছে—কিন্তু তার

BanglaBook.org

মধ্যেই একফাঁকে বলেছে, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমনভাবে বেরোও কেন, লজ্জা করে না! ঘরে রেখো, রাত্রে বেরিয়ো না আর।'

সময় ছ'মিনিটও পার হয়েছে, আর কিছু না বলে দাদা রিসিভার রেখে দিয়েছেন। নলিনাক্ষর কোনও প্রশ্ন করা কি আর কিছু জানার সময় হল না আর।

তার দাদা যতই অবাক হোন, সে হয়নি। সে বুঝেছে। আশ্বস্তও হল একটু।

এ দেবীপদরই কাজ। ওদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

দেবীপদর কাছে জীবনের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন।

নয়

পরের দিন সত্যি-সত্যিই আপিস থেকে বেরিয়ে ইলিয়ট রোডের ট্রাম ধরল সে। মধুবাবু গেছেন কিন্তু তাঁর উপদেশটা আছে; মধুবাবু মরে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ওর দলের লোক। অর্থাৎ ওর কল্যাণাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। তাই, কোনওদিকেই যখন কিছু করা যাচ্ছে না—তাঁর কথাটা শুনতে দোষ কী? অবশ্য হুঁশিয়ার করেও দিয়ে গেছেন যথেষ্ট, বাঘের গর্ত বলে গেছেন—সে যতটা সম্ভব সাবধানেই এগোবে—তবে এরকম অনিশ্চিত অনির্দেশ্য বিপদের ভয়ে দিন কাটানোর চেয়ে বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

ট্রাম থেকে নেমে আস্তে-আস্তে হাঁটছে—ঠিক কোনদিক দিয়ে কীভাবে যাবে; কী খুঁজতে এসেছে, কাকে কী জিজ্ঞাসা করবে তাও তো জানে না—বেনেপুকুরের মোড়ের মাথায় হঠাৎ বরকত আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নলিনাক্ষর মনে হল, এ ঈশ্বরেরই যোগাযোগ, মনে হল, ঠিক এইরকম একটি লোককেই খুঁজছিল সে।

বরকত আলি লোকটিকে দেখলে আগেই যে জীবটির কথা মনে আসে, সে হল শকুনি। রোগা, লম্বা, কালো, শকুনির ঠোঁটের মতোই ধারালো বাঁকা নাক, দুটি ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ চোখ। মুখের ভাব নির্বিকার, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে ঠোঁটের যে ভঙ্গি প্রকাশ পায় তাতেই বোঝা যায় যে। লোকটি নির্মমভাবেই নির্বিকার। মায়া-মমতা-দয়া প্রভৃতি দুর্বলতা বা চিত্তদোষ কখনওই ওর স্বার্থসিদ্ধিপথে অন্তরায় হতে পারবে না কোনওদিন।

বরকত আলির প্রাথমিক পরিচয় অবশ্য রাজমিস্ত্রী হিসেবেই। মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, ভালো রাজমিস্ত্রী। বুদ্ধিমান বলেই সেই সংকীর্ণ কর্ম-গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বুদ্ধিমান—এবং অত্যন্ত ফিকিরবাজ, জোগাড়েও খুব। এখন ঠিকেদারি করে, অনেক বড়-বড় কনট্র্যাক্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাছ থেকে ভালো কাজ কেড়ে নেয়। তার কারণ, যারা ওকে একবার কাজ দেয় তারা আর অন্য লোককে দিতে চায় না। কোনও জিনিসের জন্যে তাদের আর ভাবতে হয় না, কোনও কারণে, কোনও অবস্থাতেই বাড়ির মালিককে বিরক্ত করে না। আপনি রাতারাতি একটা গোটা ঘর বদলে অন্যরকম অন্য ছাঁদে করবেন? তাই হবে, বরকত আলি তো আছেই। শুধু টাকাটা ঠিকমতো দিয়ে গেলেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এইটেই হচ্ছে বরকত আলির চরিত্রের প্রধান দোষ বা গুণ। টাকার জন্যে না পারে এমন কাজ নেই, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কেউ যথেষ্ট টাকা দিলে নিজের হাতে পায়খানা সাফ করবে ও, অম্লানবদনে। টাকা না দিয়ে একটু সামান্য কাজও করানো যাবে না। তবে একবার হাত পেতে টাকা নিলে সে-কাজ—ততটুকু টাকার মতো কাজ—করে দেবেই সে।

BanglaBook.org

নলিনাক্ষ ওকে দিয়ে বহুবার টুকরো-টাকরা বহু কাজ করিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও অনেককে ওর কথা বলে দিয়েছে। ফলে ওর সঙ্গে এতদিনে একটু বন্ধুত্বের মতোও হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা-তামাশা, রসিকতাও চলে দেখা হলে। যেখানে টাকার প্রশ্ন নেই, সেখানে বরকত আলি সহৃদয় সহজ মানুষ, রস-রসিকতা সে-ও করে এবং বোঝেও।

প্রাথমিক বিস্ময় প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নের পর নলিনাক্ষ হাত ধরে টানতে-টানতে একপাশে নিয়ে গিয়ে একেবারে একশো টাকার একখানা নোট পকেটে গুঁজে দিল। কী দিল তা খুলে দেখার প্রয়োজন নেই বরকত আলির, ও যেন গন্ধতে বুঝে নেয় কে কত টাকা দিচ্ছে। নলিনাক্ষ কত দিল সে-কথা না বলে 'আরও দেব আমার কাজ উদ্ধার হলে' বলল শুধু।

বরকত আলির প্রশান্ত মুখে একটি রেখাও ফুটল না। যেন সে নলিনাক্ষকে এবং এই প্রস্তাব আশাই করছিল, এমনি ভাব তার। শুধু প্রশ্ন করল, 'কাজটা কী?'

বলল নলিনাক্ষ। ভরসা করে বলেই ফেলল। কাউকে না-কাউকে তো বলতেই হবে, যদি খোঁজ করতে হয়। বরকত তো তবু পরিচিত লোক। টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে বেইমানি করেছে এমন শোনেনি আজও। আর যাকে বলবে সে কেমন হবে তা কে জানে।

সব শুনে বরকত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে। তারপর বলল, 'কাজ করে দিলে আরও দেবেন বলছেন; এ যা কাজ—যদি বা আমি করেও দিই, করার পর আমি নেবার জন্যে বা আপনি দেবার জন্যে জিন্দা থাকবেন কি না জানি না। নগদটাই বুঝি আমি। এ যা বলছেন একটা আড্ডা নয়, একটা দলও নয়। এমন অনেক। দুনিয়াময় ছড়িয়ে আছে। অবশ্যি এদের একটা আড্ডা আমি জানি, দেখিয়েও দেব কিন্তু টাকা আগাম চাই।'

বরকত আলির চক্ষুলজ্জা আছে—বা প্রয়োজনের সময় অপরের মনে তার কোন কথার কী প্রতিক্রিয়া হবে—তা বিবেচনা করে মোলায়েম 'চিনি মণ্ডিত' করে কথা বলবে—এমন অপবাদ তাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না।

নলিনাক্ষও তা জানে, ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে, 'কত টাকা?'

'একহাজার টাকা। একহাজার টাকার আমার খুব দারকার। কালকের মধ্যে চাই। আমি আমার জামাইকে পাঠাব ধার চাইছি বলে, আপনিও সেইভাবেই তার সঙ্গে কথা কইবেন, ভেতরের কথা বলার দরকার নেই। তারপর কাল এমনি সময় এখানে আসবেন, আমি ওই গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনার দিকে চাইব না, আপনিও আমার সঙ্গে কথা বলবার বা কিছু ইশারা করার চেষ্টা করবেন না—তা হলে আপনিও মরবেন, আমিও মরব। আপনি এলেই আমি ঠিক দেখে নেব, ভাববেন না। আমার কাঁধে একটা ছাতি থাকবে, আমি গলিতে ঢুকব, আপনি একটু দূর থেকেই আমার পিছু নেবেন। যে বাড়ির সামনে গিয়ে ছাতিটা নামিয়ে আবার তুলব—। কাঁধে—ছাতির ডুগাটা হেলিয়ে দেখিয়েও দেব—সেই বাড়ি জানবেন।'

তারপর একটু থেমে, মুখের আনত অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে কপিশ শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিয়ে গলাটা আর একটু নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিও থামবেন না, আমিও থামব না। ওদিকে খানিকটা গিয়ে আমি ডাইনে চলে যাব, আপনি আর কিছুটা গেলে বড় রাস্তায় পড়বেন। তখনই সে বাড়িতে যাওয়ার কি খোঁজখবর করার চেষ্টা করবেন না, ফিরেও আসবেন না। বাড়ি-ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরের দিন কেন, অমন পাঁচ-সাত দিন পরে এলেও চিনতে পারবেন।...'

আরও একটু থেমে হুঁশিয়ারির সুরে বলল, 'তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি, এ ধরনের কারবারের কথা শুনেছি, আর কিছু জানি না। আমার মামা সওকৎ ওই বাড়িতে একবার কাজে গিছল, সামনে একটা বাড়ি, এটা দোতলা, পিছনে তেতলা বাড়ি আছে একটা, এ-বাড়ি দিয়েই সে-বাড়ি যেতে হয়—। সামনের বাড়িতেই কাজ ছিল, ওর তো সবতাতে নাকগলানো অভ্যেস—একবার একফাঁকে ভেতর-বাড়িটায় ঢুকে গিছল—একটা

BanglaBook.org

ফুটো দিয়ে দেখেছে, একটা ঘরে অনেকগুলো বাচ্চা, সার-সার ঘুমোচ্ছে। ও অত বুঝত না। কিন্তু যে ডেকেছিল ওকে, তার কীরকম সন্দেহ হয় একটা, অনেক জেরা করে যে ভেতরের ওই বাড়িটার দিকে কখনও কোনও সময় গিছল কি না। সওকৎ বলে, বাপরে, সে যা জেরা, উকিলের বেহদ্দ। তাতেই আমার কেমন মনে হয়েছিল—এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওগুলো সেই সব চোরাই বাচ্চা। ঘুম নয়—আফিং ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে।'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ যেন বাড়ি মেরামতের হিসেব দিতে লাগল, 'ইট ধরুন তিন হাজার, মাটি একটন—এ তো লাগবেই। তা ছাড়া ধরুন, বালি আছে লোহা আছে, দরজা-জানলা—পুরনো কিনলেও এক-একটা একশো টাকার কম নয়। আপনি যতই যা বলুন, চার হাজারের কমে ও ঘর নামবে না।

নলিনাক্ষ অবাক হলেও এক্ষেত্রে যে বিনা মতলবে বরকত কিছু বলছে না—সেটুকু বোঝার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি তার নষ্ট হয়নি। অনেক কষ্টে, মনোযোগ দিয়ে হিসাবটা বোঝার চেষ্টা করছে, সেই ভাবটা বজায় রেখে আড়ে চেয়ে দেখল একটা মোটামতো লোক হেলতে-দুলতে একেবারে ওদের পাশ দিয়েই চলে গেল। অকারণেই—ওদিকে ঢের জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও।

সে-লোকটা চলে গেলে আবার তেমনি প্রশান্ত মুখেই—পিছন ফিরে কি এপাশ-ওপাশ না তাকিয়েই আগের কথার খেই ধরল বরকত, 'বাড়িটাতে বেশি লোক থাকে বলে কেউ জানে না, একটি লোক—নিয়মিত যেন কাজে বেরোয়, কাজ থেকে ফেরে, হিন্দুস্থানী লোক মধ্যে-মধ্যে—মধ্যে-মধ্যে কেন বেশিরভাগই—পুলিশের পোশাক পরে বেরোয়, তাতেই সকলে ধরে নিয়েছে পুলিশে কাজ করে। মধ্যে-মধ্যে সিপাইয়ের পোশাক পরা লোকও আসে, হেঁটে, সাইকেল করে—আপিসের চিঠি নিয়ে যেমন আসে সাধারণত তেমনিই—। কিন্তু আমার ভাগ্নে বাহার বলেছে আমাকে, একবার তার সামনে একদিন পড়ে গিছল, দুজন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে বাহার চেনে—তার চোদ্দোপুরুষে কেউ পুলিশ নয়, চোরাই ভাঙ-গাঁজা-কোকেনের কারবার করে। আরও আছে, অনেক ব্যাপার। বাহার সামনের বাড়িতে যায়, ওর সব অনেকরকম কাজকাম আছে—সে থাক, ও লক্ষ করেছে অনেক জিনিস। বাজারহাট আসে, লোকে মাথায় করে নিয়ে আসে। অনেক মাল আসে এক-একদিন কিন্তু তবু গাড়ি আসে না। বাড়ির মেয়েদের কেউ দেখেনি, তবে এক-আধদিন গভীর রাত্রে মাথায় কাপড় দিয়ে বেরোতে কি ঢুকতে দেখেছে মেয়েছেলে। একদিন শেষরাতে না কি অনেক কে সব এসেছিল, ওই মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে—আবার পরের দিন শেষরাত্রে বেরিয়েছিল। বাহারকে কাজে পড়ে দু-তিনদিন ওই সামনের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল—তাতেই দেখেছে। ...যাই হোক, যা বললুম, ঠিকমতো তাই করবেন, যদি উলটো-পালটা কিছু করেন—আমিও উলটো গাইব, আমার কাছে সাফ কথা।'

দশ

নলিনাক্ষ মন স্থির করেই ফেলল।

এটুকু সে বরকতকে এতদিনে চিনেছে, সে যা বলেছে, তার নড়চড় হবে না, টাকা ও এক পয়সা কমাবে না। ওরও যখন এটা জানা দরকার—টাকার মায়া করলে চলবে না।

সে একটি ন'শো টাকার সেলফ চেক লিখে পিছনে সই করে বরকতের জামাই পেয়ার আলিকে দিয়েছিল।

পেয়ার আলি এসেছে সকাল আটটায়—তখন অত নগদ টাকা কোথায় পাবে? সইসাবুদের কোনও দরকার নেই, পেয়ার আলিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেটা, কোনও ধরা-ছোঁওয়ার

BanglaBook.org

মধ্যে পড়তে হবে না, তবু সন্দেহ ছিল বরকত যে ধাঁচের লোক, হয়তো এ চেক সে নেবে না, কাজও করবে না।

কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থেকে নামতেই তার চেককাটা লুঙ্গি, আদ্দির শার্ট আর কাঁধে ছাতাটা দেখা গেল। এদিকে ফিরে নেই, ওর সামনে কোনও পানের দোকানও নেই যে আয়নায় দেখবে —তবু নলিনাক্ষ নামামাত্র সে চলতে শুরু করল। ধীরে-সুস্থে, মন্থর গতিতে। পিছন থেকে যা মনে হল, ইতিমধ্যে একটি জর্দা দেওয়া পান সংগ্রহ করেছে—বেশ মৌতাতের আমেজে চিবোতে-চিবোতে যাচ্ছে সেটা।

যথাস্থানে গিয়ে ছাতা একদিকে হেলে কাঁধ-বদল হল। নলিনাক্ষ বাড়িটা আড়ে দেখে নিল। দোতলা পুরনো বাড়ি। যেমন এ-পাড়ার বাড়ি হয়। জানলায় পর্দা ঝুলছে, বাইরে নিচে একদিকে এক লন্‌ড্রি, একপাশে কোনও একটা কী গুদোম মতো, চাবি দেওয়া রয়েছে। আর একটু চওড়া গলি হলে সেটাকে গ্যারেজ ভাবা চলত। কিন্তু এখানে সাধারণ মাপের গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানে ঢোকানো শক্ত।

পিছনে তিনতলা বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। তার একটা সরকারি পথ নিশ্চয়ই আছে আগমন-নির্গমনের—হয়তো সেদিকটা বন্ধ থাকে কিংবা এমন কোনও ভাড়াটে বসানো আছে, যাদের সে ভাড়া নেওয়াটা নিতান্তই আবরণ মাত্র।

তখন আর দাঁড়ানো উচিত নয়। দাঁড়ালও না। ঠিকই বলেছিল বরকত, ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। উলটো দিকের বাড়িটাও দেখে নিয়েছে, সদর দরজায় কে চকখড়ি দিয়ে চারশ বিশ লিখে রেখেছে। তার বাইরের একটা ঘরে সামান্য মুদির দোকান একটা, তার সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়ি-ডিমও পাওয়া যায়।

কোনও মতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ল। সারারাত ঘুমই হয়নি ভালোকরে—উত্তেজনায় ও আশঙ্কায়, শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। এ ধরনের কাজ, গোয়েন্দাগিরি কখনও করেনি, কীভাবে করবে তাও জানে না। বরুণের বেলায় যেটুকু করেছিল—না জেনে। এ যে কোন বিপদের মধ্যে পড়ছে কে জানে। বারবারই মনে হচ্ছে—পুলিশের কাছে সবকথা জানিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ছে মধুবাবুর কথাটা। 'পুলিশের কম্ম নয়'। মধুবাবু তাকে টিপস দিতে এসে প্রাণটা দিলেন। তাঁর কথার মূল্য অনেক।

ওখানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা। গলিটা যেন কালকের সে-গলি নয়। রীতিমতো কর্মব্যস্ত, জনমুখর রাস্তা। বহু লোক নানা কাজে যাতায়াত করছে, ফিরিওলা হাঁকছে। এর মধ্যে কে কোন বাড়িটা লক্ষ করছে কিংবা কার দিকে চেয়ে আছে—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

বেড়াতে-বেড়াতেই যাচ্ছিল, কাছাকাছি একটা পানের দোকান দেখে সিগারেট কেনার জন্যে দাঁড়াল। দু-একটা দামি সিগারেট চাইল ইচ্ছেকরেই—যা এ-পাড়ায় পাওয়ার কথা নয়। পানওলা লোকটির মনে সম্ভ্রম জাগাবারই চেষ্টা এটা। কাজও হল, লোকটি বেশ খাতির করে—সাজা পান থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে একখিলি পান সেজে দিলে, প্যাকেট খুলে টাটকা সিগারেট বার করে দিলে। তারপর প্রশ্ন করল, 'বাবু কি এ-পাড়ায় থাকেন? আপনাকে তো কই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—?'

নলিনাক্ষ ধীরে সুস্থে পানটা একটু চিবিয়ে কায়দা করে নিয়ে ওরই দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরাতে-ধরাতে বলল, 'না, আমার এক বন্ধু—অনেকদিন দেখিনি, সিঙ্গাপুরে চাকরি করে—ছুটিতে

BanglaBook.org

এসে এইখানে কোথায় উঠেছে। আমার জন্যে একটা ভালো বেতের ব্যাগ আনার কথা। চিঠি দিয়েছিল—সেটা হারিয়ে ফেলেছি। ঠিকানাও তাতেই ছিল। তার নাম তপন ভৌমিক, কে এক ডিসুজার বাড়িতে উঠেছে এসে, ওইখানেরই পরিচয়—এইটুকু মনে আছে।'

'ডিসুজা?' ভুরু কুঁচকে নামটা মনে করার চেষ্টা করল পানওলা। তারপর বলল, 'রাস্তার নাম মনে আছে?'

'তা হলে তো গোল চুকেই যেত। কিচ্ছু মনে নেই। এই পাড়া, এমনি একটা ধারণা আছে শুধু—'

'তা হলে তো বাবু বলা শক্ত। অনেক গলি, অনেক লোক। ডিসুজা অবিশ্যি ছিল একজন, এই গলিতেই, তা সে তো বহুত রোজ কাবার হয়ে গিয়েছে—ফৌত, মানে মারা গিয়েছে। সে পনেরো-ষোলো বছরের ওপর হবে তো কম নয়। আর তো কই, ফিরিঙ্গি যা দু-একঘর এ গলিতে আছে—ডিসুজা কেউ না। ফার্নান্ডিজ আছে, টমাস, ডিমেলো—না, ডিসুজা কেউ নেই।'

'যে ডিসুজা ছিল বলছ—সে কোন বাড়িতে থাকত?'

'ওই যে—' আঙুল দিয়ে সেই বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়—যেটা কাল বরকত আলি ইশারা করে গেছে।

'তা ওখানে তার কেউ—মানে, ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি নেই?'

'না বাবু। কিরায়ার বাড়ি তো। তারপর বহুত হাতবদল হয়েছে। ডিসুজার বিবি বুড়ো বয়সে আমাদেরই এক মোসলমানকে শাদি করে আলিগড় চলে গিয়েছে। সে-ছোকরা টাকার লোভেই বুড়িটাকে নিকে করেছিল—শুনেছি টাকা-পয়সা কেড়েকুড়ে নিয়ে বুড়িকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে এখন আগ্রায় না টুণ্ডুলায় ভিক্ষে করে খায়। মেয়েটার আগেই শাদি হয়ে গিয়েছিল—দুটো ছেলে, তারা সব কে কোথায় চাকরি-বাকরি করে—জানি না।'

'তা ও-বাড়িতে কে আছে এখন?' খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন, তবু মনে হয় পানওলার চোখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, 'মানে, ওইখানেই এসে উঠেছে কি না—'

'না না, ও-বাড়ি তারপর বহুত হাতবদল হয়েছে। এক উড়িয়া কিনেছে। সে সব ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিচ্ছে টাকা দিয়ে দিয়ে। শুনছি হোটেল করবে। বুঝেছেন তো, হোটেলে আজকাল বহুত মুনাফা। এইসব গলিঘুঁজিতে হোটেল তো নামেই—আসলে দেদার রেণ্ডীর কারবার চালাবে।'

'অ।' আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও কারণ নেই। একটা ভুলই করে বসল। আনাড়ির কাণ্ড। মনে-মনে নলিনাক্ষ জিভই কাটল একবার। এত কথা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা ঠিক হয়নি। এরপর এখানে বেশি ঘোরাঘুরি করলে কি খোঁজখবর করলে এই লোকটারই সন্দেহ হবে।

এর মধ্যে আর একটি খদ্দেরও এসে দাঁড়িয়েছে পান ও বিড়ির। এ-পাড়ারই লোক মনে হয়, লুঙ্গির ওপর নাইলনের গেঞ্জি পরা। রোগা কালোমতো—মুখে 'মার অনুগ্রহের' দাগ। সেও আড়ে চাইছে ওর দিকে।

একরকম মরিয়া হয়েই বলে উঠল নলিনাক্ষ, 'এ-পাড়ায় বাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?... কীরকম ভাড়া?...আমাদের ওদিকে যে ভাড়া হয়েছে—আমাদের ক্ষমতায় আর কুলোয় না।'

সেই রোগা লোকটিই আগু বেড়ে কথা বলল। পান খাচ্ছিল, খানিকটা পিচ ফেলে এসে বলল, 'বাড়ি আপনার দরকার? কেতো ভাড়া দিবেন? কেখানা ঘর চাই আপনার? আমার নাম সোলেমান, আমি বাড়ি-ভাড়ারই দালালি করি। হেঁ—হেঁ—'

'কীরকম ভাড়া এ-পাড়ায় তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি এখন যে বাড়িতে আছি বাগবাজারে, অনেকদিন আছি—ভাড়া কমই দিই অবিশ্যি, নতুন নিলে ওর চেয়ে বেশি দিতেই হবে, আশি টাকায় পুরো দোতলা নিয়ে থাকি—তিনখানা ঘর, রান্নাঘর। তার কমে আমার কুলোবে না।'

BanglaBook.org

'এত সোস্তায় বাড়ি কোথা পাবেন? সে-বাড়ি ছাড়ছেন কেন?'

'বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, বাড়িওলা সারিয়ে দেয় না। তারা চাইছে আমরা উঠে যাই। তখন ওই ফ্ল্যাট সারিয়ে ভাড়া দিলে কম-সে-কম দুশো টাকা পাবে।'

'সো তো ঠিক বাত আছে বাবু। জাস্তিই পাবে। তা আপনি কেতো কিরায়া দিতে চান?'

অভিনয়টা নিখুঁত করারই চেষ্টা করে নলিনাক্ষ, 'আমি তো চাইব যত কম দিয়ে হয়। সে কথা নয়—সওয়া-শো'র বেশি দিলে আমার কষ্ট হবে। বোনের বিয়ে বাকি, একা রোজগার করি—বুঝলে না?'

'হাঁ, সো বাত বোলেন। সোওয়া-সোতে মিলবে এ-পাড়ায়। লেকিন আর কোথাও মিলবে না। বালিগোঞ্জ, ভোয়ানীপুর চোলেন—তিন কামরা ফিলাট সাড়ে তিনসো মাংগবে—কোম-সে-কোম।

কিন্তু—কিছু মনে কোরো না—এ-পাড়াতে কি আমরা থাকতে পারব? সেইথেকে যা দেখছি, তোমাদের সব বিহারি, মুসলমান, ফিরিঙ্গি, চীনে এইসবই তো দেখছি। আমরা হিন্দু—মেয়েছেলে নিয়ে বাস করতে পারব কি?'

'খুব! খুব! বহুত শৌখসে। এ-পাড়ায় কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামা কি চোরির কথা শুনেছেন? আখবারে পড়িয়েছেন? এখানে কেউ কারও কথা নিয়ে থাকে না বাবু, যে যার আপনার-আপনার কাম করে —খায়-দায়, থাকে—।'

'তা—বাড়ি, মানে তোমার সন্ধানে আছে? এখন দেখাতে পারবে?'

'এখোন তো পারব না বাবু, একঠো জরুরি কাম আছে, এখনই মাটিয়াবুরুজ যাতে হোবে! আপনি যদি মেহেরবানি করে সন্ধ্যায় আসেন—বড্ড ভালো হয়।'

'বেশ, তাই আসব। কোথায় আসব বলো।'

'এই মোড়ে আমি থাকব বাবু। কিংবা এই দুকানে। রাত সাড়ে-সাতটার মধ্যে পঁহুছিয়ে যাব, জরুর। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলে একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

কীরকম লোক, কী মতলব—কে জানে!

একবার ভাবল, গিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, এখানে এ-পাড়ায় যদি খোঁজখবর করতে হয়, এ-ঝুঁকি তো নিতেই হবে। নইলেই তো বরং—শুধু-শুধু ঘুরলে—সন্দেহ করবে লোকে। যদি সত্যিই শঙ্কর দৃষ্টি তার দিকে থাকে—সে তো বুঝেই নেবে। এ তবু বাড়িভাড়ার নাম করে—এ-বাড়ি পছন্দ হল না, ও-বাড়ি—অনেকবার যেতে পারবে এই ছুতোয়। চাই কি, এই উপলক্ষে আরও দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ হলে ওই বিশেষ বাড়ির খবরও বার করতে সুবিধে হবে। সোলেমানকে সুযোগ বুঝে কিছু কবলালে, সেও খবর দিতে পারবে।

বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার সময় মনে হল, এখানে কাউকে কিছু বলে যাবে কি না, অথবা বলে পরামর্শ চাইবে কি না। কিন্তু তেমন কারও কথাই মনে পড়ল না। এখানে বন্ধু বলতে কেউ হয়নি এখনও। ছোকরা যারা—মদ-হইহল্লা—এই নিয়েই আছে, 'বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তামগ্ন' শঙ্করের ভাষায়, যে যার উন্নতি, কিসে কী সুবিধা আদায় করা যায়—রিটায়ার করার আগে কতটুকু রস নিংড়ে বার করে নিতে পারে কুনাল দত্তর, এই চিন্তাতেই মগ্ন। ছেলে-ভাইপো-ভাগ্নের চাকরির জন্যে ব্যস্ত।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা হল না।

BanglaBook.org

যাওয়ার সময় আপিস-ক্যান্টিন থেকে একটু চা ও খাবার আনিয়ে খেয়ে নিল শুধু। যদি ফিরতে দেরি হয়, ও-পাড়ায় চা খাওয়ার কোনও জায়গা নেই।

বেরিয়ে ট্রামে উঠতে-উঠতে একটা কথা মনে পড়ল—'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।' ওরও অবস্থা তাই। যাচ্ছে গোয়েন্দাগিরি করতে—একটা কোনওরকম হাতিয়ার নেই সঙ্গে। অথচ দেবীপদ বন্ধু ছিল, ধরে পড়লে একটা রিভলভারের লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত না। এমনিও যে চেষ্টাচরিত্র করলে পাওয়া যেত না তা নয়—চোরাই-মাল লুকিয়ে-চুরিয়ে বিস্তর বিক্রি হয়। ...কিছুই করা হল না, কথাটা মনেই পড়েনি, অথচ যাচ্ছে, মধুবাবুর ভাষায়, বাঘের গর্তে পা দিতে! বাঘের চোয়ালের মধ্যে, কে যেন বলেছিল না—দেবীপদই তো। এককড়ি। সে যদি থাকত, তাকে জানালেই আর এত কাণ্ড করতে হত না ওকে। কী যে হল ছোকরার।

মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই দেখল সোলেমান, প্রসন্ন মধুর অমায়িক হাসিতে মুখটি রঞ্জিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তফাতের মধ্যে এ-বেলা গায়ে একটা জামা উঠেছে, হাফ-শার্ট একটা।

'আসুন বাবু। সালাম। ওঃ, কী যে করেছি আপনার জন্যি! মাটিয়াবুরুজ গিয়ে তো আটকে গিছলাম, আমার এক বুনের বর বহুত বদমাশ আছে, তারই তালাকের জন্যে ঘুরছি—সব ঠিক, আজ গিয়ে দেখি নানান ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রাখছে। সেই মামলার কেজিয়া করতে-করতে দেখি পাঁচটা বাজে। কী করব, বলি ভোদ্দোরলোককে কোথা দেওয়া আছে—ইনগেজমেন্ট—খেলাপী হলে তো আমাকে জানোয়ার ভাববেন। তাতেই, যা কখনও করিনি, ট্যাক্সি-মটর নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি তো খোঁজে ছিল না, দু-ঘণ্টায় কত খুঁজব বোলেন। যাই হোক, দুটো ফিলাট দেখেছি, চলুন দেখিয়ে দিই—বাড়ি, বিশোয়াস রাখবেন, কালকের মধ্যে আউরও চার-পাঁচটা পাইয়ে যাব। আজ তো ই-দুটো দেখাই। একটার ভাড়া একশো-তিশ, একটার কিছু কম হোবে। লেকিন—গলা নামিয়ে বলে—উপরে কেরেস্তান থাকবে বাবু। দেখেন—আউর দেখাব। ইটা তো দেখেন—।'

খুশি হল নলিনাক্ষ। সে তো এখানে বারবার আসারই সুযোগ খুঁজছে। সে বললে, 'বলো তো কালই না হয় আসব—আজই যে ঠিক করতে হবে কোথাও একটা, এমন তো তাড়া নেই—। জলে তো পড়িনি একেবারে।'

গলিতে ঢুকতেই সেই পানওলা লম্বা একটা সেলাম ঠুকল, 'আসুন বাবু, একখিলি পান? সেজে রেখেছি আপনার জন্যে। আর সেই সিগারেটও, সকালে যা চাইছিলেন—।'

লোকটাকে হতাশ করতে মন চাইল না। এ হাতে থাকলে বিস্তর খবর পাবে। এসব জায়গায় এই পানওলারা অনেক খবর রাখে পাড়ার। সেও এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাও। সোলেমানের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? বেচারার তো বোধহয় খাওয়াও হয়নি—।'

'কুছু না, কুছু না। এক-ঠো পান খাইবেন, কেতো দেরি হোবে? আমিও একঠো বিড়ি ধরিয়ে লিই।'

পান মুখে দিয়ে সোলেমানের সঙ্গে সেই গলি দিয়েই এগোল। বরকতের দেখিয়ে দেওয়া সে বাড়িটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা চার ফুট কানাগলি পড়ে। তার ভেতর না কি বাড়ি—কিন্তু সেইখানটায় গিয়েই নলিনাক্ষর মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরে গেল। মনে হল, বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে, গলির নিচটা তার দিকে অর্থাৎ উপর দিকে উঠতে চাইছে। তারপরই সব অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে। সোলেমান তার অবস্থা বুঝে ধরে না ফেললে মাটিতে পড়ে যেত বোধহয়।

মনে হল, যেন আরও কে ওই কানাগলিটা থেকে বেরিয়ে এসে ওর আর-একটা হাত ধরল। টানছে যেন ওইদিকেই। সোলেমানও। তারপর আর কিছু মনে নেই। আর কিছু জানে না। সব অন্ধকার। গভীর সুষুপ্তি।

এগারো

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর প্রথম যে অনুভূতি হল নলিনাক্ষর, তা এই।

কিছুই বুঝতে পারে না, কেন এমন যন্ত্রণা সেইটেই ভাবতে চেষ্টা করে শুধু। চোখ খুলতে কষ্ট হয়—কিছুতেই যেন চাইতে পারে না, গভীর ঘুমে যেমন চোখের পাতা এঁটে থাকে, তেমনিই। হেমন্তের বা শীতের দিনে দুপুরে ঘুমোলে অনেক সময় এইরকম অবস্থা হয়, চেতনা থাকে, ওঠা উচিত এবার বোঝে—উঠতে চেষ্টাও করে কিন্তু চোখ থেকে ঘুম যেতে চায় না, চোখ খুলতে পারে না।

কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে মাথায় যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। সেই বমির ভাবটাও। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে আরও খানিকটা। পরে তার আস্তে-আস্তে কেমন একটা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যর অনুভূতি হতে থাকে। বড় কষ্ট। মনে হচ্ছে কোনও কঠিন জায়গায় শুয়ে আছে। আর আছেও বোধহয় অনেকক্ষণ একভাবে। নইলে এমন কষ্ট হবে কেন? তার বিছানাটা এত শক্ত হয়ে গেল কী করে? বউদি নেই, কেউ রোদে-টোদে দেয় না। রঘুটা কী করে? বকতে হবে ওকে—।

কিন্তু এটা বিছানা কি! কীরকম যেন লাগছে?

উঃ—কী গরম! যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হল, ঘামই গড়িয়ে চোখে পড়েছিল—অন্তত জ্বালাটা সেই রকম—বন্ধ পাতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে জ্বালা করে উঠল চোখটা। তাতেই হাতটা যেন আপনিই উঠে এল চোখের দিকে, (হাত এত ভারি বোধ হচ্ছে কেন? যেন অবশ হয়ে গেছে! প্যারালিসিস হল না কি?) হাতের উলটো পিঠ করে চোখটা মুছতে গিয়ে আরও খানিকটা ঘাম গেল বোধহয় চোখে—আরও জ্বালা—যার ফলেই বোধহয় ঘুমের সেই আচ্ছন্ন-করা ভাবটা কেটে গেল, একটু-একটু চোখ পিটপিট করতে-করতে—চোখ জ্বালা করলে যেমন একবার খোলে আবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়—সেইভাবেই একসময় চোখটা খুলে ফেলল।

কিন্তু চোখটা পুরোপুরি যখন খোলা গেল—তখন বিহ্বলতা আরও বাড়ল।

সে কোথায় এসেছে, কোথায় আছে? এ কোন জায়গা? সে কি জেগে আছে—না ঘুমুচ্ছে এখনও? কিছুই বুঝতে পারছে না কেন? পাগল হয়ে গেল নাকি?

আবারও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল সে। নিজেই। ইচ্ছে করেই। মাথার যন্ত্রণা তো আছেই, সেই গা-বমি ভাবটাও। এই বিহ্বলতা ও অনিশ্চয়তাতে যেন মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে।

চোখ বুজে পড়ে থাকতে-থাকতেই একটু-একটু করে মনে পড়ল সব। রঘু, রঘু কোথায়? সে চা দিচ্ছে না কেন?

এই রঘুর সূত্র থেকেই বউদি, পুরী, দোলা, তার আপিস, মধুবাবু—একটা চেনে-বাঁধা মটরমালার দানার মতো একটার পর একটা মাথায় এসে গেল। যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছে, অনুভূতি বা চেতনা পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বোধহয়—তা হোক, সবই মনে পড়ছে এবার। বরকত আলি, পানওলা, সোলেমান। পান খাওয়া, তারপরই সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

অর্থাৎ সে বাঘের গর্তেই পা দিয়েছিল, বোকার মতো, আহাম্মকের মতো। মধুবাবু, দেবীপদ কারও সতর্কবাণীতে কোনও কাজ হয়নি—বর্তমানে সে বাঘের চোয়ালের মধ্যেই, দাঁতটা শুধু যা বসাতে বাকি।

এবার ভালো করে চেয়ে দেখল। একটা নিশ্ছিদ্র সিমেন্ট দেওয়ালওলা ঘরের মেঝেতে সে পড়ে আছে। বিছানা নেই, কোনও আসবাব নেই। কোথাও জানলা বা দরজা নেই। এককোণে একটা মাটির গামলা, বোধহয় প্রাকৃতিক কাজের জন্যে, আর একপাশে একটা টিনে—বোধহয় খানিকটা জল।

জানলা নেই, তবে সে দেখতে পাচ্ছে কী করে? নিশ্বাসের জন্যে বাতাসও তো দরকার?

BanglaBook.org

ছাদের দিকে চাইতে সে-রহস্যটাও পরিষ্কার হল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় যেমন ছাদে কতকগুলো ফুটো থাকে—তেমনিই আছে, মনে হয় ছাদটাও লোহারই। আর তেমনিই এককোণে একটা ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালে, সাদা দেওয়ালে পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে একটা আলোর আভাস সৃষ্টি করেছে। আলো খুবই কম, বোধহয় দশ বাতি কি পনেরো বাতির বাল্‌ব্‌ আছে—কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারে তা-ই যথেষ্ট।

নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বাতাস নেই। অসহ্য গুমোট, তাতেই যেন যন্ত্রণা বেশি মনে হচ্ছে। ঘামে জামা-প্যান্ট ভিজে জলের ধারার মতো মেঝেয় গড়াচ্ছে। এগুলো খোলা দরকার।

ওঠবার চেষ্টা করল—সমস্ত দেহ যেন কেমন ভারি আর অনড় হয়ে গেছে—পারল না প্রথমটায়। আরও অনেক পরে, অনেক চেষ্টায়, প্রথমে পাশ ফিরে তারপর একটা হাতে ও আর একটা কনুইতে ভর দিয়ে শেষ অবধি উঠে বসল।

কাল যে সাংঘাতিক বিষ খাইয়েছিল—তারই ফল নিশ্চয় এটা। সবাই সব জানে, শত্রুদলের (শত্রুই বা কেন, সে-প্রশ্নটাও থেকেই যাচ্ছে) পয়সা-খাওয়া লোক। পানওলা জেনেশুনেই নিশ্চয় পানে বিষ মিশিয়েছে। অজ্ঞান-অচৈতন্য করার জন্যে। কী বিষ কে জানে? তার আরও কী কুফল ভোগ করতে হবে! এ মাথার যন্ত্রণা, এই বমি ভাব—এও নিশ্চয় সেইজন্যেই।

কিন্তু ঘটনাটা কাল ঘটেছে, তাই বা ভাবছে কেন? কাল কি ক'দিন আগে—তাও তো জানে না। দিন না রাত্রি এটা?

কে জানে, কে বলবে! এ কী অদ্ভুত অবস্থা! কী ওদের মতলব কে জানে! এরা কারা তাও তো জানে না! হায় রে তার বুদ্ধির অহঙ্কার! অন্ধকার যেমন ছিল তেমনিই রইল—মাঝখান থেকে প্রাণটাই গেল। দোলা কিছু তার আপন মেয়ে নয়, আপন ভাইঝিও নয়—মিছিমিছি কেন যে তার এত মাথাব্যথা পড়ল! আসলে সেই ছেলেটা, ভিখিরি ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।

হাত-পা আর একটু নাড়বার মতো হতে জামা-গেঞ্জি সব খুলে ফেলল। হয়তো এই ভিজে জামা গায়ে থাকাতেই—ক'ঘণ্টা আছে এইভাবে কে জানে—সর্বাঙ্গে এত ব্যথা হয়েছে। আর এই মেঝেতে পড়ে থাকা। কে জানে মাটির নিচের ঘর কি না, মেঝেয় তো জল উঠছে। তবে খুব পুরনো নয়—বোধহয় নতুনই তৈরি হয়েছে ওদের জন্যে।

অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। যন্ত্রণায়, ভয়ে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—'ওঃ' বলে একটা শব্দ করে উঠল নলিনাক্ষ। আবার বলে উঠল, 'মা, মাগো! আর যে পারছি না!'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি অতি-পরিচিত চাপাকণ্ঠে শব্দ এল, 'আরে! নলিনীবাবু নাকি!'

দেবীপদ! এককড়ি!

কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে? কোথাও তো ফাঁক নেই একটাও! এক ওপরে ছাড়া। মনে হচ্ছে, সেইটেই যাতায়াতের পথও। সেকালের চাপা দরজার মতো।

'দেবীপদ? তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা কইছ?'

'চুপ। আস্তে কথা বলুন। ওই যে গামলা দেখছেন, ওটা সরান, দেখবেন একটা ছোট্ট নর্দমা। আমি আপনার পাশের ঘরে ওই নর্দমায় কান পেতে আছি। ওইদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সরু নালার মতো কাটা আছে মেঝেতে, জল বেরোবার পথ। গামলাটায় ঢাকা আছে নর্দমাটা। চলে আসুন, এইখানে মুখ দিন, কথা বলার অসুবিধা হবে না।'

আশ্চর্য মানুষের মনের গতি, পরে ভেবে নিজেরই অবাক লাগে নলিনাক্ষর। সে প্রথম প্রশ্নই করে বসল, 'আচ্ছা এখন ক'টা বাজে বলতে পারো, দিন না রাত? আমি কতকাল আছি এখানে?'

'কেন, আপনার হাতে ঘড়ি নেই?'

'না, দেখছি না তো।'

'তা হলে যে ব্যাটা ধরেছিল আপনাকে, সেই নিয়েছে। আমারটা আছে। তবে বন্ধ হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল, আন্দাজে চালিয়েছি। মোদ্দা কুড়ি ঘণ্টা হয়ে গেছে। আপনি ক'টায় এসেছিলেন? সাড়ে সাত পৌনে-আট? তা হলে এখন বিকেল চারটে বাজে।'

'তুমি কীভাবে এলে এখানে? কত দিন আছ?'

'তা হল বইকী। সেই যে ভাঙা বাড়িটার পাশে দেখা হয়েছিল মনে আছে? পুরীতে? যেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেওয়ালটার এপাশে এসেছি, একটা চট দিয়ে আমার মাথাটা ঢেকে মুখে দড়ি বেঁধে দিলে—তারপর তিন-চার জন ধরে এনে নিমেষের মধ্যে চাকলাদারের গাড়ির ক্যারিয়ারে পুরে বন্ধ করে দিলে! ভেরী নীট ওয়ার্ক।... সবসুদ্ধ বোধহয় একমিনিটও না। আমার গাড়োলগুলি পাহারা দিচ্ছিলেন, মানে দেওয়ারই কথা, নজর রাখার কথা অন্তত—কেউ টের পেল না। ...আপনি ওই পথেই বাড়ি যাবেন জানি, তখনই উঠবেন—তাই যতটা পারি গোঁ-গোঁ করে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু আপনিও শুনতে পেলেন না—।

'শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই—কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার যে কল্পনাই করতে পারিনি। আপনার সঙ্গে অত পুলিশের লোক। আমি ভেবেছি বাতাসের শব্দ।'

নলিনাক্ষ খুলে বলল ওর অভিজ্ঞতা। তার পর থেকে কী-কী ঘটেছে তাও সংক্ষেপে বলল। মধুবাবুর কথা। ওর ভাইপো-চুরির কথা। পরেশ চাকলাদারের কথা। দেবীপদব নাম করে গাড়ি পাঠাবার কথা। কেন ও কীভাবে এখানে এল, তাও।

দেবীপদ চুপ করেই শুনে গেল। তারপর বলল, 'হুঁ। ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। আমিও এসব শুনেছি—তবে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মানে সত্যি, না কি আমি কান পেতে আছি জেনেই বানিয়ে বলছে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'তুমি শুনলে কী করে? তোমার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে না কি? এ তো সেই মধ্যযুগের ডানজন।'

'তা বটে। তবে তত ভয়ানক নয়। আলোটা দিয়েছে দয়া করে আর এখনও ইঁদুরে তাড়া করেনি। মনে হয়, এটা অপেক্ষাকৃত নতুন।'

একটু অসহিষ্ণু হয়েই নলিনাক্ষ পুনশ্চ বলে, 'কিন্তু তুমি শুনলে কী করে তা তো বলছ না?'

'ঠিক এইভাবেই। এটা আমরা আছি মাটির নিচের ঘরে। ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে নামিয়ে দেয়; আবার যদি কোনওদিন আমাদের তুলতে হবে মনে করে তা হলে ওইভাবেই তুলে নেবে। তবে আমার এপাশের ঘরে মনে হচ্ছে একটা সিঁড়ি আছে। ঘরটাও বড়, ওদের কথার ভাবে যা মনে হয়—কারণ অনেক মাল আছে এতে। এটাই ওদের কনফারেন্স রুম-মতো, অনেক আলোচনা হয়, যেগুলো প্রকাশ্যে করা যায় না, মানে সামান্য দু-একজনের বাইরে যা কাউকে জানাবার নয়। নিরেট দেওয়াল মধ্যে, এই ভেবেই ওরা নিশ্চিন্ত আছে, নর্দমার কথাটা কারও মাথাতে যায়নি। তাতেই শিখলাম অনেক।'

'তা তুমি বেঁচে আছ কী করে? তোমাকে খাবার দেয়?'

'এখনও দিচ্ছে। বোধহয় তোমাকেও দিত, জ্ঞান হয়নি ভেবেই নিশ্চিন্ত আছে।'

'কীভাবে দিচ্ছে?'

'ওপরের চাপা দোর খুলে একটা তারের ট্রের মতো নামিয়ে দেয়। তাতে দুটি বস্তু থাকে একসঙ্গে—জল আর খাবার। আর একটু পরেই একটা গামলা নেমে আসে, সেটা নামিয়ে ঘরের গামলাটা তাতেই তুলে দিতে হয় নিজের হাতে। খুব সায়েন্টিফিক আর মেথডিকাল। তবে বেশিদিন খেতে দেবে না আর।'

'তার মানে?'

'মনে হয় তোমার—মানে আপনার জন্যেই—।'

BanglaBook.org

'তোমারই হোক না, আমি তো তুমি করে নিয়েছি, তুমি এখনও দূরত্বটা রাখছ কেন?'

'তা বটে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওসব ফর্মালিটির দরকার নেই আর। যা বলছিলুম, ওরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার না কি এখান থেকে সবাই চলে যাবে, ভেকেট করবে। মাল, মানুষ—যা নিয়ে যাওয়ার সব সরে গেলে তালাবন্ধ করে রেখে সরে পড়বে। আমরা এইখানে শুকিয়ে মরব। দীর্ঘকাল পরে কেউ, হয়তো যদি দোর ভেঙে ঢোকে—সে সম্ভাবনা কম, কারণ পরেশ চাকলাদারই এর মালিক—ঢুকলেও মাটির নিচের এ-মহলের সন্ধান পেতে দেরি হবে—আর যদিই পায়, দুটো কঙ্কাল থেকে কে কী বুঝবে?'

দেবীপদ খুব সহজভাবেই, যেন একটু কৌতুক করেই বলল, কিন্তু কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে—এই মাটির নিচে হয়তো পঞ্চাশ কি একশো বছর পড়ে থাকবে কঙ্কালগুলো, কেউ জানতেও পারবে না—নলিনাক্ষ শিউরে উঠল। এই প্রথম, তার যেন কান্না পেয়ে গেল। কেন মরতে এ-কাজ করতে এল সে! এই শোচনীয়ভাবে তিলে-তিলে পলে-পলে শুকিয়ে মরা!

'কী, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'তোমার ভয় করছে না?'

'যেদিন থেকে এ-কাজে এসেছি সেদিন থেকেই তো মৃত্যুর হাত ধরেছি। কতবার মরতে-মরতে বেঁচেছি। এবার না হয় বাঁচতে-বাঁচতে মরব। শুধু-শুধু ভয় করে লাভ কী বলো?'

'কিন্তু পরেশ চাকলাদার তোমাকে ধরল কেন? সে তো—সে তো শুনলুম অন্য ব্যবসায়ে ছিল। হ্যাঁ, সেও ধরা পড়েছে জানো? স্মাগলিং-এর জন্যে, বমাল ধরা পড়েছে।'

'ধরা পড়েনি, ধরা দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এই দায়, মধুবাবুকে খুনের দায়—এতগুলো থেকে বাঁচতেই ধরা দিয়েছে। কে জানে মধুবাবুর জন্যে ওর দলের লোকই নারাজ হচ্ছিল কি না, প্রাণের ভয়েই আরও ধরা দিয়েছে। এসব কাজ করার পর বাঁচতে গেলে পুলিশের ঘরে থাকাই সুবিধা।'

'মধুবাবুকে ও-ই খুন করেছে, না? লোকটাকে আমরা কিন্তু আগাগোড়া সন্দেহ করছিলুম।'

'কিচ্ছু ভুল করোনি। মধুবাবুই পালের গোদা। অর্থাৎ মানুষখেকো ব্যবসা তারই।'

'তার মানে? একই প্রশ্ন বারবার করছি—কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার—'

'একটু জল খেয়ে নাও। মাথাতে একটু জল থাবড়ে দাও। জল কাল তোমার সঙ্গেই নেমেছে তা টের পেয়েছি। শুধু কাকে ধরে আনা হল সেটা ওদের কথাবার্তার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারিনি।'

নলিনাক্ষ একটু সুস্থ হয়ে আবার নর্দমায় কান পাতলে দেবীপদ সংক্ষেপে—যতটা জানে—এই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করল।

জানার দিক থেকেও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। যে লোকটা খাবার দিতে আসে, ভবানী হালদার নাম, এর আগে একটা ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, প্রমাণ-সাক্ষী সবই ওর বিরুদ্ধে. দেবীপদই শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দেয়—আসল যারা-যারা ছিল খুঁজে বের করে। এর আগে এ-কাজ অনেকবার করলেও সে-ডাকাতিতে ভবানী ছিল না—কিন্তু হাতের কাছে একটা দাগী আসামী পেলে কে আর অত গরজ করে তারপরেও তদন্ত চালিয়ে যায়! সেই ডাকাতিতে মানুষ খুন হয়েছিল, যারা শেষে ধরা পড়ল তাদের সকলেরই 'লাইফ সেন্টেন্স' হয়েছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাকে বলে। তাতেই ভবানী হালদার ও-লাইন ছেড়ে দিয়েছে, এদের চাকরি করে। জাতে নমঃশূদ্র, বলে, 'ডাকাতিই আমাদের

BanglaBook.org

জাত-ব্যবসা, তা বুড়ো হয়েছি, এখন একটুকু ভয় ধরেছে প্রাণে। এখানে আমি তো হাতে-কলমে কিছু করি না, যদি দৈবে ধরা পড়িও, বড় জোর কিছুদিন জেল হবে—ফাঁসির দড়ি তো আর পরতে হবে না গলায়।'

সেই ভবানীই কিছু-কিছু বলেছে। আর কিছু-কিছু নর্দমার ফুটোয় কান দিয়ে শুয়ে-শুয়ে শুনেছে দেবীপদ।

মানুষ-চালান ব্যবসাটা দু-রকম হয়। বয়স্কা মেয়ে চালান হয়, বয়স্ক পুরুষও চালান হয়—তেরো-চোদ্দো থেকে উনিশ-কুড়ি পর্যন্ত—এদের বিক্রি করে দেওয়া হয় বাইরে। পুরুষরা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে, মেয়েদের দু-রকমেই খাটতে হয়। তবে এর চাহিদা এত নেই। আর ঝুঁকিও বেশি। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ওয়াকিবহাল লোক ছাড়া এসব কাজ পারে না। মধুবাবুর এই ব্যবসাই বেশি ছিল। কেরালা থেকে গুজরাট, ওদিকে পাঞ্জাব, রাজস্থান—সর্বত্রই তার অংশীদার ছিল, মিলেমিশে কাজ করত। অর্গানাইজ করা যাকে বলে, সে ক্ষমতা না কি মধুবাবুর ছিল অসাধারণ। তাই লেখাপড়া তেমন না জানলেও সকলে তাকে কেন্দ্রশক্তি হিসেবেই দেখত।

এ ছাড়া আর-একটা ব্যবসা—ছোট ছেলেপুলে এনে বিকলাঙ্গ করে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করানো। এরা ছোট বয়স থেকেই ওদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়—এমন সব পদ্ধতি আছে ভয় দেখানোর যে—আতঙ্কটা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, ভিক্ষার সব টাকা এনে মালিককে ধরে দেয়, পালাবার বা এ-অধীনতা ছিন্ন করার চেষ্টা মাত্র করে না। তা ছাড়া অনেকে জানেও না যে তাদের ইচ্ছে করে নৃশংসভাবে এইরকম করা হয়েছে—কাউকে কানা, কাউকে খোঁড়া, কাউকে গন্না-খ্যাঁদা, কারও বা হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, কারও বা আঙুল। তারা জানে দৈব-দুর্বিপাকেই এমন অবস্থা হয়েছে তাদের, এরা দয়া করে না বাঁচালে বাঁচত না, তাদের কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখার ছিল না, এরাই আশ্রয় দিয়েছে তাই বেঁচে আছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও কড়া নজর রাখতে হয়। অন্ধকার কালো পথে উপার্জনের নিয়মই এই। অহরহ সতর্ক সজাগ থাকতে হয়। দু-চারজন যে মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ করার চেষ্টা না করে এমন নয়—সে-ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সেইরকমই দেওয়া হয়েছিল কেলোকে—প্রফুল্ল বা হামিদ—সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। অবশ্য তার দোষ ছিল না, কিন্তু এরা ভেবেছিল, নলিনাক্ষ আসলে পুলিশের স্পাই, টাকা দিয়ে আইসক্রিম খাইয়ে ওর কাছ থেকে খোঁজখবর আদায় করছে। কেলোর পরিণাম দেখেই এখন বহুদিন পর্যন্ত বাকি ভিখিরিরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

মুশকিল হয়েছে এই, এইসব ব্যবসা 'ইন্টারন্যাশনাল গ্যাঙ' চালায়, এমনি একটা আবছা ধারণা আছে সকলের। পুলিশেরও। বিরাট ব্যাপার, সে কি আর আমাদের ধরা সম্ভব, এই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দেবীপদ যেটুকু জেনেছে, আসলে বহু দল, আলাদা-আলাদা ব্যবসা। ব্যবসার সম্পর্ক হিসেবেই কেরালার দলের সঙ্গে আসামের, রাজস্থানী দলের সঙ্গে তেহরাণের, বাংলার দলের সঙ্গে মার্কিন দলের যোগাযোগ। নিছক ব্যবসা। একটা দল হলে কবেই ধরা পড়ত। অনেক দল, আর এরা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবসার একটা মোটামুটি সততা বজায় রেখে যায়—দু-একজন চালাকি করতে যায় না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বাকি সকলে নিপুণভাবে তাকে খতম করে দেয়, সেই ভয়ে আবার কিছুদিন সবাই টিট থাকে। আর নিজেদের স্বার্থেই মন্ত্রগুপ্তিটা রক্ষা করে, কেউ কারও কথা ফাঁস করে না।

মধুবাবুর শক্তিও বেশি, উচ্চাশাও বেশি। তিনি মানুষের ব্যবসা থেকে কোকেন, মারিজুয়ানা, সোনা-হীরের চোরাকারবারে লিপ্ত হবেন সেটা স্বাভাবিক। মধুবাবু আসলে বহু দলের অভিভাবক উপদেষ্টা ছিলেন। সে হিসেবেও কিছু-কিছু পেতেন। কিন্তু লেখাপড়া, বিশেষ ইংরেজিটা কম জানতেন। সেইজন্যেই পরেশ চাকলাদারকে তাঁর দরকার হয়েছিল। চাকলাদার একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করত,

BanglaBook.org

সেখান থেকে লাখ তিনেক টাকা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে। আলিপুর না নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে—ডাকাতির আয়োজন করে। আয়োজন নিখুঁত। ভুল হয়েছিল একটা আনাড়ি লোককে দলে নেওয়ায়। দলের সুপারিশেই না কি নিতে হয়েছিল তাকে। তাতেই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ল।

সেই সময় এলেন মধুবাবু। নিজে যেচে এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিছু মোটা টাকারও দরকার হয়েছিল—সেও মধুবাবু পকেট থেকে খরচ করেন। সেইসঙ্গে একটি নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেন পরেশকে দিয়ে—ভবিষ্যতে হাতে থাকবে বলে। সে স্বীকারোক্তি কোনও ব্যাঙ্কের ভলটে আছে। কোনও চালাকি করতে গেলেই সেটি পুলিশের হাতে চলে যেত। পুলিশকে গুলি করেছিল নিজের হাতে, সে জখম হয়েছিল—মরেনি, তবু 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' আর সরকারি লোককে কর্তব্যপালনে বাধা দেওয়া, ডাকাতির চেষ্টা—এতগুলো চার্জে শাস্তি বড় কম হত না।

পরেশ চাকলাদার চলনে-বলনে পাকা সাহেব। ইংরেজি ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান শিখে নিয়েছিল। ওদের ব্যবসার জন্যে এগুলো দরকার। মধুবাবু ওকে প্রথমে নিজের সহকারী হিসেবে নিলেন, শেষে অংশীদার করেছিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাফ ছিলেন তিনি, শতকরা ত্রিশ টাকা দেবার কথা—পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসেব করে দিয়ে দিতেন। কিন্তু পরেশ চাকলাদার চাইত যেমন উপার্জন তেমনিভাবে থাকতে—ধনীর মতো থাকার বড় শখ তার, আসলে সেইজন্যেই ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মধুবাবু জানতেন এইভাবে পয়সা খরচ করতে থাকলে একদিন না একদিন লোকের চোখে পড়বে, তাদের চোখ টাটাবে। আর তাহলেই পুলিশেরও নজরে পড়বে।

তাই পড়েওছিল, দেবীপদ আসলে পরেশ চাকলাদারেরই পিছু নিয়েছিল। পরেশ যেমন নির্মম তেমনি বেপরোয়া, তাই দেবীপদ খুব সাবধানেই ছিল—তবু শেষরক্ষা হল না।

নলিনাক্ষর এ-জালে জড়াবার কথা নয়, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়েছিল। প্রথম ওই ভিখিরি ছেলেটার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ, ওরা ভুল বুঝে তাকে মারল। আর তার ফলটা অন্যভাবে এসে পড়ল নলিনাক্ষর ওপরই। ছেলেটা চেহারার জন্যেই বেশি রোজগার করত, সে উৎসটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের জাতক্রোধ হল নলিনাক্ষর ওপর। পরেশের সামনের বাড়িতে থাকে ও, ক্রমশ প্রকাশ পেল দেবীপদর বন্ধু। এর আগে বড় স্মাগলার গ্যাঙ একটাকে খতম করার মূলেও এই নলিনাক্ষই ছিল—অবশ্য সেও অজান্তে—কিন্তু কে আর অত খবর রাখছে—ওরা দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিল। তারপর পুরীতে গিয়ে পড়া—এরা গিয়ে পড়ল দৈবাৎই। কিন্তু মধুবাবু ও পরেশ ধরে নিল যে দেবীপদর চর হিসেবেই গেছে নলিনাক্ষ। দেবীপদ যে পুরীতে আছে তা জানত—সুতরাং এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিরাট একটা সোনার চালান ডেলিভারি নিতেই গিছল পরেশ, পরেশকে সামলাতে মধুবাবু।

মধুবাবু দেবীপদ আর নলিনাক্ষর উপস্থিতির কার্যকারণ ভেবে নিয়ে পরেশের ওপর চটে গেলেন খুব। তিরস্কার করলেন। ওর জন্যেই এদের চোখ পড়ল, নইলে এতদিন তিনি এত কারবার করছেন, কেউ তো সন্দেহ করেনি।

পরেশের যুক্তি হচ্ছে, যদি ভোগই না করলুম তো এত কাণ্ড কষ্ট করে, এত ঝুঁকি নিয়ে রোজগার করে লাভ কী? চিরদিন গর্তের মধ্যে থেকে ছুঁচোর জীবনযাপন করা—সে তো একটা দুশো টাকা মাইনের কেরানীও পারে। মধুবাবু বলেন, যথেষ্ট টাকা করে নিয়ে তুমি বিলেত-আমেরিকা যাও না, রিভিয়েরাতে গিয়ে ফুর্তি করো, এখানে ওসব চাল দেখাবার দরকার কী?

দোলাকে যে ধরে সে নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ। নলিনাক্ষর আত্মীয় বলে জানত না ওরা।

BanglaBook.org

জানার কারণও ছিল না। যখন জানল—পরেশ চেয়েছিল ফিরিয়ে দিতে, মধুবাবুই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দ্য মিসচীফ ইজ অলরেডী ডান—এখন ফিরিয়ে দিলে আরও ঝুঁকি নেওয়া। মেয়েটা কতটা কী লক্ষ করেছে কে বলতে পারে। ছোটদের অবজার্ভেশন অনেক তীক্ষ্ণ, কী বলবে তা কে জানে। আর ঘাঁটিও না।'

সে-রাত্রে বাস অ্যাক্সিডেন্ট মধুবাবুরই ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তে যে নলিনাক্ষ ট্রেনে আসবে তা ভাবেননি। নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে গেছে—এ-কথা শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। দেবীপদকে ধরা হয়েছে, এখন নলিনাক্ষকেও যদি এই খাঁচায় এনে পোরা যায় তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখান থেকে কাঠের বাক্স করে অনেক মাল ওরা চালান করে, তখন স্থির ছিল এদের দুজনকে সেইভাবে পাঠাবে। মাঝসমুদ্রে গিয়ে বাক্স দুটো ডুবিয়ে দেবে তারা।

সেইসঙ্গে মধুবাবু আর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরেশকে। এখানের 'অ্যাকটিভিটি', কাজকর্ম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে। পরেশকে বলেছিলেন উটকামণ্ডে গিয়ে একটা অ্যান্টিক জিনিসের দোকান খুলতে। মধুবাবু নিজে চলে যাবেন বাংলাদেশে, পাসপোর্ট করানোই আছে, তাতে বাধবে না। সেটাই পরেশের পছন্দ হয়নি। এখানে এখন বিস্তর কাজ—বিজনেস ওদের ভাষায়। অনেক টাকা আমদানি হচ্ছে, সব এদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে, যদি এরপর ফিরে এলে পাত্তা না দেয়!

কিছুদিন ধরেই মধুবাবুর কর্তৃত্ব পরেশের অসহ্য লাগছিল, তা ছাড়াও, তার মনে হয়েছিল কাজকর্ম সব সে-ই করছে, মাঝখান থেকে সিংহভাগ নিচ্ছেন মধুবাবু। পরেশ চিরদিনই বেপরোয়া, সে দুম করে মধুবাবুকে খুন করে বসল। করল—মানে করালো। সেও আর-একটা ভুল। এ-বিষয়ে মধুবাবুর নীতি ছিল খুব পরিষ্কার : 'খুব দরকার না পড়লে মানুষ মেরো না। বিশেষ, যাদের পিছনে অনেক আত্মীয়-বান্ধব আছে তাদের একেবারে নাচার না হলে মারবে না। আর, মারতে হলে অনেককে জড়িয়ে মারবে, যাতে কেউ ব্ল্যাকমেল করায় সুযোগ না পায়।'

পরেশ নিজেকে খুব চতুর ভাবত। মধুবাবু নলিনাক্ষকে এই পাড়ায় এনে ফেলার জন্যে—পাড়ায় এলে খাঁচায় পুরতে আর কতক্ষণ—আত্মীয়তার ওই অভিনয়টা করতে গিছলেন, অনেকটা সফলও হয়েছেন—এটুকু মনস্তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল—কিন্তু সে-খবর পাবার পর পরেশের মনে হয়েছে যে, মধুবাবু সবটা বাংগলিং করছেন, তাঁর আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। তার নিজের ভাষাতেই—পাশের ঘরে বসে বলেছে পরেশ, নিজে কানে শুনেছে দেবীপদ—'ভদ্রলোক বড় বেশি ওভারবিয়ারিং হয়ে পড়েছিলেন, এসব কাজে এ-ধরনের লোকের আর থাকা উচিত হত না।' এ পাড়ায় নলিনাক্ষ এলে কী করতে হবে তা মধুবাবু আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। পরেশের মনে হয়েছিল, এই দুজন এবং মধুবাবু মরে গেলেই সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মধুবাবুর মরার পর এদের এই জগতে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতটা আশঙ্কা করেনি পরেশ, কল্পনাও করেনি। এদের ভালবাসা স্বার্থের ভালোবাসা অবশ্য, মধুবাবু তাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, কেন্দ্রমণি। তিনি এভাবে হঠাৎ চলে যেতে এরা খুব অসহায় বোধ করল। তাদের ক্ষোভ ক্রমশ রুদ্ররূপ ধারণ করছে দেখে পরেশ ভয় পেয়ে গেল, চোরাই মাল এনে ঘরে তুলে পুলিশে খবর দিয়ে সাধ করে ধরা দিলে পুলিশে। একটা গোলমাল করে এ-দায় থেকে বছর খানেকের মধ্যে বেরোতে পারবে এ-ভরসা ওর আছে, ততদিনে এদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেও ভুল পরেশের, সে-গোলমাল মধুবাবুই করিয়ে দিতে পারতেন, তাঁরই যোগাযোগ বেশি ছিল। এসব বুঝতেনও ভালো। তাঁরই পরামর্শে ও বন্দোবস্তে পরেশের সব ক'টা গাড়ির তিন- চারটে করে নম্বর করানো ছিল, পুরী থেকে যখন নলিনাক্ষকে নিয়ে আসে তখন নির্জন রাস্তায় পড়ে অন্য

BanglaBook.org

গাড়িতে তুলে দেওয়া হয় ওকে—সে-গাড়িতে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোক ছিল—দেখলেও কেউ সন্দেহ করত না। পরেশ সোজা এসে এ-বাড়িতে উঠেছে—ওর গাড়ি যারা লক্ষ্য করেছে এখানে, তারা কিছুই সূত্র পায়নি।

এই পর্যন্ত বলে বোধহয় ক্লান্ত হয়েই চুপ করল দেবীপদ।

নলিনাক্ষ বলল, 'তারপর? আমাদের কী উপায় হবে?'

'বোধহয় কিছুই হবে না। মধুবাবুর মৃত্যু, পরেশ চাকলাদারের ধরা পড়া—এ-দুটোতে এরা খুব যেন শেকী হয়ে গেছে। এখানের চাটিবাটি গুটোচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলো—গোটা কুড়ি এখনও এ-বাড়িতেই আছে, আপনার দোলাও—তাদের ডিসপোজ করে এরা সরে পড়বে, আমাদের এখানে ফেলে। ইনক্রিমিনেটিং যা কিছু সব নষ্ট করা হচ্ছে কাল থেকে। কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়িতেই দু-তিনটে করে নাম্বার প্লেট ছিল, সেগুলো অ্যাসিড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। এখানের ম্যানেজার একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—অ্যান্টনী, তার সহকর্মী মঞ্জুর হোসেন—দুজনেই খুব শান্ত টাইপের লোক, কিন্তু একেবারেই নির্মম। তাদের কাছ থেকে কোনও হিউম্যান কনসিডারেশ্যন আশা করা নির্বুদ্ধিতা। এখন ভরসা শুধু দৈব—এক ভগবান যদি বাঁচিয়ে না দেন তো আর আমাদের বাঁচার কোনও আশা নেই। আজও আমার খাবার দিয়ে গিছল, চারখানা রুটি আর একটু আলুসিদ্ধ—কিন্তু তখনই হালদার জানিয়ে গেছে—আর বোধহয় দেওয়া যাবে না।'

বারো

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল। দেবীপদ শ্রান্তিতে, নলিনাক্ষ অন্য কারণে। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর আসামীর কী অবস্থা হয়—আজ নলিনাক্ষ কিছুটা বুঝল। জীবন্ত সমাধি কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, কথার-কথা হিসেবে। তার জীবনেই যে এই অবস্থা হবে, এই বয়েসেই—কে জানত!

সে নর্দমার কাছ থেকে সরে এসে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল।

না, ঘুম আসার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। মানসিক অবস্থা ঘুমের অনুকূল নয়। অন্য কারণও দেখা দিল। দুজনেই স্থির হয়ে আছে, এখানে অন্তিমকালের নীরবতা যাকে বলে—কাজেই মাথার উপরের সামান্য শব্দও কানে আসছে। কিছু-কিছু আগেও পাচ্ছিল, এখন যেন কাজকর্ম, বহু লোকের চলাফেরা, মালপত্র টানাটানি করার শব্দ আরও বেড়ে গেল। ভারি-ভারি জিনিসপত্র, কাঠের প্যাকিং বাক্স গোছ—সরাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে—মনে হল। খিদেতে, খিঁচের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে, তবু এইসব শব্দের অর্থ বুঝেই নলিনাক্ষ আরও যেন সেদিকে কান পেতে থাকে।

হিসেব মতো—মানে দেবীপদর ওই কুড়ি ঘণ্টার হিসেব যদি ঠিক হয়, রাত আটটা নাগাদ এই কর্মচঞ্চলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। তারপর আস্তে-আস্তে আবার যেন স্তিমিত হয়ে এসে সব নিথর হয়ে গেল। এ-নৈঃশব্দ্যের একটিই অর্থ হয়—এরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে—রাত এগারোটা নাগাদ পাশের ঘরে খুট করে একটা শব্দ হল। যেন লোহার চাপা দোরটা খুব সন্তর্পণে খুলেছে কেউ। নলিনাক্ষ প্রায় গড়িয়ে এসে আবার নর্দমায় কান দিল।

'বোসবাবু, বোসবাবু।' চাপা গলায় কে ডাকছে।

'হালদার? বলো।'

BanglaBook.org

দেবীপদ তো বেশ সহজভাবেই কথা কইছে, ওর কি একটুও ভয় হয়নি—সত্যিই? মনে-মনে বলে নলিনাক্ষ।

'বাবু, কী বলব, আমরা চলে যাচ্ছি। সব মাল চলে গেছে, ওপরতলায় চাবি দিচ্ছে—এখনই নিচে এসে পড়বে। মেন স্যুইচ অফ করা হবে, আর আলোও পাবেন না। আমার কাছে একটা বাড়তি টর্চ ছিল, আর দেশলাই। রাখুন—কী-ইবা হবে এতে, তবু ইঁদুর কি সাপখোপ এলে দেখতে পাবেন। আর এই এক প্যাকেট বিস্কুট। কিছু মনে করবেন না বাবু, আমি চললুম।'

'তুমি, তুমি কি কিছুই করতে পারো না? কোনওমতে বার করে দিতে—? এখন তো সবাই ব্যস্ত। অন্তত ওপরেও যদি রেখে যেতে পারতে। একদিন না একদিন এদের সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে হালদার, সেদিন আমি তোমার দিকে হতে পারতুম।'

'সব জানি বাবু—কিন্তু চারদিকে কড়া পাহারা। আন্টুনী সায়েব নিজে এই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা বাবু। আপনাদেরও বাঁচাতে পারব না, আমি নিজেও যাব।'

সে সরে গেল, চাপা দোরটা আবার বন্ধ করে দিয়ে।

আর একটু পরে হঠাৎই আলোটা নিভে গেল।

গাঢ়, নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার যে এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারে তা কে জানত!

নলিনাক্ষ না অন্ধকার দেখতে গিছল সমুদ্রের ধারে—শখ করে? মনে আছে—প্রথম যেদিন নামছে সমুদ্রের দিকে, সেই রাত্রিবেলা—ওই পরেশ চাকলাদারের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শাখী বুঝি নাম মেয়েটার—বলেছিল, 'অন্ধকার দেখতে যাচ্ছেন? শখ বটে বলিহারি আপনার! অন্ধকার আবার কী দেখার আছে, ওটা মরবার জন্যে রেখে দিন না! আলো আর ক'দিনের, যে ক'টা দিন বাঁচি আলোতেই যেন কাটিয়ে দিতে পারি—আমি তো এই বুঝি!' তখন উপোমি মনে হয়েছিল। আজ কথাগুলোর অর্থ বুঝছে!

নলিনাক্ষ আর সামলাতে পারল না, সত্যিই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। অনর্থক বুঝেই দেবীপদ ও-ঘর থেকে কোনও সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল না।

ক্লান্তি তো ছিলই, অপরিসীম ক্লান্তি, অনাহারের দুর্বলতা। তার ওপর এই বুকফাটা কান্না। ফলে অবসন্ন হয়েই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নলিনাক্ষ। গভীর স্বপ্নহীন ঘুম, দীর্ঘ উপবাসের পর ঘুমোলে যেমন গাঢ় ঘুম হয়—তেমনিই। সেইজন্যেই ঘুম ভাঙতেও দেরি হল। শব্দ পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই বোধহয়, প্রথম সেটা স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল, তারপর একসময় কথাটা মনে পড়ল—

—যে স্বপ্ন দেখে তার তো স্বপ্ন মনে হয় না। তবু তখনও চোখ খুলতে পারে না, চোখের পাতা যেন জুড়ে আছে। শেষে একসময় প্রচণ্ড কী একটা শব্দ, কে যেন কোনও দরজায় লাথি মারছে, চমকেই চোখ চাইল—

দেখল ঘরে আলো জ্বলছে আবার।

সত্যি? না স্বপ্ন দেখছে!

আশার আলো? জীবনের আলো?

মাথার ওপর বহু লোকের পায়ের শব্দ না? খুব চেঁচামেচি—সে-শব্দ এখানেও কিছুটা এসে পৌঁছচ্ছে। দরজায় লাথির পর লাথি মারছে কে। তারপর যেন পাশের ঘরে ওপরের চাপা দোর খোলার শব্দ, 'দেবীদা, দেবীদা—দেবীদা জেগে আছেন?'

দেবীপদ সাগ্রহে সাড়া দিল, 'কে প্রবীর? তোমরা এসেছ? তাই তো বলি—'

'হ্যাঁ দেবীদা, আমরা সবাই এসে পড়েছি। কমিশনার নিজে এসেছেন, আমাদের বড়সাহেব। আর ভয় নেই।'

BanglaBook.org

'পাশের ঘর প্রবীর, আগে পাশের ঘর দেখো। নলিনাক্ষবাবুকে রেখেছে ওখানে, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।' দেবীপদ বলল, 'প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ওঁর পেটে কিছু পড়েনি।'

'এই দরজাটা—না? তাও তো বটে। এই তো দরজা একটা। খোলো-খোলো মোহন, চাড় দাও, চাবি খুঁজে খুলতে অনেক দেরি হবে। সিঁড়িটা ফেলে নেমে যাও দুজন, যদি অজ্ঞান হয়ে থাকেন তো ধরাধরি করে তুলতে হবে। শৈলেন, তুমি যাও, ব্র্যান্ডি আছে তোমার কাছে—। অফ কোর্স, আজ নলিনাক্ষবাবু শুড বি আওয়ার ফার্স্ট কনসিডারেশান। হি ডিজারভস ইট। দেবীদা, সেবার আপনার জন্যে উনি বেঁচেছিলেন। এবার ওঁর জন্যে আপনি বাঁচলেন!'

এসব কি সত্যি, না স্বপ্ন দেখছে নলিনাক্ষ?

ওপরে এসে বসে, চা, খাবার ও ক'চামচ ব্র্যান্ডি খেয়ে একটু সুস্থ হলে দেবীপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর? তখন যে কথাটা বললে প্রবীর—।'

'আপনাকে আপনার সঙ্গীরা মিস করেছিল অন্ধকারে। আপনি কোথাও ঘাপটি মেরে আছেন ভেবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কোনও খোঁজ করেনি। তারপর সন্দেহ হতে, চাবলাদারের গাড়ির কথা এখানে ফোন করে জানায়—এখানে আগেই নজর রেখেছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায়নি। অর্থাৎ ইউ ওয়ার লস্ট! ...আপনি হেরে গেলেন কিন্তু আপনার নির্দেশ হারেনি। আপনি বলেছিলেন নলিনাক্ষবাবুর ওপর নজর রাখতে, আমরা ফেথফুলি সে-নির্দেশ পালন করেছি। তাতেই—ওঁর এ-পাড়ায় অ্যামেচার গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা, সন্ধ্যাবেলা সোলেমানের হাতে ধরা-পড়া—সব খবরই পেয়েছি। যে পিছু নিয়েছিল সে একা, সে যখন খবর দিলে তখনও আমরা এখানে এ-বাড়িতে এসে হানা দিতে সাহস করিনি, যদি খুন করে গুম করে দেয় ধরা পড়ার ভয়ে! তক্কে-তক্কে ছিলাম, সোলেমান শেষরাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে ওর মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছিল, সেখান থেকে অতর্কিতে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছি। রাত চারটের সময় জনমানব নেই, কেউ দেখেনি।'

'বাহবা। ঠিক করেছ। তারপর?'

'তারপর সোলেমানকে নিয়ে পড়া। সে কি সোজা, ভেরী হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তখন দাদা, এই বড়সাহেবরা আছেন তাঁদেরও জানাচ্ছি, আমার চাকরিটা খাবেন না—উপায় ছিল না দেখেই থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করলুম। তাও একটুতে হয়নি, লোকটার কী অসীম সহ্যগুণ কী বলব, শেষে যখন কুড়ি আঙুলে কুড়িটা পিন ফুটিয়ে বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছি—কম্বলের ওপর দিয়ে অবিশ্যি, এই মোহন হাতটা একটু-একটু করে মোচড়াচ্ছে, তখন কাজ হল। সবই বলল, কিন্তু এই করতে-করতে সন্ধে হয়ে গেছে, যখন শুনলুম সমস্ত মাল ওরা আজই পাচার করবে, দুটো রোডওয়েজের লরিতে পুরে চট চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ভাইজাগ, মানে তাই বলে বেরোবে, তার আগেই—এদিকে জাহাজ রেডি আছে, এখান থেকে সে মাল নিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে মোহানায়—এরা লরি থেকে নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে তুলবে, তখন একটু অপেক্ষা করাই ঠিক বিবেচনা করলুম। এতক্ষণই গেছে, একটুতে কী এসে যাবে! ওদের মাল বেরিয়ে গিয়ে রোডওয়েজের লরিতে উঠেছে, দুটো লরিতে এদের লোক, পিছনে মঞ্জুর মিঞার একটা ট্যাক্সিতে—ঠিক জায়গা বুঝে আমরা ঘিরে ধরেছি। তাই কি পারতুম, আমাদের এস. আই. আমেদ—সে বুদ্ধি করে রাইফেল চালিয়ে আগেই চাকাগুলো ফুটো করে দিয়েছিল, তাই। সেসব ব্যবস্থা করে এখানে আসছি—।'

'ছেলেমেয়েগুলো?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে নলিনাক্ষ।

'সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তবে সে পর্যন্ত থাকতে পারিনি, এখানে ছুটে এসেছি। অবশ্য একটু আগেই ফোন পেলুম, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেশিরভাগই বেঁচে যাবে।'

তারপরই প্রবীর বলল, 'কিন্তু নলিনীদা, এর মধ্যে একটু রোম্যান্সও আছে। আপনারই ভাগ্য।'

'কীরকম? কীরকম?' দেবীপদও ঝুঁকে পড়ে।

'আজই সন্ধ্যার পর একটি নারীহস্তের চিরকুট আমাদের কমিশনার সাহেবের ঘরে পৌঁছয়, তাতে এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে—নলিনাক্ষবাবু এখানে মাটির নিচের ঘরে মৃত্যুমুখে—এখনই যেন তাঁকে উদ্ধার করা হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু সে আবার কে?' নলিনাক্ষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, 'যাঃ! তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না-না,' কমিশনার বলে ওঠেন, 'ঠিকই বলেছে। সে-চিঠি আছে। কাল দেখবেন, হাতের লেখা যদি চিনতে পারেন। তবে আমার যা সারমাইজ—যা শুনলুম সব কেসটা—পরেশ চাকলাদারের মেয়েই হবে।'

পরেশ চাকলাদারের মেয়ে? শাখী?

শাখী খবর দিয়েছে?

শাখী?

শাখী, নলিনাক্ষকে—নিজের বাবার শত্রুকে—বাঁচাবার জন্যে পুলিশে চিঠি দিয়েছে।

না-না, সে কেমন করে হবে।

এ যে অসম্ভব।

অথচ এঁরাও যেভাবে বলছেন, তামাশা বলেও তো মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কেন? কী তার এত গরজ?

আবারও যেন মাথা গুলিয়ে যায় নলিনাক্ষর। আবার সেই যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই যন্ত্রণা ও বিহ্বলতার মধ্যেই মন মনের ভেতর হাতড়ে বেড়ায়, কারণটার সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করে। ধাঁধা বা হেঁয়ালির মতো দেখতে-দেখতে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে রহস্যটা—ক্রসওয়ার্ড পাজল-এর সূত্রের মতো অস্বস্তিকর। কোথায় যেন সমাধানের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না, সেইরকম।

এ-কাজ যে জন্যে করে মেয়েরা—কই শাখীর সঙ্গে ওর তো তেমন কোনও রোম্যান্সের—প্রেম তো দূরে থাক, অনুরাগেরও সম্বন্ধ ছিল না। কোনও পূর্বরাগের ভূমিকামাত্রও দেখা দেয়নি।

অন্তত নলিনাক্ষর তরফে দেয়নি।

তবে—এখন যা একটু-একটু মনে পড়ছে—দু-একদিন শাখীর আচরণটা ওর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

একদিন নিজেই এসেছিল সে, সে-ই প্রথম; বউদির কাছে বোনার প্যাটার্ন-বই চাইতে। বউদি সাধারণভাবে, সোয়েটার ইত্যাদি বোনেন বটে কিন্তু তাঁর কাছে কোনও বই নেই, এমন কিছু অসামান্য কারিগরও নন। এ-আসাতে তিনি খুশিও হননি, তাঁর নিজেরই ভাষায়—'বড়লোকের মেয়ে, ঐশ্বিয্যি দেখাতে আসা! হাড়পিত্তি জ্বালা করে। তা নয়—জাঁকের গল্প যেমন মা করে যায়, তেমনি ওরও করবার লোক চাই তো। কিংবা ছুতো করে খবর নিতে আসা, আমরা গরিব মানুষরা কেমন খাই দাই—।'

এ সবই বউদির রাগের কথা।

তবে ছুতোর কথাটা সত্যি। সেটা বোঝা গিছল দিন সাতেক পরেই।

বউদিই নিয়ে ওপরে উঠেছিলেন, ওর ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'ঠাকুরপো, এহ সামনের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে এসেছে একটু, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার সঙ্গে? কেন?'

একটু বোধকরি রূঢ়ই শুনিয়েছিল নলিনাক্ষর গলা। সে তখন সবে কাগজ-কলম নিয়ে একটা গল্প ফেঁদে বসেছে—এই অকারণ ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উঠবে—সে তো স্বাভাবিক।

'নাও, অত মেজাজ দেখাতে হবে না (বউদি বিবেচনাবুদ্ধির—যাকে 'ট্যাকট' বলে ইংরেজিতে

BanglaBook.org

—কিছুমাত্র ধার ধারেন না), ঢের লেখক হয়েছ! এও লেখে, ওর ইচ্ছে তুমি ওর দু-একটা লেখা একটু দেখে দাও। এখন না পারো, রেখে দাও, ধীরেসুস্থে দেখে দিয়ো।'

লাল হয়ে উঠেছিল শাখী, ঘেমে উঠেছিল সেই হেমন্তের দিনেও। হাত কাঁপছিল থরথর করে —লেখাটা টেবিলে রাখার সময় সেটাও নজরে পড়েছে। কিন্তু তার ভেতরও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায়নি, নবীন লেখকের সহজ লজ্জা, বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে এ একটা নিদারুণ অবস্থা বইকী।

লেখা কিছুই হয়নি, দেখে মনে হচ্ছে সে সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয় মেয়েটার। কিন্তু সে-কথা বলাও কঠিন। তাই ক'দিন পরে যখন লেখার খবর নিতে এসেছে তখন মিষ্টি করে অনেক ঘুরিয়ে বলতে হয়েছে, দু-একটা মামুলি উপদেশও দিতে হয়েছে।

তবে সেই সময়ই লক্ষ করেছে নলিনাক্ষ—ব্যর্থতাটা সহজেই মেনে নিয়েছে মেয়েটা এবং তখনই উঠে পালাবার চেষ্টা করেনি। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎই অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করেছে, 'আপনি বুঝি রোজ ব্যায়াম করেন?'

চমকে উঠেছে নলিনাক্ষ, ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কী করে জানলেন? কেউ বলেছে? বউদি বুঝি?'

'না-না। কেউ বলেনি। আমাদের ছাদের ওই কোণটা থেকে আপনার ঘরটা দেখা যায় যে একটু-একটু। তাতেই—। এতে কিছু দোষ আছে না কি?'

'না দোষ নেই। তবে এ দেখার বা এ নিয়ে আলোচনা করারই বা কী আছে, বিশেষ খালি হাতে করা—।'

'দেখার আছে বইকী। দেখেননি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিকেলে ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা যখন ব্যায়াম করে কীরকম ভিড় জমে যায়। সুগঠিত দেহ তো খুব সুলভ নয়।'

এই পর্যন্তই।

সেদিন তখনই চলে গিছল। আর আসেনি। তবে দেখার ব্যাপারটা পরেও লক্ষ করেছে। ছাদ নয়, চিলেকোঠার ঘর থেকেই দেখে, দূরবীন দিয়ে। বিরক্ত হয়ে জানলা বন্ধ করে ব্যায়াম করেছে তারপর থেকে।

এরপর দু-একদিন পাড়ায় কোনও-কোনও ক্রিয়াকর্ম-বাড়িতে দেখা হয়েছে, ওদের বাড়িতেও এসেছে, দু-একবার। তবে অন্তরঙ্গ হবার কোনও চেষ্টা করেনি বিশেষ, হয়তো নলিনাক্ষর কঠিন অনমনীয় ভাবভঙ্গি দেখেই সাহস হয়নি। শুধু একদিন, ওদের পুরী যাওয়ার আগে পথে একদিন দেখা হয়েছিল—হাঁটতে-হাঁটতেই আসছিল, নলিনাক্ষও বাকি সামান্য পথটুকু পাশে-পাশে এসেছিল, কতকটা বাধ্য হয়েই।

সেই সময়ই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা নলিনদা, বাইবেলে আছে শুনেছি, "সিনস অফ দি ফাদার্স উইল ভিজিট টু দেয়ার চিলড্রেন"—ঠিক হয়তো বলতে পারছি না, এইরকমই কথাটা —আপনি তো জানেন—কিন্তু কেন? বাপ যদি পাপ করে সে জন্যে ছেলেমেয়েরা দায়ী হবে কেন? কেন তাদের সেইভাবে বিচার করা হবে? আমাদের শাস্ত্রে তো এ কথা বলে না, রত্নাকরের মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্র তো সাফ জবাব দিয়েছিল, আমরা কি জানি তুমি কোথা থেকে কীভাবে রোজগার করছ! তবে কেন আমাদের সমাজ বাপ-মায়ের কাজ দেখে ছেলেমেয়েদের বিচার করবে!'

বিস্মিত হয়েছিল নলিনাক্ষ ওর উত্তেজনা দেখে। শুধু তাই নয়—মেয়েটা যে এত লেখাপড়া করে, এত ভাবে—তা দেখেও। ওদের বাড়ির পক্ষে যেন এটা বেমানান। সে উত্তর দিয়েছিল, 'না, বাইবেলের ও-কথাটার মানে এ নয় যে, তাদের দায়ী করা হয়—ওর অর্থ এই যে, বাপ-মায়ের পাপের ফল এদের ওপরও এসে পড়বে খানিকটা, এদের ভুগতে হবে। ...সামাজিক ধিক্কার—সেও সেই ভোগারই অঙ্গ একটা, নয় কি!'

BanglaBook.org

আর কিছু বলেনি শাখী, মুখটা যেন অন্য দিকে ফিরিয়ে নিঃশব্দেই হেঁটেছিল বাকি পথটুকু —অবশ্য পথও বিশেষ আর বাকি ছিল না তখন।

আজ মনে হচ্ছে, কে জানে, হয়তো বা চোখে জল এসে গিয়েছিল মেয়েটার, সেটা চাপতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

এরপর পুরীতে দেখা হয়েছে এক-আধবার। সাধারণ স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা হয়েছে। সকলের সামনেই। কেবল একদিন মাত্র মিনিটখানেকের জন্যে নির্জনে দেখা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়, নলিনাক্ষদের বাসার সামনেই, একা দাঁড়িয়েছিল, মনে হল সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছিল, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিছল—যদিচ এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—বলে উঠেছিল, চাপা কেমন একরকমের ভাঙা গলায়—'রাত্রে বেরোন কেন সমুদ্রের ধারে? অন্ধকারে একা যাওয়া বড় বাহাদুরি—না? বালির মধ্যে কত কী থাকতে পারে? জানেন এখানে খুব বিষাক্ত সাপ আছে, সন্ধের পর তারা বেরোয়?'

নলিনাক্ষ বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'সাপ! কই শুনিনি তো। তা ছাড়া আমি তো আলো নিয়ে যাই। আর ওই একদিনই তো—।'

কিন্তু সে-উত্তর নেবার জন্যে বোধহয় শাখী অপেক্ষা করেনি—কারণ, বলতে-বলতেই নলিনাক্ষ লক্ষ করেছিল, সে শূন্যকে উদ্দেশ করেই বলছে, তার সামনে কেউ কোথাও নেই আর। যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে শাখী।

মন নিমেষে বহু দূর পৌঁছে যায়। এত দ্রুত গতি আলোরও নয়।

সমস্তটা ভেবে নিতে বোধহয় একমিনিটও লাগেনি। ফিল্মের চেয়ে অনেক দ্রুত ছবিগুলো সরে-সরে গেছে স্মৃতির পর্দায়।

তার মধ্যেই কানে গেল, প্রবীর বলছে, 'বাই দ্য বাই, দেবীদা, আর একটি স্টার্টলিং নিউজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, পরেশ চাকলাদার খুন হয়েছে।'

'অ্যাঁ!' দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল—দেবীপদ ও নলিনাক্ষ। 'সে তো হাজতে ছিল!'

'হ্যাঁ। হাজতেই খুন হয়েছে। এই একটু আগে খবর পেয়েছি।'

'খুন না আত্মহত্যা?'

'খুনই তো শুনছি। এখনই যাচ্ছি আমরা। আপনাদের উদ্ধার করাটা আগে দরকার বলে এখানেই এসেছি। এবার আপনারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করুন—আমরা ওখানে যাই।'

দেবীপদ বলল, 'আমার বিশ্রাম লাগবে না। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

শ্রান্ত নলিনাক্ষ চোখ বুজেই শুধু বলে দিল, 'মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো, দেবীপদ। সেও না আত্মহত্যা করে বসে! কিংবা পারো তো কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দাও।'

'সে আমারও মনে হয়েছে।' যেতে-যেতেই উত্তর দিল দেবীপদ।

পরের পাতায় দেখুন

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

২

সম্পাদনা

অনীশ দেব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

"I cannot live without brainwork.
What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না।
এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কয়েকটি কথা, দ্বিতীয়বার

'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড চারবছর পর প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে রয়েছে বারোটি উপন্যাস। লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত শুরু করে বিমল সাহা পর্যন্ত। অর্থাৎ, অতি পরিচিত নাম দিয়ে শুরু করে অচেনা নাম দিয়ে শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ডটি যে চারবছর পর প্রকাশিত হল তার জন্য দায়ী আমি নিজে। কারণ, উপন্যাস নির্বাচন, তার পাঠ সংশোধন (কোনও-কোনও ক্ষেত্রে), টাইপ সেটিং, প্রুফ রিডিং—ইত্যাদি কাজ অনেক সময় দাবী করেছে। তবুও দেরির জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষামাণ পাঠকের কাছে মার্জনা চাইছি।

কেন এই 'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস' প্রকল্পে হাত দিয়েছিলাম সে-কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জানিয়েছি—নতুন করে আব বলব না। শুধু এটুকু জানাই, রহস্য-গোয়েন্দা জাতীয় কাহিনির প্রতি আমার যে-টান ছোটবেলা থেকেই টের পেয়েছিলাম সেটা বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে মোটেই কমেনি—বরং বেড়েছে। সেই ভালোবাসা আর আগ্রহ থেকেই এই সংকলন। আজকের ইন্টারনেট আর টিভিব যুগেও যাঁরা রহস্য গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন এই বই তাঁদের জন্য। যদি এই বই তাঁদের ভালো লাগে তা হলে জানব আমার চেষ্টা কিছুটা মূল্য পেল। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এবারেও রয়েছে 'পরিশিষ্ট'—সেখানে লেখক এবং লেখা নিয়ে কিছু তথ্য পেশ করেছি। আর উপন্যাসগুলো মোটামুটিভাবে লেখকদের জন্মসাল অনুসারে সাজাতে চেষ্টা করেছি।

এই বই প্রকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুবন্ধু ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। আমাকে এই প্রকল্পে সবসময় উৎসাহ এবং আশকারা দিয়েছেন। এ ছাড়া যাঁদের সাহায্যের হাত এই বইয়ের প্রযোজনায় নানানভাবে জড়িয়ে আছে তাঁরা হলেন মৈত্রেয়ী গুহ, বরুণ রায়, শাশ্বত সেন, মানস চক্রবর্তী, শান্তিপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, মানস ভাণ্ডারী, শুভাশিস ঘোষ, সায়ক দেব এবং প্রচ্ছদশিল্পী অমিত চক্রবর্তী। এঁদের সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। ইতি—

অনীশ দেব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নীহাররঞ্জন গুপ্ত	ঘুম নেই	১১
প্রণব রায়	ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট	১০৫
বিমল কর	হ্রদ	১৬৩
সত্যজিৎ রায়	বাদশাহী আংটি	২৫৭
সমরেশ বসু	দু-মুখো সাপ	৩২১
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ভোর রাতের আর্তনাদ	৪০৫
নারায়ণ সান্যাল	সোনার কাঁটা	৪৯৩
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	কিছু অলৌকিক	৫৫৯
কবিতা সিংহ	রাত্রি ছিল পিশাচের	৬৩১
অদ্রীশ বর্ধন	রুপোর টাকা	৬৮৯
সুখময় মুখোপাধ্যায়	তির্যক রেখা	৭৫৫
বিমল সাহা	আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়	৮২৩
পরিশিষ্ট		৮৫৩

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

ঘুম নেই

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক

কাল রাতেও আবার তুমি কাঁদছিলে, দাদা!

চায়ের টেবিলে এসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে-ঢালতে মিতা বললে।

দ্বিতীয় কাপে চিনি মেশাতে-মেশাতে আমি মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

আজ কয়েকদিন থেকেই বোন মিতা আমাকে ওই কথাটা বলছে। প্রথম দিন হেসে ওর বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছি, দ্বিতীয় দিনও স্বপ্ন দেখেছে বলে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আর কেন যেন কোনও প্রতিবাদই আমার কণ্ঠ থেকে বের হল না।

অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপে চামচটা ডুবিয়ে নাড়তে লাগলাম নিঃশব্দে।

চায়ের কাপে একটা মৃদু চুমুক দিয়ে মিতা বোধহয় আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই এবারে বললে, তুমি নিজেই একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার, দাদা, তবু বলছি, একবার তুমি কলকাতায় গিয়ে কাউকে কনসাল্ট করে এলে পারতে!

হ্যাঁ, তাই যাব না হয়, কিন্তু সত্যি তুই মিতা, আমাকে রাত্রে কাঁদতে শুনেছিস?

এক-আধদিন নয়, পর-পর কয়েক রাত্রিই তো শুনছি, তুমি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদ।

তোর শোনাটা ভুলও তো হতে পারে, মিতা! কণ্ঠে জোর দিয়েই কথাটা এবারে বলি।

না, ভুল নয়। স্পষ্ট আমি শুনেছি কান্নার শব্দ। প্রথম রাতে কান্নার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যেতে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে শোনার পর তোমাকে তো বলেছি, কেমন কৌতূহল হল। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। তোমার আর আমার শোওয়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটা সেদিন খোলাই ছিল। মনে হল, স্পষ্ট যেন তোমার ঘরের ভেতর থেকেই চাপা কান্নার শব্দটা আসছে। প্রথম তো ভেবেই পাই না, তোমার ঘরের থেকে কান্নার শব্দ আসছে কী করে! তারপর এগিয়ে গিয়ে তোমার বিছানার সামনে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। দেখি, তুমিই ঘুমের মধ্যে কাঁদছ। ভাবলাম তখন, হয়তো কোনও স্বপ্ন দেখে কাঁদছ। কিন্তু তার পরের এবং তার পরের রাতেও যখন তোমাকে কাঁদতে শুনলাম, তখনই সর্বপ্রথম তোমাকে আমি কথাটা না বলে পারিনি। কিন্তু কথাটা শুনে তুমি আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিলে। পরের দিনও বলতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছি!

মিতার কথায় আর আমি কোনও জবাব দিলাম না। চায়ের টেবিল থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়লাম।

বেলা আটটা প্রায় বাজে।

ডিসপেনসারিতে রোগীর ভিড় জমতে শুরু করেছে।

নিজের শয়নঘরে এসে জামা গায়ে দিয়ে ডিসপেনসারিতে যাওয়ার জন্য ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললাম।

বাড়ি থেকে সামান্যই দূরে বড় রাস্তার ওপরে আমার ডিসপেনসারি।

দীর্ঘদিন ধরে রাঁচি শহরে আছি আমরা।

বাবা প্রথম যৌবনে কনট্রাক্টারির কাজ নিয়ে এসেছিলেন রাঁচি শহরে। তারপর এ-শহরের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এখানেই একটু নির্জনে শহরের প্রান্তে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করে দেন। সে-ও আজ খুব কম করে ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

ভাই-বোন আমরা মাত্র দুটিই, আমি আর মিতা।

মিতা আমার চাইতে প্রায় চোদ্দো বছরের ছোট বয়েসে।

BanglaBook.org

আমার যখন ষোলো বছর ও মিতার মাত্র দু-বছর বয়েস সেই সময় মা মারা যান।

চিরদিন বিহারে মানুষ, বাবাও বিহারেই বলতে গেলে জীবনের দীর্ঘদিন কাটিয়ে বিহারেই ডোমিসাইলড হয়ে গিয়েছিলেন।

মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করার পর বিলেতে এম. আর. সি. পি. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি সেই সময় বাবার মৃত্যু হয়।

তারপর বিলেত থেকে ফিরে এসে রাঁচি শহরেই প্র্যাকটিস শুরু করলাম, কারণ, বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিল ওইখানেই প্র্যাকটিস করি।

এবং প্র্যাকটিস করতে বসে দেখলাম ভুল করিনি। পিছনে একটা মোটারকমের বিলিতি খেতাব থাকার দরুন অল্পদিনেই প্র্যাকটিস জমে উঠল।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে বিলেতে পড়বার সময় ছাত্রাবস্থায় অর্থের অভাব বেশই হয়েছিল। কারণ, সারাজীবনে বাবা যেমন প্রচুর উপায় করেছিলেন তেমনি খরচও করে গিয়েছিলেন দু-হাতে।

সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল রাঁচির ওই বসতবাটিটি ও মার কিছু অলংকার।

বিলেত থেকে ফিরে এসে প্র্যাকটিস করতে বসে ও প্র্যাকটিসটা না জমে ওঠা পর্যন্ত অর্থের অভাবটা বেশ তীব্রই ছিল। সেসব দিনের কথা ভুলব না।

ইদানীং আর অবিশ্যি সে-অভাবটা নেই।

সংসারও আমাদের ছোট্ট। আমি আর একটিমাত্র ছোট বোন মিতা।

আমিও বিয়ে করিনি, মিতাও করেনি।

বি. এ. পাস করে মিতা এখানেই গার্লস স্কুলে চাকরি করছে বছরতিনেক হল।

একই মা-বাপের সন্তান হলেও মিতা ও আমি—আমাদের দুজনের মধ্যে চেহারায় ও চরিত্রে একেবারেই কিন্তু মিল নেই।

আমার রং কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, আর এ-ও আমি জানি দেখতে আমি কুৎসিতই। অথচ মিতা আমার নিজের সহোদরা, রোগাটে পাতলা চেহারা, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ এবং চোখ-মুখ অতীব সুশ্রী। ঠিক বিপরীত।

অপরিচিতেরা প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমরা আপন সহোদর ভাই-বোন।

মিতার গলার স্বরটি মিষ্টি।

আমার গলার স্বর কর্কশ, তা-ও আমি জানি।

চট করে আমি মেজাজ খারাপ করি না। অতি বড় শত্রুর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করি না।

উচিত জেনেও নিষ্ঠুর সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা পাই।

অথচ মিতা চট করে মেজাজ খারাপ করে, শত্রুকে দু-চোখে দেখতে পারে না এবং কোনওরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে স্পষ্ট কথা মুখের ওপর বলে দেয়।

স্থানীয় ডাক্তার হলেও আমার হৃদ্যতা বলে কারও সঙ্গেই বড় একটা কিছু নেই। অর্থাৎ এক কথায় আমি আদৌ মিশুকে নই।

কিন্তু মিতার সঙ্গে শহরের অনেকেরই একটা মধুর হৃদ্যতা তো আছে দেখি।

মিতার বন্ধু ও বান্ধবীর অভাব নেই, আমার সত্যিকারের বন্ধু বলতে এ-শহরে কেউই নেই।

BanglaBook.org

ডিসপেনসারিতে এসে দেখি সেদিন দু-তিনটির বেশি রোগী নেই।

তাদের দেখে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে ঘণ্টাখানেকও লাগল না।

পার্টিশন দেওয়া চেম্বারের মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

রাঁচি শহরে এবারে পৌষের গোড়াতেই দেখছি শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। খোলা

জানলাপথে রাস্তার প্রবহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা টানতে-টানতে আবার মিতার কথাগুলোই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সত্যিই কি আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে কাঁদি!

কিন্তু কেন?

ঘুমের ঘোরে আমি কাঁদতেই বা যাব কেন?

মনের কোথায়ও কোনও দুঃখই তো আমার নেই।

কোনও দুশ্চিন্তাই নেই মনের কোথাও আমার।

অথচ দিন পনেরো থেকে নাকি মিতা রাত্রে আমাকে ঘুমের ঘোরে কাঁদতে শুনেছে।

সুইংডোরের ওপাশে সহসা কিরীটী রায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডাক্তার সেন আছেন নাকি?

কে? মিস্টার রায়! আসুন-আসুন।

কিরীটী রায় এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন সুইংডোর ঠেলে।

এত সকালে? কী খবর, বসুন-বসুন।

কিরীটী রায় সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠব ভদ্রলোকের। প্রথম পরিচয়ের দিন যেমন দেখেছিলাম, আজও তেমন দেখলাম। পরিধানে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা, গায়ে একটা সাদা শাল, পায়ে চপ্পল।

মুখে বর্মা-চুরুট।

কথা বললাম আবার আমিই, তারপর আরও কিছুদিন এখানে আছেন তো?

হ্যাঁ।

সকালে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, বেশ লাগে সকাল বেলাটা ঘুরতে এখানে। বলেই একটু থেমে বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, ডাক্তার সেন। আচ্ছা, এখানকার এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম পুলকের দাদা জগৎজীবনবাবুও নাকি টি. বি. হয়েই মারা গিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করে কিরীটী রায় আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কার মুখে শুনলেন?

ওই যে আমি যে-বাড়িটায় আছি সেই বাড়িরই পাশের বাড়িতে নির্মল চৌধুরী—।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আমার চিকিৎসাতে তো তিনি কিছুদিন ছিলেনও। ওঁদের এক বোনও নাকি টি. বি.-তে মারা গিয়েছিলেন। ইনফেকশনটা বোধহয় ওঁদের দু-ভাইয়ের সেখান থেকেই হয়েছিল। —বললাম আমি।

স্বাভাবিক। তারপর একটু থেমে কিরীটী রায় বললেন, পুলকের দাদাও টি. বি.-তেই তা হলে মারা গেছেন! পুলকের যে টি. বি. হয়েছে সে-কথাটা অবিশ্যি আমি বছর পাঁচেক আগে তারই এক চিঠিতে জেনেছিলাম।

আপনি জানতেন?

হ্যাঁ, এককালে পুলকের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে বছর দুই একত্রে পড়েছিলাম। সেই সময়েই আমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সূত্রপাত। কিন্তু তারপর ওর চিঠিতেই জেনেছিলাম, ও নাকি একেবারে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, হয়েছিলেন।

মাঝখানে বছরখানেক আগে ওর সঙ্গে একবার কলকাতায় দেখা হয়েছিল, তখনও দেখেছিলাম চমৎকার চেহারা। হাসতে-হাসতে আমাকে বললে, রোগ নাকি তার শরীর থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

BanglaBook.org

আমি নিজেও কম আশ্চর্য হইনি, মিস্টার রায়, পুলকবাবুর রোগটা হঠাৎ flare-up করায়। শেষে মাসখানেক তো আমিই চিকিৎসা করেছিলাম। কোনও ঔষধই যেন আর ধরল না।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হল।

মনে হল, খোলা জানলাপথে বাইরের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কী ভাবছেন।

এককাপ চা হবে নাকি, মিস্টার রায়?

চা! না, ধন্যবাদ—বলেই উঠে পড়লেন মিস্টার রায়।

এবং যেমন ক্ষণপূর্বে হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি হঠাৎই যেন আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দুই

কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ আমার মাত্র দিন পাঁচেক হবে।

আর আলাপটাও হয়েছিল আমার বোন মিতার মধ্যস্থতায়।

আমাদের বাড়ি 'বিরাম কুটির'-এর পাশ দিয়ে যে অপ্রশস্ত, কাঁচা, পায়ে-চলার রাস্তাটা চলে গিয়েছে তারই সাত-আটখানা পরের বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি 'সানি লজে' উনি দিন দশেক হল এসে উঠেছেন।

ইতিমধ্যে একদিন ওঁকে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের ক্লাব 'সান্ধ্যবাসরে' ওঁরই এখানকার পাশের বাড়ির ভদ্রলোক নির্মল চৌধুরী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই আমার বোন মিতার সঙ্গে নাকি ওঁর আলাপ হয়।

তারপর মিতাই ওঁকে পরের দিন আমাদের বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করে এনেছিল। এবং আমার আলাপ ওঁর সঙ্গে সেইদিনই হয়।

মিতার মুখেই শুনেছি উনি একজন বিখ্যাত বেসরকারি সত্যসন্ধানী। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

আমাদের দেশে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন বলে তো কই কখনও শুনিনি। তবে ওঁর নাকি খুব নাম।

ভদ্রলোকটির চোখমুখের দিকে তাকালেই অবিশ্যি বোঝা যায়, সেখানে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

তবে লোকটিকে যেন কেমন একটু গম্ভীর ও দাম্ভিক প্রকৃতির বলেই মনে হয়।

কিরীটীবাবুর ক্ষণপূর্বের কথাগুলো আবার মনে পড়ল। আশ্চর্য, পুলকজীবন তাহলে কিরীটী রায়ের এককালে সহপাঠী ছিলেন এবং হৃদ্যতাও হয়েছিল!

পুলকজীবনের দাদা জগৎজীবনবাবুর সঙ্গে অবিশ্যি আমার অনেকদিন থেকেই আলাপ ছিল, এবং আলাপটা আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে এখানে প্র্যাকটিস শুরু করার পর থেকে রীতিমতো হৃদ্যতাতেই পরিণত হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর ডিসপেনসারির কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই জগৎজীবনের ওখানে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে যাওয়াটা তো রীতিমতো একটা আমার অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

চমৎকার মিশুকে লোক ছিলেন জগৎজীবনবাবু।

বিয়ে-থা করেননি। আপনার জন বলতে সংসারে ছিল ওই একটিমাত্র ভাই—পুলকজীবন। কলকাতায় পাটের দালালি করতেন জগৎজীবন।

এবং শোনা যায় দালালি করে রীতিমতো দু-পয়সা উপার্জনও করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ

BanglaBook.org

টি. বি. হওয়ায় কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন কিছুদিন থাকবেন বলে। শেষটায় পুলকেরই মুখে শুনেছিলাম, রাঁচি জায়গাটা নাকি ভারী পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এখানেই একটা বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে থেকে যান।

সে-ও আজ বছর দশেক আগেকার কথা। তারপর সুস্থ হওয়ার পর স্টেশন রোডেই একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের অফিস খোলেন। কাজকর্ম ভালোই হত। ছোট ভাই পুলকজীবন প্রায় আট বছরের ছোট জগৎজীবনবাবুর থেকে। ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন জগৎজীবন। পুলকজীবন ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে বোম্বাইয়ে অধ্যাপনার কাজ করছিলেন একটি কলেজে।

বছর দুই আগে হঠাৎ জগৎজীবনবাবুর পুরাতন টি. বি. রোগটা নতুন করে দেখা দিল এবং মাসতিনেক ভুগে তিনি মারা গেলেন। জগৎজীবনের অসুখটার যখন বাড়াবাড়ি চলেছে, ছোট ভাই তার পেয়ে এখানে চলে আসেন। তারপর আর তিনিও বোম্বাইয়ে ফিরে যাননি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দাদার অফিসটাই দেখাশোনা করছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাসতিনেক আগে তাঁকেও ধরল ওই রোগে এবং মাত্র দিন পনেরো হল পুলকজীবন মারা গিয়েছেন।

জগৎজীবন ও তাঁর ভাই পুলকজীবনের কথাই ভাবছিলাম। কমপাউন্ডার সতীশ এসে ঘরে ঢুকল, স্যার।

হ্যাঁ—।

সূর্যপ্রসাদবাবু সকালে ফোন করেছিলেন, তিনি—।

স্যার সূর্যপ্রসাদ ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ, বললেন সকালে চার-পাঁচবার নাকি আপনার বাড়িতে ট্রাই করেছিলেন তিনি—।

তা হবে। কাল রাত থেকেই বাসার ফোনটা আউট-অফ-অর্ডার হয়ে আছে। তা কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ বলেছেন, পারেন যদি আজ একবার তাঁর ওখান হয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

সতীশ চলে গেল ঘর থেকে।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম।

সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ যেতে বলেছেন কেন? কারও অসুখ-বিসুখ নয় তো? বয়েস হলেও সূর্যপ্রসাদের আমি গত দেড় বৎসরের মধ্যে সামান্য সর্দি-জ্বরও হতে দেখিনি।

চমৎকার স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের। এ-বয়েসে ওরকম স্বাস্থ্য বড় একটা দেখাও যায় না।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত রাঁচি শহরে বসবাস করছেন তা প্রায় বছর ষোলো হল।

পুরাতন বাসিন্দা এ-শহরের।

ভদ্রলোকের শোনা যায় নাকি প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। এবং তাঁর ব্যাঙ্কে মজুত টাকার অঙ্ক সম্পর্কে এ-শহরের অনেকেই অনেক কথা বলে। কেউ বলে বিশ, কেউ বলে দশ লাখ।

আমাদের বাড়ি থেকে আধমাইলটাক দূরের বিরাট বাড়িটাই তাঁর। বাড়িটা এককালে পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছিল। এবং খালিই পড়ে থাকত বেশিরভাগ সময়।

সূর্যপ্রসাদ এসে বাড়িটা কিনে প্রচুর অর্থব্যয় করে নিজের পছন্দমতো সেটাকে চমৎকার বাসোপযোগী করে নেন।

সূর্যপ্রসাদ সম্পর্কে একটা গুজব শোনা যায়, কোথাকার কোন এক নেটিভ স্টেটের নাকি তিনি দেওয়ান বাহাদুর ছিলেন। কী কারণে স্টেটের মহারাজার সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় রাতারাতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। এবং কলকাতায় কিছুদিন বসবাস করে মন না বসায় শেষপর্যন্ত এখানে এসে রাঁচি শহরটি পছন্দ হওয়ায় এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেন।

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের বর্তমান বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টির বেশি হবে না। আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। একটি মাত্রই সন্তান—ছেলে সমর।

একটিমাত্র ছেলে হলেও সূর্যপ্রসাদের সংসারটি কিন্তু ছোট নয়।

ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ এককালে খুলনায় ওকালতি করতেন। কিন্তু বড় সংসার ও পসারও তেমন কিছু না হওয়ায় বৎসর দুই হল তিনিও সপরিবারে এসে রাঁচিতে ভাইয়ের আশ্রয়েই ডেরা বেঁধেছেন কায়েমিভাবে।

সূর্যপ্রসাদের চাইতে বয়েসে রাধিকাপ্রসাদ আট-নয় বৎসরের ছোট হলেও, দেখায় কিন্তু তাঁকে তাঁর দাদার চেহারার তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধ। বোধহয় দারিদ্র্য ও অভাবেই শরীরটা তাঁর অকালে বুড়িয়ে গিয়েছে।

রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী গত বৎসর এখানেই মারা গিয়েছেন। চার ছেলে ও চার মেয়ে। তার মধ্যে চার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড় দুটি ছেলে অমল ও কমল কোথায় যেন রেলে চাকরি করে। তাদের বাপের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তৃতীয় ছেলে বিমল গত বৎসর বি. এ. পাস করেছে। এখানেই থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টায় আছে। সর্বকনিষ্ঠ সুবল লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায়নি, শরীরচর্চা, ডন, বারবেল ইত্যাদি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। বিমল শান্ত স্বভাবের ও সুবল চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির।

সূর্যপ্রসাদের একমাত্র ছেলে সমর।

বিরাট ধনী বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে হওয়ায় এবং অল্প বয়েসে মা মারা যাওয়ায় সমর লেখাপড়ায় স্কুলের চৌকাঠও ডিঙোতে পারেনি। তবে গানবাজনার নেশা ছাড়াও সেতারবাদ্যে কিন্তু সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। এবং গানবাজনার নেশা ছাড়া আরও একটা নেশা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে—জুয়া খেলার। জুয়ার নেশা থেকে ছেলেকে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, কিন্তু সক্ষম হননি। এবং ওই জুয়ার নেশার জন্য সমরের যে প্রায়ই টাকার প্রয়োজন হত সেটা আমি জানতাম। যার ফলে প্রায়ই এর ওর কাছে সমরকে ধার করতে হত। আমিও অনেক সময় তাকে ধার দিয়েছি। লেখাপড়া বিশেষ না হলেও এবং জুয়ার নেশা থাকলেও মানুষ হিসেবে কিন্তু সমর এখানকার সকলেরই প্রিয়। তার মিষ্টি-মধুর ব্যবহারের জন্যে তাকে ভালোবাসে না এ-শহরে এমন কেউ নেই। বিশেষ করে মেয়েদের মহলে সমরের যে একটা বিশেষ প্রিয় স্থান আছে—সেটার মূলে হচ্ছে গানবাজনার খ্যাতি ও তার চমৎকার সুশ্রী দেহ-সৌষ্ঠব। অমন চমৎকার দেহশ্রী চট করে বড় একটা কারও নজরে পড়ে না। আমাদের বাড়িতে সমরের যথেষ্ট যাতায়াত এবং তার মূলে যে আমার বোন মিতা সে-সংবাদটা আমার অজ্ঞাত নয়। মিতারও যে সমরের ওপর বিশেষ দুর্বলতা আছে সেটাও বহুদিন বহু ব্যাপারেই আমি টের পেয়েছি। সূর্যপ্রসাদ আমাকে বিশেষ করে দেখা করতে বলেছেন—সতীশের মুখে কথাটা শোনা অবধি একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে হচ্ছিল।

তবে কি সমরের ব্যাপারেই সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

দিন কুড়ি হবে সমর নিরুদ্দিষ্ট। তার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। কানাঘুষায় শুনেছি, সমর নাকি সূর্যপ্রসাদের সই জাল করে হাজার পাঁচেক টাকা তার বাপের ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। ইদানীং সমরের জুয়া খেলার জন্যে কিছু ধার হয়ে গিয়েছিল জানতাম কিন্তু তাই বলে বাপের সই জাল করে সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে এমন প্রকৃতির ছেলে তো সে নয়।

তবু সূর্যপ্রসাদ যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার যেতে হবে তাঁর ওখানে।

সমরের কথাই ভাবতে-ভাবতে ডিসপেনসারি থেকে বের হলাম।

গাড়িতে উঠতে যাব, ড্রাইভার রামরূপ বললে, গাড়ি স্টার্ট নিতে আবার গোলমাল করছে, স্যার—।

BanglaBook.org

তা হলে কী করবে। নন্দ মিস্ত্রির ওখানে নিয়ে যাও না হয় গাড়িটা, বললাম।

ও তো এই নিয়ে তিনবার সারিয়ে দিল। আমাকে যদি একদিনের ছুটি দেন তো হাজারিবাগে একজন ভালো মিস্ত্রি আছে, নিজে আমি তাকে গিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

বেশ, তাই না হয় যাও।

এক্ষুনি তা হলে সাড়ে ন'টার বাসে চলে যাই, স্যার?

তাই যাও।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে হেঁটেই বাজারের দিকে চললাম।

কিছুদূর এগুতেই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ডাকে চমকে তাকালাম।—ডাক্তার সেন?

এই যে মিস্টার গুপ্ত—আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন শুনলাম?

হ্যাঁ, ডাক্তার।

সমরের কোনও খোঁজখবর পেলেন? নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশ্নটা করলাম।

না। সে যাক, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল, ডাক্তার।

বেশ তো, আমি বিকেলের দিকে যাব'খন।

বিকেলে নয়। একটু নিরিবিলিতে সময় নিয়ে কথাটা বলতে চাই। বরং আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানেই ডিনার খাবে। ডিনারের পরই কথাবার্তা হবে'খন। বলদেববাবু, মেজর কৃষ্ণস্বামীকেও বলেছি ডিনার খেতে—।

বেশ, যাব।

হ্যাঁ, এসো।

বলে আর দাঁড়ালেন না সূর্যপ্রসাদ।

সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চওড়া চেহারা সূর্যপ্রসাদের। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হয়েছে তবু হাঁটেন এখনও সোজা হয়ে।

উঃ, হাড়কৃপণ লোকটা! এত টাকা—ইচ্ছা করলে আট-দশটা গাড়ি রাখতে পারেন, তবু পায়ে হেঁটে সব জায়গায় যাবেন।

ভগবানের বিচার বলব অদ্ভুত!

কাউকে দেবেন তো একেবারে দু-হাতে ঢেলে দেবেন।

আর যাকে দেবেন না তো একেবারেই দেবেন না।

তিন

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গেল।

রবিবার বলে মিতার স্কুল নেই।

মিতা বাইরের ঘরেই একটা সোফার ওপরে বসে উলের কী একটা যেন বুনছিল। আমার পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।—দাদা, একটা ভালো সংবাদ আছে।

মিতার মুখের দিকে চেয়ে কোনও কথা না বলে মৃদু হেসে ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মিতা বলে ওঠে, চলে যাচ্ছ যে। সত্যি বলছি, গুড নিউজ।

কালা তো নই, শুনতে পাচ্ছি।—বলে দু-পা এগিয়ে গেলাম।

মিতা এবার সোফা থেকে উঠে আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। আমি এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম, মিতাও পিছনে-পিছনে এসে সেই ঘরে ঢুকল।

BanglaBook.org

গেস করতে পার, গুড নিউজটা কী, দাদা?

গা থেকে জামাটা খুলতে-খুলতে বললাম, তুই না হয় ইদানীং একজন হবু গণৎকার হয়ে উঠেছিস, কিন্তু আমার পেশা হচ্ছে ডাক্তারি!

সত্যি, তুমি একেবারে হোপলেস, অ্যাবসলুটলি হোপলেস।

তবু আমি নিরুত্তর।

জানি, আন্দাজও করতে পারবে না। সমর এই রাঁচি শহরেই আছে—।

সমর!

জানতাম, তোমার কাছে সারপ্রাইজই মনে হবে নিউজটা।

কী আবোল-তাবোল বকছিস, মিতা।

একেবারেই আবোল-তাবোল নয়। সত্যিই সমর রাঁচি শহরেই বর্তমানে আছে।

রাঁচি শহরে আছে?

হ্যাঁ, আজ সকালবেলা তুমি বের হয়ে যাওয়ার পরই কয়েকটা জিনিস কিনতে আমি বাজারের দিকে গিয়েছিলাম, মতি স্টোর্স থেকে জিনিসগুলো কিনে বের হচ্ছি, রাস্তার উলটোদিকে যে-রেস্টুরেন্টটা আছে তারই পাশের পান-সিগারেটের দোকানের সামনে আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

তারপর?

কিন্তু হঠাৎ ওই সময় উলটোদিক থেকে একটা গাড়ি এসে পড়ায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। চট করে সে যে কোনদিকে চলে গেল—।

যেমন তুই, কাকে না কাকে দেখেছিস! অমনি ভাবলি সে বুঝি সমর।

কী বলছ তুমি, দাদা, সমরকে চিনতে আমি ভুল করব?

নিশ্চয়ই ভুল করেছিস। নইলে—।

না দাদা, ভুল আমি করিনি। তারপরই কতকটা যেন আত্মগতভাবে মিতা মৃদুকণ্ঠে বলে, পুয়োর সমর। ঝোঁকের মাথায় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে এখন হয়তো রিপেনটেড। কে জানে হয়তো হাতের টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছে। যেরকম ময়লা জামাকাপড় গায়ে দেখলাম—।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

স্নান করবার জন্যে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিন্তু স্নান করতে-করতেও মিতার মুখে শোনা ক্ষণপূর্বের কথাগুলোই ভাবছিলাম।

আশ্চর্য।

সত্যিই কি তা হলে সমর রাঁচি শহরের মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে? কিন্তু তারই বা কী প্রয়োজন ছিল? সূর্যপ্রসাদ যতই কঠোর প্রকৃতির লোক হোন না, হাজার হলেও সমর তাঁর আত্মজ তো। মাতৃহারা একমাত্র সন্তান।

সূর্যপ্রসাদ কথাটা শুনলে হয়তো আশ্চর্যই হবেন। কারণ, তিনি নিশ্চয়ই এ-কথা জানেন না। আর যদি জানতেনই, আমাকে কি কথাটা বলতেন না?

সত্যিই বেচারি সমর।

কিন্তু মিতা দেখতে ভুল করেনি তো?

ভুলও তো সে দেখে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তাই। নইলে সূর্যপ্রসাদ কি এই ক'দিন ধরে সমরকে কম খুঁজছেন!

না, না—মিতা নিশ্চয়ই দেখতে ভুলই করেছে।

কিন্তু সূর্যপ্রসাদ আমার সঙ্গে কী এমন প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে চান?

বলবেন আবার নিরিবিলিতে, সময় লাগবে আলোচনাটা করতে।

কী জানি কী আলোচনা আমার সঙ্গে তিনি করতে চান?

BanglaBook.org

*

রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ডিসপেনসারি থেকেই সূর্যপ্রসাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বের হলাম।

একে প্রচণ্ড শীত পড়েছে, তার ওপরে আবার চলছে হাওয়া। চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বিঁধছে। গায়ের গরম লংকোটের কলারটা উলটে দিলাম। মাথার টুপিটাও একটু নীচের দিকে টেনে দিলাম।

ডিসপেনসারি থেকে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়ি প্রায় আধমাইলটাক তো হবেই।

গাড়িটা বিগড়েছে, হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বড় রাস্তার ঠিক ওপরে সূর্যপ্রসাদের 'লিলি কটেজ' নয়। খানিকটা ভেতরের দিকে। জায়গাটাও নির্জন।

দুপুরের দিক থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিছুদূর এগুতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল।

বেশ দ্রুতই পা চালালাম।

শীত, বৃষ্টি ও হাওয়া সব মিলে যেন ঠান্ডাটা আরও তীব্র করে তোলে।

টিপ-টিপ বৃষ্টি এবারে বড়-বড় ফোঁটায় শুরু হল।

আরও দ্রুত পা চালালাম।

একটা উঁচু জমির উপরে সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজ'।

গেট পার হয়েই বাড়ির সামনে একটি চমৎকার ফুলের বাগান। নানাজাতীয় রং-বেরঙের মরশুমি ফুলের সমারোহ, বৈচিত্র্য।

আমি আদৌ কবিপ্রকৃতির নই, একান্ত বাস্তববাদী। তবু যখনই সূর্যপ্রসাদের গেট দিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছি, দু-চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়েছে।

বাড়ির গেটটা খোলাই ছিল।

কাঁকর-বিছানো পায়ে-চলা-পথটা সামনের ঝুল-বারান্দার নীচে গিয়ে মিশেছে। সামনেই দু-দিকে ঘোরানো বারান্দা। সেখানেও সব ফুলের টব দিয়ে সাজানো।

বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই যেন পরিচ্ছন্ন একটা রুচির আভিজাত্য সর্বত্র চোখে পড়ে।

বারান্দায় একটা অল্পশক্তির বিদ্যুৎবাতি জ্বলছিল। সেখানে কোনও মানুষজন দেখতে পেলাম না।

সামনেই পার্লার।

পার্লারের দরজাটা ভেজানোই ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম।

পার্লারের আলোটা নেভানো। ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু বাঁ-পাশে যে মাঝারি আকারের ঘরটা তারই দরজার ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে ওপাশের ঘরের মধ্যে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সহসা একটা কথা মনে হতে নিঃশব্দে সেই পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ল্যাচ-কিটা ঘোরাতেই কাচের দরজাটা খুলে গেল।

এ-বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত, কারণ বহুবার এ-বাড়িতে আমি আসা-যাওয়া করেছি।

ঘরের আলোটা জ্বলছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীও নেই।

ঘরের মেঝেতে দামি কার্পেট বিছানো। এক চতুষ্পাশের আলমারিতে ইংরেজি বাংলা নানা ধরনের বই সাজানো।

ঘরের মধ্যস্থলে খান-দুই সোফা ও একটি [illegible] টেবিল।

BanglaBook.org
019282

বই পড়া সূর্যপ্রসাদের প্রচণ্ড নেশা। এটা তাঁর লাইব্রেরি ঘর। লাইব্রেরি ঘরেরই সংলগ্ন পশ্চিমদিকে আর-একটি ছোট ঘর আছে। এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে কোনও কপাট নেই, আছে কেবল একটি পরদা ঝোলানো।

পার্লার সংলগ্ন পশ্চিম দিককার ওই ঘরটি জানি আকারে ছোট। এবং ঘরটিকে একটি মিউজিয়াম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, সূর্যপ্রসাদের যেমন বই পড়ার নেশা তেমনি আর-একটি নেশা হচ্ছে তাঁর নানাধরনের দুষ্প্রাপ্য জিনিস—কিউরিও সংগ্রহ করা। ওই ঘরটির মধ্যে সেই সব কিউরিওগুলিই সযত্নে সাজানো আছে।

আর এ-ও আমি জানতাম, সূর্যপ্রসাদের অবসরজীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে হয় এই লাইব্রেরি ঘরে, না হয় ওই পাশেরই মিউজিয়াম ঘরে।

তবে কি সূর্যপ্রসাদ ওই ঘরেই আছেন? নচেৎ এ-ঘরে এসময় আলো জ্বলছে কেন?

পাশের ঘরটার দিকে এগুতে যাব, হঠাৎ ওইসময় খুট করে একটা শব্দ এল সেই ঘর থেকে এবং পরক্ষণেই দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার পরদাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রাধিকাপ্রসাদের ছোট ছেলে সুবল।

এবং এ-ঘরে পা দিয়েই ঘরের মধ্যে আমাকে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার সেন, আপনি! গলার স্বরে সুবলের কেমন যেন একটু দ্বিধা।

মৃদুকণ্ঠে সুবলের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আজ যে এখানে রাত্রে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ—।

হ্যাঁ, তাই আবদুলের কাছে শুনেছিলাম বটে। তা ওপরে যান। বলদেববাবু ও মেজর কৃষ্ণস্বামী এসেছেন। সকলে বসে জেঠামণির ঘরেই একটু আগে দেখেছি গল্প করছেন।

একটানা সুবল কথাগুলো যেন ছেদহীনভাবে বলে গেল।

এবং কেমন যেন আমার মনে হল সুবল আমাকে ওপরে পাঠাবার জন্যে বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আর তার কথাবার্তায় ও হাবভাবে যেন সেই ব্যস্ততাটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

সুবলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন মনে হল একটু চঞ্চল, অস্থির।

আচ্ছা আমি আসি—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে একটু যেন দ্রুতই সুবল আমার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পরক্ষণেই।

আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম তারপরও।

সহসা সুবল ঘর ছেড়ে চলে যেতেই একটা কথা আমার মনে হল, এই ঘরে পরদা তুলে প্রবেশের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কীসের যেন ঠুক করে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। এবং শব্দটা যেন মনে হয়েছিল একটা ছোট বাক্সের ডালা বা ওই ধরনের কিছু বন্ধ করবার মতোই একটা শব্দ, আর ঘরে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে দেখে সুবল যেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হল। তারপর তার অস্থিরতা এবং তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে একটা কৈফিয়ত দিয়ে চলে যাওয়া, সব কিছু জড়িয়ে মনে হল সুবল যেন এই সময় আমাকে ঠিক ওই ঘরের মধ্যে আশা করেনি।

কিন্তু কেন?

সত্যি, মানুষের মন কী সন্দিগ্ধ।

শেষপর্যন্ত কৌতূহলটা যেন কিছুতেই আমি এড়িয়ে যেতে পারলাম না। পরদা তুলে নিঃশব্দে আমি পশ্চিমের ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলাম।

ঘরটার মধ্যে কেমন যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

বলা বাহুল্য, ঘরের মধ্যে তখনও আলোটা জ্বলছিল।

ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম। কেন তাকালাম তা অবিশ্যি বলতে পারি না। কোনও

BanglaBook.org

সন্দেহ? না, তাই বা কীসের?

পূর্বেই বলেছি, ওটা সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম।

ঘরের দেওয়ালের চারপাশে কাচের শো-কেস ও র‍্যাকে পুরাতন দিনের সব বিচিত্র কিউরিও সাজানো।

ভাঙাচোরা পাথরের মূর্তি, শিলালিপি, ধাতুপাত্র, অস্ত্র, মুদ্রা, পুঁথি ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার।

মাঝখানে ছোট একটি গোল টেবিল ও খান-দুই নিচু ধরনের আরামকেদারা।

এই ঘরে পূর্বে আরও বহুবার আমি এসেছি।

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলালাম। এবং মনে হল যেখানকার যা সবই যেন তেমনই আছে। ওই যে ভাঙা পাথরের নৃসিংহ মূর্তিটি, তার পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ কৃষ্ণ-রাধা, ডানপাশের সেলফে হরগৌরীর মূর্তি, তারই পাশে অর্ধনারীশ্বর—কিন্তু এ-ঘরের পশ্চাতের বাগানের দিককার জানলার ওই কপাট দুটো খোলা কেন?

এই সময় ঘরের ওই গরাদহীন জানলার কপাট দুটো হা-হা করছে খোলা। আশ্চর্য!

এ-ঘর সম্পর্কে, যতদূর আমি জানি, সূর্যপ্রসাদ অত্যন্ত সতর্ক। বাড়ির কাউকেই বড় একটা এ-ঘরে কখনও প্রবেশ করতে দেন না, এ-ও আমি জানি।

তবে! তা ছাড়া সুবলই বা এই সময় একাকী আলো জ্বেলে এই ঘরের মধ্যে কী করছিল একটু আগে?

আর কেনই বা এ-সময়ে এ-ঘরে এসেছিল?

চার

সুবল!

সত্যি, সুবলের এ-ঘরে কী এমন দরকার পড়েছিল এ-সময়?

আর ওই জানলাটাই বা খোলা কেন? সুবলই কি তবে জানলাটা খুলেছিল? এবং ওই জানলাপথেই একটু আগে ঘরে প্রবেশ করেছিল, যার শব্দই আমি ক্ষণপূর্বে শুনেছিলাম? না, না—তাই বা হতে যাবে কেন?

এই বাড়িরই ছেলে সুবল, এ-ঘরে যদি কোনও কাজ তার থাকবেই, সে জানলাপথেই বা এ-ঘরে প্রবেশ করতে যাবে কেন?

অকস্মাৎই যেন ওই সময় একটা কথা মনে পড়ে। সুবল একটু আগে এ-ঘরে যখন এসে ঢুকেছিল, ওর চোখে, মুখে ও চুলে বৃষ্টির জল লেগেছিল দেখেছিলাম।

তবে কি—?

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে আরও একটা জিনিস আমায় আকর্ষণ করল।

দক্ষিণ দিককার দেওয়াল ঘেঁষে স্ট্যান্ডের ওপরে বসানো ভাঙা শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটার ঠিক পাশেই একটা স্ট্যান্ডের ওপরে রক্ষিত চন্দনকাঠের বাক্সটা যেন আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

বাক্সের ডালাটা ঠিক ভালো করে মুখে-মুখে বন্ধ হয়নি। খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে যেন।

কী ভেবে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাক্সটার কাছে।

ক্ষণপূর্বের কৌতূহলটা মনের মধ্যে তখন যেন আবার দানা বেঁধে উঠছে।

ওই বাক্সটার মধ্যে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা চামড়ার খাপে ভরা ধারালো একটা ছুঁচলো মেক্সিকান ছোরা আছে আমি জানি।

BanglaBook.org

ছোরাটা একদিন সূর্যপ্রসাদ আমাকে দেখিয়েছিলেনও।

ওঁর বন্ধু মেজর কৃষ্ণস্বামী, বর্তমানে তিনি এই শহরেই একটা বাড়ি কিনে তাঁর বাঙালি স্ত্রীসহ রিটায়ার্ড লাইফ অতিবাহিত করছেন সূর্যপ্রসাদেরই অনুরোধে। বহুদিনের বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে। গত মহাযুদ্ধের সময় এককালে মেজর কৃষ্ণস্বামী যখন যুদ্ধের চাকরি-ব্যাপদেশে মেক্সিকোতে ছিলেন, তখন ওই ছোরাটা কিনে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু সূর্যপ্রসাদকে। এবং চন্দনকাঠের সুন্দর কাজ করা বাক্সটাও তিনিই একবার মহীশূরে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনে ওঁকে দিয়েছিলেন। সযত্নে তাই সূর্যপ্রসাদ ওই বাক্সের মধ্যেই ছোরাটা রেখে দিয়েছেন।

এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালাটা ধীরে-ধীরে তুললাম।

কিন্তু এ কী! চমকে উঠলাম। বাক্সের মধ্যে ছোরাটা তো নেই!

ছোরাটা কি তবে সূর্যপ্রসাদ অন্যত্র কোথাও রেখে দিয়েছেন?

ভাবতে-ভাবতেই অন্যমনস্ক ভাবে বাক্সের ডালাটা বোধহয় বন্ধ করেছিলাম। খুট করে একটা মৃদু শব্দ হতেই যেন চমকে উঠি।

হঠাৎ মনে হল, সুবল পার্লারে ঢোকবার পূর্বমুহূর্তে ঠিক যেন এইরকমই শব্দ একটা আমার কানে এসেছিল।

কী খেয়াল হল, অন্যমনস্ক ভাবে দু-তিনবার ডালাটা খুলে আবার বন্ধ করে শব্দটা পরীক্ষা করলাম।

আবার ঘরের চারিদিকে একবার তাকালাম।

না, কেউ কোথাও নেই।

বাইরের অন্ধকার বাগান থেকে ঝিঁঝির একটা একঘেয়ে ঝিঁঝি শব্দ শোনা যাচ্ছে!

ধীরে-ধীরে চন্দনকাঠের বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম ঘর থেকে।

অন্ধকারেই পার্লারটা অতিক্রম করে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। সহসা ওই সময় পদশব্দ পেয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সূর্যপ্রসাদের খাসভৃত্য আবদুল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

প্রায় দীর্ঘ পনেরো বৎসর আবদুল সূর্যপ্রসাদের এখানে কাজ করছে শুনেছি। বয়েস হয়েছে। পাকা চুল-দাড়ি। লম্বা রোগাটে চেহারা।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাকি লোকটা। এবং একাধারে ভৃত্য ও বাবুর্চি। সূর্যপ্রসাদ বলাই বাহুল্য, চিরদিনই একটু সাহেবিভাবাপন্ন।

যাই হোক, এ-বাড়িতে আবদুলের বিশেষ একটা স্থান আছে।

ডক্টরসাব! কখন এলেন? আবদুল প্রশ্ন করল।

এই আসছি। তোমার সাহেব কোন ঘরে?

ওপরে তাঁর ঘরে। মেজর সাব, বলদেববাবু সবাই আছেন—।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম।

আবদুল নীচে নেমে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার সামনেই একটা বারান্দা। বলদেববাবুর প্রাণখোলা হাসির শব্দ কানে এল।

আশ্চর্য প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন ভদ্রলোক!

বলদেব সিংহ বিহারেই ডোমিসাইলড।

BanglaBook.org

বেঁটে-খাটো, হাসি-খুশি রসিক মানুষটি। বয়েস প্রায় ষাটের কোঠা ছাড়াতে চলেছে।

সিং অ্যান্ড সনস-এর মোটরবাস সার্ভিস কোম্পানির মালিক।

পনেরো-কুড়িটা বাস আছে; রাঁচি, হাজারিবাগ, চাঁইবাসার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে।

রীতিমতো ধনী ব্যক্তি বলেই বলদেব সিংহকে এ-তল্লাটে সকলে জানে। বর্তমানে কাজকর্মের ভার দুই ছেলের হাতে তুলে দিয়ে আনন্দে অবসরজীবন যাপন করছেন।

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বিশেষ বন্ধু তিনি।

প্রতি সন্ধ্যায়ই লিলি কটেজে এসে ঘণ্টা দুই-তিন কাটিয়ে যান বন্ধুর সঙ্গে।

আমি পরদা তুলে সূর্যপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করতেই বলদেববাবু বলে উঠলেন, এই যে ডাক্তার, ব্যাপার কী বলো তো? খাবারগুলো সব যে এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

একটু দেরি হয়ে গেল—একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললাম।

তাহলে আর দেরি কেন গুপ্ত, আবদুলকে বলো টেবিলে খাওয়ার দিতে। জানোই তো ডিসপেপসিয়ার ভিকটিম, হজম না হলে আবার সারাটা রাত ছটফট করতে হবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ—আবদুল—, চিৎকার করে ডাকলেন সূর্যপ্রসাদ।

একটু পরেই আবদুল এসে ঘরে ঢুকল।

ডিনার-টেবিল রেডি করো।

ডিনার শেষ হওয়ার পর ডিনার-টেবিলেই পরিষ্কার করে একটা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে বলদেববাবু ও মেজর কৃষ্ণস্বামী দাবার ছক নিয়ে বসলেন।

সূর্যপ্রসাদ ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা ততক্ষণ একদান খেলো সিংহ, ডাক্তারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। চলো ডাক্তার—।

সূর্যপ্রসাদ তাঁর শয়নঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

শয়নঘর অতিক্রম করে সূর্যপ্রসাদ সেই ঘরেরই সংলগ্ন নিরিবিলি যে ছোট ঘরটি, তার মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

শয়নঘরের অনুপাতে ওই ঘরটি ছোট হলেও একেবারে খুব ছোট নয়।

ঘরের দুটি দরজা।

একটি দরজা, সংলগ্ন কক্ষ ও ওই ঘরের মধ্যবর্তী। যাতে করে শয়নঘর থেকেই ইচ্ছে হলে ওই ঘরে যাতায়াত করা যায়।

অন্য দরজাটি বাইরের দিকে। এবং দুটি জানলা পাশাপাশি। একটি জানলার কপাট খোলা ছিল।

মেঝেতে পুরু দামি কার্পেট বিছানো।

আসবাবপত্রের মধ্যে একটি বড় হাইব্যাক আরামকেদারা ও তার পাশে দুটি গদিআঁটা চেয়ার। একটি গোল টেবিল।

টেবিলের ওপরে ফ্লাওয়ার-ভাসে রক্ষিত একরাশ মরশুমি ফুল।

হাইব্যাক আরামকেদারাটার ওপরে নিজে বসে আমার দিকে তাকিয়ে সূর্যপ্রসাদ মৃদুকণ্ঠে বললেন, বোসো, ডাক্তার।

আমি নিঃশব্দে সামনেরই একটা চেয়ারে বসলাম।

ঘরের এক কোণে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল। তাতেই ঘরটা বেশ গরম। কিন্তু খোলা জানলাপথে শীতরাত্রের হিমকণাবাহী হাওয়া আসছে।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ওই জানলাটা বন্ধ করে দিই, মিস্টার গুপ্ত।

BanglaBook.org

সূর্যপ্রসাদ অন্যমনস্ক ভাবে যেন কী ভাবছিলেন। আমার কথায় হঠাৎ যেন চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ?

বলছিলাম, ওই জানলাটা—।

হ্যাঁ, বন্ধ করে দাও।

উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। এবং জানলাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই সূর্যপ্রসাদ বললেন, বেডরুমের ওই দরজাটাও বন্ধ করে দাও, ডাক্তার।

অন্য দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল, দ্বিতীয় দরজাটাও তাঁর নির্দেশমতো বন্ধ করে আবার এসে চেয়ারে বসলাম।

সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম। অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছেন।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

দুজনেই চুপচাপ বসে আছি।

ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেসের প্রজ্বলিত আগুনের রক্তাভা সূর্যপ্রসাদের মুখের ওপর পড়ে যেন মনে হচ্ছিল—ব্রোঞ্জের তৈরি মুখটা, নিষ্প্রাণ।

ধীরে-ধীরে একসময় কিমোনোর পকেট থেকে পাইপ ও টোবাকো-পাউচটা বের করে পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন সূর্যপ্রসাদ।

তীব্র কটু তামাকের গন্ধটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সহসা একসময় পাইপটা হাতে নিয়ে সূর্যপ্রসাদ বললেন, যে-আলোচনা করবার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি সেটা জরুরি এবং গোপনীয়।

আমি কোনও জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সূর্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালাম।

সত্যি কথা বলতে কী, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঠিক ওইভাবে যেন কোনওদিন সূর্যপ্রসাদকে কথা বলতে শুনিনি।

ব্যাপারটা যদিও এখনও পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, ডাক্তার, আর বিশ্বাস করবার মতোও নয়, তবু নিজেদের মধ্যে একটা ওপেন ডিসকাসন করে আমার মনে হয় ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো, কী বলো? সূর্যপ্রসাদ বললেন।

নিশ্চয়ই, কিন্তু—।

বলছি। পরশু বিকেলের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছি—।

চিঠি!

হ্যাঁ। কে লিখেছে জানো?

কে?

চিঠিটা লিখেছে মৃত জগৎজীবনের ভাই মৃত পুলকজীবন—।

পুলকবাবু! তিনি তো—।

হ্যাঁ, পনেরো দিন আগেই সে মারা গিয়েছে। মরার ঠিক দিন দুই আগেই চিঠিটা সে তার এক বন্ধুকে লিখেছিল।

বন্ধুকে? কে তিনি?

তাঁকে অবশ্যই তুমি চেনো না। সে এখানে থাকেও না। কিন্তু তাঁকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। সেই ভদ্রলোকটিই চিঠিটা ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তা আপনার কাছে—।

হ্যাঁ, কারণ সেই চিঠির মধ্যে এমন কতকগুলো কথা আছে, যার সঙ্গে আমারও পারিবারিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

দেখুন মিস্টার গুপ্ত, সে-চিঠির ব্যাপার আমি যে কীভাবে—।

BanglaBook.org

শোনো ডাক্তার, তুমি জানো, জগৎ আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। আর তার ভাইকেও আমি যথেষ্টই স্নেহ করতাম—সে-ও তুমি জানো।

কিন্তু—।

লেট মি ফিনিশ, ডাক্তার। সে-চিঠিটার মধ্যে তাদের ও আমার ফ্যামিলি সংক্রান্ত অনেক কথা আছে তো বটেই, বিশেষ যে-ব্যাপারটার জন্যে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে জগৎ ও পুলকের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথাই আছে।

ক্ষমা করবেন আমাকে, মিস্টার গুপ্ত, আমি কিন্তু এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

শোনো, চিঠিটা আমি পড়ছি আগাগোড়া, তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে। বলতে-বলতে সূর্যপ্রসাদ তাঁর কিমোনোর পকেটে হাত চালিয়ে একটা মুখ-ছেঁড়া 'ব্লু' রঙের এনভেলাপ বের করলেন।

কিন্তু আমার মনে হয় মিস্টার গুপ্ত, ও-চিঠি আমার বোধহয় না শোনাই ভালো। আপনাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত ব্যাপার, আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি—।

না-না, ডাক্তার—চিঠিটা আমি পড়ি, তুমি শোনো—।

খাম থেকে চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন ঃ

প্রিয় বঙ্কিম,

আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমার শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। কারণ স্পষ্টই বুঝতে পারছি এ-মৃত্যুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মরতে আমাকে হবেই, যেহেতু চরম নির্বুদ্ধিতায় এই মৃত্যুকে যে আমিই ডেকে এনেছি। জানি না কেন এমন ভুল করলাম! কিন্তু আর যখন উপায় নেই, তখন যে আমাকে এমনি করে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার আসল রূপটাও আমি সকলের সামনে প্রকাশ করে দিতে চাই। আর সেই কারণেই তোমাকে চিঠিটা শেষ বিদায়ের আগে লিখে যাচ্ছি, ভাই। আর একজনকে এ-কথাগুলো জানিয়ে যাব ভেবেছিলাম—সে হচ্ছে একসময়কার সহপাঠী ও বিশেষ পরিচিত কিরীটী রায়। কিন্তু তাকে জানাতে শেষপর্যন্ত আমার সাহস হল না। কারণ, তাতে আমার প্রতি সহানুভূতির চাইতে তার ঘৃণাটাই বেশি হবে। যাক, যে-কথা বলতে চাই, তোমরা জানো, আমি আর দাদা জগৎজীবন আপন সহোদর ভাই ছিলাম। কিন্তু তা নয়। দাদা আমার বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। এবং বাবার মৃত্যুর পরই সেই কথাটা প্রথম জানতে পারি। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে এ-ও জানতে পারি, বাবার যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দাদার নামেই লিখে দিয়ে গিয়েছেন। আমাকে একটি কপর্দকও দেননি। কারণ আমি জুয়াড়ি। জুয়ার নেশা আমার ছিল। দাদা আমার বৈমাত্রেয় ভাই হলেও তিনি যে আমাকে কী গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা তোমরা জানো না। তবু বাবার উইলের সব সংবাদ জানার পর আক্রোশে আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম কিছুই করবার নেই, তখন একান্ত বাধ্য হয়েই দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ এমন অনর্থ যে, শেষ পর্যন্ত দূরে গিয়েও সেই অর্থের প্রলোভনেই জঘন্য চক্রান্ত করে দেবতার মতো অমন দাদাকেও আমার হত্যা করতে হাত এতটুকু কাঁপেনি। এমনি নরাধম, এমনি পিশাচ আমি। দাদাকে আমি বিষ দিয়ে হত্যা করেছিলাম, জানো? কিন্তু সে-বিষ কে জুগিয়েছিল আমাকে জানো? তোমারই পিসতুতো ভাই, সূর্যপ্রসাদবাবুর ছেলে সমর—।

BanglaBook.org

*

ওই পর্যন্ত চিঠিটা পড়তেই আমি এবারে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, এক্সকিউজ মি, মিস্টার গুপ্ত, আপনার ও-চিঠি আমি আর শুনতে চাই না।

না-না, ডাক্তার, শোনো, তোমাকে শেষটুকু শুনতেই হবে। বললেন সূর্যপ্রসাদ।

চেয়ার ছেড়ে আমি ততক্ষণে উঠে পড়েছি। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, ক্ষমা করবেন, মিস্টার গুপ্ত—ও-চিঠি শুনতে পারব না।

বোসো-বোসো, ডাক্তার, শরীরটা আমার ভালো নয়, কাল সুবিধে হবে কি না জানি না। বোসো, আজকেই—।

বুঝলাম সূর্যপ্রসাদ কিছুতেই ছাড়বেন না, তাই শেষপর্যন্ত বললাম, বেশ, আজ নয়—আজ আমারও শরীরটা ভালো নেই। কাল, না হয় পরশু, বা অন্য একসময় এসে বাকি চিঠিটা আপনার শুনব।

কথাগুলো বলে আর আমি এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না। বাইরের দরজাটা খুলে সঙ্গে-সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

কিন্তু দরজাটা খুলে বাইরের বারান্দায় পা দিতেই আবদুলের সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়ে গেল।

দেখি ট্রেতে করে গরম কফি নিয়ে দরজার একেবারে গোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে আবদুল।

আবদুল আমাকে সহসা ওইভাবে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে থেমে গেল।

আবদুল, এখানে কী করছিলি রে দাঁড়িয়ে?

আজ্ঞে, সাহেবের জন্যে কফি নিয়ে—।

কফি আজ রাত্রে আর তিনি খাবেন না। নিয়ে যা। আমাকে বলে দিলেন শরীরটা তাঁর ভালো নেই। তাঁকে যেন রাত্রে কেউ আর না বিরক্ত করে।

কী হয়েছে সাহেবের, ডক্টরসাব? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবদুল প্রশ্ন করে।

সেই হার্টের ব্যথাটা বোধহয়—।

আবদুল আর দাঁড়াল না। ট্রে নিয়ে চলে গেল।

বারান্দাপথে আবদুল অদৃশ্য হয়ে গেলে আমিও ধীরে-ধীরে অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সিঁড়ির আলোতেই হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম, সময়টা কত দেখবার জন্য।

ঠিক রাত সাড়ে দশটা।

কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সূর্যপ্রসাদ অত করে বারবার চিঠিটা শোনবার জন্য বলছিলেন, চিঠিটা শুনলেই হত!

কিন্তু কে ওই বঙ্কিম?

পুলকজীবনের বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। শুধু পুলকজীবন কেন, সূর্যপ্রসাদেরও তিনি বিশেষ পরিচিত বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কই, কখনও পুলকজীবনের মুখে ওই নামটা শুনেছি বলে তো আগে মনে পড়ে না। আর কী সব আবোল-তাবোল চিঠিতে লিখেছে পুলক! তার দাদা জগৎজীবনের মৃত্যুর জন্য নাকি সে-ই দায়ী।

সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেল, কিরীটী রায়ের সঙ্গেও পুলকের বিশেষ পরিচয় ছিল চিঠিতে সে লিখেছে। কোন কিরীটী রায়? যে কিরীটী রায় বর্তমানে রাঁচিতে স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছেন—

BanglaBook.org

তিনিই? সম্ভবত তাই। একই ব্যক্তি। আর সেই কারণেই বোধহয় পুলক সম্পর্কে আমাকে এত কথা তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হল।

তবে কি কিরীটী রায়ের এ-সময় রাঁচিতে আসাটা একটা অজুহাত মাত্র? নিশ্চয় তাই। নচেৎ এই দুর্দান্ত শীতে কেউ রাঁচিতে আসে নাকি?

পাঁচ

উঃ! রাত মাত্র সাড়ে দশটা, এর মধ্যে শীত যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে!

বাগান পার হয়ে অন্ধকারে গেট অতিক্রম করে এসে রাস্তায় নামতেই অন্ধকারে যেন কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল আমার অতর্কিতে।

মনটা এমনিতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, দেখে রাস্তা চলেন না?

সঙ্গে-সঙ্গে যেন অনুতপ্ত পুরুষকণ্ঠে জবাব এল, স্যরি, অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

আমি আর কোনও জবাব না দিয়ে এগুতে যাব, সেই সময় আবার পশ্চাৎ থেকে পূর্বকণ্ঠে প্রশ্ন এল, মশাই, শুনছেন?

কী বলছেন?

সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

সামনেই। ওই যে গেট দেখা যাচ্ছে।

ধন্যবাদ।

আমি আবার আমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হলাম।

ঢং-ঢং-ঢং—অদূরবর্তী গির্জার পেটা ঘড়িতে রাত্রি এগারোটা ঘোষিত হল।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন বললেও চলে।

লংকোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন আরও কনকনে হয়ে উঠেছে।

নির্জন রাস্তায় শুধু নিজের পায়ের জুতোর শব্দটাই কানে আসছে।

ঠান্ডায় নাকের ডগাটা চিনচিন করছে একটা বিশ্রী যন্ত্রণায়।

অন্যমনস্কতায় চলার গতিটা একসময় শ্লথ হয়ে এসেছিল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি মিতার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

পাশাপাশি দুটো ঘরে ভাই-বোন দুজনে আমরা শুই। মাঝখানে একটা দরজা আছে। কী ভেবে মিতার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তার ঘরেই ঢুকলাম।

একটা কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢেকে সোফার উপর বসে মিতা কী একটা বই পড়ছিল। আমার পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল, এত রাত পর্যন্ত কী করছিলে, দাদা?

সত্যই ঘরের ওয়াল-ক্লকে দেখি, রাত প্রায় পৌনে বারোটা বাজে।

ঘরের মধ্যে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফায়ার-প্লেসের আগুনের জন্য ঘরের হাওয়াটা বেশ গরম।

কী ব্যাপার, হঠাৎ সূর্যপ্রসাদ তোমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

মিতার প্রশ্নে ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিলাম, কেন, নিমন্ত্রণ করতে নেই নাকি?

তা কেন, সমরের বাবার মতো একের নম্বরের কিপটে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলেন তাই বলছি!

BanglaBook.org

শুধু আমিই নই—।

তবে?

বলদেব সিং ও মেজর কৃষ্ণস্বামীও ছিলেন।

তা হলে রীতিমতো ডিনার বলো।

তাই।

কী খাওয়াল?

স্যুপ, ফিশফ্রাই, স্টু—।

ইস, বুড়োর দেখছি রাতটা ঘুম হবে না।

মিতার কথার আর কোনও জবাব দিলাম না। ফায়ার-প্লেসের আগুনটা নিভে আসছিল, নিবন্ত ফায়ার-প্লেসের রক্তাভার দিকে তাকিয়ে রইলাম অন্যমনস্কভাবে।

এমনসময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং...।

এত রাত্রে আবার কে রে বাবা!

মিতা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বললাম, বোস তুই, আমিই দেখছি।

আমার ঘরে ফোন।

ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম হ্যালো, কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তার সেন স্পিকিং! অ্যাঁ, কী বললে, সূর্যপ্রসাদ খুন হয়েছেন? না, না—অ্যাবসার্ড! হাউ ইমপসিবল!...ও শিওর! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এখুনি আমি আসছি—।

ইতিমধ্যে ফোনে আমার কথা শুনে মিতা আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল। অবশ হাতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিতা জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, দাদা? কে খুন হয়েছে?

সূর্যপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ। কী ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না, মিতা! এই তো সেখান থেকে ডিনার খেয়ে আমি আসছি। একটু আগেও লোকটাকে কোয়াইট হেলদি, হার্ডি অ্যান্ড স্ট্রং দেখে আসছি। হাউ অ্যাবসার্ড—।

কিন্তু কে—কে তোমাকে ফোন করছিল?

আবদুল বলেই মনে হল—।

মিতা বোবার মতোই আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি নিজেও যেন কেমন বোবা বনে গিয়েছি।

শুনতে ভুল করলাম না তো কথাটা?

সূর্যপ্রসাদ কেমন করে খুন হবেন? না, না—নিশ্চয়ই আমি শুনতে ভুল করেছি। মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

পাথরের মতোই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে মিতা।

আমি—আমি একবার লিলি কটেজ থেকে ঘুরে আসি, মিতা—।

অ্যাঁ?

আমি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসি—।

যাবে?

যাব না? যাওয়া কি উচিত নয়, এমন একটা সংবাদ পাওয়ার পর?

BanglaBook.org

বেশ, যাও।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে রক্ষিত টেবিলের ওপর থেকে ডাক্তারির কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে আবার মিতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, দরজাটা তা হলে তুই আটকে দে, মিতা।

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কেবলই মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি।

হনহন করে হেঁটে চলেছি।

মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কেবলই মনকে স্তোক দিতে লাগলাম, গিয়ে হয়তো দেখব, সূর্যপ্রসাদ সুস্থই আছেন। তাই যেন হয়। কৃপণ হোক আর যাই হোক, লোকটি সত্যিই ভালো।

লিলি কটেজের গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে দেখি সদর বন্ধ। কলিংবেলের বোতামটা টিপলাম।

চার-পাঁচবার বেল বাজাবার পর দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবদুল। বেচারি বোধহয় একটুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে ছিল। চোখ ডলতে-ডলতে এসে দরজা খুলে দিয়েছে। আবদুল তো আমাকে দেখে অবাক!

ডক্টরসাব!

আবদুল, কী হয়েছে তোমার সাহেবের?

সাহেবের! কেন, কী হবে? সাহেব তো তাঁর ঘরে ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছেন?

আঃ, একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস নিই।

তবে তুমি একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলে কেন?

আমি আপনাকে ফোন করেছি! কী বলছেন, ডক্টরসাব?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—তুমিই ফোন করেছ। আমি স্পষ্ট তোমাব গলা শুনেছি।

আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম। আপনার কলিংবেলের শব্দে উঠে আসছি।

আশ্চর্য! অথচ ফোনে নাম বললে আবদুল। সত্যি বলছ, তুমি আমাকে ফোন করোনি?

নিশ্চয়ই না।

হাউ ফানি! —তারপর একটু থেমে বললাম, তোমার সাহেব সত্যিই ঘুমুচ্ছেন, জানো তো?

নিশ্চয়ই। এত রাত্রে—।

ঠিক আছে। এতদূর যখন এসেছিই, চলো একবার, ভালো করে খোঁজ নিয়ে যাই।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই যদি সাহেব ঘুমিয়ে থাকেন, ডক্টরসাব—।

ঘুমিয়েই যদি থাকেন তো ভালোই। সুস্থ থাকলেই হল। চলো—।

আসুন।

দরজা বন্ধ করে আবদুল এগিয়ে চলল, আমি তার পিছনে-পিছনে চললাম। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে।

নিস্তব্ধ, নিঝুম সব।

সিঁড়ি অতিক্রম করে আবদুলের সঙ্গে-সঙ্গে দোতলায় সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের দরজার সামনে এসে দুজনে দাঁড়ালাম।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, জানলাপথে আলো দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

ঘরে আলো জ্বলছে দেখছি! তোমার সাহেব কি রাত্রে ঘরের আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমোন নাকি, আবদুল?

না তো! রাত্রে ঘুমের আগে তিনি তো বরাবর আলো নিভিয়েই শোন জানি!

তা হলে?

BanglaBook.org

বন্ধ দরজার গায়ে কান পেতে কিছু শোনাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দই পেলাম না।

আবদুল ওই সময় বললে, মধ্যে-মধ্যে সাহেব রাত জেগে পড়াশুনো করেন।

ছয়

দরজায় নক করে দেখব? আবদুলকেই শুধোলাম।

একটু যেন ইতস্তত করেই সে বলল, দেখুন।

বন্ধ দরজার কপাটের গায়ে মৃদু নক করলাম।

কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া বা শব্দই পাওয়া গেল না।

এবারে কী ভেবে পুনরায় দরজার গায়ে নক করবার সঙ্গে-সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, মিস্টার গুপ্ত আছেন কি?

না, কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

আবদুল এবারে বললে, সাহেব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ডক্টরসাব!

আবদুলের কথায় কোনও কান না দিয়ে আবার আমি দরজার গায়ে নক করার সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠের পরদা একটু বেশ উঁচুতে তুলেই ডাকলাম, মিস্টাব গুপ্ত, জেগে আছেন কি?

মিস্টার গুপ্ত! আবার ডাকলাম পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে।—আমি ডাক্তার সেন!

তবু কোনও সাড়া নেই।

দরজার কপাটে এবারে ধাক্কা দিলাম।

পূর্ববৎ। কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

এবারে হঠাৎ খেয়াল হতেই দরজার 'কি হোল' দিয়ে নিচু হয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলাম।

টেবিলের ওপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখলাম।

আবদুল?

বলুন।

টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে দেখছি। আমার যেন কেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

কী বলছেন?

হ্যাঁ, মিস্টার গুপ্তর ঘুম আমি যতদূর জানি পাতলা। সামান্য শব্দেও তাঁর ঘুম ভেঙে যায় শুনেছি। দরজায় নক করলাম, নাম ধরে ডাকলাম, দরজায় ধাক্কা দিলাম—তবু কোনও সাড়া নেই কেন?

আর একবার দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে দেখুন তো, ডক্টরসাব! আবদুল বললে।

আবদুলের কথামতো এবারে সশব্দেই দরজার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেশ জোরেই ডাকলাম, মিস্টার গুপ্ত, আমি ডাক্তার সেন—দরজাটা খুলুন!

এবারেও পূর্ববৎ কোনও সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

সত্যি-সত্যি এবারে মনটা যেন আমার রীতিমতো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এত জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, চেঁচিয়ে ডাকলাম, তবু সাড়া নেই সূর্যপ্রসাদের। পাতলা ঘুম ভদ্রলোকের, ঘুম না ভাঙারও তো কথা নয়!

কী করি বলো তো, আবদুল! আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই ভালো ঠেকছে না!

আবদুলও যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার উচ্চকণ্ঠের ডাকাডাকিতে রাধিকাপ্রসাদ ও তাঁর ছেলে বিমল সেখানে এসে

BanglaBook.org

হাজির হল।

কী ব্যাপার? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাধিকাপ্রসাদ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি ডাক্তার সেন, এসময়ে?

এই যে রাধিকাপ্রসাদবাবু, কী ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না—বলে সংক্ষেপে আমি আমার ওই রাত্রে লিলি কটেজে আসবার কারণটা বললাম।

কিন্তু দাদার ঘুম তো এত গাঢ় নয় যে এত ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙবে না। বললেন রাধিকাপ্রসাদ।

তাই তো আমার কীরকম যেন সন্দেহ হচ্ছে, রাধিকাপ্রসাদবাবু।

এমনসময় দেখি মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেব সিংও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কী ব্যাপার? এ কী ডাক্তার, এত গোলমাল কীসের? তুমি বাড়ি যাওনি? মেজর কৃষ্ণস্বামীই প্রশ্নটা করলেন।

কিন্তু আপনারা? আপনারা রাত্রে বাড়ি যাননি? প্রশ্ন করলাম আমি।

জবাব দিলেন রাধিকাপ্রসাদই, না, এখান থেকে তো ওঁদের বাড়ি অনেকটা দূরের পথ—সেই কাঁকেতে। তাই আর রাত্রে এই ঠান্ডার মধ্যে বুড়োমানুষ ওঁদের যেতে দিইনি আমি।

হ্যাঁ, দাবা খেলতে-খেলতে অনেক রাত হয়ে গেল—তাই এখানেই দুজনে থেকে গিয়েছি। বললেন বলদেব সিং।

আমি তখন সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললাম ওঁদের।

কিন্তু ব্যাপারটা যে কীরকম সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, ডাক্তার সেন। বললেন এবারে মেজর কৃষ্ণস্বামীই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

ওসব কোনও কাজের কথা নয়। দরজাটা ভেঙে ফেলা যাক। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

শেষপর্যন্ত রাধিকাপ্রসাদের কথাতেই সকলে সায় দিলেন।

আবদুল, আমি ও বিমল অতঃপর ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেললাম।

সর্বপ্রথমে আমিই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অন্যান্য সকলে আমার পশ্চাতে ঘরে প্রবেশ করলেন একে-একে।

কিন্তু এ কী! সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ তো শূন্য!

ঘরে কেউ নেই।

খাটের ওপর নির্ভাজ শয্যা। দেখলেই বোঝা যায়, কেউ স্পর্শও করেনি শয্যাটা তখনও পর্যন্ত।

টেবিলের ওপর ঘরের মধ্যস্থলে ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে।

সাহেব কি আজ রাত্রে তা হলে শুতেই আসেননি? বললে আবদুলই।

সকলেই আমরা নিঃশব্দে পরস্পর-পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

চলো তো দেখি ওঁর প্রাইভেট রুমে। ওই ঘরেই আছেন হয়তো। বলে এবারেও সর্বাগ্রে আমি দুই ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজাপথে প্রাইভেট রুমের দিকে পা বাড়ালাম।

সে-ঘরেও একটি আলো জ্বলছিল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, কেন জানি না, মনটা যেন আমার হঠাৎ কেমন করে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম, সেই উঁচু ব্যাকওয়ালা বড় আরামকেদারাটায়, আজ রাত্রে বিদায়ের পূর্বে ঠিক যেমনটি সূর্যপ্রসাদকে এই দরজার দিকে পিছন করে উপবিষ্ট দেখে গিয়েছিলাম, তেমনই বসে আছেন তখনও।

তবে কি ওই চেয়ারে বসে-বসেই সূর্যপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছেন?

মাথার মাঝখানের টাকটা দেখা যাচ্ছে, আলোয় চকচক করছে।

অন্যান্য সকলেই ইতিমধ্যে আমার পিছনে-পিছনে ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

BanglaBook.org

জমাট একটা হিম-স্তব্ধতা যেন ঘরটার মধ্যে।

দু-পা আরও আমি এগিয়ে গেলাম।

এবং এগোবার সঙ্গে-সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভয়বিহ্বল দৃষ্টি তখন আমার সামনের দিকেই স্থিরনিবদ্ধ। সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ের কাছে ওটা কী চকচক করছে সাদামতো?

কী—কী ওটা?

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়েছিলাম। এবং সেই মুহূর্তেই একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার আমার গলা দিয়ে বের হয়ে এল বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই।

সকলেই তখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে একটা ছোবা বিদ্ধ হয়ে আছে। এবং বাঁটটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ ছোরার ফলাটাই বিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর মাংসল ঘাড়ে।

এ কী, দাদা—কী সর্বনাশ! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে রাধিকাপ্রসাদ দু-হাতে চোখ ঢাকলেন।

হাউ হরিব্‌ল। মেজর কৃষ্ণস্বামীর কণ্ঠে শোনা গেল, মার্ডার!

তারপরই যেন একটা মৃত্যুশীতল জমাট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে নেমে এল। কারও মুখেই আর কোনও কথা নেই।

কয়েকটি নির্বাক, মুহূর্ত।

তারপরই একটা শব্দ হতে দেখি, বলদেববাবু বোধহয় ওই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে সামনেব খালি চেয়ারটার ওপব বসিয়ে দিলেন।

সাত

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি।

কী ভয়াবহ, কী বীভৎস দৃশ্য!

এমনি করে সূর্যপ্রসাদকে কে হত্যা করল? এ যে শুধু আকস্মিকই নয়, অভাবনীয়ও। চিন্তারও অগোচর।

না, না—এ আমি দেখতে পারছি না আর, সহ্য করতে পারছি না। বলতে-বলতে স্খলিতপদে রাধিকাপ্রসাদ পূর্ব দ্বারপথেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বলদেববাবু তখনও চেয়ারটার ওপরে চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মেজরই বললেন, বিমল, সিংকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

বিমল বলদেব সিংহকে হাত ধরে সযত্নে তুলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে রইলাম কেবল আমি, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও ভৃত্য আবদুল। এবং চেয়ারের ওপরে উপবিষ্টাবস্থায় সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে ছোরাবিদ্ধ নিষ্প্রাণ দেহটা।

অখণ্ড একটা স্তব্ধতা ঘরটার মধ্যে থমথম করছে।

সে যে কী একটা অসহনীয় পরিস্থিতি ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য নার্ভ দেখলাম প্রৌঢ় মেজর কৃষ্ণস্বামীর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যে-বিহ্বলতা মেজর কৃষ্ণস্বামীর মধ্যে দেখেছিলাম, তার যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই তখন তাঁর কথায়-বার্তায়।

অদ্ভুত শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে মেজর ডাকলেন, ডাক্তার সেন?

BanglaBook.org

চমকে সে-ডাকে তাঁর দিকে তাকালাম।

উই মাস্ট ডু সামথিং নাও।

কী বললেন, মেজর?

বলছিলাম, পুলিশে একটা এক্ষুনি সংবাদ পাঠানো আমাদের কর্তব্য নয় কি?

পুলিশে।

হ্যাঁ। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি পুলিশে একটা ফোন করে আসি। বলে আর দাঁড়ালেন না মেজর, ঘর থেকে শান্তপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ফোনটা নীচের তলায়।

আবদুলও মেজরের পিছনে-পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এবারে আমি একা।

সামনেই চেয়ারের ওপরে উপবিষ্ট সূর্যপ্রসাদের ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহ ও আমি।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় একসময় পায়ে-পায়ে কেদারাটার খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। এবং এবারে আরও কাছ থেকে ছোরার বাঁটটার উপর নজর পড়তেই যেন চমকে উঠলাম। সর্বনাশ। এ যে সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘরে চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে মেজর কৃষ্ণস্বামীরই উপহার দেওয়া সুদৃশ্য হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা সেই মেক্সিকান ছোরাটা।

কী ভয়ানক। সেই ছোরা বিঁধিয়েই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে?

কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুর কাজটা করল? আর কখনই বা করল? রাত সাড়ে দশটায় যখন এ-ঘর ছেড়ে আমি যাই, তখনও তো উনি বেঁচেছিলেন। তারপরই নিশ্চয়ই কেউ এসে ওঁকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কেন—কেন হত্যা করল?

এ শুধু চিন্তারই অতীত নয়, অবিশ্বাস্য।

সত্যই কি সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছেন, না জেগে-জেগে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি মাত্র।

এগিয়ে গেলাম পায়ে-পায়ে সূর্যপ্রসাদের সামনের দিকে আবার।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

মুখে একটা যন্ত্রণার যেন সুস্পষ্ট চিহ্ন।

হাত দুটি শ্লথ ভঙ্গিতে কোলের দু-পাশে ঝুলছে।

হঠাৎ যেন গা-টা কেমন আমার ছমছম করে উঠল। এদিক-ওদিক তাকালাম। মনে হল বায়বীয় কিছুর একটা উপস্থিতি যেন আমার একেবারে পাশটিতেই। কে যেন চাপা গলায় কথা বলে উঠল। আমার নাম ধরে যেন ডাকল, ডাক্তার সেন।

কে?

কী আশ্চর্য, জেগে-জেগেই আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম অবিকল সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, ডাক্তার সেন।

চমকে সামনের দিকে তাকালাম।

দেখি ঘরে প্রবেশ করছেন মেজর কৃষ্ণস্বামী ও তাঁর পশ্চাতে বিভ্রান্তের মতো অমলেন্দু।

অমলেন্দু চক্রবর্তী।

লিলি কটেজে বছরখানেক হবে এসেছে। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়েস হবে। রোগাটে চেহারা। সূর্যপ্রসাদের দেশে একই গ্রামে বাড়ি অমলেন্দুর।

গরিব বিধবার ছেলে। মামাদের আশ্রয়েই মানুষ। কোনওমতে আই. এ. পর্যন্ত পড়ে আর লেখাপড়া চালাতে পারেনি। চাকরি-বাকরির কোনও সুবিধা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত রাঁচিতে এসে সূর্যপ্রসাদকেই ধরেছিল একটা কিছু করে দেওয়ার জন্যে। সূর্যপ্রসাদ অমলেন্দুর কোনও একটা ব্যবস্থা

BanglaBook.org

না করে দিতে পারলেও তাকে যেতে দেননি অন্যত্র। মনে পড়ে, কথায়-কথায় আমাকেই একদিন বলেছিলেন সূর্যপ্রসাদ, ছেলেটি বড় ভালো হে, ডাক্তার। যেমন অনেস্ট, তেমনি পরিশ্রমী। তাই ওকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি।

বৌদ্ধ যুগের উপর একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন সূর্যপ্রসাদ। অমলেন্দু তাঁকে সেই লেখার ব্যাপারেই ইদানীং সাহায্য করত।

গুছিয়ে সব কপি করে দেওয়া, নোট করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই অমলেন্দু করত।

একশত টাকা করে মাস-মাস দিতেন অমলেন্দুকে সূর্যপ্রসাদ।

মেজরের পিছনে-পিছনে অমলেন্দুও এসে ঘরে ঢুকল।

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ইতিমধ্যেই সে মেজরের মুখে সব শুনেছে।

ওদের পশ্চাতে দেখি, আবদুলও এসে দরজার গোড়াতে নিঃশব্দে দাঁড়াল আবার।

সহসা মেজরের প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম।

কতক্ষণ আগে ব্যাপারটা ঘটেছে বলে তোমার মনে হয়, ডাক্তার?

কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, মেজর। সাড়ে দশটা নাগাদ এ-ঘর থেকে আজ রাত্রে যখন আমি বের হয়ে যাই, দরজার সামনেই আবদুলের সঙ্গে আমার দেখা। আবদুল সেসময় ট্রেতে করে মিস্টার গুপ্তের জন্যে কফি নিয়ে এই ঘরেই আসছিল। মিস্টার গুপ্ত আমাকে বাড়ির লোকদের বলতে বলে দিয়েছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ না বিরক্ত করে।

কেন?

তা জানি না। বোধহয় শরীর বা মন তেমন ভালো ছিল না।

সহসা ওই সময় আবদুল বললে, আপনার কথা শুনেই তো আমি চলে গিয়েছিলাম, ডক্টরসাব।

কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, মেজরই আবার বললেন, নিশ্চয় তারপর কেউ-না-কেউ এ-ঘরে এসেছিল।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কে এসেছিল তারপর এ-ঘরে? বললাম আমি।

অকস্মাৎ ওই সময় দরজার গোড়ায় বিমলের কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ সকলেই আমরা চমকে দরজার দিকে তাকালাম।

বিমলই ইতিমধ্যে কখন যে আবার দরজার গোড়ায় আবদুলের পশ্চাতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে, কেউ আমরা জানতেও পারিনি।

বিমল বললে, আমি একবার আজ রাত সাড়ে দশটার পর এ-ঘরে জেঠামণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

আপনি এসেছিলেন? প্রশ্ন করলেন মেজরই।

হ্যাঁ।

কেন?

একটা জরুরি কথা ছিল জেঠামণির সঙ্গে আমার।

জরুরি কথা!

হ্যাঁ।

ও। তা রাত তখন ক'টা আন্দাজ হবে বলতে পারেন?

হ্যাঁ, রাত সোয়া এগারোটা হবে তখন। আর আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাওয়ার সময় আমাকেও তিনি বলেছিলেন, রাত্রে যেন তাঁকে কেউ আর না বিরক্ত করে।

আর কিছু বলেননি? প্রশ্ন করলাম এবারে আমি।

হ্যাঁ, আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেববাবু চলে গিয়েছেন কি না।

BanglaBook.org

আমি তখন বললাম যে, তাঁরা যাননি, তখনও দাবা খেলছেন। সে কথা শুনে বললেন, এই ঠান্ডার মধ্যে যেন তাঁরা এত রাত্রে আর না ফিরে যান। তাঁদের এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন।

ও। তা হলে দেখা যাচ্ছে রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত মিস্টার গুপ্ত জীবিতই ছিলেন, মেজর। বললাম আমিই কথাটা।

রাত সোয়া এগারোটা তো বটেই। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্তও তিনি বোধহয় জীবিতই ছিলেন। কথাটা বললেন এবারে আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে।

কীরকম? তাকালাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেজরের মুখের দিকে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদই হবে, আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ই সামনের ও-বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় স্পষ্ট আমি মিস্টার গুপ্তর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।

আপনি তাঁর গলার স্বর শুনেছিলেন?

হ্যাঁ। কাকে যেন তিনি বেশ চড়া গলায় কী সব বলছিলেন। কথাগুলো অবিশ্যি স্পষ্ট আমি শুনতে পাইনি, তবে বাথরুমের জানলা-পথে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় কে একজন লোককে আমি খুব দ্রুত এ-বাড়ির পিছনের বাগানে যে-আউট-হাউসটা আছে, সেই দিকে যেতে দেখেছি—।

কী বলছেন আপনি, মেজর?—প্রশ্নটা না করে আমি পারি না।

হ্যাঁ, তখন ব্যাপারটা বিশেষ কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এখন—।

আশ্চর্য! অত রাত্রে কে বাড়ির পিছনের বাগানে গিয়েছিল আর কেনই বা সেই বাগানের মধ্যেকার আউট-হাউসের দিকে গিয়েছিল?

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বিশ্রী গোলমেলে মনে হয়।

বললাম, কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে কে আবার আউট-হাউসে যাবে আর কেনই বা যাবে—এটাই তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না, মেজর!

কিন্তু কেউ যে গিয়েছিল সে-বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না, ডাক্তার!

তা পারে না। তবে—, বলে আমি আবদুলের মুখের দিকে তাকালাম, আবদুল!

ডক্টরসাব—।

আমি চলে যাওয়ার পর কেউ কি তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? বা কারও আজ রাত্রে আসবার কোনও কথা ছিল?

কেউ তো আসেনি। আবদুল বললে।

অমলেন্দুবাবু, আপনি কিছু জানেন?

না।

হুঁ। তা হলে কেউ আসেনি তুমি ঠিক জানো, আবদুল?

কী বলছেন, ডক্টরসাব, কেউ এ-বাড়িতে এলে আমি জানতে পারতাম না? তা ছাড়া, আপনি তো জানেন, সদর দরজার পাশের ছোট ঘরটাতেই আমি থাকি। আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে তো আমার ঘরেই আমি ছিলাম।

সত্যিই তো, কেউ এসে থাকলে আবদুল নিশ্চয়ই জানত। মেজর বললেন।

কথাটা ঠিক তা নয়, মেজর। বলে আমি আজ রাত্রে এ-বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় যে অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিল, সেই ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

আই সি—তা হলে—।

কিন্তু মেজরের কথা শেষ হল না।

বাইরে ওই সময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

এবং সকলেই আমরা সেই শব্দে যেন সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

BanglaBook.org

আট

আমিই সর্বপ্রথম বললাম, একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল যেন।

বোধহয় থানার ও. সি. ব্রিজনন্দন পাণ্ডে এলেন। মেজর বললেন।

মিস্টার চক্রবর্তী, যান, দেখুন গিয়ে। বললাম আমি।

অমলেন্দু ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত নয়। একটু পরেই জুতোর মচ-মচ শব্দ তুলে অমলেন্দুর সঙ্গে থানা-অফিসার পাণ্ডে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

লোকটির সঙ্গে আমার কিছুটা পূর্ব-পরিচয় ছিল।

যেমন বেঁটে তেমনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটার গায়ের রং। তার ওপরে আবার সরু প্যাঁকাটির মতো চেহারা। চুপসে যাওয়া গাল। ওষ্ঠের উপর একজোড়া কাঁচায় পাকায় মেশানো বিরাট গোঁফ। উলের একটা মাঙ্কি-ক্যাপ মাথায় থাকার দরুন গোঁফ জোড়াটা একটু যেন বেশিই উদ্ধত দেখাচ্ছিল। পায়ে ভারী বুট, গায়ে কালো গরম গ্রেট কোট।

লোকটার চেহারাটা যেমন কুৎসিত, তেমনি আচরণে দাম্ভিক এবং মেজাজটাও রুক্ষ-কর্কশ। কথাবার্তার মধ্যে একটা মুদ্রাদোষ আছে। অজস্রবার 'মারো গোলি' কথাটি ব্যবহার করেন।

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই রুক্ষ-কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ঠান্ডার রাত্রে এসব কী ব্যাপার? মারো গোলি! আরে কিঁউ, ডক্টরসাব—।

হ্যাঁ, মিস্টার পাণ্ডে—।

মারো গোলি! লেকিন সাচমুচ কেয়া—।

হ্যাঁ দেখুন না, এই যে—বলে ইঙ্গিতে মৃত সূর্যপ্রসাদকে দেখালাম।

এগিয়ে এসে এবাবে স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখে পাণ্ডে বলে উঠলেন, মারো গোলি! এ যে দেখছি সত্যি-সত্যিই—।

হ্যাঁ—।

কিন্তু কী করে এ হল? পাণ্ডেই আবাব প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে আমিই তখন ব্যাপারটা বলে গেলাম।

শুনতে-শুনতে পাণ্ডে তাঁর বিরাট গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। আমার বক্তব্য শেষ হতেই বললেন, কিন্তু সে যাই হোক, মারো গোলি, কেউ ঘরের মধ্যে আজ রাত্রে এখান থেকে আপনারা চলে যাবার পর কোনও এক সময়ে সকলের অজ্ঞাতে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। এবং সে-ই ওঁকে মার্ডার করে গিয়েছে।

সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।—বললেন মেজর।

মারো গোলি! কিন্তু আপনারা তো বলছেন দবজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আপনারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছেন! তবে হত্যাকারী এ-ঘরে ঢুকল কোন পথে?

কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে পাণ্ডের চোখের তারা দুটো যেন সহসা আনন্দে নেচে উঠল। তিনি বললেন, মারো গোলি! সমঝ গিয়া, ওই খিড়কিপথে নিশ্চয়ই সে ঘরে ঢুকেছিল। বলে বাগানের দিককার খোলা জানলাটার প্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সত্যিই তো। জানলাটা যে খোলা, এতক্ষণ তা কারওরই নজরে পড়েনি। ওই জানলাপথেই তো অনায়াসে কোনও আততায়ী এই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে যেতে পারে।

সহসা ওই সময় সেই খোলা জানলাপথে একঝলক শীতের মধ্যরাত্রির হিমকণাবাহী বাতাস ঘরের মধ্যে এসে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল আমার সর্বদেহে।

মারো গোলি! চলেন, চলেন—পাশের ঘরে চলেন, ডক্টরসাব। পাণ্ডে হঠাৎ বললেন।

অতঃপর সকলে আমরা পাশের ঘরে এলাম।

BanglaBook.org

*

সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর।

মিস্টার পান্ডের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল সকলেই এসে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ভৃত্যদের মধ্যে একমাত্র আবদুল ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিল বাইরের বারান্দায় ওই ভিড়ের মধ্যে। এবং ঘরের মধ্যে রইলেন রাধিকাপ্রসাদ, মেজর কৃষ্ণস্বামী। বলদেব সিংহও তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন বলে তিনিও এলেন। এবং সুবল-বিমল তারাও ঘরের মধ্যে রইল। আমি তো ছিলামই।

মিস্টার পান্ডে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে বসলেন পুলিশি মর্যাদায় ও গাম্ভীর্য নিয়ে।

বাকি অন্যান্য সকলে আমরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েই রইলাম।

কথা বললেন প্রথমে মিস্টার পান্ডেই, কেউ এসেছিল ঘরের মধ্যে ওই জানলাপথেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর সেই লোকই মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমরা সকলেই নিঃশব্দে মিস্টার পান্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পান্ডে আবার বলতে লাগলেন, আচ্ছা একটা কথা, এই ঘর বা ঘরের মধ্যে থেকে কোনও কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়? রাধিকাবাবু, অমলেন্দুবাবু, একবারটি সব পরীক্ষা করে দেখুন তো। আবদুল, তুমিও দেখো।

পান্ডের নির্দেশ মতো রাধিকাবাবু, আবদুল ও অমলেন্দু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

মেজর ওই সময় পান্ডেকে উদ্দেশ করে বললেন, মিস্টার পান্ডে, আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা চুরি-ডাকাতির মতো কিছু?

মারো গোলি! তা ছাড়া আর কী হতে পারে? এভাবে ঘাড়ের পিছনদিকে নিজের হাতে ছোরা বিঁধিয়ে নিশ্চয়ই কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন না! মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করেছে কেউ, আপনি কী বলেন, ডক্টরসাব?

কথাগুলো বলে পান্ডে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি কোনও জবাবই দিলাম না।

মারো গোলি! ইট ইজ মার্ডার, রাইট এনাফ! মাথাটা দুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে পান্ডে আবার কথাটা বললেন।

ওই সময় রাধিকাপ্রসাদ ও আবদুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। রাধিকাপ্রসাদ বললেন, না মিস্টার পান্ডে, ঘরের থেকে কিছু চুরি বা খোয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। যেখানকার যেটি তেমনিই আছে।

সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

তা হলে তো দেখা যাচ্ছে স্রেফ সূর্যকে হত্যা করবার জন্যেই কেউ এ-ঘরে এসেছিল আজ রাত্রে। মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করা ছাড়া তার কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। কথাটা বললেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

তাই যদি হয় তো এ খুনের উদ্দেশ্য কী? বললাম আমি।

মারো গোলি! রাইট ইউ আর, ডক্টর সেন—তা হলে কেন মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করা হল? বললেন পান্ডে।

ওই সময় অমলেন্দু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তার হাতে খানকয়েক চিঠি।

ওগুলো কী অমলেন্দুবাবু? প্রশ্নটা করলেন মেজর।

এই চিঠিগুলো মিস্টার গুপ্তর চেয়ারের নীচে পড়েছিল।

BanglaBook.org

মারো গোলি, দেখি, দেখি—হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো নিলেন পাণ্ডে।

চিঠিগুলোর ওপর নজর পড়তেই দেখলাম, আজ রাত্রে বিশেষ করে যে ব্লু রঙের এনভেলাপ থেকে ব্লু রঙের লেটার কাগজে লেখা চিঠিটা বের করে সূর্যপ্রসাদ কিছুটা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, চিঠিগুলোর মধ্যে সেই বিশেষ চিঠিটি কিন্তু নেই।

মুখ দিয়ে সেই চিঠির কথাটা প্রায় আমার বের হয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে আমি আপাতত কথাটা চেপেই গেলাম। কারণ, সে-চিঠির কথা উঠলেই হয়তো আরও অনেক কথা এসে পড়বে।

কাজ কি আর সূর্যপ্রসাদের পারিবারিক কলঙ্ককে ঘাঁটিয়ে! তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশেষ করে বোবার শত্রু নেই।

পাণ্ডে চিঠিগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে সেগুলো নিজের পকেটেই রেখে দিলেন।

একটা কথা, মিস্টার পাণ্ডে—।

মেজরের কথায় পাণ্ডে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, বলুন!

আপনি বলছেন, হত্যাকারী ওই ঘরের জানলাপথেই ও-ঘরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু হাউ? দোতলায় ঘরের জানলাপথে এসে সেই আততায়ী কী করে তা হলে ঘরে ঢুকল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, জানলাটা আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল। বলতে-বলতে পাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

বলা বাহুল্য আমরাও সকলে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আবার সেই ঘর।

জানলাটার পাল্লা দুটো বাইরের দিকে খোলা থাকলেও পরদাটা টানা ছিল। হাত দিয়ে পরদাটা সরিয়ে জানলাপথে পাণ্ডে বাইরের দিকে ঝুঁকে, পকেট থেকে একটা টর্চবাতি বের করে তার আলোয় পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

দেখা গেল জানলাটার ঠিক নীচেই গ্যারেজটা।

এবং ঢালু অ্যাসবেসটাসের ছাদ।

অতএব অনায়াসেই সেই ছাদ থেকে জানলার ঠিক নীচেই চওড়া কারনিসের ওপর উঠে এই ঘরে জানলাপথে প্রবেশ করাটা কারও পক্ষে এমন কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার একটা নয়।

পাণ্ডের হাতের টর্চের আলোয় আরও একটা অকাট্য প্রমাণও আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। কতকগুলো কাদামাখা রবার-সোল জুতোর ছাপ সেই গ্যারেজের ছাদে ও জানলার নীচে কারনিসে তখনও সুস্পষ্ট রয়েছে।

ইউ সি ডক্টর সেন, জুতোর ওই ছাপগুলো!

হ্যাঁ—।

তা হলেই বুঝতে পারছেন, ধারণা আমার মিথ্যা নয়? সামবডি এই জানলাপথেই এ-ঘরে আজ রাত্রে এসে মিঃ গুপ্তকে ব্রুটালি মার্ডার করে গিয়েছে! পাণ্ডে বললেন।

হুঁ।

আর আমার মনে হয়, আজ এখান থেকে ফেরবার পথে গেটের সামনে যে-লোকটির সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল, যে আপনাকে লিলি কটেজের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, এ নিশ্চয়ই সেই। এ তারই কাজ। পাণ্ডে বললেন।

আমি কোনও জবাব দিলাম না পাণ্ডের কথায়।

আবার আমরা সকলে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম।

রাধিকাপ্রসাদ ওই সময়ে বললেন, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, দারোগা সাহেব—।

কী?

BanglaBook.org

দাদার তো কেউ শত্রু ছিল বলে আমি জানি না। তা ছাড়া, ঘরের কোনও কিছু চুরিও যায়নি, তবে সেক্ষেত্রে কে এমনি করে দাদাকে হত্যা করে গেল?

মারো গোলি! সেসব কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে। আপাতত আমরা বুঝতে পারছি, ওই জানলাপথে এসেই কেউ মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে গিয়েছে। আর হত্যা করেছে এ-ও বুঝতে পারছি সেই লোকটিই, যার সঙ্গে আজ রাতে গেটের সামনে ডাক্তার সেনের ধাক্কা লেগেছিল। তাকে ধরতে পারলেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। আমি তাকে ধরবই। কিন্তু রাত প্রায় দুটো হল। আজ চলি। আমি আবার কাল সকালে আসব।

পান্ডে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এবং যে-ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দুজন পুলিশ-প্রহরী লিলি কটেজে মোতায়েন রেখে আমি ও মিস্টার পান্ডে সে-রাতের মতো লিলি কটেজ থেকে বের হয়ে এলাম।

চলুন, ডাক্তার সেন, আপনাকে আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব'খন।

না, ধন্যবাদ—এ-পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব।

হাতের কালো ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে আমি হাঁটা শুরু করলাম।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। পান্ডের গাড়ি চলে গেল আমার পাশ দিয়ে।

নয়

শয্যায় শোওয়ার পর সে-রাত্রে ক্লান্ত দু-চোখের পাতায় কখন যে ঘুম নেমে এসেছিল টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল মিতার ডাকে।

চোখ মেলে দেখি, হাতে এককাপ চা নিয়ে শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। সদ্য স্নানের শেষে ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর ছড়ানো।

মিতার প্রিয় কেশতৈল কালিফোর্নিয়ান পপির মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। ডাকিসনি কেন রে?

চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিতে-দিতে মিতা বললে, বিমলবাবু সেই কখন থেকে এসে তোমার জন্যে যে বাইরের ঘরে বসে আছেন!

বিমলবাবু! হঠাৎ?

তা জানি না, দেখো গিয়ে।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে ঢুকলাম।

বিমলবাবু, কী খবর, এই সকালে?

একটা চেয়ারের ওপরে কেমন যেন নিঝুম হয়ে বসেছিলেন বিমলবাবু। চোখেমুখে একটা বেদনার বিষণ্ণ ক্লান্ত ছায়া।

আমার ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকালেন।

টিকতে পারলাম না বাড়িতে, ডাক্তার সেন। ব্যাপারটা যেন সত্যিই বিশ্বাস করতে এখনও পারছি না। জেঠামণি নেই এ যেন ভাবতেও পারছি না এখনও। বলতে-বলতে চোখ দুটো বিমলবাবুর ছলছল করে উঠল। গলার স্বরটা যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে এল।

চা খেয়েছেন?

না।

বসুন, মিতাকে চা দিতে বলি।

না-না—চায়ের কোনও দরকার নেই, ডাক্তার সেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—।

BanglaBook.org

বলুন?

মিতা দেবী বলছিলেন—।

মিতা! কী বলছিল সে?

বিখ্যাত কে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ নাকি এখানে আছেন ওই 'সানি ভিলায়'—।

কিরীটীবাবুর কথা বলছেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—উনি বলছিলেন, তাঁর সাহায্য নিলে নাকি অনায়াসেই তিনি জেঠামণির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারবেন।

তা পারবেন কি না জানি না। তবে ভদ্রলোক শুনেছি খুব নামকরা একজন ডিটেকটিভ। এবং অনেক বড়-বড় জটিল হত্যারহস্যের মীমাংসাও করেছেন। কিন্তু—।

না, এর মধ্যে আর কোনও কিন্তুই থাকতে পারে না, ডাক্তার সেন। জেঠামণির এইভাবে মৃত্যু, মিস্টার পাণ্ডের দ্বারা কতদূর কী সম্ভব হবে জানি না। কিন্তু সমর যখন নিরুদ্দিষ্ট তখন আমাদেরও তো একটা কর্তব্য বলে জিনিস আছে তাঁর প্রতি।

তা নিশ্চয় আছে। তবে—।

একটা কথা গতরাত থেকেই কি আমার মনে হচ্ছে, জানেন, ডাক্তার সেন?

কী?

শেষপর্যন্ত আমিই জেঠামণিকে শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছিলাম! এক্ষেত্রে কেউ মুখে না বললেও বা প্রকাশ না করলেও, আমার ওপরে একটা সন্দেহ হওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়!

কী বলছেন আপনি, বিমলবাবু?

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, আপনি কাল রাত্রে লক্ষ করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সোয়া বা সাড়ে এগারোটার সময় আমি জেঠামণির ঘরে গিয়েছিলাম কথাটা শোনার পরই মেজর কৃষ্ণস্বামীর চোখেমুখে ও মিস্টার পাণ্ডের চোখে যে-ভাবটা আমি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সেই কথাটাই আমি বাকি রাতটুকু শুয়ে-শুয়ে ভেবেছি। শেষপর্যন্ত ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হচ্ছিল, আপনি, আপনিও কি তাঁদেরই মতো—।

ছিঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, বিমলবাবু!

না-না—ডাক্তার সেন। ভগবান জানেন, জেঠামণির দেহ কাল রাত্রে আমি স্পর্শও করিনি। কিন্তু এ-সন্দেহের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব না, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমাণিত হচ্ছে যে সত্যি-সত্যি অন্য কেউ—।

কথাটা অবিশ্যি আপনি একেবারে মিথ্যে বলেননি, বিমলবাবু, তবু আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

পুলিশ এ-ব্যাপারে যেমন অনুসন্ধান করতে চায় করুক। কিরীটীবাবুকে এ-ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনাটা বোধহয় বিবেচনার কাজ হবে না।

কেন? কেন আপনি এ-কথা বলছেন, ডাক্তার সেন?

ধরুন কিরীটী রায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে হাত দিলে যদি এমন কোনও আপনাদের পারিবারিক কলঙ্কই শেষপর্যন্ত বের হয়ে পড়ে, তখন আপনারা সকলেই কি—।

তা হোক। তবু—তবু এর একটা মীমাংসা আমার দিক থেকে আমি চাই-ই। আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, ডাক্তার সেন।

তবে আর কী বলব বলুন!

আপনার তো শুনলাম কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, চলুন না, একবার তাঁর কাছে যাই—।

BanglaBook.org

বেশ। কিন্তু আপনার বাবার একটা মতামতের তো প্রয়োজন আছে।

তা আছে অবশ্যই। তবে আমি জানি, বাবা নিশ্চয়ই এতে অমত করবেন না।

তবু আপনি কিরীটীবাবুর কাছে যাওয়ার আগে রাধিকাবাবুকে একটা ফোন করে নিলে পারতেন—।

বেশ তাই করছি।

অতঃপর আমার বাড়ি থেকেই ফোনে বিমলবাবু তাঁর বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাকে বললেন, চলুন ডাক্তার সেন, বাবা মত দিয়েছেন।

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ, এখুনি যাব, চলুন।

বেশ চলুন।

আমাদেব বাড়ি থেকে 'সানি ভিলা'র দূরত্ব সামান্যই।

কিরীটীবাবু বাইরের বারান্দায় রোদের মধ্যে একটা বেতের চেয়ারে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন-আসুন, ডাক্তার সেন। তারপর সকালবেলাতেই, কী খবর?

বিমলবাবুর পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে তখন আমাদের আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই সহসা মনে হল যেন কিরীটীবাবুর চোখের তারা দুটো সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে ক্ষণেকের জন্য কী এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চকচক করে উঠল।

এবং পরক্ষণেই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে কিরীটীবাবু চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, সে কী!

হ্যাঁ, আর বিমলবাবু তাই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছেন যদি আপনি অনুগ্রহ করে ওঁর জেঠামশায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটার মীমাংসা করে দেওয়ার ভারটা নেন।

আমার কথা শুনে কিরীটীবাবু কয়েক মুহূর্ত কোনও কথাই বললেন না। নিঃশব্দে বসে রইলেন যেমন ছিলেন।

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে কিরীটীবাবু কথা বললেন, কিন্তু একমাত্র যে-কারণটি বললেন মিস্টার গুপ্ত, সেই কারণেই কি আপনি আমার সাহায্যের জন্যে ডাক্তাব সেনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছেন? না, আপনার মতে জেঠামণির একমাত্র পুত্র, নিরুদ্দিষ্ট সমরবাবুর ওপরেও পুলিশের সন্দেহ পড়তে পারে সেইজন্যেই—।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! আপনি ঠিক-ঠিক ধরেছেন, মিস্টার রায়। বিমলবাবু বললেন, সমর আমার সমবয়েসি এবং জেঠতুতো ভাই-ই কেবল নয়, সে আমার সত্যিকারের বন্ধু ও সুহৃদ। আর ডাক্তার সেনের চাইতে তাকে আমি ঢের বেশি চিনি।

এ-কথা কেন বলছেন? আমিই বিমলবাবুকে প্রশ্নটা করলাম।

কেন যে কথাটা বলছি আপনার বোঝা উচিত ছিল, ডাক্তার সেন! তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিমলবাবু প্রত্যুত্তর দিলেন।

না, বিমলবাবু, আপনি ভুল করেছেন। সমরবাবুর কথা মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে হয়নি।

তাই যদি না হবে তো কেন আপনি কাল অত রাত্রে আমাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন, ডাক্তার সেন?

বিমলবাবুর কথায় মুহূর্তকাল আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। চেয়ে দেখলাম কিরীটীও নির্বাক বসে আমাদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আপনি তা হলে গতরাত্রে আমাকে অনুসরণ করেছিলেন, বিমলবাবু?

BanglaBook.org

না।

তবে আপনি জানলেন কী করে যে, কাল রাত্রে আমি 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলাম?

আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

কেন বলুন তো?

কথাটা তা হলে আপনাকে খুলেই বলি, মিস্টার রায়। কাল সন্ধেবেলাতেই বাজার থেকে ফেরবার পথে আমার যেন মনে হয়েছিল সমরকে 'তাজ' হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে কাজ থাকায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়েছিল বলে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে পারিনি সেসময়। কিন্তু গতরাত্রের ব্যাপারের পর আজ ভোরে উঠেই 'তাজ' হোটেলে না গিয়েও আমি পারিনি।

সহসা ওই সময় কিরীটী রায় প্রশ্ন করলেন, সমরবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

না, মিস্টার রায়। তবে দেখা তার না পেলেও সমর যে গত দু-দিন 'তাজ' হোটেলেই ঘরভাড়া করে ছিল সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি।

কীসে নিঃসন্দেহ হলেন, বিমলবাবু? প্রশ্ন করলেন আবার কিরীটীই।

হোটেলের রেজিস্টারে তার নাম রয়েছে। আর সেইখানকাব চাকরদেব মুখেই শুনলাম, কাল রাত্রে ডাক্তার সেন সেখানে গিয়েছিলেন।

বাধা দিলেন এবারে কিরীটীই। বললেন, ডাক্তার সেনেব কথা থাক। সমরবাবুর কথাটাই আগে শেষ করুন, বিমলবাবু।

কাল রাত ন'টার পর সমর হোটেল থেকে সেই যে কোথায চলে গিযেছে আর সে ফিবে আসেনি।

হুঁ। তার জিনিসপত্র কিছু ছিল না হোটেলে?

হ্যাঁ, একটা স্যুটকেস ও একপ্রস্থ জামাকাপড় সে হোটেলেই ফেলে রেখে গিয়েছে।

হুঁ। বলে কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিযে বললেন, ডাক্তার সেন, আপনি তা হলে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, অফকোর্স ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—।

নিশ্চয় না। বিমলবাবু ঠিকই ধরেছেন। সমরকে আমি খুব ভালো করেই জানি, মিস্টার রায়। এবং সে জুয়া খেললেও এবং বাপের নাম জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিলেও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, সে তার বাপকে ওইভাবে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করতে পারে। তবে এটা ঠিকই, সমরের ওপরে পুলিশের সন্দেহ জাগতে পারে ভেবেই আমি গিয়েছিলাম তাকে আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে বলতে।

আই সি। তা হলে আপনি জানতেন যে সমরবাবু 'তাজ' হোটেলেই ছিলেন?

হ্যাঁ। মিতার মুখে কথাটা শুনে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে সে 'তাজ' হোটেলেই আত্মগোপন করে আছে।

কিন্তু ডাক্তার সেন, আমি যদি বলি ঠিক ওই কারণেই কাল অত রাত্রে আপনি 'তাজ' হোটেলে যাননি?

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়? তবে আমি কী জন্য গিয়েছিলাম বলে আপনার ধারণা?

আপনি মনে-মনে চেয়েছিলেন যে সমর যেন কাল সারারাত হোটেলেই থাকে। আর সেইজন্যেই আপনি গিয়েছিলেন কাল অত রাত্রে হোটেলে। হ্যাঁ, তবে এ-ও ঠিক, সমরবাবু এইভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ায় স্বভাবতই পুলিশ তাঁকে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করবেই। এবং বর্তমানে তার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পোজিশন যে অত্যন্ত সন্দেহজনক সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু যাক সে-কথা। বিমলবাবু, আমি আপনার জেঠামণির হত্যারহস্যের ব্যাপারে সত্যিই

BanglaBook.org

একটু ইন্টারেস্টেড ফিল করছি।

আপনি তা হলে কেসটা হাতে নিন, মিস্টার রায়। বিমলবাবু বললেন।

নিয়েছি। চলুন, একবার অকুস্থানটা দেখে আসি।

চলুন।

সকলে তখুনি আমরা 'লিলি কটেজে'র উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম।

দশ

আমরা সকলে গিয়ে যখন 'লিলি কটেজে' উপস্থিত হলাম, মিস্টার পাণ্ডে তার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

আমিই কিরীটী রায়ের সঙ্গে মিস্টার পাণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিলাম ও তাঁর আসার উদ্দেশ্যটাও ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু পাণ্ডের চোখমুখের ভাব দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, ব্যাপারটা তাঁর বিশেষ মনঃপূত হয়নি। তবে কথায় সেরকম কিছু প্রকাশ না করে কেবল বললেন, বেশ তো, বেশ তো, অত্যন্ত আনন্দের কথা।

কিরীটীও জবাব দিলেন, বর্তমান কেসের ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আমি অংশগ্রহণ করলেও আমি কিন্তু আপনার পিছনেই থাকতে চাই, মিস্টার পাণ্ডে। আপনিই আসল, আমি শুধু আপনার সঙ্গে কাজ করব।

বুঝলাম সুচতুর কিরীটী রায় একটি চালেই পাণ্ডেকে মাত করে দিলেন। পাণ্ডে কিরীটীর কথায় বিশেষ খুশি হয়ে বললেন, বিলক্ষণ, আপনার নাম যে আমার অজানা তা তো নয়, মিস্টার রায়। জানি বইকী, আপনিও গুণী ব্যক্তি।

না-না—আপনাদের বাদ দিয়ে আমাদের কতটুকুই বা ক্ষমতা! আপনারা নেহাত সাহায্য করেন বলেই না—।

মারো গোলি!

সকলে হেসে উঠলেন।

কিরীটী অতঃপর বললেন, ডাক্তার সেন ও বিমলবাবুর মুখে অবিশ্যি ইতিপূর্বেই কিছুটা শুনেছি, তা হলেও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামতটাই সর্বাগ্রে আমি জানতে চাই, মিস্টার পাণ্ডে!

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—বলে পাণ্ডে সোৎসাহে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেলেন।

সব শোনার পর কিরীটী বললেন, ডাক্তার সেনের কথায় ও আপনার কথায় তা হলে বোঝা যাচ্ছে, মিস্টার পাণ্ডে, কাল রাত্রে আবদুলের মুভমেন্ট সত্যিই একটু সন্দেহজনক ছিল, কী বলেন?

আপনিই বলুন না, মিস্টার রায়, তাই নয় কি?

কিরীটী তাঁর কথার কোনও জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, সমরবাবু সম্পর্কে আপনার কী ওপিনিয়ন, মিস্টার পাণ্ডে?

কিরীটীর দ্বিতীয় প্রশ্নে এবারে দেখলাম মিস্টার পাণ্ডে যেন অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। এবং বেশ আনন্দের সঙ্গেই বললেন, ম্যায় দেখতা হুঁ কি আপ সাচ্চা জহুরি হ্যায়! ইয়ে ভি বহুৎ খুশিকি বাত হ্যায় কি আপকো মাফিক হুঁশিয়ার ব্যক্তিকে সাথ মুঝে কাম করনেকো মৌকা মিলা। সত্যিই বলেছেন, মিস্টার রায়, সবার আগে আমাদের সমরেরই খোঁজ করতে হবে।

কিন্তু মিস্টার পাণ্ডে, হঠাৎ বিমলবাবু বলে উঠলেন বাধা দিয়ে, আপনার একটু ভুল হচ্ছে না কি?

BanglaBook.org

ভুল।

হ্যাঁ, আমি হলপ করে বলতে পারি, সমর এ-কাজ করতে পারে না।

কে যে কী পারে আর কে যে কী পারে না আপনি যদি জানতেন, বিমলবাবু—হাসতে-হাসতে পাণ্ডে জবাব দিলেন।

এবারে কথা বললাম আমিই, কিন্তু সমরকে সন্দেহ করার ব্যাপারে আপনার নিশ্চয় যুক্তি আছে কিছু, মিস্টার পাণ্ডে।

যুক্তি। নিশ্চয়ই। যুক্তি আছে বইকী। হুটপাট করে আমরা পুলিশ অফিসাররা কখনও কোনও কাজ করি না, ডাক্তারসাব।

তা তো নিশ্চয়ই! কিন্তু—।

প্রথমত, ধরুন, আমরা সকলেই জেনেছি তার স্বভাবচরিত্র আদৌ ভালো ছিল না। জুয়োতে সে অভ্যস্ত ছিল। এবং মাত্র কিছুদিন আগে সে তার বাবার সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলেছিল। যার ফলে সে কিছুদিন থেকে অ্যাবসকন্ড করে বেড়াচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, বদ অভ্যাসের জন্যে বরাবরই তার একটা অর্থাভাব ছিল। তৃতীয়ত, সে কাল রাত্রে 'তাজ' হোটেলে ছিল। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে, যতদিন তার বাপ সূর্যপ্রসাদবাবু বেঁচে থাকতেন তার কাছে এ-বাড়ির দরজা ততদিন বন্ধই থাকত।

কিন্তু—, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন আবার বিমলবাবু।

শুনুন, লেট মি ফিনিশ! সই জাল করার ব্যাপারেই আলাপপ্রসঙ্গে মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই আমি সূর্যপ্রসাদবাবুর মুখেই শুনেছিলাম, ছেলের ওপরে তিনি এতখানি বিরক্ত হয়েছিলেন যে তার আর মুখদর্শনও করবেন না কোনওদিন বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ-কথাও বলেছিলেন তিনি, তাঁর সম্পত্তির একটি কপর্দকও ছেলেকে দেবেন না। তারপর আমার ষষ্ঠ যুক্তি হচ্ছে, গতরাত্রে সাড়ে ন'টার পরে সেই যে সে 'তাজ' হোটেল থেকে বের হয়ে যায়, তারপর আর সে এখনও পর্যন্ত সেখানে ফেরেনি। সপ্তম পয়েন্ট, আমাদেরই একজন কনেস্টবল তাকে গতরাত্রে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে স্টেশন রোডে ঘুরতে দেখেছে। শুধু তাই নয়, আমার সর্বশেষ যুক্তি—যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে কনেস্টবলটির মুখে সমরের সংবাদ পাওয়ার পর আজ নিজে আমি সকালে 'তাজ' হোটেলে তার অনুসন্ধানে গিয়ে তার ঘরে কী পেয়েছি জানেন, বিমলবাবু?

কী?

রবার সোল দেওয়া একজোড়া নয়, দু-জোড়া একই প্যাটার্নের জুতো...।

জুতো?

হ্যাঁ, আর সেই জুতোর একজোড়ার সোলে এখনও কাদা লেগে আছে। এবং যে-জুতোর ছাপের সঙ্গে লিলি কটেজের ঘরের জানলার কারনিসের ও গ্যারেজের ছাদের জুতোর ছাপের হুবহু মিলও পেয়েছি।

ঝড়ের মতো একটানা একটার পর একটা একগাদা যুক্তি এমনভাবে কণ্ঠে জোর দিয়ে পাণ্ডে বলে গেলেন যে, আমরা সকলেই যেন কয়েকটা মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থাকি।

এরপরও কি, বিমলবাবু, আপনি বলবেন, সমরবাবু সন্দেহের বাইরে? নো-নো—আই অ্যাম ডেফিনিট—এ আর কারও কাজ নয়। সমরবাবুই—।

না-না—তবু, তবু বলব, মিস্টার পাণ্ডে, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

বেশ তো। তার জন্যে আপনি ব্যস্তই বা হচ্ছেন কেন, বিমলবাবু? আদালত বিনা প্রমাণে তো আর কিছু তাকে শাস্তি দেবে না। ব্যাপারটা আদালতই বিচার করে দেখবে। কিন্তু যাক ওসব কথা। আমি এখুনি গিয়ে থানা থেকে ঠেলাগাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

BanglaBook.org

পাণ্ডে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

আপনি চলে যাচ্ছেন, মিস্টার পাণ্ডে? প্রশ্ন করলেন কিরীটী।

হ্যাঁ, মিস্টার রায়। কেসটার একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।

সন্ধের দিকে যদি আপনার ওদিকে যাই তো দেখা হবে?

নিশ্চয়ই আসবেন।

মিস্টার পাণ্ডে অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডের প্রস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটা পাষাণস্তব্ধতা নেমে এল।

সকলেই বোবার মতো দাঁড়িয়ে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললেন প্রথম কিরীটীবাবুই।

ডাকলেন মৃদুকণ্ঠে, ডাক্তার সেন।

বলুন।

মৃতদেহ যে-ঘরে আছে একবার চলুন সেই ঘরটা দেখব।

আসুন—।

অনেকগুলো যুক্তি সহযোগে মিস্টার পাণ্ডে বেশ জোর গলায় সমরই যে তার পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে সুনিশ্চিত সন্দেহে চিহ্নিত, কথাটা বলে যাওয়ার পর থেকে মনটা সত্যিই যেন কেন আমার বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। বাড়ির অন্যান্য সকলেও যেন মনে হল কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু লক্ষ করলাম, মিস্টার পাণ্ডের কথাগুলো যেন কিরীটী রায়ের মনে এতটুকু দাগও কাটতে পারেনি। কোনও পরিবর্তন, কোনও ভাববৈলক্ষণ্যই যেন কিরীটীর চোখেমুখে দেখতে পেলাম না।

তিনি যেন একান্ত নির্বিকার।

নিঃশব্দে কিরীটীবাবুকে নিয়ে আমি ও বিমলবাবু মৃতদেহ যে-ঘরে ছিল সেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

লক্ষ করলাম, কিরীটী দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়েই একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের যাবতীয় সব কিছুর ওপরই চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বললেই ভুল হবে, যেন ছুরির ফলার মতোই দুটি চোখের তারা তাঁর ঝকঝক করছিল সেসময়।

তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কিরীটী একসময় মৃতদেহের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতিও হয়নি।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম কাল রাত্রে যেন তেমনটিই আছে।

মনে হল সূর্যপ্রসাদ যেন তখনও জীবিত। চেয়ারের ওপরে তাঁর চিরাচরিত অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই বসে আছেন যেন চোখ দুটি বুজে।

ডাক্তার সেন।

হঠাৎ কিরীটীর ডাকে চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

একবার ভালো করে সব দিকে চেয়ে দেখুন তো, কাল রাত্রে এ-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক যে-যে জিনিস যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনটিই আছে তো?

কিরীটীর নির্দেশে চারদিকে একটিবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, তাই তো মনে হচ্ছে।

খুব ভালো করে দেখে বলুন। বিমলবাবু, আপনিও দেখে বলুন। কিরীটী আবার বললেন।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, অ্যাজ ইট ইজ আছে বলেই তো মনে হচ্ছে, মিস্টার রায়। আমিও বললাম এবাবে।

বিমলবাবু?

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

আবদুলকে একবারটি ডাকুন তো, বিমলবাবু।

তখনি আবদুলকে ডেকে আনা হল। এবং আবদুলকেও কিরীটী একই প্রশ্ন করলেন।

আবদুল কিন্তু চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে বাবু, ওই বড় চেয়ারটা, মানে যেটার ওপর এখনও বাবু বসে আছেন, ওটা যেন ঠিক ওই জায়গায় ছিল না বলেই মনে হচ্ছে।

কীরকম?

আজ্ঞে, মনে হচ্ছে চেয়ারটা যেন সেসময় দেখেছিলাম ওই দেওয়ালের দিকে আর একটু ঘেঁষে ছিল।

কীরকম ছিল দেখাও তো?

আবদুল তখন মৃতদেহ সমেতই চেয়ারটা সামান্য ঠেলে দিল এবং তার নীচে চাকা বসানো থাকায় নিঃশব্দে কার্পেটের ওপর দিয়ে চেয়ারটা সরে গিয়ে প্রায় দু-ফুট দেওয়াল বরাবর দাঁড়াল, যাতে করে চেয়ারটা সেই ঘরের বন্ধ দরজার ঠিক মুখোমুখি একই লাইনে হয়ে গেল।

কাল রাত্রে চেয়ারটা এইখানেই ছিল প্রথমে যখন এ-ঘরে এসে ঢুকেছিলাম! আবদুল বললে।

আই সি! চেয়ারটা তা হলে সরাল কে? চেয়ারটার পোজিশন দেখেই অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল, কেউ নিশ্চয় চেয়ারটা সরিয়েছে।

কী বলছেন, মিস্টার রায়? প্রশ্নটা আমিই করলাম।

এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম ডাক্তার সেন যে, চেয়ারটা একটু আগে যেভাবে ছিল, সাধারণত কেউ সেভাবে ঘরের দিকে পিছন করে দরজার মুখোমুখি বসবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, তা হলে কে চেয়ারটাকে ওইভাবে সরিয়ে রাখল? আবদুল, তুমি?

আজ্ঞে না তো, বাবু।

আপনি, ডাক্তার সেন?

না।

একটা কথা বলব, বাবু—আবদুল কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

বলো।

আজ্ঞে আমার মনে পড়ছে, পুলিশের সঙ্গে গতরাত্রে দ্বিতীয়বার যখন এই ঘরে এসে ঢুকি তখনই যেন চেয়ারটা একটু আগে যেমন ছিল তেমনি সরানো দেখেছিলাম। কিন্তু তখন কিছুই নয় ভেবে অতটা নজর দিইনি।

কিন্তু সামান্যতম ওই ব্যাপারের এমন কোনও গুরুত্ব আছে কি, মিস্টার রায়? বললাম আমি।

কিরীটী মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার সেন, আপনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। রোগীর দেহের কোনও রোগকে আবিষ্কার করবার জন্য যখন ইনভেসটিগেশন করেন, তখন যেমন সামান্যতম ব্যাপারের মধ্যেও বিশেষত্ব থাকে বলে আপনাদের ধারণা, আমাদের ক্রাইমের ইনভেসটিগেশনের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি আমরা তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম কিছুই যাতে দৃষ্টি এড়িয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকি। থাকতে হয় সর্বদা।

আবদুল যে মিথ্যা বলবে, মিস্টার রায়, তা আমি অবিশ্যি বলছি না। তবে ওর ধারণা বা দেখবার ভুলও তো হতে পারে। বললাম আমি।

কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি ভুল দেখিনি। আবদুল প্রতিবাদ জানাল।

অদ্ভুত দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে কিরীটী সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সমর্থন করলেন, না আবদুল, আমি বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি তুমি ভুল করোনি। মিথ্যাও বলোনি। আচ্ছা, এবারে তুমি যেতে পার। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী বললেন, চলুন, ডাক্তার সেন, পাশের ঘরে গিয়েই কথাবার্তা বলা যাক। আপাতত এ-ঘরে যা দেখবার ছিল আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

এগারো

সকলে আমরা আবার সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

বসুন, ডাক্তার সেন—বলে কিরীটী নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সর্বাগ্রে উপবেশন করলেন। পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বের করে একটা সিগার নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে মৃদুকণ্ঠে বললেন, চেয়ারটার ব্যাপারটা আপনি সামান্য ও তুচ্ছ বলে ইগনোর করতে চাইলেন, ডাক্তার সেন। কিন্তু কী জানেন, ওই ধরনের ঘটনার আগে বা পরে যা-কিছু অকুস্থানে থাকে বা যাঁরা সেখানে থাকেন তা—সে জড়বস্তুই কিছু হোক বা জীবিত কোনও প্রাণীই হোক, সেই জড়বস্তুর বা জীবিত প্রাণীর প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গোপনীয় থাকে বা সেই সব জড়বস্তু কিছু না কিছু indicate করে, এ-ধরনের ব্যাপারে আমি বরাবরই লক্ষ করেছি।

তা হলে তো আমারও কিছু গোপনীয় আছে বলুন এ-ব্যাপারে, মিস্টার রায়?

কিরীটী হেসে ফেললেন এবং হাসতে-হাসতেই বললেন, তা আছে বইকী, না থাকাটাই তো অস্বাভাবিক।

তা হলে সেটা অনুমানও নিশ্চয়ই আপনি করেছেন, মিস্টার রায়?

তা করিনি বললে মিথ্যাই বলা হবে, ডাক্তার সেন।

যদি কিছু মনে না করেন তো কথাটা—।

এই ধরুন না কেন, সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সম্পর্কে আমার ধারণা, অনেক কিছুই আপনি হয়তো জানেন যা সব আমাকে এখনও বলেননি বা বলতে চান না বলে গোপন করে যাচ্ছেন।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় সহসা বুঝতে পারি, আমার চোখেমুখে একটা বিব্রত ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিরীটী সেটা বোধহয় লক্ষ করেই বলে ওঠেন, না-না, ডাক্তার সেন, আমার কথায় আপনার লজ্জিত বা বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।

মিস্টার রায়।

হ্যাঁ, যতটুকু আপনি আমাকে বলেছেন তার বেশি কিছুই আমি জানতে চাই না। ইউ নিড নট বি ওরিড, যা জানবার আমি ঠিকই জেনে নেব। যাক সে-কথা। আচ্ছা আবদুল, কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আবদুল একসময় এ-ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বলল, বলুন?

কাল রাত্রে প্রথম যখন তুমি তোমার বাবুর ঘরে ঢোকো, ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটা তখনও জ্বলছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আর ফায়ার-প্লেস মানে ঘরের চুল্লিটা—সেটা তখনও বেশ ভালোভাবেই জ্বলছিল, না নিভু-নিভু হয়ে এসেছিল, মনে আছে তোমার?

আজ্ঞে ঠিক মনে নেই, বাবু।

হুঁ।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য যেন নিশ্চুপ হয়ে কী ভাবেন। তারপর আবার একসময় বলেন, ডাক্তার, আপনি আবার হয়তো মৃদু হেসে বলবেন, এটাও তুচ্ছ ব্যাপার একটা।

না-না—সে কী?

BanglaBook.org

ঘরের ওই চেয়ারটার মতো ফায়ার-প্লেসের ব্যাপারটাও কেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জানেন?

কেন?

মনে আছে বোধহয় আপনার, রাত সাড়ে দশটার সময় যখন আপনি ওই ঘর থেকে চলে যান, আপনার জবানবন্দিতে বলেছেন, ওই ঘরের বাগানের দিককার জানলাটা ছিল বন্ধ এবং ঘরের দ্বিতীয় দরজাটা ছিল খোলা। কারণ, ওই দরজাপথেই ঘর থেকে আপনি বের হয়ে গিয়েছিলেন। তাই নয় কি, ডাক্তার?

হ্যাঁ।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আপনারা সকলে এ-ঘরের দরজা ভেঙে যখন আবার গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন কিন্তু ছিল ঠিক উলটোটি...।

তার মানে?

মানে দরজাটা ছিল বন্ধ এবং জানলাটা ছিল খোলা। তাই তো?

হুঁ।

তা হলেই দেখুন, স্বভাবত একটা কথা মনে জাগতে পারে আমাদের, এমনটি কেন হল? দরজাটাই বা বন্ধ কেন এবং জানলাটাই বা খোলা কেন?

তা—।

তা হলেই দেখুন, নিশ্চয়ই কেউ জানলাটা খুলে দিয়েছিল ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল, রাত সাড়ে দশটার পর থেকে রাত বারোটায় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার এই সময়টুকুর মধ্যেই কোনও এক সময়। অবিশ্যি সেটা সূর্যপ্রসাদ নিজেও করতে পারেন।

সূর্যপ্রসাদ!

হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ ঘরের মধ্যে একা ছিলেন। এবং তাঁর পক্ষে জানলাটা কোনও এক সময় খুলে দেওয়াটা আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়। তা ছাড়া, দুটো কারণে জানলাটা তিনি খুলতে পারেন। প্রথমত, চুল্লির আগুনে ঘরটা হয়তো খুব গরম হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁকে জানলাটা খুলতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনা এক্ষেত্রে থাকতে পারে না বলেই আমার ধারণা—।

কেন? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কারণ, কাল রাত্রে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হওয়ায় ও হাওয়া থাকায় শীতটা একটু বেশিই পড়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন বৃদ্ধ জানলা খুলেছেন বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়ত, জানলা খুলে সকলের অলক্ষ্যে হয়তো তিনি এমন কোনও আগন্তুককে ওই ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, যে হয়তো তাঁর খুবই পরিচিত ছিল। এবং পরে সেই আগন্তুক ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর হয়তো জানলাটা আর বন্ধ করবার অবকাশই ঘটেনি।

সত্যি, এ-দিকটা তো একটিবারও আমার মনে আসেনি, মিস্টার রায়। অথচ হাউ সিমপল ইট ওয়াজ!

তাই তো বলছিলাম, ডাক্তার সেন, যত কঠিন মিস্ট্রিই হোক, তার আগের ও পরের ঘটনাগুলোকে যদি পরপর ঠিকমতো সাজানো যায়, সে-মিস্ট্রিকেও আয়ত্তের মধ্যে আনা যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখা যাক, কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় মেজর কৃষ্ণস্বামী যে শুনেছিলেন, ঘরের মধ্যে কার সঙ্গে সূর্যপ্রসাদ বেশ উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন, সে কার সঙ্গে? তবে কি এ সেই ব্যক্তি, যে ওই জানলাপথে ঘরে ঢুকেছিল? তারপর একটু যেন থেমেই আবার কিরীটী বলতে লাগলেন, যদিচ রাত সাড়ে দশটার পর অর্থাৎ ডাক্তার সেন সূর্যপ্রসাদকে জীবিত দেখে যাওয়ার পরও বিমলবাবু তাঁর জেঠামণির ঘরে গিয়ে তাঁকে জীবিতই দেখেছিলেন, তথাপি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা গতরাত্রির বিশেষ সেই মিস্টিরিয়াস আগন্তুক সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারছি ততক্ষণ এ-রহস্যের মীমাংসা

BanglaBook.org

অবিশ্যিই হতে পারে না। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, সেই মিস্টিরিয়াস আগন্তুক সূর্যপ্রসাদেরই পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো তাঁর সঙ্গে ওই জানলাপথেই গোপনে অত রাত্রে দেখা করতে এসেছিল। এবং সে-কারণেই হয়তো সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে কেউ যাতে আর না তাঁকে বিরক্ত করে সে-কথা একবার ডাক্তার সেন ও একবার বিমলবাবুকে বলেছিলেন, পাছে সেই আগন্তুকের আইডেনটিটি প্রকাশ হয়ে যায় সেই ভয়ে। তারপর হয়তো সেই আগন্তুক এসে সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে চলে যাওয়ার পর কোনও এক সময় খুনি, যে সম্পূর্ণ অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি, ওই জানলাপথে এসে ঘরে ঢুকে তার কাজ হাসিল করে চলে গিয়েছে।

কিন্তু—, আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিরীটী রায়কে।

রায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হয়তো খুনি পূর্বাহ্নেই জানত, সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে রাত্রে ওইরকম কারও দেখা করবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এবং সে সেই সুযোগটুকুই গ্রহণ করেছে। অথবা এ-ও হতে পারে, সেই প্রথম ব্যক্তিই হয়তো দ্বিতীয়বার সেই জানলাপথে ঘরে প্রবেশ করে সূর্যপ্রসাদকে ঘুমন্ত অবস্থায় মার্ডার করে গিয়েছে।

সকলে আমরা নির্বাক হয়ে কিরীটীর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ শুনছিলাম।

কিরীটী এবারে অমলেন্দুকে ডেকে বললেন, অমলেন্দুবাবু, দুটো খবরের যে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

বলুন?

টেলিফোন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানুন, কাল রাত্রে ডাক্তার সেনের কলটা কোথা থেকে হয়েছিল? আর—।

বলুন—।

আর ওই সঙ্গে মুরি জংশনের স্টেশনমাস্টারকেও ফোন করে জানুন, রাত বারোটার পর আপ বা ডাউন কোনও ট্রেন আছে কি না?

অমলেন্দু নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ওই সময় একজন পুলিশ এসে ঘরে ঢুকল। বললে, মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নাকি ঠেলাগাড়ি এসে গিয়েছে।

মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার পর একসময় কিরীটী বিমলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, মিস্টার গুপ্ত, চলুন, এবার বাড়িটা ঘুরে দেখি।

চলুন!

আমাকে ছেড়ে দিলে হত না এবারে, মিস্টার রায়? একবার ডিসপেনসারিতে না গেলে—।

হ্যাঁ-হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, ডাক্তার মানুষ আপনি। আপনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছি সেটাই তো অন্যায়। আমিও যাব, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে আপনার সঙ্গেই যাব, আর কয়েক মিনিট।

মৃদু হেসে বললাম, বেশ, তাই চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ আবার কিরীটী প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, ডাক্তার সেন, ঘরের মধ্যে একমাত্র আপনাকে যে নীল রঙের লেটার পেপারে লেখা চিঠিটা সূর্যপ্রসাদ গতরাত্রে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, সেটি ছাড়া আর কিছুই তা হলে খোয়া যায়নি, তাই তো?

হুঁ, সেইরকমই তো মনে হল।

মাঝামাঝি সিঁড়ি অতিক্রম করতেই দেখা গেল অমলেন্দুবাবু ফিরে আসছেন।

কী খবর, মিস্টার চক্রবর্তী? জানতে পারলেন কিছু? কিরীটীই প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। বাজারের কাছাকাছি একটা ড্রাগ ও কেমিস্ট শপ থেকে নাকি কলটা করা হয়েছিল। আর বারোটা কুড়ি মিনিটে নাগপুর প্যাসেঞ্জার কলকাতার দিকে গেছে।

ধন্যবাদ, মিস্টার চক্রবর্তী।

BanglaBook.org

কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে লাগলেন।

কিন্তু মিস্টার রায়, হঠাৎ অমলেন্দুই আবার কথা বললেন, কে যে ড্রাগ হাউস থেকে ডাক্তার সেনকে ফোন করলেন সেটা তো কিছু বোঝা গেল না! আর কেনই বা ওই ধরনের একটা নিউজ ফোনে দিয়েছিল?

সত্যি, টেলিফোনের ব্যাপারটা মাথামুণ্ডু কিছু আমিও বুঝে উঠতে পারছি না, মিস্টার রায়! বললাম আমিও।

কিরীটী পূর্ববৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই বললেন, অফকোর্স টেলিফোন কলটার একটা উদ্দেশ্য ছিল বইকী।

উদ্দেশ্য!

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী এবারে মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

কিন্তু—।

সেটা জানতে পারলে তো সব কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যেত এতক্ষণ, ডাক্তার সেন!

এবং এ-কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কিরীটী সহসা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ভালো কথা, ডাক্তার সেন, রাত্রি তো তখন ঠিক এগারোটা, যেসময় কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে সেই লোকটার গেটের সামনে ধাক্কা লেগেছিল?

হ্যাঁ। সময়টা আমার মনে আছে, কারণ ওই সময় পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত এগারোটা ঘোষণা করছিল।

হুঁ, তাই তো বলছিলাম। আচ্ছা ডাক্তার সেন, দোতলায় সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুম থেকে অর্থাৎ যে-ঘরে গতরাত্রে বসে আপনাদের কথাবার্তা হচ্ছিল, সে-ঘর থেকে বাইরের গেট পর্যন্ত যেতে কতক্ষণ লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

তা সোজা অন্য কোথাও না থেমে চলে গেলে দু-তিন মিনিটেব বেশি লাগবে কেন? বড় জোর মিনিট চার-পাঁচ—।

একজ্যাক্টলি! আচ্ছা, আর একটা কথা, অমলেন্দুবাবু, গত সপ্তাহের কোনও দিন কোনও অপরিচিত লোক কি মিস্টার সূর্যপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

অমলেন্দুবাবু এবারে যেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ।

এসেছিল? কে সে?

ট্রেডার্স বুরো থেকে একজন সেল্‌সম্যান গত শনিবার—মানে পাঁচদিন আগে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তবে তাঁকে ঠিক অপরিচিত তো বলা যায় না, মিস্টার রায়!

কেন বলুন তো?

কেননা গত মাস দুয়েক থেকেই মিস্টার গুপ্ত একটা ডিকটাফোন কিনবেন-কিনবেন করছিলেন, সেই সংক্রান্ত ব্যাপারেই ট্রেডার্স বুরোর এজেন্ট মহেন্দ্রবাবু যাতায়াত করছিলেন।

ডিকটাফোন!

হ্যাঁ।

ডিকটাফোন! কিরীটী আবার কথাটা যেন কতকটা আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করলেন। তারপরই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তা তিনি কিনেছিলেন সেটা?

না।

হুঁ। আচ্ছা, আপনাদের সেই মহেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকটির চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন আমাকে, মিস্টার চক্রবর্তী?

বেঁটে, বেশ সুশ্রী চেহারা।

BanglaBook.org

পরক্ষণেই কিরীটী আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনি গতরাত্রে গেটের সামনে যে-লোকটিকে দেখেছিলেন, তার চেহারার সঙ্গে ওই মহেন্দ্রবাবুর চেহারার কোনও মিল আছে বলে আপনার মনে হয়?

না। সে-লোকটি বেশ লম্বা ছিল।

হুঁ।

অতঃপর কিরীটী একপ্রকার চুপচাপই সমস্ত বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। এবং বাড়ি দেখবার পর আমরা বিদায় নিতে যাব ওই সময় আবদুল অমলেন্দুবাবুকে এসে বলল, বাবুর সলিসিটার মিস্টার দাস এসেছেন। আপনাকে আর বিমলবাবুকে ছোটবাবু ডাকছেন ওপরে।

বিমলবাবু আর অমলেন্দু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বারো

আমরাও যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই হঠাৎ কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভালো কথা—সব দেখা হল এ বাড়ির, ডাক্তার সেন, কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর মিউজিয়াম ঘর, যে-ঘরে চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে সেই মেক্সিকান ছোরাটা ছিল সেটা তো একবার দেখা হল না।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন না, এই তো পার্লারের সঙ্গে অ্যাটাচড ছোট ঘরটাই।

মিউজিয়াম ঘরের মধ্যে কিরীটীকে নিয়ে গেলাম।

কিরীটী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের যাবতীয় বস্তু ও বিশেষ করে চন্দনকাঠের বাক্সটা খুলে ও বন্ধ করে দেখে বললেন, চলুন, এবারে ফেরা যাক।

রাস্তায় নেমে কিরীটী আবার প্রশ্ন করলেন, এখন ডিসপেনসারিতেই তো যাবেন, ডাক্তার সেন?

হ্যাঁ।

চলুন, একবার আমিও থানাটা ঘুরে যাই।

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হবে। কিন্তু শীতকাল হলেও রৌদ্রের তীব্রতা বেশ অনুভূত হয়।

কিরীটীর পাশাপাশি আমি চলেছি।

সত্য কথা বলতে কী, কিরীটীর স্তব্ধতা যেন আমার কেমন বিশ্রী লাগছিল। তাই নিজেই একসময় কথা বললাম, সত্যি মিস্টার রায়, আমার একটা কথা কী মনে হচ্ছে জানেন?

কী?

যদি ঘরের দেওয়ালগুলোও অন্তত মানুষের মতো কথা বলতে পারত, তবে এতক্ষণে আমরা অনায়াসেই কি জানতে পারতাম না যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে?

তা বটে। তবে কথা বলার ব্যাপারে একটা মুখ ও সেই সঙ্গে জিহ্বা থাকাটাই তো বড় কথা নয়, ডাক্তার সেন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ, সিমেন্ট ও ইট দিয়ে গাঁথা ঘরের বোবা দেওয়ালগুলোর ভাষা প্রকাশের জন্য জিহ্বা না থাকলেও দেখবার ও শোনবার ক্ষমতা তো আছে। আর সেটা প্রকাশের ভাষাও তাদের আছে বইকী।

কী বললেন?

হ্যাঁ, তাই। শুধু ঘরের দেওয়ালই নয়, ঘরের মধ্যে অবস্থিত টেবল-চেয়ার যার প্রতিটি জড়বস্তুই সেই ভাষাতেই আমাকে অনেক সংবাদ পৌঁছে দেয়।

BanglaBook.org

তাই বুঝি? তা কী খবর আজ পেলেন সূর্যপ্রসাদের ঘরের দেওয়াল আর ফার্নিচারগুলোর কাছ থেকে, মিস্টার রায়?

কথার মধ্যে আমার যে একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হুল ছিল সেটা যেন আদপেই গায়ে না নিয়ে চলতে-চলতে পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠেই কিরীটী বললেন, ঘরের একটি খোলা জানলা, একটি বন্ধ দরজা ও একটি উঁচু ব্যাকরেস্ট দেওয়া চেয়ার, যেটা স্থানচ্যুত হয়েছিল—ঘরের ওই বিশেষ তিনটি জড়পদার্থ তাদের নিজস্ব ভাষায় কেবলই আমাকে কী বলছিল আজ জানেন, ডাক্তার সেন?

কী?

তারা যেন বলছিল, ভেবে দেখো, কেন— কেন এমনটা হল? কেন জানলা আমি খোলা রইলাম, আর কেনই বা দরজা রইল বন্ধ, আর কেন চেয়ারই বা আমি স্থানচ্যুত হলাম?

মনে-মনে না হেসে পারি না। লোকটা হয় পাগল, না হয় একের নম্বর বুদ্ধু!

এত নাম শুনেছি লোকটার, সব কি তা হলে গল্পকথা?

কিন্তু কিরীটীকে থানা পর্যন্ত যেতে হল না।

সহসা ওই সময় মোটর-বাইকের প্রচণ্ড ফটফট শব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দারোগা সাহেব মিস্টার পাণ্ডে তাঁর চিরপরিচিত মোটর বাইকে চেপে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উড়িয়ে এইদিকেই আসছেন।

মিস্টার পাণ্ডে!

কই?

ওই যে এইদিকেই মোটর বাইকে চেপে আসছেন! বললাম আমি।

থামতে বলুন ওঁকে। কিরীটী বললেন।

কিন্তু থামতে বলতে হল না। পাণ্ডে এসে আমাদের কাছ বরাবরই [illegible]

এই যে মিস্টার রায়, আপনাদের খোঁজেই আমি যাচ্ছিলাম।

কী ব্যাপার? কিরীটী প্রশ্ন করে

খুনের একপ্রকার কিনারা করে ফেলেছি মিস্টার রায়।

বটে!

হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে [illegible]

বেশ বেশ— চলুন, ডাক্তার সেনের চেম্বারে বসেই শোনা যাবে'খন।

বেশ তো, তাই চলুন।

মিস্টার পাণ্ডের চোখেমুখে একটা খুশির আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

আমরা তিনজনে এসে আমার ডিসপেনসারির চেম্বারেই বসলাম।

চায়ের জন্যে বলি, মিস্টার রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বললেন, বলুন মিস্টার পাণ্ডে।

বললে হয়তো বলবেন দম্ভ বা বড়াই করছি, কিরীটীবাবু, উৎসাহে বলতে লাগলেন পাণ্ডে, কিন্তু এই এগারো বছরের চাকরির জীবনে এ ধরনের খুনজখম তো কম দেখলাম না! হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—।

তা ধরতে পারলেন নাকি খুনিকে? সহসা বাধা দিয়ে বললেন কিরীটী।

মারো গোলি, নিশ্চয়ই। আরে মশাই, বড়লোকের একমাত্র ছেলে, অতিরিক্ত আদরে গোল্লায় গেলে যা হয়—।

BanglaBook.org

তার মানে, বলতে চান সমরই?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু কীসে স্থিরনিশ্চিত হলেন মিস্টার পাণ্ডে যে সমরই তার বাপের হত্যাকারী?

মারো গোলি, আরে মশাই, এ হচ্ছে ডিটেকশনের মেথড, বুঝলেন?

কীরকম?

বলছি, বলছি—আচ্ছা, সূর্যপ্রসাদবাবুকে কাল সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত দেখা গিয়েছে—অর্থাৎ তাঁর ভাইপো বিমলবাবু ওই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কেমন কি না?

হ্যাঁ, সেইরকমই তো আপাতত শোনা যাচ্ছে। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন।

মারো গোলি, বেশ। অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, ডাক্তার সেন রাত বারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে' যাওয়ার পর সকলে মিলে ঘরে ঢুকে দেখলেন মিস্টার গুপ্ত মার্ডারড, কেমন কি না?

তা—।

হুঁ।

আচ্ছা ডাক্তার সেন, আপনারা যখন মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন, তার কতক্ষণ আগে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছিল? কিরীটী সহসা আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

তা আধঘণ্টাটাক আগে তো হবেই। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলাম আমি।

মারো গোলি। তাই যদি হয়ে থাকে বা দু-দশ মিনিট আগে-পিছেও যদি তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকে, এইটাই বোঝা যাচ্ছে যে সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও এক সময় মিস্টার গুপ্তকে হত্যাকারী হত্যা করেছে—এটা আমরা মেনে নিতে পারি কি না?

বেশ বলুন—কিরীটী বললেন।

মারো গোলি। নাউ 'লিলি কটেজে' গতরাত্রে যাঁরা-যাঁরা ওই সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মুভমেন্টস সম্পর্কে আমি একটা মোটামুটি খসড়া করেছি। এই দেখুন—বলে পকেট থেকে মিস্টার পাণ্ডে একটা সাদা কাগজের শিট টেনে বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

কিরীটী নিঃশব্দে কাগজটা হাতে নিয়ে দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন।

ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজটা।

কাগজটায় যা টাইপ করা ছিল :

১। মেজর কৃষ্ণস্বামী। ডাইনিং রুমে বসে সাড়ে ন'টা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বলদেব সিংহের সঙ্গে দাবা খেলেছেন। এবং রাত দশটা থেকে অমলেন্দুবাবুও ওঁদের পাশেই বসে দাবা খেলা শেষপর্যন্ত দেখেছেন। অমলেন্দুবাবু ও ওঁরা দুজনেই পরস্পর-পরস্পরকে সমর্থন করেছেন তাঁদের জবানবন্দিতে।

২। বলদেব সিংহ। ডাইনিং রুমে দাবা খেলছিলেন প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

৩। রাধিকাপ্রসাদবাবু। তিনি তারপরে ঘরে বসে প্রাত্যহিক নিয়মিত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত গীতাপাঠ করে শুতে যান। আবদুলের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

৪। সুবলবাবু। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শরীরটা ভালো না থাকায় ঘুমোতে যান। বিমলবাবু, রাধিকাবাবু ও অন্যান্য ভৃত্যেরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

৫। বিমলবাবু রাত সোয়া এগারোটায় তাঁর জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। আবদুল ও অন্য একজন সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬। অমলেন্দুবাবু। ডাইনিং রুমেই ছিলেন প্রমাণিত হয়েছে পূর্বেই।

BanglaBook.org

৭। আবদুল। রাত সোয়া এগারটায় নীচে তার ঘরে শুতে যায়। অন্যান্য ভৃত্যদের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য, বাবুর্চি ও রাঁধুনি—আবদুলকে বাদ দিয়ে বাচ্চা, পন্টু, গোমেশ ও লছমন। এদের মধ্যে বাচ্চা ও পন্টু, একজন পাঁচ বছর ও একজন তিন বছর ওই বাড়িতে কাজ করছে। গোমেশ বছর দুই ও লছমন সাত বছর কাজ করছে। বাড়ির সকলেরই মতে ওরা যেমন নিরীহ, তেমনি বিশ্বাসী। এবং ওদের কারও সম্পর্কে কারও কোনও নালিশই নেই।

পড়লেন মিস্টার রায়? পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

হুঁ। বলে কাগজটা নিঃশব্দে আবার কিরীটী পাণ্ডের হাতে তুলে দিলেন।

অবিশ্যি একমাত্র ওদের মধ্যে আবদুল সম্পর্কে সামান্য একটু যে সন্দেহ জাগে না তা নয়। বাকি সকলে সন্দেহের একেবারে বাইরে। বললেন পাণ্ডে।

অ্যানালিসিসটা আপনার ভালোই হয়েছে বলব, মিস্টার পাণ্ডে, কিরীটী বললেন, তবে—।

তবে কী?

আবদুল যে মিস্টার গুপ্তকে খুন করেনি সে-সম্পর্কে আমি কিন্তু স্থিরনিশ্চিত।

মারো গোলি। আমিও তো তাই বলছি। তা হলেই বুঝছেন মিস্টার রায়, ব্যাপারটা গিয়ে কোথায় দাঁড়াচ্ছে! সোৎসাহে আবার বলতে লাগলেন পাণ্ডে, বাড়ির মধ্যে যাঁরা কাল ওই সময় উপস্থিত ছিল তারা যখন কেউই আমাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ছে না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির বাইরেই নজর দিতে হবে, কেমন কি না?

তা দিতে হবে বইকী। কিরীটীই বললেন।

পূর্ববৎ উৎফুল্লভাবে মিস্টার পাণ্ডে বলতে লাগলেন, মারো গোলি। এখন দেখা যাক, বাড়ির মধ্যে গতরাত্রে যারা উপস্থিত ছিল তারা যদি কেউ এ-কাজ না করে থাকে তো বাড়ির বাইরে থেকে সর্বাপেক্ষা কার বেশি সম্ভাবনা ছিল ওইভাবে এসে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে যাওয়া সে-রাত্রে!

কার? প্রশ্নটা এবারে করলাম আমিই।

মারো গোলি। এখনও বুঝতে পারছেন না, ডাক্তার সেন? সমর। হাঁ, হি ইজ দ্য পার্সন! চাপা গর্বিত কণ্ঠে বললেন পাণ্ডে।

সমর?

মারো গোলি, আই অ্যাম শিওর। সূর্যপ্রসাদের ওই ছেলে সমর, বাপের সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে গা-ঢাকা দিয়ে এতদিন বেড়ালেও ওই ঘটনার দিন পূর্ব থেকেই সে যে এই শহরেই 'তাজ' হোটেলে অবস্থান করছিল সে-কথা তো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এবং গতকাল রাত সাড়ে ন'টার পর থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সে হোটেলে আর ছিল না। অথচ রাত সাড়ে এগারোটায় তাকে আমাদেরই একজন কনেস্টবল মহাবীর সিং স্টেশন রোডে দেখেছে।

বেশ তো! তাতে করে সে-ই যে তার পিতার হত্যাকারী—কথাটা প্রমাণিত হচ্ছে কী করে, মিস্টার পাণ্ডে? বললাম আবার আমি।

পাণ্ডে যেন আমার কথায় কানই দিলেন না। যেমন বলে যাচ্ছিলেন তেমনিই বলে যেতে লাগলেন।

মারো গোলি। এখনও বুঝতে পারছেন না, সূর্যপ্রসাদবাবুর সেই পলাতক ছেলে সমরই নিশ্চয় এই দুষ্কর্মের হোতা? রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেজর সাহেব সূর্যপ্রসাদের ঘরে তাঁকে উত্তেজিত ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন, আমার মতে নিশ্চয়ই তিনি তখন তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সমর তাদের বাড়ির সব অন্ধিসন্ধি জানত, তাই তার পক্ষে বাগানের গ্যারেজের ছাদ দিয়ে তার বাবার ঘরে প্রবেশ করা সহজই ছিল। এবং বাপের সঙ্গে তার পূর্ব মনোমালিন্যের

BanglaBook.org

দরুন সে-ই হয়তো একটা হঠাৎ অন্ধ আক্রোশের বশে কাল রাত্রে বাপের সঙ্গে বচসা করতে-করতে তাঁকে খুন করেছে। তারপর হয়তো ঘটনার পরিস্থিতিতে বিহ্বল হয়ে পালিয়েছে, হঠাৎ বাপকে ওইভাবে হত্যা করে ফেলে।

বুঝলাম, তা হলে ডাক্তার সেনকে ফোনে সংবাদটা দিল কে? সহসা কিরীটী প্রশ্ন করলেন ওই সময়।

মারো গোলি। সমরই! জবাব দিলেন পাণ্ডে।

সমর?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? যদি সে, আপনি যেমন বলছেন মিস্টার পাণ্ডে, পূর্বেকার মনোমালিন্যের দরুনই একটা আক্রোশের ফলে হত্যা করেই থাকে, সে-সংবাদটা ডাক্তার সেনকে সে দিতে যাবেই বা কেন হঠাৎ গায়ে-পড়া হয়ে?

মারো গোলি। অবিশ্যি সহসা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, মিস্টার রায়, তবে কী জানেন, এ-লাইনে দীর্ঘ এগারো বছরের অভিজ্ঞতায় তো হামেশাই দেখছি, হত্যাকারীরা হত্যা করবার পর এক-এক সময় এমন এক-একটা উদ্ভট কাজ করে বসে হুট করে সেই সময়কার মানসিক আনব্যালেন্সের মধ্যে যে, সবসময় তার কোনও যুক্তিই হয়তো খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়া, আমার ওই যুক্তি ছাড়াও আর একটি মারাত্মক প্রমাণের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার রায়!

মারাত্মক প্রমাণ?

হ্যাঁ, ঘরের জানলার কার্নিসে ও গারেজের ছাদে জুতোর ছাপটা ও 'তাজ' হোটেলে সমরের ঘরে যে কাদামাখা জুতো পাওয়া গিয়েছে তার একেবারে একই জুতোর ছাপ।

কিন্তু একই প্যাটার্ন বা একই মেকের জুতো তো অনেক লোকই ব্যবহার করতে পারে, মিস্টার পাণ্ডে' কিরীটী আবার বললেন।

মারো গোলি। নিশ্চয়ই পারে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু কাদামাখা জুতো ও সমরের পা ঢাকা দেওয়াটা?

সত্যিই অন্যায় হয়েছে।

বুঝুন, এখন তা হলে আগাগোড়া সব কিছু বুঝে দেখুন। মোটিভ, পসিবিলিটি সব কিছুই একমাত্র সমরের পক্ষেই প্রমাণিত হচ্ছে না কি? তাই বলছিলাম, আই অ্যাম ডেফিনিট—এ তারই কাজ। সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে।

তা হলে এখন কী করছেন, মিস্টার পাণ্ডে?

তাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে। আর তা করবও। যাবে কোথায় সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে? আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি মিস্টার রায়।

পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন যাওয়ার জন্যে।

কিরীটী শুধু মৃদুকণ্ঠে বললেন, আসুন।

জুতোর মচ-মচ শব্দ তুলে নিজের আবিষ্কারের সাফল্যে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত পাণ্ডে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যেন বিজয়গর্বে।

BanglaBook.org

তেরো

মুখে যতই আস্ফালন করুন মিস্টার পাণ্ডে, সমরের কোনও সন্ধানই কিন্তু দীর্ঘ সাত দিন ধরে বহু পরিশ্রম করা সত্ত্বেও করতে পারলেন না।

সমর যেন কর্পূরের মতোই সহসা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে হত্যার রাত্রি থেকেই।

ইতিমধ্যে দিন-দুই মিস্টার পাণ্ডের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল এবং তাঁর মুখেই সব শুনেছিলাম।

ইচ্ছে থাকলেও এই সাত দিন কিরীটীর সঙ্গে কিন্তু দেখা করে উঠতে পারিনি। কারণ গত সাত দিন গোটা-দুই কঠিন রোগী নিয়ে আমাকে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

মোট কথা, ইতিমধ্যে সূর্যপ্রসাদের আকস্মিক রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারের উত্তেজনাটা যেন কতকটা ঝিমিয়েই এসেছিল ক্রমশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি কিন্তু একসময়ের জন্যেও ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি।

অদৃশ্য একটা কাঁটার মতোই যেন সর্বক্ষণ আমার মনের মধ্যে কটকট করে বিঁধছিল ব্যাপারটা।

তার অবিশ্যি অন্য একটা কারণও ছিল।

সমরের প্রতি আমার ছোট বোন মিতার যে একটা দুর্বলতা ছিল সেটা অবিশ্যি আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অজ্ঞাত ছিল এইটাই যে, সমরের প্রতি মিতার যেটা আমি সামান্য দুর্বলতা বলে মনে মনে জেনেছিলাম, সেটা ঠিক দুর্বলতাই কেবল নয়—তাই চাইতেও বেশি কিছু, অর্থাৎ সমরের প্রতি মিতার গভীর ভালোবাসা। মিতা সত্যিই সমরকে ভালোবেসেছিল।

এবং ওই সত্যি কথা জানার সঙ্গে-সঙ্গে যেন আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম।

সমর। সমরের মতো একটা জুয়াড়ি, ধনীর খেয়ালি, মূর্খ ছেলেকে মিতার মতো শিক্ষিত একটি মেয়ে ভালোবাসতে পারে এ যেন সত্যিই আমার কল্পনারও অতীত ছিল বুঝি।

এবং রহস্যটা দৈবক্রমেই যেন আমার কাছে সেদিন উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

কয়েক দিনের একটু বেশি পরিশ্রমে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিন দ্বিপ্রহরে বিছানায় শুয়ে নিদ্রাটাও বোধহয় তাই একটু গভীরই এসেছিল।

এবং ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনে সহসা নিজের অজ্ঞাতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

বুঝলাম কিরীটী আর মিতা পাশের ঘরে বসে কথা বলছে।

কী ভেবে সাড়া না দিয়ে চুপ করে শয্যায় শুয়ে কান পেতে রইলাম।

কানে এল মিতা বলছে, সে যাই হোক, মিস্টার রায়, আমি হলফ করে বলতে পারি, এ তার কাজ নয়। আমি তো জানি তাকে। এতখানি নিষ্ঠুরতা কখনও তার মধ্যে আমি কল্পনা করতেই পারি না।

কিন্তু সে যদি সত্যি-সত্যি নির্দোষই, তবে এমন করে গা-ঢাকা দিয়েই বা আছে কেন মিস সেন? কিরীটী প্রশ্ন করেন।

আমার মনে হয়, মিস্টার রায়, ভয়ে।

ভয়ে?

হাঁ, সে যে কী ভয়ানক ভীরু সে তো আমার অজানা নয়। কিন্তু সে-কথা থাক, আপনিও কি পুলিশের মতোই মনে করেন যে সে-ই তার বাপকে হত্যা করেছে?

একটা কথা বলব, মিস সেন?

বলুন।

সমরবাবুকে যে আপনি ভালোবাসেন তা কি আপনার দাদা জানেন?

দাদা?

হাঁ।

না, দাদার কাছে বলতে আমি সাহস পাইনি। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবেই জবাব দিল মিতা, শুনলাম।

কেন?

BanglaBook.org

কারণ জানি, দাদা কিছুতেই আমাদের এ ভালোবাসাকে মেনে নেবে না।

কিন্তু আমার মনে হয়, ফলটা তাঁর জানা থাকলে বোধহয় ভালোই হত।

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়?

যাক সে-কথা, হাতের তীর যখন একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তখন আর উপায় নেই। তবে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারি, মিস সেন, সত্যিকারের ভালোবাসা মৃত্যুকেও জয় করে।

আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না। তাই এবারে ডাকলাম, মিতা!

ওই দাদা বোধহয় ঘুম থেকে উঠল। আপনি বসুন, মিস্টার রায়, আমি আসছি।

চোখেমুখে জল দিয়ে মিতাকে চা দিতে বলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, তারপর মিস্টার রায়, কতক্ষণ?

এই আধঘণ্টাটাক হবে।

কিন্তু ডাকেননি কেন?

ঘুমুচ্ছেন, বিরক্ত করিনি তাই।

না-না, তাতে কি—ডাকলেই পারতেন। তা কেসের কতদূর কী হল?

আমার সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিরীটী বললেন, চলুন না, মিস্টার গুপ্তের 'লিলি কটেজ'টা একবার ঘুরে আসি।

বেশ তো, চলুন।

মিতা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

মিতার মুখের দিকে তাকালাম।

নিজের কর্মব্যস্ততায় এ ক'দিন মিতার মুখের দিকে ভালো করে নজর পড়েনি। আর ওর মুখের দিকে তাকাতেই যেন মনে হল, চাপা একটা বেদনার বিষণ্ণ ক্লান্তি ওর মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে ট্রে-টা ত্রিপয়ের ওপরে রেখে মিতা আমাদের দুজনকে দু-কাপ চা করে দিল।

এলোমেলো চিন্তায় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলাম।

বাপ-মা মরা ছোট বোন ওই মিতা, আপনার বলতে তো ও-ই আমার একজন।

এ-পৃথিবীতে আর তো আমার কোনও ভালোবাসারই বন্ধন নেই।

বিয়ে-থা করিনি, আর করবও না জানি।

কে আর তবে আছে আমার এ-সংসারে? কিন্তু মিতা এ কী করল? ওই ধনীর অপদার্থ, অশিক্ষিত, জুয়াড়ি ছেলেটাকে এমনি করে কেন ভালোবাসল?

ইতিমধ্যে কিরীটীবাবুর চা-পান হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন ডাক্তার সেন! চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম।

বৈকালের বিষণ্ণ আলোয় চারিদিক তখন যেন কেমন ম্রিয়মাণ মনে হয়।

নিঃশব্দে দুজনে হেঁটে চলেছি পাশাপাশি।

কিরীটী রায়কে যেন কেমন চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়।

কী ভাবছেন ওই মুহূর্তে মিস্টার রায় কে জানে।

সূর্যপ্রসাদের কথা বা তাঁর হত্যাকারীর কথাই কি? না সমরের কথা? না মিতার কথা?

মিস্টার রায়!

আমার ডাকে সহসা মিস্টার রায় আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

BanglaBook.org

কিছু বলছিলেন?

মিস্টার পান্ডের মতো আপনিও কি মনে করেন—।

কী?

সত্যি সমরই তার বাপকে হত্যা করেছে!

আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার সেন?

অতর্কিতে কিরীটীর প্রশ্নে যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলাম। এবং কয়েকটা মুহূর্ত কোনও জবাবই দিতে পারলাম না।

নিঃশব্দে হেঁটেই চলি।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করলেন, কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না, ডাক্তার?

সত্যি কথা বলতে কী মিস্টার রায়—।

কী, থামলেন কেন, বলুন?

সমর এভাবে সহসা গা-ঢাকা না দিলে—।

কিন্তু একটা কথা আপনার বুঝতে পারছি না, ডাক্তার, বাপকে হত্যা করেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছে এ-কথাটাই বা বারবার আপনারা সকলে ভাবছেন কেন? সম্পূর্ণ অন্য কারণেও সে গা-ঢাকা দিতে পারে! বা কারও প্ররোচনায় হয়তো গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছে, এমনও তো হতে পারে!

কী বলছেন, মিস্টার রায়?

মানুষের এক-এক সময়ের কার্যকারণ এমন বিচিত্র হয় ডাক্তার যে তার হদিশ মেলাই ভার হয়।

আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিস্টার রায়!

সময় হলে সবই বুঝতে পারবেন। ব্যস্ত হবেন না।

'লিলি কটেজে' পৌঁছতেই গেটের মুখে আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ছোটবাবুকে ডেকে দেব, ডক্টরসাব? আবদুল বললে।

না আবদুল, আমি আর ডাক্তারবাবু বাগানটা একটু ঘুরে দেখতে চাই। জবাব দিলেন কিরীটী রায়।

আমি সঙ্গে যাব? আবদুল বিনীতভাবে শুধায়।

না-না, ডাক্তারবাবুরই তো এখানকার সব জানা—ওঁকে নিয়েই আমি বাগানটা ঘুরে দেখতে পারব'খন। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

আবদুল বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

আমি আর মিস্টার রায় দুজনে 'লিলি কটেজে'র পশ্চাতে বাগানের দিকে অগ্রসর হলাম। পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ-বারো কাঠা জায়গা নিয়ে বাড়ির পশ্চাতের বাগানটা। নানা প্রকারের ফল ও ফুলের গাছ বাগানে।

কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বাগানের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে যে পাশাপাশি করোগেটের শেড তোলা দুখানি ঘর সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিস্টার রায় আমাকে প্রশ্ন করলেন, ওই দুটো ঘর কীসের, ডাক্তার সেন, জানেন?

একটাতে মালি থাকে, অন্যটা যতদূর জানি খালিই পড়ে আছে।

চলুন, ঘর দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি।

চলুন।

BanglaBook.org

মালি কোথায়, তাকে দেখছি না তো?

হয়তো কোথাও আছে।

মালির ঘরটায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। পাশের ঘরটার দরজায় কোনও তালা ছিল না। ভেজানো দরজা ঠেলে দুজনে ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বন্ধ থাকার দরুন ঘরের মধ্যে পা দিতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিলেন।

খানিকটা হাওয়া ও দিনশেষের ম্লান আলোর একটা ঝাপটা এসে জানলাপথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরটি মৃদু আলোকিত করে তুলল।

বহুদিনের অব্যবহারে ঘরের মেঝেতে এক পরদা ধুলো জমে আছে।

একটা চামচিকে ডানা ফড়ফড় করে উড়তে লাগল ঘরময়।

মিস্টার রায় ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। এবং একসময় সহসা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দু-দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরে এসেছিল, ডাক্তার সেন।

এ-ঘরে আবার কে আসবে? আর কেনই বা আসতে যাবে?

কেন এসেছিল তা বলতে পারি না, তবে এসেছিল যে কেউ না-কেউ এ-ঘরে সেটা নিশ্চিত।

কী করে বুঝলেন?

চেয়ে দেখুন ওই মেঝের ধুলোতে- ।

কিরীটী রায়ের নির্দেশে তাকালাম মেঝের দিকে।

সত্যি, ঘরের মেঝের ধুলোর ওপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো জুতোর ছাপ তখনও স্পষ্ট বোঝা যায়।

হুঁ, তাই তো দেখছি, জুতোর ছাপ রয়েছে।

শুধু জুতোর ছাপই নয়, আর-একটা ছাপ লক্ষ করুন।

কী বলুন তো?

ওই জুতোর ছাপের পাশে-পাশে কতকগুলো ছোট-ছোট গোলাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না, ডাক্তার সেন?

হুঁ তাই তো, কিন্তু—।

কীসের দাগ ওগুলো বলে আপনার মনে হয়, ডাক্তার সেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্টার রায়।

সহসা ওইসময় কিরীটী দু-পা এগিয়ে গিয়ে ধূলিকীর্ণ মেঝে থেকে নিচু হয়ে কী যেন একটা তুলে নিলেন হাতে।

কী মিস্টার রায়?

দেখুন—।

কিরীটী আমার দৃষ্টির সামনে হস্তটি প্রসারিত করে ধরতেই ঘরের মৃদু আলোয় আমার নজর পড়ল জিনিসটার ওপরে।

কিরীটীর হাতের পাতায় রয়েছে একটি ছোট কালো মোষের শিংয়ের নস্যির কৌটো।

নস্যির কৌটো বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

কথাটা বলে পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে মিস্টার রায় ডাকলেন, ডাক্তার সেন?

বলুন।

BanglaBook.org

আচ্ছা, এই ঘর থেকে সূর্যপ্রসাদের শয়নকক্ষ সংলগ্ন প্রাইভেট রুমের জানলার নীচে পৌঁছতে কোনও মানুষের ঠিক কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়, ডাক্তার সেন?

তা—তা কত আর সময় লাগবে, মিনিট দুই-তিন!

হ্যাঁ, বড় জোর চার মিনিট লাগতে পারে, তার বেশি নয়—কী বলেন?

কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন, মিস্টার রায়?

কিছু না, এমনি একটা কথা মনে পড়ল তাই। যাক চলুন, এসেছি যখন একবার রাধিকাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই, কী বলেন?

চলুন।

চোদ্দো

আবদুলের মুখেই শুনলাম রাধিকাপ্রসাদবাবু দোতলায় তাঁর ঘরেই আছেন। মৃত সূর্যপ্রসাদবাবুর আইন-উপদেষ্টা সলিসিটার এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

আমি আর মিস্টার রায় রাধিকাপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর ছেলে বিমলবাবু ও সূর্যপ্রসাদের সলিসিটার ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছিলেন।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বিমলবাবুই সাদর আহ্বান জানালেন, ডাক্তার সেন, কিরীটীবাবু আসুন!

সলিসিটার আমাদের ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বিমলবাবুই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মহিমবাবু, ডাক্তার সেন—আর উনি হচ্ছেন মিস্টার কিরীটী রায়।

সলিসিটার মহিমবাবু হাত তুলে কিরীটী ও আমাকে নমস্কার জানালেন, নমস্কার।

বিমলবাবুই অতঃপর সংক্ষেপে কিরীটী রায়ের পরিচয়টা দিলেন মহিমবাবুকে।

আপনি যখন মৃত সূর্যপ্রসাদবাবুর আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁর উইল সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানেন সব কথা! —কিরীটী মহিমবাবুকেই প্রশ্নটা করলেন অতঃপর।

হ্যাঁ, জানি। আর সেই উইলের ব্যাপারেই ওঁদের বলতে এসেছিলাম। মহিমবাবু বললেন।

ও, তা রাধিকাবাবু, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো সূর্যপ্রসাদবাবুর উইলের মোটামুটি ব্যাপারটা জানতে পারি কি?

রাধিকাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী রায় প্রশ্নটা করলেন।

নিশ্চয়ই। মহিমবাবু, ওঁকে বলুন না। রাধিকাপ্রসাদ বললেন।

উইলে মোটামুটি যা লেখা আছে তা হচ্ছে, মহিমবাবু বলতে লাগলেন, ব্যাঙ্কের নগদ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন তাঁর একমাত্র ছেলে সমরবাবু, ভাইপো বিমলবাবু ও সুবলবাবু পাবেন দশ হাজার করে, রাধিকাবাবু পাবেন দশ হাজার। অমলেন্দুবাবু পাবেন পাঁচ হাজার ও চাকরবাকরেরা প্রত্যেকে এক হাজার করে টাকা পাবে। বাড়িখানি অনুমান পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের এই বাড়ি যতদিন সমরবাবু জীবিত থাকবেন ভোগ করতে পারবেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটা একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত হবে।

বলেন কী! অনেক টাকার সম্পত্তি তো! কথাটা বললেন মিস্টার রায়।

হুঁ, সূর্যপ্রসাদ সত্যিকারের ধনী ব্যক্তিই ছিলেন। নিম্নকণ্ঠে আমি বললাম।

একটা কথা, মহিমবাবু, হঠাৎ কিরীটী রায় প্রশ্ন করলেন, উইলটা কবে লেখা হয়েছিল?

BanglaBook.org

আজ থেকে মাস-দুই আগে।

ওই বোধহয় প্রথম ও শেষ উইল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি, নমস্কার। কিরীটী উঠে দাঁড়ালেন।

আমিও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

গেট অতিক্রম করে রাস্তায় এসে যখন নামলাম, চারিদিকে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

পরের দিন রাত্রে।

রাত বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে আটটা।

শীতের প্রকোপটা যেন আজ একটু বেশিই। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই রোগী দেখবার পাট চুকে গিয়েছিল।

ডিসপেনসারিতে নিজের চেম্বারে বসে ডায়েরি লিখছিলাম।

কী বিচিত্র খেয়াল জানি না, প্রথম থেকেই সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটা ও তৎসংক্রান্ত তদন্তের ব্যাপারটা যেমন-যেমন ঘটেছে, নিজের মতামত সহকারে ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখছি সেই গোড়া থেকেই।

সত্যি, ব্যাপারটা আগাগোড়া যেন একটা জোরালো রহস্য-কাহিনি।

এখনও মধ্যে-মধ্যে অতর্কিতে যেন মানসপটে ভেসে ওঠে সেই রাত্রের ছোরাবিদ্ধ সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহটা।

সত্যিই আশ্চর্য!

কে যে লোকটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল?

আর কেনই বা হত্যা করল কে জানে?

প্রশ্নগুলো বারবার মনের মধ্যে ইদানীং খুব বেশিই যেন আনাগোনা করে।

কিছুতেই যেন কথাটা ভুলতে পারি না।

কম্পাউন্ডারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, স্যার!

কী?

একজন লোক কিরীটীবাবুর কাছ থেকে এইমাত্র চিঠিটা দিয়ে গেল আপনাকে দেওয়ার জন্যে। বলে গেল খুব জরুরি।

মুখ-আঁটা খামের একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন কম্পাউন্ডারবাবু আমার দিকে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বললাম, লোকটা চলে গেছে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, আপনি যান।

চিঠিটা খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলাম।

BanglaBook.org

প্রিয় ডাক্তার সেন,

কাল রাত্রে ন'টা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর 'লিলি কটেজে' একবার যেতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন। সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার সম্পর্কে সকলে মিলে একটা খোলাখুলি আলোচনা করব স্থির করেছি। দুর্ঘটনার রাত্রে যাঁরা-যাঁরা 'লিলি কটেজে' উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন তার ব্যবস্থা

আপনাকেই করতে হবে। কাল রাত আটটায় আপনার ওখানে যাব। ওখান থেকে একসঙ্গেই আমরা 'লিলি কটেজে' যাব। নমস্কার। ভবদীয়।

কিরীটী রায়

পরের দিন রাত্রে।

চেম্বারেই বসে কিরীটী রায়ের অপেক্ষা করছিলাম। সব ব্যবস্থাই করেছি।

কিন্তু হঠাৎ কিরীটীর এইভাবে সকলকে 'লিলি কটেজে' একত্রিত করে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যটা যে কী, সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

নিশ্চয় তাঁর একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে এ-ব্যাপারে।

কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী?

কী তিনি খোলাখুলি সকলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে চান?

তবে কি কিরীটী রায় আমাদের মধ্যেই কাউকে সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করছেন?

কিন্তু কাকে?

কাকে তিনি সন্দেহ করছেন?

ভেতরে আসতে পারি?

দরজার বাইরে কিরীটী রায়ের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি।

আসুন-আসুন, মিস্টার রায়!

কালো রঙের একটা গ্রেট কোট গায়ে কিরীটী এসে ঘরে ঢুকলেন, গুড ইভনিং, ডক্টর সেন।

গুড ইভনিং। বসুন।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে ন'টা বাজতে, চা দিতে বলি?

আপত্তি নেই।

কম্পাউন্ডারবাবুকে ডেকে চা দিতে বললাম।

পকেট থেকে পাইপ ও টোব্যাকো পাউচটা বের করে পাইপের মুখে তামাক ভরতে-ভরতে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী হঠাৎ বললেন, চেয়ারটা সম্পর্কে কারও কাছেই কোনও মনোমতো বা ডেফিনিট জবাব পাওয়া গেল না, ডাক্তার সেন।

চেয়ার?

হ্যাঁ, ওই যে-চেয়ারটায় সূর্যপ্রসাদের মৃতদেহ ছিল!

ও।

মেজর স্বামী, বলদেবাবু, বিমলবাবু, সুবলবাবু, রাধিকাপ্রসাদ, অমলেন্দু, আবদুল ও আপনি সকলেরই এক জবাব, চেয়ারটা কেউ সরায়নি।

সামান্য ওই চেয়ারের ব্যাপারটা নিয়ে এতই বা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন, মিস্টার রায়, বলুন তো?

মৃদু হেসে এবারে আমি বললাম।

প্রত্যুত্তরে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললেন, সামান্য ব্যাপার আদপেই নয়, ডাক্তার সেন।

ওই সময় কম্পাউন্ডারবাবু গরম-গরম দু-কাপ চা নিয়ে এসে আমাদের সামনে টেবিলের ওপরে রাখলেন।

নিন, চা নিন।

মিস্টার রায় একটা কাপ তুলে নিলেন।

আমিও একটা কাপ তুলে নিয়ে বললাম, মিস্টার রায়, আপনি হয়তো কথাটা শুনে হাসবেন,

BanglaBook.org

তবে আমি এই হত্যার ব্যাপারটা গোড়া থেকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতো পর্যালোচনা করে, বিশেষ-বিশেষ কতকগুলো পয়েন্টস আমার যা মনে হয়েছে—।

বেশ তো, বলুন না, শোনা যাক। এমনও তো হতে পারে যে, কোনও কিছু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি—।

না-না, সেরকম হয়তো কিছু না, তবে—।

বলুন, বলুন?

প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ঃ সূর্যপ্রসাদ রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর ঘরের মধ্যে কারও সঙ্গে যে কথা বলছিলেন সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে?

তা হয়েছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ ওই রাত্রেই দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কেউ-না-কেউ সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে আমার তাঁর ঘর থেকে চলে আসবার পর যে দেখা করতে গিয়েছিল ওই কথাবার্তা শোনা থেকেই সেটা বোঝা যায়, তাই না মিস্টার রায়?

তা যায়।

তা হলে কার পক্ষে ওই সময় সূর্যপ্রসাদের সঙ্গে সকলের অজান্তে দেখা করা সম্ভব ছিল বলে আপনার মনে হয় বলুন, একমাত্র ওই সমর ছাড়া?

কিন্তু—

না-না, ভেবে দেখুন, জানলার কারনিসে ও হোটেলের ঘরের মেঝেতে যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে সেটা যে সমরেরই, সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি না? তারপর ধরুন তৃতীয় পয়েন্ট, ওই রাত্রেই সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সমরকে স্টেশন রোডে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল।

হুঁ। কিন্তু—

কিন্তু নয়, মিস্টার রায়, একটু ভালো করে ভেবে দেখলেই আমার যুক্তির সারবত্তাটা গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা জানি, ইদানীং সমরের রীতিমতো অর্থকষ্ট চলছিল। এবং সে-সম্পর্কে ইতিমধ্যে সে বাপকে সাহায্যের জন্যে বলা সত্ত্বেও সূর্যপ্রসাদ তার সে-কথায় কান দেননি। তাই হয়তো সে আবার তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হয়েছিল—।

সহসা ওই সময় কিরীটী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ডাক্তার সেন।

কী?

রাত সোয়া এগারোটায় বিমলবাবু সূর্যপ্রসাদের ঘরে ঢুকেছিলেন এবং তখনও তিনি জীবিতই ছিলেন।

না, কথাটা আমি ভুলে যাইনি, মিস্টার রায়! আমার ধারণা—

কী?

আপনার সেদিনকার যুক্তিটাই ঠিক।

কী বলুন তো?

সেই আগন্তুকই হয়তো রাত সাড়ে এগারোটার পর অর্থাৎ বিমলবাবু তার জেঠামণির সঙ্গে দেখা করে চলে আসবার পরই দ্বিতীয়বার আবার জানলা-পথেই ঘরে ঢুকে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করে আবার জানলা-পথেই বের হয়ে গিয়েছে।

অতর্কিতে যেন সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটী প্রশ্ন করলেন, তা হলে আপনার মতে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী কে ডাক্তার সেন?

সে-রাত্রের সেই অচেনা আগন্তুক, যার সঙ্গে গেটের কাছে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

ও। তারপর যেন একটু হেসে বললেন, তা সেই ছোরাটা? যার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা হয়েছে? সেই ছোরাটা সেই আগন্তুক জোগাড় করল কী করে?

BanglaBook.org

সে আর এমন কী শক্ত ব্যাপার! হয়তো ওই আবদুলের সঙ্গেই পূর্ব হতে তার একটা যোগাযোগ ছিল এবং আবদুলই তাকে ছোরাটা সাপ্লাই করেছিল।

তা হলে বলতে চান, সে-রাত্রের হত্যার ব্যাপারে একটা পূর্ব ষড়যন্ত্র ছিল, ডাক্তার?

অস্বাভাবিক নয় থাকাটা।

তা অবিশ্যি নয়, তবে—।

তবে?

টেলিফোনে আপনাকে সংবাদ দেওয়াটা আর ঘরের ওই চেয়ারটা—।

সত্যি, চেয়ারটার ব্যাপারটায় আপনি যেন অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু ন'টা বাজতে আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। আমাদের এবারে বেরিয়ে পড়া দরকার। সকলেই হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, ডাক্তার সেন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমিও।

পনেরো

আমারই গাড়িতে করে আমরা 'লিলি কটেজে' এসে পৌঁছলাম।

পথে উভয়ের মধ্যে আমাদের আর কোনও কথাই হল না।

আমাদের আলোচনার জন্যে সে-রাত্রে কিরীটীর পূর্ব পরামর্শমতোই যে-ঘরে সূর্যপ্রসাদ নিহত হয়েছিলেন সেই ঘরটিই নির্দিষ্ট হয়েছিল।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক।

ঘরের মধ্যে সকলেই আমাদের জন্যে তখন অপেক্ষা করছিলেন।

এবং ঘরের মধ্যে সব কিছু যেমন পূর্বে ছিল, ঠিক তেমনিই যেন রয়েছে দেখলাম। কেবল কিরীটীর পূর্ব পরামর্শমতো ডাইনিং হল থেকে বড় টেবিলটা এনে ঘরের মধ্যে পাতা হয়েছিল ও খানকতক চেয়ার সকলের বসবার জন্য টেবিলটার দু-পাশে পেতে দেওয়া হয়েছিল।

সে-রাত্রেও বাইরে প্রচণ্ড শীত পড়ায় ঘরের ফায়ার-প্লেসটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। টেবিলটার চারপাশে চেয়ারে সকলেই বসে আছে, সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম।

আমাকে ও মিস্টার রায়কে নিয়ে উপস্থিত আমরা তখন ঘরের মধ্যে আটজন।

মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেব সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ, বিমল, সুবল, অমলেন্দু, আমি ও মিস্টার কিরীটী রায়।

ঘরের সিলিংয়ের বিদ্যুৎবাতি নিভিয়ে টেবিলের ওপরে একটি নীল ডোমে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

নীলাভ আলোর অস্পষ্টতায় সমগ্র ঘরটি জুড়ে যেন একটি বিচিত্র রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

ফায়ার প্লেসের ঊর্ধ্বে ও পার্শ্বসীমানায় অগ্নির একটা চক্রাকার রক্তাভা যেন ছড়িয়ে গিয়েছে।

আটটি প্রাণী আমরা ঘরের মধ্যে উপস্থিত, কিন্তু কারও মুখেই টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। বোবা সকলে।

প্রথমে কিরীটী ও তাঁর পশ্চাতে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে একসঙ্গে ছ'জোড়া চক্ষুর নীরব দৃষ্টি যুগপৎ কিরীটীর মুখের ওপর বারেকের জন্যে স্থিরনিবদ্ধ হল।

খোলা জানলা-পথে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সহসা যেন ঘরের মধ্যে একটা প্রেতের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেল।

BanglaBook.org

চকিতে সঙ্গে-সঙ্গে আমার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে রক্ষিত সেই হাইব্যাক চেয়ারটির ওপর।

সেই চেয়ার! মাত্র কয়েক রাত্রি আগে ওই চেয়ারের ওপরেই সকলে মিলে আমরা এই ঘরেই আবিষ্কার করেছিলাম ছুরিকাবিদ্ধ সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর হিমশীতল প্রাণহীন দেহটা।

আজ আবার রাত্রে সেই নৃশংস হত্যার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্যেই আমরা একত্রে এই ঘরে এসে মিলিত হয়েছি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

শ্বাসরোধকারী একটা মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা যেন।

মৃত্যু—মৃত্যু এসেছিল সবার অলক্ষ্যে সে-রাত্রে এই কক্ষে।

পা টিপে-টিপে এসেছিল। হাতে ছিল তীক্ষ্ণ ছোরা।

কেমন করে—কেমন করে হত্যা করেছিল হত্যাকারী?

ঢং ঢং ঢং—রাত্রি ন'টার সংকেতধ্বনি শোনা গেল ওই সময় সহসা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটিই ঘরের সেই মুহূর্তের জমাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, সকলেই তা হলে আপনারা এসেছেন! এই শীতের রাত্রে এভাবে আপনাদের এখানে টেনে এনে কষ্ট দিতে হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু সূর্যপ্রসাদবাবুর নৃশংস হত্যা ব্যাপারটারও একটা মীমাংসা হওয়া দরকার আপনাদের সকলের দিক থেকেই, তাই নয় কি?

কিরীটী উপবিষ্ট সকলের মুখের প্রতিই তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বলা বাহুল্য, কেউ কোনও শব্দ পর্যন্ত করলেন না।

যে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন, নির্বাক, নিস্পন্দ।

দুটি চেয়ার তখনও খালি ছিল।

একটিতে আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে অন্যটা টেনে নিয়ে বসলেন মিস্টার রায়। পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে তা থেকে একটা সিগার নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত আবার গড়িয়ে গেল।

তারপর কিরীটিই আবার কথা শুরু করলেন।

বললেন, শুধু খোলাখুলি আলোচনাই নয়, আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আমার এই রাত্রে এখানে আপনাদের সকলকে এভাবে একত্রিত করবার। কিন্তু সেটা বলবার আগে—বিমলবাবু, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।

বিমলবাবু সঙ্গে-সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকালেন।

বিমলবাবু! কিরীটী অতঃপর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, জানি আপনি সমরবাবুর শুধু ভাই নন, তাঁর সমবয়েসি বন্ধু, সমরকে সত্যিই আপনি ভালোবাসেন। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি সত্যিই সমরবাবুর বর্তমান গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানেন—কোথায় তিনি আছেন বা থাকতে পারেন, তাঁকে আপনি অবিলম্বে ফিরে আসতে বলুন।

বোবার মতোই যেন চেয়ে আছেন দেখলাম বিমলবাবু কিরীটীর মুখের দিকে।

মিস্টার রায় আবার বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এভাবে আত্মগোপন করে থাকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশ। এখনও তিনি ফিরে এলে হয়তো আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজে পেতেন। নিজেকে defend করবার একটা যুক্তি পেতেন। কিন্তু এরপর হয়তো সে-সুযোগটুকুও আর তাঁর থাকবে না।

কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, মিস্টার রায়, ওই নৃশংস ব্যাপারে সমরের এতটুকুও হাত আছে! বললেন বিমলবাবু।

তাই তো বলছি, বিমলবাবু, এখনও তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে বলুন। এখনও বাঁচবার সময় আছে।

BanglaBook.org

চেয়ে দেখলাম কিরীটীর শেষের কথায় সহসা যেন বিমলবাবুর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

শুষ্ককণ্ঠে কোনওমতে বিমলবাবু কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, এখনও সময় আছে!

হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমি কিরীটী রায় আপনাকে কথা দিচ্ছি, কোনও ক্ষতিই আপনার হবে না। যদি জানেন তো এখনও বলুন, কোথায় সমরবাবু আত্মগোপন করে আছেন?

বিশ্বাস করুন, মিস্টার রায়, রুদ্ধকণ্ঠে বিমলবাবু বললেন, সত্যিই সমরের কোনও সন্ধানই আমি জানি না।

জানেন না?

না, না।

এবারে রাধিকাবাবু কথা বললেন, যদি জানো তো কেন বলছ না, বিমল?

বিশ্বাস করুন, বাবা, সত্যিই আমি জানি না সমরের কোনও সংবাদ। জেঠামণির মৃত্যুর রাত্রে বা তারপর একটিবারের জন্যেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

বেশ। বলে কিরীটী রায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত আমাদের সকলের ওপরেই নিঃশব্দে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন, আজ এ-ঘরে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমি অনুরোধ করছি, যদি কেউ আপনাদের মধ্যে সমরবাবুর সংবাদ জানেন তো অনুগ্রহ করে বলুন আমাকে এখনও।

কিন্তু সকলেই নির্বাক।

কারও মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন থমথম করছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাধিকাপ্রসাদই আবার বিমলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, কেন বোকামি করছ, বিমল, জানো যদি তো বলো না সমর কোথায়? সে যদি অন্যায় করেই থাকে তো—।

কিন্তু শেষ হল না রাধিকাপ্রসাদের কথা, আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান বিমলবাবু, এ আপনি কী বলছেন বাবা? আপনিও কি মনে করেন সমরই জেঠামণিকে খুন করেছে? তাকে কি আপনি চেনেন না?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে পালটা প্রতিবাদ জানালেন রাধিকাপ্রসাদ, থামো, কতটুকু তুমি এ-সংসারের জানো? সমর যে ইদানীং গোল্লায় গিয়েছিল, জুয়ো-নেশা কোনও কিছুই তার যে বাদ ছিল না তা কে না জানে। তা ছাড়া, আমি নিজে তো জানি, দাদাকে সে অর্থের জন্যে জানিয়েছিল।

সহসা বিমলবাবু এবারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভগ্ন, করুণকণ্ঠে বলে উঠলেন, মিস্টার রায়, আপনি কি একটি কথাও বলতে পারছেন না? কেন—কেন আপনি চুপ করে আছেন?

উনি আর কী বলবেন, বিমলবাবু! বললেন মেজর স্বামী।

বিমলবাবু, শান্ত হোন। কিরীটী আবার মুখ খুললেন, ব্যস্ত হবেন না।

তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মিস্টার রায় আবার আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমি যখন এ-ব্যাপারে হাত দিয়েছি, যেমন করে যে-উপায়েই হোক এ-রহস্যের কিনারা আমি করবই। চাই কি এ-ব্যাপারে আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করুন বা না করুন।

সহসা মেজর কৃষ্ণস্বামী প্রতিবাদ জানালেন, আপনি এ-কথা বলছেন কেন, মিস্টার রায়? আমরা কি আপনাকে সূর্যপ্রসাদের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে কোনও সাহায্য করিনি বলতে চান?

না, করেননি—।

BanglaBook.org

মানে?

মানেটা তো বোঝা তেমন কঠিন নয়, মেজর স্বামী! এখানে আপনারা আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন এই মুহূর্তে, যদি বলি তাঁরা সকলেই তাঁদের জবানবন্দিতে কিছু না কিছু গোপন করেছেন, কথাটা কি মিথ্যে বলা হবে?

নিশ্চয়ই। বললেন আবার মেজর স্বামী।

না, মিথ্যে নয়। আমি বলছি, আপনাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আমার কাছে গোপন করেছেন! আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে যতটুকু জানেন ওই ব্যাপারে আমাকে অকপটে সব খুলে বলেননি।

এবারে সবাই চুপ।

বলুন ঈশ্বরের নামে, আপনাদের প্রত্যেকের বিবেকের নামে শপথ করে বলুন তো, আমার কথা মিথ্যে?

চুপ। সবাই চুপ। সবাই যেন একেবারে বোবা।

আপনাদের প্রত্যেকের নীরবতাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। যাক, আমার আর কিছু বলার নেই। যা আমার আজ বলবার ছিল সব বলা হয়েছে।

কিরীটী আর দাঁড়ালেন না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ষোলো

পরের দিন প্রত্যুষে ডিসপেনসারির চেম্বারে রোগী দেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

রিসিভারটা তুলে নিলাম, হ্যালো, ডাক্তার সেন স্পিকিং।

ফোনে থানা-অফিসার মিস্টার পাণ্ডের গলা শোনা গেল।

কে, ডাক্তার সেন? আমি পাণ্ডে কথা বলছি। মিস্টার রায়কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি একবার 'লিলি কটেজে' যদি আসেন—।

কী ব্যাপার, মিস্টার পাণ্ডে?

আসুন না। এলেই সব জানতে পারবেন। দেরি করবেন না।

যাচ্ছি।

ফোনটা রেখে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

কিরীটী তাঁর বাসাতেই ছিলেন।

আমার মুখে সব শুনে বললেন, বেশ, চলুন।

আমারই গাড়িতে দুজনে 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

গেটের কাছে একজন কনস্টেবল আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে-ই আমাদের বললে, সোজা ওপরে একেবারে সূর্যপ্রসাদের শয়নঘর-সংলগ্ন বসবার ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে। মিস্টার পাণ্ডে নাকি সেই ঘরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সূর্যপ্রসাদের বসবার ঘরে ঢুকতেই পাণ্ডে আমাদের আহ্বান জানালেন, আসুন মিস্টার রায়, ডাক্তার সেন।

ব্যাপার কী মিস্টার পাণ্ডে! এত জরুরি তলব একেবারে! কিরীটীই প্রশ্নটা করলেন।

বিশেষ কিছু না। পরশুদিন থানায় আপনি আমাকে বলেছিলেন না মিস্টার রায়, মিস্টার গুপ্তর শয়নঘরটা আর একবার ভালো করে মাইনিউটলি সার্চ করে দেখবার জন্যে—।

BanglaBook.org

হ্যাঁ।

গতকাল একটা ডাকাতি কেসে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, সময় করে উঠতে পারিনি। তাই আজ যখন এলাম সার্চ করে দেখবার জন্যে, ভাবলাম আপনারাও উপস্থিত থাকুন, তাই ডেকেছি। পান্ডে বললেন।

বেশ চলুন, দেখা যাক।

কিরীটীর পূর্ব নির্দেশমতোই সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরটা তাঁর নিহত হওয়ার পরদিন খানাতল্লাশি করবার পর থেকেই পুলিশের জিম্মায় তালাবন্ধ ছিল। এবং চাবি ছিল পান্ডের কাছেই। এ ক'দিন আর ঘরটা খোলা হয়নি।

আজ সকলের উপস্থিতি ও সাক্ষাতেই তালা খুলে আমরা সকলে পুনরায় সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরে প্রবেশ করলাম।

জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় ঘরটা ছিল দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন মনে হল কার দীর্ঘশ্বাস একটা শুনতে পেলাম। সেদিন প্রত্যুষে যেমন দেখেছিলাম আজও ঠিক তেমনটিই রয়েছে সব ঘরের মধ্যে।

কিরীটীই এগিয়ে গিয়ে ঘরের জানলা দুটো খুলে দিলেন।

দিনের প্রথম প্রসন্ন আলো খোলা জানলা-পথে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

সিঙ্গল পালঙ্কে শয্যাটি তেমনি পাতা আছে।

পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি আয়রন চেস্ট গডরেজের। ঘরের এক কোণে ছোট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটি গদিমোড়া বিভলভিং চেয়ার।

শয্যার তলাতেই সিন্দুকের চাবি ছিল।

পান্ডে চাবির সাহায্যে সিন্দুকটা খুললেন। সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া গেল একটা দামি কাসকেটের মধ্যে সূর্যপ্রসাদের মৃত স্ত্রীর গহনাগুলো, কিছু পুরাতন চিঠিপত্র। বেশিবভাগই সেগুলো সূর্যপ্রসাদের প্রথম জীবনের, স্ত্রীর লেখা।

এবং পাওয়া গেল একটা আইভরির কৌটোর মধ্যে গোটাপাঁচেক বাদশাহি মোহর।

অতঃপর পান্ডে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের টানা চাবি দিয়ে খুললেন। প্রথম টানা থেকেই কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে লাল সুতোয় বাঁধা দশ টাকার নোটের একটা মোটা তাড়া পাওয়া গেল। নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে পান্ডে বললেন, আশ্চর্য, ড্রয়ারের মধ্যে মিস্টার গুপ্ত এতগুলো নগদ টাকা এভাবে রেখে দিয়েছিলেন?

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অমলেন্দু। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরাবর তো ওইভাবে ড্রয়ারেব মধ্যেই টাকা রাখতেন মিস্টার গুপ্ত।

তাই নাকি। মারো গোলি, তা এ যা চাবি দেখছি, এ-ড্রয়ার তো অনায়াসেই ভেঙে খোলা যায়। পান্ডে আবার বললেন।

অমলেন্দু আবার বললেন, চাকরবাকরদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তবে ও-টাকাটা মনে হচ্ছে—যে-রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা আমি তাঁরই নির্দেশে তুলে এনে দিয়েছিলাম, বোধহয় সেই টাকাটাই।

হাজার টাকা তুলে এনে দিয়েছিলেন? প্রশ্ন করলেন আবার পান্ডে।

হ্যাঁ। সব দশ টাকার নোট ছিল।

এবারে বিনা বাক্যব্যয়ে লক্ষ করলাম, পান্ডে নোটের তাড়াটা গুনছেন। বার দুই গুনে অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মারো গোলি, কিন্তু এতে তো দেখছি হাজার নেই। পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট কম।

পঞ্চাশখানা মানে পাঁচশত টাকা কম। অমলেন্দু বললেন।

BanglaBook.org

তাই তো শুনে দেখছি। হয়তো পাঁচশত টাকা কাউকে তিনি দিয়েছিলেন এর মধ্যে থেকে। বললেন পাণ্ডে।

টাকাকড়ি যখন যাকে দেওয়া হত ইদানীং, বরাবর আমার কাছেই হিসেব থাকত। কাউকে পাঁচশত টাকা সেদিন দিলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম। তা ছাড়া টাকাগুলো তো আমি তাঁকে সেদিন রাত্রে ডিনারের অল্প আগে দিয়েছিলাম। এবং আমারই সামনে তিনি টাকাগুলো ড্রয়ারে রেখেছিলেন।

কিরীটী এবারে বললেন, ডিনারের পর হয়তো কাউকে টাকাটা তিনি দিয়েছেন।

না, তা হতে পারে না, কারণ, আমাকেই তিনি বলেছিলেন টাকাটা পরের দিন সকালে তাঁর প্রয়োজন আছে। কণ্ঠে বেশ কিছুটা জোর দিয়েই কথাগুলো বললেন অমলেন্দু।

কিন্তু পাঁচশত টাকা যখন বান্ডিলের মধ্যে কম তখন তিনি সেই রাত্রেই টাকাটা কাউকে দিয়েছিলেন কিংবা কেউ সেই রাত্রে তাঁর অজান্তেই ঘরে ঢুকে টাকাটা—আই মাস্ট সে—চুরি করেছে।

মারো গোলি, ইয়েস, ইউ আর রাইট, মিস্টার রায়। কিরীটীর মন্তব্যকে সমর্থন করলেন পাণ্ডে।

আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে-কে সে-রাত্রে ডিনারের পর এ-ঘরে এসেছিলেন? হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে।

জবাব দিলেন অমলেন্দুই, তা তো ঠিক বলতে পারি না, তবে ডিনারের পর বিছানা ঠিক করে দিতে রোজকার মতো আবদুল এসেছিল এ-ঘরে, আমি জানি।

আবদুলকে তখুনি ডাকানো হল পাণ্ডের নির্দেশে।

আবদুল?

আজ্ঞে—।

সে-রাত্রে সাহেবের বিছানা ঠিক করবার জন্যে তুমি এ-ঘরে এসেছিলে তো, না? প্রশ্ন করেন পাণ্ডেই।

হ্যাঁ।

তোমার সাহেবের ওই ড্রয়ারে হাজার টাকার নোট ছিল, কিন্তু এখন পাঁচশত টাকা কম দেখা যাচ্ছে।

আল্লার কসম হুজুর, টাকার কথা কিছুই আমি জানি না।

প্রায় কেঁদে ফেলে আবদুল।

পাণ্ডে কিন্তু চিৎকার করে ধমকে উঠলেন আবদুলকে, মারো গোলি, আবার মিথ্যে বলছিস! চোর বসমাশ—ডাকু কাঁহেকা! গোলি মারকে একদম জান নিকাল দেগা, সাচমুচ বাতাও।

দোহাই হুজুরের, টাকা আমি নিইনি, বিশ্বাস করুন।

জরুর তুম লিয়া হ্যায়! গর্জন করে উঠলেন পুনরায় পাণ্ডে।

না হুজুর, সত্যিই আমি নিইনি—।

মারো গোলি। ব্রিজনন্দন?

হোজুর!

সিপাই ব্রিজনন্দন এসে ঘরে ঢুকল। খট করে সেলাম দিল।

আবদুলের শপথ বা কান্নায় কোনও কানই দিলেন না পাণ্ডে। তখুনি ব্রিজনন্দনের জিম্মায় হাতকড়া লাগিয়ে আবদুলকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে আবদুল চলে গেল।

এবং অনুসন্ধানের ব্যাপারেও আপাতত ওইখানেই ইতি পড়ল। মিস্টার পাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে আমি ও মিস্টার রায়ও বের হয়ে এলাম 'লিলি কটেজ' থেকে।

BanglaBook.org

আমারই গাড়িতে সবাই ফিরে চললেন।

এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, মিস্টার রায়?

পাণ্ডের কথায় কিরীটী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী?

ওই বেটা আবদুলই বোধহয় মিস্টার গুপ্তকে মার্ডার করেছে!

তাই আপনার মনে হচ্ছে?

মারো গোলি, জরুর!

সতেরো

কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে মার্ডার-চার্জ আনলেই তো হবে না। সেক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা—।

কিরীটীর কথাটা যেন কতকটা দম্ভভরে পাণ্ডে একটা থাবা দিয়েই সহসা অর্ধপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, মারো গোলি, একশোবার। যুক্তি ও প্রমাণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত স্ট্রং আছে বইকী। বলে নিজেই কথাগুলো উৎসাহের সঙ্গে তাঁর প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, প্রথমত, ধরুন, ডাক্তার সেন সে-রাত্রে যখন সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, দরজার গোড়াতেই তাঁর আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কেমন কি না?

তা হয়েছিল।

এবং ডাক্তার সেনের জবানবন্দি থেকেই আমরা জানি, আবদুল সে-রাত্রে হঠাৎ এভাবে দরজার গোড়ায় ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার সেন তাই বলেছেন বটে। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললেন।

মারো গোলি! লেকেন হামারা বাত এহি হ্যায়, কেন সে ডাক্তারকে দেখে এরকম থতমত খেয়ে গিয়েছিল?

কী আপনার ধারণা?

সম্ভবত সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করবার সুযোগের অন্বেষণেই এসময় আবদুল সেখানে পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে এসেছিল গোপনে। এবং পাছে কেউ দেখে ফেললে তার movements সন্দেহ করে তাই সঙ্গে করে এনেছিল কফির ট্রে-টা।

লক্ষ করলাম এবারে কিরীটী প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না বটে, তবে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটা হাসির রেখা চকিতে দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল।

আবার মিস্টার পাণ্ডে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, তা হলে দেখা যাচ্ছে যে সেসময় প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার আবদুল সুযোগের অন্বেষণেই সূর্যপ্রসাদের ঘরের দিকে গিয়েছিল, যেসময় তার বিমলবাবুর সঙ্গে অতর্কিতে দেখা হয়ে যায়, কেমন কি না?

হুঁ।

মারো গোলি, তা হলেই দেখুন, রাত সোয়া এগারোটার পর সে যখন নীচে তার ঘরে শুতে যায়, তার পূর্বে দু-দুবার সে তার মনিবের ঘরের দিকে গিয়েছিল। So-কী conclusion-এ এর থেকে আমরা পৌঁছতে পারি বলুন, মিস্টার রায়? আর কী-ই বা আপনার মনে হয়?

দেখুন, মিস্টার পাণ্ডে—।

ইয়েস!

আপনার এ-যুক্তি থেকে আবদুল সম্পর্কে অনেক কিছুই যেমন মনে করে নেওয়া যেতে পারে আবার তেমনি অনেক কিছুই মনে না-ও করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললেন।

মারো গোলি।

মানে আবদুল সে-রাত্রে তার মনিবকে হত্যা করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে।

মারো গোলি—You think so?

আমার তো তাই মনে হয় সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে।

মারো গোলি, কিন্তু—।

তা ছাড়া, এ-হত্যার ব্যাপারে, মানে আবদুলই যদি ধরে নেওয়া যায় আপনার কথামতো, তার মনিবকে হত্যাই করেছে, সে-ক্ষেত্রে তার হত্যার কোনও মোটিভই তো খুঁজে পাচ্ছি না, সত্যি কথা বলতে কি!

মারো গোলি, মোটিভ? কিন্তু এ-জগতে সব ব্যাপারেই সব কিছুর মোটিভই কি খুঁজে পাওয়া যায় মিস্টার রায়?

তা হয়তো যায় না, তবে প্রত্যেক হত্যার ব্যাপারেই সেই আবহমান কাল থেকেই একটা কিছু মোটিভ খুঁজে এসেছি বইকী আমরা!

মারো গোলি, আবদুলের কথা না হয় ছেড়েই দিন, এই সমরবাবুর কথাই ধরুন না—।

সমর!

হ্যাঁ, তাঁর এভাবে আত্মগোপন করে থাকবার এখনও কী উদ্দেশ্য বলুন তো?

হয়তো আছে একটা কিছু।

মারো গোলি, হয়তো আছে? কিন্তু কী? বলে নিজেই বললেন মিস্টার পাণ্ডে, তার টাকার প্রয়োজন অতএব এই সময় যে-কোনও উপায়ে তার বাপকে সরাতে পারলে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবে এবং অভাবটাও মিটবে, এই বোধহয়!

একেবারে না-ই বা বলি কী করে? কিরীটী পুনরায় মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলেন।

মারো গোলি। ননসেন্স! ঝুটমুট সে তার বাপকে হত্যা করতে যাবে কেন বলুন তো? সে ভালো করেই জানত, তার প্রতি তার বাপের রীতিমতো দুর্বলতা আছে!

দুর্বলতা?

নিশ্চয়ই। নইলে ওইভাবে চেক জালের ব্যাপারের পরও সূর্যপ্রসাদ কখনও ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতেন?

সেটা তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহ না হয়ে, নিজের পারিবারিক কলঙ্ককে চাপা দেওয়ার জন্যেও তো হতে পারে, মিস্টার পাণ্ডে! কিরীটী বললেন।

মারো গোলি, মোটেই তা নয়।

নয়?

নিশ্চয়ই না। হিউম্যান ক্যারেকটার আমার মতো যদি study করতেন তো বুঝতে পারতেন, মিস্টার রায়, ওই সমরই নিশ্চয় আবদুলকে হাত করে তাকে দিয়ে বাপকে সরিয়েছে!

কিরীটী আবার মৃদু হাসলেন।

হাসছেন যে, মিস্টার রায়?

অন্য একটা সম্ভাবনার কথা এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার পাণ্ডে!

কীরকম?

ডাক্তার সেনের জবানবন্দিতে একটা কথা আমরা শুনেছিলাম—।

কী?

সেই ব্লু রঙের খাম ও লেটার-পেপারে লেখা সূর্যপ্রসাদের কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠিটা—।

চিঠি!

BanglaBook.org

হ্যাঁ, যেটা সূর্যপ্রসাদ পড়ে শোনাবার জন্য ডাক্তার সেন বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও—বলতে-বলতে মিস্টার রায় একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুতেই শেষপর্যন্ত শোনেননি বা শুনতে চাননি উনি। তাই না, ডাক্তার সেন?

হ্যাঁ, কিন্তু—।

কিন্তু বলছিলাম কী, সেই চিঠিটার মধ্যে সমরের উল্লেখ ছিল। তাই না ডাক্তার?

মৃদুকণ্ঠে আমি সমর্থন জানালাম, হ্যাঁ।

তা হলে এমনও তো হতে পারে, ওই চিঠির মধ্যে সূর্যপ্রসাদের কোনও পারিবারিক কলঙ্কের কথা সত্যিই ছিল?

পারিবারিক কলঙ্ক!

ডাক্তারও তো তাই সমর্থন করেন। তাই না ডাক্তার সেন? কিরীটী আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

হ্যাঁ, মানে—।

যাক সে-কথা। বলছিলাম এমনও তো হতে পারে, সমরই কোনও-না-কোনও উপায়ে জগৎজীবনবাবুর মৃত্যু ঘটিয়ে পুলকজীবনবাবু তাঁর ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাবার ভয় দেখিয়ে, তার কাছ থেকে টাকা দোহন করছিল! অর্থাৎ সাদা কথায় পুলকজীবনকে blackmailing করছিল! আর সেই কথাটারই হয়তো উল্লেখ ছিল সেই ব্লু রঙের চিঠিতে!

আশ্চর্য! Poor সমর। ক্রমেই দেখছি তার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণগুলো ঘোরালো হয়ে উঠছে একের-পর-এক। কথাটা বললাম আমিই এবার।

চকিতে কিরীটী রায় আমার দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, হচ্ছে নাকি?

তাই তো দেখছি, মিস্টার রায়! জবাব দিলাম।

কিন্তু ওইখানেই, ডাক্তার সেন আপনার ও মিস্টার পাণ্ডের সঙ্গে মতভেদ ঘটছে!

মারো গোলি, কিউ? প্রশ্ন করলেন পাণ্ডে।

কারণ, যদিও তাঁর বর্তমান দুরবস্থার জন্যে নিদারুণ অর্থাভাব, জুয়ার প্রতি তাঁর নেশা ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং শেষোক্ত দুটি জোরালো কারণ প্রভৃতি তার মোটিভই প্রমাণ করছে, তথাপি—।

তথাপি কী, মিস্টার রায়? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

ধীর শান্ত মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন এবাবে মিস্টার রায়, তথাপি কোনওমতেই এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সমরবাবুই তাঁর পিতার হত্যাকারী।

মারো গোলি, কিউ? প্রশ্ন করলেন পাণ্ডে আবার।

সহজ ও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে। যাকে বলেন আপনারা common sense!

মারো গোলি!

ইতিমধ্যে কথা বলতে-বলতে তিনজনে আমরা যে ঘোরাপথে হাঁটতে-হাঁটতে কিরীটীর বাসাবাড়ি 'সানি ভিলা'র গেটের সামনে এসে গিয়েছি, আমি বা পাণ্ডে টের পাইনি। কিরীটী রায়ের পরবর্তী কথাতেই চমক ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা খেয়াল হল।

আসুন ডাক্তার সেন, মিস্টার পাণ্ডে—গরিবের বাড়িতে এককাপ করে চা খেয়ে যান।

না-না, চা—, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমিই।

কিন্তু কিরীটী কানই দিলেন না যেন সে-কথায়।

বললেন, আরে আসুন-আসুন!

BanglaBook.org

কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি কত বড় একটা বিস্ময় পরমুহূর্তেই কিরীটীর 'সানি ভিলা'য় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'সানি ভিলা'র গেট দিয়ে প্রবেশ করে, বাইরের ঘরের পরদা তুলে ভিতরে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঘরের মধ্যে একাকী একটা সোফায় দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বিমলবাবু।

কে, বিমলবাবু?

কিরীটীর সচকিত প্রশ্নে চমকে মাথা তুলে তাকালেন বিমলবাবু আমাদের দিকে।

সমস্ত মুখখানার মধ্যে তখন যেন তাঁর মনে হল, লজ্জা, অপমান ও নিদারুণ একটা হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিমলবাবু! আবার নিরুত্তর বিমলবাবুর দিকেই তাকিয়ে ডাকলেন মিস্টার রায়।

মারো গোলি, আপ কেইসে হিঁয়া আ গেই, বিমলবাবু?

বিমলবাবু তবু নিরুত্তর।

বসুন-বসুন মিস্টার পাণ্ডে, বসুন ডাক্তার সেন।—কিরীটীই আবার বললেন।

আমরা উভয়েই অতঃপর দুটো সোফায় উপবেশন করলাম।

লেকেন বাত কেয়া, বিমলবাবু, আপ হিঁয়া কিঁউ?

বিমলবাবু তথাপি নিরুত্তর।

কী হয়েছে বিমলবাবু? কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটীর স্নেহভরা কণ্ঠস্বরে এবারে মুখ খুললেন বিমলবাবু।

মিনিট দশেক হবে এসেছি, মিস্টার রায়।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন বিমলবাবু, আপনারা আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সাইকেলে চেপে এখানে চলে এসেছি সোজা, মিস্টার রায়।

মৃদু হেসে এবারে কিরীটী হঠাৎ বললেন, কিন্তু যা আপনার আমাকে বলার ছিল সেটা গতরাত্রেই আমাকে বলতে পারতেন?

মিস্টার রায়—।

হ্যাঁ, আপনাকে তো আমি আশ্বাস দিয়েছিলামই। সেক্ষেত্রে সত্যটুকু বলবার মতো সৎসাহস আপনাদের সকলের কাছেই কিন্তু আমি আশা করেছিলাম—।

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল।

কে এল?

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায়।

খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়ে দেখি, মিস্টার পাণ্ডের অধীনস্থ পুলিশ কর্মচারী সতীনাথবাবু সাইকেল থেকে নামছেন।

সতীনাথ সাইকেলটা একপাশে ঠেসান দিয়ে রেখে সোজা একেবারে এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিস্টার পাণ্ডেই সর্বপ্রথম সতীনাথকে প্রশ্ন করলেন।

কেয়া বাত হ্যায়, সতীনাথ?

সতীনাথ তখনও রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন।—হাঁপাতে-হাঁপাতেই বললেন, সেই লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে স্যার!

কে? কাকে পেয়েছেন? প্রশ্ন করলেন এবারে মিস্টার রায়।

সেই যে যার সঙ্গে সে-রাত্রে, মানে মিস্টার গুপ্তর হত্যার রাত্রে 'লিলি কটেজে'র গেটের সামনে ডাক্তার সেনের ধাক্কা লেগেছিল।

BanglaBook.org

মারো গোলি, মিল গিয়া। সাবাস সতীনাথ! জিন্দা রহো বেটা! তুম তো তব সব কামাল কর দিয়া, মেরে লাল!

আনন্দে একেবারে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিস্টার পাণ্ডে।

আঠেরো

সত্যি কথা বলতে কী, আমি তো তখন একেবারে থ।

কিন্তু পাণ্ডে তখনও সোৎসাহে বলে চলেছেন, মারো গোলি—হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! Long eleven years,' experience in this line! মিস্টার রায়, হাম আপকো বোলা নেই—ও শালাকো জরুর হাম পাকড় লেঙ্গে?

মিস্টার পাণ্ডে গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

কিরীটী রায় ধীরপদে সোফা থেকে উঠে গিয়ে টিপয়ের ওপরে রক্ষিত একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধার থেকে একটি চুরোট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে পুনরায় নিঃশব্দে এসে সোফার ওপরে বসলেন।

ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোনও গুরুত্বই নেই।

নিতান্ত স্বাভাবিক দৈনন্দিনের একটি ঘটনা মাত্র।

সতীনাথবাবু! সহসা কিরীটী কথা বললেন।

বলুন?

লোকটিকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

না। তবে আপাতত তাকে পুলিশের নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে সন্দেহের বশে।

জবাব দিলেন সতীনাথবাবু।

ও। তা লোকটার কোনও জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে?

একের নম্বরের ঝানু আর বদমাশ লোকটা, মিস্টার রায়! কোনও কথা বলতেই চায় না।

হুঁ। কোথায় নজরবন্দি করে রেখেছেন তাকে?

মুরি পুলিশ স্টেশনে।

মারো গোলি! তা হলে তো এখুনি আমাদের একবার সেখানে যাওয়া দরকার। কী বলেন, মিস্টার রায়?

তা দরকার বইকী। কারণ যে ধরা পড়েছে সে-ই যে সেই রাত্রের অচেনা লোকটা, সেটা তো এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে তার শনাক্তকরণেরও তো একটা দরকার আছে। বললেন মিস্টার রায়।

শনাক্তকরণ! ও তো জরুর হো যায়গা। যব পাকড়া গিয়া ভাগেগা কিধার?

তা সত্যি। তা হলে, ডাক্তার সেন—।

বলুন?

তাকালাম আমি মিস্টার রায়ের মুখের দিকে।

বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার সাহায্যেরই তো সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আমাদের।

আমার?

হ্যাঁ। কারণ, it was you—যাঁর সঙ্গে সে-রাত্রে ওই লোকটির 'লিলি কটেজে'র সামনে ধাক্কা লেগেছিল! মিস্টার রায় বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—রায়সাব বিলকুল ঠিক বোলা। সমর্থন করলেন মিস্টার পাণ্ডে।

BanglaBook.org

তাই বলছিলাম, আপনি identify করলেই তো ব্যাপারটা চুকে গেল।

জরুর। চলিয়ে, ডক্টর সেন।

বেশ, চলুন।

পুলিশ ভ্যানে চেপেই আমরা অতঃপর থানা থেকে মুরি পুলিশ স্টেশনের দিকে রওনা হলাম সকলে।

বলা বাহুল্য, পূর্বেই বিমলবাবুকে তখনকার মতো বিদায় দেওয়া হয়েছিল।

বেলা তখন গোটা-বারো হবে।

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে আকাশটা যেন একেবারে পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

পুলিশ ট্রাকটা গন্তব্যস্থানের দিকে চল্লিশ মাইল স্পিডে ছুটছিল।

সকলেই চুপচাপ ভ্যানের মধ্যে বসে। একমাত্র অনর্গল বক্তা মিস্টার পান্ডে ব্যতীত। মিস্টার পান্ডে সতীনাথকে বাহবা দিয়ে বলছিলেন, তুমহে জরুর প্রমোশন মিলনা চাইয়ে, সতীনাথ। আজই রাতকো হাম পাটনা মে রিপোর্ট ভেজ দুঙ্গা। তুম এস আই. বন যায়গে বেটা।

সতীনাথ কিন্তু চুপ।

কারণ, বাকসর্বস্ব মিস্টার পান্ডেকে তিনি বোধহয় ভালো করেই চিনতেন। মিস্টাব পান্ডে যে ঠিক উলটোটিই করবেন তা হয়তো তাঁর জানা ছিল।

সমস্ত বাহাদুরি নিজে পকেটস্থ করেই তিনি রিপোর্ট দেবেন।

আমার মাথাব মধ্যে তখন কিন্তু একটিমাত্র চিন্তাই পাক খাচ্ছিল। বিমলবাবু কী বলতে এসেছিলেন মিস্টার রায়কে!

কী এমন কথা যা পূর্বে তিনি গোপন করেছিলেন এবং যা শেষ পর্যন্ত বলতে প্রস্তুত হয়েছিলেন!

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ ভ্যানটা মুরি আউটপোস্টের সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁটাতার ও রাংচিতার বেড়া দেওয়া ছোট কম্পাউন্ড ও তার মধ্যস্থলে ছোট একতলা একটা বাড়ি।

ভ্যান থেকে নেমে সকলে আমরা এগিয়ে চললাম।

সর্বাগ্রে মিস্টার পান্ডেই ভারী অ্যামুনিশান বুটের মচমচ শব্দ তুলে এগিয়ে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে আমি, মিস্টার রায় ও সতীনাথ।

ঘরে ঢুকতেই থানা-ইনচার্জ মিস্টার চৌবে তাঁর বিরাট ভুঁড়িটা নিয়ে কোনওমতে হাঁসফাঁস করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন, বোধহয় সকলকে অভ্যর্থনা জানাতেই।

মিস্টার পান্ডে কাউকে থানা ইনচার্জের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ধার দিয়েও গেলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললেন, কিধার হ্যায় উ আদমি? ইধার বুলাইয়ে—।

তখুনি দরোয়ানকে ডেকে চৌবে লোকটাকে অফিসঘরে আনতে বললেন কয়েদঘর থেকে।

একটু পরেই দরোয়ানের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি এসে ঘরে ঢুকল।

বয়েসে যুবক। বাইশ-তেইশের বেশি বয়েস হবে না যুবকটির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আমি তার দিকে।

বেশ ঢ্যাঙা, রোগাটে এবং পাকানো চেহারা।

রসকষহীন দীর্ঘ অত্যাচার-স্বাক্ষরিত রুক্ষ একটা ভাব চেহারার মধ্যে সুস্পষ্ট।

রোগা এবং ঢ্যাঙা হলেও দেহের প্রতিটি পেশি যেন দেহের শক্তিরই স্বাক্ষর দেয়।

মাথাভরতি তেলহীন রুক্ষ বিপর্যস্ত কেশ।

BanglaBook.org

মুখের রং কিছুটা রোদে পোড়া, তামাটে এবং এককালে যে গায়ের রং পরিষ্কারই ছিল, আজও তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

পরিধানে একটা মলিন চকোলেট কালারের লংস ও গায়ে একটা কালো রঙের পুরাতন লংকোট।

কোটের কলার উলটানো।

মুখটা ভেঙে গিয়েছে, ছোট-ছোট দাড়িতে ভরতি মুখটা।

চোখের দৃষ্টিতে যেন একসঙ্গে ঘৃণা ও আক্রোশ ফুটে বের হচ্ছিল।

কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?—প্রশ্ন করলেন পাণ্ডেই সর্বপ্রথম লোকটিকে।

রুক্ষ বিরক্তভরা কণ্ঠে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব এল, কেন, কতবার বলতে হবে? কমল—।

কমল কী? আপনার পদবী কী? জিজ্ঞাসা করলেন এবারে কিরীটী।

পূর্ববৎ রুক্ষ কর্কশ বিরক্তিভরা কণ্ঠে জবাব এল, কেন বলুন তো নাম, গোত্র পদবী ঠিকুজি সব চাইছেন? কী করেছি আমি?

কঠোর কণ্ঠে এবারে জবাব দিলেন মিস্টার পাণ্ডে, দেখিয়ে বাবুজি, ভালোভাবে কথার জবাব না দেন তো ঠাণ্ডি গারদে আটকে রাখব। কুছ খানাপানি ভি নেহি মিলেগা।

কেন? আমি চুরি করেছি না খুন করেছি?

হঠাৎ কিরীটী রায়ের কণ্ঠে চমকে উঠলাম, ডাক্তার সেন।

বলুন?

কী, লোকটাকে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে?

হুঁ, লম্বা লোকটা অনেকটা এইরকমই বটে—তবে অন্ধকারে একটুক্ষণের জন্যে দেখেছিলাম—

কিরীটী আমার কথার জবাব দিলেন না।

লোকটির দিকে আবার কী যেন তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিঃশব্দে।

তারপরই আবার সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন, কই কমলবাবু, আপনার পদবীটা তো বললেন না?

এবারে যেন সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র ব্যাঘ্রের মতোই গর্জন করে উঠল কমল, বলব না—শুনছেন, বলব না।

বলবেন না?

না—না—না। তারপরই পার্শ্বে দণ্ডায়মান চৌবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ আক্রোশভরা কণ্ঠে, আমাকে ছেড়ে দেবেন কি না বলুন?

কঠোর কণ্ঠে এবারে প্রত্যুত্তর দিলেন মিস্টার পাণ্ডে, না, ছাড়া হবে না।

হবে না? কিন্তু কেন শুনতে পারি কি? কীসের জন্যে এভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন?

জবাব দিলেন এবারে সতীনাথবাবু, আজ ভোররাত্রের দিকে আপনি 'লিলি কটেজে'র পেছনের বাগানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন কেন?

আমার খুশি—

বেশ খুশিই না হয়, কিন্তু আমাদের একজন পুলিশ-প্রহরী আপনাকে দেখতে পেয়ে যখন ডেকেছিল, আপনি তখন সাড়া না দিয়ে পালিয়ে এলেন কেন?

কে বললে পালিয়ে এসেছি? মিথ্যে কথা!

আমি একাগ্রচিত্তে কমলের বাদানুবাদ শুনছিলাম।

এবং এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি, ওই লোকের সঙ্গেই সেরাত্রে 'লিলি কটেজে'র সামনে আমার ধাক্কা লেগেছিল, ওর কণ্ঠস্বরও আমি চিনতে পারি।

সঙ্গে-সঙ্গে মিস্টার রায়ের মুখের দিকে চেয়ে চাপা-কণ্ঠে বললাম, মিস্টার রায়, চিনেছি! এই লোকের সঙ্গেই সে-রাত্রে আমার ধাক্কা লেগেছিল।

BanglaBook.org

চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ।

কমলবাবু!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কমল। কিরীটীর ডাকে কোনও সাড়াই দিল না।

শুধু গতকাল রাত্রেই নয়, কিছুদিন আগেও এক রাত্রে আপনি এগারোটা নাগাদ 'লিলি কটেজে'র সামনে গিয়েছিলেন—।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, আর যে-লোকের সঙ্গে সে-রাত্রে আপনার ধাক্কা লেগেছিল ও যাকে আপনি 'লিলি কটেজে'র কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এখানেই উপস্থিত। আপনাকে তিনি চিনতে পেরেছেন।

বেশ করেছেন।

কিন্তু গিয়েছিলেন কেন?

আমার খুশি আমি গিয়েছিলাম। আমি কোথায় যাব-না-যাব তা-ও কি অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে নাকি? ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিল কমল।

তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে, সে-রাত্রে আপনি 'লিলি কটেজে'র সামনে গিয়েছিলেন? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললেন।

গিয়ে থাকি গিয়েছি, না গিয়ে থাকি না গিয়েছি! কিন্তু মশাই, জিজ্ঞাসা করতে পারি, এসব অবান্তর জেরা কেন আমাকে করছেন আপনারা?

আপনি কি সংবাদপত্রে 'লিলি কটেজে'র মালিক সূর্যপ্রসাদ গুপ্তর রহস্যজনক হত্যার কথা পড়েননি, কমলবাবু?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিস্টার রায় কমলের দিকে।

বলিহারি বাবা! কী বুদ্ধি আপনাদের! সত্যি, আপনাদের বুদ্ধির বালাই নিয়ে আমার জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা করছে! অ্যাঁ, শেষপর্যন্ত আমাকেই তবে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী ঠাওরে নিয়েছেন আপনারা? ব্রেভো।

কিন্তু সে-রাত্রে আপনি রাত এগারোটার সময় 'লিলি কটেজে'র গেটের সামনে উপস্থিত ছিলেন—এ-কথাটা তো অস্বীকার করতে পারেন না, কমলবাবু?

কিরীটী আবার বললেন পূর্ববৎ দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে।

কিন্তু আমি যদি বলি, না, যাইনি?

যাননি?

না।

যাননি?

না, না।

কিন্তু আমি বলছি আপনি গিয়েছিলেন।

গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চান নাকি কথাটা?

না, গায়ের জোরে নয়। প্রমাণ আছে আমার।

প্রমাণ? কি, ফটো তুলে রেখেছিলেন বুঝি সেসময় আমার একটা?

না, ফটো নয়। কিন্তু দেখুন তো—, বলতে-বলতে চকিতে পকেটে হাত চালিয়ে কিরীটী সূর্যপ্রসাদের বাগানে মালির ঘরের পাশের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া সেই নস্যির ডিবেটা বের করে কমলের সামনে ধরে বললে, চিনতে পারছেন এটা?

কিন্তু আশ্চর্য, জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিলে মুহূর্তে যেমন জোঁকের অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি যেন ছোট্ট হয়ে গেল সহসা কমলের মুখখানা কিরীটীর হাতে কালো রঙের সেই নস্যির কৌটোটা

BanglaBook.org

দেখে। এবং ক্ষণপূর্বের তার সেই ঔদ্ধত্য ও আক্রোশ যেন দপ করে ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাবার মতো নিবে গেল।

কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্যে।

পরক্ষণেই কমলের মুখের ভাব ও চেহারা পরিবর্তিত হল।

এবং ক্ষণপূর্বের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললে, চমৎকার, একটা অতি সাধারণ কালো রঙের নস্যির কৌটো প্রমাণ করে দিল যে, সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' আমি গিয়েছিলাম।

অদ্ভুত একটা কাঠিন্য যেন চকিতে কিরীটী রায়ের সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ওঠে। তিনি ঋজু কঠিন কণ্ঠে এবারে বলেন, কমলবাবু, কিরীটী রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, নয়তো বুঝতে পারতেন সে যখন কোনও ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হয় তখন তার যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যেই হয়। কিন্তু এই তো বয়েস আপনার, কোকেন অভ্যাস কতদিন হল করেছেন?

কোকেন?

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কমল কথাটা উচ্চারণ করলে।

হ্যাঁ, কোকেন। এবং পরক্ষণেই পূর্ববৎ কঠিন স্বরেই বললেন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জীবনে যেন ও বস্তুটির নামও আপনি শোনেননি। শুনুন কমলবাবু, কোকেনে যারা অভ্যস্ত তাদের লক্ষণগুলো আমার অজানা নয়। আপনার দাঁত, ঠোঁট ও চোখের তারারন্ধ্র তার সাক্ষী দিচ্ছে। তা ছাড়া, নস্যির সঙ্গে কোকেন মেশানো থাকায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে সেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে।

কমল এবারে একেবারে নিথর স্তব্ধ।

কী কমলবাবু, এবারে বোধহয় স্বীকৃতি দিতে আপত্তি হবে না আপনার?

মিস্টার পাণ্ডে এবারে বললেন, মারো গোলি, কিউ আভি বোলো ও রোজ রাতকো 'লিলি কটেজমে' তুম গিয়া কি নেহি?

মৃদু শান্তকণ্ঠে এবার কমল জবাব দিলে, হ্যাঁ, সে-রাত্রে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু—।

বলুন?

সোয়া এগারোটার সময়েই সেখান থেকে আমি চলে আসি। সেখানকার লোকেরাই তার সাক্ষী দেবে।

বেশ, এনকোয়ারি করে যদি তাই প্রমাণ হয় তো আপনি যে নির্দোষ মেনে নেব আমরা। কিন্তু আপনার নির্দোষিতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পুলিশের নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে, কমলবাবু। কিরীটী বললেন।

বেশ।

কিন্তু সে-রাত্রে ওইসময় কেন 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন? পুনরায় প্রশ্ন করলেন কিরীটী।

দরকার ছিল আমার।

কী দরকার ছিল?

একজনের সঙ্গে সেখানে আমি—।

বলুন?

একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

অত রাত্রে?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

বলতে পারব না।

BanglaBook.org

বলবেন না?

না।

কেন?

কারণ, কথাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া, রাত সোয়া এগারোটায় যদি সেখান থেকে চলেই এসে থাকি, তা হলেই তো আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায়। তবে কেন আবাব এসব প্রশ্ন?

প্রশ্ন করছি এই জন্যে যে, রাত্রি সোয়া এগারোটায় সেখান থেকে চলে আসবার পর যে আবার আপনি রাত বারোটার মধ্যে কোনও এক সময় সেখানে যাননি, সেটা তো ওর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না, কমলবাবু!

আমি বলছি আপনাকে, সূর্যপ্রসাদকে আমি হত্যা করিনি।

সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ।

কেন?

কাবণ, যতক্ষণ না সে-রাত্রে সোয়া এগারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ের মুভমেন্টস আপনার আমরা সঠিকভাবে জানতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাই বা আপনাব কথাটা সত্যি বলে একেবারে মেনে নিই কেমন করে বলুন?

বেশ, মানতে হয় মানবেন, না মানতে হয় না-মানবেন। আমার যা বলবার ছিল বলেছি, এবারে আপনাদের যেমন খুশি করুন।

যা হোক, শেষপর্যন্ত কমলবাবুকে আপাতত নজরবন্দি অবস্থায় রেখে এসে সকলে ভ্যানে চেপে বসলাম।

ভ্যান আবার রাঁচি শহরের দিকে ছুটে চলল ফিরতিপথে।

উনিশ

একপাশে বসে কিরীটী রায় নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টার পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন কিরীটীকে, মিস্টার রায়!

বলুন?

লোকটা যা বললে, তা আপনি বিশ্বাস করেন?

হুঁ।

করেন?

হুঁ, করি।

আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে মিস্টার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সমগ্র ফিরতিপথে কেউ আর একটি কথাও বলছিলেন না।

প্রায় থানার কাছাকাছি এসে মিস্টার পাণ্ডেই আবার কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন মৃদুকণ্ঠে, আশ্চর্য, লোকটা কিছুতেই স্বীকার করল না।

কী, মিস্টার পাণ্ডে? প্রশ্নটা করলাম আমি।

লোকটা যে কেন সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিল সেই কথাটা?

দু-চোখ বুজে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই যেন অলস ভঙ্গিতে কিরীটী এতক্ষণ গাড়ির সিটে হেলান

BanglaBook.org

দিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ চোখ না খুলেই মৃদু শান্তকণ্ঠে বললেন, স্বীকার না করলেও আমি জানি কেন কমলবাবু সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন।

প্রশ্নটা করলাম এবারে আমিই সবিস্ময়ে, আপনি জানেন সে কেন গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

কিন্তু—।

লোকটা কেন গিয়েছিল জানেন, ডাক্তার সেন?

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

কিন্তু তাঁর জবাবটা আর শোনা হল না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থানার সামনে এসে আমাদের ভ্যানটা দাঁড়াল।

কিরীটী সহসা চোখ খুলে বললেন, চলুন, নামা যাক।

এবং নামতে-নামতে বললেন, মিস্টার পাণ্ডে, বড্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে যে।

মারো গোলি—চলুন চলুন, নিশ্চয়ই—।

সোৎসাহে আহ্বান জানালেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিন্তু থানায় যে আমাদের জন্যে আরও একটি নতুন বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, সেটা যেন ভাবতেই পারিনি।

অফিসঘরে বসেই মিস্টার পাণ্ডে চায়ের হুকুম দিলেন।

কিরীটী একটা সিগারে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করলেন। আমি বসে-বসে কমলবাবুর কথাই চিন্তা করতে লাগলাম।

মিস্টার পাণ্ডে সেদিনকার ডাকে আগত চিঠিপত্রগুলো খুলে একে-একে দেখতে লাগলেন। এবং হঠাৎ বেগে-রঙের একটা টাইপ করা সরকারি কাগজ দেখতে-দেখতে বলে উঠলেন, মারো গোলি, বড়ি তাজ্জব কি বাত।

কী হল? প্রশ্ন করলাম আমিই।

কিরীটীও তাকালেন মিস্টার পাণ্ডের মুখের দিকে।

যেসব ভিসেরা ও বডির পার্টস কলকাতায় কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে সূর্যপ্রসাদের বডির সব কিছুতেই arsenic পাওয়া গিয়েছে।

Arsenic? কথাটা একই সঙ্গে আমি ও মিস্টার রায় বললাম।

হ্যাঁ, arsenic।

মৃত্যুর কারণটা তাহলে কী দাঁড়াল মিস্টার পাণ্ডে? প্রশ্ন করলাম আমিই।

আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার সেন? কিরীটী আমার মুখের দিকে সহসা যেন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

আমার?

হ্যাঁ, আপনি তো একজন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার—আপনিই বলুন না, মৃত্যুর কারণটা এক্ষেত্রে আসলে কী হতে পারে?

আমার—আমার মনে হয় stabbing-ই মৃত্যুর কারণ।

তাই, আপনার অনুমানই সত্য, ডাক্তার সেন। তবে এ-ও ঠিক—।

কী, মিস্টার রায়?

হতভাগ্য সূর্যপ্রসাদকে মোক্ষম বা চরম মৃত্যু আঘাত দেওয়ার পূর্বে আর্সেনিক সেঁকো বিষ দিয়ে slow poisoning নিশ্চয় করা হচ্ছিল—।

BanglaBook.org

মারো গোলি—এ আপ কেয়া কহেতে হ্যায়, রায়সাব? মিস্টার পান্ডে বলে উঠলেন।

কেন, আপনার হাতের রিপোর্টই তো তাই প্রমাণ করছে, মিস্টার পান্ডে। তা যদি না হত, মৃতের ভিসেরা এবং চুলে ও নখে নিশ্চয়ই আর্সেনিক পাওয়া যেত না। কেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশানে আর্সেনিকের trace বডি-টিস্যু ও ভিসেরায় পাওয়া গিয়েছে, অথচ অ্যাকিউট আর্সেনিক poisoning-এর কোনও সিম্পটমস পাওয়া যায়নি মৃত্যুর পূর্বে, তাতেই কি মনে হয় না যে, ছোরার সাহায্যে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করার পূর্বে, নিশ্চয়ই আর্সেনিকের সাহায্যে নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে, হতভাগ্যকে এ-দুনিয়া থেকে সরাবার জন্যে slow poisoning চলছিল। এবং এতে করে এই সিদ্ধান্তেই আমরা অনায়াসেই পৌঁছতে পারি যে—।

কী?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারটা সর্বতোভাবেই পূর্বপরিকল্পিত।

মারো গোলি।

হ্যাঁ, মিস্টাব পান্ডে, pre-arranged and pre-meditated। বেচারির মৃত্যুব দিন সত্যিই ঘনিয়ে এসেছিল।

সহসা মিস্টার পান্ডে কিরীটীর শেষের কথায় যেন বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন, মারো গোলি, আপ ঠিক-ঠিক বোলা। তব তো জরুর ওহি বদমাশ হোগা। হ্যাঁ, অব ম্যায়নে সমঝ লিয়া।

মিস্টার পান্ডে।

কিরীটীর ডাকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে পান্ডে জবাব দিলেন, এবাব তো বুঝতে পেরেছেন, মিস্টার রায়—।

কী?

ওহি আবদুলই উনকো খুন কিয়া হোগা জরুর।

আবদুল?

নিশ্চয়ই। সে-ই যখন সূর্যপ্রসাদকে সর্বদা খাবার ও পানীয় সরবরাহ করত, তখন সেক্ষেত্রে আবদুল ছাড়া আর কাব পক্ষে ওইভাবে মিস্টার গুপ্তকে arsenic-এব সাহায্যে slow poisoning করার সুবিধে ছিল বলুন? হ্যাঁ, জরুর ওহি হোগা।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার পান্ডে।

কী?

সূর্যপ্রসাদকে arsenic দিয়ে slow poisoning করা হলেও, তাঁর মৃত্যুর কারণটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু stabbing-ই—arsenic নয়।

মৃদু শান্তকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললেন।

ধ্যুৎ তেরি শালা, মাবো গোলি।

একটা হতাশা ও ব্যর্থতা ফুটে ওঠে মিস্টার পান্ডের কণ্ঠস্বরে শেষক্ষণেই।

BanglaBook.org

পরের দিন।

বেলা তখন প্রায় গোটা-দশেক হবে।

চেম্বারে রোগীর তেমন বিশেষ ভিড় না থাকায় সাড়ে ন'টা নাগাদই হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ডায়েরিটা খুলে বসেছি গত ক'দিনের ঘটনাগুলো টুকব বলে, দরজার বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

ভেতরে আসতে পারি, ডাক্তার সেন?

কে, মিস্টার রায়? আসুন, আসুন।

কিরীটী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

পরিধানে একটা পাতলা ট্রপিক্যাল ট্রাউজার ও গায়ে তদ্রূপ হাফশার্ট।

চা দিতে বলি, মিস্টার রায়?

অমৃতে অরুচি কবে আমাব বলুন।

চায়ের কথা বলে বসলাম এসে আবার।

দু-চারটে মামুলি কথাবার্তার পর হঠাৎ একসময় আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মিস্টার রায়, গতকাল মুরি আউটপোস্ট থেকে ফেরবার পথে—কমলবাবু কেন সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' এসেছিলেন, কথাটা যে বলতে-বলতে থেমে গেলেন—।

হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন—।

কিন্তু এবারেও কিরীটী রায়ের কথাটা শেষ হল না।

বাইরে ফট-ফট-ফট পরিচিত মোটর-বাইকের গর্জন শোনা গেল।

কী ব্যাপার? মিস্টার পাণ্ডে হঠাৎ এসময় এদিকে? বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার বায়।

মিস্টার রায়ের অনুমান মিথ্যা নয়।

মিস্টার পাণ্ডেই এসে পরক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করলেন, মারো গোলি—আপনি এখানে, মিস্টার রায়, আর সারাটা শহর আপনাকে আমি ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি!

হাঁপাতে-হাঁপাতে পাণ্ডে বললেন।

কী ব্যাপার, মিস্টার পাণ্ডে? বসুন, বসুন।

মারো গোলি, আপ ঠিক কহেথে।

কী ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, কমল গুপ্ত লোকটা—।

কমল গুপ্ত! কিবীটী যেন চমকে ওঠে।

হ্যাঁ, লোকটার পদবিও জানা গিয়েছে।

হুঁ, তা কী বলছিলেন?

সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

নির্দোষ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রমাণ পেয়েছেন তা হলে?

বিনা প্রমাণে পাণ্ডে এক পা-ও এগোয় না।

কিন্তু কী প্রমাণ পেলেন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল শহরে বাঙালিদের যে-ক্লাবটা আছে, তারই পিছনে যে-রেস্টুরেন্ট ও হোটেলটা আছে—ওই যে যার নাম ম্যানিলা হোটেল, সেখানেই রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে জুয়োর আড্ডায় ছিল—অর্থাৎ ফ্লাশ খেলছিল।

বটে!

হ্যাঁ। তা হলে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যখন মিস্টার গুপ্ত সে-রাত্রে বেঁচেছিলেন, সেক্ষেত্রে কমলবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনওমতেই মার্ডার করতে পারেন না।

তা বটে।

তা হলে আর ভদ্রলোককে খুনের ব্যাপারে জড়ানো চলে না, কী বলেন?

তা আর চলে কী করে? মৃদুকণ্ঠে কিরীটী জবাব দেন।

BanglaBook.org

কুড়ি

কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপরই কিরীটী পাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কমল গুপ্তকে তা হলে মুক্তি দিচ্ছেন, বলুন?

অগত্যা।

একান্ত যেন হতাশার সঙ্গেই কথাটা বললেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম মিস্টার পাণ্ডে, তাহলে কমল গুপ্তকে এখনই ছেড়ে দিতাম না!

মারো গোলি, কিঁউ?

দিতাম না, তাই বললাম।

হস্তধৃত সিগারে একটা শিথিল টান দিয়ে কথার শেষে কিরীটী খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।

মারো গোলি—লেকিন সাব, ওহি তো হাম পুছতে হ্যায়, কিঁউ?

কেন?

হাঁ-হাঁ, বলে একটু থেমে আবার বললেন, মিস্টার সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপারে কমলবাবু যে জড়িত নন, এটা তো আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, মিস্টার রায়?

বোধহয় কমলবাবু খুনের ব্যাপারে জড়িত নন। কিন্তু তাই বলে স্থিরনিশ্চিত করেও তো কিছু এখুনি বলা যাচ্ছে না যে সত্যই তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মারো গোলি—এটা তো ঠিকই যে, রাত সাড়ে এগোরোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সে ম্যানিলা হোটেলে ছিল? অতএব উড়ে এসে নিশ্চয়ই সে সকলের অলক্ষ্যে ওই সময়ের মধ্যে মিস্টার গুপ্তকে হত্যা করে যায়নি?

মিস্টার পাণ্ডে, আমি কালাও নই—বুদ্ধি-বিবেচনাও যৎসামান্য আমার আছে। আপনার যুক্তি আমি শুনেছিও। কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়াই আপনি ভুলপথে বা ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছেন।

ভুলপথে বিচার করছি।

হ্যাঁ?

লেকিন—।

শুনুন, মিস্টার পাণ্ডে, আমরা জানি, সে-রাত্রে মিস্টার সূর্যপ্রসাদ গুপ্ত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, কেমন কি না?

হ্যাঁ।

অথচ কমলবাবু ম্যানিলা হোটেলে ছিলেন রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, তা ছাড়া—।

তা ছাড়া?

যে-ঘটনা সুনিশ্চিত ভাবে এখনও প্রমাণিত হয়নি—এমন কোনও ঘটনাই আমি বিশ্বাস করি না।

মারো গোলি! এ-কথা তো বিমলবাবুর জবানবন্দি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে আগেই যে, রাত সোয়া এগারোটার সময় মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল? অর্থাৎ তখনও তিনি বেঁচেছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু তবু কথাটা কী জানেন, মিস্টার পাণ্ডে?

কী?

আজকালকার একজন যুবকের সব কথাই আমি বিশ্বাস করি না—যা তারা বলে, বিশেষ করে বিমলবাবুর মতো লোকের কথা।

মারো গোলি, কিন্তু আবদুলও তো তার জবানবন্দিতে বলেছে—।

কী বলেছে?

BanglaBook.org

ঠিক ওই সময়েই মিস্টার গুপ্তর প্রাইভেট রুম থেকে সে বিমলবাবুকে বের হতে দেখেছে।

সহসা যেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠলেন, না, সে দেখেনি।

আমরা দুজনেই চমকে যুগপৎ কিরীটী রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

তারপর মৃদুকণ্ঠে আমিই প্রশ্ন করলাম, দেখেনি?

না।

লেকিন—, কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিস্টার পাণ্ডে, কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন মিস্টার রায়, না ডাক্তার সেন, আসলে আবদুল বিমলবাবুকে আদপেই মিস্টার গুপ্তর প্রাইভেট ঘর থেকে বের হতে দেখেনি সে-রাত্রে ওই সময়।

তবে? প্রশ্ন করলাম আবার আমিই।

সে বিমলবাবুকে দেখেছে দরজার সামনে। ঘর থেকে ঠিক বের হতে দেখেনি।

কিন্তু মিস্টার রায়, এবারে বললাম আমিই, ঘর থেকে যদি ওইসময় বিমলবাবু বের না হয়ে থাকবেন তো তাঁকে দরজার সামনেই বা আবদুল দেখতে পেল কেমন করে? কোথায়ই বা তবে সেসময় তিনি ছিলেন?

হয়তো নীচে নামবার সিঁড়ির ঠিক ওপরেই।

জবাব দিলেন কিরীটী।

সিঁড়ির ওপরে?

হ্যাঁ, আমার অনুমান তাই।

কিন্তু তা-ও যদি হয়, সেই সিঁড়ির ঠিক সামনেই তো সূর্যপ্রসাদের শয়নঘরের দরজাটা?

তাই বটে।

তা ছাড়া, আরও একটা কথা—।

বলুন?

এক্ষেত্রে মিথ্যা বলবারই বা বিমলবাবুর কী কারণ থাকতে পারে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ডক্টরসাব তো সাচ বাত বোলা। সায় দিলেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিন্তু সেটাই তো এক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রশ্ন, মিস্টার পাণ্ডে? মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন রায়।

কিরীটী রায়ের শেষের কথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা আমার মনে উদয় হয়। এবং যে-প্রশ্নটা ওই মুহূর্তে আমার ওষ্ঠপ্রান্তে এসে হাজির হয়, সেটা না উচ্চারণ করে আমি পারি না।

আমি তাই বলেই ফেলি, তার মানে আপনি কি এই বলতে চান মিস্টার রায়—।

কী? বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস্টার রায়।

যে বিমলবাবুই সেই পাঁচশত টাকাটা সে-রাত্রে তাঁর জেঠামশাইয়ের শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে চুরি করেছিলেন?

স্পষ্ট করে আপাতত কারও সম্পর্কেই কিছুই আমি বলতে চাই না, ডাক্তার সেন। তবে—।

তবে?

বিমলবাবু সম্পর্কে আপনারা কতটা এখনও পর্যন্ত কী জানেন আমি জানি না, তবে গোপনে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, ইদানীং ভদ্রলোকের রীতিমতো একটা আর্থিক অনটন চলেছিল।

বিমলবাবুর?

হ্যাঁ, বলতে পারেন বিশ্রীভাবেই আর্থিক অনটনের ব্যাপারে ইদানীং কিছুকাল যাবৎ তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

ইয়ে আপ ঠিক কহেতে হ্যায়, রায়সাব?

BanglaBook.org

জি। জেঠা সূর্যপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে বিমলবাবু প্রতি মাসে যে-হাতখরচা বাবদ মাসোহারা পেতেন, তাতে করে তাঁর কুলোচ্ছিল না—তাঁর বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জন্যেই। আর ওইখানেই ছিল তাঁর সঙ্গে সমরবাবুর হৃদ্যতা। কিন্তু যাক সে-কথা, যা বলছিলাম, পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওই কারণেই তাঁর বেশ কিছু ধার-কর্জ হয়ে যায়। ইদানীং তারা তাগাদা দিয়ে বিমলবাবুকে বেশ অস্থির করে তুলেছিল। তার ওপরে ওই দুর্ঘটনার মাত্র হপ্তাখানেক আগে এখানকার এক বেনের কাছ থেকে হ্যান্ডনোট দিয়ে শ'তিনেক টাকা বিমলবাবু কর্জ নিয়েছিলেন সাতদিনের মেয়াদে। এবারে তা হলে ভেবে দেখুন, টাকার তাগাদায় অস্থির হয়েই যদি অন্য কোনও পথ না পেয়ে সে-রাত্রে তাঁর জেঠার শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেই থাকেন—।

হাঁ-হাঁ, জরুর হো সকতা।

তাই বলছিলাম, হয়তো ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে যেমন বিমলবাবু ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির মুখে এসেছেন, সিঁড়িতে আবদুলের পায়ের শব্দে চমকে তাকে দেখতে পেয়েছেন। এবং পাছে আবদুল তাঁকে এসময় শয়নঘরের দরজার সামনে দেখে কোনওরূপ সন্দেহ করে, তাই হয়তো পরক্ষণেই দু-পা এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে করে আবদুল তাঁকে ওইখানে ওইসময় ওই অবস্থায় দেখতে পেলেও কোনওরূপ সন্দেহ তো করবেই না, বরং মনে করবে হয়তো তখনি তিনি তাঁর জেঠামশাইয়ের প্রাইভেট ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এবং পরমুহূর্তেই যেমনি তাঁর আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজের পোজিশন বাঁচাবার জন্য আবদুলকে একটা মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়েছিলেন। আশা করি, ডাক্তার সেন ও মিস্টার পান্ডে, আমি কী বলতে চাইছি তা আপনারা বুঝতে পারছেন!

জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ, তারপর?

তারপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথার সত্যতার ওপরেই বর্তমান সূর্যপ্রসাদের জটিল হত্যারহস্যের অনেকখানিই নির্ভর করছে, তখন তাঁর ওইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে বলুন! কাজেই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একবার যখন মিথ্যে কথা বলে ফেলেছেন, তখন যে টাকা চুরির ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত পুলিশের গোচরীভূত হয়ে গিয়েছে!

হঠাৎ ওই সময় মিস্টার পান্ডে বলে উঠলেন, মাবো গোলি, এ যা বলছেন আপনি একেবারে simply absurd! অসম্ভব। নেহি-নেহি, এ কভি নেহি হো সকতা।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে কোনও জবাব দিলেন না, মৃদু একটু হাসির আভাস তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল মাত্র।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসির আভাসটুকু দেখেই আমি বুঝেছিলাম, কতখানি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করলে তবে মানুষ ওইভাবে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে ওই ধরনের যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারেন।

তাই আমিও প্রশ্ন করলাম।

বললাম, এইমাত্র যা বললেন—এ-কথাটা কি আগে থাকতেই আপনি ভেবে ছিলেন মিস্টার রায়?

ধীর সংযত এবং দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন কিরীটী রায়, হ্যাঁ, ওই সম্ভাবনাই প্রথম থেকে আমার মনে উদয় হয়েছিল, ডাক্তার সেন।

সত্যি বলছেন!

হ্যাঁ। আমি বরাবরই জানতাম, বিমলবাবু সুনিশ্চিতভাবে আমার কাছে লুকোচ্ছেন। আর সেই কারণেই গত পরশু সন্ধ্যার দিকে বিমলবাবুকে নিয়ে ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম আমি।

হ্যাঁ। বলে একটু থেমে যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন মিস্টার রায়।

BanglaBook.org

একুশ

আমি আর মিস্টার পাণ্ডে নিঃশব্দে কিরীটীর কথা শুনতে লাগলাম।

শুনুন মিস্টাব পাণ্ডে ও ডাক্তার সেন, কিরীটী বলতে লাগলেন, পরশু সন্ধ্যায় আমি 'লিলি কটেজে' গিয়ে বিমলবাবুর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করি, সেই দুর্ঘটনার রাত্রে ঠিক যেভাবে সূর্যপ্রসাদের ঘরের সামনে দুজনের দেখা হয়েছিল ও পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেটা যতটা সম্ভব তাঁদের মনে আছে—আবদুলকে সঙ্গে নিয়ে পুনরভিনয় করে আমাকে একটিবার দেখানোর জন্যে।

মারো গোলি—আচ্ছা, সাবাস রায়সাব! বোলিয়ে-বোলিয়ে, উসকা বাদ কেয়া হুয়া? পাণ্ডে বললেন।

আবদুলকে ডেকে নিয়ে তক্ষুনি আমরা উপরে গেলাম, কিরীটী বলতে লাগলেন, এবং ব্যাপারটা যেমন-যেমন ঘটেছিল, পুনরাবৃত্তি করবার সময় ওরা যা বলেছিল তা হচ্ছে এই ঃ

বিমল। আবদুল, জেঠামণি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আবদুল। ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বিমল। হ্যাঁ, আজ রাত্রে যেন আর তাঁকে বিরক্ত করা না হয়।

আবদুল। আপনি এতক্ষণ সাহেবের ঘরেই ছিলেন নাকি?

বিমল। হ্যাঁ, প্রায় মিনিট পনেরো ছিলাম।

কিন্তু আসলে ঠিক তা তো নয়, কিরীটী বলতে লাগলেন, বিমলবাবুর মুভমেন্টস সম্পর্কে ভালো করে অনুসন্ধান নিতে গিয়ে অমলেন্দুবাবুর মুখেই শুনেছিলাম, এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট অর্থাৎ সোয়া এগারোটায় নাকি বিমলবাবু বাগান থেকে বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করেন।

ইয়ে আপ কেয়া কহেতে হ্যায়, রায়সাব! হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস্টাব পাণ্ডে।

ঠিকই বলছি, মিস্টার পাণ্ডে।

এবারে আমিই বললাম, সত্যিই সে-রাত্রে বিমলবাবু বাগানে গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। এবং যেসময় বাগান থেকে বাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেই সময় অমলেন্দুবাবু চাকরদের থাকবার জন্যে নীচের তলায় যে সিঁড়ির মুখের কাছের ঘরটা—সেখানেই ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সরে দাঁড়িয়েছেন। ওই সময়েই দুজনের দেখা হয়। আর ঠিক সেই সময়, সিঁড়ির সামনেই নীচের তলায় যে-ওয়াল-ক্লকটা দেওয়ালে বসানো আছে সেটায় তখন ঠিক রাত এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট—অসতর্ক মুহূর্তে বিমলবাবুর মুখ দিয়ে পরশু সত্য কথাটা বের হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি সেসময় ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, আমার কাছে সেই মুহূর্তেই সব দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তাঁর সেই সময়ের কয়েকটা কথায়।

তব তো বিমলবাবুকো ফির সব পুছনা জরুরি হায়! মিস্টার পাণ্ডে বললেন।

বেশ তো, চলুন না এখুনি সেখানে?

হাঁ-হাঁ, চলিয়ে চলিয়ে।

চলুন, ডাক্তার সেন।

চলুন।

BanglaBook.org

বেলা তখন বোধকরি পৌনে এগারোটা হবে।

আমারই গাড়িতে চেপে আমরা 'লিলি কটেজে'র দিকে রওনা হলাম।

'লিলি কটেজে' যখন গিয়ে আমরা পৌঁছলাম, বিমলবাবু ওইসময় বাইরের ঘরেই ছিলেন।

একাকী একটা সোফায় বসে বিমলবাবু ওই দিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন।

আমাদের পদশব্দে তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার, এসময় আপনারা?

কিন্তু স্পষ্ট যেন মনে হল, বিমলবাবুর কণ্ঠে একটা আশঙ্কা ও সংশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, আপনার কাছে এসেছি আমরা, বিমলবাবু। কথাটা বললেন মিস্টার রায়ই।

আমার কাছে?

হ্যাঁ। মিস্টার পান্ডে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চান।

প্রশ্ন?

হাঁ-হাঁ, বৈঠিয়ে—বৈঠিয়ে না, বিমলবাবু! বলতে-বলতে মিস্টার পান্ডে একটা সোফায় বসে পড়লেন আরাম করে।

আমরাও দুজনে দুটো সোফায় বসলাম।

বিমলবাবু! পান্ডে ডাকলেন।

বলুন?

দেখুন, আপনি আপনার যে-জবানবন্দি পুলিশকে দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে, রাত ঠিক সোয়া এগারোটার সময় দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি আপনার জেঠার সঙ্গে কথা বলে তাঁর ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই নাকি আবদুলের সঙ্গে আপনার সেই ঘরের দরজার সামনে দেখা হয়।

হ্যাঁ, বলেছিলাম তো।

স্পষ্ট মনে হল, বিমলবাবুর মধ্যে যেন একটা বিচলিত ভাব।

লেকিন বাত এহি হ্যায়, রায়সাব আপকো ও বাত বিশ্বোয়াস নেহি করতে হ্যায়!

বিশ্বাস করছেন না? শঙ্কাকুল দৃষ্টি যেন বিমলবাবুর দুই চোখে।

না, উনি বলছেন—।

আমাকে বলতে দিন, মিস্টার পান্ডে, বাধা দিলেন মিস্টার রায় এবং বললেন বিমলবাবুর দিকে এবারে চেয়েই, আমার ধারণা বিমলবাবু, আপনি আদপেই আপনার জেঠামণির প্রাইভেট ঘরে সে-রাত্রে প্রবেশ করেননি।

প্রবেশ করিনি?

না।

তবে—তবে আমি কোথায় গিয়েছিলাম?

আপনি সে-রাত্রে ঢুকেছিলেন তাঁর শয়নঘরে। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো শয়নঘর ও প্রাইভেট ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা সেসময় প্রাইভেট ঘরের দিক থেকে বন্ধই ছিল। এখন বলুন, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে?

বিমলবাবু একেবারে চুপ।

কী, চুপ করে রইলেন যে—বলুন, জবাব দিন, বিমলবাবু?

সহসা মনে হল যেন কিরীটীর শেষের কথায় ঘরের মধ্যে একটা নিদারুণ নাটকীয় মুহূর্ত ঘনিয়ে উঠেছে অকস্মাৎ।

এবং সেটা ক্ষণেকের জন্যেই। কেননা পরমুহূর্তেই নাটকের গতি পরিবর্তিত হল। বিমলবাবু সহসা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, হ্যাঁ মিস্টার রায়, আপনার—আপনার কথাই ঠিক, আমি চোর—সত্যিই আমি চোর। আমিই সে-রাত্রে জেঠামণির শয়নঘরের ড্রয়ার থেকে পাঁচশত টাকা চুরি করেছি। বলতে-বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘটনার আকস্মিকতায় এবং লজ্জা ও গ্লানিতে সোফাটার ওপরে পুনরায় বসে পড়লেন।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

BanglaBook.org

তারপর পূর্ববৎ ভগ্নকণ্ঠে দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢেকেই বিমলবাবু বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি চোর, আমি চুরি করেছি। দিনের-পর-দিন পাওনাদারদের তাগাদায়-তাগাদায় আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই—তাই শেষপর্যন্ত আমাকে চুরিই করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় যে রাধিকাপ্রসাদবাবু ওই ঘরে এসে ঢুকেছেন, কেউই আমরা টের পাইনি। এবং টের পাইনি যে রাধিকাপ্রসাদবাবু তাঁর ছেলের শেষের কথাগুলো সব শুনেছেন।

হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরে সকলে আমরা চমকে যুগপৎ দরজার দিকে তাকালাম।

বিমল! বিমল!

কে, বাবা? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই সে-রাত্রে জেঠামণির ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করেছি, বাবা।

তুমি—তুমি চুরি করেছ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ—বিশ্বাস করতে পারছেন না, বাবা, যে আমি চুরি করেছি, না? কিন্তু আমি এখন মুক্ত, আমি নিশ্চিন্ত। আর মিথ্যার পর মিথ্যা দিয়ে সব কিছু আমাকে গোপন করতে হবে না।

রাধিকাপ্রসাদ যেন পাথরের মতোই অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছেন কি বাবা, সত্যিই আমি চুরি করেছি। সে-রাত্রে ডিনারের পর একবারও আমার জেঠামণির সঙ্গে দেখা হয়নি—মিস্টার রায়ের ধারণা ঠিকই। আমি—আমি আপনাদের কাছে মিথ্যে বলেছি মিস্টার পাণ্ডে, ইচ্ছা করলে আমাকে এবারে জেলে দিতে পারেন।

বিমল?

না-বাবা-না—আমি চোর, আমি চোর—, বলতে-বলতে ঝড়ের মতোই যেন ছুটে বিমলবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন অকস্মাৎ।

ঘরের মধ্যে সবাই নির্বাক, বিহ্বল।

শুধু প্রৌঢ় রাধিকাপ্রসাদের দুই চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সহসা ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টার পাণ্ডে বললেন, না, সব—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিস্টার রায়, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—মারো গোলি!

মৃদুকণ্ঠে আবার মিস্টার রায় কথা বললেন, এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন মিস্টার পাণ্ডে, সূর্যপ্রসাদ সোয়া এগারোটা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না—তার আগেই তিনি নিহত হয়েছেন।

তার আগেই?

হ্যাঁ। ডাক্তার সেন তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পরই অর্থাৎ রাত সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

কী বলছেন, মিস্টার রায়? বললাম এবারে আমিই।

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, ওই পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যেই তিনি নিহত হয়েছেন।

তা হলে? বললেন মিস্টার পাণ্ডে।

তা হলে এবারে ভেবে দেখুন, মিস্টার পাণ্ডে—আর একবার আমাদের কমলবাবুর কথাটা ভেবে দেখুন। তিনি যে কেন সে-রাত্রে এ-বাড়িতে এসেছিলেন এবং কী করতে এসেছিলেন, কী তাঁর প্রয়োজন ছিল তার কোনও জবাবই এখনও পর্যন্ত তিনি দেননি।

এবারে আমিই বললাম মিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে, আপনি তো সেদিন বলেছিলেন, আপনি জানেন মিস্টার রায়, কেন তিনি সে-রাত্রে এখানে এসেছিলেন?

ঘুরে আমার দিকে তাকালেন কিরীটী রায় এবং বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তার সেন, আমি জানি কেন সে-রাত্রে কমলবাবু এই 'লিলি কটেজে' এসেছিলেন।

কেন?

BanglaBook.org

কেন যে তিনি এসেছিলেন সে-কথা বলবার আগে একটা কথা সুনিশ্চিতভাবে আপনাদের বলতে পারি, মিস্টার পাণ্ডে—।

কী?

তিনি সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাঁর মাথার একটি কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। এমনকী সূর্যপ্রসাদ যে-ঘরের মধ্যে নিহত হয়েছেন সে-ঘরের কুড়ি হাতের মধ্যেও যাননি।

কিন্তু—।

কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে, মিস্টাব পাণ্ডে। আমি কিরীটী রায় এ-কথা বলছি। বলেই সঙ্গে-সঙ্গে অদূরে তখনও বিহ্বলভাবে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রাধিকাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সম্বোধন করে কঠিন ঋজুকণ্ঠে বললেন কিরীটী, রাধিকাবাবু, আপনার মেজো ছেলে সুবলবাবু কোথায়?

সুবল!

বিহ্বলের মতোই যেন কথাটা উচ্চারণ করলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন বিমলবাবু, সুবলবাবু ও কমলবাবু একই মায়ের সন্তান কি না? বলুন, আমার কাছে আর গোপন করে কোনও লাভ নেই কথাটা।

ইয়ে আপ কেয়া বোলতে হ্যায়, রায়সাব! বললেন পাণ্ডে।

ঠিকই বলছি, মিস্টার পাণ্ডে। সেদিন কমলবাবুর মুখের দিকে যদি একটু নজর দিয়ে তাকাতেন তা হলে আপনারও ভুল হত না। তিনটি ভাইয়ের মুখ চোখ নাক কপাল একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। কোথায়ও এতটুকু পার্থক্য বা এতটুকু গরমিলও নেই। আর সেই কারণেই সেদিন মুন্সি আউটপোস্টে কমলবাবুকে প্রথম দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। এমনকী ওঁদেব তিন ভাইয়ের গলার স্বরে মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে।

আপনার—হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক, মিস্টার রায়, বিমল সুবল ও কমল ওরা আমাব ছেলে, একই মায়ের গর্ভে ওদের জন্ম। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি আমার কথা—কমল সত্যিই নির্দোষ। সে এ-কাজ করেনি। এ-কাজ সে করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি রাধিকাবাবু যে, অন্তত কমলবাবু সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেননি। কিন্তু তা হলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি যে, কী প্রয়োজনে এবং কার সঙ্গে দেখা করতে সে-রাত্রে কমলবাবু এখানে এসেছিলেন, ততক্ষণ তাঁর নির্দোষিতা তো প্রমাণ হবে না। ভুলে যাবেন না, এটা আইনের ব্যাপার। আর হত্যার ব্যাপারে তিনি পুলিশের সন্দেহের তালিকাভুক্ত।

বাইশ

বলব, বলব—সবই আপনাকে আমি বলব, মিস্টার রায়, বলে উঠলেন রাধিকাপ্রসাদ।

হ্যাঁ, বলুন।—কোনও কথাই গোপন করবেন না, কারণ তাতে জটিলতারই সৃষ্টি হবে মাত্র।

না, না—গোপন করব না।

কমল এসেছিল সে-রাত্রে আপনারই সঙ্গে দেখা করতে, তাই না? বললেন মিস্টার রায়।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—।

কেমন করে জানলাম সে-কথা, তাই না? আমি জেনেছি—কিন্তু কী করে জানেন, চলার সময় আপনি ওই যে লাঠিটি আপনার হাতে ব্যবহার করেন—বলে কিরীটী ইঙ্গিতে রাধিকাবাবুর হাতের লাঠিটি নির্দেশ করলেন।

আমরা সকলেই নির্বাক।

BanglaBook.org

কিরীটী বলতে লাগলেন, বাগানের মালির ঘরের পাশে অব্যবহৃত ঘরটির মধ্যেই বোধহয় আপনি গোপনে আপনার পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-রাত্রে।

হ্যাঁ, আমি আর সুবল গিয়েছিলাম।

সেটা বুঝতে পেরেছি। কারণ সেই ঘরের মেঝের ধুলোয় আপনার ওই লাঠির গোল দাগ পড়েছিল—যা এখনও সেখানে রয়েছে, কিন্তু বলুন এবারে, কেন দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-রাত্রে ওই ঘরে কমলবাবুর সঙ্গে?

অতঃপর রাধিকাপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন।

কমলের যখন মাত্র বারো কি তেরো বছর বয়েস, তখনই সে এমন দুর্দান্ত ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল যে তাকে কোনওরকমেই বাগ মানানোই যেত না। লেখাপড়ার দিকে এতটুকু মন ছিল না। দিনরাত বাইরে-বাইরেই কেবল হইহই করে বেড়াত। ওই সময় খুলনার একদল বিদেশি সার্কাস পার্টি এসে মাঠে খেলা দেখাবার তাঁবু ফেলল।

বলুন!

কমল ওই বয়েসেই নানাপ্রকার খেলায়, বিশেষ করে বার, ট্রাপিজ ও রিংয়ের কসরতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। যা হোক, ওই সার্কাস পার্টির সঙ্গেই একরাত্রে কমল আমাকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যায় চাকরি নিয়ে। এবং ওই সার্কাসের দলে থাকতেই কুসংসর্গে ক্রমশ কমল অধঃপাতের পথে নেমে যায়। নানাপ্রকার নেশা ভাঙ—এমনকী কোকেনেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি তা জানি। বলুন, তারপর? কিরীটী বললেন।

অবশেষে একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের ক্যাশ ভেঙে হাজার দুই টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়।

তারপর?

ম্যানেজার এদিকে সব জানতে পেরে কমলের নামে পুলিশে ডায়েরি করে। পুলিশ কমলের নামে ওয়ারেন্ট বের করে সর্বত্র তার অনুসন্ধানে ফিরতে লাগল। সেই থেকেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কমল পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে। দাদা যে-রাত্রে নিহত হন, তারই দিন দশেক আগে কলকাতা থেকে কমলের একটা চিঠি পাই আমি। সেই চিঠিতেই সব কথা সর্বপ্রথম ও আমাকে জানায় এবং ইদানীং অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছে বলে আমার কাছে কিছু অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু আমার কাছে টাকা কোথায়? অগত্যা তাই দাদার কাছেই আমি কিছু টাকা চাই।

তিনি দিয়েছিলেন টাকা?

না। বরং সব কথা শুনে বলেছিলেন, আমার নাকি কর্তব্য তাকে পুলিশের হাতেই ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বাপ হয়ে তা পারিনি, মিস্টার রায়। তাই নিজের সোনার ঘড়ি ও চেন বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করি তাকে দেওয়ার জন্যে। পাছে দাদা জানতে পারেন সেই ভয়ে গোপনে টাকাটা দাদার মিউজিয়াম ঘরে যে চন্দনকাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই ছোরাটা ছিল তারই মধ্যে রেখে দিই এবং কমলকে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে এসে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি দিই। ও দেখা করতে আসে, এবং আমি ও সুবল গিয়ে ওর সঙ্গে বাগানের সেই ঘরে দেখা করে টাকাটা তাকে দিয়ে দিই।

রাত ক'টার সময় সে-রাত্রে আপনাদের দেখা হয়েছিল?

রাত আটটায়।

ও। ঘরে ফিরেছিলেন কখন?

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হবে।

কোন পথে ফিরেছিলেন?

পাছে কেউ জানতে পারে বলে গোপনে আমি আর সুবল—তারই পরামর্শমতো ওই

BanglaBook.org

মিউজিয়াম ঘরের জানলাপথেই বাগানে গিয়েছিলাম ও ফিরেও এসেছিলাম।

আপনাদের মধ্যে কে আগে ফিরেছিলেন?

সুবল।

হুঁ। তা হলে সে-রাত্রে আপনিই চন্দনকাঠের বাক্সের ডালাটা খুলে রেখেছিলেন, রাধিকাবাবু?

বোধহয় তাড়াতাড়িতে ভুলে খুলেই রেখে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা একটা কথা, রাধিকাবাবু—।

বলুন?

যখন টাকাটা বের করে নিয়ে যান বাক্স থেকে, আপনার মনে আছে কি, ছোরাটা তার মধ্যে ছিল কি না?

হ্যাঁ, মনে আছে বইকী—ছিল...

আচ্ছা, ফিবে আসবার পর লক্ষ করেছিলেন কি বাক্সটা?

হ্যাঁ, লক্ষ কবেছিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো? ডালাটা খোলা আছে দেখে বন্ধ করতে গিয়েছিলাম।

ও। তখন তার মধ্যে ছোরাটা দেখেছিলেন?

না।

দেখেননি?

না।

ঠিক মনে আছে আপনার?

আছে। কিন্তু আমার ছেলে কমল আর বিমল এদের কী হবে, মিস্টার রায়?

সে-কথার জবাব আপনাকে উনি, মিস্টার পাণ্ডে, একমাত্র দিতে পারেন, রাধিকাবাবু। কিন্তু বেলা অনেক হল, মিস্টার পাণ্ডে। এবারে চলুন, ফেরা যাক।

বলতে-বলতে কিরীটী একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

থানায় মিস্টার পাণ্ডেকে ও 'সানি ভিলা'য় কিরীটী রায়কে নামিয়ে দিয়ে যখন বাড়িতে ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

নানা এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মতোই পাক খেয়ে-খেয়ে ফিরছিল। মনটা সত্যিই গত কিছুদিন ধরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কোনও কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি না।

সব কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। যে অন্ধ দুরাশা এতদিন দিবারাত্র আমাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, সেটা যেন আর অনুভব করি না।

মনে হয়, সব পুরুষকার মিথ্যা। নিষ্ঠুর নিয়তিই সব।

আরও মনে হয়, এই তো মানুষের জীবন। এই তো বিশ্বাসের ভিত্তিটা—যেটা আজ এত শক্ত ও দৃঢ় মনে হচ্ছে, কাল সেটা মনে হয় বুঝি যেমনি অলীক তেমনি অর্থহীন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবলই যেন একটা মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছুটে-ছুটে হয়রান হওয়া। জীবনে আকাঙ্ক্ষারও যেমন অন্ত নেই, তেমনি সত্যিকারের তৃপ্তিও বুঝি কোথায়ও নেই।

বাইরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

মিতা একাকী নিঃশব্দে বসে বাইরের ঘরে একটা সোফার ওপরে। আর চোখের কোণে তার দুটি প্রবহমান অশ্রুধারা।

মিতা!

BanglaBook.org

আমার ডাকে মিতা নিঃশব্দে সেই অশ্রুভেজা দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকাল।

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে।

মৃদুকণ্ঠে শুধালাম, কী হয়েছে রে, মিতা?

হাতের পাতায় ভেজা চোখ মুছে নিয়ে মিতা তাড়াতাড়ি বলল, কিছু না তো।

না, তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস, বল কী হয়েছে?

কী আবার হবে।

মিতার পাশে সোফার ওপরে গিয়ে বসলাম।

কিছুই যদি হয়নি তো চোখে জল কেন তোর?

চোখে কী যেন একটা পড়েছিল।

বুঝতে পারি মিতা মিথ্যা বলছে, কিন্তু মিতা তো কোনওদিনই এমনটি ছিল না।

হাসি, আনন্দ ও সরলতায় চিরদিন মনটি ওর দেখে এসেছি শিশুর মতো। কিন্তু হঠাৎ যেন কিছুদিন থেকেই মনে হয়, সেই হাসি ও আনন্দের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য একটি চিড় ধরেছে।

মিতা যেন ঠিক সেই মিতা আর নেই।

এ যেন চিরদিনের সেই চেনা মিতা আর নেই।

নারী-মন নিয়ে কখনও কোনও কারবার করিনি। তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কোমল অথচ তীব্র অনুভূতিগুলোর সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটেনি। ঘটবার অবকাশও হয়নি।

তাই মনে হয়, বোন হলেও এবং চিরটাকাল পাশাপাশি থাকলেও হয়তো তার সত্য পরিচয়টা কোনওদিনই পাইনি।

তাই হয়তো আজ মনে হচ্ছে, মিতা অনেক—অনেক দূরের।

সহসা মিতার ডাকে যেন চমকে উঠি।

দাদা।

কী রে?

কী হয়েছে তোমার সত্যি করে বলো তো।

অবাক হয়ে মিতার মুখের দিকে তাকালাম, কেন?

কেন? নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখো তো। ভালো করে খাও না, রাত্রে ঘুমোও না—ভালো করে একটা কথা পর্যন্ত বলো না।

মৃদু হাসি প্রত্যুত্তরে।

হাসছ? কিন্তু সত্যিই দাদা, তুমি যেন আর সেই তুমি নেই।

ও তোর ভুল ধারণা।

হতে পারে হয়তো। কিন্তু কী যে তুমি সর্বক্ষণ চিন্তা করো বুঝি না—সত্যি, কীসেরই বা তোমার এত চিন্তা। দিবারাত্র আজকাল দেখি বাইরে-বাইরে থাক।

কাজের চাপ পড়েছে—।

কাজ? কী এত কাজ? এদিকে তো শুনি আজকাল রোগীদেরও তেমন ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করো না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না?

না, না—ঠিক তা নয়। মানে ওই আর কী—, কী বলব ঠিক বুঝতে না পেরে থেমে যাই।

মিতা যা বলছে তা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু কেন—কেন?

আজ এত দেরি হল, কোথায় গিয়েছিলে?

BanglaBook.org

লিলি কটেজে।

লিলি কটেজে। হঠাৎ আবার সেখানে কেন?

না, ওই কিরীটীবাবু আর মিস্টার পাণ্ডে টেনে নিয়ে গেলেন।

একটা কথার জবাব দেবে, দাদা?

কী?

সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপার নিয়ে তোমারই বা এত মাথা ঘামানো কেন?

এ তুই কী বলছিস, মিতা? ভদ্রলোক আমাদের পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু বড়লোক বলে বরাবর তো তাঁকে দেখেছি ঘৃণাই করে এসেছ।

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে—।

না, সত্যি নিজের ওপরই যেন নিজের রাগ হয়। কী যে হয়েছে? ভালো করে একটা কথা পর্যন্ত যেন গুছিয়ে বলতে পারি না।

তবে মিতাও মিথ্যা বলেনি। সত্যিই তো, সূর্যপ্রসাদেব মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে আমার এত মাথা ঘামানোই বা কেন?

সূর্যপ্রসাদ মরলেন কি বাঁচলেন, তাতে করে আমার কী-ই বা এসে গেল?

চিন্তাটাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লাম।

না, কী এসব চিন্তা করছি? পাগল হয়ে যাব নাকি?

কিন্তু মিতা কাঁদছিল।

কথাটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না।

দ্বিপ্রহরে আহারদির পর শয্যায় চোখ বুজে শুয়ে-শুয়ে মিতার কথা ভাবতে-ভাবতে একসময় কখন যে সমরের কথা ভাবতে শুরু করেছি খেয়ালই নেই।

তবে কি সমরের কথা ভেবেই চোখ দিয়ে মিতার জল পড়ছিল?

বেচারি মিতা! সমরকে যে বাঁচানো যাবে না, এই সত্যি কথাটা ওকে কেমন করে বলি? থাক পিয়ে, বলে কী হবে?

নিষ্ঠুর সত্যকে তো একদিন ও জানতে পারবেই।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং-ক্রিং—।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলাম, হ্যালো! কে, মিস্টার রায়, কী খবর? থানা থেকে বলছেন?

আজ আবার রাত্রে সকলের সঙ্গে 'লিলি কটেজে' মিলিত হয়ে আলোচনা করতে চান? বেশ তো। আপনিই মিস্টার পাণ্ডের সাহায্যে সব ব্যবস্থা করেছেন? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রেখে দিলাম ফোনটা।

BanglaBook.org

তেইশ

আবার ওইদিন রাত্রে কিরীটীর ইচ্ছামতো 'লিলি কটেজে' সকলে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমি, রাধিকাপ্রসাদবাবু, তাঁর দুই ছেলে বিমলবাবু ও সুবলবাবু, বলদেব সিংহ, মেজর কৃষ্ণস্বামী অমলেন্দুবাবুর ঘরের মধ্যে বসেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে আবদুল।

একমাত্র কিরীটীই এখনও এসে পৌঁছননি 'লিলি কটেজে'।

সকলেই চুপচাপ বসে, কারও মুখেই কোনও কথা নেই।

কিন্তু কেউই যে একটা স্বস্তিবোধ করছি না, পরস্পর-পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সকলেই যেন কী চিন্তা করছেন?

আজও শীতটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। ঘরের কোণে ফায়ার-প্লেস জ্বলছে।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে যেন।

সহসা মৃদু একটা পদশব্দে সাতজোড়া ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি যেন দরজার ওপর গিয়ে পড়ল একই সময়ে।

দরজাব পরদা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন কিরীটী রায়।

Good evening!

কিরীটী এগিয়ে এসে তাঁর জন্যে বক্ষিত শূন্য চেয়ারটি অধিকার করে বসলেন।

কেউ কোনও কথা বলেন না।

সবাই যেন আমবা বোবা।

একসময় স্তব্ধতা ভঙ্গ কবে কিরীটীই সর্বপ্রথম কথা বললেন, আজ ইচ্ছা করেই আমাদের এই ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে মিস্টার পাণ্ডেকে ডাকিনি, কারণ—।

কিরীটী বলতে-বলতে থামলেন।

সাতজোড়া চোখের দৃষ্টি শুধু নিঃশব্দে কিরীটীর প্রতি স্থির হয়ে আছে একটিমাত্র জিজ্ঞাসায় যেন, বলো, বলো, থামলে কেন?

মিস্টার রায় আবার বলতে শুরু করেন, আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁরা প্রত্যেকেই সূর্যপ্রসাদের হত্যার রাত্রেও এইখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনাবা নিশ্চযই বুঝতে পারছেন, সেই কাবণেই সূর্যপ্রসাদের হত্যার ব্যাপাবে আপনারা যাঁরা এই মুহূর্তে এই ঘরে আছেন, প্রত্যেকেই সন্দেহের তালিকায় পড়েন।

সকলে নিস্তব্ধ।

কিরীটী আবার বলতে থাকেন, অতএব আপনাদের মধ্যেই যে একজন কেউ সে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেছেন সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী বরফের মতোই ঠান্ডা স্তব্ধতা।

আবার কিরীটী বলতে লাগলেন, আজ আপনাদের এখানে এইভাবে ডেকে আনবার কারণই হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে থেকে হত্যাকারীকে আপনাদের স্বীকৃতির দ্বারাই আমি সর্বসমক্ষে চিহ্নিত করে দিতে—।

সকলেই চুপ করে রইলেন, কিন্তু আমি পারলাম না চুপ করে থাকতে, মৃদু কণ্ঠে বললাম, তা হলে মিস্টার রায়, আপনার স্থির ধাবণা যে, আজ আমরা যারা এখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি, তাদের মধ্যে একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকাবী?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আপনাদের মধ্যেই একজন।

চকিতের জন্যে বোধহয় নিজ-নিজ অজ্ঞাতসারেই পরস্পর-পরস্পরের দিকে সকলেই আমরা নিঃশব্দে একবার তাকালাম। এবং মুখে আমরা কেউ প্রশ্ন না করলেও, একটি প্রশ্নই যে আমাদের সকলের মনে ওই মুহূর্তে জেগেছিল, সে-ও বোধহয় ঠিক।

কে? কে? কে?

কী যেন আমি বলতে উদ্যত হলাম, কিন্তু বাধা দিলেন আমাকে মিস্টার রায়। বললেন, কিরীটী রায়ের কথায় এখনও আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, ডাক্তার সেন, তাই না?

BanglaBook.org

না, মানে বলছিলাম—।

বলুন, থামলেন কেন, ডাক্তার সেন?

আপনার কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে বলব, একজন ওই একই সন্দেহের তালিকাভুক্ত—কিন্তু এখনও অনুপস্থিত এখানে—

কে ডাক্তার সেন? আপনি কার কথা বলছেন?

সমর!

সমরবাবু এসময়ে এখানে অনুপস্থিত থাকলেও, আমি জানি তিনি কোথায়—।

আপনি জানেন?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, আমি জানি।

কোথায় সে?

ওই যে, চেয়ে দেখুন দরজার সামনেই তো সমরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন!

সঙ্গে-সঙ্গে সকলে আমরা দরজার দিকে তাকাতেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যিই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমর।

আসুন সমরবাবু, ওই সোফাটায় এসে বসুন।

কিরীটীর আহ্বানে সমর এসে নির্দিষ্ট শূন্য সোফাটি নিঃশব্দে অধিকার করে বসল।

এবারে তো সকলেই এখানে উপস্থিত, ডাক্তার সেন?

আমি কোনও সাড়া দিলাম না।

সমরের দিকে যে তাকাব তাও যেন পারছি না।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই আবার বলতে শুরু করলেন, তা হলে সকলেই আজ যখন আপনারা এখানে উপস্থিত এবং আপনাদের মধ্যেই যখন একজন সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী রূপে চিহ্নিত, অথচ সেই দুঃসাহসিক স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় যখন হত্যাকারীর কাছ থেকে পাবার আশা নেই, আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সমগ্র দুর্ঘটনাটা আপনাদের সকলের সামনে আলোচনা করছি। শুনুন, বিমলবাবুর বিশেষ অনুরোধে সূর্যপ্রসাদবাবুর রহস্যজনক হত্যার মীমাংসার ভার নিয়ে এ-বাড়িতে আসবার পর এবং আপনারা যাঁরা সেই দুর্ঘটনার রাত্রে এখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জবানবন্দি বা বক্তব্য থেকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি ও সেইসঙ্গে এখানকার কয়েকটি ব্যাপার যা আমার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সেগুলোই একে-একে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলছি, আপনারা সকলেই মন দিয়ে শুনুন।

ওই পর্যন্ত বলে কিরীটী মুহূর্তের জন্য থামলেন।

সকলেই আমরা নির্বাক।

কিরীটী বলতে লাগলেন, এক নম্বর হচ্ছে—এ-বাড়ির পশ্চাতের বাগানে মালির ঘরের পাশে যে-ঘরটি সাধারণত দীর্ঘকাল অব্যবহার্য পড়ে আছে, সেটা প্রথম যেদিন বাগানে যাই সেইদিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু-নম্বর—ওই ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমত আমি দেখতে পাই, ঘরের মেঝেতে ধুলোয় কতকগুলো জুতার ছাপ ও গোল-গোল ছোট-ছোট কয়েকটা চিহ্ন এবং কুড়িয়ে পাই একটি নস্যির কালো কৌটো বা ডিবে, যে-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আপনাদের আমি বলেছি বা আপনারা জানতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, ওই দুটি ব্যাপার থেকে আমি সিদ্ধান্ত করি, মাত্র কয়েক দিন আগে নিশ্চয়ই ওই ঘরের মধ্যে কেউ গিয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে সেই ঘরে কে যেতে পারে, আপনাদের সকলের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়—বিমলবাবু ও সুবলবাবুরই কেবলমাত্র ওই ঘরে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছি, সুবলবাবু ও রাধিকাবাবুই দুর্ঘটনার দিন রাত্রে কমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওই ঘরে গিয়েছিলেন। আরও জেনেছি, ওই রাত্রেই সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেজর স্বামী কাউকে বাগানপথে ওইদিকে যেতে

BanglaBook.org

দেখেছিলেন। কথা হচ্ছে এখন, তা হলে কে অত রাত্রে ওইদিকে যেতে পারেন? পরে অবিশ্যি আমি অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে গোপনে কথা বলে জানতে পেরেছি, সে-রাত্রে ওই সময় ওই ঘরে বিমলবাবুকেই নাকি যেতে দেখেছিলেন।

বিমলবাবু? বললেন মেজর স্বামী।

হ্যাঁ মেজর, বিমলবাবুই।

কিন্তু অত রাত্রে?

হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওই ঘরে। তাই না, সমরবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নোত্তরে মৃদুভাবে মাথা হেলিয়ে সমর্থন জানালেন সমর।

বিমলবাবু, সত্যি নিশ্চয়ই কথাটি?

হ্যাঁ, মিস্টার রায়, গিয়েছিলাম সমরের সঙ্গে দেখা করতে। বিমলবাবুও বললেন।

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে ওই ব্যাপার থেকে যে, সমরবাবু ও বিমলবাবুর মধ্যে দুজনের কেউ সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী নয়। বললেন কিরীটী।

কিন্তু তাই যদি হয় তো সে-রাত্রে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সূর্যপ্রসাদ কার সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট ঘরে বসে কথা বলছিলেন? প্রশ্ন করলেন এবারে মেজর স্বামীই।

আপনার সেই প্রশ্নের জবাবেই এবারে তিন নম্বর পয়েন্টে আমি আসছি। কিরীটী বলতে লাগলেন, এই তিন নম্বর পয়েন্টটি এই রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কীরকম? প্রশ্ন করলেন আবার মেজর কৃষ্ণস্বামীই।

একটা কথা হয়তো আপনাদের কারও মনেই উদয় হয়নি মেজর, সূর্যপ্রসাদের রহস্যজনক ভাবে নিহত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাই না, অমলেন্দুবাবু?

হ্যাঁ, একটা ডিকটাফোনের ব্যাপারে।

Exactly! কিন্তু আপনি জানেন যে শেষ পর্যন্ত সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোনটি কেনেননি। আসলে তা নয়, আপনার সংবাদটা ভুল। আমি নিজে হাজরা ট্রেডিং কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সূর্যপ্রসাদ ওই দুর্ঘটনার মাত্র দিন দুই পূর্বেই একটি ডিকটাফোন মেশিন ক্রয় করেছিলেন ক্রেডিট ভাউচারে ও তার দাম দেওয়ার জন্যেই তিনি আপনাকে দিয়ে মৃত্যুর দিন ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিলেন, কারণ পরের দিন সকালেই তাঁর টাকাটা দোকানে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

আশ্চর্য! এটা কিছুতেই আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না, মিস্টার রায়, সূর্যপ্রসাদ হঠাৎ একটি ডিকটাফোন কিনতেই বা যাবেন কেন? বললেন এবারে মেজর স্বামীই।

সেটা অবিশ্যি এখন আর জানবার উপায় নেই, তবে তিনি যে ডিকটাফোন কিনেছিলেন একটা, সেটা ক্রেডিট ভাউচারে তাঁর সই-ই প্রমাণ দেবে এখনও। কিরীটী বলতে লাগলেন, সে যা হোক, ওই ডিকটাফোনেই সূর্যপ্রসাদের গলার আওয়াজের পুনরাবৃত্তি শুনে মেজর স্বামীর সে-রাত্রে মনে হয়েছিল, বুঝি তিনি ওই সময় কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কী বলছেন আপনি, মিস্টার রায়? তবে কি—।

হ্যাঁ মেজর, যদিও সেটা আপনি সূর্যপ্রসাদেরই কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তথাপি সেটা জীবিত সূর্যপ্রসাদের নয়, তাঁর recorded voice-এরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এবং সেসময় তিনি জীবিত ছিলেন না।

কী ভয়ানক কথা। যেন স্বগতোক্তি করলেন মেজর কৃষ্ণস্বামী।

যাক সে-কথা, এবারে আমি আমার চার নম্বর পয়েন্টে আসব। সেটা হচ্ছে, সমরবাবুর ব্যাপার। সমরবাবু আদৌ নিরুদ্দেশ হননি বা আত্মগোপন করেননি স্বেচ্ছায়। তিনি কিছুদিনের জন্যে তাঁর জীবনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার সেনেরই পরামর্শে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন মাত্র, পাছে পুলিশ

BanglaBook.org

তাঁকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করে বলে। হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর যে-পলিক্লিনিক আছে, সেখানেই ডাক্তার সেনের পেশেন্ট হিসাবে ভরতি হয়েছিলেন সমরবাবু।

How interesting! বললেন মেজর।

Interesting-ই বটে। মৃদু কণ্ঠে মিস্টার রায় বললেন।

But how could you guess it? পুনরায় মেজর প্রশ্ন করলেন।

সেই কথাতেই আসছি এবারে, মেজর। কিরীটী বলতে লাগলেন, ডাক্তার সেনের সেই রাত্রের ও পরের দিন প্রত্যুষের গতিবিধিই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে সর্বপ্রথম। কারণ, স্পষ্টই তাঁর কথাবার্তা শুনে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি সমরবাবু সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন যা আমার কাছে গোপন করছেন। তাই গোপনে-গোপনে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ডাক্তার সেনের সর্বপ্রকার গতিবিধি সম্পর্কে এবং তাতে করেই জানতে পারি, ডাক্তার সেনের হাজারিবাগে ডাক্তার চৌধুরীর পলিক্লিনিকে রীতিমতো যাতায়াত তো আছেই, তিনি ওই ক্লিনিকের অন্যতম পেট্রনও বটে। যা হোক, অনুসন্ধানে সেইখানেই একটি নতুন রোগীর সন্ধান পাই যাকে a case of early T.B. বলে diagnosis করে, ঠিক যে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদ রহস্যজনকভাবে নিহত হন তারই পরের দিন প্রত্যুষে ভরতি করে নেওয়া হয়, ডাক্তার সেনেরই সুপারিশে। নাম বীরেন্দ্র ভদ্র। ব্যাপারটা বুঝতে এখন আর বোধহয় আপনাদের কারোরই কষ্ট হচ্ছে না, এই বীরেন্দ্রই আমাদের ডাক্তার সেনের পরামর্শানুযায়ী, ছদ্মনামধারী আত্মগোপনকারী সূর্যপ্রসাদবাবুর একমাত্র ছেলে সমরেন্দ্রবাবু।

সত্যি, আশ্চর্য লোক মশাই মিস্টার রায় আপনি! মৃদু হেসে আমি বলি, এত কাণ্ড করেছেন? আশ্চর্য, আশ্চর্য!

আশ্চর্য, তাই না? কিন্তু যাক, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ডাক্তার সেন, কিরীটীর কাছে অজ্ঞাত কিছুই ছিল না সেদিন? কথাগুলো বলে পুনরায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস্টার রায় বললেন, যাক সে-কথা, সব কথাই আপনাদের বললাম এবং কাল প্রত্যুষেই মিঃ পান্ডেকেও সব কথাই আমি বলব। কিন্তু তার পূর্বে আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকেই শেষবারের মতো আবার বলছি, সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে আমি চিনেছি, খুনি কে আমি জানি। অতএব তিনি যতই চেষ্টা করুন, আইন তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কিরীটীবাবু থামলেন।

ঘরের মধ্যে একটা হিম-কঠিন স্তব্ধতা।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

এমন সময় বাইরে একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সকলেই আমরা দরজার দিকে তাকালাম। কিরীটী বললেন, লোকটিকে ভেতরে আসতে দাও, আবদুল।

পরক্ষণেই সাধারণ ধুতি ও চাদর গায়ে একটি লোক ঘরে এসে ঢুকল।

কী খবর, রমেশ?

এই চিঠিটা—।

কিরীটী নিঃশব্দে রমেশের হাত থেকে খামটা নিয়ে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

রমেশ বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কিরীটী এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার সেন, বাড়ি যাবেন নাকি?

হ্যাঁ, চলুন।

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

BanglaBook.org

চব্বিশ

রাত খুব বেশি হয়নি তখনও।

মাত্র দশটা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, মাত্র পনেরো দিন আগে ঠিক এমনি এক রাত্রে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছিলেন সূর্যপ্রসাদ এবং আজ রাত্রে সেই হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল।

কিন্তু সত্যিই খুনি কে?

সত্যি-সত্যিই কি কিরীটী রায় সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছেন?

নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজনে আমারই গাড়িতে বসে চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমিই।

মিস্টার রায়? মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম।

ইয়েস, ডাক্তার সেন।

রাত তো এমন কিছু বেশি হয়নি, যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না চেম্বারে এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন।

বেশ তো, চলুন।

গাড়ি চেম্বারের দিকেই চালালাম।

চেম্বারে পৌঁছে নিজের হাতেই দু-কাপ কফি তৈরি করে এককাপ দিলাম মিস্টার রায়কে, এককাপ নিলাম আমি।

দুজনে দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছি, সামনেই টেবিলের ওপর নিঃশেষিত দুটি কফির কাপ।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে ধৃত পাইপ।

টেবিলের ওপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলো কিরীটীর মুখের ওপর এসে পড়েছে। বোঝা যায় গভীর চিন্তায় যেন অন্যমনস্ক ওই লোকটি ওই মুহূর্তটিতে।

সহসা ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস্টার রায়ই একসময় মৃদুকণ্ঠে বললেন, আজকের আলোচনাটা কেমন লাগল আপনার, ডাক্তার সেন?

Rather exciting!

কিন্তু আপনাকে যেন একটু বিশেষ চিন্তিত বলে হঠাৎ মনে হচ্ছে, ডাক্তার?

না চিন্তা কী—তবে—।

বলুন, থামলেন কেন?

সত্যি কথা বলতে কী, মিস্টার রায়, আপনার কথাটা যেন সত্যিই এখনও আমার কাছে প্রহেলিকার মতোই মনে হচ্ছে।

কোন কথাটা, ডাক্তার? খুনির পরিচিতি সম্পর্কে কি?

হ্যাঁ, মানে—এখনও আমি বুঝতে পারছি না, সত্যিই যদি আপনি জানতে পেরে থাকেন যে হত্যাকারী কে, তবে তাকে এই মুহূর্তে মিস্টার পাণ্ডের হাতে না তুলে দিয়ে, খোলাখুলিভাবে, এইভাবে আলোচনা করবার পরও আগামী প্রত্যুষ পর্যন্ত—।

তাকে সময় দিলাম কেন, তাই না?

হ্যাঁ, মানে ধরুন—যদি সে পালায়?

আছে—একটা উদ্দেশ্য আছে বইকী, ডাক্তার। বিনা উদ্দেশ্যে কিছু আমি করি না।

উদ্দেশ্য?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, কিন্তু যাক সে-কথা, you need not worry! আমি জানি সে পালাতে পারবে না। ধরা তাকে দিতেই হবে।

তা হলে আমাদের মধ্যেই একজন সূর্যপ্রসাদকে হত্যা করেছে, আপনার স্থির বিশ্বাস?

হ্যাঁ।

কিন্তু কে?

তা হলে সবই আপনাকে খুলে বলি, ডাক্তার, বুঝতেই তো পারছেন আমার ক্ষণপূর্বের আলোচনা থেকে যে সমর বা বিমলবাবু হত্যাকারী নন!

তা হয়তো নয়—।

তা হলে বাকি যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কে হত্যাকারী হতে পারে, এই তো?

হ্যাঁ।

বেশ, তা হলে গোড়া থেকেই শুরু করি। প্রথমেই ধরুন, টেলিফোনে সে-রাত্রে আপনার সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদটা পাওয়া। প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে যে 'লিলি কটেজ' থেকে কেউই আপনাকে ফোন করেনি, ফোনটা এসেছিল অন্য জায়গা থেকে, কেমন কি না?

হ্যাঁ—।

তাই যদি হয়, তবে ফোনটা করা হয়েছিল কেন? একমাত্র হতে পারে, হত্যাকারী চেয়েছিল সেই রাত্রেই ওইভাবে ফোন মারফতই হত্যার ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত করে দিতে?

কিন্তু—।

হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন তার সেই রাত্রেই ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত করবারই বা এমন কী প্রয়োজন ছিল, পরের দিনই তো সকলে জানতে পারত! তা নিশ্চয়ই পারত। তবে এক্ষেত্রে খুনির ইচ্ছাই ছিল যে ওই রাত্রেই খুনের ব্যাপারটা সকলের গোচরীভূত যাতে হয়ে যায়।

কেন?

কেন? ভেবে দেখেছি, তার কারণও ছিল বইকী। হত্যাকারী চেয়েছিল মনে মনে, এমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওই হত্যার ব্যাপারটা প্রকাশিত হোক, পুলিশের গোচরীভূত হওয়ার পূর্বেই, যাতে করে তার হাতে এমন খানিকটা সময়ের সুযোগ থাকে, যে-সময়ের মধ্যে বা পরে ওই সুযোগ নিয়ে সে অনায়াসেই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবার অবকাশ পায়। আশা করি, আমি যা বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারছেন, ডাক্তার সেন!

বলুন?

কিরীটী আবার বলতে লাগলেন, টেলিফোনের ব্যাপারটার পর তা হলে আসা যাক—সেই ব্যাকরেস্ট দেওয়া চেয়ারটার কথায়।

চেয়ার!

হ্যাঁ, যেটা সম্পর্কে বহুবার ইতিপূর্বে তুচ্ছতম একটা ব্যাপার বলে আপনি আমাকে ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যে তদন্তের ব্যাপারটা আপনার ডায়েরিতে ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন তাতে সেই ঘরের, মানে অকুস্থানের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে চমৎকার একটা স্কেচ দিয়েছেন। সেটা যদি একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে দেখবেন, আপনারও বুঝতে কষ্ট হবে না যে, আবদুলের কথামতো যদি চেয়ারটা সত্যিই সরানো হয়ে থাকে তা হলে চেয়ারটা এমনভাবে এমন জায়গায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে চেয়ারটা ঠিক ঘরের বাইরে যাওয়ার দরজা ও ঘরের একটিমাত্র জানলার মাঝামাঝি position নেয়।

জানলার?

হ্যাঁ, জানলা-দরজার সঙ্গে ঠিক একই লাইনে ওই চেয়ারটা ইচ্ছা করেই অর্থাৎ প্ল্যান মতোই রাখা হয়েছিল। আর তাতেই আমার মনে হয়েছিল, আবদুল মিথ্যে বলেনি।

BanglaBook.org

কিন্তু—।

কিন্তু কেন, তাই তো। শুনুন, ডাক্তার সেন, চেয়ারটার original position এইজন্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, যাতে করে ওই position-এ চেয়ারটা সরিয়ে রাখলে দরজাপথে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে চেয়ারটার উঁচু ব্যাকরেস্টের জন্যে সহসা কারওই চেয়ারের পশ্চাতের জানলাটা নজরে পড়বে না। কিন্তু একটু ভালো করে নজর করে দেখলেই বোঝা যায়, চেয়ারের ব্যাকরেস্টটা এত বেশি উঁচু নয় যে, সেটা দরজাপথে কেউ প্রবেশ করলে তার দৃষ্টিপথ থেকে সম্পূর্ণভাবে জানলাটা ঢাকা পড়তে পারে। তবে হ্যাঁ একটা কথা—and which was more improtant, ওই চেয়ার-জানলার মধ্যস্থলে, অর্থাৎ চেয়ারটার ঠিক পশ্চাতেই ছিল একটা নিচু গোল টেবিল এবং ওইভাবে চেয়ারের original position চেঞ্জ করার দরুন জানলাটা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিপথের অগোচর না থাকলেও টেবিলটাকে দৃষ্টির অগোচর করতে কিন্তু পুরোমাত্রায়ই সাহায্য করেছিল, অর্থাৎ হত্যাকারী চেয়ারটার position ওইভাবে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার পশ্চাতে রক্ষিত টেবিলটা যেন ঘরে ঢুকলেই কারও সহজ নজরে না আসে।

কিন্তু কেন—কেন?

এ তো সোজা কথা, ডাক্তার সেন, সেই টেবিলটার ওপরে এমন কোনও বস্তু হয়তো ছিল যেটা খুনি চায়নি যে ঘরে ঢুকে কেউ দেখতে পাক। এবং যে-মুহূর্তে ওই সম্ভাবনাটি আমার অনুসন্ধিৎসু মনে পরের দিন প্রত্যুষে সেই ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই উঁকি দিয়েছে, সেই মুহূর্তেই সত্যি কথা বলতে কী আমি যেন সত্যের ছায়া দেখতে পেলাম। আর সেই মুহূর্ত থেকেই একটা চিন্তা কেবলই মনের মধ্যে আমার ঘোরাফেরা করতে লাগল, সেটা কী? কী হতে পারে? কী হওয়া সম্ভব? প্রথমটায় অবিশ্যি কোনও সূত্রই খুঁজে পাইনি। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার তারপর অনুসন্ধান করতে-করতে এমন কয়েকটি বিষয় আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে যাতে করে ক্রমশ সত্যটা একটু-একটু করে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু—।

হ্যাঁ, ক্রমশ এইটাই বুঝলাম, হত্যাকারী হয়তো হত্যা করবার পর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওই টেবিলের ওপরে এমন কোনও জিনিস ছিল যেটা সেসময় তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সুবিধে হয়নি বা হবে না জেনেই পরে তাকে টেলিফোন কলটার সহায়তা নিতে হয়েছিল। এবারে বুঝতে আশা করি নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না আমার কথাগুলো, ডাক্তার সেন, অর্থাৎ সেটা এমন কিছু মারাত্মক যেটা পরে অন্যের নজরে পড়লে হত্যাকারীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ, সেইজন্যই সে ওই টেলিফোন-কলের সুযোগে সকলের সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সেই গোলমালের ও সকলের অন্যমনস্কতার মধ্যে সেই মারাত্মক বস্তুটি সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

এখন পুলিশ সেখানে পৌঁছবার আগে কারা-কারা সে-ঘরে গিয়েছিল? আপনি, আবদুল, মেজর, বলদেববাবু, রাধিকাপ্রসাদবাবু ও বিমলবাবু। প্রথম ধরা যাক আবদুলকে। সে-ই যদি হবে তবে চেয়ারের কথা সে কোনওমতেই বলত না। একমাত্র এই কারণেই আমি আবদুল যে নির্দোষ সে-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত। তারপর মেজর, বিমলবাবু ও রাধিকাপ্রসাদবাবু। তাঁদের প্রতি একটু সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে জিনিসটা কী? আমি মেজরের কাছে খোঁজ নিয়ে শুনেছি, সূর্যপ্রসাদের কথাবার্তা যা সে-রাত্রে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেটা বেশ একটু অস্বাভাবিক রকম জোরে-জোরে। কোনও মানুষই—বিশেষ করে প্রাইভেট কথাবার্তা অত জোরে বলতে পারে না।

কিরীটী বলতে লাগলেন।

যে-মুহূর্তে আমি হাজরা কোম্পানি থেকে জানতে পারি, সূর্যপ্রসাদ মৃত্যুর দু-দিন আগে মাত্র

BanglaBook.org

একটা ডিকটাফোন ক্রয় করেছেন, তখনই ডিকটাফোনের ব্যাপারটা আমার মনে গেঁথে যায়। আমি চিন্তা করতে শুরু করি। হঠাৎ একসময় মনে হল, সূর্যপ্রসাদ যে-ডিকটাফোনটা ক্রয় করেছেন সেটা কোথায়? বহু পরিশ্রম করে খোঁজাখুঁজি করেও আমি বা ও-বাড়ির কেউ সেটা পাননি।

আমি কিন্তু এ-কথাটা একবারও ভাবিনি, মিস্টার রায়।

স্বাভাবিক। যাক, তখন আমার মনে হল, এমনও তো হতে পারে, ওই ডিকটাফোনটাই টেবিলের ওপরে ছিল এবং সেটাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু খুনি যদি সেটা সরিয়ে ফেলেই থাকে, তবে সকলের সামনে অজ্ঞাতে কীভাবে সেটা সরিয়ে ফেললে? নিশ্চয়ই এমন কোনও কিছু খুনি সঙ্গে এনেছিল যার সাহায্যে সেটা অনায়াসেই অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছেন এখন ডাক্তার সেন, খুনি আমাদের চোখের সামনে অল্পে-অল্পে আকার নিচ্ছে। এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন, কেন খুনি কৌশলে ফোন করে সেই রাত্রেই খুনের কথা সকলকে জানিয়ে ডিকটাফোনটা নিয়ে সরে পড়েছিল? যাতে করে পরের দিন সকালে তার কোনও কাজকর্মের বা সূত্রের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে। কিন্তু সকালে হলেই বা ক্ষতি ছিল কি? ছিল—ডিকটাফোন নিয়ে যাওয়ার সময় সকলের চোখে ধরা পড়ত।

আমি বাধা দিলাম, কিন্তু ডিকটাফোনটা সরানোর কী এমন প্রয়োজন ছিল?

আপনি জানেন, সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়ও তাঁর ঘর থেকে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি ডিকটাফোনের মাউথপিসে এখন কিছু বললে এবং কিছু সময় পরে মেশিন চালালেই আবার সে-কথাটা শোনা যেতে পারে।

অর্থাৎ—।

হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি বলতে চাই, রাত্রি এগারোটার ঢের আগেই স্যার সূর্যপ্রসাদকে খুন করা হয়েছিল। রাত সাড়ে এগারোটার সময় তাঁর গলা ডিকটাফোনে শোনা গিয়েছিল, তার কারণ খুনি খুন করে চলে যাওয়ার আগেই মেশিনটা চালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অন্যকে ধোঁকা দিতে। এই সব থেকেই বোঝা যায়, খুনি সূর্যপ্রসাদের যথেষ্ট পরিচিত ও জানত যে সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোন কিনেছেন। তারপরে আসা যাক জানলার গায়ে পায়ের ছাপে। পায়ের ছাপ দেখে এবং তাজ হোটেলে সমরের কাদামাখা জুতো দেখে মনে হয়—জানলার পায়ের ছাপ সমরের হতে পারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে-রাত্রে সমরের পায়ে যে-জুতো ছিল সেটা তাজ হোটেলে পাওয়া জুতোর মতো একই প্যাটার্নের রবার সোল দেওয়া জুতো। কিন্তু হাসপাতালে সমরের পায়ের সেই জুতো ভালো করে দেখেছি, সে জুতোয় এতটুকুও কাদার দাগ ছিল না। অথচ সমরের ঘরে কাদামাখা জুতো পাওয়া গেল। কোনও লোকই একই প্যাটার্নের তিনজোড়া জুতো কিনতে পারে না। তা ছাড়া প্রমাণিত হয়েছে, সমর সে-সময় হোটেলের জুয়া-ঘরে জুয়া খেলায় মত্ত ছিল। এবং সমরকে আপনিই বলে দিয়েছিলেন যে, সে হাজারিবাগ যাচ্ছে সে-কথা যেন সেই রাত্রেই ফোনে আপনাকে জানায়। এতে মনে হয়, নিশ্চয়ই কেউ সমরের জুতো পায়ে দিয়ে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জুতো আবার তার ঘরে অন্যের অলক্ষ্যে রেখে এসেছে—তার ঘাড়ে খুনের দোষ চাপানোর জন্যে। এ থেকে এও প্রমাণিত হয়, খুনি সমরকেও বেশ ভালোভাবেই চিনত ও তার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এই সব কারণ থেকেই বোঝা যায়, খুনি এমন একজন লোক যে জানত মেক্সিকান ছোরাটা কোথায় আছে এবং যে স্যার সূর্যপ্রসাদের পরিচিত ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল, যে সূর্যপ্রসাদের সংসারের অনেক সংবাদই জানত, যে ডিকটাফোনের শুধু সংবাদই নয় তার ব্যবহারও বেশ ভালোভাবেই জানত এবং যার সঙ্গে ডিকটাফোনটাকে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বাক্স বা তেমন কিছু ছিল। তা হলেই বুঝুন খুনি কে? শুনুন ডাক্তার সেন, গোখরো সাপ নিয়ে খেলা করার চাইতে আরও ভয়ংকর কিরীটী রায়কে নিয়ে খেলা করা। এখন বুঝে দেখুন, এই সব কিছুর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কে—আপনি! হ্যাঁ—আপনি, ডাক্তার সেনই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

BanglaBook.org

পঁচিশ

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, কী বলছেন পাগলের মতো, মিস্টার রায়? শেষপর্যন্ত এই ধারণা হল আপনার যে সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শুনুন ডাক্তার সেন, পাগল আমি নই—আপনার জবানবন্দির মধ্যে সামান্য একটা সময়ের হেরফেরই সমস্ত রহস্য আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি অনেক দিনই আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম, শুধু সমস্ত প্রমাণের জন্যেই এবং আজকের রাতটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

সময়ের হেরফের!

হ্যাঁ। আপনি আপনার জবানবন্দিতে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেছেন, রাত সাড়ে দশটায় সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে আপনি বিদায় নেন, অথচ গেটের কাছে কমলের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, তখন রাত্রি এগারোটা বাজল গির্জার ঘড়িতে। ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে আসতে পাঁচ-ছ মিনিটের বেশি কারও লাগতেই পারে না, অথচ আপনার আধঘণ্টা লাগল। কেন? কী করছিলেন এই আধঘণ্টা সময়? কোথায় ছিলেন? তা ছাড়া, সূর্যপ্রসাদের নিহত হবার সংবাদ ফোনে পেয়ে কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়েই বা সে-রাত্রে 'লিলি কটেজে' গিয়েছিলেন কেন? মৃত ব্যক্তিকে ইনজেকশান দিতে বুঝি? ডাক্তার, নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছেন! ব্যাগটা না নিয়ে গেলে যে ডিকটাফোনটা আনতে পারতেন না এবং ঘরে ঢুকেই চেয়ারটা সরিয়ে রেখেছিলেন পাছে কারও নজরে পড়ে!

সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র, মিস্টার রায়!

কল্পনা নয় ডাক্তার, আপনি মস্ত বড় একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ঘরের কথাবার্তার মধ্যে মেজর পরে আমাকে বলেছিলেন তিনি নাকি আপনার কণ্ঠস্বরই শুনেছিলেন, তাতেই বোঝা যায় আপনি ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ওই ঘরে ঢোকেনি বা ওই সময়ে ছিল না।

মেজরের কথাই যে অভ্রান্ত সত্য তারই বা প্রমাণ কী? বললাম আমি।

নয় তা জানি। আর সেই কারণেই ডিক্‌টাফোনটা কৌশলে পরে আপনার বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে সেফ কাস্টোডিতে রেখে দিতে হয়েছে। যাক সে-কথা—let me finish! সে-রাত্রে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জানলা টপকিয়ে নীচে নেমে তাড়াতাড়ি তাজ হোটেলে গিয়ে সমরের জুতোটা সেখানে রেখে সাইকেলে চেপে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তারপর সেই রাত্রে তাজ হোটেলে গিয়ে সমরকে ভয় দেখিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলতেও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু হায়, এত করেও সব দিক বাঁচাতে পারলেন না। নিজের জবানিতেই ধরা দিলেন। দোষীর বিচার ভগবান এমন করে তাকে দিয়েই করান। আচ্ছা আসি—Good night! পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে করে শুধু বিড়ম্বনাই বাড়বে। তা ছাড়া ঘুমিয়ে নেই—সজাগ হয়েই আছেন মিস্টার পাণ্ডে।

কিরীটী অতঃপর ধীর মন্থর পদে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ডায়েরিটা শেষ করে যাওয়া দরকার।

আর কারও জন্যে না হোক, অন্তত মিতা—মিতার জন্যেও শেষ করে যাওয়া দরকার।

অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার।

সব—সব আজ স্বীকার করে যাব।

লোভের বশবর্তী হয়ে যে-মহাপাপ করেছি, নিজের মুখে স্বীকৃতি না রেখে গেলে তো মুক্তি নেই আমার।

মুক্তি!—হ্যাঁ মুক্তি—।

BanglaBook.org

লোভের আগুনে পুড়ে মরেছি। জগৎজীবনকে টিউবারকুলিন ইনজেকশন দিয়ে তাঁর পুরাতন টি. বি. রোগকে flare up করে তাঁকে হত্যা করেছি—পুলকজীবন, তার ভাইয়েরই পরামর্শে দশ হাজার টাকার লোভে। আর সমরই পুলকজীবনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। কিন্তু অর্থের নেশা আর পাপের নেশা যে কী ভয়াবহ পথ ধরে চলে তখন তো তা বুঝিনি। তাই সেই নগদ দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির পরও যখন দুর্দান্ত লোভের বশবর্তী হয়ে পুলকজীবনকে blackmailing করতে শুরু করলাম এবং শেষপর্যন্ত যখন বুঝলাম দোহন আর সহ্য না করতে পেরে সে বেঁকে দাঁড়াবার উপক্রম করছে তখন তাকেও পথ থেকে সরাতে বাধ্য হলাম ওই একই উপায়ে। তারও টি. বি. রোগ ছিল—তাকেও টিউবারকুলিন ইনজেকশন দিয়ে শেষপর্যন্ত হত্যা করলাম। তারপর ধরলাম সমরকে। সমরের সাহায্যে arsenic দিয়ে slow poisoning করতে শুরু করলাম সূর্যপ্রসাদকে।

কিন্তু হায়, তখন তো বুঝিনি, পাপ চিরদিন চাপা থাকে না। আর তাই বোধহয় মৃত্যুর পূর্বে পুলকজীবন তার বন্ধুকে সব জানিয়ে গেল একটা চিঠিতে এবং সেই বন্ধু চিঠি লিখে সব গোচরীভূত করল সূর্যপ্রসাদের।

পুলকজীবন সম্পর্কে কিরীটীর অনুসন্ধিৎসা দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হয়েছিল এবং সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হল সূর্যপ্রসাদের আমন্ত্রণ পেয়ে।

তাই প্রস্তুত হয়েই সূর্যপ্রসাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সে-রাত্রে। ওপরে যাওয়ার পূর্বেই সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘর থেকে চন্দনকাঠের বাক্সটা খুলে ছোরাটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে লুকিয়ে এবং সূর্যপ্রসাদের চিঠি পড়া শুরু হতেই বুঝলাম, অনুমান আমার মিথ্যা নয়—সব এবারে জানাজানি হয়ে যাবে।

আর রক্ষা নেই।

অনন্যোপায় হয়েই তাই সূর্যপ্রসাদকে সে-রাত্রে হত্যা করেছি।

কিন্তু হত্যা তো উত্তেজনার বশে অকস্মাৎ করে বসলাম, তারপর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, সহসা পাশেই টেবিলের ওপর নজরে পড়ল সূর্যপ্রসাদের সদ্যক্রীত ডিকটাফোনটা। দেখলাম সেটা নিঃশব্দে তখনও চলছে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল—মেশিনটাকে থামিয়ে আবার গোড়া থেকে চালিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ, আমিই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী।

কিন্তু সমর—সমর দোষী নয়, মিতা। তাকে তুমি যেন ভুল বুঝো না। তাকে তুমি গ্রহণ কোরো।

মিতা, ক্ষমা করিস ভাই তোর এই পথভ্রান্ত হতভাগ্য দাদাকে।

হ্যাঁ, ওই যে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট দেওয়াল আলমারিতে সাজানো সারি-সারি 'বিষ' লেখা ওষুধের শিশিগুলো।

বেলেডোনা, টিনচার ওপিয়াই, টিনচার হায়োসায়ামস, বারবিটোন, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, লুমিনল, সেকোনল সোডিয়াম, ভেরোনল—।

ঠিক, ভেরোনলই সবচাইতে ভালো। অনেক রাত ঘুমোইনি। একটু—একটু ঘুমোতে চাই। ঘুমোব—হ্যাঁ, ওই ভেরোনলই দেবে আমাকে ঘুম।

আঃ, ঘুম।

ঘুম—সত্যিই কি ঘুম আসছে?

BanglaBook.org

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট

BanglaBook.org

প্রণব রায়

শ সে. র. উ ২—১৪

প্রখ্যাত কৌতুকশিল্পী
শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজহর রায়

বন্ধুবরেষু,

ভাই ভানু ও জহর,

বাঙালির বিড়ম্বিত জীবনে তোমরা অনেক আনন্দের খোরাক যুগিয়েছ। তোমাদের কাছ থেকে অনেক পেয়ে একটুখানি দিতে চাই। আমার এই বইটি তাই তোমাদের উৎসর্গ করলাম।

পয়লা ফাল্গুন, ১৩৭২
কলকাতা

প্রণবদা

BanglaBook.org

পাঠক সমীপেষু,

হাসির গোয়েন্দা-গল্প বাংলায় লেখা হয়নি বললেই চলে। আমার এ গল্পে সেই প্রচেষ্টাই করেছি। ইংরেজিতে যাকে বলে slapstick comedy, এ গল্পও তাই। নিছক হাসি। যাঁরা গল্পে যুক্তি খুঁজবেন, তাঁরা ঠকবেন।

প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় আমার প্রিয় বন্ধু। আমি তাঁদের অনুরাগী। বহুতর চবিত্রে তাঁদেরকে আমরা দেখেছি, হেসেছি, কিন্তু বোকা গোয়েন্দার চরিত্রে কেউ বোধকরি কখনো তাঁদেরকে কল্পনা করেননি। আমি কল্পনা করেছি এবং সেই কারণেই তাঁদের নামও ব্যবহার করলাম। বলে রাখা ভালো, ভানু ও জহর ছাড়া এ গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলিও কাল্পনিক।

আমার এ গল্প পড়ে যদি আপনাদের হাসি পায়, আমার লেখার সার্থকতা সেইখানেই। যারা 'রামগরুড়ের ছানা', তাদের জন্য লিখিনি। ইতি—

প্রণব রায়

BanglaBook.org

প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য নিউ এম্প্রেস স্টেজে জলসা। রাত সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বোম্বে-বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ক অচল মুখার্জির প্রোগ্রাম সবার শেষে হওয়ায় আসর ভাঙতে দেরি হচ্ছে। মুগ্ধ ও ভক্ত শ্রোতাদের ফরমায়েশ মতো খানআষ্টেক গান পরিবেশনের পর অচল মুখার্জি নবম গানটি ধরেছে। এটি অচলের লেটেস্ট হিট। শুনতে-শুনতে শ্রোতারা প্রায় মরে যাচ্ছে। মরে অচল মুখার্জিও যাচ্ছে। শ্রোতাদের অনুরোধের জ্বালায়। এবং মরতে-মরতে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বার পাঁচেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইবার পর অচলকুমার গানটি শেষ করল। সঙ্গে-সঙ্গে অডিটোরিয়াম থেকে সরু মোটা হেঁড়ে মিহি নানাবিধ গলার চিৎকার।

'আর একখানা! আর একখানা!'

'রিকশার গানখানা দাদা—সেই "পিচ গলে যায় আগুন হাওয়ায়—"।'

'না, না, ওখানা নয়, সেই "দিলকো শিককাবাব বানায়া তেরে লিয়ে পিয়া—"।'

'আরে রাখেন মশায়, যা হৌক একখান হইলেই হইল!'

কিন্তু অচলকুমার ততক্ষণে হারমোনিয়াম ছেড়ে স্টেজের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনওমতে দর্শকদের একটা নমস্কার জানিয়েই সে উইংসের পাশে অদৃশ্য হল।

ব্যাক স্টেজের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অচলকুমার হনহন করে আসছে। কিন্তু বারান্দা পার হয়ে দোতলার লবির দিকে আসতেই অচলকুমার সত্যিই অচল হয়ে গেল। মুখ উঠল শুকিয়ে, বুক করতে লাগল গুরগুর। অটোগ্রাফের খাতা হাতে একদল মেয়ে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বয়েসে তারা সকলেই তরুণী। অচলকুমার জীবনে কখনও রয়াল বেঙ্গল বাঘিনী দেখেনি, কিন্তু তারা শাড়ি পড়লে যে হুবহু ওদেরই মতো দেখতে হবে, এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত।

অচলকুমারকে এগোতে হল না। প্রগতিশীলারাই গতি বাড়িয়ে দিলে। অচলের চারপাশে সপ্তরথীর ব্যূহ রচনা করে তারা খাতা এগিয়ে কলকণ্ঠে কলরব করে উঠল, 'কী অপূর্ব গাইলেন আজকে! স্টেজের ওপর যখন গাইছিলেন, আপনাকে দেবদূতের মতো দেখাচ্ছিল। সত্যি অচলদা, আপনি যে কী—মানে কত—।'

'জানেন অচলদা, রোজ রাতে ঘুমোবার আগে আপনার ছবির সঙ্গে আমি ইয়ে—মানে কত কথা বলি।'

'আচ্ছা অচলদা, আপনার গান এত চার্ম করে কেন বলুন তো? একেবারে জার্মের মতো বুকের মধ্যে—ওকী, কী হল আপনার?'

'মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?'

দু-হাতে পেটটা খামচে ধরে কাতর স্বরে অচলকুমার শুধু বলে উঠল, 'পেট—।'

তারপর হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মরিয়ার মতো অচলকুমার লবি দিয়ে ছুটতে লাগল। লবির পর একতলার সিঁড়ি, সিঁড়ির পর রাস্তা।

নিউ এম্প্রেস থিয়েটার থেকে শ'তিনেক গজ তফাতে একটা অন্ধকার নিরালা জায়গায় অচলকুমার তার গাড়ি রেখেছিল। যাতে তার ফ্যানদের চোখে সহজে না পড়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে হাঁপ ছাড়ল। ওঃ, সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া গেছে! অল্পবয়েসি মেয়েদের দেখলে জনপ্রিয় স্মার্ট অচলকুমারের কেন যে এত ভয় লাগে, কেন যে গা গুলিয়ে ওঠে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু ওঠে। ঠোঁটে রং-মাখা, বিনুনি দোলানো ন্যাকা মেয়েগুলো তার কাছে যেন রঙিন শাড়ির লেবেল আঁটা তেতো ওষুধের এক-একটা শিশি। বা রয়াল বেঙ্গল বাঘিনীর

BanglaBook.org

এক-একটি পিসি।

যাক, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে আজ। এবার আরাম করে একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে।

গাড়ি তখন পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়েছে। একটা সিগারেট মুখে গুঁজে লাইটারটা জ্বালাতেই অচল ভূত দেখে চমকে উঠল। ভূত গাড়ির সামনে নয়, পিছনে। রিয়ার গ্লাসে তারই ছায়া। চকিতে অচল পিছন ফিরে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িখানা মাতালের পায়ের মতো বেসামাল হয়ে উঠল। রাত বারোটার পর রাস্তা প্রায় ফাঁকা ছিল তাই রক্ষে।

অচল দেখলে, ব্যাক সিটের তলা থেকে কোঁকড়া কালো চুলে ঘেরা ফরসা একখানা মুখ আস্তে-আস্তে উঠছে। বড়-বড় কালো চোখে কিছু ভয়, কিছু কৌতূহল।

ভূত নয়, প্রেতিনী, তরুণী প্রেতিনী। অচলের গা ছমছম করে উঠল। তাজ্জব ব্যাপার! গাড়িতে উঠে যখন সে স্টার্ট দিল, তখন তো কেউ ছিল না। এই চলতি গাড়িতে প্রেতিনী কখন উঠে এল? কেমন করেই বা এল? কাছে-পিঠে শ্মশান তো নেই, তবু এল কী করে?

ঘ্যাঁস করে ব্রেক চেপে অচল রাস্তার বাঁ-দিকে গাড়ি কখল। প্রেতিনীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার দরকার। মনে-মনে তিনবার রামনাম জপ করে অচল সাহস সঞ্চয় করে নিল।

কিন্তু প্রেতিনীই আগে বললে, 'থামলেন কেন, চলুন?'

অচল সাহসে ভর করে জিগ্যেস করলে, 'কে তু—আপনি?'

অচলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, প্রেতিনী হলেও সে লেডি। সম্মান রেখে কথা বলা উচিত।

ছোট্ট জবাব এল, 'কেউ না। আপনি চলুন।'

অচলের চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে উঠল। বললে, 'কেউ না ? তবে কি আপনি সত্যিই প্রে—প্রে—।'

খিলখিল হাসির সঙ্গে শোনা গেল, 'না, না, ভয় পাবেন না, আমি প্রেতিনী নই। আমি নূপুর—নূপুর চ্যাটার্জি।'

'চলতি গাড়িতে উঠলেন কী করে?'

'চলতি গাড়িতে উঠব কেন? আগেই লুকিয়ে ছিলাম পিছনের সিটের পা-দানিতে—।'

BanglaBook.org

'লুকিয়ে ছিলেন? কেন?'

'একটা রাতের আশ্রয়ের জন্যে।'

অচলের এবার ভয় থেকে রাগ হল। বললে, 'আমার গাড়িটা কি গ্র্যান্ড হোটেল? আপনার চালাকি আমি বুঝতে পারছি না, ভাবছেন? যান, নেমে যান। মেয়েদের আমি পছন্দ করিনে।'

নূপুরের দুই চোখে অনুনয় দেখা দিল। বললে, 'রাগ করছেন কেন? একা মেয়ে আমি, এত রাতে কোথায় যাব বলুন? আপনাকে দেখে তো শিক্ষিত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। দয়া করে একটু আশ্রয়—।'

বিষম রেগে গেল অচল। বললে, 'আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম তো। আপনাকে চিনি না, জানি না, কোথায় নিয়ে যাব?'

মিনতি করে নূপুর বললে, 'যেখানে হয়—রাতটা নিরাপদে কাটাবার মতো কোথাও নিয়ে চলুন।'

'না, আমি যাব না। আপনি নেমে যান।'

হঠাৎ পিছনদিকে তাকিয়ে নূপুর ভীত গলায় বলে উঠল, 'শিগগির চলুন, প্লিজ, আমার বড় বিপদ—।'

দেখা গেল, দূরে আর একখানা গাড়ির হেড লাইট ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

অচল বললে, 'বিপদ? কী বিপদ?'

রুদ্ধশ্বাসে নূপুর বলে উঠল, 'গোয়েন্দা তাড়া করেছে আমায়—সেই সন্ধে থেকে।'

চমকে উঠে অচল বললে, 'গো—গোয়েন্দা! খুন-টুন করেছেন নাকি?'

'না-না, খুন করব কেন? পরে সব বলব। আপনি শিগগির চলুন। ওরা দেখতে পেলেই আমায় ধরবে। আর ভাববে আমাকে নিয়ে আপনি পালাচ্ছেন।'

'অ্যাঁ! আপনাকে নিয়ে পা—পা—পালাচ্ছি?'

অচলের হঠাৎ ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে গেল। পিছনের হেড লাইট ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে। অচলের কাঁধে সজোরে নাড়া দিয়ে নূপুর বলে উঠল, 'ওই ওরা এসে পড়ল! স্টার্ট দিন গাড়িতে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই অচল টপ গিয়ার ঠেলে দিল। পিছন থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'গাড়ি থামাও বলছি—স্টপ। স্টপ।'

কিন্তু অচলের অস্টিন কেমব্রিজ যেন হাওয়ায় উড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর ঠিক পরের মুহূর্তে অচলের গাড়ির জায়গায় উনিশশো উনত্রিশ সালের একখানা ফোর্ড এসে দাঁড়িয়ে সশব্দে হাঁফাতে লাগল।

অস্টিন কেমব্রিজখানা এসে পৌঁছল যোধপুর পার্কের রাস্তায়। তিনতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। অচল বললে, 'আর তো গোয়েন্দার ভয় নেই। এখন আপনি আসুন।'

নূপুর বললে, 'তাড়িয়ে দেবেন তো আনলেন কেন জানি?'

'বাঃ! আমি আপনাকে আনলাম, না আপনি আমাকে আনলেন?'

'আপনিই তো আনলেন।'

হাতজোড় করে অচল বললে, 'ঘাট হয়েছে আমার। এবার দয়া করে নেমে যান।'

অসহায় গলায় নূপুর বললে, 'এত রাতে—একা—কোথায় যাব?'

'উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম যেদিকে খুশি যান। গ্যারেজে গাড়ি রেখে আমি এখন ঘরে যাব।'

'আপনার গ্যারেজেই না হয় আজকের রাতটা থাকতে দিন।'

BanglaBook.org

'বাঃ। বেশ বললেন তো। কাল ভোরে আমার ক্লিনার এসে যখন গ্যারেজ খুলবে, তখন? সোজা থানায় গিয়ে ধরা দিন।'

'বিশ্বাস করুন, আমি চোর, ডাকাত বা খুনে নই।'

'আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আমার মাথা অত নিরেট নয়। আচ্ছা বেশ, থানায় যেতে না চান, হাসপাতাল খোলা আছে। সেখানে গদিওলা বিছানাও পাবেন। আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। জানেন, আমাব নিশ্বাসেব সঙ্গে ছাই বেরিয়ে আসছে?'

নূপুর হাঁ করে তাকিয়ে বললে, 'ছাই। কেন?'

তেতো গলায় অচল বললে, 'কেন আবার। রাত একটা বাজে। খিদের চোটে পেটের নাড়ি জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।'

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নূপুর জোরে হেসে ফেলল। একরাশ রুপোর ঘণ্টাধ্বনির মতো মিষ্টি খিলখিল হাসি। আর তখুনি দোতলার একটা অন্ধকার জানলায় টুপ করে আলো জ্বলে উঠল। দেখা দিল গ্লোবের মতো গোল একখানি মুখ। আলো পিছনে থাকায় মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না, শুধু টাকের পালিশ চকচক করতে লাগল। এবং শোনা গেল হাসি-খুশি মোটা গলার কথা : 'বউরে লইয়া আইলেন নাকি, অচলবাবু? বালো, বালো। ফাল্গুন মাস পরসে, বউরে আর কয়দিন বাপের বাড়িতে রাখন যায় ? দারান, আমি সদর খুইলা দিতে আছি!'

গ্লোবের মতো গোল মুখখানি জানলা থেকে অপসৃত হল।

অচলের কপালে তখন বিনবিন করে ঘাম দেখা দিয়েছে। মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরোল, 'সর্বনাশ!'

ফিসফিস করে নূপুর বললে, 'কী হল?'

'কাল সকালে মুখ দেখাব কেমন করে?' অচলের গলাটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল।

নূপুর টপ করে গাড়ি থেকে বললে, 'উনি দরজা খোলার আগেই আমি বরং পালিয়ে যাই।'

অচল খপ করে নূপুরের হাত ধরে ফেলল। চাপা গলায় পাগলের মতো বলে উঠল, 'না, না, পালাবেন না, পালিয়ে আর কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।'

ঘটাং করে একটা শব্দ। সদর দরজা খুলে গ্লোবের মতো সেই মুখ সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসেন, আসেন।'

যন্ত্রচালিতের মতো অচল গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলল। তারপর অমায়িকভাবেই বলার চেষ্টা করলে, 'ধন্যবাদ, দুন্দুভিবাবু। আপনি শুয়ে পড়ুনগে, আমি গ্যারেজে গাড়ি তুলে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

কিন্তু দুন্দুভিবাবুর শোওয়ার কোনও তাড়া দেখা গেল না। দরজা থেকে খানিক এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বলতে লাগলেন, 'রাত দুপুরে আপনাগো হাসি-মশকরা শুইনাই বুঝছি যে বউ লইয়া আইলেন। আরে মশয়, পরিবার ছাড়া পুরুষ আর পাইলট ছাড়া প্লেন—সমান। কখন কোথায় গোঁৎ খাইয়া পড়ব, তার কিছু ঠিক আছে?'

নিজের রসিকতায় দুন্দুভিবাবু নিজেই দুন্দুভিনিনাদ করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভেতরে চলেন। শ্রীমতী আর কতক্ষণ খাড়াইয়া থাকবেন।'

অচল গ্যারেজ খুলে গাড়ি তুলল। তারপর বন্ধ করে সদর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে মোলায়েম গলায় নূপুরকে বললে, 'কই, এসো—।'

নারীজাতের জন্মগত সংস্কারের বশেই বোধহয় নূপুর আঁচলটা মাথায় তুলে দিল।

অচলের ফ্ল্যাট তেতলায়। দরজার সামনে এসে নূপুর বললে, 'ভয় করছে।'

অচল রাগতভাবে বললে, 'এখানে ভয়টা কীসের?'

'আপনার বাড়ির লোকজন—মানে, আপনার স্ত্রী যদি—।'

দরজা খুলে ঢুকে নূপুর বললে, 'ঝগড়া করে সত্যিই বাপের বাড়িতে গেছেন বুঝি?'

'কী বাজে বকছেন? মাথা নেই তার মাথা-ব্যথা! ভণ্ডুল চাকর ছাড়া কেউই এখানে থাকে না—তাও সন্ধের পর সে চলে যায়।'

নূপুর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লে।

শোওয়ার ঘরটা দেখিয়ে অচল বললে, 'যান, শুয়ে পড়ুনগে; আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'খাবার কোথায়? খাবেন কী?'

বসবার ঘরের একধারে ডাইনিং টেবিলের ওপরে ঢাকা দেওয়া খাবার দেখিয়ে অচল বললে, 'ভণ্ডুল যা রেখে গেছে।'

নূপুর সেদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'একা-একা খেলে আপনাব পাপ হবে।'

'তার মানে?'

'আমার বুঝি খিদে পায় না? দুপুরেও আজ খাওয়া হয়নি!'

অচল দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে বললে, 'এইজন্যেই মেয়েদের আমি পছন্দ করি না! সব কিছুতেই তারা ভাগ বসাতে চায়; গাড়ি করে আনব, আশ্রয় দেব, খেতে দেব—এতখানি দাসত্ব আমার পোষায় না।'

'আপনার পোষাতে হবে না, থাক।'

নূপুর শোওয়ার ঘরের দিকে এগোল।

অচল বললে, 'ওঃ, রাগটুকু আছে ষোলো আনা।'

নূপুর ততক্ষণে শোওয়ার ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

এ-ঘর থেকে অচল চেঁচিয়ে বললে, 'খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো টেবিলে এসে বসা হোক।'

অচল তোয়ালেখানা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে বেরিয়ে এসে দেখলে, নূপুর আসেনি। ভিজে মাথা মুছতে-মুছতে শোওয়ার ঘরে উঁকি মেরে দেখে, জানলার ধারে নূপুর পিছন ফিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। দরজার গোড়া থেকেই অচল হেঁকে বললে, 'সাধাসাধি করতে পারব না বলছি—আমার পেটে আগুন জ্বলছে।'

মুখ না ফিরিয়েই নূপুর জবাব দিলে, 'আপনি খেয়ে নিন।'

রেগে গিয়ে অচল বললে, 'আমি একা খেলে আপনার নজর লাগবে না? তারপর কলেরা হয়ে মরি আর কি!'

নূপুর হেসে ফেলে বললে, 'এই বয়েসেও নজর লাগার ভয়?'

অচল জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই! মেয়েদের নজর সাঙ্ঘাতিক!'

BanglaBook.org

কী করে জানলেন? নূপুর বললে, 'আপনার ওপর নজর লেগেছিল বুঝি কখনও?'

'কখনও! অনবরত লাগছে—পথে-ঘাটে, সিনেমা-হোটেলে সর্বত্র। চলুন, খাওয়ার টেবিলে চলুন।'

সেই রাতেই—।

শহরের উত্তরাঞ্চলে এক জনবিরল পাড়ায় সেই উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ডগাড়িখানা হাঁসফাঁস করতে-করতে একখানা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং-এর সামনে লম্বা রোগাটে চেহারার স্যুট-পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। মুখে ধূমায়িত একটা প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুট। কপালের দুই ভুরুর মাঝখানে বিরক্তির একটা বিছে যেন কামড়ে বসে আছে। তিরিক্ষে গলায় লোকটি বললে, 'নেমে পড়, জহর।'

জবাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বার দুয়েক আওয়াজ হল শুধু। লোকটি এবার পাশে তাকাল। জহর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাথায় খাটো, স্থূলাকার—প্রকাণ্ড একটা বেলুনকে যেন স্যুট পরানো হয়েছে। সুখ-নিদ্রায় ভুঁড়িটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে।

ফোর্ডগাড়ির চালক চাপা গর্জনে শুধু বললে, 'ক্যাডাভ্যারাস কুম্ভকর্ণ!'

তারপর মুখ থেকে ধূমায়িত চুরুটটা নামিয়ে সুখসুপ্ত জহরের নাকের নীচে ধরলে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই বিরাট একটা হাঁচির শব্দে ঝড়ঝড়ে ফোর্ডগাড়িখানা থরথর করে উঠল। চোখ রগড়ে জহর বলে উঠল, 'আঃ, চোখ বুজে একটা প্ল্যান ভাবছিলাম, দিলে সব ভেস্তে। কেন যে চুরুট খাস ভানু!'

তিরিক্ষে গলায় জবাব এল, 'থাম। রবার্ট ব্রেক চুরুট খেত, জানিস? ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে ভালো চুরুট খেতেই হবে।'

ব্যক্তি দুটি কে, এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন ? একজন বিখ্যাত ভানু গোয়েন্দা, অপরজন তার সহকারী জহর। বলা বাহুল্য দুজনেই শখের গোয়েন্দা। এতবড় দুই প্রতিভাকে সরকারি

BanglaBook.org

গোয়েন্দা-বিভাগে রাখতে সরকার ভরসা করেনি।

আশ্চর্য এদের প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য এদের বুদ্ধি। এমনকী এদের বাসস্থানটিও অদ্ভুত—লোহার শিক-লাগানো কয়েকটা জানলা ছাড়া বাড়িতে কোথাও দরজা নেই।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে ভানু পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে বাড়ির ছাদে আলো ফেললে। দেখতে-দেখতে মই নেমে এল। সেই মই বেয়ে উঠতে-উঠতে ভানু বললে, চোরই বল, আর আততায়ীই বল, ব্যাটারা ভারি জব্দ হয়েছে। বাড়িতে দরজাই তৈরি করিনি—আয়, কোথা দিয়ে আসবি!

জহর গদগদ হয়ে বললে, 'সত্যি, কী ব্রেন তোর, ভানু!'

দুজনে ছাদে ওঠার পর মইখানা টেনে নেওয়া হল। যে লোকটি টেনে নিল, সে হচ্ছে ভানুর বিশ্বস্ত চাকর ঘণ্টাকর্ণ।

ভানু বললে, 'আর এই ঘণ্টাকে রেখেছি কেন, জানিস?'

জহর বললে, 'কেন?'

'বুঝতে পারলি না? ঘণ্টা হচ্ছে বোবা এবং কালা—আমাদের প্ল্যান বা গুপ্ত-খবর কিছুতেই শত্রুপক্ষকে জানাতে পারবে না!'

বিগলিত হয়ে জহর বলে উঠল, 'ওঃ, তুই শার্লক হোমসের ওপরে গেছিস, ভানু!'

ছাদের মাঝখানে আংটা লাগানো লোহার একখানা চৌকো পাত। ভানু আংটা ধরে টানতে পাতটা সিন্দুকের ডালার মতো উঠে এল—ভেতরে একসারি সিঁড়ি। দুজনে নেমে গেল। তাদের পিছনে নামল ঘণ্টাকর্ণ। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল চৌকো লোহার দরজা।

খাওয়া-দাওয়ার পর নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে চিন্তিত-মুখে ভানু বললে, 'এখন কী করা যায়?'

হাতের আড়াল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে জহর বললে, 'ঘুমোনো যাক।'

চুরুটটা দাঁতে চেপে ভানু বলে উঠল, 'রাবিশ! এতবড় একটা কেস হাতে ঝুলছে, আর তুই বলছিস ঘুমোতে! গোয়েন্দার চোখে ঘুম আসে? রবার্ট ব্লেক মাসে ক'রাত্তির ঘুমোত, জানিস? মোটে দু-রাত্তির!'

অমায়িক হেসে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন?'

পকেট থেকে একমুঠো রাংতা-মোড়া চকোলেট বের করলে জহর। একটা মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই চকোলেটগুলোতে কী মিশিয়েছি জানিস?'

'কী?'

'অ্যান্টি স্লিপিং ডোজ। ঘুম তাড়াবার ওষুধ। ব্যস, আর ঘুম আসবে না।'

ভানু টেবিলের ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজের একটা কাটিং বের করে আনলে। কাগজের অংশটুকুতে অল্পবয়সি একটি সুরূপা মেয়ের ছবি ছাপা। ছবির নীচে যা লেখা, ভানু সেটা পড়ল। এইবার নিয়ে তিয়াত্তরবার পড়া হল।

নূপুর চ্যাটার্জি নামে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে দিল্লি হইতে নিখোঁজ হইয়াছে। রং চৌদ্দ ক্যারেট সোনার ন্যায় গৌর, দোহারা গড়ন, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, চিবুকের ডানদিকে তিল, বাম ভুরুতে ঈষৎ কাটার দাগ।

জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার।

ডাঃ দিগম্বর চ্যাটার্জি,
দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি

BanglaBook.org

জহরের সামনে কাগজের কাটিংটা ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ তো এই মেয়ে কি না।'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার কয়েক দেখে জহর গম্ভীর মুখে বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

ভানু প্রশ্ন করলে, 'তা হলে একেই তুই রেনবো কাফেতে দেখেছিলি?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'কী দেখেছিলি, ঠিক করে বল তো।'

'তেইশবার বলা হয়ে গেছে, এইবার নিয়ে চব্বিশবার হবে। হগ মার্কেটের পাশে তোর গাড়িখানা রেখে তুই নেমে গেলি শার্লক হোমসের বই কিনতে, আর আমি ঢুকলাম রেনবো কাফেতে কবিরাজি কাটলেট খেতে। ফার্স্ট ক্লাস বানায় ওরা! চোখ বুজে গোটা কাটলেটটা সবে মুখে পুরেছি, এমন সময় খিঁক করে একটা আওয়াজ কানে এল। চোখ মেলে দেখি, সামনের টেবিলে...ওঃ, সে কী বলব ভানু—একখানা বিউটি!'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাখ তোর বিউটি। কী হল বল।'

জহর বলতে লাগল, 'দেখলাম, খান কয়েক স্যান্ডউইচ আর এককাপ কফি নিয়ে বসে নীল শাড়ি-পরা একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খিঁক-খিঁক করে হাসছে। দেখে ভাই, কাটলেট চিবোতে ভুলে গেলাম।'

'ভুলে গেলি!'

'গেলাম। মনে হল, মুখখানা চেনা-চেনা, দেখা-দেখা; তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এই কাটিংটা বের করে মিলিয়ে দেখি, এই তো পলাতকা নূপুর চ্যাটার্জি!'

'ঠিক দেখলি?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'চিবুকের ডানদিকে তিল ছিল?'

'বোধহয়।'

'বাঁ-ভুরুতে কাটার দাগ?'

'হয়তো।'

তিরিক্ষে গলায় ভানু উঠল, 'বোধহয়! হয়তো! তবে শিওর অ্যান্ড সার্টেন কী দেখলি?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'তার বিউটি।'

'রাবিশ! বল তারপর কী হল।'

'আমাকে একবার কাটিং-এর দিকে, একবার তার দিকে চাইতে দেখে, মেয়েটা—মানে নূপুর চ্যাটার্জি, চট করে ঘুরে বসল, আর আড়ে-আড়ে চাইতে লাগল আমার দিকে।'

'তুই তখন কী করলি?'

'কাটলেটখানা কোঁৎ করে গিলে ফেলে, আমি তক্ষুনি তোকে ডাকতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, শুধু দেড়খানা স্যান্ডউইচ আর আধকাপ কফি পড়ে আছে—নীলবসনা সুন্দরী হাওয়া।'

দাঁতে চুরুট চেপে ভানু বলে উঠল, 'ইস, কী চান্সই মিস করলি! আমাকে ডাকতে না গিয়ে মেয়েটাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারলি না?'

'কী করে আটকাব?'

'কী করে আবার! আলাপ জমিয়ে।'

'তাই ভেবেছিলাম; কিন্তু বলব কী ভাই, মেয়েটাকে দেখা-ইস্তক আমার বুকের ভেতর, "কাম সেপ্টেম্বরের" মিউজিক বাজছিল।'

রাগে ভানু প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'থাম! ক্যাডাভারাস কোথাকার!'

BanglaBook.org

কাঁচুমাচু মুখে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন? আমার কপালই মন্দ।'

'তারপর?'

'তারপর রেনবো কাফে থেকে বেরিয়ে মেয়েটাকে রাস্তায় খুঁজতে বেরোলাম। আমায় দেখেই সে ছুটে একটা প্রাইভেট মোটরে উঠে পড়ল। আমার ভুঁড়ির ওয়েট বেশি, তাই তোকে বললাম গাড়ি চালিয়ে ফলো করতে, কিন্তু তোর গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। যদি বা স্টার্ট নিল, চলতে চায় না। আর যদি বা চলল, দু-ফার্লং গিয়েই হেঁপো রুগির মতো হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে নূপুর চ্যাটার্জি হাওয়াগাড়ি চেপে আবার হাওয়া।'

ভুরু কুঁচকে ভানু প্রশ্ন করলে, 'গাড়ির নম্বরটা নিয়েছিস?'

'শিওর। ব্লেকের যেমন স্মিথ, ভানু গোয়েন্দার তেমনি জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

'কত নম্বর?'

'০১০৯।'

এতক্ষণে ভানুর কোঁচকানো ভুরু সরল হল। খুশি-খুশি মুখে বললে, 'সে তো বিখ্যাত গায়ক অচল মুখার্জির গাড়ি। যাক, একটা ক্লু পাওয়া গেল। ডাঃ দিগম্বর চ্যাটার্জির পঁচিশ হাজার টাকা আমাদেরই কপালে নাচছে রে, জহর। পঁচিশ হাজার টাকা। অর্ধেক রাজত্ব বললেই হয়!'

গদগদ হয়ে জহর বললে, 'অর্ধেক রাজত্ব তুই নিস, ভানু, রাজকন্যাটি যেন আমার ভাগ্যে পড়ে।'

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে ভানু বললে, 'রাজকন্যার শখ। হিপোপটেমাসের মতো ওই ভুঁড়ি নিয়ে!'

সলজ্জভাবে জহর বললে, 'কেন, পাত্র হিসেবে আমি কি মন্দ? দিনকতক ডায়েটিং করে ভুঁড়িটা না হয় কমিয়ে ফেলব।'

চুরুটটা আবার দাঁতে চেপে ভানু বললে, 'হোপলেস!'

ঠিক সেই সময় খাওয়ার টেবিলে বসে নূপুর চ্যাটার্জি ওই একই কথার পুনরুচ্চারণ করলে, 'হোপলেস!'

'কী?'

'রান্না।'

একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে অচলকুমার বললে, 'অথচ খাবারের ডিশগুলো তো চেটেপুটে আরশি বানিয়ে ফেলেছেন দেখছি! মেয়েরা এমনই অকৃতজ্ঞ বটে! পথ থেকে এনে আশ্রয় দিলাম, নিজের ভাগ থেকে খেতে দিলাম, প্রতিদানে শুধু নিন্দে!'

'বেশ, প্রতিদানে কাল আমি রান্না করে খাওয়াব!'

হাত-জোড় করে অচল বলে উঠল, 'রক্ষে করুন। মেয়েদের আলিসি আমার জানা আছে। প্রথমে রাঁধুনি হতে চায়, তারপর গিন্নি।'

হেসে ফেলে নূপুর বললে, 'তাও জানেন? মেয়েদের বিষয় আপনার অসীম জ্ঞান দেখছি। কিন্তু আমার দিক থেকে সে ভয় নেই!'

বিরস মুখে অচল বললে, 'মেয়েদের বিশ্বাস কী?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না?'

'না।'

'কেন?'

'আপনি সাংঘাতিক সুন্দরী। আমার ভয় করে।'

BanglaBook.org

'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেও শেখেননি!' —মুখ লাল করে নূপুর উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

অচলের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল শুধু। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, অচল উঠে গিয়ে একটা সোফার ওপর আড় হল।

দুই

আচমকা কলিংবেলটা ঘুমন্ত কানে যেন ঠাস করে চড় মারলে।

মুখময় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সোফার ওপর অচল ওপাশ ফিরে শুল। কিন্তু কী জ্বালা, কলিংবেলটা আবার তারস্বরে ডাকাডাকি শুরু করল।

অগত্যা উঠতেই হল অচলকে। জানলাটা খুলে দিতেই ভোরের আলো যেন হাসি মুখে গুডমর্নিং জানালে। কিন্তু অচলের বিরক্তি বেড়েই গেল। ইস, সবেমাত্র ভোর। আরও ঘণ্টাখানেক দিব্যি ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। কোন হতভাগা এল কে জানে। নিশ্চয় ইনসমনিয়াব রুগি। নইলে, কাক ডাকার আগে কেউ ভদ্রলোকের বাড়িতে ডাকাডাকি করে!

কোঁচকানো ভুরু আর ঘুম-জড়ানো রাঙা চোখ নিয়ে অচল ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ থেকে ঘুম ছেড়ে গেল।

বিচিত্র দুটি মূর্তি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। একজন লম্বাটে লিকলিকে, আরেকজন খাটো ভুঁড়িদার। দুজনেরই পরনে স্যুট। একজনের ঢলঢলে, আরেকজনের আঁটো-সাঁটো ফাটো-ফাটো। একজনের চোখে তিরিক্ষে চাউনি, আরেকজনের মুখে কান-এঁটো-করা হাসি।

দুরকম আওয়াজে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নমস্কাব!'

অচলের কাছ থেকে ভারী গলায় প্রত্যুত্তর এল, 'নমস্কার।'

লম্বাটে বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। চলুন, বসা যাক।'

নেহাত ভদ্রতার খাতিরে অচলকে দরজা ছেড়ে ভেতরে সরে দাঁড়াতে হল। আগন্তুক দুজন ঘরে ঢুকে সোফায় বসলে।

লম্বাটে বললে, 'ভালো আছেন তো?'

সঙ্গে-সঙ্গে অমায়িক হেসে খাটো বললে, 'ভালো ঘুম হয়েছে?'

অচলের সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। চেপে গিয়ে শুধু বললে, 'হুঁ। কী চাই আপনাদের?'

লম্বাটে একটা চুরুট ধরিয়ে বললে, 'একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

সঙ্গে-সঙ্গে খাটো যোগ করলে, 'প্রাইভেট!'

'আমার সঙ্গে?' —অচলের মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

'ইয়েস জেন্টলম্যান, আপনারই সঙ্গে।' —লম্বাটে বললে।

খাটো হাসি-হাসি মুখে বললে, 'আপনিই তো বিখ্যাত গাইয়ে অচল মুখার্জি? আপনার গান—।'

এতক্ষণে বোমার মতো ফেটে পড়ল অচল, 'গান! হবে না—পারব না—গাইব না। টাকা দিলেও গাইব না। জলসা আর ফাংশন, ফাংশন আর জলসা করে-করে আমার দিনে খাওয়া নেই, রাতে ঘুম নেই—লাইফ মিজারেবল! আমার কাশি হয়েছে, ফ্যারেঞ্জাইটিস হয়েছে, ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে! যান, আপনারা আসুন।'

অচল দম নিতেই খাটো বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'ডেঞ্জারাস! গানের নাম শুনে একেবারে মেশিনগান চালিয়ে দিলেন!'

BanglaBook.org

লম্বাটে তার গলাকে কিছুটা মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললে, 'আপনি বৃথা চটছেন, জেন্টলম্যান, গানের জন্যে আমরা আসিনি এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে।'

'অন্য ব্যাপার! কী?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভানু-গোয়েন্দার নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'দেখেছেন?'

'না।'

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে ভানু সগর্বে বললে, 'এই দেখুন।'

হাসি-হাসি মুখে জহর বলে উঠল, 'আর এই দেখুন, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট জহর।'

অচলের ঠোঁট দুটো ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। সেই অবস্থায় সেকেন্ড কয়েক থেকে বললে, 'কিন্তু আমার এখানে গোয়েন্দা কেন?'

সোফায় আরাম করে হেলান দিয়ে ভানু বললে, 'সেটা আপনিই বুঝে দেখুন।'

'তার মানে? কী বলতে চাইছেন?'

আবার সোজা হয়ে বসল ভানু। চতুর গোয়েন্দার মতো চতুর চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মিস নূপুর চ্যাটার্জিকে চেনেন নিশ্চয়?'

এক মুহূর্তের জন্যে অচলের দেহের রক্তস্রোত সত্যিই অচল হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই অচলের মনে সন্দেহ, আশঙ্কা, আতঙ্ক প্রভৃতি নানা উৎকট ভাবের খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে অচল। মুখ-চোখে যতটা সম্ভব বিস্ময় ফুটিয়ে বলে উঠল, 'নূপুর চ্যাটার্জি। কই, না।'

'চেনেন না?'

'আজ্ঞে না। কে তিনি?'

'দিল্লির ডাক্তার দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে।'

জহর যোগ করল, 'পরমাসুন্দরী।'

অচল বললে, 'আমি কলকাতার মানুষ। ব্যাচিলার। মেয়েছেলেই আমার ধাতে সয় না, তায় আবার দিল্লিওয়ালি! ভুল হয়েছে আপনাদের।'

ভানুর মুখখানা আবার তিরিক্ষে হয়ে উঠল। চিমনির মতো চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'মিথ্যে লুকোবার চেষ্টা করবেন না, অচলবাবু, আমি সব জানি।'

ঘাবড়ে গেল অচল। বললে, 'জানেন! কী জানেন?'

'যা ঘটেছে। নূপুর চ্যাটার্জি এবং আপনি পরস্পরের "লভে" পড়েন। কিন্তু ডাক্তার দিগম্বর আপনাদের বিবাহে আপত্তি করায় মেয়েটি দিল্লি থেকে পালিয়ে আসে এবং আপনি তাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছেন। কেমন, ঠিক কি না?'

অচল বললে, 'বাঃ, দিব্যি একখানা উপন্যাসের প্লট বানিয়ে ফেলেছেন তো।'

ভানু এবার প্রায় ধমকে বললে, 'অস্বীকার করতে পারেন, গত রাত্রে এক নীলবসনা সুন্দরীকে নিয়ে আপনি মোটর হাঁকিয়ে পালাচ্ছিলেন?'

উত্তরে অচল শুধু বললে, 'মাথা খারাপ!'

ভানু এবার সোফা থেকে সোজা উঠে এল অচলের সামনে। একচোখ ছোট করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বললে, 'ভানু-গোয়েন্দার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়, জেন্টলম্যান! রবার্ট ব্লেককে আমি গুলে খেয়েছি। ভালোয়-ভালোয় নূপুর চ্যাটার্জিকে বের করে দিন।'

'বের করে দেব, মানে?' —অচল এবার রাগ দেখিয়ে বললে, 'আপনাদের কি ধারণা, আমি তাকে ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছি?'

BanglaBook.org

গম্ভীর মুখে ভানু বললে, 'ট্যাঁকে নয়, আপনার এই ফ্ল্যাটে।'

জহর যোগ করলে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

অচল বললে, 'কেন ঝামেলা করছেন, স্যার ? হারমোনিয়াম আছে, তানপুরা আছে, কিন্তু নূপুর-টুপুর এখানে নেই।'

'নেই ?'

'আজ্ঞে না।'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। পাশের ঘর থেকে সরু মিষ্টি মেয়েলি গলার গান ভেসে এল ঃ

'এ-দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?'

মুগ্ধ হয়ে গেল অচল। তারপরেই নিমেষে হিম হয়ে গেল তার রক্ত। সব মাটি করে দিলে বুঝি নূপুর, বজ্জাত মেয়েটা গান গাইবার আর সময় পেল না!

আর, গান শুনতে-শুনতে ভানুর তিরিক্ষে মুখে একটু-একটু করে সন্দেহের ছায়া দেখা দিল। একটা চোখ ছোট করে প্রশ্ন করলে, 'কে গায় ?'

মরিয়া হয়ে অচল বলে ফেলল, 'রেডিও।'

হাসি-হাসি মুখে জহর বলে উঠল, 'কেন ব্লাফ দিচ্ছেন, স্যার ? স্পষ্ট বুঝতে পারছি পাশের ঘরে খোশমেজাজে কে গাইছেন!'

'পাশের ঘরটা আমরা সার্চ করব।'—ভারী গলায় ভানু বললে।

অচলের হৃৎপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, 'স্—স্—সার্চ!'

'ইয়েস জেন্টলম্যান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাশের ঘবে যিনি গাইছেন, তিনি নূপুর চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেউ নন।'

'আঃ, বলছি রে—রে—রেডিওতে গান হচ্ছে!'

'বেশ তো, দেখাই যাক না কে গাইছে।'

শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে ভানু এগোল। সঙ্গে-সঙ্গে স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল অচল। তার মনের পরদায় সিনেমাব 'মনতাজের' মতো পরপর কতকগুলো ছবি খেলে যাচ্ছে—থানা, পুলিশ, আদালত, খবরের কাগজে বড়-বড় হেডলাইন! যেন বিকারের ঘোরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, এ-ঘরে ঢুকেছেন কি একটি ঘুষিতে নক-আউট!'

ভীষণ চমকে উঠে জহর বললে, 'নক-আউট!'

'আলবত! সাড়ে তিন বচ্ছর আমি বকসিং লড়েছি—এই দেখুন আমার বাইসেপ!'

অচলের চওড়া হাতের দিকে তাকিয়ে জহর বললে, 'বকসিং আমরাও জানি, কিন্তু লড়ব না। চলে আয়, ভানু।'

ভানু বললে, 'অলরাইট! গুডবাই!'

কিন্তু এক পলকের মধ্যে দুজনের চোখে চোখে কী যে ইশারা হল, জহর দু-হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে কাতরে উঠল, 'ওঃ!'

তারপর প্রচণ্ড হাঁপাতে-হাঁপাতে বসে পড়ল সোফার ওপর।

হতভম্ব হয়ে অচল [illegible] হল?'

'[illegible]নার।' —ভানু উত্তর দিলে।

রীতিমতো ঘাবড়ে গেল অচল। বললে, 'বলেন কী! বলেন কী! মরে যাবে নাকি?'

রুমাল নেড়ে জহরকে বাতাস-করতে করতে ভানু বললে, 'যেতেও পারে। নারীর কথা শুনলেই

BanglaBook.org

ওর করোনারি অ্যাটাক হয়। ঠান্ডা জল আছে? শিগগির এক গেলাস জল দিন—।'

দরজা ছেড়ে অচল প্রায় ছুটে গেল ঘরে জলের সোরাইয়ের কাছে। আর সেই সুযোগে ভানু হুড়মুড় করে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে গেল পাশের ঘরে। ভানুর পিছু-পিছু করোনারি অ্যাটাক ভুলে জহর এবং জলের সোরাই ফেলে দুজনের পিছু-পিছু অচল।

আশ্চর্য, ঘরে কেউ নেই! জানলার পাশে ঝকঝকে রেডিওগ্রামটা যেন হাসছে। গান চলেছে ঃ

'বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা।'

ভানু আর জহর একবার পরস্পরের দিকে তাকালে, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অচল। কী আশ্চর্য, গেল কোথায় নূপুর?

কিন্তু যায়নি সে কোথাও। গানটা হঠাৎ থেমে গেল, আর ওয়ার্ডরোবের পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে এসে নূপুর চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, 'গেছে?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল অচল। তেতো গলায় বললে, 'কী, ভেবেছেন কী? আমি মরছি গোয়েন্দার ভয়ে, আর আপনার প্রাণে গানের ফোয়ারা!'

নূপুর ভয়ে-ভয়ে বললে, 'বিশ্বাস করুন, ওরা যে গোয়েন্দা, আমি প্রথমে জানতেই পারিনি। জানলে কি গাইতাম? আর, আপনি বললেন, রেডিওতে গান হচ্ছে। হঠাৎ গান থামালে ওদের সন্দেহ বাড়ত না?'

অচল একটু খুশি হল। নাঃ, খোট্টার দেশের মেয়ে হলে কী হয়, বুদ্ধি আছে!

নূপুর বললে, 'ওয়ার্ডরোবের ফাঁক দিয়ে আমি ওদের দেখেছি। ওই ঢ্যাঙা আর বেঁটে লোক দুটোই কাল রাত্তিরে আমার পিছু নিয়েছিল।'

'কিন্তু ওরা যা বলে গেল, তা সত্যি?'

'কী বলে গেল?'

'আপনি দিল্লির ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?'

নূপুর বললে, 'সত্যি।'

'কিন্তু কেন?'

চুপ করে রইল নূপুর। অচল আবার বললে, 'পালিয়ে এলেন কেন বলুন।'

'বিয়ের ভয়ে।'

'বিয়ের ভয়ে! চালাকি পেয়েছেন? বিয়ে করতে মেয়েরা আবার ভয় পায় কবে? ভয় তো পুরুষরাই পায়।'

শুকনো মুখে নূপুর বললে, 'মেয়েরাও ভয় পায়—আমার মতো বর জোটে যাদের।'

'তার মানে?' —অচল একটু উৎসুক হয়ে বললে, 'কেমন বর জুটেছিল আপনার? উড়িয়া, না কাবলিওয়ালা?'

'বাঙালি।'

'তবে ভয় পেলেন কেন? বাঙালি স্বামীরাই তো আসলে বউ। শুধু মেটারনিটি হোমে যায় না, এই যা। কানা-খোঁড়া ছিল বুঝি পাত্রটি?'

'না।'

'তবে কেন পছন্দ হল না শুনি?'

নূপুর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'একটা শিম্পাঞ্জিকে কারও পছন্দ হয়?'

BanglaBook.org

চমকে উঠে অচল বললে, 'বলেন কী! শিম্পাঞ্জিরা আজকাল বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করতে চাইছে! ওরা বাঙলা সিনেমা দেখছে বুঝি?'

নূপুর এবার মুখ ভারী করে বললে, 'জানি না। মেয়েদের বিপদে ছেলেরা বেশ মজা পায় দেখছি।'

অচল একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, 'সরি! আপত্তি না থাকে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন। বিপদটা আপনার কোথায় ঠিক বুঝতে পারছি না।'

উদাস চোখে জানলার বাইরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নূপুর বলতে শুরু করল ঃ

ছোটবেলা থেকেই আমি দিল্লিতে মানুষ হয়েছি। মা নেই, বাবা দিগম্বর চ্যাটার্জি আরউইন হসপিটালের নাম-করা সার্জন। আমাকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই, তবে রাশভারি লোক বলে মুখে প্রকাশ ছিল না। আমাকে দেখাশুনা করার জন্যে আয়া ছিল। রোজ রাতে বাড়িতে ফিরে বাবা আয়ার কাছে খবর নিতেন আমি ঠিক সময়ে খেয়েছি কি না, ঠিকমতো পড়াশুনা করেছি কি না, আমার জন্যে কী-কী জিনিস চাই। কিন্তু আমাকে কোনওদিনও জিগ্যেস করতেন না। আমার সুখ-সুবিধের জন্যে তিনি এত খরচ করতেন যে কোনও সাধারণ বাপ তা করে না। অথচ সেই স্নেহশীল মানুষ হঠাৎ যেন—।

উদ্গত একটা দুঃখের আবেগকে সামলে নিলে নূপুর। তারপর আবার শুরু করল ঃ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা সবে দিয়েছি, মনে আমার তখন অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা। এমনসময় একদিন পানুমামা—মানে আমার ছোটমামা আমাকে বললে, 'তোর বিয়ে রে, নূপুর!'

শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভেবেছিলাম সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে ইয়োরোপ ট্যুরে বেরোব। জীবনটাকে আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতো মামুলি ছবির মতো মামুলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছোট একখানা ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে রাখব না। তাই বিয়ের কথাটা ভাবিইনি কখনও।

অচল গম্ভীর হয়ে বললে, 'না ভাবাই ভালো। বিয়ে একটা ন্যাস্টি প্রথা। সাধ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘরে এনে ঢোকানো। তারপর বলুন।'

নূপুর বলতে লাগল ঃ পানুমামা যখন আমাকে বললে, 'তোর বিয়ে রে, নূপুর', তখন চমকে গেলাম। তবু মনে-মনে কোথায় যেন একটা রঙিন স্বপ্ন ঘনিয়ে উঠতে লাগল। অনেক আলো, রসুনচৌকি, ফুল দিয়ে সাজানো প্রকাণ্ড মোটরে রূপকথার রাজপুত্র—।

অচল বলে উঠল, 'এবং দু-দিন বাদেই দাম্পত্য-জীবনের সেই ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ির টায়ার পাংচার। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গাড়ি ঠেলতে-ঠেলতে গলদঘর্ম। এই তো রঙিন স্বপ্নের পরিণাম। ছোঃ! যাকগে, কুমারী-সমাজ চিরকালই নির্বোধ।'

নূপুর এবার চটে গেল। বললে, 'কুমার ছাড়া কুমারীদের বিয়ে হয়? নির্বোধ বলতে হয়, দু-দলকেই বলুন।'

অচল একটু থতিয়ে গিয়ে বললে, 'বেশ, তাই। এখন বলুন।'

নূপুর আবার শুরু করলে, 'বিয়ের কথা শুনে সব মেয়ের যা হয়, আমারও তাই হল। মনের মধ্যে যে-ভাবটা বেশি প্রবল হয়ে উঠল, সেটা কৌতূহল।'

অচল মন্তব্য করলে, 'ওটা মেয়েদের স্বভাব-দোষ। তারপর?'

নূপুর বলতে লাগল ঃ পানুমামার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হলেও অনেকটা আমার বন্ধুর মতো। তাই জিগ্যেস করলাম, 'বর কেমন পানুমামা?'

পানুমামা তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'ফার্স্ট ক্লাস! জামাইবাবু বেছে-বেছে তোর জন্যে যে বর ঠিক করেছে, গ্র্যান্ড!'

মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। জিগ্যেস করলাম, 'দেখতে কেমন?'

পানুমামা বললে, 'দিব্যি!'

BanglaBook.org

'মাথায় বেশ লম্বা তো?'

'হ্যাঁ, অ্যাভারেজ বাঙালির তুলনায় লম্বাই বলতে হয়। সাড়ে চার ফুটের কাছাকাছি।'

'সেকি! আমি যে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি! গায়ের রং?'

'রং? রংটা অবিশ্যি ফরসা নয়। মানে কালো রঙের সোয়েটার পরলে মনে হয় খালি গায়ে আছে। তবে ব্যাটাছেলের রঙে কী আসে-যায় বল?'

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। আমার বর হবে বেঁটে কালো! জিগ্যেস করলাম, 'নাক মুখ চোখ?'

পানুমামা জবাব দিলে, 'অনবদ্য। জামাইবাবুর সিলেকশন কি যা-তা ভেবেছিস? ছোটবেলায় বকসিং শিখতে গিয়ে ছোকরার নাকটা চেপটে গেছে বটে, কিন্তু তার ফলে একটা আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আর, চোখ দুটোর গুণ কী জানিস? একই সঙ্গে দু-দিকে দুটো জিনিস দেখতে পায়।'

বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। তবু চেপে জিগ্যেস করলাম, 'ঠাট্টা করছ বুঝি?'

জিভ কেটে পানুমামা বলে উঠল, 'ছি, ছি! সে সম্পর্ক তোর বাবার সঙ্গে, তোর সঙ্গে নয়।'

মাথাটা ঘুরছিল। কোনওমতে বললাম, 'এমন পাত্রটি কোত্থেকে জুটল? নাম কী?'

পানুমামা তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে আর একবার হাত বুলিয়ে বললে, 'নামটা ঠিক—দাঁড়া, দাঁড়া, মনে পড়েছে। গোলকবিহারী, না ঢোলকবিহারী গোছের কিছু একটা হবে। যাই বলিস, নামটার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য কিন্তু বজায় আছে।'

আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। পানুমামা বলেই যাচ্ছিল, 'তোর কপাল ভালো রে, নূপুর! ছেলে একেবারে কমল-হীরের টুকরো। ইস্কুল-টিস্কুলে বেশিদূর পড়েনি বটে, তবে কমার্সে আশ্চর্য মাথা। বিরাট ব্যবসা আছে রেড়ির তেলের। নিখিল-ভারত রেড়ি-উৎপাদক সমিতির সম্পাদক। হেঁজিপেঁজি লোক নয়, রীতিমতো মানী—।'

BanglaBook.org

আর শুনতে পারছিলাম না। পানুমামার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা মুখখানা দেখতে-দেখতে একটা রামছাগলের মুখে পরিণত হয়ে গেল। আর মনে হল, শিং উঁচিয়ে যেন আমাকে তেড়ে আসছে। আমি ছুটে পালিয়ে গেলাম।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নূপুর। যেন রামছাগল সদৃশ ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা পানুমামার মুখখানা দেখতে পাচ্ছে এখনও।

তার থমথমে বিষণ্ণ মুখের পানে তাকিয়ে অচলও কিছু মন্তব্য করলে না। একটু কাশলে শুধু।

নূপুর চোখ মেলে তাকাল। তারপর আবার শুরু করল ঃ সারাটা দিন আমার কেঁদে আর ভেবে কাটল। এত দুঃখের মধ্যেও একটা আশা উঁকি দিতে লাগল যে, বাবাকে আমি মুখ ফুটে বললে এ-পাত্র তিনি ক্যানসেল করে দেবেন নিশ্চয়। ভালো তো বাসেন আমাকে। কিন্তু দুনিয়ায় এত ছেলে থাকতে ওই বিদঘুটে গোলকবিহারী না ঢোলকবিহারীকে বাবার পছন্দ হল কেন ভেবে পেলাম না। বাবার রুচির ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললাম।'

রাতে হসপিটাল থেকে বাবা ফিরলেন। রামধনির বদলে আজ আমিই তাঁর কফি নিয়ে গেলাম। বাবা একবার তাকিয়ে বললেন, 'রামধনি কোথায়? কাজ ছেড়ে দিয়েছে?'

'না।'

'তবে তুমি কেন?'

'একটা কথা আছে।'

'বলতে পারো।'

লজ্জা-সংকোচ-ভয় সব মিলিয়ে বুকের ভেতরটা আমার দুরুদুরু করছিল। সাহসে ভর করে বললাম, 'পানুমামা বলছিলেন আমার নাকি—।'

'হ্যাঁ, তোমার বিয়ে। (বাবার স্বভাবগম্ভীর মুখখানা জীবনে এই প্রথম হাসি-হাসি দেখলাম) অনেক খুঁজে অত্যন্ত ভালো একটি ছেলে পেয়েছি। দেখতে শুনতেও যেমন চমৎকার, গুণেও তেমনি। পানুর কাছে শুনেছ বোধহয়?'

কান্না পাচ্ছিল, তাই মুখ নিচু করেই বললাম, 'বিয়ে আমি করব না, বাবা।'

কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে বাবা থেমে গেলেন; বলে উঠলেন, 'বাজে কথা বোলো না! তুমি বায়োলজি পড়োনি, তাই এমন কথা বলছ। তোমার বিয়ের বয়েস হয়েছে, এমন পছন্দসই পাত্র পেয়েছি, আর তুমি—।'

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'আমার পছন্দ নয়।'

বাবার মুখের হাসি-হাসি চেহারা নিমেষে পালটে গেল। কফির পেয়ালা নামিয়ে, মোটা ভুরুর তলা থেকে পাঁচ-সাত সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'স্ত্রীলোকের স্বামী কি শাড়ি, না ভ্যানিটি ব্যাগ, যে তাদের পছন্দ না হলে চলবে না? তোমার মা পছন্দ করে আমাকে বিয়ে করেননি, বিয়ে করে পছন্দ করেছিলেন। তুমিও তাই করবে।'

ডুবতে বসে মানুষ যেমন দু-হাত বাড়িয়ে একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করে, তেমনিভাবে আমি বললাম, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ—আমার আদর্শ—'

বাবার গলায় এবার মেঘ ডেকে উঠল, 'জ্যাঠামো কোরো না। তোমার ভবিষ্যৎ তোমার চেয়ে আমি ভালো বুঝি। তেরোস্কোভার মতো রকেটে চেপে স্পেস-এ যাওয়ার মেয়ে তুমি নও। তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে—এই তোমার আদর্শ। সাতাশে ফাল্গুন তোমার বিয়ের দিন স্থির করেছি, তার আগের দিন পারগেটিভ নেবে, বুঝলে?'

BanglaBook.org

পায়ের তলায় মেঝেটা দুলতে লাগল। ঝাপসা হয়ে এল দুই চোখ। কোনওমতে ছুটে চলে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লাম। এতক্ষণের চেপে-রাখা কান্না এবার ফুলে-ফুলে উঠল। এই আমার বাবা! স্নেহ নেই, ভালোবাসা নেই, দয়া-মায়া কিচ্ছু নেই। নিষ্ঠুর এক সার্জন মাত্র। একজন অপারেশন-পেশেন্টের সঙ্গে নিজের মেয়ের কোনও তফাত নেই। ছুরি উঁচিয়েই আছেন। আজ যদি আমার মা থাকতেন, ওইরকম একটা জানুবানের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারতেন কি?

মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ কাঁদলাম। (সেই কান্নার কথা বলতে গিয়ে নূপুরের নতুন করে কান্না পেয়ে গেল। চোখ দিয়ে টসটস করে গড়িয়ে এল জল। আর, আইভরির মতো ফরসা গালের ওপর তরল মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা দেখে অচল সিগারেট টানতে ভুলে গেল।) কান্নার বেগটা কমে আসতেই মনের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। সে-জ্বালাটা বিদ্রোহের। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমি কি একটা শাড়ি-পরা পুতুল? নিজস্ব কোনও সত্তা নেই আমার? নিশ্চয় আছে। এমন করে নিজেকে বলি দেব না। মাথা পেতে নেব না বাবার এই স্বেচ্ছাচারিতা। মনে-মনে হিসেব করে দেখলাম, বাবার বয়েস ষাটের কাছে এসেছে। পঞ্চাশ পার হলেই পুরুষের ভীমরতি হয়। নইলে একটা মর্কটের হাতে আমাকে দিতে চান তিনি! একটা বেঁটে কালো কুচ্ছিৎ—রেড়ির তেলের ব্যবসাদার—।

মনে-মনে একটা কঠিন সঙ্কল্প করে ফেললাম। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে। পুবদিক ফিকে হচ্ছে। হাত-খরচের টাকা যা ছিল, সঙ্গে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। সারা বাড়ি তখন ঘুমোচ্ছে।

তারপর দিল্লি স্টেশন। ট্রেন। কলকাতা।

এসে উঠলাম শীলার ফ্ল্যাটে। শীলা একসময় দিল্লিতে পড়ত আমার সঙ্গে। বিয়ে করে চলে এসেছে কলকাতায়। ওর স্বামী মিস্টার মেহরা এয়াব-ইন্ডিয়ায় কাজ করে।

আমাকে দেখে শীলা অবাক। মিথ্যে করে বললাম, 'একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। থাকব দিন কয়েক।'

শীলা খুব খুশি। কিন্তু তিনদিনও গেল না।

খুব ভোরে ওঠাই আমার অভ্যেস। তাই খবরের কাগজ সর্বপ্রথমে আমার হাতেই পড়ে। চতুর্থ দিনে দেখি, সর্বনাশ! কাগজে আমার ফোটো সমেত বাবা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। জীবিত বা মৃত আমাকে ধরে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার! বাবার ভীমরতি সম্পর্কে আমার আর সন্দেহ রইল না।

কাগজখানা লুকিয়ে ফেললাম। শীলা একবার জিগ্যেস করল, 'আজ কাগজ দিয়ে যায়নি?'

বললাম, 'কাগজওয়ালা বললে, কাগজ আজ বন্ধ।'

'আজ বন্ধ! কেন?'

'ইয়ে—অফিসে ধর্মঘট হয়েছে কি না!'

কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম রাতে যখন মিস্টার মেহরা বাড়ি ফিরলেন। দেখলাম, হাতে তাঁর খবরের কাগজ। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে গেছি মনে করে শীলা খেতে ডাকল না। বেশি রাতে শুনলাম পাশের ঘরে শীলা চাপা উত্তেজিত গলায় বলছে, 'চাকরির ইন্টারভিউটা তা হলে নেহাতই মিথ্যে! বাপের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে পালিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই।'

মিস্টার মেহরা বললেন, 'কোয়াইট ন্যাচারাল! স্বামী যখন নেই, তখন বুড়ো বাপ ছাড়া কার সঙ্গেই বা ঝগড়া করা যায় বলো?'

শীলা রেগে বলল, 'তার মানে? আমি বুঝি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি?'

মেহরা সাহেব বললেন, 'না করলে আমি বাঁচব কী করে, শীলু? মনে হবে তুমি নেই।'

BanglaBook.org

'কী বললে! তুমি বর নও, বর্বর।'

'তুমি স্ত্রী নও, ইস্ত্রি।'

ঝনঝন করে কাচ ভাঙার শব্দ। ফুলদানিটা বোধ করি গুঁড়িয়ে গেল। তারপর একদম চুপচাপ।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ বাদে মেহরা সাহেবের গলা শোনা গেল, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এবার ভাব করা যেতে পারে। কী বলো?'

শীলা নরম গলায় বললে, 'নিশ্চয়। কেন যে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয় বুঝি না—হ্যাঁ, নূপুরের বাবাকে তাহলে কালই টেলিফোন করে দিও।'

মেহরা সাহেব বললেন, 'টেলিগ্রামে কাজ কী? আমাকে তো কাল ভোরেই দিল্লিতে ফ্লাই করতে হবে। গিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে করে আনলেই হবে।'

ফ্যানের তলায় বসেও ঘেমে উঠলাম। মনে হল, বাবা যেন এসে পড়েছেন। মোটা ভুরুর তলা থেকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, আর জাঁদরেল আওয়াজে বলছেন, সাতাশে ফাল্গুন তোমার বিয়ের দিন স্থির করেছি।

বন্ধু হয়ে শীলা যে এতখানি শত্রুতা করবে ভাবতেও পারিনি। উঃ, মেয়েটা কী বিশ্বাসঘাতক!

মনে-মনে একটা প্ল্যান ঠিক করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। সকালে নিজের শাড়িখানা পরে বেরোতে যাব, শীলা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল।

'ওকি! বেরোচ্ছিস নাকি? কোথায়? কেন?'

থতমত খেয়ে বললাম, 'মার্কেটে যাচ্ছি। কিছু কেনা-কাটা—।'

'এখন তো মোটে সাতটা। দোকান খোলেইনি। তার চেয়ে বিকেলে যাস'খন।'

বললাম, 'বিকেলে তো সময় হবে না। আজ দুপুরে সেই চাকরির ইন্টারভিউটা—।'

শীলা এমনভাবে তাকাল আমার দিকে, যেন আমি একটা শিশু, প্রথম মিথ্যে বলতে শিখছি। তারপর বললে, 'তা হলে একটা ট্যাক্সি ডাকাই। চল, আমারও কিছু কেনা-কাটা আছে।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম শীলার পানে। বুঝতে পারলাম, আমাকে সে এক সেকেন্ডও চোখের আড়াল করতে নারাজ। জীবিত বা মৃত আমাকে বাবার হাতে সঁপে না দেওয়া অবধি তার স্বস্তি নেই।

বুদ্ধিটা হঠাৎ খুলে গেল। বললাম, 'একসঙ্গে মার্কেটে গেলে তো ভালোই হত শীলা। কিন্তু কি জানিস—আজ সকালে এখানে একজনের আসার কথা।'

'কে?'

'ইয়ে—মানে—আমার এক বন্ধু।'

'বন্ধু!' শীলার মুখে চাপা কৌতুকের দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'ও, তাই বল! নাম কী রে?'

'ঢোলকবিহারী। ফাইন দেখতে। —প্লিজ শীলা, সে এলে তুই রিসিভ করিস ভাই, আমি এলুম বলে।'

শীলা আর সন্দেহ করলে না। বললে, 'তোকে ভাবতে হবে না। যা, তুই চটপট ঘুরে আয়।'

বাঁচলাম। তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, রাস্তার হাওয়ায় মুক্তির নিশ্বাস নিলাম।

সারা সকালটা কাটল পথে-পথে। ম্যাটিনিতে একটা সিনেমা দেখলাম। সন্ধেবেলা ভীষণ খিদে পেয়েছিল বলে ঢুকলাম কফি হাউসে। সেখানেও কি নিস্তার আছে? দুটো বদখৎ গোয়েন্দা লাগল পিছনে। একটু আগে যারা এসেছিল, ওই তারাই। তাদের কবল থেকে পালাতে গিয়ে আপনার গাড়িতে—তারপর আপনার বাড়িতে।

BanglaBook.org

আমার ফেরারি জীবনের গোড়াটুকু বললাম। শেষ কোথায় আমি নিজেই জানি না।

নূপুর থামল।

সিগারেটটা দু-আঙুলের ফাঁকে নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সেটা ছুড়ে ফেলে অচল বিমর্ষ মুখে বললে, 'আপনাকে সহানুভূতি জানাব কী, আমিও ওই জ্বালায় জ্বলছি। বলতে গেলে আমরা দুজনে একই নৌকোয় ভাসছি।'

নূপুর জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল।

'কিছুদিন হল আমারও জীবনে এইরকম একটা ফাঁড়া এসেছিল।' —অচল নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর শুরু করলে, 'লক্ষ্ণৌতে আমাদের দু-পুরুষের বাস। বাবা ওখানকার কোর্টে বরাবর প্র্যাকটিস করতেন। পসার ছিল খুব। একমাত্র ছেলে আমি, কিন্তু পড়াশুনো করেছি কলকাতায়। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেই বাবা মারা গেলেন। যা রেখে গেলেন, সারা জীবন দু-হাতে ওড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দেখলাম ওড়াবার বিদ্যেটা শেখা হয়নি। তবে একটা বিদ্যের ওপর ঝোঁক আমার ছোটবেলা থেকেই। বাবার ভয়ে বেশিদূর এগোতে পারিনি। সেটা—।'

'গান-বাজনা।'—নূপুর বললে।

'ঠিক।'—অচল বলতে লাগল, 'চলে গেলাম লক্ষ্ণৌ। মা খুশি হলেন, গান শেখাও চলতে লাগল। ক্রমে নাম হল। রেডিও রেকর্ডে চান্স মিলল। ফিল্মে ডাক পড়ল। ব্যস, আর যায় কোথা। অমনি জুটে গেল ঝাঁকে-ঝাঁকে ভক্তের দল। ভক্ত না বলে ভক্তা বলাই উচিত।'

নূপুর অবাক হয়ে বললে, 'ভক্তা!'

'ভক্তের ফেমিনিন। শব্দটা আমার নিজের তৈরি। তারপর শুনুন। যেখানেই গাইতে যাই, গাদা-গাদা অটোগ্রাফের খাতা। সই করতে-করতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। গানের পর গান ফরমায়েশ হয়, গাইতে-গাইতে গানে ঘেন্না ধরে যায়। তবু রেহাই নেই। সরু মোটা মিহি মেয়েরা আমাকে দেখলেই ছেঁকে ধরে। আমি যেন হরির লুটের বাতাসা। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অল্পবয়েসি মেয়ে দেখলেই আমার আতঙ্ক হয়।'

নূপুর বললে, 'তাই বুঝি মোটরে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন?'

অচল বললে, 'সে তো পেত্নী ভেবে।'

'পেত্নীতে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করিনে আবার। পেত্নী, ডাইনি, পিশাচী, মায়াবিনী—আসলে সবাই তো মেয়ে। —ডিস্টার্ব করবেন না, দুঃখের কথাটা শুনুন।'

'বলুন।'

—কলকাতা ছেড়ে আবার পালিয়ে গেলাম লক্ষ্ণৌ। ভাবলাম, মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করলে জলসা আর ভক্তাদের হাত থেকে তো রেহাই মিলবে। মা ভেরি গ্র্যান্ড। রোজই খাওয়ার সময় বলেন, 'কী ভাগ্যি আমাকে তোর মনে পড়েছে। দেখ না এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে।'

বলি, 'খাঁ-খাঁ করবে কেন? এই তো এসেছি।'

মা বলেন, 'আসবি বইকী, বাবা। মা-র দুঃখু তুই বুঝবি না তো কে বুঝবে? তুই আমার কতবড় মাতৃভক্ত ছেলে!'

মা-র মতলবটা ঠিক আঁচ করতে পারছিলাম না। একদিন জিগ্যেস করলাম, 'কী বলতে চাও সোজাসুজি বলো দিকি?'

মা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, দাড়ি ছুঁয়ে বললেন, 'তোর ঝানুকাকা বড় ভালো একটি মেয়ের সম্বন্ধ এনেছে। তুই বিয়ে করে সংসারী হ', আমি শান্তিতে মরি।'

BanglaBook.org

বলতে-বলতেই মা-র দু-চোখে গঙ্গা বয়ে গেল। দেখেশুনে আমারও চোখ দিয়ে জল বেরোবার উপক্রম।

মাকে বোঝালাম, 'তারচেয়ে তোমায় নিয়ে তীর্থে ঘুরে আসি চলো। বিয়ে যদি করতেই হয়, পরে ভেবেচিন্তে করা যাবে।'

কিন্তু রেকর্ডে পিন আটকে গেলে যেমন হয়, মা-র মুখে সেই এক কথা, 'তোর ঝানুকাকা বলছিল, মেয়েটি বড় ভালো। এমন মেয়ে আর হয় না।'

আমার হল শাঁখের করাত। কলকাতায় ভক্তার দল, লক্ষ্ণৌতে মা। জীবন বিষময়। ভেবে-ভেবে নাচার হয়ে স্থির করলাম, বিয়েই করব। কত লোকে তো আত্মহত্যাও করে...বিয়ে করলে অন্তত একটা বিষয়ে বাঁচব। নিলামে কোনও মালের গায়ে Sold লেখা টিকিট ঝুলিয়ে দিলে, লোকে যেমন সেদিকে আর নজর দেয় না, আমিও তেমনি ভক্তাদের হাত থেকে বেঁচে যাব।

ঝানুকাকাকে পাকড়াও করলাম। ঝানুকাকা বাবার দূর সম্পর্কের ভাই। পেশা ছিল কুস্তি লড়া। বয়স হওয়াতে এখন আর লড়ে না, খালি বাদাম বেটে সিদ্ধির শরবত খায়। গোল মুখে মোষের শিঙের মতো প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ, দু-প্রান্ত দুই কানের সঙ্গে পাকানো।

BanglaBook.org

ঝানুকাকা তখন শরবত খাচ্ছিল। আমায় দেখে বললে, 'কীরে, বে করতে চাচ্ছিস না কেন? দেব এক রদ্দা?'

বললাম, 'সে তোমায় দিতে হবে না, বউ এসে দেবে। মেয়ে কেমন বলো।'

গোঁফজোড়া চুমরে ঝানুকাকা বললে, 'এক নম্বর।'

'গান-বাজনা করে?'

'আলবত! রোজ ভোরে যখন ভয়রোঁ আলাপ করে, কাকেরা লজ্জায় চুপ মেরে যায়।'

সত্যিই যেন ঘাড়ে রদ্দা পড়ল। তবু জিগ্যেস করলাম, 'দেখতে কেমন?'

জবাব এল, 'কাঁধে ব্যান্ডেজ-করা পরী।'

'কাঁধে ব্যান্ডেজ কেন?'

'সবে ডানা কেটেছে কি না।'

'তামাশা রাখো। কেমন দেখতে সত্যি বলো।'

আর একবার গোঁফজোড়া চুমরে ঝানুকাকা বললে, 'হাইক্লাস। মাথায় য়্যাসা কোঁকড়ানো কালো চুল যে দেখলে সত্যি মনে হয়।'

লাফিয়ে উঠে বললাম, 'সত্যি মনে হয় মানে?'

ঝানুকাকা বললে, 'ছোটবেলায় কী একটা ব্যামোয় চুল আর দাঁতগুলো—কিন্তু নকল বলে ধরে কার সাধ্যি!'

মাথাটা ঘুরছিল। মনে হল, আমিই সিদ্ধির শরবত খেয়েছি।

একসঙ্গে গোটা ছয়েক মিঠে পানের খিলি কিমাম সমেত মুখে পুরে ঝানুকাকা বলতে লাগল, 'তবে মেয়ে হাইক্লাস! তোর সঙ্গে যা মানাবে, একদম লায়লা-মজনু! জলদি বে করে ফ্যাল, নইলে দেব এক রদ্দা!'

বিশ্বাস করুন মিস চ্যাটার্জি, আমার অবস্থাও তখন আপনার মতো। ঝানুকাকার বিশাল গোঁফওয়ালা মুখখানা দেখতে-দেখতে শিংওয়ালা একটা বাইসনের মুখ হয়ে গেল।

সেই রাতেই লক্ষ্ণৌ ছাড়লাম। মাকে দু-লাইন চিঠি লিখে এলাম ঃ

স্বপ্নে গুরুর আদেশ পাইয়াছি। হরিদ্বারে গিয়া সন্ন্যাস লইতে বলিয়াছেন। চলিলাম।

তারপর কলকাতায় ফিরেই ফ্ল্যাট-বদল। পাইকপাড়া থেকে যোধপুর পার্ক।

নূপুর অবাক হয়ে শুনছিল অচলের প্রায়-হব-হব বিয়ের উপাখ্যান। আর ভাবছিল, আজকাল সংসারে সব বাপ-মায়েরই ভীমরতি হয়েছে নাকি? তাদের দুজনের জীবনের দুর্ঘটনা গল্প-উপন্যাস আকারে লিখলে লোকে নিশ্চয় বলবে আজগুবি। কিন্তু বাস্তব জীবন গল্প-উপন্যাসকেও যে হার মানিয়ে দেয়, এ-কথা ক'জন জানে?

অচল থামতে নূপুর বললে, 'কিন্তু কী দরকার ছিল এত কাণ্ড করার? আপনি পুরুষ, আপনার ভক্তাদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতেন? মা'ও খুশি হতেন।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে অচল বললে, 'আবার! বাপের পুণ্যফলে পবচুল আর বাঁধানো দাঁতের হাত থেকে বেঁচে গেছি। এর পর আরও কত কী নকল বেরোত কে জানে! —কিন্তু আপনি এখন কী করবেন? দিল্লিতেই ফিরে যাবেন?'

নূপুরের মুখখানা শুকিয়ে উঠল। বললে, 'তারচেয়ে আমায় ডবল-ডেকারের তলায় শুয়ে পড়তে বলুন। আপনি আমার বাবাকে জানেন না, ফিরে গেলে সেই রেড়ির তেলের সঙ্গেই—।'

'তা হলে কলকাতায় কোনও ভালো পাত্র দেখে—।'

হাতজোড় করে নূপুর সবেগে বলে উঠল, 'রক্ষে করুন। রেড়ির তেলের পর হয়তো কেরোসিন তেল জুটবে। বিয়ে আমিও জীবনে করব না।'

খুশি হয়ে অচল কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মুখ হাঁ করাই রইল। পাশের ঘর থেকে অতি অমায়িক গলার ডাক শোনা গেল, 'আছেন নাকি?'

ভড়কে গেল দুজনে। আবার কে এল? তাড়াতাড়ি এ-ঘরে এসে অচল দেখে, সেই পরিচিত

BanglaBook.org

পালিশ-করা টাক। দুন্দুভিবাবু।

অচলের এলোমেলো চুল আর স্লিপিং পায়জামার দিকে নজর করে একগাল হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'ঘুমডা ভাঙ্গায়ে দিলাম বুঝি?'

অচল বললে, 'না, না।'

টাক চুলকে দুন্দুভিবাবু বলে উঠলেন, 'হ, বুঝচি-বুঝচি। বয়সকালে পরিবার বাপের বারি থনে আইলে আমারও ঘুমের থিকা উঠতে বেলা অইত। অমাবস্যার রাতেও চাঁদ দ্যাখতাম। কী দিনই আছিল রে মশয়! (পাঠকদের জেনে রাখা দরকার, দুন্দুভিবাবু বিপত্নীক) যাক, এখন চা-পর্ব অইব তো? বউঠানরে তিনকাপ বানাইতে কন।'

'বউঠান।'—অচল যেন জীবন্ত বিস্ময়চিহ্ন।

আকর্ণ হাসি-মুখ নিয়ে, টাক চুলকে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'ওই আপনার ইয়ে—মিসেস। সম্পর্কে আমি ওনার দেওর হই না? বিশ্বাস করেন অচলবাবু, বউয়ের চিন্তায় আমার টাক পইড়াছে, বয়স কিন্তু বেশি না। —যান, দ্যাখেন চা কদ্দুর।'

দুন্দুভিবাবু সোফায় চেপে বসলেন।

অচল বিরস মুখে বললে, 'চা বাড়ন্ত। ভণ্ডুলের জ্বর, কাল থেকে ছুটি নিয়েছে।'

'অ্যাঁঃ! এতক্ষণ কন নাই ক্যান?'

দুন্দুভিবাবু তৎক্ষণাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'ভণ্ডুল নাই, আমি তো আছি। আমি আইন্যা দিমু। বাজার-টাজার লাগব তো ? আচ্ছা লোক মশয় আপনি। বউঠানেরে উপাস দিয়া রাখবেন নাকি ?

দুন্দুভিবাবু আর দাঁড়ালেন না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অচল পাশের ঘরে যেতেই দেখলে, নূপুর তার ধুতি ছেড়ে নিজের নীল শাড়িখানা পরেছে। মৃদুস্বরে বললে, 'আমি যাচ্ছি।'

অচলের মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, 'যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।'

তারপর নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটি জোড় করে নূপুর বললে, 'একটা রাতের জন্যে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার দয়ার কথা আমি ভুলব না। অনেক ধন্যবাদ।'

বলতে-বলতে নূপুরের গলাটা কেমন ধরে এল।

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে রইল অচল। তারপর বললে, 'আমাকে এমন অপদস্থ করে, চলে না গেলে কি চলছিল না? এক্ষুনি দুন্দুভিবাবু একগাদা বাজার নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে, আর দুন্দুভিবাবুর জানা মানেই এই গোটা ফ্ল্যাট-বাড়ি, গোটা পাড়ার জানা। বউঠান কোথায়, জিগ্যেস করলে কী কৈফিয়ত আমি দেব শুনি?'

নূপুর বললে, 'বলবেন আমি হঠাৎ মরে গেছি।'

মুখখানা তেতো করে অচল বলে উঠল, 'বললেই হল! লোকে যখন জিগ্যেস করবে, লাশ কোথায়, তখন? শেষকালে কি আমাকে গুমখুনের চার্জে ফেলতে চান? ডেঞ্জারাস মেয়ে তো আপনি!'

চটে গিয়ে নূপুর বললে, 'তা হলে কী করব বলুন? সত্যি-সত্যিই মরব?'

'কিচ্ছু করতে হবে না, দয়া করে শুধু থাকুন। থেকে আমায় কৃতার্থ করুন।'

'বারে, কাল রাতে তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন!'

কালো দিঘির মতো নূপুরের বড়-বড় চোখ দুটো টল-টল করে উঠল।

'ঘাট মানছি। হয়েছে? নিজে আধপেটা খেয়ে কাল রাতে খাওয়ালাম, আর আজ ভণ্ডুলের জ্বর হয়েছে শুনেও দিব্যি চলে যাওয়া হচ্ছে! উঃ, কী স্বার্থপর, কী অকৃতজ্ঞ এই মেয়ে জাতটা!'

BanglaBook.org

নূপুর মুখ ভারী করে বললে, 'মেয়েজাতের নিন্দে তো আপনার ঠোঁটের আগায়। কিন্তু একরাত আধপেটা খেতে দিয়ে কী এমন মাথা কিনেছেন শুনি? —বেশ ভণ্ডুল যতদিন না আসে, আমি যাব না। বেঁধে আপনাকে খাইয়ে কৃতজ্ঞতার দেনা শোধ করব।'

অচল খুশি হয়ে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এ-কথাটা আগে বললেই হত।'

খিচুড়ি আর মাংসের শুকনো কারি।

খেতে-খেতে অচল বললে, 'রান্নার হাতটা আপনার ভালোই দেখছি। খিচুড়ি আর আছে নাকি?'

নূপুর ডেকচির বাকিটুকু উজাড় করে অচলের প্লেটে ঢেলে দিলে। অচল বলে উঠল, 'এই যা! আপনার জন্যে আর রইল না যে!'

'থাক,' নূপুর বললে, 'আমার জন্যে অত মহানুভবতা না দেখালেও চলবে। মাংস আর দেব?'

'আপনি তা হলে খাবেন কী?'

'সে-ভাবনায় আপনার কাজ নেই।' —আরও খানিকটা কারি অচলের পাতে দিয়ে নূপুর বললে, 'আপনি আমাকে আধপেটা খাইয়েছিলেন, আমি কিন্তু পেট ভরে খাওয়ালাম। আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হল। ওবেলা আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'দেখি, কোথায় নিরাপদ আশ্রয় মেলে।'

অচলের খাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নূপুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। আপনার মতো মেয়ে সহজে কখনও নিরাপদ আশ্রয় পায়? দুনিয়াটা কি বেলুড় মঠ, না জেলের ফিমেল ওয়ার্ড? পাগলামি করবেন না, সত্যিকার নিরাপদ আশ্রয় যতদিন না জোটে, এইখানেই থাকুন।'

নূপুর কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অচল আবার বললে, 'তা ছাড়া রাস্তা-ঘাটে বেরোবেনই বা কোন সাহসে? পুলিশ আছে, গোয়েন্দা আছে। আপনার বাবার বিজ্ঞাপনের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?'

নূপুরের মুখখানা শুকিয়ে উঠল। এদিকটা সে ভাবেনি। অসহায়ের মতো সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ; তারপরে বললে, 'কিন্তু এখানেই বা থাকব কী করে? কোনও মেয়েকেই তো আপনি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না—বিশ্বাসও করেন না।'

অচল বললে, 'ঠিক। বিশ্বাস করতাম না। জীবনে এই প্রথম একজন মেয়েকে বিশ্বাস করলাম। কেন জানেন? আপনার আগে আর কোনও মেয়েকেই বলতে শুনিনি "বিয়ে করব না"। কিন্তু আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন কি? সোজাসুজি বলুন।'

অচলের মুখের ওপর বড়-বড় চোখ মেলে নূপুর বললে, 'পারব।'

BanglaBook.org

তিন

পাঠক-পাঠিকা, দিল্লিতে যাওয়া যাক চলুন। দরিয়াগঞ্জে ডক্টর চ্যাটার্জির ড্রয়িংরুমে।

রাত আটটা।

দুটো একানে সোফায় মুখোমুখি দুজন বসে। দুজনেই প্রায় সমবয়সি, পঞ্চাশোত্তর। একজনের খাটো বলিষ্ঠ চেহারা, মাথার চুলে জার্মান ছাঁট, পরনে পুলিশি পোশাক, মুখে বর্মা চুরুট। ইনি মিস্টার

দুবে, দিল্লি পুলিশের মেজকর্তা। আরেকজনের লম্বা, দোহারা গড়ন, ফরসা মুখে নাকের ডগা লাল, আর তারই নীচে টুথব্রাশের মতো ছাঁটা গোঁফ। ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে পাইপ টানছেন। ইনিই নায়িকার বাপ বিখ্যাত সার্জন দিগম্বর চ্যাটার্জি।

সামনের নিচু টেবিলে দু-কাপ ধোঁয়া-ওঠা কফি।

দুটো জীবন্ত ভিসুভিয়াসের মতো দুজনে নীরবে ধোঁয়া ছাড়ছেন। ঘরের কোণে গ্র্যান্ড ফাদার্স ক্লকের টকটক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পাইপটা দাঁতে চেপে হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন সার্জনসাহেব, 'শুধু আমার বউ—মানে নূপুরের মায়ের জন্যেই এমন কাণ্ডটা ঘটল, বুঝলে দুবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মহিলা!'

মুখ থেকে বর্মা চুরুট নামিয়ে পুলিশসাহেব এক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'সেকী! মিসেস চ্যাটার্জি তো বহুদিন হল স্বর্গে গেছেন!'

সার্জনসাহেব বিষম রেগে বললেন, 'কেন গেছেন? স্বর্গ কী এমন ভালো জায়গা? সেখানে কি দিল্লির চেয়ে ভালো জরদা পাওয়া যায়?'

পুলিশসাহেব হাসতে গিয়ে কেশে ফেললেন।

সার্জনসাহেব বলতে লাগলেন, 'সে থাকলে কি আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়? বোঝো আমার অবস্থাটা! আমি অপারেশন-টেবিলে পেশেন্টের দিকে নজর রাখব, না ঘরে মেয়ের দিকে?'

'তাই তো!'

'নূপুরের জন্যে যে ছেলেটি পেয়েছিলাম, বুঝলে দুবে, জুয়েল! একখানা জুয়েল! বেটি বলে কি না "আমার পছন্দ নয়"! আরে বাবা, তুই কী বুঝিস? স্বামী নিয়ে কখনও ঘর করেছিস? আমার কথা শুনলই না, রাতারাতি গায়েব হয়ে গেল?'

'ছেলেমানুষ—ঝোঁকের মাথায় একটা বোকামি করে ফেলেছে।'

'তুমি জান না দুবে, মেয়েটা ঠিক তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। একবার জরদার কৌটো কেড়ে নিয়েছিলাম বলে সে একমাস বাপের বাড়ি গিয়ে বসেছিল! নূপুরও ঠিক তেমনি জেদি আর রাগী।'

'তাই দেখছি।' —পুলিশসাহেব মুচকে হেসে মন্তব্য করলেন, 'মেয়েটা যদি বাপের মতো ঠান্ডা মেজাজ পেত, তা হলে কি আর এমনটা হত!'

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে সার্জনসাহেব বলে উঠলেন, 'আলবত!'

সঙ্গে-সঙ্গে কফির কাপ দুটো শূন্যে লাফিয়ে উঠে কার্পেটের ওপর চুরমার হয়ে গেল।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে সার্জনসাহেব বললেন, 'যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক, নূপুরকে তুমি ধরে দাও, দুবে। জীবিত বা মৃত। পঁচিশ হাজার দেব বলেছি, না হয় তিরিশ, না হয় পঞ্চাশ—।'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও চ্যাটার্জি, অত উত্তেজিত হলে কি চলে?'

ড্রইংরুমের এধার থেকে ওধার অবধি পায়চারি করতে-করতে সার্জনসাহেব বললেন, 'উত্তেজিত হব না! ভাবী কুটুম-বাড়িতে আমার মান-ইজ্জত কিছু বাকি রাখলে সে-বেটি?'

সার্জনসাহেবের দাঁতের চাপে পাইপটা বোধহয় গুঁড়িয়ে গেল। পায়চারি দ্রুততর হয়ে উঠল।

বর্মা চুরুটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে পুলিশসাহেব বললেন, 'সামথিং রঙ সামহোয়্যার! নূপুর মাইয়াকে আমি যতদূর জানি—সে তো তেমন মেয়ে নয়!'

সার্জনসাহেবের দাঁতের চাপে ওককাঠের পাইপটা আরেকবার কড়মড় করে উঠল, 'জীবিত কিংবা মৃত, বেটিকে যেমন করে হোক ধরে দাও, দুবে।'

BanglaBook.org

পুলিশসাহেব বললেন, 'ধরে দাও বললেই তো আর ধরা যায় না, চ্যাটার্জি। সেই ইস্কুল থেকে দেখছি তুমি চিরকাল একরোখা।'

সার্জনসাহেবের গলায় এবার বাজ ডেকে উঠল, 'এতবড় পুলিশ-ডিপার্টমেন্ট তবে আছে কী করতে? ইউ হাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম!'

পুলিশসাহেবের গলায় এবার কড়া সুর শোনা গেল, 'তুমি কি মনে কর, তোমাদের বাপ-বেটির ঝগড়া মেটাবার জন্যে? ইউ ব্রেনলেস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! তোমার দোষেই তো এই কাণ্ডটা ঘটল। বাপ হয়ে তুমি শাসন করতে পার, অথচ মেয়ের মন বুঝতে পার না!'

পায়চারি হঠাৎ থেমে গেল সার্জনসাহেবের; টুথব্রাশের মতো ছাঁটা গোঁফওয়ালা তিরিক্ষে মুখখানা মিইয়ে গিয়ে করুণ হয়ে এল। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'ঠিক! ঠিক বলেছ, দুবে! মানুষের দেহের অ্যানাটমিই আমি ভালো বুঝি—ইন্ডিয়ার খুব কম সার্জনই আমার মতো এত ভালো বোঝে—কিন্তু মেয়েদের মন আমি বুঝি না। নূপুরের মায়েরও না, নূপুরেরও না। আমি কী করি বলো তো?'

পুলিশসাহেব উঠে গিয়ে সার্জনসাহেবের পিঠে হাত রাখলেন। দুজনে যেন স্কুল-জীবনের সেই পুরোনো বন্ধু। বললেন, 'ঠিক আছে। যা করবার, আমিই করছি। কাগজে তুমি যে-বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে, তার কী হল? কোনও চিঠিপত্র এসেছে?'

'এসেছে।'

সার্জনসাহেব দেরাজ খুলে একতাড়া চিঠি বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন।

'এগুলো এসেছে বেরিলি, শিলং, কোয়েম্বাটুর, কন্যাকুমারিকা, আরও নানা জায়গা থেকে। সকলেই নূপুরকে খুঁজে পেয়েছে। এখন পঁচিশ হাজার টাকা আমি পাঠিয়ে দিলেই তারা ধরে দেবে।'

পুলিশসাহেব বললেন, 'বোগাস! এদের মধ্যে কেউই সত্যি করে আসল নূপুরকে খুঁজে পায়নি। খুঁজে পেয়েছে শুধু নীল সিল্কের শাড়ি আর গালের কালো তিল।'

'কিন্তু সত্যিই যদি কেউ সন্ধান পেয়ে থাকে?'

'তা হলে টাকা না চেয়ে আগে তোমাকেই যেতে লিখত শনাক্ত করার জন্যে।'

'একজন কিন্তু যেতে বলেছিল দুবে।'

'কে সে?'

'মিস্টার মেহরা। এয়ার সার্ভিসের লোক। তার স্ত্রী নাকি নূপুরের কলেজ-বান্ধবী। পালিয়ে গিয়ে নূপুর তারই ওখানে উঠেছিল।'

BanglaBook.org

'বটে! মেহরা থাকে কোথায় ?'

'কলকাতায়। আমাকে যেতে বলেছিল, কিন্তু সেদিন একটা শক্ত অপারেশন ছিল বলে—।'

এবার পুলিশসাহেব উত্তেজিত হলেন, 'সেদিন না গিয়ে পরের দিন গেলে না কেন ?'

'পরের দিনই একটা টেলিগ্রাম এল। মেহরার ফ্ল্যাট থেকে নূপুর আবার পালিয়েছে।'

'যাক, মেয়েটা তা হলে কলকাতাতেই আছে।' পুলিশসাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন।

'কী করে বুঝলে?'

'তুমি আমাকে নূপুরের পালানোর খবর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত বড়-বড় শহরের পুলিশকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। তারা এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে-স্টেশন আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর কড়া নজর রাখছে। কলকাতা থেকে পালাতে গেলে সে নিশ্চয় ধরা পড়ত।'

পুলিশসাহেব আবার সোফায় বসলেন আরাম করে। ধরালেন নতুন চুরুট। হেসে বললেন, 'যাক, এতক্ষণে অন্ধকারে তবু আলো দেখা গেল। আরো দু-কাপ কফি আনতে বলো হে ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন!'

চার

'একটা চাকরি দিন না।'

সকালে চায়ের টেবিলে বসে নূপুর কথাটা পাড়ল।

মুখে চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে অচল থেমে গেল। বললে, 'চাকরি! আমাকে কি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পেয়েছেন? না মন্ত্রী পেয়েছেন?'

'নাই বা মন্ত্রী হলেন, কত লোকের সঙ্গে তো আপনার খাতির। দিন না একটা চাকরি।'

গম্ভীর হয়ে অচল বললে, 'আপনার চাকরি হওয়া মুশকিল। হলেও থাকবে না।'

'সেকি! কেন?'

'আপনার একটা মস্ত ডিসকোয়ালিফিকেশন আছে।'

একটু দমে গেল নূপুর। বললে, 'কী ডিসকোয়ালিফিকেশন?'

'আপনি বড্ড বেশি সুন্দর। যে অফিসে আপনি কাজ পাবেন, সেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ কাজ করবে না—সবাই পদা লিখবে। কেউ-কেউ বা অফিসের আটতলার ছাদ থেকে লাফিয়েও পড়তে পারে। তারপরেও কি আপনার চাকরি থাকবে আশা করেন?'

নূপুরের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল; সামলে নিয়ে বললে, 'চাকরিটা পাগলা-গারদে হবে নাকি?'

টোস্টে কামড় দিয়ে অচল বললে, 'উঁহু, অফিসটাই পাগলা-গারদ হয়ে যাবে।'

হাসি চেপে গম্ভীর মুখে নূপুর বললে, 'এখানেও তার নমুনা দেখছি।...কিন্তু তামাশা রাখুন, চাকরি আমার একটা চাই-ই চাই। আপনার কাঁধে ভার হয়ে আর কতদিন কাটাব বলুন?'

অচল বললে, 'দেমাক তো ষোলো আনা আছে দেখছি। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে ফেরারি নূপুর চ্যাটার্জি পুলিশে যদি ক্যাচ হয়ে যায়, তখন? আপনার ছবি তো পুলিশের মাদুলি হয়ে আছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল নূপুরের মুখ। হতাশ হয়ে বললে, 'তা হলে কোনও চান্স নেই চাকরির?'

'দাঁড়ান-দাঁড়ান! ভাবতে দিন।'

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালে অচল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আচ্ছা, ভানু গোয়েন্দা

BanglaBook.org

যেদিন এসেছিল, সেদিন একটা গান গাইছিলেন আপনি। শুনে মনে হয়েছিল তালিম নেওয়া গলা।'

'দিল্লিতে শিখতাম।'

'শুধু গান?'

'নাচও কিছু-কিছু শিখেছিলাম।'

খুশি হয়ে উঠল অচল। বললে, 'ঠিক আছে। চাকরি হয়ে যেতে পারে।'

উৎসুক গলায় নুপুর জিগ্যেস করলে, 'কোথায়?'

'দেখতেই পাবেন। সন্ধেবেলা নিয়ে যাব।'

'কী করতে হবে?'

'যেমন-যেমন বলব, তাই করবেন। তার আগে আমার কাছ থেকে একটা গানের দুটো লাইন শিখে নিতে হবে।'

'স্টার্ট মিউজিক। ওয়ান—টু—।'

হাত নেড়ে অচল কনডাকটিং শুরু করলে।

স্থান—রুবি থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ। নতুন গীতিনাট্য 'সিতারার স্বপ্ন'র রিহার্সাল চলেছে।

মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখার্জি। স্টেজের ওপর অভিনেতা, অভিনেত্রী, ব্যালে আর বাজিয়েদের জটলা। অডিটোরিয়ামের প্রথম সারিতে গদি-আঁটা একটা চেয়ারে অদ্ভুত এক মূর্তি বসে। লম্বা ভাটিয়া কোট-পরা প্রকাণ্ড একতাল চর্বির ওপর পাঁউরুটির মতো ফুলো-ফুলো একজোড়া গাল, আর দুটো কিশমিশের মতো মিটমিটে চোখ।

থিয়েটার-মালিক রতিলাল শেঠ।

মিউজিক কিছু বাজবার পর একটি মেয়ে স্টেজের মাঝখানে এসে গান ধরলে। চেহারায় রূপের চেয়ে রূপের চটক বেশি। হিরোইনদের বয়স নেই। দর্জির কল্যাণে তারা চিরযৌবনা। রুবি থিয়েটারের বাঁধা হিরোইন ললিতাকুমারী। যেমন গাইতে, তেমনি নাচতে। স্টেজ মাত করে রাখে।

BanglaBook.org

কিন্তু গানের মুখড়াটা একবার মাত্র গাইতেই অচল হাত তুলে থামিয়ে দিলে। বললে, 'হল না।'

ললিতাকুমারীর রং-মাখা ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেল। মিহি ধাতব গলায় বললে, 'হচ্ছে তো।'

'না, হচ্ছে না। আবার ধরুন। স্টার্ট—।'

আবার শুরু হল গান। এবার মুখড়া পুরো গাওয়ার আগেই অচল বলে উঠল, 'হচ্ছে না। কিছুই হচ্ছে না।'

ললিতাকুমারীর বাঁ-দিকের আঁকা ভুরু একটু উঠল। মিহি ধাতব গলা এবার একটু তীক্ষ্ণ হল, 'পরদার ভুল হচ্ছে কি?'

'না।'

'তবে?'

অসহিষ্ণু গলায় অচল বললে, 'পরদাগুলো সুর, গান নয়। ভাব দিয়ে পরদাকে প্রকাশ করাই গান। আপনার গানে প্রাণ কই? আপনার বুকে প্রেমিকা সিতারার মন কই? হচ্ছে না—কিচ্ছু হচ্ছে না।'

প্রকাণ্ড চর্বির তাল নড়ে উঠল। সামনের সারি থেকে শেঠ রতিলাল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'ললিতা যা গাইছে, ওতেই কেল্লাপ পেয়ে যাবে, ওচোলবাবু। চালিয়ে লিন না।'

অচল একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর স্টেজের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে দাঁড়াল রতিলালের সামনে। স্থির গলায় বললে, 'তা হলে আমায় ছেড়ে দিন।'

রতিলালের জোঁকের মতো পুরু ঠোঁট দুটো ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। একটা আওয়াজ শুধু বেরোল, 'অ্যাঁ!'

অচল প্রতিধ্বনি করলে, 'হ্যাঁ। আমায় ছেড়ে দিন, আমি চালাতে পারব না।'

স্টেজের ওপর থেকে মিহি ধাতব গলা শোনা গেল, 'আমার মাথা ধরেছে, শেঠজি। আমি যাচ্ছি।'

হাঁসফাঁস করে চর্বির তাল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই ললিতাকুমারীর হাইহিলের শব্দ স্টেজ থেকে মিলিয়ে গেছে। ধপ করে আবার বসে পড়ল শেঠজি। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠল, 'হায় রাম। নয়া ড্রামার অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়ে গেছে, আর আপনি বলছেন, হিরোইন চলবে না। হামি এখোন কী করবে বোলেন তো?'

রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর করে কাঁপতে থাকে।

অচল যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল। বললে, 'হয় নতুন হিরোইন নিয়ে আসুন, নয় আমাকে ছেড়ে দিন।'

রতিলাল ককিয়ে উঠল, 'বোলেন কী, ওচোলবাবু। আপনাকে ছাড়লে হামার থিয়েটার কানা হইয়ে যাবে। লেকিন, নয়ি হিরোইন এখুন পাব কোথায়? এ কি পকৌড়া ফুচকা যে যাব আর কিনে লিয়ে আসব? গানা জানবে, নাচ জানবে, বিউটিফুল হোবে—হায় রাম, তেমন লেড়কি কই?'

'আছে।' —অচল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

'আছে! কই? কোথায়?'

রতিলাল সাগ্রহে অচলের মুখের দিকে তাকাল।

'একটু সবুর করুন।' —বলে অচল বেরিয়ে গেল। মিনিট তিন-চার বাদেই অচলের সঙ্গে যেন সচল একটি মোমের শিখা প্রবেশ করল প্রেক্ষাগৃহে। উনিশ-কুড়ি বছরের ছিপছিপে সুঠাম দেহ, টকটকে ফরসা রং, টানা চোখে কাজল আছে কি না বোঝা যায় না, সাপিনীর মতো লম্বা বেণীতে

BanglaBook.org

ফুল। মেয়েটি পশ্চিমা, পরনে ধবধবে সাদা সাটিনের সালোয়ার আর কামিজ, মাথা ঘিরে বুকের ওপর ধানী রঙের ফিনফিনে দোপাট্টা।

মেয়েটি রতিলালের সামনে এসে দাঁড়াতেই জোঁকের মতো পুরু ঠোঁটজোড়া এবার দেড় ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। ক্যা তাজ্জব! বেহেস্তের এই হুরিকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল ওচোলবাবু!

অচল বললে, 'দেখে নিন শেঠজি, সিতারার পার্টে চলবে কি না।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রতিলাল প্রশ্ন করলে, 'নাম?'

চোস্ত উর্দু উচ্চারণে জবাব এল, 'খুশিবানু।'

'ঘর?'

'ফৈজাবাদ।'

'বাংলা জানেন? হামার থিয়েটার তো বাংলা আছে।'

খুশিবানু মিষ্টি হেসে নিখুঁত বাংলায় জবাব দিলে, 'জানি বইকী! বাংলাদেশে অনেকদিন আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে রতিলাল বললে, 'ব্যস! ব্যস!...এবার টেস লিয়ে লিন, ওচোলবাবু।'

'টেস!' —অচল অবাক হয়ে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানের টেস।'

'ও, টেস্ট।'

খুশিবানুকে নিয়ে অচল স্টেজের ওপর উঠে গেল। ললিতাকুমারীর গানের প্রথম দুটো লাইন নিজে গেয়ে শোনাল। তারপর রতিলালকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলে খুশিবানুকে, 'গাইতে পারবেন?'

'পারব।'

অচল হুকুম দিলে, 'স্টেজ ফাঁকা করে দাও—সব আলো নিভিয়ে ব্লু লাইট দাও—স্টার্ট মিউজিক! ওয়ান টু—ওয়ান টু—।'

নবম নীলাভ আলোয় একা স্টেজে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করলে খুশিবানু:

'শেষ প্রহরের চাঁদ যেতে-যেতে ফিরে যায়,
তোমার আমার মিলনের রাতি বুঝি বা পোহায়ে যায়।।'

মৃদু থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল খুশিবানুর গান। বেহালার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে তার গলা। প্রাণের আবেগে সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠল ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ। বাজিয়েরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। সত্যিকারের সিতারা বোধ করি এর চেয়ে বেশি দরদ দিয়ে গাইতে পারত না।

একবার—দুবার—তিনবার মুখড়া গেয়ে থামল খুশিবানু। স্টেজ থেকে নেমে এল অচল। বললে, 'কেমন বুঝছেন, শেঠজি?'

কেঁদে-কেঁদে রতিলালের তখন সর্দি হয়ে গেছে। রুমালে সশব্দে নাক ঝেড়ে বললে, 'ওচোলবাবু, খুশিবানু পাবলিকের দিল জ্বালিয়ে দেবে। ললিতাকে হামি পানশো দিই, ওকে সাতশো দিব। রাজি?'

অচল বললে, 'বেশ। আজই কনট্রাক্ট করবেন তো?'

'জরুর। লেকিন, পাঁচ দিন তো মোটে বাকি। আপনি লাউড ভোর রিহার্সাল দিতে থাকুন। আর হামি দমভোর পাবলিসিটি দিয়ে শহর গরম করিয়ে দিই।'

প্রবল উৎসাহে রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

BanglaBook.org

শহর সত্যিই গরম করে দিলে রতিলাল। পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে গেল যত দেওয়াল। পুরো-পাতা বিজ্ঞাপনে ভরে গেল যত দৈনিক কাগজ। সিতারার রূপসজ্জায় খুশিবানুর রঙিন মুখ, তার তলায় বড়-বড় হরফে লেখা:

রুবি থিয়েটার্সের
নৃত্য-গীতমুখর নবনাট্য-নিবেদন

সিতারার স্বপ্ন

নাম ভূমিকায়
নবাগতা অভিনেত্রী

খুশিবানু

লোকের মুখে-মুখে শুধু একটি নাম—'খুশিবানু!'

'খুশিবানু! নামেই মনটা খুশি! চেহারাখানা দেখো, ডেঞ্জারাস!'

হাসি-হাসি মুখে জহর দৈনিক কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিজ্ঞাপনের পাতায় খুশিবানুর ছবিখানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ভানু। মাথায় নকশা-কাটা রুমাল বাঁধা একটি জিপসি মেয়ে। পানের মতো মুখাকৃতি, সুর্মা-টানা চোখে বাঁকা ইশারা, ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটে মোহিনী হাসি।

ছবিখানা বেশ কিছুক্ষণ দেখল ভানু। ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গেল। বর্মা-চুরুটটা দাঁতে চেপে বললে, 'কে বল তো?'

জহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে।'

'ইডিয়ট!' —ধমকে উঠে ভানু বললে, 'সুন্দরী মেয়ে সে তো দেখতেই পাচ্ছি! এ কে? কোত্থেকে এল? পরিচয় কী?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'পরিচয় মানে—থিয়েটার থেকে খোঁজ নিয়েছি, খুশিবানু ফৈজাবাদ থেকে এসেছে। দারুণ নাচ-গান জানে, বাইজির মেয়ে-টেয়ে বোধহয়। নাচ-গানের জন্যেই অচল মুখুজ্যে ওকে থিয়েটারে এনেছে।'

'কে এনেছে?'

'মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখুজ্যে। লোকটার কপাল দেখো! দুনিয়ার যত সুন্দরী মেয়ে সব যেন ওর কাছে মুড়ি-মুড়কি! —নাঃ, মরে আর জন্মে গাইয়ে হব!'

গম্ভীর হয়ে ভানু বললে, 'গাইয়ে হবি তুই!'

জহর বললে, 'হুঁ। ভাবছি, একটা তানপুরা কিনব।'

'কেনবার দরকার কী? তোর পেটে গোটা চারেক তার লাগিয়ে নিলেই হবে।'

হাসবার চেষ্টা করে জহর বললে, 'কী যে বলিস!'

ভানু ড্রয়ার খুলে আইগ্লাস এনে খুশিবানুর ছবিটা দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর জহরের দিকে তাকিয়ে জেরা করলে, 'খুশিবানুকে আগে কখনও দেখেছিস?'

'না তো।'

'দেখেছিস।'

'ধেৎ; আমার তিনপুরুষে কেউ কখনও ফৈজাবাদে যায়নি, দেখব কী করে?'

ছবিখানা জহরের চোখের সামনে ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'না ভাই, আর দেখব না। বলেছি তো, সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলেই আমার বুকের মধ্যে "কাম সেপ্টেম্বরের" মিউজিক বাজে—যৌবনে কোকিল ডাকে—।'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাবিশ! তোর যৌবনে যা ডাকে, সে কোকিল নয়, কাক! দাঁড়কাক! নাঃ, তোকে নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি চলবে না।'

BanglaBook.org

ফুল। মেয়েটি পশ্চিমা, পরনে ধবধবে সাদা সাটিনের সালোয়ার আর কামিজ, মাথা ঘিরে বুকের ওপর ধানী রঙের ফিনফিনে দোপাট্টা।

মেয়েটি রতিলালের সামনে এসে দাঁড়াতেই জোঁকের মতো পুরু ঠোঁটজোড়া এবার দেড় ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। ক্যা তাজ্জব! বেহেস্তের এই হুরিকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল ওচোলবাবু!

অচল বললে, 'দেখে নিন শেঠজি, সিতারার পার্টে চলবে কি না।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রতিলাল প্রশ্ন করলে, 'নাম?'

চোস্ত উর্দু উচ্চারণে জবাব এল, 'খুশিবানু।'

'ঘর?'

'ফৈজাবাদ।'

'বাংলা জানেন? হামার ঠিয়েটার তো বাংলা আছে।'

খুশিবানু মিষ্টি হেসে নিখুঁত বাংলায় জবাব দিলে, 'জানি বইকী! বাংলাদেশে অনেকদিন আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে রতিলাল বললে, 'ব্যস! ব্যস!...এবার টেস লিয়ে লিন, ওচোলবাবু।'

'টেস!' —অচল অবাক হয়ে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানের টেস।'

'ও, টেস্ট।'

খুশিবানুকে নিয়ে অচল স্টেজের ওপর উঠে গেল। ললিতাকুমারীর গানের প্রথম দুটো লাইন নিজে গেয়ে শোনাল। তারপর রতিলালকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলে খুশিবানুকে, 'গাইতে পারবেন?'

'পারব।'

অচল হুকুম দিলে, 'স্টেজ ফাঁকা করে দাও—সব আলো নিভিয়ে ব্লু লাইট দাও—স্টার্ট মিউজিক! ওয়ান টু—ওয়ান টু—।'

নরম নীলাভ আলোয় একা স্টেজে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করলে খুশিবানু ঃ

'শেষ প্রহরের চাঁদ যেতে-যেতে ফিরে যায়,
তোমার আমার মিলনের রাতি বুঝি বা পোহায়ে যায়।।'

মৃদু থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল খুশিবানুর গান। বেহালার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে তার গলা। প্রাণের আবেগে সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠল ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ। বাজিয়েরা তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে। সত্যিকারের সিতারা বোধ করি এর চেয়ে বেশি দরদ দিয়ে গাইতে পারত না।

একবার—দুবার—তিনবার মুখড়া গেয়ে থামল খুশিবানু। স্টেজ থেকে নেমে এল অচল। বললে, 'কেমন বুঝছেন, শেঠজি?'

কেঁদে-কেঁদে রতিলালের তখন সর্দি হয়ে গেছে। রুমালে সশব্দে নাক ঝেড়ে বললে, 'ওচোলবাবু, খুশিবানু পাবলিকের দিল জ্বালিয়ে দেবে। ললিতাকে হামি পানশো দিই, ওকে সাতশো দিব। রাজি?'

অচল বললে, 'বেশ। আজই কনট্রাক্ট করবেন তো?'

'জরুর। লেকিন, পাঁচ দিন তো মোটে বাকি। আপনি কাল ভোর রিহার্সাল দিতে থাকুন। আর হামি দমভোর পাবলিসিটি দিয়ে শহর গরম করিয়ে দিই।'

প্রবল উৎসাহে রতিলালের থলথলে চিবুক থরথর করে কাঁপতে লাগল।

BanglaBook.org

শহর সত্যিই গরম করে দিলে রতিলাল। পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে গেল যত দেওয়াল। পুরো-পাতা বিজ্ঞাপনে ভরে গেল যত দৈনিক কাগজ। সিতারার রূপসজ্জায় খুশিবানুর রঙিন মুখ, তার তলায় বড়-বড় হরফে লেখা ঃ

রুবি থিয়েটার্সের
নৃত্য-গীতমুখর নবনাট্য-নিবেদন

সিতারার স্বপ্ন

নাম ভূমিকায়
নবাগতা অভিনেত্রী

খুশিবানু

লোকের মুখে-মুখে শুধু একটি নাম—'খুশিবানু!'

'খুশিবানু! নামেই মনটা খুশি! চেহারাখানা দেখো, ডেঞ্জারাস!'

হাসি-হাসি মুখে জহর দৈনিক কাগজটা এগিয়ে দিল।

বিজ্ঞাপনের পাতায় খুশিবানুর ছবিখানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ভানু। মাথায় নকশা-কাটা রুমাল বাঁধা একটি জিপসি মেয়ে। পানের মতো মুখাকৃতি, সুর্মা-টানা চোখে বাঁকা ইশারা, ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁটে মোহিনী হাসি।

ছবিখানা বেশ কিছুক্ষণ দেখল ভানু। ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গেল। বর্মা-চুরুটটা দাঁতে চেপে বললে, 'কে বল তো?'

জহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'একটি সুন্দরী মেয়ে।'

'ইডিয়ট!' —ধমকে উঠে ভানু বললে, 'সুন্দরী মেয়ে সে তো দেখতেই পাচ্ছি! এ কে? কোত্থেকে এল? পরিচয় কী?'

থতমত খেয়ে জহর বললে, 'পরিচয় মানে—থিয়েটার থেকে খোঁজ নিয়েছি, খুশিবানু ফৈজাবাদ থেকে এসেছে। দারুণ নাচ-গান জানে, বাইজির মেয়ে-টেয়ে বোধহয়। নাচ-গানের জন্যেই অচল মুখুজ্যে ওকে থিয়েটারে এনেছে।'

'কে এনেছে?'

'মিউজিক ডিরেক্টার অচল মুখুজ্যে। লোকটার কপাল দেখো! দুনিয়ার যত সুন্দরী মেয়ে সব যেন ওর কাছে মুড়ি-মুড়কি! —নাঃ, মরে আর জন্মে গাইয়ে হব!'

গম্ভীর হয়ে ভানু বললে, 'গাইয়ে হবি তুই!'

জহর বললে, 'হুঁ! ভাবছি, একটা তানপুরা কিনব।'

'কেনবার দরকার কী? তোর পেটে গোটা চারেক তার লাগিয়ে নিলেই হবে।'

হাসবার চেষ্টা করে জহর বললে, 'কী যে বলিস!'

ভানু ড্রয়ার খুলে আইগ্লাস এনে খুশিবানুর ছবিটা দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর জহরের দিকে তাকিয়ে জেরা করলে, 'খুশিবানুকে আগে কখনও দেখেছিস?'

'না তো।'

'দেখেছিস।'

'ধেৎ; আমার তিনপুরুষে কেউ কখনও ফৈজাবাদে যায়নি, দেখব কী করে?'

ছবিখানা জহরের চোখের সামনে ধরে ভানু বললে, 'ভালো করে দেখ।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'না ভাই, আর দেখব না। বলেছি তো, সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলেই আমার বুকের মধ্যে "কাম সেপ্টেম্বরের" মিউজিক বাজে—যৌবনে কোকিল ডাকে—।'

ধমকে উঠল ভানু, 'রাবিশ! তোর যৌবনে যা ডাকে, সে কোকিল নয়, কাক! দাঁড়কাক! নাঃ, তোকে নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি চলবে না।'

BanglaBook.org

কাঁচুমাচু মুখে জহর বললে, 'রাগ করিস কেন? চকোলেট খা।'

ভানু এবার ফাইল থেকে ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির বিজ্ঞাপনের কাটিং বের করে আনল। নূপুরের ছবিখানা পাশে রেখে ফাউন্টেন পেন দিয়ে খুশিবানুর চিবুকের বাঁ-দিকে আঁকলে ছোট্ট একটা কালো তিল। তারপর জহরকে বললে, 'দেখ।'

দেখে জহরের গোল চোখ আরও গোল হয়ে উঠল। ঝুলে পড়ল নীচের ঠোঁটখানা। মুখ দিয়ে বেরোল, 'এ কী রে ভানু! এ যে—।'

কোঁচকানো ভুরু নিয়ে ভানু বললে, 'হুঁ! ভেরি ডাউটফুল! খুশিবানু আসল না নকল দেখতে হবে। এখুনি থিয়েটারের দুটো সিট বুক কর।'

টেলিফোনে ডায়াল করে জহর তৎক্ষণাৎ ডাকলে, 'হ্যালো, রুবি থিয়েটার্স!'

রুবি থিয়েটার্সের 'সিতারার স্বপ্ন'। প্রেক্ষাগৃহে বাদুড় ঝুলছে। নাট্যপাগল মানুষ-বাদুড়। একস্ট্রা সিট দিয়েও কুলোয়নি। সাড়ে ছ'টায় শো আরম্ভ।

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় প্রেক্ষাগৃহের যত আলো একে-একে নিভে গেল। অতি মৃদু সুরে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা, ধীরে-ধীরে সরে গেল পরদা। স্টেজের ওপর নাটক শুরু হল। আরব্যোপন্যাসের যাদু যেন দর্শকের চোখের সামনে রূপ ধরে ফুটে উঠল।

শ্বেত পাথরে গড়া এক প্রাসাদের অলিন্দ। দূরে পাহাড়ের মাথায় সূর্যোদয় হচ্ছে। তরুণ শাহজাদা তার সহচরকে বলছে, 'কাল রাতে আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি, বন্ধু! আশমানের এক তারা থেকে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে নেমে এল। চোখে তার তারার আলো, মুখে গোলাবের হাসি, কণ্ঠে বুলবুলের আওয়াজ। তাকে ধরতে গেলাম, পারলাম না। নাম জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, সিতারা। তাকে দেখা অবধি আমার চোখে আর ঘুম নেই, মন পাগল। বলো বন্ধু, কী করে আমি পাব সেই স্বপ্নের সিতারাকে? কে এনে দেবে তাকে?'

সহচর বললে, 'তোমার আঙুলে তো যাদুর আংটি রয়েছে, শাহজাদা! ভাবনা কী?'

'ঠিক বলেছ বন্ধু।'

শাহজাদা তখন তার আংটি অলিন্দের পাথরে ঘষতেই ঝোড়ো হাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ হতে লাগল, আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিল বিরাটকায় এক দৈত্য।

কুর্নিশ করে দৈত্য বললে, 'গোলামকে স্মরণ করেছেন কেন, শাহজাদা?'

শাহাজাদা হুকুম দিল, 'সেই কন্যাকে নিয়ে এসো, চোখে যার তারার আলো, ঠোঁটে গোলাবের হাসি আর কথায় বুলবুলের আওয়াজ।'

'জো হুকুম!'

দৈত্য অদৃশ্য হল।

অন্ধকার হয়ে গেল স্টেজ। ঘুরতে লাগল ঘূর্ণি মঞ্চ। সামনের পঞ্চম সারির দুটো চেয়ার দখল করে বসে আছে ভানু আর জহর। জহরের কানে-কানে চাপা তিরিক্ষে গলায় ভানু বললে, 'রাবিশ! অল গাঁজা-অ্যাফেয়ার্স! খুশিবানু কোথা?'

'দাঁড়া, এই তো সবে শুরু। পরের সিনে আসবে।'

'ঠিক জানিস?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

চুপি-চুপি জহর বললে।

ততক্ষণে স্টেজের ওপর দেখা দিল প্রমোদ-কাননের দৃশ্য। গুলবাগে মর্মর-চত্বরে শাহজাদা বসে। আকাশে মাধবী রাতের চাঁদ। একজন বাঁদি পেয়ালা ভরে সিরাজি আনলে, শাহজাদা ছুঁল না।

BanglaBook.org

একজন রবাবের তারে ঝঙ্কার তুললে, আরেকজন শুরু করলে নাচ। শাহজাদা হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল। বাঁদিরা অবাক চোখে এ ওর মুখের পানে তাকাল।

কিছুই ভালো লাগছে না আজ শাহজাদার। কোথায় সিতারা? আশমানের তারা থেকে নেমে-আসা সেই অপরূপ কন্যা ? তাকে স্বপ্নে দেখা অবধি পাগল হয়ে উঠেছে শাহজাদার তরুণ হৃদয়। এখনও আসছে না কেন যাদু-আংটির সেই দৈত্য?

ঠিক এই সময় শোনা গেল ঝোড়ো হাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ। আর সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির সেই দৈত্য। তার পিঠে এক মস্ত ঝোলা।

শাহজাদাকে কুর্নিশ করে ঝোলার মুখটা খুলে দিয়েই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঝোলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আশ্চর্য রূপবতী এক কন্যা।

পলক পড়ল না শাহজাদার চোখে। এই তো সেই মেয়ে। চোখে যার তারার আলো, মুখে গোলাবের হাসি!

বাঁদিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কে তুমি?'

বুলবুলের মতো মিঠে আওয়াজে মেয়েটি জবাব দিল ঃ

'নীল আশমানে তারা হয়ে ছিনু আমি,
কে যেন ডাকল, মাটিতে এলাম নামি।
(মোর) হাসিতে গোলাপ ফোটে,
আমার গানে যে বুলবুল গেয়ে ওঠে,
আমি যে স্বপ্ন, যেন আলেয়ার ছলনা,
কে আমি ? আমি কে বলো না?

বিহ্বল শাহজাদা বলে উঠল, 'সিতারা!'

গদগদ জহর বললে, 'খুশিবানু!'

উত্তেজিত ভানু বললে, 'নূপুর চ্যাটার্জি!'

প্রমোদ-কাননে তখন ব্যালে নাচ শুরু হয়ে গেছে। মুগ্ধ শাহজাদা সিতারাকে ধরতে চাইছে, আর সিতারা ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না, নৃত্যরতা বাঁদিদের মাঝে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্কেস্ট্রায় বাজছে মধুর ছন্দ, নানা রঙের আলোর খেলায় স্টেজের ওপর যেন ইন্দ্রধনুর মেলা!

দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছে আর শুনছে। জহরের বাহ্যজ্ঞান নেই। হঠাৎ ভানুর কনুইয়ের একটা গুঁতো খেয়ে কোঁক করে উঠল। মুখ ফেরাতেই তার কানে-কানে কী যেন বলল ভানু। তারপর দুজনে সিট ছেড়ে উঠে, শিকারি বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল।

না, থিয়েটার ছেড়ে চলে যায়নি ভানু-জহর। থিয়েটারের পিছন দিকে স্টেজে ঢোকবার দরজার মুখে এসে দাঁড়াল তারা। একবার দেখল দরজায় লোক নেই। তারপর সুট করে ঢুকে গেল দুজনে।

অর্কেস্ট্রার ছন্দ তখন দ্রুততর হয়েছে। জমে উঠেছে নাচ। প্রমোদ-কাননে বাঁদিদের মাঝখানে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে সিতারা। আলোর খেলায় রূপের মেলায় হাজার আরব্য-রজনীর একটা রাত যেন সত্যিই নেমে এসেছে স্টেজের ওপর। হঠাৎ দ্বারের উইংসের পাশ থেকে স্টেজে ঢুকে পড়ল ভানু আর জহর।

ঘাঘরা-ওড়না পরা একঝাঁক সুন্দরীর মাঝখানে আঁচমকা সেই কোট-প্যান্ট পরা দুটি বিচিত্র মূর্তির আবির্ভাবে আরব্য-রজনীর স্বপ্ন এক মুহূর্তের জন্য লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। থেমে গেল বাঁদিদের কোরাস গান, হারিয়ে গেল ভয়ে-কাঠ খুশিবানু ওরফে নূপুরের নাচের ছন্দ! রয়্যাল বক্স থেকে হাঁসফাঁস করতে-করতে স্টেজের দিকে ছুটল চর্বির তাল রতিলাল শেঠ। মিউজিকের জায়গা ছেড়ে উইংসের পাশে এসে দাঁড়াল অচল। আর ভানু-জহরকে দেখেই দারুণ জলতেষ্টায় শুকিয়ে উঠল তার গলা।

BanglaBook.org

কিন্তু সবই এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপর যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল নাচগান। হইহই করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। স্টেজের ওপর তখন শুরু হয়ে গেছে সিতারার সত্যিকার লুকোচুরি খেলা। ভানু-জহর যতই ধরতে যায়, নূপুর ততই পাশ কাটিয়ে পালায়। এ-বাঁদির পাশ দিয়ে, ও-বাঁদির পিছন দিয়ে, সে-বাঁদির আড়াল দিয়ে। ভানু জহর যেন গোলকধাঁধায় পড়েছে।

অর্কেস্ট্রায় দ্রুতলয়ে নাচের ছন্দ বেজে চলেছে। বাঁদিরা নাচছে, নূপুর নাচছে, দলে পড়ে বা দায়ে পড়ে ভানু-জহরও নাচছে।

খুশি হয়ে দর্শকেরা পায়রা উড়িয়ে দিল। ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ হাততালির আওয়াজে। এমন চমৎকার কমিক সিন তারা জীবনে দেখেনি।

রতিলালের থলথলে চিবুক খুশিতে থরথর করে কাঁপছে। অচলের কানে-কানে বললে, 'বহুত আচ্ছা কমেডিয়ান! বাংলার লোরেল-হার্ডি আছে, কী বোলেন?'

উইংসের পাশ থেকে অচলের সজাগ চোখ দুটো নূপুরের সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। প্রমোদ-কাননের দৃশ্যের বদলে এতক্ষণ সে দেখছিল থানা-পুলিশ-আদালত!

রতিলালের কথায় মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'নিশ্চয়! দারুণ জমিয়েছে সিনটা! ওদের ছাড়বেন না, শেঠজি, আজই কনট্রাক্ট করে নিন।'

ঠিক এইসময় ভানুর হাতের তলা দিয়ে, জহরের ভুঁড়ির পাশ কাটিয়ে নূপুর উইংসের ধারে এসে পড়ল। আর বিদ্যুৎগতিতে তার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে অচল বলে উঠল, 'ওদের স্টেজ থেকে বেরোতে দেবেন না, শেঠজি, সিনটা মাটি হয়ে যাবে! খুশিবানু ড্রেস চেঞ্জ করে এখুনি আসছে।'

নূপুরকে ধরতে ভানু-জহরও তখন নাচতে-নাচতে উইংসের ধারে এসে পড়েছে। উৎসাহী দর্শক আবার পায়রা ওড়াল।

হাঁসফাঁস করে উইংসের পথ আগলে দাঁড়াল রতিলাল, 'আরে, আরে, কোথা যাচ্ছেন? শুনচেন না, পাবলিক কেলাপ দিচ্ছে! সিনটা মার্ডার হইয়ে যাবে! যান, যান, ফের নাচ করুন! খুশিবানু এখুনি আসছে।'

একরকম ঠেলেই রতিলাল দুজনকে আবার স্টেজের ভেতরে চালান করে দিলে।

অর্কেস্ট্রায় নাচের ছন্দ আরও দ্রুত হয়ে উঠল। রঙিন আলোয় রঙিন ঘাঘরা ফুলিয়ে অভ্যস্ত পায়ে বাঁদিরা নেচে চলেছে। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ভানু স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো অনবরত হাত-পা ছুঁড়ছে। জহর গলদঘর্ম, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। মুখে অমায়িক হাসি, দুটো চোখের তারা দু-দিকে।

রতিলাল হাঁকলে, 'ফেলাশ!'

সঙ্গে-সঙ্গে লাল-নীল দুটো ফ্ল্যাশ-লাইট এসে পড়ল ভানু-জহরের মুখে।

আরও একটু দ্রুত হল নাচের মিউজিক।

ভানুর দম ফুরিয়ে আসছে। তবু ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। জহরের অবস্থা আরও কাহিল। এঞ্জিনের মতো হাঁপাচ্ছে, বিরাট একটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে ভুঁড়িটা। মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে তবু নাচছে জহর।

হঠাৎ পট করে ছিঁড়ে গেল কোটের একটা বোতাম। ভ্রূক্ষেপ নেই জহরের। তারপর আরও একটা বোতাম। দৃকপাত নেই তার। অবশেষে প্যান্টের পুরোনো চামড়ার বেল্ট।

হাজার হাতের হাততালিতে ফেটে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ। যেন উড়ে গেল একলক্ষ পায়রা। বাঁদিরা মুখে ওড়না চাপা দিল।

খেয়াল নেই জহরের। নাচের নেশায় নেচেই চলেছে। যেন উদয়শংকরকে ডাউন করে দেবে, এই পণ।

BanglaBook.org

হঠাৎ ভানুর দিকে চোখ পড়তেই থমকে থেমে গেল জহর। দেখলে তার কোমরের দিকে তাকিয়ে ভানুর চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল-গোল হয়ে উঠেছে। ভানুর মুখ থেকে নিজের কোমরের দিকে চোখজোড়া নেমে আসতেই জহরের অমায়িক হাসি শুকিয়ে গেল। প্যান্ট আর কোমরে নেই। রয়েছে শুধু আন্ডারওয়্যার!

হাঁপাতে-হাঁপাতে করুণ স্বরে জহর শুধু বলে উঠল, 'ড্রপ!'

ধীরে-ধীরে পরদা নেমে এল।

পাঁচ

সেই রাতে।

অস্টিন কেমব্রিজখানা তখন যোধপুর পার্কের পথে ছুটেছে। অচলের পাশে নূপুর। পরনে সিতারার পোশাক। মুখের মেক-আপ তোলারও সময় পায়নি।

অচল বলছে, বুলডগের হাত থেকে বরং বাঁচা যায়, কিন্তু গোয়েন্দা-জাতটা তার চেয়েও সাংঘাতিক! ওরা বোধহয় গন্ধে-গন্ধে টের পায়। নইলে খুশিবানুর মেক-আপে নূপুর চ্যাটার্জিকে চিনে ফেলল কী করে?

শুকনো গলায় নূপুর বললে, 'কী হবে এখন? থিয়েটারের চাকরিটা—।'

'চুলোয় যাক থিয়েটারের চাকরি! এখন চাচা আপনা বাঁচা!' —তেতো গলায় অচল বলে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে নূপুর বললে, 'তাই করুন। আমার জন্যে অনেক ঝামেলা আপনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। কতদিন মানুষ পারে? আমায় বরং ছেড়ে দিন—আমার কপালে যা আছে, তাই হোক!'

বলতে-বলতে কান্নায় নূপুরের গলা বুজে এল।

ঝাঁঝিয়ে উঠল অচল, 'ওই তো দোষ মেয়েদের! পানসে চোখের জল ঝরতেই আছে! আপনার ঝামেলা আমি কাঁধে নিয়েছি সে আমার খুশি, আপনার তাতে কী? ওঃ, ভারি উদারতা দেখাচ্ছেন—আমায় ছেড়ে দিন! আমি ছেড়ে দিলেও পুলিশ আমায় ছাড়বে নাকি? ফেরারি নূপুর চ্যাটার্জির সঙ্গে জড়িয়ে আমাকে সুদ্ধু কোর্টে দাঁড় করাবে না? লোকে তখন ভাববে কী শুনি?'

ভয়ে-ভয়ে নূপুর বললে, 'কী ভাববে?'

'ভাববে আপনাকে আমি ভা—ভা—ভা—।'

অচল তোতলাতে শুরু করলে। হঠাৎ-উত্তেজনায় ওর প্রায়ই এমন হয়। কিন্তু কথাটা স্পষ্ট করে বেরিয়ে আসার আগেই নূপুর মুখ লাল করে বললে, 'মোটেই ভাববে না।' তারপর একটু থেমে আস্তে-আস্তে বললে, 'এ তো আর সত্যি নয়।'

'সত্যি হতে কতক্ষণ! আপনার মতো মেয়েরা ভে—ভে—ভেলকি জানে। অল রেডি আপনাকে আমার ভালো লাগতে শুরু হয়েছে জানেন? কপালে আমার কী যে আছে তাই ভাবছি।' —অচল সখেদে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললে।

এত দুঃখেও নূপুরের হাসি পেয়ে গেল। তবু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ও ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। এখন কী করা যায় তাই ভাবুন।'

'ভেবেছি।'

'কী?'

'আগে বাড়ি চলুন; বলছি।'

BanglaBook.org

'পালাতে হবে। এখুনি আমাদের পালাতে হবে।' —ছোট একটা স্যুটকেস গুছোতে-গুছোতে অচল বললে।

নূপুর প্রশ্ন করলে, 'কোথায়?'

'কলকাতার বাইরে।'

'কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'যেখানে হোক। স্টেজে উইংসের পাশে আমাকে ভানু-জহর দেখেছে। যে-কোনও মুহূর্তে এখানে এসে হানা দিতে পারে। তার আগেই পালিয়ে যাওয়া চাই। যান, রেডি হয়ে নিন।'

নূপুব শোওয়ার ঘরে ঢুকলে।

চটপট করে অচল স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিলে। ড্রয়ার খুলে ক্যাশ টাকা যা ছিল মনিব্যাগে ভরলে। তারপর ডাকলে, 'হল আপনার?'

ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল নূপুর। মুখের রং তুলে ফেলেছে। পরনে শাড়ি। বললে, 'চলুন।'

কিন্তু তার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে অচল বলে উঠল, 'এ কী করেছেন?'

হকচকিয়ে গেল নূপুর। বললে, 'কেন? কী হল?'

'খুশিবানু সেজেও গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিতে পারলেন না। আর আপনি কি আশা করেন, বিনা মেক-আপে পুলিশকে ঠকাতে পারবেন?'

নূপুর বললে, 'গলা অবধি ঘোমটা টেনে দেব?'

'পুলিশ যদি ঘোমটা তুলে দেখে?'

'আচ্ছা, মুসলমানি বোরখা পরলে হয় না?'

'সে তো আরও সন্দেহজনক। পুলিশ অত বোকা নয়।'

ভয়ানক দমে গেল নূপুর। বললে, 'তা হলে উপায়?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল দেশলায়ের বাক্সে আঙুল দিয়ে মৃদু-মৃদু তাল দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক আছে!'

দুই চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে নূপুর তাকাল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকল অচল। ওয়ার্ডরোব খুলে নীচের ড্রয়ার থেকে একটা পুরোনো ট্রাউজার, একটা কোট আর শার্ট বের করে ফেললে। খুশি মুখে বললে, 'যাকে রাখো, সেই রাখে। এগুলো আমার পাঁচ-সাত বছর আগেকার। কে জানত, আজ কাজে লেগে যাবে!'

আলনা থেকে একটা ফেল্টহ্যাট নূপুরের মাথায় বসিয়ে দিয়ে অচল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক বাদে নতুন রূপসজ্জায় সেজে বেরিয়ে এল নূপুর। এক মিনিট তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে অচল বললে, 'আপনার মেকআপের বাক্স থেকে ভুরু-আঁকা পেনসিলটা দিন তো?'

'কী হবে?'

'দিয়েই দেখুন না!'

পেনসিলটা এনে দিতেই অচল বললে, 'অফেন্স নেবেন না যেন। চোখ বন্ধ করুন।'

হতবাক নূপুর চোখ বুজলে।

মিনিট দুয়েক বাদে অচল বললে, 'ব্যস, নিশ্চিন্ত! এইবার নূপুর চ্যাটার্জিকে চেনে কার সাধ্যি! চোখ খুলুন।'

চোখ মেলতেই চোখ পড়ল সামনে ড্রেসিং আরশির ওপর। আর একটু হলেই নূপুর চেঁচিয়ে উঠত। তার টিকোলো নাকের নীচে গোলাপি ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম একজোড়া গোঁফের রেখা!

BanglaBook.org

সিঁড়িতে দেখা। একেবারে মুখোমুখি।

সেই চিরপরিচিত পালিশ-করা টাক।

একগাল হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'কই যান? হাতে সুটকেস দ্যাখছি যে?'

অচলকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল। বললে, 'চেঞ্জে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি! কোনহানে?'

'এই কাছে-পিঠে। লালটিলা।'

'তা একা যাইতে আছেন কেন? বউঠান কই?'

'বউঠান! ইয়ে—তিনি আগেই চলে গেছেন।'

দুন্দুভিবাবু টাক চুলকে বললেন, 'অ, তাই কন। হনিমুনে যাইতে আছেন।'

অচল বললে, 'কী জ্বালা! হনিমুন কোথায়? চেঞ্জে।'

হেসে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'একই কথা। কপোত-কপোতী মিল্যা চেঞ্জে গ্যালে তারে হনিমুনই কয়। আমিও বুঝিরে মশয়। আমিও একদিন লভ ম্যারেজ করছিলাম।'

'লাভ ম্যারেজ! আপনি!'

অচলের চোখ দুটো গোলাকার হয়ে উঠল।

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'হ। তখন আমার একমাথা চুল আছিল। আর, সেই দেইখ্যা আমার ওয়াইফ এক্কেরে লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।'

অচলের পিছন থেকে 'খুঁক' করে একটা ছোট্ট আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'আপনার পিছনে ও সায়েব ছোকরাটি কে, অচলবাবু? বউঠানের মুখখান যেন বসানো।'

ঘাবড়ে গিয়ে অচল বললে, 'ইয়ে—মানে—আমার শা—সম্বন্ধী।'

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'অ। বেশ, কিষ্টো-কিষ্টো চেহারা। তা পশ্চিমে যাইবেন, টিকেট আগেভাগে কাটছেন তো। স্টেশনে যা ভিড়।'

'মোটরেই যাব। এই তো সোয়া শো মাইলের মধ্যে। আচ্ছা, চলি।'

তরতরিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গেল অচল। মুখে রুমাল চেপে নূপুরও। অচল কিন্তু আবার উঠে এল। বললে, 'একটা কথা। আমি যে লালটিলা যাচ্ছি, কাউকে বলবেন না যেন। প্লিজ।'

দুন্দুভিবাবু বললেন, 'রাম কহো। আমি যা শুনি, ব্যাবাক হজম কইরা ফ্যালাই। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। —আসেন। দুর্গা, দুর্গা।'

একটু বাদেই নীচের থেকে অস্টিন কেমব্রিজের গর্জন দূরে মিলিয়ে গেল। আর, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই বনেদি ফোর্ডখানা পাড়া কাঁপিয়ে এসে হাজির।

সিঁড়িতে আবার জুতোর আওয়াজ পেয়ে দুন্দুভিবাবু ফিরে তাকালেন। ভানু-জহর তাঁকে একরকম ঠেলেই ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু অচলের ফ্ল্যাটের দরজায় তালা।

ভানু বললে, 'তাই তো।'

জহর বললে, 'নাই তো।'

দুজনে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। পিছন থেকে গলা বাড়িয়ে দুন্দুভিবাবু বললে, 'কারে খোঁজেন স্যার?'

ভানু বললে, 'অচল মুখার্জি—।'

'এইমাত্র মোটরে চাইপ্যা হনিমুনে গেছেন।'

'হনিমুনে।'—তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ভানু। '—কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

মাথা নেড়ে দুন্দুভিবাবু বললেন, 'উঁহু, সেটি কমু না।'

BanglaBook.org

'বলনু না দয়া করে—বিশেষ দরকার—ভীষণ জরুরি।'

'মাপ করেন, মশয়। কইতে পারুম না।'

দুন্দুভিবাবু অটল।

চুরুটটা দাঁতে চেপে ভানু বললে, 'হোপলেস।'

জহর দুন্দুভিবাবুর হাত দুটো ধরে ফেললে। কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'দোহাই দাদা, কেস খারাপ করবেন না। পঁচিশ হাজার টাকা মাঠে মারা যাবে। বলুন, অচল মুখুজ্যে কোথায় হনিমুন করতে গেছে? দিল্লি? আগ্রা? কাশ্মীর?'

দুন্দুভিবাবু খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'দূর মশয়! মাথাডা আপনার খারাপ। বউ গেল লালটিলা, আর সে যাইবে গিয়া কাশ্মীর! —যান, যান, পথ দ্যাখেন। আমি কমু না—অচলবাবু কোনহানে গেছে কিছুতেই কমু না।'

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে দুন্দুভিবাবু দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন।

আর, ভানু-জহর একসঙ্গে বলে উঠল, 'ইউরেকা! লালটিলা!'

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।

হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, কারা যেন হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলছে। অদূরে রেল-লাইনের একটা লেভেলক্রসিং।

গাড়ি থামতেই টর্চের আলো পড়ল মুখে। পুলিশের টর্চ! গুরুগম্ভীর গলার প্রশ্ন শোনা গেল, 'নাম?'

'অচল মুখার্জি।'

'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'লালটিলা। কেন বলুন তো? কী ব্যাপাব?'

সূচলো গোঁফের প্রান্ত পাকিয়ে পুলিশ-অফিসার বললে, 'দিল্লির এক ডাক্তারের মেয়ে পালিয়ে গেছে, আমরা তাকেই খুঁজছি।... আপনার সঙ্গে কে?'

অচল একবার চোরা চোখে নূপুরের দিকে তাকালে। তারপর ঢোঁক গিলে বললে, 'ইনি আমার ইয়ে—বা—বা—ব্রাদার ইন-ল।'

'নাম কী?'

'নাম—মানে—নকল চ্যাটার্জি।'

পুলিশ-অফিসারের সূচলো গোঁফের একটা প্রান্ত উঁচু হয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ গলায় বললে, 'নামের বাহার তো খুব! কিন্তু চেহারাটা তো দেখছি মেয়ে-মেয়ে!'

কোট-প্যান্টের আড়ালে নূপুরের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। কপালে নাকে ঠোঁটের ওপর বিনবিন করে দেখা দিল ঘাম।

অচল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ঠিক ধরেছেন! যাত্রায় ফিমেল পার্ট করে কিনা! মওড়ার সখিও সাজে।'

'বটে!' —অফিসারের সূচলো গোঁফের উঁচু প্রান্তটা আবার নেমে এল। কিন্তু গলায় সন্দেহের সুর যেন কাটল না। বললে, 'কিন্তু এই গরমে গরমের স্যুট পরেছ কেন হে, ছোকরা? ঘেমে তো নেয়ে যাচ্ছ দেখছি!'

কলের পুতুলের মতো নূপুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে ফেললে।

আর, নূপুরের দিকে তাকিয়ে অচলের মুখ শুকিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, 'এই রে! রাধা সেজে-সেজে এর আবার মৃগী রোগ হয়েছে কি না! ঘামতে শুরু করলেই ফিট হয়...আমরা যেতে

BanglaBook.org

পারি, স্যার?'

টর্চ নিভিয়ে অফিসার বললে, 'আচ্ছা, যান।'

পরমুহূর্তেই অচলের পা অ্যাকসিলেটর চেপে ধরলে। হাওয়ায় যেন উড়ে গেল অস্টিন কেমব্রিজ।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অচল বললে, 'আর একটু হলেই হাতে দড়ি দিয়েছিলেন আর কী! ভাগ্যিস অফিসারের নজর পড়েনি।'

অবাক হয়ে নূপুর বললে, 'কী হয়েছে?'

'আমার মাথা! ঘাম মুছতে গিয়ে আপনার ডানদিকের গোঁফটা মুছে গেছে, আবার এঁকে নিন।'

ছয়

লালটিলা এল অনেক রাতে।

জানা একটা হোটেলের কম্পাউন্ডে অস্টিন কেমব্রিজখানা থামল। দোতলায় একখানা মাত্র ঘর খালি আছে; তাই সই।

বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে দুজনে যখন দুটো চেয়ারে এসে বসল, ক্লান্তিতে তখন চোখ জুড়ে আসছে। খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সেটা পথেই সারা হয়েছে।

অচল বললে, 'এবার শুয়ে পড়া যাক। আপনি ঘরে, আমি বারান্দায়।'

'উঁহু, আপনি ঘরে, আমি বারান্দায়।' —নূপুর বললে।

'তা হয় না।'

'খুব হয়।'

অচল বললে, 'একগুঁয়েমি মেয়েদের স্বভাব। —আচ্ছা, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক।' —ঘরে জোড়া খাট ছিল, অচল একখানা টেনে ওধারে নিয়ে গেল। স্যুটকেস থেকে নূপুরের একখানা শাড়ি নিয়ে ঘরের মাঝামাঝি টাঙিয়ে দিলে পার্টিশন করে। তারপর বললে, 'আর কথা নয়। ঘুমিয়ে পড়ুন।'

দুজনে শুয়ে পড়ল দুখানা খাটে। মাঝে রইল শাড়ির পার্টিশন। পাহারা দিতে লাগল একটা দেওয়ালগিরি।

ওদিকে সেই সময় উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ডখানা হাঁপাতে-হাঁপাতে লালটিলার সীমানায় এসে পৌঁছল।

ভানু বললে, 'যত হোটেল আছে, সব খুঁজে দেখতে হবে। এবার দেখি, ভানু-গোয়েন্দার হাত ফসকে শ্রীমান অচল কেমন করে সচল হয়! বাছাধন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি। কী বলিস?'

উত্তরে ভানুর পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল, 'ঘরুর্ ঘোঁৎ।'

ধাক্কা দিয়ে ভানু ডাকলে, 'এই জহর। ঘুমোচ্ছিস!'

চমকে উঠে জহর বললে, 'নাঃ, ঘুমোব কেন? চোখ বুজে ভাবছিলাম।'

তিরিক্ষে-মেজাজে ভানু বললে, 'চোখ খুলে ভাব, ঘুম-তাড়ানো চকোলেট খেয়ে নে। আমি রাস্তার ডান ধারে লক্ষ রাখছি, তুই বাঁ-ধারে রাখ। লালটিলার হোটেলগুলোতে গ্যারেজ নেই, সুতরাং

BanglaBook.org

অচল মুখুজ্যের গাড়ি যেখানে পাবি, জানবি সেই হোটেলেই ওরা উঠেছে। বুঝলি?'

উত্তরে আবার আওয়াজ শোনা গেল, 'গর্‌র্‌ ঘোঁৎ।'

ঘুমের জন্যই শোওয়া। কিন্তু শোওয়ার পর ঘুম নেই।

লালটিলার রাত ঝিমঝিম করছে।

বারান্দার দিকে জানলা খোলা। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি-ধোওয়া একটুকরো ফিরোজা-রঙের আকাশ, একমুঠো ফিকে জ্যোৎস্না। অনেক দূরে কোথায় যেন বুনো বাঁশি বাজছে। আর তার সঙ্গে ঢাকের গম্ভীর আওয়াজ।

শুনতে বেশ ভালো লাগছে। পাশ ফিরে শুল নূপুর। শাড়ির পার্টিশনের ওপাশে যে-মানুষটা শুয়ে, সে কি জেগে, না ঘুমিয়ে আছে? এমন রাতেও মানুষের ঘুম আসে? কী ক্ষতি হত, সে যদি এখন জেগে থাকত? অদ্ভুত মানুষ যা হোক! ঘুমোক সে পড়ে-পড়ে, নূপুর কিন্তু আজ জেগে থাকবে—সারারাত।

বিছানায় উঠে বসল নূপুর। তারপর আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। এদিকটা হোটেলের পিছন দিক। উঁচু-নিচু ধু-ধু মাঠ। গাছ-গাছালির ঝোপ। আকাশে হেলান-দেওয়া টিলার সারি, তারই মাথায় আধখানা মোছা-টিপের মতো ভাঙা চাঁদ।

আজকের রাতটা আশ্চর্য। বাইশ বছর বয়েসে নূপুরের এই প্রথম মনে হল, ভারি একা লাগছে। অথচ জলজ্যান্ত একটা মানুষ ঘরের মধ্যে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

চোখ ফেরাতেই হঠাৎ খুশিতে নূপুরের বুকের ভেতরে যেন ঢেউ খেলে গেল। বারান্দার ওপাশে সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে অচল না? চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে?

এগিয়ে গেল নূপুর। বললে, 'ঘুমোননি?'

অচল ফিরে তাকিয়ে বললে, 'ঘুম আসছে না।'

'সেকী! কেন?'

থতমত খেয়ে অচল জবাব দিলে, 'ইয়ে—ম-ম-মশা।'

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলে, 'আপনি ঘুমোননি কেন?'

নূপুর বললে, 'ছারপোকা।'

আচমকা ভানুর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠল জহর।

চাপা গলায় ভানু বললে, 'দেখেছিস?'

আশপাশে তাকিয়ে জহর বললে, 'হুঁ।'

'কী দেখেছিস?'

'কোলাব্যাঙ।'

খিঁচিয়ে উঠল ভানু, 'সে তো আমার পাশেই বসে আছে। নাঃ, তোকে দিয়ে কিসসু হবে না।'

কাঁচুমাচু হয়ে জহর বললে, 'রাগ করছিস কেন? বল না কী দেখব?'

'ওই বাড়িটার কম্পাউন্ডে একখানা মোটর দেখতে পাচ্ছিস?'

'পাচ্ছি।'

'টর্চটা নিয়ে ওর নম্বরটা দেখে আয়।'

টর্চ হাতে নেমে গেল জহর। ফিরে এসে বললে, '০১০৯।'

BanglaBook.org

উৎফুল্ল হয়ে ভানু বললে, 'অচল মুখুজ্যের গাড়ি। সুতরাং এই হোটেলেই ওরা উঠেছে।'

জহর বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন। হোটেলের দরজায় ধাক্কা দেব?'

'না, ধাক্কা দিলে ওরা জেনে ফেলবে। অন্য উপায়ে ঢুকতে হবে। আয়।'

বনেদি ফোর্ডখানা খানিকটা তফাতে রেখে দুজনে পা টিপে-টিপে গিয়ে দাঁড়াল হোটেলের কম্পাউন্ডে। বাড়িখানা নিঝুম, সব ঘরই অন্ধকার। কম্পাউন্ড দিয়ে ঘুরে ওরা গেল হোটেলের পিছনে। সেদিকেও একটা দরজা—কিন্তু বন্ধ। এদিকটা একেবারে নির্জন। দরোয়ান বা চাকর-বাকরের কোনও চিহ্ন নেই।

ফিসফিস করে জহর বললে, 'এ দরজাও বন্ধ যে! ঢুকবি কী করে?'

চাপা গলায় ভানু বললে, 'গোয়েন্দার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। রবার্ট ব্লেক বড়-বড় দুর্গ-প্রাসাদে কী করে ঢুকত জানিস?'

'না তো।'

'দেখাচ্ছি, দাঁড়া।'

ভানু চলে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে এল একটা রোপল্যাডার—আংটা লাগানো দড়ির মই। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, দোতলার ঘরগুলোর সামনে সারি-সারি ঝুল-বারান্দা। সেদিকে লক্ষ করে ভানু দড়ির মই ছুঁড়তেই একটা বারান্দার আলসেয় আটকে গেল আংটা।

ভানু বললে, 'নে, উঠে পড়।'

জহর ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আমি!'

চাপা গলায় ভানু ধমকে উঠল, 'তুই না তো কি আমি?'

আমতা-আমতা করে জহর বললে, 'না—মানে আমার ওয়েট একটু বেশি কি না—যদি ছিঁড়ে-টিড়ে যায়—।'

'ইডিয়ট! হাতি চড়লেও এ-দড়ি ছিঁড়বে না। ওঠ!'

'দুর্গা! দুর্গা!' বলে দড়ির মইয়ে জহর পা দিল।

আর ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল নূপুর আর অচল।

তরুণ বয়েসে একরকম ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা-রোগ হয়। সেটা দেখা দেয় অবিবাহিত কুমার-কুমারীদের মধ্যে। আর, সে-রোগে আক্রান্ত হলেই কল্পিত মশা এবং ছারপোকা কামড়াতে শুরু করে।

অচল আর নূপুরকে আজ সেই রোগে ধরেছে।

'জায়গাটা বেশ, না?'

'হুঁ। রাতটাও চমৎকার!'

'এখানে কিছুদিন থাকলে কেমন হয়?'

'বেশ হয়। কিন্তু এখানে যদি কেউ জানতে চায় আমি কে, কী বলবেন?' —নূপুর জিগ্যেস করলে।

অচল বললে, 'সে যা হয় একটা বলে দিলেই হবে।'

'আমি কিন্তু আর কোট-প্যান্ট পরতে পারব না।'

'নাই পরলেন ? এখানে তো আর ভানু-জহর নেই, ভয়টা কীসের? ওঃ, টিকটিকি দুটো কী দৌড়টাই না করিয়েছে আমাদের!'

'সত্যি, গোয়েন্দারা যে এমন ছিনে জোঁক, আগে জানতাম না। এখানে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম!'

হঠাৎ নীচের দিকে তাকিয়ে নূপুর যেন আঁতকে উঠল, 'ও কী। দেখুন, দেখুন!'

BanglaBook.org

মুখ বাড়িয়ে অচল দেখলে, তাদেরই বারান্দা থেকে একটা দড়ির মই নীচে নেমে গেছে। আর তারই মাঝামাঝি ঝুলছে একটা বস্তা! না, বস্তা নয়, আবছায়া চাঁদের আলোয় অচল ঠাহর করে দেখলে, সেটা গজকচ্ছপের মতো একটা অদ্ভুত প্রাণী।

দড়ি ধরে অচল নাড়া দিতেই সেই প্রাণীটা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এই, নাড়া দিচ্ছ কেন ? পড়ে যাব যে।'

'কে? কে তুমি?' —অচল প্রশ্ন করল।

জবাব এল, 'আমি।'

'আমি কে? শিগগির বলো—নইলে—।'

দড়িটায় সজোরে নাড়া দিলে অচল।

লোকটা এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে উঠল, 'আঃ, কী ইয়ার্কি হচ্ছে। বলছি পড়ে যাব। আমি জহর—ভানু-গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

এক মুহূর্তের জন্য অচল সত্যিই অচল হয়ে গেল। এখানেও ভানু-জহর! এই লালটিলাতেও! দুনিয়ার কোথাও গিয়ে কি ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই?

হঠাৎ খুন চেপে গেল অচলের মাথায়। দু-হাতে দড়িটা ধরে পাগলের মতো ঝাঁকানি দিতে শুরু করল। আর অতিকায় শিম্পাঞ্জির মতো শূন্যে দোল খেতে-খেতে জহর ভেউ-ভেউ কেঁদে উঠল, 'ভানু রে, আমি চললাম। তোকে কত জ্বালিয়েছি, সব ক্ষমা করে দিস, ভাই! আর এই অভাগা জহরের জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলিস!'

নীচে থেকে চাপা গলায় ভানু বললে, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? ব্যালান্স ঠিক রাখ!'

জহর ডুকরে উঠে বললে, 'আর ব্যালান্স! আমার হয়ে এসেছে! তোকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, ভাই! আমি পরলোকে তোর জন্যে অপেক্ষা করব—শিগগির-শিগগির আসিস!'

জহরের সেই গগনভেদী বিলাপে শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে হোটেলের ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠল, খুলে গেল দরজা, বেরিয়ে এল ঝুল-বারান্দাগুলোয় বোর্ডারদের দল হইহই করে।

'কী হয়েছে?'

'কেয়া হুয়া?'

'কৌন হ্যায়?'

শুকনো মুখে নূপুর বললে, 'একী করলেন! এখুনি ধরা পড়ে যাব যে!'

ব্যাপারগতিক দেখে অচলও ঘাবড়ে গেল। নূপুরের হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বললে, 'আর-এক মিনিটও দেরি নয়—কোট-প্যান্ট পরে নিন—।'

হোটেলের হইহই ক্রমেই বাড়ছে।

খিড়কির দরজা খুলে ঘুম-চোখে বেরিয়ে এল দরোয়ান। হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। ঝুলন্ত জহরকে দেখে বাজখাঁই গলায় হাঁকলে, 'কৌন সওরা রে? আরে এ ভগলু, ই তো চোর বা!'

জহর কেঁদে বললে, 'চোর নেহি হ্যায় বাবা, পরলোককা যাত্রী হ্যায়!'

দরোয়ান আবার হেঁকে উঠল, 'তুম জরুর চোর হ্যায়!'

এগিয়ে এল ভানু। ধমক দিয়ে দরোয়ানকে বললে, 'তোমার মুণ্ডু হ্যায়! এতক্ষণ তো ডাল-রুটি মারকে দিব্যি মজাসে ঘুম দেতা হ্যায়, আর উপরকা ঘরমে চোর হনিমুন করতা, সে-খেয়াল হ্যায়?'

কিছুই না বুঝে হাঁ করে রইল দরোয়ান।

ভানু ওপর দিকে তাকিয়ে বললে, 'উঠে যা জহর—কুইক! আমি হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—দেখি, এবার ভানু-গোয়েন্দার হাত থেকে ওরা কেমন করে পালায়! আজ এসপার, কি ওসপার!'

BanglaBook.org

বলতে-বলতে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল ভানু। আর হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘামতে-ঘামতে দড়ির মই বেয়ে উঠতে লাগল জহর।

আলসে টপকে যখন সে বারান্দায় নামল, তখন অন্ধকার। ধরা পড়ার ভয়ে নূপুর আলো নিভিয়ে লুকিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু জহরের ভাগ্য ভালো। অন্ধকার ঘরে পা দিতে নূপুরের দেহের সঙ্গে ধাক্কা। আর সঙ্গে-সঙ্গে দু-হাতে জাপটে ধরে জহর চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরেছি! ধরেছি!'

পরমুহূর্তেই তিরিক্ষে গলায় শোনা গেল, 'আঃ, আমি ভানু। ছাড়—ছেড়ে দে বলছি! ক্যাডাভ্যারাস!'

জহরের হাত দুটো আলগা হয়ে খসে পড়ল।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে ভানু দেওয়ালগিরি জ্বেলে ফেললে। অচল আর নূপুরের ছায়াও নেই ঘরে। একটা ঠাট্টার মতো শাড়ির পার্টিশনটা রয়েছে শুধু।

করিডরে বেরিয়ে এল ভানু। পিছু-পিছু জহর। টর্চের আলোয় ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, করিডরের শেষপ্রান্তে বাথরুমের দরজা বন্ধ। দৌড়ে গিয়ে ভানু দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। বাথরুমের ভেতরে আরেকটা দরজা হাট করে খোলা। আর সেই দরজা থেকে একতলা অবধি নেমে গেছে জমাদার আসা-যাওয়ার জন্যে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ভানু নীচে তাকিয়ে দেখলে, হোটেলের কম্পাউন্ডে অস্টিন কেমব্রিজখানা নেই।

পালিয়েছে! অচল-নূপুর ফের পালিয়েছে!

ভানু আর দাঁড়ালে না। জহরকে নিয়ে সেই লোহার সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল কম্পাউন্ডে। তারপর রাস্তায়।

জহর তখনও হাঁপাচ্ছে। বললে, 'অচল মুখুজ্যে বোধহয় ভোজবাজি জানে! কোথায় হাওয়া হল বল তো?'

ভিজে রাস্তার ওপর টর্চের আলো ফেলে ভানু বললে, 'যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই।'

'কী করে বুঝলি?'

'অচলের গাড়ির টায়ারের দাগ কোনদিকে গেছে দেখ না।'

টর্চের আলোয় ভিজে রাস্তাটা লক্ষ করে জহর বলে উঠল, 'ওঃ, একেই বলে ব্রেন! ভানু রে, তুই সাক্ষাৎ রবার্ট ব্রেক।'

শেষ-রাতের অন্ধকারে ছুটছে অস্টিন কেমব্রিজ।

'এবার একটু ঘুমিয়ে নিন।'—অচল বললে।

সিটের গায়ে হেলান দিয়ে নূপুর বসে আছে চুপচাপ। বললে, 'ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ভানু-জহরের তাড়া খেয়ে।'

'তাই বটে! ওরা যেন কানামাছি খেলছে আমাদের সঙ্গে। খুব বেঁচে গেছি এ-যাত্রা।'

একটা স্টেশন এসে পড়েছে কাছাকাছি। গাড়ির স্পিড একেবারে কমিয়ে দিলে অচল। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ছোট একটা চালাঘরে টিমটিমে আলো জ্বলছে। লরিওয়ালাদের জন্যেই দোকানটা রাতভোর খোলা থাকে বোধহয়। অচল তারই সামনে গাড়ি থামাল।

'ছুটোছুটি করে দম বেরিয়ে গেছে! একটু চা পেলে মন্দ হয় না, কী বলেন?'

অচল নেমে গিয়ে দু-ভাঁড় চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নূপুর জিগ্যেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা? আবার কলকাতায়?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল বললে, 'দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিছুই ঠিক করিনি।'

BanglaBook.org

'ভোর হওয়ার আগেই ঠিক করা দরকার।'

'আচ্ছা, সুন্দরবনে গেলে কেমন হয়?'

'সুন্দরবনে! সেখানে যে বাঘ আছে।'

'কিন্তু ভানু-জহর তো নেই।'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তিরিক্ষে গলায় শোনা গেল, 'হ্যান্ডস আপ!'

আর, অন্ধকার ফুঁড়ে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল দুটি অদ্ভুত চেহারা।

ঠাস করে পড়ে গেল চায়ের ভাঁড় অচল-নূপুরের হাত থেকে। আচমকা ভূত দেখলেও ওরা এতখানি চমকে উঠত না।

ভানু আর জহর! সেই উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়িতে পিছু নিয়ে, কখন যে তারা অস্টিন কেমব্রিজকে ধরে ফেলেছে, চা খেতে-খেতে অচল আর নূপুর টেরই পায়নি।

ভানুর হাতে একটা পিস্তল। সেটা অচলের দিকে উঁচিয়ে তেমনি তিরিক্ষে গলায় আবার বললে, 'আই সে হ্যান্ডস আপ!'

জহর তাড়াতাড়ি বললে, 'তুলুন—তুলুন—হাত তুলুন!'

অচল বললে, 'এর মানে?'

পিস্তলটা তেমনি উঁচিয়ে ধরে ভানু বললে, 'ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জির মেয়ে মিস নূপুর চ্যাটার্জিকে হরণ করার দায়ে আপনাকে আমি অভিযুক্ত করলাম।'

অচল বললে, 'কী বাজে বকছেন। কোথায় নূপুর চ্যাটার্জি?'

ফেল্টহ্যাট মাথায় নূপুরের মুখে টর্চের আলো ফেলে ভানু বললে, 'আর ব্লাফ দিয়ে লাভ নেই অচলবাবু। ভানু-গোয়েন্দার এক্স-রে চোখ আছে। মিস চ্যাটার্জি আপনার পাশে। ওঁকে নামিয়ে দিন।'

অচল বললে, 'নামিয়ে দিন বললেই নামিয়ে দিতে হবে?'

জহর বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

'কেন? কী জন্যে?'

ভানু বললে, 'ডক্টর চ্যাটার্জি আসছেন, তাঁর হাতে তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দেব।'

সভয়ে নূপুর অচলের একখানা হাত আঁকড়ে ধরলে। আর গাড়ির সেলফ স্টার্টার অমনি হুঙ্কার ছাড়ল অচলের চাপে।

পিস্তল হাতে ভানু চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না—করলেই ফায়ার করব!'

হাঁ-হাঁ করে উঠল জহর, 'কেন গোঁয়ার্তুমি করছেন, স্যার? একবার মরে গেলে আর বাঁচবার চান্স পাবেন না!'

অচল গিয়ার টানল।

চিৎকার করে ভানু বললে, 'স্টপ। এখুনি গুলি করব—এই করলাম—।'

জহর তাড়াতাড়ি দু-কানে হাত চাপা দিলে। আর থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে চোখ বুজে পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিলে ভানু।

ছোট একটা আওয়াজ হল—খুট।

পর মুহূর্তেই হুস করে বেরিয়ে গেল অস্টিন কেমব্রিজ।

চোখ খুলে ভানু বললে, 'পিস্তলে গুলি ভরিসনি?'

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জহর। তারপর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই। ঘুমের ঘোরে গুলির বদলে রাংতা-মোড়া চকোলেট ভরে দিয়েছি বোধহয়!'

বিষম রাগে ভানু খিঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ইডিয়ট ক্যাডাভ্যারাস কুম্ভকর্ণ!'

তারপরেই হঠাৎ শান্ত হয়ে জিগ্যেস করলে, 'চকোলেট মনে করে গুলিটা খেয়ে ফেলিসনি তো?'

BanglaBook.org

জহর কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে রইল। চোখ দুটো হয়ে উঠল গোল-গোল। তারপর কেঁদে ফেলে বলে উঠল, 'মনে নেই। আমার কী হবে, ভানু?'

ভানু বললে, 'ঘাবড়াস না। তোকে ডবল জোলাপ খাইয়ে দেব।'

সাত

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে ভোর হচ্ছে।

অস্টিন কেমব্রিজখানা ছুটেছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে।

পাশাপাশি দুজনে বসে। অচল আর নূপুর। রাত-জাগা রাঙা চোখে অসীম ক্লান্তি। মাঝে-মাঝে হর্নের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দুজনেই চুপচাপ।

হঠাৎ অচল বলে উঠল, 'নাঃ, আর পারা যায় না। কী বলেন?'

ক্লান্ত গলায় নূপুর বললে, 'সত্যিই এমন করে আর পারা যায় না।'

'আমরা যেন চোর-ডাকাতেরও অধম হয়ে গেলাম। ক্রমাগত পুলিশ আর গোয়েন্দার তাড়া খেয়ে ছুটছি! ঘেন্না ধরে গেল জীবনে।'

বিষণ্ণ মুখে নূপুর বললে, 'সেটা আমারই জন্যে। আমারই জন্যে আপনার এত দুর্ভোগ।'

গলায় জোর দিয়ে অচল বললে, 'নেভার! আপনার জন্যে নয়, দ্যাট ফ্যাট অ্যান্ড থিন টিকটিকি জহর ভানুর জন্যে। এ-দেশে আর থাকব না, চলুন, আমরা বিদেশে চলে যাই।'

হাওয়ায় নূপুরের ফেল্টহ্যাটটা খুলে যাওয়ার উপক্রম। সেটা ভালো করে বসিয়ে নূপুর বললে, 'না, অনেক হয়েছে, আর নয়। যেখানে হয় আমাকে নামিয়ে দিন। দিয়ে রেহাই নিন আপনি।'

'আর আপনি?'

'আমার কথা ভাববেন না। মনে করবেন কোনও স্টেশনের ওয়েটিংরুমে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছিল, তারপর আমাকে ভুলে যাবেন।'

বলতে-বলতে ভারী হয়ে এল নূপুরের গলা। বড় বড় কালো চোখের কোল উঠল টলটলিয়ে।

ব্যস্ত হয়ে অচল বললে, এই দেখো! আবার কাঁদে। জল গড়িয়ে পড়ে গোঁফ মুছে যাবে যে।'

একটু থেমে অচল নিজের মনেই বললে, 'কিন্তু কেন? আমরা তো সত্যিই চোর-ডাকাত নই, ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে আমরা, এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন। ইচ্ছে করলেই তো ভানু-জহরকে জব্দ করতে পারি।'

'কেমন করে?' —উৎসুক গলায় নূপুর প্রশ্ন করলে।

'একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।' —অচল বললে।

'কী প্ল্যান?'

'খুব সোজা প্ল্যান। বলব?'

'বলুন না।'

'আচ্ছা, আপনি অদৃষ্ট মানেন? যাকে বলে ভবিতব্য?'

'মানি।'

'আমিও মানি। মানে, মানতে বাধ্য হয়েছি। তাই বলছিলাম, বিয়ের জন্যেই যখন এত ঝামেলা, তখন আসুন আমরা ইয়ে—মানে বিয়েই করে ফেলি।'

চমকে উঠে অচলের দিকে তাকাল নূপুর। তার গোঁফ আঁকা মুখখানায় কে যেন লাল কালির

BanglaBook.org

দোয়াত উপুড় করে ঢেলে দিল। মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে সে শুধু বললে, 'না।'

আর, কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে অচলের মুখ থেকে সমস্ত রং শুষে নিল। করুণ গলায় বললে, 'কেন, আমাকে প—প—পছন্দ নয়? আমাকে কি রেড়ির তেলের চেয়েও খারাপ দেখতে?'

'না।'

'তবে?'

নূপুর বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, 'মেয়েদের তো আপনি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না।'

ধড়ফড় করে অচল বলে উঠল, 'কে—কে—কে বললে? আগে দেখতে পারতাম না, এখন পারি।'

মুখখানা গম্ভীর করে নূপুর বললে, 'ওটা আপনার মুখের কথা। আসলে আমি নিরাশ্রয় বলে আমাকে দয়া করে বিয়ে করতে চাইছেন।'

অচল খপ করে নূপুরের একখানা হাত ধরে ফেললে, 'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, দয়া নয়। তোমার জন্যে আমার হার্ট উইক হয়েছে।'

বড় চোখ আরও বড় করে নূপুর বললে, 'সেকী! ডাক্তারকে দেখাননি কেন?'

অস্থির হয়ে অচল বললে, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না, নূপুর। ডাক্তার কী করবে? এ সে হার্ট-উইক নয়।'

'তবে?'

'ইয়ে—মানে আমি তোমাকে ভা—ভা—ভা—।'

ফিক করে হেসে ফেলে নূপুর বললে, 'থাক, খুব হয়েছে।'

আর সেই হাসি দেখে অচল ডুবতে-ডুবতে যেন একটা লাইফ বেল্ট পেয়ে গেল। মুখ উজ্জ্বল করে জিগ্যেস করলে, 'তা হলে রাজি তো?'

কোনও সাড়া এল না নূপুরের কাছ থেকে। ফেল্টহ্যাটটা খুলে গভীর সুখে আর তৃপ্তিতে মাথাটা অচলের কাঁধে ঠেকিয়ে চুপ করে রইল।

অচল তার কানে-কানে বলল, 'কী? রাজি?'

ছোট করে জবাব এল, 'হুঁ। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কী?'

'ভাবছি, বাবা যদি জানতে পারেন—ভীষণ রাগী মানুষ—।'

'তাঁকে ঘাঁটাবার দরকার কী? কলকাতায় পৌঁছে আমরা বিয়ে করব আইন-মতে রেজেস্ট্রি করে। কী বলো?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

অচলের হঠাৎ ঝানুকাকার কথা মনে পড়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা আছে।'

'কী?'

'এক্সকিউজ মি—তোমাব মাথার চুলগুলো পরচুল নয় তো?'

হাসি চেপে নূপুর বললে, 'টেনেই দেখো না।'

'দাঁতগুলো? বাঁধানো নয়?'

অচলের বাঁ-হাতের একটা আঙুল নিয়ে নূপুর নিজের দাঁতের ফাঁকে রেখে একটু চাপ দিলে।

'উঃ!'—বলে লাফিয়ে উঠল অচল।

দুষ্টু হেসে নূপুর বললে, 'আর প্রমাণ চাই?'

মস্তবড় একটা ক্রিসেন্থিমামের মতো তার মুখের ওপর অচলের মুখখানা নেমে আসতেই সভয়ে নূপুর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই—এই—।'

BanglaBook.org

স্টিয়ারিং-এর এক মোচড়ে অচল একখানা চলন্ত লরির পাশ কাটিয়ে নিল।
নূপুর চোখ পাকিয়ে বললে, 'বড্ড খুশি যে! অ্যাকসিডেন্ট করবে নাকি?'
হাসি-মুখে অচল গলা ছেড়ে বলে উঠল:

'তোমায় খুশি করতে আমি সব পারি,
ইচ্ছে করে তোমায় নিয়ে
দুর্গমে আজ দিই পাড়ি।।'

দরজার পাশে ট্যাবলেটে লেখা:

বিবাহবিশারদ

শ্রীপ্রজাপতি ঘটক

রেজিস্ট্রার অফ ম্যারেজ

গাড়ি থেকে নেমে অচল আর নূপুর সটান ঢুকে গেল।

বহু পুরোনো টেবিলের ওপাশে গলাবন্ধ কোট গায়ে, মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল নিয়ে স্বয়ং ঘটকমশায় বসে। অজীর্ণ রোগীর মতো রোগা, লম্বা চেহারা, মুখ দেখলে মনে হয় এইমাত্র চোঁয়া ঢেঁকুর উঠল।

অচল আর নূপুর ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন হল, 'কী চাই?'
অচল বললে, 'আজ্ঞে বিয়ে করতে চাই।'
'কেন?'
এ প্রশ্নের জন্যে অচল তৈরি ছিল না, মনে-মনে জবাব খুঁজতে লাগল।
ঘটকমশায় বললেন, 'লটারিতে টাকা পেয়েছ বুঝি?'
অবাক হয়ে অচল বললে, 'মানে? বিয়ে করতে গেলে লটারিতে টাকা পাওয়া চাই নাকি?'

'তা নইলে এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে এমন দুর্বুদ্ধি কার হবে? পটলের সেব দু-টাকা। খাবে, না তুলবে?'

হাসি চাপতে গিয়ে অচল কেশে ফেলল। মুখে রুমাল গুঁজে দিল নূপুর।
বিবাহবিশারদ আবার বললেন, 'ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে জানো।'
অচল বললে, 'গৃহপালিত পশু। যেমন, গোরু-ছাগল-ভেড়া।'

BanglaBook.org

'না।'—বিবাহবিশারদ বললেন, 'ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে আদর্শ স্বামী। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। আর একটা অ্যাডভাইস দিই শোনো। স্ত্রীকে কখনও বলবে না ভালোবাসি। বলেছ কি ট্যাক্স দিতে হবে। তিন-তিনবার বিয়ে করে এই সার বুঝেছি।

নূপুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অচল বললে, 'আপনার উপদেশ মনে থাকবে।'

চোখে চশমা এঁটে বিবাহবিশারদ ফর্ম বের করলেন, খাতা খুললেন। বললেন, 'পাত্র-পাত্রীর নাম?'

নাম বললে অচল।

'পাত্রী সাবালক তো? বয়েস?'

'আজ্ঞে বাইশ।'

'কনে কই?'

অচল দেখিয়ে দিলে।

চোখ পিটপিট করে বিবাহবিশারদ নূপুরের পানে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়ে বললেন, 'তামাশা করার জায়গা পাওনি, ছোকরা? পঁচিশ বছর ধরে আমি বিয়ে দিচ্ছি ছেলেতে-মেয়েতে, আর তুমি বলছ আজ ছেলেতে-ছেলেতে বিয়ে দিতে!'

নূপুরের পানে তাকিয়ে অচলের চক্ষুস্থির। তার পরনে যে এখনও কোট, প্যান্ট, টুপি, তাড়াতাড়িতে এতক্ষণ সে-খেয়ালই ছিল না। এমনকি, গোঁফজোড়াও মোছা হয়নি!

নার্ভাস হয়ে অচল বললে, 'মাপ করবেন স্যার, এখুনি কনেকে হাজির করে দিচ্ছি। পাশের ঘরটা খালি আছে তো।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অচল স্যুটকেস সমেত নূপুরকে পাশের ঘরটায় ঢুকিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পোশাক বদলে বেরিয়ে এল নূপুর।

অচল বললে, 'পাত্রী হাজির স্যার।'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় চশমার ফাঁকে নূপুরের পানে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর অচলকে বললেন, 'এই দেখলাম ছেলে, আর এই হয়ে গেল মেয়ে! ব্যাপার কী হে, ছোকরা? ম্যাজিক দেখাচ্ছ নাকি?'

অচল বললে, 'আজ্ঞে না। ও থিয়েটার করে কি না, তাই ছেলে সেজেছিল।'

'তখন ছেলে সেজেছিল, না এখন মেয়ে সাজল?'

'আজ্ঞে মেয়ে সাজবে কেন? ও তো মেয়েই।'

'বটে!' —ঘটকমশায়ের চোখের পাতা আরও দ্রুত পিটপিট করতে লাগল। মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, সন্দেহ হচ্ছে বাপু! আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। ঠিক করে বলো দিকি, ছেলে না মেয়ে?'

ঘাবড়ে গিয়ে অচল বলে উঠল, 'মেয়ে স্যার! জেনুইন মেয়ে—খাঁটি মেয়ে!'

'থামো হে!' —খেঁকিয়ে উঠলেন ঘটকমশায়, 'আমি বিবাহ করেছি বত্রিশ বছর—তেরোটি সন্তানের বাপ। আমি বলতে পারি আমার স্ত্রী খাঁটি মেয়ে। কিন্তু বিয়ের আগে তুমি বল কোন সাহসে?'

অচল একেবারে বোবা। আর নূপুরের ফরসা মুখখানা শীতকালের টোম্যাটো হয়ে উঠল। শুধু লজ্জায় নয়, ওই বেয়াক্কেলে বুড়োর ওপর চাপা রাগেও।

ঘটকমশায় রেজেস্টারি খাতা মুড়ে ফেললেন। তারপর চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা মুখে বললেন, 'না বাপু, আমি বিয়ে দিতে পারব না।'

রীতিমতো নার্ভাস হয়ে অচল বললে, 'এই মরেছে! বিয়ে আমাদের দিতেই হবে, স্যার! বিয়ে

BanglaBook.org

না করে আমাদের উপায় নেই।'

ধমকে উঠলেন ঘটকমশায়, 'বিয়ে করবে তো ভেলকি দেখাচ্ছ কেন? এই দেখলাম ছেলে, আবার এই দেখছি মেয়ে! বুড়ো বলে আমাকে ধাপ্পা দেওয়ার মতলব?'

জিভ কেটে অচল বললে, 'ছি, ছি, এ কী বলছেন! বিশ্বাস করুন, স্যার, ও মেয়ে। সত্যিকার মেয়ে।'

'প্রমাণ?'

অচল ধপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। হতাশ গলায় নূপুরকে বললে, 'প্রমাণ চায় যে! ডোবালে! কেন মরতে তোমাকে স্যুট পরিয়ে এনেছিলাম!'

নূপুর এবার ক্ষেপে গেল। মিহি গলা আরও মিহি করে ঘটকমশায়কে বললে, 'তার আগে আপনি যে পাগল নন, প্রমাণ করুন!'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় বললেন, 'আমি পাগল!'

'শুধু পাগল নয়, বদ্ধ পাগল!'

তেতো মুখে ঘটকমশায় বললেন, 'তোমাদের পাল্লায় পড়ে পাগলই হব দেখছি! আমায় ঠকাবার জন্যে গলার আওয়াজটা পর্যন্ত মেয়েদের মতো নকল করেছ!'

নূপুর হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঘটকমশায়ের মুখের পানে।

অচল বললে, 'খুব আক্কেল হয়েছে। আর বিয়ে করতে হবে না, চলো।'

ঠিক এই সময় ভেতরের দরজার পরদার ফাঁকে উঁকি দিল সাত-আট বছরের ফ্রক-পরা একটি মেয়ের মুখ। বললে, 'বাজারের টাকা দাও, বাবা।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঘটকমশায়, 'টাকা ছাড়া তোদের মুখে আর কথা নেই রে, টেঁপি? যা বেরো—।'

ভয়ে-ভয়ে টেঁপি বললে, 'মা যে বললে চাল বাড়ন্ত।'

'তোর কাবলিওয়ালা মাকে বলগে যা টাকাও বাড়ন্ত।'

কিন্তু টেঁপিকে গিয়ে আর বলতে হল না। ঘটকমশায়ের তৃতীয় পক্ষ বোধ করি পরদার বাইরেই ছিলেন, নিজেই পরদা সরিয়ে অফিসঘরে পা দিলেন। মোটাসোটা ভারীভুরি চেহারা, আধহাত চওড়া কস্তা-পেড়ে শাড়ি পরনে, নাকে ফাঁদি-নথ। সেই নথ নেড়ে ঘটকগিন্নি কাঁসর-বাজানো গলায় স্বামীকে বললেন, 'কী বললে! আমি কাবলিওয়ালা! তোমার হাতে পড়ে হাড়মাস আমার কালি হয়ে গেল, আর আমায় বলছ কিনা—।'

ঠোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা মুখ যথাসম্ভব হাসি-হাসি করার চেষ্টা করে ঘটকমশায় বললেন, 'আহা-হা, ওসব প্রাইভেট কথা এখানে কেন? দেখছ না, বাইরের লোক রয়েছে!'

এতক্ষণ অচল-নূপুরকে লক্ষ করেননি ঘটকগিন্নি। এবার চোখ পড়তেই আরেকটু ঘোমটা টেনে বলে উঠলেন, 'ওমা, আগে বলতে হয়!'

ঘটকমশায় বললেন, 'এসেছ, ভালোই হয়েছে। দেখো তো গিন্নি—বেশ ভালো করে দেখো—ওই মেয়েটি ছেলে না মেয়ে।'

ঘটকগিন্নি বললেন, 'এ আবার কেমনধারা কথা!'

নূপুর হঠাৎ এগিয়ে এসে টিপ করে ঘটকগিন্নিকে একটা প্রণাম করলে। তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'আপনিই বলুন তো, মাসিমা, আমি ছেলে না মেয়ে। উনি কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না!'

'আর, কিছুতেই আমাদের বিয়ে দিতে চাইছেন না। কী করি বলুন তো, মাসিমা?'—অচল বললে।

মদনভস্মের আগে মহাদেব যেমন চোখে মদনের দিকে তাকিয়েছিলেন, ঘটকগিন্নি তেমনি

BanglaBook.org

চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর কাঁসর-বাজানো গলায় বলে উঠলেন, 'বলি ভীমরতি ধরেছে বুঝি? বিয়ে দিয়ে আর বিয়ে করে মাথার চুল পেকে গেল তোমার, মেয়ে চেনো না?'

ঘটকমশায়ের মুখে কথাটি নেই।

নূপুরের চিবুকে হাত দিয়ে ঘটকগিন্নি আবার বললেন, 'এমন ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়ে, তাকে বলে কি না ছেলে! আবার বলে কি না বিয়ে দেব না! দাও, এখুনি এদের বিয়ে দাও বলছি!'

আমতা-আমতা করে ঘটকমশায় বললেন, 'আমার দোষ কী বলো? এই দেখলাম ছেলে, আবার এই দেখছি মেয়ে! তা তুমি যখন সার্টিফাই করছ, তখন হেঁ-হেঁ—আর কথা কী!'

ঘটকমশায় আবার রেজেস্ট্রি খাতা খুললেন। আর নূপুর টিপ করে আরেকটা প্রণাম করলে ঘটকগিন্নিকে।

গলা নামিয়ে ঘটকগিন্নি বললেন, 'সংসার করতে যাচ্ছ, দুটো হিতকথা বলি, মনে রেখো, মা। স্বামীকে সদাই নিজের তাঁবে রাখবে। স্বামী যদি এক পরদা গলা চড়ায়, তুমি সাত পরদা চড়াবে। তবেই স্বামী বশে থাকবে! আর একটা কথা। সুযোগ পেলেই স্বামীর পকেট থেকে পয়সাকড়ি সরাবে। আবার সংসারে টান পড়লে সেগুলো স্বামীকেই ধার দেবে। তবে দেখবে সংসারে শান্তি আছে, বুঝলে?'

হাসি চেপে নূপুর বললে, 'বুঝলাম।'

ঘটকগিন্নি খুশি হয়ে বললেন, 'সুখে থাকো, মা। হিঁদুর মেয়ে তো, কালীঘাট থেকে মাথায় সিঁদুর দিয়ে যেও।'

ঘটকমশায় ডাকলেন, 'এসো হে ছোকরা, সই করো দুজনে। সাক্ষী কোথায়?'

'সাক্ষি!' —অচল কিন্তু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে সাক্ষী তো নেই!'

চোখের পাতা পিটপিট করে ঘটকমশায় বললেন, 'নেই! যাকগে, তোমাদের বিয়েতে আমি আর গিন্নি সাক্ষী। ঘটক-বিদায়টা পুষিয়ে দিও কিন্তু—হেঁ-হেঁ!'

আমার গল্প এইখানেই শেষ করা যেত। বলতে পারতাম, অনেক ঝামেলার পর, অনেক অঘটনের পর অচল-নূপুরের বিয়ে হয়ে গেল। এবং কালীবাড়ি থেকে মাথায় সিঁদুর পরে হাসতে-হাসতে নূপুর এসে উঠল অচলের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, গল্পের এইখানে দাঁড়ি টানলে পাঠক-পাঠিকারা খুশি হবেন না। তাঁদের কৌতূহলী প্রশ্ন আমি শুনতে পাচ্ছি, 'ভানু-জহরের কী হল?' কেননা, আমার গল্প আসলে ভানু গোয়েন্দা আর জহর অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে।

অতএব তারপর শুনুন।

আট

অচল-নূপুর প্রজাপতি ঘটকের অফিসে যখন বিয়ে করছে, তখন ভানু-জহরকে দেখা গেল দমদম এয়ারপোর্টে?

দিল্লির প্লেন নামছে।

প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে ভানু-জহর ঘনঘন তাকাচ্ছে ভেতরের দিকে। জহর বললে, 'টেলিগ্রাম করে ভদ্রলোককে আসতে তো বলা হল, কিন্তু—।'

চুরুট ধরাতে-ধরাতে ভানু বললে, 'কিন্তু কী?'

'ইয়ে হয়েছে—ভদ্রলোককে তো কখনও দেখিনি। চিনব কী করে?'

BanglaBook.org

'এই কথা। ঠিক চিনে নেব দেখিস।'

'বলিস কী! কেমন করে?'

'লাল গোলাপ দেখে। ভদ্রলোককে কোটের বাটনহোলে লাল গোলাপ লাগিয়ে আসতে লিখেছি।'

জহর মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'ভানু রে, তুই একটা জিনিয়াস।'

কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে ভানু বললে, 'ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে ব্রেন চাই, ব্রেন। বুঝলি?'

জহর বললে, 'ব্রেন আমারও আছে। তবে ছোটবেলায় পণ্ডিতমশায়ের গাঁট্টা খেয়ে ব্রেনটা নড়ে গেছে।'

প্যাসেঞ্জাররা বেরিয়ে আসছে। ভানু-জহর সজাগ হয়ে উঠল। ডেক্রনের স্যুট পরা মোটা, খাটো এক সম্ভ্রান্ত চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোটের বাটনহোলে জ্বলজ্বল করছে একটা লাল গোলাপ। ভানু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বিলেতি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি-মুখে বললে, 'গুড মর্নিং, জেন্টলম্যান। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে। কেন?'

'সে-কথা আমাদের টেলিগ্রামেই তো লেখা ছিল।'

'টেলিগ্রাম!' ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, 'আপনারা নিশ্চয় ভুল করছেন।'

জহর হাসি-হাসি মুখে বললে, 'আপনি বেশ হিউমার কবতে পারেন, স্যার।'

ভুরু দুটো কপালে তুলে ভানু বললে, 'ওয়েল, ভুল বরং ববার্ট ব্রেক করতে পারে, কিন্তু ভানু গোয়েন্দা করে না। নেভার! আপনার বুকের ওই গোলাপই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, আপনি আমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং আমাদেরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। চলুন।'

'কোথায়?'

'আপনার যে-মেয়ে পালিয়ে গেছে, তারই কাছে।'

দেখতে-দেখতে ভদ্রলোকের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'হোয়াট! আমার মেয়ে পালিয়ে গেছে! বলছ কী তোমরা! এই তো আমার মেয়ে।'

পিছন থেকে বব-ছাঁটা একটি তরুণীকে সামনে টেনে এনে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'বুঝেছি, তোমরা কলকাতার গুণ্ডা, জোচ্চোর, বদমাশ! দাঁড়াও, আমি এখুনি পুলিশ ডাকছি।'

ভানুর কানে-কানে জহর বললে, 'রং নাম্বার! পালিয়ে আয়।'

ভানু আর দেরি করলে না, পায়ে-পায়ে সরে গেল। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল, ভিড় থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছাঁটা গোঁফওয়ালা লম্বা-চওড়া এক আধাবয়েসি ভদ্রলোক পাইপ মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁরও ছাইরঙের কোটের বাটনহোলে একটি লাল গোলাপের কুঁড়ি।

জহর বললে, দেখেছিস?'

ভানু বললে, 'দেখেছি। তুই যা।'

'বেজায় খণ্ডামার্কা যে। এবারেও যদি রং নাম্বার হয়?'

'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো পিছনে আছি। যা—'

সাহসে ভর করে জহর এগোল। ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে একবার তাকাল।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

জহরও আবার ঘুরে গেল তাঁর মুখের সামনে। নিজের টাইটা নিয়ে খেলা করতে-করতে হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

জহর আবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার ভরসা করে কাঁপা গলায় বললে, 'এক্সকিউজ মি, আপনি নিশ্চয় ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জি?'

BanglaBook.org

বাঘের ডাকের মতো আওয়াজে জবাব এল, 'ইয়েস।'

আনন্দে জহর চেঁচিয়ে ডাকলে, 'রং নাম্বার নয় রে, ভানু। আয়।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

'বলছি।'

ভানু এগিয়ে এল। জহর পরিচয় করিয়ে দিলে, 'ডক্টর চ্যাটার্জি, আর দ্য গ্রেট গ্রেটার গ্রেটেস্ট ডিটেকটিভ ভানু-গোয়েন্দা অ্যান্ড হিজ অ্যাসিস্ট্যান্ট জহর।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি একবার ভানু-জহরের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের চেহারা তো আদপেই গোয়েন্দার মতো নয়।'

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে ভানু বললে, 'সেই তো আমাদের বাহাদুরি। গোয়েন্দা বলে আমাদের চেনবার উপায় নেই।'

জহর বললে, 'বড় গোয়েন্দার লক্ষণই এই। দেখতে ক্লাউনের মতো।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'তাই দেখছি। আমার মেয়ে কোথায়? নূপুর?'

'আছে।' —সংক্ষেপে জবাব দিল ভানু।

বাঘের আওয়াজে দিগম্বর চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'কোথায় সে? জীবিত বা মৃত তাকে আমার চাই—যেমন করেই হোক তাকে চাই।'

ভানু বললে, 'ব্যস্ত হবেন না, জেন্টলম্যান। তাকে ধরে দেব বলেই তো আপনাকে টেলিগ্রাম করেছি। কিন্তু আপনার শর্তটা মনে আছে নিশ্চয়?'

'পঁচিশ হাজার টাকা তো? দিগম্বর চ্যাটার্জির কথার নড়চড় হয় না। চেকবই আমি নিয়েই এসেছি।'

খুশি হয়ে ভানু বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, জেন্টলম্যান, থ্যাঙ্ক ইউ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মেয়েকে আপনি জীবিতই ফিরে পাবেন।'

টাই নিয়ে খেলা করতে-করতে হাসি-হাসি মুখে জহর বললে, 'শুধু মেয়ে নয়, একটি পছন্দসই হবু জামাইও আপনি পেতে পারেন!'

দিগম্বর চ্যাটার্জি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'হবু জামাই?'

বিগলিত হয়ে জহর ঘাড় নাড়লে।

'কে সে?'

জহর কিছু বলার আগেই ভানু তার বুটের আগা দিয়ে জহরের একটা পা চেপে ধরলে। তারপর ডক্টর চ্যাটার্জিকে বললে, 'চলুন, আমি গাড়ি এনেছি।'

উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই ফোর্ড গাড়িখানার সামনে এসে দিগম্বর চ্যাটার্জি থমকে থেমে গেলেন। বললেন, 'এ গাড়ি আপনার?'

সগর্বে ভানু বললে, 'ইয়েস, জেন্টলম্যান। ইন্ডিয়াতে ভানু গোয়েন্দা যেমন অদ্বিতীয়, এ গাড়িরও তেমনি জোড়া নেই। উঠুন।'

'চলে তো?'

'শিওর অ্যান্ড সার্টেন।'

স্টার্ট দিতেই বিকট শব্দে গাড়িখানা কেঁপে উঠল। দিগম্বর চ্যাটার্জি চমকে উঠে বললেন, 'ও কী!'

জহর বললে, 'কিছু না, স্যার। গাড়িটার বাতের শরীর কি না, তাই চলবার আগে গা-ঝাড়া দিল।'

BanglaBook.org

ভানু আশ্বাস দিল, 'ভয় নেই। বনেদি গাড়ি কি না, তাই আওয়াজ একটু বেশি হয়—হর্নের দরকার হয় না। কিন্তু চলে ফার্স্ট ক্লাস।'

ক্লাচ টিপে ভানু গিয়ার দিতেই গাড়িখানা বার দুয়েক পিছন দিকে ঝাঁকানি দিয়েই হার্টফেল করলে।

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'কী হল?'

ভানু বললে, 'ও কিছু নয়। একবার ঠেলে দিলেই চলবে! ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটু হাত লাগান তো!'

একটা চাপা গর্জন করে দিগম্বর চ্যাটার্জি অগত্যা নেমে হাত লাগালেন। এবং আধমাইলটাক ঠেলবার পর ভানুব গাড়ি আবাব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল।

জহর জিগ্যেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

ভানুর কাছ থেকে জবাব এল, 'নূপুর চ্যাটার্জিকে ধরতে।'

দিগম্বর চ্যাটার্জির কান বাঁচিয়ে জহর বললে, 'তাকে পাবি কোথায়? সে তো হাওয়া দিয়েছে।'

ভানুর মুখে আবার সেই উচ্চাঙ্গের হাসি দেখা দিল। বললে, 'ভানু গোয়েন্দা হাওয়ারও খবর রাখে। কাল রাতে পালিয়ে ওরা কলকাতায় ফিরেছে।'

'কী করে জানলি? পথে যদি আর কোথাও ওঠে?'

'উঠলে হোটেলেই উঠতে হবে। কিন্তু অচল বুঝেছে যে, বাইরে তার গাড়িখানা দেখলেই আমরা আবার ধরে ফেলব। সুতরাং কলকাতায় ফেরা ছাড়া ওদের উপায় নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু কলকাতায় কোথায় উঠেছে ওরা? কোনও বড় হোটেলে বোধহয়—যেখানে গ্যারেজ আছে?'

'উঁহু। সব হোটেলে ফোন করে জেনেছি, ওরা কোথাও ওঠেনি।'

'তবে? কোনও বন্ধুব বাড়িতে উঠেছে নিশ্চয়।'

'ইমপসিবল। নূপুর চ্যাটার্জির ছবি কাগজে-কাগজে ছড়িয়ে পড়েছে—বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে উঠলেই নূপুরকে তারা ক্যাচ লুফে নেবে।'

জহর দমে গেল; করুণ মুখে বললে, 'হয়েছে! বালিব্রিজের ওপর থেকে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে নির্ঘাত। গাড়িটা একবার থামা, ভানু।'

'কেন?'

'একছড়া ফুলের মালা কিনব। বাড়ি গিয়ে নূপুরের ছবিতে দেব।'

চাপা গলায় ভানু ধমকে উঠল, 'তুই একটা আস্ত ক্যাডাভ্যারাস। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া, লেক-এ ডুবে মরা তো সেকেলে ফ্যাশন। এখন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে লাফি দেওয়ার যুগ। নূপুর তা করলে এতক্ষণে সারা কলকাতা তোলপাড় হয়ে যেত।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে জহর বললে, 'যাক, তা হলে আত্মহত্যা করেনি! কিন্তু গেল কোথায়?'

ভানু বললে, 'আপাতত একটিমাত্র আশ্রয় তাদের আছে, আর, সেইখানেই আমরা যাচ্ছি।'

জহর আড়-চোখে একবার পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি নূপুরকে পাওয়া না যায়? ডাক্তার সাহেবের হাতের পাঞ্জাখানা দেখেছিস?'

ভানু তেমনি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, 'ভানু গোয়েন্দার তদন্তে কখনও ভুল হয় না।'

সিঁড়ির মুখেই দেখা—সেই পালিশ করা ট্যাক। সেই সদা হাস্যময় বদন।

'গুড মর্নিং। আজই ফির‍্যা আইলেন যে! হনিমুনের শখ একদিনেই মিট্যা গেল নাকি?'

BanglaBook.org

দ্ব্যর্থবোধক ভাবে অচল বললে, 'আজ আমাদের বিয়ের তারিখ কি না!'

সহর্ষে দুন্দুভিবাবু বলে উঠলেন, 'নাকি! আজ তা অইলে ঘরেই হনিমুন!'

দুটো ধাপ নেমে দুন্দুভিবাবু ফের বললেন, 'আসল কথাডা কি জানেন, মশয়? মনের মতো পরিবার পাইলে ঘরেই হনি, ঘরেই মুন। কী কন? ঠিক কই না? আমারও একদিন আছিল রে, মশয়!' —হাসতে-হাসতে দুন্দুভিবাবু নীচে নেমে গেলেন।

অচল আর নূপুর তালা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। সদরে ছিটকিনি লাগিয়ে অচল শোওয়ার ঘরে এসে ধপ করে খাটে বসে পড়ল। হাঁপ ছেড়ে বললে, 'ওঃ, বিয়ে করা কী ঝকমারি!'

সিঁদুর পরা মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে নূপুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বললে, 'সত্যি! বিয়ে তো নয়, যেন একটা ফাঁড়া কাটল। এখন তোমার মা আর আমার বাবার কাছে কী করে ফাঁড়া কাটবে, তাই ভাবছি!'

আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে অচল বললে, 'কাল মাকে একটা টেলিগ্রাম করব। লিখব, "গুরুদেবের আদেশে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারী হইয়াছি"। তুমি তোমার বাবাকে কী লিখবে?'

ভয়-ভয় মুখে নূপুর বললে, 'আমি কিছু লিখতে পারব না। বাবার কথা ভাবলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে!'

অচল বললে, 'মাভৈঃ! এখন আর তোমাকে ধরবার উপায় নেই। আসুক না ভানু-গোয়েন্দা। ডোন্ট কেয়ার!'

নূপুর হেসে বললে, 'ইস, ভারি সাহস দেখছি! আমার কিন্তু ওদের ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। ওরা যদি অমন করে আমাদের পিছনে ধাওয়া না করত, তবে হয়তো—।'

'তোমার-আমার জীবনে বিয়ের নামে এই লটারি খেলা হত না?'

দুষ্টু হেসে নূপুর জিগ্যেস করলে, 'লটারিতে জিতলে, না হারলে?'

খপ করে নূপুরের একখানা হাত ধরে ফেলে অচল বললে, 'তুমিই বলো।'

'উঁহু, আগে তুমি বলো।'

সদরে কলিংবেলটা হঠাৎ বেয়াড়ারকম বেজে উঠল। নূপুরের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে অচল বললে, 'দেখো তো—মোড়ের দোকানে বলে এসেছিলাম, ফুল নিয়ে এল বোধহয়।'

নূপুর গিয়ে সদর খুলে দিলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে পিছিয়ে এল বসবার ঘরের মাঝখানে। সারা দেহ তার কাঠ হয়ে গেছে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, যাঁর কথা ভাবলে নূপুরের বুক ধড়াস করে ওঠে, সেই দিগম্বর চ্যাটার্জি স্বয়ং। তাঁর পিছনে ভানু গোয়েন্দা আর জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

ভানু বললে, 'দেখুন জেন্টলম্যান, এই আপনার নূপুর চ্যাটার্জি তো?'

জহর বললে, 'নিন স্যার, আপনার লস্ট প্রপার্টি বুঝে পড়ে নিন।'

মিনিটখানেক দিগম্বর চ্যাটার্জি কোনও কথা কইলেন না, শুধু চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

থমথম করতে লাগল ভয়ানক একটা নিস্তব্ধতা; বোমা ফাটার আগে যেমন হয়।

তারপর বোমা ফাটল। বাজখাঁই গলায় বাজের মতোই হাঁক দিলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি, 'নূপুর!'

নূপুর চমকে উঠল। গলা তার বুজে এসেছে। বাঘের ছাঁটা-গোঁফওয়ালা লাল টকটকে গম্ভীর মুখখানা তার চোখের সামনে ড্রাগনের মুখ হয়ে গেছে!

দিগম্বর চ্যাটার্জি বলতে-বলতে ঘরের মধ্যে এগোতে লাগলেন, 'গোটা দিল্লির কাছে আমার মুখ হাসিয়ে তুমি এখানে এসে লুকিয়ে আছ! আর আমার খাওয়া, ঘুম, ডাক্তারি সব চুলোয় গেছে। ছি, ছি, ছি, এত বড় বংশের মেয়ে হয়ে তোমার এই কাজ! তোমার মতো একগুঁয়ে বজ্জাত মেয়েকে —একি, তোর মাথায় সিঁদুর!'

BanglaBook.org

সোফার পিঠটা নূপুর শক্ত হাতে চেপে ধরলে।

এক মুহূর্তের জন্য যেন বোবা হয়ে গেলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি। তারপরেই গর্জে উঠলেন, 'তুই বিয়ে করেছিস! স্বাধীন হয়েছিস তুই! কার হুকুমে বিয়ে করলি? কোন বাঁদরকে? কোন ওরাংওটাংকে? বল, কে সে?'

'আজ্ঞে আমি।'

শোওয়ার ঘর থেকে বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল অচল।

দিগম্বর চ্যাটার্জি কেমন থতিয়ে গিয়ে শুধু বললেন, 'তুমি!'

ভানুর হাঁ-করা ঠোঁটের ফাঁক থেকে চুরুটটা খসে পড়ল। এগিয়ে এসে অচলকে বললে, 'বলেন কি! ব্ল্যাকে বিয়ে করলেন নাকি?'

'ব্ল্যাকে!'

'মানে—গোপনে বিয়ে করলেন বুঝি?'

অচল বললে, 'কী করব বলুন, আপনাদের গোয়েন্দাগিরির জ্বালায় বিয়ে করতে হল। আজই, একটু আগে। এই যে আমাদের বিয়ের সার্টিফিকেট।'

পকেট থেকে সার্টিফিকেটখানা বের করে অচল দেখালে।

করুণ চোখে সেই কাগজখানার দিকে তাকিয়ে ভানু বললে, 'আজ থেকে তাহলে আপনি শ্রীমতী নূপুরের সোল প্রোপ্রাইটার? একমাত্র সত্ত্বাধিকারী?'

অচল সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আইনত তাই।'

জহরের চোখ ছলছল করে উঠল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নূপুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই যদি মনে ছিল, ম্যাডাম, কেন তবে আমাকে স্টেজে নাচালেন, আর কেনই বা দড়ির মইয়ে ঝোলালেন? ভগবান আপনাদের সুখী করুন।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি এতক্ষণ অচলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'তোমার নাম?'

'অচল মুখার্জি।'

'অচল মুখার্জি! তুমি হেমাঙ্গিনী দেবীর ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লক্ষ্ণৌতে বাড়ি না?'

অচল ঘাড় নেড়ে জানালে, 'ঠিক।'

ছাঁটা গোঁফওয়ালা গম্ভীর মুখ থেকে দুর্যোগের আবহাওয়া নিমেষে কেটে গেল। বাবাকে এত খুশি নূপুর জীবনে দেখেনি। অচলের কাঁধ চাপড়ে দিগম্বর চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'ওয়েল, ওয়েল। তোমাকে তাহলে ঠিকই চিনেছি, অচল। পানু আমাকে তোমার ফোটো দেখিয়েছিল। বাঁদর বলেছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন। আরে, তোমার সঙ্গেই তো নূপুরের সম্বন্ধ করেছিলাম।'

অচল আর নূপুর দুজনেই হতবাক।

দিগম্বর চ্যাটার্জি আবার বললেন, 'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নূপুর। সেই যদি অচলকেই বিয়ে করবি, তবে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন?'

এবার নূপুরের মুখে কথা ফুটল, 'পানুমামা যে আমাকে বললে, "যার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, সে কালো বেঁটে—রেড়ির তেলের ব্যবসা করে—"।'

'পানুটা হরিণঘাটার গোরু। (গর্জে উঠলেন দিগম্বর চ্যাটার্জি) আমাকে একবার হাসতে-হাসতে বলেছিল বটে, "নূপুরকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছি, বিয়ের রাতে কিন্তু দারুণ খুশি করে দেব!" তা পানুর কথায় ভয় পেয়ে তুই পালিয়ে এলি। আমাকে একবার জিগ্যেসও করলি না। ছি, ছি, ছি! কিন্তু অচল, তুমিও লক্ষ্ণৌ ছেড়ে পালিয়েছিলে কেন বলো তো?'

মাথা চুলকে অচল বললে, 'আজ্ঞে, নূপুরের পানুমামার মতো আমারও একজন ঝানুকাকা

BanglaBook.org

আছেন। পালিয়েছিলাম তাঁরই জন্যে।'

দিগম্বর চ্যাটার্জি এবার নিশ্চিন্ত মনে পাইপ ধরালেন। বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আজকের দিনের বুদ্ধিমান মানুষেরা যতই আজগুবি বলুক, যা ঘটবার তা ঘটবেই। কে যে ঘটায়, বিজ্ঞানও তা বলতে পারে না। যাক, তোমার মাকে টেলিগ্রাম করে দিই যে, দুই আসামি একসঙ্গেই ধরা পড়েছে।'

অচল আর নূপুর লজ্জিত মুখে ডাক্তারসাহেবকে প্রণাম করলে।

ভানু বললে, 'এবার তা হলে লিখে ফেলুন, জেন্টলম্যান।'

'কী লিখব?'

'চেক।'

'চেক?'

দুটো হাতে ঘষাঘষি করতে-করতে ভানু উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'আপনার প্রতিশ্রুত পঁচিশ হাজার টাকা।'

পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে দিগম্বর চ্যাটার্জি শান্ত গলায় বললেন, 'কথা ছিল, জীবিত বা মৃত নূপুর চ্যাটার্জিকে ধরে দিতে পারলে আমি ওই টাকা পুরস্কার দেব। কেমন, তাই তো?'

ভানু বললে, 'রাইট! রাইট।'

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, 'কিন্তু তোমরা যাকে ধরে দিলে সে তো নূপুর চ্যাটার্জি নয়, সে এখন নূপুর মুখার্জি। সুতরাং, টাকাটা তোমরা দাবি কর কোন হিসেবে?'

ভানু-জহর নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকালে। তাদের চোখের তারাগুলো ট্যারা হয়ে গেছে।

দিগম্বর চ্যাটার্জি বললেন, 'পঁচিশ হাজার টাকা যদি দিতে হয়, তবে অচলকেই দেওয়া উচিত। কেননা, নূপুর চ্যাটার্জিকে খুঁজে পেয়েছিল সেই-ই। তবে তোমাদেরও আমি একেবারে হতাশ করব না। দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার আগে দুটো মেডেল তোমাদের দিয়ে যাব।'

ভানু-জহর আর একবার পরস্পরের দিকে তাকালে। ভানু বললে, 'ডাক্তার না হয়ে আপনার ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, স্যার।' তারপর টুপিটা তুলে বললে, 'গুডবাই এভরিবডি!'

ছলছল চোখে নূপুরের পানে তাকিয়ে জহর শুধু বললে, 'বিদায়!'

দুজনে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভানু বললে, 'মেয়েছেলের কেস আর জীবনে নেব না।'

জহর বললে, 'শিওর অ্যান্ড সার্টেন। নারী ছলনাময়ী!'

উনিশশো উনত্রিশ সালের সেই ফোর্ড গাড়িখানা প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ক্রমশ দূরে চলে গেল।

BanglaBook.org

হ্রদ

BanglaBook.org

বিমল কর

মেঘে ঢাকা দুপুর কখন যে ফুরিয়ে গেছে, দিনের আলো মুছে গিয়ে ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার সুদক্ষিণা বুঝতে পারেনি। পড়ন্ত বেলায় চোখের পাতা তার বুজে এসেছিল। তারপর এক সময় ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল; চাদর টেনে নিয়ে নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গেল সুদক্ষিণা।

অতসীর ডাকে চোখ মেলে চেয়ে দেখে। জানলার বাইরে তখন হাওয়ার দাপাদাপি আর অন্ধকারের ছড়াছড়ি। মেঘে-মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, পলাশবনের মাথায় ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুতের চমক।

চোখ মেলে চেয়ে ভালোই লাগল সুদক্ষিণার। আসন্ন এক বৃষ্টিমুখর স্বপ্নঘন রাত্রির স্পর্শ পাওয়ার লোভে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল—ঘুমভাঙার আলস্য জড়িয়ে থাকল সর্বাঙ্গে।

'কই ওঠ। শুয়ে থাকলি যে।' অতসী ওর গায়ে ঠেলা মেরে তাগাদা দিলে।

'বেশ লাগছে।' খুশির আমেজ সুদক্ষিণার গলায়, 'ক'টা বেজেছে রে?'

'সাড়ে পাঁচটাও বাজেনি। কী ঘটা দেখেছিস—,' অতসী জানালার বাইরে চোখ রেখে বললে, 'বৃষ্টি নামল বলে।'

সুদক্ষিণা গায়ের চাদর আরও ঘন করে জড়িয়ে নিল। অতসী কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। সুদক্ষিণার আলস্য যেন তাকেও পেয়ে বসেছে। একটু পরে হঠাৎ বললে, 'ওমা, দিব্যি শুয়ে থাকলি যে। ওঠ, তোকে ডাকতে এলাম—'

বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনও আগ্রহ সুদক্ষিণার নেই; পরম নিশ্চিন্তে অতসীর হাতটা টেনে নিয়ে বললে, 'কী হবে উঠে? আয় বোস, গল্প করি।'

অতসীর ঠোঁটের কোণে কোন ফাঁকে এক ফালি দুষ্টু হাসি নেমে এল, 'এমন দিনে আমার সঙ্গে গল্প? উঁহু, জমবে না। গল্প জমাবার লোক নীচে এসে বসে রয়েছে। তাইতো তোকে ডাকতে এলুম।' অতসীর হাসি সুদক্ষিণা দেখতে পেল না, কিন্তু তার গলার স্বরে যে রহস্যের ইঙ্গিত জাগল, সুদক্ষিণার কানে তা ধরা পড়ল।

অবাক হল সুদক্ষিণা।

'কে আবার এসে বসে রয়েছে?'

'কী করে তা বলি। তবে দর্শনপ্রার্থী কেউ নিশ্চয়। বেশ দেখতে ভদ্রলোকটিকে—' অতসী ইচ্ছে করেই শেষ কথাটায় জোর একটা টান দিল।

সুদক্ষিণার আলস্য একটু ফিকে হল। কী যেন জানবার চেষ্টায় বিছানার ওপর উঠে বসল। অতসী ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বললে, 'তুই নীচে গিয়ে বোস, আমি তোদের জন্যে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কে এল এই ঝড় বাদলের দিনে? সুদক্ষিণা ভাবল। কাউকে তার মনে পড়ছে না। এখানের চেনা-জানা কেউ নিশ্চয় নয়। অতসী তাহলে চিনত, নাম বলতে পারত। কলকাতা থেকে কেউ কি এল? সুদক্ষিণা মনে-মনে অনুমান করবার চেষ্টা করলে। কারুর তো আসার কথা নেই! তবে?

বিছানা ছেড়ে উঠল ও। আলস্যে সারা শরীরটা তখনও ভার হয়ে রয়েছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সুদক্ষিণা আয়নার সামনে দাঁড়াল। অবেলায় ঘুমিয়ে ওঠার জন্যে তার চোখ আর মুখ যেন একটু বেশিই ফুলে উঠেছে। হালকা হাতে খোঁপাটা জড়িয়ে নিল। পাউডারের কেস থেকে কখন যেন পাফটাও তুলে নিয়েছে। তারপর কী মনে করে নিজের মনেই হেসে উঠল ও। পাফটা রেখে সরে এল আয়নার সামনে থেকে আলনার কাছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। দমকা ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছিটে এসে ঢুকল ঘরে।

তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল সুদক্ষিণা। বিছানা থেকে চাদর কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াল। তারপর ঘর ছেড়ে মন্থর পায়ে নেমে গেল নীচে।

*

BanglaBook.org

বসবার ঘরের পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়েও আগন্তুককে চেনা গেল না। মুখ দেখতে পেল না সুদক্ষিণা।

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল ও। ছোট্ট একটু কাশির শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলে।

আগন্তুক একমনে দেওয়ালের গায়ে ঝুলনো একটা গ্রুপ ফটো লক্ষ করছিল। সুদক্ষিণার কাশির শব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত। ওরা পরস্পরের দিকে শুধু বিস্ময়সুলভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল।

আগন্তুকই প্রথমে কথা বললে—নমস্কারের পর্ব শেষ করে, 'আপনিই শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়?'

সুদক্ষিণা ছোট্ট একটা প্রতিনমস্কারে অভ্যর্থনা জানিয়ে মৃদু হাসল, 'হ্যাঁ, আমি। বসুন!'

'বসছি। আপনি বসুন। একটু বিরক্ত করতে এসেছি আপনাকে।' ভদ্রলোক চেয়ারে বসে সুদক্ষিণাকে লক্ষ করতে-করতে হাসল।

'তাতে কী—' সুদক্ষিণা ভদ্রজনোচিত সৌজন্যে বলল।

'পরিচয় দিলে অবশ্য আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। ভদ্রলোক কথা শুরু করলেন, 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটাল থেকে আমি আসছি। আমাব নাম প্রণব দাশগুপ্ত। আমি সেখানকার একজন ডাক্তার।'

সুদক্ষিণা সচকিত হল। মেন্টাল হসপিটাল—পাগলাদেব হাসপাতালেব সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? প্রণবের দিকে অদম্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল সুদক্ষিণা।

'মনোজ রায় বলে কাউকে চেনেন আপনি?' প্রশ্ন কবলে প্রণব।

'মনোজ?' সুদক্ষিণা মনে কববার চেষ্টা করলে।

'কই, না?'

'ভালো করে একটু ভেবে দেখুন তো—কাউকে মনে পড়ছে না?'

সুদক্ষিণাব পরিচিত জনের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। তবু আবার একবার স্মৃতি-সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনোজ রাযকে মনে কববার চেষ্টা করলে।

'চিনতে পারলেন না?'

মাথা নেড়ে সুদক্ষিণা জানালে, 'না—ওই নামেব কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না।'

'আমিও তাই আশা করেছিলুম।' প্রণব চিন্তিত হল।

সুদক্ষিণা উগ্র কৌতূহল চেপে রেখে প্রণবকে একমনে লক্ষ করতে লাগল। সুদর্শন, সুপুরুষ চেহারা। বয়েস ওর খুব অল্পই হবে। হয়তো বা সুদক্ষিণারই সমবয়েসি। ছেলেটির চোখে মুখে প্রখব বুদ্ধির দীপ্তি। চোখ দুটো বড় সুন্দর। আর আশ্চর্য তার দৃষ্টি। সুদক্ষিণার দৃষ্টির সঙ্গে যতবার ওর দৃষ্টি মিলিত হয়েছে—কেমন একটা আকর্ষণ স্পষ্ট অনুভব করেছে ও; ঠিক তীব্র নয়, তীব্র-মধুর।

প্রণব পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিলে সুদক্ষিণার দিকে। বললে, 'দেখুন তো, এটা চিনতে পারেন?'

টেবিল-ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় কাগজের টুকরোটুকু মেলে অবাক হল সুদক্ষিণা। হাতের লেখাটা তার। একটা গানের স্বরলিপির শেষ দুটি কলি। খাকিটা ছিঁড়ে গেছে। স্বরলিপির পাশে সুদক্ষিণার নাম-ঠিকানা লেখা। আর আশ্চর্য, সেটাও তার নিজের হাতের। স্বরলিপির সেই ছিন্ন অংশটুকু হাতে করে সুদক্ষিণা বোবার মতন বসে থাকল।

'হাতের লেখাটা আপনার?'

মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদক্ষিণা।

'কাউকে এই স্বরলিপিটা লিখে দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে?'

BanglaBook.org

সুদক্ষিণা মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ঝি এসে চা রেখে গেল। একটা প্লেটে কিছু খাবার।

সুদক্ষিণা বললে, 'এটুকু খেয়ে নিন।'

'আপনি?'

সলজ্জ হাসি হাসল সুদক্ষিণা, 'চা ছাড়া এখন আর কিছু আমি খাই না। তা বলে আপনি যেন 'না' বলবেন না।

প্রণব হেসে খাবারের প্লেটটা তুলে নিল।

চায়ে নিঃশব্দে একটা চুমুক দিয়ে সুদক্ষিণা আবার কিছুক্ষণ ভাবলে।

'আমার তো মনে পড়ছে না। তবে গানটা আমার খুব প্রিয়।'

'ভেবে দেখুন তো আপনার পরিচিত জনের মধ্যে গানটি আর কারও খুব প্রিয় কি না?' প্রণব খানিকটা ভেবে চিন্তে বললে।

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণার মনের একটা বন্ধ জানালা খুলে গেল দমকা ঝড়ের আঘাতে যেমন করে ভেতরের কপাট খুলে যায়। মুহূর্তে সুদক্ষিণার সর্বাঙ্গ ক্ষণেকের জন্যে শিউরে উঠল। বিস্ফারিত হল নয়নপল্লব। অর্ধস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হল, তার কণ্ঠ থেকে।

প্রণব সুদক্ষিণার মুখে পূর্ণদৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করতে লাগল পরম আগ্রহে।

অন্ধকার ক্ষয়ে ক্রমশ আলো জাগল। বিস্মৃত একটা অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল সুদক্ষিণার স্মৃতিকোষায়। সংশয় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে সুদক্ষিণা, 'এই গানের স্বরলিপির কথায় একজনকে আমার মনে পড়ছে কিন্তু'—কথার মাঝে একটু থেমে আবার যোগ করলে, 'কিন্তু তার নাম তো মনোজ রায় নয়?'

'নাও হতে পারে।' প্রণব উৎসাহিত হয়ে উঠল 'যার কথা আপনার মনে পড়ছে তার কথাই বলুন'

সুদক্ষিণার কিন্তু। তখন যেন অনিচ্ছা দেখা গেল। প্রণব লক্ষ করলে, 'গানটা উল্লেখ করার পর থেকে সুদক্ষিণার স্বাভাবিক শান্ত মুখশ্রীতে কেমন একটা পরিবর্তন ফুটে উঠছে।

'আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার এ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ্য বাঞ্ছনীয় নয়, সুদক্ষিণা দেবী। কিন্তু সময় সময় অপরিচিত, অনাত্মীয়জনের কাছেও মানুষকে অনেক কিছু প্রকাশ করতে হয়। একটা গুরুতর প্রয়োজন না থাকলে নিশ্চয় আপনার কাছে ব্যাঘাত ঘটাতে আসতাম না।'

সুদক্ষিণা প্রণবের কথা ও স্বরের মধ্যে অনুভব করছিল বিশেষ একটা ওজন। খানিকটা বুঝি প্রয়োজনের দায়িত্ব। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললে ও, 'আমার মনে পড়ছে গানটি আমি আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের স্বরলিপি সমেত লিখে দি।'

'কী সূত্রে তা কি বলবেন?'

'তিনি গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নিজেও চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতেন। আমার মুখ থেকে গানটি শোনার পর তাঁর হাতের বেহালায় তুলে নেবেন। সেই সূত্রে আমি স্বরলিপি সমেত গানটি লিখে দি।'

'আর এই নামটা?'

'সেটাও তাঁর তাগিদে।'

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে প্রণব সুদক্ষিণার সামনে ঝুঁকে বসল। পকেট থেকে বের করল একটা খাম, তার মধ্যে থেকে আবার একখানি ফটো। ফটোটি এগিয়ে দিলে সুদক্ষিণার দিকে, 'দেখুন তো চিনতে পারেন কি না?'

সুদক্ষিণা ফটোটা হাতে নিয়ে তাকাতেই সর্বাঙ্গ তার নিথর হয়ে গেল। চোখের পাতা পড়ে

BanglaBook.org

না—মুখে একটা শব্দও ফোটে না আর।.. চিন্তার শাখা-প্রশাখা বেয়ে মন তার ডুব দিয়েছে সযত্নে সরিয়ে রাখা এক অতীত ইতিবৃত্তের মাঝে। সুদক্ষিণা জানল না তার নিজের অজ্ঞাতে প্রণবের প্রশ্নার্ত দৃষ্টির মাঝে কোন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল, শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখে চোখে যে বিষাদমিশ্রিত পেশিকুঞ্চন ফুটে উঠল, তারই করুণ রেখায়-রেখায় কোন রহস্যের সন্ধান পেল প্রণব।

'চিনতে পারলেন?'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণা চমকে উঠল। ছবিটা এগিয়ে দিলে প্রণবকে।

প্রণব সযত্নে ফটোটি পকেটে রেখে প্রশ্ন করলে, 'চিনতে পারলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদক্ষিণা।

'কী নাম ভদ্রলোকের?'

'বাণীব্রত চক্রবর্তী।'

'কোথায় থাকতেন?'

'কলকাতা।'

প্রণব প্রশ্ন করে যেতে লাগল আর মন্ত্রমুগ্ধের মতন সুদক্ষিণা উত্তর দিতে থাকল।

'তাঁর বাড়ি আপনি চেনেন?'

'বাড়ি চিনি না। ঠিকানা জানি।'

'দয়া করে ঠিকানাটা বলবেন?'

'সঠিক এখুনি বলতে পারব না। তবে ওপরে আমার বইখাতার মধ্যে কোথায় যেন লেখা আছে। খুঁজে এনে দিতে পারি।'

'মাপ করবেন, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'বলুন—।'

'বাণীব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়—।'

'খুব বেশিদিনের নয়। আমার পিসতুতো দাদার বন্ধু তিনি। দল বেঁধে দাদারা এসেছিলেন দেওঘরে পুজোর সময় চেঞ্জে। দাদার সঙ্গে তিনিও আসেন। আমিও সে সময় দাদাদের দলে ছিলাম। সেই সূত্রে আলাপ।'

'তারপর?'

সুদক্ষিণা প্রণবের প্রশ্ন ঠিক অনুধাবন করতে পারলে না। বললে, 'কী তারপর?'

'সেটাই তো আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি।' প্রণব তার দৃষ্টি উজ্জ্বলতর করলে।

সুদক্ষিণা বুঝতে পারে না, প্রণব আসলে কী জানতে চায়। বাণীব্রতর সম্পর্কে পরিবেশন করার মতন অনেক তথ্য অবশ্য তার জানা আছে। আর জানা আছে বলেই কি এই অনর্থক উৎপাত?

'আপনি শেষ তাকে দেখেন কখন?' প্রণব প্রশ্ন করলে।

'পুজোর সময় দেওঘরে। সেই আমার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ।'

'ও, তাহলে তো বেশিদিন হয়নি।' প্রণব কেমন যেন নিজেও মনেই বলে উঠল।

'না। বেশিদিন আর কই?'

'আশা করি বাণীব্রতবাবুকে আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছেন?'

'বুঝলাম না।' সুদক্ষিণা বিস্মিত হয়ে বললে।

'মানে—স্বাভাবিক মানুষের মতন। এই যেমন আমি, আপনি—এই রকম আর কী।'

কথায়-কথায় আলোচনার বিষয়বস্তু যে কোন পথে গড়িয়ে যাচ্ছে সুদক্ষিণা তার অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিল। অতি সযত্নে যে-বিষয়টা প্রথম থেকেই সে পরিহার করতে চায়—কেমন করে না-জানি তাদের আলাপ সেই বিষয়টির দিকেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সুদক্ষিণার মনে বাণীব্রতর স্মৃতি যে মুহূর্তে জাগল তখন থেকেই অনেক কষ্টে সে তার মনোভাব লুকিয়ে রাখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

তবু প্রণবের শেষ কথায় সুদক্ষিণা নিজের অজ্ঞাতেই জালে জড়িয়ে পড়ল।

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রণববাবু। বাণীব্রতবাবুকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছি কি না—এ প্রশ্ন কেন করছেন? স্বাভাবিক একজন মানুষকে অস্বাভাবিক দেখার কোনও কারণ নেই।'

'ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গে যখন বাণীব্রতবাবুর আলাপ হয় তখন তিনি স্বাভাবিক মানুষের মতনই ছিলেন। যদিও আমার ধারণা তাও ঠিক হয়তো ছিলেন না। যাক সে কথা। আচ্ছা সুদক্ষিণা দেবী, বাণীব্রতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার একবার সুবিধে আপনার হবে?'

প্রণবের অনুরোধে সুদক্ষিণার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল; কিছুটা যেন বিরক্ত হল সুদক্ষিণা।

'হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন?'

'গুরুতর একটা প্রয়োজন আছে বইকী? নয়তো আপনাকে অনুরোধ করব কেন? যাবেন একবার আমাদের হাসপাতালে? একটু দূর হবে অবশ্য। খানিকটা কষ্টও হবে—যাওয়া-আসায়। তা হোক—তবুও আমি আপনাকে অনুরোধ করব। আপনি জানেন না—এই সাক্ষাতের ফলে কী পরম উপকারই না হতে পারে!' প্রণবের স্বর গভীর হয়ে এল।

হঠাৎ কী যেন হল সুদক্ষিণার। কঠিন কণ্ঠে বললে, 'মাপ করবেন। দেখা করার সুবিধে আমার হবে না!'

প্রণব বুঝি জানত এমন একটা উত্তরই সে পাবে। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে আবার সে বললে, সুদক্ষিণার চোখে তার স্থির শান্ত গভীর দৃষ্টি রেখে, 'এমনটা আশা কবিনি আপনার কাছে। অবশ্য এও আপনি হয়তো জানেন না, আপনার পরিচিত এই ভদ্রলোক—এক পাগলা হাসপাতালে অসহ্য কষ্টে, স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়ে, পাগল হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণার সাবা শরীরের ওপর দিয়ে যেন বরফের স্রোত বয়ে গেল। রুদ্ধ হল তার নিশ্বাসপতন; নিষ্পলক হল নয়ন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠল। সুদক্ষিণার মুখচোখের এই আকস্মিক পরিবর্তন অত্যন্ত সতর্ক নিরপেক্ষ চোখে দেখলে প্রণব।

'সুদক্ষিণা দেবী!'

সংবিত ফিরে এল সুদক্ষিণার। প্রণবের মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে থাকল ও।

'শরীরটা কি অসুস্থ মনে হচ্ছে আপনার?'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে মৃদু জড়িতস্বরে সুদক্ষিণা বললে, 'বাণীব্রতবাবু কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'ভাবতে পারিনি। তবে ও-ঘটনার পর পাগল হওয়া বিচিত্র নয়!'

'কোন ঘটনা?'

'ও, আপনি জানেন না? অনেকেই কিন্তু জানে। বাণীব্রতবাবু তাঁর ভাইকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।'

প্রণবের চোখের সামনে সেই অনুজ্জ্বল ঘরের আলো যেন নিভে গেল হঠাৎ; তারপর কয়েক মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল শতগুণ তীব্র হয়ে। আশ্চর্য একটা উত্তেজনা জাগল প্রণবের সর্বাঙ্গে। ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করে থমকে দাঁড়াল প্রণব সুদক্ষিণার মুখোমুখি।

'কোনও একটা মারাত্মক ঘটনা আশা করলেও যা বললেন তেমন কিছু অনুমান করিনি। বাণীব্রত খুনি। হ্যাঁ—তা এ ধরনের কিছু ঘটা বিচিত্র নয়। যাই হোক—সুদক্ষিণা দেবী, সমস্ত ঘটনাটা দয়া করে আমায় বলতে হবে। আর আপনাকে একবাব যেতেও হবে আমাদের হাসপাতালে।'

'আমার মুখ থেকেই শুনতে চান?' সুদক্ষিণা ব্যথাহত সুরে প্রশ্ন করলে।

'তেমন কোনও আপত্তি যদি না থাকে।'

BanglaBook.org

'না—আপত্তি কী, জানতেই যখন পারলেন। তবে একটা কথা প্রণববাবু, যা আমি শুনেছি তাই বলছি; ঘটনাস্থলে থাকলেও আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই।'

'বুঝেছি। আপনি বলুন।'

কথাশেষে প্রণব একটা সিগারেট কেস থেকে বের করে জ্বালিয়ে নিল।

সেই আধো-অন্ধকার ঘরের মধ্যে থমথমে আবহাওয়া জমাট হয়ে এল। বৃষ্টি নেমেছে বাইরে অঝোর ধারায়। খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তছাওয়া আঁধার। বৃষ্টির একটানা শব্দ।

সুদক্ষিণা তার কথা শুরু করল।

'ব্যাপারটা আপনাকে সব গুছিয়ে না বললে ঠিক বুঝতে পারবেন না,'—সুদক্ষিণা গায়ের চাদর আরও ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বলে যেতে লাগল। ধীর, স্পষ্ট, বিষণ্ণ তার কণ্ঠস্বর, 'আমার এক দূর সম্পর্কীয় দাদা আছেন কলকাতায়। নাম তাঁর বিভূতিভূষণ। আগে তাঁরা শোভাবাজার অঞ্চলে থাকতেন। গত বছর দাদা টালিগঞ্জ অঞ্চলে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে যান। প্রতিবেশী হিসেবে দাদার সঙ্গে আলাপ হয় বাণীব্রতবাবুর। সেই আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যে দাদার অন্তঃপুরেও বাণীব্রতবাবু আত্মীয়ের মতো সহজস্থান অধিকার করলেন। শুনেছি বাণীব্রতবাবু একা মানুষ। চাকর-বাকর নিয়ে তাঁর সংসার। আমার বউদি—এই একা নিঃসঙ্গ নিরীহ মানুষটিকে পছন্দ করতেন। স্নেহও করতেন প্রচুর। দাদার চেয়ে বউদির সঙ্গেই যেন বাণীব্রতবাবুর বেশি ভাব—প্রীতির সম্পর্ক আরও গভীর। এবার পুজোর ঠিক পরেই দাদারা এলেন দেওঘরে হাওয়া বদলাতে। তাঁদের সঙ্গে বাণীব্রতবাবু। আমিও সেই সময় স্কুলের ছুটি থাকায় ওঁদের দলে হাজির ছিলাম। বাণীব্রতবাবুর সঙ্গে দেওঘরেই আমার প্রথম আলাপ হল। ভদ্রলোক বাস্তবিক অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি—সবই প্রশংসনীয়। উপরন্তু আমার মতনই সংগীতের ওপর ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। আমরা দুজনে সম্ভবত সেই কারণেই খুব অল্পদিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি। আমি তাঁর কাছ থেকে বেহালা শেখার প্রথম পাঠ নিতেও শুরু করেছিলাম। আর তিনি ভালো গান—যা আমি ভালোভাবে জানতুম বলে তিনি মনে করতেন—সেগুলোর সুর তুলে নিতেন বেহালায়। একদিন বেড়িয়ে ফেরার পথে দাদা-বউদির অনুরোধ আর পীড়াপীড়িতে আমি একটা গান গাই। গানটা আমার নিজের লেখা এবং সুর দেওয়া। বাণীব্রতবাবুর সেই গান খুব ভালো লাগে। সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই তিনি গানটির সুর তুলতে বসে গেলেন। গানটির স্বরলিপি তাঁর সামনে বসে আমায় তখুনি করে দিতে হয়। এবং তাঁরই অনুরোধে স্বরলিপির শেষে নিজের নাম ঠিকানাও লিখেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে—গানটি তিনি কোনও গানের পত্রিকায় ছাপতে পাঠাবেন বলেই আমার নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে বলেন,—' এইখানেই সুদক্ষিণা থামল। যেন মন্থন করলে অতীতস্মৃতি। নিস্তব্ধ কতকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল। সহসা সুদক্ষিণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকাশ বলে চলল, 'এর দিন কয়েক পরে আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল। বউদি একদিন সন্ধের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওখানের এক ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁর নাম দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের কোনও আলাপ ছিল না। সেরকম কোনও সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি আগে। ডাক্তার চক্রবর্তী এসে বউদিকে দেখে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ দেখলাম বাণীব্রতবাবুর মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন। কেমন যেন হঠাৎ খুব গম্ভীর আর অস্থির হয়ে গেলেন। একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেন তিনি। তারপর নিজের ঘরের দরজা দিলেন বন্ধ করে। আমাদের সকলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শুধু জানালেন তাঁর শরীর খারাপ। আমরাও আর তাঁকে সে রাত্রের মতন বিরক্ত করলুম না। প্রতিদিনের মতন দশটা নাগাদ যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়লুম। পরের দিন একটু বেলাতেই এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে আমরা পাথর হয়ে গেলুম। মাঝ রাত্রে ডাক্তার চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে নাকি বাণীব্রতবাবু

ডাকাডাকি শুরু করেন। ডাক্তার চক্রবর্তী বৈঠকখানা ঘর খুলে বাণীব্রতবাবুকে বসান। তারপর ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর কী নিয়ে যেন বচসা বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। বাণীব্রতবাবু ডাক্তার চক্রবর্তীর ওপর হিংস্র হয়ে উঠে তাঁকে গুলি করেন। এরপর সেইরাত্রেই তিনি কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তা জানি না। আপনার কাছেই আজ আমি প্রথম জানলুম বাণীব্রতবাবু জীবিত এবং পাগল অবস্থায় রয়েছেন।' সুদক্ষিণা তার কথা শেষ করে নীরব হল।

প্রণব সুদক্ষিণার প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল। গেঁথে নিচ্ছিল মনে-মনে। সুদক্ষিণার কথা শেষ হতে প্রণব বললে, 'কিন্তু একটা ব্যাপার তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ ডাক্তার চক্রবর্তীকে খুন করার কারণ কী? বাণীব্রতবাবুর তাতে স্বার্থ কোথায়?'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলুম। কথাটা বিশ্বাস করিনি। তারপর শুনলাম—' সুদক্ষিণা থেমে গেল।

'কী শুনলেন?' প্রণব ব্যাকুল সুরে প্রশ্ন করলে।

'সে এক অদ্ভুত ঘটনা। ডাক্তার চক্রবর্তী আসলে হচ্ছেন বাণীব্রতবাবুর খুড়তুতো ভাই। একমাত্র জীবিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কলকাতায় উভয়েই ছিলেন উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটি মেয়ে, নাম নীলা তাকে নিয়েই এই দুই ভাই এবং পরম বন্ধুর মধ্যে চিরদিনের মতো একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায়—।'

'আমাকে আরও একটু বোঝবার সময় দিন, সুদক্ষিণা দেবী।' প্রণব কৌতূহল চাপতে না পেরে বললে।

কেমন একটা সংকোচ হচ্ছিল সুদক্ষিণাব এ-সব কথা বলতে। কিন্তু সংকোচের অবকাশ আর ও দিল না। ও বলছিল, 'বাণীব্রতবাবু নীলাকে ভালোবাসতেন। নীলারও বাণীব্রতবাবুর ওপর সমান অনুবাগ ছিল। কিন্তু নীলা পরে জানতে পারে বাণীব্রতবাবু তাকে সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের দরুনই বাণীব্রতবাবু নীলাকে একদিন হঠাৎ ক্ষেপে উঠে মেরে ফেলতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। ডাক্তার চক্রবর্তী নীলাকে বাঁচান। এরপর থেকে ওদের পরস্পরের সম্পর্ক ভীষণ তিক্ত হয়ে ওঠে। ডাক্তার চক্রবর্তী নীলাকে বিয়ে করে কলকাতা ছেড়ে মফস্‌সলে চলে আসেন। শুনেছি এছাড়া নাকি বাণীব্রতবাবুর হাত থেকে বাঁচবার অন্য কোনও পথ তাঁদের ছিল না। এ ঘটনার বছর তিনেক পরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেওঘবে সেই ভাইয়ের সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর দেখা হয়ে গেল—ডাক্তার চক্রবর্তী যখন বউদিকে প্রথম দেখতে এলেন আমাদের বাড়িতে। শুনেছি ভাইয়েব বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধই নাকি তিনি নিয়েছেন এ-ভাবে।

প্রণব যেন এক রোমাঞ্চ কাহিনির মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েছে। চোখে তার অতল বিস্ময়, ঠোঁটের কোণে রুদ্ধ উত্তেজনার কুঞ্চিত রেখা।

নিস্তব্ধ কতকগুলো মুহূর্ত শেষ হল; অসহনীয়, অস্বস্তিকর পরিবেশ। হঠাৎ প্রণব বললে, 'বাণীব্রতবাবুর পারিবারিক জীবনের এই পরিচ্ছেদটি আপনি কেমন করে জানলেন?'

'দাদার কাছ থেকে।'

'ডাক্তার চক্রবর্তী খুন হওয়ার আগে না পরে?'

'পরে। ডাক্তার চক্রবর্তীর স্ত্রী—নীলার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যখন আমাদের বাড়ি এসে হানা দিল।'

'ও! আপনাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল?'

'আসবেই তো। বাণীবাবুকে আমাদের লোক বলেই সকলে জানত। তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার আশায় পুলিশ আমাদের কাছে না এসে পারে না। তা ছাড়া—'

'কী, তা ছাড়া—?'

BanglaBook.org

'ডাক্তার চক্রবর্তীকে যে রিভলভার দিয়ে গুলি করে মারা হয় সেটা আমার দাদার। বাণীবাবু যাওয়ার সময় সকলের অজ্ঞাতে সেটি সরিয়ে নিয়ে যান।'

'ও! আচ্ছা, রিভলভারটা নিশ্চয়ই ঘরে পাওয়া গিয়েছিল?'

'তাই। ডাক্তার চক্রবর্তীর মৃতদেহের পাশেই, মেঝের ওপর। এই রিভলভার নিয়ে দাদাকে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি।'

'তা তো হবেই।'

প্রণব কী যেন ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়াল।

'এখনকার মতো চলি। জানবার মতো অনেক জিনিস এখনও বাকি থেকে গেল। এদিকে কালই আমি হাসপাতালে ফিরে যাব। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'কী হবে—' ক্লান্ত সুরে সুদক্ষিণা বললে।

'কিছু হবে বইকী। খুন—খুনই বা কেন বলি—আশ্চর্য একটা মনের রহস্য হয়তো জানা যাবে। এখন আমি চললুম। বৃষ্টি একটু থেমেছে। আপনি রাত্রিতে যাওয়ার সম্বন্ধে ভেবে স্থির করে রাখবেন। কাল সকালে আমি খোঁজ নেব।'

ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে প্রণব চলে গেল। তার যাওয়ার পথে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে থাকল সুদক্ষিণা।

যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল, তারপর রাত্রে সুদক্ষিণা যে ঘুমোতে পারবে নিরঙ্কুশ মনে—এমন কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত তন্দ্রাহীন, দুশ্চিন্তাপীড়িত মন নিয়ে ছটফট করলে সুদক্ষিণা। আকাশ-পাতাল কত কী ভাবল, আবার ভাবতে না পেরে হালও ছেড়ে দিলে।

বাইরে বৃষ্টির তাণ্ডব কখন যেন আরও বেড়েছে। বজ্রপাতের নির্ঘোষ মাঝে-মাঝে চমকে দিয়ে যায় সুদক্ষিণাকে, ঝড়ের মাতাল হিংস্র রূপটা চোখে না দেখেও অনুমান করতে পারে সে। শ্যামমুখর রাত্রির স্পর্শ পাওয়ার লোভে মন যার বিকেলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—রাত্রে মৃদু আলোকময় রুদ্ধ ঘরের নরম বিছানায় শুয়ে তার সেই মনই হাঁপিয়ে উঠছে—অদ্ভুত একটা ভয় গ্রাস করছে তিলে-তিলে; কী আশ্চর্য!...সুদক্ষিণা মনের সব ভাবনাকে কিছুক্ষণের জন্যে তাড়িয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চাইল; কিন্তু পারলে না।

বিছানার ওপর উঠে বসল সুদক্ষিণা। দুহাতে মাথা টিপে বসে থাকলে অনেক—অনেকক্ষণ। তারপর ঘড়িতে যখন দুটো বাজার শব্দ শুনল তখন হাল ছেড়ে দিয়ে মাটিতে নেমে এল। না, আজ আর তার ঘুম হবে না। মুখে চোখে জলের ছিটে দিল সুদক্ষিণা। অনেকটা জল খেল। পায়চারি করলে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ। অতসীকে ডেকে আনবে কি না পাশের ঘর থেকে তাও ভাবলে কবার।

শেষ পর্যন্ত আবার সেই বিছানা—সেই চিন্তা। সবার চেয়ে বড় চিন্তা—যা তার চেতনার পুরো আকাশটাকেই ঢেকে রেখেছে, তুমুল একটা ঝড়ও দিয়েছে জাগিয়ে—তা বাণীব্রতর পাগল হয়ে যাওয়ার সংবাদ। স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়ে পাগলা হাসপাতালে দিন কাটাচ্ছে বাণীব্রত দীনতম অবস্থায়। মানসিক চরম নিষ্পেষণ সহ্য করে এখনও বেঁচে রয়েছে এমন একটা মানুষ যার মৃত্যুও এ-ক্ষেত্রে বুঝি বাঞ্ছনীয়। বাণীব্রতর দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অবমাননা—সবই যেন সুদক্ষিণা নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। কিন্তু কেন? কী তার যায় আসে বাণীব্রত পাগল হোক আর না-হোক। কীসের সম্পর্ক তার বাণীব্রতর সঙ্গে? একটা প্রতারক, পাপীর জন্যে সুদক্ষিণার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ কেন?...কেন তা সুদক্ষিণা জানে। কিন্তু অস্বীকার করতে চায় সহজ সত্যটাকে জোর করে দাবিয়ে-দমিয়ে। বাণীব্রতকে ভালোবাসে সে। আজ নয়, সেই, সে-দিন—যেদিন বাণীব্রত তার হাত তুলে নিল, চুপ করে বসে

BanglaBook.org

থাকল তার দিকে তাকিয়ে; চোখের দৃষ্টি ভরে তুলল মিনতি ও প্রত্যাশায়, প্রার্থনার আশায়, ব্যাকুলতায়। সুদক্ষিণা মাঠ-শেষের সেই বকুলগাছের বেদি আর অস্তমান সূর্যের ছড়ানো সোনায় সে-দিন যা গ্রহণ করলে তার স্পষ্ট কোনও রূপ নেই। আজও তাই মাঝে-মাঝে সুদক্ষিণা ভেবে পায় না—বাণীব্রত তার কে—কেন তার জন্যে এত দুঃখ, এত উদ্বেগ?

আত্মদ্বন্দ্বের নিষ্পেষণে ক্ষয়ে যেতে লাগল সুদক্ষিণা। কী যে তার করা উচিত কিছুতেই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না।

প্রণবের মুখ থেকে বাণীব্রতর কথা শোনার পর মন চাইছে ছুটে যেতে। বাণীব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে তার দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভাগ্যকে নিজের করে নিতে। সেবায়, যত্নে, সোহাগে—হতভাগ্য বাণীব্রতকে কিছুটা শান্তি দিতে।

সুদক্ষিণার মন যা চায় সেটা তার স্বভাব—ভালোবাসার স্বভাব। কিন্তু স্বভাবে চাইলে কি হয়, বাণীব্রতর তরফ থেকে একটা অভাব তার যাওয়ার পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মানুষকে আমরা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারি না—যখন দেখি আমাদের নীতিবোধকে সে অমান্য করছে, আঘাত করছে বিশ্বাসকে। সুদক্ষিণার ক্ষেত্রে সেটাই একমাত্র বাধা—ব্যবধান। কেন বাণীব্রত এমন কাজ করল? নীলা তাকে প্রতারণা করেছিল বলে সকলকেই কি সে প্রতারণা করবে? সত্যি কি বাণী তাকে ভালোবাসেনি? বাণী কি তার বন্ধু বিভূতি আর বউদির সমস্ত স্নেহ আর প্রীতিকে ভুলে গেল? খুনের মামলার সঙ্গে তাদের নাম জড়িত করে এতবড় অমর্যাদা করলে স্নেহ, প্রীতি, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার! সহজভাবে সুদক্ষিণা যার হাত ধরে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল—সেই তাকে আঘাত দিয়ে চলে গেল। বাণীব্রতকে জড়িয়ে কুৎসা, ঘৃণা, ভয়। সমাজমনের অসমর্থনই ন্যায় নীতি ও আইনের বাধা। বাণীব্রতর কলঙ্ক কেউ ক্ষমা করবে না। আইনের চোখে মানুষ-সমাজে নিকৃষ্টতম পাপী সে। তার বিচারে বাণীব্রতর বেঁচে থাকবার অধিকারটুকুও যে ছিনিয়ে নেওয়া হয়! এই জঘন্য, কুশ্রী, গ্লানিময়, একটা জীবনের সঙ্গে কেন সুদক্ষিণা নিজেকে জড়াতে যাবে? কেন—কেন? জীবনে একদা মাত্র ক'টি দিনের জন্যে সুদক্ষিণা যে-স্বর্গ রচনা করেছিল—দেওঘর থেকে ফিরে এসে প্রাণপণে তা ভুলে যেতে চেয়েছে—মুছে ফেলতে চেয়েছে তাব কুমারী জীবনের সেই শুক্লপক্ষ, ধবলস্বপ্ন। বহুপরিশ্রমে বাণীব্রতকে সে ভুলতে না পারলেও দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল, পেরেছিল ওর ওপর অশ্রদ্ধা, বিরক্তি আর ঘৃণার একটা সমর্থন তৈরি করে সযত্নে নিজে সরে আসতে। সুদক্ষিণার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল প্রণবের আবির্ভাবে। যুক্তি, ন্যায়, নীতি, আইন—যত বাধা, যত শৃংখল সব ভেঙে গেল, ভেসে গেল। ওর ভালোবাসা যেন মন্ত্র দিল কানে-কানে—বিচার করো না, বাধা মেনো না। ভালোবাসা আদালতের আইন নয়।

ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেল।

সুদক্ষিণা স্থির করলে সে যাবে। বাণীব্রতর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যৎ ভেবে কোনও লাভ নেই। ভবিতব্য যা, তাই তো হবে। এই বুঝি তার ভাগ্য।

সুদক্ষিণার সঙ্গে প্রণবের সাক্ষাতের পর এ কাহিনির আবার যবনিকা উঠল পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটালের একটি কক্ষে। পূর্বঘটনার দিন চারেক পরে। হসপিটালের চিফ মেডিকেল অফিসারের চেম্বার। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন,—অপেক্ষাকৃত অল্প আসবাবসজ্জিত একটি ঘর। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন ডাক্তার অরুণকান্তি গুপ্ত। তিনিই এ হাসপাতালের প্রধান কর্মকর্তা। ডাক্তার গুপ্তর বয়স পঞ্চাশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। তবু প্রৌঢ়ত্ব যেন আজও পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করতে পারেনি তাঁকে। দেহে তাঁর আজ মধ্য-যৌবনের শান্ত দীপ্তি। গৌরবর্ণ এই লোকটির রূপেরও বুঝি শেষ নেই। দেহের প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বর্ধিত হয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত তাঁর চেয়ারে ঝুঁকে বসেছিলেন। একটি হাত চিবুকে, অপরটি টেবিলের ওপর ছড়ানো। মাঝে-মাঝে আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছেন টেবিলে বিছানো কাচের ওপর। ঠিক এইরকম ভঙ্গিটিই ডাক্তার গুপ্তর গভীর-চিন্তাকালীন

BanglaBook.org

বিশেষ একটি মুদ্রা বলা চলে। সুদক্ষিণা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উলটো দিকেই বসেছিল। সম্ভবত অভিভূত হচ্ছিল ডাক্তার গুপ্তর বিরাট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি বসে। নীরবে শুনছিল ডাক্তার গুপ্ত আর প্রণবের কথাবার্তা। লক্ষ করছিল ডাক্তাব গুপ্তের চোখের ভাষা। ঘনকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়ের নীচে আশ্চর্য দুটো চোখ ডাক্তার গুপ্তর; হালকা বাদামি রঙের স্বচ্ছ প্রচ্ছদপটের ওপর ধূসর দুটি মণি। অচঞ্চল, অচপল কিন্তু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। উর্ধ্ব ওষ্ঠের পাশ দিয়ে মৃদু একফালি হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। কুঞ্চিত কয়েকটি ক্ষীণ পেশি-রেখায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়েছে ডাক্তার গুপ্তর মুখশ্রী।

প্রণব ডাক্তার গুপ্তর পাশে দাঁড়িয়েছিল—হাতে তার খোলা ফাইল। ডাক্তার গুপ্ত গভীর চিন্তার মাঝে কথা বলে উঠলেন, 'Yes, I do quite agree with you, that particular detail has a great—great significance,'—কথার শেষে ডাঃ গুপ্ত চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। একটু থেমে সুদক্ষিণার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন প্রণবকে, 'এঁর সঙ্গে তোমার পেশেন্টের দেখা হয়েছে?'

প্রণব ঘাড় নাড়লে। বললে, 'না। এখনও হয়নি। আজ সকালেই প্রথম আমি এঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।'

'That's well! তোমার পেশেন্টকে ডাকো।'

'এখানে?'

'ক্ষতি কী? Let us see the result!'

প্রণব কলিং বেলে হাত দিল। একটু পরে ঘরের পরদা সরিয়ে এসে দাঁড়াল মেট্রন মিসেস নাগ।

প্রণব বললে, 'মিসেস নাগ, বত্রিশ নম্বর পেশেন্ট—মনোজ রায়কে এখানে নিয়ে আসুন।'

'Yes sir!' মিসেস নাগ সুদক্ষিণার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটা জিনিস তুমি লক্ষ করেছ প্রণব?'

প্রণব ঠিক বুঝতে পারলে না ডাক্তার গুপ্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করছেন। 'কোন বিষয়ের কথা বলছেন স্যার?'

'আমি এই পেশেন্টের ইনট্রিগের কথা বলছি। কী যেন মেয়েটির নাম বললে—ইলা—। Think!'

'নীলা—।'

'Yes—নীলা। বাণীব্রত নীলাকে ভালবাসত, হঠাৎ সন্দেহ করতে শুরু করলে। কেন? নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর এমন কোনও সম্পর্ক কি বাণীব্রত আবিষ্কার করেছিল যা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়? হয় তো তাই—সন্দেহের বশে বাণীব্রত একবার এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, নীলাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পর্যন্ত চেষ্টা করে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ স্যার। তবে আর একটু কথা আছে।'

ডাঃ গুপ্ত প্রশ্নার্ত চোখ তুলে তাকালেন।

'নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর কোনও খারাপ সম্পর্ক আবিষ্কার করে বাণীব্রত নীলাকে সন্দেহ করতে শুরু করে কি না—সে বিষয়ে কিছু জানা যাচ্ছে না। নীলাকে সন্দেহ করার অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।'

'How can you say that? Was he suffering from some psychoses?'

'যদি তাই হয়—কিংবা আরও জটিল কোনও কারণ থাকে তা হলে উত্তেজিত অবস্থায় নীলাকে হত্যা করবার ইচ্ছে হওয়া বাণীব্রতর পক্ষে অসম্ভব নয়।'

'অবশ্যই। আমি ভাবছিলুম প্রণব, নীলার ওপর সন্দেহ জাগার কারণ ডাক্তার চক্রবর্তী। নীলা নিশ্চয় পুলিশকে সেরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক।'

BanglaBook.org

'সেটাই স্বাভাবিক হত, স্যার। কিন্তু আমি দেখছি এক্ষেত্রে সেটা নয়। তাই ব্যাপারটা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আজকের ডাকে নীলার স্টেটমেন্ট পুলিশ অফিস থেকে এসেছে।'

'তাই নাকি? ওরা তা হলে আমাদের—' ডাঃ গুপ্ত খুশি হলেন।

'হ্যাঁ, আমাদের প্রোপোজালেই রাজি হয়েছে। নীলা, বিভূতিবাবু, ডাক্তার চক্রবর্তীর একটা চাকর সকলেরই স্টেটমেন্ট এবং আজ পর্যন্ত পুলিশ-এনকোয়ারির ফলে যতটা ইনভেসটিগেশান সম্ভব হয়েছে তার পুরো রিপোর্টও পুলিশ অফিস থেকে এসেছে।'

ডাঃ গুপ্ত আরও খুশি হলেন।

'তাহলে প্রণব, পুলিশ আজকাল আমাদের মূর্খ ভাবে না। বাণীব্রতকে আমরা এখানে রাখতে পারছি।'

'হ্যাঁ, স্যার, পারছি। অবশ্য যতদিন না বাণীব্রতকে সুস্থ করতে পারি। সুস্থ করতে না পারলে তাকে পুলিশের হাতে আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দিতে হবে। পুলিশ থেকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সিনিয়ার লোককে ওরা এখানে পাঠাচ্ছে।'

'Oh, they are quite upto the mark this time! যাক—তুমি যেন কী বলছিলে?'

ডাঃ গুপ্ত টেবিলে রাখা সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

প্রণব বললে, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র। নীলাকে কেন যে বাণীব্রত সন্দেহ করত তা নীলা বলেনি।'

'আশ্চর্য!'

ডাঃ গুপ্ত উগ্র কৌতূহল বোধ করলেন।

'না। পুলিশ এ সম্পর্কে তাকে কয়েকবারই প্রশ্ন করেছে—প্রতিবারেই সে বলেছে—বাণীব্রত কেন তাকে সন্দেহ করত, নীলা জানে না। একবার সে এমন কথাও বলেছে যে, ডাঃ চক্রবর্তীর সম্পর্ক নিয়ে তাকে সন্দেহ করার মতন কোনও কারণ বাণীব্রতর ঘটেনি বলেই নীলার বিশ্বাস। নীলার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর আলাপ থাকলেও উভয়ের অন্তরঙ্গ হওয়ার কোনও কারণ ছিল না।'

সুদক্ষিণা এতক্ষণ অবাক হয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল। আর পরম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল বাণীব্রতর আগমনের। তবু কে জানে কেন—প্রণবের কথাবার্তার মধ্যে সুদক্ষিণা কী যেন আবিষ্কার করে মনে-মনে খুশি হচ্ছিল।

'আমার মনে হয়,' প্রণব বললে, 'হয়-নীলা তার সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর অন্তরঙ্গ হওয়ার ইতিহাস গোপন রাখতে চায়; না হয়—সে গোপন রাখতে চায় বাণীব্রত তাকে প্রকৃতই কেন সন্দেহ করত সে কথা।'

'তোমার এ ধারণার যুক্তি?'

'আছে স্যার, ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে নীলার ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস পুলিশের কাছে প্রকাশ করা তার পক্ষে শোভন নয়। তাতে নিজের অমর্যাদা। বাণীব্রতর বাগদত্তা হয়েও ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশি মেলামেশা আর একমাত্র সেই কারণে বাণীব্রতর মনে একটা সন্দেহের জন্ম—এটা প্রকাশ হলে যেন নীলার গৌরবহানি তো হয়ই উপরন্তু বুঝি বাণীব্রতর অপরাধের গুরুত্ব কমে যায়। নয় কি?'

'Yes, it is so!'

'আমার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের যুক্তি আরও সরল।'

'বুঝলাম; তুমি বলতে চাও বাণীব্রত প্রকৃতই যে কারণে নীলাকে সন্দেহ করত তা প্রকাশ করলে নীলারই ক্ষতি। এজন্যেই সে আসল কারণ বলতে চায় না।'

প্রণব ঘাড় নাড়লে।

এমনসময় ঘরের পরদা সরিয়ে মিসেস নাগ মুখ বাড়ালে। তার স্বাভাবিক মিষ্টি গলায় জানালে,

BanglaBook.org

'আসব, স্যার?'

প্রণব ইঙ্গিতে মিসেস নাগকে আসতে অনুমতি দিল।

ধীরে-ধীরে পরদা সরিয়ে মিসেস নাগ বাণীব্রতকে নিয়ে ঘরের মাঝামাঝি এগিয়ে এল। নিমেষে ঘুরে তাকাল সুদক্ষিণা। এক মুহূর্ত। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা আর্তনাদ তার গলার মাঝপথে এসে থেমে গেল। বিস্ফারিত ওষ্ঠের মাঝে সেই আর্তধ্বনি চাপবার আশায় একটা হাত এসে থমকে গেল। ভীত, বিহ্বল সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে প্রণব হাসল। ডাক্তার গুপ্তও প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। সুদক্ষিণা বুঝি এতটা ভাবেনি। এই কি বাণীব্রত? এ তো একটা আতঙ্কের মূর্তি। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, বিশৃঙ্খল। মুখময় অযত্নবর্ধিত দাড়ির বাহুল্য। পরনে একটা পা জামা আর হাফ-শার্ট। শার্টের একটা হাত ছিঁড়ে কাপড়টা ঝুলে রয়েছে। বাণীব্রত আরও রোগা হয়ে পড়েছে। দেহের লালিত্য, সুষমা সবই অপহৃত; নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার মুখের স্নিগ্ধ সরল বিন্যাস, চোখের মধুর জ্যোতি, স্বপ্নালু দৃষ্টি, তার বদলে কেমন একটা ঘোলাটে আভায় জ্বলজ্বল করছে বাণীব্রতর চোখ, ঠোঁট দুটো হাওয়া-লাগা-পাতার মতো কেঁপে চলছে ক্ষণে-ক্ষণে। সে মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সুদক্ষিণা মুখ ফিরিয়ে নিল। তার বুকের মধ্যে একরাশ শোকের ঢেউ উত্তাল হয়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। গলার কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল ব্যথার গোমুখী ধারা। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণব না থাকলে সুদক্ষিণা তার শোকের উলঙ্গ প্রকাশকে বাধা দিতে পারত না —হয়তো চাইতও না। কিন্তু স্থান-কাল ভেদে অতিকষ্টে সুদক্ষিণা নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। অবদমিত হল তার ক্ষোভের নগ্ন, নিষ্ঠুর প্রকাশ। সুদক্ষিণা নতমুখে রুদ্ধ-ওষ্ঠ হয়ে বসে থাকল।

প্রণব ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে বাণীব্রতর সামনে দাঁড়াল। মৃদু হেসে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কেমন আছেন—মনোজবাবু?'

বাণীব্রত প্রণবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে-আস্তে বললে, 'ভালো।' তারপর হঠাৎ মিসেস নাগের দিকে তাকিয়ে দু'পা সরে গেল বাণীব্রত।

প্রণব মিসেস নাগের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি যান, পরে ডাকব।'

প্রণব বাণীব্রতর শার্টের ছেঁড়া অংশটায় হাত দিয়ে বললে, 'নতুন জামাটা ছিঁড়লেন কী করে?'

বাণীব্রত ঘরের চার পাশ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল। এই ঘরে অনেকবার সে এসেছে। আর প্রতিবারই এমনই ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। ডাঃ গুপ্ত চেয়ার ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে এসে বাণীব্রতর সামনে দাঁড়ালেন। হাত রাখলেন বাণীব্রতর গায়ে। বাণীব্রত তাঁর দিকে তাকাল। ডাঃ গুপ্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। একটু পরে হেসে বললেন, 'বসুন।'

বাণীব্রত নিরুত্তরে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

ডাক্তার গুপ্ত সহজ ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'সিগারেট!'

বাণীব্রত মাথা নাড়লে।

প্রণব এগিয়ে এসে বাণীব্রতকে সিগারেট দিল, পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালাল, এগিয়ে ধরল ওর মুখের সামনে। বাণীব্রতর সিগারেট হাতেই আটকে থাকল। লাইটারের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল বাণীব্রত। তার দৃষ্টি লাইটারের অগ্নিশিখাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তীক্ষ্ণতর হতে লাগল। ডাক্তার গুপ্ত আর প্রণব দুজনেই লক্ষ করল বাণীব্রতের সেই ক্রমবর্ধিত উত্তেজনা। তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে প্রণব হাত সরিয়ে নিল।

একটু পরে বাণীব্রতর সদ্যোত্থিত উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। ডাক্তার গুপ্ত তার সিগারেট জ্বালিয়ে দিলেন নিজের জ্বলন্ত সিগারেটের অংশটুকু দিয়ে। সহজ সুরে কথা শুরু করলেন।

'আপনার জন্যে আমরা একটা কেবিনের ব্যবস্থা করেছি। বাগানের দিকে যে কেবিনগুলো আছে তারই একটায়। আজ বিকেল থেকে আপনি সেখানে থাকবেন। Is it not good?'

বাণীব্রত নীরবে মাথা নাড়লে।

BanglaBook.org

ডাক্তার গুপ্ত একটু পরে আবার বললেন, 'দাড়ি কামাননি কেন?'

'ভালো লাগে না—'

ডাক্তার গুপ্ত হাসলেন, 'সকলের ভালো লাগে, আপনার লাগবে না কেন?'

'লাগে না!' বাণীব্রত একটু জোরে আগের মতো ছোট করে উত্তর দিল।

ডাক্তার গুপ্ত একবার ভালো করে বাণীব্রতকে লক্ষ করে হঠাৎ বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিলেন।

'একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?' ডাঃ গুপ্ত বললেন।

বাণীব্রতর মধ্যে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। শুধু বললে, 'কে?'

'একটি মহিলা। আপনার বিশেষ পরিচিত।' ডাক্তার গুপ্ত প্রণবকে ইঙ্গিত করলেন। প্রণব সুদক্ষিণাকে কাছে ডাকল।

ধীর পায়ে সুদক্ষিণা বাণীব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। ডাঃ গুপ্ত লক্ষ করতে লাগলেন। বাণীব্রত মুখ তুলে তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে শুধু তাকিয়েই থাকল। দৃষ্টিতে তার ধরা পড়ল না এতটুকু আনন্দ অথবা বিষাদ। অর্থহীন, ভাষাহীন, ধূসর সে দৃষ্টির পানে তাকিয়ে সুদক্ষিণার মুখটা আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল।

ডাঃ গুপ্ত সুদক্ষিণাকে বললেন, 'তুমি কথা বলো তো দেখি।'

সুদক্ষিণা কথা বলবে কী করে। তার ঠোঁটের আগায় সমস্ত কথা কেউ যেন লাগাম দিয়ে আটকে রেখেছে। বিশ্রী একটা অস্বস্তি সুদক্ষিণার সর্বাঙ্গ সংকুচিত করে তুলেছে। বেদনাহত বিবর্ণ মুখখানি তার বাণীব্রতর দৃষ্টি অনুসরণ করে বোবা হয়ে থাকল।

বাণীব্রত কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করল আপ্রাণ। তার ম্লান কপালে কতকগুলো কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠে আবার ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। মনে হল, বাণীব্রতর মধ্যে কীসের যেন একটা যন্ত্রণা জেগেছে।

প্রণবের তাগাদায় অবশেষে সুদক্ষিণা মুখ খুললে। অত্যন্ত ধীর সংযত, কোমল কণ্ঠে ডাকলে, 'বাণীবাবু!'

সুদক্ষিণার ডাকে বাণীব্রত ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। নির্মম নিষ্ঠুর অস্বীকারের ভাষা তার চোখে। অল্প একটু তাকিয়ে থেকে বাণীব্রত মুখ ফিরিয়ে নিল।

অবাক হওয়ার সময় পার হয়ে গেছে সুদক্ষিণার। সে জানে বাণী তাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু তবু হাল ছাড়লে চলবে না তার। একটু-একটু করে অনেক কষ্ট, পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায়ের ফলে এই স্মৃতি-হৃত মানুষটিকে আবার সুস্থ করে তুলতে হবে। প্রণব তাকে সব কথাই বুঝিয়ে বলেছে আর এও সত্য সুদক্ষিণার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে বাণীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে না। নিজেকে সামলে নিয়ে সুদক্ষিণা আরও একটু কাছে সরে এল।

'আমায় চিনতে পারছেন না?'

বাণী বিকৃত একটা মুখভঙ্গি করে নতমুখ হল।

সুদক্ষিণা এবার তার সংযম হারালে। বাণীব্রতব পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল আচমকা। বাণীর হাঁটুতে নাড়া দিল, ধরল তার হাত—তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'বাণীবাবু—বাণীবাবু, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি—আমি সুদক্ষিণা। সেই যে সেই দেওঘরে, বেড়াতে গিয়ে—'

মুহূর্তের মধ্যে বাণী সুদক্ষিণার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। সরাসরি সামনে এগিয়ে গিয়ে বুক-কেসের কাছে থামল। সেখান থেকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'সুদক্ষিণা? না। আপনাকে আমি চিনি না।'

'দেওঘরের কথা কিছুই কি মনে নেই আপনার?' প্রণব বাণীব্রতর ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে, 'সুদক্ষিণা, বিভূতিবাবু, আপনার সেই বউদি গায়ত্রীদেবী?'

BanglaBook.org

'না—না—না। কিছু আমার মনে নেই। আমি জানি না—জানি না।' বাণী ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার উত্তেজনার চিহ্ন।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু মনে যে আপনাকে করতেই হবে। আপনার অতীতই আপনার জীবন—'

'জীবন—A life!' বাণীব্রতর গলায় তিক্ততা ফুটে উঠল।

সুদক্ষিণা কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের জল নিয়েছে মুছে। ধীর পায়ে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে। এমনসময় প্রণব তার পাশে এগিয়ে কী যেন বললে মৃদুস্বরে। সমস্ত ব্যাপারটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলে বাণীব্রত। ওদের কথা শেষ হতে..সুদক্ষিণা আবার চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল—।

বাণীব্রত তাকে ডাকল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদক্ষিণা।

বাণীব্রত বললে—দু-পা এগিয়ে এসে, ক্ষুব্ধকণ্ঠে, 'দেখুন, বাস্তবিক আমি আপনাকে মনে করতে পারছি না। জানি না, কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? কী আপনাব উদ্দেশ্য?' বাণীব্রত একটু থেমে পরমুহূর্তে চাপা উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলে উঠল, 'সর্বক্ষণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, কানাকানি। আমি কিন্তু বাণীবাবু নয়। মনোজ—আমাব নাম মনোজ, মনে রাখবেন।'

'মনে রাখব।' সুদক্ষিণার গলা থেকে অর্ধস্ফুটভাবে শব্দটা প্রত্যুচ্চারিত হল।

বাণীব্রতর উত্তেজনা ডাঃ গুপ্ত আর প্রণবকে কিছুটা বিস্মিত করে তুলল। তবু প্রণব নিজেকে সংযত করে সহজকণ্ঠে বাণীব্রতকে বললে, 'আমাদের সম্পর্কে এরকম ভুল ধারণা করবেন না, বাণীব্রতবাবু। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাদের লাভ কী? আমরা আপনার কল্যাণকামী, বন্ধু।'

'বন্ধু?' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বাণীব্রতর মুখ বীভৎস হয়ে উঠল। কখন যেন বাণীব্রত পিছন হেঁটে বুককেসের কাছে ফিরে গেছে।

সুদক্ষিণা সম্ভবত বাণীব্রতর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে শান্ত করবার আশায়। কিন্তু তার এই এগিয়ে আসার চেষ্টায় বাণীব্রত আরও উত্তেজিত ও শঙ্কিত হল। ঘুরে দাঁড়াতেই বুককেসের গায় হাত ঠেকল তার। মুহূর্তে কেস থেকে একটার পর একটা বই টেনে নিয়ে ছুঁড়তে লাগল সুদক্ষিণাকে লক্ষ করে। তার ক্রুদ্ধ চিৎকার সেই ঘরের বাতাসকে খান-খান করতে লাগল, 'বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি। শয়তানি আমার সঙ্গে? মেরে ফেলব। খুন করে ফেলব। বন্ধু? ঘটা করে বন্ধুত্ব দেখাতে এসেছেন। Get out—get out!'

নিক্ষিপ্ত বইগুলো সুদক্ষিণার আশেপাশে পড়ল। একটা এসে ঠিকরে লাগল মুখে। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। সুদক্ষিণা মুখ নিচু করে হাত আড়াল দিলে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণব পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একে অপরেব চোখের ভাষা পড়ে নিলেন। প্রণব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুদক্ষিণাকে আড়াল করে দাঁড়াল। ডাঃ গুপ্ত কলিং বেল টিপলেন।

বইগুলো ছুঁড়ে বাণীব্রত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট অনুভব করা যায়—সর্বাঙ্গে তার কেমন যেন একটা ক্লান্তি ও বেদনা নেমে এসেছে।

মিসেস নাগ পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাঃ গুপ্ত ইঙ্গিতে সুদক্ষিণাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁকে নিয়ে যাও।'

সুদক্ষিণাকে ডাকল মিসেস নাগ, 'আসুন।'

সুদক্ষিণা ঠোঁটে রুমাল চেপে প্রথমে তাকাল বাণীব্রতর দিকে—তারপর প্রণবের।

প্রণব মৃদুস্বরে বললে, 'অত্যন্ত দুঃখিত, সুদক্ষিণা দেবী।'

সুদক্ষিণা একটা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করল, 'ওঁর কোনও—।'

BanglaBook.org

সুদক্ষিণার কথা শেষ না হতেই বলল প্রণব, 'ভয় নেই। আচ্ছা, আসুন!'

মিসেস নাগ সুদক্ষিণাকে নিয়ে চলে গেল। বাণীব্রত ওদের যাওয়ার পথে দৃষ্টি মেলে ম্লানভাবে হাসল। বিড়-বিড় করে কী যেন বললে আপন মনে। কেউ শুনতে পেল না।

রাত বেশি হয়নি। সাধারণত অন্যান্য দিন এ-সময় প্রণব বেড়াতে বেরোয়। অজস্র হাওয়া, জংলা মাঠ; তারা-জ্বলা আদিগন্ত আকাশ; দেবদারু, শাল, আমলকী গাছের বুনো গন্ধ তাব সারাদিনেব ক্লান্তি মুছে নেয়। মনের খেয়ালে অনেকটা ঘুরে বাড়ি ফেরে প্রণব। অন্যান্যদিনের মতো আজ আর সে বেড়াতে বেরোল না। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে অল্প খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলে ঝুঁকে বসল।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বাড়তে থাকে।

সুদক্ষিণা বারদুয়েক ঘরে ঢুকে আবার নিঃশব্দে ফিরে গেল। প্রণবের অখণ্ড মনোযোগে বাধা দিতে তার ইচ্ছে হয়নি। মন না মানতে চাইলেও কঠিন হয়েছে সুদক্ষিণা। প্রণবের দিদির সঙ্গে পাঁচ কথায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে।

ঘড়িতে ন'টা বেজে যাওয়ার পর সুদক্ষিণা তৃতীয়বারের মতো প্রণবের ঘরে এসে ঢুকল। টেবিলের সামনে সেই একই ভঙ্গিতে প্রণব বসে। হাতে তখন তার খোলা ফাউন্টেন পেন। লেখার মাঝে বুঝি অল্পক্ষণের জন্যে থেমেছে। ভাবছে কিছু গভীরভাবে।

সুদক্ষিণা ভাবছিল, ডাকবে কী ডাকবে না।

এমনসময় কুন্তলাদি এলেন। হাতে তাঁর ওভালটিনের পেয়ালা।

সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে কুন্তলাদি একটু হাসলেন।

'তুমি বুঝি এসে দাঁড়িয়েই রয়েছ!' কুন্তলাদি প্রণবের সামনে এসে টেবিলের ওপর পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন।

চোখ তুলে তাকাল প্রণব। দিদিকে দেখেই তার মনটা খুশিতে টলমল করে উঠল।

'এই যে, দিদি! তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। উঃ, মাথাটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু চা খাওয়াবে?'

কুন্তলাদি হাসলেন। মধুর সেই হাসি। প্রণবের হাত থেকে কলম নিয়ে এককোণে সরিয়ে রাখলেন।

'আমি সে আগেই বুঝেছি! মাথাধরার ছুতো করলেও এখন আর চা খায় না। ওভালটিন করে এনেছি।'

প্রণবের চোখ পড়ল পেয়ালার ওপর। তিলমাত্র বিলম্ব না করে প্রণব ওভালটিনের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গভীর তৃপ্তির একটা ছোট টানা শব্দ উচ্চারণ করল।

'বাস্তবিক, আমি মাঝে-মাঝে ভাবি দিদি, তুমি না থাকলে আমার চলবে কী করে?'

'বিয়ে করো, বউ এসে চালাবে!' কুন্তলাদি হেসে উত্তর দেন।

'বউ কি চালায় দিদি, বউকেই চালাতে হয়! তা ছাড়া সে এক মহাজ্জোতি ব্যাপার। ওসবে দরকার কী? তার চেয়ে এই বেশ আছি!'

প্রণবের গলার স্বরে পরিপূর্ণ শান্তি ফুটে উঠল।

'আমাকে কি চিরটাকাল তুই আটকে রাখতে চাস? কোন ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলাম। এখন তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস—আমারও তো বয়স কম হল না। এবার একটু পরজন্মের কাজকর্ম

BanglaBook.org

করতে দে।' কুন্তলাদি প্রণবের চুলে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন।

'পরজন্ম?' প্রণব উৎকট একটা ভঙ্গি করলে, 'তা ওটা এজন্মে করলে হিসেবপত্রের গোলমাল হবে। তার চেয়ে পরজন্মেই করো।'

কথার শেষে প্রণব এমনভাবে হেসে উঠল যে কুন্তলাদিও না হেসে পারলেন না। সুদক্ষিণাও হেসে উঠল।

ভাই-বোনের ছোট্ট সংসার। ওদের পরস্পরের প্রতি গভীর প্রীতি, স্নেহ ও মায়া এ বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সুদক্ষিণা যত দেখছে—মনটা ততই যেন স্নিগ্ধ-শান্তিতে ভরে উঠছে।

সুদক্ষিণার অবস্থিতি প্রণব জানত না। কুন্তলাদিও ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখন যেন ভুলে গিয়েছিলেন তার কথা। হঠাৎ সুদক্ষিণার হাসির শব্দে খেয়াল হল কুন্তলাদির।

প্রণবও মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

চোখের ইঙ্গিতে সুদক্ষিণাকে দেখিয়ে কুন্তলাদি প্রণবকে বললেন, 'ওকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? কবারই তো এ ঘরে এসে ঘুরে গেল।'

'তাই তো বড় অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি আমায় ডাকলেই পারতেন।' প্রণব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'না—অন্যায় আর কী? আপনি কাজ করছিলেন—' সুদক্ষিণা মৃদু হেসে বললে।

'ক'টা বেজেছে?'

'সাড়ে ন'টা।' কুন্তলাদি উত্তর দিলেন।

'তা হলে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেই ভালো।' কুন্তলাদি বললেন, 'তোরা আয়। আমি খাবার দিতে যাই।'

'কুন্তলাদি চলে যেতে সুদক্ষিণা বললে, 'একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়। অসংকোচে বলুন।'

'আপনার এখানে যেরকম যত্ন ও স্নেহের মধ্যে আছি তেমনটা আমার ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে, প্রণববাবু। কিন্তু মাঝে-মাঝে যেন কেমন লাগে! আমায় আর কতদিন আটকে রাখবেন?'

'কেমন-কেমন লাগবার কারণ?' প্রণব সুদক্ষিণার কাছে এসে দাঁড়াল।

চট করে সে কথার কোনও উত্তর দিল না সুদক্ষিণা। একটু পরে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম কারণটা আপনি বুঝতে পারবেন। বাণীবাবু আমার আত্মীয় নন। অথচ তাঁর জন্যে এভাবে এখানে এসে বসে থাকা যেন কেমন বিসদৃশ। কুন্তলাদি কী ভাবেন কে জানে? ওদিকে স্কুলের সেক্রেটারি ভদ্রলোক লোক সুবিধের নন। এভাবে চলে আসায় তিনি যে কী সব যুতসই গল্প গড়ে প্রচার করছেন তাও বুঝছি না।'

সুদক্ষিণার কথায় প্রণব যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। খানিকটা ভেবে নিয়ে জবাব দিলে, 'দিদির তরফ থেকে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আপনার স্কুলের ব্যাপার! আপনার মতন আমিও যে দোটানায় পড়েছি। আপনাকে রাখা মুশকিল অথচ না রাখলেও চলে না। দেখি, কী করতে পারি। আরও দিন কয়েক অন্তত থাকুন। তারপর ভেবে-চিন্তে, যা হোক একটা কিছু করা যাবে।'

এমনসময় দিদির ডাক শুনতে পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে বসল ওরা। ঠান্ডা হাওয়া আসছিল খোলা জানলা দিয়ে। চোখে পড়ে তারা-জ্বলা একটুকরো ধবল আকাশ। কাচের শার্শিটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রণব চেয়ারে বসল। সিগারেট ধরিয়ে টেবিল থেকে খাতাখানা তুলে নিল। সুদক্ষিণা দেখল, এই সেই খাতা এতক্ষণ প্রণব

যার ওপর ঝুঁকে একমনে কী যেন লিখছিল। প্রণব খাতার পাতা উলটে সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এটা আমার ব্যক্তিগত পুঁথি। বাণীবাবু প্রথম যেদিন আমার হাতে এসে পড়লেন সেই দিনটি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব, মতামত, নানা তথ্য, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে চলেছি। এর আগে আপনাকে আমার এই পুঁথিটি পড়ে শোনাইনি। তার অনেক কারণ ছিল। আজ সকালে পুলিশ অফিস থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর আমার আগের ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হয়েছে। এই পুঁথি থেকে কিছু-কিছু অংশ আপনাকে পড়ে শোনালেই সব বুঝতে পারবেন। আগাগোড়া পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সেসব নীরস ডাক্তারি ব্যাপার আপনার পক্ষে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়বে।'

সুদক্ষিণা শাড়ির আঁচল গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিল। নিরুত্তরে বসে থাকল প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোন রহস্যের ইঙ্গিত প্রণবের কথায়, কীসের সিদ্ধান্ত তার চিন্তার উপজীব্য—কিছুই বুঝতে পারলে না সে। প্রণব খাতার পাতা উলটে পড়া শুরু করল ঃ

২১শে ডিসেম্বর

অদ্ভুত একটা কেস আজ আমার হাতে এসেছে। সকালে হাসপাতালের কাজ সেরে গিয়েছিলাম স্টেশনে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের আসার কথা ছিল। ভদ্রলোক কাছাকাছি একটি কোলিয়ারির ডাক্তার। তাঁর নাম শ্যামল ঘোষ। শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমার বহুকালের আলাপ না হলেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কর্মসূত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।...শ্যামলবাবু মাঝে-মাঝে আমার কাছে বেড়াতে আসেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি বেড়াতেই আসছেন। জানতুম না, এবার তিনি এক খোরাক জুগিয়ে আনছেন আমার জন্যে।

...শ্যামলবাবুর সঙ্গে আর একটি লোককে নামতে দেখলুম ট্রেন থেকে। ইতিপূর্বে লোকটিকে আমি কখনও দেখিনি। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল, লোকটি ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। তার আকৃতি, প্রকৃতি ও বেশভূষায় এ-রহস্য ধরা পড়ছিল।

..শ্যামলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনোজ রায় ওর নাম।

...মনোজবাবুকে নিয়ে বাসায় এলাম। ডাঃ ঘোষ বা শ্যামলবাবু ইতিমধ্যে আমায় গোপনে বললেন—মনোজবাবুকে ভালো করে লক্ষ করতে।

দুপুরে শ্যামলবাবু আমায় আড়ালে ডেকে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে বললেন। তাঁর মুখে যা শুনলাম তা এইরকম—।

...শ্যামলবাবুর কাছে একদিন হঠাৎ একটি লোক এসে হাজির হয়। নাম বলে মনোজ। লোকটি একটা চাকরি খুঁজছিল। শ্যামলবাবু তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝেন সে শিক্ষিত। মনোজ বলে, তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এর বেশি সে কিছু বলেনি। বলতেও পারেনি।

মনোজের কথাবার্তায় কেমন যেন কৌতূহলী ও আকৃষ্ট হলেন শ্যামলবাবু। বিপদগ্রস্ত এই লোকটিকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে মন তাঁর চাইল না। তিনি মনোজকে তাঁর ডিসপেনসারিতে ক্লার্কের কাজ জুটিয়ে দিলেন। আর নিজের বাড়িতেই থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

...কিছুদিন কেটে গেল, শ্যামলবাবু লক্ষ করলেন—মনোজ মনোবিকার রোগে ভুগছে। তার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, সবের উৎকট একটা অসামঞ্জস্য থেকে-থেকে দেখা দেয়। আবার শান্ত হয়ে আসে। মাঝে-মাঝে একদিন-দুদিন এমন কী তিন-চারদিন পর্যন্ত মনোজকে বেশ সুস্থ থাকতে দেখা গেছে। আবার কখনও-কখনও তার অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে অত্যন্ত প্রকটভাবে। শ্যামলবাবু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে মনোজের এই ভাবান্তর

BanglaBook.org

লক্ষ করতেন। এবং স্থির করেছিলেন তাকে আমাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন। তিনিও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী।

যাই হোক, সম্প্রতি একটা ঘটনার পর মনোজকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান। ঘটনাটা ঘটে একদিন বিকেলে। শ্যামলবাবুর ডিসপেনসারির কমপাউন্ডার একদিন গুরুতরভাবে আহত হয়ে এসে তাঁকে জানায়—মনোজ তাকে অফিসের মধ্যে আক্রমণ করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘটনাটা গুরুতর। অনুসন্ধান করে শ্যামলবাবু জানতে পারলেন—কমপাউন্ডারের সঙ্গে মনোজের যে ব্যাপার নিয়ে বচসা হয় এবং যার ফলে এই কেলেঙ্কারি, তার পিছনে আছে এক অদ্ভুত ঘটনা। কোলিয়ারির হাসপাতালের ক্লার্ক হিসেবে মনোজের নানা কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ ছিল মাসের শেষে ওষুধ-পত্রের স্টক মিলিয়ে হিসেব পাঠানো। সেই সঙ্গে নতুন যে-যে ওষুধ ইত্যাদি আনার দরকার—তার একটা লিস্ট তৈরি করে পাঠানো। এইরকম একটা লিস্ট পাঠাবার তারিখ হয়েছিল। এবং কদিন ধরে শ্যামলবাবু কমপাউন্ডারকে এর জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। কমপাউন্ডার তাগাদা দিচ্ছিল মনোজকে। ঘটনার দিন কমপাউন্ডার মনোজের কাছ থেকে লিস্ট নিয়ে দেখে তার মধ্যে প্রতি লাইনে কাটাকাটি। লিস্টটা নিয়ে মনোজকে দেখিয়ে চেঁচামেচি করতেই মনোজ হাতের কাছে টেবিলের ওপর যে রুল পড়েছিল তাই নিয়ে কমপাউন্ডারকে আক্রমণ করে। কমপাউন্ডার আহত হয়। লিস্টটা শ্যামলবাবুর হাতে আসে। তিনি লিস্টটা দেখে অবাক হয়ে যান। প্রতিলাইনে কাটাকাটি করে সে এমন এক নোংরা 'রিটার্ন-লিস্ট' তৈরি হয়েছে যে, যে-কোনও লোকই তা দেখলে চটে যাবে। তার হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর। কোথাও বানান ভুলও নেই। তবু কেন এমন হল? একটু লক্ষ করতেই শ্যামলবাবুর চোখে একটা আশ্চর্য জিনিস ধরা পড়ল। মনোজ কিছুতেই একেবারে অর্থাৎ প্রথম চেষ্টায় ইংরিজি অক্ষর '1' (এক) লিখতে পারে না। যতবার সে '1' লিখতে গেছে প্রতিবারই প্রথমে সে 'A' অক্ষরটি লিখেছে। এবং পরে 'A' অক্ষর কেটে তারপর '1' লিখেছে। আগাগোড়া সমস্ত লিস্টেই এই কাণ্ড। এছাড়া অন্য কোনও ভুল নেই কোথাও। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্যামলবাবুকে ভীষণ কৌতূহলী করে তোলে। পরের দিনই তিনি এক সুযোগে মনোজকে পরীক্ষা করে দেখলেন—তাঁর সন্দেহই ঠিক। অফিসের পুরোনো কাগজপত্র পরীক্ষা করে শ্যামলবাবুর সন্দেহ আরও দৃঢ় হল।

...মনোজের মনোবিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়ে শ্যামলবাবু স্থির করেন তাকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়াই এখন একমাত্র কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ শ্যামলবাবু এসেছিলেন আমার কাছে। আমি সাগ্রহে মনোজকে হাসপাতালে ভরতি করে নিতে রাজি হয়েছি।

২২শে ডিসেম্বর

...শ্যামলবাবু কাল রাত্রেই ফিরে গেছেন। মনোজকে আমি হাসপাতালে ভরতি করেছি। ডাক্তার গুপ্তকে সমস্ত কথা বললাম। তিনিও মনোজ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছেন।

২৪শে ডিসেম্বর

...আজ আমরা—ডাক্তার গুপ্ত ও আমি মনোজকে প্রায় দু-ঘণ্টা যাবৎ নানাভাবে পরীক্ষা করেছি। ডাক্তার গুপ্ত বলেন—এটা Melancholia-র কেস। মনোজের স্মৃতিভ্রংশে সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হলেও আমার ব্যক্তিগত অভিমত It's a combine case! Emotional blocking বা স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে Manic Depressive Psychoses.

BanglaBook.org

২৯শে ডিসেম্বর

...শ্যামলবাবু চিঠি লিখেছেন। মনোজের ফেলে আসা জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ময়লা কোট, খান দুয়েক ইংরিজি মাসিক পত্রিকা, একটা বহু-ব্যবহৃত ট্রাউজার—এ ছাড়া, আর কিছুই নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার মধ্যে থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি—যাতে মনোজের পূর্ব-পরিচয় জানতে সাহায্য হতে পারে। মনোজের চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত রোগীর কোনও উন্নতি দেখা যায়নি।

১লা জানুয়ারি

...আজ আর একটা ঘটনা ঘটল। হাসপাতালের নাপিত মনোজের দাড়ি কামিয়ে দিতে গিয়েছিল—মনোজ তার হাত থেকে 'রেজার' কেড়ে নিয়ে তাড়া করে। ঘটনাস্থলে আমি হঠাৎ এসে পড়ি। অনেক কষ্টে মনোজের এই অদ্ভুত উত্তেজনা নিবৃত্ত করেছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—মনোজ কিছুতেই দাড়ি কামাতে চায় না। এ বিষয় যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে আমার ধারণা হয়েছে মনোজের অবচেতন মনে একটা উৎকট ভয় বিরাজ করছে। সেই ভয়ের হাত থেকে আত্মগোপন করতে মনোজ সর্বদাই উৎসুক। এক্ষেত্রে দাড়ি না-কামানোর মধ্যে এই আত্মগোপনের ইচ্ছেই বর্তমান। অবশ্য এটি একটি হাস্যকর ধারণা!

স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে মনোজের কেসটি দেখাশোনা করার ভার ডাঃ গুপ্ত আমায় দিয়েছেন। এটা আমার সৌভাগ্য। আমার চিকিৎসক জীবনে এ ধরনের জটিল মনোবিকারগ্রস্ত অন্য কোনও রুগির সাক্ষাৎ পাইনি।

২রা জানুয়ারি

...আজ মনোজকে সোডিয়াম অ্যামিটল ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে।

৭ই জানুয়ারি

...রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মনোজের দাড়ি কামিয়ে দিতে পেরেছি। He looks pretty well!

৮ই জানুয়ারি

...মনোজকে আজ খুব শান্ত মনে হচ্ছে। বিকেলে বহুক্ষণ যাবৎ সে ঘুমিয়েছে। No improvement.

১০ই জানুয়ারি

শ্যামলবাবু চিঠি দিয়েছেন। মনোজ যে-ঘরে থাকত—সেই ঘরের দেওয়াল-আলমারির মধ্যে একটা কাগজে মোড়া তালগোল পাকানো একটা ছেঁড়া শার্ট পাওয়া গেছে। আর সেই শার্টের পকেটে একটুকরো কাগজ। শ্যামলবাবু কাগজটা পাঠিয়েছেন—তবে এই চিরকুটটির ওপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করতে তাঁর বাধে।

আমি কাগজের টুকরোটুকু ভালো করে দেখলাম। একটি গানের স্বরলিপি, রুলটানা কাগজে হাতে লেখা। কোনও কারণে কাগজটির অর্ধেকেরও বেশি ছিঁড়ে গেছে। নীচের দিকের খানিকটা মাত্র অংশ এখনও অক্ষত। তাতে গানের শেষ দুই কলি স্বরলিপি সমেত লেখা; এবং স্বরলিপির শেষে, নীচে—বাঁদিকে জনৈক ভদ্রমহিলার নাম ও ঠিকানা। সুদক্ষিণা

BanglaBook.org

চট্টোপাধ্যায়, মনোহরপুর গার্লস স্কুল—মনোহরপুর।...কে এই সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়? গানের স্বরলিপি, সুদক্ষিণা ও মনোজের শার্টের পকেটে এই চিরকুটটুকু থাকা—এই তিনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? কে জানে? চিরকুটটা সযত্নে রেখে দিয়েছি।

১১ই জানুয়ারি

...মনোজকে পরীক্ষা করলাম যদি সুদক্ষিণার নাম শুনে ও চিনতে পারে। কিছুই মনে করতে পারল না সে। তবে কাগজের টুকরো টুকু দেখার পর মনোজ যেন কী মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল—বুঝতে পারলাম।

১৬ই জানুয়ারি

...সত্যিই মনোজ গান শুনতে খুব ভালোবাসে। ক'দিন লক্ষ করে দেখলাম প্রায় প্রতিদিন বিকেলে সে নিরিবিলিতে বাগানের বেঞ্চি দখল করে বসে থাকে। হাসপাতালের রেডিও যতক্ষণ না বন্ধ হয় ততক্ষণ একমনে গান শোনে একলাটি বসে। এই সময়টা মনোজকে ভালো করে লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় তার অপ্রকৃতিস্থ মন সুরের স্পর্শে যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ, শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। সর্বক্ষণ তাকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় গানের মাঝেই শুধু সে-যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরাম।

১৯শে জানুয়ারি

...আজ আমি যখন মনোজের পাশে গিয়ে বসলাম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। সূর্যাস্তের কাল। আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে গোধূলির আলো। দূরে পাহাড়ের নীচে কারা যেন শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা আগুনের আভায়। মনোজের পাশে গিয়ে আমি চুপচাপ বসলাম। বাগানের মধ্যেই আমাদের হাসপাতালের ছোট্ট ক্লাব ঘর। রুগিরা কেউ এখানে এসে বসে গান শোনে, কেউ বই দেখে, একটু আধটু তাস খেলে।..আজ 'ক্লাব-ঘর' একেবারে খালি পড়ে ছিল। বেশ একটু শীতের হাওয়া দিচ্ছিল আজ। মনোজকে বললাম, 'চলুন না, ভেতরে গিয়ে বসি।'...আমার মুখের দিকে ও শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললে, 'বরষার ঝরা চম্পা—যুথিকাও অশ্রুমতী চামেলি বকুল বনে বেদনার সরস্বতী...কী অপূর্ব কথা, না?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রতিটি শব্দ এর সুন্দর!' মনোজ খুশি হয়ে উঠল। আমার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করলে, 'বলুন তো, এ গান কার লেখা?'...আমি বললুম, 'আমি ঠিক জানি না।'... আমার কথায় ভারি অবাক হল মনোজ। যেন আমার না-জানাটা মারাত্মক কোনও অপরাধ আর সেই অপরাধ ও আমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এমনভাবে বললে—'জানেন না? আশ্চর্য!'..যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে বললুম, 'বাস্তবিক আমার জানা উচিত ছিল। আচ্ছা মনোজবাবু, আপনি বুঝি গান খুব ভালোবাসেন?'

মনোজ খুব শান্তকণ্ঠে ও শ্রদ্ধিতচিত্তে বললে, 'ভালোবাসি—শুধু ভালোবাসি বললে যেন অনেক কিছুই ফাঁক থেকে যায়।'...আমি মনে-মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলাম সুযোগের সদ্ব্যবহারের আশায়। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে মনোজের হাত ধরে টানলাম, 'চলুন একটু বেড়াই।'...মনোজ উঠে দাঁড়াল।...বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে আবার আমি মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা মনোজবাবু, গানটা যে কার লেখা আপনি জানলেন কী করে? আগে নিশ্চয় শুনেছেন?'...জের তখনও কাটেনি। ধীরে-ধীরে সে বললে, 'কী জানি—হয়তো শুনেছি—আমার মনে পড়ে না।' এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে কী করে বুঝলেন যে

BanglaBook.org

ওটা অমুকের গান?'...মনোজ ছেলেমানুষের মতন বললে, 'কেন রেডিওতে যে আগে থাকতেই বলে দেয়।'...তাইতো এ সহজ ব্যাপারটা আমিই বা ভুলে গিয়েছিলাম কী করে।

...আরও খানিকটা ঘুরে মনোজকে আবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমি একটা গান শুনেছিলাম একবার; তার কথাগুলোও বেশ মিষ্টি কিন্তু কে লিখেছে জানি না।'...মনোজ আমার দিকে তাকাল। এই তো আমার সুযোগ, মনোজের পকেটে পাওয়া স্বরলিপির সেই দুটি কলি আমার মনে ছিল। বললাম, 'চৈতালি হাওয়া বেণুবনেরও আন্দোলিয়া শাখা, হাতের প্রদীপ নিভায়ে দিয়ে রাখিয়া যাবে গো একা। বেশ, মিষ্টি কথাগুলো, না?'...মনোজ আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বললে, 'আমিও যেন এ গান কোথায় শুনেছি।' মনোজের কথায় আমার বুক নেচে উঠল। বললুম—মনোজের হাত জড়িয়ে উৎসাহিত হয়ে, 'শুনেছেন? কবে শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন?'...মনোজ আমার উৎসাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়লে।...'কিছু মনে নেই আপনার? একটুও মনে পড়ছে না?' আমি আবার বললুম।...মনোজ আগের মতোই মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে আবার মনোজকে প্রশ্ন করলুম, 'এ গানের সঙ্গে সুদক্ষিণা নামের একটি মেয়ের নাম জড়িত আছে। চেনেন আপনি তাকে?' মনোজ চোখ তুলে তাকাল, 'কী নাম?' 'সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়।' মনোজ হাসল—মৃদু শান্ত হাসি। বললে, 'বড় সুন্দর নাম তো।'...হ্যাঁ, নামটা সুন্দরই, কিন্তু আপনি তাকে চেনেন?'...'না চিনি না। কিছুই আমার মনে নেই।'

মনোজেব কথায় হতাশ হইনি আমি।

সুদক্ষিণাকে মনোজ মনে করতে না পারলেও গানের কলি দুটি তার অস্পষ্ট মনে আছে। সম্প্রতি এই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস সুদক্ষিণা, স্বরলিপি আর মনোজ—এই তিনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শীঘ্রি আমি শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজে যাব।

২১শে জানুয়ারি

...মনোজের অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যাবে আশা করেছিলুম। কোনও উন্নতিই হয়নি। ডাঃ গুপ্ত বলছেন ওকে ইনসুলিন শক (shock) দেওয়াই ভালো। আমারও তাই ইচ্ছে। আগামী হপ্তা থেকে শক দেওয়া শুরু করব।

২৩শে জানুয়ারি

...আজ চিঠি পেয়েছি। মনোহরপুর গার্লস স্কুলে শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রমহিলা সত্যি-সত্যি থাকেন। হাতে কতকগুলো জরুরি কাজ জমেছে, না হলে এ সপ্তাহে মনোহরপুর যেতাম।

৩০শে জানুয়ারি

সোডিয়াম অ্যামিটাল ইনজেকশান ও ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য নিয়ে মনোজের অবচেতন মনের লুকানো রহস্য জানার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে।

ইনজেকশানের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মনোজ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর কত রকমের কত চেষ্টাই না করেছি; আশ্চর্য, একটা কথাও সে বলে না, বলতে পারে না; খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়ে।

ডাঃ গুপ্ত বলছেন—রুগি দিনের পর দিন যে রকম মনমরা হয়ে পড়ছে তাতে

BanglaBook.org

ওকে শক (shock) দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মনোজ যে অবস্থায় থাকে তাকে আমরা depressed condition বলতে পারি। কখনও কদাচিৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাও খুব কম সময়ের জন্যে। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর মাত্র একবারই মনোজকে একটু বেশি উত্তেজিত হতে দেখেছি; আর সেটা—সেই প্রথম দাড়ি কামানোর বেলায়।

২৮শে জানুয়ারি

প্রায় দু-মাস হতে চলল মনোজ হাসপাতালে রয়েছে। আমরা তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তার মধ্যে একটা ভুল থেকে গেছে। তার ডান হাতের ব্যথাটার কথা বলছি। ওর হাতের রিস্ট বা মণিবন্ধে মাঝে-মাঝে যে তীব্র ব্যথা হয় তা সোমাটিক (somatic) নয়, সোমাটোসাইকিক (somatopsychic)। আমি হাতের এক্স-রে নিয়ে দেখেছি—কোনও আঙ্গিক ত্রুটি নেই। ব্যথাটা যে সোমাটোসাইকিক বা মানস-প্রসূত আঙ্গিক ব্যথা তার প্রমাণ পাই আব একটি উপসর্গ থেকে। অল্প ক'দিন যাবৎ মনোজের এই উপসর্গটি দেখছি। একে আমাদের মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বলে—'stereotyped action।'...নির্জন কোনও জায়গায় গিয়ে সে ডান হাতের কতকগুলো অদ্ভুত ভঙ্গি করে। ভালোভাবে নজর করে দেখলে মনে হবে—মনোজ যেন কিছু একটা হাতে করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতটা সোজা বাড়ানো। কিছুক্ষণ এভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার forefinger বা তর্জনী সে ভেতর দিকে নাড়তে থাকে—তারপর হঠাৎ একবার চমকে উঠে ধৃত বস্তুটি ফেলে দেয়। মাটিতে বসে একমনে কী যেন লক্ষ করতে থাকে।..খানিক পরে উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত মুখখানা তখন তার বিবর্ণ, শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত। ভীত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে সে ফিরে আসে নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়ে, সর্বাঙ্গ তখন ঘামে ভেসে যাচ্ছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কঠিন, নাড়ি দ্রুত। ঠিক এ ঘটনার পর মনোজ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠে হাতের ব্যথার কথা বলে।

এই নতুন উপসর্গ বা লক্ষণটি মনোজের আগে ছিল না। সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। আমার ধারণা এটা ইনজেকশান ও শকের পরোক্ষ ফল। তার মনের দ্বন্দ্ব মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও সে সম্বন্ধে একটু বুঝি সচেতন হয়েছে মনোজ।

১লা ফেব্রুয়ারি

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে মনোজকে কথা বলানোর চেষ্টা আজ সর্বপ্রথম সার্থক হল। মনোজ মাত্র তিন চারটি কথা বলেছে। অসংলগ্ন সেই কথাগুলোর মধ্যে থেকে কোনও অর্থ উদ্ধার করতে আমি পারিনি। তার কথাগুলো এই রকম : পড়ে গেল—একলা—সুটকেস—কে।

২রা ফেব্রুয়ারি

আজ একটু বেশি পরিমাণ সোডিয়াম আমিটল ইনজেকশান করেছিলাম। মনোজ মাত্র দুমিনিটের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

প্রথমে সে কথা বলেনি; বলতে পারেনি। প্রায় চার মিনিট শুধু ঠোঁট নেড়েছে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলুম, যদি সেই অল্প একটু ঠোঁট নাড়া থেকে অস্পষ্ট কোনও কথা ভেসে ওঠে। না, কোনও কথাই বুঝতে পারিনি।

একটু দেরি করে মনোজ কথা বলা শুরু করলে :

বড় যন্ত্রণা হয় মাথায়—কী হয়েছে আমার—সবসময় কান্না যেন ধরতে আসে—আমি কিছু

BanglaBook.org

করিনি—আমি চাইনি—তার আগেই (মনোজ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)—এ ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র—ও আমার সমস্ত জীবনটা বিষিয়ে দিয়েছে। টাইমটেবল...।

৫ই ফেব্রুয়ারি

আজকের অ্যাসোসিয়েসান। মনোজ যা বলছে :

'হ্যাঁ, ডাক্তার দাশগুপ্ত আমি স্বপ্ন দেখি—কাল—ঠিক কাল রাত্রেই স্বপ্ন দেখেছি—রোজ দেখি—মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ডাক্তার—(মনোজ হঠাৎ থেমে যায়। আবার বলে) ভুলে যাই—স্বপ্নটা আমার মনে থাকে না—মাথায় কী যে হল! মনে থাকবে কী করে—মনে আমার থাকে না—poor memory...মনে রেখেই বা লাভ কী, প্রণববাবু? যত মনে রাখব ততই দুঃখ—ততই কষ্ট—কষ্ট কি আমি কম পাই—কেউ সে কথা কি বুঝবে—সবাই আমায় দোষ দেবে—বিশ্বাস করবে না, কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না—ষড়যন্ত্র—আমার সর্বনাশ করতে চায়—সর্বনাশ করলে তো শেষ পর্যন্ত?.. কী সাঙ্ঘাতিক—সাঙ্ঘাতিক—আ, কী সাঙ্ঘাতিক স্বপ্ন—এত ভয় করে—কুকুরটা যেমন বড় তেমনি তার ডাক—বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল—আমার বিছানা, নৌকো—কুকুর—কুকুর—গ্রে হাউন্ড, অ্যালসেসিয়ান (মনোজ চিৎকার করে উঠে বসতে যায়)।

মনোজ আর কথা বলতে পারে না—ভয়ে তার চোখ মুখ কেমন হয়ে যায়। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে দরদর করে।

৭ই ফেব্রুয়ারি

মনোজ নিজে থেকেই আজ বলল কাল রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে। এই ধরনের স্বপ্নই প্রায় সে দেখে। সুখের বিষয় স্বপ্নটা তার মনে আছে। মাঝে মাঝে যদিও ঠিক মনে পড়ছে না—তবু চেষ্টা করলে হয়তো সে পুরো স্বপ্নটাই ভাসা-ভাসা বলতে পারে।

মনোজের কথা শুনে আমার মনে হল এতদিনে বুঝি একটা আলো দেখতে পেলুম। মাঝে-মাঝে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছিল। মনোজের স্বপ্ন দীর্ঘ। এর চেয়েও দীর্ঘতর স্বপ্ন মানুষ দেখে। মনোজের কথায় তার স্বপ্ন লিখে রাখলাম।

স্বপ্নটা আমার মনে পড়েছে ডাক্তার দাশগুপ্ত—আমি স্বপ্ন দেখি—জলের ওপর একটা ভাসানো বিছানা, আমি সেই বিছানায় শুয়ে রয়েছি। আমার পাশে বসে কে যেন আমায় ঘুম পাড়াচ্ছে। কে যে তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে মনে হয় সে আমার খুব চেনা।—আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল হঠাৎ! চোখ খুলে দেখি—একটা নৌকো আমার বিছানার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; তাতে অনেক লোক। তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল। ওদের মধ্যে কে যেন বললে—এই হ্রদের জলে একটি মেয়ে ডুবে গেছে। তাদের কথা শুনে আমার কী জানি কেন ভীষণ ভয় হল। উঠে বসে চারপাশে তাকালাম। সব কেমন যেন অস্পষ্ট অন্ধকার। শুধু দেখতে পেলুম হ্রদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ব্রিজ—সেই ব্রিজের ওপর একটা কুকুর বসে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ডাকছে। কী বিকট তার ডাক—আর জ্বলন্ত দৃষ্টি। কুকুরটা আমাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য ছুটে এল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কেমন হয়ে আসে। কুকুরটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে বিরাট লাফ দিল। তারপর কী যে হল কে জানে—জল, কুকুর, ব্রিজ সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

খানিক পরে আবার স্বপ্ন দেখি—আমি মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ঝড় উঠেছে। গাছগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঝড়ের দাপটে। মাঠের মধ্যে একটা

BanglaBook.org

বাড়ি দেখে আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম। একটি মেয়ে—হ্যাঁ একটি মেয়ে এসে আমায় দরজাটা খুলে দিল। আমার বেশ মনে পড়ে মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে—এত দেরি হল? আমিও হাসলুম। খানিক পরে আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে টেবিলে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ির দোলনা ঝোলানো রয়েছে। কে একজন অন্ধকারে বসে দুলছে তাতে। দোলনাটা দুলতে-দুলতে আমাদের টেবিলের কাছে এসে পড়ছিল। এত ভয় করছিল আমার। আমি বারণ করলুম। দোলনার লোকটা হেসে উঠে যেন আরও বাড়াবাড়ি শুরু করলে। খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে আসতে যাচ্ছি—হঠাৎ দোলনা থেকে লোকটা নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরল। দোলনার দড়িটা জড়িয়ে দিল আমার গলায়! যেন বললে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত। তারপর লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো পাথরের একটি ভাঙা 'ভেনাস মূর্তি' এতক্ষণ পরে আমার চোখে পড়ল। ভেনাস মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল।

১০ই ফেব্রুয়ারি

গত কাল রাত্রে মনোজ যে স্বপ্ন দেখেছে :

ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। একটা সুন্দর ছোট্ট স্টেশন—স্টেশনের পাশ দিয়ে একটা পথ—সেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি—হ্যাঁ, আমি গান শুনতে পেলাম—কে যেন জানালা খুলে ডাকল আমায়—চেয়ে দেখি বিয়ের সাজ আর সিঁথিমৌর পরা একটি মেয়ে—কত ফুল ফুটে রয়েছে জানলার ধারে। সেই ফুলের ওপর ভাসছে মেয়েটির মুখ। কী সুন্দর তার হাসি। আমায় সে ডাকল। এগিয়ে এলাম তার কাছে। খুব ভালো লাগছিল। আমি সেই মেয়েটির কাছাকাছি এসেছি হঠাৎ দেখলাম ফুলের গাছ মিলিয়ে একটা বীভৎস কুকুরের মুখ ভেসে উঠে ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত জায়গাটা ভরে তুলল। কুকুরটা আমায় দেখতে পেল। আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলাম। মেয়েটির কাছে যাওয়ার জন্যে অন্য পথে পা বাড়ালুম। খানিকটা গিয়ে দেখি সে পথও বন্ধ। একটা লোক খুব বড় একটা দড়ি নিয়ে ঘোরাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা দড়ি নয়, ভীষণ বড় একটা সাপ। আমায় দেখে সে দড়িটা আমার দিকে ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই আমি তাকে বাধা দিতে গেলাম। তারপর কী হল কে জানে। ভীষণ গণ্ডগোল আর হইচই। কারা যেন 'পুলিশ-পুলিশ' বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি পালাতে লাগলাম। মাঠ, নদী, বন, ট্রেন—।'

মনোজ চুপ করে যায়। একটু পরে বলে, 'এরপর আর কিছু নেই ডাক্তার। ঘুম আমার ভেঙে যায়। ভীষণ ভয় করতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। জানলা খুলে চুপচাপ বসে থাকি।'

১৪ই ফেব্রুয়ারি

স্বপ্ন মনোজ রোজই দেখে। সব স্বপ্ন তার মনে থাকে না। একটু-আধটু যা থাকে তা মনে করে মনোজ বলে। সমস্ত স্বপ্নগুলোতেই এমন কিছু-না-কিছু থাকে যাতে সে ভয় পায়।

৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মনোজ যে স্বপ্ন তিনটি দেখেছে এই তিনটি স্বপ্নই নাকি নানাভাবে সে দেখে। কখনও আংশিক, কখনও পুরোটা। আরও একটা কথা, সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে তিনটি জিনিস তার সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মনে আছে। দিনের আলোতেও সর্বক্ষণ পরিষ্কারভাবে সেগুলো মনে করতে পারে মনোজ। সেই তিনটি জিনিস,—কুকুর, ভাঙা ভেনাস মূর্তি আর সাপ।

BanglaBook.org

আমাদের বিশ্বাস মনোজ যে স্বপ্ন তিনটির কথা বলে লক্ষ করলে সহজেই ধরা পড়বে এই স্বপ্ন যদিও তিনটি, তবু আসলে তারা একটিরই অংশ। সমস্ত স্বপ্নটাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মূল একটি স্বপ্ন তিনটি আংশিক স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

স্বপ্ন তিনটির অর্থ এখনও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ স্বপ্নটি অত্যন্ত জটিল, দ্বিতীয়ত কোনও সূত্র থেকেই মনোজের অতীত ইতিহাস জানার সুবিধে ঘটছে না। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি। মনোজের মধ্যে একটা পাপবোধ রয়েছে। তার ভারে সে পীড়িত। কিন্তু আমাদের ধারণা মনোজের পাপবোধটা কাল্পনিক—প্রকৃতপক্ষে সে কোনও পাপ করেনি। Manic depressive psychoses—acute melancholia-র লক্ষণ, বইয়ে বলছে : The patients think themselves responsible for all the crimes...They themselves have commited some great sin and their souls are forever lost.

১৫ই ফেব্রুয়ারি

সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ স্বরলিপিতে যে-ভদ্রমহিলার নাম আছে তাঁর কাছ থেকে মনোজের সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে আশা করি। অনেক আগেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল। সময়াভাবে পারিনি। আগামী সপ্তাহে মনোহরপুরে তাঁর কাছে যাব স্থির করেছি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

মনোহরপুর থেকে ফিরে এসেছি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি সুদক্ষিণা দেবীকে।

প্রণব তার ডায়েরি বন্ধ করে অকস্মাৎ থেমে গেল। তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। সুদক্ষিণা সামনের চেয়ারে পুতুলের মতো বসেছিল; তন্ময় হয়ে শুনছিল প্রণবের পুঁথি পাঠ। সত্যিই তাই, তার কাছে এ এক নতুন জিনিস শোনা, নতুন জিনিস জানা। এত কী সে কোনওদিন ভাবতে পেরেছে? প্রণব যা পড়ে গেল অনেক কথাই তার বুঝল না সুদক্ষিণা। মন, মনস্তত্ত্ব, মনঃসমীক্ষা, অ্যাসোসিয়েশান, শক, স্বপ্ন—এ যেন মনের জাদুঘর আর কথার জাদুকরের কাছে নিজের সত্তা বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকা।

প্রণব সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'আপনাকে খুব অ্যাবজর্ভড মনে হচ্ছে, সুদক্ষিণাদেবী।'

সুদক্ষিণা প্রণবের একটানা কথার আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত হল। একটু হাসল। বললে, 'অবাক হচ্ছি!'

'এবার তাহলে সবাক হন।' প্রণব জোরে হেসে উঠল।

'আমার সবাক হওয়ার আর কিছু তো নেই, প্রণববাবু।'

'বোধহয় আছে, ভালো করে ভেবে দেখবেন। তাড়াতাড়ির কোনও দরকার নেই।'

সুদক্ষিণা মনে-মনে কী ভাবলে কে জানে, হঠাৎ মৃদুস্বরে আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলে।

'হ্যাঁ, আমি এলাম। তারপর?'

'তারপর যা, তা তো আপনি নিজেই জানেন। সে সব আর অযথা পড়ে কোনও লাভ নেই। রাত অনেক হল।'

সুদক্ষিণা তাকিয়ে দেখল বারোটা বাজতে চলেছে।

'আর কিছু আমি জানতে পারি না?'

'অবশ্যই পারবেন। আজ নয়; আগামী কাল। আজকের মতো এখানেই সভা ভঙ্গ হোক,

BanglaBook.org

কী বলেন।'

সুদক্ষিণা বুঝল প্রণব ক্লান্ত। রাতও অনেক হয়েছে। তার নিজের শরীরটাও ভালো লাগছে না।

'আচ্ছা, যাই।' সুদক্ষিণা উঠে দাঁড়াল কী যেন ভাবতে-ভাবতে। হঠাৎ মাঝপথ থেকে ফিরে এসে কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব, প্রণববাবু। সত্যি করে বলবেন?'

'বলুন।' প্রণব সিগারেট ধরিয়ে শরীরের ক্লান্তি কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

'পাপ-বোধ কথাটা বললেন না আপনি? আচ্ছা, বাণীবাবু কি সত্যি—' সুদক্ষিণা তার কথা শেষ করতে পারলে না।

প্রণব গা এলিয়ে চেয়ারে শুয়ে পড়ল। হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমার যতদূর মনে হয় বাণীব্রতবাবু ডাক্তার চক্রবর্তীকে গুলি করে মারেননি।'

সুদক্ষিণা আর কোনও কথা বললে না। তার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। নিঃশব্দে সে সরে গেল প্রণবের সামনে থেকে।

পরের দিন। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে প্রণব দেখলে বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে সুদক্ষিণা চুপ করে বসে আছে। সন্ধের আবছা অন্ধকারে নিঃসঙ্গ সুদক্ষিণাকে বড় অসহায় বলে মনে হল তার। অনুকম্পায় ভরে উঠল মন।

প্রণব পাশে এসে দাঁড়াল।

'চুপ করে একলাটি বসে রয়েছেন যে!'

সুদক্ষিণা কী যেন ভাবছিল। প্রণবের উপস্থিতি সে অনুভব করতে পারেনি। গলার স্বরে চমকে উঠে চাইল প্রণবের দিকে।

'এইমাত্র ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে যেন ভীষণ মনমরা দেখাচ্ছে।'

'কই! মাথাটা বড় ধরেছে।' ক্লান্ত ভাবে হাসল সুদক্ষিণা। প্রণব পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল; বললে, 'আপনার একটা চিঠি এসেছে।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিল সুদক্ষিণা।

প্রণব আবার বললে, 'হাসপাতালের পোশাকটা বদলে নি। তারপর চলুন একটু ঘুরে আসি। ফাঁকা হাওয়ায় মাথা ধরা ছেড়ে যাবে।'

'তাই ভালো।' সুদক্ষিণা হাতের চিঠিতে নজর রেখে উত্তর দিল।

প্রণব চলে গেল পোশাক বদলাতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সুদক্ষিণা মন্থর পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পথ হাঁটতে-হাঁটতে বললে সুদক্ষিণা—যেন অত্যন্ত আপনজনের কাছে উপদেশ চাইছে, 'অতসী চিঠি লিখেছে, কী করি বলুন তো?'

সুদক্ষিণার কথায় প্রণবের হাসি পায়, 'কী লিখেছে না জেনে, কী করা উচিত তা আমি কী করে বলব বলুন?'

'স্কুল থেকে আর ছুটি দিতে চাইছে না। আমি আর এক হপ্তা ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। সেক্রেটারি তা মঞ্জুর করেননি, উপরন্তু হাজাররকম প্রশ্ন করেছেন অতসীকে।

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের এমন বিশ্রী স্বভাব—।'

প্রণব চট করে কোনও জবাব দিল না। কথাটা সে ইতিপূর্বেই গভীরভাবে ভেবেছে। এখনও ভাবছে। মনে-মনে ব্যবস্থাও যে একটা না ভেবে রেখেছে এমন নয়।

এক জায়গায় এসে ওরা দাঁড়াল। ঝরনার ক্ষীণ একটা ধারা এসে পড়েছে—উঁচু পাথরের ক'টা ঢিবি; সামনে কামরাঙা গাছ। চারপাশে আর কোনও ঝোপ-ঝাড় নেই। জায়গাটা প্রণবের মনের মতো। প্রায় রোজই সে বেড়াতে-বেড়াতে এখানে এসে বসে।

সুদক্ষিণাকে বসবার আহ্বান জানিয়ে প্রণব একটা পাথরের ওপর বসল। এর আগে সুদক্ষিণা কোনওদিন এখানে আসেনি। পার্বত্য অঞ্চলের এই জনমানবহীন, শান্ত উদার পারিপার্শ্বিকের মাঝে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হল সুদক্ষিণা।

'বেশ সুন্দর তো জায়গাটা!'

প্রণব নীরবে হাসল, 'আমার নিত্য দিনের সাথী। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন? বসুন।'

পাথরের ওপর বসে সুদক্ষিণা শুধল, 'আজ কোন তিথি?'

'এই রে, বিপদে ফেললেন, তিথি-টিথির খোঁজ রাখি না।'

আকাশের দিকে চেয়েছিল সুদক্ষিণা, হিসেব করছিল, 'বোধহয় নবমী, দশমী হবে। এতদিন মেঘলা হয়ে আকাশটা ডুবে ছিল। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন?'

প্রণব অনেক চাঁদ দেখেছে এইখানে একলাটি বসে। আজ তার আর চাঁদ দেখাব অবসর নেই। অনেক কাজের কথা আছে সুদক্ষিণার সঙ্গে। ফিরে গিয়ে আবার কয়েকটা বই নাড়া চাড়া করতে হবে।

প্রণব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠল, 'আপনি স্কুলের কথা বলছিলেন না!'

সুদক্ষিণা প্রণবের মুখের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, অতসীর চিঠি—।'

'ভেবে দেখলুম', প্রণব সুদক্ষিণার কথায় বাধা দিয়ে বললে, 'আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল-পরশুই ফিরে যেতে পারেন। তবে—মাঝে-মাঝে আপনাকে আসতে হবে এখানে।'

'মাঝে-মাঝে?' করুণ শোনাল সুদক্ষিণার গলার স্বর।

'এই ধরুন মাসে একবার। পারবেন না?'

'পারব।' সুদক্ষিণা ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'কিন্তু আমার আসা-না-আসায় কিছুই যায় আসে না, প্রণববাবু।'

সুদক্ষিণার কণ্ঠস্বরের প্রতিটি স্তর বেদনায় সিক্ত।

প্রণব বুঝতে পারল কী বলতে চায় সুদক্ষিণা, এত ব্যথা তার কেন?

সমবেদনা ও সহানুভূতিতে প্রণবের গলা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বললে সে, 'অভিমানের সময় তো এটা নয়, সুদক্ষিণা দেবী। কার ওপরেই বা অভিমান করবেন।'

সুদক্ষিণা সে-কথার কোনও জবাব দিল না। বেদনার্ত দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল দূরে—পরেশনাথ পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়া আর চাঁদের আলোয় বন্য পৃথিবী যেখানে বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে।

প্রণবও চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। একটু পরে বললে, 'ওরকম মনমরা, হতাশ হলে তো চলবে না। আপনার কাছ থেকে কত সাহায্য আশা করে রয়েছি; আর আপনি—।'

'সত্যি, আমি হতাশ হয়েছি,' সুদক্ষিণা প্রণবের কথায় বাধা দিলে, 'বাণীবাবু যে আবার ভালো হয়ে উঠবেন এ আশা করা আমার পক্ষে স্বপ্ন বলে মনে হয়। তা ছাড়া ভালো হয়েই বা কী লাভ বলতে পারেন। আবার তো একটা—' কথার মধ্যে গভীর আশঙ্কার আভাস জানিয়ে সুদক্ষিণা একটু থামলে। হতাশ হয়ে শেষ করলে তার বক্তব্য, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পারবেনও না। আইনের ঘোর-প্যাঁচ, ডাক্তারির হাজাররকম ফ্যাকড়া আপনার বোঝার কথাও নয়। সোজাসুজি শুধু বুঝে রাখুন, বাণীবাবুর কোনও ক্ষতি আইনের হাতে যাতে না ঘটে তার চেষ্টা

BanglaBook.org

আমরা করছি।'

'কিন্তু আপনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন?' সুদক্ষিণা সন্দেহ জানালে।

'পারব বলেই আমার বিশ্বাস। আচ্ছা, আপনার কাছেই উপস্থিত আমার কতকগুলো সন্দেহের আভাস দি—আপনিই বলুন, বাণীবাবুকে খুনি বলে মনে হয় কি না?'

সুদক্ষিণা সচকিত হল।

প্রণব হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'ডাক্তার চক্রবর্তীর বাঁ-দিকের বুকে গুলি লেগেছিল। সেই আঘাতেই তিনি মারা যান। পোস্টমর্টেম করার পর বুকের মধ্যে যে কার্টিজ পাওয়া গেছে, সেই কার্টিজ আর আপনার দাদা বিভূতিবাবুর রিভলভারে যে বাকি চারটে কার্টিজ ভরতি ছিল তাদের নম্বর এক নয়। সোজা কথায় আপনার দাদার রিভলভারের গুলিতে যে ডাঃ চক্রবর্তী মারা যাননি—এটা পোস্টমর্টেমেই জানা যাচ্ছে।'

সুদক্ষিণা অবাক বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হয়ে প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তা হলে—' সুদক্ষিণা বিস্ময়াভিভূত হয়ে সন্দেহ জানাল।

'তা হলে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্য কোনও রিভলভারের গুলিতে ডাঃ চক্রবর্তী মারা গেছেন।' প্রণব কথা শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাল, 'নীলা পুলিশের কাছে বলেছে, দুজনের মধ্যে যখন তীব্র বচসা হচ্ছে সে সময় গোলমাল শুনেই নীলা নেমে এসেছিল। তারপর ঘরের পরদা সরিয়ে সে দেখে বাণীব্রত আর ডাঃ চক্রবর্তী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওদের কথাবার্তা নীলা স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে শাসাচ্ছিল খুন করে ফেলব বলে। অবশ্য এরকম শাসানোর কোনও মানে হয় না। ডাঃ চক্রবর্তীও তাই ভয় পাননি। কিন্তু বচসার মধ্যেই বাণীব্রত ছুটে গিয়ে ডাঃ চক্রবর্তীর গলা টিপে ধরে। তখন দুজনার মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। নীলা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কী করবে ভাবছে এমনসময় বিকট শব্দ শুনতে পেল ও। ডাঃ চক্রবর্তী যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বাণীব্রত ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। নীলা ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছে বাণীব্রত মাঠের পথ ধরে পালাচ্ছিল। পূর্ণিমা রাত্রি বলে নীলা স্পষ্টই বাণীব্রতকে পালাতে দেখেছে।'

প্রণব থামল। সুদক্ষিণা অকপট-বিস্ময়ে প্রণবের মুখের পানে আগের মতোই তাকিয়ে থাকল। অসমাপ্ত কাহিনি শোনার যে অস্বস্তি ও সম্পূর্ণ কাহিনি শোনার যে আগ্রহ সুদক্ষিণার মুখে চোখে সেই একই ধরনের অস্বস্তি ও আগ্রহ ফুটে উঠেছে। প্রণব হাতের সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আমি বড়ই অবাক হয়ে যাচ্ছি সুদক্ষিণা দেবী, এ কেমন করে হয়? ডাঃ চক্রবর্তী যে গুলিতে মারা গেলেন সেটা বাণীব্রতর মানে আপনার দাদার রিভলভারের নয়। অথচ বাণীব্রতর রিভলভারটা ডাঃ চক্রবর্তীর মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গেল। তাও পুরো ভরতি নয়। দুটো গুলি খরচ করা হয়েছে। এ যেন একটা মিস্ট্রি। বাণীব্রত নিশ্চয় দুটো রিভলভার পকেটে করে নিয়ে যায়নি। আর নিয়েই বা যাবে কী করে! একটার জন্যেই যাকে বন্ধুর রিভলভার চুরি করতে হয়, তার পক্ষে দুটো রিভলভার—' প্রণব কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

সুদক্ষিণা এতক্ষণে কথা বললে, 'পুলিশ কী বলে?'

'পুলিশ অন্যরকম সন্দেহ করে। তাদের ধারণা ডাঃ চক্রবর্তী আর বাণীব্রত দুজনের কাছেই রিভলভার ছিল। যখন ওরা পরস্পর ধস্তাধস্তি করে তখন দুজনেই সম্ভবত নিজের-নিজের রিভলভার বের করে একে অন্যকে ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু ধস্তাধস্তি করবার সময় দুজনেরই রিভলভার হাত থেকে পড়ে যায়। তারপর বাণীব্রত সুযোগমতো যে রিভলভার হাতের সামনে পেয়েছে তাই দিয়ে গুলি করেছে ডাঃ চক্রবর্তীকে। অন্য রিভলভারটি ফেলে দিয়েই পালিয়ে গেছে।'

'ও, তার মানে—বাণীবাবু ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভার দিয়েই তা হলে তাঁকে মেরেছেন?'

'পুলিশ তো তাই সন্দেহ করে। তাদের এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে নীলার কথায়। নীলা জানিয়েছে, ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভারটা বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

BanglaBook.org

প্রণব নীরব হল। সুদক্ষিণাও বসে থাকল বোবার মতো। প্রণবের কথাগুলো তার মনের মধ্যে চিন্তার আবর্ত তুলেছে। অনেকটা সময় কেটে গেল চুপচাপ। তারপরে বললে প্রণব, 'আমি কিন্তু পুলিশের সন্দেহ সমর্থন করি না।'

প্রণবের কথায় সুদক্ষিণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমার এই অসমর্থন ভিত্তিহীন নয়। যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে এর পেছনে।'

'যুক্তি!'

প্রণব মাথা নাড়ল। তার মুখে রহস্যের আভাস সঞ্চারিত হল।

'আমার কথা ভালো করে ভেবে দেখুন। যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটে সেদিন আপনাদের বাড়িতে আপনার বউদি গায়ত্রী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীকে ডাকা হয়েছিল মাত্র সে কারণেই। অর্থাৎ, স্বাভাবিক ঘটনাটা হচ্ছে একজন রুগির জন্যে একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো ও ডাক্তারের আবির্ভাব। এই তো?'

'হ্যাঁ।' সুদক্ষিণা ঘাড় নাড়ল।

'আচ্ছা, সুদক্ষিণা দেবী, তারপর রুগির বাড়ির কেউ যদি মাঝরাতে সেই ডাক্তারের বাড়িতেই তাকে ডাকতে যায় তাহলে ডাক্তার ভদ্রলোক কী ভাবতে পারেন?'

'রুগির বাড়ি থেকে রাত্রিতে লোক যখন ডাকতে এসেছে তখন নিশ্চয় রুগির বাড়াবাড়ি অবস্থা।' সুদক্ষিণা সহজ-যুক্তিতে বললে।

'ঠিক তাই। আমি তাই ভাবছি, ডাঃ চক্রবর্তী বাণীব্রতর ডাক শুনে যখন নীচে নেমে এলেন তখন রুগির কথা না ভেবে হঠাৎ অন্য কথা ভাবতে গেলেন কেন?'

'অন্য কথা? বুঝলাম না।'

'মানে রিভলভার পকেটে পুরে বাণীব্রতর সঙ্গে দেখা করতে আসার ইচ্ছে। এর কারণ কী?'

'রিভলভার হয়তো ওঘরেই ছিল।'

'না, বৈঠকখানা ঘরে ওসব মারাত্মক জিনিস কেউ রাখে না। ডাঃ চক্রবর্তীরও ছিল না। নীলাও সে-কথা স্বীকার করেছে। উপরন্তু নীলার কাছ থেকে আরও জানা গেছে, ডাক্তার চক্রবর্তী শোওয়ার ঘরে আলমারির মধ্যে রিভলভার রাখতেন। আলমারিটা তালাবন্ধ থাকত। তাছাড়া নীলা বলেছে, বাণীব্রতর ডাক শুনে ডাঃ চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়েছিলেন। রিভলভাব সে-সময় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন কি না তা নীলা জানে না।

প্রণবের জটিল ও সূক্ষ্ম যুক্তির আবর্তে সুদক্ষিণা হাঁপিয়ে উঠছিল। ও বললে, 'দেখুন, আমার মাথায় এত সব ব্যাপার ঢোকে না। কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে যুক্তি আপনার আমিও সমর্থন করছি।'

সুদক্ষিণার কথায় কান না দিয়েই প্রণব বলে চলল, 'আমার বিশ্বাস ডাক্তার চক্রবর্তী রিভলভার পকেটে পুরেই নীচে নেমেছিলেন। আর এ-থেকে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিপদের আশঙ্কা তিনি আগেই করেছেন।' প্রণব একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। নিঃশব্দে গোটা কয়েক জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে আবার—অনেকটা যেন আনমনে, 'বিপদ সম্পর্কে যিনি এত সচেতন তিনি যে কী করে অত সহজে আহত হলেন—আমি তাই ভাবি।'

এদিকে রাত হয়ে আসছিল। সামনের জঙ্গলে শিয়ালদের সমবেত কলরবে সুদক্ষিণা চমকে-চমকে উঠছিল। একটা বন্য কুকুরের আর্ত চিৎকার সেই নির্জন বনভূমির বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছিল। কেমন যেন ভয়-ভয় গলায় সুদক্ষিণা বললে, 'কী বিশ্রী।'

'কী?' প্রণব গভীর চিন্তার মধ্যে কথা কইল।

'ওই কুকুরের ডাকটা।'

'কুকুরের ডাক? ও, হ্যাঁ। এখানে ক'ঘর দেহাতি পরিবার বাস করে তাদেরই কুকুর। রাত

BanglaBook.org

হল, চলুন উঠি।'

প্রণব উঠে দাঁড়াল। সুদক্ষিণাও।

এবার ওদের ফিরে যাওয়ার পালা। মন্থর পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুজনে। পাতা মাড়ানোর শব্দ উঠতে লাগল পায়ে-পায়ে।

চুপচাপ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর সুদক্ষিণা বললে, 'আপনার কাছে লজ্জা করে কিছু লুকিয়ে রাখা আমার আর শোভা পায় না।'

সুদক্ষিণার গলার স্বর এত নম্র আব করুণ যে, প্রণব থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। অবাক বিস্ময়ে নীরবে সুদক্ষিণার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ভাষা পাঠ করবার চেষ্টা করলে খানিক। চাঁদের আলোয় সুদক্ষিণাব শীর্ণ-শান্ত মুখশ্রী আরও মধুর লাগছে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রণবের চোখে ফুটে উঠল মুগ্ধ-বিস্ময়, 'বলুন' প্রণব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বললে।

অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে বললে সুদক্ষিণা, 'এখান থেকে যেতে মন আমার সত্যিই চায় না। আপনাকে সমস্ত কিছু গুছিয়ে বলার শক্তিও নেই। এমন দোটানায় পড়েছি—' সুদক্ষিণা একটু থামল—স্বর তার ভার-ভার হয়ে উঠছে, 'ভুলেই যেতাম হয়তো, কিন্তু আপনি আবার নতুন করে অতীতকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর আপনার কাছে যত শুনি ততই মনে হয়—বাণী দোষী নয়। আর সত্যি, ওকে যে একটুও চেনে সেই বলবে ওর পক্ষে একাজ করা একেবারেই অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে কোনও কথা অবশ্য আমাদের—মনঃসমীক্ষকদের বিশ্বাস করতে নেই সুদক্ষিণা। বিশ্বাসও আমরা করি না।'

একটু অসতর্ক হয়েছিল প্রণব তার কথায়।

সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণাব মর্মে এসে ডাকটা বিঁধল। মুহূর্তের জন্যে বাণীব্রতর মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকল ও প্রণবেব দিকে।

প্রণবও তার অসতর্ক সম্বোধনের গুরুত্ব বুঝে লজ্জিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, 'ক্ষমা করবেন, হঠাৎ—।'

সুদক্ষিণা প্রণবেব কথায বাধা দিলে। আন্তরিকতায় তাব কণ্ঠস্বর মধুর হয়ে উঠল। বললে, 'কুন্তলাদি বলছিলেন—আমরা সমবয়েসি—আপনি আর আমি। আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। সত্যি, আমি খুব খুশি হব।

প্রণব এমনটা আশা করেনি। সমস্ত ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করতে তার খানিকটা সময় লাগল। তারপব সহসা ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল—সজোরে, খেয়াল-খুশিতে, 'মানে, এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চাও?'

'তাই কি?'

'তুমিই ভেবে দেখ। যদি বাণীবাবুকে কষ্টেসৃষ্টে সারিয়ে তুলে তোমার হাতে দিতে পারি, তখন—।'

'কী বলুন না, থামলেন কেন? অনাত্মীয়তার সংকোচ আমরা কাটিয়ে উঠেছি।'

'আমি কাটালেও তুমি যে কাটাতে পেরেছ পুরোপুরি তা তো মনে হচ্ছে না। সম্বোধনপদে শ্রদ্ধাভাজন হতে আমিও রাজি নই।'

'ও! বেশ। তবে বলো, বাণীকে সারিয়ে দিতে পারলে? আমি—।

'তুমি আমায় ফাঁকি দেবে।'

'দিলেই বা। যে দরিদ্র সে তোমায় দক্ষিণা দেবে কোথা থেকে, যদিও আমি সুদক্ষিণা।'

সুদক্ষিণা এত সুন্দর ও সহজভাবে হাসল যে প্রণব অসংকোচে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারল। বললে প্রণব, 'আমি মন নিয়ে দোকান করি সুদক্ষিণা। সব মানুষই ফাঁকি দেয়, তা আমি জানি। তা হোক, তোমার বন্ধুত্বের মূল্য দিয়ে সে-ফাঁক আমি ভরতি করে নেব। কেমন?'

BanglaBook.org

'তাই নিও।' সুদক্ষিণার দুচোখ জলে ভরে উঠল। অনেকক্ষণ পরে বললে, 'এ সংসারে আমার নিজের বলতে কেউ নেই, কিছুই নেই। আজ একজনকে বন্ধু করে পেলাম। তোমার হাতে বাণীর সব ভার তুলে দিয়ে যাচ্ছি প্রণব। যদি ও সেরে ওঠে—আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হব। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আজীবন।' কথা বলতে-বলতে আবেগে প্রণবের হাত ধরে ফেলেছিল সুদক্ষিণা।

প্রণব হাত ছাড়িয়ে নিল। ধীরে-ধীরে বললে, 'কোথায় গিয়ে ঠেকব জানি না। তবে তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার চেষ্টা আমি করব, সুদক্ষিণা।'

নিঃশব্দে আবার দুজনে পথ হাঁটতে শুরু করলে। হঠাৎ বললে সুদক্ষিণা 'তুমি ভগবান বিশ্বাস করো?'

প্রশ্নটা আচমকা। প্রণব একটু বুঝি অবাক হল এ ধরনের প্রশ্ন শুনে।

'না।' মাথা নাড়লে প্রণব।

'আমি করি। শুধু ভগবান নয়, ভাগ্যও।'

'নেহাতই বোকা তুমি! প্রণব হাসে।'

'তোমার চেয়ে নিশ্চয় নয়। কিন্তু ও কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎটা তাই আমি ভাগ্য বলেই মনে করি, আর আমাদের বন্ধুত্বকে—।'

'দোহাই তোমার—তুমি যা ভাববার ভেবো, আমায় শুনিও না। তার চেয়ে এসো তোমার আর এক ভগবান যে প্রকৃতপক্ষে খুনি নয় তার প্রমাণ স্বরূপ আমার দ্বিতীয় যুক্তিটা—' প্রণবের হাসির ঢেউ অনেকটা জায়গা জুড়ে ভাসতে লাগল।

'ঠাট্টা করছ?'

'না—না ঠাট্টা নয়; হিংসে। মনের গতি বড়ই বক্র এবং জটিল। সে তুমি বুঝবে না। তার চেয়ে আমার কথা শোনো—।'

'বলো।'

'দ্বিতীয় প্রমাণ নীলার নিজের মুখের কথা। বাণী নাকি একদিন নীলাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। নীলা বলেছে, শুধু সন্দেহের বশে বাণী এমন মারাত্মক একটা কাণ্ড করতে বসেছিল। অথচ মজা এই, কেন যে বাণী নীলাকে সন্দেহ করত তা নীলা বলে না।' প্রণব কথার মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে সুদক্ষিণার মুখের দিকে অল্প কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে বললে, 'বাণী নীলাকে সন্দেহ করে এটা যদি নীলা বুঝে থাকে, কেন সে সন্দেহ করে সেটা নীলা জানত না, তা আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে নীলার নীরবতার নিশ্চয় গভীর অর্থ আছে। যদি ডাক্তার চক্রবর্তী এই সন্দেহের কারণ না হন তা হলে হয় নীলার দিক থেকে অন্য ত্রুটি আছে না হয়—।'

'না হয়—' সুদক্ষিণা রুদ্ধনিশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করলে শেষ দুটো শব্দ।

'না হয় বাণীর দিক থেকেই কোনও ত্রুটি ছিল। সম্ভবত বিনা কারণে অনর্থক মনে-মনে একটা সন্দেহ পোষণ করার বাতিক ছিল ভদ্রলোকের। অর্থাৎ একটা মনোবিকারে 'সাইকোসিসে' সে আগে থেকেই ভুগছিল। তাই যদি হয় তবে প্রশ্ন করব, কেন? কেন এই মনোবিকার?'

প্রণবের ভাব-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'তোমাদের মনের-ডাক্তারিতে এর কি কোনও উত্তর নেই?'

'নেই মানে? অজস্র আছে।'

'তবে?'

'বাণীব্রতর বেলায় কোন উত্তরটা খাটবে সেটা জানতে হবে।'

'কিছু ঠিক করতে পারোনি?'

BanglaBook.org

'না। মনঃসমীক্ষণ-শাস্ত্র যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি জটিল। খুশিমতো একটা কিছু মনে করতে আমরা পারি না। বাণীব্রত মনোবিকারে ভুগছিল। এটা আমার অনুমান। কতকগুলো বাহ্য-প্রমাণ থেকে এটা অনুমান করা যায়। কিন্তু আরও কতকগুলো প্রমাণ চাই—কতকগুলো বাস্তব কারণ যার ওপর ভিত্তি করে অনুমানটা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারি।'

সুদক্ষিণার পায়ে লতা জড়িয়ে যাওয়ায় পড়ে যাচ্ছিল, প্রণব তাকে ধরে ফেলল।

'লাগল?'

'না। বাণীর মনের বিকার কী কারণে ঘটল তুমি তো তা অনুমান করতে পার!'

'এমন বোকার মতন একটা কথা বললে!'

'কেন?'

'তুমি যে বাণীকে ভালোবেসেছ এটা নিশ্চয় স্বীকার করবে।'

'ঠাট্টা হচ্ছে?' সুদক্ষিণা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলে।

'না। ঠাট্টা, ইয়ার্কি নয়। আমার কথার জবাব দাও।'

সুদক্ষিণা কিন্তু কোনও জবাব দিল না। চুপ করে পথ হাঁটতে লাগল। 'বুঝেছি! মৌনং সম্মতি লক্ষণং।' একটু অপেক্ষা করে প্রণব বললে, 'কিন্তু শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী, বাণীকে ভালোবাসো এটা জানতে পারলেও তুমি কি কোনওদিন জানতে পেরেছ কেন বাণীকেই ভালোবাসলে। আরও তো অনেক ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। কারুর সঙ্গে হয়তো বা বন্ধুত্বও ঘটেছে।'

প্রণব একটু মুচকি হাসল। সুদক্ষিণা আড়চোখে লক্ষ করল সে হাসি।

'পাগল নাকি?' সুদক্ষিণা ছোট্ট করে কাশল।

'আমায় বলছ?'

'আর কাকে বলব? এখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। কেন ভালোবাসলাম তা কি বলা যায়—না জানা যায়? এর কোনও কারণ নেই—থাকে না।' সুদক্ষিণার সুরে দৃঢ়তা।

'দোহাই তোমার, অমন সবজান্তা অথরিটির সুরে রায় দিও না।' প্রণব সজোরে হেসে উঠল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল বাতাসের স্তরে স্তরে, 'তোমরা অবশ্য তাই ভাবো। আর পৃথিবীতে যা নিজে জানো না, বোঝো না—অনায়াসে তার ওপর হালকা একটা মন্তব্য বা টিপ্পনী কেটে ছেড়ে দাও!'

'মানে?'

'মানে—ভূমিকম্প হওয়ার যেমন কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে—তেমনি হাজার ছেলের মধ্যে বাণীব্রতকে তোমার ভালোবাসারও একটা বিশেষ কারণ আছে বইকী। সে কারণটা তুমি অবশ্য জানো না।'

'তুমিও তো সাইকোলজিস্ট—মনোবিদ—তুমিই দাও না কেন—?'

'বেশ দেব। তবে উপস্থিত তার চেয়ে জরুরি জিনিস—কিছু জ্ঞানদান করি তোমায় শোনো। যা বলছিলুম—বাণীব্রতর মনোবিকারেরও একটা কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণটা কী তা জানা মুশকিল। হাজার কারণে মনোবিকার ঘটতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন কারণে বাণীব্রতর মনোবিকার ঘটেছে তা জানা সহজ নয়। যেমন সহজ নয় জানা হাজার কারণের মধ্যে ঠিক কী কারণে বাণীব্রতকে তুমি ভালোবাসো। বাণীব্রতর মনোবিকারের কারণ বের করতে হলে ওর বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের খবর জানা চাই। জানা চাই বাণীব্রতর ব্যক্তিগত জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস। এমনি আরও কত কী? কিন্তু এসব জেনেও কোনও ফল নাও হতে পারে।'

'নাও হতে পারে?' সুদক্ষিণার বিস্ময় মাত্রা হারাল।

'হ্যাঁ, নাও হতে পারে?' ধরো এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে বাণীব্রতর জীবনে যার সম্বন্ধে ও এখন একেবারেই অচেতন। পাগল না হলেও সারাজীবন এ সম্পর্কে সে অচেতন থাকতে পারত।

BanglaBook.org

এই ঘটনাটা হয়ত স্থূল, হয়ত বা সূক্ষ্মও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা তলিয়ে গেছে নির্জ্ঞান মনে। তারপর অবচেতন মনের অন্ধতলায় তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর—সজ্ঞান বা কনসাস (conscious) মনে যার তিলমাত্র ছায়া নেই। সেক্ষেত্রে কী হবে। কেমন করে তুমি জানতে পারবে ওর মনোবিকারের রহস্য?'

প্রণব কথা বলতে-বলতে তন্ময় হয়ে উঠেছিল। দেখতে পায়নি সামনে একটা শিশুগাছের মরা ডাল বেঁকে আড়াল করে রেখেছে তার পথ। আচমকা ধাক্কা খেয়ে প্রণব মৃদু কাতরোক্তি করে উঠল।

হেসে ফেলল সুদক্ষিণা।

'এতে হাসবার কী আছে?' প্রণব কপালে হাত বুলিয়ে পাশে সরে এল।

'মনের ডাক্তাররা বুঝি চোখের বেলায় অন্ধ হয়?' সুদক্ষিণা চেপে-চেপে হাসছে তখন।

সিগারেট ধরিয়ে প্রণব হেসেই উত্তর দিল, 'না। মনের ডাক্তারদের চোখ অন্য ডাক্তারদের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ।'

'বেশি?'

'অনেক বেশি। আমার এই ধাক্কা খাওয়াটাই তার প্রমাণ। আমি এই ধাক্কা খেয়ে কী বোঝাতে চাই জানো?'

'না।'

'মানুষ সংসারে এমনিভাবেই বেহুঁশ হয়ে পথ হাঁটে। খাওয়া, পরা, বাঁচা, বিয়ে, সন্তান—বাস্তবজীবনের এইসব দাবি মেটাতেই সে তন্ময়। হঠাৎ যখন তাদের সামনে ওই গাছের ডালটার মতো একটু কিছু আচমকা এসে পথ আগলায়—তখন ধাক্কা খেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। ধাক্কাটা একটু জোর হলে তার অবস্থা হয় তোমার বাণীর মতন। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'না, বোঝোনি—এখনও অনেক আছে। বাণীব্রত এই রকমই একটা ধাক্কা খেয়েছে। আর সেই ধাক্কার জের এসে থেমেছে নীলাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা আর ডাঃ চক্রবর্তীকে গুলি করে মারতে গিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ায়।'

'আশ্চর্য।' সুদক্ষিণার চোখের পাতা বিস্ফারিত হল।

'আমার মনে হয় বাণীব্রত শৈশবজীবনেই বোধহয় প্রথম ধাক্কাটা খায়।'

'শৈশবজীবনে?' গলার স্বরে অগাধ বিস্ময় সুদক্ষিণার।

'বেশির ভাগ যে তাই হয়।'

'তারপর এতদিন—।'

'এতদিনই। অবাক হওয়ার কিছু নেই। হয়তো সারাজীবনই তেমন কোনও ঘটনা আবার না ঘটলে বাণীব্রত তার ধাক্কার কথা জানতে পারত না, আমরাও না। নির্জ্ঞান মনের অন্ধকূপে বন্দি থেকে সেই ধাক্কাটা দেহের সঙ্গেই একদিন মিলিয়ে যেত।'

হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল ওরা।

গেট খুলে প্রণব দাঁড়াল। সুদক্ষিণা পা বাড়াল গেটের মধ্যে।

প্রণব আবার গেটটা বন্ধ করলে। বললে, 'পাগল কী জানো? Disbalanced personality—ব্যক্তিত্বের বেখাপ্পা ওজন, দাঁড়িপাল্লা যেখানে সমান নয়। যদি কোনওদিন আমাদের ভাগ্যেও এই বেখাপ্পা ওজন চলে—আমরাও পাগল হতে বাধ্য হব।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বললে সুদক্ষিণা, 'তোমার কথা বোঝার মতো বিদ্যে আমার নেই। আমায় শুধু একটা কথা সহজ করে বলো, বাণীর জীবনে তুমি যা বললে তাই যদি ঘটে থাকে, তুমি তা জানলে কী করে?'

BanglaBook.org

'যেমন করে আমরা জানি। বাণীব্রতর স্বপ্ন, তার '1' (one) বদলে 'A' লেখা, তার ব্যবহার, প্রকৃতি—এই সমস্ত লক্ষ করে।'

'বুঝেছি। এগুলোই বুঝি রোগের লক্ষণ?'

'চমৎকার। কে তোমায় বোকা বলবে?' প্রণব সজোরে হেসে উঠল।

লজ্জা পেয়ে সুদক্ষিণা বললে, 'তুমি আমায় কী ভাবো বলো তো?'

'বন্ধু।' প্রণব ছোট্ট করে বলল। তার গলার স্বরে আনন্দ ও প্রীতির মাধুর্য উপচে উঠছে।

কুন্তলাদি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'এত বেড়াতে পারিস?'

'তোমার মতন তো আমাদের পায়ে বাত হয়নি, দিদি।' প্রণব আবার হেসে উঠল।

'তা বইকী, আমার মতন বুড়ো হ। তখন বুঝবি।'

'ও আশীর্বাদ করবেন না, দিদি। কিন্তু ভাইটির আপনার বয়েস আমার চেয়ে কম হলে কী হবে—মনের দিক থেকে সে আপনার চেয়েও বুড়িয়ে গেছে।'

সুদক্ষিণার কথার ইঙ্গিত কুন্তলাদি বুঝলেন না। কিন্তু প্রণব আর সুদক্ষিণার হাসির সঙ্গে তিনিও গলা মেলালেন।

একদিনও বুঝি ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রণবের দেখা উচিত ছিল পলাশ বনের রং ফিকে হয়ে এসেছে, আকাশটা আরও বেশি তামাটে, তাত বেড়েছে রোদের। বসন্ত-শেষের অলস দুপুর মাঝে-মাঝে খেপে ওঠে; ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের ঝরা পাতা উড়ে এসে পায়ে চলা পথ দেয় ঢেকে। প্রকৃতির এই পরিবর্তন প্রণবের চোখে পড়ার কথা, কিন্তু পড়ল না। কর্মব্যস্ত জীবনে আজ আর তার এ পরিবর্তন লক্ষ করার অবসর নেই। সে লক্ষ করে চলেছে মানুষের পরিবর্তন। প্রকৃতির চেয়েও, মানুষের আকর্ষণ যেন তার কাছে আরও বেশি বেড়েছে, দেখা দিয়েছে আরও অনেক বেশি লোভনীয় ও চমকপ্রদ হয়ে। বরাবরই যে প্রণব বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ছিল তা নয়। এই বন আর বনের বাতাস, মাঠ, পাথর, ঝরনা—সবই তার অসম্ভব ভালো লাগত। ভালোবেসে ফেলেছিল ও এই নির্জন বন্য-জগতটাকে। সে ভালোবাসা আজ আর নেই কিংবা হয়তো আগের মতোই আছে সব, কেবল সেই তীব্র আকর্ষণটা কমে এসেছে।

প্রণবের আজকাল সময়াভাব। হাসপাতালের যাবতীয় কাজের ভার এসে চেপেছে ঘাড়ে। ডাঃ গুপ্ত কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে বাইরে গেছেন। একরাশ কাজ নিয়ে হাসপাতালে সারাটা দিন কেটে যায় প্রণবের। সন্ধেবেলায় হাসপাতালের নতুন মেয়ে ডাক্তার কুমারী ডোরা দত্তকে ডেকে রুগিদের রিপোর্ট নিতে, আর তাকে এটা সেটা বুঝোতে-বুঝোতে রাত হয়ে আসে। তারপর ঘড়ির কাঁটায় কোনওদিন আটটা, কোনওদিন ন'টা বেজে যাওয়ার পর ক্লান্ত দেহটা টানতে-টানতে বাড়ি ফেরে প্রণব। এরপর তার আর শক্তি থাকে না বাইরের জগৎটার দিকে চোখ মেলে চাইবার।

প্রণবের অজান্তে তাই নিঃশব্দে বসন্ত শেষ হল—এল গ্রীষ্ম। তামাটে আকাশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল। আগুনের হলকার মতো তপ্ত রোদ। ক্রমে দেখা দিল কালবৈশাখী। ঝড়ের দাপটে এক একটা বিকেলকে মনে হত সৃষ্টিছাড়া। সেই সর্বনাশা ঝড়ও কবে যেন থেমে গেল। চাপা, ঠাসা আবহাওয়া ভরা দিন এল আর গেল। তারপর আবার একদিন তার অজান্তে আকাশ ভরে জমে উঠল মেঘ। ছায়ায়-ছায়ায় থমথম করতে লাগল পাহাড় আর হাসপাতাল, মাঠ আর বন।

একদিন ঘুমোতে গিয়ে জানালা খুলে বসে থাকল প্রণব। বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকারের গায়ে সেই মসৃণ বারিপাতের রূপটা চোখে দেখার উপায় নেই। মনে-মনে কেবল তাকে অনুভব করা

BanglaBook.org

যায়। আর সেই সঙ্গে যাকে ভাবতে ভালো লাগে প্রণব তার চিন্তায় তন্ময় হয়ে উঠল। অবশেষে একসময় প্রণব উঠে টেবিল থেকে লেখার প্যাড আর কলমটা তুলে নিল।

টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে টেনে আনল কাছে। তারপর বুকের তলায় বালিশ সাজিয়ে আরামদায়ক এক ভঙ্গি করে চিঠি লিখতে বসল।

সুদক্ষিণা,

এখন অনেক রাত। বিছানায় শুয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। কী চুপচাপ, শান্ত এই রাত্তির। বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। জানালা খোলা। জলের ছাট এসে মাঝে মাঝে আমায় ভিজিয়ে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এত ভালো লাগছে আজকের এই রাত্তির—বৃষ্টি, নিস্তব্ধতা, তোমায় কী করে তা বোঝাই। এরই সঙ্গে ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার।

তুমি বোধ হয় ভাবছ, আমি সম্ভবত আজকাল কাব্যচর্চা করছি—তাই এ উচ্ছ্বাস। দোহাই তোমার, আর যাই ভাব, কবিতা লিখছি এমন মারাত্মক কল্পনা যেন করো না। লিখতে পারলে অবশ্য লিখতাম, কিন্তু ওটা আমি পারি না। আমি যা পারি সেটাকেও কিন্তু কবিতা বলা উচিত! শব্দ দিয়ে ভাবকে, ভাষা দিয়ে ইমোশানকে তোমরা ফুটিয়ে তোলো। মনের মধ্যে যা সুপ্ত তাকে সাজসজ্জা পরিয়ে অন্তঃপুর থেকে রাজপথে এনে দাঁড় করাও। এ যেন নতুন বউয়ের ঘোমটা খুলে মুখ দেখানোর মতন; ঘোমটার আড়ালে অজানার রহস্য ঘোমটা খুললে জানার বিস্ময়।

আমার জীবনে কাব্যচর্চাটা আরও একটু বেশি বাস্তব। মনের লুকোনো রহস্য টেনে বের করি আমি। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তফাতটা কোথায় জানো? তোমরা রহস্যটা নিজে জেনে যখন অপরকে জানাতে যাও তখন আবার রহস্য করে বসো। আর আমি রহস্যটা জেনে যখন জানাতে যাই তখন একেবারে নিরস যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ।

বুঝতে পারছি আমায় সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। তা হোক। অন্তত এখনও কিছুদিন যে আমায় সহ্য করবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। কেননা বাণীব্রত আজও সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

ভাবছ বুঝি তোমায় স্বার্থপর বলে গালাগাল দিলাম। না, গালাগাল দিইনি –যদিও স্বার্থপর বলতে বাকি রাখছি না। স্বার্থপর সকলেই। একটু মাত্রা বেশি হলেই লোকের চোখ টাটায়, অন্যথায় নির্দোষ গুণ। নিজের ছেলেকে আগলাবার জন্যে মার স্বার্থপরতা সর্বদাই ক্ষমণীয়—কিন্তু সেটা যদি পরিধিতে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ে তা হলে আর ক্ষমা থাকে না—ট্যারা কথায় কান কালা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাই বলি, স্বার্থপর বলছি বলে রাগ করো না। আমি যে কম স্বার্থপর নই—সে কথাটা অন্তত মনে করলে অনায়াসে আমায় সহ্য করতে পারবে।

চিঠিটা বোধ করি একটু বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। সুরটা যেন বাইরের বর্ষার সঙ্গে মিলছে না। সম্ভবত বিরহের মধ্যে যে নিসঙ্গ একাকীত্ব আর বেদনাবোধ তার অভাব ঘটছে—নয় কি? আচ্ছা, এসো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি।

ক'দিন ধরে তোমায় চিঠি লিখব ভাবছিলাম। সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আজকাল আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা তোমারই মতন। জানো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যেই চোখ মেললাম একটা দুশ্চিন্তা এসে জুড়ে বসল মন—তারপর সারাটা দিন গেল, আবার রাত্রে বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি ততক্ষণ চিন্তার বিরাম নেই। হাসপাতাল আর রুগি। এ যে কী সাঙ্ঘাতিক গুরুদায়িত্ব তা তোমায় বোঝানো মুশকিল।

BanglaBook.org

ডাক্তার গুপ্ত যতদিন ছিলেন—আমার কোনও দায়িত্ব ছিল না। রোগ আর রুগি ঘেঁটেই দিনটা কেটে যেত। এখন রুগি তো আছেই তার ওপর এই হাসপাতালের সব কিছু দেখাশোনা। সব সময় ভয় হয়—কোথায় কী ত্রুটি থেকে যাবে কে জানে—শেষ পর্যন্ত অপদার্থ বলে ধরা পড়ব। ডাঃ গুপ্ত ফিরে এসে কান মলে তাড়িয়ে দেবেন। তারপর? ভাবতেও আমার ভয় করে। এ হাসপাতালের বাইরে আমার অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি বোধহয় শঙ্কিত হয়ে উঠলে। ভাবছ, আমার নব-পদমর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তোমার ব্যাপারে শিথিল হয়ে পড়েছি। ঠিক কি না—বলো? বিশ্বাস করো তা হইনি। তোমায় কথা না দিলেও বাণীব্রতকে যতদিন না সুস্থ করতে পারতুম আমি তার প্রতি আমার কর্তব্য অবহেলা করতাম না। হি ইজ মোর ইন্টারেস্টিং টু মি।

তোমার আগ্রহ এবং কৌতূহল মেটাবার জন্যে এবার তার কথা বলি।

গতবার তুমি এসে তাকে যেমন দেখে গেছ এখন তার চেয়ে অবস্থা তার আরও ভালো। সেই ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তুমি এখানে প্রথম এলে—(বাণীব্রতর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটা একবার মনে করো) তখন দিন কয়েকের জন্যে হঠাৎ ও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কেন যে তা আমি তোমায় গতবার বলেছি। যাক, সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই জুলাই মাস প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে তুমি আরও বার তিনেক এসেছ। নিজের চোখেই দেখেছ বাণীর অবস্থায় ক্রমোন্নতি। বিশেষত গতবার গরমের ছুটিতে এখানে এসে বেশ ক'দিন ছিলে। বাণীকে খুব ভালো করে দেখবার সুযোগ তোমার হয়েছে। তখনই দেখেছ বাণী যেন তোমায় অনেকটা মনে করতে পারছে। আজকাল সে প্রায়ই তোমার কথা জানতে চায়। তুমি এবার এসে ওকে যে বই আর বেহালা দিয়ে গেছ সেগুলো যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে। বাণী আজকাল প্রায়ই বেহালা বাজায়। তবে তেমন ভালো করে বা পুরোপুরি কোনও সুর বাজাতে পারে না। চিন্তাশক্তির শৃংখলা এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি। তবু এ কথা সত্যি, ওর মানসিক শক্তি এখন অপেক্ষাকৃত উন্নত; সাধারণ স্বাস্থ্যও ভালো।

বাণীর সম্পর্কে অন্যান্য নতুন খবরের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—ও যে সেই একলা নির্জন জায়গায় গিয়ে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি (stereotyped action) করত তার পাট চুকে গেছে। হাতের ব্যথা কিন্তু এখনও ঘোচেনি।

এবার তোমায় আরও ক'টা কথা বলি। তুমি তো জানো পুলিশ থেকে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করতে রাজি হননি। তাঁর বিশ্বাস বাণীব্রত ছাড়া আর কেউ ডাঃ চক্রবর্তীকে খুন করেনি, করতে পারে না। ভদ্রলোক আমাদের আমলেই আনতে চাইলেন না তো সাহায্য! তারপর আবার কী কাণ্ড করেছেন ভদ্রলোক জানো? ফিরে গিয়ে অফিসে রিপোর্ট দিয়েছেন—বাণীব্রতর মনোবিকারের কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্যে তাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হোক। এর ফলে পুলিশ থেকে তাড়া দিয়ে চিঠি লিখেছে। তোমাকে বোধহয় বলেছিলাম— আমার দিদির শ্বশুর এবং আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার সেনগুপ্ত বিহার গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের একজন হোমরা-চোমরা কর্তা। তাঁকে চিঠি-লিখেই আমি বাণীব্রতকে এখানে ধরে রাখি এবং তাঁর তদ্বিরে পুলিশ থেকে যাবতীয় সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাই।

কাকাবাবু—মানে মিস্টার সেনগুপ্তকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করে যে-ভাবে মামলাটি সাজিয়েছে তাতে বাণীব্রতকে অপরাধ থেকে দোষমুক্ত করবার কোনও পথই খোলা নেই। যে পুলিশ অফিসার এই ঘটনাটি তদন্তের ভার নিয়েছিলেন

তাঁর মতে—আসামি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায়, স্থির মস্তিষ্কে উক্ত ডাক্তারের প্রাণনাশ করে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও সরল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আসামি তার আত্মীয় ও ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করে।

বুঝতেই পারো—সমস্ত ঘটনাটা এখন কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক—কাকাবাবু আমাকে মাত্র আর দুমাস সময় করিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। কোনওরকমে ধামাচাপা দিয়ে তিনি আরও দুটি মাস বাণীব্রতকে আমাদের হাতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তারপর? তারপর কী সেটা তুমি অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারো। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকার পাত্র কিন্তু আমি নই। ঠিক জানি না, কতদূর সফল হতে পারব তবে আমার বিশ্বাস এর মধ্যে একটা অঘটন ঘটে যেতেও পারে।

তোমার কলকাতার দাদা বাণীব্রতর সম্পর্কে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য খবর দিতে পারেননি। আমি স্থির করেছি নিজে একবার কলকাতায় যাব। তোমার দাদা, বউদি ও নীলার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করব।

নতুন খবর আর একটা আছে। অবশ্য খবরটা শুনলে তুমি হতাশ হবে—নিদেনপক্ষে 'জেলাস' তো নিশ্চয়ই। আমাদের হাসপাতালের নতুন ডাক্তার মিস ডোরা দত্তকে দেখবার সৌভাগ্য তোমার হয়নি। ভদ্রমহিলার বয়স বোধহয় বছর তিরিশ হবে। চেহারাখানির মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য না থাক জলুস আছে। গায়ের রঙে সে জলুস আরও প্রখরভাবে দীপ্ত। চোখ আর ঠোঁট দুটি কিন্তু বাস্তবিক অপূর্ব, ঠিক গরুর চোখের মতো আশ্চর্যরকম করুণ, মায়াময় আর শান্ত। দ্বিতীয় গুণটি শুনলে তুমি মূর্ছা যাবে। মিস দত্ত গান গাইতে পারেন। আর শুধু পারেন নয় অমন মিষ্টি গলা যার, তার কিন্তু কোকিল হয়ে জন্মানো উচিত।...কী? বুকটা বুঝি কেমন করে উঠল।

কিন্তু আমি কী করতে পারি বলো? বাণীব্রত ডোরার গানের সুরে মুগ্ধ। যত্ন ও ব্যবহারে সর্বদা কৃতজ্ঞ। ঠিক জানি না কেন ডোরাও বাণীব্রতর ওপর কেমন যেন একটু বেশি ইনটারেস্টেড। তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি—you may loose your case.

সম্প্রতি জানাবার মতো আর কোনও খবর নেই। কবে এখানে আসছ জানিও। দিদি রোজই একবার করে তোমার কথা বলেন। আর আমি তো ফাঁক পেলেই সর্বক্ষণ।

বৃষ্টি এখনও থামেনি। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। খুব বড় চিঠি লিখে ফেললাম। আবার পরে।

প্রণবের চিঠির উত্তর এল দিন পাঁচেক পরে। ছোট্ট চিঠি—

প্রণব, তোমার অনেক পাতার চিঠি পড়লাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল পড়তে। হাতের লেখাটা একটু ভালো করতে পারো না?

বাণীর কথা যা লিখেছ তাতে আমার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যে বেড়েছে তা না লিখলেও বুঝতে পারো। তোমায় বলার ঔদ্ধত্য আমার নেই। যে দায়িত্বটুকু স্বেচ্ছায় দিয়েছ তার জোরে মাত্র এইটুকু বলতে পারি যেমন করে হোক, ওকে তুমি সারিয়ে দাও। কদর্য জীবন ও গ্লানি থেকে তুমি ওকে মুক্ত করো। তুমি না করলে এ কাজ আর কেউ করবে না।

তোমাদের নতুন ডাক্তার ডোরা দত্ত যদি বাণীকে জিতে নেন তার জন্য আমি দুঃখ করব না। তিনি ওকে সুস্থ করে তুলুন তাতেই আমি সুখী।

আর একটা কথা বলে চিঠি শেষ করি। সহজ ভাবে যাকে গ্রহণ করতে পেরেছি বন্ধুর মতন, যার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করতে আমার একবিন্দু দ্বিধা, সংকোচ নেই,

BanglaBook.org

তাকে কতটা আপন করে নিয়েছি তবেই এই দাবি।

আমি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই যাব। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। দিদিকে প্রণাম জানিয়ো...।

নিমগাছের তলায় বসেছিল বাণীব্রত, ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে আধশোওয়ার ভঙ্গিতে, আরামদায়কভাবে। চোখে তার অলস, উদাস, অর্থহীন দৃষ্টি। কখনও সামনের করবীগাছের ঝোপের ওপর, কখনও ঝোপ পেরিয়ে চিকরিকাটা রোদে-ভেজা পেঁপেগাছের পাতায়, কখনও বা নীল আকাশের বুকের ওপর দিয়ে যে তুলোটে মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে—তার ওপর বাণীর দৃষ্টি থামছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার এক থেকে অন্য আর এক বস্তুতে সরে যাচ্ছে। বাণী কখন যে এই নিরালা জায়গাটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। রোদের তাত বাড়লেও গাছের ছায়ায় বসে বয়েছে বলে বুঝতেও পারে না বেলা বেড়ে চলেছে।

কার যেন হাতের স্পর্শ লাগল তার গায়। একটু চমকে উঠে মুখ ফেরাল বাণী। কুমুদশংকর।

কুমুদশংকর আনন্দের আগুনে জ্বলছে। চোখ দুটো খুশির আমেজে চঞ্চল, চপল।

বাণীর পাশে বসে পড়ল কুমুদশংকর।

'শুনেছ?' কুমুদশংকব বাণীর গায়ে ঠেলা দিল। বাণী তাকাল তার দিকে।

'আজ বিকেলে আমি চললাম। ছুটি, আমার ছুটি।' কুমুদশংকর ছোট ছেলের মতো খুশির দাপটে লাফিয়ে উঠে বসল।

'চললে?' বাণী প্রশ্ন করল।

'বিকেলে যাচ্ছি। আমার ছোট ভাই—সেই যে যার কথা বলতুম, কোলিয়ারির ম্যানেজার, সে এসেছে আমায় নিতে। এমন মজা, আমার মাও এসেছেন।' কুমুদশংকর হাতের সিগারেট দূরে ছুড়ে ফেলে দিল।

'আবার কবে আসবে?' বাণীব্রত জানতে চাইল।

'কী যে বলো তুমি!' কুমুদশংকর বাণীর নির্বুদ্ধিতার জন্যে সককণ সহানুভূতি জানালে, 'আমি আব আসব না। আমি সেরে গেছি। হাসপাতাল থেকে আমায় ছুটি দিয়ে দিয়েছে।'

'একেবারে?'

'হ্যাঁ—একেবারে। তোমাকেও দেবে।' কুমুদশংকর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল; ঠোঁটের হাসি একটু-একটু করে নিভে এল। তার বদলে জেগে উঠল বেদনা-বিষণ্ণ কালিমা। চুপচাপ অনেকক্ষণ, বাণীর দিকে তাকিয়ে কুমুদশংকর তার কাঁধে হাত রেখে ধীরে-ধীরে বললে, 'তোমায় আর তপেনকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের আমি খুব ভালোবাসতাম।'

'আমি তোমায় চিঠি লিখব।' বাণী বললে।

'নিশ্চয় লিখবে। আমি চিঠির উত্তর দেব। ঠিক দেব।'

'তোমার ঠিকানা?'

'সে আমি তোমায় দিয়ে যাব।'

খানিকটা চুপচাপ। আবার এক সময় কুমুদশংকর কথা বলল, 'জানো আমার সমস্ত কথা মনে পড়ছে আজ। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। সমস্ত মাথা ভার। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে; চোখে অসহ্য যন্ত্রণা আর মাথার কথা কী বলব যেন মনে হচ্ছিল কেউ করাত দিয়ে চিরছে। খানিকপরে জ্বর এল। ক'দিন বুঝি জ্বরে ভুগলাম।

BanglaBook.org

তারপর জ্বর ছেড়ে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় মাথাটা নিয়ে গেল; আমি পাগল হয়ে গেলাম। সারাক্ষণ আমার মনে হত কে যেন আমার গায়ে, হাতে, পায়ে ইলেকট্রিক তার ছুঁইয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়িতে আমার বউদির এক বোন থাকতেন। একদিন আমি তাঁর ঘরে ঢুকে ক'খানা শাড়ি চুরি করে নিয়ে এলাম। তারপর আর একদিন মেয়েটির মাথায় মাখার তেল আর কানের দুল। ক'দিনের মধ্যেই জিনিসগুলো সমেত ধরা পড়ে গেলাম। আবার জ্বর হল। এল ডাক্তার। বললে পাগলা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। তারপব এলাম এখানে। প্রায় দেড়বছর হতে চলল। ডাঃ গুপ্ত, প্রণববাবু, এঁদের দয়ায়, যত্নে আজ আমি সেবে উঠেছি।...কিন্তু দেড়বছর—উঃ, এর প্রতিটা দিন কীভাবে কাটিয়েছি কী বলব! আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, কর্মহীন অনন্ত অবসর; খালি ওষুধ, শক, আর যা মনে আসে বলে যাও। নরকযন্ত্রণাও বুঝি এর চেয়ে ভালো।'

কুমুদশংকর থামল।

বাণী কুমুদশংকবের হাত থেকে দেশলাইটা নিলে। কুমুদশংকর বললে, 'সিগাবেট খাবে?'

বাণী মাথা নাড়ল।

'না কেন, খাও না,' কুমুদশংকব পকেট থেকে একমুঠো সিগারেট বের বরলে, 'জানো অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রীরা আমার পাণ্ডিত্যের আর সিগাবেটখোর হিসেবে ছাত্রেরা আমার রুচির প্রশংসা কবত। Again I will have the two.' কুমুদশংকব বাণীর পকেটে সিগারেটগুলো পুবে দিয়ে হাসল।

'তুমি আবার কাজ কববে!'

'শুধু কাজ নয়, বন্ধু, এবাব আমি বিয়ে করব। ডাক্তারদের মতে বিয়ে করাটা আমাব নাকি একান্ত দরকাব,' কুমুদশংকর হেসে উঠল খুব জোরে, 'তোমায় নেমন্তন্ন করব।'

'আমিও যাব।' বাণীব্রত হাসিমুখে উত্তর দিলে।

'আগে সেরে ওঠ তবে তো?'

'সেরে?' বাণীব্রত আচমকা থেমে গেল। ভাবতে লাগল।

হঠাৎ একসময় বাণীব্রত প্রশ্ন করলে, 'তুমি কতদিন এখানে ছিলে?'

'প্রায় দেড়বছর!'

'আমি?'

'ডিসেম্বর মাসে এসেছ এখানে।'

'এটা কি মাস?'

'আগস্ট!'

বাণীব্রত ভাবতে লাগল, ডিসেম্বর—আগস্ট, কতদিন সে এখানে আছে!

কুমুদশংকর উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা ভাই, এখন চলি। সকলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিকেলে আবার সময় আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব!' কুমুদশংকর যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে কী ভেবে বাণীর পাশে আবার বসে পড়ল। বাণীর একটা হাত ধরে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। বললে তারপর, 'যাওয়ার সময় একটা কথা তোমায় বলি। রোগ হলেই কি লোকে মরে যায়? যায় না। বেশির ভাগই ভালো হয়ে ওঠে চিকিৎসা আর সেবায়। তুমিও ভালো হয়ে উঠবে। এই দেখো না, আমিও তো সেরে উঠলুম। মনমরা হয়ে থেকো না। ডাক্তারের কথা শুনো। মনে জোর আনো, বিশ্বাস আনো। আমি বলছি, তুমি ভালো হয়ে উঠবে, বাণী।'

কুমুদশংকর অনেকক্ষণ বাণীর হাত ধরে বসে থেকে শেষে নিঃশব্দে কখন উঠে চলে গেল।

কুমুদশংকর কখন যে উঠে গেছে বাণীব্রত জানে না। জানবার কোনও আগ্রহই তার নেই। কখনও হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কখনও বা মুখ তুলে বসে থাকল বাণীব্রত। মানসিক অসাচ্ছন্দ্যের লক্ষণ তার মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনের দিকে আর তাকাতে পারছে না ও। রোদের

BanglaBook.org

ঝাঁঝে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে পেঁপে গাছের চিকরিকাটা পাতা; টনটন করে ওঠে তার চোখ দুটো। চশমা? চশমাটা যে কোথায় ফেলে এল?... বাস্তবিক চশমা না থাকলে অসুবিধে যে কত! একটু দূরের জিনিস তার চোখে ঝাপসা ঠেকে! মনে হচ্ছে চশমা না হলে বুঝি কিছু ভাবা যায় না। দৃষ্টির মতোই—ভাবনাগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে বাণীব্রতর। মুঠো করে মাথার চুল ধরে বার কয়েক টানল ও। বেশ লাগে চুল ধরে টানতে। আরও একটু জোরে পাক দিলে কেমন হয়? হাত নামিয়ে নিল বাণীব্রত। চোখ পড়ল হাতের ওপর। ইস—কেমন কাঁপছে দেখেছ হাত! জ্বর এল নাকি? ভয়—আমি কি ভয় পেলাম? আশ্চর্য! ভেবে পাই না কেন ভয় পাচ্ছি! এখানে কীসের ভয়! এখানে—এখানে– । ...কী, আমি কোথায়?

বাণীব্রত চোখের পাতা বুজে চুপ করে বসে থাকল।

বসে থাকতে-থাকতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল বাণীব্রত। মৃদু দ্রুত শব্দ! একটু পরে নতুন গলার স্বর—খুব সরু—মিষ্টি গলা, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না!'

চোখ মেলে চাইল বাণীব্রত। ডোরা। পাতলা, ফরসা, ছোটখাটো গড়ন মেয়েটির। হালকা রঙের শাড়ি। কী রং ওটা—লাল, ব্রাউন, অরেঞ্জ? শাড়ির ওপর সাদা অ্যাপ্রন কিন্তু বেশ দেখায়। এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডাক্তার দত্ত! ডাক্তার দত্ত—না মিস দত্ত? ওকে আমি ডোরা বলেও ডাকতে পারি।

'অমন করে দেখছেন কী? উঠুন!' ডোরা মুখ টিপে হেসে আদেশ জানাল।

'কোথায়?' বাণীব্রত ডোরার চশমাটা লক্ষ করছিল। চশমা রয়েছে যার চোখে তার চিন্তা-শক্তি ঝাপসা হবে না নিশ্চয়।

'আজ কী বার মনে আছে?' ডোরা একটু মুখ নিচু আর বাঁকা করে ঘাড়টা একপাশে হেলিয়ে প্রশ্ন করলে।

'না। বুধবার—শুক্রবার– ।' বাণীব্রত ভাবছিল—ও কি আমায় বকবে নাকি! এমনভাবে তাকিয়েছে! ডোরার ঠোঁট দুটো কী সরু।

'বুধবার। আজ না আপনার বাথ নেওয়ার দিন?'

'মনে নেই।'

'মনে নেই বললে চলবে কেন? মনে আপনাকে রাখতে হবে।' আদেশের সুর ডোরা দত্তর গলায়।

বাণীব্রত দেখছিল—সরু সাদা গলা—All white and naked.

'কই, উঠুন! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

না বলতে পারল না বাণীব্রত। কুমুদশংকর বলেছে, ডাক্তারদের কথা শুনো। ভালো করতে যারা পারে তাদের ভালো করেই সব জানা উচিত। নয় কি? ডোরা জানে—নিশ্চয় জানে, কবে সে ভালো হয়ে উঠবে। ও কি বলতে পারে বাণীব্রত তার চশমাটা কোথায় রেখে এসেছে!

'আমি চশমার কথা ভাবছিলুম।'

'চশমা—কীসের চশমা!' ডোরা দত্তর গলায় বিস্ময়।

'আমার। চশমা ছাড়া ভাবা যায় না। আমার মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে।' বাণীব্রত হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরল।

ডোরা কী যেন ভেবে নিল অল্পক্ষণ। বললে, 'উঠুন, আর দেরি করে না।'

বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল।

পথ চলতে-চলতে বললে বাণীব্রত, 'কুমুদশংকরবাবু ছুটি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আজ বিকেলে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন।'

'আমি?'

BanglaBook.org

'ভালো হয়ে গেলে আপনিও বাড়ি যাবেন।'

বাড়ি! তার বাড়ি কোথায়? বাণীব্রত মনে করবার চেষ্টা করল। কলকাতা—দেওঘর? কে আছে তার বাড়িতে? এরা বলে তার বাড়ি নাকি কলকাতায়। এখানে আসবার আগে সে ছিল দেওঘরে। বাড়িতে আমার কে আছে? ভাই, বোন, মা, বাবা? আশ্চর্য, তারা কেউ ওকে দেখতে আসে না কেন! ও হ্যাঁ সুদক্ষিণা আসে। বেশ লাগে মেয়েটিকে। অনেক রকম গল্প করে। এমন সব কথা বলে—মনে হয় হেঁয়ালি! আর—আর কী যেন! সেই ভাঙা-ভাঙা সুরকাটা গানের মতন কথাটা! মনে পড়েছে : তুমি আমায় সত্যি চিনতে পারছ না? দেওঘরের কথা ভুলে গেলে? সেই মাঠ, বকুলগাছ!

চিনতে পারছে না। না, পারছে না। আর কী আশ্চর্য! বাণীব্রত দেওঘরে কী করছিল? অবাক হচ্ছি ভেবে দেওঘরে কী করছিলুম।

'কী ভাবছেন?' ডোরা প্রশ্ন করলে।

বাণীব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভরা চোখে ডোরার দিকে তাকিয়ে, 'বলতে পারেন, আমি দেওঘরে কেন ছিলাম?'

'পারি।' ডোরার চোখের দৃষ্টি বাণীর দৃষ্টির সঙ্গে মিশল, 'দেওঘরে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে।' ডোরার গলায় স্বর মৃদু হয়ে এল। প্রতিটা শব্দ সে উচ্চারণ করলে স্পষ্ট ভাবে। কোথায় যেন আচ্ছন্নতার আকর্ষণ ছিল তার কথা বলার ভঙ্গিতে, 'মনে পড়ছে না আপনার—সেখানে আপনি কী করেছেন?'

ধীরে-ধীরে বাণীব্রত তার মাথা নাড়লে। জ্বরের ঘোরে মানুষ যেমন ভাবে মাথা নাড়ে। অস্পষ্ট দুটি কথা তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝরে পড়ল, 'না। মনে নেই।'

'নেই নয়। মনে করুন। নীলা-নীলা কে?'

'জানি না।'

'দিব্যেন্দু?'

'কে দিব্যেন্দু?'

'ডাক্তার দিব্যেন্দু চক্রবর্তী—আপনার ভাই।'

'আমার ভাই!' বাণীব্রত অবাক হল, খুশি হল। আমার ভাই—আমার ভাই আছে। বলতে হবে কুমুদশংকরকে। হঠাৎ বললে বাণীব্রত, 'আমার ভাই আসে না কেন?'

'হাসপাতালে থাকার জন্যে।' ডোরার মুখে রহস্য ফুটে উঠল।

'আমায় দেখতে—।'

'ও!' ছোট্ট একটা শব্দ করে থেমে গেল ডোরা দত্ত। একটু পরে যেন তার হঠাৎ মনে পড়ল, এমনভাবে বললে, 'বাণীব্রতবাবু, আপনি বুঝি চশমা হারিয়েছেন?'

'হারিয়েছি কি না বুঝতে পারছি না। কোথায় যেন রেখেছিলাম।'

বাণীব্রত তখন অন্য কথা ভাবছে! এরা আমায় বাণীব্রত বলে। আশ্চর্য, মনোজ, মনোজ আমার নাম; বাণীব্রত নয়; তবু ওরা বলবে বাণীব্রত। আপত্তি জানালে বলে মনোজ তার নাম নয়, বাণীব্রতই তার নাম। কী কাণ্ড!...এরা কি নাম-ধাম সবই পালটে দিতে চায় নাকি? না, আর ভালো লাগে না এই মাথা-মোটাদের সঙ্গ। ভাইকে—কী নাম যেন তার ভাইয়ের।

'আপনি কী বললেন যেন নামটা?' বাণীব্রত প্রশ্ন করলে।

'নীলা!'

'চুলোয় যাক নীলা। ও নাম তো মেয়ের। আমার ভাইয়ের নামটা বলুন।

'দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু চক্রবর্তী।' আড়চোখে চাইল ডোরা।

বেশ নাম। দিব্যেন্দু। বাণীব্রত ভাবল—দিব্যেন্দুকে লিখতে হবে, হাসপাতাল থেকে নিয়ে

BanglaBook.org

যাওয়ার জন্যে। এতদিন কেন সে লেখেনি? ফেব্রুয়ারি—কুমুদশংকর বলেছে। না ফেব্রুয়ারি নয়—ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস থেকে এটা আগস্ট মাস। আমি গুনতে পারি। আট...আট মাস। এই আট মাস পাগলদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা কী সাঙ্ঘাতিক। আর ভালো লাগে না।

বাথটবের মধ্যে বসে বাণীব্রত ভাবছিল ঃ এত লোক এরা সবাই কি আমার মতন সমস্ত ভুলে গেছে? ওদের অতীত নেই? তপেন—ওই যে তপেন—বাচ্চা এক রত্তি ছেলে—কুড়ি বছরও বয়স হয়নি কুমুদশংকর বলে—ওই তপেনটাই বা কেন চোখে দেখতে পায় না? একদিন সকালে উঠে তপেন দেখল সব অন্ধকার; অন্ধ হয়ে গেছে সে। কত ডাক্তার, বড়-বড় নাম। কেউ চোখের, কেউ—। বাণীব্রত অজান্তে জল থেকে হাত তুলে তার মুখের ওপর বুলোলে। সেই ব্যথাটা যেন আরও বাড়ল দেখি। চোখের চারপাশে জমে বসেছে।...মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা পোকা দাঁত বসিয়ে কুরছে। চশমা—আ, চশমা না থাকার এত বিপদ!

বিশ্রী চিৎকার করে কে যেন কেঁদে উঠল। চমকে মুখ ফেরাল বাণী। সেই বদ্ধ পাগল প্রৌঢ় বিহারী ভদ্রলোক। নতুন এসেছে হাসপাতালে। সব সময় চিৎকার করছে।

'ডাকু হ্যায়—ইয়ে সব ডাকু হ্যায়—ছিনা লিয়া...বিলকুল কপাইয়া হামারা চোরি করকে পানি মে গিরা দিয়া—দে দেও—আগর...' লোকটা ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

'আর আমি পারছি না —উঠিয়ে নাও—কী গরম...ও বাবা—আর পারছি না—পুড়ে গেল—ফোসকা পড়ে গেল সারা গায়ে—হারামজাদি মাগি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।'

'চুপ করুন, বেশি চেঁচামেচি করলে আরও গরম জল গায়ে ঢেলে দেব।' তৃপ্তি—নার্স তৃপ্তি ধমক দিল।

ওই আর এক লোক—এমন বিশ্রী-বিশ্রী কথা বলে।

বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়াল মিসেস নাগ।

'নিন, খেয়ে নিন।'

'কী?'

'ওষুধ।'

'সাদা?'

'দুধের সঙ্গে মেশানো আছে।'

বাণীব্রত ওষুধ খেয়ে নিল। শাওয়ারের জল ঝরছে পাশের বাথটবে। কী ঝিরঝিরে ফোঁটা-ফোঁটা জল—হিস-হিস শব্দ।

'একটা কথা।'

'কী?' মিসেস নাগ ফিরে দাঁড়াল।

'এখানে আর আমি থাকতে পারছি না। সমস্ত মাথা কেমন করছে। আমাকে আমার কেবিনে যেতে দিন।'

মিসেস নাগ ভালো করে লক্ষ করল বাণীকে। কী যেন ভাবল মনে-মনে। বললে, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আমি ডাক্তার দাশগুপ্তকে জিগ্যেস করে আসছি।' মিসেস নাগ চলে গেল।

বিচিত্র কলরবভরা এই জায়গা। কী যেন বলে একে এরা—হাইড্রোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট। চিকিৎসার কী রূপ! এত চিৎকার গোলমাল আর কী বিশ্রী এই এক-একটা লোকের ব্যবহার!

ওই দেখো। বাণীব্রত দেখতে লাগল। কে একজন বাথটব থেকে উঠে পালাচ্ছিল। পড়ে গেল ছুটতে গিয়ে। নার্সরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে তুলল। লোকটার মাথা কেটে রক্ত ঝরছে।

BanglaBook.org

রক্ত। লাল রক্ত—মুখটা ভিজে গেছে রক্তে। করুণভাবে চিৎকার করছে। কিন্তু রক্ত—Red, colour of the blood—Red, colour of the teeth—White, colour of the hair—Black...টা, টা...টাটু...টুকলু...তুলতুল।

বাণীব্রতর চোখের সামনে বাথশাওয়ারের জলের ঝরনা হঠাৎ কেমন যেন গোল হয়ে ঘুরতে লাগল পাক খেয়ে-খেয়ে। অনেকটা সেই ঘূর্ণি আতসবাজির মতো। অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল জল-রেখার আবর্ত। একটু-একটু করে সেই অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে কার যেন ছায়া ফুটে উঠতে লাগল। দুর্বল রেখায় খাপছাড়া-ভাবে আঁকা ছাই রঙের ছবির মতো ফুটে উঠল একটি মুখ ঃ এলোমেলো চুল, দুটি বিনুনির আভাস; ছোট্ট কচিমুখ, দুষ্টু-দুষ্টু চোখ আর হাসি। তুলতুল, পিসিমা কেন 'আনটি'? আমি যে 'আনটি' বলি। তুলতুল—কী সুন্দর নাম তোমার খুকি।. ছবিটা—দাগ কাটা আয়নার মতো কিম্ভুতকিমাকার হয়ে এল। তুলতুল...আইভি—আইভি—মিত্র। বাবার নাম? জানি মশাই জানি।...বাণীব্রতর মাথার মধ্যে পোকাটা বুঝি সবকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দিল। উঃ। মনে পড়েছে—অমরবাবুর মেয়ে—ইংরেজিতে তার মাসি তাকে রং চেনা শেখাত দোলনায় দুলতে-দুলতে। ডাক নাম তুলতুল.. ভালো নাম আইভি মিত্র। কোথায় এই খুকিটিকে দেখেছিল বাণীব্রত? কী করে ভাব হল?

বাণীব্রতর স্মৃতি আবার নীরব হয়ে গেল। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল আচমকা। কালো পরদা এসে ঢেকে দিল অতীত। শাওয়ারের জলের হিসহিস শব্দ ভেসে উঠল।

'চাকুসে নেহি রে ভাই—আঁখসে দিল তোড়া।' বিহারী ভদ্রলোক চোখ টিপে হাসছে। বীভৎস তার মুখভঙ্গি।

'বাড়ি ভাড়া না দিলে তুলে দেবে, ঘাড় ধরে মারতে-মারতে বের করে দেবে। মাইরি আর কি? আমি বাড়িউলির বেয়াই না।' আপনমনে বকে চলেছে আর একজন।

তপেন তৃপ্তির হাত ধরে উঠে আসছে বাথটব থেকে। কে যেন গান গেয়ে উঠল—করাত-চেরা গলায় ঃ

'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম...না...ম কানেরও...।'

'তোমরা কেউ করো না মানা। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে খুকু খাবে ছানা।'

ছড়া। তুলতুলের মুখে সব সময় লেগে থাকত ছড়া। সেলুলয়েডের পুতুল বুকে করে দোলাতে-দোলাতে ছেলে ভুলোনো ছড়া কাটত তুলতুল। চালাক-চতুর বুদ্ধিমতী মেয়ে। পিসি সে বলবে না। বলবে 'আনটি', মাসি তাকে শিখিয়েছে। বলত কী, 'ঘুড়ি লাটাই চুরি করে পালিয়ে গেল বর। ছাদনা-তলায় নাতনি আমার বাঁধাল পাঁচ জ্বর। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল খুঁজতে নতুন বর। অবশেষে পেলাম খুঁজে...।' কোথায়, কোথায় খুঁজে পেল তাকে তুলতুল? আহা, সুন্দর একটা মিল ছিল শেষে—শিলচর, ঘুন্টিঘর, ঘর...ঘর.....দেওঘর।

বাণীব্রত আনন্দে অদ্ভুত একটা চিৎকার করে উঠল।...মনে পড়েছে। দেওঘর। তুলতুলকে ইংরিজি আর রং চিনতে শেখানো। ছড়া। দোলনা। 'আনটি'। মাসি। সুদক্ষিণা।

সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণা দেওঘরের গল্প বলে। কিছুতেই ভাবতে পারছি না—মনেও আসে না ঃ বাণীব্রত মনে-মনে ভাবে দেওঘরে আমি কী করছিলাম। সুদক্ষিণা কে?

মিসেস নাগ অবশেষে এসে পড়ল।

'উঠুন।'

মুখ তুলে তাকাল বাণীব্রত। মিসেস নাগ বোধহয় আবার কোনও ফ্যাসাদ জুটিয়ে আনল। বিরক্তি ফুটে উঠল বাণীব্রতর দৃষ্টিতে।

'ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে কেবিনে ফিরে যেতে পারেন।'

পারি বইকী, অবশ্যই পারি—উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ভাবল বাণীব্রত, ইচ্ছে করলে আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। একটা চিঠি লেখার যা কষ্ট। তারপর—।

BanglaBook.org

*

আর একদিন।

দুপুরে হঠাৎ ঝড় উঠল। হাওয়ায়, পাতায়, ধুলোতে মিলে মিশে সে এক তাণ্ডব। গাছের ডাল ভাঙল, ধুলোর ঝড়ে ঘর গেল ভরে। ফাঁকা মাঠে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতা উড়তে লাগল।

নিজের কেবিনে চুপটি করে বসে বাণীব্রত ঝড় দেখছিল। কাঁঠাল গাছের পাতা-কাঁপা শব্দে আর পাখিদের পাখা ঝাপটানোর মাঝে কোথায় যেন হাতছানি আছে। সে হাতছানি পেয়েছে বাণী। ওইরকমই একটা ঝড় উঠেছে তার মনে। তার নাম নেই, ধাম নেই—স্থান, কাল, পাত্র কিছুই না। শুধু ঝড়। ঝড়ের গর্জন বুঝি কানেই শুনতে পায় বাণী। বুঝতে পারে এবার আকাশ বাতাস মাতাল করে দুর্যোগ দেখা দেবে। তাই দিক। ঈশ্বর, তাই হোক। এ বোবা, পাথর চাপা, অজ্ঞাত অতীতকে তুমি ভেঙে চুরে, তছনছ করে দাও। একটি বার। শুধু একটি বার। আমি কে? কী আমার পরিচয়? কোথায় আমার বাড়ি। আমার ভাই বোন? তাদের পরিচয়? সুদক্ষিণা? দেওঘর? তুলতুল? ভালো হয়ে উঠবে তুমি—কুমুদশংকর বলেছে। ডিসেম্বর থেকে আগস্ট। হাসপাতালে আট মাস কেটে গেল।...

'এই যে, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন?' ডোরা দত্ত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা অ্যাপ্রন গায়ে। ফরসা চশমার ঝিলিক তোলা ছোটখাটো একটা মুখ, বোকা-বোকা চোখ, পাতলা ঠোঁট। এত নরম মনে হয় ওর গা। কথাবার্তাগুলো শুধু যদি আরও একটু নরম হত। এমন সুন্দর মিষ্টি গলায় ও যে কী করে কথা বলে ডাক্তারি চালে!

'কী দেখছেন?'

'আপনাকে।' বাণীব্রত গাল থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'আমায়! আমায় দেখবার কী আছে?' বিলাতি হাসি হাসল ডোরা।

'বেশ দেখতে আপনাকে। বেখাপ্পা, বেঢপ। কপাল ছোট, থুতনি চ্যাপটা, ছোট চোখ—বোগা—বোকা—' বাণীব্রত হাসতে লাগল অদ্ভুতভাবে।

ডোরা সন্দেহ করল— কোনও কারণে আজ বাণীব্রতর মেজাজ বিগড়েছে। ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুত হয়ে নিতে লাগল ও।

'বেশ, আমি না হয় দেখতেই খারাপ—কিন্তু তা' বলে তো আর হতকুৎসিত নই?'

'কুৎসিত কে নয়?'

'সেকি—সকলেই কুৎসিত।'

'মানুষ মাত্রেই।'

'আপনি?'

'আমি কি মানুষ নই?'

ডোরা দত্তর বুক বুঝি একটু কেঁপে উঠল। ভেসে যাওয়া মেঘের মতন তার মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল এক ফালি ছায়া।

'একটু বেহালা বাজান না শুনি।' হাসল ডোরা দত্ত। ঘরের কোণ থেকে বেহালাটা এনে বাণীর কোলে রাখল।

বেহালা তুলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল বাণীব্রত।

খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে গেল।

'কী হল?' বললে ডোরা।

টুং-টাং করে মৃদু ক'টা শব্দ উঠল। আনমনে আঙুল দিয়ে আঘাত করল বেহালার তারে। বললে বাণীব্রত, 'ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?'

'না-না, ঠাট্টা কেন করব?' ডোরা বাণীব্রতর পাশে ঘন হয়ে সরে এল।

'ঠাট্টাই তো! আমি কি বুঝি না? সুর তুলতে গিয়ে বেসুরো বাজাব। পূরবীর সঙ্গে সাহানা

BanglaBook.org

মিশে যাবে।' বাণীব্রত করুণভাবে বললে।

'তা কেন? আপনার কি কিছুতেই একটা রাগ বা রাগিনী পুরো মনে থাকে না?'

'না। চেষ্টা করি—পারি না। ও ঠিক মিশে যায়।'

'ও!' একটু থেমে—'আচ্ছা, আমি যদি গান গাই? তাহলে?'

'কী করে বলব?'

'চেষ্টা করুন না?'

ডোরা কেবিনের দরজার কাছে এসে চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিল। দরজা দিল ভেজিয়ে। তারপর বাণীব্রতর পাশে এসে বিছানায় বসল।

'খুব আস্তে-আস্তে আমি গাইছি। আপনি বাজান।'

বাইরে ঝড়ের গর্জন। কেবিনের ভেতরে মুখোমুখি ডোরা আর বাণীব্রত, সুর আর স্বর। সহজ একটা রাগিনী বেছে নিয়েছিল ডোরা। বাণীব্রতর যাতে কষ্ট পেতে না হয়। সুর না কাটে। ...তবু সুর কাটল।

'ভুল হল!' ব্যথাহত হয়ে বললে বাণী।

'হল! আপনি পুরোপুরি মন দিতে পারছেন না।'

'আমি পারি না।'

'পারেন। আমি বলছি—আপনি পারেন।' ডোরা বাণীর হাত থেকে বেহালা নিয়ে বিছানার ওপর রাখল। ঘন হয়ে এল আরও। বাণীব্রতব চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ডোরা বললে, 'তাকান তো আমার দিকে।' ডোরার গলায় এমন একটা মাদকতা মাখানো আদেশ ছিল যে বাণীব্রত না তাকিয়ে পারল না।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ডোরার দৃষ্টি যেন বদলে গেল। ধীর, স্পষ্ট, সংযত গলায় বললে সে, 'বলুন, আপনার নাম?'

'মনোজ।'

'না। আসল নাম কী আপনার?'

'মনোজ।'

'না। ঠিক করে বলুন। এখানে কেউ নেই। আপনার নাম?'

'মনোজ।'

'মনোজ নয়, বাণীব্রত।'

'বাণীব্রত।'

'বাড়ি?'

'দেওঘর।' বাণীব্রত মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে যেতে লাগল।

'দেওঘরে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে। বাড়ি আপনার কলকাতায়।

'কলকাতা।'

'দেওঘরের কথা মনে করার চেষ্টা করুন : আপনি, আপনার বন্ধু বিভূতিবাবু, তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী—'

'তুলতুল।' ডোরাকে বাধা দিয়ে বললে বাণীব্রত আচমকা।

'কে তুলতুল?'

কে তুলতুল। কী কাণ্ড দেখেছ? কে তুলতুল তাই বলতে হবে। বাণীব্রত অবাক হচ্ছিল ডোরার কথা শুনে। তুলতুল কে? কে আবার? একটা ছোট্ট মেয়ে। ছড়া কাটত, ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে দোলনায় দুলত।

'কে তুলতুল?' ডোরা আবার প্রশ্ন করলে।

BanglaBook.org

'ছোট্ট মেয়ে। ছড়া কাটত সারাদিন। পিসিকে বলত আনটি।' বাণীব্রত যেন চোখের সামনে দেখতে পেল তুলতুলকে।

'ও। আর কাউকে মনে পড়ে না?'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল। ডোরা কী ভেবে বাণীব্রতর মুখের কাছে আরও ঘন হয়ে এল। বাণীব্রতর কানের কাছে ডোরার ঠোঁট নড়তে লাগল—আস্তে-আস্তে, থেকে-থেকে।

'আপনার ভাই ডাঃ চক্রবর্তী। মনে করুন—মনে করুন তাকে। ডাঃ চক্রবর্তী।...একদিন আপনার বন্ধুর বউয়ের অসুখ করল। ডাক্তার এল দেখতে। তারপর?'

'ভাই? কী মুশকিল! আমার ভাই তো তোমার কী? সে বুঝি ডাক্তার? অসুখ হলে ডাক্তার আসবে না তো আসবে কে, ধোপা!'

'রাত হল। অনেক রাত। আপনি চুপি-চুপি বাড়ি থেকে বেরুলেন। পকেটে পিস্তল।' বাণীব্রতর কানে ডোরার ঠোঁট মিশে এল।

বাণীব্রত সেই কথার সুরে কেমন যেন অভিভূত হয়ে ওঠার উপক্রম করল। অনুভব করল কোথায় একটি অস্বস্তি জমে উঠে সর্বাঙ্গে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।...আধো-ঘুমের মধ্যে সুদূর থেকে ভেসে আসা ঝড়ের সুরে নিজের অস্তিত্ব যেমন তলিয়ে গিয়ে অস্বস্তি জমা হয়—এও তেমনি।

সাপ চলার সুরে প্রতিটি বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। আর প্রতিটি বাক্য অর্থবহ—মোহসঞ্চারী, উত্তপ্ত।

'রাত। অনেক রাত। পিস্তল পকেটে করে আপনি চুপিচুপি এলেন ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়িতে। মনে পড়ছে না? পড়বে। নিশ্চয় মনে পড়বে। তারপরের কথা মনে করুন। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি আর আপনার ভাই ডাঃ চক্রবর্তী। তারপর?'

বাণীব্রত নীরব, নিশ্চল।

'তারপর?' ডোরা শব্দ দিয়ে ওর মনের দরজায় আবার আঘাত দিলে। ভেঙে দিতে চাইল কঠিন অর্গল।

কেবিনের ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মিসেস নাগ। ঘরের মধ্যেকার অবস্থা দেখে বেচারা হকচকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে মিসেস নাগ শব্দ করে কাশল।

কাশির শব্দে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে চাইল ডোরা। ক্ষণিকের জন্যে তার মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিল।

'ডাক্তার দাশগুপ্ত বললেন, বড় দেরি হচ্ছে। তিনি অপেক্ষা করছেন, শীঘ্রি আসুন।'

সামলে নিল ডোরা নিজেকে। ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বলল, 'ভদ্রলোক একটু মুষড়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। সামলে নিয়েছেন। এখুনি আসছি।'

মিসেস নাগ বিদায় নিল।

'আসুন।' ডোরা দাঁড়িয়ে উঠে বাণীব্রতকে ডাকলে।

বাণীব্রত উঠল না। মুখে চোখে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে—ওকে দেখলে কষ্ট হয়।

ডোরা আবার ডাকলে, 'আসুন—দেরি করবেন না।' হাত ধরে টানল ডোরা।

বাণীব্রত উঠল। উঠবার সময় তার হাত পড়ল বেহালাটার ওপর। বিছানা থেকে নেমেই খপ করে বেহালাটা তুলে আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে।

অবাক হয়ে ডোরা বললে, 'ও কী? ওটা থাক।'

সজোরে মাথা নাড়ল বাণীব্রত। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল বেহালাটা বুকের ওপর।

বাণীব্রতকে নিয়ে ডোরা এসে দাঁড়াল একটা ছোট ঘরে। ঘরটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গে বাণীব্রত মনে করতে পারল, এর আগে শক নিয়েছে সে এখানে। নতুন করে ঘাবড়াবার কিছু নেই। বাণীব্রত

BanglaBook.org

আর ভাবে না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ। বাণীব্রতর মনে হল গন্ধটা যেন আঁশটে মতন। দেওয়ালে ঘোলাটে লাল কাচ বসানো।

'শুয়ে পড়ব?' বাণীব্রত বললে।

'হ্যাঁ, শুয়ে পড়ুন।' সামনের নার্সটি বললে।

অপারেশন টেবিলের মতন একটা টেবিল ছিল সামনে। বাণীব্রত জানে, ওর ওপর গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। টেবিলে শোওয়ার জন্যে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ও।

টেবিলের ওপর উঠে বসতেই কিন্তু আর এক বিপদ ঘটল। ডোরা দত্ত ওর হাত থেকে বেহালাটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালে।

'দিন।'

'না।' বাণীব্রত সজোরে মাথা ঝাঁকুনি দিল।

'না কী? টেবিলের ওপর আপনাকে শুতে হবে যে।' ডোরা বেহালাটা হাতে করে ধরল।

এক টান মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে বাণীব্রত বললে, 'ছোঁবেন না।'

'What's the trouble?'

বাণীব্রত তাকাল। একটা লোক টেবিলের সামনে এগিয়ে আসছে। ডাঃ দাশগুপ্ত। ডাক্তার। সাদা কোট পরা ডাক্তার। বাণীব্রত চিনতে পারল।

'কী হল? এই যে বাণীব্রতবাবু? তারপর কেমন আছেন আজ?'

'ভালো।'

'বেহালাটা দিন।' ডোরা এবার একটু রেগে উঠেছে মনে হল।

'না।' বাণীব্রত পিঠের পাশে আড়াল করলে তার বেহালা।

প্রণব বেশ খানিকটা অবাক হয়ে বাণীব্রত আর ডোরাকে দেখতে লাগল। কী ব্যাপার? হঠাৎ!

ডোরা ইঙ্গিতে সামনের আর-একটি নার্সকে ডেকে বাণীব্রতকে ধরতে বলল।

নার্সটি পিছন দিকে যেতেই বাণীব্রত হাত ঘুরিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল বেহালা। ডোরার দিকে ধকধকে চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ও।

বোধহয় আত্মসংবরণ করা একান্তই কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই অনেকটা মরিয়া হয়ে ডোরা বাণীব্রতর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেহালাটা কেড়ে নেওয়ারে চেষ্টা করলে। পারলে না।

'Stop it.' প্রণবের কঠিন গলা। ফিরে এল ডোরা। পিছনের নার্সটিও নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

'What's the matter!'

'বেহালাটা কিছুতেই উনি দেবেন না।' ডোরা বললে। জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আচ্ছা, আমি দেখছি। আপনি তেরো নম্বর পেশেন্টের সেনসোরিয়াম টেস্টটা সেরে নিনগে যান।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডোরা চলে গেল। যাওয়ার আগে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে নিল বাণীব্রতকে।

ডোরা চলে যেতে প্রণব বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়াল। হেসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'আপনার বেহালাটা আমায় দিন। এখন আপনি এই টেবিলের ওপর শুয়ে পড়বেন সেই আগের মতো। জানেন তো সবই!'

প্রণব টেবিলের পাশ থেকে আলগা ঝুলোনো একটা স্ট্র্যাপ তুলে নিল।

বাণীব্রত আপত্তি করলে না। বেহালা তুলে দিল প্রণবের হাতে।

প্রণব বেহালাটা নিয়ে একজন নার্সের হাতে দিল।

'শুয়ে পড়ুন।'

BanglaBook.org

বাণীব্রত শুয়ে পড়ল। নার্স তার বুক থেকে পা পর্যন্ত তিনটে চওড়া আলগা স্ট্র্যাপ জড়িয়ে দিল।

বাণীব্রতর পিঠের তলায় একটা বালিশের মতো প্যাড গুঁজে দিতে-দিতে বললে প্রণব, 'মিস দত্তর ওপর অনর্থক চটে গেলেন কেন? তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছিলেন।'

পিঠের তলায় প্যাড দেওয়া শেষ হলে বাণীব্রতর ভীষণ অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পিঠটা এমন এক অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে। বাণীব্রতর চোখের দৃষ্টি আটকে থাকল সেই ঘোলাটে লাল কাচের গায়। দেওয়ালে কাচটা গাঁথা। তুমি চেষ্টা করলেও আর চোখ ফেরাতে পারবে না। বাণীব্রত জানে এখুনি ওই কাচটা জ্বলতে থাকবে। আর তারপর সে আর কাচ জ্বলা দেখতে পাবে না। কে একজন—ও নিশ্চয় নার্স। বাণীব্রত বুঝতে পারল, বিকট-গন্ধ মলম ওর কপালের পাশে রগে ঘষে দেওয়া হচ্ছে। কী ঠান্ডা মলম!...আ—এই যে এইবার এইবার! হ্যাঁ, মাথায় আটকে দিয়েছে। কী অদ্ভুত জিনিস। টেলিফোন অপারেটাররা সেই যেমন মাথার ওপর দিয়ে কানে ঝুলোনো পরে অনেকটা তেমনি। কপালের দুপাশে রগে আটকে গেল।

কথা বলবার জন্যে বাণীব্রত মুখ খুলতেই প্রণব রবারের একটা গোঁজ ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

'That's well! Thank you! Be ready, nurse!'

...এক...দুই তিন...মাত্র ক'টা মুহূর্ত—তারপরই বাণীব্রতর চেতনায়, স্নায়ুতে বিদ্যুতের তীব্র একটা শিহরণ। হাত-পা গুলো বাঁধন থেকে ছেঁড়বার জন্যে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল ও। ...তীব্র বিকট চিৎকার। সব নিস্তব্ধ...মাত্র একটা বৈদ্যুতিক আঘাত...বাণীব্রতর সমস্ত ভাবনা, দুঃখ, উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল।

কালো মেঘের ঘনঘটার পালা কবে একদিন ফুরিয়ে গেল। আকাশ জুড়ে হাসতে থাকল উজ্জ্বল নীল স্রোত, স্বচ্ছ রোদ। বাতাসে কোথায় যেন একটা গান গুনগুনিয়ে উঠেছে—শ্যামল প্রান্তরের সবুজে সে গানের ধুয়া।

শরৎকালের এমনি এক সকাল। বাণীব্রত তার কেবিনে একলা বসে একটা বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছিল। সামনের জানালা খোলা। চোখ তার বইয়ের পাতা থেকে কখন সরে এসে থেমে গেছে হাসপাতালের রাস্তার ওপর।

ক'টা বাজে এখন? বাণীব্রত ভাবছিল : আটটা কি বেজে গেছে? বোধহয় এখন বাজেনি। একটা ঘড়ি থাকলে বেশ হত। ইচ্ছেমতো সময় জানা যেত।

রাস্তার ওপর মূর্তি ভেসে উঠল; অস্পষ্ট দুটি নরনারী। ইজিচেয়ার থেকে উঠে বাণীব্রত জানালার কাছে এসে ঝুঁকে তাকাল। না, চেনা যাচ্ছে না। চোখের জন্যে দূরের জিনিস কিছুই সে দেখতে পায় না। কতবার চশমার কথা বলেছে।...কারুর সেদিকে একটু নজর নেই। এ কেমন কথা। তার চশমাটা ফেরত দিয়ে দিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। এখন দেখছি ডোরাকে বলে কিছু হবে না। প্রণববাবুকেই বলতে হবে।

ডোরা মেয়েটি যেন কেমন। কী যে বলে তার মাথা-মুন্ডু নেই। দেওঘরের এত কথা সে জানল কী করে—কে জানে। সে বলে আমি যখন দেওঘরে ছিলুম, সেও ছিল, সেখানে। আমার সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয় তার। কত গল্প, বেড়ানো, গান। তারপর একদিন...

সেই একদিনের কথা নিয়েই যত ফ্যাসাদ। আসলে ডোরা কী যে বলতে চায় বাণীব্রত ঠিক

BanglaBook.org

বুঝতে পারে না। মাঝরাতে পিস্তল হাতে করে সে কোথায় গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল। কিছুই মনে পড়ে না বাণীব্রতর। অথচ যখন-তখন কানের কাছে ডোরা তাকে ওই একটা কথাই বলবে। কেন যে ডোরা এসব কথা বলে কে জানে। আর কী আশ্চর্য। বাণীব্রত কতবার—বোধ হয় হাজার, লক্ষ কোটিবার শুনল—তার ভাই, বন্ধু, বউদি—এদের নাম, এদের বিষয়ে কত কথা—কিন্তু কাউকে তার একবারের জন্যেও মনে পড়ল না। শুধু তার মনে পড়ে তুলতুলকে—আর বুঝি খুব অস্পষ্টভাবে আর একজনকে। মনে ঠিক পড়ে না—ভাবতেও পারে না বাণীব্রত তার মূর্তি। ধোঁয়াটে, তালগোল পাকানো কেমন যেন একটা অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে পারে বাণীব্রত।

কে সে। ডোরা, সুদক্ষিণা?

সুদক্ষিণা—সুদক্ষিণা ঃ বিড়বিড় করে বাণীব্রত উচ্চারণ করলে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল আগের মতোই।

সুদক্ষিণা এখনও আসছে না। আটটা কি বাজেনি? বেশ লাগে তার এই সুদক্ষিণাকে। এত মিষ্টি স্বভাব, কেমন নরম তার চাউনি। আমি তার কে? সে বলে আত্মীয়, বন্ধু। বোধ হয় তাই। এত মায়া, এ আর কারুর নেই.

'কে!' বাণীব্রত চমকে উঠে মুখ ফেরাল।

'কার কথা ভাবা হচ্ছে?' বাণীব্রতর পিঠ থেকে হাত সরিয়ে ডোরা ঠোঁটের কোণে বাঁকা করে হাসল।

'ও, আপনি!'...বাণীব্রত হাতের বইখানা ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর।

'কী ভাবছিলেন অত তন্ময় হয়ে? গায়ে হাত না দিলে হুঁশ হত না বোধ হয়।' ডোরা কাচ ভাঙার মতো শব্দবহুল তীক্ষ্ণ হাসি হেসে কথা শেষ করল, 'নিশ্চয় বান্ধবীর কথা ভাবছেন!'

বাণীব্রত বোধ হয় পছন্দ করল না অমন হাসি। জানালা থেকে সরে এসে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল আবার।

একটু অপেক্ষা করে ডোরা বললে, 'কই, কথার উত্তর দিলেন না?'

বাণীব্রত চোখ তুলে তাকাল শুধু।

'কথা বলবেন না বুঝি?'

বাণীব্রতর চশমা নেই, চোখও বোধহয় নেই। থাকলে দেখতে পেত ডোরার ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। সম্ভবত তার পাতলা ঠোঁটের কোণে এক ফালি অভিমান ফুটে উঠেছে।

বাণীব্রত কিছু না বুঝলেও কথা বললে, 'কী বলব?'

'জানেন না কী বলতে হয়?'

বাণীব্রত মাথা নাড়লে।

ডোরার গালে মাংসপেশির কুঞ্চন দেখা দিল। বিদ্রুপে ক্ষুরধার হয়ে উঠল তার রসনা, 'জানেন সবই। বান্ধবীটির সঙ্গে সন্ধেবেলায় বাগানে বসে গল্প করার সময় পাগলামির বাষ্পও তো আপনার মগজে থাকে না। দিব্যি তার হাত ধরে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরালা নির্জন জায়গায় ঘর বাঁধার ষড়যন্ত্র করেন! যত বুঝি মাথার গোলমাল আমাদের কাছে?' সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠল ডোরার দৃষ্টি।

'হাসপাতাল আমার আর ভালো লাগে না!' বাণীব্রত সহজভাবে বললে।

'তা জানি।'

'আপনার কথাবার্তা যেন কেমন। কিছু বুঝতে পারি না।'

'সবই পারেন। যেটুকু পারছেন না—তাও শীঘ্রি বুঝতে পারবেন।' ডোরা হাতের চিঠিখানা বাণীব্রতর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডোরা চলে যাওয়ার পর বাণীব্রত চিঠি হাতে চুপ করে বসে থাকল।

BanglaBook.org

কেন ও এমন করে? বাণীব্রত ভাবছিল। অযথা অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কী? ডোরা যেন কেমন হয়ে গেছে আজকাল। আগে প্রথম-প্রথম ডোরা যখন হাসপাতালে এল তখন এই মেয়েটিকে বেশ লাগত ওর। বাণীব্রত সে-সব কথা মনে করতে পারে সহজেই। অনেক যত্ন, সাহায্য, সহানুভূতি, জুটেছে তার কাছ থেকে। বলতে গেলে ডোরা তখন যেন ঠিক মেয়ে—হাঁ মেয়েদের মতনই ছিল, আর এখন ও হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারেই ডাক্তার। মায়া, মমতা শুকিয়ে গেছে তার বুক থেকে। কিন্তু তাই কী? বাণীব্রতর হাত থেকে চিঠিখানা খসে মেঝের ওপর পড়ল। মিটশেফের পায়ার কাছে পড়ে রয়েছে খামখানা, বাণীব্রত দেখল—তবু, তবু তার কোনও আগ্রহ নেই চিঠির জন্যে। কুমুদশংকরের চিঠি। বাণীব্রত জানে ও চিঠি কুমুদশংকরের। এ জগতে ওই একটা মাত্র লোক আছে যে তাকে চিঠি লেখে। কী লিখেছে কুমুদশংকর বাণীব্রত জানে না। বোধ হয় চাকরি পাওয়ার খবর। এমনও হতে পারে সে বিয়ে করছে তার সংবাদ।

'একটু দেরি হয়ে গেল।' ঘরে পা দিয়ে সুদক্ষিণা বললে। এগিয়ে এল বাণীব্রতর পাশে।

সুদক্ষিণার গলার স্বরে বাণীব্রত মুখ তুলে তাকাল।

'দুপুরেই আমার ট্রেন। গোছগাছ সেরে এলুম একেবারে।' টুল টেনে নিয়ে বাণীব্রতর পাশে বসে পড়ল সুদক্ষিণা। শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিতে-নিতে বলল, 'কী করছিলে চুপচাপ বসে?'

বাণীব্রত সুদক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কেমন যেন একটু বেশি ফরসা দেখাচ্ছে ওকে। ভিজে চুল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

'কী দেখছ?' সুদক্ষিণা অস্বস্তি বোধ করলে।

বাণীব্রতর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কোনও জবাব না দিয়েও শুধু দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

বাণীব্রতব হাসির মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে সুদক্ষিণা আবার বললে, 'হাসছ যে। কী হল হঠাৎ হাসির?'

মাথা নাড়ল বাণীব্রত। বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি আমাব বান্ধবী?'

প্রশ্নটা যেমন বেয়াড়া, তেমনি অযথা। সুদক্ষিণার অন্তত তাই মনে হল প্রথমটায়। কেমন যেন লজ্জা পেল ও।

'তোমার কী মনে হয়?' পালটা প্রশ্ন করলে সে।

'আমার?' বাণীব্রত ভাববার চেষ্টা করলে, 'আমার কিছুই মনে হয় না।'

'কিছু না?'

'না।'

'তাহলে আমি তোমার কিছুই না।' সুদক্ষিণা এবার মুখটিপে হাসল।

'তবে মিস দত্ত এ কথা বললে কেন?'

'কে বলেছে, মিস দত্ত?' সুদক্ষিণার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কী খানিকটা ভেবে সে বললে, 'এমনি বলেছেন বোধ হয়!'

বাণীব্রতর চোখ পড়ল মেঝেয় লুটোনো চিঠিটার ওপর। ঝুঁকে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিল ও।

'কার চিঠি?' সুদক্ষিণা জানতে চাইল।

'কুমুদশংকরের।' খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল বাণীব্রত। অল্প একটু নীরবতা। চিঠি পড়া শেষ করে বাণীব্রত বললে, 'ও বিয়ে করছে। খুব শীঘ্রি তার বিয়ে। আমায় নেমন্তন্ন করেছে। লিখেছে, আমি সেরে উঠে যেন—' বাণীব্রত হঠাৎ থেমে গেল।

সুদক্ষিণা একটু অপেক্ষা করে বললে, 'কী? তুমি সেরে উঠে!'

বাণীব্রত মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা পিষতে লাগল।

'আমি কবে সেরে উঠব বলতে পারো?'

বাণীব্রতর গলার স্বরে বেদনা ফুটে উঠল। সুদক্ষিণার বুকেও সে বেদনার ছোঁয়া লাগল।

BanglaBook.org

'আমি তো ডাক্তার নই। কবে সেরে উঠবে তা কী করে বলব? তবে এবার সেরে উঠবে। ভেব না।'

'কী জানি। আমার কিন্তু আর একমুহূর্ত ভালো লাগে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।' বাণীব্রত হাতের তালগোল-পাকানো চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সুদক্ষিণা বুঝতে পারল বাণীব্রতর মনে কীসের বিরক্তি আর ক্লান্তি জমা হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের এই একঘেয়ে বিস্বাদ জীবনকে সহ্য করা যে কত কঠিন সুদক্ষিণা আজ তা বুঝতে পেরেছে।

বাণীব্রতর মনের মেঘ কাটাবার চেষ্টা করল ও। আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিল, 'সেরে উঠে তুমিও একটা বিয়ে করে ফেল, কেমন?'

বাণীব্রত সে কথার কোনও জবাব দিল না। শুধু লক্ষ করতে লাগল সুদক্ষিণাকে। কেমন হাসছে দেখেছ?

'আমায় তখন নেমন্তন্ন করবে তো?' সুদক্ষিণার হাসি আরও উজ্জ্বল হল।

'না।'

'সে কী? আমায়।'

'তোমাকেই তো বিয়ে করব।' বাধা দিয়ে অম্লান কণ্ঠে বাণীব্রত বলে বসল। কথায় তার না একটু সংকোচ, না দ্বিধা।

সুদক্ষিণার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। কেমন যেন উষ্ণ হয়ে উঠল তার মুখখানা। চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে এল। রুদ্ধ আবেগের তরঙ্গ এসে কাঁপিয়ে তুলল ঠোঁট দুটি।

বাণীব্রত বুঝি সুদক্ষিণার এই আকস্মিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ করছিল। কিংবা হয়তো ভাবছিল, ডোরা না সুদক্ষিণা কে বেশি সুন্দর।

নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল সুদক্ষিণার। রুমাল আনতে ভুলে গিয়েছিল ও। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছে সুদক্ষিণা উঠে দাঁড়াল।

'উঠলে যে!' বাণীব্রত বললে।

'এমন অসভ্য হয়েছ আজকাল তুমি।' সুদক্ষিণা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি কি কিছু অন্যায় করলাম? বাণীব্রত মনে-মনে ভাবতে শুরু করলে। জিভ থেকে যেন হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল। সুদক্ষিণা কি বিবাহিতা? ওর কাছে ক্ষমা চাইব নাকি? ক্ষমা।

'সুদক্ষিণা!' বাণীব্রত ডাকল।

সুদক্ষিণা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। হালকা দুটি মেঘ কেমন জড়াজড়ি করে মিশে যাচ্ছে এক হয়ে। একটা পাখি শূন্যে পাখা ভাসিয়ে পা এলিয়ে কোথায় ভেসে চলেছে কে জানে।

'সুদক্ষিণা!' বাণীব্রত আবার ডাকল।

'কী, বলো?'

'শোনো। এসো না এখানে?'

সুদক্ষিণা ফিরে এসে টুলটার ওপর বসল একটু। বাণীব্রত ওর মুখের দিকে তাকাল একটু। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে করো না। আমি কী বলতে কী বলে ফেলি—নিজেই বুঝি না। তোমার—'

'থামো। আমি কিছু মনে করিনি।'

'করনি।'

সুদক্ষিণা মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, না?'

BanglaBook.org

সুদক্ষিণার হাসি পেলেও সে হাসতে পারল না, বরং একটা দুঃখের বোঝা তার বুকে চেপে বসল। তবু বললে, 'দেখতে পাচ্ছ না?'

বাণীব্রত যে কী দেখবে তা সে বুঝতে পারে না।

'না। আমার চশমা হারিয়ে ফেলেছি। সব কিছু ঝাপসা দেখি—অস্পষ্ট। কিছু দেখতে পাই না পরিষ্কার। এত কষ্ট হয়।'

ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়ার কোনও দরকার নেই। এ তো তার সব কিছু জেনে শুনে নিজের হাতে তুলে নেওয়া। সুদক্ষিণা এত দুঃখেও তাই হাসল।

'হিন্দুর মেয়ে। স্বাভাবিক সংস্কারটুকু মানি বইকী। বিয়ে হলে আমার সিঁথিতে সিঁদুর থাকত। তাই কি আছে?'

বাণীব্রতর মাথার মধ্যে যেন সেই পোকাটা দাঁত বসাল আবার। কেমন যেন একটা তীব্র ব্যথা তার বোধের শাখা-প্রশাখায় বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বয়ে গেল।

তাই তো। কী আশ্চর্য। ওর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। তা হলে সুদক্ষিণার বিয়ে হয়নি।

সুদক্ষিণা অন্য কথা ভাবছিল। বললে, 'তুমি চশমার কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, আমার চশমা। চশমার অভাব বোধ করি বড়।'

'কিন্তু চশমা তো তুমি পরতে না?'

'কী যে বলো।' বাণীব্রত হেসে উঠল, 'চশমা আমি পরতাম। চিরকালই পরতাম।'

সুদক্ষিণা ভীষণ অবাক হল। বাণীব্রতকে কোনওদিন সে চশমা পরতে দেখেনি দেওঘরে।

'দেওঘরে কিন্তু কোনওদিন তুমি চশমা ব্যবহার করনি। আমি তো কোনওদিন দেখিনি তোমায় চশমা পরতে।'

'তাই নাকি। আমার কিন্তু চশমা ছাড়া চলবে কী করে? তোমার হয়তো মনে পড়ছে না।'

'দেওঘরের কথা তোমার মনে পড়ছে?'

'না। তা মনে পড়লে তো সব গোলমালই চুকে যেত।' বাণীব্রত হঠাৎ একটু হেসে সুদক্ষিণাকে আরও সরে আসতে বলল কাছে। কিছু একটা ও বলবে এমন ভাব।

সুদক্ষিণা টুলটা আরও একটু সরিয়ে নিল।

'আমায় একটা কথা সত্যি করে বলবে?' খুব ধীরে প্রশ্ন করলে বাণীব্রত।

'বলো।'

'তুমি দেওঘরে আমার সঙ্গে তো ছিলে?'

'হ্যাঁ। এক বাড়িতে, এক সাথে।'

'আমার ভাইকে তুমি চেন?'

'না। নাম শুনেছি।' সুদক্ষিণা মনে-মনে বিপদ গুনছিল।

'বলতে পারো আমি একদিন রাত্রে পিস্তল হাতে ভাইয়ের বাড়িতে কেন গিয়েছিলাম?'

'সর্বনাশ। একথা তোমায় কে বলেছে?' সুদক্ষিণার সারা শরীর কেঁপে উঠল। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার মুখ।

'তুমি তো আমার সঙ্গে ছিলে বলছ। বলো না—কেন আমি—?'

'চুপ করো।' সুদক্ষিণা ধমক দিল, 'কে তোমায় এ কথা বলেছে?'

'কেন, ডোরা।'

'আর কী বলেছেন তিনি?'

'ওই কথাই বলেছে। আর কিছু না।'

'তিনি কী করে দেওঘরের কথা জানলেন?' সুদক্ষিণা ক্রমশ উত্তেজিত ও কঠিন হয়ে উঠছিল।

'বা, ও যে দেওঘরে থাকত। আমার সঙ্গে নাকি খুব আলাপ ছিল ওদের।'

BanglaBook.org

'হুঁ!' সুদক্ষিণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'মিস দত্ত তোমায় বুঝি এসব কথা বলেন?'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

'রোজই বলেন নাকি?'

'প্রায়ই।'

'চশমা পরতে উনি তোমায় দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। শুধু পরতে কেন—মিস দত্ত আমার চশমার কাচের পাওয়ার কত তাও জানেন! বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। বিছানার পায়েব দিকে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার চশমার পাওয়ার এখানে লিখে রেখেছি। যদি ভুলে যাই আবার তাই। আমার কিন্তু এমনিতেই মনে আছে।'

'কত?'

'মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু সেভেন, সিলেন্ড্রিক্যাল হানড্রেড সিক্সটি, রাইট গ্লাস..'

সুদক্ষিণাকে কেউ যেন দুহাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। প্রাণহীন, একটা পুতুলের মতো সে বসে থাকল টুলের ওপর।

সুদক্ষিণার আর যাওয়া হল না।

প্রণব খানিক ঠাট্টা করলে। কুন্তলাদি আড়ালে চোখের জল মুছলেন সুদক্ষিণার ভাগ্য বিড়ম্বনাব কথা ভেবে।

সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে সুদক্ষিণা প্রণবকে সব কথা খুলে বলল। সকালের পুরো ঘটনাটা। শেষে বললে, 'তোমায় এ কথা না জানিয়ে চলে যাওয়ার মতো সাহস পেলুম না।'

সব শুনে প্রণব রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। চুপ কবে পথ হাঁটছিল ও চিন্তিত মনে।

নীরবে অনেকটা পথ হেঁটে তাদের পুবোনো জায়গাটায় এসে বসল ওরা।

'এখন বোধহয় বুঝছ, না-যাওয়ার জন্যে যে ঠাট্টা করেছিলে, সেটা আমাব প্রাপ্য নয়।' সুদক্ষিণা হেসে বললে।

'হ্যাঁ—তা সত্যি।' প্রণব আবার একটা সিগারেট ধবাল। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল পাথব ছেড়ে। খানিকটা পায়চারি করলে। আবার ফিরে এসে বসল তার জাযগায়।

'কিছুদিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম। কিন্তু তেমন নজর দিইনি। তোমার কাছ থেকে আজকের ঘটনা শোনার পর সব বুঝতে পারছি।

'লক্ষ যখন করেছিলে, নজর দেওয়া তোমার উচিত ছিল।'

'এখন তাই দেখছি।'

প্রণব সুদক্ষিণাকে কয়েকটা ঘটনা বললে। এমন সব ঘটনা যাতে ডোরার ওপর বাণীব্রতর বিজাতীয়, বিরক্তিকর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। এমন কী সেই 'শক' নেওয়ার দিন বেহালা কাড়াকাড়ির ঘটনাটা পর্যন্ত।

বাণীব্রত এক সময় ডোরার ওপর প্রসন্ন ছিল। এখন আর নেই। থাকা সম্ভবও নয়। অপ্রীতিকর আলোচনা ও ঘটনা এই দুই-ই বাণীব্রত এড়িয়ে থাকতে চাইবে এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।'

'কিন্তু উনি এসব করছেন কেন?' সুদক্ষিণা জানতে চাইল।

'আমিও তাই ভাবছি।'

দুজনেই চুপ করে ভাবতে লাগল।

'আচ্ছা শোনো,' সুদক্ষিণা বললে, 'মিস দত্তর কি কোনও স্বার্থ আছে এতে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'তা হলে কী করবে?'

BanglaBook.org

'ব্যবস্থা একটা করব বইকী। ডোরার প্ররোচনায় পড়ে উত্তেজনার মাথায় কিছু একটা করে ফেলা বাণীব্রতর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া এ-সব চিন্তা তার সেরে ওঠার পক্ষেও বাধা।'

সুদক্ষিণার মন মানছিল না। থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ও বলে বসল, 'একটা কাজ করবে?'

'কী?'

'ডোরাকে বাণীর ত্রিসীমানা মাড়াতে দিও না।'

প্রণব সে কথা আগেই ভেবেছে। 'না, তা হয় না। ডোরাকে আমি জানতে দিতে চাই না। অবশ্য, তোমার ভয় নেই। বাণীব্রতর কোনও ক্ষতি সে যাতে করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।' প্রণব উঠে দাঁড়াল।

ফেরার পথে প্রণব বললে, 'তুমি একটা কাজ করবে?'

'সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় করব।'

'মনোহরপুর নয়—তুমি কালই কলকাতায় যাও। আর কিছু নয়, বাণীব্রতর জীবনের ছোট বড় ঘটনা যা জানতে পার—তার বাবা-মা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন এদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় ভালোভাবে খোঁজ করে জেনে এসো। তারপর আমি দেখছি। ডাঃ গুপ্ত না থাকায় আমার হাসপাতালের বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই—না হলে আমিই যেতাম। এটুকু সাহায্য তুমি আমায় করো, সুদক্ষিণা।'

'সব বুঝলাম, কিন্তু—' সুদক্ষিণা দোটানায় পড়ল।

'কোনও কিন্তু নয়। লজ্জার কথা ভাবলে চলবে না। তোমাব সমস্ত লজ্জা একদিন ধুয়ে যাবে। আমি বলছি, আমায় বিশ্বাস করো।' প্রণব সুদক্ষিণাব হাত ধরল।

'তাই যাব।' সুদক্ষিণা ধবা গলায় জবাব দিলে।

মাসখানেক পবের কথা।

সুদক্ষিণা কলকাতা থেকে ফিবে আবার তার কর্মস্থান মনোহরপুব চলে গেছে। সেখান থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে—স্কুলের চাকবি আর থাকবে না। কর্তৃপক্ষ তার ওপর অসন্তুষ্ট। উপবন্তু বাণীব্রতর কাছে তার যাওয়া আসার কথাটাও না জানি কেমন করে জানাজানি হয়ে গেছে। অতসী বলে, উড়ো চিঠি দিয়ে সেক্রেটারিকে সব কথা কে যেন জানিযে দিয়েছে। চিঠি পেযে প্রথমটা প্রণব যতটা না মুষড়ে পড়েছিল তার চেয়ে অবাক হযেছিল বেশি। কে এসব কথা জানাতে গেল!

কিছুদিনের মধ্যেই আবার পাটনা থেকে প্রণবের নামে চিঠি এল পুলিশ দপ্তর থেকে। বাণীব্রতকে পরীক্ষা করবার জন্যে পুলিশ থেকে 'এনকোয়ারি কমিশন' পাঠাচ্ছে। প্রণব এ চিঠি পেয়ে বিস্মিত হল না। কেননা মিস্টার সেনগুপ্তের কথামতো দুমাস শেষ হওয়ার আগেই সে পাটনায় চিঠি লিখে জানিয়েছিল—রুগি ক্রমশ আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এ সময় তাকে তার পুরাতন চিকিৎসক ও আবহাওয়ার মধ্যে না রেখে হঠাৎ নতুন এক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলে তাতে সম্ভবত আবার রুগির অবস্থার অবনতি ঘটবে। একান্তই যদি তাকে সবকাবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন তবে সে দায়িত্ব সরকাবের। ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটাল' তার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে এবং চিকিৎসক হিসেবে প্রণব তার নৈতিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার দরুন আদালতের আশ্রয় প্রার্থনা করবে। মোটকথা, বাণীব্রতকে নিয়ে যাওয়াই যদি সরকারের অভিপ্রেত হয়, তা হলে ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্বই সরকারের। 'পরেশনাথ মেন্টাল হসপিটালের' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট লালগড়ের বর্তমান রাজা হরিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এ সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থা অবলম্বনের হঠকারিতা সহ্য করবেন না বলে জানিয়েছেন। এখন পাটনা পুলিশ দপ্তর যা বিবেচনা করেন...।

প্রণবের এ চিঠির সরকারি জবাব আসার আগে মিস্টার সেনগুপ্ত চিঠি লিখে জানালেন,

'তোমার চিঠি নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে পুলিশ কমিশনার এবং মিনিস্ট্রিতেও চিঠি এসেছে। বেশ বাধিয়ে তুলেছ কাণ্ডটা। যাই হোক, একদিকে যেমন তোমার ওপরওয়ালা কুমার বাহাদুর তোমায় সাহায্য করছেন, তেমনি আর একদিকে তোমারই হাসপাতাল থেকে অভিযোগ আসছে তোমার নামে।...সমস্ত ভেবেচিন্তে আমরা স্থির করেছি একটা কমিশন পাঠাব। তাতে দুজন সরকারি ডাক্তার, আমার অ্যাসিস্টেন্ট ও বন্ধু মিঃ খা এবং দেওঘরের ব্যাপারটা যে ইন্সপেক্টার প্রথম থেকে তদন্ত করছেন এঁরা কজন থাকবেন। কমিশনের সঙ্গে আর একজন থাকবেন যাঁকে তুমি চেন। কলকাতার বিখ্যাত মনোবিদ্ ডাঃ মুখার্জি। ...আশা করি, কমিশনের কাছে তুমি তোমার সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে প্রশংসিত হবে।....'

কমিশন আসবে আসুক, প্রণব তার জন্য চিন্তিত নয়, কিন্তু তার নামে গোপন অভিযোগ জানাল কে? কার এই দুঃসাহস?

সুদক্ষিণা, কমিশন, বাণীব্রত...চিন্তায়-চিন্তায় প্রণবের সমস্ত মন হাঁপিয়ে উঠল, রাত্রে ঘুম গেল; মুখের হাসি মুছে গিয়ে থমথমে কঠিন একটা গাম্ভীর্য জেগে থাকল।

অবশেষে একদিন সকালে হাসপাতালে পা দিয়ে প্রণব দেখলে কমিশনের লোকজন এসে গেছে।

ডাঃ মুখার্জি তাকে চিনতে পেরে আনন্দে ফেটে পড়লেন। ছাত্র-জীবনে প্রণব ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। দীর্ঘ ক'টা বছর এই জ্ঞানী অধ্যাপকের পায়ের তলায় বসে প্রণব তার ভবিষ্যৎজীবনের পুঁজি সঞ্চয় করেছে। এতদিন পরে তার পরমশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ অধ্যাপকটিকে দেখে প্রণবও ছেলেমানুষের মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

অপর দুজন ডাক্তারের মধ্যে একজন এসেছেন রাঁচির হাসপাতাল থেকে, আর একজন সরকারি আর একটি হাসপাতাল থেকে। রাঁচির ডাক্তারটি সাহেব। নাম ডাঃ টমসন। দ্বিতীয় ডাক্তারটি বাঙালি, ডাঃ লাহিড়ী। ডাঃ মুখার্জির সহপাঠী ছিলেন এককালে। এখনও তাঁদের বন্ধুত্ব বজায় আছে। কমিশনের লোকজনকে বসিয়ে প্রণব নিজে গেল বাণীব্রতকে ডেকে আনতে।

কেবিনে ঢুকে প্রণব দেখল—বাণীব্রত গভীর মনোযোগে বেহালার সুর তোলবার চেষ্টা করছে—পারছে না। ভুল হচ্ছে বারবার—তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

প্রণব সামনে এসে দাঁড়াতে বাণীব্রত হাত থেকে বেহালা নামিয়ে তার দিকে তাকাল।

'হচ্ছে না। ভুল হয়ে যাচ্ছে।' হতাশ হয়ে বললে বাণীব্রত।

'আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিন্তু আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি।' হাসিমুখে জানাল প্রণব।

'কোথায়?'

'বাইরে কোথাও নয়, এই এখানেই। আমার অফিস ঘরে।'

'সে তো রোজই যাই।' বাণীব্রত উঠে দাঁড়াল।

প্রণব ওর কাঁধে হাত রাখল, 'আজ কিন্তু সেখানে অনেক লোকজন আছে।'

'তা হলে থাক। আমি—'

বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'না, থাক নয়। ওদের কাছেই আপনাকে যেতে হবে।' একটু থেমে আবার বললে, 'যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই নামজাদা বড় ডাক্তার, দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

'আমার দেখবার কী আছে? আমি বেশ আছি।'

BanglaBook.org

প্রণব বাণীব্রতর শার্টের বন্ধনীটা ঠিক করে দিয়ে বললে, 'এলেই বা, ক্ষতি কী? আপনার ভালোর জন্যেই তো তাঁদের আসা। আমার চেয়ে তাঁরা অনেক বিদ্বান, অভিজ্ঞ। যদি আমার কোনও ভুল হয়ে থাকে তাঁরা শুধরে দেবেন।'

'আপনি ওঁদের ডেকে এনেছেন?' বাণীব্রত বিচলিত হল।

'আমি? না—হ্যাঁ, তা আমিই ডেকে এনেছি।' প্রণব মুশকিলে পড়ল। পরমুহূর্তেই তার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর হাসি ফুটিয়ে বললে, 'হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সুদক্ষিণাও আপনাকে এখানে রাখতে রাজি নয়। তাই। বড়-বড় ডাক্তাররা একবার দেখে গেলে ভালো হবে। তাঁদের কথামতো দিনকয়েক চিকিৎসা করলেই আপনি একেবারে সেরে উঠবেন। তারপর বাড়ি।'

বাণীব্রত তবু পুরোপুরি সহজ হতে পারল না। 'আমায় কী করবে ওরা?' প্রশ্ন করলে।

'করবে আবার কী? এই এটা-ওটা জানতে চাইবে। আমি তো থাকব, ভয় কী? ওরা যা জানতে চাইবে আপনি শুধু তার উত্তর দিয়ে যাবেন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাণীব্রত, বললে, 'বেশ চলুন।'

হাতের বেহালাটা নামিয়ে রেখে ও পা বাড়াল।

প্রণবের ঘরের দরজায় পা দিয়ে বাণীব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চার-পাঁচজন অপরিচিত ভদ্রলোক। একেবারে সামনে সব বসে আছেন। একপাশে ডোরাকেও দেখতে পেল বাণীব্রত। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে সকলেই তার দিকে তাকাল।

প্রণব বাণীব্রতর হাত ধরে টানল। 'যান, ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন।' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে চেয়ার।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাণীব্রত সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। ওদের মুখোমুখি করে পাতা ছিল চেয়ারটা। বাণীব্রত হাত দুটো কোলের ওপর রেখে চুপ করে বসে থাকল।

কে একজন মোটা গলায় বললে, Well, we can go with our work, Just you please try with him Dr. Lahiri ?

বিলেতি ঢঙে আর একজন বললে, জড়ানো কথা—অস্পষ্ট উচ্চারণ।

বাণীব্রত সামনে তাকাল।

দোহারা চেহারা কালোমতন এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে এগিয়ে এলেন বাণীব্রতর সামনে। ডাঃ লাহিড়ী বাণীব্রতর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তীব্র চোখে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম কী?'

'বাণীব্রত।' খানিকটা থেমে জবাব দিল বাণীব্রত।

'পুরো নাম?'

বাণীব্রত চক্রবর্তী।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতার কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।' বাণীব্রত প্রণবের দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল মনে-মনে : কেমন ঠিক হচ্ছে তো।

'ডাঃ দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে আপনি চেনেন?'

'আমার ভাই।'

BanglaBook.org

'কোথায় থাকতেন তিনি?'

'দেওঘরে।' বাণীব্রত দিব্যি উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

'আপনার ভাই এখন কেমন আছেন?'

'জানি না।'

'I see! আপনার ভাইয়ের সংসারে কে-কে আছেন?'

বাণীব্রত চুপ করে থাকল।

মিঃ ঝা হঠাৎ ডাঃ লাহিড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি দেওঘরে ছিলেন?'

'ছিলাম।'

'কোথায় ছিলেন? কার কাছে? ভাইয়ের কাছে?'

'না।'

'তবে?'

'বন্ধুর বাড়িতে।'

'আপনার বন্ধুর নাম?'

'বিভূতি।'

মিঃ ঝা বললেন প্রণবকে, 'ভদ্রলোক প্রায় নির্ভুল উত্তর দিতে সমর্থ। Is this not enough?'

ডাঃ লাহিড়ী তখনও মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছিলেন বাণীব্রতকে। ওর মুখচোখের ভাবভঙ্গি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়—সেটা ঠিক স্বাভাবিক মানুষের নয়। বিশেষ করে তার এই নির্বিকার নিস্পৃহ ভাব, ফাঁকা চাউনি, নামতা পড়ার মতো প্রাণহীন উত্তর। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

ডাঃ লাহিড়ী তাঁর আসনে ফিরে গিয়ে ডাঃ টমসনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কয়েকটা কথা আলাপ করলেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে খানিক আলোচনা করে আবার বাণীব্রতর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনি যেন অস্বস্তি বোধ করছেন।'

বাণীব্রত সে কথার কোনও উত্তর দিল না। মনে-মনে বললে : তা যদি বুঝে থাক আমায় ছেড়ে দাও না কেন! কী লাভ হচ্ছে তোমার আমায় এভাবে বসিয়ে রেখে। সুরটা কিছুতেই মনে আসছিল না। এতক্ষণ চেষ্টা করলে বোধ হয় শুধরে নিতে পারতাম।

'Well, if you can just think us your friend gentleman!'

বাণীব্রত একটু বুঝি চমকে উঠেই তাকাল। ডাঃ লাহিড়ী নতুন ভাবে তোড়জোড় শুরু করলেন। সিগারেট ধরালেন। গলার টাইটা ঢিলে করলেন একটু। বাণীব্রত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'Would you?'

ডাঃ লাহিড়ী বাণীব্রতকে সিগারেট দিলেন।

বাণীব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সিগারেট টেনে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, 'It is fine!'

'Is it?' ডাঃ লাহিড়ী সুযোগ গ্রহণ করলেন, 'আপনারও এরকম হওয়া উচিত। You should be nice to us! বলুন, কেন আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন? আমরা ডাক্তার, আপনি রুগি। আমাদের কাছে কিছু লুকোনো আপনার উচিত নয়।'

বাণীব্রত কী ভাবল কে জানে। বললে, 'মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' ডাঃ লাহিড়ী প্রণবকে ডেকে কানে-কানে কী যেন বললেন।

প্রণব আবার ডোরাকে ডেকে কী আদেশ করলে।

'এরকম মাথার যন্ত্রণা আপনার কতদিন হয়?'

BanglaBook.org

'প্রায়।'

'না-না, প্রায় বললে চলবে না। কতদিন ধরে হয়—মানে ক'মাস বা ক'বছর ধরে এরকম যন্ত্রণায় ভুগছেন?'

'রোজ।'

'রোজ-ই?' ডাঃ লাহিড়ী মৃদু হাসলেন, 'রোজ—বেশ রোজই। আমি বলছি কি এই রোগটা কতদিন ধরে হয়েছে। এই ধরুন যখন আপনি দেওঘরে ছিলেন, তখন এরকম মাথার যন্ত্রণা হত?'

'জানি না।'

'সেকী? আপনার মাথায় যন্ত্রণা হত কি না আপনি জানেন না?'

'না।'

এমন সময় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ধীরে-ধীরে উঠে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাঃ লাহিড়ী প্রণবের পাশে সরে এলেন।

'আমরা জানি, আপনার মাথায় যন্ত্রণা হত।'

অধ্যাপকের গম্ভীর শান্ত স্বরে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বাণীব্রত।

'আপনার ভাই আমাদের বলেছেন, দেওঘরে আপনি ভীষণ মাথার যন্ত্রণায় ভুগতেন। মনে পড়ছে?'

বাণীব্রত ধোঁয়াটে চোখে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আর এক পা এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতের পাইপটা কথা বলার সময় বাণীব্রতর মুখের সামনে নড়ে উঠছিল।

'মাথার যন্ত্রণার কথা আপনি আমাদের কাছে লুকোচ্ছেন কেন?'

বাণীব্রত নীরব। সে অধ্যাপকের পাইপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'Why you are concealing the fact?'

বাণীব্রত কোনও কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'দেওঘরের এত কথা আপনাব মনে আছে, আর মাথার যন্ত্রণার কথা মনে নেই?'

'না—নেই।'

'তা কী করে হয়? আপনার এরকম ভুল হওয়া উচিত নয়। মাত্র সেদিনের কথা।' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছেন, 'কতদিন হল আপনি দেওঘরে ছিলেন?'

'জানি না।'

'জানেন না? হিসেব করে বলুন।'

'সাত বছর পাঁচ মাস।'

'কী বলছেন? ভালো করে হিসেব করে বলুন।' ডাঃ লাহিড়ী বললেন।

'হিসেব জানি না।'

'গুনতে জানেন না?'

'গুনতে? আচ্ছা, বলছি।' বাণীব্রত মনে-মনে হিসেব করার চেষ্টা করল, 'সাত বছর না-হয় পাঁচ বছর হবে।'

'তারও কম।'

'তাই নাকি? তাহলে দাঁড়ান। মিস দত্ত?' বাণীব্রত ডাকল।

'তিনি নেই। কিন্তু মিস দত্ত কেন?' ডাঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন বিস্মিত হয়ে।

'উনি বলে দেবেন।' বাণীব্রত মৃদু শান্ত গলায় বললে।

'উনি কী জানেন? আপনি—।'

BanglaBook.org

প্রণবের কথায় বাধা দিয়ে বাণীব্রত দ্রুত বলে উঠল, 'উনি জানেন—সব জানেন। উনি আমার কথা সমস্ত জানেন।'

'কী করে আপনি বুঝলেন মিস দত্ত আপনার সমস্ত কথা জানেন?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন।

বিচলিত হল বাণীব্রত। তার অস্থিরতা বেড়ে উঠল। ও বললে, 'তিনি বলেন।'

'কী বলেন?'

'দেওঘরের কথা বলেন।'

'দেওঘরের কোন কথা বলেন?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বাণীব্রতর মুখের ওপর স্থির রাখলেন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

বাণীব্রত চুপ করে থাকল। অসুস্থ মনে হচ্ছিল নিজেকে। চোখের সামনে মূর্তিগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের হাতের পাইপ তার মুখের সামনে বড় বেশি নড়ে উঠছে। সরু লম্বা নল, একটু-একটু ধোঁয়া। ঝাপসা, আরও ঝাপসা হয়ে এল সেই সূক্ষ্মাগ্র অংশটুকু। সেদিকে তাকিয়ে থাকল বাণীব্রত, আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

ডোরা দত্ত ঘরে এল। হাতে ওষুধ।

বাণীব্রতকে চেয়ারে বসিয়ে ডোরা ওষুধটা খাইয়ে দিল। বাণীব্রত[illegible] কপালে ঘাম জমে উঠেছে। দ্রুত নিশ্বাসপতনের শব্দ কানে বাজছে।

বাণীব্রত ডোরার একটা হাত সজোরে চেপে ধরল।

কয়েক মিনিট অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বরফের হাওয়ার মতো ঠান্ডা একটা আবহাওয়া ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগল। সকলেই চিন্তিত, নির্বাক, নিশ্চল।

'That's alright! Would you mind leaving this room Miss Dutt? অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হঠাৎ বললেন।

বুঝি চমকে উঠল ডোরা।...ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই বাণীব্রত হাত বাড়িয়ে তার অ্যাপ্রনের একটা অংশ ধরে ফেলল।

'যাবেন না, মিস দত্ত!'

বাণীব্রতর মুঠো থেকে অ্যাপ্রন ছাড়িয়ে নিলে ডোরা।

'আমি কিছুই জানি না। আমায় বাঁচান!' ব্যাকুল স্বরে বললে বাণীব্রত।

ডোরার সর্বাঙ্গ ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠল। নিশ্বাসপতন দ্রুত, শব্দময় হয়ে উঠল অকস্মাৎ।

'ভয় কী, যা আপনি জানেন, তারই জবাব দিন। আমার অন্য কাজ আছে।' ফ্যাকাসে মুখে বললে ডোরা।

কথাশেষে তিলমাত্র বিলম্ব না করে দ্রুতপায়ে ডোরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে বাণীব্রত অসহায় দৃষ্টি মেলে বসে থাকল। প্রণব বাণীব্রতর মানসিক চরম উত্তেজনার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে মৃদুস্বরে প্রণব তার আশঙ্কার আভাস দিলে।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আবার বললেন, 'আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলেই আপনার ছুটি, বাণীব্রতবাবু! Why are you getting afraid of us?'

অধ্যাপকের কথা শেষ হতে প্রণবও বাণীব্রতকে সাহস যোগাল, 'এঁদের কথার জবাব দেওয়া আপনার উচিত, বাণীব্রতবাবু। এঁরা সকলে কত বড় এক-একজন ডাক্তার। রোগ সারাতে হলে ডাক্তারের অবাধ্য হওয়া কি উচিত?'

বাণীব্রতর মাথার যন্ত্রণা বাড়তে শুরু করছিল। মনে পড়ল তার কুমুদশংকরের কথা : ডাক্তারের কথা শুনো।...কিন্তু কেন, সে তো অবাধ্য হয়নি। তার যা জানা আছে—যা মনে পড়ছে সমস্তই

BanglaBook.org

সে বলেছে। সমস্ত—সমস্ত কথা। তাই নয় কি?

'দেওঘরে আপনি যে বন্ধুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর নাম তো আপনি জানেন দেখছি। বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন?' অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

'কোথায়? মনে পড়ে না।'

'Do you remember your brother ? How he looks ?" ডাঃ টমসন প্রশ্ন করলেন।

'জানি না।'

'তাঁকে মনে পড়ছে না—অথচ তাঁর নাম মনে আছে?' অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আরও একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বাণীব্রতর চোখের ওপর স্থির হয়ে থাকল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্ভবত রহস্যের সূত্র পেলেন কিছু। বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সহজ হওয়ার জন্যে হেসে উঠলেন তিনি।

বাণীব্রত দেখছিল—এক জোড়া চোখ—দীর্ঘ দাড়ি; লম্বা ছুঁচোলো পাইপের আগা ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে—তার বুকের কাছে নড়ছে ঘন-ঘন। কী—কী—ওটা কী? ধোঁয়া কেন? কেন অত নড়ে?

'হাত সরিয়ে নিন—সরিয়ে নিন। আমায় কি মেরে ফেলতে চান?' হঠাৎ ভীষণ ভয় খেয়ে তীব্র চিৎকার করে বাণীব্রত দু-পা পিছনে সরে গেল।

বাণীব্রতর ব্যবহারে সকলে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্যে। ওর দিকে অগাধ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সম্ভবত কিছু সন্দেহ করলেন। বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সহজ হওয়ার জন্যে হেসে উঠলেন তিনি, 'বাস্তবিক আপনি হাসালেন। মারব কি মশাই, অ্যাঁ? এ তো একটা পাইপ—তামাক খাবার পাইপ। দেখুন—দেখুন না হাতে করে!'

বাণীব্রত তখন ভীতার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রসারিত হাতের দিকে।

একটু অপেক্ষা করে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এখনও দেখছি আপনার ভয় গেল না?' পাইপটা পরিষ্কার করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন তিনি, 'এবার বলুন, হঠাৎ ভয় পাবার কী হল?'

বাণীব্রত অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করছিল। তার ভীত ভাবটা কেটে এসেছিল অনেকটা।

'What's the trouble with you? Are you still afraid?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাণীব্রত বললে, 'আমি ভালো বুঝতে পারি না—দেখতে পাই না।'

'দেখতে পান না?'

'না। কেমন অস্পষ্ট, ঝাপসা। চশমা না হলে আমার বড় কষ্ট হয়।'

চশমার কথায় প্রণব বললে, 'খুব অসুবিধে বোধ করেন, না?'

'ভীষণ। আমার চশমাটা যে কোথায়—'

'আপনি কি চশমা ব্যবহার করতেন আগে?'

'করতাম। মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু সেভেন, রাইটগ্লাস সিলেন্ডিকাল্ হানড্রেড, অ্যান্ড সিক্সটি।'

আর একবার অবাক হওয়ার পালা এল সকলের। মিঃ ঝা অবাক হয়ে বললেন, 'বলেন কী, এই দীর্ঘ প্রেসক্রিপশন আপনার মনে আছে!'

বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠলেন, 'you remember that?'

'হ্যাঁ।' বাণীব্রত মাথা নাড়ল।

'অথচ দেওঘরের অন্য কোনও কথা আপনার মনে পড়ছে না? এমন কি নিজের ভাই, বন্ধু, এদের কেমন দেখতে, তাও আপনার মনে নেই?'

'না।'

'দেওঘরের কোনও কথাই আপনার মনে পড়ে না?'

BanglaBook.org

'না। খালি একজনকে।'

'কে সে?'

'তুলতুল।'

'কে তুলতুল?'

'ছোট্ট একটি মেয়ে। কেমন সুন্দর ছড়া বলত; দুলত দোলনায়? পিসিকে বলত 'আনটি'।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ডাঃ লাহিড়ীর দিকে তাকালেন। প্রগাঢ় বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

মিঃ ঝা শুধু বললেন, 'Strange !"

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিচলিত হলেন। ডান হাতটা তাঁর আবার একসময় পকেট থেকে পাইপটা টেনে নিয়েছে। বাঁ-হাতের তালুর ওপর পাইপটা ঠুকতে-ঠুকতে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার চশমার ফ্রেমের রঙটা মনে আছে নিশ্চয়?'

মাথা নেড়ে বাণীব্রত জানালে তার মনে নেই।

'বাণীব্রতবাবু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি। আপনার চশমার কাচের পাওয়ারের আগাগোড়া সব মনে আছে, অথচ তার ফ্রেমের রংটা মনে করতে পারছেন না? কেমন করে তা হবে?' ডাঃ লাহিড়ী নরম সুরে বললেন।

'কেন হবে না? আমি মনে রেখেছি।'

'কী করে রেখেছেন তাই ভেবে আমরা অবাক হচ্ছি।'

'মিস দত্তর কাছ থেকে জেনে। পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখেছি।'

'তাহলে মিস দত্ত আপনাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ—তিনি দয়া করে বলেছেন।'

'আর তুলতুলের কথা?'

'কেউ আমায় বলেনি তো!'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মৃদু হাসলেন। বললেন বাণীব্রতকে, 'আপনি এখন যেতে পারেন।'

প্রণব কলিংবেল টিপল।

বাণীব্রত অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে, 'আমি কবে সেরে উঠব?'

'শীঘ্রি—খুব শীঘ্রি?'

নার্স এসে দাঁড়াল। প্রণব বাণীব্রতকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত জানালে।

বাণীব্রত যাওয়ার আগে একটু হেসে সকলকে বুঝি তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল।

BanglaBook.org

কমিশনের লোকজন ফিরে গেল। থেকে গেলেন কেবল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। প্রণব যেতে দিল না। বললে ঃ আপনি দু-একদিন থেকে যান, স্যার। আপনার সাহায্য ও পরামর্শ পেলে কেসটার একটা মীমাংসা করে ফেলতে পারব। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। তাছাড়া জায়গাটা দু-একদিন বিশ্রাম নেওয়ার উপযুক্ত বটে। তিনি বললেন ঃ বেশ। কিন্তু বাবা দুদিনের বেশি আমায় আটকে রেখো না। শুক্রবার দিন আমায় ফিরতেই হবে।

কমিশনের অপরাপর সভ্যেরা বিদায় নেওয়ার আগে প্রণবকে জানিয়ে গেল—তারা হাসপাতালের কাজ দেখে বাস্তবিক খুশি হয়েছে।

মিঃ ঝা প্রণবকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'মিঃ দাশগুপ্ত, আপনার 'আংকল' আমায়

বিশেষভাবে এই ঘটনাটিতে এনকোয়ারি করতে পাঠিয়েছিলেন। আসলে আমি এসেছিলাম আপনাকে সাহায্য করতেই। And I am too glad you have satisfied me—you have helped me much. এখন আমিও আপনাকে সাহায্য করতে পারব। ...চশমার ব্যাপারটা এমনভাবে এড়িয়ে গেছে জানতাম না। আমি নিজে নতুন করে এ সম্পর্কে এনকোয়ারি করব। ভবিষ্যতে আপনি আমার সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন। ভালো কথা, আপনার নামে কমপ্লেন কে পাঠিয়েছিল তা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন! মিস দত্তর ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা আমি করছি। তিনিও কোনও সূত্রে এ রহস্যের সঙ্গে জড়িত বলেই মনে হয়। হয়তো তাঁকে কেন্দ্র করেই আমরা রহস্যের সমাধান করতে পারব।'

প্রণব বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাল মিঃ ঝাকে, 'আপনার সাহায্য সর্বতোভাবে না পেলে সব চেষ্টাই বৃথা হবে, মিঃ ঝা। ভদ্রলোকের মনের তদন্তটুকুই আমার হাতে, বাকিটা সবই আপনাদের হাতে।'

সেইদিনই সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ও প্রণবের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার রুগি দেওঘরের মাত্র একটি ঘটনাই মনে করতে পারছে—সেই বাচ্চা মেয়েটির কথা।' অধ্যাপক বলছিলেন।

'আজ্ঞে না—কোনও ঘটনাই সে মনে করতে পারছে না। আপনাদের তো আমি আগেই বলেছি—তুলতুল নামের কোনও বাচ্চা মেয়ের কোনওরকম অস্তিত্বই দেওঘরে ছিল না। আমিও প্রথমে কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর সুদক্ষিণার কাছ থেকে জানলাম তুলতুলের ব্যাপারটা বাণীব্রতর সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মনগড়া।'

'তা হঠাৎ এরকম মনগড়া একটা ঘটনার সঙ্গে বাণীব্রত নিজেকে জড়িয়ে ফেলল কী করে?'

'আমি তার একটা সমাধান করেছি। বাণীব্রতকে যে সমস্ত গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা পড়তে দেওয়া হত তারই মধ্যে একটি পত্রিকায় গল্প ছিল একটা। বাণীব্রতর তুলতুল আসলে সেই গল্পের একটি দুষ্টু মেয়ের চরিত্র; নামও তার তুলতুল। ছড়া কাটে, দোলনায় দোলে, পুতুল কোলে করে ঘুরে বেড়ায়। মজা কী জানেন, সেই গল্পটির ঘটনাস্থানও দেওঘর। বাণীব্রত নিজেকে এই গল্পের দেওঘর আর তুলতুলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে।'

'তাই!'

'কিন্তু এ থেকে ওর মনের একটা অবরুদ্ধ বাসনা বোধ হয় ধরা পড়ে।'

'কী?'

'বোধহয় তার নিজের বাল্যকালের স্মৃতি, সেই দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।'

'কিছু জানতে পেরেছ?'

'পেরেছি। পেশেন্ট ফাইলে সেটা লেখা নেই। আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। সুদক্ষিণাকে আমি কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম বাণীব্রতর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ছোট-বড় যে-কোনও তথ্য জানা যাক না কেন জেনে আসতে। বাণীব্রতর কোনও আত্মীয় নেই। তার মার এক বাল্যসখীর কাছ থেকে সুদক্ষিণা অনেক কষ্টে কিছু তথ্য জোগাড় করে এনেছে। বাসায় ফিরে গিয়ে স্যার, আমি আপনাকে সে-সব কথা বলব। আর সেই সঙ্গে বাণীব্রতর স্বপ্নও।'

নীরবে দুজনে পথ হাঁটতে লাগল।

একসময় অধ্যাপক বললেন, 'তোমার এই রুগিটি বাস্তবিক ইনটারেসটিং। বড় জটিল কেস হে। মাঝে-মাঝে প্যারানইয়ার লক্ষণ চোখে পড়ে।'

'হ্যাঁ, স্যার, একটার সঙ্গে আর একটা এমনভাবে মেশানো যে এখনও নিঃসন্দেহে ওর রোগটা কী, তা স্থির করতে পারিনি।'

BanglaBook.org

'তোমার কী মনে হয়?'

'Manic depressive psychoses—acute melancholia! আপনার কী ধারণা স্যার?'

'আমার?' অধ্যাপক মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একটু ভাবলেন, 'A case of extraordinary Paranoic psychoses! Of course this case is not of an acute type.'

আরও খানিকটা বেড়িয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ওহে, তোমাদের এ পার্বত্যপ্রদেশে আর বেশি হাঁটলে কাল আর আমার পায়ের অস্তিত্ব থাকবে না। চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

'চলুন।'

প্রণবের ঘর। গুরুশিষ্য গভীর আলোচনায় মগ্ন।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। চোখ দুটি বোজা। পাইপের পাতলা, আঁকা-বাঁকা ধোঁয়ার রেখা উঠছে। ঘরের বাতাস ভরে উঠেছে তামাকের গন্ধে।

প্রণব অধ্যাপকের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে। হাতে তার নিজের ডায়েরি। সামনে টিপয়ের ওপর পড়ে রয়েছে হসপিটাল থেকে আনা বাণীব্রতর কেস-ফাইল আর চায়ের শূন্য পাত্র।

কুন্তলাদি ঘরে ঢুকে কখন নিঃশব্দে শূন্য চায়ের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছেন সেদিকে ওদের খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল কুন্তলাদির কথায়, 'এবার জুড়িয়ে গেছে বললে আমি আর চা আনছি না।'

'বেশ তো, তুমি তৈরি করে রেখো, আমরা গিয়ে নিয়ে আসব।' অধ্যাপক বললেন মৃদু হেসে।

হেসে ফেললেন কুন্তলাদি, 'আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? না-না, আর নয়! কী যে মাথা মুন্ডু বক-বক করছেন দুজনে সারাদিন। আমাব কি গল্প করার কিচ্ছু নেই নাকি? এতদিন পরে এলেন যদি-বা, একটু কথা বলার জো নেই!' কুন্তলাদি রাগ করলেন।

'নেভার মাইন্ড। কাল আমি তোমার সঙ্গে পুরো একবেলা গল্প করব মা, কথা দিচ্ছি।' অধ্যাপক আগের মতো হাসতে লাগলেন।

'বেশ দেখব।' কুন্তলাদি ঘব ছেড়ে চলে গেলেন।

'কুন্তলা সেই আগের মতো তেমনটি থেকে গেল।' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'একেবারে মায়ের জাত। কোনওদিন তাকে বদলাতে দেখলাম না।'

প্রণব চুপ করে থাকল। এ কথার কোনও জবাব নেই। কুন্তলাদির জীবনের ব্যর্থতা এত গভীর ও অন্তঃস্রোতা যে তাকে অনুভব করা যায়, আলোচনায় টেনে আনা যায় না।

'হ্যাঁ, এবার স্বপ্নের কথাটা বলো।'

প্রণব তৈরি হয়ে নিলে।

'আগাগোড়া স্বপ্নটা কি আবার বলার দরকার হবে স্যার?'

'না তুমি এমনিই বলে যাও।'

'বাণীব্রতর দেখা প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি এইভাবে করেছি।...জলের ওপর ভাসানো বিছানা; তার ওপর সে শুয়ে রয়েছে। কে যেন পাশে বসে ঘুম পাড়াচ্ছে। কে যে তা বাণীব্রত দেখতে পাচ্ছে না। তবু তার মনে হয় সে খুব চেনা। বাণীব্রত ঘুমিয়ে পড়ল। এখানে আমি স্যার, স্টেকেলের মতানুযায়ী জলের ব্যাখ্যা করেছি।...স্বপ্নে জল মানের প্রতীক। বিছানার সঙ্গে রেস্ট বা বিশ্রাম বৃহত্তরভাবে মনের একটা আবামপ্রদ নিরাপদ অবস্থা বোঝায়। স্বপ্নদ্রষ্টার মনের ইচ্ছেও তাই। —ঘুম পাড়ানো বলতে এখানে আমি বুঝছি বাণীর শৈশবাবস্থা। কেননা ছেলেবেলাতেই ঘুমপাড়ানোর প্রয়োজন ঘটে, পরে

BanglaBook.org

আর নয়। আর ঘুমপাড়ানোর সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে শিশুর নির্ভাবনাময় স্নেহ, আশ্রয়, পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নির্ভরশীল অনায়াস এক জীবন। স্বপ্নের প্রথম অংশটির মোটামুটি অর্থ তা হলে দাঁড়াল—বাণীব্রত তার শৈশবজীবনের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পাশে বসে যে ঘুম পাড়াচ্ছে বাণী তাকে চিনতে পারছে না—তবু তার মনে হয় সে খুব চেনা। বাণী ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে বাণীকে ঘুম পাড়াচ্ছে যে তাকে আমরা বাণীর মা হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি। মনে হয় খুব চেনা—অর্থাৎ বাণী তার অনুভূতিতে এই মহিলাটিকে অনুভব করতে পারছে; চিনতে পারছে না। কারণ বাণী তার মার প্রত্যক্ষ মূর্তিকে যে-কোনও কারণেই হোক মনে করতে চায় না। এ এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। মনের এই দ্বিত্বভাব—'হ্যাঁ' আর 'না' সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। মার আশ্রয়ে যে নিরাপদ মধুর জীবনের আস্বাদ বাণীব্রত পেয়েছে সেটা আবার সে ফিরে পেতে চায়—কিন্তু তার মাকে চায় না। কেন? তবে কি এই মাকে কেন্দ্র করে কোনও তীব্র দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও?...আমার ধারণা স্যার, বাণী সত্যিই তাই করেছে।'

'কেমন করে?'

'সুদক্ষিণা বাণীব্রতর মার বাল্যসখীর কাছ থেকে যে খবর জোগাড় করে এনেছে তাতে দেখি বাণীব্রতর মা অ্যাকসিডেন্টে—দুর্ঘটনায় মারা যান। কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটে তা ভদ্রমহিলা বলতে পারেননি। সে-সময় তিনি নাগপুরে। বহুদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে জানতে পারেন তাঁর বান্ধবী, বাণীর মা অ্যাকসিডেন্টের ফলে হাসপাতালে মারা গেছেন। ওর বাবা বাড়ি বদল করে অন্য জায়গায় উঠে গেছেন।'

'আর কিছু খবর?'

'হ্যাঁ, সামান্য। বাণী তার মাকে ভীষণ ভালোবাসত। এবং মা-ও তাঁর ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসতেন। বাণীর সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটা বরং একটু ভয়-ভক্তির মাত্রা মেনে চলত।'

অধ্যাপক তাঁর চায়ের শূন্যপাত্র আবার পূর্ণ করলেন। প্রণবের পাত্রটিও দিলেন পূর্ণ করে। চিনি মেশাতে-মেশাতে বললেন তিনি, 'তুমি তা হলে বলতে চাও, যেহেতু অ্যাকসিডেন্টের ফলে বাণীব্রতর মা মারা যান, আর এটা একটা বড় দুঃখের অভিজ্ঞতা, তাই বাণীব্রত তার মাকে মনে করতে চায় না?'

'অনেকটা তাই। আমার আরও বিশ্বাস, এই অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে বাণীব্রত কোনও-না-কোনও ভাবে নিজেকে জড়িত বলে মনে করে। তাই তার মার মৃত্যুতে যে চরম দুঃখময় অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে—সে দুঃখ আর সে পেতে চায় না। ফলে বাণী স্বপ্নেও তার মাকে মনে করতে চায় না। আমার এ ধরনের বিশ্লেষণের যুক্তির কারণ আপনি স্বপ্নের পরের অংশটুকুতে পাবেন।' প্রণব চায়ের পেয়ালায় দ্রুত ক'টা চুমুক দিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল সিগারেট কেসের জন্যে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সামনে তার পরমশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিটি বসে। বেচারার সমস্ত শরীরটা মুষড়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। আর তার তো ঘণ্টায় কমপক্ষেও তিনটে সিগারেটের প্রয়োজন হয়। দূর ছাই! এরপর আবার বক-বক করতে হবে এখন ক'ঘণ্টা কে জানে? মাথা জমে গেছে যেন। অতএব মাথা ছাড়াবার জন্যে প্রণব বললে, 'আপনি এটা একটু দেখুন, আমি আসছি।'

প্রণব চলে গেল। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় স্বপ্নের পরের অংশটুকু গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার করতে বসলেন।

কখন যে প্রণব আবার ফিরে এসে বসেছে অধ্যাপক বুঝতে পারেননি। তন্ময় হয়ে তিনি স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পাঠ করে চলেছেন।

'আমার অ্যানালিসিস—'প্রণব বলতে চাইল।

কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক বলে উঠলেন, 'চমৎকার। ব্যাখ্যা তোমার ঠিক হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু নৌকো বলতে তুমি এখানে ধরেছ বাণীব্রতর পারিপার্শ্বিক সংসার, তার আত্মীয়,

BanglaBook.org

স্বজন, বন্ধু, বান্ধব—অর্থাৎ পারিবারিক পারিপার্শ্বিক। কেমন কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নৌকো একটা ভেসেল—আমাদের চলতি কথায় সব সময় 'জীবন-তরণী' কথাটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এখানে নিজেকে বাদ দিয়ে সংসারের দিকে তাকালে কি মনে হয় না, সত্যি বুঝি লোকজন, হাসি-দুঃখ, অভাব অভিযোগ ভরা, ভিড় করা একটা নৌকো ভেসে চলেছে! আমি শুধু তার নীরব দর্শক। শুধু বাণীব্রতর শৈশবজীবন কেন, তার উত্তরজীবনের দিনগুলো যেভাবে কেটেছে তাতে তো দেখি সে একা, নিরপেক্ষ, আত্মকেন্দ্রিক একটি প্রাণী। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা একান্তই নগণ্য। আবার যাও আছে তাদের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। সংসার থেকে নিজেকে সে সরিয়ে রাখতে চায়—আর বাণীব্রতর মনের গড়নটাই সেরকম বলে আমার ধারণা—তখন তার পক্ষে নিজের শৈশব ও কৈশোর জীবনেও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পারিপার্শ্বিক ব্যবহারিক জগৎকে দেখার ইচ্ছেই কি যুক্তিযুক্ত নয়?'

'আমি বলি কি নৌকোর ব্যাখ্যাটা তুমি এভাবে করো না। যদিও তোমার-আমার শেষ বক্তব্য একই দাঁড়াবে, তবু এখানে স্বপ্নে রূপান্তরিত নৌকো সময়ের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাহলে স্বপ্নের পরবর্তী অংশের অর্থ দাঁড়ায়—বাণীব্রতর সুখময় শৈশবজীবনের পর সময় কেটে যেতে লাগল।...ঘুম ভাঙল হঠাৎ। চোখ খুলে দেখি—একটা নৌকো আমার বিছানার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; তাতে অনেক লোক। তাদের কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। ওদের মধ্যে কেউ যেন বললে—এই হ্রদের জলে একটি মেয়ে ডুবে গেছে। তাদের কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় হল।...আমার মতে এই অংশটুকুর অর্থ ঃ বাণীব্রত একদিন তার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজনের কারুর কাছ থেকে হঠাৎ জানতে পারল—কি নিজেই তার 'সাবকনসাসে' অনুভব করলে প্রথম যে, তার মার অ্যাকসিডেন্টের জন্যে সে দায়ী।'

'সে দায়ী?' প্রণব প্রায় চমকে উঠে উচ্চারণ করলে।

'Yes—he thought himself responsible for the accident—his conscious partly admitted the fact! যদি তার সজ্ঞান মনে—আমি আমার মার দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী—এই চিন্তা না আসবে, তাহলে সে ভয় পাবে না। স্বপ্নে তুমি হ্রদ কথাটার অর্থ বাদ দিয়ে রেখেছ। এখানে হ্রদ আর কিছুই নয়, বাণীব্রতর সমস্ত জীবনটার প্রতীক। ভেবে দেখ, স্বপ্নটুকুর অর্থ কেমন সহজ হয়ে এল। একদিন হঠাৎ কোনও সূত্রে বাণীব্রত বোধ হয় জানতে পারল, তার জন্যেই মা তার মারা গেছেন। এই জানার আঘাত যে কী, তা তো বুঝতেই পারো। তারপর শুরু হল তার অবচেতন মনে এই মারাত্মক পাপ বোধের চিন্তা আর সজ্ঞান মনে সেই পাপ বোধকে অস্বীকার করার দুর্দমনীয় স্পৃহা। The conflict comes—বিপরীত উভয় চিন্তার দ্বন্দ্ব হল শুরু।'

'ব্রিজ?'

'ব্রিজই তো হবে।...শুধু দেখতে পেলুম হ্রদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ব্রিজ—সেই ব্রিজের ওপর একটা কুকুর বসে ডাকছে। কী বিকট তার ডাক আর জ্বলন্ত দৃষ্টি! কুকুরটা আমায় দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ছুটে এল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কেমন হয়ে আসে। কুকুরটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে বিরাট লাফ দিল।'...এ অংশটুকু তোমার সঙ্গে আমি একমত। ব্রিজ যেমন একটা জায়গার সঙ্গে আর একটা জায়গার সংযোগ আই মিন লিংক রাখে, তেমনি বাণীব্রতর সমস্ত জীবন ওই এক দুশ্চিন্তা দিয়ে লিংক-আপ মানে জোড়া থাকল। কুকুরের ব্যাপারটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আবার কোন এক জায়গায় কুকুরের উল্লেখ আছে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তার শেষ স্বপ্নে আবার কুকুরের কথা আছে। তা ছাড়া বাণীব্রত ফ্রি অ্যাসোসিয়েশানের সময় অনেকবারই কুকুরের কথা বলেছে।'

'What it means?' অধ্যাপক চিন্তিত হলেন।

'আমার মনে হয় কুকুরটা বাস্তবেও কুকুর।'

BanglaBook.org

'ওকি কুকুর দেখে ভয় পায়?'

'কুকুর দেখে ঠিক ভয় পায় না—অস্বস্তি বোধ করে। কুকুরের ডাক ভীষণ অপছন্দ করে। একদিন আমি পরীক্ষা করার জন্যে ডাঃ গুপ্তের গ্রে হাউন্ড কুকুরটা নিয়ে ওর কাছে গিয়েছিলাম। বাণীব্রতকে দেখে সে ডেকে উঠল। দেখলুম, বাণীব্রত ভয় পেয়ে ছুটে তার কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ক'দিনই ও আমাকে দেখলে সোজা কেবিনে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিত। অনেক কষ্টে আমি তার সে ভয় ভাঙিয়েছি। অবশ্য আর কোনওদিন কুকুর নিয়ে তার সামনে যাইনি।'

'ও! যাক, তুমি দ্বিতীয় স্বপ্নটা বলো।' অধ্যাপক আবার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন।

প্রণব তার ডায়েরিটা তুলে নিল।

'দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বপ্ন দুটো তেমন জটিল নয়। তার কারণ স্বপ্নের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব দুটির পরিপূরক হিসেবে বাণীব্রতর জীবনের দুটি অধ্যায়ের নানা বিষয় জানা সম্ভব হয়েছে। আপনি স্যার স্বপ্নটি পড়ে যান আমি তার যা ব্যাখ্যা করেছি বলে যাই—তাতে সুবিধে হবে।'

'বেশ তো দাও।' অধ্যাপক হাত বাড়িয়ে ওর ডায়েরিটা নিলেন। পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন, 'আমি মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ঝড় উঠেছে। গাছগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঝড়ের দাপটে। মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম।'

'বাণীব্রত তার অশান্তিময় জীবনের দিনগুলো এক-এক করে কাটিয়ে চলল। কৈশোর শেষ হল। এল যৌবন। দুশ্চিন্তা আর আত্মদ্বন্দ্ব যেন আরও বেড়ে উঠল। অন্তরে সে অনুভব করল যৌবনের প্রথম তাপ। মন চাইল একটুখানি আশ্রয়। অবশেষে সে আশ্রয় খুঁজে পেল বাণীব্রত।' প্রণব থামল।

'Quite good!' অধ্যাপক পড়ে যেতে লাগলেন আবার ঃ 'একটি মেয়ে—হ্যাঁ, একটি মেয়ে এসে আমায় দরজাটা খুলে দিল। আমার বেশ মনে পড়ে, মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে, এত দেরি হল? আমিও হাসলুম।'

'এই মেয়েটি বাণীব্রতর জীবনে আনল প্রথম প্রেম!' প্রণব বলে চলল, 'যৌবনে বাণীব্রত যাকে তার সাথী করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, যার কাছে চেয়েছিল আনন্দ, ভোগ, ভালোবাসা ও আশ্রয়—এই মেয়েটি সেই। বাণীব্রত ভেবে নিল তার দাবি মেটাবার ক্ষমতা আছে এর। এবং বাস্তবে এরই নাম নীলা।'

'You mean that lady—wife of Dr. Chakravartty?'

'হ্যাঁ স্যার, তবে নীলা তখন কুমারী। বাণীব্রতর প্রেমের জীবনের এই শুরু।'

'Can You explain this—আমার বেশ মনে পড়ে মেয়েটি আমায় দেখে হেসে বললে, এত দেরি হল? আমিও হাসলুম।'

'আলাদাভাবে এ কথাটির ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করিনি। কেননা মেয়েটির হাসা এবং আসতে দেরি হওয়ার জন্যে প্রশ্ন করা আর কিছু নয় নীলা ও বাণীর সহজ অনিষ্ঠ পরিচয়কে বোঝাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তারপর পড়ি।...খানিক পরে আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে টেবিলে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ির দোলনা ঝোলানো রয়েছে দেখি। কে একজন অন্ধকারে বসে দুলছে তাতে। দোলনাটা দুলতে-দুলতে আমাদের টেবিলের কাছে এসে পড়ছিল। এত ভয় করছিল আমার। আমি বারণ করলুম। দোলানার লোকটা হেসে উঠে যেন আরও বাড়াবাড়ি শুরু করলে।' অধ্যাপক থামলেন।

প্রণব বলে চলল, 'নীলার সঙ্গে বাণীব্রতর ঘনিষ্ঠতা বেশ বৃদ্ধি পেল। এমন সময় বাণীব্রত আবিষ্কার করলে—তার এবং নীলার ঘনিষ্ঠতা অন্তরাল থেকে আর একজনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। এই লোকটিকে বাণীব্রত পছন্দ করে না, তাই মনে করতেও চায় না। ক্রমশই সেই অন্তরালের লোকটি

BanglaBook.org

বাণী ও নীলার প্রেম-জীবনের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করল। বাস্তবের ঘটনাও বোধহয় তাই। নীলা যদিও বলে, ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার আলাপ প্রথমটায় তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, তবু সে কথা বিশ্বাস করতে আমার বাধে। বরং আমার মনে হয় বাণীব্রতর চোখের আড়ালে নীলা এবং ডাঃ চক্রবর্তীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। বাণীব্রত যখন সেটা বুঝতে পারল, তখন থেকেই অস্বস্তি এবং ভয়ে ও বেচারি মুষড়ে পড়ল। ডাঃ চক্রবর্তী যদিও বাণীব্রতর ভাই এবং সমবয়েসি বন্ধু, তবু মনে হয়, বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে মনে-মনে কোনওদিনই খুব বেশি পছন্দ করত না। বিশেষত এ-হেন ঘটনার পর বাণীব্রতর মনে হয়েছে, ডাঃ চক্রবর্তী স্বভাবে স্বার্থপর, নির্দয়, যুক্তিহীন এক মানুষ। ...যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাণীব্রত বোধ হয় ডাঃ চক্রবর্তীকে বারণ করলে নীলার সঙ্গে বেশিমাত্রায় মেশামেশি করতে। ডাঃ চক্রবর্তী সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে নীলার সঙ্গে তার গোপন অন্তরঙ্গতা আরও বাড়িয়ে তুলল।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মাথা নেড়ে অস্পষ্ট, মৃদু দু-একটা কথায় প্রণবের স্বপ্ন ব্যাখ্যায় সমর্থন জানাচ্ছিলেন। প্রণব চুপ করলে বললেন অধ্যাপক, 'এবার শেষ অংশটুকু : খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে আসতে যাচ্ছি, হঠাৎ দোলনা থেকে লোকটা নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরল। দোলনার দড়িটা জড়িয়ে দিল আমার গলায়, বললে, আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত তারপর লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড় করানো পাথরের একটি ভাঙা 'ভেনাস মূর্তি' এতক্ষণ পরে আমার চোখে পড়ল। ভেনাস মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল।'

'স্বপ্নের এই অংশটুকু বেশ বুঝতে পারি। বাণীব্রত বুঝতে পারল নীলার সঙ্গে তার মন বিনিময়ে বাধা এসে জুটেছে, আর সে বাধা ঘুচোনো সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?'

'বোধ হয় কোনও ব্যাপারে বাণীব্রত ডাঃ চক্রবর্তীকে ভয় পেত। উপরন্তু হয়তো নীলাব প্রেমের সততা সম্বন্ধে সে সন্দেহ করেছিল ইতিমধ্যে।'

'বেশ, তারপর?'

'তখন বাণীব্রত নীলার জীবন থেকে সরে আসতে চেয়েছে। সম্ভবত এ সময়েই ডাঃ চক্রবর্তী বাণীব্রতকে একেবারে চিরকালের জন্যে নীলার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার আশায় কোনওরকম ভয় দেখায়। এরপর ডাঃ চক্রবর্তী নীলাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। বাণীব্রতর জীবনে প্রথম প্রেম এমনি করেই একদিন গভীর আঘাত পেয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই 'ভেনাস' অর্থাৎ প্রেমেব দেবীর প্রতিমূর্তিকে বাণীব্রত দেখেছে ভাঙা। মূর্তির হাসিটা আর কিছু নয় বিদ্রুপ। প্রেম যেন বাণীকে হেসে উঠে বিদ্রুপের কশাঘাতে স্থবির করে দিলে।'

দ্বিতীয় স্বপ্নটির বিশ্লেষণ শেষ হল। প্রণব আবার একবার উঠে বাইরে থেকে ঘুরে এল। অধ্যাপক ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে ভাবতে লাগলেন স্বপ্ন-কথা।

একটু পরে প্রণব নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললে, 'তৃতীয় স্বপ্নটা স্যার, যদিও গোড়ার দিকটা সহজ কিন্তু শেষটা বেশ জটিল। এই স্বপ্নটি থেকেই আমার বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়েছে বাণীব্রত খুনি নয়—ডাঃ চক্রবর্তীকে সে হত্যা করেনি।'

'বলো শুনি।'

'স্বপ্নটা বাণীর ভাষায় এরকম।' প্রণব ডায়েরি তুলে নিয়ে পড়তে লাগল; 'ট্রেনের কামরা থেকে নামলাম। একটা সুন্দর ছোট্ট স্টেশন—স্টেশনের পাশ দিয়ে একটা পথ। হেঁটে চলেছি আমি।'

'জীবনের চলার পথে আর এক নতুন অধ্যায়ের কথা বলতে চাইছে ও।

'A fresh start?'

'ঠিক তাই, স্যার। বাণীব্রতর জীবনের নতুন পর্ব—তারই কথা। শুনুন স্বপ্নটা : হেঁটে চলেছি—

BanglaBook.org

হ্যাঁ, আমি গান শুনতে পেলুম, কে যেন জানলা খুলে ডাকল আমায়—চেয়ে দেখি সাজপরা, সিঁথিমৌর পরা একটি মেয়ে—কত ফুল ফুটে রয়েছে জানালার ধারে। সেই ফুলের ওপর ভাসছে মেয়েটির মুখ। কী সুন্দর তার হাসি। আমায় সে ডাকল।' প্রণব একটু থামল। ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে বলল, 'দেওঘরের বিষয় আর কী। বাণীব্রতর সঙ্গে সুদক্ষিণার পরিচয়। সুদক্ষিণার গান শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সুদক্ষিণাকে আপনি দেখেননি; দেখলে বুঝতে পারতেন—তার প্রকৃতিতে এমন সুন্দর একটা নমনীয় ভাব আছে যা সকলকে মুগ্ধ করে। লক্ষ করে দেখুন—গান, ফুল, সিঁথিমৌর—ব্যবহারিক জীবনে যা সুন্দর, যা আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, সবের মিলন ঘটেছে স্বপ্নে। উপরন্তু—'আমায় সে ডাকল।' বুঝতে পারছেন, বাণীব্রত এতদিন পরে তার মনের মতো একটি নারীকে আবার খুঁজে পেল। দেওঘরের কথা সুদক্ষিণার কাছে সবই আমি শুনেছি। বাণীব্রত তাকে দেখে বাস্তবিক মুগ্ধ হয়েছিল, ভালোবেসেছিল। ওদের মন জানাজানিও হয়ে যায় এসময়।'

'বুঝতে পেরেছি। তারপর?'

'এলাম তার কাছে। খুব ভালো লাগছিল। আমি যেই মেয়েটির কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ দেখলাম ফুলের গাছ মিলিয়ে একটা বীভৎস কুকুরের মুখ ভেসে উঠল; ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত জায়গাটা ভরে তুলল। কুকুরটা আমায় দেখতে পেলে। আমি ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলাম। মেয়েটির কাছে যাওয়ার জন্যে অন্য পথে পা বাড়ালুম।' প্রণব ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে বললে, 'এর অর্থ বোধহয়, বাণীব্রত যখন সুদক্ষিণার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে নতুন দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ কোনওরকম বাধা এসে জুটল আবার।'

'কী বাধা?'

'তা জানি না। সম্ভবত ডাঃ চক্রবর্তীর আবির্ভাবের ব্যাপারটাই বোঝাচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

প্রণব পড়ে চলল ঃ 'অন্য পথে পা বাড়ালুম। খানিকটা গিয়ে দেখি সে পথও বন্ধ। একটা লোক খুব বড় একটা দড়ি নিয়ে ঘোরাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা দড়ি নয় ভীষণ বড় সাপ। আমায় দেখে সে দড়িটা আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে আমি বাধা দিতে গেলাম। তারপর কী হল কে জানে। ভীষণ গণ্ডগোল আর হইচই। কারা যেন 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে চিৎকার করতে লাগল। আমি পালাতে লাগলাম।'

প্রণব ডায়েরি বন্ধ করে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

'দড়ি নিয়ে ঘোরানোয় কী বুঝতে পারো?'

'গোপন ষড়যন্ত্র। দড়ির সঙ্গে বাঁধার অঙ্গাঙ্গী একটা সরল সম্বন্ধ আছে। ষড়যন্ত্রের জালে বাণীকে বাঁধার চেষ্টা চলছিল বলে মনে হয়। স্বপ্নে যে লোকটা অদৃশ্য আছে সেটা কে, তা বলা মুশকিল।'

'ডাঃ চক্রবর্তী?'

'সন্দেহ হয় তাঁকেই বেশি। অন্য কেউ হতেও পারে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত?'

'অনেক বিচার বিবেচনা করে আমার ধারণা হয়েছে, বাণী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে তাকেই হিংস্র কোনও আক্রমণ সহ্য করতে হয়। সাপের ভাবগত অর্থ বিচার করলে দেখব, আলোচ্য প্রাণীটা আমাদের মনে হিংস্র, নিষ্ঠুর, বিষাক্ত দ্রব্য, বিপদ ও ভয়ের ভাব জাগায়। এখানে সাপ ছুঁড়ে দিয়ে বাণীব্রতকে ভয় পাওয়ানো এবং হত্যা এই উভয় চেষ্টাই করা হয়েছে। তবে মনে হয় ভয় ঠিক নয়—সম্ভবত হত্যা করার চেষ্টাই করা হয়েছিল। নয়তো—' প্রণব হঠাৎ থেমে গেল।

'নয়তো—নয়তো কী?' অধ্যাপক উদগ্র কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

'ডাঃ চক্রবর্তীর রিভলভারে তিনি নিজেই কী করে আহত হন?' প্রণবের কথাটা গভীর রহস্যময় বলেই মনে হল অধ্যাপকের।

তিনি বললেন, 'ষড়যন্ত্র আর হত্যা করার বিষয় তুমি দৃঢ় সঙ্কল্প?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বপ্নে সাপ ডাঃ চক্রবর্তীর প্রতীকও হতে পারে। এমন কি রিভলভারেরও। এ রকম একটা ব্যাখ্যা আমি পড়েছি।'

'তুমি ফ্রি অ্যাসোসিয়েশান করে কিছু উদ্ধার করতে পারোনি?'

'না। আগে যাও বা এক আধদিন হয়েছে এখন তাও হয় না।'

দুজনেই নির্বাক হয়ে ভাবতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রণব বললে, 'সমস্ত স্বপ্ন মিলিয়ে, বিচার বিশ্লেষণ করে আমার ধারণা হয়েছে, বাণী ছেলেবেলায় কোনও কারণে একটা ভীষণ রকমের মানসিক আঘাত পায়। সেই আঘাতই তার মনের নিভৃতে বেড়ে উঠেছে। যৌবনে নীলাকে ভালোবেসেও শেষ অবধি তাকে হারাতে হল, গোপনে বহন করা এই আঘাতের জের হিসেবে। সুদক্ষিণাকে একান্ত করে পেয়েও পাওয়া হল না, তাও এই আঘাতেরই আর একটা জের। বাণীব্রত আজীবন ভয় পেয়েই গেছে, কাউকে ভয় দেখাতে যায়নি। খুন—না, বাণীব্রত খুন করেনি। তার পক্ষে ওটা নেহাতই বাহুল্য।'

অধ্যাপক কোনও উত্তর দিলেন না। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রণব চিন্তিতমনে চুপ করে বসে থাকল।

এক-একটি দিনের আয়ু খুব বেশি নয়। বিশেষ কোনও অবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বিচার করলে তবেই যেন মনে হয়, একটা পুরো দিন, দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা যেন অনেক—অনেকটা সময়। দুহাত দিয়েও যাকে কুলিয়ে ওঠা যায় না। এ না হলে একটি দিনের আয়ু আর এক মুহূর্তের একটি নিশ্বাস—এদের পরমায়ু সমানই। চোখের পলকে তার স্থিতি।

দিন আসে, যায়।

দেখতে-দেখতে আরও আট-ন'মাস কেটে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতায় আর হাসপাতালের খাতায় দীর্ঘ এই সময়ের হিসেব লেখা থাকল। লেখা থাকল না শুধু বাণীব্রতর জীবনে। তার কাছে বুঝি সময়ের মূল্য শেষ হয়ে গেছে।

আজও সেই আগের মতোই দিন কাটছে বাণীব্রতর। বড় রকমের কোনও একটা পরিবর্তন তার হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হবে—এমন আশাও করা যায় না। মনের দিক থেকে, ব্যবহারে, কার্য-কারণ, শৃঙ্খলা-বোধ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বাণীব্রত যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। সহজে কারুর ধরার উপায় নেই সে মনোবিকারের রুগি। কথাবার্তা, আচরণ স্বাভাবিক, একটা মানুষের যেমনটা হতে পারে বাণীব্রতরও তাই। সেটা স্থায়ী নয়। অস্থায়ী। মাঝে-মাঝে, হঠাৎ সমস্ত সামঞ্জস্যকে উলটে-পালটে বাণীব্রত তার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে।

সম্ভবত বাণীব্রতর সুবিধে এবং ভালোর আশা করেই তাকে পুরোনো কেবিন থেকে সরিয়ে হাসপাতালের প্রথম শ্রেণীর স্বতন্ত্র একটি কেবিনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। এখানকার কড়াকড়ি নিয়মকানুন ওর ওপর থেকে যথাসম্ভব উঠিয়ে, স্বাধীন একটা জীবনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রণব। বাণীব্রত সে স্বাধীনতা ভোগ করছে অক্ষুণ্ণভাবে।

এদিকে সুদক্ষিণার দিন কাটছে মাঝরাতের ছোট স্টেশনের মতো। থেকেও যেন নেই। দরকার পড়লেই ওকে জেগে উঠতে হবে—সাড়া দিতে হবে ডাক এলেই; কিন্তু দরকার আর হয় না, ডাক আর আসে না। অপেক্ষায়-অপেক্ষায় ও যেন অসাড়।

চাকরি গেছে সুদক্ষিণার। মনোহরপুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ধানবাদ অঞ্চলে কোথায় যেন

BanglaBook.org

ও একটা চাকরি আবার খুঁজে নিয়েছিল। এখন এখানেই মাস্টারি করে। নিয়মিত আসে পরেশনাথে। ক'দিন থাকে। আবার ফিরে যায়।

পুলিশ থেকে ইতিমধ্যে একটা খবর এল। মিঃ ঝা জানালেন প্রণবকে। খবরটা চশমা সংক্রান্ত। ডাঃ চক্রবর্তীর বসবার ঘরে যে ভাঙা চশমার কাচ পাওয়া যায় এবং এতদিন যা বাণীব্রতর বলে অতি সহজেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল, আসলে সে চশমাটা নীলার। পুলিশ ডাঃ চক্রবর্তী যে-ঘরে মারা যান সে ঘরে বাণীব্রতর হাজির হওয়া সম্বন্ধে একাধিক যেসব স্থূল প্রমাণ পেয়েছিল তারপর আর সামান্য একটা ভাঙা চশমার কাচ নিয়ে মোটেই তারা মাথা ঘামায়নি। চশমাটা যে তার সেটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের মতোই ওদের মনে হয়েছে। সাম্প্রতিক তদন্তের ফলে নীলা জানিয়েছে, তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে গিয়ে তার চশমাটা ভেঙে যায়। চশমার বাকি অংশটুকু কোথায় সে রেখেছে মনে পড়ছে না। তাড়াতাড়িতে কোথায় ফেলেছে কে জানে—মনে করতে পারে না এখন। চিঠিটা পেয়ে প্রণব যেন একটু বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

একদিন। কত রাত কারুর খেয়াল নেই। পুবের হাওয়া আসছিল দমকে-দমকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বসে গল্প করছিল প্রণব, কুন্তলাদি আর সুদক্ষিণা।

গল্প বেশ জমে উঠেছিল। বক্তা কুন্তলাদি। বিষয়—ছেলেবেলায় নানা দুষ্টুমির কাহিনি। কী একটা কথায় প্রণবের বুঝি আপত্তি দেখা দিল। আপত্তি জানিয়ে সে বললে, 'কে বললে মনে নেই? তবে—' প্রণব তার কথা শেষ না করেই সামনে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে গেট খুলে কে যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

সকলেই সেদিকে চোখ ফেরাল।

বারান্দার কাছাকাছি আসতেই আগন্তুকের টর্চের আলো এসে পড়ল প্রণবদের গায়ে। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল।

'ডাক্তারবাবু, শীঘ্রি আসুন।' গলায় তার উত্তেজনা। হাঁপাচ্ছে লোকটা। হাসপাতাল থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছে বোঝা গেল।

প্রণব চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসেছে। 'কী হয়েছে, কালিচরণ?'

'দুনম্বর কেবিনের বাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি—বাণীবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাণীবাবু। তিনি যে কখন হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন কেউ জানে না।'

প্রণবের চোখের সামনে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। পায়ের তলায় বারান্দাটা যেন হঠাৎ খুব হালকা মনে হল ওর। হৃৎপিণ্ডটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো বেসামাল হয়ে উঠল।

সুদক্ষিণাও ততক্ষণে প্রণবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কতক্ষণ বাণীবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে বিকেল থেকে, কেউ বলছে সন্ধের পর থেকে।'

'দারোয়ান কী করছিল? প্রণবের গলার স্বর ভীষণ গম্ভীর।

'আজ্ঞে সে দেখেনি।'

'দেখেনি?' প্রণব দাঁতে-দাঁত চেপে ক্রোধ দমন করলে। 'বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সিধু গেছে খবর দিতে।'

প্রণব অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলে। এমন যে হতে পারে সে ভাবেনি, কল্পনা করেনি। কোথায় গেল বাণীব্রত? কেনই বা গেল? হাসপাতাল থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কী কারণ ঘটল? কিন্তু হাসপাতালই যে একরকম তার জামিন। এবার তো আর পুলিশ ছাড়বে না। বাণীব্রত

BanglaBook.org

যে খুনি নয়, তার কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পুলিশের কাছে পেশ করা হয়নি। এখনও বাণীব্রতর নামে হত্যা-দায়ের অভিযোগ। তার নামে ওয়ারেন্ট। কী হবে এবার? বাণীব্রতকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়? পুলিশ থেকে সহজে ছাড়বে না তাদের। ওরা নিশ্চয় সন্দেহ করবে তাকে। হয়তো প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে প্রণব ষড়যন্ত্র করে বাণীব্রতকে সরিয়ে দিয়েছে। কী লজ্জার কথা। ছিঃ-ছিঃ। তার নিজের সম্মান, দায়িত্ব, এ হাসপাতালের সুনাম, কুমার বাহাদুরের উঁচু মাথা সব আজ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিল বাণীব্রত। নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হতে লাগল প্রণবের। বাণীব্রতকে অতটা স্বাধীনতা দেওয়া তার উচিত হয়নি। হাসপাতালের খানিকটা কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে রাখলে এমন মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটত না। কুন্তলাদি জামা এনে দিলেন। প্রণব কোনওরকমে জামাটা গলিয়ে নীচে নামবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, দেখে সুদক্ষিণাও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার সঙ্গে আমিও যাব।' সুদক্ষিণা দৃঢ় কণ্ঠে বললে।

প্রণব বারণ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী ভেবে শেষে বললে, 'বেশ, চলো।'

ওরা বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুন্তলাদি নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন পাথরের মতো।

হাসপাতালে এসে প্রণব দেখল, ডাঃ গুপ্ত ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। বাণীব্রতর কেবিনের সামনে জনাকতক নার্স আর চাকর-দারোয়ানদের ভিড়। ডাঃ গুপ্তকে রাগতে প্রণব কোনওদিন দেখেনি। আজ এই প্রথম দেখল। শান্ত, মৃদু, হাস্যসিক্ত স্বর আর নয়—রাগে তাঁর সমস্ত মুখখানা আগুন-ধরা উনুনের আঁচের মতো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। কর্কশ, তিক্ত, কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। জেরা করে, ধমকে একসার করছেন। প্রণব এসে দাঁড়াতে ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'প্রণব, কালকে এদের একধার থেকে সব দূর করে তাড়িয়ে দেবে। আমার হাসপাতালে দায়িত্বজ্ঞানহীন কতকগুলো অপদার্থ ভূত পুষতে আমি রাজি নই।'

প্রণব সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে প্রথমেই কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। টিপয়ের ওপর বাণীব্রতর খাবার ঢাকা দেওয়া পড়ে রয়েছে। জানালা ভেজানো। টেবিলের ওপর টুকিটাকি জিনিস, দু-একটা বই অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।

টেবিলের ওপর থেকে প্যাডখানা টেনে নিল প্রণব। পাতা ওলটালো। সবুজ কাগজের ওপর কোথাও একটি কালির আঁচড় নেই। বাইরে এসে প্রণব বললে, 'দু-নম্বর কেবিনে খাবার দিয়ে গেছে কে?'

'বিশ্বনাথ কই?'

'বিশ্বনাথ ভিড়ের মধ্যে ছিল না। মিসেস নাগ বললে, 'ও বোধ হয় মিস দত্তর বাড়িতে আছে।'

'কেন?'

'আজকাল রাত্রিতে ও ওখানেই থাকে, রান্নাবান্না করে।'

বিশ্বনাথকে ডাকতে পাঠানো হল।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'স্টেশনে আমি লোক পাঠিয়েছি। যদি কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়। পুলিশেও একটা তার পাঠানো দরকার।'

প্রণবও কথাটা ভেবে দেখেছে। কিন্তু তার পাঠাবার আগে নিজেদের একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। প্রণব বললে, 'দেখি একবার চেষ্টা করে। নাহলে কাল তার করে দেব।'

অনেকক্ষণ থেকেই তৃপ্তি—তৃপ্তি যে কী একটা কথা বলবার জন্যে উসখুস করছিল। তার দিকে চোখ পড়তে প্রণব বললে, 'আপনি কিছু বলবেন?'

ঢোঁক গিলে তৃপ্তি অস্পষ্টভাবে জবাব দিলে, 'বাণীব্রতবাবুকে আমি দেখেছি বোধহয়।'

BanglaBook.org

'কখন—কোথায় দেখেছেন?'

'সন্ধেবেলা। আমি তখন হাসপাতালে আসছিলুম। মিস দত্তর সঙ্গে বাণীব্রতবাবুর মতোই একজনকে চলে যেতে দেখেছি মাঠের রাস্তা ধরে। আমার একবার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বাণীব্রতবাবু। তারপর আর—'

'দেখেছ তো এতক্ষণ বলোনি কেন?' ডাঃ গুপ্ত ধমকে উঠলেন।

তৃপ্তির কথায় প্রণব যেন আলো দেখতে পেল। বাণীব্রতর পলায়নের একটা কারণ অস্পষ্টভাবে জানা গেল এতক্ষণে। পলকের জন্যে ও একবার সুদক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। খোদাই করা মূর্তির মতো মুখের সমস্ত রেখাগুলো কঠিন ও প্রখর হয়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথকে যে লোকটা খুঁজতে গিয়েছিল ফিরে এসে সে জানাল বিশ্বনাথ নেই। মিস ডোরা দত্তর কোয়ার্টার অন্ধকার। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

এদিকে স্টেশন থেকেও লোক ফিরে এল। মাস্টারবাবু বলেছেন, হাসপাতালের লোকজন কাউকে তিনি স্টেশনে দেখেননি। তাছাড়া রাত সাড়ে ন'টার প্যাসেঞ্জার গাড়ি এখনও আসেনি। ভীষণ দেরি করছে আজ। কোথায় যেন লাইনের গোলমাল হয়েছে। সন্ধে থেকে সারারাত পরেশনাথ স্টেশনে থামে এমন দ্বিতীয় কোনও গাড়িও নেই যাওয়া আসার। কেউ যদি এসেও থাকে—পালাতে পারবে না। মাস্টারমশাই চোখ রাখবেন—ট্রেনে চড়ে কেউ যেন পালাতে না পারে।

সব শুনে প্রণব বললে, 'মিস দত্তর সঙ্গেই বাণীবাবু চলে গেছেন দেখছি। তবে পালিয়ে খুব বেশিদূর ওরা যেতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।'

'কোথায় গেছে—কেনই বা গেল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

যাওয়ার পথ তো মাত্র দুটো—হয় স্টেশন না হয় পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের যে রাস্তাটা উত্তর দিকে চলে গেছে সেটা। এ-ছাড়া যাবেই বা কোথায়? গাঙ্গুলীবাবু সিধুকে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে খোঁজ করিগে।'

'তাই ভালো। আমার গাড়ি আর বন্দুকটা আনতে পাঠিয়ে দাও।'

'বন্দুক?'

'পাহাড়ের পাশটা গরমকালে নিরাপদ নয়। সিজারকেও যেন আনে।' সিজার তাঁর গ্রে-হাউন্ড কুকুরটার নাম।

ডাঃ গুপ্তের শিকারের শখ ছিল। ব্যবস্থাও ছিল তাই সবরকমের। কালীচরণ ছুটল ডাঃ গুপ্তের বাংলোয়।

মিনিট কুড়ির মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসল প্রণব, ডাঃ গুপ্ত আর কালীচরণ। সুদক্ষিণা উঠতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'তুমিও যাবে? জায়গাটা কিন্তু ভালো নয়।'

'আমায় যেতে হবে।' সুদক্ষিণার কণ্ঠস্বর অনমনীয়।

'না গেলে পারতে।' প্রণব দ্বিতীয়বাবুর তার আপত্তি জানালে।

'এসো।' ডাঃ গুপ্ত কী বুঝে সুদক্ষিণাকে ডেকে নিলেন। বললেন প্রণবকে, 'ওর যাওয়াই ভালো।'

আর কোনও বাক্যব্যয় না করে প্রণব গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

পাহাড়ি এবড়ো-খেবড়ো গাছপালাভরা পথ দিয়ে ছুটে চলল গাড়িখানা। অন্ধকার-ঘন অরণ্য আলোয় চিরে, স্তব্ধ পারিপার্শ্বিককে যান্ত্রিক গর্জনে বিক্ষুব্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন

BanglaBook.org

একটা বর্বর স্বাদ আছে। সে স্বাদের স্পর্শ পেয়ে প্রণব বুঝি ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তার হাতের স্টিয়ারিং আর পায়ের ব্রেক বেসামাল হয়েও হয় না। গাছের ধাক্কা ফসকে, ঝাঁকুনি খেয়ে, বাঁক নেয় হঠাৎ। আবার ছুটে চলে। মাঝরাতে এ উৎপাত ভালো লাগে না বনচর জন্তুদের। তীব্র চিৎকার ওঠে মাথার ওপর, পাখা ঝাপটানোর রাশিকৃত শব্দ, আশেপাশে পলাতক শেয়াল আর বন্যকুকুরের ভীতার্ত আর্তনাদ। থেকে থেকে সিজারও গর্জন করে ওঠে। ভয় পেয়েছে এরা—প্রণব ভাবে মুহূর্তের জন্যে। আর তারপরই কেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ ওর গতির নেশাটাকে উগ্র করে তোলে।

দেখতে-দেখতে প্রায় দেড় মাইল পথ এগিয়ে এসে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রণব গাড়ি থামাল।

'থামালে যে?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ গুপ্ত।

'ওই যে খাপরার বাড়িটা দেখছেন, ওটা প্রসাদ রায়ের কাঠগোলা। লোকজন দু-চারটে থাকে। ওদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসি, যদি কেউ বাণীদের দেখে থাকে। এসো কালীচরণ।'

প্রণব কালীচরণকে ডেকে নেমে গেল।

সুদক্ষিণা দেখল টর্চের আলোয় পথ দেখে-দেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে।

ডাঃ গুপ্ত সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন।

একটু পরে হঠাৎ সুদক্ষিণা বললে, 'দূরে ওগুলো কী?'

'কোনটা?'

'ওই যে—সার-সার বাতি জ্বলছে?'

'ও! বাতিই মনে হয়। যেন দূরে কেউ হাজার-হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে নয়?'

'ঠিক সেরকম।'

'ওগুলো কিন্তু প্রদীপ নয়। গরমকালে সরকারি ফরেস্ট অফিস থেকে পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করবার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।'

'গাছপালা সব পুড়ে যাবে না?' অতল বিস্ময় সুদক্ষিণার গলায়।

'না পুড়বে কেন? বনের কোনও ক্ষতি হয় না—বন পরিষ্কার করবার জন্যেই সরকারি ব্যবস্থা এটা।'

সুদক্ষিণা চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাহাড় তাহলে এখনও অনেক দূর। অনেক দূরই তো! বাণীব্রতও তার কাছ থেকে আজ এমনি অনেক দূরেই চলে গেল। ডোবার সঙ্গে গেছে বলে যত না দুঃখ, তার চেয়ে বেশি দুঃখ প্রণবের এত ঐকান্তিক পরিশ্রম ও প্রীতিকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে গেল। নিজের জন্যে কিছু বলবার আর নেই সুদক্ষিণার। প্রচণ্ড একটা বিস্ময় ও ক্ষোভ তার অবশ্য প্রথমে হয়েছিল বাণীব্রতর পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে। এখন তা পুড়ে, নিভে, ছাইচাপা পড়ে গেছে। পালিয়ে যাওয়াই যার স্বভাব, তাকে সুদক্ষিণা কতদিন ধরে রাখতে পারে? কিন্তু এ কথা কেন ভাবছে সে? এমনও হতে পারে, ডোরাই বাণীব্রতকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে কোনও স্বার্থ সিদ্ধির আশায়। যদি তাই হয়, তবু বাণীব্রত কেন যাবে? প্রণব, হাসপাতাল, সুদক্ষিণা এরা কি কেউ নয়? কিন্তু ও যে পাগল! পাগল, পাগল—পাগল তো হয়েছে কী? এই এক কথা। দোষ, ত্রুটি ঢেকে নেওয়ার একটা মস্তবড় সুবিধে।

প্রায় ছুটতে-ছুটতে প্রণবরা ফিরে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে সুদক্ষিণার বুকটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'কোনও খবর-টবর পেলো নাকি ওরা?'

একটু পরেই প্রণব গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এক লাফে সিটে বসে প্রণব বললে, 'যা ভেবেছিলাম, স্যার। পাহাড়ের প্রায় কাছ বরাবর পুকুরধারের পাশে যে ভাঙা ডাক-বাংলোটা আছে, ফরেস্ট অফিসাররা আগে যেখানে থাকত, সেখানেই ওরা গেছে বলে মনে হয়।'

BanglaBook.org

'Strange! কেউ দেখেছে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাঠগোলার লোক সন্ধের মুখে ফেরবার সময় একটি মেয়ে ও দুটি লোককে ওদিক পানে যেতে দেখেছে। দেখে সে খুব অবাক হয়েছিল। সে ভেবেছে ওরা বুঝি শিকার করতে বেরিয়েছে। মেয়েমানুষ দেখে পুরোপুরি আবার তা বিশ্বাস করতেও পারেনি। আমি গিয়ে দেখি কাঠগোলায় এ নিয়ে রীতিমতো আলোচনা ও বচসার তখনও শেষ হয়নি।' গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রণব বললে আবার, 'শুনলাম ক'দিন থেকে একটা ভাল্লুক বেরিয়েছে এদিকে।'

সুদক্ষিণার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

ডাঃ গুপ্ত পাশে রাখা বন্দুকটায় হাত দিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'বেশ ভয়ের ব্যাপার। পালিয়ে ওরা এমন জায়গায় কেন এল কে জানে?'

ডাঃ গুপ্তের কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

নির্জন, নিস্তব্ধ বনভূমির এক অংশে এসে গাড়ি থামিয়ে প্রণব নীচে নামল। গাড়ির হেড্‌লাইট সে নিভিয়ে দিল ইচ্ছে করেই। সামনে খানিকটা ফাঁকা জমি—তারপর ঝোপ-ঝাপ, কাঁটাবন, দু-চারটে গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার পাশেই ভাঙা, জীর্ণ কাঠের বাড়ি একটা। টর্চের আলো বাড়িটার দিকে ফেলে প্রণব বললে, 'এখানেই বোধহয় লুকিয়ে আছে। রাত্রে বেশিদূর যাওয়ার সাহস ওদের নিশ্চয় হবে না। আসুন খুঁজে দেখি।'

ডাঃ গুপ্ত নামলেন। বন্দুকটা তুলে নিলেন গাড়ি থেকে। সুদক্ষিণাও নেমে এল। কালীচরণ কুকুরের চেন ধরে প্রণবের পাশে-পাশে হেঁটে চলল। ডাঃ গুপ্ত ভেবেচিন্তে বললেন, 'বেশি গোলমাল করে দরকার নেই। কী বল?'

প্রণবের হঠাৎ কেমন হাসি পেল। বললে ও, 'ওরা যদি সজাগ থেকে থাকে, আমাদের আসার কথা এতক্ষণে জেনে গেছে। কালীচবণ কুকুর নিয়ে তুমিই এগিয়ে চলো। দেখো, ওটা যেন আবার বেশি চেঁচামেচি না করে।'

অত্যন্ত সন্তর্পণে ওরা পা টিপে-টিপে এগুতে লাগল। নেহাত টর্চের আলোয় পথ যেটুকু না দেখলেই নয়—সেইটুকু আলো জ্বাললে। কাঁটাগাছে, ঝোপে সুদক্ষিণার শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে পা হাত কেটে, শাড়ি ছিঁড়ে সেও এগিয়ে যেতে লাগল সকলেব সঙ্গে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে—ভাঙা গেটটার সামনে থেকে দুটো শেয়াল ছুটে ভেতরে পালিয়ে গেল। কালীচরণের হাতের শেকল বুঝি একটু আলগাভাবেই ধবা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে কালীচরণের হাত ছাড়িয়ে বিকট একটা হুঙ্কার করে সিজার তীরের মতো পিছু ধাওয়া করলে পলাতক পশুদ্বয়ের। দেখতে দেখতে সিজারের ক্রুদ্ধ কর্কশ গর্জনে নিস্তব্ধ জায়গাটা ভরে উঠল। নিশীথ রাত্রে নির্জন বনভূমির অন্ধকার আর বাতাস সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রতিধ্বনিত গর্জনের সংস্পর্শে ভয়ংকর হয়ে উঠল।

'সিজার—সিজার!' ডাঃ গুপ্ত ডাকতে লাগলেন বারবার।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সকলে প্রথমটায়। ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সময় লাগল।

শেষে প্রণব বললে, 'আপনারা একটু দাঁড়ান।' কথা শেষ করে প্রণব আবার গাড়িব দিকে ফিরে চলল ছুটে।

সুদক্ষিণার চিন্তা করবার, কি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবার অবস্থা নয়। জড় পদার্থের মতো ও দাঁড়িয়ে। তার চোখের সামনে যেন রোমাঞ্চকর কোনও নাটকীয় দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, আর নির্বাক বিস্ময়ে ও তাই দেখে চলেছে।

কালীচরণ সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তারও ডাক শোনা যেতে লাগল, 'সিজার—সিজার!'

BanglaBook.org

গাড়ির শব্দে মুখ ফেরাতে ডাঃ গুপ্ত দেখলেন—প্রণব ফিরে গিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। চোখের পলকে সে গাড়িটাকে একেবারে গেটের সামনে এনে ভাঙা বাড়িটার মুখোমুখি করে দাঁড় করাল। গাড়ির হেডলাইট আর টপলাইট নেভাল না। কেবলমাত্র স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এল। গাড়ির আলোয় এতক্ষণে স্পষ্টভাবে কাঠের ভাঙা বাড়িটা ভেসে উঠল সকলের চোখের সামনে।

প্রণব ডাঃ গুপ্তের কাছে এসে বললে, 'আপনি সুদক্ষিণাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসুন। আমরা দুজনে এগিয়ে দেখে আসছি।'

'না-না, আমরা ঠিক আছি। সিজারটা এমন কাণ্ড করলে।'

'ওতে কিছু যাবে-আসবে না। ওরা যদি এখানে এসে লুকিয়ে থাকে ঠিক খুঁজে বের করব।'

প্রণব আর বাক্যব্যয় না করে ছুটে ডাকবাংলোর দালানটায় গিয়ে উঠল।

সিজারকে দেখা যাচ্ছে না—কোথায় গিয়ে ঢুকেছে কে জানে? তার ক্রুদ্ধ গর্জনের কিন্তু বিরাম নেই। সিজারের অবিরাম আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বনচর জন্তুর দল দূরে-দূরে মুখর হয়ে উঠছে। ভেসে আসছে তাদের বহুভাষী রব। দুটো বাদুড় প্রণবের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বিশ্রীভাবে চিৎকার করে একটা পেঁচা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'কালীচরণ?' প্রণব ডাকলে।

কালীচরণ কাছে আসতে প্রণব বললে, 'দেখ তো, ওই দরজাটা বন্ধ কি না?'

কালীচরণ সামনের দরজাটায় জোরে ধাক্কা দিল।

'বন্ধ।'

'দাঁড়াও।' প্রণব এদিক ওদিক খুঁজে ভাঙা একটা কাঠের ভারী গুঁড়ি খুঁজে নিল। ধরো, এই দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলতে হবে। দুজনে মিলে ওরা গুঁড়িটা তুলে নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। মড়মড় করে উঠল মাথার ওপরে আধভাঙা ছাদ। দরজাটা একপাশে ভেঙে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। প্রণবদের হাত থেকে কাঠের গুঁড়ি গেল পড়ে। চমকে উঠে মুখ ফেরাতেই তারা দেখতে পেল দালানের ঠিক নীচেই ঝোপের পাশ দিয়ে একটা ছোট নেকড়ে বাঘ সরে যাচ্ছে। মোটরের হেডলাইটের আলোয় সমস্ত জায়গাটাই আলোকিত—তাই স্পষ্ট ওরা দেখতে পেল। বন্দুকের শব্দেই হোক, কি গুলিতে চোট খেয়েই হোক—নেকড়েটা ঘুরে দাঁড়াল। সম্ভবত ঘুরে দাঁড়িয়ে ও আক্রমণকারীকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে আবার একটা গুলি এসে বিঁধল। ভয়াবহ বিকট আর্তনাদে সমস্ত জায়গাটা কাঁপিয়ে আহত পশু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে। এমন সময় সিজার কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

প্রণব আর কালীচরণ ইতিমধ্যে একটা থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিল। রুদ্ধ বিস্ময়ে, নির্বাক নিথর হয়ে তারা তাকিয়েছিল সামনে।

সিজার এক ফাঁকে একটু দূরে সরে আসতেই ডাঃ গুপ্ত পরপর আবার দুটো গুলি করলেন। শেষবারের মতো আক্রোশ জানিয়ে নেকড়ে বাঘটা শান্ত হয়ে গেল। সিজার তার সামনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক ডাকল। তারপর হাঁপাতে লাগল ঝড়ে দোলা গাছের ডালের মতো।

প্রণব আর কালীচরণ সংবিত ফিরে পেয়ে পা বাড়াবার আগেই ভাঙা দরজাটা খুলে দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। ত্রস্ত, ভীতার্ত সেই দুটি মূর্তির পানে তাকাতেই স্পষ্ট চেনা গেল ওদের। বাণীব্রত আর ডোরা। দরজার বাইরে পা দিয়ে আলো দেখেই বোধহয় হকচকিয়ে গিয়েছিল ওরা। ডোরা বাণীব্রতর হাত ধরে টানল। ডানপাশের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার জন্যে ওরা প্রায় ছুটে গেল।

প্রণব চিৎকার করে ডাকল, 'বাণীবাবু—বাণীবাবু?'

BanglaBook.org

বাণীব্রত ঘুরে দাঁড়াল ডোরার হাত ছাড়িয়ে। ডোরা তার হাত ধরে আবার টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। পারলে না। শেষ পর্যন্ত নিজেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

সিজার কী ভাবল কে জানে—চকিতে সে ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে তেড়ে এল। দালান থেকে সিঁড়ির মাঝামাঝি ছুটে এসে ডোবাব গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। চোখের পাতা পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেল। বাধা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। ডোরাব পক্ষে সিজারের ভার সহ্য করা সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। আর তারপরই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ডোরা। সিজারও যেন নাছোড়বান্দা। কী ভেবেছে সে কে জানে। ডোরার ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর দ্বিতীয়বার লাফিয়ে পড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল।

'সিজার—সিজার!' প্রণব ছুটে এল।

ডাঃ গুপ্তও দালান থেকে বারান্দার নীচে এসে পৌঁচেছেন। সামনে তাকিয়ে তাঁরও চক্ষুস্থির।

'সিজার—সিজার—leave her—সিজার?' ডাঃ গুপ্ত পাগলের মতন চিৎকার কবে উঠলেন।

সিজারের কাছে আজ সমস্ত অনুরোধ, আদেশ মূল্যহীন। পাশবিক উন্মাদনা ওকে পেয়ে বসেছে। বীভৎস হয়ে উঠেছে তার নির্দয়তা।

আর কোনও উপায় নেই বুঝি। ডাঃ গুপ্ত স্বগতোক্তি করলেন, 'He has become wild!'

ডোরার দেহবাস ছিন্ন-বিছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত। দেহ রক্তাক্ত। এ দৃশ্য দেখা যায় না চোখে। বৃথা সময় নষ্ট না করে ডাঃ গুপ্ত তাঁর বন্দুকের ট্রিগারে হাত দিলেন আবার।

সামান্য ক'টা মুহূর্ত। পরপর দুবার বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে সিজারের মর্মভেদী আর্ত গর্জন উগ্র থেকে উগ্রতর হল ক্ষণিকের জন্যে, আর তারপর একটানা করুণ কান্নার মতো তার শেষ আর্তনাদ শোনা গেল কিছুক্ষণ। একটু পরে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পেঁচাটা শুধু ডেকে উঠল আবার। ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, কালীচরণ তিনজনেই ডোরার পাশে এসে দাঁড়াল। সিজারের প্রাণহীন দেহটা ডোবার বুকেব পাশে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

প্রণব তাড়াতাড়ি বসে পড়ে ডোরার গায়ে হাত দিল।

'এখনও বেঁচে আছেন। কালীচরণ, এঁকে তুলে গাড়িতে নিয়ে যাও।'

কালীচরণ ডোরা দত্তর সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত দেহটা ধীরে-ধীরে কুড়িয়ে নিল।

ডাঃ গুপ্ত সিজারের পাশে বসে পড়ে গায়ে হাত দিলেন। মাথাটায় হাত বুলোলেন একটু। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার!'

কালীচরণ বারান্দা থেকে নেমে দালান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ডাঃ গুপ্ত আর প্রণবও ফিরে আসছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি পড়ল দালানের নীচে। বাণীব্রত দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রণবের কী মনে হল, বললে, 'সুদক্ষিণাকে দেখছি না?'

'গাড়িতে বসে আছে।'

কালীচরণ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। বাণীব্রত তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে তার সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

প্রণব দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল ডাঃ গুপ্তকে টেনে নিয়ে।

ডোরা দত্তর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা অনেক—অনেকক্ষণ ধরে বাণীব্রত দেখলে নেড়েচেড়ে। চোখ তুলল। তাকাল চারপাশে। ওর মুখের রেখায় অব্যক্ত রুদ্ধ একটা যন্ত্রণায় ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল।

প্রণব ততক্ষণে বাণীব্রতর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণবকে দেখা মাত্র বাণীব্রতর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কী একটা কথা বলবার আশায় সে দু-পা এগিয়ে এসে প্রণবের হাত দুটো চেপে ধরে

BanglaBook.org

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠল।

প্রণব অবাক। ডাঃ গুপ্তও এসে পড়েছিলেন। তিনিও যেন কেমন হয়ে গেলেন। কেউ কিছু অনুধাবন করতে পারলে না।

প্রণব বাণীব্রতর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'কী হয়েছে?'

বাণীব্রত কোনও কথা বলতে পারছে না। তার কুঞ্চিত ওষ্ঠ, বারবার কেঁপে উঠতে লাগল অস্পষ্ট একটা শব্দ সৃষ্টি করে। অন্তরে ওর কীসের একটা দুর্দমনীয় উত্তেজনা প্রকাশের পথ খুঁজে মরতে লাগল। কালীচরণ চলে যাচ্ছিল। বাণীব্রত দেখতে পেল তাকে। হঠাৎ যেন তার মুখ থেকে পিছলে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'আমি, আমি করিনি।'

প্রণবের বিস্ময় মাত্রা হারাল।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'What's the matter with you?'

বাণীব্রত আপ্রাণ চেষ্টা করলে কথা বলবার—পারলে না। কালীচরণের হাত থেকে ডোরাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও একবার করলে হঠাৎ। সক্ষম হল না। অবশেষে প্রণবের হাত জড়িয়ে ধরে আবার ও আবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কখন যে সুদক্ষিণা ওদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে—কেউ জানতে পারেনি। সুদক্ষিণা ডোরার রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ ভীতার্ত একটা আর্তধ্বনি করে উঠল। সেই শব্দে মুখ ফেরাল সকলে।

বাণীব্রত চোখ তুলে চাইল। দেখল একমুহূর্ত। তারপর অকস্মাৎ বাঁধভাঙা নদীর মতো ওর সমস্ত পুঞ্জীভূত আবেগ মুখর হয়ে উঠল মাত্র ক'টি অস্পষ্ট কথার মধ্য দিয়ে।

ডাঃ গুপ্তকে ঠেলে দিয়ে বাণীব্রত সুদক্ষিণার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল, 'সুদক্ষিণা! বিশ্বাস করো সুদক্ষিণা আমি নয়। আমি করিনি। আমি আমার মাকে মারিনি। মা হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলেন।' বাণীব্রতর শেষদিকের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে অস্পষ্ট, ভারী ও করুণ হয়ে উঠল।

প্রণব আর ডাঃ গুপ্ত নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বনের বাতাসে যেন তাঁদের অনুভূতি ক্ষণেকের জন্যে ভেসে গেল। আকাশ থেকে খসে পড়ল একটা তারা। গাছের পাতায় শব্দ উঠল। ঝড়ের না নিশাচর কোনও পাখির কে জানে!

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর ওরা দেখল বাণীব্রতর সংজ্ঞাহীন দেহ সুদক্ষিণার কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে। প্রণব তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাণীব্রতকে ধরে ফেলল।

জনমানবহীন অরণ্যপ্রান্তরে যে অবরুদ্ধ কান্নার জোয়ার জাগল—তার জের এসে থামল হাসপাতালের ছোট্ট একটি ঘরে।

ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ। শুধু সবুজ একটা বাতি জ্বলছে এক কোণে। অস্পষ্ট ছায়া, রহস্যময় আবহাওয়া, অন্ধকার আর পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। ঘরের মধ্যে একটি নরম বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে বাণীব্রত। তার মাথার পাশে বসে প্রণব। ক্ষণিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, প্রণব যখন দেখল বাণীব্রত সোডিয়াম অ্যামিটালের ঘোরে তার বাহ্যচৈতন্য বিস্মৃত হয়েছে, তখন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীর স্পষ্টকণ্ঠে বলল, 'মনে পড়ছে না কিছু? পড়বে, নিশ্চয় পড়বে। বলুন, আপনার যা মনে আছে—যা ইচ্ছে হয়। Relax, relax yourself!'

বাণীব্রত বোবার মতো শুয়ে থাকল। একটা শব্দও শোনা গেল না তার মুখ থেকে।

প্রণব বললে আবার, 'মনে আপনার যা আসছে বলে যান। আমার কাছে লুকিয়ে রাখার মতো আপনার কিছু নেই। ভয় কী, আমি তো প্রায় সবই জানি। বলুন, বলুন, চুপ করে থাকবেন না।'

BanglaBook.org

'আমি—,' বাণীব্রত যেন ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'আমি কিছুই লুকিয়ে রাখিনি। না-না, কিছু লুকোনো নেই। বিশ্বাস করুন।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি বইকী। আপনি কিন্তু আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন কই? বিশ্বাস করলে মনের কথা লুকিয়ে রাখতেন না আমার কাছে।'

'লুকিয়ে রেখেছি? না। আমি—আমি—'

'হ্যাঁ, আপনি লুকোচ্ছেন। বলুন, কী লুকিয়ে রাখতে চাইছেন? কী আপনি করেননি বলুন?' প্রণবের গলার স্বরে আশ্চর্য একটা আকর্ষণ।

বাণীব্রত কেমন যেন চুপ করে গেল হঠাৎ। একটু পরে অদম্য এক আবেগে ও বললে, 'আমি—হ্যাঁ আমি, আমি করিনি। বাস্তবিক—বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমার দোষ নেই। তবু সকলে আমায় দোষ দেয়। কেমন যেন সব! বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই। মা—নিজের মাকে কেউ মারতে পারে? ছিঃ ছিঃ। কী সাঙ্ঘাতিক! যে শুনবে কানে আঙুল দেবে।'

'আপনার মাকে কে মারল তাহলে?'

'আমি জানি না—আমি মারিনি (বাণীব্রত ভয় পেয়ে অতি দ্রুত বাধা দিল)। It was an accident—of course accident—অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু নয়—হতে পারে না। আমার দোষ, আমি শুধু সেই সময় ছাদে ছিলাম।'

'কেন ছিলেন আপনি ছাদে? কী কাজ ছিল আপনার সেখানে?'

'কেন? এমনি। ছাদে উঠে আমি বাজি পুড়োনো দেখছিলাম। দেখছিলাম ঘরে-ঘরে কেমন চমৎকার করে সব প্রদীপ সাজিয়ে দিয়েছে!'

'বাজি পোড়ানো হচ্ছিল? কেন, বলুন তো?'

'বাঃ, সেদিন যে দেওয়ালি? ছাদে, বারান্দায়, পাঁচিলে কেমন সুন্দর করেই না সকলে আলো সাজাত। আমার খুব ভালো লাগত দেখতে। ইচ্ছে হত নিজের হাতে পাঁচিলে উঠে পিদিম সাজাই। বাবার ভয়ে কিছুতেই পাঁচিলে উঠতে পারতাম না। ...হ্যাঁ—মনে পড়েছে ডাক্তারবাবু, বাবার ভয়েই আমি ছাদে পালিয়ে এসেছিলাম। বাবা যেন কেমন ছিলেন! একটু একলা বেড়াতে গেলে বকবেন, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশলে আর রক্ষে নেই, এমন কী নন্তু— নন্তুকে আপনি চিনতে পারবেন না—দিদিমণির ছেলে। নন্তুটা কী গুন্ডাই ছিল! নন্তুরা আমাদের বাড়িতে থাকত বলে আমি ওর সঙ্গে খেলাধুলো করতাম। বাবা কিন্তু একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন নন্তুর ওপর (বাণীব্রত একটু থামল)। ও যেন চোখের সামনে তার বাবা, নন্তু, মা সকলকে দেখতে পাচ্ছে। চোখেমুখে তার খুশির একটা ভাব ফুটে উঠেছে—একটু-একটু করে গলার স্বর সহজ হয়ে আসছে। কথা বলতেও আর যেন তার ক্লান্তি নেই। বরং খুশি হচ্ছে ও কথাগুলো বলতে পারছে বলে, 'নন্তুর জন্যে আমি বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতুম। বাবা বলতেন, নন্তুর মতো ডানপিটে ছেলের সঙ্গে মিশে-মিশে আমি নাকি ভীষণ বেয়াড়া হয়ে উঠেছি। বাবা চাইতেন আমি যেন একা-একা থাকি। একলা কি ভালো লাগে—বলুন তো?'

'আপনার বাবা বুঝি আপনাকে তেমন ভালোবাসতেন না?' প্রণব প্রশ্ন করলে।

'না-না, তা কেন? বাবা আমায় ভালোবাসতেন বইকী। ভালোবাসতেন—তবে মার মতন নয়। মা আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আমার মা—কী সুন্দর ছিলেন আমার মা! এত সুন্দর আমি আর দেখিনি। (বাণীব্রত চোখের ওপর যেন তার মাকে দেখতে পাচ্ছে) জানেন ডাক্তারবাবু, কী চুল ছিল আমার মার! এক পিঠ কালো-কালো চুল। আর গায়ের রং কী—ফুটফুটে সাদা। ছোটখাটো পাতলা মতন মানুষটি। এমন সুন্দর চোখ আর মুখ কী বলব! মা যে কত কী জানতেন! যেমন সুন্দর গান গাইতে পারতেন, তেমনি ছিল তাঁর মিষ্টি গলা। মাকে আমি কোনওদিন জোরে কথা বলতে শুনিনি। তিনি যখন কাউকে বকতেন মনে হত বুঝি আদর করছেন (বাণীব্রত একটু হেসে

BanglaBook.org

ওঠে), আমায় কিন্তু বকতেন না। বকলে এমন কাণ্ড আমি করতাম যে শেষ পর্যন্ত মা বেচারি কেঁদেকেটে একসার হত। (হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল বাণীব্রতর। একটু চুপ করে থেকে অতীতের একটা ভাঙা-চোরা অস্পষ্ট ছবিকে ক্রমশ সে চোখের সামনে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখল) বকার কথায় মাকে মনে পড়ছে আমার। সেদিনের ঘটনাটা স্পষ্ট মনে পড়ছে, ডাক্তারবাবু। আপনাকে সে কথা বলি ঃ সেদিন ছিল দেওয়ালি—কালিপুজো। দশই কার্তিক। আমার আবার সেইদিনই জন্মদিন। বাড়িতে মা-বাবার আমি একটি মাত্র সন্তান। আমার জন্মদিন তাই বেশ ঘটা করে পালন করতেন ওঁরা। স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার—দেওয়ালির দিন সকাল-সকাল স্নান করিয়ে কাপড়চোপড় পরিয়ে দিদিমণি আমায় সাজিয়ে দিলেন। কতই বা আমার বয়েস তখন—এগারো কি বড়জোর বারো। আমি গোলাপি রঙের একটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিলাম। পায়ের সঙ্গে ধুতি জড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা দেখতে পেয়ে দিদিমণিকে বললেন, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরিয়ে দিতে। আমি কিন্তু কিছুতেই মালকোঁচা বাঁধলুম না। আয়নার সামনে বাবার মতন কোঁচা হাতে ধরে হেঁটে বেড়াতে লাগলুম।...খানিক পরে মা সেজেগুজে এলেন। আমরা—আমি, মা, বাবা—আমরা তিনজনে এবার দিদিমার কাছে যাব। আমি তা জানতুম। প্রতিবারই তাই হয়। প্রথমেই আমরা দিদিমার কাছে যাই। দিদিমা থাকতেন কালীঘাটের দিকে। গাড়ি এল। আমরা গাড়িতে করে দিদিমাকে প্রণাম করতে গেলাম। একটা কথা মনে পড়েছে ডাক্তার দাশগুপ্ত, যাওয়ার সময় নন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা কুকুরের বাচ্চা এনে আমায় দেখাল। এমন সুন্দর কুকুরটা। গোলগাল। কী লোম। সমস্ত গাটা লোমে ঢাকা। তুলোর বল যেন একটা। নন্তু বললে—ওপাড়ার বলাই কুকুরটা বিক্রি করবে। আমি কিনব বলেছিলাম কি না তাই ও নিয়ে এসেছে। এদিকে ততক্ষণে বাবা গাড়িতে গিয়ে বসেছেন। দেরি করতে আমার সাহস হল না। নন্তুকে বললুম, তুই রেখে দে। দিদিমাকে প্রণাম করে ফিরে এসেই আমি মাকে বলব টাকা দিতে।...(বাণীব্রত একটু জল খেতে চাইল। প্রণব তাকে জল দিল। খানিকটা চুপচাপ। সেই রহস্যময়, আলো-আঁধার ঘরের বাতাসে নিশ্বাসের সুর শোনা যেতে লাগল। বাণীব্রত একসময়ে আবার কথা কইল)...তখন খুব বেশি বেলা হয়নি। বোধহয় সাড়ে দশটা কী এগারোটা হবে। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ঢুকেই দেখি বারান্দায় বলাই কুকুর বাচ্চাটা কোলে করে বসে আছে। গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে গিয়ে আমি কুকুর বাচ্চাটা বুকে তুলে নিলাম। কী নরম। ...মা, বাবা গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে আসতে আমি মাকে বললুম কুকুরটা আমি কিনব। বলাইকে টাকা দিয়ে দিতে। মা তো আমার কথা শুনে অবাক। বাবাও। মা বললেন, (বাণীব্রত যেন তার মাকে কথা বলতে শুনছে) হাঁ—মা বললেন, না-না, কুকুর-টুকুর আমার ভালো লাগে না, খোকা, দিয়ে দাও। কুকুরটাকে আমি আরও জাপটে ধরলুম। কুকুর আমার চাই। কুকুর কিনব বলে দোকানে ঢুকে আমি কোনও খেলনাই কিনিনি। বাবাও বারণ করলেন। আমি কিন্তু শুনলাম না। গোঁ ধরে থাকলুম। শেষ পর্যন্ত বাবা অসম্ভব রেগে আমার হাত থেকে কুকুরছানাটা কেড়ে নিয়ে বলাইকে দিয়ে দিলেন। বলাই চলে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রাগে, অভিমানে, দুঃখে আমি কেঁদে ফেললাম। মা তখন বলাইকে আবার ফিরে ডাকলেন। বাবাকে মা বললেন ঃ ও যখন শুনবেই না, দিয়ে দাও। বাবা তখনকার মতো আর কিছু বললেন না। বলাইকে টাকা দিয়ে দিলেন।...সেইদিনই খাবার সময় আবার একটা কাণ্ড ঘটল। আমরা তিনজনে খেতে বসেছি টেবিলে। এমন সময় বাবা—বাবা খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সেই কুকুর কেনার পর থেকে—বাবা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাকে বললেন, দিন-দিন তোমার ছেলে যেমন অসভ্য হয়ে উঠছে, তেমনি হচ্ছে জেদি। এ ভালো নয়। বাবার কথা শুনে মাও গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেমন যেন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। নেহাত আজ ওর জন্মদিন, চোখের জল দেখতে চাই না। নয়তো কিছুতেই কুকুর কিনতে দিতাম না আমি। যেসব ছেলে মা-বাবার কথা শোনে না, তাদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না। মার কথা শেষ হলে বাবা বললেন, নন্তুর সঙ্গে খেলা করতে তোমার ছেলেকে যেন আর না দেখি। যত সব অসভ্য, হতচ্ছাড়া ছেলে। কী

BanglaBook.org

জানি কেন, মা বাবার কথায় সায় দিলেন দেখে আমার অসম্ভব রাগ হল। বাবা তো আমায় যখন তখন একটু খুঁত পেলেই বকেন। কিন্তু মা—মা-ও বকবে। যেমন হল রাগ, তেমনি দুঃখ। আমি খাবারের থালায় হাত না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলুম। মা-বাবা দুজনেই আমার মুখের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে দেখলেন। তারপর মা বললেন, হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ কেন? খাবে না? ..আমি বললুম, না।...কেন? মা জানতে চাইলেন। খিদে নেই, বললুম আমি। বাবা বললেন, না খাবে তো উঠে যাও। খাবার টেবিলে পেঁচার মতো মুখ করে বসে থাকতে হবে না। আমি কোনও কথা না বলে গুম হয়ে বসে থাকলুম। শুনলাম, বাবা-মা'কে বলছেন, দেখছ তো, কেমন অবাধ্য হয়েছে। মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বুঝলাম, মা খুব রেগে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার বাবা কী বললেন শুনতে পাওনি? খেতে হয় খাও, না হয় যাও—উঠে যাও এখান থেকে। আমার তখন এমন রাগ হচ্ছিল মার ওপর, বাবার চেয়েও বেশি। কোনও কথা না বলে আমিও সোজা উঠে চলে এলুম খাবার ঘর ছেড়ে। (বাণীব্রত নীরব হল। মনের মধ্যে তার মাকড়সার জালের মতো অতীত-স্মৃতির জটিল জাল। সন্তর্পণে সেই জাল পরিষ্কার করতে তার সময় লাগছে। প্রণব নির্বাক, নিশ্চল। বাণীব্রতর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ সে মনের খাতায় টুকে নিচ্ছে নির্ভুলভাবে। হঠাৎ বাণীব্রত বলে যেতে লাগল) খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি সোজা আমার ঘরে চলে গেলুম। মার ঘরের গা-লাগানো আমার একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে আমি পড়তাম। আমার যত রাজ্যের খেলনা, ছবি, কাঠের দোলনা-ঘোড়া সব থাকত সে ঘরে। আমার ঘরে এসে দেখি কুকুরটা টেবিলের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা মখমলের পুঁটলি যেন পড়ে রয়েছে মনে হল। লুসি—লুসি—আমার লুসি—আস্তে-আস্তে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলুম। ও হ্যাঁ—আমি ওর নাম দিয়েছিলুম লুসি। লুসিকে আদর করে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের ওপর আমাদের ছবিটার দিকে নজর পড়ল। মার আর আমার ফটো। বাগানে বেঞ্চির ওপর মা—আমি তাঁর কোলের ওপর বসে। কী জানি কেন ফটো-টা দেখে আমার খুব কান্না পেতে লাগল। রাগ আর অভিমান হল সব চেয়ে বেশি। মনে হল, মা আমায় আর আগের মতো ভালোবাসেন না। মা আজকাল—আজকেই তো বাবার দিক নিয়ে আমায় কেমন করেই না বকলেন। কেন? মা কেন বাবার হয়ে আমায় বকবেন? ভালোবাসেন না ছাই। মিথ্যে কথা। মা আমায় ভালোবাসেন না। ভালোবাসলে কি কেউ একটা কুকুর কিনে না দিয়ে বকে? আর আমার বুঝি খিদে পেতে নেই। ওঃ, খুব একেবারে বলে দিলেন ঃ খেতে হয় খাও, না হয় উঠে যাও। যাবই তো, বেশ করব যাব। মা না আর কিছু। ছাই মা। কে চায় এমন মা? আমি চাই না—চাই না। তোমার কোলে বসতে চাই না—আদর চাই না। কিছু আমার দরকার নেই। ফটো? টেবিলের ওপর ছবির বই আর কাঁচি পড়েছিল। ছবি কেটে-কেটে জোড়ার শখ ছিল আমার খুব। কাঁচিটা আমি হাতে তুলে নিলুম। তারপর কী যে ভাবলুম কে জানে। ফটোটা বের করে মার কোমরের কাছ থেকে কচ-কচ করে কেটে ফেললুম। ফটোর নীচের অংশটা—মার কোমর আর আমার পা পর্যন্ত কেটে নীচে পড়ে গেল। বেশ হয়েছে। ছবি দেখে ভাবতে লাগলুম, আর আমি তোমার কোলে বসে নেই। (বাণীব্রত একটু উঠে বসল। গলার স্বর ভারী হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশই) আমার হাতে তখনও ফটোটার ওপরের অংশটা রয়েছে। আগের মতোই মা দেখি হাসছেন। হাসি দেখে রাগ আমার আরও বেড়ে গেল। মনে হল, মা বুঝি আমায় জব্দ করবার জন্যে হাসছেন। হাতের মুঠোর মধ্যে দুমড়ে মুড়ে তালগোল পাকিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ছেঁড়া-কাটা ফটোটা। হাওয়ায় দুলতে-দুলতে তালগোল পাকানো ছবিটা গিয়ে পড়ল করপোরেশানের ময়লা-ফেলা গাড়ির মধ্যে। গাড়িটা গলির নীচে দাঁড়িয়ে ময়লা তুলছিল। জানালা দিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম—একটা মেথর একঝুড়ি জঞ্জাল তুলে গাড়ির মধ্যে ফেললে। চাপা পড়ে গেল মার ছবির ছেঁড়া, কাটা, তালগোল পাকানো অংশটুকু। হঠাৎ বুকটা আমার কেমন করে উঠল। মার ছবিটা অমন জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে পড়বে তা কি আমি জানতুম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। (বাণীব্রত নীরব হল। তার সারা মুখে ঘাম জমে উঠেছে। চোখের

দৃষ্টিতে ক্লান্তি। সারা মুখে বেদনার ছায়া। দু-এক ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল অবরুদ্ধ ব্যথা। মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে—দাঁত কামড়ে প্রাণপণে বাণীব্রত তার ভাবাবেগ দমন করবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রণব বাণীকে আবার শুইয়ে দিল বিছানায়। ওর হাত সরিয়ে দিলে মুখ থেকে। বললে, তারপর? বাণীব্রত চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে থাকল খানিকটা, কোনও উত্তর দিল না প্রণবের ডাকে। একসময় নিজে থেকেই কথা কয়ে উঠল ধীরে-ধীরে) বিকেলের একটু পরেই আমি বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলাম। আমাদের বাড়ির আশেপাশে সমস্ত বাড়িতেই ছেলেরা পিদ্দিম সাজাচ্ছিল। কেউ-কেউ পটকা ফাটাচ্ছে। হাউইগুলো সোঁ-সোঁ করে মাথার ওপর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। ছাদে একলা-একলা দাঁড়িয়ে আমি তাই দেখছিলাম। সন্ধের দিকে বাড়িতে লোকজন আসতে শুরু করবে—আমার জন্মদিনের নেমন্তন্ন রাখতে। মা, বাবা, দিদিমণি, চাকর-বাকর সকলেই তাই নীচে কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বাজি পোড়াবার জন্যে মনটা আমার ছটফট করছিল। অথচ আমার কাছে কিছু নেই। কেউ আমায় এক পয়সারও বাজি কিনে দেয়নি। মার ওপর রাগ আমার তখনও যায়নি। অনেক ভেবেচিন্তে নীচে নিজের ঘরে এলুম। আমার একটা ছোট—সেই—সেই যে ছোট-ছোট বাচ্চা ছেলেদের খেলার জন্যে একরকম লোহার পিস্তল পাওয়া যায়—আমার একটা সেইরকম পিস্তল ছিল। আর টাকাও ছিল পকেটে। হ্যাঁ—চকচকে দুটো টাকা। কে যেন দিয়েছিল। চুপিচুপি নন্তুকে ডেকে টাকা দুটো দিলাম। বললাম চট করে দুটাকার টোটা কিনে নিয়ে আয় তো। লুকিয়ে আনবি। আমি ছাদে থাকব। বুঝলি? ...নন্তু মাথা নেড়ে এক ছুটে টোটা কিনে আনতে গেল। আমিও পিস্তলটা পকেটে পুরে ছাদে পালিয়ে এলাম। নীচে মা-বাবা সকলেই এখন খুব ব্যস্ত। কেউ আর ওপরে আসবেন না, তা জানতাম। ভালো কথা ডাক্তারবাবু, আসবার সময় লুসিটাকে নিয়ে এলাম ছাদে। ছাদে এনে ছেড়ে দিতে লুসির কী ফুর্তি। লেজ নেড়ে, লাফিয়ে-লাফিয়ে সারা ছাদে ও খেলে বেড়াতে লাগল। লুসি বোধহয় জাতে বিলিতি কুকুর ছিল। ওইটুকু বাচ্চার তখন কী ডাক। খানিক পরে ঠিক নন্তু এসে হাজির। টোটা কিনে এনেছে। আমি পিস্তলে একটা করে টোটা লাগাই আর ফাটাই। বেশ জোর শব্দ হচ্ছিল কিন্তু। ক্রমেই সন্ধে ঘনিয়ে এল। যতদূর দেখি, কাছে দূরে সব বাড়িতেই সারি-সারি প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। পটকা, তুবড়ি, হাউই, ফুলঝুরি, আকাশ-প্রদীপ—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমিও পিস্তল নিয়ে খেলা করছি। সাথী আমার শুধু লুসি। এখন হল কী—লুসির মুখের কাছে আমি যেই না একবার পিস্তল ছুঁড়েছি—ভীষণ শব্দ হয়েছে, আর লুসি সারা ছাদ ঘেউ-ঘেউ করে লাফিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল। ভয় পাচ্ছিল না খেলা পাচ্ছিল কে জানে? আর ও যতই ঘেউ-ঘেউ করছিল, আমি ততই খেলায় মেতে উঠছিলাম। ঠিক খেয়াল হচ্ছে না—কখন যেন ছাদে মা এসে উঠেছিলেন। আমি তখন লুসির সঙ্গে ছুটোছুটি করছি। মা যে কেন ছাদে এসেছিলেন জানি না। বোধহয় আমায় দেখতে কিংবা ডাকতে। লুসির কানের কাছে ঠিক সে সময় আমি একটা টোটা ফাটিয়েছি। আর সে বেটা ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে গিয়ে মার পিছনে—আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। মা বকতে লাগলেন—কুকুরের ছোঁয়া বাঁচানোর জন্যে প্রায় দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলেন ছাদের ওপর। আমিও যেন মজা পেয়ে গেলুম। হ্যাঁ—জব্দ করার একটা উপায়। যতই মা ছুটোছুটি করেন আর বকেন, লুসি ততই মার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করে আর আমি মনের সুখে লুসির মুখের কাছে গিয়ে পিস্তলের বিকট শব্দ করি। মা খুব রেগে উঠেছেন বলে আমার মনে হল। মা বকছিলেন, খোকা, শীঘ্রি তোমার কুকুর সরাও। এইমাত্র আমি গা ধুয়ে পুজোর কাপড়চোপড় পরেছি। কুকুর ছুঁয়ে দিলে আবার এই ঠান্ডায় আমায় স্নান করতে হবে। বেয়াড়া অসভ্য ছেলে কোথাকার। সরাও শীঘ্রি। মার বকুনি আমি গ্রাহ্যই করলাম না। তখন কি জানতাম এমনটা হবে। কিন্তু তাই হল। মা শেষ পর্যন্ত পিছনে সরে-সরে কখন যেন কাঠের সিঁড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার তাড়া খেয়ে লুসি গিয়ে মার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল—আর তারপর শাড়িতে আর কুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল মার পা—মা বোধহয় একটু পিছু হটতে যাচ্ছিলেন। পিছনে সরবেন

কোথায়? মা সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লেন। লুসিও।' (বাণীব্রত সোজা উঠে বসেছে। চোখ দুটো তার সামনে মেলা। সে চোখের দৃষ্টিতে বীভৎস একটা দৃশ্য দেখার ভীতি-বিহ্বলতা। গলার স্বরে অজস্র উত্তেজনা আর আবেগ। বাণীব্রত দেখছে : অন্ধকার রাত, সার-সার প্রদীপ জ্বলছে। একটা কুকুর, সোজা সিঁড়ি। পিস্তলের শব্দ, আর, আর—তীক্ষ্ণ করুণ আর্তধ্বনি করে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উলটে গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। কুকুরটা ডাকছে—সেই সার-সার বাতি। বাণীব্রত বিশ্রী বিকট একটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সেই আবছা আলো-আঁধারি নিস্তব্ধ থমথমে ছোট ঘর বাণীব্রতর মর্মস্পর্শী আর্তনাদ আর কান্নার শব্দে খান-খান হতে লাগল। প্রণবের মনে হল ঘরের বাতাসে যেন অশরীরী প্রেতাত্মাদের কান্না আর হিম নিশ্বাসের ঝড় উঠেছে। নিজেকে সংযত করে প্রণব উঠে দাঁড়াল। কী একটা ওষুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ওকে খাওয়ালে। বাণীব্রত স্নান করার মতো ঘেমে উঠেছিল। প্রণব ওর ঘাম মুছিয়ে দিয়ে ফ্যানের সুইচটা অন করলে। কী খেয়াল হল ওর। ঘরের বাতিটাও জ্বালিয়ে দিল। সাদা আলোয় এতক্ষণে ভেসে উঠল বাণীব্রত।)

বাণীব্রত একটু সুস্থ হলে প্রণব প্রশ্ন করলে, 'আপনার মা বুঝি এই অ্যাকসিডেন্টের ফলেই মারা যান?'

'হ্যাঁ। রক্তাক্ত দেহে, তালগোল পাকিয়ে মা নীচে পড়ে থাকেন। অজ্ঞান। পা ভেঙে যায়! তখুনি তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হল অ্যামবুলেন্সে করে। বাবা হাসপাতালে গেলেন। শুধু আমি বাড়িতে নিজের ঘরে একা পড়ে-পড়ে কাঁদতে লাগলুম। সারারাত ধরে ভগবানকে ডাকলাম, মা যাতে সেরে ওঠে। ভগবান আমার কথা শুনলেন না। মা ভোরের দিকে মারা গেলেন।'

'কী করে মারা গেলেন তা কিছু জানেন?'

'পরে শুনেছি। পড়ে যাওয়ার পর মার দুটো পায়ের হাড়ই নাকি ভীষণ ভাবে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা অ্যামপুট করে পা কেটে বাদ দিয়ে মাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। অপারেশান টেবিলে মা মারা যান।'

প্রণব একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এ ঘটনা সম্পর্কে আপনার আর কিছু মনে পড়ে?'

বাণীব্রত বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললে, 'পড়ে। মার সেই পা-কাটা ফটোর অংশটুকু বুকে করে আমি সারারাত অনেক কথা—কী যেন ভেবেছি। আর মার সঙ্গে যখন শ্মশানে যাচ্ছিলাম—আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তারা সকলে এমন বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল কী বলব! ফিসফিস করে দু-একটা কথাও বলছিল ওরা। সেসব কথা আমার কানে আসেনি। তবু মনে হল তারা যেন আমাকে দুষছে। কিন্তু আমি আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বললাম, ডাক্তার দাশগুপ্ত। আপনিই বলুন, সত্যিই কি আমি এর জন্যে দায়ী?'

'না।' সমবেদনা, সহানুভূতি ও আশ্বাসের সুর প্রণবের গলায়। মুখে শান্ত সুন্দর হাসি। বাণীব্রতর হাত ধরে প্রণব বললে, 'না, আপনি আপনার মার মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। মানুষের জীবনে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। এ সেইরকমই একটা দুর্ঘটনা। যেমন ধরুন, আমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা বাড়ির পাঁচিল আমার মাথায় পড়ল। আমি ভীষণ চোট পেলাম। মারাও গেলাম। এর জন্যে কাউকে কি দায়ী করা চলে? যার বাড়ি তাকে গিয়ে কেউ কি বলতে পারে, ওহে তুমিই লোকটাকে মেরেছ? না-না, তা কখনও বলা যায় না। অথচ মজা এই, আপনি আজীবন এই কথাটাই ভেবেছেন যে, আপনার মার মৃত্যুর জন্যে আপনি দায়ী! আসলে আপনি নির্দোষ।'

বাণীব্রত তার ভাসা-ভাসা টানা চোখ দুটো মেলে থাকল প্রণবের মুখের ওপর। প্রণব ওকে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খুলে দিল জানালা। ভোরের ঠান্ডা বাতাস যেন হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল ওদের চোখে, মুখে, মাথায়। দূরে পাখিদের কাকলি। শুকতারাটা জ্বলছে।

প্রণব বাণীব্রতর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'এই কথাটাই আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে। এতদিন আপনি যা বুঝে এসেছেন তা ভুল। একেবারেই ভুল। আপনার মাকে আপনি ভালোবাসতেন,

BanglaBook.org

খুব ভালো। আর ঠিক সেই জন্যে সব সময় চাইতেন, মা যেন কেবলমাত্র আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ছোট্ট করে বললে বলতে হয়—মা যেন শুধু একলা আপনাকেই ভালোবাসেন—এইটেই ছিল আপনার অন্তরের কামনা ও দাবি। মানুষের মনের এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। যাকে সে ভালোবাসে তাকে একেবারে নিজের করে পেতে চায়। আপনার মা যখন স্বামীর পক্ষ নিয়ে আপনাকে কিছু বলতেন, আপনি রাগ করতেন। কেন জানেন? আপনি ভাবতেন, মা-বাবার পক্ষ টানছেন আপনাকে উপেক্ষা করে। তাঁর স্বামীকে তিনি বেশি ভালোবাসছেন ছেলের চেয়ে। এক্ষেত্রে আপনার বাবার ওপর একটা হিংসের ভাব আর মার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। খাবার টেবিলে যখন আপনার মা তাঁর স্বামীর পক্ষ নিয়ে আপনাকে বকলেন, আপনার ধারণা হল—মা তাঁর ছেলের চেয়ে স্বামীকেই বেশি ভালোবাসেন। এই চিন্তাটা আবার এতই বিশ্রী লাগছিল আপনার—বুঝলেন বাণীবাবু, এত খারাপ লাগছিল মার এই পক্ষপাতিত্ব যে, আপনার মার ওপর আপনি অসম্ভব রেগে উঠতে লাগলেন। এ পক্ষপাতিত্ব কেন! আর ঠিক এইরকম একটা দুরন্ত অভিমানের দরুনই আপনি মার ছবি কাঁচি দিয়ে কেটে নিজেকে তাঁর কোল থেকে মুক্ত করে মনের দুঃখ জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন। মুক্তি পেতে চেয়েছেন মার কাছ থেকে। যে ভালোবাসে না তার কাছ থেকে সরে আসাটাই আমাদের ধর্ম। You wanted to get rid of your mother.'

বাণীব্রত প্রায় চমকে উঠে বলল, 'মানে? আমি কি চেয়েছি মা মারা গিয়ে আমায় মুক্তি দিন?'

'ঠিক তা নয়, তবে অনেকটা তাই। মুক্তি চাওয়ার অর্থ মৃত্যু-কামনা করা নয়। তবে আপনিই ভেবে দেখুন, আপনার মার পক্ষে আপনাকে সে সময় আর কীভাবে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হতে পারে। মৃত্যু মুক্তির একটা প্রতীক। মার মৃত্যু আপনি চাননি—তবে মুক্তি চেয়েছেন মার কাছ থেকে। আপনার দুর্ভাগ্য সে মুক্তি এসেছে মৃত্যুর বেশে। দুঃখের বিষয় মৃত্যুটা আপনার কাম্য না হলেও ঘটনাক্রমে কাকতালীয়ভাবে একই দিনে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল এবং মা আপনার মারা গেলেন, আর সেই পা-কাটতে গিয়েই। বেঁচে থাকলে মাকে আপনি পা-কাটা অবস্থায় দেখতেন। ঠিক সেই কোমর থেকে-কাটা ফটোর অংশটুকুর মতো। দেখুন, আমরা মনের ডাক্তাররা মোটামুটি মনের তিনটে ভাগ করেছি। একটা ভাগকে বলি 'নির্জ্ঞান মন'। অর্থাৎ যে মনের সম্বন্ধে আমাদের কোনও চেতনা নেই। কী হচ্ছে সেখানে কিছুই জানি না। সে-মন অন্ধকারে ঢাকা। সেখানে এমন সব বাসনা, কামনা, দাবি তলিয়ে রয়েছে, যা কোনওদিন সাধারণ একটা মানুষের পক্ষে সচেতনভাবে ভাবা তো দূরের কথা কল্পনা করা মুশকিল। এই নির্জ্ঞান বা অন্ধকারে ঢাকা মনটাই আমাদের মনের সবচেয়ে বড় অংশ। তারপর আর একটা অংশ আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের 'সেনসার বোর্ড'। নির্জ্ঞান মনের গ্লানিময় কুশ্রী বাসনাকে মনের এই অংশ বাধা দেয়—সচেতন মনে উঠে আসতে দেয় না। সাধারণভাবে যাকে 'বিবেক' বলি আমরা এ তাই। মনের তৃতীয় অংশটার নাম 'সজ্ঞান মন'। খুব অল্প অংশ জুড়ে এই সজ্ঞান বা সচেতন মন। এই মনটুকুর কথাই আমাদের মাত্র জানা থাকে।'

'আশ্চর্য! আমি কী ভুল করেছি!'

'তা তো করেছেনই।' প্রণব পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজে ধরাল। বাণীব্রতকে দিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আশা করি, এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। আপনার মার মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা মাত্র। প্রকারান্তরে আপনি সেই দুর্ঘটনার অন্যতম একটা কারণ। কিন্তু তা অনিচ্ছাকৃত। প্রকারান্তরে মানুষ কী না করে? কী না হয়? যে শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান, সেই শিশুকে তার মার মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য করলে আইনে তো তার জন্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। কিন্তু তাই কি হয়—না কেউ ভাবে? আসলে সব জিনিসের মূল উদ্দেশ্য দেখতে হবে। মার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা জেগেছিল আপনার মনে—মাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নয়। আর মুক্তি পাওয়ার বাসনাটাও নির্জ্ঞান মনের এলাকাভুক্ত। যার ওপর কোনও হাত ছিল না আপনার। I think now it is clear to you—আপনার মার মৃত্যু

BanglaBook.org

একটা অ্যাকসিডেন্ট। আর দুর্ঘটনার সঙ্গে দিন, ক্ষণ কার্যকারণের মিলটাও কাকতালীয় ব্যাপার—সেটাও দৈবক্রমে।'

প্রণব নীরব হল। বাণীব্রত তার ক্লান্ত দৃষ্টি সাদা আকাশের গায়ে নিবদ্ধ করে রাখল। শুকতারাটা ক্রমেই যেন মুছে আসছে। নীড় ছেড়ে পাখিরা উধাও হল। ওদের ঠোঁটের গানে বাতাস শব্দময়।

একসময় বাণীব্রত বললে, আশ্বাসলাভের স্বস্তি ও স্থৈর্যে ওর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য একটা সমাহিত লাভ করেছে, 'আমি যেন রাত্রের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আজকের এই ভোর দেখছি, ডাক্তার দাশগুপ্ত। কেমন যেন মনে হচ্ছে নিজেকে। কে যেন আমায় এতদিন দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছিল। সে বাঁধন খুলে গেছে।' পরিতৃপ্তির একটা নিশ্বাস পড়ল বাণীব্রতর বুক থেকে। বাণীব্রত বিড়বিড় করছিল তখনও, 'It is not I—It is an accident—accident. Not I, but accident! আর আমার কোনও দুঃখ নেই।'

প্রণব বাণীব্রতর কথাগুলো যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বাণীব্রত যখন বারবার বললে, নট আই বাট অ্যাকসিডেন্ট—প্রণব হঠাৎ যেন একটা রহস্যের সূত্র খুঁজে পেল। তাইতো—হ্যাঁ তাইতো—ঠিক। অ্যাকসিডেন্টের 'এ'(A) আর আইয়ের (I) আই, ইংরিজি এক 'ওয়ান সংখ্যা (one '1') আর 'আই' (I) অক্ষর লিখতে গেলে প্রায় একইরকম দেখতে হয়। 'I' আর '1'— ঠিক হয়েছে। বাণীব্রত যখনই এক বা ওয়ান সংখ্যা লিখতে গেছে—অলক্ষ্যে বাধা পেয়েছে। বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় 'ওয়ান' আর 'আইয়ের' সাদৃশ্য থাকার দরুনই তার নির্জ্ঞান মনে মাতৃহত্যার দরুন যে পাপ-বোধ তলিয়ে রয়েছে, সেই পাপ-বোধের (অর্থাৎ, I have killed my mother—কথাই মনে হয়েছে—পীড়িত করেছে ওর সচেতন অস্তিত্বকে। কিন্তু এই অসহ্য কষ্টকর দুশ্চিন্তাকে বাণীব্রত বাধা দিতে চায়—বলতে চায় : It is not I, but an accident—'I' নয় 'A' : হ্যাঁ—বাণীব্রত 'A' লেখে, ও A লিখে ফেলে। আবার কাটে। তারপর আবার নতুন করে লেখে '1'। নিজের পাপ-বোধকে অস্বীকার করে সান্ত্বনা পাওয়াব জন্যে বাণীর মন তাই বারবার—বোধহয় বহুকাল থেকেই এই জটিল অদ্ভুত একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে নিয়েছিল। যাক, বাণীব্রত ভবিষ্যতে আর '1' লিখতে গিয়ে 'A' লিখে বসবে না।

কথায়-কথায় আরও খানিকটা সময় কাটল। শেষে প্রণব বললে, 'এখনকার মতো আপনার ছুটি। সারাদিন আপনি বিশ্রাম করুন। বিকেলে আবার দেখা হবে। আশা করি, অতীতের সমস্ত কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে আপনার মনে পড়বে।'

প্রণব চলে যাচ্ছিল, বাণীব্রত পিছু ডাকলে, 'মিস দত্ত কোথায়?'

'এখানে।'

'কেমন আছেন?'

'জানি না। তাঁর কাছেই যাচ্ছি।' প্রণব দরজা খুলতেই একজন নার্সকে দেখতে পেল। ডাকলে তাকে। বললে, 'এঁকে এঁর কেবিনে নিয়ে যান। And give him some hot milk.'

প্রণব সোজা চলে গেল।

ডোরা দত্তর ঘরে গিয়ে প্রণব সবেমাত্র পা দিয়েছে, দেখে ডাঃ গুপ্ত ডোরার ব্যান্ডেজ ঢাকা মুখের ওপর আস্তে-আস্তে চাদরটা টেনে দিচ্ছেন। প্রণব হঠাৎ যেন তার সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলল। অপ্রকাশ্য একটা হিমস্রোত তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করল। চোখের সামনে ডাঃ গুপ্ত অস্পষ্ট হয়ে উঠলেন। বিছানার সাদা চাদরখানা যেন আকাশের মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল।

প্রণব যখন সংবিত ফিরে পেলে, দেখে ডাঃ গুপ্ত তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ডাঃ গুপ্ত ধীরে-ধীরে বললেন, 'অনেক চেষ্টা করলাম। হল না।' মাথা নাড়লেন ডাঃ গুপ্ত।

সারা ঘরটা আশ্চর্য ঠান্ডা আর নিস্তব্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। অনেক কষ্টে বললে প্রণব, 'মিস দত্ত কি কোনও কথা বলতে পেরেছিলেন?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। দুটো তিনটে কথা। অস্পষ্ট বিকার।'

'কী বললেন?'

'ঠিক বুঝলাম না, মনে হল, ও বাণীব্রতকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে দূরে কোথাও।'

প্রণব কোনও কথা বললে না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল চাদর ঢাকা ডোরার মৃতদেহের পানে। নিজেরই অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ওর বুক বেয়ে।

সেইদিনই সন্ধেবেলা। স্থান—হাসপাতাল। ডাঃ গুপ্তের ঘরে ওরা ক'জন বসেছিল। ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, মিঃ ঝা, ইনসপেক্টার গুপ্তা, সুদক্ষিণা আর বাণীব্রত। জরুরি তার পেয়ে মাত্র খানিক আগে মিঃ ঝা এবং ইনসপেক্টার গুপ্তা পরেশনাথে এসে পৌঁছেছেন মোটরে। প্রথমেই বাণীব্রতর শৈশবজীবনের দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে তার ইতিহাস সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছে প্রণব। তারপর ডেকে পাঠিয়েছে বাণীব্রতকে।

বাণীব্রত প্রণবের প্রশ্নের উত্তরে বলছিল, 'নীলার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় এক গানের মজলিশে। নীলা ভালো গান গাইতে পারত—সেই সূত্রেই আমাদের আলাপ পরিচয়। এবং পরে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। নীলাদের সংসারের কথা একটু বলতে হয় এখানে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ওর ছিল বৃদ্ধ বাবা আর বিধবা এক পিসিমা। ছোট একটি বোনও ছিল নীলার। বছর খানেক নীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর একদিন নীলা আমায় ওকে বিয়ে করার কথা বললে। আপনাদের কাছে আজ আর অস্বীকার করবার মতো কোনও কথা আমার নেই, মিঃ ঝা। নীলা যেদিন এ প্রস্তাব জানালে এবং বললে, তার বাবার কাছে গিয়ে আমি যেন প্রস্তাবটা উত্থাপন করি, সেদিন প্রথমে অবশ্য আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে রাত্রিতে যতবার কথাটা ভেবেছি, কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি আর ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ মুষড়ে পড়ছিল। কেন যে জানি না—আজও বুঝতে পারিনি। যাই হোক—এমনি ভাবে একদিন দুদিন করে ক্রমেই একটা গোটা মাস শেষ হল। আমার মনের অস্বোয়াস্তিও ক্রমে বেড়ে উঠছিল। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলাম আমি দিন-দিন। আমার হাব, ভাব, আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা—সব কিছুর মধ্যে থেকে উৎকটভাবে আমার এ পরিবর্তন ফুটে উঠতে লাগল। আত্মীয়-স্বজন বলতে আমার কেউ ছিল না চোখের সামনে—নয়তো তাদের কাছে নিশ্চয় আমি ধরা পড়ে যেতুম। আর বাস্তবিক শেষ পর্যন্ত তাই হল। ধরা পড়ে গেলুম—আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাছেই। বন্ধুই বললাম, যদিও দেবু, আপনারা যাঁকে দিব্যেন্দু বলে জানেন, যাকে হত্যা করার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত, সেই দেবু সম্পর্কে আমার ভাই হত। একটু দূর সম্পর্কের। আমার বাবা ও তার বাবা ছিলেন আপন খুড়তুতো ভাই। ভাই না বলে বন্ধু বললাম, কেননা ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বন্ধুর মতো ছিল, ঠিক ভাইয়ের মতো নয়। দেবু একদিন ধরে ফেলল। বললে, তোমার এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে যাচ্ছে কেন দিন-দিন? শুনলাম রাত্রে ঘুমোও না, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও সারাদিন টো-টো করে। কী হয়েছে?...কী হয়েছে তা আমি দেবুকে বোঝাই কী করে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওর কাছে সমস্ত কথা খুলে বললাম। দেবুর সঙ্গে নীলার আলাপ ছিল। সে আলাপের উদ্যোক্তা ছিলাম আমি নিজেই। তবে আমি জানতাম, আলাপ থাকলেও ওদের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগাযোগ কি অন্তরঙ্গতা ছিল না। আমার কথা শুনে দেবুকে চিন্তিত হতে দেখলাম। ও তখন ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের আশায় বসে রয়েছে। ডাক্তার লোক, তার ওপর ভাই, বন্ধু। আমি ওর কাছে অনেক কিছু আশা করে সব কথাই খুলে বললাম। ভেবেছিলাম আমার এই হঠাৎ বিবাহ-বিমুখতা, ভয়, এ সব নিশ্চয় শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই দেখা দিয়েছে। Yes, I was suffering from nervous breakdown at that time. সমস্ত কথা শুনে দেবু বললে, নীলার সঙ্গে দেখা করে সেসব কথা বুঝিয়ে বলবে। যাতে কি না, নীলা অন্য কিছু মনে না করে বসে—সবুর করে আরও কিছুদিন।

'দেবুর কাছে ভরসা পেয়ে আমি একটু সুস্থির হলাম। এই সময় একদিন দেবু আমায় বললে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ওর ধারণা হয়েছে, আমার যা ব্যাধি, তাকে মনের রোগ বলা যায়। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে যার জন্যে যে মেয়েকে আমি ভালোবাসি তার কাছ থেকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও আমি মেয়েটিকে বিয়ে করার কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি। দেবুর কথা আমি সেদিন বুঝিনি—আজও বুঝি না।'

বাণীব্রতর কথায় বাধা দিয়ে প্রণব বললে, 'আপনার ভাই আপনার স্নায়বিক দুর্বলতার (nervous breakdown) কারণ ঠিকই অনুমান করেছিলেন, বাণীবাবু। আপনি সেদিন যা বুঝতে পারেননি, আজ তা বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে পরে তা বুঝিয়ে দেব। এখন আপনার কথা বলে যান।'

'দেবু আমায় বললে, এ বিষয়ে সে কলকাতার কোনও একজন সাইকো-অ্যানালিস্টের সঙ্গে আলাপ করবে।'

ডাঃ গুপ্ত একটা বিস্ময়-উক্তি করলেন।

'আমি যে কী বিশ্রী, মর্মান্তিক একটা অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম, তা আপনাদের বোঝাবার শক্তি আমার নেই। দেবুর কথা শুনে যা সে ভালো বোঝে—যাতে আমার ভালো হয় তাই করতে বললুম। দিন দুয়েক পরে দেবু এসে আমায় নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে। আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে নিয়ে চলে গেল। অজস্র উদ্বেগ নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম দেবুর জন্যে। একদিন দুদিন করে পুরো একটা হপ্তা কেটে গেল—দেবু এল না। অবশেষে আমি একদিন তার বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনলাম, সে নীলার বাড়িতে গেছে। দেবুর বোন—সীতা আমায় খবরটা দিল। সীতা যেন আরও কী-কী বললে যাতে আমার কেমন সন্দেহ হল। দেবুব বাড়ি থেকে নীলার বাড়িতে এসে হাজিব হলাম। নীলার ছোট বোনের সঙ্গে দেখা হতে তার কাছ থেকেই জানলাম নীলা আর দেবু বাগানে বসে গল্প কবছে।' বাণীব্রত একটু থামল। অতীতেব ঘটনাটুকু মনে করবার আপ্রাণ প্রয়াস ওর ক্লান্ত, শুষ্ক মুখের রেখাবিন্যাস থেকেই বোঝা যায। বেদনাব সুব তার কণ্ঠে। 'আমি—আমি—' বাণীব্রত বলে চলল, 'আমি বাগানের পথে পা বাড়ালুম ওদের খোঁজে। সন্ধে তখন হয়ে এসেছে। আধো-অন্ধকার ভরা বাগানের এদিক-ওদিক খুঁজেও কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না। হতাশ হয়ে ফিরে আসছি, এমনসময় নীলার গলা শুনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। একটু নজর করে তাকাতেই দেখি—কতকগুলো ফুলগাছের ঝোপের তলায়—সহজে যে স্থানটা কারুর চোখে পড়বে না, এমন একটা জায়গায়—ওই সন্ধের অন্ধকারে নীলা আর দেবু পরস্পরের—' বাণীব্রত যেন চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ওর সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

'কী দেখলেন, বলুন? লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই, বাণীবাবু। দৃশ্যটা যতই কুৎসিত হোক, তা জানার প্রয়োজন আছে আমাদের।' বললে প্রণব।

বাণীব্রত একটু থেমে শেষে বললে, 'আমি ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখলাম।'

'তারপর?'

'সম্ভবত তারপর সংযম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পাগলের মতো তখন কী করেছি আমার মনে নেই। খালি মনে পড়ছে আমি নীলার সামনে এসে দাঁড়াই। নীলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেবু লুকিয়ে পড়েছে। আমায় দেখে নীলা বোধহয় ভূত দেখার মতোই চিৎকার করে উঠেছিল। কী জানি কেন রাগে দুঃখে আমি জ্ঞান হারিয়েছি তখন। নীলার কাঁধ ধরে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি ওকে কী সব যেন বললাম। কী বললাম আজ আর তা মনে নেই। বোধহয় জানতে চেয়েছিলাম এমন ভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল ও? নীলা প্রথমটায় চুপ করে ছিল। আমি যখন মনের সমস্ত জ্বালা উজাড় করে ফিরে আসছি, নীলা আমায় বললে, যা বললে, তা কখনও ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি। ও বলল, আমি নাকি পাগল! ছেলেবেলা থেকেই পাগল। ডাক্তারেরা

BanglaBook.org

বলেছে—আমার রক্তে পাগলামি লুকিয়ে আছে। আমি নাকি আমার মাকে মেরেছি—যে লোক তার মাকে হত্যা করতে পারে, তাকে নীলা বিশ্বাস করবে কী করে? একটা উদ্ভট পাগলকে সে ভালোবাসে না—ভালোবাসতে পারে না। ...কথাটা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী যে তখন মনে হল সে কথা আজ বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ—আমি বাস্তবিক তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। নয়তো নীলার গলা টিপে ধরে বলতাম না, মিথ্যে কথা—সমস্ত মিথ্যে কথা। কে তোমায় বলেছে? কে?...বোধ হয় নীলার গলাটা একটু জোরেই চেপে ধরেছিলাম আমি। নীলার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তার গোঙানি শুনতে পেলাম। এমন সময় ঝোপের পাশ থেকে দেবু বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে নীলাকে বাঁচালে। ও বললে—নীলা যা বলেছে তা সবই ঠিক। দেবু নীলাকে সব কথা জানিয়েছে। আর দেবু সাইকোঅ্যানালিস্টের কাছ থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছে বাস্তবিকই আমি একটা পাগল। আমি আমার মাকে মেরেছি। নীলাকেও আর একটু হলে আমি মেরে ফেলছিলাম। দেবুর মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর আমি পাথর হয়ে গেলুম। কী ভাবছিলাম তখন জানি না। যখন জ্ঞান হল দেখি ওরা কেউ নেই। বাগানে আমি শুধু একা। অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে জোরে—বড় জোরে।' বাণীব্রত চুপ করল।

ঘরের মধ্যে আবহাওয়া কেমন যেন গুমোট ভারী হয়ে উঠছে আস্তে-আস্তে। সকলেই নির্বাক, বিস্মিত, ব্যথিত।

ডাঃ গুপ্তই প্রথমে কথা বললেন, 'এর পরই কি আপনার ভাই নীলাকে সঙ্গে করে পালিয়ে আসে?'

'হ্যাঁ। এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরেই।' বাণীব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'কিন্তু আপনার ভাই নীলাকে বিয়ে করে কলকাতাতেই থাকতে পারত। ওরা পালিয়ে এল কেন? মিঃ ঝা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। এ কথাটা আমিও বহুবার ভেবেছি। কিছুতেই বুঝতে পারিনি।' উত্তর দিল বাণীব্রত।

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। বললে প্রণব। সকলে তার দিকে মুখ ফেরাল। 'ডাঃ চক্রবর্তী অসম্ভব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন দেখছি। বাণীবাবুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি নীলাকে হস্তগত করবার এক সুন্দর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক ষড়যন্ত্র ডিটেকটিভ গল্পের বইতেও বড় একটা পড়া যায় না। ষড়যন্ত্রটা বিষদভাবে বললে এইরকম দাঁড়ায়। বাণীবাবুর বিবাহ-ভীতিটা প্রকৃতপক্ষে ওঁর মনোবিকারের অন্তর্গত প্রধান লক্ষণ। আপনি যে বললেন না বাণীবাবু, আপনার সে সময়ে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল—সেটা ঠিকই। নীলা যখন আপনাকে বিয়ে করতে বললে, তখন থেকেই আপনার মনে অস্বোয়াস্তি, উদ্বেগ, কেমন একটা ভয় দেখা দেয়। তারপর সেটা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এর কারণ কী জানেন? নীলা যখনি সোজাসুজি আপনাকে বিয়ের কথা বলল, তখুনি আপনার মনে মাতৃ-হত্যাজনিত সুপ্ত পাপবোধ অজ্ঞান মনের সীমানা ছাড়িয়ে ভেসে উঠে সচেতন মনকে গ্রাস করতে চেয়েছে। যেমন ধরুন, একটা কাচের গ্লাসে থিতিয়ে পড়া বালি, ময়লা নীচে পড়ে রয়েছে, আর ওপরে তার পরিষ্কার জল। গ্লাসটা যদি এবার নেড়ে দেওয়া যায়—কাচের গ্লাসে থিতিয়ে পড়া বালি, ধুলো, ময়লা যেমন সমস্ত কাচের গ্লাসের জলটাকে ঘোলাটে, ময়লা করে দেয়, ঠিক তেমনি। কিন্তু কেন এমন হল এটাই আপনি জানতে চান, না বাণীবাবু? জিনিসটা আপনার কাছে খুবই আশ্চর্য বলে মনে হবে, কিন্তু আমাদের—মনঃসমীক্ষকদের কাছে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। হামেশাই এমনটা ঘটে। একটু গুছিয়ে বলি, আপনিও বুঝতে পারবেন। ছেলেবেলায় আপনি আপনার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মা ছাড়া আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা মুশকিল। পরে যৌবনে যখন আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসলেন, তখন সত্যি বলতে

কী নীলার মধ্যে আপনার সেই ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া মার একটা প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেলেন। আপনি হয়তো এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, কিন্তু ভালো করে নীলার চরিত্র, দেহ, মন বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আপনার মা ও নীলার মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেত। আচ্ছা বলুন তো, কোনও সাদৃশ্য আপনি কি খুঁজে পেয়েছিলেন, যা আজ মনে করতে পারেন? একটা সাদৃশ্যের কথা বলি। আপনি বলেছেন, আপনার মা খুব ভালো গান গাইতে পারতেন, নীলাও ঠিক তাই। নয় কি?'

বাণীব্রত তার বিস্মিত দৃষ্টি প্রণবের মুখের পানে নিবদ্ধ করে বললে, 'আশ্চর্য! আপনি ঠিক বলেছেন, ডাঃ দাশগুপ্ত। মার মতনই নীলার গলার স্বর ছিল অসম্ভব মিষ্টি, এমন কী, ও যখন কথা বলত আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে আমি যেন মার গলা শুনছি। এ ছাড়া নীলার সঙ্গে মার চোখেরও একটা মিল ছিল। খুব টানাটানা চোখ, ভাসা-ভাসা, তেমনি চুল।' বাণীব্রত থামল।

'তাই হয়। ছেলেরা তাদের স্ত্রীর মধ্যে মা, আর মেয়েরা তাদের স্বামীর মধ্যে পিতার প্রতিচ্ছবিই খুঁজে বেড়ায়। আপনি নীলার মধ্যে মার একটা অংশ প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন, আর তাই ভালোবেসেছিলেন তাকে। কিন্তু নীলা যখন আপনাকে বিয়ের কথা বলে, আপনি হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কেন জানেন? নীলাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে গেলেই সব সময় আপনার মনে হত মাকে—মনে পড়ত তাঁর কথা। যাঁকে আপনি প্রকারান্তরে হত্যা করেছেন এ চিন্তা কিন্তু আপনার অবচেতন মনে শেকড় গেড়ে বসে রয়েছে। তাই নীলার বেলাতেও মনে হত—ভাবতেন, নীলাকেও বুঝি আপনি মেরে ফেলবেন। বাণীবাবু, পাপবোধই আপনার মনোবিকার, আর সেটাই আপনার আসল চরিত্র। দুঃখের বিষয়, এই পাপবোধের ভারে আপনি এতই পীড়িত ছিলেন যে নীলাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করার মতো সাহস খুঁজে পাচ্ছিলেন না।'

'But what's about Dr. Chakravartty's conspiracy—তাঁর কী হল?' মিঃ ঝা প্রশ্ন করলেন।

'ডাঃ চক্রবর্তী বাণীবাবুর কাছে যা বলেছিলেন তা ঠিক। তিনি বাণীবাবুর অস্বাভাবিক ও আকস্মিক পরিবর্তনের মূল কারণ কোনও একজন মনঃসমীক্ষকের সাহায্য নিয়ে জেনে নেন। নিজেও তো তিনি একজন সাধারণ ডাক্তার। মনোবিকারের ইতিহাসটুকু জানার পর বাণীবাবুর এই দুর্বলতাটুকু নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। নীলাকে ভুল বুঝিয়ে, বাণীবাবুর মনে যে দুশ্চিন্তা এতদিন সুপ্ত ছিল, সেটাকে জাগিয়ে, ডাঃ চক্রবর্তী নিজের কার্যসিদ্ধি করলেন।'

'It's terrible!' মিঃ ঝা বিস্ফারিত নেত্রে বাণীব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'নীলাকে নিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী পালিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই কারণে। তাঁর ভয় ছিল, যদি বাণী এসব জানার পর নিজেই কোনও মনঃসমীক্ষকের কাছে যায়, তা হলে আসল সত্য ধরা পড়ে যাবে। তখন আর নীলাকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তার ওপর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আরও অনেক ক্ষতিই হয়তো হতে পারত ডাঃ চক্রবর্তীর।' প্রণব তার কথা শেষ করল।

ডাঃ গুপ্ত প্রণবের ঘটনা বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মিঃ ঝা তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত একটি হত্যা-মামলার সংস্পর্শে আসেননি কখনও। তিনি চমৎকৃত হলেন ঘটনার জটিলতা এবং প্রণবের বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দেখে। ইন্সপেক্টার গুপ্তার চোখের পাতা আর পড়ে না। তাঁর কল্পনা হার মেনে মাথা লুটিয়েছে। এখন তিনি ভাবছেন—এরপর কী শুনবেন কে জানে? সুদক্ষিণা যেন বিশেষ কোনও একটা জটিল দর্শনসূত্রের মীমাংসা করছে মনে-মনে—এমনি একটা আত্মকেন্দ্রিক তন্ময়তায় বিভোর।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে ডাঃ গুপ্ত ঘরের নিস্তব্ধতা নষ্ট করলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলকে সচকিত করল, 'এবার শেষ কথা ক'টা জানতে পারলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়। কিন্তু তার আগে আমাদের যেন একটু করে কফি দরকার। নয় কি?'

BanglaBook.org

'মন্দ কী! আমিই এবার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছি।' মিঃ ঝা সজোরে হেসে উঠলেন।

মিঃ ঝার হাসি ঘরের থমথমে আবহাওয়াকে অনেকটা লঘু করে তুলল।

খানিকক্ষণ পরস্পরে নীলার বিষয় নিয়ে এটা-সেটা আলাপ আলোচনা করলেন। নানা অনুমান, সিদ্ধান্ত, মতামত, কটূক্তি—যার যা মনে এল তাই। কফি এল। সুদক্ষিণা আর বাণীর জন্যে চা।

আরও খানিকটা সময় অতিবাহিত হল। শেষে মিঃ ঝা মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, 'ডাঃ দাশগুপ্ত, এবার দেওঘরের কথাটা জানতে পারলেই আমাদের ছুটি।'

প্রণব কোনও উত্তর দেওয়ার আগে বাণীব্রত তার হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে বললে, 'দেওঘরের কথা আপনারা যা জানেন সবই ঠিক। খালি সামান্য যে ক'টি কথা জানেন না সেটুকুই আমি বলব। জানি না, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না?'

'আপনার কথা বিশ্বাস না করবার তো কোনও কারণ নেই। আপনি বলুন।' বললে প্রণব।

বাণীব্রত বলতে লাগল, 'দেবুকে আবার আমি দেখি দেওঘরে। গায়ত্রী বউদির হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় বিভূতি ডাক্তার ডেকে আনে। সেই ডাক্তারই যে দেবু তা আমি জানলাম—গায়ত্রী বউদির বিছানার পাশে বসে—দেবু যখন ঘরে ঢুকল। দেবুকে দেখে অবাক যত না হয়েছিলাম ভয় হয়েছিল তার শতগুণ বেশি। আমার দিকে তাকিয়ে দেবুর কিন্তু কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। গম্ভীর হয়ে নিজের কাজ করতে লাগল ও। আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। দেবু চলে গেল, আমি তাও দেখলাম আড়াল থেকে। কিন্তু দেবুকে দেওঘরে দেখার পর থেকেই আমার মনের সমস্ত শান্তি কে যেন আশ্চর্যভাবে কেড়ে নিল। ভেতরে-ভেতরে ছটফট করতে লাগলাম সাঙ্ঘাতিক একটা দুশ্চিন্তা আর ভয়ে। আমার সে দুশ্চিন্তা আর ভয়ের কারণটা আপনাদের বলি। না জানি কেন, আমার মনে হতে লাগল, দেবু আমার পরমশত্রু। বিভূতিদের সংসারের সঙ্গে আমার এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব, আর বিশেষ করে সুদক্ষিণার সঙ্গে আমার মন বিনিময়ের কথা ওর কাছে লুকোনো থাকবে না। যেমন করেই হোক দেবু সব জেনে নেবে। আর তারপর প্রকাশ করে দেবে আমার গুপ্ত কলঙ্ক। কথাটা ভাবতেই আমার সারা শরীর যেন হিম হয়ে আসছিল। কী বিশ্রী হবে, যদি দেবু বিভূতিকে জানিয়ে দেয় আমার মধ্যে পাগলামির বীজ আছে, আমি অস্বাভাবিক প্রকৃতির এক ছেলে, মাকে হত্যা করেছি, পাগল হয়ে যেতে পারি যে-কোনও দিন, যে-কোনও মুহূর্তে। আর পাগলে কি না করতে পারে? কে বিশ্বাস করে তাকে? বিভূতি এসব কথা শোনার পর, গায়ত্রী বউদি, সুদক্ষিণা, কার আর জানতে বাকি থাকবে আমাব কলঙ্ক-কাহিনি। তারপর? তারপর জেনেশুনে সুদক্ষিণা নিশ্চয় আমায় বিয়ে করতে আর রাজি হবে না। বিভূতি ও বউদিও কখনও এমন বিয়েতে মত দেবেন না। জানেন প্রণববাবু, এসব কথা ভাববার পর আমার মনে হল এ জগতে আমার সব ছিল, অথচ আর একটু পরে কিছু থাকবে না। সুদক্ষিণাকে নীলার মতোই হারাতে হবে এ কল্পনা আমার কাছে যে কী দুঃসহ মনে হয়েছিল, তা আজ আপনাদের বোঝানো মুশকিল।' বাণীব্রত একটু থামল। তাকাল সুদক্ষিণার দিকে। এক কোণে মুখ নিচু করে বসে রয়েছে ও।

'বুঝেছি। আপনি বলুন।'

'ঠিক এই জন্যেই আমি মাঝরাতে লুকিয়ে দেবুর বাড়ি যাই। আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমি শুধু লুকিয়ে তাকে বলতে গিয়েছিলাম, সে যেন আমার কলঙ্কের কথা এদের কাছে প্রকাশ করে না দেয়। যে শান্ত, মধুর, মনের মতো সম্পর্ক আমি গড়ে তুলেছি, দেবু যেন আমার সে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট না করে। তার পরিবর্তে আমি আমার যা আছে সব তাকে দিয়ে দেব। ও শুধু আমায় বাঁচাক। যাদের আমি ভালোবেসেছি—যারা আমায় ভালোবেসেছে—তাদের কাছে একটা পশুর মতো বিভীষিকার বস্তু হয়ে থাকতে আমি পারি না। না—না—কখনও নয়।' বাণীব্রতর স্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

'আপনি বিভূতিবাবুর রিভলভার নিয়েছিলেন কেন?' প্রশ্ন করলেন মিঃ ঝা।

BanglaBook.org

'দেবুকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি তাই। ও যদি আমার অনুরোধে রাজি না হয়, ওকে ভয় দেখাব এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া যদি আমার সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়, আত্মহত্যা করে মনের এই অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেব, এই ছিল আমার ইচ্ছে।'

'ডাঃ চক্রবর্তীকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য আপনার ছিল না?'

'না—না—কখনওই না।' বাণীব্রত দৃঢ় আপত্তি জানাল।

'তা হলে উনি কেমন করে মারা গেলেন? আপনার রিভলভারের কার্টিজ খরচ হল কী করে?' মিঃ ঝা জেরা করলেন।

'বলছি। মাঝরাত্রে দেবুর বাড়ি যাওয়ার পথে এক জায়গায় আমি রিভলভারের একটা কার্টিজ খরচ করি। তখন রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছিল। তার শব্দে আমার গুলির শব্দ ঢাকা পড়ে যায়।'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু কেন কার্টিজ খরচ করেন তা তো বললেন না?'

'রিভলভার ছুঁড়তে আমি জানতাম না, দেখছিলাম প্রয়োজন হলে আমি সেটা ব্যবহার করতে পারব কিনা।'

'My god!'

'দেবুর বাড়িতে গিয়ে ওকে ডাকাডাকি করি। ও নীচে নেমে আসে। দেবুর বাইরের ঘরে আমরা কথা বলছিলাম। সামনা-সামনি বসে। তারপর অবশ্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। দেবু আমার কথা শুনে মজা পাচ্ছিল বলে মনে হল। সে খুব হাসছিল। আর যতবার আমি তার কাছে জোড়হাতে ভিক্ষে চাইছিলাম আমার সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ, ততবারই কুৎসিত পশুর মতন কী নির্মম ভাবেই না ও আমায় উপহাস করছিল! আমি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি ওকে দেব জানালাম, তখন সে কী বললে জানেন? বললে, আমায় পাগল প্রমাণিত করে সম্পত্তি তো বটেই, সুদক্ষিণাকে পর্যন্ত সে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে। আমি তাকে লক্ষ না করলেও দেওঘরে আমার উপস্থিতি তার চোখ এড়ায়নি। সুদক্ষিণার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কথাও সে জানে। ও শুধু অপেক্ষা করছিল একটা সুযোগের। এতদিনে সে সুযোগও জুটেছে। এ কথা শোনার পর আমার পক্ষে ধৈর্য রাখা আর সম্ভব হয়নি। আমি পকেট থেকে রিভলভার বের করে তাকে শাসাই। হ্যাঁ—আমি তাকে শাসাচ্ছিলাম। অনেক কটুকথা আমি বলেছি তাকে সে সময়। কিন্তু কী করব—আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। রিভলভার দেখে দেবু ভয় পেয়েছিল। স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি—কীরকম কুঁকড়ে, কাতরভাবে সে আমার হাতের দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক এ সময়—আমি জানি না—তবে এটা জানি, আমি রিভলভারের ট্রিগার টিপিনি—সাঙ্ঘাতিক একটা শব্দ হল। আর আমার পায়ের কাছে দেবু বিকট একটা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠি—আমার হাত থেকে রিভলভার পড়ে যায় মাটিতে। আমার তখন মনে হয়েছে—আমিই দেবুকে মেরেছি। দেবু মারা গেল কি না তা পর্যন্ত আমি দেখিনি। তার করুণ গোঙানি তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। ধরা পড়বার ভয়ে আমি জানালা ডিঙিয়ে বাইরে পালিয়ে আসি। পাশেই ছিল কুয়ো—আর কুয়োর পাশে কলাগাছের ঝোপ। সেই কলাগাছের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আমি বসে থাকলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক, কী তারও বেশি। যখন দেখলাম লোকজন কেউ এল না, তখন সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে সোজা স্টেশনে পালিয়ে আসি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি কলাগাছের ঝোপের মধ্যে ঘণ্টাখানেক লুকিয়ে থাকলেন, এর মধ্যে গুলির শব্দ শুনে কোনও লোকজন এসে জুটল না? বাড়ির মধ্যেও কোনওরকম সাড়া, শব্দ, চেঁচামেচি শুনলেন না?'

মাথা নাড়লে বাণীব্রত। বললে, 'না। শ্মশানের মতো নীরব—খাঁ-খাঁ করছিল। কোনও সাড়া, শব্দ, চেঁচামেচি কিছুই শুনিনি। কেবল—।'

BanglaBook.org

'কী?'

'আমি যখন কলাগাছের ঝোপে লুকিয়েছিলাম, কে একজন গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে কুয়োতলার পাশে এসে দাঁড়াল।'

'চাদর ঢাকা দিয়ে? কে লোকটা?' প্রণব প্রশ্ন করলে। গলায় তার উত্তেজনা।

'জানি না। চিনতে পারিনি। তবে একজন মহিলা। কেননা পরনে তার শাড়ি ছিল। আমি তার পা দেখেছি। মুখ, মাথা কিছুই দেখতে পাইনি। চাদর জড়ানো ছিল।'

'তিনি কী করলেন?'

'কী করলেন?' বাণীব্রতর কপালে কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। বুজে এল চোখের পাতা। কী একটা কথা মনে করবার চেষ্টায় ও যে আপ্রাণ মানসিক পরিশ্রম করছে তা স্পষ্টই বোঝা গেল।

'কী করলেন তিনি, মনে করতে পারছেন না? You have to remember—you must. বলুন—তিনি কী করলেন?' প্রণব হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঝুঁকে পড়ল বাণীব্রতর মুখের কাছে এসে।

বাণীব্রতর ক্লান্ত শুষ্ক মুখের বিবর্ণতা হঠাৎ যেন আলোর আভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বললে আচমকা, 'কী যেন কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই নারীমূর্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ফিরে গেল আবার। তার আসাও যেমন আকস্মিক, চলে যাওয়াও তেমনি।'

মিঃ ঝা কিছু একটা বলবার উপক্রম করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কথা বলা হল না।

প্রণব বললে, 'মিঃ ঝা, আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না। এখুনি মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। সোজা দেওঘর। ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ি। সেখানে কুয়োর মধ্যে লোক নামিয়ে দয়া করে ডাঃ চক্রবর্তী যে রিভলভারে মারা গিয়েছেন সেই রিভলভারটা তুলে নিন।'

প্রণবের কথায় সকলে তার মুখের দিকে বোকার মতো চোখ তুলে তাকাল। সমস্ত ঘরটা বুঝি ভেঙে পড়েছে হঠাৎ—এমনি একটা বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের ভাব ওদের।

'What do you mean?' মিঃ ঝা অস্পষ্টভাবে বললেন।

'যা অনুমান করেছি বোধহয় তা ঠিকই। ডাঃ চক্রবর্তীর হত্যাকারী নীলা, অর্থাৎ স্ত্রীই স্বামীকে হত্যা করেছে। যে রিভলভারে ডাঃ চক্রবর্তী মারা গেছেন এবং যেটা পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা উপযুক্ত কাজে ব্যবহারের পর কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই রিভলভার আজও কুয়োর মধ্যে জলের তলায় তলিয়ে রয়েছে।'

মিঃ ঝা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে—গলার স্বর অসংযত। অধৈর্যের আবেগ তাঁর সারা দেহে : 'যাচ্ছি। এখুনি আমি যাচ্ছি। Good heavens! আমি ইনসপেক্টারকে নিয়েই যাচ্ছি।'

'Will you allow me?' ডাঃ গুপ্ত বললেন।

'অবশ্য আপনি যদি দয়া করে যান?'

'তাহলে চলুন। একটু অ্যাডভেঞ্চার করে আসি।'

মিঃ ঝা প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব শীঘ্রি আপনাকে সুখবর জানাতে পারব বলে আশা করি।'

প্রণব মৃদু হাসল শুধু।

BanglaBook.org

আধঘণ্টার মধ্যে মিঃ ঝা তাঁর দলবল নিয়ে দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাত হয়ে এসেছিল। বাণীব্রতকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে প্রণব ফিরছিল তার কোয়ার্টারে—সঙ্গে সুদক্ষিণা।

পথে যেতে-যেতে সুদক্ষিণা বললে, 'আমার দুটো কথার উত্তর দেবে?'

'বলো।'

'বাণী ডোরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কেন?'

'বাণীব্রতর নামে পুলিশের যে অভিযোগ, সে-সংক্রান্ত সব রিপোর্ট, এনকোয়ারি, চিঠিপত্র, ফাইল ইত্যাদি হাসপাতালে আছে। ডোরা সেগুলো বাণীব্রতকে নিয়ে গিয়ে দেখায়। তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ও একজন খুনি। আমরা তাকে হাসপাতালে রেখেছি সারিয়ে তুলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব বলে। কিন্তু ডোরার সঙ্গে যদি বাণী পালিয়ে যায়, ডোরা তাকে বাঁচাবে। বাণী পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার আশায় ডোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে।'

সুদক্ষিণার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। খানিকটা হাঁটার পর আবার ও প্রশ্ন করলে, 'আর একটা কথা। বাণীর সমস্ত কথা হঠাৎ মনে পড়ল কী করে?'

'তাই পড়ে। মানুষের মনের ওই আর একটা বিস্ময়। আমরা মনঃসমীক্ষকরা একে বলি— 'অ্যাসোসিয়েশান'। ওই অন্ধকার রাত্রি, দূরে-দূরে পাহাড়ে আগুন-জ্বলা দৃশ্য, যা দূর থেকে দেখতে ঠিক প্রদীপসজ্জার মতো দেখায়, সেই বন্দুকের শব্দ, কুকুরের ডাক, এ সমস্তই বাণীব্রতর মনে তার সেই ছেলেবেলায় শোচনীয় দুর্ঘটনার দিনটির অবস্থা ও আবহাওয়াকে সৃষ্টি করেছে, ফলে তার মনে পড়ে গেছে বিস্মৃত অতীত।'

'আশ্চর্য!' সুদক্ষিণা তার অগাধ বিস্ময়কে প্রকাশ করবার আর ভাষা খুঁজে পেল না।

প্রণবের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল।

দেওঘরে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ির কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হল ডাঃ চক্রবর্তীর কোল্ট রিভলভার। দীর্ঘ আড়াই বছর জলের তলায় পড়ে ছিল আগ্নেয় অস্ত্রটা। রিভলভারের সঙ্গে নীলার সেই ভাঙা চশমাটাও একই জায়গা থেকে পাওয়া গেল।

দেওঘর থেকে নতুন করে প্রমাণ জোগাড় করে মিঃ ঝা গেলেন কলকাতায় নীলার বাড়িতে। ডাঃ চক্রবর্তী মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই নীলা দেওঘরের বাড়িতে তালা লাগিয়ে চলে এসেছিল কলকাতায় বাবার কাছে। সেখানেই থাকত ও।

বিভূতির রিভলভারটা ছিল ওয়াসন (Wesson)। অথচ কোল্ট (Colt) রিভলভারের গুলিতে মারা গেছেন ডাঃ চক্রবর্তী। ডাক্তারের মৃতদেহে প্রাপ্ত বুলেট থেকে এ-সত্য আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই কোল্ট রিভলভারটা আবার পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন। রিভলভার এবং ভাঙা চশমা পাওয়ার পর মিঃ ঝা নীলার বিরুদ্ধে যেসব নিখুঁত এবং অবধারিত প্রমাণ জোগাড় করলেন, তার থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল।

মিঃ ঝার পুলিশি জেরাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা নীলা অবশ্য অনেক করেছিল। কিন্তু কোনও মতেই পাশ কাটাতে পারলে না। অবশেষে সে স্বীকার করলে : বাণীব্রত আমার স্বামীকে রিভলভার হাতে করে শাসাচ্ছিল। আমি তাই দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। জানি তো লোকটা পাগল। কখন যে কী করে ফেলে কে জানে? তাই আমি ওপরে ছুটে গিয়ে আমাদের রিভলভারটা নিয়ে আসি। আমি যে কী করে গুলি করলাম জানি না, চোখের চশমা ভেঙে যাওয়ায় সবই অস্পষ্ট দেখছিলাম। আমি বাণীব্রতকে মারতে চেয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, লক্ষ্য ভুল হয়ে যায়। আর চশমা? চশমাটা আমি পরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দি। পুলিশের লোক ওই একটা ফ্যাকড়া নিয়ে হয়তো আমায় অতিষ্ঠ করে তুলত। আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী এবং এ-জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার প্রথম অপরাধের জন্যে যতটা অনুতপ্ত হচ্ছি, দ্বিতীয় অপরাধের জন্যে ততটা নয়।'

BanglaBook.org

*

একদিন বৃষ্টি-হাওয়া বিকেলে যে কাহিনির যবনিকা উঠেছিল—দীর্ঘ দু-বছর পরে তেমনি ঘন বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায় সে কাহিনিরই যবনিকা নেমে এল।

পরেশনাথ স্টেশন। বাণীব্রত আর সুদক্ষিণা কলকাতাগামী ট্রেনের জন্যে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। কুন্তলাদি বাণীব্রতর সঙ্গে গল্প করছিলেন। সুদক্ষিণা প্রণবের সঙ্গে পায়চারি করছিল ভিজে প্ল্যাটফর্মের ওপর। আকাশ ভরে মেঘ জমছিল আবার।

গাড়ি এসে থামল। বাণীব্রত আর সুদক্ষিণা অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা কামরায় নিজেদের জায়গা করে নিলে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রণব। বাণীব্রত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আপনি কলকাতায় এলে দিদিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবেন। আপনারা না এলে বাস্তবিক আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব প্রণববাবু।'

'কী যে বলেন? যাব—নিশ্চয় যাব। দিদিকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। কিন্তু আমি মশাই বিয়ের নেমন্তন্ন না পেলে যাচ্ছি না।'

'দেখি।' বাণীব্রত আড়চোখে সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে হাসল।

গাড়ি ছাড়বার তখনও দেরি ছিল। জানালা দিয়েই মুখ বাড়িয়ে সুদক্ষিণা বলল প্রণবকে, 'আচ্ছা, তুমি তো ডোরার সেই কথাটা কই বললে না? কেন সে বাণীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল?'

'সেই একই কারণে—যে কারণে তুমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। ডোরাও তাই চেয়েছিল। ভালোবেসে মানুষ যখন মনের মানুষকে না পায়, তখন হয় সে তাকে না-হয় নিজেকে ধ্বংস করতে চায়। এতেই তার আনন্দ। মনের এ আর এক আশ্চর্য রহস্য।'

'ও।' সুদক্ষিণা একটু চুপ করে থেকে শেষে মৃদু সুরে বললে, 'তুমি নিশ্চয় ডোরার মতো বোকা হবে না?'

'বোধহয় নয়। আর হলেও তুমি জানতে পারবে না।' প্রণবের ঠোঁটের হাসিতে বেদনার আভাস।

গাড়ি ছাড়ল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকল বাণী আর সুদক্ষিণা। যতক্ষণ দেখা যায় প্রণব আর কুন্তলাদি তাকিয়ে থাকলেন ওদের মুখের দিকে।

কখন এক সময় প্রণব দেখল—চোখের সামনে শুধু মাঠ আর জঙ্গলের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রচ্ছদপট। কেউ কোথাও নেই—কানের কাছে ট্রেনের চাকার অতি অস্পষ্ট একটু শব্দ—আর বুকের মধ্যে একরাশ ঠাসা হাওয়া।

'আয়'। কুন্তলাদি ডাকলেন।

'হ্যাঁ—চলো। বৃষ্টি এল দেখছি।' প্রণব মুখ ঘুরিয়ে তার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ লুকোতে চাইল।

BanglaBook.org

বাদশাহী আংটি

BanglaBook.org

সত্যজিৎ রায়

শ সে র. উ ২—৩৩

১

বাবা যখন বললেন, 'তোর ধীরুকাকা অনেকদিন থেকে বলছেন—তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিটা লখ্‌নৌতেই কাটিয়ে আসি'—তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল লখ্‌নৌটা বেশ বাজে জায়গা। অবিশ্যি বাবা বলেছিলেন ওখান থেকে আমরা হরিদ্বার লছমনঝুলাও ঘুরে আসব, আর লছমনঝুলাতে পাহাড়ও আছে—কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য? এর আগে প্রত্যেক ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি। আমার পাহাড়ও ভালো লাগে, আবার সমুদ্রও ভালো লাগে। লখ্‌নৌতে দুটোর একটাও নেই। তাই বাবাকে বললাম, 'ফেলুদা যেতে পারে না আমাদের সঙ্গে?'

ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন, ওকে ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটনা সব গজিয়ে ওঠে। আর সত্যিই, দার্জিলিঙে যেবার ও আমাদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেবারই রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটল। তেমন যদি হয় তাহলে জায়গা ভালো না হলেও খুব ক্ষতি নেই।

বাবা বললেন, 'ফেলু তো আসতেই পারে, কিন্তু ও যে নতুন চাকরি নিয়েছে, ছুটি পাবে কি?'

ফেলুদাকে লখ্‌নৌয়ের কথা বলতেই ও বলল, 'ফিফ্‌টি-এইটে গেসলাম—ক্রিকেট খেলতে। জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়। বড়া-ইমামবড়ার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তোর চোখ আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে। নবাব-বাদশাহের কী ইম্যাজিনেশন ছিল—বাপরে বাপ!'

'তুমি ছুটি পাবে তো?'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর শুধু ভুলভুলাইয়া কেন—গুম্‌তী নদীর ওপর মাল্কি ব্রিজ দেখবি, সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি দেখবি।'

'রেসিডেন্সি আবার কী?'

'সেপাই বিদ্রোহের সময় গোরা সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা। কিস্যু করতে পারেনি। ঘেরাও করে গোলা দেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সেপাইরা।'

দু-বছর হল চাকরি নিয়েছে ফেলুদা, কিন্তু প্রথম বছর কোনও ছুটি নেয়নি বলে পনেরো দিনের ছুটি পেতে ওর কোনও অসুবিধে হল না।

এখানে বলে রাখি—ফেলুদা আমার মাসতুতো দাদা। আমার বয়স চোদ্দো, আর ওর সাতাশ। ওকে কেউ-কেউ বলে আধপাগলা, কেউ-কেউ বলে খামখেয়ালি, আবার কেউ-কেউ বলে কুঁড়ে। আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়। আর ওর মনের মতো কাজ পেলে ওর মতো খাটতে খুব কম লোকে পারে। তাছাড়া ও ভালো ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু-একটু হিপনটিজম জানে, ডান-হাত আর বাঁ-হাত দু-হাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমারি এত ভালো ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো 'দেবতার গ্রাস' মুখস্থ করেছিল।

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটা হল—ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ শিখে নিয়েছে। তার মানে অবিশ্যি এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।

সেটা বোঝা যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

যেমন লখ্‌নৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরুকাকাকে দেখেই ও আমায় ফিসফিস করে বলল, 'তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ?'

BanglaBook.org

আমি যদিও জানতাম ধীরুকাকার বাগানের কথা, ফেলুদার কিন্তু মোটেই জানার কথা নয়, কারণ, যদিও ফেলুদা আমার মাসতুতো ভাই, ধীরুকাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন, বাবার ছেলেবেলার বন্ধু।

তাই আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কী করে জানলে?'

ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল, 'উনি পিছন ফিরলে দেখবি ওঁর ডানপায়ের জুতোর গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ পাতার ডগা বেরিয়ে আছে। আর ডানহাতের তর্জনীটায় দেখ টিনচার আয়োডিন লাগানো। সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল ঘাঁটার ফল।'

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখ্‌নৌ শহরটা আসলে খুব সুন্দর। গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চারদিকে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার, আর তাতে মোটরগাড়ি ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম। তার একটার নাম টাঙ্গা আর অন্যটা এক্কা। 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'—এই জিনিসটা নিজের চোখে এই প্রথম দেখলাম। ধীরুকাকার পুরোনো সেক্রোলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো ওরই একটাতে চড়তে হত।

যেতে-যেতে ধীরুকাকা বললেন, 'এখানে না এলে কি বুঝতে পারতে শহরটা এত সুন্দর? আর কলকাতার মতো আবর্জনা কি দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটে? আর কত গাছ দেখো, আর কত ফুলের বাগান।'

বাবা আর ধীরুকাকা পিছনে বসেছিলেন, ফেলুদা আর আমি সামনে। আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরুকাকার ড্রাইভার দীনদয়াল সিং। ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ভুলভুলাইয়ার কথাটা জিগ্যেস কর।'

ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না। তাই বললাম, 'আচ্ছা ধীরুকাকা, ভুলভুলাইয়া কী জিনিস?'

ধীরুকাকা বললেন, 'দেখবে-দেখবে—সব দেখবে। ভুলভুলাইয়া হল ইমামবড়ার ভেতরে একটা গোলকধাঁধা। আমরা বাঙালিরা অবিশ্যি বলি ঘুলঘুলিয়া, কিন্তু আসল নাম ওই ভুলভুলাইয়া। নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন ওই গোলকধাঁধায়।'

এবার ফেলুদা নিজেই বলল, 'ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে নাকি আর বেরোনো যায় না?'

'তাই তো শুনিচি। একবার এক গোরাপল্টন—অনেকদিন আগে—মদটদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে। বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে—ও নিজেই বেরিয়ে আসবে। দু-দিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলকধাঁধার এক গলিতে।'

আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই টিপটিপ করতে শুরু করেছে।

ফেলুদাকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি একা গিয়েছিলে, না গাইড নিয়ে?'

'গাইড নিয়ে। তবে একাও যাওয়া যায়।'

'সত্যি?'

আমি তো অবাক। তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'কী করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা?'

ফেলুদা চোখটা ঢুলুঢুলু করে ঘাড়টা দু-বার নাড়িয়ে চুপ করে গেল। বুঝলাম ও আর কথা বলবে না। এখন ও শহরের পথঘাট, বাড়িঘর, লোকজন, এক্কা, টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে।

ধীরুকাকা কুড়ি বছর আগে লখ্‌নৌতে প্রথম আসেন উকিল হয়ে। সেই থেকে এখানেই আছেন, এবং এখন নাকি ওঁর বেশ নামডাক। কাকিমা তিনবছর হল মারা গেছেন, আর ধীরুকাকার ছেলে জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাড়িতে এখন উনি থাকেন, ওঁর বেয়ারা

BanglaBook.org

জগমোহন থাকে, আর রান্না করার বাবুর্চি আর একটা মালি। ওঁর বাড়িটা যেখানে সে জায়গাটার নাম সেকেন্দার বাগ, স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। বাড়ির সামনে গেটের ওপর লেখা—'ডি. কে. সান্যাল, এম. এ., বি. এল. বি., অ্যাডভোকেট'। গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর ঢালা রাস্তার পর একতলা বাড়ি, আর রাস্তার দু-দিকে বাগান। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন মালি 'লন মোয়ার' দিয়ে বাগানের ঘাস কাটছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা বললেন, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছ, আজ আর বেরিও না। কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা যাবে।' তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের ম্যাজিক শিখেছি। ফেলুদা বলে—'ইন্ডিয়ানদের আঙুল ইউরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। তাই হাতসাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ।'

বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউক্যালিপটাস গাছটার পাশে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি, তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। ফেলুদা না দেখেই বলল 'ফিয়াট'। তারপর রাস্তার পাথরের ওপর দিয়ে খচমচ-খচমচ করতে-করতে ছাই রঙের সুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন। চোখে চশমা, রং ফরসা আর মাথার চুলগুলো বেশিরভাগই সাদা। কিন্তু তাও দেখে বোঝা যায় যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয়।

ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন, 'জগমোহন, আউর এক কুরসি লাও,' তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—ইনি ডক্টর শ্রীবাস্তব, আমার বিশিষ্ট বন্ধু।'

আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'নার্ভাস হয়ে আছে। তোর বাবাকে নমস্কার করতে ভুলে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'শ্রীবাস্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ, আর একেবারে খাস লখ্‌নৌইয়া।'

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি?'

আমি বললাম, 'না।'

'হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার। অস্টিও আর অস্থি—মিলটা লক্ষ করিস। অস্থি মানে হাড় সেটা জানিস তো?'

'তা জানি।'

আরেকটা বেতের চেয়ার এসে পড়াতে আমরা সকলেই বসে পড়লাম। ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা তুলে আরেকটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন, এমনসময় বাবা একটু খুক-খুক করে কাশতে 'আই অ্যাম সো সরি' বলে রেখে দিলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'আজ যেন তোমায় একটু ইয়ে বলে মনে হচ্ছে। কোনও কঠিন কেসটেস দেখে এলে নাকি?'

বাবা বললেন, 'ধীরু, তুমি বাংলায় বলছ—উনি বাংলা বোঝেন বুঝি?'

ধীরুকাকা হেসে বললেন, 'ওরে বাবা, বোঝেন বলে বোঝেন। তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও না।'

শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, 'আমি বাংলা মোটামুটি জানি। ট্যাগোরও পড়েছি কিছু-কিছু।'

'বটে?'

'ইয়েস। গ্রেট পোয়েট।'

আমি মনে-মনে ভাবছি। এই বুঝি কবিতার আলোচনা শুরু হয়, এমনসময় কাঁপা হাতে তাঁরই জন্যে ঢালা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু আসিয়াছিল।'

BanglaBook.org

ডাকু? ডাকু আবার কে? আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা ছেলে আছে যার ডাকনাম ডাকু।

কিন্তু ধীরুকাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

'সেকী—ডাকাত তো মধ্যপ্রদেশেই আছে বলে জানতাম। লখ্‌নৌ শহরে আবার ডাকাত এল কোত্থেকে?'

'ডাকু বলুন, কি চোর বলুন। আমার অঙ্গুরির কথা তো আপনি জানেন মিস্টার সানিয়াল?'

'সেই পিয়ারিলালের দেওয়া আংটি? সেটা কি চুরি গেল নাকি?'

'না, না। লেকিন আমার বিশ্বাস কি, ওই আংটি নিতেই চোর আসিল।'

বাবা বললেন, 'কী আংটি?'

শ্রীবাস্তব ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনি বোলেন। উর্দুভাষা এঁরা বুঝবেন না আর অত কথা আমার বাংলায় হোবে না।'

ধীরুকাকা বললেন, 'পিয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখ্‌নৌ-এর নামকরা ধনী ব্যবসায়ী। জাতে গুজরাটি। এককালে কলকাতায় ছিলেন। তাই বাংলাও অল্প-অল্প জানতেন। ওর ছেলে মহাবীরের যখন বারো কি তেরো বছর বয়স, তখন তার একটি কঠিন হাড়ের ব্যারাম হয়। শ্রীবাস্তব তাকে ভালো করে দেন। পিয়ারিলালের স্ত্রী নেই, দুই ছেলের বড়টি টাইফয়েডে মারা যায়। তাই বুঝতেই পারছ, সবেধন নীলমণিটিকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীবাস্তবের ওপর পিয়ারিলালের মনে একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাই মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর একটা বহুমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান।'

বাবা বললেন, 'কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'লাস্ট জুলাই। তিনমাস হল। মে মাসে ফার্স্ট হার্ট অ্যাটাক হল। তাতেই প্রায় চলে গিয়েছিলেন। সেই টাইমে আংটি দিয়েছিলেন আমায়। দেবার পরে ভালো হয়ে উঠলেন। তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড অ্যাটাক হল। তখনও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিন দিনে চলে গেলেন।...এই দেখুন—'

শ্রীবাস্তব তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাই-এর বাক্সর চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বের করে ঢাকনাটা খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল।

তারপর শ্রীবাস্তব এদিক-ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে আলতো করে ধরে আংটিটা বের করলেন।

দেখলাম আংটিটার ওপরে ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনির সাইজের ঝলমলে পাথর—নিশ্চয়ই হিরে—আর তাকে ঘিরে লাল নীল সবুজ সব আরও অনেকগুলো ছোট-ছোট পাথর।

এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনওদিন দেখিনি।

ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো ইউকালিপটাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে পাকাচ্ছে, যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে।

বাবা বললেন, 'দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরোনো। এর কোনও ইতিহাস আছে নাকি?'

শ্রীবাস্তব একটু হেসে আংটিটা বাক্সে পুরে বাক্সটা পকেটে রেখে চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তা একটু আছে। এর বয়স তিনশো বছরের বেশি। এ আংটি ছিল আওরঙ্গজেবের।'

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী! আমাদের আওরঙ্গজেব বাদশা? শাজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেব?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'হাঁ—তবে আওরঙ্গজেব তখনও বাদশা বনেননি। গদিতে শাজাহান।

BanglaBook.org

সমরকন্দ দখল করবেন বলে ফৌজ পাঠাচ্ছেন বারবার—আর বারবার ডিফিট হচ্ছে। একবার আওরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল। আওরঙ্গজেব মার খেলেন খুব। হয়তো মরেই যেতেন। এক সেনাপতি সেভ করল। আওরঙ্গজেব নিজের হাত থেকে আংটি খুলিয়ে তাকে দিলেন।'

'বাবা! এ যে একেবারে গল্পের মতো।'

'হাঁ। আর পিয়ারিলাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেনাপতির এক বংশধরের কাছ থেকে আগ্রাতে। দাম কত ছিল তা পিয়ারিলাল বলেননি। তবে—দ্যাট বিগ স্টোন ইজ ডায়ামন্ড, আমি যাচাই করিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছেন কত দাম হোবে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কমপক্ষে লাখ দুয়েক। আওরঙ্গজেব না হয়ে যদি জাহান্নন খাঁ হত, তাহলেও লাখ দেড়েক হত নিশ্চয়ই।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'তাই তো বলছি—কালকের ঘটনার পর খুব আপসেট হয়েছি। আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি। আজ যদি পুলিশকে বলি, কাল আমি বাইরে গেলে রাস্তায় কেউ যদি ইট পাটকেল ছুঁড়িয়ে মারে? একবার ভেবেছিলাম কি কোনও ব্যাঙ্কে রেখিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম—এত সুন্দর জিনিস বন্ধুবান্ধুবকে দেখিয়েও আনন্দ। ওই জন্যেই তো রেখে দিলাম নিজের কাছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'অনেককে দেখিয়েছেন ও আংটি?'

'মাত্র তিনমাস হল তো পেলাম। আর আমার বাড়িতে খুব বেশি কেউ তো আসে না। যাঁরা এলেন—বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, তাঁদেরই দেখিয়েছি।'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ইউক্যালিপটাসের মাথায় একটু রোদ লেগে আছে, তাও বেশিক্ষণ থাকবে না। শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না।

ধীরুকাকা বললেন, 'চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার।'

আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে। ও সোফাতে বসেই পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের করে হাতসাফাই প্র্যাকটিস করতে লাগল।

বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু যখন বলেন তখন বেশ ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় বলেন। বাবা বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা এসেছিল? আপনার অন্য কোনও জিনিস চুরি যায়নি? এমনও তো হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর, টাকাকড়ি নিতেই এসেছিল?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ব্যাপার কী বলি। বনবিহারীবাবু আছেন বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর-টোর আসে না। আর আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আর তার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিলিমোরিয়া—বোথ ভেরি রিচ। আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। তাদের কাছে আমি কী? তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর?'

ধীরুকাকা বললেন, 'তারা যেমন ধনী, তেমনি তাদের পাহারার বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই খুব জমকালো। সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে কেন? তারা তো বিরাট ধনদৌলতের আশায় যাবে না। শ'পাঁচেক টাকা মারতে পারলে তাদের ছ'মাসের খোরাক হয়ে যায়। কাজেই আমার-আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। উনি বললেন, 'আমি জানি না মিস্টার সানিয়াল—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই আংটি নিতেই এসেছিল। আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি খুলেছিল। দেরাজ খুলেছিল। তাতে অন্য জিনিস ছিল। নিতে পারত। টাইম ছিল। আমার ঘুম ভাঙতে চোর পালিয়ে গেল, একেবারে কিচ্ছু না নিয়ে। আর, কথা কী জানেন?—'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন। তারপর ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'পিয়ারিলাল যখন

BanglaBook.org

আমাকে আংটি দিয়েছিলেন, তখন মনে হল কি—উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। তাই আমাকে দিয়ে দিলেন। আউর—'

শ্রীবাস্তব আবার থেমে ভ্রূকুটি করলেন।

ধীরুকাকা বললেন—'আউর কেয়া, ডক্টরজি?'

শ্রীবাস্তব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্বিতীয়বার যখন হার্ট অ্যাটাক হল, আর আমি ওঁকে দেখতে গেলাম, তখন উনি একটা কিছু আমাকে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তবে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।'

'কী কথা?'

'দু-বার বলেছিলেন—"এ স্পাই..." "এ স্পাই..."।'

ধীরুকাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

'না ডক্টরজি—পিয়ারিলাল যাই বলে থাকুক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চোর সাধারণ চোর, ছ্যাঁচড় চোর। আপনি বোধহয় জানেন না, ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্তিরের বাড়িতেও রিসেন্টলি চুরি হয়ে গেছে। একটা আস্ত রেডিও আর কিছু রুপোর বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। তবে আপনার যদি সত্যিই নার্ভাস লাগে, তাহলে আপনি ও আংটি স্বচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন। আমার গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা, তারপর আপনার ভয় কেটে গেলে পর আপনি ওটা ফেরত নিয়ে যাবেন।'

শ্রীবাস্তব হঠাৎ হাঁপ ছেড়ে একগাল হেসে ফেললেন।

'আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম, লেকিন নিজে থেকে বলতে পারছিলাম না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, মিস্টার সানিয়াল। আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।'

শ্রীবাস্তব তাঁর পকেট থেকে আংটি বের করে ধীরুকাকাকে দিলেন, আর ধীরুকাকা সেটা নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন।

এইবার ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল।

'বনবিহারীবাবু কে?'

'পার্ডন?' শ্রীবাস্তব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি বললেন না যে, বনবিহারীবাবু পাড়ায় আছেন বলে চোর-টোর আসে না—এই বনবিহারীবাবুটি কে? পুলিশ-টুলিশ নাকি?'

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ও নো নো। পুলিশ না। তবে পুলিশের বাড়া। ইন্টারেস্টিং লোক। আগে বাংলাদেশে জমিদারি ছিল। তারপর সেটা গেল—আর উনি একটা ব্যবসা শুরু করলেন। বিদেশে জানোয়ার চালান দেওয়ার ব্যবসা।'

'জানোয়ার?' বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হাঁ। টেলিভিশন, সার্কাস, চিড়িয়াখানা—এইসবের জন্য এদেশ থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এইসব জায়গায়। অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে। বনবিহারীবাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন। তারপর রিটায়ার করে এখানে চলে এলেন আজ দু-তিন বছর। আর আসার সময় সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন।'

বাবা বললেন, 'বলেন কি—ভারি অদ্ভুত তো।'

'হাঁ। আর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশালিটি হল কি, ওর প্রত্যেক জানোয়ার হল ভারি...ভারি...কী বলে—'

'হিংস্র?'

'হাঁ, হাঁ—হিংস্র।'

BanglaBook.org

লখ্‌নৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব ভালো। ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না। জাল দিয়ে ঘেরা দ্বীপের মতন তৈরি করা আছে, তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় আর গুহার মধ্যে থাকে ওরা। তার ওপর আবার এই প্রাইভেট চিড়িয়াখানা।

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওঁর কাছে। হাইনা আছে, কুমির আছে, স্করপিয়ন আছে। আওয়াজ শুনা যায়। চোর আসবে কী করিয়ে?'

এর পরে আমি যেটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা আমার আগেই সেটা জিগ্যেস করে ফেলল।

'চিড়িয়াখানাটা একবার দেখা যায় না?'

ধীরুকাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। যে-কোনও দিন গেলেই হল। উনি মানুষটি মোটেই হিংস্র নন।'

শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন। বললেন, 'লাটুশ রোডে আমার এক পেশেন্ট আছে। আমি চলি।'

আমরা সবাই শ্রীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম। ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ধীরুকাকাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। বাবা আর ধীরুকাকা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফেলুদা সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, এমনসময় হুশ করে একটা কালো গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল।

ফেলুদা বলল, 'স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। নম্বরটা মিস করে গেলাম।'

আমি বললাম, 'নম্বর দিয়ে কী হবে?'

'মনে হল শ্রীবাস্তবকে ফলো করছে। রাস্তায় ওদিকটা কেমন অন্ধকার দেখছিস? ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল। আমাদের গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্জ করল দেখলি না?'

এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল।

বাড়ির গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। আমার আন্দাজ আছে, কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্ড্রেড ইয়ার্ডস দৌড়েছি। ধীরুকাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। জানলা দিয়ে ভেতরের দরজাটাও দেখা যাচ্ছে। বাবা আর ধীরুকাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই জানালার দিকে দেখছে। ওর চোখে ভ্রূকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত।

'জানিস তোপ্‌সে—'

আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয়। ফেলুদা তপেশ থেকে তোপ্‌সে করে নিয়েছে।

আমি বললাম, 'কী?'

'আমি থাকতে এ ভুলটা হওয়ার কোনও মানে হয় না।'

'কী ভুল?'

'ওই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। গেট থেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইলেকট্রিক লাইট হলে তা ও বা কথা ছিল, কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন ফ্লুয়োরেসেন্ট।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস?'

'শুধু মাথাটা। উনি যে চেয়ারে বসে আছেন।'

'ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল?'

'ডক্টর শ্রীবাস্তব।'

'আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেওয়ার সময় উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে?'

BanglaBook.org

'এর মধ্যেই ভুলে যাব?'

'সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থেকে থাকলে তার পক্ষে ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয়।'

'এই রে! কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছ কেন?'

ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের ওপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা সিগারেটের টুকরো।

'মুখটা ভালো করে লক্ষ কর।'

আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম, আর রাস্তার ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেখবার সেটা দেখে নিলাম।

ফেলুদা হাত বাড়িয়েই সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল।

'কী দেখলি?'

'চারমিনার। আর যে লোকটা খাচ্ছিল, তার মুখে পান ছিল, তাই পানের দাগ লেগে আছে।'

'ভেরি গুড। চ' ভেতরে চ'।'

রাত্রে শোওয়ার আগে ফেলুদা ধীরুকাকার কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিল। ওর যে পাথর সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না। ল্যাম্পের আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতে লাগল—

'এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস, এগুলোকে বলে স্যাফায়ার, যার বাংলা নাম নীলকান্ত মণি। লালগুলো হচ্ছে চুনি অর্থাৎ রুবি, আর সবুজগুলো পান্না—এমারেল্ড। অন্যগুলো যতদূর মনে হচ্ছে পোখরাজ—যার ইংরেজি নাম টোপ্যাজ। তবে আসল দেখবার জিনিস হল মাঝখানের ওই হিরেটা। এমন হিরে হাতে ধরে দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না।'

তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলে পরে বলল, 'আওরঙ্গজেবের আঙুল আর আমার আঙুলের সাইজ মিলে যাচ্ছে, দেখেছিস।'

সত্যিই দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে।

ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফেলুদা বলল, 'কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ আংটির সঙ্গে কে জানে। তবে কী জানিস তোপ্‌সে—এর অতীতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। এটা আওরঙ্গজেবের ছিল কি আলতামসের ছিল কি আক্রম খাঁর ছিল, সেটা অ্যানিস্পরট্যান্ট। আমাদের জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কী, আর বর্তমানে কোনও বাবাজি সত্যি করেই এর পিছনে লেগেছেন কি না, আর যদি লেগে থাকেন তবে তিনি কে এবং তাঁর কেন এই দুঃসাহস।'

তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যা, ফেরত দিয়ে আয়। আর এসে জানালাগুলো খুলে দে।'

২

পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবড়া দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা আর ধীরুকাকা মোটরে গেলেন। গাড়িতে যদিও জায়গা ছিল তবু ফেলুদা আর আমি দুজনেই বললাম যে আমরা টাঙ্গায় যাব।

সে দারুণ মজা। কলকাতায় থেকে তো ঘোড়ার গাড়ি চড়াই হয় না। সত্যি বলতে কি, আমি কোনওদিনই কোনওরকম ঘোড়ার গাড়ি চড়িনি। ফেলুদা অবিশ্যি চড়েছে। ও বলল কলকাতার

BanglaBook.org

ঠিকা গাড়ির চেয়ে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয়, আর সেটা নাকি হজমের পক্ষে খুব ভালো।

'তোর কাকার বাবুর্চি যা ফার্স্ট ক্লাস রাঁধে, মনে হচ্ছে এখানে খাওয়ার ব্যাপারে হিসেব রাখাটা খুব মুশকিল হবে। কাজেই মাঝে মাঝে এই টাঙ্গা রাইডটার এমনিতেই দরকার হবে।'

নতুন শহরের রাস্তাঘাট দেখতে-দেখতে আর টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেতে-খেতে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম, গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করাতে ও বলল সেটার নাম কাইজার-বাগ। ফেলুদা বলল, 'জার্মান আর উর্দুতে কেমন মিলিয়েছে দেখছিস?'

BanglaBook.org

নবাবি আমলের যত প্রাসাদ-টাসাদ সব নাকি এই কাইজার-বাগের আশেপাশেই রয়েছে। গাড়োয়ান এদিকে-ওদিকে আঙুল দেখিয়ে সব নাম বলে দিতে লাগল।

'উয়ো দেখিয়ে বাদশা মনজিল...উয়ো হ্যায় চাঁদিওয়ালি বরাদরি...উসকো বোলতা লাখুফটক...'

কিছুদুর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে দিয়ে। গাড়োয়ান বলল, 'রুমি দরওয়াজা।'

রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই 'মচ্ছি ভওয়ন' আর মচ্ছি ভওয়নেই হল বড়া-ইমামবড়া।

ইমামবড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় প্রাসাদ যে হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না।

টাঙ্গা থেকেই ধীরুকাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাবা আর ধীরুকাকা একজন লম্বা মাঝবয়সি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ব্ল্যাক স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড।'

সত্যিই তো! ধীরুকাকার গাড়ির পাশে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'মাডগার্ডে একটা টাটকা ঘষটার দাগ দেখছিস?'

'টাটকা কী করে জানলে?'

'চুনের গুঁড়ো সব ঝরে পড়েনি এখনও—লেগে রয়েছে। রং-করা পাঁচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘষটে ছিল বোধহয়। আজ সকালে যদি গাড়ি ধোওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে ও দাগ কাল রাত্রে লেগে থাকতে পারে।'

ধীরুকাকা আমাদের দেখে বললেন, 'এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই বনবিহারীবাবু—যাঁর চিড়িয়াখানা আছে।'

আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম। ইনিই সেই লোক। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ফরসা রং, সরু গোঁফ, ছুঁচলো দাড়ি, চোখে সোনার চশমা। সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো।

আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ভদ্রলোক বললেন, 'লক্ষ্মণের রাজধানী কেমন লাগছে খোকা? জান তো, রামায়ণের যুগে লখ্‌নৌ ছিল লক্ষ্মণাবতী।'

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও দেখলাম বেশ মানানসই।

ধীরুকাকা বললেন, 'বনবিহারীবাবু চৌক-বাজারে যাচ্ছিলেন, আমাদের গাড়ি দেখে চলে এলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। দুপুরবেলাটা আমি বাইরে কাজ সারতে বেরোই। সকালসন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে অনেকটা সময় চলে যায়।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম দলেবলে একবার আপনার ওখানে ধাওয়া করব। এদের খুব শখ একবার আপনার চিড়িয়াখানাটা দেখার।'

'বেশ তো। এনি ডে। আজই আসুন না। আমি তো কেউ এলে খুশিই হই। তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না। তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত মজবুত নয়। তাই যদি হবে তো আমি আছি কী করে?'

একথায় ফেলুদা ছাড়া আমরা সকলেই হাসলাম। ফেলুদা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, 'জানোয়ারের গন্ধ ঢাকার জন্যে কষে আতর মেখেছে।'

স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারীবাবুর নয়, কারণ তিনি তার পাশের একটা নীল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেকে তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা ইমামবড়া দেখবেন তো? তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে।'

BanglaBook.org

ধীরুকাকা বললেন, 'তাহলে আপনিও ভেতরে আসছেন আমাদের সঙ্গে?'

'চলুন না। নবাবের কীর্তিটা দেখে নেওয়া যাবে। সেই সিক্সটিথ্রিতে গিয়েছিলাম লখ্‌নৌতে আসার দু-দিন বাদেই। তারপর আর যাওয়া হয়নি।'

গেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের ওপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বনবিহারী বললেন, 'দুশো বছর আগে নবাব আসাফ-উদ্‌-দৌল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদ। ভেবেছিলেন আগ্রা দিল্লিকে টেক্কা দেবেন। ভারতবর্ষের সেরা প্রাসাদ-করনে-ওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন। তারা সব নকশা পাঠাল। তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হল এই ইমামবড়া। বাহারের দিক দিয়ে মোগল প্রাসাদের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না, তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নাম্বার ওয়ান। এত বড় দরবার-ঘর পৃথিবীর কোনও প্রাসাদে নেই।'

দরবার-ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ঢুকে যায়। আর একটা কুয়ো দেখলাম, অত বড় কুয়ো আমি কখনও দেখিনি। গাইড বলল, অপরাধীদের ধরে-ধরে ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া। এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে, যতবারই এক-একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে ছিলাম সেখানেই আবার ফিরে এলাম। একটা গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই—দুদিকে দেওয়াল, মাথার ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি। গাইড বলল, নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, তখন ওই খুপরিগুলোতে পিদিম জ্বলত। রাত্তিরবেলা যে কী ভুতুড়ে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ফেলুদা যে কেন বারবার পিছিয়ে পড়ছিল, আর দেওয়ালের এত কাছ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না। আমিও গোলকধাঁধাটা দেখতে-দেখতে, আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবতে-ভাবতে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় খেয়ালই ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'আরে ফেলু কোথায় গেল?'

সত্যিই তো! পিছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল। তারপর 'ফেলু, ফেলু' বলে বাবা দু-বার ডাক দিতেই ও আমাদের পিছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকধাঁধার প্ল্যানটা ঠিক মাথায় তুলে নিতে পারব না।'

গোলকধাঁধার শেষ গলিটার শেষে যে দরজা আছে, সেটা দিয়ে বেরোলেই ইমামবড়ার বিরাট ছাদে গিয়ে পড়তে হয়। গিয়ে দেখি সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লখ্‌নৌ শহরটাকে দেখা যায়। আমরা ছাড়াও ছাদে কয়েকজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সি ভদ্রলোক ধীরুকাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন।

ধীরুকাকা বললেন, 'মহাবীর যে—কবে এলে?'

ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না, তবু তিনি বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তিন দিন হল। এই সময়টাতে আমি প্রতি বছরই আসি। দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই। এবারে দুজন বন্ধু আছেন, তাঁদের লখ্‌নৌ শহর দেখাচ্ছি।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ইনি পিয়ারিলালের ছেলে—বোম্বাইতে অভিনয় করছেন।'

মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কীরকম যেন অবাক হয়ে দেখছেন—যেন ওঁকে আগে দেখেছেন, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারছেন না।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কি?'

মহাবীর বলল, 'হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

BanglaBook.org

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তোমার স্বর্গত পিতার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমি তো তখন এখানে ছিলে না।'

মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, 'ও। তাহলে বোধহয় ভুল করছি। আচ্ছা, আসি তাহলে।'

মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়তো ফেলুদার চেয়েও কিছু কম—আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত। মনে হল নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন, কিংবা খেলাধূলা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে ভালোই হয়। জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই হয়, তাহলে আলো থাকতে-থাকতে দেখাই ভালো। খাঁচাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি।'

আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাদ থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে একদম নীচে নেমে এলাম।

গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে।

৩

বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল। বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই যে ভেতরে একটা চিড়িয়াখানা আছে, কারণ, যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায়।

'মিউটিনিরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সওদাগর এবাড়ি তৈরি করেছিলেন' বনবিহারীবাবু বললেন। 'আমি বাড়িটা কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে।'

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরানো। আর দেওয়ালের গায়ে যেসব কারুকার্য আছে তা থেকে নবাবদের কথাই মনে হয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনারা সবাই কফি খান তো? আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই।'

আমাকে বাড়িতে বেশি কফি খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার খেতে খুব ভালো লাগে, তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল। কিন্তু কফি পরে—আগে জানোয়ার দেখা।

বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পরেই প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাগানেই এদিকে ওদিকে রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা। বাগানের মাঝখানে ছুঁচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর। সেটায় একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটাকে বছর দশেক আগে মুঙ্গের থেকে এনেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। প্রথমে আমার কলকাতার বাড়ির চৌবাচ্চায় ছিল। একদিন দোর বেরিয়ে এসে একটা আস্ত বেড়ালছানা খেয়ে ফেলেছে।'

পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগুলোর দিকে গেছে। একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ শুনে আমরা কুমির ছেড়ে সেইদিকেই গেলাম।

গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের সাইজের বেড়াল, তার চোখ দুটো সবুজ আর জ্বলজ্বলে, আর গায়ের রং ডোরাকাটা খয়েরি। এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে করে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার বাসস্থান আফ্রিকা। এটা কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এ জিনিস আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেও নেই।'

BanglaBook.org

বেড়ালের পর হাইনা, হাইনার পর নেকড়ে, নেকড়ের পর আমেরিকান র‍্যাটল স্নেক। দারুণ বিষাক্ত সাপ। একরকম সরু ছুঁচলো শামুক পুরী থেকে আমরা অনেকবার এনেছি; এই সাপের ল্যাজের ডগায় সেইরকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে। সাপটা এদিক-ওদিক চলার সময় ল্যাজটাকে কাঁপায়, আর তাতে ওই জিনিসটা মাটিতে লেগে একটু ঝুমঝুমির মতো করকর-করকর শব্দ হয়। আমেরিকার জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই এরকম শব্দ শুনতে পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র‍্যাটল স্নেক ঘোরাফেরা করছে।

BanglaBook.org

• আরও দুটো জিনিস দেখে ভয়ে গা শিউরে উঠল। একটা কাচের বাক্সর মধ্যে দেখলাম নীল রঙের বিশ্রী বিরাট এক কাঁকড়া বিছে। এটাও আমেরিকার বাসিন্দা। এর নাম ব্লু স্করপিয়ন। আর আরেকটা কাচের বাক্সে দেখলাম, একটা মানুষের আঙুল ফাঁক করা হাতের মতো বড় কালো রোঁয়াওয়ালা মাকড়সা—আফ্রিকার বিষাক্ত 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সা।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই বিছে আর মাকড়সা—ওই দুটোরই বিষ হল যাকে বলে নিউরোটক্সিক। অর্থাৎ এক কামড়ে একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই।'

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানায় এলাম। আমরা সোফায় বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারীবাবু বললেন, 'রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে-মাঝে আমার বাগান থেকে বনবেড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁসানি, হাইনার হাসি, নেকড়ের খ্যাঁকরানি আর র‍্যাটল স্নেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই। তাতে ঘুমটা হয় বড় আরামের। এরকম বডিগার্ডের সম্ভার আর ক'জনের আছে বলুন! অবিশ্যি চোর এলে এরা খুব হেলপ করতে পারে না বটে, কারণ এরা খাঁচায় বন্দি। তার জন্যে আমার আলাদা ব্যবস্থা আছে।—বাদশা!'

হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট কালো হাউন্ড কুকুর। এটাকেই নাকি বনবিহারীবাবু পাহারার জন্য রেখেছেন। শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয়—চিড়িয়াখানারও কোনও অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না।

ফেলুদা আমার পাশেই বসেছিল। কুকুরটা দেখে আমার কানে ফিস-ফিস করে বলল, 'ল্যাব্রেডর হাউন্ড। বাস্করভিলের কুকুরের জাত।'

বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'আচ্ছা, সত্যিই আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভালো লাগে?'

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে বললেন, 'কেন লাগবে না বলুন? ভয়টা কিসের? এককালে কত বাঘ ভালুক মেরেছি জানেন? ওয়াইল্ড অ্যানিমাল ছাড়া মারতুম না। অব্যর্থ টিপ ছিল। একবার কী যে ভীমরতি ধরল। চাঁদার জঙ্গলে এক মার্কিন সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম। আর তারপর সে কী অনুতাপ! সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে পারব না, তাই চালান দেওয়ার ব্যবসা ধরলুম। ব্যবসা যখন ছাড়লুম, তখন বাধ্য হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম। এদের নিয়ে বাস করার কী আনন্দ জানেন? এরা যে হিংস্র ও বিষাক্ত, সেটা সকলেরই জানা। এরা তো নিরীহ ভালোমানুষ বলে চালাতে চাইছে না নিজেদের। অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন—একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল। অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার জো আছে? তাই স্থির করেছি জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি জীবনটা কাটাব—তাতে শান্তি অনেক বেশি। আমি মশাই সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ করছি—তাতে কে কী ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? তবে শুনিচি আমার এ চিড়িয়াখানার দৌলতে পাড়ায় নাকি চুরি-চামারি বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে বলতে হয় অজান্তে আমি লোকের উপকারই করেছি!'

এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরুকাকার দিকে তারপর ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কি তাহলে শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঘটনাটা জানেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কারণ বনবিহারীবাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীবাস্তব এসে হাজির হলেন।

সকলকে নমস্কার-টমস্কার করে ধীরুকাকাকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির কাছেই কেলভিন রোডে একটি ছেলে গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে। তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনারা ফেরেননি। তাই এখানে চলে এলাম।'

BanglaBook.org

ধীরুকাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আংটি ঠিকই আছে।

বনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখলাম শ্রীবাস্তবের যথেষ্ট আলাপ। ছোট শহরে পাড়ার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধহয় সহজেই হয়।

শ্রীবাস্তব ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বনবিহারীবাবু, আপনার পাহারাদারেরা কিন্তু আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে।'

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কীরকম?'

'কাল আমার বাড়িতে চোর এল, আর আপনাব একভি জানোয়ার কিছু সাড়াশব্দ করল না।'

'সে কী? চোর? আপনার বাড়িতে? কখন?'

'রাত তিনটের কাছাকাছি। নেয়নি কিছুই। ঘুমটা ভেঙে গেল আমার, তাই পালিয়ে গেল।'

'না নিলেও—খুব এক্সপার্ট বলতে হবে। আমার "বাদশা" অন্তত খুবই সজাগ। দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি—আর চোর এলেও আমার কম্পাউন্ডের পিছন দিয়েই তাকে যেতে হবে।'

'যাক গে। আপনাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম।'

কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল প্লেটে। শ্রীবাস্তব বললেন সেটার নাম সান্ডিলা লাড্ডু।

সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি, আর ভুনা পেঁড়া—এই তিন মিষ্টি হল লখ্‌নৌয়ের স্পেশালিটি।'

আমার নিজের মিষ্টি জিনিসটা খুব ভালো লাগে না, তাই আমি ওসব কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারীবাবুকে লক্ষ করছিলাম। ওঁকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। ফেলুদা কিন্তু দেখি এর মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে, আমার কফির পেয়ালার ওপর মাছি তাড়াবার মতো করে হাত নাড়িয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো?'

শ্রীবাস্তবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন—'ও বাবা—আপনার দেখি মনে আছে।'

বনবিহারীবাবু পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মনে থাকবে না! আমার যদিও ওসব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তবুও ওরকম আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আংটি ঠিকই আছে। ওর ভ্যালু আমার জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি—আমার বেড়ালের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

একথার পর আর থাকা যায় না—তাই আমরাও উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বনবিহারীবাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। তার যে দারুণ মাসল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায়। শুনলাম তাঁর নাম নাকি গণেশ গুহ। বনবিহারীবাবুর যখন জানোয়ার চালান দেওয়ার কারবার ছিল তখন থেকেই নাকি ইনি আছেন, এখন নাকি চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা মেনটেন করা হত না। ওর ভয় বলে কোনও বস্তুই নেই। একবার ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্ত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি।'

BanglaBook.org

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারীবাবু বললেন, 'আপনার আসাতে খুব ভালো লাগল। মাঝে-মাঝে এসে পড়বেন না হয়। এখন এখানেই আছেন তো?'

বাবা বললেন, 'ক'দিন আছি। তারপর ভাবছি এদের একবার হরিদ্বারটা দেখিয়ে আনব।'

'বটে? লছমনঝুলা থেকে একটা বারো ফুট পাইথনের খবর এসেছে। আমিও তাই একবার ওদিকটায় যাব-যাব করছিলাম।'

শ্রীবাস্তবকে আমরা ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময় বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম।

ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল, 'হাইনা।'

বাপরে!—একেই বলে হাইনার হাসি।

শ্রীবাস্তব বললেন তাঁর নাকি প্রথম প্রথম এই হাসি শুনে গা ছমছম করত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

'আপনার বাড়িতে কাল আর কোনও উপদ্রব হয়নি তো?' ধীরুকাকা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'নো, নো। নাথিং।'

আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক ঢোলের শব্দ আসছে। ধীরুকাকা বললেন, 'দেওয়ালির সময় এখানে রামলীলা হয়। এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'রামলীলা কীরকম?'

প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভেতর বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দুজন ছেলেকে মেকআপ-টেকআপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায়। তারা রথে চড়ে এসে তীর দিয়ে রাবণের দিকে তাক করে মারে—আর সেইসঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই চরকি বংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে একটা দেখবার জিনিস।'

বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল। তারপর বলল, 'আউর এক সাধুবাবা ভি আয়া থা। আধঘন্টা বইঠকে চলা গিয়া।'

'সাধুবাবা?'

ধীরুকাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনও সাধুবাবাকে এক্সপেক্ট করছিলেন না।

'কোথায় বসেছিলেন?'

বেয়ারা বলল, 'বৈঠকখানায়।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম করেছিলেন?'

বেয়ারা তাতেও বলল হ্যাঁ।

'তাজ্জব ব্যাপার।'

হঠাৎ কী মনে করে ধীরুকাকা ঝড়ের মতো শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর গোদরেজ আলমারি খোলার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই শুনলাম ধীরুকাকার চিৎকার—

'সর্বনাশ!'

বাবা, আমি আর ফেলুদা প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরুকাকার ঘরে ঢুকলাম।

গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কৌটোর ঢাকনা খোলা, আর তার ভেতরে আংটি নেই।

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ করে তাঁর খাটের ওপর বসে পড়লেন।

BanglaBook.org

৪

পরদিন সকালে মনে হল যে শীতটা একটু বেড়েছে, তাই বাবা বললেন গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে নিতে। বাবার কপালে ভ্রুকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি খুব ভাবছেন। ধীরুকাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন—আর কাউকে কিছু বলেও যাননি। কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল বলছেন—শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাব কী করে? বাবা অবিশ্যি অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। 'বিকেল বেলা সন্ন্যাসী সেজে চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটি নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে কী করে। তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও। তুমি তো বলছিলে ইন্সপেক্টর গরগরির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ আছে।' এও হতে পারে যে ধীরুকাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই বেরিয়েছেন।

সকালে যখন চা আর জ্যাম-রুটি খাচ্ছি, তখন বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডেন্সিটা দেখিয়ে আনব, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক। তোরা দুজনে বরং কোথাও ঘুরে আসিস কাছাকাছির মধ্যে।'

কথাটা শুনে আমার একটু হাসিই পেয়ে গেল, কারণ ফেলুদা বলছিল ওর একটু পায়ে হেঁটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে, আর আমিও মনে-মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব। আমি জানতাম শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি সন্ধেবেলা থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে-মাঝে কেমন জানি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি—বকবক করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে দেব। বোকা সেজে থাকবি, আর পাশে-পাশে হাঁটবি।'

'কিন্তু ধীরুকাকা যদি পুলিশে খবর দেন?'

'তাতে কী হল?'

'ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে?'

'তাতে আর কী? নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলব।'

ধীরুকাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড। বেশ নির্জন রাস্তাটা। দুদিকে গেট আর বাগানওয়ালা বাড়ি, তাতে শুধু যে বাঙালিরা থাকে তা নয়। ফ্রেজার রোডটা গিয়ে পড়েছে ডাপলিং রোডে। লখ্‌নৌতে একটা সুবিধে আছে—রাস্তার নামগুলো বেশ বড়-বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। কলকাতার মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না।

ডাপলিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে, সেই মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে-দুলতে সেটার সামনে গিয়ে বলল, 'মিঠা পান হ্যায়?'

'মিঠা পান? নেহি, বাবুজি। লেকিন মিঠা মাসাল্লা দেকে বানা দেনে সেকতা।'

'তাই দিজিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাংলা দেশ ছাড়লেই এই একটা প্রবলেম।'

পানটা কিনে মুখে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আমি এ-শহরে নতুন লোক। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে পারো?'

ফেলুদা অবিশ্যি হিন্দিতে প্রশ্ন করছিল, আর লোকটাও হিন্দিতে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি।

দোকানদার বলল, 'রামকিষণ মিসির?'

'রামকৃষ্ণ মিশন। শহরে একজন বড় সাধুবাবা এসেছেন, আমি তাঁর খোঁজ করছি। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন।'

দোকানদার মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কী জানি বলে বিড়ি বাঁধতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু

BanglaBook.org

দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় একটা ইয়াবড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরোনো মরচেধরা বিস্কুটের টিন বাজিয়ে গান করছিল, সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিগ্যেস করল, 'কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পরা সাধু কি? তাই যদি হয় তাহলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে দিয়েছিলাম।'

'কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড?'

BanglaBook.org

'এখান থেকে পাঁচমিনিট। ওই দিকে প্রথম চৌমাথাটায় গেলেই সার-সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন।'

'শুক্রিয়া।'

শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম। ফেলুদা বলল ওটা হল উর্দুতে থ্যাঙ্ক ইউ।

টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌঁছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিগ্যেস করার পর আট বারের বার সাতান্ন নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে, গতকাল সন্ধ্যায় একজন গেরুয়াপরা দাড়িগোঁফওয়ালা লোক তার গাড়ি ভাড়া করেছিল বটে।

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে সাধুবাবাকে?'—ফেলুদা প্রশ্ন করল।

গাড়োয়ান বলল, 'ইস্টিশান।'

'স্টেশন?'

'হাঁ।'

'কত ভাড়া এখান থেকে?'

'বারো আনা।'

'কত টাইম লাগবে পৌঁছুতে?'

'দশ মিনিটের মতো।'

'চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌঁছে দেবে?'

'টিরেন পাকাড়না হ্যায় কেয়া?'

'টিরেন বলে টিরেন! বড়িয়া টিরেন—বাদশাহী এক্সপ্রেস!'

গাড়োয়ান একটু বোকার মতো হেসে বলল, 'চলিয়ে—আট মিনিটমে পৌঁছা দেঙ্গে!'

গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলাম, 'সেই সাধুবাবা কি এখনও বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে?'

এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কটমট করে চাইল যে আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করল, 'সাধুবাবার সঙ্গে কোনও মালপত্তর ছিল কি?'

গাড়োয়ান একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'মনে হয় একটা বাক্স ছিল। তবে, বড় নয়, ছোট।'

'হুঁ।'

স্টেশনে পৌঁছে টিকিট ঘরের লোক, গেটের চেকার, কুলি-টুলি এদের কাউকে জিগ্যেস করে কোনও ফল হল না। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাঙালি; তিনি বললেন, 'আপনি কি পরিত্রানন্দ ঠাকরের কথা বলছেন? যিনি দেরাদুনে থাকেন? তিনি তো তিনদিন হল সবে এসেছেন। তাঁর তো এখনও ফিরে যাওয়ার সময় হয়নি। আর তাঁর সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা!'

সবশেষে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের যে দারোয়ান, তাকে জিগ্যেস করতে সে বলল, একজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল বটে।

'ওয়েটিংরুমে বসেছিলেন?'

'আজ্ঞে না। বসেননি।'

'তবে?'

'বাথরুমে ঢুকেছিলেন। হাতে একটা ছোট বাক্স ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর তো জানি না।'

'সে কী? বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখনি?'

BanglaBook.org

'দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি এখানেই ছিলে তো?'

'তা তো থাকবই। ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন। ঘরে অনেক লোক যে।'

'তাহলে হয়তো খেয়াল করনি। এমনও হতে পারে তো?'

'তা পারে।'

কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল যে, সে বলতে চায় যে সাধুবাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কিন্তু তাহলে সে সাধুবাবা গেলেন কোথায়?

স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন, আর তারই একটাতে আমরা উঠে পড়লাম। টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না, কারণ সাতান্ন নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল।

এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পরে আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল—

'সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিশ করে গেল?'

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক করে খানিকটা পানের পিক রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল, 'তা হতে পারে। আগেকার দিনে তো সাধুসন্ন্যাসীদের ভ্যানিশ-ট্যানিস করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি।'

বুঝলাম ফেলুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না, যদিও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের আওয়াজ পেলাম। ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর-ভোঁপ্পর ভোঁপ্পর..আওয়াজটা এগিয়ে আসছে।

তারপর দেখলাম আমাদের মতো একটা টাঙ্গা, কিন্তু সেটার গায়ে কাগজের ফুল, বেলুন, ফ্ল্যাগ—এইসব দিয়ে খুব সাজানো হয়েছে। বাজনাটা বাজছে একটা লাউডস্পিকারে, আর-একটা রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভেতর থেকে গোছা-গোছা করে কী একটা ছাপানো কাগজ রাস্তার লোকের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন।'

সত্যিই তাই। গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রঙচঙে ছবি আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেলাম। ছবির নাম 'ডাকু মনসুর।'

হ্যান্ডবিলের দু-একটা আমাদের গাড়ির ভেতর এসে পড়ল, আর ঠিক সেই সময় একটা দলাপাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির মধ্যে এসে ফেলুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ির মেঝেতে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটাকে দেখেছি ফেলুদা। রাবলিওয়ালার পোশাক, কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হল না। ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে নিয়ে একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাঁইপাঁই করে যে দিকে লোকটাকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে ছুটে গেল। ভিড়ের মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে একটা মানুষ কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম দেখলাম।

এর মধ্যে অবিশ্যি টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে। আমি আর কী করব? অপেক্ষা করে রয়েছি। ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে, তবে রাস্তায় কতকগুলো বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে এখনও হ্যান্ডবিল কুড়োচ্ছে। এমন সময় হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ করে সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল, 'নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো জানা নেই, তাই বাবাজি রক্ষে পেয়ে গেলেন।'

BanglaBook.org

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি লোকটাকে দেখেছিলে?'

'তুই দেখলি, আর আমি দেখব না?'

আমি আর কিছু বললাম না। ফেলুদা লোকটাকে না দেখে থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার গায়ে কাবলিওয়ালার পোশাক ছিল, কিন্তু অত কম লম্বা কাবলিওয়ালা আমি কখনও দেখিনি।

ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজটা খুলে হাত দিয়ে ঘষে সমান করে, চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে লেখাটা ছিল সেটা পড়ে ফেলল। তারপর সেটাকে তিনভাঁজ করে ওর মানিব্যাগের ভেতর নিয়ে নিল। লেখাটা যে কী ছিল সেটা আর আমার জিগ্যেস করার সাহস হল না।

বাড়ি ফিরে দেখি ধীরুকাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন। শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হল না যে আংটিটা যাওয়াতে তাঁর খুব একটা দুঃখ হয়েছে। তিনি বললেন, 'উ আংটি ছিল অপয়া। যার কাছে যাবে তাবই দুশ্চিন্তা হোবে, বিপদ হোবে, বাড়িতে ডাকু আসবে। আপনি তো লাকি, ধীরুবাবু। ধরুন যদি ডাকু এসে ঝামেলা করত, গোলাগোলি চালাত!'

ধীরুকাকা একটু হেসে বললেন, 'তাহলে তবু একটা মানে হত। এ যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে চলে গেল। এটা যেন কিছুতেই হজম করতে পাবছি না।'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'আপনি কেন ভাবছেন ধীরুবাবু। আংটি আমার কাছে থাকলেও যেত, আপনার কাছে থাকলেও যেত। আর আপনি যে বলেছিলেন পুলিশে খবর দেবেন—তাও করবেন না। ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে। যারা চুরি করল, তারা ক্ষেপে গিয়ে ফির আপনাদের উপর হামলা করবে।'

ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা 'লাইফ' ম্যাগাজিন দেখছিল, এবাব সেটাকে বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে সোফার মাথাব পিছনে এলিয়ে দিযে বলল, 'মহাবীরবাবু জানেন এ আংটির কথা?'

'পিয়ারিলালের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো আমি জানি না ঠিক। মহাবীর ডুন স্কুলে পড়ত, ওখানেই থাকত। তারপর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে জয়েন করেছিল। তারপর সেটা ছেড়ে দিল, বোম্বাই গিয়ে ফিল্মে অ্যাকটিং শুরু করল।'

'উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে পিয়ারিলালের মত ছিল?'

'সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি পিয়ারিলাল। তবে জানি উনি ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন।'

'পিয়ারিলাল মারা যাওয়ার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন?'

'না। বোম্বাই ছিল। খবর পেয়ে এসে গেল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'ফেলুবাবু যে একেবারে পুলিশের মতো জেরা করছ।'

বাবা বললেন, 'ও যে শখের ডিটেকটিভ। ওর ওদিকে রেখে ইয়ে আছে।'

শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ—ভেরি গুড, ভেরি গুড!'

কেবল ধীরুকাকাই যেন একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'খোদ ডিটেকটিভের বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল, এইটেই যা আপসোস।'

ফেলুদা এসব কথাবার্তায় কোনও মন্তব্য না করে শ্রীবাস্তবকে আরেকটা প্রশ্ন করল, 'মহাবীরবাবুর ফিল্মে অ্যাকটিং করে ভালো রোজগার হচ্ছে কি?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'সেটা ঠিক জানি না। মাত্র দু-বছর তো হল?'

'ওঁর এমনিতে টাকার কোনও অভাব আছে?'

BanglaBook.org

'নাঃ। কারণ, পিয়ারিলাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। সিনেমাটা ওর শখের ব্যাপার।'

'হুঁ'—বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল।

শ্রীবাস্তব হঠাৎ তাঁর রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমার পেশেন্টের কথাই ভুলে গেছি। আমি চলি!'

শ্রীবাস্তবকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর ধীরুকাকা বাইরে গেলে পর ফেলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই তুলে বলল, 'তোর চাঁদে যেতে ইচ্ছে করে, না মঙ্গল গ্রহে?'

আমি বললাম, 'আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে করছে।'

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, 'লাইফে চাঁদের সাবফেসের ছবি দিয়েছে। দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে না। মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতূহল হয়।'

আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, 'ফেলুদা, আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমার মানিব্যাগে যে কাগজটা আছে সেইটে দেখার জন্যে।'

'ওঃ—ওইটে!'

'ওটা দেখাবে না বুঝি?'

'ওটা উর্দুতে লেখা।'

'তবু দেখি না।'

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বের করে সেটা দু-আঙুলের ফাঁকে ধরে ক্যারামের গুটির মতো করে আমার দিকে ছুড়ে দিল। খুলে দেখি সেটায় লেখা আছে—'খুব হুঁশিয়ার!'

আমি বললাম, 'তবে যে বললে উর্দু?'

'বোকচন্দর—"খুব" আর "হুঁশিয়ার"—এই দুটো কথাই যে উর্দু সেটাও বুঝি তোর জানা নেই?'

সত্যিই তো! মনে পড়ল একবার বাবা বলেছিলেন, যে-কোনও বাংলা উপন্যাস নিয়ে তার যে-কোনও একটা পাতা খুলে পড়ে দেখ, দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উর্দু, নয় ফারসি, না হয় ইংরেজি—, না হয় পর্তুগিজ, না হয় অন্য কিছু। এসব কথা বাংলায় এমন চলে গেছে যে, আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে বাংলা নয়।

আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাজ করেই ফেলুদা বলল, 'একটা সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন খয়ের মেশানো লাল রস চুঁইয়ে পড়ে দেখেছিস? এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে লেখা।'

আমি লেখাটা নাকের কাছে আনতেই পানের গন্ধ পেলাম।

'কিন্তু কে লিখেছে বল তো?'

'জানি না।'

'লোকটা বাঙালি তো বটেই?'

'জানি না।'

'কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে? তুমি তো আর আংটি চুরি করনি।'

ফেলুদা হো-হো করে হেসে বলল, 'হুমকি জিনিসটা কি আর চোরকে দেয় রে বোকা? ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে। অর্থাৎ ডিটেকটিভকে। তাই এসব কাজে নামতে হলে ডিটেকটিভের একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয়।'

আমার বুকের ভেতরটা টিপ-টিপ করে উঠল, আর বুঝতে পারলাম যে গলাটা কেমন জানি

BanglaBook.org

শুকিয়ে আসছে। কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'তাহলে এবার থেকে সত্যিই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত।'

'হুঁশিয়ার হইনি সে কথা তোকে কে বললে?'—এই বলে ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের সামনে ধরল। দেখলাম বাক্সটার ঢাকনায় লেখা রয়েছে—'দশংসংস্কারচূর্ণ।'

ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন। তাই আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'দাঁতের মাজন দিয়ে কী করে হুঁশিয়ার হবে ফেলুদা?'

'তোর যেমন বুদ্ধি!—দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন?'

'তবে ওটায় কী আছে?'

চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আব নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'চূর্ণীকৃত ব্রহ্মাস্ত্র!'

৫

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'তোপ্‌সে, কী মনে হচ্ছে বল তো?'

আমি বললাম, 'কীসের কী মনে হচ্ছে?'

'এই যেসব ঘটনা ঘটছে-টটছে।'

'বারে বা, সে তো তুমি বলবে। আমি আবার কী করে বলব? আমি কি ডিটেকটিভ নাকি? আব সন্ন্যাসীটা কে, সেটা না জানা অবধি তো কিছুই বোঝা যাবে না।'

'কিন্তু কিছু-কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে। যেমন, সন্ন্যাসীটা বাথরুমে ঢুকে আর বেরোল না। এটা তো খুব রিভিলিং।'

'রিভিলিং মানে?'

'রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়।'

'এখানে কী বোঝা যাচ্ছে?'

'তুই নিজে বুঝতে পারছিস না?'

'আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েটিংরুমের দারোয়ানটা অন্যমনস্ক ছিল।'

'তোর মুন্ডু।'

'তবে?'

'সন্ন্যাসী বেরোলে নিশ্চয় দারোয়ানের চোখে পড়ত।'

'তাহলে? সন্ন্যাসী বেরোয়নি?'

'সন্ন্যাসীর হাতে কী ছিল মনে আছে?'

'আমি তো আর.. ও হ্যাঁ-হ্যাঁ--অ্যাটাচি কেস।'

'সন্ন্যাসীর হাতে অ্যাটাচি কেস দেখেছিস কখনও?'

'তা দেখিনি।'

'সেই তো বলছি। ওটা থেকেই সন্দেহ হয়।'

'কী সন্দেহ হয়?'

'যে, সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসী নন। উনি প্যান্ট শার্ট কি ধুতি পাঞ্জাবি পরা আমাদের মতো অ-সন্ন্যাসী, আর সেই পোশাক ছিল ওই অ্যাটাচি কেসে। গেরুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ। খুব সম্ভবত দাড়ি-গোঁফটাও।'

BanglaBook.org

'বুঝেছি। সেগুলো ও বাক্সে পুরে নিয়েছে, আর অন্য পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে। তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি।'

'গুড। এইবার মাথা খুলেছে।'

'কিন্তু আজ সকালে তাহলে কে তোমার পথে কাগজ ছুঁড়ে মারল?'

'হয় ও নিজেই, না হয় ওর কোনও লোক। স্টেশনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। আমি যে একে-তাকে সন্ন্যাসীর কথা জিগ্যেস করছি, সেটা ও শুনেছিল—আর তাই হুমকি দিয়ে গেল।'

BanglaBook.org

'বুঝেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও রহস্য আছে কি?'

'বাবা, বলিস কী! রহস্যের কোনও শেষ আছে নাকি? শ্রীবাস্তবকে স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে কে ফলো করল? সেও কি ওই সন্ন্যাসী, না অন্য কেউ? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারমিনার আর পান খেতে-খেতে কে ওয়াচ করছিল? পিয়ারিলাল কোন "স্পাই"-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? বনবিহারীবাবু হিংস্র জানোয়ার পোষেন কেন? পিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারীবাবুকে আগে কোথায় দেখেছে? সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে?'...

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এইসব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম। ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল। তারপর সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই জোরে-জোরে নিশ্বাস। বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম—হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল।

বনবিহারীবাবু যে হিংস্র জানোয়ার পোষেন, তাতে ফেলুদার আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? সব সময় কি সব জিনিসের পিছনে লুকোনো কারণ থাকে? অনেকরকম অদ্ভুত-অদ্ভুত শখের কথা তো শুনতে পাওয়া যায়। বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানাও হয়তো সেইরকমই একটা অদ্ভুত শখের নমুনা।

এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর কখন যে আবার ঘুমটা ভেঙে গেছে তা জানি না। জাগতেই মনে হল চারিদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। ঢাকের বাজনা থেমে গেছে, কুকুর শেয়াল কিচ্ছু ডাকছে না। খালি ফেলুদার জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ, আর মাথার পিছনে টেবিলের ওপব রাখা টাইম পিসটার টিকটিক শব্দ। আমার চোখটা পায়ের দিকের জানালায় চলে গেল।

জানালা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা দেখা যায়। আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা। একটা অন্ধকার মতো কী যেন জানালার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষ। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভেতর দেখছে।

যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক, তবু লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। আকাশে তারা অল্প-অল্প থাকলেও ঘরের ভেতর আলো নেই, তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে তার মুখের নীচের দিকটা—মানে নাক থেকে থুতনি অবধি—একটা কালো কাপড়ে ঢাকা!

এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভেতর হাত ঢুকিয়েছে, তবে শুধু হাত নয়, হাতে একটা লম্বা ডান্ডার মতো জিনিস রয়েছে।

একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এল। একে ভয়েতেই প্রায় দম-বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন হাত-পাও কীরকম যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল।

আমার মনে যত জোর আছে, সবটা একসঙ্গে করে, শরীরটা প্রায় একদম না নাড়িয়ে, আমার বাঁ-হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম।

আমার চোখ কিন্তু জানালার দিকে। লোকটা এখনও হাতটা বাড়িয়ে রয়েছে, গন্ধটা বেড়ে চলেছে, আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে।

আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল। আমি একটা ঠেলা দিলাম। ফেলুদা একটু নড়ে উঠল। নড়তেই ক্যাঁচ করে খাটের একটা শব্দ হল। আর সেই শব্দ হতেই জানালার লোকটা হাওয়া।

ফেলুদা ঘুমো-ঘুমো গলায় বলল, 'খোঁচা মারছিস কেন?'

BanglaBook.org

আমি শুকনো গলায় কোনওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'জানালায়।'

'কে জানালায়? ইস—গন্ধ কীসের?'—বলেই ফেলুদা একলাফে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল, 'কী দেখলি ঠিক করে বল তো।'

আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি। কোনওমতে বললাম, 'একটা লোক...হাতে ডান্ডা...ঘরের ভেতর—'

'হাত বাড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি। লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্ম ছিল। আমাদের অজ্ঞান করবার তালে ছিল।'

'কেন?'

'বোধহয় আরেক আংটি-চোর। ভাবছে এখনও আংটি এখানেই আছে। যাকগে—তুই এ ব্যাপারটা আর বাবা-কাকাকে বলিস না। মিথ্যে নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে আমার কাজটাই ভেস্তে দেবে।'

পরদিন সকালে বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই বললেন যে আর বিশেষ কোনও গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আংটি উদ্ধারের ভার পুলিশের ওপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্সপেক্টর গরগরি কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার ওপর টেক্কা দেওয়া হবে, আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে, এই ভেবে আমি মনে-মনে প্রার্থনা করলাম পুলিশ যেন কোনওমতেই আংটি খুঁজে না পায়। সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয়।

বাবা বললেন, 'আজ তোদের আরও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে আনব ভাবছি।'

ঠিক হল দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো হবে। কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু।

আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, এমনসময় বনবিহারীবাবু এসে হাজির। বললেন, 'আপনাদের বাড়িতে দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে চলে এলাম। একটা ভালো দেখে হাউন্ড পুষলে এ-কেলেঙ্কারি হত না। সাধুবাবার উদ্দেশ্য সাধু না অসাধু, সেটা বুঝতে একটা ওয়েল-ট্রেনড জেন্তো হাউন্ডের লাগত ঠিক পাঁচ সেকেন্ড। যাক, চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে বলুন।'

বনবিহারীবাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন। বললেন, 'লখনৌ শহরের বেস্ট পান। খেয়ে দেখুন। এক বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এ জিনিস।'

আমি মনে-মনে ভাবছি, বনবিহারীবাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে আমাদের বাইরে যাওয়া ভেস্তে যাবে, এমনসময় উনি নিজেই বললেন, 'বাড়িতে থাকছেন, না বেরোচ্ছেন?'

বাবা বললেন, 'ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে আনব। ইমামবড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনও।'

'রেসিডেন্সি দেখনি এখনও?' প্রশ্নটা আমাকেই করলেন ভদ্রলোক। আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'চলো—আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে।'

তারপর ধীরুকাকার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কেবল একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। আংটিটা কোত্থেকে গেল। সিন্দুকে রেখেছিলেন কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'সিন্দুক আমার নেই। একটা গোদরেজের আলমারি খুলে নিয়ে গেছে। চাবি অবিশ্যি আমার পকেটেই ছিল। বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে।'

BanglaBook.org

'শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! বাক্স দেরাজে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'দেরাজ ভালো করে খুঁজে দেখেছেন তো?'

'তন্নতন্ন করে।'

'কিন্তু একটা জিনিস তো করতে পারেন। আলমারির হাতলে, বাক্সটার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কি না সেটা তো .'

'থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমারই আঙুলের ছাপ। ওতে সুবিধে হবে না।'

বনবিহারীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'খাসা লোক ছিলেন বাবা পিয়ারিলাল। আংটিটা ইনসিওর পর্যন্ত করেননি। আর যাঁকে দিয়ে গেলেন তিনিও অবিশ্যি তথৈবচ। যাক—হাড়ের ডাক্তারের এবার হাড়ে-হাড়ে শিক্ষা হয়েছে।'

এবার আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হল না। বনবিহারীবাবুর গাড়িতেই সবাই উঠে পড়লাম। ফেলুদা আর আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম।

ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন বনবিহারীবাবু আমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এখানে এসে এমন একটা রহস্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে ভেবেছিলে কি?'

আমি মাথা নেড়ে না বললাম। ফেলুদা খালি হিঃ-হিঃ করে একটু হাসল।

বাবা বললেন, 'ফেলুবাবুর অবিশ্যি পোয়া বারো, কারণ ওর এসব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।'

'বটে?'

বনবিহারীবাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। বললেন, 'ব্রেনের ব্যায়ামের পক্ষে ওটা খুব ভালো জিনিস। তা, রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'এ তো সবে শুরু।'

'অবিশ্যি তুমি কোন রহস্যের কথা ভাবছ জানি না। আমার কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কীরকম?'

'এই যেমন ধরুন—সন্ন্যাসী গোদরেজের আলমারির চাবি পেল কোত্থেকে। তারপর বাড়িতে চাকর বাকর থাকতে সে-সন্ন্যাসীর এত সাহসই বা হবে কোত্থেকে যে সে একেবারে আপনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকবে। তাছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেকদিন থেকেই খটকা লেগে আছে।'

ধীরুকাকা বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'শ্রীবাস্তবকে সত্যিই পিয়ারিলাল আংটি দিয়েছিলেন, না শ্রীবাস্তব সেটা অন্যভাবে—'

ধীরুকাকা বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি মশাই, আপনি কি শ্রীবাস্তবকেও সন্দেহ করেন নাকি?'

'সন্দেহ তো প্রত্যেককেই করতে হবে—এমনকী আমাকে আপনাকেও—তাই নয় কি ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'নিশ্চয়ই। আর যেদিন সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, সেদিন তো শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন—ওই বিকেলেই। তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে এলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!' বনবিহারীবাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন, 'কিন্তু শ্রীবাস্তব যদি অসদুপায়ে আংটি পেয়ে

BanglaBook.org

থাকেন, তাহলে তিনি সেটা আমাদের কাছে রাখবেনই বা কেন, আর রেখে সেটা চুরিই বা করবেন কেন?'

বনবিহারীবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝলেন না? অত্যন্ত সহজ। শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যিই ডাকাত লেগেছিল। ভীতু মানুষ—তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে রেখেছিলেন। এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা, তাই তিনি নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাপ্পা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তবের মতো এত ভালোমানুষ হাসিখুশি লোক, তিনি কখনও চোর হতে পারেন? ফেলুদাও কি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে একমত, নাকি বনবিহারীবাবুর কথাতেই ওর প্রথম শ্রীবাস্তবের ওপর সন্দেহ পড়েছে?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'শ্রীবাস্তব অমায়িক লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন—লখ্‌নৌ-এর মতো জায়গা—এমন আর কি—সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র—ভাবতে একটু ইয়ে লাগে না কি?'

ধীরুকাকা বললেন, 'ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট আপিসের সামান্য কেরানি।'

এই সময় ফেলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল—

'আপনার কোনও জানোয়ার কখনও আপনাকে কামড়েছে কি?'

'নো নেভার।'

'তাহলে আপনার ডানহাতের কবজিতে ওই দাগটা কী?'

'ও হো-হো—বাঃ-বাঃ, তুমি তো খুব ভালো লক্ষ করেছ—কারণ ও দাগটা সচরাচর আমার আস্তিনের ভেতরেই থাকে। ওটা হয়েছিল ফেনসিং করতে গিয়ে। ফেনসিং বোঝো?'

ফেলুদা কেন—আমিও জানতাম ফেনসিং কাকে বলে। রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে ফেনসিং।

'ফেনসিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই। এটা সেই খোঁচার দাগ।'

রেসিডেন্সিটা সত্যিই একটা দেখবার জিনিস। প্রথমত জায়গাটা খুব সুন্দর। চারিদিকে বড়-বড় গাছপালা—তার মাঝখানে এখানে ওখানে এক-একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। গাছগুলোর ডালে দেখলাম ঝাঁকে-ঝাঁকে বাঁদর। লখ্‌নৌ শহরের বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি, এবার নিজের চোখে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখলাম।

কতকগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাক করে ইট মারছিল—বনবিহারীবাবু তাদের কষে ধমক দিলেন। তারপর আমাদের বললেন, 'জন্তুজানোয়ারের ওপর দুর্ব্যবহারটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশেই এ-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।'

ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের কথা পড়েছি, রেসিডেন্সি দেখার সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটা বড় বাড়ির ভেতর আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখছি, আর বনবিহারীবাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছেন—

'সেপাই মিউটিনির সময় লখ্‌নৌ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিল এই বাড়িটার ভেতরেই। স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি। বিদ্রোহ লাগল দেখে প্রাণের ভয়ে লখ্‌নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা হাসপাতালের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল। ক'দিন

BanglaBook.org

খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না। সেপাই-এর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে ব্রিটিশদের কী দশা হল সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না-এসে পড়তেন, তাহলে ব্রিটিশদের দফারফা হয়ে যেতো।...এ ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। দেওয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখ।'

বাবা আর ধীরুকাকা আগেই রেসিডেন্সি দেখেছেন বলে মাঠে পায়চারি করছিলেন। আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম। আর দুশো বছরের পুরোনো পাতলা অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখছিলাম, এমন সময় ঘরের দেওয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কী একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান ঘেঁষে ধাঁই করে পিছনের দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। চেয়ে দেখি সেটা একটা পাথরের টুকরো।

তার পরমুহূর্তেই বনবিহারীবাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে তাঁর দিকে টেনে নিলেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকটা পাথব এসে আবার ঘরের দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। পাথরগুলো যে গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার বেশ বুঝতে পারলাম। উনি এক লাফে দেওয়ালের একটা বড় গর্তের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাইরের ঘাসে পড়লেন। আমি আর ফেলুদাও অবিশ্যি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছলাম। আর গিয়েই দেখলাম যে-দিক দিয়ে পাথর এসেছে, সেই দিকে বেশ খানিক দূরে, একটা লাল ফেজটুপি আব কালো কোট পরা দাড়িওয়ালা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা লোকটার দিকে ছুটল। আমি ফেলুদার পিছনে-পিছনে যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু বনবিহারীবাবু আমার জামার আস্তিনটা ধরে বললেন, 'তুমি এখনও স্কুলবয় তপেশ; তোমার এসব গোলমালেব মধ্যে না যাওয়াই ভালো।'

কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধবতে পারলে?'

ফেলুদা বলল, 'নাঃ। অনেকটা ডিসট্যান্স। একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা।'

বনবিহারীবাবু চাপা গলায় বললেন 'স্কাউন্ড্রেল। তারপর আমাদের দুজনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চলো—আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরুকাকার সঙ্গে দেখা হল। বাবা বললেন, 'ফেলু এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওর বোধহয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না করাই ভালো। মনে হচ্ছে ওর পেছনে গুন্ডা লেগেছে।'

বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

তখন বনবিহারীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমি রসিকতা কবছিলাম। আসলে পাথরগুলো আমাকেই লক্ষ করে মারা হয়েছিল। ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ।'

তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন, 'তবে তাও বলছি ফেলুবাবু, তোমারও বয়সটা কাঁচাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভালো হবে? এবার থেকে একটু খেয়াল করে চলো।'

কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল।

গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম—সেই সুযোগে ফেলুদাকে ফিস-ফিস করে বললাম, 'পাথরটা তোমাকে মারছিল, না ওঁকে?'

BanglaBook.org

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওঁকে মারলে কি উনি চুপ করে থাকতেন নাকি? হল্লা-টল্লা করে রেসিডেন্সির বাকি ইট ক'টা খসিয়ে দিতেন না?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তবে একটা জিনিস পেয়েছি। লোকটা পালানোর সময় ফেলে গিয়েছিল।'

'কী জিনিস?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বের করে দেখাল। ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গোঁফ, আর তাতে এখনও শুকনো আঠা লেগে রয়েছে।

গোঁফটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা বলল, 'পাথরগুলো যে আমাকেই মারা হয়েছে, সেটা ভদ্রলোক খুব ভালোভাবেই জানেন।'

'তাহলে বললেন না কেন?'

'হয় আমাদের নার্ভাস করতে চান না, আর না হয়...'

'না হয় কী?'

ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা বাঁকিয়ে একটা তুড়ি মেরে বলল, 'কেসটা জমে আসছে রে তোপ্‌সে। তুই এখন থেকে আর আমাকে একদম ডিস্টার্ব করবি না।'

বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় বাগানে পায়চারি করেছে, আর বাকি সময়টা ওর নীল নোটবইটাতে হিজিবিজি কী সব লিখেছে। ও যখন বাগানে ঘুরছিল, তখন আমি একবার লুকিয়ে-লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি, কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

৬

টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল, 'হজরতগঞ্জ।'

আমি বললাম, 'সেটা আবার কোন জায়গা?'

এখানকার চৌরঙ্গি। শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো শহরে দেখবার জিনিস আছে। আজ একটু দোকান-টোকান ঘুরে দেখব।'

গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারীবাবুর বাড়িতে কফি খেতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে ওঁর চিড়িয়াখানাটাও আরেকবার দেখে নিয়েছিলাম। সেই হাইনা, সেই র‍্যাটল স্নেক, সেই মাকড়সা, সেই বনবেড়াল, সেই কাঁকড়া বিছে।

বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে-খেতে ফেলুদা একটা দরজার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম, আজও তালা।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—ওটা একটা একস্ট্রা ঘর। এসে অবধি তালা লাগিয়ে রেখেছি। খোলা রাখলেই ঝাড়পোঁছের হাঙ্গামা এসে যায়, বুঝলে না।'

ফেলুদা বলল, 'তাহলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে, কারণ এটায় তো মরচে ধরেনি।'

বনবিহারীবাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি-হাসি অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এর আগেরটায় এত বেশি মরচে ধরেছিল যে ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম।'

বাবা বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম হরিদ্বার লছমনঝুলাটা এই ফাঁকে সেরে আসব।'

বনবিহারীবাবু পাইপ ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কবে যাবেন? পরশু যদি যান তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে। আমার এমনিতেই সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া দরকার। আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি

BanglaBook.org

শুরু করেছেন, কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয় সকলেরই মঙ্গল।'

ধীরুকাকা বললেন, 'আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। তোমরা ক'জন ঘুরে এসো না। ফেলু তপেশ দুজনেরই লছমনঝুলা না-দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা সুবিধে হবে—আমার চেনা ধরমশালা আছে, এমনকী হরিদ্বার থেকে লছমনঝুলা যাওয়ার গাড়ির ব্যবস্থাও আমি চেনাশুনার মধ্যে থেকে করে দিতে পারব। এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড করুন।'

ঠিক হল পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব। দুদিন আগে যদি বনবিহারীবাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন, তাহলে আমার খুব ভালোই লাগত। কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে। তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই, তখন আমিও মনটাকে যাওয়ার জন্য তৈরি করে নিলাম।

আজ সকালে উঠে ফেলুদা বলল, 'দাড়ি কামাবার ব্লেড ফুরিয়ে গেছে—ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব। চল ব্লেড কিনে আনিগে।'

তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি। হজরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই পাওয়া যায়।

কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছে না। আজ সকালে ও যখন স্নান করতে গিয়েছিল, তখন আমি আরেকবার ওর নোটবইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু পড়তে পারিনি। অক্ষরগুলোর এক-একটা ইংরিজি মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা।

গাড়িতে যেতে-যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ফেলুদাকে জিগ্যেস করে ফেললাম।

ও প্রথমে লুকিয়ে ওর খাতা দেখার জন্য দারুণ রেগে গেল। বলল, 'এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস। তোকে প্রায় ক্রিমিন্যাল বলা যেতে পারে।'

তারপর একটু নরম হয়ে বলল, 'তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ও অক্ষর তোর জানা নেই।'

'কী অক্ষর ওটা?'

'গ্রিক।'

'ভাষাটাও গ্রিক?'

'না।'

'তবে?'

'ইংরিজি।'

'তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কী করে?'

'সে অনেকদিনের শেখা। ফার্স্ট-ইয়ারে থাকতে। আল্‌ফা বিটা গামা ডেল্টা পাই মিউ এপসাইলন—এসব তো অঙ্কতেই শিখেছি, আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে। ইংরিজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায়। এমনি লোকের কারুর সাধ্য নেই যে পড়ে।'

'লখ্‌নৌ বানান কী হবে গ্রিকে?'

'ল্যাম্‌ডা উপসাইলন কাপা নিউ ওমিক্রন উপসাইলন। C আর W-টা গ্রিকে নেই, তাই বানানটা হচ্ছে L-U-K-N-O-U।'

'আর ক্যালকাটা বানান?'

'কাপা আল্‌ফা ল্যাম্‌ডা কাপা উপসাইলন টাউ-টাউ আল্‌ফা।'

'বাসরে বাস। তিনটে বানান করতেই পিরিয়ড কাবার!'

চৌরঙ্গি বললে অবিশ্যি বাড়িয়ে বলা হবে—কিন্তু হজরতগঞ্জের দোকান-টোকানগুলো বেশ ভালোই দেখতে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

'ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা—ওখানে নিশ্চয়ই ব্লেড পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়া, আগে একটা অন্য কাজ সেরে নিই।'

আরও কিছুদূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি উঁচু-উঁচু অক্ষরে লেখা আছে—

BanglaBook.org

MALKANI & CO.
ANTIQUE & CURIO DEALERS

কাচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভেতরটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম সেটা সব পুরোনো আমলের জিনিসের দোকান। ঢুকে দেখি হরেকরকমের পুরোনো জিনিসে দোকানটা গিজ-গিজ করছে—গয়নাগাটি, কার্পেট, ঘড়ি, চেয়ার, টেবিল, ঝাড়লণ্ঠন, বাঁধানো ছবি আর আরও কত কী।

পাকাচুলওয়ালা সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা বলল, 'বাদশাদের আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে আপনাদের এখানে?'

'গয়না তো নেই। তবে মুগল আমলের ঢাল তলোয়ার জাজিম বর্ম, এইসব কিছু আছে। দেখাব?'

ফেলুদা একটা কাচের আতরদান হাতে নিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, 'পিয়ারিলালের কাছে কিছু মুগল আমলের গয়না দেখেছিলাম। তিনি তো আপনার খুব বড় খদ্দের ছিলেন, তাই না?'

ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন।

'বড় খদ্দের? কোন পিয়ারিলাল?'

'কেন—পিয়ারিলাল শেঠ, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন।'

মালকানি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে কখনই কিছু কেনেননি তিনি, আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর নেই।'

'আই সি। তাহলে বোধহয় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিনেছিলেন।'

'তাই হবে।'

'এখানে বড় খদ্দেব বলতে কাকে বলেন আপনি?'

মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খদ্দেব তাঁর খুব বেশি নেই। বললেন, 'বিদেশি টুরিস্ট এসে মাঝে-মাঝে ভালো জিনিস ভালো দামে কিনে নিয়ে যায়। এখানের খদ্দের বলতে মিস্টার মেহতা আছেন, মাঝে-মাঝে এটা সেটা নেন, আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেকদিনের খদ্দের—সেদিন তিন হাজার টাকায় একটা কার্পেট কিনে নিয়ে গেছেন—খাস ইরানের জিনিস।'

ফেলুদা হঠাৎ একটা হাতিব দাঁতের তৈরি নৌকোব দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা বাংলা দেশের জিনিস না?'

'হ্যাঁ, মুবশিদাবাদ।'

'দেখেছিস তোপ্‌সে—বজবাটা কেমন বানিয়েছে।'

সত্যি, এত সুন্দব হাতিব দাঁতেব কাজ করা নৌকো আমি কখনও দেখিনি। বজরার ছাতে শামিয়ানার তলায নবাব বসে গড়গড়া টানছেন, তাঁর দুপাশে পাত্রমিত্র সভাসদ সব বসে আছে, আর সামনে নাচগান হচ্ছে। ষোলোজন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে, আর একটা লোক হাল ধরে বসে আছে। তাছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সব কিছুই আছে, আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে যায়।

ফেলুদা বলল, 'এটা কোত্থেকে পেলেন?'

'ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার।'

'কোন মিস্টার সবকাব?'

'মিস্টার বি সবকাব—যিনি বাদশানগরে থাকেন। উনি মাঝে-মাঝে এটা সেটা কিনে নিযে যান। ভালো জিনিস আছে ওঁর কাছে।'

'আই সি। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার দোকান ভারি ভালো লাগল। গুড ডে।'

'গুড ডে, স্যার।'

BanglaBook.org

বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'বনবিহারী সরকারের তাহলে এসব দোকানে যাতায়াত আছে। অবিশ্যি সে সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল।'

'কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এসব ব্যাপারে ওঁর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

'ইন্টারেস্ট না থাকলে পাথর দেখেই কেউ বলতে পারে সেটা আসল কি নকল?'

মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এম্পায়ার বুক স্টল বলে একটা বইয়ের দোকান। ফেলুদা বলল ওর হরিদ্বার লছমনঝুলা সম্বন্ধে একটা বই কেনা দরকার, তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম, আর ঢুকেই দেখি পিয়ারিলালের ছেলে মহাবীর।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'ক্রিকেটের বই কিনছে। ভেরি গুড।'

মহাবীর আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই আমাদের দেখতে পায়নি।

ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নেভিল কার্ডাসের কোনও বই আছে আপনাদের?'

বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল। আমি জানতাম নেভিল কার্ডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভালো-ভালো বই লিখেছে।

দোকানদার বলল, 'কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো?'

'Centuries বইটা আছে?'

'আজ্ঞে না—তবে অন্য বই দেখাতে পারি।'

মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট?'

'হ্যাঁ। আপনারও দেখছি..'

মহাবীর তার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা আমার অর্ডার দেওয়া ছিল। ব্র্যাডম্যানের আত্মজীবনী।'

'ওহো—ওটা পড়েছি। দারুণ বই।'

'আপনার কী মনে হয়—রণজি বড় ছিলেন, না ব্র্যাডম্যান?'

দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর মহাবীর বলল, 'কাছেই কোয়ালিটি আছে, আসুন না একটু বসে চা খাই।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। আমরা তিনজনে গিয়ে কোয়ালিটিতে ঢুকলাম। ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা-কোলা অর্ডার দিলাম। মহাবীর বলল, 'আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন?'

ফেলুদা বলল, 'খেলতাম। স্লো স্পিন বল দিতাম। লখ্‌নৌয়ে ক্রিকেট খেলে গেছি।...আর আপনি!'

'আমি ডুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে খেলেছি। বাবাও স্কুলে থাকতে ভালো খেলতেন।'

পিয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল।

ফেলুদা চা ঢালতে-ঢালতে বলল, 'আপনি আংটির ঘটনাটা জানেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি বলছেন।'

'আপনার বাবার যে আংটি ছিল, আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো?'

'বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে 'ভালো করে দেওয়ার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি একটা কিছু দিতে চান। সেটা যে কী, সেটা অবিশ্যি আমি বাবা মারা যাওয়ার পর শ্রীবাস্তবের কাছেই জেনেছি।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর বলল, 'কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট নিয়েছেন কেন?'

BanglaBook.org

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার।'

মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে আর কে থাকেন?'

'আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন, আর চাকর-বাকর।'

'চাকর-বাকর কি পুরোনো?'

'সবাই আমার জন্মের আগে থেকে আছে। অর্থাৎ কলকাতায় থাকার সময় থেকে। প্রীতম সিং বেয়ারা আছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আংটির মতো আর কোনও জিনিস আপনার বাবার কাছে ছিল?'

'বাবার এ-শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা অনেক দিন আগের ব্যাপার। তখন আমি খুবই ছোট। এবার এসে এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম, তাতে বাদশাহী আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি। তবে আংটির মতো অত দামি বোধহয় আর কোনওটা নয়।'

আমি 'স্ট্র' দিয়ে আমার ঠান্ডা কোকা-কোলায় চুমুক দিলাম। মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে।'

ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করত লাগল। রেস্টুরেন্টের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মহাবীর বলল, 'বাবার যেদিন দ্বিতীয় বার হার্ট অ্যাটাক হল, সেদিন সকালে অ্যাট্যাকটা হওয়ার কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।'

'বটে?'

'কিন্তু প্রীতম সিং তখন খুব বিচলিত হয়নি, কারণ বাবার মাঝে-মাঝে কোমরে একটা ব্যথা হত, তখন চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর সাহায্য নিতেন না। প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার জন্যই উনি চিৎকার করছেন, কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল হতে পারে, কারণ চিৎকারটা ছিল বেশ জোরে।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না সে খবর আপনি জানেন? প্রীতম সিং-এর কিছু মনে আছে কি?'

'সে কথা ওকে আমি জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও ডেফিনিটলি কিছু বলতে পারছে না। সকালের দিকটায় মাঝে-মাঝে বাবার কাছে লোকজন আসত—কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওঁর কাছে কেউ এসেছিল কি না সেকথা প্রীতম বলতে পারছে না। প্রীতম যখন বাবার ঘরে গিয়েছিল, তখন ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ, আর তখন ঘরে অন্য কোনও লোক ছিল না। তারপর প্রীতমই ফোন করে শ্রীবাস্তবকে আনায়। বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন—ডক্টর গ্রেহ্যাম—তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কনফারেন্সে।'

'আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

'স্পাই?'—মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'ও, তাহলে আপনি এটা জানেন না। আপনার বাবা শ্রীবাস্তবকে 'স্পাই' সম্বন্ধে কী যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারেননি।'

মহাবীর মাথা নেড়ে বলল, 'এটা আমার কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর বাবার সঙ্গে গুপ্তচরের কী সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে পারছি না।'

আমি কোকা-কোলাটাকে শেষ করে সবে স্ট্র-টাকে দুমড়ে দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম একজন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদের কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে-খেতে আমাদের দিকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন, আর ফেলুদার দিকে

BanglaBook.org

ঘাড়টা কাত করে বললেন, 'নমস্কার। চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ—কেন পারব না।'

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে গেল—ইনিই বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওঁর চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন। ভদ্রলোকের থুতনিতে একটা তুলোর ওপর দুটো স্টিকিং প্লাস্টার ক্রসের মতো করে লাগানো রয়েছে। বোধহয় দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'বসুন। ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ—আর ইনি গণেশ গুহ।'

এবার লক্ষ করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আঁচড়ের দাগ রয়েছে—যদিও এ দাগটা পুরোনো।

ফেলুদা বলল, 'আপনার থুতনিতে কী হল?'

গণেশবাবু তার নিজের টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে এনে আমাদের টেবিলে রেখে বলল, 'আর বলবেন না—সমস্ত শরীরটাই যে আদ্দিন ছিঁড়ে-ফুঁড়ে শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্যি। আমার চাকরিটা কী সে তো জানেনই।'

'জানি। তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়েই করেন আপনি।'

'পাগল! সব পেটের দায়ে। এক কালে বিজু সার্কাসের বাঘের ইন্-চার্জ ছিলুম—তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে থাকত। বনবিহারীবাবুর এই সব জানোয়ারের কাছে তো সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সেদিন বেড়ালের আঁচড়, আর কাল এই থুতনিতে হাইনার চাপড়। আর পারলুম না। সকালে গিয়ে বলে এসেছি—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি ফিরে যাচ্ছি সার্কাস পার্টিতে। তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।'

ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সেকী, আপনি বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিলেন? কাল বিকেলেও তো আমরা ওঁর ওখানে ঘুরে এলাম।'

'জানি। শুধু আপনারা কেন, অনেকেই যাবেন। কিন্তু আমি আর এ তল্লাটেই নয়। এই এখন স্টেশনে যাব, গিয়ে হাওড়ার টিকিট কাটব। ব্যস—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত। আর—' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, '—একটা কথা বলে যাই—উনি লোকটি খুব সুবিধের নন।'

'বনবিহারীবাবু?'

'আগে ঠিকই ছিলেন, ইদানীং হাতে একটি জিনিস পেয়ে মাথাটি গেছে বিগড়ে।'

'কী জিনিস?'

'সে আর না হয় নাই বললাম'—বলে গণেশ গুহ তার চায়ের পয়সা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ফেলুদা এবার মহাবীরের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি দেখেছেন বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানা?'

'ইচ্ছে ছিল যাওয়ার—কিন্তু হয়নি। বাবার আপত্তি ছিল। ওই ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না। একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে যেত! তবে এবার ভাবছি একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

মহাবীর তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল। ফেলুদা অবিশ্যি চায়ের দামটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না। আমি মনে-মনে ভাবলাম যে ফিল্মের অ্যাক্টরের অনেক টাকা, কাজেই মহাবীর দিলে কোনও ক্ষতি নেই।

বিলটা দেওয়ার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম প্যাকেটটা চারমিনারের।

'আপনি ক'দিন আছেন?' মহাবীর জিগ্যেস করল।

'পরশু দিন-দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে বাকি এ মাসটা আছি।'

BanglaBook.org

'আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার?'

'ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না। আমরা তিনজন যাচ্ছি, আর বোধহয় বনবিহারীবাবু। উনি লছমনঝুলায় একটা অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন।'

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম। মহাবীর বলল, 'আমার কিন্তু গাড়ি আছে—আমি লিফট দিতে পারি।'

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'না, থাক। মোটর তো কলকাতায় হামেশাই চড়ি। এখানে টাঙ্গাটা বেড়ে লাগছে।'

এবার মহাবীর ফেলুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভালো লাগল। একটা কথা আপনাকে বলছি—যদি জানতে পারি যে বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী, তাহলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বের করে তার প্রতিশোধ আমি নেবই। আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি চার বছর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ছিলাম। রিভলভারের লাইসেন্স আছে, আমার মতো অব্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই।...গুড বাই।'

মহাবীর রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে হুশ করে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা খালি বলল, 'সাবাস।'

আমি মনে-মনে বললাম, ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ সেটা খুব ভালো নয়।

টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে ব্লেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধহয় ফেলুদার নেই।

৭

হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে। লখ্‌নৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে, আর হরিদ্বার পৌঁছয় সাড়ে চারটেয়।

লখ্‌নৌ আসার আগে যখন হরিদ্বার যাওয়ার কথা হয় তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। কারণ পুরী ছাড়া আমি কোনও তীর্থস্থান দেখিনি। কিন্তু লখ্‌নৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আর সে রহস্যের এখনও কোনও সমাধান না হওয়ায়, আমার এখন আর লখ্‌নৌ ছেড়ে যেতে খুব বেশি ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনও অভাব নেই। ও বলল, হরিদ্বার, হৃষিকেশ আর লছমনঝুলা—এই তিনটে জায়গা পরপর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে। কারণ তিন জায়গার গঙ্গা দেখবি তিনরকম। যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে। আর ফাইন্যালি লছমনঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে উত্তাল পাহাড়ে নদী। তোড়ের শব্দে প্রায় কথাই শোনা যায় না।'

আমি বললাম, 'তোমার এসব দেখা আছে বুঝি?'

'সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লখ্‌নৌ এলাম, সেবারই দেখা সেরে গেছি।'

ধীরুকাকা অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তবে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে এলেন। কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ শ্রীবাস্তব। আমি ভাবলাম উনিও বুঝি ধীরুকাকার মতো 'সি-অফ' করতে এসেছেন, কিন্তু তারপর দেখলাম কুলির মাথা থেকে স্যুটকেস নামাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই অবাক

BanglaBook.org

ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ধীরুবাবুকে বলিয়েছিলাম যেন আপনাদের না বোলেন। উনি জানতেন আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বোলেন তো।'

বাবা দেখলাম খুব খুশি হয়েই বললেন, 'খুব ভালোই হল। আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন, তা না হলে আমি নিজেই আপনাকে বলতাম।'

শ্রীবাস্তব বেঞ্চির একটা কোণ ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন, 'সত্যি জানেন কি—ক'দিন বড্ড ওয়ারিড আছি। আমাকে বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। পিয়ারিলালের দেওয়া

BanglaBook.org

জিনিসটা এইভাবে গেল—ভাবলে বড় খারাপ লাগে। শহর ছেড়ে দু-দিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারলে খানিকটা শান্তি পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বনবিহারীবাবুও এসে পড়লেন। তাঁর মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশিই মনে হল। ভদ্রলোক হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, 'এইবার রগড় দেখবেন। পবিত্রানন্দস্বামী চলেছেন এ-গাড়িতে। তাঁর ভক্তরা তাঁকে বিদায় দিতে আসছেন। ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার।'

সত্যিই, কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন ফুলের মালাটালা নিয়ে একজন মোটামতো গেরুয়াপরা লম্বা চুলওয়ালা সন্ন্যাসী এসে আমাদের পাশের ফার্স্টক্লাস গাড়িটায় উঠলেন। ওঁর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন গেরুয়াপরা লোক উঠল—আর কিছু গেরুয়াপরা, আর অনেক এমনি পোশাক পরা লোক কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল।

গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচমিনিট দেরি, তাই আমরা সব উঠে পড়েছি, ধীরুকাকা কেবল জানালার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন, এমনসময় একজন গেরুয়াপরা লোক হঠাৎ ধীরুকাকার দিকে হাসিহাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল।

'ধীরেন না? চিনতে পারছ?'

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে, হঠাৎ—'অম্বিকা নাকি?'—বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। 'বাপরে বাপ!—তোমার আবার এ-পোশাক কী হে?'

'কেন, এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল।'

ধীরুকাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'অম্বিকা হল আমার স্কুলের সহপাঠী। প্রায় পনেরো বছর পরে দেখা ওর সঙ্গে।'

গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে। ঘ্যাঁ-চ্ করে গাড়ি ছাড়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অম্বিকাবাবু ধীরুকাকাকে বলছেন, 'আরে, সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা বসে রইলাম। তুমি ছিলে না। তোমার বেয়ারা তোমাকে সেকথা বলেনি?'

ধীরুকাকা কী উত্তর দিলেন সেটা আর শোনা গেল না, কারণ গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা, আর তারপর বাবার দিকে চাইলাম। ফেলুদার কপালে দারুণ ভ্রূকুটি।

বাবা বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ওই ভদ্রলোককেই কি আপনারা আংটিচোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন?'

বাবা বললেন, 'সে-প্রশ্ন অবিশ্যি আর ওঠে না। কিন্তু আংটিটা তাহলে গেল কোথায়? কে নিল?'

ট্রেনটা ঘটাং-ঘটাং করে লখ্‌নৌ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরোল। স্টেশনের মাথার গম্বুজগুলো ভারি সুন্দর দেখতে, কিন্তু এখন আর ওসব যেন চোখেই পড়ছিল না। মাথার মধ্যে সব যেন কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে-মনে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছে। ও-তো সেই সন্ন্যাসীর খোঁজ নিতে-নিতে একেবারে লখ্‌নৌ স্টেশন অবধি পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু তাহলে স্টেশনের সেই অ্যাটাচি-কেসওয়ালা সন্ন্যাসী কে? আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসী নয়—একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী। সে কি তাহলে আরেকজন লোক? আর সেও কি ধীরুকাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল? আর সেটার কারণ কি ওই আংটি, না অন্য কিছু? আর ফেলুদার গায়ে 'খুব হুঁশিয়ার' লেখা কাগজ কে ছুঁড়ে মেরেছিল—আর কেন?

ফেলুদার মাথাতে কি এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে—না সে অন্য কিছু ভাবছে?

ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখা খাতাটা বের করে খুব মন

BanglaBook.org

দিয়ে পড়ছে—আর মাঝে-মাঝে কলম দিয়ে আরও কী সব জানি লিখছে।

বনবিহারীবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন : 'আচ্ছা, ডক্টর শ্রীবাস্তব—পিয়ারিলাল মারা যাওয়ার আগে আপনিই বোধহয় শেষ তাঁকে দেখেছিলেন, তাই না?'

শ্রীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলালেবু বের করে সকলকে একটা-একটা করে দিতে-দিতে বললেন, 'আমি ছিলাম, ওনার বিধবা বোন ছিলেন, ওনার বেয়ারা ছিল, আর অন্য একটি চাকরও ছিল।'

বনবিহারীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। ওঁর অ্যাটাকটা হওয়ার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন?'

'হাড়ের চিকিৎসা করলে হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় বনবিহারীবাবু। আর ওঁর ডাক্তার গ্রেহ্যাম শহরে ছিলেন না, তাই আমাকে ডেকেছিলেন।'

'কে ডেকেছিল?'

'ওঁর বেয়ারা।'

'বেয়ারা?' বনবিহারীবাবু ভ্রূ কপালে তুলে জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ। প্রীতম সিং। অনেক দিনের লোক। খুব বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, কাজের লোক।'

বনবিহারীবাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলালেবুর একটা কোয়া মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আপনি বলেছেন পিয়ারিলাল আংটিটা দিয়েছেন প্রথম অ্যাটাকের পর। আর দ্বিতীয় অ্যাটাকের পর আপনাকে ডাকা হয়, আর সেই অ্যাটাকেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আংটিটা দেওয়ার সময় ঘরে কেউ ছিল কি?'

'তা কী করে থাকবে বনবিহারীবাবু? এসব কাজ কি আর বাইরের লোকের সামনে কেউ করে? বিশেষ করে পিয়ারিলাল কীরকম লোক ছিলেন তা তো আপনি জানেন। ঢাক বাজিয়ে নোবল কাজ করার লোক তিনি একেবারেই ছিলেন না। ওনার কত সিক্রেট চ্যারিটি আছে তা জানেন? লাখ লাখ টাকা হাসপাতালে অনাথাশ্রমে দান করেছেন, অথচ কোনও কাগজে তার বিষয়ে কখনও কিছু বেরোয়নি।'

'হুঁ।'

শ্রীবাস্তব বনবিহারীবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছেন?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—এই আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল হল—অথচ কেউ জানতে পারল না।'

শ্রীবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললেন, 'বাঃ বনবিহারীবাবু, বাঃ! আমি পিয়ারিলালের আংটি চুরি করলাম, আমিই ধীরেনবাবুর কাছে সেটা রাখলাম, আবার আমিই সেটা ধীরেনবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম? ওয়াভারফুল!'

বনবিহারীবাবু তাঁর মুখের ভাব একটুও না বদলিয়ে বললেন, আপনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। আমি হলেও তাই করতাম। কারণ, আপনাকে বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন, তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। তারপর ধীরুবাবুর আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কী বল, ফেলু মাস্টার? আমার গোয়েন্দাগিরিটা কি নেহাত উড়িয়ে দেওয়ার মতো?'

BanglaBook.org

ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল, 'ডাক্তার শ্রীবাস্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার কি কোনও সাক্ষীর অভাব আছে?'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'না, তা হয়তো নেই।'

ফেলুদা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, আংটির দাম যত লাখ টাকাই হোক না কেন, একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য বেশি নয়। শ্রীবাস্তব যদি আংটি চুরি করে থাকেন, তাহলে তাঁর অপরাধ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখন যারা ওঁর আংটির পিছনে লেগেছে, তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি, কারণ তারা একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর।'

'বুঝেছি।' বনবিহারীবাবুর গলার স্বর গম্ভীর। 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনও আংটিটা আছে।'

'না। করি না। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।'

কামরার সকলেই চুপ। আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী প্রমাণ আছে তা জিগ্যেস করতে পারি কি?'

'জিগ্যেস নিশ্চয় করতে পারেন, কিন্তু উত্তর এখন পাবেন না—তার সময় এখনও আসেনি।'

আমি ফেলুদাকে এরকম জোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে কখনও শুনিনি।

বনবিহারীবাবু আবার ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে সে উত্তর পাব তো?'

ফেলুদা বলল, 'আশা তো করছি। একটা স্পাই-এর রহস্য আছে—সেটা সমাধান হলেই পাবেন।'

'স্পাই?' বনবিহারীবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন ঃ 'কী স্পাই?'

শ্রীবাস্তব বললেন, 'ফেলুবাবু বোধহয় পিয়ারিলালের লাস্ট ওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন। মারা যাওয়ার আগে দুবার "স্পাই" কথাটা বলেছিলেন।'

বনবিহারীবাবুর ভ্রূকুটি আরও বেড়ে গেল। বললেন, 'আশ্চর্য! লখ্‌নৌ শহরে স্পাই?'

তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'হতে পারে...হতে পারে...আমার একবার একটা সন্দেহ হয়েছিল বটে।'

'কী সন্দেহ?'—শ্রীবাস্তব জিগ্যেস করলেন।

'নাঃ। কিচ্ছু না।...আই মে বি রং।'

বুঝলাম বনবিহারীবাবু আর ও বিষয়ে কিছু বলতে চান না। আর এমনিতেই হরদোই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধই হয়ে গেল।

'একটু চা হলে মন্দ হয় না'—বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম, কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির ভেতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

আমরা নামতেই আরেকজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক কোত্থেকে জানি এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কামরা রিজার্ভড—জায়গা নেই, জায়গা নেই!'

তাতে গেরুয়াধারী ইংরিজিতে বলল, 'বেরিলি পর্যন্ত যেতে দিন দয়া করে। তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব। রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করব না।'

অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'সন্ন্যাসীদের জ্বালায় দেখছি আর পারা গেল না। এই চা-ওয়ালা!'

চা-ওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এল।

'তুই খাবি?'

BanglaBook.org

'কেন খাব না?'

অন্যদের জিগ্যেস করাতে ওঁরা বললেন যে খাবেন না।

গরম চায়ের ভাঁড় কোনওরকমে এ-হাত ও-হাত করতে-করতে ফেলুদাকে বললাম, 'শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

ফেলুদা ওই সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ ওঁকে আমার বেশ ভালো লাগে—আর মনে হয় খুব ভালোমানুষ।'

'বোকচন্দর—তুই যে ডিটেকটিভ বই পড়িসনি। পড়লে জানতে পারতিস যে, যে-লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয়, সে-ই শেষপর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয়।'

'এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বইয়ের ঘটনা নয়।'

'তাতে কী হল? বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তো লেখকরা আইডিয়া পান।'

আমার ভারি রাগ হল। বললাম, 'তাহলে শ্রীবাস্তব যখন প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে ওঁকে ওয়াচ করছিল, আর চারমিনার খাচ্ছিল?'

'সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক।'

'তাহলে তুমি বলছ শ্রীবাস্তবও খারাপ লোক, আর ডাকাতবাও খারাপ লোক? তাহলে তো সকলেই খারাপ লোক—কারণ গণেশ গুহ বলছিল বনবিহারীবাবুও লোক ভালো নয়।'

ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক দিতেই কোত্থেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাঁই করে এসে ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল।

এক ছোবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনও উপায় নেই।

কম্পার্টমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দলা পাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল।

কাগজে লেখা ছিল 'খুব হুঁশিয়ার'—আর দেখে বুঝলাম এবারও পানের রস দিয়েই লেখা।

বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা মোটেই লখ্‌নৌ শহরে ছেড়ে আসিনি। সেটা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে।

৮

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলির দিকে।

কামরায় সবসুদ্ধ সাতজন লোক। আমি আর ফেলুদা একটা বেঞ্চিতে, একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব, আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু আর সেই সন্ন্যাসী। বাবাদের ওপরের বাঙ্কে বনবিহারীবাবুর একটা কাঠের প্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে। আমাদের ওপরের বাঙ্কে একটা লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লখ্‌নৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত আর চাদরমুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি। তার পায়ের ডগাদুটো শুধু বেরিয়ে আছে, ওপরের দিকে চাইলেই দেখা যায়।

বনবিহারীবাবু বেঞ্চির ওপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ টানছেন, শ্রীবাস্তব 'গীতাঞ্জলি' পড়ছেন, আর বাবাকে দেখলেই মনে হয় ওঁর ঘুম পেয়েছে। মাঝে-মাঝে চোখ রগড়িয়ে টান হয়ে বসছেন। সন্ন্যাসীর যেন আমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্টারেস্ট নেই। সে একমনে একটা

BanglaBook.org

হিন্দি খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। ফেলুদা জানালার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে-তালে একটা গান ধরেছে। সেটা আবার হিন্দি গান। তার প্রথম দু-লাইন হচ্ছে—

যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হাল আদম পর ক্যা গুজরী..

বাকিটা ফেলুদা হুঁ-হুঁ করে গাইছে। বুঝলাম ওই দু-লাইন ছাড়া আর কথা জানা নেই। বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'ওয়াজিদ আলি শা-র গান তুমি জানলে কী করে?'

BanglaBook

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন। খুব ভালো ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন।'

বনবিহারীবাবু পাইপে টান দিয়ে জানালার বাইরে সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি। গান গাইতেন পাখির মতো। গান রচনাও করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন—একেবারে বিলিতি ঢং-এ। কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও। শেষ বয়সটা কাটে কলকাতার মেটেবুরুজে—এখন যেখানে সব কলকাতার মুসলমান দরজিগুলো থাকে। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো? তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে একজোটে কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওয়াজেদ আলি শা।'

কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বাঙ্কে রাখা ট্রাঙ্কটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছোট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বের করে বেঞ্চির ওপরে রেখে বললেন, 'এবার আমার প্রিয় কিছু গান শোনাই। এটা হচ্ছে আমার টেপরেকর্ডার। ব্যাটারিতে চলে।'

এই বলে বাক্সটার ঢাকনা খুলে হারমোনিয়ামের পরদার মতো দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতেই পারলাম কী একটা জিনিস জানি চলতে আরম্ভ করল।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে হয় তাহলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে-দেখতে শোনো।'

আমি বাইরের দিকে চেয়ে আবছা আলোতে দেখলাম, বিরাট-বিরাট গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উলটো দিকে। সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বনবিড়ালের কর্কশ চিৎকার।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ভলুম ইচ্ছে করে বাড়াইনি—যাতে মনে হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে।'

তারপর শুনলাম হাইনার হাসি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি—আর সারা জঙ্গল থেকে হাইনার হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এর পরের শব্দটা আরেকটু কমানো উচিত, কারণ ওটা শোনা যায় খুব আস্তেই। তবে গাড়ির শব্দের জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি।'

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌..'

আমার বুকের ভেতরটা যেন টিপ টিপ করতে লাগল। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ব্যাট্‌ল স্নেক। আওয়াজটা শুনলে যদিও ভয় করে, কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্বটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই শব্দটা করে—যাতে অন্য কোনও প্রাণী অজান্তে ওদের মাড়িয়ে না ফেলে।'

বাবা বললেন, 'তাহলে ওরা এমনিতে মানুষকে অ্যাটাক করে না?'

'জঙ্গলে-টঙ্গলে এমনিতে করে না। সে আমাদের দিশি বিষাক্ত সাপেরাই বা ক'টা অ্যাটাক করে বলুন। তবে কোণঠাসা হয়ে গেলে করে বইকী। যেমন ধরুন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায়—তাহলে কি আর করবে না? নিশ্চয়ই করবে। আর এদের আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতা কী জানেন তো—ইনফ্রা রেড রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ, এরা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায়।'

তারপর রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে বনবিহারীবাবু বললেন, 'দুঃখের বিষয় আমার বাকি যে-ক'টি প্রাণী আছে—বিছে আর মাকড়সা—তারা দুটিই মৌন। এবার যদি অজগরটি পাই, তাহলে তার ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব।'

বাবা বললেন, 'ভয়-ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু আমার কাছে এ-শব্দ সংগীতের চেয়েও মধুর।

BanglaBook.org

বাইরে যখন যাই, জানোয়ারগুলোকে তো তখন নিয়ে যেতে পারি না, তাই এই শব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে।'

বেরিলিতে আমাদের ডিনার দিল, আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ফেলুদা এক প্লেট খাবার পরেও আমার প্লেট থেকে মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে বলল, 'ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে, তখন মুরগি জিনিসটা খুব হেল্প করে।'

'আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না!'

'তোরটা কাজ নয়, খেলা।'

'তোমার এত কাজ করে কী ফলটা হচ্ছে শুনি।'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই এমনভাবে বলল, 'পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলেছিলেন সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি।'

এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল।

গাড়ি বেরিলি ছেড়েছে। বাবা বললেন, 'ভোর চারটেয় উঠতে হবে। তোরা সব এবার শুয়ে পড়।'

বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে দিলাম। বনবিহারীবাবু বললেন উনি ঘুমোবেন না। 'তবে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি হরিদ্বার আসার ঠিক আগেই আপনাদের তুলে দেব।'

বাবা আর শ্রীবাস্তব ওঁদের বেঞ্চিটায় ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়লেন। বনবিহারীবাবু দেখলাম বাতিগুলো নিভিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো রয়েছে। শুধু তাই না, আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে। বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ, আর সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে চলেছে।

চাঁদ দেখতে-দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে, হরিদ্বারে শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না—আরও কিছু ঘটবে সেখানে। কিংবা এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক। শুধু গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই যেন ওখানে যাওয়াটা সার্থক হবে না।

আচ্ছা, ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কী করে ঘুম এসে যায়? কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং-ঘটাং শব্দ হত, আর আমার খাটটাকে ধরে কেউ যদি ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিত, তাহলে কি ঘুম আসত? ফেলুদাকে কথাটা জিগ্যেস করাতে ও বলল, 'এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয়, তাহলে মানুষের কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়; তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না। আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেল্পই করে। খোকাদের দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায় দেখিসনি? বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই ঘুম ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। তুই লক্ষ করে দেখিস, অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায়।'

ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুজে এসেছে, তখন একবার মনে হল, বাঙ্কের ওপর যে লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে যেন উঠে বাঙ্ক থেকে নেমে একবার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করল। তারপর একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম—সেটা মানুষও হতে পারে, আবার হাইনাও হতে পারে। তারপর দেখলাম আমি ভুলভুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, আর যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই দেখছি একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রকাণ্ড দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। একবার একটা মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার একটা প্রকাণ্ড কালো লোমে ঢাকা পা আমার কাঁধের ওপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন একসঙ্গে ভেঙে গেল, আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলছে—

'এই তোপ্‌সে ওঠ। হরিদ্বার এসে গেছে।'

BanglaBook.org

৯

'পাণ্ডা চাই, বাবু, পাণ্ডা?'

'বাবুর নামটা কী? নিবাস কোথায়?'

'এই যে বাবু, এদিকে। কোন ধর্মশালায় উঠেছেন বাবু?'

'বাবা দক্ষেশ্বর দর্শন হবে তো বাবু?'

প্ল্যাটফর্মে নামতে না নামতে পাণ্ডারা যে এভাবে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি আগেই বলেছিল যে এরকম হয়। আর এইসব পাণ্ডাদের কাছে নাকি প্রকাণ্ড মোটা-মোটা সব খাতা থাকে, তাতে নাকি আমাদের সব দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে—অবিশ্যি তাঁরা যদি কোনওদিন হরিদ্বার এসে থাকেন তাহলেই। বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা নাকি সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নাকি অনেকদিন হরিদ্বারে ছিলেন। হয়তো এইসব খাতার মধ্যে তাঁর নাম, ঠিকানা আর হাতের লেখা পাওয়া যাবে।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাণ্ডাটাণ্ডার কোনও দরকার নেই। এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতটাই বেশি। চলুন, আমার জানা শীতলদাসের ধরমশালায় নিয়ে যাই আপনাদের। একসঙ্গে থাকা যাবে, খাওয়াও মন্দ না। একদিনের তো মামলা। তারপর তো মোটরে করে হৃষিকেশ-লছমনঝুলা।'

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম।—একটায় ফেলুদা আর আমি, একটায় বনবিহারীবাবু, আর একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব।

যেতে-যেতে ফেলুদা বলল, 'তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর। তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালোই লাগবে।'

খটখট-ঘড়ঘড় করতে-করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলেছে। দোকান-টোকান এখনও একটাও খোলেনি। রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেরোসিনের বাতি দু-একটা টিমটিম করে জ্বলছে এখানে সেখানে। কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেঁটে চলেছে। ফেলুদা বলল, ওরা গঙ্গাস্নান যাত্রী। সূর্য যখন উঠবে তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে স্তব করবে। বাকি শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে।

আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন। একটা সাদা একতলা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল। আমাদের আর বাবাদের গাড়িও তার পিছনে থামল। বুঝলাম এটাই শীতলদাসের ধর্মশালা।

বাড়ির সামনের ফটকের ভেতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় খোলা জায়গা, আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের সারি।

ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল। আমরা তার ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকছি, এমনসময় আরেকটা টাঙ্গা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তারপর দেখি, বেরিলি পর্যন্ত যে সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন। লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এই সেই ট্রেনের সন্ন্যাসী, ফেলুদা!'

ফেলুদা একবার আড়চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি নাকি?'

'কিন্তু বারবার—'

'চোপ! চ' ভেতরে চ'।'

দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। একটাতে চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে,

BanglaBook.org

তার মধ্যে একটাতে একজন লোক ঘুমোচ্ছে, আর বাকি তিনটে আমি, বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক হল। পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হল। বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন।

মুখ-টুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে-খেতে সূর্য উঠে গেল, আর ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারলাম কতরকম লোক সেখানে এসে রয়েছে।

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্থানি মারোয়াড়ি গুজরাটি মারাঠি মিলে হইচই হট্টগোল ব্যাপার।

বাবা বললেন, 'তোরা কি বেরোবি নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'সেরকম তো ভাবছিলাম। একবার ঘাটের দিকটা ঘুরে এলে...'

'তাহলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি। আর একটা কাজ করো তো ফেলু—বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি একটা এভারেডি টর্চ পাওয়া যায়। এ তো আর লখ্‌নৌ শহর না—ও জিনিস একটা হাতে রাখা ভালো।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল এত ছোট শহরে টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভালো।

হাঁটতে-হাঁটতে বুঝলাম হরিদ্বার শহরে সত্যিই বেশ ঠান্ডা। আর গঙ্গার পাশে বলেই বোধহয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে ও বলল, 'যত না কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া।'

ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে জিগ্যেস করতেই সে ঘাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইহাসে আধা মিল যানেসেই ঘাট মিল যায়গা।'

ঘাটে পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই একটা গন্ডগোল শুনতে পাচ্ছিলাম, শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক একসঙ্গে স্নান করার গন্ডগোল। তার ওপর ঘাটের পথের দুদিকে ভিখিরি আর ফেরিওয়ালার সারি, তারাও কম চেঁচামেচি করছে না।

আমরা ভিড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। এরকম দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি। জলের মধ্যে যেন একটা মেলা বসেছে। ঘাটের ওপরেই একটা মন্দির, তার থেকে আরতির ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। এক জায়গায় গলায় কণ্ঠি পরা, কপালে তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে। তাকে ঘিরে একদল বুড়োবুড়ি বসে আছে। মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর গোরুবাছুরও কিছু কম নেই।

ফেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো এই ঘাটের ধাপে কিছুক্ষণ বসে থাক।'

লখ্‌নৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে, আমার মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় মুছেই যাচ্ছিল। ফেলুদারও কি তাই—না কি ও মনে-মনে রহস্য সমাধানের কাজ চালিয়েই চলেছে? ওকে সে কথাটা আর জিগ্যেস করতে সাহস হল না। ওর দিকে ফিরে দেখি, ও বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বের করেছে। বাবাদের সামনে তো খেতে পারে না, তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে।

সিগারেটটা মুখে পুরে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলতেই দেখলাম তার মধ্যে কী যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'ওটা কী, ফেলুদা?'

ফেলুদা ততক্ষণে দেশলাই বের করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। সে অবাক হওয়ার ভাব করে বলল, 'কোনটা?'

'ওই যে চকচক করে উঠল—দেশলাইয়ের বাক্সে?'

ফেলুদা কায়দা করে দু-হাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দেশলাইতে ফসফরাস থাকে জানিস তো? সেইটেই রোদে চকচক করে উঠেছে আর কি।'

আমি আর কিছু জিগ্যেস করতে পারলাম না, কিন্তু দেশলাইয়ের ওপর রোদ পড়ে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে, এ জিনিসটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

হরি-কা-চরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, দক্ষেশ্বরের মন্দির দেখে বাজারের মনিহারি দোকান

BanglaBook.org

থেকে যখন আমরা তিন-সেলের একটা টর্চ কিনছি, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। যতই ঘুরি না কেন, আর যা-ই দেখি না কেন, ফেলুদার দেশলাইয়ের বাক্সর মধ্যে ওই চকচকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে ওই আওরঙ্গজেবের আংটির হিরের চকচকানি। ফেলুদা যদি বলত ওটা একটা সিকি বা আধুলি—তাহলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্তু ফসফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল, সেটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

আর আংটিটা যদি সত্যিই ফেলুদার কাছে থেকে থাকে, আর সেটার পিছনে যদি সত্যিই ডাকাত লেগে থাকে, আর সে ডাকাত যদি জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছেই আংটিটা আছে—তাহলে? সেটা সে জানে বলেই কি ফেলুদা ওসব হুমকি দেওয়া-দেওয়া কাগজ পাচ্ছে, আর ওর দিকে গুলতি দিয়ে ইঁট মারছে, আর লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্মের ন্যাকড়া বেঁধে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে?

ফেলুদা কিন্তু সারা রাস্তা গুন-গুন করে গান গেয়েছে। একবার গান থামিয়ে আমায় বলল, 'খট বলে একটা রাগ আছে জানিস? এটা সেই রাগ। সকালে গাইতে হয়।'

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে 'খট-টট জানি না, রাগ-রাগিণী জানি না—কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় ধাপ্পা দিলে কেন।' কিন্তু কথাটা আর বলা হল না, কারণ তখন আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। মনে-মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে।

ধরমশালার বারান্দায় দেখি বাবা, বনবিহারীবাবু, শ্রীবাস্তব আর একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন।

বাবা আমাদের দেখেই বললেন, 'ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কাল ভোর ছ'টায় রওনা। বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় বেশ সস্তায় হয়ে গেল।'

বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন—নাম বিলাসবাবু। তিনি নাকি একজন নামকরা হাত-দেখিয়ে। আপাতত বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন। বনবিহারীবাবু বললেন, 'কোনও জানোয়ারের কামড়-টামড় খেয়ে মরব কি না সেটা একবার দেখুন তো।'

ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারীবাবুর হাতের ওপর বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'কই, তা তো দেখছি না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে।'

হতে পারেন বিলাসবাবু হাত-দেখিয়ে, আমার কিন্তু তাঁর পা-টা দেখে ভারি অদ্ভুত লাগল। বুড়ো আঙুলটা তার পাশের আঙুলের চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড়। আর সেটা দেখে মনে হল খুব রিসেন্টলি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি। কিন্তু কোথায় বা কার পা সেটা মনে করতে পারলাম না।

বনবিহারীবাবু একটা হাঁপ-ছাড়ার শব্দ করে বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

'কেন মোশাই, আপনি কি শিকার করেন নাকি? বাঘ-ভাল্লুক মারেন?'

বিলাসবাবুর বাঙলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'নাঃ। তবু—এসব জেনে-টেনে রাখা ভালো। আমার এক খুড়তুতো ভাই—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল। তাই আর কি...'

'আপনি কি আগে কলকাতায় ছিলেন?' বিলাসবাবু জিগ্যেস করলেন।

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, 'ওটাও কি হাতের রেখায় পাওয়া যায় নাকি?'

'তাই তো দেখছি। আর...আপনার কি পুরোনো আমলের শিল্পদ্রব্য বা অন্য দামি জিনিস জমানোর শখ আছে?'

BanglaBook.org

'আমার? না-না—আমার কেন? সে ছিল পিয়ারিলালের। আমার শখ জন্তুজানোয়ারের।'

'তাই কী? তাই কামড় খাওয়ার কথা বলছিলেন? কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

বনবিহারীবাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি সম্প্রতি কোনও উদ্বেগের কারণ ঘটেছে?'

'সম্প্রতি মানে?'

'এই ধরুন—গত মাসখানেকের মধ্যে?'

বনবিহারীবাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, 'মশাই—আমার, যাকে বলে, নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়র্লড। কোনও উদ্বেগ নেই। তবে হ্যাঁ—একটা অ্যাংজাইটি আছে এই যে, কাল লছমনঝুলায় গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাব কি না পাব।

বিলাসবাবুর বোধহয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বনবিহারীবাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—কিছু মনে করবেন না—এসব পামিস্ট্রি-ফামিস্ট্রিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই আমাদের হাতে বটে—কিন্তু সেটা হাতের রেখায় নয়। হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা, সামর্থ্য। সেইটের ওপরেই সব নির্ভর করে।'

এই বলে বনবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে।

অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়ো আঙুলওয়ালা পা।

১০

সারাদিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার কথা জিগ্যেস করার সুযোগ পেলাম না।

রাত্রে বাবা যদিও বললেন, 'তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে—' তবুও খাওয়া-দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে-শুতে প্রায় দশটা হয়ে গেল।

লেপের তলায় যখন ঢুকছি, তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম।

ফেলুদা বলল, 'বিলাসবাবু।'

'আমি বললাম, 'কী করে জানলে?'

'কেন, কাল ট্রেনেও ডাকছিল—শুনিসনি?'

ট্রেনে? বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন? তাই তো। একটা রহস্যের হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল।

'ওই বুড়ো আঙুল।'

ফেলুদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড।'

ঠিক কথা। আমাদের ওপরের বাঙ্কে উনিই সারা রাস্তা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়েছিল বাঙ্ক থেকে, আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আঙুল।

কিন্তু এবার যে আসল প্রশ্নটা করতে হবে ফেলুদাকে। বাবার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছিলাম উনি এখনও ঘুমোননি। বাবা না ঘুমোলে কথাটা বলা চলে না, তাই আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

ধরমশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে সমস্ত শহরটা। শীতকাল,

BanglaBook.org

তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমাদের ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাইরে উঠোনে বোধহয় একটা লাইট জ্বলছে, আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাঠে এসে পড়েছে। একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুট করে একটা শব্দ এল। বোধহয় ইঁদুর-টিদুর কিছু হবে।

এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওঁর জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ। বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ফেলুদার দিকে ফিরলাম। তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিসফিস করে বললাম, 'ওটা আংটিই ছিল, তাই না?'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই মতো ফিস ফিস করে বলল,

BanglaBook.org

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে, সেই প্রথম দিন থেকেই। তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ার পর, ধীরুকাকার ঘরে আলনায় ঝোলানো ওঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে আংটিটা বার করে নিই। বাক্সটা নিইনি যাতে ডেফিনিটলি বোঝা যায় আংটিটা গেছে।'

'কিন্তু কেন নিলে আংটিটা?'

'কারণ ওটা সরিয়ে রাখলে আসল ডাকাতকে উসকে দিয়ে তাকে ধরার আরও সুবিধে হবে বলে।'

'তাহলে সেই সন্ন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন?'

'অম্বিকাবাবু নয়, আরেকজন সন্ন্যাসী, যে নকল। যার হাতে অ্যাটাচি কেস ছিল। সে-ই এসেছিল চুরি করতে, কিন্তু গেট থেকেই বৈঠকখানায় আরেকজন গেরুয়াধারীকে দেখে চম্পট দেয়। তারপর টাঙ্গা করে স্টেশনে ওয়েটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে নেয়।'

'সেই নকল সন্ন্যাসী কে?'

'একটা সন্দেহ আছে মনে, কিন্তু এখনও প্রমাণ পাইনি।'

'এতদিন ধরে তুমি ওই আংটি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ?'

'না।'

'তবে?'

'একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'ভুলভুলাইয়ার একটা খুপরির ভেতর।'

বাপরে বাপ কী সাংঘাতিক বুদ্ধি! এতদিনে বুঝতে পারলাম ফেলুদার দ্বিতীয়বার ভুলভুলাইয়া যাওয়ার এবং গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাওয়ার কারণটা। কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল, তাই জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু তুমি তো ভুলভুলাইয়ার প্ল্যান জানতে না।'

'প্রথম দিনই সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বড় সেটা জানিস তো? প্রথম দিনে হাঁটবার সময় ভুলভুলাইয়ার প্রত্যেকটি গলির মুখে দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়ে ঘষে ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। সাত নম্বর গলির খুপরির মধ্যে ছিল আংটিটা। আমি জানতাম ওর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর নেই। এদিকে হরিদ্বার যাব, অথচ আংটিটা লখ্‌নৌয়ে থেকে যাবে, এটা ভালো লাগছিল না, তাই সেদিন গিয়ে বের করে নিয়ে আসি।'

আমার বুকের ভেতরটা আবার টিপটিপ করতে আরম্ভ করেছে। বললাম—

'কিন্তু সে ডাকাত যদি সন্দেহ করে যে, তোমার কাছে আংটিটা আছে?'

'সন্দেহ করলেই বা। প্রমাণ তো নেই। আমার বিশ্বাস সন্দেহ করেনি, কারণ অত বুদ্ধি ওদের নেই।'

'কিন্তু তাহলে তোমার পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন?'

'তার কারণ, আংটির লোভ ওরা ছাড়তে পারছে না। আর ওরা জানে যে আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন ওদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।'

'কিন্তু—' আমার গলা শুকিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরোচ্ছিল না, কোনওরকমে ঢোক গিলে তবে কথাটা শেষ করতে পারলাম,—'তার মানে তো তোমার সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।'

'বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো ফেলু মিত্তিরের ক্যারেকটার।'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু না। এবার ঘুমো।'

ফেলুদা একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে পাশ বদল করল।

BanglaBook.org

ধরমশালা এখন একেবারে চুপ। দূরে রাস্তায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। পাশের ঘরে নাক ডাকার শব্দ একটানা চলেছে। ঘুম কি আসবে? ফেলুদার টেক্কামার্কা দেশলাই-এর বাক্সে রোদের আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এই আংটির ব্যাপারে কী অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ এটাও ঠিক যে, ও যদি না থাকত, তাহলে হয়তো আংটি চুরিও হয়ে যেত, আর চোর ধরাও পড়ত না।

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট...কিররর কিট কিট কিট...কিরর কিট কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

পাশের ঘর থেকে—কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে—র‍্যাটল স্নেকের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম বনবিহারীবাবু তাঁর প্রিয় সংগীত শুনছেন।

আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে-শুনতে বোধহয় ঘুমটা এসে গিয়েছিল।

বাবার ট্র্যাভলিং ক্লক-এ পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'লছমনঝুলায় একেবারে ব্রিজের মুখেই দোকানে চমৎকার পুরি-তরকারি পাবেন। খাবার নেওয়ার দরকার নেই।'

সকলেই বেশ ভালো করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম। কারণ পথে তো ঠান্ডা হবেই, আর লছমনঝুলার হাইট বেশি বলে সেখানে এমনিতেই এখানের চেয়ে বেশি ঠান্ডা।

পৌনে ছ'টার সময় দুটো ট্যাক্সি পরপর এসে ধরমশালার গেটের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুও এসেছেন। শুনলাম উনিও লছমনঝুলা যাবেন বলে আমাদের দলে ঢুকে পড়েছেন। কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি, এমনসময় বনবিহারীবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'তিনজন তিনজন করে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই। জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, তপেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে আসতে পার।'

আমি বললাম, 'শুধু আমি কেন, ফেলুদাও নিশ্চয় শুনতে চাইবে।'

ফেলুদা কোনও আপত্তি করল না। তাই শেষপর্যন্ত আমি, ফেলুদা আর বনবিহারীবাবু একটা গাড়িতে, আর বাবা, শ্রীবাস্তব আর বিলাসবাবু অন্য গাড়িটায় উঠলাম। শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বনবিহারীবাবু তাঁর কাঠের বাক্সটা রাখলেন। বললেন, 'এইটেতে আমার অজগর আসবে।' পিছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা, আর দুপাশে আমি আর বনবিহারীবাবু বসলাম।

ঠিক সোয়া ছ'টার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা দিল।

শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট লাগল। সামনে পাহাড়। ডানদিকে চেয়ে থাকলে মাঝে-মাঝে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বনবিহারীবাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন, কারণ গুন-গুন করে গান ধরেছেন। বোধহয় অজগরের আশাতেই ওঁর মনের এই ভাব।

ফেলুদাই কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে। কী ভাবছে ও? আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে? সেটা জানার কোনও উপায় নেই। কারণ ও বনবিহারীবাবুর সামনে সিগারেট খাবে না।

বাবাদের ট্যাক্সিটা আমাদের সামনেই চলেছে। ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কী সব যেন বোঝাচ্ছেন। হয়তো শ্রীবাস্তব এই ফাঁকতালে তাঁর হাতটা দেখিয়ে নিচ্ছেন।

BanglaBook.org

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, 'শিশির-ভেজা রাস্তা থেকে এখনও ধুলো উঠছে না, কিন্তু রোদের তেজ বাড়লে উঠবে। আমার মনে হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এই ড্রাইভার—একটু আস্তে চালাও তো দিকি।'

দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথামতো গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল, আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্সি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। ধুলো হোক আর যাই হোক, আমি মনে-মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে, কিন্তু বনবিহারীবাবুর আদেশের ওপর কিছু বলতে সাহস হল না। ভদ্রলোক জানোয়ারের গল্প আরম্ভ করবেন কখন?

একটা গাড়ি যেন পিছন থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বারবার হর্ন দিচ্ছে। বনবিহারীবাবু বললেন, 'এ তো জ্বালাল দেখছি! পাশ দাও হে ড্রাইভার, পাশ দাও—নইলে প্যাঁক-প্যাঁক করে কান ঝালাপালা করে দেবে।'

ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁ-দিকে নিল, আর অমনি একটা পুরোনো ধরনের শেভ্রোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় দেখলাম যে, সে-গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বের করে আমাদের দিকে দেখে নিল।

এ আমাদের চেনা লোক—সেই বেরিলি পর্যন্ত যাওয়া গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

১১

আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমনঝুলা যাব, তারপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার পথে হৃষিকেশটা দেখে আসব। সত্যি বলতে কি, হৃষিকেশ সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। সেও তো তীর্থস্থান—পাণ্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির, এইসব—কেবল গঙ্গাটা একটু অন্যরকম।

বনবিহারীবাবু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন—

'যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী
তব হাল আদ্ পর ক্যা গুজরী!'..

গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন, 'এই গানের সুরে জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি—"কত কাল রবে বল ভারত হে"।'

'ঠিক বলেছ।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বনবিহারীবাবু বললেন, 'Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I Saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম—এটা জানো?'

এটা আমি জানতাম না; শুনে খুব মজা লাগল, আর মনে-মনে মুখস্থ করে নিলাম।

বনবিহারীবাবু বললেন, 'এটার জন্যই বোধহয় আমার গান বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে, আর বন্দুক বলতেই জিম করবেট। শিকারি করবেটের কথা জানো তো?'

ফেলুদা বলল, 'জানি।'

'তিনি কিন্তু এইসব অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ মেরে গেছেন। আমার করবেটকে কেন এত ভালো লাগে জান? কারণ উনিও আমার মতো জানোয়ারদের স্বভাব বুঝতেন, ওদের ভালোবাসতেন।'

এই বলে আবার গুন-গুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু।

BanglaBook.org

গাড়ি ছুটে চলেছে লছমনঝুলার দিকে। বাঁ-দিকে পাহাড়, সামনে পাহাড়, ডানদিকে মাঝে-মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। আকাশে মেঘ জমছে। সূর্যটা এক-একবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, আর তক্ষুনি বাতাসটা আরও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রথম দিকে কেবল লছমনঝুলার কথাই ভাবছিলাম, এখন আবার মাঝে-মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস এ দুদিনে জানতে পেরেছি, কিন্তু আরও অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি আছে। মহাবীর কেন সন্দেহ করে যে পিয়ারিলাল স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি? পিয়ারিলাল কীসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাওয়ার আগে?

BanglaBook

পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? সে স্পাই কি আমার চেনার মধ্যে কেউ, না চেনার বাইরে?

এইসব ভাবতে-ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির সামনে আয়নাটার দিকে চলে গেল। আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে। সে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে।

এবার আমি আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে তার সামনেই বসা ড্রাইভারেব দিকে।

আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকেই ঘুরে ড্রাইভারের দিকে গেল, আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

ড্রাইভারের পাগড়িব নিচে আর কোটের কলারের ঠিক ওপরে ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ।

এরকম দাগ আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দেখেছি।

সে হল গণেশ গুহ।

আবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরে দেখছে। তাকে এমন গম্ভীর এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে যাচ্ছে। আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে চলেছে লছমনঝুলা! হঠাৎ মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছেন। তাহলে কী...?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় চলেছি এখন? লছমনঝুলা, না অন্য কোথাও? বনবিহারীবাবুর উদ্দেশ্যটা কী? অথচ তাঁকে দেখে তো তাঁর মনে কোনওরকম উত্তেজনা বা দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম।

'আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরব এবার। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিছুদূর গেলেই একটা বাড়ি পাব, সেখানেই আমার অজগরটা থাকার কথা। যাওয়ার সময় একবার দেখে যাই, ফেরার পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব। কী বলেন ফেলুবাবু?'

আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল, 'বেশ তো।'

আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না—

'আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমনঝুলায় আছে?'

বনবিহারীবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এটা যে লছমনঝুলা নয় সেটা তোমাকে কে বলল তপেশবাবু? হাওড়া বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায়? লছমনঝুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই। গঙ্গার ব্রিজ এখান থেকে মাইল দেড়েক।

শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা, প্রায় দেখা যায় না, এমন একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁ-দিকে ঘুরল। লক্ষ করলাম ড্রাইভারটা এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না— যেন তার আগে থেকেই জানা ছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

'কেমন লাগছে ফেলুবাবু?'

বনবিহারীবাবুর গলায় একটা নতুন সুর। কথাগুলোর পিছনে যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে।

'দারুণ!'

কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ-হাতটা দিয়ে আমার ডান-হাতটা ধরে আস্তে একটা চাপ দিল বুঝতে পারলাম ও বলতে চাইছে—ভয় পাস না, আমি আছি।

'রুমাল এনেছিস, তোপ্‌সে?'

BanglaBook.org

ফেলুদার এ-প্রশ্নটার জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না, তাই কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

'রু-রুমাল?'

'রুমাল জানিস না?'

'হ্যাঁ—কিন্তু...ভুলে গেছি।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'ধুলোর জন্যে বলছ? এখানে কিন্তু ধুলোটা কম হবে।'

'না, ধুলো না'—বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে আমার পকেটে গুঁজে দিল। কেন যে সে এটা করল তা বুঝতেই পারলাম না।

বনবিহারীবাবু তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিজের কোলের ওপর নিয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলেন। শালবনের ভেতর হাইনা হেসে উঠল।

বন এখন আরও গভীর। সূর্যের আলো আর আসছে না এখানে। এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাবাদের গাড়ি এখন কোথায়? লছমনঝুলা পৌঁছে গেছে কি? আমাদের যদি কিছু হয়, ওঁরা টেরও পাবেন না। সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওঁদের গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন?

মনে যত জোর আছে, সাহস আছে, সব একসঙ্গে জড়ো করার চেষ্টা করলাম। কেন জানি বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার ওপর যতই ভরসা থাকুক না কেন, আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে, তাতে ওর যত বুদ্ধি, যত সাহস আছে, সবটুকু দরকার হবে।

গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন। বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না। এখন কেবল ঝিঁঝির ডাক আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর গাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। এরকম জায়গায় এত গভীর বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল? হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনের কোথায় যেন ফরেস্ট অফিসার। তাঁরও এরকম একটা বাড়ি আছে শুনেছি—আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে। এও হয়তো সেই ধরনের একটা বাড়ি।

আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়িটা কাঠের তৈরি, আর সেটা বহু পুরোনো। শুধু তাই না, বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর তৈরি। একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয়। বাইরে থেকে দেখে মনেই হয় না সেখানে কোনও লোক থাকে।

আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে থামল। বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাঁড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না। তবে এসেইছি যখন, তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাঠ সংগ্রহ করতে বোধ হয়। একা মানুষ তো, সব নিজেই করেন। আর ওঁর অত জানোয়ারের ভয় নেই। আমারই মতো। এসো ফেলুচন্দ্র, তপেশচন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক। মেকি সন্ন্যাসী তো অনেক দেখলে। এবার একজন সত্যিকারের সাধুপুরুষ কীভাবে থাকেন দেখবে চল।'

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা না থাকলে আমার মনের অবস্থা যে কী হত জানি না। এখনও যে সাহস পাচ্ছি তার একমাত্র কারণ হল ফেলুদার নির্বিকার ভাব। এক-এক সময় তাই মনে হচ্ছে বিপদটা হয়তো আসলে আমার কল্পনা। আসলে ড্রাইভার সত্যিকারের শিখ ড্রাইভার, আর বনবিহারীবাবু খুব ভালো লোক, আর এই বাড়িটায় সত্যিকারের পাঁড়েজি বলে একজন সাধুপুরুষ থাকেন যাঁর কাছে একটা বারো ফুট লম্বা অজগর সাপ আছে, আর সেটা দেখার জন্যই বনবিহারীবাবু এখানে আসছেন।

আগাছা আর শুকনো শালপাতার ওপর দিয়ে হেঁটে কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম।

BanglaBook.org

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার চেয়ে খুব বেশি বড় নয়। ঢোকার দরজা ছাড়াও আরেকটা আছে, সেটা দিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়—কিন্তু মনে হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। দুটো দরজার উলটো দিকে দুটো ছোট্ট জানালাও রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা যাচ্ছে। মাচাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয়।

বনবিহারীবাবু কাঁধে ঝোলানো টেপরেকর্ডার মাটিতে নামিয়ে রেখে বললেন, 'পাড়েজির কেমন সরল জীবনযাত্রা, দেখেই বুঝতে পারছ।'

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি, আর একটা টিনের চেয়ার। ফেলুদা বেঞ্চিটার ওপর বসল দেখে আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম।

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, দেশলাইটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, টিনের চেয়ারটা মজবুত কি না হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে, মুখ দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে সেটার ওপর বসলেন। তারপর পাইপটাতে একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে, চাপা অথচ পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—

'তারপর, ফেলুবাবু—আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই।'

১২

'আপনার আংটি?'

বনবিহারীবাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা বুঝতে পারলাম।

বনবিহারীবাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অল্প হাসি নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। বাইরে ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে। ফেলুদা বলল—

'আর সে আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কী করে জানলেন?'

বনবিহারীবাবু এবার কথা বললেন।

'অনুমান অনেক দিন থেকে করছিলাম। বাইরের একটা লোক এসে ধীরুবাবুর শোওয়ার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বের করে নিয়ে যাবে, এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও, এতদিন প্রমাণ পাইনি। এখন পেয়েছি।'

'কী প্রমাণ?'

বনবিহারীবাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপরেকর্ডারটা কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন। যা শুনলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। চাকা ঘুরছে, আর যন্ত্রটা থেকে আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে—

'ওটা আংটিই ছিল—তাই না?'

'তুই যখন জেনেই ফেলেছিস, তখন আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না। আংটিটা আমার কাছেই রয়েছে—সেই প্রথম দিন থেকেই।—'

বনবিহারীবাবু খট করে রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, 'কাল রাত্রে তোমরা শোওয়ার আগেই মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়ার তলায় রেখে এসেছিলাম। অবিশ্যি তোমরা যে ঠিক এই বিষয়েই কথাবার্তা বলবে সেটা আমার জানা ছিল না, কিন্তু যখন বলেইছ, তখন কি আর এ সুযোগ ছাড়া যায়? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কী দরকার আছে তোমার—অ্যাঁ, ফেলুবাবু?'

'কিন্তু আংটিটা আপনার, সে কথা আপনি বলছেন কী করে?'

বনবিহারীবাবু রেকর্ডারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান

BanglaBook.org

দিয়ে বললেন, '১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো বছর আগে, কলকাতার নৌলাখা কোম্পানি থেকে দু-লাখ টাকা দিয়ে আমি ও আংটিটা কিনি। পিয়ারিলালের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার কিছু পরেই। তাঁর যে এসব জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আংটিটা আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম। দেখে তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা যা হয়েছিল, তাতেই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। তার দু-দিন পরেই আংটিটা আমার বাড়ি থেকে লোপ পেয়ে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তারপর লখ্‌নৌ এসে ক'বছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন। পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি

BanglaBook.org

প্রথম অ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন। তাই মানে-মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম, তিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন, তাহলে শ্রীবাস্তবকে বললে নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন। শ্রীবাস্তবকে তার দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য কী জান? পিয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন। বললেন, আমার কাছে ওরকম আংটি উনি কোনওদিন দেখেননি। অথচ সে আংটির রসিদ পর্যন্ত রয়েছে এখনও আমার কাছে।'

এবার ফেলুদা কথা বলল, আর তার গলার স্বরে ভয়ের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

'কিন্তু বনবিহারীবাবু, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন।'

বনবিহারীবাবু বললেন, 'আগে বলো সে-আংটি এখনও তোমার কাছেই রয়েছে, না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছ। নিজের জিনিস আমি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই।'

এবারে ফেলুদার গলায় বিদ্রূপের ইঙ্গিত—

'কিন্তু এত দিন তো অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার ব্যাপারে, এবং আমার পিছনে লাগার ব্যাপারে আপনার উৎসাহের কোনও অভাব দেখিনি। আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি—যিনি আজ দাড়ি-পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন, তিনিই তো বোধহয় সেই নকল সন্ন্যাসী, তাই না? শ্রীবাস্তবের বাড়ির ডাকাতও তো বোধহয় তিনিই, আর প্রথম দিন শ্রীবাস্তবকে ধাওয়া করার ভারও তো তাঁর ওপরেই ছিল। অবিশ্যি পরে শ্রীবাস্তবকে ছেড়ে আমার পিছনে লাগানো হয় তাকে। রেসিডেন্সিতে গুলতি মারা, ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা, হুমকি-কাগজ ছুঁড়ে মারা—এ সবই তো তার কাজ, তাই না?'

বনবিহারীবাবু একটু হেসে বললেন, 'সব কাজ তো আর নিজে করা যায় না ফেলুরাম। এমন কিছু-কিছু কাজ সব সময়েই থাকে যার ভার অন্যের ওপর দিতে হয়। আর বুঝতেই তো পারো—গণেশের স্বাস্থ্যটা তো ভালো, কারণ সে এককালে সার্কাসে বাঘ সিংহ হ্যান্ডল করেছে—সুতরাং ডানপিটেমোর কাজগুলো সে ভালোই করে। আর এটা আমি অবশ্যই বলব যে, আমার হুকুমে এসব কাজগুলো করে সে যে-অপরাধ করেছে, তোমার অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তুমি যে-আংটি তোমার কাছে ধরে রেখেছ, তাতে তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার জিনিস, আমার প্রপার্টি। এবং সেটা আমার ফেরত চাই—আজই, এখনই!'

শেষ কথাগুলো বনবিহারীবাবু বললেন প্রায় চিৎকার করে। মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হাত-পা কীরকম যেন ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

ফেলুদার উত্তরটা এল ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে—

'খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে পর ও-আংটি কি আপনার কোনও কাজে আসবে?'

বনবিহারীবাবু প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা! যাকে তাকে ঝপ করে খুনি বলে দিচ্ছ।'

'যাকে তাকে বলতে যাব কেন। আমার বিশ্বাস খুনিকেই খুনি বলছি। আপনি পিয়ারিলালের স্পাই-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি? পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।'

বনবিহারীবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'ভেরি সিম্পল। খুলে বলার কিছু নেই। আমি আংটিটা সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্য ওঁর পিছনে কিছু লোক লাগিয়েছিলাম। পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

'আমি যদি বলি পিয়ারিলালের স্পাই-এর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও সম্পর্ক নেই?'

BanglaBook.org

'তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় অ্যাটাকের দিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'তাতে কী হয়েছে? আমি গেলেই তাঁর অ্যাটাক হবে? তাঁর বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি।'

'তখন তো খালি হাতে গেছেন।'

'খালি হাতে মানে?'

'কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি। আপনার সঙ্গে একটা বাক্স ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার চিড়িয়াখানার একটা অধিবাসী—আপনার বিশাল, বিষাক্ত আফ্রিকান মাকড়সা—ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, তাই না? পিয়ারিলাল বলতে চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই'।'

বনবিহারীবাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু...তাঁকে আমি মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কী?'

ফেলুদা বলল, 'পিয়ারিলালের আরশুলা দেখে হৃৎকম্প হয় সেটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না। আপনি হয়তো মাকড়সাটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গেল একেবারে হার্ট অ্যাটাক, এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু। এ মৃত্যুর জন্য আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন? আর আপনি বলছেন আংটিটা আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন। আমি যদি বলি, আংটি পিয়ারিলাল কিনে কলকাতায় আঠারো বছর আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন। আর সেই থেকে আপনার ও আংটির ওপর লোভ—আর আপনার বাড়ির ওই তালা-দেওয়া বন্ধ ঘরে এরকম আরও অনেক পুরোনো জিনিস আপনার আছে, আর ওইসব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই আপনার ওই চিড়িয়াখানা?'

বনবিহারীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আর কী বিশ্বাস কর সেটা শুনতে পারি কি?'

ফেলুদা গম্ভীরও গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন। আমার বিশ্বাস পিয়ারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনওদিন চোখেও দেখতে পাবেন না, আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি।'

'গণেশ!'

বনবিহারীবাবুর গুরুগম্ভীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গমগম করে উঠল।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'মুখে রুমাল চাপা দে!'

কেন একথা বলল জানি না—কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ফেলুদার দেওয়া রুমালটা বের করে মুখের ওপর চাপা দিলাম।

গণেশ গুহ ঘরের ভেতর এসে ঢুকল—হাতে সেই কাঠের বাক্স।

বনবিহারীবাবু দেখি টেপরেকর্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করল, আর তার সঙ্গে সেই মাজনের কৌটোটা—যাতে লেখা 'দশাংসংস্কারচূর্ণ'।

গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে ফেলুদা কৌটোটার ঢাকনা খুলে তার ভেতর থেকে এক খাবলা কী জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর বনবিহারীবাবুর দিকে ছুড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল।

আমার রুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এল তাতে বুঝলাম সেটা গোলমরিচ।

সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দু-জনের চোখে নাকে ঢুকে ওদের যে কী অবস্থা হল তা বলে

BanglaBook.org

বোঝাতে পারব না। প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের মুখ একেবারে বেঁকে গেল, তারপরে একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হল হাঁচি আর আর্তনাদ। বনবিহারীবাবু টলতে-টলতে দরজার বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লেন। গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা। তবু সে যাওয়ার সময় কোনওরকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে গেল।

এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতর থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সেই হাড়কাঁপানো শব্দ—

'কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌—কির্‌র্‌র্‌ কিট্‌ কিট্‌ কিট্‌...'

আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভেতরটা কেমন জানি করছে, বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিল, আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে।

খুব বেশি ভয় পেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয় সেটা এখন বুঝতে পারলাম। যার থেকে ভয়, তার দিকেই যেন চোখটা চলে যায়। কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা আছে। মাথা ঝিম-ঝিম অবস্থাতেই স্পষ্ট দেখলাম র‍্যাট্‌ল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে ঝুমঝুমির শব্দ করতে-করতে এদিক-ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরাল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদেরই বেঞ্চির দিকে প্রায় যেন আমাকে লক্ষ করেই এগোতে লাগল।

বুঝলাম আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে তিন হাত দূরে, তখন হঠাৎ মনে হল যেন একটা বাজ পড়ল, আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর। একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা কানফাটা আওয়াজ, আর তার পরেই বারুদের গন্ধ।

আর সাপ?

সাপের মাথা দেখলাম থেঁতলে শরীর থেকে আলগা হয়ে পড়ে আছে। ঝুমঝুমিটা দু-একবার নড়ে থেমে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যেই একটা সতরঞ্চির ওপর শুয়ে আছি। কপাল আর মাথাটা ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে—বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে। শ্রীবাস্তবের মুখটা প্রথম চোখে পড়ল—আর তার পরেই বাবা।

'কেমন আছেন তপেশবাবু—'

গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি—মহাবীর। কিন্তু গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন?

মহাবীর বলল, 'ট্রেনে বেরিলি পর্যন্ত একসঙ্গে এলাম, আর চিনতে পারলে না?'

দারুণ মেক-আপ করে তো লোকটা! দাড়িওয়ালা অবস্থায় সত্যিই চিনতে পারিনি। আর তাছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢং-ও বদলে গেছিল।

মহাবীর বলল, 'আমার রিভলবারের টিপ দেখলে তো? আসলে যেদিন ভুলভুলাইয়ায় দেখা হল, আর উনি বললেন আমাকে চেনেন না—সেদিন থেকেই বনবিহারীবাবুর ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন, আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। একদিন বাবার সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল—ওই আংটিটা নিয়েই। সেটাও আমার কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে।'

বাবা বললেন, 'তোদের দেরি দেখে লছমনঝুলা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের

BanglaBook.org

দাগ দেখে বনেব রাস্তাটা ধরে ভেতরে ঢুকেছি। মহাবীরবাবুই অবিশ্যি গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম বলেন।'

'আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন?'

'গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে। ফেলুর ব্রহ্মাস্ত্রের তুলনা নেই। ওরা এখন পুলিশের জিম্মায় আছে।'

'পুলিশ কোত্থেকে এল?'

'সঙ্গেই তো ছিল। বিলাসবাবু তো আসলে ইন্সপেক্টর গরগরি।'

কী আশ্চর্য। ওই হাত-দেখিয়ে ভদ্রলোকই ইন্সপেক্টর গরগরি। এমন অদ্ভুত ভাবে যে আংটির ঘটনাটা শেষ হবে তা ভাবতেই পারিনি।

কিন্তু ফেলুদা? ফেলুদা কোথায়?

ওর কথা মনে পড়তেই আমার চোখে একটা ঝিলিক-মারা আলো এসে পড়ল। যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা আঙুলে আংটিটা পরে কিছুদূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের ওপর ফেলে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমার চোখে ফেলছে।

আমি মনে-মনে বললাম—এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই।

অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়

BanglaBook.org

দু-মুখো সাপ

BanglaBook.org

সমরেশ বসু

শ সে ব উ ২—৪১

খুট করে একটি শব্দ, আর খাটের শিয়রের দিকে দেওয়ালের একশো পাওয়ারের বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। অশোক বুকের নীচে বালিশ চেপে, উপুড় হয়ে, পা ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাথা নিচু করে বই পড়ছিল। ও মুখ না তুলে বা না ফিরিয়েই বলে উঠল, 'ফাইন। ভাবছি উঠে বাতিটা জ্বালি, কিন্তু এমন নেগেটিভ-পজেটিভ ইলেকট্রিকের তার জুড়ে যাওয়া লেখা, একদম চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে।' বলে পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

ঘরে ঢোকবার দরজার কাছ থেকে ততক্ষণে কাঞ্চন চলে এসেছে খাটের সামনে ডিম্বাকৃতি শ্বেত পাথরের টেবিলের কাছে। হাতে তার ডিশের ওপর বসানো ধূমায়িত চায়ের কাপ। সেটা ঠক করে বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর, এবং অশোকের দিকে না তাকিয়েই পিছন ফিরে পা বাড়িয়ে বলল, 'তাতে তো যদ্দুর জানি, শক খেয়ে পুড়ে মরার কথা, তার তো কোনও লক্ষণ দেখছি না।'

'আরে, পুড়েই তো মরছি। তা বলে তুমি চললে কোথায়?' অশোক বুকের নীচের বালিশ সরিয়ে উঠে বসল : 'আমি আসলে বলছিলাম, ইলেকট্রিকের কারেন্টের মতো টেনে রেখেছে এমন লেখা। ছেড়ে উঠতেই পারছিলাম না। অথচ এমন গাঁজাখুরি ব্যাপার—।'

কাঞ্চন দরজার কাছে পৌঁছে বলে উঠল, 'আর এক গাঁজাখোরের খেয়ালই নেই, শীতের ছোট বেলা, ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। অবিশ্যি গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের তো আবার বাঘের চোখ। অন্ধকারেও দেখতে পায়, চোখ খারাপ হওয়ার কোনও ভয় নেই। বাতিটা কি তা হলে অফ করে দিয়ে যাব?'

'না-না, অফ করবে কী!' অশোক বলল চোখ বড় করে, 'আলোরই দরকার। কথা আছে, শোনো।'

কাঞ্চন ফিরে তাকাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার বিকেলের গা-ধোয়া সারা। মাঝখানে লাল সিঁথির দু-পাশের ঘন চুল টেনে আঁচড়ানো। মাথার পিছনে উঁকি দিয়ে আছে পিছনের মোটা বিনুনির আঁট বাঁধা খোঁপার অংশ। অনুমান করার দরকার হয় না, সেটাও সদ্য বাঁধা, আর সাদা জামার ওপরে সদ্য পাট-ভাঙা তাঁতের শাড়ি। চওড়া বেগুনি পাড়ে বেগুনি ডোরা আটপৌরে ধরনে পরা। কাঞ্চনের প্রসাধনের তেমন বালাই নেই। নেহাত শীতের দিন বলেই মুখে সামান্য ক্রিমের প্রলেপ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। কাঁচা সোনা রং বলতে যা বোঝায়, সেই রকম রং, কিন্তু নীরক্ত না। ঠোঁটের রং স্বাভাবিক লাল, আয়ত কালো চোখে বা সরু টানা ভুরুতে কোনওকালেই কাজল বা কালি টানে না। গলায় একটি সরু সোনার হার, হাতে শাঁখা-নোয়া আর কয়েক গোছা করে সোনার চুড়ি। পায়ের আলতাও সদ্য রাঙানো। ওটাকে প্রসাধন না বলে, প্রাচীন ঠাকুরবাড়ির সধবাদের জীবনযাত্রার সাবেকি অঙ্গ বলা চলে।

চকমিলানো থামওয়ালা ঢাকা বারান্দা এই বিরাট বাড়ি যার গায়ে-গায়ে আরও কয়েকটি বাড়ি, খিড়কি দরজা দিয়ে যাতায়াতের যোগাযোগ আছে, সবগুলো বাড়িই সাবেকি আমলের। কলকাতার উত্তর শহরতলি, ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, এই সাবেকি বাড়িগুলো নিয়েই প্রায় একটি পাড়া। পাড়ার নাম ঠাকুরপাড়া, বাড়িগুলোর পরিচয় ঠাকুরবাড়ি। অশোক এমনই এক ঠাকুরবাড়ির বর্তমান বংশধরদের কনিষ্ঠতম। ওর ওপরে দুই দাদা। চল্লিশোর্ধ্ব বড়দা অবনী ঘোরতর সংগীতসাধক, ধ্রুপদ-ধামার নিয়ে ওর জগৎ। ভোরের দিকেই বিশেষ করে নীচের তলায় রাস্তার ওপরে রকের ধারে কয়েকটি ঘরের একটিতে তার সাধনা চলে তারস্বরে, তানপুরা আর হারু মুচির পাখোয়াজের সংগত সহযোগে। আর এক ঘরে বসে মেজদা অচিন্ত্যর জ্যোতিষীচর্চার আসর। তার হাঁকডাকও কম না। সেখানে শনি, মঙ্গল, রাহু, লগ্ন, নক্ষত্রাদির জটিল অবস্থান নিয়ে বিতর্কের ঝড়ও শুরু হয়ে যায় সকাল থেকেই। অশোক বেছে নিয়েছে রকের মন্দির সংলগ্ন একটু দূরের এক ঘর। ওর ঘরের আড্ডায় প্রধানত চলে সমসাময়িক রাজনীতির তর্ক-বিতর্ক, শহরের নিত্যনতুন ঘটনার

BanglaBook.org

ফিরিস্তি আর ব্যাখ্যা এবং তার সঙ্গে অবিশ্যিই অপরাধতত্ত্বের আলোচনা। মাঝে-মাঝে বসে তাসের আসর।

এ বাড়ি আর অন্যান্য ঠাকুর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের বাড়ির পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই ছিলেন স্মার্ত, ন্যায়তীর্থ, তর্কচূড়ামণি, যাঁদের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। সেইসঙ্গে ভারত জুড়ে যজমানি যার আয় জমিদারির থেকে কোনও অংশেই কম না। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের মধ্যে কারওরই এখন আর ন্যায়স্মৃতির চর্চা নেই, কেউ-কেউ যজমানি করে। কিন্তু আগের সেই রমরমা নেই। অশোক আর ওর দুই দাদাও সেদিকে যায়নি। তিনভাইয়ের কেউ বিয়ে করেনি। দূরের জেলায় ও কাছেপিঠে যা কিছু সম্পত্তি আছে, সেসব দেখাশোনা করার জন্য এখনও বাবার আমলের দপ্তরহীন নায়েবমশাই আছেন। এ শহরেও কয়েকটি বাড়ি, দোকানপাটের ভাড়া আদায় সবই তাঁর হাতে। তিনি তিনভাইকে যা হাতে তুলে দেন, তা নিয়েই তিনভাইয়ের জীবনধারণ। অবিশ্যি সেই আয়ের অঙ্কটা কিছু কম না। এ জীবনের মতো তিনভাইয়ের অনায়াসেই চলে যাবে, যাচ্ছেও। একরকমের অলস জীবনযাপন বলা যায়, যদিও সকলেই কিছু-না-কিছু নিয়ে ব্যস্ত। লোকে বলে ঠাকুরবাড়ির পাগলা-গারদ, কেউ বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তা বলুক, ওদের কানে তুলো, পিঠে কুলো।

বাড়ির মধ্যে তিনভাইয়ের অভিভাবিকা বলতে এক বিধবা প্রৌঢ়া পিসিমা। আসলে তিনি ভাইপোদের রান্নাবান্না, খাওয়ানো নিয়েই থাকেন। বাকি দেখাশোনা বাড়ির পুরনো বয়স্ক দুই দাসী ও ভৃত্যের ওপর।

কাঞ্চন হল পাশের জ্ঞাতিবাড়ির একমাত্র বংশধর গোবিন্দদার বউ। গোবিন্দদা বিকলাঙ্গ, কিন্তু প্রচুর সম্পত্তির মালিক, অতএব কাঞ্চনের মতো একটি রূপসী বধূ জোটাতে এ দেশে অসুবিধে হয়নি। কাঞ্চনের পেটে বিদ্যাও আছে। কলকাতার দক্ষিণে প্রায় গ্রামাঞ্চলের মেয়ে হলেও ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার কলেজে বি. এ. পাশ করেছে। কিন্তু ওর গরিব বাবা-মায়ের মতে জামাই ভাগ্যটা নাকি ভালোই, কারণ মেয়ে তাদের রাজেন্দ্রাণী হয়েছে। আসলে রাজার স্বপ্নটা বোধহয় কাঞ্চনের বাবার মনেই। জামাইয়ের অবর্তমানে মেয়েই গোবিন্দ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তির মালকাইন হবে। এখনও প্রাপ্তিযোগটা কিছু কম না। আর রাজেন্দ্রাণীটিকে দেখলেই বোঝা যায়, হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর নিয়ে একটি কুমারী মেয়ে একটা ঘোর-লাগা যেন অবাক জিজ্ঞাসু চোখে বিশাল বাড়িতে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। শয্যাশায়ী বিকলাঙ্গ স্বামীর সেবা করে চলেছে। কেবল অশোকের ঘরে এলে ওর অবাক জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। সারাদিনের বোবামুখে কথা ফোটে, রাগ-অভিমান থেকে চটুল চপলতা সব মিলিয়ে একটি স্বাভাবিক মেয়ে হয়ে ওঠে। আর অশোকের সকালে ঘুম ভেঙে প্রথম চায়ের কাপ জোটে কাঞ্চনের কাছ থেকে এবং বিকেলেও এক কাপ। এ অলিখিত চুক্তিটি যে দুজনের মধ্যে কবে থেকে, কেমন করে লেখা হয়েছিল নিজেরাই মনে রাখেনি।

অশোকের ডাক শুনে কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল, চোখে সন্দেহ, 'কী কথা শুনতে হবে? তোমার ওই বইয়ের গাঁজাখুরি গপ্‌পো?'

'আসলে সত্যি গাঁজাখুরি নয়।' অশোক বলল, 'পড়লে মনে হয় গাঁজাখুরি, কিন্তু একেবারে সত্যি ঘটনা। যাকে বলে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।'

কাঞ্চন দরজার কাছ থেকেই বলল, 'তোমার স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন শোনার সময় নেই। আমাকে সন্ধেবাতি দিতে হবে।'

'বইয়ের গপ্‌পো তোমাকে শোনাব না।' অশোক ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে একবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখে নিল।

'সন্ধে তো এখনও হয়নি, আকাশে এখন শেষবেলা। তা ছাড়া, তোমার আনা চা খাওয়া পর্যন্ত একটু থাকবে তো, সেটাই আমাদের শর্ত।'

কাঞ্চন ঘাড় কাত করে বলল, 'শর্ত? শর্ত আবার কীসের?'

BanglaBook.org

'থুড়ি, শর্ত না। আসলে তোমার আনা চা তোমার সামনে না খেলে এ-চায়ের কোনও স্বাদই থাকে না।' অশোক ঝুঁকে পড়ে শ্বেত পাথরের টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিল। ছোট একটা চুমুক দিয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

কাঞ্চনের লাল ঠোঁট বেঁকে উঠল, 'ন্যাকামি।'

'সত্যি, তোমার মুখে ওই কথাটা শুনতে এত ভালো লাগে।' অশোক চায়ের কাপে আবার একটা চুমুক দিল, 'মনে হয় চায়ের থেকেও বেশি স্বাদ। কাছে এসো না একটু।'

কাঞ্চন সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে, 'বলো, কী বলবে।'

'মেজাজটা ভালো নেই মনে হচ্ছে?'

'না, ভালো নেই।'

'কেন, গোবিন্দদার শরীরটা ভালো নেই নাকি?'

'কেন ভালো থাকবে না?'

'তা অবিশ্যি বটে, তোমার সেবার একটা গুণ আছে তো।' অশোক একটা নিশ্বাস ফেলে চায়ের কাপটা রাখল টেবিলে। বালিশের কাছে রাখা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই টেনে নিল, 'তা হলে তোমার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে নাকি?'

'দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?'

অশোক যেন খারাপ-ভালো যাচাই করার জন্যই ঝুঁকে পড়ে দেখল কাঞ্চনের পায়ের দিকে। আস্তে-আস্তে মুখ তুলে তাকাল কাঞ্চনের মুখের দিকে। কাঞ্চনের ভুরু কোঁচকানো, তবু মুখে ঈষৎ লাল ছটা লাগল। অশোকের দেখার দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, কাঞ্চনের চোখের পাতা নত হল, বলল, 'ইয়ারকি।'

'মেজাজটা তোমার সত্যি খারাপ দেখছি।' অশোক ওর কিংসাইজ সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়ার আড়াল থেকে বলল, 'মেজাজটা যখন খারাপ, তখন কষ্ট করে চা আনতে গেলে কেন?'

কাঞ্চন চোখ তুলে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, চোখের তারায় ঝিলিক, ঠাকুরমশাইয়ের অভিমান হয়ে গেল?'

অশোক কপট উদাস স্বরে বলল, 'না, মন-মেজাজ যখন ভালো নেই—।'

'কেন থাকবে জিগ্যেস করি?' কাঞ্চন ঘাড় কাত করে তাকাল, আর ওর খোলস ছাড়ানো কুচকুচে কালো কালকেউটে সাপ জড়ানোর মতো খোঁপাটা অনেকখানি দেখা গেল, 'কথা কী ছিল এ-বেলা?'

এবার অশোকের চোখে ভুরু কোঁচকানো জিজ্ঞাসা, 'কী কথা বলো তো?'

'বলব কেন?' কাঞ্চনের চোখে রহস্য। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা প্রদীপের বাঁক নিল, 'খুনের তদন্তে যার শ্যেন চক্ষে কিছু ফাঁক যায় না, একটা সামান্য কথা তার মনে থাকে না?'

অশোক ঠোঁট ভুরু কুঁচকে সিগারেটে ঘনঘন কয়েকটা টান দিল, তারপরেই চোখ বড় করে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওহ্‌হো, আজ এ-বেলা যে তোমার কাছে গিয়ে চা খাওয়ার কথা ছিল! এখন কী হবে বলো তো?'

'হবে হাতি আর ঘোড়া।' কাঞ্চনের মুখ গম্ভীর, 'আমি অপেক্ষা করে-করে বুঝলাম, বাবু নিশ্চয় ভুলে গেছেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচের আড্ডাঘরে জমে গেছেন, নয়তো কোনও বিদঘুটে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন।'

অশোক দু-হাতে দু-কান আর নাক মলে বলল, 'এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, তবে—।' কথা শেষ না করেই ও অনেকখানি ঝুঁকে কাঞ্চনের একটা হাত ধরার চেষ্টা করল।

কাঞ্চন তার আগেই এক পা সরে গেল, 'থাক, খুব হয়েছে। এদিকে চা ঠান্ডা হচ্ছে।'

BanglaBook.org

অশোক বইটা তুলে বিছানায় আছাড় মেরে ফেলে বলল, 'এই বিদঘুটে চুম্বকি বইগুলো হল যত নষ্টের গোড়া।'

ও চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল।

'এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ, বইটার নেহাত প্রাণ নেই।' কাঞ্চনের স্ফুরিত ঠোঁটে রুদ্ধ হাসি, 'মনের টানটা কতখানি, ওতেই বোঝা যায়।'

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, আমার মনটা—।'

'সবসময় এখানে পড়ে আছে।' কাঞ্চন বাধা দিয়ে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলে উঠল।

অশোক কাঞ্চনের আঁচল-ঢাকা বুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন নিশি-পাওয়া হয়ে গেল, কেবল শব্দ করল, 'অ্যাঁ'।

ইতিমধ্যে কাঞ্চনের মুখে লেগেছে লজ্জার ছটা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বলল, 'আমি চলি।'

'প্লিজ, কাঞ্চন।' অশোক ডাকল।

কাঞ্চন ডাকে ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল, 'কাঞ্চন।'

'থুড়ি, বউদি।' অশোক যেন খুব বিব্রত মুখে হাসল, 'কিন্তু সত্যি বলছি, একেবারে ভেতর থেকে স্বতো-স্বতো-আহ্ কী কথাটা—হ্যাঁ, স্বতোৎসারিত—।'

'থাক, স্বতোৎসারিত কি ন্যাকামো আমার জানবার দরকার নেই।' কাঞ্চন বলল, 'নাম ধরে ডাকার মতো ক্ষমতা থাকা দরকার। তা যখন নেই, ডাকাডাকিরও দরকার নেই।'

অশোক কাঞ্চনের চোখের দিকে তাকাল, কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। কাঞ্চন বলল, 'বোকার মতো তাকিয়ে থেকো না, চা খেয়ে কাপ দিয়ে দাও।'

'এই দিচ্ছি।' অশোক একটা নিশ্বাস ফেলে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল, 'আসলে তখন বলতে যাচ্ছিলাম—যখন ঘরে এলে, তোমাকে দেখে কালীঘাটের জীবন্ত পটের মতো মনে হচ্ছিল।'

কাঞ্চন উদাস স্বরে বলল, 'পট তো আমি বটেই, তবে জীবন্ত কি না জানিনে।'

'এখন অবিশ্যি আর তা বলতে ইচ্ছে করছে না।' অশোক কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখল, 'একটা ফুলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

কাঞ্চন ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'সিলেটের লোকেরা একটা ফুলের নাম বলে সন্ধ্যাচণ্ডী। ঢাকার লোকেরা বলে সন্ধ্যামালতী। আমাদের বাবা-জ্যাঠারা বলতেন কেষ্টকালী। আসলে নামটা কী বলো তো?'

কাঞ্চন অবুঝ চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানিনে তো?'

'কৃষ্ণকলি।' অশোক হাসল, 'সন্ধেবেলার নিরালায় যে ফুল ফোটে। তোমাকে দেখে মনে হল, সন্ধেয় ফোটা কৃষ্ণকলি।'

কাঞ্চনের চোখের তারায় বাঁকা ঝিলিক। ঠোঁটের কোণে বাঁকা রেখা, 'সত্যান্বেষী নাকি গোয়েন্দা, সে আবার কবি হল কবে? তা ছাড়া আমি আবার ফুটলামই বা কবে?' ঈষৎ ম্লানতা নেমে এল মুখে।

'যে ফোটে, সে দেখতে পায় না।' অশোক বলল, 'যে দেখতে পায়, সে দ্যাখে। এমনকী কৃষ্ণকলির হালকা মিষ্টি গন্ধটাও পাচ্ছি।'

কাঞ্চন টেবিল থেকে কাপ-ডিশ তুলে নিল, 'একদিন তো বলছিলে, তুমি মড়ার গন্ধ পাও। অপরাধের গন্ধও পাও। ফুলের গন্ধও পাও নাকি?'

'তার মানে, তুমি আমাকে আবার সেই পিশাচ বলছ?' অশোক সাবেকি উঁচু খাট থেকে নামবার উদ্যোগ করে দু-পা নীচে ঝোলাল।

কাঞ্চন বলল, 'মোটেই না। তুমি বলেছিলে, তাই বললাম।' ও পিছন ফিরতে উদ্যত হল।

'শোনো—।'

BanglaBook.org

'ছোট ভাই।' অশোকের কথার শেষের আগেই দরজার কাছ থেকে ডাক শোনা গেল।

অশোক-কাঞ্চন দুজনেই দরজার দিকে তাকাল। বাড়ির প্রাচীন প্রৌঢ় ভৃত্য হরেরামদা। অশোকের বাবা বেঁচে থাকতে তাঁকে ডাকত 'বাবা'। আর তিনভাইকে, 'বড় ভাই', 'মেজো ভাই', 'ছোট ভাই'। অশোক জিগ্যেস করল, 'কী বলছ হরেরামদা?'

'তোমার একটা টেলিফোন এয়েছে।' হরেরাম বলল, 'সেই তোমার হুমকানো দারোগাবাবু না সি. আই. সাহেব। জিগ্যেস করল, তুমি বাড়ি আছ কি না। থাকলে তোমার সঙ্গে এক ভদ্দরলোক দেখা করতে আসবেন।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'কে ভদ্রলোক? নামধাম কিছু বলল?'

'না। বললে, বিশেষ জরুরি দরকার।' হরেরাম বলল, 'দারোগাসাহেব কী কাজে আটকে গেছে, তা নইলে ভদ্দরলোকের সঙ্গে আসত। এখন কী বলব?'

অশোক চকিতে একবার কাঞ্চনের মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'দেখা যাক ভদ্রলোকটি কে। হরেরামদা, তুমি আসতে বলে দাও।'

হরেরাম চলে গেল। কাঞ্চন বলল, 'অপরাধের গন্ধ পাচ্ছ নিশ্চয়? শুঁকতে থাকো, আমি চলি।'

অশোক হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের আঁচলটা ধরল, বলল, 'আজ দেখছি সত্যি তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই।'

'তার জন্যে আঁচল টেনে ধরার দরকার নেই।' কাঞ্চনের একহাতে কাপ-ডিশ, অন্য হাতে আঁচলটা ছাড়াবার চেষ্টা করল, 'আমার এখন অসুখ।'

অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'অসুখ? ওহ্, মানে ইয়ে?'

'ইয়ে নয়, হিয়ে।' কাঞ্চন ঝটিতি আঁচলটা ছাড়িয়ে নিল, 'অসুখ আমার হিয়েতে।' হাসতে-হাসতে দ্রুত চলে গেল দরজার কাছে।

কাঞ্চন অদৃশ্য হওয়ার আগেই অশোক গলা তুলে বলল, 'রাত্রে একবার তোমার কাছে যাব।'

'দরজা বন্ধ থাকবে।' কাঞ্চন ঘরের বাইরে পা দিয়ে বলল।

অশোক বলল, 'তা হলে পাঁচিল টপকাব।'

'ভেতরের দরজাও বন্ধ থাকবে।' কাঞ্চন ঘরের বাইরে দালানে।

অশোক বলল, 'দরজা ভাঙব।'

কাঞ্চন দালানে ফিরে দাঁড়াল, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে বলল, 'তার জন্যে মুরোদ থাকা চাই।'

অশোক আবার কিছু বলতে গেল। তার আগেই কাঞ্চন অদৃশ্য হয়ে গেল। অশোক সেদিকে তাকিয়ে হাসল আর আস্তে-আস্তে ওর হাসিটা করুণ আর ম্লান হয়ে উঠল। একটা উদ্গত নিশ্বাস ঢোক চেপে গিলল।

BanglaBook.org

অশোক যখন নীচে নামল তখন ওর পরনে টেরি-উলের ট্রাউজার। গায়ে কাঞ্চনের হাতে বোনা সাদা উলের গলার কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা হাফ-হাতা সোয়েটার। সোয়েটারের গলার কাছে আর হাতার শেষে নেভি-ব্লু বর্ডার। হাতের বাঁ কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। সময় সাড়ে পাঁচটা। বড়দা-মেজদার ঘরের সান্ধ্যকালীন আসর এখনও বসেনি। ওর নিজের বন্ধুরাও এখনও আসেনি। সকলেই প্রায় চাকুরে, সাড়ে ছ'টা-সাতটার আগে এসে পৌঁছতে পারে না, একমাত্র ফটিক ছাড়া। অয়স্কান্ত রায় যার ভালো নাম। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সেই বেকার, সি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই

সঙ্গে কলকাতায় সপ্তাহে তিনদিন ক্যারাটে শিখতে যায়। ইদানীং যে-কোনও তদন্তের ব্যাপারেই ফটিক ওর সঙ্গে থাকে। ও এসে পড়বে সকলের আগে।

অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। অশোক রকের ওপর দিয়ে মন্দিরের গায়ে ওর বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল। বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। গোটা মেঝে জুড়ে ডবল শতরঞ্চি পাতা। এপাশে-ওপাশে গোটা ছয়েক তাকিয়া আর সমসংখ্যক নানা আকারের ছাইদানি। চেয়ার-টেবিল-সোফা সেটের কোনও বালাই নেই। এ-বাড়ির সবকিছুই এখনও সাবেকি চালের।

অশোক দরজার চৌকাঠের ভেতরে স্যান্ডেল খুলতে-খুলতেই একটা সাইকেল রিকশোব ভেঁপু শুনতে পেল। স্যান্ডেল না খুলে ও বাইরে এল। রাস্তার আলোয় দেখল, একটা সাইকেল রিকশো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের রকের সামনেই। আবোহী একজন ধুতি পাঞ্জাবির ওপরে শাল চাপানো ব্যক্তি। রাস্তার আলোয় লোকটির চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

বাঙালি রিকশোওয়ালা বলল, 'এটাই ঠাকুরবাড়ি।'

অশোক রকের ধারে এগিয়ে গেল। রিকশোর আরোহী মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। ভরাট গলায় একটু ব্যস্ততার সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'এটা কি অশোক ঠাকুরের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।' অশোক জবাব দিল এবং বুঝতে পারল, অতীতের ও. সি. বর্তমানে সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্যামাপদর প্রেরিত ভদ্রলোক ইনিই।

ভদ্রলোক রিকশোয় বসেই পকেট থেকে পার্স বের কবে রিকশোওয়ালাকে ভাড়া দিলেন। নেমে এলেন রিকশো থেকে। রকে ওঠার সিঁড়ি খুঁজলেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে। অশোক বলল, 'ওই যে, আপনার ডানদিকে আর-একটু এগিয়ে যান, ওখানে সিঁড়ি আছে।'

ভদ্রলোক কয়েক পা পুবে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে রকে উঠলেন। এগিয়ে গেলেন অশোকের কাছে, কিছুটা ব্যগ্র স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'একটু আগে থানা থেকে সি. আই. শ্যামাপদবাবু অশোকবাবুকে টেলিফোন কবেছিলেন?'

'জানি।' অশোক বলল, 'আসুন'। ও ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক অশোকের পিছনে যেতে-যেতেই জিগ্যেস করলেন, 'উনি বাড়ি আছেন তো?'

'আছেন। আপনি এ-ঘরে বসুন।' অশোক দরজার পাশে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক দরজার সামনে এসে ঘরেব চেহাবা দেখে পায়েব কালো চামড়ার পাম্পশু বাইরে খুলে রাখলেন। অশোক বলে উঠল, 'জুতো বাইরে রাখবেন না, ভেতরে শতরঞ্চির সামনে খোলা মেঝেয় রাখুন। নইলে কুকুবে নিয়ে যেতে পারে।'

ভদ্রলোক যেন হতচকিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আর বলেন কেন?' অশোক হেসে বলল, 'বিশেষ কবে রাত্তিরবেলা রাস্তার কুকুরগুলো বড় জ্বালাতন করে।'

ঘরের আলোয় দেখা গেল, ভদ্রলোকও যেন একটু হাসলেন। উপুড় হয়ে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে মেঝের ওপরে রাখলেন। শতরঞ্চিতে পা দিয়ে একটু যেন দোমনাভাবে কোথায় বসবেন ঠিক করতে পারছেন না। অশোক ইতিমধ্যেই ভদ্রলোককে দেখে নিচ্ছিল। ফরসা, লম্বা, দোহারা গঠনের চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখ। চোখ-মুখ পরিচ্ছন্ন দীপ্ত, কিন্তু আপাতত গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট এবং ভাবে ভঙ্গিতে একটি বিশেষ ব্যস্ততা। বড় চোখের দুই কোল বসা, এবং কিছুটা আরক্ত। রাত জাগার জন্য হতে পারে। কাঁচা-পাকা চুলের বিন্যাসও তেমন পরিপাটি না। কোঁচানো তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঁশুটে রঙের পাঞ্জাবির ওপরে ধূসর বর্ণের কাশ্মীরের পশমি শালে সুন্দর নকশা করা। বয়েস অনুমান চল্লিশোর্ধ্বে, অনধিক পঞ্চাশ।

অশোক বলল, 'আপনার যেখানে খুশি বসুন, কোনও অসুবিধে নেই।'

BanglaBook.org

ভদ্রলোক ভেতরের একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বসলেন। অশোক পায়ের স্যান্ডেল খুলে শতরঞ্চিতে পা দিতেই ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'আপনি একটু কাইন্ডলি অশোকবাবুকে খবর দিন।'

অশোক এটাও জানে, ভদ্রলোক ওকে আদৌ অশোক ঠাকুর বলে ঠাওরাননি এবং পরিচয় পাওয়ামাত্রই ওঁর মুখে যুগপৎ বিস্ময় এবং হতাশা ফুটে উঠবে। ও ভদ্রলোকের দু-হাত দূরে বসতে-বসতে বলল, 'শ্যামাপদবাবুর টেলিফোন পেয়ে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'মানে—।' ভদ্রলোকের বড় চোখ দুটিতে বিস্ময় ফুটে উঠল।

অশোক হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'আমার নামই অশোক ঠাকুর।'

যা ভেবেছিল তা-ই। ভদ্রলোকের ব্যগ্র চোখে-মুখে একটা হতাশার ছায়া নেমে এল। 'আপনি—!' তাড়াতাড়ি কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন এবং দ্বিধাজড়িত অবাক হেসে বললেন, 'অবিশ্যি সি. আই. সাহেব আমাকে বলেই দিয়েছিলেন, আপনি অল্পবয়সি যুবক। তা বলে—।'

'এতটা অল্প ভাবতে পারেননি।' অশোক হেসে বলল, 'অবিশ্যি বয়েস আমার কম নয়, তিরিশ পেরোতে চলল। কী করব বলুন, চেহারাটা কিছুতেই আর ভারিক্কি করে তুলতে পারছি না। ভাবছি একজোড়া গোঁফ রেখে দেখব, চেহারাটা ভারী করা যায় কি না।'

ভদ্রলোক যেন হতচকিত হয়ে একটা শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ!' তারপরেই ওঁর মুখে লজ্জিত হাসি ফুটল, 'না-না, আমার ভুলের জন্যে কিছু মনে করবেন না। আমি সত্যি ভাবতে পারিনি, আপনি এত ছেলেমানুষ। তিরিশ বছর বয়েস তো কিছুই না—মানে আমার বয়েসি লোকের কাছে। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসেই এতটা খ্যাতি লাভ করেছেন—সত্যি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

'খ্যাতির কথা বলবেন না।' অশোক হেসে বলল, 'আজকের খ্যাতি কালই কুখ্যাতি হয়ে যেতে পারে।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না-না, যেসব মহলে আপনার কথা শুনেছি, আপনার কখনও কুখ্যাতি হতে পারে না।'

অশোক লজ্জিত হাসল, 'আমি কি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?'

ভদ্রলোক কপালে ভুরু তুলে চমকানো স্বরে বললেন, 'অ্যাঁ? আরে, নিশ্চয়-নিশ্চয়, এতে আবার জিজ্ঞাসার কী আছে?'

অশোকের হাতেই সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই ছিল। সিগারেটের প্যাকেট ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার চলে?'

'ঠিক নেশা বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু না।' ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা চলে।'

অশোক প্যাকেটের ঢাকনা খুলে এগিয়ে দিল, 'তা হলে নিন।'

ভদ্রলোক একটি সিগারেট নিলেন। অশোকও একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। এগিয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। ওঁর সিগারেট ধরানো দেখেই বোঝা গেল, ধূমপানে অনভ্যস্ত। অশোক নিজের সিগারেট ধরিয়ে একটি ছাইদানি টেনে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠি গুঁজে দিল, 'আপনার নামটা এখনও জানা হল না।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গোত্রে অবিশ্যি আমরা শাণ্ডিল্য।'

'মানে বন্দ্যো ঘটি সাদা।' অশোক হেসে বলল।

নরেন্দ্রবাবু একটু হেসে বললেন, 'সাদাসিধে কি না, সেটা আপনাদের বিচার্য, কিন্তু অশোকবাবু,

BanglaBook.org

সেসব ভাবনা আজ সাতদিন ধরে মন থেকে ঘুচে গেছে।' বলতে-বলতে ওঁর চোখ-মুখের ক্লিষ্টতা আরও গভীর হয়ে উঠল।

অশোক বলল, 'স্বাভাবিক। এবার আমরা কাজের কথায় আসতে পারি।'

'তার আগে আপনি এই চিঠি দুটো দেখুন।' বলে তিনি পকেট থেকে টাইপ করা একটি চিঠি আর একটি মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। অশোক প্রথমে খোলা চিঠিটাই পড়ল। ইংরেজিতে টাইপ করা ছোট চিঠি, স্থানীয় সার্কল ইন্সপেক্টর শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে সম্বোধন করে লেখা :

'প্রিয় শ্রীভট্টাচার্য, আমার বিশেষ পরিচিত এবং কলকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আপনার কাছে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য, শ্রীঅশোক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করা। আপনার মারফত যাওয়াই সংগত, শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুবিধা হবে। বিষয়টি চব্বিশ পরগনা জেলার এক্তিয়ারভুক্ত না, তবু শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অশোক ঠাকুরের সাহায্যের জন্য আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। একটি জটিল খুনের তদন্তে ইনি শ্রীঅশোক ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি আপনি উভয়ের যোগাযোগ করিয়ে দিতে সমর্থ হবেন। আমি শ্রীঅশোক ঠাকুরকেও একটি চিঠি এইসঙ্গে দিলাম। ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষর/সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, জেলা চব্বিশ পরগনা

আর কে মিত্র।'

অশোক শ্যামাপদকে লেখা চিঠিটা রেখে খামের ওপরের লেখা দেখল। কেবল লেখা আছে, 'শ্রীঅশোক ঠাকুর'। অশোক খামের মুখ খুলে চিঠি বের করল। ছাপানো প্যাডের ওপরে অশোকস্তম্ভ মুদ্রিত। পাশে 'সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, ডিস্ট্রিক্ট ২৪ পরগনা'। ইংরেজি টাইপ করা চিঠি। একপাশে আন্ডারলাইন করে লেখা, 'বিশেষ গোপনীয় এবং জরুরি'। অশোক নীচের স্বাক্ষরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এস. পি. ২৪ পরগনা, আর কে মিত্রর চেনা সই। অশোককে যথাবিহিত সম্বোধন করে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়টা এ-চিঠিতে কিছু ইলাবোরেট। যথা :

'ইনি দেওয়ানি মামলা বিষয়ক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, নিবাস এন্টালি থানার অধীন সুরেশ সরকার রোড। এঁর অনুরোধে আপনাকে চিঠি দেওয়ার আগে আমি স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, সি. আই. ডি., ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। তিনিও আপনার সম্পর্কে উৎসাহী বিশেষ করে যখন এঁর তরুণী অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগ্নিকে বাড়ির পিছনের বাগানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। ডাক্তার ময়নাতদন্ত করে নিশ্চিতভাবে হোমিসাইডাল বলে মতামত দিয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ মহলকে যা সব থেকে চিন্তিত করে তুলেছে, তা হল, গত ছ'দিনের মধ্যে সামান্যতম আলোকপাতও তাঁরা করতে পারেননি। ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে আপনি হয়তো দেখে থাকবেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অনুরোধে আপনাকে চিঠি দেওয়ার আগে আমি স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ, সি. আই. ডি., পশ্চিমবঙ্গ-এর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। উনিও আপনার সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এবং তিনিও চান আপনি এই খুনের তদন্তের ভার নিন। পুলিশের পক্ষ থেকে আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন, অবিশ্যি যদি আপনার প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, আমারও বিশেষ অনুরোধ, এই খুনের তদন্তের ভার আপনি নিন। বাকি কথা আপনাকে শ্রীভট্টাচার্য নিজেই বলবেন। ইত্যাদি...আপনার বিশ্বস্ত...

অশোক চিঠিটা ভাঁজ করতে-করতে মুখ না তুলে বলল, 'মিঃ মিত্রর চিঠিতে খুনের যে-ঘটনার কথা লেখা আছে, আমি খবরের কাগজে প্রায় সবই পড়েছি। আপনার বোনের নাম তো পারমিতা ভট্টাচার্য?'

'হ্যাঁ, খবরের কাগজে মিতার ছবি নাম সবই বেরিয়েছে।' নরেন্দ্রনাথ উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললেন।

অশোক বলল, 'পুলিশ তো কুকুরও নিয়ে গিয়েছিল, আর কুকুর বাগানের পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করেছিল। তারপরে কুকুর বাইরে আনার পরে এন্টালি মার্কেটের সামনে সার্কুলার রোডে এসে থমকে যায়।'

'ঠিক তাই, এসবও—।'

'খবরের কাগজের রিপোর্ট।' অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'এসবই আমি পড়েছি। আজও কলকাতার পয়লা নম্বর দৈনিকের শেষ নগর সংস্করণে খবর বেরিয়েছে, কলকাতা ইউনিভারসিটির পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী পারমিতা ভট্টাচার্যের খুন যেন একটা ভোজবাজির ঘটনা। অন্তত পুলিশি তদন্তে সেইরকমই মনে হচ্ছে। পারমিতার হত্যাকারী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আদৌ তার কোনও অস্তিত্ব আছে কি না সেটাই সন্দেহজনক। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক, সবাই বোঝেন। হত্যা যখন সংঘটিত হয়েছে তখন হত্যাকারীও নিশ্চয় একজন আছে। এমনকী পুলিশের তরফেই এমন অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে, পারমিতা বা তার পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারাই খুনের সম্ভাবনা অনুমান করা হচ্ছে। অথচ তার হদিশ করা যাচ্ছে না। খবর, পুলিশ নিশ্চিন্তে বসে নেই, সম্ভাব্য সবরকম তৎপরতা চালানো হচ্ছে।'

'প্রায় মুখস্থ বললেন দেখছি।' নরেন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট মুখে মুগ্ধতার ঝলক।

অশোক হেসে বলল, 'যার যাতে মন। খেলায় যাদের মন, দেখবেন খেলার খবর তাদের মুখস্থ। এবার আপনার মুখ থেকে কিছু শোনা যাক। পুলিশ ক'জনকে গ্রেপ্তার করেছে?'

'গ্রেপ্তার?' নরেন্দ্রনাথের চোখে বিস্ময়ের ভ্রূকুটি, 'খবরের কাগজে তো এমন কোনও কথা ছাপেনি?'

অশোকের মুখে সেই একই হাসি, 'সব খবরই কি ছাপা হয়, না ছাপতে দেওয়া যায়? আজকের খবরের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে, পুলিশ নিশ্চয়ই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। আপনি জানেন না?'

নরেন্দ্রনাথ সহসা কিছু বলতে পারলেন না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অশোকের মুখের দিকে প্রায় মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকলেন, তারপর প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্যের কী আছে, নরেনবাবু?' অশোকের মুখে সেই হাসি, 'আপনি সিভিল কোর্টের ল-ইয়ার হলেও এটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন, পুলিশ একবার যখন অনুমান করেছে, পারমিতা বা তার পরিবারেরই কারোর দ্বারা খুনের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন সেরকম কারওকে নিশ্চয় পুলিশ আটক করেছে। অন্তত পারমিতার ঘনিষ্ঠ কারওকে তো নিশ্চয়ই। আর এ অনুমানের ভিত্তি বোধহয় এই, রাত্রি আটটার সময় বাড়ির পেছনের বাগানে পারমিতা কেন গিয়েছিলেন। একে শীতের রাত, আর পেছনের বাগানটায় বোধহয় আপনারা অবসর সময়ে বিশ্রাম বা চায়ের আসর-টাসর করেন, না?'

নরেন্দ্রনাথের চোখে-মুখে তখনও তীব্র বিস্ময়ের অভিব্যক্তি, বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, পেছনের বাগানে বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমরা যাই না। বাগান বলতে সেরকম মালি লাগিয়ে সাজানো বাগান কিছু নয়, কাঠা-তিনেক জমির ওপরে গোটা কয়েক গাছ আছে। বাড়ির বাচ্চারা খেলাধুলো করে। একটা পেয়ারা গাছে একটি দোলনাও ঝোলানো আছে, বাচ্চাদের জন্যেই। তার দ্বারা আপনার এ কথা মনে হল কেন?

'হতে পারে, আপনার বোন পারমিতার চেনা কেউ ওই সময়ে বাগানে আসতে বলেছিল।' অশোক বলল, 'আমার বিশ্বাস, আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে।'

নরেন্দ্রনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আছে।' এবং আস্তে-আস্তে তাঁর কপালে গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

'না-না, আপনি এখন ওসব নিয়ে ভাববেন না।' অশোকের মুখে হাসি, 'আমি পুলিশের অনুমান আর কার্যক্রম বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। যাই হোক, আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি কারোর গ্রেপ্তারের খবর জানেন না।'

নরেন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'এর পরে জানিনে বলার কোনও মানেই হয় না। মিতার দুই ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছেলে-বন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ গ্রেপ্তারের খবর গোপন রাখতে বলা হয়েছে। আমি ছাড়া আমাদের বাড়িরও কেউ জানে না।'

'স্বাভাবিক।' অশোক আবার একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে প্যাকেট এগিয়ে দিল নরেন্দ্রনাথের দিকে।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ধন্যবাদ, আমি আর নেব না।'

'এ ছাড়া পুলিশের এগোবার আর কোনও রাস্তাও ছিল না।' অশোক দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল, 'এ তদন্তের ভার যদি আমি নিই, আমিও সেই ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব।'

নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'যদি নিই না, অশোকবাবু, মিতার খুনের তদন্তের ভার আপনাকে নিতেই হবে। বাপ-মা মরা আমার এই ছোট বোনের আমি পিতৃতুল্য, আমার নিজের সন্তানের থেকেও মিতা আমার বেশি আদরের। আপনাকে বোঝাতে পারব না, বড় কষ্টে আছি—।' ওঁর গলার স্বর ধরে এল, আরক্ত চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ আমি আপনার কলকাতার বাড়িতে যাব।'

নরেন্দ্রনাথ ধুতির কোঁচা দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'বেঁচে থাকতে মিতার জীবনে যা কিছুই ঘটুক, কিন্তু ওর যে এমন শত্রু থাকতে পারে, যে ওকে প্রাণে মেরে ফেলবে, কখনও ভাবতে পারিনি। হাসিখুশি মিওকে—যতদূর জানতাম, কলেজে ইউনিভারসিটিতেও প্রফেসর-ছাত্র-ছাত্রী সকলের সঙ্গেই ওর খুব সদ্ভাব ছিল। বাড়ির কথা তো আসেই না। আমার তিন ছেলে, মেয়ে নেই, ওর আদর ছিল সব থেকে বেশি।'

'সেটাই তো মুশকিল নরেনবাবু, এসব ভেবে কে কেন খুন হয় তার কোনও কূলকিনারা পাওয়া যায় না।' অশোক ম্লান হাসল, 'সরষের মধ্যে ভূতের মতো ব্যাপার, কার্যকারণ আর খুনি সেইরকমভাবে লুকিয়ে থাকে। নির্ভর করে মোটিভ খুঁজে বের করা, খুনি কোন শ্রেণির লোক ভাবতে পারা আর তার পরিকল্পনাটা সে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে।' অশোক সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আপনার নিজের কী ধারণা? কারওকে সন্দেহ হয়? সামান্যতম?' কথাটা ও খুব আচমকাই জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ অবাক মুখ তুলে বললেন, 'আমার? পুলিশও আমাদের বাড়ির সবাইকে জিগ্যেস করেছে। আমি তো মাথার চুল ছিঁড়েছি কিন্তু কারওকে সন্দেহ করতে পারিনি। এমনকী যে ছেলে দুটিকে পুলিশ সন্দেহবশত অ্যারেস্ট করেছে, তাদেরও আমি সন্দেহ করতে পারি না।'

'কেন?' অশোক স্পষ্ট জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'প্রথমত, ওরা আমাদের বাড়িতে প্রায় নিয়মিত আসত। কলকাতার অত্যন্ত বনেদি শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মিতা যেদিন খুন হল সেদিনও বিকেলে ওরা দুজনেই

BanglaBook.org

আমাদের বাড়িতে এসেছিল, চা খেয়েছে, গল্প করেছে। বাড়ির সকলের সঙ্গে ওদের আলাপ, মিতার সঙ্গে ওদের তুইতোকারি সম্পর্ক।'

'হুঁ।' অশোক হাসল, 'একমাত্র এইসব কারণেই ওদের দুজনকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না। আপনি নিজে সজ্জন, ভদ্র, উদারপন্থী সামাজিক ব্যক্তি, আপনি আপনার মতো ভেবেছেন। কিন্তু পারমিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-অসাক্ষাতে যত মহিলা পুরুষের যোগাযোগ ছিল, তাদের কারওকেই আমরা সন্দেহের বাইরে রাখতে পারিনে। অসাক্ষাতে যদি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকে, তাও খুঁজে বের করতে হবে। যাই হোক, সেসব পরের কথা, কাজের সময়ে দেখা যাবে।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'আচ্ছা, আপনি বা আপনার বাড়ির লোকেরা কেউ কি পারমিতার আচরণে বিশেষ কিছু তফাত লক্ষ করেছেন? মানে, খুন হওয়ার আগে দু-চার দিন বা তারও আগে?'

নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হলেন, একবার মাথা নিচু করলেন, তারপরে মুখ তুলে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আর বড় বউমা—।'

'বড় বউমা?'

'আমার বড় ছেলের স্ত্রী।'

'ও, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, তাতে কী। ওরা বলছিল, ইদানীং মাঝেমধ্যে মিতাকে আনমনা দেখাত, কখনও বলত, দূর ছাই কিছু ভালো লাগে না। কখনও নাকি বলত, দিন-সাতেকের জন্যে একলা কোথাও বেড়িয়ে আসব। এসব কথা বড় বউমার সঙ্গেই বেশি হত, আগে এ ধরনের কথাবার্তা ও তেমন বলত না। বড় বউমা যদি জিগ্যেস করত, একলা কেন? কারও সঙ্গে যাবে নিশ্চয়ই, মিতা বলত, হ্যাঁ, মরণের সঙ্গে যাব।' নরেন্দ্রনাথের গলাটা আবার যেন ডুবে গেল।

অশোক চুপচাপ খানিকক্ষণ সিগারেট টানল। মনে-মনে ভাবল, মরণের সঙ্গে আর যেতে হল না। মরণই ওর কাছে এসেছিল। নরেন্দ্রনাথ অশোকের নিবিষ্ট চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। অশোক বলল, 'আপনাকে বেশি কথা আর জিগ্যেস করবার নেই। যা জিগ্যেস করবার এখানেই সেরে নিই। আমি ধরেই নিচ্ছি বাড়ির মহিলারা মেয়েদের কথা যতটা জানেন বা বোঝেন আপনার পক্ষে তেমনটা সম্ভব না। আপনার কোর্ট-কাছারি-মক্কেল এসব নিয়েই কাটে। অল্পস্বল্প অবসর সময়ে কিছু পারিবারিক কথাবার্তা চলত।'

'ঠিক বলেছেন।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি, কোর্ট থেকে ফেরার পর, সন্ধেবেলায়ও মক্কেলদের ভিড়। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে যত কথা। ওই একটা সময়েই সকলের সঙ্গে আমার সংসারের দৈনিক খোঁজখবর কথাবার্তা হত।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনারা ক' ভাইবোন?'

'তিন ভাই, দু-বোন।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কেন বলুন তো?'

অশোক সিগারেটে টান দিল, 'এমনি জিগ্যেস করছি। পারমিতা ছিল সকলের ছোট, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার আর তিন ভাই-বোন? কোথায় থাকেন, কে কী করেন?'

'আমার পরের ভাই ডাক্তার, ও আলাদা বাড়ি করে ল্যান্সডাউনে থাকে। তার পরের ভাই থাকে ক্রিক রো-তে, আমাদেরই একটা বাড়ির দোতলায়। নীচের তলায় ভাড়াটে আছে। ও রাইটার্স-এ হেলথ ডিপার্টমেন্টে কেরানির চাকরি করে। ভায়েদের মধ্যে ওর অবস্থাই একটু খারাপ। অবিশ্যি ও অল্প বয়সেই একটু বখাটে হয়ে গেছিল, বাবার মনে খুব দুঃখ ছিল ওকে নিয়ে। তার পরে বোন, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ি সোদপুরে—প্রপারে নয়, সুখচরে। তারপরেই পারমিতা।'

'আপনার সুরেশ সরকার রোডের বাড়ি কি আপনি করেছেন?'

BanglaBook.org

'না, ওটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি।'

'আপনার পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ কী? কাকে-কাকে কী দিয়ে গেছেন?'

নরেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নে একটু অবাক হচ্ছিলেন, তবু বললেন, 'সুরেশ সরকার রোডের বাড়ি বাবার নিজের তৈরি। ক্রিক রো আর লোয়ার রেঞ্জে দুটি বাড়ি বাবা কিনেছিলেন। তার মধ্যে সুরেশ সরকার রোড আর ক্রিক রো-র বাড়ি আমাদের তিনভাইয়ের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে দিয়ে গেছেন। লোয়ার রেঞ্জের বাড়ি দুই বোনকে—অর্পিতা আর পারমিতাকে দিয়ে গেছেন। আমার মেজো ভাই—ডাক্তার, আর ছোট ভাই, তাদের সুরেশ সরকার রোডের বাড়ির অংশ আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ও-বাড়ির মালিক আমিই।'

'নগদ টাকাপয়সা বা কোম্পানির শেয়ার-টেয়ার কিছু ছিল নাকি?'

নরেন্দ্রনাথ এবার যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করলেন, 'এসবও কি আপনার তদন্তের মধ্যে পড়ে নাকি? পুলিশ কিন্তু এসব কিছুই জিগ্যেস করেনি।'

অশোক হাসল, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিল, 'বিরক্ত হবেন না, নরেনবাবু। আমি আপনাদের পরিবারের টোটাল চেহারাটা বুঝে নিতে চাইছি। হ্যাঁ, তদন্তের জন্যে এসবও দরকার হয়। পুলিশের কথা পুলিশই জানে। কিন্তু মনে রাখবেন, এর দ্বারা আমি আপনাদের পরিবারের রেপুটেশন সম্পর্কে কোনও কটাক্ষ করছি না। আপনি সিভিল কোর্টের অ্যাডভোকেট, সম্পত্তি নিয়ে কত কী ঘটে, আপনার না জানার কথা নয়।'

'জানি।' নরেন্দ্রনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে এটুকু বলতে পারি, সম্পত্তি নিয়ে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কোনওরকম বিবাদ-বিসম্বাদ মনকষাকষি নেই।'

অশোক লজ্জিত হেসে বলল, 'সে-কথা আপনাকে আমি জিগ্যেস করিনি। কেবল সম্পত্তির পরিমাণ আর ভাগ-বাটোয়ারার কথা জানতে চেয়েছিলাম। যাক, আপনি যখন—।'

'না-না, কথাটা যখন তুলেছেন, আপনাকে সবই বলছি।' নরেন্দ্রনাথ একটু ক্ষুব্ধভাবেই বললেন, 'আর বাবার নগদ টাকাকড়ি বা কোম্পানির শেয়ারের কথা বলছেন? বাবা মারা গেছেন আট বছর আগে। তখন তাঁর ব্যাংকে জমা ছিল প্রায় ষাট হাজার টাকা। তার মধ্যে তিরিশ হাজার টাকাই তিনি মিতার জন্যে রেখেছিলেন—অর্থাৎ মিতার বিয়ের জন্যে। বাবা বেঁচে থাকতেই আমরা তিনভাই দাঁড়িয়ে গেছলাম, অপু—মানে অর্পিতার বিয়েও তিনি বেঁচে থেকেই দিয়ে গেছলেন। দিয়ে যেতে পারেননি মিতার বিয়ে। বাকি টাকা তিন ভাইকে সমান ভাগে দিয়ে গিয়েছিলেন। একটি কোম্পানির পঁচিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছিলেন। বাবা বেঁচে থাকতেই সে-কোম্পানির গণ্ডগোল উলটেছিল। ওটা নিট লস।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'তাহলে, মিতার মৃত্যুর পরে লোয়ার রেঞ্জের বাড়ির অংশ, বিয়ের জন্যে রাখা তিরিশ হাজার টাকা, এসব কে পাবে? উইলের সময় নিশ্চয় এ-কথা ভাবা হয়েছিল, মানুষের মৃত্যুর কথা তো কিছু বলা যায় না। স্বাভাবিক মৃত্যুই যদি হত বা, এখন এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে কে পারমিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ?'

'হ্যাঁ, সে-কথাও উইলে উল্লেখ করা হয়েছে।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি খবরের কাগজেই পড়েছেন আমার বাবা নৃসিংহ ভট্টাচার্যও ছিলেন সিভিল অ্যাডভোকেট।'

'পড়েছি।'

'উইলে বলা হয়েছে, মিতার যদি বিয়ের আগে মৃত্যু ঘটে, তাহলে সে-সম্পত্তি পাবে অর্পিতার সন্তানেরা। কন্যাদের সম্পত্তি বাবা কন্যাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এমনকী, অর্পিতা যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সবটাই পারমিতা পাবে, এইরকম ব্যবস্থা ছিল।'

'আর অর্পিতার বর?'

BanglaBook.org

'তাকে নিয়ে ভাবনা কীসের? অর্পিতা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে বিক্রম আবার বিয়ে করতে পারে। তখন আর আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'ঠিক। বিক্রম নিশ্চয়ই অর্পিতার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'আর একটা কথাই জিগ্যেস করার আছে।' অশোক দু-হাতে মুখ ঘষল, 'আপনার তিন ছেলেদের কার কত বয়েস, কে কী করেন?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বড় ছেলের বত্রিশ বছর বয়েস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একটি কোম্পানিতে চাকরি করছে, এখন নিজে একটি ফার্ম খোলার কথা ভাবছে। ও বিয়ে করেছে, এক ছেলে এক মেয়ে। মেজো ছেলে এম. এ. পাশ করে আইন পড়ছে। ছোট ছেলেটি এ বছরই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে।'

'আপনার বয়েস তাহলে কত হল?' অশোক হাসল, 'দেখে তো পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর বেশি মনে হয় না।'

নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমার ষাট চলছে।'

'চেহারা আর স্বাস্থ্য বেশ ভালো আপনার।' অশোক বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আর কথা নেই। আমার জিজ্ঞাসাবাদে অসন্তুষ্ট হননি তো?'

নরেন্দ্রনাথের মুখে এখন বিরক্তি-বিক্ষোভ নেই, 'একটুও না। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু অশোকবাবু, আসল কথাটা—।'

'বললাম তো, আগামীকাল আমি আপনার বাড়ি যাব।' অশোক বলল, 'বেলা দশটা নাগাদ যাব। আপনি কাল কোর্টে বেরোবেন?'

'এতদিনে বেরোইনি। আপনি যদি বলেন, কালও বেরোব না।'

'হ্যাঁ, কালকের দিনটা আপনি থাকুন, নইলে বাড়ির লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করার অসুবিধে হবে।'

'নিশ্চয় থাকব।'

'কিন্তু আজ বাড়ি গিয়ে আমার কথা কারওকে কিছু বলবেন না। আপনার স্ত্রীকেও না। যখন যাব, তখন পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

নরেন্দ্রনাথ আবার একটু অবাক হলেন, তারপরে হেসে বললেন, 'তাই হবে।'

অশোক উঠে দাঁড়াল। নরেন্দ্রনাথ পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স টাকা—।'

'এটা আমার পেশা নয়, নরেনবাবু।' অশোক বিনীত হাসল, 'কিন্তু আমি ডেডিকেটেড। তবে আপনার কাজের জন্যে খরচের দরকার হলে টাকা আমি সময়মতো চেয়ে নেব।'

নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ, করুণ চোখে অশোকের দিকে তাকালেন, 'আমরা উকিল মানুষ, টাকার কথা আগে ভাবি, সে যে যাই বলুক। তাহলে আপনাকে পাচ্ছি। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। তবু একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'নিশ্চয়ই করবেন।'

'আমাকে যে এত কথা জিগ্যেস করলেন, তা থেকে কী বুঝলেন?'

অশোক হাসল, 'কী আবার? যে-কোনও লোকই আপনার কথা থেকে একটা কনক্লুশনে আসতে পারে। পারমিতাকে মার্ডারের মোটিভ থাকতে পারে দুজনের। আপনার বোন আর ভগ্নিপতি অর্পিতা আর বিক্রমের।'

'কী বলছেন আপনি!' নরেন্দ্রনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওরা দুজন যে এমনিতেই কথায়-কথায় বলে মিতার বিয়েতে লোয়ার রেঞ্জের বাড়িটা ওকে যৌতুক হিসেবে দিয়ে দেবে। বিক্রম

BanglaBook.org

তো এমন কথাও বলত লোয়ার রেঞ্জের বাড়িটা ঝরঝরে পুরোনো, সস্তার ভাড়াটেরা উঠতে চায় না। কোনওরকমে ভাড়াটে তুলতে পারলে, ওই বাড়িটা ভেঙে ফেলে ব্যাংক লোন নিয়ে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করবে, সবটাই থাকবে মিতার নামে, ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাখ-লাখ টাকা করবে। ওরা মিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, অপু-বিক্রমের অবস্থা বিরাট। সুখচরে ওদের বিরাট বাড়ি, আশেপাশেও বেশ কিছু জমি-বাড়ি ওদের নিজেদের। কলকাতায় একটি বাড়ি আছে। বিরাট ব্যবসা, আর বিক্রম ওর বাবার একমাত্র ছেলে।'

অশোক নরেন্দ্রনাথকে বাধা না দিয়ে কথাগুলো শুনে গেল, তারপরে হাসল, 'সবই ঠিক, আমি আপনার কথার একটা জবাব দিলাম মাত্র। পুলিশ এসব ডিটেল জানলে তারাও ওই মোটিভের কথাই আগে ভাববে। কিন্তু এটাই সত্যি, এ কথা আমি বলিনি। আপনি জিগ্যেস করলেন, আমি জবাব দিলাম, জাস্ট কথার কথা।'

'তাই বলুন।' নরেন্দ্রনাথ যেন স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেললেন, 'আপনার কথা শুনে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছলাম। শেষটায় অপু-বিক্রমকে নিয়ে টানাটানি?'

অশোক হাসল, কিছু বলবে ভেবেও না বলে হাতের ঘড়ি দেখল, 'সাড়ে সাতটা বাজে, আপনাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন।' অশোকের সঙ্গে জুতো পরে বাইরে এলেন।

অশোক দেখল, ফটিক ছাড়াও ওর আরও দুই বন্ধু রকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভেতরে নতুন অচেনা লোক দেখে ইচ্ছে করেই কেউ ঢোকেনি। অশোক বলল, 'তোরা বোস, আমি আসছি।'

বন্ধুরা ঘরে ঢুকে গেল। অশোক জিগ্যেস করল, 'শ্যামাপদবাবুর চিঠিটা আমার কাছেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, উনি বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে পরে দেখা করবেন। 'নরেন্দ্রনাথ রকের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একবার অশোকদের বাড়িটার দিকে দেখলেন।

ইতিমধ্যে বড়দা মেজদার ঘরে সংগীতচর্চা আর জ্যোতিষী শাস্ত্রালোচনা শুরু হয়ে গেছে। অশোক বলল, 'আপনি নতুন মানুষ, স্টেশন চিনে যেতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা রিকশো নিয়ে চলে যাব।'

'আর-একটা কথা।' অশোক সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল, 'ময়না তদন্তের রিপোর্টের কোনও কপি আপনার বাড়িতে আছে?'

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাকালেন অশোকের মুখের দিকে। একবার মুখ নিচু করলেন, আবার তুললেন। রাস্তার আলোয় অশোক নরেন্দ্রনাথের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না। তিনি বললেন, 'আছে। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিতা প্রায় তিনমাস কনসিভ করছিল। খবরের কাগজে এ কথা—।'

'বুঝেছি।' অশোক বলল, 'এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট। এনিহাউ, আপনি আজ আসুন, আমি কাল দশটা নাগাদ যাচ্ছি।'

নরেন্দ্রনাথ কোনও কথা বলতে পারলেন না। কোনওরকমে কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে চললেন। অশোকের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। ভদ্রলোক কি ভেবেছিলেন, অশোক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখতে চাইবে না? আশ্চর্য আত্মসম্মানবোধ! এতবড় কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলেন? তা সম্ভব না। ও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

BanglaBook.org

অশোক রাত্রি ন'টা নাগাদ ওদের বাড়ির ভেতরের অন্দর পেরিয়ে খিড়কি দরজার সামনে এল। দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে ছোট গলি ডিঙিয়ে কাঞ্চন বউদির বাড়ি ঢুকল। এত

তাড়াতাড়ি আড্ডাভঙ্গে বন্ধুরা খুশি হয়নি, বলেছে, 'ও এখন কুকুর হয়ে গেছে, গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।' অশোক হেসেছে। বন্ধুরা ওকে ভালোই চেনে। ও আসবার আগে ফটিককে বলে এসেছে, আগামীকাল সকালে আটটার সময় কলকাতা যাওয়ার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে আসে।

কাঞ্চন বউদির—অর্থাৎ জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা গোবিন্দর—বাড়িও ছোটখাটো না। অশোক বাড়িতে ঢোকবার সদর দরজাটা খোলাই পেল। সামনে লম্বা-চওড়া বিরাট বাঁধানো উঠোন। তার কোলে উঁচু রক, রকের কোলে লম্বা টানা দালান। দালানের ভেতরে সারি-সারি ঘর। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে দালান, পুবে বাঁক নিয়ে রান্নাঘর, কলতালার দিকে প্রসারিত।

অশোক দালানে ঢুকে দেখল, একটিমাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। গোবিন্দদা শুয়ে আছে সাবেকি উঁচু খাটে। সারা দিনরাত্রি প্রায় শুয়েই থাকে। সকালে-বিকেলে কাঞ্চন তুলে ধরে, পাশেই রাখা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেয়। স্নান করানো, খাওয়ানো তো আছেই। গোবিন্দদার কথার উচ্চারণও অস্পষ্ট। সে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চয় রাত্রের খাবার খাওয়ানো হয়ে গেছে। বাড়ির পুরোনো বুড়ো চাকর বসে আছে এক কোণে। একবার মুখ ফিরিয়ে অশোককে দেখল। অশোক সোজা দক্ষিণে গিয়ে পুবে ঘুরে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল। দেখল কাঞ্চন উনোনের কাছাকাছি পিঁড়েয় বসে গভীর মনোযোগে একটি বই পড়ছে। তার মানে উনোনে এখনও আগুন আছে। শীতে আগুন পোহানো আর বই পড়া একসঙ্গে চলছে। ঘরের বাইরে ছাদ ঢাকা বারান্দার টিমটিমে আলোয় ঝি ভাত খাচ্ছিল। অশোককে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকল।

কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে অশোকের ঠোঁটে হাসি ফুটল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে বিজলি চুম্বকের মতো কোনও বই পড়া হচ্ছে?'

কাঞ্চন চমকে উঠে মুখ ফেরাল। পরমুহূর্তেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিল, 'সকলে যদি ভাবে তারাই একমাত্র চুম্বকের মতো বই পড়ে তাহলে ভুল করেছে।'

অশোক বাইরে স্যান্ডেল রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকল। একপাশে জড়ো করে রাখা আসনের একটা টেনে নিয়ে কাঞ্চনের এক হাত দূরে পেতে বসে পড়ল, 'না তা করব কেন? তবে গাঁজাখুরি গল্প না হলেই হল। কিন্তু ইংরেজি পকেটবুক সাইজে বইটা কী, জানতে পারি?'

'আমি গাঁজাখুরি বই পড়িনে।' কাঞ্চন বইটির মলাট তুলে দেখিয়ে দিল।

অশোক দেখল, 'ফোর ট্র্যাজেডিস অফ শেকসপিয়র'। ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'চমৎকার। একেবারে মূল নিয়ে নাড়াচাড়া? এর ওপরে তো আর কথাই চলে না। যাকে বলে খাঁটি চুম্বক। তা, কোনটি পড়া হচ্ছে?'

'হ্যামলেট।' কাঞ্চন বইটা পিঁড়ির পাশে রাখল, 'তা এত রাত্রে, রান্নাঘরে, এরকম ঘনিয়ে এসে বসার মানে?'

অশোক বোকা-বোকা হেসে বলল, 'দেখতে এলাম, তোমার বাড়ির দরজাটা খোলা আছে কি না, দেখলাম খোলা আছে। অমনি যেন চায়ের তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে উঠল।'

'বয়ে গেছে এখন আমার চা করে দিতে। কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে নিল, 'এখন আমি খেয়ে শুতে যাব।'

অশোক ঝুঁকে পড়ে কাঞ্চনের আলতা-পরা পায়ের দিকে হাত বাড়াল, 'লক্ষ্মীটি—।'

'কী হচ্ছে?' কাঞ্চন ঝটিতি পা-জোড়া সরিয়ে নিল, ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে তাকাল, 'এত রাত্রে অন্দরে ঢুকে পরস্ত্রীর কাছে চা চাইতে লজ্জা করে না?'

অশোক মাথা নেড়ে বলল, 'না, পরস্ত্রীর চোখে তো কোনওদিন দেখিনি।'

'মানে?' কাঞ্চনের ভুরু কুঁচকে উঠল।

অশোক তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বলল, 'থুড়ি, পরস্ত্রী বটে, বলতে যাচ্ছিলাম, বন্ধু—মানে বউদি, পর বলে তো কোনওদিন ভাবতে দাওনি।'

BanglaBook.org

'আমি ঠিকই দিয়েছি, তুমিই ভাবনি।' কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে শিক তুলে নিয়ে উনোনের আগুন উসকে তুলল।

অশোক দু-হাত ঘষে বলল, 'আসলে আমি তো ভালোবাসি, তোমার হল বিরাগ—।'

কথা শেষ করার আগেই কাঞ্চন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। চোখের তারা নিবিড়। কিন্তু কিছু না বলেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাতের সামনে জলের পাত্র ছোট কেতলি এমনভাবে রাখা যে, চা তৈরির জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। কেতলিতে জল ঢেলে উনোনে বসাতে-বসাতে নিজের মনেই উচ্চারণ করল, 'ভালোবাসা।'

'সত্যি, কোথায় যে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ধরা-ছোঁয়া যায় না।' অশোক বলল।

কাঞ্চন আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। এখন ওর ডাগর কালো চোখে যেন একটা বিষণ্ণ অভিযোগ, 'যা ধরা-ছোঁয়া যায় না তার পেছনে ছুটে লাভ কী?'

'মনের রোগ।'

কাঞ্চন অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেল। পারল না। দুজনেই কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কাঞ্চন আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল। হাতের কাছেই ওর চা-চিনির কৌটো। ঝুঁকে পড়ে বাঁ-দিকের মিট সেফ-এর পাল্লা খুলে কাপ-ডিশ-চামচ বের করল। অশোক বলল, 'জীবনে কিছু-কিছু কথা কখনও বোধহয় বলা যায় না। তা না-ই যাক, একটা কথার জবাব দাও তো।'

'আজ্ঞা করুন।' কাঞ্চন মুখ ফেরাল না।

অশোক বলল, 'হ্যামলেট তো নতুন পড়ছ না। বলতে পারো, কোনও তদন্তের সময় আমরা কেন হ্যামলেটের মতো মরা মানুষের ভূত দেখতে পাই না? তা হলে অপরাধীকে ধরাটা অনেক সহজ হত।'

'দেখতে ঠিকই পাও, না দেখতে পেলে আর খুনিকে পাকড়াও কেমন করে?' কাঞ্চন ফুটে যাওয়া জলের কেতলি আঁচল দিয়ে ধরে নামাল, 'তবে হ্যামলেটের উন্মাদ একাগ্রতা থাকলে তোমরাও মরা মানুষের ভূত দেখতে পেতে। সাবকনসাস মাইন্ডের কথা তো তোমাদের মুখেই শুনি।'

অশোকের চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক খেলে গেল, 'পায়ের ধুলো দাও, কাঞ্চন—খুড়ি, বউদি।

'গায়ে গরম জল ঢেলে দেব।' কাঞ্চন নিজেকে একটু গুটিয়ে নিল, 'যাকে ভূতে পায় না তার কিছুই করা হয়ে ওঠে না।'

অশোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'দারুণ বলেছ। যাকে ভূতে পায় না, তার কিছুই করা হয়ে ওঠে না। প্রায় রামকৃষ্ণদেবের মতো কথা। ভর না হলে কিছুই হয় না।'

'এখন দয়া করে বলো তো, কী বলতে এসেছ?' কাঞ্চন কেতলির ঢাকনা খুলে চা পাতা ফেলে দিল। ঢাকনা বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কে ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন?'

অশোক ঘাড় বাঁকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, 'আমার দেখছি ক্রমেই প্রমোশন বাড়ছে। এস. এস. পি., সি. আই. ডি., ওয়েস্ট বেঙ্গলও আমার সাহায্য চাইছেন। তুমি চা দাও, জুত করে সব বলছি।'

'তুমি শুরু করো, আমি চা দিচ্ছি।'

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে পারমিতা হত্যার সব ঘটনা বলল। বলতে-বলতেই কাঞ্চনের চা হয়ে গেল, চুমুক দেওয়া চলল। কাঞ্চন সব শুনল। অশোক বলল, 'এবার বলো তো শুরু, কী বুঝলে?'

'আমার আবার বোঝাবুঝির কী আছে? আমি গুরুগিরি জানি না।' যদিও কাঞ্চনের চোখে চিন্তিত অন্যমনস্কতা, 'তবে দিদি-জামাইবাবুর দিক থেকে সম্পত্তির ব্যাপারটা আমার তেমন মনে লাগছে না। তিন মাসের প্রেগন্যান্সিটাই কেমন গোলমেলে।'

BanglaBook.org

অশোক চোখ বুজে ধ্যানস্থভাবে বলল, 'যথা?'

'তা কী করে বলব?' কাঞ্চন বলল, 'আত্মহত্যা যখন নয়, তখন যার দ্বারা প্রেগন্যান্ট হয়েছিল, হয় সে, নয় তো আর কেউ, না পাওয়ার জ্বালায় হিংসায় খেপে গিয়ে একেবারে খতম করেছে। তবে পুলিশের প্রথম ভাবনাটা ঠিকই, পারমিতার অচেনা কারওর দ্বারা এ খুন ঘটেনি।'

অশোক চোখ মেলে বলল, 'আর কেউ না-পাওয়ার জ্বালায় হিংসেয় খেপে গিয়ে খতম করেছে, কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না।'

'কেন, অপরিষ্কারের কী আছে?' কাঞ্চন বলল, 'যদি ধরে নিই পারমিতা যার প্রেমে পড়েছিল, যার কাছে ও নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, সে ছাড়া এমন হয়তো কেউ ছিল যে ওকে চেয়েছিল। পুরুষরা তো কোনওদিন বুঝল না, একটা জিনিস মেয়েদের কাছে চেয়ে, জোর করে আদায় করা যায় না, অতএব, সে যদি না পেল অপরকে কেন পেতে দেবে?'

অশোক ভুরু তুলে বলল, 'অবিশ্যি মেয়েরাও এরকম অবুঝ হয়, কিন্তু সে-তর্ক এখন থাক। তাহলে, মোটামুটি তোমার এই দুটি সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে। যে পেয়েছিল, অথচ চায়নি, আর যে চেয়েছিল, অথচ পায়নি। এরকম দুজনের একজন—।'

'হতে পারে।' কাঞ্চন বলল, 'কিন্তু খুনের আগে পারমিতার "ইচ্ছে করে দিন-সাতেকের জন্যে একলা কোথাও বেড়িয়ে আসি" কথাটাও ভেবে দেখা দরকার।'

অশোক কিছু না বলে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কাঞ্চন বলল, 'তার সঙ্গে পারমিতার বউদিকে বলা আরও একটি কথা, একলা বেড়াতে যাওয়ার জবাবে বলেছে, "মরণের সঙ্গে যাব।" কেন সে একলা যেতে চেয়েছিল, আর মরণের সঙ্গেই বা কেন?'

অশোক কাঞ্চনের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে বলল, 'পারমিতা কি ক্লিনিকে যাওয়ার কথা ভেবেছিল?'

'একলা যেতে চাওয়ার অর্থ তো সেরকমই বোঝায়।' কাঞ্চন হাসল।

অশোক জিগোস করল, 'আর মরণের সঙ্গে কেন?'

'কুমারী মেয়ে, অ্যাবরশন করাবে, প্রাণে একটা ভয় থাকবে না?'

অশোক চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল। কাঞ্চন বলল, 'এবার ওঠো তো। আমি রান্নাঘরের পাট মেটাই।'

'হ্যাঁ।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'কাল সকালে কলকাতা যাচ্ছি, অবিশ্যি তার আগে তোমার হাতে চা খেয়ে যাচ্ছি। কোনও কারণে কলকাতায় আটকে গেলে বিকেল চারটে নাগাদ তোমাকে টেলিফোন করব।'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বলল, 'পারব না। আস্তে-আস্তে তুমি কলকাতার জ্যাক হয়ে যাচ্ছ আর আমাকে সময় নেই অসময় নেই টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ওসব হবে না।'

'লক্ষ্মীটি, প্লিজ!' অশোক হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের একটা হাত ধরল।

কাঞ্চন অশোকের চোখের দিকে তাকাল, কিন্তু ওর হাতটা যেন অবশ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত দুজনেরই একটা আবেশে কাটে। অশোক হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কাল চারটে নাগাদ একটু টেলিফোনের কাছে থেকো।'

কাঞ্চন শূন্য দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মুখে একটা ব্যাকুল আর্তি।

অশোক পরের দিন সকাল দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ওর গায়ে গতকাল সন্ধের সেই হাতের কনুই পর্যন্ত উলের সোয়েটার আর

BanglaBook.org

ট্রাউজারই ছিল। পায়ে স্যান্ডেলের বদলে কালো ক্রোম লেদারের শু। সঙ্গে ফটিক। গায়ে সাদা ফুলস্লিভ শার্ট, ট্রাউজার, হাতকাটা সাদা উলেন সোয়েটার, সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে একটা অ্যাটাচি।

অশোক ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা খুঁজে বের করল। সুরেশ সরকার রোড যেখানে প্রায় সি আই টি রোডের জংশনে এসে মিশেছে, বাড়িটা তার কাছাকাছি। পুরোনো আমলের বাড়ি, সি আই টি রোডের নতুন বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনও মিল নেই। নতুন গজিয়ে ওঠা সি আই টি রোডের সঙ্গে তুলনায় এ পাড়াটা এখনও যেন তার সাবেক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদা বিশাল এলাকা জুড়ে মৌমাছির চাকের মতো ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলকে সাফ করে যে সি আই টি রোড তৈরি হয়েছে সুরেশ সরকার রোডের আশেপাশে এখনও সেই বস্তির কিছু অবশিষ্ট আছে। অল্প ছড়ানো-ছিটোনো।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িটা সম্ভবত কোনও এককালে দোতলা সাহেব-বাড়ি ছিল। নিচু দোতলা। নীচে-ওপরে চওড়া গোল থাম। কাঠের রেলিং-ঘেরা চওড়া বারান্দা। খিলানওয়ালা ত্রিকোণ। বাড়িতে ঢোকবার জন্য একপাশে চওড়া গেটের দুই পাল্লা। কোমর সমান উঁচু। গেটের দুপাশে চৌকো থাম। থামের গায়ে শ্বেতপাথরের উৎকীর্ণ কালো অক্ষরে ইংরেজি আর বাংলায় লেখা, 'এন. এন. ভট্টাচার্য, বি. এ. বি. এল.'। গেটের গায়ে একটি টিনের পাতে লেখা আছে, 'বিওয়্যার অফ ডগ'। বাড়িতে কুকুর আছে? অশোককে নরেন্দ্রনাথ তা বলেননি। আর সেই কুকুরের জন্য সাবধানী নোটিসও ঝুলছে। অথচ বাড়িতে এত বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল। কুকুরটার ভূমিকা কী ছিল? অশোককে আগে থেকে সাবধান করার জন্য নরেন্দ্রনাথের বলা উচিত ছিল। হয়তো তাঁর মনে ছিল না।

গেটের সামনে থেকে শান বাঁধানো চওড়া স্পেস বাড়ির ভেতর ঢুকে ডানদিকে মোড় ফিরেছে। একটা ছোটখাটো পুরোনো কালো বিলিতি মডেলের গাড়ি দেখে মনে হয় লম্বা ফালিটা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। মাথার ওপর অ্যাসবেসটসের ছাউনি। ডানদিকে হলুদ বাড়ি। নীচের সামনের চওড়া বারান্দায় গোল থামের পাশে ও ফাঁকে-ফাঁকে বড়-বড় ফুলের টব। শীতের চন্দ্রমল্লিকা আছে, কিছু বা শুকিয়েছে। অন্য ফুলের গাছও দু-একটা টবে রয়েছে। অশোক গেটের দু-পাশে দেখে বলল, 'ফটিক, কোনও কলিংবেল দেখছি না, লোকজনও চোখে পড়ছে না।'

'তার ওপর শালা বিওয়্যার অব ডগ।' ফটিক বাড়িটার দোতলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দরজা খুলে ঢুকে পড়ার কোনও উপায় নেই। শেষটায় ডালকুত্তোর মুখে—' ফটিক থেমে গেল।

অশোক ফটিকের দৃষ্টি লক্ষ করে দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। একজন মহিলা দোতলা থেকে ওদের দিকেই তাকিয়ে দেখছেন। বয়েস অনুমান করা কঠিন। অনধিক তিরিশ। বেশিও হতে পারে। মাঝারি লম্বা, কিছুটা দোহারা কিন্তু মোটা বলা যাবে না। তবে স্বাস্থ্যবতী, রূপসী বলতেই হবে। এমন কিছু দূরে না, তাই চোখে পড়ছে অল্প কোঁচকানো বাসি চুলের বাসি বিনুনি, খোলা সিঁথের মাঝখানে সিঁদুরের রেখা। কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল। হাতে কানে-গলায় সোনার ঝিলিক। কালো, উজ্জ্বল চোখে ভ্রূকুটি, জিজ্ঞাসা। একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চান?'

'নরেনবাবু—মানে উকিলবাবুকে।' অশোক বলল।

মহিলা জিগ্যেস করলেন, 'কোথা থেকে আসছেন? কী নাম বলব?'

'বলুন সোনারপুর থেকে এসেছি, তাহলেই উনি চিনতে পারবেন।' অশোক বলল।

ফটিক চোখের কোণে অশোকের দিকে দেখল। মহিলা বারান্দা থেকে ভেতরে চলে যাওয়ার আগে বললেন, 'দেখছি।'

ফটিক গলা নামিয়ে বলল, 'একেবারে উত্তরের বদলে দক্ষিণের সোনারপুর?'

'হ্যাঁ, রূপকথার রাক্ষসীদের কাছ থেকেও কিছু জ্ঞান নিতে হয়।' অশোক হাসল।

BanglaBook.org

বারান্দায় উদয় হল নতুন দুজন। পায়জামা পরা গায়ে পাতলা চাদর জড়ানো বছর সতেরো-আঠারোর একটি ছেলে। তার পাশে একটি নীল ফ্রক পরা বছর আটেকের মেয়ে। ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ফরসা মেয়ে। দুজনেই কিছু খাচ্ছে, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অশোক ফটিককেও দেখছে। কিন্তু চোখে তেমন কৌতূহল নেই। রাস্তায় তেমন যানবাহনের ভিড় নেই। লোক চলাচল করছে। আশেপাশে, রকে, রাস্তার ধারে দু-একগুচ্ছ ছেলে জটলা করছে। পাড়ারই বেকার ছেলে মনে হয়। তাদের দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথের বাড়ির দিকেই। আলোচ্য বিষয়ও বোধহয় পারমিতা হত্যা। অশোক ফটিকের দিকে তাদের তেমন লক্ষ্য নেই।

নীচের বারান্দা দিয়ে একজন বেরিয়ে এল গেটের দিকে। ঘন নীল রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, লাল টাই। শক্তপোক্ত মাঝারি চেহারা, ফরসা। মাথার চুলে বাঁ-দিকে সিঁথি। চেহারা আর বয়েস দেখে অশোকের মনে হল নরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে। বোধহয় অফিসে বেরোবার জন্য তৈরি। অশোক ফটিকের দিকে দেখে গেটের একটা পাল্লা খুলে বলল, 'আসুন।'

'নরেনবাবু বাড়ি আছেন তো?' অশোক জিগ্যেস করল।

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'আছেন। শরীরটা খারাপ, একটু বেলায় চান করে পুজোয় বসেছেন। এখুনি হয়ে যাবে। আপনাদের দু-মিনিট বসতে বললেন।'

'কিন্তু আপনাদের কুকুরটা?' ফটিক জিগ্যেস করল, 'সে কোথায়?'

স্যুটেড-বুটেড গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে একটু হাসল, 'কুকুর নেই, বছরখানেক হল মরে গেছে। গেটের লেখাটা রয়ে গেছে।'

'ভালোই হয়েছে।' অশোক গেট দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'চোর-ছ্যাঁচড়রা তবু একটু থমকে দাঁড়াবে।'

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'যা বলেছেন। লেখাটা দেখে এখনও অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।'

'আপনাদের কলিংবেলটা খুঁজছিলাম।' অশোক বলল।

স্যুটেড-বুটেড ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে টব সাজানো বারান্দায় উঠতে-উঠতে বলল, 'কলিংবেলটা এখানে, এই বাইরের ঘরে দরজার গায়ে।' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, আর খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে ডাকল, 'আসুন।'

অশোকের পিছনে ফটিক ঢুকল। জানলা-দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরটা তেমন আলোকিত না। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ঘরটি বেশ বড়। ঘরের ডানদিকে কাঠের পার্টিশান দেওয়া। পার্টিশানের ভেতরে যাওয়ার এক পাল্লার দরজাটা বন্ধ। পিতলের একটা গোল হ্যান্ডেল। পার্টিশানের ও-পাশে কি নরেন্দ্রনাথের অফিস চেম্বার? বাড়িটা যে পুরোনো তার প্রমাণ মাথার ওপরে কাঠের কড়িবরগা।

অশোক যে-ঘরে ঢুকল, সে-ঘরের চেহারাটা তেমন সাজানো-গোছানো বসবার মতো না। মাঝখানে একটা টেবিল, চারপাশে কিছু চেয়ার। গোটা দুয়েক বেঞ্চিও আছে। এ-ঘর সম্ভবত নরেন্দ্রনাথের মক্কেলদের বসবার ঘর। পিছন দিকের দেওয়ালে একটি খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজায় মোটা পরদা। মনে হয় একতলার ভেতরে যাওয়ার দরজা। কারও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্যুটেড-বুটেড বলল, 'আপনারা এ-ঘরে বসুন, উনি আসছেন।' বলে ঘরের বাঁদিকে গিয়ে একটা দরজা খুলল।

অশোক তাকিয়ে দেখল, ওপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ি ডানদিকে উঠে গেছে। সিঁড়ির নীচের ধাপের বাঁদিকে গোল চওড়া পালিশ করা কাঠের স্তম্ভ থেকে সিঁড়ির রেলিং। এ-ঘর থেকে সিঁড়ির মাত্র দুটো ধাপ দেখা যায়। সিঁড়িটা নিশ্চয়ই এ-ঘরে ঢোকবার বারান্দার মুখেই বাঁদিকে। চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি কেন? সিঁড়ির সামনে কি কোনও দরজা বা আড়াল করা আছে? সম্ভবত। স্যুটেড-বুটেড সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

BanglaBook.org

ফটিক কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভেতরে দরজার পরদা তুলে একজন ঘরে ঢুকল। পুরুষ। বয়স চল্লিশের মধ্যে। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। শক্ত, ধারালো, ফরসা, মেদহীন, দীর্ঘ শরীর। পায়জামার ওপরে সাদা পাঞ্জাবি, এলোমেলো করে জড়ানো একটি ছোট লাল পশমি শাল। বোধহয় মেয়েদের। পায়ে হরিণের চামড়ার নরম চটি, বাঁ-হাতের দু-আঙুলে কিংসাইজ জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ-মুখও বেশ ধারালো, বুদ্ধিদীপ্ত। দেখলেই শৌখিন রুচির মানুষ বলে মনে হয়। পরদা তুলে ঘরে ঢোকবার মুহূর্তে অন্যমনস্ক ছিল। অশোক আর ফটিককে দেখে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করে উঠল, 'আপনারা?'

'আমরা মিঃ ভট্টাচার্যের—মানে, নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' অশোক জবাব দিল।

ইতিমধ্যেই একটা চেনা সুগন্ধ লোকটির গা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল। গম্ভীর, হতাশ স্বরে খানিকটা যেন আপনমনে বলল, 'দেখা কি হবে? ওঁর শরীর, মন কিছুই ভালো নেই, কোর্টেও বেরোচ্ছেন না। কোথা থেকে আসছেন?'

'সোনারপুর।' অশোক জবাব দিতে-দিতে লোকটির পরিচয় বোঝবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বলল না, ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রনাথ খবর পেয়ে লোক পাঠিয়ে ওদের ঘরে বসিয়েছেন।

শৌখিন সুপুরুষ লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া। সিগারেটে টান দিয়ে আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ছাড়ল, 'আজ কি আপনাদের আসবার কথা ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অশোক ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল।

লোকটি বাঁদিকে পার্টিশানের দিকে একবার দেখল, তারপরে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। চিন্তিত চোখের দৃষ্টিতে ফুটল চকিত জিজ্ঞাসা, 'উনি—মানে, মিঃ ভট্টাচার্য আপনাদের আসার খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।' অশোক হাসল। লোকটি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, অনাহূত হয়ে ও আর ফটিক এ-ঘরে বসেনি।

লোকটি লজ্জা পেয়ে অপ্রস্তুত হাসল। তাকাল অশোক আর ফটিকের দিকে। বুদ্ধিদীপ্ত অথচ ভাবালু চোখে একটু বিশেষ অনুসন্ধিৎসা। বলল, 'আমারই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের কারওরই মাথার ঠিক নেই।' সে আবার পিছন ফিরে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ফটিক তাকাল অশোকের দিকে। অশোক সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে নিচু স্বরে বলল, 'নরেনবাবু কথা রেখেছেন। আমাদের আসার কথা বাড়িতে কারওকে জানাননি।'

ফটিক ধূমপান করে না। ভেতরে যাওয়ার দরজার পরদার দিকে ওর চোখ, 'ভদ্রলোক কে হতে পারে? নরেনবাবুর ছেলে?'

'না, বোধহয় জামাই।' অশোক বলল, 'যে আমাদের ঘরে এনে বসাল, সে বোধহয় ছেলে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল।'

বাঁদিকে সিঁড়ির দরজার কাছে শব্দ পেয়ে অশোক ফিরে তাকাল। নরেন্দ্রনাথ। ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে জড়ানো পাতলা চাদর, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ব্যস্তভাবে ঢুকলেন, 'দেরি হয়ে গেল, কাল রাত্রে আপনার ওখান—।'

'আমরা কি এ-ঘরে বসে কথা বলব?' অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল।

নরেন্দ্রনাথ অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'কোথায় বসবেন বলুন? পার্টিশানের ও-পাশে বসবেন?

'এ-ঘর দিয়ে তো বোধহয় নীচের তলার লোকজন যাতায়াত করবে।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ পরদা ঢাকা দরজার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিকই বলেছেন। চলুন, আমরা পার্টিশানের ও-ধারে আমার চেম্বারে গিয়ে বসি।' কথার সময়ে তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বারেবারেই ফটিকের দিকে পড়ছিল।

BanglaBook.org

অশোক উঠে দাঁড়াল। ফটিকও। নরেন্দ্রনাথ পার্টিশানের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ডাকলেন, 'আসুন।'

পার্টিশানের ভেতরের ঘরটিও ছোট না। ঘরের মাঝখানে বড় সেক্রিটারিয়েট টেবিল। টেবিল ক্যালেন্ডার, প্ল্যাস্টিকের কলমদানিতে নানা আকার আর রঙের একগুচ্ছ কলম, পেনসিল। বাঁদিকে সাজানো ফাইল নথিপত্রের গোছা। এ পার্টিশান করা ঘর থেকেও বাইরের বারান্দায় এবং পিছনে অন্দরে যাওয়ার মুখোমুখি দুটো দরজা। দুটো দরজাই বন্ধ। উত্তর দিকের দুটো জানলা। দুই জানলার দু-দিকে আর পিছনের দরজার একপাশে, তিনটি বই-ঠাসা আলমারি। সামনের বারান্দার দিকেও একটা জানলা আছে। সবই বন্ধ। নরেন্দ্রনাথ আগে জানলাগুলো খুলে দিলেন। পাশের ঘর থেকে আলো আসায় ঘরটাকে একটু বেশি আলোকিত দেখাল। নরেন্দ্রনাথের মোটা গদিওয়ালা চেয়ার ছাড়া মুখোমুখি বসবার জন্য আরও তিনটি চেয়ার রয়েছে। পিছনের এক কোণে ছোট একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। টেবিলের ওপরে কিছু নথিপত্র। এবং ঢাকা দেওয়া একটি টাইপরাইটার। টেবিলটার কাছে দেওয়ালের নীচের দিকে টেলিফোনের কানেকশন রয়েছে। এখন সম্ভবত টেলিফোন ওপরে রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বসুন।'

'এ আমার বন্ধু অয়স্কান্ত রায়।' অশোক চেয়ারে বসতে-বসতে নরেন্দ্রনাথের কৌতূহল মেটাল, 'চব্বিশ পরগনার এস. পি. মিঃ মিত্র ওকে চেনেন। প্রায় ক্ষেত্রেই ও আমার সঙ্গে থাকে।'

ফটিক হাত তুলে নমস্কার করল। নরেন্দ্রনাথ কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, ইনি আবার কে? মনে করেছিলাম আপনি একলা আসবেন।'

'মাঝে-মধ্যে ওর সাহায্যের দরকার হয়।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'গতকাল আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। বাগানে আপনার বোনের ডেডবডি প্রথম কে, কখন দেখেছিলেন?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'মথুরা, যে আমাদের বাড়িতে রান্না করে। বোধহয় রাত্রি তখন ন'টা, সোয়া ন'টা বেজেছিল। নীচের তলার পেছনদিকেই তো রান্নাঘর—।'

'আচ্ছা, মথুরার সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।' অশোক বলল, 'আপনার বোনকে কখন থেকে বাড়িতে দেখা যায়নি, কোনও খোঁজখবর করা হয়েছিল?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো তখন এ-ঘরেই ছিলাম। মিতা সন্ধের দিকে ঠিক কখন বাগানে গেছল, কেউ বলতে পারেনি। আসলে মিতা যে বাগানে যেতে পারে সে কথাটাই কারও মাথায় আসেনি। সবাই ভেবেছিল, কার্ছেপিঠেই কোথাও গেছে, দোকানে-টোকানে বা কাছাকাছি কারও বাড়িতে। এরকম তো বেরোত আর সবসময়েই যে বলে বেরোত তাও নয়। বিশেষ করে কাছেপিঠে কোথাও গেলে। তবু বেশ খানিকক্ষণ ওকে দেখতে না পেয়ে, বাড়ির কেউ কেউ ভাবছিল, মিতা গেল কোথায়? এরকম না বলে-কয়ে বেরোলে ওর বড় বউদি— মানে আমার স্ত্রী বকুনি দিত। তবে ওসব নিয়ে সিরিয়াস ঝগড়াঝাঁটি কিছু হত না।'

'বাগানে যখন আপনার বোনকে পাওয়া গেল, নিশ্চয়ই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডেডবডি যেমন পড়েছিল, তেমনিই ছিল?'

'হ্যাঁ, কেউ ছোঁয়নি।'

'পুলিশ ফটো তুলেছিল?'

'অনেকগুলো।'

'সেসব ফটো কোথায়?'

'পুলিশের কাছেই আছে।'

'সেগুলো একবার দেখা দরকার।' অশোক সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'লোকাল থানায় না থাকলে লালবাজারে অথবা ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে আছে। এখন কথা হচ্ছে,

BanglaBook.org

পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এস. পি. মিঃ মিত্র অথবা এস. এস. পি., সি. আই. ডি.-র কাছ থেকে কোনও পরিচয়পত্র না পেলে, আমার পক্ষে অসুবিধে, এ কথাটা—।'

নরেন্দ্রনাথ হাত তুলে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ওহ্, আর বলবেন না। এস. এস. পি., সি. আই. ডি.-র একটা চিঠি গতকালই আমি আপনার জন্যে নিয়ে গেছলাম। এমনকী মিঃ মিত্র আমাকে বলেও দিয়েছিলেন, আপনাকে চিঠিটা দেওয়া বিশেষ দরকারি। আর সেটাই আমি পকেটে নিয়ে চলে এসেছি।' তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উদ্যোগ করলেন, 'তা ছাড়া মিঃ মিত্র আপনাকে আপনার সুবিধেমতো সময়ে একবার টেলিফোন করতেও বলেছিলেন।'

'ব্যস্ত হবেন না, বসুন।' অশোক হাত তুলল, 'ওসব পরে দেখছি। আপনাদের পেছনের বাগানে কোন-কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়?'

নরেন্দ্রনাথ অশোকের কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। অশোক বলল, 'আমি বলছি, কেবল কি নীচের রান্নাঘরের দিক থেকেই বাগানে যাওয়া যায়, না আর কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে বইকি।' নরেন্দ্রনাথ উত্তরের জানলা দিয়ে কয়েক হাত দূরে সীমানা-পাঁচিল দেখিয়ে বললেন, 'এ-ঘর থেকে বেরিয়ে ওই পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। ওপরের দুপাশে দুটো বাথরুম থেকে বাগানের দিকে দুটো লোহার স্পাইরাল সিঁড়ি আছে। সেদিক থেকেও যাওয়া যায়।'

অশোক বলল, 'সেটাই জানতে চাইছিলাম। পারমিতা কোন পথে বাগানে গেছল, সে বিষয়ে কিছু জানা গেছে কি?'

'গেছে।' নরেন্দ্রনাথ উত্তরের জানলার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'পুলিশের ধারণা, মিতা নিশ্চয়ই আমার ঘরের সামনে দিয়ে, পাঁচিলের ওই ধার দিয়ে বাগানে গিয়েছিল। শীতের দিন, বিকেলেই আমার এ-ঘরের উত্তরেব জানলাগুলো বন্ধ করা থাকে। বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ থাকে, না থাকলে পরদা ফেলা থাকে। শব্দ করে কেউ না গেলে আমার পক্ষে টের পাওয়া মুশকিল। বুঝতেই পারছেন, আমি তখন ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকি।'

'ওপবের বাথরুমের সিঁড়ি দিয়ে যায়নি, সেটা কেমন করে জানছেন?'

'প্র্যাকটিক্যালি ওপরের বাথরুমের পেছনের দরজা বিকেল থেকেই বন্ধ থাকে, সারারাত্রে আর খোলা হয় না। সকালে জমাদারের জন্যে প্রথম খোলা হয়।'

'সেই রাত্রে, পারমিতা খুন হওয়ার পরে, কী দেখা গিয়েছিল? বাথরুমের পেছনের সিঁড়ির দরজা বন্ধ?'

'হ্যাঁ, বন্ধ ছিল। আর নীচের রান্নাঘরের দিক দিয়ে গেলে তো মথুরা বা ঝি দেখতে পেত। তা ছাড়া, আমার স্ত্রী, বড় বউমাও রান্নার সময় প্রায়ই নীচের ঘরেই থাকে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট সব নীচে। আমার মেজো আর ছোট ছেলে নীচের একটা ঘরে রাত্রে থাকে।'

'থাকবার মতো ঘর কি নীচে একটাই?'

'না, আরও একটা ঘর আছে। নীচের ঘরে বাথরুমের অসুবিধে। অবিশ্যি ঝি-চাকরের বাথরুম ছাড়াও একটা ছোটখাটো আলাদা বাথরুম আমি করিয়ে নিয়েছি, ছেলেরা রাত্রে সেটা ব্যবহার করে। আসলে বাড়িটা এমনভাবে তৈরি, নীচে খাওয়া-বসা ইত্যাদি চলে। একবার ওপরে চলে গেলে, নীচের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ থাকে না।'

'বুঝেছি।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'বোধহয় কোনও সাহেবের বাড়ি ছিল। নীচের তলাটা সারাদিনের খাওয়া-বসা-গল্প-বিশ্রাম, রাত্রে ওপরে চলে যাওয়া।'

নরেন্দ্রনাথ একটু হাসলেন, 'ঠিক বলেছেন। কিন্তু বাড়িটা সাহেবের ছিল, বুঝলেন কী করে?'

'অনুমান। রাত্রে নীচের তলার দায়দায়িত্ব চাকর বেয়ারা আয়া খানসামার হাতে দিয়ে সাহেবরা ওপরের দরজা বন্ধ করে আলাদা হয়ে যেত।' অশোক হাসল, 'নেটিভদের সামনে তো আর রাত্রিবাস

BanglaBook.org

করা যায় না। তা ছাড়া, বাড়িটার চেহারা দেখেও সেইরকম মনে হয়। যাই হোক, সেসব আমি পরে ঘুরে দেখব। পারমিতার কি ওপরে কোনও আলাদা ঘর ছিল নাকি?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ছিল কেন, এখনও আছে। ও আলাদা ঘরেই থাকত।'

'ঘরটা কি খোলা আছে?'

'না, তালা বন্ধ।'

'পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে?' অশোকের চোখে অস্বস্তি।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'সিল করাই ছিল। গতকাল সিল খুলে দিয়ে গেছে, চাবিও দিয়েছে। তবে আমরা এখনও তালা খুলে কেউ ও-ঘরে ঢুকিনি। মানে ঢুকতে পারছিনে।' তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল।

'বুঝতে পেরেছি।' অশোকও সহানুভূতিসূচক করুণ মুখ করে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানির জন্য টেবিলের আশেপাশে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে নিজেও টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাশট্রে তো একটা থাকে। কোথায় যে গেল? আমি তো স্মোক করিনে, বুঝতেই পারছেন, ক্লায়েন্টদের জন্যে—।'

'ওই তো, ওই টেবিলে রয়েছে।' ফটিক উঠে দাঁড়িয়ে কোণের দিকের টাইপরাইটার রাখা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লাল রং করা অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় ছাইদানি টাইপরাইটারের পাশ থেকে এনে অশোকের সামনে রাখল।

অশোক সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিল, 'কে প্রথম দেখল, ওপরের বাথরুমের পেছনের দরজা বন্ধ রয়েছে?'

'পুলিশ।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের তো ওসব খেয়ালই ছিল না। পুলিশই প্রথম জানতে চাইল, ওপরের থেকে পেছনের বাগানে যাওয়ার কোনও পথ আছে কি না। তারপরে তারাই দেখল, দুটো বাথরুমের পেছনের দরজাই ভেতরদিক থেকে বন্ধ।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'আর বাড়িতে তখন আপনারা সবাই রয়েছেন?'

'হ্যাঁ—না, সবাই ছিলাম, আমার মেজো ছেলে নবেন্দু তখন বাড়ি ছিল না, ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছল। আর সবাই বাড়ি ছিল।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ও কোথায় কাদের বাড়ি গেছল, পুলিশ সেসব খোঁজখবরও করেছে। আর ছেলের তো আমার মেজাজ খুবই খারাপ। পুলিশ যে ওকেও সন্দেহ করবে এটা ও ভাবতেই পারে না। মিতা আর ও তো প্রায় কাছাকাছি বয়েসি, পিসি-ভাইপোতে খুবই ভাব ছিল।'

অশোক হাসল, 'স্বাভাবিক, তবে পুলিশেরও কোনও উপায় নেই। খুন একটা এমন ব্যাপার, আর বাড়ির মধ্যে—সন্দেহ থেকে কারওকেই রেহাই দেওয়া যায় না।'

'তা বলে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ, অলমোস্ট ভাইবোনের মতো—!' নরেন্দ্রনাথ কথা শেষ না করে একটু তিক্ত হাসলেন, 'জানিনে ভাই, আপনাদের যে কাকে সন্দেহ হয় আর কাকে হয় না, আমি বুঝতে পারিনে। হয়তো আমিও সেই তালিকায় আছি।'

অশোক হাসল, কিন্তু কঠিন সত্যটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আসলে কার কী মোটিভ থাকতে পারে তা খোঁজার জন্যেই অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। এসব একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।' কথাটা বলতে-বলতেই অশোকের নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল। সেই হালকা সুগন্ধটা ওর ঘ্রাণে এসে লাগল। যে-গন্ধটা একটু আগে সেই সুপুরুষ সৌখিন মানুষটির গা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরেই পার্টিশানের ওপারে দু-একটি অস্পষ্ট কথা শোনা গেল। ও সেদিকে তাকাল।

পার্টিশানের দরজায় ঠুকঠুক শব্দ হল। নরেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কে?'

দরজাটা আস্তে-আস্তে একটু ফাঁক হল। সেই স্যুটেড-বুটেড যুবক, এখন তার ডানহাতের অ্যাটাচি অংশত দেখা যাচ্ছে। একবার অশোক আর ফটিকের দিকে দেখে নিয়ে নরেন্দ্রনাথকে বলল,

BanglaBook.org

'বাবা, আমি তা হলে বেরোচ্ছি। জ্যোতুকে বলে দিয়েছি, সেরকম কোনও দরকার হলে বা তোমার শরীর-টরির আরও খারাপ লাগলে, আমাকে যেন অফিসে টেলিফোন করে।'

নরেন্দ্রনাথ ছেলেকে কিছু বলবার আগেই অশোকের মুখের দিকে তাকালেন। অশোক নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, 'আমার ঠাকুর্দার উইলটা তো আপনি দেখলেন, এটাই আসল উইল। আমার জ্যাঠতুতো দাদা যেটা ঠাকুর্দার উইল বলে সাবমিট করেছে, তার তারিখটা—।'

নরেন্দ্রনাথ একদম বেকুবের মতো অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ফটিক ঝুঁকে পড়ে পার্টিশানের দরজায় নরেন্দ্রনাথের ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'উনি কী বলছেন, শুনুন। উনি বেরোচ্ছেন, ওঁকে ছেড়ে দিন, আমাদের মামলার কথা পরে বলছি।'

ইতিমধ্যে স্যুটেড-বুটেডের মুখেও কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ছোঁয়া লেগেছিল। সেটা নরেন্দ্রনাথের মুখের অবস্থা দেখে। নরেন্দ্রনাথ আর-একবার অশোকের ফিরিয়ে রাখা মুখের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ—আচ্ছা, তুই বেরোচ্ছিস? ঠিক আছে। আমি সারাদিন বাড়িতেই আছি।'

'তুমি এই শরীর-মন নিয়ে আজ আর এঁদের সঙ্গে কাজে না বসলেই পারতে।' স্যুটেড-বুটেডের অবাক মুখে এখন কিঞ্চিৎ বিরক্তি। চকিতে একবার অশোক ফটিকের দিকে দেখে নিল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, এঁদের সেরকম কিছু কাজ নেই। তুই অফিসে বেরিয়ে পড়।' আবার জিজ্ঞাসু চোখে অশোকের দিকে তাকালেন।

অশোক মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে নির্বিকার চোখে তাকাল। পার্টিশানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জুতো পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেই হালকা সুগন্ধটা এখনও যেন ছড়িয়ে রয়েছে। শৌখিন যুবকটি কি পার্টিশানের ওপাশে এখনও দাঁড়িয়ে আছে নাকি? এদিকে নরেন্দ্রনাথের বোধহয় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার বড় ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছিলেন তো?' অশোক খুব নিচু স্বরে বলল।

নরেন্দ্রনাথ অশোকের এত নিচু স্বর শুনেও অবাক হলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ও আমার বড় ছেলে, তা বুঝলেন কেমন করে?'

'অনুমান।' অশোক পার্টিশানের ওপারে ছাদের কড়িবরগার দিকে দেখল, 'ওঁকে যখন কিছু জানানো হয়নি, অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি করার কী দরকার? সেরকম বুঝলে, আমরা ওঁর অফিসেই যাব।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনিই কারওকে কিছু বলতে বারণ করেছিলেন।'

'আপনাকে কোনও দোষ দিচ্ছিনে।' অশোক হাসল, 'আপনি ঠিক কাজই করেছেন। পাছে আপনি পরিচয় করিয়ে দিতে যান, সেইজন্যে তাড়াতাড়ি আপনার মক্কেল সেজে গেলাম। উনি অফিসে যাচ্ছেন, যান, পরে কথা বলা যাবে। তবে আপনার এই ঘরে কথা বলার একটু অসুবিধে আছে। পার্টিশানের ও-ধারে কেউ থাকলে আমাদের সব কথাই শুনতে পাবে।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আশা করি, এ-ঘরের কথা আড়ি পেতে শোনবার মতো লোক এ-বাড়িতে কেউ নেই।'

অশোক হাসল, প্রতিবাদ করল না। স্বাভাবিক, পরিবারের লোকদের সম্পর্কে কোনও খারাপ কটাক্ষ কোনও ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে না। সেই হালকা সুগন্ধটা ইতিমধ্যে প্রায় মিলিয়ে গেছে। অশোক বলল, 'কথা অনেক হল, এবার আমরা একটু কাজ শুরু করি।'

'বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তো?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'কোথায় বসে করবেন? এখানে, না অন্য কোনও ঘরে? আপনি যেখানে বলবেন। ওপরেও যেতে পারেন।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, জিজ্ঞাসাবাদ পরে। চলুন, পেছনের বাগানটা আগে একবার দেখে আসি।'

BanglaBook.org

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফটিকও উঠে দাঁড়াল। নরেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কোন দিক দিয়ে যাবেন?'

'আপনার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ গায়ের চাদরটা গুছিয়ে বারান্দার দরজার দিকে এগোলেন।

দরজা খুলতেই বারান্দা। বারান্দার ওপরে সারি-সারি ফুলের টব। হাত তিন-চারেক ফালি জায়গা শান বাঁধানো, তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে রাস্তা। বাড়িটা পশ্চিমমুখো। বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার লোক চলাচল, যানবাহন দেখা যায়। বারান্দাটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দার দক্ষিণ দিক দিয়ে অশোক ঢুকেছিল। উত্তরে খানিকটা গিয়ে বারান্দার দু-ধাপ সিঁড়ি। সামনেব মতো উত্তরেও কয়েক হাত ফালি জায়গা, শান বাঁধানো। পুবের পাঁচিল উত্তর-পুব কোণ থেকে ঘুরে সোজা পশ্চিমে গিয়েছে।

অশোক আর ফটিক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বারান্দা থেকে নামল। বাঁয়ে ফিরে কয়েক হাত গিয়ে গ্রিলের একটা দরজা ছোট। সাধারণ ছিটকিনি লাগানো, তালা বন্ধ নেই। নরেন্দ্রনাথ ছিটকিনি খুলে পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলেন। পাঁচিলের উত্তরে কয়েক হাত দূরে লম্বা টিনের শেড। শেডের ওপরে কোথাও ত্রিপলের টুকরো ইঁট চাপা দেওয়া। নিশ্চয়ই বৃষ্টির জল আটকানোর জন্য। টিনের শেডের আরও উত্তরে পুরনো একতলা বাড়ির মাথা দেখা যাচ্ছে। তারও উত্তরে তিনতলা একটা বাড়ি।

নরেন্দ্রনাথ বাগানের একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন। অশোক দেখল, বাড়িব যেখানে শেষ সেখান থেকেই বাগানের শুরু। আড়াই-তিন কাঠার বাগান। বাগান না বলে পোড়ো বলাই ভালো। আম, পেয়ারা আর কাঁঠাল গাছ। এক কোণে একটি লেবু গাছ। জমির কোথাও মুথো ঘাস, কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া পাঁচ-ছ'ইঞ্চির মতো উঁচু নাম না জানা জঙ্গুলে গাছের ঝাড় এখানে-ওখানে। কাটা গাছ বা বিছুটি না, এই যা রক্ষা। ছড়িয়ে আছে শুকনো পাতা। পেয়ারা গাছে নাইলনের দড়িতে একখণ্ড কাঠে ঝোলানো একটি ছোট দোলনা। উত্তর পশ্চিম আর দক্ষিণ, তিন দিকেই প্রায় আট ফুট লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমের পাঁচিলের ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাথা তুলে আছে টিন টালির চালার মাথা। তার মানে ওদিকটায় এখনও একটা ঘিঞ্জি বস্তি রয়েছে। দক্ষিণের পাঁচিলের ওপারেও কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণের প্রতিবেশীর বাড়িরও পিছনে একটি বাগান আছে। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে চারতলা নতুন বাড়ি মাথা তুলে আছে।

অশোক বাগানে পা দিয়ে আগে দোতলা বাড়িটার পিছন দিকে তাকাল। ওপরের বাথরুমের দরজা বন্ধ, দু-দিকে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি নীচে নেমে এসেছে। বাথরুমের দরজা ছাড়াও একটি করে কাচের পাল্লা লাগানো ছোট জানলা আছে। দুটো বাথরুমের মাঝখানের হলুদ দেওয়ালে, প্রায় ছ'ফুট ফারাকে, কাঠের খড়খড়ি লাগানো দুটো বড়-বড় সবুজ জানলা। দুটোই বন্ধ। জানলার ওপরের খিলান ত্রিকোণ। বাথরুমের ডাইনে-বাঁয়েও একই মাপের দুটো বন্ধ জানলা।

নীচের তলায়, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দেওয়ালের মাঝখানে, একটি বড় দরজা। দরজার নীচেই সিঁড়ি ধাপে-ধাপে নেমে ক্রমে চওড়া হয়ে গেছে। সিঁড়ির ধারগুলো সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া রেলিং-এর মতো। দরজার মাথার খিলান ত্রিকোণ। চওড়া দু'পাল্লার দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করা। অর্থাৎ খোলা রয়েছে। সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। বাঁদিকে, ওপর তলার মতোই একটি খড়খড়ি লাগানো বন্ধ জানলা। ডাইনেও সেইরকম। তারপরেও ডাইনে মূল বাড়ির সঙ্গে অনেকটা নিচু ছোট একটা একতলা যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ছোট একতলার একটা দরজা এবং জানলা বাগানের দিকে। দরজাটা বন্ধ, জানলাটা আধখোলা। আধখোলা দিয়ে কথাবার্তার

BanglaBook.org

অস্পষ্ট শব্দ, নির্গত ধোঁয়া, রান্নার গন্ধে বোঝা যায় ওটা রান্নাঘর। তারপরেও নিচু একতলাটা পশ্চিমে আরও অন্তত আট ফুট মতো লম্বা। ঝি-চাকরদের বাথরুম।

অশোক এগিয়ে গেল সেদিকে। ঘরটার একেবারে পিছনে, পশ্চিমের শেষে দেখা গেল ছোট একটা বন্ধ দরজা। দরজার মাথার ওপরে এক ফুট লম্বা চওড়া চৌকো জানলা, লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। দরজার সামনেই ছোট একটা ম্যানহোল।

অশোক সেখান থেকে ডানদিকে ফিরে গোটা বাড়ির ওপর-নীচে দেখতে-দেখতে বাগানের দিকে ফিরল। তাকাল পশ্চিমের পাঁচিলের দিকে। নরেন্দ্রনাথ উত্তর ঘেঁষে আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফটিক পেয়ারা গাছের দোলনাটার কাছে। ও বাগানের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। মাঝে-মাঝে পিছনের সামান্য ফাঁক করা বড় দরজা আর রান্নাঘরের আধখোলা জানলার দিকে।

অশোক নরেন্দ্রনাথের দিকে পা বাড়াতেই বাড়ির পিছনের বড় দরজাটা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই সুঠাম, বলিষ্ঠ, শৌখিন, সুপুরুষ যুবক। ভ্রূকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। হাতে এখন আর সিগারেট নেই। অশোক আর ফটিকের দিকে কয়েকবার দেখে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাকালেন অশোকের দিকে। অশোকও তাঁর দিকেই তাকাল। বুঝল, এখন আর গোপন করার কিছু নেই। নিজেই খুব স্বাভাবিক কৌতূহল প্রকাশ করল, 'ইনি?'

'বিক্রম, অর্পিতার বর।' নরেন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

অশোক যেহেতু নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিক্রমের চেহারার মিল খুঁজে পায়নি, বয়েসটাও ছেলেদের সঙ্গে মেলাতে পারেনি, তাই প্রথম দর্শনে এরকমই একটা অনুমান করেছিল। বিক্রমের ভ্রূকুটি চোখে বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল, সিঁড়ির এক ধাপ নেমে এল, 'কী ব্যাপার বড়দা? আপনারা—মানে এঁরা—এঁদের নিয়ে বাগানে—?' কথাটা সে শেষ না করে অশোক আর ফটিকের দিকে আবার দেখল।

'একটু দরকার আছে।' নরেন্দ্রনাথ অশোকের দিকে তাকালেন। তারপর বিক্রমের দিকে ফিরে বললেন, 'এঁরা মিতার ব্যাপারে বাড়ির সবার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

'ও।' বলে বিক্রম চলে গেল। তবে তার চোখে ভ্রূকুটি থেকেই গেল।

'বিক্রম মনে হয়—' নরেন্দ্রনাথ আমতা-আমতা করে শুরু করলেন।

অশোক হাসল। হঠাৎ দেখল দূরে ফটিক হুমড়ি খেয়ে ঘাস-পাতার ওপরে পড়ল।

অশোক বলল, 'চলুন, মিতার ঘরে যাওয়া যাক।'

'চলুন।' নরেন্দ্রনাথ ওদের নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলেন।

অশোক ফটিকের চোখে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

মিতার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ-ঘরে ঢুকতে যে এত কষ্ট হবে আগে কখনও বুঝতে পারিনি। আমার—।'

'টেলিফোনটা তখন কোথায় ছিল?' অশোক নরেন্দ্রনাথের কথার মাঝখানেই জিগ্যেস করল।

নরেন্দ্রনাথ ভুরু কোঁচকালেন, 'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। আপনাদের টেলিফোনটা তখন কোথায় ছিল, মিতাকে যখন থেকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছিল না?'

'টেলিফোন তো সন্ধে সাড়ে ছ'টায় রোজই আমার চেম্বারে নামিয়ে নেওয়া হয়।'

'আর মিতা ঠিক কখন বেরিয়েছিল, সেটা কেউ বলতে পারছে না?'

'না। সকলেরই ধারণা, সাতটার পর থেকে ওকে দেখা যায়নি। কারওকে কিছু বলেও যায়নি।'

'আপনার বোন অর্পিতা কি সেই রাত্রে এখানে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওকে বিক্রম সকালবেলাই সুখচর থেকে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেছে।'

অশোক পুবের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার ওপারে পাশাপাশি কয়েকটা

BanglaBook.org

দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ি। সেদিকে মুখ রেখেই জিগ্যেস করল, 'পুলিশ তো নিশ্চয় এ-ঘর তন্নতন্ন করে সার্চ করেছে?

'তা করেছে।'

'কিছু নিয়ে গেছে?'

'গেছে। মিতার একটা ছোট নোট বুক, যার মধ্যে কিছু নাম ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল। আর কিছু চিঠিপত্র। নানান জনের লেখা, খান দশ-বারো চিঠি।'

'কোনও প্রেমপত্র ছিল তার মধ্যে?'

নরেন্দ্রনাথ জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'বলতে পারিনে, পুলিশ সেরকম কিছু বলেছে বলে শুনিনি।'

'আর কোনও ঘর পুলিশ সার্চ করেনি?'

'না, মিতার গহনাগাটি ছাড়া, সবই তো ওর নিজের ঘরে রাখত। গহনাগাটিগুলো আমার স্ত্রীর কাছে থাকত—মানে, এখনও আছে। পুলিশকে তা বলাও হয়েছে।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'এবার তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের পালাটা শেষ করে ফেলা যাক। আপনার স্ত্রীকেই আগে ডেকে দিন, গুরুজন দিয়ে শুরু করা যাক।' ও হাসল, 'এ ঘরটা পরে আমরা দেখব।'

'নিশ্চয়ই দেখবেন।' নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন।

অশোক ফটিকের দিকে ফিরে তাকাল, 'শুকনো ডাঙায় আছাড় খেলি যে?'

ফটিক ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা কিছু বের করে অশোকের সামনে এল, হাতের মুঠো খুলে দেখাল। একটি হিরে। সাধারণ পাথর না, পোখরাজ না, খাঁটি হিরে। অশোক দেখামাত্র চিনতে পারল। ও হিরে চেনে। বলল, 'হুঁ, খাঁটি হিরে মনে হচ্ছে।'

'একশো ভাগ।' ফটিক বলল, 'ঘাস আর শুকনো পাতার মধ্যে চিকচিক করছিল। জানতাম, বাড়িব লোকেরা আমাদের দেখছে। অগত্যা শুকনো ডাঙায় আছাড় খেতে হল, আর বস্তুটি হাতে চলে এল।'

অশোক হাসল, 'শাবাশ। পকেটে রাখ।'

ফটিক ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সরে যেতে-যেতেই বড় বউ ঘরের দরজায় এলেন। অশোক ডাকল, 'আসুন।'

বড় বউ ঘরে ঢুকলেন। অশোকের মস্তিষ্কে হিরের ঝিলিক। তবু আশেপাশে তাকিয়ে ডিভানটা দেখিয়ে বলল, 'আপনি ওটাতে বসুন, আমি চেয়ার টেনে নিচ্ছি।'

ফটিকই পারমিতার পড়বার টেবিলের কাছ থেকে চেয়ার এনে ডিভানের কাছে রাখল। সরে গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। বড় বউ বসলেন, অশোক চেয়ারে বসতে-বসতে বড় বউয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। হাতে শাঁখা-নোয়া ছাড়া কয়েকগাছা করে সোনার চুড়ি, গলায় সরু হার, কানে ছ'টা মুক্তো বসানো সোনার টাব। অশোক কোনওরকম ভূমিকা না করেই শুরু করল, 'আমি জানি আপনি মিতাকে নিজের মেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। আপনি চান, আমি যেন যেমন করে হোক ওর খুনিকে ধরিয়ে দিতে পারি। আপনার দু-একটা কথার জবাবের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রথম কথা, সত্যি বলুন তো, আপনাব সুন্দরী ননদটি মেয়ে হিসেবে কেমন ছিল?'

'মেয়ে হিসেবে?' বড় বউয়ের ভ্রূকুটি চোখের ওপরে, কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল, 'কেমন আবার? হাসিখুশি, মেধাবী, কথায়-কথায় ছেলেমানুষি—।' থামলেন, যেন কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অশোক কিছু না বলে হাসল। বড় বউ অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর আস্তে-আস্তে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি সরিয়ে তাঁতের লাল পাড় শাড়ির গোছানো আঁচলটা অকারণেই আবার গোছালেন। তাকালেন অশোকের দিকে, 'আর কী বলুন?'

BanglaBook.org

'বলুন নয়, বলো।' অশোকের মুখে হাসি, 'আপনি আমাকে তুমি করেই বলেছিলেন, আমি খুব খুশি। কিন্তু আমার কথার জবাব পেলাম না। যে-মন নিয়ে আমাকে তুমি বলেছেন, সেই মনটা খুলে আমাকে জবাব দিন।'

বড় বউ হঠাৎ কোনও কথা বললেন না, তাকিয়ে রইলেন অশোকের দিকে। আস্তে-আস্তে তাঁর মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল, 'তোমার কথাবার্তা ঠিক পুলিশের মতো নয়। কী জানতে চাইছ, তাও বুঝতে পারছি। তোমাকে আমি এটুকু বলতে পারি, মিতা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ছিল না।'

'খুব শক্ত চরিত্রের মেয়ে ছিল কি?' অশোকের চোখ বড় বউয়ের চোখের ওপর।

বড় বউ বললেন, 'হয়তো তাও নয়। একটা কথা জানো তো, রূপ অনেক সময় মেয়েদের কাল করে? মেয়েরা মুখে যাই বলুক রূপ থাকলে তার মনে একটা অহংকার থাকে। মিতারও ছিল, আর সবাই ওর রূপের প্রশংসা করত, ও তা শুনতে ভালোবাসত। প্রশংসা বড় মন গলায়। পুরুষরা মন গলিয়ে, আশকারা পায়। মিতা ওর ছেলে-বন্ধুদের আশকারা দিত। তারা সবসময় ওকে ঘিরে থাকত, খুশি করার চেষ্টা করত, নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে রেষারেষি করত। মিতা সেটা কতখানি বুঝতে পারত জানি নে, স্তাবকদের সকলের সঙ্গেই একরকম ব্যবহার করত। আমি অনেকদিন বলেছি, এটা ভালো নয়। বকাঝকা করেছি, রাগ করে বলেছি। আসলে তো ওর কাছে ওটা একটা খেলা ছিল। কিন্তু এ-খেলা তো ভালো খেলা নয়। বিপদ ঘটতে পারে।'

'বিপদ? কীরকম? এই যা ঘটে গেল, খুন?'

'না-না, এমন সর্বনাশের কথা আমার কখনও মনে আসেনি।' বড় বউয়ের চোখে আতঙ্ক। আমি বিপদ বলতে ভাবতাম, দুর্নাম, অপমান, ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লেগে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। এমনিতেই তো আমার জায়েরা মিতাকে—।' বলতে গিয়ে একবার ঢোক গিললেন, একটু হাসবারও চেষ্টা করলেন, 'ঢঙি ঢলানি বলত। আমি তা মনে করতাম না। ও তো নিজে গায়ে পড়া ছিল না, ঢলানি বলব কেন? তবে সকলের সঙ্গেই একেবারে হলাগলা মিশতে হবে, সেটা আমিও পছন্দ করতাম না।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভালো বলেছেন, মিতাকে চেনা যায়। কিন্তু একটা কথা বোধহয় ভুল, মিতা নিশ্চয় সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করত না।'

'একরকম মানে—উনিশ-বিশ তো ছিল।' বড় বউ বললেন, 'সব ছেলেও তো একরকম নয়।'

'তবু এমন একজন ছিল, যে সব বন্ধুর থেকে আলাদা।' অশোকের মুখে হাসি, চোখে তীক্ষ্ণতা, 'তাই না?'

বড় বউয়ের মুখ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, তা না হলে ওই ব্যাপারটা ঘটবে কেন? আর সেই একজনকে আমি কিছুতেই ঠাউরে উঠতে পারছিনে। মিতা যে কারওর কাছে নিজেকে ওরকম সঁপে দিতে পারে, আমি এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারিনে।'

'কেন?'

বড় বউ করুণ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার বকাঝকার সময়ে ও একটা কথা বরাবর বলত, বড় বউদি, আমি কোনওদিন এমন কাজ করব না, যাতে তোমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। সেরকম হলে তোমাদের বলব, বিয়ে করব। তুমি আর যাই করো, আমাকে ওই সন্দেহটা কোরো না। মেলামেশা মানে তো প্রেম নয়। আমি কারোর সঙ্গে প্রেম করিনে। এমন সাহসও কারও নেই, আমাকে কেউ কিছু করবে।'

'তা যাই বলুক, একজনের নিশ্চয় সে-সাহস ছিল, আর মিতাই তাকে সে-সাহস দিয়েছে। তাই মনে হয় না কি?'

BanglaBook.org

বড় বউ আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকালেন, একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'হ্যাঁ, এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু এর সঙ্গে কি খুনের কোনও যোগ আছে মনে হয়?'

'আমি বুঝতে পারিনে, ভেবেও পাইনে।' বড় বউ বললেন, 'বরং আমি তো উলটোটাই ভাবি। যে মিতাকে পেয়েছিল, তার বুক ফুলে বারো হাত হওয়ার কথা।'

অশোক হাসল, 'আবার এমন কেউ থাকতে পারে, মিতার প্রেমের কথা জানত, সে হিংসেয় রাগে জ্বলছিল?'

'তাও হতে পারে। কিন্তু সে কে, তা আমি ভেবে পাইনে।'

'তা হলে দুটো বিষয় পরিষ্কার হল। এক ঃ মিতা কারোর সঙ্গে প্রেম করেছিল। দুই ঃ প্রেগন্যান্সির কথা ও আপনাদের কাছে গোপন রেখেছিল।'

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু কে, কেন খুন করতে পারে, তা আপনি অনুমান করতে পারছেন না।'

'একেবারেই না।'

'যে-ছেলে দুটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'খুব ভালো।' বড় বউয়ের স্বরে দৃঢ়তা, 'সুমিত আর নীহার, দুজনেই হয়তো মনে-মনে মিতাকে ভালোবাসত। কিন্তু ওদের কোনও রেষারেষি ছিল বলে জানিনে, দেখিনি। ওরা আমাদের বাড়ির ছেলের মতোই ছিল। মিতা বাড়িতে না থাকলেও ওরা আসত, নবেন্দু—আমার মেজো ছেলেরও ওরা বন্ধু। ভদ্র, নিরীহ, শিক্ষিত, ভালো পরিবারের ছেলে। ওদের কারওকে মিতা বিয়ে করলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু মিতা ওদের তেমন আমলই দিত না। বরং ওদের নিরীহপনাকে ঠাট্টা করত। তা ছাড়া, তোমাদের ওই কী একটা কথা আছে—আমি মনে করতে পারছিনে, মিতা যখন খুন হয় তখন এরা কোথায় কী করছিল, কোথায় ছিল, সেসবও প্রমাণ হয়ে গেছে। তবু পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করে রেখেছে।'

অশোক বুঝতে পারল, বড় বউ 'অ্যালিবাই'-এর কথা বলছেন। ও বলল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। আপনার বউমাকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

বড় বউ উঠে চলে যাওয়ার মুহূর্তেই অশোক জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, একটা কথা। মিতার গায়ে কি কোনও অর্নামেন্ট ছিল?'

'মানে গহনা?' বড় বউ থমকে দাঁড়ালেন, 'কিছু না। কিছু না বলতে, একেবারে কিছুই না। এমনকী গলায়, কানে, হাতে আমি একটু সোনা রাখতে বলতাম, একটা সংস্কার বলতে পারো। একটা শাঁখের আংটিও পরত না, যেটা ওকে জ্যোতিষী পরতে বলেছিল।'

'বুঝেছি।' অশোক উঠে দাঁড়াল, 'নীপাদেবীকে একটু ডেকে দিন।'

বড় বউ বেরিয়ে গেলেন। অশোক ফটিক চোখাচোখি করল। ফটিকের চোখে জিজ্ঞাসা। অশোকের মুখ গম্ভীর। নীপা দরজায় এসে দাঁড়াল। মাথায় অল্প ঘোমটা টানা। চওড়া বেগুনি পাড় তাঁতের শাড়ি, সাদা জামা গায়ে। কানে দুটো মুক্তো, গলায় সরু হার, হাতে শাঁখা, নোয়া, চুড়ি। সুশ্রী চেহারা। অশোক ডিভান দেখিয়ে বলল, 'আসুন, এখানে বসুন।'

নীপা এগিয়ে এসে বসল। অশোকও চেয়ারে বসল। 'আচ্ছা, ইদানীং—মানে মিতার খুনের আগে, ও নাকি প্রায়ই বলত, কিছুদিনের জন্য একলা কোথাও বেড়াতে চলে যাবে। আপনি ঠাট্টা করে জিগ্যেস করতেন, একলা কেন যাবে, সঙ্গে কাকে নিয়ে যাবে বলো না। মিতা বলত মরণকে। এসব কি ঠিক কথা?'

নীপার অবাক চোখ দেখে বোঝা গেল, প্রথমেই এরকম প্রশ্ন ও প্রত্যাশা করেনি। জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হল, 'হ্যাঁ বলত।'

BanglaBook.org

'কেন বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?'

নীপা আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল, তারপরে বলল, 'তখন মনে হত, এমনি ফাজলামি করে বলছে। এখন মনে হয়—।' চুপ করে গেল।

অশোকও কোনও কথা না বলে নীপার চোখে চোখ রাখল। নীপা চোখ নামিয়ে বলল, 'ও কারও সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল।'

'কার সঙ্গে?' অশোকের চোখে ভ্রূকুটি-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

নীপা বলল, 'নিশ্চয়ই যার সঙ্গে ওর—মানে, যার সঙ্গে মিশে—।' কথাটা শেষ করতে পারল না। অশোকের মুখের দিকে একবার দেখে, নিজের পায়ের ওপর চোখ রাখল।

অশোক বুঝল, নীপা কথাটা ভেঙে বলতে পারছে না। যার দ্বারা মিতা গর্ভবতী হয়েছিল, তার কথাই সে বলতে চাইছে। অশোক জিগ্যেস করল, 'সে কে হতে পারে?'

'তা কী করে জানব?' নীপাব সরল চোখে অসহায় বিস্ময়।

অশোক ঠোঁট বাঁকাল, 'তার মানে, আপনার পিসিশাশুড়িটির এতই গন্ডা-গন্ডা প্রেমিক ছিল—।'

'না-না, তা কেন? নীপা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ওব কখনও গন্ডা-গন্ডা প্রেমিক ছিল না।'

'কী করে জানলেন? মিতা তো অনেক ছেলের সঙ্গে মিশত।'

'তা মিশত। কিন্তু কার সঙ্গে কীরকম মিশত, কে কী বলত, ও আমাকে সবই বলত। তা নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করতাম। ওতে আমাতে সব কথাই হত।'

'অথচ আসল কথাটাই আপনাকে বলেনি।'

নীপা ভুরু কুঁচকে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল, 'সব কথাই আপনাদের মধ্যে হত, অথচ ও যে একজনের কাছে সবই বিসর্জন দিয়েছিল—মানে, ভালোবাসত, সে-কথাটা আপনাকে ও বলেনি।'

নীপা মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল।'

'ভয়ও পেয়েছিল হয়তো?'

'ভয় পাওয়ার মতো মেয়ে ও ছিল না।' নীপা ঘাড় নাড়ল, 'তা ছাড়া, ও মিথ্যে কথাও বলত না, আর খুব একরোখা ছিল।'

'একরোখা? কীরকম?'

নীপা একটু ভাবল, 'এই যেমন ধরুন, জাহাঙ্গির ওসমান—ইউনিভারসিটির বন্ধু, ওর সঙ্গে মেলামেশা আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ও মিশত, আমাকে বলত, অনেক ছেলের থেকে জাহাঙ্গির অনেক ভালো ছেলে, কেন আমি মিশব না? আমি যদি ঠাট্টা করে বলতাম, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে প্রেম হলে কি ওকে বিয়েও করবে নাকি? ও বলত, প্রেম হলে করতে পারি।'

অশোকের চোখ তখন ফটিকেব দিকে। ফটিক পিছন ফিরে পকেট থেকে নোটবুক বের করে কিছু লিখছিল। অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'হুঁ, একরোখাই বলতে হবে। ঠিক বলেছেন আপনি।'

'তা ছাড়া, কে. কে. গাঙ্গুলি ব্যারিস্টার—নাম শুনেছেন বোধহয়?'

নীপা গড়গড়িয়ে বলে চলল, 'উনি আমাব শ্বশুরমশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। মিঃ গাঙ্গুলিব ছেলে টিটো গাঙ্গুলিকে সবাই চেনে। খুব হ্যান্ডসাম চেহারা, গাড়ি চেপে বেড়ায়। আমাদের বাড়িতে আসত। মিতার সঙ্গে ভাবও ছিল। দু-একবার ওব বিলিতি গাড়িতে চেপে এদিকে-ওদিকে বেড়াতেও গেছে—মানে কলকাতার মধ্যেই। একদিন কী একটা বাজে কথা বলেছিল, মিতা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু টিটো মেশবার চেষ্টা করেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল, আমি জানি। কিন্তু মিতা ওর সঙ্গে মেশা দূরের কথা, কোনওদিন আর কথাও বলেনি।'

BanglaBook.org

অশোক দেখল, ফটিক দ্রুত নোট করে যাচ্ছে। অশোকেরই নির্দেশ, নতুন নাম শুনলেই নোট করতে হবে। অশোক জিগ্যেস করল, 'এসব কথা পুলিশকে নিশ্চয়ই বলেছেন?'

'না তো।' নীপা সরল চোখে তাকাল, 'পুলিশ তো এদের কথা কিছু জিগ্যেস করেনি। তবে মিতার যে-ডায়েরি পুলিশ নিয়ে গেছে, তার মধ্যে এদের সকলেরই নাম ঠিকানা টেলিফোন লেখা আছে। দরকার মনে করলে ডাকবে নিশ্চয়ই।'

অশোক গম্ভীর চিন্তিত মুখে ঘাড় ঝাঁকাল, 'আর একটা কথাই আপনাকে জিগ্যেস করার আছে। মিতার এমন শত্রু কে থাকতে পারে, বা কারা, যে বা যারা ওকে এভাবে খুন করেছে?'

'তা কী করে জানব?' নীপার চোখে সেই অসহায় বিস্ময়, 'ওর কোনও শত্রু ছিল বলে কখনও শুনিনি।'

অশোক ঘাড় বাঁকাল, 'কেন, টিটো গাঙ্গুলি?'

নীপা মুখে হাত চেপে হেসে উঠল এবং পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল, 'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। টিটো একটা মাকাল ফল। শত্রুতা করবে ও? মিতাকে খুশি করার জন্যে বরাবর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সবসময় নিজেকে অপরাধী ভাবত। আপনি কী ভাবছেন জানিনে, তবে টিটোকে আমি মিতার শত্রু ভাবতে পারিনে। আসলে এক ধরনের বোকা, স্মার্ট, আর নিজের সম্পর্কে ধারণা, ওকে মেয়েরা দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়।' সে ঠোঁট টিপে হাসি চাপল, 'আর মেয়েরাও ওর কাছ থেকে কিছু আদায় উশুল করে সরে পড়ে।'

অশোক গম্ভীর, 'যাই হোক, একটাই আশ্চর্যের কথা, মিতা আপনার কাছেও আসল কথাটা চেপে গেছল। লজ্জা পাওয়াটা বোধহয় ঠিক কথা নয়।'

নীপা অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা নিশ্বাস পড়ল, 'হতে পারে, তবে খবরটা জানার পরে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি। আমাকেও বললে না?'

'তার মানে, বলার উপায় ছিল না।'

'অ্যাঁ?' নীপা ভুরু কোঁচকাল।

'তাই মনে হয় না কি? এমন লোকের সঙ্গে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার নামটা আপনাকেও জানানোর উপায় ছিল না।'

নীপা ঘাড় ঝাঁকাল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।' তার চোখে গভীর অন্যমনস্কতা নেমে এল।

অশোক বুঝতে পারছে, নীপার চোখের সামনে অনেক মুখ ভেসে উঠছে, অনেক নাম মনে পড়ছে। সবাই মিতার বন্ধু। কিন্তু এসব বুঝে অশোকের কোনও লাভ নেই। জিগ্যেস করল, 'মিতা যে-রাত্রে খুন হল, সেই রাত্রে আপনি সন্ধে ছটা থেকে কতক্ষণ নীচে ছিলেন, মনে করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, আমি সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ মথুরাকে সব বলে দিয়ে ওপরে চলে এসেছিলাম।'

'আপনার শাশুড়ি?'

'তিনি আমার আগেই নীচে থেকে ওপরে এসে নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন।'

'আর-একটা কথা মনে করে দেখুন তো। মিতা যেদিন খুন হয়, সেদিন ওর কোনও টেলিফোন কি আপনি রিসিভ করেছিলেন?'

নীপা চিন্তিত মুখে ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওর কোনও টেলিফোন আমি রিসিভ করিনি।'

'ও নিজে কোনও টেলিফোন করেছিল বা রিসিভ করেছিল, দেখেছিলেন কি?'

নীপা আবার চিন্তিত মুখে কয়েক সেকেন্ড ভেবে মাথা নাড়ল।

অশোক উঠে দাঁড়াল, 'আপনাকে আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। আপনি যান, আর কারওকে কোনও কথা বলবেন না। অর্পিতা দেবীকে ডেকে দিন। মেয়েদের পালাটা শেষ করে ফেলা যাক।'

BanglaBook.org

নীপা ঘাড় কাত করে ডিভান ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফটিক বলল, 'টিটো গাঙ্গুলি, জাহাঙ্গির ওসমান, কিন্তু ঠিকানা পাওয়া গেল না।'

'খুঁজে নেওয়া যাবে। এ ক'দিনে পুলিশ চেনাজানা সবাইকে হদ্দমুদ্দো করে ছেড়ে দিয়েছে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ছুঁচটা হাতে ঠেকছে না।'

'কিন্তু হিরেটা তো ঠেকেছে।' ফটিক ফিরে তাকাল।

অশোক হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল। অর্পিতার ছায়া পড়ল দরজায়, তারপরে চেহারাটা দেখা গেল। প্রথমে তাকাল ফটিকের দিকে, তারপরে অশোকের দিকে। অশোক ডাকল, 'আসুন, বসুন।' ডিভানটা দেখিয়ে দিল।

অর্পিতা ঘরে ঢুকে ডিভানের ওপর বসল। সেই হালকা সুগন্ধ, নীচে বিক্রমের উপস্থিতিতে যা ছড়িয়েছিল। কোনও বিদেশি সুগন্ধি আরকের গন্ধ। স্বামীর গায়ে থাকলে, স্ত্রীর গায়েও থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। অশোক চেয়ারে বসল, 'আপনি কি মিতার খুনের দিন থেকে এখানেই আছেন?'

'না, মাঝে একদিন সুখচরে—মানে আমার শ্বশুরবাড়ি গেছলাম।' অর্পিতার চোখ অশোকের মুখের ওপর।'

'প্রায়ই এ-বাড়িতে আসেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, উইক এন্ডে তো বটেই। ইচ্ছে হলে, উইক ডেজেও চলে আসি, যেমন সেদিন এসেছিলাম।'

'একলাই আসেন?'

'না, আমার স্বামী ওর গাড়িতে পৌঁছে দেয়। আর আমি সবসময়েই মেয়েকে নিয়ে আসি।'

'কেন, আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়েকে রাখতে পারে না?'

'নিজেদের লোক বলতে তো কেউ নেই। আমি, আমার স্বামী, আর মেয়ে। বাকি সবাই ঝি-চাকর-ঠাকুর।'

'আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি বা আর সবাই—।'

অর্পিতা কথার মাঝেই বলল, 'শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেছেন। আমার ভাসুর থাকেন কলকাতার বাড়িতে। আমরা থাকি শ্বশুরের পুরোনো বাড়িতে। ননদদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

অশোক কথা বলতে-বলতেই অর্পিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছিল। কানে দুটো হিরের ফুল। নাকের হিরের নাকছাবিটাও আগে চোখে পড়েও পড়েনি। হাতে শাঁখা নেই, মোটা দুটো সোনার বালা, পলার বালা, আর স্টেনলেস স্টিলের সরু একটা চুড়ি। বাঁ-হাতের অনামিকায় গোমেদ আর মুক্তোর জোড়া লাগানো আংটি। গলায় সোনার হার। ধনী বধূর পক্ষে এসব তেমন সাজগোজ না, এমনি সবসময়ের ব্যবহারের জন্য। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতার খুনের দিন আপনি কখন এ-বাড়িতে এসেছিলেন?'

'বেলা এগারোটা নাগাদ।' অর্পিতা বলল, 'আমার স্বামী আমাকে আর মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে অফিসে গেছল। কথা ছিল, কলকাতার অফিস থেকে এখানে এসে খেয়েদেয়ে আমাদের নিয়ে সুখচরে যাবে।'

'কিন্তু উনি তো আসেননি।'

অর্পিতা অনুসন্ধিৎসু চোখে অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'না। কী কারণে যেন ও সুখচরেই ফিরে গেছল, আর টেলিফোন করে জানিয়েছিল, ও আর কলকাতায় আসতে পারবে না, পরের দিন আমাদের নিয়ে যাবে।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন?'

'কেন, আমাদের বাড়ি থেকেই?' অর্পিতার সরু ভুরু কুঁচকে উঠল, 'আমাদের বাড়িতেই টেলিফোন আছে।'

BanglaBook.org

'কখন টেলিফোন করেছিলেন?'

'রাত্রি প্রায় দশটায়।'

'তখন কি মিতা—?'

'হ্যাঁ, তখন মিতাকে বাগানে পাওয়া গেছে। আমি সে-কথা ওকে বলেছিলাম।'

'তা শুনেও এলেন না?'

'না। ওর মেজাজ ভালো ছিল না। সুখচরে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছল, মানে, ওর পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না।' অর্পিতা মুখ নিচু করল।

অশোক কোনও কথা জিগ্যেস না করে অর্পিতার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। অর্পিতা বিক্রমের না আসার কারণ প্রথমে 'কী কারণে যেন' বলে, তারপরেই জানাচ্ছে, 'সুখচরে একটা বিশ্রী ঘটনার কথা।' নরেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। তিনিও বলেছিলেন, বিক্রম সুখচরে একটা বাজে ঘটনায় আটকে পড়েছিল, পরে সে-কথা বলবেন। কী ঘটনা? শালিখ খুন হওয়ার খবর পেয়েও আসতে পারল না? অশোক জিগ্যেস করল, 'বিক্রমবাবু পরের দিন কখন এলেন?'

'সকালবেলাতেই।' অর্পিতা মুখ তুলল।

'ওঁর সঙ্গে কি এখানে লোকাল থানার পুলিশের কোনও কথা হয়েছে? মানে ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করা হয়েছে?'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'না।'

'উনিও কি সেই থেকে এ-বাড়িতেই আছেন?'

'হ্যাঁ, তবে রোজই একবার সুখচরে ঘুরে আসে।'

'আপনার কি মনে আছে, খুনের দিন মিতাকে কখন থেকে দেখা যাচ্ছিল না?'

'ঘড়ি তো দেখিনি।' অর্পিতা চিন্তিত মুখে বলল, 'সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি নবুর ঘরে নবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। তখন ওকে ডাকাডাকি করে পাইনি। নীপা নীচে থেকে এলে ওকে জিগ্যেস করলাম, বলতে পারল না। ভাবলাম কাছে-পিঠেই কোথাও গেছে, এসে পড়বে।'

'নবু মানে আপনার দাদার বড় ছেলে নবীনবাবু।'

'হ্যাঁ। ভাবছিলাম, সবাই জমিয়ে আড্ডা দেব। আমার স্বামীও এসে পড়বে। আমি, নবু, নীপা, মিতা, আমার স্বামী, কখনও-কখনও লেবুও, আমরা সবাই একসঙ্গে বসে আড্ডা জমাতাম।'

'লেবু কে?'

'দাদার মেজো ছেলের ডাকনাম লেবু, ভালো নাম নবেন্দু।'

'উনি তো সেদিন সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন না।'

'না, ও বড়দার গাড়ি নিয়ে কোথায় বেরিয়েছিল।'

'ড্রাইভার নেই?'

'আছে। তাকে বড়দা কোর্ট থেকে ফিরে ছেড়ে দেন। বিশেষ কাজকর্ম পড়লে অবিশ্যি থাকতে বলেন।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসল, 'আপনার পিসি ভাইপোরা সকলেই বেশ অন্তরঙ্গ।'

'ন্যাচারালি।' অর্পিতা বলল, 'পিসি-ভাইপো, আসলে আমরা অনেকটা ভাইবোনের মতোই, প্রায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।'

'আপনার যে আরও দুই দাদা আছেন, ল্যান্সডাউনে আর ক্রিক রো-তে, সেখানে যান না?'

'যাই, খুব কম। আসলে বাপের বাড়ি বলতে তো এ-বাড়িটাই। আমি মিতা এ-বাড়িতেই জন্মেছি।' অর্পিতার গলাটা ধরে এল, 'আর এ-বাড়িতেই মিতা—।' গলাটা ডুবে গেল। কালো চোখ সজল হয়ে এল। মুখ নিচু করল।

অশোক অর্পিতাকে সামলে নেওয়ার সময় দেওয়ার জন্য একটা সিগারেট ধরাল। অর্পিতা

BanglaBook.org

চোখ মুছল। অশোক সিগারেটে কয়েকটা টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল মুখ ঘুরিয়ে, 'আপনার আর মিতার নামে লোয়ার রেঞ্জে একটা বাড়ি আছে।'

'আছে।' অর্পিতা ঘাড় ঝাঁকাল, 'আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, মিতার বিয়ের সময় আমার অংশটা ওকে যৌতুক দেব। আমার স্বামী অবিশ্যি নানারকম কথা বলত। বাড়িটা ভেঙে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং করবে, আর...।'

'সে-কথা নরেনবাবুর কাছে শুনেছি।' অশোক সিগারেটে টান দিল, 'মিতা আপনাদের সুখচরের বাড়িতে যেত না?'

'যেত বইকি।' অর্পিতা ঘাড় কাত করল, 'মাঝে-মধ্যে যেত, তবে ট্রেনে-বাসে যাওয়ার তো অসুবিধে। সাধারণত আমি এলে, আমার আর আমার স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে যেত। ইচ্ছে হলে থেকেও যেত। কয়েকবার ওর বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়েও গেছে, সারাদিন হইচই করে, খেয়ে-দেয়ে ফিরে এসেছে। আমরাও খুব মেতে যেতাম। বাড়ির কাছেই গঙ্গা, স্নান, সাঁতার কাটা—একরকমের চড়ুইভাতির মতো ব্যাপার। মিতা তো খুব আসর জমানো মেয়ে ছিল।'

'কীরকম?'

'কীরকম—মানে, নেচে গেয়ে হেসে, মজার-মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে পারত।'

অশোক ঘাড় বাঁকিয়ে সিগারেটে টান দিল, 'আপনার সঙ্গে মিতার সম্পর্ক তা হলে বেশ ভালোই ছিল।'

'নিশ্চয়ই। খারাপ থাকবে কেন?' অর্পিতার ঘাড় বেঁকে উঠল। চোখে ভ্রূকুটি, অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। পালটা জিজ্ঞাসাটা যেন চ্যালেঞ্জের মতো শোনাল।

অশোকের মনে জিজ্ঞাসার খোঁচা, কিন্তু হাসল, 'কেন থাকবে, তা জিগ্যেস করিনি। ছিল ভেবেই জিগ্যেস করছিলাম, মিতা হয়তো ওর মনের কথা আপনাকে বলত।'

অর্পিতা জবাব দেওয়ার আগে পুষ্ট লাল ঠোঁট দুটো একবার টিপল। একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—তা, দিদি হিসেবে যতটা বলা যায়, তা বলত।'

'বন্ধু হিসেবে নয়?'

অর্পিতা অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'তাও বলতে পারেন। একটা বয়সে মেয়েরা সবাই বন্ধু হয়ে যায়। মিতা আমাকে অনেক কথাই বলত, প্রায় বন্ধুর মতোই।'

দিদি হিসেবে অথচ প্রায় বন্ধুর মতো। কিঞ্চিৎ পারম্পর্যহীন। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতার কোনও প্রেমিক ছিল কি—মানে, আপনাকে কখনও কিছু বলেছে কি?'

অর্পিতা হাসল, 'আমার মনে হত, ও যত ছেলের সঙ্গে মিশত, সবাই ওর প্রেমিক। কিন্তু ও কারওর প্রেমিকা ছিল বলে কখনও কিছু শুনিনি।'

'একজন তো কেউ নিশ্চয়ই ছিল।' অশোক অর্পিতার চোখের দিকে তাকাল, 'তা নইলে—?' কথাটা ও শেষ করল না।

অর্পিতা আবার একবার ঠোঁট টিপল, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল, 'এটা কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে, প্রেমিক ছাড়া আর কারওর দ্বারা ব্যাপারটা ঘটতে পারে না।'

নতুন কথা। অশোকের সঙ্গে অর্পিতার দ্রুত দৃষ্টিবিনিময় হল। অর্পিতা আবার বলল, 'এমন পরিবেশ পরিস্থিতিও তো হতে পারে, মিতার অনিচ্ছাতেই কেউ সুযোগ নিয়েছিল, তারই রেজাল্ট—।' কথাটা শেষ না করে অশোকের চোখে চোখ রাখল এবং ঝটিতি কথার মোড় ঘোরাল, 'একটা মেয়েকে, সে যত শক্তই হোক, তাকে কি কখনওই কাবু করা যায় না?'

অশোকের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের চমক লাগল। কিন্তু নির্বিকার, চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে লাগল। কে বলছে কথাটা? মিতার দিদি, এবং একটি মেয়েই! অশোক জিগ্যেস করল, 'রেপ?'

'না-ই বা কেন', অর্পিতার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটল, 'অনিচ্ছাতে কিছু করা মানেই

BanglaBook.org

সেটা রেপ নয়। ওভার পাওয়ার বলে একটা কথা আছে। সিডিউসের কথাটাও মনে রাখতে হয়। মেয়েদের মন পাওয়া আর শরীর পাওয়া এক কথা নয়। এসব অবিশ্যি তর্কের খাতিরে বলছি, কিন্তু প্রেমিক কি অপ্রেমিক, এটাকে ডেফিনিট বলে ধরে নেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। তা বলে ভাববেন না, আমার বোনকে আমি ছোট করে দেখাচ্ছি।'

অশোক তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, 'না-না, তা কেন? আপনি খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন।' মনে-মনে বলল, 'আপনি অভিজ্ঞ রমণী, কোনও সন্দেহ নেই।'...আবার মুখে বলল, 'তাহলে আর-একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি। তর্কের খাতিরে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ধরে নিলে এর সঙ্গে কি খুনের সম্পর্কও থাকতে পারে?'

'তা আমি বলতে পারিনে।' অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'এর সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারিনে। মিতার শত্রু থাকতে পারে কিন্তু এমন শত্রু? যে ওরকম ভয়ংকরভাবে খুন করতে পারে? আমি গোটা সপ্তাহটা ভেবেও এমন কারও কথা মনে করতে পারিনি। অন্তত আমি মিতার যত পুরুষ-বন্ধুদের চিনি, তাদের কথা ভেবে বলছি।'

অশোক আবার একটা নতুন কথা শুনল, 'মিতার তাহলে শত্রু থাকতে পারে বা ছিল আপনার ধারণা।'

'এটা তো সহজ কথা।' অর্পিতা বলল, 'একটা সুন্দরী রূপসী মেয়ে, গবেট নয়, লেখাপড়ায় ভালো, যাকে অনেকেই চাইত, তার কোনও শত্রু থাকবে না, এমনটা কি হয়?'

অশোক বলল, 'আপনি ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের কথাই বলছেন।'

'হ্যাঁ, মেয়েরাও কেউ-কেউ নিশ্চয় ওর শত্রু ছিল।'

'আর সেরকম কোনও মেয়ে, লোক লাগিয়ে মিতাকে খুন করিয়েছে, এরকমও হতে পারে।'

'অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু সম্ভবও বোধহয় নয়। মিতাকে নিশ্চয় এমন কেউ বাগানে ডেকেছিল, যার কথা রাখতেই ও গেছল। খুব ঘনিষ্ঠ কেউ না হলে, তার ডাকে ও বাগানে যেত না। কোনও মেয়ের ভাড়াটে খুনির ডাকে মিতা বাগানে যেতে পারে বলে মনে হয় না।'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'আমি এত সব ভাবিনি।'

'কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, মিতাকে নিশ্চয় কেউ বাগানে যেতে বলেছিল, আর সেটা সম্ভবত টেলিফোনেই?' অশোক ঘাড় কাত করে অর্পিতার মুখের দিকে তাকাল।

অর্পিতা ভুরু কুঁচকে অশোকের মুখের দিকে তাকাল, 'হতে পারে, এসব কথা আমি কী করে জানব বলুন?'

'জানবেন কী করে?' অশোক হাসল, 'আমি আপনার অনুমানের কথা জানতে চাইছি। আমার সুবিধের জন্যে।'

অর্পিতা মাথা ঝাঁকাল, 'হতে পারে। তা নইলে, ওরকম সময়ে মিতা একলা বাগানে যাবেই বা কেন।'

'আর টেলিফোনটা এসেছিল নিশ্চয়ই সাড়ে ছ'টার আগে।'

অর্পিতার ভুরু আবার কুঁচকে উঠল, 'সেটা জানলেন কী করে?'

'সাড়ে ছ'টায় টেলিফোনটা আপনার বড়দাই চেম্বারে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

অর্পিতার কালো চোখে বিস্ময়, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কী করে জানলেন?'

'আপনার বড়দাই বলেছেন।' অশোক হাসল, 'আপনারা কিছু না বললে আমি আর কী করে জানব। এখন, খটকা লাগছে একটাই। টেলিফোন কল তো অনেক আসতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায়, মিতাকে সাড়ে ছ'টার আগে কেউ টেলিফোন করেছিল, সেটা যে মিতাই রিসিভ করেছিল,

BanglaBook.org

এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। অন্য কেউও করতে পারে। অন্য কেউ রিসিভ করে মিতাকে ডেকে দিতে পারে।'

অর্পিতা অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল, 'তার মানে, আপনি আমাকে জিগ্যেস করছেন, আমি টেলিফোনটা রিসিভ করেছিলাম কি না, তাই তো?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। অর্পিতা বলল, 'না, আমি সারাদিনে কোনও টেলিফোনই রিসিভ করিনি।'

'মিতা কি সেদিন সারাদিনই বাড়ি ছিল?'

অর্পিতা মাথা নাড়ল, 'না, আমি যখন এসেছিলাম, মিতা তার আগেই ইউনিভারসিটিতে বেরিয়ে গেছল।'

'ফিরেছিল কখন?'

'তিনটে নাগাদ।'

'একলা?'

'না, সুকুমার—ওর সঙ্গে পড়ে, এক বছরের সিনিয়ার, তার সঙ্গে তার গাড়িতে ফিরেছিল। শুনেছি সুকুমারকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।'

'আরও একজনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।'

'হ্যাঁ শুনেছি, দীপককে। দীপকও সেদিন সাড়ে চারটে নাগাদ এ-বাড়িতে এসেছিল।'

'দীপকও কি ইউনিভারসিটিতে পড়ে?'

'না, গত বছর পাশ করেছে, এখন বেকার।'

'আপনি দুজনকেই চেনেন?'

'চিনি বইকি। মিতার সঙ্গে ওরা আমাদের সুখচরের বাড়িতেও গেছে। এ বাড়িতেও অনেকবার দেখেছি।'

'সেদিন— মানে, মিতার খুনের দিন, সুকুমার আর দীপক কতক্ষণ ছিল, মনে আছে আপনার?'

অর্পিতা ঘাড় কাত করল, 'আছে। সুকুমার আগেই এসেছিল। আমরা নীচের বসবার ঘরে বসে চা খেতে-খেতে গল্প করছিলাম। তারপরে দীপক এসেছিল। পাঁচটা নাগাদ দুজনে একসঙ্গেই চলে গেছল।'

'আপনার বড়দার ধারণা, সুকুমার আর দীপকের মতো ছেলে মিতাকে খুন করতে পারে না।'

অর্পিতা সজোরে মাথা ঝাঁকাল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'এত জোরের সঙ্গে বলছেন কী করে?'

অর্পিতার চোখে-মুখে বিস্ময়, 'মানুষকে দেখে কি একেবারেই চেনা যায় না?'

'যায়?' অশোক হাসল।

অর্পিতার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'সবাইকে হয়তো চেনা যায় না। কিন্তু যাদের বেশুলার দেখছি, কথা বলছি, মেলামেশা করছি, তাদের একটুও চিনব না, তা কেমন করে হয়?'

অশোক না হেসে চিন্তিত, গম্ভীর মুখে আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকাল। উঠে দাঁড়িয়েই আবার একটু হাসল, 'আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেক মিলেমিশেও মানুষ চিনতে পারিনে। যাই হোক, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনি আসুন।'

অর্পিতা উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'কষ্ট দেবেন কেন, আরও যদি কিছু জিগ্যেস করতে চান, করতে পারেন। আপনি তো পুলিশের বাড়া।'

'তাই নাকি?'

BanglaBook.org

'নয়? অথচ আপনাকে দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনি আবার একজন—।' অর্পিতা কথাটা শেষ করল না।

অশোকও কথাটা পূরণ করে দিল না, বরং জিগ্যেস করল, 'আপনার কানের ফুল দুটো কি হিরের?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'দেখে মনে হল, তাই জিগ্যেস করলাম।' অশোক বলল, 'মিতার কানেও কি ওরকম কিছু ছিল না কি?'

অর্পিতা ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল, 'মিতা এসব কিছুই পরত না। মডার্ন মেয়েরা নাকি ওসব পরে বেড়ায় না। অবিশ্যি হিরে পরে ইউনিভারসিটিতে কোন মেয়েই বা যায়।'

'তা ঠিক। আপনার মেয়ের বয়েস কত?'

অর্পিতা অশোকের পারম্পর্যহীন দ্রুত জিজ্ঞাসায় হতচকিত হয়ে উঠল, 'তা প্রায় দশ।'

'কী নাম ওর?'

'ইপু—মানে—ঈপ্সিতা।'

'আপনি গিয়ে ওকে একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দিন।'

অর্পিতার কালো চোখে ভুরুকুঁচি বিস্ময়, 'ওকেও আপনার দরকার? পুলিশ কিন্তু ওকে কিছুই জিগ্যেস করেনি।'

অশোক হাসল, 'আমি পুলিশ নই। আর দয়া করে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিষয় কারওকে কিছু বলবেন না।'

অর্পিতা অশোকের চোখের দিকে একপলক দেখে বেরিয়ে গেল। ফটিক ফিরে তাকাল অশোকের দিকে। অশোকও তাকিয়েছিল, বলল, 'টেলিফোন? না আগে থেকেই যমদূতের সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'আমাকে জিগ্যেস করছিস?' ফটিক বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল।

অশোক জবাব দিল, 'না, নিজেকে।'

ঈপ্সিতা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। সুন্দরী মা, পুরুষ বাবা, উভয়ের মিলিত সৌন্দর্যে ফুলটুসি বালিকা। ডাগর কালো চোখে ভয়। এ-বাড়িতে ঢোকবার আগেই রাস্তা থেকে দোতলার বারান্দায় দেখা গিয়েছিল। অশোক ডাকল, 'এসো ইপু।'

ডাকনামটা শুনে ঈপ্সিতা একবার অশোকের দিকে তাকাল। তারপরে ফটিকের দিকে। আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাঝখানে দাঁড়াল। অশোক সস্নেহে ডাকল, 'এসো, এ ডিভানে বোসো। তোমাকে আমি দু-একটা কথা জিগ্যেস করব, ভয়ের কিছু নেই।'

ঈপ্সিতা আর-একবার অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কিঞ্চিৎ ভরসা পেল। ডিভানে বসল। অশোক চেয়ারে বসে জিগ্যেস করল, 'ইপু, মাসি যেদিন মারা গেল, সেদিন তো বেলা এগারোটায় তুমি বাবা-মার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিলে?'

ঈপ্সিতা ঘাড় ঝাঁকাল। অশোক জিগ্যেস করল, 'সেদিন সারাদিনে নিশ্চয় অনেক টেলিফোন এসেছিল, তাই না?'

ঈপ্সিতা আবার ঘাড় ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কোনও ফোন ধরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন? ক'বার, মনে আছে?'

ঈপ্সিতা মাথা নিচু করে একটু সময় ভাবল, তারপরে মুখ তুলে বলল, 'দুপুরে খাওয়ার আগে একবার আর সন্ধের সময় একবার। একটা কেনোদার, আর-একটা মাসির টেলিফোন এসেছিল।'

BanglaBook.org

'কেনোদা কে?'

'কেনোদা, শিবুদার ছোট।'

'মাসিকে কে টেলিফোন করেছিল? মেয়ে না পুরুষ? নাম বলেছিল?'

ঈপ্সিতা মাথা নাড়ল, 'না। নাম বলেনি। ব্যাটাছেলে টেলিফোন করেছিল।'

'গলার স্বর চিনতে পারোনি?'

ঈপ্সিতা আবার একটু ভাবল, তারপর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল, 'না, কিন্তু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।'

'তবু মনে করতে পারছ না?'

ঈপ্সিতা সরল চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, 'মনে হচ্ছিল, গলাটা চেনা-চেনা। কিন্তু বুঝতে পারিনি।'

'তারপরে কি তুমি মাসিকে ডেকে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তখন ক'টা বেজেছিল?'

'জানি না। সন্ধে উতরে গেছল।'

সন্ধে উতরে যাওয়ার অর্থ, এই শীতের বেলা, পাঁচটার পরেই। টেলিফোনটা তাহলে সম্ভবত পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে এসেছিল। অশোক জিগ্যেস করল, 'তুমি জানতে চাওনি, কে টেলিফোন করছেন?'

'না তো।' ঈপ্সিতা ঘাড় নাড়ল, 'আমি কেন জিগ্যেস করব? আমি মাসিকে ডেকে দিয়েছিলাম।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'মাসি তখন কোথায় ছিল?'

'মাসি নিজের ঘরে, আমার মার সঙ্গে গল্প করছিল। আমি ডেকে দিয়েছিলাম।'

'হুঁ। তুমি তো মাসির অনেক বন্ধুকে চেন। তোমাদের সুখচরের বাড়িতেও অনেকে গেছে।'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'তাদের কারও গলা বলে মনে হয়নি?'

ঈপ্সিতা আবার একটু ভাবল, মাথা নাড়ল, 'না বুঝতে পারিনি। একবার মনে হয়েছিল গলাটা যেন বাবার মতো লাগছে। কিন্তু বাবা হলে তো আমার সঙ্গে কথাই বলত। আর বাবা মাসিকে পারমিতা দেবী বলবে কেন?' ও জিজ্ঞাসু চোখে অশোকের দিকে তাকাল।

'তাতো সত্যিই।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, 'তবু তোমার মনে হয়েছিল, গলাটা যেন বাবার মতো শোনাচ্ছে।'

ঈপ্সিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু বাবা নয়, আমি জানি। একবার মনে হয়েছিল, কিন্তু লোকটার গলাটা হেঁড়ে আর বাঙাল-বাঙাল লাগছিল।'

'তার মানে মাসির বাঙাল বন্ধুও ছিল।' অশোক হাসছিল।

ঈপ্সিতাও হাসল, 'আমি কোনওদিন দেখিনি।'

'তুমি বাড়ির লোককে সেই টেলিফোনের কথা বলেছিলে?'

ঈপ্সিতা ঘাড় কাত করল, 'বলেছিলাম। পরের দিন যখন সবাই বলাবলি করছিল, মাসির কোনও টেলিফোন এসেছিল কি না, তখন বলেছি।'

সে-টেলিফোনের কোনও মূল্যই দেওয়া হয়নি, অশোক ভাবল। এবং গলাটা যারই হোক, হেঁড়ে আর বাঙাল উচ্চারণটা ইচ্ছাকৃত হওয়া অসম্ভব না। তবু ঈপ্সিতার একবার মনে হয়েছিল, যেন বাবার গলা। কেন? অশোক বলল, 'ঠিক আছে ইপু, তুমি যাও। তোমার লেবুদাকে একটু ডেকে দাও।'

BanglaBook.org

ঈপ্সিতা ঘাড় কাত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অশোকের সঙ্গে ফটিকের দৃষ্টিবিনিময় হল।

অশোক বলল, 'হেঁড়ে গলা, বাঙাল উচ্চারণ।'

'কিন্তু বাবার গলা কেন?' ফটিক বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল।

'কাকতালীয় হতে পারে।' অশোক বলল।

লেবু—অর্থাৎ নবেন্দু ঢুকল। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে। পায়জামার ওপরে হাওয়াই শার্ট। চেহারায় মায়ের আদল। অশোক ডাকল, 'আসুন নবেন্দুবাবু, বসুন এখানে।' ডিভানটা দেখিয়ে দিল।

নবেন্দুর মুখ গম্ভীর এবং শক্ত। ডিভানে বসল। অশোক বলল, 'মিতা মারা যাওয়ার দিন, আপনি আপনার বাবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন, শোনা হয়ে গেছে। কোথায় গেছলেন?'

'বালিগঞ্জ প্লেসে এক বন্ধুর বাড়িতে।'

'ফিরেছিলেন ক'টায়?'

'রাত্রি দশটা নাগাদ, বাড়িতে তখন পুলিশ এসে গেছে।'

'এসব কথা তো পুলিশের সঙ্গেই হয়েই গেছে।'

'হ্যাঁ, এমনকী বালিগঞ্জ প্লেসে আমার বন্ধুর বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে।' নবেন্দু কষ্ট গলায় বলল।

অশোক হাসল, 'পুলিস কর্তব্য করেছে। আপনার কি মনে হয়, কে এভাবে মিতাকে খুন করতে পারে?'

নবেন্দু ডান হাত ঘুরিয়ে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছিনে। পুলিশকেও বলেছি।' একটু থেমেই আবার বলল, 'অবিশ্যি পিসির চালচলন আমি একদম পছন্দ করতাম না। বাবা-মা আদর দিয়ে মাথায় তুলে বড় বেশি আশকারা দিতেন।'

'কীরকম চালচলন?'

'কীরকম আবার? যার তার সঙ্গে মেলামেশা, যখন যেখানে খুশি যাওয়া, যখন খুশি বাড়ি ফেরা, এসব আমি পছন্দ করতাম না। সেইজন্যে পিসির সঙ্গে আমার বিশেষ বনিবনা ছিল না।'

'আপনি বুঝি পিসি বলতেন?'

'হ্যাঁ, পিসি—তবে তুইতোকারি করতাম। ও তো আমার থেকে ছোট ছিল। তবে—।' কথাটা নবেন্দু শেষ করল না, অন্যমনস্ক হয়ে উঠল।

অশোক জিগ্যেস করল, 'তবে?'

'পিসির চালচলন পছন্দ করতাম না ঠিকই, আমি হয়তো একটু রক্ষণশীল।' নবেন্দু বলল, 'কিন্তু ওর এমন কোনও শত্রু থাকতে পারে, কখনও ভাবিনি, এখনও ভাবতে পারছিনে।'

'তবে ছিল, এটা আমাদের মেনে নিতেই হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে।' নবেন্দুর একটা নিশ্বাস পড়ল।

অশোক বলল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। আপনার ছোট ভাইকে একবার পাঠিয়ে দিন।'

নবেন্দু কোনও কথা না বলে উঠে চলে গেল। ফটিক অশোকের দিকে তাকিয়ে হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখল।

অশোক বলল, 'উপায় নেই। আর দুজন। নীরেন আর অর্পিতার স্বামী বিক্রম।'

নীরেন দরজায় এসে দাঁড়াল। অশোক যথারীতি তাকে ডেকে বসাল। সতেরো-আঠারোর বেশি বয়েস না। দীর্ঘ শক্ত শরীর, কিন্তু সদ্য গোঁফ গজানো মুখ নরম। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিতাকে তো পিসি বলে ডাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের দিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি ন'টা অবধি কোথায় ছিলেন?'

BanglaBook.org

'বাড়িতেই—।' হঠাৎ থমকে গিয়ে নিজেকে সংশোধন করল, 'সাড়ে আটটা নাগাদ একটু বাইরে গেছলাম।'

'কোথায়?'

'বাড়ির বাইরে, সি আই টি-র মোড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম।' অশোকের দিকে তাকাল।

অশোক বলল, 'পাড়ার বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে, বাড়িতে কোথায় ছিলেন? নীচে নিজের ঘরে?'

'না, ওপরে, বাবার ঘরে ইপুর সঙ্গে লুডো খেলছিলাম।'

'তারপরে বোধহয় বন্ধুদের সঙ্গে একটু সিগারেট টানতে গেছলেন?'

নীরেন হতবাক, অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকাল। অশোক হাসল। নীরেনও লজ্জিত হাসল, 'কী করে জানলেন?'

'পালটা কিছু জিগ্যেস করতে নেই।' অশোক হাসল, 'তারপরে বাড়ি ফিরলেন কখন?'

'সাড়ে ন'টা নাগাদ। তখন—।'

'বাড়িতে হইচই, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, তাই তো?'

নীরেন ঘাড় ঝাঁকাল, আর হঠাৎ-ই দু-হাতে মুখ ঢাকল। ওর শরীর কাঁপছে, কাঁদছে। অশোক ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিকও তাকিয়েছিল, আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল। অশোক মাথা ঝাঁকাল, এবং বলল, 'আচ্ছা, তুমি এসো ভাই। তোমার পিসেমশাইকে একবার ডেকে দাও।'

নীরেন দু-হাত দিয়ে চোখ মুছল। দু-চোখ ভেজা লাল। মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফটিক বলল, 'বেচারি।'

'তাই নাকি?' অশোক হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

বিক্রম দরজায় এসে দাঁড়াল। অশোক ভেতরে ডেকে বসাল। বিক্রম ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে সেই হালকা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এখন তার গায়ে আর ছোট উলের চাদরটি নেই। পায়জামা আর পাঞ্জাবি। ডান হাতের দুই আঙুলে সিগারেট। অনামিকায় একটি আংটি, পান্না বসানো। অশোক বলল, 'মোটামুটি আপনার সব কথাই শোনা হয়ে গেছে, তবু—।'

'সব কথা?' বিক্রমের স্বরে ও চোখে বিস্ময়।

অশোক বলল, 'সব কথা মানে, আপনি মিতার খুনের রাত্রে আসতে পারেননি, সুখচরে কী একটা বিশ্রী ব্যাপারে নাকি আটকে পড়েছিলেন, এইসব আর কি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।' বিক্রম বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলল।

অশোক সিগারেটে একটা টান দিল, 'কিন্তু আপনার তো অফিস থেকে আসার কথা ছিল এ-বাড়িতে। হঠাৎ সুখচরে চলে গেছলেন কেন?'

'একটা খবর পেয়ে।' বিক্রমের মুখে অস্বস্তির ছায়া নামল, 'সুখচরের বাড়ি থেকে আমার চাকরের একটা টেলিফোন পেয়ে, বলতে গেলে গাড়ি নিয়ে ছুটেই বেরিয়ে গেছলাম।'

'সময়?'

'প্রায় সাড়ে পাঁচটা, কাজের পাট গুটিয়ে এখানে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। টেলিফোনটা তখনই এসেছিল।'

'কিন্তু সুখচরে যাওয়ার আগে কথাটা টেলিফোনে আপনার স্ত্রীকে জানালেন না?'

'না, মাথাটা গরম হয়ে গেছল। টেলিফোন করার কথা মাথায় আসেনি।'

'ব্যাপারটা—।'

'বলছি।' বিক্রম সিগারেটে একটা টান দিল, 'ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

BanglaBook.org

সুখচরে আমাদের বাড়ি ছাড়াও গঙ্গার ধারের আশেপাশে আমাদের কিছু জমি আছে। সাত কাঠার একটা জমিতে এক সদগোপ ফ্যামিলি থাকে। জমিটা ওদের বিক্রি করা হয়নি। এমনি ইটের দেওয়াল, টালির ঘর। বাকিটা বাগান। বাবা ওদের থাকতে দিয়েছিল, অনেকটা উঠবন্দি প্রজার মতো। কিন্তু জানেন, আজকাল আর ওসব প্রথা নেই। আমি জমিটা থেকে ওদের ওঠাবার চেষ্টা করেছিলাম। আর ওরা দাবি করছিল ওদের মৌরসী স্বত্ব জন্মে গেছে। ওদের পাকা কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার ছিল না। কিন্তু ওরা সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ নিয়ে মন কষাকষি ঝগড়া চলছিল। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটা মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নিচ্ছিলাম। তার মধ্যেই সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চাকরের টেলিফোন পেলাম, ওরা নাকি বাড়ির সামনে জনমজুর লাগিয়ে ভিত খুঁড়ছে। এটা চাকরের চোখে পড়ে চারটে নাগাদ। আমাকে টেলিফোনে পেতে-পেতে সাড়ে পাঁচটা। টেলিফোনের অবস্থা তো জানেনই। সন্ধের জ্যাম কাটিয়ে পৌঁছুতে আমারও সময় লেগে যায় প্রায় ঘন্টাখানেক। তখনও আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটার একটা গতি করে, ও-বাড়ি থেকে অপু-ইপুকে নিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয়নি।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে টান দিল।

'কেন হল না?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম বিব্রত অস্বস্তিতে, ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিল, 'মাথা গরম করে একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি বাড়িতে গাড়ি পার্ক করেই সদগোপদের বাড়ি চলে গেছলাম। দেখেছিলাম, সত্যি খানিকটা ভিত খোঁড়ার কাজ করেছে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঠাকুরদাসকে চিৎকার করে ডেকেছিলাম।'

'ঠাকুরদাস কে?'

'ঠাকুরদাস মণ্ডল, ওই সদগোপ বাড়ির কর্তা।' বিক্রম বলল, 'সাড়া না পেয়ে আমি বাড়ির ভেতরের উঠোনে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে ভেতরে থেকেও ইচ্ছে করে জবাব দিচ্ছে না। কিন্তু তার বড় ছেলের বউ বেরিয়ে এসে বলল, শ্বশুর বাড়ি নেই। আমি খানিকটা ধমকধামক চোটপাট করে বাড়ি ফিরে এলাম। মাথা ঠান্ডা করে তখন এ-বাড়ি আসবার জন্যে তৈরি হতে গেলাম। দরকার ছিল আগে একটু চান করে নেওয়া। একটু চা খেয়ে, বাথরুমে ঢুকেই শুনলাম, থানা থেকে পুলিশ এসে আমাকে ডাকছে।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মেঝেয় ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে চাপল।

'পুলিশ?' অশোকের চোখে ভ্রূকুটি।

বিক্রম একটু লজ্জিত হেসে মাথা নাড়ল, 'পুলিশ। লজ্জার কথা আর বলেন কেন? শুনলাম, আমাকে থানায় যেতে হবে। অপরাধ? না, আমি নাকি ঠাকুরদাসের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস করেছি, বাড়ির মেয়েদের ইজ্জতহানি—মানে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করেছি। থানায় যেতে হল। থানার ও. সি. অচেনা নয়, ব্যবহারও খারাপ করেনি, তবে—।'

'অ্যারেস্ট?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম মাথা নাড়ল, 'না, সেটুকু খাতির করেছিল। থানায় তখন ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলিরও দু-তিনজন ছিল। ও. সি. আমাকে শুনিয়ে দিল, আমার বিরুদ্ধে কেস, ফোরফরটিওয়ান অ্যান্ড থ্রিফিফটিফোর আই পি সি। আলাদা ডেকে বলল, অ্যারেস্ট করবে না, তবে পরদিনই যেন আলিপুর পুলিশ কোর্টে গিয়ে আমি উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করি।'

'করেছিলেন?'

'করেছিলাম। পরের দিন সকালেই আগে এ-বাড়িতে এলাম। তার আগে রাত্রে তো সবই জেনেছি। সুখচরের ঘটনা অপুকে বললাম, তারপরে গেলাম আলিপুর পুলিশ কোর্টে। জামিন নিয়ে আবার এ-বাড়িতে, তারপরে অফিসে।'

'থানায় ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

BanglaBook.org

'তা হবে সাড়ে সাতটা আটটা। সেখান থেকে পানিহাটিতে এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে। গিয়ে শুনলাম, সে তখনও বাড়ি ফেরেনি। বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, কী করি? তখন যদি মিতার খুনের কথা জানতাম, হয়তো এ-বাড়িতেই এসে পড়তাম। ফলে গাড়িতে বসেই সময় কেটে গেল। উকিল বন্ধু ফিরল প্রায় রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায়। তার সঙ্গে কথা বলে আবার বাড়ি। তারপরে কলকাতায় টেলিফোনের চেষ্টা। কিছুতেই পেলাম না। রাত্রি দশটার পরে অপুর টেলিফোনে এল মিতার খুনের সংবাদ, কিন্তু তখন আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারছিলাম না। নিজের ওই ঘটনা, মিতার খুন, কেমন যেন জড়ভরত হয়ে গেলাম। নড়তে-চড়তে পারছিলাম না।'

'কেস কি চলছে?'

'হ্যাঁ, বাইশে জানুয়ারি ডেট পড়েছে।'

'সত্যি ঝামেলায় পড়ে গেছেন দেখছি।' অশোক হাসল, 'যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা এসে পড়ল। মিতার খুনের ঘটনা নিয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি?'

বিক্রম একটি গভীর নিশ্বাস ফেলল, বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, 'ভেবেছি, কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আমার অনেক পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি, লাভ কিছু হয়নি। ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে যদি বলেন, মিতার সঙ্গে আমার কম ছিল না। প্রিয় শালির থেকেও যদি বেশি কিছু বলা যায়—তাও বলতে পারেন। কত কথাই তো বলত, কিন্তু ওর যে এমন শত্রু থাকতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।'

'হুঁ।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, কিন্তু বিক্রমকে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছিল, 'আপনার ব্যাবসাটা কী? অফিসটা কোথায়?'

বিক্রম বলল, 'বিদেশি যন্ত্র আমদানি।' সে ক্লাইভ স্ট্রিটের একটি বাড়ির নম্বর বলল অফিসের ঠিকানা দিয়ে, 'থার্ড ফ্লোর। তবে ব্যাবসাটা আমাদের পৈতৃক। আমি আর আমার দাদা, দুজনেই ব্যাবসায় আছি।'

'আপনার দাদা তো কলকাতায় থাকেন?'

বিক্রম কোনও বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে আমাদের একটি বাড়ি আছে। দাদা সেই বাড়িতে থাকেন।'

অশোক বুঝতে পারল, বিক্রম এখানে আসার আগে অর্পিতার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। হবে, এটা ও ধরেই নিয়েছিল। ও জিগ্যেস করল, 'এ-বাড়িতে কি আরও থেকে যাবেন?'

'থেকে যাওয়ার তো কোনও কথা নেই।' বিক্রম বিমর্ষ মুখে হাসল, 'এ-বাড়ির কেউ ছাড়তে চাইছে না। আমার বেশ কষ্টই হচ্ছে। রোজ একবার সুখচরে ঘুরে আসতে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে। ভাবছি, আর দু-একদিন পরে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সুখচরে চলে যাব। আসলে আমার স্ত্রী-কন্যাও যেতে চাইছে না। কিন্তু সুখচরে তো একটা সংসার রয়েছে।'

'ঠিকই তো।' অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনার ওই ঠাকুরদাস মণ্ডল না কে, তারা কি এখনও ভিত খুঁড়ে চলেছে?'

বিক্রম বলল, 'না, আমি একটা ইনজাংশন জারি করে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, আপনি আসুন।' অশোক হঠাৎ বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'নরেনবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন। আমার জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ।'

বিক্রম যেন প্রস্তুত ছিল না, অশোক তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে। একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। আমি বড়দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সে যাওয়ার আগে অশোকের দিকে একবার দেখল, 'আপনাকে প্রথম দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনিই সেই অশোক ঠাকুর। আপনার যে-কোনও সাহায্যে লাগলে আমি বাধিত হব।'

BanglaBook.org

সুখচরে আমাদের বাড়ি ছাড়াও গঙ্গার ধারের আশেপাশে আমাদের কিছু জমি আছে। সাত কাঠার একটা জমিতে এক সদগোপ ফ্যামিলি থাকে। জমিটা ওদের বিক্রি করা হয়নি। এমনি ইটের দেওয়াল, টালির ঘর। বাকিটা বাগান। বাবা ওদের থাকতে দিয়েছিল, অনেকটা উঠবন্দি প্রজার মতো। কিন্তু জানেন, আজকাল আর ওসব প্রথা নেই। আমি জমিটা থেকে ওদের ওঠাবার চেষ্টা করেছিলাম। আর ওরা দাবি করছিল ওদের মৌরসী স্বত্ব জন্মে গেছে। ওদের পাকা কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার ছিল না। কিন্তু ওরা সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ নিয়ে মন কষাকষি ঝগড়া চলছিল। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটা মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নিচ্ছিলাম। তার মধ্যেই সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চাকরের টেলিফোন পেলাম, ওরা নাকি বাড়ির সামনে জনমজুর লাগিয়ে ভিত খুঁড়ছে। এটা চাকরের চোখে পড়ে চারটে নাগাদ। আমাকে টেলিফোনে পেতে-পেতে সাড়ে পাঁচটা। টেলিফোনের অবস্থা তো জানেনই। সন্ধের জ্যাম কাটিয়ে পৌঁছুতে আমারও সময় লেগে যায় প্রায় ঘণ্টাখানেক। তখনও আমি ভাবছিলাম, ব্যাপারটার একটা গতি করে, ও-বাড়ি থেকে অপু-ইপুকে নিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয়নি।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে টান দিল।

'কেন হল না?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম বিব্রত অস্বস্তিতে, ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিল, 'মাথা গরম করে একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। আমি বাড়িতে গাড়ি পার্ক করেই সদগোপদের বাড়ি চলে গেছলাম। দেখেছিলাম, সত্যি খানিকটা ভিত খোঁড়ার কাজ করেছে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঠাকুরদাসকে চিৎকার করে ডেকেছিলাম।'

'ঠাকুরদাস কে?'

'ঠাকুরদাস মণ্ডল, ওই সদগোপ বাড়ির কর্তা।' বিক্রম বলল, 'সাড়া না পেয়ে আমি বাড়ির ভেতরের উঠোনে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে ভেতরে থেকেও ইচ্ছে করে জবাব দিচ্ছে না। কিন্তু তার বড় ছেলের বউ বেরিয়ে এসে বলল, শ্বশুর বাড়ি নেই। আমি খানিকটা ধমকধামক চোটপাট করে বাড়ি ফিরে এলাম। মাথা ঠান্ডা করে তখন এ-বাড়ি আসবার জন্যে তৈরি হতে গেলাম। দরকার ছিল আগে একটু চান করে নেওয়া। একটু চা খেয়ে, বাথরুমে ঢুকেই শুনলাম, থানা থেকে পুলিশ এসে আমাকে ডাকছে।' সে কথা থামিয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মেঝেয় ফেলে স্যান্ডেল দিয়ে চাপল।

'পুলিশ?' অশোকের চোখে ভ্রূকুটি।

বিক্রম একটু লজ্জিত হেসে মাথা নাড়ল, 'পুলিশ। লজ্জার কথা আর বলেন কেন? শুনলাম, আমাকে থানায় যেতে হবে। অপরাধ? না, আমি নাকি ঠাকুরদাসের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস করেছি, বাড়ির মেয়েদের ইজ্জতহানি—মানে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করেছি। থানায় যেতে হল। থানার ও. সি. অচেনা নয়, ব্যবহারও খারাপ করেনি, তবে—।'

'অ্যারেস্ট?' অশোক জিগ্যেস করল।

বিক্রম মাথা নাড়ল, 'না, সেটুকু খাতির করেছিল। থানায় তখন ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলিরও দু-তিনজন ছিল। ও. সি. আমাকে শুনিয়ে দিল, আমার বিরুদ্ধে কেস, ফোরফরটিওয়ান অ্যান্ড থ্রিফিফটিফোর আই পি সি। আলাদা ডেকে বলল, অ্যারেস্ট করবে না, তবে পরদিনই যেন আলিপুর পুলিশ কোর্টে গিয়ে আমি উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করি।'

'করেছিলেন?'

'করেছিলাম। পরের দিন সকালেই আগে এ-বাড়িতে এলাম। তার আগে রাত্রে তো সবই জেনেছি। সুখচরের ঘটনা অপুকে বললাম, তারপরে গেলাম আলিপুর পুলিশ কোর্টে। জামিন নিয়ে আবার এ-বাড়িতে, তারপরে অফিসে।'

'থানায় ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

BanglaBook.org

'তা হবে সাড়ে সাতটা আটটা। সেখান থেকে পানিহাটিতে এক উকিল বন্ধুর বাড়িতে। গিয়ে শুনলাম, সে তখনও বাড়ি ফেরেনি। বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, কী করি? তখন যদি মিতার খুনের কথা জানতাম, হয়তো এ-বাড়িতেই এসে পড়তাম। ফলে গাড়িতে বসেই সময় কেটে গেল। উকিল বন্ধু ফিরল প্রায় রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায়। তার সঙ্গে কথা বলে আবার বাড়ি। তারপরে কলকাতায় টেলিফোনের চেষ্টা। কিছুতেই পেলাম না। রাত্রি দশটার পরে অপুর টেলিফোনে এল মিতার খুনের সংবাদ, কিন্তু তখন আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারছিলাম না। নিজের ওই ঘটনা, মিতার খুন, কেমন যেন জড়ভরত হয়ে গেলাম। নড়তে-চড়তে পারছিলাম না।'

'কেস কি চলছে?'

'হ্যাঁ, বাইশে জানুয়ারি ডেট পড়েছে।'

'সত্যি ঝামেলায় পড়ে গেছেন দেখছি।' অশোক হাসল, 'যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা এসে পড়ল। মিতার খুনের ঘটনা নিয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি?'

বিক্রম একটি গভীর নিশ্বাস ফেলল, বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল, 'ভেবেছি, কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আমার অনেক পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি, লাভ কিছু হয়নি। ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে যদি বলেন, মিতার সঙ্গে আমার কম ছিল না। প্রিয় শালির থেকেও যদি বেশি কিছু বলা যায়—তাও বলতে পারেন। কত কথাই তো বলত, কিন্তু ওর যে এমন শত্রু থাকতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।'

'হুঁ।' অশোক ঘাড় ঝাঁকাল, কিন্তু বিক্রমকে ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছিল, 'আপনার ব্যাবসাটা কী? অফিসটা কোথায়?'

বিক্রম বলল, 'বিদেশি যন্ত্র আমদানি।' সে ক্লাইভ স্ট্রিটের একটি বাড়ির নম্বর বলল অফিসের ঠিকানা দিয়ে, 'থার্ড ফ্লোর। তবে ব্যাবসাটা আমাদের পৈতৃক। আমি আর আমার দাদা, দুজনেই ব্যাবসায় আছি।'

'আপনার দাদা তো কলকাতায় থাকেন?'

বিক্রম কোনও বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে আমাদের একটি বাড়ি আছে। দাদা সেই বাড়িতে থাকেন।'

অশোক বুঝতে পারল, বিক্রম এখানে আসার আগে অর্পিতার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। হবে, এটা ও ধরেই নিয়েছিল। ও জিগ্যেস করল, 'এ-বাড়িতে কি আরও থেকে যাবেন?'

'থেকে যাওয়ার তো কোনও কথা নেই।' বিক্রম বিমর্ষ মুখে হাসল, 'এ-বাড়ির কেউ ছাড়তে চাইছে না। আমার বেশ কষ্টই হচ্ছে। রোজ একবার সুখচরে ঘুরে আসতে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে। ভাবছি, আর দু-একদিন পরে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সুখচরে চলে যাব। আসলে আমার স্ত্রী-কন্যাও যেতে চাইছে না। কিন্তু সুখচরে তো একটা সংসার রয়েছে।'

'ঠিকই তো।' অশোক মাথা ঝাঁকাল, 'আপনার ওই ঠাকুরদাস মণ্ডল না কে, তারা কি এখনও ভিত খুঁড়ে চলেছে?'

বিক্রম বলল, 'না, আমি একটা ইনজাংশন জারি করে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, আপনি আসুন।' অশোক হঠাৎ বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'নরেনবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন। আমার জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ।'

বিক্রম যেন প্রস্তুত ছিল না, অশোক তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে। একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। আমি বড়দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সে যাওয়ার আগে অশোকের দিকে একবার দেখল, 'আপনাকে প্রথম দেখে ভাবতেই পারিনি, আপনিই সেই অশোক ঠাকুর। আপনার যে-কোনও সাহায্যে লাগলে আমি বাধিত হব।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ।' অশোক হাসল, 'নরেনবাবুকে বলবেন, কাগজপত্র যা আছে, সব যেন নিয়ে আসেন।'

বিক্রম মাথা ঝাঁকিয়ে, ফটিকের দিকে একবার দেখে, ঘরের বাইরে চলে গেল।

ফটিক তাকাল অশোকের দিকে। অশোকের দৃষ্টি ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে পারমিতার ফটোর দিকে। মুখে গভীর চিন্তামগ্নতা। ফটিক কোনও কথা বলল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। অশোক আস্তে-আস্তে ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। হাতে তাঁর একটি বড় খাম, আর একটি ছোট। এসেই জিগ্যেস করলেন, 'কী বুঝলেন অশোকবাবু?'

অশোক হাসল, 'বোঝবার তো কিছু নেই, মিতার সম্পর্কে সকলের মতামত জানবার চেষ্টা করলাম। আসল কথা তো মোটিভ। জিজ্ঞাসাবাদের দরকার সেইজন্যেই।'

'কিন্তু ওই ছুঁড়ি—মানে পূর্ণিমাটা হঠাৎ পালাল কেন বলুন তো?' নরেন্দ্রনাথের স্বরে উদ্বেগ ও উত্তেজনা।'

অশোক হাসল, 'ভয় একটা পেয়েছে, তবে ওর পালানোর সঙ্গে খুনের কী যোগাযোগ আছে, এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'

'তবে পালাল কেন?'

'বোকামি হতে পারে।' অশোক নরেন্দ্রনাথের দিকে হাত বাড়াল।

নরেন্দ্রনাথ দুটো খামই অশোকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'একটা এস এস পি সি আই ডি সাহেবের চিঠি, যেটা কাল আপনাকে দিতেই ভুলে গেছলাম। আর একটা ময়না তদন্তের রিপোর্ট।'

অশোক দেখল, মোটা বড় খামটার ওপরে ওর নাম লেখা আছে। পাশে এস এস পি সি আই ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল। আগে ও বড় খামটাই সাবধানে খুলল। দুটো আলাদা খাম, খামের মুখ সিল করা। একটা খামের ওপরে লেখা, 'অফিসার ইনচার্জ, পি এস এন্টালি, কনভেন্ট রোড।' অন্যটি 'ডি সি ডি ডি লালবাজার, ক্যালকাটা।' আর একটি খোলা চিঠিতে অশোককে সম্বোধন করে লেখা, 'আপনার সুবিধার্থে এদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনে দুটি আলাদা চিঠি দিলাম। আপনার দরকারে লাগলে অবিশ্যিই ব্যবহার করবেন।'...

অশোক সিল করা খাম দুটো দেখেই বুঝতে পারল, এর ভেতরে ওর পরিচয়-পত্র, এবং ওকে তদন্তে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া আছে। খুবই প্রয়োজনীয় চিঠি, সন্দেহ নেই। বড় খাম ভাঁজ করে ছিপ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। মুখ খোলা খাম থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা বের করল। চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। পারমিতার শরীরের উচ্চতা, বর্ণনা, আভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিশিষ্ট অঙ্গের সুস্থতা ইত্যাদি। কোনও বিষক্রিয়ার উল্লেখ নেই। তিন মাসের গর্ভবতী ছিল। গর্ভনাশের কোনও ওষধ ব্যবহারের সন্ধান মেলেনি। এবং প্রধানত, গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। সময়, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে। গলায় সরু, শক্ত, পাকানো দড়ির ফাঁসের গভীর দাগ, নাক ও ঠোঁটের কষে রক্ত। মরবার আগে নিহত পারমিতা ফাঁস খোলার চেষ্টা করেছিল, তার নিজেরই নখের আঁচড়ানোর দাগ গলায়, গালে। গালের এক জায়গায় কাটার দাগ, যেটা তার নিজের হাতের না। জামা টেনে ছেঁড়া, শাড়ি অনেকটাই খোলা। সারা গায়ে মাটি দুর্বা ঘাসের দাগ। স্টমাকে হজম করা কয়েক আউন্স ভাত, কম হজম করা চিকেন স্যান্ডউইচ ইত্যাদি।

রিপোর্টের ওপর চোখ রেখেই অশোকের মন বাগানে চলে গেল। একটা ছবি। অন্ধকার বাগান। খুনি আগেই সেখানে উপস্থিত, হয়তো কোনও গাছের আড়ালে বা অন্ধকার কোণে। পারমিতা এল, আশেপাশে তাকাল, এগিয়ে গেল পাঁচিলের দিকে। খুনি পিছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল, ঝটিতি পারমিতার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। ফাঁসটা টেনে দেওয়ার আগেই পারমিতা বোধহয় কোনও শব্দ করেছিল। সেই শব্দ মথুরা বা পূর্ণিমার কানে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওরা তখন গভীর প্রেমে মত্ত। রান্নাঘরের সব দরজা জানলাই বন্ধ ছিল। নিজেদের প্রেম কুহর, ঘন নিশ্বাস, গোঙানি এসব

BanglaBook.org

ছাড়া কোনও কিছুই ওদের কানে যাচ্ছে না। খুনি ফাঁস টেনেও পারমিতার মুখে পিছন থেকে আঘাত করতে গিয়েছিল। গালের কাটা দাগটা কি খুনির আংটির হিরের? পারমিতার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবও হল না। শুয়ে পড়ল বা খুনিই মাটিতে আছড়ে ফেলল, চলল ঝাপটাঝাপটি, বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় অনেকটা মুমূর্ষু কাটা পশু বা পাখির মতো দাপাদাপি। আস্তে-আস্তে পারমিতা নিস্তেজ হয়ে এল। খুনি যখন নিশ্চিন্ত হল, পারমিতা বেঁচে নেই, দ্রুত পাঁচিল টপকে পালাল। যতটা সন্তর্পণে সে এসেছিল, যাওয়ার সময় ততটাই ভয়ে আর উত্তেজনায় পাঁচিল টপকাতে গিয়ে দু-একবার ব্যর্থ হল, তারপরে টপকাতে সমর্থ হল।

খুনি এ-বাড়ির চারপাশ, বস্তির পিছন দিক, আশেপাশের বাড়ি এবং এ-বাড়ি তো বটেই, সবকিছু সম্পর্কে এতই ওয়াকিবহাল, সে খুবই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মথুরা বা পূর্ণিমা বা নীরেন (যে নীচের ঘরে থাকে) এরা শব্দ পেতে পারত, এবং পেলে নিশ্চয় বাগানের দিকের দরজা খুলত। মথুরা আর পূর্ণিমার প্রেমের কথা তার জানা থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক সে-সময়েই যে ওরা দেহজ প্রেমে মত্ত থাকবে, এ কথা খুনির জানবার কথা না। সেই হিসেবে, সে মারাত্মক রিস্‌ক নিয়েছিল। মারাত্মক মানে, খুবই মারাত্মক। তথাপি খুনি কেন এ-বাড়ির বাগানটাই বেছে নিল?

প্রথমেই একটা কথা মাথায় আসে, পারমিতা খুনির সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা করতে রাজি হয়নি। দুই, অথবা খুনি নিজেই এই ভয়ংকর দায়িত্ব নিয়েছিল, এই ভেবে যে, বাড়ির মধ্যেই খুনটা করতে পারলে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। যদিও সে এর দরুন একটা মস্ত ভুল করেছে। পারমিতা অকারণে, সেই অসময়ে বাগানে যেত না। নিশ্চয়ই বিশেষ পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কারোর কথা রাখতেই ও বাগানে গিয়েছিল। অতএব, পুলিশের ধারণা, খুবই সঙ্গত—পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কেউ ওকে হত্যা করেছে। হিরেটা কি আদৌ খুনির আঙুলের আংটির? তা যদি হয়, সে খুব উদ্বেগে আছে। হিরেটার খোঁজে কি সে আর আসেনি? আসবে না? খুনির আঙুলের আংটির হিরে হলে তাকে যথেষ্ট সম্পন্ন বলতে হবে। অথবা হিরেটা তদন্তকারীর দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ফেলে রাখা হয়েছিল? পুলিশ নিশ্চয় তন্নতন্ন করে বাগান খুঁজেছে। হিরেটা তাদের চোখে পড়ল না? প্রায় চার-পাঁচ রতির হিরে। খুব ছোট না। যাই হোক, এ ব্যাপারটা ফটিকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

'এ-ঘরটা তো পুলিশ ভালোভাবেই সার্চ করেছে বললেন।' অশোক মুখ তুলে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ থেকেই অশোকের চিন্তামগ্ন মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন। বোধহয় ভেবেছিলেন, পি. এম. রিপোর্টে অশোক কিছু খুঁজে পেয়েছে। মাঝে-মাঝে ফটিকের নির্বিকার মুখের দিকেও জিজ্ঞাসু চোখে দেখছিলেন। অশোকের কথা শুনে যেন সুপ্তোত্থিতের মতো বললেন, 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, পুলিশ তো এ-ঘরের সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখেছে।'

'আমরাও একবার দেখি।' অশোক ফটিকের দিকে তাকাল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই, দেখুন। আমাকে কিছু করতে হবে?'

'না, আপনি ঘরে থাকলেই হবে।' অশোক ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে ড্রয়ারের হাতল ধরে টানল।

প্রথম ড্রয়ারের মধ্যে নকল চুল, কালো নাইলনের বেল্ট, কালো জাল, নানারকমের ক্লিপ, হেয়ার পিন, রিবন ইত্যাদি রয়েছে। অশোক সবকিছুই হাতে তুলে দেখল। বন্ধ করে দিয়ে নীচের ড্রয়ার খুলল। প্রায় ফাঁকা। কসমেটিকেরই কয়েকটা কৌটো। চন্দন কাঠের সিঁদুরের কৌটোও রয়েছে।

ফটিক ইতিমধ্যে খাটের বিছানা উলটেপালটে দেখতে আরম্ভ করেছে। অশোক ওয়ার্ডরোবের দুটো পাল্লা খুলে ফেলল। বিস্তর শাড়ি, নানারকমের ও রঙের, জামা, উলেন-গারমেন্টস, নাইটি, ব্রেসিয়ারস, প্যান্টি। লেডিজ লং কোটটা বিদেশি। অশোক পকেটে হাত দিয়ে দেখল। শূন্য। প্রতিটি হ্যাঙারের ভিতর শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দেখল। একেবারে নীচে পাতা মোটা কাগজের

BanglaBook.org

বোর্ডের ওপরে কয়েক ডজন ন্যাপথলিন, একটা ওডোর প্যাকেট। অশোক কাগজের বোর্ডটা টেনে তুলে আনতে গিয়ে দেখল, আটকে যাচ্ছে। বোধহয় অনেকদিন পাতা থেকে চাপ খেয়ে রয়েছে। পুলিশ কি টেনে দেখেনি?

অশোক কাগজের বোর্ডটা জোরে টানতে গেল। খানিকটা ছিঁড়ে গেল। তবু পুরোটাই টেনে তুলে ফেলল। কিছু নেই, শূন্য—অশোক আবার বোর্ডটা ঠিক করে পেতে রাখল। ফটিক তখন চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে খাটের পিছনে দেখছে। অশোক পড়ার টেবিলে এগিয়ে গেল। প্রত্যেকটা বই-খাতা আলাদা-আলাদা টেনে, পাতা মেলে-মেলে দেখল। র‍্যাক ছাড়াও গোটা টেবিলময় বই-খাতা ছড়ানো। অপরের হাত পড়েছিল, অর্থাৎ পুলিশের। প্রায় সব বই-খাতা দেখা শেষ হওয়ার মুখেই একটা মোটা খাতার ভেতর থেকে একটি খাম বেরোল। খামটা হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হল, ভেতরে কোনও চিঠি নেই, মুখটা খোলা। অশোক আঙুল দিয়ে ফাঁক করে খামের ভেতরে দেখল একটি ছোট চিঠি ভাঁজ করা রয়েছে। পুরোনো খাম, দেখলেই বোঝা যায়। পোস্টাল স্ট্যাম্পে ছাপ মারা, পারমিতার নাম-ঠিকানা লেখা। অশোক চিঠিটা খুলল, বাংলা চারিত্রিক হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, সম্বোধন, 'মিতা।' প্রথমেই শুরু—

'গরিব অধ্যাপকদের কোনও মেয়েই স্বামী হিসেবে পেতে চায় না, তুমিও না। তুমি তো অধ্যাপকমাত্রকেই বিয়ে করতে চাও না। অথচ এর আগে অনেকবার বলেছি, অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেব। ছাত্রীকে বিয়ে করলে, এমনিতেই এ কলেজ থেকে চাকরি ছাড়তে হবে। তবু, তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমি আই এ এস, এমনকি আই পি এস-এর জন্যেও নতুন করে প্রস্তুত হতে চাই। কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। অন্তত, এটা তো ধরে নিতে পারি, তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমার কথা তো বলবার দরকারই হয় না। ইদানীং মাঝে-মাঝে তোমার হাসি দেখলে, নিজেকে কেমন বিদ্রূপের পাত্র মনে হয়। মনে কষ্ট পাই, কিন্তু তোমাকে সে-কথা বলতে পারিনে। এখন সব কিছুই তোমার হাতে। আমি দেবদাস হব না, জীবনটাকেও ছারখার করতে চাইনে, তবু তোমাকে না পেলে, মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। আশা করি, শুক্রবার ছুটির পরে, 'সেইখানে' অপেক্ষা করবে, কিছু বলবে। চিঠি পেয়ে বিরক্ত হয়ো না। এক বছরের অন্তরঙ্গতার কথা মনে রেখে আর একবার এই হতভাগ্যের জন্যে ভেবো। 'শেষ কথা' বলার জন্যে মনস্থ করে এসো না।

—ইতি তোমারই পথ চেয়ে, সোমক।'

অশোক চিঠির ওপরে তারিখ দেখল। তিন বছর আগের চিঠি। জরুরি চিঠি। অথচ আশ্চর্য, পুলিশ এ চিঠি পায়নি। পেলে, নিশ্চয়ই অশোকের জন্য রেখে যেত না। সোমক। পদবি কী? আরও একাধিক চিঠি থাকা উচিত। সেসব কোথায়? কয়েক মুহূর্তের জন্য অশোকের বুকের তাল দ্রুত হয়ে উঠল। ও নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'মিতা কোন কলেজে পড়ত?'

নরেন্দ্রনাথ উৎসুক চোখে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কলেজের নাম বললেন। অশোক জিগ্যেস করল, 'সোমক নামে কারওকে চিনতেন? মিতার সঙ্গে এ-বাড়িতে কখনও এসেছে?'

নরেন্দ্রনাথ ভ্রূকুটি চিন্তিত মুখে ভাবলেন, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এরকম কোনও নামের লোককে মনে পড়ছে না তো?'

'নামটা শুনেছেন কখনও? বাড়ির কারও মুখে?'

নরেন্দ্রনাথ তেমনি চিন্তিত মুখেই আবার মাথা নাড়লেন, 'না।'

'কলেজে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে?'

BanglaBook.org

'আছে বইকি। আমি সেই কলেজের টেলিফোন নাম্বার জানি—মানে, প্রিন্সিপালের নাম্বার।'

'তাতেই হবে। আমার এ-ঘরের কাজ হয়ে গেছে। টেলিফোন এখন কোথায় আছে?'

'ওপরেই, আমার ঘরে।'

'চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে একবার কথা বলব।' অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কিছু পেলি?'

ফটিক হতাশ মুখে মাথা নাড়ল। দুজনেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘরের বাইরে গেল। করিডরের পরে, পাশের ঘরে নীপা আর অর্পিতাকে দেখা গেল। নরেন্দ্রনাথ সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরে সিঁড়ির মুখ পেরিয়ে ডানদিকের একটি দরজা-খোলা ঘরে ঢুকলেন। বোধহয় এই একটিমাত্রই দক্ষিণ খোলা ঘর। খাট, বিছানা, আলমারি, দেওয়ালে বাঘছাল, নানা মহিলা-পুরুষের ফটো ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে কালীঘাটের কালীর ছবি। এককোণে একটি তেপায়ার ওপরে টেলিফোন। সামনে বসবার কোনও কিছু নেই।

নরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালেন, আর এক সেকেন্ড পরেই রিসিভার এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। অশোক রিসিভার কানে নিয়ে শুনল, রিং হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ বেজে যাওয়ার পরে ওপার থেকে রিসিভার তোলার এবং গম্ভীর স্বর ভেসে এল, 'হ্যাঁ, হ্যালো।'

'আমি কি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলছি?' অশোক জিগ্যেস করল।

ওপারের জবাব, 'হ্যাঁ, কেন? কে কথা বলছেন?'

'এন্টালি থানার ও. সি.' অশোক নির্বিকার মুখে বলল।

ওপারের স্বরে ঈষৎ উদ্বেগ, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'সোমকবাবু কি এখন ক্লাস নিচ্ছেন?'

ওপারের অবাক চিন্তিত উত্তর, 'সোমক? সোমক কে ঠিক চিনতে পারছি নে তো? সোমক কী? পদবি? কী করে?'

'আপনার কলেজেই, বোধহয় ইংরেজি পড়ান। পদবিটা তো ঠিক—।'

ওপার থেকে বাধা দিয়ে জবাব এল, 'ওহ্, আপনি সোমক বসুর কথা বলছেন বোধহয়। তা ছাড়া তো আর ও-নামে কেউ নেই। হ্যাঁ, ইংরেজির লেকচারার ছিল। কিন্তু সে তো অনেক—মানে ধরুন বছর তিনেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি?' অশোকের মুখে হতাশা।

ওপারের জবাব, 'হ্যাঁ, ও তো—আমি যতদূর জানি, আর টিচিং লাইনে নেই। ও তো আই এ এস করে, বর্ধমানে এ ডি এম ছিল বছর খানেক আগেও। তারপরে বোধহয় হাওড়ায় ডি এম হয়ে আসে।'

অশোকের চোখে আবার আশার আলো ফুটল, 'ধন্যবাদ। বাকিটা আমি খোঁজ করে নেব।'

তবুও ওপার থেকে জবাব এল, 'থানার ও. সি. হয়ে আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের খোঁজ করছেন আমার কাছে?'

'দুঃখিত।' অশোক টেলিফোন নামিয়ে রাখল। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবং সেকেন্ডের মধ্যেই মুখে হাসি দেখা দিল, 'নমস্কার মিঃ মিত্র। অশোক ঠাকুর বলছি।'

এস পি চব্বিশ পরগনা, মিঃ আর কে মিত্রর উৎসুক সহাস্য স্বর ভেসে এল, 'নমস্কার। কোথা থেকে?'

'নরেনবাবু—মানে, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে।'

BanglaBook.org

'বুঝেছি, বুঝেছি।' মিঃ মিত্রর খুশি স্বর ভেসে এল, 'যাক, আপনি এসে পড়েছেন? কী রকম বুঝছেন?'

'অগাধ জলে আছি।' অশোক হাসল, 'হাওড়ার ডি এম সোমক বসুকে চেনেন নাকি?'

'হাওড়ার ডি এম সোমক বসু?' মিঃ মিত্রর স্বরে মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরেই ভেসে এল, 'চিনি বইকি। কিন্তু সোমক বসু তো এখন আর হাওড়ার ডি এম নেই। সে তো এখন রাইটার্সে—হেলথ ডিপার্টমেন্টে আছে। সেক্রেটারি। ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান। তাকেও আপনার দরকার পড়েছে নাকি?'

'একটুখানি।' অশোকের মুখে হাসি, 'ভদ্রলোক তো আমাকে চেনেন না। অথচ আজই একবার দেখা করতে পারলে ভালো হত।'

মিঃ মিত্রর জবাব এল, 'আপনাকে না চিনলেও নামটা হয়তো জানেন। তা ছাড়া আপনার কাছে এস. এস. পি. সি. আই. ডি. ডবলিউ. বি.-র চিঠিটা আছে তো?'

'আছে।'

'বেশ, তবু আমি একবার টেলিফোন করে দেখছি। আপনি ওখানেই থাকুন।' মিঃ মিত্রর গলা ভেসে এল, 'কী কথা হয় আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।'

'ওটা বলবেন না।' মিঃ মিত্রর হাসির সঙ্গে লাইন কেটে গেল।

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল, 'এক-একটা মানুষ কতখানি একরোখা হলে, এমন হতে পারে।'

নরেন্দ্রনাথ আর ফটিক দুজনেরই জিজ্ঞাসু চোখ অশোকের ওপরে। অশোক হেসে বলল, 'এই সোমক বসু, বছর তিন আগেও কলেজের একজন লেকচারার ছিল। তারপরে আই. এ. এস. পাস করেই অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, জাম্প করে একেবারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এখন রাইটার্স হেলথের সেক্রেটারি। মিঃ মিত্র বললেন, ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান।'

'কিন্তু এঁকে আপনার কী দরকার? নামই বা জানলেন কী করে?' নরেন্দ্রনাথ বিভ্রান্ত স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'আর এঁর সঙ্গে মিতার মার্ডারেরই বা কী যোগাযোগ থাকতে পারে?'

অশোক হাসল, 'একসঙ্গে অনেকগুলো কথা জিগ্যেস করলেন। ইনি আপনার বোন পারমিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

'ইনি মিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন? কই, কিছু জানিনে তো?' নরেন্দ্রনাথকে অধিকতর বিভ্রান্ত দেখাল।

অশোক হাসল, 'কী করে জানবেন? মিতা নিশ্চয়ই কারওকে কিছু বলেনি। ইনি মিতাকে কলেজে পড়াতেন, তিন বছর আগে। আপনার বউমা, আপনার স্ত্রী, আপনার বোন অর্পিতা আর তাঁর স্বামীকে জিগ্যেস করে আসুন না, এ নামটা তাঁরা কখনও মিতার মুখে শুনেছেন নাকি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' নরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অশোক সোমকের চিঠিটা পকেটে রেখেছিল। আবার বের করে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা ফটিকের দিকে এগিয়ে দিল, 'একে বলে ভাগ্য।'

'কেন?' ফটিক চিঠিটা নিয়ে জিগ্যেস করল।

অশোক বলল, 'এরকম একটা চিঠি, বিশেষ করে মিতা মার্ডারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। অথচ পুলিশের চোখে পড়েনি।'

ফটিক চিঠি পড়তে মন দিল। টেলিফোন বেজে উঠল। অশোক রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে মিঃ মিত্রর চেনা স্বর ভেসে এল, 'অশোকবাবু?'

'হ্যাঁ, বলুন, মিঃ মিত্র।'

'সোমক বসু পরশু দিল্লি গেছেন তাঁর মন্ত্রীর সঙ্গে। আজ বিকেলে ফেরার কথা।' মিঃ মিত্রর

BanglaBook.org

গলা শোনা গেল, 'তার মানে, আপনি আজ ওঁকে রাইটার্সে পাচ্ছেন না। ওঁর বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিতে পারি।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে লেখবার ইশারা করে বলল, 'হয়তো আজ বাড়ি গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না, তবু ঠিকানাটা লিখে রাখি। আপনি বলুন।'

ফটিক চিঠি পড়তে-পড়তেই টেলিফোন আসামাত্র অশোকের দিকে তাকিয়েছিল। ইঙ্গিত পেতেই পকেট থেকে নোটবই আর কলম বের করল। টেলিফোনে মিঃ মিত্র সোমক বসুর বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার বললেন। অশোক যথাযথ ঠিকানা টেলিফোন নম্বর উচ্চারণ করে গেল। ফটিক লিখে নিল। মিঃ মিত্র আবার বললেন, 'দিল্লি থেকে ফিরে সোমক বসু যে বাড়িতেই থাকবেন এমন নাও হতে পারে। উনি নিয়মিত একটি ক্লাবে যান।' তিনি ক্লাবের নামটা বললেন, এ খবরটা অবিশ্যি আমি আগে থেকেই জানতাম।'

'আমার ইচ্ছে নেই, আজই ওঁকে ক্লাব অবধি ধাওয়া করি।' অশোক বলল, 'তবে ওঁকে আমার জরুরি দরকার।'

মিঃ মিত্রের হাসি ভেসে এল, 'অবিশ্যি আপনার কাজে অবাক না হয়ে উপায় নেই। তবু, জানতে ইচ্ছে করছে, পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের সঙ্গে সোমক বসুর খোঁজ পড়ল কেন? মাপ করবেন, কৌতূহলটা দমন করতে পারছিনে।'

'আপনাকে বলতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।' অশোকও হাসল, 'আমি জানি, আপনার কাছ থেকে পাঁচ কান হওয়ার ভয় নেই। সোমক বসুর সঙ্গে তিন বছর আগে পারমিতার পরিচয় ছিল। উনি পারমিতার পাণিপ্রার্থী ছিলেন।'

মিঃ মিত্রর বিস্মিত স্বর ভেসে এল, 'ইজ ইট? পুলিশ কিছুই জানে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অশোক বলল, 'আসলে পুলিশের চোখে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। সোমকবাবু একসময়ে কলেজে পড়াতেন, পারমিতা তাঁর ছাত্রী ছিল।'

মিঃ মিত্রের স্বর শোনা গেল, 'আশ্চর্য। এ কী ভাই, আপনি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করবেন নাকি?'

'এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।' অশোক শব্দ করে হাসল, 'তবে কেঁচো খোঁড়ার জন্যে আমি কিছু খুঁড়ব না। খুঁড়লে সাপের জন্যেই খুঁড়ব। আপাতত মাটির ওপর ঠুকে-ঠুকে দেখছি, সাপুড়েদের মতোই।'

টেলিফোনের ওপার থেকে মিঃ মিত্রর হাসি ভেসে এল, 'ভালো বলেছেন। আমার বিশ্বাস আছে, পারমিতার খুনিকে আপনি খুঁজে বের করতে পারবেনই।'

'এতটা আশা করবেন না।' অশোক হাসল, 'কেন না, আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতাও আছে, খুনিকে জেনে-শুনেও ধরতে পারিনি। এমনকী তার নিজের মুখে স্বীকারোক্তি শুনেও। যাক, সেসব কথা পরে হবে। আপনার সময় আর নষ্ট করব না।'

মিঃ মিত্রর গলা শোনা গেল, 'সময় নষ্ট কী বলছেন! ইট্‌জ এ প্লেজার। এনি হাউ, যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে ডাকবেন, আমি আছি।'

'জানি। এসবই আমার ভরসা। ছাড়লাম। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। অশোক রিসিভার রাখতেই বললেন, 'না, সোমক বসু বলে কারও নাম মিতার মুখ থেকে কেউ শোনেনি।'

অশোক মনে-মনে ভাবল, অথচ বাড়ির সকলেরই ধারণা মিতা প্রাণখোলা মেয়ে ছিল। অন্তত নীপা আর অর্পিতাকে সব কথাই নাকি বলত। বলত নিশ্চয়ই, কিন্তু সব কথা না। যে-টুকু বলা চলত তাই বলত। অশোক বলল, 'আপনার বাড়ির সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, আপনার

BanglaBook.org

বড় ছেলেকে ছাড়া। ওঁকে নিয়ে এখন ব্যস্ততার কিছু নেই। এ-বাড়ির রুটিন ওয়ার্ক শেষ, এবার আমরা যাই।'

'যাবেন কী?' নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সেই কখন এসেছেন একটু চা-টা—।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকাল, 'চা একটু হতে পারে, টা দরকার নেই। আমরা পেছনের বস্তির সরু গলি আর আশপাশটা একটু দেখে, থানায় যাব। চলুন, নীচে যাওয়া যাক।' ও ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে ফটিক অশোকের হাতে সোমকের খামে মোড়া চিঠিটা দিল। অশোক সেটা ট্রাউজারের পকেটে রাখল। নরেন্দ্রনাথ চটি ফটফটিয়ে আগে নীচে নেমে বাইরের ঘরের দিকে এগোচ্ছেন। বাড়ির গেট দিয়ে তখন একটা লেফটহ্যান্ডার বিলিতি সবুজ রঙের ফিয়াট ব্যাক গিয়ার দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। চালকের আসনে বিক্রম। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সোজা করতে-করতেই তার চোখ পড়ল অশোকদের দিকে। অশোকও তাকিয়েছিল। বিক্রম বাঁ-হাত বাড়িয়ে বলল, 'অশোকবাবু আমি অফিসে যাচ্ছি, আর দেরি করতে পারছিনে। আপনার প্রয়োজন হলেই আমাকে স্মরণ করবেন।'

অশোক হাত তুলে বিদায় জানাল, 'নিশ্চয়ই।'

বিক্রম গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। নরেন্দ্রনাথ ডাকলেন, 'আসুন, অশোকবাবু।'

অশোক ফটিককে নিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল টেবিলের ওপর বিস্তর খাবার সাজানো প্লেট আর চা। বড় বউ দাঁড়িয়ে আছেন ভেতরে ঢোকার দরজার পাশে। তাঁর পিছনে নীপা। অশোক বলল, 'করেছেন কী। এখন কি ভুরিভোজের সময়?'

'ভুরিভোজ নয় ভাই, সামান্য একটু দিয়েছি।' বড় বউ বললেন, 'ছেলেমানুষ তোমরা, চায়ের সঙ্গে এটুকু তোমাদের কাছে কিছু নয়। বোসো।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে হাসল। ডিম ভাজা, টোস্ট, মিষ্টি কয়েকরকম আর চা। অশোক বলল, 'কথা না বাড়িয়ে শেষ করে ফ্যাল ফটিক।' বড় বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার মন খারাপ, জোর করে এখন আতিথেয়তা না করলেও চলত।'

'তা মানি।' বড় বউ বললেন, 'তবু আমাদের মন বলে একটা কথা আছে তো। আমরাও তো খাচ্ছি-পরছি। কী করব?'

অশোক আর ফটিক খেয়ে গেল, বড় বউ জিগ্যেস করলেন, 'নাম ধরেই ডাকছি। বলো তো অশোক, পূর্ণিমার পালানোর ব্যাপারটা তুমি তেমন আমল দিতে চাইছ না কেন? আমার তো মনে হয়, ও নিশ্চয়ই সেই রাত্রে কিছু দেখেছিল, অথবা জানে। নইলে ওরকম ভাবে কেউ পালায়?'

'আমল দিইনি, তা নয়।' অশোক মুখে খাবার নিয়ে বলল, 'ওকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না। ওর পালাবার কারণটাও জানতে হবে। তবে, ও কিছু দেখলে বা জানলে, না বলারই বা কারণ কী থাকতে পারে? তা হলে তো বলতে হয়, খুনির সঙ্গে ওর কোনও যোগসাজশ ছিল, না?'

বড় বউ বললেন, 'তা থাকতেও তো পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে।' অশোক হাসল, 'তবে নাও থাকতে পারে। মেয়েটাকে তো আপনারা অনেকদিন দেখছেন। আপনার কী মনে হয়? মিতার খুনের ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকতে পারে?'

বড় বউ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। অশোক আবার বলল, 'ও পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে তো?'

'তা দিয়েছে।'

'তারপরেও বাড়ি ছেড়ে পালায়নি, তাই না?'

'না।'

BanglaBook.org

অশোক চায়ের কাপে চুমুক দিল, 'আর আজ আমি যখন মথুরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তখনই হঠাৎ পালিয়ে গেল। গোলমালটা ওখানেই। ভাববেন না, ওর কাছ থেকে কথা আদায় করা যাবে।'

'আমি থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'পার্কসার্কাসে ওর মা যে-বাড়িতে কাজ করে তার ঠিকানাও দিয়েছি। ওদের দেশের বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছি।'

অশোক বলল, 'ভালোই করেছেন। আমার তো মনে হয় ওর আর পালাবার জায়গা নেই।'

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বোঝা গেল, পূর্ণিমার ব্যাপারে অশোকের তেমন ঔৎসুক্য না দেখে সকলেই কেমন অবাক আর হতাশ হচ্ছেন। অশোক সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে, খাওয়া শেষ করল। ফটিকেরও শেষ। দুজনেই উঠে দাঁড়াল। বড় বউ এগিয়ে এসে বললেন, 'মিতাকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু ও আমার সব সন্তানের বাড়া। খুনিকে তুমি খুঁজে বের করো ভাই।' বলতে-বলতে তাঁর চোখে যেমন জ্বালা ফুটল, তেমনি জলও বিদবিদ করে উঠল।

'এটা তো এখন আমারও ধ্যানজ্ঞান।' অশোক বলল, 'চেষ্টার ত্রুটি রাখব না, এই বিশ্বাস রাখবেন।' ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

নরেন্দ্রনাথ গেট অবধি এসে বললেন, 'আমি আজ সারাদিন বাড়িতেই আছি। কোনও দরকার হলে—।'

'নিশ্চয়ই।' অশোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল, 'এ-বাড়িতে ঢোকবার সময় বিক্রমবাবুর গাড়িটা দেখতে পাইনি।'

নরেন্দ্রনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন, গাড়িটা তো ছিল। আমার গাড়ির ওপাশে ছিল।'

'তা হবে, খেয়াল করিনি।' অশোক ফটিককে নিয়ে রাস্তায় পা দিল, 'এখন চলি। দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' ও ওপরের দিকে তাকাল।

ওপরের রেলিং-এ ভর দিয়ে অর্পিতা দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধিমতী মহিলা। খুব সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছে, মিতার মতো মেয়েকে রেপ করা যায় না। এখন কি অশোককেই দেখছে? কেন?

নরেন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম বাঁ-দিকে ফিরে গলি দিয়ে এগোল। বাঁধানো চাতাল, টিউবওয়েল, বস্তির মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চাদের ভিড়। টিউবওয়েলের কাছ থেকে নরেন্দ্রনাথের পাঁচিল আর গাছ চোখে পড়ে। এত সরু আর এঁদো গলি, একটা মানুষের পক্ষে কোনওরকমে যাওয়া যায়। সেখান থেকে ডানদিকে ফিরে বাজারের ধারে রাস্তায় কর্পোরেশনের জমা করা ময়লার স্তূপ। অশোক আর ফটিক ডাইনে বাজার রেখে, ট্রাম রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশের কুকুর এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

'অসম্ভব।' অশোক বলল।

ফটিক জিগ্যেস করল, 'কী?'

'কুকুরের পক্ষে এর বেশি এগোনো', অশোক বলল, 'এতটা যে খুনিকে খুঁজে এসেছিল, সেটাই যথেষ্ট। এত লোকের ভিড়। এর পরে, এই সার্কুলার রোডের লোকজন ট্রাফিকের ভিড়ে খুনি যে কোথায় কোনদিকে উধাও হয়েছে, সেটা শুঁকে বের করা অসম্ভব।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, পূর্ণিমার ব্যাপারটাকে সত্যি তুই তেমন আমল দিচ্ছিস না কেন?'

'তার কারণ, মথুরা যতই ভয় পাক, আর লজ্জা পাক, ও স্বীকারোক্তি দিতে রাজি আছে,' অশোক বলল, 'আর পূর্ণিমা সেই স্বীকারোক্তির ভয়েই পালিয়েছে। কারণ, পুলিশ ওদের সম্পর্কটা ধরতে পারেনি।'

'মথুরার আবার কীসের স্বীকারোক্তি?'

অশোক হেসে বলল, 'খুন যখন ঘটছিল, মথুরা আর পূর্ণিমা তখন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, যাকে বলে মত্ত প্রেম, তাই করছিল। ওইটাই ওদের সময় আর সুযোগ। রাত্রে খাওয়া-

BanglaBook.org

দাওয়াব পাট মিটে গেলে পূর্ণিমাকে ওপরে শুতে যেতে হয়। খুনের সময় মথুরা আর পূর্ণিমা একসঙ্গে ছিল। আর যদি খুনের ঘটনার সঙ্গে পূর্ণিমার পালানোর কোনও যোগ থাকে, তা হলে মথুবার সঙ্গেও আছে। এই সেকেন্ড থিংকিংটা আমার মনে তেমন দাগ কাটছে না। মথুবা আর পূর্ণিমার প্রেমেব কথা মিতা জানত, সমর্থন করত, প্রশ্রয়ও দিত। সেই হিসেবে এক্ষেত্রে আমি কোনও মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।' বলতে-বলতেই অশোক একটা রিকশোকে ডাকল।

রিকশো থামল, অশোক ফটিককে ডেকে নিয়ে রিকশোয় উঠে বলল, 'এন্টালি থানা চলো।'

ফটিক আবার জিগ্যেস করল, 'আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে। বাড়ির লোকদের তুই এত জেরা করলি কেন? এদেরও কি খুনের কোনও মোটিভ থাকতে পারে?'

'গতকাল নরেনবাবু যখন আমার কাছে গেছলেন, তখন চলে আসবার সময়, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এইভাবে বলেছিলেন, ময়না তদন্তে জানা গেছে মিতা প্রেগন্যান্ট ছিল।' অশোক বলল, 'ময়না তদন্তের আগে কি বাড়ির কেউ জানত না, মিতা প্রেগন্যান্ট? যদি ধরে নেওয়া যায় জানত, তাহলে গর্ভবতী আইবুড়ো মেয়েকে মেরে ফেলে কলঙ্ক মোচনের কথাটা একেবারে ভুলে গেলে চলে না।'

ফটিক বলল, 'শালা, ভাবতেও পারিস বটে।'

'না ভেবে উপায় নেই।' অশোক বলল এবং দেখে নিল রিকশোওয়ালা সি আই টি রোড ক্রস করে কনভেন্ট রোডের দিকে যাচ্ছে কি না। ঠিকই যাচ্ছে। ও আবার বলল, 'তা ছাড়া, পুলিশের জেরা আর আমার জেরায় নিশ্চয়ই একটু তফাত হবে। নীপা আর অর্পিতার কথা থেকে বোঝা গেল বিক্রমকে পুলিশ কিছু জিগ্যেসই করেনি।'

ফটিক বলল, 'স্বাভাবিক, বিক্রম তো পিকচারেই আসছে না। তার অ্যালিবাই তো পাকা। তা ছাড়া, মোটিভের প্রশ্নও আছে।'

'সবই আছে, কোনওটাই অস্বীকার করছি না।' অশোক বলল, 'আমার কাজ তো আমাকেই করতে হবে। বিক্রমের সঙ্গে কথা না বললে, মিতার খুনের ঘটনার সঙ্গে তার সুখচরের বাড়ির ঘটনার কোইন্সিডেন্সটা জানাই যেত না।'

রিকশো থানার সামনে এসে দাঁড়াল। অশোক পকেট থেকে পার্স বের করে ভাড়া মিটিয়ে থানায় ঢুকল। ব্যস্ত থানা। কিছু ভিড়ও আছে। নানারকমের লোক সামনের ঘরে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে কেউ-কেউ বসে। ঘরে ঢোকবার মুখে রাইফেলধারী পাহারা। অশোক তাকেই জিগ্যেস কবল, 'ও. সি. সাহেব আছেন।'

'হ্যাঁ, অন্দরের ঘরে আছেন।' পাহারা ভাঙা বাংলায় বলল।

অশোক বলল, 'ওঁর কাছে যেতে পারি?'

'ছোটসাহেবকে জিগ্যেস করুন।' সামনের টেবিলেই ইউনিফর্ম পরা চেয়ারে বসা একজনকে দেখিয়ে বলল।

অশোক ফটিককে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। ছোটসাহেব—হয়তো সাব-ইন্সপেকটর। অশোক সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল, 'একসকিউজ মি, ও. সি. সাহেবের একটা চিঠি আছে।'

'কার চিঠি?' ইন্সপেকটর একজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল।

অশোক বলল, 'স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, সি আই ডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল।'

ইন্সপেক্টরের ভুরু কিঞ্চিৎ সোজা হল, পিছনের বাঁদিকের ঘর দেখিয়ে বলল, 'যান, ও ঘরে আছেন।'

'খবর না দিয়েই যাব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যান না।' ইন্সপেক্টর বলল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে বলুন, আপনি কার চিঠি নিয়ে এসেছেন।'

'ধন্যবাদ।' অশোক এগিয়ে গেল। ভেতরে ঢোকবার আর-একটা দরজা আছে। ওদিকেই

BanglaBook.org

বোধহয় হাজত। ভেতরটা তেমন আলোকিত নয়। ও বাঁদিকের পিছনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পরদাটা তুলে বলল, 'আসতে পারি?'

অশোকের থেকে বয়েসে কিছু বড়, ও. সি. একজন সুসজ্জিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিরক্ত মুখে জিগ্যেস করলেন, 'কী চাই?'

'আপনার একটা চিঠি ছিল। জরুরি চিঠি।' অশোক বলল।

ও. সি বললেন, 'নিয়ে আসুন, দেখি।'

অশোক ঘরের মধ্যে ঢুকে ও. সি.-র চিঠিটা বেছে নিয়ে এগিয়ে দিল। ও. সি. খামের ওপরের লেখা দেখে অশোকের দিকে একবার তাকালেন। এক পাশে দুটো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

অশোক আর ফটিক বসল। ও. সি. মহিলাকে বললেন, 'এক মিনিট।' খামের সিল আঙুলের চাপে ভেঙে চিঠি খুলে পড়তে-পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল। তারপরে অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি অশোক ঠাকুর?'

'হ্যাঁ।' অশোক মাথা ঝাঁকাল।

ও. সি. গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করলেন, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে বলুন?'

'বিশেষ কিছু না।' অশোক বলল, 'আপনি ব্যস্ত মানুষ, সামান্য দু-একটা কথা জিগ্যেস করার ছিল। সুকুমারবাবু আর দীপকবাবু কি এখনও হাজতে আছেন?'

ও. সি. জবাব দেওয়ার আগে মহিলার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি ওবেলা একবার টেলিফোন করে আসবেন, আমি একটা ব্যবস্থা করবই।'

স্বভাবতই মহিলার মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল। কাজলটানা সুন্দর চোখে রুষ্ট নজরে অশোক আর ফটিকের দিকে একবার দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও. সি.-কে নমস্কার করে বললেন, 'আচ্ছা, তাই করব।'

ও. সি.-ও উঠে দাঁড়ালেন। মহিলা বেরিয়ে গেলেন। ও. সি. হাত তুলে ডাকলেন, 'আসুন, অশোকবাবু, সামনের চেয়ারে আসুন। হ্যাঁ, সুকুমার মল্লিক আর দীপক রায় এখনও হাজতেই আছে।'

অশোক সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল, 'ওদের জেরা করে তেমন কিছু পেলেন?'

'কিছুই না।' ও. সি বললেন, 'কথা শুনলে তো মনে হয় দুটির কেউ ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'ওঁদের অ্যালিবাই কী বলছে?'

'অ্যালিবাই তো পরিষ্কার।' ও. সি. বললেন, 'তদন্তেও একরকম প্রমাণ হয়ে গেছে। সুকুমার মল্লিক সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা অবধি একটা গল্প পাঠের আসরে ছিল। সে নাকি আবার গল্পটল্প লেখে। দীপক ওর বোন-বউদি-দাদার সঙ্গে সন্ধের শো-তে সিনেমা দেখে বাইরের থেকে খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল।'

'তবু অ্যারেস্ট করলেন?' অশোক হাসল।

ও. সি. দু-হাত তুলে বললেন, 'কী করব মশাই। কাগজগুলো মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। একটা কিছু তো করতেই হবে।'

অশোক হেসে উঠল, 'আর কারওকে অ্যারেস্ট করেছেন নাকি?'

'হাসছেন আপনি? আমাকে তো কেস একটা খাড়া করতেই হবে।' ও. সি. বললেন, 'হ্যাঁ, আর একটাকে আমার অ্যারেস্ট করার ইচ্ছে রয়েছে, পারছিনে। সে হল টিটো গাঙ্গুলি।'

'কেন পারছেন না? বাপ জাঁদরেল ব্যারিস্টার বলে?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি. অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন 'ঠিক বলেছেন। সব জায়গা তো ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় না। তবে টিটোর অ্যালিবাইও পাকা, কিন্তু একেবারে লম্পট আর দুশ্চরিত্রের শিরোমণি। বাপের

BanglaBook.org

এক ছেলে, দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। পারমিতার খুনের দিন দুটো মেয়েকে নিয়ে সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত একটা হোটেলে ছিল।'

'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

'বলেছি বইকি। মনে হল, পারমিতাকে ও পছন্দ করত না।'

'তাই নাকি?' অশোক হাসল, 'ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই।' ও. সি. বেল বাজিয়ে একজন পাহারাকে ডেকে বললেন, 'ইন্সপেক্টর ঘোষসাহেবকে একবার ডাকো তো।'

দরজায় উঁকি দেওয়া পাহারা অদৃশ্য হল। অশোক জিগ্যেস করল, 'জাহাঙ্গির ওসমানের নাম শুনেছেন?'

'ওহ্ সিওর।' ও. সি. বললেন, 'সে তো একমাসের ওপর ইউ. কে.-তে গেছে।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকুনি দিল, 'তা হলে তো মিটেই গেল।'

'দেখুন মশাই, আমি যা বুঝেছি, পারমিতা ভট্টাচার্য ছিল মক্ষীরানি।' ও. সি. বলল, 'এর মধ্যে আবার পেটও বাঁধিয়ে বসেছিল—মানে কনসিভ করেছিল।' ভাষাটা শুধরে নিলেন, 'মেয়ে যে ভালো ছিল না, কোনও সন্দেহ নেই। কম করে তার একডজন বন্ধু আর চেনাশোনা লোককে ইন্টারোগেট করেছি। কোনও ফল পাইনি। এটা পরিষ্কার, আমাদের চেনাজানা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের কাজ এটা নয়। লালবাজারে ডি ডি-ও কিছু পাত্তা করতে পারেননি। ঘরের কেলেঙ্কারি চাপতে গিয়ে বাড়িরই কেউ মেরে বাগানে ফেলে রেখেছিল কি না, কে বলতে পারে? অবিশ্যি সেরকম কোনও প্রমাণও হাতে আসেনি।'

অশোক ফটিকের দিকে ফিরে একবার দৃষ্টিবিনিময় করল। ফটিক বলে উঠল, 'বাড়ির কেউ হলে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে আসবে কেন?'

'চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে, আর কেন?' এই প্রথম ও. সি. হাসলেন।

একজন ইন্সপেক্টর ঢুকল। নতুন মুখ, জিগ্যেস করল, 'ডেকেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' ও. সি. বললেন, 'টিটোর বাড়ির ঠিকানা আপনার কাছে আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এঁদের দিন।'

ইন্সপেক্টর ঘোষ অশোক আর ফটিককে একবার দেখে, পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে বলল, 'লিখে নিন। ও বাড়ির ঠিকানা কলকাতার সবাই জানে।' বলে ঠিকানাটা নোটবই থেকে পড়ে গেল।

ফটিক প্রস্তুত ছিল। দ্রুত হাতে লিখতে-লিখতে বলল, 'কোনও টেলিফোন নাম্বার?'

'একটা না, দুটো। লিখে নিন।' ঘোষ দুটো টেলিফোন নাম্বার বলল।

ফটিক লিখে নিল। ও. সি. বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যান।'

ঘোষ বেরিয়ে গেল। অশোক জিগ্যেস করল, 'সুকুমার আর দীপকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' ও. সি. বললেন, 'আপনি যাঁর চিঠি নিয়ে এসেছেন, আপনি যা বলবেন, তাই করব। অবিশ্যি আপনার নামটা আমি এক-আধবার শুনেছি। ভেবেছিলাম, আর একটু বয়স্ক, ভারিক্কি চালের লোক হবেন।' তিনি দ্বিতীয়বার হাসলেন, 'দুজনকে একসঙ্গে, না আলাদা?'

অশোক হাসল, 'আলাদা তো বটেই। তবে এ-ঘরে, আপনার সামনে—।'

'আমি এ-ঘর থেকে চলে যাচ্ছি।' ও. সি. উঠে দাঁড়ালেন, পিছনের আর একটি ভেজানো দরজার পাল্লা ঠেলে বললেন, 'আমি আগে সুকুমারকে পাঠাচ্ছি, তারপর দীপক আসবে।' তিনি দরজার ভেতরে গিয়ে আবার ভেজিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

অশোক সিগারেট ধরাল, ফটিকের দিকে ফিরে বলল, 'বাড়ির লোকও বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে পারে, এটা তোর মাথায় এল না?'

'কেন আসবে না?' ফটিক বলল, 'কিন্তু বাড়ির লোক বাইরে থেকে টেলিফোন করে কে আসতে পারে?'

'টেলিফোন করবে কেন? বাগানে ডেকে নিয়ে যেতে পারে। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে—।'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক হাসল, 'বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বাগানে যায়নি। খুনির বাগানে আসা-যাওয়া দুয়েরই চিহ্ন রয়েছে। নরেনবাবুর মেজ ছেলে লেবুই তখন একমাত্র বাইরে ছিল। মিতার চালচলনও তার পছন্দ ছিল না, রাগ ছিল। কিন্তু তার অ্যালিবাই খুব জবরদস্ত।'

অশোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই একজন সেপাই ঘরের পিছন দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তার পিছনে ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক। মুখে দু-তিন দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন মুখ এখন বিষণ্ণ, বিমর্ষ, চোখের কোলে কালি। অশোক জিগ্যেস করল, 'সুকুমার মল্লিক?'

যুবক মাথা ঝাঁকাল। অশোক পাশের চেয়ার দেখিয়ে ডেকে বলল, 'আসুন, বসুন এখানে।'

সুকুমার তথাপি দাঁড়িয়ে রইল। অশোক হাসল, 'আমি পুলিশের লোক নই, অবিশ্যি উকিলও নই। তবু আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা আছে। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। আসুন।'

সুকুমার অশোকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একবার ফটিকের দিকে দেখে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। অশোক সেপাইকে বলল, 'আপনি বাইরে যান।'

সেপাই বেরিয়ে গেল। অশোক সুকুমারের দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম অশোক ঠাকুর, মিতার খুনের তদন্ত করছি। এটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশান, সরকারি নয়।'

'অশোক ঠাকুর মানে—।' সুকুমারের কোলবসা চোখে উৎসুক জিজ্ঞাসা ফুটল, 'বেসরকারি গোয়েন্দা?'

অশোক হাসল, 'বলতে পারেন।'

সুকুমারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু গলাটা যেন আবেগে কেঁপে উঠল, 'আপনি মিতা মার্ডার কেসের দায়িত্ব নিয়েছেন? আমি সত্যিই—কী বলব, বোঝাতে পারছিনে, একটা বড় আশা পাচ্ছি।'

অশোক সিগারেটের প্যাকেট সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল। সুকুমার হেসে বলল, 'আমি স্মোক করিনে।'

'আচ্ছা।' অশোক নিজের সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'পুলিশের মুখে শুনেছি, আপনার অ্যালিবাই পাকা। এখন আমাকে মন খুলে বলুন তো, মিতার খুনের বিষয়ে আপনার কী মনে হয়? কারওকে সন্দেহ করেন?'

সুকুমার মাথা নেড়ে বলল, 'না। এ-কথাটা প্রায় একশোবার বলেছি।'

'কোনও কথা গোপন করবেন না সুকুমারবাবু।' অশোক বলল, 'আপনার সঙ্গে মিতার সম্পর্ক কেমন ছিল? শুধুই বন্ধুত্ব, না তার চেয়ে অনেক বেশি?'

সুকুমার একমুহূর্ত দ্বিধা করল, 'দেখুন অশোকবাবু, মিতাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু মুখ ফুটে কোনওদিন কিছু বলতে পারিনি। ও আমাকে হয়তো পছন্দ করত, ভালোবাসত কি না জানিনে।'

'আপনাদের মধ্যে কোনওরকম ফিজিকাল রিলেশন—।'

'কী বলছেন?' সুকুমার অবাক চোখে তাকাল, 'পুলিশ ঠিক এ কথাই আমাকে জিগ্যেস করেছে। আপনিও? বিশ্বাস করুন, ওর গা ঘেঁষে বসতে পারা ছাড়া আর কখনও কিছুই ঘটেনি। একটা চুমোও খাইনি।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা, মিতাকে এমন কারওর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছেন, যাকে আপনার পছন্দ হত না?' অশোক জিগ্যেস করল।

সুকুমার বলল, 'সে তো আমাদের নিজেদের মধ্যেই মিতাকে নিয়ে একটু রেষারেষি ছিল। তবে হ্যাঁ, টিটো গাঙ্গুলিকে আমার কোনওকালেই পছন্দ হত না।'

'আর জাহাঙ্গির ওসমান?'

'জাহাঙ্গির ঠিক আমার বন্ধু ছিল না।' সুকুমার বলল, 'বড়লোক মুসলমানের ছেলে, আমাদের থেকে বছর তিনেকের সিনিয়র। ওর সঙ্গে কীভাবে মিতার ভাব হয়েছিল, তাও জানিনে। ওকে কয়েকবার দেখেছি, ইউনিভারসিটি থেকে মিতাকে ডেকে নিয়ে যেতে। মিতার মুখে শুনেছিলাম, জাহাঙ্গির বিবাহিত। সেজন্য ওকে নিয়ে খুব মাথাব্যথা ছিল না।'

অশোক হাসল, 'কেন, জাহাঙ্গির বিবাহিত হলেই বা ক্ষতি কী? শরিয়তের অনুমতিক্রমে ও আরও তিনটি বিয়ে করতে পারে, পয়সার অভাব নেই।'

'জাহাঙ্গির তা ভাবতে পারে, মিতা কখনই পারে না।' সুকুমার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, 'মিতা সে-জাতের মেয়ে ছিল না।'

অশোক একটু গম্ভীর হল, 'আপনি কি জানেন, মিতার কনসেপশান হয়েছিল?'

'কনসেপশান?' সুকুমার যেন সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে পাংশু হয়ে উঠল, 'কী বলছেন আপনি? আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে!' সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

অশোক আস্তে-আস্তে মাথা ঝাঁকাল, 'আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলছিনে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখেই বলছি। আপনাকে সে-খবর জানানো হয়নি। তিন মাসের কনসেপশান।'

সুকুমার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। মাথার চুল টানতে লাগল দু-হাতে। হাজতবাসের থেকে এ খবরটা তাকে অনেক বেশি আঘাত করেছে। তবু সে সন্দিগ্ধ চোখে অশোকের দিকে আবার তাকাল, বলে উঠল, 'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। কনসেপশান। মিতার? তিন মাসের?'

'হ্যাঁ।' অশোক সুকুমারের চোখের দিকে তাকাল, 'কারওকে সন্দেহ হয় আপনার?'

সুকুমারের পাংশু মুখে বিভ্রান্তি ফুটে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, 'না। কাকে সন্দেহ করব আমি? টিটোকে সন্দেহ করা যেত, কিন্তু মিতা ওকে পছন্দ করত না বলেই জানি। মেলামেশাও নেই অনেকদিন। জাহাঙ্গির মাসখানেক আগে বিলেত গেছে—কিন্তু না, জাহাঙ্গিরকেও আমার সন্দেহ হয় না। আসলে আমি মিতাকেই চিনতে পারিনি দেখছি।' কথা বলতে-বলতে ওর মুখে গভীর হতাশা আর যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

'দীপকবাবু আর আপনাকে কি একই হাজতঘরে রাখা হয়েছে?' অশোক জিগ্যেস করল।

সুকুমার মাথা নাড়ল, 'না, ওকে অ্যারেস্ট করেছে, আমার উকিলের মুখে শুনেছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'আপনাকে উকিলের সঙ্গে কথা বলতে দিয়েছে?'

'দিয়েছে।'

'উকিলও আপনাকে মিতার কনসেপশানের কথা বলেননি?'

'না তো।' সুকুমার মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

সুকুমার যেন অশোকের কথার মর্মার্থ সহসা বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওহ্, আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে জিগ্যেস করছি, এরা আমাকে এভাবে আটকে রেখেছে কেন?'

'ওটা তো পুলিশের ব্যাপার।' অশোক হাসল, 'কী করে বলি বলুন। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে।'

সুকুমার উঠে যেতে-যেতে বলল, 'রাসকেলস।'

অশোক ফটিকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল। ফটিক ঠোঁট ওলটাল, 'বেচারা।'

BanglaBook.org

'বেচারা?' অশোক হাসল, সিগারেটে টান দিল।

পিছনের দরজা আবার খুলে গেল। ট্রাউজারের ওপর শার্ট, তার ওপরে হাতকাটা সোয়েটার। সবই ময়লা কোঁচকানো, দাড়ি কামানো নেই, গোঁফ জোড়া ছাঁটা হয়নি। দোহারা, চওড়া, শক্ত গঠনের শরীর। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেপাই চলে গেল। অশোক ডাকল, 'আসুন দীপকবাবু, বসুন।'

দীপক ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখে একবার অশোক আর একবার ফটিককে দেখে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। অশোক বলল, 'আমি মিতার খুনের তদন্ত করছি, তবে—।'

'তবে-টবের আর দরকার কী?' দীপকের রাত-জাগা লাল চোখে বিরক্তি আর রাগ ফুটে উঠল, 'কী জিগ্যেস করবেন করুন। তবে বলে রাখছি, আমার নতুন করে আর বলার কিছু নেই।'

অশোক হাসল, 'কিছু না জিগ্যেস করতেই আপনি—।'

'আরে মশাই, জিগ্যেস আর কী করবেন?' দীপক প্রায় রুখে উঠে বলল, 'এর পরে ভদ্রলোকের ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙাবেন, এই তো? তাই করুন। নতুন কথা আমার আর বলার কিছু নেই।'

অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল, 'না, নতুন আর কী বলবেন? মিতার খুনের সময়, সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, সবই জানি। জানি, মিতাকে আপনি ভালোবাসতেন, কিন্তু আপনাকে—।'

'না, ভালোবাসাবাসির কথা আমি অনেক আগেই মন থেকে ত্যাগ করেছিলাম।' দীপক বলে উঠল, 'যার সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা হয়ে গেছে, তার কথাও আপনাদের বলেছি, একটা চাকরি-বাকরি হলেই সেটা হয়ে যাবে। অন্তত যেত। এখন এই জঘন্য দুর্নামের পরে কী হবে জানিনে। আপনাদের তো বলেই দিয়েছি, মিতা আমাব বন্ধু ছিল, তার বেশি কিছু নয়।'

অশোক আর কথা না বাড়িয়ে মিতার কনসেপশানের কথা বলল। ফল সুকুমারের মতোই। অবিশ্বাস, রক্তহীন অবাক মুখ, আর আর্তস্বর, 'কী বলছেন?'

'মিথ্যে বলিনি।' অশোক হাসল, 'আমি পুলিশের লোকও নই। এটা বেসরকারি তদন্ত। আপনাকে আমি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখে বলছি।'

দীপক স্তব্ধ হয়ে গেল, মিনিটখানেক কোনও কথা বলল না। তারপরে আস্তে-আস্তে ওর মুখ শক্ত হয়ে উঠল, 'মিতা যে খুব সহজ মেয়ে ছিল না, তা আমি বুঝেছিলাম। কার সঙ্গে কখন মিশত কোথায় যেত, সব জানতেও পারতাম না। অসম্ভব কিছু নয়।'

'কী অসম্ভব নয়?'

'এই যা আপনি বললেন, কনসেপশান। তাই যদি হয়েছিল, তবে আর খুন হল কেন?'

'হয়েছিল বলেই খুন। খবরটা পেয়েই রাগের মাথায় আপনিও খুন করতে পারেন।'

দীপক হাসল, তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসি, 'আপনার যা খুশি তাই বলতে পারেন। আপনাদের তো কোনও কথাই আটকায় না। তবে আমি এ খবরটা জানতাম না। আপনারাও আমাকে বলেননি।'

'কারওকে সন্দেহ করেন?'

দীপক কপালে ভাঁজ ফুটিয়ে মাথা নাড়ল, 'না, এদিকে কার সঙ্গে কনসিভ করে বসে আছে, আর খুনের দিন বিকেলেও আমাকে কত টিজ করে কথা বলেছে।'

'টিজ করে? কেন?'

'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে। যে-মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাকে ও চিনত। তার নাম করে আমাকে টিজ করত। অবিশ্যি ওটা ওর স্বভাব। ও চাইত, সবাই ওকেই ঘিরে থাকবে। অথচ নিজেই কোথায় কী বাধিয়ে বসেছিল। বাজে মেয়ে। ওর কনসেপশান হয়েছে জানলে ওর সঙ্গে আর মিশতামই না।' দীপকের চোখে-মুখে এখন ঘৃণা আর রাগ জ্বলজ্বল করছে। তার পরে হঠাৎ সচকিত হয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি তখন কী বলছিলেন, বেসরকারি তদন্ত? সেটা আবার কী?'

BanglaBook.org

'মিতার দাদা আমাকে আলাদা করে এ খুনের তদন্তের ভার দিয়েছেন।' অশোক বলল, 'আমি পুলিশের লোক নই।'

দীপক ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'তার মানে আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?'

'বলতে পারেন। আমার নাম অশোক ঠাকুর।'

দীপকের চোখ দেখে বোঝা গেল, সে অশোককে চেনে না, বা নাম শোনেনি। ও টিটো আর জাহাঙ্গিরের কথা জিগ্যেস করল। দীপক বলল, 'আমি মশাই কিছুই বলতে পারিনে। এখন আমার মনে হচ্ছে, মিতার দ্বারা সবই সম্ভব ছিল। ওকে পাওয়ার আশা আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমাকে কোনওদিনই বিয়ে করবে না।'

'আর সুকুমারবাবু? ওঁর তো আশা ছিল।'

'আশা নয়, মিতা ওকে ভুলিয়ে রেখেছিল। সুকুমারটা বোকা, ওকে আমি অনেকদিনই বলেছি।'

'তবু কিন্তু আপনি মিতার খুনের দিনও ওদের বাড়ি গেছলেন?'

'সে তো যেতামই। বাড়ির সকলের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। মিতার সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল। তবে এখন আপনার মুখে যা শুনলাম, তা যদি আগে জানতাম, আর কখনওই যেতাম না।'

অর্থাৎ, মিতার ওপর দীপকের দুর্বলতা ছিলই, সেটা বলতে পারছে না। অন্যথায়, মিতাকে পাবে না জেনেও বাড়ির লোকের টানে দীপক যেত না। অশোক বলল, 'আচ্ছা দীপকবাবু, আপনি আসুন। আমার আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। তবে ঠ্যাঙাড়ে নই, এটা বিশ্বাস হল তো?'

দীপক উঠে দাঁড়াল, একটু হাসল, 'কী করে জানব মশাই? পুলিশ যা কুৎসিত কথাবার্তা বলেছে আর ধমকেছে, মারতেই বাকি রেখেছে। এরা সব পারে।'

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। দীপক পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অশোক ফটিকের দিকে তাকাল। ফটিক বলল, 'মিতার জন্যে উইকনেস ছিল, কিন্তু মনে-মনে রাগও ছিল।'

পিছনের দরজা দিয়ে সেপাই ঢুকল। অশোক জিগ্যেস করল, 'বড়সাহেব আছেন, না বেরিয়ে গেছেন?'

'আছেন, আপনাদের বসতে বলেছেন।' সেপাই বলল।

তার কথা শেষ না হতেই ও. সি. ঢুকলেন, চেয়ারে বসতে-বসতেই বললেন, 'নরেনবাবুর বাড়ির মেডসারভেন্ট মেয়েটা পার্কসার্কাসে ওর মায়ের কাছে যায়নি, এইমাত্র খবর এল।'

'তাই নাকি?' অশোকের ভুরু কুঁচকে উঠল।

ও. সি. বললেন, 'হ্যাঁ, দেখি আবার ছুঁড়িটা কোথায় কেন পালাল। এদের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?'

'বোঝা তো সহজে কিছুই যায় না।' অশোক হাসল, 'তবে অ্যারেস্ট যখন করেছেন, কেস তো দিতেই হবে। ওদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টে প্রডিউস করে জামিন দিয়ে দিন।'

ও. সি. বললেন, 'আপনি তো মশাই বলে খালাস। খবরের কাগজগুলো তো আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করবে।'

'করতে দিন না।' অশোক বলল, 'নতুন তো কিছু নয়। ওদের বাইরে ছেড়ে রেখে একটু নজর রাখুন। কলকাতা ছাড়তে বারণ করুন।'

ও. সি. চিন্তিত মুখে বললেন, 'বলছেন? অবিশ্যি আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় কিছু ভেবেই বলছেন। বেশ তাই করব, কালই কোর্টে প্রডিউস করব। নতুন কিছু জানতে পারলেন?'

'তেমন কিছু না। তবে আপনাকে আর আমি কী বোঝাব বলুন? সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ছেড়ে রেখে চোখে-চোখে রাখাই ভালো।'

'সে তো মশাই আপনার কথা। লোকে যে মানতে চায় না। তাদের ধারণা, আমরা ইচ্ছে

BanglaBook.org

করেই অপরাধীদের ধরছি না। অথচ বোঝে না, এসব খুনের অপরাধীরা পুলিশের হাতের বাইরে। চেনাশোনা ক্রিমিনালদের কাজ এসব নয়।'

'সেইজন্যেই বলছি, এক্ষেত্রে সন্দেহজনকদের বাইরে ছেড়ে রেখে নজর রাখুন।'

'ঠিক আছে, আমি সুকুমার আর দীপককে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার জন্যে এখন আর কী করতে পারি বলুন?'

অশোকের মনে হল, একজন পুলিশের অফিসার হিসেবে ও. সি. যথার্থই ভদ্রলোক। বলল, 'আপাতত কিছুই না। পরে দেখা যাবে। আপনার কি মনে হয় টিটো গাঙ্গুলিকে এখন বাড়িতে গিয়ে পাব।'

'ও মশাই শিবের বাবারও বলা অসাধ্য।' ও. সি. বিরক্ত মুখে বললেন, 'বাড়িতে কি কোথায় কোন হোটেল-রেস্তোরাঁয় কোনও মেয়ে নিয়ে বসে আছে, কিছুই বলা যায় না। একবার টেলিফোন করে দেখব?'

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'না-না, আগে থেকে কিছু খবর নেওয়ার দরকার নেই। আজ উঠি। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই, অয়স্কান্ত রায়।'

ফটিক ও. সি.-র সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করল। ও. সি. হেসে বললেন, 'ব্যোমকেশের অজিতবাবু?'

'আমি লেখক নই।' ফটিক হেসে বলল।

ও. সি. হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন, 'কথার কথা বললুম।'

অশোক নমস্কার করে ফটিককে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে গভীর চিন্তামগ্নতা। হাঁটতে-হাঁটতে সি আই টি রোডে এসে মৌলালির দিকে মোড় নিল। ফটিক জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'পূর্ণিমা একটু ভাবিয়ে তুলল।' অশোক অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'মায়ের কাছে না গিয়ে কোথায় গেল? দেশের বাড়িতে? কেন? এত দূরে যাবে কেন?' বলতে-বলতে হাতের ঘড়ি দেখল। বেলা দেড়টা। ফটিকের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না, নরেনবাবুর বাড়িতে যা খেয়েছি, বেলা তিনটে-চারটে অবধি চলে যাবে।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'তা হলে চল্, একবার টিটো গাঙ্গুলির খোঁজে যাওয়া যাক।'

'চল্, তবে পেলে হয়।'

'চান্স নেওয়া যাক।'

সৌভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল, যেতেও রাজি হল। দক্ষিণ কলকাতার পশ-এরিয়া বলতে যা বোঝায় সেখানেই ব্যারিস্টার গাঙ্গুলির বাড়ি। খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। নিবিড় গাছপালায় ঘেরা, দুপুরে এলাকাটা একেবারে নিঝুম। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গেটের সামনে যেতেই ভেতর থেকে একটা গাড়ি জোরে বেরিয়ে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। চালক একজন সুপুরুষ যুবক। চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

অশোক এগিয়ে গেল, 'এটা কি ব্যারিস্টার গাঙ্গুলির বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো—।'

'জানি।' অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় টিটোবাবু?'

যুবকের ভ্রূকুটি চোখে সন্দেহ, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আমরা আপনার কাছেই এসেছিলাম।'

'কী দরকার?'

'মিতার মার্ডারের—।'

BanglaBook.org

'ধুত্তোরি তোর মিতা মার্ডারের নিকুচি করেছে।' টিটো রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'আমার এখন সময় নেই। কোনও কথাও বলতে পারব না। আপনি কে?'

'পুলিশের লোক নই, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।' অশোক ফটিকের দিকে একবার তাকাল, 'এখন কি আপনি খুব ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, আমি একটু বেরোচ্ছি।'

'কখন ফিরবেন?'

'তা বলতে পারছিনে। বেরোচ্ছি, এই পর্যন্ত। ফেরার কোনও ঠিক নেই।' গাড়ির স্টার্ট বন্ধ ছিল না। টিটো গিয়ার তুলে গাড়ি চালাবার উদ্যোগ করলে।

ফটিক বাঁদিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসে পড়ল। অশোকও ঝটিতি ডানদিকের দরজা খুলে টিটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত দিল। অ্যাকসিলারেটর আর ক্লাচে পা রেখে গাড়ি চালিয়ে দিল। টিটো চিৎকার করে উঠল, 'মানে? কিডন্যাপ করা হচ্ছে আমাকে?'

ফটিক বলল, 'আস্তে কথা বলুন, চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। আপনাকে কিডন্যাপ করতে আসিনি, আপনিই আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। কোথায় যাবেন বলুন, আমরাও আপনার সঙ্গে সেখানে যাব।'

'আমি হাইকোর্টে যাব।' টিটো স্বর চড়িয়ে বলল।

অশোক বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে টিটোর পাঁজরে খোঁচা মেরে বলল, 'এখন আর হাইকোর্টে বাবার কাছে যেতে হবে না। আসলে কোথায় যাচ্ছিলেন বলুন, সেখানেই যাব। চেঁচাবেন না, প্রাণটার কথা মনে রাখবেন। কোনও হোটেলে-রেস্তোরাঁয় কোনও বান্ধবীর সঙ্গে মিট করার কথা আছে কি? খেয়ে তো বেরোননি বুঝতেই পারছি। চানটান করে বেশ গন্ধ ছড়িয়ে বেরিয়েছেন। বলে ফেলুন তাড়াতাড়ি, আমি কিন্তু গুরুসদয় রোডে ঢুকছি।'

টিটো ঘামতে আরম্ভ করেছে। করবেই। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের দিকে একবার তাকাল। অশোক দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিল। টিটো বারেবারে ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকে দেখতে লাগল, আবার বাইরের দিকে। বলল, 'আপনারা কারা? এসব কি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজ? আমার গাড়িতে আমাকেই জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আপনি একটু ভদ্র ব্যবহার করলেই হত।' ফটিক বলল, 'আমাদের রাস্তার কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাধ্য হলাম আপনার গাড়িতে উঠতে।'

'কিন্তু আমি কোনও বান্ধবীর সঙ্গে মিট করতে যাচ্ছি, এ-কথা আপনারা জানলেন কী করে?'

'মন্ত্রগুণে।' অশোক গাড়ির স্পিড কমাল। ট্রাফিকের হাতের বাধা।

টিটো চঞ্চল হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে ট্রাফিক পুলিশের দিকে তাকাল। অশোক বাধ্য হয়ে খারাপ রকমের দায়িত্ব নিয়ে ট্রাফিক আইন ভেঙে বাঁদিকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকে গেল। পিছনে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। বাজুক, আর কোনও উপায় নেই এখন। টিটো অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'অ্যাকসিডেন্ট করবেন নাকি?'

'সেরকম ইচ্ছে নেই।' অশোক স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখল, সেইসঙ্গে ফুয়েলের কাঁটা। অনেক তেল আছে। সোজা রিচি রোডে পড়ে ডানদিকে হাজরা মোড়ে পড়ল, 'এখনও বলছেন না, কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাদের মাত্র দশ মিনিটের কথা আছে।' বলতে-বলতে ল্যান্সডাউনের মোড় ক্রস করে গেল।

'আমি চৌরঙ্গি যাব।' টিটো বলল।

অশোক বলল, 'সে-কথা বললেই পারতেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন, ভয়ের কিছু নেই। আপনাকে কিডন্যাপ করছি না, মারধরও করব না। কেবল কয়েকটা কথার জবাব চাই।' ও হাজরার মোড়

BanglaBook.org

ক্রস করে সোজা এগিয়ে ডানদিকে হরিশ মুখার্জি রোড ধরল। জিগ্যেস করল, 'কোনও বান্ধবীকে কোথাও অপেক্ষা করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টায় টাইম দিয়েছেন?'

'দুটোয়।'

'একটু দেরি হবে। চলুন, ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেতরে বসেই কথা বলব।'

'কেন, আপনারা কি ভাবছেন, আমি মিতাকে খুন করেছি?'

'চেয়েও যখন পাননি, অসম্ভব কী?' অশোক টিটোর ডানহাতের অনামিকার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনার আংটির পাথরটা কীসের? ডায়মন্ড?'

'হ্যাঁ।' টিটো হাতটা গুটিয়ে নিল।

অশোক হাসল, 'ভয় নেই, আপনার আংটি ছিনতাই করব না। মিতাকে এমন কী কথা বলেছিলেন, যে রেগে আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

টিটোর অবাক মুখ লাল হয়ে উঠল, 'মানে?'

'মানে আপনিই ভালো জানেন।' অশোক বলল, 'খারাপ কথা কিছু বলেছিলেন।'

'ও কি খুব ভালো মেয়ে ছিল নাকি?' টিটো এই প্রথম ঝেঁজে উঠল।

অশোক স্বস্তিবোধ করল, 'আপনার থেকেও খারাপ কি?'

'নিশ্চয়ই। ওরকম ঢলানো মেয়ে আমি অনেক দেখেছি।'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন।' অশোকের দৃষ্টি দূরের রবীন্দ্র সদনের সামনে ট্রাফিক পুলিশের হাতের দিকে, 'সে-হিসেবে আপনি অনেক বেশি বাজে মেয়ের সঙ্গে ঘোরেন, যারা আপনাকে বাঁদর নাচায়। মিতা যদি সেরকম মেয়ে হত, আপনাকেও নাচাত। খারাপ কথায় রেগে গিয়ে তাড়িয়ে দিত না। বলুন, কী বলেছিলেন?'

টিটো চুপ। সৌভাগ্যক্রমে ট্রাফিকের হাত ঘুরে গেল। অশোক সোজা এগিয়ে যাবে ভেবেও গাড়ি বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' টিটো জিগ্যেস করল।

'ভিকটোরিয়ার পেছনে, সামনে যাব না।' অশোক বলল, 'তাড়াতাড়ি জবাব দিন।'

'মিতাকে আমি একটা চুমো খেতে চেয়েছিলাম।' টিটো মুখটা নামিয়ে নিল। ভয়ে এখনও ঘামছে, তবে মনে কিছুটা ভরসাও পেয়েছে।

'মাত্র?' অশোক ফটিকের দিকে তাকিয়ে হাসল। বুঝতে পারল, সেই চুমো খেতে চাওয়ার ভাষাটা নিশ্চয়ই খুব রুচিকর বা নির্ভেজাল ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে আর কিছু জিগ্যেস না করে গাড়ি ঘুরিয়ে ভিকটোরিয়ার পিছনের রাস্তায় ঘুরে গেল।

শীতের দুপুর। ভিকটোরিয়ার ভেতরে তো বটেই, বাইরেও অল্প দু-চারজন রোদে বসে আছে। অশোক প্রায় পাঁচিলের কাছে একপাশে গাড়ি দাঁড় করাল। স্টার্ট বন্ধ করে চাবি খুলে নিজের হাতে রাখল, 'মিতার মার্ডারের দিন আপনি কখন থেকে কখন কোথায় ছিলেন, সে-খবর আমি জানি। কিন্তু ছ'টার আগে কি মিতাকে বাড়িতে টেলিফোন করেছিলেন?'

'আমি?' টিটোর ফরসা লাল মুখে বিস্ময় ও বিভ্রান্তি, 'গত পাঁচ মাসের মধ্যে আমি ওর কোনও খোঁজখবরই রাখিনে। আর আমি টেলিফোন করলে ও তো গালাগালি দিয়ে অপমান করত। তবে—।'

চুপ করে গেল।

অশোক টিটোর মুখের দিকে তাকাল। টিটো বলল, 'তবে কথা না বললেও, মিতাকে আমি কয়েকবার দূর থেকে দেখেছি।'

BanglaBook.org

'কোথায়?'

টিটো চৌরঙ্গির একটা নামকরা হোটেলের নাম করে বলল, 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দুপুরের দিকে ওকে কয়েকবার সেখানে ঢুকতে দেখেছি।'

'কে সে?' অশোকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

'চিনিনে।'

'কেমন দেখতে?'

'বেশ ভালো চেহারা, দেখতে সুন্দর, খুব স্মার্ট।'

'বয়েস?'

'আমার থেকে কিছু বেশি মনে হত। দেখে মনে হত মিতার খুব ঘনিষ্ঠ।'

'ঘনিষ্ঠ কেমন করে বুঝলেন?'

টিটো একটু দ্বিধা করে বলল, 'ভদ্রলোক মিতার পিঠে হাত দিয়ে চলতেন—কোমরেও।'

'বানিয়ে বলছেন?'

'অন গড, বিশ্বাস করুন।'

'পুলিশকে বলেছেন?'

'না, পুলিশ আমাকে জিগ্যেস করেনি।'

'আমিও তো জিগ্যেস করিনি।'

'তা করেননি।' টিটো একবার ঢোক গিলল, 'আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই বললাম, বিশ্বাস করুন।'

'আপনি মিতাকে খুব ঘেন্না করতেন, না?'

টিটো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, ওকে কখনও ঘেন্না করতাম না। ও-ই আমাকে ঘেন্না করত।'

'সে তো আগের কথা। আজকাল ওকে আপনি ঘেন্না করতেন না?'

টিটো মাথা নাড়ল, 'না আমার মনে খুব কষ্ট হত। ও আমাকে বুঝতে পারেনি।'

অশোক হাসি চাপল, 'আপনার কি কারওকে সন্দেহ হয়, কে মিতাকে মার্ডার করতে পারে?'

টিটো আবার মাথা নাড়ল, 'এটা আমি ভাবতেই পারিনে, কে ওকে খুন করতে পারে?'

'কেন, ও তো খারাপ মেয়ে ছিল?' অশোক চোখের কোণে তাকাল।

টিটো মাথা নিচু করে বলল, 'কলকাতা শহরে খারাপ মেয়ে তো কত আছে, তাদের কি কেউ খুন করতে পারে?'

অশোক এক মুহূর্ত ভাবল, মাথা ঝাঁকাল, 'আচ্ছা, যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে মিতাকে চৌরঙ্গি পাড়ার হোটেলে দেখেছেন, তাঁর চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে কি? দেখলেই চেনা যায়?'

টিটো মিনিটখানেক ভাবল, 'বেশ লম্বা চেহারা, হ্যান্ডসাম মনে হয়। চুল উলটে আঁচড়ানো, ফিটফাট সাহেব। চোখে সানগ্লাস ছাড়া দেখিনি। মনে হয় বেশ বড়লোক কেউ হবে।'

'হুঁ।' অশোক গম্ভীর হল, 'মিতার সঙ্গে ঝগড়ার আগে, ওকে আপনি কখনও কিছু প্রেজেন্ট করেছেন? এই যেমন আপনার আংটির হিরের মতো কিছু?'

টিটো মাথা নাড়ল। 'না। অন্য প্রেজেন্ট দিতে চেয়েছি, ও কখনও কিছু নিতে চায়নি।'

'আপনি ওদের বাড়ির মেডসারভেন্ট পূর্ণিমাকে চেনেন?' অশোকের দৃষ্টি অপলক।

'মেডসারভেন্ট পূর্ণিমা? না, আমি মনেই করতে পারছি না। মেডসারভেন্টকে আমি চিনতে যাব কেন?' অবাক চোখে তাকাল।

'এমনি জিগ্যেস করলাম।' অশোক হাসল, 'বেশ, এবার আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটিও মুড়োল।' ও ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে ব্যাক করল, ডাইনে ঘোরাল। 'আপনার অনেক

BanglaBook.org

দেরি হয়ে গেছে। চলে যান। আপনার বাবা সব শুনে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে আমাদের খোঁজখবর করবে, তবে লাভ হবে না কিছু। খালি মনে রাখবেন, দরকার হলেই আপনাকে আমি ঠিক সুবিধেমতো জায়গায় খুঁজে বের করে নেব।' সার্কুলার রোডের মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টার্ট-করা অবস্থাতেই নেমে পড়ল।

ফটিকও নামল। টিটো যেন এখনও আকাশ-থেকে-পড়া ভয়ের চোখে দুদিকে দুজনকে দেখে, বাঁদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। অশোক দাঁড়িয়ে দেখল, টিটো রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্রাফিক পুলিশের কাছে দাঁড়ায় কি না। না। দাঁড়াল না, বাঁয়ে দ্রুত ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আলিপুরের দিকে একটা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে অশোক হাত তুলল। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। ফটিককে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'গঙ্গার ধারে চলুন।' বলে আসনে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে দিল।

'খুব স্ট্রেন গেল।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'তার থেকে বেশি টেনশন। টিটোর ব্যারিস্টার বাপ ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা করবে। তা করুক, তবে নীপা ঠিকই বলেছিল, একটি মাকাল ফল।'

'গঙ্গার ধারে গিয়ে কী করবি?' ফটিক জিগ্যেস করল।

অশোক চোখ বুজে বলল, 'চুপচাপ বসে একটু রোদ পোয়াব।'

অশোককে দেখে মনে হচ্ছিল, গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে শুয়ে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। ফটিক হাতের ঘড়ি দেখল, ডাকল, 'অশোক, সাড়ে তিনটে বাজে।'

'খিদে পেয়েছে?'

'তা একটু পেয়েছে। কিন্তু এখানে এভাবে কতক্ষণ কাটাবি?'

'কত বললি? সাড়ে তিনটে?' অশোক লাফ দিয়ে উঠল, 'চারটের সময় কাঞ্চন বউদি টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইস, একদম ভুলে গেছি। পূর্ণিমা মেয়েটাই কেমন গোলমাল করে দিয়েছে। চল তাড়াতাড়ি। আগে একটা টেলিফোন করি।'

'শালা।' ফটিক উঠে অশোকের সঙ্গে চলতে-চলতে বলল, 'আমার খিদে, পূর্ণিমার চিন্তা, সবকিছুর ওপরে বউদি টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাই বড় তাড়া।'

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। শীতের বিকেলের ভিড় জমতে শুরু করেছে। একটা ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হল না। ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল, 'লালবাজার।'

'এখন লালবাজারে?' ফটিক অবাক চোখে তাকাল।

অশোক বলল, 'ডি. সি. ডি ডি.-র চিঠিটা দিতে হবে। ফরেনসিক রিপোর্ট এসেছে কি না, সেটা জানা দরকার। তা ছাড়া, এখন একমাত্র সেখান থেকেই বাড়িতে টেলিফোন করা যাবে। কিন্তু—।'

ফটিক ভুরু কুঁচকে তাকাল। অশোক আবার অন্যমনস্ক। 'পূর্ণিমাটা কোথায় গেল? আগে যা ভেবেছিলাম, তার মধ্যে একটা যেন খটকা লাগছে। দেখি ফটিক, হিরেটা দেখি।'

ফটিক ট্রাউজারের পকেট থেকে পার্স বের করল। তার ভেতর থেকে বের করল একটি কাগজের মোড়ক। খুলে হিরেটা দেখল। অশোক হাতে নিয়ে হিরেটা দেখল, 'প্রায় টিটোর আঙুলের আংটির হিরের মতোই সাইজ।'

'না, এটা তার থেকে অন্তত এক-দু রতি বড়।' ফটিক বলল, 'কিন্তু এর সঙ্গে পূর্ণিমার কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?'

অশোক ফটিকের হাতে হিরে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। আমি যা ভেবেছিলাম,

BanglaBook.org

তাতে পূর্ণিমার মায়ের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও বোধহয় মথুরাকেও মিথ্যে কথা বলেছে। অবিশ্যি এসবই আমার অনুমান।'

ফটিক তাকিয়ে রইল অশোকের মুখের দিকে। অশোক কোনও কথা বলল না। ফটিকও কিছু জিগ্যেস করল না। ও জানে, অশোক এখন চিন্তার গভীরে ডুবসাঁতার কাটছে। কিছু জিগ্যেস করে লাভ নেই, উচিতও না। ওদের দুজনের মধ্যে এই জানাজানিটা ভালোই আছে।

ট্যাক্সি লালবাজারের সামনে দাঁড়াল। অশোক ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পুবদিকে গেল। ফটিককে নিয়ে দোতলায় উঠে ডি. সি. ডি. ডি.-র ঘরের সামনে সেন্ট্রিকে জিগ্যেস করল, 'সাহেব আছেন?'

'আছেন।'

অশোক পকেট থেকে এস. এস. পি. ডি. ডি. ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সিলকরা খামটা সেন্ট্রির হাতে দিয়ে বলল, 'জরুরি চিঠি, সাহেবকে দিতে হবে।'

সেন্ট্রি চিঠি নিয়ে ভেতরে গেল। অশোক কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। চারটে বাজতে দশ। বলল, 'মিঃ ভট্টাচার্য একলা থাকলেই ভালো। অন্য লোক থাকলে অসুবিধে।'

সেন্ট্রি বেরিয়ে এসে বলল, 'ভেতরে যান।'

অশোক ফটিককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডি. সি. ডি. ডি. জি. এল. ভট্টাচার্য চেয়ারে ছিলেন। সামনের চেয়ারে আরও দুজন। মিঃ ভট্টাচার্য অশোক আর ফটিক দুজনের দিকেই তাকালেন। অর্থাৎ, কেউ কারোর চেনা না। অশোক বলল, 'আমার নাম অশোক ঠাকুর।'

মিঃ ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে অশোকের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। অশোক হাত বাড়িয়ে হাত মেলাল। ফটিককে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অয়স্কান্ত রায়।'

মিঃ ভট্টাচার্য মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন, ফটিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোককে পাশের দুটো চেয়ার দেখিয়ে নিজের হাতের ঘড়ি দেখলেন। সামনের দুজনকে বললেন, 'আপনারা কাল সকালে আসুন। আমি একটু এঁদের সঙ্গে কথা বলব।'

দুজনেই ওঠবার উদ্যোগ করতে অশোক বলল, 'আমি আগে একটা টেলিফোন করতে চাই। আপনি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'এই টেবিলে কথা বলবেন, না অন্য টেলিফোন থেকে?' মিঃ ভট্টাচার্য জিগ্যেস করলেন।

অশোক বলল, 'অন্য টেলিফোন পেলেই সুবিধে হয়।'

মিঃ ভট্টাচার্য বাঁ-পাশের একটি দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ও-ঘরে যান, ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোনই আছে।'

'ধন্যবাদ।' অশোক ফটিকের দিকে একবার তাকিয়ে পাশের ঘরে গেল। ফাঁকা ঘর। চেয়ার-টেবিলের তেমন কোনও জাঁকজমক নেই। ঘরের উত্তর দিকে আর-একটি দরজা রয়েছে। বন্ধ দরজা। অশোক টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনটি নাম্বার ডায়াল করল। ওপারে রিংয়ের শব্দ। লালবাজার বলেই বোধহয় মহিলার স্বর পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি। অশোক নাম্বারটা বলল। সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আর্জেন্ট।'

রিসিভার নামিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসল। মাথায় আবার পূর্ণিমার ভাবনাটা চেপে এল। ওর অনুমান অনুযায়ী যদি পূর্ণিমা পালাত, তাহলে মায়ের কাছে ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা একটু অসুবিধে। দেশের বাড়িতেও যদি গিয়ে থাকে বা থাকত, মাকে না জানিয়ে যেত না। মথুরাকে বলবার সুযোগ হয়তো পাওয়া সম্ভব ছিল না। ভয় জিনিসটা বুদ্ধিকে নষ্ট করে, বিভ্রান্ত করে, সাময়িকভাবে পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণিমা মথুরার সঙ্গে প্রেমশয়নে ছিল, এ কথাটা স্বীকার করার ভয়েই পালাল? তা যদি না হয়, তাহলে মথুরাকেও ও নিশ্চয়ই কোনও কথা চেপে গেছে।

BanglaBook.org

আর তা যদি হয়, এই পালানোর ফল মেয়েটার পক্ষে ভালো-মন্দ দুই-ই হতে পারে। মন্দটা যদি হয় তা—।'

ভাবনা থমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ও কিছু বলবার আগেই ওপার থেকে কাঞ্চনের চেনা স্বর ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'দু-মিনিট এখনও বাকি।' অশোকের চোখ হাতের ঘড়ির দিকে, 'ভাবছিলাম, এখনও দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি না।'

কাঞ্চনের সরোষ স্বর ভেসে এল, 'ন্যাকামি কোরো না, ভালোই জানো, আমি দিবানিদ্রা দিই না।'

'হাতের সামনে অনেক জম্পেশ করা গল্পের বই থাকে।' অশোক হাসল।

কাঞ্চনের বিরক্তিভরা স্বর ভেসে এল, 'ছেড়ে দেব লাইন?'

'প্লিজ।'

'বলো কী করতে হবে।' কাঞ্চনের স্বরে কিছু শোনার প্রত্যাশা।

অশোক বলল, 'খুব ভেঙে কিছু বলা যাবে না। তবে আছি অগাধ জলে, কোনও পথ পাচ্ছিনে। বাগানে, মানে যেখানে—বুঝতে পারছ?'

'পারছি।' কাঞ্চনের জবাব শোনা গেল।

'একটি হিরে পাওয়া গেছে।'

'শুধু হিরে, না হিরের গয়না?'

'শুধু হিরে, খাঁটি।'

'মেয়েদের অলংকারের, না পুরুষদের আংটির?'

'সেটা তো জানিনে, তবে ধরে নিয়েছি, পুরুষের আংটির।'

'বোধহয় ঠিকই ধরেছ।'

'বাড়িতে প্রথমে জেরা রাঁধুনি যুবককে। যুবতী ঝি আছে, বুঝলে তো? কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ পালিয়েছে, জেরার আগেই।'

'এ সাতদিনে তো পালায়নি, তবে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছিনে। কোনও সর্বনাশ বাধিয়ে বসল কি না কে জানে।'

কাঞ্চনের কোনও স্বর শোনা গেল না। অশোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কী হল?'

'ভাবছি, সর্বনাশ যদি হয়, তাহলে এর মধ্যেই ঘটে গেছে কি না।' কাঞ্চনের স্বর শোনা গেল, 'বাড়ির লোকদের কেমন বুঝলে?'

'মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না। থানায় সেই দুটো ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলেছি। এখনও পর্যন্ত তেমন কারওকে পাইনি, কেবল একজনকে খুঁজে নিতে হবে।' ও টিটোর মুখে শোনা মিতার আর-এক সঙ্গী, চৌরঙ্গির হোটেলে যার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল, তার কথা বলল।

কাঞ্চন সব শুনল, তারপরে বলল, 'হিরের মালিককে খুঁজে বের করো। আর আমার তো একটাই কথা, যে চেয়ে পায়নি অথবা যে পেয়েও চায়নি, এদের মধ্যে কেউ। তার মধ্যে একটি কথা, যে পেয়েও চায়নি, তার সংখ্যা একের বেশি হওয়া উচিত না। চেয়ে না পাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি, তাই নয় কি?'

'লক্ষ্মীটি, এ জন্যেই তোমার সঙ্গে কথা না বললে চলে না।' অশোক বলল।

কাঞ্চনের স্বর, 'ন্যাকামো কোরো না। আজ কি বাড়ি ফেরা হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। লালবাজার থেকে টেলিফোন করছি।' অশোক বলল, 'না ফিরলে, চিন্তা কোরো না।'

কাঞ্চনের স্বর, 'চিন্তা করব কি না করব, সেটা তোমার না বললেও চলবে। পূর্ণিমার খোঁজ

BanglaBook.org

করো, আর সেই টোবঙ্গির হোটেলের সঙ্গী স্মার্ট ভদ্রলোকটিকে। জানো না তো, তোমাদের ওই মিতার মতো মেয়েকে নোয়াতে হলে একটু বয়েস আর এক্সপার্ট না হলে সম্ভব নয়। ছাড়লাম।'

কাঞ্চন সত্যি-সত্যি লাইন কেটে দিল। অশোক রিসিভারটার দিকে একবার দেখে, সেটা নামিয়ে রাখল। অর্পিতার 'ওভার পাওয়ার', 'সিডিউস' কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিঃ ভট্টাচার্য সিগারেট টানছেন। অশোক সামনে এসে বসল, 'ফরেনসিক রিপোর্ট কিছু পেলেন?'

'এখনও পাইনি, দু-একদিনের মধ্যে পেয়ে যাব।' মিঃ ভট্টাচার্য জবাব দিলেন, 'কিন্তু এগোনো যাচ্ছে না, এটা বুঝতে পারছি। সাতদিনে অনেককে অনেকবার জেরা করা হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে না কিছুই।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল। 'সেসব শুনেছি। আমি ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যেই এসেছিলাম।'

'সেটা আমাদের ক্রিমিনালের সম্পর্কে ডিটারমিনেশনের সুবিধে করে দেবে নিশ্চয়।' মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'কিন্তু খুনির কোনও জিনিসই পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে, দুর্দান্ত মাস্টারমাইন্ডের কাজ, একেবারে ডুব দিয়ে বসে আছে।'

অশোক হাসল, 'কিন্তু বোধহয় পেশাদার খুনি নয়।'

'জোর করে কিছুই বলা যায় না, মিঃ ঠাকুর।' মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'এ-কথা তো জোর দিয়ে বলতে পারিনে, আমরা সবরকমের পেশাদার ক্রিমিনালদের চিনি।'

অশোক মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'আমি আর-একটা টেলিফোন করতে পারি?'

'একটা কেন, একশোটা করুন না।' মিঃ ভট্টাচার্য হাসলেন, 'পাশের ঘরে যাবেন?'

অশোক বলল, 'না এখান থেকেই করতে পারি।'

মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর টেবিলের একটা টেলিফোন অশোকের দিকে এগিয়ে দিলেন। অশোক রিসিভার তুলে ডায়াল করল। প্রায় আধমিনিট পরে ওপার থেকে জবাব এল, 'হ্যালো?'

'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আছেন?'

'আছেন, ধরুন।' অর্পিতার স্বর চিনতে ভুল হল না, 'কোনও নাম বলতে হবে কি?'

'আমি অশোক ঠাকুর বলছি। শুনুন, আপনার দাদাকে না হলেও হবে, পূর্ণিমার কোনও খবর মিলেছে কি?'

ওপার থেকে অর্পিতার হাসি শোনা গেল, 'আমার গলাটা চিনে ফেলেছেন দেখছি। না, মেয়েটার তো কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ওর মা এসে এখন আমাদের বাড়িতে কান্নাকাটি করছে। দেশের বাড়িতেও লোক পাঠানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে। নরেনবাবুকে আর দরকার নেই।' অশোক বলল, 'মেয়েটার খবরের জন্যেই টেলিফোন করেছিলাম। ওর মা কী বলছে?'

অর্পিতার স্বর শোনা গেল, 'ওর মা-তো কেবল মথুরাকেই বকছে। খুনির মায়ের ধারণা, মথুরাই একমাত্র জানে, ওর মেয়ে কোথায় গেছে।'

'হুঁ, আচ্ছা অর্পিতা দেবী ছাড়ছি।' অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন দেখছি?'

অশোক পূর্ণিমার পরিচয় ও পালানোর ঘটনার কথা জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে প্রথমে তেমন মূল্য দিইনি। এখন ক্রমেই কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি।'

'কীরকম?' মিঃ ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল।

অশোক বলল, 'মেয়েটা বেঁচে আছে কি না, সেটাই ভাবছি।'

'ইউ মিন, অ্যানাদার মার্ডার?' মিঃ ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কখন পালিয়েছে বলুন তো?'

অশোক বলল, 'তা প্রায় এগারোটা নাগাদ।'

BanglaBook.org

মিঃ ভট্টাচার্য হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন চারটে বারো মিনিট। আচ্ছা, আমি একটু খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি আর-একটা টেলিফোনে ডায়াল করে একটা এক্সটেনশন নাম্বার চাইলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, 'অধিকারী বলছ? আমি গৌরদা, একটা খবর চাইছি। সকাল এগারোটা থেকে, এনি নিউজ অফ সাম ডেডলি অ্যাকসিডেন্ট অর ডেলিবারেট মার্ডার অব এ ইয়ং গার্ল?..বয়েস?...এলাকা?... এক সেকেন্ড ধরো।' তিনি অশোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কালো, স্বাস্থ্যবতী, বয়েস কুড়ি-একুশ, অনুমান করা গেছল এন্টালি এলাকা থেকে পার্কসার্কাসে তার মায়ের বাড়ি যাবে।'

মিঃ ভট্টাচার্য টেলিফোনে অশোকের কথাগুলো হুবহু বলে গেলেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ—হুঁ—বুঝেছি। না, শ্যামপুর থানা এলাকাটা বোধহয় আসছে না। কড়েয়া থানা—হ্যাঁ, ডেডবডি কি এখন কড়েয়া থানাতেই আছে? হুঁ, থ্যাংক্যু ভাই, ছাড়ছি।' রিসিভার নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বন্ডেল ব্রিজের কাছে একটি মেয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে। গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে, চেহারার বর্ণনাটা আপনার বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। ডেডবডি এখনও থানায় আছে।'

অশোকের মুখ এই প্রথম পাংশু হয়ে উঠল, হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, 'যদি পূর্ণিমা হয়, তাহলে আমার নিজেকে ক্ষমা করা অসম্ভব। মিঃ ভট্টাচার্য, আমি একটু কড়েয়া থানায় যেতে চাই। আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, ডেডবডিটা যেন না সরায়, আর আমাকে যেন একটু দেখতে দেওয়া হয়।'

'নিশ্চয়ই।' মিঃ ভট্টাচার্য ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, 'এনগেজড।' বলেও বারেবারে করে যেতে লাগলেন, প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পেয়ে গেলেন, বললেন, 'আমি লালবাজার থেকে জি. এল. ভট্টাচার্য বলছি। বন্ডেল ব্রিজের কাছ থেকে একটি...হ্যাঁ, এখনও থানায় আছে তো?...ঠিক আছে, অশোক ঠাকুর নামে এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। এস. এস. পি. ডি. ডি -র একটা চিঠি ওঁর কাছে আছে। আমিও একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।...অ্যাঁ—? এক মিনিট।' অশোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কেবল ডেডবডিটাই দেখবেন তো?'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। ও তখন হাতের নখ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চলেছে। মিঃ ভট্টাচার্য টেলিফোনে বললেন, 'হ্যাঁ, খালি দেখবেন, ফর আইডেন্টিফিকেশন ওনলি। উনি এন্টালি থানার পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের তদন্ত করছেন।...আমার চিঠি লাগবে না? বেশ, তাহলে উনি যাচ্ছেন। থ্যাংক্যু ভাই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'আপনাকে কোনও কাগজপত্র দেখাতে হবে না, আপনার নামটা বললেই হবে। ওরা আপনাকে ডেডবডি দেখতে দেবে, কিছু জানতে চাইলে তাও বলবে।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, 'অনেক ধন্যবাদ, মিঃ ভট্টাচার্য।'

'নো মেনশন প্লিজ।' মিঃ ভট্টাচার্য অশোকের সঙ্গে হাত মেলালেন, 'ইটস অ্যাই ডিউটি। সেরকম কিছু ঘটলে জানতে পারব আশা করি।'

অশোক ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে, 'নিশ্চয়ই।'

ফটিক কোনওরকমে মিঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোকের পিছন-পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে থানার বাইরে চলে এল। ছুটির সময়, একটা ট্যাক্সি পাওয়ার উপায় নেই। বিশেষ করে এই অফিসপাড়ায়। অশোক উচ্চারণ করল, 'মুশকিল।' বলেই আবার থানায় ঢুকে পুব দিকের বিল্ডিং-এ সিঁড়ি ভেঙে মিঃ ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে এল। সেন্ট্রিকে বলল, 'একটা জিনিস ফেলে গেছি।'

'চলে যান, সাহেব একলাই আছেন।' সেন্ট্রি বলল।

অশোক ভেতরে ঢুকল। মিঃ ভট্টাচার্য তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন। অশোককে দেখে টেলিফোনে বললেন, 'এক মিনিট।' তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে, 'কী হল, মিঃ ঠাকুর?'

BanglaBook.org

'আপনার একটা সাহায্য চাই।' অশোক ব্যস্ত স্বরে বলল, 'এখন কোনও ট্যাক্সি পাওয়া সম্ভব নয়। শীতের দিন, অন্ধকার হয়ে আসছে। কড়েয়া থানা যাওয়ার জন্য কি আপনি কোনও ভেহিকেল্‌স-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। উপায় থাকলে বলতাম না।'

মিঃ ভট্টাচার্য কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন, কলিংবেল টিপলেন। সেন্ট্রি ঢুকল। তাকে বললেন, 'প্রতাপকে বলো, টু সিকস ফাইভ ফোর গাড়িতে এ সাহেবকে কড়েয়া থানায় পৌঁছে দিতে।'

'জি।' সেন্ট্রি ফিরল।

অশোক কোনওরকমে মিঃ ভট্টাচার্যকে একবার হাত তুলে দেখিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অশোক ফটিককে নিয়ে যখন কড়েয়া থানায় পৌঁছল, তখন বলতে গেলে রাত্রি। রাস্তায়-থানায় সর্বত্রই আলো জ্বলছে। গাড়ি থানায় ঢুকে পড়ল। অশোক ফটিককে নিয়ে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি চলে যান।'

থানার গেটের পাহারা লালবাজারের গাড়ি দেখে কোনওরকম বাধা দিল না। অশোক থানার বাঁদিকের ঘরে ঢুকে দেখল, একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চারপাশে আরও কয়েকজন বসে রয়েছে। অন্য পাশে একদল বিভিন্ন পোশাকের লোক দাঁড়িয়ে। তাদের কাছে একজন রাইফেলধারী সেপাই। অশোককে দেখে ইন্সপেক্টর চোখ তুলে তাকালেন। অশোক নিজের নাম বলল।

ইন্সপেক্টর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি।' চিৎকার করে ডাকলেন, 'পরশুরাম।'

বাইরে থেকে জবাব এল, 'হাঁ জি।'

'একবার এদিকে এসো।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শক্তসমর্থ চেহারার একজন লম্বা-চওড়া পুরুষ ঢুকল। ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ ভদ্রলোককে বন্ডেল ব্রিজের সেই মেয়েটার মুর্দাটা একবার দেখিয়ে দাও তো।' অশোককে বললেন, 'দেখে এসে, কোনও কথা থাকলে আমাকে বলবেন।'

'আচ্ছা।' অশোক পরশুরাম নামের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জোয়ানের দিকে ফিরে তাকাল।

পরশুরাম বাংলায় বলল, 'আসুন।'

সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে বারান্দার উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ডাকল, 'হরিয়া, এ হরিয়া।'

'হাঁ।' উত্তর দিক থেকেই জবাব এল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে আলো জ্বলছিল। একটি দলাপাকানো বড় রক্তাক্ত পুঁটুলি ছাড়া আর একটি শায়িত মূর্তি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে একটা সামান্য জামা, একটি লোক বারান্দার নীচে থেকে উঠে এল। পরশুরাম হুকুম দিল, 'ওই মুর্দাটার মুখের ঢাকাটা খোল।'

অশোকের বুক ঢিপঢিপ করছিল। হরিয়া মুখের ঢাকনা খুলল। পূর্ণিমা! দেখা মাত্র বাঁ হাতের পুরোটাই প্রায় ওর মুখের মধ্যে ঢুকে গেল, আবার তৎক্ষণাৎ বের করে নিল। আরও কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গলায় নাইলনের সরু দড়ির ফাঁস। মুখটা হাঁ-করা, জিভটা ভেতরে দলা পাকিয়ে রয়েছে। ভেতরে রক্তও জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুটো আধবোজা। গলায় রুপোর হার চিকচিক করছে। ও হরিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আর একটু খোলো তো ভাই।'

হরিয়া পূর্ণিমার কোমর অবধি ঢাকনা খুলে দিল। অশোক আরও ঝুঁকে পড়ল। জামাটা ঘাড়ের কাছে ছিঁড়ে গেছে। বুকের বোতামও দুটো খোলা। ভেতরে কোনও অন্তর্বাস নেই। বাঁ-হাতে কয়েক গাছা পিতলের চুড়ি। নাকছাবিটার কাছে রক্ত জমে আছে। ওপরের ঠোঁট থ্যাঁতলানো। ঘুষি মারা হয়েছিল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দুর্ভাগা মেয়ে, যমের ডাক এড়াতে পারেনি।'

BanglaBook.org

'আপনার নিজের লোক আছে?' পরশুরাম জিগ্যেস করল।

অশোক এখন যেন শান্ত আর নিরেট, 'নিজের লোক নয়, চেনা। কখন পাওয়া গেল?'

'তিন বাজে এখানে আনা হয়েছে।' পরশুরাম জবাব দিল।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, আমার দেখা হয়ে গেছে।'

হরিয়া পূর্ণিমাকে মাথা অবধি আবার ঢাকা দিয়ে দিল। অশোক ফটিককে নিয়ে অফিসে ঢুকল। ইন্সপেক্টর চোখ তুললেন, 'চিনতে পারলেন?'

'পারলাম।' অশোক বলল, 'এন্টালির পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারের সঙ্গে এর বোধহয় যোগ আছে। কখন পেলেন?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'বেলা একটা নাগাদ আমাদের এক ইনফর্মার এসে খবর দেয়। এই যে সব দেখছেন, এদের ওই এলাকা থেকেই ধরে নিয়ে এসেছি। কিছু জানা যায় কি না।' বলে ঘরের পাশে সেই একদল লোককে দেখালেন, 'মেয়েটাকে চিনতে পারলেন?'

'হ্যাঁ, পারমিতাদের বাড়িরই মেডসারভেন্ট। এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আপনাকে আর ব্যস্ত করব না, আমার কাজ মিটে গেছে। চলি।' কপালে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

ইন্সপেক্টর হাসলেন, 'ব্যস, মিটে গেল? আর কোনও দরকার নেই?'

অশোক একবার ভাবল, লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু না বলে হাসল, 'না অনেক ধন্যবাদ। চলি।'

ইন্সপেক্টরের হাতজোড়া কপালে উঠল, 'নমস্কার।'

অশোক ফটিককে নিয়ে থানার বাইরে এসে তারক দত্ত রোড ধরল। বলল, 'একমাত্র পূর্ণিমাই খুনিকে চিনত।'

'দেখে মনে হল, মিতা আর পূর্ণিমাকে একভাবেই মারা হয়েছে।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'ঠিক। কিন্তু দিনের বেলা, কী করে কোথায় খুনির সঙ্গে ওর যোগাযোগ হল, বুঝতে পারছিনে।' বেকবাগানের মোড়ে এসে একটা খালি ট্যাক্সির দরজা খুলল, 'যাবেন ভাই?'

'কোথায় যাবেন?'

'সি আই টি—সুরেশ সরকার রোড।' অশোক বলল।

ড্রাইভার বলল, 'বসুন।'

অশোক ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসল। ড্রাইভার মিটার নামিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। ফটিক জিগ্যেস করল, 'আবার নরেনবাবুর বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। হিরেটা সাবধানে রাখ।' অশোক বলল, হাতের ঘড়ি দেখল, 'ছটা বাজতে দশ।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'হিরেটা তো সাবধানেই রেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে পূর্ণিমার—?'

'পূর্ণিমার ওপরেই খুনি হিরেটা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিল।' অশোক বলল, 'কথাটা অনেক পরে আমার মনে স্ট্রাইক করে। প্রেমঘটিত ব্যাপারে, কনফেশনের ভয়ে ও পালায়নি। তাহলে আগেই পালাত। ওর ধারণা ছিল, হিরেটার খবর আমরা জানি। তুই জানতিস, তখনও আমি জানতাম না। ফলে, পূর্ণিমাকে আমি হিরেটার কথা জিগ্যেসও করতাম না। বেচারি, মরণ ওকে ডেকেছিল।'

ফটিক জিগ্যেস করল, 'কিন্তু এখন আবার নরেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছিস কেন?'

'নিশির ডাকে যাচ্ছি।' অশোক হাসল, একটা সিগারেট ধরাল।

ট্যাক্সি ক্রিস্টোফারের পথ পেরিয়ে আরও খানিকটা এগোল। অশোক বলল, 'বাঁয়ের রাস্তায় চলুন ভাই।'

ট্যাক্সি বাঁয়ে ঢুকে দু-একটা মোড় নিয়ে নরেনবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই, অশোক ট্যাক্সি থামাল। ভাড়া মিটিয়ে নামল। গেটের সামনে কোনও আলো নেই। নীচের ও ওপরের বাইরের

বারান্দায় আলো জ্বলছে। অশোক ফটিককে নিয়ে বন্ধ গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। নরেনবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি অশোক ঠাকুর।' অশোক ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখল, নরেনবাবুর বড় ছেলে নবীন।

নবীন ব্যস্তভাবে বলল, 'এক মিনিট, যাচ্ছি।'

অশোক ফটিককে নিয়ে বারান্দার ওপর উঠতেই নবীন নেমে এল। লুঙ্গির ওপরে চাদর জড়ানো। অফিসফেরত বাড়ির পোশাক। প্রথমেই বলল, 'আমাকে বোধহয় আপনার দরকার?'

'কেন আপনাকে ওবেলা জেরা করা হয়নি বলে?' অশোক হাসল, মাথা নাড়ল, 'না, আপনার বাবাকে দরকার। তিনি বোধহয় চেম্বারে আছেন?'

নবীন বলল, 'হ্যাঁ, ক'দিন ধরে কোর্টে যাচ্ছেন না, মক্কেলরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

'স্বাভাবিক।' অশোক বলল, 'ওঁকে একটু খবর দিন, আমি একটু কথা বলব।'

নবীন বলল, 'আপনারা আসুন, বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

অশোক ফটিক বাইরের ঘরে বসল। পিছনের দরজাটা বন্ধ। ভেতরে এখন রান্নাঘরে নীপা তার শাশুড়ির সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে। নবীন দরজা ঠেলে পাশের চেম্বারে ঢুকল। এক মিনিট না যেতেই নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। পরনে সেই ধুতি, গায়ে পশমের চাদর। ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'কী খবর, অশোকবাবু?'

'পূর্ণিমা মারা গেছে।' অশোক উঠে দাঁড়াল।

নরেন্দ্রনাথ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মারা গেছে।'

'মারা গেছে মানে খুন হয়েছে।' অশোক বলল, 'কড়েয়া থানায় ওর ডেডবডিটা দেখে এলাম। মনে হল, মিতা আর ওর খুনের ধরনটা প্রায় একইরকম। বন্ডেল ব্রিজের কাছে ওর ডেডবডিটা বেলা বারোটা নাগাদ থেকে পড়েছিল। যাই হোক, আপনার সঙ্গে একটু আলাদা দরকার আছে।'

নরেন্দ্রনাথ এবং নবীনের মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে। পিতা-পুত্রের মধ্যে একবার দৃষ্টিবিনিময় হল। নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। পুনিটা খুন হয়েছে।'

'ওটা নিয়ে এখন আর ভাববেন না।' অশোক বলল, 'আমরা কেউ কারও নিয়তিকে ঠেকাতে পারিনে। এখন আপনার সঙ্গে একলা একটা কথা আছে, সেখানে কেউ থাকলে চলবে না। এ-ঘরে এ-কথা হবে না।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাহলে ওপরে আমার ঘরেই চলুন। চেম্বারে মক্কেলরা রয়েছে।'

'তাই চলুন। তবে, আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।' অশোক বলল।

নরেন্দ্রনাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। অশোক আর ফটিক উঠতে-উঠতে দেখল, অর্পিতা সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চোখে ভ্রূকুটি, বিস্ময়। অশোক তাকিয়ে হাসল, 'আবার একবার আসতে হল, তবে আপনাদের কারওকে জ্বালাতন করব না।'

'আমাদের আর জ্বালাতন কীসের?' অর্পিতা বলল, 'ভাবছি, আজ ফিরে এলে আমরা সুখচরেই ফিরে যাব। আর ভালো লাগছে না।'

অশোক হাসল, কোনও জবাব দিল না। নরেন্দ্রনাথের ঘরে ফটিককে নিয়ে ঢুকল। অশোক গোটা ঘরটা দেখে দরজা বন্ধ করল। নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কেউ হিরের আংটি পরে?'

'না তো?' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হিরের আংটি তো কারও হাতে নেই?'

অশোক বলল, 'ওটা বের কর।'

ফটিক পকেট থেকে পার্স বের করে তার ভেতর থেকে হিরে জড়ানো মোড়কটা খুলে ধরল।

অশোক বলল, 'দেখুন তো নরেনবাবু, মনে হচ্ছে, এটা আংটির হিরে, মেয়েদের কোনও

BanglaBook.org

অর্নামেন্টের নয়। এরকম হিরের আংটি পরা কারওকে এ-বাড়িতে বা আপনাদের চেনাশোনা কারওকে দেখেছেন?'

নরেন্দ্রনাথ হিরেটার দিকে দেখলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ল। প্রায় এক মিনিট পরে বললেন, 'কোথায় পেলেন এটা?'

'সেটা পরের কথা।' অশোক বলল, 'আপনি না বলতে পারলে বাড়ির মহিলাদের জিগ্যেস করতে হবে, মিতার কোনও বন্ধুর আঙুলে এরকম হিরের আংটি কেউ দেখেছেন কি না।'

নরেন্দ্রনাথের স্বরে বিহ্বলতা, 'এরকম হিরের আংটি তো একমাত্র বিক্রমের হাতেই আছে।'

'বিক্রমবাবু?' অশোক ফটিকের দিকে তাকাল, 'আজও ছিল?'

নরেন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল, আমি আজ ওবেলাও দেখেছি।'

'হুঁ।' অশোক আবার ফটিকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে, চোখের ইশারা করল, 'তাহলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই। তা ছাড়া খুনের দিন তো তিনি সেই সময়ে সুখচরে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, মামলা চলছে। আপনি তো সবই শুনেছেন।'

'শুনেছি।' অশোক বলল, 'এখন একটা কথা আশা করি রাখবেন। এই হিরের ব্যাপারটা আপনি ছাড়া বাড়ির কেউ জানবে না। কথাটা থাকবে কি?'

নরেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

'না-থাকাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক হবে।' অশোক গম্ভীর স্বরে বলল।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি। আপনার কোনও কথাই তো আমি ফেলিনি। কিন্তু—।'

'এখন আর কিন্তু নয়, নরেনবাবু।' অশোক বলল, 'আমরা যাচ্ছি, সময়মতো দেখা হবে। আমি জানি, বাড়ির সবাই আপনার কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্যে ওত পেতে আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এ বিষয়ে কোনও কথা নয়। তবে হ্যাঁ, পূর্ণিমার খুনের কথাটা বলতে পারেন। অবিশ্যি নবীনবাবু এতক্ষণে বলেও ফেলেছেন। আর নয়। আজ চলি।' ও দরজা খোলবার আগে ফটিকের দিকে তাকাল।

ফটিকের হাতের পার্স পকেটে। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'চল।'

অশোক দরজা খুলল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুজনেই বেরিয়ে এল। আর একবার বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

রাস্তায় এসে ফটিক বলল, 'কিন্তু আমি তো বিক্রমবাবুর হাতে—।'

'পান্নার আংটি দেখেছিলি ওবেলা।' অশোক বলল।

ফটিক বলল, 'হ্যাঁ। অথচ—অথচ সুখচরে—।'

'ওসব ভাবনা একদম আর নয়।' অশোক বলল, 'পেটে ইঁদুর ডন মারছে। বাড়ি আজ আর ফেরা হবে না। এখন একটা হোটেলে গিয়ে ঘর বুক করা, পেট ঠেসে খাওয়া আর ঘুমোনো। যা করার, কাল সকালে।'

BanglaBook.org

সকাল সাড়ে ন'টা।

মধ্য কলকাতার এক হোটেলের ঘর থেকে ফটিক আর অশোক বেরোল। ওদের স্নান আর ভারী ওজনের জলখাবার খাওয়া শেষ। বিল মেটানোও হয়ে গেছে। দুজনেই বাইরে এল। ছোট রাস্তা থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির ওপর এসে পড়ল। মোড়েই কয়েকটা খালি ট্যাক্সি। অশোক আঙুল

তুলে একজন ড্রাইভারকে ইশারা করল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়ে মিটার ডাউন করল। অশোক বলল, কলকাতার বাইরে যেতে হবে ভাই।'

'কোথায়?' ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

'খড়দহ থানায়।'

'ঠিক আছে। ব্যারাকপুর পর্যন্ত অসুবিধে নেই।' ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল।

শীতের সকালে এখনও রাস্তায় তেমন জ্যাম নেই। কিন্তু কিছুটা জ্যাম রয়েছে বিশেষ করে শ্যামবাজার থেকে ডানলপ ব্রিজ পর্যন্ত। পৌনে একঘণ্টা লাগল খড়দহ থানায় পৌঁছতে। তার আগেই অশোক এস. পি. চব্বিশ পরগনা, মিঃ মিত্রকে এস. এস. পি. ডি. ডি.-র খবর জানিয়ে রাখতে বলেছিল। মিঃ মিত্র এস. এস. পি. ডি. ডি.-র চিঠিটা থানায় দেখাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

অশোক ফটিককে নিয়ে, বি টি রোডের ধারে খড়দহ থানায় ঢুকল। ও. সি.-র সঙ্গে দেখা করে মিঃ মিত্রের কথা বলল, আর এস. এস. পি. ডি. ডি.-র চিঠি দেখাল। ও. সি. বললেন, 'আমার ঘরে বসবেন চলুন, কী ব্যাপার শুনি।'

ও. সি.-র নিজস্ব ঘরে কেউ ছিল না। অশোক বিক্রমের কেসটার কথা বলে জিগ্যেস করল, 'উনি সেদিন থানায় ক'টার সময়ে এসেছিলেন?'

ও. সি. বেল টিপে একজন পাহারাকে ডাকলেন, বললেন, 'হরেনবাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

পাহারা অদৃশ্য হল। ও. সি. বললেন, 'যতদূর মনে পড়ছে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা।

'ঠাকুরদাস মণ্ডল ক'টায় থানায় এসেছিল মনে করতে পারেন?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি.-র জবাবের আগেই এস. আই. হরেনবাবু ঢুকলেন। ও. সি. এস. আই.-এর কাছে অশোকের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। হরেনবাবু বললেন, 'ছ'টায়।'

'তদন্তের রিপোর্ট কী? মণ্ডল পরিবারের সঙ্গে জমি নিয়ে পুরোনো ঝগড়া?' অশোক জিগ্যেস করল।

ও. সি. বললেন, 'পুরোনো ঝগড়া ছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না, তবে ঘটনাটা ঘটেছিল। ট্রেসপাসের কথা বিক্রমবাবু অস্বীকার করেননি। কিন্তু ক্রিমিনাল ট্রেসপাস কি না, সেটা কোর্টের বিচার্য। আর মেয়েদের অ্যাসল্ট করার কেসটা টিকবে বলে মনে হয় না। কেন, বলুন তো?'

'বিক্রমবাবু সেদিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন, সেটা জানা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সিক্রেট, স্যার।' অশোক হাসল।

ও. সি.-ও হাসল, 'সিক্রেট না হলে আর আপনি এভাবে ছুটে এসেছেন? মিঃ মিত্রই বা টেলিফোন করবেন কেন?'

'তাহলে এখানে বিক্রমবাবু সাতটা নাগাদ এসেছিলেন?' অশোক হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল।

হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু সিক্রেট ব্যাপারটা কী? ঘটনা তো সত্যি ঘটেছে, কোর্টে কেস প্রডিউসও হয়েছে, বিক্রমবাবু উকিল দিয়ে জামিন নিয়েছেন, কেসের ডেট পড়েছে।'

'হরেনবাবু, তবু ঘটনাটা যেন সিক্রেটই থাকে।' অশোক উঠে দাঁড়াল।

ও. সি. বলল, 'আপনি ভাববেন না, এস. পি. সাহেব যেখানে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে কোনও কথাই থাকতে পারে না।' তিনিও উঠে অশোকের সঙ্গে থানার বাইরে এলেন।

থানার পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই ছিল। অশোক ও. সি.-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফটিককে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে উঠল, 'চলুন, আবার কলকাতায় ফেরা যাক।'

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল। রাস্তায় এখন বেশ ভিড়। অশোক ড্রাইভারকে বলল, 'আপনার গাড়ি তো দেখছি নতুন।'

BanglaBook.org

'ছ'মাস আগে কারখানা থেকে বেরিয়েছে।' ড্রাইভার জবাব দিল।

অশোক সিগারেটের প্যাকেট বের করে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ল, 'নিন, সিগারেট খান একটা।'

'না-না, থাক না।' ড্রাইভার লজ্জিত হয়ে বলল।

'আরে নিন না।' অশোক একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল।

ড্রাইভার নিল। অশোক সিগারেটটা নিজেই দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিয়ে, নিজে একটা ধরাল, 'আচ্ছা, এখান থেকে কত তাড়াতাড়ি এন্টালি থানায় যেতে পারেন?'

ড্রাইভার বলল, 'জ্যামের সময়, তবু রিসক নিলে কতক্ষণ আর, যতক্ষণে এসেছি, প্রায় সেই টাইমেই পৌঁছে যেতে পারি।'

'তার মানে, বারোটা নাগাদ পৌঁছতে পারেন?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'তাহলে করুন। আপনার পাওনা দেড়া করে দেব।'

ড্রাইভার হেসে একবার পিছন ফিরে দেখল। গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বলল, 'আপনারা পুলিশের লোক, না?'

'আর বলেন কেন?' অশোক হাসল, 'বুঝতেই পারছেন।'

'তা আর পারছিনে?' ড্রাইভার বলল, 'আপনারা স্যার আই. বি.-র লোক।'

'ঠিক বলেছেন।'

গাড়ির স্পিড আরও বাড়ল। ডানলপ ব্রিজের মোড় থেকে জ্যাম। কিন্তু ড্রাইভার খেলা দেখাতে লাগল। বিপজ্জনকভাবেই, ডাইনে-বাঁয়ে, ওভারটেক করে ছুটল। কনভেন্ট রোডে থানায় এসে পৌঁছল যখন, তখন বারোটা বাজতে দশ। অশোক পার্স খুলে মিটার দেখতে-দেখতে বলল, 'সাবাস ভাই। এই নিন।' একশো টাকার নোট দিল।

'ভাঙানি নেই, স্যার।' ড্রাইভার বলল।

অশোক দরজা খুলে নামতে-নামতে বলল, 'দরকার নেই, ওটা পুরোই আপনার।'

ড্রাইভার দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। অশোক কপালে হাত ঠেকিয়ে ফটিককে ইশারা করে থানায় ঢুকল। সোজা গেল ও. সি.-র ঘরে। তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। অশোক হেসে বলল, 'একটু জ্বালাতন করব, স্যার।'

ও. সি. ঠিক প্রসন্ন হাসলেন না। বললেন, 'বসুন।' সামনের ব্যক্তিদের বললেন, 'একঘণ্টা পরে আসুন।'

ভদ্রলোক তিনজন বেরিয়ে গেলে অশোক বলল, 'টিটো গাঙ্গুলির কোনও খবর আছে নাকি?'

'না তো? কেন?' ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

অশোক গতকালের ঘটনাটা উল্লেখ করল না। বুঝল, টিটো বোধহয় ওর বাবার কাছেও ঘটনাটা চেপে গেছে।

বলল, 'ওকে একবার টেলিফোন করে এখানে ডাকুন, জরুরি দরকার।'

'আসবে কি? ব্যারিস্টারের ছেলে।' তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন, 'হ্যালো, এন্টালি থানার ও. সি. বলছি। টিটোবাবু—ওহ্, আপনি? একবার সামান্য সময়ের জন্যে আসতে পারবেন?...অ্যাঁ?' ও. সি. বেশ কয়েক মিনিট কান পেতে কথা শুনতে-শুনতে অশোক আর ফটিকের দিকে দেখতে লাগলেন, আর 'হুঁ-হুঁ' দিয়ে যেতে লাগলেন। তারপরে বললেন, 'না-না, ওসব ব্যাপার এখানে কিছু নেই। আপনি কয়েক মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে যান।...ওয়েল, থ্যাংক্যু।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অশোকের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

BanglaBook.org

অশোক হাসল, 'গতকাল ওকে আমরা একরকম জোর করেই ভিকটোরিয়াতে ধরে নিয়ে গেছলাম। জোর না করলে নিয়ে যাওয়া যেত না। সে কথাই বলল বুঝি?'

'হ্যাঁ, আর আপনাদের নামে পুলিশে ডায়েরিও করেছে।'

'সেটা কাছে এলে ম্যানেজ করে নেব। সুকুমার আর দীপককে কী করলেন?'

'কোর্টে পাঠিয়েছি।'

'তাহলে আপনি কাজ করুন, আমরা বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'এখানেই বসুন, টিটো গাঙ্গুলি আপনাদের বাইরে দেখলে, সেখান থেকেই কেটে পড়বে। আমি বরং একবার বাইরে ঘুরে আসি। চা-টা দরকার হলে, পাহারাকে ডেকে বলবেন।' ও. সি. উঠে বেরিয়ে গেলেন।

আধ ঘণ্টা পরে ও সি.-র ঘরে টিটো ঢুকল। ঢুকেই অশোক আর ফটিককে দেখে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। অশোক দাঁড়িয়ে ডাকল, 'টিটোবাবু, প্লিজ। একটা কথা শুনুন ভাই।'

অশোকের ব্যগ্র অনুরোধে কাজ হল। টিটো ফিরে দাঁড়াল, 'আবার কী চান?'

'বসুন। আপনার সাহায্য ছাড়া মিতার খুনিকে ধরতে পারছি না।' অশোক বলল, 'কাইন্ডলি বসুন।'

টিটোর চোখে সন্দেহ, সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে বসল। অশোক জিগ্যেস করল, 'আপনি মিতার ভগ্নীপতিকে দেখেছেন কখনও?'

'না।' টিটো বলল।

অশোক ঝটিতি ফটিকের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে কিছু লিখল। সেটা টিটোর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি এ-ঠিকানায় যান। যা-যা লেখা আছে, তা দেখবেন এবং বলবেন। আপনার জন্যে আমরা নীচে দাঁড়িয়ে থাকব।'

টিটো কাগজটা পড়ল। বলল, 'তা পারব। কিন্তু আপনারা কারা? এখানে থানায় বসে আছেন?'

'আমরা মিতার খুনের তদন্ত করছি।' অশোক হাসল, 'আপনি আমাদের সম্পর্কে থানায় ডায়েরি করেছেন। আমরাই আপনার থানায় গিয়ে নিজেদের সাবমিট করব। এখন চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আপনার গাড়ি আছে সঙ্গে?'

টিটোকে অনেকটা নির্ভয় আর সহজ দেখাল, বলল, 'আছে।'

'তাহলে আপনার গাড়িতেই আমরা যেতে পারি তো?'

'কেন পারবেন না? আসুন।'

তিনজনেই উঠল। বেরোবার সময় অশোক পাহারাকে বলল, 'বড় সাহেবকে বলবে, যে-সাহেবের আসার কথা ছিল, তিনি এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে গেছি। পরে আবার আসব।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।' বাঙালি পাহারা বলল।

তিনজনেই বাইরে এল। এবার চালকের আসনে টিটো। সামনের আসনেই অশোক আর ফটিক বসল। টিটো গাড়ি স্টার্ট করল, 'আপনারা মশাই জাল আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছিলেন, রাতে ঘুমোতে পারিনি।'

'আপনার বাবাকে বলেননি?'

'বলেছি বইকি। বাবা তো ব্যাপারটা এখন চেপে যেতে বললেন। খালি থানায় একটা ডায়েরি করতে বললেন, তাই করেছি।'

BanglaBook.org

'দরকার হলে আমরা আপনার বাবার কাছেও যাব, ক্ষমা চাইব।'

'কিন্তু মশাই, আপনারা তো যে-কোনওরকম কাজ করতে পারেন। আমার হাতের গাড়ি ছিনিয়ে আমাকেই সেই গাড়িতেই ঢুকিয়ে...।'

অশোক হেসে উঠল। টিটোও হাসল। ডালহৌসি পার্ক দিয়ে জি. পি. ও. থেকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ি পার্ক করল। গাড়ির চাবি নিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'আর ফল্‌স দেবেন না যেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' অশোক একটা সিগারেট ধরাল।

ফটিককে বলল, 'টিটোকে নিশ্চয়ই লোকটা চেনে না।'

'মনে হয় না।' অশোক বলল, 'চান্স তো নিলাম, দেখা যাক। ছেলেটা এমনিতে ভালো। বড়লোক বাপের এক ছেলে হলে যা হয়, তাই হয়েছে। চেহারাটাও সুন্দর, মেয়েরাও হিড়িক দেয়।'

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে টিটো ফিরে এল। মুখ লাল, গম্ভীর। গাড়িতে ঢুকে বসে বলল, 'একটা আস্ত ছোটলোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

'কেন? তাড়িয়ে দিল নাকি?' অশোক জিগ্যেস করল।

টিটো বলল, 'যেই বলেছি, আমি ফরেন ইমপোর্ট সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি, আমাকে প্রথমেই বলল, কোনও অচেনা ফেকলু মালের সঙ্গে আমরা কথা বলি না। তবে হ্যাঁ, এই সেই লোক।

অশোক টিটোর একটা হাত জড়িয়ে সোল্লাসে বলল, 'শিয়োর?'

'হাড্রেড পার্সেন্ট।' টিটো বলল, 'আর আঙুলে হিরের আংটিই রয়েছে।'

অশোক টিটোর হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুলনাহীন। আর কী বলল?'

'বলবে আবার কী, বাঘের মতো আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।' টিটো বলল, 'জিগ্যেস পর্যন্ত করল না, আমার কোনও ইমপোর্ট ফার্ম আছে কি না। অথচ লোকটা বাইরে থেকে দেখতে মোটেই সেরকম নয়।'

অশোক বলল, 'বোধহয় লোকটার মেজাজটা ভালো নেই। চলুন, আজ আপনাকে আমিই লাঞ্চ খাওয়াব।'

'অ্যাবসার্ড!' টিটো বলে উঠল, 'আমার জন্যে একজন এক জায়গায় অপেক্ষা করছে, সেখানে যেতে হবে। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে। কাল আপনারা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন।'

অশোক হেসে উঠে টিটোর দু-হাত ধরে বলল, 'ক্ষমা করবেন, টিটোবাবু। তবে আপনার আজকের পারফরমেন্সের কোনও তুলনা নেই।'

'কিন্তু কারণটা কিছুই বললেন না।' টিটো বলল, 'আপনি যা করতে বললেন, আমি তাই করলাম মাত্র।'

অশোক বলল, 'পরে সব জানতে পারবেন। তাহলে আপনি চলে যান।'

'বলেন তো আপনাদের এসপ্ল্যানেড অবধি এগিয়ে দিতে পারি।' টিটো বলল।

অশোক এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'তার বদলে আর একটা সাহায্য যদি করতে পারেন বেঁচে যাই। একটা বিশেষ জিনিস, যা আমার হাতের কাছে নেই, আপনি বোধহয় সহজেই জোগাড় করে দিতে পারেন। অবিশ্যি এখন যদি অশোক ঠাকুরকে আপনার বিশ্বাস হয়।'

টিটো জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী বলুন তো?'

'একটা টেপরেকর্ডার, আর একটা আনকোরা টেপ।' অশোক বলল।

টিটো ঠোঁট টিপে ভাবতে আরম্ভ করল। অশোক আবার বলল, 'তবে ঢাউস সাইজ হলে চলবে না, যত ছোট সম্ভব।'

'পারি।' টিটো বলল, 'আপনাদের তাহলে আমার সঙ্গে একবার থিয়েটার রোডে যেতে হবে।'

BanglaBook.org

অশোক বলল, 'যেখানে যেতে বলবেন যাব, জিনিসটা পেলেই হল। কাজ হয়ে গেলে যেখানে ফেরত দিতে বলবেন, সেখানেই ফেরত দিয়ে দেব।'

'এন্টালি থানায় জমা করে দেবেন।' টিটো গাড়ি স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিল, 'বলে দেবেন, আমাকে যেন টেলিফোনে ডেকে ওটা ফেরত দিয়ে দেয়।'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই।'

টিটোর গাড়ি চলল রাইটার্স-এর পাশ দিয়ে। ঘুরে ময়দানের রাস্তা। পথে যেতে-যেতে শুধু একবারই বলল, 'আচ্ছা, অশোকবাবু, আপনি কী করে জানলেন, মিতার সঙ্গে আমি ওই লোকটাকেই দেখেছি?'

'জানতাম না।' অশোক হাসল, 'আপনাকে দিয়ে একবার কনফার্ম করে নিলাম।'

গাড়ি থিয়েটার রোডে ঢুকল। দাঁড়াল একটি বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে। টিটো নেমে যেতে-যেতে বলল, 'দু-মিনিটেই আসছি।'

ফটিক এতক্ষণে মুখ খুলল, 'গতকাল জেরার সময় লোকটার হাতে তো পান্নার আংটি ছিল।'

'ওটা ম্যাজিক।' অশোক হেসে বলল, 'লোকটা গতকাল আমাদের ম্যাজিক দেখিয়েছে। কিন্তু সব ব্যাপারটা এখনও কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী করে এমনটা হয়?'

ফটিক অশোকের ভ্রূকুটি-চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকাল, 'কোনটা কেমন করে হয়?'

অশোক জবাব দেওয়ার আগেই টিটো এগিয়ে এল। হাতে বেল্ট ঝোলানো ছোট একটা টেপরেকর্ডার, 'কলকাতায় এর থেকে ছোট টেপরেকর্ডার এসে পৌঁছয়নি, এফেক্ট মারাত্মক, ১৯/২০ গজ দূরের কথাও স্পষ্ট উঠে যাবে। পাওয়ারফুল ব্যাটারি সেট। ইলেকট্রিকেও চলে। স্টিরিয়ো আছে। নতুন টেপ ভরা আছে। একটু দেখিয়ে দিই।' সে গাড়ির ভেতর উঠে বসে, স্টার্ট বন্ধ করা সাউন্ড বাড়ানো, কমানো, সব বুঝিয়ে দিল। বলল, 'জাপানি মাল। ওরা ছাড়া এসব আর কেউ করতে পারে না।'

অশোক টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে আর একবার টিটোর হাত চেপে ধরল, 'এবার আপনাকে বলি। মিতার খুনিকে যদি ধরতে পারি, তাতে আপনার অবদান থাকবে অনেকখানি।'

'মিতার জন্যে আমার কিছু যায় আসে না।' টিটো বলল, 'ও আমাকে ভারি অপমান করেছিল।'

অশোক টিটোর ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, 'ওসব ভুলে যান টিটোবাবু, একটি মৃত আত্মার সদগতি কামনা করুন।'

'তা অবিশ্যি ঠিক।' টিটো গাড়ি স্টার্ট করে বলল, 'আপনাদের কোথায় নামাব?'

অশোক বলল, 'আমাদের এখানেও নামাতে পারেন। তবে এসপ্লানেডে নামলেই ভালো হয়।'

'চলুন, আমাকেও ওই এলাকাতেই যেতে হবে।' টিটো গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

অশোক পার্ক স্ট্রিটে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ফটিককে নিয়ে খেতে বসেছে। মুখে কোনও কথা নেই। ফটিকের মুখে অস্বস্তি। না জিগ্যেস করে পারল না, 'এত ভাবছিস কী?'

'তোর কাছে বিক্রমবাবুর পানিহাটির উকিলের নামটা লেখা আছে তো?' অশোক মুখে খাবার পুরল।

ফটিক বলল, 'আছে বইকি।'

অশোক ঘাড় ঝাঁকাল। কথা না বলে খেতে লাগল। একটু পরে আবার বলল, 'এখন আবার আলিপুর পুলিশ কোর্টে যাব, না দুটো স্টপেজ গ্যালপ করব, ভাবছি।'

'গ্যালপ?' ফটিকের মুখে খাবার-ভরা, কথাটা শোনাল বিকৃত।

BanglaBook.org

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গ্যালপ। সুখচরেই যাব। আলিপুরে উকিলের কাছে একবার গেলে মন্দ হত না। কিন্তু মনে হচ্ছে দরকার হবে না। সোমক বসুকে এখন হাতে রাখলাম, তার কাছেও যাব না। তার মানে দুটো স্টপেজ গ্যালপ করে স্ট্রেট সুখচরেই যাব।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখনই গিয়ে তোড়জোড় করা যাক।' অশোক কাঁটাচামচেয় চাইনিজ চপসোয়ের দলা মুখে পুরে দিল।

ফটিক খেতে-খেতে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক খাবার গিলে বলল, 'ব্যাপারটা রিসকি, কিন্তু উপায় নেই।'

'রিসকি?' ফটিক জিগ্যেস কবল।

অশোক বলল, 'মনে তো হয তাই।'

'টেপরেকর্ডারটা নিলি কেন?'

'স্রেফ একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কাজে লাগবেই, এমন কোনও কথা নেই।' অশোক হাত তুলে চীনা স্টুয়ার্ডকে ডেকে হাতের ইশারায় বিল দিতে বলল। ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ফটিক জিগ্যেস করল, 'ট্রেনে যাবি, না ট্যাক্সিতেই?'

'টাকা যা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, প্রায় শেষ। তবু ভাবছি, ট্যাক্সিতেই যাব।' অশোক একটা সিগারেট ধরাল।

স্টুয়ার্ড বিল নিয়ে এল। অশোক বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল। অফিসপাড়ার সাহেবেদের লাঞ্চের সময়। পার্ক স্ট্রিট জুড়ে গাড়িব ভিড়। কয়েকটা খালি ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে শেষপর্যন্ত একজন যেতে রাজি হল। ফটিককে নিয়ে অশোক ট্যাক্সিতে উঠল। রাস্তা আজকাল কোনও সময়েই ফাঁকা নেই। বি. টি. রোডেব ধারে, সুখচরে ঢোকবার মোড়ে এসে নামতেই প্রায় একঘণ্টা লাগল। অশোক ট্যাক্সিব ভাড়া মিটিয়ে দিল। মোড়ের কাছে কয়েকটা সাইকেল বিকশো দাঁড়িয়েছিল। অশোক তাদের সামনে গিয়ে বলল, 'বিক্রমবাবুর বাড়ি কেউ চেনো ভাই?'

রিকশোওয়ালারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বোঝা গেল, ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। একজন জিগ্যেস করল, 'কোন পাড়ায় বলুন তো?'

'পাড়াটার নামই তো ভুলে গেছি হে।' অশোক বলল, 'ভদ্রলোকের নাম বিক্রম চ্যাটার্জি। বড়লোক। রোজ কলকাতায় অফিসে যান গাড়ি চালিযে। সবুজ রঙের গাড়ি।'

একজন রিকশোওয়ালা বলে উঠল, 'বুঝেছি-বুঝেছি, বোসপাড়ার সেই বাবু। রোজ সকাল ন'টা সাড়ে ন'টায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। কয়েকদিন দেখছি সন্ধের দিকে ফিরে আসে, আবাব চলে যায়। সকালবেলা দেখা যায় না।

'ঠিক বলেছ।' অশোক বলল, 'সেই ভদ্রলোকেব বাড়ি যাব।'

বিকশোওয়ালাটি রিকশোর সিট থেকে নেমে বলল, 'আসুন। ভাড়াটা—।'

'তোমার যা রেট, তাই পাবে, কম নয়।' অশোক ফটিককে নিয়ে রিকশোয উঠে বসল।

রিকশো চলতে লাগল। অশোক ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। ও বিকশোওযালাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠাকুরদাস মণ্ডলকে চেনো?'

'কোন ঠাকুরদাস মণ্ডল?'

'গঙ্গার ধারের কাছে চুনুরি না জেলেপাড়ার কাছে...'

রিকশোওয়ালা একটু ভাবল, 'আপনি কি চরণ মণ্ডলের বাবার কথা বলছেন?'

'ছেলের নামটা চরণ কি না মনে করতে পারছি না। তবে ছেলের বোধহয় বিয়ে হযে গেছে।' অশোক বলল।

BanglaBook.org

ফটিক অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকাল। রিকশোওয়ালা বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি। চরণের একটা বিধবা বোনও আছে তো? দেখতে বেশ সুন্দরী। চরণের বউও অবিশ্যি সুন্দরী।'

'হ্যাঁ, তাই যেন মনে পড়ছে। কলকাতায় দেখেছি তো, বিশেষ মনে করতে পারছি না।'

রিকশোওয়ালা বলল, 'বুঝেছি। ননদ-ভাজ দুই-ই খুব ঢপ জানে, পাড়ায় দুর্নাম। আপনারা তাদের কাছেও যাবেন?'

'না-না, আমরা তাদের কাছে যাব না।' অশোক বলল, 'বিক্রমবাবুর সঙ্গে ওদের বাড়ি-জমি নিয়ে মামলা চলছে। আমরা কোর্ট থেকে এসেছি। যাব বিক্রমবাবুর বাড়িতে। ওদের খোঁজটা একটু নিলাম। তুমি কোথায় থাকো?'

'আমি বোসপাড়াতেই থাকি। ওই বাবুদের বাড়ির উত্তর গায়ে, বিরিজাসার বস্তিতে।' রিকশোওয়ালা বলল, 'মামলার কথাও শুনেছি। তবে ও-মামলা টিকবে না।'

'কেন?' অশোক উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

রিকশোওয়ালা বলল, 'দেখবেন, মিটমাট হয়ে যাবে। চরণবা তো বাবুদের খুবই মান্যিগণ্যি করে। একটু বোধহয় ট্যাফোঁ করতে গেছল। তাই লেগে গেছে।'

অশোক আর কথা বাড়াল না। রিকশো ক্রমেই ডানদিকে মোড় ফিরে, এপাড়া-ওপাড়া দিয়ে চলেছে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। দেখতে-দেখতেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। অচেনা জায়গা। দেখে মনে হচ্ছে, অনেক নতুন বাড়ি উঠে, অঞ্চলের চেহারাটা বদলে গেছে। অশোক নিচু স্বরে বলল, 'পথঘাট চিনে রাখিস।'

রিকশোওয়ালা একটা বড় মন্দির পেরিয়ে, সোজা খানিকটা উত্তরে গিয়ে, বাঁ-দিকে মোড় নিল। একটা পুরোনো আমলের বিরাট দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল, 'এইটা সেই বাবুর বাড়ি।'

অশোক রিকশোতে বসেই দেখল, পুরোনো দোতলাবাড়ির গায়ে নতুন একটি ছোট দোতলা বাড়ি। অ্যানেক্স বলা যায়। নতুন বাড়ির সামনেই গ্যারেজের কোলাপসিবল গেট বন্ধ। পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজাও বন্ধ। বন্ধ পুরোনো বাড়ির সদর দরজাও। কারওকেই দেখা যাচ্ছে না। অশোক ফটিক দুজনেই রিকশো থেকে নামল। রিকশোওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'গঙ্গার ধারটা কোনদিকে?'

'বাঁ-হাতে সোজা পশ্চিমে গেলেই গঙ্গা পেয়ে যাবেন।' রিকশোওয়ালা ফিরে চলল।

অশোক চাটুয্যে-বাড়িটা দেখল। তারপরে ফটিককে বলল, 'চল্, গঙ্গার ধারে যাই।'

দুজনেই হেঁটে একটু অলিগলি দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। গঙ্গার ধারের অনেকটা জায়গাই খোলা। পোর্ট ট্রাস্টের জমি। ডানদিকে একটি পাড়া। বাঁধানো ঘাট বলে কিছু নেই। এলাকাটা ফাঁকা। বোধহয় শীতকাল বলেই। আট-দশ বছরের কয়েকটা ছেলে গঙ্গার ধারে গাদি খেলছিল। অশোক ফটিকের দিকে ওদের নজর নেই। গঙ্গার ওপারে একটা চটকল আর ইটের ভাটা দেখা যাচ্ছে। দু-একটি নৌকার গতি মন্থর।

'একটু ডানদিকের পাড়ায় ঘুরে আসি।' অশোক বলল।

দুজনেই ডানদিকে, অর্থাৎ উত্তরে, এগিয়ে গেল। আগের দিনের কাঁচা বাড়ি কয়েকটা এখনও আছে। আশেপাশে কিছু পাকা বাড়ি। গঙ্গার ধারটা ঢাকা পড়ে গেল। অশোক হঠাৎ একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পাঁচ ইঞ্চির পাকা দেওয়ালের ওপর মাথায় টালি দেওয়া দু-তিনটি ঘর। রাস্তার সামনে ভিত খোঁড়া। বাড়ির ভেতর ঢোকার দরজাটা বন্ধ। চারপাশের সীমানা ঘেরা হয়েছে, ঘন ফণীমনসার ঝাড় দিয়ে। তার দিয়ে কঞ্চি বেঁধে, ঝাড়কে খাড়া রাখা হয়েছে। সীমানাটা পাকা পাঁচিলে ঘেরা হয়নি।

অশোক কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই, আবার চলতে আরম্ভ করল। পাড়ার ভেতরে লোকজন

BanglaBook.org

চলাফেরা করছে। কিন্তু দুজন অপরিচিতকে দেখে কেউ কোনও কথা জিগ্যেস করছে না। সেরকম পল্লীঅঞ্চলের চেহারাও নেই। রিকশো চলাচল করছে। দুজনেই আশেপাশে পাক দিয়ে আবার যখন বোসপাড়ার ভেতর দিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে এগোল তখন সূর্য অস্ত গেছে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে।

অশোক উৎকর্ণ হল। একটা গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে। বিক্রমের বাড়ি থেকে তখন ওরা উত্তরে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিতে উদ্যত। একটা বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সেই লেফট হ্যান্ডার ফরেন সবুজ ফিয়াট। নতুন বাড়ির গ্যারেজের সামনে দাঁড়াল। চালকের আসনে বিক্রম। হর্ন বাজাল। অশোক ভেবেছিল, ভেতরে ঢোকবার পাশের দরজাটা খুলে যাবে।

কিন্তু তা খুলল না। গ্যারেজের ভেতর থেকেই একটি পুরুষের মূর্তি এগিয়ে এল। তার মানে, গ্যারেজের ভেতর দিয়ে বাড়িতে ঢোকবার আলাদা দরজা আছে। মূর্তি কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে দিল ভেতর থেকে। গেট সরিয়ে দিল দুপাশে। বিক্রম আলো জ্বেলে গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাল।

লোকটি আবার ভেতরে ঢুকে গেট টেনে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। গাড়ির আলো বিক্রম ইতিমধ্যে নিভিয়ে দিয়েছে। সব অন্ধকার, চুপচাপ।

অশোক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভালো করে বাড়িটার দিকে দেখল। রাস্তার আলোগুলো টিমটিমে, সর্বত্রই একটা ভৌতিক ছায়া-ছায়া ভাব। অশোক ফটিকের গায়ে হাত দিয়ে টিপল, গঙ্গার ধারে এগোল। স্বর নামিয়ে বলল, 'বিক্রম আর মণ্ডলের বাড়ির যাতায়াতের পথে কোথাও একটা আড়াল খুঁজে দাঁড়াতে হবে।'

'পথের ওপর একটা চায়ের দোকান দেখেছিলাম।' ফটিক বলল।

অশোক বলল, 'ওখানে একদম ঢোকা নেই। যদি বিক্রম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মণ্ডলবাড়িতে ঢোকে—।'

'মণ্ডলবাড়িতে ঢুকবে?' ফটিক অবাক অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

অশোক বলল, 'যদি ঢোকে, তবে তুই সোজা বিক্রমের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবি। খড়দহ থানায় টেলিফোন করে ও. সি. হরেনবাবু, এস. আই. যাকেই পাস চলে আসতে বলবি। বলবি, চব্বিশ পরগনার এস. পি.-র নির্দেশে বলছি। তারপরেই টেলিফোন করবি এন্টালি থানায়, ও. সি.-কে বলবি, অশোক ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধ আপনি এখনই সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে চলে আসুন। তারপরেই নরেনবাবুকে টেলিফোন করে একই জায়গায় আসতে বলবি। পারবি তো? অর্পিতা বা বাড়ির কেউ যেন না জানে!'

'চেষ্টা করব। বাড়ির ভেতরে কত লোক আছে, জানিনে তো?' ফটিক বলল, 'কিন্তু তুই কোথায় থাকবি?'

অশোক বলল, 'কাছেপিঠেই। কিন্তু খুব সাবধান। দরকার হলে তোর যা কেরামতি তা করবি।'

দুজনেই গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। কাছাকাছি আলো নেই। অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে তারা ফুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অশোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। আবার বিক্রমের বাড়ির দিকে এগোল। কিছুটা যেতেই, বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজার মাথায় আলো জ্বলে উঠল। দূর থেকে বিক্রমকে বেরোতে দেখা গেল।

'চলে আয়, ফটিক।' অশোক ফটিকের হাত ধরে উত্তরের আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল। খানিকটা গিয়ে দেখা গেল বাঁদিকের বাঁকের মুখে নতুন ভিত খোঁড়া টালির বাড়ির দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ওইটাই মণ্ডলবাড়ি। ডানদিকে দুটো বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে কিছুটা ঝোপঝাড়। অশোক ফটিককে টেনে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একমিনিটের মধ্যেই বিক্রমকে দেখা গেল। সে আস্তে-আস্তে হাঁটছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা।

BanglaBook.org

হাতে একটা ব্যাগ। আরও কয়েক পা গিয়ে একবার দাঁড়াল, আশেপাশে দেখল। কারোর নিচু স্বর শোনা গেল। বিক্রম দ্রুত বাঁয়ে ফিরে নতুন ভিত খোঁড়া বাড়িটার পাশের দরজার মধ্যে ঢুকে গেল। যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় একমিনিট। তারপরে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশোক ফটিককে হাত ধরে টেনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'যা-যা বলেছি, তাই করবি। চলে যা।'

ফটিক নির্দেশ পাওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেল। অশোক নতুন ভিত খোঁড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওর জামার ভেতরে টিটোর দেওয়া টেপ-রেকর্ডার।

ফটিক বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। এখন আর আলো জ্বলছে না। পকেট থেকে পেনসিল-টর্চ বের করে জ্বেলে দেখল, কলিংবেল আছে কি না। নেই। ও পাশের নতুন বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালল। কলিংবেল রয়েছে। বেল টিপল। মিনিটখানেক পরে একটি লোক বেরিয়ে এল। সাদাসিধে লোক, মাঝবয়েসি, ধুতির ওপরে একটা ময়লা শার্ট। জিগ্যেস করল, 'কাকে চান?'

'বিক্রমদাকে। পানিহাটি থেকে উকিল অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন। জরুরি দরকার।' ফটিক দরজার ভেতরে একটা পা রাখল।

লোকটা বলল, 'কিন্তু উনি তো একটু কোথায় বেরোলেন। ফিরেই আবার কলকাতায় যাবেন।'

'জানি। কিন্তু আমাকে তাহলে একটু বসতে হবে যে?' ফটিক বলল।

লোকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনি একটু ঘুরে আসুন। কোনও অচেনা লোককে ছোটবাবু বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন।'

'কিন্তু আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।' ফটিক লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি জোর করে বাড়িতে ঢুকছেন?'

ফটিক কোনও জবাব না দিয়ে ঝটিতি সামনের ঘরটা দেখে নিল, 'কোনও উপায় নেই ভাই। টেলিফোনটা কোন ঘরে?'

'ফোন দিয়ে আপনার কী দরকার?' লোকটা এবার গলার স্বর চড়াল।

ফটিক ফিরে দরজাটা বন্ধ করল। লোকটির ঘাড়ের ওপর একটি হাত রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলো। বিক্রমবাবুর সামনে খুব বিপদ!'

লোকটা ফটিকের হাত ঘাড় থেকে নামিয়ে প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, চিৎকার করে ডাকল, 'কমলা, কমলা, এদিকে এসো।'

লোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই ফটিকের হাতটা বিদ্যুৎগতিতে উঠল, আর লোকটির মুন্ডুতে আঘাত করল।

সে ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগেই ফটিক অচৈতন্য লোকটিকে ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, বাঁদিকের দরজা দিয়ে বছর তিরিশ বয়েসের একটি স্ত্রীলোক ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'কী হল, হরিদা?'

'টেলিফোনটা কোথায়?' ফটিক জিগ্যেস করল।

কমলা অবাক, 'তুমি কে? হরিদা কোথায়? টেলিফোন তো দোতলায়।'

'হরিদা একবার বাইরে গেল। আমাকে বিক্রমদা পাঠিয়েছে, উকিলকে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে। সিঁড়িটা কোনদিকে?'

BanglaBook.org

কমলা একবার পিছন ফিরে দেখে আবার সন্দেহের চোখে তাকাল, 'ছোটবাবু তো এই মাত্তর কোথায় গেলেন, এখনি আসবেন।'

'জানি। হরি ডাকতে গেছে। তুমি আমাকে সিঁড়িটা দেখাও।'

কমলার চোখে এখন সন্দেহ নিবিড়, 'কে তুমি, চিনিনে শুনিনে, তোমাকে দোতলায় যেতে দেব কেন?'

ফটিক কমলার পিছন ফিরে একবার তাকানো দেখেই বুঝে নিয়েছিল, সিঁড়িটা ওই দরজার ভেতরে। ও দ্রুত এগিয়ে গেল। দু-হাতে কমলার মাথাটা যেন ঝাপটে দিল। কমলা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। ফটিক কমলাকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডানদিকে সিঁড়ি। কমলার অচৈতন্য শরীরটা সিঁড়ির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে আলো জ্বলছিল, সামনের ঘরে ঢুকেই টেলিফোন দেখতে পেল। পাশেই একটা চেয়ার। প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে অশোকের নির্দেশমতো একটা করে টেলিফোন করতে শুরু করল। সৌভাগ্যবশত, খড়দহ থানার ও. সি.-কেই পাওয়া গেল। সব শুনে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী? যেতে বলছেন কেন?'

'বিক্রমবাবুর বিশেষ বিপদ।' ফটিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

ও. সি.-র গলা শোনা গেল, 'কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

ফটিক রিসিভার নামিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। এনগেজড। ও নরেনবাবুর নাম্বারের সুযোগ নিল। সরাসরি তাঁকেই পাওয়া গেল। ফটিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আপনার ড্রাইভার তো নেই এখন?'

'না, কেন?' নরেনবাবুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।

ফটিক বলল, 'তাহলে লেবুবাবুকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে এখনই নিয়ে আসতে বলুন। জরুরি, ভীষণ জরুরি। আর কোনও কথা নেই। তবে বাড়ির আর কারওকে এখন কিছু বলবেন না।' বলেই লাইন কেটে দিয়ে আবার এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। লাইন পাওয়া গেল। ফটিক ও. সি.-কে চাইল। পাওয়া গেল। ফটিক বলল, 'মনে হচ্ছে, মিতা মার্ডারের একটা ক্লু পাওয়া গেছে। আপনি একবার সুখচরে চলে আসুন। খড়দহ থানার আন্ডারে, সুখচর, বিক্রম চ্যাটার্জির বাড়ি।'

'মিতা মার্ডারের ক্লু সুখচরে?' ও. সি.-র অবাক স্বর ভেসে এল, 'আপনি কে বলছেন?'

'অশোক ঠাকুরের বন্ধু, অয়স্কান্ত রায়। দয়া করে একমিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না।'

ফটিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই নীচে কলিংবেল বেজে উঠল। ও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে নীচে নামল। সিঁড়ির নীচে কমলা তখনও অচৈতন্য। এখনও মিনিট পনেরো থাকবে। বাইরের ঘরে এসে দেখল, হরি তেমনই পড়ে আছে। এরও জ্ঞান ফিরতে ওইরকম সময়ই লাগবে। ফটিক হরির শরীরটা একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। কলিংবেল তখন আর বাজছে না, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, আর বিক্রমের ডাক শোনা যাচ্ছে, 'হরি, এই হরি—কমলা।'

ফটিক ঘরের আলো অফ করল। দরজা খুলে দিল। বিক্রম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। তার নিশ্বাসে মদের গন্ধ। চিৎকার করে বলল, 'একী, অন্ধকার কেন?' বলে সে নিজেই চেনা জায়গায় হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালাল। ফটিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আপনি?' বিক্রমের স্বর স্খলিত শোনাল।

ফটিক হাসতে জানে না, 'আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

বিক্রমের নজর তখন পড়ে থাকা হরির ওপরে। তাঁর মুখ কঠিন আরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি ওকে মেরেছেন?'

'হ্যাঁ, তেমন না, একটু শুইয়ে রেখেছি।'

BanglaBook.org

হাতে একটা ব্যাগ। আরও কয়েক পা গিয়ে একবার দাঁড়াল, আশেপাশে দেখল। কারোর নিচু স্বর শোনা গেল। বিক্রম দ্রুত বাঁয়ে ফিরে নতুন ভিত খোঁড়া বাড়িটার পাশের দরজার মধ্যে ঢুকে গেল। যে-লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় একমিনিট। তারপরে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অশোক ফটিককে হাত ধরে টেনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'যা-যা বলেছি, তাই করবি। চলে যা।'

ফটিক নির্দেশ পাওয়ামাত্র উধাও হয়ে গেল। অশোক নতুন ভিত খোঁড়া বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ওর জামার ভেতরে টিটোর দেওয়া টেপ-রেকর্ডার।

ফটিক বিক্রমের পুরোনো বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। এখন আর আলো জ্বলছে না। পকেট থেকে পেনসিল-টর্চ বের করে জ্বেলে দেখল, কলিংবেল আছে কি না। নেই। ও পাশের নতুন বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালল। কলিংবেল রয়েছে। বেল টিপল। মিনিটখানেক পরে একটি লোক বেরিয়ে এল। সাদাসিধে লোক, মাঝবয়েসি, ধুতির ওপরে একটা ময়লা শার্ট। জিগ্যেস করল, 'কাকে চান?'

'বিক্রমদাকে। পানিহাটি থেকে উকিল অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন। জরুরি দরকার।' ফটিক দরজার ভেতরে একটা পা রাখল।

লোকটা বলল, 'কিন্তু উনি তো একটু কোথায় বেরোলেন। ফিরেই আবার কলকাতায় যাবেন।'

'জানি। কিন্তু আমাকে তাহলে একটু বসতে হবে যে?' ফটিক বলল।

লোকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনি একটু ঘুরে আসুন। কোনও অচেনা লোককে ছোটবাবু বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন।'

'কিন্তু আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।' ফটিক লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি জোর করে বাড়িতে ঢুকছেন?'

ফটিক কোনও জবাব না দিয়ে ঝটিতি সামনের ঘরটা দেখে নিল, 'কোনও উপায় নেই ভাই। টেলিফোনটা কোন ঘরে?'

'ফোন দিয়ে আপনার কী দরকার?' লোকটা এবার গলার স্বর চড়াল।

ফটিক ফিরে দরজাটা বন্ধ করল। লোকটির ঘাড়ের ওপর একটি হাত রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলো। বিক্রমবাবুর সামনে খুব বিপদ।'

লোকটা ফটিকের হাত ঘাড় থেকে নামিয়ে প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, চিৎকার করে ডাকল, 'কমলা, কমলা, এদিকে এসো।'

লোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই ফটিকের হাতটা বিদ্যুৎগতিতে উঠল, আর লোকটির মুন্ডুতে আঘাত করল।

সে ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগেই ফটিক অচৈতন্য লোকটিকে ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, বাঁদিকের দরজা দিয়ে বছর তিরিশ বয়েসের একটি স্ত্রীলোক ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'কী হল, হরিদা?'

'টেলিফোনটা কোথায়?' ফটিক জিগ্যেস করল।

কমলা অবাক, 'তুমি কে? হরিদা কোথায়? টেলিফোন তো দোতলায়।'

'হরিদা একবার বাইরে গেল। আমাকে বিক্রমদা পাঠিয়েছে, উকিলকে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে। সিঁড়িটা কোনদিকে?'

BanglaBook.org

কমলা একবার পিছন ফিরে দেখে আবার সন্দেহের চোখে তাকাল, 'ছোটবাবু তো এই মাত্তর কোথায় গেলেন, এখনি আসবেন।'

'জানি। হরি ডাকতে গেছে। তুমি আমাকে সিঁড়িটা দেখাও।'

কমলার চোখে এখন সন্দেহ নিবিড়, 'কে তুমি, চিনিনে শুনিনে, তোমাকে দোতলায় যেতে দেব কেন?'

ফটিক কমলার পিছন ফিরে একবার তাকানো দেখেই বুঝে নিয়েছিল, সিঁড়িটা ওই দরজার ভেতরে। ও দ্রুত এগিয়ে গেল। দু-হাতে কমলার মাথাটা যেন ঝাপটে দিল। কমলা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। ফটিক কমলাকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ডানদিকে সিঁড়ি। কমলার অচৈতন্য শরীরটা সিঁড়ির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে আলো জ্বলছিল, সামনের ঘরে ঢুকেই টেলিফোন দেখতে পেল। পাশেই একটা চেয়ার। প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে অশোকের নির্দেশমতো একটা করে টেলিফোন করতে শুরু করল। সৌভাগ্যবশত, খড়দহ থানার ও. সি.-কেই পাওয়া গেল। সব শুনে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী? যেতে বলছেন কেন?'

'বিক্রমবাবুর বিশেষ বিপদ।' ফটিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

ও. সি.-র গলা শোনা গেল, 'কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

ফটিক রিসিভার নামিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করে এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। এনগেজড। ও নরেনবাবুর নাম্বারের সুযোগ নিল। সরাসরি তাঁকেই পাওয়া গেল। ফটিক নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আপনার ড্রাইভার তো নেই এখন?'

'না, কেন?' নরেনবাবুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।

ফটিক বলল, 'তাহলে লেবুবাবুকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে এখনই নিয়ে আসতে বলুন। জরুরি, ভীষণ জরুরি। আর কোনও কথা নেই। তবে বাড়ির আর কারওকে এখন কিছু বলবেন না।' বলেই লাইন কেটে দিয়ে আবার এন্টালি থানায় টেলিফোন করল। লাইন পাওয়া গেল। ফটিক ও. সি.-কে চাইল। পাওয়া গেল। ফটিক বলল, 'মনে হচ্ছে, মিতা মার্ডারের একটা ক্লু পাওয়া গেছে। আপনি একবার সুখচরে চলে আসুন। খড়দহ থানার আন্ডারে, সুখচর, বিক্রম চ্যাটার্জির বাড়ি।'

'মিতা মার্ডারের ক্লু সুখচরে?' ও. সি.-র অবাক স্বর ভেসে এল, 'আপনি কে বলছেন?'

'অশোক ঠাকুরের বন্ধু, অয়স্কান্ত রায়। দয়া করে একমিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না।'

ফটিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই নীচে কলিংবেল বেজে উঠল। ও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে নীচে নামল। সিঁড়ির নীচে কমলা তখনও অচৈতন্য। এখনও মিনিট পনেরো থাকবে। বাইরের ঘরে এসে দেখল, হরি তেমনই পড়ে আছে। এরও জ্ঞান ফিরতে ওইরকম সময়ই লাগবে। ফটিক হরির শরীরটা একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। কলিংবেল তখন আর বাজছে না, দরজায় ধাক্কা পড়ছে, আর বিক্রমের ডাক শোনা যাচ্ছে, 'হরি, এই হরি—কমলা।'

ফটিক ঘরের আলো অফ করল। দরজা খুলে দিল। বিক্রম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। তার নিশ্বাসে মদের গন্ধ। চিৎকার করে বলল, 'একী, অন্ধকার কেন?' বলে সে নিজেই চেনা জায়গায় হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালাল। ফটিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আপনি?' বিক্রমের স্বর স্খলিত শোনাল।

ফটিক হাসতে জানে না, 'আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

বিক্রমের নজর তখন পড়ে থাকা হরির ওপরে। তার মুখ কঠিন আরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি ওকে মেরেছেন?'

'হ্যাঁ, তেমন না, একটু শুইয়ে রেখেছি।'

BanglaBook.org

বিক্রমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। পায়ে-পায়ে ফটিকের দিকে এগোল। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'জীবনের ভয় নেই? হরি শুয়ে আছে, তোমাকে চিরদিনের মতোই শুইয়ে দেব।'

'সেটা ঠিক হবে না বিক্রমবাবু।' খোলা দরজায় অশোক এসে দাঁড়াল, 'আর কতজনকে চিরদিনের মতো শোয়াবেন?'

বিক্রম ঝটিতি পিছন ফিরে তাকাল। অশোকের গলায় ঝোলানো টেপ-রেকর্ডার।

বিক্রমের শক্ত স্বর আবার বিহ্বল হয়ে গেল, 'অশোক ঠাকুর। কিন্তু এখানে কেন?'

'মিতাকে ওভাবে খুন করলেন কেন, সেই জবাবটা এখনও পাইনি।' অশোক বলল, 'তবে অনুমান করেছি।'

বিক্রম অশোকের দিকে পা বাড়াল। একটা জিপ এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। হেডলাইটের আলো অন করা। খড়দহ থানার ও. সি. এসে ঢুকলেন। সকলের দিকে একবার দেখে অশোককে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'ট্রেসপাস।' বিক্রম বলে উঠল, 'ক্রিমিনাল ট্রেসপাস। ওই দেখুন, আমার চাকরকে মেরে ফেলে রেখেছে।'

অশোক হাসল, ও. সি.-কে বলল, 'হ্যাঁ, ট্রেসপাস। বসুন, কথা হবে।' ফটিক জিগ্যেস করল, 'সবাইকে জানানো হয়েছে?'

'হয়েছে। এন্টালি থানার ও. সি. আর নরেনবাবু আসছেন।' ফটিক বলল।

ও. সি. বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছিনে। আগে বসি।'

বিক্রমের সুখচরের নতুন বাড়ির বাইরের ঘরে খড়দহ ও এন্টালি থানার ও. সি., একপাশে নরেনবাবু বসেছেন। তাঁর পিছনে লেবু দাঁড়িয়ে। হরির জ্ঞান ফিরেছে। সে ভেতরে। ফটিক বিক্রমের পাশে পাথরের মূর্তির মতো সটান খাড়া। ইতিমধ্যে খড়দহ থানার ও. সি. ঠাকুরদাস মণ্ডলকেও ডাকিয়ে এনেছেন। সে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অশোক সকলের সঙ্গে সোফায় বসে। সেন্টার টেবিলের ওপর টেপরেকর্ডার, আর কাগজের মোড়ক খোলা হিরে।

অশোক বলল, 'ব্যাপারটা একদিকে যেমন সোজা, তেমনি জটিল। জটিলতার মূলে পারমিতাও অনেকটা দায়ী। বিক্রমবাবু মিতাকে পাওয়ার জন্যে পাগল ছিলেন, পেয়েও ছিলেন। মাফ করবেন, ওম্যানাইজিং কথাটার যথার্থ অর্থ আমার জানা নেই, কিন্তু বিক্রমবাবুকে আমি একটা আখ্যা দিতে চাই, এ মাস্টারমাইন্ড অফ ওম্যান, নইলে মিতাকে তিনি কাবু করতে পারতেন না। যার ফলে কনসেপশন। যোগাযোগটা গোপনে হত। মিতার নিশ্চয় বিক্রমবাবুর ওপর একটা দুর্বলতা ছিল। উনি সে-সুযোগ নিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা।' বিক্রম গর্জন করল।

অশোক হাসল, 'আপনাকে আর মিতার ফটো দেখে চৌরঙ্গির সেই বিখ্যাত হোটেলের রিসেপশনিস্ট দুটি মেয়েই শনাক্ত করবে, ভয় নেই। মিতা যদি আপনাকে ভয় না দেখাত, যে ও অ্যাবরশন করাবে না, তাহলে এই খুনটা আপনাকে করতে হত না। কিন্তু জেনে রাখুন, মিতা অ্যাবরশন করাত। নীপা দেবীকে সে বলেও ছিল, বাড়ি থেকে কয়েকদিনের জন্যে একলা কোথাও বেড়াতে যাবে। তার মানেই কোনও ক্লিনিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিল। আপনার সবুর সইল না, খুনের প্ল্যান করে ফেললেন। এখন বাগানের পাঁচিলে যে আঙুলের আর হাতের দাগ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আপনারটা মেলালেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

'মিতাকে বাগানে ডেকে মারতে গিয়ে বিক্রমবাবু তাঁর হিরের আংটির আসল হিরেটা

BanglaBook.org

খোয়ালেন, মানে খুলে পড়েছিল। সেটা খোঁজবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন পূর্ণিমাকে। বিক্রমবাবু রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে আমার বন্ধু ফটিককে বাগানে পড়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন, ফটিক হিরেটা খুঁজে পেয়েছে। তখনই তিনি পূর্ণিমাকে পালাবার নির্দেশ দিয়ে কোনও এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আমার আর ফটিকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে, জেরার সময় পান্নার আংটি পরে এসেছিলেন, যেন আমরা ভাবি, উনি হিরে ব্যবহার করেন না। শুধু এই কারণেই, দিনের বেলা, একটা মেয়েকে গাড়ির মধ্যে তুলে পায়ের নীচে শুইয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে মারতে হয়েছে, আর খুব রিসক নিয়েই সেই বডি বন্ডেল ব্রিজের পাশে ফেলে দিয়েছিলেন। এখন যে-হিরেটা বিক্রমবাবুর হাতে দেখছেন, ওটা আসল হিরে নয়, নকল। চেনাশোনাদের চোখের সামনে যাতে দেখাতে পারেন, সবই ঠিক আছে।'

'কিন্তু মামলাটা? মণ্ডলদের সঙ্গে?' খড়দহ থানার ও. সি. জিগ্যেস করলেন।

নরেন্দ্রনাথও ঘাড় ঝাঁকালেন। অশোক বলল, 'বিক্রমবাবু তো এইমাত্র মণ্ডলবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখুন, আমি বায়োলজি জানিনে, দু-মুখো সাপ হয় কি না, তাও জানিনে। তবে সাপ বোধহয় ব্যাক গিয়ার দিতে পারে। বিক্রমবাবু মণ্ডলদের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপাস, মেয়েদের অ্যাসল্ট করা, সবই অ্যালিবাই হিসাবে ভালো সাজিয়েছিলেন, অবিশ্যি হরি মিথ্যে টেলিফোন করেনি, কারণ, ভিত খোঁড়াটাও ঠাকুরদাসের সঙ্গে থ্রি-প্ল্যানড। মামলাটা সাজানো, তবে খুবই সার্থকভাবে। কিন্তু মুশকিল হল, সন্ধে সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বিক্রমবাবু কোথায় ছিলেন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ পানিহাটিতে উকিলের বাড়িতে উনি গেছলেন রাত্রি দশটায়, সেটা উকিল অবিনাশবাবুই আপনাদের বলবেন। একদিকে সুখচরে এক অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, অন্যদিকে ডেলিবারেট মার্ডার, এতেই আমি দু-মুখো সাপের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি। এবার শুনুন, এই টেপরেকর্ডার, ঘণ্টা-দেড়েক আগে তোলা।' বলে ও টেপটা চালিয়ে দিল।

প্রথমেই ঠাকুরদাসের গলা, 'এসো ছোটবাবু, বাগানের সে মালটি খুঁজে পেলে?' বিক্রমের স্বর, 'না, সেটা বোধহয় এক শালা টিকটিকির হাতে পড়েছে। তবে সাক্ষী মেয়ে— পুর্ণিটাকে খতম করে দিয়েছি, ওটা নিয়ে আর ভাবছিনে, কিন্তু আমি অস্বস্তিবোধ করছি। অশোক ঠাকুর নামে একটা বাস্তুঘুঘু পেছনে লেগেছে, শালা অন্ধকারের সাপের থেকেও নাকি ভীষণ।' কোনও মেয়ের গলা, 'কিন্তু মামলাই তোমাকে বাঁচাবে। আসল কাজ তো গুছিয়েই রেখেছ গো ছোটবাবু।'...বিক্রমের স্বরের আগে বোতলের ছিপি খোলার শব্দ, 'হ্যাঁ সেটাই যা ভরসা। এখন তুমি জল গেলাস নিয়ে এসো তো মঙ্গলা, আমার পাশে একটু বোসো। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। অপুটা যদ্দিন না এখানে আসে ততই ভালো।'...ঠাকুরদাসের গলা, 'হ্যাঁ বউ, তুমি থাকো ছোটবাবুর কাছে, তোমার ননদকেও ডেকে নাও। আমি বাইরে গিয়ে পাহারা দিচ্ছি। তবে দেখবেন ছোটবাবু, এই জমি যেন আমি পাই।'...বিক্রমের স্বর, 'পাবে-পাবে, যা চাইবে, তাই পাবে।' কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, মঙ্গলার স্বর, 'আহা, একেবারে জামাকাপড় খুলে দিচ্ছ যে গো, ছোটবাবু—।'...আবার কয়েক সেকেন্ড নীরবতা, মঙ্গলার গলা, 'ওই দ্যাখো, ননদ এসে গেছে, ছোটবাবু।'...ভিন্ন মেয়ের গলা, 'ননদকে আর ডেকো না বউদি, ছোটবাবুকে এখন আমার ভয় করে, কোনদিন আমাদেরও গলা টিপে শেষ করবে।'...খিলখিল হাসি, বিক্রমের গলা, 'ওসব কথা রাখো, দুজনে আমাকে একটু জুড়োতে দাও, আমার যেন সব জ্বলে যাচ্ছে। আর থেকে-থেকে মনটাও কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'...আবার মেয়ে গলার খিলখিল হাসি...।

BanglaBook.org

'উহ্, অসহ্য, বন্ধ করুন, অশোকবাবু।' নরেন্দ্রনাথ অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠলেন।

অশোক সঙ্গে-সঙ্গে টেপরেকর্ডার থামিয়ে দিল, তাকাল সকলের মুখের দিকে। নরেন্দ্রনাথ দু-হাতে মুখ ঢেকে আছেন। বাকিরা স্তব্ধ। বিক্রমের মাথা নিচু। ঠাকুরদাস হেঁচকি তুলে কাঁদছে। অশোক দুই ও. সি.-র দিকে তাকিয়ে জিগোস করল, 'টেপটা কি আর আপনারা শুনবেন?'

খড়দহ ও. সি. বললেন, 'কোনও দরকার নেই আর।'

'তবে বিক্রম চ্যাটার্জিকে আমিই নিয়ে যাব।' এন্টালি থানার ও. সি. বললেন, 'আপনি ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলির যাকে-যাকে দরকার, অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান।'

অশোক টেপরেকর্ডার থেকে টেপটা খুলে নিয়ে রেকর্ডারটা এন্টালি থানার ও. সি.-কে দিয়ে বললেন, 'এটা টিটো গাঙ্গুলির, ওঁকে ডেকে দিয়ে দেবেন। উনি আজ খুব উপকার করেছেন, পরে সেসব বলব। আর টেপটা আজ আমি নিয়ে যাচ্ছি, কাল কলকাতায় আপনাদের কাছে জমা দেব।' বলে ও উঠে দাঁড়াল, তাকাল নরেন্দ্রনাথের দিকে, 'নরেনবাবু, আমি আপনার কথা রেখেছি।'

নরেনবাবু মুখ না তুলে, মাথা ঝাঁকালেন, রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বড় সাংঘাতিকভাবেই রেখেছেন, আপনার ফি-র টাকাটা—।'

'পরে হবে। চল ফটিক, আমরা যাই।' অশোক ডাকল।

ফটিক অশোকের পাশে এসে দাঁড়াল। অশোক বিক্রমের দিকে ফিরে বলল, 'বিক্রমবাবু, এ-ঘটনা শুনে অর্পিতা দেবী হয়তো খুব আশ্চর্য হবেন না।' ফটিকের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ভোর রাতের আর্তনাদ

BanglaBook.org

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পাঁচ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরি লেনের একতলার ভাড়াটে নকুলচন্দ্র বিশ্বাস যে খুন হয়েছে, বাড়িওয়ালা সদানন্দবাবুই সে-কথা প্রথম জানতে পারেন কিনা, বলা শক্ত, তবে তার ডেডবডি যে তিনিই প্রথম দেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-সব কথা যথাসময়ে হবে। ভদ্রলোকের পরিচয়টা আগে দেওয়া দরকার।

সদানন্দবাবুর পুরো নাম সদানন্দ বসু। সস্ত্রীক তিনি দোতলায় থাকেন। আগে একটা সওদাগরি কোম্পানির শিপিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, বার দুয়েক এক্সটেনশান পাবার পরে রিটায়ার করেছেন। তা সেও প্রায় বছর দশেক হল।

ভদ্রলোকের বয়স এখন বাহাত্তর। সন্তানাদি হয়নি, তবে তা নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং অন্যেরা আক্ষেপ করলে বলেন, 'রাখুন মশাই! ছেলে হলেই যে সেটা বনমানুষ না হয়ে মানুষ হত, তার কোনও গ্যারান্টি আছে? গুন্ডার দলে নাম লিখিয়ে ব্যাটা হয়তো বোমবাজি করে বেড়াত, আর আমাকে তার হ্যাপা সামলাতে হত। না রে ভাই, তার চেয়ে এই দিব্যি আছি।'

সদানন্দবাবু সত্যিই যে 'দিব্যি' আছেন, এটা যে নেহাত কথার কথা নয়, সে তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। পার্ক সার্কাস এলাকার যে বাড়িটাতে এর আগে আমি থাকতুম, বাড়িওয়ালা সেটা বিক্রি করে দেওয়ায় বছর দশেক আগে আমি এখানে উঠে আসি। পাড়াটা ঘিঞ্জি, প্রথম-প্রথম তাই একটুও ভালো লাগত না। কিন্তু সবই তো আস্তে-আস্তে সয়ে যায়, আমারও গিয়েছে। তা ছাড়া সদানন্দবাবুর মতো একজন প্রতিবেশী যে পেয়েছি, এটাকেও আমার মস্ত একটা সৌভাগ্য বলে মনে হয়। সদানন্দ সত্যিই সার্থকনামা পুরুষ। মুখ নাকি মনের আয়না। তা সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রে সেই আয়নাটা আমি কখনও ঝাপসা হতে দেখিনি, প্রশান্ত হাস্যে ভদ্রলোকের মুখখানা একেবারে ঝকঝক করত।

হালে অবশ্য সেই ঝকঝকে মুখেই একটু-একটু মেঘ জমতে শুরু করেছিল। কিন্তু সে-কথায় একটু পরে আসছি।

সদানন্দবাবুর বয়স যে সত্তর ছাড়িয়েছে, সেটা আমি তাঁরই কাছে শুনি। দেখে অবশ্য বয়স বুঝবার উপায় নেই। ভদ্রলোকের চুল এখনও পুরোপুরি পাকেনি, সাদার হামলার বিরুদ্ধে কালো এখনও সমানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বছর দুয়েক আগে ছানি কাটিয়েছিলেন; দৃষ্টিশক্তি তার পরেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বটে, তবে দেহযন্ত্রের অন্য কোনও কলকবজায় জং ধরেছে বলে মনে হয় না। শরীর মোটামুটি পোক্ত। উদরে মেদ জমতে দেননি, টান হয়ে হাঁটাচলা করেন।

আমি রোগাভোগা মানুষ। একে তো খবরের কাগজে কাজ করি বলে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিয়ম-টিয়ম মেনে চলার উপায়ই নেই, তার ওপরে আবার নিয়ম-টিয়ম মেনে চলবার উপায় থাকলেই যে মান্যি করতুম তাও নয়। বেশ কিছুকাল ধরেই আমাকে তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। অম্বলের অসুখ তো আছেই, তার সঙ্গে জুটেছে গেঁটেবাতের যন্ত্রণা। শীত পড়লেই আঙুলের গাঁট ফুলে যায়, ভালো করে তখন কলমটা পর্যন্ত ধরতে পারি না, ব্যথায় যেন হাতখানা একেবারে ঝনঝন করতে থাকে।

সদানন্দবাবু বলেন, 'সিগারেটটা ছাড়ুন মশাই। চা অবশ্য আমিও ছাড়তে পারিনি, আপনিও পারবেন বলে মনে হয় না, তবে এই যে দিনের মধ্যে পনেরো-বিশ কাপ চা খাচ্ছেন, এটা তো একেবারে সর্বনেশে ব্যাপার। মেরেকেটে তিন কাপ পর্যন্ত চলতে পারে। ঘুম থেকে উঠে এক কাপ, সকালে জলখাবারের সময় এক কাপ আর বিকেলে এক কাপ। ব্যস, ওই হচ্ছে লিমিট। তাও দুধ নয়, চিনি নয়, স্রেফ হালকা লিকার। দেখবেন, অম্বলের অসুখ একেবারে বাপ-বাপ বলে পালাবে।'

বেজার হেসে আমি বলি, 'তা কি পারব?'

'পারতেই হবে। নইলে বাঁচবেন কী করে? আর হ্যাঁ, মর্নিং ওয়াকটা ধরুন। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, চোখমুখ ধুয়ে, হালকা এক কাপ চা খেয়ে রোজ মাইল দুয়েক হেঁটে আসুন দেখি, স্রেফ

BanglaBook.org

মাসখানেকের মধ্যেই টের পেয়ে যাবেন যে শরীরের কলকবজাগুলো আবার ঠিকমতো চলতে শুরু করেছে।'

'আপনি রোজ মর্নিং ওয়াক করেন?'

''করি বইকী।'' একগাল হেসে সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'ঘড়িতে রোজ দম দিতে হয় না? তা এই মর্নিং ওয়াকটা হচ্ছে শরীরটাকে দম দেওয়ার ব্যাপার। দমটা নিয়মিত দিচ্ছি বলেই ঘড়িটা এখনও বন্ধ হয়নি, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় কারেক্ট টাইম দিয়ে যাচ্ছে।'

এসব কথা বছর দশেক আগেকার। সদ্য তখন আমি পার্ক সার্কাস থেকে মধ্য-কলকাতার এই গলিতে এসে ঢুকেছি। খবরের কাগজে কাজ করি, দুপুর এগারোটা-বারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোই, কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা-দশটা বেজে যায়। রবিবারটা ছুটির দিন, রাস্তায় কি বাজারে সে-দিন সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়। দেখা হলে উনিও নমস্কার করেন, আমিও করি। কিন্তু কথাবার্তা বিশেষ এগোয় না।

এই রকমেরই এক রবিবারের সকালবেলা। বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরে আনাজ আর মাছের থলি নামিয়ে রেখে বসবার ঘরে ঢুকে সদ্য সেদিনকার কাগজের ওপরে চোখ বুলোতে শুরু করেছি, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি সদানন্দবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম, 'আরে কী আশ্চর্য, আসুন, আসুন।'

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকলেন, তারপর একটা সোফায় বসে হাসতে-হাসতেই বলেন, 'আপনি নতুন এসেছেন, তাই খবর নিতে এলুম কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। অবশ্য আরও আগেই আমাব আসা উচিত ছিল। কোনও ব্যাপারে যদি দরকার হয় তো নিঃসঙ্কোচে জানাবেন, যদি কিছু করতে পারি তো খুশি হয়ে করব। আমার বাড়িটা আপনি চেনেন তো?'

বললুম, 'চিনব না কেন? বলতে গেলে আমাদের প্রায় উলটোদিকেই তো আপনারা থাকেন, তাই না?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা থাকি পাঁচ নম্বরে। দোতলায় থাকি।'

'একতলায় কারা থাকেন?'

'কেউ না। একতলাটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ভাড়াটে বসাইনি, বসাবার ইচ্ছেও নেই।'

'কেন?'

'ও মশাই অনেক ঝঞ্ঝাট। আজ বলবে, রান্নাঘরের কলের ওয়াশারটা কেটে গেছে, প্লাম্বার ডেকে সারিয়ে দিন; কাল বলবে, শোবার ঘরের ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগানো যাচ্ছে না, ছুতোর ডেকে আনুন। ওসব ঝঞ্ঝাট কে সামলাবে? এক-একটা ভাড়াটে এমন পাজি হয় যে, সে আর কহতব্য নয়।'

আমার বাড়ি নেই, অন্যের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আছি, তাই সদানন্দবাবুর কথায় আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারলুম না। কাষ্ঠ হেসে বললুম, 'তা বটে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ও-কথা ছাড়ুন। এখন কী জন্যে এসেছি তা-ই বলি। কাল বিকেলে আপনার মিসেস আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

বললুম, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার গিন্নিরও তাই আসা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বাতের রুগি, হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়, তাই আমাকে একাই আসতে হল। তা ছাড়া আরও এইজন্যে এলুম যে, আপনার অসুখের কথা আমি শুনেছি। ওটা আমি সারিয়ে দেব।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আমার আবার কী অসুখ?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সে কী, আপনার হাইপার-অ্যাসিডিটি নেই? বুক-জ্বালা নেই? চোঁয়া-ঢেকুর ওঠে না? আপনার স্ত্রী তো আমার স্ত্রীকে কাল তা-ই বলে এলেন।'

BanglaBook.org

বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকল। সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার গলা শুনে এলুম। এক্ষুনি চলে যাবেন না যেন। চা করে আনছি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা আনুন, তবে চায়ের সঙ্গে দুধ-চিনি চলবে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ডাক্তারের নিষেধ?'

'ডাক্তারের নয়, গুরুর নিষেধ। গুরু মানে সাক্ষাৎ মহাগুরু, অর্থাৎ আমার পিতৃদেব। তিনি বলতেন, চা খাচ্ছ খাও, কিন্তু খবরদার, তার সঙ্গে দুধ-চিনি খাবে না। খেয়েছ কি মরেছ, সারা জীবন অম্বলের ব্যথায় কষ্ট পেতে হবে।'

আমি বললুম, 'তা-ই?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'অফ কোর্স। সার পি. সি. রায় বলতেন, চা-পান মানেই বিষপান, আব আমার স্বর্গত পিতৃদেব বলতেন, বিষপান তো বটেই, তবে কিনা দুধ চিনি মিশিয়ে যদি খাই।'

বাসন্তী বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার জন্যে স্রেফ লিকাব, কেমন?'

'হ্যাঁ, স্রেফ লিকার, তাও খুব হালকা হওয়া চাই।'

বাসন্তী চলে গেল।

সদানন্দবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দিনে আপনি ক'কাপ চা খান?'

হেসে বললুম, 'কী করে বলব? গুনে তো কখনও দেখিনি।'

'তাও?'

'তা পনেরো-বিশ কাপ তো বটেই।'

'দুধ-চিনি মিশিয়ে?'

'বিলক্ষণ।'

'সিগারেটও পনেরো-বিশটা?'

'পনেরো-বিশটা কী বলছেন, চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো হবেই।'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্রেফ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তা হলে মশাই আমি তো কোন ছার, বিধান রায় বেঁচে নেই, কিন্তু বেঁচে থাকলেই বা কী হত, তিনিও আপনাকে বাঁচাতে পারতেন না। যদি বাঁচতে চান তো সিগারেট ছাড়ুন, আর চা-ও মাত্র তিন কাপ, তাও দুধ-চিনি না দিয়ে স্রেফ হালকা লিকার। পাববেন?'

'পারা শক্ত। কিন্তু যদি পারি, মানে ধরুন যে, আমি পেবেই গেলুম, তা হলেই কি আব অম্বল আমাকে জ্বালাবে না?'

চওড়া হেসে সদানন্দবাবু বললেন, 'তবে আর বলছি কী। অম্বল কি আর আপনাব একার অসুখ, এই কলকাতার অন্তত নাইনটি পার্সেন্ট লোক অম্বলে ভোগে। অম্বল আমার গিন্নিরও ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। কেন নেই? না মাথার দিব্যি দিয়ে আমি তাঁর ওই দুধ-চিনি দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যেসটা ছাড়িয়েছি। বাতব্যাধিও ছাড়িয়ে দিতে পারতুম। পারলুম না কেন জানেন?'

'কেন?'

কাজের মেয়েটি এসে চা-জলখাবার দিয়ে গেল। সদানন্দবাবুর জন্যে স্রেফ হালকা লিকার। ভদ্রলোক তাঁর জলখাবারের প্লেটটা ছুঁলেন না পর্যন্ত। বললেন, 'জলখাবার আমি খেয়ে এসেছি, এক সকালে দুবার জলখাবার খেতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আপনাদের এখানে চা খেতে বলবেন, সেটা জানতুম তো, তাই বাড়িতে আর সেকেন্ড কাপ চা খাইনি।'

ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিলেন, তারপর বললেন, 'কী কথা যেন হচ্ছিল?'

'আপনার স্ত্রীর বাতব্যাধি কেন সারাতে পারলেন না, সেই কথা।'

'ও হ্যাঁ, তা হলে শুনুন, রোজ যদি আমার সঙ্গে বেরিয়ে দু-মাইল মর্নিং ওয়াক করতেন,

BanglaBook.org

তা হলে ওটাও সেরে যেত। তা ভদ্রমহিলা সকাল সাতটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না যে।'

'মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছিলুম বইকী, কিন্তু তাও পারলেন না। আরে মশাই, সাতটায় ঘুম থেকে উঠলে কি আর মর্নিং ওয়াক হয়? তখন রোদ্দুর উঠে যায়। হাঁটায় তখন আর মজা থাকে না।'

নিজের চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাসন্তী ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিল। বলল, 'আপনি কখন ঘুম থেকে ওঠেন?'

'সাড়ে চারটেয়।'

'ওরে বাবা,' বাসন্তী যেন আঁতকে উঠল, 'ওই সময়ে ওঠা যায় নাকি?'

'কেন যাবে না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেই তাড়াতাড়ি ওঠা যায়। আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ...ছেলেবেলায় পড়া সেই ছড়াটা তো আর ভুলে যাইনি, তাই সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি, আর উঠেও পড়ি কাঁটায়-কাঁটায় একেবারে সাড়ে চারটেয়। হিসেব করে দেখুন, ঝাড়া সাত ঘণ্টা ঘুমোই। কম হল?'

ঢোক গিয়ে বললুম, 'না, তা হল না বটে, তবে অত সকাল-সকাল শুয়ে পড়ব কী করে? অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে-ফিরতেই তো দশটা বেজে যায়। তারপর খাওয়া আছে, টুকটাক লেখাপড়ার কাজও থাকে, শুতে-শুতে সেই বারোটা। সকাল সাতটার আগে তা হলে আর কী করে উঠব। মর্নিং ওয়াকই বা কী করে করব?'

সদানন্দবাবুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হলে আর আমাব কিছু করবার নেই। মর্নিং ওয়াক না-কবলে আপনার কর্তার ওই গেঁটে বাত সারবে না। তবে সিগারেটটা যদি ছাড়িয়ে দিতে পারেন, আর দুধ-চিনি বাদ দিয়ে আমি যেরকম চা খেলুম, কিরণবাবুর যদি তাতে আপত্তি না হয়...তবে হ্যাঁ, তিন কাপের বেশি খাওয়া চলবে না...অম্বল তা হলে সারবেই।'

বাসন্তী বলল, 'ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই?'

'কিচ্ছু না। আজ তা হলে চলি। পরে আবার খবর নেব।'

সদানন্দবাবু চলে গেলেন।

তা এ হল দশ বছর আগের কথা। সদানন্দবাবুর কথামতো আমি মর্নিং ওয়াকটা ইতিমধ্যে ধরতে পারিনি বটে, তবে চায়ের পেয়ালা থেকে দুধ-চিনি একেবারে বাদ দিয়েছি। সিগারেটটা অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছি না, তবে আগের চেয়ে অনেক কম খাই। মেরেকেটে চার-পাঁচটা। তা দেখছি, ভদ্রলোক মোটেই বাড়িয়ে বলেননি। সত্যি আর এখন আমার অম্বল হয় না, বুকজ্বালা করে না, চোঁয়া ঢেকুরও ওঠে না। গেঁটে বাতের ব্যাপারটা অবশ্য এখনও আমাকে সমানে জ্বালাচ্ছে। তাই ভাবছিলুম যে, শিগগিরই তো রিটায়ার করব, তখন তো আর রাত দশটায় বাড়ি ফিরতে হবে না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব, উঠেও পড়ব তাড়াতাড়ি, তারপরে সদানন্দবাবুর সঙ্গে রোজ বেরিয়ে পড়ব মর্নিং ওয়াক করতে।

সদানন্দবাবুও আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কথায়-কথায় সেদিন বললেন, 'দেখলেন তো, সিগারেটটা কমিয়ে দিয়ে শুধু যে অ্যাসিডিটির হাত থেকে বেঁচে গেলেন তা নয়, সর্দিকাশিও বলতে গেলে আর আপনার হয় না। তা ছাড়া দমও বেড়েছে। তা এখন এই দমটাকে কাজে লাগান। মর্নিং ওয়াক করুন, রোজ শেষ রাত্তিরে বেরিয়ে পড়ুন আমার সঙ্গে। মাইল দুয়েক হাঁটুন। ঘাম ঝরান। দেখবেন, অম্বল যেভাবে হটেছে, গেঁটেবাতও ঠিক সেইভাবেই হটে যাচ্ছে। কী, বেরিয়ে পড়বেন আমার সঙ্গে?'

বললুম, 'এখন নয়। রিটায়ার করি, তারপর বেরুব।'

সেইরকমই কথা ছিল, কিন্তু তা আর হল না। তার আগেই খুন হয়ে গেল নকুল বিশ্বাস। আর ভাড়াটে খুন হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার বাড়িওয়ালা সদানন্দ বসুও গ্রহের ফেরে পড়ে গেলেন।

॥ ২ ॥

সদানন্দবাবুর মুখে যে কিছু-কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। ব্যাপারটা আমি প্রথম লক্ষ করি চার-পাঁচ বছর আগে। রবিবার। সকালবেলা। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে বাজার করতে গিয়েছি, সেখানে ফলপট্টিতে হঠাৎ সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাকে দেখে হাসলেন, দুটো-চারটে কথাও হল, কিন্তু লক্ষ করলুম যে, হাসিটা একটু শুকনো, কথাবার্তাতেও যেন আগেকার সেই প্রাণখোলা ভাবটা আর নেই। ভণিতা না-করে জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'কীসের ব্যাপার?'

'এই মানে কেমন যেন ঝিম মেরে রয়েছেন। মিসেসের সেই বাতের কষ্টটা আবার বেড়েছে নাকি?'

ভদ্রলোক তাতে ক্লিষ্ট হেসে বললেন, 'না মশাই, সেসব কিছু নয়, গিন্নি মোটামুটি ভালোই আছেন।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কী, মাঝে-মধ্যে একটু গম্ভীরও হতে পারব না? ও-কথা থাক, আপনি তো রোজ বৈঠকখানা বাজারে যান, আজ হঠাৎ এদিকে?'

বললুম, 'বৈঠকখানা বাজারে রবিবারে বড্ড ভিড় হয়, তাই আর আজ ওদিকে যাইনি।'

এর পরে আর কোনও কথা হল না। বুঝতে পারলুম, কিছু একটা হয়েছে ঠিকই, তবে ভদ্রলোক সেটা চেপে যেতে চাইছেন। এসব ক্ষেত্রে বেশি-কিছু বলতে যাওয়াও ঠিক নয়, তাই আর কথা বাড়ালুম না, ফলপট্টিতে যা কেনাকাটা করবার ছিল, সেটা চুকিয়ে ফের বাজারে গিয়ে ঢুকলুম।

বাড়ি ফিরে বাজারের থলি দুটো বাসন্তীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম, 'সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হল।'

'কোথায়?'

'বাজারে। তা তুমি তো প্রায়ই ও-বাড়িতে যাও, কিছু জানো?'

অবাক হয়ে বাসন্তী বলল, 'কী জানব?'

'এই মানে ভদ্রলোককে কেমন যেন বেজার ঠেকল।'

বাসন্তী বলল, 'এই ব্যাপার? আমি ভাবলুম কী না কী! তা একটু বেজার তো উনি হতেই পারেন।'

'তার মানে?'

'মানে আর কী,' বাসন্তী বলল, 'এই যে সারাজীবন আমরা ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে গেলুম, নিজের বাড়ি তৈরি করতে পারলুম না, এখন দেখছি একপক্ষে সেটা ভালোই হয়েছে।'

বাসন্তীর অনেক গুণের মধ্যে এই একটা মস্ত দোষ। সব কথাই সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলে, ফলে কী যে বলছে, চট করে সেটা বোঝা যায় না।

বললুম, 'কথাটা একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'বুঝিয়ে বলবার তো কিছু নেই। এ তো খুবই সহজ কথা। ধরো কলকাতা শহরে তোমার

BanglaBook.org

যদি একটা বাড়ি থাকত, আর ভাড়াটে বসাতে চাও না বলে সেই বাড়ির একতলাটা যদি তুমি খালি ফেলে রাখতে, আর পাড়ার ছেলেরা যদি এসে তোমাকে বলত যে, মেসোমশাই, আপনার একতলাটা তো ফাঁকাই পড়ে রয়েছে, ওটা আমাদের দিয়ে দিন, আমরা ওখানে আমাদের ড্রামাটিব ক্লাব করব, তো তুমি বেজার হতে না?'

'পাড়ার ছেলেরা সদানন্দবাবুকে তাই বলেছে বুঝি?'

'কুসুমদি তো তা-ই বললেন।'

কুসুমদি মানে কুসুমবালা বসু। সদানন্দবাবুর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার শুনেছি অনেক গুণ। ছেলেপুলে হয়নি বলে হাতে বিস্তর সময় ছিল, সেই সময়টাকে নষ্ট না করে তিনি রান্না, সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি হরেক বিদ্যার চর্চা করেছেন। দেশি-বিদেশি নানান রকম রান্না জানেন, পাড়ার মেয়ে-বউরা সেসব তাঁর কাছে শিখতেও যায়। তা ছাড়া যায় ব্লাউজ, পাঞ্জাবি, শার্ট, স্কার্ট, ইজের, প্যান্ট, ফ্রক ইত্যাদির ছাঁটকাট আর সেলাইয়ের ব্যাপারে তালিম নিতে। বাসন্তীও যায়।

বললুম, 'ও-বাড়িতে শেষ কবে গিয়েছিলে?'

'পরশু দুপুরে।' বাসন্তী বলল, 'সোয়েটার বোনার একটা নতুন প্যাটার্ন শিখতে গিয়েছিলুম। তা কথায়-কথায় কুসুমদি বললেন, এ কী উৎপাত হল বলো তো ভাই, হইচই চিৎকার চেঁচামেচি সহ্য হয় না বলে একতলাটা ভাড়া দিইনি, এখন পাড়ার ছেলেরা এসে বলছে যে একতলাটা তাদের ড্রামাটিক ক্লাবের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ওরে ব্বাবা, সে তো আরও মারাত্মক ব্যাপার! ড্রামাটিক ক্লাব মানেই তো রিহার্সাল, আর রিহার্সাল মানেই তো তুমুল হট্টগোল। বলতে গেলে আমাদেব সামনেই তো ওদের বাড়ি! কাণ্ডটা কী হবে, সেটা বুঝতে পেরেছ?'

বাসন্তী বলল, 'পারব না কেন। ওখানে যদি ড্রামাটিক ক্লাব হয় তো তার রিহার্সালের ঠেলায় শুধু সদানন্দবাবুদেব কেন, আমাদের কানও ঝালাপালা করে ছাড়বে।'

'এর চেয়ে ভাড়াটে বসানো অনেক ভালো ছিল।'

'ছিলই তো। কুসুমদিও সে-কথা বুঝতে পেরেছেন। বলছেন যে, ভাড়াটে বসালে আজ আর এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না।'

'তা সেটা তো এখনও বসানো যায়।'

'যায়ই তো। সদানন্দবাবু শুনলুম দালালও লাগিয়েছেন তার জন্যে। বলেছেন যে, সেলামি চাই না, ভাড়াও যা পারে দিক, তবে কিনা দেরি করা চলবে না, সামনের মাসের পয়লা থেকেই ভাড়াটে বসাতে হবে।'

হেসে বললুম, 'বোঝো ব্যাপার! কলকাতা শহরে আজকাল বাড়ি ভাড়া বলতে গেলে পাওয়াই যায় না, দু-খানা ঘরের জন্যে লোকে মাথা খুঁড়ে মরছে, আর এদিকে সদানন্দবাবুর অবস্থা দ্যাখো, না চান বেশি ভাড়া, না চান সেলামি, স্রেফ একটি ভাড়াটে পেলেই ভদ্রলোক এখন বর্তে যান।'

একটু অপেক্ষা করতে পারলে নিশ্চয় মোটামুটি শিক্ষিত আর ভদ্র একটি পরিবারকে ভাড়াটে হিসেবে পাওয়া যেত। তাড়াহুড়োর ফলে সেটা পাওয়া গেল না। সদানন্দবাবুকে সেজন্যে দোষ দেওয়া অর্থহীন, ভদ্রলোকেরও সত্যিই তখন অপেক্ষা করবার অবস্থা নয়। একেবারে শিরে-সংক্রান্তি অবস্থা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভাড়াটে বাছাবাছি করতে গেলে যে কালক্ষেপ হবার সম্ভাবনা, একতলাটা তার মধ্যে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

তা নকুলচন্দ্র বিশ্বাস যে আজ থেকে মোটামুটি চার বছর আগে পাঁচ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরি লেনের একতলার ভাড়াটে হয়ে এই গলিতে এসে ঢুকল, এই হচ্ছে তার ইতিহাস। দিনটার কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেও ছিল এক রবিবার। অফিসে আমার অফ ডে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। মে মাসের মাঝামাঝি। আষাঢ়স্য প্রথম দিনটিকে যদি বর্ষাকালের সূচনা-দিবস

BanglaBook.org

বলে গণ্য করি, তো সেই হিসেবমতো বর্ষা নামতে এখনও অন্তত মাস খানেক বাকি, অথচ গত পনেরো দিনের মধ্যে একটিবারও কালবৈশাখীর ঝড় ওঠেনি, ফলে তাপাঙ্ক যেন চড়চড় করে চড়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পিচ-টিচ গলে গিয়ে একেবারে একাকার। মনে হচ্ছিল, দুপুরের গনগনে রোদ্দুরে গোটা শহর যেন ঝলসে যাচ্ছে। তার আঁচ থেকে বাঁচবার জন্যে জানলা-দরজা বন্ধ করে, আমাদের শোবার ঘরটাকে একেবারে অন্ধকার করে নিয়ে, মেঝের ওপরে একটা বালিশ ফেলে সদ্য তখন আমি দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছি, এমন সময় বাসন্তী এসে বলল, 'দেখে যাও।'

রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, সদানন্দবাবুর বাড়ির সামনে একটা ঠেলাগাড়ি এসে থেমেছে। ঠেলার পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটির বয়স বছর চল্লিশ, বউটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। দুপুরের রোদ্দুরে দরদর করে ঘামতে-ঘামতে তারা ঠেলাওয়ালার সঙ্গে ধরাধরি করে মালপত্রগুলিকে একটা-একটা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে ঢোকাচ্ছে। সদানন্দবাবুও ওপর থেকে নেমে এসে তাদের সাহায্য করছেন সাধ্যমতো। মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে সবকিছু ভেতরে ঢুকে গেল।

সদানন্দবাবু আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। যথারীতি হাসলেন। মনে হল, হাসিটা যেন আর তত ক্লিষ্ট নয়। আমিও হাসলুম। কিন্তু কোনও কথা হল না।

ঠেলাওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। বউটি আগেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এবারে ভাড়াটেকে নিয়ে সদানন্দবাবুও রাস্তা থেকে ভেতরে ঢুকলেন। সদর-দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভাড়াটের নাম কী, আগে কোথায় থাকত, কাজকর্ম কী করে, সেসব কথা তখনও আমি কিছুই জানি না।

পরদিন জানা গেল।

মনে আছে যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন অনেক সকাল-সকাল আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছিল। বলতে গেলে প্রায় ভোরবেলাতেই বাসন্তী আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, কাজের মেয়েটি আজ আর আসতে পারবে না বলে খবর পাঠিয়েছে, তাই আমাকেই যেতে হবে হরিণঘাটার দুধ আনতে।

চটপট মুখ-চোখ ধুয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি, সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা।

বললুম, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'দুধ আনতে। রোজই তো এই সময়ে আমি দুধ নিয়ে ফিরি।'

'তাই বুঝি? আমি দেখছি কিছুই জানি না।'

একগাল হেসে সদানন্দবাবু বললেন, 'কী করে জানবেন? আপনার ঘুমই তো মশাই সাতটার আগে ভাঙে না। তা আজ এত সকাল-সকাল উঠে পড়েছেন যে?'

বললুম, 'কাজের মেয়েটি আসেনি। তাই আমাকেই আজ দুধ আনতে হবে।'

'ভালো, ভালো, খুব ভালো।' সদানন্দবাবু বললেন, 'কাজের মেয়েটি যদি মাঝে-মাঝেই এইরকম কামাই করে তো খুব ভালো হয়। রোজ না হোক, অন্তত মাঝে-মাঝে তা হলে আর আপনার সকাল-সকাল না-উঠে উপায় থাকে না।'

কথাটার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, পিছন থেকে সদানন্দবাবু আবার ডাকলেন। বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। নকুল কিন্তু লোকটি নেহাত খারাপ নয়।'

'কে নকুল?'

'ওই কাল দুপুরে যাকে দেখলেন। নকুল বিশ্বাস...মানে একতলাটা যাকে ভাড়া দিলুম আর কি। ভাড়া অবিশ্যি খুবই কম, মাত্র একশো টাকা। তা কী আর করা যাবে, খুব তাড়াহুড়ো করে ভাড়াটে বসাতে হল তো, নইলে নিশ্চয় অনেক বেশি ভাড়া পাওয়া যেত।'

বললুম, 'তা যেত বইকী।'

BanglaBook.org

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হোক, আমি তো আর টাকার জন্যে ভাড়া দিইনি, ভাড়া না-দিলে গোটা একতলাটাই ওই বখাটে ছেলেগুলো দখল করে নিত, তাই দিয়েছি। ভাড়া না-হয় কমই পেলুম, হল্লাবাজির হাত থেকে বাঁচলুম তো, সে-ই ঢের।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আর তা ছাড়া একশো টাকার বেশি দেবেই বা কী করে?'

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। এর পরে গেলে হয়তো শুনতে হবে যে, দুধ ফুরিয়ে গেছে। বললুম, 'পরে কথা বলব, এখন চলি।'

দুধ নিয়ে বাড়ি ফিরে বাসন্তীকে বললুম, 'শুনেছ?'

রান্নাঘর থেকে বাসন্তী বলল, 'কী শুনব?'

'সদানন্দবাবু তাঁর একতলাটা মাত্র একশো টাকায় ভাড়া দিলেন।'

'শুনেছি।'

বললুম, 'তুমি তো বলো কুসুমদির মতন মানুষ নাকি হয় না, অথচ কই, তোমাকে তো একবারও ওঁদের একতলাটা ভাড়া নেবার কথা বলেননি।'

'বলেছিলেন তো।'

'সে কী, এখানে আমরা তিনশো টাকা ভাড়া দিচ্ছি, তার জায়গায় একশো টাকাতেই হয়ে যেত। তবু রাজি হলে না?'

কাজের মেয়ে না-আসার জন্যেই বোধহয় বাসন্তীর মেজাজ বিশেষ ভালো ছিল না। রান্নাঘর থেকেই চড়া গলায় বলল, 'কেন রাজি হব? একে তো একটা বাড়ি করতে পারোনি, তার ওপরে আবার দোতলার ফ্ল্যাট থেকে একতলায় নামাতে চাইছ। কী না ভাড়া মাত্তর একশো টাকা। তোমার লজ্জা করে না?'

ওরে বাব্বা, এ তো দেখছি রেগে একেবারে যজ্ঞিবাড়ির উনুন হয়ে রয়েছে! আর কথা না বাড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে খবরের কাগজের হেডলাইনে চোখ বুলোতে লাগলুম।

খানিক বাদেই সদানন্দবাবু এলেন। বললেন, 'অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম না তো?'

বললুম, 'আরে না মশাই, কী যে বলেন! বসুন, চায়ের কথা বলে আসছি।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'আপনার যদি খেতে হয় তো খান, আমি এখন চা খাব না। আমার সেকেন্ড কাপ অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছে। আর থার্ড কাপ খাব সেই বিকেলবেলায়। আপনি তো জানেনই যে, তিন কাপের বেশি চা আমি খাই না, ওটাই হচ্ছে লিমিট।'

সত্যি কথা বলতে কী, সদানন্দবাবু যে এখন চা খাবেন না, এইটে জেনে ভারী স্বস্তি পাওয়া গেল। বাসন্তীর যা মেজাজ দেখলুম, তাতে তাকে চায়ের কথা বলতে বিশেষ ভরসা হচ্ছিল না।

বললুম, 'তখন দুধ আনতে যাচ্ছিলুম তো, তাই তাড়া ছিল, আপনার কথা ঠিকমতো শোনা হয়নি। তা ভাড়াটে তা হলে ভালোই পেয়েছেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে। আমি মশাই শান্তিপ্রিয় লোক, আমদানি না হয় একটু কমই হল, লোকটা মোটামুটি ঠান্ডা স্বভাবের হলেই আমি খুশি। তা নকুলকে তো ঠান্ডা স্বভাবের লোক বলেই মনে হচ্ছে। এখন দেখা যাক।'

'আগে ওঁরা কোথায় থাকতেন?'

'শ্রীমানী মার্কেটের পাশের গলিতে। একটা মাত্তর ঘর নিয়ে থাকত। তাতে অসুবিধে হচ্ছিল। নকুলের কাছে লোকজন আসে, তা ঘর তো একটাই, বাইরের লোককে ঘরে ঢুকিয়ে কথাবার্তা বলতে হলে বউয়ের অসুবিধে হয়, তাই দু-কামরাওলা ফ্ল্যাট খুঁজছিল।'

'কী করেন ভদ্রলোক?'

'অর্ডার সাপ্লাই। ডালহৌসি পাড়ার অফিসে-অফিসে ঘুরে খোঁজ নেয় কার কী দরকার, তারপর মাল সাপ্লাই করে। ওই আর কি, সস্তায় মাল কিনে কিছুটা মার্জিন রেখে বিক্রি করার ব্যাপার।

BanglaBook.org

খুব একটা হাতিঘোড়া রোজগার করে বলে মনে হয় না, তবে চলে যায়।'

ভাড়াটে হিসেবে নকুলের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট যা বুঝলুম, সেটা অবশ্য এই যে, তারা লোক মাত্র দুটি।

সদানন্দবাবু উঠে পড়লেন। তারপর চলে যেতে-যেতে দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললেন, 'কী জানেন, সংখ্যাটা যে আর বাড়বে, তাও মনে হয় না। বউটির বয়েস অন্তত তিরিশ তো হবেই, তা এখনও যখন ছেলেপুলে হয়নি, তখন আর কবে হবে?'

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকল। বললুম, 'সদানন্দবাবু এসেছিলেন।'

'কী বললেন?'

'বললেন যে, উনি যেমন নিঃসন্তান, ওঁর ভাড়াটেরও তেমনি নাকি ছেলেপুলে হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ভদ্রলোককে খুব খুশি বলে মনে হল।'

বাসন্তী হেসে বলল, 'খুশি তো হবেনই। যেমন বাড়িওয়ালা, তেমনি ভাড়াটে। এ তো একেবারে সোনায় সোহাগা।'

তা এও হল চার বছর আগের কথা।

॥ ৩ ॥

এই কাহিনির শুরু হয়েছে একেবারেই দিন কয়েক আগের একটা ঘটনা দিয়ে। কিন্তু তার পরেই আবার পিছিয়ে গিয়েছি। কখনও বলেছি বছর দশেক আগের কথা, কখনও বলেছি বছর চারেক আগের। এমনটা কিন্তু মাঝে-মাঝেই ঘটতে পারে। অর্থাৎ কখনও পিছিয়ে যাব, আবার কখনও এগিয়ে আসব। ঘটনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবেও পরপর সাজিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু এই কাহিনির রস তা হলে জমত না।

আমার মনে হয়, আমাদের এই গলিটার একটা বর্ণনা এখানে দেওয়া দরকার। পীতাম্বর চৌধুরি লেন যে মধ্য-কলকাতার শেয়ালদা অঞ্চলে, সেটা অবশ্য আগেই বলেছি। এর একটা মুখ আপার সার্কুলার রোডে, অর্থাৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে পড়েছে, আর অন্য মুখ পড়েছে হ্যারিসন রোডে, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী রোডে। এখান থেকে শেয়ালদা ইস্টিশানে হাঁটাপথে মাত্র তিন-চার মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়, আর বাসে উঠে—রাস্তায় যদি না জ্যাম থাকে, তো—হাওড়া ইস্টিশানে পৌঁছতে মিনিট পনেরোর বেশি সময় লাগে না। ইস্কুল-কলেজের সুবিধেও বিস্তর। রাস্তা পার হলেই রিপন কলেজ, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বঙ্গবাসী। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, মিত্র মেইন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, সবই হাঁটা-পথের চৌহদ্দির মধ্যে, তা ছাড়া, আপার সার্কুলার রোড ধরে রাজাবাজারের দিকে খানিকটা হাঁটলেই ভিক্টোরিয়া কলেজে পৌঁছে যাচ্ছেন। যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদেরও লেখাপড়ার এত সুবিধে এই শহরে আর কোথাও আছে বলে জানি না। সেন্ট পল্‌স কলেজও এখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা-পথ।

হাট-বাজারেরও বিস্তর সুবিধে। যেমন এদিকে রয়েছে বেঠকখানা বাজার আর কোলে মার্কেট, তেমনি ওদিকে রয়েছে কলেজ স্ট্রিটের বনেদি বাজার। বাস ট্রাম ইত্যাদিও একেবারে দোরগোড়ায়। সত্যি বলতে কী, এত সব সুবিধে পাচ্ছি বলেই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের দোতলার এই ফ্ল্যাটটা আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

বাসন্তীর পছন্দ হয়নি। ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'কী যে তোমার পছন্দ, বুঝি না বাপু। এইরকমের ঘিঞ্জি জায়গায় মানুষ থাকতে পারে। আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

তা পাড়াটা যে ঘিঞ্জি, তাতে সন্দেহ নেই। গলিটাও একে এঁদো, তায় সিধে-সরল নয়। এদিককার বড়রাস্তা থেকে শুরু হয়ে তিন-চারটে পাক খেয়ে তারপর ওদিককার বড়রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। লাঠির বাড়ি লাগলে সাপ যেভাবে মোচড় খায়, এও প্রায় সেইরকমের ব্যাপার।

পীতাম্বর চৌধুরি লেনের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁদের কেউই যে খুব অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, এমন মনে হয় না। তাঁদের মধ্যে ছোটখাটো ব্যবসায়ী, দোকানদার ও দালাল-শ্রেণির লোক জনাকয় আছেন বটে, তবে অধিকাংশই চাকুরে। পুরুষানুক্রমে তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি অফিসে চাকরি করে যাচ্ছেন। সকাল ন'টা সাড়ে-ন'টার মধ্যে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন, তারপর সারাটা দিন অফিসে কাটিয়ে বিকেল ছ'টা সাড়ে-ছ'টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে, স্নান সেরে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিয়ে, বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে গল্পগুজব করেন, আর কোঁচার খুঁট কি রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া খান।

বাড়িগুলো যে তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে কি তারও আগে তৈরি হয়েছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। চুন-সুরকি দিয়ে গেঁথে তোলা মোটা-দেওয়ালের পেটা-ছাতের বাড়ি। সে-কালের কর্তারা হয়তো মিস্ত্রি ডেকে মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো মেরামতি কি দাগরেজির কাজ করিয়ে নিতেন। এ-কালের কর্তাদের না আছে তেমন ট্যাঁকের জোর, না আছে ভাগের বাড়িতে পয়সা ঢালার উৎসাহ। ফলে মেরামতি যেমন হয় না, তেমনি জানলা-দরজাতেও আর নতুন করে রঙের প্রলেপ পড়ে না। কোনও-কোনও বাড়িতে বোধহয় গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে চুনকামের কাজও হয়নি। অধিকাংশ বাড়ির অবস্থাই অতি লজ্ঝড়। চৌত্রিশ সালে সেই যে একটা ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল, তার ধাক্কাটা যে এসব বাড়ি কী করে সামলে নিল তা কে জানে, তবে কিনা আবার যদি তেমন কোনও ভূমিকম্প হয় তো এ-গলির প্রত্যেকটা বাড়িই হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। আলসেয় বটগাছের চারা, বর্ষাকালে ফাটা রেনপাইপ দিয়ে ছড়ছড় করে চতুর্দিকে জল পড়তে থাকে। রাস্তা দিয়ে তখন খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই পাইপের নোংরা জল পড়ে জামাকাপড় ভিজে যাবার আশঙ্কা। বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে, ফলে ভেতরকার গাঁথনির ইঁট এমনভাবে দাঁত বার করে রয়েছে যে, তার ওপরে চোখ পড়বামাত্র অতিশয় অশ্লীল একটা উপমা অনেকের মাথায় আসবে, মনে হবে, বাড়িগুলো যেন তাদের পরনের কাপড় তুলে উদোম হয়ে সর্বজনকে নিজেদের খোস-পাঁচড়া দেখাতে পারার একটা উৎকট উল্লাসে সারাক্ষণ নিঃশব্দে হেসে চলেছে।

যে-বাড়িতে আমরা আছি, সেটাও কিছু ব্যতিক্রম নয়, মোটামুটি এই একই রকমের। তিনতলা বাড়ি। মালিকের অবস্থা ভালো নয়। তিনি রিটায়ার করেছেন, কিন্তু তিনটে ছেলের একটাও মানুষ হয়নি, তা ছাড়া দুই মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। এদিকে ছেলে তিনটে যদিও কোনও কাজকর্ম করে না, তাদের মধ্যে বড় আর মেজো ইতিমধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে। বাড়িওলার পরিবারটি অতএব নেহাত ছোট নয়। তিনতলার তিনটে ঘর নিয়ে তিনি থাকেন; খুব যে হাত-পা ছড়িয়ে থাকেন না, সেটা সহজেই বুঝতে পারি। একতলার ভাড়াটেরা সম্ভবত গত পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে রয়েছে। ভাড়া দেয় যৎসামান্য, তাও ঠিকমতো দেয় না শুনেছি, কিন্তু কিছু করবারও নেই, মামলা করেও বাড়িওয়ালা তাদের তুলে দিতে পারছেন না। বাকি রইল দোতলা। সেখানে আমরা থাকি। আমরা মানে আমি, বাসন্তী আর আমাদের ছোট মেয়ে। ছেলেকে কর্মসূত্রে বাইরে থাকতে হয়, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট মেয়ে ব্রেবোর্ন কলেজে পড়ে, এখান থেকে বাসে উঠে চটপট কলেজে পৌঁছে যায়, কোনও অসুবিধে হয় না।

যা কিছু অসুবিধে ছিল, তা এই পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়ির ফ্ল্যাটটা নিয়েই। তবে সেটাও আমি নিজের উদ্যোগে যতটা সম্ভব মিটিয়ে নিয়েছি। ফ্ল্যাটটা যখন দেখতে আসি, তখনই বুঝেছিলুম যে, দেওয়ালের পলেস্তারা থেকে জানলা-দরজা, অনেক-কিছুই সারিয়ে-সুরিয়ে নিতে হবে। বাড়িওয়ালাকে

BanglaBook.org

সেলামি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল, কিন্তু মেরামতির বাবদে তা থেকে তিনি একটি পয়সাও খরচ করতে রাজি হলেন না। বললেন যে, অ্যাডভান্স বাবদ যদি আরও হাজার কয়েক টাকা দিই, তো তাই দিয়ে তিনি মেরামতি করিয়ে দেবেন। তা টাকাটা তাঁকে দিয়েওছিলুম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কিছুই করলেন না। বারকয় তাগাদা দিতে লজ্জিত গলায় বললেন যে, তিনি অভাবী মানুষ, টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন। ফলে, যা-কিছু মেরামতির কাজ ছিল, আবার কিছু গাঁটগচ্চা দিয়ে সেগুলি করিয়ে নিয়ে তারপর আমাকে এই নতুন আস্তানায় এসে উঠতে হয়।

পাঁচ নম্বর বাড়িটার চেহারা কিন্তু এতসব পুরোনো লজ্‌ঝড় বাড়ির মধ্যেও একটু অন্যরকম। বয়স অবশ্য সেটারও কিছু কম হয়নি। সদর-দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে বর্ডার-দিয়ে বসানো শ্বেতপাথরের ট্যাবলেট পড়ে যেমন বোঝা যায় যে, বাড়িটার নাম শ্যাম-নিবাস, তেমনি সেই নামের নীচে ১৮৭০ দেখে মালুম হয় যে, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে এ বাড়ি তৈরি হয়েছিল। তৈরি করিয়েছিলেন সদানন্দের প্রপিতামহ শ্যামানন্দ বসু। পাথরের ট্যাবলেটটা অবশ্য তাঁর লাগানো নয়। সদানন্দের পিতামহ দয়ানন্দ বসু ওটা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লাগিয়ে দিয়ে তাঁর পিতৃভক্তির প্রমাণ রেখেছিলেন।

পীতাম্বর চৌধুরি লেনের বেশির ভাগ বাড়িই পার্টিশান হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। কালক্রমে শরিকের সংখ্যা তো বেড়েই যায়, ছোটখাটো নানা ব্যাপার নিয়েও তখন ঝগড়াঝাঁটি লাগতে থাকে, যৌথ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে চৌচির হয়, ফলে বাড়িটাও আর পার্টিশান না করে উপায় থাকে না। এখানেও সেই একই ব্যাপার হয়েছে।, কিছু-কিছু বাড়িতে তো যত ঘর, তত শরিক। পাঁচ নম্বর বাড়িটাও শরিকে-শরিকে ভাগ হয়ে যেতে পারত। তা যে হয়নি, তার কারণ আর কিছুই নয়, শ্যামানন্দের সময় থেকেই এ-বাড়ির মালিকদের কারও একাধিক পুত্রসন্তান হয়নি। ব্যাপারটা পরিকল্পিত নয় নিশ্চয়ই, পরিবার-পরিকল্পনা নেহাতই এ-কালের ব্যাপার, সদানন্দের পূর্বপুরুষরা এতসব প্ল্যানিংয়ের ধারা ধারতেন না। তবু যে তাঁদের প্রত্যেকেরই মাত্র একটি করে পুত্র, এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপারই বলতে হবে। শ্যামানন্দের একমাত্র পুত্রসন্তান দয়ানন্দ; দয়ানন্দের একমাত্র পুত্রসন্তান মহানন্দ; এবং মহানন্দেরও একমাত্র পুত্রসন্তান আমাদের এই সদানন্দ বসু। লাইনটা অবশ্য এখানেই শেষ। সদানন্দ যে নিঃসন্তান মানুষ, সে-কথা আগেই বলেছি।

যা-ই হোক, যে-কথা বলছিলুম সেটা এই যে, পূর্বপুরুষদের কারও একাধিক পুত্রসন্তান না হওয়ায় এই পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর কোনও সম্পত্তিই কখনও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি। তা ছাড়া, সদানন্দবাবুর কাছেই শুনেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের কারও এমন কোনও বদ-খেয়ালও ছিল না যে বাড়ি বন্ধক দেবার কি ঘটিবাটি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবার দরকার পড়বে। নেশা বলতে যা বোঝায়, তা ছিল একমাত্র দয়ানন্দের। তা সে-নেশাও ঘোড়া কিংবা মদ-মেয়েমানুষের নয়, ঘুড়ি আর পায়রা ওড়ানোর, যাকে কিনা বৃহৎ কোনও বদ-খেয়ালের পর্যায়ে ফেলা যাচ্ছে না।

জন্মসূত্রেই সদানন্দ তাই মোটামুটি সচ্ছল মানুষ। চাকরিটা খুব উঁচু দরের করেননি বটে, তবে মাঝেমধ্যেই দু-চার টাকা উপরির ব্যবস্থা থাকায় তাঁর রোজগার নেহাত খারাপও ছিল না। ফলে বাড়িটা যতই পুরোনো হোক, বছরে অন্তত একবার মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়ে তিনি তাতেই একটু চেকনাই ফুটিয়ে রাখতে পেরেছেন।

বাড়িটা বিশেষ বড়ও নয়। দোতলা-একতলা মিলিয়ে ঘর মাত্রই চারটে। ওপরের তলায় দুটো আর নীচের তলায় দুটো। তবে দুটো তলাই এমনভাবে তৈরি হয়েছিল, ওপর-নীচ ভাগাভাগির দরকার হলেও যাতে কোনও তলার শরিকেরই কোনও অসুবিধে না হয়। ওপরতলায় যেমন রান্নাঘর, একফালি ভাঁড়ার আর বাথরুম আছে, তেমনি আছে নীচতলাতেও। সদানন্দবাবুর অবশ্য চারটে ঘরের দরকারও হয় না। মানুষ তো এ-সংসারে দুটি মাত্র, দোতলার দুখানা ঘরেই তাই তাঁর দিব্যি চলে যায়। একতলাটা তবু যে তিনি ফাঁকা ফেলে রেখেছিলেন, তার কারণ তো আগেই বলেছি, ভদ্রলোক ঝুট-ঝামেলা

BanglaBook.org

পছন্দ করেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাড়ার ছেলেরা বেদখল করে নিতে পারে, এই ভয়েই তিনি তাড়াহুড়ো করে ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন। তবে সেটা বসাবার আগে, ভাড়ার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও, এই একটা ব্যাপার তিনি একেবারে ষোলো-আনা নিশ্চিত হয়ে জেনে নিয়েছিলেন যে, ভাড়াটে হয়ে যারা আসছে, তাদের লোকসংখ্যা খুবই কম।

পাড়ার ছেলেদের ভয়ে সদাহাস্যময় সদানন্দবাবুর মুখে তো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। ভাড়াটে বসাবার পরে দেখলুম মেঘ কেটে গিয়েছে, সদানন্দবাবু আবার সেই আগের মতো হাসছেন। কথাবার্তাও বলছেন সেই আগের মতোই প্রাণ খুলে। দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম।

কিন্তু খুব বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। সে-কথায় একটু বাদে আসছি। তার আগে তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আর ওই মর্নিং ওয়াকের কথাটা একটু বলে নেওয়া ভালো।

মর্নিং ওয়াকটাও অবশ্য তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই পড়ে। সবটা তো স্বচক্ষে দেখবার উপায় নেই, প্রায় বারো-আনাই শোনা-কথা। তা যে-সব কথা শুনি, তা যদি মিথ্যে না হয় তো বুঝতে হবে, সদানন্দবাবু প্রতিটি কাজ করেন একেবারে ঘড়ি ধরে, নির্দিষ্ট একটা রুটিন অনুযায়ী। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, ভদ্রলোক ঘুম থেকে ওঠেন কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে চারটের সময়; চোখে-মুখে জল দিয়ে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে, জল ফুটিয়ে এক কাপ চা খান। চা মানে ওই হালকা লিকার। তাতে সব মিলিয়ে মিনিট পঁচিশেক সময় যায়। স্টোভে যখন জল গরম হচ্ছে, তার মধ্যেই পালটে নেন তাঁর জামাকাপড়। তারপর চা খেয়ে যখন সদর-দরজা খুলে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে পড়েন, ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজেনি, মিনিট কয়েক বাকি। সদর দরজায় গোদরেজের টানা-তালা বসিয়ে নিয়েছেন। তার একটা চাবি সদানন্দবাবুর কাছে থাকে, আর অন্যটা থাকে ভাড়াটেদের কাছে। দরজা বন্ধ করবার জন্যে কাউকে ডেকে তোলবার দরকার হয় না, স্রেফ পাল্লাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। যখন বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁর হাতে থাকে একটা লাঠি আর একটা টর্চ। লাঠিটা আমি দেখেছি। এই রকমের লাঠি বড় একটা দেখা যায় না। মোটা বেতের লাঠি, তার মাথায় একটা লোহার বল বসানো।

কখনও আধ ঘণ্টা হাঁটলেন, কখনও চল্লিশ মিনিট, সদানন্দবাবুর জীবনে এমনটা হবার উপায় নেই। রোজ একেবারে নিয়ম করে তিনি ঠিক এক ঘণ্টা হাঁটেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক দূরে নয়, সেখানে গিয়ে গোটাকয়েক চক্কর মেরে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টায় তিনি বাড়িতে ফেরেন। ফিরে, দোতলায় উঠে, আবার স্টোভ ধরিয়ে চা বানাতে লেগে যান। এবারে বানান দু-কাপ চা। গিন্নির ঘুম ভাঙিয়ে এক কাপ তাঁর হাতে তুলে দেন, অন্য কাপ তাঁর নিজের জন্য। চা খেতে-খেতে গিন্নির সঙ্গে দুটো একটা কথা হয়, তারপর বেরিয়ে পড়েন দুধ আনতে। দুধ এনে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়েন বাজারে। বৈঠকখানা বাজারে রোজ যান না। বাজার আজকাল তার গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, হ্যারিসন রোডের দু-ধারেই সারে-সারে আলু-পটল-ঝিঙে-বেগুন আর মাছের ব্যাপারীরা বসে যায়, কিন্তু সদানন্দবাবুর কেনাকাটা তবু যে এক ঘণ্টার আগে শেষ হয় না, তার কারণ, তিনি দরদস্তুর করতে ভালোবাসেন, প্রতিটি জিনিস কেনেনও খুব বাছাই করে। বাড়ি ফেরেন আটটায়। তখন জলখাবার খান, কিন্তু তার সঙ্গে আর চা খান না। তৃতীয় কাপ চা খান বিকেল চারটেয়।

তা এ হল সকালবেলার হিসেব। বাকি দিনটাও এইরকমের রুটিনে বাঁধা। কোথায় কোনও নড়চড় হবার উপায় নেই। এইভাবে চললে নাকি শরীর সজুত থাকে, আয়ুবৃদ্ধি হয়। হবেও বা।

সদানন্দবাবুকে আমি কখনও মর্নিং ওয়াকে বেরোতে দেখিনি, ফিরে আসতেও না। ওই স্বর্গীয় দৃশ্য কি আর আমার মতো অলস লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব? রোজই যে আমি দেরি করে ঘুমোই, তাই ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে যায়, তা অবশ্য নয়। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে, আর রাত জেগে যা শেষ করতে হবে এমন কোনও জরুরি কাজ হাতে না থাকলে, এক-একদিন তো

BanglaBook.org

দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু তাতেও দেখেছি সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না। তা হলে আর সদানন্দবাবুর ভোর-পাঁচটার মর্নিং ওয়াক কী করে দেখব।

আমার ছোট মেয়ে পারুল অবশ্য দেখেছে। সেও দেখত না, যদি না সামনের এপ্রিলেই বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় বসবার জন্যে তাকে আদাজল খেয়ে তৈরি হতে হত। পার্ট ওয়ানের ফল বিশেষ ভালো হয়নি, এখন ফাইনালটা ভালো করে দেওয়া দরকার, গত মাস তিনেক ধরেই সে তাই নাকি শেষ-রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যাচ্ছে।

সেদিন সকালবেলার জলখাবার খাবার সময় কথায়-কথায় সদানন্দবাবুর প্রসঙ্গ উঠেছিল। দিন কয়েক যাবৎ আমার গেঁটেবাতের যন্ত্রণা বড় বেড়েছে। বাসন্তীকে সে-কথা বলতে সে বলল, 'দোষ তোমারও কম নয় বাপু। সদানন্দবাবুর পরামর্শ-মতো এই যে দুধ-চিনি বাদ দিয়ে চা ধরেছ, এতে তোমার অ্যাসিডিটি যে অনেক কমে গেছে, সেটা তো স্বীকার করবে?'

বললুম, 'বা রে, তা আমি অস্বীকার করব কেন?'

বাসন্তী বলল, 'এবারে ওঁর মতো মর্নিং ওয়াকটাও ধরে ফ্যালো। ভদ্রলোক তো কতদিন ধরেই বলছেন, অথচ তুমিই গা করছ না। রোজ সকাল পাঁচটায় যদি ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে একটু ঘুরে আসতে, তো তোমার এই গেঁটেবাতের ব্যথাও নিশ্চয় খানিকটা অন্তত কমে যেত।'

হেসে বললুম, 'ওরে ব্বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

পারুল বলল, 'না হবার কিছু নেই, বাবা। বোস-জেঠু তো দেখি রোজ সকালে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়েন। তা তিনি যদি অত সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারেন তো তুমিই বা পারবে না কেন?'

বললুম, 'তুই কি সেই সময়ে ওঁকে দেখতে পাস নাকি? তুইও তো তখন ঘুমিয়ে থাকিস।'

পারুল তাতে রেগে গিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে তোমার মস্ত দোষ। বাড়ির কোনও খবরই তুমি রাখো না; এমন কী, তোমার মেয়ে কখন ঘুম থেকে ওঠে, তাও তোমার জানা নেই। তা হলে শুনে রাখো, গত ডিসেম্বর মাস থেকেই রাত চারটেয় ঘুম থেকে উঠে আমি পড়তে বসে যাচ্ছি।'

'হঠাৎ এত সুমতি যে?'

জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ-প্লেট গোছাতে-গোছাতেই বাসন্তী আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল, তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে তেতো গলায় বলল, 'তা হলেই বোঝ যে, তোর বাবা কত দায়িত্বশীল মানুষ। সামনের মাসেই যে মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা, তা পর্যন্ত জানে না।'

পারুল যেমন হঠাৎ-হঠাৎ রেগে যায়, তেমনি তার রাগটা আবার পড়েও যায় খুব তাড়াতাড়ি। বাসন্তীর কথায় আমি যে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছি, এইটে বুঝে হেসে ফেলে বলল, 'থাক, থাক, বাবাকে আর কিছু বোলো না, মা। এমনিই তো বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, বেশি যদি বকাঝকা করো তো ব্লাড প্রেশারও চড়ে যাবে।'

বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন পারুল বলল, 'আমার পড়ার টেবিলটা তো জানলার ধারেই, রোজ পাঁচটায় সত্যি আমি বোস-জেঠুকে বেরিয়ে পড়তে দেখি। ডিসেম্বর মাস থেকেই দেখছি।'

'সত্যি?'

'তবে আর বলছি কী। এখন তো গরম পড়ে গেছে, শীতের সময়েও একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটায় উনি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়তেন। উঃ, তখন যে ওঁকে কী অদ্ভুত দেখাত, সে আর কী বলব।'

'অদ্ভুত দেখাত মানে?'

'যদি না বকো তো বলি। বলো, বকবে না তো?'

BanglaBook.org

'না, না, বকব কেন? আমি কি কখনও কাউকে বকি নাকি? ওটা তো তোর মায়ের ডিপার্টমেন্ট।'

পারুল হেসে বলল, 'ওঁর বাড়ির সামনেই স্ট্রিট-লাইট তো, তাই দেখতে কোনও অসুবিধে হত না। পায়ে বুটজুতো, গায়ে বিশাল অলেস্টার, তার ওপরে আবার মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ, ওই যা পরলে শুধু চোখ দুটো আর নাকের ফুটোটা বেরিয়ে থাকে, বাদবাকি সব ঢাকা পড়ে যায়। তখন না...তখন না...বলি বাবা?'

বললুম, 'অত কিন্তু-কিন্তু করছিস কেন, বলেই ফ্যাল না।'

'তখন ওঁকে টিভিতে যে রামায়ণ চলছিল না, তার জাম্বুবানের মতন দেখাত, বাবা!'

কথাটা বলেই ঘর থেকে পারুল ছুটে বেরিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

সদানন্দবাবুর মুখে যে আবার হাসি ফিরেছে, এইটে দেখে সত্যি আমি বড় নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। কিন্তু খুব বেশিদিন যে নিশ্চিন্ত থাকা যায়নি, আগের পরিচ্ছেদেই তা বলা হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখটা আজ থেকে বছর তিনেক আগেই আবার মেঘলা হতে শুরু করে। তার মানে এ হল গিয়ে নকুলচন্দ্র তাঁর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসবার তা ধরুন বছর খানেক পরের কথা। রাস্তায় একদিন দেখা হয়ে যেতে সদানন্দবাবুকে তখন জিগ্যেস করেছিলুম যে, কী হল, আবার কোনও ঝামেলা বাধল নাকি।

সদানন্দবাবু তাতে বললেন, 'আরে মশাই, ঝামেলা কার নেই বলুন তো। বেঁচে থাকাটাই একটা ঝামেলা। বয়েস তো নেহাত কম হল না, এখন গেলে বাঁচি।'

কথাটা আর-কেউ বললে অবাক হতুম না। সদানন্দবাবু বলছেন বলেই অবাক হতে হল। শরীরের কলকবজাগুলোকে ঠিক রাখবার জন্যে যাঁর চেষ্টার অন্ত নেই, আর সেই চেষ্টার কথাটা যিনি সগর্বে ঘোষণা করে থাকেন, বলেন যে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে আয়ুবৃদ্ধি একেবারে অবধারিত, সেই লোক বলছেন কিনা 'গেলে বাঁচি।' এসব কথা আর-যাঁরই মুখে মানিয়ে যাক, সদানন্দবাবুর মুখে একেবারেই মানায় না।

কিন্তু তবু যে তাঁকে সেদিন আর এ নিয়ে কিছু জিগ্যেস করিনি, তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর উত্তর দেবার ধরন দেখেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, প্রসঙ্গটা তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

দু-চার দিনের মধ্যেই অবশ্য ব্যাপারটা বোঝা গেল। এক রবিবার সকালে আমার বাড়িতে এলেন সদানন্দবাবু। যথারীতি হালকা এক কাপ চিকার খেলেন। তারপর অন্যান্য প্রসঙ্গে দু-চার কথা হবার পরে বললেন, 'না মশাই, ভাড়াটে বাছতে ভুল করেছি, নকুলচন্দ্র লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়।'

আমি বললুম, বাছাবাছি আর করলেন কোথায়। পাড়ার ছেলেদের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ ঠিক করলেন যে, একতলাটা ভাড়া দেবেন, আর তার দু-চার দিনের মধ্যেই তো নকুলচন্দ্র এসে গেল। সেই যে এক রাজার গল্প শুনেছি, রাত্তিরে ঠিক করলেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজবাড়ির বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে প্রথম যার মুখ দেখবেন, তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন, আপনারও তো দেখলুম সেই ব্যাপার।'

সদানন্দবাবু বিমর্ষ মুখে বললেন, 'সেইটেই বড্ড ভুল করে ফেললুম। নকুলটা মশাই অতি নচ্ছার লোক। যাদের কথার ঠিক নেই, তাদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। নকুলটা মানুষ নয়।'

বললুম, 'কথার ঠিক নেই বললেই তো আর হল না, বেঠিকটা কী দেখলেন?'

BanglaBook.org

'তা হলে শুনুন মশাই, বাড়িতে যখন ভাড়াটে হয়ে ঢোকে, নকুল তখন আমাকে বলেছিল যে স্রেফ ওরা স্বামী-স্ত্রী থাকবে, আর কাউকে এনে ঢোকাবে না। তা এক বছর পার হতে-না-হতেই দেখছি শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি শালাকে এনে ঢুকিয়েছে। বলেছিল, হপ্তাখানেক থেকেই চলে যাবে, কিন্তু কই, শালাবাবুটির তো নড়বার কোনও লক্ষণই দেখছি না।'

পাঁচ নম্বরের একতলায় যে নতুন একজন লোক কিছুদিন ধরে রয়েছে, এটা, আমিও লক্ষ করেছি। বাসন্তীকে জিগ্যেসও করেছিলুম যে, লোকটা কে? তা বাসন্তী বলল, ও হচ্ছে নকুলের বউ যমুনার দাদা। মানে আপন দাদা নয়, মামাতো দাদা। গ্রামে থাকত, সেখান থেকে বোনের বাড়িতে এসে উঠেছে। এখন কিছুদিন কলকাতায় থেকে যা-হোক কিছু একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে।

তা সদানন্দবাবুর তাতে এত আপত্তি কেন, বোঝা গেল না। বললুম, 'কাজকর্মের সন্ধানে এসেছে, একটা কিছু জুটে গেলেই চলে যাবে নিশ্চয়। সব বাড়িতেই আত্মীয়স্বজনরা এমন এসেই থাকে, চিরকালের জন্যে তো আর কেউ আসে না। ও নিয়ে আপনি এত ভাবছেন কেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ভাববার কারণ আছে বলেই ভাবছি। আপনি বলছেন, একটা কাজকর্ম জুটে গেলেই চলে যাবে। আরে মশাই, কাজকর্ম কি মামার বাড়ির ক্ষীরের নাড়ু নাকি যে, দিনরাত্তির আমি বিছানায় পড়ে রইলুম, আর আদর করে দিদিমা আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গেল। কাজকর্ম জোটাতে হলে হাঁটাহাঁটি করাই যথেষ্ট নয়, রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ করা দরকার। তা বিষ্টু হতচ্ছাড়া সে-সব করছে কোথায়?'

'ওর নাম বুঝি বিষ্টু?'

'হ্যাঁ। বিষ্টুচরণ দাস।'

'সারাদিন বিছানায় পড়ে-পড়ে ঘুমোয় বুঝি?'

'যখন ঘুমোয় না, তখন হেঁড়ে গলায় যাত্রার গান গায়। আমার মশাই একটুও পছন্দ হয় না।'

সদানন্দবাবু আর বসলেন না, বেরিয়ে গেলেন।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো হয় না। তার ওপরে আবার বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে যখন একই বাড়িতে থাকে, সম্পর্কটা তখন প্রায়ই অতি তেতো হয়ে ওঠে। আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক বিশেষ মধুর নয়। মোটামুটি দশ বছর এখানে আছি, তার মধ্যে দুবার আমার ভাড়া বেড়েছে, তা নিয়ে আমি কোনও আপত্তিও তুলিনি, রেন্ট কন্ট্রোলে যাবার ভয় দেখানো তো দূরের কথা, মুখেও কখনও বলিনি যে, এইভাবে ভাড়া খাড়ানোটা মোটেই উচিত কাজ হচ্ছে না, তবু দেখছি আমার বাড়িওয়ালাটি ঠারেঠোরে এমন সব উক্তি প্রায়ই করছেন, যাতে মনে হয়, আমি উঠে গেলেই তিনি বাঁচেন।

ভাড়াটে উঠে গেলেই যে বাড়িওয়ালার সুবিধে, সেটা অবশ্য আমি অস্বীকার করি না। আর-কিছু না হোক, নতুন ভাড়াটের কাছ থেকে ফের নতুন করে পাঁচ-দশ হাজার টাকা সেলামি আদায় করা যায়। সেটাই তো মস্ত লাভ। সম্ভবত সেই জন্যেই আমার বাড়িওয়ালা কিছুদিন যাবৎ গাইতে শুরু করেছেন যে, তিনতলায় আর তাঁর কুলোচ্ছে না, দোতলাটা যদি এবারে ছেড়ে দিই তো তাঁর বড্ড উপকার হয়।

কথাটা তিনি যেমন আমাকে বলেন, তেমনি বাসন্তীকেও বলেন। আমি বলি, 'খোঁজাখুঁজি তো করছি, নতুন একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পেলেই এটা ছেড়ে দেব।' বাসন্তীও মোটামুটি সেই কথাই বলছিল। কিন্তু দিন কয়েক আগে বাড়িওয়ালা ফের যখন কাঁদুনি গাইতে শুরু করেন, বাসন্তী তখন দুম করে রেগে গিয়ে তাঁকে বলে বসে, 'আপনার কুলোচ্ছে না তো আমরা কী করব? মেয়ে দুটোর

BanglaBook.org

বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিন, তা হলেই দেখবেন দিব্যি কুলিয়ে যাবে।'

বাস, সেই যে বাড়িওয়ালা আমাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছেন, এখনও তিনি স্পিকটি নট। দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। বাক্যালাপ বন্ধ হওয়ায় অবশ্য আমাদের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না, তবে ভয় হচ্ছে যে, এবারে হয়তো জল বন্ধ হবে। তা হলে মুশকিলে পড়ব।

জল বন্ধ হওয়ার এই ভয়টা শুরু হয়েছিল বছর তিনেক আগেই। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মোটামুটি তখন থেকেই খারাপ চলছে। ব্যাপারটা সেইসময়ে সদানন্দবাবুকে আমি জানিয়েও ছিলুম। বলেছিলুম, 'আপনার সমস্যা ভাড়াটেকে নিয়ে, আর আমার সমস্যা বাড়িওয়ালাকে নিয়ে। কী যে করব, বুঝতে পারছি না। জল বন্ধ হলে তো বিপদে পড়ব, মশাই।'

শুনে জিভ কেটে সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'ছি-ছি, জল আবার কেউ বন্ধ করে নাকি। ও তো একটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স।'

তা বছর তিনেক আগে যা-ই বলে থাকুন, মাস ছয়েক আগে নিজের বাড়িতে কিন্তু সদানন্দবাবু সেই ক্রিমিন্যাল অফেন্সটাই করে বসলেন। প্রথমে তিনি নকুলচন্দ্রের জলের সাপ্লাই বন্ধ করলেন, তার পরে কাটলেন ইলেকট্রিক।

অর্থাৎ সদানন্দবাবু একেবারে তিতিবিরক্ত, তাঁর একতলার ভাড়াটেদের তিনি তাড়াতে চাইছেন। তাড়াতে চাইবার কারণ মাত্র একটি নয়, অনেক। তাঁর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি যে, নকুল-পরিবারের বলতে গেলে প্রায় কোনও কিছুই তিনি পছন্দ করতে পারছেন না।

নকুলচন্দ্রের শালাবাবু বিষ্টুচরণের চেহারা যে খুব বদখত, তা নয়, তা ছাড়া, সদানন্দ নিজেও স্বীকার করেন যে, কথাবার্তায় লোকটা খুব বিনয়ীও বটে। কিন্তু ওই যে সে কাজকর্মের জন্যে দৌড়ঝাঁপ না করে, গোটা দুপুরটা স্রেফ ঘুমিয়ে কাটায়, আর যখন জেগে থাকে, তখন মাঝে-মাঝেই হেঁড়ে গলায় যাত্রার গান গায়, এটা তাঁর পছন্দ নয়। নকুলচন্দ্রের বউ যমুনাকে কেউ কচিখুকিটি বলবে না, তার বয়েস নিশ্চয় তিরিশ পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও সে যে চোখে পুরু করে কাজল দেয়, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, হাতকাটা ব্লাউজ পরে, আর কথাও বলে 'ন্যাকা-ন্যাকা', এটা তাঁর পছন্দ নয়। এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসবার বছর দুয়েক বাদে যে যমুনার একটি মেয়ে হয়েছে, ফলে—বিষ্টুচরণকে হিসেবের মধ্যে ধরলে—ভাড়াটেদের লোকসংখ্যা যে মাত্র দু-বছরের মধ্যেই সেন্ট পার্সেন্ট বেড়ে গিয়ে এখন দুয়ের জায়গায় চার হয়েছে, এটাও তাঁর পছন্দ নয়।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে অপছন্দের ব্যাপার হল নকুলচন্দ্রের ব্যাবসা।

নকুলচন্দ্র যখন ভাড়াটে হয়ে আসে, তখন সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত। তাতে সুবিধে না হওয়ায় সে জমি কেনাবেচার লাইন ধরে। কিন্তু তাতেও সে চোট খেয়ে যায়। ফলে বছর খানেক হল সে মাছের ব্যাবসা ধরেছে। আর এই মাছের ব্যাবসা নিয়েই সদানন্দের ঘোর আপত্তি।

আপত্তি হত না, নকুল যদি না বাড়ির মধ্যেই তার পাইকার ব্যাবসার আড়ত বসিয়ে দিত। দুটো ঘরের একটায় তারা স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চাটি থাকে। অন্য ঘরটায় বিষ্টু থাকত। এখনও থাকে, তবে কিনা ঘরের বেশির ভাগটাই ভরতি হয়ে থাকে মাছের ঝুড়িতে।

সদানন্দবাবু যে প্রথম-প্রথম এই নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন, তা নয়। শুধু একদিন হাসতে-হাসতে আমাকে বলেছিলেন, 'বিষ্টুকে এবারে পালাতে হবে, মশাই।'

আমি বলেছিলুম, 'কেন?'

'যতই হোক, মানুষ তো। গন্ধের দাপটেই পালাতে হবে।'

বললুম, 'তা বটে। বিষ্টুকেও যে মাছের ঘরে থাকতে হয়, সেটা আমার মনেই ছিল না।'

বিষ্টু কিন্তু পালাল না। নকুলচন্দ্রের মাছের ব্যাবসাও সমানে চলতে লাগল। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নাকি বাজারের খুচরো ব্যাবসায়ীরা পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, মাছ দেখে, পছন্দ হলে দামদস্তুর করে, দামে পোষালে মাছ ওজন হয়, তারপর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে মাছের

BanglaBook.org

ঝুড়ি রিকশায় তুলে তারা ছ'টার মধ্যেই বাজারে চলে যায়। আমি তো অত সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠি না। তাই স্বচক্ষে এই কেনাবেচার ব্যাপারটা কখনও দেখিনি। তবে যেমন বাসন্তী আর পারুলের কাছে, তেমনি পাড়ার অন্য দু-চারজন লোকের মুখে শুনেছি যে, গলিটা তখন আঁশটে গন্ধে ভরে ওঠে।

যে-ঘরে মাছের আড়ত, তারই একপাশে বিষ্টুর শোবার জায়গা। মাঝেমধ্যে সদানন্দবাবুর বাড়িতে যাই, দোতলায় ওঠবার সময় সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে দেখতে পাই, ঘরের মধ্যে পরপর মাছের ঝুড়ি, আর সেই ঝুড়ির পাশে নোংরা একটা বিছানা। বিষ্টুচরণকেও দেখতে পাই। দিব্যি সে তার বিছানায় শুয়ে ঘুম লাগাচ্ছে। সদানন্দবাবু আশা করেছিলেন, বিষ্টু এবারে পালাবে, ওই আঁশটে গন্ধের মধ্যে সে টিকতে পারবে না। কিন্তু যেভাবে তাকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে দেখি, তাতে আমার মনে হয় না যে, মাছের গন্ধে বিষ্টুর কোনও অসুবিধে হচ্ছে।

আসলে অসুবিধেটা যে সদানন্দবাবুরই হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারলুম, যখন এর মাস ছয়েক বাদে তিনি আবার এক রবিবারে আমার বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন। সাধারণত একটা ভূমিকা করে নিয়ে তারপরে তিনি আসল প্রসঙ্গে আসেন। সেদিন কিন্তু কোনও ভূমিকার মধ্যে তিনি গেলেন না। ঘরে ঢুকেই হতাশ গলায় বললেন, 'আর তো পারছি না মশাই!'

একটা বই বেরুবে, তার প্রুফ দেখছিলুম। সেটাকে সরিয়ে রেখে বললুম, 'কেন, আবার কী হল?'

'হবে আবার কী, গন্ধে একেবারে পাগল হয়ে গেলুম।'

'রোজই কি গন্ধ ছড়ায় নাকি?'

'রোজ। তার ওপরে আবার এক-একদিন এমন উৎকট গন্ধ ছড়ায় যে, সে আর কী বলব, গোটা শরীরটা যেন গুলিয়ে ওঠে। কী করি বলুন তো?'

জীবনে আমি মাছের ব্যাবসা কেন, কোনও ব্যাবসাই করিনি। তবে কিনা যেখানে মাছের আড়ত খোলা হয়েছে, সেখানে যে আঁশটে গন্ধে বাতাস সারাক্ষণ ভরাট হয়ে থাকবে, এটা বোঝবার জন্যে আলাদা কোনও ব্যাবসাবুদ্ধি থাকার দরকার হয় না, অল্পবিস্তর কাণ্ডজ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট। নকুলচন্দ্র মাছের ব্যাবসা করে, বাড়িতেই তার মাছের আড়ত, খুচরো ব্যাবসায়ীরা তার কাছ থেকে মাছ কেনে, কিন্তু তার আড়তের সব মাছই কি আর সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়? তা নিশ্চয় হয় না। স্টকের কিছুটা মাছ নিশ্চয় পড়ে থাকে। ঠিকমতো যদি না বরফ-চাপা দিয়ে রাখা হয়, তা হলে সেগুলো পচতে শুরু করে। তার গন্ধ তো তখন উৎকট হয়ে উঠবেই। আর তা যে উঠবে, সদানন্দবাবুর সে-কথা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

বললুম, 'কী আর করবেন। ভাড়াটে নেবার আগে একটা কনট্রাক্ট করে নিয়েছিলেন?'

'তা তো করিনি।'

'করা উচিত ছিল। তাতে এইরকম একটা শর্তও আপনার রাখা উচিত ছিল যে, একতলাটাকে শুধু রেসিডেন্সিয়াল পারপাসেই ব্যবহার করা চলবে, ওখানে গোডাউন করা চলবে না। তা তেমন কোনও কনট্রাক্ট যখন নেই, তখন আর আপনি কী করবেন?'

'সে কী মশাই,' সদানন্দবাবু বললেন, 'বাড়ি তো আজ নকুলের নয়, বাড়ি আমার। নাকি তাও আপনি স্বীকার করবেন না?'

'তা কেন করব না?' হেসে বললুম, 'বাড়ি আপনারই।'

'আর সেই বাড়িটাকে যদি কেউ নরককুণ্ড বানিয়ে তোলে, তাও আমি কিছু করতে পারব না? বাড়ি ভাড়া দিয়ে কি আমি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি নাকি?'

বললুম, 'নিয়মিত ভাড়া দেয়?'

'তা দেয়।'

BanglaBook.org

'তা হলে মামলা-টামলার মধ্যে যাবেন না, গিয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং এক কাজ করুন। ওকে বুঝিয়ে বলুন যে, বসতবাড়ির মধ্যে এই যে ও মাছের আড়ত করেছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। তাতে যদি কাজ না হয় তো তার পরের কথাটা তখন ভাবা যাবে।'

সদানন্দবাবু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন। তাতে কাজ হয়নি। মাছের আড়ত অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে, এই প্রস্তাব শুনে নকুলচন্দ্র নাকি হাত কচলে বলেছিল, 'কোথায় সরাব মেসোমশাই? আমি রইলুম এখানে আর আড়ত রইল আর-এক জায়গায়, এই করে কি ব্যাবসা চলে?'

সদানন্দবাবু বলেছিলেন, 'অন্যেরা চালায় কী করে?'

তাতে নকুল বলেছিল, 'তারা পারে। তাদের পয়সা আছে। তারা মাছ পাহারা দেবার জন্যে দরোয়ান রাখে, মাছ বিক্রি করবার জন্যে আলাদা কর্মচারী রাখে। আমি ওসব কী করে পারব?'

সদানন্দবাবুর কাছে সব শুনে আমি বললুম, 'তা হলে ওকে উঠে যেতে বলুন। পাড়ার দু-চারজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ওর কাছে যান। গিয়ে বলুন যে, এখানে ওর থাকা চলবে না।'

তা-ই বলা হল। নকুলচন্দ্র তাতে কাতর গলায় বলল, 'কোথায় যাব মেসোমশাই? এত কম ভাড়ায় আর কোথায় দু-খানা ঘর পাব আমি?'

অগত্যা কী আর করেন, যে-কাজকে নিয়েই একদিন ক্রিমিন্যাল অফেন্স বলেছিলেন, উপায়ান্তর না-থাকায় হঠাৎ একদিন সেটাই করতে হল সদানন্দবাবুকে। ভাড়াটের জলের সাপ্লাই তিনি বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। এমন নয় যে জল বন্ধ হবার ব্যাপারটা নিয়ে নকুল একটা হইচই বাধিয়ে দিল। তা সে করল না। এমনকী, সদানন্দবাবুর কাছে এই নিয়ে কোনও প্রতিবাদও জানাল না সে। স্রেফ একজন ভারী লাগিয়ে রাস্তার কল থেকে সে জল আনিয়ে নিতে লাগল।

সদানন্দবাবু বুঝে গেলেন যে, শুধুই জল বন্ধ করে নকুলচন্দ্রকে জব্দ করা যাবে না। তখন তিনি লাইটের কানেকশনও কেটে দিলেন। তার পরের দিনই আবার আমার ফ্ল্যাটে এসে কড়া নাড়লেন সদানন্দবাবু। থমথমে গম্ভীর মুখ; হাসির লেশমাত্র নেই।

বললুম, 'ব্যাপার কী মশাই, আবার কী হল?'

'হপ্তাখানেক ধরে যে ওকে জল দিচ্ছি না, সেটা জানেন তো?'

'জানতুম না। কাল রাত্তিরে বাসন্তীর কাছে শুনলুম।'

'তিনি কী করে জানলেন?'

'কাল বিকেলে কী একটা কাজে যেন আপনার মিসেসের কাছে গিয়েছিল, তাঁরই কাছে শুনেছে। কাজটা ভালো করেননি।'

'তা হয়তো করিনি,' সদানন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু এ ছাড়া উপায়টাই বা কী ছিল?'

'তা এতে কোনও কাজ হল?'

হতাশ গলায় সদানন্দবাবু বললেন, 'কিস্‌সু না। ভেবেছিলুম ধাঁধাঁধন এবারে পথে আসবে। কিন্তু কোথায় কী, ভারী দিয়ে জল আনিয়ে নিচ্ছে। কাল রাত্তিরে তাই লাইটের কানেকশনও কেটে দিলুম।'

বললুম, 'এটা আরও খারাপ করলেন। মামলা-টামলা যদি হয়ই, তাহলে এই দুটো ব্যাপারই কিন্তু ওর ফেভারে যাবে। আর মামলা তো পরের কথা, এক্ষুনি গিয়ে ও যদি থানায় ডায়েরি লিখিয়ে আসে তো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন মশাই।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'বিপদে আমি অলরেডি পড়েছি।'

'তার মানে? নকুল কি এরই মধ্যে থানায় গিয়ে ডায়েরি করেছে নাকি?'

'না মশাই, বিপদ একেবারে উলটোদিক থেকে এসেছে।'

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

সদানন্দবাবু যে কী বলতে চাইছেন, কিছুই ঠাহর করতে পারলুম না। বললুম, 'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো।'

সদানন্দবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সব তা হলে খুলেই বলি। দেখুন মশাই, নকুল যে মোটেই সুবিধের লোক নয়, সে ওরা ভাড়াটে হয়ে আসবার এক বছর বাদেই আমি টের পেয়েছি। বলেছিল, ওরা দুটিমাত্র প্রাণী এখানে থাকবে, অথচ বছরখানেক যেতে-না-যেতেই একটা উটকো লোককে আমার বাড়ির মধ্যে এনে ঢোকাল। তার মানে ওর কথার ঠিক নেই। না, না, বিষ্টুচরণ যে খারাপ লোক, তা আমি বলছি না। কাজকর্ম না খুঁজে ও যে পড়ে-পড়ে শুধু ঘুমোয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এমন তারস্বরে গান গাইবে কেন? তার ওপরে আবার বছর দুয়েক আগে নকুলের একটা মেয়ে হয়েছে। রাত্তিরে সেটা এক-একদিন এমন ট্যা-ট্যা করে কাঁদে যে আমার ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। আমি মশাই শান্তিপ্রিয় লোক, আমার গিন্নিটিও তা-ই, এতসব চিৎকার-চেঁচামেচি আমাদের পছন্দ হয় না। তার ওপরে আবার অশান্তি আজকাল আরও বেড়েছে।'

'আঁশটে গন্ধের কথা বলছেন তো?'

'আরে সে-উৎপাত তো আছেই। মাছ যখন পচে, তখন তার গন্ধে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত মুখে উঠে আসে মশাই।'

কথাটা সেদিন বাসন্তীর কাছেও শুনেছি। হাসতে-হাসতে বাসন্তী বলছিল, 'কুসুমদির কাছে আজ উলের একটা প্যাটার্ন তুলতে গিয়েছিলুম, তা পচা-মাছের দুর্গন্ধে তো বসতেই পারলুম না। কুসুমদিরও একেবারে পাগল-পাগল অবস্থা। শাড়ির আঁচল নাকের ওপর চেপে ধরে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিলেন আর সদানন্দবাবুকে নাকিসুরে বলছিলেন, 'বিদেয় কঁরো, বিদেয় কঁরো, আঁজই এই পাঁপ বিদেয় কঁরো।' প্যাটার্ন তুলব কী, আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি।'

সদানন্দবাবুকে বললুম, 'আঁশটে গন্ধটা তো আর নতুন সমস্যা নয়, ওটা তো কিছুদিন ধরেই চলছে। নতুন অশান্তিটা কী হল?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সেই কথাই তো বলছি। তা আপনি শুনছেন কই। ব্যাটা আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। মানে সবকিছুরই একটা মাত্রা থাকবে তো, তাও থাকছে না।'

ভদ্রলোকের সবই ভালো, কিন্তু মুশকিল এই যে, বক্তব্যের চেয়ে ভূমিকাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বললুম, 'অত বিতং দিয়ে কথা বলবেন না তো, স্পষ্ট করে বলুন যে কী হয়েছে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সে কী মশাই, কিছুই আপনার কানে যায় না নাকি।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অবশ্য যাবেই বা কী করে? রাত্তিরে তো আপনারা পেছনের দিককার ঘরে থাকেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো কী হয়েছে?'

'রাস্তার দিককার ঘরে যদি থাকতেন তো ঘুম ভেঙে যেত। ওরে বাপরে বাপ, সে কী চেঁচামেচি!'

'কে চেঁচামেচি করে?'

'কে আবার, ওই নকুল। ব্যাটা বরাবরই রাত করে ফিরত, তা আজকাল তো দেখছি রাত বারোটাও পেরিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসেই চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, আর বউয়ের ওপরে চোটপাট করতে থাকে। ওপর থেকে যে আমি তাতে আপত্তি করিনি, তাও নয়। বেশ কয়েকদিনই গলা চড়িয়ে বলেছি, 'এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ? এত হল্লা কীসের? এটা বস্তি নয়, এটা ভদ্রপাড়া।' তা সে-সব কথা তো গেরাহ্যিই করে না। চেঁচাচ্ছে তো চেঁচাচ্ছেই, হল্লা করছে তো করছেই। ওরে বাবা রে বাবা, সে এক জগঝম্প কাণ্ড।'

BanglaBook.org

'এত রাত করে ফেরে কেন, কখনও জিগ্যেস করেছিলেন?'

'তা করেছিলুম বইকী। রাত্তিরে তো আর নীচে নামতে ভরসা হয় না, তাই একদিন দিনের বেলায় দেখা হয়ে যেতে জিগ্যেস করেছিলুম যে, বাড়ি ফিরতে আজকাল এত রাত হচ্ছে কেন?'

'তাতে কী বলল?'

'বলল যে, মহাজনের পাওনা মিটিয়ে ফিরতে হয় তো, তাই একটু রাত হয়ে যায়।' সদানন্দবাবু একটা চোখ একটু ছোট করে হাসলেন। তারপর গলার স্বর একটু নীচে নামিয়ে বললেন, 'ও-ও বলল, আর আমিও বিশ্বাস করলুম! আসল কথাটা কী জানেন, ব্যাটা আজকাল খুব মাল টানছে।'

'তা টানুক না. আপনার পয়সায় তো আর টানছে না, তা হলে আর আপনার তা নিয়ে এত উতলা হবার দরকার কী? ওর ডানা গজিয়েছে, তাই উড়ছে। তা উড়ুক না, আপনি তাতে বিচলিত হচ্ছেন কেন?'

সদানন্দবাবু অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'যাচ্চলে, আমি কেন বিচলিত হব? আরে না মশাই, কে মাল টানল না-টানল, তাতে আমার কী। ও-সব নিয়ে আমি একটুও ভাবছি না। আমার সাফ কথা, যা করতে হয়, মুখ বুজে করো, হল্লাবাজি চলবে না। আর হ্যাঁ, বাড়ির মধ্যে পচা মাছের দুর্গন্ধ ছড়ানোও চলবে না। ওই আড়তটাকেও এখান থেকে সরাতে হবে।'

পারুল এসে ঘরে ঢুকল। বললুম, 'কী ব্যাপার, পড়া ছেড়ে উঠে এলি যে? কিছু বলবি?'

'মা বলছে, এবার চান করতে যাও, মা'র রান্না হয়ে গেছে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হলে চলি মশাই। আপনার অফিস যাবার টাইম হল।'

বললুম, 'বসুন, বসুন পাঁচ মিনিট পরে গেলেও চলবে।' তারপর পারুলের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তোর মাকে বল যে, বোসদা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, মিনিট পাঁচেক বাদে কলঘরে ঢুকব।'

পারুল চলে গেল। সদানন্দবাবু বললেন, 'মোট কথা, হল্লা যদ্দিন পর্যন্ত না বন্ধ হচ্ছে আর যদ্দিন পর্যন্ত না সরানো হচ্ছে এই মাছের আড়ত, আমিও তদ্দিন ছাড়ছি না।'

বললুম, সেইজন্যেই যে জল আর লাইট কেটে দিয়েছেন, সে তো বুঝতেই পারছি।'

'ব্যাটা ভারী দিয়ে জল আনাচ্ছে! সকালে যখন বাজার থেকে ফিরছে তখন আবার দেখলুম, এক হাতে বাজারের থলি, আর এক হাতে দুটো হ্যারিকেন।'

'লাইট যখন কেটে দিয়েছেন, তখন হ্যারিকেন আর হাতপাখা ছাড়া উপায় কী! কিন্তু এখনও বলছি, কাজটা আপনি ভালো করলেন না। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদে না পড়ে যান।'

'সে তো পড়েইছি। না, না, যা ভাবছেন তা নয়, নকুল এ নিয়ে কী করবে না-করবে জানি না, তবে এখনও থানা-পুলিশ করেনি।'

'বিপদটা তা হলে কীসের?'

'বিপদ একেবারে উলটো দিকের।'

কথাটা যে সদানন্দবাবু গোড়াতেই বলেছিলেন, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। এতক্ষণে আবার মনে পড়ল। বললুম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইরকম একটা কথা আপনি বলছিলেন বটে, আমারই খেয়াল ছিল না। তা উলটো দিকের মানে কোন দিকের?'

একটু আগেও বেশ চড়া গলায় কথা বলছিলেন সদানন্দবাবু; এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন নকুলচন্দ্রকে উচিত-শিক্ষা না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না। হঠাৎ যেন সেই 'যুদ্ধং দেহি' ভাবটা একেবারে মিলিয়ে গেল। মুখের ওপরে আবার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ভঙ্গিটাও ভারী কুণ্ঠিত। বেজার গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'বিপদটা ঘটিয়েছেন আমার গিন্নিই।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে বললুম, 'আপনার মিসেস আবার কী বলছেন?'

BanglaBook.org

কাঁচুমাচু হয়ে সদানন্দবাবু বললেন, 'বলছেন যে, আমি মানুষ নই, একেবারে অমানুষ। আমার মধ্যে নাকি মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই।'

ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে, সেটা জানতে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। অথচ সদানন্দবাবু যেভাবে অনাবশ্যক বিতং দিয়ে কথা বলেন, তাতে সন্দেহ হচ্ছিল যে, সমস্যাটা যে ঠিক কী, বিস্তর বাক্যব্যয় করেও তিনি সেটা ঠিক পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। তাই মনে হল যে, ওঁর বাড়িতে গিয়ে সরাসরি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

সদানন্দবাবুকে একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তাই বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘরে এসে বাসন্তীকে বললুম, 'অফিসের আজ তেমন তাড়া নেই, ঘণ্টাখানেক পরে গেলেও চলবে। চট করে একবার ও-বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সদানন্দবাবুকে বললুম, 'চলুন, আপনার মিসেসের সঙ্গে কথা বলব।'

আমাদের বাড়ির প্রায় উলটো দিকেই পাঁচ নম্বর বাড়ি। গলিটা পার হয়ে বাড়িতে ঢুকে ওপরে উঠে এলুম।

কুসুমবালা তাঁর শোবার ঘরের খাটের ওপরে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন। আমি কিন্তু উঠতে পারব না, বাতের ব্যথাটা আবার খুব বেড়েছে।'

বললুম, 'না-না, উঠতে হবে না।'

সদানন্দবাবু একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'আমি তো দিনে তিন কাপের বেশি চা খাই না, তার মধ্যে দু-কাপ ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। থার্ড কাপ খাব বিকেলে। কিন্তু আপনি তো আর অত হিসেব করে খান না, আপনার জন্যে একটু চা করি?'

বললুম, 'আরে না মশাই, চায়ের দরকার নেই। মিসেস বসুকে একটা কথা বলতে এসেছি। বলেই চলে যাব।'

কুসুমবালা হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে আবার কী কথা?'

'সদানন্দবাবু যে একতলার লাইট কেটে দিয়েছেন, তাতে আপনার আপত্তি আছে, তাই না?'

কুসুমবালার মুখ থেকে হাসিটা নিমেষে মিলিয়ে গেল। বললেন, 'আছেই তো। এটা কি একটা মানুষের মতো কাজ হল?'

'এ-কথা বলছেন কেন? নকুলদের জন্যে আপনার এত ভাবনা কীসের?'

কুসুমবালা যেন ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'ওদের জন্যে ভাবতে আমার বয়ে গেছে। না কিরণবাবু, আমি নকুলের কথাও ভাবছি না, যমুনার কথাও ভাবছি না, যমুনার পেটের বিষ্টুর কথাও ভাবছি না। কিন্তু দু-বছরের একটা দুধের বাচ্চা, তার কষ্টের কথাটা তো একবার ভাবতে হবে।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'কমলির কথা বলছ? সে তো বলতে গেলে সারাটা দিন দোতলায় এসে তোমার কাছেই কাটায়।'

কুসুমবালা বললেন, 'তা কাটায়। কিন্তু সারাটা রাত একতলায় তার মায়ের কাছে থাকে। চত্তির মাস, গরম পড়ে গেছে, গরমে কাল রাত্তিরে ওই মেয়েটা ঘুমোতে পারেনি। তা ছাড়া আমি জানি তো, মাঝরাত্তিরে একবার হিটারে দুধ গরম করে ওকে খাইয়ে দিতে হয়। তা ইলেকট্রিক না থাকলে যেমন ফ্যান চলে না, তেমনি হিটারও চলে না। মাঝরাত্তিরে কাল তাই মেয়েটির নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয়নি। তা এ-সব কথা কি তুমি ভেবে দেখেছিলে? একবারও ভাবোনি। দুম করে তুমি ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিলে। দিয়ে ভাবলে যে, এই করে নকুলকে খুব জব্দ করা হল। কিন্তু নকুলকে জব্দ করতে গিয়ে একটা দুধের বাচ্চাকে যে কী কষ্টে ফেলা হল, তা ভেবেও দেখলে না। তুমি কি মানুষ? ছিছি।'

BanglaBook.org

সদানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বললেন, 'আপনি কিছু বলবেন না?'

'কী আর বলব? আমার তো মনে হয়, মিসেস বসু যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন।'

উঠে পড়লুম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে একটা বাচ্চা-মেয়ের কান্নার শব্দ কানে এল। সেইসঙ্গে একটা মেয়েলি গলার ধমক। 'থাক, জেঠির দরদ যে কত, সে তো বোঝাই গেছে, ফ্যানের হাওয়া খাওয়ার জন্যে আর তোমার ওপরে গিয়ে কাজ নেই।'

বুঝতে পারলুম যে, কমলি তার জ্যাঠাইমার কাছে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে, কিন্তু তার মা তাকে যেতে দিচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

রাইটার্সে একটা ফোন করবার দরকার ছিল। সংক্ষেপে যাকে পি. এ. বি. এক্স বলে, ডায়াল ঘুরিয়ে সেই প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই সেখানকার মেয়েটি বলল, 'একটু আগেই এক ভদ্রলোক আপনাকে চাইছিলেন। আপনি নেই শুনে বললেন যে, খানিক বাদে আবার ফোন করবেন।'

'নাম বলেননি?'

'আমি জিগ্যেস করেছিলুম, উনি কিছু বললেন না। শুধু বললেন যে, উনি বাইরে থেকে এসেছেন, আপনাকে এই মেসেজটা দিয়ে দিলেই হবে।'

কিছুই বুঝতে পারলুম না। বাসন্তীর দাদা দিল্লিতে থাকেন, কিন্তু তাঁর তো এখন কলকাতায় আসবার কথা নয়, এলেও নিশ্চয় অফিসে না-করে বাড়িতেই ফোন করতেন। ছেলে থাকে এলাহাবাদে। সে-ই কি হঠাৎ তার অফিসের কাজে কলকাতায় এল? অফিসে কোনও জরুরি কনফারেন্স আছে হয়তো, তাই স্টেশন থেকে একেবারে সরাসরি অফিসে চলে গিয়ে সেখান থেকে ফোন করেছে। কিন্তু সে-ই বা অফিসে ফোন করবে কেন?

এক্সচেঞ্জের মেয়েটিকে বললুম, 'ঠিক আছে, এখন রাইটার্সকে একবার ডেকে দাও তো।'

রাইটার্সের সঙ্গে কথা শেষ করে সদ্য ডেস্কের কাজে হাত দিয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'কেমন আছেন মশাই?'

এ যে কার গলা, সে আর বলে দিতে হয় না। হাজার লোকের গলার চেতর থেকেও এই গলাটিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। চারু ভাদুড়ী।

বললুম, 'কী কাণ্ড! কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'কলকাতায় এসে বরাবর যেখান উঠি, সেখান থেকে।'

'তার মানে মালতীদের বাড়ি থেকে, তাই না?'

'বিলক্ষণ;'

'কিন্তু এখন তো আপনার কলকাতায় আসবার কথা ছিল না। গত হপ্তাতেই তো আপনার চিঠি পেয়েছি। তাতে লিখেছিলেন যে, পুজোর আগে কলকাতায় আসবার কোনও প্ল্যান নেই।'

'প্ল্যান সত্যিই ছিল না।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিন্তু হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেল। এমন কাজ যে, না এলেই নয়।'

'কবে এসেছেন?'

'তা চার-পাঁচ দিন হল।...দাঁড়ান, দাঁড়ান, হিসেব করে বলছি। আজ তো বুধবার। আমি এসেছি

BanglaBook.org

গত শুক্রবার। তা শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, পাঁচ রাত্তিরই তো হল, মোট পাঁচ রাত্তির এখানে কাটিয়েছি।'

'কাজ মিটেছে?'

'পনেরো আনা মিটেছে। আজ বিকেলে একজনের আসবার কথা আছে এখানে। সে এলে বাকি এক আনাও মিটে যায়। তা শুধু কাজ মিটলেই তো চলে না, তার একটা রিপোর্ট লিখে ক্লায়েন্টের হাতে দিতে হয়। কাল দুপুরে রিপোর্টটা লিখে ফেলব। ক্লায়েন্ট আসবে রাত্তিরে। রিপোর্টটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেই আমার ছুটি।'

'তার মানে পরশুই ব্যাঙ্গালোরে ফিরবেন?'

'তা-ই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু মালতী আটকে দিয়েছে। অরুণের শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। তাই ব্যাঙ্গালোরে ফোন করে বলে দিলুম যে, সামনের হপ্তাটাও আমি কলকাতাতেই থাকব।'

'অরুণের কী অসুখ?'

'সেই একই অসুখ। ওর যে একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল, তা তো আপনি জানেনই। তার পর থেকেই খুব সাবধানে থাকতে হয়। তা মালতী ওকে যথাসাধ্য সাবধানে রাখেও। তবু যে কেন প্রেশারটা এত ফ্লাকচুয়েট করে, বুঝতে পারি না। দিন কয়েক হল, ওর প্রেশারই একটু ট্রাবল দিচ্ছে।.. না-না, চিন্তা করবেন না। মাঝে-মাঝে তো এরকম ওর হয়ই, আবার ঠিকও হয়ে যায়।'

'কবে যাব আপনার কাছে?'

'কাল পর্যন্ত ব্যস্ত আছি। পরশু থেকে একদম ফ্রি।'

'শুক্রবার আর শনিবার, দুটো দিন একটু ঝঞ্ঝাটে থাকব। অর্থাৎ পরশু আর তরশু। তারপরেই তো রোব্বার। বলেন তো রোব্বার বিকেলেই যেতে পারি। ফোনে অবশ্য রোজই খবর নেব।'

'ঠিক আছে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা হলে রোব্বারই আসুন। তবে বিকেলে নয়, সকালে। ...এই নিন, মালতীর সঙ্গে কথা বলুন।'

'সকালেই চলে আসুন, কিরণদা।' ফোনে মালতীর গলা ভেসে এল, 'দুপুরে এখানেই খাবেন। বি কলের আগে আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। পারুল আর বউদিকেও নিয়ে আসবেন কিন্তু।'

'আবার খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা বাধাচ্ছ কেন মালতী? অরুণের শরীর তো শুনলুম ভালো যাচ্ছে না। আর তা ছাড়া তোমার বউদি যে যেতে পারবে, এমন আশাও নেই। পারুলের জন্যেই পারবে না। সামনের মাসেই পারুলের বি. এ. ফাইনাল। সারাদিন পড়ছে। অর্থাৎ কিনা মরণকালে হরিনামের ব্যাপার! তা বাসন্তীও গত দু-মাস ধরে পাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি। বলছে, মেয়ের পরীক্ষা যদ্দিন না শেষ হয়, কোথাও যাবেও না।'

'ঠিক আছে, তা হলে আপনি একাই আসুন। অরুণকে নিয়ে ভাববেন না। আজ প্রেশার নেওয়া হয়েছিল, আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে।'

ফোন নামিয়ে রেখে কাজে বসে গেলুম।

কাজকর্ম চুকিয়ে অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা। বাসন্তী বলল, 'চটপট জামাকাপড় পালটে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, সেই ফাঁকে আমি খাবারগুলো গরম করে ফেলি। দেরি কোরো না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে বাসন্তী সব সাজিয়ে ফেলেছে। পারুল চটপট নাকে-মুখে দুটি গুঁজে উঠে পড়ল। বলল, 'তোমরা ধীরে সুস্থে খাও, আমি গিয়ে পড়তে বসছি। আজ দুটো পর্যন্ত পড়ব।'

বাসন্তী বলল, 'দেখিস, পরীক্ষার আগে আবার একটা অসুখ বাধিয়ে বসিস না। চারদিকে বড্ড জ্বরজারি হচ্ছে।'

পারুল গিয়ে পড়তে বসে গেল। বাসন্তীকে বললুম, 'বাবা রে বাবা, ভালো করে খেল না

BanglaBook.org

পর্যন্ত, মেয়েটা তো দেখছি পড়তে-পড়তেই পাগল হয়ে যাবার জোগাড়।'

বাসন্তী বলল, 'বা রে, না-পড়লে চলবে কেন? পার্ট ওয়ানে অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, ফাইনালে সেটা মেটাতে হবে না? ...ওহো, একটা কথা তোমাকে তো বলা-ই হয়নি, ও-বাড়ির খবর শুনেছ?'

'কী করে শুনব? আমি তো এইমাত্র বাড়ি ফিরলুম। কেন, আবার কী হয়েছে?'

বাসন্তী হেসে বলল, 'ভাড়াটেদের জল আর লাইট আজ বিকেল থেকে আবার চালু হয়ে গেছে।'

বললুম, 'তাই নাকি? সদানন্দবাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি।'

বাসন্তী বলল, 'ওঁর আবার সুবুদ্ধি কী হল? যা কিছু হয়েছে, সবই কুসুমদির জন্যে। তুমি অফিসে চলে যাবার পরে ও-বাড়িতে একবার গিয়েছিলুম তো, কুসুমদিই ওঁদের কাজের মেয়েটাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তা গিয়ে দেখলুম, কর্তা-গিন্নিতে একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড হচ্ছে। কুসুমদি আমার সামনেই তাঁর কর্তাটিকে বলে দিলেন যে, আজ বিকেলের মধ্যেই ভাড়াটেরা যদি জল আর লাইট না পায় তো বাড়ি ছেড়ে তিনি যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাবেন। তা সদানন্দবাবুও দেখলুম, গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সুড়সুড় করে অমনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কুসুমদির অমনি অন্য চেহারা। একগাল হেসে আমাকে বললেন, 'ভয় পাসনি রে বাসন্তী, মিস্ত্রি ডাকতে গেল, আমাকে ভীষণ ভয় পায় তো!' বোঝো ব্যাপার!'

আমি বললুম, 'বটে? সদানন্দবাবু যে এত স্ত্রৈণ, তা তো জানতুম না।'

বাসন্তী মুখ টিপে হেসে বলল, 'এতে এত অবাক হচ্ছ কেন? অল্প বয়েসে যে যা-ই করুক, বুড়ো বয়েসে তো বউ ছাড়া আর গতি থাকে না, তখন আর স্ত্রৈণ না হয়ে উপায় কী।'

শুনে প্রায় বিষম খেতে যাচ্ছিলুম, অনেক কষ্টে সেটা সামলে নিয়ে বললুম, 'তা বটে।'

'এত করেও কিন্তু কিছু হল না। কুসুমদির যেটা সমস্যা, সেটা রয়েই গেল।'

'তার মানে?'

বাসন্তী বলল, 'তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? সমস্যাটা যে কী, তা তুমি এখনও টের পাওনি?'

'না, পাইনি। একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'এত তো বুদ্ধির বড়াই করো, অথচ আসল ব্যাপারটাই তুমি ধরতে পারোনি। কুসুমদির সমস্যা ওই কমলিকে নিয়ে। বাদবাকি ভাড়াটেদের কী হল না-হল, তা নিয়ে ওঁর কিছু মাথাব্যথা নেই, কিন্তু কমলির যে অসুবিধে হচ্ছে, এইটে উনি সহ্য করতে পারছেন না।'

বললুম, 'এ তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ভদ্রমহিলার ছেলেপুলে হয়নি, তাই কমলির ওপরে ওঁর যে একটা টান পড়ে যাবে, সে আর বিচিত্র কী। মেয়েটা তো শুনলুম সারাদিন ওঁরই কাছে থাকে।'

বাসন্তী বলল, 'আগে থাকত, কাল রাত্তির থেকে আর থাকছে না। কাল বিকেলের মধ্যেই তো জল আর লাইট আবার চালু হয়ে গেল, তার পরেও একবার সন্ধে-নাগাদ কুসুমদির কাছে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, মুখ ভার করে বসে আছেন। কী ব্যাপার? না কমলিকে ওপরে নিয়ে আসবার জন্যে ওঁদের কাজের মেয়েটিকে উনি একতলায় নকুলের বউয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তা নকুলের বউ তাকে খুব মুখ-ঝামটা দিয়েছে। বলেছে, 'থাক-থাক, আর অত সোহাগ দেখাতে হবে না!' কমলিকেও ওপরে নিয়ে আসতে দেয়নি।'

বললুম, 'তাই তো, সমস্যাটা দেখছি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

বাসন্তী বলল, 'পরকে আপন করার এই হচ্ছে বিপদ। ওই যে বলে না পরের সোনা কানে দিতে নেই, ঠিকই বলে, কখন হ্যাঁচকা টান মারবে, তার ঠিক কী। তখন সোনাও যাবে, কানও যাবে।'

BanglaBook.org

বললুম, 'কমলির ওপরে মিসেস বসুর এত মায়া না-পড়লেই ভালো ছিল। ভদ্রমহিলাকে কষ্ট পেতে হবে।'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালুম। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

রাত্তিরে একবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে লোডশেডিং হয়েছিল। বাড়িতে একটা ইনভার্টার আছে বটে, কিন্তু সেটা পারুলের ঘরে থাকে। ফ্যান বন্ধ। ভালো ঘুম হল না। হাতপাখা চালাতে-চালাতে শেষ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়। তাও ভাঙত না, যদি না বাসন্তী এসে ঠেলা মেরে আমাকে তুলে দিত।'

চোখ খুলে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

'আর কত ঘুমোবে, উঠে পড়ো, সদানন্দবাবু সেই কখন থেকে বসে আছেন।'

'একটু বসিয়ে রাখো; বলো যে, হাত-মুখ ধুয়েই আমি বৈঠকখানায় যাচ্ছি। ওঁকে চা দিয়েছ তো?'

'দিয়েছি। এখন ওঠো তো।'

হাত-মুখ ধুয়ে, চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলুম। ঢুকেই বুঝলুম অবস্থা সুবিধের নয়। সদানন্দবাবুর মুখ একেবারে অন্ধকার।

বললুম, 'কী ব্যাপার মশাই, আবার কিছু হল নাকি?'

'আর বলবেন না!' সদানন্দবাবু বললেন, 'আমি এবারে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।'

'কেন, পাগল হবার মতো কী ঘটল?'

'জল আর লাইট যে কাল বিকেলেই ফের চালু করে দিয়েছি, সেটা শুনেছেন তো?'

'শুনেছি। সে তো ভালোই করেছেন।'

'কিন্তু ভালোটা আমি কার জন্যে করলুম? ওই বজ্জাতগুলো কি ভালো ব্যবহার পাবার যোগ্য?'

'এ-কথা বলছেন কেন?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'তা হলে শুনুন, যার কষ্টের কথা ভেবে আমার গিন্নির ঘুম হচ্ছিল না, সেই বাচ্চা মেয়েটাকে আজ সকালেও ওরা ওপরে আসতে দেয়নি। কমলি আসতে চায়, কিন্তু ওরা আসতে দেবে না। কমলি তাই কাল থেকে সমানে কাঁদছে। তা সে কাঁদতেই পারে। ও যে এত বড়টা হয়েছে, সে তো বলতে গেলে আমার গিন্নির হাতেই। সারাটা দিন তো তিনিই ওকে দেখতেন। রাত্তিরে গিয়ে মায়ের কাছে শুত; বাস, একতলার সঙ্গে ওইটুকুই ওর সম্পর্ক। সেই মেয়েকে ওরা কিনা ওপরে আসতে দেবে না। ফলে একতলায় যেমন কমলি একটানা কেঁদে যাচ্ছে, তেমনি দোতলায় কাঁদছেন আমার গিন্নি। কাল থেকে সমানে কাঁদছেন। আমার হয়েছে জ্বালা। কী যে করি, কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা কিছু পরামর্শ দিন তো।'

এসব ক্ষেত্রে কী আর পরামর্শ দেব। একবার ভাবলুম বলেই ফেলি যে, মাদার টেরিজার কাছ থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে আপনার গিন্নির কোলে ফেলে দিন। তাতে একটা অনাথ শিশুও যেমন বেঁচে যাবে, তেমনি বাঁচবেন আপনার গিন্নিও। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে আর সে-কথা বললুম না। চুপ করে রইলুম।

সদানন্দবাবু বললেন, 'তার ওপরে আবার কাল রাত একটা-সেড়টার সময়ে বাড়ি ফিরে নকুল যে কাণ্ডটা করল, সে আর কহতব্য নয়। তখন লোডশেডিং চলছিল, কিন্তু হারামজাদা সে-কথা বুঝল না, ভাবল যে, আমিই বোধহয় ফের লাইট কেটে দিয়েছি। তাই প্রথমেই তো আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে গালাগাল করতে লাগল, তারপর শুরু হল ঠেঙানি। শুধু যে বউকে ধরে ঠেঙিয়েছে, তা নয়, ব্যাটা একেবারে বেহেড মাতাল, দুধের বাচ্চাটাকেও ছাড়েনি। তাকেও বোধহয় চড়চাপড় দিয়েছে গোটাকয়েক। মেয়েটা যেমন ডাক ছেড়ে কাঁদছিল, তাতে তো মশাই সেইরকমই মনে হয়।'

BanglaBook.org

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন সদানন্দবাবু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আপনি কিছু বলবেন না, কেমন?'

বললুম, 'কী যে বলব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'বেশ, আপনি তা হলে চুপ করেই থাকুন। কিন্তু এই আমি বলে গেলুম যে, আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই। পাড়ার সকলকে আমি বলেছি যে, যদি দরকার হয় তো গুন্ডা লাগিয়ে আমি ওকে তাড়াব। আর গুন্ডারই বা দরকার কী, এই যে লাঠিটা দেখছেন না, এটাই যথেষ্ট, এইটে দিয়েই ওর মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব আমি।'

সদানন্দবাবু বেরিয়ে গেলেন।

এ হল বৃহস্পতিবার সকালের কথা। কাল ছিল শুক্রবার। কালও নকুলচন্দ্র নাকি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। আর আজ শনিবার ভোরবেলায় একটা বিকট আর্তনাদ শুনে পাড়ার লোকেরা ছুটে গিয়ে যা দেখল, তাতে তাদের রক্ত একেবারে হিম হয়ে যাবার জোগাড়। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। পাঁচ নম্বর বাড়ির একতলার সিঁড়ির ঠিক সামনেই তার নিষ্প্রাণ শরীরটা লুটিয়ে পড়ে আছে।

॥ ৭ ॥

সদানন্দবাবুই যে নকুলচন্দ্রকে খুন করেছেন, আমার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। ভদ্রলোককে আমি চিনি, দশ বছর ধরে তাঁকে বলতে গেলে প্রায় রোজই দেখছি। তা একটা মানুষের ধাতটা যে ঠিক কীরকম, সে রগচটা না ঠান্ডা মাথার লোক, হাঙ্গামাবাজ না শান্তিপ্রিয়, তা বোঝার পক্ষে—আমার তো মনে হয়—দশ কেন, পাঁচটা বছরই যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস। তিনি পরোপকারী, সজ্জন, উপরন্তু খুবই নিরীহ ব্যক্তি। মাঝেমধ্যে একটু রেগে যান ঠিকই, রেগে গেলে 'হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা' বলেনও বটে, কিন্তু খুন তো খুন, কাউকে একটা চড়চাপড় মারাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে কিনা বাইরে থেকে যাঁকে নেহাত ভালোমানুষ বলে মনে হয়, খুন-টুন করা যে তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব একটা ব্যাপার, নিশ্চিত হয়ে তা-ই বা বলি কী করে? বললে সে-কথা আপনারা শুনবেনই বা কেন? তার ওপরে আবার গল্পটা যেখানে শোনাচ্ছি, সেই কলকাতা শহরে সম্প্রতি খুব সমারোহ সহকারে চ্যাপলিন উৎসব হয়ে গেল। চ্যাপলিনের শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর যে-সব ছবি আবার নতুন করে দেখানো হল, তার মধ্যে মঁসিয়ে ভের্দুও ছিল বইকী। আপনারা সে-ছবি দেখেছেন নিশ্চয়। কেউ-কেউ হয়তো একাধিকবার দেখেছেন। ফলে আপনারা জেনেই গিয়েছেন যে, এমনিতে যে-লোক নেহাতই নিরীহ; এত নিরীহ যে, একটা পোকাকেও পিষে মারতে পারে না; চায় যে, সেটাও বেঁচেবর্তে থাক, সে-ও খুন করতে পারে। তাও একবার নয়, বারবার। সুতরাং সদানন্দবাবুকে যদি এক্ষুনি আমি একটা গুড কনডাক্ট সার্টিফিকেট দিয়ে দিই, তো সেটা আপনারা মেনে নেবেন না।

আর তা ছাড়া, যাকে অকুস্থল বলা হয়, ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি যে সেখানে কিংবা তার আশেপাশে হাজির ছিলুম, তাও তো নয়। ফলে কিছুই আমি স্বচক্ষে দেখিনি। সবই আমার শোনা কথা। কিছুটা সদানন্দবাবুর কাছে শুনেছি, কিছুটা অন্যদের কাছে। অন্যদের কথা পরে হবে, আগে বরং সদানন্দবাবুর কাছে যা শুনেছি, সেটাই বলব।

কিন্তু তারও আগে বলা দরকার, শনিবার ভোরবেলায় একটা ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে যখন পারুল আমাদের ঘরে এসে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলে যে, পাঁচ নম্বর বাড়িতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে, এক্ষুনি আমার সেখানে যাওয়া উচিত, আর তার কথা শুনবামাত্র আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে নীচে নেমে সদর-দরজা খুলে একছুটে রাস্তা পেরিয়ে যখন ও-বাড়িতে গিয়ে ঢুকি, তখন

BanglaBook.org

সদানন্দবাবুকে আমি ঠিক কী অবস্থায় দেখেছিলুম। ভদ্রলোক তখন সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে একেবারে পাথরের একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। সিঁড়ির তলায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে যমুনা আর বিষ্টুচরণ। যা-ই দেখুক, সেটা তাদের শরীরের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় অন্তত সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পাইনি। স্পষ্ট করে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম শুধু সদানন্দবাবুকেই। তাঁর মাথার ওপরে কড়া পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে। তার আলোয় আমার মনে হল যে, ভদ্রলোকের মুখ একেবারে মড়ার মতন ফ্যাকাসে। চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন বিহ্বল। যেন কোনও কিছুই তিনি ঠিক দেখছেন না বা বুঝে উঠতে পারছেন না। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ তিনি ধপ করে সেই সিঁড়ির ধাপের ওপরেই বসে পড়লেন।

এ হল শনিবার ভোরবেলাকার ঘটনা। মনে হয়, কথা বলবার মতো অবস্থাই তখন সদানন্দবাবুর ছিল না। বাইরের লোকেদের মধ্যে আমি আর আমার পাশের বাড়ির শম্ভুবাবুই ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথম পৌঁছই। পরে এক-এক করে আরও অনেকে এসে পড়েন। মোটামুটি ছটার মধ্যেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ওপর ভিড় জমে যায়।

যমুনা আর বিষ্টুচরণের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল বলে নকুলের লাশটা প্রথমে আমার চোখেই পড়েনি। ফলে আমি মিনিট খানেকের মধ্যে বুঝেই উঠতে পারিনি যে, ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে। সেটা বুঝলুম শম্ভুবাবু গিয়ে বিষ্টুচরণকে একপাশে সরিয়ে দেবার পর।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এই শহরের রাস্তাঘাটে নিত্য যে-সব দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আর এখন একটা মৃতদেহ দেখে আমার শিউরে ওঠার কথা নয়। নকুলকে দেখে তবু যে আমি শিউরে উঠেছিলুম, তার কারণ নিশ্চয় এই যে, আমারই বয়েসি আরও অনেকের মতো এখনও আমি একটা ইট কিংবা পাথরের মতো নিশ্চেতন পদার্থে পরিণত হইনি।

সিঁড়ির নীচে চিৎ হয়ে নকুল পড়ে আছে। শম্ভুবাবু এগিয়ে গিয়ে, উবু হয়ে বসে, তার নাড়িতে হাত রাখলেন। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডেড।'

নকুল যে বেঁচে নেই, সে তার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। আমার বুকের মধ্যে দমাস-দমাস করে মুগুর পেটার শব্দ হচ্ছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছে, দুই কানের ভেতর দিয়ে বইছে গরম হাওয়া। অনেক কষ্টে প্রায় অস্ফুট গলায় শম্ভুবাবুকে বললুম, 'আপনি একটু থাকুন এখানে, আমি ডঃ চাকলাদারকে সব জানাচ্ছি, তারপর থানায় একটা ফোন করে দিয়ে এখুনি আবার ফিরে আসব।'

রাস্তায় নামতেই চোখে পড়ল যে, বাসন্তী আর পারুল সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

বললুম, 'সর্বনাশ হয়েছে।' তারপর ওপরে এসে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলুম।

ফোন আজকাল চট করে পাওয়া যায় না। ডঃ চাকলাদার কাছেই থাকেন, তাঁকে পেতে দেরি হয়নি, কিন্তু থানার লাইন পেতে-পেতে মিনিট দশেক লাগল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

ওদিক থেকে যিনি 'হ্যালো' বললেন, গলা শুনেই বোঝা গেল যে, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁর ঘুমের আমেজ এখনও কাটেনি।

বললুম, 'আমি পীতাম্বর চৌধুরী লেন থেকে কথা বলছি। আমার নাম কিরণ চট্টোপাধ্যায়, আমি জার্নালিস্ট, "দৈনিক সমাচার" পত্রিকায় কাজ করি।'

'জার্নালিস্ট? খবর চাইছেন নিশ্চয়? না, আমাদের এলাকায় কাল রাত্তিরে বড়-কিছু ঘটেনি। রাস্তা থেকে গোটা দুয়েক মাতালকে ধরে এনে লক-আপে পুরে দিয়েছি। আর আছে একটা রোড-অ্যাক্সিডেন্টের কেস। তাও মাইনর অ্যাক্সিডেন্ট, কেউ মারা-টারা যায়নি। বাস, আর কোনও খবর নেই।'

BanglaBook.org

বললুম, 'আরে মশাই, আমি খবর চাইছি না, খবর দিতে চাইছি। আমাদের রাস্তায় হঠাৎ একজন মারা গেছে। মনে হচ্ছে, আপনাদের ও সি-র একবার আসা দরকার।'

'আমিই ও সি। কী হয়েছে বলুন তো? মার্ডার?'

'তা তো জানি না। মার্ডার হতে পারে, অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে। ঠিক কী যে হয়েছে, সেটা আপনারা এসে ঠিক করুন।'

'ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি। একটা কথা জিগ্যেস করি, ব্যাপারটা কোথায় ঘটেছে? মানে রাস্তায় না বাড়ির মধ্যে?'

'বাড়ির মধ্যে।'

'যে-বাড়িতে ঘটেছে, আপনি কি তার কাছেই থাকেন?'

'খুবই কাছে। বলতে গেলে এটা আমাদের একেবারে উলটোদিকের বাড়ি।'

'তা হলে তো ভালোই হল। আমরা একটু বাদেই ওখানে পৌঁছে যাব। কিন্তু তার আগে আপনি কাইন্ডলি একবার ওখানে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিন যে, ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সেখান থেকে কেউ যেন কিছু না সরায়। মানে যা-কিছু যেখানে যেমনভাবে আছে, ঠিক সেইখানে ঠিক তেমনিভাবেই যেন থাকে। আর হ্যাঁ, ডেডবডিটাকেও যেন কেউ টাচ না করেন। এটা জানিয়ে দিতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে?'

'কিছুমাত্র না। এখুনি ওখানে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম। পরক্ষণেই মনে হল, ভাদুড়ীমশাই তো কলকাতাতেই আছেন। তাঁকে একবার ব্যাপারটা জানানো দরকার।

কপাল ভালো, এবারে আর লাইন পেতে দেরি হল না। দু-চার কথায় যা জানাবার জানাতেই তিনি বললেন, 'সম্ভবত আপনি চাইছেন যে, আপনার বন্ধু সদানন্দবাবুকে সাহায্য করবার জন্যে আমি একবার যাই। কিন্তু আমি এখন যাব না। আমার বদলে যাকে পাঠাচ্ছি, তাকে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন।'

বাসন্তী আর পারুল ইতিমধ্যে ওপরে উঠে এসেছিল। পাশেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। চুপচাপ আমার কথা শুনে যাচ্ছিল। ফোন নামিয়ে রাখতে বাসন্তী বলল, 'ও বাড়িতে অত কান্নাকাটি হচ্ছে কেন? কী হয়েছে? সদানন্দবাবুর কিছু হয়নি তো?'

বললুম, 'সদানন্দবাবুর কিছু হয়নি, তবে যা ভয় করছি, তা যদি সত্যি হয় তো ভদ্রলোক বিপদে পড়ে যাবেন। নকুল মারা গেছে।'

পারুল বলল, 'সে কী! কখন মারা গেল? কী হয়েছিল?'

বললুম, 'কিচ্ছু জানি না। আমি একবার ও-বাড়িতে যাচ্ছি।'

বাসন্তী বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর যাবার দরকার নেই। তুই নিজের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে নে। কাল বিকেলে যে পায়েস করেছিলুম, তার খানিকটা ফ্রিজে রয়েছে। সন্দেশও রয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে পড়তে বসে যা।'

আমি আর বাসন্তী চটপট নীচে নেমে রাস্তার ওপরের ভিড় ঠেলে পাঁচ-নম্বরে গিয়ে ঢুকলুম।

ছ'টা বাজে। কিন্তু যতই বেলা বাড়ুক, মধ্য-কলকাতার এইসব এঁদো গলির অন্ধকার যেন আর কাটে না। সিঁড়ির উপরকার কড়া-পাওয়ারের আলোটা তখনও জ্বলছে। নইলে নিশ্চয় চৈত্র মাসের সকাল ছ'টাতেও জায়গাটা একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকত।

নকুলের মাথার পাশে মেঝের উপরে চাপ-চাপ রক্ত। আগে এটা চোখে পড়েনি। বাসন্তী যে ভয় পেয়ে গিয়েছে, সে তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। তাকে বললুম, 'তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওপরে চলে যাও।'

শম্ভুবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। বাসন্তী ওপরে চলে যাবার পরে আমাকে জিগ্যেস করলেন,

'থানায় খবর দিয়েছেন?'

বললুম, 'দিয়েছি। ওরা একটু বাদেই এসে পড়বে। কিন্তু সদানন্দবাবুকে দেখছি না যে?'

'ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে; বললেন যে, শরীরটা অস্থির-অস্থির করছে। মাথাটা বোধহয় একটু ঘুরে গিয়েছিল। একবার একটু বমিও করে ফেললেন। ওঁকে ওপরে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছি।'

পাড়ার যাঁরা ভেতরে এসে ঢুকেছিলেন, থানায় খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই তাঁরা একে-একে সরে পড়তে লাগলেন। কী হয়েছে, সেটা জানবার জন্যে কারও কৌতূহলই কিছু কম নয়, কিন্তু যেমন কৌতূহল তেমনি অল্পবিস্তর ভয়ও আছে প্রায় প্রত্যেকেরই। পুলিশ এসে জেরা করবে, মামলা হলে সাক্ষী দিতে বলবে, সাধ করে কে আর ওসব ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়াতে চায়।

শম্ভুবাবুকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে, তিনি গেলেন না। জিগ্যেস করলুম, 'আপনার আজ অফিস নেই?'

'আজ তো শনিবার। আমার ছুটি। একবার অবশ্য বাজারে যাবার দরকার ছিল, তা সে কাল গেলেও চলবে।'

'ভালোই হল, আপনি তা হলে আর-কিছুক্ষণ এখানে থেকে যান। ও হ্যাঁ, থানা থেকে বলল যে, কেউ যেন এখান থেকে কিছু না সরায়। ডেডবডিটাও না ছোঁয়।'

দেওয়ালের ধারে বসে হাপুস নয়নে যমুনা কাঁদছিল। বিষ্টুচরণ তার ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মূলত ওদেরই উদ্দেশে বলা, কিন্তু শুনতে পেল কিনা, কে জানে।

শম্ভুবাবু বললেন, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনিও এখানে থাকবেন তো?'

বললুম, 'থাকব। তবে এখন একটু ওপরে যাচ্ছি। সদানন্দবাবুর অবস্থাটা একবার দেখে আসা দরকার।'

দোতলায় এসে দেখলুম, সদানন্দবাবুকে তাঁর খাটের ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কাজের মেয়েটি বাতাস করছে তাঁকে। সদানন্দবাবুর স্ত্রী একদিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে বাসন্তী তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, আমি গিয়ে ঘরে ঢুকতে জিগ্যেস করল, 'থানা থেকে এসেছে?'

বললুম, 'না, পুলিশ কি এত তাড়াতাড়ি আসে নাকি?'

সদানন্দবাবু আমাকে দেখে ম্লান হাসলেন। বললুম, 'কেমন আছেন এখন?'

ক্লান্ত গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'অনেকটা ভালো। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল।'

'যাবারই কথা। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি।'

আবার হাসলেন সদানন্দবাবু। সেই ম্লান হাসি। তারপর বললেন, 'কী আর বলব বলুন, সবই আমার গ্রহের ফের।'

বললুম, 'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, এই নিয়ে আপনি একটা ঝঞ্ঝাটে না জড়িয়ে যান। ঠিক কী হয়েছিল?'

সদানন্দবাবু উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওঠবার কোনও দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করবারও না। যা বলবার, আস্তেসুস্থে বলুন।'

অতঃপর তিনি যা বললেন, আপনাদেরও আমি সেটাই জানাচ্ছি।

চৈত্র মাস। রাত্তিরে বেজায় গরম পড়েছিল, তা ছাড়া মাঝরাত্তিরে মত্তাবস্থায় বাড়িতে ফিরে নকুলচন্দ্র কালও এমন হই-হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছিল যে, সদানন্দবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। টর্চ জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, রাত তখন একটা। তারপরে আর ভালো করে ঘুম হয়নি, ওই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিলেন আর কি। মনে হয়, তার বেশ কিছুক্ষণ বাদে এই মোটামুটি তিনটে

BanglaBook.org

নাগাদ একতলায় কিছু একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দও শুনেছিলেন। কিন্তু সেটা যে কীসের শব্দ, তা বুঝতে পারেননি। ভালো করে ঘুমোতে না-পারলেও, রোজ যেমন ওঠেন, তেমনি আজও ঠিক সাড়ে চারটেতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। স্টোভ ধরিয়ে তাতে জলের কেতলি বসিয়ে দেন। জলটা ফুটতে-ফুটতেই রোজকার মতো ধুয়ে নেন মুখ-চোখ। তারপর হালকা এককাপ লিকার খেয়ে, জামাকাপড় পালটে রোজকার মতোই মর্নিং ওয়াকে বেরুবার জন্যে যখন নীচে নামেন, পাঁচটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। সিঁড়িটা অন্ধকার। ওপর থেকে সুইচ টিপে সিঁড়ির আলো জ্বেলে নীচে নামা যায়। কিন্তু সিঁড়ির আলোটা তিনি কোনওদিনই এইসময় জ্বালেন না। আজও জ্বালেননি। না-জ্বালবার কারণ আর কিছুই নয়, সিঁড়ির আলো জ্বালবার আর নেবাবার জন্য যে টু-ওয়ে সুইচের ব্যবস্থা আজকাল প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়, সদানন্দবাবুর বাড়িতে সেটা নেই। তাই ওপর থেকে আলো জ্বেলে নীচে নামলে আর নীচ থেকে সেটা নেবাবারও উপায় নেই। মর্নিং ওয়াক শেষ করে যতক্ষণ না তিনি আবার বাড়িতে ফিরে আসছেন, ততক্ষণ সেটা জ্বলতেই থাকবে। ভদ্রলোক অনেকদিন ধরেই ভাবছেন যে, একটা টু-ওয়ে সুইচের ব্যবস্থা করে নেবেন, কিন্তু এখনও সেটা করা হয়নি। অগত্যা তাঁকে টর্চ জ্বেলে নীচে নামতে হয়। ছোট পকেট-টর্চ। আজ তার বোতাম টিপেই বুঝলেন যে, ব্যাটারির তেজ ফুরিয়ে এসেছে। একে তো ম্যাড়মেড়ে আলো, তায় ছানি কাটাবার পর থেকে চোখেও ভালো দেখতে পান না, খুবই সতর্কভাবে পা ফেলতে-ফেলতে তাই নীচে নামছিলেন তিনি। কিন্তু বারো-চোদ্দ ধাপ নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ম্লান আলোতে আবছামতন তিনি দেখতে পান যে, সিঁড়ির শেষ ধাপের ঠিক সামনেই একটা লোক মেঝের ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। লোকটা যে নকুলচন্দ্র, সে-কথা বুঝতে তাঁর কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। তারপরেই তিনি বিকটভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন।

নকুল যে মারাই গেছে, চিৎকার করে ওঠবার মুহূর্তেও অবশ্য সদানন্দবাবু তা বুঝতে পারেননি। তাঁর চিৎকার শুনে সিঁড়ির দু'দিকের দুটো ঘর থেকে যখন যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে বেরিয়ে আসে, তখনও না। তিনি ভেবেছিলেন, মোদো-মাতাল লোকটা হয়তো শেষ-রাত্তিরে একবার বাথরুমে যাবার জন্যে টলতে-টলতে তার ঘর থেকে বেরিয়েছিল; তখন, কিংবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার ঘরে ফেরবার সময়ে, অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালে ধাক্কা লেগে আর টাল সামলাতে পারেনি, আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে তা নয়, আরও ভয়াবহ, একটু বাদেই তা বোঝা গেল। চিৎকার শুনে কুসুমবালারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দোতলায় তাঁদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দেন। টর্চের ম্যাড়মেড়ে আলোয় সবকিছু এতক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়নি। এবারে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল যে, মেঝের ওপরে চাপ-চাপ রক্ত, আর সেই রক্ত নেমে এসেছে নকুলচন্দ্রের মাথা থেকেই। যেমন নিথর, নিস্পন্দ হয়ে সে পড়ে আছে, তাতেই সদানন্দ বুঝতে পেরে যান যে, সে বেঁচে নেই। তাঁর এক হাতের লাঠি ও অন্য হাতের টর্চ খসে পড়ে যায়। সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরে তিনি তখন দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে ওঠেন।

॥ ৮ ॥

ডঃ চাকলাদারকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে রেখেছিলুম। তিনি এলেন সাড়ে ছ'টায়। একতলায় এসে আমার খোঁজ করতে শম্ভুবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় উঠে আসেন। ডাক্তার চাকলাদারকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে শম্ভুবাবুকে বললুম, 'আপনি একটু থেকে যান। অন্তত যতক্ষণ না থানা থেকে ওরা এসে পৌঁছচ্ছে। নীচেই থাকুন, নইলে কে কী নাড়াচাড়া করবে, কোথার থেকে কোন জিনিসটা

BanglaBook.org

সরিয়ে রাখবে, তার ঠিক কী।'

শম্ভুবাবু নীচে নেমে গেলেন। ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'ওরে ব্বাবা, এতটা তো ভাবিনি। একতলায় তো রক্তারক্তি কাণ্ড! কী হয়েছিল মশাই?'

বললুম, 'ঈশ্বর জানেন। কিন্তু ও তো মারাই গেছে, ওকে নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই। যিনি বেঁচে আছেন, তাঁকে দেখুন।'

ডাক্তার চাকলাদার খাটের কাছে তাঁর চেয়ারটাকে সরিয়ে আনলেন। সদানন্দবাবুর কপালে হাত রাখলেন, টেম্পারেচার নিলেন, বুকে-পিঠে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে লম্বা করে নিশ্বাস টানতে বললেন, তারপর ব্লাড প্রেশার নিয়ে বললেন, 'কিছু না, শুধু প্রেশারটা একটু বেড়েছে। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খান, আর আজকের দিনটা চুপচাপ শুয়ে থাকুন, নড়াচড়া করবেন না। কাল সকালে কাউকে দিয়ে প্রেশারটা আর একবার দেখিয়ে নেবেন।'

কুসুমবালা আলমারি খুলে টাকা বার করে এনেছিলেন, চাকলাদার হেসে বললেন, 'টাকা কীসের? জানেন তো আমি কারও বাড়িতে যাই না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। ডঃ চাকলাদার আসলে প্যাথলজিস্ট। পাশের গলির মোড়েই তাঁর ল্যাবরেটরি। জ্বরজ্বারি হলে আমরা তাঁর কাছে যাই বটে, প্রেসক্রিপশনও লিখিয়ে নিই, কিন্তু তার জন্যে তিনি এক পয়সাও নেন না। বাড়িতেও যান না কারও। আজ যে এসেছেন, সেটা একেবারে না-এসে উপায় ছিল না বলেই।

চাকলাদার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'চলি তা হলে।'

ঘর থেকে ভদ্রলোক বেরিয়েওছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির মাথা থেকেই ফিরে এসে বললেন, 'যাওয়া হল না। মনে হচ্ছে আটকে গেলুম।'

'কেন, কী হল?'

'পুলিশ এসে গেছে।'

বললুম, 'তা হলে একটু থেকেই যান। অসুবিধে নেই তো?'

'অসুবিধে আর কী, ল্যাবরেটরিতে ক'টা টেস্ট করবার ছিল, তা সে ঘণ্টা-খানেক বাদে করলেও ক্ষতি নেই। চলুন, নীচে যাওয়া যাক।'

বাসন্তীও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলি কুসুমদি। মেয়েটা একলা রয়েছে। পরে আবার আসব।'

তিনজনে মিলে নীচে নেমে এলুম।

আমাদের থানা-অফিসার গঙ্গাধর সামন্তকে আমি আগে কখনও দেখিনি। নামটাই মাত্র শোনা ছিল। এও শুনেছিলুম যে, মানুষটি ধাপ্পাবাজ নন; পোলিটিক্যাল পেট্রনেজের ধার ধারেন না; এলাকায় যাতে শান্তি মোটামুটি বজায় থাকে, তার জন্যে যেটা করা দরকার বলে তাঁর মনে হয়, সেটাই করেন। আর তা ছাড়া খুব পরিশ্রমীও নাকি।

তা পরিশ্রম করার জন্য যেরকম স্বাস্থ্য চাই, সামন্তমশাইয়ের স্বাস্থ্য দেখলুম সেইরকমই। চওড়া কাঁধের ছ'ফুট লম্বা মানুষ; শরীর একেবারে লোহা-পেটানো। মোটা একজোড়া গোঁফ থাকায় যেন ভদ্রলোকের চেহারার বাহার আরও খোলতাই হয়েছে। ঝুলো গোঁফ নয়, আদ্যন্ত সমান করে ছাঁটা; ওই যাকে ইংরেজিতে টুথব্রাশ-গোঁফ বলে, সেই বস্তু।

বাসন্তী আর দাঁড়াল না। সিঁড়ির সামনের জায়গাটুকু দেওয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে পার হয়ে রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল। সামন্তমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো মিঃ চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলুম।'

'এইমাত্র যিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, তিনি কে?'

'আমার স্ত্রী। বলতে গেলে উলটো দিকের বাড়িতেই থাকি আমরা। টেলিফোনেই তো সে-কথা আপনাকে বলেছি।'

BanglaBook.org

গঙ্গাধর সামন্ত ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর গলায়-ঝোলানো স্টেথোস্কোপ আর ডান-হাতে ধরা ব্লাড প্রেশার মাপবার যন্ত্রটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আপনি তো দেখছি ডাক্তার। এঁদের ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান?'

'আজ্ঞে না। আমি ডাক্তার ঠিকই, তবে প্র্যাকটিস করি না। আমি প্যাথলজিস্ট; কাছেই আমার ল্যাবরেটরি রয়েছে। সব রকমের পরীক্ষা হয় সেখানে।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'বিলক্ষণ। হরষিত চাকলাদার। এ-পাড়ার সবাই আমাকে চেনেন। সাধারণত কারও বাড়িতে আমি রোগী দেখতে যাই না। তবে পাড়ায় থাকি যখন, এসব ক্ষেত্রে আসতেই হয়।'

'যিনি মারা গেছেন, তাঁকে পরীক্ষা করে তারপর ওপরে গিয়েছিলেন?'

ডঃ চাকলাদার অবাক হয়ে গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁকে আবার পরীক্ষা করব কী! পরীক্ষা করবার কথা উঠছেই বা কেন? আমি তো ময়না-তদন্ত করি না। যিনি বেঁচে আছেন, তাঁকেই আমি পরীক্ষা করে এলুম।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমি বাড়িওয়ালা সদানন্দ বসুকে দেখতে গিয়েছিলুম। এখন আমি যেতে পারি?'

'একটু থেকে যান।' গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'না-না, আমি জোর করছি না, অনুরোধ করছি মাত্র। আমাদের পুলিশ-ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার সুরেশ গুপ্তকে খবর দিয়েছি, তিনি এক্ষুনি এসে পড়বেন। এলেই আপনার ছুটি। অবশ্য যা দুর্গন্ধ এখানে, কাউকে থাকতে বলতেও সঙ্কোচ হয়।'

দুর্গন্ধের কারণ আর কিছুই নয়, মাছের ঘরের দরজা খুলে বিষ্টুচরণ ইতিমধ্যে থানা-অফিসার আর আমাদের জন্যে খান তিন-চার টিনের চেয়ার বার করে এনেছিল। গঙ্গাধর সামন্ত পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে গোঁফের ওপরে সেটাকে ঠেসে ধরে বললেন, 'ওরে বাবা, এ যে মারাত্মক গন্ধ মশাই। কীসের গন্ধ?'

আমি বললুম, 'পচা মাছের। ও-ঘরটায় মাছ থাকে। যা গরম, কিছু মাছ নিশ্চয় পচেছে।'

'তা হলে ও-ঘরের দরজা খুললেন কেন?' বিষ্টুচরণের দিকে তাকিয়ে সামন্তমশাই বললেন, 'শিগগির বন্ধ করুন। নইলে, একজন তো মরেইছে, এবারে আমরাও মারা পড়ব।'

বিষ্টুচরণ তক্ষুনি দরজা বন্ধ করে দিল। গন্ধটা তবু ঝুলেই রইল, মিলিয়ে গেল না।

নাক থেকে রুমাল নামিয়ে গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'সদানন্দবাবুকে কেমন দেখলেন?'

ডঃ চাকলাদার বললেন, 'প্রেশারটা একটু বেড়ে গেছে, আর কোনও ট্রাবল নেই।'

'যিনি মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী আর শালা ছুটে এসে তো শুনলুম সদানন্দবাবুকেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তাই না?'

বিষ্টুচরণ বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

বাইরে রাস্তার ওপরে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ হল।

সদর-দরজায় যাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই কনস্টেবলটি ভেতরে এসে জিগ্যেস করল, 'ইখানে কোই কিরোনবাবু আছেন।'

বললুম, 'আমিই কিরণ চ্যাটার্জি। কী দরকার?'

কনস্টেবলটি উত্তর দেবার আগেই যে এসে সদর-দরজায় দাঁড়াল, তাকে দেখে তো আমি অবাক। ভাদুড়ীমশাই অবশ্য বলেছিলেন যে, নিজে না এলেও কাউকে তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর যে-লোকটিকে পাঠাচ্ছেন তাকে আমি চিনতেও পারব, কিন্তু সে যে কৌশিক, তা আমি ভাবতেও পারিনি।

কৌশিককে আমি প্রথম দেখি বছর-পনেরো আগে, সেই যে-বারে আমরা মুকুন্দপুরের মনসামূর্তি উদ্ধার করতে নর্থ বেঙ্গলে গিয়েছিলুম, তখন। কৌশিক তখন তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে

BanglaBook.org

পড়ত, আর এখন একেবারে জবরদস্ত যুবাপুরুষ।

বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মিঃ সামন্তের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মিঃ সামন্ত, আপনি চারুচন্দ্র ভাদুড়ীর নাম নিশ্চয় শুনেছেন।'

'চারুচন্দ্র ভাদুড়ী...চারুচন্দ্র ভাদুড়ী...' নামটাকে দুবার জিভের ওপরে নাচিয়ে নিয়ে সামন্ত বললেন, 'আপনি কি. সি. সি. ভাদুড়ীর কথা বলছেন?...মানে এখন যিনি ব্যাঙ্গালোরে থাকেন?'

'আরে হ্যাঁ, মশাই।'

'ওরে ব্বাবা,' সামন্ত বললেন, 'তিনি তো স্বনামধন্য ইনভেস্টিগেটার। আমাদের লাইনে তাঁকে কে না চেনে। তা ইনি তাঁর কেউ হন নাকি?'

বললুম, 'এ হল কৌশিক সান্যাল। তাঁর ভাগ্নে। আর কৌশিক, ইনি মিঃ গঙ্গাধর সামন্ত, আমাদের থানার ও.সি.।'

নমস্কার বিনিময়ের পরে সামন্ত বললেন, 'তা মিঃ সান্যাল, আপনিও কি মামার লাইন ধরেছেন নাকি?'

কৌশিক হাসল। বলল, 'এখনও ঠিকমতো ধরিনি, তবে চেষ্টায় আছি। কিরণমামা আজ সকালে মামাবাবুকে ফোন করেছিলেন। তা মামাবাবুর একটা কাজ পড়ে গেছে, তাই আসতে পারলেন না, আমাকে বললেন, তুই গিয়ে ব্যাপারটা একটু দেখে আয়।'

আমি বললুম, 'গোয়েন্দা হিসেবে কৌশিকও কিন্তু এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে।'

সামন্ত বললেন, 'বটে? তা মিঃ ভাদুড়ী এখন কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, একটা কাজে এসেছেন, সামনেব হপ্তাটা থেকে যাবেন।'

'ভালো, ভালো, খুব ভালো।' সামন্তমশাই হেসে বললেন, 'ভালো করে সব দেখে যান। কাউকে যদি কিছু জিগ্যেস করতে হয় তো করুন। তারপর মিঃ ভাদুড়ীকে গিয়ে বলুন যে, কী দেখলেন, কী শুনলেন। দরকার হলে, আমিও তাঁব পরামর্শ নিতে যাব, তবে দরকার হবে বলে মনে হয না। এ তো যদ্দুর বুঝতে পারছি একেবারেই সিম্পল ব্যাপার। ওই যাকে ইংরেজিতে 'ওপন অ্যান্ড শাট কেস' বলা হয়, তাই আর কী।'

বলেই ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সামন্ত। বললেন, 'কী, ঠিক বলিনি?'

চাকলাদার হকচকিয়ে বললেন, 'কী ঠিক বলেননি?...মানে আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সামন্ত বললেন, 'না বোঝবার তো কিছু নেই। ইটস এ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল কেস অভ মার্ডার। তা প্র্যাকটিস করুন আর না-ই করুন, আপনি একজন ডাক্তার তো বটেন, খুনটা কখন হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?'

চাকলাদার চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারছিলুম যে, তিনি সাবধানী লোক, চটপট কোনও সিদ্ধান্ত করতে চাইছেন না। সামন্ত বললেন, 'কী হল, কিছু বলুন।'

চাকলাদার বললেন, 'দেখুন মশাই, এটা খুন কি না, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আনন্যাচারাল ডেথ অবশ্যই। তা পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে, আবাব কেউ ভারী কিছু, এই ধরুন থান-ইট কি পাথর কি মশলা-বাটার নোড়ার মতো কিছু দিয়ে মারবার ফলে মাথা ফেটেছে, এমনটাও হওয়া সম্ভব। সত্যি বলতে কী, যদি শুনি যে, আগেই ভদ্রলোক হার্ট-ফেল করে মারা গিয়েছেন, তারপর পড়ে যাবার ফলে মাথা ফেটেছে, তো তাতেও আমি অবাক হব না। তেমন কেসও আমি দেখেছি। তা এর মধ্যে কোনটা এক্ষেত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ এটা অ্যাকসিডেন্ট না মার্ডার, নাকি ন্যাচারাল ডেথ ইন আনন্যাচারাল সারকামস্ট্যান্সেস, তা আমি কী করে বলব, তার জন্যে তো আপনাদের এক্সপার্টরাই রয়েছেন।'

সামন্ত বললেন, 'অর্থাৎ আপনি কিছু কমিট করতে চাইছেন না, কেমন? তা না-ই করুন,

BanglaBook.org

অন্তত একটা কথা তো বলতে পারেন।'

'কী বলব?'

'ঘটনাটা কতক্ষণ আগে ঘটেছে? না-না, মিনিট আর সেকেন্ড মিলিয়ে কাঁটায়-কাঁটায় নির্ভুল সময় আপনাকে বলতে হবে না, তা আমাদের এক্সপার্টদের পক্ষেও বলা সম্ভব নয়, আপনি একটা আন্দাজের কথা বলুন।'

চাকলাদার এক-পা এগিয়ে গিয়ে ডেডবডির পাশে উবু হয়ে বসলেন। ভেবেছিলুম, নকুলের মৃতদেহের ওপরে হাত রেখে তিনি তার উত্তাপ পরীক্ষা করবেন। দেখে নেবেন যে, শরীর কতটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। এইভাবেও অনেককে মৃত্যুর সময়টা আন্দাজ করতে দেখেছি। চাকলাদার কিন্তু সেসব কিছু করলেন না। মৃতদেহের মাথার পাশে মেঝের ওপরে যে চাপ-বাঁধা রক্ত দেখা যাচ্ছিল, সেই রক্তের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। পকেট থেকে একটা ম্যাচবক্স বার করলেন। তার থেকে একটা কাঠি বার করে নিয়ে চাপ-বাঁধা রক্তের একপাশে সেটাকে চেপে ধরলেন একটু। কী যেন ভাবলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমার ধারণা, খুব বেশিক্ষণ আগের ব্যাপার এটা নয়।'

সামন্ত বললেন, 'অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবারে ওই লাঠিটা দেখুন।'

প্রথম যখন এই বাড়িতে এসে ঢুকি, লাঠিটা আমি তখনই দেখেছিলুম। সদানন্দবাবুর লাঠি। যেমন সদানন্দবাবুর টর্চ, তেমনি তাঁর লাঠিটাও সিঁড়ির নীচে পড়ে আছে। দুটো বস্তুতেই অল্পবিস্তর রক্ত লেগে রয়েছে দেখলুম।

সামন্ত বললেন, 'দেখেছেন?'

চাকলাদার বললেন, 'লাঠির আর কী দেখব?'

'আরে মশাই, আমি কি আর লাঠি দেখতে বলছি? আসলে দেখতে বলছি ওর মাথায় বসানো লোহার বলটাকে।'

আমি বললুম, 'মনে হচ্ছে, আপনি কিছু বলতে চান।'

সামন্তমশাই হাসলেন। বললেন, 'চাই-ই তো। ব্রহ্মাস্ত্রটি কার?'

'লাঠিটার কথা বলছেন তো? ওটা আমার।'

গলা শুনেই চমকে গিয়েছিলুম। তাকিয়ে দেখলুম দেড়তলা-বরাবর একটা বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা যেখানে দোতলায় উঠে গিয়েছে, সদানন্দবাবু সেই ল্যান্ডিংয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

॥ ৯ ॥

চাকলাদার বললেন, 'এ কী, আপনি বিছানা থেকে উঠে এলেন কেন? প্রেশার বেড়েছে, মাথা ঘুরে গিয়েছিল, এখন আপনার কমপ্লিট রেস্ট দরকার। না-না, এইভাবে উঠে আসা আপনার মোটেই উচিত হয়নি।'

সদানন্দবাবু ম্লান হাসলেন। বললেন, 'এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। মাথাও আর ঘুরছে না।'

সামন্ত বললেন, 'আপনিই সদানন্দ বসু?'

'হ্যাঁ।'

'এই বাড়ির মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'নীচে এসে একটু বসতে পারবেন?'

BanglaBook.org

'তা কেন পারব না? ভালোই তো আছি।'

'বেশ, তা হলে একটু নীচে এসে বসুন। আপনাকে দু-একটা কথা জিগ্যেস করব।'

রেলিং ধরে সিঁড়ির ধাপগুলি সাবধানে ভেঙে সদানন্দবাবুর নীচে নেমে এলেন। আমি তাঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলুম।

কৌশিক পটাপট ছবি তুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে সদানন্দবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'মিঃ সামন্ত আপনাকে যে-প্রশ্নই করুন, আপনি কিন্তু তার উত্তর দিতে বাধ্য নন। দরকার বোধ করলে একজন ল-ইয়ারও রাখতে পারেন। উত্তর যা দেবার, আপনার হয়ে তিনিই দেবেন।'

সামন্ত হেসে বললেন, 'ওরে ব্বাবা, এ তো দেখছি নরাণাং মাতুলক্রমঃ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সদানন্দবাবুকে আমি যেসব প্রশ্ন করব, ইচ্ছে হয় তো উনি তার উত্তর দেবেন, না হয় তো দেবেন না।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা উঠছে কেন? তবে হ্যাঁ, উত্তরটা জানা থাকলে তবেই দেব, তা নইলে আর দেব কী করে?'

সামন্ত বললেন, 'ফেয়ার এনাফ। এখন অবশ্য সামান্য-দু-একটা প্রশ্নই করব, দরকার বুঝলে অন্যসব প্রশ্ন পরে করা যাবে। তা হলে শুরু করি?'

'করুন।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন, ডেডবডি তো আপনিই প্রথম দেখেছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নের মধ্যে যে ফাঁদটা ছিল, সন্তর্পণে সেটা এড়িয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। বললেন, 'তা কী করে বলব? আমি কখন কী অবস্থায় ডেডবডিটা দেখেছিলুম, শুধু সেটাই আপনাকে বলতে পারি।'

সামন্ত বললেন, 'বেশ, তা-ই বলুন।'

অতঃপর সদানন্দবাবু যা বললেন, তা আগেই বলেছি। এই একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম যে, ভদ্রলোক খানিক আগে আমাকে যা বলেছিলেন আর এখন গঙ্গাধর সামন্তকে যা বললেন, তা একেবারে হুবহু একরকমের, কোথাও কোনও অসঙ্গতি নেই।

সামন্ত তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন লাঠিটা নিয়ে। আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে তাঁর চোখ যে বারবার লাঠিটার দিকেই ঘুরে যাচ্ছিল, আগেই সেটা দেখেছিলুম। মৃতদেহের পাশে শুধু রক্ত নয়, বেশ-খানিকটা জায়গা জুড়ে জলও ছড়িয়ে আছে। ঠিক জলও নয়, ধুলোর ওপরে জল পড়লে যেমন হয়, তেমনি; কাদা-কাদা। সেই কাদা-জলও অবশ্য প্রায় শুকিয়ে গেছে। তবু পাছে পা হড়কে যায়, তাই সামন্ত খুব সাবধানে সেই কাদার ওপর দিয়ে দু-পা এগিয়ে লাঠিটার কাছে উবু হয়ে বসলেন, তারপর বিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খানিকটা ন্যাকড়া দিতে পারেন?'

ঘর থেকে বিষ্টু খানিকটা ন্যাকড়া এনে দিল। সেই ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে যেখানটায় রক্ত নেই, খুব সন্তর্পণে সেইখানে ধরে লাঠিটাকে মেঝের ওপর থেকে তুলে এনে মিনিট খানেক সেটাকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে যখন সামন্ত আবার সদানন্দবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তখন দেখলুম যে, তাঁর ঠোঁটের ওপরে খেলা করছে একটা রহস্যময় হাসি, আর চোখ দুটিও ঈষৎ কুঁচকে গেছে।

বললেন, 'এটা তা হলে আপনারই?'

প্রশ্নটা যেভাবে করলেন, তাতেই সম্ভবত সদানন্দবাবুর গলায় কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল। ঘড়ঘড়ে গলায় তিনি বললেন, 'লাঠিটার কথা বলছেন তো? আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমারই। সে তো একটু আগেই বললুম।'

'এর মাথায় লোহার বল বসানো কেন?'

'না-বসিয়ে উপায় ছিল না, তাই বসিয়েছি। আসলে ভোরবেলায় রোজই আমি এক চক্কর মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই তো, তখন কুকুরগুলো বড্ড উৎপাত করে। গত বছর একদিন যখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরছি, তখন ওই পার্কের উত্তর-পশ্চিম দিকের ফুটপাথে

BanglaBook.org

যে ময়লা ফেলার ভ্যাটটা রয়েছে না, একটা নেড়িকুত্তা হঠাৎ সেই ভ্যাটের পাশ থেকে ছুটে এসে আমাকে কামড়েও দিয়েছিল।'

সদানন্দবাবু তাঁর ধুতিটা একটু সরিয়ে ডান-পায়ের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, সেই কামড়ের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি। তা সেইজন্যে আমাকে গুচ্ছের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল, স্যার। এই তো, ডাক্তার চাকলাদারও তো রয়েছেন এখানে। ওঁকে জিগ্যেস করে দেখুন, উনিও সব জানেন। যাই হোক সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেলুম, কিন্তু নেড়িকুত্তার ভয়ে তো আর মর্নিং ওয়াক বন্ধ করতে পারি না, তাই লাঠির মাথায় ওই লোহার বলটা বসিয়ে নিয়েছি।'

ডঃ চাকলাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সামন্ত। চাকলাদার বললেন, 'সত্যি ওঁকে জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল।'

সামন্ত আবার সদানন্দবাবুর দিকে তাকালেন : 'লাঠিতে লোহার বল বসিয়ে নেবার পরে আর কুকুরগুলো আপনাকে তাড়া করে না, কেমন?'

'আজ্ঞে তার পরেও তাড়া করত। কিন্তু ওইটে দিয়ে একদিন একটা নেড়িকুত্তাকে আমি মোক্ষম এক ঘা বসিয়ে দিই। ব্যস্, তারপর থেকে আর তেড়ে আসে না। ওই যা দূর থেকেই ঘেউ-ঘেউ করে, কিন্তু লাঠি উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়।'

লাঠিটা পড়েছিল বক্সের ধারে, আর তার পাশেই পড়ে ছিল টর্চটা, কিন্তু সেটা যেহেতু নেহাতই এক-ব্যাটারির পকেট টর্চ, এবং অতটুকু একটা জিনিসকে যেহেতু গঙ্গাধর সামন্তের পক্ষেও ব্রহ্মাস্ত্র কি পাশুপত অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়, তাই আর তিনি টর্চটা নিয়ে কিছু বললেন না।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সদর-দরজার দিকে এগোতে-এগোতে সামন্ত বললেন, 'রওনা হবার আগে যেমন আমাদের ডাক্তার গুপ্ত তেমনি ডি সি কেও একটি ফোন করে সব জানিয়ে এসেছিলুম। বোধহয় তাঁরাই এলেন।'

গাড়ি থেকে যাঁকে নামতে দেখলুম, হাতের স্টেথিস্কোপ দেখেই বোঝা গেল যে, তিনি ডাক্তার গুপ্ত। ডি সি আসেননি। সামান্য একটা মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর আসবার কথাও নয়। শুনলুম, কোথায় কোন পোলিটিক্যাল পার্টির অফিসে নাকি বোমা পড়েছে, তিনি সেখানে গেছেন।

ডাক্তার সুরেশ গুপ্ত বাড়িতে ঢুকেই কাজে লেগে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে, নানান দিক থেকে মৃতদেহটি নিরীক্ষণ করলেন তিনি, গায়ে হাত রেখে উত্তাপটা দেখে নিলেন, তারপর বেসিনে ভালো করে হাত ধুয়ে, পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে হাত মুছতে-মুছতে সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট নয়, এটা মার্ডার।'

সামন্ত বললেন, 'কী করে বুঝলেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন, আপনার তা মনে হয় না?'

'সে-কথা হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আমার ধারণাও একই। কিন্তু আপনি সেটা কী করে বুঝলেন, সেটাই জানতে চাইছি।'

ডাক্তার গুপ্ত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, 'সিম্পল ব্যাপার। বোঝবার জন্যে খুব বেশি মাথা খাটাবার দরকার নেই। কেউ যদি পা হড়কে কি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে মেঝের ওপরে দড়াম করে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তা হলে তার খুলির পিছন-দিকটা ফাটবার কথা। আর যদি উপুড় হয়ে পড়ে, তো তার খুলির সামনের দিকটা ফাটবে। তার কোনওটাই কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ঘটেনি। এ-লোকটির মাথার খুলির না-ফেটেছে পেছনের দিকটা, না-ফেটেছে সামনের দিক। ফেটেছে এর খুলির একেবারে ওপরের দিকটা। অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে আমরা ব্রহ্মতালু বলি আর সাদা বাংলায় বলি চাঁদি, সেই জায়গাটা। মাথার ওপরে ফ্যান কি ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে পড়লে খুলির এই জায়গাটা এভাবে ফাটতে পারে।'

কৌশিক এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। ডাক্তার গুপ্ত একটু থামতেই সে বলল, 'কিন্তু

BanglaBook.org

এখানে ওর মাথার ওপরে ফ্যানও ছিল না, ঝাড়লণ্ঠনও ছিল না। চাঁদিটা তা হলে ফাটল কী করে?'

হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক তাঁর কথার মধ্যে ঢুকে পড়ায় স্পষ্টতই একটু বিরক্ত হলেন ডাক্তার গুপ্ত। সামন্তকে জিগ্যেস করলেন, 'একে তো চিনতে পারলুম না, আপনাদের নতুন রিক্রুট?'

সামন্ত বললে, 'ওঃ হো পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি মিঃ কৌশিক সান্যাল। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার চারুচন্দ্র ভাদুড়ীকে মনে আছে?'

'চারু ভাদুড়ী...মানে ওই যাঁকে আমরা সিসিবি বলতুম। তিনি তো এ-লাইনে একটা লিজেন্ড মশাই। শুনেছি এখন ব্যাঙ্গালোরে থাকেন।'

'হ্যাঁ, তাঁরই কথা বলছি। ব্যাঙ্গালোরেই থাকেন বটে, তবে দিন কয়েকের জন্যে নাকি কলকাতায় এসেছেন। তা মিঃ সান্যাল তাঁরই ভাগ্নে। মামার লাইন ধরেছেন আর কি।'

ডাক্তার গুপ্ত কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে? সিসিবি তোমার মামা? 'তুমি' বলছি বলে আবার কিছু মনে কোরো না যেন।

কৌশিক বলল, 'মনে করব কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। 'তুমি'ই তো বলবেন।'

'মামার লাইনে এসেছ...মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশান? বাঃ, বাঃ, চমৎকার। লাইক মামা লাইক ভাগ্নে। এক্সেলেন্ট। তা মামাবাবুকে বোলো, সিসিবিকে আমরা ভুলিনি, উই অল রিমেমবার হিম সো ফন্ডলি।'

কৌশিক বলল, 'নিশ্চয় বলব। মামাবাবু প্রায়ই তাঁর কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের গল্প করেন।'

সামন্ত বললেন, 'মিঃ সান্যালের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও আপনি দেননি গুপ্ত সাহেব।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ও হ্যাঁ, প্রশ্নটা কী ছিল যেন? ফ্যানও নেই, ঝাড়লণ্ঠনও নেই, চাঁদিটা তাহলে ফাটল কী করে? তাই না?'

কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, কী করে ফাটল?'

ডাক্তার গুপ্ত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার সন্দেহ, একটু উঁচু জায়গা থেকে, এই ধরো ওই সিঁড়িটার দু-তিন ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে, আচমকা কেউ ভারী কিছু দিয়ে ওর মাথার ওই জায়গাটায় একটা আঘাত করেছিল। খুব জোরেই যে সেটা করেছিল, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তা নইলে নিশ্চয় খুলিটা এভাবে ফেটে যেত না।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'পাড়ার এই ডাক্তারবাবুটি ইট কি পাথর, আর নয়তো মশলা বাটা নোড়ার কথা বলছিলেন।'

'না, না,' ডাক্তার চাকলাদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চিত হয়ে আমি কিছু বলিনি। একটা সম্ভাবনার কথাই বলেছিলুম মাত্র।'

কৌশিক তার কাজ বন্ধ করেনি। যে-সব কথা হচ্ছিল, তা শুনতে-শুনতেই তার মিনস্টা ক্যামেরা দিয়ে ডেডবডির আরও কয়েকটা ছবি তুলে নিল সে। মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা কিছু ধুলোবালি আর কাঠের গুঁড়োর মতো কিছু জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে ছোট-ছোট দুটো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে রাখল। তারপর একটা 'ব্যাগ' সামন্তের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'একটা ব্যাগ আপনি রাখুন, অন্যটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, মামাবাবুকে একবার দেখাব। আপনার আপত্তি নেই তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কাজটা ইরেগুলার, তবে কিনা সিসিবিকে দেখাবেন তো, তাই আপত্তি করার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু আজই ফেরত দেবেন মশাই, নইলে আমি মুশকিলে পড়ব।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, লোকে কী ভাবে জানো তো? ভাবে যে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকেরা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তাদের দোষ দেব কী করে, গোয়েন্দা কাহিনিগুলোতে যা লেখা হয়, তাতে ওইরকমই মনে হয় যে! আরে বাবা, ক্রাইমের কিনারা করাটাই তো কাজ, তা বাইরের কেউ যদি সে-কাজে সাহায্য করেন তো তাতে আমাদের আপত্তি হবে কেন? ইন ফ্যাক্ট, উই অলওয়েজ লুক ফরোয়ার্ড টু গেটিং সাম হেলপ ফ্রম পিপল লাইক সিসিবি।'

কৌশিক বলল, 'আপনারা ভাবছেন, এটা খুন, তাই না?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সে তো বললুমই। শুধু খুন বললে অবশ্য কমই বলা হয়। ইট'স এ গ্রুসাম মার্ডার।'

'ছবি তুলতে-তুলতে আপনাদের কথা শুনছিলুম। কী দিয়ে খুন করা হয়েছে, তাও ভাবছেন নিশ্চয়?'

গঙ্গাধর সামন্ত আবার বললেন, 'ডাক্তার চাকলাদার ইট, পাথর আর মশলা-বাটা নোড়ার কথা বলছিলেন।'

চাকলাদার বললেন, 'না, না, আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলিনি।'

কৌশিক বলল, 'যদি খুনই হয়, অস্ত্রটা তা হলে ইট-পাথর কি একটা নোড়া অবশ্য হতেই পারে। তবে এক সেরি কি দুসেরি একটা বাটখারা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নয়ই তো। আবার শেষপর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় যে, বড়সড় একটা রেঞ্জ কিংবা হাতুড়ি দিয়ে মাথা ফাটানো হয়েছে, তো তাতেও আমি অবাক হব না। ...কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো, এখানে আসা অবধি একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছি। হঠাৎ যেন সেটা আরও বেড়ে গেল। ব্যাপার কী?'

তাকিয়ে দেখলুম, যে-ঘরে মাছ রাখা হয়, হাওয়ায় তার দরজাটা খুলে গেছে। গঙ্গাধর সামন্তও সেটা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'বন্ধ করুন, বন্ধ করুন, দরজাটা এখুনি বন্ধ করে দিন।'

বিষ্টুচরণ গিয়ে দরজাটা ফের বন্ধ করে দিল। এবারে হুড়কোটাও টেনে দিল সে। বাতাসে যাতে না দরজাটা আবার খুলে যায়।

সামন্ত বললেন, 'মাছের গন্ধ। পচা মাছ। এইসব মাছ খেয়েই তো ক্যালকাটার মানুষদের একেবারে বারোটা বেজে যাচ্ছে!'

॥ ১০ ॥

ভোরবেলায় যখন পাঁচ নম্বর বাড়িতে এসে ঢুকি, যমুনাকে তখন ডেডবডির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। ফোন করে ফিরে আসার পর থেকে আর তাকে দেখতে পাইনি। অনেকক্ষণ থেকেই অবশ্য চাপা একটা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তাতেই বুঝেছিলুম যে, সে তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, সেখানে বসে কাঁদছে। একটানা কান্নার শব্দ। সেইসঙ্গে ভেসে আসছিল টুকরো-টুকরো কিছু কথা। যে-রকমের কথা, তাতে মনে হচ্ছিল, কাঁদতে-কাঁদতেই কাউকে সে সমানে গালমন্দ করে যাচ্ছে। কাকে গালমন্দ করছে, নিজের ভাগ্যকে না আর কাউকে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না।

সদানন্দবাবুর স্ত্রী কুসুমবালা যে বাতের রুগি, আগেই সে-কথার উল্লেখ করেছি। ভদ্রমহিলা বিশেষ হাঁটাচলা করতে পারেন না, করেনও না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে তিনিও ইতিমধ্যে একবার নীচে নেমে এসেছিলেন। নীচে নেমে যমুনাদের ঘরেও ঢুকেছিলেন একবার। খুব সম্ভব সান্ত্বনা দিতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। ভেতরে একটা চেঁচামেচি শুনেছিলুম, কিন্তু সেটা যে কী নিয়ে তা বুঝতে পারিনি। তার পরেই অবশ্য যমুনার ঘর থেকে কুসুমবালা বেরিয়ে আসেন। দেড়তলার ল্যান্ডিংয়ে এখন একটা মোড়ার ওপরে তিনি বসে আছেন। শুনছেন কে কী বলে। নিজে কিছু বলছেন না।

সদানন্দ তাঁকে বললেন, 'বাচ্চাটাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিলে পারতে। ও তো আজ কিছুই খায়নি। অবিশ্যি খাবেই বা কী, আজ তো দুধই আনতে পারলুম না।'

BanglaBook.org

কুসুমবালা বললেন, 'দুধের জন্যে আটকাচ্ছে না। ও তো আর হরিণঘাটা কি মাদার ডেয়ারির দুধ খায় না, টিনের দুধ খায়। সে-দুধ তো ওর জন্যে দু-টিন কিনেই রেখেছি।'

সদানন্দ বললেন, 'তা হলে আর দেরি কোরো না। ওর মা'কে একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ওকে ওপরে নিয়ে যাও।'

কুসুমবালা বললেন, 'বোঝাতেই তো গিয়েছিলুম, তা শুনছে কে। কমলিকে কিছুতেই ছাড়ল না।'

গঙ্গাধর সামন্ত কথা বলছিলেন ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিকের সঙ্গে। কিন্তু সদানন্দবাবু আর কুসুমবালার কথাবার্তাও তাঁর কানে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কুসুমবালাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কমলিটা আবার কে?'

উত্তরটা কুসুমবালার বদলে সদানন্দই দিলেন। বললেন, 'নকুলের মেয়ে।' তারপর কুসুমবালাকে বললেন, 'যমুনাকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলো। না-বোঝবার তো কিছু নেই।'

কুসুমবালা বললেন, 'তবেই হয়েছে! যমুনা তখন আমাকে কী বলল জানো?'

সদানন্দবাবু কিছু বলবার আগেই সামন্ত তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তারপর খর চোখে কুসুমবালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলল?'

কুসুমবালা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখ খোলবারও সময় পেলেন না। চারদিক থেকে কানেস্তারা পিটিয়ে হাঁকোয়া করতে শুরু করলে রাগী বাঘিনি যেমন ক্রমাগত কোণঠাসা হতে-হতে তারপর হঠাৎ একসময় জঙ্গলের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে, মেয়েকে কোলে করে ঘর থেকে ঠিক তেমনি করেই ছুটে বেরিয়ে এসে যমুনা বলল, 'বাপকে মেরে এখন মেয়েকে সোহাগ দেখানো হচ্ছে! ঝাঁটা মারি তোদের সোহাগের মুখে! কী ভেবেছিস তুই রাক্ষুসি, অ্যাঁ? ভেবেছিস যে, কিছুই আমি জানি না! জানি, জানি, জানি! কমলির বাপকে তোরাই মেরেছিস! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরাই!'

তারপরেই সে গঙ্গাধর সামন্তের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'দারোগাবাবু, জলজিয়ন্ত মানুষটাকে ওরাই খুন করেছে! ওদের আপনি ফাঁসিতে লটকে দিন, দারোগাবাবু, ফাঁসিতে লটকে দিন!'

গোটা ব্যাপারটাই এমন হঠাৎ করে ঘটল যে, আমি একেবারে হতবাক! সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। যেন কিছু বলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা সরছে না। কুসুমবালা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। কৌশিক চাকলাদার আর ডাক্তার গুপ্তও স্তম্ভিত। শুধু গঙ্গাধর সামন্তই দেখলুম হকচকিয়ে যাননি। কড়া ধাতের থানা-অফিসার। যমুনা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে ছিল। সেখান থেকে দু'পা পিছিয়ে এসে কঠিন গলায় তিনি যমুনাকে বললেন, 'এখনও ওসব থাক। একটু বাদেই তো আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলব। কাকে আপনার সন্দেহ হয়, সে-কথা তখনই শোনা যাবে। এখন আপনি ঘরে যান। আমরা কাজ করতে এসেছি। কাজ করতে দিন।'

মেঝের ওপর থেকে হাত ধরে তুলে বিষ্টুচরণই যমুনাকে আবার তার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'উরে ব্বাবা, এই বুঝি নকুলবাবুর স্ত্রী?'

বিষ্টুচরণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাকে কোলে করে এনেছিল, সেই বাচ্চা মেয়েটি?'

'ওর মেয়ে, কমলি।'

'মেয়েটা কবে হল?'

'গত বছরের আগের বছর চোতমাসে হয়েছে।' সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে কুসুমবালা বললেন, 'গত বুধবারই তো ওর জন্মদিন গেল।'

BanglaBook.org

ডাক্তার চাকলাদার আর কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একসময় মুখ তুলে গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার আর এখানে কোনও কাজ নেই তো?'

ডাক্তার গুপ্তকে সামন্ত বললেন, 'ওঁকে দিয়ে কি আর কোনও দরকার আছে আমাদের?'

'কিছু না।' গুপ্ত বললেন, 'এখন ওঁকে ছেড়ে দিন। পরে যদি দরকার হয় তো আমরাই বরং ওঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখা করব।'

সামন্ত বললেন, 'ঠিক আছে ডক্টর চাকলাদার, আপনি এবারে যেতে পারেন। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছিলুম, তার জন্যে কিছু মনে করবেন না।'

চাকলাদার চলে গেলেন।

থানা থেকে ইতিমধ্যে আরও দুজন লোক এসে পৌঁছেছিল। গঙ্গাধর সামন্ত সদানন্দবাবু আর বিষ্ণুচরণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এরা এই বাড়িটা একটু সার্চ করে দেখবে, আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?'

সদানন্দবাবু বললেন, 'কিছুমাত্র না।'

সামন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। আপনারা কেউ এদের সঙ্গে থাকুন।' তারপর লোক দুটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা হলে তোমরা কাজ শুরু করে দাও। একেবারে ছাদ থেকে শুরু করবে।'

যাকে বললেন, সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সামন্ত তাকে একপাশে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বললেন। কী খুঁজতে হবে, সেটাই জানিয়ে দিলেন সম্ভবত। লোক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন সদানন্দবাবু। কুসুমবালা সেই থেকে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়েই বসে ছিলেন। এবারে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীকে বললেন, 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

বিষ্ণুচরণও ইতিমধ্যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। সম্ভবত তার বোনকে বলতে গিয়েছিল যে, একটু বাদেই একতলা সার্চ হবে।

সিঁড়ির সামনের জায়গাটায় এখন আমরা চারজন রয়েছি। সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত, কৌশিক আর আমি। পুলিশের পাহারাদারটিও রয়েছে অবশ্য। তবে সে ঠিক এই জায়গাটায় নেই। সদর-দরজার সামনে তাকে মোতায়েন করা হয়েছিল, সেইখানেই সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কী দিয়ে আঘাত করার ফলে মৃত্যু হয়েছে, তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। হ্যাঁ, ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ, হাতুড়ি, মুগুর, বাটখারা, অনেক-কিছু দিয়েই ও-রকম আঘাত করা সম্ভব। মানে এমন আঘাত, যাতে মাথার খুলি ফেটে যায়। তা মিস্টার সামন্ত, আপনি কি আশা করছেন যে, সার্চ করে অমন-কিছু পাওয়া যাবে?'

সামন্ত বললেন, 'দেখা যাক, তল্লাশি তো চলছে। ওই ধরনের জিনিস যা-কিছু পাওয়া যাক, পরীক্ষার জন্যে আটক করা হবে। গেরস্ত-বাড়িতে ও-সব জিনিস কিছু-না-কিছু থাকেই কিন্তু থাকলেই তো আর হল না, পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়া চাই যে, যে-সব জিনিস পাওয়া গেল, তারই কোনও একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা তো বটেই, কিছু-একটা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার আগে কোনও সিদ্ধান্ত করবার উপায় নেই।'

কৌশিক বলল, 'মিস্টার সামন্ত ঠিক কথাই বলেছেন। নোড়া, হাতুড়ি, রেঞ্চ কি এই ধরনের আরও নানা জিনিস যে গেরস্ত বাড়িতে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। না-থাকলেই বরং আমি অবাক হব।'

সামন্ত বললেন, 'এসব জিনিস যে থাকতেই পারে, একটু আগে আমিই সে-কথা বলেছি, তাই না?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ঠিকই বলেছেন।'

BanglaBook.org

সামন্ত বললেন, 'না মশাই, ঠিক বলিনি।'

আমি বললুম, 'সে কী, বেঠিকটা কী বললেন? যে-কটা জিনিসের নাম করা হল, তার সবই তো গেরস্ত বাড়িতে থাকে। রেঞ্চ, হাতুড়ি কিংবা এই ধরনের জিনিসও গেরস্তকে রাখতে হয়। কল-টল সারাবার কাজ অনেকে নিজেই করে নেন, তাতেই ওসব লাগে। সব সময়ে তো আর প্লাম্বারকে ডেকে পাওয়া যায় না, তাই রেঞ্চ আর হাতুড়ি না রেখে উপায় নেই। অন্তত সদানন্দবাবুকে তো অনেক সময় এসব খুঁটিনাটি কাজ আমি নিজের হাতেই করতে দেখেছি।'

সামন্ত বললেন, 'আরে মশাই, রেঞ্চ আর হাতুড়িব কথা আমি ভাবছি না।'

'তা হলে কীসের কথা ভাবছেন?'

'আমি ভাবছি নোড়ার কথা।'

'কেন, নোড়াই বা কী অপরাধ করল?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'তাও বুঝতে পারছেন না? তা হলে ভাবুন যে, নোড়া কোন কাজে লাগে।'

'কেন, মশলা বাটার জন্যেই তো নোড়া রাখতে হয়। নোড়া না-থাকলে মশলা বাটা হবে কী দিয়ে?'

'অবশ্য, অবশ্য।' গঙ্গাধর সামন্ত হেসে বললেন, 'তা হলে এবারে ভাবুন যে, ক'টা বাড়িতে আজকাল মশলা বাটা হয়। আরে মশাই, সব বাড়িতেই আজকাল গুঁড়ো-মশলা দিয়ে কাজ চলছে, সুতরাং নোড়ার কোনও ভূমিকাই কোথাও নেই। দ্য রোল অব নোড়া হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি প্লেড আউট।'

গঙ্গাধর সামন্ত হাসতে লাগলেন। হাসি থামবার পরে আমি বললুম, 'কথাটা কিন্তু ঠিক হল না।'

'কেন, এবারে আবার বেঠিকটা কী বললুম?'

'অনেকেই যে আজকাল গুঁড়ো-মশলা ব্যবহার করছেন, সেটা বেঠিক কথা নয়। কিন্তু তাঁদের বাড়িতেও হয়তো নোড়ার সন্ধান মিলবে। কাজ ফুরিয়েছে বলেই যে নোড়াটা তাঁরা ফেলে দিয়েছেন, এমন না-ও হতে পারে; হয়তো হেঁশেলের মধ্যেই সেটা ফেলে রেখেছেন। গেরস্ত-বাড়িতে এমন কত জিনিসই তো থাকে, আসলে যা কোনও কাজেই লাগে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি।' তারপর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আই থিংক, হি হ্যাজ এ পয়েন্ট দেয়ার।'

আমি বললুম, 'আর তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে, গুঁড়ো মশলার চলন হয়েছে কোন ধরনের পরিবারে। মোটামুটি সেইসব পরিবারেই হয়েছে, যেখানে গিন্নিরাও চাকরি-বাকরি করেন। কাজে বেরুবার তাগিদে রান্নার পাট তাঁদের চটপট চুকিয়ে নিতে হয়, ফলে মশলা বাটাবাটির ঝামেলার মধ্যে তাঁরা যেতে চান না। নোড়াও অতএব আউট। পুরনো আমলের গিন্নিরা কিন্তু গুঁড়ো-মশলায় অতটা বিশ্বাসী নন, তাঁরা এখনও শিলের ওপরে নোড়া দিয়ে মশলা পিষে নেন। তা সদানন্দবাবুর গিন্নিটি যে পুরনো আমলের মানুষ, সে তাঁকে দেখেই আপনারা বুঝেছেন। তো আমার বিশ্বাস, অন্তত তাঁর হেঁশেলে শিল-নোড়ার ভূমিকা এখনও শেষ হয়নি।'

সামন্তমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আই উইথড্র দ্যাট স্টেটমেন্ট। তবে কিনা নোড়া দিয়েই যে নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটানো হয়েছে, তাও কিন্তু আমি ভাবছিলুম না।'

ডাক্তারবাবু বলেন, 'তাহলে কী ভাবছিলেন?'

সদানন্দবাবুর লাঠিটা সামন্তের হাতে ধরাই ছিল। সেটার দিকেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি ভাবছিলুম অন্য কথা।'

কৌশিক চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিল। এবারে সে এগিয়ে এসে বলল, 'কী ভাবছেন

BanglaBook.org

সেটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। লাঠিটা একবার দেখতে পারি?'

কৌশিকের দিকে লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে সামন্ত বললেন, 'সাবধানে ধরুন। জায়গায়-জায়গায় রক্তের ছিটে লেগে আছে, মুছে না যায়।'

লাঠির মাথায় যে লোহার বল বসানো, এইটে দেখেই কৌশিকের ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গিয়েছিল। খানিক বাদেই সে-দুটো আবার যথাস্থানে ফিরে এল। সামন্তের হাতে লাঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'আপনার ধারণা, এইটে দিয়েই খুন করা হয়েছিল, তাই না?'

সামন্ত বললেন, 'করা কি অসম্ভব?'

কৌশিক বলল, 'তা কেন বলব? বিশেষ করে যে-দিকটায় লোহার বল বসানো রয়েছে, সেই দিক দিয়ে তেমন-তেমন জোরে মারতে পারলে মানুষ তো মানুষ, হাতির মাথাও হয়তো ফাটিয়ে দেওয়া যায়।...কিন্তু না, আর নয়, আপনি আপনার জেরার কাজ শুরু করুন। অনেক বেলা হয়েছে, আমি এবারে চলি।'

কৌশিক চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, 'কাল তো আমাদের বাড়িতে আপনার আসবার কথা, তাই না?'

বললুম, 'হ্যাঁ, কালই তো রবিবার।'

'আসবেন কিন্তু। মামাবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।'

॥ ১১ ॥

পাড়ায় দেখলুম সদানন্দবাবুর যেমন আমার মতো কিছু শুভার্থী আছেন, তেমনি শত্রুও নেহাত কম নেই। বরং শত্রুর সংখ্যাই বেশি। তার কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, ঈর্ষা। সদানন্দবাবুর অবস্থা যে তাঁর প্রতিবেশীদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। যে-কথা বলা হয়নি, সেটা এই যে, স্রেফ সেই সচ্ছলতার কারণেই অনেকে তাঁর ওপরে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ভাড়াটে খুন হয়েছে, আর খুনি হিসেবে সদানন্দবাবুকেই পুলিশ সন্দেহ করছে, এই কথাটা চাউর হতে খুব দেরি হল না। শুনে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'ঠিক হয়েছে, ব্যাটা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। এখন বোঝো ঠ্যালা! যেমন কর্ম তেমনি ফল!' অর্থাৎ তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, অপকর্মটা সদানন্দবাবুই করেছেন, আর তার ফল ভোগ না করেও তাঁর নিস্তার নেই।

মনটা ভালো নেই। রাত হয়েছে, কোনওক্রমে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি, মন যেন ততই আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সদানন্দবাবুর মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। খানাতল্লাশির পর্ব শেষ হবার পর পুলিশ যখন তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়, তখন যে তাঁকে কী অসহায় দেখাচ্ছিল!

যা দিয়ে একটা মানুষের মাথা ফাটিয়া দেওয়া যায়, তল্লাশি করে এমন জিনিস নেহাত কম পাওয়া যায়নি। ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ আর হাতুড়ি তো বটেই, একটা বেশ মোটামতন শাবলও পাওয়া গিয়েছে। সবই সদানন্দবাবুর সম্পত্তি। তল্লাশিটা প্রথমদিকে চলেছিল ওপর-ওপর। পরে উইটনেস-রেখে বাক্স-প্যাঁটরা সিন্দুক-আলমারি সবই হাঁটকে দেখা হয়। তাতে যেমন নকুলের মাছের আড়তে একগাদা বাটখারা পাওয়া যায়, তেমনি সদানন্দবাবুর আলমারি থেকেও একটা এক-কিলো ওজনের বাটখারা বেরিয়ে পড়ে। তবে, সবচেয়ে বেশি মুশকিল বাধিয়েছে ওই লোহার বল-বসানো লাঠিটাই। সামন্ত সম্ভবত ধরেই নিয়েছেন যে, ওই লাঠি দিয়েই নকুলের মাথা ফাটানো হয়েছিল। তাঁর কথা শুনে অন্তত সেইরকমই মনে হয়।

BanglaBook.org

খুনি হিসেবে যে সদানন্দবাবুকেই তিনি সন্দেহ করছেন, সেটাকে অবশ্য অস্বাভাবিকও বলা যায় না। তিনি বাড়িওয়ালা। ভাড়াটের উপরে তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। ভাড়াটে যাতে উঠে যেতে বাধ্য হয়, তার জন্যে জল দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, এমনকী ইলেকট্রিক লাইনও কেটে দিয়েছিলেন একদিনের জন্যে। তার ওপরে আবার নকুলের লাশের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেই, সামন্তের সন্দেহ তো হতেই পারে।

সন্দেহের একটা কাঁটা যে আমার মনেও খচখচ করছিল না, তা-ই বা কী করে বলি। একদিকে যেমন সদানন্দবাবুর অসহায় মুখখানা আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল, অন্যদিকে তেমনি বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল সদানন্দবাবুর সেই কথাটা, বৃহস্পতিবার সকালে আমার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যা তিনি খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে বলে গিয়েছিলেন।

কী বলেছিলেন সদানন্দবাবু? ভাড়াটে তাড়াবার জন্যে দরকার হলে যে গুন্ডা লাগাতেও পিছপা হবেন না, শুধু এইটুকু বলেই তো ক্ষান্ত হননি তিনি, সেইসঙ্গে যোগ করেছিলেন এই ভয়ংকর কথাটা যে, গুন্ডা লাগাবারই বা দরকার কী, 'এই যে লাঠিটা দেখছেন না, এটাই যথেষ্ট, এইটে দিয়েই ওর মাথা ফাটিয়ে ছাড়ব।'

তা হলে কি শেষপর্যন্ত সেই কাজই তিনি করলেন? করা যে অসম্ভব, তাও বলা যাচ্ছে না। শারীরিক সামর্থ্যের দিক থেকে তো নয়ই। ভদ্রলোকের একমাত্র অসুবিধে চোখ নিয়ে। ছানি কাটিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টির সেই আগের মতো জোর আর ফিরে পাননি। তবে শরীর এখনও রীতিমতো মজবুত। এই যে এতদিন এখানে আছি, সদানন্দবাবুকে একদিনও বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলুম না। জ্বর নেই, জারি নেই, সর্দি নেই, কাশি নেই, ছেলেছোকরাদের মতোই টগবগে টনকো-তাজা স্বাস্থ্য, তাই নিয়ে একটু জাঁকও করেন, লোহার বল বসানো ওই লাঠিটা দিয়ে একটা নেড়িকুত্তার মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মাথা ফাটানোই বা তবে একেবারে অসম্ভব হবে কেন? বিশেষ করে সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে তো কাজটা আরও সহজ হবার কথা। গঙ্গাধর সামন্ত এই ব্যাপারটার ওপরে দেখলুম খুব জোর দিচ্ছেন।

কিন্তু সত্যিই কি কাজটা সদানন্দবাবু করেছেন? ভাড়াটাকে তুলে দেবার জন্য জল আর লাইটের লাইন কেটে দিয়েও যখন সুবিধে হল না, তখন তাকে খুনই করে বসলেন? ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না। এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, বিচিত্র কী, মানবচরিত্র বড়ই জটিল, বড়ই রহস্যময় ব্যাপার, তার কতটুকুই বা বুঝি আমরা? এ তো প্রায় সমুদ্রে ভাসমান সেই হিমশৈলের মতোই, জলের ওপরে যার সামান্য অংশই আমরা দেখতে পাই, আর বেশির ভাগটাই গোপন থেকে যায় জলের তলায়। সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রেও হয়তো সেটাই ঘটেছে। তাঁর চরিত্রের খুব সামান্যই আমি দেখেছি, বাদবাকিটার সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার ছিল না। বাইরে তিনি সদানন্দ, হাস্যময়, পরোপকারী প্রতিবেশী, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে হয়তো খুবই নিষ্ঠুর। এতই নিষ্ঠুর যে, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতেও তাঁর হাত কিছুমাত্র কাঁপেনি।

এক-একবার এইরকম ভাবছিলুম আমি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল যে, না, এটা সম্ভব নয়, এটা হতে পারে না। সদানন্দবাবুর পক্ষে কাউকে খুন করা একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার।

ভদ্রলোক এখন থানা-হাজতে রয়েছেন। আজ আর আমি অফিসে যাইনি। বারোটা নাগাদ লাশ সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হল। তারপর জিপে তুলে সদানন্দবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি আর শম্ভুবাবু এই দৃশ্য দেখলুম। শম্ভুবাবুর অবস্থাও আমারই মতো। সদানন্দবাবুকে তিনিও বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। বললেন, 'কী করা যায় বলুন তো?'

করবার কিছুই ছিল না। একে শনিবার, তায় বেলা একটা বাজে। তাই জামিনের ব্যবস্থা করা যায়নি। কালও করা যাবে না। যা করবার, সোমবারে করতে হবে।

BanglaBook.org

এখন একমাত্র ভরসা ভাদুড়ীমশাই। ভাগ্য ভালো যে, তিনি কলকাতায় রয়েছেন। সদানন্দবাবুকে যে আমি উপকারী একজন বন্ধু হিসেবে গণ্য করি, সকালে ফোনেই সে-কথা ভাদুড়ীমশাইকে আমি জানিয়েছিলুম। নিজে আসতে না-পারলেও নিশ্চয় সেইজন্যেই তিনি কৌশিককে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আর বাসন্তী যদি খুব মিনতি করে বলি যে, এই খুনের তদন্তের ভার তাঁকে নিতেই হবে, তা হলে কি, দরকার হলে, আরও কিছুদিন তিনি কলকাতায় থেকে যাবেন না? মনে তো হয় থেকে যাবেন।

কৌশিকের ওপরেও আমার আস্থা অবশ্য নেহাত কম নয়। বয়স মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ, কেমিস্ট্রিতে এম.এসসি. করে আর চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেনি, মামার লাইন ধরেছে। অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরিতে তার অভিজ্ঞতা মাত্রই চার-পাঁচ বছরের। কিন্তু এরই মধ্যে যে কিছুটা নাম করেছে, তাতে বোঝা যায় যে, ছেলেটার অভিজ্ঞতা যতই কম হোক, বুদ্ধিটা পাকা। মেদবর্জিত ছিপছিপে লম্বা চেহারা, গায়ের রং বাবার মতো ফরসা নয়, মায়ের মতো তামাটে। আর অসম্ভব রকমের ধারালো চোখ দুটি দেখে তার মামার কথাই বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

নেবুতলার ঘটকবাড়ির জোড়া-খুন নিয়ে যে মামলা চলছিল, কৌশিকের পাকা বুদ্ধির প্রমাণ তাতেই প্রথম পাওয়া যায়। এ হল গত বছরের ঘটনা। তার আগেও সে খুচরো কয়েকটা কাজ করেছিল বটে, কিন্তু এটাই ছিল তার ব্রেক-থ্রু। এই মামলায় যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সে এত নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল যে, নিশ্চিত প্রাণদণ্ড থেকেও 'সন্দেহের অবকাশে' খুনের আসামিদের বাঁচিয়ে দেবার ব্যাপারে যিনি সিদ্ধহস্ত, সেই দুঁদে ব্যারিস্টার সুধাকান্ত মজুমদারও ঘটক অ্যান্ড চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের জুনিয়ার পার্টনার অমরেশ চৌধুরিকে কিছুতেই খালাস করিয়ে আনতে পারেননি। আদালতের রায়ের যে-অংশটাকে ওবিটার ডিকটাম বলা হয়, হাইকোর্টের প্রবীণ জজ আবদুল কুরেশি তাতে কৌশিকের কর্মনৈপুণ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠার খুব প্রশংসাও করেছিলেন। বলেছিলেন, স্রেফ পুলিশ বিভাগের গাফিলতির জন্যই অনেক ক্ষেত্রে তদন্তের কাজে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে যায়, আর তারই পরিণামে লোপাট হয়ে যায় অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ। ফলে, নেহাতই সন্দেহের অবকাশে আসামিদের সে-সব ক্ষেত্রে মুক্তি না দিয়ে আদালতের উপায় থাকে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ অতি দ্রুত সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং যথাসময়ে সেগুলি দাখিল করবার ব্যাপারেও কোনও শৈথিল্য ঘটেনি বলেই সমাজের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক ও অত্যন্ত নৃশংস এক অপরাধীকে সেই শাস্তি দেওয়া গেল, যা তার প্রাপ্য ছিল।'

মিঃ জাস্টিস আবদুল কুরেশির রায় পাঠ করে অনেকে অবাক হয়েছিলেন। আমি হইনি। তার কারণ, সে ভাদুড়ীমশাইয়ের ভাগনে; মামার গুণ যে কিছু-না-কিছু সে পাবেই, তা যেন আমি ধরেই নিয়েছিলুম। আসলে হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে খুনির চরিত্র কীভাবে অগ্রিম আন্দাজ করে নিতে হয়, হত্যার ফলে কে কোন দিক দিয়ে কতটা উপকৃত হচ্ছে, সেইটে বুঝে নিয়ে তদন্তের একটা ছক কীভাবে তৈরি করে নিতে হয়, এভিডেন্স কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়, এবং মামলা কীভাবে কোন পথ ধরে এগোতে পারে, সে-দিকে খেয়াল রেখে যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণকে সাজাতেই বা হয় কীভাবে, মামার কাছেই কৌশিক সে-বিষয়ে যৎপরোনাস্তি তালিম পেয়েছে। সুতরাং তদন্তের ব্যাপারে সে যে কোনও পর্যায়েই কোনও ফাঁক রাখবে না, এটাই স্বাভাবিক।

নেবুতলার কেসটাতে সে মার্ডার-ওয়েপনটিও একেবারে ঝটিতি উদ্ধার করে, এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, অস্ত্রটা আর কিছুই নয়, আসলে সেটা অমরেশ চৌধুরিরই অফিস-ঘরের কলমদানের মধ্যে অতিশয় যত্নে রাখা একটা নকশা-কাটা বিদেশি পেপার-নাইফ। নিহত ঘটক-দম্পতিই যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে ধারালো সেই কাগজ-কাটা ছুরিটি অমরেশ চৌধুরিকে উপহার দিয়েছিলেন, বাংলা কাগজে এই ঘটনাটা সেদিন 'নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস' বলে বর্ণিত হয়েছিল।

পাঁচ নম্বর বাড়ির ক্ষেত্রে যে মার্ডার-ওয়েপনস কোনটা, তা এখনও জানা যায়নি। গঙ্গাধর সামন্ত অবশ্য ধরেই নিয়েছেন যে, লাশের পাশে যে লাঠিটা পড়ে ছিল, লোহার বল বসানো সেই লাঠিটা দিয়েই নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটানো হয়েছে। তবে কৌশিকের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, সামন্তের এই সিদ্ধান্ত সে ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ঘটনাস্থল থেকে সে যখন চলে আসে, তাকে এগিয়ে দিতে আমিও তখন সদর-দরজা পর্যন্ত এসেছিলুম। সেইসময়ে সে আমাকে বলে যে সামন্তমশাই যা ভাবছেন, কেসটা তত সহজ-সরল নয়। তাতে আমি বলি, 'তোমার কী মনে হয় বলো তো। সদানন্দবাবুই খুনি?' প্রশ্ন শুনে কৌশিক একটুক্ষণ চুপ করে থাকে; তারপরে বলে, 'উনি যে খুব বিপদে পড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।'

কৌশিক তাব মারুতিতে উঠে স্টার্ট দেবার আগে ভাদুড়ীমশাই সম্পর্কেও দুটো-একটা কথা হল। জিগ্যেস করেছিলুম, 'তোমার মামাবাবু এবারে কী কাজ নিয়ে এসেছেন?' তাতে কৌশিক একগাল হেসে বলল, 'আর বলবেন না কিরণমামা, একটা রেসের ঘোড়ার ব্যাপার!'

'তার মানে?'

'তাহলে শুনুন। মাদ্রাজ থেকে একটা রেসের ঘোড়াকে নাকি কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মধ্যপথে ট্রেনের ওয়াগন থেকে সেটা হাপিস হয়ে যায়। ঘোড়ার মালিক কলকাতার এক বিরাট ব্যাবসায়ী; বিস্তর টাকা খরচা করে সে মামাবাবুকে কলকাতায় নিয়ে আসে। গ্র্যান্ডে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু মামাবাবুকে তো আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালো জানেন, তিনি গ্র্যান্ডে উঠলেন না, এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের ওখানে চলে এলেন। তা রেসের ঘোড়া উদ্ধার করবার জন্যে মামাবাবুকেই দেখলুম একেবারে রেসেব ঘোড়ার মতো ছোটাছুটি কবতে হচ্ছে। ক'টা দিন যা ধকল গেল ওঁব, সে আর বলবার নয়।'

'ঘোড়াটা উদ্ধার হয়েছে?'

'বিলক্ষণ। কাজ কমপ্লিট; ঘোড়া এখন তার মালিকের আস্তাবলে। ব্যাপার কী জানেন, জাল কাগজপত্র দেখিয়ে মধ্যপথে একটা স্টেশনে একজন লোক ওয়াগন থেকে ঘোড়াটাকে নামিয়ে নিয়েছিল। হেঁজিপেঁজি লোক নয়, তারও প্রচুর পয়সা, মস্ত কারবার। মামাবাবুর তদন্তে তার জারিজুবি যখন ফাঁস হবার উপক্রম, তখন সে নিজেই এসে ঘোড়াটা ফেরত দিয়ে যায়। শুধু তার একটা অনুরোধ, স্ক্যান্ডালটা যেন খবরের কাগজ টের না পায়।...ওঃহো, কথাটা আপনাকে বলে ফেললুম। আপনিও যে খবরের কাগজের লোক, তা আমার মনেই থাকে না।'

'কাল সকালে তুমি বাড়িতে থাকছ তো?'

'আপনি আসছেন, আর আমি থাকব না?' কৌশিক হেসে বলল, 'নিশ্চয় থাকব। আসবেন কিন্তু...উইদাউট ফেইল।...মামিমা আর পারুলকেও নিয়ে আসুন। মা খুব বলছিল।'

বললুম, 'পারুলের পরীক্ষা, তাই যেতে পারবে না। আর তোমার মামিই বা ওকে ছেড়ে এখন যায় কী করে?'

'ঠিক আছে, আপনিই আসুন।'

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে টার্ন নিল কৌশিকের গাড়ি। আমি আবার ভেতরে চলে এলুম।

শুয়ে-শুয়ে এই সব কথাই ভাবছি। ঘুম আসছে না। কৌশিককে বিদায় দিয়ে ফিরে আসবার পরে গঙ্গাধর সামন্ত যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সামন্ত বলেছিলেন, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভদের সম্পর্কে পুলিশের নাকি একটা অ্যালার্জি থাকে। কই মশাই, আমার তো কোনও অ্যালার্জি নেই। দরকার হলে ওঁদের সাহায্য নেব বইকী। তবে কিনা দরকার হবে বলে মনে হয় না। এ তো একেবারে জলের মতো সোজা ব্যাপার।'

ডাক্তার গুপ্ত কোনও কথা বলেননি। চুপ করেছিলেন। তবে সামন্তর কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলুম যে, ভদ্রলোক মনঃস্থির করে ফেলেছেন। যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার আর নড়চড়

BanglaBook.org

হবার উপায় নেই।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আমি।

পারুল এসে যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন প্রায় আটটা বাজে। বলল, 'মা খুব রাগারাগি করছে, বিছানা ছেড়ে এবার উঠে পড়ো বাবা।'

আমাকে তুলে দিয়ে পারুল আবার পড়তে চলে গেল। বাসন্তী ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিল। বলল, 'বাজার করতে হবে না? চটপট মুখ-হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ো। তোমাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি একবার ও-বাড়ি যাব।'

'কেন, ও-বাড়িতে আবার কী হল?'

'নতুন কিছু হয়নি। ওদের কাজের মেয়েটা একটু আগে একবার এসেছিল। বলল, কুসুমদি সারা রাত ঘুমোননি, সকালেও খুব কান্নাকাটি করছেন।'

'তা তো করবেনই। আজ রবিবার, ফলে আজ জামিনের ব্যবস্থা করা যাবে না। হুট করে যে কেন ওঁকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক কি তাঁর বাড়ি আর বউ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?'

বাসন্তী বলল, 'আর কথা নয়, বাথরুমে যাও, তারপর বাজার করে নিয়ে এসো। তোমার না হয় নেমন্তন্ন রয়েছে, আমাদের তো মুখে কিছু দিতে হবে। এদিকে বাড়িতে সব বাড়ন্ত। অন্তত মাছটাও যদি থাকত তো আজকের দিনটা চালিয়ে নিতুম। নাও, চটপট বেরিয়ে পড়ো, তুমি বাজারে গেলে সেই ফাঁকে আমি কুসুমদির কাছ থেকে একটু ঘুরে আসব।'

বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। বুঝতে পেরেছিলুম যে, বাসন্তীর গলা এখন ক্রমেই চড়তে থাকবে।

॥ ১২ ॥

ভাদুড়ীমশাই এবারে কলকাতায় এসেছেন তা প্রায় বছর দুই বাদে। দেখে ভালো লাগল যে, তাঁর শরীর ইতিমধ্যে একটুও টসকায়নি। অরুণ সান্যালও দেখলুম ভালোই আছেন। ভাদুড়ীমশাই মাঝখানে একবার টেলিফোন ধরবার জন্যে ঘর থেকে উঠে গিয়েছিলেন। তখন মালতীকে জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপার কী বলো তো? অরুণের শুনেছিলুম শরীর বিশেষ ভালো নয়, কিন্তু কই, তোমার কর্তাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।'

উত্তরটা অরুণই দিলেন। বললেন, 'বুঝলেন না কিরণদা, ওই কথা বলে দাদাকে আটকে রাখা হয়েছে আর কি। নইলে তো কাজ মেটবার সঙ্গে-সঙ্গেই উনি চলে যাচ্ছিলেন।'

মালতী মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, 'দাদা যে এই বয়েসেও এত খাটাখাটি করছে কেন, বুঝতে পারছি না। একটামাত্র মেয়ে, তা সে তো তার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকে। বউদিও সেই কবেই স্বর্গে গেছেন। তা হলে আর এত খাটাখাটি করছে কার জন্যে? কোনও মানে হয়? এত বলি যে, ব্যাঙ্গালোরের অফিসটা গুটিয়ে ফেলে এবারে কলকাতায় ফিরে এসে একটু থিতু হয়ে বোসো, তা সে-কথা শুনছে কে। আপনি একটু বুঝিয়ে বললেও তো পারেন।'

কৌশিক বলল, 'কালই তো কিরণমামাকে আমি বলছিলুম যে, মামাবাবুর এবারে বড্ড ধকল গেল। এই বয়েসে এত দৌড়ঝাঁপ করা ওঁর ঠিক হচ্ছে না।'

বললুম, 'সে তো আমি যখনই দেখা হয়, তখনই বলি। এও বলেছি যে, আপনার এখন আর এত ছোটাছুটি করা ঠিক নয়। আপনার ভূমিকাটি হওয়া উচিত কনসালট্যান্টের। লোকে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে আসবে, আপনি একটা ফি নিয়ে বলে দেবেন যে, কোন পথে কীভাবে তদন্তটা

BanglaBook.org

হওয়া উচিত। বাস্, ঝামেলা মিটে গেল। তা উনি সে-কথায় কানই দেন না। যত বলি, তত হাসেন। আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা তো তোমাদের না-বোঝবার কথা নয়। মানুষটা আসলে কাজ-পাগলা, সবকিছু নিজের হাতে করতে ভালোবাসেন।'

ভাদুড়ীমশাই ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'সব শুনেছি, সব শুনে ফেলেছি।'

'কী শুনলেন?'

'ওই আমাকে নিয়ে যে-সব কথা হচ্ছিল। ঠিক আছে, যা চাইছেন তা-ই হবে, অন্তত আপনাদের এই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের কেসটাতে আমি নিজের হাতে কিচ্ছু করব না। করবার অবশ্য দরকারও নেই, কৌশিকই তো রয়েছে। আমি স্রেফ পরামর্শ দেব। এতদিন তো নিজের হাতে সব করেছি। এবারে দেখা যাক কনসালট্যান্ট হয়ে কদ্দুর কী করা যায়। তবে হ্যাঁ, জায়গাটা কিন্তু স্বচক্ষে একবার দেখব।'

'আজই বিকেলে চলুন।'

'আজ যাব না।'

'কেন, আবার কী অসুবিধে ঘটল? বলেন তো আমি ফোন করে গঙ্গাধর সামন্তকে একটা খবর দিয়ে রাখি। হাতে কোনও জরুরি কাজ না থাকলে বিকেল নাগাদ তিনিও সেখানে হাজির থাকবেন।'

ভাদুরীমশাই হেসে বললেন, 'অসুবিধে ওই গঙ্গাধর সামন্তকে নিয়েই। আজ বিকেলে সে তো ওখানে যেতে পারবে না। অন্য জায়গায় তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে যে।'

'কোথায়?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না?'

কৌশিক বলল, 'অত হেঁয়ালি কোরো না, মামাবাবু। বলেই দাও।'

মালতী বলল, 'আমিই বলে দিচ্ছি, কিরণদা। তোমাদের ওই থানা-অফিসারটিকে আজ বিকেলে আমাদের এখানে চা খেতে বলা হয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবারে তোমরা খেয়ে নাও। তবে এখুনি বলে দিচ্ছি, খাবার টেবিলে বসে এসব খুন-জখম নিয়ে কিন্তু একটা কথাও বলা চলবে না। ও-সব কথা পরে হবে।'

তা-ই হল। কলকাতায় এখন চ্যাপলিন-উৎসব চলছে; তারই সূত্রে মঁসিয়ে ভের্দুর প্রসঙ্গটা একবার উঠেছিল বটে, কিন্তু কৌশিক যে-ই না ভাদুড়ীমশাইকে বলতে শুরু করে, 'আচ্ছা মামাবাবু, পাথরের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে আর দড়ির মাথায় একটা ফাঁস লাগিয়ে ভদ্রলোক ওই যেখানে তাঁর...মানে কী বলব, তাঁর নতুন বউয়ের গলায় সেটা...' মালতী অমনি কটমট করে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'থাক, থাক, এখন আর ওসব কথার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।'

কৌশিক চুপ করে গেল। অরুণ একবার হাসিমুখে বলেছিলেন, 'কেন, খুনের কথা বললে কী হয়? উইল দ্যাট স্পয়েল ইয়োর অ্যাপিটাইট?' তাতে মালতী তাঁকেও এমন ধমক কষাল যে, অরুণ আর তারপরে একবারও মুখ খুলবার সাহস পেলেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই যে পীতাম্বর চৌধুরি লেনের প্রসঙ্গটা উঠল, তাও নয়। ভাদুড়ীমশাইয়ের ঘরে ঢুকে দুজনেই গড়িয়ে নিলুম খানিকক্ষণ। গড়ানো মানে ঘুম নয়, শুয়ে-শুয়ে ঘণ্টা দেড়েক হরেক বিষয়ে গল্প চলল। তিনটে নাগাদ চা নিয়ে এল মালতী। চা খেয়ে ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সামন্তকে সাড়ে-চারটেয় আসতে বলেছি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাটা তার আগেই সেরে নেওয়া যাক।' তারপর মালতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, কৌশিক বাড়িতে আছে তো?'

মালতী বলল, 'কোথায় আর যাবে, শুয়ে-শুয়ে রাজ্যের ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে।'

'তা হলে ওকে একবার এ-ঘরে পাঠিয়ে দে।'

কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মালতী। তার মিনিট খানেক বাদেই কৌশিক এসে ঢুকল।

BanglaBook.org

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'হ্যাঁ রে কৌশিক, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো মোটামুটি বুঝতে পেরেছি; তুই ওখানে যাবার পর যা-যা ঘটেছে, তারও একটা রিপোর্ট তোর কাছে কাল শোনা গেল। এখন বল তো, সব্বাইকে বাদ দিয়ে একা ওই সদানন্দের ওপরেই সামন্তর সন্দেহটা এ-ভাবে পড়ছে কেন?'

কৌশিক বলল, 'ওর সন্দেহের কারণ আপাতত দুটি। প্রথমত, যে-ভাড়াটেকে তুলে দেবার জন্যে বাড়িওয়ালা নানানভাবে চেষ্টা করছে, আর সেই চেষ্টার কথাটা বলেও বেড়াচ্ছে সবাইকে, তার ওপরে আবার জল আর লাইটের লাইন কেটে দেবার মতো দু-দুটো ক্রিমিন্যাল অফেন্স করতেও ছাড়েনি, সেই ভাড়াটে যদি হঠাৎ এইভাবে বাড়ির মধ্যেই মারা পড়ে, তো বাড়িওয়ালাই যে তাকে মেরেছে, এমন সন্দেহ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। যেটাকে খুন-খারাবির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, পুলিশ সেখানে মোটিভের সন্ধান করবেই। তা সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রে যে সেটা ছিল, সে তো আর অস্বীকার করা চলে না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এটা তো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটা কী?'

'সেটাও তুমি আন্দাজ করেছ নিশ্চয়। সামন্তর সন্দেহের প্রথম কারণ যদি হয় মোটিভ, তো দ্বিতীয় কারণ সুযোগ। খুন করবার একটা সুযোগ চাই তো, তা সদানন্দবাবুর সেটা ভালোই ছিল।'

'মোটিভ আর সুযোগ!' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুনের একটা মোটিভ চাই, একটা সুযোগও চাই। ঠিক কথা। কিন্তু ও-দুটো বস্তু কি শুধু সদানন্দেরই ছিল? আর-কারও ছিল না?'

কৌশিক বলল, 'থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। তবে সদানন্দবাবুর যে দুটোই ছিল, সেটা মিথ্যে নয়। তার ওপরে আবার ওই যে ওখানে লোহার বল লাগানো লাঠিটা পাওয়া গেল, সামন্তর সন্দেহ তার ফলে আরও জোরদার হয়েছে।'

'অর্থাৎ একেবারে ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ডের ব্যাপার। কিন্তু চোখ তো আর একটা নয়। তা হলে কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের মতো শুধু একটা দিকেই দেখছে কেন?'

কৌশিক বলল, 'কী জানি। লাঠিটা অবশ্য দাঁড়াচ্ছে না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সে তো বুঝলুম। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হ্যাঁ রে, কৌশিক, তুই তো আজ সকালে আমার নাম করে টেলিফোনে সামন্তর সঙ্গে কথা বললি। জেরায় কে কী বলেছে, সেটা বোঝা গেল?'

'সামন্ত কিছু বললে তবে তো বুঝব। আমাকে তো কিছু জানাতেই চায় না। যা-ই জানতে চাই, উত্তরে শুধু বলে যে, বিকেলে তো যাচ্ছিই, তখন সিসিবিকে সব বলা যাবে।'

'ঠিক আছে।'

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি বললুম, 'সিগারেটটা এখনও ছাড়তে পারলেন না?'

'আপনি ছেড়েছেন?'

'একেবারে যে ছেড়েছি, তা বলতে পারব না। তবে কমিয়েছি।'

'আমিও গোটা চার-পাঁচেকের বেশি খাই না।'

কৌশিক বলল, 'আমি তা হলে নিজের ঘরে যাই মামাবাবু?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'সিগারেটের কথা শুনেই উঠে পড়বার ইচ্ছে হল বুঝি? যা তা হলে, খেয়ে আয়। তবে বেশি দেরি করিস না।'

কৌশিক রেগে গিয়ে বলল, 'কী যে বলো! ওই সব ছাইভস্ম আমি খাই নাকি? ওর চেয়ে একটা রসগোল্লা খাওয়া ভালো।'

'রসগোল্লাও একটা-দুটোর বেশি খাস না। জানিস তো সর্বমত্যন্তং গর্হিতম। কোনও কিছুরই আতিশয্য ভালো নয়। যেমন অন্যসব ব্যাপারে, তেমনি খাওয়ার ব্যাপারেও এটা একেবারে খাঁটি কথা। যা-ই হোক, সিগারেট খাওয়ার তাড়া যখন নেই, তখন একটু বোস, তোর সামনেই কিরণবাবুকে

BanglaBook.org

দু-একটা কথা জিগ্যেস করি। সদানন্দবাবুর ব্যাপারে ওঁর মতামতও তোর শুনে রাখা ভালো।'

আমি বললুম, 'কী জিগ্যেস করবেন করুন, আমি যা জানি সবই আপনাকে খোলাখুলি বলব।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দেখুন মশাই, নকুলচন্দ্র কীভাবে কখন মারা গেল, আর এটা যদি খুনের ব্যাপারই হয়, তাহলে কে-ই বা খুন করল তাকে, তার বিন্দুবিসর্গও আপনার জানবার কথা নয়। তার কারণ, ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন সেখানে আপনি ছিলেন না। সুতরাং ও-ব্যাপারে আপনাকে কিছু জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই, আর তা আমি করছিও না। আমি আপনাকে এমন প্রশ্ন করব, যার উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব।'

'বেশ তো, তা-ই করুন।'

'সদানন্দবাবুকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?'

'যতদিন ও-পাড়ায় আছি, ততদিন ধরেই চিনি। তা ধরুন, দশ বছর তো হলই।'

'লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?'

'ভালোই তো লাগে। গায়ে পড়ে একটু উপদেশ-টুপদেশ দেন ঠিকই, 'এটা খাবেন না, ওটা করবেন না' বলেন, তা সেও তো আমাদের ভালোর জন্যেই বলেন। না মশাই, লোকটি খারাপ নন, পরোপকারী সজ্জন সদালাপী মানুষ।'

'উনি কাউকে খুন করতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?'

'সেইটে ভেবেই তো কূলকিনারা পাচ্ছি না। এটা ঠিকই যে, নকুলচন্দ্রকে উনি তুলে দিতে চাইছিলেন। ওর জল আর লাইটের কানেকশন যে কেটে দিয়েছিলেন, সেটাও মিথ্যে নয়। তা ছাড়া, নকুলের ডেডবডি তো কাল সকালে সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকতে দেখা গেল, তার মাত্র দু-দিন আগে অর্থাৎ বিষ্যুতবার সকালে আমার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় উনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, কিছুতেই যখন নকুলচন্দ্রকে তাড়ানো যাচ্ছে না, তখন দরকার হলে ওঁর ওই লোহার বল বসানো লাঠিটা দিয়েই উনি নকুলের মাথা ফাটিয়ে ছাড়বেন।'

'এটা আপনি গঙ্গাধর সামন্তকে বলেছেন?'

'না, এটা বলিনি। তবে কথাটা উনি আমাকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি আরও দু-চারজনকেও বলে থাকতে পারেন। তাদের কেউ গঙ্গাধর সামন্তকে এটা জানিয়েছে কি না, বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। আর-কেউ যদি বলে থাকে তো বলুক, আপনার অন্তত এক্ষুনি এটা জানিয়ে কাজ নেই। না-না, পুলিশের কাছ থেকে কোনও তথ্য আমি আপনাকে গোপন করতে বলছি না। অন্য-কোনও সূত্রে এই খবরটা জেনে তারপর পুলিশ যদি আপনার কাছে এটার করোবরেশান চায়, তো তখন আপনাকে বলতেই হবে যে, হ্যাঁ, আপনার কাছেও অমন কথা সদানন্দ বলেছিলেন বটে। কিন্তু সেটা তো তারা এখনও চায়নি, তাই আপনারও আগ বাড়িয়ে কিছু বলবার দরকার নেই।'

'এটা বলছেন কেন?'

'এইজন্যে বলছি যে, সদানন্দের গলায় তা হলে ফাঁসটা আরও শক্ত হয়ে এঁটে যাবে। কৌশিক যে-পথটার কথা ভাবছে, সেইটে ধরে এগিয়ে তখন আর বিশেষ লাভ হবে না। সেইজন্যেই বলছি, আপাতত আপনি চুপ করে থাকুন। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যে যাকে সাপ্রেশান অভ এভিডেন্স বলে, এটা মোটেই সেই পর্যায়ে পড়ে না।'

'কৌশিক কোন পথের কথা ভাবছে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সেটা এখন আপনার জেনে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।'

'কী প্রশ্ন?' যা-যা বলছেন, সব কিছুরই তো উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।'

'একটা প্রশ্নের উত্তর পাইনি। সদানন্দবাবু যে আদৌ কাউকে খুন করতে পারেন, এটা আপনার বিশ্বাস হয়?'

BanglaBook.org

'বড় ভাবনায় ফেললেন দেখছি।'

'বেশি ভাবনাচিন্তা করবেন না। ভাবনাচিন্তা না করে যা বলবেন, সেটাই আমার শোনা দরকার।'

পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরালুম। বুকের মধ্যে ধোঁয়া টেনে নিলুম অনেকটা। তারপর আস্তে-আস্তে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'দেখুন মশাই, নজিরের অভাব নেই। এমনিতে যাকে নেহাত নিরীহ গোবেচারা কি ভালোমানুষ বলে মনে হয়, সেও যে খুন করতে পারে, করেছে, এমন ঘটনার কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। শেষপর্যন্ত হয়তো আদালতে এই গঙ্গাধর সামন্তই প্রমাণ করে ছাড়বে যে, আমাদের সদানন্দবাবুও আসলে একেবারে সেই রকমের একজন মানুষ। ওপরে-ওপরে খুবই ভদ্র, খুবই শান্ত, খুবই নিরীহ, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যেমন নির্মম, তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু তবু বলছি, না, সত্যিই যে উনি কাউকে খুন করতে পারেন, তা আমি বিশ্বাস করি না।'

কৌশিক বলল, 'বাস-বাস, এইটুকুই আমার জানবার দরকার ছিল। জানো মামাবাবু, লোকটিকে দেখে সত্যি আমার বড় মায়া হচ্ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, লোকটা বোকা; বোকামি করে একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে গেছে, এখন আর জাল কেটে বেরুতে পারছে না।'

আমি বললুম, 'কৌশিক সম্ভবত ঠিক কথাই বলেছে।'

কলিং বেল বেজে উঠল।

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুব সম্ভব গঙ্গাধর সামন্ত।'

॥ ১৩ ॥

গঙ্গাধব সামন্ত একা আসেননি, ডাক্তাব গুপ্তকেও নিয়ে এসেছেন। সুরেশ গুপ্ত যে ভাদুড়ীমশাইকে ভালোই চেনে, কালই তিনি সে-কথা বলেছিলেন। তবে তাঁকে দেখবামাত্রই 'আরে সুরেশবাবু, আপনি?' বলে ছুটে এসে ভাদুড়ীমশাই যে-ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাতেই বুঝতে পারলুম যে, এটা নেহাত চেনা-জানার ব্যাপার নয়, এককালে দুজনের সম্পর্ক রীতিমতো ঘনিষ্ঠই ছিল।

যে-ঘরে ভাদুড়ীমশাই থাকেন, এতক্ষণ আমরা সেই ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলুম। এবারে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসা গেল। চৈত্রমাস, সারা দিন বেশ গরম গেছে, ভেবেছিলুম যে, বিকেলের দিকে ঝড় উঠতে পারে, কিন্তু ওঠেনি; একটু-একটু মেঘ জমছিল বটে, কিন্তু এলোমেলো হাওয়ার দাপটে সে-মেঘ স্রোতের মধ্যে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো কোথায় যে ভেসে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই, বিকেলবেলার আকাশ এখন আবার আয়নার মতো ঝকঝক করছে।

কাজের লোকটির হাত দিয়ে মালতী পাঁচ গ্লাস ঘোলের শরবত পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গাধর সামন্ত তাঁর শরবতের গ্লাসে চুমুক দেবার আগে দু-গ্লাস জলও খেয়ে নিলেন। তারপর রুমাল বাব করে ঘাড় আর কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'উঃ গরমে একেবারে মরে গেলুম।'

খানিক বাদেই জলখাবার এসে গেল। খেতে-খেতে যেমন কুশল-জিজ্ঞাসা আর পারস্পরিক বার্তা-বিনিময় চলতে লাগল, তেমনি অন্যরকমের টুকটাক কথাও হল কিছু-কিছু। তারপর ভাদুড়ীমশাই-ই একসময়ে বললেন, 'এবারে তা হলে পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ওই ব্যাপারটার কথায় আসা যাক, কেমন? মিস্টার সামন্ত, আপনাকে যদি এই প্রসঙ্গে গোটা কয়েক প্রশ্ন করি, তা হলে তার উত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না তো? তা যদি হয়, তো এখনই বলুন, সে-ক্ষেত্রে আর আপনাকে আমি বিব্রত করব না।'

সামন্ত বললেন, 'দেখুন মিস্টার ভাদুড়ী, এ-ব্যাপারে আমার তরফে যেটা বলবার কথা, সেটা

খোলাখুলি বলা-ই ভালো। সরকারি নিয়মকানুন তো আপনার জানাই আছে। আপনি খুব ভালোই জানেন যে, এসব ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলতে আমি বাধ্য নই, সাধারণত তা আমি বলিও না। তবে কিনা আপনার কথা আলাদা।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কেন কেন, আমিই বা আর-পাঁচজনের থেকে আলাদা হলুম কিসে?'

গঙ্গাধর সামন্ত কিন্তু হাসলেন না। বললেন, 'কথাটা আমার নয়, আমার উপরওয়ালার। আপনি যে এই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, আপনার ভাগ্নের ফোন পাবার পরে এটা আমার উপরওয়ালাকে আমি সঙ্গে-সঙ্গেই জানিয়েছিলুম। জিগ্যেস করেছিলুম যে, এ-ব্যাপারে যে-সব তথ্য ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে, আপনাকে তা আমি জানাতে পারি কিনা।'

'তিনি তাতে কী বললেন?'

'বললেন যে, নর্মালি উই ডোন্ট ডু দিস, তবে কিনা মিস্টার ভাদুড়ীর কথা আলাদা, হি হ্যাজ অলওয়েজ কোঅপারেটেড উইথ আস। সো গো অ্যাহেড অ্যান্ড টক টু হিম অ্যান্ড সি ইফ হি ক্যান হেলপ আস ইন এনি ওয়ে।'

'সব কথাই আমাকে খুলে বলতে বলেছেন তিনি?'

'তা-ই তো বললেন। আপনার কাছে নাকি কোনও কিছুই গোপন রাখবার দরকার নেই। বললেন যে, গিভ হিম অল দি ইনফর্মেশন অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স দ্যাট উই হ্যাভ উইথ আস; দেয়ার'স অ্যাবসলিউটলি নো নিড টু হোল্ড এনিথিং ব্যাক।'

'বাঃ,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা হলে তো কোনও কথাই নেই। তা হলে শুরু করি, কেমন?'

সামন্ত বললেন, 'তার আগে এখানে আর-যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের একটা কথা জানিয়ে রাখি। ব্যাপারটা এখন যে-স্টেজে রয়েছে, তাতে কোনও-কিছুই ফাঁস হওয়াটা উচিত হবে না, হলে আমি তো বিপদে পড়বই, অন্য কিছু সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সুতরাং আপনারা আমাকে কথা দিন যে, যা-যা আমি বলব, তা শুধু আপনারাই জানবেন. আর কেউ নয়।'

সামন্ত যদিও 'আর-যাঁরা' 'আপনারা' ইত্যাদি সব শব্দ ব্যবহার করছিলেন, তবু বুঝতে আমার অসুবিধে হল না যে, তাঁর কথাগুলি আসলে একান্তভাবে আমাকেই বলা। আমি খবরের কাগজে কাজ করি, তাই ভদ্রলোক সম্ভবত ভয় পাচ্ছেন যে, এই নিয়ে আমাদের কাগজে কিছু বেরিয়ে যেতে পারে।

বললুম, 'আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি বরং ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু বাইরে যাই।'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'আরে বসুন, বসুন।' তারপর সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন; কিরণবাবু তো দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন, ফাঁস করতে হলে ঢের-ঢের এক্সপ্লোসিভ ব্যাপার উনি ফাঁস করে দিতে পারতেন। তা যখন করেননি, তখন এটাও করবেন না।'

সামন্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন মশাই। ঠিক আছে, এবারে তা হলে বলুন যে, আপনি কী জানতে চান।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'লাশ পরীক্ষা করা হয়েছে?'

'সে তো কালই হয়েছে।'

'রিপোর্টটা পাওয়া গেছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তাও পেয়েছি।' সামন্ত বললেন, 'তবে গুপ্তসাহেব নিজেই যখন উপস্থিত রয়েছেন এখানে, তখন আমি আর এ-ব্যাপারে কিছু বলব না; যা বলবার উনিই বলুন।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'শরীরটা চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। ওইভাবে পড়ে যাবার ফলে যদি মাথা ফেটে থাকে, তা হলে মাথার পিছন দিকটা ফাটত।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এমন যদি হয় যে, লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে মাথা ফাটিয়েছিল, কিন্তু

BanglaBook.org

পরে তার শরীরটাকে চিৎ করে দেওয়া হয়েছে?'

'সে-ক্ষেত্রে ফাটত মাথার সামনের দিক, অর্থাৎ কপালের দিক। কিন্তু এখানে দেখছি, মাথাটা সামনের দিকেও ফাটেনি, পিছনের দিকেও না। ফেটেছে একেবারে খুলির ওপরের দিকটা। ওই যাকে আমরা চাঁদি বলি।'

এসব কথা কালই আমরা শুনেছি। কৌশিকের কাছে ভাদুড়ীমশাইও নিশ্চিত শুনে থাকবেন। তবু তিনি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কিছুই জানেন না। বললেন, 'বটে? তা এ থেকে আপনার কী মনে হয়?'

'একটাই মাত্র কথা মনে হয়। সেটা এই যে, ওপর থেকে ভারী কিছু মাথার ওপরে পড়লে কিংবা ওপরথেকে ভারী কিছু দিয়ে কেউ মাথার ওখানে আঘাত করলে তবেই মাথার ওই জায়গাটা ও-ভাবে ফাটতে পারে। তা ওখানে তো মাথার ওপরে ফ্যান কিংবা ঝাড়লণ্ঠন ছিল না, তাই ওপর থেকে অমন কিছু খসে পড়বারও প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে উঠছে না। তা হলে আর এটাকে দুর্ঘটনা বলে কি হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথা ফাটবার ব্যাপার বলে মেনে নিই কী করে? একটাই মাত্র সিদ্ধান্ত এ-ক্ষেত্রে করতে পারি। সেটা হল : ইট'স এ ক্লিয়ার কেস অভ মার্ডার।'

'সেটা কীভাবে করা হল বলে আপনার মনে হয়?'

'ভারী কিছু দিয়ে খুব জোরে ওর মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। আঘাতটা কিন্তু একই লেভেলে সামনে কিংবা পিছনে দাঁড়িয়ে করা হয়নি, করা হয়েছিল একটু ওপর থেকে। একই লেভেলে দাঁড়িয়ে যে সেটা করা যায় না, তা অবশ্য নয়। যাকে আঘাতটা করা হচ্ছে, তার চেয়ে যদি যে আঘাত করছে তার হাইট আরও অন্তত ফুটখানেক বেশি হয়, তো একই লেভেলে দাঁড়িয়েও সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু তেমন কোনও সম্ভাবনাকেও এ-ক্ষেত্রে আমল দিতে পারছি না।'

'একথা কেন বলছেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'এইজন্যে বলছি যে, যাকে খুন করা হয়েছে, তার হাইট পাক্কা ছ'ফুট। একই লেভেলে দাঁড়িয়ে তার মাথার ওই জায়গায় যদি আঘাত করতে হয় তো খুনির অন্তত সাত ফুট লম্বা হওয়া দরকার। তা ওরকম লম্বা লোক আমেরিকান বাস্কেট-বল টিমে অনেক থাকতে পারে, আমাদের দেশে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কৌশিক বলল, 'আমি একটা কথা বলতে পারি?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

কৌশিক বলল, 'ওই যে আপনি এক ফুট ব্যবধানের কথা বলছেন, ওটা তো কৃত্রিমভাবেও তৈরি করে নেওয়া হতে পারে?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটু বুঝিয়ে বলো তো বাবা।'

কৌশিক বলল, 'ধরুন একই লেভেলে দাঁড়িয়ে মাথার ওইখানটায় আঘাত করে আমি যদি কাউকে মারতে চাই, তো তার জন্যে আমাকে সত্যি-সত্যি তার চেয়ে আরও এক ফুট বেশি লম্বা হতে হবে কেন? সে যদি একটা চেয়ারে বসে থাকে, আর আমি থাকি দাঁড়িয়ে, তা হলেই তো আমাদের দুজনের দৈর্ঘ্য এক হওয়া সত্ত্বেও, কি তার চেয়ে আমি ইঞ্চি কয়েক খাটো হওয়া সত্ত্বেও, কার্যত আমি তার চেয়ে অন্তত তখনকার মতো এক ফুট বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছি। কিংবা তাকে চেয়ারেই বা বসতে হবে কেন? সে না হয় দাঁড়িয়েই থাক। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ওই এক ফুট আমি গেইন করতে পারব, যদি কিনা একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি তার মাথা ফাটাই।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ওয়েল ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট দেয়ার। এ ভেরি গুড পয়েন্ট ইনডিড। এদিক থেকেও ব্যাপারটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল।'

গঙ্গাধর সামন্তকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'আমি যে এটা একেবারেই ভেবে দেখিনি, তা কিন্তু নয়। কিন্তু চেয়ারে বসে থাকার কথাটা এখানে খাটছে না। অত রাত্তিরে একটা

লোক ওখানে চেয়ারে বসে থাকবে কেন? আর টুলের ওপরে দাঁড়িয়েই বা খুন করবার দরকার কী, সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে দাঁড়িয়েই তো সেটা করা যায়। কী গুপ্তসাহেব, যায় না?

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'যায় বইকী, নিশ্চয়ই যায়।'

সামন্ত বললেন, 'খুনি আর তা হলে অনর্থক টুল নিয়ে টানাটানি করতে যাবে কেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, আপাতত এটাকে আমি খুন বলেই ধরে নিচ্ছি। তা সেটা কখন হয়েছে বলে আপনাদের ধারণা?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একেবারে একজ্যাক্ট সময় তো বলা সম্ভব নয়। লাশ পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছে মোটামুটি তিনটে নাগাদ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটু মার্জিন তো রাখতেই হয় আমাদের, তাই একেবারে নিশ্চিত হয়ে যা বলা সম্ভব, সেটা এই যে, ব্যাপারটা ঘটেছে রাত দুটো থেকে চারটের মধ্যে।'

আমি বললুম, 'আড়াইটের আগে ঘটেনি।'

সামন্ত বললেন, 'একথা আপনি বলছেন কেন?'

'এইজন্যে বলছি যে, নকুল সেদিন রাত একটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল বটে, কিন্তু চেঁচামেচি করেছিল দুটো পর্যন্ত।'

'কী করে জানলেন? আপনি কি তখন জেগে ছিলেন নাকি?'

'আমি জেগেছিলুম না, কিন্তু আমার মেয়ে জেগেছিল।...না-না, তার ইনসমনিয়া নেই, আসলে সামনেই তার বি.এ. ফাইনাল, তাই অন্তত রাত দুটো পর্যন্ত সে এখন লেখাপড়া করে। কখনও কখনও আড়াইটেও বেজে যায়। তার ঘরও একেবারে রাস্তার ধারেই। সেদিন সে ভেবেছিল যে, তিনটের আগে ঘুমোবে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে নকুল সেদিন এমন হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল যে, আমার মেয়ের পড়াশুনো একেবারে মাথায় উঠে যায়। আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে। তার আগে টেবিল-ক্লকে অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল যে, রাত তখন দুটো পঁচিশ।'

সামন্ত বললেন, 'এই ব্যাপারে দেখছি সদানন্দবাবুর কথার সঙ্গে আপনার মেয়ের কথাটা মোটামুটি ট্যালি করে যাচ্ছে।'

বললুম, 'জানি। কাল সকালে আপনি এসে পৌঁছবার আগে সদানন্দবাবুও কথাটা আমাকে বলেছিলেন। পরে দেখলুম আপনার জেরার উত্তরেও উনি একই কথা বললেন, তা ছাড়া, আর-একটা কথাও বলেছেন উনি। সেটা এই যে, রাত তিনটে নাগাদ উনি একতলায় কোনও ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ পান। কথাটা, যদ্দুর মনে করতে পারছি, আপনাকেও উনি বলেছেন। তাই না?'

সামন্ত তাঁর অ্যাটাশে-কেস খুলে একটা নোটবই বার করলেন। ওই যাতে স্টেনোরা ডিক্টেশান নিয়ে থাকেন, সেই রকমের ছোট-সাইজের খাতা আর কী। খুব দ্রুত তার কয়েকটা পাতা উলটে গিয়ে এক-জায়গায় হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। সেখানে যা লেখা ছিল, তার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা তিনি আমাকেও বলেছেন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একতলায় নকুল ছাড়া আর কে-কে থাকে যেন?'

বললুম, 'নকুলের বউ যমুনা, মেয়ে কমলি আর যমুনার দাদা বিষ্টুচরণ থাকে।'

ভাদুড়ীমশাই সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে রাত তিনটে নাগাদ একতলায় কিছু-একটা পড়ে যাবার শব্দ হয়েছিল, অন্তত হয়েছিল বলেই সদানন্দবাবু জানাচ্ছেন, এটা নিয়ে কি যমুনা আর তার দাদাকে কোনও প্রশ্ন করেছেন আপনি?'

সামন্ত বললেন, 'স্পেসিফিক্যালি যে এইটে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেছি, তা নয়। তবে অন্য অনেক প্রশ্ন তো করেছি, যমুনা আর বিষ্টুচরণ তার উত্তরও দিয়েছে। সে-রাতে যা হয়েছিল, উত্তরগুলো থেকে মোটামুটি তা আন্দাজও করা যায়। মানে একটা ছবি তার থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই।'

'যমুনা কী বলছে? সব কথা বলবার দরকার নেই, জরুরি পয়েন্টগুলোই শুধু জানতে চাইছি।'

BanglaBook.org

'যমুনা বলছে, নকুলচন্দ্র রোজই দেরি করে ফিরত, সেদিনও দেরি করেই ফিরেছিল, তবে সেদিন তার ফিরতে-ফিরতে একটা বেজে গিয়েছিল কিনা, তা সে বলতে পারবে না। ফিরে যে অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করেছিল, তাও ঠিক। তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, কিন্তু সেদিন আর সে ভাত-টাত খায়নি। বেশ কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'ভালো কথা। তারপর?'

'এই পর্যন্ত যা বলা হল, তার মধ্যে কোনও গোলমাল নেই। গোলমাল ঘটছে তার স্টেটমেন্টের শেষ-দিককার অংশটা নিয়ে।'

'সেটা কী?'

সামন্ত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'যমুনা বলছে, রোজই রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে তার স্বামী একবার বাথরুমে যেত। তারপর বাথরুম থেকে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। তবে কিনা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। খানিকক্ষণ ঘুমিয়েই ফের উঠে পড়তে হত তাকে। খুচরো দোকানিরা সাত-সকালে পাইকিরি দরে মাছ কিনতে আসত, সেইজন্যেই বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা চলত না।'

কৌশিক বলল, 'লোকটা রাত করে ফিরত, আবার উঠেও পড়ত সকাল-সকাল। তা হলে ঘুমোত কখন?'

'যমুনা বলছে, রাত্তিরে তো সাধারণত ঘণ্টা তিনের বেশি ঘুমোত না, তাই দুপুরবেলায় টানা আবার ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিত।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তা এর মধ্যে গোলমালটা ঘটছে কোথায়?'

সামন্ত বললেন, 'সেদিনও রাত তিনটে নাগাদ লোকটা বাথরুমে গিয়েছিল কিনা, যমুনা সেটা বলতে পারছে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'গিয়েছিল নিশ্চয়। খুনের সময় তো দুটো থেকে চারটের মধ্যে। তা সেইসময় ঘর থেকে ওকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে তো আর কেউ খুন করেনি। আর খুনটা যে ঘরের মধ্যে করে তারপর শরীরটাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে সিঁড়ির তলায় ফেলে রাখা হয়নি, তাও তো ও-ঘরের বিছানাপত্র পরীক্ষা করেই বোঝা গিয়েছে। তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে, ঘর থেকে ওকে টেনে নিয়ে গেলে কি ঘরের মধ্যেই খুন করে লাশটাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেলে তো ওর বউই সেটা টের পেয়ে যেত। তা কিন্তু যমুনা টের পায়নি।...না মশাই, নির্ঘাত ও তখন বাথরুমে গিয়েছিল। তারপর বেরিয়ে এসে খুন হয়।'

কৌশিক বলল, 'বাথরুমে হয়তো ঢোকেইনি, সেখানে যাবার পথেই হয়তো খুন হয়েছে। তাও কিছু বিচিত্র নয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'যমুনা কী বলছে?'

সামন্ত বললেন, 'যমুনা বলছে, রোজই তো বাথরুমে যেত। তবে সেদিনও গিয়েছিল কিনা, তা সে জানে না। তার কারণ, রাত-দুপুরে নকুলের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নকুল এসে ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়বার পর সে নিজেও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোর পাঁচটায় সদানন্দবাবুর চিৎকার শুনে সে জেগে ওঠে, তার আগে আর তার ঘুম ভাঙেনি।'

ডাক্তার গুপ্ত ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনার কী মনে হয়? যমুনা যা বলছে, সেটা সত্যি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সত্যি তো হতেই পারে, তবে মিথ্যে হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'যমুনা কেন মিথ্যেকথা বলবে?'

'জেগে থাকলেও সে-কথা স্বীকার করা সম্ভব নয় বলেই বলবে। ধরুন, নকুল সেদিনও তার অভ্যেসমতো রাত-তিনটে নাগাদ একবার বাথরুমে গিয়েছিল। ধরুন, যমুনা সেটা টেরও পেয়েছিল।

BanglaBook.org

তা আমরা এখন জেনে গেছি যে, নকুলের মৃত্যু ঘটেছিল মোটামুটি ওই সময়েই। তো যমুনা যদি স্বীকার করে যে, সে তখন জেগে ছিল, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, ওই সময়ে তার স্বামীর মাথা ফাটল, লোকটা মেঝের ওপরে পড়ে যাবার ফলে শব্দও হল একটা, তা হলে জেগে থাকা সত্ত্বেও যমুনা কিছু টের পেল না কেন?'

সামন্ত বললেন, 'আমার ধারণা যমুনা মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যি সে ঘুমিয়েই ছিল তখন, নইলে শব্দটা শুনে সে ছুটে আসত নিশ্চয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আপনার ধারণা সত্যি হলে কি তদন্তের কোনও সুবিধে হয়?'

'হয় বইকী,' সামন্ত বললেন, 'ব্যাপারটাকে যে-ভাবে আমি রিকনস্ট্রাক্ট করেছি, সেটা তা হলে জোর পায়।'

কৌশিক বলল, 'কীভাবে রিকনস্ট্রাক্ট করেছেন, একটু বুঝিয়ে বলুন।'

॥ ১৪ ॥

সামন্ত বললেন, 'নকুলচন্দ্র যে রোজই রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে বাথরুমে যেত, আমার ধারণা সদানন্দ সেটা জানতেন। গভীর রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই, খুন করবার পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার সময় আর কী হতে পারে। আমার বিশ্বাস, সদানন্দ এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, অনেক চেষ্টা করেও নকুলকে যখন তাড়ানো যাচ্ছে না, তখন তাকে খুনই করবেন তিনি। সেইজন্যেই সেদিন মোটামুটি তিনটে নাগাদ তাঁর দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। একতলার ঘর থেকে নকুল বেরিয়ে এল। বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। সদানন্দও তাঁর লোহার বল বসানো লাঠিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এলেন। বাথরুমের আলো নিবিয়ে নকুল যখন সিঁড়ির পাশ দিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই সদানন্দ তার মাথা ফাটিয়ে দেন। নকুল একটা চিৎকার করবারও সুযোগ পায়নি, মাথায় লাঠির বাড়ি পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই সে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে।'

কৌশিক বলল, 'কাট! এই দৃশ্যটা আবার নতুন করে টেক করতে হবে। কিন্তু তার আগে স্ক্রিপ্টের এই অংশটা একটু অন্যভাবে লেখা দরকার।'

সামন্ত বললেন, 'তার মানে?'

কৌশিক বলল, 'মানে আর কী, ব্যাপারটা একেবারে ফিল্মের স্ক্রিপ্টের মতো লাগছে। এইখানে যদি "ক্যাঁত্যাচ" করে একটা দরজা খোলার সাউন্ড লাগিয়ে দেন, কি সদানন্দবাবু তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক আগেই যদি ক্যামেরা চার্জ করে দেখিয়ে দেন যে, একটা দেওয়াল-ঘড়ির ছোট কাঁটাটা তিনটের ঘরে এসে পৌঁছেছে, তো সে ভারী জমাট ব্যাপার হবে।'

সামন্ত বললেন, 'অর্থাৎ আমার থিয়োরিটা আপনার বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না, কেমন?'

কৌশিক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাদুড়ীমশাই এমন কটমট করে তার দিকে তাকালেন যে, সে আর মুখ খুলল না।

ভাদুড়ীমশাই তখন সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব ছেলেছোকরাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না, মিস্টার সামন্ত। আপনি যা বলছেন বলুন। নকুল তো মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর?'

সামন্ত বললেন, 'তারপর আর কী, যমুনা আর বিষ্টুচরণ যদি তখন জেগে থাকত, তা হলে মেঝের ওপর নকুলের পড়ে যাবার শব্দ শুনেই তারা যে-যার ঘর থেকে ছুটে আসত নিশ্চয়। কিন্তু কপাল ভালো সদানন্দবাবুর। দুজনেই তখন ঘুমিয়ে ছিল। নকুলচন্দ্রের পড়ে যাবার শব্দ তারা শোনেনি,

BanglaBook.org

তাই ছুটেও আসেনি।'

'তারপর?'

'কাজ সমাধা করে সদানন্দ আবার নিঃশব্দে ওপরে যান; উঠে গিয়ে বেশ-খানিকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে তারপর রোজকার মতোই পাঁচটা বাজবার খানিক আগে আবার নীচে নেমে আসেন। চিৎকারটাও করে ওঠেন তখনই। এমন একটা ভাব দেখান, যেন ডেডবডিটা এই তিনি প্রথম দেখলেন। বুঝতেই পারছেন, সবটাই একেবারে প্ল্যান-মাফিক ব্যাপার।'

কৌশিক বলল, 'কিন্তু সদানন্দবাবুর হাত থেকে লাঠি আর টর্চ তো পড়ে গিয়েছিল। ও-দুটো জিনিস কখন পড়ল, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। বিশেষ করে লাঠিটা। তার কারণ, ওটাকেই আপনি মার্ডার-ওয়েপন বলে সন্দেহ করছেন।'

সামন্ত বললেন, 'সন্দেহ করবার কারণ নেই, তা তো নয়।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সদানন্দবাবু তো বলছেন, কুসুমবালা, যমুনা আর বিষ্টুচরণের সামনেই ওই লাঠি আর টর্চ তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল।'

সামন্ত বললেন, 'যমুনা আর বিষ্টুচরণ কিন্তু সে-কথা বলছে না। তারা বলছে, চিৎকার শুনে তারা যখন বেরিয়ে আসে, তখনই তারা নকুলের ডেডবডির পাশে টর্চ আর লাঠি পড়ে থাকতে দেখেছিল। কুসুমবালা অবশ্য সদানন্দের কথা সমর্থন করছেন। কিন্তু তিনি যে তাঁর স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে সেটা করছেন না, এমন কথা কে বলবে।'

ভাদুড়ীমশাই চুপ করে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'আপনার ধারণাও কি তা-ই? অর্থাৎ স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে কুসুমবালা মিথ্যেকথা বলছেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সে তো হতেই পারে। স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে স্ত্রী একটা মিথ্যেকথা বলবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক।'

আমি একেবারে নিবে গেলুম। দেখলুম, সামন্তমশাই হাসছেন। বিজয়ীর হাসি। বললেন, 'আপনি তাহলে আমার থিয়োরিটাই মেনে নিচ্ছেন তো?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তাও কিন্তু মেনে নিচ্ছি না।'

এবারে সামন্তের নিবে যাবার পালা। বললেন, 'কেন?'

'কী করে মেনে নেব?' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একে তো ওই লাঠিটাই যে মার্ডার-ওয়েপন, এখনও সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারিনি, তার ওপরে, আবার আপনার থিয়োরির মধ্যে অন্য একটা ফাঁকও রয়েছে।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'বলছি। ফাঁকটা ছোট, কিন্তু ভাইটাল।'

ভাদুড়ীমশাই আবার একটা সিগারেট ধরালেন। চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর আধাআধি যখন খাওয়া হয়েছে, তখন সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে বললেন, 'মাত্র একটা কথাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি। সেটা এই যে, নকুলচন্দ্র মারা গিয়েছে মোটামুটি রাত তিনটের সময়। মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। সে মেঝের ওপরে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার ফলে একটা শব্দ হয়েছিল। শব্দ শুনে যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে আসতে পারত। কিন্তু আসেনি। কেন আসেনি? না শব্দটা শুনতেই পায়নি তারা। কেন শোনেনি? না যে-যার ঘরে তারা দুজনেই তখন ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তারা না-শুনলেও শব্দটা যে কেউই শোনেনি, তা কিন্তু নয়। সদানন্দবাবু শুনেছিলেন। নিজের থেকেই আপনাকে তিনি সেটা জানিয়েছেনও। তাই না?'

সামন্ত বললেন, 'তা জানিয়েছেন বটে।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'সত্যি বলতে কী, তিনি এটা জানিয়েছেন বলেই আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেছি। ধরা যাক, আপনি যা বলছেন, সেটাই ঠিক। অর্থাৎ সদানন্দবাবুই খুনি। তিনটের সময়

BanglaBook.org

নীচে নেমে এসে সিঁড়ির দু'ধাপ ওপর থেকে তিনি নকুলচন্দ্রের মাথা ফাটিয়ে দেন। নকুলচন্দ্র মেঝেতে পড়ে যায়। শব্দ হয়। কিন্তু যমুনা আর বিষ্টুচরণ ছুটে আসে না। তাতেই সদানন্দবাবু বুঝে যান যে, তারা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তা-ই যদি তিনি বুঝে গিয়ে থাকেন, তা হলে আর এমন কথা তিনি বলতে যাবেন কেন যে, দোতলা থেকে শব্দটা তিনি শুনেছিলেন? কেউ যখন শব্দটা শোনেনি, তখন তাঁরও তো ব্যাপারটা চেপে যাবার কথা। কিন্তু তিনি চাপলেন না। বললেন যে, শব্দটা শুনেছিলেন তিনি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করে বসলেন, বাড়ির মধ্যে সবাই যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তখন একা তিনি জেগে ছিলেন। কখন জেগে ছিলেন? না, খুনটা যখন হচ্ছে, তখনই। এ-যে আগ বাড়িয়ে ধরা দেবার ব্যাপার, এ-তো সদানন্দবাবুরও না-বোঝবার কথা নয়। খুনি কি কখনও এ-ভাবে আগ বাড়িয়ে ধরা দেয়? না মশাই, তাঁকে যে খুনি হিসেবে সন্দেহ করা হতে পারে, এটা বুঝেও এই যে তিনি নিজের থেকেই একটা ভাইটাল ইনফর্মেশান আপনাকে দিয়ে দিলেন, এতেই আমার একটু ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। কী মনে হচ্ছে জানেন?'

'কী মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে যে, ইউ আর বার্কিং আপ দ্য রং ট্রি।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, সদানন্দবাবু খুনি নন?'

'না, তাও আমি বলছি না। সদানন্দবাবুর মোটিভ ছিল, সুযোগও ছিল। সুতরাং তাঁকে তো আপনি সন্দেহ করতেই পারেন। কিন্তু আমার বলবার কথাটা এই যে, ও-দুটো জিনিস আর কারও ছিল কিনা, সেটাও আপনার খুব ভালো করে ভেবে দেখা উচিত। অর্জুন যেমন সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু পাখিটাকেই দেখছিলেন...ভুল বললুম, পাখিরও সবটা তিনি দেখছিলেন না, দেখছিলেন শুধু পাখির মুণ্ডুটিকে, আপনিও তেমনি সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু সদানন্দবাবুকেই দেখছেন। কিন্তু আপনি তো অর্জুন নন, আপনি পুলিশ-অফিসার গঙ্গাধর সামন্ত। আপনার উচিত তাই চারদিকে নজর রাখা।...না-না, সদানন্দকে সন্দেহ করে আপনি কিছু অন্যায় করেননি, তবে কিনা সন্দেহের জালটাকে এবারে আর-একটু ছড়িয়ে দিন।'

সামন্ত বললেন, 'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সন্দেহ করবার মতো আর কাউকে তো এ-ক্ষেত্রে পাচ্ছি না। নকুলকে খুন করবার সুযোগ হয়তো যমুনারও ছিল, বিষ্টুচরণেরও ছিল। কিন্তু শুধু সুযোগ থাকাটাই যথেষ্ট নয়, একটা মোটিভও থাকা চাই। তা সেটা না ছিল যমুনার, না ছিল বিষ্টুচরণের।'

কৌশিক বলল, 'কিরণমামার কাছে আজই দুপুরে শুনলুম যে, রাত-দুপুরে বাড়ি ফিরে নকুল নাকি বউয়ের ওপরে খুব চোটপাট করত।'

সামন্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আপনি কোত্থেকে জানলেন কিরণবাবু?'

বললুম, 'সদানন্দবাবুই বলেছেন। পাড়ার আর পাঁচজনও যে ব্যাপারটা জানে না, তা নয়।'

কৌশিক বলল, 'চোটপাট নাকি রোজই করত। তা মারধোরও কি মাঝে-মাঝে করত না?'

সামন্ত বললেন, 'বাস, সেটাই অমনি খুন করবার মোটিভ হয়ে গেল? আর তা ছাড়া, যেভাবে খুন করা হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে, এটা কোনও স্ত্রীলোকের কাজ।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা হলে বাকি রইল বিষ্টুচরণ। তার কোনও মোটিভ থাকা সম্ভব নয়?'

একগাল হেসে সামন্ত বললেন, 'আদৌ সম্ভব নয়। আরে মশাই, যে-গোরু দুধ দিচ্ছে, তাকে সে কেন মারতে যাবে?' বিষ্টুচরণ গরিবঘরের ছেলে, চাকরি-বাকরি জোটাতে পারেনি, ভগ্নীপতির কাছে আশ্রয় মিলেছে, তাই দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। নকুল যে মরল, এতে সেই আশ্রয়টাই তার ঘুচে গেল। না মশাই, ভগ্নীপতির মৃত্যুতে বিষ্টুচরণের কোনও স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, বরং সে বেঁচে থাকলেই তার লাভ ছিল।'

BanglaBook.org

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'একেবারেই কি স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না? যমুনা কি তার স্বামীর ব্যাবসা সামলাতে পারবে? আর কমলি তো নেহাতই শিশু। খোঁজ নিয়ে দেখুন, বোন আর ভাগনির অভিভাবক সেজে সে তার ভগ্নীপতির মাছের ব্যাবসাটা হাতাতে চায় কি না।'

গঙ্গাধর সামন্ত তাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে দু-দিকে আন্দোলিত করে বললেন, 'সে গুড়েও বালি। ব্যাবসার জমা-খরচের খাতা আর অন্য সব কাগজপত্র আটক করেছি তো। তা সেখানে দেখছি, জমার ঘরে ঢুঢু। পুরোটা ধারের কারবার, আর সেই ধারের পরিমাণ হাজার পনেরো তো হবেই। আসলে নকুলচন্দ্রের মেজাজ যে ইদানীং খিঁচড়ে ছিল, সেটা এই জন্যেই। দেনার দায়ে লোকটার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ও-ব্যাবসা কে হাতাতে যাবে?'

ভাদুড়ীমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'মার্ডার-ওয়েপনের কোনও হদিশ হল?'

'পেয়েছি তো অনেক কিছুই। ইট, পাথর, নোড়া, রেঞ্চ, হাতুড়ি, বাটখারা। অর্থাৎ কিনা যা দিয়ে মাথা ফাটানো যায়, এমন বিস্তর জিনিস। তার ওপরে সদানন্দবাবুর ওই লাঠি তো আছেই। কালই সব পরীক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে হয়, আগামীকাল বিকেল নাগাদ টেস্ট-রিপোর্ট পেয়ে যাব।'

'পেলে আমাকে জানাবেন, কেমন?'

'নিশ্চয় জানাব।'

গঙ্গাধর সামন্ত উঠে পড়লেন। ডাক্তার গুপ্তকে বললেন, 'আপনিও চলুন। আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি থানায় ফিরব।'

॥ ১৫ ॥

কুসুমবালার সঙ্গে কথা বলে আমাদের চেনা একজন উকিলকে আমি আগেই সব জানিয়ে রেখেছিলুম। সদানন্দবাবুর জামিনের ব্যাপার নিয়ে সোমবার সকালে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় কৌশিক এল। অবাক হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কৌশিক বলল, 'একবার থানায় যাব। কয়েকটা বিষয়ে মিস্টার সামন্তর সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। হাতে সময় ছিল, তাই ভাবলুম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। মামিমা, পারুল—ওরা সব ভালো আছে তো?'

'তা আছে। তবে এলেই যখন ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে যাবে না?'

'আজ আর বসব না। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

কৌশিক উঠে পড়ল।

জামিনের ব্যবস্থা করা গেল না। সরকারি উকিল বললেন, একে তো এটা খুনের ব্যাপার, তার ওপরে আবার কী দিয়ে খুন করা হয়েছে, এখনও সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, পুলিশ তাই আশঙ্কা করছে যে, আসামিকে যদি এখনই জামিন দেওয়া হয়, তা হলে তদন্তের অসুবিধে হবে। এখনও যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তেমন কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ এর ফলে লোপাট হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আমাদের উকিল বললেন, সদানন্দবাবু একজন মানী ব্যক্তি, তদন্তের অছিলায় এইভাবে তাঁকে হাজতে আটকে রাখা উচিত হচ্ছে না। তা ছাড়া এটাও আদালতকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, ঘটনাস্থলে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সুতরাং সেখান থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট হবার কোনও আশঙ্কাই নেই।

BanglaBook.org

হাকিম দু-পক্ষের কথা শুনলেন; তারপর রায় দিলেন, আসামিকে আপাতত আরও তিন দিন থানা-হাজতে রাখা যেতে পারে; তবে আদালত আশা করছেন যে, পুলিশের তরফে বুধবারের মধ্যেই তদন্তের কাজ শেষ করা হবে, তারপরে আর তাঁরা জামিন দেবার ব্যাপারে কোনও আপত্তি তুলবেন না। সদানন্দবাবুর বয়েসের উল্লেখও করলেন তিনি; বললেন যে, এই বয়েসের একজন বৃদ্ধকে যে দীর্ঘকালের জন্য হাজতে আটকে রাখা চলে না, তাতে যে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে, পুলিশের সে-কথা উপলব্ধি করা উচিত।

দেবনারায়ণ ঘোষমশাই আমাদের উকিল। দুপুর দুটো নাগাদ আমার অফিসে ফোন করে তিনি এই খবর দিলেন। সব শুনে বললুম, 'বেস্পতিবার জামিনের ব্যবস্থা হবে তো?'

'তা হবে।' ঘোষমশাই বললেন, 'আজ হল না ঠিকই, তবে রায় শুনে মনে হয়, সেদিন আর কোনও অসুবিধে হবে না। আসামির বয়েস যে সত্তর, সেটা একটা মস্ত ফ্যাক্টর।'

'আসামি' শব্দটা খট করে কানে বাজল। বললুম, 'শনির থেকে বুধ। শুনলে মনে হয় মোটে তো পাঁচটা দিন। তা এই বয়েসে পাঁচ-পাঁচটা দিনও তো কম নয়। তার ওপরে আবার যা গরম পড়েছে।'

'কী আর করা যাবে বলুন। সবই কপালের ভোগ।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম। তারপরেই মনে হল, কৌশিকের সঙ্গে গঙ্গাধর সামন্তর কী কথা হল, সেটা জানা দরকার। টেলিফোন অপারেটরকে মালতীদের বাড়ির ফোন-নাম্বারটা দিয়ে বললুম, 'এই নম্বরটা একটু ডেকে দাও তো।'

ফোন মালতীই ধরেছিল। বললুম, 'আমি কিরণদা। দাদা বাড়িতে আছেন?'

'তা আছে।'

'তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলব। ঘুমুচ্ছেন না তো?'

'রাত্তিরেই দাদা ঘুমোয় না, তা দুপুরবেলায়! ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

সেকেন্ড পাঁচেক বাদেই ভাদুড়ীমশাইয়ের গলা ভেসে এল। 'কী খবর?'

'খবর তো কৌশিকের কাছে। গঙ্গাধর সামন্ত ওকে কী বললেন?'

'পরে বলব। আপাতত জেনে রাখুন, সামন্ত মোটেই খারাপ লোক নয়। একটু একবগগা ঠিকই, নাক-বরাবর যা চোখে পড়ে, তা ছাড়া আর অন্য-কিছু দেখতে পায় না। বাট সার্টেনলি নট ওয়ান অভ দোস কনসিটেড অফিসারস। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা ধরিয়ে দিলে মেনেও নেয়। কৌশিকের সঙ্গে তো এখন পুরোপুরি কো-অপারেট করছে।'

'কৌশিক বাড়িতে আছে?'

'তাই থাকে কখনও? থানা থেকে একটা নাগাদ ফিরেছিল, তার আধঘণ্টার মধ্যেই আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। মারুতি নিয়েই বেরুচ্ছিল, তা আমি বললুম, গরমে একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবি, বরং তোর বাবার অ্যাম্বাসাডরটা নিয়ে যা।'

'কোথায় গেল?'

'বাগনান আর কোলাঘাট, দু-জায়গাতেই যাবে।'

'ওখানে আবার কী?'

'বাগনানের কাছেই যমুনার বাপের বাড়ি, আর নকুলদের বাড়ি হল কোলাঘাট থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমে একটা গ্রামে। ব্যাপারটা বুঝলেন তো?'

'কিছুই বুঝলুম না।'

'যমুনা আর নকুলের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কৌশিক একটু কথা বলতে চায়।'

'ফিরবে কবে?'

'ফিরবে তো বলল কাল বিকেল নাগাদ। কিংবা তা যদি না পারে তো পরশু দুপুরে। চিন্তা

BanglaBook.org

করবেন না, ও ঠিক-পথ ধরেই এগোচ্ছে।'

বললুম, 'আমি কি আপনার ওখানে একবার যাব?'

ভাদুড়ীমশাই সেকেন্ড তিন-চার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আজ তো সোমবার। মঙ্গল আর বুধ, দুটো দিন আমাকে একটু ভাবতে দিন। আপনি একেবারে বেস্পতিবার বিকেলে আসুন। মনে তো হয় তখন কিছু খবর দিতে পারব।'

ফোন নামিয়ে রাখলুম।

মঙ্গল আর বুধ, দুটো দিন যেন কাটতেই চাইছিল না। অফিস করলুম যথারীতি, কিন্তু কাজকর্ম যে বিশেষ করতে পারা গেল, তা নয়। শুধু অফিসের কাজ বলে কথা কী, কোনও কাজেই যেন ঠিক মন বসাতে পারছিলুম না। বাসন্তী সেটা বুঝতে পেরেছিল, দু-একবার প্রশ্নও করেছিল তা নিয়ে, কিন্তু স্পষ্ট কোনও জবাব না পেয়ে আর কিছু বলেনি। আমার শরীরটা দু-একদিন ধরে একটু অবসন্ন লাগছিল। বুধবার সকালে টেলিফোন করে ডাক্তার চাকলাদারকে সে-কথা জানাতে তিনি বললেন, 'আজ বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরতে পারবেন?'

'তা কেন পারব না?'

'ঠিক আছে, তা হলে ছ'টা নাগাদ আমার চেম্বারে চলে আসুন। ব্লাড-সুগার বেড়ে যায়নি তো?'

'না মশাই, ওসব ঝঞ্ঝাট আমার নেই।'

'তাহলে হয়তো প্রেশার বেড়েছে। চলে আসুন, দেখে দেব অখন। তা ছাড়া আমারও দু-একটা কথা বলবার আছে আপনাকে।'

'কী কথা?'

'আসুন, তখন বলব।'

চাকলাদার ফোন নামিয়ে রাখলেন।

অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতেই পাঁচটা চল্লিশ। জামা-কাপড় আর পালটানো হল না। মুখ-হাত ধুয়ে, কোনওক্রমে এক কাপ চা খেয়ে, পাশের গলিতে চাকলাদারের চেম্বারে যখন পৌঁছলুম, তখন ছ'টা পাঁচ।

প্রেশার দেখে চাকলাদার বললেন, 'ঠিকই আছে। মনে হচ্ছে এগজারশানের ব্যাপার। দু-দিন একটু বিশ্রাম নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বললুম, 'বিশ্রাম তো নিতেই পারতুম, কিন্তু এখন কী করে নিই বলুন তো। সদানন্দবাবুর ব্যাপারটার একটা ফয়সলা হোক, তারপর নেওয়া যাবে।'

চাকলাদার বললেন, 'আমি যা বলতে চাই, তা-ও কিন্তু ওই পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যাপারেই।'

ভদ্রলোককে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল মানুষ; শুনেছি ছ'টা সাড়ে-ছ'টা নাগাদ তাঁর চেম্বারে রোজই কিছু-না-কিছু বন্ধুবান্ধব আসেন, আড্ডা চলে আটটা-ন'টা পর্যন্ত। আজ কাউকে দেখা গেল না। বললুম, 'কী ব্যাপার বলুন তো? কাউকে দেখছি না কেন?'

'আমিই ফোন করে সবাইকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। বলেছি, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, চেম্বারে না বসে আজ একটু বিশ্রাম নেব।'

'শরীর সত্যি খারাপ নাকি?'

'না-না, ওসব কিছু নয়। আসলে আপনাকে এমন দু-একটা কথা বলতে চাই অন্যদের যা না-শোনাই ভালো।'

'কী কথা?'

ডাক্তার চাকলাদার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখ নীচু করে কী যেন ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এখুনি আমি বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না, বলা উচিতও নয়। আমি ডাক্তার-

BanglaBook.org

মানুষ, এমন কিছু করা বা বলা আমার ঠিক হবে না, যা কিনা আমাদের পেশায় আন-এথিক্যাল বলে গণ্য হয়ে থাকে। শুধু একটা কথা বলি। আপনি তো সদানন্দবাবুর বাড়ির একেবারে সামনেই থাকেন, আপনি একটু মিসেস বসুর ওপরে নজর রাখুন।'

'সদানন্দবাবুর স্ত্রীর ওপরে? কেন?'

'আর কিছু জিগ্যেস করবেন না, প্লিজ। শুধু যা বললুম, দয়া করে সেটা মনে রাখবেন।...মানে, আপনারা একটু সতর্ক থাকুন। হ্যাঁ, আপনারা সবাই। আমার ধারণা, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

চাকলাদারের কথাবার্তা আমার কানে কেমন যেন অসংলগ্ন ঠেকছিল। মনে হল, ভদ্রলোকের শরীর সত্যি ভালো যাচ্ছে না। বিশ্রাম সম্ভবত ওঁরই সবচেয়ে বেশি দরকার।

চলে আসবার আগে একবার জিগ্যেস করেছিলুম, 'কী হয়েছে, একটু খুলে বলুন তো মশাই।'

কিন্তু চাকলাদার আর একটা কথাও বললেন না।

চাকলাদার বলেছিলেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তা কিছু-একটা যে সেই রাত্রেই ঘটবে, তখন তা আমি কল্পনাও করিনি। খবর পাওয়া গেল ভোরবেলায়। না, আমাদের জন্যে তো ভদ্রলোক বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন, আমাদের গলিতে কিন্তু কারও কিছু হয়নি। ক্ষতি যা হবার, তা চাকলাদারেরই হয়েছে। তাঁর চেম্বারের জানলা ভেঙে মাঝরাত্তিরে চোর ঢুকেছিল। চেম্বারে তো বিশেষ কিছু থাকবার কথা নয়, ছিলও না, তাই চোরও বিশেষ কিছু হাতিয়ে নিতে পারেনি। আমরা গিয়ে দেখলুম, চেম্বারের ঘরের মেঝের ওপরে একরাশ কাগজপত্র ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। পুলিশ এসেছে। ডাক্তার চাকলাদার তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'চলে যাবেন না, একটু বসুন, কথা আছে।'

পুলিশ চলে যেতে-যেতে আটটা বাজল। চাকলাদার আমাকে ভেতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। কাজের লোকটি এসে দু-কাপ চা দিয়ে গেল সেখানে। চাকলাদার বললেন, 'খান।

আমি বললুম, 'আজকাল আর আমি এই রকমের চা খাই না, সদানন্দবাবুর পরামর্শমতো স্রেফ হালকা লিকাব খাই।'

চাকলাদার বললেন, 'তা হলে ওটা খাবেন না, পালটে দিতে বলছি।'

বললুম, 'আরে দূর মশাই, আমি কি সদানন্দবাবুর মতো অত নিয়ম মানি? এটাই খেয়ে নিচ্ছি, পালটাতে হবে না।...কথাটা কী, সেইটে এবারে বলুন তো?'

'ও, হ্যাঁ,' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'আপনার কাছে মিঃ ভাদুড়ীর কথা অনেক শুনেছি। তা সেদিন তো আপনারা বলছিলেন যে, তিনি এখন কলকাতায়। তাই না?'

বললুম, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'শিগগিরই কি তাঁর কাছে আপনি যাবেন?'

'রবিবারে গিয়েছিলুম। আজ তো বেস্পতিবার, আজ বিকেলেও একবার যাব।'

'আজ অফিসে যাবেন না?'

'না। সদানন্দবাবুর জামিনের ব্যাপারটা আজ আবার উঠবে। মনে হচ্ছে আজ ওটা পেয়েও যাবেন উনি।'

'আপনি কি আদালতে যাবেন?'

'না-না,' আমি বললুম, 'আমার যাবার কিছু দরকার নেই। ভালো ল-ইয়ার দিয়েছি, যা করবার তিনিই করবেন। আমি বাড়িতেই থাকব। কেন থাকব, জানেন?'

'কেন?'

'হাজত থেকে উনি ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। যাতে না ওঁর মনে

BanglaBook.org

হয় যে, পুলিশে ধরেছিল বলে আমরা ওঁকে অচ্ছুত ভাবছি, ওঁকে এড়িয়ে যাচ্ছি।'

'সে তো ভালোই।' চাকলাদার বললেন, 'তা হলে মিঃ ভাদুড়ীর ওখানে কখন যাচ্ছেন?'

'পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব, তার আগে তো রোদ্দুরে সব তেতে থাকে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব তখন। ওঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।'

বললুম, 'আপনি ওঁকে কিছু বলতে চান?'

'হ্যাঁ, একটা কথা ওঁকে জানাতে চাই আমি। না-জানানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

'বেশ তো, যাবেন। পাঁচটা নাগাদ আপনার এখানে চলে আসব আমি, তারপরে দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ব।'

চাকলাদারের বাড়ি থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তা। দু-পা এগিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে পীতাম্বর চৌধুরি লেনে ঢুকলুম। দেখলুম, একটা থলে হাতে বিষ্টুচরণ বাজার করতে যাচ্ছে। কাপড়টা নোংরা, হাফ-হাতা শার্টটাও কাঁধের কাছে ছিঁড়ে গেছে। দেখে মায়া হল। ভগ্নীপতির আশ্রয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছিল, এবারে মুশকিলে পড়বে।

॥ ১৬ ॥

বাড়ি ফিরে শুনলুম ভাদুড়ীমশাই ফোন করেছিলেন। একটু বাদে আবার করবেন। ঠিক ন'টায় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'আজ বিকেলে আসছেন তো?'

'তা যাচ্ছি। কৌশিক ফিরেছে?'

'পরশু ফিরতে পারেনি, কালও দুপুরে ফেরা হল না, ফিরেছে কাল রাত্তিরে। অনেক খবর। বিকেলে আসুন, তখন বলব। আজ অফিসে যাচ্ছেন?'

'না, ছুটি নিয়েছি।'

'শরীর খারাপ?'

'না,' হেসে বললুম, 'সদানন্দবাবু আজ জামিন পাচ্ছেন। তাঁকে রিসিভ করতে হবে তো।'

'অর্থাৎ আপনি ধরেই নিয়েছেন যে, তিনি নির্দোষ। তাই না?'

বললুম, 'ভাদুড়ীমশাই, আমার কাছে এটা দোষ-গুণ বিচারের প্রশ্ন নয়, বিপদের সময়ে বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার প্রশ্ন। তা আপনি খুব ভালোই জানেন যে, আই অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই মাই ফ্রেন্ডস।'

'জানি বলেই তো কৌশিককে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু সে-কথা থাক। দুপুরটা যখন হাতে রয়েছে, তখন একটা কাজ করুন দেখি।'

'কী কাজ?'

'বলছি। গত শনিবার সকালে চিৎকারটা শুনেই আপনি ওঁ-বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়েছিলুম।'

'গিয়ে যা দেখেছিলেন...মানে কে কোথায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসেছিল, কে কী বলছিল কিংবা করছিল, ডিটেলসে সব লিখে ফেলুন। মানে ওই যাকে অকুস্থল বলা হয় আর কী, তার একেবারে হুবহু একটা রিপোর্ট আমি চাইছি। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।'

'পারব কি?'

'খুব পারবেন। আপনার মেমরি যে সব কিছুকেই ধরে রাখে, তার পরিচয় আমি আগেও

BanglaBook.org

পেয়েছি। নইলে কি আপনার রিপোর্টটার ওপরেই সবচেয়ে জোর দিতুম?'

'তার মানে? আরও কাউকে-কাউকে এটা লিখতে বলেছেন নাকি?'

'আবও তিনজনকে বলেছি। গঙ্গাধর সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিক। সো কিবণবাবু, ইউ আর ইন গুড কম্পানি। কৌশিক তো ব্রেকফাস্ট করেই খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেছে। ...তা হলে ছেড়ে দিই?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করা হয়নি।'

'কী কথা?'

'বিকেলে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আপনাব ওখানে যেতে চান। নিয়ে যাব?'

'ভদ্রলোকটি কে?'

'ডাক্তার চাকলাদার। বলছেন যে, আপনাকে কিছু জানাতে চান।...পাড়ার ডাক্তারবাবু তো, খবরটা তাই ওঁকেই আগে দিয়েছিলুম।'

'আই সি। উনি তা হলে ঘটনাস্থলে ছিলেন?'

'তা তো ছিলেনই। কৌশিক ওঁকে দেখেওছে ওখানে।'

'আমাকে উনি কী জানাতে চান? ..এনি আইডিয়া?'

'না, মশাই, কিচ্ছু আমার জানা নেই। শুধু বললেন যে, আপনাকে একটা কথা না বলা পর্যন্ত ওঁব শান্তি হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওঁকে নিয়ে আসুন।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রাখা হয়েছে।

কয়েকটা দিন হাজতবাসের ফলেই যে একটা লোকেব চেহারা আর চরিত্র কতটা পাল'ট যেতে পারে, সদানন্দবাবুকে না-দেখলে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত হত। এ কাকে দেবনাবায়ণবাবু জামিনে ছাড়িয়ে আনলেন? বাড়িতে ফিবে এসেছেন। চাবটে নাগাদ এই খবব পেয়ে, বাসন্তীকে নিয়ে পাঁচ নম্বরের দোতলায় উঠে 'কেমন আছেন সদানন্দবাবু' বলে যাঁব সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, আমাদেব চেনা সদানন্দবাবুব সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল ফারাক। শুকনো মুখ, চোখের কোলে কালি, মাথার প্রায় সবটাই সাদা, মুখ নিচু করে যে মানুষটি বসে আছেন, বলতে গেলে তাঁকে আমরা চিনিই না। দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। একই সঙ্গে বুঝতে পারছিলুম যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা মারাত্মক রকমের ঝাঁকুনি খেয়েছে, এটা সামলে উঠতে তাঁব সময় লাগবে। তা ছাড়া, জামিন পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর চলাফেরা স্বাধীন নয়। আপাতত তাঁর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না, তা ছাড়া রোজ একবার থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হবে।

মিনিট পনেবো ওখানে থেকে আমি বেরিয়ে এলুম। আসবার সময় নমস্কার করে বললুম, 'আজ আসি, পরে আসব।' সদানন্দবাবু তাতে প্রতি-নমস্কার তো করলেনই না, একটু হাসলেন না পর্যন্ত। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাসন্তী বসে ছিল তার কুসুমদির পাশে। আমাকে উঠতে দেখে সেও উঠে পড়ল। বলল, 'সন্ধের দিকে আবার আসব কুসুমদি। ও এখন একটু বেরোবে, আমি ওর জামাকাপড় বার করে দিয়ে আসি।'

বাড়িতে ফিরে এসে বাসন্তী বলল, 'উঃ, কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।'

বললুম, 'সে তো আমারও। কিন্তু তবু যেতে হবে। আগে তো তুমি রোজই যেতে, আমি যেতুম না। এখন থেকে আমিও রোজ যাব। কেন যাব, সেটা তুমি বুঝতেই পারছ।'

বাসন্তী বলল, 'সে তো পারছিই। এখন না গেলে কুসুমদি ভুল বুঝবেন। তা ছাড়া, দেখলে

BanglaBook.org

তো এক শম্ভুবাবুর স্ত্রী ছাড়া আর-কেউ ও-বাড়িতে যায়নি।'

বললুম, 'সে তো দেখলুমই। তবে শম্ভুবাবু যাবেন। ভদ্রলোক অফিস থেকে এখনও ফেরেননি। ফিরে একবার যাবেন নিশ্চয়। নাও, এবারে চা করো, চা খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

চা খেয়ে চাকলাদারের কাছে যেতে-যেতে পাঁচটা দশ বাজল। ভদ্রলোক তৈরি হয়েই বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'গ্যারাজ থেকে আমার মরিস-মাইনরটা এইমাত্র মেরামত হয়ে ফিরল। চলুন, ওটাতেই যাওয়া যাক। কেমন সারিয়েছে, সেটা বুঝতে পারা যাবে। চা খেয়ে বেরিয়েছেন তো?'

'তাতেই তো দেরি হয়ে গেল। গ্যাস ফুরিয়েছে, কেরোসিন নেই, তাই কাগজ পুড়িয়ে চা বানাতে হল, মশাই। ডবল সিলিন্ডার করে কী যে লাভ হল, বুঝি না। যা দেখছি, ফের সেই ঘুঁটে কয়লার ব্যবস্থা করতে হবে।'

চাকলাদার হাসলেন। বললেন, 'তা যা বলেছেন, চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

যতীন দাস রোডে মালতীদের বাড়িতে পৌঁছতে-পৌঁছতে সওয়া ছ'টা বাজল। ওপরে উঠে দেখি, বসবার ঘরে আসর একেবারে জমজমাট। গঙ্গাধর সামন্ত এসে গেছেন। বাকি শুধু ডাক্তার গুপ্ত। সামন্ত বললেন, 'তিনিও এসে পড়বেন এবারে। আসবার পথে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, ওঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কার যেন অসুখ, সেখানে রোগী দেখে আর বাড়ি ফিরবেন না, সিধে এখানে চলে আসবেন।'

বলতে-না-বলতেই ডাক্তার গুপ্ত এসে গেলেন। ঘরে ঢুকে হাত থেকে স্টেথোসকোপটা নামিয়ে রেখে একটা সোফায় বসতে-বসতে বললেন, 'খুব দেরি হয়নি তো?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আরে না। তা হলে সামন্তমশাই, শুরু করা যাক, কেমন? নকুলের ব্যাবসার কাগজপত্র যা সিজ করেছেন, সবই নিয়ে এসেছেন তো?'

কৌশিক বলল, 'কাগজপত্র তো বেশি নয়, খান তিনেক জমা-খরচের খাতা, আর কিছু রসিদ। সবই উনি এনেছেন। আমার ঘরে রেখে দিয়েছি। এতক্ষণ তো তারই ওপরে চোখ বুলোচ্ছিলুম। এখানে নিয়ে আসব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখন আনবার দরকার নেই। যখন দরকার হয়, বলব।'

সামন্ত বললেন, 'সবই কিন্তু আজই আমি ফেরত নিয়ে যাব।'

'বেশ তো, নিয়ে যাবেন, একটা কুটোও আমি এখানে আটকে রাখব না। কিন্তু আগের কথাটা আগে হোক। যা-যা আটক করেছেন, তার মধ্যে মার্ডার ওয়েপন বলে কোনটা সাব্যস্ত হল?'

সামন্তমশাই একেবারে নিবে গেলেন। বললেন, 'কোনওটাই না।'

কৌশিক বলল, 'লাঠি দিয়ে যে মাথা ফাটানো হয়নি, সে তো আমি আগেই বুঝেছিলুম।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কী করে বুঝলেন?'

কৌশিক বলল, 'বা রে, লাঠিটার এখানে ওখানে রক্ত লেগেছিল ঠিকই কিন্তু যে-জায়গাটা দিয়ে মারলে মাথা ফাটানো সম্ভব, সেই লোহার বলটার গায়ে এক ছিটেও রক্ত ছিল না। সেটা আমি শনিবার সকালেই লক্ষ করেছিলুম। আমার শুধু ভয় ছিল যে, অসাবধানে নাড়াচাড়া করার ফলে ওই লোহার বলেও না রক্ত লেগে যায়। তা আপনি সাবধানে ওটা হ্যান্ডল করেছেন, তাই রক্তও লাগেনি।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'লাঠিটাকে আমি মার্ডার ওয়েপন বলে সন্দেহ করেছিলুম ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অসাবধান হব কেন? কোনওভাবে যাতে কোনও ট্যাম্পারিং না হয়, সেদিকে আমি কড়া নজর রাখি। দোষীর শাস্তি হোক, এটা আমি চাই নিশ্চয়। কিন্তু আমি সন্দেহ করছি বলেই একটা লোক দোষী আর আমারই ভুলে কিংবা অসাবধানতায় তার ফাঁসি হয়ে যাবে, এটা নিশ্চয়

BanglaBook.org

চাই না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'মারণাস্ত্র হিসেবে ওই লাঠিটা ছাড়া আর কী-কী যেন আটক করা হয়েছিল ও-বাড়ি থেকে?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'তার লিস্টি আমি মিঃ সান্যালকে দিয়েছি। আটক তো করেছিলুম অনেক-কিছুই। ইট, পাথর, নোড়া, হাতুড়ি, বাটখারা, রেঞ্চ, বিস্তর জিনিস।'

'অন্যগুলো কী কাজে লাগে, সে তো বুঝতে পারছি। বাটখারা দিয়ে কী হত?'

'বাটখারা যেমন একতলা থেকে অনেকগুলো পেয়েছি, তেমনি অন্তত একটা পেয়েছি দোতলা থেকেও। একতলায় এত বাটখারা কেন জিগ্যেস করেছিলুম। তা বিষ্টুচরণ বলল, ওগুলো মাছ ওজন করার কাজে লাগে;'

'লাগতেই পারে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'মাছের ব্যাবসা, বাড়িতেই খুচরো-দোকানিদের মাছ বিক্রি করা হত, তা বাটখারা তো লাগবেই। কিন্তু সদানন্দবাবুর তো কোনও ব্যাবসা ছিল না, তাঁর বাটখারা কী কাজে লাগত?'

আমি বললুম, 'সদানন্দবাবু কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি জানি না, তবে কেন যে তিনি বাটখারা রাখতেন, সেটা জানি। আসলে আমরা সকলেই পুরোনো খবরের কাগজ কি অকেজো শিশিবোতল বিক্রি করি তো, তা ওসব যারা কেনে, তাদের বাটখারাকে সদানন্দবাবু বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, "ওরা ডাকাত মশাই, ডাকাত, যেটাকে ওরা এক-কিলোর বাটখারা বলে চালায়, তার ওজন অন্তত বারোশো গ্রাম।" নিজের বাটখারা ছাড়া তিনি তাই ওসব জিনিস বিক্রি করতেন না। আমাকেও একটা বাটখারা কিনতে বলেছিলেন।'

ডাক্তার গুপ্ত হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওরেব্বাবা, এ তো দেখছি ভীষণ হিসেবি লোক, এসব তো আমাদের মাথাতেই আসে না!'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'যাক, যে-সব জিনিস আটক করেছিলেন, তার একটাও তাহলে পরীক্ষায় ওতরায়নি, কেমন?'

গঙ্গাধর বললেন, 'একটাও না। ছাদে যে জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, সেটার মধ্যেও লোক নামিয়েছিলুম। বাড়ির সামনে যে কর্পোরেশনের ডাস্টবিন রয়েছে, সেটাকেও হাঁটকে দেখতে ছাড়িনি। কিন্তু না, কিচ্ছু পাওয়া গেল না। মার্ডার-ওয়েপনটা একটা মিস্ট্রিই রয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'তা তো হল, আপনি যে রিপোর্টটা দিতে বলেছিলেন, সেটা আমি লিখে এনেছি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কৌশিকের রিপোর্টও লেখা হয়ে গেছে। সামন্তমশাই, আপনি?'

'আমিও লিখে ফেলেছি।'

ভাদুড়ীমশাই আমাদের তিনজনের লেখা তিনটে রিপোর্ট নিয়ে সেন্টার-টেবিলে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর ডাক্তার গুপ্তের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনারটাও দিয়ে দিন।'

ডাক্তার গুপ্ত কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'ইয়ে আমারটা এখনও লেখা হয়নি।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আমাদের তিনটেই আপাতত পড়ে দেখুন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখন নয়। রাত্তিরে নিজের ঘরে বসে ধীরেসুস্থে পড়ব। এখন বরং কৌশিকের কথা শুনুন।'

কৌশিক প্রথমে গিয়েছিল কোলাঘাটের মাইল কয়েক পশ্চিমে, রহমতপুর গ্রামে। সেখানকার কাজ শেষ করে সে বাগনানের কাছে বিষ্ণুহাটি গ্রামে যায়।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'হঠাৎ আবার ওসব জায়গায় যাবার দরকার হল কেন?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'নকুলচন্দ্র রহমতপুরের লোক আর বিষ্ণুহাটিতে হল যমুনার বাপের

BanglaBook.org

বাড়ি। সোমবার সকালে মিঃ সান্যাল থানায় এসে আমার কাছ থেকে এই দুটো গাঁয়ের কথা জেনে গিয়েছিলেন।'

কৌশিক বলল, 'একবার ভেবেছিলুম সরাসরি পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকে বিষ্টুচরণকে জিগ্যেস করে জেনে নিই যে, ওরা কে কোথাকার লোক। কলকাতার লোক যে নয়, সে তো ওদের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম। পরে মনে হল, বিষ্টুচরণকে জিগ্যেস করবারই বা দরকার কী, জেরার সময়েই মিস্টার সামন্ত সে-সব জেনে নিয়েছেন নিশ্চয়। তাই আর পাঁচ নম্বর বাড়িতে গেলুম না, একেবারে থানায় চলে গেলুম। তারপর আর কী, থানা থেকে ঠিকানা নিয়ে সেইদিনই বেরিয়ে পড়লুম কলকাতা থেকে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'বেরিয়ে পড়বার দরকার হল কেন, সেটা কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না।'

কৌশিক বলল, 'দরকার হল মামাবাবুর জন্যে। আপনারা তো গত রবিবার এখানে এসেছিলেন। সেদিন রাত্তিরে আপনারা চলে যাবার পরেই মামাবাবু আমাকে জিগ্যেস করেন যে, নকুলচন্দ্র কোথাকার লোক তা আমি জানি কি না। তা আমি বললুম, নকুলের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ তো আমার হয়নি, আমি তার ডেডবডিটাই দেখেছি মাত্র, তবে যমুনা আর বিষ্টুচরণের কথা শুনে মনে হল যে, তারা কলকাতার লোক নয়। তখন মামাবাবু বললেন যে, নকুল যদি বাইরের লোক হয়, তো যেখান থেকে সে কলকাতায় এসেছে, সেখানেও একবার যাওয়া দরকার; সেইসঙ্গে যমুনার বাপের বাড়িতে গিয়েও একটু খোঁজখবর করলে ভালো হয়।'

গঙ্গাধর সামন্ত ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন কথা আপনার মনে হল কেন? খুন তো হয়েছে কলকাতায়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের ঝগড়া, এ তো একেবারে স্ট্রেট কেস।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওপর-ওপর দেখলে সেটাই মনে হয় বটে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে, অত স্ট্রেট কেস এটা না-ও হতে পারে। অর্থাৎ খুনটা কলকাতায় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কারণটাও যে কলকাতাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন কথা তো নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়ীমশাই। তারপর বললেন, 'কজালিটি, অর্থাৎ কার্যকারণের ব্যাপারটা আপনারা সবাই বোঝেন। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু কাজটা যেখানে হল, কারণটাকেও যে সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন তো কোনও কথা নেই। সত্যি বলতে কী, সেইজন্যেই কৌশিককে আমি কলকাতার বাইরে গিয়ে একটু খোঁজখবর করতে বলেছিলুম।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আপনি কি মনে করেন যে, খুনটা কেউ বাইরে থেকে এসে করেছে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আমি কী মনে করি না-করি, এখুনি তা বলছি না। তা সম্ভবও নয়। তবে লক্ষণ যা দেখছি, তাতে মনে হয়, উই আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। কিন্তু সে-কথা থাক। কৌশিক কী বলছে, শুনুন।'

BanglaBook.org

॥ ১৭ ॥

কৌশিক বলল, 'সোমবারে দুপুর ঠিক দেড়টার সময় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। যা গরম, তাতে গাড়ি না-নিয়ে ট্রেনে গেলেই ভালো হত। কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, বিস্তর ঘোরাঘুরি করতে হবে, তাই গাড়িতেই যাই। একটু ঘুরপথে গিয়েছিলুম। পাছে ট্র্যাফিক-জ্যামে আটকে যাই, তাই বি. টি. রোড ধরে, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গা পেরিয়ে, খানিকটা এগিয়ে, বাঁদিকে টার্ন নিয়ে, লিঙ্ক রোড দিয়ে এন. এইচ. সিক্স ধরে এগোই। তাতে বেশ কয়েক মাইল বেশি কভার করতে হল বটে, কিন্তু

ট্র্যাফিক জ্যামে পড়তে হল না বলে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই রহমতপুরে পৌঁছে গেলুম।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'ওইখানেই তো নকুলদের বাড়ি, তাই না?'

কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ। কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোক নিয়ে ছোট্ট গ্রাম। মেচেদা ছাড়িয়ে এন. এইচ. সিক্স ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে ডাইনে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে একটু ভেতরে ঢুকে যেতে হয়। বিশ্বাসদের বাড়িতে যাব বলতে একটা লোক আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। তো সেখানে নকুলের এক ভাই থাকে। বড় ভাই। বয়েস মনে হল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। অবস্থা যে মোটেই সুবিধের নয়, সে তার জামাকাপড় আর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। নিজের থেকেই লোকটা সে-কথা বললও। নাম শুনলুম যুধিষ্ঠির।'

'সুতরাং যা বলল, তা যে মিথ্যে, এমন কথা ভাবা-ই চলে না!' ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অন্য সব ভাই, মানে ভীম অর্জুন আর সহদেব, তারা কোথায় থাকে?'

কৌশিক হেসে বলল, 'কথাটা নেহাত মন্দ বলেননি। নকুলের বাবার সম্ভবত পাঁচ ছেলেরই প্ল্যান ছিল, তবে নকুল অব্দি এগিয়েই তিনি মারা যান, ফলে সহদেব আর জন্মাতেই পারল না। চার ছেলের নাম অবশ্য মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়েই রাখা। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন আর নকুল। ভীম আর অর্জুন কোথায় থাকে, যুধিষ্ঠিরের তা জানা নেই। নকুলের খবরও বছর দশেক রাখে না। আগে-আগে মাঝেমধ্যে দাদাকে পাঁচ-দশ টাকা পাঠাত; বিয়ে করবার পর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে যায়।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'নকুল যে মারা গেছে, এই খবর শুনে কী বলল?'

কৌশিক বলল, 'সেইটেই তো তাজ্জব ব্যাপার। বলল, 'তাই বুঝি? তা হবে।' মানে রি-অ্যাক্টই করল না। অথচ, নকুল তার ছোট ভাই। ভাবা যায়? কী হয়েছিল, তাও পর্যন্ত জিগ্যেস করল না।'

'ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কী, সেখান থেকে চলে এলুম। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, তাই সেদিন আর উজিয়ে আসিনি। উজিয়ে এলে লাভও হত না। রাত করে যদি বিষ্ণুহাটিতে পৌঁছতুম, তো যমুনার বাপের বাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যেত, তবে অসুবিধেয় পড়তুম রাত কাটাবার জায়গা নিয়ে। সেদিন তাই নদীর এ-পারে দাইনানেই রয়ে গেলুম আমি।'

'জায়গা পাওয়া গেল?'

'ওসব নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি।' কৌশিক বলল, 'হাওড়া আর মেদনিপুর, দুটো জেলার দুই এস. পি -কেই মামাবাবু ফোন করে দিয়েছিলেন তো; কোথায়-কোথায় যাব, তাও তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তা রহমতপুরেই দেখলুম, পুলিশের একজন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দাইনান তো রূপনারানের ধারে। সে-ই সেখানে একটা বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল আমাকে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা রাতটা সেখানে কাটিয়ে তারপর মঙ্গলবার ভোরবেলাতেই নদীর এপারে বাগনানে চলে এলে?'

কৌশিক বলল, 'একেবারে ভোরবেলাতেই যে দাইনান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম, তা নয়। দেখলুম, খাওয়াটা দাইনান থেকে চুকিয়ে যাওয়াই ভালো। বাগনানে পৌঁছলুম দেড়টা-দুটো নাগাদ। সেখানে প্রথমেই গেলুম থানায়। থানা-অফিসার বললেন, হাওড়ার এস. পি. তাঁকে সোমবারেই জানিয়ে রেখেছেন যে, আমি বাগনানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। চমৎকার লোক, বললেন যে, দরকার হলে তিনি আমার সঙ্গে একজন লোক দিতে পারেন। বিষ্ণুহাটির পথের ডিরেকশান তো তাঁর কাছেই পেলুম। জিপও দিতে চাইলেন। আমি বললুম, বৃষ্টি তো আর হয়নি, রাস্তা জায়গায়-জায়গায় কাঁচা বটে, তবে কাদা-টাদা যখন নেই, একেবারে শুকনো খটখটে, তখন আর জিপ নেব না। আর তা ছাড়া পুলিশের জিপ নিয়ে গেলে অসুবিধে হতে পারে, ভয় পেয়ে লোকে হয়তো কথাই বলতে চাইবে না। আর, কেউ যদি না কথাই বলে তো খবর পাব কী করে?'

BanglaBook.org

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'খবর পাওয়া গেল?'

কৌশিক বলল, 'তা গেল বইকী। মারাত্মক সব খবর। আসলে রহমতপুরে যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, তাতে আমি একটু দমেই গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম যে, এখানেও ওই একই ব্যাপার হবে। তা কিন্তু হল না। বিষ্ণুহাটিতে গিয়ে পৌঁছবার পর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একটার-পর-একটা খবর পেতে লাগলুম। খবর তো নয়, তাজা এক-একটা বোমা।'

সামন্তমশাই নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, 'তার মানে?'

'বলছি, সব বলছি।' কৌশিক তার পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে বলল, 'বুধবার অর্থাৎ গতকাল সারাটা সকাল নৌপালার বাংলোয় বসে এই রিপোর্ট তৈরি করেছি। যাবতীয় খবর রয়েছে এখানে। সব ডিটেলসে বলব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'রিপোর্টটা আমি কালই পড়েছি। আপনারা আপাতত সংক্ষেপে সব শুনুন। রিপোর্টটা না হয় পরে সময় করে দেখে নেবেন।'

কাগজের তাড়া পকেটে পুরে কৌশিক বলল, 'সেই ভালো। খবরগুলো আপাতত সংক্ষেপে বলছি। আমার প্রথম খবর, বিষ্ণুচরণ আর যমুনার সম্পর্ক মোটেই মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের নয়।'

সামন্ত বললেন, 'সে কী!'

'ওদের বাড়ি একই গ্রামে। যমুনার চেয়ে বিষ্টু বছর চার-পাঁচেকের বড়, তাই দাদা বলত। ওসব মামাতো ভাইটাই স্রেফ বাজে কথা। যমুনার সঙ্গে বিষ্টুর বিয়ের কথাও হয়েছিল, কিন্তু সেটা ভেস্তে যায়।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন?'

কৌশিক বলল, 'সেটাই হচ্ছে দ্বিতীয় খবর। আপনাদের ধারণা বিষ্টুর অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি-বাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসে সে তাই তার ভগ্নীপতির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কথাটা ঠিক নয়?'

'মোটেই ঠিক নয়।' কৌশিক বলল, 'বিষ্টু খুবই ধনী পরিবারের ছেলে। গাঁয়ের লোকেদের কাছে শুনলুম, স্বনামে-বেনামে বিষ্টুর বাবার বিস্তর জমিজমা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে তেজারতি ব্যাবসা। গয়নাগাঁটি বন্ধক রেখে তিনি গাঁয়ের মানুষকে টাকা ধার দেন। সুদের হার অসম্ভব রকমের চড়া, ফলে সুদে-আসলে মিলিয়ে অঙ্কটা যা দাঁড়ায়, তাতে বারো-আনা লোকের পক্ষেই আর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে তাদের গয়নাগাঁটি ফেরত নেওয়া সম্ভব হয় না, বিষ্টুর বাবা কেষ্টচরণের লোহার সিন্দুকে জমতে-জমতে সেগুলো পাহাড় হয়ে যায়।'

সামন্ত বললেন, 'বিষ্টু যে বড়লোকের ছেলে, নকুল তা জানত না? এ তো বড় তাজ্জব কথা। আরে মশাই, নকুল তো ওই গ্রামেরই জামাই। মাঝেমধ্যে শ্বশুরবাড়িতে যেতও নিশ্চয়। তা হলে সে এটা জানবে না কেন?'

'সেইটেই তো মজার ব্যাপার।' কৌশিক বলল, 'আপনি বলছেন, শ্বশুরবাড়িতে মাঝেমধ্যে যেত নকুল। মানে এটাই আপনার বিশ্বাস। তা বিশ্বাসটা যে একেবারে অবাস্তব, তা-ও নয়। কিন্তু গ্রামের লোকরা বলছে, সেই বিয়ের রাত্তিরে নকুল বিষ্ণুহাটিতে গিয়েছিল, তারপরে আর একবারও সে ও-মুখো হয়নি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'বলো কী হে?'

কৌশিক বলল, 'আমি কিছুই বলছি না। গাঁয়ের লোকেদের কাছে যে খবর পেয়েছি, সেটাই আপনাদের শোনাচ্ছি মাত্র।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'নকুল কেন শ্বশুরবাড়ি যেত না, সেসব কথা কিছু জানতে পারলে?'

'জানবার চেষ্টা করেছিলুম। তবে যাকেই জিগ্যেস করেছি, সে-ই বলেছে যে, কেন যেত

BanglaBook.org

না, তা সে জানে না।'

'যমুনার বাপের বাড়ির অবস্থা কেমন?'

'খুব খারাপ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বলে একটা কথা আছে না? প্রায় সেইরকম।'

'বাপ-মা বেঁচে আছে?'

'বিয়ের সময় বেঁচে ছিল, তার কিছুদিন পরেই তারা মারা যায়। থাকবার মধ্যে ভিটের ওপরে একটা ঘর আছে। আর আছে একটা ভাই। তার সঙ্গে দেখা করেছিলুম। কাছেই একটা ইটখোলায় সে মজুর খাটে।'

'সে কিছু বলল?'

'ভগ্নীপতির নাম করতেই খেপে গেল সে। খেপবারই কথা। নকুল যখন শ্রীমানী মার্কেটের কাছে থাকত, বাপ মরবার পর যমুনার এই ভাই তখন নাকি সেখানে একবার গিয়েছিল। গিয়েছিল বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে কিছু টাকা চাইতে। তা ভগ্নীপতি তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নকুল যে শ্বশুরবাড়িতে যেত না কেন, সেটা আন্দাজ করা তা হলে শক্ত হবে কেন? বিয়ের রাত্তিরেই সে বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয় যে, এদের অবস্থা খুবই খারাপ, সুতরাং বেশি মাখামাখি করাটা ঠিক হবে না, ওসব করতে গেলে এরা তার ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। সম্ভবত সেইজন্যেই সে আর ও-মুখো হয়নি।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা তো হতেই পারে।'

কৌশিক বলল, 'কারণ যা-ই হোক, নকুল তার শ্বশুরবাড়িতে সেই বিয়ের দিনের পরে আর একদিনও যায়নি। তবে গাঁয়ের লোকেদের কাছে শুনলুম, নকুল না-গেলেও যমুনা যেত। দু-মাস তিন-মাস অন্তর-অন্তরই যেত। যাওয়া তো খুব শক্ত নয়। হাওড়া থেকে রেলগাড়িতে উঠে বাগনানে নেমে পড়লেই হল। ওখান থেকে বিষ্টুহাটিতে বাসেও যাওয়া যায়, আবার সাইকেল-রিকশাও তো সব-সময়েই চলছে। বাপের বাড়িতে যেতে যমুনার তাই কোনও অসুবিধে ছিল না। যেত, বিষ্টুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হত। গাঁয়ে এই নিয়ে কানাঘুষো হত না, এমনও নয়। যাই হোক, যমুনাও নাকি ইদানীং আর বাপের বাড়ি যেত না। অন্তত গত তিন বছরের মধ্যে যায়নি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বিষ্ণুচরণও তো গত তিন বছর ধরেই নকুলদের সঙ্গে রয়েছে, তাই না?'

সামন্ত তাঁর নোটবইয়ের পাতা চটপট উলটে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তিন বছর।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দ্যাট এক্সপ্লেনস!'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'একটা কথার উত্তর কিন্তু এখনও পাইনি, বাবা। বিষ্টুচরণের সঙ্গে যমুনার তো বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, ভেস্তে গেল কেন?'

'ভেস্তে গেল বিষ্টুর বাবার আপত্তিতে।'

'কী যেন নাম বললেন লোকটার? কেষ্টচরণ, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' কৌশিক বলল, 'এ হল কেষ্টবিষ্টুর ব্যাপার। বিষ্টুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যমুনার বাবা গিয়েছিলেন কেষ্টচরণের কাছে। কেষ্ট তো শুনেই বোমার মতো ফেটে পড়লেন। একে তো যমুনার বাপ বংশে ছোট, তার ওপরে আবার তাঁর আর্থিক অবস্থাও যাচ্ছেতাই, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, কেষ্টচরণ নাকি তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন, ওই শুধু ঘাড়ধাক্কাটা দিতেই যা বাকি রেখেছিলেন। তিনি বিশাল বড়লোক, অমন হা-ঘরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবেন কেন? কাছাকাছি আর-এক গ্রামের এক ব্যবসায়ীর গলায় গামছা দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরপণ আর পঁচাশি ভরি গয়না নিয়ে তাঁর মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ করে এনে ঘরে তুললেন।'

'তারপর?'

'তারপরে ঘটল এক ভয়ংকর ঘটনা। বিয়ের মাস ছয়েক বাদে এক সকালবেলায় দেখা গেল,

BanglaBook.org

বিষ্টুদের বাড়ির ঠাকুরদালানের উঠোনে সেই নতুন বউয়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে রয়েছে, ওদিকে ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে...।'

'বিগ্রহটি উধাও নিশ্চয়?' ডাক্তার গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

কৌশিক হাসল। বলল, 'বিগ্রহ তো এক্ষেত্রে একটি শালগ্রাম শিলা। কিছুকাল ধরেই মন্দিরে-মন্দিরে চোরের উৎপাত খুব চলছে বটে, যেমন বিগ্রহ তেমনি আনুষঙ্গিক অন্য নানা জিনিসও নেহাত কম উধাও হচ্ছে না, তবে কিনা এসব জিনিস চুরি হচ্ছে মূলত তার আর্ট-ভ্যালুর জন্যে, বিদেশে যার প্রচণ্ড বাজার-দর। কিন্তু শালগ্রাম-শিলার তো কোনও আর্ট-ভ্যালু নেই, অথচ আপনি ঠিকই ধরেছেন, সেই শিলাটিই এক্ষেত্রে হাপিস হয়ে গেল। তাজ্জব ব্যাপার, তাতে আর সন্দেহ কী। চোর যে কেন শালগ্রাম শিলা চুরি করতে গেল, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'পুলিশ কেস হয়েছিল?'

কৌশিক বলল, 'তা হয়েছিল বইকী। তবে, তখন যিনি থানা-অফিসার ছিলেন, তিনি বললেন, এও আসলে চুরির ব্যাপার। বিগ্রহ চুরি করবার জন্যে চোর এসে মন্দিরে ঢুকেছিল, আর শেষ-রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে নতুন বউ গিয়েছিল পুজোর ফুল তুলতে। বাস, হঠাৎ সে চোরের সামনে পড়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। তার মাথা না ফাটিয়ে চোরের কোনও উপায় ছিল না।'

'চুরি করবার মতো আর-কিছু ছিল সেখানে?'

'ছিল বইকী।' কৌশিক বলল, 'পঞ্চপ্রদীপটাই তো ছিল। তার প্রদীপের অংশটা পিতলের বটে, কিন্তু পিলসুজের অংশটা সোনার পাতে বাঁধানো। ছিল রুপোর বিস্তর বাসনও। চোর সে-সব ছুঁয়েও দেখেনি, বউটাকে মেরে স্রেফ শালগ্রাম শিলা নিয়ে সে পালিয়েছে।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপারে তোকে কী জানিয়েছে, সেটাও তা হলে এঁদের বল।'

কৌশিক বলল, 'গ্রামের লোকেরা বলে, বউকে মেরেছে বিষ্টুচরণই। বউটা বড়লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু যেমন মোটা, তেমনি কালো, তাই মাথা ফাটিয়ে বিষ্টুই তাকে মেরেছে। ব্যাপারটা অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। তার কারণ, কেষ্টচরণ একে বড়লোক, তায় পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি। তা ছাড়া কাকে কীভাবে তুষ্ট করতে হয়, তাও তিনি বেশ ভালোই জানেন। ফলে গোটা ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে গেল।'

সামন্ত বললেন, 'বউয়ের মাথা কী দিয়ে ফাটানো হয়েছিল?'

'তা কেউ জানে না। পুলিশও না।' কৌশিক বলল, 'যেমন পীতাম্বর চৌধুরি লেনের ঘটনায়, তেমনি হাওড়ার গ্রামের এই ঘটনাতেও মার্ডার-ওয়েপনের কোনও হদিশ নাকি মেলেনি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কেষ্টচরণের মন্দিরে নিশ্চয় নতুন শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?'

'তা তো হয়েছেই।'

'বাড়িতে ইঁদারা আছে?'

'নেই।'

'পুকুর আছে?'

'তা আছে।' কৌশিক বলল, 'পুকুর বললে কমই বলা হয়। বিরাট দিঘি।'

ভাদুড়ীমশাই আমার দিকে তাকালেন। হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'মুকুন্দপুরে মনসামূর্তির কথা মনে পড়ছে?'

'তা পড়ছে বইকী।' আমি বললুম, 'সেখানে তো মূর্তি দিয়েই মাথা ফাটানো হয়েছিল।'

'এখানেও সম্ভবত শালগ্রাম-শিলা দিয়েই মাথা ফাটানো হয়েছে।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দিঘিতে জাল ফেলে ভালোভাবে তল্লাশ চালালেই মনে হয় মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে পাওয়া যেত।'

BanglaBook.org

॥ ১৮ ॥

সবাই একেবারে চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। প্রথম কিস্তির চা আর জলখাবার অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় কিস্তির চা নিয়ে মালতীদের কাজের লোকটি এসে ঘরে ঢুকল। হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে তাঁর চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন গঙ্গাধর সামন্ত। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'গোটা ব্যাপারটাই দেখছি অন্য-দিকে ঘুরে যাচ্ছে।'

কৌশিক বলল, 'মজাটা কী জানেন? বিষ্টুচরণের বাবার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলুম। নিজের পরিচয় অবশ্য দিইনি। বলেছিলুম যে, কলকাতায় তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার খুব চেনাশোনা, মাঝে-মাঝেই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তাতে বিষ্টুচরণের বাবা যা বললেন, তাতে তো আমি অবাক। ভদ্রলোক আমাকে জিগ্যেস করলেন যে, বিষ্টু যেখানে থাকে, সেই হোটেলে তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো নয়, সে কি এর মধ্যে নতুন কোনও হোটেলের সন্ধান পেয়েছে?'

সামন্ত বললেন, 'তার মানে? বিষ্টু যে গত তিন বছর ধরে নকুলের বাড়িতে রয়েছে, তার বাবা তা জানেই না?'

কৌশিক বলল, 'জানেন না বলেই তো মনে হল। ভদ্রলোকের ধারণা, বিষ্টু হোটেলে থাকে। কথায়-কথায় হোটেলটার নামও বললেন তিনি। মির্জাপুর এলাকার হোটেল। নাম 'শান্তিধাম'। বিষ্টুর নামে ফি মাসে তিনি ওই হোটেলের ঠিকানাতেই টাকা পাঠান। চিঠিও লেখেন ওই ঠিকানাতেই।'

সামন্ত বললেন, 'এখান থেকে একটা ফোন করতে পারি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বিলক্ষণ। কিন্তু তার দরকার হবে না। থানায় ফোন করে হোটেলে খোঁজ নিতে বলবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আজ সকালেই কৌশিক ওখানে গিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার বললেন, বিষ্টু ওখানে থাকে না, তবে হোটেলের ঘরটাও সে ছাড়েনি। প্রতি সোমবারে একবার করে সে হোটেলটায় যায়। চিঠিপত্র থাকলে নিয়ে আসে।'

'কিন্তু টাকা?' সামন্ত বললেন, 'বাবার কাছ থেকে তো নিয়মিত তার নামে টাকা আসে, হোটেলে তার হয়ে সে-টাকা রিসিভ করে কে?'

'সে-খবরও কি আর নেওয়া হয়নি ভাবছেন? টাকা রিসিভ করেন হোটেলের ম্যানেজার। তাঁকে 'লেটার অভ অথরিটি' দেওয়াই আছে। না, সামন্তমশাই, হোটেলে লোক পাঠাবার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, থানায় একটা ফোন বোধহয় করাই ভালো। জানিয়ে দিন যে, পীতাম্বর চৌধুরি লেনে যে-লোকটাকে আপনি পাহারায় রেখেছেন, এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে তাকে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার।'

'কী বলে দিতে হবে?'

'বলতে হবে যে, বিষ্টুকে সে যেন বাড়ি থেকে আপাতত বেরুতে না দেয়। কথাটা বলছি কেন জানেন? সাধারণত সোমবার-সোমবারে বিষ্টু ওই হোটেলটায় যায় বটে, কিন্তু বলা তো যায় না, হঠাৎ যদি সে আজ একবার যায় ওখানে, আর গিয়ে শোনে যে, তার সম্পর্কে ওখানে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে, তাহলে সে যে ভয় পেয়ে গা-ঢাকা দেবে না, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। নাঃ, কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

সামন্তমশাই উঠে গিয়ে ফোন করে ফের ফিরে এলেন। তারপর ধপাস করে তাঁর সোফাটায় বসে পড়ে বললেন, 'ওরেব্বাবা, এ তো দেখছি ভয়ংকর ব্যাপার! কেস তো একেবারেই ঘুরে গেল! আর আমি কিনা ভাবছি সদানন্দ বসুই কালপ্রিট, আর একটু চাপ দিলেই তাঁর কাছ থেকে কনফেশনটা আদায় করে নেওয়া যেত।'

BanglaBook.org

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আর একটু চাপ মানে? খানিকটা চাপ কি অলরেডি দিয়েছেন নাকি? পুরো পাঁচদিন তো ভদ্রলোককে একেবারে মুঠোর মধ্যে আপনি পেয়েছিলেন। কনফেশন আদায় করবার জন্যে থার্ড ডিগ্রির ব্যবস্থা করেননি তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'আরে না-না, আপনারা কি আমাদের অমানুষ ভাবেন নাকি? মারধরের কথা ভাবছেন নিশ্চয়? ওসব কিছু হয়নি। ওই আমাদের কনস্টেবল রামশরণ পাণ্ডেকে দিয়ে দু-চারটে চড়-থাপ্পড় মারাবার ব্যবস্থা করেছিলুম মাত্র, তাকে নিশ্চয়ই মারধর বলবেন না আপনারা? ওটুকু তো করতেই হয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ছি-ছি, মানী লোক, বয়েসও হয়েছে সত্তর বছর, তাঁকে চড়-থাপ্পড় লাগাবার ব্যবস্থা করলেন? ছি-ছি, মিস্টার সামন্ত কাজটা মোটেই ভালো করেননি।'

সামন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'তা নিশ্চয় করিনি। কিন্তু কী করব বলুন, আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম যে, এটা একেবারে 'ওপন অ্যান্ড শাট' কেস।'

কৌশিকের সবই ভালো, কিন্তু একটু মুখফোঁড়। গঙ্গাধর সামন্তের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে সে বলল, 'আজকাল খুব অ্যামেরিকান ক্রাইম-স্টোরি পড়ছেন বুঝি?'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কেন, কেন, একথা বলছেন কেন?'

কৌশিক বলল, 'না মানে মার্কিন গোয়েন্দা-গল্পে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিরা প্রায়ই ওরকম ধরে নেয় কিনা, তাই বলছি। তবে শেষপর্যন্ত অবশ্য দেখা যায় যে, তারা সাপ ধরতে গিয়ে ব্যাং ধরেছিল।'

সামন্ত বললেন, 'ঠাট্টা করছেন? করুন। ভুল যখন একটা হয়েই গেছে, তখন এই ধরনের কথা তো কিছু শুনতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ভুল সকলেরই হতে পারে। আমিও বিস্তর ব্যাপারে বিস্তর ভুল করেছি। ভুল এক্ষেত্রে কৌশিকেরও হতে পারত। বিষ্ণুহাটিতে গেলেই যে নির্ভুল নিশানা মিলবে, ও-ই কি সেটা জানত নাকি? সত্যটা যে কী, সেটা তো আর ও হিসেব কষে বার করেনি, ভাগ্য ওকে সাহায্য করেছে, হি জাস্ট স্টাম্বলড অন ইট।'

বুঝতে পারলুম যে, সামন্তকে একটা মারাত্মক লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই ভাদুড়ীমশাই একথা বলছেন। নয়তো আমি ভালোই জানি যে, ভাদুড়ীমশাইয়েব প্রতিটি পদক্ষেপ একেবারে হিসেব কষে করা। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদানন্দবাবু খুনি নন, তাহলে বাকি থাকে যমুনা আর বিষ্টুচরণ। খুন করবার সুযোগ ছিল তাদেরও। শুধু খুনের কোনও মোটিভ তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল না। সেই মোটিভের সন্ধানেই কৌশিককে তিনি রহমতপুরে আর বিষ্টুহাটিতে পাঠিয়েছিলেন।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সামন্তকে বললেন, 'কোন কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না বলুন তো। দেখি বুঝিয়ে দিতে পারি কি না। পারব যে, এমন কথা বলছি না কিন্তু। তবে চেষ্টা করতে পারি।'

সামন্ত বললেন, 'বিষ্টুচরণের সঙ্গে যমুনার বিয়ের কথা হয়েছিল, তা অন্তত দশ বছর আগে। অর্থাৎ এটা অনেক দিনের পুরোনো ব্যাপার। অথচ কার্যত দেখছি, সেই পুরোনো ব্যাপারের জের দশ বছর বাদেও মেটেনি। সত্যি কি এমন হতে পারে নাকি? হওয়া সম্ভব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে কী জানেন, ব্যাপারটা পুরোনো হলেও প্রেমটা পুরোনো নয়। আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছিলই। জ্বলত না, যদি যমুনা মাঝে-মাঝেই বাপের বাড়িতে না যেত। কিন্তু সে যেত, আর গাঁয়ের লোকেরা যদি না মিথ্যে কথা বলে থাকে, তবে বিষ্টুচরণের সঙ্গে তখন দেখা-সাক্ষাৎ হত তার। অর্থাৎ প্রেমের আগুনটা একেবারে নিবে যাবার সুযোগই ইতিমধ্যে পায়নি। আর তারপরে তো বিষ্টুচরণ কলকাতাতেই চলে এল। কিছুদিন একটা হোটেলে কাটিয়ে তারপর উঠলও গিয়ে নকুলের বাড়িতে। ফলে এতদিন যা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, সেই আগুন একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।'

BanglaBook.org

সামন্তমশাই বললেন, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু নিজের শালাটিকে তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল নকুল। তা হলে যমুনা যাকে মামাতো ভাই বলছে, সেই মামাতো শালাটিকে সে তার ঘাড়ে চেপে বসতে দিল কেন? তাকেও তো নকুল ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াতে পারত। বলুন, পারত না?'

'তা পারত বইকী।' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিন্তু তাড়ায়নি কেন, তাও তো আপনার না বোঝবার কথা নয়। নকুলের জমাখরচের যাবতীয় খাতা তো আপনি সিজ করেছেন; আমি দেখতে চেয়েছিলুম বলে কৌশিকের হাত দিয়ে সেগুলো পাঠিয়েও দিয়েছেন আমার কাছে। তা আপনি নিজে কি সেগুলি একবারও পড়ে দেখেননি?'

সামন্ত বললেন, 'নিশ্চয় পড়েছি। কেন, ওর মধ্যে কিছু আছে নাকি?'

'আছেই তো। গত তিন বছর ধরে প্রত্যেক মাসের একেবারে পয়লা তারিখেই দেখবেন জমার ঘরে লেখা রয়েছে বি—৫০০.০০ টাকা। ওটার অর্থ বোধহয় আপনি বুঝতে পারেননি। বি মানে বিষ্টুচরণ। প্রতি মাসে সে তার খাইখরচা বাবদ নকুলের হাতে পাঁচশো টাকা তুলে দিত। থাকত মাছের আড়তের এক কোণে, খেতও এমন-কিছু হাতি ঘোড়া নয়, অথচ তারই জন্যে মাসে-মাসে লোকটা পাঁচশো টাকা দিয়ে যাচ্ছে। এমন হাতের লক্ষ্মীকে কেউ পায়ে ঠেলতে পারে? নকুলও পারেনি। তবে আমার ধারণা, টাকার লোভে বিষ্টুচরণকে সে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল বটে, তবে শেষের দিকে হয়তো একটু-একটু সন্দেহ করতেও শুরু করেছিল। চেঁচামেচির সেটাই সম্ভবত মস্ত কারণ।'

ভাদুড়ীমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সিগারেটটা নিবে গিয়েছিল। অ্যাশট্রেতে পিষে দিলেন সেটাকে। তারপর বললেন, 'আমার ধারণা, মাঝরাত্তিরে মত্তাবস্থায় বাড়িতে ফিরে চেঁচামেচি করবার সময়ে যমুনা আর বিষ্টুচরণের সম্পর্ক নিয়ে ইদানীং এমন দু-একটা কথাও সে হয়তো বলতে শুরু করেছিল, যাতে ওরা ভয় পেয়ে যায়। হয়তো তখন থেকেই ওরা নকুলকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান আঁটতে থাকে। সদানন্দ যে নকুলকে তাড়াতে চাইছিলেন, জল আর লাইট কেটে দিয়েছিলেন, তাতে আরও সুবিধে হয়ে যায় ওদের। ওরা বুঝতে পারে, নকুল যদি খুন হয়, তা হলে সন্দেহটা সরাসরি সদানন্দবাবুর ওপরে গিয়ে পড়বে। সামন্তমশাই, ওরা যে ভুল বুঝেছিল, অন্তত আপনি তো সে-কথা বলতে পারেন না। আপনি যে সদানন্দ বসুকেই খুনি বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাতে তো আর সন্দেহ নেই।...না-না, আমি আবার বলছি যে, আপনি অত লজ্জিত হবেন না। এ-ভুল আমারও হতে পারত। কেন হয়নি জানেন?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কেন?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আমার যে ভুল হয়নি, তার মস্ত কারণ, সদানন্দ বসুর পক্ষে লাঠি দিয়ে যে একটা লোকের মাথা ফাটানো সম্ভব নয়, সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম।'

'লোহারবল বসানো লাঠি দিয়েও না?'

'না, তাও নয়। জানি, আপনারা কী বলবেন। আপনারা বলবেন যে, বয়েস সত্তর হলেও সদানন্দ বসুর স্বাস্থ্য টসকায়নি। কিন্তু তাঁর চোখের কথাটা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন? কিরণবাবুর কাছেই শুনেছি যে, মাত্র কিছুকাল আগে ছানি কাটিয়েছেন সদানন্দবাবু, কিন্তু আগের মতো দৃষ্টিশক্তি এখনও ফিরে পাননি। এখন আপনারাই বলুন, যাঁর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভালো নয়, আর স্বাস্থ্য মোটামুটি পোক্ত হলেও বয়েস অন্তত সত্তর, সেই মানুষের পক্ষে কি মাত্রই এক-হাতে লাঠি চালিয়ে কারও মাথা ফাটানো সম্ভব?'

সামন্ত বললেন, 'দু-হাতে চালাতে বাধা কোথায়?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বাধা থাকত না, যদি কিনা তাঁর দুটোর বদলে তিনটে হাত থাকত। কিন্তু মুশকিল এই যে, যেমন আমাদের, তেমনি সদানন্দবাবুরও হাত মাত্র দুটি। তার মধ্যে একটা হাতে যদি টর্চ ধরে থাকতে হয়, তো লাঠি চালাবার জন্যে দুটো হাতের সাহায্য তিনি পাবেন কী করে?'

BanglaBook.org

'সিঁড়ির আলো জ্বেলে রাখলে কিন্তু টর্চ জ্বালবার দরকার হয় না।'

'কিন্তু যাকে খুন করা হবে, তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসবার আগেই নকুল যদি দেখে যে, সিঁড়ির উপরকার ইলেকট্রিক আলোয় সব একেবারে ঝলমল করছে, তা হলে দরজা থেকেই সে সিঁড়ির দিকে তাকাবে নিশ্চয়, আর তখনই সদানন্দবাবুকে দেখতেও পেয়ে যাবে। তখন আর তার মাথা ফাটানো অত সহজ হবে না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'কিন্তু এমন যদি হয় যে, সদানন্দের স্ত্রীও এর সঙ্গে জড়িত?'

ভাদুড়ীমশাই হেসে বললেন, 'অর্থাৎ কিনা অন্ধকারে যেই নকুলচন্দ্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কুসুমবালাও অমনি দোতলা থেকে সুইচ টিপে সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়েছেন, আর সদানন্দ অমনি দু-হাতে চালিয়েছেন লাঠি? না মশাই, ইউ আর স্ট্রেচিং ইয়োর ইমাজিনেশান টু মাচ। একে তো কুসুমবালা বাতের রুগি, ভালো করে নড়াচড়াই নাকি করতে পারেন না, তার ওপরে আবার তাঁরও বয়স অন্তত পঁয়ষট্টি। দুই অ্যামেচার বুড়োবুড়ি মিলে এইভাবে গোটা ব্যাপারটাকে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সিনক্রোনাইজ করে একজনকে খুন করেছে, একথা ভাবা-ই চলে না।'

সামন্ত বললেন, অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, বিষ্টুচরণই খুনি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তার পক্ষেও একাজ করা সম্ভব হয় না, যদি না সে যমুনার সাহায্য পায়। তা, খবর যা মোটামুটি জোগাড় হয়েছে, তাতে তো মনে হয়, যমুনা তাকে সাহায্য করতেই পারে।'

সামন্ত বললেন, 'ঠিক আছে আজই ওদের দুজনকে অ্যারেস্ট করে হাজতে ঢোকাবার ব্যবস্থা করছি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ওকাজ এখুনি করবেন না। আগে মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করা চাই। আপাতত ওদের কড়া পাহারায় রাখুন, গ্রেফতার করবার দরকার নেই। তা ছাড়া, নকুলের যে একটা দু-বছরের মেয়ে রয়েছে, তার কথাটাও ভাবুন। বিষ্টু আর যমুনাকে যদি হাজতে ঢোকান, তো ওই দুধের বাচ্চাটাকেও যে মায়ের কাছছাড়া করা যাবে না, সেটা কি ভেবে দেখেছেন?'

একজন এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি। এককোণে বসে চুপচাপ অন্যদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি ডাক্তার চাকলাদার। এইবারে তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'মিস্টার ভাদুড়ীকে একটা কথা বলব বলেই আজ আমি এখানে এসেছি। ভেবেছিলুম, কথাটা একমাত্র উনিই জানবেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনারা জানলেও ক্ষতি নেই। শুধু দয়া করে বলুন, কথাটা আপনারা আর-কাউকে জানাবেন না।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'যদি বুঝি যে, কথাটা আর-কাউকে জানাবার দরকার নেই, তাহলে নাহক কেন জানাতে যাব? কী বলবেন, বলে ফেলুন মশাই।'

ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'একটু আগে কমলির কথা হচ্ছিল। আপনাদের ধারণা, ও নকুলের মেয়ে। সেটা ভুল ধারণা।'

গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। যমুনা ও-মেয়ের মা হতে পারে, কিন্তু নকুল বিশ্বাস ওর বাপ নয়।'

BanglaBook.org

॥ ১৯ ॥

গোটা ঘর একেবারে নির্বাক। গঙ্গাধর সামন্তের নোটবইটা তাঁর হাত থেকে খসে মেঝের ওপরে পড়ে গিয়েছিল। তবু যে তার শব্দ আমরা শুনতে পাইনি, তার কারণ আর কিছুই নয়, ডাক্তার অরুণপ্রকাশ সান্যালের এই ড্রয়িং রুমের গোটা মেঝেটাই পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। নইলে নিশ্চয়

একটা পিন পড়লেও তার শব্দ তখন শোনা যেত।

ডাক্তার চাকলাদারের কথায় যে ধাক্কা লেগেছিল, সেটাকে সামলে নিয়ে ভাদুড়ীমশাই-ই প্রথম তাঁর মুখ খুললেন। বললেন, 'নকুল নয়? তা হলে কে ওর বাপ?'

'সম্ভবত বিষ্ণুচরণ।'

সামন্ত বললেন, 'প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো কমলির মুখের ওপরেই লেখা রয়েছে।' ডাক্তার চাকলাদার বললেন, 'মেয়ের মুখের সঙ্গে বাপের মুখের এমন আশ্চর্য মিল বড়-একটা চোখে পড়ে না। শনিবার সকালে যখন পাঁচ নম্বর বাড়িতে যাই, মিলটা তখনই আমার চোখে পড়ে। মানে যমুনা যখন তার মেয়েকে কোলে করে আপনার পায়ের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। বিষ্টুচরণও তো সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। বিষ্টুর মুখের সঙ্গে কমলির মুখের মিলটা তবু আপনাদের চোখে পড়ল না? আশ্চর্য!

সামন্ত বললেন, 'ব্যাভিচার যে একটা মোটিভ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুখের মিলকে তো আর ব্যাভিচারের প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা যাবে না। আসামি পক্ষের উকিল বলবে, অমন একটু-আধটু মিল অনেকের সঙ্গেই অনেকের থাকতে পারে। ওসব মিল-টিলের কথা ছাড়ুন। নকুল যে কমলির বাপ নয়, তার এমন কোনও প্রমাণ কোথায়, আদালতে যা পেশ করলে আমাদের বোকা বনতে হবে না?'

ডাক্তার চাকলাদারকে দেখে মনে হল, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বললেন, 'ঠিক আছে, দরকার যদি হয় তো তেমন প্রমাণই আমি দেব। তাও আমার কাছে রয়েছে।'

সামন্তর ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তাহলে সেটা প্রথম দিনই আমাদের দেননি কেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিলেন চাকলাদার। সামন্তর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাক্তার সুরেশ গুপ্তের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'কেন যে কিছু-কিছু কথা আমরা গোপন রাখি, একজন পুলিশ-অফিসারের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত, পুলিশের ডাক্তার হলেও আপনি ডাক্তার তো বটে, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, অনেক কথা জেনেও আমরা মুখ খুলতে পারি না, অন্য-কাউকে তার সামান্যতম আভাস দিতেও আমাদের এথিকসে বাধে। তা ছাড়া, এটা বিশ্বাসরক্ষার ব্যাপার। ..রোগী তার ডাক্তারকে বিশ্বাস করে...তাঁকে সে এমন অনেক কথা জানায়, যা হয়তো তার অতি আপনজনকেও সে জানায় না...মানে জানাতে তার সংকোচ হয়...কী হয় না?'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'হয় বইকী।'

'অথচ ডাক্তারের কাছে তার কোনও সংকোচ নেই। কেন নেই? না সে ধরেই নিয়েছে যে, ডাক্তারকে সে যা বলছে, আর-কেউ তা ঘুণাক্ষরেও কখনও জানবে না। আমরাও জানি যে, রোগী যা বলছে, তা আমাদের বিশ্বাস করে বলেই বলছে। অন্য কাউকে সেটা জানাবার কোনও প্রশ্নই নেই। জানালে সেটা ব্রিচ অভ ট্রাস্ট হয়ে দাঁড়ায়। কী, আমি ভুল বলছি?'

ডাক্তার গুপ্ত চুপ করে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চাকলাদার বললেন, 'কী হল, কিছু বলছেন না কেন? যা ঠিক কিছু বলুন।'

'কী আর বলব, বলবার তো কিছু নেই।' ডাক্তার গুপ্ত মাথা নাড়লেন, 'ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। রোগী আপনাকে বিশ্বাস করে যা বলছে, তা কারও কাছে ফাঁস করবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইট উইল বি হাইলি আনএথিকাল।...না-না, ওসব কথা কাউকে জানাতে আপনি বাধ্য নন।'

চাকলাদার বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর গুপ্ত। কিন্তু আমার সমস্যা তাতেই মিটছে না। আমি পড়েছি উভয়-সংকটে। আমি যা জানি...মানে আমার পেশেন্ট আমাকে যা বলেছে, আর তাকে পরীক্ষা করে যা আমি জানতে পেরেছি, তা বলাও অন্যায়, আবার না-বলাও অন্যায়। হয়তো না-বলার অন্যায়টাই আরও মারাত্মক।'

BanglaBook.org

সামন্ত বললেন, 'বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর চাকলাদার। একটু ঝেড়ে কাসুন দেখি।'

সামন্তর কথাটাকে গ্রাহ্যও করলেন না চাকলাদার। তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। ভাব দেখে মনে হল যেন তাঁর কথাটা তিনি শুনতেও পাননি। ডাক্তার গুপ্তের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'আর সেইজন্যেই এখন আমার মনে হচ্ছে যে, কমলিকে কোলে নিয়ে যমুনা যখন তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, আর তারপর যখন আমি শুনলুম যে, ও নকুলের মেয়ে, তখনই সব কথা আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা যদি জানাতুম, মিস্টার সামন্তর সন্দেহটা তা হলে নিশ্চয় তখনই অন্য দিকে ঘুরে যেত; আর কিছু না-হোক, তিনি বুঝতে পারতেন যে, নকুলকে খুন করবার মোটিভ একমাত্র সদানন্দবাবুরই নয়, অন্যদেরও থাকা সম্ভব। আর তা যদি তিনি বুঝতেন, তা হলে নিশ্চয় তড়িঘড়ি একজন বুড়োমানুষকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কনফেশান আদায় করবার জন্যে তাঁকে চড়চাপড় লাগাবার ব্যবস্থা করতেন না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন চাকলাদার। তারপর বললেন, 'কথাটা আমার তখনই বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বলিনি। কেন বলিনি? না পেশেন্টের রোগের ব্যাপারে যাবতীয় গোপনীয়তা আমাদের রক্ষা করতে হয়, ডাক্তারি পেশার সেটা একটা মস্ত শর্ত। সেই শর্তটাকেই আমি মান্য করে চলছিলুম। কিন্তু, ডাক্তার গুপ্ত, আমাকে মার্জনা করুন, কোনও শর্তই এখন আর আমি মান্য করতে পারছি না। আর তা ছাড়া, রোগটা যার, সে তো মারাই গেছে, এখন যদি তার একটা শারীরিক ত্রুটির কথা আমি প্রকাশ করি, তবে অন্তত তার তাতে কোনও ক্ষতি হবারও আশঙ্কা নেই।'

কৌশিক বলল, 'কীসের ক্ষতি?'

চাকলাদার বললেন, 'লোকের কাছে উপহাসের, ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হওয়াটাই কি একটা মস্ত বড় ক্ষতির ব্যাপার নয়? সত্যি বলতে কী, অনেকটা সেই কারণেও এসব ত্রুটির কথা অনেকে গোপন করে রাখে, রাখতে বাধ্য হয়।'

সামন্ত আবার বললেন, 'বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে, বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে। ওসব আগড়ম-বাগড়ম বাদ দিয়ে এবারে কাজের কথায় আসুন তো। নকুল যে কমলির বাপ নয়, তার প্রমাণ কী?'

এক নিশ্বাসে বিস্তর কথা বলে ফেলে বোধহয় চাকলাদার একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আকস্মিক উত্তেজনাও বোধহয় তাঁর ক্লান্ত বোধ করবার একটা মস্ত কারণ। এতক্ষণে তিনি সামন্তর দিকে চোখ ফেরালেন। স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েই রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রতিটি শব্দকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'শুধু কমলি কেন, কারও বাপ হওয়াই নকুল বিশ্বাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

সামন্ত বললেন, 'আমি প্রমাণের কথা বলছিলুম। আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?'

ভাদুড়ীমশাই এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবারে বললেন, 'তা যে উনি দিতে পারেন, সে তো আগেই বলেছেন।'

কৌশিক বলল, 'আপনার দেখছি অনেক কথাই মনে থাকে না, মিস্টার সামন্ত। রোজ ব্রাহ্মীশাক খেতে শুরু করুন; শুনেছি ওতে মেমারি খুব বেড়ে যায়।'

ভাদুড়ীমশাই তাঁর ভাগনেকে একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ, এসব কী হচ্ছে কৌশিক? ছেলেমানুষি কোরো না।'

গঙ্গাধর সামন্তও পালটা কিছু একটা বলবেন বলে কৌশিকের দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ভাদুড়ীমশাই নিজেই যেহেতু ভাগ্নেকে ধমকে দিয়েছেন, তাই তিনি আর কৌশিককে কিছু বললেন না, চাকলাদারের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'মুখের কথায় তো চিঁড়ে ভিজবে না ডক্টর চাকলাদার, আমাকে কেস সাজিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরের হাতে তুলে দিতে হবে, আমি প্রমাণ চাই।'

BanglaBook.org

চাকলাদার বললেন, 'প্রমাণ দিতে না-পারলে কি আর এসব কথা কেউ বলে? তা হলে শুনুন মিস্টার সামন্ত, নকুল তার শরীরের ব্যাপারে যা-কিছু পরীক্ষা করাবার, তা আমাকে দিয়েই করিয়েছিল। তার যে বাপ হবার ক্ষমতা নেই, সেই রিপোর্ট তাকে আমি দিয়েওছিলাম। রিপোর্টের ওরিজিন্যাল তার কাছে ছিল, আর কপিটা আমার ফাইলে। ওরিজিন্যালটা আপনারা নকুলের বাড়িতে খুঁজে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, সেখানে সেটা পাবেন না। আপনাদের কথাবার্তা যা শুনলুম, তাতে তো মনে হয় বিষ্টুচরণ অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি, রিপোর্টটা সে নিশ্চয় গায়েব করেছে।'

সামন্ত বললেন, 'তল্লাশি চালিয়ে দু-চারটে প্রেসক্রিপশন, নার্সিং হোমের বিল আর টুকটাক কিছু ওষুধপত্রের ক্যাশমেমো পাওয়া গেছে, তবে অমন কোনও রিপোর্ট আমরা পাইনি।'

চাকলাদার বললেন, 'কী করে পাবেন, ওরা সেটা সরিয়ে ফেলেছে। আমার আরও একটা ধারণার কথা আপনাদের বলব?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নিশ্চয় বলবেন। এব্যাপারে যা-কিছু আপনার মনে হয়, সবই খুলে বলবেন। যে লোকটি খুন হয়েছে, আপনি তার ডাক্তার, আপনার প্রতিটি কথাই আমাদের শোনা দরকার।'

চাকলাদার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন আবার। মনে হল, কথাটা বলতে তিনি একটু দ্বিধা বোধ করছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'দেখুন, আমার ভুল হতে পারে, তবু ভেবে দেখলুম যে বলা-ই ভালো। আপনারা হয়তো জানেন না যে, কাল রাত্তিরে আমার চেম্বারে চোর ঢুকেছিল।'

সামন্ত বললেন, 'এঁরা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি। ভোরবেলায় আপনার ফোন পেয়ে তো আমি লোকও পাঠিয়ে দিয়েছিলুম আপনার চেম্বারে। ওই যাঃ, নকুলকে আপনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা তো পাঁচ নম্বর বাড়িতে আমরা পাইনি, কিন্তু তার একটা কপি তো আপনার কাছে আছে বলছিলেন, সেটাও কাল রাত্তিরে আপনার চেম্বার থেকে চুরি হয়ে যায়নি তো?'

চাকলাদার বললেন, 'চেম্বারে কোনও দামি জিনিস থাকে না। থাকবার মধ্যে ছিল কিছু কাগজপত্র, নোটবই আর ডায়েরি। চোর সেগুলো নেয়নি, তবে ড্রয়ার, আলমারি আর যাবতীয় কাগজপত্র যেভাবে হাঁটকে দেখেছে, তাতে মনে হয়, কিছু একটা খুঁজে বার করতেই সে এসেছিল। মিস্টার সামন্ত, ওইসব কাগজপত্র তো চেম্বারের মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। ওর ওপরে, কি টেবিলের ওপরকার কাচের ঢাকনায় কি আলমারির পাল্লায় কি অন্য কোথাও তার আঙুলের ছাপ থেকে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আপনারা কি সে কথা ভেবে দেখেছেন?'

সামন্ত হেসে বললেন, 'আপনারা আমাদের কী ভাবেন বলুন তো? ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওব্যাপারে যা ইনস্ট্রাকশান দেবার, তা আমি দিয়ে এসেছি। দেখা যাক, কোনও দাগি চোরের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে যায় কি না।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'ডাক্তার চাকলাদার কোনও দাগি চোরের কথা ভাবছেন না। উনি ভাবছেন বিষ্টুচরণের কথা। ওঁর ধারণা, চেম্বারের কোথাও যদি আঙুলের ছাপ পেয়ে যান আপনারা, তো বিষ্টুর ফিঙ্গার-প্রিন্টের সঙ্গে সেটা মিলেও যেতে পারে। কী ডাক্তার চাকলাদার, আমি কি ভুল বলছি?'

চাকলাদার বললেন, 'মোটেই না। সব রিপোর্টেরই একটা কপি যে আমি ফাইল করে রাখি, বিষ্টু সেটা ভালোই জানত।'

সামন্ত বললেন, 'বটে?'

'কী করে জানত, বলি। বিষ্টুর একটু হাঁপানি-মতো আছে। অন্য সময়ে কষ্ট দেয় না বটে, তবে শীতকালে সেটা ওকে মাঝেমধ্যে ভোগায়। ওর ডাক্তার ওকে তাই ব্লাড টেস্ট করাতে বলেছিলেন। তাঁর অ্যাডভাইস অনুযায়ী বিষ্টু আমার ল্যাবরেটরিতেই টেস্টটা করিয়েছিল। তার রিপোর্ট আমি ওকে

BanglaBook.org

দিয়েওছিলুম। কিন্তু সেটা ও হারিয়ে ফেলে। আমাকে সে-কথা বলতে আমি বলি, ঠিক আছে, সব রিপোর্টেরই তো একটা কপি আমি ফাইল করে রাখি, এটাও আছে, কপি দেখে নতুন করে একটা রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি। তো আমার ধারণা, নকুলকে যে রিপোর্ট আমি দিয়েছিলুম, বিষ্টু জানত যে, সেটার কপিও আমার কাছে রয়েছে, আর সেই কপিটা গায়েব করবার জন্যেই কাল রাত্তিরে সে আমার চেম্বারে এসে ঢুকেছিল। অবশ্য আমার ধারণাটা ভুলও হতে পারে।'

'ঢুকল কী করে?'

'জানলার কাচ খুলে। চেম্বারে তো আর দামি কিছু থাকে না। তাই জানলায় আর গ্রিলও বসাইনি।'

সামন্ত বললেন, 'কপিটা গায়েব হয়ে যায়নি তো?'

চাকলাদার বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সেটা দোতলায় থাকে। শুধু ওই একটা কপি নয়, যাবতীয় রিপোর্টের কপি আমার দোতলার ঘরে রাখি। ফলে সেটা খোয়া যায়নি। দরকার হলে জানাবেন, তার একটা জেরক্স কাল সকালেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'

সামন্ত বললেন, 'বাঃ কাজ তো তবে চোদ্দ-আনাই মিটে গেল। বাকি রইল শুধু মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করা। তা সেটারও একটা হদিশ নিশ্চয় শিগগিরই করে ফেলতে পারব।'

কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যেন যাবতীয় হদিশ এ-পর্যন্ত তিনিই করেছেন।

ডাক্তার গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ন'টা বাজতে চলল, এবারে তা হলে যাওয়া যাক।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কাল আপনারা একটু সময় দিতে পারবেন?'

সামন্ত বললেন, 'কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আব-একবার বসবার দরকার ছিল।'

'এইখানে?' গঙ্গাধর সামন্ত যেন আঁতকে উঠলেন। 'না মশাই, আমরা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মানুষ, রোজ-বোজ অ্যাদ্দুর ঠেঙিয়ে আসতে পারব না।'

'এখানে আসতে হবে কে বলল?' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'খুন যেখানে হয়েছে, সেই জায়গাটা তো আমি এখনও দেখিইনি। তাই ভাবছিলুম যে, কাল বিকেল ছ'টায় আমরা কিরণবাবুর বাড়িতে বসব। আপনি যে-সব খাতা আর কাগজপত্র সিজ করেছেন, সেগুলোও না-হয় তখনই ফেরত দেওয়া যাবে। আজ সেগুলো আমার কাছেই থাক। কোনও আপত্তি নেই তো?'

গঙ্গাধর সামন্ত হেসে বললেন, 'কিচ্ছু না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। জলখাবারের ব্যবস্থাটা যেন এইরকম হয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা এর চেয়ে ঢের ভালো হবে। কিরণবাবুর স্ত্রী বাসন্তীকে আমি অনেক কাল ধরে দেখছি তো, অমৃত যে কাকে বলে, কালই আপনারা বুঝতে পারবেন।'

এবারে আমার আঁতকে ওঠার পালা। একে তো বাড়িতে গ্যাস নেই, কালকের মধ্যে সিলিন্ডারটা পাব কি না তাও জানি না, তার ওপরে আবার দিন কয়েক বাদেই মেয়ের পরীক্ষা শুরু হবে, এই সময়ে বাড়িতে বৈঠক বসছে শুনলে বাসন্তী ক্ষেপে যায়।

অরুণ সান্যাল আর মালতী এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা নীচে নেমে এলুম। ডাক্তার গুপ্তকে নিয়ে সামন্ত তাঁর জিপে উঠলেন। আমি উঠলুম চাকলাদারের মরিস মাইনরে।

সেলফের চাবি ঘোরাতেই ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করে উঠল। চাকলাদার বললেন, 'ব্যাটা একেবারে বাঘের বাচ্চা! চলুন, মনটা হালকা হয়ে গেছে, একটু ঘুরপথে আজ বাড়ি ফিরব।'

'ঘুরপথে মানে?'

'পার্ক সার্কাস থেকে আর লোয়ার সার্কুলার রোড ধরব না, ডাইনে ঘুরে চার নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে বাইপাস ধরব। তারপর স্টেডিয়ামের কাছে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে বেলেঘাটা মেন রোড ধরে

BanglaBook.org

শেয়ালদা ফ্লাই-ওভারে উঠলেই তো আমাদের পাড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি?'

'ওরে বাবা, সে তো বিস্তর পথ।'

'পথ অবশ্যই বেশ কয়েক কিলোমিটার বেশি, তবে সময় লাগবে কম। একেবারে উড়ে চলে যাব। তা ছাড়া, গাড়ির মেরামতিটা কেমন হল, তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

বাইপাসে পড়েই অ্যাকসিলেটারে চাপ বাড়ালেন চাকলাদার। পুরোনো আমলের গাড়ি, কিন্তু মনে হল যেন সত্যিই তার দু-পাশে দুটো ডানা গজিয়ে গেছে। পাস দেবার জন্যে পিছন থেকে একটা লরি ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল, খানিক বাদে পিছনে তাকিয়ে সেটাকে আর দেখতে পেলুম না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পীতাম্বর চৌধুরি লেনে পৌঁছে গেলুম। সারাটা পথ চাকলাদার আর কোনও কথা বলেননি। এতক্ষণে তিনি মুখ খুললেন। রাস্তার একধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নকুল বিশ্বাস যে একটা ভুল বিশ্বাস নিয়ে মারা গেল, সেটা ভেবে দেখেছেন?'

'অর্থাৎ?'

'বুঝতে পারছেন না?' তিক্ত হেসে চাকলাদার বললেন, 'বিষ্টুকে সে যমুনার মামাতো ভাই বলেই জানত। এদিকে সে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে জেনে গিয়েছিল যে, যমুনা বাঁজা নয়, আসলে তার নিজেরই নেই বাপ হবার ক্ষমতা। ফলে, যমুনা যখন প্রেগন্যান্ট হল, আর তারও কিছুকাল বাদে যমুনার মেয়ের মুখে যখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল বিষ্টুচরণের মুখের আদল, নকুল তখন ধরেই নিল যে, মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে একটা ইনসেসচুয়াস সম্পর্কের জন্যেই এটা হয়েছে। আরে মশাই, বিষ্টু যে যমুনার মামাতো ভাই নয়, এটাই সে জানত না।'

॥ ২০ ॥

বাসন্তীকে নিয়ে একটু ভয় ছিল। সামনেই পারুলের পরীক্ষা, এই সময়ে বাড়িতে একগাদা লোক আসছে, তাদের জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে, হইচইও হয়তো নেহাত কম হবে না, তাই ভাবছিলুম যে, বাসন্তী না রেগে যায়।

অথচ সে-ই দেখলুম দারুণ খুশি। গ্যাস নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই, কাল বিকেলেই নতুন সিলিন্ডার দিয়ে গেছে, তবু ভাদুড়ীমশাই যে আজ আমাদের বাড়িতেই বৈঠক ডেকেছেন কাল রাত্তিরে বাড়িতে ফিরে বাসন্তীকে এই খবরটা দিয়ে একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলেছিলুম, 'রাজি না-হলেই ভালো হত, তাই না?'

বাসন্তী তা-ই শুনে অবাক। গালে হাত দিয়ে বলল, 'সে-কী! চারুদা আসছেন, কৌশিক আসছে, এ তো দারুণ ব্যাপার। কদ্দিন যে চারুদাকে দেখিনি। কৌশিক অবশ্য মাঝেমধ্যে আসে, কিন্তু চারুদা এবারে অনেক দিন বাদে কলকাতায় এলেন। তুমি কিন্তু মালতী আর অরুণবাবুকেও আসতে বললে পারতে।'

বললুম, 'বলো কী, পারুল এখন রাতদিন তার বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে, লোক আরও বেড়ে গেলে ওর অসুবিধে হত না?'

বাসন্তী বলল, 'অসুবিধে হবে কেন, বরং সুবিধেই হত। মেয়েটা সারারাত পড়ে। কিন্তু অত পড়া ভালো নয়, বুঝলে? একটু গল্প-টল্পও করা দরকার।'

এবারে আমার অবাক হবার পালা।

ছ'টায় সকলের আসবার কথা। কৌশিককে নিয়ে ভাদুড়ীমশাই কিন্তু পাঁচটার মধ্যেই এসে গেলেন। এসেই হাঁক পাড়লেন, 'কই বাসন্তী, আমার প্রিয় পানীয়টি তৈরি আছে তো?'

BanglaBook.org

ভাদুড়ীমশাইয়ের যা প্রিয় পানীয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় তা হল 'বিল্ববাসিত তক্র'। অর্থাৎ কিনা বেলের সুবাসযুক্ত ঘোল। তা বাসন্তী সেই পানীয়ের পুরো দুটি গ্লাস ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। উপর্যুপরি সেই গ্লাস দুটিকে নিঃশেষ করে ভাদুড়ীমশাই আমাকে বললেন, 'চলুন, চটপট এবারে ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসি।'

বাসন্তী বলল, 'বা রে, আপনি তো আপনার প্রিয় পানীয় পেয়েছেন, এবারে কৌশিককে তার প্রিয় পানীয় তৈরি করে দিতে হবে না?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কৌশিকের তো এখন আমার সঙ্গে যাবার কোনও দরকার নেই। ও চা খাক, পারুলের সঙ্গে গল্প করুক। কিরণবাবু আমার সঙ্গে থাকলেই হবে। দেরি হবে না, মিনিট পাঁচ-দশের মধ্যে আমরা ফিরে আসছি।'

ভাদুড়ীমশাই আর আমি গিয়ে পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকলুম। সিঁড়ির তলাটা আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোথাও ধুলো-ময়লা নেই। মাছের সেই গন্ধও নেই কোনওখানে। ভাদুড়ীমশাই মিনিট কয়েক চুপচাপ সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, এবারে ফেরা যাক।'

বললুম, 'সদানন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী ওপরে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলবেন না?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'দরকার কী।' তারপর সদর-দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ আবার বললেন, 'চলুন, ভদ্রলোককে একবার দেখেই যাই।'

ওপরে গিয়ে দেখলুম, সদানন্দবাবু তাঁর শোবার ঘরে চুপচাপ একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বললুম, 'কেমন আছেন সদানন্দবাবু?'

সদানন্দবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আমার সঙ্গে যে আরও একজন রয়েছেন, এটা দেখেও ইজিচেয়ার থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত। যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসেই রইলেন।

বললুম, 'ইনি মিস্টার চারু ভাদুড়ী। বিখ্যাত গোয়েন্দা, ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছেন। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু।'

সদানন্দবাবু ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটি কথাও বললেন না।

নীচে নামতে বিষ্টুচরণের সঙ্গে দেখা। সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, 'কী বিপদ, বলুন তো। কাল রাত্তির থেকে আমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না। আজ সকালে বাজার করতে বেরুচ্ছিলুম, তা যে লোকটা পাহারায় রয়েছে, সে আমাকে আটকে দিল। বলল, 'বাহার জানেকা হুকুম হ্যায় নেহিঁ।' কমলির বেবিফুড ফুরিয়েছে, তাও বাইরে যেতে দিচ্ছে না। মেয়েটা কি না-খেয়ে মরবে নাকি?'

বললুম, 'বাইরে যাবার দরকার কী। সদানন্দবাবুর স্ত্রী যে কমলির জন্যে গুঁড়ো দুধ আনিয়ে রেখেছেন, তা তো আপনিও সেদিন শুনলেন। ওপরে গিয়ে তার একটা নিয়ে এলেই তো হয়।'

বিষ্টুচরণ বলল, 'তা তো হয়ই। কিন্তু আমার বোন যে আমাকে ওপরে যেতে দিচ্ছে না।'

বললুম, 'তাই তো, বড় মুশকিল হল দেখছি। তা এক কাজ করুন, কমলিকেই বরং ওপরে পাঠিয়ে দিন।'

ভাদুড়ীমশাইকে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকলুম। এ-বাড়ির সদর-দরজা সব সময় খোলাই থাকে। দোতলায় ওঠবার আগে একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিলুম; তখন চোখে পড়ল, বিষ্টুচরণ আবার তাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু থানা থেকে যে পাহারাদারটিকে সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে, বিষ্টুকে সে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না।

ওপরে উঠে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলুম আমরা। বাসন্তী একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল; বুঝলুম যে, তার রান্নাবান্নার পাট শেষ হয়েছে। আমাদের দেখে ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আরে বোসো, বোসো। ...কৌশিক কোথায়?'

BanglaBook.org

বাসন্তী বলল, 'পারুলের ঘরে বসে গল্প করছে। ডেকে দেব?'

পাশের ঘর থেকে টুকরো-টুকরো কথা আর হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। ভাদুড়ীমশাই মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'থাক ডেকে দেবার দরকার নেই। বাকি সবাই আসুন, তখন ডেকে দিলেই হবে।'

বাসন্তী বলল, 'তা হলে বরং একটু চা করি আপনার জন্যে?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তারও এখন দরকার নেই। প্রায় ছ'টাই তো বাজে। ওঁরা এখুনি এসে পড়বেন। তখন চা দিলেই চলবে।'

মিনিট দশেকের মধ্যে ডাক্তার চাকলাদার এসে পৌঁছলেন। তার একটু বাদেই গঙ্গাধর সামন্ত আর ডাক্তার গুপ্ত। কৌশিককেও ডেকে পাঠানো হল।

এক প্রস্থ চা হয়ে যাবার পরে সামন্ত বললেন, 'এবারে তা হলে কাজের কথা শুরু হোক।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'আজ শুক্রবার। মার্চের আজ শেষ দিন, ৩১ তারিখ। নকুলচন্দ্র খুন হয়েছে গত শুক্রবার। গত শুক্রবার ছিল ২৪ মার্চ। কখন খুন হয়েছে? না রাত তিনটে নাগাদ। লাশ পরীক্ষা করে অন্তত সেই কথাই বলা হয়েছে। ইংরেজি মতে রাত বারোটার পরেই নতুন তারিখ শুরু হয়ে যায়। নকুল তাহলে ২৫ মার্চ খুন হয়। তার দু-ঘণ্টা বাদে সদানন্দবাবু দেখতে পান যে, তার ডেডবডিটা সিঁড়ির তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে। অবশ্য সদানন্দবাবু যা বলছেন, তাতে মনে হয়, ও যে জ্যান্ত নকুল নয়, তার ডেডবডি, তা তিনি তখনও জানতেন না।'

গত রাত্রে যে-সব কথা হয়েছিল, আর সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল যে-সব নতুন তথ্য, তাতে গঙ্গাধর সামন্তর চিন্তাভাবনার পেন্ডুলামটি দেখলুম একেবারে বিপরীত বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বললেন, 'এতে আর মনে হওয়া-টওয়ার কী আছে, সদানন্দবাবু নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেননি।'

কৌশিকের এ-ও একটা মস্ত দোষ যে, সে হাসি চাপতে পারে না।

সামন্ত তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাসছেন যে?'

কৌশিক বলল, 'হাসব না? দু-দিন আগেই যাঁকে আপনি চড়-চাপড় মারাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এখন তো দেখছি তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা একেবারে উলটে গেছে।'

সামন্ত বললেন, 'সে তো আমি ভুল করেছিলুম। তা ভুলটা ঠিক-সময়ে শুধরেও নিয়েছি। তা-ই বা ক'জন করে? এখন তো বুঝতেই পারছি যে, এটা একটা ফ্রেম-আপ, নির্দোষ একটা মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চক্রান্ত।'

কৌশিক আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, ভাদুড়ীমশাই কাল রাত্তিরের মতোই আবার তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হচ্ছে কৌশিক! যা বলছি, একটু মন দিয়ে শোনো। মিস্টার সামন্ত কাল বলছিলেন যে, চোদ্দো-আনা কাজই মিটে গেছে, বাকি মাত্র দু-আনা। কিন্তু সেই দু-আনার গুরুত্ব মোটেই কম নয়, হয়তো সবচেয়ে বেশি। কাজটা কী? না মার্ডার-ওয়েপনটা খুঁজে বার করতে হবে। যতক্ষণ না তার হদিশ করা যাচ্ছে, খুনির বিরুদ্ধে একটা ওয়াটার-টাইট কেসও ততক্ষণ দাঁড় করানো যাচ্ছে না। যা দিয়ে ওভাবে মাথা ফাটানো যেতে পারে, এমন জিনিস অবশ্য ও-বাড়ি থেকে বিস্তর আটক করা হয়েছে, কিন্তু ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় তার একটাও যে ওতরায়নি, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

কৌশিক চুপ করে রইল। চাকলাদার বললেন, 'মিস্টার সামন্ত কাল বলছিলেন যে, মার্ডার-ওয়েপনের একটা হদিশ শিগগিরই করে ফেলতে পারবেন।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'করে ফেলতে পারলে নিশ্চয় বলতেন আমাদের। মনে হচ্ছে, এখনও হদিশ করতে পারেননি। কিন্তু সে-কথা থাক। সেদিন সকালে পাঁচ নম্বর বাড়িতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার চাকলাদার ছাড়া বাকি চারজনকে—মানে কিরণবাবু, মিস্টার সামন্ত, ডাক্তার গুপ্ত আর কৌশিককে—আমি চারটে রিপোর্ট লিখে ফেলতে বলেছিলুম। এ-ও বলে দিয়েছিলুম

BanglaBook.org

যে, ওখানে সেদিন যা-কিছু তাঁরা দেখেছেন কি শুনেছেন, রিপোর্টে সব ডিটেলসে লিখতে হবে। কে কোথায় দাঁড়িয়েছিল, কিংবা বসেছিল কিংবা কার কথায় কার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাও বাদ দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ আমি চেয়েছিলুম যে, গোটা ব্যাপারটার একটা সর্বাঙ্গীণ বর্ণনা আপনারা আমাকে দিন। সেদিন সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না-থাকা সত্ত্বেও যাতে সবটা আমি ভিসুয়ালাইজ করতে পারি।'

কৌশিক বলল, আমি কিচ্ছু বাদ দিইনি মামাবাবু। যা-কিছু আমার চোখে পড়েছে সবই আমার রিপোর্টের মধ্যে আছে।'

সামন্ত বললেন, 'আমিও তো সবই জানিয়েছি আমার রিপোর্টে। কিছু বাদ পড়েছে বলে তো মনে হয় না।'

ভাদুড়ীমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার কোনও ভাবনা নেই। আপনার তো ওই যাকে বলে ফোটোগ্রাফিক মেমারি। যা-কিছু দেখেন শোনেন, সব একেবারে মাথার মধ্যে গেঁথে থাকে।'

বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আশা করি সবই আমার রিপোর্টের মধ্যে আছে, কোনও-কিছু বাদ পড়েনি।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তিনটি রিপোর্টই আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছি। একটা কথা বলতেই হবে, কারও কথার সঙ্গেই অন্য-কারও কথার বিশেষ পার্থক্য বিরোধ কিংবা অসঙ্গতি কোথাও নেই। সেটা খুবই ভালো কথা। অমন কোনও বিরোধ কি অসঙ্গতি থাকলে আমাকে ধাঁধায় পড়ে যেতে হত। ক্রমাগত ভাবতে হত কার কথাটা ভুল, এঁর না ওঁর। না, তেমন কোনও ধাঁধায় আমাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু রিপোর্টগুলি পড়ে আমি যে খুব সন্তুষ্ট হতে পেরেছি, তা-ও নয়। কেন জানি না, কেবলই আমার মনে হচ্ছে, যা আপনারা লিখেছেন, তার মধ্যে কোথাও কিছু একটা ফাঁক রয়েছে, কিছু একটা ব্যাপার বাদ পড়েছে। এমন কোনও ব্যাপার, যাকে তিনজনের একজনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। কোনও তুচ্ছ বা মাইনর ব্যাপার। মানে এমন কোনও ব্যাপার, এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যাকে একটা কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা যায় বলে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। একটু ভেবে দেখুন তো, এমন কিছু কি সেখানে আপনারা দেখেছিলেন কিংবা শুনেছিলেন?'

'না, মামাবাবু।' কৌশিক বলল, 'কিছুই আমি বাদ দিইনি। সবকিছুই তুমি জানাতে বলেছিলে, তাই সবকিছুই আমার রিপোর্টে আমি জানিয়েছি। এমনকী জায়গার একটা নকশা এঁকে সেটাও গেঁথে দিয়েছি আমার রিপোর্টের সঙ্গে।'

'তা দিয়েছিস ঠিকই,' ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কিরণবাবু আর মিস্টার সামন্তও খুঁটিনাটি কথা কিছু কম জানাননি। বাট আই জাস্ট কানট গেট রিড অভ দিস ফিলিং দ্যাট নাথিং অভ ইউ টাচড অল দ্য পয়েন্টস, ইউ মিসড সামথিং সামহোয়্যার অ্যালং দি ওয়ে। এমন কিছু, যা এই কেসটার পক্ষে খুবই ভাইটাল।'

চুপ করে রইলুম। বারবার ভাবতে লাগলুম, কী বাদ দিয়েছি। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা করতে পারলুম না।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর অনুযোগের সুরে বললেন, 'ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকেও আমি কিন্তু একটা রিপোর্ট লিখে দিতে বলেছিলুম। আপনি সেটা আজও দিলেন না।'

ডাক্তার গুপ্ত লজ্জিত গলায় বললেন, 'লিখলে তো দেব। লেখাই হয়ে ওঠেনি।'

'সময় করে উঠতে পারেননি নিশ্চয়? আপনি যা ব্যস্ত মানুষ!'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'না-না, সময়ের ব্যাপারে নয়, কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলুম ঠিকই। কিন্তু কী লিখব, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এক ওই লাশ ছাড়া আর কোনও

BanglaBook.org

কিছুই তো তেমন নজর করে দেখিনি। আর দেখবই বা কী করে? মন দিয়ে কিছু দেখবার কি শোনবার উপায়ই তো ছিল না।'

'কেন, উপায় না থাকার কী হল? রিপোর্ট পড়ে তো মনে হয় অন্যেরা অনেক কিছুই দেখেছেন। শুনেছেনও অনেক-কিছু।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তা হলে বুঝতে হবে, হয় ওঁদের সর্দি হয়ে নাক বুজে গিয়েছিল, আর নয়তো এমনিতেই ওঁদের ঘ্রাণশক্তি তেমন প্রবল নয়।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'তার মানে?'

'আরে মশাই, সে এক উৎকট গন্ধ। কোনও-কিছু দেখব অথবা শুনব কী, গন্ধের দাপটে যেন পাগল-পাগল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, পালাতে পারলে বাঁচি, নয়তো অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত মুখে উঠে আসবে। ওরে ব্বাপরে বাপ, কী গন্ধ, কী গন্ধ!'

ভাদুড়ী আমার দিকে তীব্র চোখে একবার তাকালেন। তারপর সামন্ত আর কৌশিকের দিকে। বললেন, 'কই, কারও রিপোর্টেই তো গন্ধের কথা নেই। কীসের গন্ধ?'

কৌশিক বলল, 'পচা মাছের। নকুলের তো মাছের ব্যাবসা, আর বাড়িতেই ছিল তার আড়ত। সেখানে মাছ পচে গিয়ে অতি উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছিল।'

শুনে দুই হাতে নিজের মাথাটাকে আঁকড়ে ধরে গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ভাদুড়ীমশাই। তারপর মিনিট কয়েক বাদে যখন নিজের শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন দেখলুম, তাঁর মুখচোখের চেহারা একেবারে পালটে গিয়েছে। বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল। যা-দেখেছেন, যা-শুনেছেন, শুধু তারই কথা লিখতে বলেছিলুম আমি, আর আপনারাও শুধু তা-ই লিখেছেন। গন্ধের কথাটা আপনারা কেউই বলেননি।...ডাক্তার গুপ্ত, আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আপনি রিপোর্ট লেখেননি বটে, কিন্তু সবচেয়ে যেটা জরুরি খবর, শেষপর্যন্ত সেটা আপনার কাছেই পাওয়া গেল। এখন দেখা যাক, আমি যা-ভাবছি সেটা ঠিক কি না।'

কৌশিকের দিকে তাকালেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'হ্যাঁ রে কৌশিক, নকুলের বাড়িতে তার ব্যাবসাপত্রের যে-সব হিসেব, কাগজ আর রসিদ পাওয়া গেছে, সেগুলো নিয়ে এসেছিস তো?'

কৌশিক তার অ্যাটাশে-কেস খুলে সুতো দিয়ে বাঁধা কিছু কাগজপত্র, খানকয়েক পাতা আর দুটো ফ্ল্যাট ফাইল বার করে ভাদুড়ীমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। এগুলো কিন্তু আজ মিস্টার সামন্তকে ফেরত দিতে হবে।'

কাগজপত্র আর খাতা একপাশে সরিয়ে রেখে ফ্ল্যাট-ফাইল দুটো টেনে নিলেন ভাদুড়ীমশাই। প্রথম ফাইলটায় রাখা কাগজপত্রগুলি দ্রুত একবার দেখে নিলেন। তারপর সেটাকে নামিয়ে রেখে হাতে তুলে নিলেন দ্বিতীয় ফ্ল্যাট-ফাইলটা। সেটাকে আর উলটে-পালটে দেখবার দরকার হল না। মুখের ভাব দেখে মনে হল যে, যা খুঁজছিলেন তিনি, ফাইলের একেবারে গোড়াতেই সেটা পেয়ে গেছেন। ফাইল থেকে সেটা তিনি খুলে নিলেন। একটা ক্যাশমেমো। সেটার ওপরে চোখ বুলিয়ে টেনে নিলেন জমা-খরচের খাতা। দুটোকে মিলিয়ে দেখলেন। তারপর আপন মনে বললেন, 'ও, এই তা হলে ব্যাপার!'

স্বগতোক্তিটা সামন্তও শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার!'

ভাদুড়ী তাঁর কথার কোনও জবাব দিলেন না। কৌশিককে বললেন, 'হ্যাঁ রে, লাশ যেখানে পড়েছিল, সেখানে মেঝে থেকে যা-যা কুড়িয়ে এনেছিস, তার মধ্যে কিছু কাঠের গুঁড়োও তো দেখলুম। শুকনো নয়, ভিজে গুঁড়ো। ওগুলো ভিজল কী করে? মেঝের ওপরে কি জল ছিল নাকি?'

কৌশিক বলল, 'মেঝের ওপর জল পড়েছিল নিশ্চয়। আমরা যখন যাই, তখন দেখেছিলুম যে, জায়গাটা কাদা-কাদা মতন হয়ে আছে। ধুলোবালির ওপরে জল পড়ে তারপর শুকিয়ে গেলে যেমন হয় আর কি।'

BanglaBook.org

ভাদুড়ীমশাই সামন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কৌশিক যা বলছে, সেটা সত্যি?'

সামন্ত বললেন, 'এটা উনি ঠিকই বলেছেন। জায়গাটা দেখে আমারও মনে হয়েছিল যে, এরকম কাদা-কাদা হয়ে আছে কেন, কারও হাত থেকে জল পড়েছিল নাকি?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'জল পড়ে গিয়েছিল, তাই না? মানে সেইরকমই মনে হয়েছিল, কেমন?'

'হ্যাঁ, সেইরকমই মনে হয়েছিল।'

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'তা হলে জেনেই রাখুন সামন্তমশাই, যা-নিয়ে আপনি খুব ভাবনায় রয়েছেন, সেই মার্ডার-ওয়েপনেরও একটা হদিশ হয়তো করতে পেরেছি। তবে কিনা, আমার অনুমানটা যদি সত্যি হয়, তবে যতই না কেন খুঁজে মরুন, সেই অস্ত্রটির সন্ধান আপনি কোনওদিনই পাবেন না।'

'কেন, কেন, পাব না কেন? সেটা যাবে কোথায়? এ তো আর রামানন্দ সাগরের টিভির রামায়ণের ওয়েপন নয় যে, শত্রুকে বিনাশ করেই মহাকাশে ভ্যানিশ করে যাবে। মার্ডার-ওয়েপনটা নিশ্চয় ডানা গজিয়ে উড়ে যাবার জিনিস নয়।'

'আমি কি বলছি যে, ওটা উড়ে গেছে?'

'তা হলে?'

'আরে মশাই, ওটা উড়ে যায়নি, গলে গেছে!'

সামন্ত তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দেখে ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছেন না?'

ডাক্তার গুপ্তই আমাদের সকলের হয়ে কথা বললেন। 'উনি একা কেন, সম্ভবত আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারিনি। অন্তত আমি যে পারিনি, এটা স্বীকার করতে আমার কিছু লজ্জা নেই।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'বেশ, তা হলে ঘটনাগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিন। নকুল খুন হয় মোটামুটি রাত তিনটের সময়। ইংরেজি মতে ২৫ মার্চ, ইন দি আর্লি আওয়ার্স অব দ্য মর্নিং। খুন হবার ঘণ্টা কয়েক আগে শেয়ালদা আইস ডিপো থেকে পঁচিশ কেজি বরফ কেনা হয়েছিল। এই ক্যাশমেমোটাই তার প্রমাণ। ক্যাশমেমোর তারিখ দেখছি ২৪ মার্চ। জমাখরচের খাতায় ওই একই তারিখে বরফ কেনার টাকাটা লেখা হয়েছে। টাকার অঙ্কের পাশে লেখা রয়েছে, "বিষ্টুকে পঁচিশ কেজি বরফ খরিদ করিবার জন্য দেওয়া হইল।" খাতায় ওটাই শেষ এন্ট্রি।'

কৌশিক মৃদু-মৃদু হাসছিল। মনে হল, সে একটা কিছু আঁচ করেছে। আমি কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলুম না। ডাক্তার গুপ্ত, চাকলাদার আর সামন্তর মুখ দেখে বুঝলুম, তাঁদের অবস্থাও আমার চেয়ে খুব-একটা ভালো নয়।

ভাদুড়ীমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। বুকের মধ্যে খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিলেন। তারপর গলগল করে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ যা বললুম, সেটা তথ্য, সেটা প্রমাণ করা যায়। এবারে এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কয়েকটা ব্যাপার অনুমান করে নিতে পারি। প্রথমেই বলি, জমাখরচের খাতায় ওটাই যেহেতু শেষ এন্ট্রি, তাই মনে হয়, টাকাটা সেদিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ বিকেল কিংবা সন্ধে নাগাদ বিষ্টুকে দেওয়া হয়। দুপুরে বকুল ঘুমোত, তা আমরা জানি। সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে বিষ্টুকে সে টাকাটা দেয়, খাতায় সেটা লিখে রাখে, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বিষ্টু সম্ভবত তখন-তখনই বরফ কেনেনি। কিনেছিল বরফের দোকান বন্ধ হবার খানিক আগে। দোকানপাট দশটার পরে সাধারণত খোলা থাকে না। আমার ধারণা, দোকান বন্ধ হবার মুখে-মুখে বরফটা কিনে বিষ্টু বাড়ি ফিরে আসে। অভ্যেসবশত ক্যাশমেমোটা সে গেঁথেও রাখে ফ্ল্যাট-ফাইলে।'

ডাক্তার গুপ্ত বললেন, 'তারপর?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নকুল কেন পঁচিশ কেজি বরফ কিনতে দিয়েছিল তা আপনাদের না বোঝবার কথা নয়। মাছের কারবারি বরফ কেনে মাছের ঝুড়িতে বরফ চাপা দেবার জন্যে। গরমে যাতে মাছ না পচে যায়। আর বিষ্টু যে টাকা পেয়েই বরফ কিনতে বেরিয়ে পড়েনি, যতটা সম্ভব দেরি করে বেরিয়েছিল, সেটার কারণও আমরা অনুমান করতে পারি।'

'কেন?'

'সে জানত যে, বরফ যত দেরি করে কিনবে, সেটা গলে গিয়ে আকারে ছোট আর ওজনে কম হয়ে যাবার সম্ভাবনা ততই কম। তাও সে নিশ্চিন্ত হয়নি, পানের দোকানে যেমন করে, সেইভাবে সে-ও সেই বরফের চাঙড়টাকে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, নকুল তো মত্তাবস্থায় রোজই মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফিরত। সেদিন ফিরল আরও দেরি করে। ফিরে খানিক চেঁচামেচিও করল, তারপর শুয়েও পড়ল যথারীতি। বিষ্টু কিন্তু ঘুমোল না। সে জেগে রইল। জেগে অপেক্ষা করতে লাগল, নকুল কখন বাথরুমে যায়, সেই মুহূর্তটির জন্য।'

ভাদুড়ীমশাই তাঁর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিলেন। তারপর বললেন, 'নকুল মোটামুটি রাত তিনটে নাগাদ একবার ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যেত, কিন্তু সেদিন সে চেঁচামেচি করেছিল রাত দুটো পর্যন্ত। দুটোর পরে ঘুমিয়ে আবার তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে ওঠা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আমার ধারণা, নকুল সেদিন দুটোর পরে শুয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুমোয়নি। ঘণ্টাখানেক শুয়ে থেকে তিনটে নাগাদ সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢোকে। কিন্তু সে টের পায়নি যে, সে গিয়ে বাথরুমে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিষ্টুও অন্ধকারে তার ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, বাথরুম থেকে তার বেরিয়ে আসার মুহূর্তটির জন্যে। বাথরুমের আলো নিবিয়ে নকুল বাইরে বেরিয়ে আসবামাত্র সিঁড়ির ওপর থেকে বিষ্টু তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। বেচারা নকুল! ব্রহ্মতালু ফেটে যাওয়ায় সে আর চিৎকারও করে উঠতে পারেনি; মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরুবার আগেই সে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে।'

সামন্ত বললেন, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু মাথাটা ফাটানো হল কী দিয়ে?'

ভাদুড়ীমশাই অবাক হয়ে সামন্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল, সামন্ত যে ব্যাপারটা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, এটাই যেন তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু কৌশিকের মতো তিনি আর ঠাট্টা করলেন না সামন্তকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মাথা ফাটানো হল বরফের একটা বিশাল চাঙড় দিয়ে, মাছের ওপরে চাপা দেবার জন্যে যা কেনা হয়েছিল, কিন্তু সে-কাজে যা ব্যবহার করা হয়নি বলেই ঝুড়ির সমস্ত মাছ সেদিন গরমে পচে যায়। তা নইলে "অমন উৎকট" গন্ধ ওখানে ছড়িয়ে পড়ত না।'

কৌশিক বলল, 'সিঁড়ির নীচে যে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছিল, সে তা হলে ওই বরফ-গলা জলের জন্যেই?'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'নিশ্চয়ই। সিঁড়ির নীচে ধুলোময়লার সঙ্গে ওই যে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিল, যার খানিকটা তুই ওখান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলি, সে-ও আসলে বরফের চাঙড়টা যা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল, সেই কাঠের গুঁড়ো।

কৌশিকের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আবার গঙ্গাধর সামন্তর দিকে তাকালেন ভাদুড়ীমশাই। বললেন, 'কেন যে তখন বলছিলুম যে, মার্ডার-ওয়েপনটা উড়ে না-গেলেও গলে গিয়েছে, আশা করি সেটা এবারে আপনি বুঝতে পেরেছেন। হাজার চেষ্টা করেও অস্ত্রটা আর আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন না।'

BanglaBook.org

সামন্ত বললেন, 'তা না-পারলেও ক্ষতি নেই। অন্য যা-সব প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, তা-ই যথেষ্ট।'

এই কাহিনির ছোট্ট একটা পরিশিষ্ট রয়েছে। সেটা না-জানিয়ে আমি ঠিক শান্তি পাচ্ছি না। সেই রাত্রেই বিষ্টুচরণ ও যমুনাকে খুন ও তাতে সহযোগিতার দায়ে গ্রেফতার করা হয়, যমুনার মেয়ে কমলি অর্থাৎ কমলাকে নিয়ে তখন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দু-বছরের বাচ্চা মেয়ে, তাকে কোথায় রাখা হবে। যমুনা ইচ্ছে করলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই হাজতে যেতে পারত, তার তরফে সে-রকম দাবি তোলা হলে পুলিশেরও তা মেনে না-নিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু যমুনাই কমলিকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়নি। মেয়েটা তা হলে কোথায় থাকবে। যমুনার মা-বাপ নেই, থাকার মধ্যে আছে একটা ভাই, তার অবস্থা ভালো নয়, সে কলকাতায় এসে দিদির কাছে আশ্রয় পায়নি, জামাইবাবু তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে এখন ইটের ভাটায় মজুর খাটে। কমলিকে তার কাছে পাঠানো যায় কি না, জিগ্যেস করতে ঝাঁঝিয়ে উঠে যমুনা বলে, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন, মেয়েটাকে আমার এই আঁশবটিতে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিন।' বলে সে আর দেরি করে না, বিষ্টুচরণের পিছন-পিছন হেঁটে গিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়ে।

ব্যাপার দেখে গঙ্গাধর সামন্ত বললেন, 'এ তো মহা ফ্যাসাদ হল মশাই, মেয়েটাকে তা হলে বরং সরকারি হোমে কি কোনও অনাথ আশ্রমে-টাশ্রমে পাঠিয়ে দিই। আপনারা কী বলেন?'

আমি আর শম্ভুবাবু চুপচাপ সব দেখছিলুম। শম্ভুবাবু বললেন, 'আমরা আর কী বলব?'

কুসুমবালা সম্ভবত দোতলায় সিঁড়ির রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এই সময়ে তিনি নীচে নেমে আসেন। এসে গঙ্গাধর সামন্তকে বলেন, 'আপনি অনাথ-আশ্রমের কথা কী বলছিলেন?'

সামন্ত বললেন, 'কমলিকে কোথায় রাখা হবে, সেই কথা হচ্ছিল। ভাবছি ওকে আমাদের কোনও হোমে আর নয়তো মাদার টেরিজার আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।'

কুসুমবালা বললেন, 'না। কমলি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য-কোথাও যাবে না। ওকে আমি ওপরে নিয়ে যাচ্ছি, ও আমার কাছে থাকবে।'

ডাক্তার চাকলাদারকে নিয়ে ইতিমধ্যে আর একদিন ভাদুড়ীমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম। কৌশিকও বাড়িতে ছিল। চাকলাদারকে দেখে সে বলল, 'শুনেছেন তো? আপনার চেম্বারে যে ফিংগার-প্রিন্ট পাওয়া গেছে, সেটা বিষ্টুরই। ওটা না পাওয়া গেলেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে তারপর সামন্তর হাতে তুলে দিয়েছি, তাতে কেস একেবারে পাকা। ফাঁসি হয়তো হবে না, তবে যাবজ্জীবন হবেই।'

ভাদুড়ীমশাই বললেন, 'কালই ব্যাঙ্গালোরে ফিরছি। আপনারা সেই কবে গিয়েছিলেন, সে কি আজকের কথা? পারুলের পরীক্ষা শেষ হলে সবাই আর-একবার চলে আসুন। দেখতে পাবেন যে শহরটা কত পালটে গেছে।'

বিদায় নেবার সময় কৌশিকের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে চাকলাদার বললেন, 'যেমন মামা, তেমনি ভাগ্নে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।'

পরে রাস্তায় নেমে তাঁর মরিস মাইনরের দরজা খুলতে-খুলতে নিচু গলায় বললেন, 'অবশ্য নারীরাও অনেক সময় অন্তত চেহারায় তাদের মাতুলের মতো হতে পারে। তবে কিনা এই আমাদের বিষ্টুচরণের মতো গ্রাম-সম্পর্কের মামা হওয়া চাই।'

BanglaBook.org

বাড়ি ফিরে দেখি, সদানন্দবাবু আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে বাসন্তীর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তো অবাক। জামিনে ছাড়া পাবার পর থেকে আর রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখাই যায়নি। কাজের মেয়েটিই বাজার করে দিত; মাদার ডেয়ারির দুধও এনে দিত সে-ই। রাস্তায় বার হওয়া তো দূরের কথা, সদানন্দবাবু শুনেছিলুম দোতলা থেকে নীচেই নাকি নামতে চান না।

আমি গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই সদানন্দবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'অবাক হচ্ছেন তো?'

বললুম, 'তা যে একটু হইনি, তা নয়।'

সদানন্দবাবু বললেন, 'সব শুনেছি। কিন্তু কী যে বলব, বুঝতে পারছি না। যে-কটা দিন বেঁচে আছি, আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলুম।...একটা কথা; বউমা যা বললেন, তাতে বুঝতে পারছি, ভাদুড়ীমশাই কিছু নেবেন না। কিন্তু কৌশিকবাবুও তো কম দৌড়ঝাঁপ করেননি, অন্তত তাঁর ফি'টা তো দেওয়া দরকার।'

বললুম, 'কৌশিককেও কিছু দিতে হবে না। আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলুম। তাতে সে বলল, এ-কেসটায় টাকা নিতে মামাবাবুর নিষেধ আছে। তবে কিনা ওর কিছু খরচাপত্তর তো হয়েছে, অন্তত সেটা যাতে নেয় তা আমি দেখব।'

সদানন্দবাবু চট করে তাঁর মুখটা নামিয়ে নিলেন। বুঝতে পারলুম, চোখে যে জল এসে পড়েছে, ভদ্রলোক আমাকে সেটা দেখতে দিতে চান না। আস্তে-আস্তে তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকেই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাবার আগে একটা অনুরোধ করে যাই। কমলি যে বিষ্ণুর মেয়ে, সেটা যেন কখনও প্রকাশ না পায়। নিতান্ত দরকার না হলে আদালতে যাতে ওর প্রসঙ্গটা না ওঠে, দয়া করে সেটাও একটু দেখবেন।'

বললুম, 'আমার আর চাকলাদারের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা ছাড়া গঙ্গাধর সামন্তকে বলব যে, কমলি হ্যাজ টু বি কেপট আউট অভ দিস। সামন্ত তো মানুষ মোটেই খারাপ নন। কমলির ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি এই অনুরোধটা নিশ্চয় রাখবেন।'

ফলে, সদানন্দ বসু আবার শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে লোহার-বল-বসানো সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর মর্নিং ওয়াক।

BanglaBook.org

সোনার কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

কৈফিয়ত

'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে দু-একটা কৈফিয়ত দেবার আছে। ওই উপন্যাসে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর চরিত্রটা যখন আমি সৃষ্টি করি তখন আমি জানতাম না—তিনি 'উত্তম' অথবা 'অধম'। যদি জানতেম, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে চিরকুমাররূপে চিহ্নিত করতেম না। অধম-এর এ ত্রুটি 'যদি জানতেম' চলচ্চিত্রের পরিচালক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই উত্তম প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। ফলে এখন থেকে ধরে নিতে হবে বাসু-সাহেব বিবাহিত এবং তাঁর পঙ্গু স্ত্রী বর্তমান।

দ্বিতীয় কথা, 'নাগচম্পা' উপন্যাসে ওই বাসু-সাহেব চরিত্রটাকে আমি রূপায়িত করেছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছিলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েল-এর বিশ্ববিশ্রুত গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স-এর ছায়া দিয়ে। শার্লক হোম্‌স-এর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসনের ছায়া দিয়ে গড়া অজিতবাবুকেও পেয়েছে বাংলা সাহিত্য। গোয়েন্দা গল্প যে চপল লঘু সাহিত্য নয় এটা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন শরদিন্দু। তাঁর সাহিত্য আমার শিল্প-প্রচেষ্টাকে নানাভাবে নানা যুগে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'ঝিন্দের বন্দী'তে বিদেশি কাহিনিকে খোলনলচে পালটে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আমি একসময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতি আমার 'মহাকালের মন্দির'। শুধু ভাব নয়, সেখানে শরদিন্দুর ভাষাও আমি অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি। আরও পরিণত বয়েসে লিখেছি 'আবার যদি ইচ্ছা কর'—সেখানে ভাষার বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম। এবারেও শরদিন্দুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি একটি বিদেশি গোয়েন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি বাংলা সাহিত্যে—যে-চরিত্রটি স্ট্যানলি গার্ডনার সৃষ্ট চরিত্র পেরি মেসন, বার অ্যাট-ল। গার্ডনারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যমোচন হয়েছে আদালতের কক্ষে, ওকালতি প্যাঁচে।

ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ। বাংলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পূরণ করতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না। কিরীটি, পরাশর বর্মা প্রভৃতিরাও এখন আত্মগোপন করেছেন। যেন মনে হচ্ছে এই দশকের বাংলাদেশে খুন-জখম-রাহাজানি বুঝি সব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রিমিনালরা বুঝি সব কারাপ্রাচীরের ওপারে—মিসায় আটক পড়েছে!

ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা—'পি. কে. বাসু সিরিজ'-এর অবতারণা। এই সিরিজে 'নাগচম্পা'কে প্রথম কাহিনি হিসেবে ধরে নিলে বর্তমান কাহিনি হচ্ছে দ্বিতীয় কাহিনি।

পি. কে বাসু যদি পাঠকদের মনোহরণে সমর্থ হন, তাহলে তাঁর পরবর্তী কিছু কীর্তিকাহিনি শোনানোর বাসনা রইল।

নারায়ণ সান্যাল

BanglaBook.org

॥ এক ॥

ক্রিববং-ক্রিং—ক্রিববং-ক্রিং।

কোনও মানে হয়? দার্জিলিং-এর শীত। সকাল ছ'টা বেজে দশ। ছুটির দিন—দোসরা অক্টোবর, ১৯৬৮। গান্ধীজির জন্মদিবস। সব সরকারি কর্মচারী আজ বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে—শুধু ওরই নিস্তার নেই। এই সাতসকালে টেলিফোনটা চিল্লাতে শুরু করেছে।

ক্রিববং-ক্রিং—ক্রিববং-ক্রিং।

লেপটা গা থেকে সরিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে নৃপেন ঘোষাল—দার্জিলিং সদর-থানার দারোগা। দেখে, পাশের খাটে লেপের ফাঁক থেকে সুমিতাও একটা চোখ মেলে তাকাচ্ছে। ঘোড়া দেখলেই মানুষে খোঁড়া হয়। নৃপেন আবার সটান শুয়ে পড়ে বলে—দেখো তো?

সুমিতা লেপটা টেনে দেয় মাথার ওপর। স্বগতোক্তি করে একটা। দেখতে হবে না, রং নাম্বার।

অগত্যা আবার উঠে বসতে হয়। সুমিতা লেপের মায়া ত্যাগ করবে না। রং নাম্বার ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলে তো বাঁচা যেত। ডি-সির ফোন হতে পারে, পুলিশ সুপারের হতে পারে—কে জানে ট্রাঙ্ককল কি না। হাড় কাঁপানো শীত অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে নৃপেন। হাত বাড়িয়ে হুক থেকে গরম ড্রেসিং গাউনটা নামায়। গায়ে চড়াতে চড়াতে চটিটা পায়ে গলাতে থাকে।

সুমিতা মুখটা বের করে বলে, 'বেচারি' কেন ঝামেলা করছ। শুয়ে থাক। ও আপনিই থেমে যাবে। কোথায় কোন সিঁধেল চুরি হয়েছে—।'

'সিঁধেল চুরিই হোক, আর বউ-চুরিই হোক—আরও বারো ঘণ্টা এ নরক যন্ত্রণা আমাকেই ভোগ করতে হবে—।'

ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা বাঁধতে-বাঁধতে ঘর ছেড়ে 'হল'-কামরায় পৌঁছনোর আগেই টেলিফোনটা দাঁত কিরমিরি করা বন্ধ করল।

'যা বাব্বা! ঠান্ডা মেরে গেলি?' মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ে নৃপেন।

অনেকক্ষণ বাজছিল অবশ্য। হয়তো ও পক্ষের মানুষটা ভেবেছে—যাকগে, মককগে—এখন আর ও লোকটা কী ভেবেছে তা নিয়ে নৃপেনের কী মাথাব্যথা? লোকটা যখন টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে তখন নৃপেনের দায়িত্ব খতম। ঘরে ফিরে আসে সে। ড্রেসিং-গাউনটা খুলে আবার হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে যায় কাচের জানলা দিয়ে উত্তর দিকে। অপূর্ব দৃশ্য। নির্মেঘ আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়-মাথায় লেগেছে আবীরের স্পর্শ। উদয়ভানুর প্রথম জয়টিকা। এ দৃশ্য দেখতে এতক্ষণে নিশ্চয় ভিড় জমেছে টাইগার হিলের মাথায়—দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে যাত্রীদল, নৃপেনের কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না। স্ত্রীকে ডেকে জানাল না পর্যন্ত খবরটা। একটা হাই তুলল সে। জানলার পরদাটা টেনে নিয়ে উঠে বসল খাটে। লেপটা টেনে নিল আবার। নৃপেন ঘোষাল আজ একাদিক্রমে চার বছর আছে এই দার্জিলিং-এ। সে হাড়ে-হাড়ে জানে—রোজ সকালে ভিখারি কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথার ওই দগদগে ঘা-টা ব্যান্ডেজ খোলা কুষ্ঠ রুগির মতো সবাইকে দেখায়।

দার্জিলিং ওদের কাছে পচে গেছে। ঝাঁকার তলায় চেপটে যাওয়া টমেটোর মতো লাল ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের খেলায় আর ওদের কোনও আকর্ষণ নেই। দু-বছর ধরে ক্রমাগত বদলির জন্য তদবির আর দরবার করে এসেছে। এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চেয়েছেন। বদলির অর্ডার এসেছে। মায় ওর সাবস্টিট্যুট পর্যন্ত এসে হাজির। আজই ওর শেষদিন এই হতভাগা দার্জিলিং-এ। আর মাত্র বারো ঘণ্টা এ নরক-যন্ত্রণা ওকে ভোগ করতে হবে। ফোরনুনেই বমেন গুহ ওর কাছ থেকে চার্জ বুঝে নেবে। আঃ, বাঁচা গেল। বদলি হয়েছে খাস কলকাতায়—একেবারে লালবাজারে। বলা যায় একরকম প্রমোশনই। নৃপেন লেপের নীচে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সুমিতা বিজ্ঞতা প্রকাশ করে ঃ 'দেখলে তো! বললাম রং নাম্বার।'

BanglaBook.org

'কোথায় আর দেখলাম? লোকটা তো বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল।'

'গরজ থাকলে ছাড়ত না। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন। কাল রাত দুটো পর্যন্ত যা দাপাদাপি করেছ।'

তা করেছে। মালপত্র প্যাকিং হয়ে পড়ে আছে ঘর জুড়ে। ঘরে, হলকামরায়, করিডরে। নানান আকারের প্যাকিং কেস আর ক্রেটিং। চার বছরের সংসার, গুছিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আজই ও-বেলায় নৃপেনরা নামবে। নামবে মানে কলকাতামুখো রওনা দেবে। মালপত্র যাবে ট্রাকে। হরি সিং-এর ট্রাক ঠিক এগারোটার সময় এসে দাঁড়াবে। ওরা যাবে জিপে। শিলিগুড়ি পর্যন্ত। তারপর ট্রেনে। রিজার্ভেশান করানোই আছে।

ওর সাকসেসার রমেন গুহ এসে পৌঁছেছে গতকাল। রমেন ছেলে ভালো, নৃপেন একথা স্বীকার করবে। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিয়েছে। বস্তুত মাসের শেষদিনে। আর কেউ হলে অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করত। মাসমাহিনাটা নগদে হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ত। রমেন তা করেনি। বেচারি লাস্ট পে সার্টিফিকেট কবে পাবে কে জানে? হীরের টুকরো ছেলে। কাল দুপুরেই এসে পৌঁছেছে দার্জিলিং-এ। হোটেলে মালপত্র নামিয়ে এসে দেখা করেছিল নৃপেনের সঙ্গে। নৃপেন বলেছিল, 'আবার হোটেলে উঠতে গেলে কেন রমেন? এ ফ্ল্যাটে তো তিনখানা ঘর। অসুবিধে কিছুই হবে না। তুমি হোটেল ছেড়ে এখানে চলে এসো।'

রমেন গুহ রাজি হয়নি। জবাবে বলেছিল, 'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ ভাই? তুমি বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত থাকবে, মিসেস ঘোষালও তাঁর বড়ি-আচারের বয়াম নিয়ে বিব্রত থাকবেন—এর মধ্যে উটকো গেস্ট—।'

বাধা দিয়ে সুমিতা বলেছিল, 'আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। আমরা যদি ভাতে-ভাত খাই, আপনাকেও তাই খাওয়াব।'

'আমি তা খাব কেন?' জবাবে হেসে ও বলেছিল 'রীতিমতো বিরিয়ানি, পোলাও আর মুরগির রোস্ট চাই আমার। কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। ইয়ারকি নাকি?'

একগাল হেসে সুমিতা বলেছিল, 'বেশ তাই খাওয়াব। হোটেলের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আসুন আপনি।'

রমেন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল, 'আমারও বদলির চাকরি মিসেস ঘোষাল। শেষ দিনটা কীভাবে কাটে তা কি আমি জানি না? আপনার হাতে পোলাও মাংস নিশ্চিত খাব, তবে এখানে নয়। আপনারা কলকাতায় গিয়ে গুছিয়ে বসুন; আমি যখন সরকারি কাজে কলকাতায় ট্যুরে যাব, তখন ডবল ডি.এ. ক্লেম করব আর আপনার হাতে রান্না খাব। বুঝলেন?'

নৃপেন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় উঠেছ তুমি? কোন হোটেলে?'

' "হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা"। ম্যাল-এর ওপাশে। চেন?'

'খুব চিনি। দার্জিলিং আমার নখদর্পণে। ওর ম্যানেজার তো একজন সিন্ধি ভদ্রলোক, নয়? কী যেন নাম?'

'ম্যানেজারকে দেখিনি, তবে কাউন্টারে যে ছোকরা বসেছিল সে বাঙালি। মালপত্র নামিয়ে রেখেই আমি তোমার এখানে চলে এসেছি—।'

সুমিতা আবার বলে, 'বেশ হোটেলে রাত কাটাতে চান কাটান, রাত্রে কিন্তু আমার এখানেই খেতে হবে।'

'কেন ঝুটঝামেলা পাকাচ্ছেন শখ করে?'

'ঝামেলা নয় মোটেই। শুনুন, আমি আজ রাঁধব না। বাসনপত্রও সব প্যাক হয়ে গেছে। হোটেলে খাবার অর্ডার দেব। আপনার মুখ ফসকে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে তখন আজই আপনাকে খাওয়াব—ওই বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগির রোস্ট। আজই। এখানেই—।'

BanglaBook.org

রমেন তবু বলে, 'কিন্তু আমার শর্তটা ছিল অন্যরকম। হোটেলের রান্না নয়, আপনার শ্রীহস্ত-পক্ক—।'

বাধা দিয়ে সুমিতা বলে ওঠে, 'না, শর্ত মোটেই তা ছিল না। শর্ত ছিল আপনি যখন কলকাতায় গিয়ে ডবল ডি.এ. ক্লেম করবেন তখন আমার হাতের রান্না খাবেন। তাই নয়?'

রমেন হেসে ফেলেছিল : 'ঠিক কথা! আমারই ভুল!'

'ক্রিররং-ক্রিং—ক্রিররং-ক্রিং।'

আবার উৎপাত। এ তো মহা বখেড়া হল দেখা যাচ্ছে। নৃপেন কাতরভাবে সুমিতার দিকে তাকায়। সুমিতা উঠে বসে এবার। চিৎকার করে বলে—না, নৃপেনকে নয়, টেলিফোনকে—'মশাই শুনছেন। ঘণ্টা-ছয়েক পরে ফোন করবেন। ও. সি. সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, তখন থাকবেন না।'

যন্ত্রটা এ উপদেশে কান দিল না। একগুঁয়েমি চালিয়েই চলে 'ক্রিররং-ক্রিং।'

দুত্তোর নিকুচি করেছে! উঠে পড়ে সুমিতা। দুম-দুম করে পা ফেলে চলে আসে হল-কামরায়। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, 'বলুন? হ্যাঁ, আছেন। না, ঘুমোচ্ছেন না। আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

নৃপেন কর্ণময়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল থেকে? মিস্টার গুহ বলছেন? না? কী! সে কী!।'

এবার খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে নৃপেন। ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে জড়াবার কথা আর মনেই থাকে না। সুমিতার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে নৃপেন দৌড়ে এসে বলে, 'কী হয়েছে সুমিতা?'

সুমিতা জবাব দেয় না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে। শীতেই কি না বোঝা গেল না, সে রীতিমতো কাঁপছে। দ্রুতহাতে নৃপেন রিসিভারটা কেড়ে নেয়, বলে,'ও. সি. সদর বলছি। কে আপনি? ইয়েস! কী? কী বলছেন মশাই! অসম্ভব!।'

সুমিতা ইতিমধ্যে বসে পড়েছে সামনের চেয়ারখানায়।

দীর্ঘ সময় নৃপেন আর কিছু বলে না টেলিফোনে, শুধু শুনে যায়। তারপর বলে, 'কোনও কিছু ছোঁবেন না। ঘরটা তালাবদ্ধ করে রাখুন। আমি পনেরো মিনিটের ভেতর আসছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে ঘুরে দাঁড়ায়। সুমিতার মুখোমুখি। বলে, 'শুনলে?'

সুমিতা জবাব দেয় না। মাথাটা নাড়ে শুধু।

'কী হতে পারে বলো তো? হার্টফেল? থ্রম্বোসিস?'

'আমি, আমি এখনও বিশ্বাসই করে উঠতে পারছি না। কাল রাত্রেও ভদ্রলোক কত হাসি-মশকরা করে গেলেন। ওঁর এঁটো প্লেটটা পর্যন্ত এখনও—।'

নৃপেনের দৃষ্টি চলে যায় ডাইনিং টেবিলে। তিনটি ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট। রমেন গুহর প্লেটে পাশাপাশি দুখানা ঠ্যাং। রাত পৌনে দশটা নাগাদ রমেন হোটেলে ফিরে যায়। আর আজ সকাল ছ'টা দশে সে-লোকটা বেঁচে নেই? ইম্পসিবল!

॥ দুই ॥

সকাল সাড়ে সাতটা। হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার ম্যানেজারের ঘরে জমিয়ে বসেছিল নৃপেন। এখন আর ঘুম-ঘুম চোখ স্লিপিং সুট পরা নৃপেনবাবু নয়, ধবধবে-সাটা দার্জিলিং সদর থানার জাঁদরেল ও. সি.। সমস্ত হোটেলটা সে ইতিমধ্যে মোটামুটি ঘুরে দেখেছে। তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করেছে দোতলার তেইশ নম্বর কামরাটা। রমেন গুহর মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। ওর মৃত্যুশীতল পা দুটো দেখে নৃপেনের মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা একটা ডিনার প্লেটে পাশাপাশি শোয়ানো ভুক্তাবশিষ্ট

BanglaBook.org

মুরগির ঠ্যাং-জোড়া। পুলিশ ফটোগ্রাফার এসে ফটো নিয়ে গেছে। দেহটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়নি এখনও। ইতিমধ্যে টেলেক্স চলে গেছে কলকাতায়, লালবাজার কন্ট্রোল রুমে। হয়তো রমেন গুহর পরিবারেও এতক্ষণে সংবাদটা পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ না কেউ এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ দেহটা ঠান্ডা ঘরে রাখতে হবে। কেসটা আত্মহত্যাই—থ্রম্বোসিস টম্বোসিস নয়—যদিও এখনও কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবু বড়কর্তার হুকুম ছাড়া দেহটা দাহ করাও চলবে না। সুবীর হেড-কোয়ার্টার্সে থাকলে ভালো হত। ছোকরার মাথাটা এসব বিষয়ে বেশ খেলে। দুর্ভাগ্যবশত সুবীর রায় দিন তিনেক আগে একটা তদন্তে কার্শিয়ঙে নেমেছে। সুবীর ওর অধীনে পোস্টেড বটে, তবে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিষয়ে সে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছে। তুখোড় ছোকরা। এসব বিষয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে টেক্কা দিতে পারে।

হার্টফেল যে নয়, কেসটা যে আত্মহত্যাই তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত রমেন গুহ আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে তার খাটে; আর তার ডানহাতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস। আশ্চর্য! গ্লাসটা কাত হয়ে যায়নি—বস্তুত নৃপেন যখন ওকে পরীক্ষা করে তখনও মৃতদেহের ডানহাতে বজ্রমুষ্টিতে ধরা ছিল ওই গ্লাসটা—ওই যে 'রিগর-মর্টিস' না কী যেন বলে। নৃপেনের দৃঢ় বিশ্বাস গ্লাসে তরল পানীয়ে কোনও তীব্র বিষ মিশিয়ে রমেন পান করেছে। বিষটা এতই তীব্র যে, তৎক্ষণাৎ ওর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে আত্মহত্যা কেন করল রমেন? কই, গতকাল রাত্রেও তো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যে-লোক মধ্যরাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে কি সন্ধ্যারাত্রে ওভাবে হাসি-মশকরা করতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা হবে কী করে? রমেনের ঘর ছিল তালাবন্ধ। হোটেলে সে সবেমাত্র এসেছে। তার হাতের ঘড়ি, পকেটের পার্স পর্যন্ত খোয়া যায়নি। এখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কে, কোন উদ্দেশ্যে তাকে খুন করবে? তা ছাড়া তালাবন্ধ ঘরে সে ঢুকবেই বা কী করে?

'স্যার!'

'উঁ?' সংবিত ফিরে পায় নৃপেন দারোগা।

হাত দুটি গরুড় পক্ষীর মতো জোড় করে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের ম্যানেজার। বিনীতভাবে বলে, 'মুর্দাকে এবার হটাবার হুকুম দিয়া যায় সাব। পূজা মরশুম। হমার সব বোর্ডার ভাগিয়ে যাবে!'

একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নৃপেন বলে, 'মুর্দা! ও লোকটা কে জানো? বেঁচে থাকলে ও আজ বসত আমার চেয়ারে! ও একজন দারোগা!'

ম্যানেজার যোগিন্দর কাপাডিয়া একটি তিনদুর্গ-আঁকা সবুজ টিন বাড়িয়ে ধরে। তার গর্ভে সাদা সিগারেট। যোগিন্দর গলাটা সাফা করে, মুর্দার যে জাত নেই এমন একটা দার্শনিক উক্তি করবে কি না বুঝে উঠতে পারে না।

পাশ থেকে ওর অফিস-ক্লার্ক মহেন্দ্র বলে, 'সে আমরা জানতাম স্যার। দেখুন দেখি, কী কাণ্ড হয়ে গেল!'

নৃপেন ত্রি-দুর্গ-আঁকা টিন থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'এখন বলো দিকিন—কে ওকে প্রথম ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে?'

'রুম-বেয়ারা স্যার। বীরবাহাদুর। বেড-টি দিতে গিয়ে—।'

বাধা দিয়ে নৃপেন বলে ওঠে, 'নো সেকেন্ড হ্যান্ড স্টোরি প্লিজ। প্লিজ রুম-বেহারাকো বোলাও!'

শুধু রুম-সার্ভিসের বেয়ারা নয়, ডাক পড়ল অনেকেরই। ক্রমে-ক্রমে এল তারা এজাহার দিতে। কুক, হেডকুক, গেট-কিপার, কাউন্টার ক্লার্ক ইত্যাদি। টুকরো-টুকরো জবানবন্দি থেকে সংগৃহীত হল সম্পূর্ণ কাহিনিটা। হোটেল রেজিস্টার অনুযায়ী রমেন গুহ এসে পৌঁছয় পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। দোতলার তেইশ নম্বরে আশ্রয় নেয়। সাড়ে বারোটায় সে মালপত্র রেখে বেরিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ফিরে আসে রাত দশটায়। কোনও 'মিল' নেয়নি সে। এমনকী এক কাপ চা পর্যন্ত খায়নি। তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে পরদিন সকাল ছ'টায়।

কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্রর জবানবন্দি অনুসারে কাল দুপুরে একটি ট্যাক্সি চেপে রমেন গুহ আসে। শেয়ারের ট্যাক্সি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। ট্যাক্সিতে তিনজন লোক ছিল। তিনজনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে ওঠে। দ্বিতলের পাশাপাশি তিনখানা সিংগল সিটেড রুম ভাড়া নেয়। অথচ ওরা তিনজন পৃথক যাত্রী। ওরা পরস্পরকে চিনত না।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কেমন করে জানলে ওরা পরস্পরকে চিনত না?'

'স্বচক্ষে দেখলাম স্যার! ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে দাঁড়াল। ওঁরা তিনজনে ট্যাক্সি ভাড়ার এক-তৃতীয়াংশ দিলেন। তারপর আমার হোটেল-রেজিস্টারে পর পর নাম লেখালেন। ঠিকানা সব আলাদা। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, একজন খ্রিস্টান। '

'ঠিক আছে। এবার বলো—রমেন গুহর সহযাত্রী দুজন কত নম্বরে আছেন?'

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বলে, 'সেইখানেই তো ঝামেলা হয়েছে স্যার। দুজনেই ইতিমধ্যে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন।'

'বল কি! কাল বেলা বারোটায় চেক-ইন করে আজ সকাল সাতটাতেই চেক-আউট?'

'দুজনেই নয় স্যার। মিস্টার মহম্মদ ইব্রাহিম চেক-আউট করেছেন কাল রাত সাড়ে আটটায় আব মিস ডিক্রুজা আজ ভোর পাঁচটায়।'

'মিস ডিক্রুজা! মেমসাহেব?'

'না স্যার। দিশি মেমসাহেব। দেখলে বাঙালি বলেই মনে হয়।'

'ভোর পাঁচটায়! অত ভোরে?'

'হ্যাঁ স্যার। টাইগার-হিলে সানরাইজ দেখতে গেলেন যে। বললেন আজই নামবেন। মালপত্র নিয়েই চেক-আউট করে বেরিয়ে গেলেন।

সন্দেহজনক। অত্যন্ত সন্দেহজনক। রমেন গুহ মারা গেছে রাত দশটার পরে। তেইশ নাম্বার ঘরে। আর ঠিক তার পাশের ঘরের বাসিন্দা কাকডাকা ভোরে হোটেল ছেড়ে দিল। পরবর্তী ঠিকানা না রেখে? অবশ্য মহম্মদ ইব্রাহিমকে সন্দেহ করার কিছু নেই। সে চেক-আউট করেছে রাত সাড়ে আটটায়—রমেন তখনও নৃপেনের বাড়িতে। বহাল তবিয়তে। মহম্মদ ইব্রাহিম আর মিস ডিক্রুজার স্থায়ী ঠিকানা দুটো নৃপেন লিখে নিল তার নোটবইতে। খোদা মালুম সেগুলো আদৌ সত্য কি না। কাউন্টার-ক্লার্ক ছোকরাটি বেশ চলতা-পুর্জা। অনেক খবর দিতে পারল সে ওই দুজনের সম্বন্ধে। ছোকরা লক্ষ করেছে অনেক কিছুই। মিস ডিক্রুজার বয়েস সাতাশ-আঠাশ, যদিও সাজে-সজ্জায় সে নিজেকে বাইশ-তেইশ বলতে চায়। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। বিজ্ঞের মতো বললে—ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স হবে, এই ধরুন ৩৪-২৮-৩২। চুল ছোট, বব নয়। রং মাজা, ফরসা ঘেঁষা। খুব ভালো বাংলা বলতে পারে—নাম না বললে বাঙালি বলে ভুল হতে পারে। সিগারেট খায়। 'প্রফেশান'-এর ঘরে লেখা আছে 'হাসিফ'। মিস কী করে গৃহকর্ত্রী হয় তা জানে না মহেন্দ্র। তবে সে তাতে আপত্তি করেনি। তার সঙ্গে ছিল একটা ভি. আই. পি-মার্কা সোনা স্যুটকেস। অপরপক্ষে মহম্মদ ইব্রাহিমের বয়স ত্রিশের ওপর, চল্লিশের নীচে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও গোঁফ আছে, চোখে চশমা। পাইপ খান। প্রফেশান—তাঁর রিপ্লাইমতো—বিজনেস।

হেড-কুক সবিনয়ে নিবেদন করল খাবারে কোনওক্রমেই কোনও বিষাক্ত পদার্থ মিশে যেতে পারে না। তার যুক্তি প্রাঞ্জল : তাহলে তো হুজুর হোটেলসুদ্ধ লোক আজ মরে ভূত হয়ে থাকত।

নৃপেন ধমক দেয়, 'বাজে কথা বোলো না। কে বলেছে খাবারে বিষ ছিল? রমেন তোমার কিচেনের খাবার খায়নি। কিন্তু ওর ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল রয়েছে দেখলাম। গরম জল তুমি সাপ্লাই করেছিলে?'

হেডকুক সভয়ে নিবেদন করে, 'বোর্ডারের ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল থাকলে তা আমার কিচেন থেকেই সাপ্লাই হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জল তো আমি স্রেফ কল থেকে নিয়ে গরম করেছি স্যার!'

'জানি, নর্দমা থেকে নাওনি। কিন্তু জলটা ওর ঘরে কে রেখে এসেছিল?'

'তার জিম্মেদারি আমার নয় হুজুর। রুম-সার্ভিস বেয়ারার কাজ ওটা।'

'হুঁ। কী নাম সেই রুম-সার্ভিসের বেয়ারার?'

'বীরবাহাদুর, স্যার।'

'বীরবাহাদুর কার নাম?'

কেউ সাড়া দেয় না।

নৃপেন প্রচণ্ড ধমক লাগায়, 'আধঘণ্টা থেকে ডাকছি, বীরবাহাদুর আসছে না কেন? এরা ভেবেছে কী, দারোগা খুন করে পার পাবে। সবক'টার মাজায় দড়ি বেঁধে চালান দেব আমি!'

একটা রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। দু-তিনজন ছোটে বীরবাহাদুরের খোঁজে। যোগিন্দর কাপাডিয়া কী করবে ভেবে না পেয়ে আবার থ্রি-কাসলস-এর টিনটা বাড়িয়ে ধরে। নৃপেন আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়।

তিন-চারজনে ইতিমধ্যে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে বীরবাহাদুরকে। বেচারির পিতৃদত্ত নামের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত। বীরত্ব এবং বাহাদুরি। নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে, এসে দাঁড়াল দারোগা সাহেবের সামনে।

'তোমার নাম বীরবাহাদুর?'

'জি হ্যাঁ।'

'তোম বীর হ্যায় ইয়া বাহাদুর হ্যায়?'

বেঁটে লোকটা কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

অনেক জেরার পরে লোকটা হলফ খেয়ে বললে, 'সে থার্মোফ্লাস্কে বিষ-টিষ কিছু মেশায়নি। তার বিশ বছরের নোকরি। এমনটি এর আগে কখনও হয়েছে?'

'তুমি ফ্লাস্কটা নিয়ে কিচেন থেকে সোজা ওই তেইশ নম্বর ঘরে গিয়েছিলে, না কি ফ্লাস্কটা আর কারও হাতে ধরতে দিয়ে বিড়ি-টিড়ি খেয়েছিলে?'

'জি নেহি সাব! ম্যয় বিড়ি নেহি পিতা!'

'ধেত্তেরি! যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। সিধে তেইশ নম্বরমে গয়া থা ক্যা?'

'জি সাব!'

'ঠিক আছে। এবার আজ সকালের কথা বলো। কখন তুমি প্রথম জানতে পারলে?'

বীরবাহাদুর যে বর্ণনা দিল তা সংক্ষেপে এই :

হোটেলের আইন অনুসারে রাত সাড়ে দশটার পর রুম-সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ভোর সাড়ে চারটের আগে আর রুম-সার্ভিস পাওয়া যায় না। টাইগারহিলে যাওয়ার বায়নাক্কা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বোর্ডারকে ভোর সাড়ে চারটেয় বেড-টি দিতে হয়। তাই শেষরাত্রে অন্ধকার থাকতেই কিচেনটি কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করে, 'রুম নম্বর চব্বিশে বেড-টির অর্ডার ছিল আজ?'

'জি নেহি। চব্বিশ মে থি বহু মেমসাব। উসনে বেড-টি নেহি লি-থি।'

নৃপেন মহেন্দ্রের দিকে ফিরে বললে, 'তবে যে তখন তুমি বললে—মিস ডিক্রুজা আজ সকালে টাইগার-হিলে গেছে?'

মহেন্দ্র আমতা-আমতা করে বললে, 'ইয়ে, টাইগার-হিলে যেতে হলে চা খেয়ে যেতে হবেই, এমন কোনও আইন নেই স্যার!'

'আমি জানি। বাজে কথা বলো না!' ধমক দেয় নৃপেন দারোগা। তারপর বীরবাহাদুরের

BanglaBook.org

দিকে ফিরে বলে, 'তেইশ নম্বরে বেড-টির অর্ডার ছিল?'

'জি সাব। পৌনে ছে বাজে!'

ব্যাপারটা বিস্তারিত করে বুঝিয়ে দেয় বীরবাহাদুর। তেইশ নম্বরে ছিলেন এক দারোগা সাহেব। মানে যিনি মারা গেছেন। তিনি পৌনে ছ'টায় চা চেয়েছিলেন। বীরবাহাদুর ঠিক সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে ওঁর দরজার সামনে এসে নক করে। কেউ সাড়া দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে। তবু কেউ সাড়া দেয় না। ওই সময় ওদিককার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক সাহেব পাইপ খাচ্ছিলেন। তিনি বাহাদুরকে বলে ওঠেন, 'কেন হোটেলসুদ্ধ লোকের সুখনিদ্রায় বাধা দিচ্ছ বাবা? তোমার ওই কুম্ভকর্ণ-সাহেবের ঘুম যখন ভাঙবে তিনি নিজেই চা চাইবেন।' তখন বাহাদুর সেই পাইপমুখো সাহেবকে বলেছিল, 'এমন কাণ্ডটা ঘটলে ম্যানেজার রাগ করবেন স্যার। উনি ভাববেন, আমি মিছে কথা বলছি—সময়মত বেড-টি দিতে আসিনি আমি।' তখন সেই পাইপমুখো সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষী মেনো বাবা। আমি দরকার হলে আদালতে হলফ নিয়ে বলব—তোমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

নৃপেন প্রশ্ন করে, উনি অত ভোরে ওই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

'ওহ্ নেহি জানতা সাব!'

মহেন্দ্র ওপর-পড়া হয়ে বলে, 'ওই বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সান-রাইজ দেখা যায় স্যার। উনি বোধ হয়—।'

'তুমি চুপ করো!' ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, 'তারপর? বলে যাও—।'

বীরবাহাদুর তার জবানবন্দি শুরু করে। ঠিক ওই সময়েই নাকি সেই তেইশ নম্বর ঘরের ভেতর একটা অ্যালার্ম ক্লক বেজে ওঠে। পুরো এক মিনিট সেটা বাজে। তাতেও ঘরের ভেতর কোনও সাড়াশব্দ জাগে না। পাইপমুখো সাহেব এবার কৌতূহলী হয়ে নিজেই এগিয়ে আসেন। চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বলে ওঠেন, 'আশ্চর্য, ঘরে আলো জ্বলছে!' এরপর উনি একটা দেশলাই জ্বেলে দরজার ওপর কার্ড আটকানো খোপটা দেখে বলে ওঠেন, 'রমেন গুহ! পুলিশের লোক নাকি?' বীরবাহাদুর জবাবে বলেছিল, 'জি সাব!' পাইপমুখো তখন বলেন, 'তবে তো আমার চেনা লোক মনে হচ্ছে। তুমি এক কাজ করো তো হে! কাউন্টারে গিয়ে এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে এস। বীরবাহাদুর অগত্যা ট্রে-টা নামিয়ে রেখে একতলায় কাউন্টারে ফিরে যায়। কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্র বাহাদুরকে একটা মাস্টার কি দেয়। সেটা নিয়ে বাহাদুর—।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও—' এখানেই বীরবাহাদুরের জবানবন্দি থামিয়ে নৃপেন মহেন্দ্রর দিকে ফিরে প্রশ্ন করে—'মাস্টার কি' বস্তুটা কী?

'প্রতি ঘরের 'ডুপ্লিকেট কি' ছাড়াও আমার কাছে দুটো মাস্টার-কি আছে। তার একটা চাবি দিয়ে একতলার সব ঘর খোলা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে দোতলার সব ঘর খোলা যায়।'

'আই সি! তা তুমি বাহাদুরকে ওই তেইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা না দিয়ে ফস করে "মাস্টার কি" দিয়ে বসলে কেন?'

'তেইশ নম্বর ঘরের দুটো চাবিই ওই গুহ-সাহেব আমার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন।'

'দুটো চাবিই তোমরা বোর্ডারকে দাও?'

'না স্যার। তবে আমি জানতাম ওই গুহ-সাহেব আপনার জায়গায় বদলি হয়ে আসছেন। তাই—।'

'বুঝেছি!' নৃপেন এবার বাহাদুরের দিকে ফিরে বললে, 'প্রসিড।'

বুঝতে অসুবিধে হল না বাহাদুরের। সে তার জবানবন্দির সূত্র তুলে নেয়।

মাস্টার-কি দিয়ে দরজা খুলে ওরা দুজনে ঘরে ঢোকে—বাহাদুর আর সেই পাইপমুখো সাহেব। দেখে, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলের ওপর মুখ বন্ধ করা একটা জলের ফ্লাস্ক, একটা হুইস্কির

BanglaBook.org

বোতল, এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট, একটা দেশলাই, একটা অ্যাশট্রে আর একটা অ্যালার্ম ক্লক। রমেনের হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস—তাতে ঈষৎ পীতাভ কিছু তরল পানীয়। সম্ভবত গরমজলে মেশানো হুইস্কি ছিল ঘণ্টাকতক আগে—তখন বরফ-ঠান্ডা। বীরবাহাদুর কোনওক্রমে চায়ের ট্রে-টা নামিয়ে রাখে। পাইপমুখোসাহেব রমেনকে পরীক্ষা করেন। নাড়ি দেখেন, কানের নীচে চোয়ালের তলায় কী একটা পরীক্ষা করেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলেন, 'মারা গেছে। তোমার ম্যানেজারকে খবর দাও।' বাহাদুর হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে নীচে।

'সে কী! ওই পাইপমুখোসাহেবকে ওই ঘরে একা রেখে?'

'জি হুজুর। ইয়ে তো বাতায়া ওহ। কহা কি ম্যানেজারকো সেলাম দো!'

'সেলাম দেওয়াচ্ছি!' নৃপেন ঘুরে দাঁড়ায় যোগিন্দরের মুখোমুখি। বলে, 'কী মশাই, তবে যে বললেন মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ও ঘরে কেউ ঢোকেনি? ওটা তালাবন্ধ পড়ে আছে?'

যোগিন্দর আমতা-আমতা করে। মহেন্দ্র বলে, 'ইয়ে বাহাদুর নীচে এসে খবর দেওয়া মাত্র আমি দৌড়ে ওই ঘরে উঠে যাই। মিনিট তিন-চারের বেশি ওই বোর্ডার ভদ্রলোক ও ঘরে একা ছিলেন না।'

'থামো তুমি। হুঁঃ, তিন-চার মিনিট। চার মিনিট কি কম সময়? ওর ভেতর অনেক কিছু করে ফেলা যায়, বুঝেছ? সবক'টার মাজায় দড়ি বাঁধব আমি।'

যোগিন্দর সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরবে কি না ভেবে পায় না। নৃপেনের আগের সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি।

'ওই পাইপমুখো কি হোটেলে আছেন, না কি তাঁকেও চেক-আউট করিয়ে দিয়েছ?'

মহেন্দ্র হাত কচলে বলে, 'না স্যার, উনি আছেন। একতলায় একটা ডাবল-বেড রুম নিয়ে আছেন। সস্ত্রীক।'

'দেখবে, যেন তিনি না ইতিমধ্যে কেটে পড়েন। তাঁকে খবর দাও—আমি দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘরে যাচ্ছি। তাঁর এজাহারটা নিতে হবে—।'

যোগিন্দরের ইঙ্গিতে একজন তখনই চলে গেল পাইপমুখোকে রুখতে।

'তারপর? ওপরে এসে কী দেখলে? না, তুমি নয়—বাহাদুর তুমি বলো। পাঁচ মিনিট পরে যখন তুমি ওপরে এলে তখন কী দেখলে? পাইপমুখো কী করছিলেন তখন?'

'তামাম কামরাঠো তালাশ করতা থা!'

'বাঃ-বাঃ-বাঃ! চমৎকার!' নৃপেন দারোগা দগ্ধাবশেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগিন্দরের দিকে ফেরে। বলে, 'কী মশাই? আপনি অম্লানবদনে বললেন ঘরটা বরাবর তালাবন্ধ আছে। কেউ কিছু টাচ করেনি, ট্যাম্পার করেনি!'

যোগিন্দর তৎক্ষণাৎ সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরে।

'দূর মশাই! সিগারেট নিয়ে কী করব? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন।'

যোগিন্দর হাত দুটি জোড় করে বললে, 'স্যার, বাসু-সাহেবকে আমি বিশ বরিস ধরে জানি। নাম-করা ব্যারিস্টার। উনি কোনও কিছু ট্যাম্পার করতেই পারেন না।'

'বাসু-সাহেব! কে বাসু-সাহেব?'

'ওই যাঁকে বীরবাহাদুর পাইপমুখোসাহেব বলছে। ওঁর নাম পি. কে. বাসু আছে। উনি বহুবার আমার হোটেলে উঠেছেন। একদম শরিফ আদমি। এককালে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে লাখ-লাখ টাকা খিঁচেছেন। এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন।'

'লাখ-লাখ টাকা খেঁচার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কোনও সম্পর্ক নেই, বুঝেছেন? যাক তাঁর সঙ্গে তো এখনই কথা বলব। তারপর কী হল বলুন?'

জবাব দিল মহেন্দ্র—'তারপর আর কী? আমরা ঘরটা তালাবন্ধ করে নেমে এলাম। আপনাকে

BanglaBook.org

ফোন করলাম। ঠিক ছ'টা বেজে দশে।'

ইতিমধ্যে একজন বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা খালি ব্র্যান্ডির শিশি। নৃপেন সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'খুব ভালো করে ধুয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো করে বারবার ধুয়েছি।'

'ঠিক আছে। এবার আর একবার ওই তেইশ নম্বর ঘরে যেতে হবে। চলুন।'

তেইশ নম্বর ঘরে এসে নৃপেন স্বহস্তে ওই কাচের গ্লাস থেকে তরল পদার্থটি শিশিতে ভরে নিল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। নেমে এল নীচে। সকলকে বিদায় দিয়ে একাই চলে এল নির্দেশমতো একতলায় এক নম্বর ঘরে। সব ঘরেই ইয়েল-লক, ছিটকিনি নেই। অর্থাৎ দরজা ঠেলে বন্ধ করলে চাবি ছাড়া দরজা খোলা যায় না। এক নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভারী পরদা ঝুলছে। নৃপেন খোলা দরজায় 'নক' করল। ভেতর থেকে আহ্বান এল ইয়েস! কাম ইন প্লিজ!

পরদা সরিয়ে নৃপেন প্রবেশ করল ঘরে।

ডাবল বেড বড় ঘর। একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে। তাঁর হাতে একজোড়া উলের কাঁটা। উলের সোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর মুখোমুখি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ড্রেসিং-গাউন পরে বসেছিলেন ইজিচেয়ারে। বোধ করি কী একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন স্ত্রীকে। বইটা মুড়ে এদিকে ফিরে বললেন, 'বসুন। মিস্টার ঘোষাল আই প্রিসিউম? ও. সি. সদর?'

'হ্যাঁ, আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।'

'নট দ্য লিস্ট, নট দ্য লিস্ট। বলুন কী ভাবে আপনাকে সাহায্য কবতে পারি। বাই দ্য ওয়ে, আপনার হাতে ওটা কী? ব্র্যান্ডি?'

'না। মৃতের হাতের গ্লাসে যে তরল পদার্থটা ছিল সেটা নিয়ে যাচ্ছি। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করাতে হবে।'

'ও। তা করান। তবে কী পাবেন তা আগেই বলে দিতে পারি। অ্যালকোহল, অ্যাকোয়া আব কে. সি. এন।'

' "কে. সিয়েন" মানে?'

'পটাসিয়াম সায়ানাইড!'

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই বিদ্যে জাহির করবার প্রচেষ্টা দেখে নৃপেন মনে-মনে হাসে। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারায় এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, সে প্রকাশ্যে হেসে উঠতে পারল না। বললে, 'আপনি ব্যারিস্টার মানুষ! নিশ্চয় বুঝবেন, অমন আপ্তবাক্যে কোনও কোর্টে কনভিকশন হয় না। এটা এভিডেন্স হিসেবে তখনই গ্রাহ্য হবে যখন কোনও বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক তাঁর ল্যাববেটারিতে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট দেবেন।'

'কারেক্ট! কোয়াইট কারেক্ট! এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সত্ত্বেও ওটা এভিডেন্স হিসেবে গ্রাহ্য হবে না।'

হাসি-হাসি মুখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে থাকেন নৃপেন দারোগার দিকে। অর্থাৎ এবার তুমি জানতে চাও—কেন গ্রাহ্য হবে না? তা কিন্তু জানতে চাইল না নৃপেন। সে মনে-মনে রীতিমতো চটে উঠেছে এ ভদ্রলোকের অহেতুক মোড়লিতে। ওকে নীরব থাকতে দেখে বাসু-সাহেব নিজেই বলে ওঠেন—'কেন গ্রাহ্য হবে না জানেন?'

এতক্ষণে রুখে ওঠে নৃপেন, 'না, জানি না। জানতে চাইও না।'

বাসু-সাহেব কিন্তু রাগ করেন না। হেসেই বলেন, 'গ্র্যাটিস লিগ্যাল অ্যাডভাইস আমি দিই না, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে না হয় ব্যতিক্রমই করলুম। আপনার উচিত ছিল যে-সব সাক্ষীর সামনে ওই তরল পানীয়টা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের উপস্থিতিতেই ওটা সিলমোহর কবা। ডিফেন্স কাউন্সিলারগুলো ভারি পাজি হয়, বুঝেছেন—তারা কিছুতেই মানতে চাইবে না বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে

BanglaBook.org

যে লিকুইডটার পরিচয় লেখা আছে সেটাই ওই মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া গেছে। বলবে, সিল যখন করা নেই তখন অ্যাকিউসডকে ফাঁদে ফেলতে আপনি নিজেই ওতে কিছুটা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট আপনি ইচ্ছে করলে এখনও তা মেশাতে পারেন। তাই নয়?'

কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে নৃপেনের।

'যাক ও কথা। আমার কাছে কী জানতে চান বলুন?'

অপমানটা গলাধঃকরণ করে নৃপেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। বলে, 'আপনিই মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করেন?'

'নট এক্সজ্যাক্টলি। আমরা দুজন। আমি আর বীরবাহাদুর।'

'এবং তার পরেই আপনি বীরবাহাদুরকে নীচে যেতে বলেন?'

'অ্যাফার্মেটিভ।'

'আপনি কতক্ষণ ওই ঘরে একা ছিলেন?'

'পাঁচ থেকে সাত মিনিট।'

'ওই পাঁচ-সাত মিনিট ধরে আপনি ঘরটা তন্ন-তন্ন করে সার্চ করেছেন?'

'পাঁচ-সাত মিনিটে একটা ঘর তন্ন-তন্ন করে সার্চ করা যায় না। মোটামুটি তল্লাশি করেছিলাম।'

'কাজটা ভালো করেননি।'

মিসেস বাসু তাঁর হুইল চেয়ারটা চালিয়ে পিছনের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন এ-কথায়। বাসু-সাহেব হাসি-হাসি মুখেই বলেন, 'য়ু থিংক সো?'

রূঢ়তর কণ্ঠে নৃপেন বলে, 'হ্যাঁ, তাই মনে করি আমি। আপনি হয়তো কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নষ্ট করে ফেলেছেন তল্লাশ করতে গিয়ে।'

'করিনি। আমার হাতে গ্লাভস পরা ছিল। তা ছাড়া এসব কেস কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আমার জানা আছে।'

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারে না নৃপেন। রীতিমতো ধমকের সুরে বলে, 'না, আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, ডিটেকটিভ নন। তবু ল-ইয়ার হিসেবে আপনার জানা থাকা উচিত যে, পুলিশ এসে পৌঁছনোর আগে কোনও কিছু পরীক্ষা করার অধিকার আপনার নেই!'

মিসেস বাসু শঙ্কাভরা দুচোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীকে তিনি ভালোমতোই চিনতেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। বোধ করি সেজন্যই কোনও বিস্ফোরণ হল না। বাসু-সাহেব শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'লুক হিয়ার মিস্টার ও. সি. হেড-কোয়ার্টার্স! আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। হিয়ার্স মাই কার্ড! আপনি যা ভালো বোঝেন করতে পারেন।'

নৃপেন হাত বাড়িয়ে কার্ডটা গ্রহণ করে না। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

বাসু-সাহেব বলেন, 'আগেই বলেছি গ্র্যাটিস লিগাল অ্যাডভাইস দেওয়া আমার স্বভাব নয়। এক্ষেত্রে তবু দিতে বাধ্য হচ্ছি এজন্যে যে, রমেন গুহ ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন।'

'রমেন গুহ আপনার পরিচিত?' প্রশ্ন করে নৃপেন।

বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, 'এটা যে আত্মহত্যা নয়, বরং একটা ফার্স্ট ডিগ্রি ডেলিবারেট মার্ডার তার অকাট্য এভিডেন্স আমি পেয়েছি। যেহেতু কেসটা রমেন গুহর, তাই কতকগুলো ক্লু আপনাকে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে বসবেন?'

নৃপেন বসে না। একগুঁয়ে ছেলের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলে, 'কী ক্লু?'

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বললেন, 'মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা শুনলেই কিন্তু আপনি ভালো করতেন। তাতে আপনার নেহাত আপত্তি থাকলে আমি বিপুলকেই সব কথা জানাব। আফটার অল, এটা রমেন গুহর কেস!'

BanglaBook.org

'বিপুল! বিপুল কে?'

'ডি. সি. দার্জিলিং। বিপুল ঘোষ। তার স্ত্রী মণির মামা হই আমি।'

নৃপেন বসে পড়ে। পথে নয়, চেয়ারে। বলে, 'বলুন, কী বলবেন?'

'আপনি তদন্ত করে কী বুঝেছেন? এটা আত্মহত্যার কেস?'

'না। রমেনের আত্মহত্যার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি আমি। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সে আমার বাড়িতেই ছিল। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। আমাদের সঙ্গেই রাত্রে খেয়েছে, হাসি-গল্প করেছে—হোটেলে ফিরে এসে সে তার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছে তাতেও কোনও ইঙ্গিত নেই!'

'সুতরাং—?'

'কিন্তু ওকে এখানে কে হত্যা করতে চাইবে? ওর হাতঘড়ি, মানিব্যাগ পর্যন্ত খোয়া যায়নি!'

'রমেন গুহ দারোগা ছিল। যেখান থেকে ও বদলি হয়ে এসেছে সেখানকার কোর্টে এমন দশ বিশটা কেসে হয়তো তাকে সাক্ষী দিতে যেতে হত। অন্তত একডজন আসামি খুশি হবে লোকটা বেমক্কা মারা গেলে, নয়? তাদের মধ্যে অন্তত আধডজন পাকা ক্রিমিনাল! খুনি-ডাকাত-ওয়াগন-ব্রেকার-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! তাদের মধ্যে কেউ—।'

'কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ওর রুদ্ধদ্বার ঘরে মদের পাত্রে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে কেমন করে? রমেন কাল বেলা বারোটায় হোটেলে ঢুকেছে, সাড়ে বারোটায় ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে রাত দশটায়। এর মধ্যে তার ঘরে কেউ ঢোকেনি।'

'য়ু থিংক সো?'

'নিশ্চয়। আপনি হয় তো জানেন না, ও তার ঘরের দুটো চাবিই চেয়ে নিয়েছিল!'

'জানি। কিন্তু কেন? দুটো চাবি নিয়ে সে কী করবে? সে তো একা মানুষ!'

নৃপেন একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'আমি জানি না।'

'আই সি! জানেন না!'

আবার রুখে ওঠে নৃপেন, 'কেন, আপনি জানেন?'

'জানি। কিন্তু ও কথা থাক। তার আগে বলুন তো—বীরবাহাদুর ঠিক ক'টার সময় গরম জল ভরতি ফ্লাস্কটা ওর ঘরে রেখে আসে?'

নৃপেন আবার অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, 'আমি জানি না।'

'আই সি! জানেন না! সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম। রমেন যখন সাড়ে বারোটার সময় বেরিয়ে যায় তখনই বলে যায়, তার ঘরে যেন এক ফ্লাস্ক গরম জল রেখে দেওয়া হয়। ফ্লাস্কটা তার নিজের। এখন বলুন তো, দুটো চাবিই যখন রমেনের কাছে তখন বীরবাহাদুর কেমন করে ও ঘরে ঢুকল?'

এ সমস্যা অনায়াসে সমাধান করে নৃপেন। বলে, 'জানি, ওই মাস্টার-কি দিয়ে।'

'ও! জানেন! তাহলে আপনার ওই আগেকার স্টেটমেন্টটা তো ঠিক নয়। ওই যে বললেন—'বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ও-ঘরে কেউ ঢোকেনি।'

নৃপেন অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, 'কী আশ্চর্য! বীরবাহাদুর কেন বিষ মেশাবে? সে এ হোটেলে বিশ বছর চাকরি করছে—তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'কারেক্ট! কিন্তু বীরবাহাদুর তার মাস্টার-কি দিয়ে যখন ঘরটা খুলেছিল, তখন আর কেউ কি ওই ঘরে ঢুকেছিল তার সঙ্গে?'

নৃপেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ-জাতীয় অনুসন্ধান সে করেনি।

বাসু-সাহেব নিজে থেকেই বলেন, 'ঢোকেনি। আমি বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। সে তালা খুলে একাই ঘরে ঢোকে। ফ্লাস্কটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। ঘরটা আবার তালাবন্ধ করে। পুরো এক মিনিটও সে ছিল না ওই ঘরে। সুতরাং আর কেউ কোনও সুযোগই

BanglaBook.org

পায়নি।'

'তার মানে আপনি বলতে চান, বীরবাহাদুরই একমাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি?'

'আমি মোটেই তা বলছি না। কারণ আমার কাছে এভিডেন্স আছে—বীরবাহাদুর ছাড়াও অন্তত দুজন ওই ঘরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল, গতকাল বেলা বারোটার পরে এবং আজ সকাল ছ'টার আগে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নৃপেনের। বলে, 'কী বলছেন! দুজন ওই ঘরে ঢুকেছিল?'

'ডিড আই সে দ্যাট? আমি বলেছি ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল।'

'অর্থাৎ তারা যে ঢুকেছিল তার প্রমাণ নেই?'

'আছে। একজন যে ঢুকেছিল তার একটা প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়জনও খুব সম্ভবত ঢুকেছিল। কনক্লুসিভ প্রুফ নেই, কিন্তু অত্যন্ত জোরালো যুক্তি আছে।'

নৃপেন বুঝতে পারে, এ ভদ্রলোক সহজ মানুষ নন। উনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন। চোখ তুলে দেখে মিসেস বাসু কখন অলক্ষ্যে চলে গেছেন ঘর ছেড়ে, পিছনের বারান্দায়। সাগ্রহে সে বলে, 'বলুন স্যার, কী প্রমাণ পেয়েছেন? বাই দ্য ওয়ে রমেন গুহকে আপনি কেমন করে চিনলেন?'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি থাক। প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিই। একটা অনুমান, একটা প্রমাণ। অনুমানের কথাটাই আগে বলি। মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে যে গতকাল রাত সাতটা নাগাদ বাইশ নম্বর ঘরের বোর্ডার মহম্মদ ইব্রাহিম এসে তাকে বলে যে, তার ঘরের চাবিটা ঘরের ভেতর থাকা অবস্থায় সে ভুল করে ইয়েল-লক-ওয়ালা দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে। মহেন্দ্র তখন ওকে মাস্টার-কি-টা দেয়। ইব্রাহিম মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে চাবিটা ফেরত দেয়। ফলো?'

'ইয়েস।'

'এনি কোশ্চেন?'

'কোশ্চেন! না, কোশ্চেন কীসের?'

'তাহলে আমিই প্রশ্ন করি! মহেন্দ্র মাস্টার কি টা কেন দিল? কেন ওই বাইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নয়?'

নৃপেন বলে, 'ও তো একই কথা।'

'আজ্ঞে না মশাই, মোটেই এক কথা নয়! মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে, চেক-ইন করবার সময় রমেন যখন তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়, তখন ইব্রাহিমও তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়। একজনকে সেটা দিয়ে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে মহেন্দ্র সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।'

'সো হোয়াট, তাতে হলটা কী? ডুপ্লিকেট চাবিতেও বাইশ নম্বর ঘর খোলা যায়, মাস্টার-কিতেও খোলা যায়। ও তো একই ব্যাপার!'

'না। ডুপ্লিকেট চাবিতে শুধু বাইশ নম্বর ঘরের দরজা খোলা যায়, আর মাস্টার-কিতে দোতলার সবক'টা ঘর খোলা যায়। ইব্রাহিম ওই পাঁচ মিনিটের ভেতর তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে থাকতে পারে। তার আধঘণ্টা আগে কিন্তু বীরবাহাদুর ফ্লাস্কটা রেখে গেছে। ফ্লাস্কটা খুলে তার ভেতর একটা ক্রিস্টাল ফেলে বেরিয়ে আসতে বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড লাগার কথা।'

নৃপেন জবাব দিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'আশ্চর্য, মহেন্দ্র তো এসব কথা আমাকে বলেনি!'

'আপনি প্রশ্ন করেননি, তাই বলেনি। সে এখনও জানে না ব্যাপারটার ইমপ্লিকেশন। আপনার মতো সেও বিশ্বাস করে ডুপ্লিকেট চাবি আর মাস্টার কি একই কথা। দুটোতেই বাইশ নম্বর ঘর

BanglaBook.org

খোলা যায়।'

একটা ঢোক গিলে নৃপেন বলে, 'আর আপনার দ্বিতীয় অনুমানটা স্যার?'

'দ্বিতীয়টা অনুমান নয়, আগেই বলেছি—সেটা এভিডেন্স। অকাট্য প্রমাণ। আসুন—।'

নৃপেনকে নিয়ে বাসু-সাহেব দ্বিতলে উঠে আসেন। তালা খুলে দুজনে ওই তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েন। রমেন গুহ একই ভাবে পড়ে আছে। বাসু-সাহেব পকেট থেকে একটা লোহার সন্না বের করলেন। এগিয়ে এলেন টেবিলটার কাছে। অতি সাবধানে সন্না দিয়ে অ্যাশট্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করলেন একটি দগ্ধাবশিষ্ট ফিল্টার টিপ্‌ট সিগারেটের স্টাম্প। আগুনের ওপর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যেমনভাবে শিককাবাব ভাজা হয় তেমনি ভাবে সন্নাটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখালেন। নৃপেন বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে। কী দেখছে তা সে-ই জানে।

'দেখলেন?' প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

নৃপেন আমতা-আমতা করে বললে, 'হুঁ।'

'কী দেখলেন?'

এবার নৃপেন বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী আবার দেখব? সিগারেটের স্টাম্প। অ্যাশট্রের ভেতর আবার কী থাকবে?'

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন, 'থাকে দারোগা-সাহেব, থাকে। চোখ থাকলে দেখবেন অ্যাশট্রের খোপে সিগারেটের স্টাম্পের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একটি অভিসারিকা। তার নয়নে মদির কটাক্ষ, সর্বাঙ্গে উদগ্র যৌবন, বিম্বোষ্ঠ লিপস্টিক—বোধ করি ম্যাক্সফ্যাকটার ভার্মিলিয়ান।'

নৃপেনের সন্দেহ জাগে, প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কি মাথায় দু-একটা স্ক্রু আলগা। নাকি এই সাত-সকালেই মদ্যপান করেছেন? কিন্তু এতক্ষণ তো ওঁকে প্রতিভাবান গোয়েন্দার মতো মনে হচ্ছিল।

বাসু-সাহেব নৃপেনের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। ওর বিহ্বল অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। আবার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা খোলাখুলি বলব দারোগা-সাহেব?'

'বলুন স্যার।'

'আপনার কম্মো নয়।'

মিসেস ডি. সি-র মামা! কী বলতে পারে নৃপেন? একজন সিনিয়ার আই. এ. এস. যাঁকে মামা ডাকেন তাঁর অধিকার আছে এ কথা বলার। সংবিধানের কত নম্বর ধারায় ওটা বলা আছে নৃপেন তা ঠিক জানে না, কিন্তু এটুকু মনে আছে—কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেওয়ার সময় অ্যাব্রিভিয়েশান মুখস্থ করেছিল I.A.S. শব্দের বিস্তারিত রূপ In Anticipation of Sword। অর্থাৎ এমন একটি শাসকগোষ্ঠী যাঁদের তরোয়ালের প্রয়োজন নেই, যাঁরা হাতে মাথা কাটেন। বিপুল ঘোষ সেই আই. এ. এস. গোষ্ঠীর একজন সিনিয়ার অফিসার। দুদিন পরেই হয়তো ডিভিসনাল কমিশনার হবেন। এ ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁর বেটার হাফের মামা।

নৃপেন ঢোক গেলে।

বাসু-সাহেব ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, 'দুঃখ করবেন না মিস্টার ঘোষাল। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ক্রিমিনোলজি ইজ এ সায়েন্স। দারোগা মানেই ডিটেকটিভ নয়। আপনাদের আই. জি. ও এ ভুল করতে পারেন, যদি না তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। আমার পরামর্শ শুনুন, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও লোক জানা আছে আপনার? থাকলে তাকেই পাঠান। কেসটা ঘোরালো। এসব কথা তো আর আমি বিপুলকে জানাতে যাচ্ছি না।'

নৃপেন মনস্থির করে। একেবারে আত্মসমর্পণ। বলে, 'অমন লোক আমার কাছেই আছে স্যার। আমার সেকেন্ড অফিসার সুবীর রায়। আজই তার কার্শিয়াং থেকে ফিরে আসার কথা। তাকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে—।'

'না, না—আমার কাছে নয়। আমি শীঘ্রই এ হোটেল ছেড়ে চলে যাব।'

BanglaBook.org

'কেন স্যার? আর দু-একটা দিন—।'

'উপায় নেই ঘোষাল, আমি আজই চলে যাব অন্য একটা হোটেলে। ঘুম-এর কাছে। 'রিপোজ'-এ। পরশু তার উদ্বোধন। আমাদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ আছে ওখানে।'

উনি যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছেন এতে খুশিই হল নৃপেন। বললে, 'কিন্তু ওই "ম্যাঙ্গফ্যাকটার-ভার্মিলিয়ান" না কী যেন বললেন, ওটা কী?'

সিগারেটের স্টাম্পে কী দেখতে পেলেন আপনি?'

'প্রমাণ! এভিডেন্স! গতকাল রাত্রে এ ঘরে একজন অভিসারিকা প্রবেশ করেছিলেন। দেখছ না, টেবিল-এর ওপর পড়ে রয়েছে রমেনের সিগারেটের প্যাকেট—ক্যাপস্টান! এটা ফিলটার-টিপ স্টাম্প! রমেন যখন ঘরটা ভাড়া নেয় তখন এ অ্যাশট্রেটা নিশ্চয় শূন্যগর্ভ ছিল। সে ক্যাপস্টান খেয়েছে। না হলে অ্যাশট্রেতে ফিলটার-টিপ সিগারেটের স্টাম্প আসে কেমন করে? তা ছাড়া এই লাল স্পটটা? ওটা লিপস্টিকের চিহ্ন। ফরেনসিক এক্সপার্ট করোবরেট করবে—তুমি দেখে নিও। আর এই সূত্রেই বোঝা যাচ্ছে, কেন রমেন গুহ দুটো চাবিই চেয়ে নেয়, কেন সে কিছুতেই রাজি হয়নি তোমার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে!'

নৃপেনের এখনও একবাঁও মেলে না।

'বুঝলে না? রমেন কিছু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ছিল না। মিস ডিক্রুজা ছিল কলগার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ভালোই আলাপ হয়েছিল। ট্যাক্সিতে আসার পথে। ডুপ্লিকেট চাবিটা রমেন দিয়ে রেখেছিল ওই মিস ডিক্রুজাকে। বিশ্বাস না হয় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—মিস ডিক্রুজা কাল সন্ধ্যাবেলায় যে লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলেন সেটা ভার্মিলিয়ান রেড!'

নৃপেন বলে, 'এখানে আমার আর কিছু করণীয় আছে স্যার?'

'আছে। দুটো কাজ। প্রথমত তেইশ নম্বর ঘরে যে ফ্লাস্কটা আছে ওটাও এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাও। তবে এবার আর ভুল করো না। সাক্ষী রেখে ওটা সিল করিয়ে নিও। আমার অনুমান ওই জলেও পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যাবে। দু-নম্বর কাজ—ওই তেইশ নম্বর ঘরের দু-পাশের দুটি ঘর সার্চ করা। বাইশ নম্বরে ছিল ইব্রাহিম আর চব্বিশে মিস ডিক্রুজা। দুজনেই সন্দেহভাজন।'

নৃপেন বলে, 'ইব্রাহিম তো রাত সাড়ে আটটার সময় চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। তখন তো রমেন গুহ জীবিত।'

'আহ্! তুমি বড় জ্বালাও! বললাম না তোমাকে? রাত সাড়ে আটটায় সে হোটেল ত্যাগ করে বটে, কিন্তু রাত সাতটায় সে মাস্টার-কি নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সে সময় ফ্লাস্কটা রাখা ছিল রমেনের টেবিলে।'

'আয়াম সরি! ঠিক কথা। আচ্ছা ওই দুটো ঘরই সার্চ করছি আমি; কিন্তু আপনিও সঙ্গে থাকলে ভালো হত না?'

'না, আমরা দার্জিলিং-এ এসেছি বেড়াতে। আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ একা বসে আছেন নীচের ঘরে। ওঁর কাছেই আমি ফিরে যাব এখন। তুমি বরং যাওয়ার আগে আমাকে জানিয়ে যেও ওইদুটো ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছু পেলে কিনা।'

বাসু-সাহেব নেমে এলেন একতলায়। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন ওঁর স্ত্রী রাণী দেবী চুপ করে বসে আছেন চাকা-দেওয়া চেয়ারে। কোলের ওপর পড়ে আছে কণ্টকবিদীর্ণ অসমাপ্ত উলের সোয়েটারখানা। উলের গুলিটা পোষমানা বেড়ালছানার মতো হাত পা গুটিয়ে বসে আছে ওঁর পায়ের কাছে। বিষাদের মূর্তি যেন।

'অনেকক্ষণ একা-একা বসে আছো, নয়?'

রাণী দেবীর চমক ভাঙে। ম্লান হেসে বলেন, 'দারোগা বাবা বিদায় হল?'

'আপাতত। আবার আসবেন যাওয়ার আগে।'

BanglaBook.org

'আমরা কখন "রিপোজ"-এ যাচ্ছি?'

'হয় আজ বিকেলে, নয় কাল সকালে।'

'তুমি বরং আগে একবার হোটেলটা দেখে এস। একেবারে দোর পর্যন্ত ট্যাক্সি যদি না যায়—।'

বাক্যটা উনি শেষ করেন না। প্রয়োজন ছিল না। মিসেস বাসু চলৎশক্তিহীনা। একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে রাণী দেবীর পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। উনি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। বস্তুত ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসু-সাহেবের জীবন অন্য খাতে বইছে। প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ওঁর একমাত্র কাজ পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গদান করা। সন্তান একটিমাত্রই হয়েছিল ওঁদের। ওই দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বাসু-সাহেব হেসে বলেন, খবর নিয়েছি। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে। না থাকলেও বাধা ছিল না। তোমাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার আজও আছে। বিশ্বাস না হয় তো বল এখনই পরখ করে দেখাই।'

এত দুঃখেও হেসে ফেলেন রাণী দেবী।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল নৃপেন। যথারীতি দরজায় নক করে ঢুকল ঘরে। বললে, 'মিস ডিক্রুজার ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না স্যার; কিন্তু মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরে একটা জিনিস উদ্ধার করেছি। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দেখুন তো স্যার—।'

একটা কাগজের দলা। সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কোথায় পেলে এটা?

'বাইশ নম্বর ঘরে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।'

'কাল রাত্রে ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর ও-ঘরে নতুন বোর্ডার আসেনি?'

'না। তবে শুনলাম এখনই আসবে। একুশ নম্বর ঘরের বোর্ডার নাকি ওই ঘরে শিফট করছেন।'

চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। কাগজটা ওঁর মুঠিতে ধরাই থাকে। বলেন, 'কে ওই একুশ নম্বরের বোর্ডার?'

'নামটা জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনলাম তিনি আর্টিস্ট। একুশ নম্বর ঘরের জানলা থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভালো দেখা যায় না, গাছের আড়াল পড়ে। তাই উনি বাইশ নম্বরে সরে আসতে চান। একটু আগে ঘরটা দেখে পছন্দ করে গেছেন। এখনই শিফট করবেন।'

'বুঝলাম।' ধীরে-ধীরে কোঁকড়ানো কাগজের দলাটা খুলে ফেলেন। কাগজটা মেলে ধরেন টেবিলের ওপর। হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। চোখ দুটি বুজে যায়। রাণী দেবী ছিলেন পিছনেই। কৌতূহল দমন করতে পারেন না তিনি। ঝুঁকে পড়েন কাগজটার ওপর। তাতে কালো কালিতে লেখা ছিল :

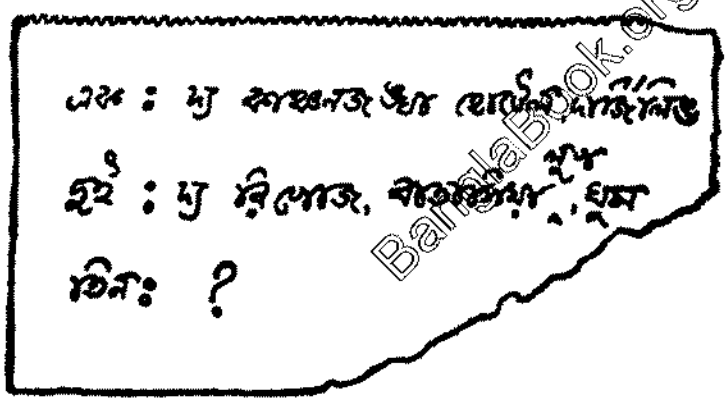

BanglaBook.org

॥ তিন ॥

দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন, ঘুম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। দার্জিলিং স্টেশনের চেয়েও তার উচ্চতা বেশি। ঘুমের অদূরে ওই খেলাঘরের রেললাইনটা জিলিপির প্যাঁচের মতো বার দুই পাক খেয়েছে—তার নাম বাতাসিয়া ডবল-লুপ। তারই পাশ দিয়ে একটা পাকা সড়ক উঠে গেছে ওপর দিকে—ও পথে যেতে পারে ক্যাভেন্টার্স অথবা কাঞ্চন ডেয়ারিতে কিংবা 'টাইগার হিল'-এ। এই সড়কের ওপরেই প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা একটা বাড়ি। এককালে ছিল কোনও চা বাগানের ইউরোপীয় মালিকের আবাসস্থল। বর্তমানে এটাই 'দ্য রিপোজ' হোটেল। না, কথাটা ঠিক হল না—আজ নয়, আগামী কাল থেকে সেটা হবে রিপোজ হোটেল। আগামী কাল দোসরা তার উদ্বোধন।

মালিক শ্রীমতী সুজাতা মিত্র। সুজাতা বিবাহিতা—স্বামী কৌশিক মিত্র। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-ই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সুজাতার বাবা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কী একটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা স্বনামে নেওয়ার আগেই সন্দেহজনকভাবে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল ভদ্রলোকের। আবিষ্কারের সেই রিসার্চ-পেপারগুলো নিয়ে সুজাতা রীতিমতো বিপদের ভেতর জড়িয়ে পড়ে। এমনকী শেষ পর্যন্ত এক খুনের মামলায়। রিসার্চের কাগজগুলো হাত করতে চেয়েছিলেন একজন কুখ্যাত ধনকুবের—ময়ূরকেতন আগরওয়াল। তিনিই ঘটনাচক্রে খুন হন। কৌশিক এবং সুজাতা বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ে সেই খুনের মামলায়। বস্তুত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতনের যৌথ চেষ্টায় ওরা দুজনেই মুক্তি পায়। এর মধ্যে বাসু-সাহেবের ভূমিকাটাই ছিল মুখ্য। যাই হোক শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হল আগরওয়ালের হত্যাকারীর নাম—নকুল হুই। সে ছিল আগরওয়ালেরই অধীনস্থ কর্মচারী এবং নানান পাপ কারবারের সাথী। সে-সব অতীতের ইতিহাস। 'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন অথবা 'যদি জানতেম' ছায়াছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এসব কথা অজানা নয়।

মোট কথা ইতিমধ্যে সুজাতার সঙ্গে কৌশিকের বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। এখনও ঠিক এক বছর হয়নি। আগামী ৫ অক্টোবর, শনিবারে ওদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। বিয়ের পরে কৌশিক ডঃ চ্যাটার্জির ওই আবিষ্কারটা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে চায়; কিন্তু সুজাতা রাজি হতে পারেনি। ওই সর্বনাশা আবিষ্কারটা তার কাছে কেমন যেন অভিশপ্ত মনে হয়েছিল। তিনজন লোকের মৃত্যু ওই আবিষ্কারটার সঙ্গে জড়িত। প্রথমত ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু, দ্বিতীয়ত গুলিবিদ্ধ হয়ে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এবং তৃতীয়ত হত্যাকারী নকুল হুই-এর ফাঁসি। হ্যাঁ, আগরওয়ালের হত্যাকারী নকুল হুইকে শেষপর্যন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়। নকুল চেষ্টার ত্রুটি করেনি—সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল—কিন্তু লোয়ার কোর্টের বিচার তিলমাত্র নড়েনি। অর্থলোভে সুপরিকল্পিতভাবে নকুল যে হত্যাকাণ্ডটা করেছিল তার জন্য বিচারক চরমতম দণ্ডই বহাল রেখেছিলেন।

তাই কেমন একটা অবসাদ এসেছিল সুজাতার। ওই রিসার্চের কাগজগুলো থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিজের কুমারী-জীবনের ওই অভিশাপকে বিবাহিত জীবনে টেনে আনতে চায়নি। কৌশিক ইঞ্জিনিয়ার। এসব ভাবালুতার প্রশ্রয় সে প্রথমটা দিতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও মেনে নিয়েছিল। ফলে নগদ দেড় লক্ষ টাকার ওই পেটেন্টটা ওরা বিক্রি করে দিয়েছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্রের কাছে। জীমূতবাহন হচ্ছেন অরূপরতনের পিতৃদেব। হয়তো অরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতাও এ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে।

সুজাতা তার সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে বলেছিল, 'ওই নগদ দেড়লাখ টাকা নিয়ে এবার তুমি ঠিকাদারি ব্যাবসা শুরু করো।'

BanglaBook.org

কৌশিক হেসে বলেছিল, 'তুমি যেমন ওই রিসার্চ পেপারগুলো থেকে মুক্তি চাইছিলে সুজাতা, আমিও তেমনি আমার ওই ডিগ্রিটা থেকে মুক্তি চাইছি আজ। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার!'

সুজাতা অবাক হয়ে বলেছিল, 'ও আবার কী কথা? কেন?'

'ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নেই। এদেশে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার অথবা কারিগরি কাজ-জানা মানুষের আর কোনও দরকার নেই। এদেশের প্রয়োজন এখন শুধু রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার আর আই. এ. এস. অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের।'

'হঠাৎ তোমার এই সিদ্ধান্ত?'

'দেখতে পাচ্ছ না দেশের হাল! ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকেরা এ দেশে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। দলে-দলে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ইহুদি হওয়ার অপরাধে নাৎসি জার্মানি যেমন আইনস্টাইনকে দেশত্যাগী করেছিল, বৈজ্ঞানিক হওয়ার অপরাধে আজ তেমনি প্রফেসর খোরানাকে ভারতবর্ষ দেশছাড়া করেছে!'

সুজাতা হেসে বলে, 'এ তোমার রাগের কথা। খোরানা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ খেতাব দেওয়া হয়েছে!'

হো-হো করে হেসে উঠেছিল কৌশিক। বলেছিল, 'ভাগ্যে প্রফেসর খোরানা শিশির ভাদুড়ী কিংবা উৎপল দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি!'

'তুমি কী বলতে চাইছ বল তো?'

'আমি বলতে চাইছি ম্যাট্রিকে আমি তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, স্টার পেয়েছিলাম, বি. ই-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। আমাদের স্কুল-ব্যাচের প্রত্যেকটি ভালো ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বৈজ্ঞানিক হতে পেরেছে। যারা ওইসব কলেজে ঢুকতে পারেনি সেই সব ঝড়তি-পড়তি মালই গেছে জেনারেল লাইনে। তাদের একটা ভগ্নাংশ আজ আই. এ. এস. আর একটা ভগ্নাংশে আজ এম এল. এ!'

সুজাতা তর্ক করেছিল। বলেছিল—'তা তুমিও আই. এ. এস পরীক্ষা দিলে পারতে? তুমিও ইলেকশানে দাঁড়াতে পারতে!'

কৌশিক বিচিত্র হেসে বলেছিল, 'তুমিও যে মন্ত্রীদের মতো কথা বলছ সুজাতা! ছয় বছরের পাঠক্রম শেষ করে আই. এ. এস. পরীক্ষা না দিলে আমার ঠাঁই হবে না এ পোড়া ভারতবর্ষে? কিন্তু মুরারী মুখার্জির মতো একজন সার্জেন, বি. সি. গাঙ্গুলির মতো একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা খোরানার মতো একজন বৈজ্ঞানিক যতদিন ফিনান্স কমিশনার, অথবা চিফ সেক্রেটারি হতে না চাইছেন—।'

অসহিষ্ণু হয়ে সুজাতা বলে উঠেছিল, 'মোদ্দা কথাটা কী? তুমি কী করতে চাও? ওই দেড় লাখ টাকা ফিক্সড-ডিপোজিটে রেখে তার সুদের টাকায় আমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াব?'

'না। ব্যাবসাই করতে চাই আমি—।'

'আমিও তো তাই বলছি। ব্যাবসাই যদি করতে হয় তবে যে জিনিসটা জানো, বোঝ, তার ব্যাবসাই করা উচিত। আমি তো তোমাকে চাকরি করতে বলছি না; আমি বলছি ঠিকাদারি করতে—।'

'কোথায়? পি. ডাবলু. ডি. ইরিগেশান অথবা কোনও পাবলিক আন্ডারটেকিং-এ তো? সর্বত্রই তো ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদল শীর্ষস্থান দখল করে বসে আছেন। তাঁদের তৈলাক্ত করতে না পারলে—।'

'তবে কীসের ব্যাবসা করবে তুমি?'

'যে-কোনও স্বাধীন ব্যাবসা। যাতে কাউকে তোষামোদ করতে হবে না। আর সেটা এমন

BanglaBook.org

একটা ব্যাবসা হবে যেখানে তুমি আমি দুজনেই খাটব। ইকোয়াল পার্টনার।'

'যেমন?'

'ধরো, আমরা একটা হোটেল খুলতে পারি। তুমি কিচেন-এর ইনচার্জ। কী রঙের পরদা হবে, কী জাতের বেড-কভার হবে সব তোমার হেপাজতে। আর আমি রাখব হিসেব, ম্যানেজমেন্ট। সারাদিন দুজনে কাছাকাছি থেকে কাজ করব। সকালবেলা দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ঠিকাদারি করতে বেরিয়ে যাব, আর রাত দশটায় ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসব, তার চেয়ে এটা ভালো নয়?'

কথাটা মনে ধরেছিল সুজাতার।

তারই ফলশ্রুতি এই 'দ্য রিপোজ'।

জমি-বাড়ি-ফার্নিচার, ফ্রিজ, কিচেন-গ্যাজেট এবং একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনতেই খরচ হয়ে গেল লাখখানেক টাকা। বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে ওরা দুজনে খুলে বসেছে হোটেল-বিজনেস।

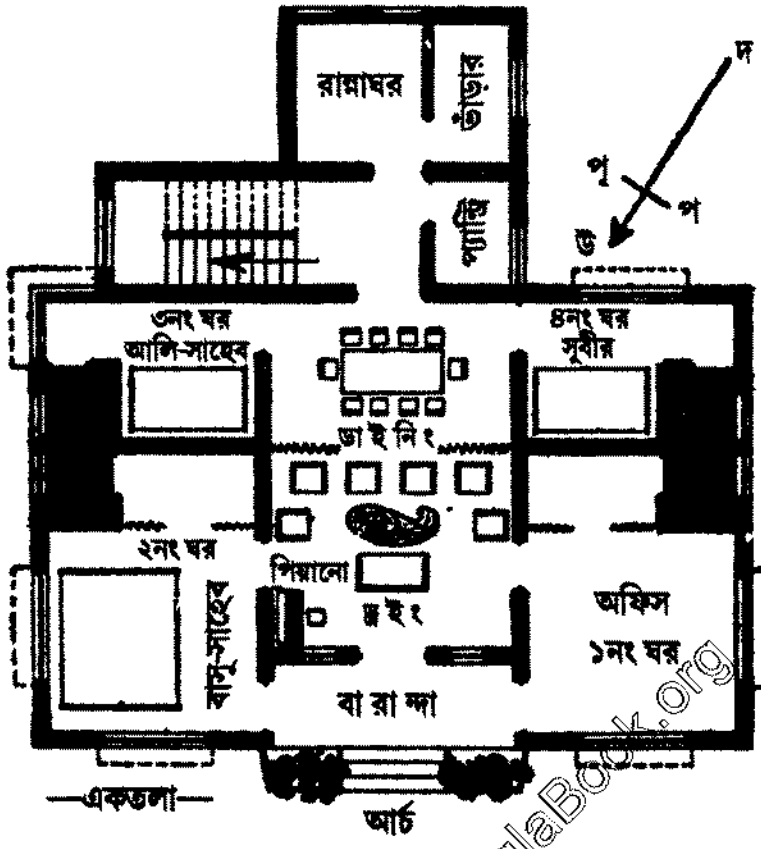

বাড়িটা দোতলা। চারটে ডাবল-বেড বড় ঘর এবং দুটি সিংগল-বেড। এ ছাড়া একতলায় বেশ বড় একটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম। কিচেন ব্লক, প্যান্ট্রি, টেরাস ইত্যাদি। রীতিমতো বিলেতি কায়দায় প্ল্যানিং। প্রায় প্রতিটি ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। কৌশিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটার মেরামতি করিয়েছে। গরম জলের গিজার বসিয়েছে। সুজাতা ম্যাচ-করা পরদা, বেড-কভার ইত্যাদি কিনেছে। আয়োজন সম্পূর্ণ, আগামীকাল 'রিপোজ'-এর উদ্বোধন। গোটা ছয়েক বিজ্ঞাপন মাত্র ছাড়া হয়েছে। দুজন সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন। আশা করা যায় পুজো মরশুমে ঘর খালি পড়ে থাকবে না।

BanglaBook.org

দার্জিলিং-এর হইচই এড়িয়ে নিরিবিলিতে ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে ইচ্ছুক যাত্রী নিশ্চয় জুটবে। যে দুজন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দুজনেই কলকাতাবাসী। মিস্টার নিজামুদ্দিন আলি এবং মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা। দুজনেই জানিয়েছেন, বুধবার ২রা দুপুরে

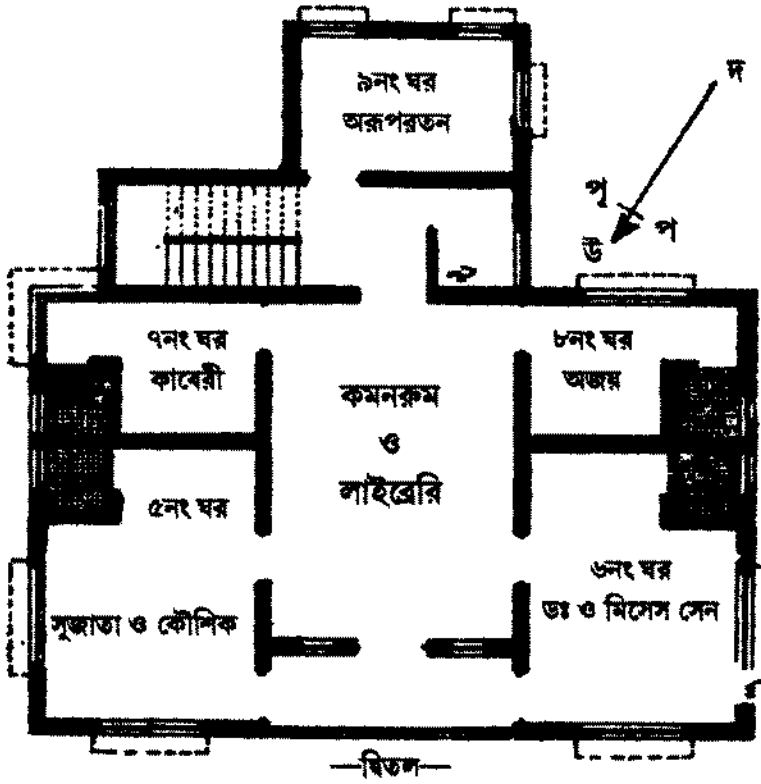

ছোট রেলে ঘুম স্টেশনে এসে পৌঁছবেন। কৌশিক লিখেছিল, স্টেশনেই ওঁদের রিসিভ করা হবে। উদ্বোধনের দিন, প্রথম বোর্ডার—তাই এই খাতির।

উদ্বোধন আগের দিন। মঙ্গলবার। পয়লা। সকাল থেকেই কালীপদ আর কাঞ্চীকে নিয়ে সুজাতা শেষবারের মতো ঝাড়াপোঁছায় লেগেছে। কালীপদ মেদিনীপুরি—সমতলবাসী। চাকরির লোভে এসেছে এতদূর। রিপোজ-এর একমাত্র বেয়ারা। আর কাঞ্চী হচ্ছে স্থানীয় নেপালি মেয়ে। সামনের গ্রামটায় থাকে।

দুজন বোর্ডার অ্যাডভান্স পাঠিয়েছেন। এ ছাড়াও আরও তিনজন আসছেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু সস্ত্রীক এবং অ্যাডভোকেট অরূপরতন। অরূপের জন্য দোতলার নয় নম্বর ঘরটা ঠিক করা আছে, আর বাসু-সাহেবের জন্য একতলার দু-নম্বর ঘরটা। মিসেস বাসুর পক্ষে একতলা ছাড়া উপায় নেই। আলি-সাহেবের জন্যে তিন নম্বর আর কাবেরীর জন্য দোতলার সাত নম্বর ঘরটা মনে-মনে স্থির করে রেখেছে সুজাতা। এখন ওঁদের পছন্দ হলে হয়।

বেলা দশটা নাগাদ কৌশিক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে। ওখান থেকে মাইল পাঁচেক। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে। কাঞ্চন ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেন ওদের

BanglaBook.org

পরিচিত। মিস্টার সেনের ভাইপো অজিত সেন কৌশিকের সহপাঠী। আপাতত ডজন-দুই-তিন ডিম, কিছু হ্যাম, সফটমিট আর মাখন নিয়ে আসবে। আলি-সাহেব হ্যাম খাবেন কি না জানা নেই। তাই দু-রকম মাংসের ব্যবস্থাই থাকল। ফ্রিজ আছে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। সুজাতা বলে দিয়েছে কাঞ্চন ডেয়ারির সঙ্গে যেন একটা অন-অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা করে আসে। একদিন অন্তর কতটা কী মাল লাগবে তার ফিরিস্তিও লিখে দিয়েছে। আজ বিকেলে সুজাতার একবার দার্জিলিং-এ যাওয়ার ইচ্ছে। কৌশিককে তাই বলে রেখেছে সকাল করে ফিরতে। কিছু টুকিটাকি বাজার এখনও বাকি আছে।

বাসু-সাহেব কাল দার্জিলিং থেকে ফোন করেছিলেন। সুজাতা অনুযোগ করেছিল—'আবার দার্জিলিং গেলেন কেন? সরাসরি এখানে এসে উঠলেই পারতেন?'

বাসু-সাহেব সকৌতুকে বলেছিলেন, 'নেমন্তন্নর গন্ধ পেয়ে আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে আগেই এসে পৌঁছেছি।'

'তাতে কী? আপনি তো ঘরের লোক। রাণু মাসিমাও এসেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। তোমার "রিপোজ" পর্যন্ত ট্যাক্সি যাবে তো?'

'আসবে। আপনি এখনই চলে আসুন।'

'না সুজাতা, কাল আসছি। লাঞ্চ-আওয়ার্সের পরে। ভালো কথা, রমেন গুহকে মনে আছে? আমাদের নাট্যামোদী রমেন দারোগা?'

'খুব মনে আছে। কেন বলুন তো?'

'বিপুলের কাছে শুনলাম রমেন দার্জিলিং-এ বদলি হয়েছে। কাল-পরশুর মধ্যেই আসবে।'

'তবে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করবেন আমার হয়ে। আমি থানায় ফোন করে খবর নেব। মিস্টার ঘোষ আর মিসেস ঘোষ কিছুক্ষণের জন্যে আসবেন বলেছেন।'

'জানি। কিন্তু বিপুল বোধহয় শেষ পর্যন্ত তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারবে না। শুনছি গভর্নর-সাহেব স্বয়ং দার্জিলিং আসছেন। ফলে ডি. সি. সাহেবের সব স্যোশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।'

কালীপদ এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, বড় ফুলদানিটা কোথায় থাকবে?

সুজাতা স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে আসে। ওর হাত থেকে চিনেমাটির ফুলদানিটা নিয়ে আঁচল দিয়ে মোছে। বলে, 'একতলায় ড্রইংরুমে, পিয়ানোটার ওপর। কাল সকালে মনে করে ওতে ফুল দিবি, বুঝলি?'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। বেলা প্রায় দুটো। এতক্ষণে কৌশিকের ফিরে আসা উচিত ছিল। রান্নাবান্না সেই কখন হয়ে গেছে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সুজাতা আর অপেক্ষা করল না। কালীপদ আর বাবুর্চিকে খাইয়ে ছেড়ে দিল। কালীপদর ওবেলায় ছুটি। কোথায় বুঝি পাহাড়িদের রামলীলা হবে, তাই শুনতে যাবে। তা যাক। সুজাতাও তো দার্জিলিং যাবে। থাকবে না। হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। কৌশিকই ফোন করছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার? এত দেরি হচ্ছে যে?'

'আরে বোলো না। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। মেরামত করাচ্ছি। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

'তার মানে ওবেলা দার্জিলিং যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেল?'

'উপায় কী বলো। তুমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নাও বরং।'

'তা তো বুঝলাম; কিন্তু তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? দুপুরে খাবে কোথায়?'

'কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে। সেন-সাহেবের অতিথি হয়েছি। বুঝলে? আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।'

BanglaBook.org

অগত্যা উপায় কী? সুজাতা একাই খেয়ে নিল। ক্রমে বেলা পড়ে এল। বিকেলের দিকে কোথা থেকে আকাশে এসে জুটল কিছু উটকো মেঘ। নামল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগেই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কৌশিকের ফোনটা আসার আগেই কালীপদকে ছুটি দিয়ে বসে আছে। আগে জানলে কালীপদকে ছাড়ত না। কাঞ্চী রাত্রে থাকে না। নির্বান্ধব পুরীতে চুপচাপ বসে রইল সুজাতা। জানলা দিয়ে দেখতে থাকে কার্ট রোড দিয়ে গাড়ির মিছিল চলেছে—ওপর থেকে নীচে আর নীচ থেকে ওপরে। বাতাসিয়া ডাবল লুপ দিয়ে একটা মালগাড়ি পাক খেতে-খেতে নেমে গেল।

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। অন্যদিন হলে দার্জিলিং-এর আলোর রোশনাই দেখা যেত। পাহাড়ের এখানে-ওখানে জুলজুলে চোখ মেলে রাতচরা বাতিগুলো তাকিয়ে থাকে। নিত্য দীপাবলীর রূপসজ্জা। আজ আকাশ আছে কালো করে। ঝিরঝির করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আঞ্চলিক পাহাড়ে বৃষ্টি। হয়তো দার্জিলিং খটখটে, হয়তো কার্শিয়াং রৌদ্রোজ্জ্বল—বৃষ্টি নেমেছে শুধু ঘুমের দেশে। এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার খ্যাপামি। সুজাতা সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে। এমন রাতে আলো ফিউস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সে কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে সুজাতার। এই নির্বান্ধব পুরীতে যদি অন্ধকারে তাকে একা বসে থাকতে হয়। তাড়াতাড়ি উঠে মোমবাতি আর দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে হাতের কাছে রাখে। টর্চটাও। কালীপদটার যেমন বুদ্ধি। ঝড়জলে রামলীলার আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে। হতভাগাটা বাড়ি ফিরে এলেই পারে। কিন্তু ওরই বা দোষ কী? হয়তো আশ্রয় নিয়েছে কারও গাড়িবারান্দার তলায়। বৃষ্টিটা একটু না ধরলে সে বেচারি আসেই বা কী করে। পাহাড়ে বৃষ্টি, থাকবে না বেশিক্ষণ। দার্জিলিং-এর বৃষ্টি ওই অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধের সগোত্র। আসতেও যেমন যেতেও তেমন। কিন্তু কই আজ তো তা হচ্ছে না। আবার নজর পড়ল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সে সাড়া দেয়। জানিয়ে দিল রাত সাতটা। হঠাৎ বেজে উঠল আবার ফোনটা। গিয়ে ধরল সুজাতা। হ্যালো?

'রিপোজ?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ' থেকে বলছি। আপনাদের গাড়ি মেরামত হয়ে গেছে। লোক দিয়ে পৌঁছে দেব, না কি মিস্টার মিত্র দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন?'

'দার্জিলিং থেকে। উনি দার্জিলিং গেছেন কে বলল?'

'বাঃ। দার্জিলিঙেই তো যাচ্ছিলেন উনি। গাড়ি থেমে যেতে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে চলে গেলেন।'

'ও। তা কী বলে গেছেন উনি?'

'বলেছেন তো উনি নিজেই নিয়ে যাবেন, তা রাত আটটার সময় আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে—।'

'আমার মনে হয় আটটার আগেই উনি ফিরবেন। নেহাত না ফেরেন দোকান বন্ধ করার সময় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।'

লাইনটা কেটে দিয়ে সুজাতা ভাবতে বসে—ব্যাপার কী? কৌশিক যদি একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিং গিয়ে থাকে, তাহলে দুপুরে সে টেলিফোন করে মিছে কথা বলল কেন? আর দার্জিলিং গেলে সে নিশ্চয় সুজাতাকেও নিয়ে যেত। সেই রকমই তো কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপটা আবার ও-দিকে—মানে দার্জিলিং যাওয়ার পথেই পড়বে, কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে নয়। তাহলে? কিন্তু কৌশিক তো স্পষ্ট বলল সে কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে ফোন করছে, মিস্টার সেনের বাড়িতে দুপুরে খাবে। এমন অদ্ভুত আচরণ তো কৌশিক কখনও করেনি এর আগে। সুজাতা শেষপর্যন্ত আর কৌতূহল দমন করতে পারে না। কৌশিক ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কাঞ্চন ডেয়ারির

BanglaBook.org

মালিক মিস্টার সেনকে ফোন করল। ফোন ধরলেন সেন-সাহেব নিজেই। সুজাতা সরাসরি প্রশ্ন করল আজ তাঁর সঙ্গে কৌশিকের দেখা হয়েছে কি না। সেন-সাহেব জানালেন—হয়েছে, দার্জিলিঙে। তাঁর অফিসে। কৌশিক ডিম-মাখন-মাংস ইত্যাদি খরিদ করেছে তাঁর দার্জিলিং-এর দোকান থেকে। সপ্তাহে দুদিন সাপ্লাই দিতেও তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কৌশিকের সঙ্গে। তারপর সেন-সাহেবই প্রতিপ্রশ্ন করেন, 'মিস্টার মিত্র কি এখনও ফিরে আসেননি?'

'না। তাই তো খোঁজ নিচ্ছি। দার্জিলিং-এ বৃষ্টি হয়েছে নাকি?'

'আদৌ না। আমি তো এইমাত্র ফিরছি সেখান থেকে।'

সুজাতা স্থির করল কৌশিক ফিরলে প্রথমেই সে সরাসরি জানতে চাইবে—কেন এমন অযথা মিথ্যে কথা বলল সে! আরও এক ঘণ্টা কাটল। রাত সওয়া ন'টা। না কৌশিক, না কালীপদ।

শেষপর্যন্ত বাইরের পোর্চে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হল। সুজাতা উঠে গেল সদর খুলে দিতে। এতক্ষণে আসা হল বাবুর। বেশ মানুষ যা হোক! হঠাৎ নজর হল—না, ওদের গাড়িটা নয়। একটা ট্যাক্সি। গাড়ি থেকে একটা স্যুটকেস আব একটা হাতব্যাগ নিয়ে একজন অচেনা ভদ্রলোক নেমে এলেন। ভদ্রলোক স্যুটের ওপর বর্ষাতি চাপিয়েছেন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। টর্চ জ্বেলে 'রিপোজ'-এর সাইন-বোর্ডটা দেখলেন। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সিটা ব্যাক করল। ভদ্রলোক কলিং বেলটা টিপে ধরলেন।

সুজাতার ভীষণ রাগ হচ্ছিল কৌশিকেব ওপর। কোনও মানে হয়? রাত সওয়া ন'টা। কী করবে সে এখন? লোকটা অচেনা—এই নির্বান্ধব পুরীতে সে একা মেয়ে। ট্যাক্সিটাও চলে গেল!

দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠল কলিংবেলটা।

উপায় নেই। দরজা খুলতেই হবে। তবে অনেক ঝড়-ঝাপটা এই বয়েসেই সয়েছে সুজাতা। ভয়ডর এমনিতেই তার কম। অকুতোভয়ে সে দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। ওকে দেখে একটু হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, 'মাপ করবেন এটা "রিপোজ" হোটেল তো?'

'হ্যাঁ। কাকে খুঁজছেন?'

'ব্যক্তিকে খুঁজছি না, খুঁজছি বস্তু।'

'বস্তু?'

'আশ্রয়। আমার নাম এন. আলি—আমার রিজার্ভেশান আছে এখানে।'

'ও আপনি। মিস্টার আলি। আসুন, আসুন—আপনার না আগামী কাল আসার কথা?'

'কথা তাই ছিল। একদিন আগেই এসে পড়েছি বিশেষ কারণে। অসুবিধে হবে না আশা করি?'

'অসুবিধে হবে। আমাদের নয়, আপনার। কিন্তু সে-কথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই। এই বর্ষণমুখর রাত্রে আপনি আরাম খুঁজছেন না, খুঁজছেন আশ্রয়।'

আলি-সাহেব পাপোশে জুতোটা ঘষে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেন। হেসে বলেন, 'বর্ষণমুখর রাত্রি! কথাটা কাব্যগন্ধী!'

সুজাতা কথা ঘোরানোর জন্যে বলে, 'ভিজে গেছেন নাকি?'

'বিশেষ নয়। ভালো কথা, আমার নামে যে ঘরটা বুক করা আছে, সেটা কি আজ এই "বর্ষণমুখর রাত্রে" ফাঁকা আছে?'

সুজাতা একটু অসোয়াস্তি বোধ করে। ঘুরিয়ে বলে, 'না থাকলেও শোওয়ার একটা ঘর পাবেন।'

'তার মানে হোটেল আপনার "উপচীয়মান"। পূজা মরশুম, তাই নয়?'

সুজাতা সত্যি কথাটা স্বীকার করবে কি না বুঝে উঠতে পারে না।

ভদ্রলোক ভিজে বর্ষাতিটা খুলে হ্যাট-র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'বেয়ারাদের কাউকে দেখছি না যে?'

BanglaBook.org

'আসবে এখনই। কোথা থেকে আসছেন এত রাত্রে?'

'দার্জিলিং থেকে। আজই সকালে পৌঁছেছিলাম সেখানে।'

'তাহলে এই রাত করে বের হলেন যে? "রিপোজ" তো আপনি চিনতেনও না।'

'দার্জিলিং ওভার-বুকড। কোনও হোটেলে ঠাঁই নেই। ভাবলাম আপনারা একটা-না-একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। আচ্ছা, মিস্টার মিত্র কোথায়? আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তো সাম মিস্টার মিত্র।'

'হ্যাঁ, কৌশিক মিত্র। আমি মিসেস মিত্র।'

'আমি তা আগেই বুঝেছি। মিস্টার কৌশিক মিত্র কোথায়?'

'দোতলায়। অফিসে কাজ করছেন। আসুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই—।'

আলি ইতস্তত করেন। আশা করছিলেন কোনও বেয়ারা এসে ওঁর ব্যাগটা নেবে।

সুজাতা বলে, 'স্যুটকেসটা এখানেই থাক। রুম-সার্ভিসের বেয়ারা পৌঁছে দেবে। আপনি শুধু হাত-ব্যাগটা নিয়ে আসুন—।'

'প্রয়োজন হবে না। নিজের ব্যাগ আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ও-দেশে স্টেশনে এয়ারপোর্টে এমন কুলির ব্যবস্থা নেই। নিজের মাল নিজেকেই বইতে হয়।'

'আপনি বুঝি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন?' চলতে-চলতে সুজাতা প্রশ্ন করে।

আলি সে কথা এড়িয়ে বলেন, 'আমি কিন্তু এখন এক কাপ চা খাব মিসেস মিত্র। বিকেলে চা জোটেনি।'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল সুজাতার। বৈকালিক চা-পান তার নিজেরও হয়নি।

ড্রইংরুম পার হয়ে পরদা সরিয়ে ডাইনিং-রুম। তার ওদিকে বাড়ির পশ্চিম-কোণার তিন নম্বর ঘরটিতে পৌঁছল ওরা। সুজাতাই আগে ঢুকল ঘরে আলোর সুইচটা জ্বেলে দিতে। বললে, 'ওয়াশ আপ করতে চান তো গিজারটা চালু করে দিন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গরম জল পাবেন। আমি চা-টা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। মিস্টার মিত্রকেও খবরটা দিই। সরুন—।'

আলি ঘরে ঢোকেননি। দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার মুখে। বস্তুত দরজা আগলে। হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব মিসেস মিত্র?'

একটু সচকিত হয়ে ওঠে সুজাতা। লোকটা অমন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তবু সাহস দেখিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, 'বলুন?'

'এমন "বর্ষণমুখর রাত্রে" এই নির্বান্ধব বাড়িতে একেবারে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?'

হাত-পা হিম হয়ে গেল সুজাতার। মনে হল পিঠের দিকে, ব্লাউজের ভেতরে কী যেন একটা সরীসৃপ কিলবিল করে নেমে গেল।

কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাদের হেডলাইট বাঁকের মুখে জমাটবাঁধা অন্ধকার স্তূপে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অন্ধকার তাতে একটুও কমছে না। গাড়ি বাঁক নিলেই আঁধারে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দুপাশের আদিম অরণ্য। তা হোক, তবু ওই গাড়িগুলো মানবসভ্যতার প্রতিনিধি। ওর ভেতর আছে মানুষজন। সুজাতা একা নয়। কিন্তু কার্ট-রোড যে ওখান থেকে তিন-চারশো ফুট!

নিতান্ত ঘটনাচক্র। ঠিক এই মুহূর্তেই ড্রইংরুমে বেজে উঠল টেলিফোন। তার যান্ত্রিক কর্কশ শব্দটা জলতরঙ্গের মতো মিঠে মনে হল সুজাতার কাছে। না, সে একা নয়। তাকে ঘিরে আছে এই পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের শুভেচ্ছা। ও তাদের সব্বাইকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওই তো ওদেরই মধ্যে একজন যান্ত্রিক দূরভাষণে ওর কুশল জানতে চাইছে। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সুজাতা বললে আগেকার শব্দটাই, 'সরুন।'

BanglaBook.org

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন আলি। সুজাতা ডাইনিং রুম পার হয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। পিয়ানোটার পাশেই টেলিফোন স্ট্যান্ড। ড্রইং আর ডাইনিং রুম-এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পরদা। বর্তমানে সরানো। তাই তিন নম্বর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিলেন আলি—শাড়ির আঁচল সামলিয়ে সুজাতা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিল : 'রিপোজ'।

দার্জিলিং থেকে মণি-বউদি ফোন করছেন। ডি. সি. মিস্টার বিপুল ঘোষ, আই. এ. এস-এর স্ত্রী। জানালেন—সুজাতার নিমন্ত্রণ রাখতে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না ওঁদের পক্ষে। গভর্নর দার্জিলিং-এ আসছেন। ফলে ডি. সি. ব্যস্ত থাকবেন। তা ছাড়া রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গে আগামী দু-তিনদিন প্রবল বর্ষণ হতে পারে।

সুজাতা অপ্রয়োজনে দীর্ঘায়ত করল তার দূরভাষণ। নানান খেজুরে গল্প জুড়ে সময় কাটাল। লক্ষ করে আড়চোখে দেখল—আলি পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসেছেন অনেকটা। তিনি এখন ড্রইং-ডাইনিং-রুম-এর সঙ্গমস্থলে। মুখ-হাত ধুতে ঘরে যাননি। বরং পাইপটা জ্বেলেছেন।

ঠিক এই সময়ই ফিরে এলে কালীপদ। কাক-ভেজা হয়ে। তাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল সুজাতার। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'জামা-কাপড় ছেড়ে ফেল। চায়ের জল বসা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আলি-সাহেবের। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজাতা বলে ওঠে, 'মাপ করবেন, তখন কী যেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি? টেলিফোনটা বেজে ওঠায় জবাব দেওয়া হয়নি।'

আলি হেসে বললেন, 'প্রশ্নটা এতক্ষণে তামাদি হয়ে গেছে।'

'ভুলে গেছেন?'

'যাব না? ডি. সি ও. সি গভর্নর!...তারপর কি আর কিছু মনে থাকে?'

নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন আলি।

রাত দশটায় ফিরে এল কৌশিক। বৃষ্টিতে ভিজে। গাড়ির কেরিয়ারে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। অভিমান-ক্ষুব্ধা সুজাতা কোনও কৌতূহল দেখাল না। জানতে চাইল না কেন এত রাত হল। কৌশিক নিজে থেকেই সাতকাহন করে কৈফিয়ত দিতে থাকে। বেশ বোঝা গেল—'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ'-এর লোকটা কৌশিককে জানায়নি যে ইতিমধ্যে সে 'রিপোজ'-এ ফোন করেছিল।

রাত্রে খাবার টেবিলে কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হল আলি-সাহেবের। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। ডিনার টেবিলে। সেলফ-হেলপ পরিবেশন ব্যবস্থা। কৌশিক আলি-সাহেবকে বললে, 'আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধে হয়েছে। আমরা এখনও ঠিকমতো প্রস্তুত নই, বুঝেছেন? আগামীকাল থেকে হোটেল চালু হওয়ার কথা।'

আলি-সাহেব আলুভাজার প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিতে-নিতে বললেন, 'বুঝেছি। তাই বুঝি গাড়ি নিয়ে শেষবারের মতো বাজার করতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ?'

'না, না, দার্জিলিং-এ তো নয়। আমি গিয়েছিলাম কাঞ্চন ডেয়ারিতে। এদিকে—।'

'ও, তাই বুঝি! আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম—আপনি বুঝি দোতলার অফিসঘরে বসে কাজ করছেন। মিসেস মিত্রই আমার ভুলটা ভেঙে দিলেন। বললেন—না, উনি বাড়িতে একেবারে একা আছেন। চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আপনি নাকি বাজার করতে দার্জিলিং গেছেন।'

'দার্জিলিং! তুমি তাই বলেছ?' কৌশিক প্রশ্ন করে সুজাতাকে।

সুজাতা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। আলি-সাহেবকে বলে, 'আজ কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেনু। এই তিনটেই আইটেম—আলুভাজা, ডিমভাজা আর খিচুড়ি।'

আলি হেসে বলেন, 'আজ আকাশের যা অবস্থা তাতে অন্যরকম আয়োজন হলে আপনাকে বেরসিকা ভাবতাম মিসেস মিত্র!'

কৌশিক বললে, 'সত্যি—কী বিশ্রী বৃষ্টি শুরু হল!'

আলি বিচিত্র হেসে বললে, 'বিশ্রী! সেটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। বিরহকাতরা কোনও বিরহিনী হয়তো এমন রাতেই গান ধরেন "কৈসে গোঁয়াইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া।" কী বলেন মিসেস মিত্র?'

সুজাতা মুখ টিপে বলে, 'আপনাকে কাব্যরোগে ধরেছে মনে হচ্ছে।'

'ধরবে না? আমার কাছে রাতটা যে মোটেই বিশ্রী নয়—আমার বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি।'

কৌশিক সন্দিগ্ধভাবে দুজনের দিকে তাকায়। তার হঠাৎ মনে হয়—সুজাতা লজ্জা পেল। কেন? যেন কথা ঘোরাতেই সুজাতা বললে, 'মুশকিল হয়েছে কি আমার হেড কুক-এর প্রবল জ্বর হয়েছে।'

'কার? কালীপদর?' কৌশিক জানতে চায়।

সুজাতা বলে, 'হ্যাঁ। বৃষ্টিতে ভিজে।'

আলি বলেন, 'তবে তো খুব মুশকিল হল আপনার। কাল সকালেই সব বোর্ডাররা আসবেন তো?'

'সকালে না হয় সারাদিনে তো আসবেই।'

'তাহলে লোকজন আসার আগে আপনাকে জনান্তিকে একটা খবর দিয়ে রাখি মিসেস মিত্র। আমি ব্যাচিলার—নিজের রান্না নিজে করি। পিকনিকে গেলে বরাবর আমাকে রাঁধতে হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আপনার হেড-কুকের অ্যাকটিং করতে পারি। ভাটপাড়া অথবা নবদ্বীপ থেকে কোনও পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় আপনার বোর্ডার হয়ে আসছেন না?'

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে, 'না-না, তার প্রয়োজন হবে না। আমিই তো আছি!'

'এখন আছেন। কাল সকালেই হয়তো আবার দার্জিলিং ছুটবেন...আই মিন কাঞ্চন ডেয়ারিতে!'

কৌশিক বিষম খেল।

॥ চার ॥

২ অক্টোবর, বুধবার। সন্ধ্যা।

ইতিমধ্যে বিপোজ-এ এসে হাজির হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সুজাতা চোখে অন্ধকার দেখে। কাল রাত্রি থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তা থামার লক্ষণ নেই। এক নাগাড়ে বর্ষণ চলেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি। কখন থামবে কেউ জানে না। রেডিওতে তো বলছে সহজে থামবে না। কালীপদ সেই যে শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই। সারারাত প্রবল জ্বরে ছটফট করেছে বেচারি। ওদিকে কাঞ্চী আজ সকালে আসেনি—ওদের বস্তির ঘরে হুড়হুড় করে জল ঢুকছে হয়তো। সেই ঝামেলাতেই ওরা হিমশিম। অথচ এদিকে একে-একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন আবাসিকেরা।

সবার আগে এসেছেন মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা। সকাল ছ টায়। তখনও শয্যাত্যাগ করেনি সুজাতারা। কাল রাত্রে সুজাতার ভালো ঘুম হয়নি। কৌশিক হঠাৎ কেন একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলল তাও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। অপরপক্ষে কৌশিকও একটু গুম মেরে গেছে। খাওয়ার টেবিলে যে কথোপকথনটা হল সেটার কথাই ওর বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাবছিল—সুজাতা কেন আলি-সাহেবকে প্রথম সাক্ষাতেই বলে বসেছিল—বাড়িতে সে একেবারে একা, চাকরটা পর্যন্ত নেই। আর আলি-সাহেব কেন অমন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বললে, 'আমার বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি।' সুজাতাই বা অমন রাঙিয়ে উঠল কেন হঠাৎ? কৌশিকের ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল—সে এসে পৌঁছনোর আগে সুজাতা আর আলি নির্জন বাড়িতে কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। আলি

BanglaBook.org

যখন আসে তখন কি সুজাতা গান গাইছিল—"কৈসে গোঁয়াইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া"। পাশাপাশি খাটে দুজনেই জেগে শুয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। দুজনেই জেগে আছে। কেউই কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর কখন দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নীচের কলিং বেলটা আর্তনাদ করে ওঠায়।

'এই, নীচে কে যেন কলিং বেল বাজাচ্ছে। কাঞ্চী এসেছে বোধহয়'—কৌশিক সুজাতাকে ডেকে দেয়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুজাতা। কাঞ্চী তো এত সকালে আসে না। নীচে নেমে আসে। দরজা খুলেই দেখে কাঞ্চী নয়—আগন্তুক একজন নতুন বোর্ডার। বছর পঁচিশ-ত্রিশ বয়েসের একজন মহিলা। চিকনের একটি শাড়ির ওপর গরম ওভারকোট। দেখতে ভালোই, সুন্দরীই বলা চলে। মেয়েটি বলে, 'আমার নাম কাবেরী দত্তগুপ্তা।'

'সুপ্রভাত! আসুন, আসুন! এত ভোরবেলা কোথা থেকে? আপনার না আজ দুপুরে আসার কথা?'

'তাই স্থির ছিল। রেলওয়ে রিজার্ভেশান পেলাম একদিন আগে। কাল এসেছি—।'

'কাল এসেছেন! রাত্রে কোথায় ছিলেন?'

'কার্শিয়াঙে। ওখানে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় লোক আছেন। তাঁর বাড়িতেই রাত্রে ছিলাম। ভোরবেলা উঠেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি। যা বৃষ্টি—।'

'আসুন, ভেতরে আসুন—আপনার জামা-কাপড় একদম ভিজে গেছে।'

কাবেরীর সঙ্গে কোনও বেডিং নেই। আছে একটা সুন্দর সাদা স্যুটকেস। কালীপদ অসুস্থ। ফলে সুজাতা আর কাবেরী দুজনে ভাগাভাগি করে সেটা টেনে নিয়ে আসে দোতলায়। কাবেরীর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল দোতলার সাত নম্বর ঘরটা। সেটা পছন্দ হল কাবেরীর। ঘরে পৌঁছে কাবেরী বলল, 'আপনিই তো হোটেলের মালিক, তাই নয়?'

'আমি একা নই—আমরা। স্বামী-স্ত্রী। আজই খোলা হল হোটেলটা। পরে ভালো করে আলাপ করা যাবে। চা খাবেন নিশ্চয়। আমরাও এখনও খাইনি।'

'চা তো খাবই। একেবারে বাসি-মুখে রওনা হয়েছি—।'

'ঠিক আছে। মুখ হাত ধুয়ে নিন। গিজার আছে, গরম জল পাবেন।'

দুপুরে যে ট্রেনটা শিলিগুড়ি থেকে আসে, সেটা এসে উপস্থিত হল বেলা চারটেয়। বৃষ্টির জন্য। কাক-ভেজা হয়ে এসে উপস্থিত হলেন অরূপরতন মহাপাত্র। ছোট রেলের ট্রেনটা যে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছবে এ ভরসাই নাকি ছিল না। প্রবল বর্ষণে অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। তবে লাইন চালু আছে এখনও। অরূপরতনের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল দোতলার নয় নম্বর ঘরটা। কিচেন-ব্লকের উত্তরে, সিঁড়ির পাশেই। অরূপ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখলেন। প্রশংসা করলেন—অতটা না বাড়ির, তার চেয়ে বেশি তার রূপসজ্জার। সুজাতার রুচিকেই তারিফ করলেন বারে-বারে। সুজাতা সারা বাড়িটা দেখিয়ে ওঁকে পৌঁছে দিচ্ছিল ওঁর সাত নম্বর ঘরে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল কাবেরীর সঙ্গে। সে নীচে নামছিল। সুজাতা ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেয় ঃ মিস কাবেরী দত্তগুপ্তা, আজই সকালে এসেছেন। আর ইনি মিঃ অরূপরতন মহাপাত্র, অ্যাডভোকেট। আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

কাবেরী কোনও কৌতূহল দেখাল না। মামুলি নমস্কার করল শুধু।

অরূপ প্রতিনমস্কার করে বললে, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

'আমাকে! কোথায়?' কেমন যেন চমকে ওঠে কাবেরী।

'মাপ করবেন, আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান?'

'ক্রিশ্চিয়ান! না তো! এমন অদ্ভুত কথা মনে হল কেন আপনার?'

অরূপ হেসে বলে, 'আমারই ভুল তাহলে। আমার এক খ্রিস্টান বন্ধুর বিয়েতে একবার চার্চে

BanglaBook.org

গিয়েছিলাম—বছরখানেক আগে। সেখানে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—।'

'না-না, আমার বংশের কেউ কখনও গির্জায় যায়নি। আপনি ভুল করছেন।'

কাবেরী তরতরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

অরূপ একটু হকচকিয়ে যায়। সুজাতাকে বলে, 'ভদ্রমহিলা কি অফেন্স নিলেন?'

'অফেন্স নেওয়ার মতো কোনও কথা তো আপনি বলেননি।'

'না, তা বলিনি। আমারই ভুল।'

সুজাতার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা। সেবারও অরূপরতন একজনকে দেখে বলেছিলেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?' আর সেবার কিন্তু অরূপের ভুল হয়নি।

বিকাল নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন আর একজন আগন্তুক। আসার ঘণ্টাখানেক আগে দার্জিলিং থেকে একটা টেলিফোন করে জানতে চাইলেন—সিঙ্গল-সিটেড ঘর পাওয়া যাবে কি না। কৌশিক অবস্থা বেগতিক দেখে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সুজাতা শোনেনি। সুজাতার মতে বোর্ডাব হচ্ছে ওদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। উদ্বোধনেব দিনেই সে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না—যতই কেন না অসুবিধে হোক। ফলে ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ। সরকারি অফিসার ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েরা বিবাহিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। খেয়ালি মানুষ, মেজাজ একটু তিরিক্ষে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি ছবি এঁকে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ে এসেছেন ছবি আঁকতে। দ্বিতলের আট নম্বরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল।

বাসু-সাহেব সস্ত্রীক যখন এসে পৌঁছলেন তখন দিনের আলো মিলিয়ে গেছে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সবাই জমিয়ে বসেছেন ড্রইংরুমে। আলি-সাহেব, কাবেরী, অরূপ, অজয় চাটুজ্জে এবং কৌশিক। শুধু সুজাতা অনুপস্থিত। সে ছিল কিচেন ব্লকে। এতগুলি প্রাণীর রান্নার জোগাড় তাকে করতে হচ্ছে একা হাতে। কালীপদ শয্যাশায়ী। কাঞ্চী আদৌ আসেনি। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার অবসর নেই সুজাতার। কৌশিক একবার এসেছিল কোনও সাহায্য করতে হবে কি না জানতে; রূঢ়ভাবে সুজাতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুজাতার মেজাজ হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল কেন কৌশিক কিছু আন্দাজ করতে পারে না। অতএব সেও গুটিগুটি এসে বসেছে ড্রইংরুমে।

বাইরের দিক থেকে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাসু-সাহেব, চাকা-দেওয়া চেয়ারে সহধর্মিণীকে নিয়ে। কৌশিক সকলের সঙ্গে তাঁর পবিচয় করিয়ে দেয়, আর ওঁদের বলে, 'আর এঁদের পরিচয় উনি আমাদের মামা আর মামিমা। মিস্টার পি. কে বাসু, বার অ্যাট-ল আর মিসেস রাণী বাসু। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! আমার একটা ঘোষণা আছে। এমন জমাট বর্ষার সন্ধ্যায় আপনাদের একটি সুখবর দিচ্ছি—আমাদের বাসু-মামুর ঝুলিতে অসংখ্য ইন্টারেস্টিং কেস-হিস্ট্রি আছে। উনি ছিলেন ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। ফলে উনি যদি একটি গোয়েন্দা গল্প ফাঁদেন আমরা অজান্তে ডিনার টাইমে পৌঁছে যাব।'

আলি বলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনার ঝুলি ঝেড়ে অতীত দিনের কোনও একটা লোমহর্ষক কাহিনি বের করে ফেলুন বাসু-সাহেব—।'

বাসু-সাহেব একটা সোফায় সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছেন। পাইপ আর পাউচটা বার করে লক্ষ করে দেখছিলেন—টোবাকোটা ভিজে গেছে কি না। অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'উঁ! অতীত দিনের কোনও লোমহর্ষক কাহিনি? নো, আয়াম সরি—।'

'শোনাবেন না?' হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

'না। অতীতের কথা থাক। Let the dead past bury it's dead! তবে তোমাদের একেবারে নিরাশও করব না। অতি সাম্প্রতিক কালের একটা লোমহর্ষক কাহিনি তোমাদের শোনাব—।'

'সে তো আরও ভালো কথা—' বলে ওঠে কাবেরী।

BanglaBook.org

'উঁ? ভালো? তা ভালো-খারাপ জানি না—আজই—এই ধরো ঘণ্টা চোদ্দো আগে দার্জিলিং-এ একটা হোটেলে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।'

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, 'দার্জিলিঙের হোটেলে? কোন হোটেলে?'

'হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?'

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন সোৎসুক দর্শকবৃন্দের ওপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন, 'আমি চিনি। ইন ফ্যাকট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ওই হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।'

'তাই নাকি! তা এত বড় খবরটা শোনেননি?' প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।'

অজয়বাবু একটু নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'শুনব না কেন, শুনেছি! তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেছে!'

কৌশিক বলে, 'কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?'

'কী বলব? এটা কি একটা বলার মতো কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফূর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা খুনের খবরটা জনে-জনে বলে বেড়াতে হবে, তার অর্থ কী?'

'দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?' প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, 'রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?'

'নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবত। কেন কী হয়েছে তার?'

'রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বারোটার সময় সে এসে ওঠে ওই হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ'টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং! ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সায়ানাইড ফেলে গেছে!'

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে-মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রাণী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে-মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগারেটের টুকরোর কথা; আর বাইশ নম্বরের ওয়েস্ট পেপার-বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বললেন, 'ওই মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কী বর্ণনা পেলেন?'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, 'হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মতো। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—।'

'আলি হেসে বললেন, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টাখানেক পরে।'

'এবং লোকটা পাইপ খেত।' পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

'পাইপ খেত! সেরেছে!' জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন—যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত, কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, 'মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান!'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন!' আলি-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।'

BanglaBook.org

'আর মিস ডিক্রুজা?' এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে-দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রং—ফরসা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ-আঠাশ। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাপ নাকি—৩৪-২৮-৩২।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাণী দেবীকে বলে, 'মামিমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যেভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স বুঝে ফেলছেন—।'

রাণী বললেন, 'উনি মিস ডিক্রুজাকে দেখেননি। শোনা কথা বলছেন।'

আলি-সাহেব রসিকতা করে, 'কী দাদা, কানে শুনেই এই! চোখে দেখলে—।'

বাধা দিয়ে রাণী বলে ওঠেন, 'উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন। মিস ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করোনি, সুজাতাও তাই করে। ওই দেখ—।'

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকর অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবার বলেন, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?'

'উঁ?' চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, 'আমাকে বলছেন?'

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেওয়ার জন্যেই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জেমশাই জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিসটার্বড ভিয়ু পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই—।'

'তাহলে শেষপর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরটা নিলেন না যে?'

'ওই যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফট করার আগেই পুলিশে এসে ঘরটা তল্লাশি করল। ভাবলাম—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"। মানে-মানে সরে পড়লাম ওখান থেকে—।'

'মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি ওই ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিট-খানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ওই এক মিনিটের ভেতর কোনও অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ওই ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন? যেমন ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরোনো ক্যাশমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—?'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব।'

অরূপ বলে ওঠে, 'কী হল মশাই? রাগ করছেন কেন?'

'রাগ নয়, আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিশি প্যাঁচ। আমি একটু আনডিসটার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—।'

রীতিমতো রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার স্যার? ওই ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিছু মালঝাল পাওয়া গেছে নাকি?'

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, 'কী দরকার অরূপ ওসবের মধ্যে আমাদের যাওয়ার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর ফুর্তি করতে। কী বলেন?'

BanglaBook.org

'উঁ? ভালো? তা ভালো-খারাপ জানি না—আজই—এই ধরো ঘণ্টা চোদ্দো আগে দার্জিলিং-এ একটা হোটেলে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী!'

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, 'দার্জিলিঙের হোটেলে? কোন হোটেলে?'

'হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?'

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন সোৎসুক দর্শকবৃন্দের ওপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন, 'আমি চিনি। ইন ফ্যাকট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ওই হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।'

'তাই নাকি! তা এত বড় খবরটা শোনেননি?' প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।'

অজয়বাবু একটু নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'শুনব না কেন, শুনেছি। তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেছে!'

কৌশিক বলে, 'কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?'

'কী বলব? এটা কি একটা বলার মতো কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফূর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা খুনের খবরটা জনে-জনে বলে বেড়াতে হবে, তার অর্থ কী?'

'দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?' প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, 'রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?'

'নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবত। কেন কী হয়েছে তার?'

'রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বারোটার সময় সে এসে ওঠে ওই হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ'টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং! ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সায়ানাইড ফেলে গেছে!'

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে-মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রাণী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে-মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে অ্যাশট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগারেটের টুকরোর কথা; আর বাইশ নম্বরের ওয়েস্ট পেপার-বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বললেন, 'ওই মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কী বর্ণনা পেলেন?'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, 'হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মতো। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—।'

'আলি হেসে বললেন, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টাখানেক পরে।'

'এবং লোকটা পাইপ খেত।' পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

'পাইপ খেত! সেরেছে!' জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন—যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত, কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, 'মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন!' আলি-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।'

BanglaBook.org

'আর মিস ডিক্রুজা?' এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে-দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রং—ফরসা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ-আঠাশ! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। মাপ নাকি—৩৪-২৮-৩২।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাণী দেবীকে বলে, 'মামিমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যেভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স বুঝে ফেলছেন—।'

রাণী বললেন, 'উনি মিস ডিক্রুজাকে দেখেননি। শোনা কথা বলছেন!'

আলি-সাহেব রসিকতা করে, 'কী দাদা, কানে শুনেই এই! চোখে দেখলে—।'

বাধা দিয়ে রাণী বলে ওঠেন, 'উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন! মিস ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করোনি, সুজাতাও তাই করে। ওই দেখ—।'

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকব অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনেব পাতা উলটে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবাব বলেন, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?'

'উঁ?' চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, 'আমাকে বলছেন?'

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেওয়াব জন্যেই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জেমশাই জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিসটার্বড ভিয়ু পাওযা যাচ্ছিল না, তাই—।'

'তাহলে শেষপর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘবটা নিলেন না যে?'

'ওই যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফট কবার আগেই পুলিশে এসে ঘরটা তল্লাশি করল। ভাবলাম—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"। মানে-মানে সবে পড়লাম ওখান থেকে—।'

'মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি ওই ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিট খানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ওই এক মিনিটের ভেতব কোনও অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ওই ঘরের ওয়েস্ট-পেপাব বাস্কেটে ফেলে দেন? ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরোনো ক্যাশমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—?'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব।'

অরূপ বলে ওঠে, 'কী হল মশাই? রাগ করছেন কেন?'

'রাগ নয়, আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিশি প্যাঁচ। আমি একটু আনডিসটার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—।'

রীতিমতো রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার স্যার? ওই ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিছু মালঝাল পাওয়া গেছে নাকি?'

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, 'কী দরকার অরূপ ওসবের মধ্যে আমাদের যাওয়ার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর ফুর্তি করতে। কী বলেন?'

BanglaBook.org

দর্শকদলের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন উনি। আলি কী একটা কথা বলতে গেলেন, তারপর কাবেরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চুপ করে গেলেন হঠাৎ।

বাসু-সাহেব অরূপরতনকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'একটা কথা আমাকে বলো তো অরূপ—ওই নকুল হুইয়ের কেসটায় তুমি কি ডিফেন্স কাউন্সিলার ছিলে? কেসটার খবর আর আমি কিছু নিইনি।'

'না। আমি সরকার-পক্ষে ছিলাম।'

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'সরকার পক্ষে! সে কী? মার্ডার কেস-এ তো পাবলিক প্রসিকিউটার থাকেন সরকার পক্ষে—।'

'তাই থাকেন।' বুঝিয়ে বলে অরূপ—'নকুল হুইয়ের কেসটায় আমাকে সরকার-পক্ষ থেকেই পি. পি.-র সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।'

'তাই নাকি? এ খবর তো বলনি আমাকে?' বাসু-সাহেব বলে ওঠেন।

'বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? আপনি তো দীর্ঘদিন না-পাত্তা!'

'তাহলে তুমিই হচ্ছ নকুল হুইয়ের দু-নম্বর শত্রু?'

অরূপ অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে? নকুল হুই তো মরে ভূত!'

'জানি। কিন্তু শুনেছি নকুল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল। এত মামলা লড়ার খরচ সে পেল কোথায়?'

আলি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'মাপ করবেন ব্যারিস্টার-সাহেব, নকুল হুই চরিত্রটা এখনও এসট্যাবলিশড হয়নি। আমরা কাহিনিব ঠিক রসাস্বাদন করতে পারছি না।'

কৌশিক এবং অরূপ ভাগাভাগি করে পূর্ব-কাহিনির মোটামুটি একটা খসড়া পেশ করে। অরূপরতন উপসংহারে বলে, 'নকুল হুই লোকটাকে আমরা ঠিকমতো চিনতে পারিনি। দীর্ঘদিন ধরে সে আগরওয়াল ইন্ডাসট্রিস-এ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেক টাকা সে তলে-তলে সরিয়েছিল—যে-কথা শেষ পর্যন্ত জেনে যেতে পারেননি ময়ূরকেতন আগরওয়াল। নকুল থাকত নিতান্ত গরিবের মতো—কিন্তু বেশ পুঁজি জমিয়ে ফেলেছিল সে। এমনকী ওর ভাইকে নাকি আমেরিকা পাঠিয়েছিল খরচ দিয়ে। ভাইটিও দাদার উপযুক্ত! মার্কিন মুলুকে নাকি নামকরা গ্যাংস্টার হয়েছিল শেষ পর্যন্ত! সেই ভাই-ই ওর মামলাব খরচ দেয়। শুনেছি ফাঁসির দিন মার্কিন-মুলুক থেকে ওর সেই ভাই চলে এসেছিল ভারতবর্ষে!'

বাসু-সাহেব নির্বাপিত পাইপটি ধরাতে-ধরাতে বলেন, 'কী নাম নকুলের ভায়ের? সহদেব নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনি কেমন করে জানলেন?'

'জানি না। আন্দাজ করছি। এপিক্যাল ইনফারেন্স—মানে মহাভারতের ওইরকমই নির্দেশ। তা সেই সহদেব বাবাজীবনের দৈহিক বর্ণনাটা কী?' কাবেরীর দিকে ফিরে যোগ করেন, 'যাকে বলে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স আর কি!'

'আমি জানি না। সহদেবকে আমি স্বচক্ষে কোনওদিন দেখিনি।' বলে অরূপ।

সুজাতা এই সময় এসে ঘোষণা করে : 'ডিনার রেডি!'

সভা ভঙ্গ হল।

BanglaBook.org

আহারাদি মিটতে যার নাম দশটা। ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বৃষ্টি থামেনি। ক্রমাগত বর্ষণ হয়ে চলেছে। খরস্রোতা উপলবন্ধুর জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে সর্পিল গতিতে ছুটে আসছে সমতলের সন্ধানে। বাতি এখনও জ্বলছে। যে-কোনও মুহূর্তে ইলেকট্রিক অফ হয়ে যেতে পারে। সুজাতা

ঘরে-ঘরে মোমবাতি রেখে এসেছে। আহারাদি মিটিয়ে যে যার ঘরে চলে গেছেন। কৌশিকও শুতে যাওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময় উপস্থিত হলেন রাতের শেষ অতিথি।

আবার একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পোর্চে।

সুজাতা আর কৌশিক দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন একজন মাঝ-বয়েসি ভদ্রলোক। গাড়ির ভেতর বসেছিলেন আর একজন সুবেশিনী সুন্দরী মহিলা। ভদ্রলোক নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটি এক করে বললেন, 'রাতটুকুর মতো তলায় একখানা করে বালিশ আর ওপরে একখানা ছাদ মিলবে?...আই মিন, আমি আমাদের মাথার কথা বলছি।'

কৌশিক প্রতিনমস্কার করে বলে, 'এমন দুর্যোগের রাত্রে কোন গৃহস্থ "না" বলতে পারে?'

গাড়ির ভেতর এক-গা-গহনা বলে ওঠেন, 'তুমি চুপ করো দিকিনি।'

কৌশিক আঁতকে ওঠে—'আমায় বলছেন?'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আজ্ঞে না, আমায়। 'ডায়ালগটা ছাড়তে একটু দেরি হয়েছে ওঁর...আই মিন, আপনার ডায়ালগের আগে ওঁর ডায়ালগ।...ইয়ে, উনি মানে আমার বেটার হাফ।'

ভদ্রমহিলা সে কথায় কর্ণপাত না করে এবার সরাসরি কৌশিককে প্রশ্ন করেন, 'এটা হোটেল তো?'

কৌশিক সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

'তবে গৃহস্থের কথা উঠছে কেন? ডবল-বেড রুম হবে?'

কৌশিক জবাব দেওয়ার আগেই ওপরের ধাপ থেকে সুজাতা বলে, 'হবে না।'

ভদ্রমহিলা সুজাতাকে আপাদমস্তক দেখে নেন একবার। তারপর তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কৌশিককেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল-সিটেড?'

কৌশিক যেন শ্রুতিধর। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, 'অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল-সিটেড?

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কৌশিক নিরুপায় ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে যেন কৈফিয়ত দেয়, 'উনি হলেন গিয়ে আবার আমার বেটার-হাফ।'

ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অগত্যা সুজাতার দিকে তাকান।

সুজাতা একইভাবে বললে, 'হবে না।'

ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন। সুজাতা তাঁকে উদ্দেশ করে বললে, 'তবে নীচে একখানা করে বালিশ এবং ওপরে একখানা পাকা ছাদ হতে পারে—।'

ভদ্রলাক চমকে তাকান সুজাতার দিকে।

সুজাতা পাদপূরণ করে : আই মিন, আমি আপনাদের মাথার কথা বলছি।

'এনাফ!' —সোৎসাহে ভদ্রলোক মালপত্র নামাবার উদ্দেশ্যে পিছনের ক্যেরিয়ারটা খুলে ফেললেন। কৌশিক হাত লাগায়। সুজাতাও। এক-গা-গহনা শুধু নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসেন। মালপত্র টানাটানিতে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না।

কৌশিক কাজ করতে-করতেই বলে, 'আপাতত আসছেন কোথা থেকে?'

'Scylla আর Charybdis-এর মধ্যবিন্দু থেকে—' মাল নামাতে-নামাতে জবাব দেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে?' কৌশিক ব্যাখ্যা চায়।

"হর্নস অব এ ডায়লামা" বোঝেন? তারই কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এদিকে কার্শিয়াঙের পথে এক বিরাট খাদ, ওদিকে দার্জিলিঙের রাস্তায় এক হোঁড়ল গর্ত। মাঝখানে স্যান্ডুইচ হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?'

'জলের মতো। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আর কী। ঘুম শহরের এই হাল হয়েছে তা আমরা এখনও টের পাইনি।'

BanglaBook.org

'আমরা পেয়েছি। অস্থিতে-অস্থিতে। দার্জিলিং থেকে কলকাতা যাচ্ছিলাম। বাধা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছিলাম দার্জিলিঙে। দুদিকেই রোড ক্লোজ্‌ড।'

খানকয়েক দশ টাকার নোট বের করে দিলেন তিনি ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে, বললেন, 'তোড়ানি রাখ দো ভাইসাব,—তোমার অবস্থাও তো সসেমিরা। আপাতত ঘুমের রাজ্যে কোথায় ঘুমোবে দেখ।

একগাল হেসে ড্রাইভার ব্যাক করল ট্যাক্সিটা।

দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরটা খুলে দিল সুজাতা। এটা সাজানো নেই, ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। এক-গা-গহনা এক নজর ঘরটা দেখে নিয়ে বললেন, 'ও রাম! পরদা নেই, বেড-কভার নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই—গুদাম ঘর নাকি?'

কৌশিক আমতা-আমতা করে বলে, 'আজ্ঞে না। এটা সবচেয়ে ভালো ডবল-বেড রুম। আকাশ ফাঁকা হলে ঘরে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাবেন। তবে ইয়ে...এটা ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। বেডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু পরদা বা ড্রেসিং টেবিল দিতে পারব না।'

ভদ্রমহিলা আড়চোখে একবার সুজাতাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'ভাড়া বোধ করি পুরোই নেবেন?'

ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আহাহা, ভাড়ার কথা কাল হবে। ইয়ে, আপনাদের কিচেন বোধ করি ক্লোজ্‌ড হয়ে গেছে?'

কৌশিক সুজাতার দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত তো বড় কম হয়নি। সব ছুটি হয়ে গেছে। তবে হেড-কুক বোধ হয় এখনও জেগে আছে, নয়?' শেষ প্রশ্নটা সুজাতাকে।

সুজাতা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'হেড-বেয়ারাও জেগে আছে মনে হয়।'

'অ!' কৌশিক ঢোক গেলে।

ভদ্রলোক সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, 'লোকে খেতে পেলে শুতে চায়...আই মিন, শুতে পেলে খেতে চায়। হবে কিছু? শুকনো বিস্কুট অবশ্য এখনও কিছু আছে আমাদের সঙ্গে।'

সুজাতা বললে, 'ডবল-ডিমের অমলেট আর কফি হতে পারে।'

'এনাফ। এনাফ।' ভদ্রলোক খুশিয়াল হয়ে ওঠেন।

তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে গহনা-ভারাক্রান্ত বলে ওঠেন, 'তুমি থামো!' তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, 'তাই বলে রাতের ফুল-মিল চার্জ করবেন না তো?'

সুজাতা যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল। দ্বারের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ফুল-মিলই চার্জ করা হবে। অসুবিধে থাকে তো দরকার কী? শুকনো বিস্কুট চিবিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিন না?'

ভদ্রমহিলাও ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই বেটার-হাফ দুজনকে দেখে নিলেন। দুই ওয়ার্ক-হাফ কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। ভদ্রমহিলা কৌশিককে প্রশ্ন করেন, 'হোটেলের ম্যানেজার কে?'

'ইয়ে, আমি!' কবুল করে কৌশিক।

'তবে সব কথায় উনি অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং করছেন কেন?'

কৌশিক আমতা-আমতা করে বলে, 'উনি যে আমার এমপ্লয়ার, হোটেলের মালিক।'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, 'আই ফলো।' স্ত্রীকে বলেন, 'এই তুমি যেমন আমার গার্জেন আর কি?' সুজাতাকে বলেন, 'তা ফুল-মিল চার্জই নেব। কিচেন যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে বইকী। আমার জন্যে এক প্লেট পাঠিয়ে দিন। আর ইয়ে...ওঁর যখন এত আপত্তি, উনি না হয় বিস্কুটই খাবেন রাত্রে।'

'থামো তুমি। ডাকাতের হাতে যখন পড়েছি, তখন নাচার।' মহিলা ক্ষুব্ধা।

'আমিও তো তাই বলছি—যাহা বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি। ও-দু-প্লেটই পাঠিয়ে দিন। আর কড়া দু-কাপ কফি।'

BanglaBook.org

'না, এক কাপ কফি, এক কাপ চা। রাত্রে কফি খেলে ওঁর ঘুম হয় না।'

নিরুপায় ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন শুধু।

সুজাতা নেমে আসে কিচেন-ব্লকে। ভদ্রলোক পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটা আইভরি-ফিনিশড কার্ড বের করে কৌশিককে দেন। বলেন, 'আমার নাম ডঃ এ কে. সেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। আপনার রেজিস্টারে কাল সকালে সই করে দেব। কেমন?

কৌশিকও নেমে আসে। পায়ে-পায়ে এসে হাজির হয় কিচেন ব্লকে। সুজাতা গুম মেরে আছে। কাল থেকেই তার কী যেন হয়েছে। কৌশিক ইতস্তত করে। ঘুরঘুর করে—সান্ত্বনাবাচক কী বলবে ভেবে পায় না। সুজাতা বলে, 'ডিমটা ফাটাও।'

ফর্ক দিয়ে ডিমগুলো ফাটাতে-ফাটাতে কৌশিক একটা স্বগতোক্তি করে, 'প্রমোশনই হল আমার। স্বাধীন ব্যাবসা! বিয়ের আগে ছিলাম হুজুরাইন-এর ড্রাইভার, বিয়ের পরে হলাম হেড-বেয়ারা।'

সুজাতা হাসল না পর্যন্ত।

ওরা ভেবেছিল কর্মব্যস্ত উদ্বোধনের দিনটার বুঝি এখানেই সমাপ্তি। ভুল ভেবেছিল। হেড-কুক অমলেট নিয়ে, আর হেড-বেয়ারা কফি ও চা নিয়ে দ্বিতলে যখন পৌঁছে দিয়ে এল, ভদ্রলোক তখন সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'সো সরি! আপনাদের চাকর-বেয়ারা পর্যন্ত শুয়ে পড়েছে দেখছি। খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

সুজাতা অম্লান বদনে বললে, 'সঙ্কুচিত হওয়ার কী আছে? এক্সট্রা চার্জ তো সেই জন্যেই দিচ্ছেন।'

শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঠিক তখনই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ঘড়ির দিকে নজর গেল স্বভাবতই। রাত পৌনে এগারোটা।

দুজনেই নেমে আসে আবার। সুজাতাই তুলে নিল টেলিফোনটা : 'হ্যালো। "রিপোজ" হোটেল।...হ্যাঁ, আছেন। কোথা থেকে বলছেন?'

শুনে নিয়ে সুজাতা কৌশিককে বলে, 'তোমাকে খুঁজছে। ও. সি. সদর, দার্জিলিং।'

'থানা। কেন, কী হল আবার?' শঙ্কিত কৌশিকের প্রশ্ন।

'কী হল তা নিজের কানে শোনো।' রিসিভারটা হস্তান্তরিত করে সুজাতা পা বাড়ায়। যায় না কিন্তু। অপেক্ষা করে।

'কৌশিক মিত্র বলছি। কে বলছেন?'

'নৃপেন ঘোষাল। ও. সি. দার্জিলিং সদর। ব্যারিস্টার-সাহেব জেগে আছেন?'

'না, ঘুমোচ্ছেন। কেন, কী হয়েছে? ডেকে দেব?'

'না, থাক। তা হলে আপনাকেই বলি। সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আকারে-ইঙ্গিতে বলব—বুঝে নেবেন। শুনুন : ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে শুনেছেন নিশ্চয় আজ সকালে দার্জিলিং-এর একটি হোটেলে—।'

'হ্যাঁ জানি, কাঞ্চনজঙ্ঘায়—।'

প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন ঘোষাল, 'প্লিজ ডোন্ট মেনশন এনি নেম। শুনুন। আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, সন্দেহভাজন লোকটা এখন ঘুমে আছে, রিপোজ-এর কাছাকাছি। হয়তো রিপোজ-এর ভেতরেই। দ্বিতীয়ত, যে-ঘটনা দার্জিলিং-এ ঘটেছে, অনুরূপ একটি ঘটনা হয়তো ঘুমে ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো রিপোজ-এর ভেতরেই। ফলে?'

কৌশিক অকপটে স্বীকার করে, 'না। আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই নয়?—না বোঝার কী আছে?'

'এমন সব অদ্ভুত কথা অনুমান করার হেতু?'

'সে-কথা টেলিফোনে বলা যায় না। শুনুন আজ রাত্রেও আপনাদের ওখানে ওই জাতীয়

BanglaBook.org

ঘটনা ঘটতে পারে। খুব সতর্ক থাকবেন, বুঝলেন?'

কৌশিক বিহ্বল হয়ে বলে, 'একটু ধরুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে ফের আপনার সঙ্গে কথা বলছি।'

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে কৌশিক সুজাতাকে ব্যাপারটা জানায়। সুজাতা ওর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে তার মাউথপিসে বলে, 'মিসেস মিত্র বলছি। আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় ইনসিকিওর্ড বোধ করছি। কিছু করা যায়?'

ও-প্রান্ত থেকে ইতস্তত করে বলে, 'মুশকিল কী জানেন, কার্ট রোড ভেঙে গেছে। ঘুম আউটপোস্টে ব্যাপারটা আমি টেলিফোনে জানিয়েছি। ওরা ওয়াচ রাখবে। আপনারা ওখান থেকে পারতপক্ষে কোনও টেলিফোন কল ইনিশিয়েট করবেন না।'

মরিয়া হয়ে সুজাতা বলে, 'থানা থেকে কেউ এসে থাকতে পারে না, আজ রাত্রে?'

'ওখানকার লোকাল ফাঁড়িতে তেমন লোক কেউ নেই। আচ্ছা এক কাজ করছি। আমার একজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি। মিস্টার পি. কে. বাসু, তাকে চেনেন। এখান থেকে জিপে বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত যাবে, বাকি পথ হেঁটে যাবে। আপনারা জেগে থাকবেন, যাতে কলিং বেল বাজাতে না হয়।'

'ধন্যবাদ। কী নাম বলুন তো তাঁর?'

'সুবীর রায়।'

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। আর বাইরে একটানা ধারাপাত। আর কোথাও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডাররা যে-যার ঘরে ঘুমে অচেতন। শেষ বাতি নিভেছে ডাক্তার সেন-এর ঘরে। তাও আধঘণ্টা হয়ে গেল। ড্রইংরুমের ঘড়িটা সাড়ে এগারোটায় ঢং করে সাড়া দিল। সারা ঘুম ঘুমে অচেতন।

কৌশিক বললে, 'যাও তুমি শুয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি।'

সুজাতা জবাবে বলে, 'শুয়ে লাভ নেই। ঘুম হবে না। আর আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন মনে হয়।'

ওর অনুমানই ঠিক। রাত বারোটায় সদর দরজার কাচের ওপর একটা টর্চের আলোর সংকেত হল। নিঃশব্দে উঠে গেল কৌশিক। পাল্লাটা একটু খুলে প্রশ্ন করল, 'কে?'

'সুবীর রায়।'

'আসুন।'

আগন্তুক ভিজে বর্ষাতিটা খুলে ফেলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। বয়েস ত্রিশের কোঠায়। হাতে একটা অ্যাটাচি। ওদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, 'মিস্টার আর মিসেস মিত্র নিশ্চয়?'

কৌশিক ঘাড় নেড়ে জানায় ওর অনুমান সত্য।

'কোন ঘরে আমি থাকব দেখিয়ে দিন। কাল সকালে কথা হবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'কেন, ও. সি. বলেননি টেলিফোনে?'

'বলেছেন। সংক্ষেপে। টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না। এমন আশঙ্কা করার কারণটা কী?'

'সেটা কাল সকালে বলব। আপনাদের জেগে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। যা করার আমিই করব। কিন্তু থাকব কোন ঘরে?'

'আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কৌশিক ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিল। একতলার চার নম্বর ঘর। সুজাতাও এল পিছন-পিছন। ঘরে ঢুকেই সুবীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। অ্যাটাচি কেসটা খুলে একটা ম্যাপ বের করে। বলে,

BanglaBook.org

'এটা এ-বাড়ির প্ল্যান। আমরা আছি এই ঘরে। এবার বলুন—কে কোন ঘরে আছেন?'

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'আমাদের হোটেলের প্ল্যান পেলেন কোথায়?'

সুবীর বিরক্ত হয়ে বলে, 'অবান্তর কথা বলে রাত বাড়ানোর দরকার আছে কি?'

কৌশিক আর প্রশ্ন করে না। উপস্থিত আবাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়, আর কে কোন ঘরে আছেন তা প্ল্যানে দেখিয়ে দিতে থাকে। সুবীর প্ল্যানের গায়ে নামগুলি লিখে নিল। তারপর বললে, 'গুড নাইট!'

অসহিষ্ণুর মতো কৌশিক বলে ওঠে, 'একটা কথা অন্তত বলুন—দার্জিলিঙে যে-ঘটনা ঘটেছে, তা হঠাৎ রিপোজ-এ ঘটতে পারে এমন ধারণা কেন হল আপনাদের?'

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে-রাখতে সুবীর বললে, 'বিশে ডাকাতের নাম শুনেছেন?'

'বিশে ডাকাত! না, কে সে?'

'কিংবদন্তির বিশে ডাকাত! সে নাকি ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে নোটিশ দিয়ে আগেইভাগেই জানিয়ে দিত। রমেনবাবুকে যে মেরেছে সে ওই বিশে ডাকাত-এর উত্তরসূরি। সে-ও অমন চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে তার সেকেন্ড টার্গেট আছে ঘুম-এ, ঘুম-এর রিপোজ হোটেলে!'

সুজাতা বলে, 'কী বলছেন আপনি? বিংশ শতাব্দীর কোনও ক্রিমিনাল এমন মূর্খামি করে?'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে! মূর্খামি নয়—লোকটা ওভার কনফিডেন্ট। ইচ্ছা করেই সে এটা করেছে। খুনির একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া। যাকে প্রাণে বধ করবে তাকে আগেভাগে জানিয়ে না দিলে যেন তার তৃপ্তি হচ্ছে না। লোকটা অত্যন্ত পাকা ক্রিমিনাল। আমেরিকায় বাফেলো অঞ্চলে গ্যাংস্টার দলে তার নাম আছে। বেঙ্গল পুলিশের এই আমাদের সে মনে করে চুনোপুঁটি।'

'লোকটা কে তা আপনারা জানতে পেরেছেন?'

'অন্তত নামটা আন্দাজ করা গেছে। তার নাম সহদেব হুই।'

সুজাতার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়, বলে, 'সহদেব হুই! নকুল হুইয়ের ভাই?'

'হ্যাঁ। তাই আমাদের অনুমান।'

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলে, 'ওর সেকেন্ড টার্গেট কে জানেন?'

সুবীর হেসে ফেলে। বলে, 'না। সহদেব আমাকে বলেনি। তবে নকুল হুইয়ের মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী তাদের মধ্যেই কেউ একজন হবেন। আপনারা আন্দাজ করতে পারেন?'

কৌশিক গম্ভীর হয়ে বলে, 'পারি। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু!'

সুবীর হেসে বললে, 'তাও ভালো। আপনাদের মুখ দেখে আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝি আপনাদের দুজনের কেউ।'

॥ পাঁচ ॥

৩ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির বিরাম নেই। ক্রমাগত বর্ষণে চরাচর বিলুপ্ত। এদিকে আজ সকাল থেকে 'রিপোজ' রীতিমতো হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। সকালবেলা আবাসিকেরা যখন প্রাতঃরাশ-টেবিল-এ এসে বসলেন তখন নবাগতদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা মনে হল না কৌশিকের। কালীপদ খাড়া হয়েছে। জ্বর নেই তার। ভোরবেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে হাতে-হাতে কাজ করছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও কাঞ্চী এসেছে ভিজতে-ভিজতে। বর্ষাবিধ্বস্ত বস্তির একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ছিল, কিন্তু সুস্থির হয়ে শোনবার অবকাশ ছিল না সুজাতার। সে ক্রমাগত টোস্ট-পোচ-অমলেট আর হাফ-বয়েল বানিয়ে চলেছে ফরমায়েশ মতো। কাঞ্চী আর কালীপদ

BanglaBook.org

পর্যায়ক্রমে পৌঁছে দিয়ে আসছে চা আর কফি। হোটেল জমে উঠেছে।

আবাসিকরা দেখলেন দুটি নতুন মুখ। ডাঃ সেন আর সুবীর রায়। মিসেস সেনকে অবশ্য দেখতে পেলেন না ওঁরা। তিনি তাঁর দ্বিতলের কামরা থেকে নামলেন না আদৌ। তাঁর ব্রেকফাস্ট কাঞ্চী পৌঁছে দিয়ে এল দ্বিতলের ছয় নম্বর ঘরে। বোধ করি এই সাতসকালে তাঁর যথোপযুক্ত প্রসাধন সারা হয়নি—তাই তিনি এই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করলেন।

সকালে উঠে প্রথম সুযোগেই কৌশিক বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। গতকাল রাত্রে যে-তিনজন নবীন অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ দাখিল করে। বাসু-সাহেব শুনে বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, সুবীর রায় নামটা আমার জানা। তাকে এ ঘরে নিয়ে এসো, আর অরূপকেও খবর দাও—সুজাতা বোধ করি রান্নাঘর ছেড়ে আসতে পারবে না, নয়?'

কৌশিক বলেছিল, 'এখন তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তা হোক, আমিই তো রইলাম। এখানে যা কিছু আলোচনা হবে তা আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

মিনিট দশেক পরে বাসু-সাহেবের ঘরে একটি গোপন বৈঠক বসল। অরূপরতন আর সুবীর রায় যোগ দিল তাতে। কৌশিক সুবীরকে পরিচয় করিয়ে দিল ওঁদের সঙ্গে। বেচারি স্থির হয়ে বসতে পারছিল না আলোচনা সভায়। তাকে বারে-বারে দেখে আসতে হচ্ছিল ঘরের চারপাশ। কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না। না, শুনছে না। ডাঃ সেন তাঁর উত্তমার্ধের সঙ্গে তাস খেলছেন নিজের ঘরে; আলি-সাহেব নিজের ঘরে একটি ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাসে বুঁদ। কাবেরী আর অজয়বাবু আছেন দোতলার উত্তরের বারান্দায়। কাবেরী বসে আছে একটি টুলে, উদাস ভঙ্গিতে আকাশপানে তাকিয়ে। অজয়বাবু ক্রেয়নে তাঁর একটি স্কেচ করছেন। দুজনে ভাব হয়ে গেছে বেশ।—সুন্দরী তন্বী কাবেরী দত্তগুপ্তা এবং বৃদ্ধ চিত্রকর অজয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে।

বাসু-সাহেব বললেন, 'মিস্টার রায়, আপনার কথা নৃপেন ঘোষাল আমাকে বলেছিল—।'

বাধা দিয়ে সুবীর বললে, 'আপনি স্যার আমাকে "তুমিই" বলবেন—।'

'তা না হয় বলব, কিন্তু—।'

কৌশিক আবার উঠে পড়ে। বলে, 'আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—।'

তাকে বাধা দিয়ে রাণী বলেন, 'না। তুমি থাক কৌশিক। আমিই বরং ব্যূহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় থাকি। তেমন-তেমন কাউকে আসতে দেখলেই আমি গান ধরব—।'

হুইল-চেয়ারে পাক দিয়ে রাণী দেবী বের হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে বারান্দায়। ড্রইংরুমে যেখানে পিয়ানোটা বসানো আছে তার পাশের দরজার কাছে থামলেন তিনি—যাতে দুদিকেই নজর রাখা যায়।

বাসু-সাহেব বললেন, 'রিপোজ-এর বাসিন্দারা এখন স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছেন একজন ভালনারেবল। তিনি যে কে তা আমরা ঠিক জানি না, তবে সে দলের সভ্যসংখ্যা পাঁচ—রাণী, সুজাতা, কৌশিক, অরূপ আর আমি। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আছেন একজন সুচতুর দক্ষ ক্রিমিনাল—তার রেঞ্জ হচ্ছে আলি, কাবেরী, ডাঃ অ্যান্ড মিসেস সেন এবং অজয় চট্টোপাধ্যায়।'

'এঁরা সবাই?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

'সবাই নয়, এঁদের মধ্যে যে-কোনও একজন অথবা দুজন। নৃপেন এবং সুবীরের ধারণা—এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত—রমেন গুহর মৃত্যুর পিছনে আছে সহদেব ঘই-এর হাত। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। ইব্রাহিম যদি স্বয়ং সহদেব হয় তবে সন্দেহ করতে হবে আলি এবং ডক্টর সেনকে। আর সহদেব যদি কোনও এজেন্ট লাগিয়ে থাকে তবে অজয়বাবুকেও নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। অপরপক্ষে মিস ডিক্রুজা যদি রমেন গুহর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে কাবেরী আর মিসেস সেনকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলে না।'

অরূপ প্রশ্ন করে, 'প্রথমে বলুন তো—আপনারা কেন মনে করছেন রমেন গুহর মৃত্যুতেই

BanglaBook.org

ব্যাপারটার যবনিকাপাত ঘটেনি? রিপোজ-এ আমাদের মধ্যে ওই ঘটনায় পুনরাভিনয় হওয়ার কথা আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন?'

বাসু-সাহেব বললেন, 'কালকে সে-কথার কিছুটা ইঙ্গিত আমি দিয়েছি। ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত ঘরটা সার্চ করতে গিয়ে নৃপেন একখণ্ড কাগজ পায় ওই ঘরের ময়লা-ফেলা কাগজের ঝুড়ি থেকে। কাগজটা আমার কাছে নেই—নৃপেন নিয়ে গেছে, না হলে তোমাদের দেখাতাম—।'

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, 'কাগজখানা আমার কাছে আছে।'

'তোমার কাছে? নৃপেন দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এই দেখুন।'

অ্যাটাচি কেস খুলে কাগজখানা সে বাসু-সাহেবকে দেয়। সবাই ঝুঁকে পড়ে। হাতে-হাতে কাগজখানা ঘোরে। অবশেষে সেটি বাসু-সাহেবের হাতে আসে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাগজটা পরীক্ষা করেন। আলোর সামনে সেটা ধরেন, যেন একশো টাকার নোট জাল কি না দেখছেন। কৌশিক লক্ষ করে দেখল, কাগজটা দলামচা করা হয়েছিল। কোঁচকানোর দাগ আছে। তার ওপরপ্রান্তে পারফোরেশনের চিহ্ন—যেন ফুটো-ফুটো করা নোটবইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা। একটি প্রান্ত মসৃণ আর দুটি প্রান্তে যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার চিহ্ন। কাগজটায় কালো কালিতে লেখা :

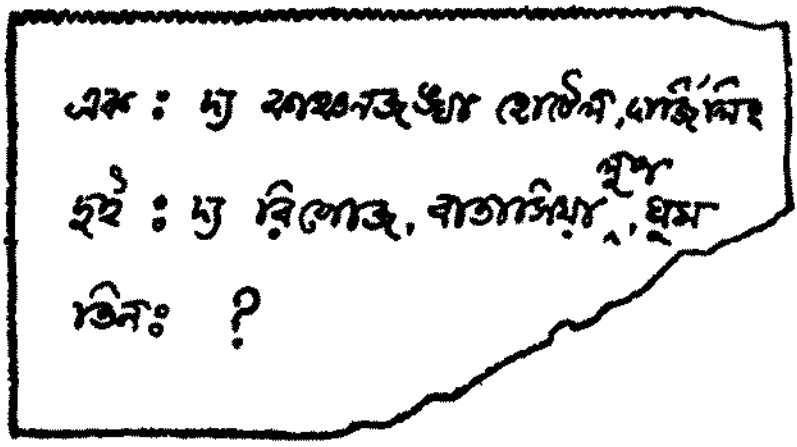

সুবীর বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে—রিপোজ-এ দ্বিতীয়বার হত্যা করলেও আততায়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা নিবৃত্ত হবে না। সে তিন নম্বর হত্যার কথাও চিন্তা করছে?'

কৌশিক বললে, 'নকুল হুইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্যে যদি এ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে, তবে আমার মনে হয় আততায়ীর দু-নম্বর টার্গেট হচ্ছেন বাসু-সাহেব, তাই নয়?'

অরূপ বললে, 'তুমি আমিও হতে পারি। সুজাতা দেবীই বা কেন বাদ যাবেন? আমরা সকলেই নকুল হুইয়ের ফাঁসির জন্যে আংশিকভাবে দায়ী।'

'সে-কথা ঠিক।' কৌশিক মেনে নেয়।

বাসু-সাহেব চোখ বুজে আপনমনে পাইপ খাচ্ছিলেন। সুবীর বলে, 'আপনি স্যার কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?'

বাসু-সাহেব চোখ মেলে তাকান। বিচিত্র হাসেন। বলেন, 'ভাবছি? হ্যাঁ, ভাবছি বইকী। ভাবনার কি অন্ত আছে? কিন্তু আজ এই পর্যন্তই—' উঠে দাঁড়ান তিনি, বলেন, 'দীর্ঘ আলোচনার কিছু নেই, এভাবে আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালে ও-পক্ষ সজাগ হয়ে যাবে। সো উই ডিজলভ।'

BanglaBook.org

বেশ বোঝা গেল সকলেই এ সিদ্ধান্তে মর্মাহত। এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে তা কেউ ভাবেনি। কিন্তু রায় দিয়ে বাসু-সাহেব উঠে পড়েছিলেন। গুটিগুটি বেরিয়ে এসে বসলেন বারান্দার একান্তে একটি ইজি-চেয়ারে। কৌশিক, অরূপ আর সুবীর একে-একে চলে গেল। রাণী দেবী তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে পাক মেরে ঘনিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের পাশে। ধ্যানস্থ বাসু-সাহেব বোধ করি তা টের পাননি। তিনি চমকে উঠলেন রাণী দেবীর প্রশ্নে ঃ কী হল? এরই মধ্যে কনফারেন্স শেষ?'

'উঁ! হুঁ।' অন্যমনস্কের মতো জবাব দিলেন বাসু। মাঝে-মাঝে পাইপে টান দিচ্ছেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়াটা উঠছে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।'

'কী ভাবছ বলো তো?' আবার প্রশ্ন করেন রাণী বাসু।

'ভাবছি? ওই রমেন গুহর মৃত্যু-রহস্যের কথাই ভাবছি। আর কী ভাবব?'

সহানুভূতির সুরে রাণী বলেন, 'কে খুন করেছে তার কোনও কূলকিনারাই করতে পারছ না, নয়?'

বিচিত্র হাসলেন বাসু-সাহেব। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'সেইটেই তো ট্র্যাজেডি রাণু। লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। কে খুন করেছে, কেন করেছে, এখানেই বা কাকে খুন করতে চাইছে তা বোধহয় সব ঠিকমতোই জানতে পেরেছি আমি। অথচ আমার হাত-পা বাঁধা। সব জেনেও কিছু করতে পারছি না। ট্র্যাজেডিটা বুঝতে পারছ?'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাণী দেবী। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা স্বামীর দিকে। যাঁকে তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে চেনেন—অথচ সে লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলেন, 'খুনি কে তা তুমি জানো?'

মুখটা সূচলো করলেন বাসু-সাহেব। সম্মতি-সূচক গ্রীবা সঞ্চালন করলেন শুধু।

'সে এখানে আছে? এই রিপোজ-এ?'

একইরকম ভঙ্গি করেন উনি।

'আমাকে বলতে পারো না?'

এবার দুদিকে মাথা নাড়েন উনি।

'আমাকে না পারো, অন্তত সুবীরকে বলো, 'নৃপেনকে কিংবা বিপুলকে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের। বললেন, 'উপায় নেই রাণু। আমার হাতে যা এভিডেন্স আছে তাতে কনভিকশান হবে না। এখন কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করবে না—বলবে পি. কে. বাসু একটা বদ্ধ পাগল! লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে হবে—তার দ্বিতীয় খুনের প্রচেষ্টার পূর্বমুহূর্তে।'

'ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাবে না?'

'তা কিছুটা যাবে। কিন্তু উপায় কী বলো? ওকে গিলটি বলে প্রমাণ করব কীভাবে? ওর দাড়ি, চশমা নেই—বীরবাহাদুর আইডেন্টিফিকেশান প্যারেডে ওকে চিনতে পারবে না। তা ছাড়া বীরবাহাদুর অথবা মহেন্দ্র ওকে দেখেছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। একমাত্র যদি মিস ডিক্রুজাকে খুঁজে বের করতে পারি তবে হতে পারে। সে সারাদিন ইব্রাহিমকে দেখেছে। বাট ব্ল নোজ—ডিক্রুজা ওর পাপের সাথী হতেও পারে, আবার নাও পারে।'

রাণী দেবী ঝুঁকে বললেন, 'কী ক্লু পেয়েছ তুমি?'

'নিজেই গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? উঁ?'

'বলো না?'

'সুবীরের হাতে ওই "এক ঃ দুই ঃ তিন" লেখা কাগজখানায়। প্রথমবার আমি ভালো করে ওটা পরীক্ষা করিনি। এবার তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করেছি। ওর ভেতরেই সহদেব ভুল করে রেখে গেছে তার আত্মপরিচয়। বেচারি সহদেব ছুঁই!'

BanglaBook.org

'তবে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'ওই যে বললাম—যে-সূক্ষ্ম যুক্তির বিচারে আমি ইব্রাহিমকে শনাক্ত করছি, তাতে খুনি-আসামির কনভিকশান হয় না। আমাকে জানতে হবে মিস ডিক্রুজা ওর পার্টনার-ইন-ক্রাইম ছিল কি না। একমাত্র সেই পারবে ইব্রাহিমকে শনাক্ত করতে। সহদেবকে আমি খুঁজে পেয়েছি, এখন খুঁজছি মিস ডিক্রুজাকে—এই বিপোজ হোটেলেই।'

'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বাহাদুর আর মহেন্দ্রকে আনানো যায় না?'

এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই বাসু-সাহেব দেখলেন কৌশিক এগিয়ে আসছে ওঁদের দিকে।

'কী ব্যাপার? এমন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন হে তোমাকে?'

'কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড স্যার! এক নম্বর, টেলিফোন লাইনটা সকাল থেকে ডেড হয়ে গেছে। দু নম্বর : কার্ট রোডের সঙ্গে এ রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে— প্রকাণ্ড একটা ধস নেমেছে। আর তিন নম্বর—সুজাতা নোটিশ দিয়েছে তার ভাঁড়ারে ডিম মাংস রুটি মাখন সব বাড়ন্ত।'

বাসু সাহেব বাণী দেবীর দিকে ফিরে বলেন, 'এই নাও তোমার প্রশ্নের জবাব।'

'কী প্রশ্ন?' জানতে চায় কৌশিক।

'উনি দার্জিলিং থেকে আজ আবার দুজনকে নিমন্ত্রণ করে আনতে চাইছিলেন। সে যাক, মন খারাপ কোরো না। যেমন করে হোক এ ক'দিন চালিয়ে নিতে হবে আমাদের। দু-তিন দিনের মধ্যেই সভ্যজগতের সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ করা যাবে।'

'রেডিওর খবর তিস্তা ব্রিজ ভেসে গেছে। মহানন্দা, তোরশা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী সবাই বেসামাল হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার মালদা—এক কথায় গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ভেসে গেছে—এত বড় বন্যা নাকি উত্তরবঙ্গে কখনও হয়নি।'

বেলা ন'টা নাগাদ বৃষ্টি মাথায় করেই কৌশিক বের হয়ে পড়ল। রেনকোট চড়িয়ে। গাড়ি চলবে না, পায়ে হেঁটে। স্থানীয় বাজারে কিছু পাওয়া যায় কি না খোঁজ নিতে।

অজয় চাটুজ্জে কাবেরীর স্কেচটা শেষ করে এনেছেন।

আলিও আগাথা ক্রিস্টি শেষ করে আনলেন প্রায়।

ছ'নম্বর ঘরে মিসেস সেন ক্ষুব্ধা। তৃতীয় এক কাপ চা চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। কিচেন ব্লক থেকে কাঞ্চী এসে জানিয়ে গেছে, এখন আর চা পাঠানো সম্ভবপর নয়। প্রাতঃরাশের সময়সীমা অতিক্রান্ত। কিচেন এখন লাঞ্চের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

বাসু সাহেব গুটিগুটি এসে হাজির হলেন রান্নাঘরে : কী সুজাতা? আজ কী রান্না হচ্ছে?

'মাংস যা আছে এ বেলা হয়ে যাবে। মাংসই করছি। আলুসেদ্ধ এই নামল।'

হঠাৎ ওর কাছে ঘনিয়ে এসে বাসু সাহেব বললেন, 'একটা কাজ করো তো সুজাতা। চট করে একবার দোতলার সাত নম্বরে চলে যাও। কাবেরীর ঘরে। কাবেরী এখন ঘরে নেই কিন্তু ওর ঘর তালাবন্ধও নেই। কাবেরী উত্তরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকছে। ওর ঘরে গিয়ে চট করে ওর অ্যাশট্রেটা নিয়ে এসো তো—।'

'অ্যাশট্রে! অ্যাশট্রে কী হবে?'

তুমি তো আগে এমন ছিলে না সুজাতা! "কেন" এ প্রশ্ন তো আগে করতে না?'

'কিন্তু এদিকে আমার তরকারিটা--।'

'ওটা আমি দেখছি—।'

ওর হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে বাসু-সাহেব উনুনের ওপর বসানো তরকারির ডেকচিটায় মনোনিবেশ করেন।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সুজাতা ওঁর অনভ্যস্ত হাতে খুন্তি নাড়া দেখে।

'হাসছ কেন?' রোষকষায়িত দৃষ্টিতে বাসু-সাহেব জানতে চান।

BanglaBook.org

হাসি থামিয়ে সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলে, 'অবজেকশান ইয়োর অনার। ইটস ইনকম্পিটেন্ট, ইররেলিভ্যান্ট অ্যান্ড ইমমেটিরিয়্যাল!'

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। বলেন, 'অবজেকশান ওভাররুলড! যাও, ওপরে যাও।'

সুজাতা দু-মিনিটের ভেতরেই অ্যাশট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। বাসু-সাহেব তার ভেতর থেকে গুটিতিনেক সিগারেটের স্টাম্প উদ্ধার করে বললেন, 'আশ্চর্য! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা শূন্যগর্ভ ছিল। যাও, এটা রেখে দিয়ে এসো আবার।'

আরও মিনিট পনেরো পরে। বাসু-সাহেবের প্রস্থানের পরে আলি-সাহেব রান্নাঘরে এসে হাজির। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসতে পারি? অনধিকার প্রবেশ করছি না তো?'

সুজাতা চমকে ওঠে : আসুন, আসুন। কী ব্যাপার? একেবারে হেঁসেলে?

'আপনাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলাম মহিলাদের হেঁসেল সম্বন্ধে আমার কিছুটা পারদর্শিতা আছে।'

'তা বলেছিলেন। ধন্যবাদ। আমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে না।'

আলি একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়েন। বলেন, 'চার নম্বরে ওই যে লম্বামতন ভদ্রলোক এসে উঠেছেন, ওঁর নামটা কী বলুন তো?'

'মিস্টার রায়।'

'কী রায়?'

সুজাতা হেসে বললে, 'তা হলে রেজিস্টার দেখতে হবে। পুরো নামটা মনে নেই।'

'কখন এলেন উনি?'

'হঠাৎ ওঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লেন কেন?' সুজাতা প্রতি-প্রশ্ন করে।

একটু থতমত খেয়ে আলি বলেন, 'না-না, শুধু ওঁর সম্বন্ধে নয়, ছ'নম্বর ঘরের দম্পতির বিষয়েও আমার কৌতূহল আছে।'

'তা আমার কাছে কেন? ছ'নম্বরে গিয়ে আলাপ জমালেই পারেন।'

আলি সে-কথার জবাব দেন না। আলুর ডেকচিটা টেনে নেন। তাতে ছিল সেদ্ধ করা আলু। আপনমনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকেন। আড়চোখে সুজাতা একবার তাঁকে দেখে নিল। বোঝা গেল যে-কোনও কারণেই হোক, আলি ভাব জমাতে চান। সুজাতার তাতে আপত্তি নেই। এবার সে নিজে থেকেই বলে ওঠে, মিস্টার আলি, এবার বলুন তো, আপনি প্রথম সাক্ষাতেই কেমন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়িতে আমি একেবারে একা আছি? চাকরটা পর্যন্ত নেই?'

আলি-সাহেব জবাব দিল না। আপনমনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকেন। সুজাতা একটা প্লেটে কিছু তরকারি তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, দেখুন তো, নুন-ঝাল ঠিক আছে কি না?

প্লেটে ফুঁ দিতে-দিতে আলি বললেন, 'একসঙ্গে এত লোকের রান্নায় আন্দাজ পাচ্ছেন না, তাই নয়? ছিল দুজনের ছোট্ট সংসার—হয়ে গেল রাবণের গুষ্টি!'

'রাবণের গুষ্টি। আপনি হিন্দুদের এপিক পড়েছেন দেখছি।'

'তা পড়েছি। ওই রামায়ণ না মহাভারতেই আছে না আর একটা কথা—। শত্রু এবং স্ত্রীর কাছে মিথ্যাভাষণে পাপ নেই।'

'হঠাৎ এ-কথা কেন?'

তরকারিটা ইতিমধ্যে ঠান্ডা হয়েছে। আলি পরীক্ষা করে বললেন, 'নুন-ঝাল ঠিক আছে।'

'তা তো আছে—কিন্তু হঠাৎ ও-কথা কেন বললেন?'

আলি হেসে বললেন, 'দেখুন, আমি ব্যাচিলার মানুষ। দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি অত জানি না। আচ্ছা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে হামেশাই মিছে কথা বলে, তাই নয়?'

'কেন ও-কথা বলছেন তাই আগে বলুন?'

BanglaBook.org

'কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?'

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বললে, 'বলব না।'

আলি হাসেন। বলেন, নেহাত পীড়াপীড়ি করছেন তাই বলছি—পরশু রাতে আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, বিকেলের দিকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম আপনাদের করা ছিল, তাই নয়? মিস্টার মিত্র বললেন যে, কাঞ্চন ডেয়ারিতে গিয়ে উনি আটকে পড়েছিলেন। কথাটা উনি সত্যি বলেননি। পরশু সকালে উনি দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন।'

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'পরশু আমি ছিলাম দার্জিলিঙে। বেলা একটার সময় একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছিলাম। আমার থেকে তিন টেবিল দূরে মিস্টার মিত্র দুপুরে ওখানে লাঞ্চ করেন। উনি নিশ্চয় আমাকে লক্ষ করেননি—।'

'দার্জিলিং-এ চাইনিজ রেস্তোরাঁ? আছে নাকি?'

'আছে। গ্রেনারির ঠিক উলটোদিকে। "শাংগ্রি-লা" তার নাম।'

'ওখানে বসে সে খাচ্ছিল?'

বিচিত্র হাসলেন আলি। বললেন, 'আপনি রাগ না করেন তো আরও কিছু নিবেদন করি। উনি একা খাচ্ছিলেন না—ওঁকে সঙ্গদান করছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রমহিলা। বিবাহিতা, বয়স বছর ত্রিশ—আর ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব? ভদ্রমহিলা রীতিমতো সুন্দরী।'

সুজাতা আত্মসংবরণ করে কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, 'ভয়ে বলতে যাবেন কোন দুঃখে? নির্ভয়েই বলুন। আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন মিস্টার আলি, আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি। আমার স্বামী কোনও সুন্দরী মহিলার সঙ্গে লাঞ্চ সেরেছেন শুনলে আমি মূর্ছা যাব না।'

আলি একটা মোগলাই কুর্নিশ ঝেড়ে বলেন, 'বেগমসাহেবা মহানুভব। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের ঔদার্য সম্বন্ধে আমার ধারণা সীমিত। আচ্ছা ধরুন, যদি সংবাদ পান লাঞ্চান্তে আপনার কর্তা সেই সুন্দরী মহিলাটিকে একটা "সোনার কাঁটা" উপহার দিচ্ছেন?'

'সোনার কাঁটা? সেটা কী জাতীয় বস্তু?'

'ও-বস্তুটা আমিও এর আগে কখনও দেখিনি। একটা অলংকার। মেয়েরা খোঁপায় কাঁটা গোঁজে—লোহার, অ্যালুমিনিয়ামের, প্লাস্টিকের। কবরী বন্ধন যাতে শিথিল না হয়ে যায় তাই তার ব্যবহার—এই যেমন আপনি এখন কাঁটা গুঁজেছেন আপনার খোঁপায়। সোনার কাঁটার মূল্য কবরীবন্ধনে নয়—।'

'কৃষ্ণা-কবরী-শোভা-বর্ধনে।' প্রশ্ন করে সুজাতা।

'অথবা রক্ত-কবরী-সোহাগ-বর্ধনে।' জবাব দেন আলি।

'সংবাদটা বিচিত্র!'

'সন্দেশটা বিস্বাদ না হলেই হল। ভরি তিনেক ওজনের অমন একটা সোনার কাঁটা মিস্টার মিত্রের পকেট থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁর মিত্রাণীর খোঁপা বিদ্ধ করলে বেদনাটা অনাত্র অনুভূত হওয়ার কারণ নেই। কী বলেন? আফটার অল আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি।'

সুজাতা এবারও হেসে বলে, 'মিস্টার আলি, রামায়ণ তো আপনার পড়া। নিশ্চয় জানেন—রাবণের গুষ্টি শেষ হওয়ার পর বিভীষণ সিংহাসনে বসে—কিন্তু কোনও হিন্দুই সত্যবাদী বিভীষণকে শ্রদ্ধা করে না—তার পরিচয় "ঘরভেদী বিভীষণ"।'

আলি এ জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সামলে নিয়ে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দ্বারপথে কে যেন বলে ওঠে, 'এক্সকিউজ মি। ভেতরে আসতে পারি?'

'কে? ডক্টর সেন। আসুন। এখানে কী মনে করে?'

BanglaBook.org

হাসি-হাসি মুখে ডঃ সেন ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে সুজাতাকে বলেন, 'এক কাপ চা কি কিছুতেই হতে পারে না, মিসেস মিত্র? আমার বেটার-হাফ, মানে ।'

স্ত্রৈণ ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে সুজাতার করুণা হয়। আলি এগিয়ে এসে বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। আমার নাম এন আলি—আমি আছি তিন নম্বরে।'

'সো গ্ল্যাড টু মিট যু। একা আছেন, না সস্ত্রীক?'

'আজ্ঞে না। স্ত্রীর বালাই নেই। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার।'

'শুনে সুখী হলাম। বেঁচে গেছেন মশাই।'

আলি বলেন, 'কেন? আপনি যে মরে আছেন তা তো মনে হচ্ছে না। "কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে" সকাল থেকে তো দিব্যি তাস পিটছেন।'

আরে তাতেই তো হয়েছে বখেড়া। এ পর্যন্ত আমার বেটার হাফ সাড়ে বাহান্ন টাকা হেরেছেন। মেজাজ খেপচুরিয়াস। তাতেই তো চায়ের সন্ধানে এসেছি।'

আলি অবাক হয়ে বলেন, 'সাড়ে বাহান্ন টাকা! আপনি কি স্ত্রীর সঙ্গে স্টেকে তাস খেলছেন?

'আলবত! স্টেক ছাড়া "ফিশ" খেলা যায় নাকি।'

'তাই বলে স্ত্রীর সঙ্গে?'

'কেন নয়? ওর রোজগার আর আমার রোজগার আলাদা। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট নেই। এমন কী I.T.O-ফাইল নাম্বার পর্যন্ত পৃথক।'

'এমনও হয় নাকি?'

'আজ্ঞে! বে-থা তো করেননি—কী বুঝবেন।' অম্লান বদনে ডাক্তার সাহেব ডেকচি থেকে একটি সেদ্ধ আলু নিয়ে মুখে পুরলেন।

সুজাতা হেসে বললে, 'ঠিক আছে ডাক্তার সাহেব, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক কাপ না দু-কাপ?'

'বানাতেই যখন হচ্ছে তখন আর এক কাপ কেন? যাহা সাড়ে বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি। দু-কাপই হোক।' দ্বিতীয় একটি বড় মাপের আলু তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসান ডাক্তার সেন। বাঁ-হাতে এক চিমটে নুনও তুলে নেন।

সুজাতা বললে, 'আচ্ছা আপনি যান, আমি দু কাপ চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! না, না, কষ্ট করে আর পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি অপেক্ষা করছি। নিজেই নিয়ে যাব।'

সুজাতা হাসতে-হাসতে বলে, 'ততক্ষণে বোধ হয় আমার আলু সেদ্ধর ডেকচি খালি হয়ে যাবে।'

'আলু সেদ্ধ! ও আয়াম সরি!' এঁটো আলুটা উনি ফেরত দিতে উদ্যত হন।

'এ কী করছেন! ওটা আপনার এঁটো!'

'এঁটো! ও আয়াম সরি!' আলুটা কোথায় রাখবেন উনি ভেবে পান না।

'এ কী! তুমি এখানে বসে আলু সেদ্ধ খাচ্ছ!' প্রবেশ করেন মিসেস সেন।

'আমি! না, মানে, ইয়ে – ' হঠাৎ বাকি আলুটা মুখে পুরে দিয়ে ডাক্তার সাহেব আলি সাহেবের দিকে ফিরে বলতে চাইলেন, 'আমার বেটার হাফ', কিন্তু মুখে গরম আলু সেদ্ধ থাকায় কথাটা বোঝা গেল না।

'চলে এসো ওপরে!' রীতিমতো ধমকের সুরে ডাকেন মিসেস সেন।

'না, মানে তোমার চা-টা—।'

'থাক। চা আর লাগবে না।'

সুজাতার গরম জল তৈরিই ছিল। ইতিমধ্যে সে চা ছেড়েছে পট এ। বললে, 'চা যে হয়ে

BanglaBook.org

গেছে ইতিমধ্যে।'

রুখে ওঠেন মিসেস সেন, 'বলছি লাগবে না। এক ঘণ্টা আগে চা চেয়েছি, এতক্ষণে শোনাচ্ছেন--হয়ে গেছে।'

সুজাতা ডক্টর সেনের দিকে ফিরে বললে, 'না লাগে পাঠাব না। তবে আপনার অর্ডার অনুযায়ী দু কাপ চা বানানো হয়েছে। বিল-এ দু কাপ চায়ের দাম কিন্তু ঠিকই উঠবে ডাঃ সেন।'

'কারেক্ট। তা তো উঠবেই। তবে এক কাজ করুন—আমার কাপটা দিন, নিয়ে যাই। ওঁর যখন আর লাগবে না—।'

'থামো তুমি। উঃ, কী ডাকাতের রাজ্যে এসে পড়েছি। দাম দেব আর চা খাব না। ইয়ার্কি নাকি। তুমি এসো – ওরা বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।'

ওয়ার্স হাফকে উদ্ধার করে ওপরে উঠে গেলেন মিসেস সেন।

॥ ছয় ॥

বেলা প্রায় এগারোটা। নিজের ঘরে বসে কাবেরী তন্ময় হয়ে একখানা ছবি দেখছিল ওরই ছবি। সিপিয়া রঙে ক্রেয়নে আঁকা। সদ্যসমাপ্ত। হঠাৎ দ্বারের কাছে প্রশ্ন হল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ করে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আছেন চার নম্বরের সুদর্শন ভদ্রলোক

'আসুন, আসুন। কী ব্যাপার?'

'কোতূহলটা দমন করতে পারলাম না। ছবিটা দেখতে পারি?'

'দেখুন না। আপত্তি কীসের?' ছবিখানা বাড়িয়ে ধরে কাবেরী।

সুবীর এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে। সমঝদারের মতো ওর ছবিখানা দেখতে থাকে কাছে ধরে দূরে ধরে। দু একবার কাবেরীর দিকেও তাকায়। তারপর বলে, 'ছবিটা সুন্দর, তার অভিব্যক্তিটাও সুন্দর নয়।'

কাবেরী একটু বাড়িয়ে ওঠে। কথা ঘোরাবার জন্য বলে, 'আপনার পরিচয়টা কিন্তু আমি জানি না। আপনি তো আছেন ওই চার নম্বরে?'

হ্যাঁ। আমার নাম সুবীর রায়। আরে আপনার সুটকেসটা তো চমৎকার।'

ওপাশে রাখা সাদা রঙের স্যুটকেসটা লক্ষ করে সে। বলে, 'এগুলোকেই ভি আই পি স্যুটকেস বলে, তাই নয়?'

কাবেরী বলে, 'শখ করে কিনেছি। যদিও আমি ভি আই পি মোটেও নই।'

'বেড়াতে এসেছেন বুঝি দার্জিলিঙে?' প্রশ্ন করে সুবীর চিপাবেট ধরাতে ধরাতে।

'হ্যাঁ। ছুটিতে—।'

'অত সকালে কোথা থেকে এলেন?'

ভ্রূ কুঞ্চিত হল কাবেরীর। বলল, 'আপনি তো এলেন মধ্যরাত্রে—আমি কখন এসেছি তা জানলেন কেমন করে?'

সুবীর মামুলি গলায় বললে, 'সুজাতা দেবী বলছিলেন আপনি নাকি সেই কাক ডাকা ভোরে এলেন।'

কাবেরীও মামুলি গলায় জবাব দিল, 'কাক-ডাকা ভোরই বটে। আমি পরশু রাত্রে কার্শিয়াঙে হলট করেছিলাম। রাত ভোর হতেই এখানে চলে এসেছি।'

'কার্শিয়াঙে কোথায় ছিলেন? হোটেলে?'

BanglaBook.org

আবার সচকিত হয়ে ওঠে কাবেরী। বলে, 'কেন বলুন তো?'

'না, আমি ফেরার পথে কার্শিয়াঙে দু-দিন থাকব ভাবছি। তাই জানতে চাইছি কোন হোটেলে ছিলেন, তাদের ব্যবস্থা কেমন—।'

কাবেরী কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, 'যদি কোনও হোটেল ছেড়ে রাত থাকতে বোর্ডার পালিয়ে বাঁচে সেটায় থাকবার কথা ভাবছেন ফেরার পথে?'

সুবীর বললে, 'তাহলে ধরে নিন ভুল করে সেটাতে উঠে যাতে নাকাল না হতে হয় তাই নামটা জানতে চাইছি। কার্শিয়াঙে কোন হোটেলে ছিলেন?'

কাবেরী আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, 'আপনি যে পুলিশের মতো জেরা করছেন!'

'তাই করছি, কারণ পুলিশ বিভাগেই কাজ করি আমি। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে। এসেছি একটা খুনের তদন্তে। সেই প্রসঙ্গেই আমি জানতে চাইছি—পয়লা অক্টোবর রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? রাত দশটার পর থেকে বাকি রাত?'

পকেট থেকে একটি নোটবুক বের করে বলে, 'এবার বলুন—।'

কাবেরীর মুখটা সাদা হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, কিন্তু কথা কিছু বলে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনা নোটিশে ঘরে ঢুকে পড়লেন অজয় চাটুজ্জে। সরাসরি কাবেরীকে বললেন, 'ও ক্রেয়নে ঠিক এফেক্টটা আসেনি, বুঝলে! আমি অয়েলে আর একখানা আঁকতে চাই। তোমার সময় হবে এখন?'

কাবেরী তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'সময় হবে না? কী বলছেন? নিশ্চয় হবে। এখনই বসবেন? চলুন—।'

এতক্ষণে অজয়বাবু সুবীরকে নজর করেন; বলেন, 'এঁকে তো ঠিক, মানে—।'

কাবেরী প্রথম সুযোগেই সুবীরের ট্রাম্প কার্ডখানা খুলে দেখায়। বলে, 'উনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন অফিসার, মিস্টার সুবীর রায়। এসেছেন একটা খুনের তদন্তে।'

সুবীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে কাবেরীর দিকে তাকায়।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে-মুছতে অজয়বাবু বলেন, 'অ!'

'বসুন অজয়বাবু। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে আমার।'

অজয় বসেন না। চশমাটা নাকে চড়িয়ে বলেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের সেই দারোগার মৃত্যু-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তাই। আপনি তো ওই হোটেলেই ছিলেন?'

'এসো কাবেরী—' অজয় প্রস্থানোদ্যত।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না?'

'দেব। যখন কোর্টের শমন পাব, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াব। তখন দেব। উঃ হরিবল্! এসো কাবেরী।'

কাবেরীর হাতটা ধরে অসংকোচে টানতে-টানতে নিয়ে চলেন অজয় চাটুজ্জে। পিছন থেকে সুবীর বলে, 'কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না। কোর্টের শমন ছাড়াও পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—।'

'হয়, জানি। কিন্তু তার একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে। পথেঘাটে প্রথম সাক্ষাতেই অমন মোড়লি করার কোনও অধিকার পুলিশের নেই। বুঝেছেন?' ঝড় ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন উনি।

BanglaBook.org

বেলা সওয়া এগারোটা।

সুবীর এসে উপস্থিত হল আলি-সাহেবের ঘরে। দরজায় নক করে বললে, 'আসতে পারি?'

আগাথা ক্রিস্টিকে বালিশের ওপর উপুড় করে রেখে আলি বললেন, 'সচ্ছন্দে! ইন ফ্যাক্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাব ভাবছিলাম। আমার নাম এন. আলি।'

সুবীর বললে, 'আমার নাম সুবীর রায়। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে আছি। এসেছি একটা খুনের তদন্তে।'

ভেবেছিল প্রতিপক্ষ হকচকিয়ে যাবে। তা কিন্তু গেলেন না আলি। হেসে বললেন, 'তাস খেলেন?'

'কেন বলুন তো?' ভ্রূকুঞ্চিত সুবীরের প্রশ্ন।

'প্রথম ডিলেই রঙের টেক্কা পেড়ে লিড দিচ্ছেন তো, তাই বলছি!'

'মানে?'

'আগাথা ক্রিস্টি পড়ছিলাম কি না—গোয়েন্দা গল্পে দেখেছি ডিটেকটিভরা সহজে আত্মপরিচয় দেয় না ওভাবে।'

'সকলের পদ্ধতি এক নয়। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'এ বিনয়ও ডিটেকটিভ-সুলভ নয়। নিশ্চয় করতে পারেন। করুন। আমি প্রস্তুত।'

'আপনি তো এখানে এসেছেন পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। কোথা থেকে এলেন?'

'দার্জিলিং থেকে।'

'দার্জিলিঙে কবে এসেছিলেন?'

'ওই পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে।'

'ওই ট্যাক্সিতে একজন পুলিশ অফিসার আর একজন ভদ্রমহিলাও এসেছিলেন?'

'না। কোনও পুলিশ অফিসার বা মহিলা ছিলেন না আমার সঙ্গে।'

'কোন হোটেলে উঠেছিলেন আপনি?'

'হোটেল কুন্ডুস। স্বনামেই উঠেছিলাম—হোটেল রেজিস্টার হাতড়ে দেখতে পারেন সত্য কি না।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে—স্বনামে হোটেল কুন্ডুস-এ ঘর বুক করে আপনি বেনামে অন্য কোনও হোটেলে উঠেছিলেন?'

আলি হেসে ফেলেন। বলেন, 'যেমন ধরা যাক মহম্মদ ইব্রাহিম এই ছদ্মনামে হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়?'

'কেন নয়?'

'নয় এজন্যে যে, সেক্ষেত্রে অজয়বাবু এবং ব্যারিস্টার বাসু আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন ওই কাঞ্চনজঙ্ঘায়।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন—মহম্মদ ইব্রাহিম হোটেলে ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। চেক-ইন করেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত সাতটায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। রাত আটটায় দার্জিলিং থেকে রওনা হলে রাত ন'টার মধ্যে তার পক্ষে রিপোজ-এ এসে পৌঁছনো সম্ভব?'

আলি পাইপ ধরালেন। বললেন, 'তাই তো হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি একটিমাত্র কাজ করতে পারেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম সার্ভিসের বেয়ারা বীরবাহাদুরকে এখানে নিয়ে আসুন। সে শনাক্ত করে যাক—ইব্রাহিম বা মিস ভিক্টোরিয়া এখানে আছে কি না!'

সুবীর বলে, 'বীরবাহাদুর! ও নাম আপনি জানলেন কেমন করে?'

'এখানেই কারও কাছে শুনেছি বোধহয়। হোটেল রিপোজে তো দিবারাত্র এই গল্পই হচ্ছে। আসুন—।'

একটি সিগারেট তিনি বাড়িয়ে ধরেন সুবীরের দিকে। পাইপখোর তাহলে সৌজন্যের খাতিরেও

BanglaBook.org

সিগারেট রাখে।

মোট কথা আলি-সাহেব বিন্দুমাত্র নার্ভাস হলেন না।

সাড়ে এগারোটায় সুবীর এসে হানা দিল ডক্টর সেনের ঘরে। সেখানেও বিশেষ কিছু সুবিধে হল না। কিন্তু একটা খটকা লাগে সুবীরের। ডক্টর সেনকে অফার করা সিগারেটের প্যাকেট থেকে মিসেস সেন অম্লান বদনে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন। দিব্যি হুসহুস করে টানলেন এবং একবারও কাশলেন না। ডক্টর আর মিসেস সেন সুবীরকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন তাসের আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারলেন না। মিসেস সেন এ হোটেলের ব্যবস্থাপনার ভূয়সী নিন্দা করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন, 'ওঁর এক ভাই আছেন ম্যাকিকায়, এক ভাই পশ্চিম জার্মানিতে। উনি নাকি ডক্টর সেনকে পইপই করে বলছেন চাটি বাটি গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে —কিন্তু ঘরকুনো ডাক্তার সেন কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না দেশ ছেড়ে যেতে।'

মোট কথা সুবীর হালে পানি পেল না।

ঠিক বারোটার সময় সুবীর এসে হানা দিল বাসু সাহেবের ঘরে।

'এসো। আর কিছু ক্লু পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করলেন বাসু।

'কিছু না। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

'পারছি। আন্দাজ নয়। অকাট্য প্রমাণ।'

ঘনিয়ে আসে সুবীর : 'বলেন কী স্যার? কে?'

'কে নয় সুবীর? কারা? দুজনকেই। ইব্রাহিম অ্যান্ড মিস ডিক্রুজা।'

সুবীর অবাক হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে ঘনিয়ে আসে বলে, 'নৃপেনদা' অবশ্য আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন, কিন্তু আপনি যে দুজনকেই— কী ব্যাপার বলুন তো?'

বাসু সাহেব নিভন্ত পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে বলেন, 'আয়াম সরি। এখনই কিছু বলতে পারছি না। আগে জাল গুটিয়ে আনি—সবটা একসঙ্গে ভাঙব।'

হতাশ হয় সুবীর। বলে, 'তাহলে, মানে —আমি এখন কী করব?'

'তোমার অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাও।'

আজও সারাদিনে বর্ষণ ক্ষান্ত হল না। ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাঁচা রোড দিয়ে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ। টেলিফোন তো অনেক আগেই গেছে —এবার গেল ইলেকট্রিক। ব্যাটারি সেট রেডিও কারও কাছে নেই। রেডিওর শেষ সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে যে, সমগ্র উত্তর বঙ্গ একটা ঐতিহাসিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। মিলিটারিকে ডাকা হয়েছে উদ্ধারের কাজে। তিস্তা ব্রিজ নিশ্চিহ্ন। আরও অনেক ব্রিজ ভেঙে গেছে। মহানন্দা, তিস্তা ফুলে ফেঁপে ডুবিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা।

সন্ধ্যার পর কালীপদ ঘরে-ঘরে মোমবাতি জ্বেলে গেল। মিটমিটে আলোয় বাড়িটাতে একটা ভুতুড়ে ভাব এসেছে। সুবীর রায়ের পরিচয় জানতে আর কারও বাকি নেই। সকলেই যেন কিছুটা সতর্ক, সন্দিগ্ধ। একঘেয়ে বৃষ্টির মতো বিপোজ-এর জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে একেবারে।

বৈচিত্র্য দেখা দিল রাত ঠিক আটটা তেত্রিশে।

তার ঠিক তিন মিনিট আগের কথা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায়। ড্রয়িংরুমের ঘড়িটা ঠিক

BanglaBook.org

যখন 'ঢং' করে সময়টা ঘোষণা করল।

সুজাতা তখন ছিল রান্নাঘরে। একাই। রাতের রান্না করছিল সে একা। কালীপদ নিজের কাজে ব্যস্ত। কাঞ্চী বাড়ি চলে গেছে।

আলি-সাহেব নিজের ঘরে মোমবাতির আলোয় আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' গল্পের শেষ ক'টা পাতায় ডুবে আছেন।

সুবীর ছিল তার নিজের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। গিজারের জল এখনও কিছুটা গরম আছে। সে হট বাথ নেওয়ার একটা চেষ্টা করছে। গরমজল আর পাওয়া যাবে না।

ডক্টর আর মিসেস সেন জোড়া মোমবাতি জ্বেলে দিশ খেলছেন। মিসেস সেন সারাদিনে প্রায় সওয়া শো-টাকা হেরে বসে আছেন।

কৌশিক একটা ছাতা আর টর্চ নিয়ে উঠেছে ছাদে। মই বেয়ে জল নিকাশী গাটারটা সাফা করতে। গাছের পাতায় জল নিকাশী গাটারটা আটকে গেছে।

বাসু-সাহেব তাঁর ঘরের সামনে উত্তরের বারান্দায় অন্ধকারে বসেছিলেন একটা ইজিচেয়ারে। শুনছিলেন গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ।

ঠিক তখনই 'ঢং' করে ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজল।

রাণী দেবী ছিলেন নিজের ঘরে। হুইল চেয়ারটা তাঁর ঘরের উত্তরের জানলার কাছে টেনে নিয়ে আপনমনে তিনি গান ধরলেন। এমন অকালবর্ষণের সন্ধ্যায় তিনি কিন্তু কোনও বর্ষা-সংগীত ধরলেন না। কী জানি কেন আপন খেয়ালে শুরু করলেন অতি পরিচিত একটা রবীন্দ্রসংগীত ঃ

'যদি জানতেম আমার কাঁদের ব্যথা তোমায় জানাতাম—।'

ঘরে-ঘরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

সুজাতা তার প্রেসার-কুকারের মুখটা খুলে দিল। সোঁ-সোঁ শব্দটা বন্ধ হল।

মিসেস সেন তাস ডিল করা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, 'কে গাইছে বলো তো?'

বাসু-সাহেব দেশলাইটা জ্বালবার উপক্রম করছিলেন। থমকে গেলেন তিনি।

সুবীর বোধহয় গানটা শুনতে পায়নি। তার কলের শব্দ বন্ধ হল না।

তরুণ পায়চারি করছিল একতলার দক্ষিণের বারান্দায়। চট করে সে ঢুকে গেল হল-কামরায়। ডাইনিং হল-এ একটা মোমবাতি জ্বলছে। মাঝের পরদাটা টানা। তাই ড্রইংরুমটা আলো-আঁধারি। অরূপ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। প্রায় হাতড়াতে-হাতড়াতে সে সরে এল ড্রইংরুমের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে। বসল গিয়ে পিয়ানো'র টুলে।

গান যখন অন্তরায় পৌঁছল তখন পিয়ানোর মিঠে আওয়াজ যুক্ত হল কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে। সমের মাথায় একবার থামলেন রাণী দেবী। কান পেতে কী শুনলেন। বুঝে নিলেন পিয়ানো বাজছে। চুপ করে রইলেন পুরো একটি কলি। পিয়ানো বেজে গেল শুধু। তারপর যুক্ত হল যন্ত্র-সংগীতের সঙ্গে কণ্ঠসংগীত। রাণী দেবী নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেননি কে এমন আচমকা সংগত করতে বসেছে—কিন্তু এটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে সংগতকারী একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী।

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর হারিয়েছে পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিক সচকিত হয়ে ওঠে। সংগীতের আকর্ষণে সে নেমে আসে মই বেয়ে। এসে নামে দোতলার বারান্দায়। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর নজরে পড়ল দক্ষিণের বারান্দার

BanglaBook.org

ও-প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল স্ত্রীলোক। কাবেরীই হবে নিশ্চয়। ঠিক তার ঘরের সামনেই। কৌশিক একটু ইতস্তত করে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে যায় একতলায়।

সংগীতের আকর্ষণে সস্ত্রীক সেনও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন উত্তরের বারান্দায়। গান শেষ হল। সংগীতমগ্না দ্বিতীয়বার শুরু করলেন স্থায়ীটা ঃ

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম—।"

ড্রইংরুমের ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজে তেত্রিশ।

হঠাৎ সমস্ত বাড়ি সচকিত করে একটা ফায়ারিং-এর শব্দ হল ড্রইংরুমে।

তৎক্ষণাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ডাইনিং হল-এর মোমবাতিটা।

একটা চেয়ার উলটে পড়ার শব্দ। ওই সঙ্গে ভেঙে পড়ল একটা ফুলদানি। বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড। বাড়িসুদ্ধ সবাই এসে উপস্থিত হল ড্রইংরুমে। প্রায় একসঙ্গেই। অরূপরতন পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার পাশেই একটা ভাঙা ফুলদানি আর কিছু ছড়ানো ছিটানো গ্ল্যাডিওলাই। ডক্টর সেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৌশিক তার হাতের টর্চটা জ্বালল। ডক্টর সেন মুখ তুলে বললেন, 'থ্যাংক গড। গুলিটা কাঁধে লেগেছে। ফেটাল নয় বোধ হয়।'

এতক্ষণে সুবীর এসে পৌঁছল তার বাথরুম থেকে। তার গায়ে একটা তোয়ালের তৈরি ড্রেসিং গাউন। তার চুল বেয়ে জল ঝরছে। বললে, 'পাশেই দু-নম্বর ঘর। ওখানেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাক।'

ধরাধরি করে অচৈতন্য অরূপকে ওরা নিয়ে গেল বাসু-সাহেবের ঘরে।

ডক্টর সেন একেবারে অন্য মানুষ। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সুজাতাকে গরম জল আনতে বললেন। আর সবাইকে বললেন, 'প্লিজ ক্লিয়ার আউট। ঘর ফাঁকা করে দিন।' স্ত্রীকে বললেন, 'আমার ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে এসো চট করে।'

মিসেস সেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন, 'কী দরকার বাপু ওসব খুনজখমের মধ্যে নাক গলাবার? তুমি চলে এসো।'

'শাট আপ।' গর্জন করে ওঠেন ডক্টর সেন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ব্যাগটা প্লিজ—।'

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন মুহূর্তে বদলে গেছেন।

বারান্দার ও-প্রান্তে ইজিচেয়ারে গিয়ে ফের বসেছিলেন বাসু-সাহেব। সুবীর গটগট করে এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। কঠিন স্বরে বলে, 'আপনিই এজন্যে দায়ী।'

'আমি। কেন? কী করে?'

'কেন তখন সব কথা খুলে বললেন না? হয়তো এ-দুর্ঘটনা রোখা যেত।'

বাসু-সাহেব বেদনাহত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

দুমদুম করে পা ফেলে সুবীর চলে গেল আবার।

রাণী দেবী হুইল চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন, 'এ-দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, তাই নয়!'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বাসু-সাহেব ঃ 'ইয়েস, ইটস মাই মিসটেক। আমি ভেবেছিলাম—আমিই বুঝি ওর টার্গেট। তাই প্রস্তুত হয়েই বসেছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি ও অরূপকে—।'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কালো যন্ত্র বের করে দেখালেন স্ত্রীকে।

রাণী দেবী স্তম্ভিত হয়ে যান।

BanglaBook.org

আধ ঘণ্টা পরে বাসু-সাহেব এসে দাঁড়ালেন রোগীর শিয়রে। অরূপের কাঁধের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধা। অরূপ তখনও অচৈতন্য। প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেনকে, 'কী বুঝছেন?'

'বুলেটটা স্ক্যাপুলার খাঁজে আটকে আছে। বের করে দেওয়া দরকার—।'

'হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটার ছাড়া সম্ভব হবে?'

'অসম্ভব! থাক, আপাতত বুলেটটা থাক। শকটা কাটিয়ে উঠুন। বেঁচে যাবেন। অন্তত মেডিকেল সায়েন্স এক্ষেত্রে যতটুকু করতে পারে তা আমি করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'থ্যাংকস।'

অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল সুবীর। বললে, 'কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেন। আমি কয়েকটা খোলা কথা বলব। অরূপবাবুকে কে গুলি করেছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের মধ্যেই কেউ একজন তা করেছে—। ইয়েস! এনি ওয়ান! আপনি-আমিও হতে পারি!'

'সো হোয়াট?' রুখে ওঠেন ডক্টর সেন।

'আপনি ওঁকে কী ওষুধ দিচ্ছেন, কী ইনজেকশান দিচ্ছেন সব একটা স্টেটমেন্টের আকারে লিখে যাবেন এবং মিসেস বাসুকে দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াবেন, ইনজেকশান দেবেন—।'

'মিসেস বাসুকে! কেন? উনি কী বোঝেন ডাক্তারির?'

'সেজন্যে নয়, একমাত্র মিসেস বাসুই সন্দেহের অতীত।'

ডাক্তার সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, 'ইয়েস ডক্টর সেন। টেক মাই লিগাল অ্যাডভাইস। সুবীর যা বলছে তাই করুন। মেডিক্যাল সায়েন্সে যতখানি সম্ভব আপনি করুন—ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্সে যতখানি সম্ভব আমাকে করতে দিন—।'

শ্রাগ করলেন ডাক্তার সেন : 'অ্যাজ য়ু প্লিজ।'

॥ সাত ॥

পরদিন। চৌঠা অক্টোবর। শুক্রবার। সকাল।

সুবীরের ঘরে এসে হাজির হলেন আলি। পরদার বাইরে থেকে বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

সুবীর একটু অবাক হল, বললে, 'নিশ্চয়। আসুন মিস্টার আলি। কী ব্যাপার?'

আলি এসে বসলেন সামনের চেয়ারটায়। বললেন, 'আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।'

'বলুন?' ঘনিয়ে আসে সুবীর।

'দেখুন মিস্টার রায়, আপনি কাল যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন আমি জোভিয়াল মুডে জবাব দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করিনি যে, দার্জিলিং-এর ঘটনা এই রিপোজ-এ রিপিটেড হতে যাচ্ছে—ভেবেছিলাম এসব আপনাদের আষাঢ়ে কল্পনা। কিন্তু এখন আর সেটা ভাবা যাচ্ছে না। দু-নম্বর ঘটনা এখানে কাল রাত্রে ঘটে গেছে। ফলে এখন সিরিয়াসলি ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—।'

'করুন। আমি কর্ণময়।'

'প্রথম কথাই বলব যে, আমি জানি—আমি নিজে আপনার সন্দেহের তালিকায় আছি। আই নো ইট। শুধু আমি নই, আপনি হয়তো ডক্টর সেন, এমনকী বৃদ্ধ অজয়বাবুকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন; মিস ডিক্রুজার সন্ধানে আপনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেনকেও নজরে-নজরে রেখেছেন—তাই নয়?'

'বলে যান—।'

BanglaBook.org

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি—এ কেস-এর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার—সমস্ত সম্ভাবনা তলিয়ে দেখছেন না, ফলে আপনার সন্দেহজনকের তালিকা থেকে একজন বাদ যাচ্ছেন, যাঁকে ঠিকমতো বাজিয়ে দেখা আপনার উচিত—আপনারা কয়েকটি ভুল পূর্বসিদ্ধান্ত করেছেন।'

'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন—।'

'আপনারা ধরে নিয়েছেন—পয়লা অক্টোবর ইব্রাহিম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান থেকে শেয়ারের ট্যাক্সি চেপে রমেন দারোগা আর মিস ডিক্রুজার সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসেছিল। তা তো না-ও হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে, রমেনবাবু আর মিস ডিক্রুজা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে আসছিল আর ইব্রাহিম মাঝপথে ওই ট্যাক্সিতে ওঠে, ধরুন পাঙ্খাবাড়ি, কার্শিয়াঙ, সোনাদা কিংবা এই ঘুম-এই।'

'এমনটা মনে করার হেতু?'

'আপনাদের ধারণা যে, এই ট্যাক্সিতে আসার সময়েই রমেনবাবু আর মিস ডিক্রুজার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়—সেটা এতদূর নিবিড় হয় যাতে হোটেলে পৌঁছেই রমেনবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয় এবং ডিক্রুজাকে সেটা দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে স্বতই ধরে নিতে হয়, ট্যাক্সিতে দুজনে বেশ নিভৃতে আলাপের সুযোগ পেয়েছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে দুটি পুরুষ ও একটি মহিলা একসঙ্গে রওনা হলে এ জাতীয় ঘনিষ্ঠতা কখনও গড়ে উঠতে পারে দুজনের মধ্যে?'

'সো হোয়াট?'

'তাতে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম পয়লা তারিখ সকালে ওই ট্রেনে কলকাতা থেকে আসেনি। সে মাঝরাস্তায় ওই ট্যাক্সিতে উঠেছিল—।'

সুবীর বলে, 'কিন্তু মুশকিল কী হচ্ছে জানেন মিস্টার আলি—আমাদের সন্দেহের তালিকায় যে কজন আছেন, যেমন ধরুন ডক্টর সেন, অজয়বাবু এবং—।'

'আপনার ইতস্তত করার কিছু নেই—আমরা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন করছি, ফলে "এবং মিস্টার আলি"। আমি নিজেকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার শুভ-ইচ্ছা নিয়ে আপনার কাছে আসিনি; আমি শুধু বলতে এসেছি যে, সমস্যাটার আরও একটা দিক আছে, আরও একজনকে সন্দেহের তালিকায় আপনার রাখা উচিত।'

'আর একটু স্পেসিফিকালি বলবেন?'

'বলব। আমি এখানে এসে পৌঁছই পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। তখন এখানে মিসেস মিত্র একা ছিলেন। মিস্টার কৌশিক মিত্র ফিরে এলেন রাত দশটায় এবং এসেই তাঁর স্ত্রীকে কৈফিয়ত দিলেন যে, তিনি সমস্ত দিন ছিলেন কাঞ্চন ডেয়ারিতে, দার্জিলিং-এ তিনি আদৌ যাননি সারাটা দিন—।'

'তাতে কী হল?'

'অথচ আমি নিশ্চিত জানি—কৌশিকবাবু বেলা এগারোটার সময় ঘুম স্টেশনে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে দার্জিলিং-এ যান। সারাটা দিন তিনি দার্জিলিং-এ কী করেছেন তা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তিনি দুপুরে 'শাংগ্রি-লা' নামে একটি চীনা হোটেলে লাঞ্চ করেন—একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি সুন্দরী মহিলা।'

'মহিলা। কে তিনি?'

'এ কাহিনির মিসিং লিংক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। চুল ছোট, কব নয়। চেহারায় অবাঙালিত্বের ছাপ; কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। মহিলাটি কে হতে পারেন তা মিসেস মিত্র আন্দাজ করতে পারছেন না, অথচ আমি স্বচক্ষে দেখেছি কৌশিকবাবু তাঁকে একটি "সোনার কাঁটা" উপহার দিচ্ছেন। আর যদি না আমার চোখ ভুল করে থাকে, মহিলাটির ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ওইরকমই ৩৪-২৮-৩২।'

BanglaBook.org

সুবীরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকে আলিকে। তারপর বলে, 'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'আমি প্রত্যক্ষদর্শী। তিন টেবিল পিছনে আমি ওই রেস্তোরাঁতেই খাচ্ছিলাম। একা। ফলে কৌশিকবাবু আমাকে নজর করেননি। আর সুন্দরী সঙ্গিনী থাকায় আমি বারবার ওদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

সুবীর বললে, 'অ্যাকাডেমিক ডিসকাশনই যখন করছি তখন বলি—এমনও তো হতে পারে যে, আপনি আদ্যন্ত বানিয়ে বলছেন। আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করতে।'

'কারেক্ট। সেটাও যেমন সম্ভব তেমনি এটাও সম্ভব যে, আমি আদ্যন্ত সত্য কথা বলছি। আমি কোনওভাবেই আপনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাই না। আমি শুধু এ-কথা বলব যে, আমি তদন্তকারী অফিসার হলে এটার সত্যতা যাচাই করে দেখতাম। সত্যি হলে কৌশিককে সন্দেহ করতাম, আর মিথ্যে হলে আলিকে আরও সন্দেহের চোখে দেখতাম।'

সুবীর বললে, 'থ্যাংকস ফর দ্য টিপস।'

আরও আধঘণ্টা পরের কথা। সুবীর এসে উপস্থিত হল কৌশিকের ঘরে। বললে, 'কৌশিকবাবু, এতক্ষণ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়নি, এখন আপনার স্টেটমেন্টটা নিতে চাই—।'

কৌশিক কী একটা হিসেব লিখছিল। খাতাটা বন্ধ করে বললে, 'বলুন?'

'ওই পয়লা তারিখ আপনি কোথায় ছিলেন? সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত?'

কৌশিক চট করে জবাব দেয় না। প্রতি-প্রশ্ন করে, 'কেন বলুন তো?'

'আমি যদি বলি ওইদিন বেলা এগারোটা নাগাদ আপনি ঘুম স্টেশন থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সারাদিন দার্জিলিং-এই ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে মিসেস মিত্রকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন—আপনি কি অস্বীকার করবেন?'

এবারও সরাসরি জবাব দেয় না কৌশিক। বলে, 'কে বলেছে আপনাকে? সুজাতা?'

'কে আমাকে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি এখনও?'

কৌশিক তবুও সহজ হতে পারে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, 'আপনার অভিযোগ সত্য।'

'আপনি দুপুরে শাংগ্রি-লাতে লাঞ্চ করেন। আপনার সঙ্গে একটি মহিলা আহার করেছিলেন—সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। অবাঙালি, অথচ তিনি চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। ট্রু?'

রীতিমতো চমকে ওঠে কৌশিক। বলে, 'আপনি কী বলতে চান? আমি...আমি রমেন দারোগাকে খুন করেছি?'

'আমি কিছু বলতে চাই না কৌশিকবাবু। বলবেন তো আপনি। আমি যা বলছি তা সত্যি?'

কৌশিক রুখে ওঠে, 'হ্যাঁ সত্যি। সো হোয়াট?'

'সেই মহিলাটি কে?'

'আমি বলব না।'

'আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।'

'বেশ তাই। তারপর?'

সুবীর উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'না, তারপর আর কিছু নেই। ধন্যবাদ।'

নিঃশব্দে উঠে চলে যায় সুবীর।

কৌশিকও উঠে পড়ে। তার মনে হয় এর মূলে আছে সুজাতা। কিন্তু সুজাতা কেমন করে আন্দাজ করল সে কাঞ্চন ডেয়ারিতে যায়নি—গিয়েছিল দার্জিলিং? সুজাতা কেমন করে জানবে সে

BanglaBook.org

কোথায় কার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিল? পায়ে-পায়ে ও চলে আসে কিচেন-ব্লকে। ব্যাপারটার ফয়সালা হওয়া দরকার। কেমন করে সুজাতা জানতে পারল এ-কথা?

কিচেন-ব্লকে পরদার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ওকে। ঘরের ভেতর দুজনে নিম্নস্বরে কথা বলছে। একজন সুজাতা, দ্বিতীয়জন কে? পুরুষকণ্ঠ। ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন সুজাতা দেবী, আমি তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ও-প্রশ্ন করিনি।'

'তাহলে আমাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে আপনার অত কৌতূহল কেন?'

'কী আশ্চর্য! আপনি অফেন্ডেড হচ্ছেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ যখন হয়নি তখন কতদিন ধরে আপনি কৌশিকবাবুকে চেনেন? এতে অফেন্স নেওয়ার কী আছে?'

'অফেন্স নিচ্ছি প্রশ্নটার জন্যে নয়, তার পিছনে যে-ইঙ্গিতটা আছে সেটায়। হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চাইছেন তা ঠিক। মিস্টার মিত্র একবার মার্ডার কেসে অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন—ওই রমেনবাবুই তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। খবরটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু সংবাদটা অসমাপ্ত—ওইসঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন আমিও ওই কেসে মার্ডার চার্জে অ্যারেস্টেড হয়েছিলাম। কিন্তু প্লিজ মিস্টার আলি, এসব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে চাই না। আপনি এবার আসুন। আমাকে কাজ করতে দিন। আর...কিছু মনে করবেন না, এ কিচেন-ব্লকটা বোর্ডারদের জন্যে নয়, এটা হোটেলের প্রাইভেট অংশ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কাঞ্চীকে দিয়ে খবর পাঠাবেন দয়া করে।'

কৌশিক নিঃশব্দ চরণে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

আরও আট-দশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। সময় যেন থমকে আছে ওই অভিশপ্ত বাড়িটায়—যেখানে নতুন জীবনের সূত্রপাত করতে সদ্য-বিবাহিত একটি দম্পতি আনন্দের আয়োজন করেছিল। না, ভুল বললাম। সময় থমকে নেই। রুদ্ধ নিশ্বাসে সময় বয়ে চলেছে—ড্রইংরুমের পেন্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়িটায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতের শব্দ। বৃষ্টি এখনও পড়ছে—কখনও জোরে, কখনও ঝড়ো হাওয়ার খ্যাপামিতে, কখনও বা ইলসে-গুঁড়ির নৈঃশব্দ্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। টেলিফোন যোগাযোগ নেই, ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই—স্তব্ধ হয়েছে কার্ট রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা। কোথাও কোনও মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। এমন কি পাখিটা পর্যন্ত ডাকছে না।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেষ্টনিতে জাহাজডুবির কজন যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে জনমানবশূন্য একটা ছোট্ট দ্বীপে। সংখ্যায় ওরা মাত্র দশজন। চারদিকেই উত্তালতরঙ্গ সমুদ্রের লবণাক্ত বেড়াজাল—পালাবার কোনও পথ নেই। ওদের মুক্তির একমাত্র উপায় হয়তো ছিল সঙ্ঘবদ্ধতায়, বিশ্বাসে, পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য ওদের—ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভদ্রতা বজায় রেখে একসঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করছে। ওরা জানে—ওদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একজন নৃশংস খুনি—জাত ক্রিমিনাল। ওদেরই মধ্যে একজনকে খুন করবার জন্য সে অবকাশ খুঁজছে। কে কাকে—তা ওরা জানে না; কিন্তু ভুলতেও পারছে না সেই মারাত্মক তিন নম্বরের জিজ্ঞাসা চিহ্নটিকে।

কৌশিক ওর ঘরে চুপ করে বসেছিল। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ধারাস্নাত পাইন গাছগুলোর দিকে। সুজাতা ঘরেই আছে। কথাবার্তা হচ্ছে না ওদের। মন খুলে কেউ যেন কিছু বলতে পারছে না এ-ক'দিন। এমনিই হয়। প্রেমের ফুল যখন ফোটে তখন কুন্দর মতো সুন্দর হয়ে ফোটে; আর প্রেমের কাঁটা যখন ফোটে তখন শজারুর কাঁটার মতো সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। শজারুর কাঁটা না সোনার কাঁটা! শেষে কী মনে করে সুজাতা এগিয়ে এল পিছন থেকে। আলতো

BanglaBook.org

করে একখানা হাত রাখল কৌশিকের কাঁধে। কৌশিক ফিরে তাকাল না। সুজাতার হাতের ওপর হাতটা রাখল।

'একটা কথা সত্যি করে বলবে?'

এবারও মুখ ঘোরাল না কৌশিক। একই ভাবে বসে বলে, 'বলো?'

'তুমি পয়লা তারিখ কাঞ্চন ডেয়ারিতে যাওনি, নয়?'

'যাইনি।'

'দার্জিলিঙে গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'সেখানে শাংগ্রি-লাতে দুপুরে লাঞ্চ করেছিলে?'

'হুঁ।'

'তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে খেয়েছিল, সে কে?'

কৌশিক নিরাসক্ত ভাবে বললে, 'প্রমীলা ডালমিয়া। আমার সহপাঠী কিশোর ডালমিয়ার স্ত্রী। শাংগ্রি-লাতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

সুজাতা এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে, 'তা হলে সেদিন কেন মিছে কথা বললে আমায়?'

কৌশিক ম্লান হাসে। এতক্ষণে ওর দিকে ফিরে বললে, 'একটা ব্যাপার তোমার কাছে থেকে গোপন করতে—।'

'কী ব্যাপার?'

'তোমার জন্যে একটা জিনিস কিনতে দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'জিনিস! কী জিনিস?'

অন্যমনস্কের মতো পকেট থেকে একটা গহনার কেস বের করে কৌশিক টেবিলের ওপর রাখে। সুজাতা সেটা খুলে দেখে না। বলে, 'হঠাৎ গয়না কেন?'

শূন্যের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলে, 'কাল তোমাকে উপহার দেব ভেবেছিলাম—কাল পাঁচই অক্টোবর।'

উদাসীনের মতো সুজাতা বলল, 'ও, হ্যাঁ—ভুলেই গেছিলাম।'

হঠাৎ পরদার বাইরে থেকে কে যেন বলল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

কৌশিক প্যাকেটটা আবার পকেটে ভরে নিয়ে বলে, 'আসুন—।'

ঘরে ঢোকে সুবীর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বলে, 'ব্যাড লাক! ঘুম অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। দার্জিলিং থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না।'

'তা হলে?'

'না, ব্যবস্থা একটা হয়েছে। ঘুম আউটপোস্ট থেকে একজন বিশেষ সংবাদবহ পাকদণ্ডী পথে আমার চিঠি নিয়ে এই বৃষ্টি মাথায় করেই দার্জিলিঙে চলে গেছে। আজ রাত্রের মধ্যেই সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ও. সি. মিস্টার ঘোষাল হয়তো নিজেই এসে পড়বেন।'

সুজাতা প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?'

একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে সুবীর বলে, 'এখনও ডেফিনিট হতে পারিনি। ইব্রাহিম যদি সহদেব স্বয়ং হয়, তবে মিস্টার আলি অথবা ডক্টর সেনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। আর ইব্রাহিম-ডিক্রুজা যদি পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয়, তাহলে ডক্টর অ্যান্ড মিসেস সেন অথবা আলি-কাবেরী গ্রুপকে সন্দেহ করতে হয়। অজয়বাবু একটু রগচটা প্রকৃতির—কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখছি না। আচ্ছা ভালো কথা—বাসু-সাহেব আমাকে বলেছেন যে তিনি ইব্রাহিম আর ডিক্রুজাকে নিশ্চিতভাবে স্পট করেছেন। আপনাদের কিছু বলেছেন তিনি?'

BanglaBook.org

সুজাতা বলে, 'বাসু-সাহেব কখন কী ভাবছেন বোঝা মুশকিল; কিন্তু উনি আমার সাহায্যে একটা ছোট্ট তদন্ত করিয়েছিলেন—।'

'কী তদন্ত?'

'কাবেরী দেবীর ঘরের অ্যাশট্রেটা আমাকে দিয়ে আনিয়ে উনি কী যেন পরীক্ষা করেন।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সুবীর। একটানে পরদাটা সরিয়ে দেয়। দেখা গেল পরদার ওপাশে ডক্টর সেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। থতমত খেয়ে ডক্টর সেন বললেন, 'ইয়ে, আজ আর থার্ড কাপ চা পাওয়া যাবে না, না মিসেস মিত্র?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুজাতা বললে, 'চায়ের সন্ধানে এখানে?'

'না, মানে রান্নাঘরে আপনাকে দেখতে না পেয়ে—।'

'আসুন।' সুজাতা ডক্টর সেনকে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

ও. সি. দার্জিলিঙের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে। কাল রাত্রেই সুবীর জানতে চেয়েছিল আসামীদের মধ্যে কার-কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বাসু-সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন, তাঁর কাছে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, 'অরূপরতন যখন গুলিবিদ্ধ হয় তখন রিভলভারটা কোথায় ছিল?'

'আমার ডান হাতে। আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম ওই ইজিচেয়ারে। পশ্চিম-মুখো—।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল সুবীরের। বলেছিল, 'কেন? রিভলভার হাতে বসেছিলেন কেন?'

'একটা প্রিমনিশান হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এখনই এই মুহূর্তেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি সহদেবের প্রতীক্ষা করছিলাম।'

বাসু একে-একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেন—আলি, অজয়, ডাক্তার সেন, কৌশিক—সকলেই পাথরের মূর্তি। সুবীর বললে, 'আপনার রিভলভারটা দেখি?'

অম্লান বদনে বাসু-সাহেব হস্তান্তরিত করলেন আগ্নেয়াস্ত্রটা। বললেন, 'ওটা লোডেড।' সুবীর সেটা শুঁকে দেখল। চেম্বারটা খুলে কী যেন দেখল। যন্ত্রটার নম্বর নোটবুকে টুকে নিয়ে ফেরত দিল সেটা। তারপর এদিকে ফিরে বলল, 'আর কার কাছে রিভলভার আছে?'

কেউ জবাব দেয়নি।

'এ-ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকের মালপত্র আমাকে সার্চ করতে হবে।'

প্রতিবাদ করেছিলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বলেছিলেন, 'আগে থানা থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট করিয়ে আনুন, তারপর আমার বাক্স ঘাঁটবেন। তার আগে নয়।'

'কেন? আমি তো প্রত্যেকের বাক্সই সার্চ করতে চাইছি। আর কেউ তো তাতে আপত্তি করছেন না। আপনি একাই বা কেন—।'

'করছি। আমারও আপত্তি আছে।' বলেছিলেন আলি।

বাসু-সাহেব বলেছিলেন, 'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তুমি হোটেল তল্লাশি করতে পার না।'

ওম মেরে গিয়েছিল সুবীর। আলি হেসে বলেছিলেন, অর্থাৎ অবজেকশান সাসটেইন্ড।

তাই সকালে উঠেই সুবীর চলে গিয়েছিল দূর আউটপোস্ট-এ। সেখানে গিয়ে জানতে পারে ঘুম অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। বাধ্য হয়ে সে নাকি দার্জিলিঙে স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছে। রাত্রের মধ্যেই ও. সি. দার্জিলিং এসে যাবেন। সার্চ-ওয়ারেন্ট আসবে। আর হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম-সার্ভিসের বেয়ারা বীরবাহাদুর। যে রিপোজ-এর আবাসিকদের দর্শন-মাত্র বলে দিতে পারে, মহম্মদ ইব্রাহিম অথবা ডিকুঞ্জা এখানে আছে কিনা।

BanglaBook.org

সন্ধ্যাবেলায় সুবীর রায়ের আহ্বানে সকলে সমবেত হলেন ড্রইংরুমে। সুবীর নাকি সকলকে সম্বোধন করে কিছু জানতে চায়। সবাই এসে গুটিগুটি বসেছেন ড্রইংরুমে।

দিনের আলো নিবে গেছে। গোটা তিন-চার মোমবাতি জ্বলছে ঘরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। সেইসঙ্গে কাঁপছে আতঙ্কতাড়িত আবাসিকদের অতিকায় ছায়ামিছিল।

গলাটা সাফ করে নিয়ে সুবীর বলে, 'অপ্রিয় সত্যটা অস্বীকার করে লাভ নেই—আমাদের মধ্যেই একজন আছেন যিনি মিস্টার মহাপাত্রের দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। রমেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা যায় কি না সেকথা ঠিক এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু অরূপ মহাপাত্রকে যে লোকটা পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ করে সে এখন বসে আছে এই ঘরেই—আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এ-যুক্তিতে আপত্তি আছে কারও?'

কেউ কোনও জবাব দেয় না।

সুবীর পুনরায় বলে, 'আপনারা এ-যুক্তি মেনে নিলেন। এবার আরও স্পেসিফিক্যালি বলি ঃ আমরা দশ-বারো জন আছি, তার মধ্যে মিসেস বাসুকে আমরা বাদ দিতে পারি। কারণ তাঁর অ্যালিবাই অকাট্য। তিনি নিজের ঘরে বসে গান গাইছিলেন—সে গান আমরা সবাই শুনেছি, গুলির শব্দের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত—ওয়েল, আর যুক্তির প্রয়োজন নেই, মিসেস বাসু অনারেবলি অ্যাকুইটেড। এগ্রিড?'

এবারও কেউ কোনও সাড়া দিল না।

'তাহলে বাকি রইলাম আমরা ন'জন। আসুন, এবার আমরা বিচার করে দেখি—এই ন'জন ঘটনার মুহূর্তে কে কোথায় ছিলেন, কারও কোনও অ্যালিবাই আছে কি না, একে-একে আপনারা বলুন—।'

'ন'জন বলতে?' প্রশ্ন করেন অজয়বাবু।

'মিস্টার কৌশিক মিত্র, মিসেস মিত্র, ডক্টর অ্যান্ড মিসেস সেন, মিস্টার অজয় চ্যাটার্জি, কাবেরী দেবী, মিস্টার আলি, মিস্টার বাসু এবং কালীপদ।'

'অ্যান্ড হোয়াই নট মিস্টার সুবীর রয়?' প্রশ্ন অজয় চাটুজ্জের।

আলি উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'পার্টিনেন্ট কোশ্চেন! হিন্দু-দর্শনে দশমস্তমসি বলে একটা কথা আছে না?'

সুবীর হেসে বলে, 'আছে। বেশ আমরা দশজন। আমিই বা বাদ যাই কেন অঙ্কের হিসেব থেকে! তাহলে আমিই আগে কৈফিয়তটা দিই, আমি ছিলাম বাথরুমে। হট-বাথ নিচ্ছিলাম। গান আমি শুনতে পাইনি, তবে গুলির শব্দটা শুনেছি। জামা-কাপড় পরে বের হয়ে আসতে আমার মিনিট দুই দেরি হয়েছিল। আমিই বোধ হয় সবার শেষে ড্রইংরুমে এসে পৌঁছই। এবার আপনারা সবাই বলুন—কৌশিকবাবু?'

'আমি ছিলাম ছাদে। গান শুরু হতেই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তখন নেমে আসি।'

'ছাদে! ছাদ তো ঢালু ছাদ—' সুবীর প্রশ্ন করে।

'না, ঠিক ছাদে নয়, মই বেয়ে উঠে আমি রেনওয়াটার পাইপটা বন্ধ হয়ে গেছে কি না দেখছিলাম। দোতলায় নেমে এসে দেখি—দক্ষিণের বারান্দার ও-প্রান্তে একজন মহিলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। জানি না—তিনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেন! সুজাতা নয়, কারণ আমি তাকে মিট করি একতলায়, কিচেন-ব্লকের সামনে—।'

ওর বক্তব্যের সূত্র ধরে কাবেরী বলে ওঠে, 'ওখানে আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। গান শুনছিলাম। আমি কৌশিকবাবুকে নেমে আসতে দেখেছিলাম। কৌশিকবাবুই কি না হলফ করে বলতে পারব না, কারণ আলো ছিল খুব কম। একজন পুরুষমানুষকে বর্ষাতি গায়ে এবং টর্চ হাতে দেখেছিলাম

BanglaBook.org

মাত্র।'

ডক্টর সেন বলেন, 'অর্থাৎ আপনারা দুজন দুজনের অ্যালিবাই, কেমন?'

আলি বলে ওঠেন, 'ব্যারিস্টার-সাহেব কী বলেন? ওঁরা তো কেউ কাউকে চিনতে পারেননি। ইনি দেখেন নারী-মূর্তি, উনি দেখেছেন পুরুষ-মূর্তি। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, 'সে বিশ্লেষণ থাক। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'নিজের ঘরে। একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির "মাউসট্র্যাপ"।'

'অর্থাৎ আপনার কোনও অ্যালিবাই নেই?'

'আগাথা ক্রিস্টি আমার অ্যালিবাই।'

অজয় চট্টোপাধ্যায় চটে উঠে বলেন, 'এই কি আপনার রসিকতা করবার সময়?'

'কেন নয়? আমরা তো এসেছি বেড়াতে, ফুর্তি করতে, পাহাড় দেখতে—তাই নয়?'

সুবীব অজয়বাবুকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কে, আমি?' সচকিত হয়ে ওঠেন অজয় চাটুজ্জে। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, 'আমি ইয়ে—আহ্নিক করছিলাম।'

'আহ্নিক। মানে?' প্রশ্ন করে সুবীর রায়।

আবার চটে ওঠেন অজয়বাবু : 'আপনি হিন্দুর ছেলে, তাই আহ্নিক বোঝেন না। আলি-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, উনি বুঝিয়ে দেবেন সন্ধ্যাহ্নিক বলতে কী বোঝায়।'

সুবীর এ-বক্রোক্তি গলাধঃকরণ করে ডাক্তার সেনকে বলে, 'আপনি কী বলেন?'

'ওই সন্ধ্যাহ্নিক বিষয়ে?' জানতে চান ডক্টর সেন।

ধমক দিয়ে ওঠে সুবীর, 'আজ্ঞে না। আপনারা দুজন তখন কোথায় ছিলেন?'

'তাস খেলছিলাম। উনি আর আমি। আমরা দুজন দুজনের অ্যালিবাই।'

আলি হেসে ওঠেন, 'অবজেকশান ইয়োর অনার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাসপেকটেড। এক্ষেত্রে কি ওঁরা পরস্পরের অ্যালিবাই হতে পাবেন?'

মিসেস সেন চিৎকার কবে ওঠেন, 'সাসপেকটেড মানে? হাউ ডেয়ার য়ু—।'

সুবীর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ব্যারিস্টার-সাহেব কাউকে কিছু প্রশ্ন করবেন?'

বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ, করব। তোমাকেই করব। আজ রাত্রে কি নৃপেন এখানে এসে পৌঁছতে পাববে?'

'তাই তো আশা করছি।'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের বেয়ারা বীরবাহাদুরও কি আসবে?'

'হ্যাঁ, আসবে। আমাদের মধ্যে ইব্রাহিম অথবা মিস ডিক্রুজা আছে কি না, সেটা আজ রাত্রেই জানা যাবে—' বলেই সুবীর একে-একে সকলের দিকে তাকায়। এ ঘোষণায় শ্রোতৃবৃন্দের কার মুখে কী অভিব্যক্তি হচ্ছে জেনে নিতে চায়। তারপর সে আবার বলে, 'আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। এবার আমাব একটি প্রস্তাব আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আশা কবি সকলের সহযোগিতা পাব।'

'কী জাতের পরীক্ষা?' জানতে চান অজয়বাবু।

জবাবে সুবীর বলে, 'একটা কথা তো মানবেন যে, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যে কথা বলেছেন। ঘটনার মুহূর্তে তিনি বাস্তবে ছিলেন অরূপবাবুর পিছনে। তিনি কে, তা আমরা জানি না—কিন্তু জানতে চাই। তাই আমার প্রস্তাব—আজ রাত ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা প্রত্যেকে গতকালকার পজিসানে ফিরে যাব। ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটার শব্দ হতেই রাণী দেবী তাঁর ঘরে বসে ওই গানটাই গাইবেন। আমরা এইমাত্র আমাদের জবানবন্দিতে যে কথা বলেছি ঠিক তাই-তাই করে যাব আটটা তেত্রিশ পর্যন্ত। ঠিক আটটা তেত্রিশে আমি ড্রইংরুমে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার

BanglaBook.org

করব। আপনারা গতকালকের মতো সবাই ছুটে আসবেন ড্রইংরুমে।'

অজয়বাবু বলেন, 'তাতে কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে?'

'যারা সত্যি কথা বলেছে, তারা গতকালকার আচরণ অনুযায়ী আজকেও কাজ করে যেতে পারবে। কিন্তু যে মিথ্যে কথা বলেছে, তার ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবেই। সে এমন একটা কিছু করে বসবে যাতে সে ধরা পড়ে যাবে। এটা ক্রাইম-ডিটেকশানের একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতি। অনেক সময়েই এতে সুফল পাওয়া গেছে। না কি, বলুন, বাসু-সাহেব?'

বাসু-সাহেব বলেন, 'হতে পারে। আমি ব্যাক-ডেটেড। আমি এ-পদ্ধতির কথা শুনিনি।'

আলি বলে ওঠে, 'আমি শুনেছি মিস্টার রায়, আগাথা ক্রিস্টির "মাউসট্র্যাপে" ঠিক ওই ধরনের একটা পরীক্ষার কথা আছে—।'

অজয়বাবু বলেন, 'দুর মশাই! তাই কি হয় নাকি? কাল যদি আমিই গুলি করে থাকি, তা হলে আজ কি আর সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াব? আজ তো গ্যাঁটসে নিজের ঘরে বসে সীতারাম জপ করব।'

সুবীর বলে, 'তাই করবেন। তাহলে তো আর আপনার আপত্তি নেই?'

কাবেরী বলে, 'তবু একটা তফাত হবে কিন্তু মিস্টার রায়। আজ আর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজবে না।'

'বাজবে।' সুবীর ওকে আশ্বস্ত করে।

'বাজবে? কেমন করে? কে বাজাবে আজ?'

'আমি বাজাব। আমার ঘরে জলের কলটা খোলা থাকবে, কিন্তু আমি বাথরুমে থাকব না। আমি আজ অভিনয় করব অরূপরতনের চরিত্রটা। অর্থাৎ, গান অন্তরায় পৌঁছলে আমি পিয়ানো বাজাতে শুরু করব। আপনি, রাণী দেবী—গত কালকের মতোই এক লাইন আমাকে "সোলো" বাজাতে দেবেন। তারপর মিউজিকে যোগ দেবেন, কেমন?'

আলি বললে, 'আপনি পিয়ানো বাজাতে জানেন?'

'জানি।'

'অত ভালো?'

'রাত সাড়ে আটটায় এ-প্রশ্নের জবাব পাবেন।'

আলি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝেছি, মহাভারতে আছে আত্মশ্লাঘা আত্মহত্যার নামান্তর।'

মিসেস সেন বলেন, 'আপনি কথায়-কথায় মহাভারত পাড়েন কেন বলুন তো?'

'মহাভারত আর রামায়ণ হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রন্থ। আর বিভীষণ হচ্ছে আমার হিরো। মন্দোদরী বিভীষণকে নিকা করেছিল কি না ঠিক জানি না—সুজাতা দেবী বলতে পারবেন?'

আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে দেখে সুবীর বলে ওঠে, 'থ্যাঙ্ক অল। রাত আটটা হয়েছে। এবার তাহলে আমরা সবাই প্রস্তুত হই।'

ডক্টর সেন বলেন, 'একটা কথা। আটটা তেত্রিশে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার শুনে আমরা সবাই ছুটে আসব, তারপর?'

সুবীর জবাবে বলে, 'তার পরেও আপনারা কালকের আচরণ করে যাবেন। আপনারা এসে দেখবেন, আমি ঠিক ওইখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছি। অর্থাৎ, আমিই যেন অরূপবাবু। আপনি, ডক্টর সেন, আমাকে পরীক্ষা করে বলবেন, থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা কাঁধে লেগেছে! ফেটাল নয়।'

ডক্টর সেন গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়লেন।

'কিন্তু একটা কথা,' সতর্ক করে দেয় সুবীর, 'কোনও কারণেই আজ ওই তিন মিনিটের জন্যে আপনারা অন্যরকম আচরণ করবেন না। ঠিক কাল যা করেছেন তাই করবেন। অন্যরকম

BanglaBook.org

আচরণ করতে বাধ্য হবে অবশ্য ক্রিমিনাল নিজে—।'

মিসেস সেন হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠেন : 'গ্র্যান্ড আইডিয়া! খেলাটা জমবে—ঠিক পার্টিতে যেমন হয়।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

রাত আটটা পঁচিশ।

বাসু-সাহেব রিভলভারটা নিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলেন। বসলেন গিয়ে ইজিচেয়ারে। অরূপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাণী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে বসে আছেন জানলার দিকে মুখ করে—উৎকর্ণ হয়ে আছেন, কখন 'ঢং' করে বেজে উঠবে হলঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা।

কৌশিক টর্চ নিয়ে মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। আলি-সাহেব পড়া বইয়ের শেষ ক'টা পাতা আবার পড়তে বসেছেন। কাবেরী উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে তার বিছানায়—কখন শুরু হয় গান। সুজাতা রান্নাঘরে। ডক্টর সেন বললেন, 'কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় তুমি ডিল করছিলে—তাসটা ধরো!'

অজয় চাটুজ্জে আহ্নিকে বসেছেন। অন্তত আজকের রাতে।

আটটা আঠাশ। সুবীর রায়ের বাথরুমে কলের জল পড়তে শুরু করল।

দু-নম্বর ঘর।

রাণী দেবী নিজের মণিবন্ধে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আটটা উনত্রিশ।

'খুট' করে শব্দ হল পিছনে। রাণী হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ওঁর থেকে হাত-তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুবীর রায়।

'কী ব্যাপার, আপনি?'

'আপনাকে আর গান গাইতে হবে না মিসেস বাসু—।'

'হবে না! সে কী? বাড়িসুদ্ধ সবাই যে আমার গান শুনতে—।'

'আপনার গান নয়, ওঁরা উদগ্রীব হয়ে আছেন সত্যিকারের রাণী দেবীর গান শুনতে।'

'মানে?'

'মানে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সহদেব হুই কে তা জানা গেছে!'

'আপনি জানেন?'

'জানি। আপনিও এখনই জানবেন—।'

দোতলায় সাত নম্বর ঘর।

কাবেরী বসেছিল খাটে। শুনল শুরু হয়ে গেল গান :

"যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।"

এক লাইন গান হতেই 'ঢং' করে সাড়ে আটটা বাজল। রাণী দেবী কয়েক সেকেন্ড আগেই শুরু করেছেন তাহলে। শুরু হতেই বেজে উঠল পিয়ানো। কালকের মতোই রাণী দেবী চুপ করে গেলেন। এক লাইন শুধু পিয়ানো বেজে গেল। তারপর শুরু হল যৌথসংগীত। কণ্ঠসংগীত আর যন্ত্রসংগীত। কাবেরী খাট থেকে নামল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঠিক কালকের মতো রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। গান তখন পৌঁছেছে সঞ্চারীতে :

BanglaBook.org

"এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে,
ভুবন ভরে আছে যেন, পাইনে জীবন ভরে।।"

হঠাৎ সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ করে, বিদ্যুৎগতিতে মই বেয়ে নেমে আসছে কৌশিক। দ্বিতলে সে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াল না কালকের মতো। যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে উদ্যত পিস্তল এক খুনি আসামি! প্রাণপণে সে ছুটে নেমে গেল একতলায়। কী ব্যাপার? কৌশিক তো নিয়ম মানছে না! গতকালকার আচরণের পুনরাভিনয় তো সে করল না! চকিতে কাবেরীর মনে হল, তবে কি কৌশিক—।

কৌশিকের দোষ নেই। বেচারি নির্দেশমতো মই বেয়ে উঠে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গান শুরু হতেই ওর কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। ওর মনে হল ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত সেই 'এক ঃ দুই ঃ তিন' লেখা কাগজখানার কথা। ওর মনে হল—আততায়ী কাল যে-সুযোগ পেয়েছিল ঠিক সেই সুযোগ ওরা যৌথভাবে তাকে পাইয়ে দিচ্ছে! হুবহু এক পরিবেশ! খুনিটা কি এই সুযোগ নেবে না? যদি নেয়? কে তার তিন নম্বর টার্গেট?

ভেসে আসছে অস্ফুট সংগীত ঃ

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর বিকিয়েছে, পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিকের মনে হল এই মুহূর্তেই বুঝি তার সব কিছু বিকিয়ে যেতে বসেছে। হয়তো এতক্ষণে খুনিটা কিচেন-ব্লকে ঢুকে—।

সব কিছু ভুল হয়ে গেল কৌশিকের। সে বিদ্যুৎবেগে নেমে এল একতলায়।

আবার ওই দু নম্বর ঘর। রাণী দেবী আর সুবীর রায়। মুখোমুখি। রাণী রীতিমতো আতঙ্কতাড়িত। বলছে, 'এসব কী বলছেন আপনি? আমি-আমি কী দোষ করলাম?'

নেপথ্যে তখন শোনা যাচ্ছে গান এবং যন্ত্রসংগীত।

সুবীর বললে, 'দোষ করেছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। প্রায়শ্চিত্ত করবেন তাঁর স্ত্রী—আপনি!'

পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল সুবীর।

রাণী আর্তনাদ করতে গেলেন, স্বর ফুটল না তাঁর কণ্ঠে।

কিচেন-ব্লকটা অন্ধকার। মোমবাতি নিবে গেছে ঝোড়ো হাওয়ায়। কৌশিক টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখল। সুজাতা কোথাও নেই। অস্ফুটে একবার ডাকল, 'সুজাতা!'

কেউ সাড়া দিল না।

কৌশিক ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটে বেরিয়ে আসে দক্ষিণের বারান্দায়। পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ে ডাইনিং রুমে। সেখানেও কেউ নেই। কিন্তু ও কী, পিয়ানোর টুলে তো সুবীর রায় বসে নেই! অথচ কী আশ্চর্য, গান হচ্ছে—পিয়ানো বাজছে! যন্ত্রসংগীত আর কণ্ঠসংগীত যৌথভাবে ফিরে এসেছে স্থায়ীতে ঃ

"যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা— ।"

BanglaBook.org

হঠাৎ কে যেন স্পর্শ করল ওর বাহুমূল। চমকে উঠল কৌশিক। দেখে, সুজাতা। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সুজাতা ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করছে। কৌশিক ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে। চার নম্বর ঘরের পরদা সরিয়ে সুজাতা প্রবেশ করল সুবীর রায়ের ঘরে। কৌশিক তার পিছন-পিছন। ঘর নিরন্ধ্র অন্ধকার—কিন্তু সেই ঘরই হচ্ছে সংগীতের উৎস। টর্চ জ্বালল সুজাতা ঃ টেবিলের ওপর একটা ব্যাটারি সেট টেপ রেকর্ডার চক্রাবর্তনের পথে গাইছে ঃ

"—তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম।।"

কৌশিক সুজাতার বাহুমূল ধরে এবার টানে। বলে, 'কুইক!'

'কী?'

'বাসু-সাহেব অথবা রাণী দেবী—।'

ওরা ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়, ঠিক তখনই হল একটা ফায়ারিঙের শব্দ। ঠিক পাশের ঘর থেকে। কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে—গুলিটা যেন তারই পাঁজরে বিঁধেছে!

সুজাতা শুধু বললে, 'শেষ হয়ে গেল!'

গুলির শব্দ শুনে সকলেই নেমে এসেছে। ডক্টর আর মিসেস সেন, কাবেরী, আলি আর অজয়বাবু প্রায় একইসঙ্গে প্রবেশ করলেন ডাইনিং রুম পার হয়ে ড্রইংরুমে। আলি টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! পিয়ানোর টুলে কেউ নেই। ভূতলেও নেই।

ঠিক তখনই চার নম্বর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল কৌশিক আর সুজাতা। কৌশিক বলল, 'কুইক। আসুন আপনারা—।'

ওরা হুড়মুড়িয়ে বের হয়ে এল উত্তরের বারান্দায়। টর্চের আলো পড়ল বাসু-সাহেবের চিহ্নিত ইজিচেয়ারে। সেটা ফাঁকা। এবার ওরা সদলবলে ঢুকে পড়ে বাসু-সাহেবের ঘরে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই লাইট-কানেকশানটা ফিরে এল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল 'রিপোজ'।

অরূপরতন শুয়েছিল বাসু-সাহেবের খাটে। বালিশে ভর দিয়ে মাথাটা তুলেছে সে। দু-হাতে মুখ ঢেকে রাণী দেবী নিথর হয়ে বসে আছেন তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে। ড্রেসিংরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার।

আর মেঝেতে লোটাচ্ছে সুবীর রায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েন ডাক্তার সেন। পরমুহূর্তেই মুখ তুলে বলেন, 'থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা পেলভিক বোনে লেগেছে—ফেটাল নয়!'

গতকালকার উক্তির সজ্ঞান অভিনয় নয়—অরিজিনাল ডায়ালগ।

সুবীরের জ্ঞান ছিল। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে।

কৌশিক সবিস্ময়ে বাসু-সাহেবকে বলে, 'কী ব্যাপার?'

বাসু-সাহেব গম্ভীরমুখে বলেন, 'আঙ্ক সহদেব!'

'সহদেব! মানে?'

রিভলভারটা দিয়ে ভূলুণ্ঠিত সুবীর রায়কে নির্দেশ করে বাসু বলেন, 'সহদেব হুই! আর্চ গ্যাংস্টার, বাফেলো, ম্যারিকা!'

BanglaBook.org

॥ আট ॥

৫ অক্টোবর, শনিবার।

ঝলমলে রোদ উঠেছে আজ। মেঘ সরে গেছে। গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে গ্যাং কুলিরা নেমেছে কার্ট রোড মেরামত করতে। উৎপাটিত টেলিগ্রাম পোল আবার মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে। মিলিটারি জিপ নাচতে-নাচতে চলতে শুরু করেছে, গর্তে-ভরা কার্ট রোড দিয়ে। অনেক কষ্টে অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এসে নিয়ে গেছে দুজন আহত মানুষকে রিপোজ থেকে হাসপাতালে।

আজ মেঘভাঙা সকালে সবাই আবার গোল হয়ে বসেছে ড্রইংরুমে বাসু-সাহেবকে ঘিরে। পরিচিত দলের মধ্যে যোগ হয়েছে একটি নতুন মুখ—দার্জিলিং থানার ও. সি. নৃপেন ঘোষাল। সে কোনও টেলিফোন পেয়ে আসেনি। রাস্তায় জিপ চলতে শুরু করা মাত্র নৃপেন চলে এসেছিল ঘুমে। খবর নিতে রিপোজের অবস্থা। নৃপেন প্রশ্ন করে, 'আপনি স্যার ঠিক কখন বুঝতে পারলেন?'

'একেবারে প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্তেই।'

'প্রথম সাক্ষাতেই!' চমকে ওঠে কৌশিক, 'কেমন করে?'

'মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছিল সুবীর, আই মিন সহদেব! দোসরা তারিখে রাত এগারোটায় সে নিজেই ফোন করে তোমাদের বলেছিল, আমি নৃপেন ঘোষাল, ও. সি. দার্জিলিং বলছি। তারপর মধ্য রাত্রে এখানে আসবার আগে সে বাড়ির বাইরে টেলিফোনের লাইনটা ছিঁড়ে ফেলে, যাতে আমরা আর থানার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারি—।'

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন, ও জাল?'

'বলছি। পরদিন সকালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতেই আমি ইব্রাহিমের সেই "এক ঃ দুই ঃ তিন" লেখা কাগজটার প্রসঙ্গ তুললাম। সুবীরবেশী সহদেব তখন একটা দুঃসাহস দেখিয়ে বসে। ও চেয়েছিল আমাদের—মানে, তোমাদের ভয় দেখাতে, ভয়ে নার্ভাস করে দিতে। বেড়াল যেমন খেলিয়ে নিয়ে ইঁদুরছানাকে মারে—তাই সে ওই "এক ঃ দুই ঃ তিন" লেখা কাগজখানা তোমাদের দেখাতে চাইল। আগে থেকেই সেটা ও নতুন করে লিখে এনেছিল। ও তাই কাগজখানা সকলকে দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না। হয়তো ও আমাকে ওইভাবে ঠকাতে চেয়েছিল, পাছে আমি ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাই, তাই ওভাবে ওর অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় মেলে ধরেছিল আমার কাছে—প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ও নৃপেনের কাছ থেকে আসছে। আর তাতেই ও ধরা পড়ে গেল।'

সুজাতা বলে, 'কেমন করে? কাগজখানা তো আমরাও দেখেছি।'

'দেখেছ। কিন্তু তোমরা দেখেছ মাত্র একবার। আমি দেখেছি দুবার। আমার ক্রিমিনাল লইয়ারের চোখ ভুল করেনি। কাগজখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—ওই লোকটাই সহদেব, ও নৃপেনের সহকারী সুবীর রায় নয়।'

'কেমন করে?'

'নৃপেন যে কাগজটা দেখিয়েছিল, সেখানা আর এই কাগজটা হুবহু এক। দুটোই চব্বিশ পাউন্ডের ব্যাঙ্ক-পেপার, একই কালো কালি, একই হস্তাক্ষর, একইভাবে ওপরদিকে পারফোরেটেড এবং ডান কোণায় ছেঁড়া। তবু একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম ছিল। প্রথমবার দার্জিলিঙ শব্দটার শেষ অক্ষরটা ছিল "ঙ", দ্বিতীয়বার "ং"। ব্যস! চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল সহদেব।'

সুজাতা আবার বলে, 'কিন্তু কেমন করে?'

'বুঝলে না? "ঙ" মুছে গিয়ে "ং" এল কেমন করে? ফলে এখানা নতুন করে লেখা—কে লিখেছে—নিঃসন্দেহে যে সেটা দাখিল করছে! কিন্তু দুটি কাগজের হস্তাক্ষর এক হয় কী করে?

BanglaBook.org

অর্থাৎ ওই ইব্রাহিম, যে লোকটা পয়লা তারিখ কয়েক মিনিটের জন্যে ওই মাস্টার-কি দিয়ে তেইশ নম্বর ঘরে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিল। রানু, তোমার মনে আছে, আমি তখনই বলেছিলাম সহদেবকে আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু প্রমাণ এমন পাক্কা নয় যাতে খুনি আসামির কনভিকশান হতে পারে।

মিসেস সেন বলেন, 'ইস, তাই সব জেনেশুনে আপনি ঘাপটি মেরে বসেছিলেন।'

'ইয়েস ম্যাডাম! তাই সব জেনেশুনে আমি ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। কিন্তু আমার ভুল কোথায় হল জানো? আমি ভেবেছিলাম আমিই ওর সেকেন্ড টার্গেট—অরূপ নয়, ওখানেই সে আমাকে টেক্কা মেরেছে! কিন্তু তৃতীয়বার আমি আর ভুল করিনি—বুঝতে পেরেছিলাম, এবার ওর টার্গেট হচ্ছে রানু।'

কাবেরী প্রশ্ন করে, 'কেন? মিসেস বাসু কেন?'

'কারণ সহদেব জানত আমি সশস্ত্র আছি। ও বুঝতে পেরেছিল আমি ওর নাগালের বাইরে, গুলি করতে গেলে গুলি খেতে হতে পারে। তা ছাড়া ও জানত রানুর মৃত্যু আমার কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক হবে, কারণ—।'

'কারণ?' সুজাতা জানতে চায়।

বাসু-সাহেব রাণীর দিকে ফিরে বলেন, 'সবার সামনে বলব?'

হতচকিত হয়ে রাণী বলেন, 'কী?'

'রানুকে আমি ভীষণ ভালোবাসি?'

সবাই হেসে ওঠে ওঁর ভঙ্গিতে। মিসেস বাসুও রাঙিয়ে ওঠেন। বলেন, 'ছাই বাসো! আচ্ছা, ওই লোকটা যখন আমাকে বলছিল যে, সে আমাকে খুন করতে চায়, তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি কী করে চুপ করে ছিলে? তুমি পারলে ওই খুনিটার সামনে আমাকে ওভাবে বসিয়ে রাখতে?'

বাসু-সাহেব মুখটা সূচালো করেন। নীরবে মাথাটা নাড়েন সম্মতিসূচক ভাবে।

'তোমার একটুও মায়া হল না?'

'কই আর হল রানু? মিস ডিক্রুজাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ওর নিজমুখে কনফেশান। সেটা তোমার কাছে স্বীকার করার আগে কি আর ওকে নিরস্ত্র করতে পারি? যতই কেন না ভালোবাসি তোমাকে—আমি যে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার!'

কৌশিক জানতে চায়, 'আচ্ছা সহদেবের প্ল্যানটা কী ছিল?'

'এখনও বুঝতে পারোনি? রাণী প্রথমবার যখন গানটা গায় তখন সহদেব ছিল তার নিজের ঘরে। চট করে সে গানটা টেপ-রেকর্ড করতে শুরু করে। তখনও ওর তৃতীয় এমন কি দ্বিতীয় খুনের পরিকল্পনাও করা ছিল না। গানটা রেকর্ড করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমতো আমাদের ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত করা। মিনিটখানেক পরেই সহদেব শোনে অরূপ এসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মুহূর্তমধ্যে সে মনস্থির করে—বাথরুমের কলটা খুলে দেয় এবং অরূপকে গুলি করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তারপর ধীরেসুস্থে সে তৃতীয় খুনের পরিকল্পনা করে। ও চেয়েছিল—দ্বিতীয়বার রাণীর গান টেপ-রেকর্ডে "তোমায় জানাতাম" শব্দটায় পৌঁছনো মাত্র সে রাণীকে গুলি করে ছুটে বেরিয়ে যাবে ড্রইংরুমে। ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে পিয়ানোর টুলটা ফুট চারেক দূরে, পাশের ঘরে। তোমরা এসে ওকে দেখতে পেতে ড্রইংরুমে পড়ে থাকতে। পরে রাণীর মৃত্যুর তদন্ত যখন হত তখন ওর মোক্ষম অ্যালিবাই থাকত পিয়ানোর শব্দ। রাণী যে আদৌ গায়নি আর ও বাজায়নি তা কেউ কোনওদিন জানতে পারত না—একমাত্র রাণীই হতে পারত সে ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যখন হত তখন রাণীর এজাহার আর নেওয়া যেত না।

BanglaBook.org

নৃপেন বলে, 'কিন্তু ওর টেপ-রেকর্ডার আর ডিসচার্জড রিভলভারটা তো আমরা তদন্তের সময় খুঁজে পেতাম। ও যে আদৌ পিয়ানো বাজাতে জানে না এটা প্রমাণ করতাম।'

'না, দারোগা-সাহেব, তা পেতে না। ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী পেতে না। সে রাত দশটার মধ্যেই "থানায় যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে যেত। তাকে আমরা সবাই পুলিশ অফিসার বলে মেনে নিয়েছিলাম—ফলে আমরা তাতে আপত্তি করতাম না। সহদেব অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।'

কাবেরী বলে, 'উঃ, কী ভীষণ!'

বাসু-সাহেব বলেন, 'তুমিই কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছ কাবেরী।'

'আমি! ওমা, কেন? কী করে?'

'কার্শিয়াঙে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে বন্ধুস্থানীয় একজনের কাছে। রাত থাকতেই বাসিমুখে কেউ বন্ধুস্থানীয় লোকের বাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে বের হয় না। তাই অনুমান করতে অসুবিধে হয় না—একটা রাগারাগি নিশ্চয় হয়েছিল। অবশ্য "রাগ" শব্দটা বাংলা না সংস্কৃতে সেটা হলফ করে বলতে পারব না। ওটা "অভিমান"ও হতে পারে। তিনি "বান্ধবী" না "বন্ধু" তা জানা না থাকায় সঠিক কনক্লুশনে আসা যাচ্ছে না।'

কাবেরী একেবারে লাল হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, 'তা ছাড়া এখানে ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময় নিজের ঘরটা তালাবন্ধ না করেও তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে তুলেছ। তুমি জানো না—তোমার ঘরে অ্যাশট্রের ভেতর সহদেব ক্রমাগত ফিলটার টিপটি সিগারেটের স্টাম্প ফেলে গেছে।

'সে কী! কেন?'

'যাতে তোমাকে মিস ডিক্রুজা বলে আমি ভুল করি।'

'আপনি আমাকে তাই ভেবেছিলেন?'

'না ভাবিনি। অরূপ তোমাকে চার্চে দেখা একটি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম অবশ্য—কিন্তু ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম সহদেব নিজেই লুকিয়ে ওই সিগারেটের স্টাম্প ফেলে আসছে। তাই সহদেবকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমি ওর ফাঁদে পা দিয়েছি। তাকে তাই বলেছিলাম—মিস ডিক্রুজাকেও আমি শনাক্ত করেছি এই হোটেলে।'

নৃপেন বলে, 'মিস ডিক্রুজা তা হলে নিরপরাধ?'

'একটা অপরাধ সে করেছে। মেয়েটা ছিল কল-গার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই রমেন তোমার বাড়িতে রাতে থাকতে রাজি হয়নি। পয়লা তারিখ গভীর রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মেয়েটা রমেনের ঘরে ঢোকে। হয়তো অনেকক্ষণ বসেও ছিল। সিগারেট সে খেয়েছিল তার তো প্রমাণই আছে। হয়তো তার চোখের সামনেই মদ্যপান করতে গিয়ে রমেন গুহ মারা যায়। মিস ডিক্রুজার একমাত্র অপরাধ—তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর না দিয়ে সে রাত ভোর হতেই পালিয়ে যায়।'

নৃপেন গম্ভীর স্বরে বলে, 'গুরুতর অপরাধ!'

বাসু-সাহেব বলেন, 'কিন্তু তার অবস্থাটাও বোঝো। বেআইনি ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে ঘরে ঢুকেছে—খুনের দায়ে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ত। তা ছাড়া অমন মেয়ে নিশ্চিত মদ খায়—হয়তো একচুলের জন্যে সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে—যাকে বলে between the cup and the lips!'

অধিবেশন ভঙ্গ হলে নৃপেন বাসু-সাহেবকে জনান্তিকে বলে, 'আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল স্যার—।'

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'মনে আছে। আমি বলব।'

BanglaBook.org

নৃপেন অবাক হয়ে বলে, 'মানে! কাকে কী বলবেন?'

'বিপুলকে তোমার সাবস্টিটুটের কথা তো? বলব আমি।'

নৃপেন যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছে! লোকটা কি অন্তর্যামী।

ঘণ্টাখানেক পরে।

সুজাতা কিচেনে ব্যস্ত। আজ পোলাও হবে। জবর খানার আয়োজন। কৌশিক নিঃশব্দে প্রবেশ করল পিছন থেকে। সুজাতা তখন কাজ করতে-করতে গুনগুন করে তান ভাজছিল : 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি—।'

'এতক্ষণে গান বেরিয়েছে গলায়?'

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সুজাতা। বলে, 'ও তুমি! আমি ভেবেছি—বিভীষণ!'

'বিভীষণ?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা ঘনিয়ে আসে। বলে, 'এই, আজ না পাঁচই অক্টোবর!'

'হুঁ, তাই কী?'

'বা রে, আমার সেই সোনার কাঁটাটা?'

'ও, আয়াম সরি। ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে, নয়?'

কৌশিক পকেট থেকে বের করে গয়নার বাক্সটা।

BanglaBook.org

কিছু অলৌকিক

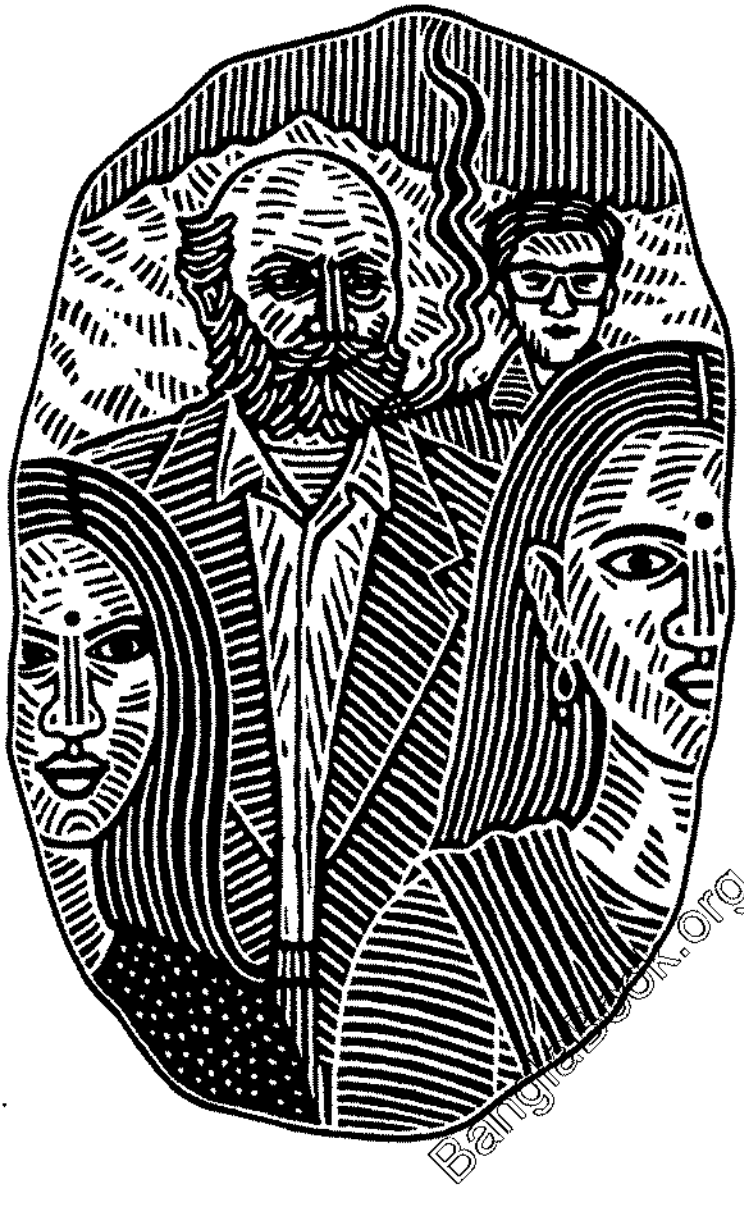

BanglaBook.org

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক ঃ ভূতের পাহাড়ে একটি সূর্যাস্ত

মে মাসের গরম আবহাওয়ায় যাঁরা জীবনধারণ অসহ্য মনে করেন, সময় ও টাকাকড়ি থাকলে তাঁদের পক্ষে বাগেশ্বরের চেয়ে ভালো জায়গা আর দুটি নেই। উত্তরপ্রদেশ ও নেপালের সীমান্তে এই তরাই অঞ্চলের পাহাড়ি জঙ্গল বসন্ত ও গ্রীষ্ম দুটি ঋতুতেই নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। বসন্তে গাছে-গাছে ও ঝোপেঝাড়ে যে অজস্র লাল ও হলুদ ফুল ফোটার পালা শুরু হয়, গ্রীষ্মের শেষ দিনটি অবধি তাতে বিরতি পড়ে না। যে দিকে চোখ যায়, স্থির শব্দহীন ওই উজ্জ্বল রঙের মেলা ভ্রমণবিলাসী ও শান্তিকামীদের মন ভরিয়ে দেয় অপার্থিব কী এক সুখের স্বাদে এবং তার সঙ্গে যখন দূর সমতলের উচ্চণ্ড আবহাওয়া সইতে না পেরে পালিয়ে আসা হাজার-হাজার পাখি প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা কোরাসে গান গাইতে থাকে, মনে পড়ে যায় প্রখ্যাত এক ফারসি কবির অতিখ্যাত একটি লাইন ঃ 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে—এখানে এবং এখানেই।'

সমুদ্রতল থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে আছে বলে বাগেশ্বরের আবহাওয়া এই গ্রীষ্মে খুবই শান্তিদায়ক। রাতের দিকে বরং একটু শীত-শীতই লাগে। বিশেষ করে রাত তিনটের পর হিমালয়ের তুষারে ঢাকা উত্তর অঞ্চল থেকে একটা হাওয়া আসে শেষরাতের অতিথির মতন, সূর্য না ওঠা অবধি সে বেশ খানিকটা দাপট দেখাতে থাকে এবং তখন গায়ে কম্বল না চড়ালে রক্ষে থাকে না।

বাগেশ্বরের আরেকটি বড় আকর্ষণ ধর্ম। বাগেশ্বর-শিবের একটি খুব পুরোনো মন্দির আছে এখানে। সারা ভারত থেকে লক্ষ তীর্থযাত্রী বছরের একটি সময়ে এখানে এসে ভিড় জমান। সে সময়টা হল চৈত্রের শিবচতুর্দশী তিথি। তারপর কিছুদিন বাগেশ্বর চুপচাপ অনাথ পড়ে থাকে। স্থায়ী ছোট্ট বাজারটা আবার ফাঁকা-ফাঁকা দেখায়। কিছু সরকারি আপিস, কোয়ার্টার, একটা স্বাস্থ্যনিবাস, তিনটে ছোটবড় হোটেল আর ত্রিশ-বত্রিশটি বেসরকারি বাড়ি মিলে অল্পস্বল্প জীবনযাত্রার যা ভিড় ও চাঞ্চল্য, তা বিশাল আকাশ ও পরিব্যাপ্ত অরণ্যভূমিতে খুব একটা তরঙ্গ তুলতে পারে না।

তারপর গ্রীষ্মে আস্তে-আস্তে কিছু ভ্রমণবিলাসীর ভিড় দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা অনেকেই টাকাকড়িওয়ালা মানুষ। কারণ এখানে জিনিসপত্রের দাম বড্ড চড়া। হোটেলভাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এর একমাত্র কারণ বাগেশ্বরের ইউরোপীয় ঐতিহ্য—যা ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি। শিবমন্দির এলাকায় ধর্মশালা অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দাপট বেশি। আর, সারা ভারতে এটা বরাবর লক্ষ করার মতন ব্যাপার যে একমাত্র বাঙালিই সম্পূর্ণ ধর্মছাড়া কারণে অর্থাৎ নিছক ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যলিপ্সায় ঘরের বাইরে পা বাড়ায় এবং বাগেশ্বর কেন, এজন্যে আরও দুর্গম জায়গায় যেতে তার আপত্তি নেই। অন্য প্রদেশবাসীরা এরকম ধর্মহীন বা অর্থোপার্জনবর্জিত ভ্রমণের সচরাচর পক্ষপাতী নন। বাঙালি মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এটাই।

বাগেশ্বরের পূর্বপ্রান্তে বয়ে চলেছে সারদানদী, ওপারে নেপাল। উত্তরদিকটা খুবই দুর্গম, খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল নেমে গেছে ভয়ংকর খাদে, তারপর শুরু হয়েছে ঢেউখেলানো পাহাড় ও বনাঞ্চল, দূরে তুষারঢাকা পাহাড়গুলো পর্যন্ত বিস্তৃত। বাকি পশ্চিম ও দক্ষিণেও তেমনি পাহাড় ও জঙ্গল আছে—কিন্তু অনেক রাস্তাঘাট ও মাঝে-মাঝে উপত্যকা থাকায় দুর্গম নয়। এইসব রাস্তায় এখন বাস চলাচল করে নিয়মিত। কোথাও পাহাড়ি নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, কোথাও সেনানিবাস ও সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু কয়েক-শো বর্গমাইল পাহাড় জঙ্গলের পরিবেশে এসব মানুষোচিত স্পন্দন খুবই নগণ্য। এখনও প্রকৃতির দাপটই এখানে বেশিমাত্রায় প্রকট। আদিমতার বিস্তীর্ণ অন্ধকারময় সমারোহে ইলেকট্রিক বাল্বগুলো জোনাকির চেয়েও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে কোনও উজ্জ্বল সাদা বা হলুদ বাড়িও মনে হয় এই আদিমতার একটি অদ্ভুত ধরনের অংশ ছাড়া কিছু নয়।

BanglaBook.org

আমার বৃদ্ধ সঙ্গী এবং বন্ধুটি, যাঁর নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, একজন খাঁটি প্রকৃতিবিদ। বাইনোকুলার ও আশ্চর্য একটি ক্যামেরা সবসময় তাঁর কাছে থাকে। নানা জাতের পাখি দেখা ও নোট করে যাওয়া তাঁর হবি। এক বিকেলে যখন আমরা 'গ্রিন ভিউ' হোটেল থেকে বেরিয়ে টনকপুর রোডে ঘুরছি, ডানদিকের লাগোয়া পাহাড়ের চুড়োয় পুতুল-পুতুল দুটি মেয়ের মূর্তি দেখতে-দেখতে তিনি বললেন—বুঝলে জয়ন্ত, এই হচ্ছে বাঙালির মানসিক বৈশিষ্ট্য। ওই যে মেয়ে দুটিকে দেখছ, বাইনোকুলার ছাড়াও এই বুড়ো চোখে দেখে আমি বলতে পারি—ওঁরা সেই বঙ্গললনাদ্বয়। ওঁরা এখন সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু দেখছেন না এবং নিছক সৌন্দর্যের খাতিরেই সবরকম বিপদ-আপদের তোয়াক্কা না করে অকুতোভয়ে এই ভূতের পাহাড়ে উঠে গেছেন।

বুড়োর ধারণা কখনও মিথ্যা হতে দেখিনি। তবু ব্যাপারটা বেশ অবাক লাগল। এখানে আসার পরই শুনে আসছি যে ওটা ভূতের পাহাড় নামে কুখ্যাত এবং পারতপক্ষে ওটাতে কেউ ওঠে না। অথচ এখন এই শেষবেলায় দুটি মেয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? বাঙালি যতই সৌন্দর্যের পূজারী হোক, ভূতের ব্যাপারে সে আফ্রিকার আদিমতম গোষ্ঠীর চেয়ে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই—এটা অস্বীকার করবে কোন মূর্খ?

কর্নেলের কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রাখলুম। অমনি চমকে উঠলুম। চিনতে একটুও ভুল হল না। আরে, এঁরা তো আমাদের পাশের স্যুটেই গতকাল এসে উঠেছেন। অল্পস্বল্প আলাপও হয়েছে পরস্পর—তবে সেটা এই বুড়োর দৌলতে। ইনি যেখানে যান, আলাপ জমাতে তো দেরি করেন না—তা সে যে শ্রেণির লোক হোক না কেন।

বাইনোকুলারটা নামিয়ে রেখে বললুম—মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান, আপনি কি পূর্বজন্মে পক্ষিবিশেষ ছিলেন, যারা এক মাইল ওপর থেকেও পৃথিবীতে প্রাণীর নিস্পন্দ দেহ দেখতে পায়?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি আমাকে শকুন বলতে চাও, জয়ন্ত?

—তা ছাড়া কী বলব?...বলে কপট গাম্ভীর্যে বাইনোকুলারটা ফিরিয়ে দিলুম ওঁর হাতে।—ওঃ। এইসব দিব্যদৃষ্টির অধিকারীদের কাছাকাছি থাকতেও বড্ড ভয় করে। মানুষের মনের ভেতরও তাঁদের দৃষ্টি হানা দিতে পারে বইকী!

—পারে।...কর্নেলের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হল।—যেমন, এ মুহূর্তে শ্রীমান জয়ন্তের চিত্তচাঞ্চল্য আমি স্পষ্ট অবলোকন করতে পারছি। সে এই পক্ককেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট বুড়োকে ছেড়ে ভূতের পাহাড়ে উঠে যেতে চাইছে। তার তর সইছে না তো, আমার আপত্তি নেই, জয়ন্ত। চলে যাও। ওঁদের সঙ্গ দিয়ে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এসো। আর, দেখ জয়ন্ত, প্রকৃতির মধ্যে মানুষ একা গিয়ে পড়লেই নিঃসঙ্গ বোধ করে—সে হাঁপিয়ে ওঠে। কারণ আদিম সময় থেকেই মানুষ যূথবদ্ধ প্রাণী হয়ে বেঁচে আসছে। এই লক্ষ-লক্ষ বছরের অভ্যাস তার দেহের কোষে-কোষে—ক্রোমোসোমে অর্থাৎ জিনপুঞ্জে ডি এন এ অণুর মধ্যে রয়ে গেছে।

হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলুম—প্লিজ কর্নেল, প্লিজ। জেনেটিকস নিয়ে লেকচার শুরু করলে এই চমৎকার বিকেলটার কী পরিণতি ঘটবে, ভেবে আমি শিউরে উঠছি। তার চেয়ে দয়া করে চলুন, আজ আমরা দুজনেই ওই ভূতের পাহাড়ে উঠে যাই। তা ছাড়া, হে ধুরন্ধর প্রোয়েন্দা মহোদয়, পাহাড়ের ভূতঘটিত রহস্যও তো আপনার এবারকার ভ্রমণের সূত্রে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হতে পারে।

কর্নেল একবার বাঁ-দিকের রাস্তার ওধারে দক্ষিণের ঢাল ছেয়ে যাওয়া জঙ্গল ও উপত্যকায় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক দেখে নিয়ে বললেন—কিছু অসম্ভব নয়, জয়ন্ত। এটা আমার ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য বলতে পারো, যেখানে যাই, তোমাদের হিন্দু দেবতা নরদের টেকির মতন একটা-না-একটা ডেড-বডি আমার বাহন হয়ে ওঠে। হরিবল্ জয়ন্ত, হরিবল্। যেন এক ইটারনাল মার্ডারার আমার পিছনে সবসময় ওত পেতে ঘুরছে।

কর্নেলের মুখে আচমকা একথা বেরোতে শুনে আমার যেমন অবাক লাগল, তেমনি অজানা

আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। কেন একথা বলছেন কর্নেল? এখানে এসে তেমন কি কোনও ভয়ংকর ঘটনার আভাস পেয়েছেন?

আরও আড়ষ্ট হয়ে দেখলুম, বুকে উনি ক্রস আঁকলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম—হঠাৎ এসব কেন কর্নেল?

—ও কিছু না। ভূতের খাতিরে। যেখানে ভূত, সেখানেই মৃত্যুর গন্ধ। চলো জয়ন্ত, অবশেষে তা হলে আমরা ভূতের পাহাড়েই যাই। কিন্তু সাবধান বৎস, শ্যামলী ও জয়ন্তীর সঙ্গে কখনও প্রেম জমাতে চেষ্টা করবে না—কারণ তোমার ফিয়াসে বেচারি চন্দ্রাণীর কাছে তোমার দায়দায়িত্ব আমাকে বুঝে নিতে হয়েছে। ফিরে গিয়ে তোমার সম্পর্কে একটা সার্টিফিকেট আমার কাছে না পেলে সে সংশয়ে ভুগবে।

হো-হো করে হেসে উঠলুম ওঁর কথাব ভঙ্গিতে। তারপর 'আই অ্যাসিওর ইউ, ওল্ড ওয়াচডগ' বলে ওঁর একটা হাত নিলুম এবং ভূতের পাহাড়ে চড়া শুরু হল।

আমার প্রাজ্ঞ সঙ্গীর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। তবু মাঝে-মাঝে ওঁর শারীরিক ক্ষমতা দেখে তাক লেগে যায়। এই বত্রিশেই আমার কয়েকশো ফুট খাড়াই ভাঙতে হাঁফ ধরে যাচ্ছিল, আর উনি পাহাড়ি বাঘের মতন অনায়াসসাধ্য ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় সবসময় অনেকটা করে এগিয়ে রয়েছেন। এখন যদি প্রশ্ন করি তা হলে উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা রণাঙ্গনের কোন-কোন পাহাড়ে উঠেছিলেন, তার বর্ণনা শুরু করবেন। সর্বক্ষেত্রে ওই একটি বাক্যই তাঁর মূলধন : বাছা জয়ন্ত, কথাটা হচ্ছে 'অতীত অভিজ্ঞতা।' তবে কিনা এ জিনিসটা সব মানুষেরই আছে। স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ তা অর্জন করে। কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে পারে কজন? যে পারে, তাকেই আমরা সবখানে জিতে যেতে দেখি। এখন, আমার কথা উঠলে বলব যে, আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রতিটি ব্যাপারেই সাধ্যমতো অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি।

ওঁর এ স্বভাবটাও আমার এতদিনের জানা হয়ে গেছে যে কর্নেল বলে ডাকলে উনি খুবই খুশি হন। পদবিটা ওঁর সামরিক জীবনের স্মারক। কিন্তু মজার কথা, যোদ্ধা হিসেবে উনি কত বড় ছিলেন জানি না, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার বা গোয়েন্দা হিসেবে ওঁর কুশলতার কোনও তুলনা নেই। এটা ওঁর বর্তমান পেশা নয় মোটেও। নিছক হবি—বিরল জাতের পাখি খুঁজে বের করার হবির মতনই এটা খেয়ালি ঝোঁক। এজন্যে একটি পয়সাও কারও কাছে উনি দাবি করেন না।

যাই হোক, ভূতের পাহাড়ের দক্ষিণ কাঁধ দিয়ে দূর উপত্যকার ওদিক থেকে পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর এসে পড়ে ওঁর মুখটা জ্বলজ্বল করছিল। খানিকটা ঝোপঝাড়ে ভরা খাড়াই অনেক কষ্টে ভেঙে এবার আমরা বেশ ঢালু ঘাসের জমি পেয়ে গেলাম। জমিটায় বড়-বড় পাথর ছড়ানো। তার ডাইনে অর্থাৎ উত্তরে ঘন গাছপালার জঙ্গল। ঢালুটা পেরিয়ে সোজাসুজি চুড়োয় ওঠা অসম্ভব—সামনে একটা গ্রানাইট দেওয়াল রয়েছে। তাই আমাদের ডাইনের জঙ্গলে ঢুকতে হল। এখানে ঢোকার পর আমরা শ্যামলী ও জয়ন্তীকে আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। গাছের আড়াল দৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছিল।

কর্নেল এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কান পেতে কিছু শুনে বললেন—কাছাকাছি ওপিঠে কোথায় একটা ঝরনা আছে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় সাধারণ ঝরনা নয়, পাতাল জলের ধারা। অর্থাৎ যাকে বলে প্রস্রবণ। এনি ওয়ে। জয়ন্ত, সম্ভবত, ওই ঝরনার জল স্বাস্থ্যকর। ফেরার পথে সময় থাকলে একবাব ওদিকটা ঘুরে যাব। আমার কাছে একটা হ্যাভারস্যাক রয়েছে। কিছু জল নিয়ে যাব।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—হুম। তুমি অধৈর্য হয়ে পড়েছ। চলো, এখন আমরা চুড়োর ওদিকেই যাই।

ক্লান্তির জন্যে পরিহাসটা গায়ে মাখলুম না। তা ছাড়া ইতিমধ্যে আমি এক অদ্ভুত ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। এই পাহাড়টার নাম ভূতের পাহাড় কেন? শনশন করে হাওয়া বইছিল

BanglaBook.org

আর নির্জন পাহাড়ি জঙ্গল জুড়ে কী যেন ধুন্ধুমার অদৃশ্য উপদ্রব চলছিল, ঠিক বোঝাতে পারব না এই অনুভূতিটা—মনে হচ্ছিল, জীবিতদের আবির্ভাবে যুগ-যুগান্তের বাসিন্দা অশুভ আত্মারা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম, এলাকার অন্যসব পাহাড় ও জঙ্গলের মতন এখানে কোনও গাছেই ফুল নেই, এখানে কোথাও কোনও পাখিও নেই। সচরাচর পাহাড়ি এলাকায় যে গিরগিটিজাতীয় প্রাণী সবসময় চোখে পড়ে, তারাও এখানে নেই। তখন আরও সচেতন দৃষ্টিতে পরখ করতে থাকলুম এবং টের পেলুম যে এক উদ্ভিদ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পার্থিব প্রাণী যেন এখানকার বাসিন্দা নয়। এ যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

পথ বলতে কিছু নেই। আন্দাজ করে এগোতে হচ্ছিল। জঙ্গলের পর বড়-বড় পাথরের টুকরো পেরিয়ে যেতেই আমরা ৪৫ ডিগ্রি কোণ বরাবর উঁচুতে ফের মেয়ে-দুটিকে দেখতে পেলুম। ওদের কথা কিছুক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম যেন। এখন দেখামাত্রই দ্বিতীয় এক বিস্ময় জাগল। এরকম কষ্টসাধ্য চড়াই ভেঙে ও জঙ্গল ঠেঙিয়ে এই নির্জন কুখ্যাত পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ওঠার ক্ষমতা ও সাহস ওরা পেল কোথায়? বিশেষ করে, দুটি বাঙালি মেয়ে ওরা—বয়েস বড়জোর পঁচিশের মধ্যেই। কোনও পুরুষ সঙ্গী নেই। মেমসায়েব হলে অবাক হতুম না নিশ্চয়। তাই কথাটা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেলকে বললুম—হ্যাল্লো ওল্ড ম্যান, নীচে থেকে যা ভেবেছিলুম, পাহাড়টা অত সাদাসিধে গোবেচারা নয় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু। এমন ঘোরপ্যাঁচওয়ালা জায়গায়, স্ত্রীলোক পা বাড়ান কোন সাহসে? বাপ্‌স। আমারই তো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—জয়ন্ত, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তবে শ্রীমতীদের তুমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। ওরা দুটিতেই কিন্তু এক মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যা। গতবছর এমনি জুনে যে মহিলা অভিযাত্রীরা মানালিতে চড়েছিলেন, শ্যামলী ও জয়ন্তী সে-দলে ছিল।

এতক্ষণে সব টের পেয়ে গেলুম।—তাই বলুন। কিন্তু আশ্চর্য, এরই মধ্যে ওদের নাড়ীনক্ষত্র আপনার জানা হয়ে গেছে দেখছি!

কর্নেল একটা শুকনো বেঁটে হলুদ গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা মোটা-মোটা একগুচ্ছ লতা আঁকড়ে ধরে একটা পাথরে উঠলেন। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—চলে এসো।

এবার আমরা চূড়োর সীমানায় এসে গেছি। চূড়োটা হাতির পিঠের মতো দেখতে—লম্বায় বড় জোর বিশ গজ, চওড়ায় তার আদ্ধেক। কোথাও টাকের মতো নগ্ন পাথর রয়েছে, কোথাও শুকনো ঘাস। ততক্ষণে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। দুজনেই এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখে চাপা হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। প্রচণ্ড বাতাসে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। দেখে তাক লেগে গেল আমার। কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন—কনগ্রাচুলেশান গার্লস।

দুজনেই হাত নেড়ে বলল—কনগ্রাচুলেশান কর্নেল।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় একটা বড় পাথর চূড়ো থেকে বেরিয়ে ছিল চাঁতালের মতন। তার ওপর গিয়ে বসে পড়লুম সবাই। কর্নেল আরামে বসে চুরুট বের করলেন। ওরা বাতাস বাঁচিয়ে সেটা জ্বালতে সাহায্য করল। এ বুড়োর সঙ্গে তরুণীদের কীভাবে অত খাতির জমে যায়, আজও আমার কাছে রহস্য।

শ্যামলীর হালকা ছিপছিপে গড়ন, মুখটা কিছু লম্বাটে, ডিমালো গাল ও সুচলো চিবুক। ওর চোখদুটোয় এক ধরনের নির্লিপ্ততা বা ঔদাসীন্যের ভাব আছে। খুব পাতলা ঠোঁট—তাই একটুখানি হাসিও জোরালো হয়ে ফোটে। আর জয়ন্তী ওর চেয়ে খানিকটা স্বাস্থ্যবতী অর্থাৎ অল্পস্বল্প মুটকি বলা যায়—অতটা ফরসাও নয়, চাপা রং। মুখটা ভারী ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, পুরু ভুরু, দৃষ্টিতে তীব্রতা আছে। ভরাট গাল, অর্ধবৃত্তাকার চোয়াল। তার গ্রীবা ও বাহুদুটোয় শক্তির আভাস মেলে। দুজনেই মোটামুটি সুন্দরী এবং পতঙ্গ আকর্ষণের মতন দীপ্তিময়ী।

শ্যামলী বলল, আজ কতগুলো পাখির ছবি নিলেন কর্নেল?

BanglaBook.org

কর্নেল হাসলেন।—এ বেলা ক্যামেরাকে সে সুযোগ দিলুম কই? আমার তরুণ বন্ধুটি হঠাৎ তোমাদের আবিষ্কার করে খুব ধাঁধায় পড়ে গেলেন—যার ফলে...।

ব্যস্ত হয়ে কপট রাগে গর্জালুম—শাট আপ ওল্ড ম্যান। মোটেও তা ঘটেনি।

শ্যামলী ও জয়ন্তী হেসে উঠল। কর্নেল অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললেন, তা হলে আমারই বোঝবার ভুল। যাই হোক, এই পাহাড়টা নাকি কুখ্যাত। এখানে অজস্র ভূতের আড্ডা। তাই কারও মনে ধাঁধা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বইকী।

জয়ন্তী বলল, ব্যাপারটা কী হয়েছে, তা হলে বলি কর্নেল।...

তাকে বাধা দিয়ে শ্যামলী বলল, দেখো জয়া, তোমার ওসব আজেবাজে কুসংস্কারের ঢাকঢোল আর না পেটালেও চলবে।

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে বলল, কিন্তু তুমিই তো বললে যে...।

শ্যামলী রেগে গেল।—কী বললুম? বললুম যে ভূত দেখেছি—তুমিও দেখবে এসো?

জয়ন্তী বলল, ওভাবে বলোনি। স্বপ্নে দেখেছ বললে।

শ্যামলী বলল, হ্যাঁ, স্বপ্ন। নিছক দিবাস্বপ্ন। তবে সেজন্যেই কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছিলুম?

জয়ন্তী বলল—না, তা আননি। বললে, এখান থেকে সূর্যাস্ত নাকি খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু যাই বলো, তোমার আসল মতলব ছিল—স্বপ্নের ব্যাপারটা সত্যি কি না দেখতে আসা।

—হ্যাঁ, তুমি মনের লেখা পড়তে ওস্তাদ!

—কিছুটা। দেখ, আমাকে লুকিয়ে পার পাবে না। এখানে ওঠার পর সবসময় লক্ষ রেখেছি, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন খুঁজছ। আমি দিব্যি তখন টের পেয়ে গেলুম যে আসলে তুমি স্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়েই কৌতূহলী এবং সূর্যাস্ত দেখার ছলে এনকোয়ারি করতে এসেছ। আর এ তো তোমার বরাবরকার স্বভাব। কেন? সেবার মুক্তেশ্বরের ওদিকে রাতদুপুরে বাংলোর পিছনে কীসের শব্দ শুনে ওই কনকনে ঠান্ডায় বেরিয়ে পড়তে আমাকে সাধাসাধি করেছিলে। অথচ বললুম—ঘুমের ঘোরে যা শোনার শুনেছ, ওটা সত্যি নয়। তোমার এই নাকগলানো অভ্যেস দেখে মনে হয়—গত জন্মে নিশ্চয় তুমি পুলিশের গোয়েন্দা-টোয়েন্দা ছিলে। বাগেশ্বরে এসে স্বপ্নে দেখবে একটা আস্ত জ্যান্ত মড়া—সেটা আবার এই ভূতের পাহাড়েই ডিগবাজি খেয়ে বেড়াবে, কী অদ্ভুত ব্যাপার!

আমরা দুজনে চুপচাপ ও হাঁ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম এতক্ষণ। দুটি স্ত্রীলোকের সংলাপ, তর্কাতর্কি, ভাবভঙ্গি বরাবর আমার কাছে জটিল হেঁয়ালি এবং দুর্বোধ্য। স্ত্রীলোক যে অপার রহস্যের আগার, তাতে কোনও ভুল নেই। দুজন জলজ্যান্ত পুরুষের সামনে এতক্ষণ ওরা যেসব নিয়ে কথা বলল, তা যত অদ্ভুত বা খাপছাড়া শোনাক—এটাই সম্ভবত স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক রীতিনীতি। আমি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সিগারেট ধরালুম। সূর্যাস্ত দেখতে থাকলুম।

এবার কর্নেল বললেন—বাই জোভ! স্বপ্নে জ্যান্ত মড়া! সে কী!

জয়ন্তী মুখ টিপে হেসে বলল—দিবাস্বপ্ন। তাও আবার গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন কর্নেল, বহু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যেতে পারে। কিন্তু শ্যামলীর ব্যাপারটা আলাদা। ওই যে বললুম, সবতাতে নাক-গলানো ওর চাই-ই। আবার বলে কী জানেন? ওর নাকি একটা সিক্সথ সেন্স আছে। ওই সিক্সথ সেন্সের জ্বালায় যে পড়েছে, সেই জানে পরিস্থিতিটা কদ্দুর গড়ায়। ইতিমধ্যে আপনারা না এসে পড়লে ও নির্ঘাত সারা পাহাড় খোঁজাখুঁজি করে বেড়াবার জন্যে আমাকে সাধাসাধি করত। ওকে সামলানো আমার পক্ষে এত কঠিন হয়ে পড়ে সময়-সময়।

শ্যামলী মুখ গম্ভীর করে বসে ছিল। ওর কথা শোনার পর বলল—থাক, আর গার্জেনগিরি ফলাতে হবে না।

আমার মনে হল চেহারা দেখে শ্যামলীকে খুব জেদোড়বাজ সরল মেয়ে মনে হলেও আদতে

BanglaBook.org

ও তার উলটো। বেশ চাপা ধরনের মেয়ে। এই চেপে রাখার প্রবণতার জন্যেই সম্ভবত ওর সুন্দর টানাটানা চোখ দুটোকে নির্লিপ্ত বা উদাসীন দেখায়।

তা কর্নেল বুড়োও আবার সবতাতে নাকগলানোর জন্যে প্রসিদ্ধ। ওঁর মুখে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করলুম এবার। বললেন—হুম! তা হলে জয়ন্তী, তুমি বলতে চাইছ যে আজ দুপুরে হোটেলে তোমরা দুপুরবেলা দুটিতে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ। তারপর ঘুম ভেঙে উঠে শ্যামলী তোমাকে বলেছে, স্বপ্নে এই ভূতের পাহাড়ে একটা জ্যান্ত মড়া ডিগবাজি খাচ্ছিল। তারপর বলেছে, পাহাড়টায় চড়ে সূর্যাস্ত দেখা যেতে পারে। এবং তোমরা শেষ অব্দি বেরিয়ে পড়েছ, চড়েছ, তারপর তোমার ধারণা হয়েছে যে আসলে শ্যামলী তার স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করতেই এখানে এসে হানা দিয়েছে। এই তো?

জয়ন্তী সোৎসাহে মাথা দুলিয়ে বলল—হুবহু ঠিক। কর্নেল! সত্যি আপনার দক্ষতা আছে রিপোর্টিংয়ে।

কর্নেল আমাকে দেখিয়ে বললেন—কিন্তু হিয়ার ইজ এ রিয়্যাল রিপোর্টার। আশা করি, তোমাদের মনে আছে সেকথা। দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী সামনাসামনি থাকতে, মাই ডিয়ার গার্ল, আমাকে ওই প্রশংসাটা দিও না। জয়ন্ত মনে-মনে তোমার মাথা কাটবে।

জয়ন্তী আমার দিকে কটাক্ষ করল।—উনিই যে তিনি তার প্রমাণ তো শুধু আপনার মুখের কথা। তাই বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু ওঁকে আমার মোটেও সেরকম মনে হচ্ছে না, কর্নেল!

কর্নেল বললেন, কেন, কেন?

জয়ন্তী ফিক করে হাসল।—রিপোর্টাররা সবসময় কৌতূহলী হবেন। সবসময় পেছনে লেগে থাকবেন। প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারবেন। আরও স্মার্ট হবেন। কিন্তু আপনার ভদ্রলোক দেখছি, নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। কথাই বলতে পারে না। চুপচাপ, ভীতু-ভীতু মুখ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন খালি।

শ্যামলী ধমকাল, তুমি বড্ড বাচাল, জয়া। এবার আমাকে ছেড়ে ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লে? নিজেকে কি তুমি ভি আই পি মনে করো? ভি আই পি হলে নিশ্চয় জয়ন্তবাবু তোমার পিছনে লেগে থাকতেন—তুমিও খুব প্লিজড হতে।

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। বললেন—জয়ন্ত আসলে এবার মনমরা হয়ে আছে। পাহাড়-জঙ্গল এসব প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন সুযোগ্য যুবকের পাশে একজন যুবতীকেই মানায়। তার বদলে এক বাহাত্তুরে ওল্ড ফুল?

জয়ন্তী সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, আহা! সে-ও কথা! জয়ন্তবাবু আর মন খারাপ করে থাকবেন না। আমরা আপনাকে সঙ্গ দেব। রাজি তো?

টের পেলুম, মেয়েটি সত্যি বাচাল এবং যেন একটু পুরুষালি টাইপের। অথচ ওর মুখে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ বেশ প্রখর। অধ্যাপিকা কিংবা দিদিমণিসুলভ গাম্ভীর্যের রেখা প্রকট হয়ে আছে। তাই বেশি কথা বললেও বেশ মানিয়ে যায়। শুধু বললুম, প্রস্তাবটা ভেবে দেখব।

জয়ন্তী খিলখিল করে হেসে উঠল। এই সময় লক্ষ করলুম, শ্যামলী কিন্তু বরাবর কেমন গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। মনে কী যেন চাপা চাঞ্চল্য আছে, তা দমিয়ে রাখার যত্ন ও কষ্ট ওর মুখে ছাপ ফেলেছে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে অনেকে নাকি এরকম নার্ভাস হয়ে পড়ে। আমার এক বন্ধু তার ফিয়াসের মৃত্যু দেখেছিল স্বপ্নে, মেয়েটি থাকে বোম্বেতে—সে ক'দিন ধরে এমন উত্যক্ত হল যে অবশেষে বোম্বে মেলের টিকিট কেটে বসতে বাধ্য হল। তবে সে তো প্রেমজ অস্বস্তির ব্যাপার। শ্যামলী কার মড়া দেখল স্বপ্নে, জানতে ইচ্ছে করছিল।

কথাটা বলেই ফেললুম, বাই দ্য বাই, স্বপ্নে যার মৃত্যু দেখা যায়, তার নাকি আয়ু বাড়ে।

BanglaBook.org

শ্রীমতী শ্যামলী নিশ্চয় কোনও আত্মীয়ের মৃতদেহ দেখে থাকবেন। কারণ আমরা স্বপ্নে সাধারণত প্রিয়জনকেই মরতে দেখি।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম গায়ে সম্ভবত পাখি খুঁজছিলেন। অন্যমনস্কভাবে শুধু বললেন, রাইট, দ্যাটস রাইট।

জয়ন্তী বলল, মাই গুডনেস! হ্যাঁরে শ্যামলী, কার মড়া দেখেছিস তা তো বলিসনি?

শ্যামলী বাঁকা ঠোঁটে বলল, ওসব ছাড়ো তো বাবা। এককথা নিয়ে ভ্যাজর-ভ্যাজর ভালো লাগে না। ওই দেখ, দিনমণি এবার ডুব দিলেন।

আমরা এবার সূর্যাস্তের দিকে ঘুরে বসলুম। অপূর্ব, অপূর্ব! দূর উপত্যকার ওদিকে পর্বতশ্রেণীর মাথায় একটা বিশাল লাল গোলক আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। চারদিকে হালকা গোলাপ, হলুদ, সবুজ, নীল, সোনালি এক ব্যাপক বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছে দীর্ঘ সব তুলির টানের মতন জ্যামিতিক সরলরেখায়, দিগন্তকে দেখাচ্ছে অলৌকিক শক্তিমান এক মহান সাধু। শবের মতন নিস্পন্দ শুয়ে আছেন তিনি, যেন স্বয়ং মহাকাল।

গ্রিন ভিউ হোটেলের দিকে যে প্রাইভেট রাস্তা উঠে গেছে, তার শুরুতে বড় সরকারি রাস্তার বাঁক। বাঁকের মুখে ডান হাতে অর্থাৎ দক্ষিণে কয়েক একর সমতল জমির ওপর একটা মোটামুটি বড় বাড়ি। বাড়িটা অবশ্য একতলা। পুরোনো ধাঁচের এইসব বাড়ি এখানে অনেক রয়েছে। কাঠ ও কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে প্রাঙ্গণটা ঘেরা। ফুলবাগিচা আর দেশি-বিদেশি অনেক গাছ আছে। সবুজ ঝকঝকে লনে চেয়ার-টেবিল পেতে কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বসে আছেন দেখলুম। গেটে বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি আছে। এখান অবধি এসেই কর্নেল বললেন, যদি আপত্তি না থাকে, আমি জয়ন্তী ও শ্যামলীকেই বিশেষভাবে বলছি, বাগেশ্বরের এক মহীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই। উনি ভীষণ খুশি হবেন। অন্যপক্ষে তোমরাও খুব খুশি তো হবেই—উপরন্তু একটি আশ্চর্য চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হবে। রিয়েলি, মিসেস মালহোত্রার কোনও তুলনা হয় না। এমন মিশুকে মহিলা আজকাল দুর্লভ।

জয়ন্তী উৎসাহ দেখাল। কিন্তু শ্যামলী বলল, আজ থাক। বরং আরেক সময় আসা যাবে।

জয়ন্তী ওর হাত ধরে টানল।—আয় না বাবা! এখানে ঘুরতেই তো এসেছি! প্রবাসে নিয়মটিয়ম কেউ মানে নাকি! বলা যায় না, নতুন চেনাজানা থেকে অনেক সময় অনেক কিছু মিলে যায়।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় এক প্রৌঢ়া মহিলাকে দেখলুম চেয়ার ছেড়ে হনহন করে গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন হাসিমুখে। কর্নেল আগে থেকেই হাত নাড়তে লাগলেন এবং চাপাস্বরে বললেন—মিসেস মালহোত্রা।

ইনি যে যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, তার ছাপ এখনও মুছে যায়নি। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখার মতন চেহারা। কর্নেলকে ইংরেজিতে বলে উঠলেন, হ্যালো, হ্যালো! আসুন, আসুন! আপনারই অপেক্ষা করছি আমরা। ডঃ পট্টনায়ক তো অস্থির এদিকে—যা খেয়ালি মানুষ আপনি। বলা যায় না, কোথায় জঙ্গলে গিয়ে ওত পেতে বসে রয়েছেন।

তারপর আমাদের দিকে ঘুরে অত্যন্ত অমায়িক হেসে বললেন, কী কাণ্ড! এইসব কচি-কচি ছেলেমেয়ে নিশ্চয় কর্নেলসায়েবের পাল্লায় পড়ে হয়রান হয়েছে!

কর্নেল আমাদের সস্নেহে দেখে নিয়ে বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস সরোজিনী মালহোত্রা একসময় নৈনিতাল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। এখন পাকাপাকিভাবে বাগেশ্বরের বাসিন্দা। আর এ হচ্ছে শ্যামলী সেন, ওর বন্ধু জয়ন্তী রায়—দুজনেই সেরা পাহাড়-চড়িয়ে। মানালি

BanglaBook.org

অভিযানে ছিল। এ জয়ন্ত চৌধুরী—কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার, প্রখ্যাত ব্যক্তি এখন।

মিসেস মালহোত্রা এসে শ্যামলী ও জয়ন্তীকে জড়িয়ে ধরলেন দু-হাতে। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন—চলে আসুন, চলে আসুন! ওঃ, আমার কী সৌভাগ্য আজ! খুব জমে যাবে আসর! কর্নেল, আপনার কোনও তুলনা হয় না।

ধাড়ি মুরগি যেমন ছানা নিয়ে এগোয়, আমাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিসেস মালহোত্রা।

লনে অনেকগুলো খালি চেয়ার ছিল। আমরা বসে পড়লুম। মিসেস মালহোত্রা ছোটাছুটি করে বেড়াতে থাকলেন ব্যস্তভাবে। একজন লোক একটা ট্রেতে সাজিয়ে কোকাকোলার বোতল নিয়ে এল।

ততক্ষণে অন্ধকার সবে জমে উঠছে। বাড়ির সামনে বাতিটি জ্বলে উঠল। এবার মিসেস মালহোত্রা পরিচয় করাতে থাকলেন।—ইনি মিঃ অরিন্দম দ্বিবেদী—ইতিহাসের অধ্যাপক. থাকেন দিল্লিতে। ইনি মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল—রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার, এখন জয়পুরের বাসিন্দা। আর ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ফোরেনসিক এক্সপার্ট ডঃ সতীনাথ পট্টনায়ক—ওড়িশার লোক, এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোরেনসিক বিভাগের লেকচারার। এখন আসতে বাকি রইলেন মিঃ মোহন পারেখ—বোম্বের বিখ্যাত ফিল্ম গায়ক। এবার আমার নবাগত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেবেন স্বনামধন্য কর্নেল এন সরকার।

কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলারা' সম্বোধন করার পর পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের তিনজনের সম্পর্কে গালভরা কিছু বাক্য বলে বসে পড়লেন।

তারপর উঠলেন ফের মিসেস মালহোত্রা।—ফ্রেন্ডস! আজকের আসরের প্রোগ্রাম আবার ঘোষণা করতে অনুমতি দিন। একটু পরেই আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করব। হ্যাঁ—আমাদের আজকের প্রোগ্রাম মিডিয়ামের মধ্যে অশরীরী আত্মা আনা। চমৎকার প্রোগ্রাম এবং রোমাঞ্চকর। তাই নয়?

কে জানে কেন, আমি শিউরে উঠলুম। চারপাশে সমর্থনসূচক সাড়া পড়ে গেল। কর্নেল প্রশংসা করে বললেন, ওয়ান্ডারফুল! মিসেস মালহোত্রার নতুনত্বের তুলনা হয় না!

তারপর একটুখানি নীরবতা জাগল। সেই সময় শুনলুম, আমার পাশ থেকে শ্যামলী ফিসফিস করে জয়ন্তীকে বলছে, তুই এসব বিশ্বাস করিস?

জয়ন্তী বলছে, নিশ্চয় করি।

—আমি করি না। সব ধাপ্পা। মিডিয়ামরা ধাপ্পা দেয়!

—বেশ তো! তুই মিডিয়াম হয়ে দেখ না। পারবি?

—নিশ্চয় পারব!—বলে শ্যামলী হাসল একটু। ফের বলল, মিডিয়াম ওদের নিশ্চয় ঠিক করা আছে। যে-সে নাকি মিডিয়াম হতেই পারে না। ওটাই তো চালাকি রে!

—চালাকি? বেশ—ওঁদের বলছি, তোকেই মিডিয়াম করে দেন।

—বলে দেখ। রাজি হবে না।

কর্নেল হঠাৎ ঘুরে বললেন, ইয়ে মিসেস মালহোত্রা, মিডিয়াম কে হচ্ছেন?

মিসেস মালহোত্রা ঘড়ি দেখে বললেন, আইডিয়াটা মিঃ পারেখের। উনিই তো মিডিয়াম হবেন বলেছিলেন। এখনও এসে পৌঁছলেন না—আশ্চর্য তো!

এবার শ্যামলী মুখ ফুটে বলে ফেলল, মিসেস মালহোত্রা, আমি মিডিয়াম হতে রাজি আছি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস মালহোত্রা কী যেন দেখলেন। তারপর সস্নেহে হেসে বললেন, পরে কিন্তু শরীর ভীষণ খারাপ করবে।

—করুক না!—শ্যামলীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, শ্যামলী পারবে। ওর শক্তি সাহস দুই-ই আছে। আমি সার্টিফাই করতে পারি।

মিসেস মালহোত্রা ঘড়ি দেখে একটু ইতস্তত করার পর রাজি হয়ে গেলেন—ঠিক আছে। কর্নেলের কথার ওপর কথা নেই। ফ্রেন্ডস, তা হলে আমরা আর মিঃ পারেখের জন্যে অপেক্ষা নাও করতে পারি। কী বলেন আপনারা?

সবাই সায় দিলেন। তখন মিসেস মালহোত্রা আবার ঘড়ি দেখে বললেন—কফি খেয়েই আমরা উঠব। ঠিক সাতটায় বসব।

আমার কী জানে কেন, খুব অস্বস্তি হতে লাগল। শ্যামলীর মিডিয়াম হতে চাওয়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। জয়ন্তীও এবার চুপিচুপি ওকে নিবৃত্ত করছে শুনলুম। কিন্তু শ্যামলী জেদের সঙ্গে ফিসফিস করে বলল, ভ্যাট! সব বাজে। দেখি না কী হয়!

দুই ঃ অশরীরী আত্মার আবির্ভাব

লম্বা-চওড়া আর বিলিতি ধাঁচে সাজানো ডাইনিং-হল পেরিয়ে শ্রীমতী মালহোত্রার স্টাডি বা পড়াশোনার ঘরে ঢুকলুম আমরা। আর সেইসময় বাইরে প্রচণ্ড মেঘগর্জন শোনা গেল। তারপর শুরু হল ভয়ংকর পাহাড়ি ঝড়। শ্রীমতী মালহোত্রার মুখে উদ্বেগ দেখা দিল।—ওই যাঃ! বেচারা পারেখ আর আসতে পারবে না!

ঝড়ে বাড়ির দরজা-জানলাগুলো বিকট শব্দে কাঁপছিল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন—সরযূ! লছমন! বদ্রী! তোমরা দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও!

সব বন্ধ হলেও ঝড়ের শব্দ চাপা শোনাচ্ছিল। মেঘের গর্জনে বাড়িটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল মুহুর্মুহু। গৃহকর্ত্রীর মুখে উদ্বেগের ছাপটা আরও গাঢ় হতে দেখছিলুম। অরিন্দম দ্বিবেদী চাপাগলায় বললেন, বড় আশ্চর্য তো! হঠাৎ এমন প্রাকৃতিক উপদ্রব কেন?

রঘুবীর জয়সোয়াল একটু হাসলেন, হ্যাঁ, প্রকৃতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারণ, কোনও অশরীরী আত্মা যেভাবেই হোক টের পেয়ে গেছে যে তাকে ডাকা হতে পারে!

এ কথায় বাকি সবাই চাপা হাসলেন। কিন্তু শ্রীমতী মালহোত্রা ক্ষুব্ধ হলেন।—মিঃ জয়সোয়াল, তুচ্ছতাচ্ছিল্য আপনি করতে পারেন বটে; কিন্তু বিজ্ঞানকে চমকে দেওয়ার মতো বহু ব্যাপার পৃথিবীতে এখনও আছে। এ-কথা মানেন তো?

ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক বললেন, তা তো আছেই! তবে আত্মার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে পারে! মানসিক অবস্থার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। হ্যালুসিনেশন বা ভ্রমদর্শন বলে একটা কথা আছে...

ওঁকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী মালহোত্রা একটু হেসে বললেন, সবুর, সবুর! এ আসবে আমরা মোট আটজন লোক। এ কোনও নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হবে না—কারণ একই জায়গায় একইসঙ্গে আটজন মানুষ হ্যালুসিনেশনে ভুগবে না নিশ্চয়।

অরিন্দম দ্বিবেদী কুণ্ঠিত মুখে বললেন, তা হলে আত্মা যে আজ আসবেই, আপনি সিওর?

শ্রীমতী মালহোত্রা শ্যামলীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, সবই নির্ভর করছে আমাদের এই সুইট মিডিয়ামটির ওপর। তোমার ভয় করছে না তো শ্যামলী?

শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম। ওর মুখে একটা জেদের ছাপ রয়েছে, সেজন্যেও নয়—তা বাদেও কী যেন আছে, রহস্যময় কিছু, এবং ওই চোখের দৃষ্টি আমার একটুও স্বাভাবিক মনে হল না। কেমন যেন তীক্ষ্ণ, গভীর উজ্জ্বল—অথচ দূরের নক্ষত্রের মতো

BanglaBook.org

ওই দৃষ্টিপাত। যেন সে আমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের একজন হয়ে নেই! নিজের মনের ভুল? কে জানে! আমার মধ্যে একটা অস্বস্তি জাগল।

আমি কর্নেলের দিকে তাকালুম। বুড়ো চোখ বুজে বসে রয়েছেন পাথরের মতো। শ্রীমতী মালহোত্রাও যেন শ্যামলীর মুখে আমার মতোই কিছু দেখলেন। তাই কোনও জবাব না পেয়েও ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, তা হলে আসুন, আমরা ওই টেবিলে গিয়ে বসি। তারপর ঘড়ি দেখে নিলেন। অস্ফুটস্বরে ফের বললেন, জাস্ট সাতটা পনেরো মিনিট। কুইক।

ঘরের মেঝে পুরোটা কাশ্মীরি কার্পেটে ঢাকা। ঠিক মধ্যিখানে একটা মেহগনি-রং বিশাল গোলটেবিল—তাতে কোনও ঢাকনা নেই। টেবিলের চারদিক ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। আমরা গিয়ে বসলে একটা বাড়তি হল। সেটা তফাতে সরিয়ে রাখলেন শ্রীমতী মালহোত্রা। বললেন—বদ্রীটার বুদ্ধিসুদ্ধি আর হবে না। বলেছিলুম ছ'টা চেয়ার রাখতে—রেখেছে ন'টা! ছয়কে নয় শোনে যে, তার কানের অসুখ হয়েছে।

বদ্রী সম্ভবত আমাদের পিছু-পিছু এসে ঘরে দাঁড়িয়েছিল। বয়েসে প্রৌঢ়, কিন্তু দেহের গড়নে শক্তি-সামর্থ্যের ছাপ স্পষ্ট। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমি ছ'টাই রেখেছিলুম মা। পরে সমঝে দেখলুম, ওনারা ন'জন হচ্ছেন, তাই...।

গৃহকর্ত্রী হেসে বললেন, তা হলে তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু বাছা, আমরা তো ন'জন ছিলুম না—আটজন মোটে।

বদ্রী বলল, পারেখসায়েবকে নিয়ে ন'জন যে মা!

—বদ্রী, তুমি বুদ্ধিমান! কিন্তু এই দুর্যোগে উনি আর আসতে পারবেন কি? যাকগে। শোনো বদ্রী, তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো। যদি দৈবাৎ পারেখসাহেব এসে পড়েন, ওঁকে ও-ঘরেই বসতে বলবে। কারণ আমাদের আসর শুরু হলে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়।

বদ্রী মাথা নেড়ে চলে গেল। শ্রীমতী মালহোত্রা দরজার তালা খুলে ওকে যেতে দিলেন—তারপর ভালো করে আটকে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে একটা হালকা নীলাভ আলো জ্বাললেন। ঘরটা কেমন রহস্যে ভরে গেল যেন। নীলাভ আলোটা এত কম ওয়াটের যে কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এ-সময় সবগুলো মুখের দিকে আমি তাকালুম।

আমার ডাইনে বসেছে জয়ন্তী। সে তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। আমার বাঁয়ে বসেছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি শ্রীমতী মালহোত্রার দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীমতী মালহোত্রা এখনও বসেননি—দাঁড়িয়ে আছেন। কর্নেলের বাঁয়ে ডঃ পট্টনায়ক। তিনিও গৃহকর্ত্রীকে দেখছেন। তাঁর বাঁ-দিকে রঘুবীর জয়সোয়াল—তাঁর দৃষ্টি শ্যামলীর দিকে, শ্যামলী তাঁর পাশের চেয়ারে এবং আমার চেয়ারের একেবারে উলটোদিকে আমার সামনাসামনি। শ্যামলী টেবিলে দৃষ্টি রেখেছে। শ্যামলীর বাঁয়ে শ্রীমতী মালহোত্রার চেয়ার—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বাঁয়ে অর্থাৎ জয়ন্তীর ডাইনে রয়েছেন অধ্যাপক দ্বিবেদী। তিনি যেন জয়সোয়ালকেই দেখছেন।

ঘরে স্তব্ধতা—কিন্তু বাইরে প্রকৃতি তোলপাড় হচ্ছে। মাঝে-মাঝে বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের শনশন শাঁ-শাঁ শব্দে পাহাড় আর অরণ্য মুখর হচ্ছে। বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে যেন। তারপর মনে হল, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাহাড়ি ঝড়বৃষ্টির ভীষণতার কোনও তুলনা নেই। এসব সময় ধস নামে। সে বড় বিপজ্জনক কাণ্ড! অনেক বসতি গুঁড়ো হয়ে যায়। মানুষ চাপা পড়ে। রাস্তা পাথরের স্তূপে বন্ধ হয়ে যায়। আবার অনেক সময় রাস্তাও ধসে গিয়ে অতল খাদ সৃষ্টি হয়। এখনও নিশ্চয় তা হচ্ছে কোথাও।

শ্রীমতী মালহোত্রা বক্তৃতার ঢঙে বললেন—বন্ধুগণ! এবার আমাদের আসর শুরু হবে। তার আগে দু-চার কথা বলা দরকার। অবসরজীবনে প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করে আমার বদ্ধমূল ধারণা

BanglaBook.org

হয়েছে যে মানুষের দেহ ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা ধ্বংস হয় না। ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ দার্শনিকরা যে সত্য হাজার-হাজার বছর আগে জেনেছিলেন, পাশ্চাত্যের নিরীশ্বরবাদী দর্শন আর বিজ্ঞানের পাল্লায় পড়ে আমরা বিদগ্ধ শিক্ষিত সমাজ তা অস্বীকার করতে শিখেছি। আমিও একসময় তাই করেছি। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় আমার স্বামী ডঃ মালহোত্রার মৃত্যুর পর এমন অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হল, যার ফলে আমি প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করলুম। এখন কথা হচ্ছে—আত্মা দেহের মৃত্যুর পর থেকে যাচ্ছে। কিন্তু তার এ থাকাটা কীরকম? এর জবাব আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমেই পাচ্ছি। আপনারা জানেন, আলো শব্দ এসব হল একরকমের তরঙ্গ। একটা তরঙ্গের নির্দিষ্ট মাপে আমরা আলো দেখতে পাই বা শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের এমন কোনও ইন্দ্রিয় নেই, যা দিয়ে সেই নির্দিষ্ট মাপের বাইরে কোনও আলো বা শব্দ আমরা টের পেতে পারি। এখানেই আমরা অসহায়। এখন তা হলে দাঁড়াল, তরঙ্গতত্ত্ব। বিজ্ঞান আজ বলছে, আমাদের চিন্তা ভাবনাও একরকম তরঙ্গ —মস্তিষ্কে তার উদ্ভব। মস্তিষ্কের তরঙ্গ নিয়েই গড়ে উঠেছে প্যারা-সাইকোলজি শাস্ত্র। সব তরঙ্গেরই ধর্ম গতিশীলতা, অর্থাৎ স্থানান্তরে চলাচলে সমর্থ সে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে—মস্তিষ্কের যে বিশেষ মাত্রার তরঙ্গ উঠল, তা চলতে শুরু করল মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে। এই তরঙ্গ ইথারের মতোই সর্বব্যাপী। পৃথিবীর সকল মস্তিষ্কে গিয়ে কাঁপন তোলে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, আমবা এত নানা ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত থাকি, এত ঝঞ্ঝাট ও বৈষয়িক জটিলতায আমাদের দিন কাটাতে হয় যে নিজের মস্তিষ্কতরঙ্গ নিয়েই কূল পাইনে—অন্য বহিরাগত তরঙ্গের আঘাতে কী অনুভূতি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল, খোঁজ বাখিনে। ধরুন, কোনও মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তে তীব্রভাবে কিছু ভেবেছিল—হ্যাঁ, আবার বলছি 'তীব্রভাবে'। এই তীব্র তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে—প্রত্যেকটি মস্তিষ্কেব স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত হানল। আমরা যদি সজাগ ও অনুভূতিশীল হই, তা হলে তা টের পাব। যেমন আমি আমার স্বামীর মৃত্যু টের পেয়েছিলুম ষাট মাইল দুব থেকে। আমার মনে হয়েছিল— কে যেন আমার অতি প্রিয়জন আমারই নাম ধরে কিছু বলতে চাইছেন।...

বাইরে কোথাও ফের বাজ পড়ল এবং তাবপর আবছা শোনা গেল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে প্রচণ্ড। শ্রীমতী মালহোত্রা অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, ওই বুঝি পারেখ এল।

কিন্তু দু-মিনিট অপেক্ষা করার পরও বদ্রী তাকে নিয়ে এল না বা বদ্রী নিজেও কোনও সাড়া দিল না। তা হলে কি আমাদের কানের ভুল?

শ্রীমতী মালহোত্রা ফের শুরু করলেন, হ্যাঁ, আমার ধাবণা, সবচেয়ে তীব্র মস্তিষ্কতরঙ্গ বা ব্রেনওয়েভগুলো মোটামুটি অনুভূতিশীল সচেতন মানুষরা ধরতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই তীব্রতা কখন থাকে? আকস্মিকভাবে যখন কোনও মানুষেব মৃত্যু হয়, তখন। তাই আমার বক্তব্য, আমাদের খুব পরিচিত কোনও মানুষ যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় অথবা কোনও ভাবে মারা গিয়ে থাকেন, তাঁর সেই মৃত্যুকালীন তীব্র ব্রেনওয়েভটা ধরতে পারলে তারই সূত্রে আমরা তাঁর আত্মাকেও আকর্ষণ করে আনতে পারব।

কর্নেল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, রাইট, রাইট।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, খুবই যুক্তিসিদ্ধ।

জয়সোয়াল একটু হাসলেন মনে হল। অধ্যাপক দ্বিবেদী বললেন, তা হলে তো মিডিয়ামেরই পরিচিত কোনও মানুষের আত্মা হওয়া দরকার।

জয়ন্তী কী বলতে যাচ্ছিল, শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, ঠিক বলেছেন প্রফেসর দ্বিবেদী। এক্ষেত্রে শ্যামলীকেই মিডিয়াম করেছি যখন, তার পরিচিত কোনও আত্মা আনাই সহজ হবে। শ্যামলী, ডার্লিং। এমন কাকেও কি তোমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে—যিনি দুর্ঘটনায় অথবা ধরো, আততায়ীর হাতে হঠাৎ মারা পড়েছিলেন?

আমরা শ্যামলীর দিকে তাকালুম। সে অস্ফুটস্বরে শুধু বললে, হ্যাঁ।

BanglaBook.org

জয়সোয়াল বললেন, একটা কথা! তাঁকে যদি আমরা সবাই না চিনি, তা হলে কীভাবে বুঝব যে শ্যামলী আমাদের ঠকাচ্ছেন না? তা ছাড়া, আমার যা জানা আছে—মিডিয়ামের মারফত আত্মা আসরে আসেন, কিন্তু তার জন্যে সেই আত্মা সম্পর্কে আসরের সবাইকে চিন্তা করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের কি তা হলে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকতে হবে?

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—আমার এ আসরের রীতি একেবারে অন্যরকম। কারণ, আমি বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে ব্যাপারটা ঘটাতে চাই। কাজেই আমাদের এক্ষেত্রে শ্যামলীর ওপরই নির্ভর করতে হবে। আর—সে ঠকাচ্ছে কি না, তার প্রমাণ পেতে আমাদের অসুবিধে হবে না। আমরা তাকে প্রত্যেকে প্রশ্ন করব। মৃত মানুষের আত্মা যেহেতু সর্বচর এবং সময়ের বাঁধনে বাঁধা থাকে না, তাই জয়সোয়াল যদি ইচ্ছে করেন, তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোনও ঘটনা সম্পর্কে আত্মা কিছু বলুক, তা অবশ্যই বলা উচিত। অন্তত আভাস দেওয়া উচিত। তা না হলে তো শ্যামলীর ওপর সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

এ সময় জয়ন্তী আমার উরুতে আঙুলের চাপ দিল। বুঝলুম, ওর বক্তব্য—শ্যামলী এবার ঠেলাটা টের পাক।

তা ঠিক। শ্রীমতী মালহোত্রা ফাঁকি বা চালাকির দরজা বন্ধ করে দিলেন। কে জানে কেন, অস্বস্তি হতে লাগল আমার। ওদিকে বাইরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমানে চলেছে।

শ্রীমতী মালহোত্রা ঘড়ি দেখে বললেন—এবার আলো নেভাব। শ্যামলী, বাছা তোমার ভয় করছে না তো? এখনও বলো!

শ্যামলী মাথা দোলাল।

—ওক্কে! তা হলে আলো নিভলেই শ্যামলী তুমি তোমার সেই পরিচিত লোকটির সম্পর্কে চিন্তা শুরু করবে। খবরদার, অন্য কোনও চিন্তা নয়। শুধু—তাঁর কথা ভাববে। প্রথমে তাঁর চেহারাটা সামনে আনবে। তারপর মনে মনে তাঁকে ডাকবে। তাঁর সম্পর্কে প্রত্যেকটি স্মৃতি ব্যবহার করবে। আশা করি, আর কিছু বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এবার আমরাও বিমূর্তভাবে শ্যামলীর সেই আত্মাকে আহ্বান জানাব। প্লিজ, কেউ অন্যমনস্ক হবেন না।

তারপরই টেবিলের পাশে কোথাও সুইচ টিপে দিলেন উনি। আলো নিভে গেল। ঘরটা প্রায় অন্ধকারে ভরে গেল তক্ষুনি। আমার মনে হল, চোখ নামে কোনও ইন্দ্রিয় আমার নেই। শ্রীমতী মালহোত্রা শুধু একবার ফিস-ফিস করে বললেন, কেউ কোনও শব্দ নয়। নড়বেন না প্লিজ। শ্যামলীর পরিচিত আত্মাকে মনে-মনে ডাকুন।

দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যেন। বাইরে ঝড়বৃষ্টি আর মেঘের তুমুল গর্জন—এখানে এই অন্ধকারে যেন ক'জন মানুষ হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বিপুল জীবনধারা থেকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেন।

কতক্ষণ কেটে গেল। ক্রমশ আমার মনে সেই অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। একটা চাপা আতঙ্ক গলা শুকিয়ে কাঠ করে দিচ্ছিল। সত্যি কি কোনও আত্মার আবির্ভাব আশঙ্কায় চমকে উঠছিলুম, কার ঠান্ডা অতিঠান্ডা হাতের ছোঁওয়া পাচ্ছি না তো? কোনও বরফের হাত হিংস্রতায় নিঃশব্দতায় আমারই গলায় চেপে বসছে না তো? আবার প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বাড়িটা কেঁপে উঠল। তারপর শ্যামলীর ওখান থেকে কী একটা আবছা শব্দ হল।

তারপরই শ্যামলীর কণ্ঠস্বর শুনলুম। এ কণ্ঠস্বর যে শ্যামলীরই, তা অবশ্য বলা কঠিন। কেমন চাপা, নাকিস্বর, দুরারোগ্য রোগে ভুগছে এমন দুর্বল কারও গলা।—আমি...আমি কোথায় আছি?

আরও দুবার কথাটা শুনলুম। তারপর শ্রীমতী মালহোত্রাকে চাপাস্বরে বলতে শোনা গেল—মিসেস সরোজিনী মালহোত্রার ঘরে।

—কেন? এখানে কেন? এখানে কেন আমি? কেন—কেন—কেন?...

—তার আগে বলুন, কে আপনি?

BanglaBook.org

—আমি...তাই তো! আমি কে? কে আমি? কে?

—স্মরণ করুন। ভেবে দেখুন, কে আপনি।

—মনে পড়ছে না। আমার মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

—এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?

—কোথায় ছিলুম? আমি...আমি কোথায়...হ্যাঁ...ছিলুম পাহাড়ি খাদে।

—পাহাড়ি খাদে? ওখানে কেন বলুন তো?

—জানি না। কিচ্ছু জানি না। আমি জানি না।

—কোন পাহাড়ি খাদে? এ প্রশ্নটা করলেন অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী।

—ভূতের পাহাড়ের পশ্চিমে। ভূতের পাহাড়ে—ভূতের পাহাড়ে...।

শ্রীমতী মালহোত্রার তীব্র চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—কিন্তু কে? আপনি কে?

—আমার কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

—কে আপনি...এ কণ্ঠস্বর জয়সোয়ালের।

—আমার ঘাড় ভেঙে গেছে। লাংস ফেটে গেছে। হার্ট গুঁড়ো হয়ে গেছে।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—আপনাকে ফেলে দিয়েছিল কেউ?

—ফেলে দিয়েছিল। ডেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছিল। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

—কে ফেলে দিয়েছিল? কী নাম তার?

—বলব না, আমি বলব না, কিছুতেই বলব না।

—কেন ফেলে দিয়েছিল?

—আমি তাকে চিনতুম। এবাব সে ভয় পেয়েছিল। খুব ভয় পেয়েছিল।

এবার কর্নেল বললেন—কিন্তু আপনি কে?

—বলব না। বলব না। বলব না।

—না বললে আপনার হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যে।

—কে? কে দেবেন শাস্তি? কে দেবেন তাকে শাস্তি? কে—কে?

—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি—আই প্রমিস।

—চিনি আপনাকে। খুব চিনি। চিনি—চিনি—চিনি...।

—তাই বলছি, বলুন কে আপনি?

—বলব? আমি বলব—বলব—বলব?

যেন সাতটি কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, বলুন, বলুন!

—আমি...আমি মোহন পারেখ! মোহন—মোহন পারেখ।

ঘরের মধ্যে ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল যেন। যেন সবাই একসঙ্গে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলুম—মোহন পারেখ!

তারপর শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—অসম্ভব। মোহন পারেখ জীবিত। তার এখানে আসার কথা ছিল। ঝড়জলে আটকে গেছে হোটেলে। আপনি মিথ্যে বলছেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টাতেও সে ফোন করেছিল—ঝড়জলে বেরুতে পারছে না।

—এখন করল না কেন? কেন করল না? কেন ফোন করলুম না?

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার মেঘ ডেকে উঠল। একবার নয়—পরপর কয়েকবার। ঘর প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠল। সেইসময় যেন আবছা কী একটা শব্দ শুনলুম। তারপর শ্রীমতী মালহোত্রা একটু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মিথ্যে! শ্যামলীর চালাকি। এমন চমৎকার আসরটা ভেস্তে দিল বোকা মেয়েটা।

তারপর চেয়ার নড়ার শব্দ হল। তারপরই সেই নীল আলোটা জ্বলে উঠল। প্রথমেই আমার

BanglaBook.org

চোখ গেল শ্যামলীর দিকে। সে চেয়ারে হেলান দিয়েছে, মাথাটা একপাশে কাত হয়েছে, ডান হাতটা ঝুলছে এবং বাঁ-হাত উরুর ওপর পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি?

জয়ন্তী চেঁচিয়ে উঠল, শ্যামলী, শ্যামলী।

শ্রীমতী মালহোত্রা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, ও মোটেও অজ্ঞান হয়নি। ও চালাকি করছে। আজকালকার মেয়েগুলোকে আমি তো কম চিনিনে? সব বিচ্ছু। ইস! কী চমৎকার সময় আজ পাওয়া গিয়েছিল। এই ঝড়বৃষ্টির রাতেই তো ওরা আসে।

জয়সোয়াল খুকখুক করে হেসে বললেন, মোহন পারেখ। মাই গুডনেস! ছোকরা শুনলে ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে।

অধ্যাপক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা ভুল করছেন। শ্যামলী হয়তো সত্যি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে।

এই শুনে জয়ন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওর দিকে এগিয়ে গেল।—শ্যামলী! এই শ্যামলী!

এই সময় শ্রীমতী মালহোত্রা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে বড় আলোর সুইচ টিপে দিলেন। উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঘর ভরে গেল। তারপর দেখলুম জয়ন্তী শ্যামলীর কাঁধে হাত রেখে ফের একবার 'শ্যামলী' বলে ডেকেই ভাঙা গলায় বিস্ময়-আতঙ্ক মেশানো চিৎকার করে উঠল—এ কী! শ্যামলীর কী হয়েছে? ওর গা এত ঠান্ডা কেন? চেহারা এমন কেন?

কর্নেলের দিকে তাকালুম। ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টিতে শ্যামলীকে দেখছিলেন উনি। এবার জয়ন্তীর কথার সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, ওঃ জেসাস! শ্যামলীর চেহারা অমন কেন? না—না, এ অদ্ভুত—অবিশ্বাস্য।

এতক্ষণে ঠাহর হল। তাই তো! শ্যামলীর অত সুন্দর মুখটা ঠিক যেন বাঁদরের মুখের চেয়ে কুৎসিত দেখাচ্ছে। ওই মুখ কি মানুষের? যেন কোনও ভয়ংকর শক্তি ওর চেহারাকে যতটা পারে বীভৎস করে গেছে অন্ধকারের সুযোগে। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিল। অজ্ঞাত ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলুম। শ্যামলীর দিকে তাকাতে সাহস পেলুম না আর।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সবাই স্তব্ধ হয়ে প্রচণ্ড বিস্ময় আর আতঙ্কে ওই বীভৎসতা লক্ষ করছিল। তারপর কর্নেল গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—জয়ন্তী, তুমি সরে দাঁড়াও ওখান থেকে। ডঃ পট্টনায়ক, প্লিজ! একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো শ্যামলীর কী হয়েছে?

শ্রীমতী মালহোত্রার মুখ ততক্ষণে সাদা হয়ে গেছে। ভয়ার্তস্বরে বললেন, তা হলে কি শ্যামলী সত্যি-সত্যি অভিনয় করেনি? কিন্তু মোহন পারেখ—না, না, সে অসম্ভব।

ডঃ পট্টনায়ক এগিয়ে গিয়ে প্রথমে শ্যামলীর নাড়ি দেখলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় দেখলুম। তারপর হাতটা রেখে চোখের পাতা পরীক্ষা করলেন। তারপর ভাঙা গলায় একটু কেশে শান্তভাবে বললেন, কর্নেল, শ্যামলী মারা গেছে।

জয়ন্তী ডুকরে কেঁদে উঠল, তুই এ কী করলি শ্যামলী!

শ্রীমতী মালহোত্রা ওকে দু-হাতে ধরে তফাতে নিয়ে গেলেন। ধরা গলায় বললেন, ক্ষমা করো, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। এ হবে আমি একটুও ভাবিনি। প্রেততত্ত্বের একটা বইতে অবশ্য সতর্ক করা হয়েছে—এ আগুন নিয়ে খেলা। সাবধানে আত্মাদের ডাকতে হয়। কিন্তু আমি সাবধান করে দিইনি ওকে। আমারই ভুলের জন্যে ফুলের মতন অমন কচি মেয়েটা...ওঃ ভগবান! এ আমি কী করলুম।

—শ্যামলী মারা গেছে? কর্নেল বলে উঠলেন।—সে কী! না—না—এ অবিশ্বাস্য!

জয়সোয়াল আস্তে-আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—আপনার ভুল হচ্ছে না তো ডঃ পট্টনায়ক?

BanglaBook.org

ডঃ পট্টনায়ক মাথা দোলালেন।—না। শ্যামলী আর বেঁচে নেই।

অধ্যাপকও উঠে দাঁড়ালেন।—কিন্তু, কী ভাবে মৃত্যু হল ওর? আপনারা কি বলতে চান কোনও প্রেতশক্তিই ওকে হত্যা করে গেছে?

জবাবটা দিলেন শ্রীমতী মালহোত্রা।—হ্যাঁ, কোনও দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল ওর মধ্যে। মোহন পারেখ কখনও তার নাম হতে পারে না। নিজের নামটা সে বলতে চায়নি। কারণ, আপনারা বুঝতে পারছেন না—মোহন পারেখ যদি সত্যি আজ মারা গিয়ে থাকে, তা হলেও শ্যামলীর সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা কী ভাবে সম্ভব?

জয়সোয়াল বললেন, তা হলে মানতে হয় সত্যি-সত্যি ভূত এসে মেরে গেল শ্যামলীকে? অ্যাবসার্ড। ইমপসিবল। আনবিলিভেবল।

কর্নেল ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মুখ তুলে শুধু বললেন—রাইট, রাইট। কিন্তু...না, না। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ক্রমশ।

—চারপাশে আমরা রইলুম জলজ্যান্ত এতগুলো মানুষ। আর ভূত এসে মারল? অসম্ভব?—জয়সোয়াল দৃঢ়স্বরে বললেন।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, কিন্তু ওর চেহারাটা দেখুন। মিঃ জয়সোয়াল, আপনি তো পুলিশ সুপার ছিলেন। অনেক মার্ডারড ডেডবডি দেখেছেন। শ্যামলীর ডেডবডিটা দেখেও কি বুঝতে পারছেন না কী ঘটেছে?

অধ্যাপক দ্বিবেদী ভীতস্বরে বললেন—ভয় পেয়ে মারা পড়েনি তো?

আমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসেছিলুম। এবার সংবিৎ ফিরে এল। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—কর্নেল। আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো দরকার। আফটার অল—এ একটা আকস্মিক মৃত্যু।

কর্নেল আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বললেন, রাইট, রাইট। আমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছিল, জয়ন্ত। এমন অদ্ভুত মৃত্যু আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মিসেস মালহোত্রা, ওকে ফোনটা দেখিয়ে দিন—প্লিজ। আর—জয়ন্তী, তুমি আমার কাছে এসো। মিঃ জয়সোয়াল, আপনি জানলা খুলে দেখুন তো ঝড়বৃষ্টির অবস্থাটা কী। অধ্যাপক, আপনি এখানে সরে আসুন। ডঃ পট্টনায়ক, আপনি শ্যামলীর পাশেই থাকুন।

নির্দেশগুলো শুনতে-শুনতে আমি শ্রীমতী মালহোত্রার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। দরজার যা ব্যবস্থা, ভেতর থেকে টানলেই তালাবন্ধ হয়ে যায়। চাবি ছাড়া খোলা যায় না। শ্রীমতী মালহোত্রার ট্যাঁকে চাবির গোছা লক্ষ করলুম। দরজা খুলে ডাইনিং হলে ঢুকে উনি বললেন—ওই যে ফোন।

ডাইনিং হলে একা বদ্রী বসে ছিল। গৃহকর্ত্রীকে দেখে বলল, পারেখসায়েব তো আসেননি মা। একবার যেন কে দরজায় ধাক্কা দিল—খুললুম, কিন্তু কাকেও দেখতে পেলুম না।

শ্রীমতী মালহোত্রা তাকে কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে আবার স্টাডিতে ফিরে গেলেন। আমি ততক্ষণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন হতভম্ব যে ওঁকে বলতে ভুলে গেছি যে টেলিফোনটা যাকে বলে ডেড—নিষ্প্রাণ।

কয়েকবার টেপাটেপি করে বদ্রীকে ইশারায় ডাকলুম। সে কাছে এসে সেলাম দিয়ে বলল, লাইন পাচ্ছেন না হুজুর?

—না বদ্রী। মনে হচ্ছে, লাইনটা কেউ কেটে রেখেছে।

বদ্রী চমকে উঠে বলল, তাজ্জব। কে কাটবে লাইন? এই তো সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পারেখজিকে ফোন করতে বললেন মাইজি। ফোন করলুম।

—পারেখজি? মানে—মোহন পারেখ?

BanglaBook.org

—জি হাঁ সাহাব।

—পেলে ওঁকে?

—জরুর পেলুম। বললুম, মাইজি আপনার ইন্তেজার করছেন। তো পারেখজি বললেন, এখনই আসছি। তারপর তো ঝড় উঠল।

—বদ্রী, এসো, আমরা লাইনটা খুঁজে দেখি—ঘরেই কোথাও কিছু ঘটেছে নাকি!

বদ্রী ব্যস্ত হয়ে লাইনটা খুঁজতে শুরু করল। আমিও তার সঙ্গে পরীক্ষা করতে থাকলুম। অবশেষে হাত পাঁচেক দূরে একটা বড় আলমারির পিছনে আবিষ্কার করলুম, তারটা সুন্দর ভাবে কেউ দুভাগে কেটে রেখেছে!

বদ্রী চেঁচিয়ে উঠল—হায় রামজি! কে এমন কাজ করল?

বললুম, বদ্রী, ব্যস্ত হতে হবে না। শোনো, তুমি গিয়ে দরজাটা খুলে দেখো তো, ঝড়বৃষ্টি কমেছে নাকি।

বদ্রী সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঝড় কমেছে—শুধু ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছে। আমিও ওর পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে নিলুম। কিন্তু এক মুহূর্তও দাঁড়াতে সাহস হল না। ওই অন্ধকারে যেন আজ রাতে দলে-দলে অশরীরী আত্মা এসে অপেক্ষা করছে, কখন কার নাম ধরে ডাকা হবে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে বললুম, দরজা বন্ধ করো বদ্রী! তারপর প্রায় দৌড়ে স্টাডির দরজায় হাজির হলুম। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলেন শ্রীমতী মালহোত্রা। তখন রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কর্নেল, কর্নেল! কে ওঘরে ফোনের লাইনটা কেটে রেখেছে!

শ্রীমতী মালহোত্রা চেঁচিয়ে উঠলেন, হোয়াট? ফোনের লাইন কেটেছে?

ঘরের আর সবাই চমকে উঠলেন একসঙ্গে। কর্নেল চিন্তিত মুখে এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বললেন, মিসেস মালহোত্রা! এখনই বদ্রীকে আলো দিয়ে থানায় পাঠান। এক মুহূর্ত দেরি নয়। জয়ন্ত, প্লিজ—বদ্রীর সঙ্গে যাও! আগাগোড়া সব জানাবে ওঁদের। কুইক!

আবার বেরিয়ে এলুম গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে।

তিন : প্যাথোজেন ও ইলেকট্রনিক ঘড়ি

ঘুম ভাঙলে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছু টের পেলুম না যে কোথায় আছি। মাথাটা খালি লাগছিল। তারপর মনে পড়ল রাত তিনটেয় গ্রিন ভিউ হোটেলে ফিরে এসেছিলুম কর্নেলের সঙ্গে। কোনও কথা আর বলিনি পরস্পর এবং শুয়ে পড়েছিলুম।

মাথার কাছে হাতড়ে ঘড়িটা বের করলুম। দেখি, সাড়ে আটটা বাজে। তখন মুখ ঘুরিয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে খুঁজলুম। ওঁর বিছানা খালি। এত পারেন বটে। যত রাতই জাগুন, বরাবর দেখেছি, ছ'টার পর আর বিছানায় কিছুতেই পড়ে থাকবেন না। প্রাতঃকৃত্য সেরেই বেড়াতে বেরোবেন এবং যথাসময়ে ফিরে আমাকে জেগে থাকতে দেখলে সলজ্জ হেসে বলবেন, সুপ্রভাত তরুণ বন্ধু! আশা করি, সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।

পশ্চিমের জানলা খোলা ছিল। কাত হয়ে কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে থাকলুম। এখন উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করছে। পাহাড় ও অরণ্য জুড়ে সবুজ হলুদ ও লাল রঙে আঁকা এক অপার্থিব আনন্দধারার ছবি আঁকা হয়েছে যেন। তাজা জীবনের ওই রূপে মৃত্যুর দুঃখ বা অশরীরী অশুভের কোনও আতঙ্ক নেই।

এবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই কুখ্যাত ভূতের পাহাড়ে চোখ গেল। সেখানেও রোদ ঝলমল করছে। এখন মনে হল, গত রাতে যা কিছু ঘটেছে সব একটা মারাত্মক দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে ঘণ্টার সুইচ টিপতে যাচ্ছি, দরজায় বেয়ারা হরিয়ার পরিচিত গলা শোনা গেল—বেড-টি এনেছি সাহাব!

—চলে এসো!

হরিয়া চা রেখে চলে গেল। ওকে জিগ্যেস করলুম না—এখন বেড-টি দিতে কে ফরমাশ করল। কর্নেল ছাড়া আর কে হবেন? নিশ্চয় বুড়ো তাঁর হাজার চোখের একটি দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছেন আমি কী করছি না-করছি।

ধীরে-সুস্থে আধশোয়া অবস্থায় চা খেয়ে তারপর উঠে পড়লুম। বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কাটতে-কাটতে রাতের সব ঘটনা এতক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠল। শ্যামলীর মুখটা মনে পড়ল। অমনি সারা শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী পুলিশ অফিসার মিঃ সন্তোশ খান্নাকে বলছিলেন,—যদি এ কোনও অলৌকিক বা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়, তা হলে আমার ধারণা, বিকেলে ওই ভূতের পাহাড়ে চড়ার সময়ই দুষ্ট আত্মাটা শ্যামলীর পিছু নিয়েছিল।

তখন কথাটা গ্রাহ্য করিনি। এখন মনে হল, তাই ঘটেছে। তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে শ্যামলীর মৃত্যুর? আর মোহন পারেখের ব্যাপারটা...

চিন্তায় বাধা পড়ল আমার বৃদ্ধ সঙ্গীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।—সুপ্রভাত জয়ন্ত। আশা করি তোমার সুনিদ্রা হয়েছে।

উঁকি মেরে দেখি, কর্নেল আর জয়ন্তী ঘরে ঢুকেছেন কখন। আশ্চর্য, এতটুকু শব্দ হয়নি দরজার। জয়ন্তীর মুখটা ফোলা-ফোলা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে। শোকগ্রস্ত রুক্ষ চেহারা। বেচারার জন্যে দুঃখ হল। সে একটা চেয়ারে বসলে কর্নেল আমার উদ্দেশ্যে ফের বললেন—জয়ন্তের মেজাজের কাঁটা কি এখনও স্বাভাবিক ডিগ্রিতে পৌঁছয়নি? দুঃখিত বৎস, খুবই দুঃখিত। তোমাকে ওই পাহাড়ি জংলি টাট্টু বদ্রীটার সঙ্গে ভূত-প্রেত অধ্যুষিত বাণেশ্বরে খানিকটা ছোটাছুটি করিয়েছিলুম গত রাত্রে। এজন্যে আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মতো শক্তসমর্থ বুদ্ধিমান যুবক আর কোথায় পেতুম তখন?

কথার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেললুম।—দাড়ি কাটার সময় কথা বলতে নেই। এ আমার গুরুজনের শিক্ষা। যাক গে। মোহন পারেখের পাত্তা পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ।

চমকে উঠলুম।—হ্যাঁ মানে? শ্যামলীর কথা তা হলে সত্যি?

—নিখাদ সত্যি, জয়ন্ত। কিছুক্ষণ আগে ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম খাদে ওর দলাপাকানো লাশটা পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। কেউ সত্যি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলুম। দাঁত ব্রাশ করা আর হল না। ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় বসে বললুম—আপনি স্বচক্ষে দেখে এলেন নাকি?

—দেখলুম।...কর্নেল চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন।

—শ্যামলীর লাশের ময়নাতদন্ত এতক্ষণ নিশ্চয় হয়ে যাওয়া উচিত। কোনও খবর পাননি এখনও?

—ডঃ পট্টনায়ক মর্গে রয়েছেন। উনি রিং করবেন যতো নাগাদ। দেখা যাক।

—মর্গ তো সেই বাণেশ্বর-ইস্টের হাসপাতালে?

কর্নেল মাথা দোলালেন। জয়ন্তী আস্তে ভাঙা গলায় বলল—কী পাবে লাশে? কিছু না। আমাকে শ্যামলী বরাবর কুসংস্কারের ডিপো বলে ঠাট্টা করত। তাই যেন ওর এই কঠিন শাস্তি হল। ওর মাকে কী ভাবে মুখ দেখাব, ভেবে পাচ্ছি না।

বললুম, ওর আত্মীয়স্বজনকে টেলি করা হয়েছে তো?

কর্নেল বললেন, তুমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছ কি না। গতরাত্রে আরও কত ভয়ংকর ঘটনা

BanglaBook.org

ঘটেছে, জানো না জয়ন্ত। বাগেশ্বরে আমরা আপাতত কয়েকটা দিন আটকে গেলুম। কারণ ফেরার পথ বন্ধ। টনকপুরের রাস্তায় বিরাট ধস নেমেছে। টেলিসংযোগ বিচ্ছিন্ন—সব পোস্ট উপড়ে গেছে। মেন ইলেকট্রিক লাইনও ছিঁড়েছে। তার ফলে এখন স্থানীয় বিদ্যুতের ওপর সামান্য ভরসা। লাধিয়া নদীর জলপ্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ যেটুকু হয় তার তিন ভাগ যায় সামরিক ছাউনিতে, এক ভাগ পায় বাগেশ্বরের অসামরিক বাসিন্দারা। লোডশেডিং না হয়ে যায় না আজ। বুঝলে জয়ন্ত, আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা যেন এক অদৃশ্য শক্তির মারাত্মক ষড়যন্ত্র।

বললুম, তা হলে অবশেষে আপনি এতদিনে অলৌকিকে বিশ্বাসী হলেন?

—হলুম মানে? আমি কি অলৌকিকে অবিশ্বাসী ছিলুম কখনও?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম আমার দীর্ঘ দিনের চেনা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী ও সর্বশাস্ত্রবিদ প্রাজ্ঞ বন্ধুটির দিকে। বলেন কী! অবশেষে এই বাগেশ্বরে এসে এক রাত্রেই ভীষণ ভাবে বদলে গেলেন ভদ্রলোক?

আমার মনের কথাগুলো যেন টের পেয়েই ধুরন্ধর গোয়েন্দাপ্রবর একটু হাসলেন। বললেন, বৎস জয়ন্ত, ধর্মসূত্রে আমি বরাবর একজন খ্রিস্টিয়ান, তা তো জানোই।

—কী মুশকিল। ভগবানে বিশ্বাস এক কথা, আর ভূতে বিশ্বাস অন্য কথা যে।

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! খামোখা তর্ক করো না। আমি ভূত কথাটা বলিইনি। বলেছি, অদৃশ্য শক্তির কথা। সবসময় পায়ে-পায়ে এই অদৃশ্য শক্তির খেলা তুমি কি লক্ষ করো না? ভুলে যেও না—আমাদের সামনে প্রতি মুহূর্তে রয়েছে এক অজানা ভবিষ্যৎ। যা ইচ্ছে করি, তা যে ঘটবেই তার গ্যারান্টি আছে কি? সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে—ওই বুঝি ডঃ পট্টনায়ক ফোন করছেন।

প্রতি স্যুটে ফোনের ব্যবস্থা আছে গ্রিন ভিউ হোটেলে। ফোন বেজে উঠেছিল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরলেন—হ্যালো, কর্নেল সরকার বলছি।...হ্যাঁ।...মাই গুডনেস।...কী? রক্তে প্যাথোজেন? আর ইউ শিওর, ডক্টর?...ও! মাই!...হুঁ...আই এগ্রি...হুঁ...ঠিক আছে। চলে আসুন, অপেক্ষা করছি।...কে? মিঃ খান্না?...দ্যাটস রাইট। চলে আসুন।

কর্নেল ফোন রাখলেন। জয়ন্তী উদ্বিগ্নমুখে বলল, মর্গ থেকে ফোন করছিল নাকি?

কর্নেলকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বললেন, হ্যাঁ। শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ তেমন কিছু বোঝা যায়নি। হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে, এটুকুই বলা যাচ্ছে। আর রক্তে প্যাথোজেন নামে একরকম সাংঘাতিক জীবাণু পাওয়া গেছে। এসব জীবাণু জন্মায় ফুলগাছের গোড়ায় স্যাঁতসেঁতে মাটিতে। অনেক সময় ফুলদানিতে অনেকদিন ফুল রাখলে তার জলে এরা কলোনি গড়ে তোলে। রক্তের সংস্পর্শে গেলেই চোখের পলকে ঠিক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মতো কোটি-কোটি কলোনি গড়ে তোলে। সম্প্রতি একটা মার্কিন মেডিক্যাল পত্রিকায় পড়ছিলুম, মিয়ামি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পরপর অনেকগুলো অপারেশনের রুগি মারা পড়ে। ডাক্তাররা হতভম্ব। তদন্ত বোর্ড বসল। শেষঅব্দি গোয়েন্দা বিভাগ আসরে নামল। তবু রহস্যের মীমাংসা হল না। অবশেষে দুজন ছোকরা ডাক্তার মরিয়া হয়ে লেগে গেলেন। তারপর আবিষ্কার করলেন যে ওই ওয়ার্ডে একটা ফুলদানিই হচ্ছে অপরাধী! না—না জয়ন্ত, তাই বলে তুমি এ ঘরের ফুলদানি দুটোর দিকে নিষ্ঠুরভাবে তাকিও না। ওই পাহাড়ি অর্কিডে সাজানো টারিলাস ম্যারাইটাভিরাস গোষ্ঠীর ফুল অনেক কষ্টে আমি সংগ্রহ করেছি। প্রতি সকালে তুমি ঘুমিয়ে থাকার সময় ফুলদানি দুটোর জল পাল্টে দিই। জীবাণুনাশক লোশন ঢেলে দিই। অতএব নির্ভয়ে থাকো। আর জয়ন্তী, ডার্লিং! ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ। সেই ছটা থেকে অনেক ঘুরেছ এ বুড়োর সঙ্গে। যথাসময়ে তোমাকে ডাকব।

জয়ন্তী বেরিয়ে গেল। আমি বললুম—মোহন পারেখের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবলেন?

কর্নেল বললেন—ভেবেছি। ও ঠিক আমাদের নীচের তলার স্যুটে ছিল। বেয়ারারা বলেছে, গতকাল দুপুর নাগাদ ও বেরিয়ে যায়। কাউকে কিছু বলে যায়নি। আর ফেরেওনি।

—কিন্তু বদ্রী বলল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ফোন করে ওকে এখানে পেয়েছিল।

—বদ্রীটা সম্ভবত কিছু জানে, গোপন করছে। তবে ওর ভুল হতেও পারে। কারণ, পুলিশের জেরায় ও কবুল করেছে যে পারেখের কণ্ঠস্বর ওর চেনা নয়। তা যদি সত্যি হয়, তা হলে কেউ ওসময় ওর স্যুটে ফোন ধরেছিল।

—কিন্তু স্যুটে তো ডিরেক্ট লাইন নেই! হোটেলের ম্যানেজার কী বলছেন? অপারেটারেরই বা বক্তব্য কী?

—ম্যানেজার কোনও খবর রাখেন না। অপারেটর মেয়েটি বলছে যে সে যথারীতি পারেখসায়েবের স্যুটে কানেকশন দিয়েছিল। কোনও বোর্ডার ঘরে না বাইরে, তার তো জানার কথা নয়। তবে সে দুপক্ষের যা সব কথাবার্তা শুনেছে, তাতে বদ্রীর কথা ঠিকঠাক মিলে যায়।

—অর্থাৎ ওই সময় পারেখের ঘরে কেউ ছিল?

—রাইট, রাইট।

—পারেখের ঘর তো রাত্রেই সার্চ করা হচ্ছিল। কিছু বোঝা গেছে?

—কিচ্ছু না। তেমন কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার দেখা গেল না। তবে কিছু খোওয়া গেছে কি না, বলা কঠিন। বলতে পারত পারেখ নিজে।

—কিন্তু কর্নেল, মিসেস মালহোত্রার লাইন কাটল কে? বদ্রীকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—বদ্রীকে পুলিশও বিশ্বাস করে না। তাই গ্রেফতার করেছে। দেখা যাক।

এই সময় জয়ন্তী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।—কর্নেল! কর্নেল! এ কী কাণ্ড! আমাদের ঘরে কেউ ঢুকেছিল—জিনিসপত্র হাতড়ে একাকার করে রেখেছে!

—সে কী! বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললে—জয়ন্ত, এক মিনিট। আমি আসছি। তুমি তিনটে ব্রেকফাস্ট বলে দাও। খিদে পেয়েছে এবার।

ফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে রাতের পোশাক বদলাচ্ছি, তখন কর্নেল ও জয়ন্তী ফিরলেন। শুধলুম, কী ব্যাপার?

কর্নেল একটু হাসলেন—ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে, মোহন পারেখ বা শ্যামলীর হত্যাকারী ভূতপ্রেত হোক বা মানুষ হোক, একটা কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কী হতে পারে সেটা? এ সার্টেন থিং—কোনও একটা জিনিস, তা অপরের কাছে যত অনাবশ্যক বা তুচ্ছ মনে হোক, তার কাছে জীবনমরণ প্রশ্নে জরুরি। হ্যাঁ—এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জিনিসটা যে কী, তা শ্যামলী আর মোহন পারেখই জানত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই আজ মৃত।

এই সময় ডঃ পট্টনায়কের সাড়া পাওয়া গেল।—আসতে পারি কর্নেল সরকার?

কর্নেল দরজা খুলে বললেন—আসুন, আসুন। আপনারই অপেক্ষা করছি। এখন শুধু ব্রেকফাস্টপর্ব বাকি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে...

ডঃ পট্টনায়ক বসে পড়লেন। তারপর চিন্তিত মুখে বললেন—জীবনে অনেক মড়া ঘেঁটেছি। একসময় তো ডাক্তারিই পেশা ছিল। ভুবনেশ্বর মর্গের চার্জেও ছিলুম কিছুদিন। তারপর তো বিলেতে ফোরেনসিক ডিগ্রি নিয়ে এলুম। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও শিক্ষানবিশি করেছি। কিন্তু কর্নেল, শ্যামলীর ডেডবডি আমাকে এক অদ্ভুত রহস্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিনে। এ এক আজব হেঁয়ালি।

—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন, ডক্টর।

—মৃত্যুর কারণ কমন। আকস্মিক হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু কেন বন্ধ হল হৃৎপিণ্ড? ওইরকম হঠাৎ বন্ধ হলই বা কেন? তার কোনও সূত্র বডিতে নেই। রক্তে অবশ্য প্রচুর প্যাথোজেন পাচ্ছি। কিন্তু প্যাথোজেন—প্রথম কথা, রক্তের সংস্পর্শ না পেলে দেহে ঢুকতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—ঢুকলেও মৃত্যু ঘটাতে অন্তত সাত-আট ঘণ্টা সময় নেয়। এই সময়টার পর্ব ভাগ করা যায়।

BanglaBook.org

প্রথমে শুরু হয় অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, ঘুম-ঘুম ভাব। দ্বিতীয় পর্বে আক্রান্ত স্থান ফুলতে শুরু করে। বেদনা বাড়ে। জ্বর আসে প্রচণ্ড। চোখের তারা লাল হয়ে যায়। তৃতীয় পর্বে আরম্ভ হয় প্রলাপ বকা। খিঁচুনি। মুখে ফেনা জমে ওঠা। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ। তারপর শ্বাসকষ্ট এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই হার্ট ফেল করে। এখন বলুন কর্নেল, প্যাথোজেন কীভাবে শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ বলি?

কর্নেল বললেন, তা তো বটেই।

—অথচ ব্লাডে প্যাথোজেন রয়েছে। কী ভাবে এল এই জীবাণু? দেহে কোনও ক্ষত নেই শ্যামলীর।

—ইনজেকশনের কোনও চিহ্নও পাননি।

—পাইনি। সে তো আপনাকে ফোনেই বলেছি তখন।..ডঃ পট্টনায়ক একটু হাসলেন।—এই প্যাথোজেনই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তা না হলে মৃত্যুটার একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া যেত—ভূতের হাতে মৃত্যু।

কর্নেল একটু নড়ে বসলেন।—আচ্ছা ডঃ পট্টনায়ক, শ্যামলীর কোনওরকম অসুখ-বিসুখের চিহ্ন কি পেয়েছেন বডিতে?

মাথা নাড়লেন ডঃ পট্টনায়ক।—কিছু পাইনি। সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল—নীরোগ ছিল। এমন কোনও অবস্থা তার দেহে দেখিনি, যাতে কোনও অসুখের আভাস মেলে। অবশ্য, ওই প্যাথোজেনঘটিত প্রতিক্রিয়াটা বাদে।

—ডঃ পট্টনায়ক, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আমি যদ্দুর জানি, প্যাথোজেন দেহে ঢোকার পর কলোনি ফর্ম করতে শুরু করে সেকেন্ডে হাজার কোটি হিসেবে। এরকম চলে কমপক্ষে দু-ঘণ্টা। এই পর্যায়ের কলোনির চেহারা ঠিক গুচ্ছ-গুচ্ছ। পরের পর্যায়ের দু-ঘণ্টা সেকেন্ডে পাঁচশো কোটিতে দাঁড়ায়। এই কলোনির চেহারাও গুচ্ছ-গুচ্ছ—কিন্তু একটি করে বৃত্ত থাকে। একেকটি বৃত্তে এক কোটি করে গুচ্ছ। তৃতীয় পর্যায়ে কলোনি গড়ার গতি আরও মন্থর—সেকেন্ডে আড়াইশো কোটি। গুচ্ছ-বৃত্তগুলো এবার ঠিক বৃত্ত বলা যায় না—বলা যায় ডিম্বাকৃতি। চতুর্থ পর্যায়ে আবার গোড়ার মতো সরলরেখায় চলে। কিন্তু গুচ্ছগুলো অনেক বড়। গোড়ায় একটা গুচ্ছের মাপ থাকে এক বাই লক্ষ সেন্টিমিটার। শেষ ধাপে গুচ্ছের মাপ হয় এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সেন্টিমিটারের কিছু বেশি।

ডঃ পট্টনায়ক হাঁ করে শুনছিলেন। এবার বললেন, ওয়ান্ডারফুল!

—হ্যাঁ। এ আমার সামান্য পড়াশোনার ফলাফল মাত্র। এখন তা হলে শুনুন ডঃ পট্টনায়ক। কারও দেহে প্যাথোজেন সংক্রামিত হলে এটা বের করা সম্ভব যে, ঠিক কোন জায়গা দিয়ে ওই মারাত্মক জীবাণু ঢুকেছে। প্রথম পর্যায়ের কলোনির চেহারা ও মাপ নিয়ে এবং দেহের যেখানে ওগুলো পাওয়া গেছে, সেখানে খুঁজলেই অবশ্য আমরা প্রথম আক্রমণের জায়গাটি দেখতে পাব।

কর্নেল থামতেই ডঃ পট্টনায়ক লাফিয়ে উঠলেন—তাই তো! তাই তো। এদিকটা তো ভাবিইনি!...বলে তিনি ফোন তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, রাজেশ্বর-ইস্ট হ্যারিংটন হসপিটাল প্লিজ।

তারপর ফোনে কান রেখে আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, এতক্ষণ ডেডবডিটার কী অবস্থা কে জানে?

জয়ন্তী বলে উঠল, কী অবস্থা মানে? ডেডবডি আমরা নেব যে।

আমি বললুম, টেলি-যোগাযোগ চালু করতে এক সপ্তাহ লেগে যাবে। শ্যামলীর আত্মীয়স্বজনের ভাগ্যে বডি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই সময় ব্রেকফাস্ট এসে গেল।

BanglaBook.org

ডঃ পট্টনায়ক লাইন পেলেন।—হ্যালো। হ্যারিংটন? ডঃ প্রসাদকে দিন।...ডঃ প্রসাদ, পট্টনায়ক বলছি। জরুরি ব্যাপার। ডেডবডিটা অ্যাজ ইট ইজ আছে তো?...আছে? প্লিজ—তাই রাখুন।...না, না। আমি এখনই যাচ্ছি। একটা ভুল...হ্যাঁ, যাচ্ছি।

ডঃ পট্টনায়ক উঠে দাঁড়ালেন।—কর্নেল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাপারটা আমি ভাবিইনি আদতে। ঠিক আছে—চললুম।

কর্নেল বললেন, আমাকে মিসেস মালহোত্রার ওখানে পেয়ে যাবেন। এখনই বেরোব আমরা।

ডঃ পট্টনায়ক বেরিয়ে গেলেন ব্যস্তভাবে।...

সেই বিভীষিকার স্মৃতিজড়ানো ঘরটাতে কর্নেলের সঙ্গে ঢুকে আবার আমার অস্বস্তি জেগে উঠেছিল। ঘরের যেখানে যা ছিল, একটুও নড়চড় করা হয়নি। গত রাতের গোলটেবিল আর তাকে ঘিরে আটটা চেয়ার একই অবস্থায় আছে। পারেখ সাহেবের জন্যে বদ্রী যে চেয়ারটা রেখেছিল এবং শ্রীমতী মালহোত্রা যেখানে সরিয়ে রেখেছিলেন, সেটা সেখানেই আছে। রাতে পুলিশ এসে পড়ার পর থেকে বাড়িটা প্রকৃতপক্ষে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

আমার বিভ্রম ঘটছিল। মনে হচ্ছিল, ওই শূন্য চেয়ারটায় এখনও শ্যামলীকে যেন দেখতে পাচ্ছি—সেই বীভৎস কালচে মুখ একদিকে কাত হয়ে আছে। পুলিশ অফিসার শ্রীখান্না আর কর্নেল ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলেন। ঘরের মধ্যে সকালের উজ্জ্বল আলো এসে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অস্বস্তি খানিকটা দূর হল।

খান্না ঘরটার ভেতর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে আততায়ী এই ঘরে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল। এতে কোনও ভুল নেই। এত সব বইয়ের শেলফ আর আলমারি চারদিকে। পিছনে ফাঁক যেটুকু আছে, একজন লোক কাত হয়ে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না।

এই বলে তিনি শ্যামলীর চেয়ারের এক মিটার দূরে বড় আলমারির পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কর্নেল বললেন, অবশ্য সবই অনুমান। এবং অনুমান কখনও সিদ্ধান্ত নয় মিঃ খান্না।

—তা যদি বলেন, আমি বলব, অনুমানটা যুক্তিসিদ্ধ।...খান্না সরে গিয়ে পাশের জানলার কাছে গেলেন।—জানলাগুলো সবই বন্ধ ছিল। কাজেই বাইরে থেকে কেউ যে কিছু ছুড়ে মারবে শ্যামলীর দিকে, তাও অসম্ভব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ছুড়বেটা কী শুনি?

—ধরুন, কোনও বিষাক্ত সুচলো অস্ত্র। এমন সূক্ষ্ম অস্ত্র কি থাকতে পারে না কর্নেল?

—খুব পারে। বিদেশে পেশাদার এক হত্যাকারী একরকম যন্ত্র বানিয়েছিল। রিভলভারের মতো দেখতে। গুলির বদলে নল দিয়ে দু-ইঞ্চি সূক্ষ্ম ইঞ্জেকশানের সূচের মতো বিষাক্ত তীর ছুড়ে মারত। ভিকটিম সঙ্গে-সঙ্গে ঢলে পড়ত। এই বিষ কিন্তু আমাদের সভ্যজগতের জানাশোনা বস্তু নয়। ব্রাজিলের আমাজন নদের অববাহিকায় যে হাজার-হাজার বর্গমাইল জঙ্গল রয়েছে, সেখানকার জিভারো নামে এক আদিম জাত 'নাটেমা' নামে একরকম সুতীব্র বিষ তৈরি করে। তা সামান্য পরিমাণে তীরে মাখিয়ে তারা শিকার করতে অভ্যস্ত। সেই হত্যাকারী কীভাবে নাটেমা জোগাড় করেছিল কে জানে, তার অদ্ভুত ব্লো-গানের সাহায্যে দিব্যি হত্যার পর হত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তো আক্কেল গুড়ুম...!

খান্না সোৎসাহে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, কর্নেল, কর্নেল। এক্ষেত্রেও যেন তাই হয়েছে অবিকল। কারণ, ডেডবডিতে আমাদের ডাক্তাররা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা পড়ার মতো কোনও জিনিস খুঁজে পাননি। এ সেই নাটেমার কাজ নয় তো?

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। আপনমনে অস্পষ্ট স্বরে দুর্বোধ্য কী আওড়ালেন। তার মধ্যে দুটো শব্দ বোঝা গেল—'নাটেমা', 'প্যাথোজেন'।

খান্না তাঁকে অবাক হয়ে লক্ষ করার পর বললেন, এনিথিং সিরিয়াস, কর্নেল?

কর্নেল আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন।—না, তেমন কিছু নয়। মিঃ খান্না, এবার আমাদের ডাইনিং হলে যেতে হবে।

—সে কী! আপনার এর মধ্যেই ডিটেল পরীক্ষা হয়ে গেল নাকি? বলেছিলেন, দিনের আলোয় ঘরটা খুঁটিয়ে দেখবেন!

—নাঃ, দেখার কিছু নেই।.. বলে কর্নেল ফের একটু হাসলেন।

—মিসেস মালহোত্রার বইয়ের সংগ্রহ দেখাটাই উদ্দেশ্য ছিল আসলে। কী কাণ্ড! শুধু প্রেততত্ত্ব, প্যারাসাইকলজি আর দর্শনের বইতে ভর্তি। সত্যি, ভদ্রমহিলার পাণ্ডিত্যের কোনও তুলনা হয় না! কী জয়ন্ত, তুমি মুখ বুজে রয়েছ যে? বলো—কিছু বলো।

বললুম, কী বলব? আমি যদি কর্নেল সরকার হতুম, তা হলে অন্তত এ ঘরে একটা ব্যাপার চোখ এড়িয়ে যেত না যে .।

কর্নেল আমাকে থামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে বললেন, বলে যাও।

—দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দুটো চলছে না। আটটা পাঁচ মিনিটে আটকে আছে।

খান্না দ্রুত নিজের ঘড়ি দেখলেন। তাঁর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কর্নেল মুখ তুলে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই। আমি এই রহস্যের আবিষ্কর্তা হিসেবে খুবই গর্বিত বোধ করছিলুম। মনে-মনে বলছিলুম, কী গোয়েন্দাপ্রবর? তা হলে অনেক ব্যাপার তোমারও চোখ এড়িয়ে যায় বটে তো?

খান্না রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন, ঘড়িটা বন্ধ দেখছি? রাত্রে তো লক্ষ করিনি আমরা!

এবার কর্নেল মুখ নামালেন। মুখটা দারুণ গম্ভীর। বললেন, হুম! ঠিক ওই সময়ই শ্যামলীকে মৃত অবস্থায় আমরা দেখতে পাই—অর্থাৎ তখনই মিসেস মালহোত্রা বড় আলো জ্বেলে দেন। আমি অভ্যেসমতো তখন নিজের ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। তারপরই দেখছি, ওই দেওয়ালঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে! ভারী আশ্চর্য তো!

খান্না ব্যস্তভাবে বললেন, মিসেস মালহোত্রা কিছু বলতে পারেন নাকি দেখা যাক। এক মিনিট—আসছি।

উনি ডাইনিং হলের দিকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। রাত্রেই এ ঘরের চাবি উনি শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে নিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল ঘড়িটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে সপ্রশংস স্বরে বললেন, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, জয়ন্ত।

বললুম, তা হলে দেখুন, আপনার সঙ্গগুণে আমিও সহস্রাক্ষ হতে পেরেছি!

কর্নেল মিটিমিটি চোখে হেসে বললেন, তবে কী জয়ন্ত, জানো? চোখ দুটোই থাক, আর হাজারটাই থাক—খুব কাছে দেখলে সব জিনিসই ঝাপসা লাগে!

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম, শ্রীমতী মালহোত্রা এসে পড়লেন।—কী ব্যাপার? ঘড়ি বন্ধ? সে কী? ঘড়ি তো কেউ বন্ধ করিনি আমরা! হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কোনও কারণও তো নেই। ইলেকট্রনিক সিস্টেমে তৈরি একেবারে মডার্ন জিনিস! আমার পরলোকগত স্বামীর পার্টনার বিদেশ থেকে এনে উপহার দিয়েছিলেন। এত ভালো সার্ভিস কোনও ঘড়ি দেয় না!

কর্নেল বললেন, তা হলে ওটা ইলেকট্রিক কারেন্টে চলে মিসেস মালহোত্রা?

—হ্যাঁ...বলে শ্রীমতী মালহোত্রা ঘড়িটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বললেন ফের—আশ্চর্য, পরম আশ্চর্য ঘটনা! ঠিক এ সময় অশরীরী আত্মাটা শ্যামলীকে মেরে

BanglaBook.org

রেখে চলে যায় গত রাতে। আটটা পাঁচ...ঘড়ি দেখে নিয়েছিলুম তক্ষুনি...।

—কোন ঘড়ি?

—রিস্টওয়াচ।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, মিসেস মালহোত্রা, অনুগ্রহ করে আর একটা কথার জবাব দিন। আপনার চেয়ার থেকে ওই ঘড়িটা সোজা তাকালেই চোখে পড়ে। গত রাতে প্রথম আলো বা দ্বিতীয় আলোটা জ্বালার পর তো স্বভাবতই আপনার ওদিকে চোখ পড়া উচিত ছিল!

শ্রীমতী মালহোত্রা গম্ভীর মুখে বললেন, ছিল, অবশ্যই ছিল। কিন্তু কেন যে ওদিকে তাকাইনি, সেটা এখন বলা কঠিন। তবে একটা সহজ ও সঙ্গত কৈফিয়ত আমি দিতে পারি। প্রেতশক্তিতে যারই বিশ্বাস আছে, সেই পারে কর্নেল! সে আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল।

—কিন্তু আপনি তখন আলো জ্বেলেছিলেন কেন, তা আশা করি স্মরণ আছে মিসেস মালহোত্রা। আপনি শ্যামলীকে অবিশ্বাস করেই রেগে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রেতশক্তি সত্যি-সত্যি আসেনি এই বিশ্বাসেই আলো জ্বেলেছিলেন!

শ্রীমতী মালহোত্রা এবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রেতশক্তি সত্যিই এসেছিল, অস্বীকার করতে পারেন? আপনিও তো ছিলেন কর্নেল। বলুন, আপনিও কি অভিভূত বা হতভম্ব হয়ে পড়েননি তখন? আপনিও কি অন্য কোনওদিকে তাকাবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

কর্নেল হার মেনে বললেন, রাইট, রাইট। আই এগ্রি, ম্যাডাম। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র শ্যামলীই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বটে।

এইসময় মিঃ খান্না বলে উঠলেন, মাই গুডনেস! কর্নেল! মিসেস মালহোত্রা! ঘড়ির পিছনে ইলেকট্রিক তারটা কাটা রয়েছে যে!

এবার খান্নার দিকে চোখ গেল সবার। এতক্ষণ তিনি ঘড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কী সব দেখছিলেন। আমরা গিয়ে দেখলুম, ঠিক তাই বটে।

কিন্তু শ্রীমতী মালহোত্রা সন্দেহাকুল হয়ে বললেন, তারটা জ্বলে যায়নি তো মিঃ খান্না?

—না ম্যাডাম। সুন্দরভাবে ধারালো কিছু দিয়ে কাটা হয়েছে!

শ্রীমতী মালহোত্রা যেন শিউরে উঠলেন।—ফোনের লাইনও অমনিভাবে কে কেটে রেখেছে! কেন—কেন কর্নেল? কী উদ্দেশ্যে ছিল সেই অশরীরী আত্মার?

অসহায় দেখাচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে। কর্নেল বললেন, আপনার প্রেততত্ত্বে কী বলে জানি না। প্রেতশক্তি কি এমন কিছু করে? পড়েছেন এমন কোনও ঘটনার কথা?

শ্রীমতী মালহোত্রা উদ্বিগ্নমুখে জবাব দিলেন, কিচ্ছু অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে। অনেক অদ্ভুত ঘটনার কথা নিশ্চয় পড়েছি।

খান্না সকৌতুকে বললেন, প্রেতশক্তি ছুরি ব্যবহার করেছে নাকি?

শ্রীমতী মালহোত্রা ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, পার্থিব অস্ত্র ব্যবহার করার দরকারই হয় না ওদের। ইচ্ছে করলেই সব ঘটে যায়। বড় গাছ বিনা ঝড়ে আচমকা ভেঙে পড়ার কথা কি শোনেননি আপনারা? শোনেননি, সেবারে হঠাৎ ভূতের পাহাড়ের ওপর থেকে তিনশো টন একটা পাথর পড়ে গিয়েছিল দিনদুপুরে? বস্তুবাদী বিজ্ঞান বলবে এই-এই কারণে এটা ঘটেছে। কিন্তু কারণেরও কারণ থাকে।

কর্নেল অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন যেন। হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মিসেস মালহোত্রা, আপনার ওই ঘড়িটার তো দেখছি পেন্ডুলাম নেই। কিন্তু টিকটিক শব্দ করতে তো বারণ নেই। রাত্রে আমরা তেমন কোনও শব্দ শুনিনি কিন্তু।

—না। ইলেকট্রনিক সিস্টেম থাকায় ওটা নিঃশব্দে চলে।

BanglaBook.org

—ঘণ্টাও কি বাজে না?

শ্রীমতী মালহোত্রা চমকে উঠে বললেন, বাজে তো।

—কিন্তু গত রাত্রে আমরা ঘড়িটা বাজতে শুনিনি।

শ্রীমতী মালহোত্রার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।—তাই তো! হ্যাঁ—ঘড়িটা তো বাজেনি। আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য! আমার তো একটু খেয়াল ছিল না।

এতক্ষণ ধরে এই ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনে আমার কান গরম হয়ে উঠেছিল। তাই বললুম, আপনারা কথা বলুন, কর্নেল। আমি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করি ততক্ষণ।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখ জয়ন্ত, বেচারা জয়ন্তী এতক্ষণ ওঘরে হাঁপিয়ে উঠেছে। তুমি ওকে সঙ্গ দাও। আমরা আসছি। মিঃ খান্না, ওকে দরজা খুলে দিন।

—ইন্টারলকিং সিস্টেমের এই এক জ্বালা!—বলে মিঃ খান্না দরজা খুলে দিলেন।

আমি ডাইনিং হলে গিয়ে জয়ন্তীকে খুঁজলুম। বা রে! গেল কোথায় সে? এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার জন্যে রেগে হোটেলে ফিরে গেল নাকি? দরজার বাইরে তিন-চারজন কনস্টেবল বসে ছিল। ভেতরে একজন সাব-ইন্সপেক্টর কোনার সোফায় বসে পুরোনো কাগজ পড়ছিলেন। এর আগেই আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম ব্রিজেশ সিং। আমাকে দেখে বললেন—ওঁদের বেরোতে দেরি হবে নাকি চৌধুরী সাহাব?

—হতে পারে। ইয়ে মিঃ সিং, আমাদের সঙ্গের ভদ্রমহিলা কোথায় গেলেন বলুন তো?

ব্রিজেশ সিং হাসলেন।—স্ত্রীলোকেরা স্যার বড্ড সাম্প্রদায়িক। সুতরাং মিস রায়কে কিচেনের দিকে যেতে দেখেছি এবং সরযূর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি।

আমি একটু ইতস্তত করে ডাইনিংয়ের শেষ দিকে কিচেনের কাছে এগিয়ে গেলুম। ওখানে যেতেই জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর কানে এল। ডাকব কি না ভাবছি, লছমন নামে বুড়ো চাকরটা পরদা তুলে বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে সেলাম দিয়ে বলল, দিদিজিকে খুঁজছেন স্যার? সরযূর সঙ্গে গপসপ করছেন। ডেকে দিচ্ছি।

সে চলে গেল। তারপর জয়ন্তী বেরিয়ে এল। বললুম, রাগ করেননি তো? আপনি আমাদের সঙ্গে ওঘরে যেতে চাইলেন না—তো কী করব?

জয়ন্তী বলল, ওঘরে প্রাণ গেলেও যেতে পারব না। সব মনে পড়ে যাবে যে।

—না, আর যেতে বলতে আসিনি। চলুন, বাইরে লনে যাই।

—চলুন!

লনে কনস্টেবল আর কিছু পুলিশ অফিসার রয়েছেন। আমরা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেলুম। সুন্দর ফুলবাগিচা আর গাছপালা আছে সেদিকটায়। একটা ফুলেভরা মেখুগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালুম। সেই সময় জয়ন্তী চাপা গলায় বলল, জয়ন্তবাবু, সরযূর কাছে একটা অদ্ভুত কথা আদায় করতে পেরেছি!

—কী বলুন তো?

জয়ন্তী কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলল, টেলিফোন লাইনটা মিসেস মালহোত্রাকে ও নিজে হাতে কাটতে দেখেছে। আমাদের লনে বসিয়ে রেখে একবার বাড়ি ঢুকলেন, মনে পড়ছে—ছ'টা বা ওইসময় নাগাদ? তখনই নাকি সরযূ দেখে ব্যাপারটা। সে বলল, মাইজি স্রেফ পাগলি। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কাণ্ড করে আসছেন—মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না সরযূরা। তা, সরযূ কথাটা বদ্রীকে না বলে পারেনি। তখন বদ্রী ওকে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা শোনায়। মাইজি নাকি স্টাডিতে ঢুকে—।

—ইলেকট্রনিক ঘড়ির তার কেটেছেন, এই তো?

জয়ন্তী সবিস্ময়ে বলে উঠল, জানেন আপনি? কীভাবে জানলেন? আশ্চর্য তো!

BanglaBook.org

চার ঃ শ্রীমতী মালহোত্রার কাণ্ড

জয়ন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে এবার শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িটা দিনের আলোয় খুঁটিয়ে দেখছিলুম। আমরা আছি একেবারে দক্ষিণের শেষপ্রান্তে। ফুট পাঁচেক উঁচু পাঁচিলের নীচে ঝোপজঙ্গল এবং তারপর খাড়া নেমে গেছে পাথরের দেওয়াল। বোঝা গেল একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মাথা সমতল করে বাড়ি ও সংলগ্ন প্রাঙ্গণটা গড়ে উঠেছিল কবে। পাহাড়টা উত্তরের বড় রাস্তার গা ঘেঁষে উঠেছিল। ওই দিকটা ছাড়া বাকি তিন দিকেই ঢালু বা খাড়া পাথরের দেওয়াল, কোথাও বা ফাটলে ঝোপঝাড় গাছপালা গজিয়ে রয়েছে। মনে হল, এ বেশ চমৎকার একটা দুর্গ।

জয়ন্তী যে বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাতে কোনও ভুল নেই। সে সরযূর কাছে বাড়িটার ইতিহাস জেনে নিয়েছে। এ এক অপয়া বাড়ি নাকি। মালহোত্রা সায়েবের প্রবল আপত্তি ছিল কিনতে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়াঝাঁটি হত। শেষ অবধি তিনি যখন গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, তখন মাইজির কিনে ফেলতে অসুবিধে হল না। এদিকে কলেজেও বিটায়ার করার বয়েস হল। তখন সোজা এখানে এসে উঠলেন।

জয়ন্তী এইসব গল্প করার পর বলল, তা হলে দেখুন, আমার বদ্ধমূল ধারণা যে ওই ভদ্রমহিলাই শ্যামলীর মৃত্যুর কারণ। কর্নেলকে এটা কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না।

বললুম, কর্নেল বড্ড একগুঁয়ে মানুষ। কিন্তু ঘড়ি আর ফোনের তার কাটার পর মিসেস মালহোত্রাকে আর সন্দেহ না করে উপায় নেই। তবে কী জানেন? একটা সঙ্গত মোটিভ (উদ্দেশ্য) সব ডেলিবারেট বা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পিছনে থাকে। শ্যামলীকে হত্যার উদ্দেশ্যটা কী, সেটাই এখন জানা যাচ্ছে না।

জয়ন্তী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আপনি যদি প্রেতশক্তিতে বিশ্বাস করেন, তা হলে হত্যার মোটিভ খোঁজার প্রশ্নই উঠবে না। জীবনে যারা অতৃপ্ত থেকে যায়, মৃত্যুর পর তারা জীবিত মানুষদের ওপর সুযোগ পেলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে সুযোগটা করে দিলেন ওই ভদ্রমহিলা। কাজেই শ্যামলীর মৃত্যুর জন্যে উনিই দায়ী।

—কিন্তু ঘড়ি আর ফোনের তার কাটার উদ্দেশ্য কী?

জয়ন্তী তার ধারণার সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে খুব ব্যগ্র হল। বলল, আমি ব্যাপারটা যেভাবে বুঝেছি, আপনাকে বলি, শুনুন। মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে প্রেতশক্তিদের যোগাযোগ আছে। উনি বলছিলেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর উনি থিওজফি বা প্রেততত্ত্বের চর্চা শুরু করেন, তা মিথ্যে। সরযূ সব বলেছে। ভূতপ্রেত নিয়ে ওঁর উৎসাহ তার অনেক আগে থেকে। এখনও অনেকে সন্দেহ করে ওঁর স্বামীর জিপ পাহাড়ি খাদে উলটে যাওয়ার পিছনে ওঁর কারসাজি ছিল। কোনও দুষ্ট আত্মাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। যাই হোক, এটা এইসব পাহাড়ি এলাকার লোকেদের চিরাচরিত কুসংস্কার বলা যেত। কিন্তু গতরাত্রে যা ঘটতে দেখেছি, তাতে আমি কনভিন্সড। তর্ক করবেন না। এবার শুনুন—কীভাবে কী ঘটেছে।

হাসি লুকিয়ে বললুম—বলুন না, শুনে যাচ্ছি।

—সরযূ বলেছে, বোম্বের গায়ক ভদ্রলোক মোহন পারেখকে মাইজি পেটের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। সরযূর ভয় হত, দুষ্ট আত্মারা তো তাঁদের স্বভাব অনুযায়ী বেছে-বেছে মাইজির প্রিয়জনদেরই মারবার তালে থাকবে। এ বেচারার আবার কিছু বিপদ না হয়! সরযূ ভেবেছিল, পারেখজিকে সতর্ক করে দেবে গোপনে। কিন্তু সুযোগ পায়নি। ব্যস, পারেখজিকে ভূতের পাহাড়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল! এখন আমার ধারণা, হোটেলে থাকার সময় এই পারেখ ভদ্রলোক নিশ্চয় শ্যামলীর প্রতি মনে-মনে লোভী হয়ে পড়েছিলেন!

—কিন্তু তার প্রমাণ কী?

BanglaBook.org

জয়ন্তী এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল—আর লুকিয়ে লাভ নেই, আপনাকেই বলছি। শ্যামলীর সঙ্গে পারেখের আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার নিষেধ কানে নেয়নি শ্যামলী। ওঁর ঘরে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসত।

—বলেন কী।

—হ্যাঁ। শ্যামলীর ওই একটা দুর্বলতা ছিল। ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের বিখ্যাত লোকদের প্রতি ওর প্রচণ্ড মোহ ছিল।

—হুঁ, তারপর?

—তারপর যা হয়েছে, খুব সোজা। পারেখ খাদে পড়ে মারা গেলেন, কিন্তু মনের অতৃপ্ত বাসনা তো নষ্ট হওয়ার নয়। কাল সন্ধ্যার আগে কতক্ষণ সেই খাদের অত কাছে শ্যামলী দাঁড়িয়ে রইল। পারেখের আত্মা ওকে অমনি বাগে পেয়ে গেল। পিছু নিল। তাই স্বাভাবিক নয়?

জয়ন্তী যেভাবে গাম্ভীর্য ও গুরুত্বসহকারে কথাগুলো বলল, আমার মনে যেন একটা চাপা অস্বস্তি ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। সত্যি কি প্রেতশক্তি বা অতৃপ্ত আত্মা বলে কিছু আছে? প্রকাশ্যে অন্যমনস্কভাবে বললুম—হুঁ, সেটা স্বাভাবিক।

জয়ন্তী দুঃখিত মুখে বলতে থাকল—জানেন? মানুষের মনে যেন কী আছে। যাকে ভালোবাসি কিংবা যার জন্যে মনে-মনে ভাবি, তার সঙ্গে যেন একটা অদৃশ্য মেন্টাল ওয়েভ বা ভাব-তরঙ্গের যোগাযোগ ঘটে। মিসেস মালহোত্রার থিওরি খুবই সত্য। প্যারাসাইকলজির ব্যাপারটা আমিও কিছুটা জেনেছি। একশো মাইল দূরে ধরুন কোনও প্রিয়জন আছেন—হঠাৎ এখানে আমার মনে অস্বস্তি জাগল তাঁর সম্পর্কে। পরে খবর এল—তিনি অসুস্থ বা মারা গেছেন—ঠিক ওই একই সময়ে। এরকম ঘটনা তো কত ঘটে আসছে!

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—ঠিক এভাবেই মোহন পারেখের মৃত্যুর ব্যাপারটা নিশ্চয় শ্যামলী অবচেতন মনে টের পেয়ে থাকবে। তা না হলে একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা কেন বলেছিল সে? আসলে স্বপ্ন কথাটা ওর বানানো। ও আমাকে ওর মনের গোপন অস্বস্তির কথাটা বলতে লজ্জা পেয়েছিল। তাই বানিয়ে যা-তা একটা বলে অবচেতন প্রক্ষোভ শান্ত করতে চেয়েছিল। এবং শেষ অবধি আর না থাকতে পেরে ভূতের পাহাড়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন আপনারাও তো গিয়েছিলেন। কেমন অন্যমনস্ক মনে হয়নি ওকে?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা চোখ এড়ায়নি আমার।

—শুধু তাই নয়, ওকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। যেন নিশির ডাকে চলে-আসা মানুষের মতো। কথা বলছিল যেন ঘুমের ঘোরে।

অতটা মনে হয়নি আমার। তবে জয়ন্তীকে সায় দিতে হল। বললুম, ঠিক, ঠিক।

জয়ন্তী সোৎসাহে বলল, আর ফেরার পথেই পড়বি তো পড়, একেবারে মিসেস মালহোত্রার পাল্লায়! কর্নেল সায়েব একটা উপলক্ষ মাত্র। তার ওপর দেখুন, প্ল্যানচেটের ব্যাপারও তখন একেবারে ঠিকঠাক পরিকল্পিত হয়ে রয়েছে। এগুলো সবই কি নিছক আকস্মিক যোগাযোগ বলে উড়িয়ে দেবেন?

—আপনি ঠিকই বলছেন জয়ন্তীদেবী। কিন্তু ফোন আর ঘড়ির তার...

বাধা দিয়ে জয়ন্তী বলল, প্রথমে ঘড়ির তার কাটার কথা বলি। মিসেস মালহোত্রা শ্যামলীর মৃত্যুর সময় চিহ্নিত করেছিলেন। প্রেতশক্তির নির্দেশেই করেছিলেন। রাত আটটা পাঁচে...

চমকে উঠে বাধা দিলুম—আপনি তো আজ ওঘরে যাননি। কেমন করে জানলেন ঘড়ির কাঁটা আটটা পাঁচে থেমে আছে?

জয়ন্তী হাসল একটু।—গত রাতে ওঘরে ঢোকার সময় আমার চোখ পড়েছিল ঘড়িটার দিকে। তখন তো মোটে সাতটা প্রায়। তাই ঘড়িতে আটটা পাঁচ দেখে অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু প্ল্যানচেটের

BanglaBook.org

আসর বসবে—সব উত্তেজনা তাই নিয়ে। ফলে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

—আশ্চর্য, কেন যে আমি ওদিকে তাকাইনি।

—আপনার চোখ সারাক্ষণ ছিল শ্যামলীর দিকে।

হাসি পেল।—কে জানে! তা এবার ফোনের তার কাটার উদ্দেশ্য বলুন।

—মিসেস মালহোত্রা চাননি যে তক্ষুনি পুলিশ এসে হাঙ্গামা বাধাক। মতলব ছিল, ব্যাপারটা যে-কোনও ভাবে সামলাবেন ততক্ষণে।

—বা রে! পায়ে হেঁটে তো থানায় গিয়ে খবর দেওয়া যায়। একঘণ্টা দেরি হয় বড়জোর! নাঃ, আপনার এ ধারণাটার কোনও যুক্তি নেই জয়ন্তীদেবী। আমি বদ্রীকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুমও বটে।

জয়ন্তী একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মিসেস মালহোত্রা সময় চেয়েছিলেন—তা সে যে জন্যেই হোক। এবং পেয়েছিলেনও। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আপনারা পুলিশ নিয়ে এলেন।

—কিন্তু কর্নেলের মতো ধুরন্ধর লোক তো সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। মিসেস মালহোত্রার তেমন কোনও উদ্দেশ্য থাকলে তা ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ খান্নার চেয়ে কর্নেলের বুদ্ধিচাতুর্য বা অপরাধতত্ত্বের ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশি জয়ন্তীদেবী।

জয়ন্তী ফের একটু ভেবে বলল, তা হলে বলব, কর্নেল সম্পর্কে মিসেস মালহোত্রার ধারণা হয়তো স্পষ্ট নয়। ওঁর সঙ্গে পরিচয় কতদিনের জানেন?

—শুনেছি। এখানে এসেই আলাপ হয়েছে ওঁদের। জয়ন্তী লাফিয়ে উঠল—আমার থিওরি কারেক্ট। ভদ্রমহিলা কর্নেলের পরিচয় জানেন না।

—বেশ। কিন্তু কিছুটা সময় কেন দরকার হয়েছিল মিসেস মালহোত্রার, তা ভেবেছেন কি?

জয়ন্তী মাথা দুলিয়ে বলল, সেটাই বুঝতে পারছিনে। ফোনের তার কাটার আর কিছু উদ্দেশ্য মাথায় ঢুকছে না।

—তা ছাড়া, কাটা তার জোড়া দিলেই তো ফোন আবার চালু হয়ে যায়। ধরে নিচ্ছি, তাতেও কিছুটা সময় লাগছে। কিন্তু...নাঃ, আপনার এই ব্যাখ্যাটা মানা গেল না।

জয়ন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, অশরীরী আত্মাদের ব্যাপার বুঝতে পারে একমাত্র তারাই, যাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। কে বলতে পারে, সরযূ যাকে তার কাটতে দেখেছিল তিনি সত্যি-সত্যি মিসেস মালহোত্রা নন—তাঁর চেহারা ধরেছিল কোনও প্রেতশক্তি!

এই সময় লছমন নামে মিসেস মালহোত্রার লোকটা এল। সেলাম করে সবিনয়ে বলল, কর্নেল সাহাব আপনাদের সেলাম দিয়েছেন।

আমরা দুজনে তক্ষুনি এগিয়ে গেলুম। ডাইনিং হলে ঢুকে দেখি, রঘুবীর জয়সোয়াল, অধ্যাপক দ্বিবেদী আর ডঃ পট্টনায়ক কখন এসে পড়েছেন। শ্রীমতী মালহোত্রা ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক করছেন। কর্নেল আমাদের দেখে ঈষৎ হেসে চাপাস্বরে বললেন, এই যে জয়জয়ন্তী!

কর্নেলের বেমক্কা রসিকতায় জয়ন্তীর মুখটা লাল হয়ে গেল—আড়চোখে দেখলুম। বললুম, কর্নেল, আবার প্ল্যানচেটের আসর নাকি?

কর্নেল তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেলেন—হুম! আপাতত চায়ের আসর। তোমরা বসে পড়ো।

একটু পরেই চা এসে গেল। চা খেতে-খেতে কর্নেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। গত রাতে মিঃ খান্না যথারীতি প্রত্যেকের কাছে একটা করে বিবৃতি নিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও অনেক নতুন তথ্য আমরা জেনেছি, যেগুলো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অতএব আবার আপনাদের বিরক্ত করতে আমরা বাধ্য হব।

অধ্যাপক দ্বিবেদী বলে উঠলেন, অবশ্য, অবশ্য। এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের একটা ফয়সালা

BanglaBook.org

করার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই কষ্ট স্বীকার করা উচিত।

জয়সোয়াল মাথা নেড়ে বললেন, আই এগ্রি।

কর্নেল বললেন, আপনাদের স্মরণশক্তিকে সাহায্য করা হবে ভেবে আমরা হত্যাকাণ্ডের জায়গাতেই একে-একে ডাকব এবং কিছু প্রশ্ন করব।

অধ্যাপক খুশি হয়ে বললেন, ভেরি ওয়েল! তারপর নিশ্চয় আমরা এই নজরবন্দি দশা থেকে মুক্তি পাব!

উনি জোরে হাসলেন কথাটা বলার পর এবং তা নিশ্চয় শুকনো হাসি। ওঁকে সমর্থন করে জয়সোয়াল বললেন, যত খুশি প্রশ্ন করুন, আপত্তি নেই। এবং আমাকে সন্দেহ-ভাজন মনে না হলে আশা করি আমি যেন আগামীকাল নৈনিতাল পৌঁছে যেতে পারি! সেখানে আমার জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একটা।

মিঃ খান্না বললেন, কার্যত আপনারা স্যার আমাদের হাতে না হলেও প্রকৃতির হাতে এখন বন্দি। বেরোবার কোনও রাস্তা নেই।

ব্রিজেশ সিং হেসে বললেন, দ্বীপান্তরিত বলা যায়! কারণ বাগেশ্বরের সঙ্গে এখন বাইরের সব সংযোগ আপাতত কয়েকদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন।

অধ্যাপক, জয়সোয়াল, জয়ন্তী আর আমি একসঙ্গে নড়ে উঠলুম। জয়ন্তী কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, তা হলে শ্যামলীর খবর এখনও ক'দিন পাঠানো যাবে না? কর্নেল যে বললেন, আপনাদের রেডিও সিস্টেম আছে...।

খান্না বললেন, না। কোনও উপায় নেই। দুঃখের বিষয়, আমাদের যে বেতার ব্যবস্থা আছে, গত রাত থেকে তাও হঠাৎ বিগড়ে বসেছে। অনেক চেষ্টা করা হল মেরামতের। কিন্তু সব এখন অবধি ব্যর্থ। বাগেশ্বর সামরিক ছাউনি থেকে যে-কোনও সাহায্য পাব, তারও উপায় নেই। পথ ধসে অতল খাদ সৃষ্টি হয়েছে ওদিকে। এক উপায় হচ্ছে হেলিকপ্টার। কিন্তু তাও আছে সামরিক ছাউনিতে।

জয়সোয়াল বললেন, কেন? সারদা নদী পেরিয়ে নেপালে ঢুকতে পারলে তো ঘুরপথে পৌঁছনো যায়—কোঠাইকুণ্ড হয়ে ঝরকাহাট।

খান্না হাসলেন।—দেখে আসতে পারেন সারদা নদীর অবস্থা। প্রচণ্ড বন্যা বইছে। তা ছাড়া বাগেশ্বরের পূর্ব সীমায় পাহাড় যা ধসেছে, নদী অবধি পৌঁছনোও অসম্ভব। তাও ধরে নিচ্ছি, কোনওরকমে নদী পেরোলেন—কিন্তু নেপালের ওই বর্ডারটা খাড়া পাহাড়। আস্ত পাথরের দেওয়াল উঠেছে তিন-চারশো ফুট উঁচু। কীভাবে ঢুকবেন নেপালে?

শ্রীমতী মালহোত্রাকে এতক্ষণ মুখ টিপে হাসতে দেখছিলুম। এবার হাত তুলে বললেন, এক মিনিট। মিঃ খান্না আর কর্নেল সরকারকে প্রশ্ন করছি, এতসব ঘটনা একইসঙ্গে ঘটার মধ্যে কি আপনারা এখনও নিছক আকস্মিকতা আছে বলতে চান?

কর্নেল তাকিয়ে থাকলেন মাত্র। খান্না বললেন, পুলিশশাস্ত্র দম্ভপূর্ণ নাস্তিকের শাস্ত্র মিসেস মালহোত্রা। এ শাস্ত্র অনুসারে কার্যের পিছনে কারণ থাকবেই।

—তা হলে বলুন, একই সময়ে বেতারযন্ত্র বিগড়ে গেল কেন? যদি বা বিগড়ে গেল, সারানো সম্ভব হল না কেন?

—দেখুন ম্যাডাম, প্রকৃত ব্যাপারটা বর্ণনা করতে হলে আমাকে এখন সরকারের সমালোচনা করতে হয়। যে কোম্পানি ওই যন্ত্র সরবরাহ করেছিল, বাজারে তার প্রচুর বদনাম আছে। কিন্তু বেছে-বেছে তাকেই নেওয়া হল, এর কারণ দুর্নীতি ছাড়া কী? বেতারযন্ত্রটা বছরে সাত মাসই বিগড়ে বসে থাকে যখন-তখন। কাল রাতে হঠাৎ আবার বিগড়ানোর কারণ সম্ভবত ঘনঘন বজ্রপাত।

শ্রীমতী মালহোত্রা মাথা দুলিয়ে বললেন, তবু আপনারা ভাঙবেন তো মচকাবেন না! চোখে

BanglaBook.org

আঙুল দিয়ে দেখালেই বা কী। অলৌকিক শক্তি যে এখনও মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, মানুষ অত জেনেও তা মানতে চায় না।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, আমাদের দেরি করা উচিত নয়। মিঃ খান্না, তা হলে চলুন আমরা মিসেস মালহোত্রার স্টাডিতে যাই। মিঃ খান্না, আপনার স্টেনো ভদ্রলোক কি এসে গেছেন?

ব্রিজেশ সিং উঠে গিয়ে দরজার বাইরে কাকে ডাকলেন—জয়গোপাল! রাজেন্দ্রজিকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে স্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক এলেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের সুন্দর এক যুবক। মুখে মিষ্টি হাসি। আমার খুব ভালো লাগল ভদ্রলোককে। হয়তো বাঘা-বাঘা বুড়োদের মধ্যে এতক্ষণে একজন তাজা যুবক দেখতে পেলুম, তাই।

স্টাডিতে ঢুকে গেলেন কর্নেল, খান্না আর সেই রাজেন্দ্র। দু-মিনিট এ-ঘরটা স্তব্ধ হয়ে থাকল। তারপর ও ঘরের দরজা খুলে খান্না মুখ বের করে ডাকলেন—মিঃ জয়সোয়াল, প্লিজ!

জয়সোয়াল সায়েব রাশভারী মূর্তি নিয়ে উঠে গেলেন। আমি সিগারেট ধরালুম। তারপর দেখি, জয়ন্তী উঠে গেল শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে। উনি বসেছিলেন কোণের দিকে একটা চেয়ারে—সামান্য দূরে। জয়ন্তীকে উনি সস্নেহে জড়িয়ে ধরে জানলার কাছে গেলেন। তারপর দুজনের মধ্যে অস্ফুটস্বরে কথাবার্তা চলতে থাকল। মনে-মনে হাসলুম। শ্রীমতীর চেলা হওয়ার উপযুক্ত মেয়ে জয়ন্তী। নির্ঘাৎ এখন প্রেতশক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে দুজনের মধ্যে। বিশেষ করে পুলিশের বেতারযন্ত্র বিগড়ানো ওঁদের তপ্ত কড়াইয়ে আরেকটি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে।

অধ্যাপক দ্বিবেদী মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। আমি ওঁর পাশে উঠে গেলুম। উনি খুশি হয়ে বললেন, আসুন, আসুন মিঃ চাউড্রি। দেখুন তো, এসব কী গড়বড় কাণ্ড হল! আগামী পরশু দিল্লিতে আমার এক বড় অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার কথা আছে। ভেবেছিলুম, রওনা দেব! অথচ আটকে গেলুম। কবে যে রাস্তা খুলবে, তাও তো বলতে পারছে না কেউ!

লোকটিকে গত সন্ধ্যা থেকেই খুব নিরীহ মনে হয়েছিল। উনি যে আমাদের গ্রিন ভিউ হোটেলেই নীচের স্যুটে উঠেছেন, কর্নেলের কাছে শুনেছিলুম। বললুম, আপনি নিশ্চয় আমাদের আসার আগেই এসেছেন এখানে?

—আমি এসেছি তেসরা জুন। প্রতিবছরই ছুটির দু-একটা সপ্তাহ এখানেই কাটিয়ে যাই। এবার অবশ্য নানা প্রোগ্রামে দিন পাঁচেকের বেশি থাকা যেত না। তার মানে, আজ আটই জুন—আজই রওনা হতুম। তা ছাড়া...একটু হাসলেন অধ্যাপক।—তা ছাড়া এবার হোটেলের চার্জও প্রায় দেড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। অত বেশি টাকা কোথায়, বলুন?

—মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে আলাপ কি এখানেই হয়েছে?

—আবার কোথায় হবে?...অধ্যাপক একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, গ্রিন ভিউতে গিয়ে প্রতি সিজনে ভদ্রমহিলা যেচে পড়ে সবার সঙ্গে আলাপ করে আসেন। বড্ড খামখেয়ালি।

পরক্ষণে জিভ কাটলেন। শ্রীমতী মালহোত্রা শুনলেন না তো? জয়ন্তীকে নিয়ে উনি মেতে উঠেছেন। অধ্যাপক এবার গলার স্বর চাপা করলেন—ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে গত বছর জুনে। সেবারও এমনি প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছিলেন। তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। আর—আমিও অবশ্য সেই আসরে যোগ দিতে পারিনি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম ওইদিন।

—মিঃ জয়সোয়ালও কি বরাবর আসেন এখানে?

—না, এই প্রথম। বলছিলেন তো তাই-ই! কে জানে কেন, ভদ্রলোককে আমার কেমন রহস্যময় মনে হয়। আপনার হয় না?

—যা বলেছেন! কেমন যেন চাপা চালচলন।

—তার ওপর ওঁর মধ্যে একটা পুলিশ ঢঙের সবজান্তা ভাব আছে লক্ষ করেছেন? ওটা

BanglaBook.org

আমার দু-চক্ষের বিষ। ও নাকি রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার। হুঁ।

আবার সায় দিলুম—একটুও বেঠিক বলেননি স্যার!

স্যার শুনে অধ্যাপক আরও নরম হয়ে বললেন—আপনি একজন মডার্ন ইয়ংম্যান। আপনি ঠিক বুঝবেন, এইসব পুলিশ-টুলিশের মানেটা কী? স্রেফ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার অর্থাৎ জন্মগত স্বাধীনতার দাবিকে দমন করার জন্যেই তো রাষ্ট্র এদের পুষে রেখেছে। তাই না? ডঃ হেন্ডাটরলভ গেটাসকিনটিকভের থিওরির কথা নিশ্চয় জানেন। রাষ্ট্র মানেই ব্যক্তির হাতের হাতকড়া। হাতকড়া-তত্ত্বের তিন নম্বর অধ্যায়ে তিনি বলেছেন...।

আমার মহাসৌভাগ্য, অধ্যাপকের হাত থেকে বাঁচাতে জয়সোয়াল বেরিয়ে এলেন এবং মুন্ডু বাড়িয়ে খান্না ডাকলেন--।

—অধ্যাপক দ্বিবেদী, প্লিজ।

অধ্যাপক মুহূর্তে স্প্রিঙের মতো গুটিয়ে সুড়সুড় করে চলে গেলেন। ওঁর মুখ দেখে মায়া জাগছিল। জয়সোয়াল এসে আমার পাশে গম্ভীরমুখে বসে পড়লেন। বললুম, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল, স্যার!

জয়সোয়াল পকেট থেকে পাইপ বের করে বললেন, আপনার আবার কী ঝামেলা চাউড্রি? ইয়ংম্যান—তার ওপর ধুরন্ধর প্রাইভেট গোয়েন্দার সঙ্গী—মজাটা উপভোগ করে যান না চুপচাপ।

ওঁর কথার ভঙ্গিতে মনে-মনে খাপ্পা হলুম। তবে সেই ভাবটা লুকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, যা বলেছেন। তবে মুশকিল কী জানেন, গোয়েন্দার পাল্লায় পড়ে আবার প্রাণে মারা না যাই এবার!

জয়সোয়াল ভুরু কুঁচকে বললেন, তেমন কি কোনও লক্ষণ দেখছেন?

—লক্ষণ কি আপনিও দেখতে পাচ্ছেন না?

—না তো!

—হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যেকেই কি ক্রমশ বেশি করে জড়িয়ে পড়ছি না?

—কী বলতে চান আপনি?

ওরে বাবা! এ যে ভারী কড়া ধাতের লোক। হবে নাই বা কেন? জাঁদরেল পুলিশ সুপার ছিল একসময়। আমতা-আমতা করে বললুম, কতদিন আটকে পড়ে থাকব আমরা, কোনও ঠিক নেই। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, যতদিন থাকব—তত বেশি করে আমাদের প্রত্যেককে জিগ্যেসপত্তর করা হবে। প্রতিদিনই নতুন-নতুন প্রশ্ন গজাবে ওঁদের মাথায়, আর এমনি করে ডাকা হবে। জবাব দিতে হবে। হরিবল!

কথাটা বুঝলেন যেন জয়সোয়াল। পাইপের তামাকে আগুন জ্বেলে বললেন, ঠিক, তা ঠিক। আই এগ্রি।

—আপনি তো স্যার জয়পুরে থাকেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—জয়পুরের আবহাওয়া এখন কীরকম বলুন তো?

—প্রচণ্ড গরম। বাঙালিবাবুরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

—তা হলে তো স্যার, আপনার এখানে পুরো গ্রীষ্মকালটা কাটিয়ে যেতে আপত্তি থাকার কথা নয়। রাস্তার ধস ছাড়লেই বা কী!

—হোটেল ভাড়াটা দেবে কে? আপনার কর্নেল সায়েব দিতে রাজি থাকলে তো ভালোই।

বুঝলুম, লোকটার সঙ্গে জমবে না। এ বড্ড বদমেজাজি গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। তাই চুপচাপ বসে থাকলুম। একটু পরে জয়সোয়াল নিজের মনেই বলে উঠলেন, হুঁ! গোয়েন্দাগিরি ফলানো হচ্ছে আমার ওপর। কেন যে এসব প্রাইভেট হ্যান্ডকে খান্না পাত্তা দেয়, বুঝি না। আমি বলব কর্তৃপক্ষকে।

BanglaBook.org

নিশ্চয় বলব, দেখবেন।

সবিনয়ে বললুম, আমাকে কি কিছু বলছেন স্যার?

জয়সোয়াল এতক্ষণে ফেটে পড়লেন।—বলছি! আপনার ওই নির্বোধ সঙ্গীটিকে বলবেন বলেই বলছি। বলবেন, ডিটেকশান অত সহজ নয়। আরে! ভিকটিম মেয়েটির পাশের চেয়ারে ছিলুম বলেই আমি ওকে অন্ধকারে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে মেরে ফেললুম! বলে কী নির্বোধের মতো! চেনা নেই, জানা নেই—কোথায় কলকাতার এক বাঙালি! সামান্য এক লেড়কি! আর আমি হলুম রাজস্থানের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল—যার দাপটে একসময় পাগলা হাতিরও মগজের অসুখ সেরে যেত। খান্নাটা ওর পাল্লায় পড়ে নির্ঘাত মরবে।

বলেই জয়সোয়াল সায়েব উঠলেন। গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় ব্রিজেশ সিং ওঁর পাশে-পাশে এগিয়ে বলে এলেন—হোটেল ছেড়ে কোথাও গেলে আমাদের লোককে বলে যাবেন, স্যার। জাস্ট এ রুটিন ইন্সট্রাকশান।

জয়সোয়াল 'আচ্ছা' বলে জোর ধমক দিয়ে পরদা তুলে অদৃশ্য হলেন। লন থেকে ওঁর জুতোর শব্দ ভেসে আসতে থাকল।

ব্রিজেশ সিং চাপা হেসে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল কেন জয়সোয়ালজির? নিশ্চয় কর্নেল সায়েব কোথাও জোর ঘা দিয়েছেন, বুঝলেন মিঃ চাউড্রি?

বললুম, তাই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা মিঃ সিং, ওঁকে কি এই প্রথম দেখলেন আপনি—নাকি আগে পরিচয় ছিল?

—এই প্রথম। তবে পুলিশ বিভাগে ওঁর প্রচণ্ড নাম আছে শুনেছি।

—উনি আমাদের হোটেলেই উঠেছেন, জানতুম না। তাহলে তো আগেই আলাপ করে ফেলতুম।

—খবরদার, খবরদার! বড্ড বদরাগী মানুষ। কক্ষনো ঘাঁটাতে যাবেন না কিন্তু?

ব্রিজেশ সিং একটু দাঁড়িয়ে থেকে লনের দিকে বেরোলেন। তারপর অধ্যাপককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। উনি মেজাজ খারাপ করে বেরোচ্ছেন না, তা ওঁর মুখের হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। খান্না যথারীতি ডাকলেন—মিসেস মালহোত্রা প্লিজ।

অধ্যাপক আপনমনে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলেন পরদা তুলে। আমাদের দিকে ঘুরেও তাকালেন না। শ্রীমতী মালহোত্রা স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলে জয়ন্তী আমার কাছে এসে বসল। বললুম, খুব প্রেতচর্চা করা হচ্ছিল যেন?

জয়ন্তী একটু হাসল।—হ্যাঁ। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে আপনাকেও এখানে বসে ডাকের অপেক্ষা করতে হচ্ছে কেন? ভেবেছিলুম—কর্নেলের অন্তরঙ্গ সঙ্গী আপনি, নিশ্চয় ওঁদের টেবিলে থাকবেন ওঁদের সঙ্গে।

—অবাক আমি একটুও হইনি, তা বলব না। তবে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির অনেক কাজই আমার কাছে রহস্যময়।

—তার মানে আপনাকেও নিশ্চয় সন্দেহের আওতায় রাখা হয়েছে?

—সেটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

—তা হলে আমাকেও তাই রাখা হয়েছে?

—বললুম তো, সেটাই নিয়ম এসব ক্ষেত্রে।

—কিন্তু শ্যামলীকে আমি...বলেই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন প্রচণ্ড অভিমানে থেমে গেল জয়ন্তী।

ডাকলুম—জয়ন্তী।

—বলুন।

BanglaBook.org

—মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভয় হচ্ছিল না তো?

—কেন? কীসের ভয়?...বলেই জয়ন্তী যেন সামলে নিল। পরক্ষণে একটু হেসে ফের বলল, আপনারা তো কাছাকাছি ছিলেন। আসলে কী জানেন, ভদ্রমহিলা খুব অমায়িক সাদাসিধে মানুষ। শুধু একটু-আধটু পাগলামিই যা করেন মাঝেমধ্যে। কথা বলে আরও বুঝলুম, উনি অনেকসময় অবসেসনের ঘোরে অনেক কিছু করেন, পরে জ্ঞান হলে খুব পস্তান।

—অবসেসনের রুগি? বলেন কী!

—হ্যাঁ। আমি তো সোজা ফোন আর ঘড়ির তার কাটার কথা জিগ্যেস করে বসলুম। তখন উনি...

বাধা দিয়ে বললুম, সর্বনাশ! আপনি ওঁকে বলে দিলেন?

—ক্ষতি কী? জয়ন্তী বেপরোয়া হয়ে জবাব দিল।—তা উনি কী বললেন জানেন? হ্যাঁ—আমার হাত দিয়েই পরলোকের বাসিন্দারা এ কাজটি করিয়েছে। তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল আমি জানি না। যাই হোক, পরে যখন সব মনে পড়ল, তখন বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। তবে এবার নিজের মুখেই স্বীকার করব। আমি বললুম, হ্যাঁ, তাই করুন। তখন উনি বললেন—শুধু এটাই নয়, এমন অনেক কাজ উনি সময়-সময় করে ফেলেন, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। একবার নাকি বাগানে রাত্তিরবেলা নিজের শাড়ি পুঁতে রেখে এসেছিলেন। সরযূ সেটা পরে আবিষ্কার করে। সরযূও এ কথাটা আমাকে বলেছিল। তখন আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

—অবসেসনের রুগিরা এ কাজ করে বটে।

—তা হলে জয়ন্তবাবু অবসেসনে থাকা অবস্থায় উনি কাউকে মেরে ফেলতেও তো পারেন?

—খুব পারেন। কর্নেল একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। তাতে এক অবসেসনের রুগি নিজের স্ত্রীর গলা টিপে খুন করেছিল। পরে তার আর কিচ্ছু মনে ছিল না।

জয়ন্তী আঁতকে উঠল।—সর্বনাশ! তা হলে তো এ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

হেসে বললুম, আপনি তো পাহাড়ে-চড়া খেলোয়াড় মেয়ে! আপনার গায়ের জোরে বুড়ি পারবেন না—নিশ্চিন্ত থাকুন।

এইসময় শ্রীমতী মালহোত্রা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন। এত ঝটপট! খান্না ডাকলেন—জয়ন্তবাবু আসুন!

কর্নেলের সঙ্গে অনেকবার অনেক হত্যাকাণ্ডের তদন্তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু কখনও আমাকে বাইরের লোকের মতো প্রশ্ন করা হয়নি—কিংবা বাইরে বসে থাকতেও হয়নি। এবার এমন কাণ্ডের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলুম না। একটু অভিমানও হয়েছিল। তবু সেটুকু চেপে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে স্টাডিতে ঢুকলুম।

খান্না বললেন, বসুন। আপনার নাম ঠিকানা পেশা ইত্যাদি বলুন।

বললুম। স্টেনো ভদ্রলোক লিখে নিলেন। টেবিলের অন্য পাশে কর্নেল গম্ভীরমুখে বসে রয়েছেন। আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না।

খান্না বললেন, আপনাকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করব জয়ন্তবাবু।

—বেশ তো। করুন না।

গত রাত্রের ভূতের আসরে যখন আলো একেবারে নিভিয়ে দেওয়া হয়, তারপর থেকে আবার আলো জ্বলে ওঠার মধ্যে—অর্থাৎ যতক্ষণ ঘরটা অন্ধকার ছিল, আপনি কি আপনার চেয়ার ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যেও উঠেছিলেন?

এ তো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি ঘাবড়ে গেলুম। খান্না আমার তাকানো দেখে কিছু টের পেয়ে আবার বললেন, দয়া করে জবাব দিন।

BanglaBook.org

দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, না।

আমার বৃদ্ধ ঘুঘুটি এবার ডেকে উঠলেন, হুম জয়ন্ত। সত্যি-সত্যি না?

বললুম, আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল। কারণ শ্যামলীর কণ্ঠস্বরে আমার সন্দেহ জেগেছিল।

—কিন্তু তুমি ওঠোনি?

—না।

—কেন?

—এখন বলা কঠিন। হয়তো ভেবেছিলুম, যদি সত্যি ভূতপ্রেত হয়, আমার ক্ষতি করতে পারে—কিংবা উঠতে গেলে চেয়ারে শব্দ হবে, কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগতেও পারে!

—হুম! তা হলে শ্যামলীর গলার স্বর শুনে তোমার সন্দেহ হয়েছিল?

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ কথা বলছে।

বুড়ো ঘুঘু ঘাড় নাড়লেন। তারপর খান্নার দিকে তাকালেন। খান্না বললেন, একটা মূল্যবান সূত্র দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, জয়ন্তবাবু। ঠিক আছে, চলুন—আপনাকে পৌঁছে দিই!

বেরিয়ে দেখি পাশাপাশি বসে জয়ন্তী আর মিসেস মালহোত্রা গল্প করছেন। খান্না জয়ন্তীকে ডাকলেন। জয়ন্তী ভীতু মুখে চলে গেল।

আমি শ্রীমতী মালহোত্রার পাশে গিয়ে বসলুম। উনি সস্নেহে বললেন, আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপই হয়নি। বসুন, বসুন। মা ও ছেলের কিছুক্ষণ আলোচনা করা যাক। বাণেশ্বরে বুঝি এই প্রথম আসা হল?

—হ্যাঁ, প্রথমই। কিন্তু এসেই পড়ে গেলুম ঝামেলায়!

—না, না। সব ঝামেলা মিটে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না! কেউ তো টের পাচ্ছে না আসল ব্যাপারটা কী। পেলেও মানতে চায় না। দেখবেন, এর ফলে কী হয়? এই তো সবে শুরু। কমিউনিকেশন বন্ধ, বেতার বিগড়েছে, মানুষ মরল—এরপর আরও সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমি দিব্যচক্ষে সব দেখতে পাচ্ছি! সব—স-ব...।

বলতে-বলতে হঠাৎ বুড়ি করলেন কী, নিজের শাড়ির আঁচলটা ফরফর করে ফেড়ে ফেললেন। বাধা দেওয়ার ফুরসতই পেলুম না। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। অস্বাভাবিক দৃষ্টি। ঠোঁট কাঁপছে। তারপর উনি ছাইদানি আর টেবিলটা উলটে দিলেন। আমি বাধা দিতে গিয়েই টের পেলুম, হাত দুটো একেবারে ইস্পাতের তৈরি! এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লুম মেঝেয়। জোর চোট লাগল।

শ্রীমতী মালহোত্রা এবার কোনার দিকে শান্তভাবে এগোচ্ছেন। মেঝে থেকে উঠেই চেঁচিয়ে ডাকলুম—মিঃ সিং! সরযূ! লছমন!

ব্রিজেশ সিং বাইরে থেকে দৌড়ে এলেন। লছমন আর সরযূও এসে গেল। শ্রীমতী মালহোত্রা তখন কোনের একটা সুন্দর পুতুল তুলে আছাড় দিতে যাচ্ছেন। ব্রিজেশ সিং ধরে ফেললেন। কিন্তু এখন ওঁর গায়ে অসুরের শক্তি। ব্রিজেশও পড়ে গেলেন মেঝেয়। বুড়ি তখন বিড়বিড় করে কী বলছেন। পুতুলটা হাতে ধরা। এবার সরযূ দৌড়ে ভেতরে কোথাও গেল। তারপর একটা তাতানো লাল লোহা এনে বুড়ির সামনে ধরে চেঁচিয়ে বলল, মাইজি! হোশমে আইয়ে! অমনি বুড়ি চোখ বেরে করে পড়ে গেলেন। এবার আমরা জানতে পারলুম, ভদ্রমহিলার সম্ভবত উৎকট হিস্টিরিয়া রোগ আছে এবং বরাবর তার প্রকোপ সামলাতে সরযূদের প্রাণান্ত হয়। লছমন ব্রিজেশ সিং আর আমাকে সেইসব কথা ইনিয়েবিনিয়ে শোনাতে শুরু করল। সরযূ তখন মাইজিকে সামলাচ্ছে।

লছমন বলল, দো সাল আগে মালহোত্রাজি অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকেই মাইজির এই আজব রোগ হয়েছে। দাওয়াইপানি করার কথা বললে মাইজি তেড়ে মারতে আসবেন। লেকিন, আসলি বাত হচ্ছে—মাইজির পেটের মধ্যে কীভাবে বাণেশ্বরের ভূতটা ঢুকে গেছে।...

BanglaBook.org

পাঁচ : যুক্তি, সম্ভাবনা ও জয়সোয়ালজি

মালহোত্রা বুড়িকে নিয়ে ওরা ভেতরে শোওয়ার ঘরে চলে গেলে আমি বেরোলুম। ঘরের ওই পরিবেশে এবার দম আটকে আসছিল। বাইরে লনে কিছুক্ষণ পায়চারি করলুম। কিন্তু জয়ন্তী বা কর্নেলরা কেউ বেরোচ্ছেন না। ব্যাপার কী? জয়ন্তীকে অতক্ষণ ধরে প্রশ্ন করা কেন? মুহূর্তে আমার মাথায় একটা আবছা সন্দেহ ভেসে এল। জয়ন্তী বা শ্যামলীর পিছনের কথা তো কিছুই জানি না। এমনও তো হতে পারে যে মোহন পারেখের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত কোনও ঘটনার জের এই বাণেশ্বর অবধি ধেয়ে এসেছিল এবং পরিণামে পারেখ আর শ্যামলীর মৃত্যু ঘটল।

সন্দেহটা মাথায় দিব্যি ভেসে বেড়াতে থাকল। কলকাতার সাউথ পার্ক লেনের সেই দু-বোন মিতা-রিতার কেসটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওরা একজনকেই ভালোবাসত। তারপর ছোটবোন রিতা পরিণামে নিজের সহোদর দিদি মিতাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিহারে এমনি এক পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। কথামতো আগে গেল দু-বোন, তারপর ওদের প্রণয়ী। রিতা এক সন্ধ্যায় পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল সেই যুবকটিকে। ফিরে এসে সেই রাতেই পটাশিয়াম সায়নাইড দিয়ে দিদিকে হত্যা করল। এবং আত্মহত্যার ঘটনা বলে রটাল। একটা চিঠিও পাওয়া গেল মিতার বিছানার তলায়। আত্মহত্যার কারণ খুবই স্বাভাবিক। প্রণয়ীর মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই বিষ খেল। ওদিকে প্রণয়ীর মৃত্যুটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে সবাই মেনে নিয়েছে। কাজেই রিতা সবদিক থেকে নিরাপদ হল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার কোনও অসুবিধেই হল না।

কিন্তু আমার সঙ্গের বুড়ো ঘুঘুটির চোখ এড়িয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। ঘটনাচক্রে তিনি তখন সেই পাহাড়ি স্বাস্থ্যনিবাসে এক বন্ধুকে দেখতে গেছেন। কোথাও কোনও আকস্মিক মৃত্যুর গন্ধ পেলেই উনি তো একেবারে চঞ্চল হয়ে ওঠেন!

যাই হোক, সে কেসের কথা খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ হয়েছিল। ধুরন্ধর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার হত্যাকারীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রিতার বয়েস বিবেচনা করে তার যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। জেলে মাঝে-মাঝে দেখা করে আসতেন কর্নেল। ফিরে এসে বলতেন, মেয়েটি অনুতপ্ত হয়েছে এতদিনে।...

বাণেশ্বরের ঘটনার সঙ্গে সেই ঘটনার একটা মোটামুটি মিল আছে, তা এতক্ষণে হঠাৎ আবিষ্কার করে আমি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলুম। কর্নেল কি মিতা-রিতার কেসটা ভুলে গিয়েছিলেন?

জয়ন্তীকে এখনও জেরা করা হচ্ছে দেখে আমার মনে হল, কর্নেল নিশ্চয় কেসটা ভোলেননি। অমনি গা শিউরে উঠল। তারপর ক্রমশ মন খারাপ হতে থাকল। জয়ন্তী কি রিতা? জয়ন্তী অত ভালো মেয়ে—অমন সরল, নিরহঙ্কার, আর দয়ালু! মনে-মনে তার মুখের দিকে তাকালুম। কোথাও একবিন্দু পাপের ছায়া দেখতে পেলুম না। না, না—আমি ভুল করছি। তা ছাড়া মোহনকে না হয় ভূতের পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা সহজ হল, শ্যামলীকে কীভাবে মারল সে? অতগুলো লোকের মধ্যে, অন্ধকার হলেও, চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে হত্যা করার মতো দক্ষতা, চাতুর্য আর নার্ভ তার যে নেই, আমি এতে নিঃসন্দেহ। কর্নেল বলেছেন, এ কাজ কোনও প্রচণ্ড শক্তিধর ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ হত্যাকারীর। সে প্রেত হোক, আর মানুষই হোক, তার যুক্তি অতি সাংঘাতিক। তা ছাড়া, প্যাথোজেন বা নাটেমা নামক আদিম জিভারো ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত বিষ কোথায় পাবে জয়ন্তী? যদি বা পায়, সে তো অন্য কোথাও অন্য কোনও সুযোগে তা ব্যবহার করতে পারত। এমনকী তা বাদেও কোনও পর্বতাভিযানে গিয়ে শ্যামলীকে খুব সহজেই সে ধাক্কা দিয়েই তুষারখাদে ফেলে মারতে পারত। ধরা যাক, যেভাবে মোহনকে মেরেছে সেভাবে তাকেও মারতে পারত ভূতের পাহাড়ে গিয়ে। কেউ কোনও সন্দেহ করত না। কারণ দুজনেরই পাহাড়ে চড়ার সার্টিফিকেট আছে। জয়ন্তী

BanglaBook.org

কৈফিয়ত দিত, পশ্চিমের খাড়াই বেয়ে চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছিল তারা—হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খুবই স্বাভাবিক কৈফিয়ত হত।

কিন্তু আরেকটা যুক্তি মনে ভেসে এল। সেটাও কর্নেলের। হত্যাকারী যেই হোক, শ্যামলীকে হত্যা করেছে সে আকস্মিক সিদ্ধান্তে।

কথাটা বারবার নাড়াচাড়া করে দেখলুম। হ্যাঁ, ঠিক তাই-ই বটে। কারণ ওই পরিবেশে শ্যামলীকে হত্যা করার ঝুঁকি ছিল—অন্ধকার থাকলেও ঝুঁকিটা খুব সামান্য নয়। হত্যাকারী মরিয়া হয়ে ঝুঁকিটা নিয়েছিল, তা বোঝা যায়। মার্ডার-উইপন বা হত্যার অস্ত্র যাই হোক, হত্যা করার মতলব যদি আগেই পরিকল্পিত হয়ে থাকে, তা হলে এতগুলো লোকের মধ্যে তা ব্যবহার না করে অন্যখানে শ্যামলীকে একা পেয়ে দিব্যি কাজে লাগানো যেত না কি? বিশেষ করে জয়ন্তীই যদি হত্যাকারী হয়, তা হলে তো তার সুযোগের জন্যে প্ল্যানচেটের আসরে আসতে হবে কেন?

স্বাভাবিক হতে বাধা অবশ্য নেই। ধরা যাক, জয়ন্তী মোহনকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে এবং শ্যামলী আড়াল থেকে দেখেছে, তারপর হঠাৎ প্ল্যানচেট আসরের সুযোগ পেয়ে প্রিয় বান্ধবীর কীর্তি ফাঁস করতে চেয়েছে—এতে জয়ন্তী বিপদ বুঝেই শ্যামলীকে কোনও অজ্ঞাত অস্ত্রে হত্যা করেছে।

আবার দেখলুম, জয়ন্তীর দিকে সন্দেহের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে।

তখন হাল ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেলুম এবং পায়চারি করলুম। হ্যাঁ এবং না'র দোলায় অস্থির হতে থাকলুম। খানিকটা আগে হলুদ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জয়ন্তী প্রেতশক্তিকে হত্যাকারী প্রমাণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল কেন? সে সুশিক্ষিতা আধুনিকা। আমার অবাক লাগছিল তার মতামত। অবশ্য শ্যামলী গতকাল বিকেলে ভূতের পাহাড়ে ওকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে বিদ্রূপ করছিল বটে। তা হলেও আজ জয়ন্তী যেন ভূতপ্রেত দিয়ে তার আত্মরক্ষার জন্যে নিছক একটা সাফাই গড়ে তুলছিল আমার কাছে। নাঃ, ভূতে আমার এখন এই উজ্জ্বল দিনের বেলায় একটুও বিশ্বাস নেই। চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। চারদিকে স্পষ্টতার মধ্যে কোনও অশুভ শক্তির কোনও চিহ্ন নেই।

সিগারেট শেষ হলে একটা সিদ্ধান্ত নিলুম। জয়ন্তীর সঙ্গে যতটা পারি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করব। দরকার হলে ফ্লার্টিং করব—এমনকী ওকে চুমু খেতে চেষ্টা করব, বুকে টানব। দেখা যাক, এতে কতখানি ফল পাওয়া যায়। নিপুণ প্রেমের অভিনয় দিয়ে, অবশ্য জানি না (ও যদি সত্যিকার হত্যাকারী হয়) কতখানি সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে। অন্তত এটুকু বলতে পারি, বহুদিন ধরে ধুরন্ধর এক গোয়েন্দার শিষ্যত্ব নিয়ে যা কিছু শিখেছি, তা ঠিক-ঠিক প্রয়োগ করতে পারলে কিছুটা কাজ হবেই।

হাসি পেল। প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি-সত্যি প্রেমে পড়ে যাব না তো? তা হলে আবার উলটো বিপদ হবে। জয়ন্তীর মধ্যে একটা মারাত্মক টান আছে—এমনিতেই তার খপ্পরে পড়েছি আজ সকাল থেকে। ওকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম না অতক্ষণ? মনকে বললুম—শক্ত হবি ব্যাটা। খবরদার, বেশিদূর এগিয়েছ কি মরেছ।

আর আমার প্রেমিকা চন্দ্রাণীর (সে এখন কলকাতায়, এম. এ. পরীক্ষার ফল না বেরোলে কোথাও নড়বে না) উদ্দেশে বললুম—চন্দ্রা, এখন দিনকতকের জন্যে আমাকে ছুটি দাও। মানুষ যেমন মাঝে-মাঝে নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরে ক'দিন বেড়াতে যায়, তেমনি আমিও তোমার-আমার নিজস্ব ঘর থেকে অন্য একটি ঘরে বেড়িয়ে আসি। বাইরে বেড়াতে গেলেই তো নিজের ঘর কিছু পর হয়ে যায় না।

তখনও কর্নেলদের কোনও পাত্তা নেই। ব্যস্ত হয়ে ডাইনিং হলে উঁকি মেরে চলে এলুম। তারপর একেবারে গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠলুম। অন্যমনস্কভাবে হোটেলের দিকে চলেছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে বেমক্কা গজিয়ে ওঠা পিরামিডের মতো তিনকোনা প্রকাণ্ড ন্যাড়া পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

জয়সোয়ালজি পাইপ টানছেন। সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপর, তাই পাথরটার উত্তরধারে ছায়া সেঁটে গেছে। ওই একফালি ছায়ায় ভদ্রলোক আপনমনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পিঠটা পাথরে ঠেকিয়ে একটু বাঁকাও হয়েছেন। আমি এই বদমেজাজি প্রাক্তন পুলিশ ডিক্টেটরের পাল্লায় পড়া বাঞ্ছনীয় মনে করলুম না। কিছুক্ষণ আগে যেভাবে রেগেমেগে বেরিয়ে এসেছেন, বলা যায় না—এখন সেই রাগটা আমার ওপর ঝেড়ে বসতে পারেন পুরোপুরি।

এড়িয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ উনি হাত তুলে ডাকলেন—চাউড্রিজি। প্লিজ কাম হিয়ার।

গলার স্বর একেবারে অন্যরকম এখন। তবু ভয়ে-ভয়ে কাছে গেলুম।—এখনও হোটেলে ফেরেননি স্যার।

—নাঃ। জাস্ট থিংকিং—ভাবছি। আসুন চাউড্রিজি।

এখানে ওইভাবে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন পুলিশ সুপারটি কী ভাবছেন, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। আমি কাছে গেলে পা বাড়ালেন। তারপর আমার একটা হাত নিয়ে বললেন—আমার মেজাজ সময়ে-সময়ে লোকে বড্ড বিগড়ে দেয়। তখন সামনে যাকে পাই, কড়া কথা বলে বসি। আপনি আমার ছেলের বয়েসি চাউড্রিজি, দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

ব্যস্তভাবে বললুম—না, না। কী যে বলেন, স্যার।

—দেখুন, আমি সেই বাইশ বছর বয়েসে ব্রিটিশ আমলে পুলিশের চাকরি নিয়েছিলুম। নিজের যোগ্যতায় সামান্য সার্জেন্ট থেকে অবশেষে পুলিশ সুপার হয়েছিলুম। অজস্র মেডেল আর পুরস্কার পেয়েছি জীবনে। কত মারাত্মক সব কেসের অপরাধীদের খুঁজে বের করেছি—সে এক দীর্ঘ রোমাঞ্চকর অধ্যায় ছিল জীবনের। আমার চোখে চোখ পড়লেই গলগল করে অপরাধীরা সব কবুল করে যেত। আপনি রাজস্থানে যান। তামাম স্টেট আমার নাম শুনলে এখনও বলে উঠবে—হ্যাঁ, পুলিশ সুপার একজনই ছিল—সে জয়সোয়ালজি। এখন আমার অবসরজীবন। আজ দশ বছর অবসর নিয়েছি। বয়েস হয়েছে। ছোটাছুটি বা কোনও ঝামেলা বিলকুল পছন্দ হয় না, পারিও না। কিন্তু বড় কষ্ট হয় চাউড্রিজি, বুঝলেন? কোন জমানা ছিল—আর আজ কোন জমানা এল। শাসন চালাবার যোগ্যতা নেই, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, সব আলুর কারবারি ঢুকেছে প্রশাসনে। আর পুলিশ প্রশাসন? ছ্যা-ছ্যা। অযোগ্য নির্বোধ কতকগুলো লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ শুনলেই একসময় লোকের পিলে চমকে উঠত। আর আজ? পুলিশের প্যান্ট খুলে লোকেরা লেজ খুঁজে দেখে।

হো-হো করে হেসে উঠলুম।

জয়সোয়ালজি বললেন, হাসবেন না, হাসবেন না। হাসির কথা নয়। খুবই দুর্ভাবনার কথা চাউড্রিজি। পুলিশকে যদি ভয় না করল, তো প্রশাসন চলবে কেমন করে? তাই তো এই অরাজক অবস্থা সারা দেশে। দুর্নীতি আর খুনজখম হু-হু করে বেড়ে গেছে। এত ক্রিমিনাল বেড়ে যাওয়ার কারণ কী জানেন? লোকে পুলিশকে আর ভয় করে না। দেখছে, এরা আসলে ভাকতাড়ুয়া—খড়ের মূর্তি। তালপাতার সেপাই সব। হাতে খেলনার বন্দুক-পিস্তল। যান—পরীক্ষা করে দেখুন, গুলি বেরোয় না—বেরোয় গুলতির গুল।

আবার হাসি এল, কিন্তু সামলে নিলুম। কড়া ধমক খাওয়া বিচিত্র নয়। বললুম—ঠিক বলেছেন স্যার। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তো তাই ঘটছে। বাচ্চা ছেলেরা পুলিশের হাত থেকে বন্দুক-পিস্তল কেড়ে নিয়ে কেটে পড়ছে।

জয়সোয়ালজি জোর নড়ে উঠলেন—বিলকুল তাই ঘটছে। আরে। তুমি হচ্ছ কি না পুলিশ। ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনের বীরত্ব, তেজ, শক্তি, সাহস তোমার রক্তে থাকবে গাঁথা। তা কি না, হাতে অমন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকতে তুমি ড্যাবলার মতো মার খাচ্ছ? পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার দেখতে-দেখতে আমি পাগল হয়ে যাই চাউড্রিজি। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। যার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তাকে কিনা সামান্য ছুরি দিয়েই কাহিল করে মারছে? আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না, যখন দেখি, বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে শেকল লটকানো

BanglaBook.org

রয়েছে। সব বাঘ এখন গিদ্ধড় হয়ে গেছে চাউড্রি। আমার হাত নিশপিশ করে। দিক না একদিনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কর্তার দায়িত্ব আমার কাঁধে—মাত্র একদিন, বুঝলেন? দেখবেন—সব শালা শায়েস্তা হয়ে গেছে!

সায় দিলুম—যা বলেছেন, স্যার!

—এই খান্নাটাকে কী ভাবছেন? ও তো একটা বুদ্ধুর বুদ্ধু। পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছে নেহাত খুঁটির জোরে। ও একজন কনস্টেবল হওয়ারও যোগ্য নয়। তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না চাউড্রি, আপনার কর্নেল ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানি না—উনি চোখের সামনে যা দেখছেন, তা ছেড়ে দিয়ে তফাতে ঘুরতে যাচ্ছেন। কোনও-কোনও মানুষের স্বভাব অবশ্য এমনিই হয়। আপনার কর্নেল কি ডিটেকটিভ ডিপার্টে ছিলেন?

জবাব দিলুম—না, না। উনি মিলিটারির লোক।

জয়সোয়ালজি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোঁতঘোঁত করে পুলিশি হাসি হাসলেন।—শখের গোয়েন্দা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর অনেক হবির মধ্যে এটাও একটা।

জয়সোয়ালজি আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনার ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলে দেবেন, খুনোখুনি হবির মধ্যে পড়ে না। আগুন নিয়ে খেলার সামিল। আরে বাবা, ডিটেকশান বিদ্যা যদি অতই সহজ আর অশিক্ষিত-পটুত্বের ব্যাপার হত, তা হলে আর ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতার দরকার হত না!...

হোটেলের গেটে এসে পড়েছিলুম, তাই বাঁ-দিকে ঘুরছি—জয়সোয়ালজি আমার হাত ধরে টানলেন।—লাঞ্চের এখনও ঢের দেরি আছে। চলুন না, একবার নেপাল বর্ডার অবধি ঘুরে দেখে আসি, কী অবস্থা। আমি যখন বললুম, সারদা নদী পেরিয়ে নেপাল হয়ে বেরোনো যায়, খান্না কী জবাব দিল শুনলেন তো? আমি বাজি রেখে বলছি—ব্যাটা ওদিকে কখনও পা বাড়ায়নি। ওদিকটা আমার চেনা।

প্রস্তাবটা ভালো মনে হল। রাস্তা কবে মেরামত হবে ঠিক নেই। কালই যদি দরকার বুঝি, ঘুরপথে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলে ছাড়া উচিত হবে না। খুব বেশিদিন থাকাও যাবে না। ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তাই ওঁর সঙ্গে পা বাড়ালুম। বললুম—কত দূর জায়গাটা?

জয়সোয়ালজি জবাব দিলেন—বেশি না, এক কিলোমিটার মাত্র। খান্নার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সারদা নদীতে এই বেমরশুমে বন্যা হয়ে গেল—মাত্র এক রাতের ঝড়বৃষ্টিতে? ব্যাটা বড্ড ফাঁকিবাজ। আসলে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

টনকপুর রোড ঘুরে বাঁ-দিকে চলে গেল। আমরা সে রাস্তা ছেড়ে সরু একটা পায়ে-চলা রাস্তায় নামলুম। দু-ধারে ঘন জঙ্গল। রাস্তাটা একটা পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে। চড়াইয়ে ওঠার পর লক্ষ করলুম, আশেপাশের পাহাড়গুলোতে অজস্র ধসের চিহ্ন রয়েছে। নীচের উপত্যকার ওপর ধস নেমে সেখানেও অনেক গাছপালাকে নিশমার করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে, যেন কোনও মহাকায় দানব হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে প্রকৃতির সাজানো ঘরসংসার লণ্ডভণ্ড করে আবার কোনও গুহার অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।

লক্ষ করলুম, কড়া ধাতের মানুষ হলে কী হবে, জয়সোয়ালজিরও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার চোখ আছে। কারণ, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছেন এবং আগুনফুলের উজ্জ্বলতায় ভরা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে তারিফ করছেন। একস্থানে পাথরের ওপর ঝরনাধারার মতো অজস্র হলুদ অর্কিডের গুচ্ছ, ডগায় আশ্চর্য সুন্দর লাল ফুল ফুটে রয়েছে। উনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর সস্নেহে ঝুঁকে অর্কিডগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—চাউড্রিজি কি বিবাহিত?

সলজ্জ হেসে জবাব দিলুম—না স্যার!

BanglaBook.org

জয়সোয়ালজি বললেন—করবেন না। খামোখা প্রবৃত্তির বশে ঘরে দুশমন ডেকে এনে কী ফল?

—আপনি কি বিবাহিত, স্যার?

জয়সোয়ালজি ঘাড় নেড়ে বললেন, নো-ও-ও! আপনি পাগল হয়েছেন চাউড্রি? জীবনে সবকিছুকে আমি বিশ্বাস করতে রাজি—ওই একটি বাদে। স্ত্রীলোক! বলবেন, কেন এ-কথা বলছি? বলছি স্রেফ আমার অভিজ্ঞতা থেকে। পৃথিবীতে যতরকম অপরাধ ঘটে থাকে, তার শতকরা নিরানব্বইটির পিছনে কোনও-না-কোনওভাবে স্ত্রীলোকের প্রভাব আছেই। স্ত্রীলোক সম্পর্কে খ্রিস্টানধর্মের ইশারা আপনাব মালুম হচ্ছে না? অ্যাডামকে স্ত্রীলোকই তো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে প্ররোচিত করেছিল। শয়তান প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য হয়েছিল ইভের ওপর। অ্যাডাম পুরুষ মানুষ। তাকে শয়তান নোযাতে পারেইনি। আর, আমাদের হিন্দুশাস্ত্র দেখুন। সেখানেও বলছে—নারী নরকের দ্বার। তাই ঈশ্বরসাধনার প্রতিবন্ধক সে। ব্রহ্মচর্য ছাড়া ঈশ্বর পাওয়া যায় না। তবে দেখুন চাউড্রিজি, ঈশ্বর-টিশ্বর অনেক বড় কথা। আমি সামান্য মানুষ। আমি জানি, স্ত্রীলোক নিয়েই সাতকাণ্ড রামায়ণ আব অষ্টাদশপর্ব মহাভারত! ওঁকে সায় দিয়ে বললুম—ট্রয়ের যুদ্ধ, ওদিকে আরবের মুসলমানদেব কাববালার যুদ্ধ—সবই স্যাব, স্ত্রীলোকেব কাবণে ঘটেছিল নাকি! এমনকী কোনও-কোনও পণ্ডিত বলেছেন, মোহেনজো-দড়ো সভ্যতার পতনের মূলেও স্ত্রীলোক! আব স্যাব, আমাদের বাঙালিমতে বলা হয, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

জয়সোয়ালজি আমার কাঁধে অন্তরঙ্গভাবে হাত বেখে বললেন, বাঙালি খুব বুদ্ধিমান জাত। টেগোবকে তাই নোবেল প্রাইজ দিযেছিল বিলিতি পণ্ডিতবা।

—টেগোবও স্যাব স্ত্রীলোকেব ব্যাপাবটা এক বিযেতেই বুঝে ফেলেছিলেন। তাই স্ত্রীর অকালমৃত্যুব পর বাকি জীবন আর বিয়েই করলেন না। বুড়িয়ে খটখটে হযে একা-একা মারা গেলেন। তবু কোনও স্ত্রীলোককে পাত্তাই দিলেন না!

জযসোয়ালজির চোখ পিটপিট করছিল উত্তেজনায। এবাব চাপা গলায় বললেন—মোহন পাবেখটা বোকার মতো ওই স্ত্রীলোকের প্যাঁচে পড়েই মাবা গেছে, বুঝলেন চাউড্রি? আমি জানি।

চমকে উঠে বললুম—আপনি জানেন?

—নিশ্চয় জানি। মানে—প্রত্যক্ষদর্শী নই। কিন্তু এ আমার একরকম জানাই বলতে পাবেন। খান্নাটা বড্ড ভুল করছে।

—ব্যাপারটা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে, স্যার।

জয়সোয়ালজি হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—দেখুন, বরাবর আমার মেথড অফ ডিটেকশান হচ্ছে, প্রথম মুহূর্তেই ইনটুইশান বা সহজাত বোধ যা বলে, তার দিকে মনোযোগ দাও। শ্যামলী মেয়েটি মারা গেছে শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ইনটুইশান বলে দিল—মিসেস মালহোত্রার দিকে লক্ষ রাখো!

—কিন্তু স্যার...।

—ওয়েট, ওয়েট। মোটিভ পরে খুঁজবেন। প্রথমে দেখুন, হত্যার চান্সটা কার বেশি ছিল? শ্যামলীর কাছাকাছি ছিল যে, তারই। এখন, ওর ডাইনে ছিলুম আমি, বাঁযে মিসেস মালহোত্রা। কেমন?

—হ্যাঁ স্যার।

—এখন দেখুন, আমি জানি যে আমি হত্যা করিনি। তা ছাড়া, যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে আমিই যখন ডিটেকশন করছি অর্থাৎ হত্যাকারীকে খুঁজছি, তখন আমি নিজে হত্যাকারী নই। তা হলে দেখলুম, বাকি রইলেন মিসেস মালহোত্রা। কিন্তু তিনি কেন খুন করবেন? হ্যাঁ—এ একটা প্রশ্ন। অনেক ভাবলুম। ভেবে দেখলুম, ভদ্রমহিলা প্রেততত্ত্ব চর্চা করেন। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা, প্রেতকে মিডিয়ামের দেহে আনা যায়। তাই শ্যামলীর মধ্যে প্রেতাত্মা আসুক, এই জেদ ওঁর ছিল। বলুন, এমন অবস্থায় ভদ্রমহিলার এই জেদ থাকা উচিত কি না?

BanglaBook.org

—ঠিক বলেছেন স্যার। গোঁড়া বিশ্বাসী মানুষ তার বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণের জন্যে সবসময় জেদ ধরে বসে থাকে।

—আপনি বুদ্ধিমান, চাউড্রি। তার ওপর আমরা এতগুলো হোমরাচোমরা সব মানুষ বসে আছি আসরে। আমাদের তাক লাগাতে পারলে মিসেস মালহোত্রার মস্ত জয় হয়ে যায়। এদিকে আমরা সবাই প্রায় অবিশ্বাসী। কাজেই ভদ্রমহিলা প্রায় বাজি ধরে বসেছিলেন। সাইকোলজিকাল পয়েন্ট থেকে ভেবে দেখুন চাউড্রিজি, এ ছিল মিসেস মালহোত্রার জীবনের এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত। হেরে গেলে সে এক বড় অসম্মানের কথা, বড় লজ্জার কথা ওঁর জীবনে।

—ঠিক স্যার, আপনার যুক্তি অসাধারণ।

জয়সোয়ালজি এবার গোঁফে তা দিয়ে বললেন—এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে, এমন একটা মানসিক উদ্বেগের সময়ে, মিসেস মালহোত্রা দেখলেন যে শ্যামলী অভিনয় করছে। অর্থাৎ তামাশা করছে!

—অভিনয় করছে?

—বিলকুল! আপনি কি বিশ্বাস করবেন, শ্যামলীর মুখ দিয়ে ভূতে কথা বলছিল? এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে, যখন মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, তখন আপনি ওইসব আদিম কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকবেন?

—মোটেও না, স্যার। ভূতটুত ছেলেভুলোনো গপ্প ছাড়া কী?

—হ্যাঁ, মিসেস মালহোত্রা টের পেলেন যে শ্যামলী তাঁর বিশ্বাস নিয়ে তামাশা করছে। বলবেন—কেমন করে টের পেলেন? পেলেন—যখন দেখলেন, জলজ্যান্ত মোহন পারেখকে ভূত বানাচ্ছে শ্যামলী।

—কিন্তু মোহন সত্যি তো তখন মৃত!

—মৃত হলেও তখন সে সবার কাছে জীবিত। কারণ কেউ জানত না যে, সে পাহাড়ের খাদে পড়ে মারা গেছে। মোহন মালহোত্রা ফ্যামিলির নাকি খুব ন্যাওটা ছিল শুনলুম। মিসেস মালহোত্রা নিঃসন্তান। এক্ষেত্রে মোহনের মৃত্যু জেনেও উনি চুপচাপ বসে থাকবেন, এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় আপনার?

—না স্যার।

—মোহনের মৃত্যু কীভাবে হল, পরে আসছি সে-কথায়। এখন দেখুন, যেই মিসেস মালহোত্রা টের পেল যে বাঙালি মেয়েটি তাঁকে নিয়ে তামাশা করছে, অমনি তাঁর মাথায় বিস্ফোরণ ঘটল। চাউড্রি, এ হচ্ছে মিসেস মালহোত্রার আকস্মিক সিদ্ধান্ত!

মুহূর্তে কর্নেলের ওই একই কথা মনে পড়ে গেল। আকস্মিক সিদ্ধান্তেই হত্যাকারী শ্যামলীকে খুন করেছে। আমি জয়সোয়ালজির মুখে কর্নেলের উক্তি এবং যুক্তির প্রতিধ্বনি শুনে শুধু অবাক নই, অভিভূত হলুম। জয়সোয়ালজি সত্যি ঝানু অভিজাত পুলিশ অফিসার। ওঁর যুক্তি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পটভূমির খুঁটিনাটি অবস্থা বিচার এবং সম্ভাবনাতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখে চমৎকৃত হয়ে বললুম—অপূর্ব ডিডাকশান আপনার! এদিকটা কেউ ভাবছেন না।

—এবার প্রশ্ন ওঠে, মার্ডার-উইপনটা তা হলে কী ছিল? চাউড্রিজি, মিসেস মালহোত্রা কেন, পৃথিবীর যেখানে যারাই প্রেততত্ত্ব, ব্ল্যাক আর্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ডাইনিতত্ত্ব বা উইচক্র্যাফ্‌ট, এক্সরসিজম বা ঝাড়ফুঁক, তুকতাক ইত্যাদি আদিম সংস্কার নিয়ে চর্চা করে—তাদের অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জিনিস সংগ্রহ করে রাখতে হয়। কেন রাখতে হয় জানেন? মানুষকে তাক লাগাবার জন্যে। কারণ, বাস্তবিক তো পৃথিবীতে কোনও অলৌকিক ব্যাপার মাথা খুঁড়লেও ঘটতে দেখা যায় না। যা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হয়, তার পিছনে বাস্তব কারণ ও যুক্তি থাকেই। তাই অসহায় ও মরিয়া হয়ে তারা বিচিত্র জিনিস জোগাড় করে রাখে। উদ্দেশ্য—অগত্যা ম্যাজিক দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন। এর জন্যে দরকার হলে তারা হত্যাতেও কুণ্ঠিত হয় না। রাজস্থানের এক গ্রামে এক তথাকথিত ডাইনি নিজের

শক্তি দেখাতে কী করেছিল শুনুন। বশীকরণ, তাড়ন, মারণ, উচাটন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় ডাকিনীবিদ্যার কথা আশা করি আপনার জানা আছে। একটা লোক তার শত্রু নিপাতের জন্যে সেই ডাইনিকে ধরল। তখন ডাইনি করল কী, মারণমন্ত্রের অনেকরকম তুকতাকের ভড়ং করল। কিন্তু কার্যত সে সেই ভিকটিমের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে গিয়ে চুপিচুপি তার ছাতুর মধ্যে বিষ মাখিয়ে এল। ছাতুখোর লোকটার ভোরে ছাতু খেয়ে কাজে যাওয়া অভ্যাস ছিল। যাই হোক, সে এক অদ্ভুত বিষ। লোকটা ক্রমশ পেটের অসুখে মারা পড়ল। চাউড্রি, আদিম যুগের লোকেরা অদ্ভুত সব বিষের সন্ধান রাখে—আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান তা কল্পনাও করতে পারে না। আপনি যান আফ্রিকার জঙ্গলে, কিংবা অস্ট্রেলিয়া, কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের জঙ্গলে—দেখবেন, আদিম অধিবাসীরা কতরকম আশ্চর্য বিষের সন্ধান রাখে। তা মডার্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানে হেঁয়ালির সৃষ্টি করবে।

মনে পড়ে গেল কর্নেলের মুখে শোনা প্যাথোজেন এবং নাটেমার কথা। প্যাথোজেন তো একালের আবিষ্কার, কিন্তু নাটেমা দক্ষিণ আমেরিকার জংলি জিভারো জাতির আবিষ্কৃত বিষ। এত তথ্য জয়সোয়ালজির জানা! আবার ওঁর বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়লুম। বললুম—খুব ইন্টারেস্টিং স্যার। বলুন।

জয়সোয়ালজি দম নিয়ে বললেন—মিসেস মালহোত্রাও আসলে সেই প্রিমিটিভ উইচক্রাফ্টের চর্চা করেন। নানা দেশ ঘুরেছেন শুনেছি। ওঁর পক্ষে তেমন কোনও আদিম এবং আমাদের অজ্ঞাত মারণাস্ত্র জোগাড় করা মোটেও অসম্ভব নয়। রাজস্থানে ডাকিনীবিদ্যার প্রভূত চর্চা আছে গ্রামাঞ্চলে। কত কেস যে আমি ধরেছি, ইয়ত্তা নেই। একবার একটা কেস ধরলুম। একের পর এক এলাকার বাচ্চারা অদ্ভুত একটা রোগে মারা পড়ছে। ডাক্তাররা ব্যতিব্যস্ত। রোগটা ধরতেই পারছেন না।

বলেই উনি থেমে গেলেন। কেন থামলেন খুঁজছি, দেখি উনি বাঁদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছু লক্ষ করছেন যেন। বাঁদিকে নীচে জঙ্গলেভরা একটা উপত্যকা। আমার চোখে কিছু পড়ল না। তাই বললুম—আর কদ্দুর স্যার?

জয়সোয়ালজি বললেন, এসে গেছি। সামনের বাঁক ছাড়ালেই দেখতে পাব।

হাঁটতে-হাঁটতে উনি বারবার পিছু ফিরে সেদিকে তাকাচ্ছেন দেখে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললুম—কী স্যার?

জয়সোয়ালজি ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে বললেন—চাউড্রি, ওই অধ্যাপক ভদ্রলোককে আপনার কেমন মনে হয়?

—ভালোই। কেন বলুন তো?

—তখন মোহন পারেখের মৃত্যুর ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বলা হয়নি। এবার শুনুন। মোহনকে ভূতের পাহাড় থেকে সম্ভবত ওই অধ্যাপকই ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।

চমকে উঠে বললুম, সে কী!

—এ-কথা কেন মাথায় এসেছে, জানেন? আমার সঙ্গে যতটুকু আলাপ হয়েছে, অধ্যাপক দ্বিবেদী ভীষণ সেকেলে রুচির মানুষ। বিশেষ করে খুব নীতিবাগীশ। ফিল্মের লোকেদের প্রতি ওর প্রচণ্ড রাগ। মোহন পারেখের সম্পর্কে ভীষণ নিন্দে করছিল পুরুষ। বলছিল, এরাই দেশটাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। বলছিল, মোহন নাকি মেয়েছেলে দেখলেই বাঘের মতো হালুম করে ঝাঁপ দেয়। ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন জয়সোয়ালজি। ফের বললেন, অধ্যাপক বলছিল, ওই মোহন নাকি কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে সংখ্যা নেই। ওর ফাঁসি হওয়া দরকার। মোহনের নিন্দে করার সময় অধ্যাপকের মুখে আমি একটা ক্রূর অভিসন্ধি লক্ষ করেছিলুম। দেখার পর, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় বড্ড নিরীহ ভীতু মানুষ।

BanglaBook.org

—কার পেটে কী আছে, বলা কঠিন। চেহারা দেখে কি খুনি চেনা যায় চাউড্রি?...বলে উনি চুপ করে গেলেন হঠাৎ, ফের নীচের উপত্যকায় কী দেখলেন।

বাঁকের কাছে এসে মুখ খুললেন—দেখুন চাউড্রি, নীচের ওই জঙ্গলে মনে হচ্ছে, অধ্যাপককে দেখছিলুম।

হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে গেল অজানা ভয়ে, বললুম, অ্যাঁ! অধ্যাপক?

—সেইরকম মনে হল। ব্যাটা গতিক বুঝে সারদা পেরিয়ে নেপালের দিকে কেটে পড়ার মতলব করেনি তো?

—কিন্তু পুলিশ যে সবাইকে চোখে-চোখে রেখেছে?

জয়সোয়ালজি রেগে গিয়ে বললেন, খান্নার পুলিশকে আর পুলিশ বলবেন না চাউড্রি! ওতে একটা বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ট্র্যাডিশনকে অপমান করা হয়! এই যে আমি বা আমরা দুজনে চলে এলুম, এখন দিব্যি পালাতে পারি—কে দেখছে?

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—আমাদের পালাবার কোনও কারণ নেই স্যার!

—নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ডিসিপ্লিন ইজ ডিসিপ্লিন!

—সত্যি, পুলিশ আজকাল বড্ড নিষ্ক্রিয়।

কথাটা বলার পরই লক্ষ করলুম, সামনে পূর্বে বিশাল খোলামেলা আকাশ—নীচে বিরাট একটা নদী। প্রচণ্ড বেগে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ওপারে নেপালের পাহাড় রোদে ঝলমল করছে। কিন্তু খান্না ঠিকই বলেছিলেন, দুরন্ত খাড়া ওইসব পাহাড়। নদীর গা ঘেঁষে সোজা দেওয়ালের মতো উঠে গেছে হাজার-হাজার ফুট উঁচুতে। নদীর স্রোতেও অজস্র গাছ ভেসে যাচ্ছে দেখলুম। ডাইনে দূরে প্রচণ্ড জলকল্লোল শোনা যাচ্ছিল। জয়সোয়ালজি বললেন, জলপ্রপাত আছে ওখানটায়। ওই দেখুন, কেমন ধোঁয়া হয়ে রয়েছে! ওগুলো আস্ত মেঘ।

আমাদের পায়ের কয়েক গজ তফাতে ধস নেমেছে। নদীগর্ভ পর্যন্ত খাড়া দেওয়ালের মতো নেমে গেছে এই পাহাড়টা। বাঁ-দিকের উপত্যকা থেকেও একটা পাহাড় উঠেছে নদীর ধার অবধি। এই পাহাড় দুটোর মধ্যে এক গভীর খাদ। তলার দিকে তাকানো যায় না।

মিনিট দশেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘড়ি দেখলেন জয়সোয়ালজি। তারপর বললেন, চলুন, ফেরা যাক। নেপাল হয়ে যাওয়া দেখছি সত্যি অসম্ভব। তবে খান্নাটা পরের মুখে ঝাল খেয়েই বলছিল, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

আবার ফেরা শুরু হল। এবার উনি বেশ খানিকটা গম্ভীর। কিছুদূর আসার পর ডাইনে সেই উপত্যকার দিকে জীবজন্তুদের একটা চলার পথ নেমে গেছে যেখানে, সেখানে এসেই আচমকা জয়সোয়ালজি বললেন—চাউড্রি, চলে আসুন তো!

তারপর ওই ঢালু পথ বেয়ে পাহাড়ি বাঘের মতো দৌড়ে নামতে শুরু করলেন জয়সোয়ালজি। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলুম। ঘুরে-ঘুরে পথটা নীচে নেমেছে। দু-ধারে ঝোপঝাড় আর বড়-বড় গাছ। পাথরও ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। একটা বাঁকে গিয়ে ওঁকে হারিয়ে ফেললুম। তখন চাপা গলায় ডেকে উঠলুম—জয়সোয়ালজি! জয়সোয়ালজি!

সামনে কোথাও ঝোপের ওপাশ থেকে আওয়াজ এল—শাট আপ।

ধমক খেয়ে ঢোঁক গিললুম। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেখি, উনি একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে নীচে কী লক্ষ করছেন। কাছে গেলে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন।

কাছে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে থাকলুম। অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী!!

তা হলে সত্যিই এই জাঁদরেল পুলিশকর্তার ধুরন্ধর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি ভদ্রলোক। কিন্তু এখানে কী করতে এসেছেন? সারদা পেরিয়ে নেপালের দিকে পালানোর মতলবে নয় তো?

BanglaBook.org

নিশ্চয়। তা ছাড়া আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু উনি স্রেফ খালি হাতে এসেছেন। পরনে যথারীতি ঢোলা পাতলুন, জগঝম্প গলাবন্ধ শেরোয়ানিজাতীয় কোট। ওই বেশে কি সাঁতার দিতে পারবেন ভদ্রলোক?

দেখলুম, অধ্যাপক একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তা হলে আমাদের দেখতে পেয়েছেন নির্ঘাত। কিন্তু উনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, আমরা ওঁকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি।

জয়সোয়ালজি এবার শিকারি বাঘের মতো গুড়ি মেরে বসে পড়লেন। দেখাদেখি আমিও বসলুম। তখন উনি ফিসফিস করে বললেন—আপনি বাঁ-দিক ঘুরে ব্যাটাকে ঘিরে ফেলুন, আমি ডানদিক ঘুরে যাচ্ছি। সাবধান, যেন ও দেখতে না পায়।

কথামতো আমি গুড়ি মেরে, কখনও বুকে হেঁটে, পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে এগোতে শুরু করলুম। জয়সোয়ালজিও ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর যেই ওঁকে ফের দেখতে গেছি, অমনি পা হড়কে সড়সড় করে একেবারে গড়াতে-গড়াতে গিয়ে অনেকটা নীচে পড়লুম। তারপর পোশাক থেকে ধুলোমাটি খড়কুটো ঝাড়তে-ঝাড়তে তাকিয়ে দেখি ওক গাছটা ফাঁকা। জয়সোয়ালজি গুম হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। কাছে গেলে বললেন।—পালিয়েছে। ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত।...

ছয় ঃ ভূতের পাহাড়ে সাইরেন

সেদিন বিকেল নাগাদ আমার সব অভিমান জল করে দিয়ে গোয়েন্দাপ্রবর বিছানার পাশে বসে আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, জয়ন্ত ডার্লিং! এবার আমরা যথারীতি বেড়াতে বেরবো। আশা করি, একপ্রস্থ চমৎকার স্যুট তুমি পরবে। পশ্য, পশ্য! বাইরে কী চমৎকার দৃশ্যরাজি! এ বুড়োর মনেও আজ রং ধরেছে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, কর্নেল যেন কোনও উৎকৃষ্ট হোটেলের জাঁকালো পার্টিতে চলেছেন! বাটনহোলে একটি লাল গোলাপও গুঁজেছেন। সবিস্ময়ে বললুম, অস্যার্থ?

—ডার্লিং! প্রকৃতির কাছ থেকেই তো মানুষ সবকিছু শিখেছে। এমন কিছু দেখাতে পারবে না—যার মূল আইডিয়ার জন্য প্রকৃতির কাছে মানুষ ঋণী নয়। সুতরাং, যদি তোমার চোখ থাকে এবং মাথার ধূসর পদার্থবিশেষে কোনও সৌন্দর্যবোধ থাকে, তাহলে দেখবে এই ডিসকমিউনিকেটেড বাণেশ্বরের প্রকৃতি সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞের পর আবার কী নতুন সাজে সেজেছেন! লুক—জাস্ট লুক!

জানলা দিয়ে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। রাতের ঝড়বৃষ্টির পর অনেকদিনের মালিন্য ধুয়ে-মুছে চারপাশে এক উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ জেগে উঠেছে। দুপুর অবধি অতটা লক্ষ করিনি। কারণ, জয়সোয়ালজির যুক্তি এবং অধ্যাপকের কাণ্ড নিয়ে যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলুম। এখন উঠে কোনও কথা না বলে তাড়াতাড়ি সেজে নিলুম।

কর্নেল সেই অবসরে পাশের ঘরে গেলেন—অবশ্যই জয়ন্তীর খোঁজে। আমি যখন কর্নেলের দেখাদেখি বাটনহোলে ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ তুলে নিয়ে গুঁজছি, উনি ফিরে এসে বললেন, চমৎকার জয়ন্ত। অপূর্ব দেখাচ্ছে তোমাকে!

—জয়ন্তী যাচ্ছেন তো?

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্তীর কথা তুমি জিগ্যেস করবে, জানি। কিন্তু খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বন্ধু, শ্রীমতী জয়ন্তী তাঁর ঘরে নেই।

—মেয়েটার সাহস তো বড্ড! একা কোথায় বেরলো?

—স্ত্রীলোকের গতিবিধির খবর দেবদূতরাও টের পান না। যাকগে, জয়ন্ত, এ নিয়ে দুঃখ

BanglaBook.org

করো না। চলো, এই বুড়োই আজ তোমাকে চাঙ্গা রাখবে।

কপট রাগ দেখিয়ে বললুম, জয়ন্তীর জন্যে আমার বয়ে গেছে! ওর ঘরে আজ কে কীসব খোঁজাখুঁজি করেছিল, সেজন্যেই আমার মাথাব্যথা।

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, মাথা ব্যাথায় কোনও লাভ নেই, বন্ধু। চলো, আমরা রওনা দিই!

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ম্যানেজার শিবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হল। কর্নেল বাও করে বললেন, গুড আফটারনুন প্রসাদজি!

—গুড আফটারনুন, স্যার! আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।

—বলুন।

—মিস রায়ের ঘরে আজ যে ঢুকেছিল বা জিনিসপত্র হাতড়েছে, তাকে আমাদের বেযারা হরিয়া দেখেছে স্যার! কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—তাই বুঝি? কে সে?

—প্রফেসর দ্বিবেদী।

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। বললুম—প্রফেসর দ্বিবেদী জয়ন্তীর ঘরে ঢুকেছিলেন? সে কী?

শিবপ্রসাদ কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন—ওকে মিঃ প্রসাদ! আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ!

—স্যার, যাই বলুন, এটা তো হোটেলেব সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই আমি ভাবছি, ভদ্রলোককে ডিবেক্ট চার্জ কবব। কী জবাব দেন, শোনা দরকার।

—প্লিজ মিঃ প্রসাদ! ছেড়ে দিন। আমি অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে দেখবখন। এ নিযে আর উত্তেজিত হবেন না! ব্যাপারটা চেপে যান।

বলে কর্নেল, ম্যানেজার আর আমি নীচে এলুম। লাউঞ্জের শেষপ্রান্ত অবধি আমাদের এগিযে দিয়ে গেলেন ম্যানেজার। পথে নেমে বললুম, এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, কর্নেল! অধ্যাপক দ্বিবেদী আরেক কাণ্ডও কবেছিলেন। শুনুন—।

আমাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ গোয়েন্দা বলে উঠলেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! ব্রিলিয়ান্ট! আজকের পশ্চিম আকাশটা লক্ষ করছ? চলো, আজও আমরা ওই ভূতের পাহাড়ে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখব। পা চালিয়ে চলো! কুইক!

এই বলে আমার হাত ধরে সত্যি-সত্যি কুইক মার্চ করে চলতে থাকলেন কর্নেল। চড়াই-উতরাইয়ের রাস্তা। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল আমার। অথচ ওঁর যেন এতটুকু পরিশ্রম হচ্ছে না। একসময় বললুম, এত তাড়া তো একটা টাঙ্গা কবে নিলেই হত!

কোনও জবাব পেলুম না। ভূতের পাহাড় সামনে দেখা যাচ্ছিল। এত ছোটাছুটির পর ওই পাহাড়ে উঠতে পারব কি না আমার সন্দেহ হচ্ছিল। বড় রাস্তা ছেড়ে আগের দিন যেখানে উঠতে শুরু করেছিলুম, সেখানে এসে কর্নেল এতক্ষণে মুখ খুললেন। জয়ন্ত, এবার তোমায়-আমায় কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়াছাড়ি হবে।

অবাক হয়ে বললুম, তার মানে?

—তুমি কালকের চেনা পথ ধরে চূড়োয় উঠবে। আমি উত্তরদিকটা ঘুরে উঠতে চাই। কোনও ভয় নেই বৎস। সূর্যের আলো থাকতে ভূতরা আক্রমণ করবে না। নেহাত যদি করে বসে, আশা করি আত্মরক্ষা করতে পারবে। ওকে?

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—কিচ্ছু না। জাস্ট এ গেম—চিলড্রেন্‌স গেম! দেখো জয়ন্ত, মাঝে-মাঝে শিশু হয়ে যাওয়ার মতো নির্মল আনন্দ আর কিছুতে নেই! ওতে বয়েস কমে যায়। আচ্ছা, অ রিভোয়া!

BanglaBook.org

অর্থাৎ আবার দেখা হবে, বিদায়! বুড়ো ধীরে-সুস্থে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উত্তর দিকে এগোলেন। আমি সেই চেনা জায়গাগুলো পেরিয়ে পাহাড়ের পুবগায়ে চড়া শুরু করলুম। ঝরনা ডাইনে রেখে বড়-বড় গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে কী যেন নড়ে উঠল। অমনি গা শিরশির করে উঠল। হৃৎপিণ্ডে একটা অস্থিরতা জাগল। এ পাহাড়ের নাম ভূতের পাহাড় যখন, তখন নিশ্চয় কিছু অদ্ভুত ঘটনা লোকে এখানে ঘটতে দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, পাথরের আড়ালে একটা কিছু নড়তে আমি দেখেছি। কী হতে পারে সেটা? জন্তুজানোয়ার নয় তো? সূর্য পাহাড়ের ওপাশে নেমে গেছে। এপাশটা তাই ইতিমধ্যে বেশ ছায়া-ছায়া হয়ে পড়েছে। তাতে ঘন গাছপালা থাকায় দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে এবং গাছের তলায় আবছা অন্ধকারও জমে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলুম। মিনিটখানেক পরে বুঝলুম, পাথরের ওপাশে একটা জ্যান্ত কিছু অবশ্যই আছে এবং সেটা আবার নড়ল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পকেট থেকে বিপদ-আপদের সঙ্গী রিভলভারটা বের করলুম। গুলি পোরা ছিল না। সুতরাং অস্ত্রটা আঘাত হানার জন্য তৈরি করে নিতে বেশ সময় লাগল। অবশ্য, অটোমেটিক রিভলভার। পরপর পাঁচবার গুলি ছোড়া যায়। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে সেবার এক দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক স্মাগলিং চক্র ধরে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ সরকার আমাকে এই অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছিলেন।

এবার পা টিপে-টিপে এগোলুম সেদিকে। জায়গায়-জায়গায় পাথর থাকায় বাধা পাচ্ছিলুম। তবে ঢালু বলে উঠতে অসুবিধে হচ্ছিল না। হাত দশেক ডাইনে ঘুরে এবার পাথরটার সোজাসুজি পৌঁছুলুম। পরক্ষণে অবাক হয়ে গেলুম। জয়ন্তী!! এ যে জয়ন্তী!!

এত অবাক যে অন্তত এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম ওর দিকে। কিন্তু ওকী করছে সে? হেঁট হয়ে একটা কিছু করছে—তার ফলে ওর শরীরটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। হ্যাঁ, এই নাড়াচাড়াটাই আমার চোখে পড়েছিল বটে।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সে একরাশ নুড়িপাথর নিয়ে যেন খেলা করছে। এই পাহাড়ের খাঁজ মতো জায়গায় ওইরকম অজস্র নুড়ি-পাথর জমে থাকতে দেখেছি। সম্ভবত বৃষ্টির সময় যখন পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়ায়, তখন মাটি ধুয়ে যাওয়ার ফলে ছোট-ছোট পাথরের টুকরো নেমে এসে খাঁজগুলোতে আটকে থাকে। যুগ-যুগ ধরে এইরকমটি ঘটে এসেছে এবং বৃষ্টিধারা ও বাতাসের আঘাতে পাথরগুলো মসৃণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই জনমানুষহীন ভুতুড়ে পাহাড়ে একা জয়ন্তী কি ওই ছেলেখেলা করতেই এসেছে? বিশেষ করে প্রেতশক্তিতে তার বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে—তা ছাড়া তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সাথী এই দুর প্রবাসে ওইভাবে ভয়ংকর মৃত্যু বরণ করেছে, এত কাণ্ডের পরও কী সাহসে সে এখানে একা এল?

ওকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাই জুতোয় সামান্য শব্দ করলুম। কিন্তু সে এত তন্ময় যে তা টেরও পেল না। তখন একটু কেশে উঠলুম।

এবার সে সাঁৎ করে ঘুরল এবং উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণে তার মুখে অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল। সে হাত দুটো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল—বাব্বা! আমি ভাবলুম বুঝি অধ্যাপক দ্বিবেদী।

এ কথায় আরও অবাক হয়ে বললুম—ওঁর বদলে শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী! কিন্তু হঠাৎ ওই নিরীহ ভদ্রলোকের কথাই বা ভাবলেন কেন বলুন তো?

জয়ন্তীকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল—আমি আসার একটু আগে দূর থেকে ওঁকে উঠতে দেখেছিলুম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না তো।

জয়ন্তী পা বাড়িয়ে বলল—চলুন, ওপরে যাই। আজও সূর্যাস্ত দেখা যাক।

BanglaBook.org

—চলুন।

একটু পরেই জয়ন্তী অদ্ভুত কৌশলে আমাকে ছাড়িয়ে কত সহজে অনেকটা ওপরে ওঠে গেল। ওর পক্ষে এ অবশ্য স্বাভাবিক। পাহাড়ে চড়ায় ওর দক্ষতা আছে। ওপর থেকে সে ঘুরে ডাকল আমাকে।—তাড়াতাড়ি আসুন। সূর্য ডুবে যাবে যে।

চুড়োয় যখন উঠলুম, তখন যথারীতি হাঁপাচ্ছি। হাঁপ সামলানোর পর জয়ন্তীর কাছাকাছি এগিয়ে বসে পড়লুম। তারপর বললুম—ওখানে কী করছিলেন জয়ন্তী দেবী?

জয়ন্তী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। একটু চমক লক্ষ করলুম ওর মুখে। কিন্তু নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বলল, ওঠার পথে এমন সুন্দর নুড়িগুলো দেখলুম। অমনি বালিকাসুলভ খেয়াল জেগে উঠল।

—তা হলে বলব, আপনি নিশ্চয় বাল্যজীবনটা গ্রামেই কাটিয়েছেন?

—ঠিক তাই। একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

—শহরের মেয়েদের বাল্যজীবনে ধুলোপাথর নিয়ে খেলা সম্ভব নয়, তাই।

—আপনি গোয়েন্দার উপযুক্ত শিষ্য জয়ন্তবাবু।...বলে জয়ন্তী এবাব হালকা ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

সিগারেট ধরিয়ে বললুম—তা হঠাৎ একা-একা বেরিয়ে পড়লেন যে। কর্নেল আসবাব সময় আপনার ঘরে গিয়ে খুঁজেছিলেন আপনাকে।

—কর্নেল সায়েব এসেছেন নাকি? কোথায় তিনি?

—এই পাহাড়ের নীচে দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তারপর তাঁর খবর এ পর্যন্ত পাইনি।

হঠাৎ জয়ন্তী পশ্চিমে একটু ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল। তাবপর চাপা গলায বলল, দেখুন তো জয়ন্তবাবু, ওই যে নীচেব খাড়াই পাথরের মাথায় ছোট্ট চাতালে, ওই লোকটা কে?

ওর নির্দেশমতো ঝুঁকে দেখি পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে খাড়া দেওয়ালের নীচে অন্তত তিনশো ফুট দূরত্বে জয়সোয়ালজি দাঁড়িয়ে আছেন—একা। অবাক হয়ে বললুম—সর্বনাশ! ওখানে পৌঁছলেন কীভাবে ভদ্রলোক?

জয়ন্তী বলল, জানেন? ওখানেই মোহন পারেখকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আরও একটু ঝুঁকলে ব্যাপারটা টের পাবেন। কিন্তু সাবধান, মাথা ঘুরে যাওয়ার চান্স আছে।

বাপ্‌স! সেই অতল খাদের শূন্যতার কোনও তুলনা হয় না! সত্যি মাথা ঘুরে যাওয়ার দশা হল। সামলে নিয়ে সরে এলুম। বললুম—ওই খাদে পারেখজিকে ফেলে দিয়েছিল তা আপনি কীভাবে জানলেন?

জয়ন্তী চোখ নামিয়ে একটু হাসল—গোয়েন্দা সায়েবের শিষ্য তা হলে আমার দিকে সবসময় কড়া নজর রেখেছেন, বলুন?

ওর ওই কটাক্ষ আর হাসিতে যৌবনের উগ্র ঝাঁজ ছিল। পলকে আড়ষ্ট হয়ে বললুম, ছি, ছি! কী যে বলেন! জাস্ট একটা কৌতূহল। কারণ আমিও জানি না, কোন খাদে পারেখজির বডি পাওয়া গেছে।

জয়ন্তী হয়তো বিশ্বাস করল আমার কথা। বলল, আজ সকালে যখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আমি আপনার প্রক্সি দিয়ে বেড়িয়েছি, তা জানেন কি?

—তাই বলুন। আমি ভাবলুম...।

জয়ন্তী চাপা দুষ্টুমি করে ব্যস্তভাবে বলল, বলুন, বলুন। ভাবলেন যে আমিই পারেখজিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলুম!

ওর চোখে চোখ রেখে বললুম, আপনি তা পারেন জয়ন্তী।

জয়ন্তীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।—পারি মানে?

BanglaBook.org

প্রেমিকের আবেগ এসে গেল আমার কণ্ঠস্বরে।—পাবেন। যেমন—এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমাকেও কোন অতল খাদে ফেলে দিয়েছেন এবং আমি রক্তাক্ত হয়ে ধুঁকছি।

জয়ন্তী কথাটা বুঝল। কিন্তু অভিনয়টা ধরতে পারল না। তাই অমনি মুখটা লাল হয়ে উঠল। সে একটু ঘুরে গিয়ে বলল, আমার কি অত সাহস বা শক্তি আছে? সামান্য মেয়ে আমি।

—আপনি অসামান্যা, জয়ন্তী। যত দেখছি আপনাকে, অবাক হচ্ছি।

—কেন শুনি?

—কোনও কৈফিয়ত দিতে পারব না। তবে আমার এই অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির চোখ এড়ায়নি। আজ শ্রীমতী মালহোত্রার ঘরে উনি আমাদের কী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, মনে পড়ছে?

জয়ন্তী সুন্দর হেসে অস্ফুটস্বরে বলল, জয়জয়ন্তী।

আমার সংকল্প ছিল যে সুযোগ পেলে হাতের চেটো নিতে কার্পণ্য করব না। বিশেষ করে এই নির্জন পাহাড়ের চূড়া, পশ্চিমে চমৎকার একটা অস্তরাগ, এবং এই যুবতী মেয়েটি মিলে আমার মধ্যে একটা হঠকারিতার উপদ্রবও সৃষ্টি করছিল। তাই খেলার ছলে ওর হাতের চেটো নিলুম, কী প্রতিক্রিয়া হবে জানতুম না, একটা রিস্ক নিতে হল বইকী—কিন্তু আশ্চর্য, জয়ন্তী চুপ করে থাকল। এবার ওকে চাপাস্বরে ডাকলুম—জয়ন্তী?

—উঁ?

—আপনি আমাকে গোয়েন্দার শিষ্যাটিষ্য বলবেন না, প্লিজ।

জয়ন্তী ঘুরে সুন্দর হাসল আবার।—তবে কী বলব?

—মিতা।

—কারণ?

—কারণ দুজনের একই নাম।

এই সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। সেই রাঙা আলোয় জয়ন্তীকে বড় সুন্দর দেখাল। আরও একটু হঠকারিতায় আমি তাকে মৃদু আকর্ষণ করলুম, জয়ন্তী বাধা দিল না। এবার ওর মুখের দিকে ঝুঁকে চুমু খাওয়ার জন্যে যেই মুখ নামিয়েছি, পিছনে কোথায় কর্নেলের কাশির শব্দ আর সম্ভাষণ শুনতে পেলুম।—গুড ইভনিং জয়ন্ত, গুড ইভনিং জয়ন্তী।

দুজনে ছিটকে দু-পাশে সরে গেলুম তক্ষুনি। জয়ন্তী আমার দিকে কপট ক্রোধে একটু কটাক্ষ করল। ঘুরে দেখি, উত্তরের ঝোপের ডগায় কর্নেলের টুপি দেখা যাচ্ছে। বাহাত্তুরে বুড়ো। মনে-মনে ওঁর মুণ্ডুপাত করতে-করতে উনি এসে গেলেন।

বেরোবার সময় শরীরের কোথায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা লুকিয়েছিলেন জানি না, এখন দেখি সুদৃশ্য ইভনিং স্যুটের ওপর বেখাপ্পা হয়ে ওই জিনিস দুটো ঝুলছে। বোঝা গেল, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে ছাড়ে না!

—যাকগে, জয়জয়ন্তী তা হলে পর্বতশীর্ষে। ব্র্যাভো! ওয়ান্ডারফুল!...বলে বুড়ো কাছের পাথরের চাতালে পা ঝুলিয়ে বসলেন।

জয়ন্তী অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। এবার বলল, আপনি কি উত্তর দিক হয়ে উঠলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ওদিকটা যে ভীষণ খাড়া।

—তাতে কী? ওঠার একটা গোপন পথ আমি আবিষ্কার করেছি। ওই পথে মোড় নিয়ে ওই নীচের খাদের চাতালে যাওয়া যায়—যেখানে এখন মিঃ রঘুবীর জয়সোয়াল রয়েছেন।

বলে কর্নেল বাইনোকুলারটা চোখে নিয়ে কিছুক্ষণ জয়সোয়ালকে দেখলেন।

জয়ন্তী বলল, আমরা অনেক আগেই দেখেছি ভদ্রলোককে। ওখানে কী করছেন উনি?

BanglaBook.org

আমি বললুম, রিটায়ার্ড পুলিশ সায়েব তদন্ত করতে গেছেন।

কর্নেল হেসে উঠলেন।—তবে তদন্ত করতে আরও অনেকে এখন এই ভূতের পাহাড়ে চড়েছেন মনে হচ্ছে।

জয়ন্তী চমকে উঠে বলল, আর কে?

—মিসেস মালহোত্রা আর অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী। ভদ্রমহিলা আছেন একেবারে খাদের তলায়। তাই খালি চোখে ওঁকে দেখা কঠিন। আর অধ্যাপক আছেন জয়সোয়ালজির অন্তত একশো ফুট নীচে একটা খোঁদলে।

বললুম, মিসেস মালহোত্রা খাদে কী করছেন? সর্বনাশ! অবসেসনের অবস্থায় ওখানে চলে যাননি তো?

জয়ন্তী বলল, অধ্যাপকমশায়ই বা খোঁদলে কী করছেন?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে, প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন যে পরপর এই দুটো হত্যাকাণ্ডের পিছনে সত্যি-সত্যি কী ব্যাপার আছে?

বললুম, তার মানে, মিসেস মালহোত্রাও প্রেতের হাতে মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নন?

কর্নেল বললেন, এ ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারছিনে, জয়ন্ত। যাকগে, এখন সূর্যাস্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরানো উচিত নয় কি? দেখো তো, কত পবিত্র, কত মহান এক ঐশ্বরিক প্রকাশ ওই প্রাকৃতিক রূপ! বৎস জয়ন্ত, বৎসে জয়ন্তী, এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্যে সবরকম পার্থিব কলুষতা ভুলে যাই এসো। ওই দিব্য আলোর মধ্যে জীবনের গভীর আনন্দ খুঁজে নিই।...

বসে থাকতে-থাকতে শিগগির সন্ধ্যার অন্ধকার এসে গেল। ভারতের সমতলে আমরা সূর্যাস্তের পরও বেশ কিছুক্ষণ যে অপূর্ব শান্ত আলো দেখি অর্থাৎ যাকে বলা হয় গোধূলিকাল, এইসব উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তার নামমাত্র নেই। খুব শিগগির রাত্রি এখানে হানা দেয়। তবে আমরা একটা পাহাড়ের মাথায় বসে আছি বলে নীচের দিকটা যখন ঘোর কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে, এখানে তখন সামান্য আবছা ধরনের আলো ছিল। জয়ন্তী এবার বলে উঠল—নামতে অসুবিধে হতে পারে। এখন ফেরা যাক, কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর বললেন—প্লিজ জয়ন্তী, আর একটুখানি তোমাদের আটকে রাখতে চাই। আমি ফেরা না অবধি তোমরা দুজনে অপেক্ষা করো, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বুড়োর কথা বলার ধরনই ওইরকম। বললুম—আবার কোথায় যাবেন?

—একটুখানি দরকার আছে। কোনও প্রশ্ন করো না, জয়ন্ত।

জয়ন্তী বলল, আপনি কি ওঁদের কারও সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী জয়ন্তী। আমি জয়সোয়ালজির কাছেই যাচ্ছি। আর জয়ন্ত, তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই। মন দিয়ে শোনো।

—বলুন।

—আমি চলে যাওয়ার পর প্লিজ, একটুখানি কান তৈরি রেখো। যদি আমার কোনও ডাক শোনো, তক্ষুনি চেঁচিয়ে সাড়া দেবে এবং শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে যাবে। কেমন?

আমার গা শিউরে উঠল। ব্যাপার কী? কিন্তু জানি, খুঁটিয়ে কোনও জবাব এখন উনি দেবেন না। তাই বললুম—ঠিক আছে।

—আশা করি তোমার দুটো কানই সম্পূর্ণ সুস্থ, জয়ন্ত?

—নিশ্চয় সুস্থ।

BanglaBook.org

—তবু বলছি, অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় মানুষকে অনেক সময় ঠকায়। তাই দরকার হলে ওই যুবতীটির কানের প্রতি নির্ভর করবে। জয়ন্তী, তুমি কী বলো?

জয়ন্তীও এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি হল যেন। বলল, দেখুন কর্নেল, পর্বতাভিযানে আমাদের কানই সবসময় বড় সহায়। সামান্য শব্দ থেকে আঁচ করতে হয়, কোথাও ধস নামতে যাচ্ছে কি না, কিংবা তুষারঝড় আসছে কি না।

কর্নেল খুব উৎসাহী হয়ে বললেন, এক্সেলেন্ট! এটা আমি ভাবিইনি। ওকে বন্ধুগণ, অ রিভোয়া।

উনি যেপথে উঠে এসেছিলেন, অর্থাৎ উত্তরদিকে, ঝোপঝাড় ঠেলে দ্রুত অদৃশ্য হলেন। তারপর আমার অস্বস্তি হতে থাকল। কেন অতক্ষণ ধরে কান নিয়ে অত কথা বললেন কর্নেল? এখন মুশকিল হচ্ছে, এখানে প্রচণ্ড জোরে দক্ষিণের বাতাস বইছে। ক্রমশ বাতাসটা বেড়েও যাচ্ছে। এ অবস্থায় উত্তরের কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া অসম্ভব নয় কি? কথাটা এতক্ষণে মাথায় এল। তা ছাড়া উনি গেলেন উত্তরের খাড়াইয়ে নীচের দিকে। ওখান থেকে কোনও চিৎকার শোনা যাবে কি না সন্দেহ আছে।

কথাটা জয়ন্তীকে বলতে সে বলে উঠল, তাই তো। চলুন, আমরা এগিয়ে উত্তরের খাড়াইয়ের মাথায় কোথাও বসি।

দুজনে এগিয়ে গেলুম। এই সময় টের পেলুম, বাতাসটা জোর বেড়ে গেছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকা যেমন কঠিন, পা বাড়ানোও তাই। তায় ঘন রিঙ্গেল ঝোপে ভর্তি জায়গাটা। ঝোপে ঢুকতে গিয়ে জয়ন্তী বলল, কী কাণ্ড! আমরা নিশ্চয় কেউ টর্চ আনিনি?

অস্বস্তি বেড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। টর্চ আনার কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু কর্নেলের কাছেও তো টর্চ আছে বলে মনে হল না। ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম—নাঃ!

অবশ্য ও বুড়োর কথা আলাদা। উনি এক অলৌকিক প্রাণী বলা চলে। এই সময় আরও মনে হল, এসব পাহাড়ে নাকি অজগর, শঙ্খচূড় আর চন্দ্রবোড়া সাপের খুব উৎপাত আছে। এ কী মুশকিলে ফেলে গেল বুড়ো। পাছে সাপের কথায় জয়ন্তী আঁতকে ওঠে, ওকে কিছু বললুম না।

কিন্তু ওর সাহসের পরিচয় পেয়ে ততক্ষণে অবাক আমি। দিব্যি রিঙ্গেল ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল জয়ন্তী। তারপর ডাকল—চলে আসুন শিগগির!

পুরুষমানুষের আঁতে লাগল নিশ্চয়। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলুম। তখন জয়ন্তী খপ করে আমার হাত ধরল।—আস্তে মশাই, আস্তে। কখনও পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিয়েছেন কি? আমাকে ফলো করুন তা হলে। নয়তো পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙবেন।

অন্ধকারে ওর চাপা খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছিল। প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি যে নারী, তা এমন করে কখনও টের পাইনি। ওকে মনে হচ্ছিল রহস্যময় এক শক্তি—যা আমাকে কোনও ভয়ংকর বিনাশ অথবা আনন্দময় এক পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে চলেছে।

অবশ্য এই আবেগ সামলে নিতে হচ্ছিল। কারণ, সময় ও পরিবেশ প্রেমের অনুকূল নয় এখন। একটু পরেই জয়ন্তী দাঁড়াল। বলল, এই পাথরটায় বসা যেতে পারে। কিন্তু সাবধান, সামনে ঝুঁকবেন না।

অন্ধকারে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে টের পেলুম, একটা চারিকোণা দশ বর্গফুট আন্দাজ পাথর ঝোপের শেষ প্রান্তে উঁচু হয়ে রয়েছে। জয়ন্তীর দৃষ্টিশক্তি যে বিস্ময়কর, তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমার হাতটা ছেড়ে দেয়নি সে। টেনে বসিয়ে দিল পাশে। তারপর আমার দিকে ঘুরে কিছু বলতে চেষ্টা করল। সেই সময় ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ এসে লাগল—আমার সারা মুখে সেই বিচিত্র গন্ধটার ঝাপটানিতে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করল। এবার স্থানকাল ভুলে ঝটপট ওকে চুমু খেয়ে ফেললুম। জয়ন্তী আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল, যাঃ, এখন অসভ্যতা করে না।

BanglaBook.org

বুঝতে পারছিলুম, অন্ধকারে ও কতখানি রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি প্রেমিকের গলায় ডাকলুম—জয়া!

জয়ন্তী হাসল।—আমার ডাকনামটা কীভাবে জানতে পারলে, শুনি?

—গতকাল বিকেলে এখানে শ্যামলী ওই নামে তোমাকে ডেকেছিল।

জয়ন্তী অমনি আমার মুখে হাত চাপা দিল।—চুপ! এখন শ্যামলীর কথা বলো না।

না—শ্যামলী মানেই এক বীভৎস মৃত্যু। এখন ওর স্মৃতি সহ্য করা যাবে না। এই বিচিত্র সময়টা বিস্বাদ হয়ে পড়বে। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম—দেখ জয়া, তোমার হাতে আমার কান দুটোরও জিম্মা দিলুম। কারণ আমি এখন কিছুক্ষণ অন্য জগতে ঢুকে পড়তে চাই। তুমি কিন্তু শুনতে পেলেই আমাকে বলবে।

জয়ন্তী হয়তো হাসল।—উঁহু। আমি তো গোয়েন্দামশায়ের শিষ্য নই। সে দায় তোমার!

ঠিক সেই সময় বাতাসটা ঘুরে গেল এবং এলোমেলো বইতে থাকল। তারপরই আমাব চোখ গেল পশ্চিমের আকাশে। ওদিকের কয়েক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়গুলোর ওপর কিছু আগেও অনেক নক্ষত্র দেখেছি, এখন তাদের একটাও নেই এবং খুবই কালো মেঘের ব্যাপকতা ঘনিয়ে উঠেছে। তারপর আচমকা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে দেখলুম। সর্বনাশ! কালকের মতো ঝড় উঠবে নির্ঘাত! জয়ন্তীও বলে উঠল—এই রে! কী হবে?

জয়ন্তীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল মেঘ। বাতাস একেবারে উলটোদিকে ঘুরল। দেখতে-দেখতে চারপাশের পাহাড় ও জঙ্গলে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। মনে হল, লক্ষ-লক্ষ হাতি হঠাৎ খেপে গিয়ে দৌড়ে আসছে। আবাব ভয়ংকর শব্দে মেঘ ডাকল। থবথব করে কাঁপতে থাকল এই পাহাড়টা। তারপরই এসে পড়ল ঝড়।

সেই ভয়াবহ তাণ্ডবের বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। দুজনে দুজনকে শক্ত করে ধবে বসে আছি, তা না হলে ছিটকে পড়ব মনে হচ্ছে। জয়ন্তী ভয়ার্ত স্বরে বলল—জয়ন্ত, আমাদের এখনই এখান থেকে নেমে যাওয়া দরকার। বৃষ্টি শুরু হলেই কিন্তু ধস নামার সম্ভাবনা।

কর্নেলের জন্যে রাগ হল। বললুম—বুড়োর পাল্লায় পড়ে বেঘোবে প্রাণটা যাবে দেখছি। এখন কী করা যায়, বুঝতেও তো পারছিনে! ওঁকে বরং চেঁচিয়ে ডাকি, কী বলো?

জয়ন্তী বলল, হ্যাঁ। তা ছাড়া কোনও উপায় নেই! সাড়া যদি পাও, বলে দাও, আমরা নেমে যাচ্ছি।

ডাকবার জন্যে মুখেব কাছে হাত তুলে চোঙ বানিয়েছি, অমনি সে এক অদ্ভুত আর অমানুষিক আওয়াজ শুনতে পেলুম। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের রক্ত হিম হয়ে পড়ল। জয়ন্তী রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—ও কীসের আওয়াজ? কীসের আওয়াজ জয়ন্ত?

আঁ—উ—উ—উ! আঁ—উ—উ—উ! কতকটা সাইরেনের মতো—বিপদজ্ঞাপক কাঁপা-কাঁপা সুর, কিংবা কোনও গুহার ভেতর কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী যেন ওই দানবীয় ডাক ছাড়ছে।

এদিকে মুহুর্মুহু বাজ পড়ার বিরাম নেই। দূরে একটা দাবানল দেখা গেল পাহাড়ের মাথায়। ঝড়ের ভয়ংকর শব্দে এই পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই কুখ্যাত পাহাড়ের যুগযুগান্তকালের ভূতপ্রেতের দল যেন জেগে উঠেছে। তারা দল বেঁধে অমানুষিক কণ্ঠে চিৎকার করছে আঁ—উ—উ—উ! আঁ—উ—উ—উ!

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। বললুম—গোল্লায় যাক বুড়ো। জয়ন্তী, ওঠো—কুইক!

জয়ন্তী উঠে পড়ল। আমরা দুজনে সামনে ঝুঁকে হাত ধরাধরি করে সেই ওঠার পথটা অনুমান করে এগিয়ে গেলুম। একখানে ঢালু পেতেই নামতে শুরু করলুম। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছিল। পথ আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। পিছনে ভুতুড়ে আওয়াজটা সমানে শোনা যাচ্ছিল। এবার সেই উঁচু গাছের জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই জয়ন্তী হঠাৎ বলে উঠল—জয়ন্ত, এক মিনিট!

BanglaBook.org

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সে যেন একটা লাফ দিল সামনে। তারপর তাকে অদৃশ্য হতে দেখলুম। অমনি আরও ভয় পেয়ে ডেকে উঠলুম—জয়া, জয়া।

বিদ্যুৎ ঝলক দিল। তখন দেখতে পেলুম, জয়ন্তী সেই নুড়িগুলোর কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে রয়েছে। আমি আন্দাজে সেদিকে এগোতেই ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সে আমার হাত ধরে টানল—আর নয়। চলে এসো।

তারপর সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় প্রায় দৌড়তে শুরু করল জঙ্গলটার মধ্যে। এখানে জমি কিছুটা সমতল। তারপর ঘাসে-ভরা ঢালু জমিটা পেরিয়ে একেবারে নীচে গিয়ে পৌঁছলুম আমরা। সেখান থেকে আবার এক দৌড়ে সোজা পাকা রাস্তায় ওঠা গেল।

এবার জয়ন্তী দাঁড়াল। নীচে ঝড়ের প্রকোপ কিছু কম। একটা বড় প্রশ্বাস পড়ল দুজনের। জয়ন্তী বলল, সেই ভুতুড়ে আওয়াজটা আর কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।

কান পাতলুম—ঠিক তাই বটে। কিন্তু এবার বাতাসে কিছু ঠান্ডা ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টি আসবে নির্ঘাত। বললুম, কর্নেলের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই, জয়া। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো ভেজার চেয়ে চলো আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

জয়ন্তী বলল, কিন্তু কী ভাববেন উনি?

—যা খুশি ভাবুন। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই।

—যাব?

ওর হাত ধরে টানলুম।—পাগল। কর্নেলকে তুমি চেনো না। উনি একাই একশো।

অগত্যা জয়ন্তী পা বাড়াল। কিছুটা যাওয়ার পর সে বলল, ওই বিকট আওয়াজ কীসের বলে মনে হল তোমার?

—সম্ভবত ওদিকের সামরিক ছাউনিতে সাইরেন বাজাচ্ছিল। ঝড়ের জন্যে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল।

—ভ্যাট। সে ছাউনি কমপক্ষে সাত মাইল দূরে। আওয়াজটা কিন্তু ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে উঠছে মনে হল আমার।

—বেশ, তুমিই বলো ও কীসের আওয়াজ?

—তুমি তো অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করো না। বলে কী হবে?

—বিশ্বাস করছি, অন্তত তোমার খাতিরে।

জয়ন্তী আমার গালে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, এই দুঃসময়ে অত প্রেমের বাতিক কেন তোমার? শোনো—এবার বুঝলুম, কেন ওটাকে সবাই ভূতের পাহাড় বলে।

—হুঁ। ঝড়ের সময় সম্ভবত ওই আওয়াজ শোনা যায়, তাই। তো ইয়ে, জয়া—এবার বলো তো, ওই নুড়িগুলোর রহস্য কী? কেন ওখানে তুমি হঠাৎ ঝাঁপ দিলে?

জয়ন্তী একটু চুপ করে থাকার পর বলল, বলব। চলো, আগে হোটেলে পৌঁছই ভালোয়-ভালোয়।

—ভালোয়-ভালোয় কেন?

—সাবধানে চারিদিকে লক্ষ রেখে এগোচ্ছ তো? আমার ক্রমশ একটা অন্যরকম অস্বস্তি হচ্ছে।

—ভয় নেই, আমার কাছে আত্মরক্ষার ভালো ব্যবস্থা আছে। এই দেখো।

জয়ন্তীর একটা হাত আমার প্যান্টের পকেটে এগিয়ে দিলুম। অস্ত্রটা পরখ করে দেখে সে বলল—ব্যাপারটা তোমাকে বলা যেতে পারে। কর্নেল আমাকে অধ্যাপক দ্বিবেদীর দিকে নজর রাখতে বলেছিলেন। আজ বিকেলে সাড়ে তিনটে নাগাদ ওঁকে বেরোতে দেখে আমি পিছু নিলুম। দেখি, উনি ভূতের পাহাড়ের দিকে চলেছেন। আমি নীচের একটা বাঁকে গাছের আড়াল থেকে দেখলুম, পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের জঙ্গলটার ভেতর থেকে বেরিয়ে উনি সেই খাঁজটার কাছে গেলেন।

BanglaBook.org

তখন আমিও পাহাড়ে চড়া শুরু করলুম। এসব পাহাড় আমার কাছে হাতের চেটোর মতো। দু-তিন মিনিটে জঙ্গলের শেষ দিকটায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, অধ্যাপক নুড়িগুলো ঘাঁটছেন। একটু পরে উনি হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে চলে এলেন। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। দেখলুম, উনি ঝরনার দিকে চলে গেলেন—উত্তর দিকে। তখন আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নুড়িগুলোর কাছে গেলুম। খাঁজের গর্তে একগাদা নুড়ি জমে রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। আমি ওগুলোর তলা অবধি সাফ করেছি, তুমি গিয়ে হাজির হলে। যাই হোক, ততক্ষণে রহস্যটা ধরা পড়েছে। অধ্যাপক একটা খাম লুকিয়ে রেখে গেলেন। তুমি এসে পড়ায় খামটা নেওয়া হল না।

অভিমানী স্বরে বললুম, তুমি তো অদ্ভুত জয়া। আমাকে অবিশ্বাস করলে। আশ্চর্য তো! আমি...।

কথা আটকে গেল ক্ষোভে। জয়ন্তী আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, বিশ্বাস করো, অত ভেবে কিছু করিনি! আমি এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলুম যে কর্নেলকে জানানোর আগে কাউকে বলা উচিত হবে কি না ভেবে পাইনি। বেশ তো, এখন তো বললুম।

—খামটা ফেরার পথে নিয়ে এলে তা হলে?

—হুঁউ।

—কই, দেখি।

—এখানে নয়, হোটেলে ফিরে দেখাব।

—না, জাস্ট একবার ছুঁয়ে আঁচ করে দেখি না, কী আছে?

—একটা হালকা খাম। চিঠিফিটি আছে হয়তো।

—জয়া, একবার প্লিজ ছুঁতে দাও। কই, কোথায় রেখেছ?

—ভ্যাট! কাতুকুতু লাগছে।

—কোথায় রেখেছ, বলোই না বাবা!

—বুকে। মেয়েরা যেখানে গোপনীয় জিনিস রাখে!

জেদের বশে ওর ব্লাউজের ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছি, আচমকা পিছনে কর্নেলের গম্ভীর আওয়াজ এল—জয়ন্ত, অসভ্যতা করে না।

আচমকা ওই আওয়াজ শুনেই ছিটকে সরে দাঁড়িয়েছিলুম। কর্নেল এগিয়ে এসে বললেন, জয়ন্তী, শিগগির খামটা দাও। তুমি বড্ড অসাবধানী।

জয়ন্তীও চমকে উঠেছিল।—কর্নেল!

—হ্যাঁ, খামটা দাও। আর দেখো, বৃষ্টি আসছে। তিনজনেই এবার দৌড়তে শুরু করি।

জয়ন্তী বুকের ভেতর থেকে বের করে জিনিসটা দিল। পকেটে পুরেই কর্নেল বললেন, কুইক মার্চ।

হ্যাঁ, ঝড়টা কমে এসেছে—কালকের মতো ভয়ংকর ঝড় আজ আর হল না, কিন্তু বৃষ্টির গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। আমরা তিনজনে জোর কদমে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলুম।

লাউঞ্জে ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক আর মিঃ খান্না বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখে খান্না বললেন, কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি আপনার।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, তাই বুঝি! এক মিনিট—আমি এই কচি বন্ধু দুটিকে বিদায় দিয়ে এক্ষুনি আসছি।

ঘরে এসে আমি ও জয়ন্তী ক্লান্তভাবে বসে পড়লুম। বাইরে তখন জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কর্নেল বললেন, আবার আমি কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিচ্ছি। অ রিভোয়া জয়জয়ন্তী, অ রিভোয়া। তোমাদের সময় আনন্দময় হোক।

উনি বেরিয়ে গেলে জয়ন্তী আমার দিকে তাকাল। আমিও তাকালুম ওর দিকে। দুজনেই

BanglaBook.org

খামটার কথা ভাবছি, তাতে কোনও ভুল নেই।

একটু পরে দুজনেরই একসঙ্গে ফোঁস করে দুটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর জয়ন্তী আমার বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, কফি বলে দাও জয়ন্ত। বড্ড ক্লান্ত।

ফোনটা তুলে রুম সার্ভিসের নম্বর ডায়াল করতে থাকলুম। বৃষ্টির সুন্দর শব্দে এখন বাণেশ্বরের রহস্যময় আরেকটি রাত মুখর হয়ে উঠেছে।...

সাত ঃ গুহার মধ্যে একটি হাত

সে রাতে জয়ন্তী আর আমি ঘরে বসেই ডিনার খেলুম। তারপর দশটা বাজল, বারোটা বাজল—তখনও গোয়েন্দাপ্রবরের পাত্তা নেই। দুজনে অবশ্য গল্পগাছা এবং একটু-আধটু ফস্টিনস্টি করে কাটাচ্ছিলুম। তবে জয়ন্তী আমাকে বেশিদূর এগোতে দেয়নি। যাই হোক, বারোটার পর হাই তুলে ঢুলুঢুলু চোখে এবং ঘুমজড়ানো গলায় ও বলেছিল, আমি বুড়োর বিছানায় শুয়ে পড়ছি। খবরদার, বিরক্ত করবে না কিন্তু। চেঁচামেচি করে হোটেল মাথায় করব বলে দিচ্ছি।

—বেশ, করব না। কিন্তু কর্নেল ফিরলে কি তোমার ঘরে গিয়ে শুতে বলব?

—হুঁউ। কারণ, গত রাতটা প্রাণের দায়ে একা কাটিয়েছি। আজ আর নয়, বাব্বা! আজ প্রাণভরে ঘুমুতে চাই।

বলেই সে গুল তো সঙ্গে-সঙ্গে মড়া হয়ে পড়ল। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিলুম। তারপর কখন কর্নেল ফিরেছেন, ঘড়ি দেখিনি, প্রায় ঘুমের ঘোরে দরজা খুলে দিয়েছি এবং তক্ষুনি টলতে-টলতে ফের বিছানায় গড়িয়ে পড়েছি। কর্নেল, আমার অনুমান, জয়ন্তীর ব্যাগ হাতড়ে ওর ঘরের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন এবং বাইরে থেকে আমাদের ঘরটা লক করে দিয়েছেন।

সকালে জয়ন্তী আমাকে ওঠাল, তখন সাতটা। জীবনে এত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। ওকে তেড়ে ধমক দিলুম। কিন্তু ও আমাকে কাতুকুতু দিতে থাকল। সেই সঙ্গে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ইস! কী চান্স না গেছে তোমার!

ক্ষিপ্ত মেজাজের দরুন কথাটা অসভ্যতা বলেই ধরে নিলুম এবং নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে ওকে একটা কড়া বক্তৃতা শোনাতে হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। বললুম, দেখো জয়া, তুমি আমাকে চিনতে ভুল করছ! আমার মেয়েবন্ধুর সংখ্যা ছাত্রজীবন থেকে এ অবধি খুব কম নয়। কতবার একসঙ্গে বাইরে কাটিয়ে এসেছি দল বেঁধে। লিমিট রেখে কীভাবে অন্তরঙ্গতা বজায় রাখা উচিত—সে সেন্স আমার আছে।

জয়ন্তী আমার মুখে হাত চেপে বলল, চুপ! বেড-টি বলেছি। ওই শোনো, দরজায় নক করছে। কিন্তু হায়, ওই অমৃত আপাতত বরাতে নেই! কারণ, দেখে এসেছি দরজা বাইরে থেকে লক করা। কর্নেল ছাড়া এ কাজ আর কার সাহস হবে?

কিন্তু কী আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল এবং বেড-টির ট্রে নিয়ে হাসিমুখে ছোকরা বেয়ারাটি ঢুকে বলল, সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব!

জয়ন্তী ভুরু কুঁচকে বলল, দরজা লক করা ছিল না?

—জি না মেমসাব।

—সে কী! এই একটু আগে আমি দেখলুম, দরজা লকড।

আমি বললুম, করিডোরে কাকেও দেখলে এইমাত্র?

—জি হাঁ। কর্নেল সাহাব নেমে গেলেন।

আমরা পরস্পর তাকাতাকি করে একটু হাসলুম। বেয়ারা ট্রেটা রেখে চলে গেল। চায়ের

BanglaBook.org

কাপ তুলে নিয়ে জয়ন্তী বলল, আমি কিন্তু আজকাল বাসিমুখে বেড-টি খাইনে। খাওয়া উচিত নয়। অস্বাস্থ্যকর। তবে একসময় খেতুম, ভারি ভালো লাগত। তুলনা হয় না।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, তুলনা হয় না বটে। তাই স্বাস্থ্য মানি না। আমি তো এভারেস্টের চুড়োয় ওঠবার অ্যামবিশান নিয়ে জন্মাইনি।

জয়ন্তী চোখে ও ঠোঁটে ঝিলিক তুলে বলল, বাসিমুখে আর কী খেতে ভালো লাগে বলো তো?

—সিগারেট।

—ভ্যাট। বলতে পারলে না।

—চুমু?

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। শুধু বলল, যাঃ।

—তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছ নিশ্চয়?

—না বাবা, না। ও কথা মোটেও নয়। আমি বলতে চাইছিলুম, বাসিমুখে কখনও পেস্ট খেয়ে দেখেছ? ছেলেবেলায় আমি খেতুম।

—এই রামোঃ! পেস্ট খেতে? ছ্যা, ছ্যা।

জয়ন্তী হাসতে-হাসতে আমার হাঁটুতে খানিকটা চা ফেলে দিল।

বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি সেরে নিতে আমার ঘণ্টাখানেক লেগেছে। বেরিয়ে দেখি, জয়ন্তীর বদলে আমার বন্ধুবর বসে রয়েছেন। স্বভাবমতো বাও করে বললেন—সুপ্রভাত জয়ন্ত ডার্লিং। আশা করি, আজও সুনিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি?

গম্ভীর হয়ে বললুম, ঘটবার চান্স ছিল। তবু ঘটতে দিইনি।

—তুমি কি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ জয়ন্ত?

—বিলক্ষণ। আপনার কি এতটুকু বৈষয়িক বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই যে জয়ন্তীকে এ-ঘরে রেখে চলে গেলেন। ওকে জাগিয়ে নিজের ঘরে পাঠানো উচিত ছিল না কি? এবং তার ওপর দরজা লক করে গেলেন। ভেতরে যে একজন শক্তসমর্থ যুবক আর একজন স্বাস্থ্যবতী যুবতী রয়ে গেল—তারা সদ্যপরিচিত এবং সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, তাও খেয়াল করলেন না?

কর্নেল অপ্রতিভ মুখে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। ঘাট মানছি। এখন এসো, ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। জয়ন্তীও আসছে। তারপর তোমাদের সামনে একটা চমৎকার দলিল পেশ করব। আজ সারাদিন তোমাদের নিয়ে কাটাতে কোনও অসুবিধে নেই।

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললুম, দলিল? মানে, সেই খামটা তো?

—খামটা পরে। এ দলিল আমার তৈরি।

জয়ন্তী এসে গেল। হালকা নীল শাড়ি, হাতকাটা ব্লাউজের দু-ধারে ঝুলছে দুটি সরল আর নগ্ন বাহু জোরালো নিয়নবাতির মতো উজ্জ্বল। তার বুকের এই উদ্দীপ্ত প্রগলভতা এর আগে লক্ষ করিনি। মনে হল, দুরধিগম্য পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল চূড়া জয়ের চেয়ে সম্ভবত পুরুষ-মানুষকে জয়ের গর্ব আনন্দ আর তৃপ্তি আজও মেয়েদের অনেক-অনেক বেশি। এবং এ সবের চাপে মেয়েরা যেন একটু স্বার্থপরও হয়ে ওঠে। অন্তত শ্যামলীর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জয়ন্তীর আচরণ চুলচেরা বিচার করলে এই স্বার্থপরতাটাই টের পাওয়া যায়। সত্যি, মেয়েদের রহস্যময়তার কোনও তুলনা নেই।

জয়ন্তীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, ইয়ে, জয়ন্ত, জয়ন্তীর মধ্যে এবেলা আমরা নতুন কিছু নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করছি। তবে দেখো, মানুষের যা কিছু সৌন্দর্য-চেতনা, তা আজও প্রকৃতির নিয়মের বাইরে নয়।

BanglaBook.org

বক্তৃতা থামিয়ে দিল ব্রেকফাস্টের ট্রে। আমরা নিঃশব্দে খেতে বসলুম। খাওয়ার পর কর্নেল বললেন—ততক্ষণ তোমরা এই কাগজগুলো পড়ে ফেলো। আমি একবার লাউঞ্জে যাই। ডঃ পট্টনায়ক এসে পড়বেন। ওঁকে নিয়েই ফিরব।

পকেট থেকে কয়েক শিট ভাঁজ-করা কাগজ হাতে গুঁজে দিয়ে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমি আর জয়ন্তী পাশাপাশি বসে তা পড়া শুরু করলুম।

হাতের লেখা কর্নেলেরই।...

(১) শ্রীমতী সরোজিনী মালহোত্রা : ৭ জুন অর্থাৎ শ্যামলীর মৃত্যুর দিন সকাল আটটায় গ্রিনভিউ হোটেলে মোহন পারেখের সঙ্গে দেখা করেন। একঘণ্টা ছিলেন পারেখের ঘরে। হিস্টিরিয়াব রুগি। সরযূ লছমন আর বদ্রীর বর্ণনা অনুসারে দু-বছব আগের জুনে স্বামীর জিপ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর থেকে এই রোগ হয়েছে। ডঃ পট্টনায়কের মতেও, রোগটা অভিনয় নয়। ভদ্রমহিলার নার্ভের অবস্থা চরমের দিকে এগোচ্ছে। এখন থেকে চিকিৎসা করা দরকার। নযতো ভবিষ্যতে উন্মাদ রোগের সম্ভাবনা আছে। মাঝে-মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করেন। ৮ জুন সকালে তার কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি। ফিটের সময় বিড়বিড় করে একটা নাম উচ্চারণ কবেন। মহাবীর সিং। জ্ঞান হওয়ার পর প্রশ্ন কবলে বলেন—ও নামে কাকেও চিনি না। সরযূ, লছমন, বদ্রীও চেনে না। প্ল্যানচেটের আসর গত বছর প্রথম এক রাত্রে বসিয়েছিলেন। অধ্যাপক দ্বিবেদী, জয়সোয়াল বা মোহন পারেখ কেউ ছিলেন না সে আসরে। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এবার বাগেশ্বরে আসেননি। তবে সে-আসর ব্যর্থ হয়েছিল। আত্মা আসেনি। মিডিয়ামটি নাকি খুবই ভীতু প্রকৃতির ছিলেন, তাই আসেনি—এ হল শ্রীমতী মালহোত্রার মত।

(২) শ্রী হরিহরপ্রসাদ মালহোত্রা : সরোজিনীর স্বামী। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু এক অতর্কিত লোকসানের ধাক্কায় ক্রমশ ব্যবসা ভাঁটার দিকে যায়। আব সামলাতে পাবেননি। একদিন নৈনিতাল থেকে দিল্লি যাওযার পথে জিপ দুর্ঘটনায় মাবা পড়েন। জিপটা খাদে গড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে কেউ ছিল না। একা নিজেই ড্রাইভ করছিলেন নাকি। অন্তত তাঁর স্ত্রীব এই বর্ণনা। মন্তব্য তথ্য খুব সামান্য। রাস্তা ও বেতার যোগাযোগ চালু হলে বিস্তারিত তথ্য নৈনিতাল পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব হত। শ্রীমতী মালহোত্রাও অনেক কথা সম্ভবত গোপন করছেন।

(৩) শ্রী মোহন পারেখ : বোম্বের প্রখ্যাত ফিল্ম গায়ক। মালহোত্রার বন্ধুর ছেলে। ছেলেবেলা থেকে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। মালহোত্রার মৃত্যুর দিন সে ঘটনাচক্রে নৈনিতাল যায়। পথে জিপ দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে এবং দুঃসংবাদ তাঁর মুখেই শ্রীমতী মালহোত্রা পান। হোটেলে তার ঘরে একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে। শ্রীমতী মালহোত্রা তাকে অবিলম্বে বাগেশ্বরে আসতে বলেছেন। টেলিগ্রামের ডেসপ্যাচ তারিখ তেসরা জুন। পারেখ পৌঁছোয় ৬ জুন রাত্রে। ৭ জুন দুপুরে সে বেরিয়ে যায়। আর ফেরেনি। ভূতের পাহাড়ের পশ্চিম খাদে তার লাশ আবিষ্কৃত হয় ৮ জুন ভোর ৬টায়। মন্তব্য : হঠাৎ তাকে শ্রীমতী মালহোত্রার টেলি করার কারণ কী? উনি তেমন কোনও কৈফিয়ত দিচ্ছেন না। বলছেন, ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। বিশ্বাস হয় না।

(৪) শ্রীমতী শ্যামলী সেন : ৭ জুন সকালে মোহন পারেখের সঙ্গে লাউঞ্জে আলাপ। শ্যামলী ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। জয়ন্তী বিরক্ত হয়েছিল। পারেখের ঘরেও গিয়েছিল শ্যামলী। জয়ন্তী এতে রাগ করে ওপরে চলে আসে। একটু পরেই শ্যামলী ফেরে। অভ্যাসমতো জয়ন্তীর ঘুম এসেছিল। ঘুমজড়ানো চোখে দেখে, শ্যামলী বিছানা ঠিকঠাক করছে। (ব্যাপারটা সিগনিফিকান্ট) তারপর শুয়ে পড়ে সে। জয়ন্তী ঘুম ভাঙে আড়াইটে

BanglaBook.org

নাগাদ। তখন দেখে, শ্যামলী বিছানায় নেই। সে ভাবে, পারেখের ঘরে গেছে। আধঘণ্টা পরে শ্যামলী আসে। অপ্রকৃতিস্থ চেহারা। জয়ন্তীর মনে সন্দেহ হয়, মোহন পারেখ ওকে বাগে পেয়ে নিশ্চয় একটা কিছু করেছে। জয়ন্তী প্রশ্ন করলে শ্যামলী জবাব দেয়, একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হয়েছিল। তাই বাইরে লনে পায়চারি করছিল এতক্ষণ। স্বপ্নটার কথা আমরা ওইদিনই ভূতের পাহাড়ে শুনেছি। সাড়ে তিনটেয় দুজন বেরোয়। শ্যামলী সারাক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। মন্তব্য : মিডিয়াম হওয়ার সময় পারেখের আত্মা ওর মুখ দিয়ে যা-যা বলেছিল—তা অবিকল এখানে নোট করা হল।..

('আমি তাকে চিনতুম।' এই বাক্যটার তলায় লাল কালির দাগ। প্রশ্ন : কে কাকে চিনতে পেরেছিল?)

*(৫) **অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী :** ৩ জুন এসেছেন। ৭ জুন মোহন পারেখ চলে যাওয়ার পর নাকি মোহন পারেখের ঘরে ঢোকেন। বেয়ারাদের সাক্ষ্য। দুপুরে লাঞ্চের সময় হোটেলে ছিলেন না। বলছেন এক মাইল দূরে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম। ফেরেন বিকেল তিনটে নাগাদ। তারপর পোশাক বদলে বেরিয়ে যান। শ্রীমতী মালহোত্রার কথামতো চারটেয় পৌঁছন ওঁর বাড়ি। লনে চেয়ার পেতে অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রমহিলা। ৮ জুন সকালে জয়ন্তীর ঘরে ঢুকেছিলেন। বলছেন, শ্যামলীর আত্মীয়স্বজনকে খবর পাঠানোর ব্যাপারে 'বেচারা' বাঙালি মেয়েটিকে সাহায্য করা যায় কি না জানতে গিয়েছিলেন। দরজা খোলা ছিল। ঢুকে দেখেন কেউ নেই, তখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসেন। অথচ জয়ন্তী বলছে, দরজা লক করা ছিল। ৯ জুন বিকেলে আমি ভূতের পাহাড়ে পশ্চিমের খাদের একটা ছোট চাতালে ওঁকে আবিষ্কার করি। কী করছিলেন? জবাবে বলছেন—বেচারি পারেখ কীভাবে কোথায় পড়ে মারা গিয়েছিল, দেখার কৌতূহল ছিল। কিন্তু জয়ন্তী যে খামটা উদ্ধার করেছে, তা উনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন ভূতের পাহাড়ের পূর্বদিকের খাঁজে। এ খাম কোথায় পেলেন? (খামে আছে একটি ছবির নেগেটিভ প্রিন্ট।) খামের প্রশ্নে উনি আকাশ থেকে পড়লেন। জয়ন্তী ভুল দেখেছে। উনি নুড়ির ওখানে যানইনি। মন্তব্য : স্পষ্টই মিথ্যা বলছেন। কী উদ্দেশ্যে?*

*(৬) **শ্রী রঘুবীর জয়সোয়াল :** ৬ জুন এসেছেন। (বেশ সিগনিফিক্যান্ট) ৭ জুন বেরিয়ে যান দুপুর বারোটায়। ফেরেন একেবারে চারটে নাগাদ। সাড়ে চারটেয় যান মালহোত্রা ভবনে। মোহন পারেখের সঙ্গে পরিচয় নেই কস্মিনকালে। বেরিয়েছিলেন সামরিক ছাউনির উদ্দেশ্যে। সেখানে এক মেজর তাঁর বন্ধু নাকি। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করেন। (এর সত্যতা যাচাই আপাতত রাস্তা চালু না হওয়া অবধি অসম্ভব) শ্রীমতী মালহোত্রার সঙ্গে পরিচয় এখানে আসার পরেই। ভূত-প্রেত ও ভগবানে আস্থা নেই। তাঁর মতে, হত্যাকারী শ্রীমতী মালহোত্রা ছাড়া আর কেউ নয়। উদ্দেশ্য? রাস্তা চালু হলে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি পাব। জয়সোয়ালজির মতে, শ্রীমতী মালহোত্রার ওই হিস্টিরিয়া নিছক ভান। (জাঁদরেল পুলিশকর্তার পক্ষে এ-সব মতামত স্বাভাবিক) আজ পশ্চিমের খাদে গিয়েছিলেন সরেজমিনে তদন্তে। সেখান থেকে শ্রীমতী মালহোত্রাকে আবিষ্কার করেন নীচের খাদে। এর অর্থ—হত্যাকারীর সেই চিরন্তন মানসিকতা। হত্যাকাণ্ডের জায়গায় আবার যাওয়ার প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। না গিয়ে কিছুতেই পারে না। (শ্রীমতী মালহোত্রা কিন্তু স্বীকার করেছেন যে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আজ খাদে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য? কৌতূহল এবং শোক। বাছা পারেখের জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে গিয়েছিলেন।)...*

এবার সাত নম্বর লোকটির নাম দেখে আমি আকাশ থেকে পড়তে-পড়তে চেঁচিয়ে উঠলুম—আরে, এ কী!

জয়ন্তীও চমকে উঠেছিল। পরক্ষণে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলল,—সুপার এক্সেলেন্ট! হিপ হিপ হুররে! তারপর ঝুঁকে পড়ল কাগজটার দিকে।

(৭) শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী : ঘটনার সময় অর্থাৎ ৭ জুন রাত্রে প্ল্যানচেটের আসরে ঘর অন্ধকার হওয়ার পর সে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল কি? বলেছে, উঠিনি। অথচ আমার ধারণা, সে উঠেছিল এবং শ্যামলীর দিকে এগোচ্ছিল। আমার হাতে ওর খসখসে কোটের ছোঁওয়া লেগেছিল। খামচে ধরতে যাচ্ছি, নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে এল—কারণ টের পেয়েছিল যে আমি অন্ধকারেও সজাগ ও সতর্ক রয়েছি। (মন্তব্য : ওরকম খসখসে কোট কারও গায়ে ছিল না তখন।)

জয়ন্তী অবাক চোখ তুলে বলল, কী খুদে গোয়েন্দামশাই? ব্যাপারটা কী খুলে বল তো?

আমি গুম হয়ে বললুম, ভ্যাট! সব গুল।

—কর্নেলের ভুল হবে, বলতে চাও?

—আলবাৎ হবে। উনি তো দেবতা নন!

জয়ন্তী একটু চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল—কে জানে! তোমাকে আমার বড্ড রহস্যময় লাগে!

—লাগা উচিত। প্রেমিক হিসেবে নিজেকে আমি খুব রহস্যময় মনে করি।

—থাক। আত্মপ্রশংসায় কাজ নেই। তারপর কী লিখেছেন কর্নেল, দেখি। আমরা আবার কাগজে চোখ রাখলুম।...

কিছু বাড়তি তথ্য : (১) প্ল্যানচেটের সময় অন্ধকারে জয়সোয়ালজির চেয়ার অন্তত এক মিনিট খালি ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে এটা টের পেয়েছিলুম। সত্যিকার ভূত কি না দেখতে চেষ্টা করছিলেন নাকি? (২) ডাইনিং হলে কফি খাওয়ার সময় অর্থাৎ আসরের আগে অধ্যাপক দ্বিবেদী আর শ্যামলী পাশাপাশি বসেছিল। তখন ওরা চাপা গলায় কিছু আলোচনা করছিল। অধ্যাপকের উচ্চারিত একটা শব্দ কানে এসেছিল আমার—সাবধান। (৩) স্টাডিতে শ্যামলীর ঠিক পিছনের বুকশেলফটার তলায় খুবই সূক্ষ্ম কালো একটা চুলের মতো জিনিস পাওয়া গেছে। কতকটা বিষাক্ত পতঙ্গের হুলের মতো দেখতে। ডঃ পট্টনায়কের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাব। (৪) শ্যামলীর মাথার পিছন দিকে বোলতার হুল ফোটানোর মতো একটা স্পট আছে। ওখানেই প্যাথোজেন প্রথম ঢোকে। (৫) ডঃ পট্টনায়ক বলছেন, প্যাথোজেনের সঙ্গে এক ধরনের অজ্ঞাত রাসায়নিক জিনিসও দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। জিনিসটার অদ্ভুত ক্রিয়াশীলতায় প্যাথোজেনের কলোনি ফর্ম করার ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে যায়।

আর পড়া হল না। কর্নেল এসে পড়লেন। এসেই কাগজগুলো ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিলেন—যথেষ্ট হয়েছে! আমরা এবার বেড়াতে বেরোব। ওঠো তোমরা। নীচে ডঃ পট্টনায়ক অপেক্ষা করছেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বেজারমুখে বললুম, আমার নামে ওসব কী লিখেছেন, শুনি?

কর্নেল মুচকি হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এখন কোনও কথা নয়, ইয়ংম্যান। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।

হোটেলের লনে গিয়ে দেখি, একটা জিপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কর্নেল ইশারা করলে আমি আর জয়ন্তী লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মতো পিছনের দিকে ঢুকে বসলুম। কর্নেল আর পট্টনায়ক বসলেন সামনে। ড্রাইভারের পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, গাড়িটা পুলিশের।

স্টার্ট দিয়ে টনকপুর রোডে পৌঁছলে জয়ন্তী আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ কোথায় যাওয়া হচ্ছে এভাবে? মাথা নাড়লুম—কে জানে! যমের বাড়ি যে নয়, তা নিশ্চিত। গত পরশু রাতের ভয়ংকর দুর্যোগে বাগেশ্বর যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার সব রাস্তারই গড় দূরত্ব

BanglaBook.org

নিশ্চয় কমে গেছে। টনকপুর রোডের কোথায় ধস নেমেছে জানি না, তবে জিপের গতি দেখে মনে হল খানিকটা দূরেই হবে।

মাইলটাক রাস্তার আঁকিবুকি গোলকধাঁধা ঘুরে একটা অন্তত হাজার পাঁচেক ফুট উঁচু পাহাড়ের গায়ে গাড়ি উঠল। তারপর ফের এক চুলের কাঁটার মতো বাঁকের কাছে গিয়ে থেমে গেল। ডাইনে খাড়া পাথরের দেওয়াল, বাঁয়ে অতল খাদ। তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। কর্নেল বললেন—তা হলে নেমে পড়া যাক।

সবাই নামলুম। জিপটা যেখানে ব্রেক কষেছিল, সেখানে বাঁয়ে খাদের ওপর রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড হলদু গাছ। কাজেই ছায়া ছিল। কর্নেল আমার ও জয়ন্তীর হাত ধরে সস্নেহে বললেন, ডঃ পট্টনায়ক, চলে আসুন।

বাঁকের ওপারে কয়েক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়ালুম সবাই। এই ভয়ংকর ধসের চেহারা কল্পনা করতে পারিনি। বনেদি এই হাইওয়েটা হঠাৎ কেউ যেন পাহাড়ের গা থেকে ধারালো কোনও অস্ত্রে চেঁছে সাফ করে ফেলেছে—ঠিক দাড়ি কামানোর মতো। ওপারে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে অন্তত সিকি মাইল দূরে। নীচে বয়ে চলেছে একটা প্রবল জলস্রোত। উত্তর থেকে এসে ধসের খাদ ঘুরে একটা প্রকাণ্ড শাখাপথ তৈরি করে ফেলেছে সে। অজস্র গাছ উপড়ে পড়ে রয়েছে ইতস্তত।

ধ্বংসের এই দৃশ্য বিস্ময় এনেছিল প্রত্যেকের চোখে। একটু পরে ঠাহর হল, মানুষ তাই বলে ভড়কে যাওয়ার তো প্রাণী নয়। ওপারে অসংখ্য লোক রাস্তাটা আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। পোশাক দেখে বোঝা গেল, ওরা সামরিক বাহিনীর লোক। অনেকগুলো এক্সক্যাভেটার, ডোজার, ক্রেনও দেখতে পেলুম। এতদূর থেকে নীচে সবকিছু পোকার নড়াচড়া বলে ভুল হতে পারে।

কিন্তু এইসব দেখাতেই কি নিয়ে এলেন কর্নেল? ওঁর দিকে তাকালুম। একটু হাসলেন।—দেখলে তো জয়ন্ত? অন্তত পনেরো দিনের আগে এখান থেকে বেরোনো যাবে না। তবে যদি অন্য ব্যবস্থা হয়ে যায় ইতিমধ্যে, তো মঙ্গল।

আমি কোনও জবাব দিলুম না। জয়ন্তী শিউরে উঠে বলল, সর্বনাশ! তা হলে কী হবে!

কর্নেল জবাব দিলেন, খুব সম্ভব হেলিকপ্টার নামবার জায়গা আজই করে ফেলবেন বাণেশ্বর কর্তৃপক্ষ। গতকাল থেকে মিলিটারি হেলিকপ্টার খুব ঘোরাঘুরি করছে, নামতে পারছে না। বাণেশ্বর ইস্টের এয়ারস্ট্রিপটা সারদা নদী পুরো খেয়ে ফেলেছে। ওখানেই একটা পাহাড়ের মাথায় গাছপালা সাফ করা হচ্ছে। যাক গে, এবার আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব। ডঃ পট্টনায়ক, আপনিও তো পথ চেনেন—আপনিই লিড নিন।

পথ! এখানে পথ কোথায়? চারদিকে খুঁজছি দেখে ডঃ পট্টনায়ক বললেন, চলে আসুন জয়ন্তবাবু।

খাদের দিকে রাস্তার কিনারায় একটা সাত-আট ফুট উঁচু পাথর রয়েছে। ডঃ পট্টনায়ক পাথরটার কাছে গিয়ে হঠাৎ এক লাফ দিলেন। তারপর উনি অদৃশ্য। আমি হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত করছি দেখে কর্নেল পিছন থেকে ঠেলে দিলেন। প্রথমে ভড়কে গিয়েছিলুম। কিন্তু পড়ে গিয়ে দেখি একটা মোটামুটি চওড়া জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছি। ফুট চারেক নীচে এটা একটা চাতাল। তারপর পাথরের চাঁই ধাপে-ধাপে নেমে গেছে গভীর খাদটার দিকে। লাফিয়ে-লাফিয়ে নামা শুরু হল। আন্দাজ একশো ফুট নামার পর দেখি ডঃ পট্টনায়ক একটা গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার পরে নামল জয়ন্তী, তারপর কর্নেল। ডঃ পট্টনায়ক পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে বললেন, সাবধানে আমাকে অনুসরণ করুন সবাই।

গুহার দরজাটা ফুট পাঁচেক উঁচু, চওড়ায় ফুট তিন-সাড়ে তিন হবে। অস্বস্তি হল একটু। ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল এগিয়ে যেতে ইশারা করলেন। ডঃ পট্টনায়ক ভেতর থেকে

BanglaBook.org

ডাকছিলেন, কই, চলে আসুন আপনারা।

এই সময় লক্ষ করলুম, গুহার দরজার কালো স্লেটপাথরে অজস্র নাম সই করা রয়েছে। সব দ্রষ্টব্য পুরোনো জায়গায় এমন কাণ্ড চোখে পড়ে। যারা বেড়াতে যায়, তারাই নাম লিখে রেখে আসে। কাজেই, এই গুহাটা অনাবিষ্কৃত রহস্যময় কোনও গুহা নয়। তবে দু-ধারে ঝোপঝাড় গাছপালা কিছু ছিল, ঝড়ে-বৃষ্টিতে ধস নেমে সেগুলো সাফ হয়ে গেছে। মাটি বলতে যা কিছু ছিল, সেদিন রাতে প্রকৃতি সব ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন। কাজেই মাটির সন্তান ওই উদ্ভিদও মাটির অনুগামী হতে বাধ্য হয়েছে।

আঁশটে গন্ধ সব গুহাতেই পাওয়া যায়। নাকে রুমাল দিয়ে এগোলুম। মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছিল। ভেতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার। দম আটকে আসছিল। আন্দাজ পনেরো থেকে কুড়ি ফুট যাওয়ার পর ডঃ পট্টনায়ক বললেন—বাঁয়ে ঘুরতে হবে।

মোড় নিতেই মনে হল এবার একটা চওড়া জায়গায় এসে পড়েছি। ডঃ পট্টনায়ক চারদিকে আলো ফেলছিলেন। ঠিক তাই। ছাদটা অন্তত ফুট নয়েক ওপরে—ভেতরটা কমপক্ষে পনেরো ফুট চওড়া। টুকরো কাগজ, বাদামের খোসা, চকোলেটের প্যাকেট, আর একটা ছেঁড়াখোড়া কম্বলও পড়ে থাকতে দেখলুম টর্চের আলোয়। এবার কর্নেল বললেন, জয়ন্তী, তা হলে এবার খুঁজে দেখা যেতে পারে।

জয়ন্তী বলল, ডঃ পট্টনায়ক, টর্চটা দিন, প্লিজ।

আমি জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে আছি তো আছি! টর্চটা ঝলসে উঠছে বারবার, আর ওর মুখেচোখে একটা তীব্রতা লক্ষ করছি। আর ক্ষোভে অভিমানে মনে জ্বালা ধরে যাচ্ছে! আশ্চর্য, জয়ন্তী আমাকে কত কথা লুকিয়েছে তা হলে! এই গুহার ব্যাপারটা তো বলেনি আমাকে—বলেছে, ওই ধুরন্ধর বুড়োটাকে! ঠিক আছে—এত গোপনীয়তা যখন আমার সঙ্গে, তখন আর ভাব করে কাজ নেই। আড়ি, তোমার সঙ্গে আড়ি, জয়ন্তী! মনে-মনে ওকে একশো আড়ি দিলুম।

এ সময় আমার কাঁধে কর্নেলের হাত পড়ল।—কী জয়ন্ত! খুব বোকা বানিয়ে ফেলেছি কি? প্লিজ, ডার্লিং, একটু ধৈর্য ধরো।

জয়ন্তী হাঁটু দুমড়ে কাগজের টুকরোগুলো কুড়োচ্ছিল। অস্ফুটস্বরে বলল—আর কি পাব খুঁজে? ৬ তারিখ দুপুরের ব্যাপার, আজ ৯ তারিখ! তিন দিন!

বলতে-বলতে হঠাৎ সে কোণের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উত্তেজিত স্বরে বলল ফের, পেয়ে গেছি! এই যে! তারপর দলাপাকানো একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কর্নেলের দিকে হাত বাড়াল।

কর্নেল সেটা নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপর অকারণ চেঁচিয়ে বললেন—তা হলে ফেরা যাক। ডঃ পট্টনায়ক, আপনি আগে—তারপর জয়ন্ত, তার পিছনে জয়ন্তী, শেষে আমি।

কিন্তু চওড়া জায়গা থেকে সরু সুড়ঙ্গে পৌঁছে দেখি, আমি সবার পিছনে। আমার আগে জয়ন্তী, তার আগে কর্নেল, এবং ডঃ পট্টনায়ক সবার আগে। তারপরই ডঃ পট্টনায়ক ঘোষণা করলেন—যাঃ! সুইচ বিগড়ে গেল টর্চের। সাবধানে এগোন।

কেউ কোনও জবাব দিল না। জয়ন্তীকে ছুঁয়ে আন্দাজ করে পা বাড়াচ্ছিলুম। দম আটকে যাচ্ছিল আবার। আগে জানলে কক্ষনো ঢুকতুম না এখানে।

তারপর মনে হল, হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীকে আর পাচ্ছি না। আসার সময় বাঁ-দিকে বেঁকে গিয়েছিল সুড়ঙ্গ—এবার তা হলে ডাইনে ঘুরতে হবে। ভাবলুম—ওদের ডাকি। কিন্তু পাছে ওঁরা ভাবেন যে ভয় পেয়ে গেছি, আঁতে ঘা লাগল। তাই সাহস করে ডাইনের দেওয়ালে হাত রেখে এগোলুম। মনে হচ্ছিল, আমি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। ওঁদের পায়ের শব্দ আবছা শোনা যাচ্ছে। এই সময় ডাইনে মনে হল পথটা ঘুরেছে। যেই ঘুরতে গেছি, অমনি টের পেলুম কী একটা আমার কোটের পকেটে ঢুকেছে। আঁতকে উঠে চেঁচালুম—কর্নেল, কর্নেল!

BanglaBook.org

ভেবেছিলুম, নির্ঘাত পাহাড়ি গুহার অজগর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্য সেই জিনিসটা সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরও অবাক কাণ্ড, কর্নেলদের সাড়া পেলুম না। তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে—শরীর হিম, গলা শুকনো কাঠ। আবার চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল। ডঃ পট্টনায়ক। জয়ন্তী!

এবার সামান্য তফাতেই ডঃ পট্টনায়কের সাড়া পাওয়া গেল।—এই যে, এদিকে জয়ন্তবাবু!

তারপর, অবাক কাণ্ড, ডঃ পট্টনায়কের বিগড়ে যাওয়া টর্চটা জ্বলে উঠল। আলো দেখাচ্ছিলেন উনি। আর পিছন ফিরে তাকালুম না। দৌড়ে সঙ্গ ধরলুম। তখন পট্টনায়ক বললেন, হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন নাকি?

কোনও জবাব দিলুম না।

বাইরে বেরিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ল স্বাভাবিকভাবে। মনে-মনে নাক-কান মলে গুম হয়ে ওঠা শুরু করলুম সবার আগে। পিছনে জয়ন্তী ও কর্নেলের হাসির শব্দ শুনলুম।

ওপরে গিয়ে হলদু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করছি, কর্নেলরা এসে গেলেন। জয়ন্তী চাপা হেসে বলল, কী হয়েছিল তোমার? পিছিয়ে পড়েছিলে কেন?

জবাব দিলুম না। সিগারেট বের করে ধরালুম। সেই সময় কর্নেল মৃদু হেসে কাছে এলেন।—ডার্লিং জয়ন্ত, আশা করি ভীষণ ভয়ের ব্যাপার কিছু ঘটেনি!

আর চুপ করে থাকা গেল না। রেগেমেগে বলে উঠলুম, আজ থেকে এই শেষ। আর কক্ষনো আমাকে কোথাও যেতে ডাকবেন না।

কর্নেল নিরীহ মুখে বললেন, আহা, অত রাগ কি তোমার মতো ছেলের শোভা পায়, জয়ন্ত? তুমি একটা জিনিয়াস ছেলে। তোমার সাহস আর শক্তির পরিচয় এর আগে তো কম পাইনি। হঠাৎ তুমি মিছিমিছি ভয় পেয়ে যাবে, এ তো ভাবতেই পারিনি আমরা?

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বুড়োর ওপর রাগ করে থাকা কিছুতেই যায় না। ওই কথাগুলো এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, মনে হল উনি সত্যিই আমার জন্য সহমর্মিতা অনুভব করছেন। তাই রাগ খানিকটা কমিয়ে দিয়ে বললুম, থাক, খুব হয়েছে। আমি কচি খোকা নই।

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, কী? হয়েছিল কী বলো তো?

গজগজ করে জবাব দিলুম, অনেক কিছুই। প্রথমত—আপনি ঘোষণা করলেন যে সবার পিছনে থাকবেন। অথচ পরে দেখি, আমাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে পিছনে ঠেলে দিলেন। দ্বিতীয়ত—ডঃ পট্টনায়কের টর্চ আচমকা বিগড়ানোর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। আপনাদের একটা ষড়যন্ত্র ছিল এর পিছনে। আমাকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছিলেন। বলুন, এটা আমার পক্ষে অপমানজনক কি না। বলুন, এরপরও আপনাদের সঙ্গে ঘোরা আমার উচিত কি?

কর্নেল বিব্রতমুখে বললেন, আ ছিঃ-ছিঃ! ওকথা বোলো না জয়ন্ত।

ডঃ পট্টনায়ক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। এবার কাছে এসে বললেন—চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন জয়ন্তবাবু?

বললুম, দেখুন ডঃ পট্টনায়ক, ওই গুহার মধ্যে একটা অজগর-টজগর আছে, তাতে কোনও ভুল নেই।

—অজগর? কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। পট্টনায়কও বিস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কী হতে পারে? আমার কোটের পকেটে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সাপটা।

জয়ন্তী খিলখিল করে হেসে উঠল। এবং আশ্চর্য, কর্নেল আর ডঃ পট্টনায়কও হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর থামতে চায় না। আমি এক লাফে তক্ষুনি গাড়িতে উঠে বসলুম। ড্রাইভার বলল, ক্যা হুয়া সাহাব?

BanglaBook.org

—কুছ নেহি। বলে গম্ভীর মুখে বসে রইলুম।

একটু পরে তিনজনে গাড়িতে ঢুকলেন। ঢুকেই কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—তোমার ভুল হচ্ছে না তো জয়ন্ত? ওটা কি সাপ ঢুকছিল, নাকি কারুর হাত?

জবাব দিলুম না। কিন্তু কথাটা শুনেই আঁতকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ডে এক ঝলক রক্ত উপচে উঠল।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, সাপ হোক, আর হাতই হোক, ওটা যে খুবই নিরীহ বস্তু, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। ধরমবীর স্টার্ট দাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আর ডঃ পট্টনায়ক, তা হলে আমাদের অনুমান হুবহু সত্য বলে প্রমাণিত হল। তাই না?

লাঞ্চের পর হোটেলের বাইরে লনে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সবটা ভাবছিলুম। ভাবতে-ভাবতে টের পেলুম, প্রকৃত ব্যাপারটা কী ঘটেছে। গুহায় কর্নেলের পিছনে থাকার কথা চেঁচিয়ে বলে দেওয়া এবং আমাকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার কারণ, কর্নেল জানতেন কেউ ওই কাগজটা হাতাতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ গুহার মধ্যে আগে থেকে কেউ লুকিয়ে ছিল কোথাও, কর্নেল জানতেন। কিন্তু তাকে হাতেনাতে ধরলেন না কেন উনি? যেন মজাটা আমার সঙ্গে নয়, তাঁর সঙ্গেই করলেন। সুতরাং, একটা ব্যাপার এতে স্পষ্ট। এই গুপ্ত লোকটিকে কর্নেল হাতেনাতে ধরতে চান না। স্বভাবমতো তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চান।

কিন্তু দুটো তীব্র প্রশ্ন সামনে ভেসে এল। এক ঃ সে-ই কি শ্যামলী ও পারেখের হত্যাকারী? দুই ঃ ওই কাগজে কী আছে?

প্রথম প্রশ্নটার দিকে আলাদা করে তাকাতে গিয়ে রক্তে খিল ধরে গেল। ওরে বাবা! তা হলে তো সে অনায়াসে আমাকে খুন করতে পারত—ঠিক যে উপায়ে শ্যামলীকে খুন করেছে।

অথচ কর্নেল বলেছেন যে 'সেই হাতটা খুবই নিরীহ বস্তু।' কেন?

এই সময় জয়ন্তী হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল। আমার কাছে এসে বলল, কী ছোট গোয়েন্দামশাই, মনে-মনে খুব ঝাল ঝাড়া হচ্ছে কারও ওপর—তাই না?

বললুম—বয়ে গেছে! সিগারেট খাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? তা ছাড়া যা গরম পড়েছে! হাওয়া নিচ্ছি গায়ে।

জয়ন্তী আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর বলল, বুঝতে পারছি, তুমি আমার ওপর ভীষণ রেগে আছ। কর্নেলের আদেশের অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমাকে ভুল বুঝো না, জয়ন্ত।

—ঠিক আছে। আমি তো অবাধ্য হতে বলিনি কাউকে।

—কিন্তু এই চমৎকার পরিবেশে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন অবাধ্য হতে ইচ্ছে করছে। এবার অনায়াসে জবাব দেব, প্রশ্ন করো।

ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমান পুষে রাখা গেল না। বললুম, ওই কাগজটার কী ব্যাপার?

—ব্যাপার সত্যি বড্ড অদ্ভুত। তবে প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি বলে গুরুত্ব দিইনি এবং ভুলেও গিয়েছিলুম। ৬ তারিখে আমি আর শ্যামলী ওই গুহা দেখতে গিয়েছিলুম। আরও অনেক ট্যুরিস্ট ছিল ওখানে। বেশ ভিড় ছিল। অনেকে মোমবাতি হাতে নিয়ে ঢুকেছিল, তাই আলোর অভাব ছিল না। গুহার গায়ে আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি আছে। অজন্তার মতো ফ্রেস্কো ছবি। তারপর কী হল শোনো। ভিড়ের মধ্যে কে শ্যামলীর হাতে একটা ভাঁজকরা কাগজ গুঁজে দিল। আমি দেখিনি, একটু পরেই শ্যামলী বলল সে-কথা। তখন দুজনে সেই অল্প আলোয় কাগজটা খুব পড়ার চেষ্টা করলুম। মোমের আলোগুলো নড়াচড়া করছিল। সেই ফাঁকে যতটা পড়া যায়, পড়লুম। লেখা আছে ঃ 'মোহন

BanglaBook.org

পারেখ আসছে। সে একজন সাংঘাতিক লম্পট। ওর সঙ্গে মিশলে বিপদে পড়বেন। সাবধান।' আমরা তো অবাক। শ্যামলী বরাবর নির্বিকার, নির্লিপ্ত থাকতে চায়। কিছু গ্রাহ্য করা ওর স্বভাব নয়। দলাপাকিয়ে কাগজটা ফেলে দিয়েছিল। তারপর ও নিয়ে আমরা আর বিশেষ আলোচনা করিনি। ভুলেই গিয়েছিলুম।

—আমাকে বললে জানি না কোন মহাভারত অশুদ্ধ হত।

—কর্নেল বুড়ো নিষেধ করেছিলেন বলতে। বলেছিলেন, জয়ন্তকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই।

বলে জয়ন্তী আমার হাত ধরে টানল।—চলো। ঘরে যাওয়া যাক। কী বাতাস এখানটায়।

লন পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলুম। দেখলুম, কর্নেল, ডঃ পট্টনায়ক আর ব্রিজেশ সিং কোণের দিকে বসে গম্ভীর হয়ে কী সব আলোচনা করছেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলুম। ওপরের করিডোরে অধ্যাপক দ্বিবেদীর সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোককে খুব মনমরা মনে হচ্ছিল। আমাদের দেখে একটু হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন। জয়ন্তী মুখ টিপে হাসল। সিঁড়ির দিকে ভদ্রলোক অদৃশ্য হলে সে বলল, ভদ্রলোক ওপরে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলেন কেন, বুঝতে পারছ? সেই খামটার জন্যে।

ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলুম। তারপর বললুম, খামের মধ্যে একটা নেগেটিভ ছবি আছে, কর্নেল বলছিলেন। তুমি জানো ছবিটা কীসের বা কার?

জয়ন্তী মাথা দোলাল।

—জানলেও তো বলবে না। ঠিক আছে, বোলো না। তুমি তো এখন গোয়েন্দাপ্রবরের প্রধান শিষ্যা। আমি কোথাকার কে।

জয়ন্তী তেড়ে এল।—এই। আর ঝগড়া নয়। এবার কিছুক্ষণ দিবানিদ্রার ব্যাপার আছে।

—তা তুমি নিজের ঘরে যাও না।

জয়ন্তী গাল ফুলিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছ?

ওর দু-কাঁধ ধরে মুখের ওপর ঝুঁকে বললুম, তা কি পারি? কিন্তু একটা কথা—তুমি যেভাবে দিবানিদ্রার প্রতি আসক্ত, তোমার যে ভুঁড়ি ও চর্বি হয়ে যাবে জয়া। তখন আর পাহাড়ে চড়তে পারবে?

জয়ন্তী ক্লান্ত ও বিষণ্ণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শ্যামলী নেই। আর আমার পাহাড়ে চড়া হবে না, জয়ন্ত। ওর টানেই আমি মাউন্টেনিয়ারিংয়ের নেশায় পড়েছিলুম।

এতক্ষণে ওকে সত্যিকার আদর করতে-করতে বললুম, ঠিক আছে। এবার লক্ষ্মী মেয়েদের মতো—বনেদি বাঙালি মেয়েদের ভঙ্গিতে স্রেফ কুলবধূ হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। কেমন?

ও মৃদু ধাক্কা দিয়ে একটু সরে বলল, বধূ হই আর যা হই, তুমি কিন্তু বিশেষ আশা করে বসো না। কারণ, আশা অনেক সময় শুধু ছলনায় ফুরিয়ে যায়।...

BanglaBook.org

আট : আবার অশরীরী আত্মার আবির্ভাব

কর্নেলের আর পাত্তা নেই সে বেলার মতো। বিকেলে অগত্যা জয়ন্তী আর আমি বেড়াতে বেরোলুম। মোল্লার দৌড় মসজিদ—আমাদের ওই ভূতের পাহাড়। স্বীকার না করে উপায় নেই, অত সুন্দর পাহাড় আর এলাকায় দুটি নেই। তা ছাড়া কী এক গভীর রহস্যময় আকর্ষণ আছে যেন ওটার, বারবার যেতে ইচ্ছে করে। ভয় পেলেও ভালো লাগে ওখানে গিয়ে বসে থাকতে। চারদিকের দৃশ্যাবলীর তো তুলনাই নেই।

আমরা আজ প্রস্রবণটা আবিষ্কার করে ফেললুম। তারপর অনেকটা ঘুরপথে চুড়োর দিকে উঠতে শুরু করলুম। উত্তরে খাড়াই ভেঙে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞা জয়ন্তী কর্নেলের আবিষ্কৃত পথটা খুঁজে বের করল। আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু জয়ন্তী অক্লেশে উঠে যাচ্ছিল আর আমার অসহায় দশা উপভোগ করছিল।

এক জায়গায় খানিকটা ঢালু চাতাল টালি বা করোগেট শিটের চালের মতো নেমে গেছে। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে জয়ন্তী তরতর করে সেখানে চলে গেল। তারপর ঘুরে-ফিরে এদিক-ওদিক দেখে হাত ইশারায় ডাকল। খুব সাবধানে গেলুম ওর কাছে। গিয়ে দেখি, চাতালটার সব জায়গায় ছোট-বড় অনেক গর্ত আছে। গর্তগুলোর ব্যাস কমপক্ষে এক ফুট থেকে দেড় ফুট। গভীরতা আন্দাজ তিন থেকে চার ফুটের কম নয়। মনে হল, কারা যেন শামিয়ানা খাটাবার জন্যে প্রকাণ্ড সব খুঁটি পুঁতেছিল—কিংবা ইঞ্জিনিয়াররা এখানে কোনও কারখানা বানাবার জন্যে কংক্রিট থাম তৈরি করতে চেয়েছিল—অর্থাৎ একটা বাড়ির আয়রন স্ট্রাকচারের আয়োজন করা হয়েছিল। পরে যেন কোনও কারণে তা বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু গর্তগুলো রয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বললুম—এ-গর্তগুলো কীসের হতে পারে? ভারী অদ্ভুত তো!

জয়ন্তী বলল—ভূতের পাহাড়ে সবই অদ্ভুত হবে, এতে আশ্চর্য কিছু নেই।...বলে সে হাঁটু দুমড়ে একটা গর্তের কিনারায় বসল। তারপর মাথা নামিয়ে গর্তের ধারে কান পাতল।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। জয়ন্তীর বালিকাপনা দেখছি।

সে হাত তুলে ডাকল—এই, শোনো। এখানে কান পাতো!

—কেন? বলে ওর কথামতো বসে পড়লুম। তারপর কান পাততেই একটা অদ্ভুত চাপা আওয়াজ পেলুম। টেলিগ্রাফের খুঁটিতে কান পাতলে একধরনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু এই গর্তের আওয়াজ একেবারে অন্যরকম। ভুতুড়েই বলা যায় বরং। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় যে বিকট আঁ—উ—উ—উ শুনেছিলুম, অবিকল তারই একটা খুদে নমুনা। মনে হল, পাহাড়ের ভেতরে গভীর কোনও জায়গায় কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী আটকে পড়ে একটানা গর্জন করছে।

জয়ন্তী বলল—তা হলে একটা রহস্যের সমাধান হল। আওয়াজটা কোত্থেকে আসছিল বোঝা গেল। এখন বাতাস কম, তাই গর্তে কান না লাগালে শোনা যায় না। কিন্তু বাতাস বাড়লে আওয়াজও বাড়ে। আর ঝড়ের সময় কী ঘটে, তা তো কাল সন্ধ্যায় শুনেছি আমরা। প্রচণ্ড বাতাসের স্রোত গর্তের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ংকর হুইসিল হয়ে বেজে ওঠে।

বললুম—হ্যাঁ, তাই বটে। কিন্তু গর্তগুলো কীসের বল তো?

জয়ন্তী কিনারায় পাথর খামচানোর চেষ্টা করতেই তা সুরকির মতো গুঁড়ো হয়ে গেল। অমনি হেসে উঠল সে।—আরে, এই পাথর আসলে মুচমুচে হয়ে রয়েছে। বেলেপাথর আছে একধরনের। সহজেই গুঁড়ো করা যায়। এই চাতালটা স্রেফ সেই জাতের পাথরের, বুঝেছ? সম্ভবত সারা শীতকাল উত্তরের প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় এইসব গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এলাকার লোকেরা বড্ড বোকা তো। এসে কেউ ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেনি কখনও।

বললুম—সব কিংবদন্তিরই উদ্ভব প্রাচীন যুগে। সময় এগিয়ে যায়, কিন্তু কিংবদন্তি টিকে থাকে। যাক গে, চলো—ওপরে গিয়ে বসি।

একটু পরেই সেই রিঙ্গেল ঝোপগুলো পেরিয়ে আমরা চুড়োয় উঠলুম। আজ কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে জনপ্রাণীটি দেখতে পেলুম না।

হঠাৎ জয়ন্তী বলল—বাঃ। হেলিকপ্টার যে। দেখো, দেখো!

উত্তরপূর্ব দিকে একটা হেলিকপ্টার দেখলুম। সেটা একটু পরেই একটা উঁচু পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল। বললুম—প্যাড তৈরি হয়ে গেছে তা হলে। নেমে পড়ল মনে হচ্ছে।

জয়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল—তা হলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ এতক্ষণে চালু হল বলা

BanglaBook.org

যায়। কিন্তু এবার আমার সামনে ভয়ংকর এক সময় আসছে। শ্যামলীর বাড়িতে খবর দিতে হবে। কেমন করে মুখ দেখাব ওঁদের কাছে। ওর বডিটারই বা কী হবে?

ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠল। ওকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলুম।

কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম আকাশে আজও মেঘের আভাস লক্ষ করে নীচে নামলুম। পথে যেতে-যেতে বাতাস বেড়ে গেল হঠাৎ। হোটেলে পৌঁছে দেখি, কর্নেল ব্যস্তভাবে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। বললেন—এখন ঘরে নয়। আমরা শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িতে যাব। আর সবাই চলে গিয়েছেন। আমি তোমাদের নিয়ে যাব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

জয়ন্তী বলল—কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে!

—ঝড় কোথায়? এমন আবহাওয়া এখানে এখন প্রতিদিনই পাবে। চলো, দেরি করা যাবে না।

তিনজন পথে নামলুম যখন, তখন আকাশের অবস্থা ভয়াবহ। ঘড়িতে সময় সবে ছ'টা কুড়ি। শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়ির গেটে ঢোকার সময় প্রচণ্ড শব্দে কোথায় বাজ পড়ল। তারপর শুরু হল মেঘগর্জন। বাতাসও খেপে গেল। আমরা সোজা গিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকে পড়লুম।

ভেতরে চাপা আলো জ্বলছে। কোনার সোফায় বসে আছেন ডঃ পট্টনায়ক, আর এক অচেনা ভদ্রলোক। মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ারে চুপচাপ গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন রঘুবীর জয়সোয়াল। আর অধ্যাপক দ্বিবেদী ও শ্রীমতী মালহোত্রা ডাইনিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে কী সব আলোচনা করছেন।

আমাদের দেখে শ্রীমতী মালহোত্রা মৃদু হেসে আপ্যায়ন জানালেন। আমরা তিনজনে গিয়ে বসলুম ডঃ পট্টনায়কের কাছে। অচেনা ভদ্রলোকটির বয়স সত্তরের কম নয়। সাদা চুল, আর মস্ত গোঁফ। তিনি কর্নেলের দিকে রাও করে বললেন—হ্যাল্লো!

কর্নেলও বললেন—হ্যাল্লো!

কিন্তু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না ভদ্রলোকের। এই সময় শ্রীমতী মালহোত্রাকে কিচেনের দরজায় ঢুকতে দেখলুম। অধ্যাপক পায়চারি শুরু করলেন। ঘরে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। ব্যাপারটা কী?

বাইরে যথারীতি প্রচণ্ড ঝড় আর মেঘের তাণ্ডব চলেছে। অস্বস্তিতে মনে-মনে অস্থির হচ্ছিলুম। জয়ন্তীর মুখে একটা উৎকণ্ঠা জড়িয়ে আছে মনে হল। সে মুখ নিচু করে নিজের কড়ে আঙুলে কিছু দেখছে।

কিচেন থেকে গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে লছমন আর সরযূ। ওদের হাতে ট্রে। নিঃশব্দে সকলের সামনে ট্রে ধরলে প্রত্যেকে কাপ তুলে নিলেন। সরযূ চমৎকার কফি করে।

যতক্ষণ কফি খাওয়া হল, কেউ কোনও কথা বললেন না। এই সময় দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হল। লছমন এগিয়ে যাচ্ছিল, শ্রীমতী মালহোত্রা কড়া স্বরে বলে উঠলেন—লছমন! বরাবর বলেছি না, রাত্রিবেলা ওভাবে কক্ষনো ঝোঁকের মাথায় দরজা খুলবে না। চলে এসো। ও কেউ না—এমনি আওয়াজ। ও কিছু না।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—এমনি আওয়াজ। বলেন কী মিসেস মালহোত্রা।

—হ্যাঁ। বিশ্বাস না হলে দরজা খুলে দেখতে পারেন আপনারা। ঝড়ের রাত্রে বরাবর এমন হয়। সে রাতে বদ্রী যদি নিষেধ মেনে দরজা না খুলত, কোনও বিপদ ঘটত না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমার মনে হয় ম্যাডাম, আপনার ও-দরজার কপাটের গঠনে ত্রুটি আছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। জোরে বাতাস বইলে অমন শব্দ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীমতী মালহোত্রা গম্ভীর হয়ে গেলেন।—আপনি অভিজ্ঞ মানুষ কর্নেল। অনেক ব্যাপারে আপনার মতামতের মূল্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু মনে রাখবেন, অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সহজে উড়িয়ে

BanglaBook.org

দেওয়া যায় না। যাক গে, প্রায় সাতটা বাজে। এবার আমরা আসরে গিয়ে বসতে পারি।

আসর! আমি জয়ন্তীর দিকে সপ্রশ্ন তাকালুম। জয়ন্তী চোখ নামাল। মুখটা উৎকণ্ঠায় ভরে আছে এখনও।

শ্রীমতী মালহোত্রা পা বাড়িয়ে বললেন—প্লিজ, আপনারা আর দেরি করবেন না। এমন সময় তো প্রতিদিন পাওয়া যাবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই চমৎকার সুযোগ আমাদের ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়।

তা হলে আবার অশরীরী আত্মার কারবার! অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। এসব হচ্ছেটা কী! কর্নেলের দিকে তাকালুম। উনি বললেন—চলো জয়ন্ত। জয়ন্তী, ওঠো। ডঃ পট্টনায়ক! আপনার মাননীয় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসুন তাহলে।

স্টাডির চাবি আজ শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে। তিনি দরজা খুলে দিলেন এবং একধারে দাঁড়িয়ে কপাটটা আটকে থাকলেন। সেদিনকার মতো। আমরা একে-একে ঢুকে পড়লুম।

সেই মারাত্মক ঘর আর সেই আটটা চেয়ার, মধ্যে সেই গোলটেবিলটা। পকেটে হাত ভরে রিভলভারটার অস্তিত্ব অনুভব করলুম। কিন্তু যদি সত্যি আজও কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটে, আমি কি এই অস্ত্রটা দিয়ে তা আটকাতে পারব?

অবিকল সেদিনকার মতো বসে পড়লুম সবাই। আমার ডাইনে রইল জয়ন্তী, বাঁ-দিকে কর্নেল। আর শ্যামলীর চেয়ারে বসলেন সেই আগন্তুক ভদ্রলোক। ওই বুড়োই কি আজকের আসরের মিডিয়াম?

উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে তক্ষুনি হালকা নীল আলো জ্বাললেন শ্রীমতী মালহোত্রা। তারপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেদিনকার মতো বক্তৃতা শুরু করলেন।—বন্ধুগণ! আজ আমার দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতার প্রয়োজন আশা করি হবে না। আজকের আসরে যিনি মিডিয়াম হতে চান, তিনি ডঃ সীতানাথ পট্টনায়কের বন্ধু—অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং। উনি আজ বিকেলেই হেলিকপ্টারে সরকারি ত্রাণ দফতরের প্রতিনিধি হিসেবে বাণেশ্বরে এসে পড়েছেন। আমার মতোই ওঁর প্রেতচর্চার আগ্রহ খুব প্রবল, তা আমি ডঃ পট্টনায়কের কাছেই শুনেছি। শোনামাত্র আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনারা জানেন, খুব সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন ও অনুভূতির প্রখরতা যাঁদের আছে, একমাত্র তাঁরাই মিডিয়াম হওয়ার উপযুক্ত। স্থূল মন, অনুভূতির বালাই নেই, সূক্ষ্ম গভীর ভাবনা ভাবতে অপটু, এমন কোনও মানুষের পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুপ্রবাহে ভাসমান সেই বিমূর্ত চিন্তাতরঙ্গ ও চেতনা—যা বস্তুর নিয়ম মেনে চলে না, তা ধরা সম্ভবই নয়। আনন্দ ও আশার কথা, আমাদের নবাগত বন্ধু মিঃ সিং একজন শৌখিন মিডিয়াম হিসেবে অনেকখানি অভিজ্ঞতা রাখেন। জানি না, এই আকস্মিক যোগাযোগের পিছনে আমাদের বিপরীত জগতের সেই অশরীরী বাসিন্দাদের কতখানি হাত আছে—তবে ডঃ পট্টনায়কের কাছে ওঁর পরিচয় পেয়েই আমি সঙ্গে-সঙ্গে এই আসরের প্রস্তাব দিয়েছিলুম। এখন কথা হচ্ছে, আজ এই আসরের মুখ্য উদ্যোক্তা হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি, হতভাগিনী শ্যামলী সেনের আত্মাকে উনি আজ আহ্বান করুন।

অধ্যাপক দ্বিবেদী বলে উঠলেন—কিন্তু উনি তো চিনতেনই না শ্যামলীকে।

জয়সোয়ালজি ঘোঁতঘোঁত করে হাসলেন শুধু।

কর্নেল বললেন—তাও তো বটে।

শ্রীমতী মালহোত্রা কী বলতে যাচ্ছিলেন, মেজর জেনারেল ভদ্রলোক একটু কেশে বিনীতভাবে বললেন—শ্যামলী সেন আমার সুপরিচিতা। মানালি অভিযানের সময় আমি ওঁর দলকে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলুম। জয়ন্তীদেবীর আশা করি মনে আছে?

জয়ন্তী কিছু বলতে ব্যস্ত হওয়ামাত্র কর্নেল আমার পায়ের ওপর দিয়ে একটা পা বাড়িয়ে জয়ন্তীর পায়ে মৃদু ধাক্কা দিলেন—ব্যাপারটা আমি আর জয়ন্তী ছাড়া কেউ টের পেল না। জয়ন্তী অমনি আমতা-আমতা করে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনিই তো! মনে আছে বইকী। খুব মনে

BanglaBook.org

আছে।

কিন্তু জয়ন্তীর চোখের বিস্ময়টুকু আমার চোখ এড়িয়ে গেল না।

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন—তা হলে এবার আলো নেভাই। অনুগ্রহ করে কেউ যেন কোনও শব্দ করবেন না। রেডি—ওয়ান...টু...থ্রি...।

আলো নিভে যাওয়ার মুহূর্তে জয়সোয়ালজিকে অস্ফুটস্বরে বলতে শোনা গেল—পাগলামি।

ঘন অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি তো আছি। কোনও শব্দ নেই ঘরে। কিন্তু বাইরে ঝড় ও মেঘের হাঁকডাক সমানে চলেছে। ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল। আজও কোনও অঘটন ঘটবে না তো? কর্নেল কেন এসব ঘটতে দিচ্ছেন? আমার অস্বস্তিটা বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশ। কিন্তু না—এখন অন্য কোনও ভাবনা নয়, শ্যামলীর কথা ভাবা উচিত। তার আত্মাকেই আজ আনা হবে। কাজেই স্থির মনে তার কথা ভাবা যাক।

ভাবতে গিয়ে সে রাতের সব ঘটনা আগাগোড়া মনে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, আমি এত অবাক হয়েছিলুম যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলুম ঝোঁকের বশে। ভূতপ্রেতে একতিল বিশ্বাস আমার নেই। তাই পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছিলুম, যদি সত্যি ভূত-প্রেত শ্যামলীকে ভর করে থাকে তা হলে আমার এই গতিবিধি টের পাবে এবং অবশ্যই এর একটা প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কিন্তু ধুরন্ধর কর্নেলের জন্যে সেটায় বাধা পড়েছিল। আমার কোটে টান পড়া মাত্র ছিটকে নিঃশব্দে চেয়ারে এসে বসেছিলুম। আজ কিন্তু সে ঝোঁক আর আমার নেই।...আচ্ছা, একটা কথা—আমার বাঁ-দিকে ছিলেন কর্নেল, তাঁর বাঁ-দিকে ডঃ পট্টনায়ক। তা হলে ডঃ পট্টনায়ককে ডিঙিয়ে কীভাবে কর্নেল টের পেলেন যে জয়সোয়ালজির চেয়ার খালি?...হ্যাঁ, কর্নেলও চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন তা হলে। কেন উঠেছিলেন? আমি যেজন্যে কৌতূহলী হয়েছিলুম, উনিও কি সেজন্যেই?...আর একটা কথা, শ্যামলী কি ইচ্ছে করেই অমন বিকৃত দুর্বল স্বরে কথা বলছিল?

আমার চিন্তাসূত্রকে মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে দিল একটা ভাঙা খ্যানখেনে স্বর। সেই মুহূর্তে বাজ পড়ল বাইরে কোথাও। ঘরটা জোরে কেঁপে উঠল। টেবিলটাও একবারের জন্যে নড়ে গেল যেন।—আমি আছি...আমি আছি...আমি আছি!...এই ঘরে আছি। এই বাড়িতে আছি। এই পাহাড়ে আছি। জঙ্গলে আছি। রাস্তায় আছি...। আছি...আছি...আছি...।

ও কি মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিংয়ের কণ্ঠস্বর? অসম্ভব। 'আছি' শব্দটা ক্রমাগত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকল। মনে হল সারা অন্ধকার ঘরে আটকে-পড়া কী একটা শক্তি পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। আই একজিস্ট...আই একজিস্ট।

(এখানে একটা কথা বলা দরকার, বাংলোঘরে অন্য লোকের সঙ্গে কিংবা শ্রীমতী মালহোত্রার বাড়িতে আমরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলেছি বা বলি। মিডিয়ামও তাই ইংরেজিতেই কথা বলবে, এটা স্বাভাবিক। শ্যামলীও বলেছিল।)

এবার ভেসে উঠল শ্রীমতী মালহোত্রার কণ্ঠস্বর।...হু আর ইউ? কে তুমি?

অন্তত তিনবার প্রশ্নের পর জবাব শোনা গেল—আমি শ্যামলী, আমি শ্যামলী, আমি শ্যামলী...।

বোঝা যাচ্ছিল প্রশ্ন না করলে অশরীরীর কথা কিছুতেই থামবে না। প্রশ্ন করতে শুনলুম জয়ন্তীকে।—শ্যামলী, শ্যামলী। তোকে কে মেরেছে রে?

—তুই কি জয়ন্তী, তুই (হুউ) জয়ন্তী, তুই কি জয়ন্তী?

—হ্যাঁ, আমি জয়ন্তী। তোকে কি মোহন পারেখের আত্মা খুন করেছিল সে রাতে?

—বলব না, বলব না, বলব না...।

—শ্যামলী, বল, তাকে আমরা শাস্তি দেব।

জয়ন্তীর এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমতী মালহোত্রাও প্রশ্ন করলেন—কে মেরেছিল মোহন

BanglaBook.org

পারেখকে? তার সঙ্গে অধ্যাপক দ্বিবেদীর ভীতু গলার প্রশ্ন যোগ দিল—বলুন, বলুন, মোহন পারেখ কাকে চিনতে পেরেছিল? কে সে?

শ্রীমতী মালহোত্রা অমনি চাপা গলায় গর্জালেন—চুপ! কেউ কোনও প্রশ্ন নয়। শুধু আমাকে প্রশ্ন করতে দিন।

ওদিকে এইসব হট্টগোলের মধ্যে কিন্তু সমানে সেই খ্যানখেনে স্বরের আওয়াজটা একটানা শোনা যাচ্ছে—বলব না, বলব না, বলব না...।

শ্রীমতী মালহোত্রা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—শ্যামলী, মোহন পারেখ কাকে চিনতে পেরেছিল?

—মহাবীর সিংকে...মহাবীর সিংকে...মহাবীর সিংকে..।

—কীভাবে মোহনের মৃত্যু হল?

—ফোনে ডেকেছিল। ভূতের পাহাড়ে যেতে বলেছিল।

—কেন?

—নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। টাকা দেবে বলেছিল। ফোটো চেয়েছিল।

—বোঝা যাচ্ছে না। খুলে বলো।

—বলব না, আর বলব না।

—প্লিজ, শ্যামলী!

—পারেখ সাহস করে ফোটো নিয়ে যায়নি সঙ্গে। আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল।

—কার ফোটো, শ্যামলী? কার ফোটো?

সে-কথার জবাব নেই। শ্যামলীর আত্মা বলে উঠল—ভূতের পাহাড়ে পারেখ গেল। আমাকে জানিয়ে গেল। আপনাকে জানাতে বললুম—সে আপনার বাড়ি হয়ে গেল। আপনি ছিলেন না। সুমিত্রাজির বাড়ি গিয়েছিলেন। তখন আমি চুপিচুপি ওকে অনুসরণ করে ব্যাপারটা দেখতে গেলুম। পাথরের আড়ালে বসে দেখলুম, মহাবীর সিং ধাক্কা মেরে পারেখকে ফেলে দিল। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম। জয়ন্তীকে বললুম না—ও আমাকে খুব বকবে বলে ভয় হল। জয়ন্তীকে আমার গার্জেন বলে সমীহ করতুম।...তারপর...।

আচমকা জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল, সেইসঙ্গে কর্নেলের গর্জন শোনা গেল—খবরদার মহাবীর সিং।

টর্চের আলোয় দেখা গেল, মেজর জেনারেল সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর ডাইনের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন রঘুবীর জয়সোয়াল—আর মেজর জেনারেল চোখের পলকে তাঁর বুকে ঘুষি মারলেন। জয়সোয়ালজি চেয়ারসুদ্ধ পড়ে গেলেন সশব্দে। অমনি উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল ঘরে।

তারপর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখি, বুকসেলফ আর উঁচু আলমারির পিছন থেকে একটি করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ খান্না আর ব্রিজেশ সিং। দুজনের হাতেই রিভলভার। খান্না জয়সোয়ালজির জামার কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করালেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এসব ঘটে গেল।

এবার দেখলুম, কর্নেল আর ডঃ পট্টনায়ক মেঝেয় কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন ব্যস্তভাবে। জয়ন্তী আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি—চেয়ার থেকে ওঠার কথা ভুলেই গেছি। ওদিকে শ্রীমতী মালহোত্রা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তখন চার-পাঁচজন পুলিশ এসে ঢুকে পড়ল। তারপর জয়সোয়ালজিকে ধরল। তখন খান্না ওঁর হাতে একটা হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জয়সোয়ালজি একটা কথাও বললেন না।

তা হলে জাঁদরেল রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়ালই হত্যাকারী! আমি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকালুম। আর এতক্ষণে জয়ন্তীর যেন সংবিত ফিরল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস

BanglaBook.org

করে বলল—চলো জয়ন্ত, আমরা বেরিয়ে ওঘরে যাই। আমার বুক কাঁপছে।

দুজনে বেরিয়ে ডাইনিং হলের কোনায় সোফায় গিয়ে বসে পড়লুম। কী বলব পরস্পর, ভেবেই পাচ্ছিলুম না। আমি চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকলুম, জয়ন্তী একবার অস্ফুটস্বরে বলল—ভীষণ মাথা ধরেছে, তারপর মাথাটা হেলিয়ে বসে রইল। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিলুম। মাঝে-মাঝে মেঘ ডেকে উঠছে।

একটু পরে স্টাডির দরজা খুলে গেল। প্রথমে ব্রিজেশ সিং ও সেই পুলিশবাহিনী জয়সোয়ালজিকে নিয়ে বেরোলেন। ডাইনিং হল পেরিয়ে সদর দরজা খুলে ওঁরা বৃষ্টির মধ্যেই অদৃশ্য হলেন। পরক্ষণে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আসামি নিয়ে ওঁরা থানায় চলেছেন।

এবার বেরোলেন হাসিখুশি মুখে অধ্যাপক অরিন্দম দ্বিবেদী। খুব চঞ্চল দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। হনহন করে এসে আমাদের পাশে বসে পড়লেন। তারপর একটু কেশে বললেন—কথাটা হচ্ছে, আমি সব টের পেয়েছিলুম, জানেন? কিন্তু প্রাণের ভয়ে বলিনি। বললেই বা কে বিশ্বাস করত বলুন? ওরে বাবা, বিটায়ার্ড পুলিশসুপার—অত দাপট আছে নামের। থানা আমাকে পাত্তা দিত ভাবছেন? উলটে আমাকেই খুনি সাব্যস্ত করে কেস সাজাত। বাপ্‌স্‌। রক্ষে করো বাবা।

জয়ন্তী হঠাৎ উঠল।—এই, কফি বলে আসি সরযূকে। আর দেখি ট্যাবলেট পাই নাকি।

সে কিচেনের দিকে চলে গেলে অধ্যাপক ফিসফিস করে বললেন—জয়ন্তী দেবী কিন্তু আমার ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন, জানেন?

তাকালুম ভদ্রলোকের দিকে। তাতে যেন উনি ঘাবড়ে গেলেন। থতমত খেয়ে ফের বললেন—বরাবর মিঃ চাউড্রি, শিক্ষক হিসেবে আমার একটা কঠোর আদর্শ আছে। সেটা মেনে চলি। দুর্নীতি বা অন্যায় দেখলেই সাধ্যমতো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমার শারীরিক সামর্থ্য ততটা নেই। তাই অনেক সময় পিছিয়ে আসতে হয়। যেমন ধরুন, মোহন পারেখের ব্যাপারটা...।

বললুম, মোহন পারেখকে আপনি চিনতেন নাকি?

—আলবাত চিনতুম। ও তো মাস্তানটাইপ ছোকরা, মশাই। দিল্লিতে এসে গত বছর যা সব কাণ্ড করেছিল, ভাবতে পারবেন না। আর আজকালকার মেয়েগুলোর কী ব্যাপার দেখুন! ছ্যা ছ্যা ছ্যা। পারেখকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তক্ষুনি। তা বুঝলেন মিঃ চাউড্রি? মিসেস মালহোত্রা যখন কথায়-কথায় সেদিন আমাকে বললেন, এবারও প্ল্যানচেটের আসর করব এবং মোহন পারেখ মিডিয়াম হবে—তাকে আনতে টেলি করেছি, আমার খুব রাগ হল। খবর নিলুম, গ্রিন ভিউয়ে ওর জন্যে ঘর বুক করা হয়েছে। জয়ন্তী দেবী আর শ্যামলী দেবীর মতো দুটি ফুলের মতো মেয়েকে পারেখ সামনে পেলে কী ঘটবে, ভাবতে বুক কেঁপে উঠল। ভাবলুম, ওঁদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। সোজাসুজি সামনাসামনি বললে তো অপমানিত হওয়ার ভয়। তাই লাধিয়া নদীর ধারে একটা গুহার মধ্যে সুযোগ পেয়ে একটা চিরকুট লিখে দিলুম।

বাধা দিয়ে বললুম—জানি। আরও জানি, আজ ওই গুহার অন্ধকারে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন। চিরকুটটা আবার কী হাঙ্গামায় ফেলে ভেবে ওটা খুঁজতে গিয়েছিলেন!

অধ্যাপক হাসলেন।—জানেন? তা কাণ্ড দেখুন। একালের মেয়েদের সত্যি বোঝা যায় না, মশাই। সেদিন ওটা পেয়ে ওরা মোটেও চমকালেন না, ভয় পেলেন না। বরং উলটে আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে পারেখের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন। আমার আবার ওই এক বাতিক। যাঃ, বেটাছেলে কখন নিষ্পাপ মেয়ে দুটোর সর্বনাশ করবে, কে জানে। খুব তক্কে-তক্কে রইলুম। দেখলুম, পারেখের সঙ্গে শ্যামলী দেবীরই জমে উঠেছে। জয়ন্তী দেবী যেন অভিমানে দূরে-দূরে ঘুরছেন। ৭ তারিখ বেলা এগারোটা নাগাদ পারেখের ঘরের দিকে নজর রেখেছি, দেখলুম বেটা বেরিয়ে এসে লাউঞ্জে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর শ্যামলী এল নেমে। আমি ওঁদের ঢলাঢলি দেখেই বুঝলুম, আজই সর্বনাশটা ঘটবে।

BanglaBook.org

তাই অমনি পারেখের ঘরে ঢুকে ওয়াডবোবের পিছনে লুকিয়ে থাকলুম। যদি সত্যি দেখি, বেটা মেয়েটির সর্বনাশ করতে যাচ্ছে—তা হলে আমার একদিন কী ওর একদিন। কান পেতে অপেক্ষা করছি, এমন সময় দুজন ঢুকল। তারপর চাপা গলায় বলা শুরু হল। শুনেই পিলে চমকে গেল আমার। এ যে সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে! পারেখ বলছে, মহাবীর সিং নামে একজনের সঙ্গে ও ভূতের পাহাড়ে দেখা করতে যাচ্ছে—খুব গোপনীয় ব্যাপার। আর এই খামটা ওঁকে দেয়। খামটা খুব দামি। লুকিয়ে রাখতে হবে। ফোনে পারেখ জেনেছে, মিসেস মালহোত্রা এখন বাড়ি নেই। তা হলে তাঁকেই দিত। শ্যামলী বলল—সকালে তো উনি এসেছিলেন, তখন দিলেন না কেন খামটা? পারেখ বলল—তখন দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। তা ছাড়া ওটা বিশেষ করে শ্রীমতী মালহোত্রাকে সে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। যাই হোক, শ্যামলীকে তার ভালো লেগেছে। তাকে সে বিশ্বাস করে বলেই রাখতে দিচ্ছে। শ্যামলী খামটা বুকে ভরে ফেলল দেখলুম। তারপর দুজনে বেরিয়ে গেল। এবার আমার অবস্থা বুঝুন! বেরোব কীভাবে? দরজা তো লক করে দিয়ে গেল। মনে পড়ল, ঠিক তিনটেয় সুইপার আসে ঘর সাফ করতে। সর্বনাশ।

—তা হলে ওইদিন আপনি তিনটে অবধি পারেখের ঘরে বন্দি থাকলেন?

—হ্যাঁ। কী দুরবস্থা বুঝুন! কর্নেলকে মিথ্যে বলতে হল যে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম।

—বেরোলেন কীভাবে?

—পারেখের বিছানায় শুয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম। (মশাই, বেটাচ্ছেলে মরে নরকেই গেছে।) সেই সময় ওর বিছানার তলায় যা-সব ছবি পেয়েছিলুম, ছ্যা-ছ্যা। খিদে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

—আহা, বেরোলেন কী করে?

—দরজা দিয়ে। সুইপার ঢুকল হোটেলের চাবিতে দরজা খুলে। আমি বেরিয়ে গেলুম। ব্যাটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ভাবল, পারেখের কুটুম্ব হবেন। যাক গে, খুনি ধরা পড়ল। এখন দেখা যাক, বিচারে কী হয়। দেখবেন—প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। আজকাল তো বিচার নয়—প্রহসন। প্রহসন।

এতক্ষণে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং, ডঃ সীতানাথ পট্টনায়ক, শ্রীমতী সরোজিনী মালহোত্রা আর খান্না সায়েব বেরোলেন। ডঃ পট্টনায়কের হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

তারপর জয়ন্তী আর সরযূ বেরিয়ে এল কিচেন থেকে—দুজনেরই হাতে ট্রে। সরযূ চলে গেল। জয়ন্তী কফি তৈরি করতে থাকল। কর্নেলরা এসে ভিড় জমালেন।

আমি কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। প্রথামতো তাঁর এবার একটি দীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার কথা। রহস্যের সমাধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকবে তাতে।

একটু পরেই কফিতে চুমুক দিতে-দিতে কর্নেল বললেন—জয়ন্ত উসখুস করছে। ওর দু-চোখে কৌতূহল ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হত্যাকাণ্ডে বিশেষ কোনও রহস্য নেই। এত প্রাঞ্জল ব্যাপার আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

তা হলে একেই বলে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কি রামের মাসি? প্রাঞ্জল ব্যাপার মানে? এমন জটিল গোলমেলে ধাঁধায় ভরা হত্যাকাণ্ড কে কোথায় শুনেছে? আমি অবাক হয়ে তাকালুম ওঁর দিকে।

কর্নেল বললেন—প্রথম কথা, শ্রীমতী মালহোত্রার বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে চাইনে—যা ঘটেছে, উনিও জানেন। আমি শুধু সংক্ষেপে তথ্যগুলো সাজিয়ে দিতে চাই। আমাদের দ্বিতীয় মিডিয়াম যে উদ্দেশ্যে অভিনয় করেছেন, শ্যামলীও তা করেছিল। উদ্দেশ্য, প্রেতাত্মার অছিলায় একটি হত্যাকাণ্ড ফাঁস করে দেওয়া। শ্যামলী সম্ভবত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। প্রচণ্ড ভয়ও পেয়েছিল। এই বিদেশে তারা দুটি মাত্র মেয়ে, চারপাশে অনাত্মীয়, সদ্য চেনা মানুষ। আজকাল পুলিশেও লোকের

BanglaBook.org

বিশ্বাস নেই। তাই তার পক্ষে এই বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য জয়ন্তীকে সে বলতে পারত। বলেনি, পাছে জয়ন্তীর যা অতি-সাহসী চালচলন এবং বেপরোয়া মনোভাব—সে হইচই বাধিয়ে বসে এবং পরিণামে মহাবীরের হাতে তারা বিপদগ্রস্ত হয়। আবার, শ্রীমতী মালহোত্রাকেও সে বলেনি। সেও একই কারণে সম্ভবত। আমার ধারণা, মোহন পারেখ বিস্তারিত তথ্য তাকে জানায়নি। তাই শ্যামলী ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, কী করা উচিত। সে সময় নিচ্ছিল ভাবতে—অথবা এড়িয়ে যেতে চাইছিল। ভেবেছিল, থাক, নাক গলিয়ে লাভ নেই।

জয়ন্তী বলে উঠল—ঠিক তাই। সেদিন আপনাদের সঙ্গে আসতে-আসতে সে বলেছিল, পরদিনই ভোরের বাসে চলে যাবে। জায়গাটা অসহ্য লাগছে। আমি অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু ও যা অভিমানী আর জেদী, তাই হ্যাঁ না কিচ্ছু বলিনি।

কর্নেল বললেন—ঘটনাচক্রে শ্রীমতী মালহোত্রার প্ল্যানচেটের আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেল। তখন সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল। ভাবল, প্রেতের ঘাড়েই দায়টা চাপাবে। খুবই স্বাভাবিক শোনাবে হত্যাকাণ্ডের খবর। সে যদি নিপুণ অভিনয় করতে পারে, হত্যাকারীও ভয় পেয়ে ভাববে, প্রেতেরই কীর্তি! এ সবই অনভিজ্ঞ শ্যামলীর বালিকাসুলভ আচরণের পরিচয়। সে ভাবল—এমনিভাবে বিবেকদংশনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, আবার মাথাও বাঁচাতে পারবে। কী বলেন ডঃ পট্টনায়ক?

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—আপনার হাইপোথিসিস যুক্তিসিদ্ধ কর্নেল।

—আমার ধারণা, হত্যাকারীর নামটা সে হয়তো বলত না। অতটা সাহস তার ছিল না। সে বারবার 'বলব না' বলছিল মনে পড়ছে? কিন্তু হত্যাকারী তো অন্তর্যামী নয়। সে আর এক সেকেন্ডও রিস্ক নিতে চাইল না। ভাবল, আর এক মুহূর্তে নামটা বলে ফেলবে শ্যামলী। তাই সে জিভারোদের প্রথায় বিষাক্ত হুল ওর মাথায় বিঁধিয়ে দিল। হত্যাকারীও ভাবল, বাঃ! চমৎকার হল। প্রেতের ঘাড়েই চলে যাবে হত্যাকাণ্ডটা। কারণ, এই অদ্ভুত বিষের কথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান জানবে কেমন করে? বিশেষ করে শ্যামলীর মুখের বীভৎসতা আশা করি মনে পড়ছে আপনাদের। মৃতের মুখের অমন চেহারা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে একেবারে অপরিচিত সিম্পটম। কাজেই ডাক্তাররা হাল ছেড়ে বলবেন, মৃত্যুর কারণ দুর্জ্ঞেয়। তার মানে—প্রেতের হত্যাকাণ্ড বলে বিশ্বাস করানো তখন বেশ সহজ হয়ে উঠবে।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন—দেখুন না, অজ্ঞাত কিছু ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে বুঝতে পেরেছিলুম। অথচ সেই চিহ্ন খুঁজতে স্বভাবত আমরা দেহের অন্যান্য অংশে খুঁজেছি। মাথা খুঁজিইনি। যখন কর্নেল বললেন, প্যাথোজেনের প্রথম পর্যায়ের কলোনি কোথায় রয়েছে—তখনই মাথায় সূচের সূক্ষ্ম দাগ চোখে পড়ল। কারণ মাথাতেই সেই কলোনির খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলুম।

কর্নেল বললেন—এই মহাবীর সিং ওরফে জাল পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়স্তোয়াল উদয়চাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা—যে ছিল হরিপ্রসাদ মালহোত্রার ব্যবসায়ের পার্টনার, সে একসময় দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল। ওর আদি কীর্তির কথা কাস্টমস, সি-বি-আই, আর বোম্বে পুলিশের নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে। শ্রীমতী মালহোত্রার কাছে এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। ওর খপ্পরে পড়ে দেনায় ডুবে যেতে থাকেন হরিহরজি। তখন ওরই পরামর্শে নির্বোধের মতো বিস্তর বেআইনি পথে টাকা রোজগারের চেষ্টা করেন। এর ফল হল আরও গুরুতর। উলটে মহাবীর সিং তাঁকে ব্ল্যাকমেল শুরু করল। তখন হরিহরজি একদিন ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করলেন। জিপসুদ্ধ ঝাঁপ দিলেন দিল্লি থেকে নৈনিতাল আসার পথে এক পাহাড়ি খাদে।

...এবার এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। সরোজিনী দেবী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা—নৈনিতাল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বরাবর তাঁর বনিবনা ছিল না। স্বামীর কারবার এবং চালচলন মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি থাকেন নৈনিতালে, হরিহরজি দিল্লিতে। তিনি ভুলেও আনকালচার্ড স্বামীর কাছে যেতেন না। স্বামী আসতেন কদাচিৎ। তাই স্বামীর পার্টনারটিকে তিনি

BanglaBook.org

জানতেন না—চিনতেনও না। এমনকী স্বামীর ব্যবসায়ে অত সব গুরুতর কাণ্ডেরও খবর রাখতেন না।

...এবার আসি মোহন পারেখের প্রসঙ্গে। মোহন হরিহরজির বাল্যবন্ধুর ছেলে। আজীবন মালহোত্রা পরিবারে তার যাতায়াত ছিল। নিঃসন্তান স্বামী ও স্ত্রী দুজনের কাছেই সে স্নেহাস্পদ হয়ে উঠেছিল। বোম্বেতে ভাগ্যান্বেষণে গেলে মোহনকে বরাবর হরিহরজি টাকা পাঠাতেন। সরোজিনীও কখনও-সখনও পাঠাতেন। হরিহরজি যখন ক্রমাগত উদয়চাঁদ বা মহাবীরের হাতে শোষিত হচ্ছেন, তখন স্ত্রীকে ভয়ে বা সংকোচে সব জানাতে না পেরে পুত্রাধিক প্রিয় মোহন পারেখকে এক দীর্ঘ চিঠিতে তা জানিয়ে দিলেন এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্পটাও গোপন রাখলেন না। সে চিঠি আমরা পেয়েছি সরোজিনী দেবীর কাছে। যাই হোক, চিঠি পেয়ে তক্ষুনি প্লেনে দিল্লি এল মোহন। এসে শুনল, হরিহরজি নৈনিতাল রওনা হয়ে গেছেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে মোহনও রওনা হল। তখন দেরি হয়ে গেছে। পথে জিপ দুর্ঘটনা দেখতে পেল সে। নৈনিতাল পৌঁছে সরোজিনীকে সব জানাল। তারপর বলল, পিতাজির এই অসহায় মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবেই। কিন্তু তখন কোথায় সেই উদয়চাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা? দিল্লি থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে...।

..অবশেষে মোহন শরণাপন্ন হল বোম্বের এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির। দিনে দিনে এজেন্সি তাকে উদয়চাঁদের তথ্য জানাল। তখন সে দিল্লিতেই জয়পুরের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়াল সেজে বাস করছে। কিন্তু তার আদি অকৃত্রিম নাম মহাবীর সিং। অনেক বছর আগে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় বোম্বেতে তার জেল হয়। কয়েদি হিসেবে থাকার সময় জেলের পোশাকপরা তার একটা ছবি জেলকর্তৃপক্ষ সরকারি প্রয়োজনে তুলে রেখেছিলেন। ডিটেকটিভ এজেন্সি সেই ছবির নেগেটিভ ঘুষ দিয়ে কীভাবে হাতায় এবং মোহনকে দেয়। সেই সঙ্গে মোহনকে এজেন্সি জানাল, মহাবীর সিং জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ তাকে খুঁজছে—পাত্তা পায়নি। যাই হোক, এতদিনে সে দিল্লিতে নিজেকে জয়পুরের রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার বলে পরিচয় দিয়ে বাস করছিল। আসল রঘুবীর জয়সোয়াল কবে মারা গেছেন।

এবার শ্রীমতী মালহোত্রা চোখের জল মুছে বললেন, আমার স্বামীর পার্টনারকে কখনও আমি দেখিনি। ওর ওই জাল নামগুলো মোহন আমাকে পরে সব জানিয়েছিল। কিন্তু বেচারা মোহন নিজেই এক লোভে পড়ে গেল। ওর মাথায় ফিল্ম প্রোডিউস করার ঝোঁক চেপেছিল। তাই মালহোত্রাজির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার ছলে শুরু করল রঘুবীর জয়সোয়ালকে ব্ল্যাকমেলিং।

জয়ন্তী বলল, ব্ল্যাকমেলিং?

অধ্যাপকও বললেন, কী কাণ্ড?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, মোহন ওর কাছে টাকা আদায় শুরু করল। সেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভ প্রিন্ট দেখিয়ে সহজেই কাবু করল তাকে।

জয়ন্তী বলল, ৭ জুন দুপুরে ভুতের পাহাড়ে তা হলে মোহন পারেখ টাকা আনতে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। টাকা আনতে তো বটেই, হয়তো আরও কোনও প্রলোভন দেখিয়েছিল মহাবীর। একটু বেশি সাহস দেখিয়ে ফেলেছিল মোহন পারেখ। ফলে প্রাণ হারাতে হল। মহাবীর মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবার।

মেজর জেনারেল হরগোবিন্দ সিং বললেন, মিসেস মালহোত্রা, আপনি তো উদয়চাঁদ ওরফে মহাবীরকে কখনও দেখেননি। কিন্তু এখানে কেমন করে চিনেছিলেন ওকে? মোহনকেই বা তার আসার অত আগে টেলিগ্রাম করেছিলেন কেন? কেমন করে জানলেন মহাবীর ওরফে জয়সোয়াল এখানে আসবে?

শ্রীমতী মালহোত্রা বললেন, এখানকার সবক'টা হোটেলে বাইরের লোক সিজনে বেড়াতে এলেই আমি যেচে গিয়ে আলাপ করি। আমন্ত্রণ করে আসি। এ আমার বরাবরকার অভ্যাস। সোসাইটি

BanglaBook.org

ছাড়া আমার দম আটকে যায়। এমনকী কারা-কারা আসবেন, অগ্রিম কারা ঘর বুক করেছেন—সে খোঁজও নিই। গ্রিন ভিউ হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, এক রিটায়ার্ড পুলিশ সুপার রঘুবীর জয়সোয়াল অগ্রিম বুক করেছেন দিল্লি থেকে। অমনি চমকে উঠি। মোহনকে টেলি করে দিই তক্ষুনি। মোহন এসে পৌঁছায় ৬ জুন রাত্রে। ৭ জুন সকালে ওর সঙ্গে পরামর্শ করি। ঠিক হয় যে প্ল্যানচেটের আসর বসাব এবং মোহনকে মিডিয়াম করে ওর মুখ দিয়ে মহাবীর সিংয়ের কীর্তি ফাঁস করে দেব। ডিটেলস সব বলে যাবে মোহন। আমার স্বামীর আত্মা যেন কথা বলছেন মিডিয়ামের মুখ দিয়ে—এভাবেই সব আয়োজন করেছিলুম। কিন্তু মোহন—বেচারা মোহন! বেটা আমার!

বলতে-বলতে হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল শ্রীমতী মালহোত্রার দৃষ্টি। নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকল। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপরই উঠে দাঁড়ালেন। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি ওর কলজে উপড়ে খাব। ওর চোখ দুটো গেলে দেব। ওর নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে ফেলব।

জয়ন্তী ওঁকে ধরতে যাচ্ছিল, তার আগেই উনি আমাকে সোফাসুদ্ধ উলটে ফেলে দিলেন। তারপর ঘরময় ছোটাছুটি শুরু করলেন। দমাদ্দম সব ভাঙচুর করতে থাকলেন।

কয়েকটি সেকেন্ডে এই উপদ্রব ঘটে গেল। তখন লছমন আর সরযূ দৌড়ে এসে ওঁকে ধরল। অধ্যাপক, মেজর জেনারেল আর আমিও গিয়ে যোগ দিলুম। শ্রীমতী মালহোত্রা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সরযূ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওঁকে ধরাধরি করে সবাই ওঁর শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলুম। ডঃ পট্টনায়ক শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত হলেন।

বাইরে বেরিয়ে কর্নেল বললেন, মানুষের জীবনে এমন কত ট্র্যাজেডি যে ঘটে! হতভাগিনী শ্রীমতী মালহোত্রার পরিণতি ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। আমি ডাক্তার নই জয়ন্ত, কিন্তু অভিজ্ঞতার বিচারে টের পেয়ে গেছি, ভদ্রমহিলা বাকি জীবন এভাবেই বেঁচে থাকবেন। সারাজীবন স্বামীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না—বুঝতে পারেননি কী হারাচ্ছেন। একদা স্বামীর ওই নিষ্ঠুর আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর অবচেতনে তীব্র আঘাত দিল। তারপর এই বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতায় ক্রমশ টের পেলেন, কী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তখন ধীরে-ধীরে দীর্ঘসঞ্চিত অতৃপ্তি, আত্মগ্লানি, অনুশোচনা আর ক্রোধ একসঙ্গে বিষাক্ত স্ফোটকের সৃষ্টি করল অবচেতনে। আমরা যা দেখছি, তা তারই কিছু প্রকাশ মাত্র। কিন্তু না—এর জন্যে উনি নিজেও হয়তো দায়ী নন। কিছুটা দায়ী মহাবীর সিংও বটে। আর কিছুটা দায়ী অন্য একজন—তাকে, আমি এক অলৌকিক শক্তিই বলব। এই প্রচ্ছন্ন গভীরতর নেপথ্যচারী শক্তি যেন মানুষের প্রকৃত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে আবহমানকাল। তার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। হ্যাঁ জয়ন্ত, কিছু অলৌকিক আছেই আড়ালে।

কর্নেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি ও জয়ন্তী কোনও কথা বললুম না। একটু পরে গ্রিন ভিউয়ের লনে পৌঁছে কর্নেল জয়ন্তীর দিকে ঘুরে বললেন, ইয়ে জয়ন্তী ডার্লিং, শুনে খুশি হবে যে, মেজর জেনারেল হরগোবিন্দজি তাঁর হেলিকপ্টারে শ্যামলীর বডিটা দিল্লি পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বডিটা এখন ডাঃ প্রসাদের জিম্মায় রয়েছে। তা ডার্লিং, আমার এই তরুণ বন্ধুটির মনে কষ্ট হলেও উপায় নেই, কাল সকালেই তোমাকে শ্যামলীর বডি নিয়ে মেজর জেনারেলের সঙ্গে হেলিকপ্টারে রওনা হতে হবে। তৈরি হয়ে থেকো।

BanglaBook.org

রাত্রি ছিল পিশাচের

BanglaBook.org

কবিতা সিংহ

সোমনাথ গাড়ি ড্রাইভ করছিল। শীতের সন্ধ্যা। শ্যামবাজারের মোড়টা ধোঁয়াশায় আবছা হয়ে আছে। দুপাশের দোকানের আলোগুলো দূর থেকে লালচে দেখাচ্ছে। ড্যাশবোর্ডের খানিকটা আলো চলকে পড়েছে সোমনাথের টানা ছাঁদের মুখে। সোমনাথ শিশিরের সঙ্গে কথা বলছিল। শিশির ওর পাশের সিটে বসে শুনছিল মন দিয়ে।

রীতিমতো ঠান্ডা পড়েছে। তার ওপর গাড়ি শ্যামবাজারের মোড় পেরিয়ে যখন একটু ফাঁকায় বরানগরের দিকে ছুটল, তখন বাতাসের ঠান্ডা ছুরিতে শরীরের খোলা অংশগুলো যেন কেটে-কেটে যাচ্ছিল। শিশির তার গরম শালটা গলার চারপাশে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা সোমনাথ, এতদিন তোর সঙ্গে আলাপ, এর আগে তো তুই কোনওদিন আমাকে অশনি চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে যাসনি। আজ হঠাৎ অশনি চৌধুরীর বাড়ি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

সোমনাথ বলল, কারণ আছে। না হলে সত্যি কথা বলতে কি, অশনিদা তো তেমন মিশুকে প্রকৃতির মানুষ নন। উনি সবার সঙ্গে তেমনভাবে মিশতেও পারেন না। আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠবার পরেই তাই তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিইনি।

শিশির বলল, আমরা যখন প্রেসিডেন্সিতে থার্ড ইয়ারে-টিয়ারে পড়ছি, অশনি চৌধুরী তখন পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে। ফাইনাল ইয়ারে। খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন, তাই না?

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ, ব্লু ছিলেন। তারপর এম. এ. পাশ করে বিলেতে যান। আরও পড়াশুনো করেন। কিন্তু ফিরে এসে ওই নিজের লাইব্রেরিতেই পড়ে থাকেন। আর মাঝে-মধ্যে দেখবি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। দেশের প্রায় সমস্ত লার্নেড সোসাইটির মেম্বার। আর অ্যানথ্রপলজি, থিয়জফি এবং অকাল্ট সায়েন্সের সমস্ত সেমিনার ওঁর অ্যাটেন্ড করা চাই-ই। দারুণ ভালো শিকারি আর অ্যাডভেঞ্চার করার বাতিক আছে। বহু বিষয়েই অশনিদার ইন্টারেস্ট। আর অঢেল সময়ও পান হাতে। চৌধুরী প্যালেসের ছেলে ভাই। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকেন। আমাদের মতো তো চাকরি করে দিন গুজরান করতে হয় না।

শিশির বলল, কিন্তু আজ আমাকে হঠাৎ আটকালি কেন? দিব্যি তো তোদের বাড়ি থেকে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্ন সেরে পালাচ্ছিলাম।

বা রে, আমি অশনিদাকে ফোনে বলেই নিয়েছি। উনি বললেন, শিশিরকে আজ আমাদের বাড়ি নিয়ে এসো। উনি তো এমনি তোকে নামেও চেনেন, পরিচয়ও জানেন। তুই যে আমার সেই ইস্কুলবয়েসের বন্ধু, তাও তো ওঁর অজানা নয়। তবে আজ কেন এই বিশেষ আমন্ত্রণ সেটা তোকে খুব শর্টে বলে রাখি। আজ অবশ্য অশনিদার ওখানে তোর ভূমিকা মুখ্য নয়। কিন্তু তোর পরামর্শ, তোর সঙ্গও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বরানগরের প্রায়ান্ধকার অঞ্চল দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল। দুপাশে শুকনো খড়ো পোড়া আর কাঁচা নালার গন্ধ। সোমনাথ বলল, আসলে ব্যাপারটা খুব গভীরে। তোকে শর্টে গল্পটা বলি।

—বেশ কিছু বছর আগের কথা বলছি। এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে আমি বাবার সঙ্গে আসানসোলের একটি কয়লাখনিতে গিয়েছিলাম। জায়গাটার কাছাকাছি একটি চমৎকার হেল্‌থ রিসর্ট ছিল, সেখানে ওঁদের কয়লাখনির অফিসারদের জন্যে কয়েকটি লাক্সারি বাংলো ছিল। সেখানেই আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম। আসলে জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যেই আমাদের যাওয়া। কিন্তু আর-একটি অন্তর্নিহিত কারণও ছিল। সেটা হল, ওই খনি অঞ্চলের বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি 'পিট'-এ নানারকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত 'পিট'-এ অশরীরী সব মূর্তি দেখা যেত। বহু শ্রমিককে টেনে নিয়ে যেত সব অপচ্ছায়া। অনেকে মারাও যেত। এইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে, বাবার বন্ধু মনীশকাকু কয়েকজন বিশেষজ্ঞকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন অশনিদা। এ ছাড়া আর-একটি ছেলেকেও দেখতাম। কোথাকার যেন জমিদারের ছেলে। চেহারাটি ভারী সুন্দর। নাম শোভন। সে-ও এসেছিল মনীশকাকুর সঙ্গে তার জ্যাঠামশায়ের বন্ধুতার সূত্রে।

শোভনের চেহারাটি ছিল একটু কবি-কবি ধরনের। বেশ ভাবপ্রবণ আর একা-একা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। আমাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। কিন্তু নেহাতই ভাসা-ভাসা আলাপ। অশনিদাকে শোভন খুব পছন্দ করত। একবার অশনিদার খুব বিপদ ঘটল। তাঁকে সারাদিন কোথাও পাওয়া গেল না। সবাই হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। ক্রমশ রাত ঘনিয়ে এল। অশনিদার আর কোনও পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত সবাই সন্দেহ করতে লাগল যে অশনিদা নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছেন। তখন শোভন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সামনের খালি জমির মাটিতে একটা কাঁচা ধরনের ম্যাপ এঁকে নিল খনি-অঞ্চল আর পিট-এর। তারপর তার ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসল। সেই হাত আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করল। চলতে-চলতে একটা পিট-এর কাছে এসে থামল। ও তখন উঠে একটা দু-ডালওয়ালা গাছের শাখা নিয়ে, তার দুটি ডাল ধরে হাঁটতে লাগল মোহাবিষ্টের মতো। আমরাও ওর পিছন-পিছন চললাম। খানিকক্ষণ বাদে মনে হতে লাগল গাছের ডালটা ওকে আকর্ষণ করছে যেন। এভাবেই ছুটতে-ছুটতে ও একটা খনির শেষপ্রান্তের পিটের মুখে এসে দাঁড়াল। অশনিদাকে পাওয়া গেল সেই পিট-এ। তলায় পড়েছিলেন তিনি। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছিল। কোনও জ্ঞান ছিল না। পরে জানা যায় একটি অশরীরী ছায়া তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পিটের দিকে। একটা লোহার সিঁড়িও দেখিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়িটা খানিক দূর গিয়ে আর নেই। পুরো সিঁড়িটাই ছিল জং-ধরা। অশনিদা নামতে যেতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তিনি ভেতরের একটা খাঁজে আটকে ছিলেন বলেই একদম তলায় পড়ে যাননি।

—এই ঘটনার পর থেকেই আমরা তিনজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই বিশেষ দিনটি ছিল চব্বিশে নভেম্বর। সেই থেকে অশনিদা বলতেন চব্বিশে নভেম্বর আমার পুনর্জন্মের দিন। আমরা ওই দিনটিতে তিনজনে একসঙ্গে গল্প করে খাওয়া-দাওয়া করে কাটাতাম। একবার শোভন ভারতের বাইরে ছিল, তখন ও টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছিল। আর-একবার দিল্লি ছিলাম। মনে আছে, প্লেনে এসে অশনিদার বাড়িতে দিনটি উদযাপন করে গিয়েছিলাম। আজও সেই দিন।

শিশির হেসে বলল, তা ভাই তোদের তিনজনের এই ঘনিষ্ঠ ভাব-সম্মেলনের দিনে হঠাৎ আমাকে কেন?

কারণ আছে রে। অশনিদাই সব বলবেন। এই যে আমরা এসে পড়লাম। এই যে, সামনেই দেউড়ি।

সোমনাথের গাড়িটা তখন বাঁক নিয়ে একটা মস্ত বন্ধ দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। দেউড়ির মাথার আলোটা জ্বলে উঠতেই দেখা গেল দুপাশে শানাই ঘর, রোশনচৌকি বসানোর জায়গা। দেউড়ির ওপর মস্ত-মস্ত জোড়া সিংহ-দাঁড়ানো। দেউড়ির লোহার গেট খুলে যেতেই গাড়ি ঢুকল ভেতরে। সেলাম করে দাঁড়াল দারোয়ান।

লম্বা ড্রাইভ দিয়ে এগিয়ে গাড়ি দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দার তলায়। নানারকম অর্কিড আর লতাপাতায় সাজানো সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে গেল দুজনে। ভেতরে কাচের দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ লাউঞ্জ। তারপর মস্ত বসবার হল। বিশেষ আবলুশ-কাঠের চওড়া সিঁড়ি—অর্ধচন্দ্রের মতো উঠে গেছে দোতলায়। তার প্রথম ধাপেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বিনীত চেহারার প্রবীণ লোক।

কী শ্রীমন্তদা, অশনিদা কোথায়?

হাতজোড় করে শ্রীমন্ত বলল, নমস্কার দাদাবাবু। উনি আপনাদের জন্যে ওপরে অপেক্ষা করছেন। যান, চলে যান।

শিশির মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। বিরাট বাড়ি। আড়ষ্টতম মূর্তি কিউরিওতে সারা বাড়িটা যেন একটা মিউজিয়ামের চেহারা নিয়েছে। কার্পেটের নরম আচ্ছাদনী দেওয়া সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ওপরে উঠে এল দুজন। সোমনাথ আর শিশিরের পিছন-পিছন শ্রীমন্তও আসছিল।

সোমনাথ বলল, নীচে যখন গাড়ি দেখলাম না, তখন মনে হয় শোভন এসে পৌঁছয়নি।

BanglaBook.org

শ্রীমন্ত পিছন থেকে বলল, শোভনদাদাবাবু আজ আর আসবেন বলে তো মনে হয় না দাদাবাবু। আমি দুবার ফোন করেছিলাম। একবার তো কেউ ফোন ধরলই না। আর একবার ফোন করতে আমাদের দাদাবাবুর নাম করে ডাকলাম। তাতে কে একজন যেন বলল,—উনি খুব ব্যস্ত আছেন, এখন ফোন ধরতে পারবেন না।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, সে কী? কী বলছ তুমি শ্রীমন্ত?—অশনিদার নাম করার পরে এই কথা বলল?

হ্যাঁ দাদাবাবু! আমি বরং যাই, আপনাদের জন্যে একটু কফি নিয়ে আসি।

সোমনাথ আর শিশির সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের পর ঘর, করিডোরের পর করিডোর পেরিয়ে চলল। এতরকম পুরোনো আসবাব, পেন্টিং, ধাতুর জিনিসপত্র, ভারী-ভারী ফার্নিচার, যে শিশিরের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সারা বাড়িতে একটি-দুটি ভৃত্য ছাড়া আর কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

সোমনাথ বলল, এ বাড়ির এই মহলটা অশনিদা মিউজিয়াম করে দেবেন বলে সাজাচ্ছেন। পরিবারটি এখন খুবই ছোট হয়ে গেছে ওঁদের। ওঁর তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই বিদেশে। দাদা-বউদি মারা গেছেন বহুদিন হল। ভাইপো নিশানাথ আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। ফিরতে এখনও বছর চারেক দেরি। এখানে আছেন শুধু অশনিদা আর পিসিমা। অশনিদার বাবা-মাও মারা গেছেন ছোট বয়সে।

অশনিদা বিয়ে করেননি?

এখনও করেননি। পিসিমা তো রোজ এইসব নিয়ে রাগারাগি করেন।

একটা ঝুলন্ত বারান্দা পেরিয়ে দুজনে আর-একটা মহলে এসে পৌঁছল। সুন্দর একটি লতাপাতায় ঢাকা বারান্দা। কাচের শার্সি বন্ধ করে জায়গাটি ঘিরে আপাতত ঘরের মতো করে নেওয়া হয়েছে। লতাপাতা আর অর্কিড দিয়ে সাজানো চমৎকার জায়গাটি। গোল-গোল জাপানি ফানুসের মতো আলো জ্বলছে। রট আয়রনের সুন্দর-সুন্দর বসার জায়গা। তাতে রঙিন-রঙিন ভেলভেটের গদি লাগানো। একটিতে বসেছিলেন অশনিনাথ।

শিশির আর সোমনাথকে ইশারায় বসতে বললেন তিনি। শিশিরের মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে দেখা অশনিনাথের সেই দৃপ্ত চেহারাটি। দীর্ঘ, ছিপছিপে, টানটান। তীক্ষ্ণ নাক। একটু বসা, টানা-টানা চোখ। জোড়া ঘন ভ্রূ। এখন কপালের চুলগুলি ঈষৎ সরে গিয়ে প্রশস্ত কপাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের রেখাগুলি আরও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আরও মহিমময়। চকিতে শিশিরের মনে পড়ল সেই ইউনিভার্সিটি ব্লু পেয়ে, রিসেপশনে দাঁড়ানো, সাদা স্যুট পরা, ছেলেমানুষি মুখটা। সে মুখটি যেন এই পরিশীলিত মুখের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অশনিনাথ বললেন—শিশির এসো, অনেক গল্প শুনেছি তোমার সোমনাথের কাছে। আজ দুপুরে সোমনাথকে ফোন করতে ও যখন বলল, তুমি আছ ওখানে, তখনই ওকে বলে দিয়েছিলাম তোমাকে ধরে আনতে।

শিশির হেসে বলল, অশনিদা আমি আপনার দারুণ অ্যাডমায়ারার। আপনাকে সোমনাথ নিশ্চয়ই সে-কথা বলেছে।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে অল্প হাসলেন। একটি চন্দন কাঠে খোদাই-করা টেবিলের চারপাশে বসবার আসন তিনজনের। বাইরে গাঢ় ঠান্ডা। মেঘলা আঁধার। ভেতরটা বেশ গরম। আরাম লাগছিল বেশ। অশনিনাথের পরনে কালো ভেলভেটিনের একটি হাউস কোট। সোমনাথের পরনে হালকা বিস্কিট রঙের সাফারি স্যুট, গলায় চেনে বাঁধা একটি ব্রোঞ্জের ওঁ কার। শিশিরের পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি আর পেস্তা রঙের একটি কাশ্মীরি শাল।

সোমনাথ বলল, অশনিদা, শুনলাম শ্রীমন্ত শোভনকে ফোন করেছিল।

অশনিনাথ বললেন, হ্যাঁ, ও একবারও নিজে ধরেনি। তুমি একবার ট্রাই করো না, সোমনাথ।

BanglaBook.org

পাশেই একটি ব্রোঞ্জের ত্রিপয়ে সেকেলে মডেলের পিতলের ফোন আর রিসিভার রাখা ছিল। সোমনাথ ফোন করল।

হ্যালো! শোভন সান্যালকে একটু ডেকে দিন না?

কী বললেন? উনি ব্যস্ত? আসতে পারবেন না?

উনি নেই?...আশ্চর্য, কতরকমের কথা বলছেন আপনি?—ধেৎ।

ফোনটা খটাং করে রেখে দিল সোমনাথ। তার ভ্রূ দুটি বিরক্তিতে জুড়ে গেল একটু। অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি স্পষ্ট শুনলাম, প্রচুর লোকজন কথা বলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। যে লোকটি ফোন ধরেছিল, তার তো দেখলাম কোনও কথারই ঠিক নেই।

অশনিনাথের ভ্রূ দুটি চিন্তায় ঈষৎ জুড়ে গেল। ইতিমধ্যে কফি এসে গেল।

শ্রীমন্তর ট্রে থেকে কফি নিয়ে সিপ করতে-করতে অশনিনাথ বললেন—দ্যাখো শিশির, আজকের এই দিনটা আমরা তিনজনে কখনও মিস করি না। এই দিনে কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও শোভন এল না, এটা কী করে সম্ভব হল বলো তো?

সোমনাথ বলল, অশনিদা, বরং সমস্ত ঘটনাটা শিশিরকে খুলেই বলা যাক। আপনিই বলুন বরং—।

শোনো শিশির, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অশনিনাথ বললেন, শোভন সান্যাল ছেলেটি বয়েসে সোমনাথেরও কিছু ছোট। ওর ভেতর দারুণ একটা সাইকিক পাওয়ার আছে। একবার—।

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলল, সে-কথা আমি শিশিরকে আগেই বলেছি, অশনিদা। আপনাকে সেভ করার সেই কাহিনি—।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, তারপব থেকেই বলি, শোনো—ওদের পরিবারের অনেক পূর্ব-পুরুষেবও সাইকিক পাওযার ছিল। তবে ওদেব পবিবারটা যাকে বলে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। ওবা হল, লক্ষ্মীপুবেব রাজ ফ্যামিলির বংশধর। সাতপুরুষ আগে থাকতেই ওদের বংশেব লতাপাতা কমতে শুরু করে। বহুধারা নদীর মতো এক-একটি ধাবা শুকিযে যেতে থাকে। আর সেই নির্বংশ পরিবারের ধনরত্ন ক্রমশ বর্তাতে থাকে ওদের বংশে। আমি আর সোমনাথ লক্ষ্মীপুরে কয়েকবার গেছি। পাহাড়, নদী, ঝরনা আর বনে ঘেরা ভারী সুন্দর জায়গাটি। চোখ জুড়িয়ে যায়। তা, লক্ষ্মীপুরের সান্যাল বংশে তন্ত্রের একটা ধারা চলতে-চলতে ওদের পিতৃপুরুষ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। এক পুরোহিত পরিবারের সঙ্গে ওদের পুরুষপরম্পরায় শত্রুতা ছিল। সেই পরিবারের লোকেরা ওদের বংশের অনেককে অপঘাত মৃত্যুর শিকার করেছে। কিন্তু সেই পরিবারটির শেষ বংশধর মারা যায়, শোভনের ঠাকুর্দার বন্দুকের গুলিতে। শোভনের বাবা অবনীভূষণ সান্যাল বিদেশি শিক্ষায় মানুষ। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের দ্বারা, লজিক দ্বারা পরিচালিত। তার কাকাও তাই। ওঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ ওই পুরোহিত পরিবারটি নানাভাবে সান্যাল পরিবারকে দোহন করছিল। পুরোহিত পরিবারের সমস্ত পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আনন্দে, শুনেছি, শোভনের দাদু নাকি তাঁর জমিদারিতে বিরাট মুক্তির উৎসব করে ফেলেন।

শোভন যখন জন্মাল দেখা গেল—ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটছে। শোভনের মৃগীরোগ ছিল। ও মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। খুব দুর্বল চেহারার ছেলে ছিল শোভন। একবার ওদের লক্ষ্মীপুরের চোরাবালির ওপরে শোভন বেড়াতে-বেড়াতে ডুবে গিয়েছিল প্রায়। সঙ্গে ছিল ওর কাকা। সে সময়ে এক পাহাড়ি জাতের শিকারি ওকে উদ্ধার করেছিল। শিকারিটির নামটি ভারী অদ্ভুত—'শারমা'। এই লোকটি কোন দেশীয় ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটি বলে যে ও কামরূপ কামাখ্যার সাধক, আর ওর চেহারাতেই 'মোঙ্গল' ছাপ যথেষ্ট প্রবল। এই শিকারিটি ক্রমশ শোভন আর শোভনের কাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আমিও শারমাকে শোভনের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। ক্রমশ দেখা গেল শারমার আসল পেশা শিকার

BanglaBook.org

নয়, গুরুগিরি। রীতিমতো বিদেশেও ঘুরে এসেছে সে। বিরাট লটবহর শিষ্য-সামন্ত নিয়ে ঘোরাফেরা করে। টাকা-পয়সার সোর্সও যথেষ্ট লোকটার।

কিন্তু শোভনদের পরিবারে, এখন আমি যত পর্যবেক্ষণ করছি ততই দেখছি, রীতিমতো কালসাপ হয়ে ঢুকেছে এই 'শারমা'। ওদের পরিবারে ঢোকার পর থেকে এই 'শারমা'র শিষ্য বনে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল সবাই। ওর বাবা মারা গেলেন অস্বাভাবিকভাবে। কাকিমা মারা গেলেন তারপর। কাকাও ওর হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেলেন। ওর মাও মারা গেলেন কিছুদিন পরে। শোভনের দিদির সব কটি ছেলেমেয়ে টুপটাপ ঝরে পড়ল কিছুদিন বাদে-বাদে। এখন প্রায় বাড়ি খালি। ওর নিরীশ্বরবাদী কাকার সঙ্গে শোভনও চব্বিশ ঘণ্টা তন্ত্রমন্ত্র আরম্ভ করেছে শুনলাম। কিছুদিন আগে খবর পেলাম ওব কাকার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। বিশাল সম্পত্তি নিয়ে তিনি নয়ছয় করতে আরম্ভ করেছেন। শোভন যে এভাবে শারমার খপ্পরে পড়বে তা আমরা ভাবিনি। অবশ্য ও চিরকালই কোমল মনের ছেলে। শোভনকে ভালোবাসে একটি ফুলের মতো মেয়ে। তার নাম সুরভি। সেই সুরভির সঙ্গেও শোভন আর সম্পর্ক রাখে না। আমাকে এড়িয়ে যায়। সোমনাথের সঙ্গেও কথা বলে না।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, অথচ আপনার মনে আছে অশনিদা, শোভন প্রথম-প্রথম শারমাকে একদম সহ্য করতে পারত না। ওর প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও বলত, শারমা কাকাকে জাদু করেছে।

অশনিনাথ বললেন, কেন? তোমার শোভনের ছোটপিসিকে মনে নেই? শারমাকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। তিনি কেমন হয়ে গিয়েছিলেন শেষের দিকে?

সোমনাথ বলল, অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন পিসিমণি। বয়েস বেশি না। শোভনের চেয়ে বড় জোর বছর-পাঁচেকের বড় হবেন। বেশির ভাগ সময়েই বিদেশে থাকতেন। এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিব ডক্টরেট। শারমা এলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে উপুড় হয়ে পড়তে দেখলে রেগে যেতেন। শারমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন না বলে শোভনের কাকার সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শারমা এসব দেখে শুধু বলেছিল, ওকে একবার আমার আস্তানায় পাঠিয়ে দিয়ো শুধু। আস্তানা মানে ওর বিভিন্ন শিষ্যর বাড়ি। সেবারে বোধহয় শারমা এসে উঠেছিল গড়িয়ার কোনও ধনী লোকের বাড়ি। একদিন অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে পিসিমণিকে নিয়ে যাওয়া হল শারমার আস্তানায়। ব্যস। সেখানে যে কী ঘটল কে জানে। পিসিমণি আর ফিরলেন না। তিনি ওই কুৎসিতদর্শন আধবুড়ো লোকটাকে বিয়ে করে বসলেন। এবং ওর কাছেই রয়ে গেলেন। মাস ছয় বাদে উনি মারা যান। শারমা বলে, ওঁর ভাব-সমাধি হয়েছিল। শোভনের কাকা বলেন যে, উনি দিব্যোন্মাদ হয়েছিলেন।

শিশিরের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল; কী সর্বনাশ!

অশনিনাথ রঙিন গালার কাজ করা চুরুটের বাক্স থেকে একটি চুরুট বের করে বললেন, সর্বনাশই বটে। আমার কেমন যেন ধারণা এবার শোভনকে ঘিরেই বিপদটা ঘনিয়ে উঠছে। শোভনকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

শিশির বলল, অশনিদা, একটা ছোট প্রশ্ন করি আপনাকে—আচ্ছা এই শোভনের বাবার মৃত্যু হয়েছিল কী করে?

শোভনের বাবা শেষপর্যন্ত এই শারমার বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতেন না যে, শারমার কোনও অলৌকিক শক্তি আছে। শারমা তাঁর ওপর শেষপর্যন্ত দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মীপুরের কাছাকাছি একটি তন্ত্রপীঠ আছে। মহাকঙ্কালী নাম জায়গাটির। সেখানে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি মন্দির আছে। চারপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে-মধ্যে বড়-বড় পাথর। লোকে বলে এই পাথরগুলো নাকি মহাকঙ্কালীর দান। এই মহাকঙ্কালীটি যে কী তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যার যেমন বিশ্বাস সে তেমনভাবে মহাকঙ্কালীকে ব্যাখ্যা করে। সিঁদুরমাখা অদ্ভুত একটা পাথর। কেউ

BanglaBook.org

বলে কালী, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ধর্মঠাকুর, আবার কেউ বলে আদিবাসীদের কোনও দেবতা। 'টাঁড়'। সেখানে নরবলিও হত শোনা যায়। হঠাৎ অমাবস্যার রাতে শোভনের বাবার মতো অবিশ্বাসী লোক কেন যে এই মহাকঙ্কালীর মন্দিরে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। কঙ্কালী মন্দিরের থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মারা যান। শারমা বলে তাকে অবিশ্বাস করার জন্যই এইভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার ধারণা তাঁকে মন্দির থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল হয়তো। তিনি পরদিন সকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। একজন গ্রামবাসী কাঠ কুড়োতে গিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করে। তখন তিনি শুধুমাত্র বলতে পেরেছিলেন, পাহাড়ের মতো ছাগল...।

সোমনাথ বলল, কথাটার কোনও মানে হয় না! কিংবা হয়তো লোকটা ভুল শুনেছিল...।

অশনিনাথ বললেন, যদি ভুল শুনে থাকে তাহলে আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু যদি ঠিক শুনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন এর অর্থ আমরা খুঁজে পাবই! আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? চলো না আজ আমরা শোভনের নাকতলার বাড়িতে যাই।

শিশির বলল, হ্যাঁ সেই-ই ভালো। আজ যাওয়ার একটা ছুতো থাকবে।

অশনিনাথ শিশিরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কথাটা তুমি মন্দ বলোনি শিশির। সে-ই ভালো। চলো, ডিনার খেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ি।

সোমনাথ বলল, এত রাতে সেই নাকতলা পেরিয়ে আপনি যাবেন অশনিদা? আমার কেমন লাগছে।

অশনিনাথ বললেন, জানো শিশির, সোমনাথ আসলে ভয় পাচ্ছে। ও ভাবছে যদি শোভনের ওখানে আমি অপমানিত হই!...নাও সোমনাথ, আমার মান-অপমানের চেয়ে শোভনের ভালো-মন্দের প্রশ্নটা অনেক জরুরি। একটি পিয়ানোর মতো সুশব্দের ঘণ্টা বাজালেন অশনিনাথ। শ্রীমন্ত এসে দাঁড়াল ঃ দাদাবাবু, খাবার ঘরে চলুন, সব রেডি।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছিল আকাশের জমাট বাঁধা মেঘে। এই মেঘলা ভেদ করে মাঝে-মাঝে উঠছিল শীতের হাওয়া। অশনিনাথের হিস্পানো গাড়িটা সেই চাপ-চাপ অন্ধকার চিরে ছুটছিল ময়দান দিয়ে। হঠাৎ জানলার ওঠানো কাচে বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টির ছাট এসে লাগল। সোমনাথ বলল, বৃষ্টি নামল। অবশ্য ভাবনার কারণ নেই। শ্রীমন্ত তিনটে ছাতা আর ওয়াটার প্রুফ দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে।

অশনিনাথ বললেন, একে ভূত চতুর্দশীর রাত তায় বৃষ্টি। শীতটা তো এমনিই বেশ পড়েছে। তায় বৃষ্টিতে রীতিমতো জাঁকিয়ে উঠবে মনে হয়।

সোমনাথ বলল, অশনিদা আপনার তো সবদিকে বেশ খেয়াল থাকে! আজকাল তো আমরা কেউ আর বাংলা তারিখের হিসেব রেখে চলি না! কী শিশির, তুমি জান নাকি?

শিশির বলল, সোমনাথ, তোদের পাড়ায় কি কালী পুজো-টুজো হয় না, নাকি?

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো হয়। সত্যি সেটা খেয়াল করিনি তো।

অশনিনাথ হেসে বললেন, আসলে ভূত চতুর্দশীর দিন পিসিমার দৌলতে এখনও আমায় চোদ্দো শাক খেতে হয় কিনা? তাই মনে আছে।

ময়দান পেরিয়ে গাড়ি তখন মধ্যবিত্ত পাড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

শিশির বলল, আচ্ছা নাকতলার কোন জায়গায় শোভনের বাড়ি?

—নাকতলায় ঠিক নয়। পেরিয়ে গিয়ে আরও দূর। ওদের অরিজিনাল বাড়ি পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি। অসলো স্ট্রিটে। এই নাকতলার বাড়িটা একটা অতি পুরোনো বাগানবাড়ি ধাঁচের। প্রায় শ'খানেক বছর বয়েস হবে। শোভনের কোনও প্রপিতামহ-টহ তৈরি করেছিলেন। বাড়িটা তো ভেঙে

BanglaBook.org

পড়ে যাচ্ছিল। আমরা মাঝেমধ্যে গেছি। পিকনিক-টিকনিক হত। আসলে নাকি তন্ত্র সাধনার জন্যে করা।

সোমনাথ বলল, আরে, আপনার কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একদিন, এই কয়েক মাস আগেই, আমি শোভনদের ওই বাড়িটার সামনে দিয়ে ব্যবসার কাজেই ড্রাইভ করে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে অনেক বাইরের লোক ছিল,—দেখছিলাম বাড়িটায় মিস্ত্রি লেগেছে। রিনোভেট হচ্ছে। শোভন বোধহয় এখন থেকে ওই বাড়িতে পাকাপাকিই থাকবে স্থির করেছে।

ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার দুপাশে চেপে আসছিল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। জলের ধারা আছড়ে পড়ছিল জানলার কাচে। উইন্ড-স্ক্রিনের ওপর ওয়াইপার না চালালে সামনের পথ দেখা যাচ্ছিল না। দুপাশে এখন খোলামেলা জমি। একটি দুটি ছোটখাটো বাড়ি বা ছাউনি ছড়ানো রয়েছে। অন্ধকারে ডুবে আছে চারিদিক। অশনিনাথ বললেন—ডান দিকটা একটু লক্ষ রেখো সোমনাথ। সেই উঁচু ইটখোলার চিমনির পাশ দিয়ে শোভনদের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ অশনিদা, আমি লক্ষ রাখছি। খানিকদূর এগোতে জটবাঁধা অন্ধকারের গায়ে আলো পড়তেই ইটখোলার তলার দিকটা আলোকিত হয়ে উঠল। অশনিনাথ তাঁর 'হিস্পানো'টা দ্রুত ঘুরিয়ে নিলেন। গাড়িটা দ্রুত চলল দুপাশের আগাছাভরা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে খোয়ার রাস্তা ধরে। সামনের অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা জায়গা কূর্ম পৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর একটি-দুটি আলোর বিন্দু।

ওই তো শোভনদের বাড়ি।

গাড়ি আরও কাছে যেতেই দেখা গেল কতকগুলো গাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে আছে। শোভনের বাড়িটাও দেখা গেল। শিশিরের মনে হল উঁচু দেয়ালঘেরা দুর্গের মতো একটি বাড়ি। ওপরে মসজিদের ডোমের মতো গোল একটা গঠন। তার মাথায় উঁচু একটি শূন্যের মতো স্ট্যান্ডে জ্বলছে নীলচে বেগুনি একটি আলো। আলোটি তেমন জোরালো নয় বলে দূর থেকে দেখা যায়নি।

সোমনাথ অবাক কণ্ঠে বলল, আরে! সেই খোলামেলা বাগানবাড়ির এ কী চেহারা দাঁড়িয়েছে অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, সত্যিই তো। এ যেন মিডলাইস্টের মরু দুর্গের মতো চেহারা নিয়েছে।

একটু তফাতে একটা ঝুপসি অশ্বত্থ গাছের তলায় গাড়িটি প্রায় লুকিয়েই রাখলেন অশনিনাথ। মৃদু নিশ্বাস ছেড়ে গাড়িটা থামল। সেই শব্দটুকুও হারিয়ে গেল বৃষ্টির ঝমঝম ধ্বনিতে। ছাতা মাথায় বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে নামল তিনজন। তাতে শরীর বাঁচল বটে, কিন্তু পা ডুবে গেল নরম ঠান্ডা কাদায়। পাশেই পিছনের কম্পাউন্ডের উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল ধরে-ধরে সামনের বন্ধ গেটের কাছে পৌঁছল তিনজনে। গেটের মুখে কুলুপ লাগানো। বারবার নক করার পর গেটটি অল্প খুলল। বর্ষাতি-পরা দারোয়ান সেই ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, কার্ড দেখান।

অশনিনাথ গায়ের জোরে গেটটি আরও উন্মোচিত করে বললেন, কী বাজে কথা বলছ? আমি অশনিনাথ চৌধুরী, শোভনের বাড়ি ঢুকতে আমার কোনও কার্ড লাগে না। দারোয়ানকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে অশনিনাথ বললেন—এসো সোমনাথ, শিশির এসো।

রোগাটে চেহারার লম্বা মানুষটার একটি ঠেলায় যে এতদূর ছিটকে পড়বে দারোয়ানটা তা সে নিজেই ভাবেনি। উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই অশনিনাথরা দ্রুতপায়ে বাগানের পথ পেরিয়ে ঢাকা প্যাসেজে গিয়ে উঠলেন। প্যাসেজটা দীর্ঘ লম্বা হয়ে গেছে বড় হলের দিকে। প্যাসেজের মুখটা লম্বা একটা টানেলের মতো। বাড়ির ভেতরে যাওয়ার এই একমাত্র দরজাটা এত সংকীর্ণ করে বানানো হয়েছে কেন তা কে জানে? আর দূরে সেই দরজার মুখে বসে আছে একটা দীর্ঘ চেহারার বীভৎস মানুষ। তার শরীরটা সম্পূর্ণ বেঢপ। হাত-পাগুলো লম্বা, পেকাল। মুখটা যেন একটা নরমুণ্ডের ওপর চামড়ার আস্তর লাগানো। লোকটি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। নিগ্রো না মোঙ্গল ঠিক বোঝা

BanglaBook.org

যায় না। মুখের পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাঁ করা। ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে হলদে উঁচু দাঁতগুলো। চোখের দৃষ্টিটা নিম্নমুখী। তাতে কোনও জ্যোতি নেই। ঠান্ডা লালচে একটা রং। তার মধ্যে কালো-কালো ভাবলেশহীন দুটি অক্ষিতারা। নিষ্ঠুর কালো ঠান্ডা মৃত্যুর মতো সেই নিম্নমুখী চোখ দেখলে কিন্তু বোঝা যায় লোকটি অদ্ভুতভাবে যেন অলক্ষ্য থেকেই ওদের লক্ষ করছে। সে লক্ষের আর যেন কোনও অবধি নেই। খানিকক্ষণ থিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিশিররা। এমনকি অশনিনাথও। তারপর, আবার সোজা হয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এগোল শিশির আর সোমনাথ। যতই লোকটির কাছাকাছি আসতে লাগল ওরা ততই কেমন যেন একটা পচা গন্ধ নাকে এসে লাগতে শুরু করল। ওদের এগিয়ে আসতে দেখে দু-হাত ছড়িয়ে রুখে দাঁড়াল লোকটা। মনে হল যেন একটা বিরাট শকুন জাতীয় পাখি ডানা বিস্তার করে উড়ে আসছে। লোকটা মাটিতে না শূন্যে, বুঝতে-না-বুঝতেই অশনিনাথ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে হটিয়ে ওদের নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ভেতরে গিয়েই সামনে পড়ল একটি অদ্ভুত চেহারার লোক। লোকটি বোধহয় চীনা। আধো-আধো ইংরেজিতে লোকটা বলল, আপনারা কোথায় যেতে চাইছেন?

অশনিনাথ বললেন, শোভন সান্যালকে ডেকে দিন। বলুন, অশনিনাথ চৌধুরী ডাকছেন।

লোকটি পিছনের দরজাটি আটকে রেখে বলল, উনি এখন ব্যস্ত আছেন। আসতে পারবেন না।

অশনিনাথ সঙ্গে-সঙ্গে সতেজে বললেন, উনি যদি না আসতে পারেন তাহলে আমরা, ভেতরে চলে যাব।

সোমনাথ ইতিমধ্যে পরদার ফাঁক দিয়ে হয়তো শোভনকে একপলক দেখে থাকবে। সে হঠাৎ ডেকে বসল, শোভন,—শোভন, এদিকে শুনে যাও।

শোভন তাড়াতাড়ি পরদা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই চীনা লোকটি অভিযোগের সুরে নিচু গলায় তাকে কিছু বলল। শোভন তার উত্তরে চাপা গলায় কিছু বলতেই সে পরদা তুলে ভেতরে চলে গেল।

শিশির এই প্রথম শোভনকে দেখল। রোগা ছোটখাটো ফরসা ছেলেটি। নরম মোলায়েম। কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক ভঙ্গি তার। ভাবলেশহীন চোখ-মুখ। অশনিনাথ আর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে খুব পোশাকি ভঙ্গিতে বলল, আরে আপনারা?

—হ্যাঁ, অবাক হলে নাকি,—ইনি শিশির, সোমনাথের ছোটবেলার বন্ধু।

হাতজোড় করে নমস্কার করে চাপা গলায় শোভন বলল, খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

শিশিরের কিন্তু শোভনের ভাবভঙ্গির আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখে কখনওই মনে হচ্ছিল না যে, শোভন অশনিনাথ বা সোমনাথের অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

হঠাৎ অশনিনাথ বললেন, শোভন, এত করে মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আজ আমার ওখানে গেলে না। আজকের তারিখটার কথা মনে আছে তোমার?

শোভন হ্যাঁ-না-র মাঝামাঝি একটা উত্তর যেন দেওয়ার চেষ্টা করল। সোমনাথ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আচ্ছা শোভন, প্রায় বছরখানেক হল তুমি আর তেমন যোগাযোগ রাখছ না কেন? আমরা কি কোনও কারণে তোমায় কোনওরকম আঘাত দিয়েছি?

শোভন কোনও কথার উত্তর না দিয়ে দুজনের মুখের দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

অশনিনাথ আবার তীব্রকণ্ঠে বললেন, শোভন, এ কী পোশাক পরেছ তুমি?

শোভনের পরনে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি।

পোশাকের কাপড়গুলি মাড়ে খড়খড় শব্দ করছে।

শোভনের চোখের দৃষ্টিটা ক্রমশ যেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল। সে বলল, বসুন,

BanglaBook.org

বসুন আপনারা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের দেয়াল ঘেঁষে রাখা সারি-সারি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শোভন বলল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত একটি লোক। লালচে-বাদামি ত্বক চকচক করছে তৈল মসৃণতায়। মুখটি বড়। একটা থলথলে চামড়ার থলির মতো। তাতে পুঁতির মতো দুটি চোখ তেরছা করে বসানো। ভ্রূ প্রায় নেই বললেই চলে। চোখের ওপরের পাতার মাংস ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। তলায়ও দুটি কমলার কোয়ার মতো মাংসের পুঁটুলি। ফোলা গাল চোয়ালের পাশ দিয়ে ঝুলছে। মোটা-মোটা কালো ঝোলা দুটো ঠোঁট। পরনে জমকালো পোশাক। ঘোর খয়েরি রঙের ওই একই ধরনের পোশাক, তবে সমস্তটাই মূল্যবান সিল্কের। লোকটির চারপাশের আবহাওয়াটাই এমন অদ্ভুত ধরনের যে কাউকে বলে দিতে হয় না যে এ-ই শারমা। শারমা এসে শোভনকে স্পর্শ করে দাঁড়াতেই শোভন যেন নিজের সেই ভাবলেশহীন আত্মবিস্মৃতির জগতে ফিরে গেল। শারমা কেমন যেন গান গাওয়ার মতো মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি কি ভুলে গেলে শোভন, এখুনি আমাদের উৎসব আরম্ভ হবে। উৎসবে তোমাকে দরকার।

শারমাকে যেন অস্বীকার করেই অশনিনাথ বললেন, সে কী, তোমার এখানে উৎসব হচ্ছে, আর তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করোনি, শোভন?

শোভন কী যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার কথার ওপরই শারমা আবার বলল, চলো শোভন, অতিথিরা অপেক্ষা করছেন। ওঁদের পরে কোনওদিন আসতে বলে দাও।

শোভন কলের পুতুলের মতো শারমার পিছন-পিছন ঘুরে গেল। পরদা সরিয়ে সে ঢুকল পরের ঘরে। পরদা পুরোটা উঠে যেতেই দেখা গেল, পরের ঘরটিতে বেশ কয়েক জোড়া জুতো আর একটি লম্বা ধরনের বেতের ঝাঁপি রাখা আছে। তারও পরের ঘরটিতে কোনও পরদা নেই। সে ঘরের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। সার-সার খাওয়ার টেবিল। তাতে স্তূপাকারে নানারকম আহার্য সাজানো। স্ত্রী-পুরুষেরা ঘোরাঘুরি করছেন সে ঘরে। বেশ কয়েকজনকেই দেখা গেল। তা অন্তত জনা-কুড়ি তো হবেই।

সোমনাথ বলল, চলুন অশনিদা। শোভন তো আমাদের রীতিমতো অপমানই করল। আমরা এবার ফিরে যাই। আর কখনও যদি শোভনের সঙ্গে...।

সোমনাথের কথা শেষ হতে-না-হতেই অশনিনাথ হঠাৎ শোভনকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, চলো শোভন, আমি তোমার অতিথিদের সঙ্গে একটু আলাপ করি।

শারমা বা শোভন অশনিনাথকে বাধা দেওয়ার আগেই তিনি অতিথিদের ঘরে চলে গেলেন। সোমনাথ আর শিশিরও চলে এল তাঁর পিছু-পিছু। হঠাৎ ওদের সামনে এসে পড়ল বেশ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ। নানা দেশের মানুষের এমন মিশ্র ভিড় শিশির এর আগে কখনও দেখেনি। সোমনাথ হঠাৎ শিশিরকে ঠেলা দিয়ে বলল, ওই মেয়েটিকে দ্যাখ। কী অপূর্ব সুন্দরী!

সুন্দরী?

শিশির দেখতে লাগল। বীভৎস মুখের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই তো ভিড় বেশি। তার মধ্যে খয়েরি জোব্বা ধরনের একটি ঢোলা পোশাক পরে পানীয়ের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তাকে দেখলে মনে হয় এত ভঙ্গুর সৌন্দর্য যেন আর হয় না। পৃথিবীর কোনও পাপ যেন কখনও স্পর্শ করতে পারে না তাকে। এমন একটি মেয়েকে এই শারমার দলে দেখে আঘাত পেল শিশির। ঠিক তখনই যেখানে জুতো রাখা ছিল সেদিক থেকে কেমন একটা ছটফট শব্দ উঠে এল। শারমা শোভনকে সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। দীর্ঘ লাফ দিয়ে অশনিনাথ ছুটে গেল সেই আওয়াজ লক্ষ করে। মেয়েটির হাত চলকে পানপাত্রটা পড়ে যেতেই তীব্র দেশি মদের গন্ধ উঠতে লাগল চারিদিক ছাপিয়ে। পানপাত্রটা তুলতে গিয়ে পোশাকে জড়িয়ে পড়ে গেল সে। কনুইয়ের ভাঁজে ঝোলানো সোনার তারে বিনোনো তার ছোট্ট পার্সটা পড়ে গেল সবার অলক্ষ্যে মাটিতে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি সেটা তুলে মেয়েটিকে

BanglaBook.org

দিতে গিয়ে দেখে মেয়েটি যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। অশনিনাথের ফেটে পড়া চিৎকার শুনে সোমনাথ আর শিশির ছুটল তাঁর কাছে। তিনি তখন সেই দীর্ঘ ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে ধরে চিৎকার করে বলছেন, শোভন, এ কী—এ কী?

শিশির তাড়াতাড়ি এসে সোমনাথের সঙ্গে উঁকি মেরে দেখল ঝাঁপির ভেতরে শোয়ানো রয়েছে একটা মৃতদেহ। দেহটি কোনও দরিদ্র পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের। হঠাৎ যেন একটি ফুঁয়ে সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিভে গেল। তালগোল পাকানো অন্ধকারে সারা বাড়িতে জেগে উঠল একটা বিশৃঙ্খলা।

সৌভাগ্যবশত শিশির সোমনাথ আর অশনিনাথ খুব কাছাকাছিই ছিলেন। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শিগগির বেরিয়ে চলো। গাড়িতে গিয়ে উঠি। অশনিনাথ ও সোমনাথ তো ভালো স্পোর্টসম্যান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা শিশিরও কোনও অংশেই কম নয়। ছুটে গিয়ে লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে বাগানের পথ দিয়ে আধখোলা গেট ছাড়িয়ে তারা ছুটতে লাগল। ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে গাড়ির লক খুলে দ্রুত স্টার্ট নিলেন অশনিনাথ। শিশির আর সোমনাথ উঠে পড়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার আগেই গাড়ি খোয়া রাস্তায় উঠে পড়ল। শব্দহীন ছুটন্ত নেকড়ের মতো এক লাফে উড়ে গিয়ে যেন ধরে ফেলল বড় রাস্তা।

খানিকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়ল গাড়িটা, তখন যেন খানিকটা সংবিত ফিরে পেল সবাই। অশনিনাথ বললেন, গলা একবারে শুকিয়ে গেছে, কোথায় একটু গলা ভেজানো যায় বলো তো সোমনাথ!

সোমনাথ বলল, এখন তো রাত প্রায় সাড়ে বারোটা, পানের দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে অশনিদা। কোথাও কিছু পাবেন না।

হঠাৎ অশনিনাথ গাড়িটি বাঁকিয়ে ঢুকলেন পাশের একটি সরু রাস্তায়।

সোমনাথ বলল, হঠাৎ এ রাস্তায় কেন অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, হঠাৎ মনে পড়ল এ রাস্তায় একটা ছোট্ট আশ্রম আছে। আর কালীমন্দির। পিসিমার গুরুপুত্রের আশ্রম। চলো, ওখানেই যাই। একটু জল যদি পাওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, এত রাতে এই বর্ষায় ওঁরা কি জেগে আছেন?

শিশির হেসে বলল, তুমি আবার ভুল করলে সোমনাথ, কাল কালীপুজো না। নিশ্চয়ই আশ্রমে এখন পুজোর আয়োজন চলছে।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, হঠাৎ এই আশ্রমের কথাটা আমার স্মরণে এলই বা কী করে? সেই কবে, কলেজে পড়ার সময় পিসিমার সঙ্গে ওঁর গুরুদেবের জন্মতিথিতে এসেছিলাম। তারপর এই কাছাকাছি বড় রাস্তা দিয়ে কত জায়গায় কতবার গেছি, একবারও তো স্মরণে আসেনি এই জায়গাটার কথা। শোভনের বাড়িতেই তো কতবার গেছি। আশ্চর্য!

শিশিরের কথাই ঠিক। আশ্রমের সামনে গাড়ি থামতেই বাগানের মাঝখানে ছোট-ছোট কুটিরগুলিতে কর্মব্যস্ততা লক্ষ করা গেল। টিউবওয়েলের কাছে জল ভরছিল কেউ। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে জলপান করলেন। সোমনাথ আর শিশিরও জল খেল আকণ্ঠ। আশ্রমকর্তা এখন অতিবৃদ্ধ। অশনিনাথ তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি কাছে টেনে নিলেন তাঁকে। শিশির আর সোমনাথ গালিচায় বসল। কিছুক্ষণ বসার পর হঠাৎ অশনিনাথ স্বামীজিকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আজ রাত বারোটা থেকে কি কোনও বিশেষ যোগ পড়েছে?

যোগ? কই না তো? কোনও শুভযোগ তো পড়েনি বাবা।

আচ্ছা, যদি বলি কোনও অশুভ যোগ?

স্বামীজি হঠাৎ চমকে উঠলেন। ভালো করে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। মনে হল তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের তিনজনের কপাল দেখছেন। তারপর কম্পিতগলায় বললেন, ওসব কথা উচ্চারণ করাও পাপ। যাও, মন্দিরে গিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এসো। একটা ঘর খুলে

BanglaBook.org

দিচ্ছি, আজকের রাতটা থেকে যাও এখানে। আজ রাতে আর তোমরা আশ্রমের বাইরে যেও না বাবা।

অশনিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, উপায় নেই। ফিরতে হবে স্বামীজি। আমাদের এক বন্ধুর খুব বিপদ। আপনি যখন বলছেন, তখন মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই যাই।

স্বামীজি বললেন, বেশ, তাই যাও!

অশনিনাথ, সোমনাথ আর শিশির যখন গাড়িতে উঠছেন, তখন একজন সন্ন্যাসী সেবক এসে ওঁদের কিছু প্রসাদী ফুল, আর মিষ্টি সমেত মোড়ক দিলেন।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

অশনিনাথ সোমনাথ আর শিশিরকে উদ্দেশ করে বললেন, সাহস আছে, আবার ফিরে যাওয়ার?

সোমনাথ বলল, কোথায়?

শোভনের বাড়ি।

কেন থাকবে না।

তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলি, আমাদের বন্ধু শোভনের এখন ঘোরতর বিপদ।

সে কী? কী বিপদ?

সোমনাথ বলল, আজ রাতে একটা অশুভ যোগ আছে। শুনলে তো। হয়তো সেটা মাঝরাত থেকেই শুরু। তাই শারমা অত তাড়াহুড়ো করছিল। ওই মৃতদেহটা তো তোমরা দেখলে। কোনও দরিদ্র, অভাগা চণ্ডালের মৃতদেহ। হয়তো লোকটাকে খুনই করা হয়েছে। আজ রাতে শবসাধনার কোনও ব্যাপার ছিল কিংবা এখনও আছে। শারমা আজ রাতের কাণ্ডকারখানাতে যদি সফল হয় তাহলে শোভন হয়তো আমাদের কাছ থেকে চিরকালের মতো দূরে চলে যাবে। শোভনকে আমাদেব বাঁচাতেই হবে সোমনাথ—শিশির।

শিশির হতবাক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। একটু থেমে সে বলল, নিশ্চয়ই! কিন্তু বাঁচাবার উপায়টা কী?

অশনিনাথ বললেন, উপায় একটাই শিশির। শোভনকে ওর বাড়ি থেকে, ওই পরিবেশ থেকে তুলে আনতে হবে। যাকে সাদা কথায বলে, কিডন্যাপ করা। জিনিসটা হয়তো বেআইনি হবে। কিন্তু তা ছাড়া যে আর কোনও উপায় নেই শিশির। শোভন ওদের পরিবারেব শেষ বংশধর। যে-কোনও মূল্যেই ওকে বাঁচাতে হবে। আমি ভুলতে পারি না যে, শোভনও একদিন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

সোমনাথ বলল, চলুন অশনিদা এখুনি ফিরে যাই। কালী-টালি জানি না, তবে একটা শুভশক্তিকে তো সর্বদাই বিশ্বাস করি। আমরা তো কোনও অন্যায় করছি না। সুতরাং সেই শুভশক্তি আমাদের সঙ্গে ঠিকই থাকবে।

অশনিনাথের নিঃশব্দ হিস্পানো একটুও ঝাঁকুনি না দিয়ে সুপার ভাবে বেঁকে আবার উড়ে চলল পুরোনো পথ দিয়ে।

BanglaBook.org

বৃষ্টি থেমে গেছে। একটা হাড়-কাঁপানো হাওয়া। ওপরে কালো নিশ্ছিদ্র আকাশে থমথম করছে অন্ধ মেঘের দল। সেই ঝুপসি বটগাছ তলায় একটা চকচকে কালো বাঘের মতো লুকিয়ে পড়ল হিস্পানোটা। আবার নামলেন অশনিনাথ। সোমনাথ আর শিশিরও নামল। অশনিনাথ বললেন, একেবারে অস্ত্রহীন নই কিন্তু। সঙ্গে একটা ছোট্ট কোল্ট আছে। সুতরাং জীবন্ত কিছু বিপদ এলে যুঝে যেতে পারব। আবার সেই উঁচু দেওয়ালের গা ঘেঁষে হেঁটে যাওয়া। হাঁটতে-হাঁটতে গেট। গেট

বন্ধ। উঁচু পাঁচিল ডিঙনো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আবার দেওয়াল ধরে-ধরে বাড়ির রান্নাঘর চাকরদের ঘরের দিকে পৌঁছল ওরা। সমস্ত বাড়ির কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। আলো নেই। অন্ধকারে দাঁড়ানো সার-সার গাড়িগুলোও উধাও।

চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন, যদ্দুর মনে পড়ে পিছনের কিচেন গার্ডেনের দিক দিয়ে একটা খিড়কি পথ ছিল। একটু এগিয়ে দেখা গেল, খিড়কিটিও বন্ধ। কিন্তু ঈষৎ নিচু হওয়ায় টপকে পেরোনো সম্ভব হল। বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে চারিদিকে আবার ঘোরা। কোনও দরজা, কোনও জানলাই খোলা নেই। শেষ পর্যন্ত পিছনের একটি বাথরুমের কাচের জানলার খানিকটা রিভলভার দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেললেন অশনিনাথ। তারপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনিটা টেনে খুলে ফেললেন। বাথরুমের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পা থেকে জুতো খুলে ফেললেন তিনি। সোমনাথ আর শিশিরও খুলল। তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে একটি বড় করিডোরে গিয়ে পড়ল তারা। ইলেকট্রিকের মিটারবক্সটাই পাগলের মতো খুঁজছিলেন অশনিনাথ। পুরোনো বাড়িতে সদরের পাশেই ছিল সেটা। সোমনাথ বলল, আজকাল অনেকে সিঁড়ির তলায় মিটারবক্স করে।

অশনিনাথ বললেন, আমার যদ্দুর ধারণা ওরা মেন অন করেনি। মেন সুইচটা সম্ভবত যেখানে ডেডবডিটা রাখা ছিল তারই কাছে-পিঠে কোথাও।

অন্ধকারে সোমনাথ একবার লাইটার জ্বালাল। লাইটারের আলোয় তারা সামনেই দেখতে পেল খাওয়ার হলটা। দ্রুত হলটা পেরিয়েই সেই ছোট ঘরটি। ঘরের কোণেই ইলেকট্রিকের মিটারবক্স। সোমনাথ ছুটে গিয়ে সুইচ অন করে দিতেই সারা বাড়িটা আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সেই ঝাঁপিটিও খালি। তাতে কোনও মৃতদেহ নেই।

ওরা আবার খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরে সারি-সারি টেবিল সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল। সব টেবিলেই সেই অদ্ভুত খয়েরি রঙের কড়কড়ে মাড় দেওয়া কাপড় পাতা। মাঝের টেবিলে অদ্ভুত সাংকেতিক নকশায় খাবাব সাজানো। ভার-ভার মাংস। নানারকমের মাংস। আব বড়-বড় মাটির পাত্রে চোলাই দেশি মদ রাখা। পাশে পানপাত্র সাজানো। এমন খাওয়ার জায়গায় দৃষ্টিকটুভাবে যেন শোভা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মড়ার খুলি আর বাহু ও পায়ের সাদা হাড়।

অশনিনাথ সমস্ত ঘরটা ঘুরে-ঘুরে লক্ষ করতে লাগলেন। শিশিরের মনে হল অশনিনাথ খুব গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, রক্ত—রক্ত দিয়ে এইসব কাপড় ছোপানো হয়েছে।

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, সে কী?

হ্যাঁ, আর এইগুলো খুব জটিল তান্ত্রিক প্যাটার্ন। এই যে, যেভাবে খাবারের পাত্রগুলো সাজানো হয়েছে। আর এই সব লতা-পাতা, ফণিমনসা, গোলা সিঁদুর এসব নানারকম তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে লাগে। চলো, আমরা সারা বাড়িটা ঘুরে দেখি। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, ওদের কোনও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোনও ইনার সার্কেলে শোভনকে অভিষিক্ত করার ব্যাপার ছিল আজকে। যে করেই হোক শোভনকে আমাদের বাঁচাতে হবেই।

সোমনাথ বলল, এক কাজ করা যাক, শিশির, চলো আমরা দুজন নীচের তলায় দুদিকে যাই। অশনিদা, আপনি দোতলাটা দেখুন।

অশনিনাথ বললেন, ঠিক আছে।

তিনি ছুটে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। শিশির আর সোমনাথ দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার খাওয়ার ঘরে ফিরে এল শিশির আর সোমনাথ। নীচের তলায় কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। ওরা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির মুখেই অশনিনাথ। তিনি বললেন, দোতলায়ও কেউ নেই। চলো, তিনতলায় যাওয়া যাক।

BanglaBook.org

তিনতলায় তো একটা ফাঁকা গম্বুজের মতো দেখছিলাম, ওখানে কি কোনও লোকের থাকার সম্ভাবনা আছে অশনিদা?

চলোই না। এতটা যখন এলাম, তিনতলাটাও একটু হয়ে যাই। তিনজনে অপেক্ষাকৃত সরু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠল। সরু ঘোরানো প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে ঘর। ঘরের ওপরটা ঠিক ডোমেরই মতো, কিন্তু অন্ধকার। ভেতরে হাতড়ে-হাতড়ে সুইচ বোর্ডের আলোগুলো জ্বেলে দিতেই সারা ডোমটা ঝলমল করে হেসে উঠল। তিনজনেই ওপর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখল আসলে এটা একটা অবজারভেটরি। একটা অতিকায় টেলিস্কোপ বসানো আছে। ঘরেব মেঝের ওপর নানা ধরনের চিহ্ন আর দাগ টানা আছে। দেওয়ালের গায়ে সার-সার সাজানো বই আর প্রাচীন পুঁথি। ডোমের ভেতরের দেওয়ালের রং রাত্রি-নীল। তার গায়ে কিছু-কিছু তফাতেই মারকারি আলোর গুচ্ছ লাগানো।

অশনিনাথ বললেন, আমার কেমন সব আবছা স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমি মাঝে শোভনদের লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে যেতাম। ওখানে আলাদা একটা পুরোনো ধুলোপড়া কোণ মতো জায়গায়, একটা পুরোনো আলমারিতে...হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, আলমারিটা নাকি পঞ্চাশ-ষাট বছর খোলাই হয়নি। শোভনরা নাকি ওটার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। ওর কোনও তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের পুঁথিপত্র ছিল। আমি আলমারিটা খুলে তার মধ্যেকার পুঁথিপত্রগুলো খানিকটা উলটে-পালটে দেখেছিলাম। ঝুরঝুরে সব পুঁথি। পিশাচতন্ত্রের নানারকম সাধনা কর্মকাণ্ডের কথা ভরতি।...কিন্তু তখন আমি আর তেমন কোনও ইন্টারেস্ট নিইনি। আমার অন্য কাজ ছিল। সব মনে পড়ছে...এইসব চিহ্ন, এইসব সংকেত...সত্যি।

সোমনাথ বলল, তার মানে অশনিদা আপনি বলতে চান...

অশনিনাথ বললেন, হ্যাঁ, আমি বলতে চাই আজ একটা ইভল দিন। অশুভ সময়। আজ পৈশাচিক কাজকর্মের উপযুক্ত কোনও মুহূর্ত। শোভনের চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে কিন্তু। আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না ওরা শোভনকে সরিয়ে ফেলল কোথায়? এই টেলিস্কোপটার মধ্যে দিয়ে একটু আকাশ দেখতে চাই। যদি কোনও বিশেষ সংকেত খুঁজে পাই।

শিশির বলল, আকাশ তো মেঘে মোড়া।

অশনিনাথ বললেন, তবু একবার দেখি না। এত ভালো টেলিস্কোপ দেখে আমার খুবই লোভ লাগছে। মনে হচ্ছে এটার স্ট্রেংথ কতটা দেখি।

অশনিনাথ টেলিস্কোপটার দিকে এগোলেন।

ঠিক তখনই অদ্ভুত ধরনের একটা বাসি গন্ধে সারা গোল গম্বুজ ঘর ভরে উঠল। মনে হতে লাগল উজ্জ্বল মারকারি আলো কেমন যেন হালকা নাইলনের ধাঁচের বাষ্পীয় আবরণে ঘিরে গেছে। যেমন রৌদ্রালোকিত কোনও জায়গায় হালকা মেঘের ছায়া পড়লে অদ্ভুত লাগতে থাকে। অশনিনাথ এগিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপটির মুখের ঢাকনিটা খুলতে গেলেন। তখন সেই বাসি গন্ধটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। এবং ক্রমশ মারকারি ল্যাম্পের উজ্জ্বলতা আরও কমে আসতে লাগল। অশনিনাথ আপনিই ঘরে ফিরে এলেন টেলিস্কোপটা ছেড়ে। তিনি এসে দাঁড়ালেন সোমনাথ আর শিশিরের পাশাপাশি। গন্ধটাকে এবার ক্রমশ চেনা যাচ্ছিল। পচা জীবজন্তুর গন্ধ। পচা গলিত মাংসের। গন্ধ যত বাড়ছিল তত কমছিল আলোর তেজ। আর ক্রমশ বাড়ছিল অদ্ভুত একটা ঠান্ডা। এই ঠান্ডা যেন পৃথিবীর শৈত্য নয়, পৃথিবীর বাইরের কোনও অলৌকিক লোকের অস্বাভাবিক মৃত শৈত্য।

হঠাৎ শিশির বলল, দেখুন, দেখুন অশনিদা, ঘরের ওই দিকটায় দেখুন।

দেখা গেল ঘরের কোণে হঠাৎ ঘোর ছাই রঙের একটা গোলার মতো বস্তু যেন শূন্য থেকে তৈরি হয়ে এসে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে বস্তুটি ক্রমশ যেন আয়তনে বাড়তে লাগল। এত

BanglaBook.org

দূর থেকেও মনে হচ্ছিল বস্তুটি যেন কুৎসিতের একটা মূর্ত প্রতীক। যা কিছু নোংরা যা কিছু কদর্য, সবই যেন আস্তে-আস্তে ঢুকে যাচ্ছে ওই গোল বলের মতো বস্তুটির ভেতরে-ভেতরে। ঘরের মধ্যেকার সেই গন্ধ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত লাগছিল অস্বাভাবিক ঠান্ডায়। অথচ বস্তুটা দ্রুত গড়ে উঠতে-উঠতে সরে যাচ্ছিল ঠিক নীচে নামবার একমাত্র দরজাটার কাছে।

দেওয়ালের গা-ঘেঁষে তিনজন দাঁড়িয়েছিল তিন টুকরো মাংসের তালের মতো। পরস্পরের শরীরের কাঁপুনি সঞ্চারিত হচ্ছিল পরস্পরের শরীরে। শিশির অপলকে তাকিয়েছিল সেই অবিশ্বাস্য গঠিত হয়ে উঠতে থাকা ভয়ংকর অতিমানবিক বস্তুপুঞ্জের দিকে। অশনিনাথ আর সোমনাথেরও অবস্থা তাই-ই।

আস্তে-আস্তে সমস্ত ঘরটা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। মারকারি বাল্বগুলির ভেতরে-ভেতরে আলোর বিন্দুপ্রমাণ জ্যোতি ম্লান হয়ে ঘিরে রইল প্রায় না জ্বলাবই মতো। ক্রমশ সারা ঘর যেন একটা অন্য জগতে রূপান্তরিত হতে লাগল। সে জগতের সঙ্গে যেন স্বাভাবিক মানুষেব কোনও যোগই নেই।

সেই বস্তুপুঞ্জ তখন বৃহৎ বিশাল হয়ে শুধু দরজা কেন, ডোমের অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত গড়ে উঠে দবজার সমস্ত প্রস্থটাকে অধিকার করে ফেলেছে। এবং মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা ছেনি, টুকরো-টুকরো করে ছেনে গড়ে তুলছে একটি আকার। অন্ধকারে আকারটা ফিকে নীলচে একটা আভা বিকিরণ করছে। আভাটা সরোম, আর গাঢ় ছাইরঙা অন্ধকার মেশানো।

ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠল বড়-বড় ঠেলে বের হয়ে আসা দুটো চোখ। চোখের আবার রংটা ঈষৎ নীলচে। তাতে কোনও দৃষ্টি নেই। স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ফোলা-ফোলা এবড়ো-খেবড়ো নাক। নাকেব তলায় মাংসল দুটি ঠোঁট। সেই লোল ঠোঁটেব ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিতে লাগল হলুদ-হলুদ দাঁতেব সারি।

ক্রমশ গড়ে উঠতে লাগল হাত, হাতের ফোলা-ফোলা বাঁকা-বাঁকা অর্ধগলিত আঙুল। আঙুলেব মুখে সুচলো নখ আর দীর্ঘ ন্যুব্জ হাঁটু। স্পষ্ট হয়ে ওঠা সেই মূর্তিকে এবার চেনা যাচ্ছে।

শারমার সেই প্রভুভক্ত দ্বাররক্ষীটি। কিন্তু সে তো এত বড়, এত বিশাল, এত বীভৎস ছিল না।

অশনিনাথ বললেন, ও কোনও জীবন্ত মানুষ নয়, পিশাচ,—ও পিশাচ. শারমা আজ রাতে একটা পিশাচকে জাগিয়ে তুলেছে, যাতে আমাদের ক'জনকে শেষ করে দেওয়া যায়।

শিশির বুঝতে পারল তার শবীবের ভেতরটা বাঁশ পাতাব মতো থরথর করে কাঁপছে। সে দেখল মূর্তিটা এবার শূন্যে দুলতে-দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সেই ভয়ংকর ভাবলেশহীন চোখের স্থির অক্ষিগোলকের তলায় সাদা-সাদা দুটি শূন্যতা, আর সেই হলুদ ছত্রখান দাঁতের দুপাশে লোল দুটি ঠোঁটের পুরু-পুরু বিস্তার। সোমনাথের দাঁতে দাঁত লেগে যাওযার শব্দ উঠছিল অন্ধকারে। সে নিজেকে সংবরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে-করতে বলল, অশনিদা, গুলি করুন, গুলি।

অশনিনাথ ভয়ার্ত চাপাকণ্ঠে বললেন, গুলি করলেও কোনও কাজ দেবে না. এখানে গুলির কোনও মূল্য নেই।

বেশ, তাহলে আপনি রিভলভারটা আমাকে দিন।

শিশির বুঝতে পারল, সোমনাথের হাতে অশনিনাথ তাঁর রিভলভারটি তুলে দিলেন।

অন্ধকারে প্রখর বিদ্যুৎচমক খেলে রিভলভার গর্জে উঠল। কিন্তু সেই ভয়ংকর মূর্তি যেন বাতাসে কাঁপতে-কাঁপতে ক্রমাগত এগিয়েই আসতে লাগল। মনে হল ঘরের হাওয়ায় পাশবিকতার প্রগাঢ় ছায়া যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর সেই ভয়ংকর মূর্তি উঁচু হয়ে ছাদের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায়।

BanglaBook.org

অশনিনাথ চাপা গলায় শিবস্তোত্র আবৃত্তি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনও শব্দ যেন তাঁর মাথায় এল না। এত পরিচিত, এত কণ্ঠস্থ সব দেবস্তোত্র, দেব-দেবীর নাম হাওয়ায় হারিয়ে যেতে লাগল। স্মৃতি থেকে মুছে যেতে লাগল।

দুটো ভয়াল হাত তার বিশাল-বিশাল করতল, তার স-নখর আঙুলগুলোর সুচলো কালো-কালো নখ যেন ভেসে উঠল ওদের তিনজনের গুটিসুটি মারা, অন্ধকারে সিঁটিয়ে থাকা শরীরের ওপর। তখনই অন্ধকারে হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল সোমনাথের গলার চেনে ঝোলানো ধাতব ওঁ-কারটি। সেদিকে শিশিরের মতো অশনিনাথেরও চোখ পড়ে গেল। তিনি হঠাৎ সোমনাথের গলা থেকে চেনটা টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন সেই স্তোত্রটি, সেই অসতো মা সদ্গময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়...সেই আলোক প্রার্থনার বাণী। তারপর ছুঁড়ে মারলেন ঝুঁকে-পড়া সেই ছায়ার ওপর।

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। টুকরো-টুকরো হয়ে খসে পড়তে লাগল সেই ভয়ংকর দীর্ঘ মূর্তির শরীর। হাওয়ায় মিশিয়ে যেতে লাগল টুকরোগুলো। ক্রমশ গন্ধ কমতে লাগল এবং আলোর বাল্‌বগুলির ভেতরে ফিরে আসতে লাগল ঈষৎ জ্যোতি। আস্তে-আস্তে জ্বলে উঠল আলোকগুচ্ছ। ঘরের বাতাস হয়ে উঠল হালকা, স্বাভাবিক।

তিনজন ভয়ার্ত বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে প্রায় একসঙ্গেই শক্তি সংগ্রহ করে, পাগলের মতো ছুটল সিঁড়ির দিকে। সোজা নেমে গিয়ে ছুটে উঠে পড়ল গাড়িতে।

গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল অশনিনাথের বাড়ির দিকে।

অশনিনাথের বারান্দায় আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল সোমনাথ আর শিশির। অত রাতেও শ্রীমন্ত উঠে গরম কফি বানিয়ে এনে দিয়েছে। উঠে বসে সেই কফিটুকু পান করার মতোও যেন শক্তি নেই তাদের। অশনিনাথের চোখের তলায় গভীর কালো ছায়া। কফির পেয়ালায় ধীরে লম্বা চুমুক মেরে তিনি বললেন, আঃ বাঁচলাম। বলো সোমনাথ, এবার তাহলে আমরা কী করব? শিশির তুমিও কিছু বুদ্ধি দাও।

কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে শিশির বলল, কিন্তু অশনিদা, আজ সন্ধে থেকে যেসব ঘটনা ঘটল এসব ঘটনা তো আমার নাগালের বাইরে।

অশনিনাথ বললেন, তাহলে তোমার মতো যুক্তিবাদী মানুষও স্বীকার করে নিচ্ছে তো অলৌকিকের অস্তিত্ব।

শিশির বলল, স্বীকার না করে আর উপায় কোথায়? কিন্তু অশনিদা, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে। যখন আপনি আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়েই ফেলেছেন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে রাখুন। আমি এ ঘটনা শেষপর্যন্ত দেখতে চাই।

অশনিনাথ বললেন, শিশির, আসলে আমাদেরও লোকবলের দরকার। আর এসব ঘটনা সবাইকে সবসময় বিশ্বাস করে বলাও সম্ভব হয় না। তুমি সোমনাথের বন্ধু, এই জন্যেই তোমাকে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিপদের ঝুঁকি...আজ জানলাম প্রচণ্ড। দ্যাখো শিশির, আমি আর সোমনাথ আগে ভেবেছিলাম কেবল ড্রাগ অ্যাডিকশন করে এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে শারমা। কিন্তু এখন দেখছি ড্রাগ অ্যাডিকশন আর খুন ছাড়াও সত্যি পিশাচতন্ত্রের ব্যাপারও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

শিশির বলল, সবরকম ঝুঁকি নিতে আমি রাজি আছি অশনিদা। আর লোকবল? লোকবলের দরকার হলেও আমি আপনাকে অতি বিশ্বস্ত কর্মী দিয়ে সাহায্য করতে পারব।

সোমনাথ কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, আমার মাথা এখনও বনবন করে ঘুরছে অশনিদা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই এখন।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু ঘুমোনোর সময় তো নেই সোমনাথ। সমস্ত ব্যাপারটা আমি যতটা

BanglaBook.org

আন্দাজ করেছি তা তোমাদের বুঝিয়ে বলি একটু। দ্যাখো, আজ ভূত-চতুর্দশী। কাল বিকেল পর্যন্ত চতুর্দশী থাকবে। আজ শারমা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করছিল, যাতে শোভনকে পিশাচতন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। কাল বিকেল থেকে অমাবস্যা পড়ছে। কাল বিকেলে হবে আসল দীক্ষার অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তন। কাল বিকেলের আগে যদি শোভনকে উদ্ধার করে না আনতে পারি, তাহলে শারমা শোভনকে শেষ করে দেবেই। শোভনকে আর আমরা ফেরাতে পারব না। তাই যেভাবেই হোক শোভনকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শিশির বলল, কলকাতা পুলিশের অত্যন্ত দক্ষ অফিসার আছেন। এ ব্যাপারে আপনি তাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ করুন না কেন অশনিদা?

সোমনাথ পকেট থেকে সিগারেটেব প্যাকেট আর লাইটার বের করতে গিয়ে হঠাৎ একটা উজ্জ্বল সোনালি বস্তু তুলে ধরল।

আবে সেই সুন্দরী মেয়েটির পার্সটা যে আমার কাছেই থেকে গেছে।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সোমনাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, দেখি, দেখি, এটার মধ্যে যদি কোনও হদিশ পাওয়া যায়।

পার্সটা খুলতেই তাব মধ্যে ঝকমক করে উঠল একটি মূল্যবান পাথর বসানো হার। একটি ছোট কার্ড। পিছনে এন্টালির একটি ঠিকানা লেখা। কার্ডটি পার্ক স্ট্রিটেব ফুলের দোকানের। আব একটি তাবিজ ও কিছু খুচরো টাকা।

অশনিনাথ বললেন, যাদেব কেউ নেই, সত্যিই তাদের ভগবান আছেন। যাও সোমনাথ তুমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল ভোবে আমি তোমায় উঠিযে দেব। তুমি এন্টালিব এই বাড়িতে গিয়ে এই মেযেটিব খোঁজ করবে। বলবে, ব্যাগটা তুমি ওকে ফেবত দিতে এসেছ। কারণ এই তাবিজটা দেখেই আমি বুঝতে পারছি এই ব্যাগ হাবিয়ে মেয়েটিরও এখন পাগলেব অবস্থা। সে যে-কোনও মূল্যে ব্যাগটি ফেরত চায।

সোমনাথ বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

অশনিনাথ বললেন, যাও এবাব একটু ঘুমিয়ে নাও তোমবা। কাল সকাল থেকে আবাব ঘোবতব খাটুনির মধ্যে গিয়ে পড়বে।

সকালবেলার হালকা আলোয় শিশির ঘুম থেকে জেগে উঠতেই দেখল অশনিনাথ তাব বিছানাব পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁব সদ্যফোটা গোলাপের একটি তোড়া।

শিশির ধড়মড় করে উঠে বসে পড়ে বলল, ব্যাপাব কী?—তারপর পাশেব বিছানায তাকিযে দেখল সোমনাথ তখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। সোমনাথকে তুলে দিযে অশনিনাথ বললেন, হাতমুখ ধোও। সুন্দর করে সাজো। আজ তোমাকে প্রেমিকের অভিনয় করতে হবে।

সোমনাথ থতমত খেয়ে বলল, মানে?

হ্যাঁ। এই গোলাপের তোড়া আজ সকালবেলায় তোমার জন্যে বেছে-বেছে বাগান থেকে তুলে এনেছি। এটা নিয়ে তুমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ব্যাগ ফেরত দেবে কিন্তু তাবিজটা দেবে না। বলবে, সম্ভবত আমার কাছে থেকে গেছে। চাপ দিয়ে শোভনের ঠিকানাটা জোগাড় করবে যাতে শোভনকে আমরা নিয়ে আসতে পারি অমাবস্যার পৈশাচিক অনুষ্ঠান ঘটার আগে।

সোমনাথ বলল, অভিনয় যদি সফল না হয়?

হতেই হবে। কারণ তোমার অভিনয়ের ওপর শোভনের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কোনওক্রমে যদি মেয়েটিকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে পার। আর শিশির, তোমারও কাজ আছে। আমার সঙ্গে তোমায় শোভনদের কলকাতার বাড়ি যেতে হবে। সেখানে বোধহয় এখন ওর কাকাও নেই। বাড়ি আছে ম্যানেজারবাবুর হেপাজতে। আমাদের পিশাচতন্ত্রেব সেই পুরোনো পুঁথিগুলো উলটে-পালটে দেখতে হবে।

BanglaBook.org

সোমনাথ উঠে বসল ঃ আমি তাহলে দ্রুত চলে যাই। এই কার্ডে লেখা ঠিকানায় আমি চলে যাব। গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কখন?

সন্ধের আগে। সূর্য যেন না ডোবে।

অশনিনাথ বলল, চা খেয়ে যাও, শ্রীমন্ত সব রেডি করেছে।

চায়ের সরঞ্জাম আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে শ্রীমন্ত তখনই ঢুকল। তার হাতে সকালের খবরের কাগজ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে অশনিনাথ কাগজ উলটোচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এই যে, আমি জানতাম,—এই ঘটনাই ঘটবে। নাকতলা পেরিয়ে ধানখেতের পাশে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটি স্থানীয় শ্মশানের ডোম। মৃতদেহটি এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া গেল কে জানে? কাল মাঝরাতের আগে তো দেহটা ফেলা হয়নি!

শিশির বলল, কাগজের অফিসে ফোন করুন না।

অশনিনাথ বললেন, ফোন করে আর কী হবে? নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ভাবে খবরের কাগজে খবরটা পৌঁছে গেছে। লোকটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল।

শিশির বলল, খুন?

হ্যাঁ, একটা বিশ্বাস আছে যে, চণ্ডাল, ডোম, বাগদি এইসব জাত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণরা যাদের ছোট জাত বলে এসেছে এতদিন, তাদের মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনা করলে নাকি সহজে সফল হওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, একটা বাজে কুসংস্কারের জন্যে নিরপরাধ লোকটিকে প্রাণ দিতে হল।

অশনিনাথ বললেন, এই তো কাগজে লিখেছে, এই দরিদ্র লোকটিকে যে কেন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হল তা কেউ বুঝতেই পারছেন না।

শিশির বলল, আচ্ছা অশনিদা, কাল যাকে সেই গম্বুজ-ঘরে দেখলাম, তার দেহ পাওয়া যায়নি?

অশনিনাথ বললেন, সেই দেহ? যে দেহ বহুদিন আগে মৃত? সে তো কবে গলে বাতাসে মিশে গেছে! শবসাধনা করে শারমা ওই দেহে পিশাচ জাগিয়েছিল। সে পিশাচ তো কাল শেষ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। হয়তো একবছর, দু-বছর, দশবছর ধরে ওই পিশাচ ক্রীতদাস ওই গলিত দেহে বন্দি হয়েছিল।

যাক নষ্ট করার সময় নেই আর। আমি চললাম। সোমনাথ উঠে পড়ল।

শিশির বাড়িতে ফোন করে দিল। সে বাড়ি হয়ে অশনিনাথের সঙ্গে শোভনদের লাইব্রেরিতে যাবে।

সোমনাথ প্রথমেই গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সেই ফুলের দোকানটিতে গেল। আসলে আজ যে কাজে সে যাচ্ছে সে কাজের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল তার। একটি অচেনা মেয়েকে নিষ্পাপ প্রেমের কথা বলে অভিনয় করার চেয়ে তার ওপর যদি একশোটা গুণ্ডার মহলা একা নেওয়ার আদেশ দিতেন অশনিনাথ তাহলে বোধহয় সে ব্যাপারটা তার পক্ষে আরও অনেক সহজ হত।

সোমনাথের দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা, তার পোশাকের পারিপাট্য, মস্ত গাড়ি দেখে সমীহভরে উঠে এলেন স্বয়ং দোকানের মালিক। সোমনাথ ভাবল, গোলাপ তোড়ার সঙ্গে একগুচ্ছ গ্লাডিওলি পেয়ে গেলে মেয়েটি হয়তো আরও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। দোকানের একজন কর্মচারী যখন ফুলগুলি তোড়া বেঁধে দিচ্ছিল তখন সে দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করল। তার প্রেমের অভিনয়ের রিহার্সাল যেন এই ফুলের দোকান থেকেই শুরু হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ বলল, আচ্ছা, সম্প্রতি একজনকে আপনি আপনার দোকানের কার্ড দিয়েছিলেন কি?

BanglaBook.org

অনেককেই তো দিয়েছিলাম।

না, মানে একটি মেয়ে—মানে আমি তার কথাতেই আপনার দোকানে এলাম!

কে বলুন তো?

খুব সুন্দরী, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস হবে—মেয়েটির ধরুন...মানে খুব নিষ্পাপ চেহারা। আর হাতে বোধহয় একটা সোনার তারের ছোট্ট হাত ব্যাগ।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। হ্যান্ডব্যাগটার জন্যে তো বটেই। নিষ্পাপ চেহারাটার জন্যেও বটে। বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে একজন বেশ বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি একঝাড় রজনীগন্ধা কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বারবার করে বলছিলেন লাল ফুল কেনবার জন্যে। আমার ফুলগুলো ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি ওঁকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম। তাতে একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে, যতদিন আপনাদের শহরে থাকব, ততদিন নিশ্চয়ই ফুল কিনতে আসব!...কিন্তু তারপর আর আসেননি। তাহলে উনিই আপনাকে আমার দোকান দেখিয়ে দিয়েছেন?—ভালো।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ! ওঁর জন্যেই ওই ফুল নিয়ে যাচ্ছি।—ফুলের গুচ্ছটা বুকের কাছে ধরে সোমনাথ হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয়, মেয়েটি খুব নিষ্পাপ?

দোকান মালিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বোধহয় সোমনাথের অসহায় অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। বললেন, সত্যিই, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি তিনি খুব নিষ্পাপ।

সোমনাথ যখন ড্রাইভ করে চলল, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারল মেয়েটির চেহারাটি তার অন্তঃস্থলে এত পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে যে সে যেন ছবির মতো সেই মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। ছিপছিপে কোমল একটি শরীর। ফুটন্ত ফুলের মতো একটি মুখ। হাতে একটা পানপাত্র নিয়ে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এন্টালির সেই বাড়িটির কাছে এসে গাড়িটা রাখল সোমনাথ। মস্ত ব্যারাক বাড়ি। গোটা কুড়ি ফ্ল্যাট আছে।

কার্ডে ফ্ল্যাট নাম্বার দেওয়া ছিল। ফ্ল্যাট নাম্বার মিলিয়ে-মিলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সোমনাথ। দরজার সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে মিসেস এন. কে. কাপুর।

সোমনাথের বুকের কাছে দু-গুচ্ছ টাটকা ফুলের তোড়া। তবু সে ডোরবেল বাজানোর আগেই পকেটে হাত দিয়ে নিজের অটোমেটিকটাকে আন্দাজ করে নিল।

বেল বাজাতেই ম্যাজিক আই-এর স্বচ্ছ কাচটা ঈষৎ ঘোর হয়ে এল। তারপরে দরজা খুলে গেল।

দরজার মুখে যেন দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক বিশালদেহী মহিলা। এঁকে সেদিন রাত্রে শোভনদের সেই পার্টিতে দেখেছিল সোমনাথ। মনে পড়ল তাঁর বিশাল চেহারা। কদর্য একটি মুখ। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত সব কুঞ্চন। ঘোলাটে চোখে বয়স্কা মহিলার অনুচিত কামার্ত দৃষ্টি। সোমনাথ বলল, মিসেস কাপুর, আমাকে চিনতে পারছেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ বলল, কেন মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন?

মহিলা ঘুম-ঘুম চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে অনেক ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন—কোনও বন্ধুর বাড়িতেই বোধহয়...।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বন্ধুই, বন্ধুই তো!

মহিলা ফুলের তোড়া দেখে এবার এগিয়ে এলেন। আসতেই ভক করে একটা গন্ধ পেল সোমনাথ। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিলা ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তাই ঠিক ধরতে পারছেন না, সোমনাথকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল। এইটুকুই তাঁর স্মৃতিতে আছে যে কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বন্ধু হিসেবেই সোমনাথকে দেখেছিলেন। সোমনাথ গোলাপের গুচ্ছটি পরম অনিচ্ছায় মিসেস

BanglaBook.org

সোমনাথ উঠে বসল ঃ আমি তাহলে দ্রুত চলে যাই। এই কার্ডে লেখা ঠিকানায় আমি চলে যাব। গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কখন?

সন্ধের আগে। সূর্য যেন না ডোবে।

অশনিনাথ বলল, চা খেয়ে যাও, শ্রীমন্ত সব রেডি করেছে।

চায়ের সরঞ্জাম আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে শ্রীমন্ত তখনই ঢুকল। তার হাতে সকালের খবরের কাগজ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে অশনিনাথ কাগজ উলটোচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এই যে, আমি জানতাম,—এই ঘটনাই ঘটবে। নাকতলা পেরিয়ে ধানখেতের পাশে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকটি স্থানীয় শ্মশানের ডোম। মৃতদেহটি এত তাড়াতাড়ি কী করে পাওয়া গেল কে জানে? কাল মাঝরাতের আগে তো দেহটা ফেলা হয়নি।

শিশির বলল, কাগজের অফিসে ফোন করুন না।

অশনিনাথ বললেন, ফোন করে আর কী হবে? নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ভাবে খবরের কাগজে খবরটা পৌঁছে গেছে। লোকটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল।

শিশির বলল, খুন?

হ্যাঁ, একটা বিশ্বাস আছে যে, চণ্ডাল, ডোম, বাগদি এইসব জাত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণরা যাদের ছোট জাত বলে এসেছে এতদিন, তাদের মৃতদেহ নিয়ে শবসাধনা করলে নাকি সহজে সফল হওয়া যায়।

সোমনাথ বলল, একটা বাজে কুসংস্কারেব জন্যে নিরপরাধ লোকটিকে প্রাণ দিতে হল।

অশনিনাথ বললেন, এই তো কাগজে লিখেছে, এই দবিদ্র লোকটিকে যে কেন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হল তা কেউ বুঝতেই পাবছেন না।

শিশির বলল, আচ্ছা অশনিদা, কাল যাকে সেই গম্বুজ-ঘরে দেখলাম, তাব দেহ পাওযা যায়নি?

অশনিনাথ বললেন, সেই দেহ? যে দেহ বহুদিন আগে মৃত? সে তো কবে গলে বাতাসে মিশে গেছে! শবসাধনা করে শারমা ওই দেহে পিশাচ জাগিয়েছিল। সে পিশাচ তো কাল শেষ হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। হযতো একবছর, দু-বছব, দশবছর ধরে ওই পিশাচ ক্রীতদাস ওই গলিত দেহে বন্দি হয়েছিল।

যাক নষ্ট করার সময় নেই আর। আমি চললাম। সোমনাথ উঠে পড়ল।

শিশির বাড়িতে ফোন করে দিল। সে বাড়ি হয়ে অশনিনাথের সঙ্গে শোভনদের লাইব্রেরিতে যাবে।

সোমনাথ প্রথমেই গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সেই ফুলের দোকানটিতে গেল। আসলে আজ যে কাজে সে যাচ্ছে সে কাজেব জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল তার। একটি অচেনা মেয়েকে নিষ্পাপ প্রেমের কথা বলে অভিনয় করার চেয়ে তার ওপর যদি একশোটা গুণ্ডার মহলা একা নেওয়ার আদেশ দিতেন অশনিনাথ তাহলে বোধহয় সে ব্যাপারটা তার পক্ষে আরও অনেক সহজ হত।

সোমনাথের দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা, তার পোশাকের পারিপাট্য, মস্ত গাড়ি দেখে সমীহভরে উঠে এলেন স্বয়ং দোকানের মালিক। সোমনাথ ভাবল, গোলাপ তোড়ার সঙ্গে একগুচ্ছ গ্লাডিওলি পেয়ে গেলে মেয়েটি হয়তো আরও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। দোকানের একজন কর্মচারী যখন ফুলগুলি তোড়া বেঁধে দিচ্ছিল তখন সে দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করল। তার প্রেমের অভিনয়ের রিহার্সাল যেন এই ফুলের দোকান থেকেই শুরু হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ বলল, আচ্ছা, সম্প্রতি একজনকে আপনি আপনার দোকানের কার্ড দিয়েছিলেন কি?

BanglaBook.org

অনেককেই তো দিয়েছিলাম।

না, মানে একটি মেয়ে—মানে আমি তার কথাতেই আপনার দোকানে এলাম।

কে বলুন তো?

খুব সুন্দরী, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস হবে—মেয়েটির ধরুন...মানে খুব নিষ্পাপ চেহারা। আর হাতে বোধহয় একটা সোনার তারের ছোট্ট হাত ব্যাগ।

ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। হ্যান্ডব্যাগটার জন্যে তো বটেই। নিষ্পাপ চেহারাটার জন্যেও বটে। বুঝতে পেরেছি। সঙ্গে একজন বেশ বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি একঝাড় রজনীগন্ধা কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বারবার করে বলছিলেন লাল ফুল কেনবার জন্যে। আমার ফুলগুলো ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি ওঁকে আমার কার্ডটা দিয়েছিলাম। তাতে একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে, যতদিন আপনাদেব শহরে থাকব, ততদিন নিশ্চয়ই ফুল কিনতে আসব।...কিন্তু তারপর আর আসেননি। তাহলে উনিই আপনাকে আমার দোকান দেখিয়ে দিয়েছেন?—ভালো।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ! ওঁর জন্যেই ওই ফুল নিয়ে যাচ্ছি।—ফুলের গুচ্ছটা বুকের কাছে ধরে সোমনাথ হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয়, মেয়েটি খুব নিষ্পাপ?

দোকান মালিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বোধহয় সোমনাথেব অসহায় অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পারলেন। বললেন, সত্যিই, আমি আন্তরিকভাবে মনে করি তিনি খুব নিষ্পাপ।

সোমনাথ যখন ড্রাইভ করে চলল, তখন স্পষ্ট বুঝতে পাবল মেয়েটির চেহারাটি তার অন্তঃস্থলে এত পরিষ্কাবভাবে অঙ্কিত হযে গেছে যে সে যেন ছবির মতো সেই মুখখানি দেখতে পাচ্ছে। ছিপছিপে কোমল একটি শরীব। ফুটন্ত ফুলের মতো একটি মুখ। হাতে একটা পানপাত্র নিয়ে কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এন্টালিব সেই বাড়িটির কাছে এসে গাড়িটা রাখল সোমনাথ। মস্ত ব্যারাক বাড়ি। গোটা কুড়ি ফ্ল্যাট আছে।

কার্ডে ফ্ল্যাট নাম্বার দেওয়া ছিল। ফ্ল্যাট নাম্বাব মিলিয়ে-মিলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সোমনাথ। দরজাব সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে মিসেস এন. কে. কাপুর।

সোমনাথের বুকের কাছে দু-গুচ্ছ টাটকা ফুলের তোড়া। তবু সে ডোরবেল বাজানোব আগেই পকেটে হাত দিয়ে নিজের অটোমেটিকটাকে আন্দাজ করে নিল।

বেল বাজাতেই ম্যাজিক আই-এব স্বচ্ছ কাচটা ঈষৎ ঘোর হয়ে এল। তারপরে দরজা খুলে গেল।

দরজার মুখে যেন দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক বিশালদেহী মহিলা। এঁকে সেদিন রাত্রে শোভনদের সেই পার্টিতে দেখেছিল সোমনাথ। মনে পড়ল তাঁর বিশাল চেহাবা। কদর্য একটি মুখ। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত সব কুঞ্চন। ঘোলাটে চোখে বয়স্কা মহিলার অনুচিত কামার্ত দৃষ্টি। সোমনাথ বলল, মিসেস কাপুর, আমাকে চিনতে পারছেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনাকে কোথায দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ বলল, কেন মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছেন?

মহিলা ঘুম-ঘুম চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে অনেক ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপব বললেন—কোনও বন্ধুর বাড়িতেই বোধহয়...।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বন্ধুই, বন্ধুই তো।

মহিলা ফুলের তোড়া দেখে এবার এগিয়ে এলেন। আসতেই ভক করে একটা গন্ধ পেল সোমনাথ। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিলা ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তাই ঠিক ধরতে পারছেন না, সোমনাথকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল। এইটুকুই তাঁর স্মৃতিতে আছে যে কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বন্ধু হিসেবেই সোমনাথকে দেখেছিলেন। সোমনাথ গোলাপের গুচ্ছটি পরম অনিচ্ছায় মিসেস

BanglaBook.org

কাপুরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপনার জন্যে এনেছি। আমার বাগানের ফুল। আর আর এই গ্ল্যাডিওলিটা—

বুঝেছি বুঝেছি,—চন্দ্রার জন্যে তো?—দিন, আমাকে দিন। চন্দ্রা এখন খুব ব্যস্ত আছে। ও আজ কারও সঙ্গে দেখা করবে না। এবার সোমনাথ একটু নির্লজ্জ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, বেশ তো চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করার কী দরকার। আপনি তো আছেন। একটু আপনার সঙ্গেই কথা বলি।

মিসেস কাপুর বোধহয় এবার একটু প্রসন্ন হলেন। দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

সোমনাথ তাঁর পিছন-পিছন ভেতরে ঢুকল। সরু প্যাসেজের ওপর একই সারিতে তিনটি ঘর। কোণে রান্নাঘর। বাক্সের মতো একটি জায়গা। যে ঘরটিতে সোমনাথকে নিয়ে ঢুকল মহিলাটি সে ঘরটি খুব সাদা-মাটাভাবে সাজানো। কোণে একটি টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে শুকনো ফুলের গোছা। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস কাপুর বললেন, আসলে ফ্ল্যাটে থাকবারই তো সময় পাচ্ছি না। তাই ফুলগুলোও বদলানো হয়নি। আপনি বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

সোমনাথ চুপচাপ বসে রইল। মোটা-মোটা পরদা টাঙানো ধুলোর গন্ধ ভরা ঘর। সারা ফ্ল্যাটে থমথমে একটা আবহাওয়া, মানুষের কোনও সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় এখুনি যেন এই মুহূর্তে কোনও একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে শারমার কোনও লোক। কিংবা কোনও অলৌকিক প্রচ্ছায়া। কিন্তু সেই মেয়েটিই বা কোথায়? সে কি সত্যিই এই ফ্ল্যাটে আছে? নাকি অন্য কোথাও থাকে সে। এ ফ্ল্যাটে কেবল এই পিশাচিনীর সঙ্গে সে একলা।

সোমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকটা। তারপর উঁকি মেরে দেখল রান্নাঘরে গ্যাস জ্বালিয়ে মিসেস কাপুর নিজেই চা বানাচ্ছেন।

হঠাৎ পাশের ঘরের পরদা দুলে উঠল। সেই পরদার পাশ দিয়ে দেখা গেল চন্দ্রাকে। সে সোমনাথকে দেখতে পায়নি। মিসেস কাপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, আন্টি, আমি চা খেতে পারি তো?

সোমনাথ দ্রুত এসে বাইরের ঘরের চেয়ারে যেমন বসেছিল তেমনি বসে পড়ল। গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে ঘরে ঢুকল চন্দ্রা, তারপর চমকে চুপ করে দাঁড়াল। সে সোমনাথকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

সোমনাথ তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

আমাকে? কেন? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

আমাকে আপনি আগে দেখেননি?

চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সোমনাথ খুব রহস্য করে বলল, হয়তো পূর্বজন্মে! যাক দয়া করে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

আমার সঙ্গে আপনার আবার কীসের দরকার থাকতে পারে?

একজন বন্ধুর, একজন বন্ধুর সঙ্গে কীসের দরকার থাকতে পারে বলুন?

আপনি আমার বন্ধু?

হাসল চন্দ্রা। ম্লান চন্দ্রকিরণের মতো একটি হাসি। মনে হয় যেন এই জগতে কারও কাছ থেকেই তার যেন কোনও কিছুই চাইবার নেই।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝবেন,—আমি আপনার কত বন্ধু!

কীসে বুঝব?

হঠাৎ সোমনাথ যেন জাদুকরের ভঙ্গিতে নিজের বুকপকেট থেকে সেই ব্যাগ বের করল।

BanglaBook.org

আনন্দে-উল্লাসে অধীর হয়ে হাত বাড়াল চন্দ্রা।

আপনি ওটা এনেছেন? ফিরিয়ে এনেছেন তাহলে? বাঁচলাম আমি। হ্যাঁ, এবার মেনে নিচ্ছি। আপনি সত্যিই আমার বন্ধু।

ইতিমধ্যে ট্রে-তে করে চা আর বিস্কুট নিয়ে ঢুকলেন মিসেস কাপুর। সোমনাথ তাবিজটি পকেটে পুরে রাখল। চন্দ্রাকে দেখেই গনগনে মুখে বললেন, এ কী তুমি এখানে বেরিয়ে এসেছ কেন, চন্দ্রা?

চন্দ্রা উল্লসিত-কণ্ঠে বলল, আন্টি, এই দেখুন, আমি আমার ব্যাগটা ফিরে পেয়েছি। শারমা এঁকে দিয়ে আমার কাছে ব্যাগটা পাঠিয়ে দিয়েছেন!

মিসেস কাপুর এবার যেন অন্য দৃষ্টিতে তাকালেন সোমনাথের দিকে।

ও-ও, আপনি আগে বললেই পারতেন যে আপনি শারমার কাছ থেকে এসেছেন। তাহলে আর,—।

সোমনাথ বুঝতে পাবল ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। সে বলল, আপনারা আর বলবার সময় দিলেন কই? যাই হোক, আমি বলছিলাম আজ সন্ধ্যায় আপনারা কী করছেন?

কেন আজ সন্ধ্যায তো আমাদের শারমার সঙ্গে যাওয়ার কথা। আপনি যাচ্ছেন না?

সোমনাথ কথার উত্তর দেওয়ার আগেই চন্দ্রা বলল, না শারমা বলেছিলেন, তাবিজটা না পাওয়া গেলে আজ সন্ধ্যায় আবার নতুন করে তাবিজ করাতে হবে—তারপর...।

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আজ সন্ধ্যার ব্যাপারটা ঠিকই আছে মিসেস কাপুর। আপনারা ওখানেই যাবেন। আমারই বলতে ভুল হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম আজ দুপুরে আপনারা কোথায় যাবেন?—যদি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে বেরোতে পাবেন।

মিসেস কাপুব অবাক হয়ে বললেন, আমি না হয় বেবোতে পারি। অ্যাকচুযালি আমার তো আব কোথাও যাওয়ার বাধা নেই। কিন্তু চন্দ্রা কী কবে যাবে? চন্দ্রাব পক্ষে তো আজ কোথাও যাওয়া সম্ভব না। এ কথা আপনি আমাদেব লোক হযে কী কবে বলছেন? কিন্তু আপনি বলছিলেন না বাইরে যাবেন! চলুন, এবার আপনাব সঙ্গে আমি বেরোতে পারি। আমার কিছু জিনিসপত্র সওদা করতে হবে। একটু অর্থপূর্ণভাবে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের রাতের উপকরণ সব, বুঝলেন তো। বাজার ঘুরলেও মেলে না।

সোমনাথের সমস্ত উৎসাহ কে যেন জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। সে ক্ষীণগলায় বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলুন কোথায় যাবেন?

মিসেস কাপুর বললেন, আপনি একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই।

মিসেস কাপুর অন্য ঘরে চলে যেতেই সোমনাথ অসহায়ভাবে চন্দ্রার দিকে তাকাল। তাকাতেই তার মনে হল চন্দ্রাব চোখ দুটি সজল একটা আকুতিতে টলটল করছে। চোখের মধ্যে যেন কিসেব একটা প্রশ্ন এবং কিসের একটা গভীর প্রার্থনা।

সোমনাথ হঠাৎ চাপাগলায় বলল, আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।

চন্দ্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, কী বলবেন বলুন।

সোমনাথ কথাটা বলেছিল তার অন্তঃস্থলের একটা আবেদন থেকে। কিন্তু কেন বলেছিল তা তার নিজেরই মনের সচেতনে ছিল না। সোমনাথ তাই থতমত খেয়ে বলল, ফুলগুলো আপনার কেমন লাগল?

চন্দ্রা বলল, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে গ্ল্যাডিওলি আপনি কী করে জানলেন?

সোমনাথ হেসে বলল, জানেন না, আমি হাত গুনতে জানি?

হঠাৎ চন্দ্রার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর তাতে ছড়িয়ে পড়ল আবির। রুদ্ধকণ্ঠে

BanglaBook.org

বলল, দেখুন তো আমার হাতটা। আপনি সত্যিই কেমন হাত গুনতে পারেন আমি তার প্রমাণ পেতে চাই।

সোমনাথের করতলে নিজের করতলটি জোর করে মেলে দিল চন্দ্রা। সোমনাথ তার হাতটা দেখতে যাবে এমন সময় করিডোরে মিসেস কাপুরের শাড়ির খসখস শব্দ উঠতে লাগল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চন্দ্রার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেন তো?

চন্দ্রা বলে ফেলল, হ্যাঁ।

তাহলে বলি আপনাকে, মিসেস কাপুরকে বাজারে পৌঁছে দিয়ে আমি এখুনি আবার ফিরে আসছি। আসলে আপনার তাবিজটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। ওটা আমি এখন আনিনি। কেবল ব্যাগটাই এনেছি।

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়লেন মিসেস কাপুর। হেসে বললেন, চলুন মিস্টার—কী বলব। আপনার নাম তো আমি ঠিক জানি না।

সোমনাথ হেসে বলল, সোমনাথ চ্যাটার্জি।

আচ্ছা আচ্ছা। চলুন তাহলে।

সোমনাথ বলল, আচ্ছা চন্দ্রা দেবী তাহলে যাই।

মিসেস কাপুরকে বড়বাজারে নামিয়ে দিয়ে সোমনাথ যখন আবার এন্টালির ফ্ল্যাটে ফিরে এল তখন চন্দ্রা তার ফ্ল্যাটে একা। সে ইতিমধ্যে স্নান সেরেছে। ভিজে চুলগুলি ঘন-কালো। চকচক করছে। মাথার চুলের স্তূপে একটি জবার মালা জড়ানো। পরনে একটি খড়খড়ে খয়েরি ধাঁচের কাপড়ের ম্যাক্সি। সেটা দেখেই সোমনাথের গা শিরশির করে উঠল। কারণ সে বুঝতে পারল এটা রক্তে ভেজানো। ঘরের এককোণে একটি ফ্লাওয়ার ভাসে সে সযত্নে গ্ল্যাডিওলিগুলো সাজিয়েছে। সব মিলিয়ে চন্দ্রাকে দেখলে মনে হয় যেন সে নিজেকে একটা উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করছে।

সোমনাথের মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে উঠল শোভনের স্মৃতি। না জানি শোভনকে নিয়ে কী করছে শারমা। তাকেও কি এমনি কোনও পৈশাচিক উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে ওরা। কে জানে? একসময় সোমনাথ, সবাই যেমন কিছুটা কৌতূহলে এবং কিছুটা খেলার ছলে করে, তেমনিভাবে কিরোর বই-টই ওলটাত। আজ যে সেই ফাঁকি দেওয়া বিদ্যে কিছুটা কাজে লেগে যাচ্ছে তাতেই সে মহাখুশি। চন্দ্রা সোমনাথের মুখোমুখি বসে সাগ্রহে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন, দেখুন তো এ কি স্বাভাবিক হাত?

সোমনাথ বলল, হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

চন্দ্রা বলল, আপনি দেখুন না। আমি সাধে শারমার কাছে আসিনি। আপনি দেখুন না আমার লাইফ-লাইনটা।

সোমনাথ চন্দ্রার কোমল সুছাঁদ করতলটি দু-হাতের মধ্যে ধরে ভালো করে দেখতে-দেখতে সত্যিই তার বিস্ময় চাপতে পারল না। মাত্র একটুখানি এগিয়েই হঠাৎ ওর সমস্ত জীবনরেখাটাই ফুরিয়ে গেছে। তারপর অনেকটা শূন্যতা। তারপর আবার জীবনরেখাটা ফিরে এসে চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এই অদ্ভুত ছেদ কেন? এ তো অবধারিত মৃত্যুচিহ্ন। এতখানি ফাঁক—এ তো থাকার কথা নয়।

চন্দ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই চোখ তুলল সোমনাথ। চন্দ্রা হেসে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, আপনার চোখেও তাহলে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে? জানেন, আমি জানি, একুশ বছর তিন দিন আমার পরমায়ু। আমার বয়েস কাল একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। একুশ বছর একদিন আমার বয়েস। আপনিই বলুন এখনও যদি না আমি পাগল উন্মাদ হয়ে উঠি তাহলে আর কবে হব?

BanglaBook.org

সোমনাথ চন্দ্রার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

চন্দ্রার চোখ দুটি ছলছলে। মুখের রেখায়-রেখায় একটা অপূর্ব পবিত্রতা। কিন্তু সত্যিই যদি চন্দ্রার পরমায়ু আর মাত্র দুদিন হয় তাহলে...।

সোমনাথ হেসে উঠল এবার।

সত্যি, সত্যি আপনি এইসব হোকাস-পোকাসে বিশ্বাস করেন?

চন্দ্রা ফ্যাকাসে মুখে বলল, আমি শারমাকে বিশ্বাস করি। উনি যা বলেন তা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়।

অর্থাৎ শারমা আপনাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রেখেছে?

না, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কাতর করে রাখলে আমি শারমার কথা মেনে নিতাম না সোমনাথবাবু। তিনি আমায় পথ দেখিয়েছেন। বাঁচার পথ—।

বাঁচার পথ?

হ্যাঁ, আপনি এমন একটা ভান করছেন যেন কিছু জানেন না।

সোমনাথ বুঝতে পারল গভীর দুশ্চিন্তায় তার অভিনয়ে ভুল হতে শুরু করেছে। তার সবই জানা উচিত ছিল।

সে তবু আন্দাজে ঢিল ছুড়ল। সে বুঝতে পারছিল এই পরমায়ু সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারেই শারমার কাছে হয়তো আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছে চন্দ্রা। আর সেই জন্যেই সারাদিন ধরে সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে। জবার মালায়, উপবাসে, রক্তে ভেজা পোশাক পরে। তাই বলল—

না সে কথা বলছি না, বলছি, যে এত দুরূহ সব ব্রত পালন-টালন আপনাকে করতে হবে, আপনার তাতে কত কষ্ট হবে বলুন,—আমি সেই কথাই বলছিলাম।

চন্দ্রা বলল, কষ্ট? কষ্ট কী বলছেন! অনন্ত জীবনের জন্য অনন্তকালের জন্যে ভগবানের জগৎ থেকে শয়তানের জগতে চলে যাচ্ছি। এ জন্যে মনস্থির করতে আমার কম সময় লাগেনি। তিন মাস ধরে ক্রমাগত ভেবেছি, আর ভেবেছি। আমি ভেবেছি, শোভনবাবু ভেবেছেন, আরও যাঁদের শারমা আশ্রয় দেবেন তাঁরাও ভেবেছেন।

সোমনাথ খুব গম্ভীর সবজান্তার ভঙ্গি করে বলল, সত্যিই তো। ভাববারই তো কথা। আমিও ভাবছি! আমিও যে শেষপর্যন্ত কী করব...।

শারমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিন, আর কী করবেন? কী-বা করার আছে?

আচ্ছা, শোভনেরও তো এই একই ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ, ওঁদের পরিবারে তো মৃগী রোগ আছে। তাই মৃগীর পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আজকাল যখন-তখন অজ্ঞান হয়ে যান। বংশে তো বাতি দেওয়ার মতো কেউ রইল না। তাই শারমা বলেছেন, যদিও শোভনবাবু সন্তানের মুখ হয়তো দেখতে পাবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পরমায়ু অনন্ত করে নেবেন।

সোমনাথের ভেতর একটা অজানা ভয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনন্ত কালের জন্য ভগবানের রাজত্ব ছেড়ে শয়তানের রাজত্বে প্রবেশ? সে কী ভীষণ জীবন্ত নরক। এই নরক থেকে এই নিষ্পাপ মেয়েটিকে কি কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না? কিংবা শোভনকে বের করে আনা যায় না?

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, সে বলল, চলুন আজ শারমার ওখানে যাওয়ার আগে আমি কালীঘাটের কাছ থেকে আপনাকে টাটকা কিছু জবা এনে দিই।

চন্দ্রা বলল, না না, ফুল লাগবে না। ফুল নিয়ে কী হবে! শারমা কালীঘাটের ফুল তো আরওই নেবেন না।

BanglaBook.org

সোমনাথ তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠেছে চন্দ্রাকে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে বলল, না, আপনাকে নিয়ে আজ আমি একটু বেরোবই, আমার একটা কথা আপনি দয়া করে রাখুন।

চন্দ্রা একটু অবাক হয়ে বলল, কী কথা? বলুন?

আমার একজন অত্যন্ত পরিচিত লোক আছেন। তিনি খুব ভালো কর-কোষ্ঠী বিচার করেন। আপনি তাঁকে একবার আপনার হাতটা দেখান। তাহলে হয়তো তিনি হাতের রেখার অন্য কোনও অর্থ বলে দেবেন।

চন্দ্রা হাসল। অদ্ভুত হতাশ আর করুণ একটা হাসি।

আর মাত্র দুদিন পরমায়ু আমার। এখন আর আমার নতুন কোনও ঝুঁকি নেওয়ার সময় নেই। তা ছাড়া, আমি কম লোককে হাত দেখাইনি, সোমনাথবাবু। আমার পরমায়ুর অভাব থাকতে পারে। কিন্তু টাকার অভাব নেই।

সোমনাথ হঠাৎ তীব্র আবেগের বশবর্তী হয়ে চন্দ্রার দুটো হাত নিজের অঞ্জলিতে তুলে নিল। তারপর বলল, একটি অনুরোধ রাখুন আমার। আমায় দয়া করুন। আমি আপনাকে ভালোবাসি!

চন্দ্রা আস্তে-আস্তে নিজের হাতটা সোমনাথের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কী—কী বলছেন আপনি?

সোমনাথ হাঁটুগেড়ে বসে চন্দ্রার কোলের ওপর ভেঙে পড়ল।

চন্দ্রা আস্তে-আস্তে সোমনাথের মাথাটি তুলে দিতে-দিতে বলল, বেশ, চলুন। দেখুন এখন ঘড়িতে তিনটে বাজে। আমায় কিন্তু সন্ধে পাঁচটার সময় এই ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিতে হবে। না হলে আমার মৃত্যু আর কিছুতেই রোধ করতে পারবেন না আপনি। মনে রাখবেন আমার জীবন নিয়ে কিন্তু আপনি ছিনিমিনি খেলছেন।

সোমনাথ উঠে পড়ল। উৎফুল্লমুখে বলল, চলুন! এই পোশাকেই চলুন। আমার বন্ধু কিছু মনে করবেন না। তাঁর কাছেই আপনার তাবিজটা আছে।

চন্দ্রা বলল, বেশ, আমি তাহলে পাশের ঘর থেকে আমার হাত ব্যাগটা নিয়ে আসি। মনে রাখবেন, ডায়মন্ডহারবারের কাছে, হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে আমাকে সন্ধে সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবেই।

চন্দ্রা পাশের ঘরে চলে গেলে সোমনাথ তীব্র একটা লাফ দিয়ে উঠে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে শোভনদের বাড়িতে ফোন করল! সৌভাগ্যবশত একবারেই লাইন পাওয়া গেল। এবং এক্সটেনশন ধরে লাইব্রেরিতে লাইন নিয়ে পেয়ে গেল অশনিনাথকে। চাপা গলায় বলল, আজ সন্ধে সাতটায় হীরাপুর গ্রামের শৈবাল কুটিরে শারমা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ওই চন্দ্রা নামের মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাই। আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুন।

ওদিক থেকে অশনিনাথ বললেন, যেমন করে পারো মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। কিছুতেই ছেড়ো না। শোভনকে বাঁচানো চাই-ই।

চন্দ্রার পায়ের শব্দ পেয়ে সোমনাথ তাড়াতাড়ি ফোনটা রেখে দিল।

চন্দ্রা বলল, কাকে ফোন করছিলেন?

সোমনাথ বলল, দেখছিলাম আমার সেই বন্ধুটি বাড়িতে আছে কি না? শারণ হাতে তো আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই একদম।

অশনিনাথের বাইরের ঘরটিতে বসে চন্দ্রা, মুগ্ধ হয়ে পুরোনো আমলের জিনিসপত্রগুলো দেখছিল। সোমনাথ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বড়-বড় ড্রাগন এনগ্রেভ করা চায়না ভাস, ভারী পরদা, পুরু সোনালি ফ্রেম দেওয়া তেলরঙা ছবি, বড়-বড় আয়না, ঝাড়-লণ্ঠন এইসব দেখছিল। স্বপ্নাশ্রিতের মতো চন্দ্রা বলল—জানেন, এই বাড়িটা দেখে আমার নিজের ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছে।

BanglaBook.org

আমি যেন ছোটবেলায় এমনি ধরনের কোনও বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু সে বাড়ি এখানে নয়। অনেক দূর। সেখানে বন আছে। পাহাড় আছে। বালিয়াড়ি আছে।

আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমার মায়ের খুব অসুখ ছিল। তিনি সবসময় বিছানায় পড়ে থাকতেন। আর আমি আমার আয়ার হাত ধরে-ধরে একটা বিরাট বাড়িতে একা-একা ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের মস্ত বড় বাগান ছিল। বাগান না বলে মাইলের-পর-মাইল জোড়া বিরাট জায়গায় অজস্র গাছপালার ছোটখাটো একটা জঙ্গলই বলা যায়। আমাদের ওই বিরাট বাড়িতে আমার মায়ের ওই একলা শুয়ে-থাকা আর অন্যমহল থেকে সামান্য দু-একজন আত্মীয়স্বজনের মাকে দেখে যাওয়া—এইসব দেখতে-দেখতে আমার মাথা ঝিমঝিম করত। আয়ার হাত ধরে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে আমি যেন দেখতে পেতাম একটা অদ্ভুত চেহারার লোক আমাকে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে! চোখাচোখি হতেই হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যেত। আয়া আমাকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু সে অত নির্জন বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারত না। ছটফট করত। বলত—আমি এবার ঠিক চলে যাব। তোর বাবা গেছে, তোর মামারা গেছে—কেউ থাকতে পারেনি। এ বাড়িতে যে থাকবে সে-ই মরবে। তোর মা, অমন ফুলের মতো মানুষটা। দেখিস বেশি দিন আর বাঁচবে না। ঠিক চলে যাবে।

সেই সময় একদিন আমাদের ম্যানেজারবাবু একজন জ্যোতিষী নিয়ে এসেছিলেন। যদ্দুর মনে পড়ে, সে মায়ের হাত দেখে, আমার হাত দেখে বলেছিল—আমাদের নাকি অনেক পরমায়ু। কিন্তু জানেন, মা-কে শেখানো কথা বলা হয়েছিল। কিচ্ছু সত্যি না। লোকটা চলে যাওয়ার পর আয়া আমাকে বলেছিল। তারপর কী হল জানেন, সেই অদ্ভুত চেহারার লোকটা, যাকে আমি মাঝে-মাঝেই লতাপাতার আড়ালে দেখতে পেতাম—সবার নজর এড়িয়ে আমাদের বাড়ির ওপর তলায় একদম মায়ের ঘরের কাছে চলে এল। আমি কী একটা কাজে যেন মায়ের ঘরে গিয়ে পড়েছিলাম তখনই। দেখলাম লোকটা মায়ের বিছানার পাশে কার্পেটের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে নির্নিমেষ চোখে মাকে দেখছে। মা তার কাছে নিজের হাতটি মেলে ধরেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন সোমনাথবাবু, লোকটি দেখতে ঠিক শারমার মতো। শারমার এখন যা বয়েস, ঠিক সেই বয়েস। তবে পোশাক অন্যরকম। একটা আলখাল্লার মতো জিনিস পরা। থুতনি থেকে ঝুলছে কতকগুলো আলগা সাদা দাড়ি। লোকটা মাকে বলেছিল—তুমি মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে। তাই বলছি, তোমার আত্মাটা দিয়ে দাও। তাহলে আমি তোমায় অনেক বছর পরমায়ু দিয়ে দেব।

আমাকে লোকটা প্রথমে দেখতে পায়নি। পিছন ফিরে ছিল। মা যেই বললেন—তুমি এখানে কেন? তুমি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে—

মায়ের কথা শুনেই শারমার মতো দেখতে লোকটা ফিরে তাকাল। ওঃ, সে কী অদ্ভুত চোখ লোকটার! যেন আমার সমস্ত ভেতরটা ধরে টান দিচ্ছিল। লোকটা আমাকে ডাকতে লাগল। এসো, এসো খুকি, এদিকে এসো, এই যে, দ্যাখো সুরমা, তোমার মেয়ের পরমায়ু দ্যাখো। তোমার ভগবানের রাজত্বের বিচারে মাত্র একুশ বছর! বেশ অন্তত ওর মুখ চেয়ে ওর আত্মাটা আমাকে দিয়ে দাও! তুমি কি চাও তোমার মেয়ে অকালে এইভাবে মারা যাক?

আমার মা কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যাও, যাও, শনিগ্রহ, যাও— হ্যাঁ, আমার মেয়ের শয়তানের জীবন পাওয়ার চেয়ে মরা অনেক ভালো। অনেক ভালো। জানেন, সেইদিন রাতেই আমার মা মারা যান। তারপর আমার কাকারা আমাকে নিয়ে গেলেন লক্ষ্ণৌ-এ। সেখানেই আমার জীবনের আঠেরোটা বছর কাটে। আবার ফিরে এলাম আমার বিষয়-আশয় বুঝে নেওয়ার জন্য। তারপরই শারমা নিজে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দেখুন, আমি কিন্তু রাজি হয়েছি। বাঁচার লোভ আমার প্রচণ্ড। এ লোভ আমি ছাড়তে পারব না সোমনাথবাবু।

BanglaBook.org

সোমনাথ অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রার জীবনের দীর্ঘ কাহিনি শুনছিল। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ফোনের ওপাশে অশনিনাথ কথা বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। অশনিনাথ বললেন, সোমনাথ, এইমাত্র শিশির একটা পুরোনো পুঁথি খুঁজে পেয়েছে। মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা পুঁথিটা। পুঁথিটায় অদ্ভুত সব ব্যাপার পাচ্ছি। পুঁথিটা শোভনদের পুরোহিত বংশের কোনও পূর্বপুরুষের। কিন্তু এর ভেতর শারমা বলে একজন টীকাকারের নামও পাচ্ছি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে সেই টীকাকার শারমা আর এই শারমার মধ্যে একটা যোগসাজস রয়েছে। এতে লেখা আছে কী করে মানুষের আত্মা শয়তানকে উৎসর্গ করতে হয়। খুব জটিল সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। আমরা তার প্রতিষেধক কীভাবে নেওয়া যায় সেটাও লক্ষ রাখছি। সেজন্যেই কিছুটা দেরি হবে। তুমি কোনওক্রমে মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখো।

সোমনাথ ফোনটা নামিয়ে রেখে ফিরে এল।

চন্দ্রা ততক্ষণে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কই, কী হল?—আপনার বন্ধু আসছেন না? আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না সোমনাথবাবু!

সোমনাথ বলল, কেন? কিছু দেরি হয়নি, এই তো দেখুন না ঘড়িতে মাত্র—

মাত্র সাড়ে-চারটে। আপনি ঠিক পাঁচটার মধ্যে আমাকে মিসেস কাপুরের ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তো? কখনও পারবেন না সোমনাথবাবু। তা হয় না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি এবার চলে যাই। আমি না হয় একটা ট্যাক্সিই ডেকে নিচ্ছি, আপনি কেবল আমার তাবিজটা ফিরিয়ে দিন।

সোমনাথ বলল, না না, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা এখন তো সাড়ে-চারটে আর আধঘণ্টা সময় আমায় দয়া করে দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি রকেট স্পিডে এন্টালিতে পৌঁছে দেব। ঠিক পৌঁছে দেব। চলুন আপনাকে একটু বাগানে নিয়ে যাই। অশনিনাথের বাগানটা দেখবার মতো। আর বাগানের শেষে গঙ্গার ঘাট। ওঁদের নিজস্ব ঘাট। ঘাটে ছোট বোট থাকে। বোটে একটু ঘুরিয়েও আনা যাবে আপনাকে...বেশি দেরি লাগবে না। ভয় পাবেন না। যদিও আপনার পরমায়ু সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা, তা আমি বিশ্বাস করি না। তবুও আপনার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আমার হাতেই।

চন্দ্রা কেমন যেন সন্দিগ্ধ-চোখে সোমনাথের দিকে তাকাল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে—চলুন।

সোমনাথ আর চন্দ্রা বাগানে নেমে যেতেই সোমনাথ শ্রীমন্তর সঙ্গে কথা বলার ছুতো করে একটু পিছিয়ে গিয়ে নিজের হাতঘড়িটা আধঘণ্টা পিছিয়ে নিল।

এই অন্যায়টা করার জন্য একটা গ্লানি তাকে স্পর্শ করছিল। কিন্তু শোভনকে তো শারমার কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। তা ছাড়া, অশনিনাথ এই সরল, সহজ, নিষ্পাপ মেয়েটির মধ্যেও তো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন। শারমার সর্বনাশা কবল থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়ই হল তাকে বোঝানো যে, শারমার পথ অনন্ত জীবনের পথ নয়। পৈশাচিক মৃত্যুর পথ। স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যদি একটা দেহ বেঁচে থাকে, তাহলে সে দেহের বাঁচার উপকরণ অন্য দেহ-নিঃসৃত জীবন। রক্ত। মেদ মজ্জা।

বাগানের সবুজ ঘাসের আস্তরণ পেরিয়ে সোমনাথ সোজা এগিয়ে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে রঙিন ছাতার তলায়। সেখানে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনা হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দ্রা।

BanglaBook.org

শ্রীমন্ত ট্রে-তে করে গরম ক্রিম আর ফেনায়-ভরা দু-গেলাস এসপ্রেসো কফি এনে নামিয়ে দিল।

চন্দ্রা একবার বিরস চোখে কফির দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গার দিকে।

শ্রীমন্ত ফিরে এসে বলল, আপনাকে ফোনে ডাকছেন। সোমনাথ মিয়োনো গলায় চন্দ্রাকে বলল,—কফিটা খান, আমি এক্ষুণি আসছি...

অশনিনাথই ফোন করছিলেন। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, আজ যে-জায়গায় ওদের মিট করার কথা সে-জায়গাটা কোথায় যেন সোমনাথ?

—ডায়মন্ডহারবারের কাছে। হীরাপুরের শৈবাল কুটিরে।

—শোনো সোমনাথ, আমাকে আর শিশিরকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফিরতে-ফিরতে সন্ধে সাতটার কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি তেমন দেরি দেখি তাহলে হয়তো সোজা ডায়মন্ডহারবারেই চলে যেতে পারি। তুমি কিন্তু মেয়েটিকে যেভাবে হোক আটকে রেখো। এমনও তো হতে পারে, যে শারমা মেয়েটিকে না পেলে আজকের পৈশাচিক ক্রিয়াকর্মটা বন্ধ করেও দিতে পারে—।

সোমনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু একটি মেয়ে, যার মাত্র দু-দিন পরমায়ু বাকি আছে, তাকে কি আটকে রাখাটা ঠিক হবে?

অশনিনাথ বললেন, যার সত্যিই মাত্র দু-দিন পরমায়ু, তার জন্যে মনের জোর তৈরি করা ছাড়া আমি তো আর কোনও উপায়ই দেখি না।

কিন্তু শারমা যে তাকে অনন্ত জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—।

ওদিক থেকে অশনিনাথ চরম বিরক্তিতে বলে উঠলেন, আঃ, সোমনাথ, তুমি খামোখা উত্তেজিত হয়ে পড়ছ, দুর্বল হয়ে পড়ছ! তোমার কি খুব ভালো লাগবে যদি ওই সুন্দর পবিত্র মেয়েটি একটা রক্তপিপাসু, কামার্ত পিশাচিনী হয়ে যায়?

সোমনাথ বলল, কিন্তু আমি যে চন্দ্রাদেবীকে কথা দিয়েছি যে পাঁচটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবই...

অশনিনাথ বললেন, যাক, তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলারও এখন সময় নেই আমার। তুমি যা ভালো বোঝো করো।

টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ হল।

অপরাহ্ণের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। গঙ্গার জল রঙিন হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা গাঢ় বিষাদ, একটা গভীর শান্তি। সোমনাথ দেখল, দূরে রঙিন ছাতার তলায় গা এলিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে চন্দ্রা। চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ায়, করুণায় সোমনাথের সারা মন যেন কেঁদে উঠল। সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল চন্দ্রার কাছে। বলল, চলুন, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রা গ্রীবা তুলে বলল, ক'টা বেজেছে?

সোমনাথ বলল, আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ঘড়ির সময় আধঘণ্টা পিছিয়ে রেখেছিলাম। এখন মিসেস কাপুরের কাছে এন্টালিতে যাওয়ার সময় নেই আর। আপনাকে আমি সিধে নিয়ে যেতে চাই হীরাপুরের শৈবাল কুটিরে।

চন্দ্রা চোখ বড়-বড় করে তাকাল।

কী বলছেন আপনি, সোমনাথবাবু? আপনি আমার এতখানি বিপদ জেনেও আমাকে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলছিলেন! কিন্তু কেন?

সোমনাথ বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, এখনও পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে যা-যা করেছি সবই আপনার ভালোর জন্যেই। কিন্তু এখন সত্যিই যখন উপায় নেই তখন কী আর বলব বলুন, আপনাকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিতে চাই আমার বন্ধুর হাতে।

চন্দ্রা এবারে সবেগে উঠে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

আপনার বন্ধুর হাতে। অনেক হয়েছে সোমনাথবাবু। আপনি আমার প্রচুর উপকার করেছেন। আর দয়া করে উপকার করতে হবে না আমার। আমাকে আপনি সোজা শারমার কাছে পৌঁছে দিন।..তা ছাড়া, আপনাকে আর বিশ্বাস কী বলুন? নিজেই চলে যেতে চাই শারমার কাছে...আপনি যে কৌশল করে আমার তাবিজটা নিয়ে নিলেন এটাই আক্ষেপ রইল।

চন্দ্রা দ্রুতবেগে এগোতে লাগল। সোমনাথ তার পিছন-পিছন যেতে-যেতে বলল, চন্দ্রা দেবী! চন্দ্রা দেবী! আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক আপনাকে শৈবাল কুটিরে পৌঁছে দেব। দয়া করে এ বিশ্বাসটুকু আমার ওপর রাখুন।

চন্দ্রাকে নিয়ে নিজের স্পোর্টসকারে উঠল সোমনাথ। গাড়িটা উড়ে চলল রাস্তা দিয়ে।

অশনিনাথ আর শিশির পাশাপাশি বসে। গাড়ি ছুটছে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হেড লাইটের আলোটুকুই ঈষৎ পথ দেখাচ্ছে। হীরাপুর গ্রাম রাস্তার পাশের একটি বাঁকা মোড় ঘুরে খানিকদূরে চলে গেলে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এই রাস্তায় এখন যেন গাড়ির মেলা লেগে গেছে। গাড়ির মেলা মানে অন্তত তিন চারটি বিশাল-বিশাল বিদেশি গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

অশনিনাথ বললেন, বুঝতে পারলে তো, গাড়িগুলো সব চলেছে হীরাপুরের দিকে।

শিশির সোৎসাহে বলল, অশনিদা, ওদের পিছন-পিছন গেলে কেমন হয়?

খুব ভালো হয়। কিন্তু একটু স্পিড কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে। যাতে সবশেষে পৌঁছয় আমাদের গাড়িটা। কারণ, সবাই নেমে ভেতরে না ঢুকে গেলে আমাদের পক্ষে নামাটা অত্যন্ত বিশ্রি হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের দেখলেই ওরা বুঝতে পারবে আমরা ওই দলের কেউ নই। এবং সেদিনের সেই গোলমালের নায়ক আমরাই। শারমার সেই পিশাচকে তো আমরাই সেদিন শেষ করে দিয়েছি। শারমা আমাদের দেখলে এর বদলা নেবেই।

শিশির বলল, কিন্তু অশনিদা ওই নারকীয় পুরাণে যা পড়লাম তা কি বাস্তবে সত্যি-সত্যি ঘটে?

ঘটে না? —অশনিদা গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে বললেন, আমি তো ছোটবেলায় গল্প শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়িতে এক পূর্বপুরুষের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ছেলেটিকে যখন শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন হঠাৎ এক তান্ত্রিক এসে হাজির। সেদিন নাকি ছিল এক ভীষণ ঝড় বাদলের রাত্রি। সেই তান্ত্রিক বললেন, যদি কেউ এই ঝড় আর হাওয়ার তোড় অস্বীকার করে নারকেল গাছের মাথা থেকে একটা ডাব পেড়ে আনে তাহলে আমি এই ছেলের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে পারি। এবং শোনা যায় সেই ডাব নিয়ে নিশি ডেকে-ডেকে সে রাতে তিনি সারা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত একটি গরিব চাষির ছেলের প্রাণ নিয়ে বাঁচিয়েছিলেন ছেলেটিকে।

শিশির বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল অশনিনাথের মুখের দিকে।

অশনিনাথ বললেন, ওই চন্দ্রা মেয়েটিকে যেমন আয়ু দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে, তেমনি শোভনকেও বোধহয় আয়ু আর ক্ষমতা দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে শারমা। আমার সেটাই দৃঢ় ধারণা। যাক, শেষপর্যন্ত দেখা যাক ব্যাপারটা কদ্দূর গড়ায়।

শিশির বলল, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এসব ঘটনা যে সত্যিই ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না অশনিদা।

অশনিনাথ কিছু বললেন না। মৃদু হাসলেন শুধু।

চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। হেড লাইটের আলোও সেই অন্ধকারে হলদেটে হয়ে

BanglaBook.org

আসছিল। অশনিনাথ এবার গাড়ির স্পিড অনেকটা স্তিমিত করে আনলেন। বললেন, এবারে আমরা একটু পিছনে সরে যাই শিশির। দ্যাখো গাড়িগুলো ওই দূরে, বনের পাশ দিয়ে বেঁকে যাচ্ছে। দেখা যাক কতগুলো গাড়ি যায়। নিশ্চয়ই ওই রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে শৈবালকুটিরের কাছে গিয়ে পড়েছে। আর মাত্র একটি গাড়িই বাকি ছিল। গাড়িটা বুলেটের মতো পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর রাস্তার পাশে হেডলাইট নিভিয়ে, গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসলেন অশনিনাথ। শিশির বুঝতে পারল অশনিনাথ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে চান। সেও চুপচাপ বসে রইল। জায়গাটা নিচু। স্যাঁতসেঁতে। জলা ধরনের। চারিদিকে কেবল লম্বা-লম্বা ঘাসওয়ালা মাঠ, আর-একটু দূরে ঝুপসি একটা জঙ্গল। আকাশের গাঢ় অন্ধকারে তারাগুলো একটু-একটু ঝিলমিল করছে। কিন্তু কুয়াশার পাতলা আবরণে ঝলমলে জ্যোতিটা স্পষ্ট নয়। এইভাবে কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর অশনিনাথ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়িটা শব্দহীনভাবে চলতে শুরু করল। আস্তে বাঁক নিল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশাল প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকা। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে মিশে আছে। বাড়িটির সমস্ত আলোই নেভানো। নীচের তলায় মৃদু একটি-দুটি আলোর রেখা। বিদ্যুতের নয়। সম্ভবত লণ্ঠনের আলো। কিন্তু সেই আলোর আভা হলদেটে নয়। কেমন যেন নীলচে ধরনের। অশনিনাথ গাড়িটা অনেক দূরে থামালেন। তারপর ঝুপসি একটা গাছের ছায়ায় বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চললেন তিনি। শিশির তাঁর পিছন-পিছন চলল। অশনিনাথ বললেন, শিশির, একটা কাজ করলে আমরা অনেকটা ঝুঁকি এড়াতে পারি। চল, আমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটি। এইভাবে হেঁটে আমরা শৈবাল কুটিরের পিছন দিয়ে ঢুকতে পারব।

শৈবালকুটিরের আবছা আকারটা চোখের সামনে রেখে কাঁপতে-কাঁপতে, শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর পা ফেলতে-ফেলতে দুজনে এগিয়ে চলল। শিশির স্পষ্ট বুঝতে পারল, শীতের কাঁপুনিটা কেবল বাইরে থেকেই নয়, ভেতর থেকেও তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। একটা ভয়ংকর অজানা ভয়। এত ভয় শিশির এর আগে আর কখনও পায়নি।

ক্রমশ শৈবাল কুটির যখন কাছে ঘনিয়ে এল অশনিনাথ বললেন, দ্যাখো পিছনের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু। এখান দিয়ে ডিঙিয়েও যাওয়া যেতে পারে।

শিশির চাপা গলায় বলল, তা তো পারে, কিন্তু ভেতরে আবার ডালকুত্তা ছেড়ে রেখে দেয়নি তো?

অন্ধকারে হেসে উঠলেন অশনিনাথ।

না শিশির, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শৈবালকুটিরে আর যাই হোক কোনও কুকুরের দেখা তুমি পাবে না। প্রাণী বলতে বেড়াল ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়।

শিশিরের শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। পাঁচিল পেরিয়ে ওপাশে লাফিয়ে পড়লেন অশনিনাথ। ওপাশের পাথরের ওপর একটু শব্দ হল। শিশিরও লাফিয়ে পড়ল। অন্ধকারে সরু প্যাসেজ ধরনের জায়গাটিতে বড় কয়েকটি জানলা। জানলায় মোটা কাচ লাগানো। কাচের বাইরে মোটা লোহার জাল। জালের গায়ে বহু দিনের জমে-ওঠা ময়লা দিয়ে ভেতরের বিশেষ কিছুই দৃশ্যমান হয় না। তবু নড়াচড়া ছায়া শরীর দেখে মনে হচ্ছিল ভেতরে কিছু লোক গল্পগাছা, পানাহার করছে। অশনিনাথ মাথা ঝুঁকিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ করতে-করতে একটা ছবি দেখতে পেলেন। তার মধ্যে দিয়ে দেখে বললেন, ওরা সব গাড়ির শোফারের দল। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদে মেতে আছে। এসব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না শিশির। চলো, অন্যদিকে যাই। দুজনে মিলে ঘুরে-ঘুরে বাড়ির অন্য একটি পাশে গিয়ে পৌঁছল। এ পাশেও একটি সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটি বোগেনভেলিয়ার লতা। লতার তলা দিয়ে মাথা নিচু করে যেতে গিয়ে দেখা গেল বেশ চমৎকার একটি গুহার মতো অন্ধকার আবেষ্টনী তৈরি হয়। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে পড়ল একটি জানলা।

BanglaBook.org

এ জানলাটির পাল্লা খোলা। কিন্তু ভারী লোহার জালের আবরণে ঢাকা দেওয়া। জালের ওপাশে গাঢ় বেগুনি রঙের ভেলভেটের পরদা ফেলা রয়েছে। পরদার ওপাশে মানুষের কণ্ঠের একটা চাপা শোরগোলের আওয়াজ। অশনিনাথের অসীম দুঃসাহসই বলতে হবে, তিনি মাটি থেকে একটা শুকনো সরু ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে ভেলভেটের পরদাটা কিছুটা ফাঁক করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একচুল ফাঁক হতে দেখা গেল ঘরের ভিতর মৃদু উদ্ভাসিত আলো জ্বলছে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার থাকায় ভেলভেটের পবদা কতটুকু সরল-না-সবল সেদিকে ভেতরের লোকের চোখে পড়ার কোনও কারণই নেই। সেই সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল এক বৃদ্ধা মহিলার মাথা। মাথার নকল চুলের কারিকুরি যেন চূড়ার মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। তিনি যখনই পাশ ফিরেছিলেন তাঁর খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর সুচলো চিবুক দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ডাকিনীর মুখের পাশের অংশটা দেখা যাচ্ছে। সন্তর্পণে ঝোপের তলা দিযে বেরিয়ে আর-একটি জানলা পেলেন অশনিনাথ। সেই জানলার পাশে এক বিশাল নিমগাছ। জানলার পরদা আরও বেশি ফাঁক করা। ভেতরের বেশ খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল তার ভেতর দিয়ে। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে। তাদেব বেশির ভাগই মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পবা। এবং বেশির ভাগের চেহারাতেই বিকৃত ভোগের ছাপ। শরীর জরাগ্রস্ত এবং মুখের রেখায় অতৃপ্ত ভঙ্গি। হলের মাঝখানে পুরু কার্পেট বিছানো। কার্পেটেব ওপর সোনালি, রুপালি জরির কাজ। হলের শেষ প্রান্তে একটি উঁচু বেদি। বেদির ওপর অদ্ভুত লিপিতে কতকগুলি শ্লোক লেখা। শ্লোকগুলির অর্থ বোঝা যাচ্ছিল না। লিপিটাও অচেনা। অনেকটা জড়ানো-জড়ানো ব্রাহ্মী লিপিব কাছাকাছি। কার্পেটের মাঝখানে একটি উঁচু চৌকিতে একটি নগ্ন মৃতদেহ শোয়ানো আছে। তার ঠিক তলাতেই একটি বড় ডাবর জাতীয় বাসন। বাসনটির ভেতর খানিকটা তরল পদার্থ বয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, আর একটি খুন। পিশাচতন্ত্রের নামে আর একটি বলি!

শিশিবের সমস্ত শরীরেব মধ্যে দিয়ে ভয় চলাফেরা করছিল। সে দেখল, মৃতদেহটির কাছে শাবমা দাঁড়িযে আছে। তার পরনে রক্তবর্ণ আলখাল্লা। হাতে একটা দীর্ঘ জঙ্ঘা হাড়।

মন্ত্রোচ্চাবণ যত প্রবল হতে লাগল, ততই শারমার অনুচরেরা তার দুপাশের ধুনুচিতে ধকধকে অগ্নির মতো পদার্থে একরকম দুর্গন্ধময় গুঁড়ো ছুড়ে দিতে লাগল। ঘরটা ক্রমশ ভরে উঠতে লাগল ধোঁয়ায়। ধোঁয়ার নেশায় মানুষ ঢুলে পড়তে লাগল। ধোঁয়ায যে বিলক্ষণ মাদকতা আছে তা অশনিনাথ আর শিশিরের বুঝতে কষ্ট হল না। তাঁরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন একটু। ছায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল কতকগুলি স্ত্রী পুরুষকে ধরে-ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় কোনও বিশেষ উৎসর্গের জন্য তারা আলাদাভাবে প্রস্তুত হয়েছে। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন—ওই দ্যাখো, ওই যে ক্ষীণ চেহারার ন্যুব্জ মানুষটি—ওই-ই শোভন। ইসস্, কী চেহারা হয়েছে শোভনের। মনে হচ্ছে দেহে আব কোনও বল নেই। ধোঁয়ার আধিক্যে আবার সরে দাঁড়াতে হল তাঁদের। খানিকক্ষণ খোলা হাওযার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার পর আবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সেই ডাবর থেকে হাতায় করে চরণামৃতের মতো পানীয় বিতরণ হচ্ছে। জানলার কাছে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চলতা।

শারমাও উত্তেজিত। তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। একটা পুরোনো দেওয়াল-ঘড়ির দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিল সবাই। যেন কারও অপেক্ষা করছে। কিংবা কোনও বিশেষ লগ্নের জন্য অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত শারমা কী যেন একটা আদেশ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই উঠে পড়ল। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে চলল।

অশনিনাথ আর শিশির পায়ে-পায়ে এগিয়ে বাড়িটির সামনের দিকের অংশের প্যাসেজে পৌঁছল। এবার যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। এবং একটি-একটি করে গাড়িগুলি স্টার্ট নিতে থাকল।

BanglaBook.org

অশনিনাথ একহাতে শিশিরের হাতটা মুঠিয়ে ধরেছিলেন। শেষ গাড়িটাও যখন ছেড়ে চলে গেল তিনি বললেন, দেখলে শিশির, এ যাত্রায় কিন্তু ওরা ড্রাইভারকে নিল না।

শিশির রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, দেখলাম।

অশনিনাথ বললেন, চলো, আর দেরি নয়, আমরাও ওদের পিছু নিই।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই শিশির বলল, অশনিদা একটা কথা, সেই মেয়েটিকে তো দেখলাম না। যার বাড়িতে আপনি সোমনাথকে পাঠালেন। সেই চন্দ্রা। তারও তো আজ আসার কথা ছিল, তাই না?

অশনিনাথ বললেন, ঠিক বলেছ, হ্যাঁ, চন্দ্রার তো আসার কথা ছিল। তার জন্যেই ওরা অত ছটফট করছিল। ওদের পৈশাচিক কার্যকলাপগুলো বোধহয় বিশেষ কোনও গ্রহের যোগে হয়। সেই সময়টাই বোধহয় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই চন্দ্রাকে ছাড়াই ওরা রওনা হল। গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে বহু দূর থেকে একটি গাড়ির লাল টেল-লাইট লক্ষ করে এগিয়ে চলছিল অশনিনাথের গাড়ি।

অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকিয়ে আছে তাই ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল শিশির।

চন্দ্রা সিটের প্রায় কিনারায় বসেছিল। উত্তেজনায়, ক্রোধে, হতাশায় তার চোখ মুখ যেন গজ-গজ করছে।

সোমনাথ মাঝে-মাঝে আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, কিন্তু চন্দ্রার সে-দিকে দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি সামনে। রাস্তার দিকে। বারবার সে খালি প্রশ্ন করছিল, আর কতখানি পথ যেতে হবে?—আর কতদূর বাকি আছে?

সোমনাথের কিন্তু সত্যিই নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। অশনিনাথের ওপরও তার রাগ হচ্ছিল। একটি মেয়ের জীবন-মৃত্যু নিয়ে এ-ভাবে ছিনিমিনি খেলাটা অশনিনাথের পক্ষে ঠিক হয়নি। আজ যদি সত্যিই চন্দ্রার জীবনে কোনও দুর্ভাগ্য নেমে আসে তাহলে সোমনাথ নিজেকেও যে দায়ী না করে পারবে না। কারণ চন্দ্রার সঙ্গে মিথ্যে স্তোকবাক্যের খেলায়, সেও তো ছিল অংশীদার।

চন্দ্রা হঠাৎ রাস্তার পাশের একটি পাথর ম্যাপ আঁকা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু রাখুন তো!—আমরা ঠিক আসছি কি না দেখি?

সোমনাথ গাড়ি থামাল। দুজনেই নেমে গেল। চন্দ্রা নকশার ওপর আঙুল রাখতেই মনে হল দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী একটি অংশের দিকে কে যেন তার আঙুলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রা যেন কেমন স্বপ্নাশ্রিতের মতো গাড়িতে উঠল। তারপর বলল, রাস্তাটা আমি এবার চিনতে পেরেছি। চলুন, সোজা চলুন। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলুন—।

সোমনাথ গাড়ির স্পিড বাড়াল। গাড়িটা উড়ে চলতে লাগল। চন্দ্রা উদগ্র চোখে গাড়ির সিটের কিনারায় খাড়া বসে।

সোমনাথ সোজা যাচ্ছিল, হঠাৎ চন্দ্রা বলল, এবার বাঁ-হাতি রাস্তা ধরুন—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলল, সে কী? আপনি শৈবাল কুটিরে যাবেন না?

চন্দ্রা সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে স্বপ্নাশ্রিতের মতো বলল, আপনাকে যা বলছি,—বাঁহাতি রাস্তাটা ধরুন না।

সোমনাথ সংকীর্ণ লাল ধুলো ওড়া বাঁহাতি রাস্তাটা নিল। খানিকটা যাওয়ার পর তার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা নিষেধ-এর বোধ কাজ করতে লাগল। সোমনাথের মনে হল সে একটা ভুল পথে, একটা বিপদের দিকে ক্রমশ চলে যাচ্ছে। এভাবে যাওয়া উচিত নয় তার। খানিকক্ষণ বাদে আস্তে করে সে আর-একটি রাস্তা ধরে আবার বড় রাস্তার ওপর উঠে এল।

BanglaBook.org

চন্দ্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনি কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না? সেই বড় রাস্তায় নিয়ে তুললেন আবার? আমার জীবনের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই আপনার? সত্যি, আজ বুঝতে পারছি, একমাত্র শারমা ছাড়া আমার আর কোনও বন্ধু নেই। তিনিই আমার একমাত্র শুভার্থী।

খানিকদূর যাওয়ার পর রাস্তা আবার দু-ভাগ হয়ে বেঁকে গেল। একটি বাঁকের কাছে এসে চন্দ্রা বলল, এবার গাড়ি থামান। রাস্তার ছবি আঁকা বোর্ডটা আমাকে দেখতে দিন। সোমনাথ গাড়ি থামাল। চন্দ্রা বলল, দেখুন না নেমে, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না?

সোমনাথ বলল, ঠিক রাস্তাতেই তো যাচ্ছি—।

না, যাচ্ছি না—।

সোমনাথ অগত্যা গাড়ি থেকে নামল। সে বোর্ডের গায়ে আঁকা রাস্তার দিক নির্ণয় করতে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে পিছন ফিরতেই শুনতে পেল গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে। বড়-বড় লাফ দিয়ে ছুটে আসতে-না-আসতেই গাড়িটা ঘুরে গিয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলল ফিরতি পথে।

সোমনাথ হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে পাশের বাঁকা রাস্তা ক্রস করে সোজা অন্ধকার ঘাসজমিতে নেমে গেল। তার কেমন যেন মনে হল সোজা হেঁটে গেলে চন্দ্রা যে রাস্তা দিয়ে আবার এতটা এগিয়ে কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাবে, সে রাস্তাটায় গিয়ে পড়বে। সোমনাথ তাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে আড়াআড়ি পথে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এবং সত্যিই সে দেখল লালধুলোর একটা কাঁচা রাস্তার ওপর এসে সে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে যে সময়টা গেল, তাতে অতদূর ব্যাক্ করে আবার ফিরে আসতে চন্দ্রার কিছুটা সময় লাগবার কথা। সোমনাথ সেই শীতে অন্ধকারে অসহায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সে দেখল লালধুলোর রাস্তা দিয়ে নয়, আরও দূরে মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ ঢালুর দিকে তার স্পোর্টস কারটা অদ্ভুত গতিতে, ওঠানামা করতে-করতে, ঝাঁকানি খেতে-খেতে চলেছে। এবং সেইভাবে লাফাতে-লাফাতে হঠাৎ কোনও গাছ, ঢিবি বা বাড়িটাড়িতে ধাক্কা খেয়ে তার চোখের সামনে গাড়িটা উলটে গিয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

সোমনাথ আর অপেক্ষা না করে পাগলের মতো পড়িমড়ি করে ছুটে চলল। স্পোর্টস কারটার জন্যে তার জ্বলন নয়। তার সমস্ত অন্তরাত্মা তখন ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলছে চন্দ্রার অবস্থার কথা ভেবে।

অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় পৌঁছতে-পৌঁছতে সোমনাথের মিনিট পনেরো লেগে গেল। গাড়িটার কাছে এসে সে পোড়া তেল, রেক্সিন আর তারের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু মানুষের পোড়া মাংসের গন্ধ নয়। গাড়ির আগুনের আলোয় জায়গাটা অন্ধকারের মধ্যে ভয়ংকর ধরনের আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সেই আলোয় সে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল চন্দ্রাকে। অনেকক্ষণ দেখার পরে সে লক্ষ করল কয়েক হাত দূরে একটি রঙিন স্কার্ফ পড়ে আছে। পাগলের মতো ছুটল স্কার্ফ লক্ষ করে। চন্দ্রারই স্কার্ফ। যে জায়গায় স্কার্ফটা পড়েছে, জায়গাটা কেমন যেন উঁচু হয়ে উঠে গেছে। যেন একটা খাড়াই দেওয়ালের মতো। সেখান থেকে পোশাকের একটা টুকরো যেন ঝুলতে দেখল সোমনাথ। কী কাণ্ড, এতদূর ছিটকে গেছে চন্দ্রা?—সোমনাথ সেই খাড়াই-এর ওপর দ্রুতপায়ে উঠে গেল। উঠে গিয়ে সে দেখল চন্দ্রার দেহটা একটা ঝোপের পাশে নীচে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ঢালুর দিকে নেমে যেতে গিয়ে, সোমনাথ সবিস্ময়ে লক্ষ করল জায়গাটা যেন একটা শুকিয়ে যাওয়া দিঘির মতো। কানা উঁচু একটা মস্ত বড় বাটি বসানো আছে যেন মাটিতে। নীচে নেমে গেছে তার তলা। সেই অনেক নীচে মধ্যদেশে আলেয়ার মতো ছোটাছুটি করছে নীলচে আগুন আর মানুষের চলমান ছায়া।

সোমনাথ আস্তে-আস্তে গড়িয়ে গিয়ে চন্দ্রার দেহটার পাশে গিয়ে পড়ল। চন্দ্রা তখনও অজ্ঞান। কপালে সামান্য রক্তের দাগ। গভীর হয়ে কাটেনি, কপালটা থেঁতলে গেছে শুধু। কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে

BanglaBook.org

খুব মৃদু। থেমে-থেমে। যেন জ্ঞানহীনতার অতল গর্ভের দিকে নেমে গেছে চন্দ্রা হঠাৎ।

চন্দ্রাকে পাশে রেখে সোমনাথ নীচের দিকে তাকাল। নীচে তখন আলোয় আলো হয়ে গেছে একেবারে মাঝখানের অংশটি। বড়-বড় মশালের মতো দণ্ডের মুখে জ্বলছে নীলচে শিখা ওঠা আলো। পিচ জাতীয় কোনও জিনিস পোড়ার গন্ধ উঠে আসছে সেখান থেকে। সে আলো আগুনের আলো নয়। অন্য কোনও ধরনের আলো। আলোর সেই মালার মাঝখানে ছোট উঠান মতো গোল জায়গাটিতে জড়ো হয়েছে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ। নীলচে আলোয় তাদের পরনের আলখাল্লা ধরনের পোশাকগুলো ঝলমল করছে। সেই অদ্ভুত ভিড়ের মাঝখানে একটি সিংহাসনের মতো বিরাট বেদি আনা হয়েছে। বেদির সামনে জ্বালানো হয়েছে মস্ত একটি কুণ্ড। কিন্তু সেই কুণ্ডে আগুন নেই। আছে অদ্ভুত সব কালোকালো চাঙড়। যা থেকে নীল, বেগুনি, সবুজাভ সব লকলকে শিখা উঠছে। ক্রমশ সেই বেদি ঘিরে, কুণ্ড ঘিরে শুরু হয়ে গেল নৃত্য। নৃত্যের সঙ্গে পান-ভোজন। প্রচুর খাদ্য-পানীয় রাখা ছিল পাশে। একজন বিশাল একটা জ্বালা থেকে পাত্র ভরে-ভরে দিচ্ছিল। আর একজন বিশাল একটা বারকোশ থেকে চাঙড়-চাঙড় মাংস তুলে দিচ্ছিল। দু-হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল উন্মাদ, নৃত্যপর মানুষগুলো। নাচতে-নাচতে অজান্তে তাদের শরীর থেকে আলখাল্লার আবরণ পড়ছিল খসে খসে। উলঙ্গ অর্ধো-লঙ্গদের সেই আচরণের মাঝখানে, সেই মধ্য বেদিতে হঠাৎ ধোঁয়ার আবরণ জমাট বাঁধতে আরম্ভ করল। একটা বিশাল অতিকায় মূর্তির আকার নিতে লাগল ক্রমশ।

এই অন্ধকার ঠান্ডা রাতে, অজানা একটি জলাভূমিতে অনৈসর্গিক ওই দৃশ্য দেখতে-দেখতে যেন মাথা ঘুরে উঠতে লাগল সোমনাথের। সে ঝিম ঝিম মাথায় আস্তে হাত বাড়িয়ে চন্দ্রাকে ধরে রইল তবুও।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর দূরের গাড়িগুলির টেল লাইটের লাল আলোগুলো লাল লাল ভোনাকির মতো রাস্তা ছেড়ে একটা অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হেড লাইটের আলো জ্বেলে-জ্বেলে নিশানা করে-করে গাড়িগুলি একে-একে থামল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বড় বড় বপ্লমের মতো জিনিস, আরও নানারকম আসবাবপত্রও ধরে-ধরে নামাল ছায়া ছায়া স্ত্রী পুরুষেরা। তারপর চলল সামনের অন্ধকারের দিকে।

দূরে গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন অশনিনাথ। সবাই হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর যখন মানুষজনের সাড়া শব্দ আর পাওয়া গেল না, আস্তে-আস্তে দুজনে নামল। হাঁটতে-হাঁটতে সাবধানে গাড়ি জাঙালের মধ্যে দিয়ে দুজনে এগোল উঁচু খাড়াই-এর দিকে। খাড়াই-এর মুখের কাছে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় অশনিনাথ বললেন, এসো, এসো শিশির, ওই দ্যাখো, লোকগুলো যেন ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখন মনে পড়েছে এ জায়গাটা একটা পোড়ো শ্মশান। এই তলায় মড়া পোড়ানো হত। ওখান দিয়ে সরু একটা নালামতোও বয়ে গেছে। মড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আর ওপরে উঠত না বা ঘুরত না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নীচের দিকে খানিকটা নেমে দেখতে লাগল নীচের ঘটনাগুলো। ওই তো সেই পলিত-গলিত লোকগুলো। স্ত্রীলোকগুলোও ওদের সঙ্গে রয়েছে। উন্মাদের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে সবাই। মানুষ যদি তার সভ্য সুন্দর আবরণী থেকে বেরিয়ে এসে এমনি প্রাগৈতিহাসিক রূপ নেয়, তাহলে যেন মনে হয়, নরকই বুঝি আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠল। মাঝখানের বেদির ওপর ক্রমশ একটা বিশাল ধূম্রময় আকার জমাট বেঁধে উঠতে লাগল ওদের চোখের সামনে। শারমাকে দেখা গেল। পাগলের মতো কুণ্ডের চারপাশে ঘুরছে। তার যেন কোনও জ্ঞানই নেই। ক্রমশ সেই বিশাল মূর্তিটি সুস্পষ্ট একটা আকার নিতে-নিতে পরিণত হল মহাকায় একটি ছাগমূর্তিতে। তার এক-একটি ক্ষুর যেন এক-একটি বিশাল থামের

BanglaBook.org

মতো। সেইগুলো ক্রমশ ধাতব, শাণিত আলোময় হয়ে উঠতে লাগল। ছাগমূর্তির দাঁতগুলো হলুদ। বিশাল। চোখে লালচে ঘন আলো। সেই অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে যেন পৈশাচিক একটা অভিব্যক্তি ফুটে আছে। সেই ছাগমূর্তির সামনে গিয়ে সবাই মাথা নুইয়ে শরীর দোলাচ্ছিল।

অশনিনাথ আর শিশির অজান্তেই পরস্পরের হাত মুঠিয়ে ধরে ফেলেছিলেন। দেখা গেল ক্রমে সেই উন্মত্ত নৃত্য শেষ হয়ে এল। অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি স্থানে কিছু লোক জটলা করছিল। তাদের মধ্যে থেকে ধরে-ধরে নিয়ে আসা হল কয়েকজন মূর্তিকে। মূর্তি বলাই ভালো, কারণ অত্যধিক মাদক পানের জন্যই হোক, কিংবা অন্য কোনও কারণে, দুর্বলতাবশতই হোক তাদের কারও মধ্যেই কোনওরকম চৈতন্য আছে বলে মনে হচ্ছিল না। শরীরের ওপব কোনওরকম দখল ছিল না বলেই, যেন যেমন তেমন করে গা ছেড়ে দিয়েছিল তারা। শারমা একটি বিশাল আকারের পুরোনো বালিঘড়ি এনে সামনে রাখতেই সেই বিশাল ছাগমূর্তি তার ধাতব ক্ষুর নেড়ে-নেড়ে পাশবিক ভঙ্গি করে হেসে উঠল। তারপর একটি-একটি করে মানুষকে তার সামনে এনে ফেলা হল। এবং সে প্রত্যেকের মাথায ও সারা গাযে তার সেই ক্ষুর বুলিয়ে দিতে লাগল। যখন এক-একজনকে সেই প্রক্রিয়ার পর তোলা হতে লাগল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে আর সেই পতিত দলিত অবস্থা নেই। সবলে হেঁটে তারা যোগ দিল সেই নৃত্য-পানভোজনকারীদের দলে।

চাপা গলায় অশনিনাথ শিশিরকে বললেন, শিশির দ্যাখো, একেই বলে দীক্ষাদান। ওই মানুষগুলো এখন যে শক্তিতে বলীয়ান, সে-শক্তি হল পৈশাচিক শক্তি। ওই পৈশাচিক শক্তিলাভের জন্য, ওরা ওদের আত্মাকে চিরকালের মতো শয়তানের হাতে তুলে দিল। এখন ওরাও হয়ে উঠবে এক-একটি খুদে শয়তান। ওদের দিয়েই হবে পৃথিবীর ক্ষতি—।

হঠাৎ চাপা গলায় শিশিব বলল, অশনিদা, ওই দেখুন, সাবির শেষে ওরা কাকে আনছে?

অশনিনাথ তাকিয়ে দেখে বললেন, শোভন! শোভনকে আনছে শিশিব! কী ভয়ানক! শোভনকে একবার যদি ওরা দীক্ষিত করে ফেলে, তাহলে আর তো শোভনকে আমবা ফিবে পাব না শিশির।

শিশির হতাশ কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমরা আর কী করতে পারি অশনিদা?

একটা কিছু, একটা কিছু করতেই হবে শিশির!

তাঁর হাত দুটি মুঠো হতে লাগল, খুলতে থাকল উত্তেজনায়। তিনি হঠাৎ বললেন, এসো, উঠে এসো শিশির। আমরা গাড়িতে উঠি। একটা কাজ করলে হবে। গাড়িটা সোজা চালিয়ে দেওয়া যাবে ওদের মাঝখান দিয়ে। তারপর আমরা দুজনে তুলে নেব শোভনকে। যা হয় হবে তাবপর।

শিশির উঠে পড়ল। বলল, চলুন, চলুন তাহলে!

দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চালিয়ে ঢালু দিযে নামতে হবে। গাড়ির সামনের দুটি উজ্জ্বল, দুটি ছোট, মোট চারটি ফ্লাড আলো জ্বেলে, সোজা গাড়ি চালিয়ে দিলেন অশনিনাথ। অন্ধকার মাঠের মাঝখান দিয়ে, হঠাৎ তীব্র আলোর ঝরনা ঝরিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে চলল অশনিনাথের 'হিস্পানো'। অন্ধকারের মধ্যে মৃদু আভা জ্বেলে যে নীলচে ধরনের অন্য আলো জ্বলছিল, তা যে এই তীব্র বিদ্যুতের পাশে কত নিষ্প্রভ, তা একপলকেই যেন প্রমাণিত হয়ে গেল। গাড়ি একপলকে নেমে গিয়ে সেই ভিড়ের শৃঙ্খলাকে যেন ছত্রখান করে দিল। নানারকম অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম, মশাল, মড়মড় করে ভাঙতে-ভাঙতে গাড়ি এগোতে লাগল। সেই তীব্র আলোর বন্যায় শিশির স্পষ্ট দেখল নারী-পুরুষেরা—যেন সংকুচিত হয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। আর সেই বিশাল বেদির ওপর সেই ছাগমূর্তিও যেন কেমন আকুঞ্চিত হতে লাগল। তারপর আস্তে-আস্তে ভেঙে-ভেঙে, হাওয়ায় শূন্যে মিলিয়ে-মিলিয়ে যেতে লাগল।

অশনিনাথ দ্রুত ডাইভ করে গাড়িটা এনে ফেললেন অচেতন শোভনের পাশে। শোভনকে একটা বেদির ওপর ফেলে রেখে তার সঙ্গীরা ততক্ষণে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামল গাড়িটা, স্টার্ট দেওয়া অবস্থায় কাঁপতে লাগল গাড়ির ইঞ্জিন। থরথর শব্দ উঠতে লাগল গাড়ি থেকে। তার মধ্যেই শিশির নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিল শোভনের দেহটা। গাড়ির পিছনের সিটে কোনওমতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও বসল পিছনের সিটে। অশনিনাথ এবার ফুল স্পিডে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন গাড়ি। অগভীর জলার জলকাদা দুপাশে ছিটিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠলেন মাঠের আর-এক অজানা কিনারায়। সেখানে দেখলেন দুটি দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটি স্ত্রী-দেহ এবং একটি পুরুষের। শিশির বলল, ওদের তুলে নিলে হয় না অশনিদা?

অশনিনাথ বললেন, আমাদের এখন সময় নেই। তা ছাড়া ওরা যে শয়তানের অনুচর নয়, তাই বা কী করে জানলে? হয়তো আমাদের সঙ্গে পাঠাবার জন্য শারমা ওদের সাজিয়ে রেখেছে।

শিশির আর কিছু বলল না। হুশ করে গাড়ি বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অশনিনাথ আর শিশির জানতেও পারল না যে মাঠের ধারে পড়ে আছে সোমনাথ আর চন্দ্রা।

অশনিনাথ গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

পিছনের সিটে গাড়িতে রাখা পুরু কম্বল দিয়ে নিরাবরণ শোভনকে মুড়ে নিয়ে চলেছে শিশির। গ্রামের-পর-গ্রাম, ধানখেত জঙ্গল ভেদ করে চলেছে গাড়ি। আস্তে-আস্তে ভোরের ছোঁয়া এসে লাগছে অন্ধকার কুয়াশা-মাখা আকাশের গায়ে। গাড়ি আস্তে একটি লোকালয়ে প্রবেশ করছে।

থানার কাছে এসে অশনিনাথ গাড়ি থামালেন। শিশিরকে গাড়িতে রেখে তিনি নেমে গেলেন থানায়। জায়গাটার নাম পাথর-পাড়া। গাড়ি এসে পৌঁছেছে বিহার বর্ডার পেরিয়ে সামান্য ভেতরে। পাথর-পাড়ার কাছাকাছিই যদ্দুর মনে পড়ছে তাঁর, ঘনশ্যামগড়। ঘনশ্যামগড়ে থাকে তাঁর বন্ধু দেবকান্ত রাও। দেবকান্ত ঘনশ্যামগড়ের রাজ-পরিবারের উত্তরসূরী। পাথর-পাড়ার পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর অফিস-ঘরেই ছিলেন। কী যেন একটা ডাকাতির তদন্ত সেরে তিনিও ফিরেছেন ভোর রাত্তিরে। অশনিনাথকে তিনি ঘনশ্যামগড়ের নিশানা দিয়ে দিলেন। অশনিনাথকে বললেন, তিনি যদি কোনও জরুরি খবর দিতে চান, তাহলে তাও দিতে পারেন টেলিফোন মারফত। ঘনশ্যামগড়ের দুর্গবাড়িতে দেবকান্ত রাও-এর টেলিফোনও আছে। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে ফোন করলেন। দেবকান্ত রাওই ধরলেন ফোন।

অশনিনাথ সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তিনজন ঘনশ্যামগড়ে দেবকান্ত রাও-এর আতিথ্য নিতে যাচ্ছেন। দেবকান্ত যেন তৈরি থাকেন।

দেবকান্ত রাও তো দারুণ খুশি। তিনি অশনিনাথের একজন বন্ধু এবং ভক্ত। তাঁর স্ত্রী উমা অশনিনাথের লতায় পাতায় ভগ্নি। কতদিন তিনি অশনিনাথকে ঘনশ্যামগড়ে কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এই প্রথম বিনা নিমন্ত্রণেই তাঁকে পাওয়া গেল। সানন্দে অগ্রিম সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখলেন দেবকান্ত রাও। ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ কথাটি অশনিনাথ যা বললেন, তাতে একটু চমকে গেলেন স্বয়ং ইন্সপেক্টরও।

শোন দেবকান্ত, আমাদের জন্যে কিন্তু কোনওরকম আমিষের ব্যবস্থা করবি না। আর হ্যাঁ, তোরা স্বামী-স্ত্রী আর তোদের বাচ্চাকেও কোনওরকম আমিষ দিবি না। এরপর কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে সোমনাথের জন্য, শ্রীমন্তের কাছে নির্দেশ রেখে ইন্সপেক্টরকে আর একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে অশনিনাথ সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

শিশির এবার বলল, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি অশনিদা।

ঘনশ্যামগড়। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, দেবকান্ত রাও। ওর গড়ে যাচ্ছি। চমৎকার গড়টা। একসময় সত্যিকার দুর্গ ছিল। অনেক বড়-বড় যুদ্ধ হয়েছে ওই গড় থেকে। এক বিশাল বাগান সমেত গড়টাকে দেখতে আছে আগের মতোই। দেবকান্ত নষ্ট হতে দেয়নি বনেদি আর্কিটেকচারকে। কিন্তু ভেতরটা মোটামুটি মডার্ন করে নিয়েছে। আমি একবার রাঁচি যাওয়ার পথে

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের জন্যে উঠেছিলাম ওর গড়ে। অপূর্ব বাগ-বাগিচা, অপূর্ব গড়। আর দেবকান্ত আর উমা দুজনে মানুষও খুব ভালো। বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে দেবকান্ত। উমাও ফার্মিং-এর কী সব ট্রেনিং নিয়ে ফার্ম করেছে। ওদের ওখানে গেলে টাটকা ডিম, মুরগি, পর্ক, ভেড়ার মাংস খুব ভালো খেতে পারতে। কিন্তু আজ সব বারণ।

শিশির সকৌতূহলে বলল, সে কী?

অশনিনাথ সামনের পাহাড়ে ওঠার আঁকাবাঁকা ফিতের মতো রাস্তাটির দিকে চোখ রেখে গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে বললেন, হ্যাঁ আমাদের আজকের সারাটা দিন আর সারাটা রাত শুদ্ধাচারে থাকতেই হবে। তার কারণ অমাবস্যার জের আজও শেষ হয়নি। আজ শারমা একবার শেষ চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তোমার মনে আছে পরশু যে পিশাচ মূর্তি পেয়েছিল সে আমাদের কাউকে হত্যা করতে পারেনি বলে ক্রুদ্ধ। তাকে ভেঙে ফেলায় শারমার পাশবিক শক্তি অনেকটা খর্ব হয়েছিল। পরও সেই খুন হওয়া নিষ্পাপ ডোমটির মৃতদেহের ওপর বসেও কোনওরকম শবসাধনা করার সুযোগ পায়নি শারমা। তা সত্ত্বেও কাল রাতে অমাবস্যার ভয়ংকর সময়ে আসল শয়তানকে নামাতে হয়েছে তাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শয়তান যাওয়ার আগে একাধিক মানুষকে খুন করে গেছে—কারণ শয়তান নামিয়ে দীক্ষাদানের কাজও তো কাল পুরো করতে পারেনি শারমা। কথায় বলে—বার-বার তিনবার। দুবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে শারমা। আজ রাত্রে সে শেষ চেষ্টা করবে। পিশাচলোকের সবচেয়ে ভয়ংকর মৃত্যুদূতকে সে পাঠাবে আমাদের কাছে। আজও তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ হল শোভন।

গাড়ি পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামার ঢালুপথে খানিকটা দূর এসে পৌঁছলে, ভোরের প্রথম গোলাপি আলোয় সামনের পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল এক পাথরের দুর্গের গোল-গোল গম্বুজ।

শিশির মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই ক্রমশ কাছে আসতে থাকা এবং ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকা দুর্গটিকে দেখতে লাগল। দুর্গের গেটের কাছে গাড়ি এসে পৌঁছতেই ভারী লোহার দরজা সরিয়ে ঢুকল গাড়িটা। দীর্ঘ সাজানো কেয়ারি-করা লতার বেড়া দেওয়া রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এসে প্রশস্ত গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াল। শিশির আর অশনিনাথ লোকজনদের সহায়তায় শোভনের জ্ঞানহীন কম্বলে জড়ানো দেহটি তুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় গৃহকর্তা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। নীচের তলার প্রশস্ত ড্রইং রুমের পাশের ছোট ঘরে শোভনের দেহটি একটি ডিভানে শুইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন অশনিনাথ। শিশিরের প্রথম দর্শনেই গৃহকর্তা দেবকান্ত রাওকে খুব ভালো লেগে গেল। তাঁর চেহারা প্রায় অশনিনাথের বিপরীত। গোলগাল মিষ্টি ধরনের চেহারা। খুব লম্বা নন। মুখে একটা সুন্দর মাধুর্য আঁকা। হাসিখুশি ভাব। তাঁর পরনে সাধারণ চোস্ত পায়জামা আর পাঞ্জাবি। তার ওপর গাঢ় লাল রঙের জরির কাজ-করা জামিয়ার শাল। তাঁর পিছনে-পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন উমা। উমার পরনে খুব ঢিলেঢালা ম্যাক্সি। মুখে কোনও প্রসাধন নেই। মাথার চুলগুলি এলো করে পিঠে ছড়ানো।

উমাই প্রথম কথা বললেন, এ কী অশনিদা, শোভনের কী হয়েছে? ওকে নীচের ঘরে শোয়াচ্ছেন কেন? ওপরে আমাদের ঘরে নিয়ে আসুন—ডাক্তারকে খবর দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি—।

অশনিনাথ হাত তুলে বললেন, না উমা, ডাক্তারের দরকার হবে না। আর শোভনকে এখন আমরা ওপরে তুলব না। তোদের দুজনের সঙ্গে আমি কিছু জরুরি কথা বলে নিতে চাই।

দেবকান্ত বললেন,—আহা বলবে-বলবে, অশনিদা, আগে চা-টা খাও, একটু বিশ্রাম করো।

না, তোমাদের সঙ্গে কথা না শেষ করে আমি এ বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না।

এবার উমা এবং দেবকান্ত দুজনেই একটু অবাক হলেন। চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে। অশনিনাথ বললেন,—চলো, ও ঘরে শোভন আছে। ওখানে বসেই নিরিবিলিতে আমরা কথাবার্তা সেরে নিই।

শিশির, দেবকান্ত ও উমাকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে অশনিনাথ দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চারটি পুফে টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসলেন চারজন।

দেবকান্ত বললেন, কী ব্যাপার অশনিদা, খুলে বলুন!

অশনিনাথ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটি উমা ও দেবকান্তকে বললেন।

উমা শুনে বললেন, অশনিদা, এই কাহিনি যদি আপনি না বলে আর কেউ বলতেন তাহলে আমি তা কখনও বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের এখানে জলগ্রহণ করার সম্বন্ধ কী?

শুধু জলগ্রহণ নয়, তোমাদের এখানে থাকাও আমাদের পক্ষে উচিত নয়। কারণ গত দুরাত শয়তানেব সঙ্গে সংগ্রাম করে-কবে, আমাদের দুজনের এবং সোমনাথের ভেতরে সব পবিত্রতা প্রায় দেউলে হয়ে এসেছে। এখন আমাদের চাই সতেজ পবিত্র আত্মার সাহায্য। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দুজনের আত্মিক সাহায্য আমার দরকার। আজই আমাদের সংগ্রামের শেষ দিন। আজ সবচেয়ে ভয়ানক দিন। আজকের দিনটিতে যদি আমরা শোভনকে শারমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে আর শারমার পক্ষে শোভনকে কবজা করার সুবিধা হবে না।

দেববকান্ত রাও বললেন,—তোমার কি সন্দেহ আছে অশনিদা যে আমি কিংবা উমা তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব?

না, তোমাদের আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা যদি আজ রাত্রিটা এই বাড়িতে কাটাই, এবং তোমরা আমাদের সাহায্য করো, তাহলে কিন্তু তোমাদেরও শাবমার কুনজরে পড়তে হতে পারে। এবং সে তোমাদেব নানারকম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পাবে। উমা হেসে বললেন, ক্ষতি? নাঃ, কোনও ক্ষতি আমাদের হবে না। ক্ষতি করার সাধ্য কি শাবমার। আমাদের এই দুর্গের চৌহদ্দিতে সে ঢুকতে পারবে ভেবেছেন আপনি? পাহাড়ের প্রান্তে-প্রান্তে আমাদের চৌকি বসানো. চারিদিকে পাহারাদার।

অশনিনাথ হাসলেন ঃ কিন্তু শারমা যদি এমন কোনও দূত পাঠায় যে দূতকে কোনও প্রহরীই আটকাতে পারে না? দেবকান্ত রাও বললেন, আমি ওসব হোকাস-পোকাসকে বিশ্বাসই করি না।

অশনিনাথ বললেন, কিন্তু আমি করি দেবকান্ত, আর সেই সঙ্গে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে যে, যে-কোনও অনৈসর্গিক বিপদের উদয়ই হোক না কেন, আমি ঠিক সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব।

দেবকান্ত রাও বললেন, পারো-না-পারো অশনিদা তোমাদের আমরা ছাড়ছি না।

অশনিনাথ বললেন, বেশ! আমরা থাকব! তবে একটা শর্তে। তা হল তোমাদের সবাইকে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমার একটি কথারও অন্যথা করতে পারবে না তোমবা। তোমরা মানে, তুমি বা উমাই শুধু নয়। শিশির, এবং জ্ঞান ফিরে এলে শোভনকেও। তবে শোভন হয়তো স্বইচ্ছায় কিছু শুনবে না। তার ওপর জোর খাটাতে হবে।

উমা হেসে বললেন, শুনব! শুনব অশনিদা! এবার শোভনকে নিয়ে চলুন ওপরে। আর আপনাদের জন্য চা-টা দিই।

অশনিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, না কথাগুলো অত হালকাভাবে বললে চলবে না উমা। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা যেভাবে নাবিকরা শোনে, যুদ্ধের সময় সেনাপতির নির্দেশ শোনে সৈনিকেরা, সেভাবেই আমার সবকথা শুনতে হবে তোমাদের।

দেবকান্ত রাও হেসে বললেন, এ আর কি নতুন কথা হল। চিরকালই তো তোমার কথা

BanglaBook.org

ওইভাবেই শুনে এসেছি।

বেশ চলো তাহলে; ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া যাক। কিন্তু শোভনের কাছে কে থাকবে?

আমাদের আয়া রানি থাকুক। ও আমার পুরোনো আয়া। আমাকে মানুষ করেছে।

উমা তাঁর আয়াকে ডেকে শোভনের কাছে বসিয়ে ওদের নিয়ে গেলেন বিশাল সুসজ্জিত ডাইনিং হলে। টেবিলে স্তূপাকার আহারবস্তু দেখে অশনিনাথ পিছিয়ে এলেন। বললেন—করেছ কী উমা?

উমা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, কী আর করেছি?

এই যে এতরকম আয়োজন, ডিম? পর্ক? লবস্টার?

কত কষ্টে লবস্টার জোগাড় করেছি। আমি জানি আপনি পছন্দ করেন। আপনারা আসছেন শুনে তাড়াতাড়ি আমার নিচু পাহাড়ির ফিশারি থেকে আনিয়েছি—।

অশনিনাথ বললেন, কেন? দেবকান্ত তোমাকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনও রেসট্রিকশানের কথা বলেনি?

কই না তো?

দেবকান্ত রাও মাথা চুলকে, অপ্রস্তুত হেসে বললেন, স্যরি, ভুল হয়ে গেছে।

অশনিনাথ বললেন, এসব সরিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে দিয়ে এসো। আমাদের জন্যে উমা তুমি নিজে গিয়ে চা, দুধ, পনির আর রুটি নিয়ে এসো। ইচ্ছে করলে সামান্য ফলও আনতে পারো।

উমা বললেন, এখুনি ব্যবস্থা করছি, আপনারা তাহলে পাশের চা-ঘরে চলুন।

এরপর অশনিনাথ দ্রুত কাজে নেমে গেলেন। চা-খাবার খেয়ে সারা দুর্গবাড়িটা দেখতে বেরোলেন। অতি প্রাচীন বিশাল দুর্গ। দুর্গের ঘরের সংখ্যাই প্রায় দেড়শো। উইং আছে তিনটি। মূল প্রাসাদের নীচের তলায় দীর্ঘ লাইব্রেরি-ঘর। সেই বিশাল ঘরের চারিদিকে ঘেরা প্যাসেজ। প্যাসেজে টানা কাচ দেওয়া জানলা। লাইব্রেরি-ঘরটি সবে সারানো হয়েছে। রঙের শেষ-পোঁচ পড়েছে। ঘরটি খালি। বইপত্র সব সরিয়ে অন্যত্র রাখা হয়েছে। অশনিনাথ বিরাট হলঘরটি ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। তারপর উমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ অঞ্চলে সবচেয়ে পবিত্র নদী কী?

সর্বতোয়া—স্বতোয়া বলে এখানকার লোক। আমরা পুজোর কাজে গঙ্গাজলের অভাবে স্বতোয়ার জলই ব্যবহার করি। সে-জল আমাদের এখানে মন্দিরে জালা ভরে-ভরে রেখে দেওয়া হয়।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, উমা তোমার ওপর ভার দিলাম এই বড়ঘর দেওয়াল জানলা সমেত ধুয়ে, তার ওপর স্বতোয়ার জল ছিটিয়ে দেবে। তারপর সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ধুনো গুগ্‌গুল দেবে ভালো করে। ঠিক ঘরের মাঝখানে একেবারে নতুন ব্যবহার না করা তোশক গদি পেতে বড় একটি বিছানা করবে। সবাই আজ নিরামিষ খাবে। তারপর শুদ্ধ বস্ত্রে স্নান সেরে সন্ধে থেকে এই ঘরে এসে ঢুকবে, সারা রাত আর ঘর থেকে কোথাও বেরোবে না। আর হ্যাঁ, চাকর-বাকরদের বলে দেবে সন্ধে থেকে তারা যেন তাদের মহলে চলে যায়। এবং টেলিফোনের লাইনও থাকবে না। কেটে দিতে হবে।

উমা বললেন, আর আমার মেয়ে অশনিদা। তাকেও কি আমাদের কাছে রাখব?

না-না। মেয়ে থাকুক ওপরে ওর বেডরুমে। আয়ার কাছে শোয় তো?

হ্যাঁ, আমার আয়া রানির কাছে।

খুব ভালো। তাই-ই শোবে। কিন্তু ওকে কোনও আমিষ দিও না?

না, চাকরদের বলে দিয়েছি। ফ্রিজ থেকে পর্যন্ত সব আমিষ খাবার বের করে দিয়েছি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা।

BanglaBook.org

কী?

অন্য সিকিউরিটি।

দেবকান্ত রাও বললেন, আমিও তাই ভাবছি। ভাবছি যে চাকর-বাকর অন্য বিল্ডিং-এ থাকলে যদি বিপদ-আপদ হয় তারা তো আসতে পারবে না। তা ছাড়া ফোনের লাইন ডিসকানেকট করে দিলে যদি—।

অশনিনাথ বললেন, তোমরা সিকিউরিটি দিয়ে সারা দুর্গ ঘিরে রাখো না। আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু যদি বলি এই ঘরের বাইরে চাকর-বাকর মোতায়েন রাখলে, তাদের জীবন আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে, আমি সেই আশঙ্কা থেকে তাদের বাঁচাতে চাইছি, তাহলে?

দেবকান্ত রাও বললেন, তুমি যা বলবে, তাই-ই হবে অশনিদা।

অশনিনাথ বললেন, বেশ, তুমি তাহলে আমি যা-যা বলেছি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করো। শিশির শোভনের কাছে থাক। আমি একটু বেরোব। আমি না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু শোভন তোমাদের দায়িত্বে থাকছে। শোভনের কোনও ক্ষতি হলে আমি তোমাদের দায়ী করব। আমি সন্ধের আগেই ফিরে আসছি। শারমার ছল-চাতুরি থেকে সাবধান।

শিশির বলল, কিন্তু আপনি একা-একা কোথায় যাচ্ছেন অশনিদা, যদি কোনও বিপদে পড়েন আপনাকে কে দেখবে?

উমা বললেন, সত্যিই তো! অশনিদা আপনি বরং শিশিরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি আর উনি শোভনের দেখাশুনো ঠিকমতোই করতে পারব। ভাববার কোনও কারণ নেই। হয় আমি, না হয় উনি কেউ-না-কেউ ওর কাছে থাকবই।

অশনিনাথ হেসে বললেন, বেশ! আমি তাহলে শিশিরকে নিয়ে যাচ্ছি।

শিশির অশনিনাথের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উমা বললেন, কিন্তু অশনিদা, সোমনাথের কী হল? কিংবা চন্দ্রাব?

অশনিনাথ বললেন, তোমরা একটা কাজ করো কলকাতায় আমার বাড়িতে ট্রাঙ্ককল করো। শ্রীমন্তকে বলে দাও যে, আমরা এই দুর্গে আছি। যদি সোমনাথের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে সোমনাথ যেন এখানেই চলে আসে—কিন্তু সঙ্গে কেউ থাকলে যেন না আসে।

উমা বললেন—বেশ। এখনই ট্রাঙ্ক বুক করছি।

শিশির আর অশনিনাথ বেরিয়ে পড়লেন।

অশনিনাথ উমাকে বিশেষ কতকগুলো গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমা সেই অনুযায়ী লোকজন লাগিয়ে, স্বতোয়ার জলে বিশাল হলটি পরিষ্কার করে জানলাগুলো বন্ধ করে শার্শি লাগিয়ে দিলেন। শার্শির কাচের ফাঁকগুলিতে তুলো ও মোম দিয়ে আলাদা একটি আস্তরণও দিয়ে দিলেন। প্রতিটি ভেন্টিলেটারে ঝোলালেন গুচ্ছ গুচ্ছ রশুন, পাতিলেবু আর বিশেষ একটি বনজ লতার পত্রমুকুল। ঘরের চার কোণে ধূপধুনোর প্রচুর আয়োজন রইল। একটি ফ্যামিলি খাটের আয়তনে ভারী গদি তোশক পাতালেন তিনি ঘরের মাঝখানে। মাত্রই কয়েকমাস আগে, অতিথিশালার জন্যে তৈরি হয়েছিল ওই গদি-তোশক। সদ্য-ধোয়া সাদা বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে, সেই উঁচু বেদির মতো শয্যার মাঝখানে তিনি স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখলেন ধোপ-ভাঙা ওয়াড়-দেওয়া কিছু বালিশ। তারপর ঘর নিজে হাতে বন্ধ করে তালা দিয়ে যখন ওপরে গেলেন তখন দেবকান্ত রাও শোভনের ঘরের সামনে বসে বই পড়ছিলেন। তিনি বললেন,—অশনিদার নির্দেশমতো শোভনকে স্পঞ্জ করে মাথা ধুইয়ে সদ্য-ধোয়া পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর বোধহয় এবার জ্ঞান ফিরে আসছে।—তুমি কি ওর কাছে বসবে একটু?

উমা বললেন, আমি বসছি, তুমি বরং স্নান-টান সেরে এসো।

দেবকান্ত বললেন, সেই ভালো, আমি স্নানটা সেরে আসি। দেবকান্ত এগোতে যাবেন এমন

সময় তাঁদের খাস বেয়ারা ভরত এসে বলল, মা, আপনাকে নীচে একজন ডাকছেন।

আমাকে?

উমা অবাক হলেন।

কারণ উমাকে ডাকতে হলে নীচের পাহাড় থেকে সাতটি চৌকি পেরিয়ে তবেই তাঁর খাসমহলে পৌঁছতে পারা যায়। তবে যদি কোনও চেনাজানা লোক হয়, কিংবা লোকটি নীচের চৌকির পাহারাদারকে ঠিকমতো বোঝাতে পারে, যে সে কোনও কাজে আসছে, তাহলে আর তাকে আটক করা হয় না।

উমা দেবকান্ত রাওকে বললেন, তুমি বরং কলকাতায় অশনিদার বাড়ি ট্রাঙ্ককল বুক করো, আমি তাড়াতাড়ি দেখাটা সেরে আসছি।

দেবকান্ত বললেন, সেই ভালো।

উমা নীচে নেমে তাঁর নিজের ছোট বসবার ঘরে এসে খাসবেয়ারা জমীর সিংকে বললেন, কে লোকটি? নাম বলেছে কোনও?

জমীর সিং বলল, হ্যাঁ মা, বললেন, সোমনাথবাবু।

ওঃ, সোমনাথ, তা-ই—আচ্ছা, আচ্ছা, এখুনি আসতে বলো—।

উমা সোফায় নিশ্চিন্ত হয়ে এলিয়ে বসে পাশের ত্রিপয়ের ফুলদানিতে রাখা সদ্য ফোটা কার্নেশনগুলোকে হাত দিয়ে আদর করছিলেন। দরজার কাছে পাপোশে মোলায়েম পা ঘষার সঙ্গে সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কেউ বলল, গুড মর্নিং শ্রীমতী দেও।

উমা চমকে তাকালেন। এ তো সোমনাথের কণ্ঠস্বর নয়। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পরদা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা, থলথলে শরীরের, মোঙ্গলীয় মুখের একটি প্রায়-প্রবীণ লোক। তার পরনে হালকা ব্রাউন রঙের বিলিতি স্যুট। উমা কিছু বলার আগেই হাসিমুখে লোকটি এগিয়ে এসে উমার মুখোমুখি সোফায় বসল।

উমা কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

লোকটি উমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে কোমলকণ্ঠে বলল, মিসেস রাও, আমি বুঝতে পারছি, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে এভাবে আসা আমার উচিত নয়। কিন্তু এ ছাড়া আপনার কাছে পৌঁছনোর কোনও উপায় ছিল না আমার। সত্যিকথা বলতে কি আপনার উপকারের জন্যেই এই পথ নিতে হয়েছে আমাকে। আমার নাম নিশা শারমা। আমি একটি তন্ত্র-সংস্থার সঙ্গে আছি। আমার কাজ মানব-কল্যাণ।

উমা ওষ্ঠ বিকৃত করে বলল, ছাই মানব-কল্যাণ, আমি আপনার সংস্থার কথা সব জানি।

না আপনি জানেন না। আপনি যা শুনেছেন তা যে সর্বৈব ঠিক তাই বা কী করে জানলেন? যারা অবিশ্বাসী, যারা বিপথগামী, তারা আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেকরকম অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, এবং তারা যথাযোগ্য শাস্তিও পায়। মনে রাখবেন মিসেস রাও, সে শাস্তি আমরা দিই না, আপনা থেকেই তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়ে।

উমার কেমন যেন শিথিল, বিমর্ষ লাগছিল নিজেকে। শারমার এই একটি কথায় সে যেন কেমন চমকে উঠল।

আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আমার বাড়িতে বসে আপনি আমার বন্ধুদের সমালোচনা করছেন?

আহাঃ—উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন, স্থির হয়ে বসুন উমাদেবী, আপনাকে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি। বলেই চলে যাব। আপনি বুদ্ধিমতী। এসব কথা আপনার শোনা দরকার। এতবড় প্রাসাদের মালিকানা আপনাদের, পূর্বপুরুষদের এতবড় গৌরব ঐতিহ্য, আপনার সামান্য ভুলের ফলে তাকে মাটিতে মিলিয়ে দেবেন না? না-না-না, এমনটা হতেই পারে না উমাদেবী। আপনাকে আমি

BanglaBook.org

উমাদেবীই বলছি। আপনি—আপনি জানেন না আপনি কী আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। কী দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব আপনার। কী যৌবনশ্রী। আপনার মতো একজন মহিলা আমাদের সঙ্গে এলে আমরা তো জগৎ জয় করতে পারতাম। দেখুন আপনাকে এবার আসল কথাটা বলি—তার আগে আপনার ওই ত্রিপয়ে রাখা চকোলেটের বাক্সটা থেকে আমাকে একটা চকোলেট দিন না, উমাদেবী...।

উমা ডানহাতে ত্রিপয়ে রাখা কলিং বেলটা বাজাতে যাচ্ছিলেন, তার বদলে চকোলেটের বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালেন। বাক্সটা স্বপ্নাশ্রিতের মতো এগিয়ে দিলেন শারমার হাতে। শারমা একটা চকোলেট মুখে পুরে দিয়ে এ গাল থেকে ও গাল করল। উমা দেখতে লাগলেন। কুশ্রী ঝোলা গাল। গালের ভেতরে চকোলেট। তাঁর গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। তারপর শারমার চোখে চোখ রাখতেই তাঁর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। শারমা অদ্ভুত একটা হেসে বলল,—এই যে আপনার বাড়ির একটি জিনিস আমি গ্রহণ করলাম, এইতেই আপনার অধিকারের আওতায়—আপনার আওতার মধ্যে আমি ঢুকে পড়লাম।

উমার অদ্ভুত মনে হতে লাগল। তাঁর চোখের সামনে শারমার কুশ্রী চেহারাটা যেন ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। উমার মনে হতে লাগল, যে লোকটা তাঁর সামনে বসে আছে, সে যেমন সুন্দর, তেমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি, তার হাসি সব কিছুই যেন মোহময়, আকর্ষণীয়। এত সুন্দর করে যেন আর কাউকে কোনওদিন কথা বলতে শোনেননি উমা। শারমা বলে চলেছে—।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন, জানেন, আপনাদের বন্ধু শোভন, শোভনদের পরিবারটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে কি শোভনই ওই পরিবারের শেষ বংশধর। ওর কাকা যখন আমার কাছে কেঁদে পড়লেন, ওকে যখন একবার আমি নির্ঘাত চোরাবালির মৃত্যু থেকে বাঁচালাম, তখন থেকেই ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেল। আপনিই বলুন না উমাদেবী, না হলে বনের মধ্যে শোভন চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল যখন, সেখানে আমি হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলাম—তা সেই শোভন, যাকে আমি নতুন পরমায়ু, পূর্ণ স্বাস্থ্য, বাঁচার আনন্দ দিতে চাই, তাকে যদি কেউ ছল-ছুতো করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে আনে, বলুন, তাতে কি তার ক্ষতি করা হয় না? আমি তো ডাক্তারেরই মতো। ডাক্তার যেমন রুগিকে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব নেয়, আমিও তো তেমনি শোভনকে বাঁচিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। এ সবই আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। আসলে কাজ করছেন সাক্ষাৎ 'কাল', 'নিশা'। তিনি যেখানে তাঁর ডানার ছায়া ফেলেন, যেখানে দু-রকম ঘটনাই ঘটতে পারে। তাঁর ইচ্ছেমতো শক্তি, ক্ষমতা সুখ-সম্পদ সব আসতে পারে, আবার ঘনিয়ে উঠতে পারে মৃত্যুর করাল ছায়া। যেমন আপনাদের সংসারে শোভনকে আপনারা আটকে রেখেছেন। কাল অমাবস্যার লগ্নে দু-একবার তাকে 'নিশা'—'কালের' পায়ে উৎসর্গ করার কাজে বাধা দিয়েছেন আপনার বিপথগামী বন্ধুরা। আজ এসেছে আপনার সংসারে অশান্তি, মৃত্যু, দুর্গ্রহ তাদের জন্য—আপনার আর এ থেকে উদ্ধার নেই।

উমা বোধ করতে লাগলেন তাঁর মনের মধ্যে ক্রমশ শারমার কথাগুলো ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে। শারমার কথাগুলো দারুণ যুক্তিসঙ্গত। এখন মনে হচ্ছে, অশনিলাল, শিশির এবং শোভন—এরাই উমার সংসারের চরম শত্রু এবং দুর্গ্রহ। বেশ ছিলেন উমা স্বামী, কন্যা নিয়ে। আজ সকালে উঠে তাঁর ফার্মে যাওয়ার কথা ছিল। তারপর তাঁদের ছোট্ট গার্ডেন হাউসে মিষ্টি একটা পিকনিক, সবই ভেস্তে গেল এই অনাহূত অতিথিদের জন্য। কিন্তু কেবল এই চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল না উমার। এই সঙ্গে আর এক চিন্তাও ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মনের মধ্যে। সে চিন্তা হল ছোটবেলার এক অস্পষ্ট স্মৃতি। উমারা হলেন বিহারের আর এক পার্বত্য মহল্লার এক সর্দারের ঘরের মেয়ে। তাঁদের মহল্লায় এক ডাকিনী ছিল। বুড়ি থুড়থুড়ি ডাকিনী। সে যেদিকে তাকাত সেদিকেই কেমন যেন ক্ষতি হয়ে যেত। ক্ষতি এবং মহামারী।

BanglaBook.org

ডাইনি থাকত দূরের একটা ফণিমনসার জঙ্গলে। কিন্তু কখনও-কখনও সে লোকালয়ে ভিক্ষে করতে আসত। উমার মা একবার বুড়িকে ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেন। উমার ঠাকুমা সঙ্গে-সঙ্গে বারণ করে দিলেন। বললেন, বউমা, ওকে ভিক্ষে দিও না। ওরা ডাইনি। ওদের সংসার থেকে কিছু দিতেও নেই, ওদের কাছ থেকে কিছু নিতেও নেই।

উমার মাথার ভেতর যখন প্রবল স্রোতের পিছন-পিছন সেই স্মৃতির ক্ষীণ স্রোতটা দুলতে লাগল, তখন সে শুনল, শারমা বার-বার খালি বলছে,—তাহলে এক কাজ করুন, আপনাদের স্বার্থে, শোভনের স্বার্থে, শোভনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। উমার মনে হল, ভারী সুন্দর, ভদ্র, কোমল এই মানুষটি। ইনি সত্যিই তাঁর পরিবারের ও শোভনের ভালো চান। সত্যিই তো বাড়তি ঝামেলা নিজেদের ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখার কী দরকার। শারমার কথামতো শোভনকে এদের হাতে তুলে দিলেই তো ভালো হয়।...তুলে দিলেই তো ভালো হয়...উমা যখন একথা ভাবতে শুরু করেছেন, তখনই হাসতে-হাসতে, লাফাতে-লাফাতে রানি-আয়ার হাত ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকল তাঁর চার বছরের মেয়ে হাসি। খিলখিল করে হেসে সে চকোলেটের বাক্সের দিকে ছুটে এল।

এই বুঝি আপনার মেয়ে, আহা ভারী লাভলি তো! এসো-এসো খুকি চকোলেটের বাক্সটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো তো! তারপর, তুমি একটা খাবে, আর আমিও একটা খাব। কী বল?

হাসি চকোলেটের বাক্সটা তুলে শারমার দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ উমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা চেতনার ছুরি ঝনঝন করে তাঁকে কাটতে-কাটতে চলে যেতে থাকল। ওই চকোলেটের বাক্স ছুঁয়ে শারমা চকোলেট নিয়েছে,—উমার ফুলের মতো মেয়েকে সে ছোঁবে এখন। তারপর হাসিও চলে যাবে ওর কবলে। উমার গা ঘৃণায় রিরি করে উঠতে লাগল। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তঁরে নিজস্ব বোধ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঘুম ভেঙে যেতে লাগল ক্রমশ। উমা চমকিত হয়ে বেল বাজালেন। তারপর কঠোরকণ্ঠে হাসিকে ডেকে বললেন, হাসি, শিগগির এদিকে চলে এসো। ও লোকটির কাছে কিছুতেই যেও না।

শারমা তখনও হাসছে।

কী হল?—কী হল উমাদেবী?

উমা তাকিয়ে দেখলেন, শারমার পিছনের দরজায় পরদা তুলে এসে দাঁড়িয়েছে জমীর সিং আর হাজারী সিং। উমা এক-হাতে মেয়েকে কোলের কাছে চেপে ধরে অন্য হাতে জমীর আর হাজারীকে ইশারা করে বললেন—এই লোকটাকে ভালো করে চিনে রাখো, এটাকে কক্ষনো আর আমাদের ঘনশ্যামগড়ের দুর্গের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না।

তীরের বেগে উঠে দাঁড়াল শারমা।

কী বলছেন আপনি উমাদেবী?

কে উমাদেবী? আমি মিসেস রাও,—এক্ষুনি বেরিয়ে যান আপনি। আমার হাসির দিকে কু-দৃষ্টি দিচ্ছেন; এত বড় সাহস?

আমি কিন্তু আপনাদের বন্ধু?

বন্ধু?—বন্ধুদের নামে নিন্দে করতে এসেছিলেন আপনি, লজ্জা করে না আপনার? ছিঃ! আমি কী অপরাধই না করেছি। আমার ঘরে বসে আপনার কাছ থেকে আমাদের বন্ধুদের নিন্দে শুনেছি—ছিঃ—

জমীর আর হাজারী সিং-এর দিকে তাকিয়ে, শারমা দরজার দিকে এগোল। যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, শুনুন মিসেস রাও,—আপনার মেয়েটিকে আপনি খুব বেশি ভালোবাসেন তাই না?—আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়?

উমা তীব্র কণ্ঠে বললেন, ভগবান আমাদের সহায়। আপনার চেষ্টায় কোনও সুফল হবে

BanglaBook.org

না জানবেন। আর আপনার ভয়ও আমি করি না।

শারমা তীব্র দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সোমনাথের যখন জ্ঞান হল তখন চারিদিকে সকালের আলো ফুটে উঠছে। তার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে চন্দ্রা। তার কপালের কাটা দাগটার রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। তার জ্ঞান নেই, না সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটা বুঝতে পারছিল না সোমনাথ। একটু দূরে জ্বলন্ত গাড়িটার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। তখনও পোড়া তেলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপর। আস্তে-আস্তে উঠল সোমনাথ। নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে-টেনে নিয়ে রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। যদি কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু ওই গ্রামীণ রাস্তায় গাড়ি আর কোথায়। আস্তে-আস্তে শোভন, অশনিনাথ, শিশির, শারমা, মিসেস কাপুর এদের সকলের কথা মনে পড়তে লাগল সোমনাথের। তার জানতে ইচ্ছে করল এদের কী অবস্থা হয়েছে। শোভনকে উদ্ধার করা গেল কি না? কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্বও তো এখন তারই ওপর। চন্দ্রাকে এখুনি চিকিৎসা করা দরকার।

সোমনাথ রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখল দূরে সবজি নিয়ে কলকাতাগামী ট্রাক যাচ্ছে একটি-আধটি। খানিকবাদে গ্রামীণ সরু রাস্তা দিয়ে একটি গোরুর গাড়ি আসতে দেখল। শরতের কুয়াশা আর নবোদিত সূর্যের লালচে রং লাগা সেই অদ্ভুত ভোরে সোমনাথের মনে হল গোরুর গাড়িটা যেন কোনও অলৌকিক লোক থেকে বেরিয়ে ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথও এগিয়ে গেল। হাত নেড়ে থামাল গাড়িটা। তারপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত।

গোরুর গাড়িটায় কেবল ছিল গাড়োয়ান। গ্রামে চালের 'বোরা' রেখে আসছে সে। সেই খালি গাড়িতে চন্দ্রার অচেতন দেহটাকে তুলে যতদূর শহরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততদূর চলল সোমনাথ। গাড়িটা কাছাকাছি পুলিশচৌকির কাছে এলে, চন্দ্রাকে গাড়িতে রেখে অশনিনাথকে ফোন করল সোমনাথ। ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে যেমন ট্রাঙ্ককল হয় তেমন।

ফোন ধরল শ্রীমন্ত। না, অশনিনাথ, শিশির বা শোভন কেউ ফেরেনি। তবে অশনিনাথ সোমনাথকে জানাতে বলেছেন যে, তিনি ঘনশ্যামগড় যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে শোভন আর শিশির। তিনি ঘনশ্যামগড়ে সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে সোমনাথকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। এবং বলেছেন, সোমনাথ যদি একা আসে, তাহলে বাধা নেই আসার, কিন্তু সোমনাথ যদি সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসে তাহলে ঘনশ্যামগড়ে সে যেন না আসে। টেলিফোনে এই অদ্ভুত ধরনের নির্দেশ পেয়ে সোমনাথ অবাক হল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, ঘনশ্যামগড়ে চন্দ্রাকে নিয়ে যাওয়া বারণ তার পক্ষে।

কিন্তু চন্দ্রার দায়িত্ব যে কোনও বিবেকবান মানুষের মতোই তো সোমনাথের ঘাড়েই পড়ছে। সোমনাথ কী করে অসহায় মেয়েটার দায়িত্ব এড়ায়?

সে ফিরে গিয়ে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে তুলল চন্দ্রাকে। ক্ষতস্থানে ড্রেস করে সামান্য ব্র্যান্ডি খাওয়ানোর পর আস্তে-আস্তে তার জ্ঞান ফিরল। চন্দ্রা জ্ঞান ফিরতেই অবুঝের মতো তাকাল সোমনাথের দিকে।

সোমনাথ হেসে বলল, কী?—কোথায় আছেন বলুন তো?

চন্দ্রা বলল, আপনার কাছে।

পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

পালাতে চেষ্টা করিনি, বাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার জীবনের শেষ তো ঘনিয়ে আসছে।

হঠাৎ ছটফট করে উঠল চন্দ্রা।

আজ—আজ কত তারিখ বলুন তো?

BanglaBook.org

সোমনাথ বলল, যাই হোক না, আপনি তো বেঁচে আছেন। চলুন নতুন জীবনের সন্ধানে আমরা দুজন কলকাতায় ফিরে না গিয়ে ঘুরে আসি বিহারের সুন্দর একটি জায়গায়।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে সোমনাথের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বেরিয়ে এল হাসপাতালের বাইরে। সোমনাথের কোটের ভেতর পকেটে ছিল হাজারখানেক টাকা। সে কাছাকাছি মোটর ট্যাক্সির আড্ডায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এক বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে ধরল। ড্রাইভারটি দুরপাল্লার প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া দেয়। ঘনশ্যামগড বহুদিন যায়নি সোমনাথ। ঘনশ্যামগড়ের কাছাকাছি বিশাল শিল্প-শহর বিশালপুর। সেখানে সুন্দর-সুন্দর বিলাসবহুল হোটেল আছে অনেক। পাহাড়ের ওপর একটি হ্রদের ধারে ভারী সুন্দর নির্জন একটি হোটেল আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, সেই ড্রিমল্যান্ড হোটেলেই ওদের দুজনকে পৌঁছে দেবে সে।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে চন্দ্রা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, আঃ—মাথার ভারটা একটু-একটু করে কাটছে এবার। শরীরটা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সোমনাথ বলল, শরীরের কী দোষ? সারারাত এই শীতে হিমে মাঠের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। বরং বলতে পারেন শরীরে আমাদের আসুরিক শক্তি আছে বলেই এত অত্যাচার সহ্য করার পরও নিমোনিয়ায় ভুগিনি।

চন্দ্রা বলল, কই আপনি তো বললেন না আজ কী বার?

সোমনাথ বলল, আপনার খেয়াল আছে অজ্ঞান হওয়ার পর ক'দিন চলে গেছে আপনার জীবন থেকে?

চন্দ্রা তাব সুন্দর চোখ দুটি তুলে বলল, না তো!

সোমনাথ শান্তকণ্ঠে জেনে-শুনে একটা মিথ্যে কথা বলল।

একটি পুরো দিন!

চন্দ্রা হেসে উঠে বলল, সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনাব বয়েস এখন পুরো একুশ বছর চার-চারটি দিন।

চন্দ্রা যেন সোমনাথের এই একটি কথায় গুটি-কেটে বেরিয়ে আসা প্রজাপতির মতো রঙিন আর ফুল্ল হয়ে উঠল। সে দু-হাতে সোমনাথের হাত দুটি চেপে ধরে বলল, তাহলে আপনি সত্যি-ই বলছেন, আমি বেঁচে গেলাম। শারমার কথা মিথ্যে?

হ্যাঁ মিথ্যে! পরিষ্কার মিথ্যে!

আবার মেঘলা ছায়া পড়ল চন্দ্রার মুখে।

না কী শারমা আমাকে শয়তানের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে আমার পরমায়ু এনে দিল?

না-না-না। আপনি তো দ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করলেন। আপনাকে খুঁজতে এসে দেখলাম আপনি জ্ঞানহীন পড়ে আছেন। আর দেখলাম অনেক দূরে একটু নীচের দিকে শয়তানকে উৎসর্গ করার সেই সব ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে। যখন সেসব হচ্ছিল তখন তো আপনি আমারই পাশে শুয়েছিলেন।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল। সোমনাথের একবারও মনে হল না যে চন্দ্রাকে মিথ্যে কথা বলে সে অন্যায় করেছে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনও নির্দিষ্ট তুলাদণ্ড থাকে কী? চন্দ্রা যে মনের জোরেই তার সীমিত পরমায়ুর বাইরে চলে যেতে পারে, নতুন হয়ে উঠতে পারে।

বিহার বর্ডার পেরিয়ে ট্যাক্সি এসে পৌঁছল বিশালপুরের কাছাকাছি। তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে। 'ড্রিমল্যান্ড' হোটেলে যখন ট্যাক্সি এসে পৌঁছল, তখন বেলা তিনটে পঁয়তাল্লিশ। হ্রদের ঝকঝকে ময়ূরাক্ষি জলে বিশাল হোটেলের ছায়া পড়ে দুলছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে নামতেই সোমনাথকে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, হোটেলের পেছনে দেখবেন চমৎকার ছোট-ছোট কটেজ আছে। লেক ওদিকে বেঁকে গেছে। চমৎকার জায়গা।

BanglaBook.org

সোমনাথ আর চন্দ্রা দৃষ্টি বিনিময় করে হাসল।

শীত-বিকেলের রঙিন আলোয় ড্রিমল্যান্ড হোটেলে যেন সত্যিই সোনালি-রঙিন কল্পনার ছন্দ নেমে আসার আয়োজন চলছিল। সোমনাথ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে পিছনের বিরাট বাগিচার ধারে—একেবারে হ্রদের ওপর ছোট একটি কটেজ নিল। কটেজটিতে চূড়ান্ত আরামের আয়োজন। সুসজ্জিত কটেজে চন্দ্রাকে রেখে দুজন বেয়ারা মোতায়েন করে শহরে গিয়ে চন্দ্রার জন্য গোটা দুই ম্যাক্সি, তোয়ালে, অন্যান্য টুকিটাকি এবং নিজের জন্য পাঞ্জাবি-গেঞ্জি-পায়জামা কয়েক প্রস্থ কিনে কটেজে পাঠিয়ে দিয়ে সোমনাথ ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ককল করল।

ঘনশ্যামগড়ে ট্রাঙ্ককল করে সোমনাথ দেবকান্ত রাওকে পেল। তাঁর কাছ থেকে অশনিনাথের নির্দেশ শুনে তার মন অপ্রসন্ন হল। প্রথম থেকেই অশনিনাথ চন্দ্রার ভালো-মন্দের কথা এতটুকুও ভাবছেন না। সঙ্গে কেউ থাকলে যদি ঘনশ্যামগড়ের দুর্গে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সোমনাথ নিজেও সেখানে যাবে না। চন্দ্রাকে একা ফেলে কাপুরুষের মতো ঘনশ্যামগড়ে বন্ধু-বান্ধবের নিরাপদ আশ্রয়ে ডানামুড়ে বসে থাকার মতো চরিত্র সোমনাথের নয়।

সোমনাথ শুনল অশনিনাথ আর শিশির তখনও ফেরেনি। তারা শোভনকে রেখে বেরিয়ে গেছে। তবে অশনিনাথ বলেছেন, পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন। সোমনাথ অগত্যা ফোন ছেড়ে দিল। পাঁচটার সময়ই এসে আবার না-হয় ফোন করবে। সত্যি কথা বলতে কি চন্দ্রার ব্যাপারে সোমনাথ একা-একা সমস্ত দায়িত্বটা মাথায় নেওয়ার ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না।

সোমনাথ কটেজে ফিরে গিয়ে দেখল, চন্দ্রা স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে লাউঞ্জে বসে হ্রদের জলে রঙিন সূর্যাস্ত দেখছে। সোমনাথকে দেখে হেসে বলল—নতুন পোশাকের জন্যে ধন্যবাদ। যান, স্নান-টান সেরে একটু রেস্ট নিন, আপনি আসবেন বলে এখনও চায়ের অর্ডার দিইনি।

সোমনাথ হেসে চন্দ্রার দিকে তাকাল। চন্দ্রার চোখ দুটি কোমল আভায় ভরে আছে। সদ্যোস্নাত ঈষৎ অসমতল গালে ঝকঝক করছে গোধূলির আভা। স্তরে-স্তরে সাজানো খোলা চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমেছে গাঢ় ভেলভেটিনের ম্যাক্সির ওপর। সোমনাথ চন্দ্রার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, এখনও তুমি আমাকে আপনি বলবে চন্দ্রা?

চন্দ্রা চোখ তুলে তাকিয়ে একবার চকিতে সোমনাথকে দেখে নিয়ে ঝট করে চোখটা নামিয়ে নিল। তার কোমল মুখে ফুটে উঠল মৃদু একটি হাসি।

সোমনাথ স্নান করতে চলে গেল।

সোমনাথ যখন সতেজ হয়ে ফিরে এল তখন সূর্যাস্তের শেষ রং লাল-লাল ছড় টেনে জেগে উঠেছে পশ্চিম আকাশের নীল মেঘের প্রান্তে-প্রান্তে। কুয়াশার হালকা একটি স্তর ধীরে জেগে উঠছে নীল-সবুজ শান্ত হ্রদের বুকে। দূরে লাল-হলুদ পালতোলা বোটের শান্ত সঞ্চরণ।

সোমনাথ দেখল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম এসে গেছে। সামান্য কাটি-বিস্কিট সঙ্গে।

সোমনাথ বলল, চন্দ্রা তোমার খিদে পায়নি? আমার তো খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। আর তুমিও তো কিছু খাওনি। তা ছাড়া অতটা কেটে গিয়েছিল তোমার কপাল। রক্তও তো কম পড়েনি। এখন হাই-টি খেয়ে নাও। পরে না হয় দেরিতে ডিনার খাওয়া যাবে।

বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল সোমনাথ। প্রন কাটলেট, হ্যাম-স্যান্ডউইচ, চিজ-ফ্রাই।

চন্দ্রা হাসল, তুমি জানলে কী করে আমি ঠিক এই আইটেমগুলোই খেতে ভালোবাসি?

গত জন্ম থেকে।

হাসল সোমনাথ। আস্তে-আস্তে চন্দ্রার কোমল করতলটি নিজের হাতে তুলে নিল সে। তার মনে হল এই হাতটির সঙ্গে সে যেন এই মেয়েটির সুখ-দুঃখ অতীত-ভবিষ্যৎ সবই নিজের হাতে তুলে নিল। সোমনাথের হঠাৎ মনে পড়ল—পাঁচটার সময় অশনিনাথ ঘনশ্যামগড়ে ফিরবেন। তখন তাঁকে ফোন করতে হবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চায়ের টেবল থেকে উঠে পড়ে চন্দ্রাকে বলল, এখুনি

BanglaBook.org

একটা ট্রাঙ্ক বুক করে আসি চন্দ্রা।

কাকে?

অশনিনাথকে।

ও!

ট্রাঙ্ককল বুক করে যখন ফিরে এল সোমনাথ, চন্দ্রা তখন সবে চা ঢালার আয়োজন করছে। চা খেতে-খেতে চন্দ্রা বলল, তোমার বন্ধু কোথায়?

ঘনশ্যামগড়ে। এই বিশালপুর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়।

তুমি যে আমার সঙ্গে থাকছ তাতে তোমার বন্ধু চটছেন না তো।

না-না। আমার বন্ধু তো তোমাকেও বাঁচাতে চেয়েছিলেন চন্দ্রা শারমার হাত থেকে। এবং তুমি শুনে খুশি হবে আমাদের মিশন সাকসেসফুল হয়েছে। শারমা শোভনকেও শেষপর্যন্ত শয়তানের রাজ্যে পাঠাতে পারেনি। শোভনকেও উদ্ধার করে আনা হয়েছে আমাদের আশ্রয়ে।

খেতে-খেতে চন্দ্রা বলল, সত্যি কী মোহেই না পড়েছিলাম। কী ভয়ংকর সব ঘটনা। আমি তো আজ চলেই যেতাম শয়তানের রাজত্বে। কালই তো আমার শেষ দীক্ষা ছিল। পরমায়ুর শেষ দিনও ছিল। মাঝে-মাঝে আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

সোমনাথ হেসে বলল, কী? কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে, এই যে তোমার সঙ্গে আসা, এখানে থাকা, এই সমস্তটা একটা স্বপ্ন নয় তো?

না, না, এটা কেন স্বপ্ন হবে? বরং এর আগেরটাই ছিল স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন।

ভেতরে সোমনাথের বেডরুম থেকে টেলিফোন বেজে উঠল।

সোমনাথ বলল, এখুনি আসছি চন্দ্রা, পাঁচ মিনিট।

কিন্তু কথা বলা শেষ করে ফিরে আসতে সোমনাথের দু-মিনিটের বেশি লাগল না। অশনিনাথের আশ্চর্য ব্যবহারে সোমনাথ মনে-মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করছিল। সোমনাথের মুখের অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলল, কী হল? কোনও খারাপ খবর নাকি?

সোমনাথ শুকনো হেসে বলল, না-না খারাপ খবর না। শোভনের জ্ঞান ফিরেছে। শোভন ভালোই আছে। কোনও চিন্তার কারণ নেই আর। অশনিদা তোমার বিপদ কেটে গেছে শুনে খুব আনন্দ করলেন। বললেন এই হোটেলেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে।

চন্দ্রা বলল, তা-তো দেব। কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে। অনন্তকাল ধরে তো আর আমরা এই ড্রিমল্যান্ড হোটেলে কাটিয়ে দেব না?

সোমনাথ বলল, কেন, আমার ওপর কি তুমি নির্ভর করতে পারছ না? চলো আমরা বাগিচায় একটু বেড়াই। এরপর সন্ধে নেমে গেলে তো ঘরের মধ্যে এসে বসতেই হবে। বেড়াতে-বেড়াতে আমার পরিচয় তোমাকে দিতে চাই।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে বাগিচার মধ্যে দিয়ে চলল। মাঝারি আকারের পাহাড়ের টিলায় উঠে গেছে বাগানটি। আঁকাবাঁকা পথ। পথের দুপাশে বনের মতো করে গাছপালা সাজানো। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে একপাশে পাহাড়, একপাশে হ্রদ। হ্রদের জলে দিনের আলোর ঝিকিমিকি ক্রমশ কমে আসছে। টুপটাপ করে জ্বলে উঠছে মৃদু বিদ্যুতের আলো। ঘোরানো-ঘোরানো তরুবীথির দু-ধারে আলোর মালাগুলি দূরে-দূরে সাজানো।

কথা বলতে-বলতে চন্দ্রা আর সোমনাথ সেই তরুবীথির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সোমনাথ তার কাজকর্ম বাড়ি-ঘর সংসার-পরিবার পছন্দ-অপছন্দের কথা বলে যাচ্ছিল। চন্দ্রা মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু ক্রমশ চন্দ্রার মনের পরদায় বারবার ফুটে উঠতে লাগল সেই অর্ধভুক্ত মাছ-মাংসের প্লেট ছড়ানো লাউঞ্জের টেবিলের ছবি। কেমন যেন শরীরের ভেতর থেকে একটা অত্যধিক আমিষ খাওয়ার বিবমিষা পাক মারতে থাকল। সে আস্তে-আস্তে চারিদিকে তাকাল। যে হ্রদ, যে পাহাড় উদ্যান তার এত ভালো

BanglaBook.org

লাগছিল সেই উদ্যান হ্রদের ওপর থেকে ভালো লাগার রঙিন আস্তর যেন আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে। তার বদলে তাল-তাল অজানা অন্ধকার, দীর্ঘ-দীর্ঘ ভয়াল ছায়া যেন ডানা মেলে এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে ঘিরে ধরছে চন্দ্রাকে।

এই অন্ধকারের পদধ্বনি যেন সোমনাথও শুনতে পাচ্ছিল। ক্রমশ সেও নিশ্চুপ হয়ে গেল। তার মনে পড়ল ট্রাঙ্কে অশনিনাথের সঙ্গে তার শেষ কথোপকথনের কথা।

অশনিদা, আমি সোমনাথ বলছি!

কোথা থেকে?

বিশালপুরের ড্রিমল্যান্ড হোটেল থেকে বলছি।

তোমার সঙ্গে চন্দ্রা আছে?

হ্যাঁ, আছে।...অশনিদা, আমি ঘনশ্যামগড়ে যেতে চাই।

না। তুমি চন্দ্রাকে নিয়ে এখানে আসতে পারবে না।

অশনিদা আজ চন্দ্রার জীবনের শেষ দিন। অবশ্য তার নিজের বিশ্বাসমতে। তুমি তাকে একটু সাহায্য করবে না?

না। উপায় নেই। তুমি, আমি, শিশির—আমরা সব ক্লান্ত, ফাঁকা হয়ে গেছি। আমাদেব আব কোনও শক্তি নেই। ওই চন্দ্রা মেয়েটি আব শোভন তো 'মাইনাস-পাওয়ার' বলতে পাবা যায। অথচ আজই হল আমাদের সংগ্রামের ভয়ংকর শেষ দিন। এ দিনের যুদ্ধ সব চেয়ে প্রচণ্ড। এ দিনের জন্যে আমাদের বিশেষ ধরনের প্রিকশান নিতে হচ্ছে। সুতবাং আমি এখুনি টেলিফোনের লাইন কেটে দিচ্ছি। তুমি চন্দ্রাকে নিযে সাবধানে থাকো। আব যত বিপদই আসুক তোমার জন্যে আমাব কোনও ভাবনা নেই। তবে আজ বাত্রের মধ্যে আর ঘনশ্যামগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না। ছাড়ছি—।

সোমনাথ নিজেব জন্যে সত্যিই কিছু ভাবে না। কিন্তু যাব জন্যে তার ভাবনা, যাকে সে ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, যাকে সে নিজের দাযিত্বে শারমাব নারকীয ক্রিযাকলাপে শামিল হতে দেয়নি, তার সম্বন্ধে অশনিনাথ পরোক্ষে যা বললেন, তাতে তো তার ঘোব বিপদের ইঙ্গিত দিলেন।

চন্দ্রার পাশে-পাশে সোমনাথ এইসব চিন্তা-ভাবনায নিমগ্ন হযে চুপচাপ হাঁটতে-হাঁটতে চলে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ বাদে চন্দ্রা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল। তাবপর সোমনাথের দিকে ফিরে বলল, চলো, ভেতরে চলো, আমার ভালো লাগছে না। আমার কেমন যেন শীত-শীত করছে।

সোমনাথের এই ড্রিমল্যান্ড হোটেলের নির্জনে কেমন যেন একা অসহায লাগতে শুরু কবল। হাঁটতে-হাঁটতে যখন কটেজে ফিরে এল তারা তখন কটেজটাকে আর সুপার, মনোরম, আবামপ্রদ লাগল না তাদের। সদরে দাঁড়িয়েছিল দিনের দুটি বেয়ারা। তারা এখন বিদায় নেবে। রাতে এখানে বেয়ারাদের থাকার ব্যবস্থা নেই। রাতের প্রহরীরা একটু পরেই রোঁদে বেরোবে। সুতরাং কোনওরকম ভয়ের কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, এসব অঞ্চল অত্যন্ত সুরক্ষিত আর নিরাপদ। বাতের খাওয়ার জন্য সোজা কিচেনে হেড 'শেফ'-এর কাছে ফোন করে বলে দিলেই ডিনার সার্ভ করে যাবে। বেয়ারাবা চলে যাওয়ার পর সোমনাথ চন্দ্রাকে নিয়ে কটেজের ভেতরে ঢুকে ভালো করে দরজা লক কবে দিল। দুজনে মিলে কাচের পাল্লা, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো সব টেনে বন্ধ করে পরদা টেনে সমস্ত কটেজটা অন্তত নিরাপদ করে বসবার ঘরে এসে পাশাপাশি সোফায় বসল। মৃদু একটি শেডেড ল্যাম্প জ্বলছিল ঘরে। মেঝেয় নরম কার্পেটের ওপর সোফা-সেট পাতা। রেডিওগ্রামে বাজছিল রবিশঙ্করের সেতার। ছোট কটেজটি। মাঝখানে বসবার ঘর। দুপাশে দুটি বেডরুম। কটেজ ঘিরে বাইরের লাউঞ্জ। দুটি বেডরুমে দুজনের শোওয়ার আয়োজন। দুজনেই কিছুটা ক্লান্তিবোধ করছিল। চন্দ্রার পক্ষে কত দিন

হল কে জানে?

সোমনাথের পক্ষে তো দীর্ঘ তিনটি দিন ধরে যে-মানসিক চাপ পড়ছে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দুজনে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন, সুখ-দুঃখের কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে-করতেও কেমন যেন হঠাৎ-হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ-হঠাৎ সামান্য খুটখাট শব্দেও কেমন যেন একটা চমকে-ওঠা ভয়। যেন কটেজের চারপাশে একটা ভয়ংকর অজানা কিছু আস্তে-আস্তে জাল গুটোতে-গুটোতে এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রা উঠে রেডিওগ্রামটা বন্ধ করে দিল। তার ভালো লাগছিল না আর। সোমনাথ খানিকক্ষণ কলেজ জীবনের হাসির গল্প বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও জমল না। এভাবেই সময় এগোতে-এগোতে ঘড়িতে যখন দশটা বাজল তখন ডিনারের অর্ডার পাঠাল সোমনাথ। বিস্তারিত পদ। কাঁকড়া-নারকেল, কচ্ছপের ডিমের কষা, ভেটকির রোস্ট, মুরগির ফ্রাই, মাটন রেজালা আর সাদা ঘি-ভাত। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতে-চুকতে রাত বারোটা বাজল। কফি খাওয়ার অজুহাতে রাত একটা। তারপরও চন্দ্রা সোমনাথের কাছ থেকে যেতে চাইছিল না।

সোমনাথ বুঝতেই পারছিল, চন্দ্রা অন্য কোনও কারণে নয়, কেবল ভয়ানক ভয় পাচ্ছে বলে সোমনাথকে ছাড়তে চাইছে না। সোমনাথ শেষ পর্যন্ত বলল, চন্দ্রা তুমি কেন এত নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ? নার্ভাস হওয়ার মতো কোনও কারণ ঘটেছে কি?

চন্দ্রা ফ্যাকাসে মুখ তুলে বলল, না ঘটেনি। কিন্তু আমি কেন স্বস্তি পাচ্ছি না সোমনাথ। আমার বুকের ভেতরটা এত ধড়ফড় করছে কেন? আমার কেবল মনে হচ্ছে আমাদের বিপদ কাটেনি সোমনাথ। বিপদ যেন পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে দু-হাতে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল,—চন্দ্রা, চন্দ্রা, আমার এই দু-হাতের বেড়ার মধ্যে থেকে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না চন্দ্রা। যাকে তোমার ভয়, সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতও না!

চন্দ্রার মুখে একটা তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠল যেন।

সোমনাথের বুকে মাথা রেখে খানিকক্ষণ সে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলল।

সোমনাথ বলল, চন্দ্রা এক কাজ করা যাক। আজকে আর রাতে আমরা নাই বা শুলাম। এসো আজ সারারাত আমরা এই ড্রইংরুমে জেগে; গল্প করে, বাজনা শুনে কাটিয়ে দিই। দাঁড়াও তোমাকে আমি ভালো করে, আরাম করে বসিয়ে দিই। সুন্দর নরম একটি গভীর সোফায় নরম-নরম কুশন দিয়ে তার মাঝখানে চন্দ্রাকে বসিয়ে ভেলভেটের কুইল্ট দিয়ে তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কার্পেটের ওপর তার হাঁটুতে গাল রেখে বসল সোমনাথ।

চন্দ্রা সোমনাথের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কোমল ছোঁয়ায়।

আস্তে-আস্তে রেডিওগ্রামের সংগীত মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা ঘরে। সোমনাথের দু-চোখ ভরে ধীরে-ধীরে গভীর ঘুম এসে নামতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল চোখ খুলে রাখার। কিন্তু তার মাথার ভেতর ক্লান্তি আর প্রগাঢ় ঘুমের মিশ্র একটা অনুভূতি এমনভাবে ঘুরতে লাগল যে সে কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারল না। আস্তে-আস্তে গাঢ় ঘুমে মগ্ন হয়ে সে চন্দ্রার কোলেই ঢলে পড়ল।

চন্দ্রা সোমনাথকে লক্ষ করছিল ঘুম-ঘুম চোখে। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই যখন গাঢ় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল, তখন চন্দ্রা আপন মনেই অদ্ভুত হেসে উঠল একটু। যেন নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই এই হাসি। হঠাৎ চন্দ্রার চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে। ক্যালেন্ডারের গায়ে সেদিনের তারিখের চারপাশে প্লাস্টিকের একটি ফ্রেম দেওয়া। ট্রেন্ড বেয়ারা সেদিনের তারিখের ওপর ঠিকমতো ফ্রেমটি টেনে দিয়েছে। তারিখ দেখে বার মিলিয়ে চমকে উঠল চন্দ্রা। তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল। তার দু-হাতের আঙুল কুঁকড়ে উঠল। তীব্রকণ্ঠে

BanglaBook.org

সে বলল, সোমনাথ। সোমনাথ। তুমি জেনেশুনে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? আমার মৃত্যুদিন চলে যায়নি তাহলে?—তাহলে আজই,—আজই সেই ভয়ংকর দিন?

সোমনাথের মাথাটা সোফার ওপর আলগোছে নামিয়ে রেখে চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে হেঁটে গেল সে। সঙ্গে-সঙ্গে হা—হা করে খুলে গেল সব দরজা-জানলা। ঘরের বিদ্যুৎকে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল কে। নিজের অজান্তেই চন্দ্রা হেঁটে চলল কটেজের বাইরে।

ভেতরে যেন অনন্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল সোমনাথ।

অশনিনাথ আর শিশির গাড়িভরতি নানারকম সরঞ্জাম নিয়ে বিকেল সাড়ে-চারটেয় ঘনশ্যামগড়ে ফিরে এলেন। অশনিনাথকে শারমা সংক্রান্ত সমস্ত খবর দিলেন উমা। অশনিনাথ সব শুনে দেবকান্ত রাও-এর দিকে ফিরে বললেন, দেখেছ দেবকান্ত, আমার বোন কী কথা, উমা যদি বুদ্ধি না খাটাত, তাহলে এতক্ষণে শোভনকে নিয়ে বহুদূরে চলে যেত শারমা।

দেবকান্ত সোফায় গা এলিয়ে বসে সব শুনছিলেন আর মিটিমিটি হাসছিলেন। তার ভাবটা হল, তোমরা বলছ, বন্ধু মানুষ,—তাই সব শুনছি। কিন্তু এখনও ঠিক মেনে নিতে পারছি না। ইতিমধ্যে সোমনাথের ফোন এল। অশনিনাথ সোমনাথকে যা-যা বললেন তা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সবাই। ফোন রেখে দিয়ে সোফায় এসে গা এলিয়ে বসতেই দেবকান্ত বললেন, সে কী, সোমনাথকে আমাদের দুর্গে আশ্রয় দেবেন না, অশনিদা?

সোমনাথকে দেব না কেন? কিন্তু ওর সঙ্গের মেয়েটিকে এখানে আনার বিপদ আছে। মেয়েটি যে কী, ভালো না খারাপ, শয়তান না দেবীর অংশ, তা তো এখনও জানি না। আজ রাতে কেবল শোভনই আমার চিন্তা-ভাবনা দখল করে আছে। আজ আমি আর অন্য চিন্তা মাথায় নিতে চাই না। ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজবে আর ফোনের লাইন কেটে দেব আমরা। হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসব শোভনকে নিয়ে। চাকর-বেয়ারাদের বলে দিয়েছ তো উমা, ওদের বিল্ডিং-এ চলে যেতে?

দেবকান্ত বললেন, সে কী, চাকর-বেয়ারারা সত্যিই আমাদের মহলে থাকবে না?

আমি তো আগেই বলে দিয়েছি সে কথা। উমাকে বলেছি তোমার ঘনশ্যামগড় যেভাবে ঘেরা আছে, পাহারার ব্যবস্থা আছে, তাতে জাগতিক শত্রুর কোনও ভয় আমাদের নেই। আমাদের ভয় অন্য অতি-জাগতিক শত্রুর জন্যে।

টেলিফোন আসতেই অশনিনাথের কথার উত্তর না দিয়ে দেবকান্ত উঠে গেলেন।

অশনিনাথ শিশির আর উমাকে নিয়ে চলে গেলেন লাইব্রেরি-ঘরে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে অশনিনাথ খুশি হলেন। তারপর তিনি দ্রুত কাজ শুরু করে দিলেন।

ঘরের মাঝখানের বিশাল শয্যাবেদিকে কেন্দ্র করে, সঙ্গে আনা অদ্ভুত ধরনের রঙিন গুঁড়ো দিয়ে একটি পাঁচকোণা বিশাল তারকা আঁকলেন। তারকার মাথায়-মাথায় সরার ওপর রাখলেন নানান রকম সামগ্রী। প্রতিটি সরার মাথায় রইল স্বতোয়ার জল-ভরা ঘট। ঘটের পর মাটির দীর্ঘ পিলসুজে তেল-ভরা বড়-বড় প্রদীপ। প্রদীপের পর কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন। ঘরের কোণে-কোণে বড়-বড় ধুনুচি-ভরা ধুনো রাখা হল। ধুনোর জ্বালানির জন্য ছোবড়া আর কাঠকয়লা ধূপ-দীপ-ফুল দিয়ে সাজানো হল ভেতরের দেওয়াল। এসব করার পর অশনিনাথ শোভনের কথা জিগ্যেস করলেন। উমা বললেন, তাকে সুস্থ করে, পরিষ্কার পোশাক পরিয়ে শরবত খেতে দেওয়া হয়েছে।

অশনিনাথ বললেন, এবার তাহলে আমরা স্নান সেরে খেয়ে নিই। আর তোমার মেয়ে হাসি?

হাসিকে রানি খাইয়ে-দাইয়ে দেবে, রানি ওপরে নার্সারিতে থাকছে, আর রানির সঙ্গে থাকছে আর দুজন খাস চাকরানি।

BanglaBook.org

অশনিনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, খাস চাকরানি? ক'দ্দিনের পুরোনো?

—বহুদিনের। রানিরই দুই ভাইঝি।

বেশ, তাহলে তারা থাকতে পারে। চলো, স্নান সেরে নিই।

স্নান সেরে খাওয়ার টেবিলে এসে বসল সবাই।

সামান্য আয়োজন, আলুসেদ্ধ, মাখন, গরম রুটি, কলা, ক্ষীর আর ফলের রস।

দেবকান্ত নিচু হয়ে খাচ্ছিলেন। কোনও কথা বলছিলেন না। উমা খানিকক্ষণ তাঁর মুখের গম্ভীরভাব লক্ষ করে বললেন, কী ব্যাপার? এত রাগ-রাগ ভাব কেন?

দ্যুৎ, এইসব নিরামিষ ছাতামাথা কখনও খাওয়া যায়?

উমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে অশনিনাথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার দেবকান্তকে বললেন, না হয় একদিন অমন একটু নিরামিষ খেলেই—।

আসলে আমি এসব কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।

অশনিনাথ চমকে তাকালেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল নিমেষের জন্য। তারপর কী যেন গভীরভাবে ভেবে নিলেন তিনি। মুখের রেখাগুলি আবার কোমল হয়ে এল ঈষৎ। হেসে বললেন—দেবকান্ত তখন কে ফোন করছিল তোমায়?

দেবকান্ত চমকে তাকালেন অশনিনাথের দিকে। অশনিনাথ স্থির, পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন দেবকান্তর দিকে।

বলো? কে ফোন করেছিল? কী বলেছিল ফোনে?

দেবকান্তর চোখের দৃষ্টি আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি বললেন, দুঃখিত অশনিদা। আমার যে মাথার মধ্যে কী হচ্ছিল কী বলব? শারমা ফোন করেছিল আমাকে। ফোনে ওই একই কথা বলছিল, যা উমাকে বলে গেছে। কিন্তু লোকটার গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা এমন—।

অশনিনাথ বললেন, ওই জন্যেই বলছিলাম উমা, ফোনের লাইনটা কেটে দাও। সারা জগৎ থেকে আজ আমাদের লাইব্রেরি-ঘরটিকে ডিসকানেক্ট করে ফেলতে হবে। সিল করে রাখতে হবে। শারমা কণ্ঠস্বর দিয়েই দেবকান্তকে কতখানি বশীভূত করে ফেলেছে তোমরা লক্ষ করো।

উমা বললেন, আপনি তো অশনিদা ওকে দিব্যি অ্যান্টিডোট দিলেন।

অশনিনাথ বললেন, অর্থাৎ!

অর্থাৎ, আপনি ওর দিকে কীভাবে তাকিয়েছিলেন তা তো স্বচক্ষে দেখলামই আমি।

অশনিনাথ বললেন, ও কিছু না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আর একপ্রস্থ পোশাক পরিবর্তন করে, চলো আমরা শোভনকে নিয়ে আজকের রাতের মতো লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকি।

প্রথমে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন অশনিনাথ।

ঘনশ্যামগড় দুর্গে এখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘরের মাঝখানের শয্যায় শোভন শুয়ে আছে। তার কাছে বসে আছে উমা, শিশির আর অশনিনাথ। ঘরের একদিকে জ্বলছে একটি একশো পাওয়ারের আলোর বাল্ব। বলতে গেলে বিশাল ঘরটি ঢেকে আছে আধো আলো-আঁধারিতে। ধুনুচিতে জ্বলছে ধুনো। তার ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে। পাঁচকোণা তারার পাঁচটি কোণে জ্বলছে অকম্পশিখা-প্রদীপ। শোভন ক্লান্তি আর আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেন এলিয়ে আছে। কিন্তু বোঝা যায় বন্ধুদের মাঝখানে থাকার স্বস্তিটা আবার আস্তে-আস্তে ফিরে আসছে তার ভেতরে। একটি-দুটি কথা বলছে সবাই। সাধারণ কথা। ক্রমশ কথার সংখ্যা কমে আসতে লাগল। শিশির লক্ষ করল, সবাই কেমন যেন বাক্যহারা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে বাইরে ঘরে-ফেরা পাখিদের কাকলি কখন যেন টুপটাপ স্তব্ধতায় ডুবে হারিয়ে গেল। গড়ের এই মহল ছেড়ে দূরে চলে গেল চাকর-বেয়ারারা। এমনিই বিশাল দুর্গটি নির্জন। তায় টিলার ওপর দুর্গ আর দুর্গসন্নিহিত বাগান ছাড়া কিছু নেই। পাহাড়ের গায়ে-

BanglaBook.org

গায়ে ছোট-ছোট চৌকি। কেবল পেটাঘড়িতে মাঝে-মাঝে সময় সংকেত। এইমাত্র সাতটা বেজে গেল। চারিদিক বন্ধ থাকায় মনে হচ্ছে যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে ঘড়ির শব্দ।

শিশির কান পেতে শুনতে লাগল। শুনতে-শুনতে মনে হতে লাগল সে যেন নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতে আরম্ভ করেছে।

শব্দহীন সেই শব্দ কানের ভেতর দিয়ে আরও গভীরে পৌঁছে অদ্ভুত একটা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

বহুদূর থেকে যেন মাঝে-মাঝে ভেসে আসছিল রাত-পাখির ডাক। কখনও-কখনও পেঁচার চিৎকার।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ শোভন কেমন থরথর করে কেঁপে উঠল, এলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে চারিদিকে তাকাতে লাগল সে। মনে হতে লাগল, যেন তার কাছে শিশির, অশনিনাথ, দেবকান্ত, উমা সবাই-ই কেমন অপরিচিত হয়ে গেছে। ক্রমশ বন্ধুত্বের ছোঁয়া, পরিচিতির আলো তার মুখের রেখা থেকে নেমে যেতে লাগল। যেন কেমন বিরুদ্ধ হয়ে উঠল সে। অস্ফুটস্বরে বলল, তোমরা আমায় বন্দি করে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও—যেতে দাও আমাকে!

দেবকান্ত বললেন, কোথায় যাবে তুমি শোভন?

অশনিনাথ ইশারায় বললেন, কোনও কথা বলে লাভ নেই, শুধু ওকে স্পর্শ করে বসে থাকতে হবে সবাইকে।

শিশির চাপা গলায় বলল, অশনিদা, এত যেসব সাবধানতা নিলেন, এতেও তো কিছু হল না। শারমা ঠিক টানছে শোভনকে।

অশনিনাথ বললেন, টানবেই তো। আমি তো তা জানতাম। দ্যাখো, শারমা আমাদের সকলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করছে। তোমায় বলি, আমি জানি লাইব্রেরি-ঘরের বাতাসের, শূন্যতার প্রতিটি 'আয়ন'কে যদি শুদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো শারমা আর তার দলের শয়তান সাধকেরা ওভাবে তাদের মিলিত আকর্ষণ, সম্মোহনী শক্তি পাঠাতে পারত না। হয়তো প্রতিটি 'আয়ন'কে সেভাবে শুদ্ধ করতে পারিনি। তবে আমাদের মানসিক শক্তি শোভনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি বলে আমরা ওই টানের কোনওরকম বোধ পাচ্ছি না।

শোভনের কাছে সরে গিয়ে অশনিনাথ তাকে দু-হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরে কানের কাছে সম্ভবত চণ্ডী থেকে কোনও শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

আস্তে-আস্তে শোভনের অস্থিরতা খানিকটা কমে এল।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা। গলা-চাপা নিশ্চুপ সময়। শিশির হাতঘড়ির দিকে তাকাল। মনে হচ্ছিল যেন অনেকখানি রাত হয়ে গেছে। ঘড়িতে মাত্র ন'টা।

স্তব্ধতা যেন ক্রমশ গলা-চাপা হয়ে উঠতে লাগল। শিশির দেখল, হাঁটুতে থুতনি রেখে, এক হাতে শোভনকে ছুঁয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উমা। অশনিনাথ পদ্মাসন হয়ে স্থির বসে আছেন। তিনিও একহাতে ছুঁয়ে রেখেছেন শোভনকে। দেবকান্ত কেমন যেন অস্থির আড়মোড়া ভাঙছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করছেন মাঝে-মাঝে। খানিক পরে দেবকান্ত বললেন, জানেন অশনিদা, এখন মনে হচ্ছে সঙ্গে বেশ একটা বইটই থাকলে ভালো হত।

সে কী?

চমকে উঠলেন অশনিনাথ।

আজ বইও চলবে না। আজ কেবল মনস্থির করে শুভচিন্তা, শুভভাবনা আর শোভন যাতে শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পায় তার জন্যে প্রার্থনা জানানো।

না, না, বই ছাড়া আমি থাকতে পারছি না। আমার গলা চেপে আসছে, ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছে।

অশনিনাথ একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন দেবকান্তর দিকে। দেবকান্তর মুখের রেখা কঠিন

BanglaBook.org

হয়ে উঠছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে, যেন সবাই তার পরম শত্রু।

অশনিনাথ ইশারা করে উমাকে বললেন, দেবকান্তকে ছুঁয়ে থাকতে।

উমা তাড়াতাড়ি দেবকান্তর গায়ে হাত ছুঁইয়ে হেসে বলল, কী, তুমি এত অস্থির-অস্থির করছ কেন? কী এমন অস্থির হওয়ার কারণ ঘটেছে?

দেবকান্ত হঠাৎ কেমন যেন রেগে গেলেন। রাগে ফুলতে-ফুলতে তিনি বললেন, কী যে লাগিয়েছ তোমরা সবাই মিলে। সারাদিন নিরামিষ খাইয়ে রাখলে। তার ওপর এইরকম একটা বন্ধ ঘরে সন্ধে থেকে বন্দি। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি সব ভেঙেচুরে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে পালিয়ে যাই।

অশনিনাথ তাড়াতাড়ি বোতলে রাখা বিশেষভাবে শোধনকরা জল ছোট গেলাসে ঢেলে উমার হাতে দিলেন। উমা জলটা দেবকান্তকে প্রায় জোর করে খাইয়ে দিয়ে বললেন পিপাসা পেয়েছিল খুব, তাই না? জানেন অশনিদা, আজকাল ওর একটু-একটু প্রেসারের ভাব দেখা দিচ্ছে।

অশনিনাথ বললেন, তাই নাকি দেবকান্ত?

শিশির অবাক ভয়ে দেখল, দেবকান্তর মুখ থেকে বিরক্তির রেখাগুলি সব মুছে গেছে। মুখের ভাবটি আবার সমাহিত, শান্ত।

এবার সবাই যেন আবার মনে-মনে একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। আবার যেন পুরোনো মনের টানগুলো ফিরে এল।

ঘড়ির টিক-টিক ক্রমশ এগোচ্ছে। দূরে পেটাঘড়িতে রাত বারোটা বাজল।

হঠাৎ মনে হল ঘরের আলো ঈষৎ কমে যাচ্ছে। যেন কারেন্ট-এর ইনটেনসিটিটা আস্তে আস্তে ফল করছে। লাইট ফিউজ হয়ে যাওয়ার মুখে।

এ লক্ষণ শিশির আর অশনিনাথের দিব্যি চেনা। হঠাৎ বাইরের ঘেরা বারান্দার নিস্তব্ধতা ভেঙে উঠে এল জুতোর মশমশ শব্দ। লাইব্রেরি ঘরের দরজার ঠিক সামনে এসে থামল শব্দটা। পরিষ্কার শোনা গেল সোমনাথের গলা।

দেবকান্ত, দেবকান্ত, উমা, উমা, দরজা খোলো। আমার ভীষণ বিপদ, ভেতরে ঢুকতে দাও— ঢুকতে দাও আমাকে।

চমকে উঠল শিশির। উঠে দাঁড়াল সে।

অশনিনাথ বললেন, কী হল শিশির, উঠে দাঁড়ালে কেন?

শিশিরের চোখের সামনে তখন কেবল ভাসছে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের একটা ভয়াবহ ছবি, যেন এক অজানা আতঙ্ক এগিয়ে আসছে নীচের পাহাড় বেয়ে, সোমনাথের পিছন-পিছন। প্রায় আক্রান্ত অবস্থায় সোমনাথ দাঁড়িয়ে দরজা ঠেলছে। সোমনাথকে বাঁচাতেই হবে। সে বলল, দরজা খুলে দিই অশনিদা, দেখছেন না সোমনাথের বিপদ।

ও সোমনাথ নয়।

স্পষ্ট শুনছি সোমনাথ ডাকছে!

বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত উত্তাল হয়ে উঠছিল। সোমনাথ পাগলের মতো আকুল হয়ে ডেকে যাচ্ছে—।

খোলো, দরজা খোলো উমা, দরজা খোলো দেবকান্ত, খোলো—।

এবার শিশিরের সঙ্গে দেবকান্তও উঠে দাঁড়ালেন।

অশনিনাথ দেখলেন, উমাও কেমন যেন ছটফট করছে। অশনিনাথ এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,— আচ্ছা শিশির, দেবকান্ত, তোমরা কেবল গলা শুনেই বুঝে ফেলছ বাইরে সত্যিই সোমনাথ দাঁড়িয়ে আছে? সোমনাথ যদি সত্যিই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে সে সবার আগে আমাকে ডাকত। তা ছাড়া, সে একা বিপদে পড়ে ড্রিমল্যান্ড হোটেল থেকে পালিয়ে আসবে, এমন ধারণা আমার নয়। সে ভীরু নয়। সে ঠিক চন্দ্রাকে নিয়েই আসত। তোমরা একটু যুক্তি দিয়ে কথাটা ভাবছ না

BanglaBook.org

কেন?

শিশির আচ্ছন্নের মতো অশনিনাথের দিকে তাকাল। আস্তে-আস্তে তার মাথার ভেতর যুক্তি ফিরে আসতে লাগল। দেবকান্তও কিছুটা শান্ত হল। শিশির আস্তে শোভনের পাশে বসে পড়ল। ঘরের আলোয় আবার ক্রমশ উজ্জ্বলতা ফিরে আসতে লাগল। বাইরে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, সোমনাথ যেন ক্রমশ-ক্রমশ সরে-সরে দূরে চলে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঘরের একটি মাত্র আলোর বাল্‌ব ফিরে এল নিজস্ব উজ্জ্বলতায়।

অশনিনাথ শান্ত হলেন কিছুটা। তিনি হেসে বললেন, উমা, দেবকান্ত, বুঝতে পারছি কী ভীষণ বিপদের মধ্যে আমরা আছি। এই বিপদে তোমাদের সাহায্য যে কত কাজে লাগছে, তা বলে বোঝানো সম্ভবপর নয়।

হঠাৎ ঘরের আলো আবার কেমন যেন ম্লান হয়ে আসতে লাগল। অশনিনাথ আক্রমণ হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি পঞ্চ তারকার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধুনুচির নিভন্ত আগুনে দিলেন বড়-বড় কাঠকয়লা। তার ওপর ফেলে দিলেন আঁজলা আঁজলা ধুনো। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কাঠকয়লাগুলো জ্বলে লাল টকটকে হয়ে উঠল। গন-গন করতে লাগল আগুন, কিন্তু কী আশ্চর্য বন্ধ ঘরের মধ্যে ধুনুচির স্তূপাকার কাঠকয়লাব গনগনে উত্তাপের আঁচ পেরিযে ঘবের মধ্যে কেমন যেন একটা অতি প্রাকৃত ঠান্ডা নামতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠান্ডা থলথলে জেলির মতো একটা বস্তু জমে উঠছে মেঝের ওপর। আস্তে-আস্তে সেই জোলো ঠান্ডা যেন চেটে নিতে লাগল ধুনুচিব আগুনকে। আগুন মরতে-মবতে, কমতে-কমতে, বিদ্যুতের বাল্‌বেব সঙ্গে তাল রেখে একেবাবেই যেন মিলিযে গেল। যেতেই ঘবেব কোণের দিকেব একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল।

উমা চমকে উঠল ঃ অশনিদা, দবজাটা খুলল কী কবে?

অশনিদা চমকে তাকিযে দেখলেন, দবজা খুলে ঢুকছে ছোট্ট হাসি। হাসিব পরনে রাত-পোশাক। সে উমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিযেছে।

উমা লাফিয়ে উঠলেন ঃ হাসি, হাসি নীচে নেমে এল কী করে? নীচে আসার সিঁড়ির দরজাটা তো আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি—হাসি,—হাসি, আয়, ওখানে দাঁড়াসনি, এখানে আমার কোলে আয়।

কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারে হাসি একটা কাচ-কাচ নাইটড্রেস পরে কান্নার ভঙ্গিতে কেবলই হাত বাড়িয়ে যাচ্ছে।

উমা পাগলের মতো পঞ্চতারা থেকে বেরোতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! দেবকান্ত কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। তিনি হাসির দিকে কিছুতেই যেতে দিলেন না উমাকে। বললেন, উমা, উমা, পাগলামি করো না, স্থির হও। একটু স্থির হও।

হঠাৎ দেখা গেল, ঘরের যে প্রান্তে হাসি দাঁড়িয়ে আছে তার আর একপ্রান্তে একটি গোল ছাইরঙের কোমল বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়েছে। পিণ্ডটি থেকে ক্রমশ দুর্গন্ধ বেরোতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল পিণ্ডটি ঘূর্ণিপাক খেতে-খেতে ক্রমশ আকারে বিরাট হয়ে উঠছে। ক্রমশ পিণ্ডটি একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে লাগল। বিরাট উঁচু, হিংস্র একটা রোমশ বেড়াল হয়ে উঠল সেটা। ছাইকালো অতীন্দ্রিয় সেই বেড়ালের চোখ দুটিতে বেগুনি-সবুজ অঙ্গার জ্বলছিল যেন। তার পায়ের নখে চমকাচ্ছিল ইস্পাতের কাঠিন্য। আস্তে-আস্তে সেই অতিকায় বেড়াল এগোতে লাগল হাসিকে তাক করে। হাসি যেন তাকে দেখে আরও শিউরে, আরও গুটিয়ে দু-হাত মেলে উমাকে ইশারা করতে লাগল। উমা ছুটে বেরিয়ে যাবেনই—দেবকান্ত আর শিশির প্রাণপণে ধরে রইলেন তাঁকে। অশনিনাথ কঠিনকণ্ঠে বললেন, ছিঃ উমা, হাসির একটা মিথ্যে মূর্তি দেখে তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে! ও মূর্তি তো হাসির নয়। তোমার খেয়াল নেই হাসি ওই দরজা দিয়ে আসতেই পারে না? দরজা তো সিল করা। বন্ধ।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়ত, আমাদের দরজাও তো খোলা নেই। তৃতীয়ত, ওই মূর্তি কি সত্যিই হাসির? হাসি হলে তোমাকে ডাকত না। তোমার কাছে ছুটে আসত। হাসি হলে কেবল হাত বাড়িয়ে দিত না, মা মা করে ডাকত, হাসি হলে—ভালো করে লক্ষ করে দ্যাখো, তার ঠোঁট অমনি নীল, নিষ্ঠুরের মতো হত না। চোখে জ্বলত না ওইরকম ভয়ংকর সবুজ আলো। ও হাসি নয়—তোমাকে পঞ্চতারা থেকে বের করে এনে শারমার দলে শামিল করবার জন্যে ওই ভয়ংকর আয়োজন। তুমি স্থির হয়ে বোসো। এই চরণামৃতটুকু খাও। তারপর ভালো করে লক্ষ করতে থাকো।

উমা তাড়াতাড়ি চরণামৃতটুকু খেলেন। তারপর একহাতে দেবকান্ত এবং একহাতে শিশিরকে ধরে স্থির হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট বেড়াল থাবা বাড়িয়ে আস্তে-আস্তে হাসিকে ধরল। তারপর দুটো মূর্তি ক্রমশ পরিণত হতে লাগল গোল একটা বিরাট বস্তুপিণ্ডে। বস্তুপিণ্ডটা আস্তে-আস্তে ক্ষয়ে ছোট হতে লাগল ক্রমশ। তারপর তিলমাত্র হয়ে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে টুকটাক আবার জ্বলে উঠল আগুনের ফুলকি। কাঠকয়লাগুলো একটু-একটু করে জ্বলে-জ্বলে লাল হয়ে উঠল আবার। আলোর বাল্বটাও উঠল জ্বলে।

অশনিনাথ বললেন, তাকিয়ে দ্যাখো উমা, হাসি যে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে দরজা বন্ধই রয়েছে। হাসি আসলে নীচে আসেইনি।

উমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। উমা বলল, অশনিদা এ কী ভীষণ ব্যাপার। এ আতঙ্কের কল্পনাই তো আমার মধ্যে ছিল না। কী ঘটে গেল বলুন তো?

ইতিমধ্যে আবার আলোর বাল্ব তার নিজস্ব জ্যোতি হারাতে আরম্ভ করেছে। আস্তে-আস্তে বাল্ব থেকে সব আলো মুছে গিয়ে জ্বলতে লাগল কেবল তারটুকু। সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে ওরা শুনল বাইরের নিস্তব্ধতা ঝোড়ো হাওয়ায় খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। পেটাঘড়িতে একটা বাজার ঘণ্টা যেন সেই সাইক্লোনের শব্দ ভেদ করে বেজে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, এবার প্রচণ্ড বিপদ, প্রচণ্ড বিপদ আসছে কিন্তু। এসো, মনোবল তৈরি করো। সবাই মিলে চেষ্টা করো। এ বিপদকে ভয়ংকর শক্তি দিয়ে রুখতে হবেই। রুখতেই হবে।

এক অন্ধকার ঘরে, পঞ্চতারার গণ্ডির মধ্যে বসে পাঁচজন মানুষ যেন সারা পৃথিবীর পরিচিত নিয়মের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে। অশনিনাথের কথায় হাতে-হাত বেঁধে-বেঁধে সবাই বসে গেলেন। এমন কি অর্ধশায়িত শোভনও। বাইরের প্রবল সাইক্লোনে যেন সারা লাইব্রেরি-ঘরটা কাগজের ঠোঙার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। অশনিনাথ বললেন, শারমা এবার যাকে পাঠাচ্ছে তাকে সে গড়েছে একটা আত্মার সম্পূর্ণ শক্তিকে উৎসর্গ করে। এই আক্রমণ ঠেকানো কিন্তু সত্যিই আমাদের পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর হয়ে পড়বে।

অশনিনাথের কথা শেষ হতে-না-হতেই ঝড়ের বেগ এবং হাওয়ার শব্দ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠল যে লাইব্রেরি-ঘরের মুখ্য দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল খানিকটা বেগুনি ধরনের আলোর ঢেউ-এর মাঝখানে একটি ছায়ামূর্তি দুলতে-দুলতে ভেতরে ঢুকল, তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে। দরজাটা সঙ্গে-সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শিশির এবার কিন্তু দরজা সত্যিই খুলেছে—

ঘরের মধ্যে এবার প্রবল শৈত্য প্রবাহ বইতে লাগল যেন। নিঃসীম অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করে নিচ্ছে। এত চাপ-চাপ অন্ধকার শিশির এর আগে কখনও দেখেনি। সেই ঠাণ্ডাহিম অন্ধকারে ওরা পাঁচজন যেন জমে যেতে লাগল। পরস্পরের কাছাকাছি সরে এল সবাই। অশনিনাথ চাপা গলায় বললেন, শোভনকে সবাই মিলে ঘিরে ধরো। ছেড়ো না কিছুতেই।

সবাই যেন আঁকড়ে ধরল শোভনকে। হাতগুলি যখন পরস্পরের হাতে ঠেকতে লাগল তখন শিশিরের মনে হল থরথর করে কাঁপছে হাতগুলো। যেন পৃথিবীর শেষকণা তাপটুকুও নিংড়ে নিয়েছে

BanglaBook.org

কেউ। চতুর্দিকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল এমনই মর্মান্তিক ঠান্ডা।

সেই ঠান্ডার মধ্যে ঘরের কোণে, যেখানে সেই আবছা ছায়ামূর্তিটা আছড়ে পড়েছিল, সেখানে দেখা গেল আবছায়া একটি বিন্দু। বিন্দুটি লাফাচ্ছে যেন। লাফাতে-লাফাতে ক্রমশ বড় হতে থাকল সেটি, খুব দ্রুত চেহারা পালটাতে-পালটাতে এক বিরাটাকৃতি অশ্বে পরিণত হল। সেই অশ্বের চেহারা কিন্তু ঘোড়ার মতো সৌন্দর্য কিংবা বীর্যমণ্ডিত নয়। কেমন যেন অদ্ভুত। অশ্বটি গড়ে ওঠা মাত্র সারা ঘর ভরে গেল আঁশটে একটা গন্ধে। মনে হল কে যেন অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। সে অদৃশ্য, কিন্তু সে আছে। রেকাবে তার টান করা অদৃশ্য পা। লাগামও তার হাতে টান করে ধরা। একটানে ঘোড়া লাফিয়ে উঠল ওপরে। শূন্যে। তার পায়ের ক্ষুরগুলো শানানো ব্লেডের মতো ঝকঝক করছে। হাঁ করলে বড়-বড় হলদে দাঁত ঝলসে উঠছে। নাক দিয়ে বেরোচ্ছে নীল আগুন। চোখ দুটো ক্রোধে, ঘৃণায় খয়েরি আগুন ছড়াচ্ছে। ঘোড়াটি চক্কর শুরু করল। মাথার ওপর কড়িকাঠের চারিদিকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ঘোড়াটি। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে উঠল শোভন।

আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—আমাকে ডাকছে—আমাকে নিতে এসেছে—ওরা আমাকে নিয়ে যাবে—।

অশনিনাথ শোভনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, না, শোভন না, তোমাকে আমরা সবাই আটকে রাখব।

ও মৃত্যু, ও মৃত্যু—সাক্ষাৎ মৃত্যু—ও আমায় ডাকছে—আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি—ওই আমার সব। ও-ই আমার সবকিছুর নিয়ামক—আমি যাই—আমি যাচ্ছি—।

উমা বললেন, শোভন, শোভন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শুনুন ভাই—শুনুন—।

শোভনের গায়ে যেন আসুরিক শক্তি। কিছু যেন শোভনকে মারাত্মক টানছে। শোভনের দেহটা পঞ্চতারার মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একেবারে তারকার প্রান্তে। তার হাতের ধাক্কা খেয়ে একটি ঘট উলটে পড়ল। স্বতোয়ার পূত সলিল উপচে পড়ল। অশনিনাথ তাড়াতাড়ি দেবকান্তর হাতে শোভনকে তুলে দিয়ে উলটে পড়া ঘটটি নতুন করে ভর্তি করে দিলেন। ব্যর্থ চেষ্টা করলেন প্রদীপ জ্বালাতে। দেশলাই জ্বলল না। ইতিমধ্যে সেই মৃত্যু ঘোড়ার বেগ আরও বেড়েছে। গরম ভাপ এসে লাগছে সকলের গায়ে। গা জ্বলছে সকলের। শোভনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। তার উচ্চারণ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। চারজন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত সেই ভীষণ ঘোড়া নেমে এল অনেক নীচে। মনে হল তার ক্ষুরের আঘাতে মাথা ফেটে যাবে সবাইয়ের। সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত শোভনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

অশনিনাথ পাগলের মতো চিৎকার করে অসতো মা সদগময়ো মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই ভীষণ অশ্ব দ্রুত নেমে আসতে লাগল ছোঁ মারার ভঙ্গিতে—এক পলকের জন্য তখনই তারা মৃত্যুর মুখ দেখতে পেল। জ্ঞান হারাবার আগে সেই মুখ দেখে চমকে উঠলেন অশনিনাথ। চেনা মুখ। শিশিরও ভাবল এ মুখ কোথায় যেন দেখেছে—যেন চন্দ্রা মেয়েটির মুখের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে—।

নেমে আসা ঘোড়ার ভয়ংকর হ্রেষাধ্বনির পর আর কোনও সাড়াশব্দ উঠল না। সমস্ত ঘরে দুটি অচেতন দেহের ওপর নেমে এল কবরের স্তব্ধতা।

BanglaBook.org

সোমনাথের যখন চেতনা হল তখন ঘরের আলো ধু-ধু করে জ্বলছে। দরজা-জানলা সব হাট করে খোলা।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সোমনাথ বুঝতে পারল চন্দ্রা কটেজে নেই। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরোল। ভয়, হতাশা, অনুতাপ তার মধ্যে তখন পাগলের মতো পাক খেতে আরম্ভ করেছে।

খানিকটা চিন্তার পর সোমনাথ ড্রিমল্যান্ড হোটেলের মালিককে জাগিয়ে একটি গাড়ি ও কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার জোগাড় করল। আর কোনও পথ নেই। এবার তাকে ঘনশ্যামগড় দুর্গে যেতেই হবে। অশনিনাথ তার যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, চন্দ্রার যদি ভালো-মন্দ কিছু হয় তাহলে তাঁকে জবাবদিহি করতেই হবে।

মধ্যরাত্রির উঁচু-নিচু জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে ঘনশ্যামগড়ের দিকে চলল তার ভাড়া করা গাড়িটি। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘনশ্যামগড়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু গাড়িটা যেন একই রাস্তায় পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরছে বলে মনে হতে লাগল তার। ঘড়িতে এক ঘণ্টা কখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সোমনাথের রাগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই কুশলী অভিজ্ঞ ড্রাইভার? লোকটা কি পাহাড়ি পথটথ সত্যিই জানে। বেরোবার সময় তো বলল সব ওর জানা আছে। নাকি নেশাটেশা করেছে লোকটা? হোটেলের ম্যানেজারের ওপরও রাগ হতে লাগল সোমনাথের। জেনেশুনে এমন একটা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল সোমনাথকে?

অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তায় শৃগালের কান্না, পেঁচার আর্তস্বর শুনতে-শুনতে সোমনাথের কেমন ঝিম আসতে লাগল। হঠাৎ সমস্ত ঝিমকে বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে দিয়ে তার সামনে দিয়ে ছুটে ওপর দিকে উঠে বাতাসে ফেটে পড়ল একটা ছাই বর্ণের অতিকায় উড়ুক্কু প্রাণী। ঠিক যেন অলৌকিক ঘোড়ার মতো।

সঙ্গে-সঙ্গে কেটে গেল সব ঘুম। সে চমকে তাকাল চারিদিকে। সামনের সিট থেকে ঝিমন্ত ড্রাইভার সোজা হয়ে বসে হেডলাইটের আলোর কোনও নিশানা দেখে চমকে উঠে পরিষ্কার গলায় বলল,—ছি-ছি, আমি এ কী করছিলাম স্যার এতক্ষণ। এ তো ভুল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। ইস, রাত শেষ হয়ে এল। চলুন, তড়িঘড়ি আপনাকে ঘনশ্যামগড়ে নিয়ে যাই।

এবার গাড়ি ছুটল নির্দিষ্ট পথে স-বেগে। ঘনশ্যামগড় দুর্গের প্রথম চৌকির কাছাকাছি গাড়ি এসে পৌঁছতেই গাড়ির সামনে কী যেন একটা পড়তে ব্রেক কষল ড্রাইভার।

একটা মানুষ পড়ে আছে স্যার।

ধক করে উঠল সোমনাথের বুকটা। চন্দ্রা নয় তো?

সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নামল। হেডলাইটের আলোর বন্যায় পরিষ্কার দেখা গেল লোকটাকে। শারমা। শারমা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছিন্নভিন্ন তার শরীর। তাকে হত্যা করা হয়েছে।

সোমনাথ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, চলুন, জলদি ঘনশ্যামগড়।

প্রথম চৌকিতেই বাধা পেল সোমনাথ। পাহারাদার জানাল, ওপরে যেতে মানা আছে। রাত ভোর না হলে, আদেশ না পেলে, ছাড়তে পারবে না সোমনাথকে। সোমনাথ হতাশ হয়ে গাড়ির ভেতরেই চুপচাপ বসে রইল।

ভোরের পাখির ডাকে প্রথম ঘুম ভাঙল উমার। উঠে দেখল শোভন ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত বোধ করল উমা। দেবকান্ত, অশনিনাথ আর শিশিরও ঘুমোচ্ছে। উঠে বসে উমা দেখল দূরে ঘরের কোণে একটি মানুষ পড়ে আছে। সে কী করবে স্থির করতে না পেরে অশনিনাথকে ডাকল।

অশনিনাথ উঠে কতকগুলি প্রক্রিয়া সেরে উমাকে বললেন, চলো উমা, এবার আমরা পঞ্চতারার আঁটান থেকে বেরোতে পারি।

দুজনে এসে দেখলেন একটি নারীদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে চন্দ্রা। অশনিনাথ নাড়ি ধরে দেখলেন, কোনও স্পন্দন নেই। চন্দ্রা মৃত। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল অশনিনাথের মন। সোমনাথকে আশা দিয়েও তিনি আশা পূরণ করতে পারলেন না। চন্দ্রা শেষ পর্যন্ত মারা গেলই। যাক, তবু মন্দের ভালো শোভন বেঁচেছে। কাল রাত্রে মৃত্যু স্বয়ং এসেছিল শোভনকে নিতে। মৃত্যুকে

BanglaBook.org

জয় করেছে শোভন। মৃত্যুকে শারমা তৈরি করেছিল চন্দ্রার আত্মার সহায়তা নিয়ে। চন্দ্রার শরীর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছিল মৃত্যুর পৈশাচিক আকৃতি। সেই মৃত্যু যখন শোভনকে অধিকার করতে পারল না তখন আর কাউকে না পেয়ে ফিরে গেল চন্দ্রারই কাছে। চন্দ্রাকেই করল নিহত। শোভন সুস্থ হয়ে উঠে বসল বিছানায়। শিশির আর দেবকান্তও। ভয়ংকর রাত্রি কেটে গেছে। এখন শান্তি, স্বস্তি। উমা, শোভন, শিশির আর দেবকান্তকে বাইরে স্নান-খাওয়া করতে পাঠিয়ে দিয়ে অশনিনাথ চন্দ্রার দেহটি তুলে পঞ্চতারার মাঝখানে শোয়ালেন। চন্দ্রা যেন ঘুমোচ্ছে। তার চারপাশে জ্বেলে দিলেন সুগন্ধী দীপ। তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল। আহা, মেয়েটি আরও বেশি কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিল। চন্দ্রার প্রাণহীন দেহের সামনে অশনিনাথ স্থির হয়ে বসে আছেন, এমনসময় বিভ্রান্ত সোমনাথকে নিয়ে ঢুকল উমা। দেবকান্ত, শিশির আর শোভন পিছনে দাঁড়িয়ে।

সোমনাথ চিৎকার করে উঠল বুক ফাটিয়ে : অশনিদা, আপনি চন্দ্রাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন—তাকে বাঁচানোর চেষ্টাও করলেন না একটুও। এখন সারাজীবন আমি কেবল নিজেকেই দায়ী করে যাব চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য। আমি যে তাকে বড় মুখ করে বলেছিলাম—বাঁচাব, বাঁচাব...

সোমনাথ ছুটে গিয়ে চন্দ্রার বুকে মাথা রেখে লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ শিশির দেখল, চন্দ্রার চোখের পল্লব থরথর করে কাঁপছে। সে কাছে এগিয়ে গেল ভালো করে দেখবার জন্য। ধূপের মৃদু ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে আবছা করে দিচ্ছিল চন্দ্রার চারিদিক। না, সত্যিই চন্দ্রা চোখ মেলছে। তার ঠোঁট নড়ছে। সে যেন কী বলতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন অশনিনাথ। চন্দ্রাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি সোমনাথকে সরিয়ে দিয়ে। আস্তে-আস্তে চন্দ্রার দেহে প্রাণস্পন্দন ফিরে আসছে।

কিন্তু তা কী করে হয়?—তবে সেই ভয়ংকর মৃত্যু কার দিকে ছুটে গেল?

অস্ফুটকণ্ঠে অশনিনাথ বললেন, কে, কে মরল সেই মৃত্যু-পিশাচের আক্রমণে?

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, রাস্তায় শারমার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি, ঘনশ্যামগড়ের প্রথম চৌকির কাছে।

অশনিনাথের মুখে আনন্দ ঝলসে উঠল।

—বুঝেছি। অল্পক্ষণের জন্য চন্দ্রার শরীরে প্রাণ ছিলই না বলতে গেলে। নাড়ি পাইনি তার ঘোর দুর্বলতার জন্যে। মৃত্যু তাহলে তার স্রষ্টাকেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে গেছে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে সেদিন বিপুল আয়োজন।

উমা আর দেবকান্ত সাধ মিটিয়ে আয়োজন করেছে। খেতে-খেতে হাসির খিলখিল হাসি শুনছিলেন অশনিনাথ। আজ সে তাঁর সুপারিশে খাওয়ার টেবিলে একটি আসন পেয়েছে।

শোভন বলল, অশনিদা, আপনি আজ সকালে কী একটি কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়েছিলেন। আপনি বলছিলেন, শারমা নাকি আমাদের পুরোনো শত্রু। সে-কথা আপনি জানলেন কী করে?

অশনিনাথ বললেন, অনেক পুরোনো কুলজি ঘেঁটেই শারমার ইতিহাস বের করতে। তোমাদের যে তান্ত্রিক গুরুবংশ ছিল, সে-বংশের একজন আসামের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে যায় তন্ত্রসাধনা করতে। সেখানে তার যে ভৈরবী ছিল তার সন্তান হয় একটি। ভৈরবীর পদবি ছিল শারমা। তাই তোমরা যদিও ভেবেছিলে যে তোমাদের গুরুবংশ নির্বংশ হয়েছে, আসলে শারমারা পুরুষ-পরম্পরায় থেকে গিয়েছিল। শারমাদের তান্ত্রিক-সাধনা তিব্বতি ভাবধারায়। সেই ভাবধারাকে প্রবল করে তুলেছে শারমার অর্থ, বিদেশি শিক্ষা, অভিজ্ঞতা আর শাঁসালো মক্কেলরা। শারমা যখন জানতে পারল তোমার দাদুর গুলিতে তার শাখাবংশ নির্বংশ হয়েছে তখন রাগে, ক্রোধে, টাকার লোভে

BanglaBook.org

ও বন্ধু সেজে গিয়ে তোমাদের বংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আসলে এটা শারমার পুরোনো রাগ।

উমা বলল, বাঃ, নতুন তথ্য জানা হল দেখছি একটি।

দেবকান্ত রাও বললেন, আর একটি নতুন খবর সোমনাথের কাছ থেকে শুনতে চাই—

সোমনাথ হেসে বললেন, চন্দ্রা হ্যাঁ-না বললে কী করে নতুন খবর দিই—চন্দ্রা, তোমার হাতের রেখা কী বলে?

চন্দ্রা সলজ্জ মুখে বলল, হাতের রেখা তো যা বলে তা সত্যিই বলে। আমি অল্পক্ষণের জন্যে হলেও প্রায় মরেই তো গিয়েছিলাম।

অশনি-নাথ হেসে বললেন, প্রায় কেন? সত্যি-সত্যিই। মৃত্যুর শরীর তৈরি করতে গিয়ে তোমার শরীর থেকে প্রায় সব জীবনীশক্তিই নিংড়ে নিয়েছিল শারমা। ওর দৃষ্টি ছিল তোমার ওপর, ওর পূর্বপুরুষদের দৃষ্টি ছিল তোমার মা-দিদিমার ওপর। যাক, সব যখন মিটেই গেছে তখন তুমি মতটা দিয়েই দাও বাপু। সোমনাথকে চটপট বিয়ে করে ফেল।

দেবকান্ত রাও বললেন, আপনারা কি ভাবছেন এতেই সব নতুন খবর শেষ হয়ে গেল। আমার ঝুলিতে আর একটি নতুন খবর আছে যা শুনলে একজন এখুনি খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে। রীতিমতো বুদ্ধি খরচ করে ব্যাপারটা ঘটাতে হয়েছে আমাকে।

—কে? কে? কে লাফিয়ে উঠবে?

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই। সবারই চোখে সহাস্য কৌতূহল।

দেবকান্ত হাঁক দিলেন, কই? সুরভি, বেরিয়ে এসো তো?

অ্যান্টিরুমের লাল ভেলভেটের পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল সুরভি। শোভনের প্রেমিকা। এবং সত্যিই শোভন চেয়ার ছেড়ে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

BanglaBook.org

রুপোর টাকা

BanglaBook.org

অদ্রীশ বর্ধন

শ সে. র. উ. ২—৮৭

জানলার ধারে প্যাকিংকেসটা টেনে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ।

বর্ষা নেমেছে। অবিশ্রান্ত ধারায় কদিন ধরে বর্ষণের আর বিরতি নেই। অবিরাম, অবিরল ধারায় নামছে বর্ষাসুন্দরী। অসমছন্দের সে বর্ষণ-সঙ্গীত শুনে-শুনে ইন্দ্রনাথেরও একঘেয়ে লাগতে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির সঙ্গীতের সুরে মানুষেব মনোবীণাও একই তারে বাঁধা। একের ঝঙ্কার অপরটিতে অনুরণিত হয়ে এসেছে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকে। তাই বুঝি আজ বাইরের মেঘ ভিড় করে এসেছে ইন্দ্রনাথের মনের আকাশেও। বাইরের স্তিমিত আলোয় ওর মনের দীপও বুঝি আজ নিষ্প্রভ। বাইরের ঝাপসা জলধারায় সজল ওরও অন্তর।

বর্ষার মৃত্যুশীতল অবসাদ যেন ধীরে-ধীরে ওর মনেও সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকে। ম্লান-বিষণ্ণ দুই নয়ন-মণিকায় সুদূর অতীতের স্বপ্নালু স্মৃতির আবেশ ঘনিয়ে ওঠে। যৌবনের প্রভাতে কল্পনার কত অলীক জালবোনা আর স্বপ্ন-সৌধ ভঙ্গের সুখদুঃখবিধুর উষ্ণ সে অতীত। রুক্ষ জীবনের ধূসর পথপ্রান্তে ধূলার মাঝে তারা আজ পেতেছে আসন—সে-ধূলা তার জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা আর বঞ্চনাব নির্মম আঘাতে রেণু-রেণু কল্পনার মর্মর মঞ্জিল বিরচিত। যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে মিশে আছে তার যৌবনের নিশ্বাস, বোবা কান্নার অদৃশ্য অশ্রু।...

বিবর্ণ, বিরং, পাণ্ডুর আকাশ আর নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে তাই বুঝি ইন্দ্রনাথেব দুই চোখ জ্বালা করে ওঠে।...

দরজায় আচমকা করাঘাত হতে চমক ভাঙল ওব।

ডাকপিওন। পুরু আর বিপুলায়তন একটা রেজিস্টার্ড প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয় সে।

প্যাকেটের ওপর চোখ পড়তেই ওর মুখের বিষাদকে ম্লান করে দিয়ে ফুটে ওঠে খুশির আভা। মৃগাঙ্কর চিঠি। বম্বে থেকে সে লিখছে।

বোম্বাই
এপ্রিল ১২, ১৯৫৭

ভাই ইন্দ্রনাথ,

বুঝতেই পারছি, আমার এ-চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন হয় স্মৃতি রোমন্থন করছ ম্লান মুখে, আর না-হয় কাঁচি ধ্বংস করছ একমনে। দ্যাখো ইন্দ্র, বহুবার বলেছি তোমায়, আবার বলছি—সুখ, দুঃখ, আশা, বঞ্চনা নিয়েই মানুষের জীবন। সব স্বপ্নই কি ফসল ফলায়? সব জেনেশুনেও কেন যে তিলে-তিলে জীবনের এই মূল্যবান অধ্যায়টিকে নষ্ট করছ জানি না।

তোমার প্রতিভার এই অহেতুক আত্মহত্যা রোধ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে নিতান্ত রাগের বশেই এসেছিলাম বোম্বাইয়ে—সাংবাদিকের জীবনকে বেছে নিয়ে। এখানে এসে একটা বিচিত্র ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ি। ব্যাপারটা বেশ মজার হলেও ওর মধ্যে একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়ায় তোমার সান্নিধ্য থেকে পাওয়া যৎসামান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। ফল পেয়েছি হাতে-হাতে। লিখতে-লিখতে আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি সত্যিই মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি। কী, বুঝলে না তো? এ আমার নিছক রহস্যভেদ নয়, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ, আর...।

আচ্ছা, শোনোই তবে সে-কাহিনি...।

*

BanglaBook.org

সন্ধে হয়ে এসেছিল। মালাবার হিলের ওপাশে সূর্য নেমে এসেছিল—আকাশকে রঙে-রঙে রাঙিয়ে ক্ষণেকের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরব সাগরের বুকের উপর।

বোম্বাই নাগরিক-নাগরিকাদের বড় প্রিয় এই গোধূলি মুহূর্তটি। আকাশে-বাতাসে ফাগুনের উৎসব ওদের মনেও সুরের পরশ লাগায়। তাই প্রত্যেকেই গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসে পথে—আসে সাগরের তীরে, বসে শ্যাওলা-সবুজ পাথরের আনাচে-কানাচে অথবা বালুকা-চিক্কণ জুহু-চৌপাট্টির বেলাভূমিতে। সারাদিন কর্মমুখর সুদীর্ঘ প্রহরগুলো কাটাবার পর এই সংক্ষিপ্ত ম্লান মধুর গোধূলি মুহূর্তটি প্রতিজনেই লঘু রসালাপ আর ভ্রমণ-বিলাসে ভরিয়ে তোলে।

কিন্তু ছুটি নেই আমার—নেই সম্পাদক শেখর শর্মার। আর, বোধহয় এই কারণেই প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই বিশেষভাবে বিগড়ে থাকত শর্মাজির মেজাজ। বিশ বছর ধরে বিরতিবিহীন সম্পাদনায় সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি, আর বিশ বছরের প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যায় করুণ নয়নে শুধু সূর্যদর্শন করে নিষ্ফল রোষে আক্রমণ করেছেন ফাইলের স্তূপকে। সে রোষবহ্নি থেকে আমরাও নিষ্কৃতি পাইনি।

সেদিনও তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সটান এসে দাঁড়ালেন আমার টেবিলের সামনে।

প্রথমে আমি লক্ষই করিনি। লক্ষ করবার মতো অবসরও ছিল না। টেলিফোন যন্ত্রটির মাউথপিসের ওপর সপ্রেম দৃষ্টি রেখে মধুক্ষরা শব্দ প্রেরণ করছিলাম অপর প্রান্তে।

'সত্যিই কবি, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা যে কীভাবে শুরু করব, তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না...ভাবব না? তবে থাক...না, না, এ বিষয়ে এখনও বিন্দুবিসর্গও শুনিনি, তবে শুনব শিগগিরই...তাহলে আগামীকাল সন্ধে ছ'টায় আলেকজান্দ্রা ডকে...আরে, আমি তো থাকবই...সমস্যা তো সেটা নয়, কাল পর্যন্ত সময়টা যে কী মৃদুছন্দে কাটবে, তা ভাবতেও অসহ্য লাগছে।...বললাম, মৃদুছন্দে একটু কবিত্ব করলাম আর কী।...তাহলে কাল সন্ধেয় দর্শন পাচ্ছি, কেমন? আচ্ছা, তাহলে এখনকার মতো—।'

বলে, রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলতেই ম্যানেজিং এডিটরের বরফ-কঠিন চোখে চোখ পড়ল আমার।

বেশ কিছুক্ষণ তুষার-রশ্মি বিকিরণ করল শেখর শর্মার চোখ দুটি। তারপর শ্লেষ-বঙ্কিম স্বরে বললেন, 'বটে। আজকাল তাহলে কবি নাম ধরেই ডাকাডাকি চলছে দেখছি।'

সসম্ভ্রমে বললাম, 'অনেকটা সময় বেঁচে যায় তাতে, তাই—।'

'একমাত্র সন্তানকে এমন মিষ্টি নামে আপ্যায়নের বৃত্তান্ত কি সোমেশ রায় শুনেছেন?'

'খুব সম্ভব না। অত্যন্ত কাজের মানুষ কিনা—।'

'খবরটা শুনলে আর-একটা কাজ তাঁর বাড়বে শুধু। জ্যান্ত তোমার চামড়া ছাড়িয়ে রোস্ট করবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বেশি দেরি তাঁর লাগবে না। সামান্য একটা সাংবাদিক—মাস গেলে তিনশো টাকা যার রোজগার, সে কিনা—।'

'সত্যিই, মাইনেটা বড় অল্প স্যার।' তৎক্ষণাৎ একমত হই আমি। এ-প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য ছিল আমার, কিন্তু সেরকম কোনও সুযোগ না দিয়ে ঝটিতি উত্তর দিলেন শেখর শর্মা, 'তোমার দাম ওর থেকে এক কানাকড়িও বেশি নয়। বুঝলে গোবর্ধন?'

'আজ্ঞে, আমার নাম—।'

'চোপরাও। মেয়েটা তাহলে সবই বলেছে তোমায়। হুম, এখন সব জলের মতো বুঝতে পারছি। মতলবটা এসেছে ওরই মাথা থেকে, তাই কিনা?'

'কবিতা একটা মস্ত সুখবর শোনাল স্যার। কিন্তু সে যাই শোনাক না কেন, আদেশ তো স্যার আপনার কাছ থেকেই নেব।'

BanglaBook.org

এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন শেখর শর্মা।

'হাইস্কুল ম্যাগাজিন চালানোর মতো কতকগুলো নিরেট সাংবাদিক আমায় দিয়ে আবার তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ডাকা হচ্ছে কিনা একটা মেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যে।'

'তা যা বলেছেন স্যার।' খুশি-খুশি স্বরে সায় দিই আমি।

খরখরে চোখে তাকাল শেখর শর্মা : 'বেশি কথা বোলো না ছোকরা। কথাটা হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় অন্নদাতাকে নিয়ে। সে খেয়ালটা থাকে যেন। এইমাত্র ফোনে জানালেন যে, হপ্তাখানেকের জন্যে সোমেশ রায়ের স্টিমার-পার্টিতে তোমাকেও যেতে হবে। পার্টি পোর্ট ভিক্টোরিয়া, রত্নগিরি, মাঙ্গালোর ঘুরে আসবে। কাল সন্ধে ছ'টায় আঠারো নম্বর আলেকজান্দ্রা ডকে। কিন্তু সবই তো জানো বলে মনে হচ্ছে।'

'জানলেও আপনার মুখে শুনে বুঝছি খাঁটি খবরই দিয়েছে কবিতা।'

'বটে! নিছক সাগর-বিহারের জন্যে যে তোমায় ডাকা হচ্ছে না, কাজের দায়িত্ব যথেষ্ট আছে, তা নিশ্চয় মেয়েটা বলতে ভুলে গেছে, তাই না?'

'তা স্যার, গেছে। নীরস কথাবার্তা ও মোটেই পছন্দ করে না কিনা, তা না—হলে—।'

'শা-ব্বাশ রিপোর্টার রোমিও!' বলেই চোখ পাকালেন শেখর শর্মা : 'হপ্তাখানেক হল সিলোন থেকে ডক্টর তারাপদ তরফদার ফিরেছেন। ভদ্রলোকের নাম তোমার অজানা নয়। তোমার কাজ হচ্ছে ও-দেশ সম্বন্ধে ডক্টরের মতামতগুলো কায়দা করে লিখে নেওয়া। বুঝেছ?'

'এ আর এমন কী কঠিন কাজ, স্যার।' বলি আমি।

'যতটা সহজ ভাবছ, ততটা সহজও নয়। এ যে শুধু ডিউটি নয়, সেইসঙ্গে সাগরবিহার, কাজেই—'শ্লেষের শেষ খোঁচাটুকু অনুক্ত রেখেই পেছন ফিরলেন শেখর শর্মা।

'একটা কথা স্যার, ইয়ে, কাল তাহলে আমার আর অফিসে আসার দরকার নেই, কী বলেন?' তাড়াতাড়ি বলি আমি।

আবার খরখরে চোখে তাকালেন শেখর শর্মা।

'কে বললে দরকার নেই? এইমাত্র কবিত্ব করছিলে না সময়টা বড়ই মৃদুছন্দে যাবে? সেভাবে যাতে না যায়, তা আমি দেখব। যথাসময়ে কাল অফিসে হাজিরা দেবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' বেশ দমে যাই আমি। বড় কড়াপ্রকৃতির মানুষ শেখর শর্মা।

'আর একটা কথা,' টেবিলের কাছে এগিয়ে আসেন উনি : 'ইয়ে মানে, তোমার এই কবিতা রায়টিকে তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, কী বলো?'

'তাই তো সবাই বলে স্যার।'

'দ্যাখো ছোকরা, মনটন দিয়ে কাজকর্ম করো একটু।' কোমল হয়ে আসে ওঁর বলি-অঙ্কিত রুক্ষ মুখ : 'জানোই তো দুনিয়াটা কতখানি কঠিন। এখানে চলতে গেলে কাঁটায় পা ছেঁড়ে প্রত্যেকের। তাইতেই হতাশ হয়ে শুধু কাব্যরচনা করলেই গোলাপ হাতের মুঠোয় আসে না। বুড়ো সোমেশ রায় আলট্রামাইক্রোস্কোপ দিয়ে ধুলো থেকে সোনা তুলেছেন; আর, চোখে টেলিস্কোপ আঁটলেও দুনিয়ায় টাকা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না তাঁর। টাকা আর টাকা—এ ছাড়া কিছু ভাবেনই না তিনি।'

'আমিও অনেকটা সেইরকম শুনেছি স্যার।'

'জীবনে সর্বপ্রথম যে-রুপোর টাকাটি তিনি রোজগার করেছিলেন, আজও তা সযত্নে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। তোমার প্রথম রোজগারের টাকাটা কোথায় শুনি?'

'কাকে যেন দিয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'পড়বে না। তোমার সঙ্গে সোমেশ রায়ের তফাত এইখানেই। যাই হোক, এ দুর্মুখ বুড়োটার কথা মনে রেখো। একজন ভালো রিপোর্টার সব জেনেশুনে পরে ভুল করে পস্তাক, তা আমি দেখতে চাই না।'

BanglaBook.org

'ভালো রিপোর্টার স্যার?' উজ্জ্বল হয়ে উঠি আমি।

'তাই তো বললাম হে।'

হেসে ফেলি আমি। আরও খুশি-খুশি হয়ে ওঠে আগে থেকেই প্রসন্ন মেজাজটা।

এবার একটু সাহস করেই বলে ফেলি, 'মাইনের দিন কিন্তু স্যার পরশু।'

'ক্যাশিয়ারকে বলে দেব'খন।' বলে খসখস করে একটা কাগজে দু-ছত্র লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন উনি : 'টাকাটা কালকেই নিয়ে নিও, বুঝলে?'

'মাত্র পঞ্চাশ টাকা!' করুণ হয়ে ওঠে আমার চোখ : 'আমি যে স্যার একটা ভালোরকমের ডিনার সুটের কথা ভাবছিলাম!'

আবার তিরিক্ষে হয়ে ওঠে শেখর শর্মার মেজাজ।

'যে-শার্ট আর প্যান্ট ধুতে দিয়েছ, তাই নিয়ে যাবে। ফালতু বাবুগিরির জন্যে তোমায় আমরা পাঠাচ্ছি না—তা যেন মনে থাকে।' বলে হনহন করে উনি সেঁধিয়ে গেলেন ওনার খুপরি-ঘরে।

কাজেই ঘরের মধ্যে রইলাম শুধু আমি। কাগজটা সান্ধ্য-দৈনিক। শেষ সংস্করণও পথে চলে গেছে অনেকক্ষণ। তাই হাতে আর বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। বাইরের গোধূলি ক্রমশ ফিকে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে। অল্প-অল্প ছায়া দানা বেঁধে উঠছিল ঘরের কোণগুলিতে। রাস্তার ওপাশের গাছটায় স্তবকে-স্তবকে ফোটা হলুদ ফুলের আড়ালে দেহ লুকিয়ে দিনের শেষ গান গাইছিল নাম-না-জানা একটা পাখি। আনমনে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলাম আমি।

সেই ছায়া-ছায়া গোধূলি-সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে অনেক কথাই ভিড় করে এল মনে। মনটা পিছিয়ে চলে গেল সেই দিনটিতে, যেদিন প্রথম দেখেছিলাম কবিতা রায়কে..।

গেছিলাম বান্দ্রার মাউন্ট মেরিতে। নিরাশ্রয় অনাথদের আশ্রয়-দানের জন্যে একটা সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করেছিল বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত নট-নটী ও সঙ্গীতশিল্পীরা। বেশ বড় অনুষ্ঠান। আর তাই শেখর শর্মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন হরেকরকম মালমশলার সন্ধানে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য কায়দায় সুসজ্জিত ঝলমলে তোরণের নীচে হাসিমুখে আগতদের মাঝে ফুল বিক্রি করছিল একটি তন্বী। মেয়েটির একহাতে বেতের সাজিতে ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধার গুচ্ছ, অপর হাতে রক্তগোলাপের কয়েকটি সুদৃশ্য বাটন হোল। হাত-মুখ, ঠোঁট-ভুরু-চোখ নেড়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় ফুল বিকোচ্ছিল সে। দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। যদিও সুন্দরী ললনা দেখে থমকে দাঁড়ানোর অভ্যাস আমার কোনওদিনই ছিল না, তবুও এ-মেয়েটির চোখে-মুখে এমন কিছু একটা ছিল, যা দেখে আপনাহতেই স্তব্ধ হয়ে গেল আমার চরণ-যুগল।

মেয়েটিকে ডানাকাটা পরী বলব না। রম্ভা-তিলোত্তমা-উর্বশী-মেনকার মতো স্বর্গীয় সৌন্দর্য না থাকলেও সে সুন্দরী। ছিপছিপে একহারা চেহারা, টুকটুকে ফরসা মুখ, ঘন-কালো চঞ্চল দুটি চোখ, চুলগুলো টান করে পেছনে বাঁধা আর টানা-টানা দুই ভুরুর মাঝে রক্তচন্দন বিন্দুর মতো একটি কুমকুমের টিপ।

এই টিপ দেখেই মনে হল মেয়েটি মহারাষ্ট্রীয় নয় নিশ্চয়। গুজরাট বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের তরুণীদের টিপ অঙ্কন দেখেছি বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ স্থানে। কিন্তু এ মেয়েটির কুমকুম-বিন্দু, বিশেষ করে ওর মুখের ঢলঢলে স্নিগ্ধ লাবণ্য দেখে মনে হল, বঙ্গললনা ছাড়া তো এমন চোখ-জুড়োনো শ্রী আর কোনও নারীর মুখে দেখিনি।

বড় ভালো লাগল মেয়েটিকে। জীবনে বহু সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু হৃৎপিণ্ড নামক দেহযন্ত্রটি কোনওদিন ভুলেও কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখায়নি। আর সেই আশ্চর্য রকমের শান্ত যন্ত্রটাই হঠাৎ ওই তন্বী-সৌন্দর্য দেখে অত্যধিক মাত্রায় চনমনে হয়ে উঠে এমন দাপাদাপি শুরু করে দিলে যে, কেমন জানি চুম্বকের টানে পড়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ালাম বটে, কিন্তু ওর চন্দন-স্নিগ্ধ লাবণ্য আমার অশান্ত হৃদযন্ত্রকে

BanglaBook.org

শান্ত করা দূরে থাক, বরং তার স্পন্দনবেগ রীতিমতো বাড়িয়ে তুললে। বোধ করি আমার বিমুগ্ধ-আনন দেখেই মিষ্টি করে একটু হাসল ও। আহা, মরি, মরি! সে তো হাসি নয়, যেন সুদৃশ্য শুক্তির ফাঁকে একসার দুধসাগরের সেরা মুক্তো ঝিলমিল করে উঠল, আর সে দুধ-মুক্তোর চাপা শুভ্রদ্যুতি রাঙা অধরের কোণে-কোণে আশ্রয় নিলে অপরূপ ভঙ্গিমায়।

আমি যদি কবি হতাম, তাহলে সেই মুহূর্তেই ওই অমল-ধবল কুন্দবরণ সুন্দর হাসি নিয়ে সৃষ্টি করতাম শ্রেষ্ঠ কাব্য।

মেয়েটি কিন্তু শুধু একটু হাসল। হেসে সুরেলা সুরে বললে ফুলের নামধাম আর দাম। দামটা যদিও একটু বেশিই বললে, কিন্তু বর্ণনভঙ্গি এমনই সরস, সুন্দর আর সুমিষ্ট যে, খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল তা। তা ছাড়া, আমার এতদিন ধরে দিব্যি শান্ত থাকা হৃদযন্ত্রের দাপাদাপি আর সহ্য করতে না পেরে পকেট উজাড় করে সর্বস্ব তুলে দিলাম শিখরদশনার হাতে।

শিঞ্জিত-কাঁকন চঞ্চল-অঞ্চল বহু পরিচিত তরুণী আশপাশে ঘুরছিল ফুরফুরে প্রজাপতির মতো লঘুচরণে ও লঘুমনে। বোধ করি আমার মুগ্ধ নয়ন দেখেই ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে আমাদের।

আর, তা শুনেই নিমেষ মধ্যে স্থির হয়ে গেল আমার চঞ্চল চিত্ত। ফুলওয়ালি মেয়েটি অনাথ নয় মোটেই। সারা বোম্বাইতে হেন জন নেই যে, চেনে না ওর দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতৃদেবটিকে। পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার আগেই আমার তখন চক্ষুস্থির! বুঝলাম, বড় বেশি আশা করে ফেলেছি আমি। রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানিব চেয়ারম্যান সোমেশ রায় কোনওদিনই মার্জনা করবেন না আমার এ ধৃষ্টতা। জীবন-পথে আসা কোনও কাঁটাকে তিনি কখনও পাশ কাটিয়ে যাননি, দলে গেছেন দু-পায়ে। আর, তিনশো টাকা মাইনের যে-নগণ্য সাংবাদিক তরুণটি তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তানের শুধু রূপসুধা পান নয়, জীবনসঙ্গিনী করারও স্বপ্ন দ্যাখে, তাকে যে তিনি অতি সহজে রেহাই দেবেন না, তা তখনই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে ফেললাম আমি।

যাকে বলে হরিষে-বিষাদ—তাই হল আমার। মুহূর্তের দর্শনে আকাশকুসুম রচনা শুরু করে দিয়েছিলাম, তার পরমুহূর্তেই পতন ঘটল স্বর্গ থেকে মর্তে। তোমার কথাই মনে পড়ল তখন। তুমিও যা চেয়েছ, তা পাওনি, শুধু পেয়েছ আঘাতের পর আঘাত। তাই বাইরের জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছ নিজের অন্তরের কন্দরে, তাই চিত্তের কুহরে কুহরিছে সদা অতীত-দিনের কাহিনি। নিজেকে সেদিন আরও বেশি করে একাত্ম বোধ করলাম তোমার সঙ্গে।

কাজ নিয়ে গেছিলাম—তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসার উপায় ছিল না। তাই থেকে গেলাম শেষ পর্যন্ত। অবশ্য যতক্ষণ ছিলাম, মেয়েটির মধুসঙ্গ দিয়ে হৃদয়ের ছোট-বড় সব ফাঁকগুলিই ভরিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর উৎসব-চঞ্চল মণ্ডপ ত্যাগ করলাম আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই প্রথম আর এই শেষ। কাশ্মীরি আপেলের আভা-আঁকা ও-মুখ ইহজীবনে আর দেখা তো দূরের কথা, ওর স্মৃতিও সজ্ঞান-নির্জ্ঞান মন থেকে বিসর্জন দেব চিরতরে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। আর প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করছিলাম যে, সেদিনকার সন্ধ্যার সে সুখস্মৃতি কেটে-কেটে বসে গেছে এ-হতভাগ্যের মানসপটে। বুঝলাম, আমি প্রেমে পড়েছি।

প্রেম কারও জীবনে আনে শুধু আনন্দ—অমৃতময় আনন্দরসে ভরিয়ে তোলে তার অন্তর-পেয়ালা, আর কারও জীবনে আনে শুধু বেদনা, দুঃখ আর অশ্রু। সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে কোনও চিন্তা, কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তারপর থেকেই এক দুঃসহ চিন্তাভারে তিরোহিত হল আমার মনের শান্তি। শুধু দুটি পথ ছিল আমার সামনে। মেয়েটিকে স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে কাজে ডুবে যাওয়া; ব্যর্থতার গ্লানি মনেপ্রাণে বয়ে নিয়ে যাওয়া জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর না হয় পুরুষকারকে অবলম্বন করে সংগ্রামে নেমে পড়া। যে-পত্রিকায় আমি

BanglaBook.org

এখন সামান্য সাংবাদিক, মনপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করলে হয়তো একদিন এইখানেই উচ্চতর পদের সঙ্গে যশ আর অর্থ সমাগমও নেহাত কিঞ্চিৎ হবে না। তখন এই দুই হাতিয়ারকে সম্বল করে স্বর্ণ-প্রাসাদ চূর্ণ করে রাজকন্যাকে জয় করে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না আমার পক্ষে। আর এই শেষের পথটিই আমি বেছে নিলাম—যদিও দুস্তর এই পথ বহু বিঘ্নে বন্ধুর, তবুও পিছু হটে আসার কথা কিছুতেই ভাবতে পারলাম না।

কবিতা রায়ের মুখদর্শন না করার প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত আর রাখতে পারিনি আমি। দেখা-সাক্ষাৎ পুরোদমেই চলছিল। কখনও গেলর্ড, কখনও লিবার্টি, কখনও জুহু, আবার কখনও বেসিন ফোর্টে মিলতাম আমরা। বন্ধুর মতো সহজ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। তার আর আমার মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান, তা সে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করত। কিন্তু তবুও সে সমানে তার মিষ্টি হাসির অমৃত-সিঞ্চনে নিত্য সঞ্জীবিত করে চলেছিল আমার অন্তরের আনন্দ-উৎস। দিনের-পর-দিন দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করেছে সে নিজেই—অকুণ্ঠ, সহস্র, স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে নিবিড়তর করে তুলেছে আমাদের পরিচয়। আর আজ সোমেশ রায়ের দেওয়া স্টিমার-পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর মূলেও আছে সে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত সাগরবিহার, দ্বিতীয়ত পুরুষসিংহ সোমেশ রায়ের সঙ্গে তাঁরই প্রাসাদতুল্য আধুনিক বজরাতে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া।

ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল আমার। অথচ ভেবে পেলাম না বৃদ্ধ সোমেশ রায়কে এত বেশি ভয় পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে আমার। বংশমর্যাদার দিক দিয়ে নিতান্ত কম যাই না আমি। বোম্বাইতে না হোক, কলকাতায় আমার কুলপরিচয় দিলে এখনও সম্মান পাওয়া যায় সমাজের বনেদিমহলে। পক্ষান্তরে, শুধু সোনার বাট সাজাতে-সাজাতেই সন্ধে ঘনিয়ে এল সোমেশ রায়ের জীবনে। টাকা আর টাকা। টাকা ছাড়া দুনিয়াতে ভদ্রলোকের কাছে সত্য বস্তু আর কিছুই নেই। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর যে-ক'টি কোম্পানির কাগজ পেয়েছিলাম, সেগুলো তো বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের বিপুল অর্থ-সমুদ্রের তুলনায় নগণ্য ক'টি বিন্দু। অর্থ আর অর্থ! অর্থ ছাড়া প্রতিভার কোনও আদরই নেই তাঁর কাছে।

ধুত্তোর, কী আর করব এত ভেবে। আমাদের মোলাকাতের জন্য কবিতা যখন এত বড় একটা পার্টির আয়োজনই করে ফেলল, তখন যাবই আমি। অর্থ-সম্রাট সোমেশ রায়কে কেন যে লোকে এত ডরায়, তা দেখতে হবে স্বচক্ষে। শেখর শর্মা ঠিকই বলেছেন। ধনীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে নতুন ডিনার-সুটের কোনও প্রয়োজনই নেই আমার। যে-শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা নিয়েই—।

হঠাৎ শার্টের কথা ভাবতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমার এলোমেলো চিন্তা। যে-শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা তো সামনের শুক্রবারের আগে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ঘরেতেও ধোয়া জামাকাপড় নেই একটিও।

কী নিয়ে যাব আমি? লন্ড্রিতে আজ ধুতে দিলে শনিবারের আগে তো আর পাওয়ার উপায় নেই। নতুন শার্ট কেনারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে ওই পঞ্চাশ টাকা থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা দিয়ে আর বেয়ারা-খানসামাদের কাছে ইজ্জত রক্ষা করা যাবে না। তাই তো, করি কী তাহলে?

মহা চিন্তায় পড়লাম আমি। অদূরে কাঠের পার্টিশন দেওয়া পায়রার খুপরির মতো ছোট্ট ঘরটায় শেখর শর্মা নির্দয় চোখে অগ্নিবৃষ্টি করছিলেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার শেষ সংস্করণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। ওঁর কাছে আরও কিছু চাইলে হয় না? কিন্তু দৃশ্যটি বিশেষ আশাপ্রদ মনে হল না। তারপরই হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল ওয়ার্ডেন রোডে একটা চীনা লন্ড্রির সাইনবোর্ড। ও-পথে যেতে-আসতে বহুবার বোর্ডটা চোখে পড়েছে আমার। আঁকাবাঁকা চীনা কায়দায় তাতে লেখা আছে, সকাল আটটার মধ্যে ময়লা পোশাক দিয়ে গেলে সেইদিন তা পরিষ্কার করে ফেরত দেওয়া হয় সন্ধের সময়ে।

BanglaBook.org

মহোপকারী চীনা ভদ্রলোকটির নামটাও মনে পড়ল আমার—হনলুলু স্যাম। মনে পড়ামাত্র আর অযথা দেরি করলাম না। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সম্পাদকীয়তে তন্ময় শেখর শর্মাকে আর না ঘাঁটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।

প্রোগ্রামটা মনে-মনে তৈরি করে নিলাম। প্রথমেই আশপাশের কোনও হোটেলে ঢুকে রাতের আহারটা সেরে নিয়ে যাব আমার ঘরে। সেখান থেকে সিধে হনলুলু স্যামের দোকানে—ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা তার হাতে সঁপে দিয়ে ফিরব আপন শয্যায়; পরিপাটি নিদ্রা দেওয়া দরকার। বহুদিন আশা মিটিয়ে ঘুমোনোর সুযোগ পাইনি—আজ যখন পেয়েছি, তখন তার সদ্ব্যবহার করবই।

কিন্তু বোম্বাইয়ের মতো নিশীথ-নগরীতে সকাল-সকাল ঘরে ফেরা তো আর সহজ কথা নয়। হোটেলেই কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ছাড়া যখন পেলাম, তখন আর চীনা ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ করা সমীচীন বোধ করলাম না। ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা সুটকেসে পুরে মাথার কাছে রেখে অ্যালার্ম ঘড়িটার কাঁটা ভোর ছ'টায় ঘুরিয়ে রেখে টান-টান হলাম শয্যায়।

মনকে আশ্বাস দিলাম, স্টিমারে যেভাবেই হোক খেদ মিটিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করব আমি।

পরের দিন সকাল ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে হনলুলু স্যামের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালাম।

সুটকেস খুলে প্যাকেটটা কাউন্টারে রাখতে-রাখতে হাঁক দিলাম, 'আজই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চাই।'

'আজকেই পাবেন ঠিক, তবে সাড়ে পাঁচটায় কি সাড়ে সাতটায় তা বলতে পারছি না—আটটার আগে দেব ঠিকই।'

'উঁহু, ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় চাই সব ক'টা পোশাক।'

কাচের মতো স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়লে হনলুলু স্যাম।

মোক্ষম দাওয়াই দিলাম এবার। কড়কড়ে একটা দু-টাকার নোট কাউন্টারে রেখে বললাম, 'জলদি দেওয়ার আলাদা চার্জ—হবে না এবার?'

'হবে।' স্ফটিক-স্বচ্ছ চোখ দুটো চিকচিক করে ওর।

'শাবাশ!' অন্তরের সঙ্গেই স্যাম মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করে ফেলি। টাকাটা অবশ্য ডেলিভারি দেওয়ার সময়ে দিলেই চলত, তবুও ভাবলাম এ রকম পরিস্থিতিতে কর্তব্যনিষ্ঠ চীনাম্যানদের বিনাবাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করা উচিত আমার। কথায় কখনও নড়চড় হয় না ওদের, তা কে না জানে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেছিলাম সেদিন। উঠেই ঘুম-ঘুম চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। পাঁচখানা ধোয়া শার্ট, আনুষঙ্গিক ট্রাউজার, নেকটাই আর একখানা আস্ত কোট—এই বিপুল পোশাক-সম্ভার নিয়ে যাব আজ সোমেশ রায়ের আধুনিক বজরায়। নাই বা রইল নতুন ডিনার-সুট—তাতে কী আসে-যায়। কবিতা তো রইলই, তার মধুমুখ, তার মৃদু হাসি, তার সুধাভরা আঁখিই রইল আমার সব গর্ব আর আনন্দের উৎসে, রইল আমার না-থাকা সম্পদ-জৌলুসের পরিপূরক হয়ে—নাই বা থাকল সেথায় জমকালো পোশাকের চোখধাঁধানো পারিপাট্য। একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো শুভ্রসুন্দর কবিতার কথা ভাবতেই মনটা বড় খুশি-খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ রবি ঠাকুরকে মনে পড়ে গেল। তাই 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে পুঞ্জ-পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল' আবৃত্তি করতে-করতে ঢুকলাম অফিসে।

আর তৎক্ষণাৎ আমার দ্রাক্ষাকুঞ্জবনের সব দ্রাক্ষারসই লুটেপুটে নিলেন শেখর শর্মা—আমাকে অত্যন্ত কঠিন একটা কাজে পাঠিয়ে। সারাদিন ওই এক কাজ নিয়েই ছুটোছুটি করে কাটল—খাওয়ার সময় পেলাম না। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময় সুটকেসটা আঁকড়ে সবে বন্দুকের গুলির মতো বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সামনে দরজার পথ আটকালেন শেখর শর্মা।

BanglaBook.org

বললেন, 'শুভেচ্ছা রইল ফুটো কাপ্তেন। এইমাত্র খবর পেলাম একজন বেজায়-সম্মানিত ভদ্রলোকও সঙ্গদান করবেন তোমাদের।'

'ডিউক অব এডিনবরা?'

'হুম। সোমনাথ মুখার্জি।'

'অ্যাঁ! সোমনাথ মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, সোমনাথ মুখার্জি। তোমার-আমার একমাত্র অন্নদাতা প্রভু আর এ-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী স্বয়ং সোমনাথ মুখার্জি। চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে যিনি অঙ্গুলি হেলনে আমাদের প্রত্যেককেই পথে বসাতে পারেন, অথচ যাঁর অসীম অনুগ্রহে এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তেই রয়েছি আমরা। কাজেই, বুঝতেই পারছ, কত বড় সুযোগ তুমি পাচ্ছ। এ মহাসুযোগ চাঁদের আলোয় কবিতা আবৃত্তি করে নষ্ট না করে কাজে লাগিও, তাঁকে সম্মান দিও, তাঁর স্নেহ অর্জনেব চেষ্টার কসুর কোরো না। তারপর যখন অতিরিক্ত কাজের চাপে চোখ মুদব আমি—হপ্তাখানেকের মধ্যেই তা ঘটতে পাবে—তখন আমাব এ-কাজের দায়িত্ব হয়তো তোমাকেই দিতে পারেন উনি।'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করাব কোনও সদিচ্ছাই নেই আমাব।' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমি।

'ননসেন্স! অন্ততপক্ষে তিনশোবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হযেছি আমি, আর প্রতিবারই পরিতাপের অন্ত ছিল না আমার। যাকগে, না গেলেই তাহলে ভালো করতে হে। কোনওবকমে ঠান্ডা লাগিয়ে হুপিংকাফ তৈরি করে ফ্যালো, না হয় ডিসেন্ট্রি—তাহলেই তোমার জায়গায় আর একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'রাবিশ।'

'আজ বেস্পতিবার।'

'তাতে কী?'

'বেস্পতিবাবের বাববেলা।'

'ফুঃ।'

'তার ওপর তেরো তারিখ। কী বুঝলে?'

'কিস্‌সু না। চললাম।'

'যত্ত সব—।'

বাকি কথাগুলো আর কানে ঢুকল না—ততক্ষণে আমি অফিস-ফেরতা পথচারীদের মধ্যে দিয়ে উল্কাবেগে ধেয়ে চলেছি হনলুলু স্যামের দর্শন অভিলাষে।

সবে অফিস ভেঙেছে তখন। ফুটপাতের জনস্রোত ঠেলে যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম, তখন বিবাট কিউ দাঁড়িয়ে গেছে শেডের তলায়। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো সে-দীর্ঘ সারি দেখে বাসে চড়ার আশা ত্যাগ করে ভিড় ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললাম ওয়ার্ডেন রোডের হনলুলু স্যামের ধৌতাগার অভিমুখে। ওখান থেকেই সিধে যাব আলেকজান্দ্রা ডকে। তারপর সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ব আমি আর কবিতা। কে জানে, হয়তো এই সাগর-বিহারই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সূচনা করবে নতুন অধ্যায়ের।

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে সবে কেম্পস কর্নারে পৌঁছেছি। চার রাস্তার মোড়—তাই যানবাহন দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। হিউজেস রোড দিয়ে আসা অত্যন্ত মূল্যবান একটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ভ্রাচমকা লাফিয়ে উঠল আমার হৃদযন্ত্রটি।

একেবারে কানের কাছে শুনলাম এক অতি পরিচিত মধু-কণ্ঠ: 'এই তো মৃগাঙ্ক!'

দেখি, গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে কবিতার হাসি-হাসি মুখটি।

অহো, সে কী দৃশ্য! কালো চোখের সে-আলো দেখেই নিমেষে মুছে গেল আমার সারাদিনের ক্লান্তি। কিন্তু সে-মুহূর্তে এ-দৃশ্যটা না দেখলেই খুশি হতাম আরও। কিন্তু একেবারে চোখে-চোখে তাকিয়ে ফেলেছি—কাজেই না-দেখার ভান করা আর চলে না কোনওমতেই। অগত্যা একটা ট্যাক্সির পাশ দিয়ে এসে পৌঁছলাম জানলার পাশে—ও ততক্ষণে একটা দরজা খুলে ধরেছে।

মহা খুশিতে রনরনিয়ে ওঠে ওর স্বর, 'ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল! আমরাও চলেছি ডকে। উঠে পড়ো।'

উঠে পড়ো! ধোয়া পোশাক না নিয়েই! হিমশীতল একটা স্রোত শিরশির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কী কুক্ষণেই হেঁটে এসেছিলাম। গাড়ির মধ্যে দেখলাম আরও জনাতিনেক বসে। এপাশে একজন বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা আর ওপাশে দুজন পলিতকেশ পুরুষ। তাঁদের একজন যে সোমেশ রায়, তা না বললেও বুঝতে দেরি হল না আমার। আর, অপরজন সোমনাথ মুখার্জি স্বয়ং। পাশাপাশি বসে দুজন ধনকুবের; যেন দুটি সজীব ব্যাঙ্ক।

'কিছু মনে কোরো না,' আমতা-আমতা করি আমি, 'দারুণ জরুরি একটা কাজ সারতে হবে। পরে দেখা করব'খন।'

'চলেছ কোন দিকে?' শুধোয় কবিতা।

'ইয়ে—এই তো এই দিকে।'

'তবে উঠে এসো। গাড়ি ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

লাখ টাকা দামের গাড়িতে চড়ে হনলুলু স্যামের দোকানের সামনে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করেই শিউরে উঠলাম আমি।

বললাম, 'আরে না-না, কী দরকার মিছিমিছি এদিক দিয়ে যাওয়ার। তুমি চলে যাও—একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখুনি আসছি আমি।'

ট্র্যাফিক পুলিশের এগোবার নির্দেশ পাওয়ায় সোমেশ রায়ের গাড়ির ঠিক পেছনের অধৈর্য ড্রাইভারটা অত্যন্ত অভদ্রভাবে হর্ন টিপতে শুরু করে দিয়েছিল।

বিপন্ন সুরে বলি আমি, 'তুমি এগোও কবি।' সাৎ করে একটা গাড়ি গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সামনে।

'সামনের ওই ব্লকটায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব, বুঝলে?' মিষ্টি হেসে বলল। বাধ্যতা গুণটা বাস্তবিকই নেই ওর মধ্যে। তারপরেই হাত বাড়ায়, 'দাও তোমার সুটকেসটা, গাড়িতে রেখে দিচ্ছি।'

'আরে...ইয়ে...না...না।' প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি আমি সুটকেসটা : 'দরকার আছে যে, আমার কাছেই থাকুক না।'

মস্ত একটা লন্ড্রি-প্যাকেট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সোমেশ রায়ের সামনে হাজির হওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করেই লাল হয়ে উঠি আমি। পেছনের হট্টগোল ততক্ষণে তুমুল হয়ে উঠেছে; ট্র্যাফিক কনস্টেবল নিজেও এগিয়ে এল এদিকে।

'ক্যায়া ঝামেলা সাব?' মাতৃভাষা প্রয়োগ করে নীল কুর্তা পরা মহারাষ্ট্রীয়।

'যাও কবি, এগোও তুমি।' অনুনয় ফুটে ওঠে আমার কণ্ঠে।

এবারে পেয়েছি আইনের সাহায্য। তাই আর অকারণতার চেষ্টা করল না ও। তা ছাড়া আমার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখেও বোধ করি দয়া হল ওর। সিটের পেছনে হেলে পড়ে কনস্টেবলের মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা ও বন্ধ করে দিলে।

'বেশি দেরি কোরো না যেন!' হাসি মুখে বলে ও।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। কবিতার কথার উত্তরস্বরূপ কোনওরকমে একটা কাষ্ঠহাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তুললাম আমি। তারপরেই মূল্যবান সুটকেসটা আঁকড়ে ধরে সচল গাড়ি-

BanglaBook.org

অরণ্যের মধ্য দিয়ে হর্নের বিকট শব্দ উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে চললাম অপর দিকের ফুটপাতে। মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে উর্দিপরা কয়েকজন ড্রাইভারের কটূক্তি শুনতে-শুনতে ওপাশে পৌঁছে জেট-গতিতে এগিয়ে চললাম হনলুলু স্যামের দোকানের দিকে।

ভেতরে ঢুকেই লাল কাগজের মেমোটা আছড়ে ফেললাম কাউন্টারের ওপর। তারপর সুটকেস রেখে স্ট্র্যাপ খুলতে-খুলতে জোর হাঁক দিলাম, 'কই হে, গেলে কোথায়? জলদি, জলদি করো—চটপট বার করো জামাপ্যান্টগুলো।'

ধীরে-সুস্থে পেছনের আলমারির ফাঁক থেকে যে-মূর্তিটি বেরিয়ে এল, সে হনলুলু স্যাম নয়। বয়েসের ভারে ন্যুব্জ এক চীনা বৃদ্ধ—নাকের ডগায় ধূমাচ্ছন্ন লেন্সের একটা ট্যারাবাঁকা চশমা। হনলুলু তাহলে দোকানে নেই—কাজে গেছে নিশ্চয়।

সুটকেস ততক্ষণে খোলা হয়ে গেছে। ডালাটা তুলে ধরে অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? জলদি বার করো প্যাকেটটা।'

কিন্তু চটপট কাজ না করার মহা গুণটি বোধহয় চীনা বুড়োর জন্মগত। তাই ধীরে-সুস্থে চশমার ধোঁয়াটে লেন্স দুটো জামার ঢলঢলে হাতায় মুছে তুলল লাল মেমোটা। তারপর র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসহায় ভঙ্গিমায়।

'প্লিজ! প্লিজ!' মিনতিতে করুণ হয়ে ওঠে আমার স্বর ঃ 'বাড়তি টাকা দিয়েছি এ জন্যে—হনলুলু স্যাম আমায় কথা দিয়েছে সাড়ে পাঁচটায় ডেলিভারি দেবে। দাও, দাও আমায়, দেখি—ধুত্তোর, কী যে ছাই লিখেছে, বুঝতেই পারছি না কিছু। আরে গেল যা, তুমি আবার হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন—দ্যাখো না ওদিককার আলমারিতে।'

এমন ভর্ৎসনা মেশানো চোখে আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধ, যার অর্থটা দাঁড়ায় 'শান্ত হও, শান্ত হও, এত ছটোপাটি কেন?' চশমার কাচদুটো আবার ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল। সেইভাবেই আবার ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল আলমারির সামনে। আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে মুণ্ডপাত করতে লাগলাম প্রায় অন্ধ স্থবিরটার। কিছুক্ষণ পরে বেশ বড় আকারের একটা প্যাকেট টেনে নিয়ে এগিয়ে এল ও। হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে সুটকেসে পুরে স্ট্র্যাপ লাগাতে লাগলাম দ্রুত হাতে। তখনও লাল মেমোটা নাকের ছ'ইঞ্চি দূরে রেখে চোখের কসরত করছিল বুড়ো চীনেটি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলল ও, 'থ্রি লুপিজ।'

'দারুণ সস্তা রে!' বাংলায় মন্তব্য করে চটপট বার করে দিই পাঁচ টাকার একটা নোট। তারপর ওর হাত থেকে রুপোর টাকা দুটো একরকম ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরতে-পুরতে ছুটলাম দরজার দিকে। চীনেটি ততক্ষণে জামার ঢিলে আস্তিন দিয়ে আবার চশমার কাচ মুছতে শুরু করেছে।

'জোরে হাঁটো' প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার মতো জোরে হেঁটে যখন গোয়ালিয়র ট্যাঙ্কের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম, দেখি, জমকালো গাড়িখানা পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আমার জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভারের ঝকঝকে তকমা আঁটা নেপালি সহকারী বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে পৌঁছনোমাত্র সুটকেসটা হাত থেকে টেনে নিয়ে খুলে ধরল পেছনের দরজা। ক্ষণেকের জন্যে শ্বাস রুদ্ধ রেখে পরমুহূর্তেই উঠে পড়লাম ভেতরে। মাঝের কোলাপসিবল চেয়ার দুটোর একটায় বসেছিল কবিতা—অপরটা দখল করলাম আমি। ওর দিকে ফিরে বসলাম আমি—কবিতাও কাত হয়ে ফিরল আমার দিকে; তারপর শুরু হল আলাপ-পরিচয়।

'পিসিমা, ইনিই মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্ক রায়।' মাথা হেলিয়ে হালফ্যাশানি কায়দায় অভিবাদন জানালাম আমি। পেছনের সিটে স্থান অকুলান হওয়ার মূল কারণ বিপুলকায়া রাশভারী প্রকৃতির মহিলাটিও মাথা হেলালেন—তবে কঠোর চোখে।

'সোমনাথকাকাকে চেনো তো?' বলে চলে কবিতা, 'চিনবে বইকি, ওঁর কাগজেই তো কাজ করো তুমি।'

BanglaBook.org

অন্নদাতা ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা মসৃণ চোখে চোখ রাখলাম আমি। সোমনাথ মুখার্জিকে দেখতে অনেকটা কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো। তাঁর অত নামডাকের মূল কারণ অবশ্য তা নয়।

'নমস্কার স্যার।' একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলি আমি। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন বরফ দিয়ে তৈরি একজোড়া ধারালো ছুরি।

'আর ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনিই মিস্টার রায়।'

রোগা-রোগা ছোট্ট একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন সোমেশ রায়। মানুষটি সত্যই খুব ছোটখাটো। প্রখ্যাত শিল্পপতির নাম করলেই যেরকম ছবিটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সে ধরনের নয় মোটেই। ভাবলেশহীন শীর্ণ মুখ—কিন্তু চোখ দুটো বেশ স্বপ্নমদির। সে-চোখ দেখে কিছুতেই অনুমান করা যায় না যে, কী প্রখর ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তাঁর ওই শান্ত-সুন্দর মণিকার অন্তরালে। আর যে-বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের সামান্য স্ফুরণমাত্রই প্রতিপক্ষের অর্ধেক সাহসই যায় উবে, তার ছায়াও ছিল না তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখে, ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে। পক্ষান্তরে, পাশেই বিন্ধ্যাচলের মতো আসীন মহিলাটি তাঁর চেয়েও অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর সর্ব অবয়বে। ভদ্রমহিলা সে-বিষয়ে বেশ সচেতনও বটে।

সোমেশ রায়ই প্রথম কথা বললেন, 'খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কবিতা তো প্রায়ই আপনার কথা বলে আমায়।'

বিগলিত সুরে বললাম, 'আপনাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার যা উপকার করলেন—।'

'অফিসের কাজেই আসা হয়েছে নিশ্চয়?' কীরকম যেন রুক্ষ স্বরে শুধোলেন সোমনাথ মুখার্জি।

একটু থতমত খেয়ে গেলাম আমি। কিছু বলার আগেই কিন্তু সোমেশ রায় উত্তর দিলেন, 'আরে তা তো আছেই। কাজ তো আর চব্বিশ ঘণ্টা নয়। তা মিস্টার রায়, তারাপদ তরফদার মানুষটা বড় চমৎকার। প্রবন্ধের বেশ কিছু খোরাক পেয়ে যাবেন ওঁর কাছে। কিন্তু কাজ নিয়ে এসেছেন বলে পার্টির আনন্দ থেকে দূরে থাকবেন, তা চলবে না—এমনকী সোমনাথ থাকলেও নয়।' বলে যুগপৎ আমার আর সোমনাথ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসলেন সোমেশ রায়।

প্রত্যুত্তরে আপনাহতেই একটু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। মুখে বললাম, 'চেষ্টা করব, স্যার।'

অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে দিব্যি সহজ হয়ে উঠলাম এরপর। বাস্তবিকই, সোমেশ রায় ধনকুবের হলেও মানুষ হিসেবে অতি চমৎকার।

গাড়ি তখন গ্রান্ট রোডের মোড় ঘুরেছে। সোমেশ রায় বললেন, 'আচ্ছা, পার্টিটা খুব নীরস, নিরানন্দ হয়ে যাচ্ছে না তো? আপনি কী বলেন, মিস্টার রায়?'

উত্তর দিল কবিতা, 'সে আর এমনকী নতুন ব্যাপার, বাবা। তাই না পিসিমা?'

'তার শুরু তো দেখছি এখন থেকেই হল।' ফোঁস করে বলে নাসিকা কুঞ্চন করলেন পেছনের সিটের বিন্ধ্যাচলটি।

সোমেশ রায় বললেন, 'সে যাই হোক, মিসেস প্যাটেল তো আসছেনই।'

'মিসেস প্যাটেল!' ঘন ঝোপের মতো পুরু ভুরুজোড়া ওপরে তুললেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভুরু দুটো যে একেবারেই ওপরে তুলে ফেললে হে!' পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলেন সোমেশ রায়ঃ 'ভদ্রমহিলা হিসেবে মিসেস প্যাটেলের জুড়ি মেলা ভার শুনেছি। স্বচক্ষেই দেখব তা। অনেকদিন সিলোনে ছিলেন। তাই ওখানকার হালচাল সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হওয়া দরকার। জানোই তো, নিছক ফুর্তির জন্যে এবার আমি বেরোচ্ছি না। ফিরে আসার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্নের উত্তর আমায় জানতে হবে। সিলোন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে মানোয় নদীতে ব্রিজ তৈরির যে-কনট্র্যাক্টটা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই স্থির করা হল না। তোমাকে

BanglaBook.org

তো এ-বিষয়ে আগেই একবার বলেছিলাম না? কাজটা আদৌ শুরু করব কি না সেই চিন্তাই ঘুরছে এখন মাথায়। মিসেস প্যাটেল আর ডক্টর তরফদারের সঙ্গে দু-চার কথা কইলেই মনস্থির করে ফেলতে পারি।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'শুনলাম, চুনীলাল দয়াভাইও নাকি এ-ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছে? তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু তুমি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার মনে হওয়াটা যে চিরকালই একটা আজব ব্যাপার, তা ভালো করেই জানি। দয়াভাই যে একটা পাকা জোচ্চোর, তা কে না জানে? আমি যদি উঠে-পড়ে লাগি, তাহলে দয়াভাইয়ের ক্ষমতা নেই কনট্র্যাক্টটা ছিনিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। শুনলাম, সেই কারণেই আমি কী করি-না-করি তা জানার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে বেচারা। যদি মনে করি, তাহলে ওর খেলা আমি একেবারেই সাঙ্গ করে দিতে পারি।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়। সে-হাসিতে এবার আমি স্বপ্নের ছায়াও দেখলাম না। বললেন, 'যাই হোক, এখনও তো ক'টা দিন রয়েছে হাতে। এ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমি।'

'আরও একটা প্রশ্নের কথা বলছিলে না?' বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'অ্যাসেম্বলির ইলেকশান। আমি দাঁড়াব কি না ভাবছি।'

'বাবিশ।' গবগর করে ওঠেন মিঃ মুখার্জি : 'এসব বাজে ঝামেলায় আবার মাথা গলাচ্ছ কেন?'

পিসিমা মুখ খুললেন এবার : 'আমিও তাই বলছিলাম। কী দরকার এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করার?'

হাসিমুখে বললেন সোমেশ রায়, 'আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরিস্তর থাকে। এই কারণেই তো দেশমুখকে সঙ্গে নিচ্ছি আমি। আইনজ্ঞ বটে, কিন্তু রাজনীতির প্রশ্ন উঠলে ক্রেমলিন থেকে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত সব কিছুই নখের ডগায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন।'

'দেশমুখ!' স্বরের তিক্ততা আর গোপন রাখেন না সোমনাথ মুখার্জি।

পেছনের বিন্ধ্যাচলটি সময় বুঝে আবার সরব হয়ে ওঠে : 'যত্ত সব আজেবাজে লোকের ভিড়!'

আমার কিন্তু মনে হল, কথাটি বিশেষ সুরে বলে যেন একটু বিশেষ চোখেই তাকালেন আমার দিকে। মনে-মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি আমি।

'সাধারণ পার্টির একঘেয়েমি কাটিয়ে কতটা বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছি দেখো।' বলে চলেন সোমেশ রায়, 'আর সেইজন্যেই তো আমন্ত্রণ জানিয়েছি অলোক ঘোষকে।'

'অলোক ঘোষকে! চমৎকার! কবিতার তো খুশি হওয়া উচিত এ-খবর শুনে।' বলে আবার খরখরে চোখে পিসিমা তাকালেন আমার দিকে—এবারও সে-দৃষ্টির তাৎপর্য বড় গূঢ়।

বুঝলাম, ওঁরা রায় কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর অলোক ঘোষের কথা বলছেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে অলোক ঘোষ—সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে কবিতার বিয়ের গুজব একাধিকবার শুনেছি শহরের অভিজাতমহলে। কবিতার দিকে আড়চোখে তাকালাম আমি—ও কিন্তু দেখি নির্বিকারভাবে তাকিয়ে রয়েছে সিধে সামনের দিকে। ওর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মনের চিন্তাধারা।

গাড়ি তখন বোরিবন্দরের সার্কেলটা ঘুরছে।

হঠাৎ কথা কইলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সত্যিই আশ্চর্য!'

'কী আশ্চর্য?' শুধোন সোমেশ রায়।

'আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে যে, আজকের দিনে তুমি এত লোককে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলে কেন।'

BanglaBook.org

'কেন, হয়েছে কী তাতে?'

'একে বেস্পতিবারের বারবেলা, তার ওপর ইংরেজি মাসের তেরো তারিখ।'

'বারবেলা। তেরো তারিখ। তাই তো হে, আমার তো একেবারেই খেয়াল ছিল না।'

পেছন ফিরে সোমেশ রায়ের মুখের অকস্মাৎ গাম্ভীর্য দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম আমি।

মুচকি হাসলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'আমার তো মনে হয় না তোমার তা খেয়াল ছিল না। তোমার দুর্বলতা তো আমার অজানা নয়।'

'দুর্বলতা? কী সব আজেবাজে বকছ? ওসব বাজে সংস্কার সোমেশ রায়ের নেই।' বলে একটু হাসলেন উনি। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটিতে খুশির আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে : 'যতক্ষণ পয়মন্ত রুপোটা পকেটে রয়েছে আমার, ওসব তুচ্ছ কারণকে না ডরালেও চলবে আমার।'

পয়মন্ত রুপো? কবিতার দিকে তাকালাম আমি।

'এই,' ফিক করে হেসে ফেলে ফিসফিস করে বলে ও, 'বাবাকে যেন ও-কথাটা আবার জিগ্যেস করে বোসো না। অবশ্য আমার অবর্তমানে সে-দুরবস্থা তোমার হবে না ঠিকই—তবে এখন চুপ।'

আলেকজান্দ্রা ডকের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। এখানে মস্ত বড় একটা স্টিমশিপ কোম্পানির হোমরাচোমরা শেয়ার-হোল্ডার ছিলেন সোমেশ রায়। ভেতরে জেটির কাছে গিয়ে দেখি বেশ ঝকঝকে একটা লঞ্চ ভাসছে জলে। আরও চারজন অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ হল সেইখানেই। কবিতাই সে পর্বটা চটপট সেরে দিলে।

শিবেন্দ্র দেশমুখের সঙ্গে আলাপ আমার আজকের নয়। শেখর শর্মার নির্দেশে বহুবার তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হয়েছে। পুরুষের মতো দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের। কথাবার্তা কিন্তু খুব মোলায়েম।

বছর তিরিশ বয়স অলোক ঘোষের। ছিমছাম, মার্জিত চেহারা। ধরন-ধারণ ইংরেজি ঘেঁষা। পোশাক-পরিচ্ছদে কিন্তু উগ্র মার্কিনি ছাপ। মৃগাঙ্ক রায়ের সঙ্গে আলাপ করার কোনও আগ্রহই তাঁর ছিল না এবং তা গোপন করারও কোনও প্রচেষ্টা তিনি করলেন না।

বহু আয়াস সত্ত্বেও যে বয়েসে আর যৌবনের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তোলা যায় না, সেই বয়েসে এসে পৌঁছেছিলেন মিসেস প্যাটেল। যৌবনকালে নিশ্চয় পরাশ্রয়ী লতাবিশেষ ছিলেন ভদ্রমহিলা। এখন অবশ্য কিছু অবাঞ্ছিত মেদের আবির্ভাবে সুডৌল দেহরেখাগুলি লোপ পাওয়ায় সুপুষ্ট আশ্রয়গুলোও হঠাৎ ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। তাতে কিন্তু মোটেই দমেননি তিনি। পুরোদমে কিউটেক্স-লিপস্টিক-ম্যাক্স ফ্যাক্টর দিয়ে চেষ্টা করছেন পুরোনো অভ্যাস বজায় রাখার।

ডক্টর তারাপদ তরফদারকে দেখে কিন্তু অনেকটা শান্তি পেল আমার চোখ দুটো। চেহারা বটে তাঁর। লম্বায় সাড়ে ছ'ফুটের কম তো নয়ই—সেইসঙ্গে যেমনি চওড়া তাঁর বুকের ছাতি, তেমনি সুপুষ্ট তাঁর কাঁধের মাংসপেশি। সে-স্বাস্থ্য দেখে তরুণী তো দূরের কথা, অনেক পুরুষেরও মাথা ঘুরে যায়। রেশমের মতো একমাথা নরম ঢেউতোলা চুল, রাঙা মুখ আর পরনে ট্রাইডের মূল্যবান সুট। ভদ্রলোক কিন্তু যতবার কবিতা রায়ের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছিলেন, ততবারই কীরকম যেন খচখচ করে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটা। শুধু আমি কেন, সুপুরুষ অলোক ঘোষও বোধ করি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন মনে-মনে; তাই মাপজোক করা সূক্ষ্ম হাসি আর মার্জিত কথার মধ্যে দিয়েও মাঝে-মাঝে প্রগলভ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন কবিতার সঙ্গে।

সাদা পোশাক পরা নেপালি পরিচারক দুজন আমাদের মালপত্র তুলছিল লঞ্চে। ওদের কাজ শেষ হলে পর অভ্যাগতরা একে-একে উঠতে শুরু করলেন। আমার ইচ্ছে ছিল কবিতার ঠিক পাশের আসনটি দখল করা। কিন্তু তারাপদ তরফদার আর অলোক ঘোষ এদিক দিয়ে আমার চেয়ে আশ্চর্য রকমের তৎপর। আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে এমন ঝটিতি দুজনে এগিয়ে গেলেন যে, শুধু দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমার। যাত্রারম্ভেই প্রতিযোগিতার এই নমুনা দেখে অনুমান করে নিলাম, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে শুরু হবে আমার সংগ্রাম। করুণ নয়নে একবার তারাপদ-অলোক বেষ্টিত কবিতাকে দেখে নিয়ে বসলাম মিসেস প্যাটেলের পাশে।

ফটফট শব্দে জল কেটে লঞ্চটা এগিয়ে চলল 'জলপরী' লেখা সোমেশ রায়ের বিরাট স্টিম-বজরার দিকে।

বজরার একপ্রান্তে দুপাশে ডানামেলা মস্ত বড় একটা জলপরীর হাসি-হাসি মুখের দিকে বিরস-বদনে তাকিয়ে বসেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিসেস প্যাটেল।

'কী মজা। কতদিন যে স্টিমার-পার্টিতে আসিনি। ওঃ, সে যে কত যুগ হয়ে গেল তার হিসেব নেই।'

আশ্চর্য কী। মনে-মনেই বলি আমি। সাগর-বিহারে যাওয়ার বয়স বেশ কয়েক বছর আগেই ফেলে এসেছেন আপনি। মুখে বললাম, 'যাই বলুন, বড়লোক হওয়ার অনেক সুবিধে, তাই না?'

'সত্যি কথাই বলেছেন।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস প্যাটেল : 'নিজের চেষ্টায় কোটিপতি হওয়ার মধ্যে যে-তৃপ্তি আছে, তার তুলনা নেই। আমাকে কিন্তু আপনার সব কথাই বলতে হবে—কিছুই তো জানি না আমি।'

'আমি!' প্রমাদ গনি আমি : 'মস্ত একটা ভুল করে ফেললেন মিসেস প্যাটেল। কোটি কেন, হাজারের ঘরে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। সামান্য একজন রিপোর্টার আমি।'

'রিপোর্টার!' একটু ফিকে হয়ে আসে প্রৌঢ়ার হাসি। কিন্তু প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরমুহূর্তেই আবার সুর তোলেন : 'সে তো আরও চমৎকার। রিপোর্টার—তার মানে—তার মানে হাজার রকমের অভিজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছেন আপনার ঝুলিতে। ও, ওয়াণ্ডারফুল। আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে।'

সপ্তদশী সুলভ 'আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে' চপল সুরের অনুরণন প্রৌঢ়ার কণ্ঠে শুনে ভেতরে-ভেতরে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি আমি। বলি, 'নিশ্চয়। কাজের ঝামেলা না থাকলে এত্তার গল্প করা যাবে আপনার সঙ্গে, কী বলেন?'

'কাজের ঝামেলা?' পেনসিল আঁকা ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গেল।

'ইয়ে—মানে ডক্টর তরফদারের সঙ্গে আমায় একটু বসতে হবে বলেই আমার আগমন এখানে। ভদ্রলোক সিংহলে বেশ কিছুদিন ছিলেন তো—অভিজ্ঞতা ওঁর প্রচুর।'

বাঁকা ভুরুটা আবার নেমে এল স্বস্থানে। এবার লিপস্টিক-রঞ্জিত অধর বেঁকিয়ে হাসলেন মিসেস প্যাটেল।

'বটে। আপনি বোধ হয় জানেন না, ডক্টর তরফদার আমার বহুদিনের—ইয়ে—বন্ধু। সিংহলে থাকার সময়ে আমাদের পরিচয় হয়। ভদ্রলোক কথা বলেন সুন্দর, গল্পও জমাতে পারেন চমৎকার। তবে কী জানেন, ওঁর সব কথাই ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস না করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। একটু বেশি রকমের কল্পনাপ্রবণ কিনা, তাই।'

বলে, সুর্মা-আঁকা চোখ তুলে তাকালেন অদূরে তরফদারের পানে—সে-দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও দেখলাম না। তরফদার তখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে যুগপৎ হাত আর মুখ নেড়ে কোনও গূঢ় বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন কবিতাকে।

'জলপরী'-র ডেকে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। লঞ্চ এসে দাঁড়াতেই কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানালে সোমেশ রায়কে। সাদা ইউনিফর্ম পরা নেপালিরা আমাদের মালপত্র তুলতে লাগল ওপরে।

সবাই উঠে আসার পর বললেন সোমেশ রায়, 'ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। আপনাদের মালপত্র ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পর চলে আসুন সবাই স্মোকিংরুমে—গল্পগুজব করা যাবে। কী বলেন?'

BanglaBook.org

'আর আমরা?' পেছন থেকে কবিতা বলে ওঠে, 'আমরা কি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের হাওয়া খাব?'

'আরে-আরে, তা কেন! মেয়েরাও তো আসবে।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়, 'আমি ভাবলাম মেয়েরা বুঝি ব্যস্ত থাকবে অন্য কিছু নিয়ে!'

আসলে, মেয়েদের কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেছলেন। ওঁর প্রকৃতিই এইরকম। নিজে পুরুষসিংহ, তাই অন্তরে-অন্তরে পছন্দ করেন পুরুষদেরই সান্নিধ্য।

মাথায়, পিঠে, দু-হাতে বিপুলায়তন সুটকেস, কিটব্যাগ ঝুলিয়ে একজন নেপালি এসে বিনীতভাবে আহ্বান জানালে আমায়। পিছু-পিছু এগিয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে দেখি তরফদারও এলেন। দেখেই সন্দেহ হল হয়তো-বা একই ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হবে দুজনকে। আর, তার পরিণাম যে কী, তা না বললেও চলে। ওই পর্বত-প্রমাণ মালপত্র সমেত ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের তিন-চতুর্থাংশ দখল করে নির্বিকারভাবে চতুর্থ কোণটিতে আমায় নিক্ষেপ করবেন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসার পর নেপালিটা কিন্তু অতি কষ্টে একটু কাত হয়ে আমার সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বাকি মালপত্র সমেত পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল ভেতরের কেবিনে। তরফদারও গেলেন পেছনে। ভেতর থেকে শুনলাম নেপালি স্বর, 'আপকা কামরা।' তারপর বেরিয়ে এসে তুলে নিলে আমার সুটকেস। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। এক ঘরে একসঙ্গে থাকাটা মোটেই পছন্দ হয় না আমার।

ঠিক পরের দরজাটা খুলে ধরল নেপালিটি—সুটকেস ভেতরে রেখে জানালে এ-ঘর আমার।

'বাঃ চমৎকার। সব ঘরটাই আমার তো?'

'জি হাঁ সাব। জলপরীমে ফিফটিন বেডরুম হ্যায়।'

'বহুত আচ্ছা। জলপরী জিন্দাবাদ।'

'বাথরুম ইধার হ্যায়,' বলে পাশের ছোট্ট ঘরটা খুলে ধরল সে।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। মাইশোর গেস্ট হাউসের বাথরুমের মতো ঝকমক করছে ভেতরটা—নিষ্কলঙ্ক সিঙ্ক আর আয়নার ঝিলমিলে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

হঠাৎ ওপাশের দরজাটা খুলে গেল—তারপরই দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের ক্রুদ্ধ মুখ। পরক্ষণেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'দো আদমি কা বাথরুম, সাব। আপকাভি।' বলে বেচারি নিজেও যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে।

মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল আমার। বললাম, 'সে-কথাটা ওদিককার সাবকে আগে ভালো করে সমঝে দিয়ে এসো—নইলে ও-বাথরুমে ইহজীবনেও ঢুকছি না আমি।'

বেরিয়ে যায় নেপালি-নন্দন। পাশের কেবিনে শুনলাম ওর কণ্ঠস্বর। তারপরই বাথরুমের লকে শব্দ হল ক্লিক এবং পরক্ষণেই ছোট দরজা খুলে সে ফিরে এল ঘরে। একগাল হেসে বললে, 'ঠিক হ্যায় সাব।'

'ঠিক হ্যায়। কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

'বলবাহাদুর।'

'বহুত আচ্ছা বলবাহাদুর—' বলে দু-টাকার একটা নোট তুলে দিলাম ওর হাতে। আর-একটু ছড়িয়ে পড়ে বাহাদুরের হাসি।

'উঁহু, সাব দরওয়াজা বন্ধ করকে চলা গ্যায়া। আপনি এদিক দিয়ে গিয়ে—।'

'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। ঠিক সময়ে স্নান সেরে নেব আমি, যাবড়াও মাত।'

নোটটা একবার উলটেপালটে দেখে নিয়ে টোকা মেরে সযত্নে পকেটে রেখে অন্তর্হিত হল বলবাহাদুর।

BanglaBook.org

পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বাইরে নীল আকাশকে অস্পষ্ট করে ছায়া-ধূসর গোধূলি নেমেছিল বোম্বাই নগরীর ওপর— প্রাসাদ শীর্ষ বুকে নিয়ে যেন সমস্ত পাষাণপুরীটাই দুলছিল আরব সাগরের নীল কোলে। ভাবলাম, এই তো জীবন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, নিরঙ্কুশ।

ঘরের মধ্যে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পা বাড়ালাম বাইরে।

ওপরের ডেকেই মুখোমুখি হয়ে গেল সোমেশ রায়ের সঙ্গে। আমাকে দেখেই সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন উনি।

'আসুন, আসুন, চলুন সবাই মিলে স্মোকিংরুমে, গল্পগুজব করা যাবে।'

আগে থেকেই স্মোকিংরুমে এসে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি। শুধু বসেছিলেন না, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে 'নোটিলস' আকারের একটা চুরুট থেকে সশব্দে এবং সবেগে ধূমোদগীরণ করছিলেন।

আমরা ঢুকতেই শুধোলেন উনি, 'কারেন্ট ম্যাগাজিনের প্যাকেটটা এনেছ, সোমেশ?'

'বলা বাহুল্য। কিন্তু এসেছ দু-দিন সমুদ্রের হাওয়া খেতে, এখানে ম্যাগাজিন পড়ার কী দরকারটা শুনি?' বলেন সোমেশ রায়।

'ও তুমি বুঝবে না। কারবার তো করো লোহালক্কড় নিয়ে—এসব ব্যাপারের কী বুঝবে হে?'

'শোনো কথা। আরে, এই তো সাংবাদিক ভায়া এসেছেন। ইনিও কী সঙ্গে ম্যাগাজিন এনেছেন বলতে চাও?'

'আনা উচিত ছিল।' গম্ভীর স্বরে বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ইয়ে...মানে—' গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে বলি আমি, 'এত তাড়াতাড়ি এলাম যে জামাকাপড় গুছোবারই সময় পেলাম না। তা না হলে—।'

দেশমুখ ঢুকলেন ঘরে।

'মিস্টার রায়, স্টিমার-পার্টির নাম করে এ যে একেবারে জাহাজে এনে ফেললেন দেখছি।'

'জাহাজ আর কোথায় বলুন!' খুশি-খুশি স্বরে বলেন সোমেশ রায়, 'দেখতে-শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়—এই যা।'

'মন্দ নয়। এমন সুন্দরভাবে সাজানো, এত বড় বজরা তো আমি জীবনে দেখিইনি, তার ওপর—।'

'আপনার জাহাজি কথা এখন থাকুক, মিস্টার দেশমুখ।' বাধা দিয়ে বললেন সোমনাথ মুখার্জি : 'সোমেশের মাথায় একটা উদ্ভট খেয়াল ঢুকেছে। অ্যাসেম্বলির ইলেকশানে নামবার বদ মতলব কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে জানি না, কিন্তু ওর যে মুখে চুনকালি মাখাই সার হবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই আমার।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' জবাব দিলেন দেশমুখ,'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাফল্যের ষোলো আনা সম্ভাবনাই রয়েছে ওঁর। আপনি নেমে পড়ুন মিস্টার, তারপর আমরা তো রইলামই।'

স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়, 'এখনও তো পাকাপাকিভাবে কিছুই ভেবে উঠিনি। পরে এ-প্রসঙ্গে আরও কথাবার্তা আছে। আরে, ডক্টর তরফদার যে, আসুন-আসুন। তারপর বলুন, ঘর কীরকম পেলেন? মনের মতো হয়েছে তো?'

'ওয়ান্ডারফুল! স্টিম এঞ্জিনে চলে, অথচ ভেতরে-বাইরে জমিদারি বজরার কায়দায় সাজানো—এরকম জলযানে তো মশায় আমার আগমন এই প্রথম। আর এ জন্যে যে আপনাকে কী ভাষায় ধন্যবাদ দেব, তা ভেবে পাচ্ছি না, মিস্টার রায়।'

'আপনাকে কিন্তু এখানে আমন্ত্রণ জানানোর মূলে আমার উদ্দেশ্য আছে প্রচুর। এই যেমন ধরুন না কেন, সিংহলে একটা বড় রকমের কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছে আছে। সে-বিষয়ে আপনার পরামর্শ দারুণ প্রয়োজন। তা ছাড়া—।'

BanglaBook.org

'সিংহল সম্বন্ধে যা কিছু জানি, তা যদি আপনার কোনও কাজে লাগে, তাহলে সত্যিই খুব খুশি হব আমি। অবশ্য আমার পরামর্শ কতটা কার্যকরী হবে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। আপনি ব্রিজ কনট্র্যাক্টের কথা বলছেন, না?'

'ধরেছেন ঠিক। খুব সিরিয়াসলি ভাবছি ব্যাপারটা।'

'কাজটা কিন্তু বেশ ঝুঁকির। কাজে নামার আগে অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু তাতেও এর রিস্ক কমবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার সঙ্গে আমিও একমত, ডক্টর।' বললেন অলোক ঘোষ। সবে ভেতরে এসে একটা কাউচ দখল করেছিলেন উনি।

'কিন্তু জানোই তো, ঝুঁকি আমি ভালোবাসি।' স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়।

'তা জানি। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তো।' একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনি যাই বলুন কাকাবাবু, এ ব্যাপারে কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারব না।'

'বার্মার লাইট হাউসের ব্যাপারেও হওনি।'

'সেক্ষেত্রে ভুল হতে পারে—কিন্তু এবার আর নয়। আবার বলছি আমি, এ ব্যাপারে নাক না গলানোই মঙ্গল। আপনি কী বলেন, ডক্টর?'

সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন তরফদার। বললেন, 'এ কনট্র্যাক্টে টাকা ঢালা মানেই তিন টেক্কার জুয়া খেলা। তিনটে টেক্কা পড়লেই লক্ষপতি—না পড়লেই ফকিব। স্রেফ লাক—আর কিস্‌সু না।'

'লাক!' মৃদু হাসি ফুটে ওঠে সোমেশ রায়ের ঠোঁটের কোণে : 'লাক! আর এই একটিমাত্র শব্দকেই সম্বল করে রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির এই জয়যাত্রা। সাঁইত্রিশ বছরেরও ওপর হল—তিন টেক্কা শুধু ঘুরে-ফিরে পড়ছে আমার দিকেই। লাক! কী বলেন? জীবনের দীর্ঘ সাঁইত্রিশটি বছব যে শুধু একটা লাকি পিসকে নিয়েই জীবন-যুদ্ধে জিতে এল, তার কী কখনও লাক-এর অভাব হয়?' বলে ঘড়ির পকেট থেকে বার করলেন চকচকে একটা রুপোর টাকা।

অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। অপর তিনজন কিন্তু সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মুদ্রাটির দিকে।

সস্নেহে টাকাটির দিকে তাকিয়েছিলেন সোমেশ রায়। ক্ষণেক পরে মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে রোজগার করেছিলাম টাকাটা—সেই আমার প্রথম উপার্জন। তখন আমার বয়স বছর এগারো হবে। বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। মাউন্ট মেরির ওপর মস্ত বড় একটা প্রাসাদ তৈরি হচ্ছিল—উনি সেখানেই কাজ করছিলেন। নিচ থেকে ইট আর টুকরো-টুকরো পাথব বয়ে আনার জন্যে একজন ছোকরার দরকার হওয়ায় বাবা আমায় কাজে লাগিয়ে দিলেন। পাহাড় ভেঙে-ভেঙে ইট বয়েছিলাম ওই অল্প বয়েসেই। মাথায় বোঝা চাপিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে যে কী কষ্ট হত, তা বোঝাতে পারব না কিছুতেই। ঘাড় টনটন করত, শিড়দাঁড়াটা যেন ভেঙে পড়তে চাইত—দরদর ঘামের ধারায় ভিজে উঠত সর্বাঙ্গ। এইভাবে কাজ করলাম ক'দিন। তারপর পেলাম এই টাকাটা। সযত্নে তা বুকপকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম বাবার সঙ্গে। পথে কত আলো-ঝলমল রঙচঙে লোভনীয় জিনিস সাজানো দোকান হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করে তুললে আমায়। বাবাও জিগ্যেস করলেন, "কী করবি রে টাকাটা নিয়ে?" বললাম, "খরচ করব না বাবা। আমার কাছেই চিরকাল থাকুক এটা।" আছেও। তারপর সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ফিরেছে টাকাটা। জীবনের কত অবিস্মরণীয় মুহূর্তে এই টাকার সান্নিধ্য আমায় শান্তি দিয়েছে, এনেছে সাফল্য। একে সঙ্গে রেখে যে-আত্মবিশ্বাস, মনোবল পেয়ে এসেছি তার তুলনা নেই। ১৯১০ সালে কলকাতার টাকশাল থেকে পিঠে-বুকে ছাপ নিয়ে পথে বেরিয়েছিল ছোট্ট এই রুপোর টুকরোটি। কিন্তু ওর ক্ষমতা অসীম, অপরিমেয়, অবিশ্বাস্য। আমার জীবন তার প্রমাণ।'

BanglaBook.org

স্বপ্নালু চোখে টাকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়। সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র সঙ্গী; রুক্ষ, ধূসর জীবনযাত্রার মূক সাক্ষী; বিপদে শক্তি, সাহস আর আত্মবিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ব্রিটিশ-সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখচ্ছবি আঁকা অতি সামান্যদর্শন ছোট্ট একটি রুপোর টাকা।

তরফদার এগিয়ে এসেছিলেন টাকাটা হাতে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু চকিতে হাত টেনে নিয়ে সোমেশ রায় তা রেখে দিলেন ঘড়ির পকেটে।

বললেন, 'আজও যে-কোনও সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এর সাহচর্য আর সাহায্য আমাকে শুধু সাফল্যের পথেই নিয়ে চলেছে।'

'রাবিশ!' মন্তব্য করলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'হতে পারে। কিন্তু শুনেছি চুনীলাল দয়াভাইয়ের অফিসে নাকি পাঁচ হাজার টাকার একটা অফার আছে সামান্য এই রুপোর টাকাটার জন্যে। রাবিশ, কী বলো, সোম?'

'চুনীলাল দয়াভাই ভালোভাবেই জানে তোমার মূর্খতা। তোমার মনের ওপর টাকা হারানোর প্রতিক্রিয়া যে কী নিদারুণ, তা তো তার অজানা নয়। আর সেই কারণেই পাঁচ হাজার কেন, ওর দ্বিগুণ টাকা দিতেও পেছপা হবে না তারা।'

'যথাসর্বস্ব দিলেও লাকি পিস্-এর ধারে-কাছে ঘেঁষার সাধ্য ওদের হবে না। যাক, চা এসে গেছে। আসুন, এক-একটা কাপ তুলে নেওয়া যাক।'

কাপে ঠোঁট ঠেকাবার আগে লক্ষ করলাম, উপস্থিত প্রত্যেকেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে ঘড়ির পকেটের ওপর।

সাতটার সময়ে ডিনারের জন্যে সাজগোজ করার উদ্দেশে রওনা হলাম ঘরের দিকে। সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। গাঢ় সবুজ রঙের একটা ভেলভেটের ব্লাউজের ওপর উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা শাড়ি জড়িয়ে ধরেছে ওর শ্রীঅঙ্গ। আহা, সে বরতনু দেখে নিমেষে যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল আমার সর্ব অঙ্গ।

আমার মুগ্ধ রসনা তৎপর হওয়ার আগেই কলকলিয়ে উঠল কবিতা, 'কীরকম আক্কেল বলো তো তোমাদের? কারও আর পাত্তা নেই? কখন থেকে একজন দোসর খুঁজছি—একলা কি আর সূর্যাস্ত দেখতে ভালোলাগে?'

'খাঁটি কথাই বলেছ। আগে থেকেই দরখাস্ত দিয়ে রাখছি—জায়গাটা যেন আর কেউ বেদখল না করে। কবি, আজকের এ-পার্টিতে আমাকে এনে যা উপকার তুমি করলে, কোনওদিনই তা শুধতে পারব না।'

'তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'শুধু খুশি! এরকম দুর্বল বিশেষণ ব্যবহার করছ কবি?'

'আমি জানতাম তুমি খুশি হবে। আমোদ-প্রমোদের হরেকরকম আয়োজন আছে জলপরীতে—বিস্তর খরচ করে বাবা তৈরি করেছিলেন শুধু এই কারণেই।'

'বজরার কথা মোটেই বলছি না আমি। একটা গাধাবোটেও যদি বেরোতাম তুমি আর আমি—আনন্দ আমার একতিলও কম হত না। জানোই তো—।'

সোমনাথ মুখার্জি আর অলোক ঘোষ পেছনে এসে পড়েছিলেন।

'কী মুশকিল!' চট করে সুর পালটে নেয় কবিতা, 'এতক্ষণ ধরে স্মোকিংরুমে কী করছিলেন বলুন তো? বাবা রুপোর টাকার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন নিশ্চয়?'

'তা আর বলতে!' বলেন মিঃ মুখার্জি।

বললাম, 'আমি কিন্তু গল্পটা শুনে খুব খুশি হলাম। ওঁর মনের গঠনের নতুন একটা পরিচয় পেলাম। ইট-পাথরের বোঝা মাথায় নিয়ে চড়াই বেয়ে ওঠার সে-দৃশ্য—।'

'বেচারা!' স্মিত মুখে বলল কবিতা, 'খারাপ লাগার মতো গল্প তো নয় ওটা। একবার শুনলেই

BanglaBook.org

ভালো লাগে। কিন্তু বারবার ওই একই কাহিনি যদি তোমার কানের কাছে দিবানিশি শোনানো হয়, তাহলে তোমার অবস্থাটা কীরকম দাঁড়ায় ভাবো তো? বিশ বছর ধরে একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি কি খুব চমৎকার লাগে শুনতে? মাঝে-মাঝে তাই তো ভাবি, ভগবান, দাও না কেন টাকাটা হারিয়ে।'

'আমিও,' সায় দেন অলোক ঘোষ : 'বিশেষ করে সিংহল-গভর্নমেন্টের ব্রিজ কনট্র্যাক্ট নেওয়ার মতো দুঃসাহস যখন তিনি দেখান, তখন ভাবি, চুলোয় যাক ওই চাঁদির চাকতিটা।'

'তবেই হয়েছে,' ছোট-ছোট চোখ নাচিয়ে বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সোমেশ তাহলে হার্টফেল করবে।'

'তা যা বলেছেন,' সায় দেন অলোক ঘোষ। তারপর যা বললেন, তা আর কানে ঢুকল না আমার। উর্ধ্বশ্বাসে কেবিনের দিকে যেতে-যেতে আমি তখন কল্পনার চোখে দেখছি কবিতার পাশে সুট পরে দাঁড়িয়ে সাগরের বুকে সূর্যাস্তের রঙিন দৃশ্য।

আমার অনেক আগেই স্মোকিংরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তরফদার। করিডর দিয়ে যেতে-যেতে শুনলাম কেবিনের মধ্যে উচ্চগ্রামে স্বর চড়িয়ে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা। শুনে খুশি হলাম। কিন্তু নিজের কেবিনে ফিরে বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, তা ভেতর থেকে বন্ধ। খটাখট শব্দ-তরঙ্গ তুললাম আর আদ্য-শ্রাদ্ধ করতে লাগলাম তরফদারের। আর পাঁচজনের সুবিধে-অসুবিধের কথা মোটেই ভাবেন না, কীরকম ভদ্রলোক ইনি?

উত্তর সঙ্গে-সঙ্গেই পেলাম। ভাবেন না সত্যিই। ওঁর একঝলক রুক্ষ দৃষ্টিই বললে তা।

নিষ্ফল রাগে ফুলতে-ফুলতে পেছন ফিরেছি, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল বলবাহাদুর।

ঢুকেই এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'বহুত দেরি হো গ্যায়া সাব। আসুন, আপনাকে ডিনার-সুট পরিয়ে দিই।' বলে সুটকেস খুলে বার করল একমাত্র কোটটা।

জীবনে ডিনার-সুট পরার জন্যে ভ্যালের সাহায্য নিইনি—নেওয়ার সৌভাগ্যই হয়নি। বনেদি বংশের মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলে আমি—সাহেব-ঘেঁষা আভিজাত্যের স্বাদ বলতে গেলে এই প্রথম নিচ্ছি। বলবাহাদুরের কথায় তাই যেন কানে সুধাবর্ষণ হল। পরক্ষণেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে উঠল তরফদারের স্বার্থপরতা মনে পড়তে।'

বললাম, 'বাপু হে, কোট এখন থাক। আগে গিয়ে ওপাশের সাবকে বাথরুম থেকে চটপট বার করে দাও দিকি—তাহলেই বুঝব তোমার কেরামতি।'

খুবই স্মার্ট বলতে হবে বলবাহাদুরকে। মুখের কথা খসতে-না-খসতেই উধাও হল সে বাইরে। পরমুহূর্তেই বাথরুমে শুনলাম কথা কাটাকাটির শব্দ। তারপরই কড়াং করে বন্ধ হল বাথরুমের ওপাশের দরজা, আর চকিতে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল বলবাহাদুর।

সাঁ করে ওর পাশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে সজোরে কড়াৎ করে টেনে দিলাম ওপাশের লকটা। শব্দটা যতটা জোরে হলে আমার মনোভাবটা পুরোপুরি প্রকাশ পেত, ততটা জোরে না হওয়ায় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলাম যদিও।

ফিরে এসে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'শাবাশ বাহাদুর, কিন্তু আজ আর তোমায় কোনও কষ্ট দেব না। ভ্যালের কাজটা আর-একদিন তোমার কাছে শিখে নেব'খন, কী বলো?'

'দরকার হলেই কলিংবেল টিপবেন,' বলে অন্তর্হিত হল বাহাদুর।

ক্ষিপ্র হাতে শার্ট খুলতে শুরু করলাম আমি। সূর্যাস্ত যদি দেখতেই হয়, আর কয়েক মিনিটের জন্যেও যদি কবিতাকে নিরালায় পেতে চাই, তাহলে আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। ভোরবেলা উঠে বিশ মিনিটের মধ্যে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পরে অফিস যাওয়ার যে-রেকর্ড আমার ছিল—তাও আজ ভাঙবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলাম আমি।

BanglaBook.org

দাড়িটা নিখুঁতভাবে কামানো হল কি না হাত বুলিয়ে দেখছি, এমন সময়ে আবার দরজার নবটা বাজাতে শুরু করলেন তরফদার। বহুক্ষণ ধরে বেশ ধৈর্যের সঙ্গে খটাখট-সঙ্গীত শোনালেন তিনি—আর ফটকিরি ঘষতে-ঘষতে তন্ময় হয়ে উপভোগ করতে লাগলাম সে-সুর-লহরী।

'যতই লম্ফঝম্প করুন না কেন—দরজা আর খুলছি না।' বিড়বিড় করে বলি আমি।

'ধুত্তোর।' তারপরেই স্তব্ধ হল নব-সঙ্গীত।

ওপাশের লক যেমন তেমনি রেখে চটপট বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। বার করলাম হিরের বোতামগুলো। পুরোনো আমলের যদিও, তবুও মূল্যবান সন্দেহ নেই। ঠাকুরদাব মৃত্যুর পর বোতাম ক'টা আমার হাতেই তুলে দিয়েছিল ঠাকুমা। আজকের এই অভিজাত মহলে সে-বোতাম যে এমনভাবে কাজে লেগে যাবে, তা ভাবিনি।

লঘু সুরে শিস দিতে-দিতে লন্ড্রির বিরাট প্যাকেটটা খুলতে লাগলাম। হনলুলু স্যাম জিন্দাবাদ—শেষ পর্যন্ত শপথ সে রেখেছে। যেদিন দেওয়া, সেদিনই ধোওয়া—এ-বিজ্ঞাপনের যাথার্থ হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে স্যামমশায়। বাস্তবিকই চীনাম্যানদের গুণের অবধি নেই। দেখতে অমন বেঁটেখাটো হলেও যে-বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তা কি আর বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়? না, বোঝা যায় পেস্তাচেরা চোখের কুতকুতে চাহনি দেখে ওদের অভ্রভেদী সততা? দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ওরা—যা বলবে তা করবেই। আঙুলের টান দিয়ে সুতোটা ছিঁড়ে ফেললাম, তারপর সন্তর্পণে খুললাম প্যাকিং পেপারটা।

আর দেখলাম, প্রথম স্তরেই রয়েছে টকটকে লাল-সাদা ডোরাকাটা একটা ম্যানিলা।

জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে কেন যে অতি সহজ জিনিসও বুঝতে এত দেরি লাগে, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে থেকেও বুঝলাম না আমার ব্যক্তিগত পোশাকের সারিতে এ-বিচিত্র বস্তুটার প্রবেশের স্পর্ধা হল কেমন করে। তারপরই একটানে ম্যানিলাটা নিক্ষেপ করার পর এমন গাঢ় নীল রঙের একটা শার্টের সম্মুখীন হলাম—যা জীবনে দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। এরপর যেন কুচকাওয়াজ করে পরপর বেরিয়ে এল সবুজ পুলওভার, ময়লা একটা অন্তর্বাস, একজোড়া বেজায় ঝলমলে নাইলন মোজা, গোটা কয়েক পশুপাখি আঁকা নেকটাই—ব্যস! আর কোনও শার্টের চিহ্নই দেখলাম না!

অবশ হয়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপর।

এ-লন্ড্রি আমার নয়।

এই সামান্য ব্যাপারটা এত দেরিতে মাথায় এলেও এর পরই অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল চিন্তাশক্তি। ঢেউ-উত্তাল দরিয়ায় আজ আমি বড় নিঃসঙ্গ—বড় একলা। সঙ্গে শুধু একটি সুটকেস—সে-সুটকেসে সবই আছে, নেই শুধু ডিনার টেবিলে বসার উপযুক্ত অন্তত একটা সাদা শার্ট। রঙচঙে ম্যানিলা আর তার সহোদরদের শ্রীঅঙ্গে চাপিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকেছি—এ-কথা কল্পনা করতেই শিউরে উঠলাম। অথচ আর মিনিট পনেরো পরেই পড়বে খাওয়ার ঘন্টা। টেবিলে উপস্থিত হবেন আমার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—দুজনেই সঙ্গে এনেছেন দুটি সংক্ষিপ্ত বস্ত্রশালা।

চোখ ফেটে বুঝি-বা জল গড়িয়ে পড়ে এবার। ভেবেছিলাম, এই সাগর-বিহারকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জয় করব কবিতা রায়ের অভিভাবকদের চিত্ত—এমন ছাপ ফেলব তাঁদের মনে যে, আমার বরনারী আমারই থেকে যাবে জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু সাগর-যাত্রার প্রথম সন্ধ্যায় এ কী দুর্দৈব? সাদা শার্টবিহীন মৃগাঙ্ক রায়ের ক্ষমতা কোথায় প্রতিপক্ষবাহিনীর বিদ্রূপ-হাসিকে উপেক্ষা করার? প্রতীচ্য-রীতি-অনুরাগী সোমেশ রায়ের বিরাগ দৃষ্টির সামনে সাধ্য কি তাঁর স্নেহ অর্জন করার?

অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করলাম দুরন্ত ক্রোধের কবলে। প্রায়-অন্ধ চীনে স্থবরটাই আমার এই দুরবস্থার জন্যে দায়ী। পেতাম যদি বুড়োকে হাতের কাছে—অন্ধত্ব তার ঘুচিয়ে দিতাম ইহজন্মের মতো।

BanglaBook.org

মূর্খ! অসতর্ক মুহূর্তে এমন একটা সাংঘাতিক ভুল সে করে বসল, যার ফলে বহু বছর ধরে বহু পরিশ্রমে অর্জিত চীনাদের সুনাম নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল জগৎবাসীর কাছে। শুধু যে দুর্নামই কুড়োলে তা নয়, ও জাতটারও অবলুপ্তির সূচনা এঁকে দিলে ওই নিরেট চীনে বুড়োটা। কেন না, পৃথিবী চীনে শূন্য করার কাজ শুরু করব আমিই স্বয়ং—আর তা শুরু হবে হনলুলু স্যামের দোকানঘর থেকেই।

কিন্তু হুহু করে সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রবীণ এক চীনেম্যানের কবর রচনার পরিকল্পনায় সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না মোটেই। কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু করি কী? আবহাওয়া তো দেখছি চমৎকার—শুধু যা জলপরীই এদিকে-ওদিকে সামান্য হেলেদুলে ভেসে চলেছে। সমুদ্রপীড়ার ছল করে বার্থ আশ্রয় করলে কেমন হয়? কিন্তু তাহলে তো কবিতাকে আবার সঁপে দিতে হবে তরফদার-অলোক ঘোষের যুগ্ম দাঁড়ায়। উঁহু, তা হবে না। শার্ট একটা চাই-ই। যেভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, শার্ট একটা জোগাড় করতেই হবে আমায়।

জলপরীতে সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, যিনি এই সঙ্কট-মুহূর্তে আমায় কিছু সাহায্য করতে পারেন? দেশমুখ অবশ্য পারেন। কিন্তু দেশমুখের একটা শার্টে অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে দু-দুটো মৃগাঙ্ক রায়। কিন্তু অপর অভ্যাগতদের কাছেও তো আমার এ দুরবস্থার কথা বলা সম্ভব নয় কিছুতেই। অবশ্য কবিতাকে বলা চলতে পারে, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা তো হবে না। তাকে বললে সহানুভূতি পাওয়া যাবে প্রচুর—কিন্তু শার্ট নয়। তাহলে? তাহলে বাকি থাকে শুধু বলবাহাদুর। দু-টাকার কড়কড়ে নোট যখন দিয়েছি ওকে, তখন প্রতিদান পাব নিশ্চয়।

ঘন্টা বাজালাম। অন্তর্বাস পরে নিতে-নিতেই এসে পড়ল নেপালি-নন্দন। ভেবে দেখলাম, এরকম পরিস্থিতিতে অকপট সরলতাই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বললাম, 'বাহাদুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।' লাল, নীল, সবুজ রঙের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়ে বলি, 'চীনে ব্যাটা আমার জামাকাপড় সব পালটে দিয়েছে। সাদা শার্ট একটিও নেই।'

'চীনেরা লোক খুব খারাপ।' মন্তব্য প্রকাশ করে বলবাহাদুর।

'নিঃসন্দেহে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে'খন। কিন্তু আপাতত, বাহাদুর, কী পরে ডিনারে যাই বলো তো? সাদা শার্ট হবে নাকি দু-একটা?'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বলবাহাদুর। ওর মুখভাব দেখেই বুঝলাম, 'সাব'-এর পরার উপযুক্ত স্নো-হোয়াইট শার্ট রাখার স্পর্ধা সে রাখে না। ইচ্ছে হল, একটা-একটা করে মাথার চুলগুলো সব টেনে ছিঁড়ে ফেলি, আর না হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি কিছুক্ষণ। অমল-ধবল কামিজ পরে ডিনার খাওয়ার রেওয়াজ আমার ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষের কখনও ছিল না—আর বংশের সে-ঐতিহ্য ভঙ্গ করার কোনও সদিচ্ছাই আমার নেই। কিন্তু কবিতা তা জানে বলেই আগে থেকে একাধিকবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে, জন্মাবধি বোম্বাই শহরে মানুষ বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের প্রতীচ্য-প্রীতি আর তাঁর উগ্র সাহেবিয়ানা। গণ্যমান্য অভ্যাগতদের সামনে ডিনার টেবিলে সাদা শার্ট না পরে গেলে তাঁর মনে কতখানি বিরাগ-বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হবে, তা ভেবে চিন্তিত হলাম না মোটেই; কিন্তু তার ফলে কবিতারাণীর আশা যে ইহজন্মের মতো ত্যাগ করতে হবে, তা ভাবতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হল আমার।

আমার শুকনো মুখ আর সজল চোখ দেখে বুঝি বলবাহাদুরের মনেও করুণার উদ্রেক হল। নিজে থেকেই 'জরা কোশিশ করনা পড়েগা সাব' বলে উধাও হল সে।

মনে হল, শার্ট তো নয়, যেন আমেরিকা আবিষ্কার করতে বেরোল সে। ঘরময় অনর্থক দাপাদাপি না করে পোশাক-পারিপাট্য যতটা সম্ভব এগিয়ে রাখার উদ্দেশেই আগে জুতো-মোজা পরে ফেললাম। কিন্তু শার্ট? রামধনু-রঙিন ম্যানিলা পরে ডিনার টেবিলে অনুকম্পা-দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হওয়ার চাইতে বিরহী যক্ষের মতো শার্ট বিরহে অশ্রু বিসর্জন করব ঘরে বসে-বসে। আর সেই

BanglaBook.org

সুযোগে মহা আনন্দে অনবগুণ্ঠিতা কবিতা-সুন্দরীর রূপসুধা পান করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিচরণ করবে সুখের সপ্তম স্বর্গে?

এসব পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সতর্কতা যে রীতিমতো প্রয়োজন, তা হয়তো নেপালি-তনয়ের চোখ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই চকিতে আলো নিভিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে উঁকি মারলাম বাইরের প্যাসেজে। কারও চিহ্নও দেখলাম না। নেপালি-সুতই বা গেল কোথায়?

তারপরেই করিডরের শেষপ্রান্তের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল—বেরিয়ে এল একটি মূর্তি। সামনে-পেছনে সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লোকটি পা টিপে-টিপে এগিয়ে এল করিডর দিয়ে। বাহাদুর যে নয়, তা বুঝলাম চলার ধরন দেখেই। কেবিনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলাম লোকটিকে। আরও একটু এগিয়ে একটা স্টেটরুমের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

হতাশভাবে বসে পড়লাম বার্থের ওপর। বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠতে লাগল কপালে। বলবাহাদুর কি শেষপর্যন্ত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করল? তারপরেই দরজায় অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখি ওর হাসি-হাসি মুখ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জ্বাললাম আলোটা।

জয় জগদীশ্বর! নেপালি-নন্দনের হাতে ঝকমক করছে বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা একটা শার্ট!

চোখের সামনে যেন গজমুক্তা দেখছি, এমনিভাবে জুলজুল চোখে তাকিয়ে রইলাম তুষার-শুভ্র শার্টটার দিকে।

বলবাহাদুর বললে, 'দিন, দিন, বোতামগুলো লাগাই তাড়াতাড়ি।' বলে নিজেই ঠাকুরদার হিরের বোতাম লাগাতে বসল বোতাম-ঘরে ঃ 'খুব বড় হবে না, কী বলেন?'

হঠাৎ কীরকম যেন মনে হল আমার।

একটু কঠিন স্বরেই শুধোই, 'শার্টটা আনলে কোত্থেকে?'

'আনলাম।' সংক্ষিপ্ততর জবাব আসে ওদিক থেকে ঃ 'নিন, পরে ফেলুন।'

'সামান্য একটু ঢিলে হচ্ছে যদিও, তবুও শার্ট তো, তাহলেই হল। বাঃ, কলারটাও তো দেখছি বেশ ফিট করে গেল গলায়। কপাল, বুঝলে বাহাদুর, সবই কপাল। উঃ, কলারটা তো দারুণ শক্ত হে!' ক্ষিপ্রহাতে টাইয়ের গ্রন্থি রচনা করতে-করতে বলি।

'বাঃ, বেশ মানিয়েছে সাব।' ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে-শুনে প্রশংসিকা দিয়ে দেয় বাহাদুর।

একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলি, 'দ্যাখো বৎস, শার্টটা যেখান থেকেই আনো না কেন, আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, বুঝেছ?'

'জরুর।'

'বহুত আচ্ছা। একটা টাকাও দেব সেইসঙ্গে—ধোয়ার খরচ হিসেবে। সততার জয় সর্বত্র, বুঝলে বাহাদুর, অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই।'

'জি সাব।'

'নিজে যদি সৎ থাকো, তাহলে সারা দুনিয়া এসে লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে।' নেপালি-নন্দন ততক্ষণে দরজার বাইরে এক পা দিয়েছে ঃ 'আরে, হ্যাঁ, শার্টটা এল কোত্থেকে তা বলে গেলে না?'

'আনলাম।' বলে মুচকি হেসে অন্তর্হিত হল সে।

ধুত্তোর, কী আর করা যায়। বেপরোয়া পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হল নিজেই বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। চটপট ট্রাউজারের মধ্যে দু-পা গলিয়ে ফেললাম—ওয়েস্ট কোট আর কোট চাপানো শেষ হতে-না-হতেই প্যানট্রিবয় বিউগ্‌লে একটা নাম-না-জানা ইংরেজি সুর বাজাতে শুরু করে দিলে।

BanglaBook.org

বাথরুমের দরজায় আবার খটাখট শব্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করছিলেন তরফদার। তাই, প্রথমে সবক'টা আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে খুলে দিলাম লকটা, তারপরেই তিরবেগে উঠে এলাম ওপরের ডেকে কবিতার সন্ধানে।

আমাকে দেখেই স্ফুরিত অধর আর ঘনকৃষ্ণ আঁখিযুগলে ভর্ৎসনা আর অভিমানের এক বিচিত্র মিশ্রণ ফুটিয়ে তুলল ও।

শুধু বলল, 'সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে।'

'জানি। কিন্তু—' দু-আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে কলারটা টানাটানি করতে-করতে বলি, 'কিন্তু কী করব, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে দেরি করে দিল আমার।'

'তা তো বলবেই। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় কখনও?'

'তা যা বলেছ,' আনমনা হয়ে বলি আমি। ভাবছিলাম, শার্টের প্রকৃত অধিকারীর গলাটা নিশ্চয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এরকম শক্ত আর ধারালো কলার কি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে পরা সম্ভব?

'কী ব্যাপার বলো তো? সুস্থ আছ তো?'

'নিশ্চয় নয়। তুমি যে মূর্তিমতী উর্বশী, তা তো আমার অজানা নয় হে ভুবনমোহিনী উর্বশী—তবুও তোমায় দেখেই কেমন জানি বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা।'

উঠে দাঁড়াল কবিতা ঃ 'ডাইনিং সেলুনে দ্বিতীয়বার ঘুরিও সেটা। খাবার টেবিলে দেরি হওয়া মোটেই পছন্দ করেন না বাবা।'

কবিতার ডানদিকের আসনটাই নির্ধারিত হয়েছিল আমার জন্যে—দেখেই বেশ খুশি-খুশি হয়ে উঠল মনটা। বাঁ-দিকে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি স্বয়ং। এমন নিখুঁত আসন পরিকল্পনা লক্ষ করে নিমেষের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি। এক মুহূর্ত আগেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম হতাশার সমুদ্রে—কিন্তু এখন আর আমায় পায় কে। পরস্মৈপদী শার্টের প্রসাদ যে এত সুমধুর তা তো জানতাম না!

খাওয়ার শুরুতেই সোমেশ রায় প্রস্তাব করলেন, তরফদার সিংহলে তাঁর প্রবাসী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনান গল্পচ্ছলে। ভাবলাম, গেল বুঝি এবার খাওয়ার সব আনন্দটাই মাটি হয়ে। কিন্তু তরফদার ভদ্রলোক অন্যান্য ব্যাপারে যতই অশিষ্ট অভদ্র হোন না কেন—কথা বলার ব্যাপারে সত্যই অতুলনীয়। সুন্দরভাবে গুছিয়ে সামান্য ঘটনাকেই গল্পের আকারে পরিবেশন করে আসর জমাতে দক্ষ পুরুষ তিনি। কলম্বোতে একটা ইংরেজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক থাকার সময়ে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার, কান্দির একটা হাসপাতালে টাইফয়েডে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ টিকাটিপ্পনী দিয়ে বেশ চমৎকারভাবেই বলে গেলেন তিনি। কোকেলাই, বাটিকালোয়া, ভাঙ্গালা, আরিপু প্রভৃতি ছোটখাটো বন্দরে কত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নাবিকের সঙ্গে, কত দুর্দান্ত কোকেন, আফিমের চোরাকারবারীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমেছিল—তা শুনতে-শুনতে পুলকে-ভয়ে-রোমাঞ্চে শিউরে উঠল সবাই। জীবনে বিঘ্ন এসেছে বহু, আর তা জয় করতে গিয়ে শিখেছেন প্রচুর, দেখেছেন অনেক। জীবনের মূল সংজ্ঞা অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করেছেন দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুর পথে চলার মধ্যে দিয়ে।

কফি না আসা পর্যন্ত একাই আসর সরগরম করে রাখলেন তরফদার—তারপর শুরু হল লঘু রসালাপ। বহু কণ্ঠের গুঞ্জরন ছাপিয়ে হঠাৎ সোমেশ রায়ের উচ্ছ্বসিত স্বর ভেসে এল প্রত্যেকের কানে। মিসেস প্যাটেলকে উদ্দেশ করে বলছিলেন তিনি।

'সাঁইত্রিশ বছর। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে পকেটে-পকেটে ঘুরছে টাকাটা। জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে ওর স্পর্শ আমায় দিয়েছে শক্তি, সাহস, উদ্যম, প্রেরণা আর সাফল্য। ছোট্ট একটা রুপোর টাকা—উনিশশো দশ সালে আলিপুর মিন্টে যার জন্ম—।'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা ঃ 'সেরেছে! আবার লাকি পিস-এর গল্প ফেঁদেছে বাবা।'

BanglaBook.org

'থ্রিলিং!' বললেন মিসেস প্যাটেল। সেইসঙ্গে উৎসাহসূচক লিপস্টিক রাঙানো একটু হাসি : 'টাকাটা আপনার কাছেই আছে তো?'

'নিশ্চয়।' বলেই ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে চকচকে একটা রুপোর টাকা বার করে আনলেন তিনি : 'সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র বন্ধু আমার এই লাকি পিস।' বড়-বড় চোখে ক্ষণেক তাকিয়ে রইলেন তালুর ওপর রাখা টাকাটার দিকে। তারপর, খুব থেমে-থেমে বললেন, 'একী! এ তো আ-আমার টাকা নয়!'

থমথমে স্তব্ধতা নেমে এল সেলুনের মধ্যে।

কবিতাই প্রথম কথা বলল, 'কী বলছ বাবা, এ টাকা তোমার নয়?'

'না! এতে ছাপ রয়েছে ১৯৩৪ সালের।' বলে ঠন করে টেবিলের ওপর টাকাটা ছুড়ে দিয়ে সবক'টা পকেট হাতড়ালেন। তারপর শূন্য দু-হাত টেবিলের ওপর রেখে মুখ অন্ধকার করে বসে রইলেন ক্ষণকাল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে, 'ভাবছেন, খুবই সামান্য ব্যাপার এটা—কিন্তু আদতে তা নয় মোটেই। জানি না, কী জাতীয় রসিকতা এটা। রসিক পুরুষটি যেই হোক না কেন, তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না কিছুতেই। কিন্তু তবুও আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি যদি এই মুহূর্তে তিনি স্বীকার করেন সব কিছু। বলুন—' গলা কেঁপে ওঠে ওঁর, 'বলুন, এ কার রসিকতা?'

উৎকণ্ঠিত চোখে প্রত্যেকের মুখের ওপর একে-একে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন উনি। কেউই কথা বলল না। কঠিন হয়ে এল সোমেশ রায়ের স্বপ্নালু চোখ।

বললেন, 'তাহলে রসিকতা নয়। একটা বদ উদ্দেশ্যই রয়েছে এর পেছনে।'

'কী আজেবাজে বকছিস, সমু? তিলকে তাল করে তুলিসনি।' বাধা দিয়ে বলেন স্থূলকায়া পিসিমা।

'সেটা আমিই বুঝব ভালো।' ইস্পাতের মতোই কঠিন শোনাল তাঁর স্বর। তারপর চেষ্টা করে একটু ফিকে হাসি হেসে বললেন, 'তা তুমি মন্দ কথা বলোনি, দিদি। পার্টিটা নষ্ট করা উচিত হবে না আমার।'

থমথমে ভাবটা একটু লঘু হল। মিসেস প্যাটেল অবশ্য সুযোগটা যথা ব্যবহার করতে দ্বিধা করলেন না। কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললেন, 'আশ্চর্য! আপনার কোনও কর্মচারীর কাণ্ড নয় তো এটা?'

'আপনার ধারণা ভুল, মিসেস প্যাটেল।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সোমেশ রায় : 'আমার সঙ্গে ওরা অনেক দিন আছে। তবুও, জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেককে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করব আমি নিজে। যাক, এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এখন এখানেই বন্ধ থাকুক। ভালো কথা—আর কারও কিছু হারিয়েছে?'

নিস্পন্দ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্র। শার্ট। কারও মুখে এখুনি প্রকাশ পাবে একটা শার্টের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কাহিনি। আর, তার পরিণাম ভাবতেই বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠল আমার কপালে।

কিন্তু কারও জিহ্বাকেই তৎপর হতে দেখলাম না। তাহলে চুরির খবর এখনও প্রকাশ পায়নি। আবার শুরু হল আমার শ্বাসপ্রশ্বাস।

'তাহলে এ-প্রসঙ্গ বন্ধ থাকুক এখানেই।' বললেন সোমেশ রায়।

'এক মিনিট!' দাঁড়িয়ে উঠলেন দেশমুখ : 'টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে। তুচ্ছই হোক আর মূল্যবানই হোক, একটা জিনিস হারিয়েছে মিস্টার রায়ের। কাজেই সন্দেহভাজন এখন আমরা প্রত্যেকেই। তাই, আমার ইচ্ছে প্রথমেই সার্চ করা হোক আমায়। আমার তো বিশ্বাস এ-প্রস্তাবে কারওরই আপত্তি থাকতে পারে না।'

'কী বাজে বকছেন?' কঠিন স্বরে বললেন সোমেশ রায় : 'এ-প্রস্তাব শোনার মতো ধৈর্য

BanglaBook.org

আমার নেই।'

তরফদার বললেন, 'মিস্টার দেশমুখ কিন্তু কিছুই অন্যায় বলেননি। আমার তো মনে আছে, কলম্বোর ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে একবার গৃহস্বামিনীর একটা হিরের নেকলেস হারায়। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল সেখানে—তবুও তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রত্যেককেই ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সার্চ করা হল তন্নতন্ন করে।' বলে উঠে দাঁড়ালেন উনি ঃ 'মিস্টার দেশমুখের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।'

'রাবিশ! এভাবে কিছুতেই অপমানিত হতে দেব না আমার অতিথিদের।' অনড় থাকেন সোমেশ রায়।

এবারে কথা বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনাকে স্যার কিছুই করতে হবে না। নিজেরাই যদি নিজেদের সার্চ করে সন্দেহের কাঁটা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে খুশি হব প্রত্যেকেই। এতে অপমানিত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মহিলারা যদি অনুগ্রহ করে সেলুনে অপেক্ষা করেন, তাহলে—।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিসিমা, মিসেস প্যাটেল আর কবিতা বেরিয়ে গেল বাইরে। চটপট কোট আর ওয়েস্ট কোট খুলে ফেললেন দেশমুখ।

'আপনাদের মধ্যে একজন এগিয়ে আসুন। আমার পালা শেষ হলে আপনাদেব আমিই দেখব'খন।

অলোক ঘোষই এগিয়ে এলেন সবার আগে। অতি কষ্টে বুকের ধুকধুকুনি সংযত করে আমিও খুললাম আমার কোট আর ওয়েস্ট কোট। শার্টটিও যে গায়ে ভালো করে ফিট করেনি, তা কী আর কারও চোখ এড়িয়েছে! দেশমুখ নির্দোষ প্রমাণিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মহা উৎসাহে শুরু করলেন অপবেব অঙ্গতল্লাস।

কিন্তু এত কিছু করেও ফল হল না কিছুই। আগাগোড়া শূন্য দৃষ্টি মেলে এমনভাবে টেবিলে বসে বইলেন সোমেশ রায যেন এ ছেলেখেলায় কোনও আগ্রহই নেই তাঁর। কপালেব ঘাম মুছতে-মুছতে শূন্য হাতে তাঁর পাশে এসে বসলেন দেশমুখ।

'খুশি তো? বেশ, আমার একান্ত অনুরোধ এ বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আর কোনও কথা নয়। চলুন, এখন বাইরে যাওয়া যাক।' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

সেলুনে গিয়ে দেখি ব্রিজখেলার উদ্দেশ্যে সোৎসাহে দুটো টেবিল জোড়া লাগাবার কাজ তদারক করছেন পিসিমা। বাড়তি হচ্ছিল শুধু একজনই। কিন্তু প্রত্যেকেরই আন্তরিক ইচ্ছে যে, বাদ দেওয়া হোক তাকেই। শেষ পর্যন্ত ভারিক্কি চালে অলোক ঘোষকেই বাড়তি হিসেবে গণ্য করলেন পিসিমা—আর বেশ খুশি মনেই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এরপর পার্টনার নেওয়ার পালা। সভয়ে লক্ষ করলাম, আমার ঠিক বিপরীত দিকেই বসেছেন পিসিমা স্বয়ং। এমনভাবে বসেছেন যেন ব্রিজখেলার আবিষ্কর্ত্রী তিনিই। আর, কার্যত দেখলাম তাই বটে।

তাস ফেটে দিলাম আমি। মেদ-থলথল বিশাল বাহু সঞ্চালন করে তাস ক'টি তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন পিসিমা। শুধু তাকালেন তো নয়, যেন দৃষ্টিশরে বিদ্ধ করলেন।

তারপরেই এল কড়া আদেশ, 'তাস গুনুন। এই হল প্রথম নিয়ম। আপনি কোন নিয়মে খেলেন মিস্টার রায়?'

'নিয়ম?' ক্ষীণস্বরে পুনরাবৃত্তি করি আমি ঃ 'তা তো জানি না। আমি তো শুধু খেলি।'

চট করে বললেন উনি, 'আমরা নড়েচড়ে খেলব।'

'ইয়ে—ঠিক বুঝতে তো পারলাম না।' কাঁচুমাচু মুখে বলি আমি।

'বলা হচ্ছে যে, মাঝে-মাঝে পার্টনার পালটাব আমরা।'

BanglaBook.org

'ওঃ, তাতে আমি রাজি!' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

এমন শক্ত চোখে আমার দিকে উনি তাকালেন যে-চোখ এড়াতে গিয়ে আমায় তাকাতে হল অন্য দিকে। আর, তাইতেই চোখাচোখি হয়ে গেল যাঁর সঙ্গে, তাঁকেই আজ সন্ধ্যায় ডিনারের ঠিক আগেই দেখেছিলাম আধো-অন্ধকার করিডরে। হঠাৎ রাশি-রাশি চিন্তা ভিড় করে এল মাথায়। পিসিমার দু-নম্বর কানুন মনে হল যেন মাইলখানেক দূর থেকে ভেসে আসছে। অবশ্য, সে-স্বরলহরী অচিরেই এসে পৌঁছল একেবারে কানের গোড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর পিসিমা বুঝলেন যে, অনভিজ্ঞ শুধু আমি একা নই, উপস্থিত প্রত্যেকেই। অসাধারণ তাঁর সহ্যশক্তি, কিছু তবুও তিন-তিনবার পার্টনার বদল করার পরও যখন দেশমুখই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে, তখন হাতের তাস টেবিলে আছড়ে ফেলে সচল বিন্ধ্যাচলের মতো সেলুন ত্যাগ করলেন তিনি। জলপরীর ঘড়িতে তখন পর-পর ছ'বার ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। তাই শুনে বেশ কিছুক্ষণ হিসেব করে এবং নিজের ঘড়ি দেখে জানলাম ছ'টা ঘণ্টাধ্বনির অর্থ রাত এগারোটার সময়-সঙ্কেত।

অলোক ঘোষ আর তরফদার দুজনেই তখন বেজায় ব্যস্ত কবিতাকে নিয়ে। মনে হল, রাত এগারোটার আগে কন্দর্প দুজনের জিহ্বাযুগল অসাড় হবে না কোনওমতেই। কবিতা কিন্তু আড়চোখে ইশারা করে দিলে আমায়—তারপর হাসি মুখে দুজনকেই শুভরাত্রি জানিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

ফিসফিস করে বললে, 'শালটা আনছি—একটু অপেক্ষ করো, বুঝলে? সূর্যাস্ত সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে।'

হাতে বিশেষ কোনও কাজও ছিল না তখন। কাজেই সানন্দে সায় দিলাম কবিতার প্রস্তাবে। শালটা গায়ে জড়িয়ে একটু পরেই ও ফিরে এলে দুজনে এগিয়ে গেলাম ডেকের এক নিরালা কোণে পাশাপাশি রাখা দুটো ডেক চেয়ারের দিকে।

নিস্তরঙ্গ আরব সাগরের ওপরে দুলে-দুলে এগিয়ে চলেছিল জলপরী। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো অপরূপ সুষমা এনেছিল ধীর-স্থির-শান্ত জলে। যেন লক্ষ মণিদীপদীপ্ত অঞ্চল চঞ্চল দেহে টেনে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীত শুনতে-শুনতে প্রবাল-পালঙ্কে সুপ্তির অঙ্কে ঢলে পড়েছে অযুত জলকন্যা। মৃদুমন্দ বাতাসে মধ্যে-মধ্যে সে-অঞ্চলে জাগছিল বিলোল-হিল্লোল। চারদিক নিশ্চুপ নিথর—দিক হতে দিগন্তে প্রসারিত সে অসীম, অনন্ত, অব্যয় শান্তির সঙ্গে তুলনা হয় না কোনও কিছুর সঙ্গেই।

মুগ্ধ হয়ে গেছলাম আমি। কল্পনাপ্রবণ বাঙালি নাকি অল্পেতেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে ফ্যালে নিজেকে। দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্দর তেরো নদী আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যার পাশটিতে বসে আরব সাগরের বুকে দুলতে-দুলতে আবেশ লাগল আমার চোখেও। মুগ্ধ অন্তর থেকে তাই শুধু একটি শব্দই বেরোল, 'অপূর্ব!'

'তোমার ভালো লেগেছে?' শুধোয় কবিতা।

নিরর্থক প্রশ্ন। ভালো যে লেগেছে, তা না জিগ্যেস করলেও চলে। তবুও সেই আদম আর ইভের সময় থেকে যুগ-যুগ ধরে মুগ্ধ পুরুষের আঁখিতে মায়া সিঞ্চন করার পর এই প্রশ্নই করে এসেছে প্রিয়ংবদারা। এ-প্রশ্নের বাঙ্ময় উত্তর নেই—আছে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির পালা, আছে আঁখির কালো মণিকা দিয়ে শব্দের অতীত সুরকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।

আমিও তাই কথা বলে আর হৃদয়তন্ত্রীতে রণিত সুর-হারানোর কারণ হলাম না। কতক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি বসে রইলাম দুজনে।

তারপর শুধোলাম এক সময়, 'সূর্যাস্ত সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে না? কীরকম লাগল তোমার?'

BanglaBook.org

'মন্দ কী। তবে আমার আবার চাঁদকেই ভালো লাগে বেশি।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ও। তারপর শুধোয়, 'কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি নয়। ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নেমে আসুক কবিতা রায় আর তার ফ্যামিলি, আর শ-দুই টাকা মাইনের হেডমাস্টার হয়ে যান সোমেশ রায়। সত্যি কথা বলতে কী কবি, বান্দ্রার চ্যারিটি শো-তে তোমার আমার প্রথম পরিচয়ের পরের মুহূর্ত থেকেই সমানে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছি আমি।'

হেসে ফেলল কবিতা।

'স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় সারা জীবনেও পাননি বাবা। কাজেই বৃথাই শক্তিক্ষয় করছ তুমি।'

একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসে সাগরের বুক থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের ওপর থেকে রাগটা তুলে নিয়ে জড়িয়ে দিলাম ওর ঊর্ধ্বাঙ্গে। ওর আঙুলের ছোঁয়া লাগল আমার আঙুলে। হঠাৎ কী হল, হাতখানা সরিয়ে ওর উষ্ণ কোমল আঙুলগুলি আলতো করে ধরলাম আমার মুঠিব মধ্যে। সে-ছোঁয়ায় বুঝি সোনার কাঠির জাদুপরশ লাগল দুজনের মনের মণিকোঠায—তাই দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম চুপ করে।

তারপর যেন বাতাসের সুরে বললাম, 'কবি।'

'বলো।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না। আবার নৈঃশব্দ।

একটু পরে কবিতাই শুধোয়, 'বাবাকে কীরকম লাগল তোমার?'

'সত্যিকারের পুরুষসিংহ উনি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামতেব কী মূল্য বলো? হোমবা-চোমরা অভ্যাগতদের মতামত শুনলেই তিনি খুশি হবেন বেশি।'

'ভুল ওইখানেই করলে মৃগ। কোটিপতি হলেও সামান্য রাজমিস্ত্রির সন্তান তিনি—তা সোমেশ রায় কখনও ভোলেন না। সমাজের অভিজাত মহলে মেশবার জন্যে আজ তিনি সাহেবিয়ানা রপ্ত করেছেন—কিন্তু একদিন যে দিনরাত পরিশ্রম করেও মাসান্তে কুড়িটা টাকাও রোজগার করতে পারেননি—তা উনি ভোলেন না কখনও।'

'কিন্তু সে তো বহু বছর আগেকার কথা।'

'বিয়ের ক'বছর আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল ওঁব।'

লক্ষ মাণিকের দীপ্তি জড়ানো সাগর জলের অশান্ত কল্লোল-সঙ্গীতে সুর মিলিয়ে এমন সুরে কথাটা ও বললে যে, হঠাৎ যেন কীরকম হয়ে গেলাম আমি। বসন্ত-বায়ুর কত স্পন্দন-কম্পন, নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস আর আভাসগুঞ্জন মৌন বেদনায় হারিয়ে যাচ্ছিল নীরব নিশীথের অশ্রুত সঙ্গীত-ঝঙ্কারে। তাই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, দু-হাতে ওর হাতটা চেপে ধরে বললুম, 'কবি, তুমি কী কিছুই বোঝোনি?'

'বুঝেছি। যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছিলাম, সেদিনই।'

'কবি।'

'আমি জানতাম। এতদিন প্রতীক্ষা করছিলাম কখন তুমি নিজে তা বলবে।'

ঠিক এই সময়ে একটুকরো মেঘের আড়ালে মুখ লুকোলে চাঁদ। আমিও যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

বললাম, 'না কবি, এ আমার দুরাশা। কোনওদিনই রাজি হবেন না তোমার বাবা।'

'কিন্তু রাজি তাঁকে করাতেই হবে।'

'তুমি বুঝছ না, এ-কথা শোনামাত্র উনি সোজা আদেশ দেবেন জ্যান্ত অবস্থায় আমায় একটা ফার্নেসে ঢুকিয়ে দিতে।'

BanglaBook.org

'তোমার সঙ্গে আমাকেও ঢোকাতে হবে তাহলে।'

'কবি! আশ্চর্য! কিন্তু এ কি অন্তর থেকে বললে তুমি?'

'তুমি যে জন্যে আশ্চর্য হচ্ছ তা আমি বলতে চাইছি না। বিয়ে আমি তোমাকেই করব, এই কথাই বলতে চাই আমি।'

'আমিও তা চাই। ধনীকন্যাদের বিয়ে করার পরই অর্থপিশাচ হয়ে যেতে দেখেছি অনেককে। আমি কিন্তু একটি কানাকড়িও নেব না তোমার বাবার কাছ থেকে, এমনকী কোনও চাকরিও নয়।'

'মিছে ভেব না—কোনওটাই পাবে না তুমি।'

'কিন্তু কবি, আমি তো তা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই – আমি বলতে চাই—।'

'থাক, শুধু চাইলেই হবে না। সক্রিয় হতে হবে, যেমনটি আমি চাই।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, বাবার কাছে গিয়ে সবকিছুই বলতে হবে তোমায়। পারবে?'

'আলবাৎ। ইয়ে...নিশ্চয়। এবার দেখা হলেই কথা পাড়ব।'

'কী বলবে? গুড মর্নিং, না গুড ইভনিং?'

'ঠাট্টা হচ্ছে? কিন্তু এক লাইন শুনলেই তো উনি বলবেন জলপরী ছেড়ে জলে নেমে যেতে।'

'মোটেই না। বাবার প্রকৃতিই নয় ওরকম। তোমার প্রস্তাব যদি ওঁর মনঃপূত না হয়, তাহলে তুমি যা ভাবছ, সেরকমটি কিছুই করবেন না উনি। বুদ্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের হৃদয়ের তল পর্যন্ত দেখে নেওয়ার ক্ষমতা ওঁর আছে বলেই জীবনে এত উন্নতি করতে পেরেছেন কারও সাহায্য না নিয়েই। লোক চিনতে বেশি দেরি ওঁর হয় না।'

'তাহলে কলির সত্যবান মৃগাঙ্ক রায়ের জয় তো অবশ্যম্ভাবী।'

'আহা রে, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির আর কি। ওই বচনটুকুই শুধু সার।'

'তার মানে? বলো না কী করতে হবে?'

'কিছু না করলেই বাধিত থাকব। শুধু এমনভাবে ওঁর সঙ্গে মানিয়ে চলবে যেন তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখার সুযোগ পান উনি। মোট কথা, খুব সহজ হয়ে উঠবে, বুঝেছ?'

'তাহলে আরও বছর কয়েকের মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'তোমার মুন্ডু! সাধে কি আর বলি—যাই হোক, শোনো বাক্যবাগীশ, আমি যেমন তোমায় ভালোবাসি—ঠিক তেমনি বাবাও ভালোবাসেন আমায় সমস্ত অন্তর দিয়ে। কাজেই যেভাবেই হোক, তোমাকে তাঁর প্রিয়পাত্র হতেই হবে। তাঁর অমতে কিছুতেই সুখী হব না আমি এ-বিয়েতে।'

'খুবই স্বাভাবিক।'

'তার ওপরে হতচ্ছাড়া ওই টাকাটা হারিয়ে যাওয়ায় একেবারেই মন ভেঙে গেছে ওঁর।'

সেকেন্ড কয়েক একটা নতুন চিন্তা করে নিই। তারপর বলি, 'কবি, ইন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?'

'তোমার বন্ধু তো? অনেকবার ওঁর গোয়েন্দাগিরির গল্প তো আমায় শুনিয়েছ। কেন বলো দিকি?'

'জানোই তো, সব বাঁশে বংশলোচন হয় না। তাই অনেকদিন ধরে ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করেও যেরকম জড়দগব ছিলাম, সেই রকমটিই রয়ে গেছি—।'

'তা না বললেও চলত।'

'কিন্তু চেষ্টা করলে ওর অভিজ্ঞতাকে হয়তো আমিও কাজে লাগাতে পারি।'

'তাতে লাভ?

'রুপোর টাকা উদ্ধার।'

লাফিয়ে উঠল কবিতা : 'দি আইডিয়া! এতক্ষণ একথা বলোনি কেন?'

'বলতে আর দিচ্ছ কই। ধরো, টাকাটা খুঁজেপেতে বার করে ফেললাম—তাহলেই

BanglaBook.org

পুরস্কারস্বরূপ তোমায় তখন অনায়াসেই চাইতে পারব, কী বলো?'

'শুধু কি তাই? সেই সঙ্গে পিসিমা আর জলপরীকেও উনি গছিয়ে দেবেন তোমার হাতে।'

'তবেই সেরেছে। ইয়ে-মানে—আমি বলছি কী, জলপরী রাখার মতো সঙ্গতি কই আমার?'

'ওসব বাজে কথা এখন থাকুক। শোনো,' বলে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ও। বলে, 'এসো, আমরা দুজনেই একসঙ্গে তদন্ত করি এ ব্যাপারে। প্রথম কাজ তো সন্দেহভাজনদের জেরা, তাই না?'

'তাহলে প্রথমে তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। তুমিই তখন বলছিলে না, টাকাটা হারিয়ে গেলে খুশি হতে খুবই?'

'খবরদার, কী বলতে চাও তুমি?'

'এই দ্যাখো, চট করে চটে গেলে কাজ এগোয় কী করে?'

'চটব না? তোমাকে আর ভাবতে হবে না, আমি বলছি। পিসিমাকেও অনায়াসে বাদ দিতে পারো তুমি।'

'ওভাবে পটাপট বাদ দিতে থাকলে গোয়েন্দাকেও তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।'

'আলবাত দেব। এসব ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত বোধশক্তি গোয়েন্দাদের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকরী। মিস্টার তরফদার—কোনও মোটিভ নেই। মিস্টার দেশমুখ—তোমার কী মনে হয়?'

'একে আইনজ্ঞ, তার ওপর রাজনীতিজ্ঞ। চালচলন বেশ দুর্বোধ্য আর রহস্যময়।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। সবার আগে নিজের দেহ সার্চ করানোর জন্যে বড় বেশি আগ্রহ দেখেছিলাম। খুবই সন্দেহজনক।'

'কিন্তু যাই বলো, তোমার বাবা কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ। পাছে অতিথিদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, তাই কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না দেশমুখের প্রস্তাবে।'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা।

'বাবার সৌজন্যবোধ দেখে এতটা মুগ্ধ না হলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে। টাকা-চোর যে চোরাই মাল নিয়ে টেবিলে আসেননি—তা উনি ভালো করেই জানতেন। অতখানি দুঃসাহস চোরের থাকবে না জেনেই চূড়ান্ত আতিথেয়তা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি বাবা। কিন্তু রুপোর টাকা ওঁর যেভাবেই হোক চাই। আর, সেজন্যে জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেকের কলজে চিরে দেখতেও ইতস্তত করবেন না উনি। তারপর ধরো অলোক ঘোষকে। বাবাকে সিংহলের ব্রিজ কনট্র্যাক্ট থেকে দূরে রাখার জন্যে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করেছ তো?'

'হুম। অলোক ঘোষকে তো তাহলে রেহাই দেওয়া চলে না কোনওমতেই। ভালো কথা, মিসেস প্যাটেলকে কীরকম মনে হয় তোমার?'

'ওঁর সম্বন্ধে তো কিছুই জানি না আমি।'

'ভদ্রমহিলার অবস্থা কিন্তু খুব সচ্ছল নয়। আমাকে বলছিলেন নিজেই। আমার অবস্থাও অবশ্য তাই।...ও হ্যাঁ, আমাকে যেন আবার বাদ দিও না।'

'ননসেন্স! পরের জিনিস নেওয়ার মতো নীচ তুমি নও।'

'তা—ইয়ে—ঠিকই বলেছ।' গলার কলারটা আবার যেন বড় শক্ত মনে হল।

হতাশ হয়ে পড়ে কবিতা : 'কিন্তু কোনও লাভই তো হল না। একটা সূত্রও যদি পেতাম।'

'তা অবশ্য পেয়েছি।'

'কী বললে?'

'একজন অভ্যাগতকে তুমি একেবারেই বাদ দিয়েছ। রুপোর টাকা চুরি করার পেছনে সোমনাথ মুখার্জিরও তো মোটিভ থাকতে পারে?'

'মোটেই না—ভুল ধারণা তোমার।'

BanglaBook.org

'হবেও বা। আচ্ছা, করিডরের শেষের কেবিনটা তোমার বাবার, তাই না?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল কবিতা।

বললাম, 'ডিনারের ঠিক আগেই দেখলাম স্বয়ং সোমনাথ মুখার্জি চোরের মতো পা টিপে-টিপে বেরিয়ে আসছেন কেবিনটা থেকে। তাঁর ধরন-ধারণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। দেখলাম, চুপিসাড়ে করিডর পেরিয়ে উনি ঢুকে গেলেন নিজের কেবিনে।'

'কী বলছ তুমি?'

'যা দেখেছি। ভদ্রলোক আমার অন্নদাতা, হর্তাকর্তা বিধাতা। এ ব্যাপার যদি ফাঁস করে দিই—তাহলে খুবই খুশি হয়ে উঠবেন আমার ওপর, কী বলো?'

'কী করবে তাহলে?'

'জানি না। অদ্ভুত সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি। তোমার বাবাকে যদি সব বলি, তাহলেই সোমনাথ মুখার্জি এমন একটা সাফাই গাইবেন যে, আমি যে একটা নিরেট মূর্খ, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে সঙ্গে-সঙ্গেই। আমার মতে, আগে সোমনাথ মুখার্জিকেই সবকিছু খুলে বলা ভালো।'

'তোমার চাকরিও খতম তাহলে।'

'আশ্চর্য নয়। কিন্তু সত্যের মূল্য চিরকালই এইরকম। তা ছাড়া, দৈনিকের অভাব এদেশে নেই, কাজেই—।'

'যা ভালো বোঝো করো।'

'ভালো কি না জানি না। তবুও বুক ঠুকে দেখা যাক ধোপে টেকে কি না প্ল্যানটা। সোমনাথ মুখার্জি যে আসলে একজন পাকা ক্রিমিন্যাল, এইটাই প্রথম সমঝে দিতে চাই তাঁকে। ঘরের মধ্যে কী করছিলেন উনি—তাহলেই তা জানতে পারব। পারলে এখনই দেখা করতাম ওঁর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়ালাম দুজনে।

কবিতা বলল, 'তাহলে মনে থাকে যেন, এ-কেসের দায়িত্ব দুজনেরই সমান। তুমি শার্লক হোমস আর আমি ডক্টর ওয়াটসন। ওয়াটসন হিসেবে আমাকে তো অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়, কী বলো?'

'শুধু ওয়াটসন। স্বয়ং কনান ডয়েল বললেও অত্যুক্তি হয় না।'

'সত্যি? তাহলে আমার ব্রেন আছে বলো? আমি কিন্তু ব্রেনওয়ালা পুরুষদের ভালোবাসি খুবই।'

'আর, আমি বাসি তোমায়। কবি, সত্যিই কি পাব তোমার বরমাল্য? আমার যেন মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।'

'কিন্তু আমি দেখছি না। চললাম। গুডনাইট অ্যান্ড গুড লাক।'

সৌভাগ্য-সূর্য যে আমার মধ্যগগনে, তার প্রমাণ পেলাম তৎক্ষণাৎ। স্মোকিংরুমে গিয়ে দেখি, 'নোটিলাস' আকারের চুরুট কামড়ে ধরে তন্ময় হয়ে ধূম্রজাল নিরীক্ষণ করছেন সোমনাথ মুখার্জি। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন বলে মনে হল না—আমি কিন্তু তা উপেক্ষা করে বেশ আয়েস করে বসলাম পাশের কাউচে।

'বাইরের আবহাওয়া কত পরিষ্কার দেখছেন?' একটু নড়েচড়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি আমি।

'দেখেছি।' নিস্পৃহ স্বর সোমনাথ মুখার্জির।

'দিব্যি ফুর্তিতে ছিলাম সবাই—যত ঝামেলার সূত্রপাত হল ওই টাকাটা হারিয়ে গিয়ে। আপনি কী বলেন?'

'ঠিক কথা।'

বলে, চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করলেন তিনি।

'এক মিনিট স্যার,' বাধা দিয়ে বলি আমি : 'আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ, তাই আপনার কাছে

BanglaBook.org

কিছু পরামর্শ চাই আমি।'

'বটে?'

'ধরুন এমন একটা সূত্র আমাদের একজন পেয়েছে, যা—ইয়ে—টাকা-চোরকে খুঁজে বার করার কাজে লাগতে পারে খুবই। তাহলে তা মিস্টার রায়ের কাছেই জানানো উচিত হবে আমাদের, তাই নয় কি? আপনি কী বলেন স্যার?'

'এ বিষয়ে কোনও দ্বিমতই থাকতে পারে না।'

'মহাসঙ্কটে পড়েছি আমি। ডিনারের ঠিক আগেই ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম—ঘরের আলো অবশ্য নেভানো ছিল। হঠাৎ দেখলাম মিস্টার রায়ের কেবিন থেকে একটি মূর্তি বেরিয়ে এসে করিডর পেরিয়ে ঢুকে গেল নিজের কেবিনে। লোকটার হাবভাব কীরকম অদ্ভুত মনে হল আমার।'

'তাই নাকি?'

'এরকম পরিস্থিতিতে আপনি পড়লে কী করতেন স্যার?'

'সোমেশ রায়কে সবকিছুই খুলে বলতাম নিশ্চয়।'

'কিন্তু স্যার, সে-মূর্তি তো আপনারই।'

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়-মহলে মধ্যে-মধ্যে সোমনাথ মুখার্জির মুখকে তুলনা করা হয় ড্রাগনের মুখের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে এ-উপমার যাথার্থ উপলব্ধি করলাম অন্তরে-অন্তরে।

শুধোলেন, 'অফিসে ওরা কত মাইনে দেয় আপনাকে?'

সংযত স্বরে বললাম, 'ব্ল্যাকমেল করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, স্যার।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল বৃদ্ধ সোমনাথ মুখার্জির দুই চক্ষু।

'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলের কথা? আমি শুধু বলতে চাই যে, অফিসের ওরা আপনাকে যা দেয়, তার উপযুক্ত আপনি নন মোটেই। কেন না, আপনার মতো নিরেট আহাম্মক আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। সোমেশ রায়ের টাকা আমি নেব কী জন্যে?'

'তা তো জানি না স্যার।'

'কেউই জানে না। ওর ঘরে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই—ওর একটা জিনিসও আমি সরিয়েছি, কিন্তু নিতান্ত অদরকারি সে-জিনিসটা। যদিও সব কথা বলার কোনও দরকার দেখি না—তবুও শুনে রাখুন। ভ্যালে রাখা নিয়ে বহু বছর ধরে সোমেশের সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক চলছে। পোশাক পরার সময়ে ভ্যালে রাখা পছন্দ করে ও—আমি কিন্তু একদম দেখতে পারি না তা। নিজের পোশাক যদি নিজেই না পরতে পারলাম—তাহলে খাইয়ে দেবার জন্যেও তো দরকার অন্য লোকের। কিন্তু সন্ধেবেলা সুটকেস খুলে দেখি, তাড়াতাড়িতে একটা ড্রেস-টাইও আনা হয়নি সঙ্গে।'

'টাই না নিয়েই সুটকেস গুছিয়েছেন?' ফস করে বলে ফেলি আমি। কোটিপতিদেরও পোশাক বিভ্রাট ঘটে তাহলে।

'একটিও না। অথচ ডিনার টেবিলে টাই না পরে গেলে অপদস্থর চূড়ান্ত হতে হবে। তাই, এ-কথা ওর কানে না তুলে ওর অজান্তে ওরই একটা টাই নেওয়া স্থির করলাম। জানতাম হরেকরকম টাই আছে ওর কাছে—তাই ও বাথরুমে গেলে চুপিসাড়ে একটা টাই নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভেবেছিলাম, কাউকে বলব না এ-কথা—কিন্তু যখন তা আর হল না, তখন এও বলে রাখি—অনায়াসেই এ-কথা আপনি সোমেশের কানে তুলতে পারেন।'

মনে-মনেই বলি, 'গভীর জলের মাছ!' কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল আমার শার্ট-বৃত্তান্ত। মুখে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। কথা দিচ্ছি, এসব কথা আর কেউই শুনতে পাবে না।'

'যথা অভিরুচি।' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

BanglaBook.org

'আর এক মিনিট, স্যার। ডক্টর তরফদারের ইন্টারভিউ নেওয়ার দায়িত্ব কি এখনও রইল আমার ওপর? মানে—আপনার কাজে এরপরও বহাল রইলাম কি না জানতে চাইছি।'

বেশ কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। প্রথমে চোখ সরিয়ে নিলেন মিঃ মুখার্জিই।

বললেন, 'ওহো, সেই প্রবন্ধটার কথা বলছেন বুঝি? ঠিক আছে, সে-ভার আপনার ওপরেই রইল।'

বলে, ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। আর পেছন থেকে তাঁর মন্থর চলন-ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। আমি আপন মনেই থেমে-থেমে পুনরাবৃত্তি করি, 'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলের কথা?'

কেবিনে ফেরার পথে দেখি ফাঁকা হয়ে গেছে চাঁদের আলোয় ধোওয়া জলপরীর ডেক। ঘরে এসে চটপট কোট, টাই খুলে ফেললাম, তারপর টান মেরে নিজেকে মুক্ত করলাম বেয়াড়া আকারের শার্টের কবল থেকে। নিচু একটা সেট্টির ওপর হিরের বোতাম সমেত শার্টটা ছড়িয়ে রেখে এসে বসলাম বার্থের ওপর। সিলিংয়ের আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল হিরেগুলো। সে-দ্যুতি দেখে মনে হল ধার করা শার্টের শোভা বাড়িয়ে লজ্জায় অভিমানে ঝিলকিয়ে উঠছে রায় বংশের ঐশ্বর্য।

কাল সকালে উঠেই বাহাদুরকে দিয়ে শার্টটা ফেরত দিতেই হবে। ভাবতে-ভাবতে লম্বমান হলাম শয্যায়। আজকের সোনালি সন্ধ্যা আমার জীবনে সৃষ্টি করল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের। কবিতা তাহলে সত্যিই আমায় ভালোবাসে। যা এতদিন স্বপ্ন ছিল, সে ভিরু ইচ্ছাটাকে এতদিন অতি সঙ্গোপনে লালন করে এসেছি মনের গহনে, তা তাহলে সত্যি হয়েছে। জীবনে যে এত সুধা আছে তা তো জানতাম না। সুখ, শুধু সুখ—আনন্দের অমৃত-সলিলে অবগাহন করেও এত সুখ পায় কেউ.. ।

ভালো কথা, টাকাটা যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু সরাল কে? সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। অবশ্য সত্যি হওয়াও বিচিত্র নয়। দারুণ দরকারের সময়ে আমারও তো শার্ট ছিল না। ও ভদ্রলোকেরও সে-অবস্থা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু আর সকলে? অলোক ঘোষ, দেশমুখ, মিসেস প্যাটেল? প্রত্যেকেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি..প্রমাণ নেই...কিন্তু...তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। দেখতে পেলাম না কিছুই, তবুও সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম ঘরের মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির।

'কে?'

ঘুম জড়ানো চোখে জড়িত স্বরে শুধোই আমি।

ছোট্ট একটা শব্দ—খুলে গেল দরজা। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে। চকিতে আলো জ্বেলে দিয়ে তাকালাম করিডরে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখলাম করিডরের শেষপ্রান্তের সিঁড়িটার দুটো-তিনটে ধাপ একসঙ্গে টপকে বেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটা কালো ছায়া। পেছন ফিরে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে, স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সেদিকে।

কিন্তু চাদর আনতে আর স্লিপার পায়ে গলাতে গিয়ে যে-সময় নষ্ট করেছিলাম—তার খেসারত দিতে হল সঙ্গে-সঙ্গেই। ওপরের ডেকে পৌঁছে জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না ধারে-কাছে।

ঘুম তখন একেবারেই ছুটে গেছে চোখ থেকে। তবুও যে কী করা উচিত, তা ভেবে না পেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর রেলিংয়ের পাশ দিয়ে আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলাম গলুইয়ের দিকে। আর তারপরেই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

যে-দৃশ্য দেখে দাঁড়ালাম, তা কিন্তু জাহাজের ডেকের ওপর নয়, জলপরী থেকে খানিক দূরে

সাদা আশ্চর্য শান্ত সমুদ্রের ওপর। আরব সাগরের জলে দুলতে-দুলতে দ্রুতগতিতে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল—একটা শার্ট।

অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও তা সত্যি। আর—এ কী! এ আমার কল্পনা, না চক্ষুভ্রম? ভাসমান শার্টটার ধবধবে বুকে দুধ-সাগরের শুক্তি-মুক্তোর মতো ঝিকমিক করছে ঠাকুরদার হিরের বোতাম না?

দূরে, দূরে, আরও দূরে ভেসে চলল শার্টটা—আর ঠাকুরদাব একমাত্র উত্তরাধিকারী জলপরীর রেলিংয়ে ভর দিয়ে বিচ্ছেদ-করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

হঠাৎ ঠিক পেছনেই একটা স্বর শুনে ধক করে উঠল হৃদযন্ত্রটা।

'কী ব্যাপার, বেড়াচ্ছেন নাকি?'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

ডাইনিং সেলুনের ঠিক দরজার কাছে বসে একটা কালো ছায়ামূর্তি, জ্বলন্ত সিগারেটের লাল অগ্নিপ্রান্তটি স্থির হয়ে ছিল মুখের সামনে।

'মিস্টার দেশমুখ যে!' সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই আমি।

'ধরেছেন ঠিকই। ভারি সুন্দর রাত, না?'

'কতক্ষণ আছেন এখানে?'

'ঘণ্টা দেড়েক তো বটেই। এমন সুন্দর রাতে ঘরে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না আমার।'

'আচ্ছা, একটু আগেই এদিকে কে দৌড়ে এল বলুন তো?'

'কে?'

'আমার কেবিনে ঢুকেছিল লোকটা—পিছু নিয়ে এদিকে দৌড়ে এলাম। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ব্রোমাইড আছে ঘরে? থাকলে, এক ডোজ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন, স্নায়ুগুলো শান্ত হবে, ভালো ঘুম হবে।'

'কিন্তু—।'

'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী আমি দেখিনি।'

'সারাক্ষণ এখানেই ছিলেন তো? কিন্তু সিগারেটটা তো দেখছি এইমাত্র ধরিয়েছেন।' বলি আমি।

'আপনার দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আমার তিন নম্বর সিগারেট।' বললেন দেশমুখ ঃ 'আপনি যদি আমি হতাম, তাহলে এত রাতে গোয়েন্দাগিরি অভ্যাস করতাম না ভদ্রসন্তানের ওপর। বাজে ছেলেমানুষি করবেন না মশায়। এখানে এসে পর্যন্ত লক্ষ করছি কেউ বা কারা একটা বিশ্রী ঝামেলার সৃষ্টি করেছে নিতান্ত অকারণে। এসবের মধ্যে আমি নেই। শহরের হট্টগোল আর হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে দূরে সরে এসেছি শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে—তাই নিরালায় এসে বসেছিলাম এখানে। কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে আপনি উড়ে এসে শুধু আমার শান্তি ভঙ্গ করেই ক্ষান্ত হলেন না, ফট করে আমার সিগারেট সম্বন্ধে একটা নোংরা ইঙ্গিতও করে ফেললেন।'

'মাপ করবেন। আমি শুধু—।'

'শুধু কী?'

'বলতে চাই যে, সমুদ্রের শোভা দেখতে-দেখতে আপনি এমনই তন্ময় হয়ে গেছিলেন যে, লোকটাকে একেবারেই খেয়াল করেননি।'

'ঘরে গিয়ে ঘুমোন—মাথা ঠান্ডা হবে।'

'তা যাচ্ছি।' বলে সরে পড়ি আমি।

BanglaBook.org

চটপট পা চালিয়ে কেবিনে এসে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম এদিকে সেদিকে। আমার শঙ্কা অমূলক নয়—উধাও হয়েছে শার্টটা। সেইসঙ্গে ঠাকুরদার সুখের হিরের বোতামও। ঠাকুমা এ-কথা শুনলে না জানি কী ধারণাই করে বসবে আমার সম্বন্ধে!

বার্থের কিনারায় বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে এইসব কথাই ভাবতে লাগলাম। না বলে শার্ট আনাটা নিশ্চয় কারও মনঃপূত হয়নি। তাই—কিন্তু কে তিনি? শার্টের একমেবাদ্বিতীয়ম সত্ত্বাধিকারী নিশ্চয়। তল্লাশি চালানোর সময়ে নিজের শার্ট চিনতে পেরে এই কাণ্ডটি করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি কোনজন? কাল সকালেই বলবাহাদুরকে বেশ কিছু সিলভার টনিক দিয়ে আদায় করতে হবে নামটা।

হাই তুললাম সশব্দে। ব্রোমাইড না খেলেও ঘুমের কোনও অভাব আমার হবে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বড় গোলমেলে। মাঝরাতে না বলেকয়ে কারও কেবিনে ঢুকে শার্ট চুরি করাটাই প্রথমত বেজায় বিসদৃশ ব্যাপার। তারপর অত কষ্ট করে নেওয়া শার্ট সাগর-জলে বিসর্জন দিয়ে কী পুণ্যলাভ হল জানি না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এ আজব ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক আছে?

শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ধুত্তোর—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। কিন্তু দেশমুখ যে ডাহা মিথ্যে বলেছে, তা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। আবার একটা হাই উঠল। সতৃষ্ণ নয়নে তাকাই উষ্ণ বার্থটার দিকে। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসে স্লিপার ছেড়ে শুয়ে পড়ি বার্থে।

পরের দিন সকালে বাথরুমের ভেতর তরফদারের গলা ছেড়ে গান গাওয়ার শব্দে ঘুম ছুটে গেল আমার। ভদ্রলোকের গলা অবশ্য খুব খারাপ নয়—চারদিক আঁটা বাথরুমে ঝরনা জলে স্নান করার ফুর্তিতে সে-গলা আরও খুলে গেছিল।

ঘড়িতে দেখি সাড়ে আটটার ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে ছোট কাঁটাটা। উঠি-উঠি করেও উঠতে আর ইচ্ছে হল না। মধুর আলস্যে রিমঝিম করছিল দেহ-মন—চেতনার দিক হতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তারই আমেজে। চুপ করে শুয়ে তাই তাকিয়ে রইলাম পোর্টহোলের পাতলা পরদাটার দিকে—সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলছিল সেটা। ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বাইরের ঝকঝকে নীল আকাশ—কাঁচা রোদের সোনালি আলোর প্রসাধন-লাবণ্যে উজ্জ্বলতর তার সৌন্দর্য। মৃদু ছন্দে দুলতে-দুলতে মসৃণ গতিতে ভেসে চলছিল আমাদের জলপরী। মনে হল, হঠাৎ কি যাদুমন্ত্রবলে নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, নিঃসীম শান্তিঘেরা কোনও এক স্বপনপুরীতে এসে পড়েছি আমি।

বড় মিষ্টি একটা সুখের পরশ পাচ্ছিলাম অন্তরে—বড় মোলায়েম সে-অনুভূতি। যেন খুব আনন্দের একটা অধ্যায় হঠাৎ খুলে গেছে আমার জীবনে—ও, হ্যাঁ, কবিতা। আমায় ভালোবাসে সে। তার কাছে আমি শপথ করেছি টাকাটা খুঁজে বার করার। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পাশে কবিতাকে নিয়ে কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, এখন মনে হল ততটা সহজ নয় নিশ্চয়। যেই নিক না কেন, টাকাটার মূল্য সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল সে। আর, সুযোগ পেলেই বেশ কিছু রজতখণ্ডের বিনিময়ে তাকে হস্তান্তরিত করতে সে দ্বিধা করবে না মোটেই। কিন্তু কে সেই চতুর-চূড়ামণি?

সোমনাথ মুখার্জির কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের ভুল করে টাই না-আনার আষাঢ়ে গল্পটা যেন কেমনতরো। রাত দেড়টার সময়ে শান্তি আর সৌন্দর্যের উপাসক দেশমুখকে মনে পড়ল নির্জন ডেকের ওপর। ভদ্রলোক দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে কাঁচা মিথ্যাকেও এমন সহজ-সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন যে, ধরার ক্ষমতা তাঁর অতি প্রিয়জনেরও থাকে না। মনে পড়ল, গভীর রাতে শার্ট-চোর আগন্তুকের কথা—কিন্তু সত্যিই কী কেউ এসেছিল আমার ঘরে? স্বপ্ন নয় তো?

একলাফে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে—তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কেবিনটা। কিন্তু সাদা শার্টের

চিহ্নও দেখলাম না কোথাও—শুধু চোখধাঁধানো লাল-সবুজ-নীল ম্যানিলা পুলওভার যেন নীরবে বিদ্রুপ করতে লাগল আমায়। তাহলে কাল রাতের ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় মোটেই। এই মুহূর্তে না জানি দূর হতে বহু দূরে কোনও এক অজানা অচেনা রোমান্টিক বন্দর অভিমুখে ভেসে চলেছে ঠাকুরদার শখের হিরের বোতাম। কোনও বিজন দ্বীপের নরখাদক-গৃহিণী এবার তা সানন্দে ধারণ করবে নাক অথবা কানের ফুটোয়! ঠাকুমা শুনলে কী মনে করবে আমার সম্বন্ধে?

সেই মুহূর্তে অবশ্য ঠাকুমার মনে করা-করি নিয়ে খুব বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম না আমি। গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করতে যখন চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, তখন কাজ শুরু করতেই হবে যেমন করেই হোক। পলাতক শার্টের মালিকের নাম জানাই হবে আমার সর্বপ্রথম কাজ।

ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। তখনও সমানে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দে স্নান-সুখ উপলব্ধি করে চলেছিলেন তরফদার ভদ্রলোক—কাজেই খটাখট বাদ্যসঙ্গীতটা একবার শুনিয়ে দিলাম বাথরুমের দরজায়। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছুই হল না, তবে মনটা একটা তৃপ্তি পেল, এই যা।

ভেতরে ঢুকল বাহাদুর—কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত হাসিটুকু না নিয়েই। বেশ চিন্তিত মনে হল ওকে।

'সেলাম সাব, বহুত তকলিফ আজ।' শুকনো মুখে শুরু করে ও : 'টাকা চুরি গেছে তো আমাদের আর বিপদের শেষ নেই। আপ কুছ মাংগতা তো জলদি বাতাইয়ে।'

ওর চোখে চোখ রেখে শুধোলাম, 'শার্টটা কোত্থেকে এনেছিলে?'

'জি হাঁ।' নিমেষে উদাসীন হয়ে যায় ও।

'আজই ফেরত দেবে তো ওটা?'

'জি হাঁ।'

'দিতে আর হবে না—কাল রাতে ঘর থেকে চুরি গেছে শার্টটা।'

'জী হাঁ।'

বিস্ময় নেই, আগ্রহ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। তাহলে কি বুঝব শার্টবৃত্তান্তের কিছুই অজানা নয় ওর? না, নিছক নেপালিসুলভ অহেতুক জেদে কিছু না জানাব ভান করছে? অপলক চোখে তাকালাম ওর দিকে—নিষ্পলক চোখে সেও তাকাল আমাব দিকে।

হতাশ হয়ে পড়লাম। চলতে-চলতে হঠাৎ নিরেট পাথরের দেওয়ালের সামনে হোঁচট খেলে যেমন হয়, তেমনি নিরাশ সুরে বললাম, 'বাহাদুর,.খবরটা কিন্তু খুবই দরকারি। শার্টটা তুমি কার কাছ থেকে এনেছ তা আমায় জানতেই হবে।'

বার্থের দিকে তাকাল বাহাদুর, তারপর একে-একে বাথরুমের দরজা, পোর্টহোল, সিলিংয়ের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে চোখ বাখল আমার ওপর। বলল, 'ভুল গ্যয়া।'

'কী বললে?' দপ করে জ্বলে উঠি আমি : 'দ্যাখো, ওসব চালাকির চেষ্টা আমার কাছে কোরো না বলে রাখছি। কোত্থেকে এনেছিলে ভালো চাও তো বলে ফ্যালো চটপট।'

'ভুল গ্যয়া।' উত্তর এল।

আশ্চর্য এই খর্বকায় নেপালিগুলো। অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

'এক মিনিট আগেও তো বলছিলে শার্টটা আজই ফেরত দিয়ে আসবে। কোথায় ফেরত দেবে তা না জানলে কাকে দিয়ে আসবে শুনি?'

'ভুল গ্যয়া।' বলে ও।

বাংলা আর নেপাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। একজনা কটমট করে অগ্নিদৃষ্টি মেলে রইল তাকিয়ে—অপরজন শুধু নির্বিকারভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার জ্বলন্ত চক্ষু।

প্রথমে আমিই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মেজাজ খারাপ করে কোনও লাভ নেই। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা আর মিষ্টি কথা দিয়ে দেখা যাক কার্যোদ্ধার হয় কি না। পর মুহূর্তেই কাজে প্রয়োগ করলাম সবক'টা কৌশলই।

BanglaBook.org

ও বলল, 'বাথরুমের দরজায় চাবি দেওয়া সাব? বহুত খারাপ, বহুত খারাপ।'

'তা যা বলেছ,' বলি আমি ঃ 'যাই হোক, তোমাতে-আমাতে ঝগড়া না করাই ভালো। কাল যা উপকার করেছ, তারপর তো অন্তত নয়ই।'

নিরুত্তরে আমার কোটটার ওপর সবেগে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর।

বিদ্যুতের মতো একটা মতলব ঝলসে উঠল স্নায়ুতন্ত্রীতে।

বললাম, 'কালকের বিপদের কথা তো তুমি জানোই। কাল আরেকজনও এ-বিপদে পড়েছিলেন। শুনলাম, টাই আনতে একেবারে ভুলে গেছেন মুখার্জি সাহেব।'

একটু বিরতি। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর।

'শুনলাম, পোশাক পরতে গিয়ে উনি দেখলেন যে, সবক'টা টাই ফেলে এসেছেন বাড়িতে।'

কোটটা নামিয়ে রাখল বাহাদুর।

বলল, 'মোখার্জি সাবকা বহুত টাই হ্যায়'।

'তাই নাকি?' এমন ভান করি যেন দারুণ ভুল করে ফেলেছি আমি ঃ 'তাহলে তো বিলকুল বাজে কথাই শুনেছি আমি। অনেক টাই এনেছেন তাহলে?'

'বড় একটা বাক্স দেখলাম। দশ-বিশটা তো হবেই।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'ওঁকে যে আমিই পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

পাছে মুখের ভাব ধরা পড়ে যায়, তাই ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দারুণ খবর! সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ত তাহলে সত্যিই কপোলকল্পিত। ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করা সার্থক হয়েছে এতদিনে। রিপোর্টার না হয়ে গোয়েন্দা হলেই দেখছি উন্নতি ছিল অনেক।

শার্টের মালিকানা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

আনমনা হয়ে পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে বাইরের নীল আকাশ দেখতে-দেখতে শুধোলাম, 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কখন পৌঁছচ্ছি বাহাদুর?'

'পৌঁছচ্ছি না,' জবাব এল তৎক্ষণাৎ।

'কী বলছ?' চমকে উঠি আমি।

'বড়া সাবকা বহুত গোসসা হো গ্যায়া সাব। সকাল থেকেই বড় ঝামেলা চলছে সবার ওপর।' ওপর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল।

'আভি যা রহা সাব।' বলেই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ও বাইরে।

আবার টোকা দিলাম বাথরুমের দরজায়—কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধাক্কা দিলাম, নব ধরে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকানি দিলাম, কিন্তু কোনওরকম প্রত্যুত্তরই পেলাম না ওদিক থেকে। দারুণ রাগ হয়ে গেল। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে পাশের দরজায় বেশ সানন্দেই নক করলাম কয়েকবার।

খট করে খুলে গেল দরজা, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের হাসি-হাসি প্রসন্ন মুখ।

'গুড মর্নিং মিস্টার রায়,' মধুক্ষরা স্বরে বললেন উনি ঃ 'বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

বেশ সংযত স্বরে শুরু করি আমি, 'বাথরুমটায় আপনার আমার ফিফটি-ফিফটি শেয়ার আছে, কী বলেন?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়,' হাসি মুখে ঘাড় নাড়তে থাকেন ভদ্রলোক ঃ 'এ-কথা আর বলতে—যখন খুশি, যেভাবে খুশি আসতে পারেন আপনি।'

এবার আমার সংযম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়—অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

দাঁতে দাঁত দিয়ে বলি কোনওমতে, 'দয়া করে চাবিটা তাহলে খুলবেন কি?'

'ও-হো। বড় দুঃখিত, সত্যই বড় দুঃখিত। একেবারেই মনে ছিল না আমার। এক মিনিট।'

BanglaBook.org

বলেই আমার মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

চটপট ফিরে এলাম কেবিনে। বাথরুমের দরজায় ক্লিক শব্দ হওয়ামাত্র একলাফে হাজির হলাম ভেতরে।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আজ আমার কিছু কথা আছে।'

'বটে?' ভুরু তোলেন তরফদার : 'তা কথা তো হবেই। এত কাছাকাছি যখন রয়েছি, তখন ইচ্ছে না থাকলেও উপায় কোথায় বলুন।'

'আমিও তাই বলি। যাই হোক, আমাদের পেপারের তরফ থেকে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে আমার।'

'ওয়ান্ডারফুল! আপনি তাহলে প্রেস থেকে এসেছেন?'

'একটা দৈনিক পত্রিকায় কাজ করি।'

'তাই নাকি! সিলোনে কিন্তু এরকম হয় না।'

'কীরকম হয় না?'

'অভ্যাগত হিসেবে প্রেসম্যানদের আমন্ত্রণ জানানো। আশ্চর্য! অদ্ভুত!'

'জিহ্বা সংবরণ করে বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগ আমার কাজ না শেষ-হওয়া পর্যন্ত দেব আপনাকে। আর, আপাতত নিরালা বাথরুমে একলা স্নান করার ইচ্ছে প্রেসম্যানদেরও থাকে।'

'ওহো, আমি যাচ্ছি।' একটু তপ্ত স্বরেই বলেন তরফদার।

'চমৎকার।' বলে ওঁর পেছনেই কড়াং করে টেনে দিলাম লকটা।

ডাইনিং সেলুনে গিয়ে দেখি একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসেছেন মিসেস প্যাটেল আর দেশমুখ। দেখে মনে হল, বেশ গভীর একটা আলোচনা চলছে দুজনের মধ্যে। আমার সদ্য-নিদ্রোত্থিত আর দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার চকচকে মুখ দেখে ওঁরা যে খুব খুশি হয়েছেন, তা মনে হল না।

বললাম, 'গুড মর্নিং। আজ দেখছি প্রত্যেকের দেরি হয়েছে।'

'বেজায়।' সায় দেন মিসেস প্যাটেল।

সায় দিয়ে বলি, 'অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। রাত করে ঘুমোনো মানেই বেলা করে ব্রেকফাস্ট খাওয়া, কী বলেন মিস্টার দেশমুখ?'

মিসেস প্যাটেল শুধোন, 'মিস্টার দেশমুখ রাত জেগেছিলেন নাকি?'

'রাত প্রায় দেড়টার সময়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগে যায় ডেকের ওপর।' নিরীহ স্বরে হাসি-হাসি মুখে বলি আমি।

'আপনার তাতে খুশি হওয়াই উচিত মশায়।' অপ্রসন্নভাবে বলেন দেশমুখ। তারপর উদ্দেশ করেন মিসেস প্যাটেলকে : 'মাঝরাতে কে যেন ঘরে ঢুকেছে এইরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ডেকের ওপর ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে কম বেগ পেতে হয়নি আমার।'

ফিক করে অষ্টাদশীর হাসি হাসলেন মিসেস প্যাটেল। তারপর বড়-বড় চোখ করে বললেন, 'তাহলে খুব মজার-মজার স্বপ্ন দেখেন বলুন! ভারি আশ্চর্য তো! আমায় কিন্তু সবকিছুই বলতে হবে। ভালো কথা, আজ আমার একটু মার্কেটে যাওয়ার দরকার ছিল, ভাবছি কার সঙ্গে যাব।'

'আর ভাববেন না।' বলি আমি।

'বাঁচালেন আপনি—অনেক ধন্যবাদ।' হাসেন মিসেস প্যাটেল।

'আ—আমি বলতে চাই যে,' তাড়াতাড়ি বলি আমি, 'মোটেই পোর্ট ভিক্টোরিয়া যাচ্ছি না আমরা।'

BanglaBook.org

'তার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন দেশমুখ : 'তবে চলেছি কোথায়?'

বললাম, 'আমাকে জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই, মিস্টার দেশমুখ। এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে, পোর্ট ভিক্টোরিয়ার অনেক আগেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'কিন্তু এসবের অর্থ কী?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন দেশমুখ।

অলোক ঘোষ ঢুকলেন সেলুনে। দুধের মতো ধবধবে সাদা শার্টটা দেখে নিজের অজান্তেই ভাবি ভদ্রলোকের কেবিনটা কোন দিকে। দেশমুখ কিন্তু তৎক্ষণাৎ খবরটা জানিয়ে দিলেন ওঁকে।

'সত্যি কথাই শুনেছেন।' বলেন অলোক ঘোষ, 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কেন, কোনও পোর্টের দিকেই যাচ্ছি না আমরা। কাল রাত থেকেই জলের ওপর চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী।'

'চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী।' পুনরাবৃত্তি করেন দেশমুখ।

'হ্যাঁ। স্রেফ হাওয়া খাচ্ছি আর কী। আরও কতদিন যে খাব, তা জানি না!'

'বুঝলাম না।' হতবুদ্ধি হয়ে যান রাজনীতিবিদ ভদ্রলোক।

মৃদু হাসলেন অলোক ঘোষ।

'সোমেশ রায়কে আমরা ভালো করেই চিনি। অত্যন্ত মূল্যবান একটা জিনিস খোয়া গেছে তাঁর। কাজেই, এ-জাহাজের প্রতিটি কর্মচারী, এমনকী অভ্যাগতদেরও ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে সার্চ না করা পর্যন্ত পোর্টে নামতে দেওয়ার মতো আহাম্মক তিনি নন।' দেশমুখের দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে বলে চলেন অলোক ঘোষ : 'প্রত্যেককেই বলছি, টাকাটা সত্যই যদি কেউ নিয়ে থাকেন, ফিরিয়ে দিন। না হলে, এ বছরে আর বোম্বাই ফিরতে হবে না কাউকে।'

উঠে দাঁড়ালেন দেশমুখ।

'এ কী অত্যাচার! সোমেশ রায়ের মনের অবস্থা আমিও বুঝছি। কিন্তু যারা চোর নয়, তাদের এ জাতীয় নিগ্রহ শুধু অন্যায় নয়, বেআইনিও।' বলে তিনিও শক্ত চোখে তাকালেন অলোক ঘোষের দিকে : 'সোমবার সকালের মধ্যেই আমাকে বোম্বাই ফিরতে হবে—মিঃ রায়কে জানিয়ে দেবেন তা।' বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন সেলুন থেকে।

মিসেস প্যাটেল বললেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' তারপর তিনিও অনুসরণ করলেন দেশমুখকে।

অলোক ঘোষ তাকালেন আমার দিকে—আমি তাকালাম তাঁর দিকে। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলি আমি, 'আমার মনে হয় একজন প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা আনা উচিত এখন।'

ভাবলেশহীন স্বরে বললেন অলোক ঘোষ, 'নিশ্চয় নয়। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করার মতো যোগ্যতা মিঃ রায়ের আছে।'

তারপর সব চুপচাপ।

প্রাতরাশ শেষ হলে পর বেরোলাম কবিতার সন্ধানে। খোলা ডেকে চোখধাঁধানো রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ওকে।

'আশ্চর্য!' দেখামাত্র উচ্ছ্বাস জাগে আমার।

'তার মানে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় ও।

'যখন দূরে থাকি, ভাবি না-জানি কত সুন্দরী তুমি। কিন্তু যখনই কাছে পাই, দেখি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশি তোমার সৌন্দর্য। তাই বলছিলাম—।'

'থাক, আর বলতে হবে না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'উদরদেবকে শান্ত করছিলাম। তোমার বুঝি হয়নি এখনও?'

'অনেক আগেই।'

'শাবাশ!'

'শার্লক হোমস ছিলেন কর্মবীর, তোমার মতো বাক্যবীর ছিলেন না। একসঙ্গে গোয়েন্দাগিরির

BanglaBook.org

চুক্তি তো হল কাল—এদিকে সব খবর না শুনতে পেয়ে যে দম আটকে মরতে চলেছি। সে-খেয়ালটা নেই?'

'কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমায় বাঁচাব।'

সোমনাথ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনিটা বললাম ওকে। টাই প্রসঙ্গও বাদ গেল না। বলবাহাদুরের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাও সরস করে শুনিয়ে দিলাম। শুনে কপাল কুঁচকে ওঠে ওর।

অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'তুমি বলছ কী, মৃগ? সোমনাথকাকা বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'বেশি ঘনিষ্ঠতাই তো বিপজ্জনক। ভালো কথা, তোমার বাবার খবর কী?'

'সারারাত ঘুমোতে পারেননি উনি। শুনে অবাক হলাম না মোটেই। সাঁইত্রিশ বছর পর এই প্রথম লাকি পিস না নিয়ে রাত্রিযাপন—আশ্চর্য কী! এ ব্যাপারে তুমি যে স্বেচ্ছায় তদন্ত শুরু করেছ তা বলেছি ওঁকে। তোমার বন্ধু গোয়েন্দা শিরোমণি ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করে তুমিও যে একটা ছোটখাটো গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ, তাও বলেছি। এমন সুন্দর করে বললাম যে, আগাগোড়া বেশ মন দিয়ে শুনলেন বাবা।'

'এই তো চাই। আশীর্বাদ করছি প্রিয়ে, আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই চিরকাল এমনি করেই যেন স্বয়ং সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হন তব জিহ্বাগ্রে।'

'বড় যে পুলক দেখছি আজ, ব্যাপার কী?'

ব্যাপার কী, তা বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এসে হাজির হলেন আমাদের মাঝে।

উসকোখুসকো চুল, চোখের কোণে রাত জাগার ক্লান্তি-চিহ্ন। বুঝলাম, সত্যিই বড় মানসিক অশান্তিতে রয়েছেন উনি।

'এই যে মিস্টার রায়, কবিতার কাছে শুনলাম আপনি নাকি এই বিশ্রী ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন?'

'লেগেছি ঠিকই। কিন্তু আমার ক্ষমতা এমন কিছু বেশি নয় যে—।'

'রাবিশ! অন্তত আমার চেয়ে এসব ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, আর সেই কারণেই আপনার সাহায্য আমার এখন খুবই দরকার। তা ছাড়া'—আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন আবার : 'তা ছাড়া অভ্যাগতদের সবাইকেও তো এসব কথা বলা চলে না। কিন্তু আপনি—ইয়ে তুমি আমার ছেলের মতো। আমার পুরো আস্থা রইল তোমার ওপর।'

শেষের শব্দ ক'টি শুনেই বুঝলাম কবিতার কথাই ঠিক। সোমেশ রায়ের সৌজন্যবোধের অন্তরালে যে কী পরিমাণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে, তা আগে থেকে জানা না থাকলে প্রথম আলাপে বুঝে ওঠার সাধ্য কারওরই নেই।

বললাম, 'আপনার কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, স্যার। কিন্তু একটা প্রশ্ন। টাকাটা উদ্ধার করার জন্যে আপনি নিজে কি কিছু করেছেন?'

'জলপরীর প্রত্যেক কর্মচারীকে জেরা করেছি নিজে। খানসামারাও বাদ যায়নি। প্রত্যেকের দেহ তল্লাশ হয়েছে—ঘরগুলোও বাদ যায়নি। কিন্তু ওদের কাউকেই সন্দেহ হয় না আমার। দিনের বেলায় এক ফাঁকে অভ্যাগতদের মালপত্রগুলোও পরীক্ষা করা হবে। যদিও আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি হতে দেওয়া পছন্দ করি না আমি, তবুও এ ব্যাপারের গুরুত্ব ওসব সেন্টিমেন্টের চেয়ে অনেক বেশি—কাজেই কাউকেই বাদ দেব না আমি। ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিয়েছি, কোনও পোর্টের ধারে-কাছেও যাবে না জলপরী। খাবারদাবার, কয়লা যা আছে তাতে পাঁচদিন পর্যন্ত দিব্যি চলে যাবে। দরকার হলে ততদিন পর্যন্ত এইভাবেই ভেসে বেড়াব আমি।'

'চমৎকার ব্যবস্থা।' বলি আমি।

'এ ছাড়া, বোর্ডে এইমাত্র একটা নোটিশ দিয়ে এলাম—লাকি পিস যে ফেরত দেবে, তাকে নগদ চার হাজার টাকা পুরস্কার তো দেবই, উপরন্তু সবরকম জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকেও রেহাই

BanglaBook.org

দেওয়া হবে। ওপরে মোটা-মোটা করে "জরুরি" লিখে দিয়েছি। চোর যদি তুমি ধরো, তাহলে টাকাটা তোমারই হবে।'

'কিন্তু স্যার, টাকা তো আমি নেব না।' টাকা শব্দটার ওপর যতটা জোর দেব ভেবেছিলাম, ততটা না হওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হই আমি।

'রাবিশ। কেন নয় শুনি? ও সামান্য টাকায় আমার কোনও ক্ষতিই হবে না। চার হাজার টাকার বিনিময়ে মনের যে-শান্তি আমি ফিরে পাব, তার তুলনায় ও-টাকা কিছুই নয়। আর যতক্ষণ তা না পাচ্ছি—আমার মতো অসুখী আর দুনিয়ায় নেই।'

চট করে কবিতা বলে উঠল, 'বাবাকে সব বলোই না।'

'কী বলবে?' চকিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'ও যা জেনেছে, তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে বাবা। বিশ্বাস করা যায় না—।'

'কী মুশকিল! এখনও পর্যন্ত তা জানাওনি আমায়? বলো, বলো, কোথায় আমার টাকা?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়।

বললাম, 'সবই বলব। কিন্তু তার আগে আমায় শুধু এক মিনিট সময় দিন। আমি—।'

'শুধু এক মিনিট? ঠিক আছে—দিলাম। কিন্তু শুধু এক মিনিট—মনে থাকে যেন? এ উদ্বেগের মধ্যে বেশিক্ষণ আর রেখো না আমায়।'

'না স্যার, এখুনি আসছি।' বলে তাড়াতাড়ি পা চালাই আমি।

সোমনাথ মুখার্জির কেবিনে গিয়ে বলবাহাদুরকে জিগ্যেস করে জানলাম, অত্যন্ত দেরিতে শয্যা ত্যাগ করেই তিনি প্রাতরাশ খেতে গেছেন ডাইনিং সেলুনে।

সন্ধানী চোখে চারদিক দেখে নিই আমি। তারপর শুধোই, 'টাইগুলো গেল কোথায় বাহাদুর?'

'সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন। চাবি সাবের পকেটে।'

মনে-মনে একটু হেসে নিয়ে গেলাম ডাইনিং সেলুনে, একটা টেবিল দখল করে, ধূমায়িত কফির দিকে তাকিয়ে চুরুট টানছিলেন তিনি।

'গুড মর্নিং, স্যার।' বললাম আমি।

'গুড মর্নিং। বড় দেরি করে ব্রেকফাস্ট খান দেখছি।' এমন সুরে বললেন যেন এরকম গর্হিত অভ্যাস আর দুনিয়ায় নেই।

বললাম, 'ব্রেকফাস্ট অনেক আগেই সেরে নিয়েছি, স্যার। এখন এলাম আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।'

'আর, যদি মনে করি?'

'তাহলেও আমায় বলতে হবে।' দৃঢ়স্বরে বলি আমি।

চুরুটটা নামিয়ে কঠিন চোখে আমার দিকে তাকালেন সোমনাথ মুখার্জি।

'আমার কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বাচাল আর সবচেয়ে অসহ্য হলেন আপনি।'

'কী করব বলুন। যা ন্যায়, তাই শুধু করতে চাই আমি।'

'যারা ভাবে, শুধু ন্যায় করবার জন্যেই তাদের জন্ম—তাদের মতো নিরেট মূর্খ দুনিয়ায় আর নেই। কী মতলব এবার শুনি।'

'গতরাতে আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, যা জেনেছি, তা সোমেশ রায়কে বলব না। কিন্তু আমার এ-শপথ রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না স্যার।'

'বটে! কেন হবে না শুনি?'

'টাই সম্বন্ধে আপনার গল্পটার জন্যে। গল্পটা যে সত্যি নয়, তা আমি জেনেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি বললেন, সোমেশ রায়ের ঘরে টাই আনতে গেছলেন আপনি। আমার

BanglaBook.org

মতে ওটা একটা আক্ষরিক ভুল। কেন না আপনি সেখানে টাই নয়, টাকা আনতেই গেছলেন।'

ন্যাপকিনটা আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

বললেন, 'আমার সঙ্গে বাইরে আসবেন কি?'

'নিশ্চয়, স্যার।' ওঁর পেছন-পেছন বেরিয়ে এলাম ডেকে ঃ 'সত্যিই বড় দুঃখিত, স্যার। কিন্তু কী করব—।'

'আমিও—আপনার জন্যে। সোমেশ রায় কোন দিকে আছে, জানেন?'

'নীচের ডেকে।'

সেইদিকেই ফিরলেন সোমনাথ মুখার্জি ঃ 'ভালো কথা, ডক্টর তরফদারের ব্যাপার নিয়ে আপনার আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার কাগজের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্পর্ক রইল না।'

'ধন্যবাদ স্যার।' মৃদু হেসে বললাম।

বললাম বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে গেলাম খুবই। প্রেমের শুরু আর চাকরির সারা—অপূর্ব যোগাযোগ।

নীচের ডেকে অধীর আগ্রহে কবিতার সামনে পায়চারি করছিলেন সোমেশ রায়। আমাদের দেখেই উৎকণ্ঠিত চোখে তাকালেন আমাব পানে। তারপব যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়ে পা নাড়াতে লাগলেন ঘন-ঘন।

কিন্তু সোমনাথ মুখার্জিই প্রথমে কথা বললেন, 'সোমেশ, তোমায কিছু বলতে চাই আমি।'

'বেশ তো, বলে ফ্যালো।'

'এই অর্বাচীন ছোকরাটার ধারণা, তোমার টাকাটা আমিই সরিয়েছি।'

'রাবিশ!' মুখ দেখে মনে হল আমার সম্বন্ধে ধারণাটা তাঁর ফিকে হয়ে আসছে দ্রুত ঃ 'রাবিশ! তুমি যে নেবে না তা আমি জানি।'

'কিন্তু—ইয়ে,' মুখ লাল হযে ওঠে সোমনাথ মুখার্জির ঃ 'আমি—আমি,' একটা ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, 'সত্যি কথা বলতে কী সোমেশ, টাকাটা আমিই নিয়েছি।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কী বললে? আবার বলো!'

'আরে শোনো-শোনো, উত্তেজিত হয়ো না। এ একটা নিছক পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।'

'পরিহাস! এই বয়েসে পরিহাস! ভীমরতি ধরেছে তোমার? যাক, কোথায় আমার টাকা?'

'আমার কথাটা শোনো আগে। টাকাটার সঙ্গে তোমার মনের কী সম্পর্ক, তা জানার জন্যেই সরিয়েছিলাম ওটা। প্রায়ই শুনি এ-টাকা হারালে নাকি একেবারেই ভেঙে পড়বে তুমি। কিন্তু আমাব তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তোমার মতো একজন শক্ত পুরুষের মনের ওপর সামান্য একটা টাকার অর্থহীন কুসংস্কারের যে কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না তা প্রমাণ করবার জন্যেই গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ঘরে চুপিসাড়ে ঢুকে টাকাটা পালটে রেখেছিলাম আমিই।'

'ক্রিমিন্যাল—হাড়ে-হাড়ে তুমি একটা পাকা ক্রিমিন্যাল। প্রথম থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু—।'

'তুমি যে এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেবে, তা তো কল্পনাও করতে পারিনি আমি। এই সম্পর্কেই কয়েকটি কথা বলতে চাই তোমায়। সোমেশ, টাকাটা যে তোমার কী ক্ষতি করেছে, তা বোঝো না কেন? কোনও পুরুষের উচিত নয় এরকম বাজে একটা কুসংস্কারের ওপর জীবনের সাফল্যের ভিত গাঁথা। তোমার তো নয়ই। এই তুচ্ছ কারণে কেন এত অশান্তি ভোগ করছ বলো তো? এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলাম তোমায়—।'

'তোমার নীতিকথা সংক্ষিপ্ত করে টাকাটা বার করবে কি?'

BanglaBook.org

'ঘরে আছে, এনে দিচ্ছি। যাক, কোনওরকম মন-কষাকষি রইল না তো, সোমেশ?'

'থাকবে—যদি না মুখটা বন্ধ করে টাকাটা বার করো তাড়াতাড়ি।'

কেবিনের দিকে গেলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর ডেকের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে লাগলেন সোমেশ রায়। ভেতরে-ভেতরে তিনি যে কতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন, তা তাঁর অস্থিরতা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। আত্মদমন ওঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চিহ্নও দেখলাম না ওঁর মধ্যে।

'বুড়ো খোকা কোথাকার!' আপনমনেই গজরাতে থাকেন উনি : 'হল কী ওর? কচি খোকার মতো এ কী ব্যবহার পরিহাস। শুনলে তো তুমি, বলে কিনা নিছক পরিহাস।'

সান্ত্বনার ছলে বলে কবিতা, 'কেন উত্তেজিত হচ্ছ বাবা। টাকা তো তুমি পেয়েই যাচ্ছ। মনে রেখো কিন্তু এ জন্যে সমস্ত বাহবাটুকুই মৃগাঙ্কর পাওনা।'

'ভারি চালাক ছেলে। এখুনি চেক লিখে দিচ্ছি আমি।'

'এখন থাকুক স্যার,' প্রতিবাদ জানাই আমি : 'এরকম পরিস্থিতিতে ওসব ঝামেলা করবেন না। পরে হবে'খন।'

'রাবিশ! পাকা চোরের মতো—ছি-ছি, কী বিশ্রী ব্যাপার! ছুঁচো কোথাকার। এইজন্যেই কোনওদিনই ওকে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।'

'বাবা! কী বলছ তুমি! উনি তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।' আহত স্বরে বলে কবিতা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিরে এলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর সেই প্রথম দেখলাম তাঁর সুবিখ্যাত ড্রাগন-মুখে উত্তেজনার রক্তিম উচ্ছ্বাস।

'সোমেশ, আমি সত্যিই একটা গর্দভ।'

'হাবভাব তো সেইরকমই। টাকা কোথায়?'

নীরবে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন সোমনাথ মুখার্জি। অধীর আগ্রহে সোমেশ রায়ও হাত বাড়ালেন। আর তাঁর প্রসারিত হাতের তালুতে টুপ করে তিনি ফেলে দিলেন নীল রঙের অশোক স্তম্ভের ছাপওলা একটা কাগজখণ্ড—দাবিমতো ভারত সরকারের এক টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র।

'শয়তান!' সিংহের মতো গর্জে উঠলেন সোমেশ রায়।

ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'টাকাটা যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে হাত দিয়ে পেলাম এটা।'

আর একটিও কথা বললেন না সোমেশ রায়। নোটটা দলা পাকিয়ে নিক্ষেপ করলেন ডেকের ওপর। মুখ তাঁর এমনই টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল যে, মনে-মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।

আবার বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'কী বলব ভেবে পাচ্ছি না সোমেশ। লাখ টাকার বিনিময়েও এ ব্যাপার আমি ঘটতে দিতাম না। কিন্তু—।'

'ক্ষমা! অনুতাপ!' গরগর করে ওঠেন সোমেশ রায় : 'ওসব কে শুনতে চায়? আমি চাই আমার টাকা—ব্যস, আর কিছু না।'

'নিছক রসিকতা করতে গিয়ে—।'

কথাটা আর শেষ হয় না—বোমার মতোই ফেটে পড়েন সোমেশ রায় : 'রসিকতা! পরিহাস! বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! এই কথাই ভাবছে আরও একজন—চোরের ওপর যে বাটপাড়ি করেছে। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম—ঘুরে-ফিরে সেইখানেই এসে দাঁড়ালাম আবার।'

'একটু শুধু তফাত রইল,' বললেন সোমনাথ মুখার্জি : 'তোমার পাশে এবার আমিও দাঁড়ালাম। তুমি আমি দুজনেই খুঁজে বার করব এ-চোরকে। তাই আমি আরও দু-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি চোরকে যে ধরবে তার জন্যে।'

'তাতে কাজ হবে না কিছুই।' বললেন সোমেশ রায় : 'চার হাজারে যদি কোনও সুরাহা

BanglaBook.org

না হয়, তাহলে ছ'হাজারেও হবে না। কিন্তু কোনও উপায় তো আর দেখছি না আমি।' বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে ঃ 'তোমার কী মনে হয়? আর কোনও সূত্র-টুত্র আছে?'

করুণ স্বর শুনে মনে-মনে বেশ খুশি হই আমি।

বললাম, 'হ্যাঁ, এখনও একটা আছে।'

'আছে?' নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তিনি।

'হ্যাঁ, আছে। খুব সামান্য যদিও, তবুও ওই নিয়েই কাজ করতে চাই। ভালো কথা, প্রয়োজনমতো সব কিছু করার অনুমতি চাইছি, স্যার। যেমন ধরুন না কেন, অভ্যাগতদের ঘর তল্লাশি, অবশ্য তাঁদের অজান্তেই।'

'যা খুশি করবে, কোনও আপত্তি নেই আমার।' বলে সোমনাথ মুখার্জির দিকে ফিরলেন তিনি ঃ 'ছেলেটি আমায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সোম।'

'ও এক আশ্চর্য ছেলে হে!' জবাব আসে তৎক্ষণাৎ।

'সত্যিই তাই। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও পাকড়াও করে এনেছে তোমায়। তাই, দু-নম্বর চোরটাকেও ধরার সুযোগ ওকেই দিচ্ছি আমি।'

'বাবা!' ঈষৎ ভর্ৎসনা মেশানো সুরে বলে কবিতা।

ডেকের ওপর থেকে দলা পাকানো নোটটা তুলে নিলাম আমি।

বললাম, 'নোটটা আমার কাছেই রইল, স্যার। আর একটা কথা, মিস্টার মুখার্জি, টাকাটা যে আপনার কাছেই ছিল, তা কি আর কেউ জানে?'

'তা—হ্যাঁ, জানে বইকি। পাছে আমার মোটিভের অন্য অর্থ দাঁড়ায়, তাই শুরুতেই আমি অলোক ঘোষকে সব বলে রেখেছিলাম।'

'কখন বলেছিলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়—টাকাটা নেওয়ার একটু আগেই। লাকি পিস যে আমার কেবিনেই আছে, তাও ওকে পরে বলেছিলাম।'

চোখের সামনে গত রাতের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—ব্রিজের আসর বসেছে দুটো টেবিলে। সবাই আছেন সেখানে, নেই কেবল অলোক ঘোষ।

সোমেশ রায় বললেন, 'আর-একটা কথা, রায়। জানি না তোমার কাজে লাগবে কি না খবরটা। সকালে শুনলাম গত বুধবার চুনীলাল দয়াভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিলেন মিসেস প্যাটেল। দয়াভাই যে আমার পুরোনো শত্রু, তা তো জানোই। আর আমার লাকি পিসটা পাওয়ার জন্যে ওরা যে কিছুই করতে কুণ্ঠিত নয়—তাও জানি।'

'কার কাছে শুনলেন এ-খবর?'

'অলোক ঘোষের কাছে।'

মৃদু হেসে বলি, 'পয়েন্টটা খুবই দরকারি। যাই হোক স্যার, কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করব আমি।'

'তা যে করবে, তা বিশ্বাস করি। ভুলো না—ছ'হাজার টাকা তোমার পকেটে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।'

মনে-মনে বলি, তার চাইতেও অনেক বেশি। মুখে বলি, 'ঠিক আছে, স্যার।' বলে, কবিতার পানে একটু হেসে এগিয়ে গেলাম ওপাশে। পেছন থেকে ডাক দিলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো কথা, রায়। সময় পেলে ডাক্তার তরফদারের প্রবন্ধটা না হয় লিখেই ফেলো। কেদার শর্মা আশা করে রয়েছে তো।'

অল্প হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, স্যার।' কবিতা এসে পড়ায় দুজনে মিলে এগিয়ে গেলাম রেলিংয়ের ধারে।

BanglaBook.org

প্রথমেই শুধোল ও : 'ও-কথার মানে কী, মৃগ?'

'চাকরিটা আবার ফেরত দিলেন। কিছুক্ষণ আগেই পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমায়—এখন দেখছি আবার ভালোবাসতে শুরু করেছেন। অহো, বিচিত্র এই সংসার। যাক, কতদূর এগোলে তুমি?'

'এক পা-ও নয়।'

'জানতাম আমি। আগে বোসো, তারপর বলো কী বলবে।'

'আমি আবার কী বলব?' দুটো ডেক-চেয়ারের একটা দখল করে বলে কবিতা।

'দুজন যুবক-যুবতী একত্র হলে যা বলে, তাই। তুমি বলবে, যৌবন-প্রভাতে এলে তুমি শশাঙ্ক সমান, কী তব প্রার্থনা। আর আমি বলব, ফুলের কঙ্কন গড়ি সাজাইব তোমায়, অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার, মঞ্জুমালিকাখানি জড়াইব ভালে কবরী ঘেরিয়া, অশোকের রক্তকান্তে চিত্রি পদতল, কহিব—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।'

'বড় যে উচ্ছ্বাস দেখছি! কী একটা নতুন সূত্রের কথা বলছিলে, তার কী হল?'

'চুলোয় যাক সূত্র। এখন কথা হচ্ছে প্রেমের—।'

'প্রেম ছুটে যাবে তোমার, বাবার সামনে এ-কথা বললে। বলো, কী সেই সূত্র?'

'কী আবার, একটা শার্ট।'

'শার্ট!'

'টাই প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে, এবার শুরু হোক শার্ট-বৃত্তান্ত।' বলে, সব কথা খুলে বললাম ওকে। হনলুলু স্যামের লন্ড্রিতে আমার অভিযান, জলপরীতে এসে প্যাকেট খোলার পর আমার মানসিক অবস্থা, বলবাহাদুরের সাহায্য, রাত্রে চুরি, পরদিন সকালে বাহাদুরের একগুঁয়েমি—সবই পরপর বলে গেলাম।

শেষ হলে পর কবিতা শুধোল, 'শার্টটা কার বলে মনে হয় তোমার?'

'অলোক ঘোষের। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা ছোটখাটো ওয়ার্ড্রোব এসেছে বলেই তো মনে হল আমার।'

'মৃগ, অলোক ঘোষ কিন্তু—।'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না, যা মনে হল তা বললাম। আপাতত আমার প্রথম কাজই হল বলবাহাদুরকে চাপ দিয়ে আসল খবরটা পেট থেকে টেনে বার করা।'

'নেপালিগুলো বড় একগুঁয়ে হয় কিন্তু।' বলে ও।

'খাঁটি কথাই বলেছ। কিন্তু দেখা যাক কার ধৈর্য এবার বেশি।'

'তোমার।'

'তোমাকে ভালোবাসাই তো তার একটা প্রমাণ।' বলেই সিধে সটকান দিই কেবিনের দিকে।

কিন্তু আমায় নিরাশ হতে হল। আমার অটল অধ্যবসায়, প্রযত্ন আর ধৈর্য সম্বন্ধে কবিতার আর আমার স্থির বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়ে অনড় হয়ে রইল নেপালি-নন্দন বলবাহাদুর। একটা শব্দও বার করতে পারলাম না ওর মুখ থেকে। পাক্কা পনেরো মিনিট ধরে সম্ভাব্য সবরকম পন্থা প্রয়োগ করলাম অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে—কিন্তু সবকিছুই নির্বিকার মুখে সহ্য করে মাউন্ট এভারেস্টের মতো অটল হয়ে রইল ও। মিনতি, তোষামোদ, চাকরি যাওয়ার ভয়—সবই হল ব্যর্থ। কুতকুতে মঙ্গোলিয়ান চোখে রহস্য-ঘেরা তিব্বতের যাবতীয় রহস্য ফুটিয়ে তুলে শান্তভাবে শুধু তাকিয়ে রইল আমার পানে—শার্টের প্রকৃত অধিকারীর নাম শেষ পর্যন্ত আঁধারেই থেকে গেল। ঠিক এই সময়ে লাঞ্চের বিউগ্‌ল্ বেজে উঠতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

BanglaBook.org

বললাম, 'এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু মনে রেখো, এত সহজে ছাড়ছি না তোমায়।'

'জি হাঁ সাব।' বলে এত কাণ্ডের পরেও নির্লজ্জভাবে একটু হেসে সরে পড়ল ও।

ডাইনিং সেলুনের দরজার সামনেই পায়চারি করছিল কবিতা।

'কিছু হল?' সাগ্রহে শুধোয় ও।

'বলবাহাদুরের চরণে কোটি প্রণাম আমার।' বলি আমি।

'কিছুই বলল না?'

'দারুণ একগুঁয়ে।'

'বাবার হাতে ছেড়ে দাও না?'

'না। এ-কাজ আমি একাই শেষ করতে চাই—কারণ না বললেও চলবে নিশ্চয়।'

'কিন্তু তাহলে কী করবে ঠিক করলে?'

'যা সব গোয়েন্দাই করে। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, প্রিয়ে—।'

'ধুত্তোর! ধৈর্যের নিকুচি করেছে—গোয়েন্দাগুলোই এইরকম।'

'বলেছ ঠিকই। অনেকদিন আগে একজন ফরাসি ডিটেকটিভের একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—তখন না বুঝলেও এখন তার সারমর্ম হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। লেখক ভদ্রলোক আরও একটা কথা বলেছিলেন। গোয়েন্দাদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে লাক।'

'তোমার মোটেই তা নেই।'

'পক্ষান্তরে, কাল রাতের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়ার সেরা লাকি মানুষ এখন আমিই।'

সোমেশ রায় উঠে এলেন নীচ থেকে।

'কী করছ এখানে?' রুক্ষস্বরে শুধোন উনি।

'তদন্ত।' বেশ গম্ভীরভাবে চট করে উত্তর দিই।

'করো, কিন্তু ফলাফল যেন ভালো হয়।' তর্জনী নেড়ে বলেন উনি।

'আশা আছে তা হবেই।' বলে সবাই মিলে ঢুকলাম সেলুনে।

গত রাতের প্রাণচঞ্চল খুশি-উচ্ছল পরিবেশের চিহ্নও পেলাম না আজকের টেবিলে। প্রত্যেকেই নিঃশব্দে প্লেটের খাদ্য জঠরে প্রেরণ করে চললেন। এমনকী টাকা ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার যে-অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন সোমেশ রায়—তার বিরুদ্ধেও টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ।

খাওয়া শেষ হলে পর লক্ষ করলাম, তরফদার গিয়ে ঢুকলেন স্মোকিংরুমে। পিছু-পিছু আমিও এলাম—এসে বসলাম ঠিক তাঁর বিপরীত দিকের চেয়ারটায়। তারপর কেস খুলে অফার করলাম একটা সিগারেট।

সন্দিগ্ধভাবে সিগারেটটা তুলে নিলেন তরফদার—অগ্নিসংযোগও করলেন সেইভাবে। যদিও সিগারেটটা অত্যন্ত দামি, তবুও ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, যা ভয় করেছিলেন তিনি তাই হয়েছে।

বললাম, 'আপত্তি না থাকলে আমাদের ইন্টারভিউ এখানেই শুরু করে দেওয়া যাক, কী বলেন?'

'যথা অভিরুচি। কিন্তু নোটবই কই আপনার?'

'নোটবই? ওহো—শুনুন। শুধু নভেল-নাটকের রিপোর্টাররাই সঙ্গে নোটবুক নিয়ে বেড়ায়—সবাই নয়।'

প্রতিবাদের সুরে বলেন তরফদার, 'কিন্তু আমি বলব এক, আর আপনি লিখবেন আর-এক—তা চলবে না।'

BanglaBook.org

'ঘাবড়াবেন না। ভগবান দু-দুটো টেপ-রেকর্ডারের মতো কান আমায় দিয়েছেন।'

'কী শুনতে চান বলুন তাহলে।'

'খুব ছোট্ট, অথচ যা দিয়ে বেশ জোরালো হেডলাইন লেখা যায়, এইরকম কিছু হলেই ভালো হয়।'

'কিন্তু আমার স্টাইল তো সেরকম নয়। ও ধরনের সস্তা কায়দা দু-চক্ষে দেখতে পারি না আমি—অত্যন্ত বাজে রুচির পরিচয় ওটা। ওসব থাক। সিংহলবাসীদের সম্বন্ধে কিছু বলি শুনুন। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ ওরা—প্রশংসা করার মতো।'

'তারপর?' নিস্পৃহ স্বরে শুধোই আমি।

শুরু করলেন তরফদার। নিঃসন্দেহে কথা বলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা সরসভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে চললেন তিনি—আমি শুধু মধ্যে-মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন দিয়ে অব্যাহত রাখলাম তাঁর কথার স্রোত। মিনিট দশেক কেটে গেল—আর, তারপরেই—জলপরীর সেকেন্ড অফিসার ঢুকলেন ঘরে।

'আপনার চিঠি, মিস্টার রায়।' বলে একটা খাম তুলে দিলেন আমার হাতে।

'এক মিনিট!' বলে খুলে ফেললাম খামটা।

ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছেন কেদার শর্মা বোম্বাই থেকে।

'ইন্টারভিউয়ের আর দরকার নেই। টেলিগ্রামে খবর পেলাম এইমাত্র। স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ ভদ্রলোকের। কলম্বোর বাঙালিসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন শুধু তাঁর শার্টের জন্যে।'

আবার শার্ট!

'কী ব্যাপার? খুব দরকারি চিঠি নাকি?' শুধোন তরফদার।

'তেমন কিছু নয়। আপনি আবার শুরু করুন।'

শুরু হল বটে, কিন্তু আমার আর মন বইল না সেদিকে। ইন্টারভিউয়ের উৎসাহ নিভে গিয়ে তখন আবার টাকা-অনুসন্ধান পর্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মগজে। শার্ট! কলম্বোর বাঙালি-সমাজ নাকি ভদ্রলোকের শার্ট পছন্দ করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন?.. তরফদারের শার্টগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই বোধহয় এ-প্রশ্নের সদুত্তর পেতে পারি...তবে...।

'এর বেশি তো আর কিছুই বলার নেই আমার। আশা করি, এতেই হবে?' কাহিনির উপসংহার টানেন তরফদার।

'নিশ্চয়। প্রচুর বলেছেন আপনি। এতেই হবে।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলি, 'সিংহলকে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও কেন যে ছেড়ে এলেন, তা ভেবে সত্যিই অবাক হয়ে যাই আমি।'

কপাল কুঁচকে ওঠে তরফদারের। সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন, 'হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, বাবার খুব শরীর খারাপ। সেই যে এলাম, সংসারের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় আর যাওয়া হল না ওদিকে। তবে ইচ্ছে আছে, শিগগিরই স্থায়ীভাবেই ফিরে যাব ওদেশে।'

'যাওয়া উচিত।' বলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি।

যাচ্ছিলাম কেবিনের দিকেই। পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে—আলোর নিশানাও যেন পাচ্ছি। এখন নির্জনে বসে ধীর মস্তিষ্কে কিছু চিন্তার দরকার। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম বলবাহাদুরের সঙ্গে।

তৎক্ষণাৎ টানতে-টানতে নিয়ে এলাম ওকে আমার কেবিনে।

'ফরমাইয়ে সাব?' নিরীহভাবে বলে ও।

তর্জনী নাড়তে-নাড়তে নাটকীয় কায়দায় শুরু করি আমি, 'শার্টটা তরফদার সাহেবের?'

'জি হাঁ। কে বললে আপনাকে?' কথাটা বলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে ও।

BanglaBook.org

'যে-ই বলুক। মোটের ওপর তোমার আর কোনও বিপদ নেই। এখন বলো দিকি কী করে সরিয়েছিলে শার্টটা?'

'ও-সাহেবের দুটো শার্ট আর আপনার একটাও নেই। উনি যখন-তখন গালিগালাজ করতেন আমায়—তাই ও-ঘর থেকে একটা শার্ট এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। কেন করব না বলুন?'

'আলবাত করবে। একশোবার করবে। কিন্তু এ-কথা আমায় আগে বলোনি কেন?'

'কাল রাত প্রায় বারোটার সময়ে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়। আমি নাকি তাঁর একটা শার্ট চুরি করে আপনাকে দিয়েছি। আমি অবশ্য স্বীকার করিনি কিছুই। কিন্তু উনি বললেন, নিয়েছি বেশ করেছি, কিন্তু শার্টটা কার, তা যদি কাউকে না বলি, তাহলেই নগদ পঞ্চাশ টাকা বকশিস দেবেন উনি। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হলাম আমি।' মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ওর : 'পঞ্চাশটা টাকা আমার গেল।'

'টাকা পাওনি তুমি?'

'একটা টাকা শুধু আগাম দিয়েছিলেন।'

'কই, দেখি সে-টাকাটা।'

কড়কড়ে একটা ব্যাঙ্ক নোট আমার হাতে তুলে দেয় বাহাদুর।

শুধোলাম, 'এই টাকাটাই দিয়েছিলেন উনি?'

'জি হাঁ সাব।'

পকেট হাতড়ে স্যামের দোকান থেকে পাওয়া একটা রুপোর টাকা বার করলাম। উলটে-পালটে দেখে দিয়ে দিলাম ওর হাতে।

'তোমার টাকাটা আমার কাছেই রইল বাহাদুর। আর শোনো, আজ থেকে কিন্তু আমরা দোস্ত। রাজি?'

'জি হাঁ, সাব।' দন্তপংক্তি বিকশিত করে নেপালি-নন্দন।

'বেশ, তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোনো। তোমার বড়সাহেব, সোমেশ রায়, রুপোর টাকাটা খুঁজে বার করার ভার আমাকেই দিয়েছেন। আর, আমার দোস্ত হলে তুমি—কাজেই আমাদের কোনও কথা তরফদার সাহেবের কাছে বলবে না, কেমন? যদি বলো, বিপদের শেষ থাকবে না—চাকরিটিও যাবে।'

'বুঝেছি।'

'বেশ। তরফদার সাহেবের বাকি শার্টটা আমি একবার দেখতে চাই বাহাদুর।'

'উঁহু। সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন উনি।'

'জানতাম। তবুও ঘরটা একবার পরীক্ষা করতে হবে। চট করে দেখে এসো দিকি, ওঘরে কেউ আছে কি না।'

বাথরুমের ভেতর দিয়ে ওপাশে গেল বাহাদুর—সেকেন্ড কয়েক পরেই ফিরে এসে জানালে, কেউ নেই।

'চমৎকার।'

করিডরে পাহারায় রাখলুম বাহাদুরকে। তারপর পালাবার পথ হিসেবে বাথরুমের দরজা খুলে রেখে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটা। কিন্তু পেলাম না কিছুই। মস্ত বড় একটা সুটকেসে তালা লাগানো ছিল। দেখেই বুঝলাম, ধূর্ত শিরোমণি তরফদার শার্টটিকে ওর মধ্যে বন্দি করে রেখে তবে কেবিন ছেড়ে গেছেন বাইরে।

হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরে এসে ডাকলাম বাহাদুরকে। সব শুনে ও বলল, 'সুটকেসটা খুলতে চান?'

'খুললে তো ভালোই হয়।' বলি আমি।

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় টাকাটা ওর মধ্যেই আছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'বড় শক্ত তালা।'

'তাও লক্ষ করেছ? শাবাশ! আচ্ছা, দেখা যাক, সবুরে মেওয়া ফলে। শার্ট তো ওঁকে পরতেই হবে—তখন দেখব।'

বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠতেই সবেগে প্রস্থান করল বাহাদুর।

বার্থে বসে নতুন পরিস্থিতিগুলো ভালো করে ভেবে নিলাম। গত রাতে তাহলে তরফদারের শার্ট পরেই ডিনার খেয়েছি আমি। সুতরাং রাতের আগন্তুক যে তরফদার স্বয়ং—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই আর থাকছে না। নিজের জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কী অভিনব পন্থা। ওঁর পিছু ধরেছি তা বুঝেই নিজের ঘরে ঢোকবার সাহস আর ভদ্রলোকের হয়নি। আর সেই কারণেই শার্টটা ফেলে দিয়েছেন সাগরের জলে। কিন্তু সামান্য একটা সাদা শার্ট নিয়ে কেন ঝামেলা, বুঝলাম না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? নিশ্চয় আছে—অন্তত আমার তো মনে হয় তাই।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ওপরের ডেকে এলাম। জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না আশপাশে।

ও-পাশের ছায়া-ছায়া কোণের ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম আরাম করে। সমস্যাটা কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। তরফদারের সুটকেসটা খুলতেই হবে আমায়—কিন্তু কী করে?

ডেকের ওপর ভারী-ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম—পাশ দিয়ে চলে গেলেন দেশমুখ। ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না—কথাও বললেন না। খুব চিন্তিত মনে হল ওঁকে। দেখে আবার চিন্তার আবর্ত পাক দিয়ে ওঠে মাথার মধ্যে। ভুল সূত্র নিয়ে সময় নষ্ট করছি না তো। দেশমুখ, অলোক ঘোষ, মিসেস প্যাটেল—প্রত্যেককেই সন্দেহ হয় আমার। কিন্তু—।

কিন্তু না। আপাতত শার্ট-সূত্রই অনুসরণ করব আমি—দেখাই যাক না কোথায় পৌঁছই। তরফদারের ব্যাগের ভেতর কী আছে তা আমায় দেখতেই হবে। শখের গোয়েন্দারা এ-ক্ষেত্রে কী করত? তালাটা ভাঙত নিশ্চয়। উঁহু, সে বড় নিষ্ঠুর পদ্ধতি। ওর চাইতে চাবিটা সংগ্রহ করা ভালো। কিন্তু করি কী করে?

পুরো বিশ মিনিট কেটে গেল এই একই চিন্তায়—তারপরই চকিতে একটা মতলব এল মাথায়। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে এগোলাম—স্মোকিংরুমের দরজায় পৌঁছে দেখি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন তরফদার।

বললাম, 'আপনার প্রবন্ধর কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। এ সম্পর্কে একটা ফোটোগ্রাফ দরকার আমার।'

ত্রস্তে উত্তর দেন তরফদার, 'না, না, ওসব পছন্দ হয় না আমার।'

'আপনার ফোটোর কথা বলছি না আমি। সিলোনে থাকার সময়ে কোনও ফটো তোলেননি ওখানকার?'

'তা তুলেছি। ঠিক আছে, পরে দেব'খন।'

হাসিমুখে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, প্রবন্ধটা লিখতে-লিখতে উঠে এলাম শুধু ফোটোর জন্যেই।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির চোখে আমার দিকে তাকালেন তরফদার। তারপর বললেন, 'বেশ তো, আসুন আমার সঙ্গে।'

কোনও কিছু যাতে চোখ এড়িয়ে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পিছু নিলাম ভদ্রলোকের।

BanglaBook.org

দরজার সামনে পৌঁছে উনি একগোছা চাবি বার করলেন পকেট থেকে। আর চেষ্টাকৃত অনাগ্রহ চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি।

বললেন, 'সুটকেসে সবসময়ে চাবি দিয়ে রাখি আজকাল। যেভাবে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে—বিশ্বাস হয় না কাউকেই।'

'তা যা বলেছেন।' সায় দিই আমি।

সুটকেসের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তরফদার এবং পরক্ষণেই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠলেন, 'এ কী!'

দেখি, অতবড় তালাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঝুলছে সুটকেসের আংটা থেকে।

রাগে লাল হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখ : 'এ কী জঘন্য ব্যাপার। কী বিশ্রী কাণ্ড! এর একটা হেস্তনেস্ত আমি আজই করব—ঢের হয়েছে, আর না। একদল চোরের মাঝে এভাবে থাকা কোনও ভদ্রসন্তানের শোভা পায় না।' ক্ষিপ্র হাতে সুটকেসের ভেতরটা পরীক্ষা করতে থাকেন উনি।

'কিছু হারিয়েছে নাকি?' সহানুভূতির সুরে শুধোই আমি।

'মনে তো হচ্ছে না।' একটু ঠান্ডা হন ভদ্রলোক : 'কিন্তু কিছু হারানোটা বড় কথা নয়—সব কিছুর সীমা আছে। সোমেশ রায়ের সঙ্গে আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে আমার।' একটা খাম বার করে বললেন, 'ফোটোগুলো এর মধ্যেই আছে। আপনার যেগুলো দরকার নিয়ে বাকিগুলো ফেরত দিয়ে যান, কেমন?'

'নিশ্চয়,' কিন্তু যাওয়ার কোনও চেষ্টা করি না আমি। অনেক আশা নিয়েই বলি, 'আপনি বরং মিস্টার রায়কে ডেকে নিয়ে আসুন—আমি আপনার জিনিসগুলোর ওপর নজর রাখছি।'

স্থির চোখে তরফদার তাকালেন আমার দিকে। আমার কল্পনা কি না জানি না, কিন্তু স্পষ্ট মনে হল যেন ওঁর ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত নিগূঢ় প্রকৃতির কুটিল এক হাসি।

'অনেক ধন্যবাদ। মিস্টার রায়কে আমি এ-ঘরেই ডেকে পাঠাচ্ছি। আপাতত ঘর ফাঁকা রেখে বাইরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই—এমনকী আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়।'

আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়।

এ-কথার অর্থ? আমি যে ওঁর পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছি, তা কি জেনে ফেলেছেন, না, স্রেফ আন্দাজের ওপর ঢিল ছুড়লেন অন্ধকারে?

'ইয়ে—তা তো ভালোই।' আমতা-আমতা করে সরে পড়ি আমি।

ঘরে এসে আবার নতুন করে ভাবতে বসি।

'আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়', একথা বলার অর্থ?

সুটকেসের তালাটাই বা ভাঙল কে? তাহলে শুধু তরফদারকেই সন্দেহ করা চলে না এ ব্যাপারে—আরও অনেকেই ওত পেতে রয়েছেন সুযোগের প্রতীক্ষায়।

একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম বার্থে। মনটা কিন্তু রইল পাশের কেবিনে।

পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল—কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না ওদিকে। তরফদার তাহলে সত্যিই ঘর পাহারা দিতে বসেছেন।

অবসাদে, ক্লান্তিতে, বিশেষ করে বহুদিন পরে কিছু চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরস্থ করার ফলে বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। দিবানিদ্রার অভ্যাস যদিও ছিল না, তবুও সেদিনের সেই নিশ্চিন্ত অপরাহ্নের তন্দ্রা-জড়ানো আবেশ বড় মধুময় মনে হল আমার কাছে। কেদার শর্মার দাঁতখিঁচুনি নেই, নেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করে সন্ধের আগেই কাগজ বার করার গুরুদায়িত্ব—আছে শুধু জলের মৃদু ছলছল-সঙ্গীত, এঞ্জিনের গুঞ্জরন আর ফুরফুরে হাওয়া। আর সেইসঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, অনাবিল শান্তির কোলে ধীরে-ধীরে গা এলিয়ে দেওয়া।

BanglaBook.org

*

ঘুম ভাঙল দরজায় নক করার শব্দে।

ধড়মড় করে উঠে দেখি, ওপরের ডেকের একজন কর্মচারী।

'আপনাকে ওপরে ডাকছেন।' বিনীতভাবে জানালে সে।

আমাকে ডাকছেন? আবার কী হল? রুপোর টাকা নিয়ে নতুন কোনও জটিলতার সৃষ্টি, না টাকাটার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন? তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়ে নিয়ে ছুটলাম ওপরে।

সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল পিসিমার সঙ্গে।

'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ব্রিজের টেবিলে একজন কম পড়ল বলে ডাকলাম তোমায়। অসুবিধে হল না তো?'

বুঝলাম ফাঁদে পড়েছি। অসহায়ভাবে তাকালাম এদিক-ওদিক।

'আ-আমি ভাবলাম বুঝি দারুণ দরকারি কিছু।' তোতলাতে শুরু করি আমি।

'ও।'

'তা ছাড়া, ইয়ে—আমি না খেললেই কিন্তু ভালো হত। জানেন তো কী বিশ্রী খেলি আমি।'

'অভ্যাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমায় কতকগুলো পয়েন্ট শিখিয়ে দেব'খন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। কিন্তু, ইয়ে—একটা জরুরি কাজ রয়েছে হাতে। তা ছাড়া, আমি তো ভালো দেখতেও পাই না।'

'তা আমি আগেই লক্ষ করেছি। গতকাল যখন সাহেব ফেলা উচিত, পট করে তুমি সেখানে দশ ফেলে দিয়েছিলে। চোখ খারাপ তো কী হয়েছে, টেবিলটা আলোর নীচেই রাখব'খন। চলে এসো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' আত্মসমর্পণ করি আমি।

আমার কীসে ভালো হয়, আর কীসে খারাপ হয়, তা দেখার ধৈর্য পিসিমার ছিল না। আমাকে যে কায়দা করে বাগে এনে ফেলেছেন, এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। তাঁর মতে যদিও আমি আদর্শ ব্রিজ-খেলোয়াড় নই, তবু একটি কারণে আমায় খুব পছন্দ করেন উনি। নিত্য নতুন নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ায় আমার ওপর খুব খুশি ছিলেন তিনি। সচল বিন্ধ্যাচলের পিছু-পিছু সেলুনে ঢুকতে-ঢুকতে বিপন্নভাবে তাকালাম আশপাশে কবিতার আশায়। কিন্তু ধারে-কাছে ওর চিহ্নও দেখলাম না। মুখ অন্ধকার করে একটা টেবিলে বসেছিলেন অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি—সদ্য-কেনা বন্দি ক্রীতদাসের মতো তাঁদের মুখচ্ছবি দেখে মনে-মনে বেশ হৃষ্ট হলাম আমি। জাঁকিয়ে বসলেন পিসিমা—শুরু হল খেলা। সে-দীর্ঘ যন্ত্রণার আর বর্ণনা দেব না। প্রত্যেক হাতের তাস শেষ হওয়ার পর খেলা থামিয়ে প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন পিসিমা। আর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগলাম তাঁর আশ্চর্য সৃজনী-প্রতিভা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ডিনারের বিউগ্‌ল বাজার কিছুক্ষণ আগে কবিতা এসে মুক্তি দিল আমাদের। পিসিমা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন আমার ওপর—আমার অজ্ঞতার ফলে যে তিনি ডুবতে বসেছেন, তা প্রতি দু-মিনিট অন্তর সরবে ঘোষণা করছিলেন প্রত্যেকের কাছে।

বাইরে এসে বললাম, 'আমার ওপর দারুণ চটেছেন উনি—ওঁর সব সিগন্যাল গুলিয়ে ফেলেছি আমি।'

হাসিমুখে কবিতা সায় দেয়, 'মাঝে-মাঝে পিসিমা সত্যিই বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। তুমি না খেললেই পারতে।'

'খেলার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার—কতটা সময় নষ্ট হল বলো তো। এতক্ষণে অনেকটা কাজ এগিয়ে যেত আমার।'

'তার মানে? অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ মনে হচ্ছে?'

'তা জেনেছি।' বলে তরফদার সম্পর্কে কেদার শর্মার বেতার-বার্তা আর তরফদারের

BanglaBook.org

সুটকেসের তালা ভাঙার কাহিনি শুনিয়ে দিলাম ওকে।

সব শুনে ও বললে, 'তাহলে এখন তোমার কাজের প্রোগ্রাম কী শুনি?'

'পরে বলব, হাতে একদম সময় নেই এখন।' বলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি কেবিনে।

বাথরুমের দরজা ঠেলে দেখি ওপাশ থেকে চাবি লাগানো। জোরে কয়েকবার নক করে আর ডেকেও কারও সাড়া পেলাম না ওদিকে। অগত্যা ওপাশ দিয়ে গিয়ে দরজা খোলা ছাড়া কোনও উপায় আর দেখলাম না।

তরফদারের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় নক করতে গিয়েও হাত নামিয়ে নিলাম। ভাবলাম, এই তো সুযোগ। কাজেই নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে ঢুকলাম ভেতরে।

কেবিনের আধো-আলো আধো-আঁধারের মাঝে মালপত্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

পোর্টহোলের ঠিক নীচেই একটা সেটির ওপর অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম ধবধবে সাদা একটা বস্তু—তরফদারের শার্ট।

সবে শার্টটায় হাত দিয়েছি—হঠাৎ বাথরুমে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। চকিতে শার্টের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম বটে—কিন্তু ওই ছোট্ট মুহূর্তটাতেই মস্ত এক আবিষ্কার করে ফেললাম। পরক্ষণেই বাথরুমের দরজায় আবির্ভূত হলেন তরফদার স্বয়ং।

'একী! কী করছেন আপনি এখানে? ঘরে ঢোকার আগে দরজায় নক করা যে সাধারণ ভদ্রতা, তাও কি আপনাদের পেশায় শেখায় না?'

কাঁচুমাচু মুখে বলি, 'মাপ করবেন, ওদিক থেকে নক করে কারও সাড়া না পেয়ে এদিক দিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলাম—আপনি যে চুপ করে ভেতরে বসে আছেন, তা কী করে জানব?'

দাড়ি কামাতে-কামাতে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক—এখন আবার সেফটি রেজারখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি ঘরে বসে থাকি কি দাঁড়িয়ে থাকি—তা আপনার দেখার দরকার নেই। ভবিষ্যতে ঘরে ঢোকার আগে নক করে ঢুকলেই খুশি হব আমি।'

তরফদারের বাক্যবাণগুলো কানে ঢুকলেও মাথা পর্যন্ত আর পৌঁছচ্ছিল না। ভদ্রলোকের সব রহস্যই জেনে ফেলেছি আমি—কিন্তু তবুও আমার নাটকীয় দৃশ্যলোভী মনটা তৎক্ষণাৎ কিছু করতে রাজি হল না। আধো-অন্ধকার একটা কেবিনে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়ার চাইতে সোমেশ রায় এবং আরও কয়েকজনের সামনে ধাপে-ধাপে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে মুখোশ খোলার দৃশ্য ভাবতেই পুলকিত হয়ে উঠলাম আমি।

বললাম, 'মাপ করবেন—সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

'এ কী অত্যাচার বলুন তো?' তবুও ফুলতে থাকেন ভদ্রলোক : 'প্রথমে ভাঙল সুটকেসের তালা। তারপর বলা নেই কওয়া নেই ভূতের মতো ঘরে ঢুকে পড়লেন আপনি—এ সব কী?' পিছু-পিছু এসে আমার পেছনেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

করিডরে আসার পর কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দে চনমন করে উঠল দেহমন। এত সহজে যে রহস্যের সমাধানে পৌঁছনো যাবে তা বিশ্বাস করা চলে না, কিন্তু তবুও সেটা সত্যি। সত্যিই ধড়িবাজ বটে তারাপদ তরফদার, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর মৃগাঙ্ক রায় যে ধড়িবাজ-শিরোমণি, তা এবার ভদ্রলোক টের পাবেন হাড়ে-হাড়ে। রুপোর টাকা যে কোন গোপন কন্দরে সুপ্তিময়, তা আর অজানা নয় আমার কাছে।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যকর নাটক মঞ্চস্থ করার আগে সোমেশ রায়ের সঙ্গে কিছু কথা বলার দরকার। পা টিপে-টিপে করিডরের শেষে এসে নক করলাম ওঁর ঘরে। আর দরজা খুলেই কবিতাকে দেখে হৃদয়টা যেন ময়ূরের মতোই নেচে উঠল। অনুরাগিণী কন্যার মতোই বাবার ড্রেস-টাই বেঁধে দিচ্ছিল

BanglaBook.org

ও। আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কতদূর?' ঘাড় ফেরাতে গিয়ে নটটাই খারাপ হয়ে যায় ওঁর।

'কাজ প্রায় শেষ।' খুশি-খুশি স্বরে বলি আমি।

'টাকাটা?'

'কোথায় আমি জানি—পাওয়ারই সামিল।'

'মোটেই নয়।' মুখটা আবার অন্ধকার হয়ে যায় ওঁর : 'যাক, কোথায় আছে শুনি?'

'যথাসময়ে তা বলব। আজ ডিনার শেষ হলে ছোটখাটো একটা নাটকের অবতারণা করতে চাই। কফি শেষ হলে পর ডাইনিং সেলুন থেকে পিসিমা আর মিসেস প্যাটেলকে নিয়ে কবিতা তুমি বাইরে চলে যেও—ঘরে থাকব শুধু আমরা।'

'কী—এত বড় নাটকটা আমি দেখতে পাব না? না, আমি যাব না।'

'কবিতা—ও যা বলে শোন।' তিরস্কার মেশানো স্বরে বলেন সোমেশ রায়।

'কিন্তু বাবা—।'

'কবিতা!'

'বেশ, মৃগাঙ্ক যদি বেশি জানে বলে মনে করে, তবে তাই হবে।'

'নিশ্চয় ও বেশি জানে—অন্তত আমাদের চেয়ে তো বেশি।'

বললাম, 'কতকগুলো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে—তাই মেয়েদের সেখানে থাকা সমীচীন নয় মোটেই। আর স্যার, আপনার সাহায্য তখন খুবই দরকার আমার। আমি যা-ই বলি না কেন, তৎক্ষণাৎ আপনি সায় দেবেন তাতে—ব্যস, বাকি যা করবার আমিই করব।'

'নিশ্চয়, সে আর বলতে। তবে বাবা যদি একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে—'

'তা দিচ্ছি।' বলে কেদার শর্মার বেতার-বার্তাটা তুলে দিই ওঁর হাতে : 'পড়ে দেখুন।'

পড়লেন সোমেশ রায়।

'কার কথা হচ্ছে? তরফদারের নয় নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, স্যার, তরফদারেরই।'

'আশ্চর্য! এ যে কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু ওর শার্টের কথা কী লিখেছে, তা তো বুঝলাম না।'

'এখন বললে বিশ্বাস হবে না আপনার। ডিনারের পর আমি নিজেই দেখিয়ে দেব আপনাকে।'

'চমৎকার।' আবও জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের উৎসাহ : 'এ ঝামেলা আজ রাতেই মিটে গেলে খুবই খুশি হব আমি। ক্যাপ্টেন এইমাত্র বলে গেল, এঞ্জিনে নাকি কী গোলমাল দেখা দিয়েছে—জলপরী তাই পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকেই চলেছে। ভালো কথা, আজ দুপুরে তরফদার আমায় ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বেশ খানিকটা লম্ফঝম্প করল। ওর সুটকেসের তালা নাকি কে ভেঙে রেখে গেছে। শুনে সহানুভূতি জানালাম। কিন্তু এর মূলে যে ক্যাপ্টেন, তা আর বলিনি।'

'ও-হো। তালাটা তাহলে ক্যাপ্টেন ভেঙেছে?'

'খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। ও বললে যে, সরু একটা ছুরি দিয়ে অনায়াসেই খুলে ফেলবে তালাটা—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ছুরি পিছলে যাওয়ায় ওই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এত বাড়াবাড়ি করাটা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার।'

'কিছু পেয়েছে ও?' শুধোই আমি।

'কিস্সু না। তন্নতন্ন করে দেখেও কিছু পায়নি।'

'খুবই স্বাভাবিক,' হাসিমুখে বলি আমি : 'আর-একটা কথা স্যার। আজকের ডিনারে আমি সাদা শার্টটা পরে হাজির হতে পারব না। যদি কিছু মনে না করেন—তাহলে সাধারণ পোশাক পরেই আসব।'

BanglaBook.org

'দরকার হলে লুঙ্গি পরেও এসো, কোনও আপত্তি নেই আমার। শুধু টাকাটা আমায় পাইয়ে দিলেই হল।'

'তা দেব।'

আশ্বাস দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। বেরোবার আগে অবশ্য কবিতার স্ফুরিত অধরের কোণে ফোটা ছোট্ট হাসিটুকুর উত্তর দিয়ে যাই অপাঙ্গে চোখের ভাষা দিয়ে।

আসন্ন যুদ্ধজয়ের আনন্দ বুকে নিয়ে ফিরে এলাম কেবিনে।

সে-রাতে বেশ থমথমে হয়ে ওঠে ডিনার টেবিলের আবহাওয়া। টাকা-তদন্ত যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তা যেন মনে-মনে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে থাকে। একজন শুধু দেখলাম নির্বিকার। সিংহলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প অনর্গল বলে চললেন তবফদাব। দেখে ভদ্রলোকের বুদ্ধিমত্তার আর-একদফা প্রশংসা না করে পারি না আমি।

মেয়েরা ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর নিথর নৈঃশব্দ নেমে আসে ঘরের মধ্যে। সিগারেটের শেষ প্রান্তের দিকে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সোমেশ রায়।

তারপর বললেন, 'টাকা হারানোর প্রসঙ্গ আবার তুলছি, আশা করি কারও আপত্তি নেই। টাকাটা ফিরে পেলে শুধু আমি নই, আপনারাও যে কম খুশি হবেন না, তা আমি বিশ্বাস কবি। মিস্টার রায়—মৃগাঙ্ক রায়—এ ব্যাপারে তদন্ত করছিলেন আমারই অনুরোধে। শুনলাম, রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে আজ তৈরি হয়েই এসেছেন উনি।'

যন্ত্রবৎ প্রত্যেকের মুখ ঘুরে গেল আমাব দিকে। সবার মুখের ওপব মসৃণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলাম আমি।

তারপর বললাম, 'গৌরচন্দ্রিকা না করে গোড়া থেকেই শুরু করছি আমি। টাকাটা প্রথমে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু পবিহাস করা।' চেয়ারে উসখুস করে উঠলেন সোমনাথ মুখার্জি—কিন্তু কারও নামোল্লেখ না করে আমি বললাম কীভাবে রসিক পুরুষটি টাকা আনতে গিয়ে দেখেন রুপোর টাকার জায়গায় বিরাজ করছে একটা এক টাকার নোট। বলে পকেট থেকে বার করলাম ব্যাঙ্ক-নোটটা।

'নোটটা একেবারেই নতুন। এর ক্রমিক সংখ্যা হল ঃ Y15/641525A। ব্যাঙ্ক থেকে নতুন নোট নিলে টাকাগুলো যে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে পরপর সাজানো থাকে, তা তো জানেনই।' পকেট থেকে আর-একটা নোট বার করি আমি ঃ 'এ-নোটটার ক্রমিক সংখ্যা হল ঃ Y15/641526A। দুটো নোটই যে এক লোকের কাছ থেকে এসেছে, তা অনুমান করে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়, কী বলেন?'

'শাবাশ!' চিকচিক করে ওঠে সোমেশ রায়ের চোখ ঃ 'এ-টাকাটা পেলে কোত্থেকে?'

'দ্বিতীয় নোটটা ছোট্ট একটা কাজের পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল বলবাহাদুরকে। দিয়েছিলেন উপস্থিত ভদ্রলোকদেরই একজন।' একটু থামলাম। সবাই নির্বাক। তারপর ঃ 'দিয়েছিলেন ডক্টর তরফদার।'

প্রত্যেকের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে স্থির হল তরফদারের ওপর। কিন্তু ভদ্রলোকের বেপরোয়া মুখভাবের প্রশংসা না করে পারলাম না।

মৃদু হেসে বললেন উনি, 'বোধহয় দিয়েছিলাম। কখন দিয়েছি যদিও তা মনে নেই। কিন্তু হয়েছে কী তাতে?'

দেশমুখ বাধা দিয়ে বললেন, 'এসব ছেলেমানুষির কোনও মানে হয়? আইনশাস্ত্রটা মোটামুটি ভালোই জানা আছে আমার। মিস্টার ডিটেকটিভকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—।'

BanglaBook.org

হাসিমুখেই বলি, 'এক মিনিট, মিস্টার দেশমুখ। আইনজ্ঞের প্রয়োজন এখনও আসেনি। এ-প্রমাণ যে যথেষ্ট নয়, তা আমিও জানি। কিন্তু এটুকু বললাম শুধু পরবর্তী ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে। সবার চোখে ডক্টর তরফদারকে দোষী প্রতিপন্ন করছে শুধু নোট দুটোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নয়, করছে আরও অনেক কিছু এবং সবশেষে করছি আমি। কাজেই ডক্টর তরফদারকে আমি অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াতে দেহ তল্লাশির জন্যে—অবশ্য মিস্টার রায়ের কোনও আপত্তি না থাকলে।'

'স্বচ্ছন্দে।' মাথা দুলিয়ে বেশ উল্লসিত স্বরে সম্মতি জানালেন সোমেশ রায় ঃ 'তাহলে ডক্টর তরফদার, অনুগ্রহ করে—।'

লাল হয়ে ওঠেন তরফদার।

তীব্র স্বরে প্রতিবাদ জানান তিনি, 'এ শুধু আমাকে অপমান করার চক্রান্ত। মিস্টার রায়, আমার বিনীত অনুরোধ, আতিথেয়তার সহজ নিয়মটি যদি জানেন, তাহলে—।'

'আমার আতিথেয়তাকে আপনিই অপমান করেছেন!' কড়া কণ্ঠে উত্তর দেন সোমেশ রায় ঃ 'আপনার সব কথাই আমি জেনেছি। উঠে দাঁড়ান।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তরফদার।

'প্রথমে কোট আর ওয়েস্ট কোট,' চটপট আদেশ দিই আমি, আর মনে-মনে অনুভব করি প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর আনন্দ উল্লাস।

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার টাইটা। ঠিক আছে, আমি সাহায্য করছি আপনাকে।' দু-টানে টাইটা খুলে ফেলি—সেইসঙ্গে গোটা দুয়েক বোতামও।

তারপর বলি, 'ডাক্তার তরফদারের শার্টটা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আর এ জন্যে প্রথমেই তাঁর প্রশংসা করে নিচ্ছি মুক্ত কণ্ঠে। এই বিশেষ রকমের শার্ট পরার জন্যেই সিংহলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন উনি। লক্ষ করে দেখুন, শার্টের কলারটা একটু অস্বাভাবিক রকমের শক্ত। বিশেষ করে প্রান্ত দুটো। অনেক স্টার্চ দিয়ে খুব কড়া করে ইস্ত্রি করলেও কলার কখনও এত শক্ত হয় না। আসলে আশ্চর্য রকমের শক্ত দুটো প্রান্তে আছে দুটো ছোট্ট পকেট—মুখদুটো অবশ্য নীচের দিকেই ঢাকা পড়ে রয়েছে। সদ্য ইস্ত্রি করা থাকলে কলারের বৈশিষ্ট্য কারওরই নজরে পড়ে না। আমারও পড়েনি। কিন্তু তদন্তের ফলে জানলাম, পকেট দুটোর সৃষ্টি ছোটখাটো কিন্তু মূল্যবান চোরাই মাল রাখার জন্যে। যেমন ধরুন না কেন, হিরের দুল, নাকছাবি, আংটি, ছোট করে ভাঁজ করা ব্যাঙ্ক নোট অথবা একটা রুপোর টাকা। অত্যন্ত শক্ত হওয়ার দরুণ ওপর থেকে দেখলেও কিছু ধরা যায় না—যেমন এখনও যাচ্ছে না। তা ছাড়া, পো বর্ণিত "The Purloined Letter"-এর মূল সূত্র অনুযায়ী তল্লাশির সময়ে চোখের সামনে থাকা জিনিসটাই চোখ এড়ায় সবার আগে, যেমন এড়িয়েছিল গতবার। কিন্তু এবার—' বলে কলারের ভেতর থেকে একটা রুপোর টাকা বার করে ফেলে দিলাম সোমেশ রায়ের সামনে। বিজয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আমার স্বর—ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছি—আর কী! মুখে বলি, 'আপনার লাকি পিস, স্যার।'

খুশির আলো জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের স্বপ্নালু চোখে ঃ 'তোমার ঋণ যে কী করে শোধ করব—' বলতে-বলতে কাঁপা হাতে টাকাটা তুলে নিলেন। পরক্ষণেই দারুণ চিৎকারে চমকে উঠলাম আমি। টেবিলের ওপর টাকাটা আছড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'আবার রসিকতা! আবার পরিহাস আমার সঙ্গে!' দু-হাত নাড়তে-নাড়তে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

'কী—কী হল স্যার?' আমার বিজয়-গৌরব তখন নিষ্প্রভ প্রায়।

সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন সোমেশ রায় ঃ 'এ-টাকা আমার নয়! এতে ছাপ রয়েছে ১৯৪৬ সালের!'

'১৯৪৬ সালের!' তরফদারের মুখেও দেখি অকপট বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি।

BanglaBook.org

মুহূর্তের মধ্যে তুমুল হট্টগোলে ভরে উঠল সেলুন। প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেন। কিন্তু গোলমাল ছাপিয়ে বিউগ্‌লের মতো বেজে ওঠে সোমেশ রায়ের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক স্বর। আমার দিকে ফিরে সবেগে তর্জনী নাড়তে-নাড়তে আমার মুণ্ডপাত করছিলেন তিনি।

'ডিকেটটিভ! তুমি আবার একটা ডিটেকটিভ! প্রত্যেকবার আশায় আনন্দে ভরিয়ে তুলছ আমায়! তারপর তুমি—তুমি—তুমি—!'

'দুঃখিত স্যার!' ক্ষীণ স্বরে কোনওমতে বলি। রীতিমতো ঘাবড়ে গেছিলাম আমি।

'দুঃখিত! এটা আবার কী ধরনের কথা হে ছোকরা? দুঃখিত! ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করতে দেখি তোমায়—তোমার ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব!' তারপর ফিরলেন তরফদারের দিকে—ভদ্রলোক তখন নিপুণ হাতে টাইটা বাঁধছিলেন ঃ 'আর আপনি! কী বলার আছে আপনার? কী সাফাই গাইবেন ঠিক করেছেন? ম্যাজিক শার্ট পরে কোনও সৎ ব্যক্তি ভদ্রলোকের আসবে আসে না—সিংহলে আপনার কীর্তিকলাপ সবই শুনেছি আমি। কী করে এ-টাকা গেল আপনার কাছে?'

ওয়েস্ট কোটটা পরতে-পরতে নিরুত্তাপ গলায় বললেন তরফদার, 'এক মিনিট!' বলে কোটটায় হাত গলাতে-গলাতে বললেন, 'এ রকম পরিস্থিতিতে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবলেই দেখবেন আসলে কোনও ক্ষেত্রেই চুরি হয়নি। প্রতিবারই একটা টাকার জায়গায় রাখা হচ্ছে আর-একটা টাকা—একে চুরি বলে না। তা ছাড়া লাকি পিসটা আপনার কাছে নিছক একটা প্রেজুডিস ছাড়া কিছুই নয়। কথাটা মনে রাখলেই ভালো করবেন।'

'তা নিয়ে আপনি মাথা না ঘামালে আরও ভালো করবেন!' বললেন সোমেশ রায়।

'গত রাত্রে আপনার কেবিনে গেছিলাম টাকাটা আনতে। শুধু একটা রসিকতা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার। দরজার কাছে হঠাৎ কার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম বড় আলমারিটার আড়ালে। দেখি চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ মুখার্জি। আপনার রুপোর টাকাটা নিজের পকেটে রেখে অন্য একটা টাকা রাখলেন আপনার পকেটে। ওঁর পিছু নিলাম আমি। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উনি ডিনার-সেলুনে এলে ঢুকলাম ওঁর কেবিনে। টাকাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। তারপর মিঃ মুখার্জি যা করেছেন, আমিও তাই করলাম, অর্থাৎ টাকার বদলে টাকাই রাখলাম। আজ সকাল পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছেই ছিল। আমাদের এই তরুণ বন্ধুটি যেখান থেকে নতুন টাকাটা বার করলেন, ওইখানেই লুকোনো ছিল টাকাটা। টাকাসমেত শার্টটা তালা দিয়ে রেখেছিলাম সুটকেসে। কিন্তু আজ বিকেলে সে-তালা কে যেন ভেঙে রেখে যায়—মিঃ রায়কে আমি তা দেখিয়েছি। আমার বিশ্বাস, তখনই কেউ আবার পালটে রেখে গেছে টাকাটা!'

'রাবিশ! আপনি তাহলে বলতে চান তালা ভাঙার পরও টাকাটা আছে কি না তা যাচাই করে নেননি আপনি?' বললেন সোমেশ রায়।

'ওপর থেকে হাত দিয়েই বুঝেছিলাম একটা টাকা রয়েছে ভেতরে। কিন্তু সেটা যে আপনার লাকি পিস নয়, তা তো বুঝিনি তখন।'

পলকহীন চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন সোমেশ রায়। তারপর মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বললেন, 'আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অত্যন্ত ধূর্ত্তবাজ আপনি সন্দেহ নেই। এঞ্জিনে কী গন্ডগোল হয়েছে, তাই আমরা পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকেই চলেছি। কাল সকালে পোর্টে পৌঁছলে আপনার মালপত্র নিয়ে নেমে গেলে খুশি হব আমি। আপনার মতো অভ্যাগতর সান্নিধ্য আমি বা আমার বন্ধুরা পছন্দ করেন না বলেই এ-কথা বলতে বাধ্য হলাম।'

'বেশ তো!' শান্তভাবে রাজি হন তরফদার।

'অবশ্য তার আগে আপনাকে আর-একবার সার্চ করা হবে। আচ্ছা, এখন চলুন বাইরে যাওয়া যাক!' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন সোমেশ রায়।

ডাইনিং সেলুন থেকে বেরোবার সময়ে লক্ষ করলাম তরফদারের কনুই ধরে আটকে রাখলেন

BanglaBook.org

দেশমুখ—ভদ্রলোকের আরক্ত মুখে বিবিধ ভাবের যে-বিচিত্র খেলা দেখলাম—তার কোনওটাই বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়।

বড় সেলুনে ঢুকেই পড়লাম কবিতার সামনে। সামনের টেবিলেই উদগ্রীব হয়ে বসেছিল ও। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে টানতে-টানতে নিয়ে এল বাইরে।

'বলো তাড়াতাড়ি সব। তরফদারকে এক হাত নিলে তো?'

'হায়রে কপাল!' করুণ স্বরে বলি আমি।

'তার মানে?' একটু ঘাবড়ে যায় ও।

'তরফদারকে আমি এক হাত নিয়েছি ঠিকই, আর তোমার বাবাও বেশ এক হাত নিয়েছেন আমায়। গোয়েন্দা না কচু—ওঃ কবি, সব ভেস্তে গেল।' বলে আগাগোড়া সব বললাম ওকে।

শেষ হলে পর ও শুধোল, 'কিন্তু বাবা কী বললেন, তা বললে না?'

'বললেন যে, ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করি, আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন তিনি। কবি, সেসময়ে যদি তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখতে—না, আর আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'দুর পাগল। এত সহজে ভেঙে পড়া কি পুরুষের শোভা পায়?' একটুও দমে না কবিতা: 'বাবা দুর্মুখ বটে, কিন্তু ওরকম মানুষ হয় না, তা তো বিশ্বাস করো। আর কোনও সূত্র নেই তোমার হাতে?'

'আছে, খুব সামান্য তা।'

'জানতাম, আমি জানতাম,' উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ও: 'কী সূত্র শুনি?'

'খুব বেশি ভরসা নেই ওতে। তরফদারের কাছে পাওয়া টাকাটা আমার কাছেই রেখেছি। দেখলাম—,'

সোমেশ রায় আর সোমনাথ মুখার্জি বড় সেলুন থেকে বেরিয়ে সিধে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'কী খবর হে গোয়েন্দাজি?' শ্লেষ-তীক্ষ্ণ স্বরে শুধোন সোমনাথ মুখার্জি:

'ওরকম অবজ্ঞা দেখিও না হে সোম,' বললেন সোমেশ রায়।

'ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বকফেলারের চেয়েও অনেক বেশি টাকা ও শুধু মাটি খুঁড়েই তুলতে পারে।'

'আমি খুবই দুঃখিত স্যার—' করুণ কণ্ঠে বলি আমি।

'ঘাবড়াও মাত। তাহলে আমাদের এখন অবস্থাটা কী? আগের চেয়েও দেখছি পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'আমার কথা যদি শোনো তো বলি। ক্যাপ্টেনকে তোমার কীরকম মনে হয়? তরফদারের সুটকেস তো সে-ই খুলেছিল। তখন তো ও একলাই ছিল—তাই না?'

'বারিশ। চিরকালই এমনি ভুল করো তুমি।'

'বেশ তবে তাই। কিন্তু এঞ্জিনই বা হঠাৎ খারাপ হল কেন? ফিরেই বা যাচ্ছি কেন?'

'বারিশ। আজ নয়, দশ বছর ধরে ক্যাপ্টেনকে আমি দেখছি।' মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেন সোমেশ রায়: 'ওসব বাজে কথা থাক। এমন ফাঁদে জীবনে আর পড়িনি। বেশ বুঝছি, বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলছে আমার বিরুদ্ধে। তরফদার তো সব কিছুই অস্বীকার করতে পারত? তা না করে সবার সামনে দোষ স্বীকার করাটা আমার তো অন্তত কীরকম লাগছে।'

কবিতা বলল, 'বাবা, মৃগাঙ্ক আর-একটা সূত্র পেয়েছে।'

'আমি জানতাম তা।' উত্তর এল তৎক্ষণাৎ: 'সূত্র আবিষ্কার করতে ছেলেটার জুড়ি মেলা ভার। এরপর যদি শুনি একজনের কানের ভেতর থেকে একটা টাকা বার করেছে, মোটেই অবাক হব না আমি। অবশ্য টাকাটা যে আমার হবে না—তা নিশ্চিত।'

'আর-একবার যদি সুযোগ দেন স্যার।' কোনওমতে বলি আমি।

'না দিয়েই বা উপায় কী? তুমিই এখন অগতির গতি—আর কেউ এমন নেই যার ওপর নির্ভর করতে পারি এ বিষয়ে। যাক, এবার কী সূত্র শুনি?'

'বেলা প্রায় আড়াইটের সময়ে তরফদারের সুটকেসের তালা ভাঙা হয়েছিল—তিনটের সময় আমরা তা জানতে পারি। দশ-পনেরো মিনিটের বেশি ঘরে ছিলেন না ক্যাপ্টেন—থাকতেও পারেন না। কাজেই, ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যাওয়ার পর আর আমার তরফদারের ঘরে ফিরে আসার মধ্যের সময়টায় যে কী ঘটেছে, তা কেউ জানে না।'

'তুমি যদি জেনে থাকো তো ভনিতা ছেড়ে বলে ফ্যালো।'

'আমার শুধু অনুমান স্যার। ১৯৪৬ সালের যে-টাকাটা আমরা তরফদারের কাছে পেয়েছি, ওটা কার কাছে ছিল, তা আমি জানি।'

'কী! জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, জানি। আজ সকালেই বলবাহাদুরকে আমি টাকাটা দিয়েছিলাম। তরফদারের কাছ থেকে যে-এক টাকার নোটটা বকশিশ পেয়েছিল—তারই বদলে দিয়েছিলাম রুপোর টাকাটা।'

'বলবাহাদুর! শাবাশ! এসো স্মোকিংরুমে। বলবাহাদুরকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি আমি।'

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু এসে বসলাম স্মোকিংরুমে। বলবাহাদুরকে তলব পাঠানো হল তৎক্ষণাৎ।

একটু পরেই বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকল ও। আমার তর্জন-গর্জনেব সামনেও ওর যে-বেপরোয়া হাসি অম্লান ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্রও না দেখে বুঝলাম মনিবকে কীরকম বাঘের মতো ভয় করে সে।

টাকাটা ওর সামনে ধবে বললাম, 'আজ সকালে তোমায এ-টাকাটা দিয়েছিলাম আমি। তারপর কী করেছিলে এটা নিয়ে?'

একদৃষ্টে টাকাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও।

তারপর বলল, 'ফেরত দিয়েছিলাম।'

'কাকে?'

'তরফদার সাবকে।'

'সত্যি বলো বাহাদুর।' কঠিন কণ্ঠে বলি আমি।

'সাচ বোলতা সাব। তরফদার সাব বললেন আমি যখন আমার কথা রাখিনি, তখন টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আপনি জানেন সাব তা সত্যি নয়। কিন্তু উনি গালিগালাজ করতে টাকাটা আমি ফিরিয়ে দিই।'

ব্যস, এই হল বাহাদুরের কাহিনি। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম অজস্র প্রশ্ন—কিন্তু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ওই একই কাহিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উপহার দিতে লাগল সে। শেষে বিরক্ত হয়ে সোমেশ রায় বিদায় দিলেন ওকে।

'তাহলে?' শুধোন তিনি।

জোর গলায় বললেন সোমনাথ মুখার্জি, 'ব্যাটা ডাহা মিথ্যে বলে গেল।'

বললাম, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও সত্যি কথাই বলছে। স্যার, তরফদারের স্বীকার-পর্বটা বেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অভিনীত হয়েছে।'

'কী উদ্দেশ্য শুনি?'

'তা আমিও সঠিক বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি, টাকাটা এখনও ভদ্রলোকের কাছেই আছে।'

'কিন্তু ঠিক কোনখানটায় তা বলো?'

BanglaBook.org

'সেইটাই তো জানতে হবে স্যার।' চকিতে আবার তৎপর হয়ে উঠি আমি ঃ 'কবিতা, তুমি চট করে গিয়ে তরফদারকে ভুলিয়ে সেলুনে এনে ব্রিজ খেলায় আটকে দাও। ওর ঘরটা তল্লাশ করতে হবে।'

'ঠিক বলেছ।' সোৎসাহে বলেন সোমেশ রায়। পরমুহূর্তেই কপাল কুঁচকে ওঠে ওঁর ঃ 'ঠিক অবশ্য তুমি আগাগোড়াই বলছ—কিন্তু প্রতিবারই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে বিপরীত। আশা করি, এবার আসল টাকাটা বার করতে পারবে, কী বলো?'

'নিশ্চয়।' বলি বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে যাই বেশ। সত্যিই তো, প্রতিবারই আশা দিয়ে নিরাশ করেছি ওঁকে। নাঃ, এবার আমায় সফল হতেই হবে। যেভাবেই হোক, যে-পথেই হোক।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরফদারকে তাসের টেবিলে বসতে দেখে আমি দৌড়লাম নীচে। কোনওরকম ইতস্তত না করে আলো জ্বেলে দিলাম তরফদারের কেবিনে—তারপর শুরু হল তল্লাশি-পর্ব। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম। কার্পেটের তলায়, আলমারির কোণে, ব্র্যাকেটের পেছনে, জুতোর সুকতলার নীচে—কোথাও বাকি রাখলাম না। কিন্তু সবই বৃথা। রুপোর টাকার চিহ্ন দেখলাম না কোথাও। বাক্সর ঠিক নীচে এক টুকরো কুণ্ডলি পাকানো চ্যাপ্টা তার ছাড়া উল্লেখ্য আর কিছুই চোখে পড়ল না। নিতান্ত অদরকারি মনে হলেও নোটবুকে রেখে দিলাম তারটা।

হতাশ হয়ে আলোটা নিভিয়ে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে দিয়ে এগোলাম নিজের ঘরের দিকে। এক-পা তরফদারের কেবিনে, আর এক-পা বাথরুমে সবে রেখেছি, এমন সময়ে কেবিনের দরজা গেল খুলে।

'কী খবর?' খুব মৃদু-মৃদু স্বরে বললেন একজন। দেশমুখ।

সরে পড়লাম। বাথরুম থেকে আমার ঘরে আসার দরজার চাবিটা নিঃশব্দে ঘুরিয়ে খুলে নিজের ঘরে এসে আবার চাবি ঘুরিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে। তারপর দরজার নবের ওপর একটা হাত রেখে অন্ধকারের মধ্যে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

একটু পরেই অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম বাথরুমে—তারপরেই হাতের মুঠির মধ্যে খুব আস্তে-আস্তে ঘুরতে লাগল নবটা। মুঠি আলগা করে দিলাম আমি। ছোট্ট একটা ঝাঁকানি—দরজা বন্ধ। আবার পায়ের শব্দ পিছিয়ে গেল ওপাশের ঘরে।

সাহস করে এবার চাবি ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁক করলাম দরজাটা—উঁকি মারলাম ওদিকে। তরফদারের কেবিনে মাঝে-মাঝে টর্চের আলোর ঝিলিক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁজলেন দেশমুখ। তারপরেই হঠাৎ আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে? পরক্ষণেই দেশমুখের স্বর শুনেই বুঝলাম কে।

'মিসেস প্যাটেল!' মৃদু খসখসে স্বরে শুধোলেন উনি।

'মিস্টার দেশমুখ!' নারীকণ্ঠে উত্তর এল।

'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?' শ্লেষ-বঙ্কিম সুরে শুধোন দেশমুখ।

'এ-কেবিন আপনার?' একইরকম শ্লেষ-তীক্ষ্ণ সুরে শুধোন মিসেস প্যাটেল।

'না।'

'তাহলে কী করছেন এখানে?'

'আপনি যা করতে এসেছেন—তাই। টাকাটার সন্ধানে।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ—।'

'আস্তে। সব জানি আমি। শুনুন মিসেস প্যাটেল, আমাদের দুজনেরই স্বার্থ যখন এক তখন আসুন একসঙ্গেই কাজ শুরু করা যাক।'

'বুঝলাম না কী বলছেন।'

'বুঝছেন ঠিকই। আপনি টাকাটা খুঁজছেন চুনীলাল দয়াভাইয়ের জন্যে। কিন্তু আমি খুঁজছি

BanglaBook.org

দেশের জন্য। আপনার উদ্দেশ্য অর্থলাভ—আমার উদ্দেশ্য সমাজসেবা। আগামী অ্যাসেম্বলির ইলেকশান থেকে যেভাবেই হোক সোমেশ রায়কে দূরে রাখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পরের বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছে রাখুন—তারপর নিয়ে গিয়ে যাকে খুশি দিন কোনও আপত্তি নেই।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ, টাকাটা তো আমি পাইনি।'

'তা জানি। যদি পাই টাকাটা—তাহলে এই চুক্তিই থাকবে আমাদের মধ্যে। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু ওটা আছে কোথায় বলুন তো?'

'এ-ঘরে থাকাই স্বাভাবিক। বড় ধড়িবাজ এই তরফদার লোকটা। বোধ হয় শুনেছেন। ওর সঙ্গে আমার পাকাপাকি কথা হয়ে গেছিল এ সম্পর্কে। গত রাতে জলপরীর ডক থেকে সমুদ্রের জলে একটা শার্ট ছুড়ে ফেলার সময়ে ওকে ধরে ফেলি আমি। তখনই জেরার মুখে ও স্বীকার করে যে, লাকি পিসটা ওর কাছেই আছে। ঠিক হয়, পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে সে নগদ দু-হাজার টাকার বিনিময়ে আমার হাতে তুলে দেবে টাকাটা।'

নারীকণ্ঠ বলেন, 'আমি ভাবছিলাম, আমিও একটা দর দেব ওকে। ভারি ধূর্ত লোক তো—সবকিছুই সম্ভব ওর পক্ষে।'

'দেননি, ভালোই করেছেন। আজ সকালে সোমেশ রায় আর সোমনাথ মুখার্জি যখন ছ'হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন, তখনই হতভাগা অন্য সুর গাইতে শুরু করে। জাহাজ থেকে নামামাত্র আইনের প্যাঁচে ফেলে জেলে পোরার ভয় না দেখালে ও তো সকালেই ফিরিয়ে দিয়ে আসত টাকাটা। আমি যা বলি, তা করি। সেটা জানে বলেই চুপ করে যায় তখনকার মতো।'

'ডিনার টেবিলে অত স্বীকারোক্তি তাহলে সবই অভিনয়?'

'বলা বাহুল্য। ওর চোখ দেখেই বুঝেছিলাম আমি। রিপোর্টার ছোকরাটাও লেগেছে ওর পেছনে। তাই টাকাটা অন্য কেউ সরিয়েছে, এইরকম একটা ধোঁকা দিয়ে ও নেমে যেতে চায় পোর্টে। তারপর অন্য কারও হাতে ওটা সোমেশ রায়কে ফিরিয়ে দিয়ে ছ'হাজার টাকা রোজগার করতে কতক্ষণই বা আর লাগে। কিন্তু আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি তা হতে দেব না। আসুন, খোঁজা যাক।'

'এ-দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় জানেন নাকি?' শুধোন নারীকণ্ঠ।

'বাথরুমে। তার ওপাশে একটা কেবিন আছে—কিন্তু দরজায় চাবি দেওয়া।'

শুনে আর দেরি করলাম না। আশা মিটিয়ে আমায় ঘরটাও তল্লাশ করার সুযোগ দিয়ে চলে এলাম ওপরের ডেকে।

ব্রিজের আসর তখন সবে ভাঙছে। পিসিমা ছাড়া আর কারও উৎসাহ নেই খেলায়। কবিতাকে ডেকে নিয়ে এলাম ঘরের এক কোণে। কিন্তু কিছু বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এগিয়ে এলেন আমাদের মাঝে।

'কী হল?' শুধোন উনি।

তরফদারের কেবিনে এইমাত্র যা শুনে এলাম, সব বললাম ওঁকে। শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল ওঁর মুখ।

'চমৎকার! দেশমুখ আর ওই স্ত্রীলোকটাও কিনা—। জানতাম, এ-জাহাজে কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। ঠিক আছে, কাল সকালেই তরফদারের সঙ্গে ওরাও নেমে যাবে মালপত্র নিয়ে। কিন্তু তার আগে তিনজনকেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সার্চ না করে ছাড়ছি না আমি।'

'বাবা।'

'যা বললাম, তা করবই। ভালো কথা মৃগাঙ্ক, অবস্থা কীরকম বুঝছ এখন? তরফদার যদি টাকাটা রেখেই থাকে, কোথায় রেখেছে বলে মনে হয়?'

BanglaBook.org

'আমি—।'

'আর-একটা সূত্র পেয়েছ, কেমন?'

'একটাও না।' বিষণ্ণভাবে বলি।

'একটাও না?' দাঁড়িয়ে উঠলেন সোমেশ রায় : 'তাহলে আর কী—বেশ বুঝছি, ইহজীবনে আর ও-টাকার মুখ দেখতে পাব না আমি। তোমার সূত্র ফুরিয়ে যাওয়া মানেই আমার দফারফা হওয়া। রিপোর্টার হিসেবে তোমার জুড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু বাবা ডিটেকটিভ হিসেবে—যাকগে, কী দরকার এসব কথা বলে। শুতে চললাম আমি।'

ওঁর পিছু-পিছু আমরাও বাইরের ডেকে এলাম। ওপাশের ছায়া-ছায়া একটা কোণে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতা বলল, 'তাহলে সত্যিই আমাদের আর কোনও আশা নেই, মৃগ?'

'খুব সামান্য একটা সূত্র আমি পেয়েছি, কবি। কিন্তু তা এতই তুচ্ছ যে, ওঁকে বলার সাহস হল না আমার। তরফদারের কেবিনে ছোট্ট একটা তারের কয়েল কুড়িয়ে পেলাম।'

'তাতে লাভ?'

'তা তো জানি না। কিন্তু তবুও ওই নিয়েই আজ সারা রাত আমি ভাবব। কোনওদিন এভাবে আর চিন্তা করিনি, করবও না। তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না কবি, কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

'আমি তো তোমার মতো অমন করে বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনের কথা তো তুমিও জানো, মৃগ।' সজল চোখে বলে ও।

সে-রাতে শোওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভোর হয় হোক, তবুও সূত্রের অর্থ না বার করে ঘুমোচ্ছি না। একে-একে তরফদারের ছোটখাটো মালপত্রগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—আর মানসচোখে চুলচেরা দৃষ্টি নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম তাদের। তারপর, নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রত্যেক মানুষের এমন একটা অবচেতন সত্তা আছে, যে কখনও ঘুমোয় না। বরং মানুষটার নিদ্রার সুযোগ নিয়ে সজ্ঞান মনের কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই বোধহয় পরদিন সকালে যে-আনন্দ নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলাম, সে-আনন্দ বোধ করি কলম্বাসও আমেরিকা আবিষ্কার করে পায়নি। দেরি হয়ে গেছিল খুবই। পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটি দেখা যাচ্ছে। জলপরী তাহলে নোঙর ফেলেছে।

বাথরুমের দরজায় চাবি ছিল না—তরফদারের ঘরের দরজাও দেখি দু-হাট করে খোলা। ঘর শূন্য—রাশি-রাশি মালপত্রের একটিও নেই।

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। শুনলাম, এখনও কেউ তীরে নামেনি।

'চট করে বড় সাহেবকে গিয়ে বলো—আমি না বলা পর্যন্ত কেউ যেন জলপরী ছেড়ে না যায়।' বলে তাড়াতাড়ি পোশাক পালটাতে শুরু করি আমি।

শার্টটার বোতাম আঁটছি—ঘরে ঢুকলেন সোমেশ রায়।

শুধোলাম, 'নতুন কোনও খবর আছে?'

'কিস্‌সু না।' বলে মুখ অন্ধকার করে বার্থে বসে পড়লেন উনি। ম্লান মুখ দেখে খুশিই হলাম—নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা ভালোই জমবে দেখছি।

BanglaBook.org

'সেকেন্ড অফিসার তরফদারের ঘর সার্চ করেছে সকালে—পোশাক পরার সময়েও তন্নতন্ন করে দেখেছে সবকিছু। মালপত্রগুলোও আবার পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। টাকাটা হয় ওর কাছেই নেই, আর থাকলেও নির্ঘাত গিলে ফেলেছে ও।'

'ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'ডেকে, তীরে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে। লঞ্চ তৈরি। দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেলও যাচ্ছেন।'

'ওঁদেরও সার্চ করেছেন নাকি?'

'না। সবকিছুর একটা সীমা আছে। তা ছাড়া, ওঁরাও যে আমার মতোই অন্ধকারে, তা বিশ্বাস করি আমি। সকালে এসে ওঁরা বললেন যে, এখানেই নেমে যেতে চান দুজনে। তৎক্ষণাৎ রাজি হলাম আমি। আর ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ বলো।'

'তা ঠিক।' সায় দিই আমি।

'কিন্তু তুমিই তো একটু আগে বলে পাঠালে যে, তুমি না আসা পর্যন্ত কেউ যেন জাহাজ ছেড়ে না যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, আমিই।' হাসিমুখে বলি আমি।

'তুমি—তুমি নতুন কোনও সূত্র পেয়েছ বুঝি?'

'মনে হচ্ছে।'

'শাবাশ। না, না, আবার বেশি আশা আমি করব না। নিরাশ হওয়ার আঘাত এবার আব সহ্য করতে পারব না আমি।'

'সামান্য একটু আলো দেখতে পেয়েছি, স্যার। তাই বেশি আশা না করাই ভালো।'

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সোমেশ রায় বললেন, 'সামান্যই হোক, আর অসামান্যই হোক, হাল ছেড়ো না কিছুতেই। আবার বলছি বাবা, টাকাটা যদি উদ্ধার করতে পারো—তোমার কোনও খেদ আমি রাখব না।'

'মনে থাকে যেন।' স্বগতোক্তি করি আমি।

ডেকে ওঠার সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। দু-চোখে ওর উদ্বেগের ছবি দেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলাম একটু। তারপর সবাই মিলে এগিয়ে গেলাম ডেকের মাঝখানে। সেখানে স্তূপীকৃত মালপত্রের মাঝে বসেছিলেন তরফদার, দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেল।

সোমেশ রায় বললেন, 'বাধ্য হয়ে আজ এদের সঙ্গ আমায় হারাতে হচ্ছে।'

বললাম, 'ডক্টর তরফদারের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে নিজেকে আগে থেকেই শক্ত করে রেখেছিলাম। কিন্তু এঁরা—।'

কটমট করে দেশমুখ তাকালেন আমার দিকে। খবর পেয়ে সোমনাথ মুখার্জিও উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এলেন ডেকে।

অল্প হেসে বললাম, 'চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ডক্টর তরফদারকে আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যার।'

'নিশ্চয়। করে ফ্যালো।'

'ডক্টর তরফদার!' উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধোলাম আমি, 'ডক্টর তরফদার, ক'টা বাজে এখন?'

ধীরে-ধীরে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তরফদারের দু-চোখ।

'বুঝলাম না।'

'আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে, তাই জিগ্যেস করছি। অনেকবার ঘড়িটার সময় দেখতে দেখেছি আপনাকে। তাই শুধোচ্ছি, কী সময় এখন?'

খুব সহজভাবে জবাব দিলেন তরফদার, 'ঠাকুরদার আমলের ঘড়ি তো, মাঝে-মাঝে বড়

BanglaBook.org

বেয়াড়া টাইম দিতে থাকে। কাল থেকে দেখছি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা।'

'বন্ধ হয়ে গেছে? খুব খারাপ, খুব খারাপ।' বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি : 'দিন আমায়—চালু করে দিচ্ছি আমি।'

চকিতে তরফদারের দু-চোখ ঘুরল ডাইনে আর বাঁয়ে—যেন জলপরী আর পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটির মধ্যে ব্যবধানটুকু মেপে নিলেন মনে-মনে।

বললাম, 'কই দিন! পালাবার কোনও পথই নেই—বার করুন।'

'নিন না।' বলে পকেট থেকে বড় আকারের সেকেলে একটা পকেট-ঘড়ি বার করেন উনি। চেন থেকে খুলে বেশ হাসিমুখে আমার হাতে তুলে দিলেন ঘড়িটা—দেখে আবার দমে যাই আমি। সবই কি শেষে ভুল হল?

শক্ত আঙুলে ঘড়িটা চেপে ধরে দুরুদুরু বুকে পেছনের ডালাটা খুলে ফেললাম। ভেতরটা পাতলা কাগজ দিয়ে ঠাসা। টেনে তুলে ফেললাম কাগজটা।

আর দেখলাম, ঠিক নীচেই রয়েছে একটা রুপোর টাকা।

হাসিমুখে টাকাটা তুলে দিলাম সোমেশ রায়ের হাতে : 'আশা করি, এবার ভুল হয়নি আমার।'

'শাবাশ। শাবাশ।' উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সোমেশ রায় : 'এই আমার লাকি পিস। আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই তো খুদে-খুদে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো। শাবাশ মৃগাঙ্ক, শাবাশ।'

কবিতার দিকে তাকালাম : খুশির আভায় চিকমিক করছে ওর দু-চোখ। ডালা বন্ধ করে ঘড়িটা ফেরত দিলাম তরফদারকে।

বললাম, 'কাজ শেষ করার পর মেন স্প্রিংটাকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয়নি আপনার। জানেন তো, বড় কাজের জিনিস এই মেন স্প্রিং। তাই না?'

'তাই বটে।' তখনও মৃদু হাসতে থাকেন তরফদার। বেপরোয়া ভঙ্গিমায় ঘড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে পকেটে রাখেন উনি। বলেন, 'মিস্টার রায়, এবার তাহলে যেতে পারি আমি? তবে দোহাই আপনার, চোর বদনামটা যাওয়ার আগে দেবেন না। আদতে কিছুই চুরি হয়নি আপনার।'

'কে বললে হয়নি?'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল দেশমুখের মুখ। সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তিনি, 'মিস্টার রায়, এ-জোচ্চোরটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওকে জেলে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত আমি করেছি।'

মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন সোমেশ রায়, 'ন্যায়ের প্রতি আপনার এই নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে তা নয়। মিস্টার তরফদার, আমার অভিনন্দন জানবেন। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলায় নিশ্চয় খুব পাকা খেলোয়াড় ছিলেন আপনি। যাক, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ সেজন্যে,' হাসি মুখে বলেন তরফদার : 'সমুদ্রের ওপর ভালোই কাটল ক'দিন—সেজন্যেও রইল ধন্যবাদ।' দেশমুখের রক্তচক্ষুর ওপর চোখ পড়তেই ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ : 'আপনার কাছে একটু অনুগ্রহ আশা করতে পারি কি মিস্টার রায়?'

'হুম। একটুও বিচলিত হননি দেখছি। বলুন কী চাই?'

'প্রথমে শুধু আমাকে পাঠিয়ে দিন তীরে—তারপর লঞ্চ ফিরে এলে এঁরা যাবেন'খন।'

বেশ খুশি-খুশি মন তখন সোমেশ রায়ের। তরফদারের বিচিত্র অনুরোধ শুনে হেসে ফেললেন তিনি।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাই হবে। অনেকগুলি রত্ন একসঙ্গে রাখা যেমন সমীচীন নয়—তেমনি আপনাদের তিনজনকেই একসঙ্গে লঞ্চে চাপানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উঠে পড়ুন আপনি। আর আপনি মিস্টার দেশমুখ—' এগিয়ে গিয়ে রাজনীতিবিদ ভদ্রলোকের পথরোধ করে দাঁড়ান উনি : 'যেখানে আছেন, ওইখানেই থাকুন।'

BanglaBook.org

মালপত্রগুলো একজন নেপালিকে দেখিয়ে দিয়ে চটপট সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তরফদার। ফটফট শব্দে জলের ওপর মস্ত একটা অর্ধবৃত্ত কেটে জেটির দিকে এগিয়ে গেল লঞ্চটা। রেলিংয়ের ধারে গিয়ে শূন্যে মুঠি তুলে চিৎকার করে উঠলেন দেশমুখ, 'তোমায় দেখে নেব আমি জোচ্চোর কোথাকার!'

প্রত্যুত্তরে লঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় অভিনন্দন জানালেন তরফদার। অজানা অচেনা পথে ভাগ্যের অন্বেষণে আবার নতুন করে শুরু হল তাঁর পথ চলা।

মিসেস প্যাটেলের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। 'মিস্টার রায়, জানেন তো মত পরিবর্তন করা মেয়েদের স্বভাব। তাই ভাবছি, আপনার সঙ্গেই থেকে যাই। একসঙ্গে তাহলে বম্বে ফেরা যাবে।'

'আজ্ঞে না।' বিদ্রূপকঠিন স্বরে উত্তর দেন সোমেশ রায় : 'এত কষ্টে পাওয়া টাকা আর-একবার হাতছাড়া করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'তার মানে?' নিরুৎসাহভাবে তাকান প্যাটেল-গৃহিণী।

'আপনার আর মিস্টার দেশমুখের সঙ্গ বিষের মতোই অসহ্য মনে হচ্ছে—বলতে বাধ্য হলাম, কিছু মনে করবেন না। আপনার বন্ধু চুনীলাল দয়াভাইকে বলবেন সিলোন ব্রিজ কনট্র্যাক্ট আমি নেবই—ক্ষমতা থাকে তো ছিনিয়ে নিক আমার হাত থেকে। আর মিস্টার দেশমুখ—শুনে রাখুন, সামনের হপ্তাতেই অ্যাসেম্বলির ইলেকশানে নামার সব ব্যবস্থা আমি সম্পূর্ণ করছি। আপনার বর্তমান অবস্থাটা জেনে খুবই খুশি হলাম।'

'এসবের মানে কী?' রাগত স্বরে শুধোন দেশমুখ।

'আপনি ভালো করেই তা জানেন। শহরে সামান্য কাজ আছে সেকেন্ড অফিসারের—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লঞ্চ নিয়ে ফিরে আসবে ও। এলেই মিসেস প্যাটেলের সঙ্গে জলপরী ছেড়ে চলে যাবেন আপনি।'

বলে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। দু-চোখে তাঁর অনাবিল আনন্দের প্রতিচ্ছবি। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ডিটেকটিভ-কাম-রিপোর্টার, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়। কী বলো? এসো বাবা, সেলুনে এসো। তোমার-আমার মধ্যে ব্যাবসার সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে ফেলা যাক। ভালো কথা সোম, চেকবইটা কাছে আছে তো?'

'আছে।' বললেন সোমনাথ মুখার্জি।

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু সবাই এসে ঢুকলাম বড় সেলুনে। কবিতাও এল সঙ্গে।

'সোম, তোমার দু-হাজার।' স্মরণ করিয়ে দেন সোমেশ রায়।

'জানি,' অনিচ্ছার সঙ্গে টেবিলে বসে লেখার উদ্যোগ করেন সোমনাথ মুখার্জি।

'এক মিনিট, স্যার।' বাধা দিয়ে বলি আমি : 'আপনার কাছে কোনও টাকা আমি চাই না।'

'তবে কী চাও?' শুধোল সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো একটা কাজ।'

'ও তার উপযুক্তও বটে।' প্রশংসিকা দিয়ে দেন সোমেশ রায়।

অনিচ্ছার ভাবটা একটু-একটু করে ফিকে হয়ে আসছিল মিঃ মুখার্জির মুখের রেখায়। বললেন, 'কিন্তু অফিসের ব্যাপারে নাকগলানো মোটেই পছন্দ করি না আমি।' বললেন বটে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হল, নগদ দু-হাজারের বিচ্ছেদ-বেদনাও বড় কম নয় তাঁর কাছে।

বললাম, 'গত হপ্তায় সানডে ম্যাগাজিনের সম্পাদক চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার মুখের একটা কথা পেলেই প্রমোশনটা হয়ে যায় আমার। মাসে তাহলে সাড়ে চারশোর মতো পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।'

উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি : 'আমি কথা দিলাম।' বলে সস্নেহে চেকবইটাও পকেটে রেখে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায় ঃ 'কাজের মতো একটা কাজ করলে বাবা। ভালো কাজ মানে ভবিষ্যতের পথ সোনা দিয়ে বাঁধানো। নগদ টাকার চাইতে অনেক ভালো।'

'আমিও তা বিশ্বাস করি স্যার,' মৃদু হেসে বলি আমি ঃ 'তা ছাড়া, আমি আবার বিয়ে করার কথা চিন্তা করছি।'

দাঁড়িয়ে উঠে সজোরে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন সোমেশ রায়।

'চমৎকার! চমৎকার! এই তো চাই। আগে থেকেই তোমাদের কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করে রাখছি আমি।'

'তাহলে আপনার মত আছে?'

'একশোবার। বিয়ে মানেই ছন্নছাড়া তরুণের জীবন ঘড়ির কাঁটার মতো যথানিয়মে চলা। এর চেয়ে ভালো কাজ আর আছে? জীবনে বড় হওয়ার প্রেরণা, শক্তি আর সাহস—এসব কিছুব উৎসই তো স্ত্রী।'

'আমারও সেই বিশ্বাস, স্যার।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

'অসংযম থেকে সংযম, যাযাবরের জীবন থেকে সংসার-জীবনের শ্রী, অন্যায় প্রলোভন থেকে ন্যায়েব প্রতি নিষ্ঠা—এসবই সম্ভব শুধু বিয়ের ফলেই।' বক্তৃতা শেষ করে আবার টেবিলের সামনে বসে পড়েন তিনি ঃ 'আর এই বিয়ের প্রথম যৌতুক হবে আমার ছোট্ট চেকটা।' একটু থেমে ঃ 'মেয়ে আশা করি ভালোই? রূপে-গুণে তোমার উপযুক্ত তো?'

'বরং আমিই তার উপযুক্ত নই।'

টেবিল চাপড়ে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন সোমেশ রায় ঃ 'বেশ কথা বলেছ বাবা, বেশ বলেছ। তবে কী জানো, আজকালকার এই মেয়েগুলোকে মোটেই পছন্দ হয় না আমার। অত্যন্ত অপব্যয়ী। সামান্য একটা টাকার মূল্য যে কতখানি, তা তো জানেই না, উপবন্তু—।'

'কিন্তু এ-মেয়েটি জানে। অন্তত জানা তো উচিত।'

'কে সে?'

'কবিতা।'

'এ কী!' লাফিয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'চেকবইটা পকেটে রাখুন স্যাব। আমি যা চাই, তা আপনার টাকা নয়।'

টেবিলেব ওপব পেনটাকে সজোবে আছড়ে ফেললেন সোমেশ রায়।

'আমি—আমি কল্পনাই করতে পারিনি। কবিতা, এসবেব মানে কী?'

পাশে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কবিতা।

'বাবা, ছেলেবেলা থেকেই আমি যা চেয়েছি, তাই দিয়েছ তুমি। মৃগাঙ্ককে নিয়ে তুমি আব উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথা রাখো।'

'কিন্তু—এ কী করে সম্ভব—ছেলেটির—ওর যে কিছুই নেই।'

'তুমি যখন বিয়ে করেছিলে, তোমার কী ছিল বাবা?' শুধোয় ও।

'ছিল আমার মস্তিষ্ক আর শক্ত দুটো হাত।'

'মৃগাঙ্করও তা আছে।'

সোমেশ রায মুখ ফেরালেন আমার দিকে। একটু থেমে আস্তে-আস্তে চেযারে বসে পড়ে বললেন, 'তোমাকে আমার ভালোই লাগে মৃগাঙ্ক। আর তাই তোমায় দুঃখ দেব না আমি। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি পারবে? ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে কবিতা। ওর জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু। তুমি কি পারবে সামলাতে?'

'আপনার আশীর্বাদ পেলে নিশ্চয় পারব!' বলি আমি।

সস্নেহে মেয়ের চিবুকটি নেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

BanglaBook.org

বললেন, 'একটু সময় দাও ভাববার। আচমকা কিছু করা উচিত নয়। কী বলো?'

বললাম, 'নিশ্চয়। ইতিমধ্যে—।'

'ইতিমধ্যে।' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন উনি। বেশ কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। তারপর বললেন, 'ইতিমধ্যে যে-অবস্থায় তুমি পৌঁছেছ, সেখান থেকে লাখ টাকা পেলেও রাজি হব না তোমায় টেনে আনতে।' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কবিতা বলল, 'দেখলে? আমার বাবা কত ভালো, দেখলে? এরকম মানুষকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে?'

'তোমাদের বংশের প্রত্যেকেই ওইরকম কবি। অনেকদিন ধরেই তা লক্ষ করে আসছি।'

'কিন্তু চিরকাল কি এমনি সুন্দর থাকবে তোমার ভালোবাসা? পুরুষের মন—।'

'তোমাদের মতো নয়। মানে—তোমাদের মতো অত সুন্দর নয়। জীবনের অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্তে তোমার সাহায্য, তোমার প্রেরণা, তোমার প্রেম কোনওদিনই আমি ভুলতে পারব না। তুমিই আমার জীবনের প্রথম স্বোপার্জিত স্ত্রী।'

'মৃগ! সাবধান—কেউ এসে পড়তে পারে এদিকে।'

ভায়া ইন্দ্রনাথ, তাই বলছিলাম, এ শুধু আমার রহস্যভেদ নয়, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ এবং বধূলাভ।

বম্বেতে ফিরেই লিখলাম এই চিঠি। পরের খবর পরের চিঠিতেই পাবে। অতএব, ধৈর্য ধরো!

ইতি—
তোমার প্রিয়তম
মৃগাঙ্ক রায়

চিঠিটা নামিয়ে রেখে চোখ তোলে ইন্দ্রনাথ। ওর টানা-টানা বিষাদ-মাখা দুই চোখে টলমল করে ওঠে আনন্দ-অশ্রু গোধূলির বিষণ্ণ আভায়।

BanglaBook.org

তির্যক রেখা

BanglaBook.org

সুখময় মুখোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

এই বইয়ের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

প্রথমত, এর প্রথম খণ্ডের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত ও পরাশর বর্মা তাঁদের পাত্রমিত্রবর্গসমেত দেখা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই চরিত্রগুলি আমার সৃষ্টি নয়। ব্যোমকেশের স্রষ্টা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হুকা-কাশির স্রষ্টা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (অধ্যাপক), জয়ন্তের স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং পরাশর বর্মার স্রষ্টা শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। নিছক বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই বাংলা সাহিত্যের এই সব শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভদের আমি এ-বইয়ে একত্র সমবেত করেছি। আমার মতে, বাংলা ভাষায় মুষ্টিমেয় যে ক'টি সার্থক ডিটেকটিভ কাহিনি এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, তা পূর্বোক্ত চারজন লেখকের হাত দিয়েই বেরিয়েছে। এঁদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম এখনকার তরুণ পাঠকদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। তার কারণ, তাঁর বইগুলি এতকাল ছাপা ছিল না। কয়েক মাস হল তাঁর 'সোনার হরিণ'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য বইগুলির নতুন সংস্করণও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। ওই বইগুলি পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ডিটেকটিভ কাহিনি রচনায় কী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, এই বইখানি সম্পূর্ণ মৌলিক; কোনও বিখ্যাত বা অখ্যাত বিদেশি কাহিনির ছায়া এর ওপর পড়েনি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তুলসী দাস ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেনের যত্ন ও আগ্রহের ফলেই এই বইটি প্রকাশিত হল। এঁদের সঙ্গে আমার যে সুনিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ, তাতে ধন্যবাদ জানানোর কোনও কথাই ওঠে না।

BanglaBook.org

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানি

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া অসহিষ্ণুভাবে উসখুস করিবার পর অবশেষে হাঁক দিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম! আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যাও।'

আমি বলিলাম, 'ব্যাপার কী? এত ছটফট করছ কেন, আর এতবার চা খাওয়ারই বা দরকার পড়ছে কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারছ না। একটা জটিল রহস্যের অর্ধেকটাব সমাধান করার পর তথ্যের অভাবে আর এগোতে না পারলে মানুষ এই রকমই ছটফট করে।'

আমি বলিলাম, 'সেটা যে বুঝতে পাবছি না তা নয়। কিন্তু এতে তোমার এত ঘাবড়াবার কী আছে? বিকাশকে যখন লাগিয়েছ, তখন সে আজকালেব মধ্যেই সমস্ত খবর এনে হাজির করবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিকাশকে লাগিয়েছি। পুলিশও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু খবর যে আজকালের মধ্যেই আসবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। খবর আসতে দুদিন লাগতে পারে, পাঁচদিন লাগতে পারে, দশদিন লাগতে পারে, একমাস লাগতে পারে, আবও বেশি সময় লাগতে পারে। ততদিন কিছু করার উপায় নেই। এইভাবে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা আমার অসহ্য লাগে!'

ইহার আর কী উত্তর দিব? ব্যোমকেশ বর্তমানে যে-বহস্যের উদঘাটনে ব্যাপৃত রহিয়াছে ও যেসব প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে তাহার কাজ এখন বন্ধ বহিযাছে, সেগুলির বিষয় আমি ভালো কবিযাই জানি। সুতরাং ব্যোমকেশের অধৈর্যেব কারণ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে অযথা আলোচনা না করিয়া তাহার মনকে যদি সাময়িক ভাবে অন্য দিকে চালিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বরং কতকটা কাজ হয়। কিন্তু কীভাবে তাহা করা সম্ভব?

পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। টিপয়ে চা রাখিয়া সে ব্যোমকেশকে বলিল, 'একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি এই কার্ড দিয়েছেন।'

দেখিলাম কার্ডে লেখা আছে :

শ্রীসজলকুমার সেন
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ,
নিত্যানন্দ কলেজ।

ব্যোমকেশ কিছু বলিবার আগেই আমি বলিয়া উঠিলাম, 'তাঁকে ভেতবে নিয়ে এসো।'

পুঁটিরাম ঘরের বাহিরে গেলে ব্যোমকেশ আমায় বলিল, 'ব্যাপার কী? ভদ্রলোককে ভেতরে আনবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

আমি বলিলাম, 'আগ্রহের কারণ তোমার মনের এই অবস্থা। ওঁর সঙ্গে কথা কইলে খানিকক্ষণ তুমি ভুলে থাকবে। ভদ্রলোক যদি কোনও নতুন রহস্যের সন্ধান দেন, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এই ভেবেই ওঁকে ভেতরে ডাকলাম।'

সজলবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স তাঁহার বেশি নয়, ত্রিশের মধ্যেই। মাঝারি দৈর্ঘ্যের একহারা চেহারা। চেহারার মধ্যে বেশ একটা কমনীয়তার ছাপ আছে। আমাদের দুইজনকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া তিনি চেয়ারে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, 'যে-কারণের জন্যে আপনার কাছে আজ

BanglaBook.org

এসেছি, সেটার গুরুত্ব যে কতখানি, তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আপনার অমূল্য সময়ের খানিকটা হয়তো মিছিমিছি নষ্ট করে দিচ্ছি, এই ভেবে আমার অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষয়টাব গুরুত্ব কতখানি, সে বিবেচনার ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিন। আপনার যা বলবার আছে, তা ভালো করে খুলে বলুন।'

সজলবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'আমাদের আদি বাড়ি বর্ধমান জেলায়, কিন্তু দু-পুরুষ ধরে আমরা কলকাতাতেই আছি। বাবা রেলওয়ের বড় অফিসার ছিলেন। যেমন প্রচুর মাইনে পেতেন, তেমনি দু-হাতে খরচ করতেন। তাই তিনি কিছুই জমাতে পারেননি। আমাদের জন্যে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। তাঁর প্রধান শখ ছিল বাগান করা। এই জন্যে তিনি বালিগঞ্জের গ্রিনউড গার্ডেনসে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। বাড়িটার কম্পাউন্ড বেশ বড়; তার মধ্যে বেশ ভালোভাবেই বাগান করা চলে। বাবা করেছিলেনও তাই। পাঁচ বছর হল বাবা মারা গেছেন। আমরা দুই ভাই। দাদা আমাব চেয়ে বছর দশেকের বড়। বাবা তাঁকে রেলের চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন, তাঁর আগেকার তুলনায় পদোন্নতি হয়েছে, মাইনেও বেড়েছে। দাদা দশ বছর আগে বিয়ে করেছেন। বউদি দস্তুরমতো শিক্ষিতা, তিনিও চাকরি করেন—সরকারি চাকরি, মাইনে ভালোই পান।

'আমাদের জন্ম-কর্ম সব গ্রিনউড গার্ডেনসের বাড়িতেই। মাত্র ছ'মাস হল আমরা সে বাড়ি ছেড়ে আর একটা বাড়িতে এসেছি। গ্রিনউড গার্ডেনসের বাড়িটা বাবা পঞ্চাশ বছর আগে ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন বাড়িটার যে-ভাড়া ছিল, তা তখনকার তুলনায় যথেষ্ট বেশি হলেও এখনকাব তুলনায় খুবই কম। রেন্ট-কন্ট্রোল আইনের দরুন বাড়িওয়ালা অনেক চেষ্টা করেও বেশি ভাড়া বাড়াতে পারেননি। যা হোক, পুবোনো বাড়িওয়ালা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এ নিয়ে বিশেষ ঝামেলা বাধেনি। তিন বছর আগে তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে বাড়ির মালিক হয়ে গোল-াল শুরু করল। তার মতলব হল, আমাদেব উঠিয়ে দিয়ে এখনকার ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে বসাবে। এ জন্যে সে আমাদের ওপরে নানাভাবে চাপ দিতে শুরু করল। আমরা প্রথম-প্রথম তাতে গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু অনেকদিন বাড়িটার মেরামত হয়নি। বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ত। তা ছাড়া, অনেকখানি অংশ একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে পড়েছিল। আমবা যখন নতুন বাড়িওয়ালাকে মেরামতের কথা বললাম, সে বলল, "আপনারা বাড়ি ছেড়ে উঠে যান। আমি বাড়িটা ভেঙে নতুন করে তৈবি করব। কম্পাউন্ড টম্পাউন্ড আর রাখব না। সমস্ত জমিটা নিয়ে পাঁচতলা বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট-সিস্টেমে ভাড়া দেব।" অবিলম্বে বাড়ি ছেড়ে না গেলে সে যে আমাদের নামে মামলা করবে, তাবও আভাস দিল। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। এমনিতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমাদের ভালো লাগছিল না। তা ছাড়া, মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। আমরা তিনজনেই চাকরি করি, মামলার তদ্বির করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া মামলায় শেষ পর্যন্ত যে-পক্ষই জিতুক না কেন, দু-পক্ষেরই টাকার শ্রাদ্ধ হয়। সেইজন্যে আমরা তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, ও বাড়ি ছেড়ে দেব। ছেড়ে দেওয়ার জন্যে বাড়িওয়ালার কাছে এক মাসের সময় চেয়ে নিলাম।

'কিন্তু ছেড়ে দিয়ে যাই কোথায়? যেমন-তেমন বাড়ি হলে আমাদেব চলবে না। কারণ, বাবার বাগান করার শখটা আমরাও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। বউদিরও এ-শখ আছে। বাবার মতো পয়সা আমাদের নেই—কিন্তু আমরা তিনজনে মিলে যা রোজগার করি, তাতে আমাদের বেশ ভালোভাবেই চলে যায়, তাই আমাদের বাগানের নেশা ছাড়তে হয়নি। সুতরাং আমরা যে-বাড়িতে যাব, তাতে বাগান করার মতো কম্পাউন্ড থাকা চাই। অথচ এই ধরনের বাড়ির যে-আকাশ-ছোঁড়া ভাড়া, তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। এ অবস্থায় কী করা যায়, তাই আমরা ভাবতে লাগলাম।

'ভাবতে-ভাবতে আর বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে যখন দিশেহারা হচ্ছি, এমন সময় বাংলা খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল ঃ

BanglaBook.org

*

'দক্ষিণ কলিকাতায় বিস্তীর্ণ কম্পাউন্ড সমেত একটি একতলা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া মাসিক দুই শত টাকা। নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেলা ৮টা হইতে ১০টার মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীপীতাম্বর ঘোষাল

৮নং দিবাকর সাহা লেন, কলিকাতা-৬।'

'বিজ্ঞাপন দেখে অবিলম্বে আমি গিয়ে পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পীতাম্বরবাবু বেশ সাদাসিধে মানুষ, কোনও চাল নেই। আমরা বাড়িটা ভাড়া নিতে চাই শুনে পীতাম্বরবাবু আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন—আমাদের পরিবারে কত জন লোক, আমরা কী করি, আদি বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পরে তিনি বললেন, "আরও অনেকে ও বাড়ি নিতে চাইছে তবে আমার আপনাদেরই সবচেয়ে desirable পার্টি বলে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আজ সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় আসুন, বাড়িটা দেখবেন। তারপর বাড়ি পছন্দ হলে নেবেনখন।"

'বাড়িটা লেকের কাছে—হেমন্ত ঘোষ রোডে। নম্বর ৩৯-এর বি। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় আমি, দাদা আর বউদি সবাই মিলে বাড়িটা দেখতে গেলাম। খাসা বাড়ি। চারখানা ঘর, তার সঙ্গে রান্নাঘর, বাথরুম প্রভৃতি। প্রায় নতুন বাড়িই বলা চলে। মাত্র পাঁচ বছর আগে বাড়িটা তৈরি হয়েছে। যিনি তৈরি করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে পীতাম্বরবাবু বাড়িটা কিনেছেন মাত্র মাস ছয়েক আগে। বাড়ির কম্পাউন্ডের একপাশে একটি অপরূপ সুন্দর বাগান আছে। বিজ্ঞাপনে বাগানের কথা কিছু লেখা ছিল না। এই বাগানটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করল।

'বাড়ি, বাগান—সব কিছু দেখা হলে পীতাম্বরবাবু বললেন, "কী? বাড়ি পছন্দ হল?"

'দাদা বললেন, "বাড়ি তো পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এত ভালো বাড়ি, তার সঙ্গে এত সুন্দর বাগান—এ আপনি মাত্র দুশো টাকায় ভাড়া দিতে চাইছেন কেন?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "তাহলে মশায় আসল কথাটা খুলে বলি। আমি কলকাতায় থাকি না। ইউ. পি.-র মিরাট শহরে কন্ট্রাকটরি করি। অল্প বয়েসেই নিজের দেশ ছেড়ে ওদেশে গিয়েছিলাম—তখন আমি কপর্দকহীন। প্রথমদিকে প্রায় কুলিগিরি করে পেট চালাতে হয়েছে। তারপর নিজের চেষ্টায় ধাপে-ধাপে, একটু-একটু করে উঠেছি। এখন আপনাদের আশীর্বাদে পয়সাকড়ির কোনও অভাব নেই। কিন্তু এদিকে আবার বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের জন্যে মন কেমন করতে শুরু করছে। সেইজন্যে ঠিক করলাম ও-দেশ থেকে একেবারে ব্যাবসা গুটিয়ে এনে এখানে এসে বসব। দিবাকর সাহা লেনের বাড়িটা আমার পৈত্রিক বাড়ি। ওখানে আমার দাদারা রয়েছেন—বিরাট সংসার। এর ওপর আমার সংসারটা ওখানে চাপলে বাড়িতে নিশ্বাস ফেলার জায়গা থাকবে না। তা ছাড়া, আমার বাগান করার শখ আছে। তা ওখানে হবে না। তাই এ-বাড়িটা কিনলাম। কিন্তু এখানে এসে বাস করা বোধহয় আমার কপালে লেখা নেই। এ-বাড়িটা কেনার সঙ্গে-সঙ্গেই ওখানে একগাদা মোটা টাকার সরকারি কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেলাম। ব্যাবসাদার মানুষ। টাকার লোভটা ছাড়ি কী করে? তাই কন্ট্রাক্টগুলো নিতে বাধ্য হয়েছি। গভর্নমেন্টের একটা নতুন টাউনশিপ তৈরি হচ্ছে—তারই বাড়িঘর তৈরির কন্ট্রাক্ট। টাউনশিপ তৈরি শেষ হতে অন্তত পাঁচ বছর লাগবে—ততদিন আমার কাজও কিছু না কিছু থাকবে।

' "কাজেই আমার তো মশায় আপাতত কয়েক বছর এখানে আসা হচ্ছে না। আমি ঠিক করলাম, এ ক'বছর এ-বাড়ি খালিই পড়ে থাকবে। কিছু দিন বাড়ি খালিই পড়ে রইল। তারপর অল্প ক'দিন আগে আমার একজন আত্মীয় আমায় চিঠিতে জানাল যে, গভর্নমেন্ট এ-বাড়িটা রিকুইজিশন করার মতলব করছে। শুনে আমার হৃৎকম্প হওয়ার জোগাড়। কারণ, গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিহন করলে কোন উটমুখো গভর্নমেন্ট অফিসার এখানে এসে অধিষ্ঠান হবে—তার হয়তো

BanglaBook.org

একপাল কাচ্চাবাচ্চা—আমার এত সাধের বাড়ি আর বাগান একেবারে নষ্ট করে দেবে। তাই আমি তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় ছুটে এলাম। উদ্দেশ্য, গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিশন করবার আগেই এমন কোনও ফ্যামিলিকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেওয়া—যাদের লোক কম, কাচ্চাবাচ্চা নেই—এক কথায় যাদের থেকে বাড়ি-বাগান নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। আপনাদের ফ্যামিলি ঠিক সেইরকম—তাই আপনাদেরই বাড়িটা দিতে চাই।"

'দাদা বললেন, "আপনার মনোমতো ভাড়াটেরা যাতে ভাড়া দেখে পিছিয়ে না যায়, সেইজন্যেই কি আপনি ভাড়াটা কম করে ধার্য করেছেন?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "সে জন্যেও বটে, আর-একটা কারণেও বটে। আপনাদের কেবল বাড়িটাই ভাড়া দেব—বাগানটা নয়—বাগান আমারই দখলে থাকবে।"

'এ-কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বউদি বললেন, "সে কী? বাগানে আমরা হাত দিতে পারব না?"

'পীতাম্বরবাবু বললেন, "না-না! তা পারবেন না কেন? আসল কথা এই। বাগানটা গত ছ'মাস ধরে অনেক যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে। এর প্ল্যান আমারই। আমার মালি এ ক'মাস ধবে অবিশ্রাম খেটে এটাকে গড়ে তুলেছে। আপনারা এর ফুলটুল মালির কাছ থেকে যত খুশি চেয়ে নিতে পারেন। তা ছাড়া কম্পাউন্ডের ওপাশে অনেকখানি খালি জমি পড়ে আছে। সেখানে আপনারা আপনাদের খুশিমতো বাগান করতে পারেন। আমার বক্তব্য এই যে, এই বাগানটার এখন যে-চেহারা আছে, সেটা যেন বদলানো না হয়।"

'আমরা তাতে রাজি হলাম। তখন পীতাম্বরবাবু বললেন, "আর একটা কথা। পাঁচ বছর বাদে আমি যদি কলকাতায় আসতে চাই তখন কিন্তু আপনারা দয়া করে বাড়িটা ছেড়ে দেবেন, এই কথা দিন।"

'আমবা এই শর্তে রাজি হয়ে দু-মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়িটা নিলাম। পবের মাসেব পয়লা তারিখেই গ্রিনউড গার্ডেনস ছেড়ে ও-বাড়িতে চলে এলাম। পীতাম্বরবাবু তখনও কলকাতায় ছিলেন। এর পবেও তিনি দিনকয়েক ছিলেন। যতদিন ছিলেন মাঝে-মাঝে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তারপর তিনি মিরাটে চলে গেলেন। আমাদের ঠিকানা দিয়ে গেলেন। তাবপব থেকে আমরা প্রতি মাসে তাঁর কাছে মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার ঝামেলাটা কী, সে সম্বন্ধে তো আপনি এখনও কিছু বললেন না।'

সজলবাবু বলিলেন, 'এইবার সেই কথাই বলছি। ঝামেলাটা শুরু হয়েছে আমাদের এ-বাড়িতে আসবার পরদিন থেকেই। আমাদের পুরোনো বাড়িতে যে চাকরটা কাজ করত, তাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। সে রাত্রে বারান্দায় শুত। আমাদের আসার পরের পরেরদিন সকালে সে বলল যে, আগের দিন রাত্রিতে সে ভূত দেখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভূত?'

সজলবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ! ভূত! সাদা কাপড় পরা ঘোমটা টানা একটা পেতনি। মাঝরাত্রিতে চাকরটা যখন একবার উঠেছিল, তখন সে নাকি পেতনিটাকে বাগানের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ! তার কথা শুনে আপনারা কী করলেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আমরা তাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, সে যা দেখেছে, তা তার চোখের ভুল। তারপর মালিটাকে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল যে, সে কিছু দেখেনি। চাকরটা বুঝল কি না জানি না, তবে গোঁজ হয়ে রইল। তার পরেরদিন সকালে সে আমাদের কাছ থেকে দেশে টাকা পাঠাতে হবে বলে মাইনেটা চেয়ে নিল। তারপর বলল, কাল

BanglaBook.org

রাত্রিতেও সে সেই পেতনিটাকে দেখেছে। আমরা তখন অন্য কথা বলছিলাম, তার কথায় কান দিলাম না। কিন্তু সেইদিন বিকেলে আমরা বাড়ি ফিরে দেখলাম সে তার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তারপর আর পেতনিটাকে দেখা গিয়েছিল?'

সজলবাবু বলিলেন, 'তারপর আর কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। কিন্তু ঝামেলার এইখানেই শেষ হল না। আজ মাস তিনেক ধরে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করছি। আমাদের পাড়া দিয়ে আজকাল রোজ অসংখ্য নানা ধরনের লোক নতুন-নতুন যাতায়াত করছে। এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। একটেরে নিরিবিলি পাড়া, সদর রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, এত লোক তো এ পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাবার আসবার কথা নয়। তা-ও লোকগুলো যে শুধু রাস্তা দিয়ে চলে যায় তা নয়, তারা প্রায়ই দাঁড়িয়ে যায়, বাড়িগুলোর দিকে তাকায়, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ করে, আমি মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়ে চলবার সময় দেখতে পেতাম আমার কেউ পিছু নিয়েছে। প্রথমে ভাবতাম এ হয়তো আমার মনের ভুল। কিন্তু পরে দাদা-বউদির কাছে আমার ধারণার কথা বলাতে তাঁরা বললেন, তাঁরাও এ জিনিসটা অনুভব করেছেন। তার পরে আমাদের দু-একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করলাম, তাঁরা বললেন, তাঁরাও এটা feel করেছেন।

'সে যাক, এসব ব্যাপার অস্বস্তিকর হলেও খানিকটা গা-সহা হয়ে এসেছিল। কিন্তু কিছুদিন হল এক নতুন আপদ এসে জুটেছে। দিন পনেরো আগে একদিন রবিবার সকালবেলায় বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি, এমনসময় সদর দরজার সামনে একটি আধাবয়েসি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চেহারাটা তাঁর নাদুসনুদুস, চাউনি ভিজে বেড়াল ধরনের, বিরাট একজোড়া গোঁফও আছে। জামাকাপড় আধময়লা। ভদ্রলোক আমায় নমস্কার করে বললেন, "এই যে, হেঁ-হেঁ! রামচরণ বটব্যাল স্ট্রিটটা কোন দিকে বলতে পারেন?"

আমি বললাম, "আর-একটু এগিয়ে যান। বাঁয়ে পড়বে।"

'ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, "হেঁ-হেঁ! অনেকখানি হেঁটে বড় থকে গেছি। বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

'আমি তখন তাঁকে ভেতরে আসতে বললাম। তিনি এসে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলেন। বসে বললেন, "হেঁ-হেঁ অধীনের নাম শ্রীযুগলকিশোর পতিতুন্ডি। নিবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল চকহাটি গ্রামে।"

'আমি আমাদের চাকরকে ডেকে জল আনালাম। ভদ্রলোক জল খেলেন। কিন্তু তক্ষুনি উঠলেন না। তার বদলে তাঁর বাড়িতে কে-কে আছে, তাঁর ছোট মেয়েটি কিরকম দুষ্টু, কবে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়েছিল, কী ওষুধ খেয়ে ভালো হয়, এইসব ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন, আর আমাদের দেশ, পরিবার, আর্থিক অবস্থা, চাকরি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। এতে আমার খুবই বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু ধৈর্য ধরে ওঁর কথা শুনে আর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে, লোকটা বকে চলেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি এদিক সেদিকে ঘুরছে, চারপাশের সব কিছু সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। আমার মনে হল এ কি চোরের দলের লোক, আমাদের বাড়ির সন্ধান নিতে এসেছে? যা হোক, আমার বিরক্তি বা সন্দেহ সেদিন মুখে প্রকাশ করিনি। লোকটা অনেকক্ষণ বকে আর বকিয়ে তারপর উঠল। ভাবলুম, আপদ গেল।

'কিন্তু এর দিন চার-পাঁচ বাদে একদিন সকালবেলায় বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় হতভাগা আবার এসে হাজির। বলল, "হেঁ-হেঁ! এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দাদার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

'সেদিন আর বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করিনি। লোকটা তবুও নাছোড়বান্দা। বসে আবার বকুনি শুরু করল। সেইসঙ্গে আগের দিনের মতো এদিক-সেদিকে চাওয়া। খানিকক্ষণ বকবার পর আমি বললাম, "কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা তখন

উপায়ান্তর না দেখে "হেঁ-হেঁ! আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।" বলে উঠল। তারপর বেরিয়ে গেল।

'এরও দিন তিনেক বাদে একদিন বিকেল তিনটের সময় কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি যুগলকিশোর আমার বারান্দায় বসে আছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চাকর রঘু। যুগলকিশোর বলল, "হেঁ-হেঁ! আজ এসে দেখি দাদা নেই। তাই ভাবলাম একটু অপেক্ষা করি। তা যাক বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।"

'আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "অপেক্ষা! কেন? আমার সঙ্গে কি আপনার কোনও দরকার আছে?"

'যুগলকিশোর এ-কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে বলল, "দরকার? না, মানে, আপনি কি টোটকা ওষুধে বিশ্বাস করেন?"

'আমি বেজায় চটে বললাম, "বাজে কথা রাখুন। আপনার কোনও দরকার নেই তো খালি-খালি এসে আমার সময় নষ্ট করেন কেন?"

'যুগলকিশোর আমার রূঢ় কথা শুনে খুব অপ্রস্তুত হল বলে মনে হল না। তবে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, "ও, তাও তো বটে। হেঁ-হেঁ! আপনার অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। খেয়াল ছিল না।" এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

'সেদিন রাত্রিতে খাওয়ার সময় দাদা-বউদির কাছে যুগলকিশোরের কথা বললাম। দাদা শুনে বললেন, "ও! সেই লোকটা। আরে সে তো আরও দু-দিন এ-বাড়িতে এসে আমায় জ্বালিয়ে গেছে। তখন তুই বাড়িতে ছিলি না।"

তার পরের দিন সকালে আমি চাকর-মালি দুজনকেই ডেকে বলে দিলাম, এরপর যুগলকিশোর এলে তারা যেন তাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয়।

'পরশুদিন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠল। বিকেলে আমি অনেকক্ষণ ধরে বেড়াই। সেদিন বেড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি আমাদের বাড়ি আর সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্রের বাড়ির মাঝখানে যে-সরু গলিটা, সেই গলি দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। তারপর আমায় দেখে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে পারলাম। যুগলকিশোর। সে গলিটাতে কী করছিল, তা জানবার কৌতূহল হল। আমি গলির মধ্যে ঢুকলাম। দেখি গলির কাঁচা মাটির ওপরে একসার টাটকা পায়ের ছাপ; সেগুলো আমাদের বাগানের পাশের পাঁচিলটার ধারে একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই জায়গাটায় পাঁচিলের খানিকটা খসে গিয়ে একটা ফোকর সৃষ্টি হয়েছে, তার পাশেই বাগান। বাগানের পরে আমাদের বাড়ি। বাড়ির একটা জানলা খোলা, কাজেই এখান থেকে ভেতরের অনেকখানি দেখা যায়। বোঝা যায়, লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে ফোকর দিয়ে আমাদের বাগানটা আর বাড়ির ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে।

'এতদিন যুগলকিশোরের উপদ্রব সহ্য করেছিলাম, কিন্তু এখন একেবারে অসহ্য লাগল। পরের দিন, অর্থাৎ, গতকাল সকালে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানালাম। থানার দারোগা গম্ভীরভাবে আমার নালিশ লিখে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। আমরা ব্যাপারটা দেখব। আবার যদি লোকটা এসে জ্বালাতন করে, তাহলে আমাদের খবর দেবেন।"

'থানা থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু পুলিশের ওপর আমার খুব বেশি ভরসা নেই। আমার মনে হয়, আমরা এ-বাড়িতে আসার পর থেকে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে—যেমন, ভূত দেখে আমাদের চাকরের পালানো, পাড়ার মধ্যে দিয়ে নিত্য নতুন গাদা-গাদা অচেনা লোকের যাতায়াত, সবশেষে, লক্ষ্মীছাড়া যুগলকিশোরের আবির্ভাব—তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে—এগুলোকে আমি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন বা তাৎপর্যহীন ঘটনা বলে মানতে পারি না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে আর সে-রহস্য ভেদ করা পুলিশের কাজ নয়। তাই উপায়ান্তর না দেখে আমি আপনার কাছে

BanglaBook.org

এসেছি। আপনাকে সব কথা খুলে বললাম। আপনি কি মনে করেন না যে, ব্যাপারগুলোর মধ্যে একটা রহস্য আছে?'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কী ভাবিল। তারপর ধীরে-ধীরে বলিল, 'রহস্য যে একটা আছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আচ্ছা, আপনাদের পাড়াটা কেমন?'

'খুবই ভালো। আমাদের প্রতিবেশীরা সবাই চমৎকার ভদ্রলোক, সকলেই শিক্ষিত, অনেকেই বেশ ধনী। কারও বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত আমরা কিছু শুনিনি। আমাদের বাড়ির দুপাশে দুজন বিখ্যাত লোক থাকেন। একজন হলেন সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র, আর একজন বিজ্ঞানী অম্বিকারঞ্জন কানুনগো। উমাশঙ্করবাবু থাকেন আমাদের ডানপাশে আর অম্বিকাবাবু বাঁ-পাশে। আপনি নিশ্চয়ই এঁদের নাম জানেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এঁদের নাম নিশ্চয়ই জানি। তবে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কারও সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।'

সজলবাবু বলিলেন, 'মানুষ হিসেবে এঁরা দুজনেই বেশ interesting।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'যেমন ধরুন উমাশঙ্করবাবু। ভদ্রলোক দাবা খেলতে অসম্ভব ভালোবাসেন। দিনরাতই কারও না কারও সঙ্গে দাবা খেলছেন। আমার দাদারও দাবা খেলার নেশা আছে। তাই উমাশঙ্করবাবু সকাল সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। তারপর দাদার অফিস যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত দুজনের খেলা চলে। ছুটির দিনে বেলা বারোটার আগে কেউ ওঠেন না। দাদার সঙ্গে খেলার পর উনি একটু দূরে ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলেন। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নিজের বাড়িতে বসে তাঁর আর-এক বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এত দাবা খেলে উনি লেখবার সময় পান কখন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'লিখতে উনি পারতপক্ষে চান না। প্রকাশকরা বাড়িতে তাগাদা দিতে এলে উনি তাদের সঙ্গে দেখা না করে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। তবুও যে ওঁর হাত দিয়ে লেখা বেরোয়, তার মূলে আছেন ওঁর স্ত্রী। তিনিই প্রকাশকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর উনি উমাশঙ্করবাবুকে তাঁর বসবার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। বলে যান যে, যতক্ষণ না উমাশঙ্করবাবু দশ পাতা লিখে শেষ করবেন, ততক্ষণ তিনি তালা খুলবেন না। তারপর উমাশঙ্করবাবুর দশ পাতা লেখা শেষ হলে উনি তালা খুলে ঘরে ঢুকে লেখার পাতা গুনে নিয়ে তারপর তাঁকে ছেড়ে দেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারী মজার ব্যাপার তো! উনি বুঝি স্ত্রীকে খুব ভয় করেন?'

'খুব। তবে মাঝে-মাঝে আবার উনি রুখে দাঁড়ান। তখন দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। ষাট বছরের বুড়ো আর পঞ্চান্ন বছরের বুড়ির সে-ঝগড়ার সবটাই আমরা পাশের বাড়িতে থেকে শুনতে পাই। আমাদের তখন বেজায় অস্বস্তি হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর বিজ্ঞানী অম্বিকাবাবু?'

'উনি আর-এক ধরনের লোক। অম্বিকাবাবুকে আমাদের পাড়ার সবাই মাস্টারমশাই বলে। উনি নিজের বিষয় কেমিস্ট্রি ছাড়া আর প্রায় কিছুই জানেন না। ওঁর বাড়িটা তিনতলা। তার মধ্যে একতলাটায় উনি থাকেন। দোতলার সবটা জুড়ে ওঁর লাইব্রেরি আর তেতলার সবটা জুড়ে ওঁর ল্যাবরেটরি। ইউনিভার্সিটির চাকরি থেকে বছর কয়েক হল অবসর নিয়েছেন, এখন বেশিরভাগ সময় ল্যাবরেটরিতে বসে গবেষণা করেন। আমাদের বাড়ির সাবেক মালিক ওঁর বন্ধু ছিলেন। নতুন মালিক পীতাম্বরবাবুও ওঁকে খুব খাতির করেন। মাস্টারমশাই ফুল খুব ভালোবাসেন। বাড়িতে তাঁর অনেকগুলো ফুলদানি আছে। সেগুলো সবসময় তাজা ফুলে ভরা থাকা চাই। আমাদের মালি রোজ

BanglaBook.org

সকাল-বিকেল ওঁকে বড় একটা সাজিতে করে ফুল দিয়ে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'ওঁর স্ত্রী অনেকদিন মারা গেছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে। ওঁর কাছেই থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মেয়েটি কী পড়ে? বিয়ে হয়নি এখনও?'

সজলবাবু বলিলেন, 'বিয়ে এখনও হয়নি। দু-বছর আগে ও বি. এ. পাস করেছে। তারপর আর পড়েনি। ওই এক আশ্চর্য মেয়ে। লেখাপড়া শিখেছে, গানও বেশ ভালো জানে। কিন্তু দিন-রাত্রি রান্না নিয়ে ব্যস্ত। একালের মেয়েদের রান্নার দিকে এতখানি ঝোঁক আমি আর কখনও দেখিনি। কেবল রান্না কেন, বাড়ির সব কাজ ও নিজেই করে—বাড়িতে কোনও ঝি-চাকর নেই।'

লক্ষ করিলাম, অম্বিকাবাবুর কন্যার উল্লেখ করিতে গিয়া সজলবাবুর কণ্ঠস্বর বেশ দ্রবীভূত হইয়া আসিল। ব্যোমকেশেরও ঠোঁটে চাপা একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল। সেটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'পীতাম্বরবাবু যে বলেছিলেন, কম্পাউন্ডের খালি অংশটাতে আপনারা নিজেদের খুশিমতো বাগান করতে পারেন—তা কি আপনারা করেছেন।'

'করেছি। আমাদের চিরদিনের বাগান করার নেশা। পরের তৈরি বাগান দেখে আমাদের মন ভরে না। আমরাও বেশ ভালোই বাগান করেছি। অবশ্য একজন মালি না থাকলে বাগান সম্পূর্ণ successful হয় না। তাই আমরা পীতাম্বরবাবুর মালিকে দিয়ে আমাদের বাগানের কিছু কাজ করিয়ে নিই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ জন্যে কি আপনারা তাকে কিছু টাকা দেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'না। এ-কাজ করার জন্যে আমরা তাকে দুবেলা খেতে দিই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থাৎ তার মাইনে দিচ্ছেন পীতাম্বরবাবু, আর খাওয়া দিচ্ছেন আপনারা। মালিটা আছে কতদিন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'ও বাড়ির পুরোনো মালিকের আমল থেকেই আছে। পীতাম্বরবাবু বাড়িটা কেনার পর ওকে কাজের লোক দেখে ওকেই রাখেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের পুরোনো চাকর তো এ-বাড়িতে আসার দু-দিন পরেই পালিয়েছে। তাহলে আপনাদের যে-চাকরটা যুগলকিশোরের সঙ্গে কথা বলছিল, সে কবে কাজে বহাল হয়েছে?'

'ও বহাল হয়েছে পুরোনো চাকরটা চলে যাওয়ার দিন দশেক পরে।'

'কে ওকে জোগাড় করে দিয়েছে?'

'পীতাম্বরবাবু।'

ব্যোমকেশ সোজা হইয়া বসিল। তারপর বলিল, 'পীতাম্বরবাবু? কীরকম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, আমরা এ-বাড়িতে আসবার পরে পীতাম্বরবাবু যে ক'দিন কলকাতায় ছিলেন মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমাদের সে চাকরটা যখন পালাল, তখন পীতাম্বরবাবু কলকাতাতেই ছিলেন। তার পালানোর দু-দিন পরে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখন আমরা তাঁকে কীভাবে বাজে ভয় পেয়ে আমাদের চাকরটা চলে গেছে এবং চাকরের অভাবে আমাদের কত কষ্ট হচ্ছে তা বললাম। তিনি শুনে বললেন, "ঠিক আছে। কলকাতায় এসে আমি আমার কাজের জন্যে একটা চাকর রেখেছি। আমি তো ক'দিন বাদেই মিরাটে চলে যাব। তাকে আর নিয়ে যাব না, ওখানে আমার অনেক চাকর আছে। ওকেই আপনারা নিতে পারেন। লোকটাকে যদিও আমি অল্পদিন ধরে দেখছি, তাহলেও সে যে সৎ আর কাজের লোক তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।" এর সাত-আট দিন বাদেই পীতাম্বরবাবু মিরাটে চলে গেলেন আর চাকরটাকে আমাদের কাছে দিয়ে গেলেন। লোকটা সত্যিই

BanglaBook.org

বেশ কাজের। স্বভাব-চরিত্রও ভালো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওর কোনও বৈশিষ্ট্য কি আপনাদের নজরে পড়েছে?'

সজলবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'বৈশিষ্ট্য যে ওর কিছু নেই তা নয়। রোজ বিকেলের দিকে ও হঠাৎ খুব অস্বাভাবিক রকম চনমনে হয়ে ওঠে। তখন ওর কাজে যেমন খুব উৎসাহ দেখা যায়, তেমনি ফুর্তিটা খুব বেড়ে ওঠে। রাত সাড়ে সাতটা-আটটার সময় ওর এ ভাবটা কেটে যায়। তারপর আবার এর ঠিক উলটোটা হয়। তখন ও আর কোনও কাজই করতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ওকে তুলে খাওয়াতে অবধি আমাদের বেগ পেতে হয়। ভাগ্যিস রাত্রে আমাদের বিশেষ কাজ থাকে না। তা না হলে ওকে নিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধে হত।'

এ-কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর বলিল, 'আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই?'

সজলবাবু বলিলেন, 'আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ও ভারী পিটপিটে স্বভাবের। সর্বক্ষণ ঘর বারান্দা বাগান ঝাঁট দেয়, এমন কি রান্নাঘরের উনুনের ছাইগুলো অবধি বারবার টেনে বার করে পরিষ্কার করে। ছাই, ময়লা, ধুলো-বালি সব কিছু জঞ্জাল একটা টিনে জড়ো করে। টিনটা ভরতি হয়ে গেলে জঞ্জালগুলো মোড়ের ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিয়ে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওর এই অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনাদের কিছু মনে হয়নি?'

সজলবাবু বলিলেন, 'তা হয়েছে। তবে ও নিজের থেকেই আমাদের বলেছে যে, বড়বাবু অর্থাৎ পীতাম্বরবাবু, ওকে দিনরাত বারবার করে বাড়ির জঞ্জাল সাফ করতে বলে গেছেন। অবশ্য পীতাম্বরবাবু যে সত্যিই এ-কথা বলেছেন তা আমাদের মালি দুখীরামও বলেছে। দুখীরাম বলেছে, পীতাম্বরবাবু তাকে ডেকে বলেছিলেন যে, বাড়িতে যে-ই থাকুক না কেন তাঁর বাড়ি সর্বক্ষণ পরিষ্কার থাকা চাই। সুতরাং দুখীরাম যেন সবসময় রঘুকে তাগাদা দিয়ে বাড়ি সাফ করায় এবং কোনও কারণে রঘু অক্ষম হয়ে পড়লে সে যেন নিজে এই কাজ করে। রঘুকে অবশ্য দুখীরামের তাগাদা দিতে হয় না। তবে সন্ধ্যার পরে যখন রঘু ঢুলতে শুরু করে, তারপর আর সে ঝাঁটপাট দেয় না। তাই রাত্রিতে দুখীরামই বারকয়েক বাড়ি ঝাঁট দেয় আর জঞ্জালগুলো ডাস্টবিনে ফেলে আসে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনাদের বাড়িতে ভৃত্য শ্রেণির লোক বলতে এই রঘু আর দুখীরাম?'

সজলবাবু বলিলেন, 'না। করুণাও আছে। সে আমাদের cook। তবে whole-time নয়, part-time। দিনে সে একটা অফিসে পিওনের কাজ করে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কতদিন এসেছে?'

সজলবাবু বলিলেন, 'সে-ও আমরা এ-বাড়িতে আসার ক'দিন পরেই এসেছে। একদিন সকালে আমি আর বউদি বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় সে এসে নমস্কার করে বলল যে, চন্দ্রমল আগরমলের একটা অফিসে সে পিওনের কাজ করে। সে বেশ ভালো রাঁধতে পারে। আমরা যদি তাকে অল্প মাইনে আর খাওয়া দিই, তাহলে সে সকাল বিকেল আমাদের রেঁধে দিতে পারে। আমাদের পুরোনো রান্নার লোক মাসআষ্টেক আগেই চলে গিয়েছিল। এতদিন বউদিই রাঁধছিলেন। তবে অফিস করে দু-বেলা রাঁধতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমরা করুণাকে রাখলাম।''

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সম্বন্ধে কোনও কিছু না জেনেই?'

সজলবাবু বলিলেন, 'বউদি বললেন, ''আমি মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারি সে কেমন লোক। এ যে খারাপ লোক নয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'' বউদি এই কথা বলায় আমি বা দাদা আর অমত করলাম না।'

এ কথা শুনিয়া আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'করুণার মধ্যে কোনও

BanglaBook.org

বৈশিষ্ট্য আপনি লক্ষ করেছেন?'

সজলবাবু বলিলেন, 'করুণার বৈশিষ্ট্য বলতে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছে যে, ইদানীং ও যখন খুশি অফিসে যায়, যখন খুশি ফেরে। অর্থাৎ, অনেক দিন সে খুব দেরি করে অফিসে যায়, আবার অনেক দিন খুব সকাল-সকাল অফিস থেকে ফিরে আসে। আর-একটা জিনিস, ও রোজ অনেকগুলো করে চিঠি লেখে। কাকে লেখে, তা জানি না।'

সজলবাবুর কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। সজলবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! আপনাকে তো সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। এখন বলুন আপনার এ সম্বন্ধে কী মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বলব। তবে তার আগে আমার একটা জিনিস জানা দরকার।'

'কী জিনিস?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জানা দরকার—আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি এদের পায়ের তলা, গোড়ালি আর আঙুলগুলো কী ধরনের।'

ব্যোমকেশের কথা শুনিয়া সজলবাবু হতচকিত হইলেন। তারপর বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই আপনার জিজ্ঞাস্য?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ! এই!'

সজলবাবু ব্যোমকেশের কথা শুনিযা একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাবপর আস্তে-আস্তে বলিলেন, 'কিন্তু তাদের পায়ের তলা কীবকম, তা তো আমি কোনওদিন লক্ষ করিনি ব্যোমকেশবাবু।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে এখন তা লক্ষ করুন। তাবপর—।'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিকাশ ছুটিতে-ছুটিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিল। প্রবেশ করিয়া সে হাঁফাইতে-হাঁফাইতে বলিল, 'স্যার! বংশীবদনের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি।'

বিকাশের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ প্রায় লাফাইয়া উঠিল। তারপর বলিল, 'অ্যাঁ! বংশীবদনেব বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে! দাঁড়াও, এক্ষুনি আমি বেবোচ্ছি।'

এই বলিয়া ব্যোমকেশ দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল এবং দুই-এক মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, 'অজিত! আমি চললাম! কখন ফিরব তার ঠিক নেই। সত্যবতীকে বলে এলাম দেরি হলে সে যেন না ভাবে। তুমি কোথাও বেরিয়ো না। আমায় কেউ কিছু বলতে এলে তা note করে রাখবে। কোনও টেলিফোন কল এলে কী বলে শুনে রাখবে। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বলবে আজ কাল দু-দিন দেখা হবে না। ভীষণ ব্যস্ত আছি।' তারপর সে সজলবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তাহলে ওই কথাই রইল।' বলিয়া সজলবাবুর উত্তবের অপেক্ষা না করিয়া বিকাশকে লইয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সজলবাবুও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং 'আচ্ছা। চললুম। নমস্কার।' বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানি শেষ)

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যোমকেশ বক্সীর বাসা হইতে বাহির হইয়া অধ্যাপক সজলকুমার সেন হ্যারিসন রোড ধরিয়া হাঁটিয়া আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে আসিয়া পড়িল। সেখান হইতে সে ৩বি নং বাসে চাপিল। চাপিয়া একেবারে নামিল বিবেকানন্দ রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে। সেখান হইতে মানিকতলা রোড ধরিয়া

সজলকুমার হাজির হইল ডাফ স্ট্রিটে।

ডাফ স্ট্রিটে পৌঁছাইয়া সজল একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, মিঃ হুকা-কাশি এখানে কোন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?'

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ির নম্বর কত?'

'নম্বরটা ঠিক জানি না।'

'নম্বর না জানলে কি কলকাতায় বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় মশাই? কে হুকা-কাশি, আমি চিনি না।'

সজল আরও দুই-তিনজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দেখা গেল কেহই হুকা-কাশিকে চেনে না। একজন আবার রসিকতা করিয়া বলিল, 'হুঁকা কাশি? তিনি আবার কে? তাঁর বুঝি হুঁকা টানলেই কাশি পায়—তাই এই নাম?'

সজল আর-একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, 'হুকা-কাশি? অদ্ভুত নাম তো! কোথাকার লোক?'

সজল বলিল, 'জাপানের।'

'জাপানের? ও হো-হো! একজন জাপানি ভদ্রলোক ডাফ স্ট্রিটে থাকেন বটে। তাঁকে ওই দিক থেকে আসতে দেখেছি, কিন্তু কোনটা তাঁর বাড়ি তা তো বলতে পারব না মশাই।'

বিখ্যাত ডিটেকটিভ হুকা-কাশিকে তাঁর পাড়ার লোকরা চেনে না! দুই একজন তাঁহাকে লক্ষ করিয়াছে তিনি জাপানি বলিয়া! ডিটেকটিভ হিসাবে এখানে তাঁহার কোনও খ্যাতি নাই! ইহাতে সজল খুবই বিস্মিত হইল।

যাহা হউক, ভদ্রলোক যে দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেইদিকে গিয়া সজল একটা লন্ড্রিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা! জাপানি ডিটেকটিভ মিঃ হুকা-কাশি এখানে কোন বাড়িতে থাকেন, বলতে পারেন?'

লন্ড্রির লোকেরা বলিল, 'একজন মিঃ হুকা-কাশির কাপড় আমরা কাচি, তবে তিনি ডিটেকটিভ কি না তা বলতে পারব না।'

'তাঁর বাড়িটা কোথায়?'

'ওই যে, তাঁর বেয়ারা অমৃত আসছে। অমৃত, এই ভদ্রলোক তোমার সায়েবকে খুঁজছেন। নিয়ে যাও এঁকে।'

অমৃত তখন বাজার করিয়া ফিরিতেছিল। সজল তাহার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া একটি ফটকওয়ালা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। অমৃত সজলকে বৈঠকখানা ঘরে বসাইয়া বলিল, 'এজ্ঞে! আপনি বসুন। আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।' সজল অমৃতের হাতে তাহার কার্ড দিল।

অল্পক্ষণ পরে হুকা-কাশি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুকা-কাশির বয়স হইয়াছে, তবে শরীরটি এখনও সম্পূর্ণ মজবুত। তিনি বলিলেন, 'অধ্যাপক সজলকুমার সেন? ঠিক চিনতে পারলাম না তো।'

সজল বলিল, 'আপনি আমায় চিনবেন না। আমিও এর আগে আপনাকে চোখে দেখিনি। তবে আপনার খ্যাতি শুনেছি, বইয়ে আপনার কথা পড়েছি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বইয়ে পড়েছেন? সে বইগুলো তো এখন আর পাওয়া যায় না। আর খ্যাতি? মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বহুকাল মারা গেছেন, তারপর থেকে আমার কথা আর তো কেউই লেখে না। এখন আমাকে সবাই ভুলেই গেছে। সে যাক, যে-কারণের জন্যে আমার কুটিরে মশায়ের পদধূলি পড়েছে, সেটা কী তা জানতে পারি?'

সজল বলিল, 'একটা রহস্য আমি কিছুতেই ভেদ করতে পারছি না। আপনাকে তার কথা বলতে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে এ সম্বন্ধে একটু পরামর্শ দেন।'

BanglaBook.org

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রহস্যভেদ? কিন্তু আমি তো গোয়েন্দাগিরি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি মশাই।'

সজল বলিল, 'আপনি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আপনি ঠাট্টা করছেন মিঃ হুকা-কাশি।'

'ঠাট্টা নয় সজলবাবু। সত্যিই আমি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই এখন আমায় আর বিশেষ কেউ চেনে না—এমনকি এ পাড়ায় যারা হালে এসেছে তারাও চেনে না।'

সজল বলিল, 'কিন্তু কেন আপনি গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিলেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'আপনাদের ঋষিরা একটি সুন্দর কথা বলে গিয়েছেন, "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" সেই চমৎকারা অন্নচিন্তাই আমাকে গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়েছে।'

সজল বলিল, 'তার মানে? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বুঝতে কী করে পারবেন সজলবাবু? আপনারা আমার সম্বন্ধে যা কিছু জানেন, সমস্তই ১৯৩৯ সালের আগের ব্যাপার। তারপর থেকে আমার জীবনে যে একের পর এক কত বিপর্যয় গেছে, তা তো আপনারা জানেন না।'

সজল বলিল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দয়া করে সংক্ষেপে একটু বলুন না।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'না শুনে ছাড়বেন না? বেশ, তাহলে বলছি। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে মনোরঞ্জনবাবু মারা গেলেন—আমার কথা বাইরে প্রচার হওয়া বন্ধ হল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধে নামল আর সঙ্গে-সঙ্গে বেচারা হুকা-কাশিকে যেতে হল ফাটকে।'

সজল সবিস্ময়ে বলিল, 'ফাটকে? কেন?'

'কারণ আমি জাপানি, ইংরেজদের শত্রু দেশের লোক। চার বছর ফাটকে আটক ছিলাম। এই চার বছর ইংরেজ সরকার আমার এই ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটা দখল করে এখানে তাদের প্রচার অফিস বসিয়ে ভূতের নৃত্য চালিয়েছিল।' হুকা-কাশির কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল।

তাহার পর হুকা-কাশি বলিলেন, '১৯৪৫ সালের আগস্টে যুদ্ধ শেষ হল, আমিও ছাড়া পেলাম। কিন্তু শান্তি আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না। মাস কয়েক বাদে দেশ থেকে বউদির চিঠি এল—দাদার মারাত্মক অসুখ—অবিলম্বে যেন আমি দেশে চলে আসি। তখন আমার যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সব তুলে নিয়ে দেশে গেলাম। সে সময় টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। দেশে গিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলাম—চিকিৎসা করিয়ে দাদাকে সারিয়ে তুলতে। কিন্তু দাদা বাঁচলেন না। এক বছর বাদে তিনি স্ত্রী আর তিনটি বাচ্চা ছেলেকে রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় আমার যথাসর্বস্ব তখন খরচ হয়ে গেছে।

'দাদা মারা যাওয়ার পর অনেকে আমায় দেশে থেকে তাঁর সংসার প্রতিপালন করতে বললেন, কিন্তু আমার আর জাপানে থাকতে ভালো লাগছিল না। কারণ প্রথম যখন দেশ ছেড়েছিলাম, তারপর বহু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দেশটা একেবারে বদলে গেছে। তার ওপর তখন সারা দেশটাতে ছড়িয়ে ছিল যুদ্ধে সদ্য পরাজয়ের গ্লানি। আমি যে এতকাল কলকাতায় থেকে মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে গেছি, তা জাপানে যাওয়ার পর ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই ডাফ স্ট্রিটের এই বাড়িটাতে ফেরবার জন্যে আমার প্রাণ আইঢাই করতে শুরু করেছিল।

'এদিকে বউদি আর দাদার ছেলে তিনটিকে দেখবার আমি ছাড়া তখন আর কেউ নেই। ছেলে তিনটির একটি ছ'বছরের, একটি চার বছরের আর একটি দু-বছরের। আমি বউদি আর বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে এখানে ফিরে এলাম। এখানে এসে তো বসলাম, কিন্তু পেট চলবে কেমন করে? আর ছেলে তিনটিকে মানুষই বা করব কেমন করে? রোজগারের চিন্তাই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়াল।'

সজল বলিল, 'কেন মিঃ হুকা-কাশি? আপনি আবার আগেকার মতো রহস্যভেদ করার কাজ

BanglaBook.org

নিতে লাগলেন না কেন? যাঁরা আপনাকে রহস্যভেদের জন্যে নিয়োগ করতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভালো পারিশ্রমিক দিতেন। আগে তো রহস্যভেদ করাই ছিল আপনার একমাত্র জীবিকা।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ধীরে, সজলবাবু, ধীরে। আমি যখন আবার এ দেশে ফিরলাম, তখন এখানে আমায় কে চেনে? যিনি আমার কথা লিখে বাইরে প্রচার করতেন, তিনি অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তা ছাড়া এর আগের ক'বছরের কতক আমার কেটেছে ফাটকে, কতক জাপানে। এতদিন লোকের সামনে থেকে সরে আছি, লোকে আমাকে মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। এখন আমাকে কে রহস্যভেদ করতে ডাকবে? ইতিমধ্যে এদেশে অনেক ভালো-ভালো নতুন গোয়েন্দা উঠেছেন। তারপর ব্যোমকেশবাবু এখানে সশরীরে বর্তমান রয়েছেন। এঁদের বাদ দিয়ে লোকে আমাকে রহস্যভেদের ভার দেবে কেন? পুলিশের সঙ্গেও আমার কোনওদিনই এমন কিছু দহরম-মহরম ছিল না যার জন্যে পুলিশ আমার সাহায্য নিতে আসবে। তা ছাড়া আমি যে সবরকমেরই রহস্যভেদ করার কাজে লাগি, তা-ও নয়। খুন-জখম সংক্রান্ত রহস্যের দিকে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

সজল বলিল, 'তাই তো। আপনি কোনও খুনের রহস্যের কিনারা করছেন, এমন কাহিনি তো আমি একটাও পড়িনি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'তবেই বুঝতে পারছেন। চুরি-জোচ্চুরি সংক্রান্ত রহস্যের উদ্ঘাটন, অপহৃত মণিরত্নের উদ্ধার প্রভৃতি কাজেই আমি আত্মনিয়োগ করতাম, তা-ও কেবলমাত্র সেইসব কেসই নিতাম, যাতে কিছু মাথা খাটানো যায়। বাইরে পরিচয় নেই, প্রচার নেই, এরকম অবস্থায় এই জাতীয় কেস ক'টাই বা পাওয়া যায়, আর কী-ই বা তাতে রোজগার হয়? তাই জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ দেখতে বাধ্য হলাম। বউবাজারের Foreign Language Teaching Institute-এ জাপানি ভাষা শেখাবার কাজ নিলাম। সে-কাজ এখনও করছি। কিন্তু এতে যে মাইনে পাওয়া যায়, তাতে আমার সব খরচ কুলোয় না। তাই রোজগারের আর-একটা উপায় দেখতে হল।'

এই বলিয়া হুকা-কাশি সজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাদের রণজিৎবাবুকে জানেন?'

সজল বলিল, 'বা রে! আপনাকে জানি আর তাঁকে জানি না? তিনি তো আপনারই ছায়া।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রণজিৎবাবুদের আগে বিরাট জমিদারি ছিল, তার সবই পাকিস্তানে পড়ে গেছে। এখানে ওঁদের বড় ব্যাবসাও ছিল, কিন্তু ওঁর বাবা অনেক টাকা লোকসান দেওয়ার ফলে তাও উঠে গেছে। অবশ্য এখনও ওঁদের বাড়ি, গাড়ি সবই আছে, কিন্তু নগদ পয়সার তেমন জোর নেই। এদিকে রণজিৎবাবু বিয়ে করেছেন, অনেকগুলি ছেলেপিলেও হয়েছে। তাই তাঁর অর্থের প্রয়োজন। রণজিৎবাবু সবরকমের খেলাধুলা আর সাঁতারে ওস্তাদ, তা আপনি জানেন বোধহয়?'

সজল বলিল, 'সে-কথা তো বইয়েই পড়েছি।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'কয়েক বছর হল আমি আর রণজিৎবাবু মিলে ভবানীপুরে ব্যায়াম আর সাঁতার শেখানোর একটা স্কুল খুলেছি। এতে রণজিৎবাবু কিছু-কিছু ব্যায়াম শেখান, তবে তিনি প্রধানত সাঁতারটাই শেখান—ছেলেদের লেকে নিয়ে গিয়ে। আর আমি শেখাই নানারকম ব্যায়াম আর আমাদের দেশের বিদ্যেটা।'

সজল বলিল, 'দেশের বিদ্যে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'অর্থাৎ, যুযুৎসু। এই স্কুলটা থেকে আমাদের কিছু আয় হয়। এর ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। এ ছাড়া বাইরে থেকে আমাদের মাঝে-মাঝে সাঁতার আর ব্যায়ামের ফিট্‌স দেখাবার আমন্ত্রণ আসে। এই ফিট্‌স দেখিয়েও কিছু পয়সা পাওয়া যায়। এখন এরকম একটা আমন্ত্রণ এসেছে। আজই আমরা বেরিয়ে পড়ব। বিহারের বিভিন্ন শহরে আমাদের ফিট্‌স দেখাতে হবে।'

সজল বলিল, 'কখন রওনা হবেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'বিকেলের ট্রেনে। সে যাক, আপনি যখন এসেছেন তখন আপনার সমস্যার কথা বলুনই একবার। দেখি যদি আপনাকে কোনও পথের হদিশ দিতে পারি।'

BanglaBook.org

সজল সমস্ত ব্যাপারটা ব্যোমকেশকে যেমনভাবে বলিয়াছিল সেইভাবেই হুকা-কাশিকে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বলিল, ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে সে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছিল সেগুলিও বাদ দিল না।

হুকা-কাশি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সজল বলিল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ব্যাপারটা একেবারে ধরা-ছোঁয়ার অতীত নয়।'

সজল বলিল, 'আমি যা বললাম, তা ছাড়া আপনি আর কোনও কথা জানতে চান? আমাদের চাকর-মালি-রাঁধুনি—এদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানতে চান?'

হুকা-কাশি চিন্তা করিতে করিতেই বলিলেন, 'ওদের সম্বন্ধে—ওদের সম্বন্ধে তো আপনি সব কথাই বলেছেন। ভালো কথা—ওদের মধ্যে একজন একটু পেটরোগা—তাই না?'

এ-কথা শুনিয়া সজল অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, 'পেটরোগা? কই, সেরকম তো কিছু জানি না!'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'ওঃ! জানেন না। আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে একজন পেটরোগা।'

সজল বলিল, 'তাই যদি হয় তো আপনি সে-কথা জানলেন কেমন করে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'মানে—আমি আপনার রহস্যটা সম্বন্ধে যতখানি বুঝেছি, তাতে আপনাদের চাকর-মালি-রাঁধুনিদের মধ্যে একজনকে পেটরোগা হতেই হবে।'

সজল এ-কথা শুনিয়া বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গেল।

ঠিক এই সময় বাহিরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনা গেল। ক্ষণকাল পরেই ভিতরে যে-ব্যক্তি আসিয়া ঢুকিল, তাহার বয়স সজলের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু চেহারাটি দেখিবার মতো। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যপুষ্ট চেহারা। সজলের বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে, এ-ই রণজিৎ।

রণজিৎ হুকা-কাশিকে বলিল, 'এ কী, মিঃ হুকা-কাশি, আপনি এখনও নির্বিকারভাবে বসে আছেন! এদিকে আমাদের যে বিকেল চারটের সময় বেরোতে হবে!'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'আমি তো একেবারে তৈরি। বউদি আর অমৃত জিনিসপত্রগুলোকে বাঁধাছাঁদা করছে।'

হুকা-কাশি সজলের সঙ্গে রণজিতের আলাপ করাইয়া দিলেন। সজল রণজিতের কাছেও তাহার সমস্যার কথা সংক্ষেপে বলিল। শুনিয়া রণজিৎ বলিল, 'আজ তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা ফেরার পরে আর-একদিন আসবেন। তখন এ-বিষয়টা নিয়ে ভালো করে আলোচনা করা যাবে।'

সজল বলিল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি মিঃ হুকা-কাশি। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনার বাড়ি ফিরতে প্রায় বারোটা বাজবে। সকাল সাড়ে ছ'টার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। তারপর এতক্ষণ বাইরে-বাইরে।'

সজল সবিস্ময়ে বলিল, 'সকাল সাড়ে ছ'টার আগে যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, সে-কথা আপনি কী করে জানলেন?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'সে-কথা তো আপনার গায়েই লেখা আছে।'

সজল বলিল, 'গায়ে লেখা আছে! তার মানে?'

হুকা-কাশি বলিলেন, 'তার মানে এই। আপনি ওই অঞ্চলে থাকেন। ওখানে আমার এক বন্ধুও থাকেন। ন'টার সময় তিনি আমায় ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন যে, সাড়ে ছ'টা থেকে ওই অঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল, আধ ঘণ্টাটাক আগে বন্ধ হয়েছে। আপনি যখন এখানে এলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা বাজে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কেউ খুব সাংঘাতিক দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয় না, বেরোলেও সঙ্গে ছাতা নেয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ছাতা নেই। অবশ্য ছাতাটা আপনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরে কোথাও ফেলে আসতে পারেন। কিন্তু আপনার জামাকাপড় যেরকম শুকনো

BanglaBook.org

আর পরিষ্কার রয়েছে, বেশি বৃষ্টির সময় ছাতা নিয়ে বেরোলে সেরকম থাকে না। অতএব আপনি বৃষ্টির সময়ে কখনওই বাড়ি থেকে বেরোননি—হয় তার আগে বেরিয়েছেন, না হয় পরে। বৃষ্টির পরে সাড়ে আটটা থেকে সওয়া ন'টার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি অবশ্য দশটার আগেই এখানে পৌঁছোতে পারেন। কিন্তু ওই সময়ে ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট নিশ্চয়ই জল-কাদায় প্যাচপ্যাচ করছিল, কারণ তার আগেই দু-ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আপনি হাওয়াইয়ান চটি পরে এসেছেন। বাড়ি থেকে ট্রাম বা বাসের স্টপেজটুকু আপনাকে হাঁটতেই হবে। চটি পরে জল-কাদায় প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে জামার পেছন দিকে ছিট-ছিট কাদা লাগবে—খুব পা চেপে হাঁটলেও একটু না একটু লাগবেই। কিন্তু আপনার পাঞ্জাবির পেছনদিকে কাদার কোনও চিহ্ন নেই। এর থেকে বুঝলাম আপনি বৃষ্টির পরে নয়—বৃষ্টির আগে—অর্থাৎ, সকাল সাড়ে ছ'টার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।'

সজল হুকা-কাশির পর্যবেক্ষণ-শক্তির কথা আগেই বইয়ে পড়িয়াছিল, এখন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। হুকা-কাশি ও রণজিৎকে নমস্কার জানাইয়া সজল হুকা-কাশির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সজলকুমার সেনের জবানি

সকাল সওয়া ছ'টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তারপর ব্যোমকেশ বক্সীর সঙ্গে দেখা করেছি, হুকা-কাশির সঙ্গে দেখা করেছি। সারা সকালটা এই করে কাটল, কিন্তু যে-রহস্যের কিনারা করার জন্যে ওঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা করলাম, সে-রহস্য যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। ওঁরা এমন দুটো জিনিস জানতে চাইলেন, যা আমি কোনওদিন লক্ষ করিনি। আর লক্ষ করলেই বা রহস্যভেদের পক্ষে যে কী সুবিধা হত, তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

যাহোক, বেলা বারোটার সময় বাড়িতে ফিরে স্নান-খাওয়া করলাম। আজ ছুটি, সুতরাং কলেজ যেতে হবে না। খাওয়ার পর একটু ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে চা-টা খাওয়ার পর ভাবলাম এখন কী করা যায়? ব্যোমকেশ বক্সী আর হুকা-কাশি অবশ্য খুবই বড় গোয়েন্দা। কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের ধরন দেখে আমার মনে হল, তাঁরা এ ব্যাপারটাকে মোটেই 'সিরিয়াসলি' নিচ্ছেন না। যাহোক, তাঁরা আমাকে যে-দুটো বিষয় লক্ষ করতে বলেছেন, তা আমি লক্ষ করব। কিন্তু আপাতত আর কোনও অভিজ্ঞ গোয়েন্দার সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে পরামর্শ করলে কেমন হয়?

হঠাৎ আমার মনে হল জয়ন্তর কাছে যাই না কেন? জয়ন্তর সঙ্গে অবশ্য আমার আলাপ নেই, কিন্তু মানিকের সঙ্গে আমার শুধু আলাপ নয়, অন্তরঙ্গতা আছে। আমি আর সে দুজনে একই সময়ে চৌরঙ্গির ওয়াই. এম. সি. এ.-র মেম্বার ছিলাম। দিনের-পর-দিন আমরা একসঙ্গে টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, দাবা খেলেছি। যদিও মানিক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তবুও দিনের-পর-দিন খেলাধুলা মেলামেশার মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। মানিকদের বাড়িতেও কতবার গেছি। তার বাবা, দাদা এঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। মানিকের মাধ্যমে আমি সহজেই জয়ন্তর কাছে যেতে পারি।

বিকেল সওয়া চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোলাম। বাগবাজারে মানিকদের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। সেখানে গিয়ে কিন্তু মানিকের দেখা পেলাম না। তার দাদা বাড়িতে ছিলেন। আমায় দেখে তিনি বললেন, 'সজল যে! এতদিন পরে?'

BanglaBook.org

আমি বললাম, মানিকের খোঁজে এসেছি।

মানিকের দাদা বললেন, 'মানিকের খোঁজে এই বাড়িতে এসেছ? হায় ভগবান! মানিক তো আজকাল প্রায় সবসময় জয়ন্তর বাড়িতেই থাকে। মাঝে কিছুদিন তো চব্বিশ ঘণ্টাই ওর বাড়িতে থাকত। এখন জয়ন্ত সেরে উঠছে, তাই আজকাল ও দিনে একবার করে এ-বাড়িতে আসে। তবে রাত্তিরে সে ওখানেই থাকে।'

আমি বললাম, 'জয়ন্ত সেরে উঠছে? কেন, জয়ন্তর কী হয়েছিল?'

মানিকের দাদা বললেন, 'তা বুঝি জানো না? বিমল-কুমারের নাম শুনেছ? অ্যাডভেঞ্চারার বিমল-কুমার?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই শুনেছি।'

মানিকের দাদা বললেন, 'কী কুক্ষণেই না তাদের সঙ্গে মানিক-জয়ন্তর আলাপ হয়েছিল। বিমল-কুমারের কাজ হচ্ছে যত সব উদ্ভট, দুর্গম আর ভয়ানক জায়গায় গিয়ে যেচে বিপদ ডেকে আনা। মাসকয়েক আগে ওরা বোর্নিওর কাছে একটা অজানা দ্বীপে গিয়েছিল—সেখানে কী এক অদ্ভুত জন্তু আছে, তাদের দেখবার জন্যে। মাঝে-মাঝে ওরা মানিক, জয়ন্ত আর সুন্দরবাবুকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়, এবারেও গিয়েছিল। দ্বীপটাতে পৌঁছে অনেকখানি পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর তবেই ওরা সেইসব জন্তুগুলোর আস্তানার সন্ধান পায়। তাদের দেখে আর ফটো নিয়ে ওরা ফিরে আসছে, এমনসময় দ্বীপের জংলি বাসিন্দারা ওদের আক্রমণ করে। ওইসব জংলিগুলো ওই জন্তুগুলোকে দেবতা বলে মনে করে। বিদেশি বিধর্মী এই লোকগুলো ওদের দেবতার বাসায় হানা দিয়েছে, ওদের কাছে এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তাই তারা সদলবলে এদের ওপর চড়াও হল। জয়ন্তই দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া বলে ওরই ওপর ওদের গায়ের ঝাল ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথমেই ওরা জয়ন্তর মাথায় আর পায়ে মেরে দিল লাঠির ঘা। তারপর আমাদের বাবুরা বন্দুক ছুড়ে ওদের তাড়াল বটে, কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্তর মাথা ফেটে গেছে, পা-ও ভেঙে গেছে। অবশ্য প্রাণের কোনও ভয় ছিল না। ওরা জয়ন্তকে নিয়ে জাহাজে ফিরে এল, তারপর দেশে ফিরল। দেশে ফেরবার পর জয়ন্ত অনেকদিন শয্যাশায়ী হয়েছিল, এখন সেরে উঠেছে—তবে এখনও তার বেশি চলাফেরা করা বারণ। তুমি যদি মানিকের সঙ্গে দেখা করতে চাও তো সোজা জয়ন্তর বাড়ি চলে যাও।'

মানিকের দাদার কাছ থেকে জয়ন্তর ঠিকানা নিয়ে আমি সেদিকেই রওনা হলাম। জয়ন্তর বাড়ি পৌঁছে কলিংবেল টিপতে জয়ন্তর চাকর মধু এসে দরজা খুলে দিল। আমি বললাম, 'মানিক আছে?'

মধু বলল, 'আছেন। আপনার নাম?'

আমি তাকে আমার কার্ড দিতে সে ওপরে উঠে গেল। খানিক বাদে মানিক নেমে এসে বলল, 'আরে সজল! তুমি হঠাৎ!'

আমি বললাম, 'আর ভাই, একটা গোলমেলে ব্যাপারের কিনারা করতে না পেরে তোমার কাছে এসেছি। তোমার বন্ধু জয়ন্তবাবু বোধহয় এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। তা তাঁর সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দেবে?'

মানিক বলল, 'জয়ন্তর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও? অবশ্য পরামর্শ করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু জয়ন্তর বেশি ওঠা-হাঁটা বা চলাফেরা করা বারণ। এ অবস্থায় পরামর্শ দেওয়ার বেশি আর কোনও সাহায্য ও করতে পারবে না। যাক, তুমি চলো, জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সুন্দরবাবুও ওপরে আছেন। পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরে তিনি বেশিরভাগ সময় এখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব। চলো।'

মানিক আমাকে নিয়ে গেল দোতলায় জয়ন্তর শোওয়ার ঘরে। সেখানে ঢুকে দেখি জয়ন্ত তার সাতফুট লম্বা দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছেন

BanglaBook.org

সুন্দরবাবু, মানিক তাঁর পরিচয় না দিলেও তাঁর কুচকুচে কালো রং, আশ্চর্যরকমের খাঁদা নাক, প্রকাণ্ড চকচকে টাক আর সুবিশাল ভুঁড়ি দেখে আমি তাঁকে অনায়াসেই চিনে নিতে পারতাম।

মানিকের মুখে আমার পরিচয় শুনে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম। আপনি কলেজের প্রফেসর? এই অল্প বয়েসেই আপনি প্রফেসর হয়েছেন?'

মানিক বলল, 'কেন সুন্দরবাবু, আপনার বয়েস তো আরও অল্প। এই তো সেদিন আপনার দুধে-দাঁত ভেঙেছে।'

সুন্দরবাবু এ কথায় মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'মানিক! আবার, আবার তুমি বাঁদরামি করছ?'

জয়ন্ত বলল, 'বসুন সজলবাবু। মানিক, তুমি মধুকে একটু চা-টা আনতে বলে দাও।'

মানিক চেঁচিয়ে বলল, 'মধু! আমাদের জন্যে তিন কাপ চা আর তিন প্লেট খাবার নিয়ে এসো। আর সুন্দরবাবুর জন্যে এক পিপে চা, এক গামলা খাবার। এর কমে ওঁর ভুঁড়ি ভরবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চোপরাও মানিক, ইস্টুপিড কোথাকার।'

মধু চা-খাবার নিয়ে এল। জলযোগ পর্ব শেষ হলে আমি বললাম, 'জয়ন্তবাবু, যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি, সেটা এবার বলি। আমরা ছ'মাস হল বাড়ি বদল করেছি। নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে এমন কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে, যার থেকে মনে হয় এগুলোর ভেতরে একটা রহস্য আছে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কী তা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার কাছে সব কথা গোড়া থেকে খুলে বলছি, আপনি যদি শুনে এ সম্বন্ধে আপনার মতটা দয়া করে বলেন—।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'রহস্য? আপনিও রহস্যকে ল্যাজে বেঁধে এনেছেন? হুম! আমি এখন আর রহস্য-টহস্য মোটেই পছন্দ করি না।'

মানিক বলল, 'সুন্দরবাবু যে কেন রহস্য পছন্দ করেন না তা আমি জানি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন করি না বলো দিকি!'

মানিক বলল, 'রহস্যের পেছনে ছুটলে আপনার এই নধর সুগোল ভুঁড়িখানা চুপসে একেবারে চেপটে যাবে, তাই।'

সুন্দরবাবু চটেমটে বললেন, 'মানিক! আবার তোমার ইয়ারকি? এক চড়ে তোমায় শায়েস্তা করব।'

জয়ন্ত বলল, 'আঃ! কী কাণ্ড বাধিয়েছেন দুজনে?'

সুন্দরবাবু চুপ করলেন।

জয়ন্ত আমায় বলল, 'সজলবাবু, একটা রহস্যের সমাধানের হদিশ চেয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন। রহস্যের সমাধান করার আগ্রহ যে আমার চিরদিনের, তা বোধহয় আপনি জানেন। কিন্তু রহস্যভেদ করার জন্যে গোয়েন্দাকে শুধু মাথা খাটাতে হয় না, শরীরকেও খাটাতে হয়। অর্থাৎ, বিছানায় শুয়ে সব ব্যাপার শুনে তা নিয়ে ভাবলেই রহস্যভেদ করা যায় না। তার জন্যে গোয়েন্দাকে ঘটনার জায়গায় যেতে হয়, নিজের চোখে সব কিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হয় আর খোঁজখবর নিতে হয়। কিন্তু আমার এখন তা করার কোনও উপায় নেই। ক'মাস আমি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। এখন সেরে উঠেছি বটে, কিন্তু ডাক্তাররা এখনও আমায় বেশি ঘোরাফেরা করতে বারণ করেছেন। সারা দিনে মাত্র আধঘণ্টা ছাদে আস্তে-আস্তে পায়চারি করার অনুমতি পেয়েছি। আমি যাতে ডাক্তারদের কথার অবাধ্য না হই, সেদিকে মানিক আর সুন্দরবাবুর সর্বসময় সজাগ দৃষ্টি। এ অবস্থায় আপনাকে আমি খুব বেশি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। তবুও আপনার সব কথা শুনতে আমার কৌতূহল হচ্ছে। আপনি বলুন।'

আমি জয়ন্তকে সব কথা বললাম।

জয়ন্ত শুনে চুপ করে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু আমায় বললেন, 'হুম! এমন আজেবাজে ব্যাপার তো কতই ঘটছে। এ নিয়ে এত

BanglaBook.org

মাথা ঘামাচ্ছেন কেন, ইয়ে বাবু,—কী যেন আপনার নাম, ভুলে গেলুম।'

আমি বললাম, 'সজল—শ্রীসজলকুমার সেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সজল? আপনার এরকম নাম কেন হল মশাই? আপনার চোখে বা শরীরের আর কোথাও তো এক ফোঁটাও জল দেখছি না।'

আমি বললাম, 'নাম মানুষের বাপ-মা নিজেদের খুশিমতো রাখেন। নামের সঙ্গে মানুষের মিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না।'

মানিক বলল, 'সুন্দরবাবু, আপনার নাম তো সার্থক, তাই না?'

সুন্দরবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সার্থক! আলবাৎ সার্থক! একশোবার সার্থক! মানিক, তোমার মতো এরকম ডেঁপো আর বেয়াদব ছোকরা আমি আর কখনও দেখিনি!'

মানিক বলল, 'আহা, আপনি এত চটছেন কেন? কী সজল, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না। তা বলোনি আবার! তোমার মতলব বুঝতে আমার বাকি নেই। অসভ্য বেল্লিক কোথাকার!'

জয়ন্ত তখনও ভাবছে দেখে আমি বললাম, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কি আমায় আর কিছু জিগ্যেস করবেন?' ব্যোমকেশ বক্সী আর হুকা-কাশি আমাকে আমাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সে-কথা মনে পড়াতে আমি জয়ন্তকে বললাম, 'আমাদের চাকর-মালি-রাঁধুনি এদের সম্বন্ধে আপনি কিছু জিগ্যেস করবেন?'

জয়ন্ত বলল, 'ওদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই বলতে পারি! আমাদের চাকর রঘু—ওর বাড়ি ওড়িশার কটক জেলার গজপতিপুর গ্রামে। আমাদের মালি দুখীরাম—তার বাড়ি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার তাঁতিপাড়া গ্রামে। আর আমাদের রাঁধুনি করুণা—ওর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গেই—মেদিনীপুর জেলার বলরামচক গ্রামে।'

আমার কথা শুনে জয়ন্ত কোনও কথা না বলে বিছানার এক পাশ থেকে তার নস্যদানটা তুলে নিয়ে এক টিপ নস্য নিল। তার একটু পরেই আবার একবার নিল। আর একটু পরে আবার।

জয়ন্তের বিভিন্ন কীর্তিকাহিনি যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে জয়ন্ত কোনও কারণে খুশি হলেই ঘন-ঘন নস্য নেয়। সুতরাং জয়ন্ত আমার উত্তরের মধ্যে রহস্যভেদের একটা কিছু সূত্র পেয়েছে, আর তাতেই খুশি হয়ে ঘন-ঘন নস্য নিচ্ছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাকে যে খবর দিলাম, তার মধ্যে তো কোনও অসাধারণত্ব নেই! তবে তার থেকে রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি পাওয়া কী করে সম্ভব?

জয়ন্ত আর-এক টিপ নস্য নিয়ে সুন্দরবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'সুন্দরবাবু, আমি তো এখন সেরে উঠেছি। কাল যদি আমি মোটরে চড়ে এক ঘণ্টা সজলবাবুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি নেই?'

সুন্দরবাবু মহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হুম! আপত্তি নেই আবার! তোমার এই অবস্থা—আর তুমি এখন বালিগঞ্জে যাবে? তারপর সেখানে গিয়ে লাফালাফি দাপাদাপি করবে? তার চেয়ে বলো না কেন হিমালয়ে চড়বে? হুম! আমি তোমায় এখন এক পাও নড়তে দেব না। হুম! হুম!'

জয়ন্ত বেশ একটু মুষড়ে পড়ে আমার দিকে ফিরে বলল, 'হল না সজলবাবু। এ বড় কড়া শাসন।'

আমি বললাম, 'না। আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে এখন আপনার আমাদের ওখানে যাওয়ার কোনও কথাই উঠতে পারে না।'

ওদের সঙ্গে আর খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার পরে আমি উঠলাম। মানিক আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

(সজলকুমার সেনের জবানি শেষ)

BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃত্তিবাস ওঝার জবানি

সন্ত্রাসের ছদ্মবেশে কালো ডানা ভাসে চারিধার,
ডুবন্ত চাঁদের জমি চষে শুধু মরি বারে বার;
প্যাঁচার ক্লেদাক্ত স্বেদে পরিপাটি গাথা রচি হায়,
জ্বলদর্চি মেঘ দেখে ছত্রাকের স্বপ্ন ভেঙে যায়!

এ-কবিতা যে লেখে, সে অনায়াসেই মনের আনন্দে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে শোনে, তার অবস্থা ভাবুন দেখি একবার!

বলা বাহুল্য এরকম কবিতা মাত্র একজনেরই হাত দিয়ে বেরোতে পারে। সে হচ্ছে বিখ্যাত গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মা।

আজ সকালে পরাশর আমায় চা খেতে নেমন্তন্ন করেছিল। চা এখনও আসেনি। পরাশরের বেয়ারা ভুবন রান্নাঘরে এখনও তার জোগাড়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমি এ-বাড়িতে পা দিতে না দিতেই পরাশরের চারখানা কবিতার খাতা বাক্স থেকে বেরিয়েছে। যে ক'টা কবিতা এতক্ষণে শুনেছি তাতেই গা গুলোতে শুরু করেছে। চা-খাবার এখন গলা দিয়ে নামলে হয়।

যে-কবিতাটার চার লাইন ওপরে তুলেছি, সেটা দশ মিনিট ধরে পড়ার পর শেষ করে পরাশর বলল, 'কেমন লাগল?'

আমি যথারীতি বললাম, 'বেশ হয়েছে।'

পরাশর বলল, 'এ-কবিতার বৈশিষ্ট্য কিছু লক্ষ করলে?'

আমি বলবার আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'এর লাইনগুলো খুব বড়-বড়।'

পরাশর বলল, 'তুমি ভাবছ আমি ছোট লাইনের চটুল ছন্দের কবিতা লিখতে পারি না?'

আমি সেরকম কিছু ভাবিনি, তা বলার আগেই পরাশর 'এটা শোনো তাহলে' বলে পড়তে শুরু করেছে,

'পরশুরাম!
ঝরছে ঘাম।
আলোর নাচ,
চিংড়ি মাছ।
ঘূর্ণিপাক
লাগায় তাক!'

এ-কবিতাটা শেষ করতে তার মিনিট বারো লাগল। এবার পরাশর কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'বাঃ! এটা একেবারে খাসা হয়েছে।'

পরাশর খুশি হয়ে বলল, 'আচ্ছা, এবারে একটা গদ্য কবিতা শুনবে? শোনো—

তোমাকে আমি পেয়েছিলাম,
কালো নীলিমার মধ্যে,
কঠিন ঘুমের মধ্যে,
পাইথনের দাঁতের মধ্যে।
আজ তুমি ভেসে গেছ
হিমানীর আবর্তের টানে।

BanglaBook.org

আমি বসে দাঁতে ঘষি দাঁত,
পরাভূত কবুতর!'

এইভাবে পরাশর দশ-বারো মিনিট ধরে এক-একটা কবিতা পড়ে চলে, আমি নিবিষ্টচিত্তে শোনার ভান করে মনে-মনে 'এক দুই দিন চার' গুনে চলি। তারপর পরাশর থামলে 'বেশ হয়েছে' 'তোফা হয়েছে' 'চমৎকার লিখেছ' এই জাতীয় একটা কিছু মন্তব্য মুখ দিয়ে বের করি। কখন যে এই যন্ত্রণা শেষ হবে। হায় রে!

ভুবন চা-টা নিয়ে এলে পরাশরের কাব্যপাঠে একটু ছেদ পড়ল। চা শেষ করে পরাশর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে যাবে, এমনসময় কলিংবেলটা বেজে উঠল।

কে আবার এল দেখবার জন্যে আমি জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালাম। দেখি একজন সুদর্শন অল্পবয়সি ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণে পরাশরের 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা' কাজ করে চলেছে। ভদ্রলোক কলিং বেল টেপবামাত্র দরজার ভেতর থেকে টেপ রেকর্ডে ধরা একটি কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে, 'কাকে চান?'

কাউকে দেখা যাচ্ছে না অথচ একটা গলার আওয়াজ কী করে শোনা যাচ্ছে বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক একটু বিমূঢ়ভাবে বলেছেন, 'আজ্ঞে, মিঃ পরাশর বর্মাকে।' তাঁর সে কথা দরজার গায়ে লুকোনো রিসিভারে ধরা পড়ে আমাদের ঘরের লাউডস্পিকারে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

তখন দরজার সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'নাম বলুন আপনার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সজলকুমার সেন।'

পরাশর বেজায় বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ! কোথায় নিশ্চিন্ত মনে দুটো কবিতা পড়ে তোমায় শোনাব তা নয় কোথাকার কে এক সজলকুমার সেন জ্বালাতে এল। যাও বলে দাও আমি বাড়িতে নেই, এখন দেখা হবে না।'

আমি কি আর তা বলতে পারি? ভদ্রলোক এসে কথা বলতে শুরু করলে হয়তো পরাশর কবিতা পড়ায় ক্ষান্ত দেবে। তাই ওঁকে ওপরে নিয়ে আসব ঠিক করে নীচে নামলাম।

ততক্ষণে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা'-র মহিমায় সদর দরজা আপনা থেকেই খুলে গেছে আর ভদ্রলোক কাউকে দেখতে না পেয়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি তাঁর পরিচয় আর প্রয়োজন জেনে নিয়ে ওপরে নিয়ে এলাম। পরাশরকে বললাম, 'পরাশর! ইনি নিত্যানন্দ কলেজের বাংলার প্রফেসর। কয়েকটা রহস্যজনক ব্যাপারের মানে বুঝতে না পেরে তোমার কাছে এসেছেন।'

ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে আসায় পরাশর যে আমার ওপর বেজায় চটেছে তা ওর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাঁর পরিচয় জানতে পেরে ওর সে ভাব কেটে গেল। মহা উৎসাহে সে বলে উঠল, 'আপনি বাংলার প্রফেসর! বাঃ! ভালোই হল আপনি আসায়। কবিতার সেরা সমঝদার তো আপনারাই। আপনারা তো কবিতা নিয়েই পড়ে আছেন মশাই। বসুন! বসুন!'

ভদ্রলোক বসলে পরাশর বলল, 'আমার লেখা দু-একটা কবিতা আপনাকে পড়ে শোনাই। শুনে আপনি একটু দয়া করে বলুন আপনার কেমন লাগল।' এই বলে পরাশর পড়তে লাগল,

'চন্দন! স্বপ্নিল!
পিচ্ছিল! পঙ্কিল!
শিম নিম উচ্ছে—
বনবন ঘুরছে!'

পরাশরের কবিতার কয়েক লাইন শুনেই ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া। একে এই ধরনের কবিতা, তায় আবার শেষ হতে চায় না! পনেরো মিনিট ধরে পড়ে কবিতাটা শেষ করে পরাশর বলল, 'কেমন লাগল আপনার?'

BanglaBook.org

ভদ্রলোক বললেন, 'মন্দ হয়নি।'

'মন্দ হয়নি? তার মানে খুব ভালো লাগল না? আচ্ছা, এটা শুনুন তাহলে।' এই বলে পরাশর আর-একটি 'অপূর্ব' কবিতা পড়তে শুরু করল। এটা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এই কবিতাটা খুব চমৎকার হয়েছে।'

আমি কোনওরকমে হাসি চাপলাম।

পরাশর ততক্ষণে নতুন উৎসাহে আর-একটা কবিতা পড়া শুরু করেছে।

সেটা শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেটা এইবার একটু সংক্ষেপে বলছি।'

'বলবেন। বলবেন। তার আগে আর দু-একটা কবিতা হয়ে যাক।' বলে পরাশর ওঁকে আর বলবার অবকাশ না দিয়ে আর-একটা কবিতা শুরু করে দিল।

আরও দুটো কবিতা শেষ হলে ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কথা বেশিদূর এগোতে পেল না। পরাশর আবার নতুন কবিতা পড়তে আরম্ভ করল। তার ফলে কিছুক্ষণ ধরে এই ব্যাপার চলল যে, পরাশর একটা করে কবিতা পড়ছে, সেটা শেষ করে যেই সে একটু করে দম নিচ্ছে, সেই ফাঁকে ভদ্রলোক তাঁর কাহিনির খানিকটা বলে নিচ্ছেন।

এমনিভাবে ভদ্রলোক কোনওরকমে তাঁর কাহিনিটা শেষ করলেন। পরাশরও ততক্ষণে গোটা আঠেরো কবিতা শেষ করেছে। ভদ্রলোক থামার পরেও সে আরও গোটা দুই কবিতা পড়ল।

পড়ে যখন সে থামল, ভদ্রলোক তখন ওঠার জোগাড় করছেন। পরাশরের এতক্ষণে হুঁশ হল তাঁর দিকে ভালো করে তাকাবার।

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার কবিতা শুনে বড়ই আনন্দ পেলাম মিঃ বর্মা।'

পরাশর বলল, 'সেটা আমার সৌভাগ্য।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যে ব্যাপারগুলো আপনাকে বললাম, সেগুলো বোধহয় আপনাকে ভালো করে বোঝাতে পারিনি।'

অত্যন্ত ভদ্রভাবে তিনি পরাশরকে জানিয়ে দিলেন যে, পরাশর তাঁর কথা মন দিয়ে শোনেনি, এতে তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছেন।

পরাশর বলল, 'না-না, আমি সবই বুঝেছি।'

'সবই বুঝেছেন?' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট সন্দেহের আভাস।

পরাশর বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সবই বুঝেছি। আপনারা আগে গ্রিনউড গার্ডেনসের এক বাড়িতে থাকতেন। সে-বাড়ির মালিক আপনাদের উঠে যেতে বলায় আপনারা লেক অঞ্চলের হেমন্ত ঘোষ রোডের একটা বাড়িতে উঠে আসেন। এ-বাড়ির মালিক পীতাম্বর ঘোষাল আপনাদের বাড়ি ভাড়া দেন, কিন্তু বাগানটা নিজের দখলে রেখে দেন। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কয়েক দিন বাদেই তিনি মিরাটে চলে যান। এ-বাড়িতে আসার দু-দিন পরেই আপনাদের পুরোনো চাকর ভূতের ভয় পেয়ে পালায়। আপনারা কিছুদিন যাওয়ার পর লক্ষ করেন যে, এ-অঞ্চলটাতে রোজই অনেক অচেনা লোক যাতায়াত করে। তারা শুধু আসে আর চলে যায় তা নয়, সবকিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করে। এদিকে আপনাদের বাড়িতে দিন পনেরো ধরে যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি নামে একটা অচেনা সন্দেহজনক লোক আসতে শুরু করেছে। সে বারবার আসে, এমনকি আপনারা কেউ না থাকার সময়েও আসে আর আপনাদের বাড়ির সবকিছু লক্ষ করে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ! আপনি তো বেশ...!'

পরাশর তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে চলল, 'আপনাদের বাড়ির দুপাশে থাকেন দুজন বিখ্যাত লোক। একজন সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র, দাবা খেলতে অসম্ভব ভালোবাসেন, লিখতে

মোটেই চান না, তাঁর স্ত্রী জোর করে তাঁকে দিয়ে লেখান। স্ত্রীর তিনি খুব বাধ্য, তবে সময়-সময় খেপে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেন। আর একজন বিজ্ঞানী অম্বিকারঞ্জন কানুনগো, নিজের বিষয় ছাড়া যিনি আর প্রায় কিছুই জানেন না। প্রায় সব সময়েই তিনি নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে গবেষণা করেন। ফুল খুব ভালোবাসেন। দু-বেলা আপনাদের বাড়ির বাগান থেকে তাঁর জন্যে ফুল যায়। তাঁর মেয়ে সুশিক্ষিতা, সুগায়িকা, কিন্তু সর্বক্ষণ সে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মিঃ বর্মা, সত্যিই আমি খুব খুশি হলাম। আপনি যে শুধু আমার সব কথা মন দিয়ে শুনেছেন তাই নয়, কোনও খুঁটিনাটি বিষয়ও আপনার নজরকে এড়াতে পারেনি।'

পরাশর কোনও কিছু একবার আরম্ভ করলে তাকে আর থামানো যায় না। সে তখন মহা উৎসাহে বলে চলেছে, 'আপনাদের বাড়িতে আছে একটি রাঁধুনি, একটি মালি, একটি চাকর। রাঁধুনিটি সকালে বিকেলে রাঁধে, দিনের বেলায় একটা অফিসে পিওনের কাজ করে। সে নিজে থেকেই একদিন আপনার কাছে এসে কাজ চেয়েছিল, আপনারা তাকে আগে থাকতে না চেনা সত্ত্বেও বহাল করেছেন। মালিটি বাড়ির সাবেক মালিকের আমল থেকে আছে। সে মাইনে পায় বাড়িওয়ালার কাছ থেকে, আর আপনারা আপনাদের বাগানের কাজ করার জন্যে তাকে খেতে দেন। চাকরটা বাড়িওয়ালার দেওয়া লোক, ও সারাদিন একরকম থাকে, কিন্তু বিকেল বেলায় খুব চটপটে আর ফুর্তিবাজ হয়ে যায়, সন্ধ্যার পরে সে ভাবটা কেটে যায়, তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ে; তা ছাড়া, সে খুব পিটপিটে স্বভাবের, সারাদিন ঘর বারান্দা রান্নাঘর সাফ করে বেড়াচ্ছে। সব জঞ্জাল সে একটা টিনে জড়ো করে রাখে। টিনটা ভরতি হয়ে গেলে জঞ্জালগুলো রাস্তার মোড়ের ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিয়ে আসা হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মি বর্মা, আপনি গোটা ব্যাপারটা শুনেছেন, বুঝেছেন, মনেও রেখেছেন। এখন যদি দয়া করে এই রহস্যের ওপর একটু আলোকসম্পাত করেন, তাহলে বড় ভালো হয়।'

পরাশর একটা হাই তুলে বলল, 'আমাকে আলোকসম্পাত করতে বলছেন? কিন্তু তার আগে আপনাদের যা করা উচিত ছিল, তা তো করে রাখেননি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'আমরা কী করিনি? কী করবার ছিল আমাদের, তা তো বুঝতে পারছি না।'

পরাশর তার কবিতার খাতার একটা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, 'আর কিছু না করুন, জঞ্জালগুলোকে ওজন করলেও তো পারতেন?'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, 'জঞ্জালগুলো ওজন করব? আপনি কি ওই টিনের জঞ্জালগুলোর কথা বলছেন?'

পরাশর বলল,

'জঞ্জাল ভরা টিন,
কানায়-কানায় যখন ভরিবে—
ওজন করিয়া নিন।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে বললেন, 'কিন্তু কেন?'

কিন্তু পরাশর তখন ভাবে এমন বিভোর হয়ে গেছে যে, ভদ্রলোকের কথা তার কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না।

ভদ্রলোক তখন বলবার আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই বললেন, 'আচ্ছা, দেখব এখন জঞ্জালগুলোর টিনটা ওজন করে একদিন—।'

পরাশর ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, 'এক দিন নয়, দিনের পর দিন। শুধু দিন নয়, রাতেও,—প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে সন্ধ্যায় ত্রিযামায়—

BanglaBook.org

'দিবানিশি নিরন্তর
তুমি দাও কি মন্তর
জীবনের হাটের ভিড়ে
বাঁশি বাজে অনন্ত-র।'

পরাশর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'আঃ! New idea ! কৃত্তিবাস। পেন দাও। Quick !'

আমি তাকে ফাউন্টেন পেনটা এগিয়ে দিলে সে সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খাতায় খসখস করে লিখতে লাগল।

ভদ্রলোক আমায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তাহলে এই বেলা উঠি।'

আমিও ফিসফিস করে বললাম, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। এখন ওর কবিতা লেখার মুড এসেছে। একটার পর একটা নতুন কবিতা লিখবে আর শোনাবে।'

ভদ্রলোক আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়লেন।

(কৃত্তিবাস ওঝার জবানি শেষ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্রাজিৎ সিংহরায়ের নাম কে না জানে!

কোটিপতির একমাত্র পুত্র তিনি। পিতা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন; যে বিপুল সম্পত্তি ব্যাবসায় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সত্রাজিৎই এখন তাহার একচ্ছত্র মালিক।

এহেন সত্রাজিৎ সিংহরায় সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। গিয়াছিলেন একা, ফিরিয়াছেন নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া। পত্নীটি আবার শ্বেতাঙ্গিনী।

দেশে ফিরিবার পরে সত্রাজিৎ আজ তাঁহার বাড়িতে এক বিরাট পার্টি দিতেছেন। শহরের প্রায় সমস্ত অভিজাত পরিবারই তাহাতে আমন্ত্রিত। আসিয়াছেনও তাঁহাদের অধিকাংশ। অতিথির সংখ্যা গনিয়া ওঠা যায় না।

আজ সত্রাজিতের বাড়ির ভিতরে গেলে দেখা যাইবে দামি স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক এবং চোখ-ধাঁধানো শাড়িপরা মহিলারা পার্টি আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য মহিলাদের সাজপোশাক যতটা আড়ম্বরপূর্ণ, ততটা পর্যাপ্ত নহে—তাহা আবৃত করিয়াছে যতটুকু, প্রকট করিয়া তুলিয়াছে তাহার তুলনায় অনেক বেশি।

এই জাতীয় অভিজাত পার্টিতে যে শুধু আহারেরই আয়োজন করা হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আনুষঙ্গিকেরও বন্দোবস্ত রহিয়াছে। তাই নিমন্ত্রিতদের অনেকেরই হাতে গ্লাস, এমনকি মহিলাদের হাতেও। চক্ষে অনেকেরই ফুটিয়া উঠিয়াছে রক্তিম আভা। দুই-একজনের কথাবার্তাতেও দ্রব্যগুণের প্রভাব ইতিমধ্যেই সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইহাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উমাশঙ্কর মিত্র। তিনি হাত মুখ নাড়িয়া মহা উৎসাহে বলিতেছিলেন, 'কে বললে রাশিয়ায় বেগুন হয় না? আমি নিজের চোখে দেখেছি ওখানে বাঁধাকপির মতো বড়-বড় বেগুন ফলে।'

উমাশঙ্করবাবুর বক্তৃতা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পড়ায় তিনি একেবারে চুপ মারিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ইশারায় ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'পইপই করে তোমায় বারণ করেছি, তবু তুমি ওই ছাইপাঁশগুলো আবার গিলেছ? তোমাকে পার্টিতে আসতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। দাঁড়াও, আজ একবার বাড়ি চলো,

BanglaBook.org

তারপর তোমায় মজা দেখাচ্ছি।'

সত্রাজিৎ সিংহরায় একেবারে সাহেব মানুষ। পার্টির সাহেবিয়ানা পুরাপুরি বজায় রাখা তাঁহার চাই-ই। তাই এ-পার্টিতে বলডান্সেরও আয়োজন রহিয়াছে।

যথাসময়ে সে-নাচ শুরু হইল। যাঁহারা বলেন এই জাতীয় নৃত্য আদিম রিপুর বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল নহেন। তবে আজিকার এই নাচে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের নৃত্যকলার প্রতি গভীর অনুরাগের কোনও প্রমাণও ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার অভিজাত সমাজের মুকুটমণি মিসেস স্বয়ম্প্রভা পালচৌধুরিও আজিকার এই পার্টিতে আসিয়াছেন।

তিনি কিন্তু এই নাচে অংশ গ্রহণ করেন নাই।

তাহার কারণ এই নয় যে, এই জাতীয় নৃত্যের প্রতি তাঁহার কোনও বিরাগ আছে। অতীতে তিনি অনেক বলডান্স নাচিয়াছেন। যে সময়ে তাঁহার দেহবল্লরী পুরুষদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, তখন তিনি কিছুই করিতে বাকি রাখেন নাই।

কিন্তু এখন আর ওসব করিবার উপায় নাই। কারণ বয়স হইয়াছে। শরীরে মেদও বাড়িয়াছে বিপুল পরিমাণে। তাহার ওপর শৌখিন ব্যক্তিদের দেহে যে-রোগ ঢুকিয়া থাকে সেই রোগ তাঁহার দেহেও ঢুকিয়াছে—ডায়াবিটিস।

কিন্তু মিসেস পালচৌধুরি পার্টিতে আসা ছাড়েন নাই। যে-কোনও পার্টিতে নিমন্ত্রণ হইলেই তিনি যথাসময়ে তরুণীকে লজ্জা দেওয়া সাজসজ্জা করিয়া ব্রেসিয়ারের উপর হ্রস্বতম ব্লাউজ পরিয়া সব চাইতে দামি জড়োয়া নেকলেসটা গলায় ঝুলাইয়া ড্রাইভারকে গাড়ি বাহির করিতে বলেন।

মিসেস পালচৌধুরির এই নেকলেসটা অত্যন্ত বিখ্যাত। ইহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন নাই, এমন মহিলা খুব কমই আছেন।

সত্রাজিৎ সিংহরায়ের পার্টির বলডান্সে যোগ না দিলেও মিসেস পালচৌধুরি নাচের আসরে অনুপস্থিত ছিলেন না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি নাচ দেখিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা তাঁহার হইল না। কোথা হইতে যে একটা পাজি রোগ আসিয়া জুটিল!

ভ্যানিটি ব্যাগটা বগলে চাপিয়া এবং হাতে পানের বাটা লইয়া (অভিজাত এবং আধুনিক মহিলা হইয়াও পানের মতো সেকেলে নেশাকে তিনি ছাড়িতে পারেন নাই) মিসেস পালচৌধুরি বাথরুমের দিকে চলিলেন। ব্যাগ আর বাটা অপরের জিম্মায় রাখিয়া যাইতে তাঁহার ভরসা হয় না।

এই সময়ে বাথরুম হইতে কিছু দূরে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া একটি স্যুট-পরিহিত লোক সিগারেট ফুঁকিতেছিল। মিসেস পালচৌধুরি তাহাকে লক্ষই করিলেন না। করিলে অনুভব করিতেন যে, স্যুট তাহাকে মানায় নাই, তাহার চেহারায় আভিজাত্যের কোনও ছাপই নাই।

ভ্যানিটি ব্যাগ এবং পানের বাটা বাথরুমের বাহিরে একটা টেবিলের উপর রাখিয়া মিসেস পালচৌধুরি বাথরুমের ভিতরে ঢুকিলেন। মিনিট দুয়েক পরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর ব্যাগ ও বাটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন সেইদিকেই আবার তিনি চলিলেন।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার বিপরীত দিক হইতে সেই লোকটা আসিয়া পড়িল। মুহূর্তের মধ্যেই তাহার সঙ্গে মিসেস পালচৌধুরির এমন একটা ধাক্কা বাধিল যে, তাঁহার বগল হইতে ব্যাগ আর হাত হইতে বাটা পড়িয়া গেল।

হেঁট হইয়া মিসেস পালচৌধুরি সে দুইটি বস্তু কুড়াইয়া লইলেন। তারপর পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া নাচ দেখিতে লাগিলেন।

একটু পরে তাঁহার ঘাড়টা একটু চুলকাইয়া উঠিল। ঘাড়ে হাত দিয়া কিন্তু তাঁহার আর চুলকানো

BanglaBook.org

হইল না। তাহার পরিবর্তে...প্রথমে একটা অস্ফুট উপলব্ধি...তারপর...।

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া, আভিজাত্য ভুলিয়া, মিসেস পালচৌধুরি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আ—মার নেক—লেস!'

পুলিশ যথাসময়ে আসিয়া হাজির হইল। পুলিশ অফিসার মিসেস পালচৌধুরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পার্টিতে কোনও সময় আপনার খুব কাছাকাছি কেউ এসেছিল?'

মিসেস পালচৌধুরি অল্পক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেই লোকটা! বাথরুম থেকে ফিরছি, এমনসময়ে কী জোরেই না আমায় ধাক্কা দিল। লোকটা একেবারে অভদ্র। ধাক্কা লাগার জন্যে sorry-ও বলল না, আমার ভ্যানিটি ব্যাগ আর পানের বাটা মাটিতে পড়ে গেছল—সেগুলো কুড়িয়েও দিল না! আমাকেই ওগুলো কুড়োতে হল।'

তাঁহার কথা শুনিয়া পুলিশ অফিসার তেঁতুল খাওয়ার মতো মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 'আর বলতে হবে না। আপনি যখন ভ্যানিটি ব্যাগ আর পানের বাটা কুড়োচ্ছিলেন, সেই সময়েই সে পেছন থেকে টুক করে আপনার নেকলেসটা খুলে নিয়েছে। এ নিশ্চয়ই সাত্যকি সাঁইয়ের দলের লোকের কাজ।'

মিসেস পালচৌধুরি বলিলেন, 'সাত্যকি সাঁই! সে আবার কে?'

পুলিশ অফিসার বলিলেন, 'তিনি একটি মহাপুরুষ। ভোজবাজির মতো হাতসাফাই করে গয়না চুরি করতে তাঁর জুড়ি নেই। শাগরেদগুলোকেও তেমনিভাবেই তিনি তৈরি করেছেন। আজকাল শাগরেদরাই চুরি করে। তিনি নিজে আড়ালে থেকে দল চালান আর চোরাই মালগুলো পাচার করেন।'

মিসেস পালচৌধুরি বলিলেন, 'আপনারা তাকে ধরছেন না কেন?'

পুলিশ অফিসার বলিলেন, 'আমরা তো ধরবার চেষ্টা করছি অনেক দিন ধরেই। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, পারছি না। সে যাক, এখন আপনার নেকলেসটার একটা description দিন।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া সি. আই. ডি. বিভাগের অন্যতম অফিসার শিশিরকুমার হাজরার সহিত কথা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন, 'দ্যাখো শিশির, সাত্যকি সাঁইকে যত দিন না ধরতে পারছি, ততদিন আমার মনে শান্তি নেই। বাপ রে বাপ, কী accomplished criminal লোকটা! দু-বছর আগে তো ও সারা কলকাতা শহরে বেপরোয়াভাবে গয়না চুরি করে বেড়াত। আর তেমনি আশ্চর্য ওর চুরি করার কায়দা! শাগরেদগুলোকেও ও আচ্ছা training দিয়েছিল বটে!

'বছরের পর বছর ধরে লোকটা পুলিশকে কলা দেখিয়ে নিজের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা কিছুই করতে পারছিলাম না। শেষটা আমি তোমার ওপর ওকে শায়েস্তা করার ভার দিলাম। তুমি ওর চেলা-চামুণ্ডাগুলোর অধিকাংশকেই ধরলে। ওর আড্ডাটাও ভেঙে দিলে। যে কারখানাটায় ও সোনা গলাত, সেটাও তুমি খুঁজে বের করে তার লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করলে।

'এইসব শ্রীমান তো আজ শ্রীঘরে বাস করছে, কিন্তু এদের সর্দার? সে তো আজও ধরা পড়ল না শিশির! এদিকে আমি খবর পেয়েছি হতভাগা সাত্যকি তার যে দু-একটা শাগরেদ বাইরে আছে তাদের নিয়ে এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও রোজই কলকাতার এখানে সেখানে গয়না চুরি হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু চুরি যে সাত্যকির বা তার দলের লোকের কাজ, তা চুরির কায়দা দেখেই বোঝা যায়। সেদিন যে সত্রাজিৎ সিংহরায়ের বাড়ির পার্টি থেকে মিসেস স্বয়ম্প্রভা পালচৌধুরির নেকলেসটা চুরি হয়ে গেল, সেটা নিঃসন্দেহে ওদেরই কাজ। যদিও সাত্যকি এখন আগেকার তুলনায়

BanglaBook.org

অনেক কম চুরি করতে পারছে, কিন্তু এটুকু করার সুযোগই বা সে পাবে কেন? কেন তাকে আমরা ধরতে পারব না?'

শিশির হাজরা বলিলেন, 'সাত্যকি এখনও ধরা পড়েনি বটে, তবে আমার মনে আশা আছে শীঘ্রই আমরা ওকে ধরব। হেমন্ত ঘোষ রোডের সঙ্গে তার যোগাযোগের খবরটা যদি সত্যি হয়—।'

'সত্যি কি মিথ্যে, সে তো তুমি দেখবে শিশির। আমি তোমার ওপরেই এ ব্যাপারটার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েছি। যা করা দরকার বলে তুমি মনে করবে, তাই করবে। যেমন করে পারো তুমি হতভাগা সাত্যকিকে পাকড়াও করো। ওকে যদি আমরা ধরতে না পারি, তাহলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।'

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই খণ্ডের আগাগোড়াই সজলকুমার সেনের জবানি

ডিটেকটিভ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে আমার দেখা করার পর প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। এই দু-মাসের মধ্যে আর কোনও নতুন ঘটনা ঘটেনি, লক্ষ্মীছাড়া যুগলকিশোরও আর আসেনি। কাজেই আমার আগেকার ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আগ্রহও স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে গেছে। রহস্য হয়তো তাদের মধ্যে একটা কিছু ছিল, কিন্তু সে-রহস্য যখন চাপা পড়ে গেছে, তখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

গোয়েন্দারা যেসব বিষয় জানার ওপর রহস্যের সমাধান নির্ভর করছে বলেছিলেন, সেগুলোর গুরুত্ব যে কী, তা আজ অবধি আমার মাথায় ঢোকেনি। তবুও ব্যোমকেশবাবু আর মিঃ হুকা-কাশি যা জানতে বলেছিলেন, তা জেনেছি। যা জেনেছি, তার মধ্যে অবশ্য অসাধারণ কিছুই নেই। তবু তাঁদের তা ফোনে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বারবার ফোন করে একবারও ওঁদের পাইনি। ওঁদের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে জেনেছি যে, ব্যোমকেশবাবু বংশীবদনকে ধরার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত, বেশিরভাগ সময়ই তিনি বাড়িতে থাকেন না। আর মিঃ হুকা-কাশি এখনও কলকাতায় ফেরেননি। পরাশর বর্মা যা করতে বলেছিলেন, তা করা আমার পক্ষে আজ অবধি সম্ভব হয়নি। কারণ, আমাদের জঞ্জালের টিনটা আধমনের টিন। একসঙ্গে আধমন ওজন করার দাঁড়িপাল্লা জোগাড় করাই শক্ত। যদি বা জোগাড় করা গেল, সে-দাঁড়িপাল্লা আমায় সকলের সামনে দিয়েই বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে, জঞ্জাল ওজনও করতে হবে সকলের সামনে। তার মানেই হচ্ছে রহস্যের সঙ্গে যারা জড়িত (যদি জঞ্জালের সঙ্গে রহস্যের কোনও যোগ থাকে), তাদের সাবধান করে দেওয়া। তা ছাড়া, এইভাবে প্রকাশ্য জায়গায় বসে-বসে জঞ্জাল ওজন করলে অন্য লোকের তো কথাই নেই, আমার দাদা-বউদিও মনে করবেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাজেই জঞ্জাল ওজন করা হয়নি। তবে আমি মাঝে-মাঝে ভরতি জঞ্জালের টিনটা হাত দিয়ে তুলে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সময়ে ওজনের কোনও তারতম্য বোধ করিনি। দু-দিন যেন টিনটা একটু ভারী ঠেকেছিল, তবে জঞ্জালের ওজন আধমনের কাছাকাছি বলেই সবসময়ে আমার মনে হয়েছে।

তা ছাড়া, এই দু-মাসের মধ্যে এমন আর-একটা ব্যাপার ঘটেছে, যার ফলে আমি এখন আর রহস্য নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে পারছি না। সে ব্যাপারটা কী, তা এখন খুলে বলছি।

পরাশর বর্মার সঙ্গে দেখা করার দিন দুই পরের কথা। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরছি।

অম্বিকাবাবু তাঁর সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। অম্বিকাবাবুর বয়েস অনেক হয়েছে, রিটায়ারই করেছেন আজ বছর পাঁচেক হল। কিন্তু স্বাস্থ্যটি এখনও বেশ ভালো রয়েছে। তাঁর দীর্ঘ দেহ এখনও এতটুকু বাঁকেনি। অবশ্য চুল দাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে।

বেশ সুন্দর একটি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে তাঁর। চোখে সবসময়েই কালো চশমা পরেন। পরনে সবসময়েই থাকে ধুতি আর পাঞ্জাবি।

আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। অম্বিকাবাবু বললেন, 'কী সজল, ভালো আছ?'

আমি ওঁর ছাত্রের ছাত্র, এই জন্যে আমায় উনি 'তুমি' বলেন।

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মাস্টারমশাই।'

উনি 'স্যার' সম্বোধনটা পছন্দ করেন না। তাই ওঁর ছাত্রেরা থেকে শুরু করে সকলে ওঁকে 'মাস্টারমশাই' বলেই ডাকে।

তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম। মাস্টারমশাই সারাদিন বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকলেও একবার গল্প করতে শুরু করলে তাতে একেবারে মেতে ওঠেন। খানিকক্ষণ গল্প চলার পর পেছন থেকে শুনি একটি মেয়েলি গলার আওয়াজ, 'বা রে! বাবা! তুমি প্রফেসর সেনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? ভেতরে নিয়ে এসে গল্প করো না!'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাই তো, তাই তো! চলো সজল, ভেতরেই চলো।' তারপর ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি মেয়েকে বললেন, 'ইলা! আমার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর সালফিউরিক অ্যাসিড ফুরিয়ে গেছে।'

ইলা বলল, 'অর্ডার পাঠিয়ে দিয়েছি বাবা। তারপর ফোনেও তাগাদা দিয়েছি। ওরা বলেছে কালই পাঠাবে।'

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে আমি তাঁর বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। ইলাও সঙ্গে-সঙ্গে এল। ইলা বলল, 'আমাদের কী সৌভাগ্য, প্রফেসর সেন আজ আমাদের বাড়ি এলেন।'

সৌভাগ্যটা যে কার, তাদের না আমার, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ইলাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই সে আমার মনে দাগ কেটেছে। সে যে অসামান্য সুন্দরী তা নয়, কিন্তু তার চেহারা, কথাবার্তা, হাবভাব, সমস্ত কিছু মিলিয়ে এমন একটা কিছু আছে, যা পুরুষের মনকে টানে। সে আমার বউদির কাছে মাঝে-মাঝে আসে, সেই সময়ে আমার সঙ্গেও তার আলাপ হয়েছে। কিন্তু সে শুধু আলাপ মাত্র। আজকের মতো এমন অন্তরঙ্গতার সুরে ইলা এর আগে কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। তাই মনে যেন আজ একটা নতুন কিছুর স্বাদ পেলাম। জীবনটা যেন আজ একটা নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল।

মাস্টারমশাই বললেন, 'ও এখানে আসবে কেন? আমিও যেমন পাগল, তুইও তেমনি পাগলি। আমি সবসময় পড়ে আছি ল্যাবরেটরিতে, আর তুই সবসময় আছিস রান্না নিয়ে।'

এতক্ষণে আমার ইলার পোশাকের দিকে নজর পড়ল। এর আগেও অনেকবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলেছি, ইলা তখনও তার বাবাকে ডাকতে এসেছে, প্রতিবারই দেখেছি তার পরনে আটপৌরে কাপড়, আর তাতে রান্নাঘরের হলুদের দাগ। ইলা যে বেশিরভাগ সময়ই রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে-কথা তার বাবার কাছে, আমার বউদির কাছে, আরও অনেকের কাছে শুনেছি। তাই ইলাকে রান্নার ছোপ-লাগা কাপড় ছাড়া আর কোনও পোশাকে আমি এতকাল কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু আজ ইলা সত্যিরমতো সেজেছে। নাইলনের শাড়ি পরেছে, স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে, স্নো, পাউডার, রুজ, লিপস্টিক এবং আর সব প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহারের চিহ্নও ওর সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। আমি সত্যিই আজ ইলাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, 'যা, সজলের জন্যে একটু চা নিয়ে আয়।'

চা নিয়ে এসে ইলা আমাদের সঙ্গেই বসে গল্প করতে লাগল।

একটু বাদে মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা সজল, আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। আজ একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করব। তোমরা বসে গল্প করো।'

মাস্টারমশাই চলে গেলেন। আমি আর ইলা বসে গল্প করতে লাগলাম। ইলার কথা বলার ধরন যে শুধু মধুর তা নয়, তার মধ্যে ঝরনার মতো একটি সহজ সাবলীলতা আছে। সত্যি, আমি ভাগ্যবান। ইলা আজ আমার কাছে বসে বন্ধুর মতো গল্প করছে।

গল্পের ফাঁকে এক সময় আমি ইলাকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি দিনরাত বাড়িতে বসে থাকেন? বেরোন না কখনও?'

ইলা বলল, 'বেরোব কী করে?

' "*মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।*
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।" '

বৈষ্ণব পদাবলির লাইনও ইলার মুখস্থ। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মুখে বললাম, 'কী যে বলেন? আপনার কঠিন কপাট থাকতে যাবে কীসের দুঃখে? আর চলার পথই বা শঙ্কিল পঙ্কিল হবে কেন?'

গল্প করতে-করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইলা তখন একটু উসখুস করছে দেখে আমি বুঝলাম ওর রান্নাঘরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি উঠে পড়লাম।

বাড়িতে ঢুকলে বউদি বললেন, 'কী ঠাকুরপো, তোমাকে ঘণ্টা দেড়েক আগে দেখলাম কলেজ থেকে ফিরছ। তারপর মাস্টারমশায়ের বাড়ি ঢুকে গেলে। এতক্ষণ ওখানে বসে কী করছিলে?'

আমি বললাম, 'মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

বউদি মুচকি হেসে বললেন, 'মাস্টারমশায়ের সঙ্গে—এতক্ষণ ধরে গল্প?'

দাদা একটা বই পড়ছিলেন, হঠাৎ যেন তাঁর বইয়ের প্রতি মনোযোগ খুব বেশি হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন বিকেলে আবার মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেলাম। ঘণ্টা দুই সেখানেই কাটালাম। পুরো সময়টা যে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটাইনি, তা বলাই বাহুল্য।

তার পরের দিন আবার গেলাম। তার পরের দিনও গেলাম। তার পরের দিনও।

বিকেলটা আজকাল বেশ ভালোভাবেই কাটে। কাটতে চায় না শুধু সকালটা আর দুপুরটা।

এদিকে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। সারা দিন হাতে কোনও কাজ নেই। অন্য বছরে আমি এই সময়টাতে বই লিখি, কিন্তু এ বছরে আর তাতে মন লাগছে না।

সকালে বা দুপুরে মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাওয়া যায় না, কারণ ইলা এ সময়টা রান্নাঘরে থাকে।

দাদা-বউদি খাওয়াদাওয়া সেরে ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তারপর আমি সারাদিন বাড়িতে একা। ন'টা থেকে দশটা অবধি আমি বাগানের কাজ করি। দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকি, শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজ পড়ি, বই পড়ি। তারপর এগারোটার সময় উঠে স্নান-খাওয়াদাওয়া করি। ভাত অবশ্য ততক্ষণ গরম থাকে না। করুণা সকালেই রান্নাবান্না সেরে নিজে খেয়ে নিয়ে আমার, রঘুর আর দুখীরামের ভাত চাপা দিয়ে অফিসে চলে যায়। ছুটির দিনে সকাল-সকাল গরম ভাত খাওয়ার চেয়ে দেরি করে ঠান্ডা ভাত খাওয়াই আমি পছন্দ করি।

একদিন সকাল দশটার সময় আমি বাগানের কাজ সেরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে শুলাম। খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেছে। বই হাতের কাছে অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু বই পড়তে আর

BanglaBook.org

ভালো লাগছিল না। তাই চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

শুয়ে-শুয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। রঘু বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। ওই এক আশ্চর্য লোক। সারাদিন খালি ঝাঁট দিয়ে যাবে। এতটুকু ক্লান্তিও আসে না।

বারান্দা ঝাঁট দিয়ে রঘু ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে, রান্নাঘর ঝাঁট দিয়ে রান্নাঘরের উনুনের ছাইগুলো তুলে নিয়ে রঘু সব জঞ্জাল একত্র করে টিনটাতে ফেলে দিল। এতখানি পরিশ্রমের ফলে রঘুর লম্বা-চওড়া শরীরটা একদম ঘেমে গেছে দেখলাম।

জঞ্জাল টিনে ফেলে দিয়ে রঘু হাঁক দিল, 'অ দুখীদা, একটা পান দেবে?'

ফটকের পাশের মালির ঘর থেকে দুখীরাম চেঁচিয়ে বলল, 'কী রে রঘো? পান খাবি? আয় আয়।'

দুখীরাম বেশ দক্ষ মালি। বয়েস তার চল্লিশ পেরিয়েছে। সারা দিনই সে বাগানে বসে কাজ করে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পান সাজে। সেজে নিজে খায়, রঘুকে খাওয়ায়। দিনের বেলায় অনেকক্ষণ ঘুমোয়। তার চেহারাটাও বেশ লম্বা-চওড়া। তার ওপর লম্বা চুল আর দাড়ি রাখায় তাকে দেখায় ঠিক যাত্রা দলের নারদ মুনির মতো।

রঘুকে পান দিয়ে দুখীরাম সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেল।

আমি বসেই থাকলাম। একটু বাদে উমাশঙ্করবাবু এসে হাজির হলেন। উমাশঙ্করবাবুর চেহারাটি বেশ মোটাসোটা, তিনি খুব বেশি লম্বা নন। তাঁর মাথা জুড়ে চকচক করছে প্রকাণ্ড টাক। আস্তে-আস্তে কথা বলেন তিনি। চাউনিটা তাঁর যেন কেমন একরকম, তার মধ্যে একটা সদা-সতর্ক, সদা-সন্দিগ্ধ ভাব।

তাঁর স্ত্রী আবার অন্য এক ধরনের। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত রোগা, বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। চুল খুব বেশি, প্রায় গোড়ালি অবধি নেমে এসেছে। গলাটা তাঁর খনখনে, কথাও বলেন হাঁক-ডাক করে।

উমাশঙ্করবাবু বললেন, 'এই যে সজলবাবু। আমার চশমাটা বোধহয় এইখানেই ফেলে গেছি। আপনারা পেয়েছেন?'

উমাশঙ্কর কোনও কিছু পড়ার সময় ছাড়া চশমা পরেন না, চশমাটা ওঁর পকেটেই থাকে। আজ সকালে দাদার সঙ্গে দাবা খেলার সময় দাদা ওঁকে খবরের কাগজের একটা খবর দেখিয়ে ছিলেন, উমাশঙ্করবাবু সেটা পড়ার পর চশমা খুলে খাপের মধ্যে ভরে আমাদের খাটের ওপরেই রেখে দিয়েছিলেন। তারপর যাওয়ার সময় সেটা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। রঘু সেটা তুলে রেখে দিয়েছে।

রঘুকে ডেকে আমি উমাশঙ্করবাবুর চশমা আনিয়ে দিলাম। উমাশঙ্করবাবু তখনই উঠলেন না, এ-কথা সে-কথা বলতে লাগলেন।

নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আমি বললাম, 'আচ্ছা উমাশঙ্করবাবু, আপনি তো নানাধরনের বই লিখেছেন। কখনও ডিটেকটিভ গল্প লেখেননি কেন?'

উমাশঙ্করবাবু আমার কথায় একটু অস্বস্তিবোধ করে বললেন, 'ডিটেকটিভ গল্প? না-না, ওসব লিখলে মান থাকে না।'

আমি বললাম, 'কেন মান থাকবে না? এডগার অ্যালান পো, চেস্টারটন এঁরা কত বড় সাহিত্যিক—এঁরাও ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন। তা ছাড়া বাকি ডিটেকটিভ গল্প লিখে যাঁরা নাম করেছেন, তাঁদেরও তো কেউ অশ্রদ্ধা করে না।'

উমাশঙ্করবাবু এ-কথার আর কোনও জবাব দিলেন না। ডিটেকটিভ গল্পের কথা উঠতে আমার চারজন বিখ্যাত ডিটেকটিভের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, 'আচ্ছা উমাশঙ্করবাবু। ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত, পরাশর বর্মা এঁদের কোনও কীর্তিকাহিনি

BanglaBook.org

আপনি পড়েছেন?'

উমাশঙ্করবাবু বললেন, 'না। এঁরা কে?'

আমি বললাম, 'এঁরা সকলেই নামকরা ডিটেকটিভ। আমার সঙ্গে এঁদের সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। আপনার সঙ্গে কোনও ডিটেকটিভের আলাপ আছে?'

আমার কথা শুনে উমাশঙ্করবাবুর মুখ-চোখের ওপরে যেন একটা ছায়া নেমে এল। তিনি কোনওরকমে থেমে-থেমে বললেন, 'ডিটেক-টিভ? ন—না।'

এরপর আর আমাদের কথা জমল না। একটু বাদেই উমাশঙ্করবাবু উঠে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

উমাশঙ্করবাবু চলে গেলে আমি ভাবতে লাগলাম ব্যাপার কী? এত বড় একজন সাহিত্যিক কোনও ডিটেকটিভের সঙ্গে পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় এমন বিচলিত বোধ করলেন কেন?

একটু বাদে খুট করে একটা শব্দ হতে দেখি করুণা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও যে এতক্ষণ বাড়িতে ছিল তা টের পাইনি। এদিকে বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।

করুণা এক মজার মানুষ। বয়েস পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, একহারা লম্বাটে ধরনের চেহারা। রং বেশ কালো। লাজুক ধরনের লোক। কোনও দোষ ধরা পড়লে একরকমের অপ্রতিভ হাসি হাসে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, যখনই ফুরসত পায় তখনই কী যেন লেখে।

করুণা আজকাল প্রায়ই দেরি করে অফিসে যায়। ও আমাদের বলেছে যে, চন্দ্রমল আগরমলের একটা অফিসে ও পিওনের কাজ করে। আমরা অবশ্য ওর অফিসে গিয়ে ওর কথা যাচাই করে দেখিনি। আমরা কারও কথায় চট করে সন্দেহ করি না। কিন্তু এ কীরকম মজার অফিস যে, পিওনরা যখন খুশি তখন কাজে যেতে পারে?

একটু বাদে উমাশঙ্করবাবুর বাড়ির থেকে ওঁর স্ত্রীর খনখনে গলার চড়া আওয়াজ শোনা গেল, 'এখনও চান হয়নি? সকাল থেকে কাজ নেই, কম্ম নেই, চান নেই, খাওয়া নেই, খালি দাবাখেলা আর দাবাখেলা। যত বুড়ো হচ্ছেন ততই আদিখ্যেতা বাড়ছে। নিষ্কম্মার ঢেঁকি একেবারে।'

উমাশঙ্করবাবুর তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ শোনা গেল না।

ফটকটা খোলার শব্দ পেয়ে দেখি দুখীরাম ফিরে আসছে। দুখীরামের একটা লম্বা ঝুলওয়ালা খদ্দরের জোব্বা আছে। সেটা ও মাঝে-মাঝে পরে। আজও পরেছে।

আমি বললাম, 'কী দুখীরাম! তোমার বুঝি মাঝে-মাঝে জোব্বাটা গায়ে দেওয়ার শখ হয়?'

দুখিরাম একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ দাদাবাবু। আমাদের আর এর বেশি কী শখ হবে?'

আমি বললাম, 'জোব্বাটা তুমি কতদিন আগে তৈরি করিয়েছ দুখীরাম?'

দুখীরাম বলল, 'তৈরি করাইনি তো দাদাবাবু। আমাদের পুরোনো কত্তাবাবু দিয়েছেন। আহা হা, অমন মানুষ আর হয় না। এটা ন'মাসে-ছ'মাসে পরি কি না, তাই এখনও ছেঁড়েনি।'

'পুরোনো কত্তাবাবু' মানে এ-বাড়ির সাবেক মালিক বিরাজবাবু। তাঁর প্রশংসায় দুখীরাম সর্বদাই পঞ্চমুখ।

BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ইলার সঙ্গে আমার ব্যবধানটা কমে আসছে।

একদিন ওকে সাহস করে 'তুমি' বলে ফেললাম।

এতে সে কিছুই মনে করেনি, বরং সানন্দ অনুমোদন জানিয়েছে।

ছলনায় ইলার জুড়ি বোধহয় পৃথিবীতে খুব কমই আছে। একদিন বিকেলে এসে দেখি ইলা

তার ঘরে বসে বই পড়ছে। আমি 'ইলা' বলে ডাকতেই সে গম্ভীরভাবে বলে উঠল, 'আমি এখন ব্যস্ত আছি।'

আমি তখন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'ও, আচ্ছা। আমি তাহলে চললাম।'

এই না বলে আমি যেই যাওয়ার জন্য পেছন ফিরেছি, অমনি ইলা বই-টই ফেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

ইলার সঙ্গে আমার মেলামেশা নিয়ে পাড়ায় যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে তা বেশ টের পাই।

আমার দাদা-বউদি অবশ্য আমার সাক্ষাতে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। বউদি কেবল দু-একটা রসিকতা করেন। দাদা গম্ভীর হয়ে থাকেন।

একদিন ইলার কাছে সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব করলাম।

আমার কথা শুনে ইলা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বেশ উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সিনেমা? না-না, সে কিছুতেই হতে পারে না। আপনার সঙ্গে আমি কোনওমতেই সিনেমায় যেতে পারি না।'

ওর জবাব শুনে আমি বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আস্তে-আস্তে অন্য কথা শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ ধরে কথা চলবার পর ইলা বলে উঠল, 'তারপর? কবে যাচ্ছি?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

ইলা বলল, 'কোথায় আবার? সিনেমায়।'

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, 'বা রে। এই তো তুমি বললে সিনেমায় যাবে না।'

ইলা দিব্যি গম্ভীরভাবে বলল, 'বা রে! কখন আবার বললাম?'

তারপর ইলাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় গেছি—একদিন নয়, দু-দিন নয়, অনেক দিন।

এই হচ্ছে ইলা। বারবার ওর ছলনায় জব্দ হয়ে আমি মাঝে-মাঝে ওকে পালটা ছলনা করার চেষ্টা করি। যেমন একবার ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই পরপর চারদিন ইলাদের বাড়ি গেলাম না। তারপর যেদিন গেলাম, ইলার ঘরে ঢুকতেই ও বলে উঠল, 'ভেবেছিলেন আপনার কাছে চিঠি পাঠাব? সাধ্যসাধনা করে বলব, "এতদিন আসেননি কেন? কী হয়েছে? আমার ওপর রাগ করেছেন? আজ আপনার আসা চাই-ই চাই। নইলে আমি মাথা খুঁড়ব।" তাই না? সে গুড়ে বালি মশাই। অত সহজে আমায় কাবু করা যায় না।'

এমনিভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। কবে কীভাবে ওর কাছে আসল প্রস্তাবটা করব, সেই কথাই এখন মনের মধ্যে দিনরাত জল্পনা করতে থাকি।

রোজই ভাবি আজ প্রস্তাব করব, কিন্তু ওর কাছে গিয়ে শেষ অবধি আর সাহস করে বলে উঠতে পারি না। অন্য কথা বলে চলে আসি।

এরই মাঝখানে একদিন একটা ব্যাপার ঘটল।

সেদিন বিকেলে যথাসময়ে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ওর ঘর তালাবন্ধ।

ফিরে চলে আসছিলাম এমনসময় পেছন থেকে শুনলাম, 'সজল, শোনো।'

ইলাদের বাড়ির একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে একটা দরজা আছে। দোতলা থেকে তেতলায় ওঠবার সিঁড়িতেও আছে। মাস্টারমশাই মাঝে ক'বছর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এ-বাড়ির একতলা, দোতলা ও তেতলা তিনটি পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিলেন এবং দোতলা আর তেতলার ভাড়াটেদের সুবিধের জন্যে সিঁড়িতে দরজা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ডাক শুনে পেছন ফিরে দেখি, দোতলার সিঁড়ির দরজায় মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে।

আমি ফিরে তাকাতে মাস্টারমশাই বললেন, 'ইলা আজ ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে। তুমি একটু ওপরে এসো।'

BanglaBook.org

ইলা বন্ধুর বাড়ি গেছে? এতদিন তো ও কোথাও যায়নি। ওর কোনও বন্ধু আছে বলেও কখনও শুনিনি। আমি আমার বিস্ময় চেপে রেখে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ওপরে উঠলাম।

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাঁর ল্যাবরেটরিতে গেলাম। মাস্টারমশাই যে ফুল কত ভালোবাসেন, তা তাঁর ল্যাবরেটরিতে গেলে বোঝা যায়। ল্যাবরেটরির মধ্যেই গোটা কয়েক ফুলদানি, সেগুলো টাটকা ফুলে ভরা। নানা ধরনের ফুল। তাদের গন্ধ অবশ্য ল্যাবরেটরির অ্যাসিড আর গ্যাসের গন্ধে চাপা পড়েছে, কিন্তু তাদের বর্ণবৈচিত্র্য মনকে একটা অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে তোলে।

আমি ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'অনবরত অ্যাসিড গ্যাস নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ফুলগুলো আমাকে নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তি জোগায়। কিন্তু আজ আর ওদেরও ভালো লাগছে না। বোসো সজল।'

আমি বসলাম। মাস্টারমশায়ও বসলেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আচ্ছা সজল, তুমি তো বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, তুমি আমায় একটা কথা বলতে পারো?'

আমি বললাম, 'কী কথা মাস্টারমশাই?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সজল! রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না—

জীবন যখন শুকায়ে যায়,
করুণাধারায় এসো।

এটা কি শুধুই কথার কথা? না, সত্যিই যখন জীবন শুকিয়ে যায়, তখন তাঁকে ডাকলে তিনি করুণাধারায় নেমে আসেন?'

মাস্টারমশায়ের এ-প্রশ্ন করার মানে আমি বুঝতে পারলাম না। কার জীবন শুকিয়ে গেছে? মাস্টারমশায়ের? কিন্তু তাঁর চেয়ে কার জীবন বেশি সার্থক হয়েছে? আজ তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তাঁর খ্যাতি অপরিসীম। ভারত সরকার আসছে বছর তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেবেন বলে শুনেছি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে আজ কৃতী বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর বাইরেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর ছাত্র। এঁদের মধ্যে আছেন মন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারি, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার—আরও অনেক উচ্চপদস্থ লোক। যখনই তাঁরা এ-পাড়ায় আসেন, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করে যান। বিজয়া দশমীর রাত্রে মাস্টারমশায়ের বাড়ির সামনে সারি-সারি বিশিষ্ট লোকের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনেও মাস্টারমশায়ের কোনও অশান্তি নেই। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে—সুদর্শনা, সুশিক্ষিতা, সুগায়িকা। তার বিয়ের জন্যে মাস্টারমশাইকে একটুও ভাবতে হবে না।

তবে? তবে কেন আজ মাস্টারমশাই আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করলেন?

মাস্টারমশাই বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি নিজের থেকেই আস্তে-আস্তে বললেন, 'আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে সজল।'

এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'মাস্টারমশাই! আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি, আপনি যে-বিষয়টা নিয়ে experiment করছিলেন, সেটা successful হয়নি। এত যত্ন নিয়ে, এরকম মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারলেন না, এতে আপনার মন যে কতখানি ভেঙে গেছে, তা বুঝতে পারছি। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে একটা experiment সফল না হয় না-ই হল, আপনার অন্য আবিষ্কার তো রয়েছে। সেগুলোই তো আপনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তা ছাড়া, আপনি এখনও আরও কতদিন গবেষণা করবেন, কত কিছু আবিষ্কার করবেন—তখন দেখবেন, আপনার আজকের এ-দুঃখ নিঃশেষে মুছে গেছে।'

BanglaBook.org

মাস্টারমশাই আমার কথার জবাব না দিয়ে অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পড়ন্ত দিনের আলোয় তাঁর গাম্ভীর্যভরা মুখখানা যেন বড় করুণ, বড় ম্লান দেখাতে লাগল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এর পরের দিনের কথা বলছি।

ইলা আজ বাড়িতেই আছে। তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। আজ তার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু বেলা পাঁচটার আগে নয়।

দুপুরটা যেন কাটতে চায় না।

খাওয়াদাওয়ার পরে একটু ঘুমোলাম। একটু বই পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বইয়ে মন বসতে চায় না। অগত্যা বাইরের বারান্দাটায় এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে চুপচাপ পড়ে থেকে সময় কাটাতে লাগলাম।

এমনি করে বেলা তিনটে বাজল।

বাকি সময়টা কী করে কাটাই? এমন সময় দেখি সামনে দিয়ে দুখীরাম আসছে। অগত্যা ওকে ডেকে ওরই সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

কথায়-কথায় এ-বাড়ির সাবেক মালিক বিরাজবাবুর কথা উঠল।

বিরাজবাবুর কথা উঠলে দুখীরাম আর থামতে চায় না। তিনি কত মহৎ ছিলেন, তাঁর নজর কতখানি উঁচু ছিল, কীরকম তিনি দানধ্যান করতেন, সেসব কথা তার সবিস্তারে বলা চাই।

আমি বললাম, 'আচ্ছা দুখীরাম! বিরাজবাবুর কাছে তুমি কতদিন কাজ করেছ?'

দুখীরাম একটু বিমর্ষ হয়ে বলল, 'সে দুঃখের কথা বলেন কেন বাবু? আমি কাজে ঢোকার ছ'মাস বাদেই কত্তাবাবু বাড়ি বেচে দিলেন।'

আমি বললাম, 'কেন উনি বাড়ি বেচলেন দুখীরাম?'

দুখীরাম বলল, 'আয়ের তুলনায় খরচ বেশি ছিল ওঁর। লোক খাওয়ানোতে কম টাকা খরচ করতেন না। তার ওপর আত্মীয় কুটুম পুষ্যি এদের পেছনে অনেক টাকা ঢালতেন। যে কেউ ওঁর সাহায্য চাইলে কম-সে-কম পাঁচশো টাকা তাকে দিতেন।'

বিরাজবাবুর কথা শুনে অবাক হলাম। আধুনিক যুগেও এরকম 'কোশল নৃপতি' আছে?

রঘু তখন ঝাঁট দিচ্ছিল। ঝাঁট দিতে-দিতে সে দুখীরামের কাছে এসে বলল, 'দুখীদা, আমাদের এ কত্তাবাবু কাউকে একটা পয়সা দেন না।'

'এ কত্তাবাবু' মানে পীতাম্বরবাবু। রঘুর কথায় বিরক্ত হয়ে দুখীরাম বলল, 'তোর যেমন কথা রঘো? মুনিব, মুনিব। তাঁর কাজের বিচার করার আমরা কে?'

রঘু এই জাতীয় বেফাঁস কথা প্রায়ই বলে ফ্যালে। কিন্তু ও কি সত্যিই অতখানি বোকা? ওর মুখ-চোখ দেখে তো তা মনে হয় না।

দুখীরাম আর রঘু চলে গেল। দুখীরাম গেল স্নান করতে, আর রঘু গেল টিনের জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলতে।

করুণাও এখন বাড়িতে রয়েছে। আজ ও অফিস থেকে ফিরেছে বেলা একটার সময়। তাহলে ওর যেমন অফিসে যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই, তেমনি অফিস থেকে ফেরারও কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই?

অফিস থেকে ফিরেই করুণা তার ঘরে বসে লিখতে শুরু করেছে। এত কী সে লেখে?

BanglaBook.org

আমি একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা করুণা, তুমি সারাক্ষণ কী লেখ এত?'

করুণা একটু চুপ করে থেকে তারপর সলজ্জভাবে বলেছিল, 'চিঠি।'

এ-কথা শুনে আমার মুখ থেকে নিতান্ত অসঙ্গত একটা প্রশ্ন আকস্মিকভাবে বেরিয়ে এসেছিল, 'চিঠি? কাকে?'

এর উত্তরে করুণা শুধু একটু অপ্রতিভ হাসি হেসেছিল।

এত চিঠি লেখে করুণা কাকে? বউকে? কিন্তু বউয়ের ওপর খুব টান থাকলেও বড় জোর রোজ একখানা চিঠি লিখতে পারে। অথচ করুণা রোজ খানদশেকের কম চিঠি লেখে বলে তো মনে হয় না।

করুণার কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ 'ঠক' করে একটা শব্দ হওয়াতে অন্যমনস্কতা ভাঙল। দেখি রঘু জঞ্জালের খালি টিনটা সশব্দে নামিয়ে রাখছে।

একটু বাদে দেখি রঘু এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে দুখীরামের ঘরের ভেতর ঢুকছে। দুখীরাম এখনও স্নান করছে। অন্য সময় দুখীরাম অল্পক্ষণের জন্যে বাইরে গেলেও ঘর তালাবন্ধ করে যায়। আজ দেখি ঘর খোলাই আছে।

আবার এ-কথা সে-কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। হঠাৎ উমাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে দুটি উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজ কানে আসায় আবেশটা ভেঙে গেল। বহুক্ষণ ধরেই ওঁদের কথা কাটাকাটি চলছিল, কিন্তু এতক্ষণ গলা চড়েনি। এখন দুজনেই খোঁচা খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, তাই গলাও পৌঁছে গেছে সবচেয়ে উঁচু পরদায়।

আজ উমাশঙ্করবাবুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। তাই গলার জোর আজ তাঁরই বেশি।

স্পষ্ট শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'যাও-যাও! বেশ করব আমি দাবা খেলব। তোমায় আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

ওঁর স্ত্রী বললেন, 'তা তো এখন করবেই। কথায় বলে কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরুলেই পাজি।'

'অত রোয়াব দেখাচ্ছ কেন!'

'বেশ করছি দেখাচ্ছি। আমার দেখাবার হক আছে তাই দেখাচ্ছি।'

'হক আছে না কচুপোড়া আছে, আমড়া আছে। বই আমি লিখি, টাকা আমি রোজগার করি, এ-বাড়ি আমার—সব কিছু আমার।'

'সব কিছু তোমার—না? আজ যে খুব বই, টাকা, বাড়ির কথা বলছ, এ সমস্তর গোড়াপত্তন কীসের থেকে হয়েছে? শুনি একবার।'

'দ্যাখো, বাজে কথা বোলো না বলছি। বাজে কথা বললে তোমায় এ-বাড়ি থেকে দূর করে দেব।'

'কী, আমায় তুমি দূর করে দেবে? দাও না, কত বড় তোমার মুরোদ দেখি। আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি তা জানো? এত মান, এত সম্মান, এত মজা লুটছ, কোথায় থাকবে তখন এসব? হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমি সব কথা ফাঁস করে দেব। দেশের লোক একবার জানুক তুমি আসলে কী চিজ! আমার আর কী ক্ষতি হবে?'

এর উত্তরে উমাশঙ্কর ক্রুদ্ধস্বরে কী একটা বললেন কিন্তু আমার আর তা শোনবার প্রবৃত্তি রইল না। আমি আমার ঘরে গিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে রইলাম। ছি-ছি! কী আরম্ভ করেছেন এঁরা!

এর পরে মিনিট দশেকও কাটেনি, এমনসময়ে আমাদের বাড়ির ভেতরেই একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে বাইরে এলাম। এসে দেখি দুখীরাম বেজায় চটে রঘুকে ধমকাচ্ছে, 'আমি ঘরে নেই

BanglaBook.org

আর তুই শালা আমার ঘরের ভেতরে ঢুকলি! ইয়ারকির জায়গা পাসনি? হারামজাদা, আজ আমি তোর পিণ্ডি চটকাব।'

রঘু মিউমিউ করে কী একটা কৈফিয়ত দিতে গেল, কিন্তু দুখীরামের গলার জোরে তা চাপা পড়ে গেল।

এই চেঁচামেচিটা আমার মনে এত বিরক্তি জাগিয়ে তুলল যে, বলবার কথা নয়। দোষ অবশ্য রঘুরই, কিন্তু দুখীরামের রাগ যেন আর মিটছে না। এত রাগের কী কারণ আছে?

পাশের বাড়ির গলাবাজি তখন শেষ হয়েছে। তার বদলে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঝড় শেষ হয়ে এবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

একটু বাদে দুখীরামেরও বকুনি শান্ত হল।

আমি অপ্রসন্ন মনে আবার বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে শুলাম। একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

খানিক বাদে দেখি দুখীরাম সাজিতে ফুল ভরে নিয়ে খালি গায়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছে।

যাও বৎস। যেখানে তুমি যাচ্ছ, সেখানে আমিও যাব। তবে এখন নয়, একটু পরে।

রঘু বকুনি আর গালাগালি হজম করে চুপচাপ বাড়ির ভেতরে এসে ঝাঁটা হাতে নিল। ওর দিকে চেয়ে দেখি ওর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ও হাঁপাচ্ছে, এলোমেলোভাবে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। অন্যদিন এ সময় ওর কাজে উৎসাহটা বেড়ে যায়, আজ কিন্তু ওর কাজে যেন একটুও মন নেই।

এমনসময় হঠাৎ আমার সদর দরজার দিকে নজর পড়ল। দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছে। আমাকে দেখেই সে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে হনহন করে চলে গেল।

কিন্তু একবার মাত্র দেখা সত্ত্বেও তাকে চিনতে আমার ভুল হল না।

যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি।

আবার লক্ষ্মীছাড়া এসেছে! এতদিন তাকে না দেখে ভেবেছিলাম আর সে কোনওদিন এ-মুখো হবে না।

আমাদের থানার দারোগা বলেছিলেন তাকে আবার দেখতে পেলেই থানায় গিয়ে জানাতে। সুতরাং আমার এখনই থানায় যাওয়া উচিত।

না। এখন আমার অন্য কাজ আছে। আমার কাছে সে কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঠিক করে ফেলেছিলাম আজই প্রস্তাবটা করে ফেলব। শেষ পর্যন্ত বরাতে যা-ই থাকুক না কেন...আজই!

ইলা যে রাজি হবে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ, এতদিন ধরে ওর কথার ধরন, ওর চাউনি, ওর মান-অভিমান সমস্ত-কিছু এই সাক্ষ্যই দিয়েছে যে, ও আমায় পছন্দ করে, আমায় ও কাছে পেতে চায়।

মনে অনেক কষ্টে সাহস এনে, দ্বিধাসংকোচ কাটিয়ে, চোখকান বুজে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা করে ফেললাম।

ফল হল কিন্তু উলটো।

ইলা আমার কথা শুনে মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'এখন দেখছি আপনার সঙ্গে আমার কোনওদিন আলাপ না হলেই ভালো হত।'

BanglaBook.org

তার এ-কথায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মর্মাহত হয়ে আমি বললাম, 'কেন ইলা? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?'

ইলা বলল, 'অন্যায় বলেছেন কি না তা জানি না প্রফেসর সেন। তবে যা বলেছেন তা না বললেই ভালো হত।'

আমি বললাম, 'তুমি এই কথা বলছ ইলা? কিন্তু এতদিন আমার প্রতি তোমার মনোভাব আর আচরণ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে, এতে তোমার মত আছে।'

অসহিষ্ণু স্বরে ইলা বলল, 'ওই তো মুশকিল। আপনাদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করলে, একটু হেসে কথা বললেই আপনারা ধরে নেন—।'

আমি বললাম, 'এ কী একটু মেলামেশা, একটু হেসে কথা বলা? দিনের পর দিন তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছ, আমাকে কাছে টেনেছ, আমার মনে আশা জাগিয়ে তুলেছ, আমায়—।'

ইলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'থাক প্রফেসর সেন। এসব কথা আর ভালো লাগছে না।'

আমি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

এইভাবে চুপ করে বসেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর আমার মনে হল আর বসে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ইলা। আমার স্বপ্ন আজ ভেঙে গেল। আমি চললাম। তবে তোমায় একটা কথা বলে যাই। আমি সারা জীবন তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি কোনও দিন তোমার মত বদলায়, আমায় জানিও। দরজা খোলাই রইল।'

ইলাদের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। এখন বাড়িতে যেতে আর ভালো লাগছিল না। তাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে লেকে গিয়ে হাজির হলাম।

এই লেক! অন্যদিন আমার একে কত ভালো লাগে। আর আজ এত কুশ্রী মনে হচ্ছে। কাছাকাছি একটা পাখি ডাকছে, মনে হচ্ছে কী বিশ্রী আওয়াজ। চারধারে মানুষ আসছে যাচ্ছে, মোটর-গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। অসহ্য! অসহ্য! কী বিরক্তিকর এই জীবনটা!

এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন এই পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এর পর ক'দিন কেটে গেছে।

আমাদের কলেজ আবার খুলেছে। কাজেই সারা দিনটা কাজের মধ্যে দিয়েই কেটে যায়। বিকেলে বেড়াতে বেরোই, ইতস্ততভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে, ফিরি একেবারে রাত্রে খাওয়ার সময়।

মনের বিরাট শূন্যতা কিন্তু কিছুতেই ভরাট হতে চায় না। এ ভরাট হওয়ার নয়।

এদিকে আর-একটা ব্যাপার ঘটেছে।

খড়দায় আমাদের এক পিসি থাকতেন, তিনি মাসখানেক হল মারা গেছেন। পিসির ছেলেপিলে ছিল না। তাঁর সব সম্পত্তি আমরাই পেয়েছি। সম্পত্তি বলতে কিছু নগদ টাকা আর বাড়িটা। বাড়িটা বেশ ভালো। বাড়ির লাগাও অনেকখানি জমি, বাগান, পুকুর। আর বাড়িটা গঙ্গার একরকম ধারেই।

পিসির সঙ্গে একজন বিধবা বামুনের মেয়ে থাকতেন। তিনি এক চিঠিতে আমাদের লিখেছেন, 'তোমরা অবিলম্বে তোমাদের বাড়িতে এসে বাস করো, উইলের প্রোবেট নেওয়া—সে যথাসময়ে হবে। আমি কোথাকার কেউ নই, এ-বাড়ি আর আগলাতে পারছি না। তোমরা এখানে এলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী চলে যেতে পারি। কেউ না এলে আমি নড়তে পারছি না, কারণ এ-বাড়িতে গৃহদেবতা আছেন। বাড়িতে কেউ না থাকলে তিনি উপোসী থাকবেন।'

চিঠি পাওয়া অবধি আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। দাদা বলেন, 'খড়দায় যাওয়াই

BanglaBook.org

ভালো। সে-বাড়ি এ-বাড়ির তুলনায় অনেক বড়। তা ছাড়া মাস-মাস এতগুলো টাকা ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেটা তো বেঁচে যাবে।'

বউদি বললেন, 'সে-কথা একশোবার। তা ছাড়া আমাদের তো কোনও অসুবিধে হবে না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খড়দা থেকে অফিসে পৌঁছতে পারব।'

খড়দায় যাওয়াতে ওদের দুজনেরই মত আছে। মত ছিল না খালি এতদিন আমার—ইলার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে বলে।

এখন কিন্তু আমার চেয়ে বেশি মত আর কারও নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়ে গেল যে, একমাস বাদেই আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে দেব। পীতাম্বরবাবুকে এ-কথা জানিয়ে চিঠিও লেখা হল।

যাওয়ার কথা পাকা হয়ে গেলে বউদি রঘুকে ডেকে বললেন, 'রঘু! আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে খড়দায় আমাদের নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছি।'

বউদির কথা শুনে রঘু একটু বিমূঢ় হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'খড়দা—সে কোথায়?'

রঘুটা কি সত্যিই খড়দার নাম শোনেনি? না বোকা সাজছে?

বউদি বললেন, 'এখান থেকে বেশি দূরে নয়। রেলগাড়িতে চড়ে যেতে হয়।'

রঘু আবার ন্যাকার মতো বলল, 'কিন্তু কেন আপনারা সেখানে যাবেন? এ-বাড়ি তো ভালোই।'

বউদি হেসে বললেন, 'এ-বাড়ি যতই ভালো হোক, এটা ভাড়া বাড়ি আর খড়দার বাড়ি আমাদের নিজেদের বাড়ি। তোমাকেও আমরা সেখানে নিয়ে যাব রঘু।'

রঘু অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল।

করুণাকেও বলা হল আমরা খড়দায় যাচ্ছি। বউদি বললেন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো করুণা?'

করুণা বলল, 'খড়দায় যাব? সে কী করে হয় বউদি? খড়দায় গেলে আমার আপিসে যাওয়ার অসুবিধে হবে যে।'

করুণার কথা শুনে আমার হাসি পেল। যে-অফিসে যখন খুশি যাওয়া যায় আর যখন খুশি সেখান থেকে ফেরা যায়, সেই অফিসে যেতে অসুবিধে হবে বলে উনি খড়দা যাবেন না। আজ ক'দিন মাত্র সে সকাল-সকাল অফিসে যাচ্ছে। চিঠি লেখাও তার এখন কমেছে।

বউদি বললেন, 'অফিস তো আমাদেরও আছে করুণা।'

করুণা বলল, 'আপনাদের কথা আলাদা। আপনারা করেন বড় চাকরি। আপনাদের দু-এক দিন লেট হলেও কিছু যাবে আসবে না। আর আমি সামান্য পিওন। আমার যদি প্রায়ই লেট হতে থাকে, তাহলে চাকরি থাকবে না।'

আমার আবার হাসি পেল।

এমনি করে আরও ক'টা দিন কেটে গেল। খড়দায় যেতে আর দিন দশেক বাকি আছে। সে-দিনটা ছুটি ছিল। দুপুরবেলায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি, এমনসময় রঘু এসে আমার পা টিপতে শুরু করল।

রঘু এরকম প্রায়ই আমার পা টেপে, আপত্তি করলেও শোনে না।

পা টিপতে-টিপতে রঘু আমায় জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা দাদাবাবু, কবে আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে যাব?'

আমি বললাম, 'এই তো রঘু, আর ঠিক দশ দিন পরে।'

BanglaBook.org

রঘু এর উত্তরে কিছু না বলে পা টিপতে লাগল। আরও খানিকক্ষণ পা টিপে তারপর সে উঠে কাঁটা হাতে নিল।

আমরা যেদিন খড়দায় যাব, তার দু-দিন আগে একটা ছুটি ছিল। সেদিন বউদি নিজের হাতে পুডিং তৈরি করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিনি কম পড়ে যাওয়ায় তিনি মুশকিলে পড়লেন। সেদিন আবার পাড়ার মুদির দোকানটা বন্ধ। তাই বউদি রঘুকে ইলাদের বাড়ি থেকে খানিকটা চিনি চেয়ে আনতে বললেন।

রঘু চিনি নিয়ে ফিরল প্রায় মিনিট পনেরো পরে। কিন্তু ফিরে যখন এল, তখন দেখলাম সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে, নিশ্বাস ঘন-ঘন পড়ছে। এ উত্তেজনার কারণ কী? তবে কি মোহিনী নারীর আকর্ষণ রঘুর মনে প্রভাব বিস্তার করেছে? কিন্তু তা কী হয়? কিন্তু হবে না-ই বা কেন? রঘু চাকর হলেও পুরুষমানুষ।

পরের দিন দুপুর থেকে রঘুর কোনও পাত্তা নেই। আমরা রাত অবধি তার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু রঘু আর ফিরল না।

আমাদের কোনও জিনিসই সে নিয়ে যায়নি। তার নিজের জামাকাপড় বিছানা কিছুই নিয়ে যায়নি। আমাদের কাছে তার একমাসের মাইনে পাওনা। এভাবে না বলে কয়ে কোথায় গেল সে?

কিন্তু আমরা তো তার জন্যে বসে থাকতে পারি না। পরের দিন সকালে আমাদের যেতেই হবে। ঠিক হল যাওয়ার সময় থানায় খবর দিয়ে রঘুর খোঁজ করতে বলে যাব।

পরের দিন সকালবেলা। প্রথমে জিনিসপত্র ট্রাকে করে রওনা করে দেওয়া হল। আমরা তিনজন ট্যাক্সিতে করে শেয়ালদা যাব, সেখান থেকে ট্রেনে খড়দা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় উমাশঙ্করবাবু আর তাঁর স্ত্রী আমাদের বিদায় দিতে এলেন। প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেকে এলেন। অনেকে নিজেদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের যাওয়া দেখতে লাগলেন। আমার খালি খেয়াল ছিল যাতে যাওয়ার সময় আমাদের বাঁ-পাশের বাড়িটার দিকে আমার দৃষ্টি না পড়ে সেই দিকে।

আমরা ট্যাক্সিতে চড়ার আগে দুখীরাম আমাদের তিনজনকে প্রণাম করে বলল, 'আপনারা চললেন? আপনাদের কাছে আমি মনের আনন্দে ছিলাম। জানি না আবার এ-বাড়িতে কারা আসবেন। তাঁরা কীরকম লোক হবেন কে জানে!'

আমরা দুখীরামকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে বললাম যদি সে রঘুর দেখা পায় তাহলে যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

করুণা ভোরেই চলে গেছে। সে কাছের একটা বাড়িতে পার্ট-টাইম ভাত রাঁধার কাজ পেয়েছে।

ট্যাক্সিতে চড়তে যাব, এমন সময় দেখি মাস্টারমশাই আসছেন। আমাদের কাছে এসে তিনি দাদাকে বললেন, 'চললেন তাহলে?' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'সজল! চললে বাবা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ মাস্টারমশাই!' বলে আমি তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম।

তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম।

BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ট্যাক্সিকে থানা হয়ে ঘুরে যেতে বলা হল। থানায় গিয়ে সব কথা বললাম। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী আমাদের ডায়েরি লিখে নিলেন। আমরা একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। শুনলাম দারোগাবাবু আধ ঘণ্টা বাদে আসবেন।

তখন আমি দাদা-বউদিকে বললাম, 'ঠিক আছে। তোমরা এখন চলে যাও। আমি এখানে

বসে অপেক্ষা করি। দারোগা এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর আমি যাব।'

দাদা-বউদি তখন চলে গেলেন। আমি দারোগাবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দারোগাবাবু ঠিক আধ ঘণ্টা বাদেই এলেন। যে-দারোগাবাবুর কাছে আমি যুগলকিশোর পতিতুণ্ডির বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলাম, তিনি এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় ইনি এসেছেন। এঁকে আমি আমার বক্তব্য বললাম।

শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'আপনাদের চাকর পালিয়েছে? কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না। আমাদের কোনও জিনিসপত্র তো নেয়ইনি, এমনকী নিজের জিনিসপত্রগুলো অবধি ফেলে রেখে গেছে। আমাদের কাছে ওর এক মাসের মাইনেও পাওনা আছে। ওর কোনও বিপদ-আপদ হয়ে থাকতে পারে। সেইজন্যেই আপনাদের ওর খোঁজ করতে বলছি।'

দারোগাবাবু বললেন, 'আপনাদের কাছে ওর কোনও ফটো আছে?'

আমি বললাম, 'না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তাহলে লোকটার চেহারার একটা description দিন।'

আমি রঘুর চেহারার বিশদ বিবরণ দিলাম। বিবরণ শুনে দারোগাবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'Oh ! My God !' তারপর একটু থেমে তিনি নিজের মনেই বললেন, 'এ সাত্যকি সাঁই না হয়ে যায় না।'

আমি বললাম, 'সাত্যকি সাঁই কে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি সাত্যকি সাঁইয়ের নাম শোনেননি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

দারোগাবাবু বললেন, 'সাত্যকি সাঁই একটা অসাধারণ লোক। লোকটার সম্বন্ধে যতদূর জানা গেছে সে ভদ্রঘরের ছেলে, বেশ শিক্ষিতও বটে। মেক-আপ নিতে আর অভিনয় করতে তার সমান ওস্তাদ খুব কমই আছে। সৎপথে থাকলে সে হয়তো খুব বড়ই হতে পারত। কিন্তু তার বদলে সে হাত পাকিয়েছে গয়না চুরিতে।'

আমি বললাম, 'গয়না চুরিতে?'

দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ! গয়না চুরির ব্যাপারে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ আর কেউ নেই। দোকানে গয়না দেখার অছিলা করে এক ফাঁকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গয়না নিয়ে উধাও হওয়া, নকল চাবি দিয়ে আয়রন সেফ খুলে তার থেকে গয়না সরানো, পার্টিতে সকলের মাঝখান থেকে বড়লোকের বউ-ঝিদের গলার হার চুপিসারে খুলে নেওয়া—এসব তার কাছে জল-ভাত।

'এই সাত্যকি সাঁইয়ের একটা বিরাট দল ছিল। সে-দলের লোকেরা নানাভাবে গয়না চুরি করত, লুঠ করত, গয়নাপরা মেয়ে বা সোনার আংটি-বোতাম-পরা ভদ্রলোক একলা নির্জন রাস্তা দিয়ে রাত্রিতে গেলে তার কাছ থেকে সব কেড়ে-কুড়ে নিত। দলের এমন অনেক লোক ছিল, যারা সাত্যকিকে কোনওদিন দেখেইনি, সাত্যকি তার সহকারীদের মারফত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। দলের সবাই মিলে এক-একটা দিন যা-কিছু গয়না পেত, রাত্রিতে সমস্ত সাত্যকির কাছে জমা হত। কলকাতায় সাত্যকির একটা বড় আড্ডা ছিল, সেখানে সে আর তার প্রধান assistant-রা থাকত। সেখানে তারা গয়নাগুলো রাতারাতি গলিয়ে নিয়ে সোনার বার তৈরি করে ফেলত। জহরতগুলো আলাদা করা হত। তারপর সাত্যকি সোনার বার আর জহরতগুলো চেনাশুনো খদ্দেরের কাছে বিক্রি করত, আর বিক্রি করে যে-টাকা পাওয়া যেত, সেগুলোর অর্ধেক নিজে নিয়ে বাকিটা তার দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিত।

'সাত্যকি সাঁইকে আজ অবধি পুলিশ ধরতে পারেনি। তার চেহারাও পুলিশের কোনও লোক দেখেনি। তার আসল নাম সাত্যকি সাঁই কি না, তাও জানা যায়নি।

BanglaBook.org

'যা হোক, সাত্যকি সাঁইয়ের দলের উপদ্রব দিন-দিন বেড়েই চলছিল। অনেক চেষ্টা করেও যখন তাদের ধরতে পারা গেল না, তখন পুলিশ কমিশনার অভিজ্ঞ সি. আই. ডি. অফিসার শিশির হাজরার ওপর সাত্যকি আর তার দলবলকে ধরার ভার দিলেন। আপনি মিঃ হাজরার নাম শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'এরকম দক্ষ আর পরিশ্রমী লোক আমাদের দেশের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে খুব কমই আছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে সাত্যকির দলের অধিকাংশ লোককেই ধরে ফেললেন। তার আড্ডাটাও খুঁজে বের করে তিনি সে-আড্ডা একবারে ভেঙে দিলেন। যে-কারখানায় সাত্যকির চোরাই গয়না গালানো হত, সেটাও তিনি আবিষ্কার করলেন আর তার লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করলেন। বিচারে এদের সবাইকারই জেল হল। কিন্তু পালের গোদা সাত্যকিকে তিনি ধরতে পারলেন না। সে এখনও গা ঢাকা দিয়ে আছে। তার দলের ক'জন লোকও এখনও ধরা পড়েনি।

'কিন্তু যদিও সাত্যকির দলের বেশিরভাগ লোক ধরা পড়েছে, তা হলেও এখনও কলকাতায় রোজই কিছু না কিছু গয়না চুরি হয়ে চলেছে। তার মধ্যে কতকগুলোর ধরন-ধারণ দেখে পুলিশ মনে করে, এগুলো সাত্যকির দলেরই কাজ। অর্থাৎ, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোথাও তিনি লুকিয়ে বসে আছেন, আর তাঁর যে-ক'জন সহকারী ধরা পড়েনি, তাদের সাহায্যে এখনও কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।'

এই পর্যন্ত বলে দারোগাবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'পুলিশের কোনও লোক সাত্যকিকে দেখতে পায়নি, তার ফটোও পুলিশ জোগাড় করতে পারেনি। তবে তাকে ভালোভাবে দেখেছে এমন লোকের কাছ থেকে আমরা তার চেহারার বিবরণ পেয়েছি। আপনাদের চাকর রঘুর চেহারার যে-বিবরণ আপনি এখন দিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছে যে, সাত্যকির চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার বেশ মিল আছে।

'এর মধ্যে আর-একটা ব্যাপার আছে। পুলিশ ক'মাস আগে কোনও এক সূত্র থেকে খবর পেয়েছিল যে, সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে। আপনারাও হেমন্ত ঘোষ রোডে ছিলেন। সেখানেই রঘু আপনাদের কাছে কাজ করত।

'এ সমস্ত বিষয় থেকে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, হতচ্ছাড়া সাত্যকি এতদিন চাকর সেজে আপনাদের বাড়িতে ছিল। এখন আপনারা চলে যাচ্ছেন, তাই সেও ওখান থেকে কেটে পড়েছে।'

আমি বললাম, 'আমি তাহলে এখন উঠি?'

দারোগাবাবু বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমার ওপর instruction দেওয়া আছে সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম খবর এলে সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ হাজরাকে জানাতে। আমি এখুনি ওঁকে ফোন করছি। ওঁর হয়তো আপনাকে কিছু জিগ্যেস করার থাকতে পারে। আপনি বসুন।'

এই বলে দারোগাবাবু টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন। তারপর ফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো, লালবাজার? মিঃ হাজরাকে একটু দিন।'

একটু বাদে ওধারে মিঃ হাজরা ফোন ধরলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে দারোগাবাবু ফোন রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মিঃ হাজরা বলছেন এখুনি যদি আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে বড় ভালো হয়। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি বলেই তিনি আপনাকে এখন যেতে অনুরোধ করছেন। আপনার এখন যেতে কোনও অসুবিধে আছে?'

আমি বললাম, 'অসুবিধে থাকলেও বিষয়টা যখন জরুরি তখন আমি নিশ্চয়ই যাব। লালবাজারে তো?'

দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লালবাজারে। তিন তলায়।'

আমি দারোগাবাবুকে নমস্কার জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লালবাজারে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা বেজেছে। মিঃ হাজরার কাছে কার্ড পাঠানোমাত্রই তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন।

মিঃ হাজরা অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন আসুন প্রফেসর সেন। আমাদের সবসময়েই চোর-ছ্যাঁচড় নিয়ে কারবার করতে হয়, আপনার মতো সম্মানিত ব্যক্তির পায়ের ধুলো এখানে খুব কমই পড়ে। সেদিক দিয়ে আমি আজ নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। বসুন।'

আমি বসার পরে মিঃ হাজরা বললেন, 'সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। সাত্যকি সাঁই সম্বন্ধে আপনি কিছু শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'আগে শুনিনি। আজ সকালে শুনেছি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তার মানে আপনাদের থানার O. C.-র কাছে শুনেছেন?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'Good. এখন তাহলে আসল কথা শুরু করতে পারি। আপনাদের থানার O. C. বলছিলেন আপনাদের নিরুদ্দিষ্ট চাকর রঘুর সঙ্গে সাত্যকির চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। আপনি আমায় বলুন, রঘু কীভাবে আপনাদের বাড়ির চাকরিতে ঢুকল। তারপর, ও যে-সময়টা আপনাদের বাড়িতে কাজ করেছে, সেই সময়ে আপনারা যদি তার চালচলনের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে থাকেন, তা-ও বলুন। তারপর বলুন, আপনাদের বাড়ি থেকে ওর পালাবার ঠিক আগে কী ঘটেছিল?'

আমি সবকিছুই খুলে বললাম।

মিঃ হাজরা আমার কথা শুনতে-শুনতে শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার বলা শেষ হলে তিনি বললেন, 'বেশ। এবারে বলুন, রঘু যে-সময়টা আপনাদের বাড়িতে কাজ করেছিল, সে-সময়টা এমন কোনও ব্যাপার আপনাদের নজরে পড়েছিল কি না, যা আপাতদৃষ্টিতে রঘুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও রহস্যজনক?'

আমি বললাম, 'এ ধরনের ব্যাপার কিছু-কিছু যে আমাদের নজরে পড়েনি, তা নয়। আপনাকে সব কথাই বলছি। এই ধরনের রহস্যজনক ব্যাপার শুরু হয়েছে রঘুর চাকরিতে ঢোকার আগে থাকতেই।'

এই বলে কীভাবে আমরা হেমন্ত ঘোষ রোডের বাড়িতে এলাম, তারপর কী-কী ব্যাপার ঘটেছিল, কোন সব লোকদের সংস্পর্শে আমরা এসেছিলাম এবং কী ধরনের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছিলাম—সবকিছুই আমি বিশদভাবে বর্ণনা করলাম।

আমার বলা আর মিঃ হাজরার নোট নেওয়া শেষ হলে মিঃ হাজরা আমায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মিঃ হাজরা কথা আদায় করে নিতে ওস্তাদ। আমার বিবৃতিতে যে-সমস্ত বিষয় অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছিল, সেগুলি তাঁর প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হল। অবশ্য একটা প্রসঙ্গ আমি সযত্নে গোপন রাখলাম। সে-কথা আমি কোনওদিন কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারব না।

আমার সব কথা শেষ হওয়ার পর মিঃ হাজরা তাঁর টাইপিস্টকে ডেকে শর্টহ্যান্ডে নেওয়া নোটগুলো টাইপ করে আনতে বললেন। তারপর আমায় বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি আমায় যা বললেন তা খুবই interesting, কিন্তু—।'

একটু থেমে মিঃ হাজরা তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে বছর আড়াই আগে আমরা সাত্যকি সাঁইয়ের দলের বেশিরভাগ লোককে গ্রেপ্তার করি। কিন্তু সাত্যকিকে ধরতে পারলাম না। সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল, হাজার চেষ্টা করেও আমরা তার কোনও হদিশ পেলাম না।

BanglaBook.org

অথচ সে যে চুপ করে নেই, তার প্রমাণ আমরা প্রায়ই পেতে লাগলাম। এমন সব গয়না চুরির খবর আসতে লাগল, যেগুলোর ধরন-ধারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এ তারই দলের লোকের কাজ। অর্থাৎ, সাত্যকি সাঁইয়ের দল ভেঙে যাওয়ায় সে আগেকার মতো ব্যাপক আকারে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না বটে, কিন্তু লোক-চক্ষুর আড়ালে থেকে ছোট স্কেলে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

'এইভাবেই বছর দেড়েক কেটে গেল। অবশেষে ছ'মাস আগে আমরা একটা কথা শুনতে পেলাম। আমাদের ইনফর্মাররা খবর সংগ্রহ করার জন্যে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে চোর-গুন্ডা-বদমায়েশদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তা নিশ্চয়ই জানেন। একদিন একজন ইনফর্মার বদমায়েশদের একটা আড্ডায় হঠাৎ একজনের কাছে শুনতে পেল যে, সাত্যকি সাঁই হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে। যার কাছে শুনল, তার সঙ্গে একসময় সাত্যকির দলের যোগ ছিল—সুতরাং খবরটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডের কত নম্বর বাড়িতে আছে, সে-খবর আমাদের ইনফর্মার লোকটার কাছ থেকে বের করতে পারল না। যা হোক, সে যেটুকু শুনেছিল, তা-ই আমার কাছে বলল। আমি তক্ষুনি একদল সাদা পোশাকের সি. আই. ডি. পুলিশকে হেমন্ত ঘোষ রোডে পাঠিয়ে দিলাম। তারা দিনের পর দিন হেমন্ত ঘোষ রোডে ঘোরাফেরা করে জানবার চেষ্টা করল সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে আছে কি না এবং থাকলে কোথায় আছে। আপনি রোজ অসংখ্য নতুন-নতুন নানাধরনের লোককে আপনাদের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছিলেন বলেছেন। এরাই আমাদের সেইসব লোক। এরা বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মেক-আপ নিয়ে আপনাদের রাস্তা দিয়ে যেত, তাই আপনি নানাধরনের অসংখ্য নতুন-নতুন লোককে দেখেছেন বলে মনে করেছেন।'

মিঃ হাজরা একটু থেমে তারপর বললেন, 'তারপর আমরা আরও কয়েকজন দক্ষ লোককে হেমন্ত ঘোষ রোডে পাঠালাম। এরা নানা অছিলা করে হেমন্ত ঘোষ রোডের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে বাড়ির লোকদের সঙ্গে মিশে জানবার চেষ্টা করতে লাগল সাত্যকি সেখানে আছে কি না। বিশেষ করে হেমন্ত ঘোষ রোডে যাঁরা নতুন এসেছেন, তাঁদের কাছেই এইসব লোকরা বেশি করে যেতে লাগল আর সন্ধান নিতে লাগল।'

আমি বললাম, 'কই। আমাদের বাড়িতে তো আপনাদের কোনও লোক যায়নি?'

মিঃ হাজরা আমার কথা শুনে একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, 'কে বললে যায়নি? যুগলকিশোর পতিতুণ্ডি তাহলে কে?'

এ-কথা শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, 'যুগলকিশোর পুলিশের লোক? আমি ভেবেছিলাম—।'

'একটা বদমায়েশ, তাই না? সেই pose-ই ও আপনাদের কাছে নিয়েছিল। অভিনয় করতেও ও একেবারে ওস্তাদ। ওর আসল নাম নিখিলেশ সান্যাল। এরকম দক্ষ লোক আমাদের লাইনে বেশি নেই। কিন্তু—' এই বলে মিঃ হাজরা উঠে একটা ফাইল বের করে বললেন, 'রিপোর্টগুলো সব এখানেই আছে। দেখা যাক নিখিলেশ আপনাদের বাড়ির সম্বন্ধে কী লিখেছে? আপনাদের বাড়ির নম্বর কত ছিল?'

আমি বললাম, '৩৯-এর বি।'

'৩৯-এর বি?' এই বলে মিঃ হাজরা ফাইলের কতকগুলো পাতা উলটে বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে, এই তো পাওয়া গেছে। আপনাদের বাড়ি সম্বন্ধে নিখিলেশ রিপোর্ট দিয়েছে—আমি এ-বাড়িতে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে-সাত্যকি সাঁই বা তার দলের কোনও লোক এ-বাড়িতে নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে?'

BanglaBook.org

মিঃ হাজরা চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, 'সেটাই তো আমি ভাবছি। অবশ্য নিখিলেশ যে ভুল করতে পারে না তা নয়। ও এখন এখানে নেই। আমরা একটা বিশেষ কাজে ওকে বোম্বাইয়ে পাঠিয়েছি। ও এখানে থাকলে একবার ওকে এ সম্বন্ধে জিগ্যেস করে দেখতাম।' তারপর মিঃ হাজরা ফাইলের অন্য পাতাগুলো ওলটাতে-ওলটাতে বললেন, 'অন্য সব বাড়িতে যারা গিয়েছিল তারাও একই রিপোর্ট দিয়েছে। এদের রিপোর্ট থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, সাত্যকি হেমন্ত ঘোষ রোডে নেই। কিন্তু এখন আপনি আসায় বোধহয় আমাদের সে সিদ্ধান্ত পালটাবার দরকার হবে।'

এমন সময়ে মিঃ হাজরার টাইপিস্ট আমার বিবৃতির যেসব নোট তিনি নিয়েছিলেন, সেগুলো টাইপ করে নিয়ে এল। তার একটা কপি আমার হাতে দিয়ে মিঃ হাজরা বললেন, 'পড়ে দেখুন আপনার বিবৃতি ঠিকমতো রেকর্ড করা হয়েছে কি না?'

আমি পড়ে বললাম, 'সব ঠিকই আছে।' এই বলে মিঃ হাজরার দিকে চেয়ে দেখলাম, বিবৃতির একটা অংশের দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে।

বললাম, 'এত মন দিয়ে কোন কথাটা পড়ছেন?'

মিঃ হাজরা ধীরে-ধীরে বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনার বিবৃতির এক জায়গায় আপনি বলেছেন, "যখন দেখলাম যুগলকিশোর বারবার এইভাবে আসছে আর জ্বালাতন করছে তখন আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমি থানায় গিয়ে এ সম্বন্ধে নালিশ করলাম। থানার দারোগা আমার নালিশ লিখে নিলেন—।" তা তো নেবেই, কারণ আপনাদের থানার দারোগার ওপর আমাদের নির্দেশ ছিল যে, কোনও সি. আই. ডি. পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কোনও নালিশ করলে সে তা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করবে, যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে ওরা সি. আই. ডি. পুলিশ। প্রফেসর সেন, এর পরে যে আপনি বলেছেন, "তারপব আমি পরপর চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালাম। কিন্তু তাঁরা যা বললেন, তাতেও এই রহস্যের সমাধানের কোনও হদিশ পেলাম না।" এই প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কে, প্রফেসর সেন?'

আমি বললাম, 'এঁদের মধ্যে একজন হলেন ব্যোমকেশ বক্সী, দ্বিতীয়জন মিঃ হুকা-কাশি, তৃতীয়জন জয়ন্তবাবু, চতুর্থজন পরাশর বর্মা। আপনি এদের চেনেন মিঃ হাজরা?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'চিনি। ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমি একবার কাজ করেছিলাম। জয়ন্তবাবুর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। আমাদের ভূতপূর্ব colleague সুন্দরবাবু আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরাশরবাবুর সঙ্গে দু-একটা পার্টিতে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক খুব খামখেয়ালি বলে ওঁর কাছে আমি বিশেষ ঘেঁষিনি। মিঃ হুকা-কাশির সঙ্গে অনেকদিন আগে আমার আলাপ ছিল, কিন্তু মাঝে বহু বছর তাঁর কোনও খবর পাইনি। তিনি যে বেঁচে আছেন, তা-ই এতদিন আমি জানতাম না। যাক, এইসব ডিটেকটিভরা আপনাকে কী বলেছিলেন, তা তো আপনি আমাকে বলেননি প্রফেসর সেন।'

আমি বললাম, 'সে-কথা আপনাকে বলার কি কোনও দরকার ছিল? আপনাদের তো প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপরে তেমন আস্থা নেই বলেই জানি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আপনার ধারণা ঠিক নয় প্রফেসর সেন। কতকগুলো ব্যাপারে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা যা পারেন, পুলিশ তা পারে না। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা যখন যা খুশি করতে পারেন, আমাদের মতন তাঁদের ওপরওলার হুকুমের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। অপরাধীর অপরাধের প্রমাণ আবিষ্কারের জন্যে তাঁরা না বলে চোরের মতো চুপিচুপি তার বাড়ি ঢুকতে পারেন, যা আমরা পারি না। তা ছাড়া, আমরা তদন্ত করি স্থূলভাবে—ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সবকিছু দেখি, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, জেরা করে, চাপ দিয়ে কথা আদায় করি, সন্দেহভাজন লোকদের গ্রেপ্তার করে চালান দিই, তারপর তাদের দিয়ে দোষ স্বীকার করাবার আর তাদের কাছ থেকে অন্য সব খবর আদায় করার চেষ্টা করি। আর প্রাইভেট ডিটেকটিভরা রহস্যভেদ করেন প্রধানত বুদ্ধি দিয়ে, আমাদের

BanglaBook.org

পদ্ধতির তুলনায় তাঁদের পদ্ধতি সূক্ষ্মতর। তবে আমাদের দেশে মাথা খাটিয়ে মীমাংসা করবার মতো কেস ক'টা মেলে। তা ছাড়া পুলিশের যে সবরকম খবর জানবার অধিকার ও সুযোগ আছে, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের তা নেই। এ জন্যে আমাদের দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ক্ষেত্র একটু সংকীর্ণ। সে যাক, আপনি যাঁদের নাম করলেন, তাঁদের সকলেরই শক্তি সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। এখন বলুন, কী তাঁরা বলেছিলেন আপনাকে?'

আমি তখন মিঃ হাজরাকে ব্যোমকেশ বক্সী, হুকা-কাশি, জয়ন্ত আর পরাশর বর্মার সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ দিলাম এবং তাঁরা শেষকালে কোন বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন, তা-ও বললাম।

লক্ষ করলাম, আমার কথা শুনতে-শুনতে মিঃ হাজরার চোখ দুটো ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। আমার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, 'আশ্চর্য লোক এঁরা। সাত্যকি সাঁইকে ঘিরেই যে আপনাদের পাড়ার রহস্যটা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তা না জেনেও কেবল আপনার কথা শুনেই এঁরা আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন? কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না? জয়ন্তবাবু আপনার কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনে খুশি হয়ে নস্যি নিলেন কেন, তা আপনি বুঝতে পারেননি?'

আমি বললাম, 'না তো।'

মিঃ হাজরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর তিনজন ডিটেকটিভ আপনাকে যা করতে বলেছিলেন তা করেছিলেন?'

আমি বললাম, 'সবটা করিনি। যেমন পরাশরবাবু আমায় বলেছিলেন জঞ্জালের টিন ওজন করতে—শুধু একদিন নয় দিনের-পর-দিন এবং বারবার। কিন্তু কী করে আমি তা করব? করলে সবাই আমায় পাগল ভাবত। অত বড় দাঁড়িপাল্লাই বা পাব কোথায়? তাছাড়া সকলের সামনে বসে যদি ওগুলো ওজন করতাম, তাহলে রহস্যের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সাবধান করে দেওয়া হত না? অবশ্য জঞ্জালগুলোর সঙ্গে রহস্যের যোগটা কী, তা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে আপনি কিছুই করেননি?'

আমি বললাম, 'প্রায় কিছুই করিনি। তবে পরাশরবাবু আমাকে ও-কথা বলার পর কিছুদিন আমি ভরতি জঞ্জালের টিনটা হাত দিয়ে তুলে তার ওজন আন্দাজ করবার চেষ্টা করতাম।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'চেষ্টা করে কী মনে হত?'

আমি বললাম, 'কী আবার মনে হবে? টিনটা আধমনি টিন। দিনে কোনওসময় টিনটা একেবারে ভরত না। একটু ভরলেই রঘু ডাস্টবিনে জঞ্জাল ফেলে আসত। রাত্রে বাড়ির জঞ্জাল, বাগানের জঞ্জাল, উনুনের ছাই, এঁটোকাঁটা সব এসে পড়ায় টিনটা প্রায় ভরে যেত। তখন টিনটা হাত দিয়ে তুলেও বোঝা যেত আধমনটাক জঞ্জাল আছে। জঞ্জালের পরিমাণের কোনও ইতরবিশেষ কখনও টের পাইনি। তবে দু-দিন রাত্রে টিনটা যেন একটু ভারী-ভারী ঠেকেছিল।'

এ-কথা শুনে মিঃ হাজরা বললেন, 'যে, দু-দিন আপনার টিন ভারী-ভারী ঠেকেছিল, সে দু-দিনের ব্যবধান কতখানি, তা আপনার মনে আছে?'

আমি বললাম, 'যতদূর মনে হচ্ছে দিন সাতেক। তবে জোর করে বলতে পারব না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে আপনাকে বলেছিলেন আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি-এদের গোড়ালি, আঙুল আর পায়ের তলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে, তা কি আপনি করেছেন?'

আমি বললাম, 'করেছি। অবশ্য ওদের পায়ের তলা লক্ষ করা খুব সহজ নয়। গল্প করার অছিলায় ওদের কাছে বসিয়ে লক্ষ করতে হয়েছে।'

BanglaBook.org

মিঃ হাজরা বললেন, 'কী লক্ষ করেছেন?'

আমি বললাম, 'রঘুর পায়ের তলাটা খুব শক্ত, তবে পাশগুলো বেশ প্লেন আর নরম। দুখীরামের পায়ের তলাটা যেমন খুব শক্ত, তেমনি তার পায়ের পাশটাও—বিশেষ করে গোড়ালি আর কড়ে আঙুল খুব বেশি কড়া পড়া। করুণার পায়ের তলাও শক্ত আর তার পায়ে সামান্য কড়াও আছে।'

আমার কথা শুনে মিঃ হাজরার চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'আর মিঃ হুকা-কাশি যা জানতে চেয়েছিলেন, তা আপনি জেনেছিলেন?'

আমি বললাম, 'জেনেছিলাম। আমাদের চাকর-রাঁধুনি-মালিদের মধ্যে সত্যিই একজন পেটরোগা ছিল। কিন্তু মিঃ হুকা-কাশি সে-কথা কী করে আন্দাজ করলেন, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।'

মিঃ হাজরা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে পেটরোগা ছিল?'

আমি বললাম, 'দুখীরাম।'

আমার কথা শুনে মিঃ হাজরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'দুখীরামের চেহারা কীরকম?'

আমি দুখীরামের চেহারার বিবরণ দিলাম।

দুখীরামের চেহারার বিবরণ শুনে মিঃ হাজরা ঘণ্টি বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে বললেন, 'এক্ষুনি গাড়ি বের করতে বলো, আর সার্জেন্ট জোন্‌সকে খবর দাও।'

মিনিট খানেক বাদেই আর্দালি এসে বলল গাড়ি তৈরি। সার্জেন্ট জোন্‌সও এসে স্যালিউট করে দাঁড়ালেন।

মিঃ হাজরা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'চলুন প্রফেসর সেন, এখুনি আমাদের যেতে হবে। একমুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। এসো সার্জেন্ট।'

নবম পরিচ্ছেদ

কোথায় যেতে হবে, তা কিন্তু মিঃ হাজরা বললেন না। গাড়িতে চড়ে দেখি গাড়ি চলেছে দক্ষিণ দিকে।

মিঃ হাজরার ঘরে প্রথম যখন ঢুকেছিলাম, তখন বেলা দশটা। তারপর কথায় বার্তায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এতক্ষণ আমার ভাত খাওয়া হয়নি। স্নান অবশ্য সকালেই করে বেরিয়েছি। খড়দার বাড়িতে গিয়ে আমার ভাত খাওয়ার কথা ছিল। কখন সকালে চা-জলখাবার খেয়েছি, এখন বেজায় খিদে পেয়ে গেছে। তা ছাড়া, দাদা-বউদি নিশ্চয়ই আমার দেরি দেখে ভাবছেন।

মিঃ হাজরাকে আমার অসুবিধের কথা বললাম। তিনি শুনে বললেন, 'বাড়ি ফিরতে অবশ্য আপনার একটু দেরি হবে। এটুকু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। তবে আপনার দাদা-বউদি যাতে না ভাবেন, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আপনাদের খড়দার বাড়িটার একটু direction দিন তো, আর আপনার দাদার নামটা বলুন।'

আমি খড়দার বাড়ির নিশানা আর দাদার নাম বললে মিঃ হাজরা সোফারকে গাড়ি থামাতে বললেন। দেখি গাড়িটা ভবানীপুর থানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিঃ হাজরা থানার ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, 'খড়দার পুলিশ স্টেশনে জানিয়ে দিলাম আপনার দাদাকে বলে দিতে যে, আপনার ফিরতে একটু দেরি হবে। তিনি যেন আপনার জন্যে না ভাবেন।'

গাড়ি আবার চলল। একটু পরে দেখি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে।

BanglaBook.org

মিঃ হাজরা গাড়ির দরজা খুলে বললেন, 'আসুন প্রফেসর সেন।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ব্যাপার কী?'

'ব্যাপার কিছুই নয়। আসুন।' বলে আমাকে একরকম জোর করেই ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার জন্যে চিকেন কারি আর রাইস অর্ডার দিয়ে বললেন, 'নিন। খেয়ে নিন। না, না, কোনও কথা শুনছি না। কখন খাওয়া হয় কিছুই তো বলা যায় না।'

আমি খেলাম। মিঃ হাজরা আর সার্জেন্ট জোন্‌স মাত্র এক পেয়ালা করে চা খেলেন। আমার খাওয়া শেষ হলে বিল চুকিয়ে দিয়ে মিঃ হাজরা বললেন, 'এবার চলুন।'

তারপর আবার সবাই গাড়িতে উঠে বসলাম। একটু বাদে দেখি গাড়ি হেমন্ত ঘোষ রোডে ঢুকছে।

হেমন্ত ঘোষ রোডে আমাদের পুরোনো বাড়িটার সামনে গাড়ি থামল। মিঃ হাজরা গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আপনাদের মালি দুখীরামকে ডাকুন একবার। তার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

আমি ফটক খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। মালির ঘরটার সামনে গিয়ে দেখি ঘর তালাবন্ধ। দুখীরাম নেই।

আমি মিঃ হাজরাকে সে-কথা বললাম।

মিঃ হাজরা বললেন, 'নেই? ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই!'

এমনসময় দেখি আমাদের সামনের বাড়ির শ্রীপতিবাবু তাঁর দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'একি সজলবাবু! আপনারা তো আজ সকালে চলে গেলেন। তারপর আবার এসেছেন যে?'

আমি বললাম, 'দুখীরামকে আমাদের একটু দরকার। সে তো নেই দেখছি। কখন বেরিয়েছে বলতে পারেন?'

শ্রীপতিবাবু বললেন, 'দুখীরাম? আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে তাকে দেখেছিলাম মনে পড়ছে। তখন সে ফুল নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাচ্ছিল। তারপর তাকে আর দেখিনি।'

এ-কথা শুনে মিঃ হাজরা বললেন, 'মাস্টারমশাই—মানে ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগো? তাহলে চলুন প্রফেসর সেন, তাঁকেই একবার জিগ্যেস করে দেখি। তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন।'

আমি এ-কথায় একটু বিব্রত বোধ করলাম। সেই অবিস্মরণীয় দিনটির পরে আর আমি মাস্টারমশায়ের বাড়ি যাইনি। আমি বললাম, 'মাস্টারমশায়ের বাড়ি গিয়ে আর কী হবে? উনি আত্মভোলা মানুষ, কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। উনি কিছুই বলতে পারবেন না।'

'উনি না পারুন, ওঁর বাড়ির লোকেরা পারতে পারে। আসুন প্রফেসর সেন।' এই বলে মিঃ হাজরা আমাকে একরকম জোর করে টেনে নিয়েই ঢুকে পড়লেন মাস্টারমশায়ের বাড়ির মধ্যে।

ইলা বাড়িতেই ছিল। সে বোধহয় আমার গলা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু আমি যে বাড়িতে ঢুকব, তা সম্ভবত ভাবতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সেদিনের পরে ইলার সঙ্গে আমার আর কোনও কথা হয়নি। আমাকে দেখে ইলা মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বলল, 'ব্যাপার কী প্রফেসর সেন? আপনি হঠাৎ—এই সময়ে?'

আমি কিছু বলার আগেই মিঃ হাজরা বললেন, 'আমরা পাশের বাড়ির মালি দুখীরামের খোঁজে এসেছিলাম। তাকে পেলাম না। শুনলাম সে সকালে আপনাদের বাড়ি ফুল দিতে এসেছিল। তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি। সে কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

ইলা বলল, 'দুখীরাম? কই না তো। সে কোথায় গেছে তা আমরা কী করে জানব?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে-কথা ঠিক। আচ্ছা ডক্টর কানুনগো কি বাড়িতে আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

BanglaBook.org

ইলা বলল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হবে না। তিনি সকাল ন'টায় সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েই ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছেন। বলেছেন একটা খুব important experiment করবেন, সারাদিন ল্যাবরেটরি থেকে বেরোবেন না, কারও সঙ্গে দেখাও করবেন না। চার-পাঁচজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'তাঁদের কথা আর আমার কথা স্বতন্ত্র মিস কানুনগো। আমার duty হচ্ছে এ ব্যাপারে ডাঃ কানুনগোকে একবার জিগ্যেস করা। সে duty আমাকে করতেই হবে। আমি মাত্র একটা কথা জিগ্যেস করেই চলে যাব। আসুন প্রফেসর সেন। এসো সার্জেন্ট। বাড়িতে আর কেউ নেই তো? তাহলে আমরা নির্ভয়ে ওপরে উঠতে পারি।' এই বলে মিঃ হাজরা ওপরে উঠতে লাগলেন। আমি যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর পেছনে-পেছনে চললাম। আমার পেছনে ছিলেন সার্জেন্ট জোন্‌স।

তেতলায় উঠে দেখি মাস্টারমশায়ের ল্যাবরেটরির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানলাগুলোর শার্শিও বন্ধ। বাইরে থেকে আমরা দেখতে পেলাম মাস্টারমশাই চেয়ারে বসে একটা বিকার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

মিঃ হাজরা দরজায় একটা টোকা মেরে বললেন, 'ডক্টর কানুনগো! আপনার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

মাস্টারমশাই কিন্তু দরজা খুললেন না। তিনি যেমনভাবে ছিলেন সেইভাবেই বসে রইলেন। তখন মিঃ হাজরা একটা শার্শির সামনে এসে চিৎকার করে বললেন, 'ডক্টর কানুনগো! আপনার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই।'

মাস্টারমশাই এতক্ষণে বাইরের দিকে তাকালেন। তিনি যেন হঠাৎ কীরকম বিব্রত হয়ে পড়লেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ল্যাবরেটরির লাগাও বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

মিনিট খানেক আমরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু মাস্টারমশাই আর ফিরে এলেন না।

হঠাৎ মিঃ হাজরা বললেন, 'জোন্‌স! বাড়ির পেছন দিক থেকে কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। কেউ যেন ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, এ-বাড়িতে বাথরুমে মেথরদের ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ি আছে?'

আমি বললাম, 'আছে।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে ডক্টর কানুনগো নিশ্চয়ই সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। ব্যাপার কী? আসুন তো নীচে নেমে দেখি।' এই বলে মিঃ হাজরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর পেছনে আমরা। কিন্তু সিঁড়ির দরজাটা অবধি গিয়েই আমাদের থেমে যেতে হল। দেখি দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে কে শেকল লাগিয়ে গেছে।

মিঃ হাজরা এই ব্যাপার দেখে ছুটে আবার ওপরে উঠে এলেন। এসে বললেন, 'জোন্‌স! তুমি এক্ষুনি নর্দমার পাইপ বেয়ে নীচে নামো। নেমে ডক্টর কানুনগোকে পাকড়াও করো।'

জোন্‌স আর কথাটি না বলে তক্ষুনি ড্রেন-পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করলেন। আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতি তাঁর।

মিঃ হাজরা কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'ডক্টর কানুনগোকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যিনি পুলিশকে দেখে এইভাবে পালান, তাঁকে আটক না করে আমাদের উপায় নেই। Duty is duty!'

আমি বললাম, 'কিন্তু ব্যাপার কী? মাস্টারমশাই এইভাবে পালালেন কেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সেটা আমাদের জানতে হবে।'

আমি বললাম, 'আর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করল কে?'

BanglaBook.org

মিঃ হাজরা বললেন, 'সেটা বোধহয় আমি বলতে পারি। যিনি একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'ইলা? না-না, এ হতে পারে না! ইলা কোনও কিছুর মধ্যে থাকতে পারে না।'

মিঃ হাজরা আমার কথা বলার ধরন দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী প্রফেসর সেন? আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

আমি তার উত্তরে কিছু বলার আগেই পাশের গলি থেকে দু-জোড়া পায়ের দৌড়োনোর শব্দ শোনা গেল। বেশ বোঝা গেল একজন লোক ছুটে পালাচ্ছে, আর একজন তার পিছু-পিছু ধাওয়া করছে।

একটুবাদেই পুলিশ-হুইসলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

মিঃ হাজরা বললেন, 'জোন্‌স তাহলে ডক্টর কানুগোকে ধরেছে। কিন্তু ডক্টর কানুনগো কেন এমন—।'

তারপর দেখলাম চারদিক থেকে বহু পুলিশ কনস্টেবল ছুটে আসছে। কাছেপিঠে যে যেখানে ছিল, হুইসলের আওয়াজ পেয়ে সবাই চলে আসছে।

একটু বাদে দুজন কনস্টেবল এই বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ির দরজা খুলে দিল। অবশ্য এতে তাদের একটু সময় লাগল, কারণ একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার আর দোতলা থেকে তেতলায় ওঠবার দুটো সিঁড়ির দরজাই বন্ধ ছিল। তাও আবার শুধু শেকল দেওয়া নয়, একেবারে তালাবন্ধ। তালা ভাঙতে কনস্টেবলদের খানিকটা দেরি হল। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে তারা মিঃ হাজরাকে সেলাম করে বলল, 'সার্জেন্ট জোন্‌স আপনাকে যেতে বলছেন।'

মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের সঙ্গে-সঙ্গে যেখানটায় জোন্‌স মাস্টারমশাইকে ধরেছিল, সেইখানে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি জোন্‌স মাস্টারমশাইকে শুধু ধরেনি, তাঁকে হাতকড়াও পরিয়েছে।

মিঃ হাজরা বললেন, 'কী ব্যাপার, জোন্‌স?'

জোন্‌স বললেন, 'Very tough guy, sir ! অনেক ধস্তাধস্তি করে তারপব আমি ওকে বাগ মানাতে পেরেছি। But have you noticed the real thing, sir ?'

'Certainly I have,' বলে মিঃ হাজরা মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে একটানে তাঁর মুখ থেকে দাড়িটা আর মাথা থেকে পরচুলোটা খুলে ফেলে বললেন, 'সাত্যকি সাঁই! এতদিনে তোমার খেল খতম হল।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখুন। একে চিনতে পারেন?'

আমি বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বললাম, 'এ তো দুখীরাম!'

BanglaBook.org

দশম পরিচ্ছেদ

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আশ্চর্য, এই সেই দুখীরাম। যদিও চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা আর দাড়ি গোঁফ কামানো, তাহলেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না।

আমার মনে হল, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমি বলে উঠলাম, 'তাহলে মাস্টারমশাই আর দুখীরাম একই লোক?'

দুখীরাম দাঁত কড়মড় করে আমার আর মিঃ হাজরার দিকে তাকাল। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এখন তার মুখখানা। আশ্চর্য। এই লোকটাকেই এতদিন আমরা—।

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন! আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমাদের কাজ বাকি

রয়েছে। জোন্‌স। তুমি তোমার আসামিকে দ্যাখো। আর একজন কনস্টেবলকে দিয়ে ফোন করিয়ে দাও প্রিজন ভ্যান পাঠাবার জন্যে।' বলে তিনি দুজন কনস্টেবলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

আমরা আবার মাস্টারমশায়ের বাড়িতে গেলাম। সেখানে তখন কেউ নেই। ইলার টিকিটিও কোথাও দেখা গেল না।

মিঃ হাজরা একতলার ঘরগুলোর সামনে গিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরগুলোর বেশিরভাগই তালাবন্ধ। মিঃ হাজরা আমায় বললেন, 'ডক্টর কানুনগোর শোওয়ার ঘরটা কোথায়?'

আমি ঘরটা দেখিয়ে দিতে তিনি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেটাও তখন তালাবন্ধ ছিল। মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের ডেকে বললেন, 'তোমরা তালা ভেঙে ফ্যালো।'

তালা ভাঙা হতে আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের জানলাগুলোও সব বন্ধ। কিন্তু খাটের ওপর শুয়ে ও কে?

মাস্টারমশাই!

মিঃ হাজরা কনস্টেবলদের ইঙ্গিত করে জানলা খুলে দিতে বললেন, তারপর মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর নাড়ি হাতে নিলেন।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, কী সর্বনাশ। মাস্টারমশাইকে কি ওরা খুন করে রেখে গেছে?'

মিঃ হাজরা হাত তুলে আমায় শান্ত হতে বললেন। তারপর বললেন, 'না। বেঁচে আছেন। ওঁকে মারেনি। অজ্ঞান করেছে। নকল ডক্টর কানুনগোকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে, আসলকে ওরা বাড়ির মধ্যে গুম করে রেখেছে। প্রফেসর সেন। আপনি এখুনি গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনুন।'

আমি ডাক্তারকে নিয়ে যখন ফিরলাম, তখন ওদিকে প্রিজন ভ্যান এসে গেছে আর সাত্যকি সাঁইকে তাতে তোলা হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন, 'ভয়ের কোনও কিছু নেই। কয়েক ঘন্টা বাদে ওঁর জ্ঞান ফিরবে। কিন্তু ওঁকে অজ্ঞান করলে কে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে অনেক কথা ডক্টর। আচ্ছা, ওঁকে হাসপাতালে remove করলে বোধহয় ভালো হয়, তাই না?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হাসপাতালে? কেন, ওঁর মেয়েই তো ওঁর দেখাশুনো করতে পারেন।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হত। কিন্তু সে কোথায় চলে গেছে। আমাদেরই বোধহয় তাকে খুঁজে—সে যাক। হাসপাতালেই তাহলে ওঁকে পাঠানো যাক। আমি already হাসপাতালে ফোন করে দিয়েছি।'

একটু বাদেই হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছল এবং মাস্টারমশাইকে নিয়ে চলে গেল।

মিঃ হাজরা তখন আমার দিকে ফিরে বললেন, 'প্রফেসর সেন। আপনিও এবার বাড়ি চলে যান। সারাদিন আপনার শরীর মনের ওপর কম strain হয়নি। এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। হপ্তাখানেক বাদে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

BanglaBook.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক সপ্তাহ বাদে—৭ আগস্ট, ১৯৬৩ তারিখে আমি মিঃ হাজরার সঙ্গে দেখা করলাম।

মিঃ হাজরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আপনাকে দুটি সুসংবাদ দিচ্ছি প্রফেসর

সেন। প্রথম, ডক্টর কানুনগোর জ্ঞান যথাসময়েই ফিরে এসেছে—উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। দ্বিতীয়, সাত্যকিকে গ্রেপ্তার করার পরে ওর জামাকাপড় তল্লাশ করে আমরা এমন কিছু কাগজপত্র পেয়েছিলাম, যার থেকে ওর সহকর্মীদের আস্তানার হদিশ পাই। তা পাওয়ার ফলে আমরা তার দলের সবাইকেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'বাঃ! বেশ আনন্দের খবর!'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কিন্তু একটি দুঃসংবাদও আছে। একজনকে আমরা ধরতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'তিনি কে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী ইলা দেবী, ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগোর কন্যা এবং—।'

মিঃ হাজরা একটু থেমে বললেন, 'এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত সাত্যকি সাঁইয়ের স্ত্রী।'

আমি এ-কথা শুনে স্থান কাল পাত্র ভুলে চিৎকার করে উঠলাম, 'অ্যাঁ! এ কী বলছেন? ইলা—ইলা—সে সাত্যকি সাঁইয়ের মতো criminal-এর—না, না, আমি বিশ্বাস করি না! ইলা বিবাহিতা! না, না, এ সত্যি হতে পারে না, কখনও সত্যি হতে পারে না!'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এ-কথা সম্পূর্ণ সত্যি, প্রফেসর সেন। তার প্রমাণ এই দেখুন—' বলে তিনি একখানা কাগজ আমার হাতে দিলেন।

যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর হাত থেকে আমি কাগজখানা নিলাম। নিয়ে দেখি, সেটি স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে সম্পাদিত একটি বিবাহের দলিল। বিবাহের তারিখ ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ। বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছেন স্পেশাল ম্যারেজের রেজিস্ট্রার কালীপদ সরকার। দলিলে পাত্র-পাত্রী হিসেবে যাঁদের সই আছে তাঁরা হলেন অনিলেন্দু মিত্র এবং ইলা কানুনগো। শেষের সইটির হস্তাক্ষর আমার একান্ত পরিচিত।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'কিন্তু অনিলেন্দু মিত্র—।'

'এটা দেখুন প্রফেসর সেন' এই বলে মিঃ হাজরা আমার হাতে আর-একখানা কাগজ দিলেন। দেখি তাতে লেখা আছে ঃ

> *গত ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৯ তারিখে আমি শ্রীযুক্ত অনিলেন্দু মিত্র ও কুমারী ইলা কানুনগোর বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছিলাম। আজ আমায় লালবাজার পুলিশ স্টেশনের হাজতে সাত্যকি সাঁই নামে পরিচিত একটি বন্দিকে দেখানো হয়। আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, উক্ত অনিলেন্দু মিত্র এবং এই সাত্যকি সাঁই অভিন্ন লোক।*
>
> *শ্রীকালীপদ সরকার*
> *৪ আগস্ট, ১৯৬৩*

মিঃ হাজরা বললেন, 'বুঝতে পারছেন না? অনিলেন্দু মিত্রই ওর আসল নাম, আর সাত্যকি সাঁই ছদ্মনাম।'

আমি কপাল চেপে ধরে বসে রইলাম। নিজের মনোভাব গোপন রাখার কোনও চেষ্টাই আর করতে পারছিলাম না।

তখন মিঃ হাজরা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এত ঘাবড়ে যাবেন না প্রফেসর সেন। Be steady. আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনি যদি এত বিচলিত হন, তাহলে অন্য লোক কী করবে?'

BanglaBook.org

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'আপনি সব কথা বুঝতে পারছেন না, মিঃ হাজরা।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আমি সব কথা জানি। সেদিন যখন আমি বললাম ইলা দেবীই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেছেন, তখন আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। এতে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। তারপর এই ক'দিনে আমি আপনাদের হেমন্ত ঘোষ রোডের অনেক প্রতিবেশীর জবানবন্দি নিয়েছি। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার সঙ্গে ইলা দেবীর সম্পর্ক এক সময়ে চরম ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তারপর মাস দেড়েক হল আপনাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

আমি কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

মিঃ হাজরা সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? তাহলে আর বসে থেকে কাজ নেই, বাড়ি চলে যান। বলেন তো আপনাকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমি তখন গলার স্বরকে সহজ করার চেষ্টা করে বললাম, 'না মিঃ হাজরা! আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। এখন আপনার কাছে আমি সব কথা শুনতে চাই। সব রহস্য আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হয়নি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'পরিষ্কার করে দিচ্ছি প্রফেসর সেন। সব কথাই আমরা জানতে পেরেছি। সাত্যকি সাঁই বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই দেখে সব কথাই স্বীকার করেছে। যে দু-একটা কথা সে জানত না, তা আমরা ডক্টর কানুনগো আর রঘুর কাছ থেকে জানতে পেরেছি।'

আমি বললাম, 'রঘু? রঘুকে আপনারা কোথায় পেলেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'রঘুকে যথাস্থানেই পেয়েছি। সে যাক, এখন সমস্ত ব্যাপারটার ইতিহাস আগাগোড়া শুনুন।'

মিঃ হাজরা বলতে লাগলেন ঃ

'ইলা ডক্টর অম্বিকারঞ্জন কানুনগোর একমাত্র সন্তান। শৈশবেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। ডক্টর কানুনগো আত্মভোলা বিজ্ঞানী। গবেষণা আর অধ্যাপনা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। মেয়েকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে তিনি একেবারেই মন দিতে পারেননি। তার ফলে অল্প বয়েস থেকেই ইলার চালচলন বিগড়োতে শুরু করে। অবশ্য মাথা ছিল বলে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলো সে বরাবর পাশ করে গেছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সে ছিল বিপরীত পথের পথিক। যেসব স্কুল-কলেজে সে পড়েছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে এবং তার কোনও-কোনও সহপাঠিনীর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পেরেছি যে, কৈশোরেই তার একদল পুরুষ বন্ধু জুটেছিল, যাদের চাল-চলন একেবারেই ভালো ছিল না; বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার এই ধরনের বন্ধুর সংখ্যাও ক্রমশই বাড়তে থাকে।

'অনিলেন্দু, ওরফে সাত্যকি, দুর্বৃত্ত হলেও ভদ্রঘরের ছেলে। সে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে, আদবকায়দাও জানে। ঘটনাচক্রে ইলার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। মেয়েদের পটাবার কায়দা সাত্যকি ভালো করেই জানত। সুতরাং ইলাকে সে সহজেই হাত করে নিল। সাত্যকি যে আসলে কী, তা ইলার কাছে সে গোপন করেনি। ইলা তার পরিচয় জানতে পেরে অখুশি হয়নি, বরং তার বিকৃত রুচির জন্যে সাত্যকির প্রতি তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

'এই ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের পরিণতি হয় দুর্ভাগ্যের পরিণয়ের মধ্যে। কিন্তু সাত্যকি ইলাকে বিশেষ করে বলে দিল ইলা যাতে এই বিয়ের কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে এবং কুমারী সেজেই থাকে। ইলাও তাতে রাজি হল। এরকম ব্যবস্থা হল তার কারণ—প্রথমত, ইলার বাবা দেশবরেণ্য ব্যক্তি, আদর্শবাদী অধ্যাপক। একজন অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তিনি মোটেই প্রসন্নভাবে অনুমোদন করবেন না এবং জামাইয়ের আসল পরিচয় জানতে পারলে হয়তো মেয়ের

BanglaBook.org

সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন। তা যদি করেন, তাহলে ইলা বাপের বাড়ি, টাকাপয়সা এবং অন্যান্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত, কুমারী ইলার পক্ষে পুরুষদের আকৃষ্ট করা যতটা সহজ হবে, বিবাহিতা ইলার পক্ষে ততটা সহজ হবে না। ইলাকে দিয়ে পুরুষদের আকৃষ্ট করানোর দরকার যে সময়-সময় হবেই, তা সাত্যকি বুঝতে পেরেছিল।'

এই বলে মিঃ হাজরা একটু হাসলেন।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, সাত্যকি আর ইলার বিয়ে হয়ে গেলেও সে-বিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষিত হল না, সাত্যকির সঙ্গে তার শ্বশুরেরও পরিচয় হল না। স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন ঘটতে লাগল বিভিন্ন নির্জন স্থানে, গোপন মধুচক্রে। এককথায় সাত্যকি-ইলা স্বামী-স্ত্রী হলেও তারা পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনযাপন করে চলল।

'এইভাবেই বছর দুয়েক নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপরেই ঘনিয়ে এল বিপদ। পুলিশ কমিশনার দুরাত্মা শিশির হাজরার ওপর সাত্যকিকে ধরার ভার দিলেন। ছোটলোকটা সাত্যকির প্রধান-প্রধান শাগরেদদের গ্রেপ্তার করল, তার বড় আড্ডাটা ভেঙে দিল। এমনকি তার কারখানাটাও আবিষ্কার করে ফেলল। তারপর শয়তানটা ব্লাড হাউন্ডের মতো সাত্যকিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সাত্যকি তখন বেগতিক দেখে কলকাতা ছেড়ে মিরাটে পালিয়ে গেল। সেখানে সে তার বহুদিনের বন্ধু পীতাম্বর ঘোষালের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল। পীতাম্বর ঘোষাল লোকটার আসল নাম পীতাম্বর ঘোষালই বটে এবং সে কন্ট্রাক্টরও বটে, কিন্তু খুব বড় কন্ট্রাক্টর নয়। অবশ্য বেশ কিছু টাকা তার আছে। কীভাবে সে এই টাকা রোজগার করল, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। লোকটা নানারকম চোরাকারবার আর নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ব্যাবসা করে বলে মিরাটের পুলিশ সন্দেহ করে। সম্ভবত এইসব ব্যাপারেরই সূত্র ধরে সাত্যকির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।

'সাত্যকি প্রায় ছ'মাস মিরাটে ছিল। এই ছ'মাসের মধ্যে তার লম্বা দাড়ি গজাল, চুল খুব বড় হয়ে গেল। তার ফলে তার চেহারাটা অনেকখানি বদলে গেল। মিরাটে চিরকাল বসে থাকলে তার চলবে না—তাকে কলকাতায় ফিরতে হবে, পুরোনো ব্যাবসা আবার শুরু করতে হবে। ও-কাজ ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

'সুতরাং চেহারা বদলে নিয়ে সাত্যকি দেশে ফিরল। ফিরে প্রথমে সে তার যেসব সহকারী তখনও ধরা পড়েনি, তাদের সঙ্গে দেখা করল। সর্দার চলে যাওয়ায় তাদের অবস্থা হয়েছিল হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোর মতো—কাজকর্ম বিশেষ কিছুই তারা করতে পারছিল না। সাত্যকি তাদের শিখিয়ে দিল কোথায়-কোথায় তারা থাকবে, কীভাবে কাজ সারবে, পুলিশ এলে কীভাবে তাদের পালাতে হবে ইত্যাদি।

'কিন্তু সাত্যকি নিজে থাকবে কোথায়? শুধু থাকার কথা ভাবলেই চলবে না, রোজকার সব চোরাই গয়না তার হাতে আসা চাই। তারপর তাকে সেগুলো গালিয়ে সোনার বার তৈরি করতে হবে, সোনার বারগুলো বিক্রি করতে হবে। এসব সে করবে কেমন করে? চারদিকে পুলিশ ঘুরছে তার খোঁজে। লক্ষ্মীছাড়া শিশির হাজরাও এখনও তাকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু সাত্যকি দমবার পাত্র নয়। অনেক ভেবে সে একটা প্ল্যান ঠিক করল। প্রথমে সে চিঠি লিখে তার বউকে ডেকে পাঠিয়ে একটা নির্জন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করল। তারপর তাকে তার প্ল্যান খুলে বলে সেটা কাজে পরিণত করে তোলার ব্যাপারে তার সাহায্য চাইল। ইলা তো সানন্দে রাজি। দীর্ঘকাল বিরহযন্ত্রণা ভোগ করার পর সে স্বামীর দেখা পেয়েছে, তার সুখ আর মঙ্গলের জন্যে সে কিছুই করতে পিছপাও নয়।

'সাত্যকির প্ল্যানের প্রথম অঙ্গ হচ্ছে তার স্ত্রীর খুব কাছে থাকা এবং এমনভাবে থাকা, যাতে কেউ তার পরিচয় আন্দাজ করতে না পারে। ইলাকে প্রথমে সে সেই ব্যবস্থা করতে বলল। ইলাও সে-ব্যবস্থা করল। সে তার বাবার কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল যে, তার কলেজের পুরোনো মালি

BanglaBook.org

দুখীরাম এখন বেকার হয়ে বসে আছে, তার একটা কাজ করে দেওয়া দরকার। পাশের বাড়ির বিরাজবাবুর মালি তো চলে গেছে, ওই কাজটা তাকে করে দাও না। তারপর একদিন সাত্যকি typical মালি সেজে এসে ডক্টর কানুনগোকে প্রণাম করে বলল যে, "ইলা দিদিমণি" বলেছে তার বাবা ওর জন্যে একটা কাজ জোগাড় করে দেবেন, যদি দেন তাহলে বড় উপকার হয়। তখন ডক্টর কানুনগো তাঁর বন্ধু বিরাজবাবুকে বলে সাত্যকিকে তাঁর মালির পদে নিযুক্ত করালেন।

'এদিকে ইলা বাড়ি থেকে ঝি-চাকরগুলোকে বিদায় করে দিল। দিয়ে বাড়ির সব কাজ নিজেই করতে লাগল। প্রথম-প্রথম এতে তার কষ্ট হতে লাগল, কিন্তু পরে সব সয়ে গেল। তবে কাজও খুব বেশি ছিল না। বাড়িতে মানুষ তো মোটে দুটি। সাত্যকি ওরফে দুখীরাম ইতিপূর্বে গোপন মিলনস্থানে বসে ইলাকে সোনা গালানো এবং তার থেকে বার তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিল। এখন থেকে স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাদের ব্যাবসাটা বেশ ভালোই চলতে লাগল। রাত্রে দুখীরাম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার একজন শাগরেদ সাধারণ পথিকের মতো সেখান দিয়ে হেঁটে যায় এবং যাওয়ার সময় সেদিনকার চোরাই গয়নাগুলো প্যাক করা অবস্থায় দুখীরামকে দিয়ে যায়। দুখীরাম পরের দিন সেগুলো ইলাকে এনে দেয়। ইলা রান্নাঘরে বসে হাপরে সেগুলো গালায়। রান্নাঘরের মধ্যে একটা inner chamber ছিল, নিশ্চয়ই দেখেছেন। সেটা বাইরে থেকে দেখা যেত না। হাপরটা সেখানেই থাকত। রান্নাঘরে ইলা ছাড়া আর কেউ যেত না বলে তার গয়না গালানোর ব্যাপার কারও দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। যা হোক, গয়নাগুলো গালাবার পর ইলা সোনাটাকে ছাঁচে ঢেলে বার তৈরি করত এবং বিকেলে দুখীরামকে সেগুলো দিত। সাতদিন অন্তর বারগুলো কেনার জন্যে দুখীরামের কাছে লোক আসত এবং বারগুলো নিয়ে তার দাম দিয়ে সে চলে যেত। এ লেনদেন রাত্রেই হত।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'কিন্তু কী করে ওরা এসব করত? আমরা তো এতদিন ওখানে ছিলাম। সেসময় ওরা যদি এসব ব্যাপার চালাত তাহলে কি আমরা টের পেতাম না?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ওদের কৌশল এত অদ্ভুত যে, আপনাদের চোখের সামনেই ওরা সব কাজ সারত, কিন্তু আপনারা কিছু বুঝতে পারতেন না। সে-কথায় পরে আসছি। এখন শুনুন।

'এদিকে বিরাজবাবুর বাড়িতে বসে কাজ করতে সাত্যকির অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ বিরাজবাবু দিনরাত বাড়িতেই থাকেন, তাঁর স্ত্রী আছে, ছেলে-বউ, মেয়ে, আছে—কাজেই সেখানে সাত্যকিকে সবসময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। এ-সমস্যার সমাধান করার জন্যে সে তার বন্ধু পীতাম্বর ঘোষালকে দিয়ে বিরাজবাবুর বাড়িটা কিনিয়ে নিল। কলকাতায় অত টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনতে পীতাম্বরের তেমন মত ছিল না। কিন্তু সাত্যকি তাকে বোঝাল যে, ডক্টর কানুনগো যখন তাঁর পরবর্তী আবিষ্কারের পেটেন্টটা বিক্রি করে একটা মোটা টাকা পাবেন, তখন ইলা পীতাম্বরের কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে বাড়িটা কিনে নেবে। অবশ্য তার আগে সাত্যকি যতদিন এ-বাড়িতে থাকবে ততদিন পীতাম্বরকে ন্যায্য ভাড়া দেবে। তা সে দিয়েও ছিল। আপনারা ও-বাড়িতে থাকার সময় পীতাম্বরকে যে মাসে-মাসে দুশো টাকা ভাড়া পাঠাতেন, সেটা পীতাম্বরের বাড়তি লাভ।

'পীতাম্বর বাড়িটা কেনার পর সাত্যকি ছ'মাস একা বাড়িতে থেকে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালাল, কিন্তু তার পরেই তার আবার বিপদ দেখা দিল। তার শাগরেদটি রাত্রে আসার সময় নানারকম সূত্র থেকে খবর জোগাড় করে সেগুলো একটা কাগজে লিখে গয়না বোঝাই প্যাকেটটাতে ভরে সাত্যকিকে দিয়ে যেত। একদিন তার কাছ থেকে সাত্যকি খবর পেল যে, ও-বাড়িটা গভর্নমেন্ট তার কোন অফিসারের জন্যে রিকুইজিশন করতে চায়। সে এ-খবর পেয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কীরকম অফিসার আসবে এখানে কে জানে! হয়তো কোনও পুলিশ অফিসারই আসবে। যে-ই আসুক না কেন, তার সামনে বসে যে সাত্যকি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, এ আশা করা যায় না। বাড়িওয়ালার মালি হিসেবে যে তারা তাকে ও-বাড়িতে থাকতে

BanglaBook.org

দেবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সাত্যকি তক্ষুনি তার বন্ধু পীতাম্বরকে টেলিগ্রাম করে তাকে অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসতে বলল। পীতাম্বর এলে সাত্যকি তাকে বলল, "গভর্নমেন্ট বাড়ি নেওয়ার আগেই এ-বাড়িতে একঘর ভাড়াটে বসিয়ে দাও। দেখো যেন তাদের লোকজন বেশি না হয়, কাচ্চাবাচ্চা না থাকে, আর সারাদিন যেন তারা বাইরে থাকে। এরকম family পাওয়া গেলে দুশো টাকা ভাড়াতেই তাদের বাড়িটা দিয়ে দাও।" পীতাম্বর তখন কাগজে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিল। বিজ্ঞাপন দেখে যেসব family বাড়িটা নেওয়ার জন্যে তার কাছে গেল, তাদের মধ্যে আপনাদের সঙ্গেই সাত্যকির পছন্দটা ঠিক মিলে যাচ্ছে দেখে আপনাদেরই সে বাড়িটা দিল। তবে দেওয়ার সময় আপনাদের বলে দিল বাগানটা সে নিজের দখলেই রাখবে। বাগানটা রাখা মানেই তার মালিটিকে রেখে দেওয়া। আপনারা এই শর্তেই রাজি হয়ে বাড়িটা নিলেন, পীতাম্বরও চলে গেল।

'কিন্তু পীতাম্বর যাওয়ার আগে একটা কাজ করে গেল। কলকাতায় সে এমন একটা চাকর পেয়েছিল, যার সঙ্গে সাত্যকির চেহারার মিল আছে। সে তাকে মিরাটে নিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু সাত্যকি তাকে বলল, এই বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের কাছে চাকরটাকে দিতে। পীতাম্বর তাতে রাজি হল। তখন সাত্যকি পরপর দুরাত সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে বাগানে পায়চারি করে আপনাদের পুরোনো চাকরকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াল এবং তার ফলে পীতাম্বরের চাকর রঘু এসে আপনাদের কাজে বহাল হল।'

'রঘুকে সাত্যকি কাছে রেখেছিল একটা বিশেষ মতলবে। পুলিশের গোয়েন্দারা যদি কোনওদিন খোঁজ পায় সাত্যকি এ-বাড়িতে আছে, তবে এ-বাড়িতে এসে প্রথমেই দেখবে রঘুকে। তারা কেউই সাত্যকিকে কোনওদিন চোখে দেখেনি, কেবল তার চেহারার বিবরণ পেয়েছে। সেই বিবরণের সঙ্গে রঘুর চেহারার মিল দেখে তারা মনে করবে যে, রঘুই সাত্যকি। রঘুকে সন্দেহ করার অন্য কারণও যাতে থাকে, সাত্যকি তার ব্যবস্থা করেছিল। সে সারাদিন রঘুকে পান খাওয়াত এবং বিকেলে পানের সঙ্গে একটু কোকেন খাইয়ে দিত। কোকেন খেলে মানুষ প্রথমটা চটপটে আর ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠে, তারপর সে এলিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রঘুরও তাই হত, সেটা আপনারা লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এর কারণ না জানায় আপনারা মনে করেছিলেন রঘু বুঝি একজন বিচিত্র ধরনের লোক। তারপর পীতাম্বর আর সাত্যকির কথায় রঘু বারবার আপনাদের বাড়ি-ঘর ঝাঁট দিত। জঞ্জালগুলো টিনে জমাত, তারপর সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে আসত। এটাও আপনাদের কাছে অদ্ভুত লাগত। যা হোক, এই সমস্ত ব্যাপার থেকে রঘুকে সন্দেহজনক লোক মনে হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া রঘু এ-বাড়িতে নতুন এসেছে, কিন্তু দুখীরাম অনেক দিন ধরে—পুরোনো মালিকের আমল থেকে—আছে। সুতরাং কেউ যদি মনে করে যে, এ-বাড়িতে চাকরের ছদ্মবেশে একজন criminal আছে, তাহলে সে প্রথমে দুখীরামকে সন্দেহ না করে রঘুকেই করবে।

'সাত্যকি জানত যে, পুলিশের গোয়েন্দা এ-বাড়িতে এলে প্রথমে রঘুকেই সাত্যকি বলে মনে করবে। মনে করে তারা রঘুর ওপরই কিছুকাল নজর রাখবে, তারপর বুঝবে রঘু সাত্যকি নয়। তারপর তারা আর এ-বাড়ির দিকে লক্ষ রাখবে না। অর্থাৎ, নকল সাত্যকিকে সামনে রেখে আসল সাত্যকি রেহাই পেয়ে যাবে। সাত্যকির এই চাল ষোলো আনা সফল হয়, যখন নিখিলেশও প্রথমে রঘুকে দেখে সন্দেহ করেছিল যে, রঘুই সাত্যকি। কিন্তু রঘুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং তার কার্যকলাপ লক্ষ করে নিখিলেশ বুঝল যে, রঘু সাধারণ একটা চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা বোঝার পর সে তার রিপোর্টেও রঘুর কথা লেখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। নিখিলেশ দু-দিন হল কলকাতায় ফিরেছে। ওকে জিগ্যেস করেই এসব কথা জেনেছি। হ্যাঁ, আর-একটা কথা, একদিন নিখিলেশকে আপনি আপনাদের বাড়ির পাশের গলি থেকে বেরোতে দেখেছিলেন—তখন ভেবেছিলেন সে আপনাদের বাগান আর বাড়ির ভেতরটা দেখছিল, কিন্তু আসলে সে রঘুর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। যা হোক, নিখিলেশ তো রঘু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আপনাদের বাড়ি সম্বন্ধে clean report দিয়ে

BanglaBook.org

চলে গেল, কিন্তু ও-বাড়িতে যে আসল চিজটি দাড়ি-গোঁফ-চুলের আড়ালে চেহারা লুকিয়ে বিরাজ করছে, এটা তার চোখে ধরা পড়ল না।

'রঘুকে যে সাত্যকি কোকেন খাওয়াত, তারপর তাকে দিয়ে দিনরাত বাড়ি-ঘর ঝাঁট দেওয়াত আর জঞ্জাল ফেলাত, সেটা শুধু রঘুকে অস্বাভাবিক দেখাবার জন্যে নয়। রোজ-রোজ দুখীরাম রাত্রে বাইরে যায়, এতে আপনারা সন্দেহ করতে পারেন। তা ছাড়া রাস্তা দিয়ে যদি সি. আই. ডি. পুলিশ ঘোরাফেরা করে, তাহলে দুখীরাম অত রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে এবং হাতে করে একটা প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরলে নিশ্চয়ই তার সন্দেহ হত। তাই দুখীরাম এই বুদ্ধিটি করেছিল। ভেবে দেখুন, সারাদিন রঘু বারবার বাড়িঘর ঝাঁট দিত আর টিনভরতি জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলে আসত। কিন্তু রাত আটটা সাড়ে আটটার পর যখন রঘু কোকেনের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত তার পরেও তো একবার ডাস্টবিনে টিনভরতি জঞ্জাল ফেলা হত। সেটা ফেলত কে? দুখীরাম। তাহলে দেখুন রাত্রে জঞ্জাল ফেলতে যাওয়ার মধ্যে দুখীরাম বাইরে বেরোনোর চমৎকার একটি অজুহাত পেয়ে গিয়েছিল। জঞ্জাল ফেলার জন্যে যখন সে ডাস্টবিনের ধারে যেত, তার আগেই তার সহকারী এসে গয়না ভরতি প্যাকেটটি ডাস্টবিনের পাশের অন্ধকার জায়গাটাতে রেখে দিয়ে যেত। তারপর সে কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। দুখীরাম গয়নার প্যাকেটটা জঞ্জালের খালি টিনে ভরে নিয়ে চলে যেত। তার সহকারীকে কোনও নির্দেশ বা টাকা দেওয়ার থাকলে সে তা একটা সিগারেটের টিনে ভরে সঙ্গে করে নিয়ে আসত এবং ডাস্টবিনের পাশেই রেখে যেত। যেতে-যেতে সে পেছন ফিরে দেখত সহকারী টিনটা নিচ্ছে কি না। যখন দেখত সে নিয়ে নিয়েছে, তখন বাড়ি ফিরে যেত এবং আপনারা কেউ লক্ষ করছেন কি না ভালো করে দেখে নিয়ে সে গয়নার প্যাকেটটা নিজের ঘরে পুরে জঞ্জালের টিনটা যথাস্থানে রেখে দিত।

'পরের দিন গয়নাগুলো সে স্ত্রীর কাছে দিয়ে আসত। আপনাদের চোখের সামনে দিয়েই সে সেগুলো নিয়ে যেত, কিন্তু আপনারা কেউ ধরতে পারতেন না! কীভাবে নিয়ে যেত জানেন? ফুলের সাজিতে ভরে। দলের অধিকাংশই জেলে। অন্যেরা সারাদিন যে-পরিমাণ উপার্জন করত, তা দুবার ফুলের সাজিতে ভরে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। যদি কোনওদিন গয়নার পরিমাণ বেশি হত, তাহলে সেদিন সে তার ঝুলওয়ালা খদ্দরের পাঞ্জাবিটা পরে পকেটে বাড়তি গয়নাগুলো ভরে নিয়ে যেত। তবে তার দরকার বড় একটা হত না। ফুলের সাজিতে গয়নাগুলো ভরে দুখীরাম তার ওপরটা ফুল দিয়ে চাপা দিত, যাতে লোকে মনে করে সে বুঝি সাজিভরতি ফুলই নিয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তা কী করে হবে? আমি তো দেখেছি মাস্টারমশায়ের বাড়ির ফুলদানিগুলো রোজই তাজা ফুলে ভরা থাকত। দুখীরাম যদি কম ফুল নিয়ে যেত, তাহলে তো তা সম্ভব হত না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তা যাতে সম্ভব হয়, তার জন্যে ইলা দেবী রোজ বাজার থেকে তাজা ফুল কিনে আনতেন। যাক, এখন শুনুন—।

'ইলা দুখীরামের কাছ থেকে গয়নাগুলো নিয়ে সেগুলো গালিয়ে গালিয়ে সোনার বার তৈরি করত কোথায় জানেন? রান্নাঘরে বসে। ইলার দিনরাত রান্নাঘরে থাকার রহস্যটা এবার বুঝতে পারলেন তো? দেখুন তো, কী মজার ব্যাপার! এ-কথা কারুর মাথায় ঢুকল না যে, যে-বাড়িতে মাত্র দুটি লোক, সে বাড়ির রান্নাঘরে দিনরাত এত কী রান্না হয়? সে যাক—।

'হপ্তায় শুধু একদিন দুখীরামকে একটু বেশি ঝুঁকি নিতে হত, যে, দিনটিতে দুখীরামের খদ্দের আসত তার কাছ থেকে সোনার বারগুলো কেনবার জন্যে। সেদিন দুখীরাম কী করত জানেন? শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। প্রতিদিন ইলা যেসব সোনার বার তৈরি করত, সেগুলো দুখীরাম শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার সময় ফুলের খালি সাজিতে করে নিয়ে আসত। তারপর হপ্তার যে-দিনটিতে খদ্দেরের সেগুলো নিতে আসবার কথা, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেগুলো সে প্যাক করত এবং রঘু ঘুমিয়ে পড়ার

BanglaBook.org

পর সেই প্যাকেটটা জঞ্জালের টিনের মধ্যে রেখে দিত, একেবারে সবচেয়ে নীচে। তারপর নিজে অন্যদিনের মতো দু-একবার বাড়ি ঝাঁট দিয়ে টিনটাকে ভরতি করে তুলত। দেখুন দেখি, কী মাথা। হাজার-হাজার টাকার সোনা খানিকক্ষণ ধরে সকলের চোখের সামনে পড়ে থাকত। কোথায়? না, একটা তুচ্ছ জঞ্জালের টিনে।'

আমি বললাম, 'বলেন কী?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ঠিকই বলছি। তারপর শুনুন। এই বিশেষ রাত্রিটিতে দুখীরাম টিনের জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলে সোনার বার ভরতি প্যাকেটটা টিন থেকে সন্তর্পণে বের করে ডাস্টবিনের পাশে রেখে দিত। সেখানে তার খদ্দের আগেই তার দাম—নোটের প্যাকেট—রেখে দিয়ে গেছে। গিয়ে কাছেই বসে অপেক্ষা করছে। কোন হপ্তায় কতগুলো সোনার বার দেওয়া হবে, তা দুখীরাম আগে থাকতে খদ্দেরকে সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখে জানিয়ে দিত। খদ্দেরও সেই অনুযায়ী দাম দিত। দুখীরাম সোনার বারের প্যাকেটটা নামিয়ে নোটের প্যাকেটটা নিয়ে বাড়ির দিকে যেত এবং খদ্দের সোনার বারের প্যাকেটটা যে নিয়েছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে বাড়ি ঢুকত।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, অনেক গয়নায় তো হিরে-জহরত থাকত। সেগুলো দুখীরাম কী করে পাচার করত?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'গয়নার সোনা গালানোর পরে হিরে-জহরতগুলো আলাদা করে রাখা হত। দু-তিন মাস অন্তর সেগুলো নিয়ে দুখীরাম নিজে বেরোত এবং বিক্রি করে আসত। এ জন্যে তাকে অবশ্য বিরাট ঝুঁকি নিতে হত। কিন্তু এটুকু না নিয়ে তার উপায় ছিল না। তারপর শুনুন।

'এমনিভাবে সকলের চোখের ওপরই ওদের কারবার নির্বিঘ্নে দিনের পর দিন ধরে চলছিল। পুলিশের গোয়েন্দা গন্ধ পেয়েও কিছু করতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আপনি এক ঝামেলা বাধিয়ে বসলেন।'

বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি। একদিন রাত্রে দুখীরাম হঠাৎ দেখল যে, আপনি জঞ্জালের টিনটা হাতে করে তুলে দেখছেন।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো কেউ দেখছে কি না ভালো করে দেখে নিয়েই তবে টিনটা তুলতাম।'

'এবার বোধহয় ততটা সাবধান হননি। দুখীরাম আপনাকে টিনটা তুলতে দেখে গোড়ায় ভাবল আপনি বুঝি সব ব্যাপার জেনে ফেলেছেন। কিন্তু পরে সে আপনার হাবভাব দেখে বুঝতে পারল আপনি কিছুই ধরতে পারেননি, নিছক খেয়ালের বসে টিনটা তুলেছেন। বলা বাহুল্য, পরাশর বর্মার কথা ওর জানা ছিল না। যা হোক, যদিও আপনি তখনও পর্যন্ত কিছু ধরতে পারেননি, তাহলেও টিনটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়তো একদিন ধরে ফেলবেন, এই ভেবে দুখীরাম আপনার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।'

আমি বললাম, 'কী ব্যবস্থা করল?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'বলছি। কিন্তু আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন প্রফেসর সেন। আপনার মন অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে সাত্যকি ইলাকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দিল। আগেই আপনাকে বলেছি না যে-সাত্যকির ইলাকে বিয়ের পরেও কুমারী সাজিয়ে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইলা যাতে প্রয়োজন হলে পুরুষমানুষের মন ভোলাতে পারে? ইলা আপনার সঙ্গে কয়েকদিন হেসে কথা বলল, অন্তরঙ্গতা দেখাল, সিনেমায় গেল—অমনি আপনি ভাবলেন, স্বর্গ আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। ইলা ছাড়া আর সব কিছুই তখন আপনার মন থেকে মুছে গেল। এইভাবে কিছুদিন রোমান্সের সমুদ্রে ভাসবার পর একদিন আপনি ইলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। ইলা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করল। তখন আপনার মনে হল পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনার মন

BanglaBook.org

তারপর তীব্র ব্যথায় ভরে রইল, অন্য কোনও দিকে আর আপনি মন দিতে পারলেন না। এইভাবে সাত্যকির আপনার চিন্তাকে অন্যদিকে ঘোরাবার প্ল্যান সফল হল।

'তারপর আপনারা হেমন্ত ঘোষ রোডের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিলেন। তাতে সাত্যকি-ইলার কোনও আপত্তি নেই। আপনি চলে গেলে তারা নির্ঝঞ্ঝাট হয়। কিন্তু গোল বাধাল রঘু।'

আমি বললাম, 'রঘু আবার কী গোল বাধাল?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রায় দু-বছর ধরে সাত্যকি ইলার পাশের বাড়িতে বাস করেছে আর রোজ দু-বেলা ইলার সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু ওদের সম্পর্কের কথা বাইরের কেউ জানতে পারেনি। তার মানে এই নয় যে, এই দু-বছর ওরা ব্রহ্মচর্য পালন করেছে। আসলে চলত সব কিছুই, কিন্তু ওরা এমন সাবধানতা অবলম্বন করত যে, কেউ কিছুই টের পেত না। ওরা যখন একত্র হত, তখন সদর দরজা আর ইলার ঘরের দরজা-জানালা দুই-ই বন্ধ থাকত। বাড়ির মধ্যে আর থাকতেন কেবল ডক্টর কানুনগো, তিনি তেতলার ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় মগ্ন। সুতরাং মুশকিল কিছুই ছিল না। কিন্তু আপনারা ও-বাড়ি ছাড়ার আগের আগের দিন ওরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেনি। সদর দরজা আর ইলার ঘরের একটা জানলা সেদিন খোলা ছিল। তার ফলে রঘু যখন চিনি আনতে ইলাদের বাড়ি গেল, তখন সে সদর দরজা দিয়ে বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকে গেল এবং ঢুকে গিয়ে ইলার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেল যে, ইলা আর দুখীরাম নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওরা দুজনেই রঘুকে দেখতে পেল। ইলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে যেন কিছুই হয়নি, এরকম ভাব দেখিয়ে রঘুকে তার আসার কারণ জিগ্যেস করল এবং রঘুর কথা শুনে তাকে চিনি দিল। কিন্তু রঘু চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল যে, রঘুকে অবিলম্বে সরানো হবে। কারণ, সে যা দেখেছে তা যদি সবাইয়ের কাছে বলে বেড়াতে শুরু করে, তাহলে চারদিকে হুলুস্থুল সৃষ্টি হবে এবং তারই সূত্র ধরে বেরিয়ে পড়বে দুখীরাম আসলে কে। তাই সেদিন রাত্রে সাত্যকি তার সহকারীকে রঘুকে এখান থেকে কীভাবে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে দিল।

'রঘু কিন্তু আসলে কাউকে কিছুই বলেনি। তবে সে ওই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আপনি তার এই ভাবটা লক্ষ করেছিলেন। পরের দিন দুপুরে সাত্যকির একজন সহকারী এসে রঘুর কাছে তার দেশের লোক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে গল্পে-গল্পে ভুলিয়ে তার বাসায় নিয়ে গেল এবং বিষ-মেশানো পান খেতে দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল। সেখানেই রঘু অজ্ঞান অবস্থায় তিন দিন পড়ে ছিল। বোধহয় ওদের মতলব ছিল পরে লাশ পাচার করবার পাকা ব্যবস্থা করে খুন করবে। কিন্তু সাত্যকি যেদিন ধরা পড়ে, সেদিনই ওর সেই সহকারীটাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলাম আর তার বাসার সন্ধানও পেয়েছিলাম। তাই সেখানে গিয়ে রঘুকে উদ্ধার করতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। তারপর রঘু একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা ওর জবানবন্দি নিয়েছি।

'এইবার আমাদের নাটকের শেষ অঙ্কে আসা যাক। সেদিন ইলা-সাত্যকির মিলন দৃশ্য শুধু রঘুই দেখেনি, আরও একজন দেখেছিলেন। তিনি ডক্টর কানুনগো। রঘু আসার একটু আগে তিনি ইলাকে একটা কথা বলবার জন্যে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন। আপনভোলা মানুষ, আসার সময় চটি পরতে ভুলে গিয়েছিলেন, খালি পায়ে আসার জন্যে কোনও শব্দ হয়নি। নীচে নেমে এসে জানালা দিয়ে ওই দৃশ্য দেখে তিনি তক্ষুনি আবার ওপরে উঠে যান।

'ইলা যে বিপথে, তা ডক্টর কানুনগো এর আগেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। একদিন তিনি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে দেখেছিলেন যে, ইলা সেখানে বসে সোনা গালানোর মতো কী একটা করছিল, তাঁকে দেখেই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল।

'তার খানিকক্ষণ পরে ইলাকে ডেকে তিনি রান্নাঘরে বসে তখন সে কী করছিল, তা জিগ্যেস

BanglaBook.org

করেন। ইলা তাঁর কথার জবাব না দিয়ে "আমায় এক্ষুনি একজন বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে" বলে বেরিয়ে গিয়েছিল। ডক্টর কানুনগো সেদিন ইলার ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই সেদিন যখন আপনি এসেছিলেন, তখন তিনি আপনাকে বলেছিলেন, "আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে।" আপনি ভেবেছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাটি সফল না হওয়ার জন্যে তিনি এ-কথা বলেছেন। তা নয়। তাঁর একমাত্র সন্তান এই মেয়ে। সারাজীবন ধরে তিনি মেয়ের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখেছেন তা ব্যর্থ হয়েছে—এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। তিনি বেশ সুস্পষ্টভাবেই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে লুকিয়ে ইলা এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা মোটেই ভালো জিনিস নয়। তাঁর মেয়ে যে মানুষ হয়নি, এটা তিনি সেদিনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

'এরপরে কিছুদিন ইলা খুব সাবধান হয়ে সোনা গালাত। সেদিনকার ব্যাপারটা ডক্টর কানুনগো তাই পরে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন তিনি যা দেখলেন, তা তাঁর মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। সেদিন বাকি সময়টা তিনি গুম হয়ে রইলেন। পরের দিন সকালে তিনি ইলাকে ডেকে বললেন যে, তিনি ইলার নোংরামি স্বচক্ষে দেখেছেন। এসব তাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দুখীরাম যেন আর এ-বাড়িতে না ঢোকে। যদি সে ঢোকে তাহলে তিনি তাকে পুলিশে দেবেন। পুলিশ কমিশনার তাঁর ছাত্র, কাজেই দুখীরামের মতো scoundral-কে শায়েস্তা করা তাঁর পক্ষে একটুও কঠিন নয়। বলা বাহুল্য, ইলা এতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তার একটু পরে দুখীরাম যখন ফুল দিতে এল, তখন সে তাকে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে বিকেলে পুরোনো মিলনের স্থানে দেখা করতে বলল। দেখা হওয়ার পরে সে দুখীরামকে সব কথা খুলে বলল।

'দুখীরামও এতে খুব ঘাবড়ে গেল। একে পুলিশ তাকে ধরবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তার ওপর ডক্টর কানুনগোর মতো লোক যদি তার শত্রুতা করেন, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে মুক্ত রাখা শক্ত হবে। সে তখন ঠিক করল পরের দিনই কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গিয়ে দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। কিন্তু ইলা তাকে ছাড়তে চাইল না। সেও তার সঙ্গে যেতে চাইল। সে বলল যে, পরের দিন সকালে সে ডক্টর কানুনগোকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলবে এবং তাঁর সব টাকাকড়ি (যা ইলার নামেই ব্যাঙ্কে জমা আছে) তুলে নিয়ে তারা দুজনে মিলে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। দুখীরাম তাতে রাজি হল।

'পরের দিন সকালেই ইলা ডক্টর কানুনগোকে চায়ের সঙ্গে মরফিন মিশিয়ে খাওয়াল। খেয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একটু বাদেই দুখীরাম সাজিতে করে ফুল নিয়ে এসে হাজির হল। তারপর তারা দুজনে মিলে ডক্টর কানুনগোকে ধরে তুলে তাঁর ঘরে শুইয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

'দুখীরাম ইলাকে বলল যে, হেমন্ত ঘোষ রোডে প্রায়ই সি. আই. ডি. পুলিশ ঘোরে। তারা যদি দেখে যে, ইলা পাশের বাড়ির মালির সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ছে, তাহলে তারা হয়তো আসল ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলবে। আর যদি সাত্যকি মালির রূপ ছেড়ে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে রাস্তায় বেরোয়, তাহলেও তারা হয়তো তাকে চিনে ফেলবে। কারণ, তার চেহারার বিবরণ তাদের সকলেরই জানা। ছদ্মবেশ ধরে বেরোনোও তার পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ দিনের বেলায় ছদ্মবেশের কৃত্রিমতা লোকের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে। ধরা পড়ার ভয়টা সাত্যকির বরাবরই অত্যন্ত বেশি। সাত্যকি প্রস্তাব করল যে, সে আর ইলা আলাদা-আলাদাভাবে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হবে, কিন্তু ইলা তাতে রাজি হল না। সে চায় স্বামীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে যেতে।

'অবশেষে ইলা মাথা খাটিয়ে দুজনে একসঙ্গে পালাবার খুব সুন্দর একটা উপায় আবিষ্কার করল। ব্যাঙ্ক থেকে যখন সে টাকা তুলতে গেল, তখন সে ফেরার পথে একটা পরচুলোর দোকানে গিয়ে পাকা চুল আর পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির পরচুলো কিনে নিয়ে এল। তারপর বাড়ি ফিরে সে

BanglaBook.org

সাত্যকির চুলগুলো কাঁচি দিয়ে খুব ছোট-ছোট করে কেটে দিল। সাত্যকি তার লম্বা কালো দাড়ি আগেই কামিয়ে ফেলেছিল। সে এখন পরচুলোর চুল আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লাগিয়ে, ডক্টর কানুনগোর জামাকাপড় পরে, চোখে তাঁর কালো চশমাটা পরে, তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে বসে রইল। ঠিক হল একটু বেশি রাত হলে যখন লোকে পরচুলোকে পরচুলো বলে চট করে বুঝতে পারবে না, তখন তারা দুজনে ট্যাক্সি করে ও-বাড়ি ছেড়ে হাওড়া স্টেশনে চলে যাবে। রাস্তায় সি. আই. ডি. পুলিশ বা আর কেউ যদি তাদের যেতে দ্যাখে তাহলে সে ভাববে ডক্টর কানুনগো তাঁর মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। ইলা ঠিক করেছিল তার বাবার মাথার শিয়রে একটা চিঠি রেখে যাবে, যাতে জ্ঞান হলেই তিনি সেটা পান। তাতে সে লিখবে, "আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছি। আমার খোঁজ কোরো না।"

'প্ল্যান বেশ সুন্দরই হল, হয়তো কাজেও পরিণত হত, কিন্তু অসময়ে আমবা গিয়ে পড়ায় সমস্ত ভেস্তে গেল। ওড়বার আগেই পাখি ফাঁদে পড়ল। মজা দেখুন, রঘুর সঙ্গে নিজের চেহারার মিল থাকার জন্যেই সাত্যকি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাকে আনিয়েছিল, কিন্তু সেই চেহারার মিলই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। কারণ, এই চেহারার মিল না থাকলে আমরা কেউই কল্পনা করতে পারতাম না যে, আপনাদের বাড়ির সঙ্গে সাত্যকির কোনও সম্পর্ক আছে।'

'কিন্তু শেষ সময়েও ইলা একটা খেল দেখাল। যখন দেখল যে, আমরা তার বারণ না শুনে ডক্টর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তেতলায় উঠছি, তখন সে দেখল সর্বনাশ আসন্ন। আগে থাকতেই ঠিক ছিল যে, বেগতিক দেখলে সাত্যকি বাথরুমে ঢুকে মেথরদের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পালাবে। আমরা যাতে সঙ্গে-সঙ্গেই সাত্যকির পিছু-পিছু ধাওয়া করতে না পারি, এইজন্যে ইলা আমাদের পেছনে-পেছনে এসে সিঁড়ির দরজা দুটো তালাবন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। কী ধড়িবাজ মেয়ে। সাত্যকির উপযুক্ত সহধর্মিণী! তবে ইলা কল্পনা করতে পারেনি যে, আমাদের মধ্যে ড্রেন-পাইপ বেয়ে নামার মতো লোকও আছে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করেই সে নিজের বাড়ি থেকে পালাল। কোথায় পালিয়েছে, তা আমরা এই সাত দিনেও বের করতে পারিনি। তবে বের তাকে আমরা করবই। ডক্টর কানুনগোও আমাদের বলেছেন যে, ইলাকে যেন খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। মেয়ের মুখ তিনি আর দেখবেন না। সে তার অপরাধের শাস্তি পাক এই তাঁর ইচ্ছে।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ হাজরার কথা শেষ হলে আমি শুকনো গলায় বললাম, 'সাত্যকির মতো এত বড় একটা অপরাধী তাহলে এবার ধরা পড়ল। এ জন্যে সব কৃতিত্ব আপনার, মিঃ হাজরা।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আমার নয় প্রফেসর সেন, আপনার!'

বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আমার?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'হ্যাঁ। আপনার। যদিও আপনি রহস্যটাকে উলটোদিক থেকে দেখেছিলেন, তাহলেও যে শেষ পর্যন্ত রহস্যটা ভেদ হল আর রহস্যময় পুরুষটি ধরা পড়ল এ জন্যে সব কৃতিত্ব আপনিই দাবি করতে পারেন। আপনি যদি চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে না যেতেন, তাহলে কোনওদিনই সাত্যকি ধরা পড়ত না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু—।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনি যখন চারজন ডিটেকটিভের কাছে গিয়েছিলেন, তখন আপনি ভেতরের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। ভূত দেখে আপনাদের চাকরের পালানো, পাড়ায় নিত্যনতুন অচেনা লোকের আবির্ভাব, যুগলকিশোরের বারবার আপনাদের বাড়িতে এসে জ্বালাতন

BanglaBook.org

করা—এই ধরনের কতকগুলো ব্যাপার ঘটতে দেখেই আপনি ধরে নিয়েছিলেন যে, এসবের মূলে একটা রহস্য আছে। আপনার অনুমান নির্ভুল। একটা কিছু রহস্য না থাকলে এত বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে কেন? সেই রহস্য ভেদ করার আগ্রহ দিয়ে আপনি পরপর চারজন ডিটেকটিভের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সব কথা বলেছিলেন।

'আপনি যুগলকিশোরের সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড বিরূপ ধারণা নিয়ে ওঁদের কাছে গিয়েছিলেন। যুগলকিশোর, অর্থাৎ নিখিলেশ, ইচ্ছে করে তার চালচলনকে এমন বিরক্তিকর করে তুলেছিল যে, আপনি ধরে নিয়েছিলেন সে একটা বদমায়েশ লোক। কিন্তু সে সত্যিকার ডিটেকটিভ, সে কখনও আপনার মতো এইরকম ওপর-ওপর দেখে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। সবকিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে সমস্ত সম্ভাবনার কথা বিচার করে দেখাই তার অভ্যাস। এইসব ডিটেকটিভরা আপনাকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যুগলকিশোর সম্বন্ধে আপনার ধারণার সঙ্গে তাঁরা একমত হতে পারেননি। তাঁরা যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, সেটা আমি অনুমান করতে পারি। তাঁরা ভেবেছিলেন, যুগলকিশোর কি সত্যিই একটা বদমায়েশ লোক? বদমায়েশ লোক যদি হয়, তাহলে সে কীসের জন্যে বারবার আপনাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে? যদি আপনাদের কাছ থেকে কিছু চাওয়া তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে এতবার সে এসেছে, এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করত। তা যদি না হয়, তাহলে কী সে চায়? আপনারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিশ্চয়ই দামি হীরে-জহরত আপনাদের বাড়িতে নেই, আর তা যদি থাকত, তাহলে প্রথমেই আপনারা ভাবতেন যুগলকিশোর তার জন্যে এসেছে, সেই কথাই ডিটেকটিভদের কাছে আপনি বলতেন। টাকাও নিশ্চয় আপনারা ব্যাঙ্কে রাখেন। তাহলে আপনাদের কাছে এমন কিছু নেই, যার জন্যে একটা বদমায়েশ আকৃষ্ট হতে পারে। তবে কি আপনাদের বাগানে সাত ঘড়া মোহর পোঁতা আছে? এ ধরনের ব্যাপার গল্পে ঘটতে পারে, বাস্তব জীবনে ঘটে না। এখনকার কালে কেউ একজায়গায় অতখানি সম্পদ পুঁতে রাখে না, কারণ চুরি হলে একসঙ্গেই সব যাবে; আর পোঁতারই বা দরকার কি, সেফটি ভল্টেই তো এসব জিনিস রাখা যেতে পারে।

'সুতরাং আপনাদের বাড়িতে একটা বদমায়েশকে আকৃষ্ট করার মতো কিছুই নেই। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ডিটেকটিভরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, যুগলকিশোর বদমায়েশ নয়। তাহলে সে কী? নিশ্চয়ই গোয়েন্দা। গোয়েন্দা যখন, তখন কী সে খুঁজছে? আপনাদের ছোট বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও মাদকদ্রব্য তৈরির বা জাল নোট ছাপার কারখানা নেই। থাকলে আপনি তা টের পেতেন। তাহলে গোয়েন্দা খুঁজছে কোনও অপরাধীকে, যে কোথাও লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁদের কাছে বেশ পরিষ্কার হল। কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন এই যে, সেই ফেরারি অপরাধীটি কি আপনাদেরই বাড়িতে আছে? না-ও থাকতে পারে, কারণ কেবলমাত্র আপনাদের বাড়িতেই যুগলকিশোরের মতো অচেনা লোকের আবির্ভাব ঘটেনি, সমস্ত পাড়াটাতেই দিনের পর দিন বহু অচেনা লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় আপনাদেরই বাড়িতে সেই আততায়ীটি রয়েছে, তাহলে কোন ব্যক্তি সেই আততায়ী হতে পারে? আপনি বা আপনার দাদা বা আপনার বউদি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে, তা ছাড়া, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধী হতেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ডিটেকটিভদের কাছে যেতেন না। অপরাধী নিজেদের সম্বন্ধে অতিনিশ্চিত হয়ে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ডিটেকটিভের কাছে গেছে, এরকম কথা কোনও-কোনও গল্পের বইয়ে পড়া যায় বটে, কিন্তু এটা নিতান্তই বাজে কথা। সাধ করে নিজের বিপদ কেউ ডেকে আনে না। অতএব সেই অজ্ঞাতনামা অপরাধীটি যদি আপনাদেরই বাড়িতে থেকে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আপনাদের বাড়ির বাকি তিনজন লোকের মধ্যে একজন। এই তিনজন হল, আপনাদের চাকর রঘু, মালি দুখীরাম এবং পার্ট-টাইম কুক করুণা।

'আমি অনায়াসেই বলতে পারি যে, ডিটেকটিভদের চিন্তাধারা অতঃপর এদেরই ওপর নিবদ্ধ

হল এবং চিন্তা করে এঁরা বুঝতে পারলেন যে, এদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। প্রথমে রঘুর কথা ধরা যাক। সে আপনাদের বাড়িতে যেভাবে ঢুকেছে, তা বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক লাগে। আপনাদের বাড়িওয়ালা সুদূর মিরাট থেকে ছুটে এলেন কলকাতার বাড়িটি ভাড়া দেওয়ার জন্যে, তারপর বাড়িটি আপনাদের দিলেন নিতান্ত কম ভাড়ায়। ও-বাড়িতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের চাকর ভূতের ভয় পেয়ে পালাল। তখন নতুন চাকর দিল কে? না, আপনাদের সদাশয় বাড়িওয়ালা। দিয়েই তিনি মিরাটে চলে গেলেন। ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে লাগে না? তারপর দেখুন, রঘু দিনরাত বাড়িঘর ঝাঁট দিচ্ছে আর টিনের জঞ্জাল বাইরে ফেলছে। তারপর, বিকেলে ও হঠাৎ খুব চনমনে ফুর্তিবাজ কর্মঠ হয়ে ওঠে, আবার সন্ধের পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। সবটাই অদ্ভুত। তারপর দেখুন দুখীরাম। ও-বাড়ি যারই দখলে থাকুক না কেন, দুখীরাম সবসময়েই সেখানে থাকছে। সাবেক মালিক বিরাজবাবুর আমলেও ছিল, নতুন মালিক পীতাম্বরবাবুর আমলেও ছিল, আবার আপনারা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পরেও সে আছে। পাছে আপনারা তাকে না রাখেন, যেন সেইজন্যেই পীতাম্বরবাবু আপনাদের বললেন, "বাড়ি আপনাদের দিলাম বটে, কিন্তু বাগান আমারই দখলে থাকবে।" তারপর দেখুন, বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্যে দুখীরামেরও আগ্রহ কম নয়। এর কারণ কী? শুধু কি মালিকের প্রতি loyalty? আপনাদের পুরোনো চাকর যে বাগানে ভূত দেখে ভয় পেয়ে পালাল, তাকে ভয় দেখাবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ বাগানের মালি দুখীরামেরই ছিল, রঘু বা করুণা তখনও আপনাদের বাড়িতে আসেনি। সুতরাং তাকেও সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তারপর করুণা। হঠাৎ একদিন সে এসে পড়ে নিজের থেকে চাকরি চাইল। অথচ এই ধরনের লোকের আজকাল demand এত বেশি যে, এদের দোরে-দোরে চাকরি খুঁজে বেড়াতে হয় না, চাকরিই এদের খুঁজে বেড়ায়। আর আপনারা লোকটার সম্বন্ধে কিছু না জেনেই তাকে কাজে বহাল করে বসলেন। তারপর দেখুন, লোকটা যখন খুশি অফিসে যায়, যখন খুশি অফিস থেকে ফেরে, আর রোজ রাশি-রাশি চিঠি লেখে। সুতরাং তাকে খুব সহজ লোক বলে মনে হয় না।

'এই থেকেই ডিটেকটিভরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে কারও না কারও নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। অর্থাৎ, ওদের মধ্যে এমন অন্তত একজন লোক আছে যে চাকর class-এর লোক নয়, এখন আত্মগোপন করে চাকর সেজে বসে আছে এবং সম্ভবত এই লোকটিই সেই অজ্ঞাতনামা অপরাধী।

'কিন্তু কী করে সেই লোকটিকে ধরা যাবে? যাতে ধরা যায়, তার দুটি test নিতে আপনাকে বললেন দুজন ডিটেকটিভ—মিঃ ব্যোমকেশ বক্সী আর মিঃ হুকা-কাশি।

'ব্যোমকেশবাবু আপনাকে বললেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির পায়ের তলা আর তার আশপাশগুলো কী ধরনের, তা জানা দরকার।" এ-কথা বলার কারণ, আমাদের দেশের চাকর class-এর লোকদের সঙ্গে ভদ্রলোকদের পায়ের তলার চেহারার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। চাকর class-এর লোকেরা, যারা বাড়িতে কাজ করে, তারা সবসময়েই খালি পায়ে থাকে, তার ফলে তাদের পায়ের তলা খুব শক্ত হয়। আর ভদ্রলোকেরা প্রায় সবসময়েই জুতো পরে বলে তাদের পায়ের তলাটা নরম থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা পা-ঢাকা জুতো পরে, তাদের গোড়ালিতে আর কড়ে আঙুলে কড়া পড়ে। আর যারা চটি পরে তাদের পায়ের পেছন দিকটা ফেটে যায়। এখন, আপনাদের রঘু-দুখীরাম-করুণা এরা যদি সত্যিই ভৃত্য শ্রেণির লোক হয়, তাহলে তাদের পা হবে এইরকম। রঘু আর দুখীরাম সবসময়েই খালি পায়ে থাকে, সুতরাং তাদের পায়ের তলা খুব শক্ত হবে, তাতে কড়া মোটেই থাকবে না। করুণা যখন বাড়িতে থাকে, রান্না করে—তখন সে খালি পায়েই থাকে, বছরের মধ্যে কিছুদিন সে নিশ্চয়ই দেশে কাটায়, সেখানে সে খালি পায়েই থাকে। কিন্তু সে অফিসে যায় জুতো পরে। সুতরাং তার পায়ের তলা শক্তই হবে, কিন্তু তার পায়ে অল্পস্বল্প কড়াও থাকবে। এখন এই তিনজনের কারও পায়ের নীচের অংশ যদি ঠিক যেরকম

হওয়া উচিত, সেরকম না হয়ে অন্যরকম হয়, বুঝতে হবে তিনি বর্ণচোরা। যেমন, এদের কারও পায়ের তলা যদি নরম হয় অথবা বঘু দুখীরাম এদের মধ্যে কারও পায়ে যদি কড়া থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি চাকর class-এর লোক নন, চাকর সেজে আপনাদের বাড়িতে রয়েছেন।

'তারপর ধরুন মিঃ হুকা-কাশির প্রশ্নটা। এর মধ্যে যে কতখানি subtlety আছে, তা আপনি ধরতে পারেননি। উনি বলেছিলেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে একজন পেটরোগা, তাই না?" এখন দেখুন, চাকরবাকরদের আমরা কী খেতে দিই? আমরা যা খাই, তাই কি তাদের দিই? না, তা দিই না। তাদের খেতে দিই মোটা চালের ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট, আর কোনওদিন পুঁটি জাতীয় একটা মাছের ঝোল, জলখাবার খেতে দিই মুড়ি আর শুকনো রুটি। তারপর আমরা যেসব খাবার খাই, সেগুলো বাসি হয়ে গেলে অনেক সময় তাদের দিই। এইসব জিনিস খেয়ে আপনি থাকতে পারবেন না, কিন্তু ওরা পারে। এই খাওয়াতেই ওরা অভ্যস্ত। চাকর-বাকরদের হজম-শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি, ওদের মধ্যে সাধারণত কেউ পেটরোগা হয় না। এ কাজ, এ খাওয়া পেটরোগা লোকরা stand করতে পারে না। এখন দেখুন, মিঃ হুকা-কাশি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, আপনাদের চাকরদের মধ্যে একজন বর্ণচোরা। কিন্তু ওই বর্ণচোরা লোকটি আগে যা খেতেন, আপনাদের কাছে তার চেয়ে অনেক খারাপ খাদ্য পাচ্ছেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই পেট-রোগা হয়ে পড়েছেন। আপনি কয়েকদিন চাকরদের খাওয়া খেয়ে দেখুন, আপনিও পেটরোগা হয়ে পড়বেন। সুতরাং এখন বুঝতে পারছেন তো, মিঃ হুকা-কাশির প্রশ্নের তাৎপর্যটা আসলে কী?

'তারপর ধরুন জয়ন্তবাবু। তিনি আপনাকে জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালি—এদের বাড়ি কোথায়?" এ-প্রশ্ন করার অর্থ এই যে, কোনও অপরাধী যদি আপনাদের বাড়িতে চাকর সেজে থাকে, তাহলে সে কিছুতেই তার বাড়ির সঠিক ঠিকানা দেবে না—মিথ্যে ঠিকানা দেবে এবং এমনভাবে দেবে, যাতে কেউ সহজে যাচাই করতে না পারে, সে ঠিকানা সত্যি কি না। এখন, আপনাদের চাকর-রাঁধুনি-মালির মধ্যে কারও ঠিকানায় যদি একটু গন্ডগোল থাকে, তাহলে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সেই লোকটিই বর্ণচোরা। আপনি জয়ন্তবাবুর প্রশ্নের যে, উত্তর দিলেন, তা শুনে জয়ন্তবাবু খুশি হলেন। আপনাদের রাঁধুনি করুণার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার বলরামচক গ্রামে, চাকর রঘুর বাড়ি কটক জেলার গজপতিপুর গ্রামে। সত্যিই ওদের ওখানে বাড়ি কি না, তা আমরা যে-কোনও মুহূর্তে যাচাই করে নিতে পারি। কিন্তু দুখীরামের কোথায়? না—ঢাকা জেলার তাঁতীপাড়া গ্রামে, অর্থাৎ পাকিস্তানে। সে-দেশের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নেই। কাজেই সত্যিই সেখানে দুখীরামের বাড়ি কি না, তা যাচাই করবার কোনও উপায় নেই। তারপর আর-একটা ব্যাপার দেখুন। এটা কেন আপনাদের চোখে পড়েনি? পূর্ববঙ্গের কোনও লোক কারও বাড়িতে মালিগিরি করছে, এ কি আপনি আর কোথাও দেখেছেন? শুধু পূর্ববঙ্গ কেন, ওড়িশা ছাড়া অন্য কোনও জায়গার লোক মালির কাজ করছে, এ জিনিসও আপনি বাংলাদেশে খুব কমই দেখতে পাবেন। এখানে মালির কাজটা ওড়িয়াদের প্রায় একচেটে। আর দুখীরাম বাবাজি পূর্ববঙ্গের লোক অথচ মালি। এটা খুবই অসাধারণ ব্যাপার। এই দুটো কারণে জয়ন্তবাবুর দুখীরামের ওপরেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের ওখানে গিয়ে সবকিছু দেখার আগে তিনি কোনও মত প্রকাশ করা সঙ্গত বলে মনে করেননি।

'বাকি রইলেন পরাশরবাবু। তাঁর মনে একটা জিনিস বিশেষভাবে strike করেছিল—আপনাদের চাকরদের বারবার বাড়িঘর ঝাঁট দেওয়া আর জঞ্জালগুলো টিনে ভরে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে আসার ব্যাপারটা। তিনি সন্দেহ করলেন, আসলে বোধহয় জঞ্জালের মধ্যে দিয়ে কোনও কিছু পাচার করা হচ্ছে—এমন কিছু, যা প্রকাশ্যে চালান দেওয়া যায় না—যেমন চোরাই মাল বা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য। এইসব জিনিসের ওজন জঞ্জালের চেয়ে ভারী, তা ছাড়া এগুলো জঞ্জালের মধ্যে রাখতে গেলে প্যাক করে রাখতে হবে, প্যাকেটেরও ওজন আছে। এইজন্যে তিনি আপনাকে জঞ্জালগুলো ওজন করতে বলেছিলেন—দিনের পর দিন, বারবার। অর্থাৎ ভরা টিনের মধ্যে যখন শুধু জঞ্জালই

থাকবে, তখন তার ওজন প্রতিবারই মোটামুটি এক হবে। কিন্তু যদি কোনও সময়ে টিনের ওজন অপেক্ষাকৃত ভারী হয়, তাহলে বুঝতে হবে তখন অন্য কোনও একটা জিনিস জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনি তাঁর নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি।'

আমি বললাম, 'আমি তো কারও নির্দেশের তাৎপর্যই বুঝতে পারিনি। ওঁরা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে আর কোনও গন্ডগোল থাকত না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'সে কোনও ডিটেকটিভই করেন না প্রফেসর সেন। সম্পূর্ণ রহস্যভেদ করার আগে যখন ওঁরা কোনও একটা point বুঝতে পারেন, তখন সেটা কখনওই ব্যাখ্যা করেন না। সবকিছু ওঁরা ব্যাখ্যা করেন একেবারে শেষে। আপনার উচিত ছিল ওঁদের নির্দেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না করে সে-নির্দেশ পালন করা। আপনি তা যে একেবারে করেননি, তা নয়। কিন্তু তাঁদের নির্দেশ অনুসারে চলে আপনি যা জানতে পেরেছিলেন, তা ওঁদের কিছু জানাননি। জানালে ওঁরা অনেক আগেই সমস্ত রহস্য ভেদ করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু আপনি ওঁদের কিছু জানাননি, কারণ তখন আপনার মন অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। Excuse me, Professor Sen.'

আমি মিঃ হাজরার কথায় অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলাম। কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যেই আমি বললাম, 'আপনি বুঝি ওঁদের সঙ্গে আমার interview-এর কথা শোনামাত্রই সব বুঝে নিলেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'হ্যাঁ। যখন আপনার কাছে জয়ন্তবাবুর প্রশ্ন আর তার উত্তর এবং সেই উত্তর শুনে জয়ন্তবাবুর খুশি হওয়ার কথা শুনলাম, তখনই দুখীরামের ওপর আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল। তারপর যখন শুনলাম কিছুদিন রাত্রে আপনি জঞ্জালের ভরা টিন হাত দিয়ে তুলে তার ওজন আন্দাজ করেছেন আর দু-রাত্রে টিনটা আপনার কাছে অন্য সময়ের তুলনায় ভারী ঠেকেছে, তখন আমার সন্দেহ বাড়ল। রাত্রিতে জঞ্জালের টিন নিয়ে কে বাইরে যায়? দুখীরাম। ওই দু-রাত্রির ব্যবধান আপনি বললেন হপ্তাখানেক। এর থেকে আমি সন্দেহ করলাম এক হপ্তা অন্তর ও সেই বস্তুটি বাইরে পাচার করে।

'তারপর আপনি যখন বললেন দুখীরামের পায়ের তলা খুব শক্ত অথচ তার পায়ের পাশ, গোড়ালি আর কড়ে আঙুলে খুব বেশি কড়া পড়েছে, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, দুখীরাম আসলে ভদ্রলোক class-এর লোক, মালি সেজে আছে। দু-বছর ধরে সে মালির কাজ করছে, এই দু-বছর সে সবসময়ে খালি পায়ে চলাফেরা করছে, তাই তার পায়ের তলা শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দু-বছর আগে সে সবসময় জুতো পরত, তখন তার পায়ের পাশে, গোড়ালিতে আর কড়ে আঙুলে কড়া পড়েছিল, সেই কড়া এখনও রয়ে গেছে। কড়া একবার পড়লে আর যায় না। দুখীরাম যদি originally চাকর class-এর লোক হত, তাহলে ওর পায়ে কড়া পড়ত না।

'এবং আমি একেবার স্থিরনিশ্চিত হলাম যখন শুনলাম আপনাদের তিনজন ভৃত্যশ্রেণির লোকের মধ্যে একমাত্র দুখীরামই পেটরোগা। এর থেকে বুঝলাম উনি একটি কর্পচোরা, সারা জীবন সুখাদ্য খেতে অভ্যস্ত, তাই আপনাদের দেওয়া চাকরের খাবার ওঁর পেটে সহ্য হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের দেওয়া খাবার যদি দুখীরামের সহ্য না হত, তাহলে সে সেগুলো খেত কেন? তার তো তা খাওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমরা যখন তাকে বললাম যে, আমাদের বাগানের কাজ করার বদলে আমরা তাকে খেতে দেব, তখন সে তা refuse করলেই তো পারত।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাই কখনও সে পারে! সাত্যকি এমনভাবে চলত, যাতে আপনারা মনে করতে না পারেন, সে সাধারণ একটা মালি ছাড়া আর কিছু। একটা সাধারণ মালিকে আপনারা সামান্য একটু কাজ করার বদলে পেটভরে খেতে দিতে চাইছেন, এ তো তার কাছে লোভনীয় প্রস্তাব। কত্তাবাবুর দেওয়া মাইনের থেকে তাহলে একটা পয়সাও খাওয়ার জন্যে তাকে খরচ করতে হবে

BanglaBook.org

না। সাত্যকি মালি হিসেবে নিজের স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আপনাদের দেওয়া খাবার গপগপ করে গিলত আর তার ফলে পেটের গোলমালে ভুগত।

'সে যাক! গোড়ায় যা বলছিলাম, সেই কথায় ফিরে আসা যাক। আপনি যদি ওই চারজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে না যেতেন, তাহলে সাত্যকি কোনওদিনই ধরা পড়ত না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর সেন, আপনি ওঁদের কাছে গিয়েছিলেন বলে আর ওঁদের নির্দেশ অনুযায়ী চলে যা জানতে পেরেছিলেন তা আমায় জানিয়েছেন বলে। অবশ্য আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন। আর-একটু দেরি করলে আর ওকে ধরা যেত না। আপনার কথা শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনাদের দুখীরামটি বর্ণচোরা। সে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রঘুর সমান আর তার আসল চেহারাটা চুল-দাড়ি, গোঁফের আড়ালে অনেকখানি ঢাকা। সুতরাং সম্ভবত দুখীরামই সাত্যকি। আপনার কাছে তার চেহারার বিবরণ শুনে আমরা এই ধারণা দৃঢ় হল। তারপর আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ধরার জন্যে ছুটে গেলাম বলে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারলাম।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'কতকগুলো ব্যাপার আমি আগে বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। যেমন একদিন রঘু চুপিচুপি দুখীরামের ঘরে ঢুকেছিল। দুখীরাম ফিরে এসে রঘুকে তার ঘরে দেখে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিল, তারপর রঘু খুব নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, হাঁপাচ্ছিল—।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'দুখীরাম যে, রঘুকে বিকেলবেলায় পানের সঙ্গে কোকেন খাওয়াত, তা রঘু জানত না। সে শুধু এইটুকুই জানত যে, বিকেলের পানটা খেলেই তার ফুর্তি আসে। সেদিন সে দুখীরামের দেখা না পেয়ে তার ঘরে ঢুকে গিয়েছিল পানের সন্ধানে। এদিকে দুখীরামের ঘরে হাজার-হাজার টাকার সোনা থাকে—যদিও সেগুলো বাক্সয় তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলেও তার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে কারও ঢোকা স্বভাবতই সে পছন্দ করত না। তাই রঘুকে সে সেদিন গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পানও খেতে দেয়নি। যে রোজ কোকেন খায়, সে একদিন কোকেন না পেলে অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে যায়। রঘু সেদিন তাই হয়ে পড়েছিল।'

আমি বললাম, 'আর-একটা কথা। রঘুকে বাইরে থেকে বেশ চালাক দেখাত, কিন্তু ও মাঝে-মাঝে বোকা-বোকা কথা বলত কেন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'ওটা কোকেনেরই প্রভাবে।'

আমি বললাম, 'দুটো বিষয় এখনও পরিষ্কার হল না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কোন দুটো বিষয়?'

আমি বললাম, 'একদিন উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী উমাশঙ্করবাবুকে ভয় দেখিয়েছিলেন, "আমি সব কথা ফাঁস করে দেব।" "সব কথা" মানে কী? সেটা বোধহয় আপনারা জানেন না?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'পুলিশ জানে না এমন ব্যাপার খুব বেশি নেই। উমাশঙ্করবাবুর গোপন রহস্যটির কথাও আমরা সবই জানি। সে রহস্যটা এই যে, যে-মহিলাটিকে সবাই উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী বলে জানে, তিনি ওঁর স্ত্রী নন।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'স্ত্রী নন?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'না। আসলে ব্যাপারটা এই—উমাশঙ্করবাবু প্রথম যৌবনে বোম্বাইয়ে কেরানির চাকরি করতেন। তখনও তিনি লেখক হননি। সেই সময়ে বোম্বাইয়ের আর-এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হয়। তাঁর বাড়িতে উনি রোজই যেতেন। তার ফলে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়। সেই আলাপ ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। ওই মহিলাই উমাশঙ্করবাবুর সৃষ্টি ও প্রেরণার উৎস খুলে দেন এবং ওঁকে নিয়েই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। তারপর দুজনের প্রেম যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছয় তখন উমাশঙ্করবাবু মহিলাটিকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং সকলের কাছে তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। তখন হিন্দু মেয়ের ডিভোর্স করার

BanglaBook.org

আইন ছিল না। এখন তা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি ওই মহিলা পূর্বতন স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করেন তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে, কারণ, এত বছর ধরে সকলেই জেনে আসছে উনি উমাশঙ্করবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী।

'সেই ভদ্রলোক এই স্ত্রীর আর কোনও খোঁজ করেননি। তিনি অন্য বিয়ে করে বহুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছেন। কিন্তু উমাশঙ্করবাবুর ভারী ভয় যদি কোনওদিন আসল কথা ফাঁস হয়ে যায়! তাহলে তাঁর এত মানসম্মান ধুলোয় লোটাবে।'

আমি বললাম, 'সেইজন্যে সেদিন তিনি ডিটেকটিভের কথা শুনে অত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর সেইজন্যেই ঝগড়ার সময় ওঁর এই তথাকথিত স্ত্রী ওঁকে ভয় দেখান, "তোমার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।" কিন্তু তা কোনওদিন তিনি ভাঙেন না, কারণ ভাঙলে তো তাঁর নিজের হাঁড়িও ভাঙা যাবে। তবে এই মহিলা উমাশঙ্করবাবুর স্ত্রী না হলেও উনি উমাশঙ্করবাবুর জন্যে যা করেছেন, নিজের স্ত্রীও তা অনেক সময় করে না। উমাশঙ্করবাবুর প্রথম দু-তিনখানা বইয়ের পাবলিশার পাওয়া যায়নি। তখন এই মহিলা নিজের গয়না বিক্রি করে সেই টাকায় ওঁর বই ছাপিয়েছিলেন। তিনি যদি সেদিন তা না করতেন, তাহলে উমাশঙ্করবাবুর আজ এত নাম, এত টাকা—কিছুই হত না।'

আমি বললাম, 'ও! সেইজন্যেই উনি বলছিলেন, এ সমস্তর গোড়াপত্তন কীসের থেকে হয়েছে?'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এ তো গেল একটা বিষয়। আর একটা বিষয় কী, যা এখনও পরিষ্কার হয়নি?'

আমি বললাম, 'করুণার ব্যাপারটা। করুণা কেন অত দেরি করে অফিসে যেত, সকাল-সকাল বাড়ি ফিরত, রোজ-রোজ রাশি রাশি চিঠি লিখত, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'এই ব্যাপারটা সম্বন্ধেও আমি এই ক'দিনে খোঁজ নিয়ে সব জেনেছি। করুণা একটি রত্ন। ও এ পর্যন্ত অনেক অফিসে কাজ করেছে, কিন্তু সব অফিসেরই কাগজ, পেন্সিল, কলম, খাতা, ফাইল এবং আর সব জিনিস চুরি করে বিক্রি করেছে, তারপর একদিন ধরা পড়েছে আর সেইসঙ্গে তার চাকরি গেছে। ও অনেক বাড়িতে পার্ট-টাইম বাঁধুনির কাজ করেছে। সেখানেও এটা সেটা চুরি করেছে, তার ফলে তারাও ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এইজন্যে ও দোরে-দোরে ঘুরে সবাইকে সেধে বেড়াত ওকে রান্নার কাজ দেওয়ার জন্যে, যেভাবে ও আপনাদের কাছে এসেছিল। আপনার বউদি তাঁর লোক চেনার ক্ষমতা সম্বন্ধে cock-sure বলেই কোনও খোঁজখবর না করে ওকে রেখেছিলেন, অন্য কেউ হলে খোঁজখবর নিয়ে ওর হাতটানের কথা জানতে পারত, আর ওকে রাখত না। আপনাদের বাড়িতে যখন ও ঢুকেছিল, তখন ও সত্যিই চন্দ্রমল অ্যান্ড সন্সের অফিসে কাজ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেখান থেকে চুরির অপরাধে ওর চাকরি যায়। কিন্তু আপনাদের ও কিছু জানায়নি, পাছে আপনারা কেন চাকরি গেল তা অনুসন্ধান করে ওর চুরির কথা জানতে পেরে তাড়িয়ে দেন। এর পরেও ও যেন অফিস যাচ্ছে, এইভাবেই রোজ বেরোত, কিন্তু যখন খুশি বেরোত, যখন খুশি ফিরত। রোজ-রোজ ও যেসব চিঠি লিখত, সবই চাকরির দরখাস্ত। তবে ওর চুরির কথাটা চারদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোনও অফিসই ওকে চাকরি দিতে চাইত না। আপনারা ও-বাড়ি ছাড়ার কিছুদিন আগে ও একটা চাকরির জোগাড় করেছিল। তখন ও ঠিক সময়েই অফিসে যেত, ঠিক সময়েই ফিরত, চিঠিও লিখত না—সে আপনি লক্ষ করেছেন। তবু ভাগ্যি ভালো, লোকটা আপনাদের কোনও জিনিস সরায়নি।'

আমি বললাম, 'সে-কথা হলফ করে বলতে পারব না। ছোটখাটো জিনিসের হিসেব আমরা কেউই রাখি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'তাই নাকি? সেটা মোটেই ভালো নয়। ভবিষ্যতে সব জিনিসের হিসেব

BanglaBook.org

রাখবেন। আর চাকর রাখবার সময় ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন। আর—আর—।'

এই বলে মিঃ হাজরা একটু হেসে বললেন, 'আর কেবলমাত্র মেয়েদের কথার ওপর ভরসা করে কোনও কাজ করবেন না।'

আমি বললাম, 'মিঃ হাজরা, অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমি এসেছি। এইবার আমি উঠি।'

'উঠবেন? আচ্ছা!' বলে মিঃ হাজরা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, 'আর-একটা কথা। আমি যখন সাত্যকি ওরফে দুখীরামের নকল দাড়ি-গোঁফ টেনে খুলে ফেললাম, তখন আপনি দুখীরামকে চিনতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "তাহলে মাস্টারমশাই আর দুখীরাম একই লোক?" কী করে এ-কথা আপনি বললেন, প্রফেসর সেন? এরকম একটা আষাঢ়ে কল্পনা করতে আপনার বাধল না?'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না-না, মানে সেসময় এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। যা হঠাৎ মনে হয়েছিল, তাই তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

মিঃ হাজরাকে নমস্কার জানিয়ে আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি এমনসময় মিঃ হাজরা বললেন, 'প্রফেসর সেন, আপনার morose ভাবটা এখনও কাটেনি। আপনি কি খুবই আঘাত পেয়েছেন? অবশ্য পাওয়াই স্বাভাবিক। আপনার হৃদয়মন যার জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন সে যে এমন তা জানতে পেরে আপনার মন তো ভেঙে যাবেই। কিন্তু—।'

এই বলে মিঃ হাজরা আমার হাত ধরে বললেন, 'নারী জাতিকে বিশ্বাস করে ঠকেনি এমন লোক জগতে বিরল, প্রফেসর সেন। যে-অভিজ্ঞতা আপনার একদিন হতই, তা এখনই হয়ে গেল। আপনার ভাগ্য ভালো, অল্পেই আপনি রেহাই পেয়েছেন।'

আমি কোনও কথা না বলে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিকেল হয়ে গেছে।

লালবাজার থানা থেকে বেরিয়ে আমি হাঁটতে-হাঁটতে ময়দানে এসে পড়লাম।

ময়দানের একটু ভেতর দিকে চলে গিয়ে একজায়গায় ঘাসের ওপরে বসলাম।

সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মনের মেঘ পরিষ্কার হল কই?

তিন মাস আগে আমি যা ছিলাম, আজও কি তাই আছি?

এই ক'মাসে যেন আমার মনের রাজ্যে একটা ভূমিকম্প এসে সমস্ত ওলটপালট করে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠে আমার জীবনের আকাশকে আলোয় আলো করে তুলেছিল। তখন বুঝিনি এ-আলো ক্ষণিকের—একটু বাদেই নিভে যাবে—পড়ে থাকবে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ইলা! যেদিন তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে, সেদিন আমি দুঃখিত হয়েছিলাম—কিন্তু নিজেকে রিক্ত, সর্বস্বান্ত বলে মনে করিনি, যেমন আজ করছি—তোমার সব কথা জানবার পরে।

প্রেমের ব্যর্থতা মর্মন্তুদ হলেও তার মধ্যে একটা মহিমা আছে। তার স্মৃতিকে অবলম্বন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু প্রেম যখন ঘৃণায় পরিণত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক দুর্বিষহ অভিশাপ।

এই অভিশাপের বোঝা আমায় সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

BanglaBook.org

আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়

বিমল সাহা

অমিতেশ তার সমুদ্র-সবুজ ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখে এসে সদর দরজার কলিংবেল টিপল। কলিংবেলের আওয়াজ ঘরের ভেতর পিয়ানোর টুংটাং শব্দ করে ছড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ। আবার অমিতেশের ব্যস্ত আঙুল চেপে ধরল কলিংবেলের সাদা বোতামটা। বেল বেজে যায়। দরজা খোলে না কেউ। লনের আলোয় ঘড়িটা দেখে নেয়। রাত একটা। ফিল রোডের চারপাশে নিথর স্তব্ধতা, মাঝে-মাঝে বিলিতি কুকুরের একটানা ডাক। রাত বেশি হয়েছে ঠিকই। তবে মাধুদি, মতিয়া আর বুড়ি আম্মার কেউ-না-কেউ এতক্ষণ দরজা খুলে দেয়ই। আবার কলিংবেলের বোতামে আঙুলটা জোরে চেপে ধরল। এক মিনিট। দু-মিনিট। একটানা পিয়ানোর টুংটাং শব্দের রেশ। দোতলার বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। বুঝল মাধুদি জেগে উঠেছে। কিন্তু না, এবারও কেউ আসছে না। দূরে মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা লরি মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে গেল। খালের এপারে পোর্টের রেলগাড়ির শান্টিং-এর রাত-জাগানো যন্ত্রণা।

মতিয়া দরজা খুলে দিয়েছে।

বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে গেল, এতক্ষণ কী করছিলে তোমরা? বাড়িতে কি কেউ নেই?

মাজি এখনও বাড়ি আসেনি, বাবু!—মতিয়া কাঁপছে।

মাজি নেই তো তোমরা তো ছিলে।—বলতে-বলতে দোতলার সিঁড়ির মুখে বুড়ি আম্মার কান্না শুনে অমিতেশ দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ি আম্মা কাঁদছে! ছেলেবেলা থেকে ও এ-বাড়িতে আছে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওকে মানুষ করেছে বুড়ি আম্মাই। জড়িয়ে ধরে বুড়ি আম্মাকে জিগ্যেস করল, কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

বউরানি আর আসবে না, খোকাবাবু! আমি ঠিক জানি আর আসবে না।—হাপরের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উঠছে বুড়ি আম্মার ন্যুব্জ শরীরটা।

কী বলছ তুমি? সুনীতা কোথায় গেছে? কেন আসবে না? ও তো প্রায়ই ক্লাব থেকে রাত করেই ফেরে। দেরি হচ্ছে হয়তো। নিশ্চয়ই আসবে। অত ভাবছ কেন?—অসংলগ্নভাবে অজস্র প্রশ্নের ঝড় ভেঙে পড়ল অমিতেশের গলা দিয়ে।

ওপরে এসো অমি, হয়তো সুনীতা আর আসবে না।

কে? মাধুদি! চমকে ওপরদিকে তাকায় অমিতেশ। ডাক্তার অমিতেশ সেন। প্রায়-চল্লিশ দৃপ্ত মানুষটা যেন এক আবেশে সাত বছরের শিশু হয়ে যায়। বুকের মধ্যে মৃদু-মৃদু ইথারের কাঁপুনি। ভয়? এরই নাম কি ভয়? কেমন একটা অবশতা দু-পায়ে জড়িয়ে ওঠে লতিয়ে-লতিয়ে। সিঁড়ির রেলিং ধরে দোতলার বেডরুমের দিকে এগোয়।

কাছে আসতেই মাধুদি অমিতেশকে ডানহাতে আঁকড়ে ধরে।

চলো শোবে চলো!

মাধুদির দৃপ্ত স্বরে মোহাচ্ছন্ন অমিতেশ। মুহূর্তে একটি জিজ্ঞাসা ছুড়ে দেয়, তোমরা সবাই এমন ভয় পেয়েছ কেন? সুনীতার তো আজ চোদ্দো বছর ধরেই বাড়ি ফিরতে এমন রাত হয়। ক্লাব, পার্টি, ড্যান্স, ফাংশান—এসব সেরে কোনদিন ও রাত বারোটার আগে বাড়ি ফেরে বলতে পারো মাধুদি? তবু তোমরা ভাবছ ও আসবে না।

চলো, সব বলছি। আমিও বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে মতিয়া আর বুড়ি আম্মার মুখেই সব শুনে আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে সুনীতা বোধহয় চলে গেল।

দোতলার পুবদিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল অমিতেশ। আকাশ জুড়ে চাঁদের আলো রুপোর পাতের মতো পড়ে আছে। রাতজাগা কোনও একটা পাখি বোধহয় ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। শরতের মিঠে হাওয়া চোখের পাতায় একটু করে ঘুমের রেশ এনে দেয়। পাশে নাইট-গাউন পরে বসে মাধুদি। কতকগুলো স্নেহের আঙুল ক্লান্ত অমিতেশের মাথায় এলোমেলো ঢেউ তুলছে। মাধুদি। দূরসম্পর্কের পিসতুতো দিদি। জন্মের সময়েই মাধুদি মাকে হারায়। দু-চারদিনের মধ্যেই বাবাও

BanglaBook.org

নাকি হার্টফেল করেন। সেই থেকে এ-বাড়িতেই মানুষ। বয়সে হয়তো বছর দশেকের বড়ই হবে মাধুদি। অথচ বরাবরই অমিতেশ তার নিঃসঙ্গ জীবনের যত হাসি-কান্না, ব্যথা-যন্ত্রণা সব কিছুরই ভাগ মাধুদিকে দিয়ে হালকা করেছে নিজেকে। মাধুদিও কী বিচিত্র! ছেলে পছন্দ করতে-করতে আর বিয়েই করা হল না তার। মেয়েদেব বয়েসে এমন একটা সময় হয়তো আসে যখন সেখানে আর কোনও অপরিচিত আগন্তুকের পদচিহ্নে কোনও ক্ষতের সৃষ্টি হয় না।

কী ভাবছ অমি?—মাধুদির স্বরে চমকে ওঠে অমিতেশ।

সুনীতা কি পালিয়ে গেল? না কি কেউ তাকে কিডন্যাপ করেছে? পুলিশে তো অন্তত একটা ফোন করা দরকার।

পুলিশ!—মাধুদি সেই নিশীথ রাতে প্রায় চিৎকাব কবে ওঠে।

কেন, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?

কী বলছ অমি? আমাদের এত বড় বাড়ির নাম খবরের কাগজে উঠবে? লোকে বলবে অমিতেশ সেনের বউ পালিয়েছে? কত রং-বেরঙের খবর বানিয়ে গল্প বেরোবে? সোসাইটিতে, ক্লাবে, বাবে, সবাই চোখ টেবিযে তাকাবে। না-না, দু একদিন দ্যাখো না। হয়তো সুনীতা ফিরে আসতে পারে। বলতে-বলতে অমিতেশের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ঃ জামাকাপড় ছেড়ে এখন শুয়ে পড়ো। কাল ভোরে দেখা যাবে।

মাধুদি নিজেও এবাব দাঁড়ায।

আ মরণ!

কে? কে ওখানে?—একইসঙ্গে অমিতেশ আব মাধুদি দুজনেই চেঁচিযে ওঠে, কে বললে এ-কথা? আ মরণ!—কে বললে?

লাফিযে উঠে দাঁড়ায় অমিতেশ। আলো জ্বালাব আগেই একটি ছাযা তরতব করে মিলিয়ে গেল ভেতরের লন আব সুইমিং পুলের পাশের ঝোপে। মাধুদি কাঁপছে। বোধহয় হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

অমি—অমি!

ফিরে এল অমিতেশ। প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে আসা মাধুদিকে তাড়াতাড়ি দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। কোনওরকমে তার ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালেই সব শুনব। গুড নাইট।

দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অমিতেশ। কিছুক্ষণ চোখ দুটো মেলে দিল দূরে নীলচে জলে-ভরা সুইমিং পুলের ওপর। চাঁদের রুপো-গলা আভায় জলের আঁধার টলমল। আশেপাশে ঝোপের ভেতর ভালুক-অন্ধকার। দূর্বাঘাসের লনের সবুজে, রাতেব নিঃশব্দ সংগীতে আর মনের চেপে রাখা চিন্তার রেশে অমিতেশ পিছিয়ে গেল পনেরো বছর আগের দিনগুলিতে।

আগস্টের ছ'তারিখ। বিকেল থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। কলকাতার অর্ধেক রাস্তা জলে ভাসছে। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। ট্রাফিক জ্যাম্। (অমিতেশ বলত, ট্রাফিক থ্রম্বোসিস!)

কোনও-কোনও রাস্তায় আলো নেই। নিঃসাড় অন্ধকার। বিদ্যুতের সাদা-সাদা দাগ গোটা কালো আকাশ যেন ফেঁড়ে ফেলছে। সেদিনও এমনি দোতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে অমিতেশ। ভাবছিল, কেন এত দেরি করছে মালবিকা?

হ্যাঁ, সেদিন মালবিকাই ছিল তার সব।

মালবিকা। তার প্রথমা প্রিয়া। প্রথম সঙ্গিনী। সুনীতাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে একটা সান্ধ্য পার্টিতে প্রথম আলাপ। রেডিওগ্রামে সেসময়ের দুরন্ত মিউজিক বিল হেইলির রক-এন্-রোল।

BanglaBook.org

সুনীতা, সুরিন্দর, অমৃত খান্না, তেজেশ, মীনা, রুমা, অবনীশ, গৌরীশ সবাই নাচছে। মাঝে-মাঝে দু-এক সিপ বিয়ার আর হুইস্কি। কোণের দিকে নন্দা রমানি, ভানু প্যাটেল, চিলতু, ওমপ্রকাশ, উমাশঙ্কর, রতি—ওরা স্ট্রিপ পোকার খেলছে। কেউ-কেউ মেঝেতে শুয়ে বোম-বোম আওয়াজে মাতোয়ারা। হঠাৎ নজরে এল অমিতেশের, বাইরে লনে একটি দোহারা শ্যামলা রঙের মেয়ে। একলা।

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অমিতেশ, আপনি এখানে একা? ডু ইউ ফিল বোর্ড?

ঠিক বলেছেন আপনি।—ঘুরে দাঁড়াল সেই অপরিচিতা। চোখ দুটিতে একটি নিঃসঙ্গ সকরুণ সুর। মুখের হাসিতে মেঘ ডুবে যায়।

অমিতেশও সায় দিল, আমারও বিশ্রী লাগছে। চলুন না, সামনের লনে বসে আপনার কথাই শুনি।

'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসেছিল মালবিকা। সুনীতারই বন্ধু।

তারপর কত দ্রুত দুটি মন একদিন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ষড়যন্ত্র-সংকুল এই মাটিতে এক হয়ে গেল, আজ আর তা মনে পড়ে না। বাবা বেঁচে থাকতেই মালবিকা এ-বাড়ির বউ হয়ে এল। (আমাদের সমাজে 'বউ' বলাটা হাস্যকর। বেটার হাফ। কিন্তু মালবিকা ফুলশয্যার রাতে বারবার 'বউ' কথাটাই শুনতে চেয়েছিল। অমিতেশের আদরে ডুবে গিয়ে বারবার করুণ কান্নার মতো বলেছিল, আমি বোধহয় তোমার মিসফিট।)

এরপর অনেক মেঘ গড়িয়ে গেল। অনেক হাসি-কান্নায় ভরা রাত পেরিয়ে গেল।

এল সেই ভয়ংকর দিন। না-না—থাক। কী সব ভাবছে অমিতেশ। বলির আগের মুহূর্তের মৃত্যু-আতঙ্কে শিউরে ওঠা পাঁঠার দুটি চোখের করুণ আর্তি ভেসে উঠেছিল সেই ভয়ংকর রাতে। কার চোখে?

যে-চোখ বুজলে অমিতেশ আদরে-আদরে ভিজিয়ে দিত, সেই চোখ ওকে সেই ভয়ংকর রাতে কী বলেছিল?

সেইদিনও সুনীতার বাড়িতে পার্টি ছিল। ওরা দুজনেই গিয়েছিল, মাধুদিও ছিল। রাত প্রায় একটা। তখন সুনীতাই দৌড়ে এল : এইমাত্র তোমার একটা ফোনকল এসেছে, অমিতেশ। সিরিয়াস কেস। সুইনহো স্ট্রিটে। এই নাও ঠিকানাটা।

আমি গেলে মালবিকারা কার সঙ্গে ফিরবে?

কেন, আমার বুইকটা নিয়ে চলে যাবে।—সুনীতা বলল।

আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তুমি রোগী অ্যাটেন্ড করো—ততক্ষণ আমি গাড়িতেই বসে থাকব—।

মাধুদি এসে পাশে দাঁড়াল : তা ছাড়া আমার মাথাটাও বড্ড ধরেছে।

বেশ। তাই হোক। মালবি?—দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মালবিকার দিকে কথাটা ছুড়ে দিল।

ডোন্ট ওরি। আমি তো আর অচেনা কারও বাড়িতে বসে নেই। পার্টি শেষ হতেই ঠিক চলে যাব। সুনীতার গাড়িটা নিয়ে নেব।

মাধুদিকে নিয়ে অমিতেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুইনহো স্ট্রিটে। বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা। বারোটা। একটা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। তবুও আসছে না দেখে ফোন করল সুনীতাকে।

ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ওঠা স্বরে জবাব এল, সে কী? মালবিকা এখনও বাড়ি ফেরেনি? সে তো ঘণ্টা দুয়েক আগেই আমার বুইকটা নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

বলছ কী তুমি? মালবি তো একলা এত রাতে গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তবে, তবে কি তার কোনও বিপদ হল?—ফোনের ভেতর যেন কান্না গুলিয়ে ওঠে।

শিগগির পুলিশে খবর দাও।—ও-পাশ থেকে সুনীতা তাড়া দিল।

BanglaBook.org

পুলিশে খবর দিল ডাঃ অমিতেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হসপিটাল থেকে খবর এল, মালবির বডি পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতরে। শি ইজ ডাইং। একমুহূর্ত দেরি না করে অমিতেশ হাসপাতালে ছুটল। মাধুদিও সুনীতাকে ফোন করে হাসপাতালে এল।

তদন্তে প্রকাশ পেল ধারালো দা জাতীয় কিছু দিয়ে মাথার পিছনের খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা গায়ে মুখে মদের গন্ধ। গাড়িটা আলিপুর রোডের এক বড় বাড়ির পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে পড়েছিল।

গায়ের সমস্ত দামি অলংকার, আর পার্সের ভেতর রাখা শ'পাঁচেক টাকাও গায়েব। মরবার আগে মালবি শেষ কথা বলেছিল দুবার ঃ সুনীতা! সুনীতা!

মালবিকে হারিয়ে অমিতেশ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মন ও শরীর দুই-ই নাজেহাল। একদিকে মাধুদি অপরদিকে সুনীতার সেবার স্পর্শে আবার নতুন করে হাসতে শুরু করল। আবার মনে হল, জীবনের গভীরে শোকই সব নয়—আনন্দও আছে, প্রেমও মানুষকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। বাড়ির সবকিছু ফেলে সুনীতা তার মনের নতুন আলো অমিতেশকে দিনরাত ছায়ার মতো ঘিরে রইল।

পনেরোটি বছর। সত্যি ভাবতেও আজ এই নিশীথ রাতে রোমাঞ্চ লাগে। পনেরো বছর আগে সুনীতা তার নতুন স্ত্রী হয়ে এ-বাড়িতে আসে। জীবনের এই ক'টি দিনে সে কোনও আশা করেনি, কোনও সুদূর কামনার বেড়াজালে নিজেকে জড়ায়নি। দিন যায়। মাস যায়। ক্রমে-ক্রমে মালবিকার অভাবের শূন্যতা ভরিয়ে দিল সুনীতা।

সুনীতার নিজের ভাবনা—নিরুদ্দেশের বেশ কিছু আগে

স্বপ্ন দেখছিল সুনীতা। মালবিকা শোবার ঘরে টেবিলে বসে কী যেন লিখছে। উলটোদিকের চেয়ারে হাঁটুমুড়ে বসে সে।

কী লিখছিস তুই? ডায়েরি? না আর কিছু?

আস্তে-আস্তে দূর থেকে ভেসে আসা গানের রেশের মতো মালবিকার স্বর ঃ লিখছি, লিখছি, কিছু লিখছি। শেষ হয়ে গেছে লেখা।—বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঢেউ-এর মতো দুলতে-দুলতে জানলা খুলে এলোমেলো হয়ে পিছন ফিরে লাফিয়ে পড়ল। দৌড়ে গেল সুনীতা ঃ মালবি? মালবি?

আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি! যাচ্ছি!

ফিরে আয়, ফিরে আয় লক্ষ্মীটি।

আমার ফেরায় আর কী হবে?—তিনতলার জানলার নীচের বাতাসে শূন্যে হাঁটছে মালবিকা। মাথার পিছনের খুলি ফেটে গিয়ে হাঁ হয়ে রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে লাল রক্তের ধারা ঝরঝর করে পড়ছে। মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও পাগল শিল্পীর লাল রঙের খেলা।

মালবি ফিরে আয়। তোর মাথার পিছনটা একদম ফেটে গেছে।

সুনীতার ডাকে তবুও মালবিকা আর উঠে আসছে না। সে হাওয়ায় দুলছে। পুবদিকের সুইমিং পুলের জলের ছায়ায় নেচে-নেচে, কখনও বা গাছের ফাঁক দিয়ে, কখনও বা দূরের ট্রামলাইনের তারের ওপর দিয়ে সার্কাসের মেয়ের মতো দুলে-দুলে মালবিকা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। মাঝে-মাঝে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। কচি মেয়ের হাসি। পুতুলের হাসি। শব্দহীন হাসি।

মালবি! ফিরে আয় সোনা আমার!—সুনীতা বোধহয় কাঁদছিল।

আর নয় সুনীতা, তুই-ই ওকে দেখিস!—মালবিকা হাঁটছে। শূন্যে হাঁটছে।

চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। কালো-কালো শকুনের দল তেড়ে আসছে উড়ন্ত মালবিকার

BanglaBook.org

দিকে। ওকে ঠোকরাচ্ছে। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া সব ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো। একটা নয়, দুটো নয়, শ'য়ে-শ'য়ে শকুন। চিঁ-চিঁ চিৎকার। মহাশূন্যের কালো অন্ধকারে এক রূপবতী নায়িকার পুতুল-হাসি। মালবিকার পিছনটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সুনীতা। হাঁ-টা বড় হচ্ছে, বড়, বড়, আরও বড়। আর লাল রক্তের ধারা যেন নদী হয়ে উঠল। শকুনগুলো মাথার খুলিটাকে দু-ভাগ করে ফেলে তার ভেতরের ঘিলু, রক্ত, মাংস ঠুকরে-ঠুকরে চেটে নিচ্ছে।

সুনীতার ঘুম ভেঙে গেল এক বীভৎস যন্ত্রণায়। দম বন্ধ ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠল। চেঁচাতে গেল, পারল না।

এ কী, আমার গলায় কী হল? কথা বেরোয় না কেন?

কাশল সুনীতা। মাথার পিছন, বুক, পিঠ ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে জানলার ধারে গেল। কেউ নেই। ভোরের বাতাস। দু-একটা পাখি মিষ্টি গলায় ডেকে চলেছে। দূর থেকে কার রেডিওগ্রামে বিদেশি সুরের আলাপ।

শুধু লনের ওপর পাম গাছটায় বসা একটি শকুনের চোখ ওর দিকে তাকিয়ে।

সুনীতা তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। এ কী চেহারা হয়েছে তার? আয়নার ভেতরে আর-এক সুনীতা। চুল এলোমেলো, উচ্ছৃঙ্খল। পরনের নাইট গাউনের স্ট্র্যাপ খোলা। চোখের কোণে কালি। গালটার ফরসা রং মেটে-মেটে। চোয়াল ঠেলে যেন অনেকটা বয়েস বেড়ে গেছে।

আয়নার দিকে নিজের গালটা ফোলাল। ঠোঁট উলটে জিভ বের করে দেখল। চোখের কোলে হাত বোলাল। কপালের কোণে একটা পাকা চুল। তবে কি তার অনেক বয়েস হয়ে গেল। শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে যৌবন বোধহয় গতায়ু। পনেরোটা বছর তো অমিতেশের সঙ্গে ওর বিয়েই হয়েছে। পনেরোটা বছর ধরে এই ঘর তার। এর জানলার পরদা, ক্যাবিনেট সেট, কোণের ফ্লাওয়ার ভাস—এমনকি মডার্ন পলিথিনের ইজিচেয়ারটি পর্যন্ত তার পছন্দ করা।

আয়নার ছবিটার সঙ্গে খেলা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। জিভটা বের করে ভেঙিয়ে দিল। কী বিশ্রী ওই লম্বা ছুঁচলো জিভটা। গায়ে ফাটা-ফাটা দাগ। খেলা! শুধু-শুধু খেলা?

অমিতেশ বলে, সব খেলার পিছনেই একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের কোনও শারীরিক ক্রিয়াই মোটিভ ছাড়া হয় না। এখন যদি অমিতেশ হঠাৎ এ-ঘরে ঢুকে পড়ত, তবে ওকে এ-ভাবে দেখলে কী ভাববে? সত্যি কি সুনীতা পনেরো বছর পর মালবির মৃতদেহ খুঁজছে? এ-বাড়ির প্রতিটি ঘর তার চেনা, প্রতিটি মানুষ তার আপনজন। তবু—তবুও কেন তার মনে হয় সে যেন অপর এক বাড়িতে অন্য কারও স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? স্বামীর আত্মীয় বন্ধু, দাস-দাসী সকলের সঙ্গে সে পনেরো বছর ধরে যেন শুধু আগন্তুকের মতো দেখাই করে চলেছে। কেন?

তবে, তবে কি মাধুদি?

অমিতেশকে সবসময় অদৃশ্য ছায়া দিয়ে আড়াল করে রেখেছে এই মাধুদি। মাধুদির বয়েস অমিতেশের চাইতে খুব বেশি নয়। রোগা, দোহারা, দৃপ্তময়ী চেহারা। গলার স্বর খুব জোরালো। কী বাড়িতে কী পার্টিতে সবসময়ে চেঁচিয়ে কথা বলাই মাধুদির স্বভাব। বোধহয় ধারণা, চেঁচিয়ে কথা না বললে কেউ শুনবে না। সবারই অমনোযোগের, অবহেলার পাত্র। মাধুদির চোখে-মুখে শরীরের ভাঁজে এমন এক পৌরুষ-কাঠিন্য ভাসে, যার ফলে অনেকেই মাধুদিকে ভুল বোঝে। তবু এই মাধুদিই সুনীতাকে এ-বাড়িতে সবার আগে আপন করে নেয়। প্রথম-প্রথম অমিতেশের মনের কোণে মালবির ব্যথাবিন্দুর স্মৃতির দেওয়াল ওকে কাছে যেতে দেয়নি। সেদিনের সেই সাধনায় মাধুদি সুনীতাকে দিয়েছে আশ্বাস।

অমিতেশ বিয়ের পর বহু বছর পরেও জানতে চাইত : মালবিকে সামান্য ক'টা টাকা আর গহনার লোভে কারা এমন নৃশংস ভাবে হত্যা করল? কোনও কিনারা হল না! তোমার কী মনে হয় সুনীতা?

আমার ধারণা আমাদের পার্টিতেই ওই ডাকাত দলের কেউ ছিল? হয় বেয়ারার বেশে, অথবা কোল্ড-ড্রিংক সাপ্লায়ারের লোকেদের মধ্যে কেউ থাকতে পারে। তারাই পরে সুযোগ বুঝে এই কাণ্ড করেছে।

দ্যাখো তো, তুমি পর্যন্ত কেমন সুন্দর একটি ক্লু পেয়ে গেলে।

সুনীতা ভয় পেত। চোখের তারায়-তারায় অজানা এক ভয়ের স্বাদ। ছুটে গিয়ে মাধুদিকে জড়িয়ে ধরত। সব বলত।

মাধুদি, ও যে আজ দশ বছরেও মালবিকে ভোলেনি। আমাকে তবে কেন এভাবে ওর জীবনে জড়িয়ে নিল? বলো, বলো মাধুদি! আমার দুর্বলতা অমিতেশকে ঘিরে অনেকদিন, এ-কথা ঠিক। কিন্তু মালবিকাকে বিয়ের পর আমি তো ওর জীবন থেকে অনেক দূরেই ছিলাম।

ব্যস্ত হোয়ো না সুনীতা।—সেই প্রথম মাধুদি ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। অনাবশ্যকভাবে আচমকা ওকে পুরুষের মতো জড়িয়ে আদর করল। সুনীতা সেই মুহূর্তে একটি স্নেহের হাতের পরশ পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

এক-একসময় ওর মনে হত, মাধুদিই অমিতেশকে আড়াল করে রাখছে। বাড়ির সমস্ত গৃহস্থালি থেকে যত কিছু ফাংশান-পার্টি, এমন কী অমিতেশের দেখাশোনা, সবই মাধুদির।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে সবাই সেদিন বসেছে। আম্মা খাবার দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমিতেশ তখনও নীচে আসেনি। ওপর থেকেই চেঁচাচ্ছে, আমার ব্রাউন টাইটা কোথায়?

মাধুদি আর ও দুজনে চুপচাপ।

কী ব্যাপার বলো তো? তোমরা আমার ঘরে সবসময় জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করো কেন? —বলতে-বলতে ঘরের বাইরে সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়াল অমিতেশ।

তোমার ড্রয়ারের ভেতর আছে।—কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে মুখ নীচু করে জবাব দিল সুনীতা।

অমি, তোর কি রুচিজ্ঞান কমে যাচ্ছে?—প্রশ্নটা চেঁচিয়ে ছুড়ে দিল মাধুদি। অমিতেশ শান্ত। এই সকালবেলায় কেউ ব্রাউন টাই পরে। মর্নিং-এর বেস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট হল লাইট ইয়েলো।

একটু পরেই অমিতেশ খাওয়ার টেবিলে ফিকে হলুদ রঙের টাইটা পরে এসে বসল। মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই সুনীতার দু-চোখে এক ঘৃণার ছোবল খেলে গেল। কী জানি কেন, মাথার ভেতরটা ভীষণভাবে জ্বালা করতে লাগল। মাথাটা বোধহয় ছিঁড়ে যাবে। দপদপ করছে। মাথার যন্ত্রণা ছড়িয়ে গেল হাতের শিরায়-শিরায়। এক ঝটকায় কফির কাপ টেবিল থেকে ফেলে দিয়ে গটগট করে দোতলায় উঠে এল। কী মনে করে একবার তাকাল নীচের দিকে। মাধুদির ক্রূর হিংস্র চাউনি ওর দিকে। সুনীতাকে দেখিয়ে বোধহয় অমিতেশকে বলল, (প্রচণ্ড জোরে-জোরে) ডোন্ট ফিল পারটার্ড।

অমিতেশ ঘুরে দাঁড়াতে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট আর স্টেথিস্কোপটাও সামনে রাখল, বলল, সুনীতাকে আমি দেখছি। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।

মাজি।—বুড়ি আম্মার ডাকে চমক ভাঙল সুনীতার। এতক্ষণ যেন সে বিদেশি চলচ্চিত্র দেখছিল। নিজের হাতদুটো অস্থির চঞ্চল হয়ে নিজের গালে ঘুরতে-ঘুরতে গলার কাছে এসে থেমে গেল। এ কী! আবার সেই দমবন্ধ হয়ে যাওয়া যন্ত্রণা। কোথায় কীসের যন্ত্রণা, কিছুই বুঝতে পারে না। বুক, পিঠ, গলা সব ঘেমে উঠছে। গলার ভেতর এক ব্যথা আর আবেগের দলা গুলিয়ে উঠছে। চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে, অব্যক্ত এক কাতরতায় হু-হু করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

কী হল মাজি? শরীর খারাপ লাগছে? বাবুকে ফিরিয়ে আনব?—বুড়ি আম্মা পাশে এসে স্নেহময়ী মায়ের মতো দু-হাতে জড়িয়ে ধরে। বাইরে তখনও অমিতেশের গাড়ি স্টার্ট নেয়নি। মাধুদি ফিরে আসেনি মেন গেট থেকে।

ফিসফিসিয়ে বলে সুনীতা, না, বুড়ি আম্মা। আমার কিছু হয়নি। আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি।

বুড়ি আম্মা স্বগতোক্তি করার মতো বলে চলল আস্তে-আস্তে : ডাইন, একদম ডাইন। নিজে বিয়ে-শাদি না করে খোকাবাবুকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

অন্যদিন হলে সুনীতা হয়তো ধমকে দিত, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বুড়ি আম্মাকে কিছুই বলল না।

রাত শেষ হতে চলল। আর দেরি করা উচিত নয়। সুনীতা যখন এখনও ফিরল না, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। তার আগে বুড়ি আম্মাকে ডেকে সবটা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। আস্তে-আস্তে মাধুদির দরজায় টোকা দিল অমিতেশ।

কে? অমি?

জেগে আছ?

ঘুম কি আসে?

কেন? তুমি তো আজ ক'বছর ধরে আমার কথা না শুনে স্লিপিং পিল খাচ্ছ—তাতেও ঘুম আসে না?

সুনীতার নিরুদ্দেশ হওয়া বা বাড়িতে এখনও ফিরে না আসাটা কি একটা দারুণ শকিং ব্যাপার নয়? আজ আর স্লিপিং পিল খাওয়ার জন্যে ইচ্ছেই করছে না।—বলতে-বলতে দরজা খুলে বাইরে এল মাধুদি।—আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, সুনীতা কোথায় যেতে পারে? তুমি যখন বারান্দায় তখন আমি ঘরে বসে অনেক জায়গাতেই ফোন করেছি, কিন্তু সুনীতা কোথাও যায়নি। তা ছাড়া আজ মাস ছয়েক তো সুনীতা শুধু ক্লাবে গিয়ে সন্ধের পর মদ আর নাচ নিয়েই থাকে।

অমিতেশ কিছু বলে না। নিশ্চুপ। কী যেন ভাবছে হয়তো।

মাধুদি বলে চলে (অন্যদিনের মতো চেঁচিয়ে নয়। আজ যেন কারও মন্ত্রে গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে), আমার কথা তো শোনেও না। তুমি তো তোমার হসপিটাল, রিসার্চ আর পেশেন্ট নিয়েই আছ। ওর দিকে তো ভালো করে চেয়েও দ্যাখো না।

মাধুদি!

কী?

কয়েক মাস ধরে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলে?

কী?

কারণে-অকারণে নিজের রাগকে সংযত করতে পারে না। বিশেষ করে আমার ওপর তোমার কোনও খবরদারি বোধহয় সুনীতা ঠিক পছন্দ করছিল না।

নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতায় মাধুদির বুকের দপদপানি বোধহয় শোনা গেল। চোখের তারায় ভয়ের কাঁপন : কী বলছ অমি?

অমিতেশ থামেনি। সে তখনও বলছে, আজ ক'মাস আমি তোমাদের দুজনকেই লক্ষ করেছি। মনে হয় তুমিও বোধহয় চাও না, আমার ওপর আর কারও কোনও অধিকার এসে চেপে বসে। তাই না? মালবিও একদিন আমায় কেমন যেন এই আভাসই দিয়েছিল।

না—না—মিথ্যে কথা! এ হতেই পারে না। তোমাকে আমি স্নেহ করি ঠিক, কিন্তু সেটাকে আমাদের সমাজ এমন বিকৃতভাবে দেখবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। অনেক অনাত্মীয়া মেয়েও তো কাউকে-কাউকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে। আর আমি তো সত্যিই তোমার সম্পর্কে দিদি।—মাধুদি থামল। দূরে রেলগাড়ির ঝিকঝিক আওয়াজ। খানিকটা সাদাটে ধোঁয়া। পুলের ওপরে সারি-সারি আলো শকুন-চক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে।

অমিতেশ স্তব্ধতা ভাঙল, কিছুদিন আগে ডাঃ শ্রীবাস্তব বলেছিলেন, একটু খেয়াল রেখো মাই

BanglaBook.org

সন, সুনীতা বোধহয় মেন্টাল ব্যালান্স রাখতে পারছে না। কিন্তু কী করতে পারে সুনীতা? কোথায় বা যেতে পারে?

ওর ঘরটা ভালো করে দেখে আসি।

বেশ, তাই চলো।

দুজনে সুনীতার ঘরে এল। ঘরের কোণে ফুলদানিটায় ফুল নেই। জানলার পরদা আধময়লা। ক্যাবিনেটের সব ক'টি ড্রয়ার আধখোলা। বিছানার ওপর দুটো সুটকেশ খোলা। একটা শাড়ি, দুটো অন্তর্বাস (অত ময়লা জিনিস সুনীতা ঘরে জমিয়ে রাখে না!) পেটিকোট, প্যান্টিস। মেঝেতে দু-জোড়া চটি। একটা পাটি ওলটানো।

চারদিক ঘুরতে লাগল দুজনেই। কিছুই নজরে পড়ল না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজে একটি ফোন নম্বর ঃ বিউটি ক্লিনিক, ৯৫-৫৫৯৬। চিঠি লেখার প্যাড। একটি পাতা আধছেঁড়া। আর-একটি পাতা উলটে গেল মাধুদি। কলম দিয়ে একটি ছবি আঁকা। মুখটা প্রায় মালবিকার মতোই। হ্যাঁ, এই তো ছবির নীচে নাম লেখা ঃ মালবিকার মৃত্যু! ছবিতে চোখ দুটির জায়গায় দুটি ফুটো।

অমিতেশ ছবিটি নিয়ে আলোর কাছে গেল, ডাকল, মাধুদি, এদিকে এসো। এই দ্যাখো, ছবিটিতে চোখ এঁকেছিল সুনীতা। তারপর বোধহয় জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চোখের জায়গাটুকু আগুনে পুড়িয়ে ফুটো করে দিয়েছে।

কী সাংঘাতিক!—মাধুদি শিউরে উঠে অমিতেশের হাত আঁকড়ে ধরল। ডানাভাঙা পাখির থাবার মতো অসহায় মাধুদির হাত। অমিতেশের মনে হল, হাতটা এগিয়ে দিলে আরও জোরে চেপে বসবে মৃত্যুপথযাত্রী পাখির করুণ আর্তি নিয়ে।

ওরা দুজনেই একটা আতঙ্কের মতো, প্রেতের মতো, নীচে নেমে এল। চেঁচিয়ে ডাকল ঃ বুড়ি আম্মা, মতিয়া!

নিস্তব্ধ রাত্রির শেষ প্রহরে অত বড় বাড়িতে সেই আওয়াজ গমগম করে ফিরতে লাগল।

ওরাও বোধহয় ঘুমোতে পারেনি।

ডাক শেষ হতে না হতেই দুজনে বেরিয়ে এল।

বুড়ি আম্মা, তুমি আর মতিয়া মাজিকে ঘর থেকে বেরোতে দেখোনি? গাড়িও তো ছিল না। আমি একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি সেই সকালে, আর একটা তো মাধুদি আমার বন্ধুর বিদেশ থেকে ফেরার পার্টিতে যাওয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল? তবে মাজি কীসেই বা গেল? তার জামাকাপড় তো সবই ঘরে রয়েছে—তবে কোথায় গেল?

মতিয়াই প্রথমে কথা বলল, দিদি বাইরে যাওয়ার পর মাজি আমাদের বললে তোরা নীচের ঘরের সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে কিচেন রুমে চলে যা। আমিও ঠিক তাই করলাম। হঠাৎ আমাদের পেছন দরজায় টকটক আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি একটি ভিখারি কিসিমকা আদমি।

কাকে চাই?

একটা স্পেশাল পার্সেল আছে। এসেছে একটা বিলিতি কোম্পানি থেকে। মিসেস সেনের পার্সেল।

বুড়ি আম্মা লোকটার কথা শুনে ওপরে গেল। মাজিকে বলল, একটা লোক এসেছে পার্সেল নিয়ে তার জন্যে। মাজি বলে দিল, তোমরা নিয়ে নাও।

পার্সেলটা নিয়ে নিলাম লোকটার কাছ থেকে। মনে হল কোনও নামকরা সেন্ট হবে। তাই ছোট কাঠের বাক্সটা আমরা খুব ঝাঁকাতে লাগলাম।

এমনসময় মাজি জানতে চাইলেন কীসের পার্সেল এসেছে।

তখন রাত ক'টা? মাধুদি জানতে চাইল।

বড় জোর আটটা।—বুড়ি আম্মা বলল।—মতিয়া পার্সেলটা নিয়ে মাজির ঘরে দিয়ে এল।

BanglaBook.org

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে না আসতেই মাজির বীভৎস এক ভয়ার্ত চিৎকার। আবার দৌড়ে গিয়ে দেখে সুনীতা দেবীজির ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে কীসের যেন দাপাদাপির শব্দ। জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ। আবার চিৎকার।

মাজি! মাজি!—মতিয়া চেঁচায় দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে।

ভেতর থেকে গলা চেঁচিয়ে ওঠে, যা, নিজের কাজে যা! আমাকে এখন জ্বালাস নে!

মতিয়া নীচে নেমে এসে বুড়ি আম্মাকে মাজির রাগের কথা বলল। বুড়ি আম্মা বলল, রাগিস না মতিয়া। দেবীজির বোধহয় মেজাজটা ভালো নেই। দেখিস না, আজকাল রাতে মদ খেয়ে কীভাবে বাড়ি ফেরে। আমার তো ভয়ই করে। আবার নিজে গাড়ি চালায়। কী হবে জানি না বাপু। একটা লেড়কা লেড়কি থাকলে এসব কিছুই হয় না। তা কী হবার জো আছে। ডাইনটা সবসময়েই বাবুজিকে আগলে রেখেছে।

কে ডাইন?—ঘটনার মাঝে মাধুদি জানতে চাইল রাগতস্বরে।

মতিয়া বুঝল বেফাঁস কথা বলা হয়ে গেছে। সামনেই বুড়ি আম্মা ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলল, আমি সেই মোটা নার্সটার কথা বলছিলাম।

বাজে কথা শোনার সময় নেই। বলো, তারপর কী হল?—অমিতেশ প্রায় ধমকে উঠল।

মতিয়া বলতে শুরু করে : আমি বললাম, চলো না, দেখে আসি। মাজি পড়ে গেল না তো? যেমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে। আমরা দুজনে আবার সিঁড়ি বেয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোনও সাড়া নেই। জোরে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতর জিনিসপত্র লন্ডভন্ড। দেবীজি কোথাও নেই। চেঁচিয়ে ডাকলাম, মাজি! মাজি! না, কোথাও নেই। বুড়ি আম্মাও ডাকল কয়েকবার। বাথরুম, দিদিজির ঘর, আপনার ঘরও দেখলাম। কোথাও না পেয়ে ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

মাধুদির চোখের সামনে ভাসতে লাগল মতিয়ার কথাগুলো।

অত রাতে বিরাট বাড়িতে সুনীতার অনুপস্থিতিতে ওরা দুজনে ভীষণ ভয় পেয়েছে। মতিয়া আর বুড়ি আম্মা দুজনে হাত ধরাধরি করে দোতলার সব ঘরেই খুঁজল : মাজি! মাজি!—প্রতিবার ওদের গলার স্বর ভয়ে বিকল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ওরা ঘর-বারান্দার সমস্ত আলো জ্বেলে দিল।

দাঁড়াও। কার পায়ের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে!—বুড়ি আম্মা থমকে গেল।

কোথায় শব্দ? ও তোমার মনের ভুল।

কী জানি বাপু। বাবুজি আর দিদিজি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়। মাজির রকমসকম আজ ক'দিনই যেন অদ্ভুত লাগছিল। আত্মহত্যা করেনি তো?

ও মা!—নাকি সুরে চেঁচিয়ে ওঠে মতিয়া।—মরলে তো আমরা লাশ দেখতে পেতাম। আচ্ছা, ওই লোকটাই বা এত রাতে কীসের পার্সেল দিয়ে গেল? চল তো, সেটাই খুঁজে দেখি।

আবার ওরা সুনীতার ঘরে এল। না, কোথাও খুঁজে পেল না সেই পার্সেল বা কোনও বাক্স। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলা। শাড়ি, ব্লাউজ, জামা, স্ল্যাক্স—সবই সাজানো। এমনকী টেবিলের ওপর বাইরে বেরোনোর ব্যাগটাও রয়েছে। শুধু কালো রঙের মাঝারি সাইজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নেই।

তাড়াতাড়ি ওরা নীচে রান্নাঘরে ফিরে এল।

কোথায় যেতে পারে মাজি? কারণ বাইরে বেরোতে হলে তো আমাদের সামনে দিয়েই যেতে হবে। বাবুজিকে হাসপাতালে ফোন করে দিই!—সিঁড়ির নীচে টেলিফোনটা তুলতে গিয়ে দেখে, টেলিফোনের তার কাটা। সর্বনাশ। দুজনে ভয়ে জড়াজড়ি করে বসে রইল সেই থেকে।

মাধুদি, মালবিকার ছবিটা কার আঁকা বলে তোমার মনে হয়?

কেন? সুনীতা ছাড়া আর কে আঁকবে?

BanglaBook.org

এত রাতেও যখন সুনীতা ফিরল না, তখন আমার কী মনে হচ্ছে জানো? ও কোথাও যায়নি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে।

কী বলছ তুমি?—মাধুদি নতুন করে ভয় পায়। পনেরো বছর সুনীতা এ-বাড়িতে পাশাপাশি রয়েছে। কোনওদিনই তো মনে হয়নি ও অসুখী। তবে মাস ছয়েক ওর ব্যবহারটা যেন কেমন-কেমন। কথায়-কথায় অল্পেতে রেগে ওঠে। প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। এমনকী পার্টিতেও নাচতে-নাচতে স্টেপিং-এ ভুল হয়ে যায়। কতদিন মিঃ বটব্যাল ও মিঃ কাপুর বলে উঠেছেন, কী হল মিসেস সেন? আপনার শরীর ভালো না?

মতিয়া!—অমিতেশের চিৎকারে তাল কেটে যায়।

জি বাবুজি।

একটা গ্লাস আর হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আয়।

কী বলছ অমি? তোমার না মদ খাওয়া বারণ!—মাধুদি বলে।

ছেলেমানুষি কোরো না মাধুদি। আমার বয়েস এখন প্রায় চল্লিশ। আর ভালো লাগে না সবসময়ে তোমার এই খবরদারি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মাধুদি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর বলে, পুলিশে খবর দেবে না? তুমিই তো পুলিশে খবর দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও যেতে পারে। সেখানে খোঁজ নেবে না?

কী করে খোঁজ নেব? টেলিফোনের তার তো কাটা। তা ছাড়া শুনছ না, একটা রহস্যময় লোক এসে একটা পার্সেল দিয়ে গেল, সুনীতা ভয়ে পেয়ে চেঁচাল, টেলিফোনের তার কাটা, আর তারপরই সুনীতা একদম হাওয়া। নিশ্চয়ই এ কোনও ষড়যন্ত্র অথবা—।

কী অথবা? বলো, থামলে কেন?

অথবা কোনও কিছুতে ভয় পেয়ে পালিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়নি তো?

দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের চাপা গর্জনের মতো অমিতেশের কথাগুলো মাধুদির কানে বাজতে লাগল। হতেও পারে তাই।

মানুষের মন বিচিত্র, মাধুদি। এ-এক গহন বনের মতো। অন্ধকার, কালো, শব্দহীন। অসংখ্য ছোট-ছোট রাস্তা সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এত অন্ধকার সেখানে যে, কোনও পথই চিনতে পারা যায় না। হঠাৎ যদি কোনও একটা হিংস্র জানোয়ার সেই আঁধার থেকে বেরিয়ে আসে, তখনই বোঝা যায় যে, ওদিকে কোনও পথের নিশানা আছে। বহু বিচিত্র শক্তি আমাদের মনের ভেতর খেলা করে। কখন যে কোন শক্তি আরেকটাকে দাবিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে আসবে, কেউ বলতে পারে না। মনের অসংখ্য পথে চলতে-চলতে কখনও যায় পথটা হারিয়ে। তখন পুরোনো পথ খুঁজে না পেয়েই সব কেমন গুলিয়ে যায়...আর তখনই হয়তো আত্মহত্যার নেশায় পায়।

মাধুদি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কার জন্য কান্না পেল নিজেই বুঝতে পারল না মাধুদি। সুনীতার জন্যে? অমিতেশের জন্যে? চোখের জলে আশ্চর্য রকমের নরম হয়ে গেল মাধুদির স্বর, তুমি তাহলে গাড়িটা নিয়ে পুলিশে খবর দাও।

সেই ভালো!—অমিতেশ উঠে দাঁড়ায়। ঘড়িতে রাত প্রায় তিনটে।

আমার স্ত্রী রাত আটটার পর থেকেই নিখোঁজ।

সে কি ডাঃ সেন! কী ব্যাপার, ঝগড়াঝাঁটি করেছিলেন নাকি?—হাসতে লাগলেন পুলিশ অফিসারটি। প্রতিদিন হাজারটা নিরুদ্দেশের খবর শুনে ওঁরা অভ্যস্ত। তার ওপর ডাঃ সেনদের মতো

BanglaBook.org

আপাব ক্লাস এলিটদের জীবনে এই ধরনের ব্যাপার তো প্রায়ই তাঁর নজরে আসে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নেহাতই দাম্পত্যকলহের ব্যাপার।

আমার মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল ধরে ও নিউরোসিসে ভুগছিল।

বলুন তো ব্যাপারটা।—কাগজ কলম হাতে নিলেন পুলিশ অফিসার।

আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলে গেল অমিতেশ। বলা শেষ হলে জিগ্যেস করল, আমি একটা টেলিফোন করতে পারি? ডায়াল করল ৩৯৯।

আমার টেলিফোনের তারটা কেটে গেছে। দয়া করে তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দিন। ১৩২২ নম্বর ফিল রোড। থ্যাঙ্ক ইউ।

কিন্তু এত রাতে কোন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে পাঠাই বলুন তো?—পুলিশ অফিসারটি বেশ সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হল।

কেন, আমি তো রয়েছি।—ঘরের কোণে ইজিচেয়ারে শুয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। চোখের ওপর আলো আড়াল কবা রুমাল।

তুমি কি জেগে আছ নাকি। তা ছাড়া তোমার তো কাল অফ ডে।

তা হোক সমীর।—বলে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকটি।

কাছে এসে বললেন ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না ঠিকই, কিন্তু আমি আপনাকে জানি অনেকদিন থেকে। পনেরো বছর আগে আপনার প্রথম স্ত্রী মালবিকা দেবীর খুনের তদন্তের সময় আমি মিঃ মেননের সঙ্গে ছিলাম।

অ্যাঁ।—অমিতেশ একটু চমকে ওঠে।

আপনি ক্লান্ত। বাড়ি যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি আপনার বাসায়। সমীর, তুমি ততক্ষণ সর্বত্র ওয়ারলেসে খবর দিয়ে দাও। স্টেশন, এয়ারপোর্ট আর শহর থেকে বেরোবার আগে সব জায়গায় যেন ভালোমতো চেক করা হয়। সুনীতা দেবীর একটা ছবি পেলে ভালো হত।

আমি নিয়ে এসেছিলাম। কথায়-কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম।—পকেট থেকে পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা বের করে দেয় অমিতেশ। তারপরই বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

আমি না যাওয়া পর্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না।

যদি কোনও আর্জেন্ট কল আসে হাসপাতাল থেকে?—অমিতেশ দাঁড়ায়।

তাহলে যাবেন অবশ্য। ডক্টর'স হ্যান্ডস ক্যান সেভ এ ডাইং ম্যান।

অমিতেশ চলে যেতেই সমীর গুহ একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, কী ব্যাপার তোমার অজয়? কেসটা যেন তুমি ইচ্ছে করেই হাতে নিলে? বড় ঘরের কেচ্ছায় তোমার দেখি খুব ইন্টারেস্ট?

নো, ব্রাদার, নো। তুমি জানো না অনেক কিছুই। ডাঃ সেনের প্রথমা যখন মারা গেল তখন আমি মেননের আন্ডারে সামান্য একজন সাব-ইন্সপেক্টার। মালবিকা দেবীর মৃত্যুটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট-কাম-ডাকাতি বলে চাপা পড়ে গেল। আমার ধারণা কিন্তু অন্য। বছর তিনেক হল আমি একটা নতুন ইনফরমারকে পেয়েছি। নাম বাবুরাম। মালবিকা দেবী যে গাড়িতে ওঠার আগেই খুন হয়েছিলেন, তাঁকে কোনও ডাকাত টাকাপয়সার লোভে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেনি, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ওই বাবুরামই সেদিনের চোর। দ্বিতীয়ত, ওই ছিল ডাঃ সেনের বর্তমান স্ত্রীর পেয়ারের চাকর। তৃতীয়ত, মালবিকাকে না দেখলে বোধহয় উনি সুনীতা দেবীকেই আগে বিয়ে করতেন।

কীসব বলছ তুমি?

বুঝলে সমীর, অজয় বোস কোনও বিষয়ে নিশ্চিত না হলে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। বলতে পারো, এটা আমার জেদ। আমি পনেরো বছর আগেই ধরে নিয়েছিলাম মালবিকা মার্ডারের পিছনে

BanglaBook.org

কোনও ক্রুর ষড়যন্ত্র আছে। কিন্তু কারও কোনও মোটিভ কিছু খুঁজে পাইনি। অমিতেশবাবুর এক অদ্ভুত দিদি আছেন। তাঁকেও সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রমাণ পাইনি। ঘুরেফিরে সুনীতা দেবীকে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ছেলেবেলা থেকেই সুনীতা ও মালবিকা পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একমাত্র অমিতেশকে নিজের কাছে পাওয়া ছাড়া আর কোনও মোটিভই ভাবা যায় না। এ ছাড়া বাবুরামের কথা একবারও সুনীতা দেবী তদন্তের সময়ে বলেননি। টাকাপয়সা সোনা-গয়না চুরি হওয়াতে পুলিশের নজর সম্পূর্ণ অন্য দিকেই ছিল। মেনন সাহেবকে এসব কথা বললে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। বলতেন, হ্যালো, ইয়াং বয়, পুলিশের কাজটা রিয়ালিস্টিক, ওখানে নাটক নভেলের গল্প বানানো যায় না। তুমি বোধহয় খুব ডিটেকটিভ নভেল পড়ো? এইসব বলে একেবারে কেসটা শেষ পর্যন্ত চাপাই পড়ে গেল। কিন্তু আমি জানতাম, সময় একদিন আসবেই। দেখো, ভাগ্যচক্রে সেই বাবুরামই আজ আমার চেলা। সে-ই সব স্বীকারোক্তি করেছে। টাকা চুরি করেছে সে ঠিকই, কিন্তু মালবিকা দেবীকে আঘাত করার মতো সাহস তার কিশোর বয়েসে ছিল না। শুধু কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলেই সুনীতা দেবীকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন আবার শুনছি সুনীতা দেবীই নিরুদ্দেশ। এ-কেস আমিই তদন্ত করব। তুমি কেবল ইনসপেক্টর নিয়োগীকে সবসময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দাও।

বেশ। তাহলে এখুনি ডাঃ সেনের বাড়িতে চলে যাও। আমি ওয়ারলেসে সব জায়গায় ইতিমধ্যেই মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি যাও। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে।

অজয় বোস সমস্ত বাড়িটার আনাচকানাচ পর্যন্ত দেখে নিলেন। মাধুদি, বুড়ি আম্মা ও মতিয়ার সঙ্গেও কথা বলে ঘটনার আদ্যোপান্ত জেনে নিলেন। তারপর নীচে রান্নাঘরের কাছে বসে মতিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে-লোকটি পার্সেল নিয়ে এসেছিল তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। তা ছাড়া লোকটা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণই তো কথা বলেছিল।

অজয়বাবু ফোলিওব্যাগ থেকে অনেকগুলি ছবি বের করলেন। আলোর নীচে সবগুলিকে সাজিয়ে রাখলেন। একটার পর একটা ছবি দেখিয়ে যেতে লাগলেন।

চিনতে পারছ?

না, এ না।

পরপর গোটা পনেরো ছবি দেখানোর পর চোখ-বসা কাঠির মতো চেহারার একটা লোকের ছবি দেখে মতিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, এই, এই লোকটাই এসেছিল বাবুজি।

এ তো নেশাখোর লালু! তোমাদের বাড়ির কাছেই ওই বস্তিটায় থাকে। ওর পুলিশ রেকর্ড খুবই খারাপ। তুমি ঠিক বলছ মতিয়া?

হ্যাঁ, বাবুজি।—দৃঢ় স্বর মতিয়ার।

ঠিক আছে। চলুন, বাইরেটা এবার দেখে আসি।—ইন্সপেক্টর মিঃ নিয়োগী উঠে দাঁড়ালেন।

মাধুদি বললেন, অমির একটা আর্জেন্ট কল ছিল, ওকে চলে যেতে হয়েছে। চলুন, আমিই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।

সে কী! দিস ইজ ভেরি ব্যাড। যাওয়ার আগে আমাদের একটু বলে যাওয়া তো উচিত ছিল। এত সকালে আর্জেন্ট কল। স্ট্রেঞ্জ!

সদর দরজা পেরিয়ে সবাই বাইরে এলেন। মেন গেট পর্যন্ত পাথর বিছানো রাস্তা। দু-ধারে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। একটু দূরে সবুজ গালিচা, নরম ঘাসের লন। ভোরের রোদে গলে যাচ্ছে যেন। এক পাশে টেনিস কোর্ট। লন ঘিরে পামগাছের সারি। একেবারে কোণে নীল জলে

BanglaBook.org

টলমল সুইমিং পুল। পুলের এক পাশে কাপড় ছাড়ার ছোট একটা ঘর। পাশে একটা টেবিলে বিদেশি পানীয়ের বোতল, ডিক্যান্টার, গ্লাসের বাহার।

দেখতে-দেখতে অবাক লাগছিল অজয় বোসের। এত সুখ, এত সমৃদ্ধি, এত প্রাচুর্য—তবুও তার নীচে কত কান্না, কত দীর্ঘশ্বাস, আর কত বঞ্চনার গোপন যন্ত্রণা।

জলের ওপর ওটা কী ভাসছে?—একটি সিপাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে যান সবাই সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখেন অজয়, একটি নারীদেহ জলে ডুবে ফেঁপে ফুলে ভাসছে!

সু-নী-তা!—বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজের মতো আতঙ্কের রেশ ঝরে পড়ল মাধুদির গলায়।—ওই তো সুনীতা। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করল। হা ভগবান।

তাড়াতাড়ি জল থেকে টেনে এনে পাড়ে রাখা হল মৃতদেহটিকে। সুনীতার মৃতদেহ। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অজয় বোস। পরনের পোশাকটি একটু অস্বাভাবিক। শরীরের ওপরে ছোট হাতকাটা, পেটকাটা জামরঙের ব্লাউজ। নীচের দিকে ছোট একটা শর্ট পরা। সাঁতার কাটতে হলে এরকম অদ্ভুত পোশাক পরবে কেন? মুখের কাছে নাকটা নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, মদের গন্ধ। হয়তো মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভুগছিল। তারপর মদ খেয়ে নেশার ঝোঁকে সাঁতারের অর্ধেকটা পোশাক পরেই পুলে নেমে পড়েছিল। পরে হয়তো আর হুঁশ ফেরেনি, কিংবা সাঁতার কাটতে-কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপরই দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু।

ব্লাউজের ভেতর থেকে একটি রেক্সিনের ছোট্ট ব্যাগ বেরিয়ে পড়ল। মিঃ নিয়োগী রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে সন্তর্পণে ছোট চেনটা ধরে টান দিতেই এক টুকরো কাগজ গড়িয়ে পড়ল।

অজয় বোস কাগজটা খুলে ফেললেন। তাতে লেখা : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার মানসিক শান্তি নেই। আমি ...আমি....।

মৃতদেহটা ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর নিয়োগী নিজের চেয়ারে এসে বসলেন, জানেন মিঃ বোস, আমার ধারণাটা ছিল কোনও সেনসেশনাল কেস হবে। আপনার সঙ্গে থাকাও রীতিমতো ভাগ্যের দরকার। কিন্তু শেষকালে একটা সাধারণ সুইসাইড কেস।

আপনি কী ভেবেছিলেন?

আমি ভেবেছিলাম মিসেস সেনের চেহারা তো খারাপ নয়, বরং ফিগারটা যে-কোনও ফিল্ম আর্টিস্টেরও হিংসার ব্যাপার। হয়তো কেউ কিডন্যাপ করেছে। মানে, আরও কিছু থ্রিলিং ব্যাপার, এই আর কী। জানেনই তো, মাঝেমধ্যে এরকম সেনসেশনাল কেস না পেলে দিনরাত চোর-পকেটমার নিয়ে দিন কাটাতে একঘেয়েমি আসে, তাই না?

ডাঃ সেনকে খবর পাঠিয়েছেন তো?

খবর পাঠানো হয়েছে অনেক আগেই। এমনকী ওঁর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছি। ব্লাউজের মধ্যে পাওয়া ব্যাগটার ভেতরের কাগজের লেখাটা সুনীতারই। তবে লেখার ধরনটা এলোমেলো আর বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি লেখা। অমিতেশবাবুর দিদি কিন্তু বললেন যে, লেখাটায় সুনীতার লেখার ধাঁচ আছে ঠিকই, কিন্তু একটু অন্যরকম। তবে আত্মহত্যার আগে মানুষের মনে কোনও উন্মাদনা জাগে বোধহয়। তাই মানসিক বিকৃতিতে লেখাটাও একটু-আধটু পালটে যেতে পারে।

কাউকে পাঠিয়ে ওদের বাড়ি থেকে সুনীতা দেবীর লেখার কিছু স্পেসিমেন আনিয়ে এই লেখাটা সমেত হস্তরেখাবিশারদ মিঃ কৃষ্ণানের কাছে পাঠিয়ে দিন। যদি হাতের লেখা এক না হয়, তবে অন্যভাবে ভাবতে হবে। না হলে—।

না হলে আত্মহত্যাই ধরতে হবে। আমার মনে হয় কী জানেন, সুনীতা দেবী হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী তাঁর অপরাধের কথা জানতে পেরেছেন। না হলে গত ছ'মাস ধরে তাঁর

BanglaBook.org

ব্যবহার সবার কাছেই খারাপ লাগত কেন—সবসময় অন্যমনস্ক ভাব, রাস্তাতেও নাকি দুবার দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন। সেই মানসিক হতাশারই চরম ফল আত্মহত্যা।

হতে পারে। আচ্ছা, এখন তবে উঠি। কাল সকালের মধ্যেই করোনারের রিপোর্ট আর মিঃ কৃষ্ণানের হাতের লেখার মালিকানার ফয়সালাটা পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু!

করোনারের রিপোর্ট ও হস্তলেখাবিশারদ মিঃ কৃষ্ণানের রিপোর্ট স্থির করল নেশার ঘোরে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যেই মিসেস সুনীতা সেন সুইমিং পুলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং জলে ডুবে মারা গেছেন।

অনেকেই ভাবল সুনীতা দেবীর মৃত্যুরহস্যের সমাপ্তি হল। কিন্তু তিন-চার দিন পর বাবুরাম এসে যদি লালুর মৃত্যুসংবাদ না জানাত, তাহলে হয়তো সবার মতোই অজয় বোসও এ-কাহিনির পরিসমাপ্তি টেনে দিতেন।

তুই ঠিক বলছিস, লালু মান্না মারা গেছে।

হ্যাঁ, স্যার। কোনও খবরের আশায় আগেই আমি সেই কাফেতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি খুব ভিড়। কী ব্যাপার? শুনলাম কিছুক্ষণ আগে ওখানে লালু সেই বাজে মেয়ে সুখীকে নিয়ে মদ খেতে গিয়েছিল। চেয়ারে বসে বকবক করতে-করতেই হঠাৎ লোকটা টেঁসে গেল। থানার লোকজনকেও দেখলাম। মড়া পোস্টমর্টেমে চলে গেছে।

চল তো, দেখে আসি।—অজয় বোস তাড়াতাড়ি মর্গের দিকে রওনা হলেন।

পুলিশ সার্জন মিঃ পাকড়াশী ওঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে মিঃ বোস যে। ব্যাপার কী?

কিচ্ছু না! লালুর অটোপ্সির ফল কী?

অত্যধিক মাত্রায় আফিম সেবনই মৃত্যুর কারণ। লোকটা নাকি নামকরা গুন্ডা ও নেশাখোর। নেশার মাত্রা বোধহয় আজ একটু বেশি হয়েছে। ব্যস! শুনলাম ওর সঙ্গে নাকি একটি বাজে মেয়েও ছিল। নেশার ঘোরে আফিমের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তার ফলেই মৃত্যু। কিন্তু সামান্য একটা গুন্ডার মৃত্যুতে আপনি এত চিন্তিত কেন?

সে-কথা পরে বলব মিঃ পাকড়াশী।—অজয় বোস আর দাঁড়ালেন না। তাঁর নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে করছে। যে-মুহূর্তে মতিয়া লালুর ছবি দেখে শনাক্ত করল, সেইদিনই লালুকে থানায় ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ছিল। কীসের পার্সেল সে অত রাতে মিসেস সেনের বাড়িতে দিতে গিয়েছিল? কে-ই বা তাকে পাঠিয়েছিল? সব গোলমাল করে দিল সুনীতা দেবীর চিঠিটা। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' এই ক'টি কথা আবার সব গুলিয়ে দিল। কিন্তু হস্তলেখা-বিশারদের রিপোর্টও তো বলল যে, ওই লেখাটা সুনীতা দেবীর অন্য লেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে? তবে? তিনি কি সুনীতা দেবীর আগের হাতের লেখা দেখেছেন? ডাঃ সেনের বাড়ি থেকে যে-লেখাগুলো সুনীতা দেবীর স্পেসিমেন বলে দেওয়া হয়েছে, তা তো অন্যলোকের লেখাও হতে পারে। কে লিখতে পারে? মাধুদি? বুড়ি আম্মার গোপন সাক্ষীতে বোঝা গেল অমিতেশবাবু সবসময়েই মাধুদির ছায়ার বেড়াজালে আটকে থাকতেন। এমনও তো হতে পারে, মাধুদিই অস্বাভাবিক হিংসায় কোনওভাবে সুনীতাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। তবু অজয় বোসের স্পেসিমেন লেখাটা মিলিয়ে দেখা উচিত ছিল।

উত্তেজনায় অজয় বোসের আঙুলগুলো ছটফট করতে থাকে।

লালুর মৃত্যুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সুনীতা দেবীর আত্মহত্যার কোনও লিংক রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাবুরামকে ডেকে তিনি বললেন, সুখীর ঠিকানা জোগাড় করে তাকে খুঁজে বের করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুখীকে নিয়ে হাজির হল বাবুরাম। নিজের বাড়ির ভেতর ঘরে নিয়ে সুখীকে বসাল। কোনও নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে সুখী। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। চোখে-মুখে অনাচারের চিহ্ন। অজয়কে দেখে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল।

ভয় নেই। যা জিগ্যেস করব, তাব ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। লালুকে কতদিন থেকে জানো?

হুজুর, বেশি দিন না, বছর দুয়েক। আমাদের পাড়ায় ওর ঘাঁটি ছিল। একদিন রাতে আমার ঘরে কোনও লোক না আসায় চুপচাপ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি লালু রাস্তার কোণে পড়ে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে। শরীরটা কীরকম কুঁচকে-কুঁচকে উঠছে। নিয়ে এলাম নিজের ঘরে। বলল, একটু আফিম দাও। আমাদের বুড়ি ঝিটা আফিম খেত। তার কাছ থেকে একটু আফিম নিয়ে ওর মুখে দিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে উঠল। সেই থেকেই ও আমার বাঁধা মানুষ।

তোকে মাসে কত করে দিত?

কী আর দেবে? উলটে মাঝে-মাঝে আমাকেই দিতে হত। ওর মনটা বড় সাদা ছিল গো বাবুজি।—বলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সুখী কাঁদতে লাগল।

লালু কিছুদিন আগেও তোকে কিছু দেয়নি?

তিন-চারদিন আগে হঠাৎ এসে সন্ধেবেলায় বললে, আব ভাবনা নেই সুখী, এবাব থেকে মাসে-মাসে তোকে কিছু টাকা দিতে পারব। এই নে, এটা খোল তো দেখি। বলে একটা ছোট কাঠেব বাক্স দিল।

কী দিল? কাঠের বাক্স?—অজয় চমকে উঠলেন।

হাঁ হুজুর। খুলে দেখি কাগজের মোড়কে কী যেন একটা ছোট জিনিস। পাতলা কাগজটা খুলে দেখি মাথার চুল আর একটা ছোট্ট আঙুল। ভয়ে তাড়াতাড়ি আবাব বন্ধ করে দিয়ে বললাম, এসব কোত্থেকে আনলি?

লালু শুধু বলল, তা দিয়ে তোর দরকার কী? আমাদের পাড়ায় এক মেমসাবকে রাত আটটার পরে গিয়ে যে-কোনও সময়ে এটা দিয়ে আসতে হবে। তার জন্যেই কুড়ি টাকা বকশিশ পেয়েছি। আর বাবুকে বলেছি, আপনি যা বলবেন তাই করব। এবার তো বাবুকে ভয় দেখিয়েই টাকা নিয়ে আসব।

তারপর কী হল?

পরে দেখলাম, ওর ভেতরে একটা সুন্দর কাগজে লেখা চিঠিও ছিল। সেটা বাক্সর ভেতবে রাখতে ভুলে গেছি।

চিঠিটা কোথায়?

আমার বাড়িতে বিছানার নীচে আছে।

মারা যাওয়ার দিন তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল লালুর?

ওই 'বারে'ই। ক'দিনই বাড়ি আসে আব আমাকে দশ টাকার নোট ছুড়ে-ছুড়ে দেয়। আমি ভয়েতে জিগ্যেস করি, লালু, এত টাকা কোথায় পাচ্ছিস তুই? চুরি করিস না কি? লালু গালাগালি দিত। বলত, চুরি করব কেন? এ সেই বাবু দিচ্ছে। বলেছে রোজ দশটাকা করে দেবে। এমনকী দু-তিন দিন আফিমও কিনে দিয়েছে তাকে। আর বাবু নাকি বলেছে, এবার থেকে তোর ওষুধেরও পয়সা লাগবে না। যখন খুশি গেলেই বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের চিকিৎসা করবে বিনেপয়সায়। সারাজীবন। বুঝলি সুখী, তোর আমার দিন ফিরল।

BanglaBook.org

এই বাবুটি কি ডাক্তার? তুমি তাকে দেখেছ?

তা আমি বলতে পারব না। তবে আমাকে বাবুর কাছে নিয়ে যাবে বলে ঠিক ছিল। কিন্তু এমন নেশাখোর লোকটা, ভাগ্য ফিরলে হবে কী, শেষ পর্যন্ত আফিমই লোকটাকে মারল।

সুখীর বাড়ি থেকে বাক্সের ভেতর পাওয়া চিঠিটা দেখে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। লালু মারা যাওয়ার চার-পাঁচ দিন আগের একটা ওষুধের শিশি নিয়ে এসে তার গায়ের লেবেল থেকে ফার্মেসির নাম আর ক্রমিক সংখ্যাটি টুকে নিয়ে অজয় ইন্সপেক্টর নিয়োগীকে পাঠিয়ে দিলেন। ওষুধের প্রেসক্রিপশনটায় কী ছিল আর কোন ডাক্তারেব তা যেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ঘরে পায়চারি করছেন অজয় বোস। পাইপে ধোঁয়া ছাড়ছেন মাঝে-মাঝে। কিছুতেই সব সূত্রগুলো এক জায়গায় এনে মেলাতে পারছেন না। এমনও হতে পারে, সুনীতা দেবী আত্মহত্যা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কেউ তাঁকে দিনের পর দিন মালবিকা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা জানিয়ে ভয় দেখিয়েছে। এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে যাব কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, ডাঃ অমিতেশ সেনের প্রথম স্ত্রী মালবিকার মৃত্যুর জন্য সুনীতা দেবীই দায়ী। সে গত কয়েক বছর ধরে শিকাবি বেড়ালের মতো তার শিকারকে নিয়ে খেলায় মেতেছে। খেলতে-খেলতে ভয়ে ও হতাশায় যখন সুনীতা দেবীর মন ক্লান্ত, তখনই চরম হতাশায় আত্মহত্যার পথই একমাত্র শান্তির পথ ভেবে নিয়ে সেই পথেই তিনি পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু কে সে? লালুকেই বা কে টাকা দিচ্ছিল? লালুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক? কে এই ডাক্তার? এই ডাক্তার কি অমিতেশ সেন? এত বড় ডাক্তার যার ফি বত্রিশ টাকা, সে নিয়মিত চিকিৎসা করছে একটি বস্তির গুন্ডাকে। সবই সম্ভব এ জগতে। ডাঃ সেনের দিদি এর পিছনে নেই তো? এমনও হতে পারে, ওরা দুজনে মিলে দিনের পব দিন (বুড়ি আম্মা ডাঃ সেনের মাধুদিকে 'ডাইন' বলে ভাবে) সুকৌশলে মানসিক যন্ত্রণার বেড়াজাল সৃষ্টি করে সুনীতা দেবীকে উন্মাদ করে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কাটা আঙুল পার্সেলে পাঠিয়েছিল শুধু ভয়টাকেই বাড়াতে। বাক্সের ভেতরে নীল কাগজে লেখা চিঠিটাই বা কার?

ক্রিং-ক্রিং!...হ্যালো, কে?...নিয়োগী?...কী খবর?

অ্যাঁ কী বললেন? আর ইউ শিয়োর?—উত্তেজনায় গলা কাঁপতে থাকে অজয় বোসের ঃ আপনি হাসপাতালে গিয়ে লালুর ছবিটা ডাঃ সেনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, লালুকে ডাঃ সেন চেনেন কি না? তারপর চলে যান তাঁর দিদির কাছে, তাঁকেও দেখান। সুখীর বাড়ির চিঠিটাও দেখাবেন। আর সুনীতা দেবীর ঘর সার্চ করে তাঁর হাতের লেখা কোনও কাগজ আনা চাই-ই। ডাঃ সেনের লেখা জোগাড় করতে কোনও কষ্ট হবে না। এ সমস্ত রিপোর্টই আজ সন্ধের মধ্যে চাই।

তাই হবে।—ওপাশ থেকে মিঃ নিয়োগী ফোন ছেড়ে দিলেন।

সারা দুপুর আজ কোথাও বেরোননি অজয় বোস। মাঝে-মাঝে ইন্সপেক্টর নিয়োগীকে ফোন করে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ফোনে পাচ্ছেন না। সন্ধে হতে চলল, এখনও পাকা খবর কিছুই পাওয়া গেল না। সবচেয়ে বড় কথা, তেমন কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী নেই যাতে সত্যিকারের খুনি আসামিকে ধরা যায়। সুনীতা দেবীর আত্মহত্যায় (যদি আত্মহত্যাই ধরে নেওয়া যায়) পিছনে সুপরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র আছেই। লালুর মৃত্যুই তাঁকে ঠিক পথ দেখিয়েছে। কিন্তু...।

BanglaBook.org

মিঃ বোস! মিঃ বোস!—উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢোকেন মিঃ নিয়োগী। আপনার কথামতো আগে ডাঃ সেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁর দিদির সঙ্গে দেখা করি। অমিতেশবাবুর মাধুদি যখন আমার কাছে এলেন, আমি প্রথমে তাঁকে চিনতেই পারিনি।

সে কী! এই তো মাত্র চারদিন আগেই তাঁর জবানবন্দি নিলেন।—হাসতে-হাসতে বললেন অজয় বোস।

যা বলছি তাই। বিশ্বাস করুন, আপনি গেলেও চিনতে পারতেন না। চোখ দুটো বসা। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো। এমনকী পরনের কাপড়টাও অবিন্যস্ত। আমার সামনে যখন এলেন তখন বেশ একটু টলছেন। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে যখন এলেন, তখন বুকের আঁচল ধুলোয়। জড়ানো স্বরে বললেন, কে? পুলিশ! আবার কেন? সুনীতার কেস তো ক্লোজড ফরএভার।

আপনাকে একটা চিঠি দেখানোর জন্যে এসেছি। দেখুন তো কার হাতের লেখা? চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে উনি লেখাটা পড়লেন ঃ সুনীতা দেবী, সাবধান। আপনি যে মালবিকাকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিলেন, সেই খবর আমরা জেনেছি। এবার আপনার শাস্তি, অপমান, লোকলজ্জা আর শেষকালে ফাঁসির দড়ি। শুধু দিদির জন্যে কিছু করতে পারছি না। আপনার স্বামী সব জেনেছেন।—পড়া শেষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, না—না—আমি কিছু জানি না। আমাকে এরা পাগল করে দেবে। হায় ভগবান।

কী হয়েছে মাধুদি? আপনি কি অসুস্থ?

কে, কে বললে মাধুদি! না—না—আমি কারও দিদি নই! মিথ্যে কথা! মিঃ নিয়োগী, আজ তিনরাত আমার ঘুম নেই। সারা বাড়ি ঘুমোয়। আর আমার স্লিপিং পিল খেয়েও ঘুম হচ্ছে না। এ কী জ্বালা! মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। উঃ।

তবুও মিঃ নিয়োগী চাপ দিলেন, এ লেখাটা কার?

কোনও জবাব দিলেন না মাধুদি। উদাস। আনমনা। নিরুত্তাপ, বরফ।

দেখুন তো, এই লোকটাকে চেনেন কি না?—লালুর ছবিটা দেখালেন মিঃ নিয়োগী।

না। এরকম কাউকে অন্তত দেখিনি। আপনি কী খুঁজতে এসেছেন মিঃ নিয়োগী? খুনি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। অদ্ভুতভাবে পুরুষালি গলায় হেসে উঠলেন মাধুদি ঃ আজ ক'দিন ধরেই অনবরত ফোন আসছে আমার, তারা বলছে, মাধুদি, মালবিকাকে সুনীতা খুন করেছে। আর সুনীতাকে তুমিই অমিতেশের জীবন থেকে সরিয়েছ। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে।

এ-কথা আমাদের জানাননি কেন?

আমি জানি সুনীতার আত্মহত্যাই প্রমাণ করল, পাপের শাস্তি মৃত্যু।

সুনীতা দেবীর ঘটনা আমরা এখনও মুছে দিইনি। এ-বিষয়েও আমরা নিশ্চিত সুনীতা দেবীকে খুন করা হয়েছে। তবে আসল খুনিকে ধরা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আপনার অনুতাপের লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে—' মিঃ নিয়োগীর কথা শেষ হতে না হতেই টেলিফোনের আওয়াজ এল।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং।

লাইনটা ধরুন ইন্সপেক্টর। নিশ্চয়ই তারা ফোন করছে।—মাধুদি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলেন।

দাঁড়ান। জবাবটা আপনিই দিন। আমি বাকি কথাটা শুনব।

হ্যালো।—খুব ভয়ে-ভয়ে মাধুদি রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

আস্তে-আস্তে মাধুদির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে নিজের কানের কাছে নিয়োগী ধরলেন, শুনতে পেলেন ঃ মাধুদি সাবধান। আমি জানি তুমি অমিতেশকে ভালোবাসো, তাই তাকে আর কেউ গ্রাস করুক এ তোমার পছন্দ নয়। তুমিই সুনীতাকে হত্যা করেছ। তুমিই খুনি। এখুনি পুলিশের হাতে সব প্রমাণ পাঠিয়ে দিচ্ছি।—লাইন কেটে গেল।

BanglaBook.org

মাধুদি হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে। মিঃ নিয়োগী ধীরে-ধীরে বললেন, ওরা বলল আপনি খুনি।

অ্যাঁ, না—না—আমি কিছু জানি না। আমি খুনি নই। এই নিন একটা ডায়েরি। বলেই টিপয়ের নীচে রাখা ছোট একটা পুরোনো ডায়েরি ওঁর হাতে তুলে দিলেন। ফিসফিসিয়ে আধপাগলের মতো বলতে লাগলেন, পালান। পালান।

এই পর্যন্ত বলে মিঃ নিয়োগী থামলেন। উত্তেজনায় গলার স্বর থমথম করছে।

তা হলে আপনি সত্যিই পালিয়ে এলেন? ডায়েরিটা দেখি। অমিতেশের দেখা পেলেন না? রাতে সাদা পোশাকের পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ওঁর গোটা বাড়িটা ঘিরে রাখুন। আর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখুন ডাঃ সেন, যেন শহর ছেড়ে না পালান।

অজয় বোস ডায়েরিটা নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। নীলাভ রঙের ছোট্ট মেয়েলি ডায়েরি। ওপরে গোটা-গোটা করে মেয়েলি হাতের লেখা, মালবিকা সেন। পরপর কয়েকটা পাতা উলটে গেলেন। নিজের বাড়ির কথা, স্বামীর কথা, কেনাকাটা, সিনেমার কথা। নিতান্তই ঘরোয়া।

২ মার্চ

খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ভালো লাগছে না। অমিতেশ এখনও বাড়ি আসছে না কেন? আজকাল কী যে ছেলেমানুষি করে অমি। মাধুদির সামনেই জড়িয়ে ধরে। আদর করতে চায় ফাঁক পেলেই। আমিই বোধহয় সেকেলে হয়ে গেছি।

২৮ মার্চ

মাধুদিকে আজ কী সুন্দরই না লাগছিল! সত্যি, মাধুদি এত সুন্দর, তবুও বিয়ে করছে না কেন? কেবলই বলে, ছেলে পছন্দ হয় না। আজ সুনীতা এসেছিল। দুজনে খুব খানিকটা গল্প করলাম। ও শুধু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অমিতেশের খবরই জানতে চাইল। অমিতেশ আমাকে কী করে আদর করে, কী ভাবে রাতে আমরা পাশাপাশি শুই, কী ভাবে অমিতেশ...ও যে কী করে এসব কথা মুখে বলে, মেয়েটার লজ্জাও নেই। আর সুনীতাকে বাড়িতে ডাকব না। এতদিন পর আমার সঙ্গে দেখা হল, অথচ আমাদের মনের কথা হল না। সুনীতা একটু পালটে গেছে যেন।

শেষ কথাটির তলায় লাল দাগ দেওয়া।

১২ এপ্রিল

আজ আমাদের পিকনিক হয়ে গেল ডায়মন্ডহারবারে। অনেকদিন পর আমরা খুব আনন্দ করলাম। মিনি, কুলদীপ, সুরিন্দর, প্রতিম ওরাও এসেছিল। সুনীতা আর অমিতেশ আজ খুব হাসাল সবাইকে। সুরিন্দর তো ঠাট্টা করেই বলল, মালবিকা, তুমি কিন্তু ভারী অন্যায় করেছ। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা সবাই ভেবেছিলাম অমিতেশ সুনীতাকেই লাইফ পার্টনার করবে।

কী জানি বাপু, তবে আমাকে বিয়ে করছে গেল কেন?

BanglaBook.org

এরপর প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই কোনও না কোনওভাবে সুনীতার কথা একটু-আধটু আছেই। যেমন,

*

আজ আমরা কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। সুনীতা বেশি কিছু কেনেনি। অমিতেশকে বললাম, সুনীতার জন্যে কিনে দাও না কিছু! সুনীতা খুব চালাক মেয়ে জানো তো?

সত্যিই খুব চালাক, মালবিকা। অজয় মনে-মনে ভাবলেন। পনেরো বছর পর মালবিকা দেবীকে কল্পনা করে নিতে একটু কষ্ট হল অজয়ের।

৬ জুন

কী বিশ্রী গরম ছিল সারাদিন। পাশের বাড়ির রুমা আর টুটু এসেছিল বেড়াতে। ফুলের মতো দুটি শিশু। আদর করে ওদের জ্বালাতন করেছি। সুনীতাও এসেছিল দুপুরে। সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলাম দুজনে। ও এখনও ভালো করে সাঁতার শেখেনি। তবে আমার পাল্লায় যখন পড়েছে আর বাড়ির ভেতর যখন সুইমিং পুল আছে তখন ওকে পাকাপোক্ত সাঁতারু মেয়ে বানিয়ে তবে ছাড়ব। সামনে আমাদের মাধুদির জন্মদিন। সুনীতাকেও কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সুনীতা রাজি হল না। ও জানে, অমিতেশ ওকে বেশি পছন্দ করে না। আজ ডায়েরি লিখছিলাম ওর সামনে বসেই। সুনীতার কথাও লিখে ফেললাম, কিন্তু ও জানতে পারল না।

১৮ জুন

মাধুদি আজ কী বকবকই না করল। অমিতেশের ছেলেমানুষি নিয়ে। অমিতেশ মাধুদির চেয়ে খুব বেশি ছোট নয়, অথচ মাধুদি এমন ভাব করেন যেন মাধুদির কাছে অমিতেশ একটা দশ-বারো বছরের ছেলে। কী বিশ্রী লাগে।

২০ সেপ্টেম্বর

পুজো আসছে। সবাই প্ল্যান আঁটছে বাইরে যাওয়ার জন্যে। অমিতেশের নাকি যাওয়াই হবে না। বলে, ডাক্তারদের ছুটি নেই, ইচ্ছে হলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়ালটেয়ার ঘুরে এসো।

কী বোকা! দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে। তা ছাড়া সুনীতা আজকাল অমিতেশ সম্বন্ধে বড় বেশি খোঁজখবর নেয়। আর অমিতেশ ঠিক ততটাই বিরক্তি দেখায় সুনীতার বিষয়ে।

৩ অক্টোবর

আজ মাধুদিকে নিয়ে বেরোব ভাবছিলাম, এমন সময়ে সুনীতা এসে গেল। অমিতেশ আসতে দেরি করায় আমরা দুজনেই বেরোলাম। পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্টুরেন্টে কফি খেলাম, নাচলাম। পরে সিনেমা দেখলাম। সুনীতার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগে। কত ধীর আর স্থির। কোনও ব্যাপারে মাধুদির মতো তড়বড়ে ভাব নেই।

BanglaBook.org

কত ধীর আর স্থির। অজয় মনে-মনে হাসলেন। ধীরে-ধীরে, সত্যিই মালবিকাকে মেরে ফেলতে সুনীতার অনেক সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ও নিজেও মরল আরও তিনটে জীবন বিষিয়ে দিল। কবে সুনীতা প্ল্যান করেছিল? ঠিক কোন সময় থেকে সে মালবিকার স্বামী অমিতেশকে আপনার করে পেতে চেয়েছিল? ভাবতে-ভাবতে আরও কয়েকটা তারিখের ওপর নজর পড়ে অজয়ের।

*

৬ অক্টোবর

আজ রাতে আবার সুনীতার বাড়ি এলাম। দারুণ পার্টি আছে। অল্প-অল্প ব্র্যান্ডি, হুইস্কি আর বিয়ার চলছে। আমি কোল্ড ড্রিংকস নিলাম। অমিতেশ কলে গেছে। মাধুদি তার অনেকদিনের বন্ধু রাঘবনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রাঘবন এলেই মাধুদিকে ছাড়তে চায় না। অথচ সুনীতা বলে, মাধুদি কখনও কাউকে বিয়ে করবে না, কারণ অমিতেশকে ছেড়ে যেতেই পারবে না। আমার খুব অবাক লাগে কথাটায়। এটা অবশ্য ঠিক যে, মাধুদি অমিতেশকে ভীষণ ভালোবাসে, আর ওকে আঁকড়ে ধরেই জীবনটা কাটাতে চায়, কিন্তু সেটা শুধু মাত্র ততদিন যতদিন না কাউকে বিয়ে করছে সে। আমি সুনীতাকে এই কথাটা বলি, কিন্তু সুনীতা মৃদু হাসে।

আমার মনে হয় আমিই ঠিক। তুমি অমিতেশের কতটুকু জানো সুনীতা! আমি তো সবই জানি।

ইস! কত নিশ্চিন্ত ছিল মালবিকা। কোনওদিনও ওর মনে স্বামী সম্বন্ধে কোনও সংশয় দানা বাঁধেনি। এমনকী বন্ধু সুনীতার ওপর কী অগাধ বিশ্বাস। অজয়ের মনে মালবিকার এক অদৃশ্য তৃপ্তিময় মুখের ছায়া ভেসে ওঠে। ডায়েরির প্রায় সব পাতাগুলোতে পৌঁছে গেছে অজয়। কয়েকটা পাতা শেষের দিকে সাদা রয়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি তো মালবিকা দেবীর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। বারবার সে স্বামীর, মাধুদির আর সুনীতার গল্প করেছে ডায়েরির পাতায়-পাতায়। শিশুরা একই গল্প শুনতে ও বলতে যেমন ক্লান্তি অনুভব করে না, মালবিকারও তেমন একই সুরে বারবার আবৃত্তি কবতে দ্বিধা নেই।

৮ অক্টোবর

বিকেলে সুনীতা হঠাৎ এসেছিল। বললাম, কীরে, তুই বিয়ে করবি না? কাউকেই তোর পছন্দ হয় না? উত্তরে হঠাৎ কেমন ইমোশনাল হয়ে উঠল সুনীতা, বলল, জীবনে ভালোবেসেছি একজনকে। ছ'বছর ধরে তার আশেপাশে ঘুরছি। হয়তো সে আমাকে ভালোও বেসেছিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ এক অচেনা মেয়েকে দেখে তাকেই বিয়ে করে বসল। ছ'বছর অপেক্ষার এই পরিণাম। সে আমাকে এখন বলে, ছ'বছর ধরে সে আমাকে শুধু ঘৃণা করেই এসেছে। বুঝলাম না ও কার কথা বলতে চাইল। ওর ছলছল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলিনি।

৯ অক্টোবর

কাল আমাদের বিবাহবার্ষিকী। সকালে অমিতেশ আমাকে একজোড়া নতুন বেনারসী শাড়ি এনে দিয়েছে। বিকেলের দিকে সুনীতাকে দেখাতে গেলাম। শুধু তাই নয়, একটা শাড়ি সুনীতাকে দিয়ে দিলাম। ও কিছুতেই নেবে না। বলে, আমার তো আর বিবাহবার্ষিকী নয়। অমিতেশ জানলে ভীষণ রেগে যাবে। আমি জোর করেই দিয়েছিলাম। ওর বড় ডাইনিং হলটা দেবদারু পাতা আর বেলুনে সাজিয়েছে। সন্ধের পর আলো জ্বেলে দিতেই কী সুন্দর দেখাতে লাগল। বলল, তপেশ আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। তোর কাছে আমিই যেতাম। তুই এ বেলা থেকেই যা। একেবারে রাতে ডিনার খেয়ে চলে যাস। আমি ফোন করে একটু পরে অমিতেশ আর মাধুদিকেও আসতে বলে দিচ্ছি। আমি বললাম, দেবদারু পাতাগুলো কী সুন্দর! কোত্থেকে আনলি এ-পাতা। কেন আমাদের বাড়ির লনের শেষ কোণে ছোট্ট

BanglaBook.org

দেবদারু গাছটা দেখিসনি? আমি তো নিজেই দা দিয়ে কেটে নিয়ে এসেছি। আমি বললাম, ভাই আমারও কিছু দেবদারু পাতা কাল চাই। সুনীতা হাসল, কাল কেন। আজই পার্টির শেষে যাওয়ার আগে তুই আর আমি গিয়ে কিছু পাতা কেটে আনব'খন।

এরপর ডায়েরির পাতাগুলো সাদা। অজয়ের মানসচোখে ভাসতে লাগল না-বলা দৃশ্যটি। পার্টি শেষের পরে পরিকল্পিত দৃশ্যটি।

অন্ধকারে দেবদারু গাছের পাশে দুটি সুন্দরী মেয়ে।

কী সুন্দর। কচি-কচি পাতা, দেখেছিস?

আমি নিজেই দা দিয়ে ডাল কেটেছি।

কোনও চাকরকে ডাকলেই হয়।

তাতে আনন্দ নেই, থ্রিল নেই।

অনেক রাত এখন। এত বেশি ড্রিংক করিয়েছিস তুই, বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

দা নিয়ে আসব?

হ্যাঁ, একটা ধারালো ছোট দা .।

সুনীতা কি তবে সেই মুহূর্তেই প্ল্যানটা করে ফেলেছিল, না অনেক ভেবেচিন্তে ওদের বিবাহ-বার্ষিকীর আগে বাড়িতে পার্টি দিয়ে দেবদারু পাতার টোপ ফেলেছিল! দা আনার একটু ছুতো তো চাই। কে জানে। সুনীতার সেই গোপন কথা জানার আজ আর কোনও উপায়ই নেই।

সুনীতা আর মালবিকা হাসছে। খানিকটা নেশার ঘোরেও। আঁচল লুটোচ্ছে দুজনের। মালবিকা বলছে : বেশ মজা লাগছে। বাড়িতে গিয়ে একগাদা পাতা নিয়ে অমিতেশকে চমকে দেব।

দে, আমাকে দে। আমি কাটছি।

অন্ধকারে খুব সাবধান। লনের আলোটা জ্বেলে দে।

আলো জ্বাললে সবাই দেখলে হাসবে।

পার্টি তো শেষ। কেউ তো নেই। সুনীতা, আমার ভয় করছে।

দুর। এই দ্যাখ, কেমন করে দা ধরতে হয়।

কোথায় তুই?

মালবিকা! আমি ঠিক তোর পেছনে।

হঠাৎ অন্ধকারে দা-টি কোথায় গিয়েছিল? পনেরো বছর আগে মালবিকা দেবীর মৃত্যুটা ডাকাতির ব্যাপার বলে সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া হয়। আর তার ফলেই সত্যিকারের ঘটনা সেদিন কেউ জানেনি। অজয় সেদিন সামান্য সাব-ইন্সপেক্টর। তার সন্দেহের সূত্র ধরে কোনও তদন্ত এগোয়নি। আজ পনেরো বছর পরে এই ডায়েরিই প্রমাণ করে দিচ্ছে সুনীতা দেবীর মোটিভ। মানুষ খুন করার একটা উদ্দেশ্য থাকতেই হবে। আজ সেই উদ্দেশ্যের যবনিকা উঠল।

কী ভাবছেন?—মিঃ নিয়োগীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে অজয়ের। চেঁচিয়ে ওঠেন, পেয়েছি। পেয়েছি।—তারপর মিঃ নিয়োগীকে জড়িয়ে ধরে লাফাতে থাকেন : পনেরো বছর ধরে সূত্রের সন্ধান করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। আজ ডায়েরিই প্রমাণ করল সুনীতা দেবীই তাঁর পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু মালবিকাকে খুন করেছিলেন। আর এ-ডায়েরি থেকে অমিতেশ সেটা যেদিন জেনেছেন, তখন থেকেই সুকৌশলে চিন্তা করেছেন কী করে সুনীতা দেবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। ভাবতে পারেন, শহরের নামকরা ডাক্তার, যাঁর হাতে শত-শত মানুষ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, সেই ডাক্তারই পনেরো বছর ধরে তাঁরই স্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন? ইটস ইউনিক। আর দেরি নয়। আপনি যে করেই হোক ডাঃ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেষ্টা করুন উনি লালু মান্নার ছবিটা দেখে চিনতে পারেন কি না। যদি না চেনার কথা বলেন তবে বুঝতে হবে ডাঃ সেন ভয় পেয়েছেন। আর যদি সহজভাবেই

BanglaBook.org

চিনে নেন, তাহলে বুঝতে হবে উনি বড় রকমের অপরাধী।

মিঃ নিয়োগীর কানে-কানে আর কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে অজয় বোস বললেন, আপনি এইভাবে সব ব্যবস্থা করুন। আমি ঠিক সময় মতোই ডাঃ সেনের বাড়িতে যাচ্ছি।

শাড়ি, ব্লাউজ, এমনকী চটিটা পর্যন্ত পায়ে দিয়ে ফুল-আঁকা নরম বালিশে শুয়ে মাধুদি। চোখ দুটি বোজা।

ওটা ওর শোবার সময় নয়। তা ছাড়া শুতে যাওয়ার আগে বরাবরই নাইট-গাউন পরে মাধুদি।—খুব আস্তে-আস্তে কথাগুলো বললেন ডাঃ সেন। যেন গলার স্বর পেলে মাধুদি জেগে উঠবে, বেডরুমে পুলিশের লোককে নিয়ে আসায় বিরক্ত হবে।

অজয় বোস বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। সরু-সরু পাখির পালক-আঙুলের একটিতে কালির ছোপ। তবে কি তিনি কিছু লিখছিলেন? টেবিলের দিকে তাকালেন, ছোট্ট বিলিতি টাইম পিস, একটা টেবিল ক্যালেন্ডার (ফুটফুটে মেয়ে স্কিপিং করছে), আধখোলা ফাউন্টেন পেন, তার নিব এবং মুখ কালিতে ভেজানো। শোবার আগে টেবিলে বসে নিশ্চয়ই কিছু লিখছিলেন। হয়তো কলমে কালি ছিল না, তাই দোয়াতে কলম ডুবিয়ে-ডুবিয়ে লিখছিলেন। কেন এত তাড়াতাড়ি করছিলেন? তবে কি খুব ভয় পেয়েছিলেন? কীসের ভয়? কে ভয় দেখিয়েছে? মিঃ নিয়োগীও বললেন, মাধুদির ক'দিন ঘুম নেই। পাগলের মতো চেহারা। তবে কি তাঁকেও মানসিক বিকৃতির পর্যায়ে এনে ফেলা হয়েছিল? হ্যাড শি গন ক্রেজি? কী এত তাড়া ছিল যে, পেনে নতুন করে কালি ভরার সময় পর্যন্ত ছিল না? মাধুদি কি তাড়াতাড়ি ঘুমোতে, স্বপ্ন দেখতে, বা মরতে চেয়েছিলেন? অসংখ্য প্রশ্ন অজয়ের মনে দাপাদাপি করতে-করতে মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, কেন? কেন?

পাশে দাঁড়ানো অমিতেশ বলল, কেন আত্মহত্যা করল মাধুদি? কারণ, সুনীতা মরার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সেই চিঠিটা লুকোনো ছিল। আজ আমিই সেটাকে ওর সামনে এনে দিই। সে-চিঠিতে স্পষ্ট লেখা যে, মাধুদিই সুনীতাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে।

চমৎকার।—অজয় বোস হাসলেন : আপনি এটা কী করলেন? চিঠিটা পেয়ে তো আমাদের জানানো উচিত ছিল। এত বড় একটা সূত্র তো আমরা পেলে বর্তে যাই।

মাধুদি আমার কাছে এসে বলল, অমি, আজ ক'টা দিনরাত কোনও ঘুমের ওষুধেই ঘুম আসছে না। কী করি বল তো? আমি তো পাগল হয়ে যাব। তখন আমি বললাম, সুনীতাকে লেখা তোমার চিঠিটার ক'টা লাইন কেটে দাও, না হলে পুলিশ ওটা পড়লেই তোমাকেই সুনীতার আত্মহত্যার জন্যে দায়ী করবে। তারপরে ফরেন মেক-এর ভালো স্লিপিং পিলের নাম লিখে দিচ্ছি—কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও। বেশ আরামে ঘুমোতে পারবে। এই দেখুন সেই চিঠি।

অজয় মাধুদির চিঠিটা পড়তে লাগলেন :

সুনীতা, তুমি আজ নেই। এ-চিঠি লেখার অর্থ নিজের মনটা পরিষ্কার করা। কী সুন্দর আমাদের সংসার ছিল বলো তো? তুমি, আমি আর অমিতেশ। তোমার ছেলেপুলের অভাবটা অবশ্য আমিও অনুভব করতাম। কিন্তু এসব কী হল বলো তো? পুলিশ অফিসার অজয় বোস আর মিঃ নিয়োগী প্রায়ই আসছেন। ভালো লাগে না। মালবিকার ডায়েরিটা আচমকা একদিন টেবিলে পেলাম। কে রেখে দিল, কোত্থেকে এল, কেউ বলতে পারল না। পড়তে-পড়তে ভয় পেলাম। তুমি—তুমিই কি তবে মালবিকাকে দা দিয়ে আঘাত করেছিলে? আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা, ব্যথা। দপদপানি। বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

BanglaBook.org

ফুলের মতো মেয়ে ছিলে তুমি। মালবিকার মৃত্যুর পর অমিতেশের ভেঙে পড়া মন ও শরীরকে কীভাবেই না বাঁচালে! অথচ...শেষ কয়েকটা মাস আমারও যেন কী হয়েছিল। অমিকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে, পারিনি। বিশেষ করে ডায়েরিটা পড়ার পর। কোনও-কোনওদিন তুমি আর অমিতেশ যখন এক শয্যায়, তখনও আমি চুপি-চুপি চোরের মতো তোমাদের বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমন কী তোমাদের নিদ্রার দৃশ্য পর্যন্তও হয়তো দেখেছি। কেবলই ভয় হত, হয়তো ওই দুর্বল মুহূর্তে মালবিকার মতো অমিতেশকেও তুমি খুন করবে। তুমি লক্ষ করতে অমিকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে চাইতাম না। বুড়ি আম্মা ও মতিয়া অমিতেশের পাশে ছায়ার মতো আমার থাকাটা ভালো চোখে দেখত না (ওরা বলত, ডাইন)। সবই আমি জানতাম, তবুও...। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম, কথায়-কথায় তুমি রেগে যাও। আমার ওপর ভীষণ বিরক্তি। অমিতেশকে একলা পাও না। ভাবতে, আমার নিশ্চয়ই কোনও অবৈধ ব্যাপার আছে অমিতেশের সঙ্গে।

নিঃসঙ্গ মনে ভাবতাম, আমার এই গুপ্তচরের মতো অমিতেশকে নজরে রাখাটা ভালো দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমি কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একেই বোধহয় লোকে বলে অ্যালার্মিস্ট। সব কিছুর ভেতর খারাপটাই আগে ভাবা।

অথচ ডায়েরির ব্যাপারটা তোমাকে কিংবা অমিকে বলতেও পারিনি। তুমিও সারা বাড়িতে প্রায়ই কী যেন খুঁজে বেড়াতে। এখন মনে হচ্ছে, তুমিও এই ডায়েরি খুঁজতে। কিন্তু বিশ্বাস করো সুনীতা, আমি এসব কিছুই জানি না। কে ডায়েরিটা আমার টেবিলে রেখে দিল? বিশ্বাস করো, লক্ষ্মীটি, আমি নির্দোষ। আমি নির্দোষ। তুমি আত্মহত্যা করো, এ আমি একটুও চাইনি। সত্যিই চাইনি।

না চাইলেও তাই ঘটে গেছে। সুনীতা দেবীও নেই। মাধুদিও গেলেন। আগে লালু মান্নাও গেছে। সব ঘটনাই কি নিতান্ত দুর্ঘটনা? না, আর দেরি করা নয়। ডাঃ সেন, আপনার প্যান্টের পকেটে কী আছে?

ভয় নেই, রিভলভার নেই।

রিভলভার আমারও নেই।—হাসতে-হাসতে অজয় বোস বললেন।

একটা ফোন করতাম ডাঃ সেন। নীচে যাবেন?

চলুন।—ডাঃ সেন ও অজয় বোস দুজনেই নীচের হলঘরটায় নেমে এলেন।

অজয় বোস মাধুদির ডেড বডি পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাওয়ার জন্য থানায় ফোন করলেন। মিঃ নিয়োগীকেও তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। ফিরে এসে দেখেন, অমিতেশ সোফায় বসে আছে।

আপনার পকেটে আমার স্ত্রীর ডায়েরিটা আছে। ওটা দিন। আমি ওটা মাধুদিকে পড়তে দিয়েছিলাম সুনীতার স্বরূপ জানাতে।

কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি সে-কথা বলেনি অমিতেশবাবু।

এ-ডায়েরিটা আজ দু-দিন ধরে খুঁজে পাইনি। আপনি কী করে এটা পেলেন?

সে-কথা থাক। মালবিকার পুরোনো কাগজপত্তর খাঁটতে গিয়ে এই ডায়েরিটা আপনি যেদিন পেলেন, সেদিনই আপনার সন্দেহ হয়েছিল সুনীতার সম্বন্ধে। কিন্তু তখন বিয়ের সবে এক বছরও হয়নি। ইচ্ছে করলে এটা পুলিশকে দিতে পারতেন। পুলিশের পক্ষে সুনীতা দেবীকে গ্রেপ্তার করা সেদিনই হয়তো সম্ভব ছিল।

আপনাকে কী আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কৈফিয়ত দিতে হবে? আমি এখুনি আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি চুরির দায়ে আপনার ওপরওয়ালাকে রিং করব, যদি না বলেন, এটা কী করে পেলেন।

BanglaBook.org

মাধুদিই এটা পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ নিয়োগীকে স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন।

মাধুদি!

হ্যাঁ, তাই। লালু মান্নার মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে মিঃ নিয়োগী আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন যখন, তখনই আপনার দিদি এটা তাঁকে দেন।

লালু তো আমার অনেকদিনের রোগী, সে কথা তো মিঃ নিয়োগীকে আমি বলেছি। লোকটা নেশাখোর। আফিমের ডোজ বেশি খেয়েই এই দুর্ঘটনা।—ডাঃ সেন খানিকটা সহজ হয়ে উঠল।

সুনীতা দেবীর মৃত্যু, লালুর মৃত্যু, এমনকী মাধুদির মৃত্যুও দুর্ঘটনা ছাড়া আর কী—।

সে তো একশোবার।—ডাঃ সেন জোরে বলে উঠল।

কিন্তু দুর্ঘটনা যখন প্ল্যান্ড ওয়েতে করা হয়, তখন আর তাকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।—অজয় বোস ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, ডায়েরিটা আপনি কেন দিয়েছিলেন মাধুদিকে?

আমি তো বলেছি, সুনীতাকে মাধুদি খুব বেশি ভালোবাসত। সুনীতার মতো মেয়ে নাকি আর হয় না। পাশাপাশি ছ-সাত বছর একটা কুকুর থাকলেও মানুষের মন তার জন্যে আকুল হয়ে থাকে। তাই ডায়েরিটা দিয়েছিলাম মালবিকার মনের কথাগুলো বুঝতে, আর সুনীতার সত্যিকারের স্বরূপ দেখাতে।

আমি যদি বলি, এটাও একটা পরীক্ষা। আপনি চেয়েছিলেন, মাধুদির মনের ওপর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হোক। জানতেন, আপনাকে উনি সবচেয়ে ভালোবাসেন সেই পাঁচ বছর বয়েস থেকে। ওর মনের কাছে আপনি এখনও দশ বছরের শিশু। এটুকু আপনি বুঝতেন বলেই আপনি এই চাল চেলেছিলেন। আপনাকে বাঁচানোর জন্যে মাধুদি দিনরাত আপনার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবে। সুনীতার সন্দেহ হবে। ভাববেন, আপনারা তাঁর খুনের কথা জেনেছেন। তিনি পালাতে চাইবেন কিংবা আত্মহত্যা করবেন। ঠিক তাই না?

আপনি ডিটেকটিভ না হয়ে মনস্তত্ত্ববিদ হলেই বোধহয় ভালো করতেন মিঃ বোস।

ডিটেকটিভরাও এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক। প্রতিটি অপরাধের পিছনে মানুষের মন কাজ করে। মনের কোন বাঁকা পথ ধরে অপরাধের ইচ্ছে এগিয়ে চলে, সেটা জানতে বা বুঝতে না পারলে অপরাধী ধরব কেমন করে? ডায়েরিটা সবার আগে সুনীতা দেবীর ঘরে তার সামনে আপনিই দিয়েছিলেন। সুনীতা দেবী ভেবেছিলেন, মালবিকার হত্যা-স্মৃতি পুলিশের খাতায় মুছে গেছে। ডায়েরিটা পড়ে তিনি দারুণ ভয় পেলেন। তারপর আসত ফোনে গোস্ট-কল। যে গোস্ট-কল থেকে দু-দিন আগে মাধুদিও রেহাই পাননি। তারপর একদিন একটা রক্তমাখা নতুন দা-ও তাঁর ঘরে রেখে দেওয়া হল। যেটা পরে সুনীতা দেবীর গডরেজের লকারে পাওয়া গেছে। আলমারির লকারে দা।

এসব কী যা তা বলছেন আপনি?—ডাঃ সেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

রাগ করছেন কেন অমিতেশবাবু? উড়ো চিঠি, ডায়েরি, দা আর টেলিফোনের গোস্ট-কল দিনে-দিনে সুনীতা দেবীর মানসিক সুস্থতাকে একেবারে শেষ সীমানায় এনে দিল। যখন-তখন রাগে ফেটে পড়েন, রাতে অত্যধিক ড্রিংক করেন। নাচ আর পার্টিতে মশগুল থাকেন সবকিছু ভোলার জন্যে। ওদিকে মাধুদিও ডায়েরিটা পাওয়ার পর আপনাকে আগলাচ্ছেন। ফলে সুনীতা দেবীর মেন্টাল স্ট্রেসটা ফেটে পড়ার শেষ স্তরে যখন পৌঁছেছে, তখনই লালুকে দিয়ে পার্সেল করে একটি কাটা আঙুল পাঠালেন। মাধুদি কোথায় কাটা আঙুল পাবেন? কিন্তু আপনি হাসপাতালের বড় ডাক্তার, আপনার পক্ষে একটা মড়ার কাটা আঙুল অ্যাম্পুটেট করে লুকিয়ে আনা কিছুই কষ্টকর নয়। তাহলে কে সুনীতা দেবীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে?

এসব আপনার বানানো গল্প। এর কোনও প্রমাণ নেই। লালুও তো বেঁচে নেই যে, আপনার গল্পটা মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দেবে? এসব ষড়যন্ত্র। আমাকে হেয় করার মতলব।—রাগে মুখ-চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে অমিতেশের।

BanglaBook.org

লালুকে তো সেজন্যেই আপনি সরিয়ে ফেলেছেন। সুখীর সাক্ষ্যে প্রমাণ আছে যে, এক ডাক্তার তাকে নিয়মিত টাকা দিতেন। যে-কাঠের বাক্সটা ওকে দিয়ে সুনীতাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটা লালু আগে বাড়িতে নিয়ে যায় খুলে দেখতে, ভেতরে কী আছে। আপনি যদি এক টাকা বকশিশ দিতেন তাহলে লালু সঙ্গে-সঙ্গেই ডেলিভারি দিত। কিন্তু যখন ঝোঁকের মাথায় আপনি তিরিশ টাকা বকশিশ দিয়ে ফেললেন, তখনই ওর লোভ হল। ভাবল নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান জিনিস আছে। খুলে দেখল, একটা আঙুল আর একটা চিঠি। তাড়াতাড়িতে চিঠিটা ভেতরে রাখতে ভুলে গেল। সেটা এখন পুলিশের কাছে। লালু আবার আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে লাগল। তখন আপনি বেশি আফিম দিয়ে ওকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নেশাখোর মানুষ, নেশার ঘোরে মাত্রাতিরিক্ত আফিম খেতেই শেষ।

কী প্রমাণ যে ওই চিঠিটা কাঠের বাক্সেই ছিল?

আছে বইকী। তা ছাড়া হাতের লেখাটাও আপনার। ভেবেছিলেন আপনার লেখা দেখেই সুনীতা বুঝবেন মালবিকা হত্যার আসল আসামিকে আপনি চিনতে পেরেছেন। সুনীতা পালাবেন। সুইসাইড করবেন। কিন্তু দেখুন দেখি কী ভবিতব্য। চিঠিটা না পেয়েই যদি পালাবেন তাহলে তাঁকে আত্মহত্যায় কে প্ররোচিত করেছিল? আপনি না মাধুদি?

সুনীতা নিজের বিবেক থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। সে তো তার স্বীকারোক্তিও রেখে গেছে। দিজ আর অল ফিকশানস।

মাধুদির মৃত্যু?

সে তো আপনি তার শেষ চিঠি থেকেই বুঝলেন। মাধুদিও তার বিবেকের শাসানি থেকে বাঁচার জন্যেই ঘুমের ওষুধটা বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেলেছে। এটাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

আপনি কি তবে বলতে চান, ডায়েরি থেকে সব জেনেশুনেও আপনি প্রায় আট বছর সুনীতা দেবীর সঙ্গে সংসার করেছেন? এ তো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।—অজয় বোস অমিতেশের মনের কথা জানবার জন্য এই কথাটা ছুড়ে দিলেন।

মানুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। বিশেষ করে যারা ভগবানের বিচারে অর্থাৎ ন্যাচারাল জাস্টিসে বিশ্বাস করে। শয়তানের একদিন শাস্তি হবেই, আর ভালো যা তা একদিন পুরস্কৃত হবেই—এ-তথ্যে যারা বিশ্বাস করে তারা সব কিছুই সহ্য করতে পারে। আমাদের ধর্মেও সেই কথা। মহাভারতে দেখেননি কেমন করে সর্বশক্তিমান, সর্ববুদ্ধিমান মহান সেনানীরা একদিন সামান্য পাঁচটি ভাইয়ের কাছে পরাজিত হল। ধর্মের বিচারেই তো প্রতিশোধের কথা আছে। সেই প্রকৃতির প্রতিশোধেই আমি বিশ্বাসী। খুনির পরিণতি মৃত্যু। আইন তাকে ধরতে পারেনি হয়তো, কিন্তু মৃত্যুই তার অপরাধের সাজা দিয়েছে।—অমিতেশ সেনের মুখটা কেমন যেন বিচিত্র এক আলোয় ভরে গেছে। নিজের অপরাধের স্বপক্ষে কী বিচিত্র যুক্তি!

কিছুক্ষণের জন্য অজয়ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিন্তু সুনীতা দেবী তো আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে। জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।—ঘরের ভেতর বজ্রপাতের মতো শোনাতে লাগল অজয় বোসের কথাগুলো। এখানেই থামলেন না তিনি। আরও বললেন, সুনীতা দেবী পালিয়ে যাননি। সেদিন রাতে কারও কাছে বা কোনও হোটেলে বা ক্লাবে না গিয়ে গাড়ির ভেতরে বসে-বসে মদ খেয়েছেন আর এলোমেলোভাবে গঙ্গার পাড় দিয়ে, ময়দানের পাশ দিয়ে, গাড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। পুলিশ প্যাট্রল দুবার সুনীতা দেবীকে সাবধান হয়ে গাড়ি চালাতে বলেছে। গাড়ির নম্বর সার্জেন্টের নোটবুকে পাওয়া গেছে। বাড়ি ফিরেই মারাত্মক ভুল করলেন তিনি। অন্ধকারে লনের কাছে আপনাকে দেখে বোধহয় শেষবারের মতো মানবিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার আশায় আপনার কাছে ছুটে যান। সুনীতা তখন মদের নেশায় বেসামাল। ওঁকে টানতে-টানতে সুইমিং পুলের পাশে নিয়ে এলেন, তারপর জলের ভেতর

BanglaBook.org

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। নেশার ঘোরে সাঁতার কাটেননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে ভেসে উঠলেন। তখন আপনি তাড়াতাড়ি শাড়িটা সরিয়ে ছোট প্যান্টটা পরালেন, বোঝাতে চাইলেন, উনি নিজেই সাঁতার কাটতে এসে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু একবারও ভাবলেন না ব্লাউজটা থাকলে বেমানান লাগছে।

চুপ করুন। এসব বাজে কথা। এর কী প্রমাণ আছে?

প্রমাণ নেই ভাবলেই বা কী করবেন? কারণ, সুনীতা দেবীর স্বীকারোক্তিটা আপনি কোথায় রাখবেন?

অমিতেশ উঠে দাঁড়ালেন। দোতলার সিঁড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়াচ্ছিলেন। অজয় বোস বাধা দিলেন, কোথায় যাচ্ছেন ডাঃ সেন? ছেলেমানুষি করে কোনও লাভ নেই। ওই শুনুন, বাইরে হর্ন বাজল। এখুনি মিঃ নিয়োগী এসে পড়ছেন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

তারপর?

তারপর আমি আপনাকে সুনীতা দেবীর হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করব।

আপনার প্রমাণ কী?

আপনি যদি নিজে থেকে স্বীকার না করেন তবে আদালতে যথাসময়ে সপ্রমাণ হাজির থাকব। সুনীতা দেবী ঘড়ি পরে সাঁতার কাটতে নেমেছিলেন? তাও আবার ঘড়িটা ওয়াটারপ্রুফ নয়। সুনীতা দেবীর ভিজে শাড়ি-সায়া লনের কোণে লিটার বিনের ভেতর বালি-চাপা দিয়ে কে রেখেছিল? সুনীতা দেবী নিজে, না আপনি? হস্তলেখা-বিশারদকে সুনীতা দেবীর লেখার স্পেসিমেন, অর্থাৎ নমুনা, তো আপনিই দিয়েছিলেন, তাই না? কতকগুলো পুরোনো টুকরো কাগজে মার্কেটিং-এর হিসেব, অসমাপ্ত চিঠি, আপনাকে লেখা চিঠি—এসবই তো আপনি দিয়েছিলেন। যে-ক'টি লেখা দিয়েছিলেন সব ক'টিই আপনার নিজের লেখা। জানতেন 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'—লেখাটি আদৌ সুনীতা দেবীর কি না এটা পুলিশ মেলাবেই। তাই সেই রাতেই সব তৈরি করে রেখেছিলেন, কারণ দুটো লেখা এক হওয়া দরকার, তাই না, ভারত বিখ্যাত ডাঃ অমিতেশ সেন?

এসব আপনি কী বলছেন অজয়বাবু? আপনার স্পর্ধা দেখে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার জন্যে আমার নামে দিব্যি একটা মিথ্যে কেস সাজিয়ে আমার কেরিয়ারটা আপনি নষ্ট করতে চান। হোয়াট ডু য়্যু ওয়ান্ট একজ্যাক্টলি?—উত্তেজিত স্বর ডাঃ অমিতেশ সেনের।

এত রাগ করছেন কেন? আমি তো আমার ডিউটি করতে এসেছি। পনেরো বছর ধরে যে অপরাধের প্ল্যান আপনি করেছেন, তা শুধু আপনার মতো শয়তান মস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভব।

ভুলে যাবেন না, দেশে এখনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইন রয়েছে। মিথ্যে ঘটনার বেড়াজাল সাজিয়ে আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন। আর সুনীতা ও মাধুদিকে আমি কেন খুন করতে যাব? আমার মোটিভ কী? আপনি বললেই হল। সাক্ষ্য-প্রমাণই বা কী আছে? আর এ ছাড়া সবাই জানে সুনীতা আত্মহত্যা করেছে। তার নিজের স্বীকারোক্তির ফোটোস্ট্যাট কপি আপনারাই কাগজে বের করেছেন। আর মাধুদি বরাবরই অনিদ্রায় ভুগত। স্লিপিং পিলের ডোজ বেশি হওয়ায় মারা গেছে। পোস্টমর্টেমে তাও প্রমাণিত হবে। আমার সময়ের মূল্য আছে। প্লিজ লিভ মি নাও।—দাঁড়িয়ে পড়ে অমিতেশ। এগোতে যায়।

হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠেন অজয় বোস। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জনাপাঁচেক সশস্ত্র পুলিশ। আর লোকাল থানার ইন্সপেক্টর।

এর মানে কী?—আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় অমিতেশ : সত্যিই কি আপনি আমাকে হেনস্থা করতে চান? মাত্র দু-দিন বাদে আন্তর্জাতিক চিকিৎসক সম্মেলনে আমার লন্ডন যাওয়ার কথা। ডু য়্যু ওয়ান্ট টু ডিজঅনার মি?

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।—প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন অজয় বোস : আপনি সত্যিই বড় রেগে

BanglaBook.org

গেছেন। ঠান্ডা হয়ে একটু বসুন। মাত্র আর কয়েক মিনিট আপনার সময় নষ্ট করব। সুনীতা দেবীকে কেউ খুন করেনি, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কী বলুন ইন্সপেক্টর নিয়োগী?

হ্যাঁ, মিঃ বোস।

তবুও আপনাকে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। কারণ দ্য বুক অফ ক্রাইম ইজ নেভার ক্লোজড। পনেরো বছর আগে আপনার প্রথমা স্ত্রী মালবিকা দেবী কোনও অর্থলোভী ডাকাতের হাতে প্রাণ দেননি, সে-কথা আগেই বলেছি। ডায়েরি থেকে এটুকু আঁচ করা যায় যে, সুনীতা দেবীই তাঁকে সেই রাতে খুন করতে পারেন। মালবিকা দেবীকে শেষ দেখা যায় একমাত্র সুনীতা দেবীর সঙ্গেই এবং তাঁরই গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরের দিন আপনাদের বিবাহবার্ষিকী উৎসবে দেবদারু পাতা জোগাড় করে দেওয়ার জন্যে প্রায় জোর করেই সুনীতা দেবী মালবিকাকে লনের কোণে অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যান। তারপর আচমকা দা দিয়ে মাথার পিছনে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করায় মালবিকা দেবী যেই পড়ে যান, তখুনি কোনওরকমে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরিয়ে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দেন। অত রাত্রে ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা ব্যালান্স হারিয়ে এলোমেলো হয়ে খানিক দূর এসে পাঁচিলে ধাক্কা খায়। সুনীতা দেবী তখন তাঁর পেয়ারের বিশ্বস্ত চাকর বারো-তেরো বছরের বাবুরামকে বলেন বড় রাস্তায় গিয়ে দেখতে যে, তাঁর গাড়িটা কোনও অ্যাকসিডেন্ট করেছে কি না। ছেলেমানুষ বাবুরাম খানিকটা দূর হেঁটে পাঁচিলের পাশে ধাক্কা খাওয়া দিদিমণির গাড়ি দেখে ছুটে যায়। মালবিকার মৃতদেহের পাশে অনেক টাকা আর সোনা দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। লোভের বশে সে আর-কাউকে না জানিয়ে সেই রাতেই দেশে চম্পট দেয়। হয়তো তখনই মালবিকা দেবীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনি বেঁচে উঠতেও পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। ঘটনাচক্রে সেই বাবুরামই আজ পুলিশের নাম্বার ওয়ান ইনফরমার, আর আমারই অন্যতম সহযোগী। তা ছাড়া ঘাসের ওপর যেখানে মালবিকা দেবী দা-এর আঘাতে পড়ে গিয়েছিলেন, সেই জায়গাটুকুর ঘাসসমেত মাটি পরের দিন উঠিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে, ওটা খুন। তাই সুনীতা দেবীদের মতো সম্ভ্রান্ত নারীর বাড়ির ভেতরে গভীর তদন্তও করা হয়নি।

কিন্তু আজ আর এ-সব বলেও তো কোনও লাভ নেই মিঃ বোস। সুনীতাও মৃত।

সে-কথা ঠিক হয়তো নয় ডাঃ সেন। তা ছাড়া আপনার বোধহয় মনে আছে, হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ডাক্তার-নার্স মাত্র দুটি কথাই শুনতে পেয়েছিলেন : 'সুনীতা সুনীতা।' ওয়াজ ইট নট সো?

অমিতেশ স্তব্ধ। ঘর ভরতি পুলিশ। একবার চারদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলেন।

কিছু ভাবছেন ডাঃ সেন? আপনার কোনও ভয় নেই। তবে আপনার প্রথমা স্ত্রী মালবিকা দেবীকে খুন করার অপরাধে আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতা দেবীকে আজ পনেরো বছর পরে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছি। আর সুনীতা দেবী বেঁচে আছেন বলেই আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ইনোসেন্ট। আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আই অ্যাম সরি ফর অল দ্য ট্রাবল। স্ত্রীর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করবেন না? অজয় বোস অনেকক্ষণ পর তাঁর পাইপে আগুন দিলেন।

কী বলছেন? আপনি কি পাগল?—লাফিয়ে উঠল অমিতেশ, সুনীতা ইজ ডেড। সে আবার কী করে বেঁচে উঠবে? ঠাট্টা-তামাশার একটা সীমা আছে মিঃ বোস।

মিঃ নিয়োগী, সুনীতা দেবীকে হাজির করতে বলুন।

অমিতেশ তাকিয়ে রইলেন বাইরের দরজার দিকে। সামনে-পিছনে পুলিশ নিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নিচু করে প্রবেশ করল এক মহিলা। মাথায় একটু ঘোমটা টানা। মাথা নিচু করে। তাই তো। সুনীতাই তো। সেইরকম চুলের সিঁথি। প্রায় গলাবন্ধ ব্লাউজ, অথচ হাতের মূল পর্যন্ত ফাঁকা। দাঁড়ানোর ভঙ্গিও। সেইরকম। শুধু মুখটা অত দূরে দাঁড়ানোয় স্পষ্ট নজরে আসছে না।

এগিয়ে যেতে চাইলেন অমিতেশ। বাধা দিলেন অজয় : ব্যস্ত হবেন না ডাঃ সেন। সুনীতা

BanglaBook.org

দেবী আপনার কাছে আসবেন। অপরাধ তো ওঁর। আপনাকে বিয়ের বাসনায় নিজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে উনি দা দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছেন। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে আপনাকে একবার দেখতে উনি নিজেই চেয়েছেন। আসুন সুনীতা দেবী।

ধীরে-ধীরে সুনীতা এক-পা দু-পা করে এগোল। উজ্জ্বল আলোয় মুখ তুলে চাইল স্বামীর দিকে। দু-চোখ গড়িয়ে শ্রাবণের ধারা নামল। অনুচ্চার ব্যথায় ঠোঁট জোড়া বুঝি কিছু বলতে চাইছে। ফিসফিসিয়ে মৃদু স্বর বেরোল ঃ অমিতেশ, আমাকে ক্ষমা কোরো।

মিথ্যে। মিথ্যে। জালিয়াতি।—হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর বাজ ফেটে পড়ল। দু-হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে উন্মত্তের মতো হা-হা করে হেসে উঠলেন ভারত-বিখ্যাত ডাঃ সেন। চেঁচিয়ে উঠলেন অজয় বোসের জামা ধরে ঃ সুনীতা বেঁচে থাকতে পারে না। পারে না। কে এ?

কেন বেঁচে থাকতে পারে না ডাঃ সেন?

সুনীতা মারা যাওয়ার পর আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। আই অ্যাম এ ডক্টর। আমার ভুল হতে পারে না।

সুনীতা দেবীর ডেডবডি তো আপনাকে দেখতেও দেওয়া হয়নি। করোনার পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট দিয়েছিল। সেটাই আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। ওটা আমাদের সাজানো।

স্টিল ইউ আর টেলিং লাই। মিথ্যে। ইমপসিবল। অসম্ভব। এ-মেয়ে সুনীতা নয়।

ভালো করে চেয়ে দেখুন সেই অবিকল চেহারা কি না? সুনীতা দেবীর কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আপনার জানা আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর বাঁ-পিঠে একটা বড় জড়ুল আছে।

অমিতেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই লেডি পুলিশ অফিসার মিসেস মৈত্র সুনীতা দেবীকে ঘুরিয়ে পিঠের বাঁ-দিকের জামাটা একটানে ছিঁড়ে দিলেন। দেখা গেল, সত্যিই একটা খয়েরি রঙের জড়ুল আছে।

অমিতেশ বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের চোখকে। সমস্ত শরীর তাঁর কাঁপছে। কান, গলা, পিঠ, বুক ভয়ের ঘামে জবজবে। বসে পড়লেন সোফায়। হঠাৎ কেঁদে উঠলেন শিশুর মতো, মিঃ বোস, এ আমি কী দেখছি? সুনীতা সত্যিই মারা গেছে। আমি, হ্যাঁ আমিই তাকে মেরেছি। সুইমিং পুলের জলে ওকে জোর করে ফেলে দিয়েছি। সুনীতা সাঁতার জানত অল্প-অল্প। বাঁচতে চেয়েছিল। পাড়ের কাছে এসে আমার হাত ধরতে চেয়েছিল। তবু, তবু, আমি ওর মুখ-নাক রুমালে বেঁধে ওকে লাঠি দিয়ে জলে চেপে ধরেছি। অত রাতে মতিয়া আর বুড়ি আম্মা কিছুই টের পায়নি। মাধুদি তো বাড়ির বাইরেই ছিল।—এই পর্যন্ত বলে কাতর হয়ে অসুখী কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগল অমিতেশ।

কিন্তু সুইমিং পুল থেকে আমরা যখন সুনীতা দেবীকে পরের দিন বিকেলে উদ্ধার করি, তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন না। আমরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখি, সুনীতা দেবীর শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। স্পেশাল ট্রিটমেন্ট করে ওকে বাঁচানো হয়েছে। এটা কেন ভাবছেন না?

ওঃ ভগবান। আপনি এখনও আষাঢ়ে গল্প বানাচ্ছেন মিঃ বোস? সত্যি করে বলুন, সুনীতা ইজ নো মোর।

কেন আপনি তো নিজের চোখে সুনীতা দেবীর পিঠের জড়ুলও দেখলেন।

হতে পারে না, হতে পারে না। সুনীতা বাঁচতে পারে না। সুনীতা জলের ভেতর মারা গিয়ে যখন ভেসে উঠল, তখন আমিই ওর মরা দেহটাকে টেনে পাড়ে তুলি। আমি ডাক্তার। আমি সেদিন ভুল দেখিনি।—মাথাটা চেপে রইলেন অমিতেশ।

তারপর?

তারপর ওর বড় ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ টেনে বের করি। ভ্যানিটি ব্যাগটা

BanglaBook.org

গাড়িতেই ছিল। আমার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ ওর হাতের কাছে ধরে ওর নিঃসাড় আঙুলে আমারই কলমটা গুঁজে দিয়ে ওর হাত ধরে লিখিয়ে নিই : 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমাব মানসিক শান্তি নেই। আমি...আমি....।' তারপর ছোট ব্যাগের ভেতর কাগজটা পুরে দিয়ে ব্লাউজের ভেতর গুঁজে দিই। গাড়ির সিটের নীচে আগে থাকতেই আমি সুনীতার টু-পিস সুইমিং কস্টিউমটা রেখে দিয়েছিলাম। মরা শরীরটা থেকে শাড়ি-সায়া সরিয়ে ওকে সাঁতারের পোশাকের ছোট শর্টটা পরিয়ে দিয়ে আবার জলে ফেলে দিই। কী যে আমার তখন হয়েছিল আমি বুঝতে পাবিনি।

মিথ্যে কথা ডাঃ সেন। যেদিন আপনি মালবিকার ডায়েরি পেয়েছেন, সেদিনই আপনি স্থিব জেনেছেন সুনীতা দেবী খুনি। তাই তাঁকে নকল দা, মরা আঙুল, মিথ্যে টেলিফোন কল করে মানসিক যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সুনীতা দেবী কনফেশস করবেন। শেষ পর্যন্ত আচমকা এই সুযোগ এসে গেল। যখনই টের পেলেন সুনীতা দেবী বাড়ি ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছেন, তখনই আপনি লুকিয়ে থেকে গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করলেন। তারপর যে-লোকটাকে দিয়ে মড়াব আঙুলের পার্সেল পাঠিয়েছিলেন, তাকেই কিছু টাকা দিয়ে সুনীতাকে ব্ল্যাকমেল করালেন। ভয়ে সুনীতা দেবী আবার ফিরে এলেন। মদে বেসামাল সুনীতা দেবীকে জলে ডুবিয়ে মাবতে এতটুকু কষ্ট হয়নি আপনার। মড়া দেখে-দেখে ডাক্তারের মনে মায়া বলে আর বোধহয় কিছু থাকে না। তাই না ডাঃ সেন? তাড়াতাড়িতে মাত্র দু-একটা ভুলের জন্যেই সুনীতা দেবীর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে আর ভাবা গেল না। থ্যাঙ্ক ইউ ডাঃ সেন ফর ইয়োর কনফেশান। যে-লোকটাকে দিয়ে পার্সেল পাঠিয়েছিলেন, সে আপনার নিয়মিত পেশেন্ট। আফিমের নেশা করে-করে লোকটা এমনিতেই আধপাগলা ছিল। তাকেও ওষুধের নামে ওভারডোজ আফিম দিয়ে মারতে বিবেকে আপনাব এতটুকুও বাধেনি। ভেবেছিলেন, আফিমখোর লালু বেশি আফিম খেয়ে মারা যাবে, এটাকে আর খুন বলে কে ধরবে? তাই না, ডাঃ সেন? আপনার দিদিকে কেন স্লিপিং পিলের ওভারডোজ দিয়ে মারলেন সেটাই শুধু বুঝলাম না।

অজয়বাবু, আজ আমার শেষ দিন। আমার জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গেল এই মুহূর্তে। মাধুদিকে মেরে ফেললাম ভয়ে। শেষদিকে কেমন করে জানি মাধুদি বুঝতে পেবেছিল, সুনীতা আত্মহত্যা করেনি। আমি তখন তাকে ভয় দেখালাম, পুলিশ হয়তো তাকেই সন্দেহ করবে, ধবে নেবে আমাব জীবনে অন্য কোনও নারীর সাহচর্য সে ভালোবাসে না, চায় না। তাই প্রতিহিংসায় আমাব দুই স্ত্রীকেই সে সরিয়ে দিয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিল মাধুদি। সত্যিই মাধুদি আমাকে ভালোবাসত। মুখে বলত ভাই, আদরের ভাই। কিন্তু মানুষের মনের আঁধারে অনেক সাপ চলে। তাই বোধহয় ভয় পেয়েই এক ফাইল স্লিপিং পিলের সব ক'টাই খেয়ে ফেলেছিল। সে সুযোগ আমি নিয়েছি। উঃ, আর পারি না। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, অজয়বাবু।

এতক্ষণের উন্মত্ত মন শ্রান্ত। দুরন্ত সমুদ্রে ধীরে-ধীরে শীতের স্তব্ধতা নেমে এল। ডাঃ সেন আস্তে-আস্তে চোখ বুজলেন, বললেন, আর দেরি কেন মিঃ বোস?

অজয় বোস পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, সত্যিই তো আর দেরি কীসের? মিঃ নিয়োগী, আগে মিস রুদ্রের মুখোশটা খুলে দিন, ওর বোধহয় সুনীতা দেবী সেজে থেকে দম বন্ধ হয়ে গেল।

পরের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

শতবর্ষের সেরা
রহস্য উপন্যাস
৩

সম্পাদনা

অনীশ দেব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্র ভারতী

"I cannot live without brainwork.
What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না।
এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	অচেনা মানুষ	১১
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	ছায়া-ছায়া রাতে	৬৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম	১৪৭
বুদ্ধদেব গুহ	ওয়াইকিকি	১৯৫
মিলন মুখোপাধ্যায়	নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রবেশ	২৭১
মনোজ সেন	শেষে দিল রা	৩৭৫
অমলেন্দু সামুই	অন্বেষণ	৩৯৯
অনিরুদ্ধ চৌধুরী	বিদায়, শরীর	৪৪৯
অশোক বিশ্বাস	নাটকের নাম শিবাজী	৪৮১
হিমাংশু সরকার	অপারেশান ব্ল্যাঙ্ক	৫০৩
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	বহে বিষ বাতাস	৫৬৯
অমিত মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণাপ্পার শিকে	৭২৫
নীল মজুমদার	বীজমন্ত্র	৭৪৩
সৌরভ মুখোপাধ্যায়	গোধূলিতে মৃত্যুর ছায়া	৭৭৯
পরিশিষ্ট		৭৯৭

অচেনা মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

কর্নেল সেন বললেন, 'জায়গার নামটা আমি বলব না। ধরে নাও, বিহার আর পশ্চিম বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি কোনও অঞ্চল। সময়টা শীতকাল—নভেম্বর মাস, খুব জাঁকিয়ে শীত তখনও পড়েনি। গাড়িতে আমি একা ছিলাম—'

রঞ্জন বলল, 'কেন, জায়গাটার নাম বলতে আপনার আপত্তি কী? পটভূমিকা সম্পর্কে ভালো ধারণা না হলে গল্প জমে না।'

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝাড়লেন, তারপর বললেন, 'প্রথম কথা, এটা গল্প নয়। আমি ঠিক গল্পের মতন গুছিয়ে বলতেও পারব না—যদিও অনেক সত্যি ঘটনা গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়। কিন্তু লেখকেরা যে-রকম কায়দাকানুন করে আগাগোড়া সাসপেন্স বজায় রাখতে পারেন, সেরকম ক্ষমতা তো আমার নেই! আমি ঠিক যে-রকম দেখেছিলাম, সেই রকম ভাবেই বলে যাব। তা ছাড়া, জায়গাটার নাম-ধাম আমি বলতে চাই না, কারণ যে ঘটনা আমি বলতে যাচ্ছি, তার মধ্যে এমন অনেক লোকজনের নাম থাকবে, তাঁরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের চিনিয়ে দেওয়া ঠিক রুচিসম্মত হবে না। আমি অবশ্য নামটাম বদলেই বলব ঘটনাটা। ঘটেছিল বছর পনেরো আগে—যেখানে এটা হয়েছিল, সেখানে কাহিনিটা এখনও প্রচলিত। ওখানকার একটি বিশিষ্ট পরিবার এর সঙ্গে জড়িত। এক হিসেবে আমিই সেই পরিবারের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। যাকগে, গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

আমি রামগড় থেকে ঘুরতে-ঘুরতে পুরুলিয়ার দিকে আসছিলাম। ধরে নাও চাস রোডেই কোথাও সেই বাংলোটা। আশেপাশে কোনও শহর নেই—বাংলোটা বলতে গেলে জনশূন্য মাঠের মধ্যে। তখনও ওসব জায়গায় ইলেকট্রিক যায়নি। এখনও গেছে কিনা আমি জানি না। ডাকবাংলোটা নতুন তৈরি হয়েছে, বেশ ছিমছাম চেহারা। আমি সেখানেই সে রাতের জন্য বসতি নেব ঠিক করলুম।'

আমি বললাম, 'কর্নেল সেন, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।'

কর্নেল সেন অবাক হয়ে বললেন, 'চমৎকার বাংলা বলি? এরকম কথা তো কেউ আমাকে আগে বলেনি। চমৎকারের কী দেখলে?'

'না, আপনার কথার মধ্যে বেশি ইংরেজি শব্দ থাকে না। বেশ ঝরঝরে সহজবোধ্য ভাষা।'

'বাঃ, বাঙালির ছেলে হয়ে এটুকু বাংলা বলতে পারব না কেন?'

'আপনি এতদিন আর্মিতে ছিলেন। আর্মির লোকেরা খুব সাহেব হয়। ইংরেজি ছাড়া আর কিছু বলতে চায় না। তা ছাড়া আপনি অনেক দিন বাংলাদেশের বাইরে ছিলেন—'

কর্নেল সেন হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'আর্মির লোকরা খুব সাহেব হয়? তা অবশ্য অনেকটা ঠিক। নানা জায়গার লোক থাকে—তাই ইংরেজিটাই হয় সকলের সাধারণ ভাষা। কিন্তু ইংরেজিতে কথা বললেই যে সাহেবদের মতন চালচলন দেখাতে হবে তার কোনও মানে আমি বুঝতে পারি না। আর যারা মাতৃভাষা ভুলে যায়, তাদের আমি ঘৃণা করি।'

'যাই বলুন, আর্মির লোকজনের মধ্যে আপনি একজন ব্যতিক্রম!'

'বারবার আর্মির লোক আর্মির লোক বলছ, তাতে মনে হতে পারে, আমি বোধহয় বন্দুক-মেসিনগান নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তা নয়—আমি একজন ডাক্তার। কিছু দিন আর্মিতে চাকরি করেছি।'

'আপনি ডাক্তার? তা কিন্তু জানতাম না। রঞ্জন যখন বলেছিল, ওর মামা আসছেন, কর্নেল সেন—তখন আমি ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই একজন ঝানু সোলজার।'

'না, আমি যুদ্ধ করিনি। আর্মিতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবারই র‍্যাংক থাকে। আমি অবশ্য পুরোপুরি কর্নেল নই। লেফটেন্যান্ট কর্নেল। অতখানি উচ্চারণ করার অসুবিধে বলে অনেকে শুধু কর্নেল বলে। যাই হোক, আর্মির লোক বলে সবাইকে কিন্তু এক শ্রেণিতে ফেলবে না। আমি নেফা

BanglaBook.org

অঞ্চলে একজন সত্যিকারের আর্মি কর্নেল দেখেছিলাম, তিনি অগাধ পণ্ডিত, ট্রাইবালদের কত চর্চা করেছেন, যদিও বাইরে সে বিদ্যা জাহির করেন না। সেনাবাহিনীর অফিসার র‍্যাংকে সাধারণত ভালো-ভালো ছাত্ররাই যায়।'

রঞ্জন আমাকে ধমকে দিয়ে বলল, 'তুই বড্ড গল্পের মাঝখানে বাধা দিস। মামাবাবু, আপনি গল্পটা বলুন!'

রঞ্জনের মামা কর্নেল সেন থাকেন লাডাকে। ওখানে একটি সরকারি হাসপাতাল পরিচালনা করেন। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ খুবই কম। কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, সুপুরুষ, সুঠাম স্বাস্থ্য। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র। বিয়ে-থা করেননি, গরিব-দুঃখীদের চিকিৎসার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তায় সে সব কিছুই প্রকাশ পায় না। নিজের সম্পর্কে উনি খুবই কম কথা বলেন। ব্যবহারের মধ্যে বেশ মার্জিত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে—কিন্তু তার মধ্যে কোনও কঠোরতা নেই।

রঞ্জন ওর মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে আজ রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। আর একজন বন্ধু এবং তার স্ত্রীকেও বলেছিল, কিন্তু তারা আসতে পারেনি। কয়েক দিন ধরেই আবহাওয়া বেশ খারাপ যাচ্ছে। আজ সারা দিনে বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েকবার। রাত ন'টা থেকে বৃষ্টি নামল অসম্ভব তোড়ে। রঞ্জনের বাড়ির সামনে এককোমর জল জমে গেল। আমার বাড়ির সামনেও নিশ্চয়ই এতক্ষণ একবুক জল। রঞ্জন বলল, 'তাহলে সুনীল, তোকে আজ আর বাড়ি ফিরতে হবে না। ফোন করে দে এখানেই থেকে যাবি!'

রঞ্জনের মামাবাবুর সঙ্গে গল্পে এত জমে গিয়েছিলুম যে আমার বাড়ি না ফেরায় বিশেষ আপত্তি হল না। খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের ঘরে জমিয়ে বসলাম। মামাবাবু চুরুট ধরিয়েছেন এবং গোড়াতেই আমাদের সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন।

মামাবাবু ঘুরেছেন অনেক দেশ। আর্মিতে ঢোকার আগে উনি ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সারা ভারতবর্ষ। আমরা অনুরোধ করলাম, 'মামাবাবু আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা—তার থেকে দারুণ একটা গল্প বলুন আমাদের। শুনতে-শুনতে যদি গা ছমছম করে তাহলে বৃষ্টির দিনে জমবে।'

মামাবাবু বললেন, 'আমি আর কী বলব! আমি তো গল্প বলতে জানি না। তোমরাই বরং বলো—পশ্চিমবাংলার খবরটবর কী। আমরা তো অত দূর থেকে খবর পাই না।'

রঞ্জন বলল, 'পশ্চিম বাংলার খবর একঘেয়ে হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপনি একটা গল্প বলুন!'

'কিন্তু আমি যে গল্পটল্প বলতে জানি না।'

আমি বললাম, 'গল্প মানে কী? বানিয়ে বলতে হবে না—আপনি আপনার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন না। আপনি জীবনে এত কিছু দেখেছেন—'

মামাবাবু খানিকটা ভেবে বললেন, 'আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে কিন্তু সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে খুব কাছাকাছি জায়গায়—বিহার আর পশ্চিম বাংলার সীমান্তেই এক জায়গায়। জায়গাটার নাম বলব না—'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'তোর বউকে ডাকবি নাকি? মাধবীকে ডাক!'

রঞ্জন বলল, 'ও থাক। ও তো একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়বে। বেশি রাত জাগতেই পারে না—'

'ডাক না, ঘুম পেলে উঠে যাবে না হয়!'

মাধবী দরজার পাশ থেকে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। চাকরের খাবারটা দিয়েই আসছি। মামাবাবু, আমি না এলে আরম্ভ করবেন না কিন্তু!'

BanglaBook.org

মাধবী এসে বসার পর মামাবাবু স্মিত ভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'মাধবী থাকলে আমার গল্পটা বলতে একটু অসুবিধে হবে অবশ্য। তাহলে এটা বরং থাক। আমি অন্য আর কোনও ঘটনার কথা বলা যায় কিনা ভেবে দেখি। এর মধ্যে কিছুটা মেয়েঘটিত ব্যাপার আছে—'

মাধবী আদুরে গলায় বলল, 'মামাবাবু, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। ওদের সামনে যা বলতে পারেন, আমার সামনে তা পারেন না?'

'ছেলেদের সামনে যা বলা যায় মেয়েদের সামনেও কি আর তা—'

'মামাবাবু, আপনি জানেন না, আজকাল ছেলেরা মেয়েদের সামনে আর কিছু ঢাকাঢুকি রাখে না। সব বলে দেয়। এমনকী স্বামীরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করলেও সে-কথা বউদের কাছে লুকোয় না।'

মাধবী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল। কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'তাই নাকি? বাঃ, এ তো বেশ ভালোই ব্যাপার! এতটা বদলে গেছে? কিন্তু আমার তবু একটু বাধো-বাধো ঠেকবে। আমি তো একটু পুরোনো কালের লোক! আচ্ছা দেখা যাক—'

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তা বলে মামাবাবু গল্পটা কিন্তু সেনসার করে বলবেন না! একেই তো সিনেমার সেনসারের জ্বালায় আমরা অস্থির।'

বয়সে অনেক বড় হলেও কর্নেল সেন এসব কথা বেশ সহজ ভাবে নিতে পারেন। রঞ্জনের কথা শুনে আন্তরিক ভাবে হেসে উঠলেন।

এবার গল্প শুরু হল। কর্নেল সেন চুরুটে অল্প ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়, উনি অতীতে ফিরে গেছেন। উনি বসেছেন একটা ইজিচেয়ারে, জানলার পাশে। রঞ্জন আর আমি একটা সোফায়। আর একটা সোফায় মাধবী পা গুটিয়ে বসেছে আরাম করে।

কর্নেল সেন বললেন, 'তখন আমার বয়স হবে তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। আমি তখন রামগড়ে পোস্টেড। আমার এক কাকা থাকতেন পুরুলিয়ায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছিলাম। গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়েছি। অনেক পথঘাট তখন নতুন তৈরি হচ্ছে। ঠিকমতো পথের হদিশ পাওয়া যায় না। এক-এক জন এক-একটা ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঘণ্টা ছয়েকের পথ, কিন্তু বেলা বারোটাতে বেরিয়েও অনেক ঘুরতে হল। রাত ন'টার সময়েও বিহারের সীমানা পার হতে পারিনি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আলো নেই—একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আজকাল নিশ্চয়ই ওসব রাস্তায় সারা রাত গাড়ি চলে—'

রঞ্জন বলল, 'না, মামাবাবু। ট্রাক ড্রাইভাররা ছাড়া রাত্রে কেউ গাড়ি চালাতে সাহস করে না ওইসব রাস্তায়। বিশেষত বর্ডারের কাছে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমার কাছে অবশ্য ডাকাতি করার মতন বিশেষ কিছু ছিল না। তবু, গাড়িটা কেড়ে নিয়ে যদি রাস্তায় একা ছেড়ে দেয়, সেও এক ঝামেলা। হঠাৎ একটা ডাকবাংলো চোখে পড়ল। তখন ভাবলাম, ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বেরোলেই হবে।

পি ডব্লু ডি-র ইন্সপেকশান বাংলো। এইসব বাংলোতে আগে থেকে রিজার্ভ করার দরকার হয় না। খালি থাকলে ঢুকে পড়া যায়। আর বাংলোটা এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে যে সেখানে নিশ্চয়ই সচরাচর কেউ রাত্রিবাস করে না।'

কর্নেল সেনের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। তিনি সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। সেই সুযোগে আমি আর রঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চোখাচোখি করলাম। আমি আর রঞ্জনও বহু বাংলোতে থেকেছি, আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক, রঞ্জনের মামাবাবুর অভিজ্ঞতাটা কী ধরনের।

কর্নেল সেন বললেন, 'গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে। সেখানে ইলেকট্রিক নেই, বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছে। ঘর তালাবন্ধ। জনমনুষ্য দেখা গেল না, চৌকিদার, চৌকিদার বলে

BanglaBook.org

দুবার হাঁক দিলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বোঝাই গেল, এইসব ডাকবাংলোতে কালেভদ্রে কেউ আসে। এত রাত্রে বোধহয় কেউই আসে না। চৌকিদারটা তাই আড্ডা মারতে গেছে। কিংবা নেশাটেশা করে হয়তো ঘুমিয়ে আছে। কারওর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবলাম চলে যাব কিনা। কিন্তু সারাদিন ঘুরে তখন আমার খুবই ক্লান্তি এসেছে, তার ওপর একটা জ্বর-জ্বর ভাব। এদিকে টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল হঠাৎ। শীতকালের বৃষ্টিতে জানোই তো কীরকম শিরশিরে শীত করে। কপালে হাত দিয়ে মনে হল, জ্বরই এসেছে। এখন শরীর চাইছে বিছানা।

ডাকবাংলোর চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে গেলাম। ডাকবাংলোটা দেখেই মনে হল নতুন তৈরি হয়েছে—বছরখানেকও হবে না—সবকিছুই ঝকঝক করছে। একটু দূরে একটা টালির ঘর—সাধারণত এরকম ঘরে চৌকিদার থাকে। সেখানে গিয়ে দেখি, সে ঘরের দরজাটাও বন্ধ। দুবার ঠেলা দিলাম, আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কোনও সাড়া নেই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ, নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ আছে, কিন্তু খুলছে না। বেশ কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি করলাম দরজায়, তাতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা, কিন্তু চৌকিদারটা উঠল না।

মহা বিরক্তিকর অবস্থা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ যখন, তখন ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। অথচ আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন—এ নিয়ে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমি ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শরীর ভালো ছিল না, মেজাজও ভালো ছিল না।

সেখান থেকে চলে আসছি, হঠাৎ চোখে পড়ল ডাকবাংলোর পেছনে দেওয়াল ঘেঁসে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গায়ের রং কালো কুচকুচে, ঠিক যেন অন্ধকারে মিশে আছে। বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ।

জিগ্যেস করলাম, 'কে ওখানে? তুমি চৌকিদার নাকি?'

লোকটা কোনও সাড়া দিল না। আমি এগিয়ে গেলাম। লোকটি তখন নীচু হয়ে মাটি থেকে কী যেন খুঁজছে। আমি তার সামনে গিয়ে বললাম, 'এই, চৌকিদার কোথায়?' লোকটি মুখ তুলে বলল, 'আমিই চৌকিদার!'

প্রচণ্ড রাগ হল! ধমক দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি চৌকিদার তো এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?'

'হুজুর আমি কানে শুনতে পাই না।'

কানে শুনতে না পাওয়া একজন মানুষের দোষ না। কিন্তু কানে-কালা লোকদের চৌকিদারের চাকরি দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে তখন রাগারাগি করে লাভ নেই।

'কানে শুনতে পাও না, কিন্তু আমাকে তো দেখতে পেয়েছিলে? নাকি চোখেও দেখতে পাও না?'

'আমি এখানে একটা জিনিস খুঁজছিলাম, তাই আপনাকে দেখতে পাইনি।'

'এত রাত্রে কী খুঁজছ এখানে?'

'আমার ক'টা পয়সা পড়ে গেছে। একটা সিকি কিছুতেই পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, কামরা খুলে দাও। আমি আজ রাতে এখানে থাকব।'

'কামরা তো রিজার্ভ আছে।'

'রিজার্ভ আছে? কার নামে রিজার্ভ আছে?'

'আছে এক সাহেবের নামে।'

লোকটার ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না, বিশ্বাস হল না ওর কথা। বললাম, 'কোথায়, রিজার্ভেশন স্লিপ কোথায়? সেটা তো বাইরে ঝোলাবার কথা।'

BanglaBook.org

লোকটা বলল, 'এখানে ঘর খালি নেই। সাত মাইল দূরে আর একটা ডাকবাংলো আছে, আপনি সেখানে যান না—জায়গা পেয়ে যাবেন।'

আমি বললাম, 'কেন, সেখানে যাব কেন? এখানে তো দুটো ঘরই খালি দেখছি—বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।'

'ওই দুটো কামরাই এক সাহেবের নামে রিজার্ভ আছে। সাহেব হঠাৎ এসে পড়লে আমার নোকরি চলে যাবে।'

স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। যে-কোনও কারণেই হোক আমাকে থাকতে দিতে চায় না। এক ধমক দিয়ে বললাম, 'রিজার্ভ আছে? কই, সেই চিঠি দেখাও।'

লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণ আমার সব কথা সে বেশ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখন আবার কালা সেজে গেল। জেদ চেপে গেল আমার। আমি বললাম, 'দেখাও স্লিপ। কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

আমার পরনে সামরিক বাহিনীর পোশাক। সেই সময় আমি আবার মোটা গোঁফ রাখতাম। সুতরাং আমাকে হেলাফেলা করতে পারে না। বুঝতেই পারলাম, লোকটা ভয় পেয়েছে। নির্বোধ চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'যাও, চাবি নিয়ে এসো। যদি রিজার্ভ করা থাকেও, এত রাত্রে কেউ আসবে না। আমি কাল সকালেই চলে যাব। ঘর খুলে দাও।'

পাশাপাশি দুটো ঘর, সামনে টানা বারান্দা। বৃষ্টি চেপে এসেছে। আমি দৌড়ে বারান্দায় উঠলাম। চৌকিদারটা চাবি আনতে গেছে তো গেছেই। আসার আর নাম নেই। খালি ডাকবাংলোটা খুলে দিতে ওর আপত্তির কারণটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ও তো আমার কাছে কিছু বকশিশ পাবেই। তা ছাড়া যদি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দেয়, তারও কিছু ভাগ পাবে।

আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কিন্তু সত্যিই যদি কানে কালা হয়, তাহলে শুনতে পাবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে ওকে যদি আবার ডাকতে যেতে হয়—

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল, চৌকিদার তখনও এল না। ও কি আমাকে এখানেই সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়? বারান্দায় একটা চেয়ারও নেই যে বসব। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে। একবার ভাবলাম, মাইল সাতেক দূরে যখন আর একটা বাংলো আছে, তখন সেটাতেই যাব কিনা। এই বিদ্‌ঘুটে বাংলোর চাইতে সেটা নিশ্চয়ই ভালো হবে। কিন্তু, এই চৌকিদারটা যেন দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে—আমি চলে যাই কিনা। আমি ঠিক করলাম, এখানেই থাকব। গলা চড়িয়ে হাঁক দিলাম, চৌকিদার—

শেষপর্যন্ত লোকটি এল চাবি নিয়ে। সেইসঙ্গে রেজিস্টার বুক। সেটা খুলে দেখলাম, মাস দেড়েক আগে একজন সার্কেল অফিসার এসেছিলেন সপরিবারে, তারপর আর কেউ আসেনি। অনেক সময় অবশ্য বাইরের লোক এলে এরা খাতায় নাম এনট্রি করে না, টাকাটা নিজেই নিয়ে নেয়। আমার বেলায় অবশ্য খাতাটা আগেই এনেছে—সম্ভবত আমার সামরিক পোশাক দেখে।

ওর আসতে এত দেরি হল কেন—একথা জিগ্যেস করার আগেই লোকটা বললে, 'হুজুর, চাবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

যে লোক কানে শুনতে পায় না, এবং সময় মতন চাবি খুঁজে পায় না—সে ডাকবাংলোর চৌকিদার হিসেবে খুবই অযোগ্য। লোকটির চেহারা দেখলে কিন্তু খুব বোকাসোকা মনে হয় না। যাই হোক আমি ঠিক করলাম, আর মেজাজ গরম করব না। একটা মাত্র রাত কাটাবার তো ব্যাপার। আমি লোকটিকে বললাম, 'এখানে তো বিশেষ কেউ আসেই না দেখছি। তুমি এটা রিজার্ভ আছে বলে আমাকে মিথ্যে কথা বলছিলে কেন?'

'না, হুজুর, একটা চিঠি এসেছিল। আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে তুমি ঘর খোলো। দুটো তো ঘর রয়েছে। তা ছাড়া আমি কাল সকালেই চলে যাব।'

লোকটি একটি ঘর খুলল। সেই ঘরটা অবশ্য ভালোই, আমার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'পাশের ঘরটা কীরকম, খোলো তো?'

'হুজুর, ও-ঘরটা পরিষ্কার করা নেই।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমার সঙ্গে শুধু একটা সুটকেস, মালপত্র কিছু বিশেষ নেই। বিছানাও নেই। আমার ধমক খেয়ে লোকটি কম্বল বার করে দিল।

'তোমার নাম কী?'

'রামদাস।'

'ঠিক আছে, তুমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'না! হুজুর, খাবারের ব্যবস্থা কিছু নেই। এখানে কিছু পাওয়া যায় না।'

'যারা এখানে আসে, তারা খায় কী? কাছাকাছি গ্রাম নেই?'

'আছে দু-মাইল দূরে। এত রাতে সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না।'

'তুমি অন্তত একটু চা বানিয়ে দিতে পারবে?'

'চা, দুধ কিছু নেই।'

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটি আমার সঙ্গে কোনও সহযোগিতাই করতে চায় না। বকশিশের লোভও নেই ওর? আমার অবশ্য খিদে খুব একটা ছিল না। কিন্তু এক কাপ গরম চা পেলে ভালোই লাগত। তা ছাড়া খাবার পাওয়া যাবে না শুনলেই খিদে পেতে শুরু করে। রামদাসের ওপর রাগ আমার ক্রমশ বাড়ছিল। ওর নামে কমপ্লেন করা উচিত। খালি থাকতেও যদি ডাকবাংলোয় এসে দরকারের সময় জায়গা পাওয়া না যায় কিংবা খাবারের ব্যবস্থা না থাকে— তাহলে এগুলো তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া লোকটি যদি আমার সঙ্গে একটু ভালো ভাবে কথা বলত তাহলেই আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতুম।

কিন্তু লোকটা সবসময় গুম মেরে আছে। কিছু জিগ্যেস করলে ভালো উত্তর দেয় না।'

রঞ্জন হঠাৎ বলে উঠল, 'মামাবাবু, আপনার বোধহয় ডাকবাংলো সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞতা নেই। নইলে ওরকম বাংলোয় আপনার থাকা উচিত হয় কি?'

মাধবী বলল, 'আপনার ভয় করছিল না? অত ফাঁকা জায়গায়, চৌকিদারটা পাজি—'

কর্নেল সেন হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কেন ভয় কেন? আমার সঙ্গে তো দামি জিনিসপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। তা ছাড়া মিলিটারির লোকদেরই লোকে ভয় পায়।'

রঞ্জন বলল, 'আমি জানি, ওইরকম বাংলোয় এমন সব ঘটনা ঘটে—'

রঞ্জনকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'তুই চুপ কর তো। ওইখানে নিশ্চয়ই সেইরকম একটা কিছু ঘটেছিল, নইলে উনি এই বাংলোর অভিজ্ঞতার কথাটাই বা বলবেন কেন?'

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এটা ভূতের গল্প নয় তো?'

'কেন, ভূতের গল্প হলে তোমার আপত্তি আছে?'

'তাহলে কাল সকালে শুনব! ভূতের গল্প আমার রাত্রিতে শুনতে ভালো লাগে না'—

রঞ্জন তার স্ত্রীকে বলল, 'তাহলে খুকুমণি তুমি শুতে যাও না, কে তোমাকে আটকে রেখেছে! এটা নির্ঘাত ভূতের গল্প।'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'আঃ চুপ কর না! গল্পটা শুনতে দে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি এরকম ফাঁকা জায়গায় অনেক বার একা রাত কাটিয়েছি, ভূত-টুতের দেখা পাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কখনও দেখা হয়নি। তবে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম একবার। এক্ষুনি বলছি সেই কথা। সেদিন সেই বাংলোতে চৌকিদারের ব্যবহার আমার

BanglaBook.org

খুব অদ্ভুত লেগেছিল। ও যেন আমাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি যাও!' তারপর চৌকিদার চলে যাওয়ার পর আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। খালি পেটে সহজে ঘুম আসতে চায় না।

একবার দরজা খুলে বাইরে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। গাড়িটার সব দরজা লক করা আছে কিনা দেখলাম। চৌকিদারের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। কম্পাউন্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ। বড় রাস্তা দিয়ে একটাও গাড়ি যাচ্ছে না। বাংলোর কম্পাউন্ডের ওপাশে একটা উঁচু বাঁধের মতো। ওপরে উঠে দেখলাম, পাশেই একটা খাল। তার উলটো দিকে আট-দশটা খড় ও টিনের বাড়ি। চৌকিদারটা মিথ্যেবাদী, ও বলেছিল গ্রাম দু-মাইল দূরে। অথচ এত কাছেই তো বাড়ি রয়েছে।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কেন জানি না, খুবই অস্বস্তি লাগছে, কিছুতেই শুতে ইচ্ছা করছে না। আর মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে একটা যেন ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছি। ঘরে ঢোকার পর থেকেই গন্ধটা নাকে আসছিল। আগে ঠিক খেয়াল করিনি। ডেটলের গন্ধের মতন। অবশ্য আমি ডাক্তার মানুষ, ডেটলের গন্ধ শোঁকা অভ্যাস বলেই বোধহয় কল্পনা করেছিলাম সেটা। নইলে, অত রাত্রে বাংলোর মধ্যে ডেটলের গন্ধ আসবে কোথা থেকে।

আমার ঘরের তিনটে দরজা বারান্দার দিকে। উলটো দিকে আর একটা বাথরুমের—বাকি দরজাটা খুলে দেখতে হল। সেটা খুলতেই আমি চলে এলাম পাশের ঘরে। দরজাটার ছিটকানি লাগানো ছিল না।

পাশের ঘরে এসে চৌকিদারটার ওপর আমি আরও রেগে গেলাম। ও বলেছিল, এই ঘরটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। কিন্তু ঠিক তার উলটো; সেই ঘরটিই বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হয় সেদিন বিকেলেই সাফ করা হয়েছে। এই ঘরে ডেটলের গন্ধ আরও বেশি। এদিক-ওদিকে তাকিয়েও এই গন্ধের কোনও কারণ বুঝতে পারলাম না। দুটো খাট পাশাপাশি জোড়া দিয়ে তার ওপর নিখুঁত ভাবে বিছানা পাতা। ধপধপে চাদর। চৌকিদারটার মিথ্যে কথা বলার মানে কী! এ-ঘরে কি অন্য কেউ থাকে? চৌকিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অনেক সময়ে বাইরের লোক ডাকবাংলোয় পাকাপাকি আস্তানা গাড়ে। হোটেলের চেয়ে অনেক সস্তা হয়। কিন্তু এখানে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কে থাকতে আসবে? তা ছাড়া, ঘরটায় এমন কোনও জিনিসপত্র নেই যা থেকে বোঝা যাবে সেখানে কেউ নিয়মিত থাকে।

আমার গোঁ চাপল যে আমি এ-ঘরটাতেই থাকব। আমার ঘরে সিঙ্গল খাট, ওই ঘরে ডবল খাট—হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে। পাশের ঘর থেকে আমার সুটকেস ও জামাকাপড় নিয়ে এলাম। এই ঘরটায় দরজায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ, তবু আমি ছিটকিনি দিয়ে দিলাম ভেতর থেকে। অন্য সব দরজাটরজাও আটকালাম, হ্যাজাকটা সম্পূর্ণ না নিভিয়ে খুব কমিয়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে। সুটকেস থেকে আমার রিভলভারটা বার করে রেখে দিলাম বালিশের নীচে।'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'আপনার সঙ্গে বুঝি সবসময় রিভলভার থাকে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'তখন থাকত। বিহার শরিফে একবার গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম—তারপর থেকে গান পারমিট করিয়ে নিয়েছিলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করলে, 'কী হয়েছিল বিহার শরিফে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'সে গল্প শোনোনি? সেবার তো রঞ্জনের কাকা—অর্থাৎ তোমার খুড়শ্বশুর শৈলেনও আমার সঙ্গে ছিল। বিহার শরিফের কাছে গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলাম। প্রাণেই মেরে ফেলত—শৈলেনের কাঁধে তো ছুরিও মেরেছিল—'

আমি বললাম, 'সেটা অন্য গল্প। সেটা এখন থাক। এখন আগে এই ডাকবাংলোর গল্পটাই

BanglaBook.org

শোনা যাক।'

কর্নেল সেন বললেন, 'ঠিক বলেছ, সে-ই ভালো। এক গল্পের মধ্যে অন্য গল্প এসে যাচ্ছিল। ডাকবাংলোর ঘটনাটাই বেশি চমকপ্রদ। সেই রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুমটা গাঢ় হয়নি। নতুন জায়গায় গেলে মানুষের সাধারণত পাতলা ঘুমই হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের সহজাত ডিফেন্স ইন্সটিংকট। যাই হোক, ঘুমের মধ্যেই অস্পষ্ট ভাবে একবার মনে হল, কাছাকাছি একটা গাড়ির আওয়াজ। একবার মনে হল, দূরের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে গাড়িটা, আবার মনে হল, বাংলোর কম্পাউন্ডেই ঢুকেছে। তাহলে কি যাদের আসবার কথা ছিল তারা এসেছে? কিন্তু এত রাতে? একটুক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করার পর আর কোনও আওয়াজ পেলাম না। লোকের পায়ের আওয়াজ কিংবা বারান্দায় উঠে চৌকিদারকে ডাকাডাকি তো শুনতে পাব। তার কিছুই না। তখন বুঝতে পারলাম, আমারই মনের ভুল। রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি চলে গেছে আমি ভেবেছি বাংলোতে এসেছে। রাত্রিবেলা, বিশেষত নির্জন জায়গায়, দূরের আওয়াজও কাছের মনে হয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। কিন্তু সেটাও ঠিক শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ঘুম নয়। কিছু একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছিল। কোথায় যেন খুটখাট শব্দ শুনছি, কে যেন কোনও একটা ভারী জিনিস ধরে টানছে, কেউ ফিসফাস করে কথা বলছে। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করলাম। কোথাও কিছুই নেই। সবই আমার মনের ভুল। ভুতুড়ে ডাকবাংলো নিয়ে অনেক গল্পটল্প পড়েছি তো—মনের মধ্যে সেগুলোই বোধহয় কাজ করছিল। বাংলার থেকেই ইংরেজিতেই এসব গল্প বেশি আছে। ভুতুড়ে ডাকবাংলো সাধারণত খুব পুরোনো হয়। কিন্তু এই বাংলোটা প্রায় নতুন। নতুন বাড়ি ভূতদের সহ্য হয় না।

আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলামও। এবার ঘুম ভাঙল স্পষ্ট একটা অনুভূতিতে। মুখের ওপর সুড়সুড়ির মতন ভাব, কেউ যেন আমার মুখের ওপর চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকালাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম আশেপাশে। কোথায় কিছু নেই। এটাও আমার মনের ভুল ছাড়া আর কী-ই বা হবে। তাহলে হয়তো স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবার মানে কী? রাতদুপুরে আমার মুখে চামর বোলাতে আসবে কে? ভূতের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? তা ছাড়া খুব ছেলেবেলায় মুশকিল আসানদের হাতে চামর দেখতাম, তারপর তো আর দেখিইনি।

এবার মনটা শান্ত করে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু চোখ বোজবার পরই মনে হল, না, মনের ভুল হতেই পারে না! আমার মন তো এতখানি কল্পনাপ্রবণ নয়। স্পষ্ট অনুভব করেছি, আমার মুখে চামরের মতন কিছু একটার ছোঁয়া লেগেছে। এটা একটা বাস্তব অনুভূতি। অর্থাৎ সত্যিই এরকম কোনও জিনিস আছে এই ঘরের মধ্যে। কী হতে পারে? কোনও পাখিটাখি নয় তো! চোখ খুলে তাকালাম আবার! এই ঘরের মধ্যে পাখি কী করে আসবে? ব্যাপারটা যতক্ষণ না কোনও নিষ্পত্তি করতে পারছি, ততক্ষণ আর ঘুম আসবে না।

তারপর ভাবলাম, যদি পাখি বা বাদুড়টাদুড় কিছু হয়, তাহলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলেই আবার তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। চোখ খোলা রেখে স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম। ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোনও শব্দ নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ রাত। হঠাৎ মনে হল, আমি খুব ক্ষীণ একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার নিজের নয়, অন্য কারওর। এক বার, দু-বার, তিন বার—

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, হ্যাজাকের মৃদু আলোয় ঘরটা আবছায়া। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম আমার শিয়রের কাছে দেওয়াল ঘেঁষে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার মাথার চুল খোলা। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, সেই চুলের ঝাপটা লেগেছিল আমার মুখে।'

মাধবী বিবর্ণ মুখে বলল, 'ভূত?'

BanglaBook.org

রঞ্জন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চুপ।'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। নইলে, আমার তখন যুবক বয়স, মাঝ রাত্রে ঘরের মধ্যে একটি যুবতী মেয়েকে দেখে অন্য কিছুও তো মনে হতে পারত। আমরা যতই শিক্ষিত হই আর কুসংস্কার মুক্ত হওয়ার বড়াই করি, এক-এক সময় আমাদেরও যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ভদ্রঘরের মেয়ে, মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। একটা কালো রঙের শাড়ি পরে আছে, চুলগুলো সব খোলা, চোখ-মুখে রীতিমতন ভয়ের চিহ্ন। মেয়েটি দু-হাত জোড় করে আছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। পাগল হতে পারে, কিংবা বিপদে পড়ে কেউ আশ্রয় চাইতে পারে—কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম কেন জানও? মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে? আমি তো সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছি শোওয়ার আগে।

রক্তমাংসের কোনও মানুষের পক্ষে তো দেওয়াল কিংবা দরজা ভেদ করে ঢোকা সম্ভব নয়। দরজাটা খোলা, স্পষ্ট দেখছি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। এটা কী করে সম্ভব? তবে কি অলৌকিক বা অশরীরী কিছু? আমার গলা শুকিয়ে গেল, হাত-পা কিছুই নড়াতে পারলাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও তাকিয়ে আছে সোজাসুজি আমার চোখে। মনে হয়, তার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম, আর যাই হোক, ভূত নয়, রক্তমাংসেরই মেয়ে। হয়তো পাগল, কিংবা ডাইনি জাতীয়া কিছু—

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, 'কে? কে আপনি?'

সেই অস্পষ্ট আলোতেও মনে হল মেয়েটির ঠোঁট কাঁপছে। কিন্তু কিছু বলল না। আমি আবার জোরে জিগ্যেস করলাম, 'কে আপনি?'

'শুনুন'—

মেয়েটি কথা শেষ করল না। হঠাৎ একটা দৌড় লাগাল। দৌড় শুরু করতেই আমি ভেবেছিলাম, ও বুঝি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নখ দিয়ে আমার চোখ অন্ধ করে...। ভয়ে আমি মুখ ঢেকে ফেলেছি।

মেয়েটি কিন্তু দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল মাঝখানের দরজা দিয়ে। ওই দরজাও তো আমি বন্ধ করেছিলাম।

ভয়ে আমার বুক রীতিমতন টিপটিপ করছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে। এ কথাগুলো স্বীকার না করলে মিথ্যে বলা হত। আমি ভিতু লোক নই। কিন্তু সেদিন ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। মেয়ের বদলে ঘরের মধ্যে পুরুষমানুষকে দেখলে বোধহয় ভয় পেতাম না। হঠাৎ রিভলভারটার কথা মনে পড়ল। মনে পড়তেই সাহস ফিরে এল কিছুটা।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে খাট থেকে নামলাম। প্রথমে আমার পা দুটো কাঁপছিল খুব। আস্তে-আস্তে সেটা কমল। একবার ইচ্ছে হল, কোনওরকমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু আবার এটাও অনুভব করলুম, মনের এই ভীরুতা না কাটাতে পারলে সারা জীবন একটা লজ্জা থেকে যাবে। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত দেখা দরকার। একটা রক্তমাংসের মেয়েই তো—তাকে এতটা ভয় পাওয়ার কী আছে! হ্যাজাকটা বাড়িয়ে দিয়ে সেটা বাঁ হাতে নিয়ে এলাম পাশের ঘরে।

মেয়েটি সেই ঘরেই অপেক্ষা করছিল, আমি খাট থেকে নেমে দু-এক পা এগোতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওখানে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিল আমাকে। ও ঘরের দরজাও খোলাই ছিল, কেননা আমি ছিটকিনি খোলার শব্দ পাইনি। শুধু দরজার একটা পাল্লায় আওয়াজ হল দড়াম করে।

BanglaBook.org

পাশের ঘরে এসে আমি চুপ করে দাঁড়ালাম। তক্ষুনি বাইরে না বেরিয়ে দেখতে লাগলাম দরজাগুলো। কোনও দরজাই ভাঙা নয়। তাহলে ছিটকিনি খুলল কী করে? আমি প্রত্যেকটা বন্ধ করেছি। নাকি করিনি? অনেক সময় বেশি সাবধানী হতে গেলে আসল ব্যাপারেই ভুল হয়ে যায়। আমি যে একবার বাইরে গিয়েছিলাম—তারপর ভেতরে ঢুকে আর দরজা বন্ধ করিনি? তা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। অথচ মেয়েটি ঢুকল কী করে ভেতরে? দরজা না ভেঙে বা দেওয়াল ভেদ করে তো কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না। কিংবা বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলার কোনও উপায় আছে! এই সমস্যার সমাধান আমি আজও করতে পারিনি।

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েই আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে? কীজন্য এসেছেন?'

বাইরে থেকে কোনও উত্তর এল না। কোনও শব্দও নেই। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অলৌকিক বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। তখন আমার উচিত ছিল ভালো করেই দরজা-জানলা আবার বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়া। মন থেকে ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেলা।

কিন্তু এ যে একবার ধারণা হয়ে গেল, ছিটকিনি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজা দিয়ে মেয়েটি ঢুকেছে, তাহলে তো আবার বন্ধ করলে আবার ঢুকতে পারে। কোনও রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যে বন্ধ দরজা না ভেঙে কিংবা দেওয়াল ভেদ করে আসা সম্ভব নয়, এই যুক্তিবোধটা আমার দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

আমি বাইরের বারান্দায় চলে এলাম। সেখানেও কেউ নেই। তবু আমি চিৎকার করলাম, 'কে? কে ওখানে?'

কোনও সাড়া নেই। তখন আমার চোখ পড়ল আমার গাড়িটার ঠিক পেছনেই আর একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে আগে সেটা আমি দেখতে পাইনি। তাহলে তো আর অলৌকিক বলে মনে করা যায় না। একটা জলজ্যান্ত জিপগাড়ি তো সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাড়ি যখন আছে তাতে নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে দু-এক পা নেমে গিয়ে দেখলাম, জিপগাড়িটা খালি, ভেতরে কেউ নেই। যারা এসেছে, তারা গেল কোথায়? কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চৌকিদারের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। বেশ চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'চৌকিদার, চৌকিদার!'

চৌকিদার তো আগেই বলে রেখেছে যে সে কানে শুনতে পায় না। সুতরাং তার সাড়া না দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু চৌকিদারের ঘরে নিশ্চয়ই অন্য কেউ-না-কেউ আছে। আমি প্রথম যখন দরজা ধাক্কা দিয়েছিলাম, তখন ওর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ওর বউটউ হতে পারে। কিন্তু সে তো শুনতে পারে আমার চিৎকার। সে ডেকে দিতে পারছে না। এত রাত্রে ওর ঘরে আলো জ্বলছেই বা কেন?

জিপগাড়িটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমি এসেছিলাম। এমনসময় মনে হল জিপগাড়িটার পেছন থেকে কিছু একটা শব্দ হল। এই প্রথম আমি অন্য ভয়ে সতর্ক হয়ে উঠলাম। জিপগাড়িটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু বদমাইস লোক। আমার ডাকে যখন সাড়া দিচ্ছে না তখন ওদের কুমতলব থাকাই স্বাভাবিক।

আমার হাতে রিভলভার ছিল। কিন্তু ওরা জিপের পেছন থেকে খুব সহজেই আমাকে গুলি করতে পারে। আমি মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আপনারা কে? কথা বলছেন না কেন?'

এবারও কেউ সাড়া দিল না। এই সাড়া না দেওয়ার ব্যাপারই আমার কাছে সবচেয়ে অস্বাভাবিক লাগছিল। চৌকিদারকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। মাঝরাত্রে যারা জিপে করে আসে, তারাও সাড়া দেয় না। কিন্তু ওদের যদি চুরি করার মতলব থেকে থাকে—তাহলে আমি যখন বাইরে বেরিয়ে ছিলাম, তখন ওরা আমাকে সহজেই ঘায়েল করতে পারত। একলা মেয়েটাকে

BanglaBook.org

প্রথমে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে আমাকে বাইরে টেনে এনেছে।

যাই হোক, এরা ডাকাত হলেও আমাকে একাই আত্মরক্ষা করতে হবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চৌকিদারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। খালের ওপারে কয়েকটা ঘরবাড়ি আছে বটে, কিন্তু এখান থেকে চ্যাঁচালেও তারা শুনতে পাবে না। কিংবা শুনতে পেলেও সাহায্য করতে আসবে কিনা সন্দেহ। সাধারণত কেউ আসে না।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম জিপগাড়িটার ওপর। গাড়িটার পেছনে মানুষের নড়াচড়া আর ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছে একটু-একটু। ওরা ক'জন আছে? সেই মেয়েটাও গিয়ে ওখানে লুকিয়েছে? মেয়েটাকে দেখে আর যাই হোক, ডাকাত দলের সঙ্গিনী বলে মনে হয়নি। বরং ওর মুখে বেশ একটা ভয়ের চিহ্ন দেখেছিলাম, আমাকে কিছু একটা বলতেও চেয়েছিল। 'শুনুন' বলেই আর শেষ করতে পারেনি, ছুটে পালিয়েছে। কী ওদের মতলব? যদি ডাকাত হয় তাহলে আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েও ওরা ছেড়ে দিল কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন? কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

দরজার ছিটকিনিটা খিল লাগিয়ে দিলাম। সে ঘরের খাটখানা এনে ঠেকিয়ে দিলাম দরজার সঙ্গে। তারপর চলে এলাম পাশের ঘরে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে টেবিলটা টেনে এনে সেখানে আটকে দিলাম। বাথরুমের দরজাটার সামনে পরপর দাঁড় করিয়ে দিলাম দুটো চেয়ার। আমার কাছে চব্বিশটা বুলেট আছে। যদি কেউ দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করতে পারা যাবে। অন্তত দু-এক জন ঘায়েল না হয়ে আমাকে কিছু করতে পারবে না।

ওইসব চেয়ার-টেবিল টানাটানি করার সময় আমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল চৌকিদারটার ওপর। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ডাকাতদলের যোগসাজশ আছে। কিন্তু তাহলে আবার ও আমাকে এই ডাকবাংলোয় থাকতে বারণ করেছিল কেন? এত রাত্তিরে ওর ঘরে আলোই বা জ্বলছে কেন? চৌকিদারের ব্যবহারটাই বেশ রহস্যময়। যাই হোক, তখন কিন্তু আমার আর সে রকম ভয় করছিল না। আমি রীতিমতন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

বাইরের দিকে দরজাটা সবচেয়ে ভালো ভাবে গার্ড করা দরকার। এ-ঘরে দুটো খাট আছে। দুটো খাটকেই টেনে এনে যদি দরজার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে অনেকটা দুর্গের মতো হবে।

বিছানাটা পাট করে রেখে আমি একটা খাট প্রথমে টেনে সরাতে গেলাম। একটু সরাতেই দেখলাম, তলায় একটা ডেডবডি!'

মাধবী চেঁচিয়ে উঠল, 'কী?'

কর্নেল সেন নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, 'একটা ডেডবডি। একজন পুরুষমানুষ, বছর তিরিশেক বয়স। পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, সুপুরুষ বলা যায়—মেঝেতে একটা চাদর পেতে তার মৃতদেহটি শোয়ানো, রক্তটক্ত কিছু নেই—সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা, লোকটির চোখ চেয়ে আছে—হঠাৎ দেখলে তাকে মৃত বলে মনে হবে না। কিন্তু আমি তো ডাক্তার মানুষ, আমি একপলক তাকিয়েই তার মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কেন একটু আগে ঘরের মধ্যে ডেটলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। রক্তটক্ত সব ধুয়ে ডেটল দিয়ে ঘর মোছা হয়েছে। লোকটির জামাটামা তখনও ভিজে-ভিজে—বুলেটের গর্তটা ঠিক বুকের মাঝখানে নয়, গলার কাছে। যে তাকে মেরেছে, সে রিভলভার চালানোয় খুব অভিজ্ঞ নয়। কিংবা হয়তো তাড়াহুড়ি হয়েছিল।

খাটটা সরিয়েই সেই মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে আমি দু-একটা মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।'

রঞ্জন বলল, 'ব্যস। এখন এই পর্যন্ত।'

আমি রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালাম।

মাধবী জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

BanglaBook.org

রঞ্জন বলল, 'তোমার তো ঘুম পেয়ে গেছে! গল্পটা আজ এই পর্যন্ত থাক। আবার কাল শুনবে।'

মাধবী সোজা হয়ে বসে চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে? তোমাকে বলেছে! এখন কেউ ঘুমোতে পারে?'

রঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, 'এই রকম দারুণ সাসপেন্সের জায়গায় গল্প থামিয়ে দিলে কী চমৎকার হবে বলো তো! শুয়ে-শুয়ে সারারাত তারপর কী হল, তারপর কী হল ভাববে! আসল গল্পের চেয়েও নিজের মনে-মনে অনেক গল্প তৈরি হবে! সেটাই ভালো না?'

মাধবী ধমকে উঠল, 'তুমি চুপ করো তো! বড্ড বাজে বকো! এই পর্যন্ত শুনে বাকিটা কেউ না শুনে পারে? সেই মেয়েটা কোথায় গেল?'

রঞ্জন আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুই কী বলিস সুনীল? আজ এই পর্যন্ত থাক। না হলে সারারাত কেটে যাবে। মামাবাবুকে তো বিশ্রাম দেওয়া উচিত!'

কর্নেল সেন চুপ করে বসে আছেন। আমি বললাম, 'তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়। মাধবী বরং একটু কফি বানাক! এখন একটু গরম হলেই জমবে। না হয় সারারাত জাগা হবে আজ! কর্নেল সেন, আপনার আপত্তি আছে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিছুমাত্র না। কফির আইডিয়াটা খুব ভালো। এখন একটু গরম কফি পেলে মন্দ হত না!'

রঞ্জন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই হোক তবে। মাধবী উঠে পড়ো!'

মাধবী আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'খালি আমাকে খাটানো, এত রাত্রে রান্নাঘরে ঢুকতে আমার ভয় করছে!'

॥ ২ ॥

বৃষ্টি থামেনি। সমানে পড়ছে। রাস্তাঘাট সব থইথই। মনে হচ্ছে আজ রাত্রেই কলকাতা প্লাবনে ডুবে যাবে। কাল সকালেও বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে কিনা সন্দেহ। আজকের রাতটা গল্প জমাবার পক্ষে চমৎকার। কফির কাপ হাতে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির দৃশ্য দেখলাম।

কফি শেষ হওয়ার পর কর্নেল সেন চুরুট ধরালেন। আমি আর রঞ্জনও সিগারেট জ্বেলে নিলাম। মাধবীর আর তর সইছিল না, ব্যগ্র ভাবে বলল, 'এইবার বলুন, তারপর কী হল?'

কর্নেল সেন বললেন, 'ওই অবস্থায় ওইরকম পরিবেশে খাটের তলায় হঠাৎ একটা ডেডবডি দেখতে পেলে অন্যদের পক্ষে খুব ভয় পাওয়ার কথা। আমিও দু-একটা মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ওটা দেখার পর আমার বরং ভয়টা একেবারেই কেটে গেল। আগে যে অলৌকিক কিছু বা ভূতটুত সম্পর্কে মনের মধ্যে একটু ছমছমে ভাব হয়েছিল, সেটা আর রইল না। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার কাছে ডেডবডি একটা রিয়ালিটি, অর্থাৎ একটা মানুষের মৃতদেহ দেখলেই মনে হয় যে তার মৃত্যুর একটা কারণ আছে। সে কিছুক্ষণ আগে বেঁচে ছিল। একটা মৃতদেহ হঠাৎ দেওয়াল ভেদ করে আসে না বা হঠাৎ উপে যায় না।

তখন গুণ্ডা বদমায়েশের চিন্তাই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। মৃতদেহটার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে আমি খাটটা টেনে এনে দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। রিভলভারটা হাতে তৈরি রেখে দেখতে লাগলাম, আর কোনও দিক থেকে কেউ ঢুকতে পারবে কিনা। একটা জানলা আছে, কিন্তু সেই জানলাটা ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়। আর জানলাটা একটু উঁচুতে বলে, সেটার সামনে

BanglaBook.org

অন্য কিছু রাখারও উপায় নেই। আমি জানলার পাশে গিয়েই দাঁড়ালাম। জানলা ভেঙে যদি ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে প্রথমেই আমি গুলি করব। ওদের লোকসংখ্যা যদি খুব বেশি না হয়, তাহলে সারা রাত আমি লড়ে যেতে পারব।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাঝরাত্রে এক জায়গায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই ক্লান্ত লাগে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হলে চলবে না, সারা রাতই একরকম দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বেশ বুঝতে পারলাম, এই নির্জন বাংলোয় একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত কাল রাত্রে। দিনেরবেলা ওরা ডেডবডিটা সরাবার সুযোগ পায়নি—এখন সেটা সরাতে এসেছে। অর্থাৎ একটা বিশ্রী খুনের ঘটনা, এর মধ্যে একটি মেয়েরও ভূমিকা আছে। যারা এক রাত্রে কাউকে খুন করে পরের রাত্রে ডেডবডি সরাতে আসে, তারা সাঙ্ঘাতিক লোক। মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি এসে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। জড়িয়ে তো পড়ছি, এখন এর মধ্য থেকে বেরোব কী করে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

ওদিক থেকে আর কোনও শব্দটব্দ না পেয়ে আমি মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। ডাক্তার মানুষ তো, এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। চোখের সামনে এরকম একটা ডেডবডি পড়ে থাকলে পরীক্ষা না করে দেখা পর্যন্ত শান্ত হতে পারি না। সব দেখেশুনে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'মামাবাবু, সত্যি কথা বলুন তো, তখন আপনার ভয় করছিল না? ঘরের মধ্যে একটা মড়া।'

কর্নেল সেন বললেন, 'না, মড়া দেখে ভয় পেলে আমাদের চলে না। তবে, ঘরের বাইরে জ্যান্ত লোকগুলো সম্পর্কেই ভয় পাচ্ছিলাম।'

'সেই মেয়েটার কী হল? তার আর কোনও পাত্তা পেলেন না?'

কর্নেল সেন বললেন, 'হ্যাঁ পেলাম। একটু বাদে, জানলায় একটা শব্দ হতেই আমি চট করে উঠে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মনে হল, কেউ যেন জানলার খড়খড়ি তোলার চেষ্টা করছে। আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'আমার কাছে রিভলভার আছে, জানলা খোলার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব।'

তখন সেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম। সে বলল, 'শুনুন।'

এখন আর তাকে আমি পেত্নি-টেত্নি ভাবতে পারছি না। সুতরাং ভয় না পেয়ে বললাম, 'বলুন।'

'দরজাটা একটু খুলবেন?'

'না। আপনারা কে?'

'ঘরের মধ্যে যে দেহটা আছে আমি সেটা নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

'কেউ নেই। আমি একা।'

'আপনি একা তো এই ডেডবডি নিয়ে যেতে পারবেন না।'

'আপনি একটু সাহায্য করবেন। সঙ্গে আমার জিপ আছে।'

এটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হল না যে মেয়েটির সঙ্গে অন্য লোক আছে। একজন বা তারও বেশি। তাদের নড়াচড়ার শব্দও আমি শুনতে পেয়েছি। কিন্তু ওরা মেয়েটিকে প্রথমে এগিয়ে দিচ্ছে বিশেষ কারণে। চৌকিদারের কাছ থেকেই হোক বা আমার গাড়িটা থেকেই হোক—ওরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি মিলিটারির লোক। সুতরাং আমার কাছে বন্দুক রিভলভার থাকবেই। ওরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে আমি একজন ডাক্তার। যাই হোক, ওরা ভেবেছে, মিলিটারির লোক সাধারণত মাথাগরম হয়। ওদের মধ্যে কোনও পুরুষকে সামনে দেখতে পেলে প্রথমেই হয়তো আমি

BanglaBook.org

গুলি করতে পারি। একটি মেয়েকে দেখলে আর যাই হোক, প্রথমেই কোনও পুরুষমানুষ গুলি ছুড়তে পারে না।

যে-কোনও উপায়েই হোক, আমার ঘরের দরজা খুলে ওরা মেয়েটিকে ভেতরে পাঠিয়েছিল। মেয়েটি একলাই বোধহয় ডেডবডিটা টেনে নিয়ে যেত, তার আগে সে দেখে গিয়েছিল, আমি জেগে আছি কিনা। সেই সময় তার চুল এসে লেগেছিল আমার মুখে।

যাই হোক, আমি জেগে ওঠবার পর মেয়েটি যদি খুব কান্নাকাটি করে কোনও একটা গল্প বানিয়ে বলত, আমি হয়তো বিশ্বাসও করে ফেলতাম। আমার তখন যা বয়স, সেই বয়সের ছেলেরা যুবতী মেয়েদের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে চায়। বিশেষত মেয়েদের চোখের জল দেখলে তো কথাই নেই। কী, ঠিক বলছি না?

মেয়েটা যদি কান্নাকাটি করে একটা রোমহর্ষক গল্প বানিয়ে বলতে পারত, তাহলে ওকে হয়তো আমি সাহায্যও করতে পারতাম। একা কোনও মেয়ে বিপদে পড়লে, লোকে কিছুটা অন্যায়ের ঝুঁকি নিয়েও তাদের সাহায্য করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি তার পার্ট ভালো করে প্লে করতে পারেনি। ঘরের মধ্যে ওকে যখন আমি দেখলাম, তখন ও দেওয়াল ঘেঁষে হাতজোড় করে বলেছিল, 'শুনুন—।' তারপর কথা শেষ করতে পারেনি, দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখনই আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

এখনও, জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভালো করে অভিনয় করতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। কেউ যেন পাশে থেকে তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে?'

মেয়েটি বলল, 'সে কথা আপনার জেনে দরকার নেই। আমার স্বামী হঠাৎ আত্মহত্যা করেছেন। আমি তাঁর ডেডবডিটা নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আত্মহত্যা করলেও পুলিশে খবর দিতে হয়। খবর দিয়েছেন?'

'আপনি এর মধ্যে জড়াবেন না। আপনি দরজাটা খুলে দিন। আমি ওকে নিয়ে যাই। তারপর আপনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

আমি তখন বললাম, 'ঠিক আছে, বাইরে সারা রাত অপেক্ষা করুন। সকালবেলা দেখা যাবে কী করা যায়।'

মেয়েটি আবার বলল, 'আপনি শুধু-শুধু ব্যাপারটা জটিল করছেন। আমি ডেডবডিটা নিয়ে গেলে—আপনার কথা কেউ জানতেও পারবে না।'

কর্নেল সেন একটু থামলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরাই বলো তো, তখন আমার কী করা উচিত ছিল? আমার কি দরজা খোলাই উচিত ছিল?'

রঞ্জন বলল, 'নিশ্চয়ই না। ওই রকম অবস্থায় দরজা খোলা তো পাগলামি। খুনের ব্যাপারে আপনি একজন সাক্ষী হয়ে গেলেন। ওরা আপনাকেও শেষ করার চেষ্টা করত। মেয়েটাকে আড়াল করে লোকগুলো ঢুকত, ওদের কাছেও রিভলভার বা বন্দুক নিশ্চয়ই ছিল। কারণ খুনটা হয়েছিল গুলি করে। এমনকী মেয়েটাও আপনাকে গুলি করতে পারত। মেয়েদের বেশি ভালো ভাবার তো কোনও কারণ নেই!'

মাধবী বলল, 'কিন্তু মামাবাবু, আপনাকেও তো ওরা জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারত। ওরা যদি তখন পালিয়ে গিয়ে গোপনে পুলিশে খবর দিত—তাহলে পুলিশ এসে দেখত ঘরের মধ্যে আপনি একা আর একটা ডেডবডি—'

কর্নেল সেন বললেন, 'মাধবী, তুমি এক বিষয়ে ঠিকই বলেছ। যে-কোনও সাধারণ লোক ওই অবস্থায় পড়লে ওইরকম ভাবতে পারত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি একজন ডাক্তার। এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের চিন্তাভঙ্গি একটু অন্য রকম হয়। মৃতদেহটি পরীক্ষা করেই আমি বুঝেছিলাম,

BanglaBook.org

লোকটিকে খুন করা হয়েছে অন্তত ষোলো থেকে কুড়ি ঘণ্টা আগে। পোস্টমর্টেমে সেটা ধরা পড়বেই—তখন মৃত্যুর সময়টা আরও নির্ভুল ভাবে বলা যায়। ষোলো থেকে কুড়ি ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম ওই ডাকবাংলো থেকে অনেক দূরে। সেটা প্রমাণ করতে কোনও অসুবিধে হবে না। সুতরাং খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ভয় আমার ছিল না। আমার ভয় ছিল আমি নিজেই না খুন হয়ে যাই।

আমি মেয়েটিকে বললাম, 'আমি দরজা এখন কিছুতেই খুলব না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর দেখা যাবে।' মেয়েটি আর কোনও উত্তর দিল না। আমি শুনতে পেলাম সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর সে ধরা-গলায় বললে, 'আপনার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। আপনি আমাকে এইটুকু সাহায্য করবেন না? আমার স্বামীর দেহটা আমাকে নিয়ে যেতে দিন।'

আমি এখন আর মেয়েটির অভিনয়ে ভুললাম না। রুক্ষ গলায় বললাম, 'আপনার স্বামীর দেহ কি কার দেহ, সেসব আমি কিছু জানি না। সকালবেলা বোঝা যাবে। এখন আমি দরজা খুলব না।'

এতক্ষণ বাদে একজন পুরুষের কথা শুনতে পাওয়া গেল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আপনি যদি না খোলেন, আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।'

তখন আমার ভয় পাওয়ার কোনওই মানে হয় না! আমিও ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে বললাম, 'প্রথম যে ঢুকবে, তার নির্ঘাত মরণ আছে আমার হাতে। সে চেষ্টা না করাই ভালো।'

পুরুষটি আবার বলল, 'আপনি কেন এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন? দরজা খুলে দিন, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে চলে যাই। আপনি চুপচাপ ঘুমোবেন, আপনার কেউ কোনও ক্ষতি করবে না।'

আমি বললাম, 'কাল সকালের আগে কিছু হবে না। সকালের আগে আমি দরজা খুলব না।'

পুরুষটি যদিও বাংলায় কথা বলছিল, কিন্তু টান শুনলেই বোঝা যায় যে বাঙালি নয়। মেয়েটি কিন্তু খাঁটি বাঙালি। মৃতদেহটা যার, সেও বাঙালিই। ব্যাপারটা আমার কাছে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। যাই হোক, আমার কথা শুনে লোকটি আর কিছু বলল না।

তারপর আবার চুপ। মনে হল, একটু বাদে কে যেন নেমে গেল বারান্দা দিয়ে। আবার কেউ যেন ফিরে এল। আবার চুপচাপ। আমি উৎকণ্ঠ হয়ে রইলাম, সামান্য শব্দও যে আমার কান না এড়ায়। কিন্তু মনে হল, জানলা বা দরজা ভাঙার চেষ্টা আপাতত ওরা ত্যাগ করেছে। ওরা অপেক্ষা করছে আমার কোনও দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নেওয়ার জন্য। এমনি ভাবে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কেটে গেল।

'শেষপর্যন্ত আমি কী করলাম জান? শুনলে বোধহয় তোমরা বিশ্বাসই করবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম!'

মাধবী আঁতকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? ঘুমিয়ে পড়লেন? ওই অবস্থায়?'

কর্নেল সেন বললেন, 'কী করব। ঘুমের ওপর কি কারওর হাত আছে? ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার শরীরটাও সেদিন বিশেষ ভালো ছিল না। ঘুমে চোখ টেনে আসছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে আর না পেরে, আমি দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘরের মধ্যে একটা মড়া, বাইরে কতকগুলো গুণ্ডা বদমাইশ। তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।'

রঞ্জন বলল, 'ব্যস এই পর্যন্ত। এবার চলো, আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি।'

মাধবী রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করো তো! তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো, তুমি যাও। আমরা শুনব। তারপর কী হল মামাবাবু?'

BanglaBook.org

রঞ্জন বলল, 'আমার একটুও ঘুম পায়নি। কিন্তু গল্প খুব জমে উঠলে আমার মনে হয়, শেষ হলেই তো ফুরিয়ে যাবে। ভালো বই যে কারণে আমি তারিয়ে-তারিয়ে পড়ি। আজ এই পর্যন্ত শোনা হল, আবার কাল সকালে বাকিটা শুনব। না হলে কাল সকালে কী করব? যা বৃষ্টি কাল সকালেও তো বেরোনো যাবে না।'

মাধবী বললে, 'কাল সকালে সুনীলদা গল্প বলবে। আজ রাতে আমরা এটা শেষপর্যন্ত না শুনে শুতে যাব না।'

কর্নেল সেন মুচকি হেসে বললেন, 'এটা শেষ হতে-হতে কিন্তু সারা রাত কেটে যেতে পারে।'

'তা হোক। একটুও ঘুম পাচ্ছে না।'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'ভাই, আমারও নেশা লেগে গেছে। এখন এই পর্যন্ত শুনে আর থাকা যায় না। ডিটেকটিভ বই পড়তে-পড়তে আমি অনেক রাত কাবার করে দিই।'

কর্নেল সেন বললেন, 'ডিটেকটিভ বইয়ের মতন এ-গল্পে সেরকম কোনও জটিল প্লট অবশ্য নেই! পরে যখন কেস উঠল'—

রঞ্জন তার মামাবাবুকে বাধা দিয়ে বলল, 'শেষের কথা এখন বলবেন না। আপনি পরপর বলুন। ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর কী হল?'

॥ ৩ ॥

কর্নেল সেন আবার হেসে মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর আর কী? আসলে গল্পটা বেশি বড় নয় মোটেই। এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। বসে-বসে সেই যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। এর মধ্যে জানলা ভেঙে ঢুকে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। কিংবা জানলা ভাঙার শব্দে আমি হয়তো জেগে উঠতাম। সেসব কিছুই হয়নি। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম যে রীতিমতন সকাল হয়ে গেছে; গল্পটা এখানেই শেষ। এবার ঘুমোতে যেতে পারো।'

মাধবী সবিস্ময়ে বলল, 'গল্প শেষ মানে? মড়াটা কী হল। নেই?'

কর্নেল সেন বললেন, 'মড়াটা ভূত হয়ে পালায়নি। সেটা তখনও সেখানেই পড়ে আছে। কিন্তু এরপর তো পুলিশ-টুলিশের ব্যাপার। আমি ডাকবাংলোর অভিজ্ঞতার কথা বলব বলেছিলাম। সে গল্প এখানেই শেষ। ডাকবাংলোর এরকম রোমাঞ্চকর রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তোমাদের কখনও হয়েছে? ডাকাতদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত গুলি ছোড়াছুড়ি করতে হয়নি অবশ্য, কিন্তু গোটা রাত অজানা অচেনা এক লোকের মৃতদেহের সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়ে ছিলাম। ঘরের বাইরে কয়েকজন রহস্যময় নারী-পুরুষ। তারপর আবার ঘুম। এরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কি সচরাচর মানুষের হয়? এইটুকুই গল্প। এরপর থানা-পুলিশ, আইনের ব্যাপার—তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।'

মাধবী বলল, 'না মামাবাবু, ওসব চলবে না। তারপর কী হল বলুন।'

রঞ্জন বলল, 'তারপর আর কী? গল্প তো শেষ হয়ে গেছে। এই গল্পের নামে 'একরাত্রির অভিজ্ঞতা।' তুমি বাচ্চা মেয়ের মতন তারপর, তারপর জিগ্যেস করছ কেন? বাচ্চারাই তো গল্প শেষ হওয়ার পরও জিগ্যেস করে তারপর কী হল।'

মাধবী এত চটে গেছে যে চটাস করে এক চড় বসাল স্বামীকে।

আমিও আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না। কর্নেল সেনকে জিগ্যেস করলাম, 'গল্প তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আপনি ও-ঘর থেকে বেরোলেন কী করে? ওরা তখনও ছিল না বাইরে?'

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'আমি অনেকক্ষণ দরজা খুলিনি। তারপর জানলার

BanglaBook.org

খড়খড়ি তুলে দেখলাম। দেখতে পেলাম না কাউকে। জিপটাও নেই, তবে আমার গাড়িটা ঠিকই আছে। মনে হল ওরা চলে গেছে।

দিনের আলোয় মৃতদেহটা ভালো করে দেখলাম। লোকটি বিশেষ যন্ত্রণা পেয়ে মরেনি, গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ছাপ—যেন মৃত্যুর জন্য সে তৈরি ছিল না। রিভলভার বা বন্দুকের গুলি তার গলার কাছ দিয়ে ঢুকে ব্রেনের দিকে চলে গেছে। চেহারা দেখলে মনে হয়, লোকটি সাধারণত মধ্যবিত্ত ঘরের। টাকাপয়সার জন্য কেউ তাকে খুন করেছে—এমন মনে হয় না। যে মেয়েটি কাল রাত্তিরে এসেছিল, সে কি সত্যিই এর স্ত্রী?

ডাকবাংলোই একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে দিলাম। তারপর সাবানটাবান নিয়ে আমি ঢুকলাম বাথরুমে। বাইরে তখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা খুললাম। ওরা আশেপাশে লুকিয়ে থাকতেও পারে। হয়তো আমাকে ঘর থেকে বার করার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিই বা কতক্ষণ ঘরের মধ্যে বন্দি থাকব?

তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে গাড়ি যাচ্ছে টের পাচ্ছি। দিনের আলোয় অতটা ভয় করে না। রিভলভারটা পকেটে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কেউ কোথাও নেই। বাংলোটার চারপাশ ঘুরে দেখলাম ভালো করে। আর কোনও লুকোনো জায়গা থাকা সম্ভব নয়। রাত্রির আগন্তুকদের তো খুঁজে পাওয়া গেলই না, চৌকিদারটারও কোনও পাত্তা নেই। তার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে জিনিসপত্তর পড়ে আছে, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন নেই কোনওখানে। গতকাল যখন আমি তার ঘরের দরজাটা ঠেলেছিলাম, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তার বউটউ কেউ ছিল। দুজনেই সকালবেলা উঠে কোথায় গেল? পালিয়েছে?

কাল সন্ধ্যার পর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চিনচিন করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার চা খাওয়া অভ্যাস। চায়ের তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। কী করব, কিছুই ভেবে পেলাম না।

সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল অবশ্য আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে চম্পট দেওয়া। তাই না?'

রঞ্জন বলল, 'সেটা আপাতত খুব সহজ মনে হলেও আসলে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পরে ধরা পড়লে অনেক বেশি গুরুতর অভিযোগ—'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিন্তু পরে ধরা পড়ার সম্ভবনা খুবই কম। তোমরা ডিটেকটিভ বইতে পড়ো, ছোটখাটো সূত্র ধরে পুলিশ চটপট এক-একজনকে গ্রেফতার করে ফেলে। আসলে কি তাই হয়? শুধু আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও সবসময় হয় না। আমি যদি সকালবেলায় উঠে সেই বাংলো থেকে সরে পড়তাম, তাহলে আর আমার খোঁজ পাওয়ার সাধ্য ছিল না কারওর। আমাকেও কোনও ঝামেলায় পড়তে হত না। ওই খুনের কোনও কিনারা হত কিনা তাও সন্দেহ। আশেপাশে কত ফাঁকা জায়গা—আততায়ীরা যদি রাত্রির অন্ধকারে ডেডবডিটা সরিয়ে মাঠের মধ্যে কোথাও গভীর গর্ত করে পুঁতে দেয়—কে আর তার খোঁজ পাবে? টাকা দিয়ে চৌকিদারের মুখ বন্ধ করে রাখা যায়। মাঝখান থেকে আমি এসে পড়াতেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

আমার বয়স তখন কম, সেই সময়ে ঝামেলা এড়াবার বদলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াতেই বেশি ঝোঁক চাপে। সুতরাং আমি সকালবেলা উঠে পালিয়ে যাইনি। তা ছাড়া একটা নিয়ম আছে, তুমি যদি হত্যা বা এই ধরনের ক্রাইম সংঘটিত হতে দেখো, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশকে জানানো কর্তব্য। না জানালে, আইনের চোখে তুমিও অপরাধী। আজকাল অবশ্য এসব কেউ মানে না—খুনজখম এত বেশি হচ্ছে যে লোকে দেখলেও চোখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা পুরোনো কালের মানুষ, আমাদের এথিক্‌স আলাদা।

বাংলোর ঘরে ফিরে এসে আমি ডেডবডিটা আবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম।

লোকটির পকেটে কাগজপত্তর কিছু নেই। তার পরিচয় জানবার কোনও চিহ্ন রাখা হয়নি। বুলেটটা তার দেহের ভেতরেই রয়েছে। ঘরের মধ্যে তার ব্যবহৃত একটা জিনিসও নেই।

এই রহস্যটার শেষ না জেনে বাংলো থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। গত রাত্রির সেই মেয়েটির পরিচয় জানবার জন্য ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিলাম। তা ছাড়া এরকম অবস্থায় পড়লে সবারই একটু-একটু ডিটেকটিভ হওয়ার সাধ জাগে। ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। লোকটির সঙ্গে কোনও লাগেজ নেই কেন? ডাকবাংলোয় এসে যদি কেউ ওঠে, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী—তাদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র তো থাকবেই। সেগুলো যদি কেউ সেরিয়ে ফেলতে পারে—তাহলে ডেডবডিটাই বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখল না কেন; কিংবা ফেলে গিয়েও আবার নিতে আসবে কেন?

ঘর থেকে আবার বাইরে এলাম। কথা বলার মতন একটা লোক পেলে ভালো হত। কিন্তু কেউ নেই ধারে কাছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি তো আর হঠাৎ কোনও গাড়িকে জোর করে থামিয়ে বলতে পারি না—'ও মশাই, দেখবেন আসুন, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে!' সুতরাং আমাকেই থানায় খবর দিতে যেতে হবে। থানা কত দূরে তাও জানি না।

ডাকবাংলোর ঘরের তালাচাবি ঘরের মধ্যেই পড়েছিল। সেগুলোর বদলে আমি আমার নিজের সুটকেসের তালাটা ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলাম। অন্য সব দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

গাড়িতে উঠে ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডটা ছাড়াতেই খালের ওপারে সেই ঘর বাড়িগুলোর কিছু লোকজনের চিহ্ন দেখা গেল। সেখানে গিয়ে থানার খবরটা জিগ্যেস করব কিনা ভাবছি, এমন সময় রাস্তার ওপরেই একজন বুড়ো মতন লোককে দেখা গেল।

গাড়িতে বসে লোকটিকে ডাকলাম। গ্রাম্য চাষি শ্রেণির মানুষ, মুখে-চোখে খুব একটা বুদ্ধির ছাপ নেই। তাকে জিগ্যেস করলাম, 'থানা কোথায় বলতে পারো?'

সে হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল।

'কত দূরে?'

'দু-ক্রোশ তিন ক্রোশ হবে।'

দূরত্ব সম্পর্কে গ্রামের লোকদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তিন ক্রোশ যখন বলছে—তখন অন্তত মাইল দশেকের কম নয়। আমি তাকে বললাম, 'চলো, আমার সঙ্গে একটু থানায় চলো—'

বলেই বুঝতে পারলাম খুব ভুল করেছি। লোকটি ভয়ার্ত সন্দেহ-মাখা চোখে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। গ্রামের লোক সাধারণত থানার নাম শুনলেই ভয় পায়—তারপর তাকে বিনা দোষে থানায় যেতে বলা! লোকটি আর কোনও কথা না বলে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, 'এই যে, শোনো-শোনো—। তোমাকে থানায় যেতে হবে না। একটা কথা শোনো।'

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে ভাই? আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ওই বাংলোটায় একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমার কিছু জিনিসপত্তর রেখে গেলাম—'

আমি চাইছিলাম বাংলোটার ওপর কেউ একটু নজর রাখুক। কিন্তু ডেডবডিটার কথা ওকে বলতে পারি না। ওকে ঠিক বোঝানোই মুশকিল! লোকটি বিনা বাক্যব্যয় টাকাটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল, নোটখানা জাল কিনা। আমি তাকে বললাম, 'এখানে একটু থেকো কিন্তু—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।' লোকটি তারও কোনও উত্তর দিল না।

আমি গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই পেছনে তাকিয়ে দেখি লোকটা মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে। ওর বেশ মওকায় পাঁচটা টাকা লাভ হয়ে গেল।'

মাধবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্নেল সেন বললেন, 'হাসছ? খুব বোকার মতন কাজ করে ফেলেছিলাম, তাই না? কিন্তু

BanglaBook.org

আগের রাত্রে ওইরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার পর তার পরদিন সব ব্যাপারে মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

থানা অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়, মাইল পাঁচেকের মধ্যেই, আমার গাড়ি সেখানে থামতেই গেটের সেপাই আমাকে দেখে লম্বা একটা স্যালুট দিল। বুঝলাম, আমার মিলিটারি পোশাকের মহিমা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, একজন সাব ইনস্পেক্টর টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে এক মনে শ্যামাসংগীত গাইছে। আমাকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল। আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বলে উঠল, 'বসুন স্যার, আমাদের বড়বাবুকে ডাকছি।'

বড়বাবু এলেন লুঙ্গি পরে। বিশাল বপু। অত সকালেই পান চিবোচ্ছেন। মফস্বলে ছোট থানায় এরকমই ঢিলেঢালা ব্যাপার চলে। অন্তত তখনকার দিনে চলত। বড়বাবু অর্থাৎ ও. সি. আমাকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বিগলিত ভাবে বললেন, 'বসুন স্যার, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চা খাবেন তো! ওরে, চা নিয়ে আয়! সিঙাড়া খাবেন? এই সময় গরম সিঙাড়া ভাজে!'

আমি বললাম, 'চা খাওয়ার সময় নেই। আমি একটা খুনের ঘটনা রিপোর্ট করতে এসেছি।'

বড়বাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'খুন? আমার এরিয়ায়? এ কী অসম্ভব কথা।'

বড়বাবু চ্যাঁচামেচি করে থানায় সব্বাইকে ডেকে জড়ো করলেন। তাদের সামনে আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে হল।

মোটমাট থানা থেকে ফিরে আসতে আমার মিনিট পঞ্চাশেক সময় লেগেছিল। বড়জোর এক ঘণ্টা। দারোগাকে ঘটনার গুরুত্ব কিছুতেই বোঝানো যায় না। বারবার বলতে লাগলেন, তাঁর এরিয়াতে চাষাভুষোরা মাঝে-মাঝে খুনোখুনি করে বটে, কিন্তু গত দু-তিন বছরের মধ্যে কোনও ভদ্দরলোক খুন হয়নি। আমি শেষকালে একটু রাগের সঙ্গেই বললাম, 'আগে ডেডবডিটা দেখবেন চলুন—তারপর বিচার করবেন সেটা ভদ্রলোকের কিংবা চাষাভুষোর! আমার কাছে একটা খুন হয়েছে, সেইটাই বড় কথা, সেটা ভদ্দরলোক কিংবা চাষার—তাতে কিছু যায় আসে না।'

এর পরেও দারোগা আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। আমার চা-তেষ্টা পেয়েছিল বটে, কিন্তু দেরি করতেও ইচ্ছে করছিল না। দারোগাবাবু বললেন, 'আরে মশাই ডেডবডি তো আর পাখা মেলে উড়ে পালাবে না! চা-টা নষ্ট করবেন কেন?

তারপর দারোগাবাবু গেলেন পোশাক বদলাতে। তাতে লাগল মিনিট দশেক। ফিরে এসে জিব কেটে বললেন, কিন্তু যাব কীসে? আমাদের গাড়িটা তো খারাপ হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে।' আমি বললাম। 'চলুন। আমার গাড়িতে চলুন।'

ফিরে এসে প্রথমেই আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ করলুম। দরজায় আমার তালাটা লাগানো নেই। আমার তালার কোনও চিহ্নই নেই, দরজায় ডাকবাংলোর নিজস্ব ডবল তালা লাগানো। তার চাবি আমার নেই। অর্থাৎ এর মধ্যেই কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

আমি দারোগাকে বললাম, 'তালা ভাঙতে হবে। এই তালার চাবি তো এখন পাওয়া যাবে না।'

দারোগাবাবু জানালার খড়খড়ি তুলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার বলে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিনি আমাকে বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তালা ভাঙা কি অত সহজ?'

দারোগা হাঁক দিলেন, 'চৌকিদার, এ চৌকিদার!'

আশ্চর্যের ব্যাপার, চৌকিদার রামদাস তার ঘর থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এল। আমাকে সে একেবারে গ্রাহ্যই করল না। দারোগার সামনে লম্বা এক সেলাম দিয়ে বলল, 'জি হুজুর?'

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'সকালবেলা কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে সে হাবার মতন তাকিয়ে রইল। লোকটি অতি ধূর্ত, সুবিধাজনকভাবে

BanglaBook.org

সে সব কথা কানে শুনতে পায় না। দারোগার ডাক শুনতে পেল, আমি চেঁচিয়ে মরলেও শুনতে পায়নি। এখনও আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

আবার তাকে জিগ্যেস করলাম, 'কাল রাতে কিছু শুনতে পাওনি? অতবার ডাকলাম তোমাকে—'

চৌকিদার তাও কোনও উত্তর দেয় না।

দারোগা তাকে জিগ্যেস করলেন; 'এই বাবুকে চিনতে পারছ না?'

চৌকিদার মাথা নেড়ে বলল, না।

'কোনওদিন দেখোনি?'

'আজ্ঞে না।'

আমি স্তম্ভিত। লোকটা বলে কী! রাগে শরীর জ্বলছিল। কিন্তু এখন বেশি রাগ না দেখানোই ভালো। যথাসম্ভব শান্ত ভাবে বললাম, 'কাল রাতে আমি এখানে ছিলাম, আর তুমি বলছ, আমাকে কখনও দেখোনি?'

'আজ্ঞে না হুজুর!'

'ঠিক আছে। তুমি খুব শয়তান, না? বুঝবে পরে মজা, খাতা নিয়ে এসো। বাংলোর খাতা কোথায়? সেখানে আমি নাম লিখেছি।'

দারোগা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সেসব পরে হবে। এখন দরজা খুলে দাও।'

চৌকিদারটার কী স্পর্ধা। সে নিরীহ ভাবে জিগ্যেস করল, 'আপনি থাকবেন হুজুর?'

দারোগা বললেন, 'থাকব কি না সে আমি পরে বুঝব। এখন দরজা খোলো তো!'

দরজা খোলা হল। মৃতদেহটা সেখানে নেই।'

মাধবী চমকে উঠে বলল, 'নেই? ওর মধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে? ইস মামাবাবু, আপনি কেন ডাকবাংলো ছেড়ে চলে গেলেন?'

রঞ্জন ধমকে উঠে বলল, 'বাজে বোকো না! চুপ করে শোনো—ডাকবাংলো ছেড়ে না গেলে পুলিশে খবর দিতেন কী করে?'

মামাবাবু বললেন, 'শুধু যে মৃতদেহটা নেই তাই-ই নয়। কোনও কিছুই নেই। আমার সুটকেস, জামাকাপড় সব উধাও। আমি যে ওই ডাকবাংলোয় এক রাত কাটিয়েছি—তার সব চিহ্নও লোপাট করে দিয়েছে। এমনকী, বাথরুমে আমি আমার সাবান টুথব্রাশ রেখে গিয়েছিলাম, সে দিকেও ওরা নজর দিতে ভোলেনি। চেয়ার টেবিল খাট সব ঠিক জায়গায় বসানো। ওরা খুব নিপুণ হাতে কাজ সেরেছে।

দারোগা আমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'কী মশাই, কী ব্যাপার?'

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছি ঠিকই। সেটাকে সামলে উঠে চৌকিদারকে জিগ্যেস করলাম, 'কী হে রামদাস, মড়াটা কোথায় গেল!'

'আমি তো কিছু জানি না হুজুর!'

'কিচ্ছু জানো না? এখানে একটা খুন হয়নি?'

'খুন? কী বলছেন হুজুর!'

'আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথায় গেল? আমার সুটকেস?'

উত্তর না দিয়ে আবার হাবার মতন তাকিয়ে রইল রামদাস। লোকটা দারুণ অভিনয় করতে পারে। এখন দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না।

'যাও বাংলোর খাতা নিয়ে এসো।'

চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। যা মনে-মনে আশঙ্কা করছিলাম, তাই। খাতার একটা পাতা খুব সাবধানে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়, কিন্তু দারোগাকে

BanglaBook.org

বোঝবার ব্যাপারে তাতে কোনও কাজ হবে মনে হয় না।

তবু আমি দুর্বলভাবে বললাম, 'দেখুন এই খাতা দেখে মনে হয়, এখানে ছ-সাত মাসের মধ্যে কোনও ভিজিটার আসেনি। সেটা সম্ভব? লাস্ট এনট্রি রয়েছে মার্চ মাসের।'

দারোগাটি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হুঁ, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু খুনের অভিযোগ দায়ের করতে হলে একটা ডেডবডি অন্তত থাকা দরকার। সেটাই তো পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ডেডবডি তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না?'

'এরা এর মধ্যে এসে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

'এই দিনের আলোয়? ভেরি আনলাইক্‌লি। ভেরি আনলাইক্‌লি।'

'আপনি ওই চৌকিদারকে ভালো করে জেরা করুন। ও সব জানে। ওর কাছ থেকে সব বার করা যাবে। কাল রাত্রে এখানে একটি জিপগাড়ি এসেছিল। তাতে একটি মেয়ে এবং আরও কয়েক জন লোক ছিল—চৌকিদার সে সব কথা জানে—ওর ঘরে আলো জ্বলছিল তখন, আমার ডাকে সাড়া দেয়নি—' দারোগাবাবু আকস্মিক ভাবে হেসে উঠে বললেন, 'আর যাই বলুন, আপনার ওই মেয়েটির কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। রাতদুপুরে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে কাঁদবে আবার উধাও হয়ে যাবে—ও নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ওসব তো গল্পে হয়। পাঁচকড়ি দে-র কী যেন গল্প আছে না, "নীলবসনা সুন্দরী" না কী যেন—'

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, 'আমি যা বলছি, তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। এখানে একটা খুন হয়ে গেছে—ব্যাপারটা আপনি হালকা ভাবে নেবেন না।'

'কিন্তু একটা কিছু ভিত্তি তো থাকা দরকার। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনি যাকে দেখে ছিলেন, সে হয়তো সত্যি-সত্যি মরেনি। কোনও কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চলে গেছে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি একজন ডাক্তার। কে মারা গেছে আর কে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—এটা একজন ডাক্তার প্রায় খালি চোখেই বলে দিতে পারে। যেমন আপনাকে দেখে আমি বলতে পারি, আপনার ডায়াবেটিস আছে।'

দারোগাটি চমকে বললেন, 'অ্যাঁ? আপনি দেখেই বুঝতে পারেন? ধরেছেন তো ঠিকই। বছরখানেক হল ডায়াবিটিসে ভুগছি! ভাত, আলু, মিষ্টি—সব বন্ধ। জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। এখানে ডাক্তার-বদ্যিও তেমন ভালো নেই। বাইচান্‌স আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েইছে—একটা ভালো ওষুধ বাতলে দেবেন কিন্তু। অন্তত দু-বেলা ভাত যাতে খেতে পারি—যাকগে, তাহলে এখন কী করা যায় বলুন তো? আপনার একটা কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।'

আমি দারোগাবাবুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, 'বসুন, দু-একটা কথা বলা যাক। আপনার লোকদের বলুন, চৌকিদারের ওপর যেন নজর রাখে। ওকে পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।'

দারোগাবাবু চেয়ারে বসে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর আরাম করে সেটাকে টান দিয়ে বললেন, 'এখানে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না। কাল দুটো স্মাগলিংয়ের কেস ধরা পড়েছে। সেখানে এনকোয়ারিতে যেতে হবে। বলুন স্যার, কী বলবেন।'

আমি বললাম, 'শুনুন, আপনাকে সকালবেলা দশ মাইল দূরের থানা থেকে ডেকে এনে কিছুই দেখাতে পারলাম না—এতে মনে হতে পারে যে আমি আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে সেরকম কোনও মধুর সম্পর্ক আমার নয়। তা ছাড়া ঠাট্টা রসিকতা করে এতটা সময় নষ্ট করার মতন সময়ও আমার হাতে নেই। আর এক হতে পারে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি সবকিছুই ভুল দেখছি, ভুল শুনছি! কিন্তু আপাতত নিজেকে আমার পাগল বলেও মনে হচ্ছে না। আমি জরুরি কাজে পুরুলিয়া যাচ্ছিলাম। সেসব আমার মাথায় উঠে গেছে। এখন এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। আপনি থানায়

অতক্ষণ দেরি না করলে বোধহয় আমরা আসামিদের হাতেনাতে ধরতে পারতাম। আপনি যদি ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতে না চান, তাহলে আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্টার্সে যাব।'

দারোগা মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'আমার এখন তাহলে কী করা উচিত বলুন তো? আপনার সব কথা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও তো মনে হচ্ছে—এটা ভৌতিক কারবার। ভূতের সঙ্গে পুলিশ কী করবে? আমি মশাই বামুনের ছেলে, আমি ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবতা সব মানি।'

'সে আপনি যাই মানুন, এক্ষুনি গোটা বাংলোটা, চৌকিদারের ঘর সার্চ করে দেখুন। এই চৌকিদারকেও কি আপনার ভূত বলে মনে হয়? সে কাল রাত্রে জেগে ছিল, কিন্তু আমার ডাক শুনেও আসেনি। আজ সকালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—এখন আবার জলজ্যান্ত হয়ে ফিরে এসে বলছে কিছুই জানে না। চৌকিদারকে ভালো ভাবে জেরা করুন।'

'তাহলে কি আপনি বলছেন, চৌকিদারই যত নষ্টের গোড়া। ও ব্যাটাই খুন করেছে?'

'না, সে কথা আমি বলতে চাইছি না। তবে, ও নিশ্চয়ই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। ও অনেক কিছু জানে।'

দারোগা আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন। সঙ্গের লোকদের সার্চ করার হুকুম দিলেন। এবং নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য হঠাৎ ঠাস করে এক চড় মারলেন চৌকিদারের গালে। হুংকার দিয়ে বললেন, 'বল, হারামজাদা! কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল, বল।'

ডাকবাংলোটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। চৌকিদারের ঘরেও কিছু নেই। ওরা কাজ করেছে নিখুঁতভাবে। পুলিশের চোখে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টাও করেছে বেশ ভালো ভাবে।

এই সবকিছুর মধ্যে আমি সেই মেয়েটির অনেকখানি ভূমিকা দেখতে পাচ্ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার ভাবে গুছিয়ে যাওয়া কোনও পুরুষের কাজ নয়, তাহলে দু-একটা ভুল থেকেই যেত। মেয়েরা সাধারণত ভুল করে না। মেয়েটি কি তাহলে সর্বক্ষণ কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ করছিল?

চৌকিদারের ঘরের জানলার পাশে একটা ছোট্ট হলদে রুমাল পাওয়া গেল। মেয়েলি রুমাল, লেসের কাজ করা—কিন্তু কোনও নামটাম লেখা নেই। দারোগাবাবু ওটাকে পাত্তা দিলেন না। রুমালটুমাল থেকে সূত্র খুঁজে বার করা শুধু বইতেই দেখা যায়। বাংলোর কম্পাউন্ডে জিপগাড়ির চাকার দাগ—অন্তত আমার গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়ির চাকার যে দাগ আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। দারোগাবাবুর কাছে ওরও কোনও মূল্য নেই।

কিন্তু অপরাধীদের কাজ যতই নিখুঁত হোক, একটা-না একটা ভুল তারা করবেই। এ ক্ষেত্রেও তারা একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে। এরকম ছেলেমানুষি ভুলের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দারোগাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমাকে শেষপর্যন্ত পাগলই ভেবে বসেছিলেন হয়তো। তিনি তখন ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ফিরতে হলে আমার গাড়িতেই ফিরতে হবে। আসবার সময়ই সেটা কড়ার করে নিয়েছেন। আমার তখন যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। হার স্বীকার করে চলে যাব? দারোগাবাবু তাঁর লোকজনকে চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করার জন্য খুব হম্বিতম্বি করছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখে সবসময় একটা মৃদু-মৃদু হাসি। ওই হাসিটাই আমার অসহ্য লাগছিল।

অক্লান্ত ভাবে আমি নিজেই চতুর্দিকে খুঁজে দেখছিলাম। ডাকবাংলোর কম্পাউন্ড ছেড়ে উঠে গেলাম সেই বাঁধটার ওপর। নীচেই খাল। সেই খালের জলে একটা কী যেন কালো মতন জিনিস ভাসছে। দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে জলের মধ্যে নেমে লাঠি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে সেই জিনিসটা।

আমি তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। তারপরই চেঁচিয়ে ডাকলাম দারোগাবাবুকে।

খালের জলে ভাসছে আমার সুটকেসটা। অপরাধীরা আমার সব জিনিসপত্র সরিয়ে

ফেলেছিল—ডাকবাংলোতে আমার থাকার প্রমাণ লোপ করবার জন্য। আমার জিনিসপত্রগুলো ওদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোনও একটা দুর্বলতায় ওরা সঙ্গে নিয়ে যায়নি, ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে খালের জলে। খালের জল বেশি নয়, স্রোতও নেই, সুটকেসটা ভেসে যায়নি। গ্রামের ছেলেরা ওই জিনিসটা দেখতে পেয়ে তোলার চেষ্টা করছে মহা উৎসাহে।

মোটা শরীর নিয়ে দারোগাবাবুর নেমে আসতে সময় লাগল। নেমে হাঁসফাস করতে লাগলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার? এটা কী?'

'আমার সুটকেস! এবার প্রমাণ হল তো, এই বাংলোতে কাল রাত্রে আমি ছিলাম। চৌকিদার আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে!'

দারোগা এর উত্তরে কী বললেন জানো? বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতেও কিন্তু খুনের ব্যাপারটার কিছুই প্রমাণ হয় না।'

শুনেই আমার রাগ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলাম। এবার আমি প্রায় ধমকেই বললাম, 'আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? খুনটুন কিছু হয়নি এটাই আপনি প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত! নাকি খুন যে করেছে, সেই আসামিকে ধরতে চান?'

এরা সব শক্তের ভক্ত। ধমক খেয়েই দারোগাটির সুর বদলে গেল। তটস্থ হয়ে বললেন, 'সে কী বলছেন? খুন হলে খুনিকে ধরব না? একটা মার্ডার কেস ধরতে পারলে আমার প্রমোশন হয়ে যাবে। কত দিন ধরে বদলির চেষ্টা করছি এখান থেকে। খুন হওয়া মানে তো আমার গুড লাক! তবে আমাদের এখানে তো এরকম কেসটেস বিশেষ হয় না...'

সুটকেসটা তোলা গেল সহজেই। চৌকিদারকে ডাকা হল। দারোগাবাবু তাকে গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, 'কীরে, তুই যে কিছু জানিস না বললি? এই সাহেবের সুটকেস এখানে এল কী করে?'

চৌকিদারের সেই এক উত্তর, 'আমি কিছু জানি না হুজুর।'

'জানিস না মানে? তুই বাংলোর চৌকিদার হয়েছিস—আর বাংলো থেকে জিনিসপত্তর উধাও হয়ে খালের জলে ভাসবে?'

'আমি সকালেবেলা তেল আনতে গিয়েছিলাম। তখন কেউ চুরি করেছে!'

'তাহলে তখন যে বললি, এই সাহেবকে তুই কখনও দেখিসনি? অ্যাঁ? কী ব্যাপারটা কী? সাহেব তাহলে রাত্তিরে এখানেই ছিলেন?'

চৌকিদার আবার চুপ! দারোগা তখন চৌকিদারকে এমন মারতে শুরু করলেন যে আমাকেই থামাতে হল। আমি বললাম, 'ওকে এত মেরে কী হবে? মারলে ও কি বলবে?'

দারোগা হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'আপনি জানেন না! এরা মার ছাড়া কিছু বোঝে না। এই জমাদার, বাঁধো একে। থানায় চলুক, সেখানে গিয়ে বুঝবে।'

খালের ও-পাশে তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। যে বাচ্চা ছেলেগুলো সুটকেসটা তোলার চেষ্টা করছিল, তাদের একজনকে ডেকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'এই খোকা, শোনো। সকালবেলা এখানে একটা জিপগাড়ি দেখেছ?'

ছেলেটি বললে, 'হ্যাঁ। রায়বাবুর জিপ।'

'রায়বাবু মানে, কোন রায়বাবু?'

ছেলেটি আবার বললে, 'রায়বাবুর জিপগাড়ি।'

আমি দারোগাকে বললাম, 'এই ছেলেটির নাম-টাম জেনে নিন। পরে এর কথা কাজে লাগবে। রায়বাবুর জিপ যে বলছে, রায়বাবু কে? মনে হচ্ছে এখানে প্রায়ই আসে। ওরা চেনে।'

দারোগা বললেন, 'খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ নিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

পরে যখন আদালতে মামলা ওঠে, তখন ওই ছেলেটির সাক্ষী খুব কাজে লেগেছিল। ওই

BanglaBook.org

ছেলেটি দেখেছিল, চলন্ত জিপগাড়ি থেকে সুটকেসটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল খালের মধ্যে। এবং সেই জিপগাড়ির মধ্যে যারা ছিল, তাদেরও সে শনাক্ত করেছে।

শুধু তাই নয়, ওইখানে আর একটাও খুব জরুরি খবর পাওয়া গেল। ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে এল সেই বুড়ো। যাকে আমি পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম। তোমরা তখন ওকে পাঁচটা টাকা দেওয়ার কথা শুনে হেসেছিল। ও কিন্তু ওর কাজ ঠিকই করেছে। গ্রামের সরল সাধারণ লোক টাকা নিলে তার বিনিময়ে কাজটা ঠিকই করে। এটা আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। লোকটাকে সেই পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম বলে খুনের কিনারা করতে সাহায্য হয়েছিল অনেকখানি। দূরে কোনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকে লক্ষ রেখেছিল।

সেই বুড়ো লোকটি বলল, সকালবেলা সে রায়বাবুর জিপ আসতে দেখেছে এখানে। খানিকটা বাদে আবার চলে গেছে। রায়বাবুকেও সে চেনে। রায়বাবু হচ্ছেন পি ডবলু ডি-র ওভারসিয়ার বাবু।

আমি দারোগার চোখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ-মুখ এখন চিন্তাসংকুল। তিনি বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। পি ডবলু ডি অফিসে সুখেন রায় নামে একজন ওভারসিয়ার ভদ্রলোক আছেন বটে। তাঁর একটা জিপগাড়িও আছে। কিন্তু তাঁর জিপে এইসব...'

আমি বললুম, 'চলুন, আর দেরি না করে সেই সুখেন রায়ের কাছে যাওয়া যাক। তার কাছেই সবকিছু জানা যাবে।'

একজন কনস্টেবলকে সেখানে পাহারায় রেখে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার আগে আমি দারোগাবাবুকে বললাম, আপনি আপনার কনস্টেবলকে বলুন যেন চৌকিদার রামদাসকে সে কোনওক্রমেই চোখের আড়াল না করে। কারণ লোকটা বোকা সেজে থাকলেও আসলে অতি ধূর্ত। একটু সুযোগ পেলেই আরও হয়তো প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা করবে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ডাকবাংলোর ঘরখানা এমন পরিষ্কার করে ফেলেছিল যে আমিই প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি যে একটা গালগপ্প বানিয়ে বলছি না সেটা দারোগাবাবুকে বিশ্বাস করানোই শক্ত হয়ে উঠেছিল।

গাড়িতে দারোগাবাবুকে বেশ গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা গেল। এমনিতে তিনি বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু গাড়িতে একটাও কথা বললেন না। আমার মনে হল, দারোগাবাবুর চেনাশোনা স্থানীয় লোকেরাই এর সঙ্গে জড়িত, তিনি এরকম সন্দেহ করছেন। সেটা অমূলকও নয়। মৃতদেহটা ফেলে যাওয়া এবং আবার ফিরে এসে সেটা সরাবার জন্য ব্যস্ততাতেই সেটা বোঝা যায়। দূর অঞ্চলের লোক হলে হয় আততায়ীরা মৃতদেহটা ফেলেই পালাত অথবা সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কাছাকাছি জায়গার লোক বলেই তারা ঘরদোর পরিষ্কার করে মৃতদেহটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল খাটের নীচে। অন্য দিকের সব ব্যবস্থা সেরে এসে আবার রাত্রির অন্ধকারে সরিয়ে ফেলবে—এই ছিল প্ল্যান। দূরের লোক হলে তাদের পক্ষে একটা সুবিধে ছিল। তারা সব চিহ্ন বিলোপ করে মৃতদেহটা ফেলে রেখে যদি সরে পড়তে পারত—তাহলে মৃত ব্যক্তিটির পরিচয় খুঁজে বার করতে-করতেই সময় লেগে যেত বেশ কয়েক দিন। ততদিনে আততায়ীরা পগার পার হওয়ার পক্ষে পেয়ে যেত অনেক সুযোগ। কিন্তু স্থানীয় লোক হলে মৃতদেহটি দেখেই সবাই চিনে ফেলবে। তখনই তার সঙ্গে জড়িত অন্য লোকদের ওপর পড়বে পুলিশের দৃষ্টি।'

কর্নেল সেন হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী, আমার অ্যানালিসিস ঠিক হচ্ছে?'

রঞ্জন বলল, 'পারফেক্ট। এরকুল পোয়ারোও ঠিক এই কথাই বলতেন।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সেই সময়ে আমিও প্রায় ডিটেকটিভ হয়ে উঠেছিলুম। না হয়েও উপায়ও ছিল না। কারণ, আমাদের দারোগাবাবুটি আগাগোড়া একটুও বুদ্ধির পরিচয় দেননি। অথচ রহস্যটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। গ্রামটামের দিকে আমাদের থানাপুলিশের যা অবস্থা—তাতে সেখানকার মানুষ যে পটাপট খুন করে না কেন, আমি বুঝতে

BanglaBook.org

পারি না। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ খুন করলে, তাকে ধরার সাধ্য পুলিশের নেই। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের গ্রামদেশের মানুষেরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির—কথায়-কথায় খুনজখম করে না। কখনও রাগের মাথায় হয়তো কাউকে মেরে বসে—সেটা এমনই প্রকাশ্য ভাবে হয় যে ধরা পড়তেও দেরি হয় না। জটিল, কুচক্রী ধরনের খুন শহরেই বেশি হয়।

যাই হোক, আমার এ-গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এটাও এমনকিছু জটিল খুনের কাহিনি নয়। মাঝখান থেকে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে একটু জট পাকিয়ে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে হয়েছিল সাংঘাতিক। নইলে, তোমাদের বইতে যেসব খুনের গল্প থাকে তার মধ্যে কখনও বুদ্ধিমান খুনিরা সুটকেসটা ফেলে যাওয়ার মতো কাঁচা কাজ করে? কিংবা, ডিটেকটিভের জন্য এতটা সুবিধে করে দিয়ে যায়? কিন্তু জীবনে বাস্তব ঘটনায় এরকম ভুল অনেক বার হয়।

সুটকেসটা ফেলে না গেলে খালের পাশের গ্রামের লোকদের জেরা করার কথা আমাদের মনে আসত না হয়তো। আর তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে যে কিছু বলত না—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের লোককে জেরা করে ওই জিপগাড়িতে কজন লোক ছিল এবং তাদের চেহারার বর্ণনাও আমরা পেয়ে গেলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল শেষপর্যন্ত?'

রঞ্জন বলল, 'তুমি কী করে জানলে এটা ডাকাতদের ব্যাপার?'

'যারা রাত্তিরবেলা জিপে করে বন্দুক নিয়ে এসে আক্রমণ করে, তারা ডাকাত ছাড়া কী?'

'আর সেই ডাকাতদলের লিডার হচ্ছে একটা মেয়ে? মেয়ে ডাকাত? এ যে হিন্দি সিনেমা?'

কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'কিন্তু ডাকাতরা কীসের জন্য ওই বাংলোতে আসবে। কারওর কাছে তো বেশি টাকাপয়সা নেই!'

'যে লোকটা খুন হয়েছে, সে হয়তো কোনও ব্যবসায়ী! সঙ্গে অনেক টাকা ছিল।'

রঞ্জন বলল, 'মামাবাবু, আপনি মাধবীর কথা শুনবেন না। যে-রকম বলছিলেন সেই রকম বলে যান।'

'পি ডবলু ডি অফিসে পৌঁছে সুখেন রায়কে পাওয়া গেল না! দারোগার সঙ্গে ওই অফিসের অনেকের চেনা। দারোগাবাবু যে ওখানে খুনের তদন্ত করতে এসেছেন, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি। তিনিও বুঝতে দেননি। অফিসের লোকেরা দারোগাবাবুকে খাতির করে বসালেন, এমনকী চায়ের অর্ডারও হয়ে গেল। বোঝা গেল দারোগাবাবুটি মাঝে-মাঝে ওখানে এমনই আসেন।

কথায়-কথায় দারোগাবাবু বললেন, 'সুখেনকে দেখছি না কেন? সুখেন কোথায়?'

অফিসের একজন বলল, 'সুখেন পাটনায় হেড অফিসে কী একটা ব্যাপারে তদবিরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।'

দারোগাবাবু উদাসীন ভাবে বললেন, 'তাহলে কী হবে! সুখেনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটু দরকার ছিল। সেই জন্যই এসেছিলাম। কাজটা তাহলে হল না। একটা জরুরি বাড়ির প্ল্যান করানো দরকার এনার। সুখেনের কিছু টাকা রোজগার হয়ে যেত। ওহে রণধীর, সুখেন কবে নাগাদ ফিরবে, তাও বলতে পারো না?'

রণধীর নামের কর্মচারীটি বলল, 'দিন দশেক তো লাগবেই।'

'কীসে গেছে? ট্রেনে?'

'না, ও জিপগাড়িটা নিয়ে গেছে।'

দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন, ওঠা যাক তাহলে। কাজ তো হল না।'

সেই অফিস থেকে বেরিয়ে এসে দারোগাবাবু বললেন, 'এবার? এখানেও তো কিছু পাওয়া গেল না।'

আমি বললাম, 'সুখেন রায় কোনও ছুটির দরখাস্ত করে গেছে কিনা সেটা আপনার দেখা

BanglaBook.org

উচিত ছিল। যদি সে ট্যুরেও গিয়ে থাকে, তাহলে অফিসে তার ট্যুর প্রোগ্রামের একটা রেকর্ড থাকবে—সেগুলো আপনি চেক করে দেখলেন না। একটা লোক তো এমনি-এমনি অফিস ছেড়ে আউট স্টেশনে যেতে পারে না।'

দারোগার কী করা উচিত, না উচিত সে সম্পর্কে আমার উপদেশ দেওয়া তিনি এখন আর একটুও পছন্দ করলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু আমার কথা উপেক্ষা করতেও সাহস পেলেন না। হাজার হোক আমি মিলিটারির লোক। মিলিটারির সম্পর্কে আমার দেশের লোকের বেশ ভয় ও শ্রদ্ধা আছে।

তিনি আমার কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'এইসব মফস্বলের ছোটখাটো অফিসে কি আর সব নিয়মকানুন মানে? আপনাদের স্যার, বড়-বড় ব্যাপার, সবকিছু স্ট্রিকট্। কিন্তু এসব জায়গায় এরা বিনা দরখাস্তে ছুটি নেয়—নিজস্ব দরকারে কোথাও গেলেও সেটা ট্যুর হিসেবে দেখায়—নিজেদের মধ্যে সবকিছু ম্যানেজ করে নেয়।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'তবু আপনার চেক করে দেখা উচিত।'

আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে দারোগাবাবু এবার একা গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, 'না সেসব কিছু নেই। সুখেন ফিরে এসে দরখাস্ত করে দেবে বলে গেছে। এসব এখানে প্রায়ই হয় বলল।'

'কিন্তু সুখেন রায় যে জিপগাড়ি নিয়ে পাটনা গেছে, সেই জিপগাড়িই আজ সকালবেলা বাংলোর সামনে দেখা গেল কী করে?'

'বোঝাই তো যাচ্ছে, ওই চাষাভুষোরা ভুল দেখেছে। সুখেনের জিপগাড়ি ওখানে মাঝে-মাঝে যায় তো—সুখেনের সুপারভিশানেই তো বাংলোটা তৈরি হল। গাঁয়ের লোক তো বেশি গাড়িটাড়ি দেখে না—তাই যে-কোনও জিপগাড়ি দেখলেই ভাবে সুখেনের গাড়ি।'

'গ্রামের দু-এক জন লোক কিন্তু সুখেনকেও ওই গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছে। জিপের পেছনদিকে হেলান দিয়ে বসে ছিল।'

'ওই খুনি গুণ্ডাদের দলে সুখেনও থাকবে আপনি ভাবছেন? আমি সুখেনকে চিনি—সে একটা পিঁপড়েও মারতে চায় না।'

আমি কোটের পকেট থেকে আমার ডায়েরি বার করে ব্যাপারটা নোট করলাম। তারপর দারোগাবাবুকে বললাম, 'এবার তাহলে আমাকে পুরো ঘটনাটি আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আমি নিজের চোখে একটা ক্রাইম ঘটতে দেখেছি। ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন হিসাবে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানো আমার কর্তব্য। সুতরাং ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সে একবার যেতেই হবে আমাকে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরাও ওপর মহলে রিপোর্ট পাঠাব। আপনি তো আমাদের জানিয়েছেনই। আমরা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশানের পর ওপর মহলের হাতে কেসটা দিয়ে দেব। তবে মুশকিল হচ্ছে এই ডেডবডিটিরই কোনও ট্রেস পাওয়া গেল না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আপনারা জানাবেন সে তো ভালো কথাই। আমিও আমার তরফ থেকে জানিয়ে দিয়ে বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই। চলুন তাহলে, আপনাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে যাই।'

দারোগাবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন, 'যাবেন? চলুন। বুঝতেই পারছি, আপনার সন্দেহ কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আমরা যে তদন্ত শুরু করব—তার একটা ভিত্তি কী আছে, আপনার মুখের কথা ছাড়া? বাংলোর চৌকিদারটা অবশ্য একটা কিছু অপকর্ম করেছে ঠিকই—নইলে আপনার সুটকেস খালের জলে পাওয়া যাবে কেন? আপনি তো আর নিজে সেটা ফেলেননি! গ্রামের লোক কী জিপগাড়ি-টাড়ি দেখেছে—সে-কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। চৌকিদারের ওই

BanglaBook.org

বদমাইসির সঙ্গে তো আর খুনের ব্যাপারটা এক করা যায় না। আচ্ছা এক কাজ করা যাক। যাওয়ার আগে একবার সুখেনের বাড়িটি ঘুরে যাওয়া যাক চলুন। আপনার আপত্তি নেই তো?'

ছোট্ট ঘিঞ্জি শহরটির নাম আমি তোমাদের কাছে ইচ্ছে করেই বলছি না। তবে বিহার বা পশ্চিম বাংলার ছোটখাটো শহর তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই। একইরকম হয়। সুতরাং অনুমান করে নিতে তোমাদের অসুবিধে হবে না।

যেতে-যেতে দারোগাবাবু বললেন, 'সুখেন রায় এখানে বছর দু-এক হল বদলি হয়ে এসেছে। অত্যন্ত নিরীহ, ভদ্র ছেলে। কোনও সাতে-পাঁচে নেই। লোকজনের উপকার করতে পারলে সুখী হয়। অফিসের কাছেই তার কোয়ার্টার পাওয়ার কথা, কিন্তু কোয়ার্টার খালি নেই বলে বাড়ি ভাড়া করে আছে। এখানে সেরকম কোনও ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। যে বাংলোটায় আপনি উঠেছিলেন, সেটা প্র্যাকটিক্যালি সুখেনেরই তৈরি। সুখেনই দেখাশুনা করে বানিয়েছে। চলুন, সুখেন যদি পাটনায় না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে—আপনি তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন। সত্যিই ভালো ছেলে।'

শহর একটু ছাড়িয়ে সুখেন রায়ের বাড়ি। বাড়িটার চেহারা সত্যিই ভালো নয়। সিমেন্টের দেওয়াল কিন্তু খাপরার ছাদ। তাও বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। সামনে একটু বাগানের মতন। সেই বাগানের এক কোণে একটি জিপগাড়ি দাঁড় করানো।

জিপগাড়িটি আমার আর দারোগাবাবুর একসঙ্গে চোখে পড়ল। দারোগা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'সুখেন বাড়িতেই আছে মনে হচ্ছে। পাটনায় যায়নি। ওর এখানে এসে ভালোই হল—ওর কাছ থেকেই সবকিছু জানা যাবে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এই জিপগাড়িটি কি সুখেন রায়ের নিজের? না অফিসের?'

দারোগাবাবু বললেন, 'অফিসেরই। তবে, ও নিজেই সবসময় প্রায় ব্যবহার করে। অফিসের গাড়িটা কেনা হয়েছে, কিন্তু ড্রাইভারের পোস্ট এখনও স্যাংকশান করা হয়নি। জানেন তো গভর্নমেন্টের ব্যাপার। সুখেন ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। তাই গাড়িটি সর্বক্ষণ ওর কাছেই থাকে।'

বাগানের গেট খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম, দারোগাবাবু এগিয়ে গেলেন বাড়ির দরজার দিকে। আমি গেলাম জিপটি একটু পরীক্ষা করতে। কাল রাত্তিরে আমি এই জিপটিই যে দেখেছিলাম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ডান দিকের মাডগার্ডটা একদম তোবড়ানো। এতক্ষণ আমার মনে ছিল না এ-কথা—এখন দেখামাত্র মনে পড়ল যে কাল রাত্রেও আমি এটি লক্ষ করেছিলাম। গ্রামের লোকদের পক্ষেও জিপটি চেনা এইজন্যই সহজ।

দরজা খুলল একটি মেয়ে। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। জীবনে এরকম ভাবে চমকে গেছি খুবই কম বার। আর যাই হোক, এখানে এই অবস্থায় মেয়েটিকে আমি দেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

তাকে দেখে আমি অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। এই সেই কাল রাত্রে দেখা মেয়েটি। আজও তার চুলগুলো খোলা। সদ্য স্নান করেছে মনে হয়। একটি কালো রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে। ভেজা চুলে জ্বলজ্বল করছে টাটকা সিঁদুর।

মেয়েটিকে দিনেরবেলা দেখে বুঝলাম, এ মেয়ে সাধারণ নয়। কাল রাত্রে ওকে অলৌকিক মনে হয়েছিল। এখন সেরকম কিছু মনে হয় না বটে, কিন্তু ছোট্ট শহরের একজন ওভারসিয়ারের বউ হিসাবে তাকে একদম মানায় না। খুব একটা সুন্দরী বলা যায় না তাকে। কিন্তু তার আঁটসাঁট স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে এমন একটা কিছু আছে, যা পুরুষদের মাথায় আগুন জ্বালায়। এই মেয়ে অনেক ঘর ভাঙে।

মেয়েটি আমাকে একদম গ্রাহ্যই করল না। আমাকে সে চিনতে পেরেছে কিংবা জীবনে আগে

BanglaBook.org

কখনও দেখেছে, এরকম কোনও চিহ্নই নেই তার মুখে। আমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'কী খবর? আসুন। আসুন! অনেক দিন আসেননি এদিকে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'এসেছিলাম এদিকে তাই ভাবলাম তোমাদের এদিকে একবার ঘুরে যাই।'

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি একজন ডাক্তার। এখানে এসেছেন একটি কাজে। আর এ হচ্ছে করবী, আমাদের সুখেন রায়ের মিসেস। করবী খুব ভালো চা বানায়। এপাশে কাজকর্মে এলেই একবার এদের বাড়িতে চায়ের লোভে আসি। কী করবী, এখন একটু চা হবে নাকি? নতুন লোককে সঙ্গে করে এনেছি।'

করবী এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

মেয়েটি দরজার একপাশে সরে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। ভেতরে ঢোকার সময় আমি মেয়েটির গা থেকে খুব হালকা ডেটলের গন্ধ পেলাম। আশ্চর্য এই ডেটলের গন্ধটা কাল রাত থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। এই গ্রামদেশে এত ডেটলের ব্যবহার হয়! মেয়েটি তো একটু আগেই স্নান করেছে, তারপর আবার ডেটল মেখেছে? মেয়েটির কপালে সিঁদুর—অথচ কাল রাত্রে মৃতদেহটিকে বলেছিল ওর স্বামী!

বসবার ঘরে একটি চৌকি পাতা, দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল। অনেক রকমের বইপত্তর চারিদিকে ছড়ানো। মফস্বলের এ ধরনের চাকুরিজীবীদের বাড়িতে সাধারণত এত বই দেখা যায় না।

দারোগাবাবু আরাম করে বসলেন চৌকিতে। আমি বসলাম চেয়ারে। দারোগাবাবু জিগ্যেস করলেন, 'সুখেন কোথায়?'

করবী বলল, 'ও তো পরশু পাটনা চলে গেছে।'

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'পাটনা গেছে? জিপ নিয়ে যায়নি? ওর অফিস থেকে যে বলল সুখেন পাটনায় দশ দিনের ট্যুরে গেছে জিপ নিয়ে?'

করবী বলল, 'না শেষপর্যন্ত নিল না। জিপেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় বলল ওর শরীরটা ভালো লাগছে না—অতটা একা ড্রাইভ করতে পারবে না। তাই ট্রেনেই গেল।'

দারোগাবাবু বললেন, 'ইদানীং ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দেখছি। প্রায় ভুগছে, এই বয়সের ছেলে, এরমধ্যে হার্টের অসুখ যদি হয়।'

করবী দৃঢ় স্বরে বলল, 'না, হার্টের কিছু হয়নি। অনেক সময় উইন্ডের জন্য ওরকম ব্যথা হয়। আমি বলেছি, এবার পাটনায় ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আসতে।'

দারোগাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝলেন মশাই, সুখেনের বয়স বেশি না—কিন্তু মাঝে-মাঝে বুকে এমন ব্যথা হয় যে দেখলে ভয় লাগে। ব্যথার চোটে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি বারবার বলেছি, ভালো মতন চিকিৎসা না করলে কোনদিন রাস্তাঘাটে অজ্ঞান হয়ে বেঘোরে মরবে।'

তারপর করবীর দিকে ফিরে বললেন, 'সুখেন আজ বাড়ি থাকলে ইনি ওর বুকটা দেখে দিতে পারতেন। ইনি খুব বড় ডাক্তার।'

আমি চুপ করে রইলাম। করবীও কোনও কথা বলল না।

দারোগাবাবু চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, আমি অবশ্য চায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছি। সকালবেলা বেশি চা খাওয়া অভ্যাস নেই আমার। করবীর তৈরি বিখ্যাত চা খেতেও আমি প্রলুব্ধ হইনি।

তা ছাড়া, আমার আর সাসপেন্স সহ্য হচ্ছিল না। সেখানে আমরা বসেছিলাম এমন ভাবে যেন কিছুই হয়নি। চা খেতে-খেতে বিশ্রম্ভালাপ। সবই আমরা অভিনয় করছিলাম!

দারোগাবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, 'করবী, আজকের কাগজ এসেছে নাকি? কাল নাকি

BanglaBook.org

পাটনায় খুব মারামারি হয়েছে—রেডিয়োতে বলছিল—'

করবী বলল, না, কাগজ তো সেই বিকেলবেলা দেয়।'

'করবী, সুখেনের কাছ থেকে জিপগাড়িটা কেউ এরমধ্যে ধার করে নিয়েছিল নাকি?'

করবী আশ্চর্য হয়ে বলল, গভর্নমেন্টের জিপগাড়ি—অন্য কেউ ধার নেবে কী করে?'

'কাল সন্ধ্যাবেলা গ্রামের দু-এক জন এই জিপগাড়িটাকে নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।'

'তা হতেই পারে না।'

দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ সবটাই আমার ভুল। করবী আগেই গরম জল বসিয়ে এসেছিল, এবার উঠে গিয়ে চা করে নিয়ে এল। আমি খাব না বলেছিলাম, তবু আমার জন্য এনেছে। হাসিমুখে অনুরোধ জানাল, খান না এক কাপ! অপূর্ব অভিনয়।

সেই অভিনয় ভেঙে দিয়ে আমি করবীকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি আমাকে আগে কখনও দেখেছেন?'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'আপনাকে? না তো!'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি।'

করবী সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাব বদলে ফেলে বলল, 'তা হতেও পারে। আপনাকেও আমার একটু-একটু চেনা লাগছে। আপনি কি রাঁচীতে প্র্যাকটিস করেন? কিংবা ওখানে আমাকে দেখেছেন কখনও? আমরা রাঁচীতে থাকতাম—বিয়ের আগে।

'আমি বললাম, 'না রাঁচীতে আপনাকে দেখিনি। আপনাকে আমি দেখেছি কাল রাত্রে। এখানে যে একটি ডাকবাংলো আছে, সেখানে!'

করবী বিমূঢ় ভাবে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে। আস্তে-আস্তে বলল, 'ডাকবাংলোয়? আমাকে? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।'

'না, আমার অত সহজে ভুল হয় না।'

'কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় কেন যাব বলুন তো! আমি তো কাল বাড়ি থেকে একবারও বেরোইনি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে কাল ডাকবাংলোতেই দেখেছি। আপনিও আমাকে দেখেছেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন কিছুই মনে পড়ছে না?'

করবী এবার দৃঢ় গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। আপনি কী বলতে চান কী? আমি ডাকবাংলোয় যাব কেন? আমার স্বামী বাইরে গেছেন...'

একজন মহিলার স্বামী বাইরে ট্যুরে গেছেন, আর মহিলাকে যদি রাত্রিবেলা একটি ডাকবাংলোতে দেখা যায়—সেটা নিশ্চয়ই একটি কলঙ্কের অপবাদ। একজনের বাড়িতে বসে এরকম অভিযোগ করার মধ্যে চূড়ান্ত অভদ্রতা আছে। কিন্তু এটা তো ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্ন নয়। এর মধ্যে একটা খুনের ব্যাপার জড়িত।

কাল রাত্রে করবীর মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখেছিলাম, আজ সেসব কিছু নেই। বরং একটা তেজি অহংকারী ভাব। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যেন আমি একটি ভণ্ড প্রতারক, কোনও ভদ্রমহিলার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি।

কিন্তু আমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া এখন একেবারেই উচিত নয়। আমি নীচু গলায় বললাম, 'দেখুন, শুধু মিথ্যের বোঝা বাড়িয়ে আর কোনও লাভ নেই। বরং আপনি সব কথা খুলে বলুন, তাহলে আপনাকে আমরা হয়তো কোনও সাহায্য করতে পারি।'

করবী বলল, 'আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'হয়তো আপনার স্বামী পাটনায় শেষ পর্যন্ত যাননি। তাঁর কোনও বিপদ হয়ে থাকতে পারে।'

BanglaBook.org

'এ-কথা আপনি বলছেন কেন?'

দারোগাবাবু একেবারে চুপ। আস্তে-আস্তে চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সব আমাকেই বলতে হচ্ছে। আমি এবার জিগ্যেস করলাম, 'আপনার কাছে কি জিপগাড়িটার চাবি আছে, না আপনার স্বামী নিয়ে গেছেন?'

করবী বলল, 'চাবি নিয়ে যাবে কেন? চাবি আমার কাছেই রেখে গেছে।'

'চাবিটা একবার দেখাবেন?'

'কেন বলুন তো?'

'হয়তো গাড়ির চাবিটা চুরি হয়ে গেছে—কাল কেউ চুরি করে জিপগাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল কিনা সেটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

'না, চুরি হয়নি।'

করবী উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে চাবিটা নিয়ে এল। সেটা আমি নিয়ে দারোগাকে বললাম, 'এটা আপনার কাছে রাখুন।'

করবীকে জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে আপনি বলছেন গাড়িটা চুরি হয়নি?'

'না।'

আপনি গাড়ি চালাতে জানেন?

'না।'

এবার আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে বললাম, 'একটা ব্যাপার খুব মন দিয়ে শুনুন। কাল রাত্তিরে এই জিপগাড়িটা ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে ছিল—আমি নিজে দেখেছি। সেটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়—আজ সকালেও এই জিপগাড়িটাকে ডাকবাংলোর কাছে যেতে গ্রামের অনেক লোক দেখেছে, তারা সবাই সাক্ষী দেবে। আপনার স্বামীর অফিসের আর কেউ গাড়ি চালাতে পারে না। তাহলে এই জিপটাকে বাংলো পর্যন্ত কে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? সেটা আপনার জানা উচিত, যেহেতু চাবি আপনার কাছে—'

করবী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমাকে এইভাবে জেরা করার কী অধিকার আছে আপনার সেটা জানতে পারি কি?'

দারোগাবাবু তখনও একেবারে চুপ। আমি পকেট থেকে নোটবইটা বার করলাম এইবার। কলমটা খুলে বললাম, 'অধিকারের প্রশ্ন পরে। দারোগাবাবু যতক্ষণ বাধা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কতগুলো প্রশ্ন করে যাব। আপনি উত্তরগুলো ভেবেচিন্তে দেবেন। কারণ সেগুলো আমি লিখে রাখছি। এবং দারোগাবাবু তার সাক্ষী থাকছেন। এবার শুনুন। কাল রাত্রে আমি ডাকবাংলোর যে ঘরে ছিলাম, তার খাটের নীচে একটি ডেডবডি ছিল—সেটা কি আপনার স্বামী সুখেন রায়ের? আপনি জানলার বাইরে থেকে বলেছিলেন, আপনারই স্বামীর দেহ—'

করবীর সিঁথিতে তখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। আজ সকালেই স্নান করে নতুন করে সিঁদুর লাগিয়েছে। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, 'আপনি এইসব উদ্ভট কথা হঠাৎ আমাকে বলতে এসেছেন কেন? আমি আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই। আপনি অন্য কাউকে দেখেছেন বা কোথায় কী দেখে এসেছেন—সে সম্পর্কে আমি কিছু শুনতে চাই না।'

আমি বললাম, 'ডেডবডিটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই ডেডবডিটা আপনি সরাতে গিয়েছিলেন, তাও দেখেছি। এই ঘটনাটা পুলিশের ওপর মহলে আমাকে জানাতেই হবে। আপনি আমার কথার উত্তর দিতে না চান—সেটা আলাদা কথা। পরে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবেই।'

দারোগাবাবু এতক্ষণ বাদে কথা বললেন। একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের সিগারেটটি নিভিয়ে ফেললেন চায়ের কাপে। তারপর বললেন, 'করবী আর কোনও লাভ নেই। দি গেম ইজ আপ! এই ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। তুমি সব কথা অস্বীকার করলে এঁকে পাগল ভাবতে হয়। সেটা

BanglaBook.org

উনি মেনে নেবেন কেন? তোমাদের ব্যাডলাক, ইনি মাঝখানে এসে পড়েছেন। আমাকেও তো চাকরি বাঁচাতে হবে! তাও বাঁচাতে পারব কিনা জানি না।'

করবীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে যেন কেউ নিভিয়ে দিল একটা মোমবাতি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেটিকে খুব ঘৃণার দৃষ্টি বলা যায় না। দারুণ হতাশা, দারুণ দুঃখ মিশে আছে সেই দৃষ্টিতে। পুরো দু-তিন মিনিট তাকিয়ে রইল আমার চোখে-চোখে। শেষ পর্যন্ত আমিই চোখ সরিয়ে নিলাম।

খুব অস্ফুট ভাবে করবী বলল, 'আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। বিশ্বাস করুন। আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।'

করবীর প্রতি আমার কোনও রকম দয়া হল না। আমি বিদ্রূপের সুরে বললাম, 'প্রথমে জানা দরকার, যিনি মারা গেছেন, তিনি আপনার সত্যি-সত্যি স্বামী কি না। স্বামী হোক বা যে-ই হোক, আত্মহত্যা করার পক্ষে খুব চমৎকার পরিবেশ বটে। আপনি যখন ডেডবডিটি সরাবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অন্য লোক ছিল, তারা কে?

করবী সে কথার উত্তর না দিয়ে আবার বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।'

আমি দারোগার দিকে ফিরে বললাম, 'সুখেন রায়ের কি রিভলভার ছিল? সেটা আপনার জানার কথা।'

দারোগাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ছিল না।'

'আমি ডেডবডির গলায় বুলেটের ক্ষত দেখেছি। এবং ডেডবডির কাছে কোনও রিভলভার ছিল না। এটি আত্মহত্যা?'

দারোগা বললেন, 'করবী, আর মিথ্যে কথা বলে ওঁকে ভোলাতে পারবে না। বললাম না, ব্যাড লাক, তোমরা শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছ। ডেডবডিটি কোথায়?'

করবী কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। করবীকে এখন কিছুতেই চোখের আড়াল করা যায় না। এ মেয়ে অতি সাঙ্ঘাতিক, কখন কী করে বসবে, ঠিক নেই। এমনকী আত্মরক্ষার তাগিদে আমি আমার রিভলভারটা পকেটে শক্ত করে ধরে রইলাম। দারোগাবাবুর মুখ-চোখে একটা উদাসীন ভাব। পারতপক্ষে আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। করবী একটার-পর-একটা ঘর পেরিয়ে যেতে লাগল। বসবার ঘরের পরেই বড় ঘর, তার পেছনে আর একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘরে খাটের ওপরে কফিনের আকারে একটি বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে ডেডবডিটি। চিনতে আমার দেরি হল না। এক রাত আমি এর সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছি। গলায় বুলেট-বেঁধা সুখেন রায়ের মৃতদেহ। সেটা যে করবীর স্বামী সুখেন রায়েরই দেহ, অন্য কারওর নয়—সেটা দারোগাবাবুর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বডিটি আস্তে-আস্তে ডিকমপোজ করতে আরম্ভ করেছে। পাছে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়, তাই ঘরের মেঝেতে অনেকখানি ডেটল ছড়ানো।

আমি স্তম্ভিত ভাবে তাকালাম করবীর দিকে। কী বিস্ময়কর এই মেয়েটি! স্বামীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে শোয়ানো। আর মেয়েটি স্নান করে সিঁদুর পরে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছিল হাসিমুখে। আমি যদি সুর না বদলাতাম, তাহলে এখনও হয়তো ওই গল্পই চলত।

করবীর মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। কিংবা তার তখনকার মুখের চেহারার বর্ণনা দিতে পারি, এমন ভাষাজ্ঞান নেই আমার। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মৃত স্বামীর মুখের দিকে। তার ঘরসংসার, ভবিষ্যৎ সবই শেষ হয়ে গেল।

একটু বাদে করবী আস্তে-আস্তে বলল, 'ওকে কবর দেওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। ওর নিজের দোষেই ও মরেছে। ওর যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আমি কী করতে পারি!'

BanglaBook.org

দারোগাবাবু বললেন, 'থাক, এখন ওসব কথা থাক। ডেডবডিও থানায় নিয়ে যেতে হবে। করবী, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে থানায় যেতে হবে।

'আমি তৈরিই আছি।'

'সুরযলাল কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'সুরযলাল পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো?'

'আমি জানি না।'

মাধবী হঠাৎ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'দারোগাবাবু আগে থেকে সব জানত তার মানে? সেও কি ওদের সঙ্গে ছিল নাকি?'

রঞ্জন বলল, 'আঃ! এমন বেটপকা কথা বলো। সেটা বুঝতে পারছ না এখনও?'

কর্নেল সেন মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, দারোগাবাবু ওদের সঙ্গে আসল ক্রাইমের সময় ছিলেন না বটে—কিন্তু সবই জানতেন। ওরা সবাই দারোগাবাবুর পরিচিত। ডাকবাংলোর ঘরটায় আমি যখন ডেডবডিটাকে সঙ্গে নিয়ে দরজা জানলা আটকে রয়েছি, তখন ওরা কোনওক্রমেই সুবিধে করতে না পেরে, আমার আগেভাগে থানায় গিয়ে সব জানিয়েছিল—এবং দারোগাবাবুর পরামর্শ নিয়েছিল।

আমি যখন থানায় যাই, তখন দারোগাবাবু ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে বেরোতে দেরি করেছেন। যাতে সেই সময় ওরা ডেডবডিটা সরিয়ে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পায়। সেই জন্যই গাড়ি খারাপটারাপ ইত্যাদি ছুতো বার করেছিলেন।

আর একটা জিনিসও আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা যে খালের জলে আমার সুটকেসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল—সেটাও নেহাত বোকামি করে নয়। তার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তখন পরিপূর্ণ দিনের আলো, সেই সময় ওরা জিপে করে এসে ডাকবাংলো থেকে সুখেন রায়কে নিয়ে যাবে—এটা কারওর-না-কারওর চোখে পড়বেই। সুখেনের মৃতদেহটা ওরা জিপের পেছনে এমন ভাবে হেলান দিয়ে শুইয়ে এনেছিল যে কেউ চট করে বুঝতে না পারে যে সে মরে গেছে। ওই জিপটাও গ্রামের লোকের চেনা। সুতরাং কেউ-না-কেউ আমাদের বলে দিতে পারত সেই কথা। সুটকেসটা ফেলে আসাও আমাদের দেরি করানোর চেষ্টা। ওরা সময়ের সঙ্গে রেস দিচ্ছিল। যেমন করে হোক, আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে ডেডবডিটাকে পুঁতে ফেলতে পারলেই ওরা অনেকটা নিরাপদ হতে পারত। কোনও ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের অভিযোগ টেঁকে না! ব্যাপারটা আমার এক রাত্তিরের দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এসেও ভাগ্য ওদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে ওইরকম গ্রামাঞ্চলে একটা ডেডবডি পুঁতে ফেলা খুব শক্ত নয়—কিন্তু দিনের আলোয় অনেক অসুবিধে। ওরা স্থানীয় মুসলমানদের কবরখানায় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল—সেই সময়েই আবার একটি মুসলমান শিশুকে সেখানে গোর দেওয়া হচ্ছে। কবরখানায় অনেক লোকজন। এরকম আশঙ্কা ওদের মনে একবারও জাগেনি। কবরখানাটা নির্জন পড়ে থাকে সাধারণত। কিন্তু সেদিনই যে একটা বাচ্চা ছেলে মারা যাবে আর ঠিক ওই সময়েই তাকে কবর দিতে আনা হবে এ আর ওরা জানবে কী করে। এত চেষ্টা করেও ওরা শেষরক্ষা করতে পারল না। বাধ্য হয়ে ওদের ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত ওরা নির্ভর করেছিল করবীর অভিনয়দক্ষতার ওপরে। করবী যদি ভুলিয়েভালিয়ে আমাদের ফেরত পাঠাতে পারে। স্নান করা সিঁদুর পরা একটি মেয়েকে দেখে কি কল্পনা করা সহজ যে স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে শোয়ানো আছে?'

মাধবী বলল, 'সত্যি বাবা, কল্পনাই করা যায় না। কোনও মেয়ে এরকম করতে পারে? আপনি কী করে সন্দেহ করলেন কে জানে!'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি খেপে গিয়েছিলাম বলা যায়। ওরা সবাই মিলে এমন একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, যেন আমি একটা পাগল। আগের দিন রাত্রে কিছুই ঘটেনি, ঘরের মধ্যে কোনও ডেডবডি ছিল না—সবই যেন আমি বানিয়ে বলছি। তাই আমি শেষপর্যন্ত না দেখে ছাড়তে চাইনি!'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'তারপর কী হল?'

কর্নেল সেন বললেন, 'ডেডবডির কাছে একজন কনস্টেবলকে পাহারায় বসিয়ে দারোগাবাবু করবীকে বললেন, 'চলো।'

করবী সহজ ভাবে বলল, 'যাচ্ছি, চলুন। আমি এক গেলাস জল খেয়ে আসি।'

কিন্তু আমি করবীকে চোখের আড়াল হওয়ার সুযোগ দিতে চাই না। জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় জল আছে? আমি এনে দিচ্ছি, আপনি এখানে দাঁড়ান!'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আপনি এনে দেবেন কেন?'

আমি বললাম, 'বাড়িতে আর কেউ নেই? আপনার স্বামী চলে গেলে আপনি একা থাকেন?'

করবীর বদলে দারোগাবাবু বললেন, 'একজন ঠিকে ঝি এসে কাজটাজ করে দিয়ে যায়, তাই না? সে বোধহয় এখন নেই।'

করবী বলল, 'এ-ঘরেই জল আছে। আমি নিজে গড়িয়ে নিচ্ছি।'

কলসি থেকে করবী জল গড়াল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। আমি দ্রুত গিয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, দাঁড়ান, জলটা আগে খাবেন না। আমি আগে দেখব—'

করবী পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হেসে উঠল শব্দ করে। হাসতে-হাসতে বলল, 'ও আপনি ভাবছেন আমি আত্মহত্যা করব? হা-হা-হা—। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমি মরতে চাই না—আত্মহত্যা করতে চাইলে অনেকদিন আগেই করতাম! ঠিক আছে, আমি জল খাব না—এই নিন দেখুন—'

করবী জলসুদ্ধ গেলাসটা ছুড়ে মারল আমার মুখের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়েছিলাম বলে গেলাসটা আমার চোখে লাগেনি, কিন্তু ঘাড়ে লাগল। করবী আমার চোখেই মারতে চেয়েছিল—আমার চোখই তো ওদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। বড় কাঁসার গেলাস, আমার ঘাড়ের কাছে একটু কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, জলে জামাকাপড় ভিজে গেল।

আমি করবীর চোখে-মুখে হিস্টিরিয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম। দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি এসে করবীর হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই করবী, কী হচ্ছে কী? এখন আর এসব করে কী লাভ হবে। তোমাদের ভরাডুবি হয়েছে। এখন চলো—সূরযলাল কোথায়?'

করবী খরচোখে তাকিয়ে বলল, 'সূরযলাল কে আমি তা জানি না। আপনি কার কথা বলছেন?'

দারোগাবাবু একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন, সূরযলালকে ধরা যাক। এমনি বড় ভালো ছেলে সূরযলাল—এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে—শাস্তি পেতেই হবে—মার্ডার ইজ মার্ডার—'

করবী দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। কেউ তাকে খুন করেনি! এর সঙ্গে সূরযলালের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক আছে, এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি তোমাদের জন্য ভালো উকিল ঠিক করে দেব'খন!'

করবী কিন্তু কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সূরযলালের বাড়িতে যেতে রাজি হল না। একেবারে বেঁকে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তাকে মেরে ফেললেও সে সূরযলালের বাড়িতে যাবে না। অথচ করবীকে একা রেখে যাওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। দারোগাবাবু আমাকে বললেন, 'তাহলে স্যার, আপনিই একটু থাকুন এখানে, ওকে চোখে-চোখে রাখুন!'

আমি ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বললাম, 'আমি আর একা ওর সামনে থাকতে পারছি না।'

BanglaBook.org

করবী বিচিত্র গলায় হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমি পালাবও না, আত্মহত্যাও করব না। আমি এখানেই থাকব।'

দারোগাবাবু এবার আর কোনও ঝুঁকি নিলেন না—সেপাইকে ডেকে করবীর হাতে দড়ি বাঁধলেন, তারপর সেই অবস্থায় বসিয়ে রাখলেন জিপগাড়িতে। সেপাইটি সেখানে পাহারায় রইল।

সুরযলালকে ধরার জন্য খুব একটা হ্যাঙ্গাম করতে হল না। কাছেই সুরযলালের বাড়ি। স্থানীয় অবস্থাপন্ন কাঠের ব্যবসায়ীর ছেলে সে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, দোহারা সুন্দর চেহারা। মুখে বেশ একটা সরল ভাব আছে। ঠিক ক্রিমিন্যাল টাইপ সে নয়, গ্রাম্য বড়লোকের ছেলে, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে বখে গেলে যা হয় আর কী।

সুরযলাল যেন আমাদের প্রতীক্ষাতেই ছিল। দাঁড়িয়েই ছিল দোতলার বারান্দায়।

দারোগাবাবু গিয়ে ডাকতেই সে বেরিয়ে এল। পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা। ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলল, 'খেল খতম হো গিয়া?'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, স্যার। যা হওয়ার সে হোবেই, কেউ রুখতে পারবে না। ঠিক কিনা?'

দারোগাবাবু জিগ্যেস করলেন, 'হরিনাথ ফিরেছে? না এখনও পালিয়ে আছে?'

সুরযলাল হাতজোড় করে বলল, 'আমি ওর কথা কিচ্ছু জানি না। বিশওয়াস করুন। হরিনাথের কথা জানি না।'

'ঠিক আছে। সে দেখা যাবে পরে। বুদ্ধুরাম কোথায় গেল?'

সুরযলালের বাড়ির সামনেই একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় মাটিতে একটা লোক বসে ছিল। ময়লা, ছেঁড়াখোঁড়া খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরা। দারোগাবাবু তাকে ডাকতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে এসে বলল, 'সাহেব, আমি কিছু জানি না। আমি শুধু গাড়ি চালিয়ে ছিলাম! আমাকে ছেড়ে দিন, ঘরে আমার বালবাচ্চা আছে!'

দারোগাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চল ব্যাটা, বাড়ি থেকে জিপটা নিয়ে চল থানায়।'

সুরযলালের বাড়ির লোকজন ততক্ষণে নেমে এসে ভিড় করেছে। একটি যুবতী মেয়ে কেঁদে-কেঁদে বারবার দারোগাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরতে লাগল। সম্ভবত সে সুরযলালের স্ত্রী। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। এক হিসাবে তাকে করবীর চেয়েও সুন্দরী বলা যায়—কিন্তু করবীর মতন মানুষকে পাগল করার ক্ষমতা বোধহয় তার নেই। নইলে তাকে ছেড়ে তার স্বামী করবীর কাছে যাবে কেন? মেয়েটি কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল, কিছুতেই তাকে থামানো যায় না। সুরযলালের মা খুব বুড়ি, তিনি এসে অভিশাপ দিতে লাগলেন আমাদের সবাইকে। সুরযলাল বলল, 'আর দেরি করছেন কেন দারোগাবাবু, চলেন-চলেন! ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

তোমরা কেউ এরকম পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই পড়োনি। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এতক্ষণ বাদে আমার নিজেকে একটু অপরাধী লাগতে লাগল। এরা সবাই ভাবছে, আমিই ওদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। আমিই এতগুলো সংসার ভেঙে দিচ্ছি। কিন্তু খুনের ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, তাদের তো শাস্তি পেতেই হবে।

আমি সবাইকে আমার গাড়িতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে গিয়ে তুললাম।'

BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

কর্নেল সেন গল্প থামিয়ে নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন। ওঁর মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। একটা হাই তুলে বললেন, 'রাত বেশি নেই। এবার একটু শুয়ে পড়া যাক!'

মাধবী বলল, 'কিন্তু কে খুন করল? ওই মেয়েটি, না সূরযলাল?'

কর্নেল সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রঞ্জন তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'মামাবাবু, বলবেন না, বলবেন না। ফট করে এক কথায় খুনির নাম বলে দিলে এই ধরনের গল্পের কোনও মজা থাকে না। ডিডাকশান করে যদি না বেরিয়ে আসে—। এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। সূরযলাল, বুদ্ধুরাম, হরিনাথ এদের কথা তো এইমাত্র শুনলাম। এদের সঙ্গে করবীর কী সম্পর্ক সেটা এখনও জানা হল না। তা ছাড়া খুনের একটা মোটিভ থাকে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'তাহলে সেসব আবার কাল হবে। আমার একটু ক্লান্ত লাগছে এখন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি।'

রঞ্জন বলল, 'এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। এখন আর শুয়ে লাভ নেই। ঘণ্টা কয়েক বাদেই ভোর হয়ে যাবে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাকি রাতটা গল্প করেই কাটানো যাক। আর এক কাপ করে কফি হবে নাকি?'

মাধবী বলল, 'না, না, এত রাত্তিরে আর কফি খায় না!'

রঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, 'তোমাকে বানাতে হবে বলে ভয় পাচ্ছ তো? তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো। সুনীল বানিয়ে দেবে। সুনীল খুব ভালো কফি বানায়।'

আমি বললাম, 'ভ্যাট। আমি এখন উঠতে পারব না। তুই নিজে যেতে পারছিস না? তোর নিজের বাড়ি—আর আমি কফি বানাব?'

'না, না, তুই ভালো বানাস কিনা তাই বলছিলাম।'

'কফি বানানোর আবার ভালো আর খারাপ কী? আমি নিজে কোনওদিন বানিয়ে খাইনি—

রঞ্জন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, 'মামাবাবু, আপনি কফি খাবেন তো?'

'আপত্তি নেই।'

জল চাপিয়ে এসে রঞ্জন বলল, 'মামাবাবু এবার বলুন, খুনের মোটিভ কী? খানিকটা অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি তো এতক্ষণ বললাম, এবার তোমরাই বলো না, বাকিটা কী হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আমরা সেটা চেষ্টা করব। আপনি আমাদের আর কয়েকটা তথ্য সাপ্লাই করুন। যেমন সুখেন রায় লোকটা কেমন ছিল—'

মাধবী বলল, 'ওই করবী বলে মেয়েটার শেষ পর্যন্ত কী হল? ফাঁসি হয়েছিল?'

কর্নেল সেন হেসে ফেলে বললেন, 'তার মানে তুমি ধরেই নিচ্ছ যে করবীই খুন করেছিল?'

রঞ্জন বলল, 'মাধবী, তুমি থামো তো! আগে মামাবাবুকে আর একটু বলতে দাও—তারপর তো খুনি কে সেটা বুঝবে!'

মাধবী বলল, 'আমায় আর কিছু বলতে হবে না। আমি ঠিক জানি, মেয়েটাই খুন করেছে।'

রঞ্জন বলল, 'আঃ, তুমি থামো তো! এইসব ক্রাইম স্টোরি কল্পনা করা মেয়েদের কর্ম নয়। মামাবাবু, এটা কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়! এতক্ষণ গল্প বেশ চলছিল, হঠাৎ গল্পের শেষ দিকে দুমদাম করে সূরযলাল, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম এই এতগুলো ক্যারেক্টার এনে ফেললেন! এদের সম্পর্কে আগে আভাস দেওয়া উচিত ছিল। খুনি কখনও লাস্ট দৃশ্যে আসে না।'

'কিন্তু আমি তো গল্প বানাতে জানি না। বানানো গল্প হলে লেখকরা ভেবেচিন্তে চরিত্র ঠিক করে। কিন্তু আমার জীবনে ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছিল, আমি সেই ভাবেই বললাম। সূরযলাল বা হরিনাথ বা বুদ্ধুরামের কথা তো আমি নিজেও আগে জানতে পারিনি।'

'ওই দারোগাটির সঙ্গে ওদের কতখানি সম্পর্ক সেটাও ভালো ভাবে জানা দরকার।'

কর্নেল সেন বললেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা

BanglaBook.org

করার জন্য আমি তোমাদের আর একটু জানিয়ে দিচ্ছি। মামলা চলার সময় আমাকে বেশ জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল—তাই আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। সব বলতে গেলে তো এক মহাভারত হয়ে যাবে। সংক্ষেপে কিছু-কিছু বলছি।

সেদিন ওদের সবাইকে নিয়ে থানায় আসার পথে দারোগাবাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'স্যার আমাকে ফাঁসাবেন না। আমার চাকরিটা অন্তত বাঁচিয়ে দেবেন। আমি নিতান্ত মায়ায় পড়েই কেসটা চেপে যেতে চাইছিলাম। নইলে আমার আর অন্য কোনও স্বার্থ নেই। বিশ্বাস করুন। আমি এদের সবাইকেই আগে থেকে চিনি। সুখেনকেও আমি স্নেহ করতাম। এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, নইলে এরা কিন্তু কেউই মানুষ খারাপ নয়। আমি তাই ভেবেছিলাম, একজন যখন মরেই গেছে, তাকে তো আর বাঁচানো যাবে না—তবে শুধু-শুধু এদেরও জীবনটা নষ্ট করে কী হবে। আর একটা সুযোগ যদি দেওয়া যায়—পুলিশ অফিসার হিসাবে কেসটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে আমি অন্যায় করেছি ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে কোনও স্বার্থ নেই। টাকাপয়সার ব্যাপারও নেই। পুলিশ হলেও আমারও তো একটা মানুষের প্রাণ আছে। আমি ওদের ওপর মায়া করেই—'

দারোগাবাবু একটা কথা অন্তত ঠিক বলেছিলেন, ওরা কেউই ঝানু ক্রিমিন্যাল নয়। হত্যাকাণ্ড ঝোঁকের মাথাতেই হয়েছে। ওরা যদি খাঁটি ক্রিমিন্যাল হত তাহলে ওরা আমাকেও ছাড়ত না। আমাকে মেরে ফেললেই ওদের ঝামেলা চুকে যেত। ওইরকম নির্জন ডাকবাংলোয় একটা খুনও যা, দুটো খুনও তাই, আমাকে মারার সুযোগও ওরা পেয়েছিল। ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে দেখার পর আমি যখন খানিকটা অসাবধান ভাবে বাইরে বেরিয়ে ছিলাম—তখন ওরা জিপের আড়ালে লুকিয়ে অনায়াসেই আমাকে গুলি করতে পারত। রিভলভার ছিল সূরযলালের কাছে। আমাকেও মেরে ফেলে দুটো লাশ একসঙ্গে পুঁতে ফেলায় ঝঞ্ঝাট আর কী ছিল! আমি যে সেই রাত্রে ওই ডাকবাংলোয় থাকব—তা তো আর কেউ জানত না। কিন্তু কথায়-কথায় মানুষ খুন করার অভ্যাস সত্যিই ওদের নেই। কিংবা, আমি মিলিটারির লোক বলেই ওরা ভয় পেয়েছিল কিনা কে জানে। সত্যিকারের ক্রিমিন্যালরা অবশ্য ওইরকম অবস্থায় কিছুই পরোয়া করে না। সূরযলালের গান লাইসেন্স ছিল বটে কিন্তু সে ঠিকমতন রিভলভার চালাতে জানত কি না—সেটাই একটা সন্দেহের ব্যাপার। খুব ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার করা এক কথা—আর দূর থেকে কাউকে গুলি করতে গেলে রীতিমতন প্র্যাকটিস থাকা দরকার।

সুখেন রায় লোকটি ছিল খুব নিরীহ আর শান্ত ধরনের। বেশ জনপ্রিয় ছিল সে। তার নম্র ব্যবহার আর বিদ্যাবুদ্ধির জন্য সবাই ভালোবাসত তাকে। খুবই গরিব পরিবারের ছেলে সে, কোনও রকমে লেখাপড়া শিখে চাকরি জুটিয়েছে। বউটিও তার সুন্দরী। সংসারে কোনও ঝামেলা নেই। লোকের চোখে সে মোটামুটি সুখী মানুষ। পেশায় ওভারসিয়ার হলেও তার ঝোঁক ছিল নানা রকমের বই পড়ার—সামান্য মাইনে পেলেও সে সেই টাকার মধ্যে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে অনেক বই ও পত্রপত্রিকা আনত বাইরে থেকে।

সুখেন রায়ের বাড়িতে রীতিমতন একটা আড্ডা ছিল। আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অবশ্য তার বউ করবী এবং করবীর হাতে বানানো চা। করবীর বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। ষোলো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়—তখন সে রোগা পাতলা একটি শ্যামা লাজুক মেয়ে। বিয়ের পর সুখেন রায় নানান জায়গায় বদলি হয়েছে—করবী সেই সব জায়গায় লোকজনের সঙ্গে মিশে আস্তে-আস্তে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে, পুরুষদের আড্ডায় সমানে যোগ দিতে পারে। মফস্বল জায়গায় এরকম মেয়ে তো সহজে চোখে পড়ে না। অবিবাহিত মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিতে পারে না, আর বিবাহিত মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা সামলাতেই ব্যস্ত। করবীর ঝামেলাও ছিল না—তারপর সে একটু-আধটু গানটানও গাইতে পারে।

BanglaBook.org

এমনিতে সুখেন রায়ের সংসারটাকে সুখের সংসারই বলা যেতে পারত। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার—খুব একটা অভাবের টানাটানি ছিল না। সুখেন রায়ের সংস্পর্শে থেকে করবী খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছিল। বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে, হইচই আনন্দ হয়—সব মিলিয়ে অভিযোগ করার মতন কিছু নেই।

কিন্তু ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে, করবী ঠিক সাধারণ মেয়ে নয়। তার স্বভাব ও শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষের মধ্যে আগুন জ্বালায়। সাধারণ শান্তশিষ্ট বাড়ির বউ হয়ে থাকবার মতন মেয়ে সে নয়। তা ছাড়া বিয়ের পর আট-বছরের মধ্যেও তার কোনও ছেলেপুলে হয়নি। স্বাস্থ্য খুব ভালো। সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটা ছটফটানি ছিল। ছোট্ট সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সে উপচে পড়তে চাইত।

পুরুষেরা আকৃষ্ট হত তাকে দেখে। এই ধরনের মেয়েদের দেখে প্রলুব্ধ হওয়ার মতন রসিক পুরুষের অভাব নেই কোনও দেশে। সুখেন রায় যেখানে-যেখানে ট্রান্সপার হয়েছে, তার অনেক জায়গাতেই দু-একটা ছোটখাটো গোলমাল হয়েছে করবীকে নিয়ে। সেজন্য কতটা দোষ করবীর আর কতটা অন্য পুরুষদের—তা বলা যায় না। সে একবার ধরাও পড়েছে সুখেনের কাছে, তখন করবী অনুনয়বিনয় করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। সুখেনই অনেক সময় ইচ্ছে করে বদলি হয়ে গেছে এক-এক জায়গা থেকে। লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করার মতন স্বভাব সুখেনের নয়। যেখানেই দেখেছে কোনও লোক করবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইছে—সেখান থেকেই সে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে কোনওক্রমে। বউকে কোনও শাস্তি দিতে চায়নি। আবার, তার বাড়িতে যে আড্ডা বসে, এটাও সে বন্ধ করে দিতে চায়নি কখনও, কারণ সে নিজেই আড্ডা দিতে ভালোবাসত। মোট কথা, স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসত সুখেন। তার এই ধরনের ছোটখাটো দোষত্রুটিও সে ক্ষমা করতে পারত। করবীও স্বামীকে ভালোবাসত—এ-কথাও ঠিক। নইলে সুখেনকে ছেড়ে কখনও সে চলে যায়নি কেন? যেতেও তো পারত। সেরকম সুযোগও তার ছিল। সব মিলিয়ে করবী মেয়েটা অদ্ভুত ধরনের। স্বামীর প্রতি ভালোবাসাও ছিল তার, আবার অতৃপ্তিও ছিল। অতৃপ্তিটা কখনও-কখনও বেড়ে গেলেই গোলমাল দেখা দিত।

সুখেন তার স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেত না। ট্যুরে যাওয়ার কথা সব বাজে। কোনওদিন সে স্ত্রীকে একলা বাড়িতে রেখে ট্যুরে যায়নি, মৃত্যুর আগের দিনও না। করবীকে বাপের বাড়িতেও পাঠাত না সে—যদিও করবীর বাপের বাড়িতে বিশেষ কেউ ছিল না—তাব বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে অল্প বয়সে। দাদার সংসারে মানুষ।

সূরযলালের সঙ্গে তার ঠিক কতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—তা জানা যায়নি শেষপর্যন্ত। আদালতে হাজার জেরাতেও ওরা এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। এমনকী সূরযলালই জোর করে করবীর দিকে ঝুঁকেছিল, না করবীই আকৃষ্ট করেছিল তাকে—তাও বলা যায় না। তবে, দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল। সূরযলাল অনেকবার এসেছে ওদের বাড়িতে, সুখেনের উপস্থিতিতেই।...

ব্যাপারটা তোমাদের পক্ষে অনুমান করা নিশ্চয়ই শক্ত হবে না। সুখেনের বাড়িতে নিয়মিত আড্ডা বসত, তার সুন্দরী স্ত্রী করবী চা তৈরি করে খাওয়াত সবাইকে। আড্ডার লোভে না হোক, চায়ের লোভেই তো যেতে পারে অনেকে—'

রঞ্জন ফস করে বলে উঠল, 'কিংবা যে বানিয়ে দেয় তার লোভেও কেউ-কেউ যেতে পারে। আপনি যেরকম বলছেন, তাতে মেয়েটি...'

কর্নেল সেন মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা বোধহয় সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল। ওই আড্ডার মধ্যে কেউ-কেউ একটু ঝুঁকে পড়ে করবীর দিকে। সুখেন বোধহয় সেদিকে নজর দেয়নি। অন্যান্য পুরুষমানুষদের মধ্যে সূরযলালই করবীকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে। তার সুন্দর চেহারা,

BanglaBook.org

পয়সাকড়ি যথেষ্ট আছে, ফূর্তিবাজ। সুখেনকে লুকিয়েও যে সে করবীর সঙ্গে দেখা করত—'

মাধবী ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলল, 'এই যা...। জল গরম হয়ে উথলে পড়ে যাচ্ছে—তোমার খেয়ালই নেই। তোমার দ্বারা যদি একটু কাজ হয়—'

রঞ্জন বলল, 'ও, জল চাপিয়ে ছিলাম, না? যাও, যাও, কফি বানিয়ে নিয়ে এসো, এসব কি আর পুরুষমানুষের কাজ!'

মাধবীর কফি বানিয়ে আনার অপেক্ষায় আমরা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। মনে-মনে আমি করবী নামে মেয়েটির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। এই গল্পের প্রথম দিকে তার চরিত্রটা অনেকখানি রহস্যে মোড়া ছিল। এখন আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে। মেয়েটির জীবন তার সংসারকে ছাপিয়ে আরও বড় হয়ে উঠছিল। অন্য ধরনের পরিবেশে পড়লে কিংবা অন্য রকমের সুযোগ পেলে এই ধরনের মেয়েরাই দেশনেত্রী হয়, সমাজসেবিকা হয় কিংবা ফিল্মস্টার বা ডাকাতদলের সর্দারনিও হতে পারে। যেসব মেয়ে সংসার ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে ওঠে, তারাই জীবনে বড় কিছু করে। এখানে, দুর্ভাগ্যবশত বেচারি অবৈধ প্রেম আর খুনখারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল সেন বললেন, 'সুরযলাল সম্পর্কে বিশেষ কোনও বদনাম আগে শোনা যায়নি। তার বাবা কাঠের ব্যাবসা করে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর সুরযলাল ব্যাবসার দিকে বেশি মন না দিয়ে টাকাপয়সা ওড়াবার দিকে মন দেয়। অল্প বয়সেই বিয়ে হয় ওদের। স্ত্রীটি সুন্দরী, দুটি বাচ্চাও আছে। কিন্তু ঘরে মন টেঁকে না সুরযলালের। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফূর্তি করে, মদটদ খায়। তার মা এখনও বেঁচে আছেন বলে বাড়িতে ওসব চলে না—মাঝে-মাঝেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাইরে চলে যেত। এইসব সত্ত্বেও সুরযলালের মনটা উদার—অনেককে সে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কখনও কারওর কোনও ক্ষতিটতি করেনি। মোটামুটি ভাবে তার জীবনটা কেটে যেতে পারত—কিন্তু সুখেন রায় তার স্ত্রীকে নিয়ে ওই ছোট্ট শহরে বদলি হয়ে আসার ফলেই তার জীবনেও সবকিছুই বদলি হয়ে গেল। সুরযলাল রাশি-রাশি টাকার জিনিস কিনে উপহার দিয়েছে করবীকে। করবীও সেসব নিতে আপত্তি করেনি—।'

কর্নেল সেন মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'সুরযলালের সঙ্গে করবীর অবৈধ মিলনের কোনও সুযোগ কখনও ঘটেছিল কিনা তা জানা যায়নি। যদিও সুরযলালের বউ তার সাক্ষ্যে বলেছিল, 'ওই ডাইনিই তার স্বামীর সর্বনাশ করেছে।'

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন লোকের শেষপর্যন্ত আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার নাম হরিনাথ।

এই হরিনাথ ছিল সুখেনের অফিসেরই সহকর্মী। কিন্তু সে সুরযলালের ফূর্তির সঙ্গী একজন। সুরযলালের টাকায় আমোদআহ্লাদ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। ঘটনার দিন রাত্রিতে সে ডাকবাংলোতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু গুলি চলার পরই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই যে পালিয়েছে, আর কেউ তার কোনও খোঁজ পায়নি। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি তাকে—চাকরিটাকরি সব ছেড়ে সে অবাক কাণ্ড করেই রইল।

এই তো শুনলে লোকগুলির পরিচয়। এবার তোমরা—'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'আর সেই বুদ্ধুরাম?'

কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'সে কিছু না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুরযলাল বা করবী কেউই গাড়ি চালাতে জানে না। সুতরাং ডেডবডিটা আর জিপগাড়িটা সরানোর জন্য একজন ড্রাইভার দরকার। এটা একটা মজার ব্যাপার। এটা থেকেই বুঝতে পারবে, কত ছোটখাটো ঘটনার জন্য কত বড়-বড় ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। করবীর পক্ষে গাড়ি চালাতে না জানা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু সুযরলাল বড়লোকের ছেলে—তাদের নিজেদের কোম্পানির দু-তিনটে ট্রাক আছে—সে তো

BanglaBook.org

গাড়ি চালাতে জানতেও পারত। তাহলেই, খুনের রাত্রেই সে বডিটা সরিয়ে ফেলতে পারত—আমি ডাকবাংলোয় গিয়ে কিছুই দেখতে পেতাম না। ওরা পুরো ঘটনাটাই চাপা দিয়ে দিতে পারত, বিশেষ করে দারোগাবাবুর সঙ্গে যখন ওদের খাতির। কিন্তু তা হতে পারল না, সুখেন রায় একমাত্র গাড়ি চালাতে জানত ওদের মধ্যে—সে মারা যাওয়ার পর গাড়ি চালাবে কে? এই জন্যই সূরযলাল অনেক টাকাকড়ি দিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে বুদ্ধুরামকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার পরদিন। লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি কম—সে হয়তো কিছুই ফাঁস করত না শেষপর্যন্ত। বেচারা তার পুরো টাকা পায়নি বলে সেই টাকার লোভে বসে ছিল।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'তাহলে কি ওই হরিনাথ নামের লোকটাই খুন করেছে!'

রঞ্জন বলল, 'তা হতেই পারে না।'

মাধবী বলল, 'কেন হতে পারে না?'

'তার কারণ হরিনাথ বলে কোনও লোকের অস্তিত্বের কথা আমরা জানতুমই না। হঠাৎ গল্পের শেষের দিকে একটা লোকের কথা শোনা গেল। আর সে-ই খুনি হয়ে গেল।—এটা হয় না। ডিটেকটিভ গল্পে এটা খুব ব্যাড ফর্ম।'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিন্তু রঞ্জন, এটা তো গল্প নয়। জীবনের সব ঘটনা কি গল্পের নিয়ম মেনে চলে? আমি হয়তো ঘটনাটা ঠিক মতন সাজিয়ে বলতে পারিনি—'

মাধবী বলল, 'খুন না করলে ওই লোকটা পালাবে কেন? লুকিয়েই বা থাকবে কেন?'

রঞ্জন বলল, 'ভয় পেয়ে পালিয়েছে! ওইসব কাণ্ডমাণ্ড দেখে ওর পিলে চমকে গিয়েছিল—'

কর্নেল সেন বললেন, 'লোকটা একেবারে চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে জন্মের মতন পালিয়ে গেল—এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার নয়?'

রঞ্জন নিরাশ ভাবে বললে, 'তাহলে মামাবাবু, আপনি বলছেন, ওই হরিনাথই খুন করেছে?'

'না, সে-কথা আমি বলছি না। আদালতেও সে-কথা বলা হয়নি। যে পালিয়ে যায় তার প্রতিই বেশি সন্দেহ জাগে—সেই জন্যই হরিনাথের নামটা প্রথম মনে আসে। কিন্তু খুনের একটা মোটিভ থাকা চাই তো। সেই হিসাবে হরিনাথের পক্ষে খুন করার কোনও কারণই নেই বলতে গেলে। সে একটা সাধারণ ফূর্তিবাজ লোক। সূরযলালের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মদ্য পানটান করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। অবিবাহিত লোক, সংসারের কোনও বন্ধনও নেই। লোকের মুখে আমি যা শুনেছি—হরিনাথের চেহারাটাও ছিল বেশ খারাপ—লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা, মুখের একপাশে একটা পোড়া দাগ। এইসব লোক সাধারণত নারীর প্রীতি বা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্তত অবৈধ প্রেমের নায়ক হিসাবে এদের কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া, যতদূর জানা গেছে, মেয়েদের ব্যাপারে হরিনাথের দুর্বলতাও ছিল না বিশেষ। সুতরাং তার পক্ষে হঠাৎ সুখেন রায়কে খুন করার কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

হরিনাথের কোনও পুরোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও নেই। সম্ভবত জীবনে প্রথম চোখের সামনে একটা মানুষকে অপঘাতে মরতে দেখে তার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। দেখেশুনে ভয়ের চোটে সে সেই যে এক দৌড় দেয়—কোথায় গিয়ে থেমেছে, তার ঠিক নেই, কিংবা হয়তো এখনও দৌড়োচ্ছে।'

মাধবী বলল, 'তাহলে কে খুন করেছে বলুন! আর সাসপেন্স ভালো লাগছে না।'

রঞ্জন বলল, এখন না! বলে দিলেই তো সব ফুরিয়ে গেল!'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি তো ঘটনাটা সব খুলে বললাম তোমাদের। লোকজনদেরও চিনিয়ে দিলাম। এই কাহিনির এই কজনই পাত্রপাত্রী। এদের সম্পর্কে আমি যেটুকু জেনেছি তা সবই বলেছি তোমাদের। এর বাইরের আর কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়, অন্য কেউ খুন করেনি।

BanglaBook.org

এদের মধ্য থেকেই খুনিকে খুঁজে নিতে হবে। এবার তোমরাই বলো কে খুন করেছে?'

মাধবী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'আমি ঠিক জানি, ওই মেয়েটাই খুন করেছে!'

কর্নেল সেন, রঞ্জন আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠলাম। রঞ্জন বলল, 'তোমার ওই মেয়েটার ওপর খুব রাগ, তাই না!'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই! যে মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে রেখে নিজে বাইরের লোকের সঙ্গে হেসে গল্প করতে পারে—সে সব পারে!'

আমি বললাম, 'মাধবী, তোমাকে যদি বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হত—তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মেয়েটাকে ফাঁসি দিতে, তাই না?'

'দিতুমই তো!'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা মাধবী, তুমি যে বলছ করবীই খুন করেছে, কিন্তু কীভাবে খুন করেছে, সেটাও তো তোমাকে বলতে হবে। শুধু-শুধু একজনকে খুনি বললেই তো আর হয় না!'

মাধবী বলল, 'এ তো খুব জলের মতন বোঝাই যাচ্ছে। অসভ্য পাজি মেয়েটার সঙ্গে সুরযলালের নিয়মিত দেখা হত গোপনে। সুখেন কখনও অফিসের কাজে বাইরে গেলে তো আর কথাই নেই! সেবার যখন সুখেন বাইরে গেল—'

রঞ্জন বলল, 'সুখেন তো আসলে যায়নি বাইরে—'

'আঃ, আমাকে বলতে দাও না! সুখেন পাটনায় যাওয়ার নাম করে বাইরে লুকিয়েটুকিয়ে ছিল। সুরযলাল রাত্তিরে ওদের বাড়ি যেই এসেছে—সুখেনও ঢুকে পড়েছে। ধরা পড়ে গিয়ে বেগতিক দেখে করবী অমনি সুরযলালের পিস্তল নিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। ও মেয়ে সব পারে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু মাধবী, এর সঙ্গে ডাকবাংলোর সম্পর্ক কী?' ঘটনাটা ওদের বাড়িতে না ঘটে ডাকবাংলোয় ঘটল কেন? করবীর পক্ষে বাড়িতে থাকাই তো সুবিধেজনক!'

'বাড়িতেই তো হয়েছে। তারপর ডেডবডিটা ডাকবাংলোয় নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ছিল।'

'মাধবী, আগাথা ক্রিস্টি তোমাকে দেখলে লজ্জা পেতেন! মেয়েরা এমন ভালো ডিটেকটিভ গল্প লিখতে পারে, আর তোমার এই বুদ্ধি!'

রঞ্জন বলল, 'তোমার মেয়েটার প্রতি একটুও সহানুভূতি হচ্ছে না? আমার কিন্তু একটু-একটু হচ্ছে।'

'তা তো হবেই। তোমরা পুরুষমানুষরা...'

আর একদফা হেসে রঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুনীল, তুই বল কে খুন করেছে।'

আমি বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই বল না!'

রঞ্জন বলল, 'আমার ধারণা, এই ঘটনায় করবীর ভূমিকাটা একটু বড় করে দেখানো হচ্ছে। আসলে এর মধ্যে টাকাপয়সার কোনও ব্যাপার জড়িত। সুরযলাল, মুখেন, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম, আর ডাকবাংলোর চৌকিদার এরা সবাই মিলে কোনও অবৈধ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব জায়গায় এরকম হয়। ওই ব্যাবসার ব্যাপারেই কোনও গোলমাল হয়, সুখেন বোধহয় বিট্রে করেছিল—তাই সুরযলাল আর অন্যরা মিলে সুখেনকে মেরে ফেলে। তারপর সুরযলালই কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে করবীকে ওই ডাকবাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ফেলে খুনের ঘটনার সঙ্গে। করবী তখন নিজে বাঁচবার জন্যই বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করে ওদের সঙ্গে। মামাবাবু যে সুখেনকে ভালো লোক বলছেন, তারই বা প্রমাণ কী! বাইরে থেকে দেখে অনেককে ভালো মনে হয়। সুখেনই হয়তো নিজের বউকে অন্যদের সামনে এগিয়ে দিত!'

কর্নেল সেন বললেন, 'রঞ্জন, তোমার থিয়োরিটা একেবারে অবাস্তব। এটা চমকপ্রদ বটে

BanglaBook.org

কিন্তু একটুও সত্যি নয়। ওদের মধ্যে কোনও ব্যাবসার সম্পর্ক যে ছিল না সেটা আমি ভালো ভাবেই জেনেছি।'

রঞ্জন হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুনীল, তুই তাহলে বল।'

আমি বললাম, 'আমি ভাই পারব না। আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারি না একদম।'

'ধাঁধা কোথায়? লজিক্যাল অ্যানালিসিস করলেই তো পাওয়া যায়।'

'ওইটাই যে আমি পারি না। আমি যখন ডিটেকটিভ গল্প-টল্প পড়ি—কোনওদিন আগে থেকে বুঝতে পারি না খুনি কে—। তা ছাড়া মানুষকে চেনা অত সহজ নয়। কোন মানুষ কখন কীরকম ব্যবহার করবে—তা কেউ বলতে পারে না। আমার তো মনে হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে—করবী, সুরযলাল—এমনকী হরিনাথের পক্ষেও কোনও কারণে খুন করা অসম্ভব নয়। তার মনের মধ্যে কী জটিলতা ছিল, তা তো আমরা জানতে পারব না। বুদ্ধুরামও যদি খুন করে, তাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

কর্নেল সেন বললেন, 'এরকম ভাবে ভাবলে অবশ্য সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় কিংবা কোনও মানুষকেই সন্দেহ করা যায় না। একথা ঠিক, বাইরে থেকে দেখে আর মানুষকে কতটা বোঝা যায়! ভেতরে-ভেতরে মনের মধ্যে তার কী খেলা চলছে, সেটা কেউ জানতে পারে না। তবে, অন্য একটা দিক থেকেও রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা যায়। ক্রাইমের সময় এবং ঘটনাটা যদি রিকনস্ট্রাক্ট করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হতে পারে। আমি যেদিন ডাকবাংলোটাতে হাজির হয়েছিলাম—তার আগের রাত্রে অর্থাৎ যেসময় খুনটা হয়েছিল—সেই সময়কার ঘটনা যদি কল্পনা করা যায়—তাহলে খুনিকে সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে। চরিত্রগুলো যদি চেনা যায়, তাহলে তাদের ব্যবহার কীরকম হবে, সেটাও অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করা যায়। কোনও মানুষই তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যবহার সহজে করে না। বাইরে ভালো মানুষ আর ভেতরে-ভেতরে হিংস্র শয়তান—এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। অনেক উত্তেজক ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছি—প্রথম দিকে ঘটনাটা যা মনে হয়েছিল, শেষের দিকে তার সম্পূর্ণ একটা উলটো ব্যাখ্যা দেওয়া হল। রঞ্জনও সেই টেকনিকেই বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, বাস্তবে ওরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে। আমি তোমাদের যে ঘটনা বললাম, এটা কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব—এর মধ্যে অদ্ভুত অপ্রাকৃত কিছু নেই। আগের রাত্রে কী-কী ঘটেছিল, সেটা টুকরো-টুকরো ভাবে আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু পুরো ছবিটা ফুটিয়ে তোলার জন্য ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আমার নেই। সুনীল, তুমি তো গল্প উপন্যাস লেখো—তুমি কল্পনায় সেই রাত্তিরটার একটা ছবি ফোটাতে পারবে না?'

আমি বললাম, 'গল্প-উপন্যাস লেখা এক কথা আর অন্যের মুখে একটা ঘটনা শুনে সেটাকে বাস্তবের মতন ভাবা অন্য একটা ব্যাপার। আমি বোধহয় এটা পারব না।'

রঞ্জন বলল, 'পারবি, চেষ্টা কর না।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ, আপনি বলুন। আপনার যদি ভুল হয়, আমরা ধরে দেব।'

রঞ্জন বলল, 'এইরকম ভাবে আরম্ভ কর। ডাকবাংলোয় কে আগে গিয়েছিল, সুখেন, না করবীর সঙ্গে সুরযলাল—'

॥ ৫ ॥

ওদের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত আমাকেই গল্পের বক্তার ভূমিকা নিতে হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি চরিত্রগুলোর কথা ভেবে নিলাম। সুরযলাল—হঠকারী বড়লোকের ছেলে, ইয়ারবন্ধুদের পাল্লায় পড়ে টাকা ওড়াচ্ছে। সুখেন রায়—শান্তশিষ্ট বই-পড়া যুবক, বাড়িতে পুত্রহীনা সুন্দরী স্ত্রী। করবী

BanglaBook.org

তার স্বামীকে ভালোবাসে—অথচ ছোট্ট সংসারের একঘেয়ে জীবনে মন টেঁকে না। হরিনাথ অন্যের পয়সায় মদ খায়—সুখেনকে অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে তার। নিজের চরিত্রের বিপরীত ধরনের লোক দেখলেই অনেকের রাগ হয়। চৌকিদার রামদাস—

আমি মুখ তুলে বললাম, 'কর্নেল সেন, আমার আরও দু-একটা ব্যাপার জেনে নেওয়ার আছে। চৌকিদার রামদাস কি বিবাহিত? আপনি পরে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। চৌকিদারের বউ মারা গিয়েছিল অনেক দিন আগে। সে একা থাকত।'

'কিন্তু আপনি যখন তার ঘরের দরজা ঠেলে ছিলেন, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।'

'তাই ছিল।'

'অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে ছিল। আপনি সে সময়ে ও ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর একটা কথা। এই গল্পের মধ্যে ডাকবাংলোটার বেশ অনেকখানি ভূমিকা আছে। কেননা, সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা স্থানীয় লোক—ডাকবাংলো ব্যবহার করে বাইরে থেকে যারা আসে। তা ছাড়া সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা থাকে কাছাকাছি বাড়িতে। সুখেন যদি ট্যুরের নাম করে অন্য কোথাও গিয়ে থাকে, তাহলে তার বাড়িতে এসব ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। তবু, ডাকবাংলোটার ভূমিকা আমি আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমি ওই ধরনের বাংলোতে অনেক বার থেকেছি। রঞ্জনেরও অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, সুখেন রায় যে বাড়িটাতে থাকত সেই বাড়িটা, আপনি বলেছেন, খুব ভালো নয়। ঠিক কীরকম? বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে জল পড়তে পারে?'

কর্নেল সেন হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছ। হ্যাঁ, সুখেনের বাড়িটা ওইরকমই।'

কর্নেল সেনের কাছে প্রশ্ন করে আমি আরও কয়েকটা তথ্য জেনে নিলাম।

তারপর আর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি পটভূমিটা মনে-মনে ছকে নিলাম। আস্তে-আস্তে চরিত্রগুলো আমার চোখের সামনে নড়াচড়া করতে লাগল। গল্প-উপন্যাস লেখার সময় আমি চরিত্রগুলোকে যেমন রক্তমাংসের চেহারায় কিছুক্ষণ দেখে নিই, তাদের সঙ্গে কথা বলি—এখানে সুখেন, করবী, সূরযলাল, রামদাস প্রভৃতির সঙ্গে আমার একে-একে পরিচয় হল, আমি যেন চেনাশুনা লোকদের মতনই ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ তুলে এবার কর্নেল সেনের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'দেখুন, সেই সন্ধ্যাবেলার দৃশ্যটা আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তাতে এই রহস্য-কাহিনির কোনও সমাধান হবে কিনা জানি না।'

মাধবী বলল, 'ঠিক আছে, আগে শুনেই দেখি না।'

আমি শুরু করলাম।

'বিহারের ওই ধরনের ছোটখাটো শহরে শীতকালে যারা থেকেছে, তারাই বুঝতে পারবে কীরকম দুর্দান্ত শীত পড়ে, ড্রাই কোল্ড যাকে বলে। হাড় কনকনিয়ে দেয়। যে সময় ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা যদিও নভেম্বর মাস, খুব বেশি শীত পড়ার কথা নয়। কিন্তু বৃষ্টি পড়লে ওসব জায়গায় নভেম্বরেও খুব শীত লাগতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। সেইসঙ্গে কনকনে হাওয়া। কর্নেল সেন, আপনিই বলেছেন যে পরের দিন আপনি যখন ডাকবাংলোতে গিয়েছিলেন, তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সুতরাং তার আগের দিনও বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মোট কথা, আমি ধরেই নিচ্ছি যে বৃষ্টি পড়ছিল সেই সন্ধ্যাবেলা—তাতে আমার গল্পের সুবিধে হয়।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরুন না, কে আপত্তি করছে?'

'সুখেন তার বসবার ঘরের চৌকিতে শরীর এলিয়ে বই পড়ছে। এইসব ছোটখাটো জায়গায় সন্ধ্যার পর আর কেউই থাকে না। বৃষ্টির জন্য সেদিন আর কেউ আড্ডা দিতেও আসবে না।

করবী এ-ঘরে ও-ঘরে একবার যাচ্ছে আর একবার আসছে। কখনও একটু বসছে সুখেনের পাশে, আবার উঠে যাচ্ছে ভেতরে। তার কোনও কাজ নেই। সন্ধ্যাটা আর কাটতেই চায় না। দুজন

BanglaBook.org

মানুষের রান্না, তাও কখন শেষ হয়ে গেছে। সুখেনের মতন তার বই পড়ার অত নেশা নেই।

করবী একবার বসবার ঘরে ঢুকে সুখেনকে বলল, 'এখন খেয়ে নেবে?'

সুখেন বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'এক্ষুনি? ক'টা বাজে?'

টেবিলের ওপর রাখা হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'মাত্র সাতটা। এর মধ্যেই খেয়ে নেব!'

সুখেনের মুখটা শুকনো। সেদিন তাকে খানিকটা মনমরা দেখাচ্ছিল। এক হাতে বই, এক হাতে সিগারেট—মাঝে-মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। অফিস থেকে পাটনা যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছে, অথচ পাটনায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার।

করবী বলল, 'হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খেয়েই নাও। আমি আজ রাত্তিরে এখানে থাকব না।'

সুখেন বলল, 'আজ আবার বেরোবে? আজ থাক না—'

করবী বলল, 'না, আজ আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি!'

সুখেন বলল, 'আজ রাত্তিরে আর বেরিয়ে কাজ নেই। কালকে বরং তুমিও আমার সঙ্গে চলো পাটনায়।'

'সে কালকের কথা কালকে। আজ রাত্তিরে আমার একটু থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। তোমাকে কত করে বলছি, আর একটা বাড়ি দেখো।'

'আজকের রাতটা অন্তত...'

করবী বলল, 'না, চলো। বৃষ্টি পড়ছে, বেশি জোরে বৃষ্টি নামলে আবার আজ ছাদ থেকে জল পড়বে।'

'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই, গা ম্যাজম্যাজ করছে—আবার গাড়ি চালাতে হবে।'

'কী হয়েছে কী! জ্বর হয়েছে নাকি?'

করবী স্বামীর কপালে হাত রাখল। তারপর বলল, 'জ্বর তো নেই। চলো, ওখানে গিয়ে আরাম করে শোয়া যাবে। এই শীতের মধ্যে—'

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। সামান্য দু-একটি টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিল শুধু। বিছানাপত্তর ডাকবাংলোতেই সব আছে। মাঝে-মাঝেই ওরা বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় এসে থাকে। ওদের নিজের বাড়ির থেকে ডাকবাংলোয় থাকা অনেক বেশি আরামপ্রদ, বিশেষত শীতকালে।

নির্জন জায়গায় ডাকবাংলোগুলোতে এসব ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। বাইরের লোকজন যেখানে কম আসে, সেখানে স্থানীয় সরকারি অফিসের কোনও কর্মচারীই পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে যায়। একটা ঘর শুধু খালি থাকে। এইসব বাংলো আবার অনেক সময় অসামাজিক লোকদেরও আড্ডা হয়। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে তারা সন্ধ্যার পর এসে আড্ডা জমায়, মদ্যপান করে, মেয়েদের নিয়ে অবৈধ কাণ্ডকারখানার পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক জায়গা। আমাদের গল্পের এই বাংলোটা সেই ধরনের।'

রঞ্জন ফস করে জিগ্যেস করল, 'তুই কী করে বুঝলি যে সেই বাংলোটা এই ধরনের? তুই কি সেখানে গেছিস? বাংলোটা কোন জায়গায় তার নামই তো আমরা কেউ জানি না।'

আমি বললাম, 'আমি সে বাংলোতে যাইনি বটে। কিন্তু সবকিছু শুনে মনে হচ্ছে বাংলোটা এই ধরনেরই। এরকম অনেক বাংলো আমি দেখেছি—সেখানে স্থানীয় কোনও সরকারি কর্মচারী নিজের কোয়ার্টার বানিয়ে নিয়েছে একেবারে।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সুনীলকে বাধা দিয়ো না। আমার মনে হচ্ছে, সুনীল ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছে। এ পর্যন্ত যা বলেছে, তা মিলে যাচ্ছে, তুমি বলে যাও।'

'করবী আর সুখেন যখন পৌঁছাল, তখন সেই বাংলোয় আগে থেকেই আরও লোক এসে রয়েছে। সাধারণত, বাংলোতে যদি অন্য লোক এসে যায়, তাহলে আর করবীরা সেখানে সেদিন

BanglaBook.org

থাকে না। ফিরে যায়। এতটা এসে আবার ফিরে যেতে হবে বলে সুখেন বিরক্ত হয়ে উঠছিল, এমন সময় দেখতে পেল, যারা এসেছে, তারা ওদের চেনা লোক। ওদের চেনা সূরযলাল আর হরিনাথ মদের বোতল নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। সূরযলালের বাড়িতে ওসব চলে না, তাই সে ডাকবাংলোতে আসে মাঝে-মাঝে। চৌকিদার রামদাস তাদের খাবারটাবার বানিয়ে দেয়—সূরযলাল কথায়-কথায় বকশিশ দেয় পাঁচ টাকা-দশ টাকা।

সুখেন আর করবীকে দেখে সূরযলাল হইহই করে উঠল। এমন ভাবে সে আপ্যায়ন করতে লাগল যেন বাংলোটা তার নিজের। হাত বাড়িয়ে বলল, 'আইয়ে ভাবীজি, আইয়ে সুখেনদাদা—আজ কত সৌভাগ্য আমাদের যে আপনারা এসেছেন—'

সুখেন বলল, 'আমরা এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'কী যে বলেন!'

সুখেন নম্র ধরনের মানুষ। সে ইচ্ছে করলে চৌকিদারকে হুকুম দিয়ে বাংলোতে এই ধরনের লোকদের আসা বন্ধ করে দিতে পারে। তার বদলে সে নিজেই সংকুচিত হয়ে রইল।

একটা চেয়ারে আরাম করে বসে, আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়েছে সূরযলাল। ছোট টেবিলে দুটি মদের বোতল ও কয়েকটি গেলাস। হরিনাথ ঠিক অনুগত ভৃত্যের মতন সূরযলালকে গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছে, জল মেশাচ্ছে। হরিনাথ নিজেই খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। সে সুখেন আর করবীকে দেখে বলল, 'এই যে, দাদা আর বউদিও এসে গেছেন! তাহলে জমবে ভালো আজ!'

করবী ওদের সঙ্গে একটাও কথা বলল না। চলে এল তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। ভুরু কুঁচকে স্বামীকে বলল, 'ওরা আবার এখানে কেন? ওদের চলে যেতে বলো।'

করবী বেশ গলা উঁচু করেই কথা বলেছিল। সুখেন ফিসফিস করে বলল, 'এই আস্তে যাঃ, তা কি বলা যায়! থাক না!'

করবী বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ! ভালো লাগে না! এখানে একটু নিরিবিলিতে ঘুমোতে এসেছি—তার মধ্যে আবার জ্বালাতন! ওরা সারা রাত হইহল্লা করবে।'

'না, না, সারা রাত থাকবে না! খানিকটা বাদে চলে যাবে নিশ্চয়ই!'

'মোটেই যাবে না! দেখো তুমি।'

এর আগেও দু-এক বার সুখেন আর করবী ডাকবাংলোতে এসে সূরযলালদের দেখতে পেয়েছে। তবে, আগে যখন আলাপ পরিচয় ততটা বেশি ছিল না, তখন সূরযলাল সুখেনকে খানিকটা সমীহ করত। ওরা এলে ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যেত তাড়াতাড়ি। মাসখানেক আগে এক রাত্রে ওরা রাত তিনটে পর্যন্ত ছিল—শেষপর্যন্ত সুখেনই ওদের জিপে পৌঁছে দিয়ে আসে।

করবী বলল, 'তুমি কিন্তু আজ ওদের পৌঁছে দিয়ে আসতে যাবে না কিছুতেই। একা-একা থাকতে আমার ভয় করে। ওদের বলো তাড়াতাড়ি চলে যেতে—এখন বেশি রাত হয়নি, হেঁটেই চলে যেতে পারবে।'

করবী বেশ রেগে গেছে। সুখেন তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। সুখেনের ভদ্রতাবোধ আছে। সে মুখ ফুটে ওদের চলে যেতে বলতে পারবে না।

দরজার বাইরে থেকে সূরযলাল বলল, 'এই সুখেনদাদা, আসুন একটু গপসপ করি। এক্ষুনি কি নিদ যাবে নাকি?'

সুখেন করবীকে বলল, 'একটু বাইরে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসা যাক। মোটে তো সাড়ে আটটা বাজে!'

করবী বলল, 'তুমি যাও। আমার ভালো লাগছে না।'

সুখেন বাইরের বারান্দায় ওদের সঙ্গে এসে বসল। কয়েকখানা চেয়ার বাইরে বার করা হয়েছে। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালেনি। বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত ভাবে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। চাদরমুড়ি

BanglaBook.org

দিয়ে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসতে বেশ আরাম লাগে।

সূরযলাল মদের বোতল দেখিয়ে বলল, 'দাদা, একটু খাবেন নাকি?'

সুখেন বলল, 'না ভাই, আমি ওসব খাই না। আমার ভালো লাগে না।'

হরিনাথ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার হেসে উঠে বলল, 'না খেলে বুঝলেন কী করে যে ভালো লাগে না। আগে খেয়ে দেখুন। তবে তো বুঝবেন!'

সুখেন বলল, 'না, তার দরকার নেই।'

হরিনাথ নিজের গেলাসের সবটুকু মদ ঢক করে শেষ করে দিয়ে বলল, 'ওফ্, গলা জ্বলে গেল! মাইরি সুখেনদা, এ-জিনিস খেলে যেমন কষ্ট, না খেলেও সেরকম কষ্ট! তবে, বুঝলেন, খেয়ে কষ্ট পাওয়াটাই বেটার! আর সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।'

সুখেন জিগ্যেস করল, 'হরিনাথ তুমি কোথা থেকে এসব খাওয়া শিখলে?'

হরিনাথ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'এসব কি কাউকে শেখাতে হয়? ভালোবাসা কি কাউকে শেখাতে হয়? মানুষ আপনি-আপনি ভালোবাসে।'

'আমি তো আপনি-আপনি শিখলাম না!'

'আপনি চেষ্টা করলেন না তা শিখবেন কী। মেয়েমানুষ ছাড়া যেমন ভালোবাসা জমে না।'

সূরযলাল ততক্ষণে আর একটা গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে জল মিশিয়ে বলল, 'নিন দাদা, একটু চেখে দেখুন! ভাবীজি রাগ করবেন বলে ভয় পাচ্ছেন? হা—হা—'

'না, না, তার জন্য নয়।'

'ভাবীজির কাছে পারমিশান সিক করে লিন।'

'ও কিছু বলবে না। এমনিই আমি খাব না—'

সুখেন আড়চোখে তার ঘরের জানলার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। করবী শুয়ে পড়েনি, বোঝাই যায়। ঘরের মধ্যে তার চলাফেরার খুটখাট শব্দ। সুখেন মনে-মনে শঙ্কিত হল, করবী বোধহয় খুব রেগে যাচ্ছে। তারা এসেছিল এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে ঘুমোতে। তা ছাড়া সুখেনের নিজেরই আজ শরীরটা ভালো নয়—তারই ইচ্ছে করছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু এরা বাইরে বসে থাকলে কি আর হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমোনো যায়!

সামনে একটা প্লেটে শুকনো করে ভাজা মুরগির মাংস জমা আছে। সূরযলাল নিজের বাড়িতে মাংস খেতে পারে না বলে ডাকবাংলোতে এসে খায়। প্লেটটা সুখেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এক টুকরো মাংস মুখে দিন। তারপর গেলাসে একটু চুমুক দিন, দেখবেন কীরকম ভালো লাগে। গ্যারান্টি দিচ্ছি!'

সুখেন হাত দিয়ে গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না ভাই, তোমরা খাও না। তোমরা আনন্দ করছ, তাতে তো আমি বাধা দিচ্ছি না! আমাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন? আমি গরিব লোক, আমার এসব বড়লোকি নেশা কি পোষায়?'

সূরযলাল থতমত খেয়ে গেলাস সরিয়ে নিয়ে বলল, 'থাক! তবে থাক। আমি কি আপনাকে জুলুম করছি! আমি বলছিলাম কী, লাইফ তো খুব শর্ট, এর ভিতরে একটু ফূর্তি মজা যদি না করা যায়!'

সুখেন গরিব-বড়লোকের কথাটা তোলায় হরিনাথের খোঁচা লেগেছে। সে সরু চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কেন খাবেন না তা আমি জানি। পেটে-পেটে ইচ্ছে থাকলেও—'

সূরযলাল বলল, 'কেন-কেন?'

হরিনাথ ব্যঙ্গ করে বলল, 'ও খাবে না। বউয়ের ভয় পাচ্ছে। আমাদের তো বউ নেই—'

এই ধরনের খোঁচা মারলে মানুষের পৌরুষে লাগে। সুখেন দুর্বল ধরনের পুরুষ। তা ছাড়া

BanglaBook.org

হরিনাথ তার দুর্বল জায়গাতেই খোঁচা মেরেছে। সুখেন সত্যিই করবীকে বেশ ভয় পায়। আজ করবী রেগে আছে বলে সে এমনিতেই মনে-মনে অস্থির। তবু বউয়ের নামে খোঁচা মারলে অনেক পুরুষই হঠাৎ সাহসী হয়ে যায়। গেলাসটা তুলে নিয়ে অবহেলার সঙ্গে বলল, 'খাওয়ার মধ্যে কী আছে? খেলেই হয়। কিন্তু আমার এসব ভালো লাগে না—'

হরিনাথ বলল, 'একটু টেস্ট করেই দেখুন না ভালো লাগে কি না!'

সুখেন গেলাসটা তুলে একসঙ্গে সমস্ত মদ গলায় ঢেলে দিল। বিষম খেল সঙ্গে-সঙ্গে।

সুরযলাল ব্যস্ত হয়ে হা-হা করে উঠল। বলল, 'করলেন কী, করলেন কী! সবটা একসঙ্গে —আপনি নতুন—'

সুখেন দুর্বলতা ঢাকবার জন্য বলল, 'আমার কিছু হয়নি। এমনি বিষম খেয়েছি।'

সুরযলাল বলল, 'এ-জিনিস আস্তে-আস্তে খেতে হয়। পানি কা মাফিক ঢকঢক করে আপনি মেরে দিলেন।'

সুখেন বলল, 'খেলাম তো। কিছু তো হল না আমার! তোমরা এসব খেয়ে কী আনন্দ পাও?'

সুখেনের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। সে নিজেও আগে কল্পনাই করতে পারেনি যে সামান্য একগেলাস পানীয়র এতখানি তেজ। রীতিমতো ভয় ধরে গেছে তার, কিন্তু কিছুতে সেটা ওদের সামনে প্রকাশ করবে না। বারবার সে ফাঁকা অহংকার দেখিয়ে বলতে লাগল, এসব খেলে তার কিছু হয় না। এসব জিনিসের জন্য টাকা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ইচ্ছে হলে সে এক বোতলও খেয়ে ফেলতে পারে। এসব খাওয়ার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই।

হরিনাথ বলল, 'এই তো দাদা, বেশ কল্‌জের জোর আছে। তাহলে আগে খাব না খাব না করছিলেন কেন?'

'সত্যি, আমি আগে কখনও খাইনি।'

'আর একটু খান।'

'না, আর দরকার নেই।'

'খান না। এই সুরযলাল দাও, দাদাকে দাও।'

সুরযলাল আবার ঢেলে দিয়ে বলল, 'নিন, সঙ্গে একটু মাংস খেয়ে নিন। মাংস না খেলে লিভার ঠিক থাকে না।'

হরিনাথ বলল, 'একটু-একটু মাংস চাখবেন আর গেলাসে একটু-একটু চুমুক দেবেন। ও রকম গোঁয়ারের মতন কেউ এক ঢোকে খায়! আস্তে-আস্তে খেলে জিনিসটার স্বাদ পাবেন ঠিক।'

'আমি আর খাব না। '

'এই যে বললেন, ইচ্ছে করলে এক বোতল খেয়ে ফেলতে পারেন? আর এক পেগেই হয়ে গেল! আপনার কিছু নেশা হয়েছে বলুন?'

'কিছু হয়নি।'

'তাহলে আর ওটুকু খেয়ে কী ভালো হল? আর একটা খান।'

এইভাবে সুখেন তিন-চার গেলাস খেয়ে ফেলল। এবং ক্রমাগত বলতে লাগল, 'আমার কিছু হয়নি! আমার কিছু হয়নি!' হরিনাথ মিটিমিটি হাসছে। এই হরিনাথ ধরনের লোকরা অন্যদের নেশা ধরিয়ে দিয়ে বেকায়দায় ফেলে খুব আনন্দ পায়। সে কথার মার প্যাঁচে সুখেনকে ক্রমাগত খাইয়ে যেতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর করবী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ক্রুদ্ধ গলায় স্বামীকে বলল, 'তোমরা এখানে বসে-বসে গল্প করবে, আর আমি একা ঘরে শুয়ে থাকব? এবার চলে এসো— অনেক রাত হয়েছে।'

সুরযলাল হাসতে-হাসতে বলল, 'ভাবীজি, আপনার কি ঘরের মধ্যে ভয় করছে নাকি?

BanglaBook.org

আপনাদের বাংলাতে যাকে বলে ব্রহ্মদৈত্য—এখানে সেই একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে কিন্তু।'

করবী সুরযলালের কথা গ্রাহ্য না করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী, তুমি বসে-বসে এইসব ছাইভস্ম খাচ্ছ!'

সুখেন জড়িত গলায় বলল, 'একটুখানি শুধু টেস্ট করেছি। কিন্তু আমার কিছু হয়নি। কিছু যে খেয়েছি—তা টেরই পাচ্ছি না। কেন যে ওরা এইসব খেয়ে পয়সা নষ্ট করে!'

'বুঝেছি! আর খেতে হবে না, তুমি এবার ওঠো।'

'কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ আমি মাতাল হয়ে যাব? হাঃ—হাঃ—হাঃ? অত সহজ নয়! তুমি কিছু বুঝতে পারছ? আমি নর্মাল, কমপ্লিটলি নর্মাল।'

'ঠিক আছে, তোমার কিছু হয়নি। কিন্তু এখানে আর কত রাত পর্যন্ত বসে থাকবে?'

'কেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি একলা-একলা ঘুমিয়ে পড়ো! আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

'একলা-একলা ওই ঘরে থাকতে আমার বুঝি ভালো লাগে?'

'তাহলে তুমি এখানেই একটু বোসো!'

'না! তুমি ওঠো বলছি!'

সুরযলাল বলল, 'ভাবীজি এত রাগারাগি করছেন কেন? বসুন না। আপনিও একটু বসুন না।'

হরিনাথও বলল, 'বসুন বউদি, একটু বসুন। আমরা তো আর খানিকটা বাদে চলে যাব।'

ওদের অনুরোধে করবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল। সুরযলাল তার দিকে মুরগির প্লেটটা বাড়িয়ে দিল—করবী সেটা ছুঁয়েও দেখল না।

সুরযলাল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ওদের বংশে কেউ কখনও মদ তো দূরের কথা মাছমাংসও ছোঁয়নি। সুরযলাল এর মধ্যে ওর সবক'টারই ভক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হরিনাথ তার প্রধান শাগরেদ। সুরযলালের আত্মীয়স্বজনরা বলে যে বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশেই তার এই অধঃপতন।

হরিনাথ বলল, 'বউদি, আপনার স্বামীটি কিন্তু বেশ খেতে পারে। ঢকঢক করে মেরে দিল কীরকম! আপনিও একটু খাবেন নাকি!'

করবী বলল, 'ছিঃ!'

করবীর সেই ছিঃ বলার মধ্যে এমন একটা দর্প এবং অবহেলা ছিল যে কেউ আর অনুরোধ করতে সাহস পেল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। করবী আসার পর সব গল্প থেমে গেছে। সুরযলাল আর হরিনাথ খেয়ে যাচ্ছে, সুখেনের গেলাস খালি। হরিনাথ বলল, 'দাদা আর একটু নেবেন নাকি?'

সুখেন করবীর দিকে চেয়ে বলল, 'থাক, আর না!'

করবী সুখেনের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে কিছু বলল না। সুখেন অপরাধীর মতন একটু হাসল।

সুরযলাল গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলল, 'নিন আর একটু নিন। ভাবীজি কিছু বলবেন না!'

সুখেন গেলাসটা তুলে নিয়ে বলল, 'আর খেয়েই বা কী হবে? এত খেয়েও তো কিচ্ছু হচ্ছে না! তোমরা ভেবেছিলে আমি এক চুমুক দিয়েই বেহেড হয়ে যাব।'

হরিনাথ হাসতে-হাসতে বলল, 'সত্যি দাদার কলজের জোর আছে।'

এই সময়ে দূরে কিছু লোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওরা সতর্ক হয়ে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে-ভিজতে চার-পাঁচ জন লোক হেঁটে আসছে

BanglaBook.org

বাংলোর কম্পাউন্ড দিয়ে।

সূরযলাল চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে?'

কোনও উত্তর নেই।

গেলাস নামিয়ে রেখে ওরা সবাই তাকিয়ে রইল লোকগুলোর দিকে। ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

সূরযলাল গলা চড়িয়ে আবার জিগ্যেস করল, 'কৌন হ্যায়?'

এবারও সাড়া না পেয়ে সূরযলাল পকেট থেকে রিভলভার বার করল। রাতবিরেতে কোথাও বেরোলে এটা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। রিভলভারটা হাতে নিয়ে সূরযলাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুম লোগ কৌন হ্যায়? খাড়া হো যাও! মত আও ইধার!'

লোকগুলো থমকে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে উত্তর দিল এবার। ওরা নিরীহ গ্রামের লোক। শর্টকাট করার জন্য বাংলোর কম্পাউন্ড দিয়ে যায়। ওদের অন্যায় হয়ে গেছে, বাবুরা আছে জানলে আসত না।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর হরিনাথ হেসে বলল, 'তুমি একেবারে বন্দুক বার করে ফেললে ওদের দেখে?'

সূরযলাল বলল, 'বিশ্বাস নেই। চোর-ডাকাতের তো কমতি নেই।

'সুখেন রিভলভারটা হাতে নিয়ে বললে, 'দেখি তো! গুলি ভরা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা তো অনেক পুরোনো কালের জিনিস দেখছি।'

'আমার পিতাজির ছিল।'

'তোমার টিপ কীরকম? কখনও ছুড়েছ এটা?'

'না দাদা, আভিতক কোনও মানুষের দিকে ছুড়তে হয়নি। শুধু ভয় দেখালেই হয়।'

'পাখিটাখি শিকার করেছ তো? নাকি তাও করোনি?'

সূরযলাল বলল, 'দাদার তো বন্দুক-পিস্তল সম্বন্ধে বহুত জ্ঞান দেখছি। রিভলভার দিয়ে কি কেউ পাখি শিকার করে? বাড়িতে আমার আর একটা শট গান আছে। চলুন, আপনাকে একদিন শিকারে নিয়ে যাব। আপনি মারতে পারবেন তো?'

সুখেন বললে, 'আমি কোনওদিন বন্দুক-পিস্তল হাতে ছুঁয়েই দেখিনি এর আগে। তোমারটাই প্রথম হাতে নিলাম।'

করবী বলল, 'ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে না। রেখে দাও। হঠাৎ গুলিটুলি যদি বেরিয়ে যায়—'

সূরযলাল বললে, 'না হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাবে না। সেফটি ক্যাচ তোলা আছে। এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রিভলভারটা হঠাৎ নামিয়ে রেখে সুখেন হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। একটা হেঁচকি তুলে বলল, 'এ কী, আমার মাথা ঘুরছে কেন?'

সূরযলাল বলল, 'আপনার তাহলে বেশি হয়ে গেছে। আর খাবেন না।'

সুখেন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, করবী তাড়াতাড়ি তাকে ধরল। সুখেনের চোখদুটো সম্পূর্ণ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মতন। আস্তে-আস্তে বলল, 'করবী, আমার মাথা ঘুরছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না।'

করবী ধমক দিয়ে বলল, 'কেন ওসব খেতে যাও? এমনিতেই তোমার শরীর খারাপ—'

'ওরা যে বলল।'

'ওরা বললেই তুমি খাবে?'

BanglaBook.org

'আমি এতক্ষণ খাচ্ছিলুম, কিন্তু টের পাইনি।'

'চলো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চলো।'

'আমার ভীষণ গরম লাগছে।'

'এত শীতের মধ্যে তোমার গরম লাগছে? জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব?'

সুরযলাল খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। সে উঠে এসে বলল, 'না, না, ভাবীজি, এখন পানি লাগালে অচানক ঠান্ডা লেগে যাবে। আপনি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিন। সুখেনদাদা, ভয় পাবেন না। থোড়া বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। এরকম সবারই এক-এক দিন হয়।'

সুখেন অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আমার এতক্ষণ কিছু হয়নি, হঠাৎ এরকম হল কেন? শেষ গেলাসটায় কিছু মিশিয়ে দিয়েছ নাকি?'

সুরযলাল অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কী মিশিয়ে দেব?'

হরিনাথ বলল, 'তখনই বুঝেছি। যেরকম ঢকঢক করে খাচ্ছিলেন—'

সুখেন তবু বলল, 'কিন্তু এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি। হঠাৎ এরকম হল কেন? নিশ্চয়ই এবার আলাদা কিছু ছিল।'

সুরযলাল বলল, 'কারওর-কারওর এরকম হঠাৎই হয়।'

করবী বলল, 'এতক্ষণ তোমার কিছু হয়নি মানে কী? তোমার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল।'

'মোটেই না।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন ঘরে চলো!'

'আমাকে ওরা কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের কিছু হল না, শুধু আমারই—একা এরকম হল কেন? আমার গা গুলোচ্ছে, অসম্ভব গুলোচ্ছে—'

সুরযলাল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'দাদা আমাদের নামে মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। আপনাকে বললাম, আস্তে-আস্তে খেতে—'

সুখেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'আস্তে-আস্তেই তো খেয়েছি! আগেরগুলোতে আমাকে শুধু জল দিয়েছ। আমি খেয়েই বুঝেছি স্রেফ জল। কিন্তু শেষবারটায়, ওঃ, গলা জ্বলে যাচ্ছে—কী দিয়েছিলে বলো! বিষ খাইয়েছ আমাকে!'

'আপনি কী বলছেন? যান গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন, সব ঠিক হয়ে যাবে!'

'চোপ! আমি সব জানি!'

করবী জোর করেই স্বামীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল খাটে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল মুখ। খাটে শুয়ে-শুয়েই মাটির দিকে মুখ নীচু করে বমি করল সুখেন। সে সব পরিষ্কার করল করবী।

তারপর বলল, 'আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো।'

সুখেন চিৎকার করে বললে, 'না ঘুমোব না। ওরা আমাকে কী খাইয়ে দিয়েছে? বলো! বলো!'

করবী বলল, 'তুমি খেতে গেলে কেন? তুমি কি কচি খোকা? তোমাকে জোর করে খাওয়াতে পারত কেউ?'

'তা বলে যা-তা কিছু একটা খাইয়ে দেবে?'

'চুপ। আস্তে কথা বলো।'

'কেন, আমি আস্তে কথা বলব কেন? আমি কি কাউকে ভয় করি?'

'সেকথা হচ্ছে না। এখন না ঘুমোলে তোমারই আরও শরীর খারাপ হবে।'

'আমার শরীর খারাপের জন্য তুমি তো ভারী কেয়ার করো। আমাকে ওরা বিষ খাইয়ে দিল, তুমি কিছু বলতে পারলে না?'

'আমি তোমাকে ওসব ছাইভস্ম খেতে বারণ করিনি?'

BanglaBook.org

'কোথায় বারণ করলে? শেষ গেলাসটা খাওয়ার আগে আমি তোমার চোখের দিকে তাকালাম। তখন তুমি আমাকে বারণ করতে পারতে না?'

'করিনি?'

'না, করোনি! তুমি দেখছিলে, আমি খাই কিনা! সেইজন্যই তো আমি খেলাম?'

'তুমি খুব বুঝেছ তাহলে!'

সুখেনের কথাবার্তা অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনওদিন সে করবীকে ধমকায় না, তার নামে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানায় না। আজ সে বেপরোয়া। চোখদুটো লাল। হেঁচকি ওঠা এখনও বন্ধ হয়নি।

করবীর হাতটা চেপে ধরে সুখেন আস্তে-আস্তে দৃঢ় গলায় বলল, 'সত্যি করে বলো তো, সুরযলাল এখানে যে আজ থাকবে, তুমি আগে থেকেই জানতে, না?'

'বাঃ, আমি তা জানব কী করে?'

'নিশ্চয়ই জানতে! সেই জন্যই আজ এখানে আসার জন্য তোমার এত গরজ!'

'কী যা তা বলছ। গরজের আবার কী আছে। বৃষ্টি পড়লেই তো এখানে আসি।'

'আজ আমার শরীর খারাপ, আসতে চাইনি—তাও তুমি জোর করে—'

'শরীর খারাপ নিয়েও তুমি ওইসব খেলে? তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই!'

'আমি না খেতে চাইলেও ওরা আমাকে জোর করে খাওয়াত!'

'আজেবাজে কথা বোলো না। এখন ঘুমোও।'

'আমি আজেবাজে কথা বলছি? আমি সব বুঝি! সুরযলাল যে এখানে আসবে, তা তুমি খুব ভালো করেই জানতে। তাই তুমি জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। আমি জানি, আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে না। আমি জেগে থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে—তাই আমাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে—'

'আমি তো এসেই ওদের দেখে বলেছিলাম, তুমি ওদের চলে যেতে বলে দাও! তখন বললে না কেন?'

'আমি বললেও ওরা শুনত না। তুমি ওদের আসতে বলেছ—আমার কথা ওরা শুনবে কেন! আমার কথা কেউ শোনে না! আমায় কেউ ভালোবাসে না!'

'আচ্ছা পাগলামি করছ তো আজ। আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি এসব কিছু জানতাম না—এবার তোমার বিশ্বাস হবে?'

সুখেন হঠাৎ হু-হু করে কাঁদতে আরম্ভ করল। অবোধ শিশুর মতন বারবার বলতে লাগল, 'আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না! তুমি আমাকে ভালোবাসো না!'

করবী ধৈর্য ধরে ভিজে তোয়ালে দিয়ে আবার মুখ মুছিয়ে দিল সুখেনের। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অস্ফুট গলায় বলল, 'শোনো, তাকাও আমার চোখের দিকে। কিছু দেখতে পাচ্ছ না! বুঝতে পারো না, আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি?'

'সত্যি-সত্যি বলছ?'

'তিন সত্যি করব?'

'আমার গা ছুঁয়ে বলো।'

'এই তো গা ছুঁয়ে বলছি।'

'না, পুরোটা বলো। আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে রেখে বলো, আমি তোমায় ভালোবাসি। যদি মিথ্যে কথা বলো, তাহলে আমি মরে যাব।'

'এই যে বলছি, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

করবীর হাতখানা বুকে চেপে রেখে সুখেন আবার কাঁদতে লাগল।'

BanglaBook.org

গল্প থামিয়ে আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মেয়েদের মন বোঝা খুব শক্ত। হয়তো করবী তার স্বামীর কাছে সত্যি কথাই বলেছিল। সে হয়তো সুরযলালের সঙ্গে আগে থেকে কোনও ষড়যন্ত্রই করেনি—সবটাই একটা গোলযোগ। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসে—এবং দুশ্চরিত্রা—একইসঙ্গে এরকম দুটি ব্যাপার থাকা অস্বাভাবিক নয়।'

মাধবী বলল, 'তার মানে? এ আবার কী অদ্ভুত কথা?'

'এরকম অদ্ভুত মানুষও আছে। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসত—যেরকম অধিকাংশ মেয়েই ভালোবাসে। কিন্তু করবীর জীবনটা তার সংসারের ওই ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতেও পারেনি। সেই জন্যই সুরযলালের সঙ্গে—। তা ছাড়া, একটি মেয়ে কি একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না? মেয়েদের ভালোবাসা কি এত কম যে একজনকে দিয়েই ফুরিয়ে যাবে?'

'ওকে ভালোবাসা বলো না। ওর অন্য নাম আছে।'

'কী নাম?'

'তা আপনি ভালোরকমই জানেন।'

'তাহলে ভালোবাসা কাকে বলে—তা নিয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সেটা কিন্তু হবে অ্যাকাডেমিক আলোচনা, সেটা এ-গল্পের সঙ্গে খাপ খাবে না।'

রঞ্জন আমাকে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর গল্পের মধ্যে টীকাটিপ্পনী দিতে হবে না। শুধু গল্পটাই বলে যাও।'

আমি বললাম, 'সুখেনকে যে ওরা বিষ-টিস কিছু খাইয়েছে তা-ও মনে হয় না। প্রথম-প্রথম মদ খেতে গিয়ে লোকে হঠাৎ এইরকম ভাবে আউট হয়ে যায়।

সুখেন করবীর সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক মান-অভিমান করল। তারপর বলল, 'আমি আজ সারা রাত ঘুমোব না।'

করবী বলল, 'বেশ তো ঘুমিয়ো না।'

'দরজা-টরজা সব বন্ধ করে দাও।'

'দিচ্ছি।'

'আলো নিভিয়ে দাও। তুমি এসে শোও আমার পাশে।'

কিন্তু কোনও নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে সারা রাত জেগে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষত বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। করবী সুখেনের কথামতন আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সুখেনের পাশে। সুখেন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আজ একটুও ঘুমোব না। সারা রাত গল্প করব।' কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুখেন ঘুমিয়ে পড়ল।

নেশাগ্রস্ত লোকেরা একবার ঘুমিয়ে পড়লে সাধারণত সারা রাতের মধ্যে আর জাগে না। সুখেনও যদি না জাগত, তাহলে সবকিছুই অন্য রকম হত। পরদিন সকালে আবার সবকিছুই স্বাভাবিক। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা সন্দেহ থেকে যেত মনের মধ্যে—কিন্তু মানুষের জীবনে তাতে বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

বাইরের বারান্দায় বসে হরিনাথ আর সুরযলাল আরও কিছুক্ষণ বসে খেল। ঘরের মধ্যে সুখেন আর করবীর সব কথাই তারা শুনতে পেয়েছে। সুরযলালের মুখখানা গম্ভীর। হরিনাথ কিন্তু বেশ খুশি-খুশি। অন্য কেউ অসুবিধেয় পড়লে তার বেশ আনন্দ হয়।

সুরযলাল ব্যাজার ভাবে বলল, 'কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা! উনি খেলেন কেন? আমরা কি ওঁকে জোর করে খাওয়াতে গেছি?'

হরিনাথ বলল, 'এদিকে শালা কত বারফট্টাই! খেলেও আমার কিছু হয় না। এবার বোঝো, কিছু হয় কি না! আবার বলে কিনা আমরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছি! যত সব নভিসের কাণ্ড!'

BanglaBook.org

'এই হরিয়া, তুই শালা ওকে বেশি-বেশি খাইয়েছিস?'

'মোটেই না! আমি নিজে কম খেয়ে অন্যকে বেশি দেব—আমি তেমন পাত্তর নই! শেষকালে নিজের মাল শর্ট পড়ে যাবে—'

'তাহলে হঠাৎ ওরকম আউট হয়ে গেল কেন?'

'কল্‌জের জোর নেই, শুধু মুখে বড়-বড় কথা।'

'আজ আর জমবে না। চল, ঘর যাই।'

'এত রাত্তিরে ঘর যাব? রামদাস খাবার দিয়া না এখনও। খাবার-টাবার খাই, তারপর আর একটু মাল খাব।'

'আমার আর ভালো লাগছে না।'

একটু বাদে রামদাস এসে গরম-গরম মাংস আর রুটি দিয়ে গেল। সুরযলাল কিছুই খেল না প্রায়, হরিনাথ খেল চেটেপুটে। তারপর গেলাসে আবার মদ ঢেলে দুটো চুমুক দিয়ে বলল, 'আর পারছি না, পেট অ্যাইসা ভরে গেছে। চলো শুয়ে পড়া যাক।'

সুরযলাল কোনও উত্তর দিল না।

হরিনাথ বলল, 'চলো ওস্তাদ, এবার শুয়ে পড়ি? তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে এসো!'

হরিনাথ চলে যাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল একা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত থমথমে। বৃষ্টি থেমে গেছে একটু আগে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারল মলিন চাঁদ। তারপর একটি-দুটি তারা। হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। সুরযলাল গায়ের শালটা জড়িয়ে নিল ভালো করে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে খুব ক্ষীণভাবে খুট করে শব্দ হল দরজা খোলার। সুরযলাল পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। আবার একটা সিগারেট ধরাল। দরজা খুলে বাইরে এল করবী। হালকা পায়ে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সুরযলালের পাশে। কোনও কথা বলল না, সুরযলালের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে টানল দু-একবার। তারপর সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

করবীর গায়ে গরম জামা নেই, শীতে সে কাঁপছে। সুরযলাল নিজের শালটা খুলে এগিয়ে দিল করবীর দিকে। করবী সেটা একসঙ্গে জড়িয়ে নিল দুজনের গায়ে। দুজনে হাত রাখল পরস্পরের কাঁধে।

করবী বলল, 'তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়তে তাহলে জীবনে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতাম না।'

সুরযলাল বলল, 'আমি রাতভর এখানে জেগে থাকতে পারতাম।'

'ওকে অত মদ খাওয়ালে কেন?'

'আমি তো খাওয়াইনি। হরিনাথ খাইয়েছে। আমি একবার শুধু বলেছিলাম।'

'আর কোনওদিন খাওয়াবে না।'

'আচ্ছা।'

'তুমিও এত বেশি খাবে না। আজ খুব বেশি খেয়েছ?'

'এখনও পুরা হয়নি। তুমি এসেছ তো, তাই আর একটু খাব।'

'বৃষ্টি থেমে গেছে। মাঠের মধ্যে একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

'চলো।'

বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ওরা দুজনে। দুজনের গায়ে একই চাদর জড়ানো—যমজ মূর্তির মতন ওরা ঘুরতে লাগল সামনের বাগানে। আকাশে অস্বচ্ছ আলো, হু-হু করছে শীতের

BanglaBook.org

হাওয়া—তার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক ও এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী। বাকি সবাই এখন ঘুমন্ত।

তবু, মাঝরাত্রে সুখেনের নিয়তি তাকে জাগিয়ে দিল। এমননিতেই তার গাঢ় ঘুম, আজ এত নেশা হওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখল বিছানায় অনেকখানি শূন্যতা। ঘর অন্ধকার, অথচ করবী বিছানায় নেই। ঘরের মধ্যে হ্যাজাকটাও করবী ঘুমোতে যাওয়ার সময়ই নিভিয়ে দিয়েছিল—বারান্দার হ্যাজাকটাও এখন নেভানো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সুখেন ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুখেনের তখনও পুরো নেশা, মাথা টলমল করছে। তবু সে খাট থেকে নেমে নিঃশব্দে চলে এল পাশের ঘরে। সে ঘরও অন্ধকার। খাটের ওপর বিশ্রী ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে হরিনাথ।

সুখেন বেরিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দার এক কোণে মেঝের ওপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে করবী, তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সুরযলাল। সুরযলালের হাতে মদের গেলাস, সেটা উঁচু করে দিচ্ছে করবীর মুখের কাছে। করবী আলতো করে চুমুক দিয়ে খানিকটা খেল, তারপর মুখ নীচু করে চুমু দিল সুরযলালের ঠোঁটে।

ওরা এমনই নিশ্চিন্ত এবং ভাবে বিভোর ছিল যে সুখেনের আসার ব্যাপারটা টেরই পায়নি। সুখেন প্রায় এক মিনিট থমকে থেকে ওদের দেখল। যেন সে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিংবা, করবী যেন তার স্ত্রী নয়, অন্য একটি মেয়ে ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে ফেলেছে সে। বৃষ্টি থেমে গেছে, অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়—বারান্দার কোণে ওদের ওই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি এক হিসাবে খুব সুন্দর।

একটি মেয়ে আর একটি ছেলে যদি ওরকম অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে থাকে তাহলে দূর থেকে সেটা লুকিয়ে দেখতে যে-কোনও লোকেরই ভালো লাগবার কথা। একমাত্র নিজের স্ত্রীকে ওই অবস্থায় পরপুরুষের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলে স্বামীর ভালো লাগে না। সুখেন যেন ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি। তাই প্রথমে কয়েক মুহূর্ত সে বিভোর হয়ে তাকিয়ে ছিল সেদিকে। তারপর তার বুকের মধ্যে চড়াৎ করে উঠল।

হঠাৎ সুখেনের চোখ পড়ল চেয়ারের ওপরে রাখা রিভলভারটার দিকে। সেটা তুলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে বিকৃত গলায় বলল, 'খুন করব! আজ দুজনকেই খুন করব!'

ওরা দুজনে ছিটকে সরে গেল দুপাশে। সুরযলাল উঠে দাঁড়াবার আগেই গুলি চালাল সুখেন।

সিমেন্টের মেঝেতে সেই গুলির শব্দ হল প্রচণ্ড। গুলি সুরযলালের গায়ে লাগেনি।

সুরযলাল লাফিয়ে উঠে সুখেনকে ধরার চেষ্টা করল কিন্তু সুখেন ততক্ষণে রিভলভারটা ঠিক ভাবে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। সুরযলাল চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়ান! এ কী করছেন। একটা কথা শুনুন!'

সুখেন আবার গুলি করতে যাওয়ার আগেই করবী এসে তার সামনে দাঁড়াল, হাত তুলে বলল, 'কী করছ, দাঁড়াও! সুরয অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আমি ওর কপালে জল দিয়ে—'

সুখেন উন্মত্তের মতন বলল, 'সরে যাও! আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি আগে ওকে মারব। তারপর তোমাকেও—'

করবী সুরযলালকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি ভুল দেখেছ। পাগলামো কোরো না—তুমি খুনের দায়ে পড়বে—'

'আমার ফাঁসি হোক। কিছু যায় আসে না। আমি ভুল দেখেছি? আমি চিরকালই ভুল দেখি। সরে যাও—'

'না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারো আগে। সুরয, তুমি চলে যাও—'

'সর হারামজাদি—'

'না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারতে চাও মারো—।'

BanglaBook.org

করবীর এইটুকু বিশ্বাস আছে যে সুখেন কিছুতেই তার ওপর গুলি চালাতে পারবে না। যত অন্যায় করুক, তবু করবীর ওপর সুখেনের সাঙ্ঘাতিক দুর্বলতা। সুখেন পিস্তলটা হাতে ধরে, 'সরে যাও, সরে যাও' করছে, কিন্তু গুলি চালাতে পারছে না। তার হাত কাঁপছে। করবী এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে সুখেনের দিকে। অসম্ভব তার মনের জোর, এগোতে-এগোতে সে বলছে, 'সুরয, তুমি পালিয়ে যাও, তুমি পালিয়ে যাও—।'

প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে হরিনাথও জেগে উঠেছিল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে। সে আছে সুখেনের পেছন দিকে। করবী তাকে চোখের ইশারায় বলার চেষ্টা করল, পেছন থেকে সুখেনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিতে। কিন্তু হরিনাথের সে সাহস নেই।

করবী সুখেনের একেবারে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওটা আমাকে দিয়ে দাও।'

সুখেন বলল, 'সরে যাও! খুন করে ফেলব। একদম খুন করে ফেলব আজ! হারামজাদি—'

সুরযলাল পালিয়ে যায়নি। সে বলল, 'সুখেনদাদা, ওটা রেখে দিন। আমি আপনাকে সব কুছ বলছি। মাথা খারাপ করবেন না—'

সুখেন বলল, 'আমি তোমাকে খুন করব, শয়তান কাঁহাকা!'

করবী বলল, 'তাহলে আগে আমাকে মারো। আমাকে মারছ না কেন? এই তো আমি এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—'

'তোমাকেও মারব। দুজনকেই একসঙ্গে। আগে ওই কুত্তাটাকে—'

তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। সুখেন করবীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না। করবীই ধরে ফেলেছে তাকে, অন্য হাত দিয়ে করবী খপ করে কেড়ে নিতে গেল রিভলভারটা, সুখেন সেটা সরিয়ে জোরে চেষ্টা করতেই গুলি ছুটে গেল। গুলি ফুঁড়ে গেছে সুখেনের গলা দিয়ে। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। রিভলভারটার শব্দ হল ঠক করে।

হরিনাথ তক্ষুনি দৌড়ে এসেছে বাইরে। একটি কথাও না বলে হরিনাথ ছুটতে লাগল মাঠ ভেঙে। সুরযলাল এগিয়ে এল, করবীর কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'মর গয়া? তুমি মেরে ফেললে? একদম মেরে ফেললে?'

করবী হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে সুখেনের পাশে। সুখেনের প্রাণ বেরিয়ে গেছে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে। আর একটা কথাও সে উচ্চারণ করতে পারেনি। গলার ক্ষত থেকে, মুখ থেকে রক্ত তখনও বেরোচ্ছে গলগল করে। একটু আগে মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এখন আর তাকে চেনাই যায় না।

করবী মুখ নীচু করে বলল, 'এ কী? মরে গেল? একদম মরে গেল?'

সুরযলাল বলল, 'তুমি রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারলে না শুধু? তুমি ওকে মেরেছ কেন?'

করবী রক্তহীন বিবর্ণ মুখে সুরযলালের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি মেরে ফেললাম? আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইলাম, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম—এখন তুমি বলছ, আমি মেরে ফেলেছি?'

পাগলের মতন হয়ে গেল করবী, সুরযলালের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে গুম-গুম করে কিল মারতে লাগল। সুরযলাল অতি কষ্টে তাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শান্ত করলে একটু, তারপর দুজনে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল, দেখল সুখেনের দেহ। মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনও উপায়ই নেই। ওরা দুজনে ঘোর-লাগা চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে। করবী বলল, 'সব শেষ। আমার এখন কী হবে?'

সুরযলাল করবীকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর বলল, 'চলো, আমরা জলদি এখান থেকে চলে যাই।'

BanglaBook.org

করবী বলল, 'চলে যাব? তারপর ওর কী হবে?'

'সেসব পরে ব্যবস্থা করলেই হবে। এখন চলো।'

কিন্তু সূরযলালের চেয়ে করবীর বুদ্ধি বেশি। সে বুঝতে পেরেছিল, এইভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় না। পালাবার আগে একটা কিছু প্ল্যান ঠিক করে নিতে হবে।

ততক্ষণে চৌকিদার রামদাস এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সূরযলাল বলল, 'আমাদের বাঁচতেই হবে।' তারপর রামদাসের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা ফাঁস করবি তো তোর জবান ছিঁড়ে দেব!'

এরপর করবী আর সূরযলাল একসঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। কেউ কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।'

কথা থামিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। ভালো করে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এর পরের ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে। মৃতদেহটা সরানোই ওদের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ডাকবাংলোর আশেপাশে কোথাও পুঁতে ফেলতে সাহস করেনি। ডাকবাংলোর কাছে খোঁজাখুঁজি হবেই। জিপগাড়িটা নিয়েও মুশকিল, ওটা সরাতেই হবে, কিন্তু কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। সবকিছু ধুয়ে মুছে ওরা পরিষ্কার করে রাখল। ডেডবডিটা লুকিয়ে রাখল খাটের নীচে। ঠিক হল, পরের রাত্তিরে সব ব্যবস্থা হবে। করবী ওইখানেই রয়ে গেল, সূরযলাল গেল সব ব্যবস্থা করতে। সূরযলাল আর না ফিরতেও পারত। সূরযলালের টাকাপয়সা আছে অনেক। ওইসব জায়গায় টাকাপয়সার জোরে অনেক কাজ হাসিল করা যায়। সূরযলাল টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করে নিজে যদি সবকিছু অস্বীকার করত, তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা খুব সহজ হত না। কিন্তু সূরযলাল তা করেনি। সে ফিরে এসেছিল। ইতিমধ্যে কর্নেল সেন সেখানে হাজির হয়েই সব গোলমাল পাকিয়ে দিলেন। একে উনি মিলিটারির লোক—এবং ওঁর সঙ্গেও রিভলভার। ওঁকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। আমার ধারণা, কর্নেল সেন যখন প্রথম ডাকবাংলোটাতে হাজির হন, তখন করবী চৌকিদারের ঘরেই লুকিয়ে ছিল। কী, ঠিক বলছি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'তোমার বর্ণনা মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হয়। অন্তত বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি বলছ খুনটা আসলে অ্যাকসিডেন্ট? ওরা কেউ খুন করেনি?'

রঞ্জন বলল, 'ভেরি অনলাইকলি। সুনীল যেভাবে চরিত্রগুলো এঁকেছে, তাতে মনে হয়, ধরা পড়লেও ওরা কেউ চট করে সুখেনকে খুন করবে না। তার কোনও দরকার ছিল না। রিভলভারটা যদি ওখানে না থাকত—আচ্ছা, রিভলভারে কারও হাতের দাগ পাওয়া যায়নি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'সে হাতের দাগের কোনও মূল্য নেই। ওদের তো ও সম্পর্কে আইডিয়া নেই—তাই রিভলভারটা ওরা সবাই ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। সবারই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। সুতরাং ও থেকে কিছু প্রমাণ করা যায় না।'

মাধবী বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট বাজে কথা। আমি বলছি, ওই করবীই খুন করেছে। আগে থেকে প্ল্যান করেই খুন করেছে।'

আমি হাসলাম। রঞ্জন বলল, 'তোমার করবীর ওপর খুবই ঘেন্না দেখছি। এখনও তুমি ভাবছ, ওই করবীই নিজের হাতে ইচ্ছে করে তার স্বামীকে খুন করেছে? আমার কিন্তু মেয়েটাকে অত খারাপ মনে হয় না। তা ছাড়া, স্বামীকে খুন করার দরকার কী? ও তো অনায়াসেই সুখেনকে ছেড়ে সূরযলালের সঙ্গে থাকতে পারত। অনেক বিবাহিতা মেয়েরা করে না এরকম? এজন্য কি খুন করার দরকার হয়?'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'মামাবাবু, আপনি এবার সত্যি করে বলুন তো, ওই মেয়েটাই খুন করেনি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'প্রকৃতপক্ষে ওদের দুজনের মধ্যে কে খুন করেছে, তা শেষ পর্যন্ত

BanglaBook.org

কিছুতেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সুনীলের অ্যাকসিডেন্টের থিয়োরিটাই ঠিক হতে পারে। এমনকী আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। করবী আর সূরযলাল দুজনেই শেষপর্যন্ত বলে গেছে যে সুখেন আত্মহত্যা করেছে। এই কথা থেকে একচুলও নড়েনি। রিভলভার থেকে দুটো গুলি খরচ হয়েছিল। একটা গুলি সুখেনই ছুড়েছিল সূরযলালের দিকে। গায়ে লাগেনি। সূরযলাল রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করে এরকম একটা থিয়োরিও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তাতে সূরযলালের ওপর ঠিক হত্যার অভিযোগ আসত না, কিন্তু সূরযলাল সে-কথা কিছুতেই স্বীকার করেনি। সে বারবার বলেছে, সুখেন আত্মহত্যা করেছে—তার বা করবীর ওতে কোনও হাত নেই। মৃতদেহটা লুকোবার চেষ্টা করেছিল কেন? ওরা ভয় পেয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলেছিল—এই ওদের বক্তব্য।

বিচারের সময় ওদের যদি দেখতে তোমরা। করবী আর সূরযলাল পরস্পরের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকত শুধু, যেন পরস্পর এক সাঙ্ঘাতিক বন্ধনে বাঁধা। আর কারও সঙ্গে একটাও কথা বলত না, কোনওরকম অপরাধী বা অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থীর ভাব ছিল না তাদের মধ্যে। সরকার পক্ষের উকিল ওদের জেরা করে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। এমন সব জঘন্য অভিযোগ এনেছে দুজনের নামে যে, তা কল্পনা করা যায় না। সূরযলাল আরও তিন-চারটি দুশ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গে নাকি কত কী কাণ্ড করেছে—এসব কথাও বলেছে করবীর সামনে, তবু ওরা এক চুলও বিচলিত হয়নি। পরস্পরের নামে কক্ষনও কোনও দোষারোপ করেনি। শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতন দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকত।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'শেষ পর্যন্ত ওদের শাস্তি হয়নি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। খুনের অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। অন্যান্য সব কারণ মিলিয়ে করবীর জেল হল তিন বছর, আর সূরযলালের পাঁচ বছর। করবী আড়াই বছর পরেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। সূরযলাল তখন আবার একটা ভুল করে। এমনিতে ছটফটে স্বভাবের মানুষ, করবী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর নিশ্চয়ই কোনও উপায়ে ওর কাছে পৌঁছেছিল। ও তখন জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। ধরাও পড়ে যায়। তাতে ওর শাস্তি বেড়ে যায় আরও কয়েক বছর। জানি না আর কোনওদিন ওদের দুজনের দেখা হয়েছে কিনা।

করবী জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াবে আর ও জেলের মধ্যে বন্দি থাকবে, এই চিন্তা বোধহয় সূরযলালের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না।'

একটুক্ষণ আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। রঞ্জন বলল, 'আচ্ছা মামাবাবু, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন। সুনীল এমনভাবে করবী আর সূরযলালের কথা বলে গেল, যেন ও একেবারে সবসময় ওখানে উপস্থিত ছিল ওদের সঙ্গে...ডায়ালগ পর্যন্ত।'

আমি বললাম, 'ওটা লেখকদের লাইসেন্স! কোনও ছেলে আর মেয়ে যখন কোনও নির্জন জায়গায় বসে কথা বলে, তখন কি কোনও লেখক আড়াল থেকে তাদের কথা শোনে? কিংবা তাদের পাশে গিয়ে বসে থাকে? তবু, ওদের সেই নির্জনে বসে থাকা ও কথাবার্তা হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয় কী করে? লেখকরা মানুষের চরিত্র স্টাডি করে। তারপর সেই চরিত্রের অনুযায়ী লেখকরা তাদের প্রেমের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি ওদের ব্যাপারটা ঠিক বানাইনি, বলতে-বলতে এমনিই মনে আসছিল, যেন হুবহু হত্যাকাণ্ডটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং সত্যি কথা বলতে কী জানিস, করবী মেয়েটার ওপর আমার খানিকটা সহানুভূতিও এসে যাচ্ছিল।'

মাধবী ভঙ্গি করে বলল, 'তা তো আসবেই! পুরুষ তো!'

কর্নেল সেন বললেন, 'করবী মেয়েটির মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু ছিল। তাকে নিছক একটা খারাপ মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরে থেকে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেলে ও হয়তো বড় একটা কিছু করতে পারত। এই ধরনের মেয়েকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অনেক বড়-বড় কাণ্ড ঘটে। ওর প্রতি খানিকটা সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমারও বোধহয় একটু-একটু আছে—

BanglaBook.org

যদিও আমার জন্যই ওরা ধরা পড়েছিল।

তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। করবীর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল। ওই ঘটনার বছর পাঁচেক পর। লছমনঝোলায় এক মহিলাকে আমার হঠাৎ খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটের একবারে শেষ ধাপে জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—লাল পাড়ের গরদের শাড়ি পরা, একগোছা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। বোধহয় ওই চুল দেখেই আমি চিনতে পারলাম। করবী। ওকে দেখে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার জন্যই ওর জীবনে একটা বিপর্যয় এসেছে। আমাকে ওর পছন্দ করার কথা নয়। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ডেকে বললাম, 'এই যে, শুনুন।'

তখন তার চেহারা একটুও খারাপ হয়নি, আকর্ষণীয়। মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমাকে চিনতে না পারার কথা নয়, কিন্তু সেরকম কোনও ভাব দেখাল না। চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দু-এক পলক, বড় অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। তারপর জলের মধ্যে নেমে গেল। জানো তো ওখানকার গঙ্গায় কীরকম স্রোত, তার মধ্যেই সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল অবলীলাক্রমে। আমি কোনও কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

তবে, আমার ধারণা ওই মেয়ে যেখানেই থাকবে, আশেপাশের লোকের জীবনে বিপদ ডেকে আনবে। কিছু দিন বাদেই লছমনঝোলায় একজন ব্যবসায়ী খুন হয়। আমার বিশ্বাস করবী সেই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। সেবারে অবশ্য আমি আর গোয়েন্দাগিরি করতে যাইনি।

তারপর তো অনেক বছর কেটে গেছে—করবী বেঁচে থাকলে এখন তার যথেষ্ট বয়স। কিন্তু এখনও আমার মাঝে-মাঝে তার সেই চেহারাটা মনে পড়ে। সেই সকালবেলা স্নান করার পর চুল খোলা, জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।'

রঞ্জন উঠে গিয়ে জানলার পরদা সরিয়ে দিল। বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ভোর হয়ে এসেছে। আলো ফুটেছে।'

কর্নেল সেনও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, তাহলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যাক। অনেক দিন সূর্য ওঠা দেখিনি।'

BanglaBook.org

ছায়া-ছায়া রাতে

BanglaBook.org

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

আর ভালো লাগছে না কলকাতা।

ভীষণ একঘেয়ে লাগছে বাসবের। বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।

মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনস্রোতের চাপে ও যেন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। কাজেও মন বসাতে পারছে না আর।

তাছাড়া বাসব ক্লান্ত—ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে বেশ কিছুদিন ধরে। অবশ্য ক্লান্তিবোধটা তখন ওর মনে হয়নি। সম্প্রতি জটিল এক খুনের তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটানোর পরই—অর্থাৎ হাতের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মনে হচ্ছে আর কলকাতায় নয়। এখন দূরে কোথাও গিয়ে এই ক্লান্ত শরীরকে দিতে হবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

কোথায় যাওয়া যায়?

এই বিরাট দেশে যাওয়ার জায়গার অবশ্য অভাব নেই, তাই বাসব ভাবছে। ঠান্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে সবে, কাজেই কোনও হিল স্টেশনে যাওয়া চলবে না। তবে—।

হঠাৎ বাসবের মনে পড়ে গেল হীরকের কথা।

হীরক চৌধুরী। ওর বাল্যবন্ধু।

আগ্রায় থাকে সে।

এক্সপোর্ট ইমপোর্টের বিরাট ব্যাবসা আছে তার।

বহুবারই হীরক আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাসবকে আগ্রায় বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সময় করে উঠতে পারেনি বাসব। একটা-না-একটা কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে থেকেছে।

মাস ছয়েক আগে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল ওদের।

হীরক এসেছিল কলকাতায়।

বেশ অভিমানের সুরেই বাসবকে বলেছিল, জানি, তুমি এখন একজন মস্ত মানুষ। আমার মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব রাখতে চাও না।

কেন, তোমার মনের মধ্যে এ ধারণা কেন বদ্ধমূল হল হীরক? বাসব প্রশ্ন করেছিল।

না হওয়ার, তো কোনও কারণ নেই। বন্ধুত্বটা যদি সত্যি তুমি আমার সঙ্গে বজায় রাখতে চাইতে, তাহলে এতদিনে কি একবার তোমার পক্ষে ঘুরে আসা সম্ভব হত না?

উচ্চহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুলেছিল বাসব। বলেছিল, এ কিন্তু তোমার রাগের কথা। সময় নেহাতই করে উঠতে পারিনি, তাই, নইলে একবার আগ্রায় গিয়ে পড়তে পারলে তুমি ভেবেছ সহজে আমায় তাড়াতে পারবে—।

ও ধরনের কথা তো আমি অনেকদিন ধরেই শুনেছি। হীরক বলল, আসছ নাকি সামনের শীতে?

নিশ্চয়ই। এবার আর আমার কথার নড়চড় হবে না দেখে নিয়ো।

হ্যাঁ, আর ভেবে লাভ নেই।

বাসব আগ্রায় যাবে। বহু দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে মানুষ তাজমহল দেখতে যায়। আর ও সামান্য কলকাতা থেকে আগ্রায় এতদিনে গিয়ে উঠতে পারেনি।

হীরকের রাগ করাটা অন্যায় নয়।

বাসব কালবিলম্ব না করে হীরককে একটা টেলিগ্রাম করে দিল। তারপর স্যুটকেশ আর হোল্ডঅল নিয়ে চেপে বসল গিয়ে তুফান এক্সপ্রেসে।

ট্রেনে খুব বেশি ভিড় ছিল না। সহজেই তাই রিজার্ভেশন পাওয়া গিয়েছিল।

ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট। একটা বার্থ খালি ছিল। বাসব ছাড়া আর দুটো বার্থে দুজন মারোয়াড়ি

BanglaBook.org

ভদ্রলোক ছিলেন। খালি বার্থটাও অবশ্য সম্পূর্ণ খালি নেই। পাটনা থেকে আগ্রা অবধি রিজার্ভ হয়ে রয়েছে ওটা।

বাসব নিজের বার্থে একটা ক্রাইম-ফিকশান নিয়ে আড় হয়ে শুলো। দুরন্ত গতিবেগ নিয়ে তখন আপ তুফান এক্সপ্রেস স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করে চলেছে।

প্রায় রাত দশটার সময় তুফান এক্সপ্রেস পাটনায় এসে থামল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কামরায় প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। দীর্ঘকায় স্যুট-পরিহিত যুবক শ্রেণীর ভদ্রলোকটি চতুর্থ বার্থের অধিকারী, বাসব অনুমান করল।

ভদ্রলোক ফেল্টের হ্যাটটা হুকে আটকে, টাই-এর বন্ধনটা ঢিলে করতে-করতে নিজের বার্থে গিয়ে বসলেন।

বাসব আগেই দরজার বাইরে আটকানো স্লিপে ভদ্রলোকের নামটা দেখে রেখেছিল—অজয় সোম।

ট্রেন আবার গতি নিল।

অজয় সোম গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ম্যাচবক্স আপনার কাছে আছে?

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক দুজন নিদ্রিত ছিলেন। কাজেই প্রশ্নটা যে ওকেই করা হয়েছে, বাসব বুঝতে পারল।

ও পকেট থেকে ম্যাচবক্সটা বার করে এগিয়ে ধরল।

এই সূত্রে জমে উঠল আলাপ।

অজয় সোম পেশায় অ্যাটর্নি।

কথা প্রসঙ্গে হীরকের কথা উঠতেই তিনি জানালেন, হীরক চৌধুরীকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। তার বাড়িতে যাওয়া-আসা আছে তাঁর। উপস্থিত তিনি আইনঘটিত ব্যাপারে পাটনা গিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে।

আজ ফিরছেন।

বাসবের পরিচয় পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হলেন অজয় সোম। খবরের কাগজের দৌলতে ওর কার্যকলাপের বিষয়ে অনেক কিছুই জানা ছিল তাঁর।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট ছিল ট্রেনটা। মেকআপ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত কুড়ি মিনিটে এসে দাঁড়াল, যখন আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করছে তুফান এক্সপ্রেস।

হাসিমুখে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল হীরককে। সে এসে বাসবকে জড়িয়ে ধরল।

স্টেশনের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

দশ মিনিটের বেশি লাগল না হীরকের বাড়ি পৌঁছতে।

চমৎকার বাড়িখানা। সম্পূর্ণ বিদেশি কেতায় সাজানো।

অকৃতদার হীরক এখানে একলাই থাকে।

পরের দিন থেকেই আগ্রার দ্রষ্টব্যগুলো একে-একে দেখতে আরম্ভ করল বাসব। মমতাজের অমর স্মৃতি তাজের বুঝি আর তুলনা নেই। বাসব চাঁদের আলোয় অপরূপ তাজমহলকে প্রাণ ভরে দেখেছে।

BanglaBook.org

মেহরোত্রা বিল্ডিংএর চারতলার দুখানা ঘর নিয়ে অজয় সোমের চেম্বার। অবশ্য চেম্বারের ঠিক পিছনে আরও দুখানা ঘর আছে প্রাইভেট ইউজের জন্যে।

ওতেই থাকেন অজয় সোম। একাই থাকেন।

তিনি অবিবাহিত। আগ্রায় বাঙালি মহলে সুপাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। মেয়ের বাপেদের আনাগোনা একরকম তাঁর কাছে নিয়মিত ছিল। অনেক লোভনীয় অফারকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। বিয়েতে তাঁর অনিচ্ছা থাকার দরুণ যে তিনি এরকম করেছেন তা নয়, আসলে নিজের পত্নী নির্বাচন অজয় সোম করে ফেলেছেন, কাজেই অন্যত্র বিয়ে করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু তিনি আগ্রার অধিবাসী নন। এখানে একরকম উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বলা চলে।

গয়ার লোক অজয় সোম। পড়াশুনো করেছেন কলকাতায়। তাঁর বাবা বিজয় সোম, গয়ার জজকোর্টে কাজ করতেন। সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করলেও, শেষ বয়েসে তিনি বড়বাবু হয়েছিলেন।

কাছারির কোনও-কোনও দপ্তরের বড়বাবুদের হাতে কাঁচা পয়সা আসার প্রচুর সুযোগ থাকে। বিজয় সোমও সে সুযোগে বঞ্চিত ছিলেন না।

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রচুর কালো পয়সা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

অজয় সোম নিজের কলেজ জীবন শেষ করার মাস দুয়েকের মধ্যেই বিজয় সোম মারা গেলেন। স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন। আর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না তাঁর।

পৃথিবীতে অজয় সোম তখন সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু তাঁর অসহায়তাকে কাটিয়ে দিল বিজয় সোমের অপর্যাপ্ত অর্থ। গয়াতেই তিনি নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করলেন। চেম্বার খুলে বসলেন।

একটি বছর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করার পরও কোনও মক্কেলের সাক্ষাৎ তিনি পেলেন না। অজয় সোম বুঝলেন এখানকার ব্যবসা তাঁকে এবার গোটাতে হবে। কিন্তু করবেন কী তিনি? চাকরি? চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকার পর চাকরির বন্ধন কি তাঁর সইবে?

এইরকম মনের অবস্থা নিয়ে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি সত্যই একদিন চেম্বার বন্ধ করে দিলেন। এবং বেরিয়ে পড়লেন গয়া থেকে। অনির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে পড়লেন।

পরবর্তী কালে অজয় সোমকে দেখা গেল আগ্রার বিশিষ্ট অ্যাটর্নি রূপে। তিনি এখানে এসে কীভাবে যে নিজের ব্যাবসা জমিয়ে ফেললেন সে আরেক ইতিহাস।

বেলা তখন সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে। মিঃ সোম নিজের চেম্বারে বসে একমনে কাজ করে চলেছেন।

এই সময় সুইংডোর ঠেলে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘাড় তুলে তাঁকে দেখতে পেয়েই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ সোম।

প্রৌঢ়-ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললেন, বসো, বসো অজয়—।

অজয় সোম বসলেন।

এখানে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়াটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। ইনি বঙ্কিম রুদ্র। আগ্রার সুবিখ্যাত চিকিৎসক। ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী।

বঙ্কিম রুদ্র পকেট থেকে একটা সিগার বার করে নিজের মুখে গুঁজে দিলেন। তারপর লাইটারের সাহায্যে তাতে অগ্নিসংযোগ করে, মন্থরভাবে অল্প একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, খুব ব্যস্ত ছিলে নাকি?

আজ্ঞে, ভাল্লা এস্টেটের প্রপার্টির ব্যাপারটা নিয়ে—

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা কী হল?

প্রায় কম্প্রোমাইজ হয়ে এসেছে। আর দু-একটা সিটিং-এর পরই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যাবে আশা করছি।

হুঁ। ভাল্লা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। যাক, এই মূল্যবান প্যাকেটটা রেখে দাও।

ডাঃ রুদ্র নিজের পকেট থেকে একটা সিল করা সরু খাম বার করে অজয় সোমের

BanglaBook.org

হাতে দিলেন।

আপনাকে আজ কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?—প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মিঃ সোম বললেন।

মনটা বিশেষ ভালো নেই। বহুদিন পরে আজ চন্দ্রকান্তর কথা বারবার মনে পড়ছে।

কে চন্দ্রকান্ত?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র।—চিনবে না তুমি তাকে। আজকের আমার এই বৈভবের মূলে সে আছে, অজয়। তবু আমি তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কই, পারি না তো।

আত্মগত ভাবেই কথাটা বললেন তিনি।

মিঃ সোম আর কিছু বললেন না। অনুমান করলেন, যে-কোনও কারণেই হোক ডাক্তারের মেজাজ আজ ভালো নেই।

সিগারটা নিভে গিয়েছিল। পকেট থেকে লাইটার বার করে আবার সিগারে অগ্নিসংযোগ করলেন ডঃ রুদ্র। বললেন, আমি এখন উঠলাম। প্যাকেটটা যত্ন করে রেখে দিয়ো।

তিনি আর কিছু না বলে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। অজয় সোম। তারপর নিজের দৃষ্টি সরিয়ে আনলেন ওয়াল ক্লকটার দিকে।—একটা পাঁচ।

লাঞ্চ-টাইম হয়ে গেছে।

পাশের ঘরের আর্টিকল ক্লার্করা এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেতে চলে গেছে। তাঁর লাঞ্চ অবশ্য রেডি আছে। ওপাশের জলি-বোর্ডের দরজাটা ঠেলে ভেতরে গেলেই হয়।

মিঃ সোম ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে ফেললেন। তারপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গেলেন লাঞ্চের উদ্দেশে।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

বহুক্ষণ আগেই নিজের টেবিলে ফিরে এসেছেন অজয় সোম। এতক্ষণ একটার পর একটা টেলিফোন রিসিভ করে যাচ্ছিলেন তিনি। কোনওটা নিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আবার কোনওটা পুরোনো ক্লায়েন্টের নানা বিষয়ের তাগাদা।

টেলিফোন কলগুলো অ্যাটেন্ড করবার পর অজয় সোমের মনে পড়ল ডাঃ রুদ্রের দিয়ে যাওয়া প্যাকেটটার কথা।

টেবিলের ওপর রেখেই লাঞ্চে গিয়েছিলেন, এখন সেটা আয়রন-চেস্টে তুলে রাখবেন তিনি।

কিন্তু কোথায় প্যাকেটটা?

টেবিলের ওপর প্যাকেটের সন্ধান পাওয়া গেল না। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন মিঃ সোম। বৃথা চেষ্টা—।

সর্বনাশ। এখন কী হবে? মাথায় হাত দিয়ে বসলেন মিঃ সোম।

ক্লায়েন্টের জিনিস হারিয়ে ফেলার মতো গর্হিত কাজ আর কী হতে পারে। বিশেষত ডাঃ রুদ্রের জিনিস।

কেন লাঞ্চে যাওয়ার আগে প্যাকেটটা আয়রনচেস্টে বন্ধ করে দিলেন না। রাগে বিরক্তিতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে অজয় সোমের।

কে নিতে পারে প্যাকেটটা?

ডাঃ রুদ্র চলে যাওয়ার পর ঘরে আর কেউ আসেনি। তাছাড়া দরজার বাইরে বেয়ারা অপেক্ষা

BanglaBook.org

করছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে তার চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

বেল বাজালেন মিঃ সোম। কিন্তু বেয়ারার সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার বেল বাজালেন তিনি। এবারেও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

মিঃ সোম সুইংডোর ঠেলে বাইরে এলেন।

টুল খালি। বেয়ারার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

কোথায় গেল সে? প্যাকেটটা সে-ই কি নিয়ে সরে পড়েছে? কিন্তু কেন? প্যাকেটের মধ্যে কিছু নোটের তাড়া ছিল না। তবে—।

কী করবেন এখন অজয় সোম?

এ নিয়ে বিশেষ চেঁচামেচি করা চলে না—সম্মানের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। জানাজানি হলে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

এই সময় ভয়চকিত মুখে একজন ক্লার্ক ঘরে প্রবেশ করল।

মিঃ সোম মুখ তুলে বললেন, কিছু বলবেন, বিকাশবাবু?

বিকাশবাবু কাঁপা গলায় বললেন, অফিস ঘরের পিছনের প্যাসেজটায় হরিপদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে স্যার।

হরিপদ—অর্থাৎ সেই নিখোঁজ বেয়ারাটি।

সেকী?

তাই তো দেখলাম। মাথার একপাশটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে—।

চলুন তো দেখি।

ব্যস্তভাবে বিকাশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ সোম ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অফিসের কয়েকজন কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সত্যিই মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে হরিপদ। তার কপালের একটু ওপর থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। এরকম অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না অজয় সোম। তাঁরই অফিসে যে একটা রক্তাক্ত ঘটনা ঘটতে পারে, কল্পনার অতীত ছিল তাঁর।

স্যার—।

বিকাশবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন তিনি।

ডাক্তারকে খবর দেব?

নিশ্চয়ই। ডাঃ মিরচান্দানীকে রিং করে দিন। তিনি যেন এখুনি এসে পড়েন।

॥ দুই ॥

সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেল। গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিজের ঘরের হ্যামিংটন চেয়ারে বসে রয়েছেন ডাঃ রুদ্র। শরীর ও মন দুই আজ তাঁর ভালো নেই। তাই চেম্বারে আজ যাননি। মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। মনকে একটু অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করছেন আর কী।

সুমিত্রা—বড় আদরের মেয়ে তাঁর। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর অসীম যত্নে ওকে মানুষ করেছেন তিনি। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে ওর সুনাম আছে।

গল্প-গুজবের পর সুমিত্রা একটা ফরেন ম্যাগাজিন থেকে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা পড়ে শোনাচ্ছিল বাবাকে। ডাঃ রুদ্র সিগারে টান দিতে-দিতে শুনছিলেন।

শুনতে-শুনতে বোধ হয় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সুমিত্রা পত্রিকার পাতা থেকে চোখ তুলে অনুযোগ ভরা গলায় বলল, তুমি কিচ্ছু শুনছ না বাবা। আমি শুধু বকে মরছি।

BanglaBook.org

আমি শুনছিলাম বইকি।

মোটেই শুনছিলে না।

পাগলি মেয়ে।

সকাল থেকেই দেখছি শুধু তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছ। কী এত ভাবছ বাবা?

সিগারটা অ্যাশট্রের ওপর রাখলেন ডাঃ রুদ্র। বললেন, কী আবার!

বলো না কী ভাবছিলে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

কেন জানি না, কয়েকদিন থেকে পুরোনো দিনের বহু ঘটনা বারবার আমার মনে পড়ছে। তাই বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

তোমার শরীরও নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে বাবা। হয়তো দুর্বলতার জন্যেই এই সমস্ত হচ্ছে।

হতে পারে। শরীরে একটু ক্লান্ত ভাব যে এসেছে বুঝতে পারছি।

তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আগ্রার বাইরে থেকে ঘুরে এলে আরও ভালো হয়।

আমি তাই ভেবেছি। কয়েকদিন কলকাতা থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না।

সুমিত্রা হেসে ফেলল, তোমার যেমন কথা! কলকাতায় কেউ হাওয়া বদল করতে যায় নাকি?

ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

ডাঃ রুদ্রর আর কিছু বলা হল না। তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে নিম্নস্বরে কথা বললেন কার সঙ্গে। কথা শেষ করে আবার ফিরে এলেন তিনি নিজের চেয়ারে। বললেন, বেবি, এবার তুমি নিজের ঘরে যাও। আমি একটু একলা থাকব।

এক কাপ ওভাল্টিন এনে দেব বাবা?

ওভাল্টিন আর এখন খাব না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডিনার সেরে ফেলব ভাবছি।

সুমিত্রা আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সামনেই টানা বারান্দা। বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে ওর ঘর।

নিজের ঘরের দিকে ও কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র, চাকর এসে খবর দিল অজয়বাবু ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন।

কী যেন ভাবল সুমিত্রা। তারপর দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল ড্রইং রুমের উদ্দেশে।

অজয় সোম কারপেটের দিকে তাকিয়ে কোচের ওপর বসেছিলেন। সুমিত্রা ধীর পায়ে ঘরে প্রবেশ করল। হালকা গলায় বলল, অ্যার্টনিপ্রবর, কী এত চিন্তা করছেন?

অজয় মুখ তুললেন। বললেন, ভাবছি—।

আপনারা এত কী ভাবেন বলুন তো? বাবাও গোমড়া মুখ করে কী সমস্ত ভাবছেন। আবার আপনিও—।

ঠাট্টা নয় সুমিত্রা। বেশ সিরিয়াস একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

সিরিয়াস?

হ্যাঁ। আজ দুপুরে তোমার বাবা আমাকে সিল করা একটা খাম দিয়ে এসেছিলেন। আমি সেখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছেন, কীভাবে?

ঠিক হারিয়ে যে ফেলেছি, তা নয়। চুরি গেছে।

কী ছিল খামের মধ্যে?

তা তো আমি জানি না। ডাঃ রুদ্র প্রায়ই ওই ধরনের খাম আমার কাছে জমা রাখেন। খামগুলি নাকি মূল্যবান।

BanglaBook.org

এরপর অজয় সোম আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা সুমিত্রাকে বলে গেলেন।

সুমিত্রা অবাক হয়ে বলল, রক্তারক্তি অবধি গড়িয়েছে! পুলিশে খবর দেননি কেন?

জানাজানি হয়ে গেলে আমার ব্যবসার অবস্থা কীরকম শোচনীয় হয়ে উঠবে তা জানো? মক্কেলের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলা গুরুতর অপরাধ। তাছাড়া পুলিশে খবর দিলেই কথাটা ডাঃ রুদ্রর কানে উঠবে। আমার অন্যমনস্কতার দরুন তিনি আমার ওপর অত্যন্ত বিরূপ হবেন।

আচ্ছা, হরিপদর কাছ থেকে তো এ সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে?

তা অবশ্য পারে। কিন্তু এখনও তার জ্ঞান ফিরে আসেনি।

আপনি এক কাজ করলে পারেন।

কী বল তো?

বলছিলেন না, পাটনা থেকে ফেরার পথে ট্রেনে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ্ বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর সাহায্য...।

মন্দ পরামর্শ নয়। তাঁর সাহায্য এক্ষেত্রে অবশ্য নেওয়া চলতে পারে।

মিনিট কয়েক আরও কথাবার্তা বলার পর অজয় সোম উঠে পড়লেন। যাওয়ার আগে অবশ্য সুমিত্রাকে সাবধান করে গেলেন, এই কথাটা যাতে ডাঃ রুদ্রর কানে না ওঠে।

সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।

সন্ধ্যার মুখে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হল।

আজ আর কোথাও বেরুবে না বাসব। এই দুর্যোগে কোথায় বা যাবে। আর সে যাওয়ার আনন্দই বা কী। তাছাড়া বৃষ্টি হওয়ার দরুণ শীত চতুর্গুণ বেড়ে গেছে।

বাসব কম্বল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে খাটের ওপর গদিয়ান হয়ে বসল। সিগারেট ধরাল একটা। হীরক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা বাঁধতে-বাঁধতে বলল, তারপর কী রকম বুঝছ?

বাসব সিগারেটের দীর্ঘটান দিয়ে বলল, খুবই খারাপ বুঝছি ভাই।

কেন?

শুনেছিলাম, উত্তর ভারতের শীত খুবই জোরালো। তবে তার ওয়েট যে এতখানি বুঝতে পারিনি।

আমি কিন্তু বছরের পর বছর এখানে কাটিয়ে চলেছি।

তা কাটাবে না কেন। তোমার গায়ে আছে গন্ডারের চামড়া। ও চামড়া ভেদ করার ক্ষমতা শীতের বাবারও নেই।

দুজনে জোরে হেসে উঠল।

কলিং বেল বেজে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তে।

হীরকের কুর্গি চাকর এসে সংবাদ দিল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। হীরক পার্লারের দিকে গেল। কয়েক মিনিট পরে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল বাসবকে।

অনিচ্ছার সঙ্গে বাসব বিছানা থেকে উঠে পার্লারে আসতেই দেখতে পেল, অজয় সোম বিমর্ষভাবে একটা কোচে বসে রয়েছেন।

হীরক বলল, মিস্টার সোমের সঙ্গে তো তোমার আলাপ আগেই হয়েছে।

বিলক্ষণ। কয়েকশো' মাইল একইসঙ্গে এলাম আমরা। কেমন আছেন, মিস্টার সোম?

ভালোই।

উঁহু, মুখ দেখে তো খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

BanglaBook.org

হীরক বলল, খুবই গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন উনি। তোমার কাছে এসেছেন সাহায্যের আশায়।

সাহায্য?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে—অজয় সোম বললেন, খুবই কুণ্ঠিত হচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি। তবে—।

কুণ্ঠাকে মিথ্যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন মিস্টার সোম। কোনও ব্যাপারে আমার সহযোগিতা আপনার যদি প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই পাবেন। কী হয়েছে বলুন তো?

আমার অফিস থেকে প্রয়োজনীয় একটা খাম চুরি গেছে।

খাম?

অত্যন্ত মূল্যবান খাম।

ও। তারপর—।

অফিস রুমের টেবিলের ওপরই খামটা ছিল। ভেবেছিলাম লাঞ্চে যাওয়ার আগে সেফে রেখে দেব। কিন্তু ভুলে যাওয়ার দরুন—।

লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে দেখলেন খামটা টেবিলের ওপর নেই, এই তো?

হ্যাঁ।

আপনার বেয়ারা কী বলে? আপনি লাঞ্চে যাওয়ার পর ঘরে কেউ ঢুকলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত।

সে দেখতে পেয়েছিল কি না বলতে পারছি না। কারণ কে তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে রেখে গেছে। এখনও তার জ্ঞান হয়নি।

ছুরি-টুরি মেরেছে নাকি?

না। কপালের একটুও পরে কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

হুঁ। বাসব বলল, আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। ভালো কথা, আপনি বলছিলেন, খামটা খুবই মূল্যবান। ওতে কী ছিল?

তা বলতে পারব না। ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র আমার কাছে ওটি জমা রেখেছিলেন অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হিসেবে।

ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র কে?

হীরক এতক্ষণ পরে কথা বলল, আগ্রার সুবিখ্যাত ডাক্তার। তাছাড়া মিঃ সোমের উড বি ফাদার-ইন-ল!

আই সি। কবে ডাক্তার রুদ্র আপনার কাছে খামটা জমা রাখেন?

চুরি যাওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে। মিস্টার ব্যানার্জি এর একটা বিহিত আপনাকে করে দিতেই হবে। নইলে—।

বাসব মৃদু হাসল।

বলল, নইলে ভাবী শ্বশুর মশাইয়ের কাছে আপনার পজিশন বেশ কিছুটা অকোয়ার্ড হয়ে উঠবে। ওয়েল, কাল দুপুরে আমি আপনার অফিসে যাব। দেখি কতদূর কী করা যায়। অজয় সোম উঠে দাঁড়ালেন।

আরেকটা কথা—বাসব বলল, আমি কাল না যাওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার চেম্বারের কোনও কিছু নাড়াচাড়া করবেন না।

বেশ।

অজয় সোম বিদায় নিলেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

BanglaBook.org

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হীরকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি চেনো নাকি ডাক্তার রুদ্রকে?

আগ্রার কে না চেনে তাঁকে।

আমি ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলছি।

আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাই আছে ভদ্রলোকের।

কী সূত্রে? কোনও বড় রকম অসুখে-টসুখে পড়েছিলে নাকি?

না। ব্যবসার সূত্রে। আমার থ্রু দিয়ে বহু ওষুধপত্র বিদেশ থেকে আনিয়েছেন ডাক্তার রুদ্র।

নিজের মেয়ের জন্যে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাত্রই নির্বাচন করেছেন তিনি।

নিশ্চয়ই। অজয় সোমের মতো ছেলে পাত্রের বাজারে সত্যিই বিরল। ওঁর উপযুক্ততা সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনও দ্বিমত নেই।

বাসব আর কিছু বলল না। সিগারেটে বারকতক ঘন-ঘন টান দিল।

হীরক উঠে দাঁড়াল।

বলল, আমি অফিস রুমে যাচ্ছি। একটা স্টেটমেন্ট টাইপ করতে হবে। তুমি ততক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়ার কারিকুরিতে ব্যস্ত থাক।

হীরক পার্লার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাসব চিন্তার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিল। অজয় সোমের খাম চুরি কিন্তু ওর চিন্তার বিষয় নয়। ও ভাবছে, তাজমহলের অপূর্ব কারুকার্যের কথা। মানুষের অন্তরে কত নিখুঁত শিল্প-চেতনা থাকলে, এইরকম একটা স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার নিটোল পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা সম্ভব হয়।

একসময় ওর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

পোর্টিকোতে গাড়ি থামার শব্দ হল। এই দুর্যোগ মাথায় করে আবার কে এল।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে গেল। সত্যি, মূল্যবান একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ি থেমে নামলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। লম্বায় তিনি প্রায় ছ' ফুট হবেন। কালো নিরেট চেহারা। কাঁচায়-পাকায় মেশানো ঘন চুল মাথায়। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

বাসবের দিকে তিনি তাকিয়ে বললেন, আপনি হীরক চৌধুরীর বন্ধু—কলকাতা থেকে এসেছেন?

বাসব বিস্মিত গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। আপনিই তাহলে সুবিখ্যাত বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়?

সুবিখ্যাত কি না জানি না। তবে ওই নামটা আমারই।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে পার্লারের একটা কোচে গিয়ে বসেছেন। বললেন, আমি ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র।

ডাক্তার রুদ্র! বাসবের মনের মধ্যে একটা তীব্র কৌতূহল উঠানামা করতে লাগল। ভদ্রলোক এই সময় এখানে এসেছেন ওরই সন্ধানে নাকি? কেন?

ও বলল, আপনার নাম শুনেছি। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

আমি আপনার কাছে এসেছি বিশেষ প্রয়োজনে। অবশ্য এর দরুন যা পারিশ্রমিক হবে তা আমি দেব।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে আমি সবসময় পরের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি তা নয়। এবার বলুন, আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা,।

ডাঃ রুদ্র চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে এনে রুমাল দিয়ে লেন্স দুটো পরিষ্কার করলেন। তারপর চশমাটা আবার চোখে দিয়ে বললেন, এই দুর্যোগ মাথায় করে কেন আমি এখন এখানে এলাম, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনার তীব্র কৌতূহল হচ্ছে?

BanglaBook.org

স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ আগে আমি আমার মেয়ের কাছে শুনলাম, আপনি কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন। উঠেছেন হীরকের বাড়িতে; তাই কালবিলম্ব না করে এখানে চলে এলাম।

আপনার উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত। কিন্তু এখনও আপনার এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা আমার অজানা।

এবার সে কথাই বলব। আমাকে কেউ মেরে ফেলতে চায়।

॥ তিন ॥

বাসব এ ধরনের কথা আশা করেনি।

ও বিস্মিত গলায় বলল, মেরে ফেলতে চায়?

সেই কথাই বলতে এসেছি আপনাকে। মূর্তিমান মৃত্যু ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

বলেন কী?

কিন্তু আমি বাঁচতে চাই মিস্টার ব্যানার্জি। সুস্থ সবলভাবে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

আপনি অস্থির হবেন না ডাক্তার রুদ্র। প্রকৃত ব্যাপারটা আমায় খুলে বলুন। কে আপনাকে মেরে ফেলতে চায়?

তা তো নির্ণয় করতে পারছি না। মাসখানেক আগে চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানের কাছে ধরতেই শুনতে পেলাম কে বলছে, আপনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছেন ঋণ পরিশোধের জন্যে?

আমি বললাম, কে তুমি—কীসের ঋণ?

উত্তর হল, আপনার স্মরণশক্তির প্রশংসা করতে পারছি না। ঋণ পরিশোধের জন্যে প্রস্তুত থাকুন।—আর কিছু না বলে লাইনটা কেটে দিল সে। এরপর থেকে বহুবার টেলিফোনে আমি এইরকম কথাবার্তা শুনেছি। কয়েকটা চিঠিও পেয়েছি। তাতে আমায় মৃত্যুভয় দেখানো হয়েছে।

বাসব বলল, আপনি একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক। শহরের অন্যান্য ডাক্তাররা হয়তো আপনার প্রতি জেলাস। তাদের মধ্যে কেউ আপনাকে নার্ভাস করবার জন্যে এরকম করতে পারে।

আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কালকের রাত্রের ঘটনার পর আর সে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে পারছি না।

কালকের রাত্রের ঘটনা?

রোজকার মতো কাল রাত্রেও একটা আমি এগারোটার সময় শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কীসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি—বেডরুম ল্যাম্পের আলোটা চোখে সয়ে আসতেই লক্ষ করলাম, একটা ছায়ামূর্তি আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হয়তো চেঁচিয়ে উঠতাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দার বড় আলোটা জ্বলে উঠল। পায়ের শব্দ হল। ছায়ামূর্তিও কাল বিলম্ব না করে আরেক পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল।

হুঁ। বারান্দায় কে এসেছিল সে সময়ে?

আমার ছেলে সঞ্জীব।

আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

না। নিজের প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করে পুলিশের কাছে যাইনি। তারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাসই করবে না। মাঝ থেকে সারা শহরে এই নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। এমনকী আমি নিজের বাড়ির কাউকে বলিনি।

BanglaBook.org

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ডাক্তার রুদ্র—অতীতে আপনি কী কারুর কোনও ক্ষতি করেছিলেন?

ক্ষতি! কই না। এ প্রশ্ন করছেন কেন?

যে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে ঋণ পরিশোধের কথা বলছে, বললেন না? তাই প্রশ্ন করলাম।—হ্যাভ ইট।—বাসব সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরল।

নো, থ্যাঙ্কস।

ডাঃ রুদ্র পকেট থেকে সিগার বার করলেন।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, আপনাকে যে প্রাণে মারতে চায়, নিশ্চয়ই তার এতে কোনও লাভ আছে। অকারণে মানুষ মানুষকে খুন করতে চায় না। আপনি ভেবে দেখুন, কেন সেই অদৃশ্য লোকটি আপনাকে খুন করতে চায়। কোন ঋণ পরিশোধের কথা সে বলছে। এ সম্বন্ধে যদি কোনও ব্যাক রেফারেন্স থাকে তো বলুন?

আমার কিছুই মনে পড়ছে না। সে যদি আমাব কাছ থেকে কিছু টাকা দাবি করে, তাহলেও আমি স্বস্তি পাই। টাকাটা দিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার একটা পন্থা পাওয়া যায়।

এরপর কয়েক মিনিট নীরবে কাটল।

ডাঃ রুদ্র সিগার ধরালেন।

বাসব সিগারেটে কয়েকবার ঘন-ঘন টান দিয়ে বলল, আপনি আমাব কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য চাইছেন?

উপস্থিত আমি আপনার কাছ থেকে সুপরামর্শ চাই।

পরামর্শ। খুব সাবধানে থাকবেন এইটুকু এখন বলতে পারি।

সাবধানেই আছি। বডি গার্ডের মতো একজনকে সবসময় নিজেব সঙ্গে-সঙ্গে রাখছি।

এখনও সে সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ। গাড়িতে অপেক্ষা করছে।

নিউলি অ্যাপয়েন্টেড কেউ?

না। অনেক দিন ধরে আমার কাছে আছে, আমার সেক্রেটারি সুব্রত রায়।

শুনুন, ডাক্তার রুদ্র, আমি একটা কথা ভাবছি।

কী বলুন?

এবার যখন সেই অদৃশ্য লোকটি আপনাকে টেলিফোন করবে, ঋণ পরিশোধের কথা বলবে, আপনি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন। বলবেন, ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন আপনি। কীভাবে এবং কোথায় তা করতে হবে জানালে আপনি খুশি হবেন।

কিন্তু...

ভয় পাবেন না। বাকি ব্যবস্থাটা আমিই করব। শুধু ফোনে কথাবার্তা হওয়ার পরই আমাকে জানাবেন।

ঘড়িতে এই সময় সত্রাসে ন'টা বাজল।

তাই জানাব।

ডাঃ রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি যে বেনামী চিঠিগুলো পেয়েছেন, সঙ্গে তার একখানাও আছে কি?

আছে। আপনাকে দেখাব বলে একটা চিঠি সঙ্গে এনেছি।

তিনি পকেট থেকে খামে মোড়া একটা চিঠি বার করে বাসবের হাতে দিলেন। তারপর বিদায় নিলেন।

বাসব তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

ভদ্রলোক যা কিছু বলে গেলেন সবই কি সত্যি? হয়তো বা! বাসব চিন্তিত মনে হীরকের উদ্দেশে অফিসরুমের দিকে গেল।

পরের দিন বেলা ন'টার সময় বাসব অজয় সোমের চেম্বারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। কাল তাঁকে ও কথা দিয়েছিল।

হীরকের জন্যে ও অপেক্ষা করছে। সে বাজার থেকে ফিরে এলেই দুজনে যাত্রা করবে অজয় সোমের চেম্বারের উদ্দেশে। ঠিকানাটা জানা থাকলে অবশ্য বাসব একাই চলে যেত কিন্তু ঠিকানা ওর জানা নেই, তাই হীরকের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ঘড়িটা ড্যামেজ হওয়ায় সে বাজারে গেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হীরক ফিরে এল।

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল, কী হে, দেরি করে ফেললাম?

তেমন কিছু নয়। তুমি আর গাড়ি থেকে নেমো না।

বাসব গিয়ে বসল হীরকের পাশে।

এখান থেকে খুব বেশি দূর নয় অজয় সোমের অফিস। শ'ছয়েক গজের মধ্যেই হবে।

মিঃ সোম ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

বাসব ও হীরককে দেখে সাদরে আহ্বান জানালেন তিনি।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল ঘরখানা। ওয়ালনাট কালারের ডিস্টেম্পার করা দেওয়াল। উত্তর দিকে পরপর দুটো জানলা। পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রতি দিকে একটা করে দরজা। পুবদিকের দরজাটা দিয়েই ওরা ঘরে ঢুকেছে।

জানলা ঘেঁষে কোণাকুণিভাবে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা রাখা। যথা নিয়মে টেবিলের ওপর যা কিছু থাকা উচিত সবই রয়েছে।

বাসব মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার হরিপদ কেমন আছে বলুন?

ভালো আছে। কথা বলতে পারছে।

তাই নাকি! ওকে জিগ্যেসবাদ কিছু করেছিলেন?

হ্যাঁ। ও যা বললে, তার সারমর্ম হল, একটার কিছু আগে ও ওই প্যাসেজটায় গিয়েছিল খৈনি খেতে। দরজার পাশে টুলে বসে খৈনি খেতে ওর সংকোচ হয়। রোজই হরিপদ মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে খৈনি খেয়ে আসে। গতকাল ওইরকম খৈনি খাওয়ার সময় কে ওর মাথার পিছনে আঘাত করে। সঙ্গে-সঙ্গে হরিপদ জ্ঞান হারায়।

আচ্ছা, এর আগে ডাঃ রুদ্র ওই ধরনের আর কোনও খাম আপনার কাছে জমা রেখেছেন?

কম করে আরও ত্রিশখানা খাম উনি আমার কাছে জমা রেখেছেন।

ডাঃ রুদ্রকে পরিষ্কারভাবে খাম হারিয়ে যাওয়ার কথাটা বললে কেমন হয়?

অজয় সোম করুণভাবে হাসলেন। বললেন, আপনি তো আগেই বুঝতে পেরেছেন, কথাটা আমি কেন তাঁর কাছে প্রকাশ করতে চাই না। উনি অত্যন্ত খামখেয়ালি লোক। হয়তো এই কারণেই আমাদের বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে।

বাসব আর কিছু বলল না। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে কী যেন পর্যবেক্ষণ করল ও। তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী একটা তুলে নিল।

বস্তুটা আর কিছু নয়। ছোট একটা কাচের টুকরো। স্টেপল মেশিন আর দোয়াতদানের মাঝামাঝি জায়গায় সেটা পড়েছিল। বাসব তাকিয়ে বলল, টেবিলের ওপর সমস্ত কিছুই রয়েছে, শুধু পেপার ওয়েটের অনুপস্থিতিতে একটু অবাক হচ্ছি। টেবিলের ওপর কোনও পেপার ওয়েট ছিল না নাকি?

পেপার ওয়েট—অজয় সোম বিস্মিত দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই ছিল।

BanglaBook.org

কী আশ্চর্য, সেটা গেল কোথায়?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু সিল করা খামই নয়, ওই সঙ্গে একটা পেপার ওয়েটও হারিয়েছে।

কিন্তু...।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।—হরিপদ কোন অঞ্চলের লোক?

ওড়িশার সম্বলপুর জেলায় বাড়ি।

কত মাইনে দেন?

কুড়ি টাকা।

বাসব হাই তুলল।

হুঁ। আচ্ছা, সেদিন ডাঃ রুদ্র আপনার অফিসে এসে বেশ সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছিলেন?

একটু চিন্তা করে অজয় সোম বললেন, তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধ হয় খুব সুস্থ ছিলেন না। হঠাৎ একবার বললেন, আজ বারবার চন্দ্রকান্তর কথা মনে পড়ছে।

চন্দ্রকান্ত! সে কে?

আমার পরিচিত কোনও লোক নয়।

এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমরা ফিরে যাব মিস্টার সোম। এসো হীরক—।

একটু চা খেয়ে যাবেন না?

চা—আজ থাক।...ভালো কথা, আপনার ভাবী শ্বশুরমশাই কাল আমার কাছে এসেছিলেন।

কেন? অজয় সোমের চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

তিনি নিজের প্রাণের আশঙ্কা করছেন। কে নাকি তাঁকে বার-বার খুন করার ভয় দেখাচ্ছে।

কই, আমি তো এ সম্বন্ধে কিছু জানি না!

কথাটা বিশেষ জানাজানি হয়নি।...আচ্ছা, চলি—।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

ফেরার পথে হীরক প্রশ্ন করলে, কিছু আন্দাজ করলে?

কেন, তুমি কিছু বুঝতে পারোনি?

আমি! কই, না!

বড় রকমের একটা গলদ আমার চোখে পড়েছে হীরক। যেমন অজয়বাবু আমাদের কাল বলেছিলেন, তিনি গিয়ে দেখলেন মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে হরিপদ, কপালের কিছু ওপরে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা বলেছিলেন তো?

হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার মনে আছে।

অথচ তিনি আজ বললেন, হরিপদ তাঁকে বলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তাকে আঘাত করে।

তাই তো বললেন শুনলাম।

কাজেই ভেবে দেখ স্টেটমেন্ট ডিফার করছে কি না। মাথার পিছন দিকে আঘাত করা হয়ে থাকলে ক্ষত সামনের দিকে হতে পারে না।

তাহলে বলতে হয় মিঃ সোম আমাদের কাছে মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

আবার হরিপদও মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে। উত্তেজনার দরুন খেয়াল না করে মিঃ সোম তার কথাই রিপিট করে গেছে আমাদের কাছে হয়তো।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

হীরক বলল, এখন কী করবে ভাবছ?

ভাবছি হরিপদকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করছেন তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলব।

BanglaBook.org

বাসব আর কিছু বলল না।

চিন্তিত মনে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনা করতে লাগল।

সারাটা দিন নীরবেই কাটিয়ে দিল বাসব।

হীরক বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল বাসব তখনও চিন্তিত মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের যা টুকরো জমেছে, তাতে সহজেই চোখ কপালে উঠতে পারে।

কী হে, এখনও ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, হাবুডুবু খেতে-খেতে সমুদ্রের তলা থেকে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে আনতে পেরেছি, হীরক।

কীরকম?

আমি দুপুরবেলা মিঃ সোমকে ফোন করে ডাক্তারের ফোন নম্বরটা জেনে নিলাম। তারপর তাঁকে ফোন করে প্রশ্ন করলাম, হরিপদর মাথায় ক্ষতটা কীভাবে হয়েছে এবং কোন দিকে হয়েছে। অবশ্য তার আগে তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হাতুড়ি বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে হরিপদর কপালের ডান পাশে আঘাত করা হয়েছে।

তারপর?

তারপর আর কী, কতকগুলো জিনিস আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অর্থাৎ—?

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই গট-আপ। হরিপদ খাম-চোরকে বিলক্ষণ চেনে।

মহা আশ্চর্য হয়ে হীরক বলল, কী বলছ তুমি? তাই যদি হবে, তাহলে হরিপদ খাম-চোরের নাম করছে না কেন?

বললাম না, সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। ডাক্তার আমায় এ কথা বলেননি যে, হরিপদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন হাতুড়ি বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে। এখন ভেবে দেখো, পেপারওয়েট দিয়ে আঘাত করা যায় কি না? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিঃ সোমের টেবিলের পেপারওয়েটটা অদৃশ্য হয়েছে।

তুমি বলতে চাও পেপারওয়েট দিয়ে হরিপদকে আঘাত করা হয়েছিল।

কারেক্ট। এবার তুমি বলো, যদি কেউ তোমার সামনে থেকে আঘাত করতে আসে, তাহলে কি তুমি তার মুখ দেখতে পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হরিপদ দেখতে পেয়েও যখন স্বীকার করছে না, তখন ব্যাপারটা গট-আপ বলেই কী তোমার মনে হয় না? শোনো, আমার থিয়োরি অনুসারে ঘটনাটা এই ভাবে ঘটেছে, খাম-চোরের সঙ্গে হরিপদর আগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা ছিল। মিঃ সোম লাঞ্চে যাওয়ার পরই চোর ঘরে ঢুকে খামটা তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে, ওই সঙ্গে পেপার ওয়েটটাও। পরিকল্পনা মতো চোর পেপারওয়েট দিয়ে হরিপদকে আঘাত করে চম্পট দেয়। এরকম করার উদ্দেশ্য হল, কেউ যাতে হরিপদকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে।

হীরক বলল, হরিপদকে তাহলে মর্মান্তিক শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

হয়েছে বইকি। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, যদি মিঃ সোম খামটা আগেই তুলে রাখতেন তাহলে কী হত। এ একটা কোয়েশ্চিডেন্স। চোর ডাঃ রুদ্রকে অনুসরণ করে অজয় সোমের অফিসে এসেছিল এবং কোনওক্রমে সে বুঝতে পেরেছিল, খামটা টেবিলের ওপর রেখেই মিঃ সোম লাঞ্চে গেছেন। এরপর উপরোক্ত পন্থায় সে খামটা সরিয়েছিল।

হীরক কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

BanglaBook.org

হীরক এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল—হ্যালো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলুন—আমি হীরক চৌধুরী কথা বলছি—ও, মিস্টার সোম, কী ব্যাপার—কী, কী বললেন, ডাঃ রুদ্র মারা গেছেন—মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—পুলিশ এসেছে—আমি বাসবকে নিয়ে এখুনি ওখানে যাব—বেশ, আমরা যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে হীরক বলল, ডাঃ রুদ্র—।

মারা গেছেন। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, শুনলাম।

কী অদ্ভুত কাণ্ড। ভাবতেই পারা যায় না এ কথা।

আমিও বুঝতে পারিনি। কাল রাত্রে যখন সমস্ত কিছু আমায় বলে গেলেন, তখনও অনুমান করিনি তিনি আজই মারা যাবেন।

মিঃ সোম তোমায় ওখানে যেতে রিকোয়েস্ট করলেন, যাবে নাকি?

সিগারেটের ছাই ছাড়তে-ছাড়তে বাসব বলল, স্বর্গে গিয়েও টেঁকি রেহাই পায় না, হীরক। ভেবেছিলাম আগ্রায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম করব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে উঠছে কই। চলো, যাওয়াই যাক।

॥ চার ॥

বাসব ও হীরক যখন ডাঃ রুদ্রের বাড়ি এসে পৌঁছলো, তখন সাড়ে সাতটা।

গেটের বাইরে কয়েকটা পুলিশ-ভ্যান পার্ক করা হয়েছে। ওরা দুজন গেটের বাইরেই গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে গেল। ভেতর থেকে একটা চাপা কোলাহল ভেসে আসছে। বারান্দায় পা দেওয়ার পরই মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

তিনি বললেন, এই যে আপনারা এসে পড়েছেন। কী বিশ্রী কাণ্ডটাই যে ঘটে গেল—

খুবই দুঃখের কথা। তিনি যে এইভাবে—।

বাসব হীরককে বাধা দিয়ে বলল, তিনি কী সত্যিই স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি মিস্টার সোম?

না, তিনি খুন হয়েছেন।

এই সময় একজন পুলিশ-কর্মচারী এগিয়ে এলেন ওদের দিকে।

অজয় সোম পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনিই বিখ্যাত বাসববাবু। যাঁর কথা একটু আগে আপনাকে বলছিলাম। আর ইনি হলেন ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ।

নমস্কার বিনিময় হল।

ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিস্টার ব্যানার্জি। এখন পরিচিত হয়ে আনন্দিত হচ্ছি।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এই আনন্দ উভয়ত মিস্টার প্রেম।

এরপর দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হল দুজনের মধ্যে।

ফোন পেয়ে মাত্র মিনিট কুড়ি হল এখানে এসেছে পুলিশ। এখনও কারুর জবানবন্দি নেওয়া হয়নি। যতদূর ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করা গেছে তাতে, কেসটা খুবই জটিল মনে হয়েছে ইন্সপেক্টর প্রেমের। বাসব এসে পড়ায় তিনি খুশি হয়েছেন। তদন্তে ওর সাহায্য মিঃ সোমের মতোই তাঁর কাম্য।

বাসব বলল, চলুন, এবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।

ইন্সপেক্টর বাসবকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন।

ঘরখানা বেশ ছোট। দেওয়ালের সঙ্গে ফিক্সড করা আলমারিগুলোয় কেতাবের সারি।

BanglaBook.org

দুটো বড়-বড় জানলা পাশাপাশি। কাচের শার্সি আঁটা।

একটি মাত্র দরজা। তার একটা পাল্লা আধভাঙা অবস্থায় একপাশে ঝুলছে।

ঘরের মাঝখানে সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানকয়েক গদিমোড়া চেয়ার তার চারপাশে। তার একখানায় বসে, টেবিলের ওপর মুখ রেখে পড়ে আছেন ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র। মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যেন তিনি।

বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মৃতদেহটা দেখতে-দেখতে বলল, কোনও উড্ড আছে কি?

না।

মার্ডার সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হচ্ছেন কীভাবে? এমন তো হতে পারে উনি হঠাৎ হার্টফেল করেছেন?

ইন্সপেক্টার বললেন, ডাক্তার রুদ্রকে পটাশিয়াম সায়ানাইড দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কোনও ডাক্তার পরীক্ষা করেছেন কি?

হ্যাঁ। ডাক্তার রুদ্রের ছোট ভাই ডাঃ বিনয় রুদ্র আমাদের জানিয়েছেন একথা।

ওয়েল ইন্সপেক্টার, আমি বাড়ির সকলকে কিছু-কিছু প্রশ্ন করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি সকলের স্টেটমেন্ট নিতামই, আপনিই নিন। আমি বরং নোট নিচ্ছি।

বেশ। প্রথমে তাহলে ডাঃ বিনয় রুদ্রকেই ডেকে পাঠান।

পরিবারের প্রায় সকলেই এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। পুলিশ আসার পর যে যার নিজের ঘরে চলে গেছেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিনয় রুদ্র এলেন। রোগা, লম্বা চেহারা। গায়ের রং ফরসা। চোখে চশমা। বয়েস চল্লিশের মধ্যেই। ম্রিয়মাণ মুখ।

বসুন ডাক্তার রুদ্র।

বাসবের অনুরোধে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

আমি পুলিশের লোক নই। আপনার দাদার হত্যাকাণ্ড বেসরকারি ভাবে তদন্ত করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছি।

বিনয় রুদ্র কিছু বললেন না।

বাসব আবার বলল, আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই।

বলুন?

শুনলাম, আপনিই প্রথমে বুঝতে পারেন, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হত্যা। এরকম সিদ্ধান্ত আপনি কীভাবে করলেন?

একজন ডাক্তার হিসেবে। বডিতে সায়ানাইডের কিছু সিম্পটম লক্ষ করে আমি মার্ডার সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হয়ে পড়ি।

ও। এমন হতে পারে তো, আপনার দাদাকে কেউ খুন করেনি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন?

আত্মহত্যা করার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই।

আপনি বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা করার মতো শোচনীয় মনের অবস্থা আপনার দাদার ছিল না?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন বিনয় রুদ্র।

বাসব আবার বলল, আপনারা কখন এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারলেন?

ছটার সময়। বাড়ির পুরোনো চাকর দাদাকে চা দিতে যায়। ওই সময় তিনি রোজ দ্বিতীয়বার চা খেতেন। কিন্তু বার-বার ডেকে এবং দরজায় ধাক্কা দিয়েও তাঁর কোনও সাড়া না পেয়ে আমাদের ডাকে।

তারপর?

আমরাও অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই।

BanglaBook.org

হুঁ। আপনি আপনার দাদাকে জীবিত অবস্থায় শেষবার কখন দেখেন?

বিকেল পাঁচটায় সময়।

সে সময় উনি কোথায় ছিলেন?

চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলেন।

বিকেলের দিকে কতক্ষণ তিনি চেম্বারে থাকতেন?

চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। কোনও-কোনও দিন ছ'টা।

তারপর কী করতেন?

ক্লাবে যেতেন। টেনিস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আপনি কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন?

এই ধরনের প্রশ্নের পর প্রশ্নে বেশ বিরক্ত বোধ করছিলেন বিনয় রুদ্র। কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ না করে বললেন, আমি একটি ওষুধের কারখানার সঙ্গে যুক্ত আছি।

ধন্যবাদ বিনয়বাবু। আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এবার আপনি যেতে পারেন।

বিনয় রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, এবার কাকে ডাকা যায় বলুন, ডাক্তার রুদ্রর ছেলে সঞ্জীববাবুকে, না মেয়ে সুমিত্রা দেবীকে?

বাসব বলল, আগে ঘরখানা ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। তারপর আবার কাউকে ডাকা যাবে।

ও সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

টেবিলের ওপর মাত্র গুটি কয়েক জিনিস আছে। একটা প্যাড, খানকয়েক ফাইল, কালির দোয়াত, খানতিনেক পেন্সিল। একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, আর এক বাক্স টুথপিক।

একখানা বই মাটিতে পড়ে রয়েছে। মারা যাওয়ার আগে বোধহয় বইখানা পড়ছিলেন ডাঃ রুদ্র।

বইখানা তুলে নিল বাসব। রাইডার হ্যাগার্ডের লেখা ব্ল্যাড শ্যাডো। বহুল প্রচারিত রোমাঞ্চকর উত্তেজনামূলক উপন্যাস। বইখানার মলাটের ওপর সুদৃশ্য জ্যাকেট।

প্রেমপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন, কীরকম বুঝছেন?

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, আমি ভাবছি হত্যাকারী কোন পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল।

আমিও ভাবছি তাই। জানলা দুটো ভেতর দিক থেকে বন্ধ, দরজাটাও বন্ধ ছিল। অথচ—

বাসব আরেকবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আর কোনও পথ নেই ঘরের মধ্যে আসার। তবে কি হত্যাকারী ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল হাওয়া হয়ে?

ধরে নেওয়া যায় যদি হত্যাকারী ঘরের মধ্যে না এসেই ডাঃ রুদ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিল, তাহলে টেবিলের ওপরে বা মেঝেয় একটা গেলাসের সন্ধান পাওয়া যেত।

কেন?

জলের গেলাসে সায়ানাইড মিশিয়ে রাখাটাই সহজ। জল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু নিজে থেকেই এসে পড়ে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু তো দেখছি না।

আত্মহত্যার ওপর আমরা জোর দিতে পারি নাকি? ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, উনি নিজেই হয়তো সায়ানাইড পাউডার ইউজ করেছিলেন।

এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। বাসব বলল, আমি বিশেষভাবে জানি, অর্থাৎ গতকালই তিনি আমায় এমন গোটাকতক কথা বলছিলেন, যার ওপর নির্ভর করে আমি বলতে পারি তিনি বেঁচে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর মতো বিজ্ঞ লোক আত্মহত্যা করার আগে নিশ্চয়ই একটা চিঠি লিখে রেখে যেতেন।

কথা বলতে-বলতে বাসব ঝুঁকে পড়ল মেঝের দিকে। একটা কাঠি পড়ে রয়েছে। ইঞ্চি আড়াই লম্বা একটা কাঠি।

BanglaBook.org

বাসব কাঠিটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, মিস্টার প্রেম, এবার আপনি ডেডবডি মর্গে পাঠাতে পারেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হল। অবশ্য তার আগে পুলিশের ফটোগ্রাফার মৃতদেহ ও ঘরের কয়েকটা ছবি তুলতে ভুললেন না। এবার কাকে ডাকব বলুন?

এবার কাকে ডাকব বলুন?

সঞ্জীব রুদ্রকে।

খবর পাঠাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সঞ্জীব রুদ্র এলেন। স্বাস্থ্যবান যুবক। বয়েস আন্দাজ তিরিশ।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনাকে এসময় বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত মিস্টার রুদ্র। প্রয়োজনের তাগিদে এটুকু করতে হয়েছে জানবেন।

দেখুন, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই। যা বলতে চান, তাড়াতাড়ি বলুন।

আপনার বাবা নিহত হয়েছেন—নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন সঞ্জীব রুদ্র।

তাহলে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন?

বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা অবধি—অর্থাৎ অনুমান করা যাচ্ছে যেসময় আপনার বাবা নিহত হন, সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে।

তারপর?

হইহল্লা কানে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুনি, হাজার ডাকাডাকির পরও বাবা স্টাডি থেকে বেরুচ্ছেন না। তখন বাধ্য হয়ে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলি।

স্টাডিতে ওই দরজা ছাড়া আর কোনও গুপ্ত প্যাসেজ আছে?

না।

আপনি কী কাজকর্ম করেন সঞ্জীববাবু?

নর্দান ইন্ডিয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিলের আমি ফোরম্যান।

বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল।—পরশু রাত্রে—বোধহয় তখন দেড়টা, আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বারান্দার আলো জ্বেলেছিলেন কেন?

মহা আশ্চর্য হয়ে সঞ্জীব বললেন, আপনি একথা জানলেন কীভাবে?

জেনেছি নিশ্চয়ই কোনও সূত্রে। আমার প্রশ্নর উত্তর এখনও আপনি দেননি।

সেদিন শরীর আমার ভালো ছিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলাম। হঠাৎ মনে হল বারান্দা দিয়ে কে যেন দ্রুতপায়ে চলে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বারান্দায় আলো জ্বাললাম। কেউ কোথাও নেই। ঘরে ফিরে আসছি, আবার মনে হল, এবার সিঁড়ি দিয়ে কে যেন—থামলেন সঞ্জীব রুদ্র।

সিঁড়ি দিয়ে কাকে নেমে যেতে দেখলেন?

দেখলাম—।

বলুন, থামলেন কেন?

দেখলাম কাকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

কাকা মানে—বিনয়বাবু?

হ্যাঁ।

হুঁ। আপনার কাকা কি বিবাহিত?

না, অনেক চেষ্টা করেও বাবা ওঁর বিয়ে দিতে পারেননি।

BanglaBook.org

আপনার বাবার সম্পত্তি এখন নিশ্চয়ই আপনি আর আপনার বোন পাবেন?

আমি যতদূর জানি, বাবা নিজের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত কিছু তিন ভাগে ভাগ করে গেছেন। আমার, সুমিত্রা ও কাকার মধ্যে।

আচ্ছা, টেবিলের ওপর ওই টুথপিকের বাক্সটা কেন বলতে পারেন?

বাবার সবসময় দাঁত খোঁচানো একটা অভ্যেস ছিল। তাই আমাদের বাড়ির যেখানে-সেখানে টুথপিকের বাক্স আপনি দেখতে পাবেন।

ধন্যবাদ সঞ্জীববাবু। আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ বিরক্ত করলাম। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।

একটি কথাও না বলে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সঞ্জীব রুদ্র।

ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, বাপের মৃত্যুতে ছেলে তেমন শোকাহত হয়েছে বলে মনে হল না।

বাসব হাসল। বলল, ওরকম পয়সাওলা বাপ পটল তুললে শোক একটু বিলম্বেই আসে ইন্সপেক্টার। চলুন, সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখাটা করে নিই।

সুমিত্রা নিজের ঘরে শোকে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল।

সুগঠনা, সুরূপা মেয়েটি। এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

চাকরের মুখে খবর পাঠিয়ে, বাসব ও ইন্সপেক্টার তার ঘরে প্রবেশ করল। সময়োচিত সান্ত্বনা দেওয়ার পর বাসব বলল, আপনার বাবার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমরা চাই। কাঁপা গলায় সুমিত্রা বলল, আমি আর আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি?

আমার গোটাকতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেই প্রচুর সাহায্য করা হবে।

বলুন?

আপনার সঙ্গে ডাক্তার রুদ্রর শেষ কখন দেখা হয়?

পাঁচটার কিছু পরে। বাবা তখন চেম্বারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।

কোনও কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?

বাবার শরীর ভালো ছিল না, আমি তাঁকে চেম্বারে যেতে নিষেধ করছিলাম।

তিনি কি আপনার কথা শুনেছিলেন?

হ্যাঁ। প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও, পরে আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন।

ডাঃ রুদ্র কি চেম্বারের কাজ শেষ হওয়ার পর কোথাও বেরুতেন?

মাঝে-মাঝে ক্লাবে যেতেন, নইলে হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

হিসেবপত্র।

বাবা অত্যন্ত হিসেবি লোক ছিলেন। রোজকার আয় হিসেব করে চেম্বারের ড্রয়ারে রাখতেন। তারপর কয়েক দিনের জমা টাকা একদিন ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতেন।

ইদানীং বাড়ির কারুর সঙ্গে আপনার বাবার মতান্তর হয়েছিল?

আজই সকালে কাকার সঙ্গে কী একটা টাকার ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। উনি কখনও কাউকে বকতেন না। যদি বা—।

কথা ক'টা বলতে-বলতে গলা বুজে এল সুমিত্রার। কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

আপনার মনের অবস্থা অনুমান করতে আমার কষ্ট হচ্ছে মিস রুদ্র। সত্যি, খুবই দুঃখের কথা। তাঁর মতো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন এইভাবে শেষ হবে কে জানত।

সুমিত্রা নীরব রইল।

BanglaBook.org

বাসব আবার বলল, আপনার সঙ্গে অজয়বাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা মিস রুদ্র, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র কি অজয়বাবুর কাছে গচ্ছিত রাখতেন আপনার বাবা?

আমি ওবিষয়ে সঠিক কিছু জানি না।

এবার আমরা উঠব। আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে। আসুন ইন্সপেক্টার—দুজনে আবার স্টাডিতে ফিরে এল।

ঘরে কেউ নেই। হীরক ও অজয় সোম পাশের ঘরে যে যার চেয়ারে বসে।

বাসব বলল, আপনি সকলের কথাই তো শুনলেন। কোথাও বেখাপ্পা কিছু চোখে পড়ল কি?

ইন্সপেক্টার বললেন, কই, তেমন...।

স্টেটমেন্টগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে গেলেই আপনি গোলমালটা ধরতে পারবেন। বেশ, আমিই বলছি আপনাকে পরিষ্কার করে। বিনয়বাবু আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তিনি ডাঃ রুদ্রকে শেষ দেখেন পাঁচটার সময়। তখন তিনি চেম্বারে রুগি দেখছিলেন। অথচ ঠিক ওই প্রশ্নের উত্তরেই সুমিত্রা দেবী বললেন, পাঁচটার কিছু পরে তাঁর অনুরোধে ডাঃ রুদ্র চেম্বারে গেলেন না।

তাই তো। এখন ধরে নিতে হবে দুজনের মধ্যে একজন মিথ্যে কথা বলছেন। কে তিনি—?

তিনি যেই হোন—ও আলোচনা উপস্থিত মুলতুবি থাক। এখন বলুন ডাঃ রুদ্রের চেম্বার এখান থেকে কত দূরে?

বিন্দুমাত্র দূরে নয়, এই বাড়িতেই তাঁর চেম্বার।

আই সি। চলুন, সেখানে একবার যাওয়া যাক।

পোর্টিকোর ডান ধারের তিনখানা ঘর নিয়ে চেম্বার।

প্রথমটি রুগিদের ওয়েটিংরুম, তারপরের ঘরটিতে ডাক্তার বসতেন আর সব শেষের ঘরখানা ডিসপেনসারি।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল ঘর তিনটি। ইন্সপেক্টারও সজাগ দৃষ্টি রেখে ঘরগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের চেম্বার যেরকম হওয়া উচিত, এটি তার ব্যতিক্রম নয়। চমৎকার ভাবে সাজানো যথাযথ।

বাসব ডাক্তারের বসবার ঘরের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। পুরু কাচ দিয়ে টেবিলের ওপরের ভাগটা ঢাকা। এক ধারে পর-পর তিনটে দেরাজ। বাসব ওপরকার দেরাজটা টেনে দেখল—বন্ধ। চাবি দিয়ে বন্ধ। পরেরটা অবশ্য টানতেই খুলে গেল। অনেক কিছু রয়েছে তার মধ্যে। হিসেবের খাতা, প্যাড, কিছু মেডিক্যাল জার্নাল। খানকতক চিঠিও রয়েছে, আর রয়েছে একখানা ফটোগ্রাফ।

ছবিটা খুবই পুরোনো, ফেড হয়ে গেছে। আধাবয়সি কোনও লোকের ছবি। ভদ্রলোক বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন।

বাসব চিঠিগুলো তুলে নিল। হপ্তা-দুয়েকের মধ্যেই এসেছে সেগুলো। সবই ওষুধ কোম্পানি থেকে আসা চিঠি।

চিঠিগুলো রেখে হিসেবের খাতাটা এবার হাতে নিল ও। তারিখের নীচে-নীচে দৈনিক সমস্ত হিসেব তাতে লেখা রয়েছে! এমনকী এক আনা বা দু'পয়সার হিসেবও বাদ পাড়েনি।

BanglaBook.org

বাসব হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, খুবই সিস্টেমেটিক ছিলেন ডাঃ রুদ্র। খুঁটিনাটি কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, আমি যতদূর শুনেছি, ভদ্রলোক খুবই কৃপণ ছিলেন।

বাসব এবার নীচের দেরাজটা টেনে দেখল—সেটাও বন্ধ।

চলুন, এবার যাওয়া যাক, এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। মিস্টার প্রেম, আপনি শুধু বন্ধ দেরাজ দুটো খোলাবার ব্যবস্থা করুন। পরে একসময় এসে ও-দুটো পরীক্ষা করে যাওয়া যাবে।

॥ পাঁচ ॥

কোচের ওপর আড় হয়ে বসে সিগারেট টানছে বাসব। হীরক আরেকটা কোচে বসে।

দুজনেই চুপচাপ।

শেষে হীরকই নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল, কী হে, কিছুই বলছ না যে?

কী শুনতে চাও, বলো?

ডাঃ রুদ্রর হত্যা সম্বন্ধে কীরকম কী বুঝলে?

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, ডাঃ রুদ্রকে কে খুন করেছে, তা এখন আমার কাছে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল খুনের মোটিভ কী?

মোটিভ?

নিশ্চয়ই, মোটিভ একটা থাকতে হবে বইকি। কারণ না থাকলে কর্ম হয় না হীরক।

তা বটে।

সম্পত্তির লোভে কেউ তাঁকে খুন করেছে, একথা বলা চলে না। ডাঃ রুদ্র কোনওরকম গোলমাল না রেখে তিন ভাগে সম্পত্তি ভাগ করে গেছেন শুনলাম। কাজেই সম্পত্তির লোভে কেউ তাঁকে খুন করেনি। রাগের মাথায় কেউ এ কাজ করেছে, তাই বা বলি কীভাবে।

খুন করার পদ্ধতিতে এমন চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, যাতে সহজেই অনুমান করা যায়, হত্যাকারী অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। আচমকা কোনও ঘটনা হলে সে কখনই এতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারত না।

তোমার কী মনে হয়—হীরক বলল, অজয় সোমের খাম চুরি যাওয়া ও এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে?

যদিও এখনও ও বিষয়ে কিছু ভেবে দেখিনি, তবে দুটো ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যাক, এখন ডাঃ রায় সম্বন্ধে গোটাকতক কথা আমায় বলো দেখি?

কী কথা, বলো?

তাঁর আর্থিক অবস্থা কি খুব ভালো ছিল?

তিনি রীতিমতো ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

এখানে কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছেন?

তা বছর আটেক হবে।

বাসব বিস্মিত গলায় বলল, মাত্র বছর আটেক! তার আগে কোথায় ছিলেন?

কলকাতার কোন এক কোম্পানির মাইনে করা ডাক্তার ছিলেন।

অথচ তিনি অত্যন্ত ধনশালী! তাঁর এই আশানুরূপ অবস্থাটা একটু সন্দেহজনক নয় কি হীরক?

তুমি বলতে চাইছ, সারা জীবন চাকরি করার পর মাত্র আট বছর প্র্যাকটিস করে কারুর এতটা ধনী হওয়া সম্ভব নয়?

BanglaBook.org

এক্সজ্যাক্টলি। তবে পৈত্রিক সূত্রে তিনি যদি অর্থশালী হয়ে থাকেন, স্বতন্ত্র কথা।

তা-ও নয়। কতবার তাঁর মুখে শুনেছি—হীরক বলল, তিনি নাকি স্কুলের মাস্টারের ছেলে ছিলেন।

হুঁ। বাসব আর কিছু বলল না। একটা সিগারেট ধরাল।

বেশ কয়েক মিনিট নীরবে কেটে যাওয়ার পর ও ঘড়ির দিকে তাকাল। দুটো দশ।

বলল, চলো, অজয় সোমের অফিস থেকে একবার ঘুরে আসি।

অজয় সোম অফিসেই ছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ওদের। তাঁকে কিছুটা ম্রিয়মান দেখাচ্ছে।

বাসব একটা চেয়ারে বসে বলল, হরিপদ নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠেছে? তাকে একবার ডেকে পাঠান।

হরিপদ! সে তো ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

বাড়ি গেছে! কীরকম?

কাল ও আমায় বলল, দিন দশেকের ছুটি দিন, বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। হাওয়া বদলালে অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

কাজটা আপনি খুব ভালো করেননি মিস্টার সোম। তাকে ছুটি দেওয়ার আগে অন্তত একবার আমাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল।

মিঃ সোম বললেন, সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

তার ঠিকানা জানেন?

সম্বলপুর জেলার কোন একটা গ্রামে তার বাড়ি, এর বেশি আমি কিছু জানি না।

বাসব আর ও-প্রসঙ্গ তুলল না। বলল, রুদ্র পরিবারের সঙ্গে আপনার আলাপ কী সূত্রে?

ব্যবসা সূত্রেই। আমি এখানে অফিস খোলার পরই ডাঃ রুদ্র ক্লায়েন্ট হিসেবে আমার কাছে আসেন। তারপর পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হবওয়ার পর আমি তাঁর বাড়িতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করি।

আচ্ছা, ডাঃ রুদ্রের কী ধরনের কাজকর্ম আপনি করতেন?

তিনি নিয়মিত আমার কাছে কাগজপত্র জমা রাখতেন। ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ে কোনও গোলমাল বাঁধলে, সেগুলো দেখাশোনা করতে হত। তাছাড়া তাঁর উইলটিও আমার সাহায্যে তৈরি হয়েছে।

উইলের বিষয় কিছু বলতে এখন নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি নেই।

উইল পড়ার আগে কোনও কিছু বলাটা অবশ্য উচিত নয়। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি আপনাদের বলছি—তাঁর নগদ ছ'লক্ষ টাকা, তিনখানা বাড়ি ও ত্রিশ হাজার টাকার গহনা তিন ভাগে তিনি ভাই ও দুই ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন।

বাসব একটু থেকে বলল, আর কাগজপত্র, যা তিনি আপনার কাছে জমা রাখতেন, সেগুলো সম্বন্ধেও আমার আগ্রহ রয়েছে।

ও বিষয় আপনাকে জানাবার মতো আমি জানি না। কাগজপত্র সমস্তই তিনি শিল করা খামে আমায় দিয়ে যেতেন।

এখন অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে, আপনি খামগুলোর মধ্যে থেকে একটা নিয়ে আসুন। খুলে দেখা যাক কী আছে তাতে।

অজয় সোম চেয়ার ছেড়ে আয়রন সেফের দিকে এগিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

দেওয়ালের সঙ্গে ফিক্সড করা আয়রন সেফ। বিচিত্র গঠনের চাবির সাহায্যে তার পাল্লা খুললেন তিনি। একটা মুখ-আঁটা খাম বের করলেন।

খামের মুখ ছেঁড়া হল। ভেতরে পাওয়া গেল একটা হ্যান্ডনোট।

টাকা ধার দেওয়ার দলিল। বাসব দলিলটা পরীক্ষা করল। জনৈক ধরনীধর দুবেকে আট হাজার টাকা ধার দেওয়া হয়েছে—দলিলটা তারই।

বাসব কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল, মনে হচ্ছে, সমস্ত খামগুলোতে হ্যান্ডনোটই আছে। বোধহয় সেদিন আপনার চেম্বার থেকে যে খামটা চুরি গেছে, তাতেও কোনও হ্যান্ডনোট ছিল।

হীরক বলল, ডাঃ রুদ্র টাকা ধার নেওয়ার ব্যবসা করতেন ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে।

আমি অবাক হচ্ছি, অজয় সোম বললেন।

আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না, বাসব বলল, এবার তাহলে উঠি। বেশ কিছুক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।

না, না, বিরক্ত আর কী। আমি এর একটা আশু মীমাংসা চাই মিস্টার ব্যানার্জি!

আপ্রাণ চেষ্টা আমি করছি মিস্টার সোম। এসো হীরক—।

ফেরার পথে হীরক প্রশ্ন করল, ডাক্তার রুদ্র টাকা ধারের ব্যাবসা করতেন, এতে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ না কেন?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি আগেই তোমার কাছে ডাঃ রুদ্রর অত্যধিক ধনশালী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছি। আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে যে, এখন বুঝতে পারলাম তাঁর অর্থাগমের অন্যতম কারণটা কী, তবে ওই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন এখানে অ্যারাইজ করছে, তিনি যখন টাকা ধারের ব্যবসা করতেন, তখন তাঁর কাছে মোটা টাকাই মজুত ছিল। এই মোটা টাকাটা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

তাই তো!

আমার মনে হয়, কোনও বাঁকা পথ দিয়ে টাকাটা তাঁর কাছে এসেছিল।

হীরক কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বাসব তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, সঞ্জীব রুদ্র দ্রুতপায়ে অজয় সোমের অফিসের দিকে যেতে-যেতে, ওদের দেখতে পেয়েই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

বাসব গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কোথায় চলেছেন এত ব্যস্তভাবে?

নিজের থতমত ভাবটা অসীম বলে সংযত করে নিয়েছেন ততক্ষণে সঞ্জীব রুদ্র। বরং মুখে কিছুটা বিরক্তির ভাবই ফুটে উঠেছে।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কোথাও একটা কাজে যাচ্ছি নিশ্চয়ই।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। ডাঃ রুদ্রর সেক্রেটারি—সুব্রত রায় নাম বোধ হয় ভদ্রলোকের, তাঁকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

বেশ।

আর দাঁড়ালেন না সঞ্জীব। দ্রুত অন্তর্হিত হলেন সেখান থেকে।

বাসব ও হীরক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

শেষে হীরক বলল, ভীষণ রগচটা ছেলে। ওর ওই স্বভাবের জন্যে ডাক্তার কম আক্ষেপ করতেন না।

হুঁ। থানায় চলো।

ওরা থানায় পৌঁছবার আগেই ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ থানায় ফিরেছেন।

BanglaBook.org

বাসব পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা দেখতে চাইল।

রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

পটাশিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময় নির্দেশ করা হয়েছে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে।

বাসব রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে বলল, কীভাবে ডাঃ রুদ্রকে হত্যা করা হয়েছিল বলে আপনি অনুমান করেন।

পটাশিয়াম সায়ানাইড দিয়ে।

আমি বলতে চাইছি ডাঃ রুদ্রর শরীরে সায়ানাইড গেল কীভাবে। যেক্ষেত্রে হত্যাকারী স্টাডির মধ্যে প্রবেশ করেনি বলে আমরা ধরে নিয়েছি।

ইন্সপেক্টর বললেন, ও বিষয় কোনও সিদ্ধান্ত এখনো আমি করিনি।

আমি কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

কীরকম?

ডাঃ রুদ্র নিজের অভ্যাসের দোষেই মারা গেছেন।

আপনার কথাটা ঠিক ফলো করলাম না।

তাঁর সর্বদা দাঁত খোঁটবার অভ্যাস ছিল। বাড়ির সর্বত্র টুথপেকের বাক্সের ছড়াছড়ি। একথা জানা ছিল হত্যাকারীর, সে ডাঃ রুদ্রর অভ্যাসটাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছে।

অর্থাৎ—?

আপনি বোধ হয় লক্ষ করে থাকবেন, সেদিন আমি মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় মেঝে থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—।

আমার শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে। বাসব বলল, তাকে কাছ-ছাড়া করি না। আগ্রাতেও এনেছি। ওই কুড়িয়ে পাওয়া কাঠিটা কাল রাত্রে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলাম। কাঠির গায়ে সায়ানাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে।

আপনি বলতে চান—দ্রুত বেগে প্রেমপ্রকাশ বললেন, বই পড়তে-পড়তে ডাঃ রুদ্র নিজের অভ্যাসমতো টেবিলের ওপর রাখা টুথপিকের বাক্স থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে দাঁতে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছেন?

ঠিক তাই?

টুথপিকের বাক্সর প্রত্যেকটা কাঠিতেই তাহলে সায়ানাইড মাখানো ছিল বলতে হবে। নইলে বেছে-বেছে বিষ মাখানো কাঠিটাই ডাঃ রুদ্র তুলে নেবেন, এটা কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা নয়।

তাই তো ছিল। প্রত্যেক কাঠিতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল। আপনি বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ভালো কথা, ডাঃ রুদ্রর দেরাজে যে ফটোগ্রাফখানা পাওয়া গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু খোঁজ করেছিলেন নাকি?

আলাদা-আলাদাভাবে আমি বাড়ির প্রত্যেককে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, কিন্তু কেউই ছবির মধ্যেকার লোকটির পরিচয় দিতে পারলেন না।

আশ্চর্য! যাই হোক, ডাঃ রুদ্রর অতীত সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালোভাবে খোঁজ-খবর করা দরকার।

আমি তার ব্যবস্থা করেছি। দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে কিছু খবর পাওয়া যাবে—

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে কেসটা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে ধরল। প্রেমপ্রকাশ একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালেন।

হীরক সিগারেট খায় না।

BanglaBook.org

ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে প্রেম বললেন, আমার চাকরি-জীবনের চোদ্দ বছর চলেছে। বহু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আমি করেছি। তবে এই ধরনের রহস্যময় খুনের সম্মুখীন এই আমায় প্রথম হতে হল। হত্যাকারী সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে চমৎকারভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে। এমন একটা ক্লু কোথাও নেই, যার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

বাসবর বলল, আমাকে অবশ্য বহুবারই অনেক রহস্যেরই সামনাসামনি হতে হয়েছে, তবু এ ঘটনার সঙ্গে পূর্বের আর কোনও ঘটনার সিমিলারিটি নেই, একথা বলতে পারি।

বাসব এরপর ইন্সপেক্টারকে অজয় সোমের খাম চুরি থেকে হরিপদর ছুটি নেওয়া অবধি সমস্ত কিছু বলল।

সমস্ত শুনে প্রেমপ্রকাশ বললেন, আমাদের তাহলে এখন অন্যতম কাজ হল হরিপদকে খুঁজে বার করা।

আমার দৃঢ় ধারণা হরিপদকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই সময় চা এল।

ট্রের ওপর তিনটে চায়ের কাপ বয়ে আনল একজন কনস্টেবল। ইন্সপেক্টর বোধ হয় আগেই এবিষয় কোনও ইশারা দিয়ে রেখেছিলেন।

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল।

কথা প্রসঙ্গে প্রেমপ্রকাশ বললেন, কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক।

কী বলুন তো?

মারা যাওয়ার আগে ডাঃ রুদ্র বই পড়ছিলেন। সময়টাও ছিল বিকেল। দরজা বন্ধ করে বিকেলবেলা গল্পের বই পড়ার কী সার্থকতা থাকতে পারে?

একটু চিন্তা করে বাসব বলল, আপনি ভালো পয়েন্ট রেজ করেছেন। আমার মনে হয়, উনি দরজাটা বন্ধ করেছিলেন বই পড়ার জন্যে নয়। বই পড়ার আগে হয়তো অন্য কিছু করছিলেন, যা সকলকে তিনি জানতে দিতে চান না। তাই তাঁকে দরজা বন্ধ করতে হয়েছিল।

তা হতে পারে।

শহরতলির একাংশ।

আগ্রার শহরতলি। বৈভবের ছোঁয়াচ এখানে কিছুটা ম্লান। নিম্ন শ্রেণির লোকেদের আবাস-বহুল অঞ্চলের পথগুলি ইট বাঁধানো।

এখানে নানা দেশীয় লোকের বসবাস। তাদের মধ্যে বুঝি শিখেদের সংখ্যাই বেশি। বোধ হয় তারা রিফিউজি।

লোকালয় ছাড়িয়ে স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের সাহায্যপুষ্ট কয়েকটা যন্ত্রশালা। সেগুলো পেরিয়ে একটা ট্রাকের গ্যারেজ। কুড়ি-বাইশটা ট্রাক জড়ো হয়ে রয়েছে সেখানে।

ক্লিনাররা সেগুলো ধোয়া-মোছা করছে।

ট্রাকগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনেই একসারি ঘর। অ্যাসবেস্টাস ছাওয়া ঘরগুলোর সংখ্যা খান ছয়েকের বেশি হবে না। সবশেষের ঘরখানার দরজায় একটা ফলক আটকানো। তাতে ইংরেজিতে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'অফিস'।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়।

বোধ হয় পাঁচটা হবে। শীতের বিকেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অফিস-ঘরে আলো জ্বলছে।

টেবিলের সামনে বসে একজন যুবক শ্রেণির লোক খাতায় কী সব লিখছে। কাজের মধ্যে

BanglaBook.org

সে এতটা ডুবে রয়েছে যে দরজা পেরিয়ে একজন লোক ঘরে ঢুকেছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

আগন্তুকের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যেই।

ময়লা জামা-কাপড় গায়ে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

বিশেষত্ব বিবর্জিত মুখ।

ঘরে ঢুকেই আগন্তুক গলাখাঁকারি দিল।

মুখ তুলে চাইল যুবকটি। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বলল, এই যে হরিপদ, কোথায় ছিলে ক'দিন?

ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, এই নিয়ে চারবার এলাম এখানে। আপনারা কোথায় থাকেন তাই বলুন?

আমরা? আমি অন্তত খুবই ব্যস্ত ছিলাম হপ্তাখানেক।

আপনার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি খুঁজছি সিংজিকে।

তিনি তো আগ্রার বাইরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে।

হরিপদ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ফিরতে দেরি হলে চলবে কেন? আমার টাকাটা দেবে কে?

টাকা! যুবকটি এবার আশ্চর্য হল। টাকা তোমায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কীসের টাকা?

ওই অল্প টাকায় এত বড় দায়িত্বের কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না বীরচাঁদবাবু।

তুমি আবার দায়িত্ব নিলে কোথায়?

দায়িত্ব নিইনি মানে—।

দায়িত্ব নিয়ে যে কাজ করবার, সেই করেছে। তবে বলা চলতে পারে শারীরিক কষ্ট তোমার একটু হয়েছে। তার জন্যে আমরা দায়ী নই। তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই এরকম করতে হয়েছিল।

এত কথা শুনে আমার লাভ নেই, আরও কয়েক হাজার টাকা আমার চাই।

বীরচাঁদের চোখ কপালে উঠল।—আরও কত?

বললাম তো কয়েক হাজার।

শোনো হরিপদ, তোমাকে যা দেওয়ার আমরা দিয়েছি—আর কিছু দেওয়া হবে না। তুমি দেশে ফিরে যাও, তোমার এখন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই উচিত।

আপনাদের প্রত্যেকটি কথা আমি শুনে এসেছি, কিন্তু আর নয়।

আর নয় মানে—?

হরিপদ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, মানে এবার আমার কথা আপনাদের শুনতে হবে। আপনারা টাকাটা যদি আমায় না দেন, তাহলে আমি—।

তাহলে তুমি—।

পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব। আমি যা জানি সমস্ত প্রকাশ করে দেব।

ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে তুমি?

সহজে না দিলে এ ছাড়া আমি কী করতে পারি বলুন?

বীরচাঁদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার দিকে চোখ পড়তেই আর কিছু বলা হল না। ঠিক চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক শিখ ভদ্রলোক। পরনে ওস্টেডের স্যুট। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। চোখে চশমা, মাথায় চকোলেট রংএর পাগড়ি।

তিনি বাইরে থেকেই প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে, বীরচাঁদ?

প্রশ্ন অবশ্য ইংরেজিতেই করলেন তিনি।

বীরচাঁদ সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল।

শিখ ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

তিনি হরিপদকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হিন্দিতে বললেন, কত টাকা চাই তোমার?

আজ্ঞে, চার হাজার।

চার হাজার টাকা পেলে তুমি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবে?

হরিপদ ঘাড় নাড়ল।

এসো।

হরিপদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

॥ ছয় ॥

আকাশের গায়ে কে যেন হাজার-হাজার বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে।

গুরুগম্ভীর শব্দে মেঘ ডাকছে থেকে-থেকে। বিদ্যুতের ঝিলিক মারছে বারবার। ওই সঙ্গে বৃষ্টিও হচ্ছে টিপটিপ করে।

রাত তখন গভীর।

রুদ্র-বাড়ির সকলেই তখন যে যার বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন। এই দুর্যোগের রাতে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঘুম গভীর হওয়াই স্বাভাবিক।

বাসব বাড়ির পিছন দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের ধারে এসে দাঁড়াল। গ্রেটকোটে ওর সারা দেহ আচ্ছাদিত। মাথায় ফেল্টের হ্যাট। ও একলা। হীরককে আর ডাকেনি। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেচারার নাজেহাল অবস্থা হত অনর্থক।

সকলের অলক্ষ্যে এই বাড়ির একটা ঘর পরীক্ষা করবার ইচ্ছে আছে বাসবের। ওর পরিকল্পনায় এই দুর্যোগের রাত নানা দিক থেকে সহায়ক হবে বিবেচনা করে ও এই নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে।

অনেক চেষ্টার পর পাঁচিল টপকে বাসব বাগানে এল।

অন্ধকারে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে—বিরাট দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। বিদ্যুৎ চমকাল। স্পাইর‍্যালের সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। ওর সাহায্যেই ওকে ওপরে উঠতে হবে। অবশ্য সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ নিশ্চয়ই। ব্যালেন্স করে কিছুটা পথ কারনিসের ওপর দিয়ে গিয়ে বারান্দার রেলিংটা ধরতে হবে।

বাসব গ্রেট কোটের কলার আরেকটু তুলে স্পাইর‍্যালের সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছে মাত্র—মনে হল মৃদু পায়ের শব্দ হচ্ছে কাছেই। কে যেন সতর্কতার সঙ্গে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

বাসব সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এসে, দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার দরুন বাসবের চোখ অন্ধকারে বেশ সয়ে এসেছিল। ও দেখল, একটা জমাট কালো ছায়া দ্রুত স্পাইর‍্যালের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলল।

সিঁড়ির ওপরকার শেষ ধাপে উঠে সে কী কৌশলে বাইরের দিকে থেকে দরজা খুলে ভেতরে গেল, নীচে থেকে বাসবের পক্ষে তা লক্ষ করা সম্ভব হল না।

আগন্তুক ল্যাট্টিন পার হয়ে বারান্দায় এল।

বারান্দার শেষমুখে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে গেল আগন্তুক। পদক্ষেপে তার বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। অন্ধকারের মধ্যে বেশ সহজভাবেই এগিয়ে চলেছে। যেন সবই তার অত্যন্ত পরিচিত।

সামনেই একটা তালাবন্ধ ঘর।

BanglaBook.org

আগন্তুক নিজের পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। দরজায় তালা ঝুলছে। বেশ বড় সাইজের আলিগড়ের তালা। সে সহজ ভঙ্গিতে আবার পকেটে হাত চালিয়ে দিল। বাঁ-হাতে টর্চটা তখন। এবার ডান হাতের মুঠোয় চাবির গোছা।

দরজায় যে তালা লাগানো থাকবে একথা অজানা ছিল না আগন্তুকের। কয়েকটা চাবি পরীক্ষা করবার পরই একটা লেগে গেল। খুলে গেল তালাটা।

ঘরে প্রবেশ করল আগন্তুক।

অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে সে একটা বই তুলে নিল। গ্লসি পেপারের জ্যাকেট দেওয়া মোটা বই। বইটা নিয়ে সে যেই পিছন ফিরতে গেছে—কে চাপা গলায় বলল, বইখানা আমায় দিন।

কে!—চমকে উঠল আগন্তুক।

হাত দুয়েক দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় জন আবার বলল, ইতস্তত করে কোনও লাভ নেই। বইখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরুন।

আপনি যে আসবেন, তা আমি জানতাম। তবে আজই বুঝতে পারিনি।

এই শীতেও প্রথম আগন্তুকের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

এত করেও কি শেষ রক্ষা হবে না? সে বইটা এগিয়ে ধরল। দ্বিতীয় জন নিজের হাত প্রসারিত করল বইটা নেওয়ার জন্যে। এই অমূল্য মুহূর্ত হাতছাড়া করতে চাইল না প্রথম আগন্তুক। সে দ্বিতীয় জনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। আরম্ভ হল ধ্বস্তাধস্তি।

এদিকে—

এদিকে আগন্তুক অদৃশ্য হওয়ার পর, বাসব কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল আগেকার জায়গায়, তারপর সেও স্পাইর‍্যালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ল্যাট্রিন পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল বাসব।

এখন কোন দিকে যাবে? আগন্তুক কোনদিকে গেছে আন্দাজ করা দুষ্কর। সে কাজে এই দুর্যোগ মাথায় করে ও এখানে এসেছিল, সে-কাজ আজ মুলতুবি থাক। বরং যে নতুন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে, সে বিষয় অনুসন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু—আগন্তুককে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? এই অন্ধকার রাজ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেছে কে জানে। এই বাড়ির সম্বন্ধে বাসব হীরকের কাছ থেকে যে মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছিল, তারই ওপর নির্ভর করে ও এগিয়ে চলল।

তখনও চলেছে ঝটাপটি।

বইটা ছিটকে পড়ল একধারে।

ঘুম ভেঙে গেল সুমিত্রার।

কীসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল।

বিছানায় উঠে বসল সুমিত্রা।

বাইরে মেঘ ডাকছে। জানলার কাচ ভেদ করে বিদ্যুতের ঝিলিক ক্ষণে-ক্ষণে ঘরখানাকে আলোকিত করে তুলছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল তার।

কিন্তু ওকী—পাশের ঘরে একটানা কীসের শব্দ হচ্ছে?

BanglaBook.org

পাশের ঘরটা স্টাডি। ওই ঘরে ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র নিহত হয়েছেন। ও ঘরে তো কারুর ঢোকার উপায় নেই। পুলিশ তালা দিয়ে গেছে। তবে শব্দ হচ্ছে কীসের।

তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে কেউ—চোর নাকি?

কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে খাট থেকে নামল সুমিত্রা। ঘরের আলো জ্বালল। তীব্র আলোয় ভরে গেল ঘরখানা। ওই সঙ্গে সম্পূর্ণ সাহসও ফিরে এল।

দরজা খুলে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুমিত্রা। বারান্দায় আলোর সুইচের দিকে এগিয়ে গেল। এখনও শব্দটা হচ্ছে। কিন্তু সুইচ অবধি পৌঁছতে পারল না ও। তার আগেই স্টাডি থেকে কে একজন বেরিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ল। ছিটকে পড়ল একধারে সুমিত্রা। মাথাটা ঠুকে গেল দেওয়ালের সঙ্গে।

সেই অবস্থাতেই ও লক্ষ করল, আরেকজন লোক স্টাডি থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল।

নিজের বেশবাশ সংযত করে উঠে দাঁড়াল সুমিত্রা। একজন নয়—দু-দুজন লোক স্টাডিতে ঢুকেছিল। কী নিতে ঢুকেছিল ওরা? ও-ঘরে তো টাকা-পয়সা কিছু নেই।

সুমিত্রা দ্রুত পার্লারের দিকে এগিয়ে গেল।

দারোয়ানদের ডেকে এখনো যদি লোক দুটোকে আটক করা যায়, সে বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠল সুমিত্রা। পার্লার পেরিয়ে পোর্টিকোতে এল ও।

তখনো বিদ্যুৎ ঝলসে চলেছে।

ওকী....কে...কে ওখানে...।

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি। পুরো দৃশ্যটা তার চোখের ওপর পরিষ্কার হয়ে উঠল।

ভয়ে দম আটকে আসতে লাগল সুমিত্রার। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। ও অস্ফুট শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বাসব অন্ধকার হাতড়ে সিঁড়িটা খুঁজে পেল শেষে।

টর্চ সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু পাঁচিল টপকে বাগানের মধ্যে ঢোকবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে সেটা।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসেছে বাসব, হঠাৎ গুরুভার কিছু পতনের শব্দ ওর কানে গেল।

বাসব দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। শব্দ লক্ষ করে ছুটে চলল।

জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তখন।

পোর্টিকোর আলো জ্বলছে।

বাসব পোর্টিকোতে পৌঁছে দেখল, সঞ্জীব রুদ্র সুইচের কাছ থেকে সরে আসছেন। তাঁর ভয়চকিত দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ। বাসব তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, পোর্টিকোর শেষ প্রান্তে ছিন্নমূল লতার মতো পড়ে আছে সুমিত্রা।

বাসব এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে সুমিত্রার পাল্‌সটা দেখল—ঠিকই চলছে। সামান্য মূর্ছা। সঞ্জীব রুদ্র ওকে এই সময় এখানে দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন।

বাসব বলল, আসুন, আমরা ধরাধরি করে মিস রুদ্রকে পার্লারের সোফায় শুইয়ে দিই। ভয়ের কিছু নেই, মুখে জলের ঝাপটা দিলেই এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

ওর কথাই ঠিক।

সোফায় শুইয়ে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিত্রার। ভীত চোখে তাকাল ও। বাসবের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভয় বিস্ময়ে পরিণত হল। বলল, আপনি—।

বাসব একটু হাসল। সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, কী হয়েছিল মিস রুদ্র? আপনি ভয় পেয়েছিলেন কেন?

BanglaBook.org

আমি...আমি দেখলাম পোর্টিকোতে কে একজন—।

পোর্টিকোতে কে একজন—?

কে একজন পড়ে রয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক—!

সেকী। আমরা তো কিছু দেখতে পেলাম না। তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। সঞ্জীব বললেন।

না, ভুল আমি দেখিনি। বিদ্যুতের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম। তাছাড়া দুজন লোককে স্টাডি থেকে পালাতে দেখেছি।

বাসব দ্রুত চিন্তা করল, ও দেখেছে একজনকে, অথচ সুমিত্রা বলছে দুজন। ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।

বাসব বলল, হয়তো আমরা দেখতে পাইনি। চলুন, গিয়ে দেখা যাক। সুমিত্রা দেবীর কথাটা সত্যি কি মিথ্যে এখুনি প্রমাণিত হয়ে যাবে।

সঞ্জীব রুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ও আবার পোর্টিকোতে এল।

বিদ্যুৎ তখন আর চমকাচ্ছে না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবল ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

বাইরের আলোটা জ্বাললেন সঞ্জীব। সুমিত্রার কথার সত্যতা প্রমাণিত হল।

বৈদ্যুতিক আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ল, একধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে স্রোতের আকারে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা।

বাসব দেহটাকে সোজা করে দিল।

সঞ্জীব রুদ্র বিস্মিত গলায় বললেন, একী! এ কী হরিপদ!!

অজয়বাবুর বেয়ারা হরিপদ?

হ্যাঁ। কিন্তু সে...।

সঞ্জীববাবু, আর কথা নয়, এখুনি গিয়ে পুলিশে রিং করুন।

পুলিশ এল।

বাসব ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল প্রেমপ্রকাশকে।

মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হল।

ইন্সপেক্টর বললেন, হরিপদ শেষপর্যন্ত এ বাড়িতে খুন হল!

আমার মনে হয়, এ বাড়িতে খুন সে হয়নি। দেখছেন না কীরকম পজিশনে মৃতদেহ পড়েছিল। তাছাড়া সে এ বাড়ির লোক নয়। সে কখনো এ বাড়িতে এসেছে কি না এ বিষয়েও আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।

আপনি বলতে চান খুন হওয়ার পর তার মৃতদেহ এখানে বয়ে আনা হয়েছিল?

হ্যাঁ। বৃষ্টি না হলে আমরা বাগানের কোথাও-কোথাও রক্তের দাগ দেখতে পেতাম। কারণ মাথায় যেরকম প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে, তাতে রক্ত পড়তে-পড়তে আসাই স্বাভাবিক।

আরেকটা প্রশ্ন অ্যারাইজ করে তাহলে এই প্রসঙ্গে, মৃতদেহ এখানে বয়ে আনার পূর্ব মুহূর্তেই হরিপদকে হত্যা করা হয়েছিল। নইলে রক্ত চুঁইয়ে পড়ার কোনও সার্থকতা থাকে না।

নিশ্চয়ই। বেশ কিছুক্ষণ আগে তাকে খুন করা হলে রক্ত জমাট বেঁধে যেত।

এরপর প্রেমপ্রকাশ বাড়ির সকলকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সে রকমের উল্লেখযোগ্য কোনও উত্তর পাওয়া গেল না কারুর কাছ থেকে।

বাসব সঞ্জীব রুদ্রকে প্রশ্ন করল, সুব্রত রায়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

তিনি কি এ-বাড়িতে থাকেন না?

BanglaBook.org

না।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, স্টাডিটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সুমিত্রা নিজেকে সামলে নিয়েছে।

ওকে বিশ্রাম করতে সুযোগ দেওয়া হল।

বাসবকে অনুসরণ করে প্রেমপ্রকাশ স্টাডিতে এলেন।

সারা ঘরে লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। চেয়ারগুলো উলটে পড়েছে। টেবিলে ওপরকার কিছু জিনিস মেঝের এখানে-ওখানে ছড়ানো। ঘরের মধ্যে যেন গজকচ্ছপের মহারণ হয়ে গেছে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটা বই তুলে নিল। রাইডার হ্যাগার্ডের ব্ল্যাক শ্যাডো। যে বইখানা মারা যাওয়ার আগে পড়ছিলেন ডাঃ রুদ্র।

ও চিন্তিত মনে বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করল বারকতক। প্রেমপ্রকাশ মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পায়ার কাছে কী একটা চকচক করছে।

কী ওটা? হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন তিনি।

রতি তিনেক ওজনের একটা লাল পাথর।

ইন্সপেক্টর দেখালেন পাথরটা বাসবকে। ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে পাথরটা ফিরিয়ে দিল। কোনও মন্তব্য করল না।

কীরকম বুঝছেন? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর।

আর কোনও মন্তব্য করতে ভরসা পাচ্ছি না। বাসব বলল, ঘটনার গতি এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।—এই টেবিলের ড্রয়ারগুলো, বোধ হয় চাবি বন্ধ আছে। আমি ওগুলো পরীক্ষা করতে চাই। ডাক্তার রুদ্রর পকেটে যে চাবির গোছা পাওয়া গিয়েছিল—সেটা অবশ্য থানায় আছে। তবে, এখানে ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া যায় কি না, তার অনুসন্ধান করা হল।

সুমিত্রার কাছে ছিল ডুপ্লিকেট চাবি।

ডাঃ রুদ্র প্রায়ই চাবি হারাতেন। তাই এক সেট ডুপ্লিকেট চাবি সুমিত্রার কাছে থাকত। সেই চাবির সাহায্যেই দেরাজগুলো খোলা হল। অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর একটা দেরাজ থেকে খান তিনেক ডায়েরি পাওয়া গেল। অবশ্য বাজারে যে ধরনের ডায়েরি কিনতে পাওয়া যায়, এই ডায়েরিগুলো সে-ধরনের নয়।

মোটা-মোটা বাঁধানো খাতা। তারিখ দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেক দিনের বিবরণ লেখা রয়েছে।

রোজনামচা।

এগুলো আমি কয়েকদিনের জন্যে নিজের কাছে রাখতে চাই।

বেশ তো।

দেরাজ বন্ধ করা হল। এ ঘরের কাজ এখনকার মতো শেষ হয়েছিল।

ফেরার পথে ইন্সপেক্টর বললেন, আপনার একটা থিওরিতে কিন্তু গলদ বেরিয়েছে।

কীরকম?

টুথপিকের বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। কোনও কাঠির গায়ে সায়ানাইডের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বলেন কী! তা কী করে সম্ভব?

পরীক্ষার ফলাফল তো তাই।

কিন্তু একটা টুথপিকের বাক্সর এতগুলো সাধারণ কাঠির মধ্যে থেকে বেছে-বেছে সায়ানাইড

BanglaBook.org

মাখানো কাঠিটাই ডাক্তার রুদ্র তুলে নেবেন, তা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও গোলমাল আছে।

বাসব মিনিট খানেক গভীরভাবে কী চিন্তা করল, তারপর আবার বলল, একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে জাগছে। যদিও...শুনুন ইন্সপেক্টর, ওই টুথপিকের বাক্সর গায়ে যে সমস্ত আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, সেগুলো সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করুন।

বেশ।

ডাঃ রুদ্রর অতীত সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। আগ্রায় আসবার আগে তিনি কলিন্স অ্যান্ড হো কোম্পানির মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন।

কত টাকা মাইনে পেতেন?

তিনশো পঞ্চাশ টাকা।

তিনি ধনী ছিলেন না প্রমাণিত হল। তিনি হঠাৎ আগ্রায় এসে এত বড় চেম্বার খুলে বসলেন, এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভদ্রলোক কোথা থেকে সকলকে হাজার-হাজার টাকা ধার দিচ্ছিলেন। তিনি এখানে এসে নিশ্চয়ই রাতারাতি গুপ্তধন পেয়ে যাননি?

প্রেমপ্রকাশ নীরব রইল। ডাঃ রুদ্র যে টাকা ধার দেওয়ার ব্যাবসা করতেন, এ-কথা ইন্সপেক্টরকে আগেই বলেছিল বাসব।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর সুমিত্রা নিজের ঘরে ফিরে এল।

এতক্ষণ ও পার্লারে ছিল। শরীর এখন বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে।

ও ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল।

একলা শুয়ে ভয়-ভয় করছে। যেসমস্ত ঘটনা বাড়িতে ঘটে চলেছে, তাতে ভয় না করাই আশ্চর্য। অজয়বাবুর বেয়ারা এবাড়িতে খুন হল! বাবাকে যে খুন করেছে, একাজ কি তারই? কেন, এমন ঘটেছে?

কার স্বার্থের জন্যে বাবা মারা পড়লেন?...আর ভাবতে পারে না ও। কেমন নিজেকে অসহায় বোধ করে। ঘরে বড় আলোটা জ্বলছিল। সুমিত্রা বড় আলোটা নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বালল। ঘুম কি আসবে?

এই সময় পিছন থেকে ওর কাঁধে কে হাত রাখল।

সুমিত্রা—।

কে!

চমকে সুমিত্রা মুখ ফেরাল।

আমি।

নাইট ল্যাম্পের মোলায়েম আলোর মধ্যেও সুব্রতকে চিনতে কষ্ট হল না সুমিত্রার।

তুমি!!

অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কী দুঃসাহস তোমার। এত রাত্রে...কেউ যদি দেখে ফেলত?

সুমিত্রার সামনে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

নিজের হাত দুটো ওর কাঁধের ওপর রেখে বলল, আজকাল আমার সঙ্গে তোমার মোটেই দেখা হয় না। চোখের দেখার কথা বলছি না। আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই, মিত্রা। ঠিক এখনকার মতো খুব কাছে।

BanglaBook.org

সুব্রত খুব কাছে সরে এল সুমিত্রার।

তবুও এত দুঃসাহস কি ভালো?

এই শেষ। আর হয়তো দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারব না।

কেন, কেন এ-কথা বলছ তুমি?

আমি কয়েকদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব ভাবছি।

চলে যাবে! কেন?

এখানে আর থেকে কী করব বল? তোমার বাবা মারা যাওয়ার পরই, আমার এখানকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

সুব্রত হাসল।

তুমি কোথায় যাবে সুমিত্রা? তোমার অর্থ-সম্পদ, অজয় সোম, সবই তো এখানে রইল।

সুব্রতর বুকে মুখ রাখল সুমিত্রা।

ভেজা গলায় বলল, না, না, তুমি আমাকে যেভাবেই উপহাস করতে চাও না কেন, আমি তোমার কোনও কথায় কান দেব না। তুমি যদি এখান থেকে যাও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তুমি কি আজও আমায় বুঝতে পারলে না!

অমনি কান্না! সুব্রত ওর মুখটা তুলে ধরল।—এবাড়িতে চাকরি নিয়ে ঢোকার প্রথম অবকাশেই তোমায় আমি বুঝতে পেরেছি সুমিত্রা। আমি ভুলিনি, আলাপের সেই প্রথম মুহূর্ত। তোমার হাত কেটে গিয়েছিল। ডাক্তার রুদ্র আদেশ দিলেন, ব্যান্ডেজ করে দিতে। অদ্ভুত মমতা ভরা দৃষ্টি নিয়ে তুমি আমার কার্যকলাপ লক্ষ করলে। কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল আমার শার্টের ওপর। বিশ্বাস করো, সে শার্টটা আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

তবে কেন—কেন তুমি আমাকে...।

তুমি সিরিয়াসলি ধরে নিলে কথাটা? আচ্ছা বোকা মেয়ে যা হোক। আমি তোমাকে কখনও একলা ছেড়ে যেতে পারি?

এই...এবার তুমি যাও। জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ লজ্জার বিষয় হবে।

পুলিশ চলে গেছে?

হ্যাঁ। অজয়বাবুর বেয়ারা—।

খুন হয়েছে তো? আমি জানি। ক্রমেই তোমাদের বাড়িটা রহস্যের খাসমহল হয়ে উঠছে। শোনো, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে!

বলো?

তোমার কাছে তো চাবি আছে। ডাঃ রুদ্রর ডায়েরিগুলো আমায় সংগ্রহ করে দিতে হবে।

ডায়েরিগুলো?

হ্যাঁ, মিত্রা। তুমি একটু আশ্চর্য হচ্ছ, বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে বলব—সব কথাই বলব পরে। তবে...।

সুব্রতর কথা শেষ হল না, দরজায় করাঘাত হল কয়েকবার।

সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল সুমিত্রা।

ওর সুন্দর মুখের রেখায়-রেখায় ভয়ের ছায়া নেমে এল।

সুব্রত এধার-ওধার তাকিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল।

চাপা গলায় বলল, আমি জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো।

BanglaBook.org

সুব্রত আর কালবিলম্ব না করে জানলার পাল্লাটা খুলে বাগানে নেমে পড়ল।
দরজায় আবার বারকতক করাঘাত হল।
জানলার পাল্লাটা বন্ধ করে দরজা খুলে দিল সুমিত্রা।
সামনেই দাঁড়িয়ে সঞ্জীব রুদ্র ও অজয় সোম।

॥ সাত ॥

সঞ্জীব টেলিফোন করেছিলেন অজয় সোমকে।

হরিপদ খুন হয়েছে শুনে কালবিলম্ব না করে মিঃ সোম চলে এসেছেন এখানে।

দরজার গোড়ায় দুজনকে দেখে বিস্মিত গলায় বলল সুমিত্রা, কী হয়েছে?

সঞ্জীব রুদ্র বললেন, তোমার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ পেলাম?

কথাবার্তার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।

শুনেছি বলেই প্রশ্ন করছি।

এত রাত্রে আমার ঘরে কে আসতে পারে?

কিন্তু...।

দাদা! গম্ভীর গলায় সুমিত্রা বলল, তুমি যা বলতে চাইছ, তার অর্থ কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা তুমি জান?

অজয় সোম বলে উঠলেন, ও নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই সঞ্জীব। আমরা হয়তো ভুল শুনেছি।

সঞ্জীব রুদ্র আর কিছু বললেন না।

গম্ভীর মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে।

মিঃ সোম বললেন, ঘরে আসব?

আসুন।

তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে বসলেন।

বললেন, নিশ্চয়ই তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম, না? এইরকম একটা দুর্ঘটনার পর কারুর চোখেই ঘুম আসতে পারে না।

সুমিত্রা মনের মধ্যে অসহিষ্ণুভাব অনুভব করলেও, বেশ শান্তভাবেই বলল, আপনি কি আমায় কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। যদিও আমার বক্তব্যের পক্ষে পরিস্থিতি তেমন অনুকূল নয়। তবুও আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে।

বলুন?

তোমাকে এ বিষয়ে কিছু না বললেও চলত। এসব স্থলে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করাই বিধেয়। কিন্তু এখন তুমি প্রায় তোমার নিজের গার্জেন। কাজেই—।

অজয় সোমের ভণিতায় কিছুটা বিরক্ত বোধ করল সুমিত্রা।

ও অধীর গলায় বলল, আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না। পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়।

পরিষ্কার করেই বলেছি। আমি আর দেরি করতে চাই না। ম্যারেজের ডেটটা—।

বিয়ের তারিখ!! আপনি কী বলছেন, মিস্টার সোম? মাত্র কয়েকদিন আগে বাবা মারা গেছেন—।

BanglaBook.org

না, না, আমি এই মুহূর্তে কিছু বলছি না। তারিখ একটা নির্দিষ্ট করে রাখলে—।

আমায় ক্ষমা করবেন। ও বিষয় আলোচনা এখন আমি করতে চাই না।

অজয় সোম উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল সুমিত্রা। সত্যি, তোমার এই মনের অবস্থাতে এখন ও বিষয় আলোচনা চলতে পারে না। আচ্ছা, আমি চলি। তুমি বিশ্রাম করো।

নানা কথা ভাবতে-ভাবতে সুমিত্রা দরজাটা বন্ধ করল।

বেশ কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে।

চা-পর্ব শেষ করে বাসব ও হীরক নানারকম আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে।

একসময় বাসব প্রশ্ন করল, যেদিন ডাক্তার রুদ্র মারা যান, সেদিনকার সমস্ত কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

আছে বইকি।

ভেবে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি ও প্রেমপ্রকাশ যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করে সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, তখন তুমি ও অজয় সোম ড্রইংরুমে বসেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সেসময় কি অজয় সোম বসে থাকতে-থাকতে একবার উঠে গিয়েছিলেন?

হীরক একটু ভেবে বলল, তোমরা চলে যাওয়ার পরই অজয় সোম উঠে গিয়েছিলেন।

হুঁ। কোন দিকে গিয়েছিলেন, কিছু মনে আছে?

যতদূর মনে পড়ছে পোর্টিকোর দিকে।

বাসব আর কিছু বলল না।

কলিংবেল বেজে উঠল।

হীরক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একজন দীর্ঘকায় সুরূপ যুবক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হীরককে দেখে সে বলল, বাসববাবু আছেন কি?

আছেন। আসুন।

যুবকটি ভেতরে এল।

বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সুব্রত রায়।

সুব্রতকে বার কয়েক আগে দেখেছিল হীরক।

লম্বায় সে প্রায় ছ'ফিট। তামাটে গায়ের রং। সুশ্রী মুখশ্রী। সুরুচিকর জামাকাপড় গায়ে। বাঁ-হাতের পাতায় ব্যান্ডেজ করা।

বাসব বসতে অনুরোধ করল সুব্রতকে।

সুব্রত বলল, সঞ্জীববাবুর মুখে খবর পেলাম, আপনি আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ। ডাক্তার রুদ্রর হত্যাসংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করব।

কিন্তু আমি হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু জানি না।

আমার প্রশ্ন ডাক্তার রুদ্রকে কেন্দ্র করেই থাকবে মিস্টার রায়।

বলুন, কী জানতে চান?

আপনি ডাক্তার রুদ্রর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, কিন্তু সচরাচর ডাক্তারদের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে দেখা যায় না।

অ্যাপায়েন্টমেন্টের সময় আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।

BanglaBook.org

আপনাকে কী ধরনের কাজ করতে হত?

আমি...আমি...একটু ইতস্তত করল সুব্রত।

আপনি মিথ্যে সংকোচ করছেন মিস্টার রায়।

ডাক্তার রুদ্রর তেজারতি কারবার ছিল। আমাকে ওদিকটা দেখতে হত।

সমস্ত লেন-দেনের দলিল কি আপনার সামনে তৈরি হত?

প্রায় সমস্তই। কাউকে-কাউকে আবার গোপনেও টাকা দিতেন—তার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেন না।

আপনি কতদিন ডাক্তার রুদ্রর কাছে কাজ করছেন?

বছর চারেক হবে।

আপনার আগে কেউ একাজে নিযুক্ত ছিল?

না।

বাসব সিগারেটের কেসটা পকেট থেকে বের করে, এগিয়ে ধরে বলল, চলে নাকি?

আমি সিগারেটে অভ্যস্ত নই।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আপনি স্থানীয় লোক।

না। আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

আপনি কলকাতা থেকে আগ্রায় এলেন কেন? ডাক্তার রুদ্র কি পেপারে সেক্রেটারি পদটির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

না। আমি এক পাঞ্জাবি বন্ধুর অনুরোধে আগ্রায় এসেছিলাম। চাকরির তখন আমার খুব প্রয়োজন ছিল। চাকরি খুঁজছিলাম। দৈবাৎ একদিন ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল এক কাওয়ালি মহফিলে। উনি কাওয়ালি শুনতে খুব ভালোবাসেন। তারপর একদিন ওঁর কাছে গিয়ে চাকরির আবেদন করলাম। উনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেন।

ডাক্তার রুদ্রর বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে আমি আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

সুব্রত একটু থেমে বলল, বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে—ডাক্তার রুদ্র ছেলে আর নিজের ছোট ভাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

কীভাবে বুঝলেন?

প্রায়ই তাঁদের সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা বলতেন।

কী বলতেন?

বলতেন, দুনিয়ার একটা জিনিসই ওরা চিনতে শিখেছে সুব্রত, তা হল, টাকা। নিজেরা ভালোভাবে রোজগার করতে পারে না, শুধু আমার টাকার ওপর লোভ। আমার বাপ গরিব ছিলেন, আমি যা কিছু সংগ্রহ করেছি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। ওদের সে চেষ্টা আছে? আমি কিছু না দিয়ে গেলে তো ওরা না খেতে পেয়ে মরবে।

আর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলতেন না?

সুমিত্রা দেবীকে উনি ভালোবাসতেন।

বাসব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, মিস্টার সোমের সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে শুনলাম। এর মধ্যে কোনওরকম প্রণয়ঘটিত ব্যাপার আছে নাকি?

মিস্টার সোমকে ডাক্তার রুদ্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন। বিয়ের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন।

ও। দুর্ঘটনার দিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

সুদের তাগাদায় গিয়েছিলাম।

ইদানীং কি ডাক্তার রুদ্র নিজের প্রাণের আশঙ্কা করছিলেন? এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

BanglaBook.org

না। তবে তাঁর মুখে ভীত ভাব লেগে থাকত। তিনি সবসময় আমাকে কাছে-কাছে রাখতেন।
ধন্যবাদ মিস্টার রায়। বাসব বলল, আপনার এই সাহায্যের জন্যে আমি আনন্দিত।
সুব্রত উঠে দাঁড়াল।—আমি এখন যেতে পারি নিশ্চয়ই?
হ্যাঁ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসব বঙ্কিম রুদ্রর ডায়েরিগুলো নিয়ে বসল গিয়ে নিজের বিছানায়। এবার এগুলো ও পড়ে দেখবে।
যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।
হীরক কাজে বেরিয়ে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগেই।
তিনটে মোটা-মোটা খাতায় বছর চোদ্দোর রোজনামচা ধারাবাহিকভাবে লেখা রয়েছে।
বাসব চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।
সর্তকতার সঙ্গে এক একটি পাতা পড়তে লাগল।
হঠাৎ এক জায়গায় ওর দৃষ্টি হোঁচট খেল।

৮ই জুন, ১৯৪৯
চন্দ্রকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালোই হল। ধনী লোক। মনে হয় তার সাহায্যে কিছু গুছিয়ে নিতে পারব। অফিস থেকে পাওয়া ওই কটা টাকায় এতবড় সংসার চালানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিছু বাড়তি টাকা চাই।

১১ই জুন, ১৯৪৯
চন্দ্রকান্তকে যতটা দরাজ ভেবেছিলাম, সে ঠিক ততটা নয়। বেশ হাতটান আছে। টাকা ছাড়া আর সব ব্যাপারে সে অবশ্য খুব প্রাণখোলা।

১৮ই জুন, ১৯৪৯
কিন্তু এত টাকা চন্দ্রকান্ত পাচ্ছে কোথা থেকে? খোঁজ নিয়ে দেখেছি তার কোনও জমিদারি নেই। বিরাট কোনও ব্যবসা নেই। তার আছে ছোট একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান। তার থেকেই এত টাকা আয় হচ্ছে বিশ্বাস হয় না।

বাসব চিন্তিত হল।
ওর মনে পড়ল, প্রশ্নের উত্তরে অজয় সোম বলেছিলেন, তাঁর চেম্বারে একবার ডাঃ রুদ্র চন্দ্রকান্তর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই রহস্যের নাটকে চন্দ্রকান্ত কোনও রোলে অ্যাক্ট করছে কি না কে বলতে পারে। ও আবার ডায়েরির পাতা ওলটাতে লাগল।

১৬ই জুন, ১৯৪৯
মনে হচ্ছে, চন্দ্রকান্তর অর্থাগমের পথটা আমি জেনে ফেলেছি। লোহালক্কড়ের ছোট দোকানটা আসলে লোকের চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করার জন্যেই। সে কোনও একটা জিনিস ব্ল্যাক করে লক্ষ-লক্ষ টাকা করেছে। কিন্তু জিনিসটা যে কী বুঝতে পারছি না।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৫০
আমি ধৈর্য ধরেছিলাম। জানতাম শেষপর্যন্ত চন্দ্রকান্তকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। সে প্রস্তাব করেছে একটা লোকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করতে।

BanglaBook.org

এতে নাকি আমার আশাতীত লাভের সম্ভাবনা। বুঝতে পারলাম না, একটা লোকের চিকিৎসা করে আমি কীভাবে আশাতীত লাভবান হব।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০

আজ কথাটা ভাঙল চন্দ্রকান্ত আমার কাছে।

সে বলল, তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। একজন পেশেন্টকে চিকিৎসা করে কীভাবে বহু টাকা রোজগার করা যাবে, তাই না? যাবে। তবে চিকিৎসা করে নয়। যাতে রুগির চিকিৎসা খুব বেশিদিন করতে না হয়, সেই পথ ধরে।

আমি বিস্মিত ভাবে বললাম, অর্থাৎ—?

রুগিকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

সেকী?

শোনো বঙ্কিম, আমি যে রুগিটির কথা বলছি, তার নাম কৈলাস বর্মা। তার কাছে যে প্রচুর অর্থ আছে, তা নয়। তবে এমন একটা জিনিস আছে, যা আমরা সংগ্রহ করতে পারলে লক্ষ-লক্ষ টাকা পকেটস্থ করতে পারব।

কিন্তু...

কোনও কিন্তু নয়। 'কিন্তু'কে প্রশ্রয় দিয়ে কেউ কখনো বড়লোক হতে পারেনি। আমার কথাই ধরো, বাঁকা পথ দিয়ে প্রচুর টাকা আমার কাছে আসে। তাই আমার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই সমান আছে। টাকাই হল সব। আর তুমি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘরে টাকা আনছ—তবুও কি পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ?

আমি ঘামতে লাগলাম।

চন্দ্রকান্ত আবার বলল, এত বড় সুযোগ জীবনে তুমি পাবে না। কৈলাস বর্মার কাছে একটা নকশা আছে। ওই নকশাই আমাদের টার্গেট।

নকশা!!

অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসেই অবশ্য এ সমস্ত পড়া যায়। তবু আমি যা বলছি, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। ও নকশা অনেক টাকার সন্ধান দেবে আমাদের।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সবই বলব। বেশ কিছু পিছিয়ে আরম্ভ করতে হবে আমাকে। নিশ্চয়ই তুমি ধৈর্য ধরে শুনবে। এবার আমি বাংলার ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

আমি তখন বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

বললাম, বলো, আমি শুনছি।

চন্দ্রকান্ত আরম্ভ করল : পাল-সাম্রাজ্য তখন ভেঙে পড়ছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব আর গুপ্তহত্যা সুমহান ঐতিহ্যশালী এই বংশের রাজপুরুষদের শিরায়-শিরায় বাসা বেঁধেছে তখন। চলেছে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে মৃত্যু-মহোৎসব। এইভাবেই চলত হয়তো—পাল বংশের শেষ পালটিও সিংহাসনের নেশায় বুকের রক্তে গৌড়বঙ্গের মাটি লাল করে তুলত হয়তো—কিন্তু তা হল না। দুরন্ত ঘোড়ার দুর্বার গতিবেগকে কঠোর হাতে সংযত করার মতো, এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তে এই হানাহানির রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়ে রক্তের গতিবেগকে রুদ্ধ করলেন এক অসামান্য পুরুষ—ইনিই মহেন্দ্র পাল। সংযতবাক বিরাটদেহী মহেন্দ্র সিংহাসনের আনাচে-কানাচের সমস্ত মলিনতা দূর করে বৃহৎ চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

অচিরেই সন্ধান পাওয়া গেল কুচক্রীর। তিনি অবশ্য কেউ নন, মহা অমাত্য ইন্দ্রকান্ত বর্মা। কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না। এমনকী ইন্দ্রকান্তর প্রাসাদে গিয়ে রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করার মতোও কিছু পাওয়া গেল না। শূন্য বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শেষপর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে এবং মহেন্দ্র পালের সিংহাসনে আরোহনের উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র এবং প্রচুর ধনরত্নসহ গৌড় ত্যাগ করলেন।

সঙ্গে তিনি যে ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা রাজার সম্পদ।

অরাজকতার সুযোগ নিয়ে রাজকোষ থেকেই এ সমস্ত অপহরণ করেছিলেন ইন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত থামল।

বললাম, তারপর—?

তারপর গৌড় থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন ইন্দ্রকান্ত। চলে এলেন মহেন্দ্রের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। তিনি আগ্রার কাছে চৌপুরায় এসে ঘর বাঁধলেন। অতি সাধারণভাবে জীবন আরম্ভ করলেন, এবং সমস্ত ধনরত্ন বিশেষ একস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ইন্দ্রকান্ত। ধনরত্ন যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তার একটা নকশা তৈরি করলেন। কিন্তু এমনই বিধির বিধান—নকশা তৈরি করার পরের দিনই তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর বিছানায়। গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন তিনি। তবে সৌভাগ্যক্রমে নকশাটা খোয়া গেল না।

এরপর হাত বদল হতে-হতে নকশাটা উপস্থিত হয়েছে বর্মা-বংশের শেষ বর্মা কৈলাস বর্মার কাছে। এতদিন কেউই নকশাটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু কৈলাস স্বতন্ত্র চরিত্রের লোক। তিনি এ বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন ঠিক করেছিলেন—হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে রয়েছে।

বললাম, এতে আমার ভূমিকাটা কী?

তোমাকে কী করতে হবে আমি আগেই বলেছি। কৈলাস বর্মা নকশাটা রেখেছে তার বিছানার তোশকের সঙ্গে সেলাই করে। একথা আমি জানি। বাড়িতে তার ঘাটের যাত্রী পিসি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি কৈলাশের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করবে, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। তারপর সময় বুঝে তার একটা ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। নকশাটা উদ্ধার করার এই হল একমাত্র উপায়।

না-না, এ ভাই আমার দ্বারা হবে না।

এত ভাবপ্রবণ হলে মানুষ বড় হতে পারে না। এই কাজটা করে দিতে পারলে, আমি তোমায় হাজার কুড়িক টাকা দিতাম নিশ্চয়ই। যাই হোক, ভেবে দেখো, সময় দিচ্ছি কয়েক দিন।

কুড়ি হাজার!!

১০ই জানুয়ারি, ১৯৫০

চন্দ্রকান্তর প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত রাজি হতে হল। কুড়ি হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারলাম না। নিদারুণ অভাবে নুয়ে রয়েছি, টাকার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস কোথায়?

১১ই জানুয়ারি, ১৯৫০

কৈলাস বর্মার চিকিৎসার ভার নিয়েছি। লোকটা হয়তো এমনিতেই বাঁচবে না। গ্যাংগ্রিন হয়েছে।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০

বিষিয়ে উঠেছে কৈলাস বর্মার শরীর। ঘায়ের মুখ দিয়ে রক্তের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছি কি না, সে গবেষণার এখন প্রয়োজন নেই। ওই লোকটার পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আর খুব বেশি বিলম্ব নেই।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৫০

আজ সকালে মারা গেছে কৈলাস। নকশাটা পাওয়া গেছে।

এবার কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

২১ শে জানুয়ারি, ১৯৫০
নকশাটা দিয়েছি চন্দ্রকান্তকে।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫০
টাকা দেওয়ার ব্যাপারে চন্দ্রকান্ত আমায় ঘোরাচ্ছে। আজ নয় কাল, এই তার মুখের বুলি। ফাঁকি দেবে নাকি আমায়?

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০
আজ পরিষ্কার চন্দ্রকান্ত আমায় বলল, এত সহজে, এত মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যায় না বঙ্কিম। সময় হলে আমি ঠিকই দেব। বেশি গোলমাল করবার চেষ্টা করলে নিজেই বিপদে পড়বে। ভুলে যেও না, তুমি একজনকে পরিকল্পনা করে খুন করেছ।

আমি স্তম্ভিত হলাম। বুঝলাম, আমায় টাকার আশা ছাড়তে হবে।

রাগে ফুলতে লাগলাম।

এরপর ডায়েরিতে মাস দুয়েকের মধ্যে চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখ নেই। বাসব পাতার পর পাতা উলটে গেল। শেষে এপ্রিলের প্রথম দিকে আবার উল্লেখ পাওয়া গেল।

২রা এপ্রিল, ১৯৫০
আজ চন্দ্রকান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমার কাছে এল।

বলল, আমার পিছনে পুলিশ লেগেছে।

কেন?

পুলিশ কীভাবে সন্ধান পেয়েছে আমি একজন চোরা-কারবারি।

ও।

এখন ভাই তোমরা সাহায্য না পেলে আমি বাঁচব না।

আবার সাহায্য!

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, এ ব্যাপারে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি বলো?

তুমিই পারো। দু-একদিনের মধ্যেই আমার বাড়ি সার্চ হবে। আমি তোমার কাছে জরুরি কাগজপত্রভরা দুটো বাক্স রাখতে চাই।

কিন্তু—

বিশ্বাস করো, এই গোলমাল মিটলেই আমি তোমার কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে দেব।

ভরসা করি এবার তুমি নিজের কথা নিশ্চয়ই রাখবে?

নিশ্চয়ই।

কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম ওর প্রস্তাবে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫০
বিচিত্র গঠনের দুটো লোহার বাক্স আমার কাছে রেখে গেলে চন্দ্রকান্ত। বাক্স দুটোর ওপর যাতে আমি সবসময় নজর রাখি সে-বিষয়ে বার-বার অনুরোধ করল।

আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হল। এরকম বাক্সে কেউ কাগজপত্র রাখে নাকি?

রাত্রে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি ছেনি আর হাতুড়ি সংগ্রহ করে, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বাক্স দুটোর ডালা ভেঙে ফেললাম।

কিন্তু আমার বাকরোধ হয়ে গেল বাক্সর মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই। অজস্র নোট। সবই একশো টাকার। বাক্সর মধ্যে থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে। কত শত লোকের বুকের রক্ত, হাজার হাজার টাকার রূপ নিয়ে কালো বাজারের বাঁকা পথ দিয়ে এসে এই দুটো

BanglaBook.org

লোহার বাক্সর মধ্যে জমা হয়েছে। গুণলাম নোটগুলো। গুণতে-গুণতে রাত তিনটে বেজে গেল।

দুটো বাক্স মিলিয়ে দু-লক্ষ আটাশ হাজার টাকা রয়েছে।

কৈলাশ বর্মার নকশাটাও পাওয়া গেল।

৮ই এপ্রিল, ১৯৫০

হাসিমুখে এল চন্দ্রকান্ত। বলল, যাক, পুলিশের ঝামেলা মিটেছে। বেটাদের একচোট খুব ঠকানো গেছে। আজ ভাই বাক্স দুটো আমি নিয়ে যাব।

আমি নির্বিকার গলায় বললাম, কোন বাক্স?

আকাশ থেকে পড়ল চন্দ্রকান্ত।—কোন বাক্স মানে? আমার সেই লোহার বাক্স দুটো—

তোমার লোহার বাক্স আমার কাছে আছে।

ঠাট্টা নয় বঙ্কিম। বাক্স দুটো দাও ভাই।

কী বিপদ! এক কথা কেন বারবার বলছ! আমার কাছে তোমার কোনও বাক্স থাকলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতাম।

ব্যাকুলভাবে চন্দ্রকান্ত বলল, আমি তোমার টাকা দিতে দেরি করেছি। সত্যি, অন্যায় হয়েছে। সে জন্যে তুমি তোমাকে এভাবে বিপদে ফেলো না। আমি আজই তোমায় টাকা দিয়ে দেব।

তার বারবার অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়ে আমার মন টলল না। আমি বাক্স দুটোর কথা অস্বীকার করলাম বারবার।

সে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বলল, আমাকে নয়, আমার ছেলের ওপর দয়া করো। তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না।

আমি নিজের সংকল্প পরিবর্তন করলাম না। নিজের কথায় অটল রইলাম।

১০ই এপ্রিল, ১৯৫০

আজ খবর পেয়েছি চন্দ্রকান্তর নাকি মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাস্তাঘাটে টাকা-টাকা করে চেঁচাচ্ছে সে।

এতে কি আমার কোনও দোষ আছে?

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০

আজকেই পেলাম সংবাদটা।

রাস্তায় পাগলামি করে বেড়াবার সময় মোটর চাপা পড়ে মারা গেছে চন্দ্রকান্ত। আমি নিজেকে অদ্ভুত হালকা বোধ করলাম। খুব বড় একটা সমস্যা মিটল।

কলকাতায় আমার আর থেকে লাভ কী? চাকরি ছেড়ে দিয়ে আগ্রায় পাড়ি দিলে কেমন হয়?

নকশার নির্দেশ অনুসারে আগ্রার কাছেই পোঁতা আছে সেই ধনসম্পত্তি। অবশ্য নকশার গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে পথটা খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু...আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকবে, তাহলে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কেউ এ-ব্যাপারে সচেষ্ট হয়নি কেন?

মাঝের কয়েক বছর বিরতির পর আবার নকশার উল্লেখ পাওয়া গেল ডায়েরিতে ১৯৫৮ সালে।

BanglaBook.org

*

১৮ই মার্চ, ১৯৫৮
তোড়জোড় করে বেরিয়েছিলাম। কাউকে নকশা সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এইরকম অভিযানে বেরুতে গেলে, অনিবার্যভাবে একজন সহকারির প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই সহকারি হিসেবে যাকে মনোনীত করেছি, তাকে সমস্ত কথা বলতে হল। নকশার নির্দেশ অনুসারে আমরা বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ গোলমাল দেখা দিল। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এখনকার মতো অভিযান মাঝপথেই স্থগিত রাখতে হল। পরে আবার তোড়জোড় করে একাজে নামতে হবে।

॥ আট ॥

এরপর ডায়েরিতে তিন বছরের মধ্যে ও-বিষয়ে আর কোনও উল্লেখ নেই।
খাতাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করল বাসব।
শেষে আবার উল্লেখ পাওয়া গেল, ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬১।
আজ একটা চিঠি পেয়েছি।
এক অজ্ঞাত পত্রলেখক আমায় ভয় দেখিয়ে লিখেছে, আমাকে নাকি সে হত্যা করবে।
কে এই পত্রলেখক? কেন সে আমাকে হত্যা করবে?
চন্দ্রকান্তর ছেলে নয়তো? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছে কি?

২৬শে অক্টোবর, ১৯৬১।
আমি পাগল হয়ে যাব।
প্রত্যহ আমায় কে টেলিফোন করছে। বারংবার মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে।

৮ই নভেম্বর, ১৯৬১।
আর আমি পারছি না। কাজে মন বসছে না।
টেলিফোন আর চিঠি পেয়ে-পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।
চন্দ্রকান্ত, আমি ভুল করেছিলাম ভাই। যে কোনও শাস্তিই এখন আমার প্রাপ্য। তবে আমি বাঁচতে চাই—এই রূপ, রস, গন্ধময় পৃথিবীতে আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬১।
বুঝতে পেরেছি, কে আমাকে এইভাবে দিনের পর দিন ভয় দেখাচ্ছে। প্রাণে মারবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। সম্পূর্ণ মুখ বন্ধ করে, নিজের জীবন দিয়েই হয়তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ডায়েরি বন্ধ করল বাসব।
আর কোনও উল্লেখ নেই ও-বিষয়ে কোথাও।
ও চিন্তিত মনে একটা সিগারেট ধরাল।

BanglaBook.org

*

এখন আর কলেজ যাচ্ছে না সুমিত্রা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর লঘুপদে ও বাগানে এল।

কাল রাত্রে সুব্রত জানলা টপকে চলে যাওয়ার পর থেকে ওর মন মোটেই ভালো নেই। নানারকম চিন্তা ওকে উতলা করে তুলেছে।

সুমিত্রা এখন বাগানে চলেছে একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। গতকাল কিছু বোতল ভাঙা কাচ ও জানলা দিয়ে ফেলেছিল বাগানে। সেগুলো নিশ্চয়ই জানলার তলায় ছড়িয়ে রয়েছে।

কাল সুব্রত ওখানেই লাফিয়ে পড়েছিল।

ওর কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি তো?

জানলার তলায় এসে দাঁড়াল সুমিত্রা।

এ কী, এখানে এত রক্তের দাগ কেন? সুব্রত কি আহত হয়েছে? পায়ে ওর জুতো ছিল, কাজেই পায়ের তলা কাটতে পারে না। নিশ্চয়ই পা-মুড়ে ও পড়ে গিয়েছিল কাচের ওপর।

মনের মধ্যে কেমন আকুলতা অনুভব করে সুমিত্রা।

যদি ক্ষত মারাত্মক হয়ে থাকে? একলা থাকে সুব্রত, কে ওকে পরিচর্যা করছে। সুমিত্রা যাবে। হ্যাঁ, যাবে সে সুব্রতর সঙ্গে দেখা করতে।

বাগান পেরিয়ে সুমিত্রা গেটের কাছে এল। এবার একটা রিকশা ডেকে নিতে হবে।

গেটের সামনেই সঞ্জীব রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওকে দেখে বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

একটু বেরুচ্ছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার গন্তব্যস্থলটা কোথায়?

কোথাও একটা যাচ্ছি নিশ্চয়ই।

কোথায় যাচ্ছ সেটা আমি জানতে চাই।

সুমিত্রা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর হাত দিয়ো না দাদা। আমার বয়েস হয়েছে। মিথ্যে সবসময় আমায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছ!

বিয়ে না হওয়া অবধি তোমাকে পাহারা দিয়ে চলতে হবে বইকি।

অনেকগুলো কথা ওর ঠোঁটের আগায় ভিড় করে এল। কিন্তু অসীম বলে নিজেকে সংযত করল সুমিত্রা। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল।

BanglaBook.org

বিছানায় শুয়ে আছে সুব্রত।

জ্বর হয়েছে।

সকালে খুব অল্প জ্বর ছিল। হীরকের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পরেই ওর শরীর বেশিমাত্রায় খারাপ হয়ে পড়ে। তাড়সে জ্বর এসেছে। মিত্রার জানলার তলায় যে কাচের গাদা আছে কে জানত। লাফিয়ে পড়ার সময় বেকায়দায় পা-হড়কে পড়ে গিয়েছিল সুব্রত। পা ও হাতের চেটোর কোথাও-কোথাও কেটে গেছে কাচে। উত্তেজনার দরুন প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। বাসায় ফিরে দেখল জামাকাপড় রক্তে জবজব করছে।

কোনওরকমে ডেটলের সাহায্যে রক্ত বন্ধ করে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিয়েছিল সুব্রত। তারপর সকালে উঠেই চলে গিয়েছিলে বাসবের কাছে।

অবশ্য জ্বর এখন কমে গেছে। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে ও।

হঠাৎ দরজার কাছে শব্দ হতেই চোখ ফেরাল সুব্রত।

কী আশ্চর্য! সুমিত্রা!

সুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হয়েছে তোমার?

শুকনো একটু হেসে সুব্রত বলল, জ্বর। কিন্তু তুমি—তুমি যে এখানে আসতে পারো এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিত্রা।

সুমিত্রা বিছানার ওপর গিয়ে বসল। ওর কপালের ওপর হাত রেখে বলল, কেন—কেন বিশ্বাস করতে পারছ না?

কারণ,—আড়চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, যারা প্রাসাদে বাস করে, মোজাইকের ফ্লোরে হাঁটে, তাদের পক্ষে...।

এই...একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? আচ্ছা, তোমার কোথাও কেটে গেছে কি? জানলার তলায় রক্তের ছোপ দেখলাম।

তাই বুঝি ছুটে এলে?

হ্যাঁ, তাই। সব তাতেই শুধু ঠাট্টা—।

সুব্রতর গায়ের ওপর কম্বল ছিল। কম্বলের মধ্যে থেকে ও ব্যান্ডেজ জড়ানো হাতটা বের করল।

খুব গভীর ক্ষত, না? সুমিত্রার গলায় উৎকণ্ঠা।

খুবই অগভীর। চামড়া ছিঁড়ে গেছে মাত্র। এছাড়া পায়ে কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে।

সুব্রতর আহত হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল সুমিত্রা। বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

হচ্ছিল, এখন আর হচ্ছে না। তুমি যতক্ষণ থাকবে মোটেই আমার কষ্ট হবে না।

ধরো, আমি যদি আর না যাই, এখানেই থেকে যাই। তাহলে তুমি কী করবে শুনি?

সুব্রত বালিশের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে এনে সুমিত্রার কোলের ওপর রাখল। বলল, আমি এই অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়ব। যেখান থেকে হোক খুঁজে আনব একজন পুরুত। সাতে পাকে ঘুরিয়ে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা একটা করে নেব নিজেদের মধ্যে, তারপর আমার খালি বাক্সর চাবিটা তোমাকে গুছিয়ে দেব।

সুমিত্রা সুব্রতর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে বলল, বাবা, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠবার উপায় নেই।

কিন্তু আমি এক-একসময় তোমার কথা ভেবে অবাক হই।

কোন কথা?

তোমার বোকামির কথা আর কী।

অর্থাৎ—?

অজয় সোম একজন প্রতিষ্ঠিত অ্যাটর্নি। রূপবান এবং প্রতিপত্তিশালী। তাকে ছেড়ে তুমি—তোমার সিলেকশান মোটেই প্রশংসনীয় হয়নি, মিত্রা।

অল্প একটু হেসে সুমিত্রা বলল, এবার তোমার গুণাবলীর বিবরণটা দাও, তবে বুঝতে পারা যাবে, আমার সিলেকশানটা ঠিক হয়েছে কি না।

আমার!—ম্লান হাসল সুব্রত।—দেওয়ার মতো কোনও ব্যাক-রেফারেন্স আমার নেই। তোমার পাশে দাঁড়াবার প্রচুর অযোগ্যতা আমার আছে।

ছাই আছে। সিরিয়াস হয়ে পড়লে তো?

আমি এক-এক সময় ভেবেছি, তুমি তো কিছুই জানো না আমার সম্বন্ধে। কী আমার বংশ-পরিচয়, কোথাকার লোক আমি...।

তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ।

সুমিত্রা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।—এই...তোমাকে কতবার বলেছি না, আমাদের দুজনের

BanglaBook.org

মধ্যে যখন কথা হবে, একান্ত আমাদের দুজনের কথা, সেখানে আর কারুর কথা উঠবে না।

সুব্রত গাঢ় কণ্ঠে বলল, তুমি আমার সমস্ত এলোমেলো করে দিয়েছ মিত্রা। কেন এখানে আমি এসেছিলাম, কী আমার পরিকল্পনা ছিল, এখন আমার কিছুই মনে পড়ে না। আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার ও আমার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোনও বিভেদের কথা উঠতে পারে না—উঠতে পারে না কোন অজয় সোমের নাম।

এই তো গুড বয়ের মতো কথা।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল।

সুমিত্রা সুব্রতর মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে।

শেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ও।—কী খাবে তুমি আজ? বার্লি?

হুঁ।

কেনা আছে ঘরে?

না।

আমি যখন ফিরব, চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর হাতেই কিনে পাঠিয়ে দেব বার্লি। সকাল থেকে উপোস করে আছ নিশ্চয়ই?

একটু আগে ফল খেয়েছি। শোনো, তোমাকে যে বলেছিলাম ডাঃ রুদ্রর ডায়েরিগুলোর কথা—খুঁজে দেখেছিলে?

কী করে দেখব? স্টাডি-রুমে যে পুলিশ তালা দিয়ে গেছে।

ও।

কিন্তু ডায়েরিগুলো নিয়ে তুমি কী করবে, বলছ না তো?

নষ্ট করে ফেলব।

নষ্ট করে ফেলবে।

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ। ডায়েরিগুলোতে যা লেখা আছে, তা আর কারুর চোখে পড়ুক আমি চাই না।

কেন? তুমি হেঁয়ালি করো না লক্ষ্মীটি, আমায় বুঝিয়ে বলো কী হয়েছে। সুব্রত আর কিছু বলার অবকাশ পেল না।

এই সময় দরজার কাছ থেকে কে গম্ভীর গলায় বলল, সুমিত্রা—।

চমকে দুজনেই মুখ ফেরাল।

দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অজয় সোম, এবং তাঁর পাশেই সঞ্জীব রুদ্র।

দুজনেরই মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

মনে-মনে সুমিত্রা সংকুচিত হল। সুব্রত ততক্ষণে উঠে বসেছে।

অজয় সোম বললেন, তুমি এখানে?

সুমিত্রা নিজের সংকুচিত ভাব কাটিয়ে ফেলেছে।

ও সহজভাবেই বলল, আপনারা এখানে?

সঞ্জীব ফেটে পড়লেন, বললেন, সুমিত্রা, চলে এসো আমার সঙ্গে।

কেন, দাদা?

কেন, জিগ্যেস করতে লজ্জা করছে না তোমার?

লজ্জা। কীসের লজ্জা!

বোকা মেয়ে, কণামাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার শরীরে থাকলে তুমি এভাবে কথা বলতে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে—চলে এসো তুমি। আর এক সেকেন্ড তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

উত্তেজনার দরুন একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা, আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতে এখানে

BanglaBook.org

এসেছি, এবং নিজের ইচ্ছেতেই ফিরে যাব। তোমার ব্যস্ততার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

অপমানে সারা মুখ কালো হয়ে উঠল সঞ্জীব রুদ্রর।

তুমি ভাবছ এই অপমান আমি মুখ বুজে সয়ে যাব?

কী হচ্ছে সঞ্জীব?—এতক্ষণে কথা বললেন অজয় সোম।—চলো, আমরা ফিরে যাই।

সঞ্জীব রুদ্রর কানে বোধহয় সে-কথা গেল না। তিনি আগের ভাব বজায় রেখে বললেন, বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে তুমি এতটা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করবে আমরা কল্পনা করিনি। একটা স্ট্রিট বেগার, আমাদের বাড়িতে চাকরি করে, তার সঙ্গে...ছি, ছি—।

মিস্টার রুদ্র—সুব্রত বলল, আপনি অবশ্যই আপনার বোনকে কিছু বলতে পারেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি বোধহয় কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন না।

সুমিত্রার সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে অজস্র কথা দ্রুত ওঠানামা করছে। ও তবু সংযত গলায় বলল, আমাদের মুখে এসব কথা মানায় না। ঠাকুরদা স্কুল-মাস্টার ছিলেন, বাবা জীবনের বেশির ভাগ সময়ই চাকরি করেছেন। আর তুমি—তুমি এখনও চাকরি করছ। সুতরাং পরের বাড়িতে দাসত্ব করাব খোঁটা তোমার মুখে মানায় না।

সঞ্জীব, চলে এসো। তুমি ক্রমেই ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছ।—অজয় সোম সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত সুব্রতবাবু।

তিনি একরকম জোর করে সঞ্জীব রুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে নীরবতা নেমে এল। শুধু ওয়ালক্লকের একটানা টিকটিক শব্দ—সময়ের গতিবেগ যে ঠিক-ঠিক চলেছে সেকথাই জানিয়ে যাচ্ছিল।

বন্ধ জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুমিত্রা।

সুব্রত ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, খুবই বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। তুমি একটু নরম হয়ে কথা বললেই পারতে।

সুব্রতর দিকে ফিরে দাঁড়াল সুমিত্রা।—কেন—কেন আমি নরম হব বলতে পারো? ওরা কি ভেবেছে, আমি মাংসের টুকরো? আমাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, অথচ আমি প্রতিবাদ করতে পারব না?

মিত্রা—।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। দিনের পর দিন—দাদার জোরজুলুম আমি অনেক সয়েছি। এ সমস্তই অজয় সোমের উসকানি, তা আমি জানি। যে-কোনও উপায়ে সে আমায় বিয়ে করতে চায়।

যেতে দাও ওসব কথা—যা হওয়ার হয়ে গেছে।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, মানুষ কতটা নীচে নেমে গেলে এইভাবে পরের আস্তানায় চড়াও হয়ে জুলুম করতে পারে! তাও যদি না আমি কিছু জানতাম। বাবাকে কে খুন করেছে সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

না তো?

এ ব্যাপারের মধ্যে দাদা...।

কী বলছ তুমি?

এ সম্বন্ধে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।

কীরকম?

গতমাসে কথা প্রসঙ্গে বাবা আমায় হঠাৎ বললেন, ভাবছি উইলটা পালটাব। অপদার্থদের কতকগুলো টাকা দিলে মরেও আমার শান্তি হবে না। দাদা এ কথা শুনেছিল বারান্দা থেকে। পরে আমাকে বলেছিল, বাবা আমাদের অপদার্থ বলতে পারেন না। তাঁকে কোনওমতেই উইল পালটাতে

BanglaBook.org

দেওয়া হবে না।

তারপর?

তারপর আর তিনি উইল পালটাবার সুযোগ পেলেন কোথায়। অর্থাৎ, তাঁকে সুযোগ আর দেওয়া হল না।

তুমি এ-কথা বলেছ নাকি পুলিশকে?

না।

তাহলে আর এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। এবার একটা রিকশা ডাকিয়ে দিচ্ছি, বেলা থাকতে-থাকতেই বাড়ি ফিরে যাও।

আমি এখানেই থাকব।

বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে সুব্রত।

তুমি এখানে থাকবে! কিন্তু—।

তুমি মিথ্যে কিন্তু হচ্ছ,—সুমিত্রা স্বাভাবিক গলায় বলল, একটু আগে তুমি বলছিলে না, আমি এখানে থাকতে চাইলে, একজন পুরুত ডেকে আনবে। বেশ তো, যাও না, ডেকে নিয়ে এসো—।

সুব্রত ওকে কাছে টেনে আনল।—তুমি কি ভাব আমি পারি না। এখুনি পারি ডেকে আনতে একজন পুরুত। কিন্তু মিত্রা, সুষ্ঠু সামাজিক নিয়মে আমাদের বিয়ে সকলের সামনে হোক, আমরা কি তাই চাইব না?

কিন্তু এই ঘটনার পর বাড়ি ফিরে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। ওরা যদি—।

তোমার কোনও ভয় নেই, কোনও অনিষ্টই এখন কেউ করতে সাহস করবে না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

সুমিত্রা সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল, বলল, বেশ।

তুমি রাগ করলে মিত্রা?

রাগ!—মিষ্টি করে হাসল সুমিত্রা।—তোমার ওপর রাগ আমি করতে পারি না, তা তো তুমি জানো। তুমি ঠিকই বলেছ, এখন আমার বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি।

সুব্রত বিছানার ওপর গিয়ে বসল।

সুমিত্রা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে আবার বলল, চাকরটাকে ডেকে নেব, ও বোধহয় বাইরেই কোথাও আছে। ওর হাত দিয়ে বার্লি কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

॥ নয় ॥

সন্ধ্যার পর হীরকের বাড়িতে প্রেমপ্রকাশ এলেন।

বাসব ও হীরক কোনও একটা বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। ইন্সপেক্টরকে দেখে ওরা সাড়ম্বরে আহ্বান জানাল।

একটা কোচে বললেন প্রেমপ্রকাশ।

বললেন, কেসটার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।

বেশ তো। যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলতে বলেছিলাম—তোলা হয়েছে নাকি? বাসব প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, কাল আপনাকে প্রিন্টের কপি দিতে পারব আশা করি। হরিপদর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন?

BanglaBook.org

ওর মৃত্যু সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। মনে হয় ভবিষ্যতে আমার থিয়োরি নির্ভুল প্রমাণিত হবে।

হীরক বলল, তোমার থিয়োরিটা কী?

আমি আগেই বলেছি খাম-চোরের সঙ্গে হরিপদর পরিচয় ছিল। তার সাহায্যেই চোর খামটা চুরি করতে পেরেছিল, এবং চোরের পরামর্শেই হরিপদ অজয় সোমের কাছ থেকে দেশে যাওয়ার ছুটি চেয়ে নিয়ে, আগ্রাতেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। গা-ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল—খাম-চোর নিশ্চিত ভাবে জানত, পুলিশের জেরায় পড়লে হরিপদ বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে—তাই এই ব্যবস্থা। আমার মনে হয়, হরিপদ এবিষয়ে খুবই সজাগ ছিল যে খাম-চোর এখন তার হাতের মুঠোয়। এবং পুলিশের কাছে সমস্ত প্রকাশ করে দেবে এই ভয় দেখিয়ে সে চোরকে ব্ল্যাকমেল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হরিপদ বুঝতে পারেনি, শক্তিমান প্রতিপক্ষকে এভাবে ঘাঁটানো তার উচিত হচ্ছে না। এই কারণেই শেষপর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—প্রেমপ্রকাশ বললেন, হরিপদর মৃতদেহ ডাঃ রুদ্রর বাড়িতে ফেলে আসার কী সার্থকতা।

আপাতদৃষ্টিতে এর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও আমার ধারণা, হত্যাকারীর মনের মধ্যে যে গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে, তারই সূক্ষ্ম বিকাশ ঘটেছে এতে। অর্থাৎ হত্যাকারী—এখানে ভুলে গেলে চলবে না, খাম-চোর ও হত্যাকারী একই ব্যক্তি। ঘটনার গতির প্রতি দৃষ্টি রেখে এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হরিপদকে হত্যা করার পর তার মৃতদেহ কোথাও ফেলতেই হত। তাই হত্যাকারী পরিস্থিতিটাকে আরও জটিল করে তোলবার জন্যে মৃতদেহ ওখানে ফেলে এসেছিল। এক্ষেত্রে সে কতটা রিস্ক নিয়েছিল ভেবে দেখুন। মৃতদেহ বয়ে আনার সময়, যে কোনও মুহূর্তে তা ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবু সে এ-কাজ করেছিল পুলিশ ও আমাকে ধাঁধায় ফেলবার জন্যেই।

আপনি বলতে চান খাম-চোর, ডাঃ রুদ্র আর হরিপদ—দুজনকেই খুন করেছে?

আগেই বলেছি, ঘটনার গতি দেখে তাই মনে হচ্ছে।

হরিপদর ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ডাঃ রুদ্রকে খুন করবার মোটিভ কী?

হত্যাকারীর মোটিভ আমি প্রথমে ধরতে পারিনি। কিন্তু ডাঃ রুদ্রর টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসার কথা জানবার পর এবং অজয় সোমের কাছে গচ্ছিত সমস্ত খামের মধ্যেই হ্যান্ডনোট আছে বুঝতে পারার পরেই, আমি হত্যার মোটিভ ধরে নিয়েছি।

আমি আপনাকে ঠিক ফলো করলাম না।

যে-খামটা চুরি গেছে, সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে তার মধ্যেও অন্যান্য খামের মতো হ্যান্ডনোট ছিল। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন, চোর হ্যান্ডনোট সমেত খাম কেন চুরি করবে? নিশ্চয়ই সে বেশ মোটা টাকা ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে ধার নিয়েছিল। অবশ্য টাকা শোধ দেওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না, তাই কৌশলে হ্যান্ডনোট সমেত খামটাকে সে সরিয়েছিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, খামটা যখন সে চুরি করতেই পেরেছিল, তখন ডাঃ রুদ্রকে খুন করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

বিরাট একটা উদ্দেশ্য ছিল। ডাঃ রুদ্রকে খুন না করলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেত। খাম চুরি যাওয়ার কথা ডাঃ রুদ্রর কানে গেলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন এ কাজটা কার—যে টাকা ধার নিয়েছে, সে-ই তাঁকে এইভাবে ফাঁকি দিতে চায় অনুমান করে নিতে কষ্ট হত না তাঁর। তিনি পুলিশের কাছে তার নাম প্রকাশ করে দিতে পারতেন। সুতরাং তাঁর মুখ বন্ধ করা হত্যাকারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। অবশ্য এ-ছাড়া আরও কারণ থাকতে পারে তাঁকে খুন করার।

প্রেমপ্রকাশ বাসবের দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কত সহজভাবে আপনি

BanglaBook.org

রহস্যের গ্রন্থিগুলো খুলে চলেছেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বাসব হাসল, ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি। বলল, আসলে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আমাকে সাহায্য করে।

চা এল। হীরকের চাকর মঙ্গলময় ট্রেতে করে তিনকাপ চা দিয়ে গেল।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।—চলবে নাকি?

চা-এর কাপ তুলে নিতে-নিতে প্রেমপ্রকাশ বললেন, না।

এতক্ষণে হীরক কথা বলল, হরিপদর মৃতদেহ যেদিন ডাঃ রুদ্রর বাড়িতে পাওয়া যায়, সেদিন স্টাডিতে চোর ঢুকেছিল—ও বিষয়ে কিছু ভেবেছ নাকি?

বাসব সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল, সেদিন ও-বাড়িতে আমি আগে থেকেই উপস্থিত ছিলাম, একথা আমি তোমায় বলেছি। ইন্সপেক্টর, আপনিও জানেন। আমার চোখের সামনেই একজন লোক স্পাইর‍্যালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কিছু পরে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম, কিন্তু ওপরে উঠে আর তার দেখা পেলাম না। সে তখন স্টাডিতে গিয়ে ঢুকেছিল। পরে আমরা স্টাডিরুমটা পরীক্ষা করে দেখেছি সারা ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মনে হয় একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে যেন। আমি সহজেই বুঝতে পারলাম, আমার দেখা আগন্তুকটি ছাড়াও, আরেকজন সজাগ হয়েছিল, তাই বোধ হয় আগন্তুক স্টাডিতে ঢোকার পরই দুজনের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। কিন্তু কোন বস্তুটিকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব, তা বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ বস্তু সংগ্রহ করবার জন্যেই আগন্তুক ওখানে গিয়েছিল, এবং একই কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

বস্তুটি কী?

সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। ঘরের এক কোণে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইখানা পড়ে থাকতে দেখলাম। এই বইখানাই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ডাক্তার রুদ্র পড়ছিলেন বলে ধারণা করা হয়েছে। বইটিকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলে এনেছিলাম, কিন্তু নেড়েচেড়ে দেখে তার মধ্যে থেকে কিছুই পাইনি।

বাসব সিগারেটে ঘন-ঘন বারকতক টান দিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, সেদিন ঘরে আরেকটা জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল, ছোট লাল রঙের একটা পাথর। আমি অভিজ্ঞ জহুরিকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি, ওটা চুনি।

বাসব ও বিষয়ে কোনও মন্তব্য করল না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাদের এখন আমি এক বিচিত্র কাহিনি বলব। বরং বলতে পারেন, একজন বরেণ্য লোকের চরিত্র উদঘাটন করব।

হীরক ও প্রেমপ্রকাশ সাগ্রহে তাকালেন ওর দিকে।

সেদিন গোটা তিনেক ডায়েরি স্টাডিরুমের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমি বের করে নিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, আপনি নিয়ে এসেছিলেন বটে। ইন্সপেক্টর বললেন।

সেই ডায়েরি থেকেই আপনাদের কিছু বলব।

বাসব ডাঃ বঙ্কিম রুদ্রর ডায়েরিতে যা পড়েছিল, সমস্ত বলে গেল একে-একে।

সমস্ত শুনে আকাশ থেকে পড়লেন প্রেমপ্রকাশ।

বললেন, এ যে ভাবতেও পারা যায় না মিস্টার ব্যানার্জি। ডাক্তার রুদ্রর মতো লোক বলতে গেলে দুজন লোকের হত্যাকারী!

পৃথিবী বিচিত্র জায়গা ইন্সপেক্টর, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি বিচিত্র হল মানুষের মন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যেখানেই আমি জোর দিয়ে কোনও একটা বিষয়ের ওপর নিজের

BanglaBook.org

আস্থা আনবার চেষ্টা করেছি, পরে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে ঠকতে হয়েছে।

এই কেসে ওই ডায়েরিগুলো কোনও আলোকপাত করতে পারবে বলে ভরসা করেন?

বাসব বলল, ভুলে যাবেন না, ডায়েরিতে উল্লিখিত সেই নকশাটির সন্ধান এখনও আমরা পাইনি। কে বলতে পারে ওই নকশার সন্ধানেই সেদিন স্টাডিতে দুজন আগন্তুকের আগমন হয়েছিল কিনা। আরেকটা কথা, ডাক্তারের চেম্বার থেকে আমরা যে ফটোগ্রাফখানা পেয়েছি—তার পরিচয় আর আমার অজানা নেই।

কে সে?

চন্দ্রকান্ত।

কীভাবে বুঝলেন?

সুব্রতবাবুকে দেখে।

সেকী! সুব্রতবাবুর সঙ্গে চন্দ্রকান্তর কী সম্পর্ক?

বাসব তরল কণ্ঠে বলল, পিতাপুত্রের।

হীরক বিস্মিত গলায় বলল, তা কী করে সম্ভব!

অসম্ভব নয় বলেই। আজ সকালে যখন সুব্রত রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—প্রথম দর্শনেই মনে হল এ-মুখ কোথায় যেন আগে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। দুপুরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল। আমি থানায় গিয়ে ছবিটা দেখে এলাম। ছবিটা দেখে আমার সন্দেহ দূর হল। ফটোর মধ্যেকার মানুষটির সঙ্গে সুব্রত রায়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলাম। তাছাড়া ছবিটির পিছনে পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে মিস্টার রায় লেখা ছিল। কাজেই তিনি নিশ্চয়ই চন্দ্রকান্ত—আর সুব্রত রায় তাঁর ছেলে। অবশ্য আমার অনুমান ঠিক না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই সহজ জিনিসটা—হীরক বলল, যা তোমার চোখে পড়ল, ডাক্তার রুদ্র তা বুঝতে পারেননি?

নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, হয়তো সুব্রত রায়কে এ বিষয়ে কিছু জানতে দেননি।

কেন?

এক কাজ করা যেতে পারে—বাসব বলল, সুব্রত রায়কে ডায়রেক্ট চার্জ করা যেতে পারে। তাহলে তোমার 'কেন'র উত্তরটা হয়তো পাওয়া যাবে।

তুমি সরাসরি সুব্রতবাবুকে গিয়ে জিগ্যেস করতে চাও এ বিষয়ে?

হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর বললেন, এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

ইন্সপেক্টর, আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন নাকি?

জানি। লেখা আছে থানার ডায়েরিতে। তবে মনে নেই। কারণ আমি তাঁর বাসায় যাইনি একবারও। থানায় ডেকে পাঠিয়ে কথা বলেছিলাম। যাই হোক, আমি এখুনি ঠিকানা জোগাড় করে নিচ্ছি।

প্রেমপ্রকাশ টেলিফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন একটা নম্বর। ডাঃ রুদ্রর বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করলেন তিনি। ওপ্রান্তে ফোন ধরলেন ডাঃ বিনয় রুদ্র।

ইন্সপেক্টর তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলেন সুব্রতর ঠিকানাটা।

সুব্রতর এখন জ্বর নেই।

তবু শুয়ে আছে বিছানায়। ভাবছে আজকের সকালের ঘটনার কথা।

BanglaBook.org

ওই সঙ্গে সুমিত্রার মনের জোরকে বাহবা না দিয়ে পারছে না সুব্রত। সত্যি, অদ্ভুত চরিত্রের এই মেয়েটি।

অলসভাবে শুয়ে-শুয়ে চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে চলে যায় ও। কত কথা মনে পড়ে। কলকাতা থেকে আগ্রায় আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না সুব্রতর। ও এখানে আসে একটা ঋণ পরিশোধের তাগিদে।

কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে গেল। ভেস্তে গেল সমস্ত পরিকল্পনা। সুমিত্রা ওকে নব-জীবন দিল যেন। নিজের অজান্তেই ও এক অন্যপথে পা বাড়াল। সুমিত্রার মায়া-পরশে জীবনের সুনির্দিষ্ট পথ দিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সুব্রত।

এইভাবেই বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ ভাবনার সমুদ্রে সাঁতার দিত ও। কিন্তু এই সময় চাকর ঘরে প্রবেশ করতে চটকা ভাঙল ওর।

চাকরটির ভীতচকিত ভাব। সে জানাল, বাইরে পুলিশ এসেছে।

পুলিশ! পুলিশ কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

আজ্ঞে।

এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চাকরকে অনুসরণ করে প্রেমপ্রকাশ, বাসব ও হীরক ঘরে এল।

সুব্রত বসতে বলল সকলকে।

তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি কি অসুস্থ?

একটু জ্বরভাব হয়েছিল।

আপনাকে এ-সময় বিরক্ত করতে আসায় আমরা দুঃখিত। গোটাকতক কথা জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে আসতে হল।

আমি এখন এমন কিছু অসুস্থ নেই। আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না। কী জানতে চান বলুন?

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে আমার একবার কথা হয়ে গেছে। তবু আরেক দফা আসতে হল। আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

বেশ তো। বলুন?

শেষজীবনে আপনার বাবার কি মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল?

ইতস্তত করে সুব্রত বলল, হ্যাঁ।

আপনি সেসময় তাঁর কাছেই ছিলেন?

আংশিকভাবে ছিলাম।

আপনার বাবার নামটা কী ছিল?

চন্দ্রকান্ত রায়।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল।

শুনুন মিস্টার রায়, আপনার বাবার সঙ্গে ডাক্তার রুদ্রর প্রথমে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, এবং পরে অর্থঘটিত ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কীভাবে বিচ্ছেদ ঘটে, তা আমরা জানি। এখন বলবেন কি, আপনি এখানে এসে ছিলেন শুধু চাকরির সন্ধানে, না ডাক্তার রুদ্রকে...।

বাসবকে বাধা দিল সুব্রত : আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ডাক্তার রুদ্রকে খুন করেছি?

প্রমাণ ছাড়া, আমি বলতে চাইলেও আপনি খুনি প্রতিপন্ন হবেন না মিস্টার রায়। একটা খুনের তদন্ত করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। নানারকম প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে থেকেই আমাদের আসল উত্তরটা জেনে নিতে হয়। কাজেই—।

BanglaBook.org

সুব্রত কিছু বলল না।

বাসব আবার বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার পরিচয় আমাদের জানা ছিল। আপনাকে প্রশ্ন করে শুধু সত্যকে যাচাই করা হল। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি আপনাকে প্রথম দর্শনেই প্রায় চিনতে পারলাম, অথচ ডাক্তার রুদ্র—

তিনিও আমাকে চিনতে পেরেছিলেন।

মিস্টার রায়,—বাসব বলল, আপনি যদি প্রথম থেকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেন, তাহলে আমাদের বিশেষ সুবিধে হয়।

॥ দশ ॥

সুব্রত একটু চিন্তা করল।

তারপর বলল, বেশ, আমার আপত্তি নেই। শুনুন—।

বাবা মারা যাওয়ার পরই সুব্রতর পক্ষে আর শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। ওখানেই বি-এ পড়ছিল ও।

শান্তিনিকেতনে ফিরে না যাওয়ার কারণ হল আর্থিক অনটন।

অথচ প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ ও, এবং বরাবরই নিজের বাবাকে একজন ধনী ব্যক্তি বলে জানে সুব্রত। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভোজবাজির মতোই সমস্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা মিলিয়ে গেল। এবং দু'চারজন পাওনাদার ওর কাছে এল। বেশ কিছু টাকা তাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত।

কিছুই বুঝতে পারে না সুব্রত।

হাওয়ার একটা ফুৎকারে যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি চন্দ্রকান্তর জীবনদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও অবাক হয়ে লক্ষ করছে, সংসারের সমস্ত তেলও ফুরিয়ে গেছে ওই সঙ্গে।

পাওনাদারদের তাগাদা বাড়তে লাগল ক্রমেই। তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠল। কাজেই শেষ সম্বলের ওপর টান পড়ল। বাড়ি বিক্রি করে দিতে হল সুব্রতকে। ধার শোধ হল। এখন চাকরির সমস্যা। বেঁচে থাকতে গেলে অবশ্যই চাকরির প্রয়োজন। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক ধরাধরির পর শেষে চাকরি পাওয়া গেল।

বিশিষ্ট এক মার্কেন্টাইল ফার্মে ডেসপ্যাচ ক্লার্কের পদ। দক্ষিণা একশো পঁচিশ টাকা।

চলে যাচ্ছিল। কয়েকটা বছর মোটামুটিভাবে কেটে গেল।

এইভাবে জীবনটাও কেটে যেত বোধ হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রবাহ বজায় থাকল না। দৈবাৎ একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ওর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল বলা চলে।

বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সুব্রত আস্তানা গেড়েছিল তাই বেলেঘাটার এক বস্তিতে। টিনের ছাদওয়ালা ছোট্ট ঘর। চারধারে নোংরা পরিবেশ। তবু এই আওতায় নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল ও।

আসবাবপত্র ঘরে বিশেষ ছিল না। একটা তক্তাপোষ, দুটো চেয়ার আর দুটো তোরঙ্গ। তোরঙ্গ দুটোর মধ্যে একটাতে ওর ব্যবহারের জিনিস থাকে, অন্যটায় কাগজপত্র, দলিলদস্তাবেজ আছে যত রাজ্যের। এগুলো জমা করে রাখার কোনও সার্থকতা নেই। তবু কাগজপত্রগুলোকে নষ্ট করে ফেলেনি, চন্দ্রকান্তর স্মৃতিবিজড়িত বলেই।

সেদিন শনিবার।

BanglaBook.org

কীসের একটা ছুটি ছিল।

বেশ বেলাতেই ঘুম থেকে উঠল সুব্রত। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে এখন কী করবে ভাবছিল—হঠাৎ ওর খেয়াল হল, কাগজভর্তি ট্রাঙ্কটা এই অবকাশে ঘেঁটেঘুঁটে দেখলে কেমন হয়। ট্রাঙ্কের ডালা খুলে, তাড়া-তাড়া কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল ও। সমস্তই ব্যবসা সম্পর্কীয় কাগজপত্র।

হঠাৎ সুব্রতর দৃষ্টি পড়ল একটা অর্ধসমাপ্ত চিঠির ওপর। কী আশ্চর্য, চিঠিটা ওকে লিখেছিলেন চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যে কোনও করণেই হোক চিঠিটা তিনি শেষ করেননি।

সুব্রত অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা তুলে নিল নিজের চোখের সামনে ঃ

বাবা সুবু,

তোমাকে যে কোনওদিন এভাবে চিঠি লিখতে হবে ভাবিনি। কিন্তু পৃথিবীতে অচিন্তনীয় ঘটনাই ঘটছে অহরহ।

আমার আশা ছিল তোমাকে আমি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলব। এ বিষয়ে যে আমার চেষ্টার অভাব নেই, তা তুমি লক্ষ করে থাকবে। তবে বোধ হয় শেষরক্ষা করতে পারলাম না।

তুমি বড় হয়েছ। তোমাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করে লেখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। আজ আমি কপর্দকশূন্য। ক্রমেই দেনায় ডুবে যাচ্ছি। বন্ধুকে বিশ্বাস করে আজ আমার এই বিপদ। আমার কাছ থেকে তুমি বঙ্কিম রুদ্রর কথা শুনে থাকবে। সেই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটি আমাকে দু'লক্ষ আটাশ হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। আমাকে পথের ভিখারি করে ছেড়েছে।

আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। মাথার মধ্যে ক্রমেই গোলমাল অনুভব করছি। বোধ হয়...

চিঠি এখানেই শেষ হয়েছে।

এতদিন পরে সুব্রত বুঝতে পারল, বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর্থিক অনটনের কারণটা কী। বঙ্কিম রুদ্রর কথা বহুবার শুনেছে ও চন্দ্রকান্তর মুখে। শেষপর্যন্ত তিনিই ওদের মর্মন্তুদ পরিস্থিতির জন্যে দায়ী।

এখন বারবার মনে হচ্ছে সুব্রতর, এত তাড়াতাড়ি হয়তো বাবা মারা যেতেন না। টাকার শোকে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, বঙ্কিম রুদ্রই বাবার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল সুব্রতর।

এখন ওর কী কর্তব্য?

ঘুম এল না সারারাত। কর্তব্য নির্ধারণের চিন্তায় পায়চারি করেই কাটিয়ে দিল। ভোরবেলা ওর মন একটা বিষয়ে একাগ্র হল। এর প্রতিশোধ ও নেবে। বঙ্কিম রুদ্রকে দু-লক্ষ আটাশ হাজার টাকা হজম করতে দেওয়া হবে না। চন্দ্রকান্তর আত্মার তৃপ্তির জন্যে চূড়ান্তভাবে একটা কিছু করবে সুব্রত।

BanglaBook.org

প্রায় এক হপ্তা লেগে গেল বঙ্কিম রুদ্রর সমস্ত খোঁজখবর নিতে।

বহু কষ্টে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। পাওয়া গেল তাঁর বর্তমান ঠিকানা।

একমাসের ছুটি নিল সুব্রত। ওর এতদিনের চাকরি জীবনে ছুটির বড় একটা প্রয়োজন হয়নি।

ছুটি নিয়ে কী করবে ও। বরং কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে, অনেক কিছু ভুলে থাকার সম্ভাবনা। সহজেই ছুটি মঞ্জুর হল।

আগ্রায় চলে এল সুব্রত।

এক কাওয়ালির আসরে ডাঃ রুদ্রর সঙ্গে আলাপ হল। সরাসরি চাকরির প্রার্থনা করল তাঁর কাছে। ডাঃ রুদ্র ওকে চাকরি দিলেন। নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে বহাল করলেন সুব্রতকে। ও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। অবশ্য কীভাবে ডাঃ রুদ্রর ওপর প্রতিশোধ নেবে, এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। কাজেই সে বিষয়ে সুব্রত বিশেষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সে চিন্তা বেশিদিন স্থায়ী হল না।

সুমিত্রা সমস্ত এলোমেলো করে দিল। ডাঃ রুদ্রর সুগঠনা সুন্দরী মেয়েটি। আগ্রায় আসার প্রধান উদ্দেশ্য থেকে ক্রমেই সরে যেতে লাগল ও। ধীরে-ধীরে সুমিত্রা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। গভীরভাবে ওকে ভালোবেসে ফেলল সুব্রত।

কয়েকদিন থেকে খুবই শীত পড়ছে।

বেলা তখন দশটা।

সুব্রত একমনে কাজ করে যাচ্ছিল।

ডাঃ রুদ্র ঘরে এলেন। ওর পাশে এসে বললেন, এখন তুমি খুব ব্যস্ত আছ, সুব্রত?

আজ্ঞে...

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

সুব্রত ডাঃ রুদ্রর দিকে তাকাল। চোখ-মুখ শুকনো। ক্লান্ত চেহারা।

বলুন?

তুমি যখন আমার কাছে কাজ করতে এলে, তখন আমি তোমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নিইনি। আজ ওবিষয়ে আমার কিছু আগ্রহ রয়েছে।

আমার পরিচয়...

তোমার আপত্তি আছে নাকি?

না। তবে—।

ডাঃ রুদ্র পাউচ থেকে টোবাকো বার করে পাইপে ভরতে-ভরতে বললেন, আমি জানি, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ।

শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে হিমপ্রবাহ বয়ে গেল সুব্রতর।

ও অসংলগ্ন গলায় বলল, আমার অভাব ছিল। চাকরি দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য আর কী থাকতে পারে।

সিগারে অগ্নিসংযোগ করলেন ডাঃ রুদ্র। বললেন, তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ো না সুব্রত। প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম। আমি জানি তুমি কে।

সুব্রত ঘামতে লাগল।

এই প্রচণ্ড শীতেও সারা গা ওর ঘামে জবজবে হয়ে উঠল। একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল না।

ডাঃ রুদ্র আবার বললেন, তোমাকে চিনতে পারার পরও, তোমাকে চাকরি দিলাম কেন, এ-প্রশ্ন তোমার মনে উঠতে পারে। তোমাকে আমি ঠিক চাকরি দিইনি, দিয়েছিলাম কার্যোদ্ধারের সুযোগ।

সুযোগ।

হ্যাঁ, সুযোগ। তুমি চন্দ্রকান্তর ছেলে। আমি তোমাদের কতবড় সর্বনাশ করেছি, সে-কথা জানতে

BanglaBook.org

পেরেই তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলে—কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তিন বছর প্রায় পার হতে চলেছে, কই, তুমি তো আমার কোনও ক্ষতি করলে না?

আপনি কী বলছেন, আমি...।

বারবার অস্বীকার করবার চেষ্টা করো না। তোমার মতো অবস্থায় পড়লে, আমারও মাথায় রক্ত উঠে যেত।

দেখুন, আমি...।

আমার সারা মন অনুশোচনায় ভরে গেছে। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুব্রত, চন্দ্রকান্ত আমায় যতই বিপথগামী করবার চেষ্টা করুক না কেন, তবু আমি ওর যে ক্ষতি করেছি তার ক্ষমা নেই।

সুব্রত নিজেকে সংযত করে ফেলেছে এতক্ষণে।

ও শান্ত গলায় বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, স্যার। এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

লাভ আছে সুব্রত। একটা পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার দায়ে আমি অভিযুক্ত। শাস্তি আমাকে পেতে হবে বইকি, যদিও আমি বাঁচতে চাই—তবুও অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—তোমার হাত থেকে যে কোনও শাস্তি আমাকে নিতেই হবে।

আপনি আর একথা বলবেন না, স্যার। আমিও স্বীকার করছি, আপনার ওপর আক্রোশ নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন ওটা আর কোনও সমস্যাই নয়।

তোমার উদারতা আছে সুব্রত। কিন্তু এখন আমি নিজের নৈতিক দিকটা কীভাবে অস্বীকার করব!

পকেট থেকে রিভলবার বের করলেন ডাঃ রুদ্র।

পরিবেশটা সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠল।

রিভলবারটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি বললেন, এই যন্ত্রটা কোল্টের ০.৪২ ক্যালিবারের। সায়লেন্সার লাগানো আছে। তুমি এর সাহায্যে মনের ক্ষোভকে এই মুহূর্তে মেটাতে পারো। ঘরে আর কোনও সাক্ষী নেই।

আমার মনেও আর কোনও ক্ষোভ নেই স্যার। অন্যায় হলেও আমি আপনার ডায়েরি থেকে কিছু-কিছু পড়েছি। বাবা নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে বিপথগামী করেছিলেন—আপনাকে ঠকিয়েছিলেন। আপনি প্রথম সুযোগেই তাই তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কাজেই...।

ঠিক সেই সময় সুমিত্রা ঘরে এল—সুব্রত হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সুমিত্রা রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল, বাবা, রিভলবার কেন এখানে?

মেয়ের এই প্রশ্নে ডাঃ রুদ্র অসহায়ভাবে এধার-ওধার তাকাতে লাগলেন।

তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সুব্রত বলল, ওটা দোকানে দিতে হবে, ট্রিগার ভালো কাজ করছে না।

BanglaBook.org

সুব্রত নিজের বক্তব্য শেষ করল।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার কতদিন আগে আপনার সঙ্গে এই কথাগুলো হয়েছিল?

মাসখানেক আগে বোধ হয়।

বাসব বলল, তিনি জানতেন আপনার সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর ঘনিষ্ঠতার কথা?

না, আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত কিছু গোপন রেখেছিলাম।

আপনি যখন ডাঃ রুদ্রের ডায়েরি পড়েছেন, তখন নকশার বিষয় সমস্ত কিছু জানেন। ও সম্বন্ধে তিনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

না।

কে তাঁকে প্রাণের ভয় দেখাচ্ছিল, বলতে পারেন কি?

না, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ডাঃ রুদ্রকে ভয় দেখানো হচ্ছিল—যাতে তাঁর মনে হয়, এ সমস্ত কাজ আমারই।

বাসব বলল, আপনার এই সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। ভরসা করি, আপনি আমাদের কাছে কিছু লুকিয়ে যাননি।...আমরা এখন উঠলাম।

আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সুমিত্রার ভয় ছিল, বাড়ি ফেরার পর হয়তো দাদা আরও কিছু বলবে। কিন্তু সঞ্জীব রুদ্র আর কিছু বলেননি। থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শুধু।

এক হিসেবে এই ঘটনা সুমিত্রার পক্ষে বেশ লাভজনক হয়েছে। যে কথাটা প্রকাশ করতে ওকে সংকোচের বেড়ায় আটকে পড়তে হত, অর্থাৎ সুব্রতর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা দাদা বা কাকাকে বলতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হত, এক্ষেত্রে তার আর কোনও অসুবিধা রইল না, সমস্ত কিছুই পরিষ্কার ভাবে জানাজানি হয়ে গেল। ভালোই হয়েছে।

এই সময় চাকর এসে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে গেল সুমিত্রাকে।

খামের ওপর ওরই নাম লেখা। সুমিত্রা বেশ অবাক হয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ বার করল—চিঠি!

ওকে আবার কে চিঠি লিখল! চিঠির শেষের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল সুমিত্রা—লেখক অজয় সোম। অজয় সোম ওকে চিঠি দিয়েছেন? কেন? অনিচ্ছার সঙ্গেই ও চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল ঃ

সুমিত্রা,

উপায়হীন অবস্থায় তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। সামনাসামনি হয়তো এতগুলো কথা গুছিয়ে আমি বলতে পারতাম না, কিংবা বলতে পারলেও তুমি ধৈর্য ধরে শুনতে চাইতে না।

আমি এতদিন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। বুঝতে পারিনি যে তুমি সুব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তোমাদের দুজনের আগামী জীবন আনন্দময় হোক, এই আমার কামনা।

তবে আমি তোমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবে এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সুব্রতবাবু আপাতদৃষ্টিতে একজন ভালোলোক। কিন্তু তুমি তাঁর অতীত সম্পর্কে কিছু জানো কি? সম্প্রতি আমি তাঁর সম্বন্ধে গোটাকয়েক এমন কথা জানতে পেরেছি, যাতে মনে হয় তিনি তোমাকে বিয়ে করার পরিবর্তে, অন্য কিছু করার পরিকল্পনা রাখেন।

আমার জানা নেই, এমন কোনও বিশেষ কারণে তিনি তোমাদের পরিবারের সর্বনাশ করতে চান। তাই আগ্রায় এসে ছল করে তোমার বাবার কাছে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। আমি এমন অনেক কিছু জানি, যা লিখতে আমার সংকোচ হচ্ছে। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই না যে ডাঃ রুদ্রকে তিনি হত্যা করেছেন। তবে এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এবং এখনও তাঁর সম্বন্ধে সাবধান

BanglaBook.org

না হলে ভবিষ্যতে পরিবারের সকলের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। এখানেই শেষ করলাম।

অজয় সোম

চিঠিটা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুমিত্রা। আরেকবার পড়ল।

অজয় সোমের ধৃষ্টতায় ওর শরীর রি-রি করে উঠল। স্বীকার করতেই হয় লোকটার সাহস আছে। কিন্তু—এখানে যে বড়রকম একটা কিন্তুর খোঁচা রয়েছে। একটা লোকের নামে ডাহা এতগুলো মিথ্যে কথা লিখতে কেউ সাহস করবে? সুব্রতর নামে অজয় সোম যে সমস্ত কথা লিখেছেন, তা প্রমাণিত না হলে, বড়রকম একটা লিগ্যাল অফেন্স খাড়া হতে পারে। মিঃ সোম একজন আইনজ্ঞ হয়ে কি এতবড় ভুল করবেন?

কিন্তু সুব্রত—প্রাণচঞ্চল মনোরম সুব্রত। সে কী—? তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ও। সে-ও তো সুমিত্রাকে কত গভীরভাবে চায়। সুব্রতর মনে কি এত পাপ থাকতে পারে? বাবাকে সে খুন করেছে, একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

এ বিষয়ে অজয় সোমের সঙ্গে কথা বলবে সুমিত্রা। সুব্রতর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তিনি প্রমাণিত করতে পারবেন কি না, তাও জেনে নেবে। একটা চিঠির কয়েক ছত্রই ওর এবং সুব্রতর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল সুমিত্রা, টেলিফোন-স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ল, সুব্রত ডাঃ রুদ্রর ডায়েরির খোঁজ করছিল। এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করেছিল ও। কেন—?

আরেক দিনের একটা দৃশ্য ওর মনের পরদায় ভেসে উঠছে। একটা রিভলবারকে মাঝামাঝি রেখে সুব্রত আর ডাঃ রুদ্রর মধ্যে কথা হচ্ছিল। ডাঃ রুদ্রর মুখের ভাব ছিল থমথমে, সুব্রতও কেমন চঞ্চল ছিল। কেন—?

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল সুমিত্রা।

॥ এগারো ॥

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন অজয় সোম।

চিঠি পাওয়ার পরেই যে সুমিত্রা তাঁকে ফোন করবে, একথা তিনি ভাবতে পারেননি। চিঠিতে কিছুটা কাজ হয়েছে বুঝতে পারা গেল। মিঃ সোম সুমিত্রার প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতর যা কিছু জানেন, সমস্তই বললেন।

অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানতার সঙ্গেই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তিনি। আগে যদি তিনি বুঝতে পারতেন সুব্রত তাঁর প্রতিপক্ষ, তাহলে কবে এই কাঁটাটিকে তুলে দিতেন। এ ধরনের প্রতিবন্ধককে খুব বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন না তিনি।

একটা ইংরেজি প্রবাদ তাঁর জানা ছিল। ইংরেজরা বলে, শীতের হাওয়া আল্প মেয়েদের মনকে বিশ্বাস নেই। সুব্রতর দিকে এখন সুমিত্রার মনের হাওয়া বইছে, তিনি যেভাবে কল নেড়েছেন, তাতে হাওয়া যে তাঁর দিকে ঘুরবে না, কে বলতে পারে?

রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি সঞ্জীব রুদ্রর দিকে তাকালেন।

সঞ্জীব বসেছিলেন ঠিক তাঁর সামনে।

কিছু বলতেও বোধ হয় যাচ্ছিলেন সঞ্জীব রুদ্র। কিন্তু বলা আর হল না—ঘরে প্রবেশ করলেন

BanglaBook.org

এক ভদ্রলোক। বেঁটে, নিরেট চেহারার প্রৌঢ় আগন্তুককে দেখে অজয় সোম সাদরে আহ্বান জানালেন।

আসুন, আসুন মিস্টার ভাটিয়া—কী সৌভাগ্য!

মিঃ ভাটিয়া আসন গ্রহণ করলেন।

বললেন, বিশেষ কাজেই আপনার কাছে এলাম।

বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?

চশমা নাকের ওপর ঠিক ভাবে বসাতে-বসাতে বললেন, মৃত ডাক্তার বঙ্কিম রুদ্র আপনার ক্লায়েন্ট ছিলেন?

হ্যাঁ। ইনিই তাঁর ছেলে সঞ্জীব রুদ্র। কিন্তু কী হয়েছে বলুন তো?

ভাটিয়া ও সঞ্জীবের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল।

কেন জানি না, ডাক্তার রুদ্র আপনার ক্লায়েন্ট হয়েও জীবনের শেষ বৈষয়িক কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে গেছেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, রূপনারায়ণ ভাটিয়া আগ্রার একজন খ্যাতনামা প্রবীণ এটর্নি।

অজয় সোমের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তিনি বললেন, আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

তিনি আমাকে দিয়ে একটা উইল করিয়েছেন।

উইল! বিস্মিত গলায় সঞ্জীব বললেন, কিন্তু বাবার উইল তো মিস্টার সোমের কাছেই আছে।

মিঃ সোম বললেন, আপনার কথা আমারও বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কারণ তিনি বেশ কিছুদিন আগেই আমাকে দিয়ে উইল করিয়েছেন।

জানি।—মিঃ ভাটিয়া বললেন, তিনি আমাকে সে-কথা বলেছিলেন। আমার কাছে তিনি গিয়েছিলেন, মারা যাওয়ার দিন দশেক আগে। উইল তখুনি তৈরি হয়। সাক্ষীদের দিয়ে সই করানো হয়। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, আপনার নিজের এটর্নি থাকতে আপনি আমার কাছে এলেন যে? এর অবশ্য কোনও যুক্তিপূর্ণ উত্তর তিনি আমায় দেননি। যাই হোক, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি।

অজয় সোম কেমন একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ডাঃ রুদ্রর এই সামঞ্জস্যহীন কার্যকলাপ।

তিনি বললেন, তাঁর নির্দেশ কী?

সঞ্জীব রুদ্রও মনের মধ্যে উত্তেজনা বোধ করছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর ন'দিন পরে আমি যেন উইল পড়ি। কাল সেই ন'দিন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার রুদ্রর বাড়ির সকলকে বাড়িতেই থাকতে বলেন, তাহলে আমার বিশেষ সুবিধে হয়। সঞ্জীববাবু এখানে রয়েছেন, ভালোই হল। ইনিও এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

উইল রেজিস্ট্রি হয়েছে? অজয় সোম প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই। ভালো কথা, ডাক্তার রুদ্রর সেক্রেটারি সুব্রত রায়কেও বলবেন উপস্থিত থাকতে।

বেশ। আপনার বক্তব্য আমি সকলকে জানিয়ে দেব।

এরপর আর রূপনারায়ণ ভাটিয়া অপেক্ষা করলেন না।

বিদায় নিলেন।

সঞ্জীব রুদ্র ও অজয় সোম বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

মিঃ ভাটিয়ার অপেক্ষায় সকলে বসে রয়েছেন ড্রইংরুমে।

BanglaBook.org

বিনয় রুদ্র, অজয় সোম, সঞ্জীব রুদ্র, সুব্রত, সুমিত্রা সকলেই উপস্থিত ঘরে। তাছাড়া ইন্সপেক্টর প্রেমও রয়েছেন, তাঁর অনুরোধে বাসব ও হীরকও এসেছে।

কথাবার্তা বিশেষ হচ্ছে না। অনেকেই গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন।

সাতটা দশে রূপনারায়ণ ভাটিয়া ঘরে এলেন। তাঁর হাতে ব্রিফকেস। তিনি সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসলেন।

আপনারা সকলেই ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, এবার আমি ডাঃ বঙ্কিম রুদ্রর উইল পড়ব।

তিনি ব্রিফকেসের মধ্যে থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। বললেন, এই উইলের বলে ডাঃ রুদ্রর আগেকার উইল বাতিল হয়ে গেল। এই সর্বাধুনিক উইলটি পড়ার আগে আপনাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তো আমায় করতে পারেন।

কেউ কোনও প্রশ্ন করলেন না।

মিঃ ভাটিয়া উইলের ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ

আমি ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র রুদ্র সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে আমার শেষ উইল করিতেছি। ইহার সহিত কোনওরূপ প্ররোচনা জড়িত নাই।

আমার নগদ ছয় লক্ষ টাকা, তিনখানি বাড়ি ও ত্রিশ হাজার টাকার গহনা এই উইলের আওতায় পড়িবে। আমার পুত্র শ্রীসঞ্জীব রুদ্রকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। আমার ভ্রাতা ডাঃ বিনয় রুদ্রকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। এক লক্ষ টাকা, ক্যান্টনমেন্টস্থিত আমার বসত বাটী ও দশ হাজার টাকার গহনা আমার কন্যা শ্রীমতী সুমিত্রা রুদ্র পাইবে। আমার প্রিয়পাত্র শ্রীঅজয় সোমকে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। ক্যান্টনমেন্টের আরও দুইখানি বাড়ি ও পঁচাত্তর হাজার টাকা একটি চক্ষুচিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ব্যয়িত হইবে। এই কার্যভার আগ্রার সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি শ্রীরূপনারায়ণ ভাটিয়া ও আমার ভ্রাতা ডাঃ বিনয় রুদ্রর ওপর ন্যস্ত রহিল। শ্রীঅজয় সোমের নিকট আমার ত্রিশটি হ্যান্ডনোট রহিয়াছে, সেগুলি হাসপাতালের সাহায্যার্থে নিয়োজিত থাকিবে। বাকি তিন লক্ষ টাকা আমার বন্ধুপুত্র শ্রীসুব্রত রায় পাইবে।

আইন ঘটিত সমস্ত কার্য শ্রীরূপনারায়ণ ভাটিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাই আমার নির্দেশ।

ভবদীয়
ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র রুদ্র
রুদ্র হাউস, আগ্রা।

উইল পড়া শেষ করলেন রূপনারায়ণ।

সকলেই নির্বাক।

কারুর মুখে কথা না থাকলেও, অনেকের মুখেই অমাবস্যার ঘন অন্ধকার নেমেছে দেখা গেল। উইলের এই অদ্ভুত রদবদলে সকলেই বিস্মিত। সুব্রতও। ঘটনার কী অচিন্তনীয় বিন্যাস। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন—তাঁর টাকা অতিরিক্ত মাত্রায় ফিরে এসেছে দেখে কত আনন্দিত হতেন। বন্ধুকে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে ক্ষমা করতেন।

উইলটা আবার ব্রিফ কেসের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ভাটিয়া। সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এখনকার মতো আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাল থেকেই প্রবেট নেওয়ার ব্যাপার আরম্ভ করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

তিনি বিদায় নিলেন।

সুমিত্রা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। একটা কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে খারাপ দেখাবে বিবেচনা করে বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি চলি। আপনারা উঠবেন নাকি?

বাসব বলল, এবার আমরাও উঠব।

সুব্রত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

অজয় সোম বললেন, লোকটার ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে। এখানে চাকরি করতে এসে শেষপর্যন্ত লক্ষপতি হয়ে গেল।

বিনয় রুদ্র বললেন, ইদানীং বোধ হয় দাদার মতিভ্রম হয়েছিল। নইলে—।

হীরক বলল, উপস্থিত এটাই সুখের কথা যে, ডাক্তার রুদ্র কাউকে বঞ্চিত করেননি। কম-বেশি সকলকেই কিছু দিয়েছেন।

বাসব বলল, এবার আমি আপনাদের একটা অনুরোধ করব। আগামী কাল সকালে আপনারা আবার সবাই এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি ডাক্তার রুদ্রর খুন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

ঘর থেকে বেরিয়ে সুব্রত টানা করিডোর পার হয়ে সবে পার্লারে পা দিয়েছে—

শোনো—।

ফিরে দাঁড়াল সুব্রত।

করিডোরে আলো ছিল না। পার্লারের আলোয় কিছুটা স্বচ্ছ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। সেই মোলায়েম স্বচ্ছতার মাঝে ছায়ায় গড়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সুমিত্রা।

এক অভূতপূর্ব আবেগে সুব্রতর মন নেচে উঠল।

ও নরম গলায় বলল, মিত্রা—।

আমার সঙ্গে এসো।

সুমিত্রার পিছু-পিছু ওর ঘরে এল সুব্রত।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে সহাস্যে সুমিত্রা বলল, তুমি এখন একজন মস্ত ধনী, তাই না?

সুব্রত ওকে কাছে টেনে আনল।

হ্যাঁ, মিত্রা। তোমার বাবার অনুগ্রহে।

একটা কথা বলব? তার কিন্তু সঠিক উত্তর চাই।

একটা কেন, তোমার হাজারটা কথার উত্তর দিতে আমি বিন্দুমাত্র গররাজি নই।

সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল সুমিত্রা।

তুমি আগ্রায় কেন এসেছিলে?

কেন এসেছিলাম!—বিস্মিতভাবে সুব্রত বলল, তুমি তো জানো, চাকরির সন্ধানে এসেছিলাম।

আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছ তুমি! কারুর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই কি তুমি এখানে আসোনি?

সুব্রতর বুকের রক্ত শরীরের চতুর্দিকে যেন চলকে পড়ল।

ও দ্রুত গলায় বলল, কে বলেছে তোমায় একথা?

কে বলেছে, তা তো বড় কথা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার উদ্দেশ্যটা তাই ছিল কি না?

সুব্রত নিজের মনকে দৃঢ় করল। বলল, যদি বলি ছিল না, তাহলে উদ্দেশ্যটা আমার তাই ছিল, এটা প্রমাণ করার মতো লোক উপস্থিত পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু আমি তোমার অভিযোগ অস্বীকার করব না। ওই ওরনের একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। সে অনেক কথা

BanglaBook.org

মিত্রা। তবে আমি বলব না যে, আমরা মতো অবস্থায় পড়লে প্রত্যেক মানুষই এইরকম সিদ্ধান্ত করত। আমি ডাক্তার রুদ্রর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এখানে এসেছিলাম ঠিকই—নিজের ভুল বুঝতে আমার বেশি বিলম্ব হয়নি। তুমি বিশ্বাস করো, তোমার বাবাকে আমি খুন করিনি।

কথা কটা বলেই ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

সুমিত্রা ব্যস্ততার সঙ্গে ডাকল।—এই শোনো—শোনো বলছি!

না মিত্রা। অবিশ্বাস মানুষের মনকে কোথায় নিয়ে যায়, তা আমি জানি। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ, আমার এখানে আর অপেক্ষা করা চলে না।

সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুদ্র হাউসের বাইরে ফুটপাতের পাশে ইন্সপেক্টার প্রেমপ্রকাশের জিপ পার্ক করা ছিল।

উইল পর্ব শেষ করে বাসব ও হীরককে সঙ্গে নিয়ে প্রেমপ্রকাশ বাইরে এলেন। কিন্তু জিপে যাওয়ার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

ওদের গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে অজয় সোম ও বিনয় রুদ্র এসেছিলেন।

জীপের সামনের সিটে ড্রাইভার ছিল। মুভিং সিটটা সরিয়ে হীরক ও প্রেমপ্রকাশ পিছনে গিয়ে বসলেন। বিনয় রুদ্র সামনের সিটটা টেনে ধরে সকলকে উঠতে সাহায্য করছিলেন। বাসব উঠে বসতে যাবে ঠিক সেই সময় ওর মুভিং-সিটটা ওর ঘড়ির ওপর এসে পড়ল।

অন্য হাত দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করলেও, ঘড়ির কাচ ভেঙে গেল।

বিনয়বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর হীরক বলল, ঘড়িটা সিরিয়াসলি ড্যামেজ হল নাকি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি সিটটা একটু বিগড়েছে,—প্রেমপ্রকাশ বললেন, দিন তিনেক আগে আমার হাতের ওপরও পড়েছিল। তখন ঠিক করে রাখলে আর এই বিপত্তি ঘটত না। আমি দুঃখিত মিস্টার ব্যানার্জি।

আপনি ব্যস্ত হবেন না ইন্সপেক্টার। ভালো কথা, আমি আপনাকে একটা খাম দিচ্ছি, তার থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টটা তুলতে হবে।

বাসব নিজের পকেট থেকে কাপড়ে জড়ানো খামটা বের করে প্রেমপ্রকাশের হাতে দিল।

তিনি বললেন, আগে যে প্রিন্টটা তুলতে দিয়েছিলেন, তার কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পেয়েছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। এই প্রিন্টটা কালকের মধ্যে পেলেই ভালো হয়।

বেশ।

ইন্সপেক্টর ওদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

বাসব ও হীরক এসে ড্রইংরুমে বসল।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে অলসভাবে বলল, এই নতুন উইল পড়ার ব্যাপারে কী বুঝলে?

দুটো জিনিস আমার চোখে পড়েছে।—হীরক বলল, প্রথম ডাক্তার রুদ্র অজয় সোমের ক্লায়েন্ট হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে উইল করিয়েছেন। এমনকী অজয় সোমের প্রতি একটু উপেক্ষা ভাবই দেখানো হয়েছে। এতে আমি অবাক হচ্ছি। দ্বিতীয়, এতগুলো টাকা সুব্রতবাবুকে দিয়ে ডাক্তার রুদ্র নিজের অতীতের অপরাধকে সুন্দরভাবে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

হুঁ।

হরিপদর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখলে নাকি?

BanglaBook.org

একটা মোক্ষম সূত্র পেয়েছি।

কীরকম?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে আছে, শক্ত কিছু দিয়ে হরিপদর মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছে তাতেই। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ক্ষতস্থানে তেলতেলে একটা পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। ওই তেলতেলে পদার্থটা ক্রুডঅয়েল জাতীয়।

এতে কী প্রমাণ হচ্ছে?

অনেক কিছু। তুমি জানো, মোটরপার্টস্ ইত্যাদি ধোয়ার কাজে ক্রুডঅয়েল প্রয়োজন হয়। এখন একটু চিন্তা করে দেখো, ক্ষতস্থানে ক্রুডঅয়েলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই যা দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল তাতে ক্রুডঅয়েল লেগেছিল।

তারপর?

ক্রুড অয়েল যেখানে পাওয়া যায়, গ্যারেজ বা মোটরের কারখানাতেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটা হাতুড়ি জাতীয় কিছু এবং তার আমদানি হয়েছিল কোনও মোটরের গ্যারেজ বা কারখানা থেকেই।

তুমি বলতে চাও হত্যাকারী কোনও মোটর গ্যারেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি জোর দিয়ে একথা বলতে চাই না। তবে হত্যাকাণ্ড যে কোনও গ্যারেজের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হীরক দ্রুত বলল, তোমায় একটা কথা বলা হয়নি।

কী?

কাল থেকে একটা লোক ক্রমাগত আমাকে অনুসরণ করছে।

অনুসরণ করছে! কীরকম?

প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি।—হীরক বলল, বুঝতে পারলাম দুপুরের দিকে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসবার সময়। আমি গাড়িতে উঠলাম, সেও ট্যাক্সিতে উঠল। আমি যে-যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলাম, সেও কিছু দূরত্ব রেখে আমাকে অনুসরণ করে গেল। তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে আমি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম, দেখি সেখানেও সে উপস্থিত।

লোকটা কেমন? কী জাতীয়?

শিখ। সারা মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরতি। মাথায় পাগড়ি। চোখে রঙিন চশমা। পরনে সুট।

এবার আমি তোমাকে একটু অবাক করে দেব।—বাসব বলল, তুমি লোকটাকে কাল থেকে দেখেছ, আর আমি ওর কীর্তিকলাপ লক্ষ করছি দিন পাঁচেক ধরে।

বলো কী!

ওই লোকটা আমাদের ওপর অত্যন্ত খর দৃষ্টি রেখেছে কেন, বুঝতে পারছি না। কে ও? যদি কোনও গুন্ডা-শ্রেণীর লোক হয়, তাহলে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। তবে—

বাসব চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

উঠলে যে?

বাজারে যাব।

বাজারে যাবে! কেন?

এখানে বাইয়ের বাজার কেমন? বিদেশি বই-টই পাওয়া যায় তো?

তা পাওয়া যায়। কোনও বই কিনতে চললে নাকি?

হ্যাঁ। রাইডার হ্যাগার্ডের একটা বই।

এ ক'দিনেই বাসবের খামখেয়ালি স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়ে পড়েছিল হীরক। তবুও

BanglaBook.org

সে বলল, রাইডার হ্যাগার্ডের বই। কেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, নিশ্চয়ই পড়ব না বলে। কাল আবার তোমাদের বাজার বন্ধের দিন, তাই আজই বইটা কিনে আনতে হচ্ছে। ভালো কথা, তুমি ঘড়িটা মেরামত করিয়েছিলে কোথায়? ঠিকানাটা দাও দেখি। এই ফাঁকে আমি ঘড়িটা দিয়ে আসি দোকানে।

হীরক ঠিকানাটা বলে দিল।

বাসব রওনা হল বাজারে।

সেইদিন রাত্রে।

দুটো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে বাসব ও হীরক।

বাসব অনেকক্ষণ জেগেছিল। নানা চিন্তা ওঠা-নামা করছিল ওর মনের মধ্যে। একসময় ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়।

উচ্চরবে কোথায় তিনটে বাজল।

শীতের নিশুতি রাত্রি। ঝিমিয়ে রয়েছে।

খুট করে একটা শব্দ হল। মৃদু, খুব চাপা। ঘুম ভেঙেছে কী কারুর?

ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। হালকা আলোয় সারা ঘরখানা মায়াময়।

শব্দের তালে দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ছায়ামূর্তি। ভারী লম্বা কোটে সারা শরীর আচ্ছাদিত তার। মাথায় ফেল্টের হ্যাট। কোটের কলার খাড়া হয়ে রয়েছে। হ্যাট ও কলারের মাঝখানে মুখখানা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

ছায়ামূর্তি ম্যানটলপিসের দিকে এগিয়ে গেল।

সে কী খুঁজল যেন সেখানে। ওখান থেকে আবার বইয়ের তাকের কাছে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করল বইগুলো। ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়া গেল না বোধ হয়। ঘরের এখানে-সেখানে খোঁজ করে পাশের ঘরে চলে গেল ছায়ামূর্তি।

পাশের ঘরটি ড্রইংরুম।

ঘর অন্ধকার। পকেট থেকে টর্চ বের করল সে।

আলো ফেলে-ফেলে কী খুঁজে বেড়াতে লাগল চতুর্দিকে।

শেষে—।

শেষে শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। শো-কেসের মাথায় একটা বই রাখা রয়েছে। মোটা বইখানার মলাটের ওপর চকচকে কাগজের জ্যাকেট।

সাগ্রহে বইখানা তুলে নিল সে। ডান হাতে ধরা বইখানার ওপর, বাঁ-হাতে ধরা টর্চের আলো ফেলল ছায়ামূর্তি। রঙিন জ্যাকেটের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা, 'ব্ল্যাক শ্যাডো'—রাইডার হ্যাগার্ড। বইটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

সুচারুরূপে কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই।

ছায়ামূর্তি বাইরে যাওয়ার বন্ধ দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। টিপয়ের ওপর অ্যাশট্রে রাখা ছিল। ছায়ামূর্তি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ঝন-ঝন শব্দ তুলে অ্যাশট্রেটা পড়ে গেল মাটিতে। ঘুম ভেঙে গেল হীরকের।

কীসের একটা শব্দ হল। ওকি, ড্রইংরুমে আলোর ঝলকানি দেখা গেল না? হীরক বিছানার ওপর উঠে বসল। আবার আলো জ্বলে উঠল। কে যেন বাইরের দরজা খুলছে। চোর নাকি?

হীরক বিছানা থেকে নামতে যাবে—কে তার হাতে চেপে ধরল। চমকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল বাসব।

BanglaBook.org

বাসব নিজের ঠোঁটের গোড়ায় আঙুল তুলে তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

মিনিট পাঁচেক কাটল এইভাবে। পাশের ঘরে আর কোনও আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে না। কোনও শব্দ হচ্ছে না। চোর বোধ হয় সরে পড়েছে।

বাসব বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালল। সারা ঘর বয়ে গেল আলোর বন্যায়।

হীরক বিস্মিত গলায় বলল, তুমি যেতে দিলে লোকটাকে?

তাই তো দিলাম।

কী যে হেঁয়ালি করো বুঝতে পারি না।

আমি জানি, কে এসেছিল। উঃ, খুব ঠকানো গেছে লোকটাকে।

কী যে বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। কে লোকটা?

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, রক্ত-মাংসেরই কেউ একজন। এখন কিন্তু তোমায় আমি তার নামটা বলব না। শুধু বলতে পারি, সে কী চুরি করে নিয়ে গেছে।

কী?

'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইটা। এতে কী প্রমাণ হল জানো? প্রমাণ হল, আমার থিয়োরি কাঁটায়-কাঁটায় কারেক্ট। কিন্তু এখন দেওয়াল ঘড়িটা কী বলছে বলো তো, তিনটে দশ। কাজেই আমরা অনায়াসে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারি। প্লিজ হীরক, আলোটা নিভিয়ে দাও ভাই। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

অসংখ্য প্রশ্ন হীরকের মনের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু বাসবের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ও আর একটা কথাও বলবে না। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এল হীরক।

॥ বারো ॥

পরের দিন কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল হীরক মনে না পড়লেও সাংঘাতিক খারাপ গেল দিনটা। অবশ্য সারা দিনের মধ্যে কিছু হয়নি। বিপর্যয় যা ঘটবার সন্ধের সময় ঘটল।

হীরকের বাড়ির কাছেই মস্ত একটা কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি আছে। কম্পাউন্ডের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছ রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। পথটাও জনবিরল। এটাকে একটা করিডোর রোড বলা চলতে পারে। অর্থাৎ একটা বড় রাস্তা থেকে আরেকটা বড় রাস্তার মাঝখানের প্যাসেজ।

পায়ে হেঁটেই আজ অফিস থেকে ফিরছিল হীরক। গাড়ি নিয়ে সকালে বাসব বেরিয়েছিল বলে গাড়ি নিয়ে তার পক্ষে অফিস যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই প্যাসেজটা যে সব সময় জনবিরল থাকে তা নয়। তবে আজকের কথা স্বতন্ত্র। একে শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর সারা আকাশ মেঘে-মেঘে কালো হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি নামবে যে কোনও মুহূর্তে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে কেউ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না।

একটা গানের লাইন গুনগুনিয়ে ভাঁজতে-ভাঁজতে ঝাঁকড়া গাছগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে হীরক—আচম্বিতে তার ঘাড়ের ওপর কে লাফিয়ে পড়ল। অভ্যস্ত দ্রুত হাত চালিয়ে কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা টেনে বার করল আততায়ী। তারপর হাত থেকে ফোলিওটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা।

হীরক বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ পেল না।

তবে আবছা আলোতেই সে দেখতে পেয়েছিল আততায়ীকে। সে আর কেউ নয়, তাকে অনুসরণকারী সেই শিখ। ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল হীরক। এই প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছিল সে। এই আকস্মিক বিপদের জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। লোকটা দিন দুয়েক

BanglaBook.org

ধরে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে সে-যে তাকে এইভাবে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবেনি হীরক।

দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এল সে।

এখন তার কর্তব্য কী?

পুলিশে খবর দেবে—না, তার আগে বাসবের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। ওর পরামর্শ ও সাহায্য অপরিহার্য।

বাসব বাড়ি ছিল না, কোথায় বেরিয়েছিল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ও ফিরে এল।

হীরক ঘটনাটা সবিস্তারে বলল ওকে।

বাসব সমস্ত শুনে চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করল, কত টাকা ছিল ব্যাগে?

একশো কুড়ি টাকা আর কিছু খুচরো।

ফোলিওতে কাগজপত্র ছাড়া আর কী ছিল?

আর কিছু ছিল না। ভাবনা কাগজপত্রগুলোর জন্যই। ব্যাবসার সমস্ত দরকারি কাগজ—

বড় রকম লাভের আশায় ফোলিওটা হাতিয়েছে সে। যখন দেখবে, ওতে টাকা-পয়সা কিছু নেই, তখন কাগজপত্রগুলো কোথাও ফেলে দেবে বলে আমার ধারণা।

এখন তাহলে কী করা যায়?—হীরক শুকনো মুখে প্রশ্ন করল।

এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া। আমিও অনুসন্ধান করে দেখছি, তবে এইসব ছিঁচকে চোরদের ধরা খুব শক্ত হবে।

পুলিশ খবর দেওয়া হল।

পরের দিন সকালে প্রেমপ্রকাশ এলেন বাসব ও হীরককে জিপে তুলে নিয়ে ডাঃ রুদ্রর বাড়ি যাওয়ার জন্যে। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে গতকালই বাসব সকলের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করবে ঠিক করেছিল, কিন্তু গতকাল নানা কারণে পরিকল্পনাটাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আজ ব্যবস্থা হয়েছে।

জিপে হীরকের বাড়ি থেকে রুদ্র-হাউসে পৌঁছতে মিনিট সাতেক সময় লাগে। গাড়িতে কোনও কথাই হল না—তিনজনেই নির্বাক। ফোলিও-চোরের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি পুলিশ দ্রুত অনুসন্ধানের কাজে নেমেছে। বাসব ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে এখনও কোনও যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করতে পারেনি।

কাউকে ডাকাডাকি করতে হল না, ড্রইরুমে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রতকে খবর দেওয়া হয়েছিল, সেও উপস্থিত আছে ঘরে।

প্রেমপ্রকাশ আসনে গ্রহণ করলেন প্রথমে, তারপর বাসব ও হীরক।

বাসব বলল, আপনারা হয়তো বেশ কিছুক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন—আমি দুঃখিত। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। জীবনে আমায় বহু রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘোরাফেরা করতে হয়েছে। যদিও অহমিকার কথা, তবু বলব, প্রতিবারই আমি সেই সমস্ত রহস্যের সাফল্যজনক সমাধান করেছি। ডাঃ রুদ্রর হত্যাকাণ্ডও নিঃসন্দেহে রহস্যমূলক ঘটনা। আমি এখনও এর সমাধানে পৌঁছতে পারিনি, এ নিয়ে অনেকেরই আমার প্রতি উপেক্ষা থাকা স্বাভাবিক—আছেও। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি ভগবান নই। তথ্য ও তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই আমাকে কাজ করতে হয়। যদি সেই তথ্যই আমার কাছে অন্যভাবে পরিবেশিত হয়, তাহলে আমার কার্যধারাও ভুল পথে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে তাই হওয়ায় আমি একটু বিপথগামী হয়ে পড়েছিলাম। অর্থাৎ...

BanglaBook.org

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অজয় সোম বললেন, আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের মধ্যে কেউ আপনাকে ভুল বা মিথ্যে কথা বলে বিপথে চালিত করেছে?

শুধু তাই নয়, অনেকে আবার আমার কাছে অনেক কিছু সম্পূর্ণ চেপে গেছেন।

আপনি কাকে-কাকে মিন করছেন?

বাসব অল্প একটু হাসল। বলল, কাউকে বাদ দিতে পারলে খুশি হতাম। আপনাদের অনুরোধেই আমি এ-কাজে যুক্ত হয়েছি, অথচ আপনারাই আমাকে অফ ট্র্যাকে ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

আপনি কী বলতে চাইছেন জানি না, অজয় সোম বললেন, আমি যেমন আপনাকে এ-কাজে নিয়োজিত করেছি, তেমনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হইনি।

আমার অভিযোগ আপনাকে বাদ দিয়ে নয়, মিস্টার সোম।

আমাকে!! আকাশ থেকে পড়লেন অজয় সোম।

আপনি বিস্মিত হচ্ছেন মিস্টার সোম? বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অবশ্য আপনাকে আর কিছু বলবার আগে সুব্রতবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। মিস্টার রায়—

সুব্রত বাসবের আহ্বানে মুখ তুলল।

আপনি সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, কোনও কথাই না লুকিয়ে সমস্ত কিছু আপনাকে বলেছেন, তাই না?

নিশ্চয়ই, আমার যা কিছু জানা ছিল সমস্ত আপনাকে জানিয়েছি।

আমি আপনার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে চাই, মিস্টার রায়। সেদিন একটা কথা আপনি আমার কাছে লুকিয়ে গিয়েছিলেন।

কোন কথা?

হরিপদর মৃতদেহ যেদিন এই বাড়িতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেদিন স্টাডিতে চোর ঢুকেছিল—সেদিন রাত্রে আপনি শুধু সুমিত্রা দেবীর ঘরেই যাননি, আরেকটি উদ্দেশ্যও আপনার ছিল।

উদ্দেশ্য?

স্টাডি-রুমে আপনি ঢুকেছিলেন এবং সেই ঘরে উপস্থিত দ্বিতীয়জনের সঙ্গে আপনার ঝটাপটি হয়েছিল। য়্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার রায়?

সুব্রত একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। হয়তো আমার ও-কথাটা চেপে যাওয়া উচিত হয়নি।

এখন বলবেন কি, ঘটনাটা কী ঘটেছিল, কেন এই ঝটাপটির সূত্রপাত?

আপনি জানেন, সুমিত্রার সঙ্গে অজয়বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে, অথচ ওর ঘনিষ্ঠতা আমার সঙ্গে। ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার পর আমার এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া কমে গেল। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সুমিত্রার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে এলাম এ-বাড়িতে রাত্রে। সবে সুমিত্রার দরজায় করাঘাত করতে যাব, মনে হল কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম আড়ালে। দেখলাম, ওপর থেকে একটা ছায়ামূর্তি নেমে এসে স্টাডির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর তালা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। মনের মধ্যে দারুণ সন্দেহ জাগল আমার। আমি সন্তর্পণে ভেতরে গেলাম। দেখি সে কী সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা বই তুলে নিল—আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর।

সে লোকটা কে ছিল আপনি বলতে পারেন?

বেশ সহজ ভাবে সুব্রত বলল, পারি, তবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তার নাম এখানে প্রকাশ করতে পারব না।

হুঁ। এবার আমি আপনার বিস্ময় দূর করব মিস্টার সোম—তবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করার পর। ডাঃ রুদ্র যেদিন খুন হন, আমি এলাম এখানে তদন্তে। আমি ও ইন্সপেক্টর তদন্ত আরম্ভ করলাম,

BanglaBook.org

আমি সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম—পরে হীরকের মুখে শুনেছি, আপনি সে সময় ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।

বেশ, আপনার কথাই মেনে নেওয়া গেল। এবার আমি বলব, আপনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এই জটিল পরিবেশকে আরও কত জটিল করে তুলেছেন।

কোন উদ্দেশ্য! অজয় সোম বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি?

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, আপনার ডান হাতের মধ্যের আঙুলে একটা আংটি ছিল, সেটা কোথায় বলবেন কি?

অজয় সোমের ডান হাতের মধ্যে আঙুল যে একটা আংটি ছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আংটিটা উপস্থিতি যথাস্থানে না থাকলেও, দীর্ঘদিন তার ওখানে উপস্থিতি বুঝতে পারা যায়, চামড়ার ওপর হালকা দাগ দেখে।

ওর ওই প্রশ্নে সকলে বিস্মিত হলেন।

ভ্রূ কুঁচকে মিঃ সোম বললেন, খুলে রেখেছি।

এমনি খুলে রেখেছেন, না আংটির পাথরটা পড়ে যাওয়ায় খুলে রাখতে বাধ্য হয়েছেন? দেখুন তো, এই চুনিটা কি না?

সকলেই দেখলেন বাসবের হাতের চেটোয় একটা লাল পাথর চকচক করছে।

অজয় সোম অধীর ভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাসব তাঁকে বাধা দিয়ে আবার বলল, অনর্থক আপনি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন মিস্টার সোম। আমি জানি, স্টাডি রুমে সেদিন আপনার সঙ্গে সুব্রতবাবুর ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় এই পাথরটা আপনার আংটি থেকে খসে পড়ে।

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

বিনয় রুদ্র বললেন, মিস্টার সোম সেদিন স্টাডিরুমে ঢুকেছিলেন।

সুব্রতবাবু, এবার নিশ্চয়ই সেই রাতের আগন্তুকের নাম প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি নেই? অজয়বাবু ছিলেন, তাই না?

সুব্রত ঘাড় নাড়ল।

অজয় সোম ঘামতে আরম্ভ করলেন।

বাসব বলল, শুধু তাই নয়, যে বস্তুটি পেয়েও আপনি হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছিলেন,তারই সন্ধানে গত পরশু রাত্রে, আপনাকে যেতে হয়েছিল আমাদের ওখানে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, তখন আমরা আপনাকে দেখেছিলাম। ইচ্ছে করলেই ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরিনি।

মিস্টার সোম কীসের সন্ধানে এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জি? সুমিত্রা প্রশ্ন করল।

আপনার বাবার 'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইখানার জন্যে।

বই! কেন?

তাতে একটা নকশা আছে।

নকশা!

ঘরের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল।

অবশ্য এত চেষ্টা করেও নকশা সংবলিত সেই বইখানি মিস্টার সোম পাননি। যে-খানা আমাদের ওখান থেকে নিয়ে গেছেন, তা হল আমারই সদ্য কেনা ওই নামের আরেকটা বই।

বাসব নিজের কোটের পকেট থেকে একটা বই বের করল।

এই হল আসল বই। এর মলাটের ওপর যে চকচকে জ্যাকেট রয়েছে, তারই উলটো দিকে নকশাটা আঁকা আছে। জনশ্রুতি মিথ্যে না হলে, পাল সম্রাটের কোষাগার লুণ্ঠন করা বিপুল ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে এর সাহায্যে। এখন আমি বইখানা ইন্সপেক্টর প্রেমের হাতে নিয়ে অনুরোধ করব,

BanglaBook.org

তিনি যেন নকশাখানা ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা-দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁরাই এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

বাসবের হাত থেকে নিলেন বইখানা প্রেমপ্রকাশ।

ঘরে নীরবতা নেমে এল।

কয়েক মিনিট কেউ কিছু বললেন না।

শেষে অজয় সোমই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন ধরা গলায়, আপনার ক্ষমতার আমি প্রশংসা করি মিস্টার ব্যানার্জি। লোভে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নকশাটা হাতে পাওয়ার জন্যে আমি অনেক কিছু করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ডাক্তার রুদ্রকে আমি খুন করিনি। ও বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আপনি উতলা হবেন না মিস্টার সোম। ব্যাড স্টার মানুষকে অনেক সময় বিপথগামী করে দেয়। এবার আমি বিনয়বাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বিনয় রুদ্র ভীতভাবে এধার-ওধার তাকালেন। বললেন, বলুন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, ডাক্তার রুদ্রকে শেষ দেখেন বিকেল পাঁচটার সময়, তখন তিনি চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলেন।

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম।

অথচ ঠিক এই একই প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা দেবী আমাকে জানিয়েছেন, বিকেল পাঁচটার সময় ডাক্তার রুদ্র চেম্বারে আর গেলেন না। কার কথাটা ঠিক?

একটু থতমত খেয়ে বিনয় রুদ্র বললেন, সুমিত্রার। আমি ভুল বলেছিলাম।

আপনি এরকম স্থূল প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলেন কেন?

না...মানে..., আমতা-আমতা করতে লাগলেন তিনি।

অকারণে কেউ মিথ্যে কথা বলে না। এখন বলবেন কি, আপনি কেন আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন?

দেখুন...মানে...।

আমি জানি, উনি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলেন—সঞ্জীব।

সকলে সবিস্ময়ে সঞ্জীব রুদ্রর দিকে তাকালেন।

তিনি আবার বললেন, পাঁচটার সময় কাকা নিজেই বাবার চেম্বারে ছিলেন।

সঞ্জীব!—প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বিনয় রুদ্র।

কিন্তু আপনি,—বাসব বলল, আপনি জানলেন কীভাবে একথা?

আমার দোতলার ঘর থেকে বাবার চেম্বার দেখা যায়।

ওখানে তিনি কী করছিলেন সেসময়?

তা আমি দেখতে পাইনি। উনি আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের ওধারে ঝুঁকে কিছু করছিলেন।

বিনয়বাবু, এই অভিযোগের উত্তরে আপনার বক্তব্য কী?

বিনয় রুদ্র কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

বাসব আবার বলল, আপনি আপনার দাদার চেম্বারে গিয়েছিলেন, মোটেই তা দোষণীয় নয়। তবে প্রকৃত কথাটা চেপে গিয়ে আরেকটা মিথ্যের অবতারণা করে আমাকে বিপথগামী করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ আপনার দাদা ওই সময় চেম্বারে ছিলেন একথা বলে, নিজের চেম্বারে অনুপস্থিতি প্রমাণ করতে যাওয়াটা সন্দেহজনক নয় কি?

একটা ছোট ব্যাপারকে নিয়ে এত কথা বাড়াচ্ছেন কেন, মিস্টার ব্যানার্জি?—সুমিত্রা বলল।

বাসব মৃদু হাসল। বলল, এই ব্যাপারটার মধ্যে অর্থ-অর্থ না গন্ধ থাকলে আমি কথা বাড়াতাম না।

BanglaBook.org

অর্থাৎ?

সকলে উৎসুক হয়ে তাকাল বাসবের দিকে।

আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা সম্পূর্ণ আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। এ বিষয়ে নাক গলানোর প্রয়োজন আমার ছিল না—যদি না ঘটনাচক্রে আমার তদন্তের আওতায় এই ব্যাপারটা এসে পড়ত। সুমিত্রা দেবীর মুখে আমি শুনেছি, ডাক্তার রুদ্র প্রতিদিনকার আয় নিজের চেম্বারের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারে জমা রাখতেন। তারপর কয়েকদিনের টাকা জমা হয়ে গেলে, ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি এবং পরে ইন্সপেক্টর সেক্রেটারিয়েটের ড্রয়ারগুলোতে একটা পয়সাও দেখতে পাইনি। নিশ্চিতভাবে ওখানে কিছু টাকা থাকার কথা। কিন্তু ছিল না। এবার আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে ওইদিনই টাকা চাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিনয়বাবুর। এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, ডাক্তার রুদ্রর অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে বিনয়বাবুর উপস্থিতি এবং ড্রয়ার থেকে টাকা অদৃশ্য হওয়া কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কারুর মুখে কথা নেই।

বিনয় রুদ্র মাথা নত করে বসে রইলেন।

বাসব উড়ে দাঁড়াল।

এই অপ্রীতিকর কথাটা উল্লেখ করার জন্যে মর্মাহত। এবার আমরা বিদায় নেব। আসুন ইন্সপেক্টর, এসো হীরক।

বাসব দরজার দিকে এগিয়ে এল। প্রেমপ্রকাশ ওকে অনুসরণ করলেন। হীরকও।

মিনিট কয়েক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধভাবে কেটে গেল।

তারপর—।

তারপর ফেটে পড়লেন সঞ্জীব রুদ্র, কাকা, তুমি—তুমি বাবার টাকা চুরি করেছিলে?

বিনয় রুদ্র কিছু বললেন না।

সুমিত্রা বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়—।

না, সবকিছু ধামা-চাপা দেওয়া যায় না। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সেদিন রাত্রে আমি কাকাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে ঠিকই দেখেছিলাম। তুমি তাহলে বাবার ঘরে ঢুকেছিলে সেদিন? টাকার সন্ধানে নিশ্চয়ই।

বিনয় রুদ্র মুখ খুললেন।

বেশ সহজভাবেই বললেন, আমি দাদার ঘরে টাকার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। দুর্ঘটনার দিন ড্রয়ার থেকে হাজার তিনেক টাকা আমিই নিয়েছি। দাদার কাছ থেকে কয়েকবার টাকা চাওয়ার পর না পেয়ে এই কাজ আমায় করতে হয়েছে। কিন্তু কেন এ কাজ আমায় করতে হয়েছে, তা তুমি জানো?

কেন?

তোমার জন্যে?

আমার জন্যে! আকাশ থেকে পড়লেন সঞ্জীব রুদ্র।

তোমার বিস্মিত ভাব দেখে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি সঞ্জীব। বাসবাবু অবশ্য নিজের কর্তব্য করেছেন—আমি শুধু ভাবছি, তোমার ব্যবহারের কথা। তুমি সকলের সামনে আমাকে চোর বলতে দ্বিধা করলে না, অথচ আমি টাকাটা তোমার জন্যেই নিয়েছিলাম। তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না, যেসব পাওনাদারেরা তোমার পিছনে ফেউয়ের মতো লেগেছিল, তারা আর তোমায় কেন বিরক্ত করছে না।

একটু থেমে আবার বিনয়বাবু বললেন, তুমি কেন টাকা ধার নিয়েছিলে জানি না। তবে আমি টাকাটা যে কোনও উপায়েই হোক শোধ দিতে বাধ্য হলাম দাদার সম্মানের কথা চিন্তা করেই।

সঞ্জীব রুদ্রর চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

BanglaBook.org

কেউ আর কারুর দিকে যেন তাকাতে পারছেন না। কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে ক্রমেই সাপ বেরিয়ে পড়ছে! শেষে সমস্ত কিছুকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে সুব্রতই বলল, মিথ্যে কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, ডাক্তার রুদ্রর হত্যাকারী এখনও অদৃশ্য। ও বিষয়ে বাসববাবুকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

অজয় সোম উপেক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, প্রশ্ন করে লাভ কী। যথা সময়েই হত্যাকারীর নাম—

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। অ্যাটর্নি-বাড়ি ওকে যেতে হবে এখুনি। ভাটিয়া গতকালই খবর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু যাওয়া হয়নি। কাজেই এখন তাঁর ওখানে একবার না গেলেই নয়।

সেদিনের পর সুমিত্রার সঙ্গে আর সুব্রতর কোনও কথা হয়নি। সুব্রত ইচ্ছে করেই এদিকে আসেনি। কী দরকার—সুমিত্রা নিজের মনের ভাব একরকম প্রকাশ করে দিয়েছে, কাজেই—।

রূপনারায়ণ ভাটিয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে সুব্রত সোজা নিজের বাসায় ফিরে এল।

বেশ ক্লান্ত লাগছে। এখন খেয়ে দেয়ে স্রেফ ঘুম। কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে বিস্মিত হল সুব্রত। বিস্মিত হওয়ারই কথা, সুমিত্রা বিছানার ওপর বসে রয়েছে। হাসছে অল্প-অল্প।

দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। সুব্রত হতবাক হয়ে গেছে।

সুমিত্রা বলল, হাঁ করে কী দেখছ? আমি কি কুতুবমিনার, না চিড়িয়াখানার বেবুন? মজার জিনিস দেখে আশ আর মিটছে না বুঝি?

সুব্রত জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, তুমি আবার কেন এলে? আমি কী মতলব নিয়ে আগ্রায় এসেছিলাম, তা তো তুমি জেনে ফেলেছ। সত্যি, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তুমি যা জেনেছ, তাতে এক তিল মিথ্যে নেই। তাই বলছিলাম—

থামলে কেন? তোমার বক্তৃতার আরম্ভ বেশ ভালো হয়েছে। আমি শুনছি, তুমি বলো।

তাই আমি ভাবতে পারিনি, তুমি আমার কাছে আবার আসবে। এখনও কি কোনও প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে। বলো, আমি আর সঠিক উত্তর দেব।

হ্যাঁ আছে, অনেক প্রশ্ন। সারা জীবন ধরে তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে।—সুমিত্রা সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! আমি না হয় গোটাকতক প্রশ্নের উত্তরই চেয়েছিলাম, তাই বলে মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে রাখতে হবে বুঝি! আমি কি একবারও বলেছিলাম, হে আর্যপুত্র, তোমার মনে কখনো কোনও কু-অভিসন্ধি ছিল, তাই তোমার সঙ্গে সারা জীবনের মতো সম্পর্ক শেষ করলাম?

সুমিত্রার কথা বলার ভঙ্গিতে সুব্রত হেসে ফেলল।

কিন্তু...।

এখনও কিন্তু! আর কোনও কিন্তু নয়। আমি আর কত বেহায়া হব বলতো! অজয় সোম আমায় বাজিয়ে দেখছিল, তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে বলে তার দিকে আমার মনকে ফেরাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু—।

সুব্রতর মন স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। ও হালকা গলায় বলল, তুমিও তো কিন্তুর বেড়াজালে আটকে পড়লে মিত্রা। অজয় সোমের ওপর একটু করুণা কি হয় না তোমার?

এ জীবনে করুণা দেখাবার অবকাশ কোথায়?

তাও তো বটে।

এইভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু বকে মরব বুঝি? একজন ভদ্রমহিলা তোমার বাসায় এসেছেন, কোথায় তাঁকে জিগ্যেস করবে, ম্যাডাম, এই অবেলায় এসেছেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব কি?

BanglaBook.org

খিদে-তেষ্টায় আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে উঠেছে! তা নয়...।

তুমি খেয়ে আসোনি নাকি? আশ্চর্য হয়ে সুব্রত প্রশ্ন করল।

কই আর খেয়ে এলাম।

খুব অন্যায় করেছ। এত বেলা হয়ে গেছে, বাড়ির লোকেরা তোমার জন্যে ভাবছেন।

ভাবতে তাঁদের বয়ে গেছে। আমি অবাক হচ্ছি তোমার ব্যবহারে। কই, একবারও তো প্রশ্ন করছ না, কেন খেয়ে এলাম না?

সত্যি তো! তুমি কেন খেয়ে এলে না, মিত্রা?

কেন আবার, তোমার সঙ্গে খাব বলে। তোমার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা তো আমায় করতে হবে।

সুমিত্রার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সুব্রত।

তারপর সবলে ওকে জড়িয়ে ধরল।—মিত্রা—সত্যি, আমি তোমায় সবসময় বুঝতে পারি না, মিত্রা!

॥ তেরো ॥

রুদ্র-হাউস থেকে বেরিয়ে ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ বাসব ও হীরককে নিয়ে হীরকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

হীরক বলল, অনেক বেলা হল, মধ্যাহ্নের আহারটা এখানেই সেরে নিন, ইন্সপেক্টর।

সহাস্যে বাসব বলল, উপযুক্ত প্রস্তাব। হীরককে অতিথি-সৎকারের একটা সুযোগ দিন মিস্টার প্রেম।

প্রেমপ্রকাশ হেসে বললেন, বেশ তো। বাঙালি-খানার ওপর আমার দুর্বলতা চিরদিনের। তবে শ্রীমতীকে একটা ফোন করতে হবে। নইলে—।

নিশ্চয়ই, বাসব সহাস্যে বলল, মিছিমিছি দাম্পত্য-কলহকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

খাওয়াটা বেশ জুতেরই ছিল।

পান মুখে তিনজনে ড্রইংরুমে এসে বসল।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, এবার কেসটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলুন, আমরা শুনি।

খুবই ভালো প্রস্তাব—হীরক বলল, আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে রয়েছে। একটু বুঝিয়ে বল।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আজকের ঘটনার একটা সূত্র নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করা যাক। যেমন, নকশার কথা ধরা যেতে পারে। উপস্থিত পরিস্থিতিটাকে অত্যন্ত জটিল করে রেখেছে এই নকশা। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী ডাঃ রুদ্র নিজেই। ডায়েরিতে লক্ষ করেছি, তিনি যখন নকশার ওপর নির্ভর করে গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়া মনস্থ করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে কোনও লোককে সহকারী হিসেবে নেওয়া যায় না। নিজের ছেলে আর ভাইকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না। শেষে তিনি অজয় সোমকেই নিজের সহকারী মনোনীত করেন। যদিও ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। তবু এখন নিশ্চিতভাবে তাঁর নাম আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁকে কীভাবে সন্দেহ করেছিলাম আপনারা শুনেছেন। যাই হোক, মিঃ সোমকে নিয়ে ডাঃ রুদ্র অভিযানে বেরোলেন,

BanglaBook.org

কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক অভিযান পরিত্যক্ত হল। এদিকে পুরো ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় মিঃ সোমের প্রচণ্ড লোভ হল, যে কোনও উপায়ে হোক নকশাটা হাতাবেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন—তিনি জানতেন 'ব্ল্যাক শ্যাডো'র মলাটের ওপর যে জ্যাকেট আছে, তারই ভেতর দিকে আঁকা আছে ম্যাপটা। তবে ডাক্তারের সতর্ক চোখ এড়িয়ে সেটা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই ডাক্তারের মৃত্যুর পর কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়লেন অজয় সোম। অবশ্য তার আগে ভয় দেখিয়ে কয়েকখানা চিঠি তিনি ডাঃ রুদ্রকে পাঠিয়েছিলেন।

বাসব থামল। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। আবার বলতে আরম্ভ করল, ওই চিঠিগুলোর মধ্যে একটা চিঠি ডাঃ রুদ্র আমাকে দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটার ওপর থেকে আমি মিঃ প্রেমের সাহায্যে হাতের ছাপ তুলি। সেই ছাপের সঙ্গে হুবহু মিল হয়ে যায় 'ব্ল্যাক শাডো'র ওপরকার মলাটে যে হাতের ছাপ পাওয়া যায় তার সঙ্গে। কাজেই বুঝতে পারা গেল পত্রলেখক ও স্টাডিতে প্রবেশকারী একজন আগন্তুক অভিন্ন ব্যক্তি। আমি ভাবতে লাগলাম এই ব্যক্তিটি কেন? হরিপদ মারা যাওয়ার পরের দিন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল মিঃ সোমের আঙুলে আংটিটা নেই। চোখে পড়বার কারণ হল, ওই চুনিযুক্ত আংটিটা আমার আগেই লক্ষ করা ছিল। আঙুলে আংটি অনুপস্থিত দেখার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল স্টাডিতে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটার কথা। তবে কি—মিঃ সোমই কী তাহলে স্টাডিতে ঢুকেছিলেন। কেন? রাইডার হ্যাগার্ডের বইটাকে ঘরের এককোণে পড়ে থাকতে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি বইটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারলাম, মলাটের জ্যাকেটের তলায় ম্যাপটা আঁকা রয়েছে। মিঃ সোম সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁর হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। সংগ্রহ করা খুব শক্ত হল না। এবার তাঁর হাতের ছাপের সঙ্গে, পত্রলেখক ও আগন্তুকের হাতের ছাপ মেলালাম। হুবহু এক।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার পর মিঃ সোম নকশাটা সংগ্রহ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। চরম সাহসের পরিচয় দিয়ে স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু কার্যোদ্ধার হল না। সুব্রতবাবু কোথা থেকে এসে সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। যাই হোক, অজয় সোম অনুমান করে নিলেন বইখানি আমি নিয়ে গেছি। তাই তাঁর এবাড়িতে শুভাগমন হল। কিন্তু এবারও তিনি সফল হতে পারলেন না। বাজার থেকে আমার কিনে আনা অন্য একটা 'ব্ল্যাক শ্যাডো' তিনি নিয়ে গেলেন।

আর বিনয় রুদ্র—তিনি টাকা চুরি করতে গিয়েছিলেন কেন? প্রেমপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন।

কোনও ব্যক্তিগত কারণেই বোধ হয়। ও বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিনি।

কিন্তু এতে ডাঃ রুদ্রর হত্যারহস্য সরল হল না। মিঃ সোমের নকশার প্রতি লোভ ছিল। তিনিই কি—

নকশা সংক্রান্ত উপকাহিনিটি সমসাময়িক ঘটনা হওয়ায় হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। আসলে দুটি হল ডিফারেন্ট ইসু। হত্যার সঙ্গে ও ব্যাপারের কোনও যোগ নেই।

হীরক বলল, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু ডাঃ রুদ্রকে একজন খুন তো করেছে, কে সে?

বাসবকের কানে যেন কথাটা গেল না।

ও অন্যমনস্কভাবে বলল, তোমার কাছে টাইম-টেবল আছে?

টাইম-টেবল!!

থাকলে দাও।

টাইম-টেবল কী করবে?

আহা, দাওই না।

BanglaBook.org

হীরক উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টাইম-টেবলটা এনে দিল।

টাইম-টেবল্ হাতে নিয়ে বাসব পাতা উলটে-উলটে কীসব দেখল, তারপর বলল, এখান থেকে টুন্ডলা কতদূর?

প্রেমপ্রকাশ বললেন, মাইল কুড়ি হবে।

ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, তুফান কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগ্রা পাস করে যাবে। ও গাড়িটা আর ধরা যাবে না। আপনি আমাকে মোটরে টুন্ডলা পৌঁছে দিতে পারেন ইন্সপেক্টর?

টুন্ডলা। ওখানে যাবেন কেন?

না গিয়ে কী করি বলুন? আগ্রা থেকে কলকাতায় ফেরার আজ আর তো কোনও ট্রেন নেই। সন্ধ্যা আটটার সময় টুন্ডলা থেকে ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেস পাস করে। আমাকে ওটা অ্যাভেল করতে হবে।

সেকী!—বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল হীরক।—তুমি কলকাতা ফিরবে কীরকম? এদিকে কেসটার কী হবে?

আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, মিস্টার ব্যানার্জি। সত্যিই তো, আপনি চলে গেলে কেসটার কী হবে? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার।

কেস তো আমি সলভ করে ফেলেছি। কোনও রহস্যই এখন আমার কাছে রহস্য নয়। অবশ্য যাওয়ার আগে আমি সমস্তই বলে যেতাম।

আপনি জানেন, ডাক্তার রুদ্রকে কে খুন করেছে?

জানি বইকি। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই জানি।

বলেন কী!

হত্যাকারীকে শেষপর্যন্ত আমি ধরতে পারতাম কি না সন্দেহ, যদি না সে ছোট্ট একটা ভুল করত—অবশ্য তাকে ভুল না বলে ওভার-চালাকিও বলা যেতে পারে। আমার সম্বন্ধে হত্যাকারীর ধারণা খুব অস্পষ্ট থাকার দরুনই সে এই চালাকিটা খেলতে গিয়েছিল।

কীরকম?

আপনারা আগেই শুনেছেন, ডাক্তার রুদ্রকে খুন করার মোটিভ কী। তিনি গোপনে হুন্ডির ব্যবসা করতেন। ঠেকায় পড়লে অনেকে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করত। হত্যাকারীর অনেক টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধরুন, পঁচাত্তর হাজার টাকা। সে টাকাটা ধার নেয়। এখানে ভেবে নিতে হবে, ডাক্তার রুদ্র যাকে-তাকে এত টাকা ধার দিতে পারেন না। সে নিশ্চয়ই তাঁর পরিচিত ব্যক্তি ছিল—কাজেই এত টাকা ধার তিনি তাকে সহজেই দিয়েছিলেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

প্রেমপ্রকাশ ও হীরক ওর কাহিনিতে তন্ময়।

বাসব আবার আরম্ভ করল, টাকাটা কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধার করেনি হত্যাকারী। তার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। সে জানত, ডাক্তার রুদ্র হ্যান্ডনোটগুলো কোথায় জমা রাখেন। তারপর হরিপদর সাহায্যে সে কীভাবে হ্যান্ডনোটটা চুরি করেছিল এবং ডাক্তার রুদ্রকেই বা কেন খুন করেছিল, সেকথা আপনারা আমার মুখ থেকে আগেই শুনেছেন। আর এও শুনেছেন, হরিপদ তার হাতে হত হল কেন।

হীরক বলল, কিন্তু হত্যাকারী কে সে কথা তো তুমি বলছ না একবারও?

এখনও বুঝতে পারনি, হত্যাকারী কে?

না।

ইন্সপেক্টর আপনি—?

সলজ্জভাবে হেসে প্রেমপ্রকাশ বললেন, আমি এখনও অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি।

BanglaBook.org

বেশ, এবার আমি সরল করে বলছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, ডাক্তার রুদ্র পঁচাত্তর হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন নিজের পরিচিত এমন কোন্ ব্যক্তিকে। বিনয়বাবু ও সঞ্জীবাবুকে সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ নিজের ভাই আর ছেলেকে কিছু টাকা ধার দেওয়া যায় না। সুব্রতবাবু তাঁর কর্মচারী, তাঁকে তিনি এত টাকা ধার দিতে পারেন না। অজয় সোম যদি টাকাটা ধার নিতেন, তবে তাঁর কাছে হ্যান্ডনোটটা নিশ্চয়ই ডাক্তার রুদ্র জমা রাখতে যেতেন না। তবে কে?—কে সেই চক্রান্তকারী এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, এ যজ্ঞের প্রধান হোতা হল, আমারই পরম বন্ধু হীরক চৌধুরী। ঘরের মধ্যে যেন এভারেস্টের চূড়াও ভেঙে পড়ল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রেমপ্রকাশ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হীরক। তীব্র গলায় বলল, আমি!!

হ্যাঁ ভাই, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি চমৎকার একটি পরিকল্পনার সাহায্যে, নিজের স্বার্থের অনুকূলে ডাক্তার রুদ্র ও হরিপদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছ!

আমি খুন করেছি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বাকচাতুর্যে তুমি আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না, হীরক। তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার মতো প্রচুর প্রমাণ আমার হাতে আছে।

মরণাহত হায়নার মতো হীরকের চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলে উঠল।

ভব্যতার মুখোশ ছিঁড়ে অবয়বের প্রতিটি রেখায়-রেখায় ফুটে উঠল দানবীয় বিকাশ। নিরুদ্ধ গলায় সে চিৎকার করে উঠল ঃ আমাকে ডাক্তার রুদ্রর হত্যাকারী প্রমাণিত করবার কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

বলেছি তো, প্রচুর প্রমাণ। তোমার আত্মপ্রত্যয়ই তোমার পতন ঘটাল। আমাকে আরও গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারার জন্যে যদি ডাক্তার রুদ্রর টেবিলের ওপর থেকে টুথপিকের বাক্সটা বদলে না নিত, তাহলে বোধ হয় তোমাকে এক তাড়াতাড়ি ধরতে পারতাম না। সবচেয়ে স্থূল প্রমাণ হল তোমার ফোলিও ব্যাগটা। যার মধ্যে আছে তোমার ব্যবসার কাগজপত্র—যা পড়ে বুঝতে পারা যায়, তোমার ব্যবসায় বিরাট টাল যাওয়ার কথাটা, বুঝতে পারা যায় সেই টাল সামলে ছিলে তুমি ডাক্তার রুদ্রর কাছ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে। আমি মর্মাহত হীরক, গতকাল তোমাকে জনৈক শিখের ছদ্মবেশে আক্রমণ করার জন্যে। অবশ্য তার আগেই তোমাকে অনুসরণ করে শহরতলির ট্রাক গ্যারেজটা দেখে এসেছিলাম—যেখানে হরিপদকে খুন করা হয়েছিল। তোমার সহকারী বীরচাঁদকে সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। সেই হবে তোমার বিপক্ষে সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

প্রেমপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন।

হীরক কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মুখের ওপরকার হিংস্র ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমেই। তার পরিবর্তে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠেছে একটা ম্লান অনুশোচনার ছায়া।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে মাথা নত করল।

প্রেমপ্রকাশ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আসুন, মিস্টার চৌধুরী।

হীরক বাসবের দিকে মুখ তুলল।

বাসবও ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টর প্রেমকে অনুসরণ করল।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা নামছে ধীরে-ধীরে।

শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

অ্যাসফাল্টে মোড়া পথের ওপর দিয়ে কুয়াশা কাটতে-কাটতে এগিয়ে চলেছে অজয় সোমের

স্টুডিবেকার। গাড়িতে অবশ্য অজয় সোম নেই। বাসবকে টুণ্ডলাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গাড়িটা শুধু চেয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। পুলিশের জিপে এই শীতে এতখানি পথ যাওয়া রীতিমতো কষ্টকর, তাই...।

স্টিয়ারিংএর সামনে বসে স্টুডিবেকারকে চালিত করছেন ইন্সপেক্টর প্রেম স্বয়ং। ড্যাসবোর্ডের আলোয় তাঁর মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

বাসব রয়েছে পিছনের সিটে।

ওর দুপাশে সুমিত্রা ও সুব্রত।

কিছুতেই ছাড়ল না। সমস্ত জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর, যখন সকলে শুনল বাসব আজই কলকাতা ফিরে যাচ্ছে, তখন টুণ্ডলা অবধি ওকে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ থেকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না তাদের দুজনকে।

বেশ দ্রুতবেগেই গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

কখনো-কখনো অপর দিকে থেকে বা পিছন দিক থেকে দু-একখানা গাড়ি স্টুডিবেকারকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

সকলে চুপচাপ।

বাসব নির্বিকার ভাবে সিগারেট টানছে।

একসময় সুমিত্রা বলল, ভাবতেই পারা যায় না, হীরকবাবু বাবাকে খুন করেছেন?

বাসব বলল, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম মর্মান্তিক কেস এল এটি। হাজার হলেও হীরক আমার বন্ধু। তার জীবন ফাঁসির দড়িতে শেষ হবে আমি ভাবতেও পারিনি।

ওঁর ফাঁসি হবে?

না হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। আর যদি একান্তই না হয়, তাহলে দীর্ঘ কারাবাস নিশ্চিত।

সুব্রত বলল, পুরো ব্যাপারটাই এখন আমার কাছে হেঁয়ালি। আপনি হীরকবাবুকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন?

প্রেমপ্রকাশ বললেন, বিস্তারিতভাবে বলুন মিস্টার ব্যানার্জি।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে আরম্ভ করল, বঙ্কিম রুদ্র খুন হয়ে যাওয়ার পর আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম কার পক্ষে একাজ করা সম্ভব। আর হত্যার মোটিভই বা কী? এদিকে অজয় সোমের অফিস থেকে একটা খাম চুরি গিয়েছিল এবং অদৃশ্য হয়েছিল তাঁর আহত বেয়ারা হরিপদ। হঠাৎ আমার মনে হল, খাম চুরির সঙ্গে রুদ্রর মৃত্যুর কোনও যোগ নিশ্চয়ই আছে। আমি অজয় সোমের অফিসে গিয়ে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা ডাঃ রুদ্রর খামগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটি খামের মধ্যে হ্যান্ডনোট রয়েছে। কাজেই অনুমান করে নেওয়া গেল, চুরি যাওয়া খামটার মধ্যেই ছিল একটা হ্যান্ডনোট। চোর টাকা ধার নিয়ে, শোধ না দেওয়ার অপচেষ্টাতেই এরকম করেছে। ওই সঙ্গে তাকে ডাঃ রুদ্রকেও খুন করতে হয়েছে, কারণ হ্যান্ডনোট চুরি যাওয়ার কথা তাঁর কানে উঠলেই তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন কে চোর। তাই তাঁর মুখ এইভাবে বন্ধ করা ছাড়া উপায় ছিল না। হত্যার পদ্ধতিতে হত্যাকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আর দশজনের মতো সেও জানত, কাঠি নিয়ে দাঁত খোঁটা ডাক্তারের অভ্যাস আছে। সে তাঁর অভ্যেসটুকুকে মূলধন করল। স্টাডির টেবিলের ওপর একটা টুথপিকের বাক্স রাখা থাকত। হত্যাকারী এক সময় বাক্সটা বদলে দিয়ে এল। একাজ করতে তার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। কারণ ও-বাড়িতে তার বিশেষ যাওয়া-আসা ছিল।

আমি স্টাডিতে একটা কাঠি কুড়িয়ে পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম হত্যাকারী কীভাবে ডাঃ রুদ্রকে প্রাণে মেরেছে। টুথপিকের বাক্সের প্রতিটি কাঠিতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল। ডাঃ রুদ্র বাক্স থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে দাঁতে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর আমাকে অবাক করে দিলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন, পরীক্ষা করে জানা গেছে বাক্সের মধ্যেকার অন্যান্য কাঠিতে

সায়ানাইড মাখানো নেই। এ তো সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাক্সর সমস্ত কাঠির মধ্যে একটাতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল, তবে আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়, এতগুলো কাঠির মধ্যে থেকে ডাক্তার সায়ানাইড যুক্ত কাঠিটাই বা তুলে নিলেন কীভাবে—এরকম কোয়েন্সিডেন্স কী সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম। আবার আমার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। কেউ বাক্সটা বদলে নেয়নি তো? কখন বদলাল? দরজা বন্ধ অবস্থায় ডাঃ রুদ্র মারা গেছেন। দরজা ভাঙার পর বাড়ির সকলে পুলিশ না আসা পর্যন্ত একই সঙ্গে ছিলেন। হত্যাকারীর পক্ষে তখন কাজ গোছানো সম্ভব হয়নি নিশ্চয়ই, তবে সে নিজের কার্যোদ্ধার করল কখন? ভাবতে-ভাবতে আমি এর সমাধান পেলাম। আমি ও ইন্সপেক্টর যখন স্টাডিটা পরীক্ষা করবার পর সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তখন কয়েক মিনিটের জন্যে স্টাডি খালি ছিল। তখন ড্রইংরুমে অজয় সোম ও হীরক অপেক্ষা করছিল, আর সকলে যে যার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। এই সময়েই হত্যাকারী বাক্স বদলাবার সুযোগ নিয়েছে। তাহলে কি অজয় সোমই একাজ করেছেন?

একটানা এতক্ষণ বলবার পর বাসব থামল।

একটা সিগারেট ধরাল ও। তারপর আবার আরম্ভ করল, আমি টুথপিকের বাক্সর ওপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলতে বললাম ইন্সপেক্টরকে। এদিকে আমি প্রায় সকলেরই হাতের ছাপ সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। ইন্সপেক্টর যখন আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কপি দিলেন, তখন দেখা গেল কারুর হাতের ছাপের সঙ্গেই এই প্রিন্ট মিলছে না। তবে কি কোনও বাইরের লোক ডাঃ রুদ্রকে খুন করেছে? বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র হীরক—। কিন্তু হীরককে সন্দেহ করা চলে না। তবুও আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, আমরা তখন সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন অজয় সোম বাথরুমে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই কি হীরক টুথপিকের বাক্স বদলে আমাকে বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিল? হীরকের হাতের ছাপ সংগ্রহ করতে অসুবিধে হল না—এবার মেলাতেই, তার হাতের ছাপের সঙ্গে টুথপিকের বাক্সর ছাপের হুবহু মিল হল। আমি হীরক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। বুঝলাম, নিজের ওপর অত্যন্ত আস্থাশীল হয়ে পড়ার দরুন সে নিজের পতন ঘটিয়েছে। খাম চুরির ব্যাপারে যখন আমি অজয় সোমের অফিস-ঘর পরীক্ষা করছিলাম, তখন টেবিলের ওপর খুব পাতলা একটুকরো ভাঙা কাচের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে পড়ল, হীরকের ঘড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে দোকানে মেরামত করতে দিয়েছিল। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ভাঙা কাচের টুকরোটা ঘড়ির। বোধ হয় মিঃ সোমের টেবিলের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি খামটা তুলে নিতে গিয়ে, স্টেপল মেশিন বা আর কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে হীরকের ঘড়ির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে বিনয়বাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ঘড়ির কাচটা ভাঙতে হল। কোনও কৌশলের প্রয়োজন হল না। সহজেই হীরকের কাছ থেকে পাওয়া গেল ঘড়ির দোকানের ঠিকানাটা। নইলে আগ্রার অজস্র ঘড়ির দোকানের মধ্যে ওই ঘড়ির দোকানটার সন্ধান পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হত। দোকানদারের হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে আমি কুড়িয়ে পাওয়া কাচের টুকরোর সঙ্গে হীরকের ঘড়ির ভাঙা কাচ মিলিয়ে নিলাম—এক সেলের। ঘড়িওয়ালা অবশ্য অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই কাচের সন্ধান পেয়েছিল।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে বাসব আবার বলে চলল, ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে সে এত টাকা ধার নিয়েছিল কেন? ছদ্মবেশে হীরকের পিছু নিলাম। দুদিনের মধ্যেই সন্ধান পেলাম শহরতলির মোটর গ্যারেজের। সে গ্যারেজটা বোধ হয় তার বেনামিতে ছিল, কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হীরক শিখের ছদ্মবেশ গ্রহণ করত অন্য একটা ভাড়া করা ঘরে। তারপর গ্যারেজে যেত। এর মধ্যে হরিপদ খুন হয়েছিল। হীরক তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই। হরিপদ যে কোনও মুহূর্তে পুলিশের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতে পারে। গ্যারেজের সন্ধান পাওয়ার পর একদিন রাত্রে আমি ওখানে হানা দিলাম, যদি কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু আঙুলের ছাপের নির্ভর করলে চলবে না। আরও প্রমাণ চাই। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পাওয়া গেল

BanglaBook.org

না। হীরকের অনুপস্থিতিতে খুঁজলাম—বৃথা চেষ্টা। আমার দৃষ্টি পড়ল ফোলিও ব্যাগটার ওপর। ব্যাগটা হীরক চোখের আড়াল করে না। বোধহয় ওতে আশাজনক কিছু পাওয়া যেতে পারে। অগত্যা ব্যাগটা পথে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করলাম—কাড়লামও। ওই সঙ্গে মানিব্যাগটাও কাড়তে হল। যাতে হীরক মনে করে এটা কোনও পেশাদার গুন্ডার কাজ, টাকা কেড়ে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। ফোলিওটা হাতে পাওয়ার পর আর কিছু বুঝতে বাকি রইলে না। অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল—দেখলাম, বছরখানেক ধরে তার বেশ লোকসান যাচ্ছিল। তাই সে ব্যবসাকে বাঁচানোর জন্যে ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ফোলিওর মধ্যে আরও পাওয়া গেল, ক্রেপ, স্পিরিটগাম, কাঁচি ইত্যাদি। ছদ্মবেশ নেওয়ার উপকরণ। এরপর হীরক কীভাবে ধরা পড়ল আপনারা জানেন।

বাসব থামতেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা বলল, আপনার প্রতিভা প্রশংসার অনেক ঊর্ধ্বে মিস্টার ব্যানার্জি। তবু বলব, অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় আপনি দিয়েছেন। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না, হরিপদর মৃতদেহ আমাদের বাড়িতে ফেলে আসার কী সার্থকতা। নদীতে ভাসিয়ে দিলেই তো হত।

তা অবশ্য হত, বাসব বলল, আমি দেখেছি—অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে হত্যাকারা নিজেদের বাহাদুরি জাহির করবার লোভ সংবরণ করতে পারে না। অপরাধীরা কোনও-না-কোনও দুর্বল মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এখানেও তাই হয়েছে। নইলে হরিপদর মৃতদেহ ওখানে ফেলে আসার আর কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরেকটা কথা—সুব্রত বলল, হীরকবাবুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আপনি ছদ্মবেশ পরতেন কোথায়?

থানায়, মিস্টার প্রেমকে সামনাসামনি বসিয়ে। ছদ্মবেশ নিখুঁত হচ্ছে কি না, তাঁর সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে তবে রাস্তায় বেরুতাম।

টুন্ডলা প্রায় এসে গেছে।

শহরতলির মধ্যে দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, আপনার প্রচুর সুখ্যাতি আমি শুনেছিলাম, মিস্টার ব্যানার্জি। এখন দেখেছি একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। আপনার সঙ্গে কাজ করে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। ভবিষ্যতে আমাদের আর দেখা হবে কি না কে জানে।

নিশ্চয়ই হবে, বাসব অল্প একটু হেসে বলল, খুব তাড়াতাড়িই আবার আমাদের দেখা হবে। অবশ্য সুব্রতবাবু আর সুমিত্রা দেবী যদি তাদের বিয়েতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান—তবেই!

সুমিত্রা মুখ নত করল।

বলল, ও-কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না, মিস্টার ব্যানার্জি।

লজ্জা দিইনি ভাই। আসলে ব্রাহ্মণের ছেলে তো, একপেট খাওয়ার সম্ভাবনা কোথাও দেখা দিলে, মনটা কেমন আনচান করতে থাকে? তাই শুভদিনটিতে পাত পাতার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাটা ইঙ্গিত দিয়েই পাকাপাকি করে নিচ্ছিলাম আর কী।।

বাসবের কথায় প্রেমপ্রকাশ ও সুব্রতর হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না। সুমিত্রাও যোগ দিল দুজনের সঙ্গে।

স্টুডিবেকার তখন শহরের মাঝপথ দিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ট্রেনের আর খুব বেশি দেরি নেই।

BanglaBook.org

প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

লোকটাকে আমি ভীষণ-ভীষণ ঘেন্না করি।

কেন?

লোকটা একটা নরপশু।

ধারণাটা হল কেন?

কেন আবার! অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

আপনার সঙ্গে ওর বিবাহিত জীবন কতদিনের?

মাত্র সাত দিনের।

মাত্র সাত দিন বাদেই আপনি চলে আসেন?

বিয়ের মানে ফুলশয্যার পরদিন সকালেই চলে আসার কথা। আসিনি। লোকলজ্জা বাধা হয়েছিল।

লোকটা আপনার ওপর ফিজিক্যাল টর্চার করেছিল কি?

মানে মারধর?

হ্যাঁ।

মারধরের চেয়ে অনেক বেশি।

আপনি কি বলতে চান লোকটার সেক্স একটু বেশি?

একটু বেশি? একটু বেশি বললে কিছুই বলা হয় না।

তা হলে খুব বেশি?

আমি আর কিছু বলতে চাই না। লজ্জার কথা এ ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটা নরপশু, জেনে রাখুন।

বুঝলাম, আপনি তার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন।

হ্যাঁ। আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

দেড় বছর।

এই দেড় বছরের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি?

ওর সঙ্গে নয়। তবে ওর বাড়ির কেউ-কেউ আমার কাছে আজও আসে, খোঁজখবর নেয়। তারা আমার জন্য দুঃখিত।

লোকটির সঙ্গে আপনার শেষ দেখা তা হলে দেড় বছর আগে?

হ্যাঁ।

আপনি ডিভোর্সের মামলা করেননি?

না।

কেন?

ডিভোর্স করেই বা কী হবে বলুন। আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না।

তাই বা কেন?

একবারের অভিজ্ঞতায় আমি এত আতঙ্কিত যে আর ও কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।

আপনি কি ভজনবাবুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পান?

হ্যাঁ পাই। ওর বাড়ির লোকেরা খারাপ নয়, তারাই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাসে-মাসে টাকা দিয়ে যায়।

ভজনবাবু নিজেই আসেন টাকা দিতে?

না-না। তার অত সাহস নেই। আসে ওর ছোটভাই পূজন।

আপনি তো চাকরি করেন।

BanglaBook.org

করি।

কোথায়?

আলফা নেটওয়ার্ক-এর মার্কেটিং ডিভিশনে।

সেটা কেমন চাকরি?

ভালোই। আমি একজন একজিকিউটিভ।

তা হলে ভজনবাবুর সাহায্য না হলেও চলে?

কেন চলবে না?

আপনার বাপের বাড়ির অবস্থাও তো ভালোই দেখছি।

খারাপ নয়। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, সুরেকা ইন্ডাস্ট্রিজের ওয়ার্কস ডিরেক্টর। আমার দাদা আমেরিকার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

ভজনবাবুর সাহায্য তবু আপনি নেন?

কেন নেব না? সে আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। তার কিছু ক্ষতিপূরণ তো ওকে করতে হবে।

তা তো বটেই। এ বার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন।

বলুন।

ইজ হি ক্যাপেবল অফ মার্ডার?

তা কী করে বলব? আমার সঙ্গে পরিচয় তো সামান্য।

আপনি তো ওকে নরপশু বললেন।

তা তো বলেইছি।

আপনার কি মনে হয় লোকটা খুব হিংস্র?

অন্তত একটা ব্যাপারে তো তাই।

একটা ব্যাপার থেকেও তো কিছু আন্দাজ করা যায়।

এবার আমাকে একটু মুশকিলে ফেলেছেন।

কেন বলুন তো!

লোকটাকে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ মনে হয়।

সেটা কেমন?

এমনিতে চুপচাপ, মাথা নীচু করে থাকে।

তাতে কি নিরীহ বলে প্রমাণ হয়?

না। তা হয় না।

তাহলে?

ফুলশয্যার পরদিন সকালে আমার অবস্থা দেখে ওর এক বোন সব কথা বাড়ির লোককে বলে দেয়। ওর বাড়ির লোক ওকে খুব বকাঝকা করেছিল। লোকটা খুব যেন অপরাধবোধে কাতর হয়েছিল। তবে সেটা অভিনয়ও হতে পারে।

আমার জানা দরকার লোকটা খুনটুন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে কি না।

তা জানি না।

এবার একটা কথা বলি।

বলুন।

খুন সবাই করতে পারে না। খুন করার জন্য একটু আলাদা এলেম দরকার হয়। এক ধরনের মানসিকতার।

তা হবে।

BanglaBook.org

এ-লোকটার সেই মানসিকতা আছে কি না আমি সেইটে জানার চেষ্টা করছি।

বলেছি তো, লোকটাকে আমি ভালো করে চিনি না।

একটা কথা।

বলুন।

আপনি একজন শিক্ষিতা মহিলা, আপনার পরিবারও বেশ কালচারড। আপনি ভজনবাবুর মতো একজন গ্যারেজ মালিককে বিয়ে করলেন কেন?

গ্যারেজ মালিক হলেও ভজন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার।

একসময়ে ভালো মোটর তৈরির কারখানায় কাজ করত। তারপর নিজে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা শুরু করে। শুনেছি ওর গ্যারেজে নতুন ডিজাইনের দু-তিনটে গাড়ি তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করেছে।

শুধু সেই কারণ?

আমার বাবা স্বাধীনচিত্ত পুরুষকে খুব পছন্দ করেন।

শুধু প্রফেশনের দিকটা ছাড়া আপনি আর কিছু দেখেননি?

এটা নেগোসিয়েটেড ম্যারেজ ছিল। আমি বাবার মতে মত দিয়েছিলাম মাত্র। লোকটার যে-সব বিবরণ পেয়েছিলাম তাতে খারাপ লাগেনি।

বিয়ের আগে আপনারা পরস্পরকে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার পছন্দ হয়েছিল?

চেহারাটা খারাপ লাগেনি। বিনয়ী ভাবটাও তো ভালোই মনে হয়েছিল।

ওঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে সে তো জানেন।

হ্যাঁ।

আপনি ওর মোটর গ্যারেজে কখনও গেছেন?

না। যাওয়ার মতো সময় তো পাইনি। বিয়ের পরই তো চলে এলাম।

কারখানাটা কোথায় তা জানেন?

শুনেছি, কলকাতার বাইরে বারাসাতের কাছে কোথায় যেন।

হ্যাঁ। খুনের ডিটেলসটা জানেন কি?

না। শুনেছি একটি মেয়ে খুন হয়েছে।

হ্যাঁ। তার আগে একটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পর পুলিশে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে একটা ডায়েরি করেন।

হ্যাঁ, রাগের মাথায় করেছিলাম।

তাতে কি ওর সেক্সচুয়াল ক্রুটালিটির উল্লেখ ছিল?

ছিল। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে ডায়েরি করেছিলাম। পরে জেলেকারির ভয়ে উইথড্র করি।

হ্যাঁ, আমরা তা জানি। পুলিশ ভজনবাবুকে ধরেও আপনার বাবার অনুরোধে এক রাত্তির পরেই ছেড়ে দেয়।

আমরা পারিবারিক দুর্নামের ভয়ে এটা করি।

এই খুনের ঘটনার পর কি আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আপনার কাছে এসেছিল?

না।

খুনটা হয়েছে সাত দিন আগে। এর মধ্যে কেউ আসেনি?

পূজন মাঝে-মাঝে আসে, কিন্তু ঘন-ঘন নয়। গত সাত দিনে কেউ আসেনি।

BanglaBook.org

এ বার একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন।

বলুন।

লজ্জা পাবেন না তো।

লজ্জা পেলে জবাব দেব না।

ভেরি গুড।

প্রশ্নটা কী?

ভজনবাবু যে সেক্সচুয়াল ব্যাপারে স্যাডিস্ট গোছের মানুষ তা আপনার কথা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, যার সেক্সচুয়াল আর্জ এত বেশি সে তো নিশ্চয়ই প্রস কোয়ার্টারে যায়।

এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

সমস্যা হল এরকম মানুষেরা নিজেদের সামলে সংযত রাখতে পারে না।

প্রস কোয়ার্টারে গেলে হয়তো যায়। আমি কী করে জানব বলুন।

কোনও হিন্ট পাননি?

না।

সমস্যা হল, পুলিশ এই অ্যাঙ্গেলটা ভালো করে দেখেছে, কিন্তু ওঁর প্রস কোয়ার্টারে যাওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

প্রস কোয়ার্টারে গেলে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে কেসটা আরও শক্ত হত। উনি যে স্যাডিস্ট তা প্রমাণ করার সুযোগ থাকত।

আমি তো বলেইছি লোকটাকে ভালো করে চেনার কোনও সুযোগ আমার হয়নি। যে মেয়েটা খুন হয় সে কি প্রস?

না।

তা হলে এ প্রসঙ্গ কেন?

মেয়েটিকে খুন করার আগে ব্রুটালি রেপ করা হয়।

ওঃ!

ইজ ইট জাস্ট লাইক ভজনবাবু?

কী করে বলব বলুন। আমাকে তো খুন করেনি।

মারধর বা হাত মুচড়ে দেওয়া, গালাগাল করা, এসব?

আমাকে প্লিজ, এসব প্রশ্ন করবেন না। আমার পক্ষে ডিটেলস বলা সম্ভব নয়। রুচিতে বাধে।

সরি। কিন্তু এটা তো জানেন যে, এটা মার্ডার কেস।

হ্যাঁ। কিন্তু আমার পক্ষে এর বেশি বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু কোর্টে যে আপনাকে এসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা হবে।

কোর্টে! কোর্টে কেন আমি যাব?

আপনাকে পুলিশ সাক্ষী হিসেবে ডাকবে।

সে আমি পারব না।

ভয় পাচ্ছেন?

ভয় নয়। এসব বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না।

সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আপনার সাক্ষ্যের ওপর অনেকে কিছু নির্ভর করছে।

কী নির্ভর করছে?

মোটিভ অফ মার্ডার।

আমার ওপর নির্ভর করবে কেন? আমার সঙ্গে লোকটার তো কোনও সম্পর্কই নেই।

BanglaBook.org

সম্পর্ক যে নেই তার কারণটাই তো আমাদের দরকার। ভজনবাবু যে একজন স্যাডিস্ট সেটা প্রমাণ করতে পারলে পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যায়।

প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। খুন যদি ও করে থাকে তো সেটা পুলিশ প্রমাণ করুক। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

পুলিশ তার কাজ করবে। পুলিশকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

মেয়েটা কে?

ভালো প্রশ্ন। এ প্রশ্ন অনেক আগেই আপনি করতে পারতেন।

আপনি আমাকে এত প্রশ্ন করছেন যে, আমি প্রশ্ন করার সুযোগই পাচ্ছি না।

সরি ম্যাডাম। এসব ঘনটা ঘটলে লোককে বিরক্ত না করে উপায় থাকে না কি না।

বুঝেছি। এ বার বলুন মেয়েটা কে।

একজন টিন এজার। ষোলো-সতেরোর বেশি বয়স নয়। খুব চঞ্চল আর একটু ডানপিটে গোছের মেয়ে। ভজনবাবুর গ্যারেজের পর একটা খেলার মাঠ। মেয়েটার বাড়ি ওই মাঠটা পেরিয়ে। মেয়েটার নাম রিঙ্কু। খুব মড মেয়ে। তার বাবার চিংড়ি মাছের ব্যাবসা আছে। মোটামুটি পয়সাওলা লোক। মেয়েটা একটা সাইকেলে চড়ে পাড়ায় চক্কর দিয়ে বেড়াত। পোশাকও পরত খুব উগ্র। কখনও শর্টস আর কামিজ। কখনও জিনস আর টি শার্ট।

কেমন মেয়ে?

যেটুকু জানা যায়, বখাটে টাইপের মেয়ে। বাবা ডিভোর্সি। মা আবার কাকে বিয়ে করে বাইরে কোথাও থাকে। মেয়েটা বাবার কাছে থাকত।

একমাত্র মেয়ে?

হ্যাঁ, বোধহয় খুব আদরেরও। দেখতেও খারাপ ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে, মেয়েটার বেশ অ্যাট্রাকটিভ চেহারা ছিল এবং যথারীতি পাড়া-বেপাড়ার ছেলেরা তার পিছনে ঘুরঘুর করত। রিঙ্কুর বদনাম ছিল, সে ছেলেদের সঙ্গে ফ্রিলি মেলামেশা করে। বাবার কোনও শাসন ছিল না। ভদ্রলোক নিজের কাজ নিয়ে হিমশিম খেতেন, মেয়ের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

রিঙ্কুর ঠাকুমা আর দাদু ও বাড়িতে থাকেন। তাদের থাকা নিয়েই রিঙ্কুর মা আর বাবার মধ্যে বনিবনার অভাব দেখা দেয়। তারপর অশান্তি বেড়ে-বেড়ে শেষ অবধি ডিভোর্স।

রিঙ্কুর বাবা আর বিয়ে করেননি?

না। তিনিও আপনার মতোই। বিয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ত হয়েছিল বলে আর বিয়ে করেননি। তা বলে তাঁর বিয়ের বয়স যায়নি। হি ইজ ওনলি ফর্টিফোর।

এবার আমার করণীয় কী বলুন। সাক্ষী দিতে হবে শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয় কীসের?

সাক্ষী-টাক্ষী দিলে তো পাবলিসিটি হবে। পুরোনো কথা উঠবে।

তা উঠবে।

সেইটেই ভয় পাচ্ছি। এ ঘটনার সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্কই নেই। তবু কেন যে আপনারা আমাকে ইনভলভড করতে চাইছেন।

উপায় নেই বলে।

লোকটা কি এখন জেলে?

পুলিশ কাস্টডিতে। আপনি চাইলে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

দেখা করব? সে কী কথা! আমি ওর সঙ্গে দেখা করব কেন?

লোকটা আপনার কাছে হয়তো কিছু বলতে পারে।

BanglaBook.org

প্লিজ, আমাকে এসব কাজে জড়াবেন না। আমি ওর ছায়াও মাড়াতে চাই না।

ম্যাডাম, কাজটা অপ্রীতিকর হলেও আমার কিছু কৌতূহল আছে।

আমি পারব না। মাপ করবেন।

আগে একটু শুনুন। দিন সাতেক আগে ঘটনাটা ঘটে। ভজনবাবুর মোটর গ্যারেজের পাশের মাঠে মেয়েটির ডেডবডি পাওয়া যায় সকালবেলা। মাঠটায় কিছু আগাছার জঙ্গল আছে, তার মধ্যে। মেয়েটি বাড়ি না ফেরায় সারা রাত লোকজন এবং পুলিশও তাকে অনেক খুঁজেছিল। পায়নি।

শুনতেই আমার খারাপ লাগছে। ডেডবডি কথাটা শুনেই আমার মনটা কেমন করে উঠল। আহা, ওইটুকু একটা মেয়েকে মারে কেউ?

মানুষের ভিতরে একটা পশু তো থাকেই। আর সেই পশুটাকে ধরার জন্যই আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

পশুটা কি ওই ভজন?

তাই মনে হচ্ছে।

আপনাদের হাতে প্রমাণ নেই?

একেবারে প্রমাণ ছাড়া তো ভজনকে ধরা হয়নি।

প্রমাণই যদি থাকে তা হলে ওকে শাস্তি দিলেই তো হয়। আমার সাহায্যের কী দরকার?

প্রমাণ আছে, আবার নেইও।

সে আবার কী?

ভজনবাবুর গ্যারেজটা একটু নির্জন জায়গায়। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে গ্যারেজ। অনেক সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি আছে। ডিজাইনার গাড়ি তৈরি করার জন্য ভজনবাবু কিছু অর্ডার পাচ্ছিলেন। দেশি-বিদেশি গাড়ির মোটর নিয়েও বোধহয় এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। গ্যারেজটা আরও বড় করার জন্য পাশের মাঠটা কেনারও চেষ্টা করছিলেন।

আমি এত সব জানি না। তবে পূজন বলেছিল ওর গ্যারেজ বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ, বেশ বড় গ্যারেজ।

ওর কি অনেক টাকা?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি তো দেড় বছরের?

এক বছর আট মাস।

গত দেড় বছরের মধ্যেই ভজনবাবু অনেক টাকা করেছেন। আর বোধহয় সেই কারণেই লোকটার পিছনে ওখানকার ক্লাব এবং মস্তানেরা লেগে গিয়েছিল। তারা টাকা চাইত, উনি দিতেন না।

এসব আমার জানা ছিল না।

আপনার জানার কথা নয়। তবে মাস ছয়েক আগে ভজনবাবুর ওপর হামলা হয় এবং উনি কয়েকটা গুণ্ডাছেলের হাতে মার খান।

হ্যাঁ, এ রকম একটা কী যেন পূজনের কাছে শুনেছিলাম। বেশি মাথা ঘামাইনি।

ভজনবাবু লোকটি খুব বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাবসাদার নন। তা যদি হতেন তা হলে গুণ্ডা মস্তানদের কিছু চাঁদা দিয়ে হাতে রাখতে পারতেন। সে পথে না গিয়ে উনি কনফ্রন্টেশনের পন্থা নিয়েছিলেন। এমনিতে নিরীহ হলেও বেশ একগুঁয়ে আর জেদি। তাই না?

তা তো বটেই।

যাই হোক, এই ঘটনার পর গ্যারেজটা প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভজনবাবু আপস-রফা করতে রাজি হননি, টাকাও দেননি। উনি পুলিশকেও হাত করার চেষ্টা করেননি বলে প্রোটেকশনও পাননি।

BanglaBook.org

এতসব জেনে আমার কী হবে?

লোকটার চারিত্রিক আউটলাইনটা আপনার সম্পূর্ণ জানা নেই বলেই বলছি।

তা হলে বলুন।

লোকটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ওখানে গ্যারেজ চালাতে লাগলেন। ভজনবাবু একটা রিভলভার কিনেছিলেন। লাইসেন্সও ছিল। আর ওঁর গ্যারেজের কর্মচারীরা—কী জানি কেন—ওঁর খুবই অনুগত। তারাও ওঁকে প্রোটেকশন দিতে লাগল। ফলে গ্যারেজের সঙ্গে লোকালিটির একটা শত্রুতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গ্যারেজে বারকয়েক বোমা পড়েছে, আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলে অবরোধের চেষ্টাও হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা পলিটিক্যাল প্রেশারও ওঁর বিরুদ্ধে ছিল। জনসাধারণের অভিযোগ ওই গ্যারেজে চোলাই তৈরি হয়, সমাজবিরোধী কাজ হয় ইত্যাদি।

সত্যিই হত নাকি?

বোধহয় না।

তা হলে আপনি কী বলতে চাইছেন?

বলতে চাইছি ভজনবাবুর শত্রুর অভাব নেই।

সে তো হতেই পারে।

আর শত্রুতা ছিল বলেই ভজনবাবু ইদানীং গ্যারেজেই থাকা শুরু করেছিলেন। গ্যারেজের ভিতর দিকে ওঁর যে অফিসঘরটা আছে সেখানে চৌকি পেতে বিছানা করে নিয়েছিলেন। রান্নাবান্নাও নিজেই করে নিতেন। ওঁর জবানবন্দি অনুসারে গ্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওঁর গ্যারেজে থাকাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। লোকটাকে সাহসী বলতে হয়। কী বলেন?

আমি কী বলব বলুন। আপনার মনে হলে হতে পারে।

গ্যারেজে দুজন কর্মচারী রাতে পাহারা দিত। আর ভজনবাবু তো সপ্তাহে চার-পাঁচ দিনই থাকতেন। যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিনও ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন।

গার্ডরাও ছিল তো।

দুঃখের বিষয় সেদিন দিবাকর নামে যে কর্মচারীটির গার্ড দেওয়ার কথা ছিল তার মায়ের অসুখ বলে সে আসেনি। ছিল রতন নামে দ্বিতীয় গার্ডটি।

মেয়েটির সঙ্গে কি ভজনের আলাপ ছিল?

ছিল। মেয়েটা প্রায়ই নাকি গ্যারেজে হানা দিত। সে ভজনবাবুকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিতে বলত। এবং ভজনবাবু মাঝে-মাঝে রিঙ্কুকে গাড়ি চালানো শেখাতেনও। শোনা যায়, রিঙ্কু ভালো গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল।

বাঃ, তা হলে আর সন্দেহ কী?

সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নেই। কারণ ঘটনার দিন সন্ধেবেলা গ্যারেজের উল্টো দিকের বাড়ির সনাতন মল্লিক দেখেছেন যে, রিঙ্কুর সাইকেলটা গ্যারেজের ফটকের কাছে দাঁড় করানো।

তা হলে তো মিলেই যাচ্ছে।

যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা সন্ধেবেলা ঘটেনি। ঘটেছে একটু বেশি রাতে। অন্তত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলে।

আপনি বড্ড ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলেন শবরবাবু।

হ্যাঁ, ওইটে আমার দোষ। তবে আসল ঘটনা বের করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো করে বুঝিয়ে বলা দরকার মিসেস আচার্য।

আমাকে প্লিজ, মিসেস আচার্য বলবেন না। আমার নাম বিভাবরী ভট্টাচার্য।

জানি। ডিভোর্স করেননি বলে মিসেস আচার্য বলে ফেলেছিলাম।

কোর্টের ডিভোর্স না হলেই কী? আমি মনে-মনে তো কবেই ওকে পরিত্যাগ করেছি।

BanglaBook.org

তা বটে। ডিভোর্সের প্ল্যান আছে কি?

এসব শুনে—মনে হচ্ছে, ডিভোর্সটা করে রাখলেই ভালো হত।

তা ঠিক। তবে ডিভোর্স হয়ে থাকলেও আমরা আপনাকে সাক্ষী মানতাম।

উঃ, কী যে মুশকিল!

সরি ম্যাডাম।

আপনি আমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছেন তো শবরবাবু?

পারছি বিভাবরী দেবী। কিন্তু প্রবলেমটা আমাদের সকলেরই। আপনি এক্সপোজারকে ভয় পাচ্ছেন, কোর্ট কাছারিতে যেতে অপছন্দ করছেন, কিন্তু আমাদের যে উপায় নেই।

ঠিক আছে বলুন।

রিঙ্কুর সাইকেলটা খুব দামি এবং রেসিং মডেলের।

ওরকম দামি সাইকেল ওই অঞ্চলে কারও নেই। সুতরাং ওই লাল রঙের সাইকেলটা সহজেই চোখে পড়ত। বুঝতে পারছেন?

পারছি। সন্ধেবেলা গ্যারেজে সাইকেলটা দাঁড় করানো ছিল।

হ্যাঁ।

তা হলে তো প্রমাণই হয়ে গেল যে, রিঙ্কু ভিতরে ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে তাই।

আবার আপাতদৃষ্টি কেন?

পুলিশের মনটা বড্ড খুঁতখুঁতে। এই যে ধরুন না আমার মোটরবাইকটা এখন আপনাদের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো আছে, আর আমি ভিতরে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। মোটরবাইকটা যে চেনে সে ওটা দেখে বলতেই পারে যে, শবর দাশগুপ্ত এখন বিভাবরী ভট্টাচার্যের বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, মোটরবাইকটা আর কেউ টেনে এনে রেখেছে বা আমিই ওটা রেখে দিয়ে বাসে উঠে বাড়ি চলে গেছি। সুতরাং এটাকে ফুল প্রুফ বলে ধরা যায় না।

আপনারা সোজা জিনিসটাকে প্যাঁচালো করতে ভালোবাসেন।

তা নয়। আসলে দুনিয়ায় সহজ সরলভাবে কিছুই ঘটে না। তা যদি ঘটত তা হলে আমাদের কত পরিশ্রম বেঁচে যেত বলুন।

তা বটে। একটু চা খাবেন? অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলছেন।

কফি হলে হত। বেশির ভাগ বাড়িতেই চা-টা ভালো হয় না।

আপনি ভীষণ ঠোঁটকাটা তো!

খারাপ চা খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ঠোঁটকাটা হতে হয়েছে।

আচ্ছা, কফিই করে আনছি।

আনুন।

বিভাবরী উঠে যাওয়ার পর শবর ঘরটা আবার দেখল। সচ্ছল পরিবারের বৈঠকখানা যেমন হয় তেমনই সাজানো। সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, নীচু বুক কেস, দেয়ালে কিছু ওয়াল ডেকোরেশন। বুক কেসের ওপর কাঠের তৈরি বাঁকুড়ার ঘোড়া। তার পাশে দুটো স্টিল ফ্রেমের ছবি। একটা ছবি বিভাবরীর মা আর বাবার। অন্যটা বোধহয় কম বয়সে বিভাবরী আর তার দাদার।

বিভাবরী কফি এনে বলল, শুধু দুধের কফি। চলবে তো!

শবর একটা চুমুক দিয়ে বলল, ব্রাঃ। চিনিটা খুব পারফেক্ট হয়েছে তো। চিনিতেই গণ্ডগোলটা বেশি হয়।

বিভাবরী একটু হেসে বলল, রিঙ্কুর সাইকেলের গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

শবর বিভাবরীর দিকে তাকাল। মেয়েটির চেহারা খুবই ভালো। খুব লম্বা নয়, তেমন ফর্সাও

BanglaBook.org

বলা যায় না, কিন্তু মুখখানা খুব ঢলঢলে। চোখ দু-খানা টানা এবং দৃষ্টিটা মায়ায় মাখানো। অ্যাট্রাকটিভ। হ্যাঁ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

কী দেখছেন?

ভাবছি আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলার ভাগ্যটা সুন্দর হল না কেন। কী যেন কথায় আছে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর—না কী যেন।

বিভাবরী একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, আমি সুন্দরী হলে বলতে হয় আপনি সুন্দরী কথাটার মানেই জানেন না।

তা হতে পারে। তবে যা চোখের পক্ষে স্নিগ্ধকর, তাই আমার সুন্দর বলে মনে হয়। যাকগে।

হ্যাঁ, খুব আনইজি সাবজেক্ট।

যা বলছিলাম। রিঙ্কুর সাইকেল। গ্যারেজে রিঙ্কুর সাইকেলটা সন্ধে থেকেই ছিল। বা তারও আগে থেকে। অন্তত সন্ধে থেকে যে ছিলই তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রিঙ্কুকে কেউ গ্যারেজে ঢুকতে দেখেনি?

খুব ভালো প্রশ্ন। না, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শীকে পাইনি যে রিঙ্কুকে গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছে। জায়গাটা একটু নির্জন। উল্টোদিকে মল্লিকবাবুর বাড়ি, আশেপাশে আর বাড়ি নেই। একধারে ডোবা, অন্য ধারে একটা বাড়ির ভিত হয়ে পড়ে আছে। লোকজন বিশেষ চলাচল করে না। ভজনবাবুর গ্যারেজেই যা লোকের যাতায়াত। সেদিন রবিবার গ্যারেজ বন্ধ থাকায় লোকজনও ছিল না।

রতন না কী যেন নাম—সে কী বলে?

রতন ডিউটিতে এসেছিল রাত ন'টা নাগাদ।

সে সাইকেলটা দেখেনি?

দেখেছে। তবে রিঙ্কু ভিতরে ছিল কি না সে জানে না।

কেন, তার তো খোঁজ করা উচিত ছিল।

সে যা বলেছে তা মোটামুটি এ রকম, সে রাত ন'টার কিছু পরে গার্ড দিতে আসে। ফটক খোলাই ছিল। একটা বাতি মাত্র জ্বলছিল বলে জায়গাটায় আলো আঁধারি ছিল। সে ফটকের কাছে একটা পুরোনো গাড়িতে বসে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সাইকেলটা তার নজরে পড়ে। ও দিকে ভজনবাবুর ঘরের দরজা তখন বন্ধ। তার ধারণা হয়েছিল রিঙ্কু ভজনবাবুর ঘরে বসে গল্প-টল্প করছে।

ইস্ লোকটা যদি তখন গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিত তা হলে বোধহয় মেয়েটা বেঁচে যেত।

ধাক্কা না দিলেও সে পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওঃ। তারপর?

সে শুনতে পায়, ভিতরে একটি মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হচ্ছে। কথা বা তর্কাতর্কি।

তর্কাতর্কি?

হ্যাঁ। অন্তত রতন তাই বলছে।

মেয়েটার গলা তো নিশ্চয়ই তার চেনা।

না চেনার কথা নয়। তবে সেটা যে রিঙ্কুরই গলা এটা সে হলফ করে বলতে পারছে না।

এরপরও কি কোনও সন্দেহ আছে শবরবাবু?

না, সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সন্দেহ তো প্রমাণ নয়।

সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

আছে। আর সেটাই আমাদের তুরুপের তাস।

BanglaBook.org

রতন মেয়েটাকে দেখেনি, ভালো কথা। কিন্তু রেপ এবং খুনের পর লাশটা যখন মাঠে নিয়ে ফেলা হল, তখন তো তার চোখ বুজে থাকার কথা নয়।

বলছি ম্যাডাম। কথাটা খুবই সত্যি। রতন জানিয়েছে, রাত দশটার কিছু পরে ভজনবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে তাকে ডাকেন। রতন খুব কাছাকাছি যাওয়ার আগেই ভজনবাবু তাকে কোকাকোলার ক্যান আনতে পাঠান। ধারে কাছে কোকাকোলার ক্যান পাওয়া যায় না। তাকে বেশ কিছুটা দূরে যেতে হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে সে ফিরে এসে ভজনবাবুর দরজায় নক করে। ভজনবাবু দরজা খুলে ক্যানগুলো নেন। তখন ঘরে কেউ ছিল না।

তার মানে কী দাঁড়াল?

দুইয়ে-দুইয়ে যোগ করলে চারই হয় ম্যাডাম। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ওই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে খুন এবং গুম দুটোই হয়েছিল।

উঃ মাগো! কী সাঙঘাতিক লোক।

হ্যাঁ, খুবই সাঙঘাতিক লোক। আর এই কথাটাই আপনাকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে।

আমাকে না হলেও তো হয়। রতনই তো সাক্ষী আছে।

রতন আমাদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট সাক্ষী। কিন্তু তার একটা কথা গোলমেলে।

কোন কথাটা?

যে-মেয়েটার কণ্ঠস্বর সে ভজনবাবুর ঘরের ভিতর শুনতে পেয়েছিল সেটা রিঙ্কুর কি না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

ওটা তো সামান্য ব্যাপার। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, হয়তো তাই গলাটা ভালো শুনতে পায়নি।

সেটা খুব সম্ভব।

ভজনের সঙ্গে রিঙ্কুর কী কথা হচ্ছিল?

শবর একটু হেসে বলে, শুনতে চান? এসব টপ সেক্রেট কি আপনার শোনা উচিত?

উচিত না হলে বলবেন না।

আরে রাগ করছেন কেন? রতন শুনতে পায় মেয়েটা বেশ চিৎকার করেই বলছে, কেন আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না? আপনাকে করতেই হবে। জবাবে ভজনবাবু বেশ উত্তেজিত গলায় বলছিলেন, এসব কী বলছ পাগলের মতো? তোমাকে আমি ওভাবে কখনও ভাবিইনি! তুমি বাড়ি যাও, আমাকে এভাবে বিরক্ত কোরো না। জবাবে মেয়েটা বলছিল, আপনি একটা কাপুরুষ, নপুংসক, আপনার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই, ইত্যাদি। ডিটেলস পুলিশের খাতায় লেখা আছে।

ও বাবা! রিঙ্কু আবার ওকে বিয়েও করতে চেয়েছিল?

চাইতেই পারে। ভজনবাবুর বয়স বোধহয় আঠাশ-উনত্রিশ, তাই না?

ওরকমই।

বয়সের একটু তফাত হত, কিন্তু বিয়ে হতেই পারে।

তা পারে, বিয়েই না হয় করত, মারল কেন?

সেটাই প্রশ্ন। আপনি বলতে পারেন কেন মারল?

না। কিন্তু ভজন কী বলছে?

ওঁর মুখ থেকে খুব বেশি কথা বের করা যায়নি। উনি বলছেন, সেইদিন সন্ধেবেলা ওঁর ঘরে যে-মেয়েটি ছিল সে রিঙ্কু নয়।

তবে কে?

তা উনি বলতে রাজি নন।

বলবে কী করে? সত্যি কথা বললে তো প্রমাণই হয়ে গেল।

আমাদেরও সন্দেহ মেয়েটা রিঙ্কুই।

BanglaBook.org

এখনও সন্দেহ?

নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত না হলে সন্দেহ কথাটাই ব্যবহার করা ভালো।

সে আপনারা করুন। আমি জানি মেয়েটা রিঙ্কুই।

শবর একটু হাসল, তারপর বলল, ভজনবাবুকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য আপনি যে একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

হব না। একটা মেয়েকে রেপ করে যে খুন করেছে তার কি ফাঁসি হওয়া উচিত নয়?

ফাঁসি বা যাবজ্জীবন যাই হোক, সব সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন না করতে পারলে জজ তো আর সেই হুকুম দেবেন না।

আপনি রিঙ্কুর সাইকেলের কথাটা কি ভুলে যাচ্ছেন?

না, আমি কিছুই ভুলি না, রিঙ্কুর সাইকেলটাও একটা মস্ত এভিডেন্স। কিন্তু ভজনবাবু বলছেন, সাইকেলটা যে ওখানে ছিল তা তিনি জানতেন না। সে ব্যাপারে কিছু বলতেও পারেন না।

বেশ কথা তো!

হ্যাঁ। পুলিশ কেস সাজালে ভজনবাবু যে বিপদে পড়বেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেস সাজানোর ব্যাপারে আমাদের ফুলপ্রুফ হওয়া দরকার।

ফুলপ্রুফ হওয়ার জন্য আর কী-কী দরকার?

ভালো হত একজন আই উইটনেস পেলে।

গ্যারেজের উলটোদিকে যে-লোকটা থাকে সে কিছু দেখেনি?

না। আরও একটা কথা।

কী কথা?

পুলিশের কুকুর কিন্তু ভজনবাবুর গ্যারেজের দিকে যায়নি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তবে বর্ষাকাল তো এবং সেদিন রাত্রেও বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই গন্ধের ট্রেলটা মুছে যেতেই পারে।

সে তো পারেই। আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি ঘটনাটা সম্পর্কে তেমন নিশ্চিত নন!

আমাকে বলতে পারেন সন্দেহ-পিশাচ।

তাই দেখছি, পুলিশ কি এইরকমই?

না। আমি এইরকম।

তা হলে আপনি ক্রিমিনালদের ধরবেন কী করে?

সবসময়ে যে ক্রিমিনালদের ধরা যায় এমন নয়, অনেক ফাঁকফোকর দিয়ে তারা রেহাই পেয়ে যায়। ওই ফাঁকফোকরগুলোই ভরাট করার চেষ্টা করছি।

আমার তো মনে হচ্ছে এটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস।

শবর মৃদু হেসে বলল, হলে তো ভালোই হত। এবার একটা কথা জিগ্যেস করছি, একটু ভেবে জবাব দেবেন।

নিশ্চয়ই। আমি তো এতক্ষণ কো-অপারেট করেছি।

হ্যাঁ। আপনি নার্ভাস হননি।

এবার প্রশ্ন করুন।

ফুলশয্যার রাতে ভজনবাবুর যে পরিচয় আপনি পেয়েছিলেন তা খুবই খারাপ এবং ভয়ঙ্কর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তারপরও আপনি আরও সাতদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন।

হ্যাঁ।

BanglaBook.org

আপনি কি ভজনবাবুর ঘরেই রাতে থাকতেন? আই মিন, একসঙ্গে?

পাগল নাকি? আমি ওর ঘরে শুতাম। কিন্তু ও চলে যেত ওর ভাই পূজনের ঘরে। বাড়ির লোকেরাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই সাতদিনের কথা কিছু মনে আছে?

কেন থাকবে না? মাত্র তো দেড় পৌনে দুই বছরের ঘটনা।

সেই অভিজ্ঞতাটা কীরকম? মানে রিগার্ডিং ভজনবাবু।

ও কিন্তু কখনও আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি, এমনকী লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতও না।

ওই সাতদিনে আপনার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হত কি?

না। আমার কাছাকাছি আসত না।

আপনি এই সাত দিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন কেন? মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে?

না। প্রবলেমটা মানিয়ে নেওয়ার মতো ছিল না। সাতদিন ছিলাম, শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অনুরোধে। ওর ভাই পূজন আর বোন দেবারতি আমাকে খুবই ভালোবাসত। শ্বশুরমশাই অসুস্থ মানুষ, শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু শাশুড়ি খারাপ ছিলেন না। খুব ভালোমানুষ গোছের।

এই সাতদিনে ভজনবাবুর বিশেষ কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে কি?

না।

ভালো করে ভেবে দেখুন। দেয়ার মে বি এ ভাইটাল ফ্যাক্ট।

কিছু মনে পড়েছে না তেমন। তবে—।

তবে কী? থামলেন কেন?

ও সকালবেলা রোজ পাড়ার কুকুরদের পাঁউরুটি খাওয়াত।

বাঃ, এই তো একটা কথা জানা গেল। আর কী?

নাঃ, আর কিছু নয়।

॥ দুই ॥

নমস্কার সনাতনবাবু।

আরে, আসুন, আসুন। নমস্কার, নমস্কার।

একটু বিরক্ত করতে এলাম।

বিরক্ত কীসের? আপনারা আইনের রক্ষক, আপনাদের একটু সাহায্য করব এ তো সৌভাগ্য।

শবর সনাতনবাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

একটু চা বা কফি?

না, ধন্যবাদ।

ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

না-না, ব্যস্ত হবেন না, আই অ্যাম অলরাইট।

তারপর বলুন।

ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কেমন পরিচয়?

খুব একটা নয় মশাই। যৎসামান্য। বাড়ির উলটোদিকে একটা গ্যারেজ থাকায় খুবই ডিস্টার্বড হতে হয়। দিনরাত দুমদাম শব্দ হচ্ছে, কলকব্জা চলছে, মিস্ত্রিদের হল্লাও আছে।

আপনি কি গ্যারেজটা তুলে দেওয়ার জন্য একটা মামলা করেছিলেন?

BanglaBook.org

ঠিক মামলা নয়। আমার স্ত্রী হার্টের রুগি, জোরালো শব্দ তাঁর পক্ষে ক্ষতিকারক। সেটা জানিয়ে পুলিশে একটা রিপোর্ট করি। ভজনবাবুকে একটা উকিলের চিঠিও দিই।

তার আগে কি ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল?

হয়েছিল।

কীরকম কথা?

প্রথমে তো লোকটাকে ভালোমানুষ বলেই মনে হয়েছিল। আমি ওঁকে মাঝে-মাঝে বলতাম লোকালিটির মধ্যে গ্যারেজ থাকায় পাড়ার লোকের অসুবিধে হচ্ছে, উনি যেন হাইওয়ের দিকে গ্যারেজটা সরিয়ে নেন।

উনি কী বলতেন?

উচ্চবাচ্য করতেন না। চুপচাপ শুনতেন।

তারপরই ঝগড়া লাগে?

ঝগড়া ঠিক ওঁর সঙ্গে হয়নি।

তবে কার সঙ্গে?

ভজনবাবুর একজন কর্মচারী আছে, তার নাম রাখাল।

খুব লম্বা চওড়া?

হ্যাঁ সে-ই। ও হচ্ছে ঘাটপুকুরের মস্তান।

ঝগড়া হল কেন?

একদিন দুপুরে ওরা একটা গাড়ির বডি তৈরি করছিল। সে সাঙঘাতিক দুমদাম শব্দ। আমার স্ত্রী দুপুরে ঘুমোতে পারেননি, শব্দে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি অফিস থেকে ফিরে ঘটনা শুনে গ্যারেজে যাই। তখন রাখালের সঙ্গে কথা হয়

কী কথা হল?

আমি বললাম, এরকম চলবে না। রাখালও তেড়া-তেড়া জবাব দিচ্ছিল। তারপর ঝগড়ার মতো হল।

তখন কি ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন?

না।

ঝগড়াটা কতদূর গড়িয়েছিল?

আমরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের সঙ্গে কি ঝগড়ায় পারি? রাখাল আমাকে দেখে নেবে বলে শাসিয়েছিল।

আপনি কী করলেন?

পাড়ার নাগরিক কমিটিকে জানালাম। তারা পরদিন গিয়ে ভজনবাবুকে ধরল।

ফলাফল কী হয়েছিল?

ভজনবাবু রাখালকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। রাখাল ক্ষমাও চাইল। কিন্তু গ্যারেজের শব্দটার যে সমস্যা ছিল তার তো সমাধান হল না। ভজনবাবু বললেন, আপনারা একটা টাইম বেঁধে দিন, আমরা সেই সময়েই গাড়ির বডির কাজ করব অন্য সময়ে করব না।

তা হলে তিনি কো-অপারেট করতেই চেয়েছিলেন?

তা বলতে পারেন। তবে ওটা আই ওয়াশ। গ্যারেজে শব্দ তো সারাদিনই হত। বডির কাজই তো শুধু নয়।

আপনার একটি মেয়ে, তাই না?

হ্যাঁ। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

আপনার জামাই কন্ট্রাক্টর তো।

BanglaBook.org

সবই তো জানেন তা হলে।

জানি। জানাটাই আমাদের কাজ।

সনাতনবাবু আপ্যায়িতের হাসি হেসে বললেন, আপনারা জানবেন না তো কে জানবে? আপনার জামাই বিজয়বাবু চাঁপাডালির মোড়ের কাছে থাকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি চান আপনার মেয়ে-জামাই আপনার কাছাকাছি কোথাও এসে থাকুক, যাতে বিপদে-আপদে তারা আপনাদের দেখাশোনা করতে পারে।

কী আশ্চর্য! হ্যাঁ, তাই। আপনি সত্যিই—।

দাঁড়ান, কথাটা শেষ করার পর আপনার হয়তো ততটা ভালো লাগবে না।

আরে বলুন না। ভালো না লাগার কী আছে?

আপনি মেয়ে-জামাইয়ের জন্য এ-পাড়ায় একটু বড় একটা প্লট খুঁজছেন, তাই তো!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই।

আপনার জামাই ভজনবাবুর গ্যারেজের জমিটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। কিন্তু ভজনবাবু জমি বিক্রি করতে রাজি হননি।

আমার জামাই ওকে দুনো টাকা অফার করেছে। তাও রাজি হয়নি। এতে কোনও অপরাধ হয়নি তো!

আরে না। অপরাধ কিসের? তবে ভজনবাবুর গ্যারেজটা তুলে দিতে পারলে আপনার অনেক সুবিধে।

সনাতন চুপ।

এবার ঘটনার দিনের কথা।

বলুন না কী বলতে হবে। পুলিশকে একদফা বলেছি।

সেদিন রাতে রিঙ্কু খুন হয়।

হ্যাঁ মশাই। কী নৃশংস ব্যাপার। ফুটফুটে মেয়েটা পাড়া দাপিয়ে বেড়াত। তাকে কেউ ওভাবে খুন করে? লোকটার ফাঁসি নয় মশাই, শূলে চড়ানো উচিত ওকে।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু শূলে চড়াতে গেলে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার।

সোজা কেস মশাই। আমরা সবাই জানি।

কী জানেন?

খুন আর রেপ ওই ভজনই করেছে।

কী ভাবে জানলেন?

রিঙ্কুর তো যাতায়াত ছিলই ওর কাছে। সেদিন সন্ধে থেকে আটকে রেখেছিল ঘরে। তারপর রেপ করার পর মেরে ফেলে।

কী করে বুঝলেন? কোনও চিৎকার শুনেছেন?

চিৎকার! না, সেরকম কিছু শুনিনি।

এ-জায়গাটা খুব নির্জন। রাতে আরও নির্জন। সামান্য শব্দ হলেও শোনার কথা।

তা ঠিক। তবে আমার ঘরে অনেক রাত অবধি টিভি চলে। আমার শাশুড়ি ইনসোমনিয়ার রুগি। তিনি সন্ধে-রাত্তির থেকেই টিভি ছেড়ে বসে থাকেন। টিভি-র শব্দে—।

বুঝেছি। রিঙ্কুকে আপনি সেদিন গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছেন?

না, দেখিনি। তবে সাইকেলটা দেখেছি।

সেটা জানি। রিঙ্কু কি খুব ঘন-ঘন গ্যারেজে আসত?

খুব ঘন-ঘন। রোজই আসত।

BanglaBook.org

আপনার কি ধারণা মেয়েটা ভজনবাবুর সঙ্গে ইনভলভড ছিল?

মেয়েটার একটু ফস্টিনস্টি করার মতো ছিল। আর ভজনবাবু তো অতি বাজে লোক। শুনেছি ওর চরিত্রদোষ আছে বলে বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর ঘনিষ্ঠতা কীরকম ছিল জানেন?

গাড়ি চালাতে শেখাত, ঢলাঢলিও করত, গ্যারেজে বসে আড্ডা মারত। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়েছে।

কীরকম অশান্তি?

পাড়ার ছেলেরা ভজনবাবুর ওপর কয়েকবারই চড়াও হয়েছে।

কেন?

রিঙ্কুর সঙ্গে ওর খারাপ সম্পর্ক বলে।

রিঙ্কুর বাবা কি কখনও ভজনবাবুকে কিছু বলেছে?

শচীনন্দন? ও কি একটা মানুষ? সারাদিন তো চিংড়ির ভেড়িতেই পড়ে থাকত। সংসার ভেসে গেলেও খেয়াল করত না। একটু সাবধান হলে মেয়েটা বাঁচত।

রিঙ্কুর সাইকেলটা খুনের পরদিনও গ্যারেজে ছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি কি আগের দিন জানতে পেরেছিলেন যে রিঙ্কুকে পাওয়া যাচ্ছে না?

না। আমার কানে আসেনি।

পাড়ার ছেলেরা যখন জানতই যে রিঙ্কু প্রায়ই ভজনবাবুর গ্যারেজে আসে তখন তারা গ্যারেজে রিঙ্কুর খোঁজ করল না কেন বলুন তো!

জানি না মশাই। ওখানেই তো আগে খোঁজা উচিত ছিল।

রিঙ্কু কি কখনও আপনার বাড়িতে আসত?

না। এ-বাড়িতে তার সমবয়সী তো কেউ নেই, কেন আসবে?

ওদের পরিবারকে আপনি কতটা চেনেন?

ভালোই চিনি। আমরা কয়েকজন প্রথম এ-জায়গায় বাড়িঘর পত্তন করি। শচীনন্দন আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু ভালোই আলাপ আছে।

যাতায়াত আছে?

কালেভদ্রে। যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত, সময়টা কোথায়? শচী তো থাকেও না এখানে। মাছের ভেড়িতে পড়ে থাকে।

সেই রাতে অস্বাভাবিক কোনও চিৎকার বা শব্দ শোনেননি তো!

না মশাই, মনে তো পড়ছে না।

ভালো করে ভেবে দেখুন তো, রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনও সময়ে খুব কুকুর ডাকছিল কি?

সনাতন মল্লিক ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে সোৎসাহে বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এগারোটার পরে কিছু কুকুর খুব ডাকছিল বটে। তবে তারা কিন্তু রোজই ডাকে। সেদিন হয়তো একটু বেশি ডাকছিল।

আর কোনও অস্বাভাবিক শব্দ?

না, মনে পড়ছে না।

রিঙ্কুর কোনও বিশেষ ছেলেবন্ধু ছিল কি?

সে আমি কী করে জানব? পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের জিগ্যেস করুন। ওরা হয়তো বলতে পারবে।

আপনার কি মনে হয় ভজনবাবু খুন করতে পারেন?

BanglaBook.org

না পারার কী আছে? ও লোক সব পারে।

আপনার স্ত্রীর অসুখটা কি জটিল?

হার্ট প্রবলেম। অ্যানজাইনা।

আপনার শাশুড়ি তো সারা রাত জেগে থাকেন!

হ্যাঁ।

তিনি মধ্যরাতে কোনও শব্দ শুনেছেন কি?

না। পুলিশ তাঁকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সেই ভয়ে তিনি মধ্যমগ্রামে তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আছেন।

আপনার স্ত্রী বাড়িতে আছেন?

আছেন।

তাঁকে ডাকুন।

তাঁকেও জেরা করা হয়েছে।

জানি। আমার দু-একটা প্রশ্ন মাত্র।

ডাকছি।

সনাতনবাবু ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। মধ্যবয়স্কা সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে।

মাপ করবেন, আপনি অসুস্থ, তবু বিরক্ত করছি।

অসুস্থতা তেমন কিছু নয়। প্রশ্ন করতে পারেন।

ভজনবাবু কেমন লোক?

ভালো নয়। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। ওঁকে বলছি বাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় বাড়ি করতে।

গ্যারেজের শব্দে আপনার অসুবিধে হত, সে তো বুঝলাম। ভজনবাবুকে কতটা চিনতেন?

চিনতাম একটু-আধটু। দেখতাম প্রায়ই।

দেখে কি মনে হত?

মনে আবার কী হবে! চেহারাটা ভালো। একটা মারুতি গাড়ি করে আসা-যাওয়া করত। ইদানীং তো থাকতই এখানে।

কখনও আলাপ হয়নি?

তা হবে না কেন?

কী সূত্রে আলাপ?

আমরা বছর চারেক হল এ-বাড়ি করেছি। ভজনবাবু তার বছরখানেক আগে এখানে গ্যারেজ করেন। বাড়ি করার মেটেরিয়াল আমরা ওঁর গ্যারেজেই রাখতাম। তখন ওঁর ব্যাবসা বড় হয়নি।

ওর ক্লায়েন্টরা কীরকম?

ইদানীং তো দেখতাম বেশ বড়লোক মাড়োয়ারিরা আসছে। শুনেছি ওঁর খদ্দেররা বেশিরভাগ বড়লোক।

ঘটনার দিনের কথা মনে আছে?

থাকবে না কেন? তবে আমরা কিছু দেখিওনি, শুনিওনি।

রিঙ্কুকে যে সন্ধেবেলা থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না এ খবর কি জানতেন?

না। আমাদের কেউ বলেনি। রিঙ্কুরা একটু তফাতে থাকে। মাঠের ওপাশে। পাড়াটা আলাদা।

রিঙ্কুকে তো চিনতেন!

হ্যাঁ। ছোট থেকে দেখছি। ওর মা যখন এখানে থাকত তখন কয়েকবার গেছি ওদের বাড়িতে। ওর মা-ও আসত।

BanglaBook.org

মা কেমন মহিলা?

খারাপ তো তেমন কিছু দেখিনি। দেখতে সুন্দর ছিল, আর উগ্র সাজগোজ করত।

আর কিছু?

না। আর কী বলুন!

ভজনবাবু সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন?

না।

রিঙ্কু মেয়েটা কেমন ছিল?

ভালো নয়। বড্ড উড়নচণ্ডী।

সে কি খুব ঘন-ঘন ভজনবাবুর কাছে আসত?

হ্যাঁ। রোজ। দুজনের তো খুব ভাব ছিল দেখেছি।

কীরকম ভাব?

মাখামাখি ছিল বেশ।

কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?

দুজনে গাড়ির সিটে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গাড়ি চালাত দেখেছি।

রিঙ্কুর অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল কি?

ও বাবা, সে অনেক ছিল।

তারা ভজনবাবুকে হিংসে করত না?

করত বোধহয়। গ্যারেজে তো কতবার বোমা পড়ল, হামলা হল। কেন হাঙ্গামা হত কে জানে বাবা।

সেই হামলার লিডারশিপ কে দিত বলতে পারেন?

না। হাঙ্গামা হলে আমরা জানালা দরজা বন্ধ করে দিই। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অশান্তি হচ্ছে।

গ্যারেজটা উঠে গেলে কি আপনাদের সুবিধে হয়?

হবে না? খুব হয়। দিন না উঠিয়ে।

ভজনবাবু কনভিকটেড হলে গ্যারেজ উঠেও যেতে পারে।

তাই হোক বাবা। ক'দিন গ্যারেজটা বন্ধ বলে খুব শান্তিতে আছি।

শচীনন্দনবাবু, আপনার শোকটা যে কতখানি তা বুঝতে পারছি। এ সময়ে আপনাকে ডিস্টার্ব করা হয়তো উচিত নয়। আপনার অস্বস্তি হলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করবও না।

শচীনন্দনের বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ হলেও শরীরে অতিরিক্ত চর্বির জন্য বয়স্ক বলে মনে হয়। মাথায় টাক। প্রচুর কেঁদেছেন বলে চোখ দুটো এখনও রক্তিম। মুখে গভীর শোকের ছাপ। দৃষ্টিতে শূন্যতা। মাথা নেড়ে শচীনন্দন বলল, না, কোনও অসুবিধে হবে না। কী জানতে চান বলুন।

আপনার ডিভোর্স কত দিন হয়েছে?

বছর সাত-আট।

ডিভোর্সের কারণটা কী?

আমার মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক?

হয়তো সম্পর্ক নেই। ইচ্ছে না হলে বলার দরকার নেই।

শচীনন্দন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট, আমার স্ত্রী শ্যামলী আর একজন লোকের প্রেমে পড়েছিল।

BanglaBook.org

লোকটা কে?

শুনেছি ওর পূর্বপ্রণয়ী। তার নাম সুজিত।

তাঁরা এখন কোথায় থাকেন?

কানপুর।

রিঙ্কুর খবর তাঁকে দেওয়া হয়েছে কি?

হ্যাঁ। শ্যামলী তো তিন-চার দিন হল চলেও এসেছে। এই বাড়িতেই আছে।

ওঁর হাজব্যান্ডও এসেছেন কি?

না। ওর এ পক্ষের দুটো মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

ডিভোর্সের পর উনি রিঙ্কুর কাস্টডি চাননি?

না। বোধহয় সুজিতের ইচ্ছে ছিল না।

শুনেছি আপনি রিঙ্কুর দেখাশোনা করার সময় পেতেন না।

ঠিকই শুনেছেন। আমার ব্যাবসাটা বড়। মাছের ব্যাবসা। একা মানুষ, সামাল দিতে হিমশিম খাই। তবে রিঙ্কুর দেখাশোনা আমার মা আর বাবাই করেন। ঝি-চাকরের অভাব নেই।

শ্যামলীদেবীর সঙ্গে কি আপনার বাবা-মা'র বনিবনা ছিল না?

না। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মা-বাবাকে আমি ফেলি কী করে বলুন!

ডিভোর্সের কারণ সেটাই নয়তো?

সেটা অপ্রধান কারণ। আমি শ্যামলীর জন্য আর একটা বাড়ি করে দিচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাবেন বাড়িটা খানিকটা হয়ে পড়ে আছে। বলেছিলাম, কাছাকাছি আলাদা থাকো, তা হলে খিটিমিটিও লাগবে না, সম্পর্কটাও ভালো থাকবে। ও রাজি ছিল। কাজেই ডিভোর্সের কারণ আমার মা-বাবা হতে পারে না।

বুঝলাম। রিঙ্কু সম্পর্কে আপনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন?

মেয়েটা চঞ্চল ছিল। ডাকাবুকোও।

অবাধ্য ছিল কি?

একটু ছিল।

আপনাকে কেমন ভালোবাসত?

খুব। বলেই শচীনন্দন দু-হাতে মুখ ঢেকে রইল। কান্না চাপার চেষ্টা করতে লাগল।

শবর চুপ করে বসে রইল।

মিনিট কয়েক পরে ধাতস্থ হয়ে শচীনন্দন বলল, ওর সম্পর্কে পাড়ায় দুর্নাম শুনবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, রিঙ্কু খারাপ ছিল না। আদর পেয়ে-পেয়ে একটু স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এরকম হতেই পারে। আপনি কি জানেন ভজনবাবুর সঙ্গে ওর কীরকম রিলেশান ছিল?

কী করে বলব? ভজন মাঝে-মাঝে আমার বাড়িতে আসত। একটু গম্ভীর আর চুপচাপ মানুষ। আমার ওকে খারাপ লাগত না।

রিঙ্কু কি কখনও বাড়ির কাউকে জানিয়েছিল যে ও ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চায়?

না, সেরকম ভাবে কিছু জানায়নি। তবে—।

তবে কী?

আমার মায়ের কাছে ও প্রায়ই ভজনবাবুর গল্প করত।

কীরকম গল্প?

ভজনকে যে ও খুব পছন্দ করে সেই কথা বলত।

পছন্দটা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না জানেন?

BanglaBook.org

শচীনন্দন একটু থতমত খেয়ে বলল, আমি মাকে ডাকছি। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

শচীনন্দন গিয়ে তাঁর মাকে ডেকে আনলেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের মুখশ্রীর অদ্ভুত মিল। মা অবশ্য রোগা মানুষ, বয়স মধ্য ষাট। মুখে গভীর শোক থম ধরে আছে।

মাসিমা, কিছু মনে করবেন না।

না বাবা, বলো।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

কী করে বলব? খারাপ কিছু তো মনে হয়নি।

ভজনবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

তাকেও খারাপ লাগেনি। মিশুকে ছিল না এই যা।

রিঙ্কু কি তাকে ভালোবাসত বলে মনে হয়? মানে রিঙ্কুর কথায় তেমন কিছু ধরা যেত কি?

শচীনন্দনের মা মাথা নেড়ে বললেন, বলতে পারব না বাবা। আজকালকার মেয়েদের কি অত সহজে বোঝা যায়? তা ছাড়া রিঙ্কুর বয়সটাই বা কী বলো! বুদ্ধিশুদ্ধি তো ছিল না।

রিঙ্কু কি বোকা ছিল?

তাও নয়। লেখাপড়ায় বেশ মাথা, কথাবার্তায় চৌকশ, আবার আগুপিছু না ভেবে হুটহাট এক-একটা কাজ করে বসত।

কিছু মনে করবেন না, ভজনবাবু ছাড়া আর কোনও ছেলের প্রতি ওর সফ্‌টনেস ছিল কি?

ওসব জানি না বাবা। তবে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে মিশত খুব।

শচীনন্দন বলল, এসব জেনে আর কী হবে? খুনি তো ধরাই পড়ে গেছে।

সেটা ঠিক। তবে আমাদের কেস সাজাতে হলে সব রকম সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নিতে হবে। কোনওখানে ফাঁক থাকলে সেই রন্ধ্র দিয়ে দোষী পার পেয়ে যায়।

পার পেয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ ছাড়লেও এ-পাড়ার লোক ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

মৃদু হেসে শবর বলল, হ্যাঁ, জনগণের আদালতে তো সেরকমই হয়। শচীনন্দনবাবু, ভজনবাবুর গ্যারেজে বারকয়েক হামলা হয়েছে। কেন জানেন?

চাঁদার জন্য। ব্যাবসা করলে বেকার ভাতা না দিয়ে রেহাই নেই। সেটা নিয়েই গন্ডগোল। ও তো মারও খেয়েছে।

কে মেরেছিল?

হাবু আর জগুর দল।

আর কারও সঙ্গে ভজনবাবুর শত্রুতা ছিল কি?

গ্যারেজটার জন্য পাড়ার লোকেদের অসুবিধে হচ্ছিল। আরও কী-কী সব যেন, অত ডিটেলসে জানি না। তবে অশান্তি ছিলই।

ভজনবাবু কি একটু মারকুট্টা একরোখা লোক?

তা বোধহয় একটু আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি মনে করেন যে ভজনবাবুই আপনার মেয়েকে ওরকম নৃশংসভাবে মেরেছে?

শচীনন্দন অনেকক্ষণ ভাবল। খুব চিন্তিত। তার পর মৃদু গলায় বলল, আর কে মারবে?

সম্ভাবনার কথা বলছি।

আপনারা কি আর কাউকে সন্দেহ করছেন?

আরে না।

আমার মেয়েকে মেরে কার কী লাভ বলুন। রিঙ্কু হয়তো দুষ্টু একটু ছিল, কিন্তু এত বড় শাস্তি ওর হল কেন? মেয়েটা আমার—।

BanglaBook.org

শচীনন্দন হঠাৎ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

মা এসে ছেলেকে দু-হাতে ধরে বলল, ওকে এবার রেহাই দাও বাবা। গত আটদিন ধরে ওর যে কী অবস্থা!

ঠিক আছে মাসিমা।

আপনি কি তদন্তের ব্যাপারে কথা বলবেন?

শ্যামলী নামক মহিলাটির মুখে শোক ও রাগের মাখামাখি লক্ষ করল শবর। রাগটাই বেশি। বেশ সুন্দর ঢলঢলে মুখশ্রীতে একটু কাঠিন্যও আছে। গম্ভীরভাবে শবরের দিকে চেয়ে বলল, আপনাদের উচিত রিঙ্কুর বাবাকেও অ্যারেস্ট করা।

কেন?

কেন সেটা আবার জিগ্যেস করছেন। ব্যাবসা-ব্যাবসা করে স্বার্থপর লোকটা মেয়েটার দিকে একটু নজরও রাখল না! ও যদি মানুষ হত তা হলে মেয়েটার এ রকম পরিণতি হত বলে ভাবেন?

আপনি একটু শান্ত হন।

শান্ত হব? কী ভেবেছেন আপনারা? খুনির ফাঁসি হোক, একশোবার হোক, কিন্তু যার অবহেলার ফলে আমার ফুলের মতো মেয়েটা মরল সে কেন রেহাই পাবে?

ঠিক কথা। সে-প্রশ্ন আপনাকে আমারও করতে ইচ্ছে করছে।

তার মানে?

আপনি যখন শচীনন্দনবাবুকে ছেড়ে চলে যান তখন রিঙ্কু মাইনর। আপনি ইচ্ছে করলেই তো মেয়েকে নিয়ে যেতে পারতেন। নেননি কেন?

নিইনি বলেই মেয়েটাকে অবহেলা করা হবে? শুধু আমারই তো মেয়ে নয়, ওরও তো!

এটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। আমি জানতে চাই, আপনি মেয়েকে নেননি কেন?

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে শ্যামলী বলল, আমার অসুবিধে ছিল।

কীরকম অসুবিধে?

এ-প্রশ্নের জবাব কি দিতেই হবে?

না দিলেও কিছু করার নেই। ইচ্ছে না হলে বলবেন না।

আমার সেকেন্ড হাজব্যান্ড রাজি ছিল না।

আপনি কানপুরে থাকেন?

হ্যাঁ।

অত দূর থেকে মেয়ের খবর কীভাবে নিতেন?

চিঠি লিখে।

শচীনন্দনবাবুকে চিঠি লিখতেন?

না।

তা হলে?

পাড়া-প্রতিবেশীদের লিখতাম।

পার্টিকুলারলি কাকে?

সে আছে। রিঙ্কু একটু বড় হওয়ার পর ওকেই লিখতাম।

রিঙ্কু জবাব দিত?

হ্যাঁ।

সে কি আপনার জন্য ফিল করত?

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই।

আপনার ডিভোর্স কতদিন হয়েছে?

আট বছর।

রিঙ্কুকে আপনি কত বছর দেখেননি?

চার বছর আগে এসে দেখে গেছি।

চার বছর লম্বা সময়। মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হত না?

হবে না! সবসময়ে তো ওর কথা ভাবতাম। কিন্তু ওখানে আমার নিজস্ব একটা ব্যাবসা আছে।

কীসের ব্যাবসা?

বাচ্চাদের ড্রেস তৈরির ব্যাবসা।

টাকা কে দিয়েছিল?

সুজিত—মানে আমার হাজব্যান্ড।

উনি কি আপনার আগের চেনা?

হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে।

ওকেই আগে বিয়ে করলেন না কেন?

সেটা দিয়ে এই তদন্তে কী দরকার?

কখন কোনটা কাজে লাগে তার ঠিক কী?

বিয়ে করিনি বাধা ছিল বলে।

কীসের বাধা?

আমার বাবা রাজি ছিলেন না।

কেন, জাতের বাধা ছিল?

না।

তবে?

সুজিতকে আমার বাবা পছন্দ করতেন না।

আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

না।

ঠিক আছে, আমি আপনার আর সময় নষ্ট করব না।

লোকটার ফাঁসি কবে হবে?

কার ফাঁসি?

ওই লোকটার। যে আমার মেয়েকে খুন করেছে!

ফাঁসি দেওয়ার মালিক আমি নই।

ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন?

কেন?

আইনের ফাঁক দিয়ে হয়তো বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

কী করবেন?

খুন করব।

শবর হাসল, লোকটাকে কেউই পছন্দ করে না দেখছি।

পছন্দ করার কথা নাকি? রেপ আর খুন দুটোর জন্য তো আর দুবার ফাঁসি হবে না। আমার হাতে ছেড়ে দিলে আমি আগে একটা-একটা করে ওর চোখ ওপড়াব, জিব টেনে ছিঁড়ব, পুরুষাঙ্গ কাটব...।

BanglaBook.org

দাঁড়ান, অত উত্তেজিত হবেন না। অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি।

সেটা আপনাদের ইনএফিসিয়েন্সির জন্য হয়নি। অত বড় একটা অন্যায় করল আর আপনারা এখনও প্রমাণই করতে পারলেন না।

আমরা অযোগ্য হতেই পারি। কিন্তু তবু এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা ভালো নয়।

সেইজন্যই তো বলছি, ওকে না হয় জামিনেই ছেড়ে দিন কয়েক দিনের জন্য।

ওকে মারলে আমাদের যে আপনাকে ধরতে হবে।

ধরবেন। মরতেও রাজি।

আপনি অযথা রেগে যাচ্ছেন।

অযথা? আপনার মেয়ে আছে?

থাকার কথা নয়। আমি বিয়ে করিনি।

তা হলে বুঝবেন কী করে?

মেয়ের বাবা নই বলে কি আপনাদের দুঃখের কারণটা বুঝতে পারব না?

ওর গ্যারেজটায় আমি আগুন লাগাব।

শবর শুধু হাসল।

শ্যামলী বলল, আচ্ছা, ওর সঙ্গে লক আপ-এ গিয়ে দেখা করতে দেবেন?

দেখা করতে চান?

খুব চাই। দরকার হলে ঘুষ দেব।

ঘুষ দিতে হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব।

সত্যি করবেন?

করব।

থ্যাংক ইউ।

॥ তিন ॥

ছবিটা কার মিস্টার দাশগুপ্ত?

রিঙ্কু নামে একটা মেয়ের।

ও, সেই বারাসাতের মার্ডার কেসটা না?

হ্যাঁ, ছবিটা কেমন দেখছেন?

মেয়েটা তো দেখতে স্মার্ট অ্যান্ড লাভলি।

আর কিছু?

একটু দুষ্টু ছিল বোধহয়?

হ্যাঁ, তা ছিল।

আচ্ছা দাশগুপ্ত, এটা তো রাজ্য পুলিশের ব্যাপার, আপনি কেন ওদের কেস-এ ফেঁসে যাচ্ছেন? ইউ আর গোয়িং আউট অব ইওর বাউন্ডস টু হেলপ দেম, তাই না?

শবর একটু হাসল, হ্যাঁ মিস্টার ঘোষাল, ব্যাপারটা তাই।

এই একস্ট্রা দায়িত্ব নিলেন কেন? মেয়েটা কি আপনার চেনা?

না মশাই, আমি ফ্যাক খাটছি বলতে পারেন।

কিন্তু কেন?

রজতদার জন্য।

BanglaBook.org

রজতদা মানে? ডি আই জি রজত গুপ্ত?

হ্যাঁ।

আপনাদের বদ্যিতে-বদ্যিতে বেশ ভাব, তাই না?

শবর হাসল, ঠিকই বলেছেন। বদ্যিরা অপেক্ষাকৃত স্মল কমিউনিটি, আর একটু বোধহয় ক্ল্যানিশও।

রজতবাবু নিশ্চয়ই আপনার আত্মীয় হন?

দূর সম্পর্কের।

ওই তো, বদ্যিরা সবাই সবার আত্মীয়, আর এ-মেয়েটা কি রজতবাবুর কেউ হয়?

না।

তা হলে ওঁর ইন্টারেস্ট কীসের?

ইন্টারেস্ট কেন তা আমি জানি না। আই ওয়াজ আসকড টু হেলপ।

সবই জানেন মশাই, বলবেন না।

শবর হাসল।

ছবিটা স্টাডি করছেন কেন?

ছবি অনেক সময় অনেক কথা বলে।

কেসটা কি খুব জটিল? মার্ডারারকে তো ধরেছেন।

আমি ধরিনি। লোকাল পুলিশ ধরেছে। সময়মতো না ধরলে লোকটা গণপিটুনিতেই খুন হয়ে যেত।

লোকে আজকাল বড্ড বেশি আইন হাতে নিচ্ছে।

হ্যাঁ। তার জন্য ওভার অল পরিবেশটাই দায়ী। লোকে পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে। আইনের ওপর বিশ্বাস নেই, দেশে চোর ডাকাত খুনিও তো বাড়ছে।

হুঁ। লোকটার এগেনস্টে কেস দেওয়া হয়েছে?

না, তবে কেস জোরালো। প্রমাণ হয়ে যাবে।

তা হলে আর ভাবনা কী? কেস তো সোজা।

তা ঠিক, কিন্তু লোকটার কনফেশন বের করা গেল না।

তার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

শবর একটু আনমনা চোখে ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, মানুষ কতটা পেন সহ্য করতে পারে বলুন তো! আপনি তো এ বিষয়ে স্টাডি করেছেন।

হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?

কারণ আছে।

বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের বিভিন্ন সহ্যশক্তি। চিনাদের একটু বেশি সহ্যশক্তি আছে। ট্রাইবালদের মধ্যেও ফিজিক্যাল পেন সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশি। কেন বলুন তো!

এই মার্ডার কেসের সাসপেক্ট ভজন আচার্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণরা নাকি খুব বেশি ব্যথা সইতে পারে না! মহাভারতে কী একটা গল্প আছে না?

হ্যাঁ, সেই বজ্রকীটের দংশনের গল্প তো! ব্রাহ্মণরা বোধহয় পেন সহ্য করার খুব বেশি ক্ষমতা রাখে না।

এ-লোকটা তা হলে এক্সেপশন।

তার মানে?

দিস ম্যান ওয়াজ ব্রুটালি মলড্ বাই দি পাবলিক দ্যাট্ ডে। কিন্তু হি কেপ্ট হিজ কুল কম্পোজার। ইনজুরি ছিল মারাত্মক, তবু কোনওরকম এক্সপ্রেশন ছিল না। হাবু বলে একটা গুণ্ডা

BanglaBook.org

আছে ওখানে। সে আর লোকাল মস্তানেরাও ওকে বার দুই মেরেছে। একবার প্রচণ্ডভাবে, রড, পানচ্ সবই ব্যবহার করা হয়। হাবু আমাকে বলেছে, ভজন অত মার খেয়েও গ্যারেজের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের আটকেছে। যে দিন ডেডবডি পাওয়া গেল সেদিনও হাটুরে মার খায় লোকটা। হাসপাতালে দিতে হয়েছিল।

হিরো নাকি?

না, হিরো বলা যায় না। তবে অদ্ভুত।

আর পুলিশের থার্ড ডিগ্রি?

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছিলাম। খুনের আগের রাতে ওর গ্যারেজের ঘরে একটা মেয়ে ছিল। স্ট্রং সাসপিশন, মেয়েটা রিঙ্কু। কিন্তু ভজন আচার্যিকে দিয়ে সেটা বলানো যায়নি। গত কিছুদিনের মধ্যে লোকটাকে বারকয়েক ইনহিউম্যান টর্চার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু লোকটার যেন ফিজিক্যাল সেন্স বলে কিছু নেই। এরকম কি হতে পারে?

কারও-কারও সহ্যের ক্ষমতা খুব বেশি থাকতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছেন?

বুঝতে পারছি না।

যতদূর শুনেছিলাম, আপনাদের হাতে প্রমাণ সব এসে গেছে।

হ্যাঁ। লোকটা রেহাই পাবে না। আপনি বোধহয় জানেন না, লোকটা আবার স্যাডিস্ট। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং?

ওর স্ত্রী বলেন, লোকটার সেক্স খুব উগ্র এবং ভায়োলেন্ট, শি লেফট হিম ফর দ্যাট।

মাই গড!

রিঙ্কুকে খুন করার পিছনে এই স্যাডিজম ছাড়া আর কোনও মোটিভ পাচ্ছি না।

কেন, রেপ!

হ্যাঁ, রেপ। কিন্তু লোকটার অত সেক্স সত্ত্বেও সে প্রস কোয়ার্টারে যেত না কেন বলুন তো! মে বি হি হ্যাড স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড। হাফগেরস্তও তো আছে। তাদের তো প্রস কোয়ার্টারে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া রেড লাইট এরিয়া তো বিশাল এবং সংখ্যাও কম নয়। সব কি খুঁজে দেখা সম্ভব?

তা ঠিক, সম্ভাব্য জায়গাগুলিতেই খোঁজ করা হয়েছে।

আপনি এত ব্রড অ্যাঙ্গেলে ভাবছেন কেন?

শবর মাথা নেড়ে বলল, ভাববার কোনও মানে হয় না।

এবার ঘোষালও একটু হাসল, মিস্টার দাশগুপ্ত, আমি আপনাকে চিনি। আপনার কোথাও একটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে।

না, খিঁচ নয়। একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

ভজন রেপ করে রিঙ্কুকে মার্ডার করল। কিন্তু তারপর সে আটে রয়ে গেল কেন? ও তো রাতেই কলকাতায় চলে আসতে পারত।

ইজি। কলকাতায় পালিয়ে এলে ওর ওপর সন্দেহ আরও বাড়ত। হয়তো ভেবেছিল, ভালোমানুষটি সেজে থাকলে লোকে সন্দেহ করবে না।

হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। সেটাই সম্ভব।

আপনার কোনও জায়গায় গ্যাপ আছে বলে মনে হচ্ছে কি?

শবর একটু চিন্তিত ভাবে বলল, না, ঠিক তা নয়। গ্যাপ কিছু নেই। কিন্তু কেসটা বড্ড সোজা আর সরল।

BanglaBook.org

তা তো হতেই পারে। আমাদের দেশের ক্রিমিনালরা তো আর মাথা বেশি খাটায় না। তাদের বেশিরভাগ কাজই মোটা দাগের। আপনি অত ভাবছেন কেন?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাবছি একটা কথা।

কী বলুন তো!

ভজন আচার্যি রোজ সকালে পাড়ার কুকুরদের ডেকে পাঁউরুটি খাওয়াত। কলকাতাতেও, বারাসাতেও।

সো হোয়াট? হি লাভড ডগস। এ তো হতেই পারে।

কলকাতায় একবার একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে ঠ্যাং ভাঙে। তাকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি করে ভেটারনারি হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভালো করে এনেছিলেন ভজনবাবু। উনি এসপিসিএ-র মেম্বার এবং অ্যানিম্যাল লাভার।

ঘোষাল একটু থমকাল, তারপর বলল, তা হলে তো ভাবতে হচ্ছে। অ্যানিম্যাল লাভাররা হোমিসাইড করতে পারবে না তা নয়। স্প্লিট পারসোনালিটি হতে পারে। তবে ইটস এ পয়েন্ট টু পন্ডার। কেসটা ডিটেলসে বলবেন?

শবর বলল।

রিঙ্কুর ছবিটা ভালো করে দেখে ঘোষাল বলল, হাউ ওল্ড ওয়াজ শি? সিক্সটিন?

হ্যাঁ।

ও কি ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ।

তা হলে একটু ভাবতে হচ্ছে। পুলিশ কি এই অ্যাঙ্গেলটা দেখেনি?

লোকাল পুলিশ এত দেখতে চাইছে না। তাদের কাছে এটা একটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। ভজন আচার্যি কনভিকটেড হলে তারা বাহবা পাবে। একটা সলভড মার্ডার কেসকে কে কাঁচিয়ে দিতে চায় বলুন।

ঘোষাল একটু হেসে বলল, তা তো বটেই। আপনি কী করতে চান?

বুঝতে পারছি না।

রিঙ্কুর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখেছেন?

হ্যাঁ।

স্টমাকে কিছু পাওয়া গেছে?

কী পাওয়া যাবে?

ধরুন অ্যালকোহল।

হ্যাঁ।

বয়ফ্রেন্ডদের ক্রস করেছেন?

দুজনকে। দুজনেরই ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে। কেউ-ই সেই রাতে বারাসাতে ছিল না। একজন শিলিগুড়ি গিয়েছিল দু-দিন আগে। অন্যজন আগের দিন মামাবাড়ি কোন্নগর।

আর কেউ?

না।

আচ্ছা, ডাক্তারি রিপোর্টে রেপ-এর রিপোর্টটা কী রকম? সিঙ্গল রেপ না গ্যাং রেপ?

সিঙ্গল।

ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল?

অ্যাপারেন্টলি।

ওয়াজ ইট হার ফার্স্ট টাইম?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, মেয়েটা উড়নচণ্ডী হলেও সেক্সটা আগে হয়নি।

আপনাকে জিগ্যেস করা উচিত নয়, তবু বলি, মেয়েটা নখ দিয়ে কাউকে খামচে দিয়েছিল কি না বা রেপিস্টের লালা বা লোম বা চুল কিছু পাওয়া গেছে কি না তা দেখেছেন?

হ্যাঁ। নখে দু-একটা হিউম্যান টিসু পাওয়া গেছে।

ভজনের সঙ্গে মিলেছে?

মেলানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্টিল আন্ডার প্রসেস। তবে আমি যতদূর জানি, লোকাল পুলিশ আমাকে মুখে বললেও কাজে টিসু পরীক্ষা করা হচ্ছে না। ওঁরা এত ডিপে যাবেই বা কেন?

অর্থাৎ ভজনকে ওরা ঝোলাবেই?

হ্যাঁ।

দেন লেট দেম হ্যাঙ হিম।

তাই তো দিচ্ছি মিস্টার ঘোষাল। লোকটা হয়তো সত্যিই কাণ্ডটা করেছে কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে ব্যাপারটা প্রমাণ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে জিংগসটা একজন ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু সেই বিশেষ একজন খুবই স্টাবোর্ন।

কে লোকটা?

ওর স্ত্রী।

কী ভাবে? ওঁর স্ত্রী তো ওঁকে ঘেন্না করে শুনলাম।

হ্যাঁ তা করে।

তাহলে?

ভজনবাবু তাঁর স্ত্রীকে ঘেন্না করেন না।

তাহলে কী দাঁড়াল?

ডিফিকাল্ট ব্যাপার।

ভজনবাবু তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেন?

তেমন কিছু নয়। আমি জিগ্যেস করেছিলাম ওঁর স্ত্রী কেন চলে গেলেন? ভজন সংক্ষেপে বলেছেন, আমার দোষে। শত চাপাচাপিতেও দোষটা অবশ্য কবুল করেননি। স্ত্রীর প্রতি অ্যাটিচুড কেমন তা জিগ্যেস করায় বলেছেন ও ভালো মেয়ে, আমি খারাপ।

ব্যস?

হ্যাঁ।

তাহলে ওঁর স্ত্রী কী করবেন?

ভজনবাবুকে ঘিরে একটা রহস্য রয়েছে। ওঁর ওই চুপচাপ থাকা, জেদি মনোভাব আর মার খাওয়ার ক্ষমতা আমাকে সমস্যায় ফেলেছে।

তাই তো দেখছি।

আমি যদি বিভাবরীকে রাজি করাতে পারতাম এবং উনি যদি লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতেন তা হলে একটা কিছু বেরিয়ে আসতে পারত।

এটা কী করে বলছেন?

জাস্ট এ হান্‌চ্‌।

ও।

আরও একজন মহিলা ভজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

তিনি কে?

রিঙ্কুর মা। শ্যামলী।

তিনি কেন দেখা করবেন?

BanglaBook.org

বোধহয় ভজনবাবুকে নিজের হাতে খুন করতে চান।

আপনি রাজি হয়েছেন নাকি?

হয়েছি।

কেন?

ভজনবাবুকে শক দেওয়ার কোনও চেষ্টাই আমি ছাড়ছি না।

ও। আপনি সব সময়ে ডেনজার নিয়ে খেলা করেন।

অ্যান্ড হোয়াই নট?

ঘোষাল হাসল, ইটস ওকে ইফ ইট পে'জ। কিন্তু এসব তো পণ্ডশ্রম।

মনে হচ্ছে তাই।

বাই দি বাই, রেপ করার সময় যদি রিঙ্কু ভজনবাবুকে বাধা দিয়ে থাকে তা হলে ভজনবাবুর গালে বা গলায় পা পিঠে বা হাতে নখের দাগ থাকার কথা।

নিশ্চয়ই। তবে গণপ্রহারে ভজনবাবুর সারা শরীর এমনই ক্ষতবিক্ষত ছিল যে রিঙ্কুর নখের দাগের মতো সূক্ষ্ম জিনিস খোঁজা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার সামিল।

তাও তো বটে।

আরও একটা কথা।

কী বলুন তো!

রিঙ্কু যদি ভজনের প্রেমেই পড়ে থাকে তা হলে সেক্স-এর সময় বাধা দেবে কেন?

কিন্তু আপনিই তো বললেন যে ভজন ভায়োলেন্ট লাভার।

হ্যাঁ।

সেক্ষেত্রে বাধা দিতে পারেই।

সেটা ঠিক। তবু সব দিক ভেবে দেখতে হচ্ছে।

চার্জশিট তো নিশ্চয়ই ফাইল করা হয়নি?

না।

ভজনবাবু উকিল নিয়েছেন?

হ্যাঁ। ওর পরিবার জামিন চেয়েছে।

এখন আপনার অ্যাঙ্গেল অফ থটটা কী?

মাথা নেড়ে শবর বলল, আই অ্যাম ইন কনফিউশন।

শবর দাশগুপ্তর মুখে এ-কথা শুনব বলে ভাবিনি।

শবর মৃদু হেসে বলল, ঘটনাবলি নয়, আমাকে কনফিউজ করছে লোকটা, ভজন আচার্য।

লোকটাকে কি আপনার ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না?

তা বলছি না। হতেই পারে।

রজতদা আসলে কী চাইছেন বলুন তো!

রজতদা ভেঙে কিছু বলেননি। তিনি আমাকে শুধু বলেছেন, এ-কেসটায় আমার একটা পারসোনাল ইন্টারেস্ট আছে। তুমি প্যারালেল ইনভেস্টিগেশন করো। আমি লোকাল থানাকে বলে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে কো-অপারেট করতে।

ওঁর ইন্টারেস্টটা কোন দিকে তা বুঝতে পেরেছেন? ভিকটিম না সাসপেক্ট?

সম্ভবত সাসপেক্ট।

মাই গড! তাই আপনি মুশকিলে পড়েছেন!

অনেকটা তাই। ছবিটা আবার দেখুন তো দাদা।

ঘোষাল রঙিন ছবিটা তুলে নিয়ে দেখল। গায়ে একটা পোলকা ডটওয়ালা ঢিলা কামিজ,

BanglaBook.org

পরনে নীল জিনস, একখানা সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো, পিছনে একটা মাঠ। মেয়েটার মুখে একটু হাসি।

কিছু মনে হয়?

না। ছবি তো স্থির জিনিস। একটা এক্সপ্রেশন মাত্র। এ থেকে কী বোঝা যাবে বলুন!

ইজ শি সেক্সি?

টিন এজাররা সবাই বয়সের গুণেই অ্যাট্রাকটিভ। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

আমি মহিলাদের ব্যাপারে একটু অনভিজ্ঞ, তাই জিগ্যেস করলাম।

অনভিজ্ঞ থাকার দরকারটা কী? বয়স তো বোধহয় একত্রিশ-বত্রিশ হল!

ওরকমই।

তাহলে টোপরটা এ-বেলা পরে ফেললেই তো হয়।

ঘোষালদা, নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন। বছরখানেক আগেও আপনি ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন।

হ্যাঁ দাশগুপ্ত, সেবার আপনি আমার পাশে না দাঁড়ালে মরতে হত।

ফ্যামিলি লাইফকে আমি একটু ভয় পাই।

ভয়ও আছে, ভরসাও আছে।

আমার এরকমই ভালো লাগে। সিঙ্গল, অ্যাকটিভ, ফ্রি।

দাঁড়ান আমার বউকে আপনার পেছনে লাগাব। সে খুব ভালো ঘটকী।

সর্বনাশ! আমি ওর কাছে যাব! একটা রেপিস্ট, খুনির কাছে আমি যাব কেন শবরবাবু? আমার তো ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

জানি, সব জানি। আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই।

কী সেটা?

সেদিন রাতে উনি সত্যিই রিঙ্কুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কি না।

ওবভিয়াসলি রিঙ্কু। আর কে হবে!

মানছি। কিন্তু তবু সন্দেহের কোনও অঙ্কুর আমি রাখতে চাইছি না।

এটা আপনার বাড়াবাড়ি।

কোনও কিছুই বাড়াবাড়ি নয়। সত্যের শিকড়ে পৌঁছানো সব সময়েই কঠিন।

সত্যকে আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না।

সত্য হলে অবশ্যই স্বীকার করব।

কিন্তু আমাকে টানাটানি করছেন কেন?

জেরা বা রুটিন প্রশ্ন করে ভজনবাবুর কাছ থেকে কিছুতেই কথাটা বের করা যাচ্ছে না। আপনি হয়তো জানেন না লোকটার সহ্যশক্তি অসীম। আমি কাউকে এত ফিজিক্যাল টর্চার সহ্য করার পরও এত শান্ত থাকতে দেখিনি।

তাতে কী হল?

লোকটাকে ক্র্যাকডাউন করাটাই আমার স্বার্থ। কেসটার যা অবস্থা ভজনবাবুর রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি ওঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি না। লোকটার ফাঁসি হোক কি যাবজ্জীবন আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে কথাটা বের করা যাবে না কেন?

এটা কি আপনার জেদ বা প্রেস্টিজ ইসু?

না একেবারেই তা নয়।

BanglaBook.org

মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা আপনার মনে হচ্ছে না কেন?

মনে হচ্ছে। আবার হচ্ছেও না।

বড্ড হেঁয়ালি করেন আপনি। আমার তো মনে হচ্ছে ভজন আপনাকে ঘুষ দিয়েছে।

শবর হাসল, মনে রাখবেন ভজনবাবু গুণ্ডা বদমাশদের হাতে মার খেয়েও তাঁদের চাঁদা দেননি। ঘুষ দেওয়ার লোক নন।

আমাকে কী করতে হবে?

জাস্ট মিট হিম।

মিট করে কথা-টথা বলতে হবে তো!

তা হবে।

কী বলব তখন?

যেমন মনে হয় বলবেন। প্রম্পট করার বা শিখে-পড়ে যাওয়ার দরকার নেই।

আমি যে ওর ওপর ভীষণ রেগেও আছি।

তা থাকুন না। কী যায়-আসে তাতে?

কোন লাইনে কথা বলতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

নানা ধরনের কথা হতে পারে। বুদ্ধি খাটিয়ে বলবেন। বলার চেয়েও শোনাটা বেশ জরুরি।

ও আমাকে সব বলবে কেন?

উনি কারও সঙ্গেই কথা বলছেন না বিশেষ। আপনার সঙ্গেও না বলতে পারেন। তবে আমার একটা ধারণা, উনি আপনার ওপর টর্চার করেছেন বলেই একটু অপরাধবোধ থাকতে পারে।

নরপশুদের অনুতাপ থাকে না। রিঙ্কুকে মেরে কি ও অনুতপ্ত?

এ-প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আপনি লোকটাকে দেখে বুঝতে চেষ্টা করুন।

আমার কী দরকার?

দরকারটা তো আপনার নয়, আমার।

আপনি আমাকে বড্ড মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, একটা শর্তে দেখা করব।

কী শর্ত?

আমি আপনার কথা মানছি, বদলে আমাকে সাক্ষী হওয়া থেকে রেহাই দেবেন।

শর্তটা বেশ কঠিন। আমি চেষ্টা করব।

আপনি কি জানেন যে আপনি খুব নাছোড়বান্দা লোক?

জানি। আমার কাজটাই আমাকে আনপপুলার করে তোলে।

আমি কিন্তু আপনাকে ডিজলাইক করিনি। বরং আপনি হেটো মেঠো পুলিশের মতো নন বলে ফ্রিলি কথাও বলেছি।

তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কবে যেতে হবে?

আজ এবং এখনই।

আমার যে ভয় করছে।

ভয় কী? লোকটা শোওয়ার ঘরে নরপশু হলেও এমনিতে এ সিক ম্যান।

তবু নার্ভাস লাগছে।

আমি কাছাকাছি থাকব।

গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা হবে তো।

শবর হেসে বলল, আপনি চাইলে তাই হবে। তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে যদি চিন্তিত না হন তা হলে আমার ইচ্ছে আপনাদের দেখাটা হোক পুলিশ কাস্টডির বাইরে কোথাও।

BanglaBook.org

সে কী! পুলিশ ওকে ছেড়ে দেবে?

আইনত ছাড়বে না। তবে আমার আন্ডারটেকিং-এ ছাড়বে। চলুন।

ঠিক আছে। সব রিস্ক কিন্তু আপনার।

নিশ্চয়ই।

আপনার খুব আত্মবিশ্বাস, তাই না?

না মিস ভট্টাচার্য, আত্মবিশ্বাস নয়। শুধু লজিক্যাল।

ঠিক আছে চলুন। আমি পোশাকটা পালটে আসছি। গাড়ি আছে?

আছে। পুলিশের জিপ।

ওতেই হবে।

শবর যখন বিভাবরীকে নিয়ে বেরল তখন বেলা দুটো। পথে বিভাবরী তেমন কথাটথা বলল না। শবর জিগ্যেস করল, স্টিল ফিলিং নার্ভাস?

হ্যাঁ।

ওঁর প্রতি আপনার ঘেন্নার ভাবটা এখনও আছে?

থাকবে না? আমি ভুলতে পারি না।

শবর গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, থানায় নয়, বারাসাতের একটা ফাঁকা বাড়িতে আপনাদের দেখা হবে।

আপনি খুব রিস্ক নিচ্ছেন কিন্তু। থানাই ভালো ছিল। আমি সেফ ফিল করতাম।

আপনি সেফটি নিয়ে ভাববেন না। ইউ উইল বি সেফ।

বিভাবরী চুপ করে রইল।

॥ চার ॥

শবর যে বাড়িটায় নিয়ে এল বিভাবরীকে তা যে বড়লোকের বাগানবাড়ি তা দেখলেই বোঝা যায়। চারদিকে অনেকটা জমিতে ভারী সুন্দর নিবিড় গাছপালা। সামনে ফুলের বাগান। এই বর্ষাকালের শেষেও বাগানে ফুলের অভাব নেই। বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ির সামনে একটা মনোরম বারান্দা। তার পর ঘরটর।

এটা কার বাড়ি শবরবাবু?

একজন বড়লোকের। কেউ থাকে না। ফাঁকা পড়ে থাকে। শুধু মালি আছে।

জিপটা একেবারে বারান্দার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। শবর জিপ থেকে নেমে বলল, আসুন।

কেউ নেই তো এখানে দেখছি।

আসবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

ভিতরে ঢুকে বিভাবরী চারদিকে চেয়ে দেখল। বৈঠকখানাটা কী সুন্দর করে যে সাজানো! বেশি আসবাব নেই। কিন্তু, রুচির পরিচয় আছে।

এখানে নয়, ভিতরের ডাইনিং হল-এ।

বিভাবরী বলল, ঠিক আছে।

ডাইনিং হলটাও দারুণ সাজানো। গ্লাস টপ মস্ত খাবার টেবিল ঘিরে গদি আঁটা চেয়ার। ভারী নরম। এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে ভ্যাপসা গরম থেকে এসে ভারী আরাম বোধ করল বিভাবরী। চারদিক নিস্তব্ধ।

কী খাবেন? চা, কফি বা কোল্ড ড্রিংক?

BanglaBook.org

জল খাব। আর কিছু নয়।

একজন পরিচ্ছন্ন পরিচারক ট্রেতে একটা টাম্বলার আর ঝকঝকে কাচের গেলাস এনে রাখল সামনে। বিভাবরী খানিকটা জল খেয়ে বুঝল তার তেষ্টাটা নার্ভাসনেসের। বারবার তেষ্টা পাবে।

শবর তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, আমি বা আর কেউ আর আসব না। ঘাবড়াবেন না। জাস্ট ফেস হিম অ্যান্ড টক।

বিভাবরী একটু হাসবার চেষ্টা করল, পারল না।

খাওয়ার ঘরের পিছন দিককার দেয়াল জুড়ে বিশাল চওড়া-চওড়া জানালা দিয়ে পিছনের সবুজ বাগান আর গাছপালার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শুধুই সবুজ যেন ছেয়ে আছে চারদিক। ঘরে বাইরের প্রাকৃতিক আলো আসছে। আজও একটু মেঘলা বলে ঘরের আলোটার তীব্রতা নেই।

বিভাবরী বারবার ঘড়ি দেখছে। এক-একটা মিনিট যেন এক-একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। বিভাবরী ঢোঁক গিলছে বার-বার। একটু করে জল খাচ্ছে। ভাবছে লোকটাকে যে কী বলবে। মাথাটা এত তালগোল পাকিয়ে আছে যে, সে কথা বলতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় বৈঠকখানার দিককার ফ্লাশ ডোর খুলে দুজন পুলিশ ঢুকল। ঢুকে দরজার দুদিকে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড বাদে ক্রাচে ভর দিয়ে যে লোকটা অতি কষ্টে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে চেনার উপায় নেই যে, এ-লোকটা সেই ভজন আচার্য। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ, গালে স্টিকিং প্লাস্টার, পায়ে প্লাস্টার, ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ফুলে আছে, একটা চোখও ব্যান্ডেজে ঢাকা। এত অবাক হল বিভাবরী যে বলার নয়।

ভজন ঘরে ঢুকতেই পুলিশ দুজন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

ভজন দরজার কাছেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হাঁফাচ্ছে। তার পর দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে এল।

বিভাবরীর হয়তো উচিত ছিল উঠে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করা। কিন্তু ভজনের অবস্থা দেখে এমনই ঘাবড়ে গেছে বিভাবরী যে, সে নড়তেও পারল না।

ভজন খুব শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা ক্রাচ পড়ে গেল ঠন্‌ঠন্‌ করে। সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নীচু হওয়ার ক্ষমতাও নেই লোকটার। ভারসাম্যহীন শরীরে কোনওরকমে চেয়ারের পিছনটা ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে। চেয়ার নিয়ে উলটেই পড়ে যেত, কিন্তু সেটা ঝুঁকে কোনওরকমে আটকাল। তার পর অতি কষ্টে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ মাথাটা নুইয়ে শুধু শ্বাস নিতে লাগল। বড়-বড় শ্বাস। কথা বলার মতো অবস্থাই নয়। লোকটার যে এ দশা হয়েছে তা একবারও বলেনি শবর। কে এই অবস্থা করল? পুলিশ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে লোকটার দিকে চেয়ে রইল বিভাবরী। গত তেরো-চোদ্দো দিন দাড়ি কামায়নি বলে মুখটা দাড়িতে ঢাকা। গোঁফ নেমে ওপরের ঠোঁট আড়াল করেছে।

বিভাবরী খুব ধীরে উঠে গিয়ে মেঝে থেকে ক্রাচটা তুলে অন্য ক্রাচটার পাশে টেবিলের গায়ে হেলিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসে ক্ষীণ গলায় বলল, জল খাবে?

লোকটা মৃদু মাথা নেড়ে জানাল, খাবে না।

এ দশা করল কে? পুলিশ।

ভজন একবার তার ক্লান্ত মুখখানা তুলে বিভাবরীর দিকে তাকাল। হাঁ করা মুখে এখনও শ্বাস নিচ্ছে প্রবলভাবে। ফের মাথাটা যেন ঝুলে পড়ল আপনাথেকেই। কথা বলার মতো অবস্থায় এখনও আসেনি।

বিভাবরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। এ-লোকটাকে সে ঘেন্না করে এসেছে এতদিন, আজ

BanglaBook.org

বড্ড দুঃখ হচ্ছে। মানুষের এ রকম দুর্দশা দেখলে কারই বা না হবে! শবর কি তাকে ইচ্ছে করেই এই ঘটনার কথা বলেনি?

প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ ঘরে ভজনের শ্বাসযন্ত্রের শব্দ হল। তার পর একটু কমে এল হাঁফধরা ভাবটা। মাথা নীচু করেই বসে রইল ভজন।

একটু জল খাও এবার।

ভজন ফের মাথা নাড়ল, খাবে না।

এ দশা কে করেছে তোমার?

ভজন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বলল, সবাই।

সবাই বলতে?

ভজন ফের চুপ করে থেকে আরও মৃদু গলায় বলল, সবাই।

এর পর ভজনের শরীরটা হঠাৎ একটু কেঁপে-কেঁপে উঠল। কাঁদছে নাকি? কান্নার মানুষ তো নয়! বিস্মিত বিভাবরী পলকহীন চেয়ে রইল।

কাঁপুনিটা কমে গেল। ভজন মুখ তুলল না।

তোমাকে কি পাবলিকও মেরেছে?

ভজন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

পুলিশও?

ভজন মাথা নাড়া দিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

রিঙ্কুকে কি তুমি খুন করেছ?

ভজন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাত্র। জবাব দিল না।

বললে না?

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে থেকে ভজন ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, বলে কী লাভ?

লাভ নেই?

ভজন মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে মাথা নীচু অবস্থাতেই বিড়বিড় করে আপনমনে বলল, কতবার তো বলেছি। কেউ বিশ্বাস করে না।

বিভাবরী কী বলবে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল, রিঙ্কু তোমার কাছে সেই রাতে এসেছিল কেন? বিয়ের প্রস্তাব দিতে?

ভজনের রি-অ্যাকশন হচ্ছে অনেক দেরিতে। হয়তো মাথায় বেশ জোরালো চোট পেয়েছে, রিফ্লেক্স কাজ করছে না। সময় নিচ্ছে। অনেকক্ষণ বাদে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

রিঙ্কু নয়?

না।

তাহলে কে?

ভজন একটা হিক্কার মতো শব্দ করল। টেবিলের ওপর মাথাটা নামিয়ে যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে লাগল। এই অবস্থায় কেন যে লোকটাকে এতদূর টেনে আনল শবর, কেন যে তাকে বসাল ওর মুখোমুখি! বিভাবরী উঠে ভজনের কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?

ভজন কেঁপে উঠল। তার পর ধীরে-ধীরে মাথাটা তুলল। রক্তজবার মতো লাল ডানচোখটা দিয়ে বিভাবরীকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, না, ঠিক আছি।

একে কি ঠিক থাকা বলে?

ভজন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে অতি মৃদু স্বরে বলল, আরও হবে। আরও কত হবে। এ তো কিছু নয়।

আর কী হবে তোমার?

BanglaBook.org

ভজন ধীরে-ধীরে চোখের জল আর লালায় মাখামাখি বীভৎস মুখটা তুলল। লাল চোখে চেয়ে সেই ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এখনও মরিনি যে! মারবে না?

আমি জানতে চাই তুমি সত্যিই রেপ আর খুন করেছ কি না।

ভজন হাঁফধরা গলায় শুধু বলল, কী লাভ বলে? বিশ্বাস করবে না কেউ।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইছি। সত্যি কথাটা বলো আমাকে।

ভজন মাথা নেড়ে শুধু না জানাল। তার পর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে হঠাৎ ধীরে-ধীরে মুখ তুলে বিভাবরীর দিকে চাইল। দু-খানা কম্পিত হাত তুলে করজোড় করে রইল কিছুক্ষণ। দুটো হাত থরথর করে কাঁপছে।

ওরকম করছ কেন?

ভজন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে। প্রায় অশ্রুত গলায় বলল, ক্ষমা...ক্ষমা...।

দু-খানা ক্রাচের দিকে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল ভজন। উঠবে।

বিভাবরী গিয়ে ক্রাচ দু-খানা এগিয়ে দিল। প্রায় ছ-ফুটের মতো লম্বা শক্ত সমর্থ শরীরটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে শরীর। তিনবারের চেষ্টায় উঠল ভজন। দু-বগলে ক্রাচ।

বিভাবরী গিয়ে দরজা খুলে সেপাইদের ডাকল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় যেন ভজনের কষ্ট হচ্ছিল অনেক বেশি। দুজন সেপাই না ধরলে শুধু ক্রাচে ভর করে বেরোতে পারত না সে।

পিছন থেকে অপলক চোখে চেয়ে ছিল বিভাবরী। এরকমভাবে কেউ কাউকে মারে? মানুষ এত নৃশংস? চোখে জল আসছিল তার, আবার একইসঙ্গে রাগে আগুন হয়ে যাচ্ছিল মাথা।

ভজন বেরিয়ে যাওয়ার পর বিভাবরী তার শরীরের কাঁপুনি আর দুর্বলতা টের পেল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

দেখা হল ম্যাডাম?

বিভাবরী চোখ তুলে চেয়ে শবরকে দেখে বলল, আপনাদের নামে মামলা করা উচিত।

শবর হাসল, করুন না।

পুলিশ কেন মারবে? মারা তো বে-আইনি।

অবশ্যই। কিন্তু ভজনবাবুর বেশিরভাগ চোট পাবলিকের উপহার, পুলিশের নয়।

তাদের কেন ধরা হল না?

ক'জনকে ধরা যাবে বলুন। গোটা লোকালিটিটাই তো ইনভলভড।

ছিঃ শবরবাবু।

শবর একটু হাসল আবার। বলল, পাবলিকের হয়ে আপনার ধিক্কারটা আমি ঘাড়ে নিচ্ছি ম্যাডাম। সরি। এক্সট্রিমলি সরি।

আপনি আমাকে ওর এই অবস্থার কথা বলেননি কেন?

শোনার চেয়ে দেখা অনেক বেশি এফেক্টিভ। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিভাবরী উঠল। শরীর ও মনের একটা বিকলতা টের পাচ্ছে সে। পা দুটো ভারী। মাথাটা একটু-একটু টলছে। জিপে বসে সে বলল, আপনার কি এখন কোনও জরুরি কাজ আছে?

না তো!

তা হলে আমি ওর গ্যারেজটা দেখতে চাই।

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু দেখে কী করবেন?

এমনি কৌতূহল।

ঠিক আছে ম্যাডাম। এনিথিং ইউ সে।

BanglaBook.org

গ্যারেজটা একটু প্রত্যন্ত জায়গায়। ছাড়া-ছাড়া বাড়িঘর, ফাঁকা জমি, ঝোপজঙ্গল, পুকুর। বাঁ-ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া বেশ বড় একটা জায়গা। ফটকের সামনে দুজন সেপাই গাড়ির একখানা সিট পেতে বসে আছে। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

এটাই ভজনবাবুর গ্যারেজ।

ভিতরে ঢোকা যাবে?

কেন নয়?

শবরের ইশারায় সেপাইরা ফটকের তালা খুলে দিল। বিকল মোটর গাড়ি, নানা যন্ত্রাংশ, তেল কালি, হাইড্রলিক প্রেস পেরিয়ে শেষ প্রান্তে ভজনের ঘর। সেপাইরা দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আসুন ম্যাডাম।

ঘরে একটা সরু চৌকিতে সাধারণ বিছানা পাতা রয়েছে। একধারে চেয়ার-টেবিল। বইয়ের র‍্যাকে প্রচুর টেকনিক্যাল বই, কিছু পেপারব্যাক উপন্যাস, কিছু ম্যাগাজিন। বাঁ-ধারে মেঝের ওপর একটা বায়োগ্যাসের উনুন। কিছু বাসনপত্র।

বসুন ম্যাডাম।

বিভাবরী চেয়ারে বসল। তারপর ঘরটা ভালো করে দেখল। কিছুই দেখার মতো নয়। একজন পুরুষ মানুষের ঘর।

শবর বলল, সম্ভবত আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন সেই চেয়ারেই রিঙ্কু বসে ছিল সেই রাতে।

কী করে বুঝলেন?

প্রবাবিলিটির কথা বলছি।

কিন্তু মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা কী করে বুঝলেন?

আপনার কী মনে হয়?

ও তো বলছে রিঙ্কু নয়।

তাহলে কে হতে পারে ম্যাডাম?

কী করে বলব? আপনি বলতে পারেন না?

শবর মৃদু একটু হাসল। বলল, রিঙ্কু হতেই পারে। রিঙ্কু তো ভজনবাবুকে ভালোবাসত বলেই মনে হয়।

আপনি কিছু লুকোচ্ছেন।

শবর ফের হাসল, আপাতত কিছু লুকোনোই থাক।

আচ্ছা, ভজনের সঙ্গে আমার কী কথা হল তা তো আপনি জানতে চাইলেন না!

শবর মৃদু-মৃদু হাসি হাসছিল। বলল, পরে জেনে নেওয়া যাবে।

তার মানে আপনার জানার কৌতূহল মিটে গেছে?

তা নয়। ভজনবাবু এখন খুব বেশি কথা বলার মতো মুডে নেই। সেটা জানি বলেই অনুমান করছি আপনাদের মধ্যে খুব বেশি কথা হয়নি। কিন্তু—।

কিন্তু কী?

আপনার অমত না থাকলে কয়েকদিন পর আপনি আর একবার ওঁর সঙ্গে মিট করুন। করবেন?

করব।

থ্যাঙ্ক ইউ। হি নিডস এ সিমপ্যাথেটিক হিয়ারিং।

তার মানে?

ওঁর মনটা অদ্ভুত। জোর করলে বা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে উনি ভিতরকার কপাট বন্ধ করে

BanglaBook.org

দেন। কোনও কনফেশনই তখন আদায় করা যায় না। কিন্তু এই কেসটার জট খুলতে হলে ওঁর মুখ খোলানো দরকার। আমরা যেটা পারছি না সেটা আপনি হয়তো পারতেও পারেন।

চেষ্টা করব।

কাইন্ড অফ ইউ।

এবার কি আমরা উঠব?

হ্যাঁ ম্যাডাম। চলুন।

ফেরার সময় বিভাবরী তেমন কথা বলছিল না। খুব ভাবছিল। আজ সে বড্ড নাড়া খেয়েছে ভজনকে দেখে। লোকটাকে তার আর ঘেন্না হচ্ছে না, কিন্তু ঘেন্না হচ্ছে তাদের যারা ওকে ওরকমভাবে মেরেছে।

শবরবাবু।

বলুন।

আমার মনে হয় না ভজন এ কাজ করেছে।

কী করে বুঝলেন?

যেভাবে আপনিও বুঝেছেন।

আমি কি বুঝেছি?

আপনিও বুঝেছেন বা অনুমান করেন যে ও খুন বা রেপ করেনি।

কী সর্বনাশ! এ যে গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি!

আমি জানি।

॥ পাঁচ ॥

রতন তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বলুন স্যার।

মার্ডারের আগের রাতে তুমি শুনেছিলে ভজনবাবু একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কি বলতে পারো দুজনের মধ্যে কে কাকে আপনি করে বা তুমি করে বলছিল?

স্যার, পুলিশকে তো বলেছি।

ব্যাপারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ভালো করে ভেবে বলো।

এই রে! এত খুনখারাপি মারদাঙ্গায় মাথাটাই কেমন গুলিয়ে গেছে স্যার।

সেইজন্যেই বলছি ভালো করে ভেবে বলতে। অনেক সময়ে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর স্মৃতিটা পরিষ্কার হয়। যখন তুমি জবানবন্দি দিয়েছিলে তখন তুমি ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থায় ছিলে।

ঠিক স্যার।

এবার শান্ত মাথায় ভেবে বলো।

দু-মিনিট সময় দেবেন স্যার? চোখ বুজে একটু ভাবব।

দুই পাঁচ যত মিনিট খুশি সময় নাও। তবু আসল কথাটা বলো।

রতন দু-মিনিটের বেশি ভাবল না। চোখ খুলে এক গাল হেসে বলল, মনে পড়েছে স্যার। মেয়েটা বাবুকে তুমি করে বলছিল, বাবু আপনি করে বলছিল।

আরও ভেবে বলো।

না স্যার মনে পড়ে গেছে।

তুমি কিন্তু পুলিশের কাছে উলটোটাই বলেছিলে।

BanglaBook.org

তা হতেই পারে স্যার। তখন যা অবস্থা! বাবুর ফাঁসি হলে তো চাকরিটাও গেল স্যার। বাবু লোকটা খারাপ ছিলেন না।

ফাঁসি নাও হতে পারে।

একটু উজ্জ্বল হয়ে রতন বলল, তবে কি বাবু ছাড়া পাবেন?

সেটা তোমার ওপরেও খানিকটা নির্ভর করছে।

কী বলতে হবে বলুন।

সেই রাতে তুমি গ্যারেজের কাছাকাছি কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ স্যার। সামনে নয় ঠিক, ওই পশ্চিম দিকে একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড় করানো ছিল। ডার্ক কালার।

আর কিছু?

না স্যার। গ্যারেজে এসেছে কি না ভেবে ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম, কী হে, গ্যারেজে এসেছ নাকি? লোকটা বলল, না, সওয়ারি আছে।

প্রাইভেট গাড়ি?

এ মার্কা গাড়ি স্যার, ওরা ভাড়া খাটে।

গাড়িটা কখন দেখলে?

ডিউটিতে আসার সময়। তার পর যখন বাবুর জন্য কোক নিয়ে এলাম তখন গাড়িটা চলে গেছে।

বাঃ, ভেরি গুড।

আর কিছু বলতে হবে স্যার?

তুমি কি জানো তোমার বাবুকে বারাসাতে গ্যারেজ খুলতে কে সাহায্য করেছে?

সেটা ভালো জানি না। তবে শুনেছি বাবুর এক বন্ধু।

তার নাম জানো?

সুবীর-টুবির হবে। অত মেমারি নেই স্যার।

সুজিত হতে পারে কি?

রাখাল জানে। ও পুরোনো লোক।

রিঙ্কুকে কখনও মাতাল অবস্থায় দেখেছ?

না তো স্যার।

কখনও দেখনি? ভালো করে ভেবে বলো।

না স্যার। রিঙ্কুর বন্ধুরা হয়তো খেত।

তারা কারা?

অনেক ছিল। ইদানীং—।

বলেই থেমে গেল রতন।

থামলে কেন?

বলতে ভয় পাচ্ছি স্যার। কথা ফাঁস হলে আমার জান চলে যাবে।

ফাঁস হবে না। বলো।

ইদানীং রিঙ্কু হাবু জগুদের সঙ্গে ঘুরত। ওরা খুব অচ্চর।

ওদের সঙ্গে মিশত কেন?

বলতে পারব না স্যার। তবে রিঙ্কু একদিন গ্যারেজে গাড়ির বনেটে বসে কুল খেতে-খেতে বলেছিল, তোমাদের গ্যারেজে আর কেউ কখনও হামলা করবে না দেখো। আমি হাবু আর জগুকে হাত করেছি।

তুমি কী বললে?

BanglaBook.org

আমি বললাম, খবরদার ওদের খপ্পরে যেয়ো না। তোমাকে শেষ করে দেবে।

রিঙ্কু কী বলল?

হাসল, পাত্তা দিল না। রিঙ্কু স্যার, কারও কথা শুনত না। বাবুর সঙ্গে বিয়েটা হলে বেঁচে যেত।

বিয়ে! বিয়ের কথা উঠেছিল নাকি?

না স্যার। আমার মনে হত, দুজনকে যেন মানায়।

কেন মনে হত?

কী জানি কেন মনে হত।

রিঙ্কু কি ভজনবাবুকে ভালোবাসত বলে তোমার মনে হয়?

হ্যাঁ স্যার, খুব মনে হয়। রিঙ্কু মাঝে-মাঝে বাবুর জন্য খাবার নিয়ে আসত, বই আনত, আর বাবুর কাছে এলেই খুব হাসিখুশি থাকত।

আর ভজনবাবু?

বাবু তো স্যার, সবসময়ে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সবসময়েই নানা চিন্তা। বাবু রিঙ্কুকে মাঝে-মাঝে বকুনিও দিত।

কী রকম?

বলত, আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করছ কেন, পড়াশুনো করোগে যাও। কিংবা বলত, এত উড়নচণ্ডী হলে জীবনে কষ্ট পাবে। এইসব আর কী।

ভজনবাবুর কাছে আর কোনও মেয়ে আসত কী?

গাড়ি সারাতে অনেকে আসত।

তারা ছাড়া?

না স্যার, বাবুর মেয়েছেলের দোষ তেমন ছিল না।

তোমার বাবু কি ঘন-ঘন ট্যুরে যেত?

মাঝে-মাঝে যেত স্যার।

ঠিক আছে।

কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয় শ্যামলীদেবী?

কেন বলুন তো! এসবও কি তদন্তে দরকার হচ্ছে নাকি?

কে জানে কখন কোনটার দরকার পড়ে। বলতে না চাইলে অবশ্য—।

আমার বিয়ে হয় ষোলো বছর বয়সে।

এত কম বয়সে?

দেখতে সুন্দর ছিলাম বলে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব পছন্দ করে ফেলেছিলেন। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় তাই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হয়ে গেল। আর ওইটেই আমার জীবনের সর্বনাশের মূল।

সর্বনাশ কেন?

ষোলোতে বিয়ে, সতেরোয় মেয়ের মা, এই সুন্দর বয়সটা টেরই পেলাম না। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো! সাধে কি এদের ওপর এত রাগ আমার!

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার চেনা কত দিনের?

প্রায় জন্ম থেকে। ও আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

আপনি কবে ওঁর প্রেমে পড়েন?

এসব জেনে কী হবে আপনার?

প্লিজ!

BanglaBook.org

আপনার কথাবার্তা পুলিশের মতো নয়, আর আপনি বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সে জন্যই বোধহয় আপনি একজন বিপজ্জনক লোক। তবু আমি আপনাকে খুব একটা অপছন্দ করছি না। তাই বলছি, আমাদের শৈশব প্রেম।

আপনি সুজিতকে কখনও প্রেমের কথা জানিয়েছেন?

জানানোর কী? আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবেসেই বড় হয়েছি।

বিয়ের সময় কী রি-অ্যাকশন হল সুজিতবাবুর?

কী আর হবে? ও তো তখন সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলে। সবে কলেজে ঢুকেছে। ওর পক্ষে কী আমাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল?

আপনি?

আমি। আমি কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। কিন্তু রুখে দাঁড়ানোর মতো মন তখনও তৈরি হয়নি।

আপনি কি ভজনবাবুকে চেনেন?

শ্যামলী হঠাৎ স্থির চোখে চেয়ে বলল, হঠাৎ এ-কথা কেন?

বলতে আপত্তি আছে কি?

ওকে কি আমার চেনার কথা?

বলা তো যায় না।

আমি আট বছর আগে চলে গেছি, ও তখন এখানে আসেনি।

সেটা জানি। যে জমিতে ভজনবাবুর গ্যারেজ তার মালিক ছিলেন সুজিতবাবুর কাকা বরুণ গুণ।

তা হতে পারে।

খবর হল, সুজিতবাবুই ভজন আচার্যকে জমিটা কিনতে সাহায্য করেন।

আমি অত জানি না।

সুজিতবাবু ও ভজনবাবুর মধ্যে পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল।

আমি সেসবের খবর রাখি না।

ভজনবাবু কানপুরে আপনাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছেন।

শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কিছু বলবেন না?

শ্যামলী একটুও না ঘাবড়ে তার দিকে সপাটে চেয়ে বলল, যদি তাই হয় তাতেই বা কী হল?

কী থেকে যে কী হয় কে বলতে পারে?

ভজনকে আমি চিনতাম। এবার কি ফাঁসি দেবেন আমাকে?

না। ফাঁসির দড়ি ভজনবাবুর জন্যই থাক। আপনি তো ওকে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলেন।

এখনও চাই।

যদি ভজনবাবু নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন?

তবুও—।

বলেই থমকে গেল শ্যামলী। সুর পালটে বলল, তা হলে অন্য কথা। কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ কালপ্রিট নয়।

ঠিক জানেন?

জানি।

খুনের রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

তার মানে?

BanglaBook.org

কৌতূহল।

শ্যামলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কলকাতায়। তিলজলায় আমাদের একটা ফ্ল্যাট আছে।

রিঙ্কুর মৃত্যুর খবর কখন কীভাবে পেলেন?

প্রথমে খবরের কাগজে। তারপর টেলিগ্রাম পেয়ে কানপুর থেকে সুজিতও টেলিফোন করে।

আপনি তবু দু-দিন পরে বারাসাতে এলেন কেন? মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও কি মা দেরি করতে পারে?

পারে, যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কোয়াইট পসিবল। এবং খুব সম্ভব আপনি যে কলকাতায় আছেন তা শচীনন্দনবাবুকে জানাতে চাননি। আপনি ডিভোর্সি স্বামীর বাড়িতে উঠলেন কেন?

তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

তা নয়, তবু প্রোটোকলে আটকায় হয়তো।

বারাসাতে আমার ওঠার জায়গা নেই। বাপের বাড়ি বা সুজিতের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া এ-বাড়িটা বিরাট বড়, নীচের তলার এই পোরশনটা আমার জন্য আলাদা করে করা হয়েছিল, বাড়ির অশান্তি এড়ানোর জন্য।

বুঝেছি। একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার।

কী বলুন তো!

রিঙ্কুর পেটে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।

কে বলল?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট। একটু ডিলেইড রিপোর্ট।

তার মানে কী? কেউ ওকে মদ খাইয়ে রেপ করেছিল?

সেরকমই অনুমান।

ও।

ভজনবাবু মদ খান না।

ওতে কিছু প্রমাণিত হয় না।

ভজনবাবুর ফাঁসিটা দেখছি একটা পপুলার ডিমান্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোন শালা রে? কোন শুয়োরের বাচ্চা?

পুলিশ। দরজা খোলো।

ফোট শালা পুলিশ। ফোট বাঞ্চোৎ, খানকির ছেলে।

সঙ্গে মদন নামে যে সেপাইটা ছিল সে চাপা গলায় বলল, স্যার, ও-ডেনজারাস ছেলে। মদ খেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ফোর্স না নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। চলুন, ফোর্স নিয়ে আসি।

না মদন। গন্ধ পেলে পাখি উড়ে যাবে।

ঘর থেকে জঘন্য খিস্তি ভেসে আসছিল।

শবর কাঠের দরজাটায় একটা লাথি মারল। তাতে বোমা ফাটার মতো একটা আওয়াজ করে দরজার তলার দিককার প্যানেলটা কিছু অংশ ফেটে গেল।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাত। শব্দ শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে 'কে-কে' আওয়াজ উঠল। দু-একটা দরজা খুলে টর্চ মারল কেউ-কেউ।

স্যার, এ-পাড়া কিন্তু খারাপ। অ্যান্টিসোশ্যালদের ডেন। সবাই ঘিরে ফেললে বিপদ হবে।

শবর নিস্পৃহ গলায় বলল, কিছু হবে না। ভয় পেয়ো না। এই সাহস নিয়ে পুলিশে চাকরি করো কী করে?

BanglaBook.org

ভিতরের খিস্তি বন্ধ হয়েছে। এবার দরজার কাছ থেকে একটা মেয়ে গলা প্রশ্ন করল, কে?

দরজাটা খুলুন।

কেন খুলব?

তাহলে সরে দাঁড়ান। দরজা ভাঙা হবে।

হাবু বাড়ি নেই।

শবরের দ্বিতীয় লাথিতে দরজার খিল আর ছিটকিনি উড়ে গেল। দরজাটা পটাং করে খুলে হাঁ হতেই টর্চ হাতে ভিতরে ঢুকল শবর।

সামনেই একটা মেয়ে। বয়স বেশি নয়, উনিশ-কুড়ি।

তুমি কে?

আমি শেফালি, হাবুর বোন। দাদা বাড়ি নেই।

পথ ছাড়ো।

শবর তড়িৎ পায়ে দু-খানা ঘর ডিঙিয়ে উঠোনে নামল। উঠোনের পিছনে খোলা জমি। শবর মুখ ফিরিয়ে মদনকে বলল, ঘরটা সার্চ করো। ও পালিয়েছে, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

ঠিক আছে স্যার।

শবর তার হোমওয়ার্ক করেই এসেছে। হাবুর সবরকম ঠেক তার জানা। জমিটা পেরিয়ে সে ডান দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় উঠে এল। রাস্তা পেরিয়ে রেললাইন। লাইন পার হয়ে সে একটা নাবালে নেমে স্বাভাবিক পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল।

পাঁচু হালদারের বাড়িটা একতলা। সামনে ঘাসজমি আছে। পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল শবর।

পাঁচু এবার পার্টির নমিনেশন পেয়েছে। ভোটে দাঁড়াবে। ক্ষমতাশালী লোক।

ভিতরে পাঁচুর গলা পাওয়া যাচ্ছিল, তা তুই এখানে এলি কেন?

কোথায় যাব?

বৃন্দাবনের কাছে চলে যা পিছন দিয়ে। পালা।

অত হুড়ো দিচ্ছেন কেন? যাচ্ছি। পুলিশ কি আর আপনার বাড়িতে আসবে?

যত্তো সব ঝামেলা। এখন গিয়ে গা-ঢাকা দে, কাল সকালে দেখা যাবে।

ফালতু আমার ওপর হামলা করছে পাঁচুদা।

এখন যা। কাল সকালে দেখব। যা।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল পিছনদিকে।

পিছনে আধা জংলা পতিত জমি। কয়েকটা বড় গাছ। বৃষ্টি পড়ছিল। হাবু ছুটছিল প্রাণপণে। মাটি পিছল, বিপজ্জনক, পেটে মদের গ্যাঁজলা, ঠিক ব্যালান্স নেই শরীরের।

পিছন থেকে ছায়ামূর্তিটা কখন এগিয়ে এল সে বুঝতেই পারেনি। একটা মজবুত হাত তার কাঁধের কাছে জামাটা চেপে ধরল। তারপর একটা প্রবল ঝাঁকুনি। আপনা থেকেই প্যান্টের পকেটে হাত চলে গিয়েছিল হাবুর। রিভলভারটা ধরেও ফেলেছিল। কিন্তু বের করতে পারল না। তার আগেই একটা বিদ্যুৎগতির ঘুঁসি তাকে শুইয়ে দিল।

মিনিট দশেক পরে দুজনে বৃষ্টির মধ্যেই মুখোমুখি বসা মাটির ওপরেই। জলকাদা থিকথিক করছে। ভিজে ঝুপুস হয়ে যাচ্ছে দুজন।

শবর শান্ত গলায় বলল, বলো।

কী বলব? ও আমাদের কাছে আসত। বন্ধুত্ব করতে চাইত। আমরা কী করব?

বন্ধুত্ব করতে চাইত কেন?

ও চাইত যাতে আমরা ভজন আচার্যর পিছনে না লাগি।

ওর ইন্টারেস্ট কী?

BanglaBook.org

কী আবার! মহব্বত।

বুঝেছি। বলো।

ঘুরে-ফিরে আসছিল। বারবার আসত।

টাকাপয়সা দিত?

না।

তোমরা ওকে কিডন্যাপ করে বাপের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কথা ভেবেছিলে?

না। ওটা আমাদের লাইন নয়।

বলো।

আমার ওকে ভালো লাগত। ওকে চাইতাম। পুরুষচাটা মেয়েছেলে তো।

বুঝেছি। আগে বাড়ো।

মদ খেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই দিন বিকেলে ও গ্যারেজের কাছে আমাকে থাকতে বলেছিল।

কেন?

সেদিন ওর পাঁচুদার কাছে যাওয়ার কথা ছিল।

সেটাই বা কেন?

গ্যারেজ নিয়ে লোকালিটিতে ঝামেলা হচ্ছে তার একটা মিটমাটের জন্য।

সেটা কি ভজনবাবু জানতেন?

বোধহয় না। ভজনবাবু ত্যাঁদোড় লোক, অন্যের সাহায্য নেবে না। মেয়েটাকে পাত্তা দিত না, কিন্তু মেয়েটা ওর জন্য পাগল ছিল।

আগে বাড়ো।

আমি স্কুটার নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওখানে ছিলাম। রিঙ্কু সাইকেলে এসে গ্যারেজে সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমার স্কুটারে ওঠে।

কেউ তোমাদের দেখেনি?

বোধহয় না। গ্যারেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে বাঁয়ে একটা জংলা জমি দেখেছেন তো! ওটা দিয়ে শর্টকাট হয়।

রিঙ্কুকে মদ খাওয়াল কে?

ও নিজেই খেতে চাইল। আমার কাছে ছিল একটা বোতল।

ও খেত নাকি মাঝে-মাঝে?

হ্যাঁ। ইদানীং খেত।

কোথায় খেলে?

ওই জঙ্গলে বসে।

পাঁচুবাবুর বাড়িতে যাওনি?

পাঁচুদা সেদিন ছিলেন না। কলকাতায় গিয়েছিলেন।

সেটা রিঙ্কু জানত?

না। আমি ওকে বলিনি।

কেন?

সেদিন ওকে খুব চাইছিলাম।

কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

ওখানেই—।

রিঙ্কু বাধা দেয়নি?

হ্যাঁ। খুব চেঁচিয়েছিল, খিমচে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আমি পাগল।

BanglaBook.org

কখন মারলে?

প্রথমে মারিনি। ওখানে বসে-বসে ঘণ্টা দুই-তিন দুজনে ড্রিঙ্ক করি। অনেক কথা হয়।

প্রেমের কথা?

ওইরকমই সব। ও আমাকে বলছিল যে ও ভজনবাবুকে ভালোবাসে, তাই কিছু করার নেই। তবে আমার কথা ওর মনে থাকবে—এইসব।

আগে বাড়ো। কখন রেপ করেছিলে?

রাত ন'টা সাড়ে-ন'টা হবে। যখন চেঁচাল তখন মুখ চাপা দিতে হয়েছিল।

আগে বাড়ো।

ও বলেছিল সব কিছু বলে দেবে সবাইকে। আমি ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন শালা আমিও তো মাতাল। কী কথায় কী কথা হল মাথায় কীরকম রক্ত চড়ে গেল।

গলা টিপে?

তাই হবে মনে হয়। কী করেছি খেয়াল নেই। ওখানে বসে আরও মদ খেলাম। রাত একটা নাগাদ বৃষ্টি নামল। তখন নিয়ে গিয়ে মাঠটায় ফেললাম।

লাশটা সরালে কেন?

মনে হয়েছিল ওখানে পুলিশের কুকুর আমার গন্ধ পাবে। মদের বোতলটাও অন্ধকারে কোথায় ছুড়ে ফেলেছিলাম। মনে হল, বোতল পেলে সর্বনাশ।

পুলিশের কাছে কনফেস করবে?

না করলে?

শোনো হাবু, কনফেস করলে তোমার সাজা হবে। যদি বাইচান্স তুমি ছাড়া পেয়ে যাও তাহলেও আমার হাত থেকে বাঁচবে না। আর কনফেস যদি না করো তাহলেও বাঁচবে না। আমি তোমাকে মারবই।

যদি সাজা হয়?

তাহলে আমার কিছু আর করার থাকবে না।

আমাকে রাতটা ভাবতে দিন।

শবর হাসল, পালাবে, না পাঁচুবাবুর বাড়ি যাবে? যা-ই করো, আমার হাত থেকে রেহাই নেই। শুনে রাখো, আমার চেয়ে বড় গুন্ডা এখনও জন্মায়নি। থানায় চলো।

এখনই?

হ্যাঁ। পাঁচুবাবু যদি তোমাকে ছাড়ানোর জন্য কাল সকালে থানায় আসে তাহলে তাকে বোলো, আমার হাতে তাঁর নির্ঘাত মৃত্যু। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উনি আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছিলেন।

খুব ভালো। চলো।

সময় দেবেন না একটু?

না। যা বললাম মনে রেখো।

BanglaBook.org

॥ ছয় ॥

আপনাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেন বলুন তো।

কীরকম?

স্যাড অ্যান্ড ফ্রেস্টফলেন। মনে হচ্ছে কান্নাকাটিও করেছেন।

আপনি আমার এত বড় ক্ষতিটা কেন করলেন শবরবাবু?

ক্ষতি! সে কী! আমি কী করলাম?

মানুষটাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। দিব্যি ছিলাম। কেন আপনি আমাকে ওর কাছে নিয়ে গেলেন?

ম্যাডাম, রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া তো কিছু নয়।

ক'টা দিন ধরে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, সবসময়ে কেমন অস্থির-অস্থির লাগছে।

কেন?

ও রকম মার-খাওয়া চেহারা, ও রকম ভেঙে-পড়া, আর হাতজোড় করে ওই ক্ষমা চাওয়া—কী করে ভুলি। কতবার ইচ্ছে হয়েছে একাই গিয়ে দেখা করি, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করি, কিংবা কী যে সব মাথামুন্ডু ভেবেছি।

এবং কেঁদেছেন।

হ্যাঁ।

কান্নার কী আছে?

বেশ করেছি কেঁদেছি। যে-কেউ কাঁদবে।

শবর হাসল, আর কী হল বলুন। কোনও সিদ্ধান্তে এলেন?

কী সিদ্ধান্তে আসব? আপনাদের মামলা কতদূর?

শেষের দিকে।

তার মানে কী? চার্জশিট দেওয়া হয়ে গেছে?

চার্জশিট তৈরি হচ্ছে।

তাহলে ওর রেহাই নেই?

না। উনি রেহাই পেলেই বা আপনার কী?

তা ঠিক। কিন্তু—।

কিন্তু কী?

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তা তো হতেই পারে। কিন্তু তা বলে তো একজন ক্রিমিনালকে ক্ষমা করা যায় না।

ক্ষমা না হয় না-ই করলেন। অপরাধ করে থাকলে শাস্তি হোক। কিন্তু ওরকমভাবে মারে কেউ?

মানছি মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো মরেই যেত। ভজন আচার্য খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। হার্ডেনড পারসন।

স্বাস্থ্য ভালো বলে বলছেন?

না। স্বাস্থ্যের চেয়েও মজবুত ওর মন। এ কারেজিয়াস ম্যান।

কী লাভ আর তাতে?

লাভ নেই অবশ্য।

কী পানিশমেন্ট হবে ওর বলুন তো! ফাঁসি?

যাবজ্জীবনও হতে পারে।

যাবজ্জীবন তো চোদ্দো বছর, তাই না?

হ্যাঁ। তবে ভালো বিহেভ করলে মেয়াদ কিছু কমে যায়।

কত কমবে?

চার পাঁচ বছরও হতে পারে।

তাও তো দশ বছর। কম কী?

হ্যাঁ। জীবনের সবচেয়ে প্রসপারাস সময়টায় দশ বছর আটক থাকাটা দুঃখজনক।

ওর দোষ কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে?

কিছু ফাঁক তো থাকবেই। তবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

আমি ঠিক করেছি, আপনারা আমাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকলে আমি ওর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলব না।

সে কী ম্যাডাম! আপনি যে ইম্পর্ট্যান্ট উইটনেস!

সেজন্যই আমি উলটো কথা বলব।

কী মুশকিল! আপনার সঙ্গে ওঁর মিট করানোটাই যে ভুল হল।

মিট করালেন কেন? আমার যে কী সর্বনাশ করালেন!

লোকটাকে কি ক্রিমিনাল মনে হয়নি আপনার?

তা বলছি না।

তাহলে কী বলছেন ম্যাডাম?

কী বলছি তা আমিও জানি না। সেই মেয়েটা কি রিঙ্কু?

কোন মেয়েটা?

রতন যার কথা শুনতে পেয়েছিল ওর ঘরে!

ডাউটফুল।

তাহলে একটা লুপ হোল তো আছে।

তা আছে। আমি জিপ নিয়ে এসেছি। আজ যাবেন?

হঠাৎ মুখখানা উজ্জ্বল হল বিভাবরীর। বলল, হ্যাঁ। আমাকে দু-মিনিট সময় দিন।

দু-মিনিট মাত্র! অত তাড়া নেই। মেয়েদের সাজতে একটু সময় লাগে জানি। টেক ইওর টাইম, আমি বসছি।

সাজব! সাজব কেন? জাস্ট পোশাকটা পালটে আসছি।

দু-মিনিটই লাগল। মুখে পাউডারটুকুও না ছুঁইয়ে বেরিয়ে এল বিভাবরী, চলুন।

জিপে বসে শবর বলল, আপনার ভিসিবল চেঞ্জ হয়েছে।

হয়েছে, আমিও তা জানি।

দ্যাটস গুড।

ও এখন কেমন আছে?

বেটার। মাচ বেটার।

ওর যদি যাবজ্জীবন হয় তাহলে গ্যারেজটার কী হবে?

আপনাদের যখন ডিভোর্স হয়নি তখন ওই গ্যারেজের ওপর আপনারও অধিকার আছে।

যাঃ।

আইন তো তাই বলে।

আমি গ্যারেজ নিয়ে কী করব? গাড়ির কিছুই জানি না।

তাই হলে বেচে দিতে পারেন। অনেক খদ্দের আছে। ভালো দামও পাবেন।

পাগল! ও অত সাধ করে গ্যারেজ করেছিল, বেচব কেন?

সেও ঠিক কথা। তা হলে বেচবেন না।

ও কি আমার কথা কিছু বলেছে?

হ্যাঁ।

কী বলেছে?

আপনাকে এই নোংরা মোকদ্দমায় টেনে আনার জন্য ভজনবাবু আমাদের ওপর একটু অসন্তুষ্ট।

ও।

উনি হয়তো আপনাকে এখনও ভালোবাসেন।

কী যে বলেন!

BanglaBook.org

ভুলও বলে থাকতে পারি। আমি তো শুধা মানুষ।

আমি ভাবছি ও রিঙ্কুকে রিফিউজ করল কেন! আর রিফিউজ করে রেপই বা করবে কেন, খুনই বা করবে কেন?

আপনিই বলুন।

আপনারা ভালো করে তদন্ত করেননি।

আপনার ইনস্টিংট কী বলে?

বলে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

আজ উনি অনেকটাই সুস্থ। ওঁকে জিগোস করে দেখবেন।

আমার কাছে বলবে কেন?

কেন তার কোনও কারণ নেই। হয়তো বলবেন।

আমি কিন্তু আদালতে কিছু বলব না ওর বিরুদ্ধে।

মুশকিল।

কিছুতেই বলব না।

তাহলে তো সাক্ষী হিসেবে আপনাকে বাদ দিতে হয়।

তা কেন দেবেন? আমারও তো বক্তব্য আছে।

আপনি যে মামলা কাঁচিয়ে দেবেন।

দেবই তো।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি কি ভজনবাবুর প্রতি সফট হয়ে পড়ছেন?

আমি সিমপ্যাথেটিক। ওকে আমার ক্রিমিনাল মনে হচ্ছে না।

লজিকটা কী?

ওই তো বললাম, যে ওকে বিয়ে করতে চায় তাকে ও হঠাৎ রেপ করতে যাবে কেন?

গুড লজিক। কিন্তু এমন তো হতে পারে সেই রাতের মেয়েটা রিঙ্কু ছিল না!

হতে পারে। আপনারা ঠিকমতো তদন্ত করলেন না যে!

শবর একটু হাসল।

হাসছেন যে!

ইউ হ্যাভ এ লজিক্যাল মাইন্ড।

তার মানে?

মেয়েটা হয়তো রিঙ্কু ছিল না।

প্রমাণ পেয়েছেন?

যদি বলি হ্যাঁ?

কেন হেঁয়ালি করেন বলুন তো! মেয়েটা কে?

শবর গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, আর একজন।

তার একটা নাম আছে তো!

আছে। শ্যামলী।

সে আবার কে?

শুনে শকড হবেন।

প্লিজ! বলুন না।

শোনার আগে সামনের হ্যান্ডেলটা শক্ত করে চেপে ধরুন।

ওমাঃ কেন?

জিপ খোলা গাড়ি। খুব চমকে গেলে যদি পড়ে-টড়ে যান!

আহা, এ-সময়ে কেউ ইয়ার্কি করে? বলুন না।

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য।

ফের।

মেয়েটি বা মহিলাটি রিঙ্কুর মা।

অ্যাঁ।

ইটস এ ফ্যাক্ট।

যাঃ, আপনি একটা যাচ্ছেতাই।

মিস ভট্টাচার্য, শুনতে অদ্ভুত হলেও সত্যি।

কী করে?

লম্বা কাহিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে শ্যামলী একটি দুর্ভাগা মেয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে এবং মা হয়েছিল। স্বামীকে পছন্দ ছিল না। সংসার ভালো লাগত না। সুজিতের সঙ্গে বিয়ের আগের প্রেমটাও ওকে জ্বালাত। কিন্তু যখন সুজিতের সঙ্গে চলে গেল তখনও স্বপ্নটা ফের ভাঙল।

কেন, কী হয়েছিল?

সুজিতবাবুর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। এসব ক্ষেত্রে হয়ও না। খবর পেয়েছি, সুজিতবাবুর একজন মারাঠী মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কোনও একটা সময়ে সুজিতবাবুর বন্ধু ভজনের প্রেমে পড়েন তিনি। ফের একটা ভুল পদক্ষেপ। উনি ভজনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতেন, বিয়ে করার কথা বলতেন।

সুজিতের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে?

না। ওদের বিয়েও হয়নি, ডিভোর্সের প্রশ্ন নেই। দে ওয়্যার লিভিং টুগেদার ইন কানপুর। সুজিতবাবু বিয়ে না করায় ওঁর ইনসিকিউরিটি দেখা দিয়েছিল। সে দিন রাতে উনি একটা এসপার-ওসপার করার জন্য ভজনের গ্যারেজে হানা দেন।

আর সেদিনই রিঙ্কু—।

হ্যাঁ। কোয়াইট কো-ইন্সিডেন্স।

মহিলার কী হবে?

মহিলার বিরুদ্ধে তো কোনও চার্জ নেই।

ভজন শেষ অবধি স্বীকার করেছে?

হ্যাঁ। আমরা এসে গেছি।

এত তাড়াতাড়ি?

হ্যাঁ। আসুন।

ফের সেই সুন্দর বাংলো বাড়িটায় ঢুকল বিভাবরী। সেই ডাইনিং হল।

ও কখন আসবে?

এখনই। আমরা আজও কেউ সামনে থাকব না। ভয় করবে না তো!

ভ্রূ কুঁচকে বিভাবরী বলল, আপনি ভীষণ ইয়ার্কি করেন!

শবর হেসে চলে গেল।

আজ মাত্র একজন সেপাই এসে দরজাটা খুলে দাঁড়াল। দুই ক্রাচ ভর দিয়ে খুব ধীরে ঘরে ঢুকল ভজন। মুখটা নামানো।

আজ ভুল হল না বিভাবরীর। উঠে গিয়ে সে একটা চেয়ার টেনে বের করল। ধরে বসাল। ক্রাচ দু-খানা নিয়ে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে কাছে এসে বসল।

কেমন আছ?

ভজন মাথা নীচু করেই বলল, ভালো।

একটু ভালোই দেখল বিভাবরী। চোখের ব্যান্ডেজটা নেই। স্টিকিং প্লাস্টারও খুলে ফেলা হয়েছে। শুধু মাথার ব্যান্ডেজ আর পায়ের প্লাস্টার আছে। গলার স্বরটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল।

BanglaBook.org

শুনলাম সেই মেয়েটা নাকি রিঙ্কুর মা!

ভজন চুপ করে রইল।

তোমার ওপর দিয়ে কত ঝড় গেল। আমি তোমাকে আজ বলতে চাই যে, আমি তোমার জন্য কষ্ট পাচ্ছি।

ঘেন্না?

না, একটুও না। সেদিন ওভাবে ক্ষমা চাইলে কেন?

মনে হল।

যতবার দৃশ্যটা ভাবি ততবার চোখে জল আসে।

ভজন চুপ।

তোমার কী হবে বলো তো।

ভজন ধীরে-ধীরে তার ম্লান, করুণ, ব্যথাতুর মুখখানা তুলল।

কষ্ট পেয়ো না। আমার বুদ্ধির দোষ।

তোমার দোষ? নাকি পুলিশ মিথ্যে করে সাজিয়েছে?

মিথ্যেটা তো সত্যি হয়নি।

তার মানে?

পুলিশ খুনিকে ধরেছে।

কী বলছ?

হাবু বলে ছেলেটা।

কই, আমাকে শবরবাবু কিছু বলেননি তো।

ভজন একটু হাসল, সারপ্রাইজ দিতে ভালোবাসেন বোধহয়।

ভজনের দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিভাবরী উত্তেজিত গলায় বলল, সত্যি বলছ? সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বিভাবরী। টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল ভজন। কী করবে বুঝতে পারল না।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল শবর।

ম্যাডাম, দি ড্রামা ইজ ওভার।

চোখের জলে মাখামাখি মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টি হেনে বিভাবরী বলল, আপনি কেন বলেননি আমাকে?

আপনি একজন অ্যান্টিরোমানটিক লোককে বিয়ে করেছেন দেখছি। এই সময়ে এঁর তো কিছু রোমান্টিক অ্যাডভানসেস করার সুযোগ ছিল। কিন্তু দেখুন কেমন পাথরের মতো বসে আছেন।

বিভাবরী ঝেঁঝেঁ উঠে বলল, এরকমই ভালো।

ভজনবাবু রিলিজ হয়ে গেছেন। এবার চলুন মিস ভট্টাচার্য।

থাক আর ইয়ার্কি করতে হবে না।

কীসের ইয়ার্কি?

আপনি আমাকে এখন থেকে মিসেস আচার্য বলে ডাকতে পারেন।

BanglaBook.org

ওয়াইকিকি

BanglaBook.org

বুদ্ধদেব গুহ

লেখকের মন্তব্য

উনিশশো পঁচাত্তর সনের প্রথম শীতে ইউএস-এর উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে দিন দশেক কেটেছিল। গেছিলাম ছুটি কাটাতেই এবং হনলুলুর ওয়াইকিকি বীচ-এর 'হলিডে ইন্' মোটেলেই উঠেছিলাম। না জেনেই হাওয়াইয়ের আলোহা-সপ্তাহে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সৌভাগ্যবশত।

কানাডায় মনট্রিয়ালে, হনলুলু যাওয়ার কিছুদিন আগে, এক ভারতীয় রেস্তোরাঁতে, সত্যিই একটি ফুলওয়ালি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাকে বড়ই বেশি ভালো লেগেছিল। কিন্তু সহজবোধ্য কারণে তার নামটা এই উপন্যাসে বদলে দিতে হয়েছে। তাকে ভালোলাগার দাম প্রায় নিজের জীবন দিয়েই দিতে হচ্ছিল। তবুও, তার সঙ্গে আবারও দেখা হলে খুশিই হব।

'ওয়াইকিকি' ওয়াইকিকির অভিজ্ঞতানির্ভর প্রায় বাধ্যতামূলক রহস্য উপন্যাস। এর পটভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি। যেসব পাঠক-পাঠিকা হনলুলু গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

ভবিষ্যতে আর কখনও রহস্য উপন্যাস লিখব কী না, তা নির্ভর করবে পাঠক-পাঠিকাদের এই উপন্যাস সম্পর্কে মতামতের উপর।

এই উপন্যাস শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদেরই জন্যে। বইয়ের প্রচ্ছদেই তার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন প্রকাশক।

BanglaBook.org

হনলুলু

লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্ট থেকে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্লেনটা যখন এক চক্কর ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপরে মেঘ ফুঁড়ে উঠছিল তখন হাওয়াইতে সত্যি-সত্যিই যাওয়া হয়ে উঠল ভেবে বেশ খুশি হয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র মেঘের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্লেন এখন চল্লিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে চলেছে। ওপরে নীল অসীম ব্রহ্মাণ্ড, নীচে মেঘের গালিচা। ঘণ্টা-পাঁচেক লাগবে যেতে। দূরত্ব তিন হাজার মাইল।

পৃথিবীতে যত এয়ারলাইনস আছে তার মধ্যে দেশীয় কোম্পানি হিসেবে ইউ এস এর ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের তুলনা হয় না। যেমন যত্ন, তেমনই খাওয়া-দাওয়ার ধূম। ইকনমি ক্লাসেও পানীয় নিখরচায় পাওয়া যায়। প্লেন ছাড়তে-না-ছাড়তেই এত বড় একটা পটাটো চিপসের প্যাকেট দিয়ে গেল এয়ারহোস্টেস যে ঘাবড়েই গেলাম। সঙ্গে ক্যানবিয়ার। তবু দেখতে-দেখতে চিপস শেষ হয়ে গেল। তারপর লাঞ্চ সার্ভ করার আগে আবার খাদ্য-পানীয়ের ছড়াছড়ি। বিনিপয়সায় পাওয়া যাচ্ছে, তাই একটু শ্যাম্পেন খেয়ে বড়লোকি করে নিলাম।

যখন দূর থেকে নীল জলজ দিগন্তে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ দেখা গেল সবুজে-সবুজ তখন বহুদিন দেশ-ছাড়া সবুজ-পিয়াসী চোখটা আনন্দে নেচে উঠল। বেলা তখন চারটে। প্লেনটা এসে ওআহু (Oahu) দ্বীপের হনলুলুতে নামল। হনলুলু সমস্ত হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

এই দ্বীপপুঞ্জ বিদেশিদের এ-দেশীয় ভাষায় বলা হয় হাওলস। ইংরিজি বানানটা Haoles। প্রথম হাওলস ইংরেজরা। তারপর ফরাসি, আমেরিকান, রাশান ইত্যাদি বহু বিদেশি এই সবুজ স্বর্গে পা রেখেছিলেন। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ডরূপে।

আজকে আরেক অনামা অখ্যাত হাওলস প্লেন থেকে নামবে।

অতিকায় অ্যালবাট্রস পাখির মতো ডি সি টেন প্লেনটা ট্যাক্সিং করে এগিয়ে চলল টার্মিনালের দিকে, ডানায় হাওয়া কাটার সোঁ-সোঁ আর গলা-টিপে-ধরা ইঞ্জিনের ক্ষুব্ধ গুঞ্জরণের সঙ্গে।

হাওয়াইয়ান ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশিরা প্রায় গত দুশো বছর ধরেই কর্তৃত্বের বীজ পুঁতে আসছিলেন ওই দ্বীপপুঞ্জে। প্রথম বিদেশি ইংরেজ ক্যাপ্টেন টমাস কুক, ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথ থেকে সতেরোশো ছিয়াত্তরে সমুদ্র যাত্রা করে কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে এসে টাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফ্রেন্ডলি আইল্যান্ডস ছুঁয়ে তাহিতীতে এসে পৌঁছান।

তারপর তাহিতী থেকে কুক উত্তরে ভেসে এলেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজে। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে, তারিখটা আঠারোই; ডাঙা দেখা গেল প্রথম। আর কী সে ডাঙা। ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় ঝর্নায় পাহাড়ে, প্রজাপতি আর নারীতে সে এক বর্ণ-গন্ধের উষ্ণ দেশ।

সেসব অনেক কথা। অনেক দিনের কথা। মনে করতে গিয়েও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা, হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই সমীচীন ছিল—হাওয়াইনদের কারণেই। কিন্তু উনিশশো আটান্ন সনে যখন আলাস্কা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল তখন যাঁরা হাওয়াইকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন তাঁদের লবি আরও জোরদার হল। অবশেষে উনিশশো পঞ্চান্নর এগারোই মার্চ, সেনেট আলাস্কার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে হবহু এক বিল পাস করলেন হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে।

হনলুলু এয়ারপোর্টটি অতি আধুনিক। এবং বিশাল। হাওয়াই-এর চতুর্দিক থেকে এত লোক এখানে আসেন-যান যে এয়ারপোর্টের বিশালতা সহজেই অনুমেয়। প্লেন থেকে নামার পর বাসে করে আমাকে নিয়ে এসে বাইরের টার্মিনাল বিল্ডিং-এ পৌঁছে দিল। হনলুলু ছাড়া একমাত্র নিউইয়র্কের

BanglaBook.org

কেনেডি এয়ারপোর্টেই এমন দেখেছি। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললাম, ওয়াইকিকি বিচ-এ চলো।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এ বাস থেকে নামতেই অনেক হাওয়াইন মেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরে হাইবিসকাস ফুলের রং-বেরঙের মালা পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানাল। আসলে আমি ফালতু। কোনও এক ডেলিগেশানের মেম্বাররা সেই প্লেন থেকে নেমেছিলেন। মেয়েরা আমাকেও তাঁদের একজন বলে ভুল করে মালা পরাল। ভুল করে হলেও মালা কে না পরতে চায়? মেয়েরা হাসিমুখে কলরোলে বলল, 'আলোহা!' এক চালাক-চতুর সঙ্গী তার উত্তরে বললেন, 'মাহালো!'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে শুনলাম যে, আমি না জেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে উৎসব মুখর সপ্তাহে এসে হাজির হয়েছি। অক্টোবরের শেষে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহ উদযাপিত হয়। হাওয়াইন ভাষায় আলোহা মানে স্বাগতম, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা সব কিছু। আর মাহালো মানে, ধন্যবাদ।

ট্যাক্সিটা চলেছে হু-হু করে। দু-পাশে দোকান আর হোটেল। পরে জেনেছিলাম যে, হাওয়াইতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শপিং-কমপ্লেক্স রয়েছে। এত হোটেলও বোধহয় পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। দেখতে-দেখতে ওয়াইকিকি বিচের পাশে সমুদ্রের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথে এসে পড়লাম। পথের এ-পাশে হোটেল, ও-পাশেও হোটেল। ডানদিকের হোটেলশ্রেণির ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চোখে পড়ছে ওয়াইকিকি বিচের বালি আর নীল জল। আশ্চর্য! আমাদের দেশের সমুদ্রের পারের হাওয়াতে যেমন এক আর্দ্রতা ও নোনা গা-চিটচিটে ভাব থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের হাওয়াতে তেমন দেখলাম না। কারণটা আমার জানা নেই।

হলিডে ইন-এর লবিতে কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকেছি। পোর্টার স্যুটকেশটা হাতে তুলে নিয়েছে। এমন সময় মেয়েলি গলায় কে যেন বলে উঠল, হাই।

চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। এখানে আমার চেনা লোক কে থাকতে পারে? কে ডাকল বুঝতে না পেরে ভাবলাম অন্য কাউকে কেউ ডেকেছে। পোর্টারের পিছন-পিছন এগিয়ে গেলাম। তখন পেছন থেকে হলুদ আর কালো প্রিন্টের ড্রেস পরে একটি মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, হাই! তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না? কী খারাপ তুমি!

চিনতে, হঠাৎ দেখে, সত্যিই পারিনি। মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। পোশাকও একেবারে অন্য ছিল। সত্যিই লারাকে চিনতে পারিনি।

লারা বলল, হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য হিয়ার। আলোহা! বলেই ওর হাতের একটা গাব্দা-গোব্দা পেপারব্যাক বই দেখিয়ে বলল, একা-একা বই পড়ে-পড়ে বোরড হয়ে গেলাম। তুমি এলে ভালোই হল।

পরক্ষণেই বলল, তোমার ঘরের নাম্বার কত?

আমি বললাম, জানি না। তারপর বললাম, তোমার কত?

ও ওর ঘরের নাম্বার বলল। তারপর বলল, ফ্রেশ হয়ে আমার ঘরে চলে এসো। একসঙ্গে চা খাব।

থ্যাঙ্ক উ্য, বলে আমি এগোলাম।

মনে-মনে খুবই খুশি হলাম। সত্যি কথা বলতে কী কানাডার মনট্রিয়ালে এক রাতে লারার সঙ্গে যখন আলাপ হয় সেই রাতের পর থেকে ওর কথা অনেকবার মনে হয়েছে। টোরোন্টো ও মনট্রিয়ালে আমি যে বন্ধুর হেপাজতে ছিলাম তাকে ওর সম্বন্ধে লিখেওছি বিভিন্ন জায়গা থেকে।

এমন হয় না? মাঝে-মাঝে হঠাৎ কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন মনে হয় যেন যুগ-যুগান্ত ধরে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। যেন তাকে দেখা হওয়ার আগেও কতবার স্বপ্নে দেখেছি। এখনও এই ভীষণ ব্যস্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু পৃথিবীতে কত না কত আশ্চর্য সুন্দর দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

BanglaBook.org

লিফট দিয়ে উঠতে-উঠতে লারার কথা ভেবে এবং এখানে ওকে দেখে মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠল। আমি মনে-মনে বললাম, মাহালো।

লারা

আমার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকে সমুদ্র ও তটভূমি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার বাতিগুলো এক-এক করে জ্বলে উঠেছে। সমুদ্রতটে বিকিনি আর স্যুইম স্যুট পরে তখনও জোড়ায়-জোড়ায় মানুষ বসে আছে, চান করছে। দূরে সার্ফ-রাইডিং শেষ করে ফিরে আসছে নারী-পুরুষ। রবারের রং-বেরঙের ইনফ্লেটেড নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের মা-বাবারা তাদের তীরে ফিরে আসতে বলছেন অন্ধকার হয়ে গেছে বলে।

ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে এবং কানাডাতে যেখানেই গেছি চারদিকে জোড়ায়-জোড়ায় মানুষ দেখে কেবলি মনে হয়েছে মানুষ, সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই কি এই সব দেশে যুগলেই জন্মায়? সকলেই এমন সঙ্গী পায় কী করে? সঙ্গীমাত্রই কী মনোমতো? না মন্দের ভালো না কি ওরা একা থাকার আনন্দকে ভুলে গেছে? ভয় পায় কি ওরা মুহূর্তের একাকিত্বকেও? ওদের কাউকেই, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, একা দেখা যায় না।

এসব দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ালে বড় হীনমন্য লাগে। হাওয়াই-এর মতো আলোর দেশে, রঙের দেশে, একা-একা কাউকে ঘুরতে দেখলে লোকে ভাবে পুলিশের এজেন্ট, হাই-জ্যাকার বা টেররিস্ট কিংবা ক্রিমিনাল। সকলেই সন্দেহের চোখে তাকায়। তাও ভালো। কিন্তু অনেকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে। অগ্রাহ্য করাটা অসহ্য।

বাইরে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে কত যে রঙের খেলা। গোলাপি হয়ে আছে সমস্ত আকাশ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওই আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জন্মের গল্প। এ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, রূপকথার গল্প।

হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ আটটি দ্বীপ নিয়ে। সব চেয়ে বড় দ্বীপ হাওয়াই। তারপর মাউই। কাউয়াই, ওআহু, মোলোকাই, নিহাউ আর লানাই। হাওয়াই আর মাউই-এর মধ্যে আরও একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে।

এই প্রত্যেকটি দ্বীপই ভগবানদের সন্তান। পলিনেশিয়ানদের ভগবানদের মা এবং ওদের আলোর দেবতা আকাশে বসবাস করতেন। তাঁদের মিলনের প্রথম সন্তান হাওয়াই দ্বীপ আকাশ থেকে ঝপাং করে জলে পড়ে। মানে, ভূমিষ্ঠ না হয়ে জলস্থ হয়। তারপর আরও দু-বার গর্ভবতী হন ভগবানের মা এবং একই ভাবে মাউই ও কাহুলায়ে দ্বীপের জন্ম হয়।

ওই তিনটি সন্তান জন্ম দেওয়ার পর ভগবানের মা তাহিতীতে ফিরে যান। আলোর ভগবান আকাশেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সঙ্গিনী তাহিতীতে যেতে-না-যেতেই আকাশের ভগবান অন্য একজন নারীর সঙ্গে সহবাস করেন। সেই সহবাসে লানাই দ্বীপের জন্ম হয়। এবং আরেকজন রমণীর সঙ্গে সহবাসে মোলোকাই দ্বীপের জন্ম হয়। কিন্তু অচিরেই আলোর ভগবানের এই দুশ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে ভগবানদের মা তাহিতী থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁর প্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার জন্যে নিজেও একজন পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হন।

আকাশে বিছানা পাতা যেত কিনা জানা নেই। ভগবানদের পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত উড়তে-উড়তেই মিলিত হতেন তাঁরা। যে দৈবিক প্রক্রিয়াতেই তাঁরা মিলিত হন না কেন, পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের ফলে ওআহু দ্বীপের জন্ম হয়।

BanglaBook.org

এর পর ভগবানদের মা ও আলোর দেবতার পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের পরই ভগবানদের মা অন্তঃসত্ত্বা হন। কাউই দ্বীপের জন্ম হয়। তারপর একাদিক্রমে নিহাউ, কাউলা ইত্যাদি দ্বীপের জন্মের পর মা বন্ধ্যা হয়ে যান। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়।

অবশ্য ভূতত্ত্ববিদরা যা বলেন, তার সঙ্গে এই মিষ্টি রোমান্টিক জন্ম ইতিহাস মেলে না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদদের তত্ত্ব নিয়ে এখন নাই-ই বা ব্যস্ত হলাম, তার চেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে লারার ঘরে যাওয়া যাক, লারা কবে এসেছে, কে জানে? যবেই আসুক। এসেছে যে, তাতেই আমি ভীষণ খুশি।

লারার ঘরের সামনের বেল টিপলাম। ভিতর থেকে লারার চাপা গলা শোনা গেল, কাম-ইন্ প্লিজ। আমি দরজার নব ঘোরাবার আগেই ও নিজে এসে দরজা খুলল। বলল, কাম অন্ ইন্।

সাধারণ আমেরিকানরা ও কানাডিয়ানরা প্রচুর ভুল-ভাল ইংরিজি বলে। ইংরেজরাও বলে। ভারতীয় স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও বোধহয় ইংরিজিজ্ঞান ও দেশের অনেকের চেয়ে ভালো। তবে লারা স্বল্পশিক্ষিতা নয়, রীতিমত উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু অন্য সকলেই ভুল বলে তাই চালু হয়ে গেছে অনেক ভুল কথা। আমার যদি টাকা থাকত তবে প্রত্যেক আমেরিকান ও কানাডিয়ানদের নিজের পয়সায় আমি নেসফিল্ড সাহেবের গ্রামারের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান চ্যাপ্টার ফোটো-কপি করে প্রেজেন্ট করতাম।

নিছক আমেরিকান বলে প্রতিপন্ন করার জন্যে আমেরিকানরা এতদিনের ঐতিহ্যময় ইংরিজি ভাষাটার সর্বনাশ করেছে। জাতীয় পোশাক বা খাবার অন্য হতে আপত্তি দেখি না কিন্তু জোর করে একটা ভাষাকে বদলে নিজেদের জাতীয় ভাষা করে নেওয়ার মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে বলেই মনে হয়।

জানালার পাশের সোফায় আমাকে বসাল লারা। ওর ঘরটা আমার ঘরের চেয়ে অনেক বড়। দুপাশে দুটো খাট। অ্যাটাচড বাথ, ড্রেসিং টেবল, একটা সোফাসেট। পুরোপুরি কার্পেটে মোড়া। কালারড মালটি-চ্যানেল টিভি। প্রত্যেক ঘরেই।

রুম-সার্ভিসে টেলিফোন করে চা আনতে দিল ও। বলল, কী খাবে আর?

আমি বললাম, কিচ্ছু না। ইউনাইটেড এয়ারলাইনস যা ফাঁসির খাওয়া খাইয়েছে তা বলার নয়।

লারা হাসল।

মনট্রিয়ালে আমি যখন লারার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন লারার একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ছেলেটি ক্যানাডিয়ান ইনটারন্যাশানালের কুইন এলিজাবেথ হোটেলে কাজ করত তখন।

লারার সামনে বসে ভাবছিলাম। ও একটা কালো ফুল-হাতা ম্যাক্সি পরে ছিল সেই প্রথম দেখার রাতে। কালো বনেট মাথায় দিয়ে, গভীর রাতে লাল গোলাপ ফুল বিক্রি করছিল ও মনট্রিয়ালের ডাউন-টাউনের বারে-বারে। ইংলিশ লিটারেচারে মেজর করছিল তখন ও ইউনিভার্সিটিতে। জাজ-ব্যালের ক্লাস, এবং ওখানকার একটা অ্যামেচার ড্রামা গ্রুপে থিয়েটারও করত। একই সঙ্গে। ওর ব্যক্তিত্বের শালীন, ভদ্র সম্ভ্রান্ততা আমাকে প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ করেছিল। সৌন্দর্য তো করেই ছিল।

এমন ওই সব দেশেই সম্ভব। ইউনিভার্সিটিতে মেজর-করা পরমাসুন্দরী যুবতী মেয়ে রাত বারোটায় ডাউন-টাউনের বারে-বারে ফুল ফিরি করে পড়াশোনার খরচ তুলছে। অথচ তবু কুৎসা রটছে না, আমাদের দেশের আদেখলাদের মতো সুন্দরী মেয়ে দেখেই মান-সম্মান রহিত হয়ে মাছি পড়ার মতো তার ওপর হামড়ে পড়ছে না ধেড়ে মন্দ পুরুষগুলো। কারণ ও দেশের পুরুষরা সেক্স-স্টার্ভড নয়।

ওই প্রথম দেখার পরও আরও দুবার দেখা হয়েছিল লারার সঙ্গে। একবার মনট্রিয়ালেই, একটি বারে। আরেকবার টোরোন্টোতে যখন ও উইক-এন্ডে এসেছিল, গো-গো ডান্স দেখতে গিয়ে।

BanglaBook.org

ওয়েটার চা এনে দিল টি-কোজিতে জুড়ে, ট্রেতে সাজিয়ে।

সুগার-কিউব হাতে তুলে নিয়ে লারা বলল, হাউ মেনি?

আমি বললাম, ওয়ান, থ্যাঙ্ক ইউ।

লারা হাসল। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ নয়। বলো, মাহালো। তারপর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ছোট্ট প্যাকেটটা খুলে দুধ ঢালল আমার কাপে। লেবুর স্লাইস নিল নিজের কাপে।

আমি বললাম, হঠাৎ? হাওয়াইতে এলে?

বাঃ আমার ছুটি যে। তাছাড়া তুমি বোধহয় জানো না ছোটবেলায় আমি আমার মায়ের সঙ্গে এখানে ছিলাম ছ'বছর। তখন হনলুলু অন্য রকম ছিল। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী, মানে আমার সৎবাবার আনারসের ব্যাবসা ছিল ওআহুতে। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি ছড়ানো এখানে।

আমি বললাম, খুব ভালো হল। তুমি তাহলে আমার লোকাল গার্জেন হয়ে যাও। হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখী, আমি যে পথ জানি না।

লারা হেসে উঠল গানটির ইংরিজি তর্জমা শুনে। বলল, তোমাকে এবং মনট্রিয়ালে অন্যান্য ভারতীয়দের দেখে খুব ভালো লাগে আমার। তোমাদের দেশে যাব একবার।

আমি বললাম, এনি টাইম। এবং যদি আসো, বি মাই গেস্ট। আমি তখন তোমার লোকাল গার্জেন হব।

লারা চা শেষ করে বলল, ঘরে বসে কী করবে? চলো ওয়াইকিকির রাস্তা ধরে হেঁটে আসি। ভালো লাগবে। ওয়াইকিকিতেই ইনটারন্যাশানাল মার্কেট সেন্টার আছে একটা বিরাট গাছের তলায়। ওরিয়েন্টাল ট্রি। তুমি নাম জানবে হয়ত। চলো।

আমি উঠলাম। তারপর দুজনে করিডোর দিয়ে লিফটে নেমে, লবি পেরিয়ে এসে পথে পড়লাম।

সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে কিন্তু হাওয়াটা আমাদের সমুদ্রতীরের হাওয়ার মতো অত জোর ও বিরক্তিকর নয়। বালি ওড়ে না। পাঞ্জাবির সঙ্গে পায়জামা লেপ্টে যায় না, শাড়ি উড়ে হাঁটু বেরিয়ে পড়ে না। না! ও সব জ্বালাতন নেই। তাই-ই বোধহয় ওয়াইকিকি পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত সমুদ্রতট—। চান করার, সার্ফ-রাইডিং-এর, ওয়াটার স্কিয়িং-এর এমন জায়গা কমই আছে সারা দুনিয়ায়।

লারা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কত আলো, কত লোকজন। আমাদের দেশের মতো নারকেল গাছ, পামগাছ, বটগাছ। খুব ভালো লাগছিল অনেকদিন পর এসব গাছ দেখে। সমুদ্রের দিকের ফুটপাথে দেবকন্যার মতো দেখতে একটি পনেরো-ষোলো বছরের আমেরিকান মেয়েকে একটি অল্পবয়সি হাওয়াইয়ান ছেলে বটগাছ চেনাচ্ছিল, বলছিল, লুক দিস ইজ আ ব্যানিয়ান ট্রি।

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বটের ঝুরি ধরে টানাটানি করছিল।

ওদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এবং হাওয়াইন ছেলেটির চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে ফিক করে হেসে উঠলাম আমি।

মানে, হাসি চাপতে পারলাম না।

লারা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

বলল, হাসলে কেন তুমি?

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম। আমাদের দিকে অনেকে তাকাল। লারা লজ্জা পেল।

বলল, বলোই না কেন হাসলে?

আমি বললাম, বাংলায় একটা মজার গল্প আছে। এই ছেলেটি মেয়েটিকে যেমন করে বটগাছ দেখাচ্ছিল তাতে আমার সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল।

কী গল্প বলো না? লারা আমার হাতে-হাত ছুঁইয়ে বলল।

BanglaBook.org

আমি বললাম, চাঁদ দেখার গল্প। ছেলেটি মেয়েটিকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখাচ্ছিল, বলছিল, আহা! দেখো কী সুন্দর চাঁদ, কী চাঁদের আলো, আহা।

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি বলে উঠেছিল, বুঝছি-বুঝছি; তুমি আমারে চুমু খাবা। চাঁদের বিকল্প বটগাছ।

এবার লারার হাসির পালা। শব্দ বেশি করছিল না কিন্তু ওর সারা শরীর দুলে উঠছিল হাসির দমকে। এবারও অনেকে তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে।

কিছুদূর গিয়ে আমরা রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাথে উঠলাম। একটা বিরাট বটগাছে নানা রকম আলো দিয়ে সাজিয়েছে। তার ছায়ায়-ছায়ায় কত যে দোকান। পোস্টাফিস, রেস্টুরেন্ট, জামা-কাপড় স্যুভিনির খেলনা, পাগো-পাগো, মু-মু, হাওয়াইয়ান রঙিন প্রিন্টেড শার্ট। দোকানে-দোকানে ছয়লাপ। কী সুন্দর করে যে সাজানো আলোয়-আলোয় সমস্ত জায়গাটা তা বলার নয়। ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ ও বারও আছে।

হনলুলু শহরটা বট, নারকেল, খেজুর, রঙ্গন, করবী, হেনা আর চাঁপা গাছে ভরা। এই সব ট্রপিকাল ফুল-ফলের গাছ পশ্চিমীদের চোখে এক বিস্ময়। যারা এশিয়াতে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে আসেনি কখনও তাদের এই ওরিয়েন্টাল হাওয়াই-এর গন্ধ বর্ণের তীব্র আমেজ মাতাল করে ফেলে।

আমি বললাম, তুমি তো হাওয়াই-এ আগে ছিলে। এই আলোহা উইক কী এক সপ্তাহই? সারা বছরে?

লারা বলল, না, প্রায় মাসখানেক। প্রত্যেক বছর একই সময় হয় না। একটু এদিক-ওদিক হয়। পাঁচটা প্রধান দ্বীপে এক-এক সপ্তাহ করে হয় তাই সবশুদ্ধ পাঁচ সপ্তাহ হয়েই যায়। এই আলোহা ফেস্টিভালের ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে এখানে 'মাকাহিকি' উৎসব হত প্রতি বছর। হাওয়াই-এর সর্দাররা, যাঁদের ভূমিকা ছিল রাজার পরেই; ওই সময় সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন দেবতা 'লোনার' নাম করে। কর-টর আদায় হয়ে গেলে কর-আদায়কারী সর্দাররা এবং সাধারণ করদাতারা সবাই একসঙ্গে মিলে উৎসবে মাততেন দেবতা লোনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে। তখন ওই উৎসবকে থ্যাঙ্কস-গিভিং উৎসব বলত লোকে। 'মাহালো' উৎসব।

তারপরই লারা বলল, তুমি থাকবে ক'দিন?

বললাম, কতদিন আর। ছুটি তো বছরে পনেরো দিনের। তার মধ্যে সাতদিন তো ওয়েস্ট-কোস্ট-এই কাটিয়ে এলাম।

লারা বলল, তাহলে আজ রাতে বসে তোমার জন্যে একটা প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলি। আমিও তো মাত্র কালই এসেছি। কেনেথের আসবার কথা ছিল আজকে। ফ্লাইট নাম্বার জানায়নি বলে এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না। এত জায়গা থেকে এত ফ্লাইট আসে হনলুলুতে যে আন্দাজে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

আমি বললাম, কেনেথ মানে? কেনেথ হচনার? যার কথা তুমি বলেছিলে? তোমার মনট্রিয়ালের বয়-ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ। লারা বলল।

তারপর বলল, আজও যদি না আসে কেনেথ তাহলে রাতে ফোন করবে হয়ত। ও যদি আসে তাহলে তোমাকে আমার পক্ষে বেশি সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমি হাসলাম। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ও এলে, আমি যে এখানে এসেছি তা তোমাকে বুঝতেই দেব না, তোমাদের নির্জনতায় কোনও বিঘ্ন ঘটাবো না আমি।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। নানা রঙা আলোয় ওর হলুদ আর কালো ফুল-ফুল ড্রেসে ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কাঁধ অবধি কালো চুল নেমে এসেছে। ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি যেন। ওর সুন্দর দাঁতের সারি, ওর হাসিতে টোল পড়া গাল, ওর গায়ের হালকা পারফ্যুমের গন্ধ

BanglaBook.org

সব মিলে মিশে আমার নেশা লাগছিল।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি রাগ করলে?

আমি হাসলাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী হাসতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, তুমি আমার কে? তোমার ওপর রাগ করার অধিকার কোথায় আমার?

ও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে আমার হাতে-হাত রেখে বলল, পৃথিবীতে কোনও অধিকারই কেউ নিয়ে জন্মায় না। অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হয়। তুমি বড় বোকা আর সেন্টিমেন্টাল। আজকের দিনের কোনও মানুষের সেন্টিমেন্ট আছে নাকি?

আমি বললাম, নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। সেন্টিমেন্ট না থাকলে মানুষ কি মানুষ থাকে? পশুদের তো সেন্টিমেন্ট নেই। তাহলে পশুদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়?

লারা মুখ ফেরাল আমার দিকে। বলল, জানি না। তবে কথাটা ভাবার মতো। ভাবব এ নিয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আমরা ফিরলাম।

আমরা স্বীকার করি আর নাই-ই করি জেট প্লেনে ওড়া-উড়ি করলে শরীরের ওপর তার এফেক্ট কিছু নিশ্চয়ই হয়। মানুষ মাধ্যাকর্ষণে বন্দি স্থলচর জীব, সে যদি হঠাৎ চল্লিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে ঘন্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে একটা প্রেসারাইজড এয়ারকন্ডিশানড বাক্সে বসে হাজার-হাজার মাইল ছোটাছুটি করে তবে তার শরীরে সেই উড়ুনতুবড়ির যাত্রার কী ফল হয় না-হয়, তা এখনও বোধহয় পুরোপুরি নিরূপিত হয়নি। লম্বা প্লেনজার্নির পর আমার ঘাড়ের কাছে ব্যথা করে, গা ম্যাজম্যাজ করে।

হোটেলের কাছে এসে লারা বলল, কী করবে এখন?

আমি বললাম, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকব পনেরো মিনিট।

লারা বলল, আমিও। ঘেমে গেছি একেবারে।

তারপর তুমি কী করবে? আমি বললাম।

লারা বলল, একটু কাচাকাচি করতে হবে। আন্ডারগার্মেন্টস। তারপর তুমিও চান করে আমার ঘরে চলে এসো।

আমি বললাম, তুমিই এসো না কেন আমার ঘরে। তোমার ঘর তো কেনেথের পায়ের শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমার ঘরেই এসো।

লারা অদ্ভুত চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর দুষ্টুমির হাসি হাসল।

বলল, ঠিক আছে। আমিই আসব।

হোটেলে ঢুকে লারা ওর ঘরে গেল।

হোটেলের নীচেই একটা স্টেশনারি-কাম-ড্রাগ-স্টোর-কাম-পোস্টাফিস আছে। অনেকদিন পর গোল্ড-ব্লক টোব্যাকো পেলাম এই দোকানে। ডিলস পাইপ ক্লিনার। ঘরে এসে টিভি-টা খুলে দিয়ে, জানালার তাকে দু-পা তুলে দিয়ে বসে পাইপ খেলাম কিছুক্ষণ।

তারপর শাওয়ার খুলে দিয়ে খুব ভালো করে চান করলাম। চান-টান সেরে খালি গায়ে একটা হাওয়াইয়ান শার্ট পরে ট্রাউজার গলিয়ে বসে-বসে টিভি দেখতে লাগলাম।

ওয়াল্ট ডিজনির একটা ছবি দেখাচ্ছিল। ইয়ালোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের পটভূমিতে।

ছবিটাতে বুঁদ হয়ে গেছি এমন সময় ফোনটা বাজল।

ভারি, খসখসে গলায় একজন পুরুষ বললেন, মে আই স্পিক টু লারা প্লিজ?

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই?

এখানেই তো থাকার কথা। উনি বললেন, বিদ্রূপের গলায়।

BanglaBook.org

তারপর অভব্যভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে বলুন বিছানা ছেড়ে এসে ফোনটা ধরতে। ফোন ধরতে জামাকাপড় পরার দরকার নেই।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

বললাম, আপনি কে বলছেন?

ভদ্রলোক বললেন, প্লিজ টেল হার ইটস কেনেথ ফ্রম টরোন্টো।

ইতিমধ্যে আমার ঘরের ডোর-বেলটা বাজল।

আমি বললাম, আপনি একটু ধরবেন ফোনটা?

উনি বললেন, না। ধরতে পারা সম্ভব নয়। লারাকে বলে দেবেন যে আমি ফোন করেছিলাম। বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে দরজা খুলে লারাকে বললাম যে, কেনেথ ফোন করেছিল।

লারার চোখ-মুখ খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। ও ফোনের কাছে দৌড়ে এল। এসেই বলল, কই? ছেড়ে দিয়েছে!

লারা হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, আমার ঘর থেকে তোমার ঘরে আসতে গিয়ে লিফটে আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। লিফটটা নীচেই নামছিল, ওর সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম লবিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট গল্প করে সোজা তোমার ঘরে আসছি।

আমি বললাম। আমার ঘরের নাম্বার কী করে পেল কেনেথ?

তাই-ই-ত? অবাক হল লারা।

লারা বলল, ও আমাকে বলেছিল যদি ফোন করে তবে রাত দশটার পর করবে। লারার দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হল।

আমি টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে হোটেলের অপারেটরকে চাইলাম। বললাম, আমার ঘরে একটু আগে টোরোন্টো থেকে যে কল এসেছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন কি না?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল যে, জানে।

বলল, একটু আগে টোরোন্টো থেকে কেউ ফোন করেন হোটেলের রিসেপশানে। বলেন, মিস লারা ডস এই হোটেলে উঠেছেন কিনা। ওঁরা বলেন যে, উঠেছেন। এবং লারার ঘরে কানেকট করে দেন ওঁকে। সেখানে নো-রিপ্লাই হয়। তখন রিসেপশানের মেয়েটি আমার ঘরে কলটি দিয়ে, ও বলে যে আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে বাইরে যেতে দেখেছে তাই লারা ওঁর ঘরে না থাকলে হয়ত আমার ঘরেও থাকতে পারে।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি লারাকে বললাম, অপারেটর যা বলল। কিন্তু কেনেথ আমাকে যেসব কথা বলেছিল তা আর ওকে বললাম না। বলতে খারাপ লাগল।

লারা কথা না বলে ওর ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট অ্যাড্রেস বই বের করে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল চিন্তান্বিত মুখে। এরিয়া কোড তারপর নাম্বার।

তারপরই কেনেথের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিন্তু কী বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না আমি। কারণ ও ফ্রেঞ্চে কথা বলছিল। তবে ও যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছিলাম।

মনট্রিয়ালে যারা থাকে, তাদের ফ্রেঞ্চ না জেনে উপায় নেই। ফরাসি দেশীয় লোকের আধিপত্য সেখানে। কানাডায় যখন কুইন এলিজাবেথ টু এসেছিলেন তখন মনট্রিয়ালে তাঁকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেনি মনট্রিয়ালের লোকেরা। মনট্রিয়াল পুরোপুরি ফ্রেঞ্চ ডমিনেটেড, মনট্রিয়ালের আরেক নাম, প্যারিস অব কানাডা।

কথা বলতে-বলতে, দেখতে-দেখতে লারার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। লারার চোখ জলে ভরে গেল। লারা দু-বার তিনবার রাগত স্বরে বলল, পাঁর্দো? পাঁর্দো? পাঁর্দো?

তারপর নিজের হাতের মুঠি পাকিয়ে নিজের হাঁটুতেই ঘুষি মারতে লাগল।

BanglaBook.org

আমি মিথ্যা অছিলায় বাথরুমে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। জল খেলাম বেসিন থেকে এক গ্লাস। হঠাৎ যখন ঠক করে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেলাম তখন বাথরুম থেকে ঘরে এসে দেখি লারা আমার দিকে পিছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আস্তে ডাকলাম, লারা।

লারা উত্তর দিল না।

আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম, দু-চোখের জলে ওর সুন্দর গোলাপি পোশাকটা ভিজে যাচ্ছে।

আমি বললাম, কোন কুক্ষণে যে এসে তোমার এত বড় সর্বনাশ করলাম।

আমি বললাম, লারা আমাকে ক্ষমা করো। আমার খুবই খারাপ লাগছে।

লারা কথা বলল না।

লারা চোয়ারে বসে পড়ল। বসে, আমার দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর লারা প্রথম কথা বলল।

বলল, কেনেথ যেসব অপমানকর কথা বলছিল তার জবাবে তুমি কিছু বললে না কেন ওকে? আমাকে ও অপমান করতে পারে, আমি এক সময় ওর প্রেমিকা ছিলাম সেই অপরাধে, কিন্তু তোমাকে কোন সাহসে অপমান করল ও?

আমি বললাম, আমি তো কিছু মনে করিনি। তাছাড়া একজন অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে ফোনে ঝগড়া করার মানে কী হত? তাছাড়া তুমি যাকে ভালোবাসো, যে তোমার বন্ধু, তার সঙ্গে আমি কোন নির্বুদ্ধিতায় ঝগড়া করব? আমার কথা তুমি একেবারেই ভেবো না। সে আমাকে দেখেইনি কখনও, আমিও দেখিনি তাকে, তাই মান-অপমানের কথাই ওঠে না।

লারা বলল, আই পিটি হিম। ওকে ভালোবেসেছিলাম বলে আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত, দুঃখিত। ও এত ভীরু যে সোজা কথাটা সোজা করে বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, ও ক্রিস্টিনের খপ্পরে পড়েছে। আমি কী ওকে জোর করে আটকে রাখতাম? জোর করে কি কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে, না কারো ভালোবাসা পেতে পারে?

আমি শুধোলাম, ক্রিস্টিন কে?

লারা বলল, ওদের কোম্পানিতেই কাজ করে। টোরোন্টো যাওয়ার পর থেকেই ও ক্রিস্টিনের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক উইক-এন্ডে ওর অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে, বেড়াতে যায়। কী করব। ভালোবেসেছিলাম বলে দুঃখ পেতেই হবে।

আমি বললাম, লারা শান্ত হও। তুমি ভালো মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে। তোমার কষ্ট দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

লারা চোখ তুলে বলল, কেন? আমি তোমার কে? আমার কষ্ট দেখে তোমার কষ্ট হওয়া ভুল, মিথ্যা। আমার কষ্ট আমি একাই বইতে পারি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই ডোন্ট নিড ইওর সিমপ্যাথি। ফর দ্যাট ম্যাটার আই ডোন্ট নিড এনিবডিজ সিমপ্যাথি।

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, লারা আমি তোমাকে কী-ই বা দিতে পারি? তুমি আমার কেউ নও। কেউ হবে না কোনওদিন। আমিও হব না তোমার। আর এক বছর পরই ফিরে যাব আমি আমার দেশে পড়াশোনা শেষ করে। আমি তোমাকে স্থায়ী কিছুই দিতে পারব না। কিন্তু তা বলে, যা দিতে পারি, একজন মানুষ অন্যজনকে যা দিতে পারে, ভালো ব্যবহার, ভালোবাসা, সমবেদনা, সাহচর্য তাই-ই বা দেব না কেন? আর দিতে গেলে তুমি ফিরিয়েই বা তা দেবে কেন?

কিন্তু আমি মুখে কিছুই বললাম না। চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু বললাম, লারা আমি সত্যিই বড় দুঃখিত। আমি তোমার সর্বনাশ হয়ে এলাম এই হাওয়াইতে। এ বড় লজ্জার।

BanglaBook.org

লারা বলল, তুমি আমার ভালো করবারই কে আর সর্বনাশ করবারই কে? তুমি নিজের ইমপর্ট্যান্স বড় বেশি দিচ্ছ।

তারপরই আমাকে ধমক দেওয়ার মতো করে বলল হঠাৎ, ওয়াচ আউট! অর ইউ উইল হিট দ্যা সিলিং।

একটুক্ষণ পরে চুপ করে বসে থেকে লারা উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করার আওয়াজ হল কটাং করে। দরজার আওয়াজের সঙ্গে ছিটকে এল, গুড নাইট।

পশ্চিমের মানুষরা বড় বেশি আত্মনির্ভরশীল। একটু কম হলে বোধহয় ভালো হত। নিজের সব শোক, দুঃখ, অসুবিধা, সব ওরা একা-একা নিজেরাই বইতে চায়। অন্য কেউ তার হয়ে তা বইতে গেলে অপমানিত বোধ করে। এমন কী পথচলা ক্রাচে ভরকরা পুরুষকে সাহায্য করতে গেলেও সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। এদের চরিত্র আর আমাদের চরিত্র অন্যরকম। পশ্চিমে বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পাই এটা।

আমি অবসন্ন ও বিষণ্ণ বোধ করছিলাম। লারা যদি পুরুষ হত তবে আমি ওর ঘরে গিয়ে থাকতাম আজ রাতে। ওকে ওর এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় সাহায্য করতাম। ওকে হাসাতাম, ওকে নিয়ে বাইরে বেরোতাম, সারা রাত কোথাও কোনও রেস্টুরেন্টে কি নাইটক্লাবে গিয়ে হই-হই করে ওর মনের দুঃখ ভুলিয়ে দিতাম। কিন্তু চাঁদে যখন মানুষ পা দিচ্ছে, পৃথিবী যখন ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ আধুনিকতার আত্মশ্লাঘায় ন্যুব্জ হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই যেহেতু বিধাতা লারার শরীর আর আমার শরীর বিভিন্নভাবে গড়েছেন এই অপরাধে এই মুহূর্তে ওর জন্যে আমার কিছুই করার নেই।

আমার ঘরে কেনেথের কলটা দেওয়াতে বোধহয় ওদের সম্পর্ক যেটুকু ছিল, সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। এ-কথাটা ভেবে আমি এমন স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে তা বলার নয়।

আমি একবার উঠে, আবার টিভি-টা চালিয়ে দিলাম। তারপর জুতোটা খুলে পা-দুটো তুলে খাটের ওপরে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসলাম। সেই ছবিটা আবার শুরু হল, ডগ-ফিড, ক্যাট-ফিডের বিজ্ঞাপনের পর। যে জগত আমার নিজের, যে জগতে গেলে আমি বড় শান্তি পাই, যেখানে মানুষ নেই, নারী-পুরুষের শরীর মনের কোনও রকম বিভ্রাট নেই সেই আদিম অরণ্যের জগতে ফিরে গেলাম ওয়াল্ট ডিজনির ছবি দেখতে-দেখতে।

পুরানো হাওয়াই

কে যেন আমার মাথার কাছে কথা বলছিল, কারা যেন কথা বলছিল। গরমের সময় স্কুল ছুটি হল। আমি বন্ধুদের সঙ্গে বই-খাতা শ্লেট হাতে নিয়ে গ্রামের লাল মাটির পথ বেয়ে ধুলো উড়িয়ে ছায়া ঢাকা আমের বোলের গন্ধে ভরা ঘুঘু ডাকা, ফড়িং-ওড়া মন্থর দুপুরে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম।

এমন সময় আমার পিছনে, পাশে সামনে কারা যেন কথা বলে উঠল।

টুং-টুং-টাং-টুং করে দরজার বেলটা বাজল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি যে অবস্থায় কাল বালিশে পিঠ দিয়ে টিভি দেখছিলাম সেই অবস্থাতেই শুয়ে আছি। খালি পায়েই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। টিভি-টা তখনও চলছিল।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে।

চান করেছে। একটা সমুদ্রের গায়ের রঙের মতো নীল গাউন। প্রসাধন করেছে। ওর সারা শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ উড়ছে। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লারা। বেশ লম্বাও। ওর মাথাটা

BanglaBook.org

আমার বুকের কাছে।

লারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও ঘরে ঢুকল। টিভি-টা চলছে দেখল, আমার বিছানা দেখল, পোশাক দেখল, তারপর কথা না বলে স্যুইচ টিপে টিভি-টা বন্ধ করে দিল। জানালার কাছে গিয়ে পরদা সরাল পুরোটা। এ-ঘরে পুবের রোদ আসে না, পশ্চিমের আসে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ওর বাঁ হাতের ঘড়ির ওপর ডান হাতের তর্জনী রেখে বলল, ক'টা বেজেছে জানো?

ক'টা? আমি বাচ্চাছেলের মতো বললাম।

লারা বলল, ন'টা।

তারপর ও চেয়ারে বসে বলল, কাল সারারাত কী করেছ? ঘুমোওনি? জামাকাপড়ও তো ছাড়োনি, টিভি-টাও চলছিল।

একটু থেমে বলল, কেন? ঘুমোওনি কেন?

আমি বললাম, নাঃ, ঘুমিয়েছিলাম তো। দেখছ না বেশিই ঘুমিয়েছিলাম। দেশ দেখতে এসে কেউ ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে?

কাল রাতে কী খেয়েছ? লারা শুধোল।

আমি বললাম, মনে নেই।

তুমি খাওনি। লারা বড়দির মতো স্নেহ-মাখা গলায় ধমক দিল।

তারপর বিড়বিড় করে নিজের মনে বকল, ইউ সিলি ফুল। ইটস আনবিলিভেবল।

আমি দাঁড়িয়ে স্যুটকেশটা খুলে জামাকাপড়ের চেঞ্জ বের করছিলাম, এমন সময় লারা চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এক দৌড়ে চলে এল, এসে দুটি হাত আমার দু-কাঁধে ছুড়ে দিয়ে ওর মুখটা আমার বুকে রেখে কী সব বিড়বিড় করে বলতে লাগল। সে সব আমার সম্বন্ধে এত ভালো-ভালো কথা যে আমার লিখতেও লজ্জা করছে।

আমি শুধু বললাম, দাঁত মাজিনি, মুখে গন্ধ; দাড়ি কামাইনি আমি।

লারাকে প্রথম দিন দেখেই ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার অনেকানেক রকম আছে। সে এক অন্যরকম ভালোবাসা। যে কেউ কাউকে ভালোবেসেছে কখনও সেই-ই জানে যে ভালোবাসার জন যদি দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন শরীর ও মস্তিষ্ক অবশ হয়ে যায়। তখন ভালো লাগা যা করিয়ে নেয়, তাই-ই করে মানুষ। পুরুষ কী নারী।

লারা শান্ত হয়ে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, এখন শুধুই মুখ-টুখ ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নাও। চলো, লেটস গো ফর আ সুইম। ওয়াইকিকিতে এসে সুইম না করে চলে যাবে তা হবে না।

আমি বললাম, সুইম স্যুট নেই আমার।

লারা বলল, কিনে দেব আমি তোমায়। নীচের দোকানেই পাওয়া যায়।

আমি বললাম, বেশি বড়লোক হয়েছ না? তার চেয়ে চলো তুমি সাঁতার কাটবে আমি বিচে লাল-নীল ছাতার নীচে বসে বিয়ার খেতে-খেতে তোমাকে দেখব। আমিও কাটব সাঁতার, কল্পনায়; তোমার পাশে-পাশে।

বলেই বললাম, তুমি পাঁচ মিনিট বসো। আমি চান সেরে আসছি।

চান-টান করে নিয়ে আমি আর লারা ডাইনিং রুমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। ফ্রুট-জুস, স্ক্রাম্বলড এগস উইথ ব্যাকন। টোস্ট ও কফি।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম বিচে।

চারদিকে কত আনন্দ, কত খুশি, কত রং-বেরঙের স্নানের পোশাক। মোটামোটা আমেরিকান

BanglaBook.org

মেয়ে-পুরুষ সাঁতরাগাছির ওলের মতো জলে ভাসছে, রোদ পোয়াচ্ছে। নৈনিতাল আলুর মতো গোল-গাল জাপানিরাও কম নেই। চেঁচামেচি, জলের মধ্যে উলটো-পালটি, পপ-কর্ণ, নানা রঙা ক্যান্ডি, হট ডগ; কোকাকোলা ও বিয়ারের মোচ্ছব লেগেছে।

হঠাৎ-হঠাৎ রসভঙ্গ করে মাইক্রোফোনে হোটেল থেকে চিৎকার করছে, মিস্টার সো এন্ড সো, কল ফর ইউ ফ্রম নিউইয়র্ক, অথবা টোকিও।

সাহেব প্রশান্ত মহাসাগরের জল থেকে উঠে প্রাগৈতিহাসিক কচ্ছপের মতো থপথপ করে দৌড়ে গেলেন হোটেলে ফোন ধরতে। এদের মিনিটে দশ হাজার ডলার রোজগার বোধহয়। কাজ আর ছুটিকে টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা কখনও আলাদা করতে জানে না—যারা বড় ব্যবসায়ী। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম দেখিনি কোনও।

লারা আর আমি মুখোমুখি বসেছিলাম চেয়ারে। আমাদের চতুর্দিকে নীল সমুদ্র রোদে চিকচিক, সাদা ফেনা, ভেজা-গায়ের ছেলে-মেয়ে যুবতীরা। সানগ্লাসে বড়দের সকলেরই চোখ ঢাকা। এরা কে কোন দিকে চেয়ে আছে এবং কে কী ভাবছে তা বোঝার উপায় নেই। চতুর্দিকে নড়ে-চড়ে বেড়ানো মানুষগুলোকে ঠুলিপরা মনহীন অতিকায় কিলবিলে পোকা বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াইকিকি বিচে বসে, লারার কথাই ভাবছিলাম। পশ্চিমের মেয়েরা শুধু আদর খেতে জানে যে, তাই-ই নয়, আদর করতেও জানে। আমি কোনও বাঙালি মেয়েকে জানি না যে লারার মতো প্রিয়জনকে দৌড়ে এসে এমন করে জমজমিয়ে চুমু খায়। আসলে আমাদের মেয়েরা বড় সংস্কারাবদ্ধ। প্রেমের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে লুকোবার কিছু নেই, মনের মতোই তার বহিঃপ্রকাশ যে বিচিত্র ও মধুর তারা যেন জেনেও জানে না। এতে তারা তো ঠকেই কিন্তু তারা অন্যজনকে যে কতখানি ঠকায় তা তারা নিজেরা কখনও জানতেও পারে না। বহু বিবাহিত বাঙালি পুরুষ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনেছি যে, তাঁদের কোনারক ও খাজুরাহের দেশের স্ত্রীরা তাঁদের সামান্যতম আবদারের জবাবে বলেন, 'আমার দ্বারা হবে না, অন্য মেয়ের কাছে যাও।' সত্যি-সত্যিই যে তাঁরা যান না, এটা তাঁদের স্ত্রীদের যে কত বড় সৌভাগ্য তা স্ত্রীরা জানেন না। এবং এ-বাবদে বাঙালি স্ত্রীদের একতার তুলনা নেই। পুরো জাতটাকে জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিসংবাদী ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও প্রাণহীনতার শিকার করে রেখেছেন তাঁরা তাঁদের সংস্কারাচ্ছন্ন অনুদার মনোভাবে।

আশা করব বাঙালি স্বামী মাত্রই তাঁদের পক্ষ নিয়ে আমার এই সাহস প্রদর্শন সমর্থন করবেন এবং আমাকে স্ত্রীকুলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।

আমি বললাম, বলো লারা তুমি কী খাবে?

লারা বলল, কোক।

আমি বললাম, যখন আমি কানাডাতে গেছিলাম তখন তোমাকে একদিনও সফট ড্রিঙ্কস নিতে দেখিনি। আজ হঠাৎ?

লারা হাসল। নীল গাউনটাতে ওকে লাল-নীল-হলুদ ছাতার নীচে প্রতিসরিত আলোতে এত ভালো দেখাচ্ছিল যে কী বলব।

বলল, তখন আমার চারধারে সব হার্ড পুরুষেরা ভীড় করেছিল। তোমার মতো সফট পুরুষ আমি দেখিনি। যে একজন স্বল্প পরিচিত মানুষের দুঃখে না খেয়ে থাকে—এতখানি ইনভলভড হয়।

তারপর হেসে বলল, আমি সফট ড্রিংকসই নেব।

আমি বললাম, আমিও তাহলে কোকই নেব। এই সবে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলাম।

লারার দিকে তাকিয়ে মনে হল সত্যিই আমি হয়ত ওর কাল রাতের দুঃখের অনেকটাই শুষে নিয়েছি। আজ এই আলো হাওয়া। চারধারের এত আনন্দের মধ্যে কাল রাতের মন খারাপের কথা বোধহয় ও ভুলেই গেছে।

BanglaBook.org

দেখতে-দেখতে ওর চোখে কী সব ভাবনা ভিড় করে এল। মুখটা হাসি-হাসি হয়ে উঠল, চোখ দুটো ভাবালু।

আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম, কোথায় চলে গেলে তুমি? কত দূরে?

ও বলল, জানো, ভাবছিলাম, আজ এখানে কত হইহই, বাড়ির পর বাড়ি, কংক্রিটের রাস্তা, বিজলি আলো—। এই সমুদ্রতটের আজকের চেহারা দেখে পুরোনো হাওয়াই-এর জীবনযাত্রার কথা মনে আনতেও বুঝি রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। তাই না?

তারপর বলল, যে জীবনের কথা আমি বলছি ও ভাবছি সে জীবন অবশ্য আমার চোখে দেখা নয়, বইয়ে পড়া। তখন রাজা প্রথম কামেহামেহা পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হননি। আমি ভাবছি, ক্যাপ্টেন টমাস কুক যে হাওয়াইকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই ঘুমন্ত, সুন্দর, ফুলে-ফলে পাখি, প্রজাপতিতে ঘেরা প্রাকৃত হাওয়াই-এর কথা।

একটি মেয়ে গলায় নরম কাপড়ের বাকলস আঁটা রাজহাঁসের মতো একটা পাখিকে নিয়ে বিচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আমি বললাম, কী পাখি ওটা? কখনও তো দেখিনি?

লারা বলল, নেনে। তুমি জানো না?

আমি শুধোলাম, নেনে পাখি কী পাখি? তুমি তো এখানকার অনেক খবর রাখো।

লারা অবাক হল, বললে, 'নেনে' এখানকার ন্যাশনাল বার্ড। নেনে কিন্তু প্রাণীতত্ত্বের এক উজ্জ্বল আবিষ্কার ও বিস্ময়। এরা আসলে রাজহাঁস ছিল। কিন্তু এই আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত শক্ত লাভার দেশে বসবাস করার জন্যে এবং এদের পায়ের জোড়া পাতাকে বদলে নখের মতো করে ফেলেছে। বড়-বড় রাজহাঁসসুলভ ডানাগুলো স্বল্প দূরত্ব সহজে উড়ে বেড়ানোর জন্যে ছোটও করে নিয়েছে। কতদিনের সচেতন চেষ্টায় এই পাখিরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তা এরাই জানে। তবে প্রকৃতির মধ্যে সম্ভবকে অসম্ভব করার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে এরা। নেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে বড় স্থলচর পাখি। এখন সমস্ত হাওয়াই-এ সাড়ে তিনশো মতো নেনে আছে। তবে ওআহু দ্বীপে নেই। শিকারি আর জংলি জানোয়ারদের দৌরাত্ম্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ওরা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে আইন করে নেনেকে রক্ষা করতে হয়। হাওয়াই-এর মোউনা-লোআ পাহাড়ের ঢালে হুয়ালালাইতে আর হালেআকালা ক্রেটারে এদের জন্যে অভয়াবাস করা হয়েছে। পোষা পাখিদের বাচ্চা হলেও সেই নেনের বাচ্চাদের এই সব অভয়াবাসে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়।

আমি উঠে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আমাদের দুজনের জন্যে দুটো কোক নিয়ে এলাম। লারার কোকটা দিয়ে বললাম, এবার বলো যা বলছিলে। পুরোনো হাওয়াই-এর কথা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার হাওয়াই বেড়ানো বিফল হত। কিছুই জানতে শুনতেই পারতাম না জায়গাটা সম্বন্ধে। কী বলো?

লারা বলল, কেন? ফিরেও জানতে পারতে। বই পড়লেই জানা যায়। জানতে বাহাদুরি কী?

শুধু বই পড়লে এক রকম জানা হয় আর নিজের চোখে দেখলে অন্যরকম।

তা ঠিক। লারা বলল।

আমি বললাম, কথায়-কথায় কথা ঘুরে যাচ্ছে। বল, শিগগির বল।

লারা ওর কোকে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আমরা যেখানে বসে আছি। সমুদ্রের ঢেউ আগে এখান অবধি আছড়ে পড়ত। ওয়াইকিকি সমুদ্রতট কিন্তু মানুষের তৈরি, তা জানো তো। সাঁতার কাটার, স্কিয়িং-এর সুবিধার জন্যে সানসেট বিচ থেকে ড্রেজারে করে বালি কেটে বার্জ-এ করে অনেক বছর ধরে সে বালি বয়ে এনে-এনে এখানের সমুদ্রকে ভরাট করে ওয়াইকিকি তৈরি হয়েছে।

আমি বললাম, তাই-ই বল। এসে অবধি মনে হচ্ছিল কী নেই, কী যেন পাচ্ছি না। খোদার ওপর খোদকারি। এই জন্যেই তো সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিলাম না এর মধ্যে। আমাদের দেশের ফরেস্ট

BanglaBook.org

ডিপার্টমেন্টের কর্তারা যেমন প্রকৃতিকে সুন্দরতর করতে সিমেন্ট দিয়ে পাথর দিয়ে লাল, নীল রং দিয়ে বনপাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বনাশ করেন এরাও দেখছি তাই-ই করেছে। ছিঃ-ছিঃ। ঘেন্না হয়ে গেল ওয়াইকিকির ওপর।

লারা বলল, তুমি রাগছ কেন? তুমি তো আর সাঁতার কাটছ না। ছেলেমেয়ে পরিবার সকলকে নিয়ে সাঁতার কাটার জন্যে সেফ এন্ড সাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে বিচটাকে অগভীর করে। খারাপ কী?

আমি বললাম, যাই-ই হোক। আমি এই মডার্ন ওয়াইকিকির কথা শুনতে চাই না। তুমি পুরোনো হাওয়াই-এর কথা বলো।

একটু চুপ করে থেকে লারা বলতে লাগল, মনে করো, ওই যেখানে কিয়স্ক কফি-বারটা আছে ওখানে একটা খড়ের ঘর। মনে করো, সমুদ্রের ধারের প্রথম ঘর। সকালের সমুদ্র দিগন্ত অবধি রোদে চিকচিক করছে। চারিদিকে কী নির্জনতা। কোলাহলহীন শান্তি। হু-হু করে নারকোল খেজুর পামের মাথায় দোল লাগিয়ে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে। মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটি ছোট মেয়ে আধমাইল হেঁটে গেছিল জঙ্গলের ভিতরের ঝরনাতে কাঠের পাত্রে জল বয়ে আনতে। ঘরের কাছের ঠান্ডা হাওয়াতে তার মা হয়তো পেপার মালবেরির ঝোপের ছাল বাকড় কাঠের ওপর ধোপ দিচ্ছে। 'কাপা' কাপড় তৈরি করবে সে। ছালের ফালিগুলোকে জলে ভিজোনো হয়েছে, শুকোনো হয়েছে রোদে এবং কোটা হয়েছে আগে। এখন শেষবারের মতো ধোপ দেওয়া হচ্ছে ওগুলোকে। একটা চার ফলাওয়ালা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ধোপ দিচ্ছে সে। প্রত্যেকবার আছড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে সেই চারফলার প্রত্যেক ফলায় যে জ্যামিতিক প্যাটার্ন খোদাই করা আছে সেগুলোর ছাপ পড়ছে কাপাতে। মেয়েটির মা কাপা কাপড় ফাঁপা একটা কাঠের ওপর কাঠের একটা ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মারছে।

তার সেই বাড়িমারার ধর-ধর শব্দের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকের উজ্জ্বল সবুজ নিরবচ্ছিন্ন ট্রপিক্যাল বনে-পাতায়। সমুদ্রের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিধ্বনির টুকরোগুলিকে, মিশিয়ে দিচ্ছে পাথরে-পাথরে ছিটকেওঠা সমুদ্রের ফেনিল জলবিন্দু আর হাওয়ার সঙ্গে।

পুরোপুরি ধোপ দেওয়া ও কোটা হয়ে গেলে 'কাপা' কাপড়টি মেলে দেওয়া হবে রোদে শুকোবার জন্যে। আর যদি সময় থাকে তাহলে ওর ওপরে নানা রঙের নক্সাও কাটা হবে।

উলঙ্গ ছোট্ট-ছোট্ট শিশুরা গ্রামের পথে উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। কুস্তি লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে। কেউ-কেউ সগর্বে তার বাবা কি দাদাকে অনুকরণ করছে। পাথর গড়িয়ে-গড়িয়ে কার নিশানা ভালো তার পরখ করছে। বাঁশের চোঁচকে বর্শা মনে করে নিয়ে খেলার লড়াই লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে।

একটু থেমে আরেক ঢোক কোক খেয়ে লারা বলল, হাওয়াইয়ান ছেলেমেয়েরা তখন যখনই হাঁটতে শিখত প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রে যেত। জল কি স্থল দুই-ই তাদের কাছে সমতুল ছিল। চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত এই দ্বীপগুলোর বাসিন্দারা তখন সত্যি-সত্যিই উভচর ছিল বলতে গেলে। জল ও স্থলে ছিল তাদের সমান আয়াস।

মেয়েরা কাজেকর্মে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাঝে-মাঝে যাতায়াতের পথে তারা ছেলেমেয়েদের কাউকে বকে-ঝকে, কাউকে খেপিয়ে চলে যাচ্ছিল। শিশুরা তখন একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল না। তারা আনন্দের বাহক, আনন্দের মধ্যে সৃষ্ট এবং আনন্দের পরিপূরক ছিল।

ওদিকে বিকেলের ভরা রোদে বড় ছেলেরা তাদের ক্যানোটাকে সমুদ্র থেকে তীরে টেনে তুলে একটা নারকোলকুঞ্জের নীচে রাখল বালিতে। তারপর বাড়ির দিকে মুখ করে সকলে একসঙ্গে দৌড়ে আসতে লাগল দুড়দাড় করে। দৌড়বার কারণও ছিল। অনেক মাছ ধরা পড়েছিল। অথচ বছরের ঠিক এই সময়ে বেশি মাছ পাওয়ার কথা নয়। তাই ওদের আনন্দ। ওদের পারিবারিক

BanglaBook.org

ভগবানের কৃপা ছাড়া এত মাছ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপর, ওই যে বড় হোটেলটা দেখছ, ওইখানে সবুজ বনের মধ্যে যে সুঁড়িপথ ছিল তখন সেই পথ দিয়ে বাবা আর একটি বড় ছেলে ক্ষেত থেকে টারো আর যাম নিয়ে ফিরল। এত খাওয়ার যে রীতিমতো ভোজ লাগানো যায়। পুরুষেরা, বাবা ফেরা মাত্র তক্ষুনি 'ইমু' ঠিক করতে লেগে গেল। উনুনকে ওরা ইমু বলতো। যখন কাঠগুলো উজ্জ্বল লাল কয়লা হয়ে উঠল পুড়ে তখন মাছ, যাম আর টারো সবটাই পাতায় মুড়ে পাথরের ওপরের টকটকে লাল আগুনে দিয়ে দেওয়া হল ভাপে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে। একটা মাছকে কিন্তু ইমুতে দেওয়া হল না। সে মাছটা পুরুষরা সকলে মিলে কাঁচা খেল মজা করে। মাথা-ল্যাজা, নাড়িভুঁড়ি, পিত্তি সব সমেত। ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বা একাসনে খাওয়ায় মেয়েদের 'কাপু' ছিল। ছেলেদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই শুধু মেয়েরা খেতে পারত।

আমি বললাম, আগে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাই-ই করত। কাপু মানে কী?

লারা বলল, কাপু মানে মানা, নিষেধ, ট্যাবু। তখন হাওয়াইয়ান সমাজে হাজার-হাজার কাপু ছিল। আড়াআড়ি করে লাঠি রেখে দিত এখানে সেখানে পুরুতরা। সেখানে যাওয়া কাপু ছিল সকলের। কত রকম যে কাপু ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

আমি বললাম, এখন ভাগ্যিস কাপু নেই। থাকলে তুমি আমার সঙ্গে বসে এখানে কোক খেতে পারতে না।

যা বলেছ। হেসে বলল লারা।

তারপর একটু কোক খেয়ে আবার শুরু করল লারা।

এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওকে সেই পুরোনো হাওয়াই যেন হাতছানি দিচ্ছে। প্রথমে শোনার আগ্রহ আমার যত ছিল এখন বলার আগ্রহ ওর তার চেয়ে বেশি।

রান্না হতে-হতে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। তারপর ধীরে-ধীরে সমুদ্রের ওপর পশ্চিম দিগন্তে নিভে গেল। আকাশে যদিও লালের ছোপ তখনও কিন্তু গ্রামের বাড়িগুলোতে প্রায় অন্ধকার নেমে এল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঘুমোবার ঘরে সকলে যে যার মাদুরের ওপর বসে বা শুয়ে পড়ল। মেয়েরা কাপা কাপড় টেনে নিল কাঁধের ওপর রাতের শীতের ভয়ে। মেঝের মাঝখানে একটা শীষতোলা প্রদীপ জ্বলতে লাগল। কিন্তু মোমের তৈরি প্রদীপ নয়। পাথরের থালার ওপরে এক ছড়া কুকুই বাদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রদীপ। এই প্রদীপ থেকে এক আবছা কাঁপা-কাঁপা আলো ঘরময় ছড়িয়ে গিয়ে নাচানাচি করছিল। দেওয়ালে নিজেদের নৃত্যরত ছায়া দেখে চমকে উঠছিল ছেলেমেয়েরা। প্রদীপ থেকে ওঠা ধুঁয়োয় পাতায় ছাওয়া ছাদ আর পাতার দেওয়ালের খাঁজ-খোঁজ ভরে উঠল।

যখন আবহাওয়াটা ঠিক গল্প শোনার মতো হয়ে উঠল তখন ছোটোরা বয়োজ্যেষ্ঠকে ধরত, গল্প বলো। উমির গল্প বলো।

এই অবধি বলে, লারা কোকের গ্লাস শেষ করে ফেলল। ফেলেই বলল, আর না।

আমি বললাম, প্লিজ বলো। তোমার গল্প শুনতে-শুনতে আমি যেন কোথায় চলে গেছিলাম। সে হাওয়াইই দেখলাম না। আর আজ কী এই অ্যামেরিকান হাওয়াই দেখতে এলাম আমি।

বলো, লক্ষ্মীটি বলো, বলে আমি লারাকে অনুরোধ করলাম।

লারা হেসে বলল, আমি কী তোমার ঠাকুরদাদা যে তোমাকে উমির গল্প শোনাব?

আমি হেসে বললাম, শুধু ঠাকুর্দা কেন? তুমি আমার সব, লক্ষ্মীটি।

লারা ব্যাগ থেকে বের করে ওর সানগ্লাসটা পরে নিল। বলল, চোখে বড় চমক লাগছে। রোদটা লক্ষ-লক্ষ পায়ে সমুদ্রের ওপর এমন করে নাচছে না।

BanglaBook.org

আমি বললাম, নাচলে নাচুক, তুমি সানগ্লাসটা খোলো তো। তোমার অমন চোখ দুটো না দেখা গেলে তোমার গল্পের মানেই বুঝতে পারব না আমি।

লারা হাসল। বলল, তুমি লোককে কমপ্লিমেন্ট দিতে জানো বটে।

আমি হাসলাম না। বললাম, আমরা চোখের দেশের লোক। আমাদের অভিধানে চলতি ভাষায় তোমাদের মতো থ্যাঙ্ক ইউ, প্লিজ-এর ছড়াছড়ি নেই। আমরা কাউকে কখনও মুখে বলি না, আই লাভ ইউ। মেক লাভ টু মি তো বলার প্রশ্নই ওঠে না।

লারা চোখ থেকে সানগ্লাসটা নামাতে-নামাতে অবাক গলায় বলল, তাহলে কী করে ওই সব বলো তোমরা?

আমি বললাম, সবই বলি। কিন্তু চোখ দিয়ে বলি। তোমাদের চেয়ে অনেক মিষ্টি করে অনেক লাজুক, নরম, সৌন্দর্যের সঙ্গে বলি। আমরা চোখ দিয়ে কথা বলি। মুখ দিয়ে নয়। চোখের ভিতর দিয়ে কথা শুনিও। তাই আমার সামনে কখনও চোখ ঢেকো না তুমি।

লারা আমার চোখের দিকে চাইল। এই প্রথম ও আমার চোখের দিকে এমন করে চাইল। মুখে অস্ফুটে বলল, ফ্যানটাস্টিক। ইট জাস্ট ডিড নট স্ট্রাইক মি। তোমার চোখ দুটো কী সুন্দর; কী একসপ্রেসিভ।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, এবার আমি সানগ্লাস পরে ফেলব কিন্তু।

তারপর বললাম, আমার চোখ জেলি-ফিশের চোখের মতো জানি আমি। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের চোখ ভারি সুন্দর। তুমি এসো আমাদের দেশে, তোমাকে দেখাব।

লারা বলল, যদিও হিংসে হচ্ছে তবে যাব হয়তো কখনও। একদিন সকালে দরজা খুলে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে।

আমি বললাম, সেই সকালের জন্যে সব রাতে স্বপ্ন দেখব। সত্যিই এসো কিন্তু।

লারা বলল, আমিও সাহিত্যের ছাত্রী কিন্তু কথায় আমি তোমার ধারে কাছে যেতে পারব না।

আমি বললাম, তোমার কোন দুঃখ। কবি-সাহিত্যিকদের নিজেদের কথা নেই বলেই তারা পরের কথা লিখে মরে। তুমিও তো কবিতা। সাহিত্যের অনুপ্রেরণা। তুমি বা তোমরা আছ বলেই তো লেখকরা তোমাদের নিয়ে লিখতে পারেন। এই দুঃখেই তো কখনও লেখক হওয়ার বাসনা নেই। লেখকরা নায়ক-নায়িকার কথাই লেখেন, নিজেরা জীবনে কখনও নায়ক হতে পারেন না।

লারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল। নিজের প্রশংসাটা ওর ভালো লেগেছিল। কার না লাগে?

বলল, তোমার মতো অন্যকে ফ্লাশ করতে আমি কাউকে দেখিনি।

আমি বললাম, ফ্লাশ করবার মতো এমন কাউকে আমিও তো দেখিনি আগে।

লারা হাসতে-হাসতেই বলল, প্লিজ, প্লিজ, তুমি এমন করে বললে কোনও দুর্বল মুহূর্তে বিশ্বাস করে ফেলব এসব কথা।

আমি বললাম, অ্যাই! কথায়-কথায় অন্য কথায় চলে যাচ্ছি কিন্তু আমরা। তুমি উমির গল্পটা বলবে, না বলবে না?

বলছি, বলছি। বলে লারা শুরু করল।

বলল, বলছি শোনো।

অনেক অনেকদিন আগে সমস্ত হাওয়াই-এর রাজা ছিলেন একজন ভারি শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর নাম লিওলা। একদিন তিনি হামাকুয়া জেলার এক গ্রাম্য বুনো জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মেয়েটি তার পিরিয়ডস শেষ হওয়ার পর ঝরনায় চান করছিল। সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তার নাম আকাহি।

আমি এই জায়গায় ফুট কেটে বললাম, ইতিহাসে কি এই রকম অশ্লীল খুঁটিনাটিও লেখা

BanglaBook.org

ছিল? না তুমি বানিয়ে বললে?

লারা লজ্জা পেল।

বলল, বানালে আর ইতিহাস হবে কী করে? তোমার বিশ্বাস না হয়, হনলুলুর লাইব্রেরিতে চলে যাও। সত্য-মিথ্যা জানতে পাবে। হবহু যা পড়েছি তাই-ই বলছি তোমাকে।

আমি বললাম, সরি, বলো, বলো, থেমো না।

ঝরনার পাশে দাঁড়ানো নিরাবরণ আকাহি হঠাৎ রাজাকে ওর দিকে আসতে দেখে বড় ভয় পেয়ে গেল। ভাবল সে নিশ্চয়ই কোনও কাপু ভেঙেছে এবং শাস্তি হিসেবে হয়তো বা তার প্রাণদণ্ডই হবে।

রাজাকে দেখামাত্রই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে না পড়লেই কাপু ভাঙা হত তখন। কিন্তু লিওলার আকাহিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। রাজা সেই ইলিমা ফুলের মতো পেলব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাই তিনি আকাহির ভয় ভেঙে দিলেন।

রাজাকে দেখে আকাহিরও বড় ভালো লেগেছিল। আর রাজা তো সেই সুন্দরীকে দেখা মাত্রই কামাতুর হয়ে উঠেছিলেন। সেই ঝরনারই ধারে, পাখির ডাকের মধ্যে, ফুলের গন্ধের মধ্যে রাজা লিওলা আকাহির সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের অশান্ত কামজ্বরতপ্ত শরীরকে শান্ত করলেন।

পূর্ণ মিলনের পর লিওলা আকাহিকে বললেন যে, তার গর্ভে রাজার সন্তান আসতে পারে। বললেন, যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার আসল বাবার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। আর যদি ছেলে হয় তাহলে রাজার পরিচয় সে পাবে।

এই বলে রাজা তাঁর পরিধেয়র কিছু-কিছু অংশ ও মুকুটের অংশ দিয়ে গেলেন আকাহিকে পুরস্কার ও তাঁর মিলনের স্মারক স্বরূপ।

যথাসময়ে আকাহির সন্তান নিশ্চয়ই হল। এবং ছেলে হল। আকাহি ছেলের নাম রাখল উমি। আকাহির স্বামী অনেকানেক বেচারি স্বামীর মতোই উমিকে নিজের ছেলে ভেবে তার মতো করেই মানুষ করতে লাগল। সাধারণ মানুষের ঘরে ছেলেকে যেমন করে মানুষ করা হত তেমন করেই।

আকাহির স্বামী উমিকে প্রায়ই মারধর করত। একদিন উমি যখন বেধড়ক মার খাচ্ছে তখন আকাহি দৌড়ে এসে তার স্বামীকে বলল যে, উমি তোমার ছেলে নয়, ও রাজা লিওলার ছেলে। এ কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাহির স্বামী বেচারির তো প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। পাছে তার স্বামী আকাহির কথা অবিশ্বাস করে, তাই আকাহি রাজা লিওলার দেওয়া স্মারকগুলো এনে তার স্বামীকে দেখাল।

স্বামী বেচারির অবস্থা আরও শোচনীয় হল।

গল্পের এইখানে আমি হেসে উঠলাম।

লারা বলল, তুমি হাসলে কেন?

আমি বললাম, এবার থেকে বিবাহিত বন্ধুদের বলব যেন সাবধান হয়ে ছেলেমেয়েদের মারধর করে। রমণী জাতকে বিশ্বাস নেই।

লারা বলল, তা তো বলবেই! সব দোষ মেয়েদেরই। তোমরা তো সব সাধুসন্ত। ঝামেলা বাধিয়ে দিয়ে তোমরা ঝাড়া হাত-পায়ে ঘুরে বেড়াও। দোষের ভাগী হয় মেয়েরা; বোঝাও বয়ে বেড়ায়।

আমি বললাম, ঝগড়া কোরো না, গল্প বলো।

তার কিছুদিন পর, অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উমির সঙ্গে তার বাবা রাজা লিওলার মিলন হল।

উমি পরে বিভিন্নরকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রাজা হলেন এবং তার উত্তরপুরুষকে উচ্চবংশমর্যাদা দেওয়ার জন্যে লিওলার এক মেয়েকেই, মানে উমির সৎবোনকে বিয়ে করলেন।

BanglaBook.org

উমি রাজা হয়েও নিজে হাতে সাধারণ লোকদের সঙ্গে কাজ করতেন। চাষার কাজ। জেলের কাজ। হাওয়াই-এর ইতিহাসে মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে উমি এবং উমির রাজত্বকাল নানা কারণে।

অন্যান্য রাজারা তাদের সবচেয়ে প্রিয় মেয়েদের নিয়ে আসতেন উমির কাছে উমির স্ত্রী হিসেবে দান করতে। উমি রানি এবং অরানি কতজনের সঙ্গে যে সহবাস করেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। উমির এতই ছেলেমেয়ে হয়েছিল যে পরবর্তী কালে যদি কোনও সাধারণ লোক বলত যে উমি-আ-লিওলা তাঁর পূর্বপুরুষ নন, তবে অন্য লোকে তাকে পাগল অথবা নীরেট-বুদ্ধি বলে ঠাওরাত।

উমি রূপকথার নয়, সত্যিকারেরই একজন বড়, বিখ্যাত এবং দয়ালু রাজা ছিলেন। হাওয়াইতে তাঁর এবং তাঁর রাজত্বকালের গল্প প্রায় রূপকথাতেই দাঁড়িয়ে গেছে প্রজন্মের মুখে-মুখে ছড়াতে-ছড়াতে। ইংল্যান্ডের কিং আর্থার এবং তাঁর নাইটস অফ দ্যা রাউন্ড টেবলের গল্পের মতো।

আমি যেন তখনও ঘোরের মধ্যে ছিলাম। লারার গল্প শুনতে-শুনতে কোথায় কত শত বছর পিছনে চলে গেছিলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। অতীত থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা করছিল না।

লারাও চুপ করে ছিল। হাওয়ায় ওর চুলগুলো কপালে এসে পড়ছিল।

তারপর লারাকে বললাম, তুমি পার্ল হারবার দেখেছ?

লারা হাসল। বলল, নিশ্চয়ই। তুমিও দেখে যেও।

তারপরই বলল, চলো কোথাও ছায়াতে গিয়ে বসি। রোদটা বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, চলো।

লারা বলল, কয়েক ব্লক হেঁটে গিয়ে ইনটারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারেই যাওয়া যাক। তোমাদের ব্যানিয়ান ট্রির ছায়ায় ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে গল্প করা যাবে। তুমি কোনও স্যুভেনির কিনতে চাও বাড়ির লোকের জন্যে তাহলে তাও কিনতে পারো। অনেকরকম দোকান আছে।

আমি বললাম, স্যুভেনির কিনে দেব কাকে? আর কতবছর পরে দেশে ফিরব তারই ঠিক নেই। এখন কিছুই কেনার মানে হয় না।

তা যা বলেছ। লারা বলল।

আমরা দশ মিনিট হেঁটে গিয়ে বটগাছের ঠান্ডা ছায়ায় ঝিরঝিরে হাওয়ায় এসে বসলাম।

আমাদের দেশে কত গাছ-গাছালি কিন্তু আমাদের মধ্যে কত কম লোকই গাছপালা ভালোবাসি। কলকাতা শহরের বুকে ব্রিটিশরা যেসব গাছপালা পুঁতে গেছিলেন সেই সব গাছ বিনা দ্বিধায় আমরা কেটে ফেলেছি। নতুন গাছ লাগানোর কথা ভাবিনি। গাছ-গাছালি রেখেও যে একটা শহরকে বাড়ানো যায় কী করে তা আমরা সত্যিই জানি না। ভাবলেও খারাপ লাগে।

লারা বলল, বিয়ার খাওয়াচ্ছি আমি তোমাকে।

তুমি?

আমিও খাব। লারা বলল। যেন ও খেলেই ওর দাম দেওয়ার অধিকার বর্তে যাবে।

বেশ লাগছে এই পরিপূর্ণ অবকাশ। পড়াশোনা নেই, কাজ নেই, টেলিফোন নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই—নিরবচ্ছিন্ন ছুটি—শুধু ছুটি।

পশ্চিমের জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে না পড়লে বোধহয় জানতেও পেতাম না যে, ছুটিটা কত উপভোগের। আমরা কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলাতে বিশ্বাস করি না। এদেশের লোকে যখন কাজ করে, শুধুই কাজ করে। কাজের মধ্যে আড্ডা বা খেলা বা রাজনীতি কিছুই করে না। যারা সত্যি-সত্যিই প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে তারাই ছুটির মজা পুরোপুরি পায়। কাজের নিয়মানুবর্তিতা ও নেশা যাকে পায়নি, সে ছুটির আনন্দের গভীরতাও জানে না।

BanglaBook.org

লারা ওর বিয়ারে চুমুক দিতে-দিতে বলল, পার্ল হারবারের ওপরে একটা ফিল্ম দেখেছিলাম ছোটবেলায়। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, মার্লন ব্রান্ডো আর কে যেন...।

আমি বলে উঠলাম, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার। আমিও দেখেছি। কী যেন নামটা? মনে পড়েছে 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি।' তাই না?

ঠিক-ঠিক। লারা বলল।

লারা বলল, সকাল সাতটা পঞ্চান্ন। ডিসেম্বরের সাত তারিখ। ১৯৪১ সন। জাপানি বোম্বাররা টোরা, টোরা, টোরা মেসেজ নিয়ে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের ফাঁক থেকে হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে এল পার্ল হারবারে। তার আগে অত নীচু দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট ফর্মেশানে উড়ে রাডারের চোখ এড়ানোর অমন দুঃসাহসিক চেষ্টা আর কোনও জাতের এয়ার ফোর্সই করেনি। চার হাজার লোক মারা গেছিল সেই আক্রমণে। আর ইউ-এস-এর প্যাসেফিক ফ্লিটের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাপ ছিল না। যখন পার্ল হারবার যাবে তখন দেখতে পাবে অ্যারিজোনা মেমোরিয়াল। ইউ-এস-এস অ্যারিজোনা ছিল ইউ-এস-এর গর্ব। অ্যারিজোনা এবং অন্যান্য অনেক নৌ-জাহাজ একেবারে শেষ করে দিয়েছিল জাপানিরা। পার্ল হারবার বন্ধ করেই জাপান ইউ-এস-এ-কে যুদ্ধে টেনে নামাল তাদের বিপক্ষে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পার্ল হারবার আক্রমণই জাপানের সর্বনাশের সূত্রপাত।

আমি লারাকে বললাম, তুমি যেরকম সন তারিখ মুখস্থ রাখো দেখছি তাতে মনে হয় তুমি ইতিহাসের ছাত্রী, সাহিত্যের নও।

লারা হাসল। বলল, ইতিহাসকে উপেক্ষা করা আর নিজেদের অতীতকে অবজ্ঞা করা একই কথা। ছাত্রী যে বিষয়েরই হই না কেন—ইতিহাস আমাকে ভীষণ টানে। হিসটরি রিপিটস ইটসেল্ফ। সমস্ত জাতের ভবিষ্যৎ তার ইতিহাসের মধ্যেই সুপ্ত থাকে, এতে কোনও ভুল নেই।

বিয়ার খেয়ে আমরা একটু দোকানগুলো ঘুরে-টুরে দেখলাম। লারাকে আমি একটা পাগো-পাগো কিনে দিলাম। সবুজ আর হলুদ হাইবিসকাস ফুলের ছাপ দেওয়া প্রিন্টের কাপড়ের। লারা একটা হাওয়াইন সার্ট কিনে দিল আমাকে। বেগুনি আর জংলা-ফুলের কাজের। একটা দোকানে বাঁশের নানা জিনিস ছিল। টিপিক্যাল হাওয়াইয়ান ডিজাইনের। আমার স্কুলে পড়া ছোট ভাইকে পাঠাবার জন্যে একটা মানি-ব্যাঙ্ক কিনলাম। কাঠের তৈরি, হালকা বাদামি রঙা, অপদেবতার মুখ খোদাই করা তাতে।

কেনাকাটা সেরে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে ফিরে চললাম।

হোটেলে পৌঁছে লারা বলল, দাঁড়াও। তোমাকে একটা বই প্রেজেন্ট করব। হাওয়াই সম্বন্ধে লেখা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের দোকানে ঢুকে লারা বইটা চাইল।

বইটা আমার হাতে দিয়ে লারা বলল, আশ্চর্য কথা কী জানো? হাওয়াইয়ান ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট যে বাছা-বাছা বই-এর বিবলিওগ্রাফি তৈরি করে ওদের মুখপত্র ছাপিয়েছেন তাতে এই বইটিরই নাম নেই। অথচ বইটি কী ভালো!

লিফটের দিকে এগোতে-এগোতে লারা আমার হাত ধরে বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আজ রাতে তোমাকে আমি কাহালা হিলটনে খাওয়াতে নিয়ে যাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, আমার জন্যে তোমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, কেনেথের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হল, আর তুমিই আমাকে খাওয়াবে?

লারা দুষ্টুমি করে হাসল। বলল, সর্বনাশ হল না লাভ হল কে বলতে পারে? আমি মুহূর্তে বাঁচার পক্ষপাতী। মুহূর্তের সমষ্টিই তো জীবন। এই মুহূর্তে সুখী হলেই সব মুহূর্তে সুখী। ভবিষ্যৎ-এর জন্যে বর্তমানকে মাটি করতে আমি কখনওই রাজি নই।

BanglaBook.org

তারপর হঠাৎ, গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, বিশ্বাস করো, আমার মতো সুখী এই মুহূর্তে কেউ নেই।

আমি বললাম, তোমার সুখ যেন স্থায়ী হয়।

লারা বলল, হবে। আমি জানি যে, হবে।

দেবত্বের পরীক্ষা

লারাই বলেছিল যে আবার সন্ধের সময় আমার সঙ্গে দেখা হবে। মধ্যবর্তী সময়ে উই উইল বি অন আওয়ার ওওন।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন এমন স্বেচ্ছারোপিত বিচ্ছেদ?

লারা হেসে বলেছিল, কারণ বিচ্ছেদ মাত্রই মিলনকে মধুর করে।

তারপর বলেছিল, সমস্ত সময় একসঙ্গে থাকলে তুমি বোরড হয়ে যাবে। আমিও হয়ত বা। টু মাচ ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেমপ্ট। তোমার সম্বন্ধে আমি একইরকম মনোভাব নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে। আশা করি তুমি আমার কথা বুঝবে।

আমি বলেছিলাম, বুঝব।

ঘরেই এক প্লেট ফিশ-ফ্রাই আনিয়ে নিয়েছিলাম। লাঞ্চের পর ঘরে শুয়ে-শুয়ে লারার দেওয়া বইটা পড়ছিলাম। সত্যি। আমরা বড় আনইনফর্মড। কোনও দেশ দেখতে আসার আগে সেই দেশ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করে তবেই আসতে হয়। রথের মেলা দেখতে আসার মতো নতুন দেশে এসে পাঁপড় ভাজা খেয়ে আর ঘাড়-নাড়া বুড়ি কিনে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। আমেরিকায় আসার পর থেকে এ-দেশীয় মানুষদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া করে থাকেন তাঁদের এই একজাকটিং অ্যাটিচুডটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে। ফাঁকিবাজী বা অগভীর ব্যাপার-স্যাপারকে এরা বেশ ঘৃণার চোখে দেখে।

বইটা পড়তে-পড়তে সত্যিই তন্ময় হয়ে গেছিলাম।

লারা যে উমি রাজার গল্প করছিল, সেই উমির রাজত্বকালের তিনশো বছর পর মানে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উমির রাজত্বকালের পর হাওয়াইতে আর বিশেষ উন্নতি হয়নি কোনও।

ক্যাপ্টেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজ রেজলুশান ও ডিসকভারি নিয়ে তাহিতী ছেড়ে উত্তরমুখো রওয়ানা হয়েছিলেন। দুটো জাহাজই হুইটবি কলিয়ার্স—। তাদের গতিবেগ ছিল খুবই কম কিন্তু বড় শক্ত পোক্ত জাহাজ। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে রেজুলেশানের লুক-আউট রিপোর্ট করল যে, স্থলচর পাখি দেখতে পেয়েছে সে। নাবিকরা উৎসুক হয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে সামনে চেয়ে রইল। তারপর কচ্ছপের ভিড় দেখা গেল জলে। জাহাজের দুপাশে তারা সরে-সরে যেতে লাগল। এরও পরে যখন সমুদ্রের স্রোতে অনেক বেশি টান লক্ষ করল তখন যেসব পুরোনো নাবিক ছিল জাহাজে তারা নিঃসন্দেহ হল যে ডাঙা আর বেশি দূরে নেই।

আঠারোই জানুয়ারির সকালবেলা দূরে ডাঙা দেখা গেল। কুয়াশার ঘোমটার আড়াল থেকে ফিকে-নীল আর করমচা-লাল পাহাড় আর নরম সবুজ বনানী ঘেরা ওআহু দ্বীপ নাবিকদের অবাক করে দিল। তারা সব জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে রইল সেদিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর মাটির গন্ধে বুঁদ হয়ে।

কিন্তু বিপরীত হাওয়া, পালতোলা জাহাজগুলোকে ওআহু দ্বীপের হাতছানি সত্ত্বেও উত্তরে

BanglaBook.org

ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উত্তরে কানাই দ্বীপ। অন্ধকারে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ দুটো ওই কানাই দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে লাগল।

সেই রাতে কয়েকজন হাওয়াইয়ান তাদের ক্যানোতে থেবড়ে বসেছিল। মাছের জাল ফেলেছিল তারা। ওদের মধ্যে একজন, তার নাম মোআপু, মুখ তুলে হঠাৎ দেখল আলো ঝলমল, দুটি স্বর্গের পাখির মতো সাদা ডানার কী প্রাণী জলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জাল-টাল ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ক্যানো চালিয়ে তীরে ভিড়ল। তারপর পড়ি কি-মরি দৌড়ে গিয়ে তাদের সর্দারদের এই অলৌকিক জলযানের খবর জানাল।

সকাল হতে-না-হতেই ছোট-ছোট ক্যানোতে দাঁড় বেয়ে দলে-দলে হাওয়াইয়ানরা সমুদ্রে ভেসে পড়ল। রেজুলেশান আর ডিসকভারির কাছাকাছি আসার সাহস ছিল না তাদের। তারা দূর থেকে তাদের ক্যানোতে বসে অবাক চোখে জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়িতে শুয়োর, মাছ, মিষ্টি আলু এইসব বেঁধে নবাগন্তুকদের ভেট পাঠাল। বদলে, তাদের ইংরেজরা ধাতুর টুকরো দিল।

হাওয়াইয়ানদের মধ্যে যারা ক্যানো নিয়ে আসেনি তারা তটে মহা ভিড়ভারাক্কার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। পালগুলোকে দেখে কেউ বলল, সূর্যের রশ্মি আটকে গেছে ওখানে। মাস্তুল দেখে অনেকে বলল যে, ওগুলো গাছ, সমুদ্রেও হেঁটে বেড়াচ্ছে।

শেষমেষ ওখানকার যে সর্দার—মানে ছোট রাজা—সে জনাকয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। আর উঠে এসেই তো চক্ষুস্থির। ইংরেজদের মধ্যে কেউ-কেউ তেকোনা টুপি পরে ছিল। হাওয়াইয়ানরা ভাবল যে, মানুষগুলোর মাথাই তিনকোনা। ইংরেজদের পোশাক দেখে ভাবল ওগুলো গায়েরই চামড়া—ঢিলেঢালা হয়ে গেছে এবং মাঝে-মাঝে জিনিসপত্র রাখার থলে আছে সেই চামড়ায়। একজন নাবিক পাইপ খাচ্ছিল। তাকে দেখে হাওয়াইয়ানরা ভাবল যে, সে দেবতা লোনো আগ্নেয়গিরির আগুন মুখে নিয়ে এসেছেন। একটা মরা ষাঁড়ের চামড়া দেখে ভাবল যে, এই হাওলরা মানে বিদেশিরা কু-লঙ্গ কুকুরটাকেই বুঝি বা মেরে তার চামড়া নিয়ে এসেছে। কু-লঙ্গ কুকুর ওদের প্রবাদে আছে যে কুকুর মানুষখেকো। সাদা চামড়ার ক্যাপ্টেন জেমস কুককে দেখে ওরা ভাবল যে ইনি নিশ্চয়ই হাওয়াইয়ানদের পূর্বপুরুষদের কল্পিত রোমান্টিক পলিনেশিয়ান পিতৃভূমি থেকে এসেছেন।

এমন অভ্যর্থনা কুক জীবনে কখনও পাননি।

কুক এই ধনধান্যে পুষ্পেভরা দ্বীপের নাম রাখলেন স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডস। ইংল্যান্ডের তৎকালীন চিফ অ্যাডমিরালিটি আর্ল অব স্যান্ডউইচের উৎসাহেই ক্যাপ্টেন কুক সেবারকার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাই তাঁরই নামে নাম রাখলেন। এদিকে দ্বীপবাসীরা নবাগন্তুকদের পোশাক-আশাক সাজ-সরঞ্জাম দেখে উৎসাহে একেবারে চেগে উঠেছিল। আগন্তুকরা যে কী বড়লোক তাদের কত কী যে আছে! তাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে যা পাওয়া যায় তাই-ই নিতে তারা উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় পুরুত দ্বীপের তিনি মানা করলেন। এই নবাগন্তুকরা মানুষ না ভগবান এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পুরুতমশাই দ্বীপবাসীদের নিরস্ত থাকতে বললেন।

পুরুতমশাই বললেন যে, আগে এদের পরীক্ষা করতে হবে। এমনই এক পরীক্ষা করবেন তিনি, তাতে ওরা মানুষ যদি হয় তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে মানুষ বলে। ভগবান হলে তাও বোঝা যাবে।

পরীক্ষাটা কী?

না, মেয়েছেলে।

পুরুতমশাই বললেন, নবাগন্তুকদের মেয়েছেলে সেধে দিয়ে দেখা যাক ওরা তাদের নিয়ে কী করে। যদি মেয়েদের নিয়ে আমরা যা করি তাই-ই করে তবে যে ব্যাটারা মানুষ এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকবে না।

BanglaBook.org

পরীক্ষা নেওয়া হল।

প্রায় নগ্ন ঝাঁক-ঝাঁক পরম ইচ্ছুক ও উৎসুক নরম ফুলের মতো যুবতী মেয়েরা সাঁতরে এসে জাহাজের দড়ি ধরে জাহাজে উঠে আসতে লাগল। এবং বলা বাহুল্য আগন্তুক ইংরেজরা সেই ভগবান হওয়ার পরীক্ষায় মর্মান্তিকভাবে ফেল করল।

কিন্তু জাহাজে এত মেয়ে দেখে ক্যাপ্টেন কুক চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে তাঁর নাবিকদের মধ্যে অনেকেই সিফিলিস ও গনোরিয়ার রোগি। যাদের অসুখের কথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন তাদের অত্যন্ত আপত্তি সত্ত্বেও আলাদা করে রাখলেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না। অভিসার শেষে মেয়েরা যখন আবার সাঁতরে তীরে ফিরে গেল সেই সুন্দরী হাসি-খুশি পবিত্র মুখগুলির আড়ালে ভবিষ্যতের এক কদর্য ব্যাধির বীজ বয়ে নিয়ে গেল তারা তাদের শরীরে। হাইবিসকাস ফুলের রং-বেরঙা হাসির আড়ালে চোখের জলের বিন্দু টলটল করে উঠল।

শুধু রেজলুশান জাহাজেই একশো বারো জন নাবিকের মধ্যে ছেষট্টি জনের যে ওই ব্যাধি ছিল তা তাদের পে-বুক থেকে জানা যায়। ক্যাপ্টেন কুকের আসার এক বছরের মধ্যে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপে গানোরিয়া ও সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে যায়। এই রোগের কারণে পরবর্তী সময়ে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে জন্মহারও প্রচণ্ডভাবে কমে আসে।

ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজের পালগুলি কূল ছেড়ে সমুদ্রে অদৃশ্য হতে-না-হতেই চতুর্দিকের দ্বীপে এই দ্বীপবাসিরা অদ্ভুত দর্শন আগন্তুকদের আগমনের খবর পাঠিয়ে দিল দূতের মাধ্যমে। সেই পাখির ডাকের মতো ভাষায় কথা বলা পা ঢাকা সাদা লোকগুলোর কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল। বলা হল যে, ওরা আগুন খায় এবং মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ধুঁয়ো উদগীরণ করে।

তার সঙ্গী-সাথীরা দেবত্বর পরীক্ষায় ফেল করলেও হাওয়াইয়ানরা কিন্তু বিশ্বাস করেছিল যে ক্যাপ্টেন টমাস কুক নিজে মানুষ নন, ভগবানই। ভেবেছিল যে উনিই তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান দেবতা 'লোনো'।

এই অবধি পড়ে বইটাকে পেজ-মার্ক দিয়ে রেখে দিলাম। রীতিমতো নেশা লেগে গেছে। মনেই হয় না ইতিহাস পড়ছি বলে।

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই পুরোপুরি বঙ্গসন্তানের মতো এক ঘুম ঘুমিয়ে নেব ঠিক করলাম ভর দুপুরে। রাতে হোটেলে ফিরে আবার পড়ব বইটা।

ঘুমিয়ে যখন উঠলাম তখন প্রায় চারটে বাজে।

কাল থেকে লারার সঙ্গে-সঙ্গে থাকায় হাঁটা-চলা বিশেষ হয়নি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সওনা-বাথ, সাঁতার অথবা স্কোয়াশে গেলে হত। আজকেই খবর নিতে হবে কাছাকাছি কোথায় র‍্যাকেট ক্লাব আছে। আপাতত বড়-বড় পা ফেলে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসা মনস্থ করে চোখমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হলিডে ইন-এর মেইন এনট্রান্স-এর সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা ডানদিকে চলে গেছে সেই রাস্তাতেই পা বাড়ালাম।

অচেনা অজানা জায়গায় একা-একা হাঁটতে আমার ভারি ভালো লাগে। বিশেষ করে ছুটিতে। কত কী যে চোখ ভরে দেখা যায়, কত মানুষজন দোকানপাট।

এই হাঁটায় কোনও গন্তব্যে পৌঁছবার হীনতা নেই। খবরদারি নেই ঘড়ির ওপর। মূল্যবান সময়কে পথের মেজাজের ওপর ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনতাকে পাথেয় করে এই রকম হাঁটার সুযোগ আজকের জীবনে খুব কম মানুষেরই আসে।

হাঁটতে ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ ভালো লাগে এই কারণে যে, হাঁটাই মানুষের আদিমতম ও প্রাকৃততম ব্যায়াম। পায়ে হেঁটেই গুহামানব পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে এসেছে। পায়ে হেঁটেই চাষ করেছে—ফসল ফলিয়েছে। অস্ত্র বানিয়েছে তারা পাথর থেকে, লোহা থেকে, তারপর এই সেদিন পর্যন্তও প্রধানত পায়ে হেঁটেই লড়াই করেছে। পায়ে হেঁটেই মানুষ আর মানুষি অভিসারে গেছে—

BanglaBook.org

আবার মিলনের পর আলো ছায়ার রুটিকাটা গালচের বনপথ ধরে যে যার পর্ণকুটিরে ফিরে এসেছে। তাই হাঁটতে থাকলেই আমি, এই সামান্য একজন মানুষ, মানুষের সার্বিক ইতিহাসের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। দারুন আনন্দিত হই এ-কথাটা ভেবেই।

আমাদের দেশের বাঙ্গালোর শহরের রাস্তাঘাট যেমন, হনলুলুর ভিতরের রাস্তাঘাটও অনেকটা তেমন। পাহাড় ও উপত্যকা সব নিয়েই শহর। এদিকে ওদিকে চলে গেছে পথ উঁচু-নীচু। জুইক-জুইক করে গাড়ি যাচ্ছে। সারা শহরে সর্বক্ষণ একটা মেলা-মেলা ভাব। চিউয়িংগাম চিবোনো আর চকোলেট মুখে আমেরিকানরা। বেঁটে-খাটো ব্যস্ত-সমস্ত দাড়ি-গোঁফহীন ফ্যাকাসে জাপানিরা। হরেকৃষ্ণ কাল্টের গেরুয়া বসনাবৃত শ্বেতাঙ্গিনি সন্ন্যাসিনী পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ধ্বনি তুলে চাঁদা ওঠাচ্ছে। ভাড়া-করা কলগার্লের হাত ধরে সময়ের ওপর জবরদখল নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পয়সা উসুল ও জীবন সার্থক করে চলেছে লাল-নাক, গাব্দা-গোব্দা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো এক ধরনের মানুষ।

মানে, যে যার ধান্দায় এই হনলুলুতে লু-লু করে হনুমানের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও আনন্দে কেউ বাধা দেওয়ার নেই। হুলা-হুলা নাচছে কেউ-কেউ। হুলা-নাচিয়েদের সঙ্গে বা নাচ দেখছে খড়ের ঘাঘরা পরা কদলীকাণ্ডবৎ উরুসম্পন্ন হাওয়াইয়ান মেয়েদের। কেউ বা মাহিলাহি খাচ্ছে কোনও সরাইখানায় বসে। হাওয়াই-এর স্পেশ্যাল মাছের প্রিপারেশান। কেউ বা খাচ্ছে মাই-টাই। হাওয়াই-এর জাতীয় পানীয়। অথবা কেউ বা সন্ধে হব-হব সমুদ্রে গ্লাস-বটম বোটে করে রঙিন কোরাল-রিক দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করছে। অন্য কেউ সঙ্গিনীর সঙ্গে সানসেট ডিনারে বসেছে পালতোলা ছোট্ট নৌকোয় আদিগন্ত সমুদ্রের ওপর, পশ্চিমের আকাশের ক্রিমসন-লাল পটভূমি পিছনে রেখে। ওয়াটার স্কিয়িং করছে কোনও শ্বেতাঙ্গিনি। রোদে পুড়ে যাওয়া তার এক জোড়া বাদামি সুডোল উত্তেজিত স্পন্দিত বুক উথাল-পাথাল হচ্ছে, তীব্র বেগে চলেছে সে সমুদ্রে নীল দুটি স্বর্ণকমল পা-ছুঁইয়ে দ্রুতধাবমান স্পিডবোটের দড়ি ধরে। আবু দাবি বা দুবাইয়ের কোনও বুড়ো ক্ষয়েরি শেখ তার প্রাইভেট এয়ার কন্ডিশানড মোটর বোটে বিশ্বের যাবৎ দেশের তাবৎ কচি-কচি সুন্দরিদের তেল-বেচা টাকা দিয়ে কিনে এনে বোটের খোলে রঙিন মাছের মতো ঢেলে দিয়েছে। মেয়েগুলো এক গামলা রঙিন কই মাছের মতো খলখল-খলখল করছে।

ক্ষয়েরি খচ্চরের মতো শেখ নিজে তার কাঁচঢাকা কেবিনে ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ঢুকুর-ঢুকুর করে দেড় হাজার টাকা দামি বোতলের রয়্যাল স্যালুট হুইস্কি খাচ্ছে। হাওয়াইয়ান সূর্যাস্তর লালিমা দেখে, তাল খেজুড় উট আর তার অফিসিয়াল পয়লা নম্বরী বিবির মুখ এবং মাকাল ফলের মতো লাল মরুভূমির সূর্যাস্তর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে শেখ সাহেবের। তেল-সাম্রাজ্যে এখন সূর্য ডোবে না একদিনও। কিন্তু শেখসাহেব জানেন যে একদিন ডুববে। সব সূর্যই ডোবে একদিন না একদিন। তাই বেলা থাকতে-থাকতে শেখ সাহেব ভোগের চরম করে নিচ্ছেন যাতে বেলা পড়লে হজ যাত্রায় যেতে পারেন পরম নিশ্চিন্তে।

এক রাস্তা দিয়ে ঢুকে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে ওয়াইকিকিতে পড়লাম। তারপর হনহনিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম। বেশ ভালো হাঁটা হল। জামাকাপড় ঘামে ভিজে উঠল। মাথার চুলও। শরীরটা হালকা ও সুস্থ লাগতে লাগল। মন প্রসন্ন।

শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চান করলাম। তারপর জামাকাপড় পড়ে লবিতে নেমে এলাম।

পৃথিবীর যে-কোনও জায়গার আন্তর্জাতিক হোটেলের লবিতে বসে আমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। কত রকম, কত জাতের কত চরিত্রের নারী পুরুষ যে দেখা যায় তা বলার নয়। বসে-বসে তাঁদের লক্ষ করতে এবং তাদের ফেসরিডিং করতে খুব ভালো লাগে আমার।

একটু পর লারা নামল সেজেগুজে। ওকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

লারা হাসল আমাকে দেখে তারপর এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

আমি বললাম, তুমি পাগো-পাগোটা পরলে না কেন?

লারা বলল, কাহালা হিলটনে পাগো-পাগো পরে গিয়ে লাভ কী?

আমি বললাম, তাহলে আমরা যেদিন অন্য কোথাও যাব সেদিন পরো।

লারা একটু অবাক হল। তারপর বলল, বেশ!

লারাও আমার পাশে বসল, সোফায়। তারপর বলল, আমাদের গাড়ি আসবে সাড়ে-ছ'টায়।

কিসের গাড়ি?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

বাঃ রে, হোটেলে যাব না? তোমাকে কি অনাদর করতে পারি? তাই ক্যাডিলাক লিমুজিনের কথা বলে দিয়েছি।

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, তুমি ভেবেছ কী? তুমি কি কোটিপতি ঠাউরেছ নিজেকে?

মোটেই না। তা হলে আর ফুল বিক্রি করে পড়াশুনা করি? কোটিপতি হলে কী আর ভাড়া করা ক্যাডিলাকে তোমাকে চড়াতাম আমি?

আমি বললাম, ইউ আর গ্রেট।

লারা হাসল। টোল পড়ল ওর গালে। বাহারে আঙুলগুলো নেড়ে এক সুন্দর ভঙ্গি করে বলল, নট অ্যাট অল।

লারা রিসেপশানে বলে রেখেছিল। একটি প্রায় সাড়ে ছ'ফিট লম্বা গুণ্ডার মতো নিগ্রো লোক লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে কাঁচের দরজা ফুঁড়ে এসে রিসেপশানে দাঁড়ালেন।

রিসেপশানের মেয়েটি মিস ডস বলে আস্তে ডাকল।

থ্যাঙ্ক ইউ। বলে লারা উঠল। আমিও উঠলাম।

কাঁচের দরজা এখানের সব জায়গাতেই অটোম্যাটিক। দরজার সামনে দাঁড়ালেই 'সুইশ' শব্দ করে দরজা আপনা আপনিই খুলে যায়। ভদ্রলোক বিরাট কালো ক্যাডিলাকের দরজা খুলে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লারা আগে উঠল, তারপর আমি উঠলে দরজা বন্ধ করে দিল শোফার।

ভাঙা-ভাঙা হাসকি গলায় শুধোল লারাকে, হোয়্যার টু? মিস ডস? টু ক্যাসিনো?

মনে হল, লারা একটু বিব্রত হল।

বলল, নো। টু কাহালা হিলটন প্লিজ।

ওক্কে ম্যাম। বলল শোফার।

হু-হু করে চলতে লাগল গাড়িটা।

নিউইয়র্কের শো-রুমে এ-গাড়ি দেখেছি বহুবার। লস এঞ্জেলসেও দেখেছি। গাড়িগুলো এয়ার কণ্ডিশানড এবং হিটেড। যখন যেমন দরকার। একটা গাড়ির দাম ষাট হাজার ডলার। মানে আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মতো। যেমন ভারি গাড়িটা, তেমন নিঃশব্দ গতি, তেমন পিক-আপ। মনেই হয় না যে গাড়িতে বসে আছি আর গাড়িটা অত জোরে চলছে। গাড়িটা এত লম্বা যে মনে হয় ড্রাইভার যেন আমাদের ওপর রাগ করে দূরে গিয়ে বসেছে।

প্রায় মিনিট বারো থেকে পনেরো বেশ জোরে গাড়ি চলার পর আমরা কাহালা হিলটনে গিয়ে নামলাম। শোফার এসে লারাকে দরজা খুলে নামালেন। আমি নিজেই নামলাম অন্য দিকের দরজা খুলে।

হিলটন সমস্ত পৃথিবীতে একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় শহরে হিলটনের একটি করে বা একাধিক হোটেল আছে। প্রথমে শহরের নাম বা জায়গার নাম পরে হিলটন। কাহালা হিলটন হিলটন-এর হোটেলগুলির মধ্যে ছোটখাটই কিন্তু তবুও এই হোটেল সম্বন্ধে বলবার অনেক

BanglaBook.org

কিছুই আছে।

একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই বহুতল হোটেলটি। নিজস্ব তটভূমি আছে এর, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা স্বচ্ছন্দে ও আরামে চান করতে, সার্ফ রাইডিং করতে, ওয়াটার স্কিয়িং করতে পারেন। সমুদ্র থেকে জল পাম্প করে এসে হোটেলের নিজের জলের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও হোটেলের মধ্যে ঝরনা পন্ড ইত্যাদি সব করা হয়েছে। দিনে তিরিশ লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে তোলা হয়। এদের নিজেদের যে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি প্ল্যান্ট আছে তা থেকেই এই হোটেলের বিজলীর প্রয়োজন মেটে। সবচেয়ে কম যে ঘরের ভাড়া বেসমেন্টে—যেখান থেকে আকাশ কী সমুদ্র কিছুই দেখা যায় না—তাই-ই বেয়াল্লিশ ডলার দিনে। আমেরিকান প্ল্যানে। প্রায় চারশো টাকার মতো। বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট।

সবচেয়ে দামি ঘর প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট—দিনে ছ'শো ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার চারশো টাকা।

এসব শুনে-টুনে আমি ভাবলাম যে, এ-হোটেল বুঝি ফাঁকাই থাকে। কিন্তু শুনলাম এখানে থাকতে হলে আগে থেকে রিজার্ভেশন না করে এলে ঘর পাওয়াই যায় না। সবচেয়ে ভালো লাগল হাইড-এওয়ে কটেজগুলো। প্রেমিক-প্রেমিকা নববিবাহিত দম্পতির এবং পরকীয়া প্রেমের নির্বিঘ্ন আশ্রয়।

ঝরনা পেরিয়ে, পুকুরের ওপর ব্রিজ পেরিয়ে এসে আমরা একতলার বিরাট ডাইনিং হল-এ পৌঁছালাম। ডাইনিং হল-এর একদিকটাতে পুরো কাঁচের দরজা। দরজার পরই সমুদ্রের তটভূমি। তারপরই জল।

আমরা বসার পর মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডাইনিং হল-এর সবক'টি চেয়ারই প্রায় ভরে গেল। আমাদের টেবলে শ্যাম্পেন দিয়ে গেল ওয়েটার।

আমি লারাকে বললাম, ব্যাপারটা কী? এত বড়লোকি?

লারা বলল, আমি যে বড়লোক! বড়লোক কী মানুষ টাকায় হয়, বড়লোক হয় মনে।

এমন সময় হঠাৎ ডাইনিং হল-এর সব আলোগুলো নিভে গেল। কাঁচের মাটিসমান দরজাগুলো ইলেকট্রিকালি খুলে গেল। কোনও অদৃশ্য জায়গা থেকে বহুবর্ণ সার্চলাইটের আলো পড়ল সমুদ্রে এবং সমুদ্রতটে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাজনার তালে-তালে সুর মিলিয়ে নানা রঙা হাইবিসকাস ফুলের মালা গলায় পরে রঙিন ফুল-ফুল ছাপা কাপড়ের স্তনবন্ধনী এবং ঘাসের ঘাঘরা পরে জলকন্যারা যেন সমুদ্র থেকে নাচতে-নাচতে উঠে এল বাদামি তটভূমিতে। তারপর হুলা-হুলা নাচতে-নাচতে সোজা সেই খুলে-দেওয়া কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ডাইনিং হল-এর মধ্যে চলে এল। তারপর নাচতে-নাচতেই সোজা স্টেজে এসে উঠল। তারপর শুরু হল তাঁদের নাচ ও গান। নানারকমের।

ড্যানি কাহিলানী বলে একজন রোদ-পোড়া চেহারার সপ্রতিভ জলদকণ্ঠের গায়ক হাওইয়ান গিটার বাজিয়ে আমাদের গান শোনালেন। গলায় দারুণ গভীরতা ছিল ভদ্রলোকের। হাওয়াইতে গিটারের চল খুব। গিটারের উৎসস্থলও বোধহয় হাওয়াই-ই। ঠিক জানি না। তবে অনেকানেক গায়ক, নৃত্যরতা মেয়েদের সঙ্গে গিটার বাজিয়ে গান গাইলেন। মেয়েরা যখন নাচছিল তখন তাদের ঘাসের ঘাঘরা ফুলে-ফুলে উঠছিল—গলার রঙিন হাইবিসকাসের মালা দোল খাচ্ছিল।

শ্যাম্পেন দিয়ে ডিনার শেষ করতে-করতে গান বাজনার মধ্যে কখন যে রাত দশটা বাজতে চলল, হুঁশই ছিল না।

ফেরার সময় ক্যাডিলাক লিমুজিনের পেছনের সিটে বসে লারা আমার হাতটা ওর কোলে তুলে নিয়ে বলল, সময়টা ভালোই কাটল আমাদের! কী বলো?

আমি বললাম, ধন্যবাদ তো তোমারই প্রাপ্য।

BanglaBook.org

তাপরই বললাম, কাল কিন্তু আমার তোমাকে খাওয়ানোর দিন।

লারা হাসল, বলল, বেশ। কোথায় খাওয়াবে?

হাওয়াইয়ান হাটে। আমি বললাম।

হোটেলের রিসেপশানের মেয়েটিকে জিগ্যেস করে আমি হাওয়াইয়ান হাট অর্থাৎ হাওয়াইয়ান কুঁড়েঘরের ঠিকানা যোগাড় করেছিলাম।

লারা বলল, ভালো। খুব মজা হবে। কিন্তু কাল সারাদিন কী করবে?

আমি বললাম, চল একটা ট্যাওর নিয়ে ঘুরে আসি। যাবে? ওহাউ ট্যাওর?

যাব। খুশি-খুশি গলায় লারা বলল।

তারপর বলল, যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাব। আমি এখন তোমারই ইচ্ছাধীন।

ক্যাডিলাকের নিগ্রো শোফার যখন হোটেলের সামনে এসে দরজা খুলে লারাকে নামাচ্ছিল তখন হঠাৎ লক্ষ করলাম তার কাঁধের ওপরের ফ্ল্যাপে ডি-আই-আই এই তিনটি অক্ষর লেখা।

লারা নামতেই শোফার তাকে বলল, ম্যাম, এনি মেসেজ ফর বস?

লারা অপ্রতিভ মুখে তাড়াতাড়ি বলল, নো! থ্যাঙ্ক ইউ!

শোফার গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে লবিতে উঠতে-উঠতে বললাম, ডি-আই-আই মানে কি? এরা কি ট্রাভেল এজেন্ট? না ট্যাওর কোম্পানি?

লারা কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কে জানে? হবে ওইরকমই কিছু। ভাড়াগাড়ি সম্বন্ধে আমার কোনও ঔৎসুক্য নেই।

হঠাৎ আমার মনে হল, যখন ঝকঝকে পালিশ করা কালো হিরের মতো কালো ক্যাডিলাক গাড়িটা চলে যায় তখন যেন তার নাম্বার প্লেটে প্রাইভেট গাড়ির নম্বর দেখেছিলাম। ট্যাক্সির নয়।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে লারা লিফটের দিকে এগোতে-এগোতে বলল, কী ভাবছ?

কিছু না। আমি বললাম।

মাঝে-মাঝে তুমি এত গম্ভীর হয়ে যাও যে ভালো লাগে না। লারা বলল।

আমি বললাম, সরি।

লারা বলল, আমার ঘরে চল। কফি খেয়ে যাবে অথবা একটা কনিয়াক। নাইটক্যাপ।

আমি ওর সঙ্গেই ওর ঘরে গেলাম।

রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিয়ে যখন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও, তখন আমি বললাম, শোফার তোমাকে কী বলছিল নামবার সময়?

লারা চমকে উঠল। তারপর বলল, কী জানি? ওর বস-এর কথা বোধহয়। বুঝলাম না কী বলল।

কনিয়াকটা শেষ করে আমি উঠলাম। বললাম, গুড নাইট। ও উঠে এসে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল, ওন্ট উ্য কিস মি গুড নাইট?

বলেই দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল। আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম। ও কীরকমভাবে যেন চুমু খেল আমাকে। ওর জিভটা আমার মুখের মধ্যে ঠেলে দিল। গা-শিরশির করে উঠল আমার ভালো লাগায়।

আমার ঘরে ফিরে আসতে-আসতে ভাবছিলাম কোনও বাঙালি মেয়ে কি লারার মতো চুমু খেতে জানে? বোধহয় না। নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। কারণ দেশ ছেড়ে আসার আগে কারোরই চুমু পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

BanglaBook.org

গোল্ডেন প্লোভার

কোন অজানা কাল হতে প্রতি শীতে ঝাঁকে-ঝাঁকে একরকম পাখি উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে উড়ে আসত প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। তারা আজও আসে। আবার গরমের সময় দক্ষিণ ছেড়ে উড়ে যায় তারা আলাস্কায়, সাইবেরিয়ার দক্ষিণ দিগন্তে। পাখিগুলোর গায়ের রং নরম ক্ষয়েরিতে মেশা সোনালি। তাদের নাম গোল্ডেন প্লোভার।

প্রতি শীতে তারা দু-হাজার মাইল পেরিয়ে হাওয়াইতে আসত। কোনও-কোনও ঝাঁক তারও দক্ষিণে চলে যেত আরও হাজার-দুই মাইল পেরিয়ে গিয়ে পলিনেশিয়ার নানা দ্বীপে। কেউ জানে না কত শতাব্দী ধরে এই গোল্ডেন প্লোভার পাখিরা তাদের বাৎসরিক যাত্রায় বেরোচ্ছে।

এই পাখিগুলোর বাৎসরিক যাত্রা নিশ্চয়ই পলিনেশিয়ানদের চোখ এড়ায়নি। তারা ভাবত যে পাখিগুলো যখন প্রতিবছর উত্তর থেকে উড়ে আসে এবং আবার গরমের শুরুতে উত্তরে ফিরে যায় তখন নিশ্চয়ই উত্তরে স্থলভূমি আছে। হাওয়াই-এর আবিষ্কারে গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের ভূমিকা বড় কম নয়।

হাওয়াইয়ানদের পূর্বসূরী কারা তা নিয়েও কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। নানা মুনির নানা মত।

উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী-ওরিয়েন্টেড ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ইজরায়েলের দশটি হারিয়ে যাওয়া উপজাতি থেকে হাওয়াইয়ানদের উৎপত্তি। ডঃ পিটার ব্লাক বিখ্যাত পলিনেশিয়ান অ্যান্থ্রপলজিস্টের ধারণা যে পলিনেশিয়ান ভাষার শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি হয়েছে মিশর মেসোপটেমিয়া এবং বালুচিস্থান থেকে। এবং খুবই উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের ভিরহিয়া নামক জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে-হতে কয়েকদল লোক বর্মা হয়ে, থাইল্যান্ড হয়ে, মালয় উপকূলে এসে পৌঁছয়। এবং সেখান থেকে আবার শত্রুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে এই বসবাসযোগ্য আশ্চর্য ভূখণ্ডের হদিস পায়। তারা যখন হাজার-হাজার বছর ধরে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশের মধ্যে দিয়ে পালাতে থাকে তখন বিভিন্ন দেশীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের বিবাহ বন্ধন হয়। এই প্রক্রিয়াতে তাদের শারীরিক চেহারা মানসিকতা এবং চারিত্রিক বিশেষত্ব সবই পাল্টে যায়।

আরেকদল ঐতিহাসিকের ধারণা যে, পলিনেশিয়ানরা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কূল ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার দিকে চলে আসে।

আসলে যেখান থেকেই হাওয়াইয়ানরা এসে থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই যে ইন্দোনেশিয়াকেই তারা জাম্পিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যে-কোনও কারণেই হোক, ইন্দোনেশিয়ায় তারা না থেকে পূবে পলিনেশিয়াতে এসে হাজির হয়।

উনিশশো আটাত্তরের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন কুক আবার হাওয়াইন আইল্যান্ডস-এ ফিরে আসেন। তাঁরা ফেরার পথে প্রথম যে দ্বীপ চোখে পড়ে তাঁর, তা হচ্ছে মাউই। কিন্তু মাউই-এর উপকূল প্রস্তরসঙ্কুল ও এবড়োখেবড়ো বলে সেখানে নোঙর করা হয় না। তাই দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে গিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মূল ভূখণ্ড হাওয়াইতে এসে পৌঁছন কুক। কূল দিয়ে যখন কুক ভেসে চলেছেন তখন সমস্ত কূল জুড়ে কৌতূহলী উৎসুক দ্বীপবাসীরা দাঁড়িয়ে। জাহাজ দুটো হামাকুয়া কূলের সবুজ পাহাড়ি ঢাল ও খাড়া নীচু উপত্যকার পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। দূরে মাথা উঁচু করা বরফ-ঢাকা মউনা-কিয়া পাহাড়ের চুড়োটা দেখা যায়। আরও এগিয়ে চওড়া ইংরিজি 'ভি' আকারের হিলো উপসাগরের পাশ দিয়ে চলে যান কুক।

ওইখান থেকে দূরের আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত কালো লাভায় ঢাকা পুনা আর কাউজেলার ভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে দক্ষিণপ্রান্তে ঘুরে ছিমছাম নিস্তরঙ্গ কোনও কূলে এসে পৌঁছন। তবুও নোঙর করতে ভীষণ বেগ পেতে হয়। অতি ধীরে-ধীরে জাহাজ দুটো নোঙর করার জন্যে

BanglaBook.org

কূলের কাছে এগোতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজে নাবিকদের একাকীত্ব ঘুচে যায়। দলে-দলে মেয়েরা সাঁতরে এসে দড়ি ধরে ওপরে উঠে আসে। এবং ওপরে উঠে নাবিকদের সবরকম খুশি করে।

মাউই দ্বীপেও এরকমভাবে মেয়েরা দড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছিল কিন্তু ক্যাপ্টেন কুক তাদের অনুমতি দেন না। ডঃ স্যামওয়েল, জাহাজের ডাক্তার লিখে গেছেন যে তাতে মেয়েগুলো প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে তাদের সাধুসঙ্গ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করে।

আগেই বলেছি, হাওয়াইতে ক্যাপ্টেন কুককে ভগবান লোনো বলে মেনে নিয়েছিল দ্বীপবাসীরা। তাঁর জাহাজের উঁচু মাস্তুল ও সাদা পালগুলোকে দ্বীপবাসীরা ভগবান লোনোর উঁচু দণ্ড ও কাপা কাপড় বলে জানত। তাছাড়া কুক দু-দুবারই মাকাহিকি উৎসবের সময়ে হাওয়াইতে উপস্থিত হওয়ায় কুকের লোনোত্বে দ্বীপবাসীদের কোনওই সন্দেহ ছিল না।

সেবারও ক্যাপ্টেন কুক-এর জন্যে আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার অভাব হয়নি কোনও। খাবার-দাবার, ফল মূল, শুয়োর এবং নাবিকদের জন্যে অগণিত মহিলাকুল কিছুরই কমতি ছিল না। কিন্তু সমস্ত অভ্যর্থনার মূলে ছিল কুকের তৎকালীন লোনোত্ব।

তাঁদের থাকাকালীনই অবশ্য দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগরূক হয়েছিল দ্বীপবাসীদের, বিশেষ করে পুরুতদের মনে। কোয়ালাকুয়া উপসাগরে নোঙর করার দু-সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের একজন সহকর্মী উইলিয়াম ওয়াটম্যান মারা গেলেন। ওয়াটম্যানকে ক্রিশ্চিয়ান মতানুসারে কবর দেওয়া হল। নৌসেনারা গার্ড অব অনার দিল ওয়াটম্যানকে। বন্দুক উলটো করে ধরে তারা ইউনিয়ন জ্যাক মোড়া ওয়াটম্যানের কফিনের সামনে-সামনে শোভাযাত্রা করে গেল। কিন্তু ওয়াটম্যানের মৃত্যু দ্বীপবাসীদের কাছে একটা কথা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল যে সাদা চামড়ার এই বিদেশীরা অমর নয়। অন্যান্য মরণশীল মানুষের মতো তারাও মরণশীল।

ওয়াটম্যানের কবরে দ্বীপবাসীরা একটা শুয়োর দিতে চেয়েছিল আহুতি হিসেবে তাদের প্রথানুযায়ী। কুক বারণ করেছিলেন। কিন্তু তারা ভরা রাতের প্রাঞ্জল অন্ধকারে কয়েকজন বয়স্ক হাওয়াইয়ান ওয়াটম্যানের কবরের ওপরে উঠে বসে। তারপর কবরের ওপর তারা একটা শুয়োর মারে। ছোট্ট আগুন করে শুয়োরটার নাড়িভুঁড়ি সেই আগুনে ফেলে শুয়োরটার মড়িটা কবরের ওপরে ফেলে রেখে যায়।

বিদেশিদের সম্বন্ধে দ্বীপবাসীদের মনোভাবের পরিবর্তনের আরও একটা বড় কারণ হয় তাদের কাপুর পর কাপু ভাঙ্গা। হাওয়াইতে কাপু ভাঙ্গা যে ভীষণ গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হত তাই-ই নয়, যে কাপু ভাঙ্গে তাকে গলা টিপে অথবা মাথায় বাড়ি মেরে নিধন করা হত।

একদিন লাঠি আড়াআড়ি করে রেখে যে কাপু সৃষ্টি করেছিল পুরুতরা, ইংরেজরা সেই লাঠিগুলো তুলে নিয়ে গেল জাহাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। তাছাড়া জাহাজ দুটো অনেকদিন নোঙর করে থাকাতে দ্বীপবাসীদের স্বল্প ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড চাপেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার সব কিছুতে বিদেশীরা ভাগ বসাতে তাদের ভাঁড়ার বাড়ন্ত হয়ে এল। নিজেদের দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হল।

একদিন দ্বীপের লোকেরা ইংরেজদের ভুঁড়িওয়ালা পেটে আলতো করে টোকা মেরে বিনয়ের সঙ্গে তাদের এবার তীর ছেড়ে চলে যেতে বলল। শ্বেতাঙ্গদের ওরা বলল, যখন ওদের কাছে আবার যথেষ্ট খাবার-দাবার জমা হবে তখন যেন বিদেশিরা আবার আসে।

অনেক মেয়েদের মতোই একজন হাওয়াইয়ান মেয়ে যে জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে নিয়ত সহবাসে লিপ্ত ছিল একদিন এসে এক গল্প কবল সবাইকে। যখন একজন তার ওপরে শুয়ে চরম আদর করছিল তাকে তখন সে তার নখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল নাবিকটির পিঠে। কী আশ্চর্য! নাবিকটা

BanglaBook.org

অন্য দশজন মানুষের মতই ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল। নখ ঢোকালে যদি ব্যথা লাগে তাদের তাহলে তারা নিশ্চয়ই ভগবান নয়।

হাওয়াইয়ান দ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে ভগবানদের মরণশীল মেয়েছেলের সঙ্গে সহবাস করার কথা নয়। ভগবানদের শরীরে ব্যথা বা যন্ত্রণাও থাকে না।

ততদিনে দ্বীপশুদ্ধ লোকই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল যে কুক ভগবান হলেও যদি বা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর নাবিকরা মোটেই ভগবান নয়।

সতেরোশো উনআশি সনের ফেব্রুয়ারির চার তারিখে কুক কোয়ালাকুয়া থেকে জাহাজ দুটির নোঙর তুললেন। তার ঠিক চার সপ্তাহ আগে নোঙর ফেলেছিলেন কুক।

কিন্তু বাহির সমুদ্রে বেরোতে-না-বেরোতেই প্রচন্ড হাওয়ার মধ্যে পড়ে জাহাজ দুটোর ভীষণ ক্ষতি হল। এমন ক্ষতি হল যে পাল মাস্তুল দড়াদড়ি সব মেরামত না করে ফিরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই কুক বাধ্য হয়ে আবার কোয়ালাকুয়া উপসাগরে ফিরে এলেন।

যখন ফিরে এলেন তখন সমুদ্রতটে একজন লোকও ছিল না তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। একটি নৌকোয় কয়েকজন নাবিককে পাঠালেন কুক সেই স্তব্ধ, জনশূন্যতটে খবরাখবর নিয়ে আসার জন্যে। সেই নৌকোর নাবিকরা এসে খবর দিল যে, রাজা কালানিওপু যিনি গতবার ইংরেজদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিলেন তিনিই সমস্ত সমুদ্রতটে কাপু জারি করেছেন। সেখানে পা ফেলা নিষেধ, যাওয়া নিষেধ।

কুকের মন উদ্বেগে ভরে গেল কিন্তু নোঙর করে জাহাজ মেরামত না করে ফিরে যাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না।

পরদিন রাজা কালানিওপু নিজে সমুদ্রতটে এসে ইংরেজদের বন্ধুভাবে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু একটা ছোট ঘটনার পর দ্বীপবাসীদের মেজাজ বিগড়ে গেল আরও। ওই শ্বেতাঙ্গ বিদেশিদের প্রতি তাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা আগেই মরে গেছিল।

কয়েকজন নাবিক দ্বীপের ভিতরে গেছিল জল আনতে। রাজা তাদের কোনওরকম সাহায্য দিতে মানা করে দিলেন। তখন যে ছ'জন নৌ-সেনা ওই নাবিকদের রক্ষক হয়ে তীরে গেছিল তাদের রাইফেলে গ্রেপশট-এর বদলে বুলেট পুরতে আদেশ দিলেন কুক।

তখনকার মতো ক্যাপ্টেন কুক আর তাঁর বিশ্বস্ত অফিসার জেমস কিং সেই উত্তেজনাময় থমথমে আবহাওয়া শান্ত করলেন। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হতে-না-হতেই কুকের বাহিনির অন্য জাহাজ ডিসকভারি থেকে বন্দুকের ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা আওয়াজ শোনা গেল। কুক তাকিয়ে দেখলেন একটা ক্যানো তীরবেগে ওই দিক থেকে ডাঙ্গার দিকে চলে আসছে। নিশ্চয়ই হাওয়াইয়ানরা ওই জাহাজ থেকে কিছু চুরি করে পালাচ্ছিল, ওদের আটকাতে না পেরে ওই জাহাজ থেকে গুলি চালায়।

ইতিমধ্যে নানারকম গণ্ডগোল শুরু হল। কুক নিজে আবার জমিতে নেমে রাজা কালানিওপুর সঙ্গে দেখা করলেন। কুকের মতলব ছিল রাজাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে বন্দি করে ফেলতে পারলে প্রজারা আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজাকে নিয়ে তিনি তীরের দিকে যখন এগিয়ে আসছেন তখন একজন নৌ-সেনার গুলিতে একজন হাওয়াইয়ান সর্দার মারা গেল। কোনও সর্দারকে মারা আর দ্বীপবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা সমগোত্রীয় বলে মনে করত তারা। এ ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা ও ছোট ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। বর্শা, ছোরা, লাঠি, পাথর নিয়ে মাদুরের বর্ম পরে দলে-দলে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রতটে দৌড়ে আসতে লাগল।

একজন যোদ্ধা ক্যাপ্টেন কুককে তরোয়াল তুলে মারার ভয় দেখাতেই কুক তার পিস্তল

BanglaBook.org

বের করে তাকে গুলি করলেন। কিন্তু পিস্তলে ছররা পোরা ছিল। ছররাগুলো মাদুরের বর্মে আটকে গেল। লোকটার কিছুই হল না। তখন লোকটা সোল্লাসে সবাইকে বলল যে, দ্যাখো দেবতা লোনো আমাকে মারতে চাইল কিন্তু আমার কিছুই হল না। এই ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীরু দ্বীপবাসীরা সাহসী হয়ে উঠল। সেই দিন সকালে কোয়ালাকুয়ার তটে প্রায় বাইশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার সশস্ত্র দ্বীপবাসী জমায়েত হয়েছিল।

কুক জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশেই ছিলেন মোলসওয়ার্থ ফিলিপস। আরেকজন যোদ্ধা কুককে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করল, কুক তাকে গুলি করলেন কিন্তু ফসকে গেল গুলি। আক্রমণকারীর পাশের লোক মারা গেল গুলিতে। ফিলিপসও গুলি করে পর-পর দুজন আক্রমণকারীকে মারলেন। নৌকায় যে নাবিকরা ছিল তারাও গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। অন্য যারা তীরে ছিল তারা জলের দিকে পিছন ফিরে লাইন করে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়তে লাগল।

কুক প্রায় হাঁটু জলে চলে এসেছিলেন, এসে হাত তুলে গুলি চালানো বন্ধ করতে অর্ডার দিলেন।

ঠিক তখনই তাঁকে পিছন থেকে একটা মুগুরের বাড়ি মারল একজন মাথায়। কুক জলে পড়ে গেলেন।

যেই কুক জলে পড়লেন, অন্য আরেকজন দ্বীপবাসী তার ছোরা ক্যাপ্টেন কুকের পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় নামার ঠিক এক ঘণ্টা পর কুক মারা গেলেন।

কুককে পড়ে যেতে দেখে দ্বীপবাসীরা উল্লাসে পাহাড় ফাটানো চিৎকার করে উঠল। কুককে ওরা টেনে ডাঙ্গার অনেক ভিতরে নিয়ে গেল এবং একে অন্যের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কুকের লাসে ছোরা বা বর্শা বসাতে পারে।

কুকের মৃত্যুতে ইংরেজরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। চার্লস ক্লার্ক তখন অধিনায়ক হলেন কুকের জায়গায়।

সেদিন গভীর অন্ধকার রাতে রেজলুশান জাহাজের ওপর দুজন নার্ভাস প্রহরী অন্ধকারতর জল-কেটে একটা ক্যানো আসবার আওয়াজ শুনতে পেল। ওরা কাঁপা হাতে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়ল আন্দাজে। গুলি একটুর জন্যে লাগলো না। যে দুজন দ্বীপবাসী ক্যানোটা চালিয়ে আসছিল তারা জাহাজের কাছাকাছি এসে ওপরে আসার অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়া হল। লোক দুটো এক টুকরো কাপা কাপড়ে মুড়ে একটা ছোট পুঁটলি নিয়ে ঝোলানো দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে সেই পুঁটুলিটা খুলে দিল তারা। হতবাক ইংরেজরা বিস্ফারিত চোখে দেখল যে তার মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের শরীরের একতাল রক্তমাখা লাল-টকটকে মাংস।

ইংরেজরা কুকের মৃতদেহ নিয়ে দ্বীপবাসীদের এমন নরখাদকের মতো ব্যবহারে দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। দ্বীপবাসীরা কিন্তু কুকের মৃতদেহকে তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী যথেষ্ট সম্মানই দেখিয়েছিল।

হাওয়াইতে যদি কোনও শ্রদ্ধার জন বা ভালোলাগার জন মারা যান, তাহলে ওখানকার প্রথানুযায়ী তাঁর হাড়-মাংস মুণ্ডু-চামড়া সকলে ভাগাভাগি করে নিয়ে যায় ঘরে।

কুকের মাথা গেছিল রাজার বাড়িতে। মাথার খুলি গেছিল এক বড় সর্দারের বাড়ি। শরীরের অন্যান্য অংশ সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন সর্দারেরা। ও-দেশীয় প্রথানুযায়ী হাড় থেকে মাংস চেঁচে নিয়ে সেই মাংসও ভাগ করে নিয়েছিল ওরা। তারপর হাড়গুলো সব একসঙ্গে করে পুঁতে দিয়েছিল মাটিতে।

প্রতি শীতে নরম সোনালি-বাদামি গোল্ডেন প্লোভার পাখির ঝাঁকের গন্তব্য আদিগন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের কোরকের ফিকে-নীল আর করমচা-লাল জলজ হাওয়াই-এর আবিষ্কারক প্রথম হাওল ক্যাপ্টেন টমাস কুক-এর মর্মান্তিক পরিণতি এই-ই।

BanglaBook.org

ডেরিল ড্যানার

সেদিন আর কনডাকটেড ট্যুরে যাওয়া হল না। লারার শরীরটা খারাপ হয়েছিল। খুব ভোরে উঠে অনেকক্ষণ চান করাতে ঠাণ্ডা লেগে গেছিল। ও ঠাণ্ডা দেশের লোক। হাওয়াই-এর উষ্ণ আবহাওয়ায় গরম-ঠাণ্ডার খেলায় কাবু হয়ে পড়েছিল।

ব্রেকফাস্টের পর ফোন করে ওর ঘরে গেছিলাম। ও মেরুন আর কালো খোপকাটা সুতীর একটা হাউস-কোট পরে বসেছিল সোফাতে। আমাকে দেখে বলল, এসো, এসো।

কিছুক্ষণ গল্প করার পরই দরজার ঘণ্টা বাজল।

লারা বলল, কাম অন ইন।

আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি একজন বেঁটেখাটো লোক বয়স্ক, শক্ত-সমর্থ চেহারা, দরজায় দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা গোরখা টুপি। চেহারা দেখে মনে হল হাফ-হাওয়াইয়ান।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, গুড মর্নিং টু ইউ, ইউ মাস্ট বি লারাজ ফ্রেন্ড।

ইতিমধ্যে লারাও উঠে এসেছিল সোফা ছেড়ে।

লারাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, হাই। সুইটি।

লারা এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক লারার গালে চুমু খেলেন। বললেন, তোমাকে বহুদিন পরে দেখে খুবই ভালো লাগল।

লারাও হাসল। কিন্তু লারার মুখ দেখে লারা যে ভদ্রলোককে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে তা মনে হল না। বরং তাঁকে দেখে উচ্ছল লারা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো অদ্ভুত। আশ্চর্য জ্বলজ্বলে, বড়-বড় চোখ। চোখের নীচে কালি। মাথার গোরখা টুপিটার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই হনলুলুতে নেপালি টুপি উনি কী করে পেলেন? আড়াআড়ি করে দুটি রুপোলি ভোজালি টুপির সঙ্গে গাঁথা আছে দেখলাম। যেমন থাকে ওই কাপড়ের টুপিগুলোতে।

লারা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মিট মিস্টার জিত্ বোস। ফ্রম নিউইয়র্ক। আর এই যে মিস্টার ডেরিল ড্যানার।

আমি মাথা নাড়লাম। অবাক হয়ে টুপিটার দিকে চেয়ে ছিলাম আমি।

তারপর উঠে বললাম, আমি এবার চলি।

লারার চোখ দেখে মনে হল ও চাইছিল না যে, আমি চলে যাই, কিন্তু ড্যানার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেরি নাইস টু হ্যাভ মেট ইউ মিস্টার বোস।

আমি, সি ইউ...বলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর সোজা লিফট নিয়ে নীচে।

হলিডে-ইন থেকে যখন বেরোচ্ছি দেখি পার্কিং লট-এ কালকের সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লম্বা-চওড়া নিগ্রো ড্রাইভারটি নিজের সীটে বসে মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছে।

কেন জানি না, ড্যানার ভদ্রলোককে আমার ভালো লাগলো না একটুও। ওঁর চোখ দুটো এমন যে মনে হয় উনি একজন অসাধারণ লোক। অসাধারণ খারাপ লোকও হতে পারেন।

কলকাতা থেকে আসার আগে আমার পিসিমা বলে দিয়েছিলেন, খবরদার জিত্, মেমসাহেব বিয়ে করিসনি।

সে অনেকদিনের কথা। আজকের যুগে বিয়ে ব্যাপারটা অত চট করে হয় না। পশ্চিমি দেশে তো নয়ই এখন আমাদের দেশেও হয় না। তবে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে, ঘনিষ্ঠতা হতে তো কোনও বাধা নেই। দুজন মানুষের যদি একে অন্যকে ভালো লাগে, তারা মনে এমনকি শরীরেও যদি কাছাকাছি আসতে চায় একে অন্যের তাহলে তাতে কোনও দোষ দেখি না আমি। বিয়ে অনেক

BanglaBook.org

গভীর ব্যাপার। সারা জীবনের ব্যাপার। রক্তের শরিক সৃষ্টির চিরায়ত নীড়ের ব্যাপার। যাযাবর পাখিদের মতো হয়ে গেছে এখন পৃথিবীর মানুষ-মানুষী। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেড়ায় তারা গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের মতো, একটু উষ্ণতার খোঁজে। খড়কুটো মুখে করে তারা চিরদিনের নীড়ের চেষ্টায় প্রায়ই সচেষ্ট হয় না। এই পারমাণবিক যুগে এক একটা দিনই এক একটি নিটোল জীবন, মুক্তোর মতো। চিরস্থায়ী ভাবনা, চিরায়ত কামনা, মানুষের আর নেই। তারা সকলেই অস্থির, ক্ষণস্থায়ী, ছটফটে অপরিণত সম্পর্কের পরিণতির দিকে নিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে। কালকের কথা ভাবারই সময় নেই এখন মানুষের, সারা জীবনের কথা কে ভাবে? যখন জীবন, ভবিষ্যৎ সবকিছুই মানুষের নিজ-নির্ধারিত ছিল, তখন ওইসব ভাবনা ভেবে দিন কাটানো যেত। আজকে যখন দেশ, কাল, সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমন কি পৃথিবীর ভবিষ্যৎই অনির্দিষ্ট তখন ওসব ভাবনা ভাবা বোকামি ছাড়া আর কী?

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভালো করে দেখবার জন্যে। ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন আমেরিকান। বিরাট গাড়িটার স্টিয়ারিং ধরে বড় বোলের পাইপ মুখে বসে আছে সে।

তার সঙ্গে গল্প করতে-করতে চললাম। নাম ম্যাট।

শুধোলাম, বিয়ে করেছ?

ও বলল, হোয়াট ফর?

আমি চমকে উঠলাম, কপালের দু-পাশের চুলে তার পাক ধরেছে এখনও বিয়ে করেনি কীরকম।

আমাদের দেশে তো এরকম ভাবাই যায় না। জন্ম মৃত্যুর মতো বিয়েও তো অবশ্যম্ভাবী, সেখানে কেউ খেতে পাক আর নাই-ই পাক, নিজে রোজগার করুক আর নাই-ই করুক, বৌকে খাওয়াতে পারুক আর নাই-ই পারুক, একটা বিয়ে না করে ফেলতে পারলে এবং ছেলেমেয়ে না হলে তো মানবজন্মই বৃথা। তাই সেদেশের মানুষ হয়ে কেন বিয়ে করব, এই কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম।

আমি বললাম, কেন, তুমি যথেষ্ট রোজগার করো না?

ও বলল, করব না কেন?

আমি বললাম, তুমি একা বোধ করো না? শারীরিক একাকিত্ব, মানসিক একাকিত্ব?

ও বলল, একেবারেই নয়। আমি আমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকি। উই লিভ টুগেদার।

আমি বললাম, সে না হয় কয়েকদিন, কয়েকমাস, তারপর?

ও বলল, তারপর কি? পাঁচবছর তো হয়ে গেল।

ছেলে-মেয়ের বাবা হতে ইচ্ছা করে না? তোমার গার্ল ফ্রেন্ড মা হতে চায় না?

ড্রাইভার বলল, আমাদের ওসব ফালতু বিলাস ও বড়লোকি নেই। আমরা দুজন নিজেদের বড়ই ভালোবাসি। আমার বান্ধবীও রোজগার করে, আমিও করি। নিজের-নিজের সব খরচা নিজের-নিজের। হ্যাঁ। কখনও কেউ কাউকে কোনও প্রেজেন্ট দিলাম, বা খাওয়ালাম-দাওয়ালাম সে অন্য কথা। দুজনেই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেউ কারও ওপরে নির্ভরশীল নই। যতদিন ভালো লাগে থাকব—যখন লাগবে না সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম ওর জন্যে। বললাম, ওর দশবছর পর যদি তোমার সঙ্গিনী তোমাকে ছেড়ে চলে যায়?

ও হো-হো হেসে উঠল। তারপর বলল, ওঃ বয়! যেতে ও পারেই। আমিও যেতে পারি। কিন্তু গেলে আমারও সঙ্গিনীর অভাব হবে না, ওরও হবে না সঙ্গীর। এতে অসুবিধার কী?

হু-হু করে হাওয়া আসছিল ওয়াইকিকি বিচ থেকে—দোকান-বাজার-হোটেল সারি-সারি—মালটিস্টোরিড। জানালায় হাত রেখে আমি ভাবছিলাম যে, এদের সবচেয়ে বড় বন্ধন বোধহয় এদের

BanglaBook.org

মুক্তিই। স্বার্থপর, অন্যের দায়মুক্ত সবরকম স্বাধীনতাময় জীবনে আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। এ আনন্দটা একরকম। বড় স্বার্থপর আনন্দ এ। আমাদের দেশে এখনও কত ছেলেমেয়ে আছে যারা নিজের ভাইবোনেদের মানুষ করে তোলার জন্যে, নিজের বেকার ও অযোগ্য আত্মীয়স্বজনদের শুভার্থে চিরদিন নিজেদের সবদিক দিয়ে বঞ্চনা করে এসেছে ও করছে। কী জানি সেই আত্মবঞ্চনার মধ্যে যে এক বিশেষ সুখ আছে তা বোধহয় এই স্বার্থপরতার সঙ্গে ছিনিয়ে নেওয়া সুখের চেয়ে অনেক গভীর।

অথবা তাই-ই কি? আমাদের দেশেও কি একদল মানুষ ভার বইতে-বইতে অন্যের দায় নিজের কাঁধে চাপাতে-চাপাতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পর যখন যাদের জন্যে নিজেকে নিঃস্ব করল, সেই সব অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন লোকেদের দ্বারা অবহেলিত এমন কি অপমানিতও হয় তখন কী তারাও বড় দেরি করে হারানো-অতীতের দিকে চেয়ে হতাশার মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে ভাবে না যে, স্বার্থপর হওয়াই ভালো ছিল?

দেখতে-দেখতে ডোলমান্ডির আনারসের ফার্মে চলে এলাম। এত বড় যে আনারসের বাগান হয়, হতে পারে, তা না দেখলে ভাবা যায় না। যেদিকেই তাকাই না কেন আদিগন্ত আনারস। নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধভাবে লাগানো। মাইলের পর মাইল। তীরবেগে ট্যাক্সি ছুটিয়েও দেখা যায় দিগন্ত রেখাই শুধু প্রসারিত হচ্ছে; বাগান শেষ হচ্ছে না।

আনারস তোলা হয় হাতে, কিন্তু মেকানিকালি কনভেয়র বেল্টে করে সেগুলো ট্রাকে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে ক্যানিং ফ্যাকটরিতে।

হাওয়াই-এর প্রথম গভর্নর ছিলেন মিস্টার স্যানফোর্ড বি. ডোল্। উনিশশো সন থেকে উনিশশো তিন সন পর্যন্ত। তখনই মিস্টার ডোলের এক কাজিন এখানে এসে আনারসের চাষের পত্তন করেন। আজকে ওআহু ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ডোল কোম্পানির বাগান আছে। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের একটা পুরো দ্বীপ লানাইর মালিকই এই কোম্পানি। আনারসের দ্বীপ করে ফেলেছেন সেখানে। পুরো ইউ-এস-এ-তে যত আনারস এবং আনারসের রস বিক্রি হয় তার যথাক্রমে পঁয়ষট্টি ভাগ এবং পঁচাশি ভাগই যায় হাওয়াই থেকে।

একসময় ব্রিটিশরা, রাশানরা এবং ফ্রেঞ্চরা তিমি মাছের ব্যাবসার জন্যে এখানে আসত। তখন এই নীল-সবুজ করমচা-লাল শান্ত মেঘাচ্ছন্ন ঘুমন্ত দ্বীপগুলোতে কে ভেবেছিল এত বড়-বড় কল বসবে, চাষাবাদ হবে এমন করে? ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট হবে? এখন হাওয়াই-এর সবচেয়ে বড় রোজগারের সূত্র হচ্ছে—ইউ-এস-এর সামরিক বায়। তারপরই ট্যুরিজম।

হাওয়াই এখন বিশ্রাম ও ছুটি কাটানোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরল। দেখি, মোড়ের মাথায় রাজা কামেহামেহার বিরাট এক বারো-ফুট মূর্তি। লিই ফুলের মালায় ঢাকা। কাঁধের পিছনে বর্শা শোয়ানো, সামনে হাত প্রসারিত করা রাজা এখন কামেহামেহা।

এই কামেহামেহা নামটি হাওয়াইন ইতিহাসে কখনও বিস্মৃত হবে না। আগে প্রত্যেকটি দ্বীপ একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক-একটা দ্বীপ উত্তরাধিকার সূত্রে এক একজন ছোট রাজা বা চিফদের দ্বারা শাসিত হত। কামেহামেহা ওইরকম একজন সর্দার বা ছোট রাজা ছিলেন। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি আস্তে-আস্তে সমস্ত হাওয়াইতে একাধিপত্য করেন।

বেলা বেশ বেড়ে গেছিল। গরমও বেশ। সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে হু-হু করে। ট্যাক্সির মিটারে ডলারের অঙ্কও হু-হু করে বেড়ে চলেছিল।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, এবার কোথায়?

আমি বললাম, সোজা হোটেলে সবচেয়ে শর্ট-কাট দিয়ে।

হোটেলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে নামবার সময় লক্ষ করলাম যে, সেই কালো ক্যাডিল্যাক লিমুজিনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে তবে সকালে যেখানে ছিল সেখানে নয়।

BanglaBook.org

আমি ইচ্ছে করে গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। শোফার কোলের ওপর খবরের কাগজটা ফেলে রেখেছিল কিন্তু তার চোখ ছিল গাড়ির ভিতরের আয়নায়। আয়না দিয়ে সে আমাকে লক্ষ করছিল।

আমি যেন ওকে দেখিইনি এমনভাবে ওর পাশ দিয়ে গিয়ে হোটেলের সিঁড়িতে উঠলাম। ওর পাশ দিয়ে আসার সময় ওর কাঁধের ডি-আই-আই লেখাটাতে আবার চোখ পড়ল।

আবার মন বলছিল যে লারা কোনও কথা আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছে। এই ড্যানার নামের গোরখাটুপি পরা লোকটা এই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন, লারা এবং ড্যানারের মধ্যের সম্পর্ক — ওই সমস্তই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে আমি টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে ড্যানার নামটা বের করে দেখলাম। 'ড্যানার' 'ড্যানার' পেয়েছি! ড্যানার ইনটিগ্রেটেড-ইনটার-ন্যাশনাল। ডি-আই-আই।

কিন্তু এই ড্যানার যে সেই ড্যানার বুঝব কী করে?

নাম্বারটা ডায়াল করলাম। সেক্রেটারি লাইন ধরল। বলল, গুড মর্নিং। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড।

মে আই স্পিক টু মিস্টার ড্যানার? আমি বললাম।

বলেই বললাম, আমি কথা বলতে চাই না, আপনি শুধু মিস্টার ড্যানারকে জিগ্যেস করুন যে তাঁর গোরখা টুপিটা ফেলে এসেছেন কি না?

সেক্রেটারি মেয়েটি একটু অবাক হল। পরমুহূর্তেই বলল, না তো। ওঁকে তো টুপি মাথায় দিয়েই ঢুকতে দেখলাম।

আমি থ্যাঙ্ক উ্য বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ততক্ষণে ড্যানারকে সেক্রেটারি নিশ্চয়ই ওই ফোন কলের কথা বলেছে। এবং ড্যানার কী ভাবছেন কে জানে।

টেলিফোনের বই থেকে কোম্পানির নাম, ঠিকানা ফোন নাম্বার টেলেক্স এবং মিস্টার ড্যানারের বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে আমি ডাইরিতে লিখলাম।

কেন জানি না, বারবারই আমার মনে হচ্ছিল যে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং সম্পূর্ণ না জেনে আমি একটা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ছি। বিপদটা কিসের, কার কাছ থেকে এবং কী ধরনের সে সম্বন্ধে আমার কোনওই ধারণা ছিল না।

নিজের ঘরে ফিরে লারাকে ফোন করে পেলাম না ওর ঘরে। রিসেপশান থেকে বলল যে, ও বেরিয়ে গেছে, ফিরতে পাঁচটা-ছ'টা হবে।

হাওয়াইয়ান হাট

লাঞ্চের পর আমি নীচের লাউঞ্জে নেমে এসে দেখি সেখানে কুরুক্ষেত্র বেধেছে। বাচ্চাকাচ্চা বুড়ো ধাড়ি সব নানারঙা জামা গায়ে দিয়ে একটা ট্যাবলো সাজাতে লেগে গেছে বিরাট লাউঞ্জের মধ্যেখানে। ফুলে-ফুলে ছয়লাপ। কত রঙের যে কতরকম ট্রপিকাল ফুল, তার ইয়ত্তা নেই।

রিসেপশানে জিগ্যেস করতে জানলাম যে কাল আলোহা প্যারেড হবে। ওয়াইকিকি বিচের রাস্তা বেয়ে প্রতিবছরে একবার করে যে প্যারেড হয়, সেই আলোহা প্যারেড। ট্রাডিশান অনুসারে প্রত্যেক হোটেলের রেসিডেন্টরা একটা করে ট্যাবলো সাজাবেন।

বেশ মজা লাগল আমার। মনে কত স্ফূর্তি থাকলে বড়রাও এমন ছেলেমানুষের মতো ট্যাবলো সাজাতে লেগে যেতে পারে তা ভেবে অবাক হলাম। বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে হাত লাগিয়েছে। শুনলাম হোটেলের বাসিন্দাদের নিয়ে একটা কমিটি হয়েছে। সকলে নাকি চাঁদাটাদাও

BanglaBook.org

দিয়েছে। রেসিডেন্টদের চাঁদা ও হোটেলের টাকা নিয়ে এই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে।

আমি ওর কাছাকাছি একটা সোফায় বসে ফুল সাজানো দেখতে লাগলাম। আর্যকন্যাদের মতো ফুটফুটে সব মেয়েরা, জ্বলজ্বলে স্বাস্থ্যের ছেলেরা ফুলের পাহাড় ঘিরে প্রজাপতির মতো নাচানাচি করছে। দেশের সরস্বতী পুজোর আগের দিন বাড়ির পুজোয় রাত জেগে ঠাকুর ও মণ্ডপ সাজানোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

একটি হাওয়াইন ছেলে ফুলের পাহাড়ের জিম্মায় ছিল। সেই-ই ফুল এগিয়ে দিচ্ছিল। এয়ার-কন্ডিশানড হোটেলের এয়ার-কন্ডিশানড লাউঞ্জ। তাই আজ ফুল সাজালেও কাল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই কোনও।

ছেলেটির সঙ্গে ফুল নিয়ে কথা শুরু করলাম। ওর ফুলের দোকান আছে এয়ারপোর্টে, হাসপাতালে, বাজারে। সে যে এ-দেশীয় ফুলের ওপরে অথরিটি তা জানা গেল, একটুক্ষণের মধ্যেই। পটাপট ফুলের নাম বলতে লাগল। বলল, হাওয়াই-এর প্রত্যেকটা দ্বীপেরই এক একটা করে ন্যাশানাল ফ্লাওয়ার আছে।

হাইবিসকাস, কটেজ রোজ, এয়ার প্লান্ট আরও কতরকম ভ্যারাইটির ফুল। ছেলেটি গরগর করে বলে যেতে লাগল।

হাওয়াই-এর, মানে মূল হাওয়াই দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে লাল লেহুয়া (ওহিয়া)—লাল রঙা। মাউই-এর জাতীয় ফুল হচ্ছে লোকেলানি-গোলাপি। মোলাকাই বেছে নিয়েছে হোয়াইট কুকুই ব্লসমস যে কুকুই বাদাম দিয়ে ওদের পূর্বপুরুষেরা মোমবাতির কাজ চালাত। কুকুই গাছকে এখানে মোম-বাদামও বলে—ক্যান্ডেলনাট। এ-গাছ থেকে পুরোনো দিনে তেল, আলো আর ওষুধ তৈরি হত।

কাহুলায়ে দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হিনাহিনা (বিচ হেলিয়োট্রোপ) ধূসর রাঙা। লানাই দ্বীপের পছন্দ কাউমাওআ, হলুদ-হলুদ আর সোনালি এয়ার প্লান্ট। আর হনলুলু যে দ্বীপে, সেই ওআহুর জাতীয় ফুল হচ্ছে ইলিমা। হলুদ ফুল! এই রকমই মোহিকানা দেখতে পার্পল—কাউআই দ্বীপের জাতীয় ফুল। আর নিহাউ দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হোয়াইট পাপ শেল—সাদা। সমস্ত দ্বীপ থেকে ফুল উড়ে আসে প্লেনে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহের জন্যে।

যেমন এক একটা ফুলের নাম মনপসন্দ তেমনই তাদের রং আঁখ-পসন্দ। রামধনুর কোনও রঙই বিভিন্ন মিশ্র হাইবিসকাসে অপ্রাপ্য নয়। এতরকম রঙের যে হয় হাইবিসকাস! দেখলে চোখ ও মন জুড়িয়ে যায়।

দেখতে-দেখতে ছেলেটার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, ও বলল, ওদের কাজ শেষ হতে-হতে রাত আটটা বাজবে। তারপর এই ট্যাবলো টেনে নিয়ে যাবে গাড়ি সেখানে, যেখান থেকে প্যারেড শুরু হবে কাল। প্যারেড দেখবে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে বটগাছ দেখাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, বটগাছের দেশের লোক আমি।

ও বলল, কোথাকার?

ইন্ডিয়ার, আমি বললাম।

ও বলল, সাটাজিৎ রে'র দেশের লোক?

রবীন্দ্রনাথকে বিদেশি তরুণরা জানে না। তারা সত্যজিৎকে জানে। পরে জানলাম, অবসর সময়ে ও একটা টিভি কোম্পানির ফটোগ্রাফারও।

ওর সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছি, এমন সময় সেই দীর্ঘকায় গুন্ডাদর্শন ক্যাডিলাক লিমুজিনের শোফার এসে আমাকে বলল, গুড আফটারনুন স্যার। আপনি কি মিস ডসকে দেখেছেন?

BanglaBook.org

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল যে, লারা হোটেলে নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললাম, যে, না। আমি দেখিনি।

উনি কী ঘরে আছেন?

আমি বললাম, জানি না।

শোফার আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সোজা রিসেপশানের দিকে হেঁটে গেল।

রিসেপশানের অনেকগুলি মেয়ের মধ্যে একজনকে জিগ্যেস করল ও দেখলাম। কী উত্তর পেল অতদূর থেকে শোনা সম্ভব ছিল না। সেই মেয়েটি একটি সবুজ গাউন পরে ছিল। শোফার আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, কী বলল?

ও বলল, ঘরে নেই।

একটু পর বাইরে গিয়ে দেখি যেখানে লিমুজিনটা ছিল, সেখানে সেটা নেই।

লারা নিশ্চয়ই ওয়াইকিকি বিচের ওপরে যে গেটটা হোটেলের সেই গেট দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? ও কেন ওরই জন্যে অপেক্ষমাণ ক্যাডিলাক লিমুজিন-এর আরাম অগ্রাহ্য করে অন্য দরজা দিয়ে শোফারের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে? এ দেখছি এক রীতিমত রহস্যময় নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জীবনে কখনও অভিনয় করিনি। অথচ...

লারাকে আজ হাওয়াইয়ান হাটে ডিনার খাওয়াব বলেছিলাম। ওয়াইকিকি বিচের দিকে রাস্তায় হোটেলেরই লাগোয়া একটা কফি ও স্ন্যাকস বার ছিল। সেখান থেকে এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এলাম। টি ভি খুলে দিয়ে লারার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পর ফোনটা বাজল।

মিঃ বোস?

ইয়েস। আমি বললাম পুরুষকণ্ঠের উত্তরে।

গুড আফটারনুন। ইডস ড্যানার হিয়ার। ডেরিল ড্যানার।

ইয়েস মিস্টার ড্যানার। হোয়াট ইজ ইট? আমি উৎকর্ণ হয়ে বললাম।

মিস্টার ড্যানার বললেন, লারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই।

ওঃ নেই বুঝি?

তারপর বললেন, আমি কী আমার গোরখা টুপিটা আপনার ওখানে ফেলে গেছি?

সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলাম আমি। বললাম, গোরখা টুপি, আপনার? না তো! আপনি আমার ঘরে আসেনই নি! লারার ঘরে ফেলে গেছিলেন কি?

মিঃ ড্যানার বললেন, ও! আই অ্যাম সরি। তাহলে অন্য কোথাও ফেলে এসেছি।

আমি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, আপনার কাছে ওই টুপির গল্প শোনা হল না। আবার কবে দেখা হবে?

মিঃ ড্যানার কাটা-কাটা গলায় বললেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে মিঃ বোস। দেখা নিশ্চয়ই হবে।

'নিশ্চয়ই হবে' কথাটার ওপর বেশ জোর দিলেন মিস্টার ড্যানার। রিসিভারটা নামাতে না-নামাতে দরজার বেল বাজল, উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। রীতিমত হ্যান্ডসাম। ছিপছিপে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আমারই মতো বয়স হবে। পরনে একটা গ্রে-রঙা বিজনেস স্যুট। হাতে ব্রিফকেস, চোখে সানগ্লাস—ফোটো সান—যে চশমার রং আলোর সঙ্গে-সঙ্গে বদলায়।

ভদ্রলোক বললেন, সরি টু বদার ইউ। ইজ মিস ডস ইন?

আমি ততোধিক অবাক হয়ে বললাম, লারা তো নেই।

ভদ্রলোক সরি, আই এ্যাম রিয়্যালি সরি; বলে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

দু-মিনিট পরে আবার দরজার ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলতেই দেখি রিসেপশানের সেই সবুজ গাউন পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে। যার সঙ্গে নিগ্রো শোফার কথা বলেছিল কিছুক্ষণ আগে।

মেয়েটি বলল, একসকিউজ মি স্যার, মিস ডস কি আছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আছেন কী নেই তা আপনি রিসেপশান থেকে আমার ঘরে ফোন করেই তো জানতে পারতেন। কি পারতেন না?

মেয়েটি প্রথমে অপ্রস্তুত হল। তারপর বলল, আপনার ঘরের টেলিফোন বাজছে না—বোধহয় কোনও গোলমাল হয়েছে—।

বলতে-বলতেই, দরজায় মেয়েটি যখন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তখনই ফোনটা আবার বাজল।

মেয়েটি অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে হাসির ভাব মুখে এনে বলল, ওঃ, ফোনটা তাহলে ঠিক হয়ে গেছে। পরক্ষণেই বলল, আই অ্যাম সরি টু ডিসটারব ইউ।

আমি দরজাটা লক করে দিয়ে রিসিভারটা তুললাম।

লারা ওপাশ থেকে বলল, হাই জিত তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে অবেলায়, না স্বপ্ন দেখছিলে কারও? ফোন ধরতে এতক্ষণ লাগল?

আমি বললাম, না, ঘুমোইনি। কী বলছ বল?

লারা বলল, কখন বেরোবে?

তুমি যখন আসবে? কখন আসবে?

এই ছ'টার মধ্যে। তারপর বলল, রাতে কোথায় যাবে?

আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বললাম, পলিনেসিয়ান কর্ণারে।

ও বলল, কেন? হাওয়াইয়ান হাটে যাবে না?

আমি বললাম, নাঃ।

ও বলল, যাই-ই হোক, আমি আসছি।

বিকেল থেকে নানারকম রহস্যময় ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে দেখে ফোনে আমি বলতে চাইনি ওকে যে, হাওয়াইয়ান হাটেই যাব, কিন্তু লারাই নামটা বলে দিল। জানি না সবুজ গাউনের মেয়েটা তখন বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কি না?

টিভি-র দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম আমি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লারা হোটেলে পৌঁছে নিজের ঘর থেকে ফোন করল আমায়। বলল দশমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি।

লারা যখন এল তখন একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। বিভিন্ন পোশাকে ওর সৌন্দর্য যে কত বিভিন্নতায় আমার চোখে ধরা পড়ছিল এ-ক'দিনের দিনে ও রাতে তা কী বলব! আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, হোয়াট? আর ইউ মুন-স্ট্রাক?

আমি বললাম, নো। লারা-স্ট্রাক।

ও দৌড়ে এসে আমাকে চুমু খেল। বলল, ইউ নটি ফ্লাশার।

আমি বললাম, আই মেন্ট ইট। রিয়্যালি, আই ডিড।

তারপর ওকে সোফায় বসিয়ে পর-পর যা ঘটেছে তাই-ই বলে গেলাম।

শুনতে-শুনতে লারার মুখটা চিন্তায়, ভয়ে কুঁকড়ে উঠল।

ও যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তার চেহারার বর্ণনা আরেকবার চাইল আমার কাছে। আমি আবার বলতেই ওর মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, কেনেথ। নোওও, ইট কান্ট বি।

কেনেথ মানে? তোমার টোরোন্টোর বয় ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ। কিন্তু আবারও বল ওর চেহারার কথা। কেনেথ হতেই পারে না।

BanglaBook.org

আমি আবার ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিলাম।

লারা রিসেপশানে ফোন করল। রিসেপশান থেকে বলল, যে ওই নামে হলিডে ইন-এ কেউই চেক-ইন করেনি।

মেয়েটি বলল, বেনামেও উঠে থাকতে পারে।

পরক্ষণেই লারা আমার কাছে এসে বলল, জিত্ তুমি আমার কতখানি বন্ধু কেন জানি না, আমার বড় ভয় করছে।

মানে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম। বললাম, কীসের ভয়?

ও বলল, তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অল্প দিনের, কিন্তু তোমাকে না বলেও আমার উপায় নেই। সত্যিটা তোমার জানা দরকার। আমার বড় বিপদ জিত্।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বলো আমাকে।

ও বলল, চলো, যেতে-যেতে ট্যাক্সিতে বলব। দেওয়ালেরও কান আছে।

আমি বললাম, যাবে?

ও আমার হাত ধরে বলল, চলো।

আমরা লাউঞ্জে এসে নামতেই দেখি সেই নিগ্রো শোফার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

সে বাউ করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, গুড ইভনিং ম্যাম। আমি আপনার জন্যে সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি।

লারা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আমরা ট্যাক্সি নিয়েই যাব।

লোকটি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আমার চাকরি যাবে। বস বলে দিয়েছেন যে, আপনি ট্যাক্সিতে যাতায়াত করলে আমার চাকরিই থাকবে না। আর আমার চাকরি না থাকলে....।

লারা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি ওর মুখের দিকে।

তারপর আমরা ক্যাডিলাক লিমুজিনের দিকেই এগিয়ে চললাম।

খুব সৌজন্যের সঙ্গে শোফার দরজা খুলে দিল লারাকে। তারপর আমিও বসলে বলল, হোয়্যার টু?

লারাই বলল, হাওয়াইয়ান হাট। আমি কিছু বললাম না।

হাওয়াইয়ান হাট একটা রেস্তোরাঁ। একেবারে ঘাসে ও শনে ছাওয়া একটা প্রকাণ্ড কুঁড়েঘরের মতো দেখতে তার ভিতরটাও, বাইরেটাও। ক্যাডিলাক লিমুজিনটা যখন নিঃশব্দে অথচ বেগে ছুটে চলেছিল হাওয়াইয়ান হাট-এর দিকে তখন লারা আমার হাতটা তুলে নিয়ে ওর কোলে রাখল।

দেখলাম, ওর হাতের পাতা দুটো ঠান্ডা, ঘামে ভেজা।

আমি আমার হাতের পাতা ঘষে-ঘষে ওর হাতের পাতা গরম করে দিলাম। তারপর আমার হাতের মধ্যে ওর হাতের পাতা নিয়ে চাপা দিলাম তাতে।

হাওয়াইয়ান হাটে যখন পৌঁছলাম আমরা তখনও শোফার খুব যত্ন করে দরজা খুলে লারাকে নামাল, তারপর বলল, আমি অপেক্ষা করছি।

আমরা ভিতরে ঢুকে একটা দুজনের মতো ছোট্ট টেবলে বসলাম। রেস্তোরাঁটি প্রায়ান্ধকার। তবে অন্ধকারের চেহারাটা কালো নয়, রঙিন। নানারঙা আলোর তরল রঙে। কুকুই বাদামের ছড়া দিয়ে বাতি জ্বালা উচিত ছিল ওদের। অবশ্য আগুন লাগার ভয় তাতে।

ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার নিতে এল ওয়েটার। আমি মাই-টাই এর অর্ডার দিলাম। এখানের জাতীয় পানীয়। ওয়েটারে কাছেই শুনলাম যে, মাই-টাই তৈরি হয় ফলের রসের সঙ্গে হোয়াইট রাম মিশিয়ে। বোতলেও মাই-টাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই স্টেজে হুলা ড্যানস আরম্ভ হল। পেছন দুলিয়ে ঘাসের ঘাঘরা উড়িয়ে উদ্দাম অথচ ছন্দোবদ্ধ নাচ। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে বাজনাও বাজছিল।

BanglaBook.org

আমি ওই গোলমালের মধ্যে লারাকে বললাম, এবার বলো। এই গোলমালে কেউ কিছু শুনতে পাবে না।

লারা এদিক-ওদিক তাকাল, যেন এই হাওয়াইয়ান হাটেও কোনও লোক ওকে নজরে রেখেছে।

কিন্তু ওর কথা শোনা হল না। আমাদের একেবারে পাশের টেবলেই এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে বসলেন। এত কাছে যে ফিসফিস করে বললেও সেকথা শোনা যায়।

লারা মাই-টাই শেষ করে আমাকে বলল, গিভ মি অ্যানাদার ড্রিঙ্ক। আই ফিল লাইক গেটিং ড্রাঙ্ক টু-নাইট।

আমি ওয়েটারকে ডেকে আরও মাই-টাই-এর অর্ডার দিলাম। স্টেজে ততক্ষণে হুলা নাচ শেষ হয়ে গেছে। এখন সামোয়ান ফায়ার ডান্স হচ্ছে। সামোয়া আইল্যান্ডের লোকেদের এই আগুনের নাচ একটি দেখার মতো জিনিস

আমি মাই-টাই-এ চুমুক দিয়ে বললাম যে, কেনেথই কী তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ?

লারা হেসে ফেলল। বলল, নাঃ।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এমন প্রশ্ন অসভ্য, ইতর লোকেরা করে কোনও মেয়েকে। আমি এও বুঝতে পারছিলাম না যে, লারার ব্যাপারে আমার এত ইন্টারেস্ট কিসের, কেন? আমি কি লারাকে...? লারাকে আমি কি...?

লারা আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। একটা আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় হাসিতে ওর সমস্ত মুখ দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। বলল, আমরা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতো ভালো ও বোকা নই। অন্য শরীরের কাছে আসাটার কোনও দামই নেই আমার কাছে। আমাদের কাছে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেকে এসেছে। কেউ এসেছে কোনও মুহূর্তের ভালোলাগায়, পরিবেশের অভিনবত্ব বা মাদকতায়, দয়ায় সমবেদনায় অথবা কৃতজ্ঞতায় কেউ-কেউ বা ঘৃণাতেও। আমার প্রতি ঘৃণা, তার নিজের প্রতি ঘৃণা। ওটা কিছুই নয়; আসলে ভালোবাসা তো মনের। মনের ভালোবাসা কেনেথকেই প্রথম বেসেছিলাম, হয়তো ভুল করে।

আমি লারার টেবলের ওপরে রাখা হাতে আমার হাত রাখলাম।

লারা বলল, আমি আসছি, একটু একসকিউজ মি।

বলেই, লেডিজ রুমের দিকে চলে গেল।

লারা চলে যেতেই একজন ওয়েটারের পোশাক পরা লোক অচিরে আমার কাছে এসে হাজির হল। তারপর বাউ করে বলল, একসকিউজ মি স্যার। হাউ ওয়েল ডু ইউ নো দিস লেডি? এন্ড ফর হাউ লঙ?

লারাকে আমি কতখানি চিনি এবং কতদিন হল চিনি এ-কথা ও জিগোস করবার কে?

প্রথমে খুব রাগ হল আমার। ভাবলাম বলি যে দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।

কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, ওয়াচ আউট। টেক কেয়ার অফ ইওরসেল্ফ। শি ইজ ডেনজারাস।

বলেই লোকটা যে ট্রে-টা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেই ট্রে-টা নিয়ে চলে গেল।

লারা ফিরে এল। লারাকে আমি কিছু বললাম না, কারণ ও এমনিতেই যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। কিন্তু এবার আমার চিন্তা শুরু হল।

এবার খাবার নিয়ে এল, যা অর্ডার করেছিলাম। হাওয়াইয়ান স্পেশালিটি। মাহি-লাহি। ফ্রেঞ্চ পাইজ, স্যালাড উইথ ড্রেসিংস সঙ্গে মাছ ভাজা। এই-ই মাহি-লাহি।

লারাকে বেশ চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, চিয়ার আপ। হোয়াটেভার উইল বি, উইল বি। আমি তোমার পাশে আছি। ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স—তোমার সঙ্গেই আছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা উঠলাম। আবার ক্যাডিলাক লিমুজিন। হু-হু করে গাড়ি চলল।

BanglaBook.org

শোফার বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম ম্যাম?

ইয়েস! থ্যাঙ্ক ইউ! লারা বলল নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

হলিডে ইন-এর কাছাকাছি এসেছি এমন সময় পিঁ-পাঁ, পিঁ-পা, পিঁ-পা করে সাইরেন বাজাতে-বাজাতে দুটো পুলিশের গাড়ি মাথার ওপরের ঘুরন্ত লাল আলো জ্বালিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লারা চমকে উঠে গাড়ি দুটোর দিকে তাকাল। শোফারও। গাড়ি দুটো হলিডে ইন-এর সামনে গিয়েই থেমে গেল। গাড়ি থেকে দু-কোমরে দুটি পিস্তল ঝোলানো পুলিশ নেমে বিচের দিকে দৌড়ে গেল।

ওসব দেশে, আমাদের দেশের মতো অসংখ্য কৌতূহলী, বেকার ও পরের ব্যাপারে নাক-গলানো লোক নেই। বিচে বিশেষ ভীড় ছিল না। দু-তিনজন লোক এবং একজন মহিলা হোটেলের দিকে ফিরে আসছিলেন বিচের দিক থেকে।

আমাদেরও নামিয়ে দিল শোফার গাড়ি থেকে। পুলিশ দুজন তখন জোরে বিচের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ফ্লাড লাইটের আলোয় বিচে কী যেন একটা জিনিস পড়ে আছে দেখলাম।

আমি আর লারা হোটেলে ঢুকে গেলাম।

লারা অটোমেটিক লিফটে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আজকে আমার সঙ্গে থেকো। আমার ভয় করছে। আমার খুব কাছে থেকো।

আমি কিছুই না ভেবে বললাম, বেশ।

লারাকে বললাম, তুমি ঘরে যাও। আমি চেঞ্জ করে আসি। আমার ঘর থেকে।

লারা আমার হাত জড়িয়ে বলল, না। তুমি আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকবে না। আমার ভয় করে।

আমি হাসলাম, বললাম, পাগলি নাকি? জামাকাপড় ছাড়ব না? স্লিপিং স্যুটটা পরে আসি।

লারা বলল, না। আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে যেও না।

তারপর বলল, রাতে তো শুয়েই থাকবে বাবা! স্লিপিং স্যুটের দরকার কী? বলে দুষ্টুমি করে হাসল।

আমি বললাম, নটি গার্ল।

লারা ঘরে ঢুকেই রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো বড় কনিয়াকের অর্ডার দিল।

জুতোটা খুলে ফেলে, কার্পেটে পা রেখে আরাম করে বসল। তারপরেই উঠে পড়ে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতো খুলতে লাগল দু-হাতে।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। বললাম, করো কী? করো কী?

লারা বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, কেন? শুনেছি ইন্ডিয়ায় স্ত্রীরা স্বামীদের জুতো খুলে দেয়।

আমি হাসলাম। বললাম, সে স্বর্ণযুগ চলে গেছে, এখন স্বামীদের জুতো পেটা করে।

লারা জুতোটা টেনে খুলতে-খুলতে বলল, আই ডোন্ট বিলিভ। তোমাদের দেশের বাবা-মা-ছেলেমেয়ে ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। পরের জন্মে যদি কখনও কেউ আমাকে বিয়ে করে তাহলে আমি ভারতীয়কে বিয়ে করব।

আমি বললাম, পরজন্ম কেন? এ-জন্মে কী দোষ করলে? তা ছাড়া তোমরা আবার পরজন্ম মানো নাকি?

লারা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মানতে পারলে খুশি হতাম।

পিসিমার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমি বললাম, ধরো আমিই যদি বিয়ে করি?

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, না, না। তা হয় না। আমার কী আছে যে তোমাকে দিতে পারি? আমি খারাপ, খুব খারাপ। আমাকে তুমি কয়েক রাতের সঙ্গিনী করতে পারো, বিয়ে করার কথাই ওঠে না। বিয়ে মানে সন্তানের জননী। রক্তের উত্তরাধিকারী। বিয়ে কি যাকে-তাকে করা উচিত?

BanglaBook.org

ওসব কথা মনেও এনো না।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

লারা ফোন ধরল। বলল, ইয়েস।

তারপর অন্য প্রান্তে যে ছিল তাকে বলল, শুনেছি নাকি কেনেথ এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। মিস্টার বোস, আমার বন্ধুর কাছে ও নাকি আমার খোঁজে এসেছিল। এ-হোটেলে ও নেই। আমি চেক করেছি। যদি বেনামে উঠে থাকে তো অন্য কথা।

আমি ঘড়ি দেখলাম, প্রায় দশটা বাজে। আমরা হাওয়াইয়ান হাট থেকে ফিরেছি সাড়ে ন'টা নাগাদ।

তারপরই লারা উত্তেজিত হয়ে উঠল দেখলাম। রাগত স্বরে ড্যানারকে বলল, না। আমি তোমার কাছে এখন যেতে পারব না।

ওপাশ থেকে কে কী বলল, শোনা গেল না কিন্তু লারা বলল, তোমার জন্যে যা করার সবই করেছি। তোমার কোনও বিপদ আমি ঘটাইনি, ঘটাব না। বাট ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন মাই প্রাইভেট লাইফ। মিস্টার বোস আমার বন্ধু—তার সঙ্গে আমি কতখানি ঘনিষ্ঠ হব না-হব তা আমার ব্যাপার।

তারপর রিসিভারে কান লাগিয়ে কিছুক্ষণ শুনল লারা।

তারপর বলল, লুক ড্যানার। আই হ্যাড হ্যাড এনাফ অফ ইউ! লেট মি লিভ মাই ওওন লাইফ। ভয় দেখিও না আমাকে। সবচেয়ে বড় ভয় তো মৃত্যুভয়? তুমি না হয় মেরেই ফেলবে আমাকে। মেরে ফেললে ফেলো, ভয় দেখিও না প্লিজ। গত দশবছর ভয়ের মধ্যেই কেটেছে প্রতিটি মুহূর্ত। ভয়ের ভয় আর করি না। তোমার যা খুশি করতে পারো।

একটু থেমে, আবার কী যেন শুনল। তারপর আবার বলল, বললামই তো। যা খুশি করতে পারো। আমাকে ঘাঁটিও না। আমি নানাকারণে এখন ডেসপারেট হয়ে গেছি। তোমার ভালোর জন্যেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলিও না। লিভ মি অ্যালোন।

বলেই ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা।

আমি বললাম, কী? এবার আমাকে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে? তার চেয়ে আমি চলে যাই না কেন, কালই ফিরে যাই। নইলে তোমার বিপদ হবে।

লারা হাসল। বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে। যদি ভয় পাও তো চলেই যাও। আমি চাই না আমার জন্যে তোমার কোনও ক্ষতি হোক। তুমি ড্যানারের কোনও ক্ষতি না করলে ড্যানার তোমার ক্ষতি করবে না। তাই তোমার ভয়ের কারণ দেখি না। ভয় যা তা আমার। তবুও ভয় যদি পাও তাহলে তুমি চলে যাও। অন্য হোটেলেও চলে যেতে পারো। সেটাই ভালো।

আমি বললাম, ড্যানার লোকটা কীসের ব্যাবসা করে?

লারা বলল, করে না এমন ব্যাবসা নেই। তারপর বলল, আমাকে তুমি যত পবিত্র ভাবছ তা নই আমি—নইলে ড্যানারের ভয় পাই আমি! ড্যানারও আমাকে ভয় পায়। কারণ তার অনেক গোপন কথা জানি আমি।

তারপর বলল, কেনেথকে ড্যানার চিনত কিন্তু ওদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই।

এমন সময় ওয়েটার কনিয়াক নিয়ে এল।

লারা আরও দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিল।

আমি বললাম, করছ কী? একেই তো অতগুলো মাই-টাই খেয়ে নেশা হয়ে গেছে, দুটো কনিয়াক তো পুরো মাতাল হয়ে যাবে।

লারা হাসছিল। বলল, কিছু-কিছু রাত থাকে, মুহূর্ত থাকে, মাতাল হওয়ার। বিশেষ রাতে,

BanglaBook.org

বিশেষ মুহূর্তে 'না' করতে নেই। কোনও কিছুতেই 'না' করতে নেই।

ওয়েটার আর একটা কনিয়াক দিয়ে যাওয়ার পর সেটা টেবলে রেখে আমি বাথরুমে শাওয়ার নিতে গেলাম। শাওয়ার নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলাম লারা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

লারা কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। আমার দিকে পিছন ফিরে।

লারাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের ওয়াইকিকির রাতের বহুবর্ণ আলোকমালার রামধনুর রং ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। লারা একটা হালকা বেগুনি-নাইটি পরে ফেলেছে। আমি যখন চান করতে গেছিলাম তখন। ও আমার কনিয়াকটা হাতে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাতে দিল। তারপর শক্ত করে আমার হাত ধরল।

ফ্রেঞ্চ ওডিকোলনের গন্ধে আমার নাক ভরে গেল।

কনিয়াকটা নিতে-নিতে আমি বললাম হাসতে-হাসতে, আচ্ছা পাগলির পাল্লায় পড়লাম যা হোক। স্লিপিং স্যুটটাও পরে আসতে দিলে না?

লারা খাটে এসে আমার কোমরের পাশে বসল। ওর কাঁধ সমান নেমে আসা সুন্দর ঢেউ খেলানো চুল তীক্ষ্ণ নাক, ভরন্ত ঠোঁট, গোল্ডেন প্লোভারের মতো নরম সোনালি-বাদামি বুকের আভাষে মনে হচ্ছিল ঠাকুমার ঝুলির মতো আমি কোনও মন্ত্রপুত রাজপুত্র হয়ে জলের তলার কোনও পরম রূপসি রাজকন্যার শোওয়ার ঘরে চলে এসেছি।

জীবনে যে স্বপ্ন সত্যি হয় রূপকথার নরম পাখিও বাস্তবে এসে ডানা ঝাপটায় তা আমার জানা ছিল না।

আমার কনিয়াকটা শেষ হতেই লারা নিজেরটাও শেষ করে দৌড়ে এসে আমার চাদরের তলায় ঢুকে গেল। তারপর কী করে যে আদরে সোহাগে খেলায় অভিমানে ক্লান্তিতে আধোঘুমে আবারও খেলায় সারা রাত কেটে গেল তা আমি জানি না।

ঘোরের মধ্যে ভালোলাগার আশ্লেষে বারবার আমি লারাকে নেনে বলে ডাকছিলাম। ওর নরম সাদা দুধল ফুলের মতো শরীরের সঙ্গে একমাত্র নেনেরই তুলনা চলে। কী করে কোনও পুরুষকে খুশি করতে হয় তার শরীরের সর্বস্বতায় তা লারা জানে। আমার জীবনে, প্রথম গোঁফ ওঠার মতো, সাইকেল চড়া শেখার মতো, সাঁতার কাটতে শেখার মতো প্রচণ্ড এক আনন্দময় উত্তেজনার মধ্যে আমি এক দারুণ ভরন্ত অথচ নিঃস্ব হওয়ার খেলা জীবনে সেই প্রথম শিখলাম।

সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো শেখার মতোই সেই আদিম, প্রাকৃত এবং প্রথম মানুষি খেলা একবার শিখে ফেলার পর পরবর্তী জীবনে কেউ কখনওই আর ভোলে না।

সে রাতে আমি প্রথম পুরুষ শরীরে প্রাপ্তবয়স্ক হলাম। শরীরের মধ্যে যে এত সুপ্ত আনন্দ এমন হেলাফেলায় লুকোনো ছিল সেই জানাকে হৃদয়ের সর্বস্বতায় সেই রাতে প্রথম আবিষ্কার করলাম। সে খেলায় লারাই আমার প্রথম পার্টনার হল। আমার শিক্ষয়িত্রী।

আলোহা প্যারেড এবং তারপর

প্যারেড চলেছে তো চলেছেই। শেষ নেই।

ঝকঝক করছে রোদ্দুর। ওয়াইকিকির পথের দু-পাশের হোটেল থেকে মানুষজন সব ভেঙে পড়েছে রাস্তায়। খবরের কাগজ পেতে-পেতে বসে পড়েছে সকলে ফুটপাথে। অল্পবয়সিরা দাঁড়িয়ে আছে। কী চমৎকার যে সাজসজ্জা। মেয়েরা ও ছেলেরা ঝকমকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে চকচকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে। ট্যাবলোর পর ট্যাবলো। গাড়ির পর গাড়ি। ব্যান্ডের পর ব্যান্ড। মিলিটারির বিভিন্ন শাখার ব্যান্ড। পুলিশের ব্যান্ড। স্কুল কলেজের আলাদা ব্যান্ড।

BanglaBook.org

প্যাসিফিক ফ্লিটের কম্যান্ডার সস্ত্রীক চলে গেলেন ধীর-গতিতে যাওয়া কনভার্টিবল গাড়িতে। হাওয়াইয়ের গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরও গেলেন সস্ত্রীক। বিভিন্ন হোটেল, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দ্বীপের আলাদা-আলাদা ট্যাবলো। চোখ ধেঁধে যায়।

আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম দেরি করে। ততক্ষণে প্যারেড আধ ঘণ্টাটাক হল চলা শুরু করেছে। তবুও আমরাও প্রায় ঘণ্টা তিনেক ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হট-ডগ আর কাগজের কাপে কফি খেতে-খেতে আলোহা প্যারেড দেখলাম।

প্যারেড যখন শেষ হল তখন সারা পথে খবরের কাগজ, আইসক্রিমের কাগজের কাপ, ক্যান্ডি-নাটের ঠোঙা, পপ-কর্ন ও পটেটো চিপসের প্ল্যাস্টিকের আবরণী সব পড়েছিল। অত লোক বলে রাস্তার বিন-এ জায়গা হয়নি তাদের। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পথ ঝাঁট দেওয়ার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগানো বিরাট-বিরাট সিভিক ভ্যান এসে সমস্ত কাগজপত্র নোংরা ধুলো সাফ করে শুষে নিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

রোদটা কড়া হয়েছিল বেশ। লারা বলল, চলো আমরা সানসেট বিচ-এ যাই।

আমি বললাম, আমি ঘুমোব। রাতে ঘুম হয়নি একটুও। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। লারা হাসল। বলল, দোষটা যেন আমারই একার।

আমিও হাসলাম। বললাম, আমি তো তা বলিনি।

হোটেলে ফিরে আমি শুয়ে পড়লাম। লারার ঘরেই। লারাও বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললাম, চলো আজ আমরা ক্যাটামেরানে ডিনার খাব।

লারা বলল, বেশ।

তারপর দুজনেই ঘুম লাগালাম। ছুটি, কী আনন্দ, কী আশ্চর্য আরাম। জীবনে এমন ছুটিও যে কখনও কাটাব তা কোনওদিনও ভাবিনি। কাজ থেকে ছুটি, কর্তব্য থেকে ছুটি, ভয় থেকে, মজ্জাগত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈতিক বোধ থেকে, ভারতীয় 'কাপু' থেকে ছুটি। বড় পিসিমার শাসন থেকে ছুটি।

বিকেলে আমার ঘরে গিয়ে আমি তৈরি হয়ে এলাম। লারাও তৈরি। আমি বললাম, আর দেরি নয়, চলো।

নীচে নেমে দেখলাম, কোনও অনিবার্য কারণে সেই সাড়ে ছ'ফুটের শোফার এবং কালো লিমুজিনটি অনুপস্থিত। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছলাম গিয়ে সমুদ্রের সেই জায়গায় যেখানে ক্যাটামেরন ভাড়া পাওয়া যায়, বিরাট প্রমোদ তরণী, হাউসবোট। গ্লাস-বটম বোট—নীচটা কাঁচের। রঙিন কোরাল বিফ দেখে তাতে চড়ে লোকেরা।

ওখানে গিয়ে লারা বলল, চলো, হাউস বোটেই যাই। পরে চেঞ্জ করে ছলে যাব ক্যাটামেরনে।

সূর্য ডোবার দেরি ছিল, তবুও বোট ছেড়ে দিল। পশ্চিমের রামধনু আকাশের দিকে মুখ করে। কী আশ্চর্য যে দেখতে লাগে এখানে সমুদ্রের ওপরের অস্তগামী সূর্যের আলো তা কী বলব।

লারা বলল, বহুদিন চাইনিজ খাই না, চাইনিজ খাব। সাওয়া স্যুপ সোয়াবিন সস দিয়ে, আর প্রণ গোল্ড-কয়েন। সঙ্গে অ্যামেরিকান চপসুই। তার সঙ্গে বুলস-ব্লাড রেড-ওয়াইন।

লারা আমার টেবিলে-রাখা হাতের ওপর ওর হাতটা রেখেছিল। কথা বলছিল না কোনও। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। লাল মুছে গিয়ে আকাশে কালোর ছোপ লেগেছিল ততক্ষণে—শেষ সূর্যের লাল পাড় লুটিয়ে ছিল দিগন্তরেখার বুকে। সাদা সিগালের ঝাঁক কোথায় না-জানি দেরি করে ফেলেছিল। দ্রুত পাখায় উড়তে-উড়তে তাদের অদ্ভুত বিষণ্ণ অস্ফুট ডাকে আসন্ন রাতের রহস্যময়তাকে গভীর করে ওরা চলে যাচ্ছিল তীরের দিকে।

এমন সময় ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা বেজে উঠল। দপ করে জ্বলে উঠল জাহাজের সবক'টা

BanglaBook.org

আলো একসঙ্গে। নানারঙা রঙিন আলো জ্বলবার পরই শুধু বুঝতে পেলাম কী সুন্দর করে সাজিয়েছে জাহাজটাকে। কালো গভীর আদিম মহাসাগরের বুকে আলোকমালায় সাজা সুবেশ-সুবেশি, সুন্দর ও সুন্দরী পুরুষ ও নারীর সুগন্ধি ভীড়ে আনন্দ যেন ট্যাঙ্গো নাচের বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে একে অন্যের হৃদয়ে বিকীরিত হচ্ছিল। পৃথিবীর কত জায়গায় নারী ও পুরুষ যে এই স্বর্গীয় সুন্দর সন্ধ্যায় আনন্দের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে।

ভাবছিলাম, ওরা কত যে আনন্দ করতে জানে, জীবনকে কী দারুণ ভালোবাসে ওরা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এ-কথাটা সর্বক্ষণ জানে বলেই আঁজলা গলে এক বিন্দু জীবনকেও বুঝি ওরা গড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হতে দেয় না। পান করে জীবনের অনুপরমাণুকেও। ওদের কাজ করা যেমন শেখার আছে আমাদের, ওদের আনন্দ করার ও আনন্দ পাবার ক্ষমতাও শেখার নিশ্চয়ই।

লারা বলল, নাচবে? ট্যাঙ্গো আমার প্রিয় নাচ।

আমি বললাম, কখনও যে নাচিনি এমন নয়—। দার্জিলিং-এ ঠান্ডা জলে চান করলে, অথবা মুখে গরম আলু পড়লে অনেকবার নেচেছি।

লারা হাসল। বলল, দার্জিলিং কোথায়?

আমি বললাম, যখন আমাদের দেশে যাবে তখন দেখাব, হিমালয়ের বুকের শহর। কোথায় লাগে ইয়োরোপের আল্পস তার কাছে।

লারার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল। বলল, সত্যি নিয়ে যাবে?

বললাম, তুমি তো যাচ্ছই।

লারা হাঁসির মতো হিস-স-স-স করে উঠল।

বলল, বিশ্বাস হয় না।

রাত ন'টা নাগাদ হাউসবোট এসে পাড়ে ভিড়ল। আমরা নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে এলাম। তারপর হোটেল থেকে মাইল খানেক আগে নেমে পড়লাম, হাঁটবার জন্যে।

এখন দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে বেশির ভাগ। সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। এদিকে ঢেউ ভাঙার শব্দ পাওয়া যায় না একেবারেই সমুদ্রকে বালিতে ভরে দিয়েছে বলে।

আমরা দুজনে হাতে-হাত ধরে হেঁটে আসছিলাম হোটেলের দিকে। আমি যে কী খুশি ছিলাম কী বলব। মানুষ শারীরিকভাবে সুখি হলে যে মানসিকভাবেও কতখানি সুখি হয় তা আমি আগে জানতাম না। মানুষের শরীর মন বোধহয় অবিচ্ছেদ্য। একটার সুখ অসুখের সঙ্গে অন্যটার সুখ অসুখ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

হোটেলে ঢুকতেই মনে হল একটা ছমছমে ভাব। লাউঞ্জে বিশেষ লোকজন নেই। রিসেপশান ডেস্কের কাছে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন রঙিন হাওয়াইয়ান শার্ট আর ট্রাউজার পরে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন—রিসেপশানিস্টের কাছ থেকে আমাদের পরিচয় পেয়ে। তারপর আমাদের কাছে এসে আইডিন্টিটি কার্ড বের করে দেখালেন। ইউ-এস-এর এফ-বি-আই-এর লোক ওঁরা।

ওঁরা বললেন যে, আপনাদের একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

আমি বললাম, আপনারা যে ভুয়া আইডিন্টিটি কার্ড নিয়ে আসেননি তার প্রমাণ?

ভদ্রলোক দুটি বললেন, কী প্রমাণ চান?

আমি বললাম, আমি ফোন করে জানব, তারপর যাব।

ওঁদের মধ্যে যে ভদ্রলোকের বয়স বেশি, তিনি কাঁধ শ্রাগ করে বললেন, ফেয়ার এনাফ।

ওঁরা নম্বর বললেন একটা। কিন্তু তবুও আমি রিসেপশানে গিয়ে টেলিফোন ডিরেকটারি

BanglaBook.org

চেয়ে নিয়ে ফোন নাম্বার বের করে টেলিফোন করলাম। যিনি লোকাল এফ-বি-আই-র বস তাঁর বাড়িতে। তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁকে মিস্টার ম্যাক্স গিলিগান বলেই উল্লেখ করছি।

মিস্টার গিলিগানকে আমি ওঁদের আইডিন্টিটি কার্ড দুটো দেখে নাম ও নম্বর বললাম। চেহারার বর্ণনা দিলাম।

উনি বললেন, ইয়া! বোথ অফ দেম আর ভেরি মাচ উইথ আস।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

ম্যাক্সের বাড়ির নাম্বারটা মনে-মনে মুখস্থ করে নিলাম।

আমাদের দুজনকে গাড়িতে বসিয়ে ওঁরা লোকাল পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলেন। একটা ছোট ঘরে আমাদের বসতে বলে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

আমি লারাকে বললাম, ওঁরা কি তোমার সম্বন্ধে জানতে পেরেছে?

লারা মুখে আঙুল দিয়ে ইসারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

বুঝতে পারলাম, হয়ত এ-ঘরে টেপ রেকর্ডার আছে অথবা টিভি-র ক্যামেরা আছে।

যে টেবলের সামনে আমরা বসেছিলাম, সেই টেবলের ওপর সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়েছিল। লোকাল কাগজ। সময় কাটাবার জন্য আমি কাগজটা তুলে নিলাম। কাগজটা তুলে নিতেই আমার চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। প্রথম পাতার মাঝামাঝি জায়গায় বাঁদিকে বড়-বড় হেডলাইনের খবরঃ 'মার্ডার অন দ্য বিচ।' তার নীচেই কেনেথের ছবি। যে-টাইটা পরে ও আমার কাছে এসেছিল সেই টাইটাই তখনও গলায় ছিল। সেই জামা, সেই স্যুট। নিশ্চয়ই কেনেথ।

সন্দেহের অবকাশও ছিল না। খবরে লেখা ছিল যে, কেনেথ হচনার নামের এক ভদ্রলোক, তাঁর বাড়ি ম্যাসচুসেটস-এ কর্মস্থল টোরোন্টো, কাল সকালের ফ্লাইটেই লস এঞ্জেলস থেকে এসেছিলেন হনলুলুতে। বোধহয় আলোহা প্যারেড দেখতে, কোনও দুর্বোধ্য কারণে তিনি ওয়াইকিকির একটা হোটেলে বেনামে উঠেছিলেন। সন্ধেবেলায় তিনি বিচ-এ হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় কে বা কারা তাঁকে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে। একটিই গুলি, হার্টে। করোনার বলেছেন, পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোলট পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়। আততায়ী ধরা পড়েনি।

লারা আমার দিকে তাকিয়েছিল।

ও আমাকে বলল, হঠাৎ এত মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করলে? তারপরই বলল, আজ তো কাগজ আমার দেখাই হয়নি।

বলল বটে, তবে ও ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কোথায় যেন চলে গেছিল লারা।

আমি কথা না বলে কাগজটা লারার দিকে এগিয়ে দিলাম।

কাগজটা দেখেই লারা, ওঃ মাই গড! বলে মুখ ঢেকে ফেলল দু-হাতে। তারপর মুখ ঢেকেই রইল।

এমন সময় দরজা খুলে একজন সৌম্যদর্শন, হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি কোনও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

উনি বললেন, কেনেথ হচনারকে আপনারা কি চিনতেন?

লারা তাড়াতাড়ি বলল, আমাকে দেখিয়ে যে, ও কিছু জানে না, চিনতও না কেনেথকে। আমিই চিনতাম। ভালোভাবেই চিনতাম।

ভদ্রলোক লারাকে তারপর খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার অনেকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করলেন।

আমি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম লারাকে। একটুও উত্তেজিত না হয়ে, না ঘাবড়ে গিয়ে ও কীভাবে নিজের বিষয়ে বলছিল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক আমাকে বাইরে যেতে বলে লারাকে আরও অনেক কিছু জিগ্যেস করলেন। তারপর আমাকে ডেকে কেনেথকে আমি যে এক ঝলক

BanglaBook.org

দেখেছিলাম সেই দেখা সম্বন্ধে যা জানার তা জানলেন। তারপর কেনেথের যে-ছবিটা কাগজে ছাপা হয়েছে তার ওরিজিনাল দেখিয়ে আমাকে বললেন, এই লোকই তাহলে আপনার ঘরে লারার খোঁজে গেছিলেন? কেনেথ হচনারকে আপনি শনাক্ত করছেন তাহলে!

আমি বললাম, কেনেথকে আমি চিনি না। তবে ছবিটি এ লোকেরই।

একটু পর আমাদের ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউই যদি শহর ছেড়ে যান তাহলে আমাদের জানিয়ে যাবেন। আপাতত কিছুই করার নেই।

লারা বলল, কেনেথের বেরিয়াল কোথায় হবে? আমি কী ওকে দেখতে পাব না একটুও?

ভদ্রলোক বললেন, ওঁর বাবার রিকোয়েস্টে ওঁর বডি ম্যাসচুসেটস-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলের প্লেনে চলে গেছে বডি।

লারা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একটু হেঁটে গিয়েই আমরা একটা ক্যাব পেলাম। ট্যাক্সিতে উঠেই লারা নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছিল—দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে কামড়েছিল ও। ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে ও কোনও কথাই বলল না, বোধহয় ড্রাইভারের সামনে বলবে না বলেই।

হোটেলের কাছাকাছি আসার আগেই ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নিজেকে সংযত করল ও। মুখে পাউডার মাখল। যখন হলিডে ইন-এ নামলাম আমরা ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। লাউঞ্জে ঢুকতেই একজন লোক আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে বাইরে গেল। লারা পিছন ফিরে লোকটাকে দেখল অনেকক্ষণ।

লিফট-এ করে লারার ঘরে এসে পৌঁছতেই লারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু একবারই। তারপরই সামলে নিল নিজেকে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। পশ্চিমি দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের অনেক ছেলেদের চেয়েও শক্ত হয় যে, তা নিজের চোখেই দেখলাম। একটু পর ও নিজেই সামলে নিল নিজেকে।

লারা আমার হাত ধরে বলল, জিত্। কোনওক্রমে আমাকে উদ্ধার করো ড্যানারের হাত থেকে। গতকাল কেনেথকে মারল, আগামীকাল আমাকেও যে মারবে না তার কী গ্যারান্টি আছে? এসব লোক বিপদে পড়লে কোনও কিছু করতেই দেরি করে না।

আমি বললাম, তুমি জানলে কী করে যে কেনেথকে মেরেছে ড্যানারই। তোমার সব জানাশোনা লোকেরাই আমার কাছে হেঁয়ালি। ড্যানার কেনেথকে মারবে কেন? কিসের ইন্টারেস্টে?

ও ছাড়া কে মারবে? ও নিজে হাতে মারে না। ওর লোক আছে। লারার চোখ দুটি ভয়ে ও হতাশায় মাখামাখি হয়ে কোনও গৃহপালিত পরনির্ভর ভাষাহীন প্রাণীর মতো হয়ে গেছিল।

লারার জন্যে, লারাকে আমার বুকে নিয়ে, আমার বড়ই কষ্ট হল।

ম্যাক্স গিলিগান

কাল লারার ঘরে আমি শুইনি। লারাই বারণ করেছিল। অথচ ওর ওইরকম মানসিক অবস্থাতে ওর সঙ্গে থাকা আমার উচিত ছিল।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ড্যানার। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনাল। ডি-আই-আই। এই নামগুলো মাথায় ঘুরছে কেবল। লোকটার চেহারাই খুনি-খুনি। কিন্তু এরকম খুনি চেহারার রহস্যময় চরিত্রের লোকের সঙ্গে ফুলের মতো ফুলওয়ালি মেয়ের আলাপ কী করে হল এবং ওদের সম্পর্কটাই বা কী তা আমার মাথায় এল না। অথচ, লারা প্রায় প্রাঞ্জলভাবেই বলছে ড্যানারই মেরেছে কেনেথকে। যদি তা জানেই লারা তবে ও পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন?

BanglaBook.org

চান-টান করে তৈরি হয়ে নিলাম আমি। ঠিক করলাম আজ একা-একাই বেড়াব। পরশু আমার চলে যাওয়ার দিন। মধ্যে মাত্র একটা দিন কাল। ভালো করে ঘুরে ফিরে নিই। এ-জীবনে আবার কখনও হনলুলুতে ফেরা হবে কি না জানি না।

জামাকাপড় পরে ফেলেছি, বেরোব, এমন সময় লারা এসে উপস্থিত।

দরজা খুলতেই বলল, কোথায় চললে তুমি?

আমি বললাম, পুলিশে খবর দেব অথবা এফ-বি-আইকে।

লারার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

ও বলল, কী খবর?

আমি বললাম, ড্যানারের খবর। কেনেথের হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-কথা বলব ওদের।

লারা আমাকে ধমকে বলল, ডোন্ট বি সিলি। তুমি এসবের মধ্যে জড়িও না নিজেকে।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে ড্যানারের সম্পর্ক কী?

লারা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়েছিল। এমন চোখে আগে কখনও তাকায়নি ও।

ও বলল, তোমার তা জেনে লাভ কী?

আমি বললাম, এত কিছু ঘটার পর আমার জানা দরকার। কারণ আমি তো জড়িয়েই পড়ছি তোমার ব্যাপারে।

লারা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল, সম্পর্কটা কী তা বললে তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আর আমাকে ভালোবাসতে পারবে না।

আমি বললাম, জীবনের কোনও লজ্জা বা গ্লানির কথা লুকিয়ে রেখে যে-ভালোবাসা পাওয়া যায় তা কি থাকে?

লারা বলল, একথা ঠিক। থাকে না। তবু ক্ষণিকের ভালোবাসারও কী কোনও দাম নেই?

আমি বললাম, কথা ঘুরিও না, বলো।

ও একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, আমি ড্যানারের রক্ষিতা ছিলাম। অনেকদিন। ও আমার সৎ বাবার বন্ধু। আমাকে দশবছর বয়স থেকে জানত। জীবনে ওই প্রথম পুরুষ আমার। টাকার বিনিময়ে এখনও সেই সম্পর্কই রাখতে চায়। আমি যে ফুল বিক্রি করে, কষ্ট করে নিজের পড়াশুনা চালাই, ভবিষ্যৎ স্থির করি তা ওর ইচ্ছে নয়। আমাকে ওর রক্ষিতা করেই রাখতে চায় চিরদিন। এখানে আসার আগে ওকে না জানালেই ভালো হত যে আসছি। আমি ভেবেছিলাম, বড়লোক ড্যানার আমার ও কেনেথের অনেক উপকারে আসবে। আমার সৎ বাবার বন্ধু হিসেবে কেনেথের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতাম ওর। গাড়ি, নৌকো, বেড়ানো-টেড়ানো সবই চলতে পারত ওর ঘাড়ে। আফটার অল, একসময়ের শয্যাসঙ্গিনী—কিছু দুর্বলতা তো থাকতই আমার প্রতি।

আমি বললাম, কেনেথ যদি তোমাদের সম্পর্ক জেনে ফেলত?

লারা হাসল। বলল, কেনেথ জানত। ওকে সবই বলেছিলাম। জানালেই বা কী? ও-ও তো আর ধোওয়া বাইবেল ছিল না। নাথিং লাইক গুড লিভিং এন্ড গুড লাইফ। বুড়ো ড্যানারের ঘাড়ে আমাদের ছুটিটা পরম উপভোগ্য হত। অনেক মেয়েরই মানি ইজ দ্য ফার্স্ট হাজব্যান্ড। টাকার চেয়ে বড় আধুনিক মানুষের জীবনে আর কী আছে? কিন্তু দ্যাখো, লোকটা কী সাংঘাতিক। আমার বয়-ফ্রেন্ডকেও সহ্য করতে পারল না। কেনেথ আসতে-না-আসতেই কেনেথকে মেরে ফেলল।

আমি বললাম, এখন তোমার বয়-ফ্রেন্ড তো আমি। এবার আমার পালা বলো।

লারা বলল, তোমাকে এ-জন্যেই তো চলে যেতে বলছি।

আমি সেই কথার পিঠে বললাম, তুমি যদি ড্যানারের ব্যাপারে নিশ্চিতই, তবে পুলিশ বা এফ-বি-আইকে বলছ না কেন?

BanglaBook.org

লারা বলল, বলে লাভ? সব জায়গায় ড্যানারের লোক আছে। টাকা ছড়িয়ে রেখেছে সে সব পকেটে। মাঝখান থেকে আমার আরও বিপদ হবে—কারণ ও জানতে পারবেই।

তারপরই লারা বলল, এবার আমি যাই। তুমি এসব ব্যাপারে মাথা গলিও না। তোমারই বিপদ হবে।

আমি বললাম, চললে কোথায়?

ও বলল, কেনেথের এক কাজিন থাকে এখানে। নেভিতে কাজ করে। ওর কাছে যাব। পাল হারবারে। কেনেথের সম্বন্ধে সব জানতে।

ওঃ। আমি বললাম।

লারা চলে গেল আমার ঘর ছেড়ে। আমি ব্রেকফাস্ট করার জন্যে বেরোবার আগে সারাটা দিন কীভাবে কাটানো যায়, তাই-ই মনে-মনে ঠিক করে নিচ্ছিলাম। এমন সময় লারা আবার আমার ঘরে ঢুকল। দরজা লক করা ছিল না। এসেই বলল, তোমাকে একটু বিরক্ত করছি। এই প্যাকেটটা তোমার কাছে রাখো। এতে কতগুলো দলিল আছে। মোলোকাইতে আমি একটা জমি কিনছি—তার দলিলপত্র। আমার সলিসিটরকে দেখাতে হবে। ওখানেই থাকব ভাবছি এরপর। কানাডার ঠাণ্ডা আমার সহ্য হয় না। এই জমি কেনার ব্যাপারেও ড্যানারের কাছে আমার হাত পাতার ছিল। কিন্তু সে যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ তা কী আগে জানতাম? আমি হোটেলে না থাকলে আমার ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেওয়াও ড্যানারের লোকেদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কাল থেকে আমার ভীষণ ভয় করছে। এই প্যাকেটটা তোমার কাছেই থাক। তুমি যখন পরশু চলে যাবে, নিয়ে যেও। আমার সলিসিটরস লোক পাঠিয়ে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন নিউইয়র্কে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমার সলিসিটরসদের কোনও লোক নেই হাওয়াইতে?

লারা বেশ বিরক্ত গলায় বলল, থাকলে আর তোমাকে কষ্ট দেব কেন?

তারপর বলল, এটা তুমি এখুনি তোমার স্যুটকেশে চাবি বন্ধ করে রাখো। হারিও না।

আমি হাসলাম। বললাম, তথাস্তু।

লারা বলল, তুমি নিউইয়র্কে তোমার ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যেই সলিসিটরের লোক ওটা নিয়ে যাবে। তোমার কোনও চিন্তা নেই।

আমার কোনও চিন্তা নেই। আমি বললাম।

লারা চলে গেলে আমি উঠে প্যাকেটটাকে স্যুটকেশে ভরে রাখলাম। প্যাকেটটা বেশি ভারি নয়। চারকোণা একটা বাক্সর মতো। দলিল দস্তাবেজ লম্বাই হয়। নয়ত মোড়কের মতো মোড়া থাকে। এ-দেশের ব্যাপার আলাদা। হয়ত ফোটোস্টাট করা আছে।

লিফট নিয়ে লাউঞ্জে এলাম। এ ক'দিন প্রায় সর্বক্ষণ লারার সঙ্গে থেকে হঠাৎ একলা পড়ে যাওয়ায় খারাপ লাগতে লাগল। লাউঞ্জেই বসে রইলাম আমি। বসে-বসে বইটা পড়তে লাগলাম। এমন সময় রিসেপশানের একটি মেয়ে, পেজবয়কে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। রিসেপশানে গিয়ে পৌঁছতেই মেয়েটি বলল, কল ফর ইউ স্যার।

ফোনটা তুলে নিতেই ওপাশ থেকে লারা বলল, হাই! জিন? আই ফিল ব্যাড ফর ইউ। তুমি একা আছ। কী করব বল? না এসে উপায় ছিল না। আজ সন্ধেবেলায় আমরা খুব মজা করব। উই উইল বিট ইট আপ। আমার দুঃখ মাই-টাইতে ডুবিয়ে দেব।

আমি বললাম, তুমি কখন ফিরবে? লাঞ্চ খাবে নাকি একসঙ্গে?

ও বলল, আমার জন্যে বসে থেকো না। তুমি খেয়ে নিও।

আচ্ছা। আমি বললাম।

ফোনটা ছাড়ার আগে ও বলল, দলিলের প্যাকেটটা স্যুটকেশে রেখেছ তো?

আমি অবাক হলাম। বললাম, হ্যাঁ।

BanglaBook.org

ও বলল, বাই।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পিছন ফিরেছি এমন সময় মেয়েটি আবার ডাকল আমাকে। বলল, ইয়েট অ্যানাদার কল।

আমি আবার গিয়ে রিসিভার নিলাম।

ওপাশ থেকে একটি চেনা-চেনা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। মর্নিং মিস্টার বোস।

বললাম, গুড মর্নিং টু ইউ। আপনি কে?

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বললেন, ম্যাক্স। ম্যাক্স গিলিগান।

ম্যাক্স! আমি এক মুহূর্ত ভাবতেই মনে পড়ল। সেদিন রাতে এফ-বি-আইয়ের বড় সাহেবকে ফোন করেছিলাম এখান থেকে। তার আসল নাম বলা যাচ্ছে না। ম্যাক্সই বলছি।

আমি বললাম, কী ব্যাপার?

ম্যাক্স বলল, হাউ বাউট হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ মি। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাও আজকে—খুশি হব। তুমিও খুশি হবে।

অন্য সময় হলে আমি রাজি হতাম না। কিন্তু এই রহস্যের পর রহস্য আমাকে ড্যানার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। লারার জন্যে চিন্তান্বিত।

আমি বললাম, আমাকে হঠাৎ লাঞ্চে ডাকছেন কেন? আমাকে তো আপনি প্রায় চেনেনই না।

ওপাশ থেকে বলল ম্যাক্স, চিনি, চিনব না কেন? তবে আমার স্বার্থ আছে বলেই ডাকছি। হয়তো তোমার স্বার্থেও ডাকছি।

তারপরই বলল, চলে এসো। ক্যাব নিয়ে চলে এসো, বলেই ঠিকনা বলল। তারপর বলল, এসো, আমরা পাম গাছের নীচে বসে বিয়ার খাব, গল্প করব। তোমার ভালোই হবে এলে। চলে এসো।

ভালো করছি না মন্দ বুঝতে না পেরে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

বাড়িটা বাংলো ধরনের, মনে হল, এটা একটা অফিসও। ছোট্ট—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সুন্দর সবুজ লন, বড়-বড় পাম গাছ—সামনেই সমুদ্র। লনে সাদা ফার্নিচার পাতা—লাল নীল ছাতার নীচে। দুটো কালো কুচকুচে অ্যালসাসিয়ান কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে। আমাকে দেখে যে ভদ্রলোক লনের অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে এলেন তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই অধ্যাপকের মতো দেখতে ভদ্রলোক—যিনি সেদিন রাতে আমাকে আর লারাকে জেরা করেছিলেন পুলিশ স্টেশানে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। উনি বললেন, হ্যাঁ। আমিই সেই লোক। আমাকেই তুমি ফোন করেছিলে। পুলিশ স্টেশনেও দেখেছিলে।

আমি বসতেই বাটলার ক্যান বিয়ার দিয়ে গেল, সঙ্গে সসেজ ও পটাটো চিপস।

জিগ্যেস করলাম, আপনি খাবেন না?

ম্যাক্স বলল, আমিও খাব।

বসেই আমি বললাম, আমাকে ডেকেছেন কেন?

ম্যাক্স বলল, বলব, বলব। রিল্যাক্স মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। রিল্যাক্স করো এবং আমাকে তোমার বন্ধু ভাবো।

তারপর বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে বলল, লারাকে তুমি কতখানি চেনো? ও কি তোমার ফিয়াসে?

BanglaBook.org

বলেই বলল, অত্যন্ত পার্সোন্যাল প্রশ্ন—কিন্তু তুমি সত্যি কথা বললে আমার পক্ষেও তোমাকে সত্যি কথা বলা সহজ হবে।

আমি বললাম, ফিঁয়াসে নয়, তবে আমরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছি। এখানে এসেই। তার আগেই আলাপ হয়েছিল মনট্রিয়ালের একটি বারে—রাতে ও ফুল বিক্রি করতে এসেছিল সেখানে। তার পরেও দেখা হয়েছে দু-একবার।

ম্যাক্স বলল, তার আগে তুমি চিনেত না লারাকে?

না। আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমি নিউইয়র্কে থাকি—পড়ি....।

ম্যাক্স বলল, তোমার সব খবর আমি রাখি। বলেই আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা, ইউনিভার্সিটির হদিস, এমনকি আমার দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নামও বলল ম্যাক্স।

তারপর বলল, আমাদের কাজই হচ্ছে খবর রাখা। উই হ্যাভ ডাবল-চেকড অন উ্য। অ্যান্ড উ্য আর ক্লিন। উই নো দ্যাট।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, তবে লারা সম্বন্ধে কি তোমরা অন্যরকম ভাবছ? আসলে ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। ড্যানার বলে একটা লোকই কিন্তু কেনেথের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ড্যানার ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনালের ড্যানার। লারা আগে ওর রক্ষিতা ছিল।

ম্যাক্সকে উৎসাহিত দেখাল। ও সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, ড্যানারকে তুমি মিট করেছ?

হ্যাঁ। আমি বললাম, লারার ঘরে। লোকটার চেহারাই খুনি-খুনি। তোমরা খোঁজ করে দেখো, কেনেথ হচনারের মৃত্যুর পিছনে ওই ড্যানারই আছে।

ম্যাক্স বলল, তুমি এত জোরের সঙ্গে কী করে বলছ কথাটা?

লারার কাছ থেকে শুনে। আমি বললাম।

ম্যাক্স বলল, তোমার কাছে ড্যানারের ঠিকানা আছে?

এই যে, বলে সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ঠিকানা ফোন নম্বর সব দিলাম।

ম্যাক্সের পাশেই লম্বা তার লাগানো ফোন ছিল। একটা সাদা একটা লাল।

লাল ফোনটা তুলে ম্যাক্স কাকে যেন বলল, মারিয়ান, চেক অন দিস জেন্টেলম্যান অ্যান্ড লেট মি নো ইমিডিয়েটলি।

ম্যাক্সকে চিন্তান্বিত দেখাল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফোনটা বাজল। ড্যানারের ইউ-এস-এ এবং ইয়োরোপে কোথায়-কোথায় ব্যাবসা আছে তা সব জানিয়ে দিল ম্যাক্সকে কে যেন।

ম্যাক্স বলল, ড্যানারের নানারকম ব্যাবসা আছে, ব্রথেল-কিপারও সে। মানা আন্ডার-ডেভালাপড দেশ থেকে মেয়ে আনে ও। ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, আফ্রিকার নানা দেশ। স্মাগলিং করে নানা জিনিসের।

তারপরই বলল, লারা কি কল গার্ল?

আমি বললাম, ছিঃ-ছিঃ, না-না। তবে ওর প্রথম যৌবনে ও ড্যানারের রক্ষিতা ছিল। ড্যানারই ওর জীবনে প্রথম পুরুষ।

তারপর বললাম, এত সব গর্হিত কাজ করে তাহলেও ড্যানারকে ধরছ না কেন?

ম্যাক্স বলল, লাইসেন্সওয়ালা মেয়েরা ওর ব্রথেলে থাকে। এদেশে এটা বে-আইনি নয়। স্মাগলিং-এর প্রমাণ হাতে-নাতে পেলে ধরব।

তারপর একটু থেমে ম্যাক্স বলল, মিস্টার বোস, আপাতত আমরা কেনেথ হচনারের মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যেই প্রথমে চেষ্টা করতে হবে।

আমি বললাম, আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?

BanglaBook.org

ম্যাক্স বলল, কিছু না, কিছু না। যা-যা বললে এতেই যথেষ্ট সাহায্য হবে। ড্যানারের পিছনে লোক লাগাচ্ছি আমরা। তোমার এবং লারার কথাও সত্যি হতে পারে। ড্যানার মারতেও পারে কেনেথকে। কিন্তু আমাদের তো প্রমাণ চাই। সন্দেহের বশে তো আর কোনও কেস টিকবে না। সন্দেহটাকে প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

বলেই বলল, লারা আর কেনেথের সম্পর্ক সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো?

আমি যা জানি, বললাম। তারপর এও বললাম যে, কেনেথ একদিন ফোন করেছিল লারাকে আমার ঘরে—ওর আসবার কথা ছিল এখানে।

ম্যাক্স সোজা হয়ে বসল। বলল, ফোন করেছিল? তুমি কেনেথের গলা শুনেছিলে?

হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে বললাম।

তারপর বললাম, ফোনে কথা বললাম আর গলা শুনব না?

ম্যাক্স বলল, জাস্ট আ সেকেন্ড প্লিজ। বলেই সাদা ফোনটা তুলে নিয়ে কাকে যেন কী বলল।

দু-মিনিটের মধ্যে একজন ছাই-রঙা স্যুট পরা লোক একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডার নিয়ে এল। এনে টেবলের ওপর রাখল। রেখেই চলে গেল।

ম্যাক্স চাবি টিপে টেপ-রেকর্ডারটাকে বাজাল। একজন লোক কথা বলছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। কোনও বার বা রেস্টুরেন্টে টেপ করা হয়েছে কণ্ঠস্বর।

ম্যাক্স বলল, ভালো করে শোনো তো! এই ভদ্রলোকের গলার সঙ্গে কেনেথ হচনারের গলার কোনও মিল আছে?

একটুক্ষণই গলা শুনেছিলাম আমি কেনেথের—ভালো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল এ অন্য লোকের গলা।

ম্যাক্স আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে।

চটপট বন্ধ করে বলল, কী? কী মনে হল?

আমি বললাম, ভালো মনে নেই আমার কিন্তু এ যে অন্য লোকের গলা বলে মনে হচ্ছে।

ম্যাক্স তখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বলল, আবারও শোনো।

বলেই আবার টেপটা চালিয়ে দিল।

মেয়েটা আর ছেলেটা আবার কথা শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম এবারে। কিন্তু মনে হল না যে, এই গলাটার সঙ্গে কেনেথের যে গলা শুনেছিলাম তার খুব মিল আছে বলে।

ম্যাক্সকে সে-কথা বললাম।

ম্যাক্স বলল, এক লোকের গলাও তো অন্যরকম শোনায় বিভিন্ন সময়ে। তা ছাড়া তুমি একটু শুনেছ। তোমার পক্ষে বোঝা মুশকিলও।

আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আমরা পলিনেসিয়ান খাবার খেলাম।

ম্যাক্স বলল, আমার স্ত্রী থাকলে তোমাকে বিরিয়ানি পোলাউ খাওয়াতাম। আমরা দু-বছর যে দিল্লিতে ছিলাম।

তাই বুঝি? অবাক হলাম আমি।

ম্যাক্স বলল, আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেকট ফর ইন্ডিয়ানস। তোমরা বড় সাদাসরল অতিথিপরায়ণ লোক—ইন্ডিয়াতে ক্রাইমও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

তারপর ম্যাক্স আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ দিল। এবং নিজের শোফার ড্রিভন সাদা স্পোর্টস মডেল জাগুয়ার গাড়ির দরজা খুলে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল।

গাড়িতে হলিডে ইন-এ ফিরে আসতে-আসতে আমি ভাবছিলাম যে, ম্যাক্স আমাকে একবারও বারণ করল না লারাকে জানাতে যে, আমি এখানে এসেছিলাম। লারার প্রতি কোনও সন্দেহ থাকলে

BanglaBook.org

তা নিশ্চয়ই করত। লারাকে সন্দেহ করবেই বা কেন? ভাবলাম আমি। আহা এমন সুন্দরী নরম নেনে পাখির মতো মেয়ে, সে কী কোনও অন্যায় করতে পারে? কেনেথের মৃত্যুতে বেচারি ভেঙে পড়েছে একেবারে।

রৌদ্রালোকিত পথে গাড়িতে যেতে-যেতে রাতের স্বপ্নালোকিত আলোয় বিছানার ওপর লারার নগ্ন নিভৃত স্বপ্নময় শরীরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বলেছিল যে, বিয়ের পরপর কয়েকমাস ও-ও এমনি করে দিনদুপুরে ওর নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখতে পেত। ভাই ডাক্তার ছিল। ও বলত, ওই সময় যে কত ভুল চিকিৎসাই না করেছি কত লোকের তা কী বলব!

বিয়ারটা একটু বেশিই খেয়েছিলাম। জামাকাপড় ছেড়ে লম্বা ঘুম লাগালাম। ঘুম ভাঙল দরজার বেল বাজায়।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দু-হাত বাড়িয়ে এসে আমাকে চুমু খেল ও।

আমি বললাম, চা আনাই।

ও বলল, চা না কফি! রিয়্যাল স্ট্রং ব্ল্যাক কফি।

রুম সার্ভিসে কফির অর্ডার করে আমি ওকে বললাম ম্যাক্সের কথা। ওখানে যাওয়ার কথা। লারার চোখ দুটি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আমার জন্যে।

বলল, তুমি করেছ কী? তুমি জানো যে যেই-ই কেনেথকে মেরে থাকুক তার লোক আমাদের নজর রাখছে, ড্যানারের লোক তো রাখছেই।

তারা তোমাকে কিছু বোঝার আগেই শেষ করে দেবে। তুমি জানো না তুমি কী ভুল করেছ! এখন আমার চেয়ে তোমার বিপদ বেশি।

আমি বললাম, আমার কিসের বিপদ?

লারা বলল, তুমি এইসব আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর লোকদের জানো না। এরা সাংঘাতিক।

লারাকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

আমি ভাবলাম যে আমি ফিরে যাই নিউইয়র্কে। মিছিমিছি কীসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু লারা। লারার সুন্দর শরীর। শরীরের মধ্যের কত সব লুকোনো যাদু ছলা কলা। আমার নেশা লেগে গেছে। মৃত্যুর নেশাও বুঝি এরকম। নিশির ডাকের মতো লারার শরীর সবসময় আমাকে হাতছানি দেয়।

নারী-শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমি শরীরী জগতে প্রবেশ করলাম এমনই একজন নমনীয় পেলব রঙ্গিনি নারীর হাত ধরে যে, মনে হচ্ছে সারা জীবনের মতো এই জগতেই বুঝি বন্দি হয়ে থাকব। এই গোলকধাঁধা থেকে আমার বুঝি মুক্তি নেই। পরশু যেতে তো হবেই। কিন্তু আজ ও কাল এই দুটি দিন ও রাতের বিনিময়ে যে-কোনও দামই দিতে রাজি আমি।

লারা আমাকে বলল, তুমি আজই চলে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। সানফ্রানসিসকো বা লসএঞ্জেলেস হয়ে অনেক ফ্লাইট আছে নিউইয়র্কের। দেরি কোরো না তুমি। দেরি করলে মরবে।

আমি ওকে দু-হাতে জড়িয়ে বললাম, আমাকে এই দু-দিন দু-রাত তোমার কাছে থাকতে দাও। তাতে যদি মরতে হয় তাহলে মরব। এই আনন্দের জন্যে মরতে হলেও মরব।

লারা হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, ইউ সিলি সেন্টিমেন্টাল ফুল। তুমি জানো না যে, এখন আমার সঙ্গে শোওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে শোওয়া।

আমি হেসে উঠলাম। কাব্য করে বললাম, তাই-ই! মৃত্যুকেই রমণ করব।

তারপর মনে-মনে বললাম, লারার শরীরের নিবিড় আশ্লেষে প্রতিবারের উষ্ণ নিঃশ্বাসে মৃত্যুর জঘনে ওঠা নামা করব আমি।

BanglaBook.org

লারা অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। ওর মুখটা ভাবলেশহীন।

ও বলল, মৃত্যুর মধ্যে কোনও উষ্ণতা নেই। মৃত্যু ব্যাঙের গায়ের মতো ঠান্ডা। মৃত্যুকে জানোনি তুমি। তাই-ই এমন পাগলের মতো কথা বলছ।

আমি বললাম, কথা বাড়িও না।

লারা বলল, তুমি যদি চলে নাই-ই যাও তবে এখানে আমাদের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তবে কোথায় যাবে?

পালাব। নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল লারা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি পালাবে কেন? তুমি কী করেছ? ড্যানারের ভার নিয়ে নিয়েছে ম্যাক্স। ড্যানার আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত থেকো।

লারা বলল, তুমি কিছু চেনো না ড্যানারকে। তুমি চুপ করো। চলো আজ রাতেই চলে যাই আমরা।

আমি বললাম, বাঃ। থানায় না জানিয়ে যাবে কী করে? আমাদের না বলেছে শহর ছেড়ে গেলে জানিয়ে যেতে।

তুমি জানাও। আমি জানাব না। লারা বলল।

আমি লারাকে বললাম, জানো ম্যাক্স আমাকে কেনেথের গলার টেপ বাজিয়ে শোনাল।

টেপ? কিসের টেপ? কেন?

গলাটা কেনেথের কী না জানার জন্যে।

লারা বলল, তুমি কী বললে?

বললাম, কেনেথের মতো মনে হচ্ছে না—মানে আমি যে কেনেথের গলা শুনেছিলাম।

লারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বলল, তার মানেই আমাকে এবং তোমাকে ওরা ড্যানারের সাগরেদ ভাবছে। তুমি জানো না তুমি কী ইডিয়টের মতো কাজ করেছ।

আমি ওর ভাষায় স্তম্ভিত ও দুঃখিত হলাম। মুখে কিছু বললাম না।

লারা বলল, চলো আমরা এই হোটেল থেকে পালাই।

কোথায় যাবে? আমি শুধোলাম। তারপর বললাম, তোমার সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্যই তো দেখায়নি ম্যাক্স। তুমি নিজেকে এত ইমপর্টান্ট ভাবছ কেন?

কাহালা হিলটনে যাব। হাইড এওয়ে কটেজে থাকব চুপচাপ। বেনামে। ওদিকটা একেবারে নির্জন। সমুদ্রের ধারে।

আমি বললাম, আমি বেনামে থাকতে যাব কেন? বেনামে কোথাও থাকাটাও তো বেআইনি।

লারা বলল, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো—যখন খুশি চলে এসো আমার কাছে। কিন্তু কেউ যেন বুঝতে না পায়। যেন ওই হোটেলেই খেতে গেছ—এমনি ভাবে যাবে—ট্যাক্সি ঘুরিয়ে অন্য পথ দিয়ে—যাতে কেউই বুঝতে না পারে যে তুমি আমার কাছে আসছ।

আমি বললাম, যা ভালো মনে করো। আমি তো পরশু ভোরেই চলে যাচ্ছি। তোমার কী যে এমন অসুবিধা হত জানি না দু-দিন এখানে থাকলে।

লারা বলল, আমি এই হোটেলের ঘরটাও রেখে দেব। যাতে আমি চলে গেছি এখান থেকে এমন সন্দেহ কেউ না করতে পারে। শুধু নাইটিটা নিয়ে যাব কাগজে মুড়ে। তুমি আমার ঘরের বিছানাতে শুয়ে থেকো মাঝে-মাঝে, যাতে হোটেলের হাউসকিপিং স্টাফেরা জানে যে আমি এখানেই আছি।

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

লারা বলল, আমি চললাম। আমার কথা কেউ জিগ্যেস করলে বোলো, জানো না। আমাকে ফোনও কোরো না। যদি আসতে চাও, তাহলে সোজা চলে এসো কাহালা হিলটনে রাতে। আমি

BanglaBook.org

অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

বলেই, হঠাৎ উঠে পড়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে চুমু খেল আমাকে। পরক্ষণেই বলল, বাই!

দরজা অবধি ফিরে গিয়েই বলল আমার প্যাকেটটা—প্যাকেটটা হারিও না যেন। আমার সলিসিটরের নাম ফিনিগান ব্রাদার্স, ফিফথ অ্যাভিন্যুতে ওদের অফিস। ওদের লোকই আসবে।

লারা আবার বলল, আমার নতুন নাম জিনা ওয়াকার, সানফ্রানসিসকোর।

আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা সুন্দর উষ্ণ ছুটি ধীরে-ধীরে কেমন ঠান্ডা, টেল, ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠছে।

লারা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে থেকে পথে বেরোলাম। হলিডে ইন-এর দুটো দরজা। একটা ওয়াইকিকি বিচের দিকে হোটেলের স্টেশনারি দোকানটার পাশ দিয়ে আর অন্যটা পাশের রাস্তায় পড়েছে। সেটাও গিয়ে মিশেছে ওয়াইকিকিতে।

একবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারে গেলাম। কিছুই ভালো লাগছিল না। রাত বাড়তেই লারার চুলের সুগন্ধ ওর শরীরের সাবানের গন্ধের সঙ্গে মিশে উড়াল হাওয়ায় হাতছানি দিতে লাগল আমাকে। আমি এই প্রথম জানলাম, নারী-পুরুষের পক্ষে কত বড় বিপদের। নারীর নেশায় কীভাবে পুরুষ সর্বস্বান্ত হয়। আমার মন বলছিল লারার কাছে যাওয়ায় আমার বিপদ আছে। এমনিতেও হয়তো আছে। ড্যানার এবং তার লোকজন চারপাশে। তবুও, সব জেনেও আমি নিজেকে বাগ মানাতে পারলাম না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে থেকেই একটা ক্যাব নিয়ে বললাম, কাহালা হিলটন।

ট্যাক্সিটা মুহূর্তের মধ্যে ছুটে চলল রাতের পথ ধরে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথ ঘাট ভিজে। ভেজা পথে পথের রঙিন আলোর প্রতিফলন পড়েছে। কাহালা হিলটনের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন খুব জোরে আমার ট্যাক্সিকে ওভারটেক করে চলে গেল। যেন নাম্বার প্লেটটা চেনা মনে হল। কিন্তু ভালো করে দেখার আগেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাড়া মিটিয়ে রিশেপসানে গিয়ে জিনা ওয়াকারের খোঁজ করলাম। হাইড-এওয়ে কটেজগুলো কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে কটেজের নাম্বার বলে দিল।

হু-হু করে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে, পামগাছের পাতাগুলো হাত নাড়ছে পাগলের মতো। আরও নানারকম গাছ। এদিকটা কেমন ছায়া-ছায়া অন্ধকার-অন্ধকার। হনিমুনিং কাপলসরা, প্রেমিক-প্রেমিকারা এবং পরকীয়া প্রেমের অংশীদাররা বড় পছন্দ করে এই লুকিয়ে-থাকা কটেজগুলো। ওরা যেমন পরিবেশ চায়, তেমনই পরিবেশ।

লারার কটেজের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখি লারা জল থেকে উঠে আসছে বিকিনি পরে। তারপর ওইখানেই দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি কাছে যেতেই বলল, এসো, পাম গাছের অন্ধকারে বসি। কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। বলেই লারা টান-টান হয়ে বালির মধ্যে শুয়ে পড়ল।

আজ ত্রয়োদশী কী চতুর্দশী। চাঁদের আলো পাতার ফাঁক-ফোঁক দিয়ে এসে নীচে পড়েছে। তবুও জায়গাটা অন্ধকার। লারার ভেজা ঠোঁটে আমি জামাকাপড় পরেই নীচু হয়ে চুমু খেলাম।

লারা বলল, সুইটি পাই। তারপর বলল, খেয়ে এসেছ?

আমি বললাম, না। খাব না। আজ শুধু তোমাকে খাব।

লারা চাপা হাসি হাসল। বলল, ক্যানিবাল।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, এসো আমরা বালির বাড়ি-ঘর বানাই বালি খুঁড়ে।

আমাকেও খেলায় পেল। লারা যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেল। আমরা দুজনে মিলে বালি খুঁড়তে লাগলাম ঘনসন্নিবিষ্ট পাম গাছেদের মাঝের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাতে। অনেকক্ষণ খোঁড়ার পর আমি বললাম, অনেক হয়েছে, আর কী হবে?

BanglaBook.org

লারা বলল, প্রাসাদ বানাব। ছোট্ট বাড়িতে কী আমাদের দুজনকে কুলোবে? বলেই দ্বিগুণ জোরে বালি তুলতে লাগল।

আমি বললাম, করছ কী? আঙুল ব্যথা হয়ে গেল আমার।

ও বলল, হোক না কেন? আমি রাতে ব্যথা সারিয়ে দেব।

দেখতে-দেখতে প্রায় দু-ফিট মতো গর্ত হয়ে গেল একটা। অনেক বালি উঠল। আমরা দুজনে ঘর-বাড়ি বানাতে লাগলাম। আমি একটা, ও একটা।

লারা বলল, আমাদের আলাদা-আলাদা বাড়ি—মধ্যে জল থাকবে আর তাতে ব্রিজ। পূর্ণিমা রাতে তুমি আমার বাড়ি আসবে, কেমন?

আমি হাসলাম। বললাম, বাব্বাঃ এ যে শেষের কবিতা হয়ে গেল।

লারা বলল, সেটা কী?

আমি বললাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। টেগোরের নাম শুনেছ?

না!

আমি বললাম, তোমাকে দেব বইটা। কৃষ্ণ কৃপালনীর ইংরিজি ট্র্যানস্লেশান আছে, 'অ্যাডিউ মাই ফ্রেন্ড।' বলেই, আমি বাংলায় আবৃত্তি করলাম, 'মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে, আমাকে।' তারপর ইংরিজিতে তর্জমা করে শোনালাম লারাকে।

লারা বলল, গ্রেট।

এমন সময় স্যুট-পরা একজন লোককে দূরের হোটেলের মেইন ব্লকের দিক থেকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

লারা কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখেই সিঁটিয়ে গেল ভয়ে।

ও আমাকে বলল, তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখো তো লোকটা কে? কী চায়?

আমিও যেন বিচে হেঁটে বেড়াচ্ছি এমনিভাবে ওইদিকে হেঁটে গেলাম। লোকটা সোজা ওই পামগাছের ছায়া ঘেরা জায়গাটার দিকেই আসছিল। আমার মুখোমুখি হতেই হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারলাম আমি।

আবছা চাঁদের আলোয়, সমুদ্রের গর্জনে, পামের পাতা কাঁপানো হাওয়ায় আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম।

লোকটা বলল, হাই! মিস্টার বোস।

আমি বললাম, হাই!

বলেই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই ছাইরঙা বিজনেস স্যুট—কেনেথ হচনার।

লোকটা বলল, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে কী করছিলে তুমি? লারা কোথায়?

আমি বললাম, আমার এক গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে বালির ঘর বানাচ্ছিলাম। লারার কথা জানি না। ও বোধহয় হলিডে ইন-এই থাকবে।

কেনেথ বলল, দ্যাটস ফাইন। আমি বরং হলিডে ইন-এই যাই।

তুমি এখানে কী করছিলে?

কনডাকটেড ট্যুওরে এসেছিলাম নাচ দেখতে, ডিনার খেতে। বলেই হাত তুলে বলল, সি ইউ এগেইন।

ও পিছন ফিরতে আমি বললাম, আমিই কী বললাম? বললাম, তুমি তো মরে গেছ।

কেনেথ হচনার মুখটা ঘোরাল। বলল, ইয়েস, অলমোস্ট। তারপর বলল, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস।

বলেই আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

BanglaBook.org

আমি লারার দিকে দৌড়ে যেতে-যেতে দেখলাম, লারা কী একটা জিনিস বালির গর্তের মধ্যে ফেলে বালি চাপা দিচ্ছে।

আমি পৌঁছতেই বলল, হাত লাগাও। এসো গর্ত বুজিয়ে দিয়ে ঘরে যাই আমরা।

আমি বললাম, তুমি গর্তের মধ্যে কী কিছু ফেললে?

লারা অবাক হয়ে বলল, আমি! কী ফেলব? না তো?

আমি তাকিয়ে দেখলাম লারার হ্যান্ডব্যাগটা পাশেই রাখা।

আমি বললাম, এই ব্যাগটা তো তোমার সঙ্গে ছিল না।

না। আমি ওইখানে ছায়ায় রেখে গেছিলাম লুকিয়ে। তুমি বোধহয় ব্যাগটাকে নিতে দেখেছ আমায়।

আমি বললাম, হবে।

লারা বলল, লোকটা কে?

আমি বললাম, কেনেথ। কেনেথ হচনার।

হোয়াট! বলে লারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আমাকে ধমকে উঠল।

তারপর বলল, আমাকে সত্যি কথা বল। নইলে তোমাকেও সন্দেহ করব আমি।

আমি বললাম, সত্যিই বলছি। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকল। তোমার কথা জিগ্যেস করল। আমি বললাম, তুমি হলিডে ইন-এই আছ। ও বলল এখানে ও খেতে ও নাচ দেখতে এসেছিল। বিচে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে-বেড়াতে এদিকে চলে আসে।

লারা রাগে কাঁপছিল। বলল, ইউ ইন্ডিয়ানস। ইউ বিলিভ ইন রোপট্রিকস, স্নেক-চার্মিং এন্ড ইন ঘোস্টস। ইউ আর ফানি, রিয়্যালি ফানি।

আমি বললাম, হবে। আমি কথা বললাম জ্যান্ত লোকটার সঙ্গে। চলো, আমরা তো ওই পথ দিয়েই কটেজে ফিরব। তোমাকে ওর জুতোর দাগও দেখাব বালিতে।

লারা আমার সাহায্য ছাড়াই গর্তটা বালি দিয়ে বুজিয়ে দিল।

আমি বললাম, বাড়িগুলো গড়তে-না-গড়তেই ভাঙলে কেন? গর্ত ভরাট করার তাড়া কী ছিল?

লারা বলল, তা কেন? কোনও লোক অন্ধকারে এর মধ্যে পড়ে পা মচকাক আর কী!

আমরা ফিরে আসছিলাম। লারা আমার হাত ধরে আসছিল। কিন্তু ওর নিজের পায়ে যেন জোর ছিল না। আমার শরীরে ভর দিয়ে হাঁটছিল।

কেনেথের সঙ্গে যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি লারাকে জুতোর ছাপ দেখাতে নীচু হতেই দেখলাম কী যেন একটা পড়ে আছে সেখানে।

আমি সেটা তুলে নিতেই লারা আতঙ্কে অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, রুমালটায় কোনও পারফিউম আছে?

আমি শুঁকে বললাম, আছে।

কী পারফিউম? বলতে পারো?

লারা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

আমি বললাম, পারি। ব্রুট।

লারা আবারও যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, ব্রুট! ব্রুট পারফিউমের গন্ধ। এ তো কেনেথেরই রুমাল, কেনেথেরই পারফিউম।

পরক্ষণেই বলল, ঘরে চলো, তাড়াতাড়ি ঘরে চলো। ইট জাস্ট কানট বি। কেনেথ ইজ ডেড। ও মরে গেছে। মরে যাওয়া মানুষ কেমন করে, কেমন করে...?

আমরা কটেজে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এয়ারকন্ডিশানড কটেজ। ফ্রিজ খুলে আমি

BanglaBook.org

ওয়াইনের বোতল বের করলাম একটা। ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন।

লারা সোফাতে বসে পড়ল বিকিনি পরেই। তারপর চোখ বন্ধ করে বালিশ টেনে নিল।

আমি ওয়াইন ঢালতে-ঢালতে বললাম, কী ব্যাপার বলো তো? কেনেথ কী তাহলে সেদিন মারা যায়নি বিচে? কেনেথের মতো দেখতে অন্য কোনও লোক কি মারা গেছিল তাহলে?

লারা বলল, ইটস ফুলিশ। হতেই পারে না। আমি জানি যে কেনেথ মারা গেছে। আমি নিশ্চয়ই জানি। এবং জানি বলেই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এর মাথামুন্ডু।

আমি বললাম, লোকটাকে ডেকে আনব তোমার কাছে? কথা বলবে তুমি? কথা বলো তাহলে? যে লোক জুতো পায়ে হাঁটে, রুমাল ফেলে দিয়ে যায় সে তো ভূত নয়।

ভূত নয়, তাই-ই বা বলি কী করে? লারা স্বগতোক্তির মতো বলল।

তারপর বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে বলল, হতে পারে না জিত্, হতেই পারে না এ। আমি নিশ্চয়ই জানি যে কেনেথ মারা গেছে।

হাত বাড়িয়ে লারা ওয়াইনের গ্লাসটা নিল এবং এক চুমুকে শেষ করে ফেলল তা। আমাকে আবারও ঢেলে দিতে বলল। দেখতে-দেখতে ও একাই বলতে গেলে পুরো বোতল শেষ করে ফেলল। ফ্রিজ থেকে আরও একটা বোতল বের করলাম।

লারার ততক্ষণে পুরো নেশা হয়ে গেছিল। আমাকে লাইটটা নিভিয়ে দিতে বলল।

লাইটটা নিভিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেল। লারা শোওয়া অবস্থাতেই নিজেকে অনাবৃত করে ফেলল। তারপর জড়ানো গলায় আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। বলল, কাম, মেক লাভ টু মি। উই উইল ড্রাইভ এওয়ে কেনেথেস থোস্ট টুনাইট। হোল্ড মি টাইট। প্লিজ হোল্ড মি টাইট।

কেনেথ হচনার

সারা রাত জিনা ওয়াকার ও লারা ডস-এর সঙ্গে কেনেথ হচনারের ভূত তাড়ালাম আমি। রাতভর আনন্দময় ক্লান্তির পর আমি যখন প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে কাহালা হিলটনের হাইড-এওয়ে কটেজ থেকে বেরিয়ে হোটেলের পার্কিং লট-এ এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম তখন ঘুম পাচ্ছিল।

গাড়ির পিছনের সিটে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছিল খুব। চোখের পাতা বুঝি বুঁজেই ফেলেছিলাম। এমন সময় ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরেই থেমে গেল।

রাস্তার ফুটপাথের এক বেঞ্চে একটা লোক সকালের খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে আছে। ট্যাক্সিটা থামতেই, কেন থামল এ-কথা ড্রাইভারকে জিগ্যেস করার আগেই দেখি, কেনেথ হচনার খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে এসে বাঁদিকের দরজা খুলে আমার পাশে বসে পড়ল।

বসেই বলল, গুড মর্নিং টু ইউ মিস্টার বোস।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে জিগ্যেস না করে হচনারকেই জিগ্যেস করল, হোয়ার টু?

হচনার বলল, বস-এর বাড়ি।

আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে হচনার ড্যানারের লোক। সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনের ড্রাইভারও ঠিক এমনিভাবে লারার কাছে ড্যানারকে বস বলে উল্লেখ করত।

আমি দরজার একদিকে সরে যেতেই হচনার তার কোটের নীচে বাঁ-কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, ঝামেলা করবেন না। আপনাকে গরম-গরম ব্রেকফাস্ট রোলস, চিকেন, ওমলেট উইথ ব্যাকন এবং মধু দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াব বস-

BanglaBook.org

এর বাড়ি। পিস্তলের গুলির চেয়ে তা খেতে নিশ্চয়ই অনেক ভালো।

কেনেথ পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। ব্রুট পারফ্যুমের গন্ধ পেলাম আমি।

ট্যাক্সিটা কিন্তু যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেটা ম্যাক্স-এর বাড়ি।

দরজায় হচনার আমাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল। কলিং বেল টিপতেই ড্রেসিং গাউন পরে ম্যাক্স নিজে এসে দরজা খুলল। আমাকে দেখে যেন খুশিই হয়েছে বলে মনে হল।

হচনার স্যালুট করে বলল, গুড মর্নিং স্যার। আমি ভদ্রলোককে গরম রোলস, চিকেন, ওমলেট, ব্যাকন এবং মধু খাওয়াব বলে নিয়ে এসেছি ব্রেকফাস্টে। আমি খাব। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

ম্যাক্স আমাদের বসবার ঘরে বসতে বলে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে গেল।

বসবার ঘরে আরেকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, খুব লম্বা কালো স্যুট পরে। আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক শুধু বললেন, হাই।

হচনার বলল, আপনি বসুন, আমি আসছি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ম্যাক্স ও হচনার দুজনেই এল একসঙ্গে। ম্যাক্স লম্বা মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মরিসন, ওহারা অফ ক্যানাডিয়ান পোলিস। এখন ইন্টারপোলে আছেন।

ডাইনিং রুমের টেবলে বাটলার কাঁটাচামচ সাজিয়ে ব্রেকফাস্ট রেডি করছিল। ফুটন্ত জলে টাটকা কফি ভেজানোর গন্ধ আসছিল হাওয়ায়।

আমি বললাম, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমাকে কেন এখানে আনা হল জানালে ভালো হয়। কখন ছাড়া পাব আমি?

ম্যাক্স আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলল, আজ ছাড়া পেতে দেরি আছে। কাল সকালে তোমাকে আমিই এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসব। তুমি আজকের মতো আমার অতিথি।

আমি বললাম, আমার জামাকাপড়। সব তো হোটেলে।

ম্যাক্স হাসল। বলল, সব আছে। তারপর হচনারকে বলল, তুমি মিঃ বোসকে ওঁর ঘরে নিয়ে যাও। চেঞ্জ করে আসুন উনি।

ওপরে গিয়ে যে-ঘরের দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল কেনেথ, সে ঘরে ঢুকে দেখি আমার সব সম্পত্তি সেখানে। এমনকি টুথ ব্রাশ, দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র সমস্ত বাথরুমে জায়গামত সাজানো আছে।

হঠাৎ আমার স্যুটকেশটার কথা মনে হল। তালাটা বন্ধই ছিল। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে খুলে দেখি সবই ঠিক আছে, শুধু লারার দেওয়া প্যাকেটটাই নেই।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নেমে আমি প্যাকেটটার কথা বললাম ম্যাক্সকে। বললাম, প্রথমত আমাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তা বলা হোক, দ্বিতীয়ত একটা প্যাকেট ছিল স্যুটকেশে। প্যাকেটটা স্যুটকেশে নেই কেন? কে চুরি করেছে?

ম্যাক্স বলল, ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্যাকেট নয়। ওটার মালিকানা দাবি করলে ভীষণ বিপদে পড়বে তুমি। আমরা তোমার বন্ধু, শত্রু নই, আপাতত সে কথাটুকু জানলেই যথেষ্ট। এখন রিল্যাক্স করো। উত্তেজনা এখন আমাদের। তোমার নয়। তুমি পুরোপুরি নিরাপদ।

আর লারা? লারা যে ওখানে একা রইল?

ম্যাক্স কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও। সব কথাই বলা হবে তোমাকে। আমরা তোমার সাহায্য চাই। লারার জন্যে তোমার চিন্তা করার কারণ নেই। নিজের ভার সে নিজেই বইতে পারে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে খেতে বসে ম্যাক্স হচনারকে বলল, বিল, কাহালা হিলটনে পামগাছের নীচে লোক পাঠিয়েছ—ওটা বালি থেকে তোলার জন্যে?

BanglaBook.org

বুঝলাম যে, কেনেথ হচনারবেশি মানুষটার আসল নাম বিল।

বিল বলল, আমি তো এই-ই এলাম স্যার।

ম্যাক্স বলল, রাতারাতিই ওটা করা উচিত ছিল। এখন দিনের আলোতে তুলতে পারবে না। সব বন্দোবস্ত করে রেখো যাতে সন্ধে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই তুলে আনতে পারো।

পুরো ব্যাপারটা, এদের কথাবার্তা, আমার কাছে এমন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল যে অমন রোলস মধু আর ব্যাকন এবং চিকেন ওমলেটটা ভালো করে খেতে পারলাম না।

বিল টেবল ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে কাকে কী যেন বলে এল।

বিল চলে যেতে ম্যাক্স বলল, এর নাম বিল সেমুর। মেক আপ ও মাইনর প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে ওকে কেনেথ হচনার সাজানো হয়েছিল।

ক্যানাডিয়ান পোলিস-এর মরিস ওহারা বললেন, আমি তাহলে কাল সকালের প্লেনেই প্রিজনারকে নিয়ে মনট্রিয়ালে চলে যেতে পারি।

কফির কাপে দুধ চিনি নাড়তে-নাড়তে ম্যাক্স বলল, আশা করছি। বলেই বাঁ-হাতের দু-তর্জনী আর মধ্যমা জোড়া করে বলল, কিপ ইওর ফিঙ্গারস ক্রসড।

ওহারা বলল, তোমাকে চোখের সামনে কাজ করতে দেখলাম এই সাতদিন। অনেক কিছু শিখলাম ম্যাক্স তোমার কাছ থেকে।

ম্যাক্স মনে-মনে খুশি হলেও হেসে বলল, ওহ্ স্টপ ইট। আমি যখন কানাডা যাব তখন তোমাকে দেখেও আমার অবাক লাগবে।

বিল-এর ও আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে ম্যাক্স বলল, বিল টেক আওয়ার ফ্রেন্ড টু ইওর বেডরুম অ্যান্ড ব্রিফ হিম। আমি পরে আসছি।

বিল আমাকে নিয়ে ওর বেডরুমে এল। একটা নরম গদিওয়ালা বড় চেয়ারে আমাকে বসাল। তারপর ড্রয়ার খুলে ডানহিল-এর আফটার ব্রেকফাস্ট টোব্যাকো বের করে দিল আমাকে।

বলল, আরাম করে পাইপটা ধরাও।

আমি পাইপ ধরাতে-ধরাতে ভাবছিলাম, এইবার ইন্টারোগেশান শুরু হবে। ভালো কথায় কাজ না হলে অত্যাচার করবে এরা। অত্যাচারের রকম এবং প্রক্রিয়া যে কত রকম হয় তা বইয়ে ও সিনেমাতে পড়া ও দেখা ছিল। কিন্তু মৃত কেনেথ হচনার সাজল কেন বিল আর হচনারের হত্যাকারীই বা কে এবং ওই হত্যার উদ্দেশ্যই বা কী এ সব কথা জানার আগ্রহ কম ছিল না। ওই চেয়ারে বসে ভালো ব্রেকফাস্টের পর পাইপ খেতে-খেতে তখন খুব যে একটা ভয় করছিল এমন বলব না।

কেনেথ একটা হাভানা সিগার ধরিয়ে বসল।

আমি দাঁতের ডাক্তারকে যেভাবে দাঁত তোলা শুরু করতে বলে লোকে, সেইভাবে বললাম, প্রশ্ন করতে শুরু করুন।

বিল হেসে ফেলল। বলল, আপনিই আমাকে করুন। বড় সাহেব আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছেন আমাকে।

আমাকে প্রশ্ন করতে বলেছেন? আমি অবাক হয়ে বললাম।

বিল বলল হ্যাঁ। তাই।

আমি বললাম, সেদিন হলিডে ইন-এর সামনে যে লোকটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল সে লোকটি কে?

বিল হাসল। বলল, লোকটি আমিই। তবে আমাকে মারা হয়নি। একটা মার্ডার স্টেজ করা হয়েছিল শুধু। আমারই কলিগরা গুলি করেছিল। ব্ল্যাঙ্ক শট। সিনথেটিক রক্তের ব্যাগে। বুক-পকেটে সে ব্যাগ লুকোনো ছিল।

BanglaBook.org

আমি বললাম, তাহলে কাগজের রিপোর্ট, পোস্ট-মর্টেম, করোনারের রিপোর্ট?

ওগুলো সব অ্যারেঞ্জড।

কেনেথের ডেডবডিটা ম্যাসাচুসেটস-এ পাঠানো?

কফিনটা সত্যিই গেছিল। ম্যাসাচুসেটস-এই। কিন্তু কফিনে আনারস ছিল এখানকার। ওখানকার এয়ারপোর্টে আমাদেরই একজন কেনেথের বাবা সেজে কফিনের ডেলিভারি নিয়েছিল।

বিল একটু থেমে বলল, আনারসগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পৌঁছেচে। স্বাদও খুবই ভালো ছিল। বড় সাহেব খবর পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে।

আমি বললাম, তাহলে লারার বন্ধু কেনেথ হচনার মারা যায়নি?

হ্যাঁ। মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কি হেঁয়ালি করছেন।

বিল বলল, কেনেথ হচনার মারা গেছিল আজ থেকে আটদিন আগে। এবং মারা গেছিল টোরোন্টোতে তার অ্যাপার্টমেন্টে। তাকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোলট পিস্তল দিয়েই মারা হয়েছিল।

আমি বিল-এর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললাম, তাহলে কেনেথ যে আমার সঙ্গে কথা বলল, হলিডে ইন-এ টেলিফোনে। কেনেথ যে এল একদিন, আমার ঘরে, কথা বলে গেল আমার সঙ্গে।

বিল বলল, প্রথম কেনেথ যে কানাডার টোরোন্টো থেকে তোমার সঙ্গে ও লারার সঙ্গে কথা বলেছিল ফোনে সে আসল কেনেথ নয়। আসল কেনেথ তার অনেক আগেই মারা যায়। আর যে কেনেথ হোটেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলে সে আমি, এই বিল সেমুর।

শুধোলাম, তা হলে টেলিফোনের কেনেথ কে?

বিল বলল, দ্যাটস ইমম্যাটেরিয়্যাল। আমাদের তাকে দরকার নেই, যদিও পরে সে ধরা পড়বে হয়ত। সে খুনির কোলাবরেটর। আমাদের এবং তোমাকে কনফিউজ করবার জন্যে লারা তাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল। আসল কথাটা হচ্ছে কেনেথের প্রকৃত হত্যাকারি টেলিফোন কলের বন্দোবস্ত করে পুরো ব্যাপারটা গোলমেলে করে দিয়ে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, ড্যানারকে কী ধরা হয়েছে?

বিল অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, বড়সাহেব বলতে পারবেন. কিন্তু ওকে শ্যাডো করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে ধরা যাবে।

বিল তারপর বলল, লারা সম্বন্ধে তোমার মতামত কী?

চমৎকার মেয়ে। আমি বললাম।

বিল হাসল। অসভ্যের মতো বলল, নো-ডাউট শি মাস্ট বি ভেরি গুড ইন বেড। আমিই আসল কেনেথ হচনার মানে ওর বয় ফ্রেন্ড হলে ভালো হত। যাই-ই হোক আই হোপ ইউ উইল এগ্রি উইথ হোয়াট আই সে।

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, ও বিষয়ে কোনও দ্বিতীয় মতের প্রশ্নই ওঠে না। এমনভাবে বললাম যেন আমি এ সব ব্যাপারে একজন অথরিটি।

এবার আমি বললাম, লারা সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা, মানে তোমাদের?

বিল একটু চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, চমৎকার মেয়ে। তবে আরও ভালো হতে পারত। ওর সঙ্গী-সাথী ভালো ছিল না।

কেনেথ তো ভালো ছিল।

না। বিল বলল। ওর চাকরিটা একটা ছুতো ছিল। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলারের দলের লোক

BanglaBook.org

ছিল ও। সাংঘাতিক সব মানুষজনের সঙ্গে ওর ওঠা-বসা ছিল।

আমি বললাম, তাই-ই বল, এতক্ষণে ওর মৃত্যু কাদের হাতে হয়েছে বুঝতে পারছি।

তারপর বললাম, ড্যানার তাহলে মারেনি ওকে? কারণ লারা তো তোমাদের সাজানো-খুনের কেনেথকে ড্যানার মেরেছে বলে ভাবছিল। যদি এখানে কোনও সত্যিকারের খুনই না হয়ে থাকে তাহলে ড্যানারকে সন্দেহর প্রশ্নই আসে না।

বিল বলল, ড্যানার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

সাংঘাতিক লোক। ওর চোখই বলে সে-কথা।

আমি কিন্তু ড্যানারের ভক্ত। ড্যানার নাম করা মাউন্টেনিয়ার ছিল যৌবনে। বহুবার তোমাদের দেশে গেছে, তারপর নেপাল থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন চুড়োয় উঠেছে। চমৎকার স্পোর্টসম্যান ড্যানার।

আমি বললাম, কিন্তু ও তো ব্রথেল-কিপার।

তাতে কী? বিল বলল। ব্যাবসা ব্যাবসাই। মদের ব্যবসায়ীদের যেমন প্রায়ই মদ খেতে দেখা যায় না, মেয়ে-খাটিয়ে যারা খায় তাদের নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ে সম্বন্ধে অস্বাভাবিকভাবে কম আসক্তি দেখা যায়।

তারপর বিল একটু থেমে বলল, টাকার আসক্তিই মানুষের সব চেয়ে বড় ক্রাইম। এই আসক্তির কোনও শেষ নেই। ওর জন্যে করতে পারে না মানুষে এমন কোনও কাজ নেই।

বিল সিগারটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার মনে হল এতক্ষণে আসল প্রশ্নটাই করা হয়নি বিলকে। এত সব ব্যাপার খুন-খারাপির মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায়? আমাকে কেন ধরে আনা হল, জড়ানো হল কেন আমায়?

বিলকে কথাটা বলতেই, বিল বলল, তুমি কেনেথের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার কেসে যদি আমাদের সাক্ষী হও, মানে উইটনেস ফর দ্যা প্রসিকিউশান, তা হলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি সাক্ষী না দিলে আমরা জোর করতে পারি না, যদিও সমন করে কোর্ট তোমাকে ডাকতে পারে। কিন্তু তুমি প্রথম থেকে আমাদের সাহায্য করলে খুব উপকার হয় আমাদের। হত্যাকারী যাতে সাজা পায়, তা দেখা সৎ নাগরিকের কর্তব্য।

আমি বললাম, কিছুই বুঝছি না তোমার কথা। হত্যাকারীটি কে?

বিল বলল, তা আমরা জানি না এখনও। তবে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

ঠিক এই সময় ম্যাক্স ঘরে এসে ঢুকল।

বিল উঠে দাঁড়াল।

ম্যাক্স বিলকে বলল, বিল লকার খুলে প্যাকেটটা নিয়ে এসো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিটেক্টিভদের রিপোর্ট এসেছে। টোরোন্টোর রিপোর্টের সঙ্গে মেলানো হয়ে গেছে। আইডেনটিকাল। সেই মেয়েটিকে নিয়ে একটু পরে ড্যানার আসছে। মেয়েটি বলেছে, হত্যাকারীকে দেখলে সে চিনতে পারবে। ফোটো দেখেও আইডেনটিফাই করেছে। এখন তুমি প্যাকেটটা নিয়ে এসো।

বিল চলে যেতেই, ম্যাক্স বলল, তুমি তো শুনলে সব, এবার তোমার কী মনে হয় বলো তো?

আমি বললাম, আমার কী মনে হবে? মার্ডার যখন এখানেই হয়নি, হয়েছে টোরোন্টোতে তাও আটদিন আগে, এখানকার কাকে সন্দেহ করব? ড্যানারের ওপর সন্দেহ হয়েছিল, লারারও তাই-ই সন্দেহ। এখন তো দেখছি এখানের মার্ডারটাই সাজানো।

ম্যাক্স বলল, হ্যাঁ সাজানো। এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে সত্যিকারের মার্ডারারকে পাজল করে দেওয়ার জন্যে। অনেক সময় এই রকম ঘটনা ঘটানোর পর খুনির ব্যবহারের তারতম্য দেখে

BanglaBook.org

তাকে শনাক্ত করা সোজা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তো আর কাউকে গ্রেফতার করা যায় না—হাতে প্রমাণ আজকেই সব এসে যাবে। আজ রাতেই অ্যারেস্ট করব মার্ডারারকে। কিন্তু অ্যারেস্ট করার পর তোমার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। তুমি আমাদের অত্যন্ত ইমপর্টান্ট সাক্ষী।

আমি বললাম, আজকে সন্ধেয় অ্যারেস্ট করবেন মানে? মার্ডারার তো টোরোন্টোতে মার্ডার করেছে—তাকে এখানে পাবেন কী করে?

ম্যাক্স বলল, সে এখানে এসেছে। তা নইলে কানাডিয়ান পোলিসের ওহারা কী এখানে এসে বসে থাকে। অ্যারেস্ট করার পর ওহারার হাতে তাকে দিয়ে আমার ছুটি। নিউইয়র্ক থেকে টোরোন্টো আর কতটুকু পথ। তোমাকে যাওয়া-আসার খরচ, ভালো হোটেলে থাকার খরচ, সিকিউরিটি সবই দেওয়া হবে। ভীরু লোকেরা রাজসাক্ষী হতে পারে না—কারণ সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে মনের জোর লাগে। তোমার কোনও বিপদ না হয় তার সব দায়িত্ব আমাদের। সাক্ষ্য দেওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত তোমাকে আমরা পাহারা দেব সব সময়। যদি দরকার হয়।

আমি আবারও শুধোলাম, খুনি কে তা জানেন?

ম্যাক্স বলল, জানি।

আমি বললাম, বলুন।

ম্যাক্স বলল, তুমি নিজেই জানতে পাবে। নিজের মাথা খাটাও। খুনিদের কোনও পৃথক জাত নেই—অত্যন্ত স্বল্প ক্ষেত্র ছাড়া—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো মন্দ আছে। কখনও আমরা মহৎ, কখনও নীচ। আমাদের মধ্যেই খারাপত্বটা যখন মাথাচাড়া দেয় তখন আমরা অনেকেই এমন-এমন কাজ করে ফেলি যে পরে সুস্থ অবস্থায় তা ভেবে দেখলে আশ্চর্য লাগে। কোনও মানুষ যখন একটা বড় রকমের অন্যায় করে ফেলে, তখন সেটা ঢাকতে তাকে অন্যায়ের পর অন্যায় করে যেতে হয়—মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার। তখন কারো-কারো মাথায় নানা রকম শয়তানী বুদ্ধি খেলে—এমন-এমন বুদ্ধি যা বড়-বড় মনীষীদের মাথা দিয়েও বেরোত না। এই রকম বুদ্ধি ভালো কাজে লাগালে, যারা খারাপ কাজ করে ফেলে সমাজের হাতে শাস্তি পায় তারা কত না বড় হতে পারত।

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আমার যা কাজ তা করতে-করতে কত রকম মানুষই দেখি, মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা, পাপের দিকটা। তবু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে এখনও যেন পারি না। যে সব চেয়ে খারাপ মানুষ তার মধ্যেও যে কত কী ভালো দিক থাকে তা আমার মতো করে খারাপ মানুষদের নিয়ে না থাকলে বোধহয় জানতেই পেতাম না।

বিল, লারা আমাকে যে প্যাকেটটা দিয়েছিল রাখতে সেই প্যাকেটটা নিয়ে এল হাতে করে। সঙ্গে ওহারাও এল। ওরা তিনজনে প্যাকেটটা খুলল। প্যাকেটটার মধ্যে থেকে বাচ্চাদের খেলার গুলির মতো বড় দশটা হীরে বেরোল।

বিল ফোন করল নীচে। ভ্যালুয়ার এখনও আসেনি। রাতের আগে নাকি আসতে পারবে না।

হীরেগুলো ম্যাক্স ও ওহারা নেড়েচেড়ে বলল, এদের দাম সব মিলিয়ে প্রায় বারো-তেরো মিলিয়ন পাউন্ড হবে।

তারপর বলল, আমরা তো জহুরী নই। জহুরী এলে হয়ত জানা যাবে যে দাম আরও বেশি।

দেখা হয়ে গেলে, বিল সঙ্গে-সঙ্গে প্যাকেটটা নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড লকারে তুলে রাখল।

আমার গলায় থুথু আটকে গেছিল। ম্যাক্স বলল, ইয়েস, দিস ইজ লাইফ।

তারপর বলল, তুমি কাল যখন এই হীরেগুলো সমেত ধরা পড়তে তখন তোমার কত বছর, জেল হত জানো তো? ধরা পড়লে একেবারে হাতেনাতেই পড়তে। তোমার লাগেজ চেক করার ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এয়ারপোর্টে, এবং সমস্ত কস্টমস অফিসেও—গত সাতদিন হল—যেদিন

BanglaBook.org

থেকে তুমি লারার সঙ্গে মাখামাখি আরম্ভ করেছিলে।

আমার গলায় থুথু তখন দলা পাকিয়ে গেছিল।

আমি বললাম, লারা তাহলে জেনেশুনেই আমাকে জেলে পাঠাচ্ছিল?

ম্যাক্স বলল, জেনেশুনে নয়। তাহলে ও তোমাকে দিয়ে পাচার করার চেষ্টা করত না।

আমি বললাম, কেন? ও যে ওর সলিসিটরের কথা বলল, বলল, আমি নিউইয়র্কে ফেরার আধঘণ্টার মধ্যে ওর সলিসিটরের লোক এসে প্যাকেটটা নিয়ে যাবে।

ম্যাক্স বলল, সলিসিটর? মাই ফুট।

আমি নাম ও ফিফথ অ্যাভিন্যুর কথা বললাম।

ম্যাক্স ফোন তুলে টেলেক্স অপারেটরকে বলল, এক্ষুনি নিউইয়র্ক থেকে জেনে নিতে ওই নামে কোনও সলিসিটর ফার্ম আছে কি নেই। থাকলে নিউইয়র্ক এফ-বি-আই-কে বলে দিতে বলল তাদের ইমিডিয়েটলি শ্যাডো করতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিল নিজেই টেলেক্স মেসেজের স্ট্রিপটা নিয়ে ম্যাক্সকে দিল।

ম্যাক্স স্ট্রিপটা দেখে নিয়ে আমাকে এগিয়ে দিল। 'নো সাচ ফার্ম একজিসটস।' ওই নামে কোনও ফার্ম নেই নিউইয়র্কে।

ম্যাক্স বলল, কী বুঝলে? খুব সম্ভব যে ওই হীরের প্যাকেট নিতে আসত সে তোমাকে খুন করেও যেত কারণ পরে কখনও তোমার মাধ্যমে ওই প্যাকেটের কথা ফাঁস হলে লারা এবং তার দলের ভারী বিপদ ছিল।

ততক্ষণে যা বোঝার বুঝেছিলাম আমি। সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে, নারীশরীরের মাদকতা, সুগন্ধ, স্বাদ সম্বন্ধে আমি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলাম। লারার মুখটা মনেও আনতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, কেনেথকে মারল কেন লারা? ও তো ওকে ভালোবাসত।

ম্যাক্স হাসল।

আমি ভাবছিলাম, মৃতদেহের ওপরে বসে, ফাঁসিতে লটকানো আসামির জিভ বের করা চেহারা দেখতে-দেখতে এদের হাসতে আটকায় না একটুও।

ম্যাক্স বলল, কেনেথকে ভালো নিশ্চয়ই বাসত। কিন্তু বারো মিলিয়ন ডলারের ভালোবাসার কাছে কেনেথের ভালোবাসার দাম কতটুকু ছিল? টাকা থাকলে সব সুখ থাকে। কেনেথকে ভালোবাসা সত্ত্বেও ওই হীরেগুলোর লোভে ও কেনেথের আদর খেতে-খেতেই ওর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে ওকে গুলি করে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায় কেনেথ। গুলি করার সঙ্গে -সঙ্গে ও জামাকাপড় পরে কেনেথের আলমারি থেকে প্যাকেটটা নিয়ে টোরোন্টোর ক্রিস্পসনস-এর দোকানের একটা পলিথিনের ব্যাগে প্যাকেটটা ভরে নিয়ে লিফট দিয়ে নেমে যায়। ফেরার সময়, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, জুইশ মার্কেটের একটা দোকানে বসে ডিনার খায় লারা, বিয়ার খায় দুটো। কেনেথকে কোল্ড ব্লাডে খুন করার পনেরো মিনিট পর। তখনও নিশ্চয়ই কেনেথের আদরে তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ভেজা ছিল। বোঝো কী সাংঘাতিক মেয়ে।

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, টাকার জন্যে মেয়েরা সব করতে পারে। মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের থেকে সাধারণত বেশি লোভী হয়।

আমি বললাম, তুমি এত সব জানলে কী করে?

ম্যাক্স বলল, পিস বাই পিস এভিডেন্স জোগাড় হয়েছে। ওহারা দু-দিনের মধ্যে টোরোন্টো থেকে এখানে চলে আসে সমস্ত প্রাইমারি ড্যাটা নিয়ে। লারা অত্যন্ত সুন্দরী। সকলেরই চোখে পড়ে। ড্যানারের ব্রথেলের একটি মেয়েকে কেনেথ সে রাতে ডেকেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাবার জন্যে। সে মেয়েটিও সুন্দরী। লারার সেদিন কেনেথের কাছে যাওয়ার কথাই ছিল না। লারা জানত

BanglaBook.org

যে কেনেথ স্মাগলিং করে। সেই দুপুরেই লারা হনলুলুতে ছুটি কাটাতে আসবে বলে লাঞ্চের পর অফিস ছুটি করে কেনেথের অ্যাপার্টমেন্টে যায় এবং দুজনে-দুজনকে আদর করে। সেই সময় কেনেথ দর্বল মুহূর্তে লারাকে ওই হীরের কথা বলে। বলে যে এটা জায়গামত পাচার করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার হবে কেনেথের। তখন ওরা দুজনে লম্বা ছুটিতে যাবে—সারা পৃথিবী ঘুরবে রাজা-মহারাজার মতো। লারার সামনেই আলমারি খুলে হীরেগুলো বের করে দেখায়। হীরেগুলো তখন একটা ভেলভেটের বাক্সে ছিল।

সারা বিকেল হীরেগুলো লারার মাথায় ঝড় তোলে। ও ওর নিজের ফ্ল্যাটে যাবে বলে টিউব স্টেশানে গিয়েও ফিরে আসে। কেনেথ তখন ঘুমোচ্ছিল। কেনেথকে ও বলে যে আমি চলে যাব কাল, কতদিন তোমাকে দেখতে পাব না—আরেকবার তোমার আদর খেতে এলাম। কেনেথ আলমারি থেকে কনিয়াকের বোতল বের করে, দুজনে মিলে খায়। কেনেথই বেশি খায়—প্রায় ড্রাঙ্ক হয়ে যায়। তখন লারা বলে, বালিশের তলায় তোমার পিস্তলটা যে সবসময় গুলিভরা অবস্থায় রেখে দাও, আমার শুতে ভয় করে বড়। তখন কেনেথ পিস্তলটা বের করে সাইড টেবলে রাখে।

লারা মিষ্টি করে জিগ্যেস করে চেম্বারে গুলি ভরে রাখো? না, গুলি শুধু ম্যাগাজিনেই আছে?

কেনেথ হাসে। বলে, চেম্বারে না-রাখলে হঠাৎ প্রয়োজনে কাজেই তো লাগবে না।

লারা বলে, আমি তোমার ওপরে শুচ্ছি, তোমাকে ভীষণ আদর করব আমি।

তার কিছুক্ষণ পরই যা করার করে। কেনেথ সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়।

আমার বাকরোধ হয়ে গেছিল। কোন কালনাগিনীর সঙ্গে কোন সর্বনাশের খেলায় মেতেছিলাম আমি!

একটু পর আমি শুধোলাম, তুমি যে মেয়েটির কথা বলছিলে, ড্যানারের ব্রথেলের মেয়ে—সে কী করল?

সে যখন লিফটে এসে কেনেথের পঁয়তাল্লিশ তলার ফ্ল্যাটে যাবে বলে পঁয়তাল্লিশ তলায় পৌঁছে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন দেখে কেনেথের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে লারা হাতে সিম্পসনস-এর শপিং ব্যাগ আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

লারাকে মেয়েটি দেখেছিল এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে গিয়ে দূর থেকে কেনেথের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। পরে কেনেথকে জিগ্যেস করে লারার পরিচয় জেনেছিল। তারপর মেয়েটি দরজা খুলেই ড্রইংরুম পেরিয়ে বেডরুমের দরজা খুলেই ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়ে আসে। খারাপ মেয়েদের ওপরে সন্দেহ সহজে হয় তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই ও এসে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দরজায় লারার হাতের প্রিন্টের সঙ্গে ওর হাতের প্রিন্টও পায় এবং বোঝে যে ও সত্যি কথা বলছে। ওই মেয়েটি লারার নাম জানত না, কোথায় থাকে লারা তাও জানত না। শুধু চেহারাটা চিনত। লারাও নিশ্চয়ই দেখতে চেয়েছিল মেয়েটি কোথায় যায় কিন্তু তখন সময় নষ্ট করতে পারেনি। লারা কেনেথের পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ও যদি মেয়েটির পিছন-পিছন গিয়ে কেনেথের ড্রইংরুমে ওকে গুলি করে মেরে ফেলত তাহলে একজনও সাক্ষী থাকত না। কিন্তু মাথা অত সঠিকভাবে কাজ করলে কোনও খুনিই কখনও ধরা পড়ত না।

আমি বললাম, ম্যাক্স, আমি একটু ঘুমুতে পারি? আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

ম্যাক্স বলল, এমনি ঘুম হবে না তোমার। বলেই ফোন তুলল। দু-মিনিটের মধ্যেই একজন ডাক্তার এসে আমাকে সবরকম পরীক্ষা করে সিডেটিভ ইনজেক্ট করে দিলেন।

ম্যাক্স বলল, ডাক্তার ছ'টার মধ্যেই কিন্তু ওঁকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে। ওভারডোজ যেন না হয়।

ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে। তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি ঘুমিয়ে উঠে দেরি করে লাঞ্চ খান—একদম ফিট হয়ে যাবে শরীর।

BanglaBook.org

জিনা ওয়াকার

তিনটে নাগাদ আমার ঘুম ভাঙতেই বাইরে বেরিয়ে দেখি অনেক লোক সেখানে। ম্যাক্স গিলিগান খুব উত্তেজিত। বিল একটু আগে ফিরে এসে একটা খারাপ খবর দিয়েছে।

ম্যাক্স আমাকে জিগ্যেস করল, কাল রাতে তুমি আর লারা যখন বিচে পাম গাছতলায় বসেছিলে তখন বালির গর্ত সে খোঁড়ার পর সেই গর্তে লারাকে কিছু লুকিয়ে রাখতে দেখেছিলে?

আমি অবাক হলাম। আমার মনে যে কথাটা এসেছিল মুহূর্তের জন্যে তা ম্যাক্স কী করে জানল ভেবে পেলাম না।

আমি বললাম, বিলের সঙ্গে কথা বলার পর আমি পিছন ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়েছিল আমার, লারা কী যেন একটা গর্তের মধ্যে ফেলল। লারাকে সে-কথা বলেও ছিলাম, ও অস্বীকার করল, বলল আমি দূর থেকে ভুল দেখেছি।

ম্যাক্স বলল, কেনেথের পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোল্ট-পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছিল ও-যা দিয়ে কেনেথকে মেরেছিল লারা। বালি খুঁড়ে দেখা গেছে সে পিস্তল নেই। কাল রাতের পর আজ সকালে নতুন করে বালি খুঁড়ে সেটাকে বের করে নিয়ে গেছে কেউ।

কে নিতে পারে? আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম।

লারাও নিতে পারে। কিন্তু লারা নিলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কেনেথের দলের লোকেরা যদি লারার খবর পেয়ে থাকে তাহলে বিপদ। কারণ, লারা ধরা পড়লে কেনেথের খুনের কিনারা যে শুধু হবে তাই-ই নয়, কেনেথের কাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাও জানা যাবে ওকে জেরা করে। তাই ওদের পক্ষে ওই পিস্তলটি লুকিয়ে ফেলা খুব জরুরি। ওহারা ইতিমধ্যেই কানাডা থেকে খবর পেয়েছে যে, কেনেথের দলের দুজন কন-ম্যান হনলুলুতে এসে পৌঁছেছে। লারা যে হীরেগুলো তোমাকে দিয়ে দিয়েছে একথা তারা জানে না। তারা মোটেই লারার বন্ধু নয়। তারা জানে যে হীরেগুলো লারার কাছেই আছে। লারা হঠাৎ লোভের বশে কেনেথকে হয়তো মেরে বসেছিল কিন্তু ও এই স্মাগলারদের আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তারা করতে পারে না এমন কাজ নেই। ওদের কাছে লারা একেবারেই দুধের শিশু।

ম্যাক্সের কথা শেষ হতে-না-হতে কাহালা হিলটনের পাশে দাঁড়ানো এফ-বি-আই-এর লোক ওয়ারলেসে মেসেজ পাঠাল যে লারার পাশের হাইড-এওয়ে কটেজ থেকে একজন সন্দেহজনক লোক এবং একজন সুন্দরী মেয়েকে চেক-ইন করে ঢুকতে দেখা গেছে। লোকটির চেহারার সঙ্গে কানাডিয়ান পুলিশের কন-ম্যানদের চেহারা সম্বন্ধে যা ইনফরমেশান ছিল, তার সঙ্গে মিলে গেছে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল তাদের ওপর কড়া নজর রাখো। ইতিমধ্যে লারা ঘর থেকে বেরোলেই নজর রেখো তার ওপরও।

জবাব এল, লারার হাইড-এওয়ে কটেজের ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে না। ওদের হাইড-আউট থেকে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল, ঘরের সামনেই তাহলে প্লেইন-ড্রেসে আর্মড লোক রাখো। লারার ঘরে যেন কেউ ঢুকতে না পারে। লারাও যেন বেরোতে না পারে। আমরা ঠিক সাতটায় যাব।

তারপর ম্যাক্স একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, ড্যানার এখনও আসছে না কেন মেয়েটিকে নিয়ে কে জানে?

আমি বললাম, সন্দেহ বা কল্পনায় ভর করে তো আর তোমরা লারাকে ধরতে পারবে না। ধরতে পারলেও কেস টেঁকাতে পারবে না। তোমাদের হাতে কী প্রমাণ আছে?

তারপর একটু থেমে বললাম, তোমরা ভুল করছ না তো ম্যাক্স?

বিরক্ত গলায় ম্যাক্স বলল, আছে-আছে। অনেক প্রমাণ আছে। পরে কখনও তোমাকে বলব।

BanglaBook.org

তাছাড়া তোমার কাছ থেকে যে হীরেগুলো বেরোলো সেগুলোও কী যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

তখনও সূর্য ডোবেনি, বেলা ছিল। ম্যাক্সকে খুব উত্তেজিত ও বিচলিত দেখাচ্ছিল।

ম্যাক্স বলল, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

ম্যাক্স ড্রইংরুমে এসে সেলারের সামনে দাঁড়িয়ে হুইস্কির বোতল খুলে র' হুইস্কি ঢালল দুটো। তারপর বাটলারকে বলল, আমাকে কিছু খাবার দিতে।

বাটলার বলল, কী দেব?

আমি লাঞ্চ খাইনি আজ। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। বললাম, যা খুশি। সসেজ বা হ্যাম স্যান্ডউইচ বা হট-ডগ যা হয়।

ম্যাক্স ড্রিঙ্কটা হাতে করে আমাকে পাশের ঘরে ওর স্টাডিতে নিয়ে গেল। গিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে আমার হাতে দিল। ম্যাক্স বইটার একটা চ্যাপটার খুলে আমাকে দেখাল। দেখলাম চ্যাপটারটার নাম আইডেনটিফিকেশান অফ ইন্ডিভিজুয়ালস। ড্যাকটিলো-সকোপির প্রথম রুল হচ্ছে কোনও মানুষের আঙুলের ছাপই অন্য মানুষের আঙুলের ছাপের মতো নয়। আমাদের আঙুলের ছাপ নানারকম হয়। প্লেইন আর্চ, টেন্টেড আর্চ, একসেপশানাল আর্চ, প্লেইন লুপ, হোর্ল সেন্ট্রাল পকেট লুপ, টুইন লুপ, ল্যাটারাল পকেট লুপ এবং অ্যাকসিডেন্টাল। তাই আঙুলের ছাপ দেখে সহজেই বোঝা যায়।

তারপর বইটা জায়গায় তুলে রেখে, হুইস্কির গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, কেনেথের টোরোন্টোর ঘরের দরজায় যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে লারার, সাইড বোর্ডের ওপরে, এখানে হোটেলের কাউন্টারের ওপরে, বাথরুমের দরজায়, বাইরের দরজায়, সব হুবহু মিলে গেছে। আঙুলের ছাপের ডেলটা এবং লুপস দেখে অনেক কিছুই বোঝা যায়। বোঝা যায়, রিজ ট্রেসিং করেও। তাছাড়া ড্যানারের মেয়েটি আইডেনটিফাই করবে লারাকে। এফ-বি-আই-এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভিশানে যে কত লোক কাজ করে তা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

তারপরই বলল, আচ্ছা, কেনেথ কাল ওখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার পর লারার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখলে?

আমি বললাম, শুধু কাল কেন? ও যখন হোটেলে এসেছিল, লারা কেবলি বলেছিল, ইট কান্ট বি। ইটস ইমপসিবল। কালকে কেনেথের রুমালটা আমি যখন তুলে নিলাম, যখন জুতোর ছাপ দেখালাম, সত্যি মানুষের, তখনও ও চমকে উঠল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও আমাকে শুধোলো, রুমালে কোনও পারফিউমের গন্ধ আছে?

আমি বললাম, ব্রুট।

ও চমকে উঠল। বলল, ব্রুট।

তারপরই একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে, ভীষণ ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি তখন ভেবেছিলাম ও ভূতের ভয় পেয়েছে বুঝি।

ম্যাক্স হাসল। বলল, ভূতের ভয়ই বটে। পেত্নিরা ভূতকে ভয় পায় না। তারপর বলল, কেনেথ সবসময় ব্রুটের টয়লেটরিজ ব্যবহার করত, তাই বিলকে বলেছিলাম ব্রুটের পারফ্যুম লাগিয়ে যেতে।

তারপর বলল, এখন বুঝতে পারছ কেনেথকে দেখে এবং কেনেথ দ্বিতীয়বার মার্ডার হওয়ার খবরে ও কেন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। ওর মতো করে আর কেউই জানত না যে ও নিজে হাতে কেনেথকে গুলি করে মেরেছে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ দিয়ে গুলি করলে সিংহও মরে যায়, তায় মানুষ। এবং যে-মুহূর্তে ও বুঝতে পারছে এই দ্বিতীয় কেনেথ মিথ্যা সেই মুহূর্তেই ও অনবধানে বলে ফেলেছে তোমার কাছে নিশ্চয়ই যে, এ হতেই পারে না,

BanglaBook.org

ইট কান্ট বি, অসম্ভব। এই কথাই ওর দোষ প্রমাণ করবে। তোমার কাছ থেকে এইটুকু সাহায্য আমার দরকার।

আমি বললাম, আমি সবই বুঝছি, কিন্তু ও যদিও আমার কেউই ছিল না কিন্তু এই ক'দিনে আমাকে যে ও অনেক কিছু দিয়েছে—এত কিছু যা জীবনে আর কারও কাছেই পাইনি। কী করে আমি ওকে জেনে শুনে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাই। আমার যে কী খারাপ লাগছে ম্যাক্স, কী বলব! আমি এখনও ভাবতে পারছি না।

ম্যাক্স বলল, এইটুকু সাহায্য না করলে তো আমার তোমাকেই জেলে পাঠাতে হয়। এত টাকার স্মাগলড হীরে কিন্তু আমরা পেয়েছি তোমারই কাছ থেকে। লারাকে বাঁচাতে হলে তোমাকে মারতে হয়। লারা যে তোমার কত বড় বন্ধু তা তোমার হাত দিয়ে হীরে পাচার করার চেষ্টাতেই বুঝতে পারছ!

আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। তখনও অবাক হয়েই ছিলাম। কেবলই বলছিলাম, অমন ফুলের মতো ফুলওয়ালি কি করে এমন কাজ করল। নাঃ ম্যাক্স! কোথাও কোনও ভুল করছ তোমরা। লারার খুব বিপদ। তোমরা লারাকে কোনওক্রমে বাঁচাও।

ম্যাক্স হাসছিল।

বলল, বাঁচাবার মালিক ভগবান। আমি তুমি মারবারই বা কে? বাঁচাবারই বা কে?

বাটলার হ্যামবার্গার এনে দিল সঙ্গে মাস্টার্ড আর সেলারি পাতা দিয়ে। খেয়ে নিলাম। তারপর স্টিফ ড্রিঙ্কটা এক ঢোকে গিলে ফেললাম। ম্যাক্স আগেই গিলে ফেলেছিল।

ম্যাক্স ঘড়ি দেখল। তারপর আমাকে বলল, তুমি তৈরি হয়ে নাও। দ্য হাউস ইজ ইয়োর্স। হেলপ ইওরসেলফ উইথ এ্যানাদার ড্রিঙ্ক—।

বলেই নীচে নেমে গেল।

সাড়ে ছ'টা নাগাদ ম্যাক্স আমাকে নিয়ে ওর সাদা জাগুয়ারে উঠল। আগে পিছনে দেখলাম, দুটি কালো গাড়ি। বুঝলাম প্লেইন ড্রেসে এফ-বি-আই-এর আর্মড লোক আছে।

ম্যাক্স-এর কাঁধে একটা ব্যাগ। তার মধ্যে ওয়াকি-টকি আছে। শর্ট ডিসট্যান্স ওয়ারলেস। সামনের পিছনের গাড়ির সঙ্গে কথা বলল ম্যাক্স।

দেখতে-দেখতে আমরা কাহালা হিলটনের বিরাট পার্কিং লটে এসে পৌঁছলাম। চতুর্দিকে বড়-বড় ট্রপিক্যাল গাছ। ওয়াইকিকি বিচ থেকে হুশ-হুশ করে হাওয়া আসছে। চমৎকার সন্ধেটা। আমার লারার জন্যে, এবং আমার জন্যেও বড় খারাপ লাগতে লাগল। চাঁদ উঠেছে আকাশ ভরে। চাঁদের আলো চকচক করছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলের ওপরে। গত দু-তিনটি দিন লারার সঙ্গ যেমন আমার এই জীবনের এক মধুরতম স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে আমার কাছে, চারধারের ঘটনাবলী তেমনই দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছে, হচ্ছে। এমন এক আনন্দ ও দুঃখের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয়নি আগে। আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

রিসেপশান লবিতে ঢুকতেই একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একজন লোক উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সকে দেখে। লোকটি দেখতে কদাকার। তার মুখটা শিয়ালে চিবিয়ে খাওয়া কইমাছের মাথার মতো কুদৃশ্য। সে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল, ড্যানার আসতে পারেনি, আমি এসেছি তার বদলে।

ম্যাক্স যখন তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তক্ষুনি লোকটি বলল, নিহাউ!

ম্যাক্স আশ্বস্ত গলায় বলল, নিহাউ।

বুঝলাম, কোড ওয়ার্ড একটা।

ম্যাক্স শুধোল, ড্যানার কোথায়?

জানি না। বোধহয় বাড়িতেই আছে। শরীর ভালো না। অপারেশন ওয়াকার ওভার হয়ে গেলে আপনাকে কথা বলতে বলেছে ওর সঙ্গে।

BanglaBook.org

ম্যাক্স বলল, ও-কে।

আমি আর ম্যাক্স রিশেপসান ডেস্কে গিয়ে পৌঁছলাম। ম্যাক্স যেমন গাড়িতে আসতে-আসতে আমাকে শিখিয়ে রেখেছিল, আমি তেমনই রিশেপসানের একটি মেয়েকে বললাম, আমি মিস জিনা ওয়াকার-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেয়েটি শুধোল রুম নাম্বার জানেন?

আমি বললাম, হাইড-এওয়ে কটেজ।

মেয়েটি হেসে বলল, হাইড-এওয়ে কটেজ তো লুকিয়ে থাকার জন্যে। ওখানে কী গিয়ে আপনি বিরক্ত করবেন মিস ওয়াকারকে? এই কারণেই অনেক কটেজে টেলিফোনের কানেকশানই রাখিনি আমরা। কিন্তু ওঁর ঘরে আছে। তারপর ডায়াল করে কথা বলতে দিল আমায়।

ফোনটা অনেকক্ষণ বাজবার পর লারা ধরল।

লারা বলল, ইয়েস হু ইজ ইট?

আমি বললাম, আমি জিত্।

লারা ওপাশ থেকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমি জিনা, জিনা ওয়াকার।

আমি বললাম, বুঝেছি।

লারা বলল, কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন? আমি তো ভাবলাম তুমি চলেই গেলে নিউইয়র্কে।

আমি বললাম, পাগল।

তারপর বললাম, আমি আসছি তোমার কাছে।

লারা বলল, তোমার আসতে ফোন করার দরকার কী ছিল। তবে যখন করেইছ তখন এক্ষুনি এসো না। আমি চান করতে যাচ্ছি। জামাকাপড় ছেড়ে ফেলেছি। দরজা বন্ধ, তুমি দশ মিনিট পরে এসো। হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক অর আ কোক এ্যাজ উ্য প্লিজ।

আমি বললাম, আমি গেলেই চান কোরো। তারপর বললাম, তোমার চান দেখব আমি।

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, দেখো, আজ নয়, অন্য কোনওদিন, অন্য কোনওখানে।

ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হলাম। ভাবলাম, ও কি জানতে পেরেছে যে আমি, এমনকি আমিও ওর শত্রু হয়েছি?

আমি বললাম, ঠিক আছে, দশ মিনিট পরেই যাচ্ছি।

ম্যাক্সের ইঙ্গিতে আমি রিশেপসানের মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, লারা বেরিয়েছিল কি না?

মেয়েটি বলল, বিকেলে একবার বেরিয়েছিল শপিং-এর জন্যে। এই তো ঘণ্টাখানেক হল ফিরে চাবি নিয়ে গেল ডেস্ক থেকে।

আমার খুব দুর্বল লাগছিল নিজেকে, ভীষণ অপরাধী, পা কাঁপছিল আমার। লারাকে কী করে মুখ দেখাব জানি না। এত কিছু ওর সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও ওকে তবুও খারাপ বলে, খুনি বলে ভাবতে পারছিলাম না।

ম্যাক্স ঠিকই বলেছিল, যখন বলেছিল, কতিপয় ব্যাতিক্রম ছাড়া আমরা সকলেই ভালোত্বে-মন্দত্বে মেশানো মানুষ। কখনও ভালোত্বটা প্রবল হলে আমরা মহৎ হয়ে উঠি, মন্দত্বটা প্রকট হলে নীচ। সংসারে অবিমিশ্র খারাপ মানুষ বা ভালো মানুষ বলে কিছুই কেউই নেই।

ভালোর মধ্যেও খারাপ থাকে, খারাপের মধ্যেও ভালো।

এমন সময় ম্যাক্সের একজন, অনুচর বাইরে থেকে এসে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল যে, সময় নষ্ট করা উচিত নয় আমাদের। ওহারা তাড়া লাগিয়েছেন, ব্যাপারটা মিটে গেলে উনি আজই রাতের প্লেনে চলে যেতে চান কানাডাতে।

ম্যাক্স বলল, ঠিক আছে। ওহারাকে বলে দাও দশ মিনিটে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ব্যাপারটা যে জরুরি তা আমরাও বুঝি। আমরা এখানে স্ট্রিপটিজ দেখতে আসিনি।

BanglaBook.org

তারপর ফিসফিস করে আমাকে ম্যাক্স বলল, পিস্তলটা যে লারার কাছে নেই এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। যদি লারাই আবার ওটাকে খুঁড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। একমাত্র তোমাকেই ও সন্দেহ করবে না। তুমি ঘরে যাওয়ার পরই ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে নেবে। এর জন্যে তোমাকে আমি দু-মিনিট সময় দেব। প্রয়োজন হলে তুমি গায়ের জোরে কেড়ে নেবে। তা না হলে ও যে ডেসপ্যারেট কন্ডিশানে আছে এখন ওর পক্ষে আমাদের দেখেই এলোপাথাড়ি গুলি চালানো অসম্ভব নয়। এত বড় নামজাদা হোটেলের মধ্যে আমি সিন ক্রিয়েট করতে চাই না। পুরো অপারেশনটা কোয়েইটলি সারতে চাই। উইদাউট এনি ব্লাড শেড।

আমি বললাম, পিস্তলটা যদি লারার কাছে থাকে এবং ও যদি এতক্ষণে বুঝে থাকে যে ওর বাঁচবার আর পথ নেই, তাহলে ও যদি আত্মহত্যা করে?

ম্যাক্সের চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল।

এক সেকেন্ড ও চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, এই কথাটা আমার মনে আসেনি, যদিও আসা উচিত ছিল। তবে লোকচরিত্র আমি যতটুকু বুঝি তাতে লারা এমন করবে বলে আমার মনে হয় না। যে-মেয়ে টাকার জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, সে অত সহজে নিজেকে মারবে না।

আমি বললাম, কী জানি? আমার তো মনে হয়েছে লারা খুব ইমোশনাল মেয়ে, বেসিকালি ভালো মেয়ে। ওকে কাল সন্ধেতেই যেমন আপসেট দেখেছি তাতে ওর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। যদি ও আত্মহত্যা করে মারা যায়?

ম্যাক্স আমার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, ডোন্ট ওরি। শি উইল বি এজ গুড ইন হার ডেথ এজ উ্য ফাউন্ড হার অন বেড।

আমি ম্যাক্সের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা ও স্থূলতা দেখে অবাক হলাম।

ঘড়িতে আট মিনিট হয়ে গেছিল। ম্যাক্স ও আমি হাইড-এওয়ে কটেজের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ কাটিয়ে জিনস-পরা একটি কদর্য প্রসাধন করা কুৎসিত দর্শন বুড়ি গটগট করে ছ'ইঞ্চি হিলের জুতো পরে চলে গেল। হাতে জিনের হ্যান্ডব্যাগ।

ম্যাক্স হেসে ফেলল। আমাকে বলল, এই ছুঁড়ি-সাজা বুড়ির লুকোবার মতো কোনও অ্যাফেয়ার আছে যে হাইড-এওয়ে কটেজে উঠছে? এর বয়ফ্রেন্ডই বা কে?

আমি বললাম, বয়ফ্রেন্ড যে থাকবেই, তার কী মানে আছে। লেসবিয়ানও হতে পারে।

ম্যাক্স আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, এই তো বুদ্ধি খুলছে আস্তে-আস্তে।

আমরা যখন লারার কটেজের সামনে পৌঁছেছি, তখন ম্যাক্স অবাক হল সেখানে প্লেইন ড্রেসে আর্মড গার্ড নেই দেখে। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে কথা বলল ম্যাক্স। হোটেলের বাইরে গাড়িতে বসা ওর সহচরেরা বলল, নিশ্চয়ই আছে, সে বোধহয় এদিকে-ওদিকে আছে। ঘরের সামনেই হয়তো নেই। ওরা আরও বলল যে, পাঁচ মিনিট আগেও কথা বলেছে ও তাদের সঙ্গে। হয়তো বাথরুমে গেছে।

ম্যাক্স নিজের ওয়াকি-টকিতে লোকটার নাম ধরে ডাকল। তার নাম জন।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ম্যাক্স বাইরের গাড়িকে বলল, ওকে লোকেট করতে পারলেই যেন ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা করতে বলে।

আমরা যখন লারার দরজার সামনে পৌঁছলাম তখন ম্যাক্স আড়ালে চলে গেল। বেল টিপতেই ভিতর থেকে একেবারে দরজার পাশ থেকেই লারা বলল, ডার্লিং, দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এইমাত্র গেল। এখনই চান করতে যাচ্ছি—জামাকাপড় পরে নেই, দরজা খুলতে

BanglaBook.org

পারছি না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আমি বললাম, ও-কে। লারা।

ম্যাক্স ও আমি সরে গিয়ে যাতে কটেজ থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওয়াকি-টকিতে ম্যাক্স ওই বুড়ির চেহারার বিবরণ দিয়ে বাইরের গাড়ির লোকদের বলল, তারা তাকে দেখেছে কী না?

তারা বলল, দেখেছে, বুড়ি তো একটু আগে নিজের গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। লবিতেও ঢুকেছিল। লেডিজরুমে গেছিল লবির। তারপর বেরিয়ে এসে চলে গেল।

ম্যাক্স শুধোল, সন্দেহজনক দেখলে কিছু চলাফেরায়?

ওরা বলল, নাথিং। একটুও নার্ভাস বা টেন্স নয়—ধীরেসুস্থে লবি থেকে বেরিয়ে গাড়ির লক খুলল তারপর গাড়ি স্টার্ট করে আস্তে-আস্তে চালিয়ে চলে গেল, বুড়িরা যেমন সাবধানীভাবে গাড়ি চালায়। শি ওয়জ জাস্ট এ্যান ওল্ড হ্যাগ।

ম্যাক্স বলল, গাড়ির নাম্বার প্লেট নোট করেছ?

ওরা বলল, করেছি।

ম্যাক্স বলল, খোঁজ নাও কার গাড়ি।

তারপর বলল, কিন্তু জন কোথায়? জনের কী হল? জন তো সাড়া দিচ্ছে না। দ্যাখো তোমরা কোথায় গেল জন?

ম্যাক্স আমাকে বলল, তোমার সঙ্গিনী তো একটি নিম্ফ—দ্যাখো, জনকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর খাচ্ছে কি না। তোমাকেও যখন দরজা খুলল না—আরও দশ মিনিট পর আসতে বলল। তখন ব্যাপারটা রহস্যময়।

আমি বললাম, দরজা ভাঙবে না কি?

ম্যাক্স বলল, না। নিজেই যখন সাড়া দিল তখন দশ মিনিট অপেক্ষাই করা যাক। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করলে ওর কাছে পিস্তলটা যদি থাকে তবে তাতে দু-একজন লোক মারা পড়বে। লারাও মারা যেতে পারে।

লারার গুলিতে মারা যাওয়ার কথাতে আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

তারপর ম্যাক্স ইয়ার্কি করে বলল, দশ মিনিট সময় কী জনের আদর খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট?

আমি অনেকক্ষণ পরে হাসলাম। বললাম, আমরা কোনারক খাজুরাহোর দেশের পুরুষ। দশ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে। তোমার জনের কথা জানি না।

ম্যাক্স খিলখিল করে হাসল। বলল, বুলশিট। বাড়িয়ে বলার একটা সীমা আছে। দশ মিনিট কেটে যেতে চলল কিন্তু তবুও জনের পাত্তা নেই।

আমি আবার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেল টিপলাম। তখনও লারা আবারও ওই একই কথা বলল।

আমি ম্যাক্সকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। ম্যাক্স দৌড়ে এল। আমরা দুজনেই কান পেতে শুনলাম। লারার আগের কথাগুলো বার-বার শোনা গেল—ঘুরে-ঘুরে বারবার একই কথা বলছে লারা।

ম্যাক্সকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাল। ফ্যাকাশে মুখে আমাকে বলল, এ তো টেপ-রেকর্ডার বাজছে। টেপড মেসেজ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বল কী?

ম্যাক্স সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে বাইরের গাড়িগুলোকে কনটাক্ট করল। ওরা বলল, জনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

লারার কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এবার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। রক্ত গড়িয়ে

BanglaBook.org

আসছিল ভিতর থেকে বাইরে, দরজার তলা দিয়ে।

ম্যাক্সকে দেখালাম।

ম্যাক্স সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের লোকদের যা-যা ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার দিল।

আমি ও ম্যাক্স দৌড়ে রিশেপসানে ফিরে গেলাম। সেখানে দেখি ড্যানারের সেই লোকটি ছটফট করছে। পায়চারি করছে উদ্বেগে।

ম্যাক্স বলল, মেয়েটি কোথায়?

লোকটি বলল, লেডিজরুমে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই।

এতক্ষণ? ম্যাক্স অবাক হয়ে গেল।

তারপর বলল, তুমি গিয়ে দেখোনি কেন এতক্ষণ?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, মেয়েদের ল্যাভেটরিতে আমি কী করে ঢুকব?

আমার হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু হাসি বেরোল না।

ম্যাক্স রিশেপসানে নিজের পরিচয় দিয়ে একটি মেয়েকে যেতে বলল লেডিজরুমে। গিয়ে দেখতে বলল, কী ব্যাপার?

মেয়েটি লোকটির কথা শুনে, হাসতে-হাসতে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রচণ্ড চিৎকার করে আতঙ্কে দৌড়ে এল বাইরে। প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, রক্ত, খুন।

ম্যাক্সের অনেক অনুচর তখন এসে গেছে। হোটেল তখন ইনিউফর্ম পরা পুলিশেও ভরতি।

মেয়েটি যখন বলল, লেডিজরুমে আর কেউ নেই—তখন ম্যাক্স ও তার অনুচরেরা লেডিজরুমেই ঢুকল। ঢুকে ফিরে এল।

আমাকে বলল, ড্যানারের সেই মেয়েটিকে গুলি করে মেরেছে কেউ। ঘাড়ে গুলি করেছে পিছন থেকে।

লেডিজরুমে আর কে ঢুকেছিল ওই মেয়েটি ঢোকার আগে ও পরে? ম্যাক্স জিগ্যেস করল ড্যানারের লোক ও রিশেপসানের মেয়েদের।

ওরা সকলেই বলল, একজন জিনস-পরা বুড়ি ছাড়া কেউই ঢোকেনি।

যদিও ম্যাক্স বলল, শি ইজ এজ ডেড অ্যাজ হ্যাম। তবুও পুলিশের লোক মেয়েটিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল।

ম্যাক্স জিগ্যেস করল, রিশেপসানে, এ বুড়ি কি হোটেলের রেসিডেন্ট?

মেয়েরা বলল, বোধহয় না। আমরা তো আগে দেখিনি। কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বোধহয়।

তারপর হোটেলের অনুমতি নিয়ে লারার ঘরের দরজা ভাঙা হল। দরজা ভাঙতেই—আমি ও ম্যাক্স সামনে ছিলাম—আঁতকে উঠলাম।

ম্যাক্স বলে উঠল, জন, ওহ্ জন।

জন নামক ম্যাক্সের অনুচর মেঝের কার্পেটে পড়ে আছে। তার বুকের বাঁদিকে একটা রক্তাক্ত গর্ত।

বাথরুমে ঢুকে দেখা গেল জনের ওয়াকি-টকিটা বাথরুমের জলের মধ্যে ডুবোন। লারার ছাড়া জামাকাপড়—চান করেছে তার সাবানের ফেনা। থিয়েটারের মেক-আপের নানা রকম জিনিসের খাপ ও খোল ঘরময় পড়ে আছে।

দরজার সামনে মাটিতে শুইয়ে রাখা একটা ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার তখনও বেজে চলেছে—'ডার্লিং দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এই গেল...প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

ম্যাক্স আমার দিকে এবার সন্দেহের চোখে তাকাল।

BanglaBook.org

একটা ভয়, আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নামতে লাগল।

ম্যাক্স বলল, আজ লারার হাতে তোমারই মৃত্যু ছিল, কিন্তু মরল জন।

তারপর দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে জন-এর মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, লুক অ্যাট দিস লাউজি ইডিয়ট। একজন এভারেজ আমেরিকান। এদের জন্যেই সারা পৃথিবীতে আমরা বেইজ্জত। এদের জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতার যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি আমরা। সিলি সোয়াইন।

তারপর বড় দুঃখের গলায় বলল, জানো, দ্যা স্ট্রেনথ অফ আ নেশান ইজ লাইক দ্যাট অফ অ্যান আয়রন চেইন—দ্যা উইকেস্ট হিউম্যান এলিমেন্ট—দ্যা উইকেস্ট লিঙ্ক! দ্যাটস দ্যা স্ট্রেনথ।

বেচারি ম্যাক্স গিলিগান। ও সম্পূর্ণ ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে ওই একটি লোক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করায় এতগুলো যোগ্য লোকের পরিশ্রম বৃথা গেল।

নেনে

ম্যাক্স আমাকে কিছুতেই হোটেলে ফিরতে দিল না। বলল, এর পরও আজ রাতে তোমাকে একা থাকতে দেওয়া যায় না। তারপর বলল, কাল সকালে তোমার প্লেন ক'টায়?

আমি বললাম দশটায়।

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে আসবে আমার লোক। লারার কোনও ক্ষতি তুমি করোনি। নিউইয়র্কে তোমার কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তবুও আমার নিউইয়র্কের লোককে বলে রাখব আমি।

আমি কথা আর কী বলব। বললাম, যা ভালো মনে করো তুমি।

আমরা ম্যাক্সের বাড়ি-কাম অফিসে ফিরে যাওয়ার পর হনলুলুর সব চেয়ে নামি জুয়েলার ফার্মের ভ্যালুয়ারকে ডাকল ওরা। হীরেগুলোর মূল্যায়ন করতে।

বুড়ো ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা, রঙিন হাওয়াইন শার্ট পরা পৃথিবীবিখ্যাত জহুরি চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একে-একে হীরেগুলোকে দেখলেন।

পরীক্ষা শেষ করার পর ম্যাক্সকে বললেন, ম্যাক্স উড উ্য প্লিজ গিভ মি আ স্টিফ ড্রিঙ্ক।

ম্যাক্স গিয়ে ড্রিঙ্ক ঢালতে-ঢালতে বলল, স্বাভাবিক।

তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বলল, তুমিও নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এত দামি এবং এতগুলো হীরে একসঙ্গে দেখোনি। কী বল?

বুড়ো আস্তে-আস্তে বলল, এই সবগুলো কাঁচের দাম একটা বেলজিয়ান কাট গ্লাসের অ্যাশট্রের চেয়েও কম হবে।

হো—য়া—ট! বলেই ম্যাক্স ড্রিঙ্ক হাতে থমকে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই এক গাল্পে হুইস্কির গ্লাসটা নিজের মুখেই ঢেলে দিল।

তারপর আরও দুটো গ্লাস বের করে নিজে আরেকটা নিয়ে আমাকে ও জহুরি বুড়োকে দিল।

বুড়ো বলল, সব কাঁচ! একটাও হীরে নয়।

ম্যাক্স বলল, মাই গুডনেস। দ্যাট গার্ল মাস্ট বি দ্যা ডেভিল হিমসেল্ফ।

বলেই ম্যাক্স পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ল।

আমার মাথাও ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরছিল।

কখন যে বুড়ো আরেকটা ড্রিঙ্ক নেওয়ার পর চলে গেল, কখন রাত গভীর হল, কখন আমরা খেতে বসলাম, কতগুলো হুইস্কি খাওয়ার পর, আমার মনে নেই।

BanglaBook.org

আমি একাই ছিলাম তারপর আমার ঘরে। ম্যাক্স বুড়ো চলে যাওয়ার পরই নীচে ওর অফিসে চলে গেল।

টেলেক্স মেসিনের আওয়াজ ইন্টারকমের বুঁ-বুঁ টেলিফোন, ওয়ারলেস মেসেজ—সারা পৃথিবীময় একটি নেনে পাখিকে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল যে কী বলব!

এমন সময় খবর এল, যে গাড়িটা করে বুড়িটা কাহালা হিলটন থেকে বেরিয়ে গেছিল, সেটি একটা ভাড়া করা গাড়ি। হোটেল থেকে আধমাইল দূরে একটা পার্কিংলটে গাড়িটা পাওয়া গেছে। একজন সুন্দরী মেয়ে, লীনা জনসন—গাড়িটা বিকেলে কার-রেন্টাল কোম্পানি থেকে ভাড়া নিয়েছিল।

পরদিন সকালে প্লেনের সময় হলে ম্যাক্স আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, ওর লোকেদের দিয়ে পাঠিয়ে দিল এয়ারপোর্টে। প্যান-এ্যাম-এর ফ্লাইট আমার। সানফ্রান্সিসকো হয়ে নিউইয়র্ক। লম্বা ফ্লাইট।

এয়ারপোর্টে এসে প্যান-এ্যাম-এর টিকিট দেখিয়ে চেক ইন করতে যেতেই ডেস্কের মেয়েটি আমাকে একটি চিঠি দিল। খামে বন্ধ চিঠি।

আমি বললাম, কে দিয়েছে?

মেয়েটি বলল, কিছুক্ষণ আগে একটি স্কুলের ইউনিফর্ম পরা মেয়ে দিয়ে গেছে আপনাকে দেওয়ার জন্যে। এই তো ছিল মেয়েটি—বলে ডেস্কের মেয়েটি এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

ম্যাক্স-এর লোকরা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। চিঠিটা ওরা দেখতে পায়নি, কথাও শুনতে পায়নি।

আমি এ্যান্টি-হাই-জ্যাকিং-এর ব্যাগেজ চেকিং-এর কাউন্টারে ঢুকে পড়ে ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বললাম।

প্যান-এ্যাম-এর ডি-সি টেন প্লেনটা অতিকায় রাজহাঁসের মতো টারম্যাক ছেড়ে উঠে এল—নীচে দিগন্তবিস্তৃত ওয়াইকিকি বিচটা দেখা যেতে লাগল। প্লেনটা একটা চক্কর মেরে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি নীচে ফেলে মেঘ ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে এল।

সিট-বেল্টটা খুলে ফেলে আমি খামটাও খুলে ফেললাম।

চিঠিটা টয়লেট পেপারের ওপর বল-পয়েন্ট পেন দিয়ে তাড়াতাড়ি লেখা।

মাই ডিয়ার জিত্,

আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম।

কিন্তু টাকার মতো ভালো জীবনে আর কিছুকেই বাসিনি।

এই পৃথিবীতে টাকাই হচ্ছে সব প্রেম, সুখ এবং ক্ষমতার মূল। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই।

আমার জন্যে তোমাকে কিছু ঝামেলা পোহাতে হল। আমাকে ক্ষমা কোরো। এয়ারপোর্টে সঙ্গে গিলিগানের লোক নিয়ে এসেছিলে কেন?

তুমি জানো না, জীবনটা কি দারুণ ইন্টারেস্টিং। যে-জীবনে ঝুঁকি নেই, বুদ্ধি এবং টাকার খেলা নেই, নিজের ইচ্ছামতো মুঠিভরে হেলায় পৃথিবীকে ধরার ক্ষমতা নেই, সে জীবন জীবনই নয়।

গিলিগানকে প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছি মর্মান্তিকভাবে। আবারও খেলা হবে। এই খেলার মধ্যেই, খেলার আনন্দেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। আমি এখন তোমার

BanglaBook.org

দেশের আগেকার কোনও মহারানীর মতো বড়লোক। কুকুরের মতো অনেক পুরুষকে পুষব আমি। সব পুরুষই বোকা। মেয়েরা তাদের শরীর ও বুদ্ধিকে ঠিকভাবে চালিত করতে পারলে উইমেনস লিব-এর জন্যে শোভাযাত্রা করতে হত না মেয়েদের। পুরুষদের ঠুলি পরানো চোখ দিয়ে মেয়েরা চিরদিন জীবনকে দেখে এসেছে। আমি তেমন মেয়ে নই।

তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভালোবাসা বলতে তুমি যা বোঝো, অন্য অনেক মেয়ে যা বোঝে, আমি তা বুঝি না। আমার ভালোবাসা শরীরনির্ভর। আমার মন আমি কাউকেই দিতে পারব না। আমার মন আমারই একার।

এদেশে তোমার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না। হলে তোমারই বিপদ।

কোনওদিন তোমাদের দেশে যদি যাই তো তোমার কাছে যাব। কলকাতার ঠিকানা রেখেছি। তোমার সঙ্গে দার্জিলিং-এ যাব ও 'শেষের কবিতা' পড়ব। তখন আবার তোমাদের দেশের গিলিগানদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না যেন।

আরও টাকা, অনেক টাকার পর ক্ষমতা, আরও ক্ষমতার জন্যে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সব দেশের টাকাওয়ালা লোকেরা, রাজনীতিকরা মানুষ খুন করেছে, সততা, চরিত্র, সরলতা যা-কিছু পবিত্র সব কিছুই খুন করছে—। সে খুনে রক্ত ঝরে না। সে বড় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী খুন।

আমি একসময় খুবই গরিব ছিলাম বলে সেই খুনিদের প্রকৃত চেহারা আমি জানি। ধনী এবং ক্ষমতাসীন থাকার জন্যে ওরা পারে না এবং করে না এমন কিছুই নেই। ওরা সার্বিক খুনি, জন্ম খুনি, বংশ পরম্পরায় খুনি।

ওদের তুলনায় আমি কিছুই নই।

আমার মধ্যে যে লারাকে তুমি জেনেছ সেও বাস করে, করবে চিরদিন, অন্য একটা রাগী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে।

তুমি সেই প্রথম লারাকে মনে রেখো।

যে লারা তোমাকে ভালোবেসেছিল।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—তোমার আদরের নেনে।

জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম।

এখন আর ওয়াইকিকি, ওআহু দেখা যাচ্ছে না। নীচে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু মেঘ, আর সুনীল শূন্যতা।

BanglaBook.org

নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রবেশ

মিলন মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

হাতের প্লেটে শিক-কাবাব নিয়ে প্রায় দৌড়ে এল জেজে। উলটোদিকে চলে গেছে বস। টলটলে নীলচে সবুজ জলে দুই হাত দুই পা খেলিয়ে পৌঁছে গেছে ওপারে। গরম-গরম কাবাব। বসের ফিরে আসতে-আসতে ঠান্ডা না হয়ে যায়। তাহলেই আবার ছুটতে হবে কিচেনে। নতুন কাবাব বানিয়ে আনতে হবে। দুশ্চিন্তা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকল জেজে। জিতু বা জীতেন্দ্র জোগলেকর। লাইনের সমস্ত পরিচিত লোকেরাই 'জেজে' নামে চেনে। নিজের পুরো নাম মনে করে বলতে হয়।

বস ওপারে হাত ছুঁইয়ে চিত সাঁতারে ফিরে আসছে। জেজেকে দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। এই মানুষ ঠিক কখন যে কী দেখে আবার কী দেখে না—বোঝার কোনও উপায় নেই। তবু, ওকে মাঝপথে পৌঁছতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হল জেজে। আহ্! বাঁচা গেল! ফের বোধহয় দৌড়তে হবে না কিচেনে। প্লেটের নীচে হাতের চেটোয় ওমভাব টের পেল সে। সারাদিন যথেষ্ট ছুটোছুটি গেছে। অথচ, এখানকার ছড়ানো-ছেটানো রঙিন ডেক-চেয়ারের একটায় বসে যে দু-সেকেন্ড জিরিয়ে নেবে তার উপায় নেই। কাজের সময় বস সবাইকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে পছন্দ করে। সুতরাং ক্লান্ত জেজেকে দাঁড়িয়েই থাকতে হল সটান।

সুইমিং পুলের মাঝ বরাবর জল কাটতে-কাটতে এপারে এসে পৌঁছোল বস। পাড়ে হাতের ভর দিতেই ঝুঁকে পড়ল জেজে। প্লেটটা সামান্য এগিয়ে ধরল। কিন্তু সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে, পাড়ে-রাখা বিয়ারের গ্লাস তুলে নিল বস। এক চুমুকে খালি করে দিল গ্লাস। মুখে আরামের শব্দ করল।—'আহ্।'

তারপর ধীরেসুস্থে আলতো আঙুলে কাবাবের টুকরো তুলে দিল মুখে। ফরসা, রোমশ বুক অবধি জলে ডোবা। শরীরের বাকি অংশ মাথার চুল অবধি সপসপে জলে ভেজা এবং মুখের ভেতরে গরম কাবাব। চিবোতে-চিবোতে বলল, 'হুম! এটা গরম আছে। থ্যাংক ইউ।'

বস যদিও বাঙালি, তবে দারুণ হিন্দি বলে। পরিষ্কার হিন্দির অনেক কথাই আবার মারাঠি। জেজেকে আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিশা। হাতের ট্রেতে বিয়ারের বোতল। অল্প ঝুঁকে বসের খালি গ্লাস ভরতি করে দিল কানায়-কানায়। দ্রুত পায়ে ফিরে গেল আবার।

বসের এখানে খাতির অনেক। বিগ বস দুবাইতে থাকেন বেশিরভাগ সময়। ন'মাসে ছ'মাসে বম্বে এসে এখানে ওঠেন। ওয়ালকেশ্বরের এই প্রাসাদতুল্য দালানটি মোটামুটি মালাবার হিলের যথেষ্ট উচ্চতায়। চারপাশে তিন-মানুষ উঁচু দেওয়াল। কালো পাথরের। দেওয়ালের চারপাশে নেই আকাশ। এই বাঙালি বস সেন-সাহেব ছাড়া আরও দুজন 'বস' আছে। তাদের ঘাঁটি যে ঠিক কোথায় জানে না জেজে। জানার প্রয়োজনও মনে করে না। কারণ, এই আলো-অন্ধকার জগতে বেশি কৌতূহল আবার অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। দু-একটা কেস সম্পর্কে জেজে নিজেই ওয়াকিবহাল। তবে, কাজেকর্মের সূত্রেই এটুকু সে জানে যে, সেন-সাহেবের রবরবা দিল্লি এবং বাংলা মুলুকে।

বাঁ-হাতে শরীরের ভর ঝুলিয়ে ডানহাতে আরও একটা কাবাব তুলে নিল বস। কাবাবটিকে সম্বোধন করেই যেন জিগ্যেস করল, 'কুয়েতের মাল চলে গেছে?'

কাবাব জবাব না দিয়ে বসের মুখগহ্বরে হারিয়ে গেল। জেজে বলল, 'ইয়েস বস'।

'কোনও গোলমাল হয়নি এয়ারপোর্টে?'

'নো, বস।'

'পুলিশের কে-কে ছিল?'

'ইনস্পেক্টর কানাড়ে আর দত্তারাম ছিল, বস।'

এক মুহূর্ত চুপ।

BanglaBook.org

হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো হেসে উঠল সেন-সাহেব। জলের মধ্যে তলিয়ে গেল হাসতে-হাসতে। ডুব সাঁতারে অনেকখানি গিয়ে সুইমিং পুলের মাঝখানে ভেসে উঠল ভুশ করে। এখন হাসির চিহ্নমাত্র নেই মুখে। সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে ফিরে আসছে।

জেজের প্রায়ই মনে হয়, এই বাঙালি বসকে দেখতে অনেকটা সিনেমার ভিলেন অনুপম খেরের মতো। ভারী সুপুরুষ। বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে মনে হয়। মুখের হাসিটি দেখবার মতো।

ওর হাসির কারণ বোধহয় ইনস্পেক্টর কানাড়ে। হালে প্রমোশন পেয়ে বেলগাঁও থেকে এসে খুব হম্বিতম্বি। ইনফরমারের মারফত খবর পেয়ে, গেল মাসে থানা চেকপোস্টে দুটো লরি আটক করে ভেবেছিল লাইনের ধান্ধা টোপাট করে দেবে। ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করেছে ঠিকই, কাউকে ধরতে পারেনি। কুয়েতে ছেলে পাচারও সব বানচাল করে দেবে বলে খুব আস্ফালন করেছিল মারাঠি দৈনিকে। ওর মুখে চুনকালি মাখিয়ে গত তিনদিনে সাহার বিমানবন্দর থেকে আঠাশটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে উটের রাজ্যে চলে গেছে। কানাড়াকে বোকা বানাবার আনন্দেই বস হেসে উঠল।

ফিরে এসে আবার সান-বাঁধানো পাড়ে ডানহাতে ভর রেখে বলল, 'সিগারেট।'

মারবেলের ছোট্ট টিপয়ের ওপর রাখা ডানহিলের লাল প্যাকেট। কাবাবের প্লেট তার পাশে রেখে প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে ধরল জিতু। ভেজা হাতের সাবধানী আঙুলে সিগারেট তুলে ঠোঁটের ফাঁকে আলতো করে আটকাল বস। সোনার ডানহিল লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল জিতু, উবু হয়ে।

মোক্ষম একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে শব্দ ছুড়ল বস, 'বম্বেতে তুমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক।'

জিতু অপেক্ষা করল। সিগারেটে আর-এক টান। ধোঁয়ার সঙ্গে কথা, ধীর লয়ে, 'কাল সন্ধের মধ্যে একটি মেয়েকে তুলে আনতে হবে।'

চমকে উঠল জিতু। নারীঘটিত ব্যাপারে এই বসের বিন্দুমাত্র বদনাম পুলিশেও দিতে পারবে না। তিন বছরের ওপর বসের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতায় ওকে মোটামুটি চিনে ফেলেছে জিতু। অন্তত তাই ভেবেছিল সে। হঠাৎ কী হল? অন্য কারুর জন্যে কি? রাজ্যের তাবড়-তাবড় শিল্পপতি, পলিটিক্যাল হোতাদের সঙ্গে বসের ওঠা-বসা। লাখিনি, বাজোরিয়া, বানার্জী এদের কারুর অনুরোধ নয়তো! পরের কথাগুলির জন্যে অধীর আগ্রহে এই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল জেজে। কথা কম বলে মানুষটা। ভেবেচিন্তে কেটে-কেটে পরিষ্কার উচ্চারণে ছাঁকা প্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া মুখই খোলে না।

টিপয় থেকে সুডৌল, সুদৃশ্য কাট-গ্লাসের অ্যাশট্রে ওর হাতের নাগালে নামিয়ে রেখেছিল জিতু। জ্বলন্ত সিগারেটটা অর্ধেকের বেশি চেপে-চেপে নিবিয়ে দিল তাতে। জিগ্যেস করলে, 'ক'টা বাজে?'

তটস্থ হয়ে হাতঘড়ি দেখল জিতু, 'আটটা কুড়ি।'

'হুঁ। সাতটা নাগাদ সূর্যাস্ত হয়। কাল এই সময়ের মধ্যে মেয়েটিকে চাই।'

লম্বা চুমুকে গ্লাস শেষ করে দিল বস। খবর পড়ার গলায় বলল, 'থাকে—"লিডো" সিনেমার পেছনদিকে—বড় হাউসিং কমপ্লেক্সের গায়ে। কমপ্লেক্সের নামটা বোধহয়—অজন্তা বা ইলোরা। ডি-ব্লক, এ উইঙ, সেকেন্ড ফ্লোর।'

এতক্ষণে হাতের খালি গেলাসটা নামিয়ে সরাসরি জেজের দিকে তাকাল বস। জিগ্যেস করল, 'ও-কে?'

'ইয়েস বস।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে, খুব স্বাভাবিক কারণেই জিতুর প্রশ্ন, 'বস, নাম?'

'নাম জানবার দরকার নেই—' বলে ব্যাক-স্ট্রোকে আর-এক চক্কর সাঁতার কেটে ফিরে এল বস। সামান্য দম নিয়ে বলল, 'বাঙালি। শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ। ভিলে পার্লের মীনাবাঈ কলেজে যায় এগারোটা নাগাদ। বিকেলে ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে জুহু বিচে বেড়াতে যায়। রোজ। দেখতে

BanglaBook.org

সুশ্রী। ফরসা। একহারা চেহারা।'

নিশা এসে আবার গেলাস ভরে দিয়ে চলে গেল শব্দহীন পায়ে। ফেনা-ভরতি গেলাসটা সাবধানে ব্যালেন্স করে হাতে নিল বস। চুমুক দিতে যাওয়ার মুখে বলল, 'ও—কে।'

'বস, জ্যান্ত? না—?'

গেলাসে চুমুক দেওয়া হল না বসের। ঝট করে ফিরে তাকাল জিতুর দিকে। একেবারে স্থির, পাষাণ চোখ। জিতু এই চোখদুটিকে ক্বচিৎ কখনও দেখতে পেয়েছে। তবে, চিনে গেছে ভালো করে। ফলে, ভীষণ ভয় পায়। কয়েক সেকেন্ড সেই চোখে চেয়ে থাকল বস। তারপর, কেটে-কেটে বরফের টুকরোর মতো শব্দ ছুঁড়ে দিল, 'বাচ্চা মেয়ে। বয়েস—আঠারো-উনিশ। গায়ে এক বিন্দুও—আঁচড় যেন—না লাগে। শাড়ির—এক চিলতে সুতোও যেন—না ছেঁড়ে।—যাও!'

'ইয়েস বস। সমঝ গয়া, বস। থ্যাংক ইউ, বস।' বলে, সাবধানে কাবাবের প্লেটটা নামিয়ে রেখে প্রায় পালিয়ে যাওয়ার পায়ে দ্রুত চলে গেল জিতু। সুইমিং পুল পেরিয়ে দালানে ঢুকে, বসের চোখের আড়াল হয়ে—তবে, দম নিল সে।

করিডোরের শুরুতেই তে-কোণা মোজাইক টেবিলের সামনে নিশা বসে আছে। এখান থেকে বসের লম্বা ডেক-চেয়ার এবং তার ওপরে রাখা ধবধবে সাদা তোয়ালে দেখা যায়। বিয়ারের গেলাস, কাবাবের প্লেট, ডানহিলের প্যাকেটও নজরে আসে। সেদিকেই লক্ষ রাখছে নিশা। গেলাস খালি হলেই পাশের চেম্বার থেকে ফ্রিজ খুলে বিয়ার নিয়ে ছুটে আসবে আবার।

কাচের দরজা পেরিয়ে জিতু আসতেই নিশা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ড্রিংক নেবেন, স্যার?'

জিতু করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতেই জবাব দেয়, 'নো। থ্যাংকস। একটা চা পাঠিয়ে দিতে বলো ব্লু চেম্বারে!—' তারপর থমকে, পিছন ফিরে জুড়ে দিল, 'বস বোধহয় একটু খেপেছে। খেয়াল রেখো। আমি কয়েকটা টেলিফোন করেই বেরিয়ে যাব।'

'ও-কে, স্যার।'

সুবিশাল এবং সুনসান হলঘরে আসবাব বলতে কিছুই নেই। সাদা মারবেলের মেঝের ওপরে চার কোণে রাখা চারটে হাই কুশন। চার রঙের—সাদা, হলুদ, নীল, সবুজ। হলের মধ্যিখানে কালো মারবেলের সুদৃশ্য গোল টেবিল। চেয়ার-সোফা কিছু নেই। টেবিলের ওপরে কালো ওয়ারলেস পুশ বাটন টেলিফোন। নীল কুশনের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল জেজে। দশ পনেরো ফুট লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে 'ব্লু চেম্বারে' ঢুকে পড়ল।

সব চেম্বারই এখানে এয়ারকন্ডিশনড। বাইরে সন্ধে উতরে গেলেও বাতাস এখনও ঠান্ডা হয়নি।

হালকা নীল আলোকিত ঘরে ঢুকে আরাম লাগল জিতুর। পুরো মেঝে নীল রঙের মারবেল পাথরে তৈরি। চারপাশের দেওয়ালও নীল। গাঢ় নীল বিশাল টেবিল ঘিরে ছাটা নীল রঙের উঁচু সোফা। উলটোদিকে দেওয়ালে পিঠ করে সোফাটা টেবিলের মতো গাঢ় নীল। সবচেয়ে উঁচু ও চওড়া। নীল কাট-গ্লাসের ছাইদান। লেখার প্যাডটিও হালকা নীল। কলমদানে টেবিল ক্যালেন্ডার ও দুটি ঝরনা কলম। নীল রঙের শরীর। হালকা নীলটিতে লাল ও গাঢ় নীলে নীল কালি। জিতু জানে। দুটি পুশ-বাটন টেলিফোনও দু-রকমের নীল। একটি ইন্টারকম। অন্যটি ডাইরেক্ট। রিসিভার না তুলেও স্রেফ ডায়াল ঘুরিয়ে কথা বলা চলে। সাতটা বোতাম টিপে ধপ করে উঁচু চওড়া সোফাটায় বসে পড়ল জীতেন্দ্র জোগলেকর। অনেক কাজ। চব্বিশ ঘণ্টাও হাতে নেই। অচেনা-অজানা একটি যুবতীকে তুলে এনে সেন-সাহেবকে দিতে হবে। জিতু আন্দাজেই ধরে নিয়েছে, এটা দলীয় কোনও কাজ নয় বোধহয়। স্রেফ বসের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মাউথপিসে শব্দ আসছে বিপ-বিপ বিপ-বিপ। ততক্ষণে পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট খুলে ইলেকট্রনিক লাইটারে ধরিয়ে ফেলল জিতু। একবারে লাইন পেয়ে গেল—ক্রিং-ক্রিং—

BanglaBook.org

মেয়েলি গলা ভেসে এল টেলিফোনের খুদে মাইকে।

'হোটেল সন্তুর। গুড ইভনিং। মে আই হেলপ ইউ?'

জিতুর বাঁ-হাতে সিগারেট। অন্য হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করতে-করতে জিতুর জবাব, 'পুট মি অন টু থ্রি জিরো এইট ফাইভ—'

'প্লিজ হোল্ড অন—'

বিলিতি মিউজিক বাজতে আরম্ভ করল। পাঁচ-সাত সেকেন্ড। তারপরেই, 'হ্যালো?'

হেঁড়ে গলা শুনেই চিনতে পারল জিতু। নিশ্চিন্ত হয়ে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে-মুছতে বলল, 'হাই, বব। কেমন আছ?'

সামান্য সময় ও-পক্ষের সাড়া নেই। হঠাৎ একেবারে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল ববি ফিচার্ডো, 'ওম্মাই গড! এ কার কণ্ঠস্বর? জেজে! কিতেঁ গ'? কিদার হায় তুম, ম্যান? লং টাইম নো সি?—'

ভাঙা ইংরেজি, হিন্দি ও গোয়ান ভাষার খিচুড়ি মাখা উচ্ছ্বাস কমলে, কাজের কথা বলার সুযোগ পেল জেজে, 'শোনো বব! একটা জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট আছে।'

বাধা দিয়ে ববের গলা, 'স্মল অর বিগ?'

'স্মল। তবে, খোদ—'

ঠিক তক্ষুনি দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল রঘুনাথ। নীল ট্রলিতে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। কাপ-ডিশ, এমনকি টি-কোজিটা পর্যন্ত নীল রঙের।

'সেলাম সাব।' বলতে-বলতে ট্রলি ঠেলে এগিয়ে এল রঘু।

দরজায় টোকার সঙ্গে-সঙ্গে বোতাম টিপে টেলিফোনের স্পিকার বন্ধ করে দিয়েছে জিতু। রিসিভারটা কানে তুলে নিয়েছে। ববিকে বলল, 'ওয়েট ফর এ মোমেন্ট।'

রঘুকে বলল, 'আও, রঘু—'

পুরো নাম রঘুনাথ ভাট। ভট্টাচার্য বামুন এখানে বম্বের বাতাসে 'ভাট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালি বস একে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে।

ট্রলি ঠেলে জেজে-সায়েবের ডানধারে এনে দাঁড় করাল। পরম বিনয়ে জিগ্যেস করলে, 'চা বানিয়ে দেব, সা'ব?'

'না। ঠিক আছে। তুম যা সকতে হো।'

রঘু সেলাম ঠুকে আড়চোখে দ্রুত একবার টেলিফোন যন্ত্র ও লেখার প্যাডটা দেখে নিল। তারপর আটান্ন বছরের বেঁটে-খাটো শক্ত শরীর নিয়ে টানটান বেরিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলে ধরা যায়, বাঁ-পায়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে রঘু। একাত্তরের যুদ্ধে গোলার কুচি লেগেছিল নাকি হাঁটুতে।

ও বেরিয়ে যেতেই জিতু বলল, 'হ্যা—যা বলছিলুম। কাজটা বড় মারাত্মক না হলেও, খোদ বাঙালি বসের হুকুম।'

রিসিভার আর নামায়নি জেজে। ববের গলা শুনল, 'বাঙালি বস কি টাউনে?'

'হুঁ।'

'কদ্দিন থাকবে?'

'সে, ব্রাদার, শয়তানেও জানে না। এঁদের যাওয়া-আসার কথা নিজে থেকে না জানালে কি এক সেকেন্ড আগেও জানার উপায় আছে?'

'তা ছোট্ট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও না, গুরু।' ববির গলায় আমূল মাখন।

'দেখি। আগে কাজটা হোক। সেই সুবাদে সাক্ষাত আলাপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

'ও-কে, জেজে। বলো কী কাজ?'

'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার তো অনেক সাঙাত আছে।'

BanglaBook.org

'বাঙালি বস কি ফিল্ম করবে নাকি?'

হালকা গলায় কথা বলছিল জেজে। এবার স্বর গম্ভীর হল, 'তুমি একটু বেশি প্রশ্ন করছ, বব।'

জেজে দেখতে পেল না, ওপারের কণ্ঠস্বরের মালিক ববি ফিচার্ডো ধমক খেয়ে নড়ে বসল। একটা গোয়ান গালিও দিল মনে-মনে। করুণ গলা করে বলল, 'স-স্‌রি জেজে!—আছে। ফিল্ম লাইনে অনেক চেনাজানা আছে। টপ স্টার থেকে নিয়ে চামচে একস্ট্রা—সব্বাইকে তো মাল সাপ্লাই দিই। কাউকে বিলেতি, কাউকে চোলাই—যার যেমন রেস্তোর তাকত। কাকে চাই, বলো?'

জেজের গলা শোনা গেল, আবার স্বাভাবিক নরম, 'ভালো ঘোড়সওয়ার সমেত একটা দারুণ ঘোড়া চাই।'

মনে-মনে বব বলল, খচ্চর কোথাকার। টেলিফোনে জিগ্যেস করল, 'কী ধরনের কাজ? একটু হিন্ট দাও। সেই বুঝে লোক দেব।'

মিনিট পনেরো কথা হল দু-জনে। রিসিভার নামিয়ে রেখে বিশাল বপু নিয়ে সন্তর হোটেলের পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়াল ববি। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় জামাপ্যান্ট পরে ফেলল, নাম্বার বের করল। প্রাইভেট ডায়েরি হাতড়ে। অপারেটরের কাছে লাইন চাইল, 'চট করে লাগিয়ে দাও, ডার্লিং!'

'এক্ষুনি দিচ্ছি, মিস্টার ফিচার্ডো।'

ওধারে আনোয়ারের গলা, 'হ্যালো!'

'ববি বোলতা। কাল মর্নিংয়ে জুহু বিচে আসবে। ট্রেনার লাখানের সবচেয়ে তেজি ওই সাদা ঘোড়াটা নিয়ে আসবে। বিচে বার তিনেক চক্কর দিয়ে যাবে—আমি দেখে নেব। খুব জমকালো ড্রেস পরে নেবে। যেন, ড্রেস রিহার্সাল দিচ্ছ। শুটিং হবে বিকেল চারটে-পাঁচটার পর।'

'দুপুরে?'

'ছুটি। তবে, ফর গডস সেক—ডোন্ট ড্রিংক!'

'কাজটা কী?'

'সন্ধে নাগাদ একটা মেয়েকে ঘোড়ায় তুলতে হবে।'

'কোথায় নিয়ে যাব?'

'বিচের লাগোয়া গাড়ি তৈরি থাকবে। এক মিনিটের কাজ।'

'কত?'

'সাধারণত ফিল্মের শুটিং করে একমাসে যা পাও, তার ডবল।'

'থ্যাংক ইউ, বস।'

'ও-হ্যাঁ। সঙ্গে, পকেটের রুমালে ক্লোরোফর্ম রেখো। ঝামেলা, চেঁচামেচি নেই। মাংতা, ও-কে?'

'ও-কে।'

জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে ববি ভেবে নিল, শ্রীনিবাসের ভিডিও ক্যামেরাটা ভালো ছবি দেয় না। তবু, ওতেই চলবে। ছোট্ট একটা জেনারেটর। সঙ্গে পাঁচশো। না-না, হাজার পাওয়ারের তিনটে স্পট। দুটো হলেও চলবে। শ্রীনিবাসকেই বলে দেবে দু-তিনজন চামচে আনতে। সুইচ অন অফ জাতীয় খুচরো কাজে লাগবে।

BanglaBook.org

॥ দুই ॥

গাঢ় কমলা ও হলুদ ছোপ ধরেছে দূরের আকাশে। সূর্যের গায়ের আগুন-রং শীতল হওয়ার জন্যেই যেন জলে নেমে পড়েছে ধীরে-ধীরে। আরব সাগর এখন ঘোলাটে সাদা। আগুন লেগেছে দিগন্তে।

জাহ্নবীর চোখের সামনে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে খেয়ালই করছে না চারপাশের মানুষজন। কোনও আড়ম্বর আয়োজন নেই। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই আকাশে-বাতাসে। এমনকি বিশাল সমুদ্রের মৃদু, ছল-ছল ঢেউয়ের শব্দও চাপা পড়ে গেছে কোলাহলে। খেলনা ভেঁপু বাজছে প্যাঁ-পোঁ। ঝুমঝুমির শব্দ। বাঁদর-নাচওয়ালার ডুগডুগির আওয়াজ। এই সব ছাপিয়ে হকারদের, স্টলওয়ালাদের চিৎকার। কুলপি, ভেলপুরি, পানিপুরি।

জাহ্নবী প্রায় কানের কাছে শুনতে পেল, 'সিং-চানা, মেমসাব—'

সামান্য চমকে, বিরক্ত মুখে প্রায় ধমক দিল সে বাদামওয়ালাকে।

'ননসেন্স। নেহি চাহিয়ে।'

কাগজের রঙিন ফুলে সাজানো ঘোড়ার গাড়ি ছুটে গেল সামনের বালির ওপর দিয়ে। একটা গোটা ফ্যামিলিই বোধহয় চড়ে বসেছে তাতে। বদখত চলনে দুটো উট দৌড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। সওয়ারি পিঠে নিয়ে ঘোড়াদের ছুটোছুটি। এইসব বাধায় সমুদ্র আড়াল হয়ে যায়। সূর্যও কখন টুপ করে ডুবে গেল। শেষটুকু দেখা হল না জাহ্নবীর।

'দিদি, ঘোড়ায় চড়ব।'

শুকনো বালির ভেতরে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে আছে জাহ্নবী। বেশ লাগে। ঈষদুষ্ণ আরামে ভারী মিষ্টি ওমভাব। জয়ীর গলা শুনে ফিরে তাকাল সে। পাশেই খেলছে তার ছোটভাই। সবে নয় পেরিয়েছে। বালি জড়ো করে-করে ঢিবি বানিয়েছে একটা। তার মাথায় গুঁজে দিয়েছে সরু কাঠি। আইসক্রিমের কাঠিটাই বোধহয়।

হাত ঝেড়ে উঠে এসে কাছে দাঁড়াল জয়ী। আবার বলল, 'একবার ঘোড়ায় চড়াও না, দিদি, প্লিজ—'

ওকে পাশে বসিয়ে মাথার চুলের বালি, কাঁধের কাছে জামায় লাগা বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে জাহ্নবী বলল, 'এই তো, পরশুই তো ঘোড়ায় চড়লে বাপু।'

'তো কী হয়! ওটা তো ঘোড়া নয়, মিউল ছিল—'

কপট চোখ পাকিয়ে জাহ্নবী বলল, 'উঁহু! কী বলতে হয়?'

কলকাতা ছেড়ে এসে অবধি ভাষার ব্যাপারে সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে জয়ীর। ছোট তো! স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ইংরিজি-হিন্দি বলতে-বলতে, বাংলাটা ধীরে-ধীরে কেমন পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে। ভেবেই হাসি পেল জাহ্নবীর। অনেক বাংলা শব্দ তো ও নিজেও ভুলতে বসেছে! পলিউটেড মানে কী হবে—বিষাক্ত না দূষিত? তিন বছর সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই কলকাতার সঙ্গে। চিঠিপত্তরের সংখ্যাও কমে এসেছে দিন-দিন। অথচ, বম্বেতে এসে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না জাহ্নবী। বয়সের জন্যেই বোধহয় জয়ী এখানকার পড়শি, ক্ল্যাসমেটদের দলে মিশে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। তবু দিদির সঙ্গে রোজ বিকেলে, বাড়ির কাছাকাছি এই জুহু বিচে এসে একটু ছোটাছুটি করে। শুকনো এবং ভেজা বালিতে। কখনও একদৌড়ে জল ছুঁয়ে ফিরে আসে। ভেবেচিন্তে বলল জয়ী, 'খচ্চর! কিন্তু ওটা তো খারাপ কথা, দিদি!'

জাহ্নবী হেসে ফেলল। ব্যস, সুযোগ পেয়ে ছোটভাই গলা জড়িয়ে ধরল দিদির। আবদারের গলায় বলল আবার, 'খালি এক রাউন্ড।' বলে, ডানদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'দ্যাখো, দ্যাখো দিদি, একেবারে আসল ঘোড়া। পক্ষীরাজের মতো ছুটে আসছে।'

জাহ্নবী তাকিয়ে দেখল। উট, ঘোড়া, উটের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, শুদ্ধ বায়ুসেবনের জন্যে মানুষের ধীর গতির মধ্যে প্রায় বায়ুবেগে ছুটে আসছে ঘোড়াটা। জলের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সমুদ্র থেকে উঠে আসছে যেন। জাহ্নবীর হঠাৎ উচ্চৈঃশ্রবার কথা মনে পড়ল। ঝকঝকে রঙিন যাত্রার পোশাকে সজ্জিত ঘোড়সওয়ার ঝুঁকে রয়েছে সামনে। লাফিয়ে-লাফিয়ে রাজসিক ভঙ্গিতে বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছে ছুটে।

BanglaBook.org

ভাঁটার টানে জল এখন নেমে গেছে প্রায় সেড়শো-দুশো ফিট নীচে। বালির চরিত্র এখন তিনরকম। জলের ঢেউ আসছে যদ্দুর, তদ্দুর নরম, ভেজা আর চকচকে। তারপর, ক্রমে এগিয়ে আসছে শক্ত, আধো-ভেজা এবং সবশেষে এদিকে শুকনো ফুরফুরে বালি—যা দিয়ে পাহাড় বানিয়েছে জয়ী।

জাহ্নবীর পিঠের দিকে সিটিজেন হোটেল। তারপর বাঁ-দিকে মাঝারি দু-তিনটে হোটেলের পিছন দিকের দেওয়াল। হোটেল সি প্রিন্সেস। পাম গ্রোভ, জুহু হোটেলের পিছন-দেওয়াল শুরু হয় স্টলের ভিড় ছাড়িয়ে। আরও উত্তরে সেন্টুর সান-এন-স্যান্ড হলিডে ইন। এই সমস্ত হোটেলের পশ্চিমে সমুদ্রের জল বা তটভূমি। পুবে লাগোয়া টানা সদর রাস্তা। জুহু তারা রোড।

বড় রাস্তা ও সি-বিচের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে কয়েকটি গলি রয়েছে। নামবিহীন, দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও বেশ চওড়া। দুটি মারুতি বা অ্যামবাসাডার অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। পিচ-ঢালা গলিপথগুলি সামান্য ঢালু হতে-হতে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে সমুদ্রসৈকতের বালিতে।

জয়ী আর জাহ্নবী রোজই উত্তরের শেষ গলিটি দিয়ে নেমে আসে বালিতে। ফিরে যাওয়ারও একই পথ। সাদা ঘোড়াটার দূরে চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে উঠে দাঁড়াল জাহ্নবী। ঘোর হয়ে আসছে। জয়ীকে বলল, 'ও-ঘোড়া ভাড়ায় চড়তে দেওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।'

'তবে?' বালির দুই হাত প্যান্টে ঝাড়তে-ঝাড়তে জয়ীর প্রশ্ন।

'হয়তো কারুর পার্সোনাল, ইয়ে,—মানে, নিজের ঘোড়া। হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসেছে।'

'তা হলে, অন্য যে-কোনও ঘোড়াই চলবে। একবারটি চড়াও না, দি!' সেই প্রথম কথা বলতে পারার সময় থেকেই জয়ী তার দিদিকে স্রেফ একটা 'দি করেই ডাকে। সেই ছোট্ট জয়ীর মুখে একসঙ্গে পরপর দুটো 'দি' জড়িয়ে যেত।

ভাইয়ের দিকে ঘুরে সামান্য ঝুঁকে পড়ল জাহ্নবী। ওর চিবুক নেড়ে-নেড়ে হাসিমুখে বলল, 'আজ আর হবে না, খোকাবাবু। দেখছ না, সন্ধে হয়ে গেছে। কাল দেখা যাবে।'

ভাইবোন হাত ধরাধরি করে প্রথমে সোজা জলের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিক দূরে বাঁ-দিকে চোখ যেতেই জাহ্নবী দেখল সিটিজেন হোটেলের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে শুকনো বালির ওপর ছোটখাটো একটি জটলা। এ ছাড়া, লোকজনের ভিড় আস্তে-আস্তে হালকা হয়ে আসছে। কাছেই শ্রীমান ভুট্টাওয়ালা বসে-বসে ভুট্টা সেঁকছে। গাঢ় নীল রংয়ের উর্দি পরে সেপাইমশাই ভুট্টা চিবোতে ব্যস্ত। দু-হাতে ধরে নিবিষ্ট মনে। আয়েশে প্রায় বুজে আসছে চোখদুটো। এইসব চানাচুর-ভুট্টা-বাদামভাজা কি আর এরা নগদ পয়সা দিয়ে খায়? ভাবতে-ভাবতে জাহ্নবী জিগ্যেস করল, 'হাবিলদার সাহাব, উধার কেয়া হো রহা হ্যয়?

এখানকার কনস্টেবলদের হাবিলদার ডাকলে খুশি হয়। ভুট্টার দানা চিবোতে-চিবোতে সেপাই বলল, 'ফিল্মকা শুটিং-বুটিং হোগা, আউর ক্যা।'

'কউনসা ফিল্ম?'

'কেয়া মালুম?—' বলে, আবার ভুট্টা আক্রমণ।

হাঁটতে-হাঁটতে জল অবধি পৌঁছে গেল ওরা। এবার দিগন্ত রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হাঁটবে দুজনে। রোজকার মতো। কখনও পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে, কখনও সপসপে ভেজা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে সোজা দক্ষিণ দিকে রওনা হল। ওদিককার শেষ গলি দিয়ে সদর রাস্তায় পড়লেই, বাড়ি পৌঁছতে মিনিট দশেক।

জুহু বিচের এদিকে সরকারি বাতির ব্যবস্থা নেই। থাকলেও সমুদ্রের অন্ধকারে বুদবুদের মতো জ্বলে। হোটেলগুলোর পিছনদিক বলে, স্রেফ জানালার ক্ষীণ আলো দেখা যায়। ফেরিওয়ালাদের স্টলের আলো, ভাজাভুজির গন্ধ, কোলাহল ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে।

জয়ী বারবার ঘুরে দেখছে বাঁ-দিকে। দুটি লণ্ঠন-টর্চের আলোয় শুটিংয়ের ভিড়টি। জাহ্নবীর

BanglaBook.org

দেখে মনে হল, কমপক্ষে জনা পনেরো-কুড়ি মানুষ। একজনের কাঁধে ক্যামরাই বোধহয়। দু-তিন জন আলোর স্ট্যান্ড ঠিক করছে। খুদে জেনারেটরের পাশে ভূতের মতো বসে একজন। এরা ব্যস্ত। কলাকুশলী হবে। বাকি সব দর্শকের ভূমিকায়। পথ-চলতি, হাওয়া খেতে-আসা মানুষজন, ভিখিরি-টাইপের ছেলেপিলে—সবাই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

প্রায় কালো সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল জাহ্নবী। আরও একবার ওর মনে হল—বড় শান্ত বম্বের এই আরবসাগর। পুরীর বঙ্গোপসাগরের মতো মোটেই উত্তাল নয়। কোনও গর্জন নেই। ভরা জোয়ারের উচ্ছ্বাসের প্রকাশ বড়জোর একটু ছলাত-ছলাত। উলটোদিক থেকে একটা উটের গাড়ি ফিরে আসছে। লগবগ লগরবগর। এটাই বোধহয় আজকের শেষ ট্রিপ। ওটার পিছনে দেখা গেল রাজকীয় ভঙ্গিতে ছুটে আসছে সাদা ঘোড়া। উটের গাড়ি ও ভাইবোনদের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে পিছনে চলে গেল তীরবেগে। বাতাসের ঝাপটাতেই হোক বা দাপটের ভয়ে চমকে আরও খানিক পশ্চিমে, জলের দিকে সরে হাঁটতে লাগল ওরা।

জয়ী বলল, 'কী দারুণ ঘোড়া, না দি? একেবারে রানা প্রতাপের চৈতকের মতো।'

জাহ্নবী মজা করার জন্যেই বলল, 'তা হলে যে-লোকটা ঝকমকে পোশাক পরে ওর পিঠে বসে আছে, সে তো রানা প্রতাপ! কী বলিস?'

'ধ্যাত! রানা প্রতাপের দাড়ি আছে নাকি? এ তো মোঘলদের সেনাপতি-টতি কেউ হবে—'

রানা প্রতাপ বা মোঘল সেনাপতি নয়। ফিল্ম লাইনের ট্রেইনড তুখোড় ঘোড়া জুবিলির পিঠে বসে রয়েছে আনোয়ার। দামি এবং নামী স্ট্যান্টম্যান। জিপ, ট্রাক, মোটর-বাইক, ঘোড়া চালিয়ে দমবন্ধ স্টান্ট দৃশ্যের জন্যে ওর নাম প্রথম সারিতে। দৈনিক 'রেট' বেশ ভালো। তবে মাসে দু-দিন-চারদিন, বড়জোর ছ'দিন কাজ জোটে বায়োস্কোপের শুটিংয়ে। ববি ফিচার্ডোর মতো আন্ডার-ওয়ার্লড মস্তান বা 'দাদা'দের কাছ থেকে ডাক আসে। সামান্য খুচরো কাজের বদলে তিন-চারগুণ বেশি রোজগার হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি পুলিশের ঝামেলার ভয় থাকে। ভাড়া করা গোঁফ-দাড়িতে মুখ আড়াল করে নেওয়াই রীতি।

টার্গেটকে পিছনে ফেলে হলিডে ইন-এর দিকে ছুটছে আনোয়ার। ছ-সাত রাউন্ড দেওয়া হয়ে গেছে। লাইট জ্বলেনি তখনও। ববি বলেছিল, 'ঠিক সময় বুঝে, জায়গা মতো ফোকাস জ্বলবে। টার্গেট তখন লাইট-জোনের মধ্যেই থাকবে। দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ হাসিল করতে হবে তোমাকে।—'

কিন্তু কখন লাইট জ্বলবে? কতক্ষণ? আর কতক্ষণ? ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে বারবার ঘুরে দেখছে সে। অস্থির চোখে উত্তেজনা আর প্রতীক্ষা।

ক্লান্ত ঢেউয়ের শেষ জলে এবং ফেনায় বারবার ডুবে যাচ্ছে ওদের প্যান্টের পাতা। জয়ী হঠাৎ হঠাৎ পা দিয়ে জল ছেটাচ্ছে। বাতাসের ধাক্কায় জলকণা ফিরে আসছে গায়ে। জাহ্নবী বলল, 'ব্যস! আর নয়। এবার হাত ধরে হাঁটো।'

এখানে ঝিনুক নেই। বাতাসে নোনা গন্ধ। কী একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়তেই, ঝুঁকে সেটাকে তুলে ফেলল জয়ী। একটা আধুলি। কেউ সমুদ্রকে দান করেছে প্রণামসমেত। জাহ্নবী তাড়াতাড়ি বলল, 'ফেলে দে। ফ্যাল শিগগির। অন্যের ছোঁয়া পয়সা কুড়োতে নেই।—'

জয়ী আধুলিটা জোরে জলের দিকে ছুঁড়তেই, হঠাৎ সার্চলাইটের আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের চোখে, মুখে, শরীরে। চমকে, বাঁ-দিকে দেখল ওরা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। প্রথমে কিছুই ঠাহর হয় না। ভাইয়ের হাত ধরে জাহ্নবী বলল, 'শিগগির চল। শুটিং আরম্ভ হয়েছে বোধহয়। দৌড়ে আলোর বাইরে চলে যা।' বলে, দ্রুত পা চালাল সে, যাতে আলোর গণ্ডির থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। দু-পা হাঁটতেই চোখ সয়ে যাচ্ছে। বাঁ-দিকের সেই ফিল্মি-জটলার ওখানেই দুটো আলোর স্ট্যান্ড

BanglaBook.org

আবছা দেখতে পেল জাহ্নবী।

জয়ী ততক্ষণে দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছে সোজা। হাঁটু অবধি ভেজা শাড়ি লেপটে যাচ্ছে পায়ে। সামলে-সুমলে যতটা সম্ভব জোর কদমে হাঁটছে জাহ্নবী। মনে-মনে ভাবছে—ইশ! ছি-ছি কী লজ্জা! ওদিকে দাঁড়ানো সমস্ত লোকগুলো নিশ্চয়ই ড্যাবডেবে চোখে দেখছে আমায়। যেন প্রায় ধমক দিয়ে উড়ু-উড়ু আঁচলকে কাঁধে-পিঠে জড়িয়ে নিল সে। আলোর সীমানা পেরিয়ে গেছে জয়ী।

ঠিক তক্ষুনি পিছন দিকে খপাখপ-খপাখপ শব্দ। জাহ্নবী ফিরে দেখতে গিয়ে পলকের জন্যে টের পেল অতিকায় ঘোড়াটা দুদ্দাড় করে প্রায় তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। ভয়ে, জলের দিকে সরে যাওয়ার আগেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। কিছুই বুঝে উঠতে পারল না জাহ্নবী। দুরন্ত ঘোড়সওয়ার সামান্য ঝুঁকে শক্ত ডানহাতে শূন্যে তুলে নিল ওকে। কী একটা চিৎকার করল সে। বোধহয় জয়ীর নাম ধরে ডাকল। অথবা, 'বাঁচাও—', না কি—, 'ও মাগো—'

ঠিক কী বলল জাহ্নবী নিজেও জানে না। সমুদ্রের বাতাস গিলে ফেলল অক্ষরগুলি। সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে। নেশার ভাব।

দিদির গলার অর্থহীন চিৎকার ক্ষীণ হয়ে পৌঁছেছে জয়ীর চেতনায়। ছুটতে-ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফিরে দেখল, ঘোড়ায় বসা লোকটা দিদিকে তুলে নিয়েছে শূন্যে। উজ্জ্বল ফোকাসের আলোয় হাত-পা ছুঁড়ছে দিদি। শাড়ির আঁচল উড়তে-উড়তে শাঁ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

কিছু না-বুঝেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল জয়ী, 'দি—ই-ই—'

ভিডিও ক্যামেরায় লুক-থ্রু করছিল শ্রীনিবাস। ওরই ক্যামেরা। ক্যামেরায় রোল-টোল কিছু নেই। বোতাম টিপলে ঘর-র-র শব্দ চলতে থাকে। পাশে দাঁড়ানো ববি ফিচার্ডো চাপা গলায় বলল, 'ভিড় খেদিয়ে কেটে পড়ো তোমরা।' তারপরেই যেন, সমবেত জনতাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাট ইট। ও-কে। লাইটস অফ।'

অর্ডার দিয়েই, বিশাল বপু নিয়ে ছোঁড়াটার দিকে ছুটে চলল ববি। ওর পিছন-পিছন গুটিকয়েক ছেলে-ছোকরা দৌড়ে গেল। জয়ীও ভয়ে দিশেহারা হয়ে টালমাটাল ছুটছে—অন্ধকারে অদৃশ্য ঘোড়ার পিছনে। নারকোলের খোলা বা পাথর জাতীয় কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল জয়ী। পড়েই, কেঁদে ফেলল, 'দি—ই—ই—'

ববি পৌঁছে গেল কাছে। হাত ধরে ওকে টেনে তুলতে-তুলতে বলল, ভারী বিশ্বাসী নরম গলায়, 'কাম অন—বিগ বয়। ভয় নেই। উ-ই যে দূরে শেষ গলির আলো দেখা যাচ্ছে ওইখানে নিয়ে গেছে তোমার দিদিকে—চলো, দৌড়োও—লেট আস গেট দেয়ার—'

বলে, পেছন ফিরে অনুধাবনকারীদের উদ্দেশে চেঁচাল সে, প্রায় ধমকের সুরেই, 'ভাগো ইধারসে। দেখছ না, বাচ্চা ছেলে ভয় পেয়েছে। যাও, যাও, বাড়ি যাও। শুটিং খতম। ভাগো—'

ওরা থমকে দাঁড়াল। দু-একজনের আওয়াজ শোনা গেল ঃ

'কী ছবির শুটিং, সাব?'

'সিরিয়ালের নাম কী?'

'কবে দেখাবে টিভিতে?'

জয়ীর হাত ধরে শেষ গলিটির দিকে ছুটতে-ছুটতে ববি পিছনে ছুড়ে দিল, 'ভাগম ভাগ।'

ছোট দলটা দু-হাত তুলে নাচতে-নাচতে ফিরে যাচ্ছে স্টলগুলোর দিকে, 'ভাগম ভাগ—ভাগম ভাগ—।'

গাঢ় নীল মার্সিডিস ইঞ্জিন চালু করে অপেক্ষা করছিল। আনোয়ার এবং জেজে ধরাধরি করে অজ্ঞান জাহ্নবীকে পিছনের সিটে শুইয়ে দিল। ড্রাইভারের পাশে বসে জেজে বলল, 'চলো। জলদি।'

BanglaBook.org

দরজা বন্ধ করতে যাবে, ববির গলা শুনল, 'জেজে—ফেউটাকে কী করবে?'

'তোমার গাড়িতে তুলে নিয়ে, আমায় "ফলো" করো।—'

বলেই, ঝপ করে দরজা বন্ধ করে দিল জেজে। হুশ করে গলি বেয়ে উঠে গেল মার্সিডিস। ববির কালো কন্টেসা পাশেই দাঁড়ানো। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ হচ্ছে। জয়ীকে নিয়ে পিছনে বসতে-বসতে অভয় দিল ববি, 'ওই তো। সামনের গাড়িটায় তোলা হয়েছে তোমার সিস্টারকে। এক্ষুনি ধরে ফেলছি।'

॥ তিন ॥

দেখে অবাক হওয়ার মতোই মস্ত গাড়িখানা। বিশেষ করে এমন বেঁটে রাস্তায়। ছোটখাটো একটা গাঢ় নীল রঙের জাহাজ যেন উঠে এল জুহুর সমুদ্র থেকে এই গলিতে। মাদলের হাঁ চোখের সামনে দিয়ে হুশ করে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কালচে রোদ-চশমার মতো বাঁ-দিকের কাচ নেমে এল অর্ধেকটা। ফরসা চৌকো মুখের তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ঘুরে-ঘুরে দেখল ছবিগুলো। পিছনের দেওয়ালে দড়িতে টাঙানো ঘোড়া, মোনালিসা, ফুল, সমুদ্রের নৌকা অল্প বাতাসে দুলছে। নীচে রাস্তায় লাল প্ল্যাসটিকের শিটের ওপরে ছোট-ছোট নুড়ি দিয়ে চাপা নারকেল গাছের সারি, সারকাসের ক্লাউন, গরুর গাড়ির রঙিন ছবিগুলি দেখতে-দেখতে মুখের মালিক চোখের ইশারায় মাদলকে ডাকল। শুধু মাদল নয়। এ-ধারের সবাই গোল চোখে গাড়ি এবং জানালার মুণ্ডুটি দেখছিল।

গ্যাস-বেলুনওয়ালা হরকিশান চাপা উত্তেজিত গলায় তাড়া দিল, 'হেই মাধো। জলদি যা। সাব বুলাতা হ্যয়।'

গত পনেরো দিন থেকে এ-রাজ্যের রাস্তায় নেমে মাদল বসু 'মাধো' হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির মালিক বড়লোক নিঃসন্দেহে। ছবি কিনবে নাকি? না, মাদলের পনেরো দিনের প্রতীক্ষার দেওয়ালে ফাটল ধরল? ভাবতে-ভাবতে তড়িঘড়ি উঠে এগিয়ে এল লোকটির মুখের কাছে।

'ইয়ে সব পিকচার তুম বনায়ে?'

'জী হাঁ।' হিন্দিতে জবাব দিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল মাদল। কী আছে? গাঢ় কাচের ফাঁক দিয়ে, ওপাশে চালককে দেখা যাচ্ছে।

'আমার জন্যে ছবি আঁকতে পারবে?'

'ইয়েস স্যার। কী ছবি বলুন?'

কথা বলতে-বলতে চঞ্চল চোখে গাড়ির পিছনের সিট দেখার চেষ্টা করছে মাদল।

'বড়-বড় ছবি। অয়েল পেইন্টিং?' লোকটি জানাল।

উঁহু, কেউ বসে নেই বোধহয়। খালি?

'ক্যানভাস নেই হ্যয়, সাব। কালার বহুত দাম।'

হাসল মাদল। হেসে, চোখ পিছলে সরিয়ে গাঢ় কাচ ভেদ করতে চাইল। কেউ শুয়ে আছে নাকি? কোনও মহিলা? শাড়ি অথবা গাউন। অসুস্থ কেউ?

'ও সবের চিন্তা করতে হবে না।'

আরও দু-তিনজন এগিয়ে এসেছে পায়ে-পায়ে। বাদাম, বেলুন, ভুট্টাওয়ালা। ঝকঝকে মস্ত গাড়ির মালিক 'কাল-কা-ছোকরা' এই মাধোর সঙ্গে কী কথা বলছে? কৌতূহল হতেই পারে। কখন হকারদের মস্তান জগগুদাদাও এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ইশারায় ডাকল গাড়ির লোকটি। মাদলের প্রায় গায়ে-গায়ে এসে দাঁড়াল জগগুদাদা। লোকটি খাটো গলায় বলল, 'জগগু। রাত দশটায় এই ছোকরাকে ওয়ালকেশ্বরের গেটে দরোয়ানের কাছে পৌঁছে দিবি।'

সেলাম ঠুকে, কৃতার্থ গলায় জগগু বলল, 'জী, বস।'

ইঞ্জিন চালু ছিল। সড়াত করে জানালার কাচ উঠে লোকটির মুখ আড়াল হয়ে গেল। হুশ

BanglaBook.org

করে বেরিয়ে গেল মার্সিডিস। সদর রাস্তার ডানদিকে ঘুরে উধাও।

ছোট্ট জটলাটি পাতলা করে সবাই ফিরে যাচ্ছে যে যার জায়গায়। মাদলের মাথার পিছনে আলতো চাঁটি মেরে জগ্‌গু বলল, 'হেই স্‌শালা। ঠিক নও বাজে তৈয়ার রহনা। ওহাঁ পহুঁচনেমে টেইম লাগতা।'

মাদল দ্রুত ভাবছিল। লোকটা কে, মস্তানদের হোমরাচোমরা কেউ? গাড়ির পিছনে কে শুয়েছিল? হয়তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিচে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে কেউ। তাকে পিছনের সিটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। হেলাফেলার নিত্যি-দেখা গাড়ি ফিয়াট-অ্যাম্বাসাডার হলে মাদল কিছুই ভাবত না হয়তো। কিন্তু অমন গাড়ি! তার মালিক আবার জগ্‌গুকে চেনে। শুধু চেনে নয়, জগ্‌গুকে হুকুম দিয়ে চলে যায়। ব্যাপারটা কি স্রেফ সাধারণ ঘটনা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে?

ভাজা-মাছ উলটে-খেতে-জানে-না মুখ বানিয়ে মাদল জিগ্যেস করল, 'জগ্‌গুদাদা, উও সাহাব কউন থে?'

তক্ষুনি সমুদ্রের অন্ধকার দিক থেকে আরও-একখানা গাড়িকে উঠে আসতে দেখল মাদল। আধ মিনিটও হয়নি মার্সিডিসটা বেরিয়ে গেছে। এবারেও হেঁজিপেঁজি মডেল নয়। কন্টেসা। রাস্তার নিয়ন আলো পিছলে যাচ্ছে তকতকে কালো রঙের বডিতে। ওরা দুজনে রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির স্পিড দেখে দ্রুত সরে এল পাশে। কন্টেসা দাঁড়াল। স্বচ্ছ কাচের জানালায় দুটি মুখ দেখা গেল সামনে এবং পিছনে। সামনেরটিকে একটি মিশকালো জলহস্তীর মুখ বলা চলে। পিছনে কচি একটা বাচ্চা। ভিতরে কাচের গায়ে নাক থেবড়ে হাঁ করে বোধহয় কাঁদছে বা চেঁচাচ্ছে। দুটি খুদে হাত কাচের গায়ে চাপড়াচ্ছে।

কাচ বন্ধ, সাউন্ডপ্রুফ গাড়ির ভেতর থেকেও কি আবছা চিৎকার শুনল মাদল? নাকি, মনের ভুল! গাড়িটা সদর রাস্তায় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হতেই মাদল দেখল, জগ্‌গুর ভুরু সামান্য কুঁচকোনো।

'এ-গাড়িটায় আবার কে গেল, জগ্‌গুদাদা? একেও চেনো নাকি তুমি?

মাদলের গলা শুনে ওর দিকে ফিরতেই কুঞ্চিত ভ্রূ স্বাভাবিক করে জগ্‌গু রুক্ষ গলায় জবাব দিল, 'অত কথার দরকার নেই তোর। তোর ফোটু নেচবি, মাল কামাবি, হফ্‌তা দিবি— বাস, ফুরিয়ে গেল ঝামেলা। যা ভাগ—বোস গে যা জায়গায়। আমি ঘুরে আসছি। ঠিক ন'টায়।'

বলতে-বলতে, মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল জগ্‌গু। আড্ডায় চোলাই খেতেই বোধহয়। মাদল লক্ষ করল, ওর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে আবার।

বাচ্চা ছেলেটার মুখ মনের পরদায় ভেসে উঠল মাদলের। এ কী? মুখটি কোথাও যেন দেখেছে। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভিতরে লন্ডভন্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। স্মৃতি তোলপাড় করে খুঁজতে লেগে গেল সে। কোথায় দেখেছে? কোনও ছবিতে কি? নাকি, সত্যকাকুর আপিসে কাজের সময় ওই মুখের ছবি সে নিজে হাতে এঁকেছে? চব্বিশ বছরের মাদল বসু গোয়েন্দা নয়, তবে দস্যু মোহন থেকে নিয়ে ব্যোমকেশ-ফেলুদা, হওয়ার নেশায় সেই ছোটবেলা থেকে পাগল। ছবি এঁকে সামান্য রোজগার হয় বটে, তবে, সে তো পাশ-করা শিল্পীও নয়। আর্ট কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের মাথায় বাবার মৃত্যুর পর কলেজ ছাড়তে হল। ছাড়তে হল কলকাতা। সাত বছর আগে পিতৃবন্ধু সত্যকাকুর কাছে এসে উঠেছিল। তাঁর আপিসেই ফুরনে কাজ করে কয়েক ঘণ্টা। ভারী বিচিত্র সে কাজ। মুখ আঁকতে হয়। মৃত মানুষের মুখ। হত্যাকারী বা 'ওয়ান্টেড' মুখ। আগুনে পোড়া ঝলসানো বা জখম মুখ। কখনও প্রোফাইল থেকে 'ফ্রন্ট', কখনও বা ফ্রন্ট-ফেস দেখে প্রোফাইল। তা ছাড়া, পলাতক মুখ অসংখ্য এঁকেছে মাদল। এদেরই ভিড়ে কি কোথাও সে দেখেছে ছেলেটিকে? কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না।

ডবল-হাফ জাতীয় আধা-গেলাস চা-কে এ-রাজ্যে বলে কাটিং। নিত্যিকার মতো মোড়ের ভাইয়াজি কাটিং নিয়ে এল। তার মানে, এখন সন্ধে আটটা হবে। নিজের ছবির পাশ দিয়ে এসে

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছিল মাদল। উবু হয়ে বসে ঘাড়ের গামছায় মুখ মুছল ভাইয়াজি। গেলাসটা মাদলকে ধরিয়ে জিগ্যেস করল, 'কা হুয়া, বাবুয়া? উ মোটরওয়ালা সাহাব কা কহতান?'

মুখের ভিড় মাথার থেকে সরিয়ে মাদল হাসল। চায়ে হুস করে চুমুক দিয়ে বলল, 'তেমন কিছু না, ভাইয়াজি! সায়েবের বাড়িতে গিয়ে বোধহয় বড় ছবি আঁকার অর্ডার পাব।'

'ই তো বহুত খুশ খবর, বাবুয়া—' বলে, ট্যাঁক থেকে চুন-খৈনির ডিবে বের করল। বয়েস ভাইয়াজির কম করে ষাট। বেশ শক্ত চেহারা। টাক মাথা। তোবড়ানো চোয়ালের অর্ধেক ঢাকা পড়েছে মস্ত একজোড়া গোঁফে। মানুষটা ভালো। খৈনি জিভের তলায় পুরে, গলা খাটো করে বলল, 'তবে একটু হুঁশে থেকো, বাবু। সাহাব জগ্‌গুর চেনাশোনা। জগ্‌গু যে কেমন ট্যারা আদমি তা তো জানোই। উ বদমাশের জুয়ার আড্ডা, চোলাই-কারবার আছে শুনেছি। খুন-টুনও যে করেনি, কে বলবে!'

এখানে এসে বসার প্রথম দিনই ভাইয়াজির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল মাদল। সেই দিনই আকারে-ইঙ্গিতে ফেরিওলাদের কে কেমন, জগ্‌গু কী জিনিস—এসব আন্দাজ দিয়েছিল ভাইয়াজি।

'ওর সঙ্গে পুলিশের লোকেরও দোস্তি আছে। একটু সামলে-সুমলে মিশো। রাস্তায় ফিরিওলাদের ভালোমন্দও ও-ই দেখে। "হপ্তা" পেলেই খুশি।'

আজকে নিয়ে ঠিক বারো দিন হল মাদল এখানে এসে বসছে। সারাদিন নয়। দুপুরে রোদের তেজ কমলে আসে। নিজের আঁকা ছবি সাজিয়ে বসে থাকে সেই রাত সাড়ে-আটটা ন'টা অবধি। 'লিডো' সিনেমার পর উত্তরে হোটেলগুলোর দিকে জুহু-তারা রোড ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। কয়েক পা এগোলেই প্রথম বাঁ-হাতি এই গলির মুখে ফিরিওলাদের অস্থায়ী দোকান-পাট। ভাইয়াজির চা-বিস্কুট, গণপতের চাকাওলা মনোহারি পসারা, ডাব, বাদাম, কাচের চুড়ি, ঝুমঝুমি-খেলনা, ফুচকা এই সব।

এখানে এসে বসার কারণ ঘটেছিল প্রায় মাসখানেক আগে। সেদিন একটাই ফোটো ছিল। দুর্ঘটনায় বাঁ-দিকের গাল থেঁতলানো যুবকের ছবি। সত্যকাকুর আপিস সি-আই-এ, অর্থাৎ চ্যানেল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে নিদেন ছ-সাতটা এমনি মুখ আঁকতে হয় হপ্তায়। জখম মুখটা টেবিলের ড্রয়িং বোর্ডে ফেলে সত্যকাকু বলেছিলেন, 'একটু তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক মুখটা বানিয়ে দাও। মধুকর পাঠিয়েছে। টেলিফোনও করেছে দুবার।'

বলতে-বলতে সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর মধুকর সাঠে এসে ঢুকেছিলেন, 'কই, সাধনকর? হয়েছে ছবিটা?'

কাকুর পুরো নাম সত্যসাধন কর। মারাঠি উপাধি বেশিরভাগই, 'কর' দিয়ে শেষ হয়। উপসিকর, তুলসকর, জোগলেকর—এমনি সব। তা, এ-রাজ্যে সত্যকাকুও 'সাধনকর' নামে পরিচিত। উনি বললেন, 'এক্ষুনি হয়ে যাবে। বসো, বসো। চা খাবে তো?'

বলে নিজের টেবিলে বসে বোতাম টিপলেন সত্যকাকু। মুখেও হাঁক দিলেন, 'সখারাম!'

দরজা ঠেলে সখা মুখ বাড়াতেই অর্ডার দিলেন, 'তিনটে চা। স্পেশাল আনবি।'

উলটোদিকের চেয়ারে বসতে-বসতে সাঠে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথাও ছিল—'

মাদল, নিজের টেবিল থেকে চোখ না সরিয়েও টের পেল সাঠে ওর দিকে ইশারা করে বললেন কথাগুলি। সঙ্গে-সঙ্গে সত্যকাকু বললেন, 'আহা, তুমি তো ওকে দেখেছ। চেনো। ও-ই তো এখানকার ছবি-টবিগুলো আঁকে, ফোটো ডেভলাপ করে দ্যায়, রি-টাচ করে। আমার দাদা-তুল্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে। নিজের ভাইপোর মতোই বলতে পার। নির্দ্বিধায় বলো, কী ব্যাপার?'

তবু একটু গলা খাটো করেই কথা বলতে শুরু করলেন সাঠে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত শব্দহীন ঘরে ফিসফিসে কথাও স্পষ্ট শোনা যায়। নিজের কাজ করতে-করতে প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই

BanglaBook.org

শুনল মাদল।

বম্বেতে স্মাগলার-মাফিয়াদের গোটা তিনেক বড় গ্যাং আন্ডারওয়ার্লডে দাপিয়ে বেড়ায়। সেই পাতালপুরীর সবচেয়ে শক্তিশালী এখন গাজি কাপ্তানের দল। কাপ্তান নিজে গত তিন-চার বছর ধরে দুবাইতে ঘাঁটি নিয়ে আছে। সেখান থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির কয়েকটির সঙ্গে ড্রাগস-সোনা ইত্যাদির ফলাও স্মাগলিংয়ের কলকাঠি নাড়ে। ভারতবর্ষের মূল ঘাঁটি বোম্বাই। নানান চোরাপথে ওই সব মাল আসে এবং যায়। হালে, ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে বা সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে উট-দৌড়ের সওয়ার হিসেবে চালানও দিচ্ছে।

'একেবারে জেরবার হয়ে গেলুম, ভাই। ভারসোবা, মাঢ আইল্যান্ড, গোরাই, ডক, এয়ারপোর্টের নানান পকেট থেকে মাল পাচার হচ্ছে।'

সখারাম চা দিয়ে গেল সবাইকে। ও বেরিয়ে যেতেই এতক্ষণে সত্যকাকু কথা বললেন, 'এ সবই তো পুরোনো খবর। গত একমাসে তোমাদের দুজন সৎ এবং সাহসী সাব-ইন্সপেক্টর ও ছ'টি কনস্টেবল মারা গেছে এনকাউন্টারে। তা এসব ব্যাপারে আমরা চুনোপুঁটি, তোমার জন্যে কী করতে পারি, বলো?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সাঠে বললেন, 'বিনয়ের অবতার! তুমি চুনোপুঁটি নও বলেই তো তোমাকে শ্রদ্ধা করি।'

'তুমি করলে কী হবে। তোমার ডিপার্টমেন্টের বহু কর্তারই আমি দু-চক্ষের বিষ।'

হাসতে লাগলেন সাঠে। হাসতে-হাসতেই বললেন, 'আসলে তোমরা, মানে, প্রাইভেট গোয়েন্দারা যদি আমাদের কাজ কমিয়ে দাও, তো আমাদের চাকরি যাওয়ার ভয় আছে না!'

সত্যকাকুর বয়েস চল্লিশের ভারী দিকে। সাঠের কম করে পঞ্চান্ন। প্রফেশনাল জেলাসি বয়েসের ফারাক ইত্যাদি থাকলেও দু-জনের দোস্তি যথেষ্ট পুরোনো।

হাসি থামিয়ে আসল কথা বললেন মধুকর, 'আমাদের ইনফরমাররা বেতনভুক নয়। তা ছাড়া, নীচু পোস্টের কর্মচারীরা সবাই তো আর তেমন বিশ্বস্ত হয় না। সাধনকর, তোমাদের চ্যানেলের দু-চারজন যদি লাগিয়ে দিতে পার, তাহলে, কিছু হদিশ মেলা সম্ভব। উপকারটুকু করবে, ব্রাদার?'

পুলিশ, তথা, সাঠের সাহায্য ছাড়া বহু-কেসের সুরাহা সি-আই-এ করতে পারত না। সুযোগ-সুবিধে, ভাব-ভালোবাসার আদান-প্রদান অলিখিতভাবে দু-পক্ষের মধ্যেই রয়েছে।

বাঁ-দিকের চোখের মণিটা ডানদিকের আধবোজা চোখ থেকে আন্দাজ করে আরও একটু গাঢ় করে দিল মাদল। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে মুখটা। শুনল, সত্যকাকু বলছেন, 'দ্যাখো সাঠে। দুজন লোক এখন মোটামুটি ফ্রি আছে। ভারসোবা, গোরাই বিচে লাগাতে পারি।'

সাঠের গলা, 'লিংকিং রোড, জুহু বিচেও পকেটের খবর আছে। তার কী করা যায়?'

'আপাতত দুটো মেইন স্পটে দুজন লাগাচ্ছি কাল থেকেই। বাকি এ-সপ্তাহেই তোমাকে জানাব।'

'থ্যাংক ইউ সো মাচ!'

বলে, উঠে দাঁড়িয়েই গলা তুলে হাঁক ছাড়লেন মধুকর। 'কোথায় হে, ছবি হল? কী নাম যেন—'

এবারে আসল পুলিশি গলা। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এল মাদল। হাতের ফোটো এবং ওর আঁকা মুখ এগিয়ে দিতে গিয়ে, নাম বলতে যাচ্ছিল সে, শুনল, 'মনে পড়েছে! বাদল! কারেক্ট?'

মাদল একটু হেসে বলে ফেললে, 'প্রায় কারেক্ট।'

ছবি মেলাতে-মেলাতে সাঠে বললেন, 'মানে?'

হো-হো করে হেসে ফেলেছেন কাকু। বললেন, 'স্রেফ ওই "ব"য়ের বদলে "ম" হবে।'

BanglaBook.org

'ও।' বলে, তারিফ করলেন মাদলের, 'খাসা হয়েছে। থ্যাংকস।'

সত্যকাকুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে যেতেই মাদল ওঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরকার কাচের কোনা খুঁটতে-খুঁটতে বলল, 'কাকু, আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলে, আমি একটা চান্স নিতে পারি।'

ফরসা, চওড়া কপালে ভাঁজ পড়ল। চোখ তুলে সত্যকাকু জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'জুহু বিচে আমার ঘোরা-ফেরা আছে। ও-অঞ্চলে আমি একটু নজর রাখতে পারি।'

'তুমি?' কাকু সত্যিই অবাক।

'হুঁ।' সঙ্কোচের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল মাদল।

'বাছা, তুমি শিল্পী মানুষ। গোয়েন্দাগিরিতে নাক গলিয়ে ঝামেলায় পড়বে।'

'কেন কাকু? গোয়েন্দার যেটা সর্বপ্রথম থাকা দরকার, তা হল অবজারভেশন অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখার চোখ। শিল্পী হিসেবে আমার কি তা নেই?'

ঠোঁটের কোণে কি একটু হাসি ফুটল কাকুর?

মাদল ঠিক বুঝল না। তবে, কোঁচকানো ভুরু সোজা হয়েছে। বললেন, 'শুধু চোখ নয়, কানও সজাগ থাকা দরকার।'

মাদল বলল, 'আপনাদের দুজনের দিকে পিছন ফিরে বসে আমি ছবি আঁকছিলুম। আপনি কম কথা বলছিলেন। তবে, মিস্টার সাঠের কথা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন।'

'বেশ। তাতে কী হল?' সত্যকাকুর গলায় কৌতূহল।

'অন্তত একবার বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আপনি একেবারে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব নানাবতীর কেসটা নিয়ে ভাবছিলেন।'

সত্যকাকু এবার একটু অবাক। এবং খুশিও বোধহয়। কারণ, মাদল ঠিক বলেছে। প্রশ্ন করলেন, 'কী করে জানলে?'

'আপনি পকেট থেকে দুবার ডটপেন বের করেছেন, কিছু লেখার জন্যে। তিনবার খোলা-বন্ধর টুক-টুক আওয়াজ পেয়েছি। তারপর, একটু সময় পরে কাগজের গোল্লা বাস্কেটে পড়ার শব্দ পেয়েছি। এবং চতুর্থবার পেন বন্ধর ক্ষীণ আওয়াজ।'

বেমক্কা সত্যকাকুর প্রশ্ন, 'কত জোরে ছুটতে পারো, মাদল?'

'আপনার চেয়ে জোরে। মনে নেই, গেল বছর মেরিন ড্রাইভে পাল্লা হয়েছিল?'

হেসে ফেললেন কাকু, 'তুমি জুহুতে যাবেই?'

'আপনি অনুমতি দিলেই।'

'কিন্তু, কীভাবে?'

'কাকু, আমি আইডিয়া পেয়েছি। দু-একদিনে কিছু ছবি—সিন সিনারি, গান্ধীজি, ঘোড়া—এই সব এঁকে বেচতে বসব কোথাও।'

'কবে থেকে?'

'কাল পরশু।'

'না। পনেরো দিন বাদে। কাল থেকে দাড়ি কামাবে না। ঠিক আছে?'

মাদল একগাল হেসেছিল।...পনেরো দিন দাড়ি না কামিয়ে, খান পঁচিশেক রঙিন ছবি জলরঙে, প্যাস্টেলে বানিয়ে, প্লাস্টিকের শিট-সমেত এখানে এসে বসেছিল। এই বারো দিন বসে একটা নৌকোওলা জল-রং কুড়ি টাকায় আর প্যাস্টেলের ঘোড়া পনেরো টাকায় বেচেছে। দু-সপ্তাহের পাঁচ-পাঁচ-দশ টাকা দিতে হয়েছে জগ্‌গুকে। ও বলে—সেলামি।

গত ক'দিনের কথা ভাবতে-ভাবতে মাদলের খেয়াল হল, জয়দীপদার আপিসে প্রায় তিন সপ্তাহ ঢুঁ মারা হয়নি। অ্যাডমার্কেট বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে প্রতিমাসেই দু-চারটে ইলাস্ট্রেশনের কাজ

BanglaBook.org

জুটে যায় ফুরনে। ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট, কালার বা হাফটোনে প্রেস বা ম্যাগাজিন অ্যাডের জন্যে ছবি এঁকে দিতে হয়। কালারে ভালো মজুরি।

দুম করে যেন আলো জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। মনে পড়ে গেল, ওই ছেলেটির মুখ। হিপো-মুখো হুমদোর কন্টেসা গাড়ির পিছনে, বন্ধ জানালার কাচ থাবড়াচ্ছিল, আর, বোধহয় চ্যাঁচাচ্ছিল। ওকে তো মাদল দেখেছে জয়দীপদার অফিস-ক্যাবিনে। টেবিলের ওপর। ছোট্ট একটা ল্যামিনেট করা ছবি আছে টেবিলে। ছবিতে এক বয়স্কা বিধবা চেয়ারে বসে। তাঁর কোলে বসে রয়েছে ছেলেটি। চেয়ারের পিছনে একটি কিশোরী ও জয়দীপদা দাঁড়িয়ে।

ব্যাপারটা ভালো নয়। এবং ভালো। ছেলেটি যদি কোনও বিপদে পড়ে থাকে—মোটেই ভালো কথা নয়। আবার, অপর দিকে—হয়তো, এর থেকেই কিছু হদিশ বেরোবে। এ-ক'দিন প্রতীক্ষার একটা ফল তো পাওয়া উচিত। অত বড় মুখ করে মাদল সত্যকাকুকে রাজি করিয়েছে!

ভাবতে-ভাবতে, হঠাৎ পরিপূর্ণ যুবক মাদলের ভয় ঢুকল শরীরে। সমুদ্রের ঠান্ডা বাতাসেই কি না কে জানে, মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিম-কাঁপুনি লাগল। রাত দশটায় যেতে হবে অচেনা ওয়ালকেশ্বর। তা-ও জগগুর সঙ্গে।

ভাইয়াজির কাছে এসে দাঁড়াল মাদল, 'আমার ছবিগুলি একটু দেখবেন। আমি পাঁচ মিনিট ঘুরে আসছি। টেলিফোন করতে হবে।'

॥ চার ॥

'হ্যালো?'

'সত্যকাকু? মাদল বলছি। আপনি এখনও আপিসে? আমি বাড়ির নাম্বার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হয়রান—।'

'এক্ষুনি বেরুচ্ছিলাম। কী ব্যাপার? অত হাঁপাচ্ছ কেন? কোনও গন্ডগোল?'

'না, কাকু। তবে, মনে হচ্ছে একটা সুতো পেয়েছি।'

'কোত্থেকে কথা বলছ, সেইটে বলো আগে?'

'জুহু বিচের কাছে।'

'একজ্যাক্ট লোকেশনটা বলো?' ধমক দিলেন সত্যসাধন।

'মানে, ক্লোজ টু দ্য—'

'ইংরাজি-হিন্দি নয়। বাংলায় বলো। কাছে-পিঠে লোক নেই নাকি?' আবার ধমক।

'অনেক। উদিপি চায়ের দোকান থেকে ফোন করছি।' এক সেকেন্ড ভেবে বাংলায় বলল, মাদল, 'পাঁচ তারকা সরাইখানা সমুদ্র-সম্রাজ্ঞীর কাছে।'

হেসে ফেলল সত্যসাধন।

'বেশ। কী ব্যাপার হয়েছে সেটা বলো। গুরুত্বপূর্ণ কিছু? সংক্ষেপে বলবে।'

বিকেলের গাড়ি দুটির কথা, জগগু, চেনা-চেনা ছেলেটি—সব মোটামুটি দ্রুত গুছিয়ে বলে দিল মাদল। আপন ঘটনা বিন্যাসের ক্ষমতায় নিজেই অবাক। সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'ছেলেটিকে কোথায় দেখেছ, মনে পড়ল?'

মাদলের জবাব, 'হ্যাঁ। আমি যে বিজ্ঞাপন কোম্পানির মাঝে-মধ্যে ইলাস্ট্রেশন করতে যাই, তার চিফ এক্সিকিউটিভ জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে। জয়দীপদার ফ্যামিলি ফটোতে বোধহয়।'

'ভদ্রলোককে খবরটা দিয়েছ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু, উনি বিশেষ গা করলেন না। মনে হয়, প্যাঁচে পড়েছেন। শুধু বললেন, "তোমার

BanglaBook.org

কাকু সত্যসাধন বাবুকে যে করে হোক এক্ষুনি এখানে আসতে বলো। আমি বেশ বাজে ঝামেলায় ফেঁসেছি।" জিগ্যেস করলুম, "কী ধরনের ঝামেলা?" বললেন, "আপিসে একটা খুন হয়েছে—পুলিশ বোধহয় আমাকেই সন্দেহ করছে!" কাকু, আপনি প্লিজ এক্ষুনি যান।'

সত্যসাধন লেখার প্যাড টেনে, ডটপেন টিপে তৈরি হলেন। বললেন, 'ঠিকানা বলো।'

'আপনার আপিসের কাছেই—'

ঠিকানা টোকা শেষ হতে-হতে প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ালকেশ্বরে ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তোমায়?'

হঠাৎ মাদল দেখল, প্রায় ভুঁই ফুঁড়ে কোত্থেকে উদয় হয়েছে জগ্‌গু। ওর দিকে খর চোখে তাকিয়ে হেঁটে আসছে দশ ফুট দূর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে মাদল গলা তুলে বলল, 'নেহি, কাকা! বড়া কাম মিলা হ্যয়—'

ওপার থেকে সত্য বললেন, 'হঠাৎ কী হল? হিন্দিতে চ্যাঁচাচ্ছ—?

'হাঁ-হাঁ। আনেমে থোড়ি দের হোগি। আপ খানা খা লিজিয়েগা। ইন্তজার মত করিয়ে—আচ্ছা, ফোন রাখতা হুঁ।' বলে, ঝট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল মাদল।

হাত খানেক দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জগ্‌গু। কোঁচকানো ভুরু কোমরে হাত। চোখেমুখে জঙ্গি ভাব। চিবিয়ে-চিবিয়ে জিগ্যেস করলে হিন্দিতে, 'কাকে ফোন করলি স্‌-শালা?'

অকপটে সত্যি কথা বলল মাদল, 'যে-লোকটার সঙ্গে থাকি তাকে।'

'কে হয় তোর? তুই না বলেছিলি, তোর কেউ নেই—বান্দ্রার ঝুপড়িতে থাকিস?'

'হ্যাঁ। থাকিই তো। মারাঠি ফ্যামিলির সঙ্গে।'

যদিও গলা শুকিয়ে আসছিল, ঠোঁট চেটে, হাসবার চেষ্টা করল মাদল।

'ঝুপড়ি-বস্তিতে টেলিফোনও আছে নাকি?' অ্যাঁ?'

'খোঁচা মেরে কথা কটি বলে, জগ্‌গু একদলা থুতু ফেলল রাস্তায়।

'না, না। বস্তিতে কী করে ফোন থাকবে? তুমি মজাক করছ, জগ্‌গু দাদা!' মাদল আবার একখানা হেঁ-হেঁ হাসি টানল মুখে, 'উলটো ফুটের মুদিখানায় ফোন। ওরা কাকাকে ডেকে দেয়।'

ভালো করে ওর সারা মুখ, চোখ দিয়ে চেটে দেখল জগ্‌গু। তারপর বলল, 'ভাগ জলদি। সাড়ে আটটা বাজতে চলল। ঠিক ন'টায় রওনা হব—ও-কে?'

আহ্‌! হাঁফ ছাড়ল মাদল। আসল হেসে, বলল, 'ওকে।'

জগ্‌গু যেমন উদয় হয়েছিল। তেমনি মিলিয়ে গেল ডানধারের এঁদো গলির অন্ধকারে।

সত্যসাধনের একখানা গাড়ি আছে। তার গুণ দুই প্রকার। হয় লোকে গ্রাহ্যই করে না, বা হাঁ করে চেয়ে থাকে। উনিশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দের মডেল। ইটালিয়ান ফিয়াট। কোনওকালে এটার রঙ ছিল ট্যাক্সির ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ ওপরের অংশ কালো, নীচের ভাগ হলুদ। এখন অবিশ্যি সারা গায়ের চলটা উঠে-উঠে যত্রতত্র মরচে পড়া রঙ। বছর দুয়েক আগে মাদলের চেঁচামেচির ঠেলায় ছোট্ট এক কৌটা সাদা পেইন্ট এনে, দুজনে মিলে ক্ষতচিহ্নগুলিতে মলম লাগিয়েছিল। তাতে অঙ্গ শোভা আরও বিচিত্র হয়েছে। ডোরাকাটা বাঘ, চিতল হরিণ বা জেব্রা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, মরুভূমি পেরিয়ে এলে যেমন দেখাবে, অনেকটা তেমনি। সত্যকাকু মেকানিকের কাজ জানেন। মন খারাপ হলে, অথবা কোনও কঠিন মামলার চিন্তার জট ছাড়াতে হলে, হঠাৎ ওঁকে দেখা যাবে গাড়ির হুড তুলে কিছু-না-কিছু করছেন। নয়তো, মাদুর বিছিয়ে গাড়ির তলায় চিত হয়ে ঢুকে খুট-খাট লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে, ভেতরকার আসল ইতালীয় নাড়িভুঁড়ি তথা মোদ্দা ইঞ্জিনের প্রতিটি ইঞ্চি সর্বদাই চকচকে। ফার্স্ট গিয়ারের পিক-আপে যে কোনও মারুতিকে কাত করে দেবে। কিন্তু 'বডি' অর্থাৎ গতরে নানান

BanglaBook.org

আওয়াজ। ধীরে-ধীরে চললে সর্বাঙ্গ এমন ঝমঝমিয়ে বাজে যে, ছোটখাটো গলিতে পাড়ার কুত্তারা আঁতকে উঠে ডেকে ওঠে এবং তাড়া করে আসে।

সত্যকাকু বলেন, 'ওরে, এইরকম ঝমঝম গাড়ি গোটা বম্বের কোনও রাস্তায় দেখতে পাবি না। হন্ডা, মার্সিডিস, কন্টেসা, মারুতিতে গিসগিস করছে এ-শহর। ঝমরঝম একেবারে, একমেবাদ্বিতীয়ম। জুড়ি নেই। যেই রং-চং করিয়ে দুরস্ত করতে যাব একে—এ সিওর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে—বেচারা সাধারণ ছাপোষা হয়ে যাবে যে!

এ হেন ঝমর থেকে প্রায় ছ'ফুট লম্বা সত্যসাধন যখন বেরুলেন, গেটের দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

'কিধার যানা হ্যয়, সাব?

দুটি কনস্টেবলও এগিয়ে এল দু-পাশ থেকে।

'অ্যাডমার্কেট।'

পুলিশ দুটি মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন বলল। 'আপিস বন্ধ হয়ে গেছে। কার কাছে যাবেন?'

'জয়দীপ রায়।'

সেপাই একজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

গোটা সাত-তলা জুড়ে অ্যাডমার্কেটের অফিস। লিফট থেকে বাইরে পা রাখলেই অলিভ গ্রিন-কার্পেট, তার ওপরে কোম্পানির সাদা সিম্বল ও 'ওয়েলকাম' লেখা। উলটো দিকে রিসেপশান কাউন্টারে কেউ নেই। রাত সাড়ে আটটায় থাকার কথাও নয়। ডানদিকের উইঙ-এ দু-কদম এগোতেই মানুষের গলা শুনতে পেলেন সত্যসাধন। গলা তো নয়—বাজখাঁই ধমক, 'লেকিন তুম কিঁউ অন্দর গয়া থা?'

জবাবে, মনুষ্যকণ্ঠে বেড়ালের মিঁউ-মিঁউ শোনা গেল। বাজখাঁই গলা শুনেই মালিককে চিনেছে সত্য।

ইনস্পেক্টর মধুকর সাঠে।

বেশ বড় সাইজের ঘরে ছোট-মাঝারি কিউবিকলে বিভিন্ন কর্মচারীদের বসবার ব্যবস্থা। সবই প্রায় খালি এখন। হলের ভেতরে খানিকটা গেলেই বাঁ-দিকে একটি মাঝারি ঘর। সেখানে জনকয়েক নরনারী বসে, দাঁড়িয়ে। রিভলভিং সোফা এদিক পানে ঘুরিয়ে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন সাঠে। সত্যসাধনকে দেখেই উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন মধুকর। গম্ভীর মুখে বললেন, 'এই যে সাধনকর। এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'তুমি জানলে কী করে, যে, আমি আসছি?'

ততক্ষণে একটু দূরে দেওয়াল ঘেঁষে, আলাদা হয়ে যে-লোকটি বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে। হালকা নীল শার্টের উপরে গাঢ় রংয়ের টাই। গলার কাছে ফাঁস আলগা করে দেওয়া হয়েছে। ফরসা মুখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। মাঝারি হাইট। শরীরে মেদের চিহ্ন নেই। বয়েস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে, কথা ফুটল তার মুখে, 'আপনি খবর পেয়েছেন, তা হলে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার রয়।' বলে, সত্যসাধন সাঠেকে বললেন, 'সাঠে, আমি একটু এঁর সঙ্গে—।'

বাধা দিলেন মধুকর। হেসে বললেন, 'আগে ফিজিফিস করবে—এই তো? ঠিক আছে।'

সাঠের কথা বলার ধরনে বোধহয় একটু হালকা রসিকতার চেষ্টা ছিল। কিন্তু হাসল না কেউ। সবক'টি শুকনো মুখ যেমন-কে-তেমন রইল।

মাঝারি ঘরটি পেরিয়ে ডিজাইন স্টুডিওতে এসে ঢুকল দুজনে। টেবিলে শিল্পীদের ড্রইং বোর্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে। লোকজন নেই। একটা টেবিলে মুখোমুখি বসলেন ওঁরা। সত্য সরাসরি

BanglaBook.org

জিগ্যেস করলেন, 'বাড়িতে আপনার কে-কে আছেন, জয়দীপবাবু?'

'প্যারালিটিক মা। এক বোন, ভাই।'

'বাড়িতে টেলিফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের খবর দিয়েছেন।'

প্রশ্নটা করেই জয়দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সত্যসাধন। মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে সে বলল, 'কাকে দেব? কেউ ছিল না। মা তো টেলিফোনের হলঘরে আসতে পারেন না। মারাঠি বাই, মানে, ঝি তুলেছিল রিসিভার।'

'হুঁ।' বলে, একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সত্যসাধন।

'তা ওকে বললুম—ফিরতে দেরি হতে পারে। মাকে যেন খাইয়ে দেয়।'

'আপনার ভাইবোনের নাম কী?'

'জয়ী এবং জাহ্নবী।'

'ওরা কোথায়?'

'ইয়ে মানে, বিকেলে বেড়াতে বেরোয়। ফিরতে দেরি করছে হয়তো।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সত্য, 'ঠিক আছে। চলি তা হলে।'

'সে কী? আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না?'

'কীসে?' হাঁটতে আরম্ভ করেছেন সত্য।

'অফিসের মার্ডার কেসে পুলিশ আমাকেই মেন সাসপেক্ট করছে।' পিছন-পিছন হেঁটে আসছে জয়দীপ।

দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্য। ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমায় ইনভেস্টিগেট করতে বলছেন?'

'প্লিজ, স্যার। আপনার ফি আমি দেব।' জয়দীপের গলায় আকুতি।

'কিন্তু, আমার এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন কতখানি। পুলিশ তো ইনভেস্টিগেট করবে। যথাযত সত্যের সন্ধান করবে। সেটাই ওদের কাজ।'

সামান্য শ্লেষের সঙ্গে জয়দীপের জবাব, 'চাকরি।'

সত্যসাধন দু-সেকেন্ড চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। করুণ মুখে চেয়ে আছে জয়দীপ।

সত্য শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হুম। তবে, স্রেফ ফি দিলেই আমি কাজে হাত দেব না।'

'বলুন, বলুন, স্যার। আর কী চাই?'

তারপরেই, হঠাৎ সত্যর হাত ধরে ফেলল জয়দীপ। বলল, 'পুলিশ ইন্সপেক্টার যেভাবে কর্নার করছিলেন—আমাকে হয়তো জামিনও দিতে চাইবেন না। অথচ বাড়িতে আমার অথর্ব মা। ভাই বোনও নেই আজ—'

'ঠিক এই প্রসঙ্গেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস্টার জয়দীপ রায়, পুরো ফি ছাড়াও আপনি যদি কথা দেন, যে সত্য গোপন করবেন না—তবেই আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।'

'কিন্তু, কিন্তু—আমি তো কোনও মিথ্যে কথা বলিনি আপনাকে। মানে, আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই বললেন না।'

ফের হাঁটতে আরম্ভ করেছেন সত্য, 'এরই মধ্যে আপনি আপনার ছোট্ট ভাইটি প্রসঙ্গে কিছু কথা এড়িয়ে গেছেন।'

সাঠের জেরা-ধ্বনি কানে আসছিল। সত্য আবার হেঁটে প্রায় ও-ঘরের কাছে পৌঁছলেন। ক্ষীণ গলায় পিছন থেকে জয়দীপ বলল, 'ওটা বড়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানে, আজকের এই দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

BanglaBook.org

থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে না ফিরেই সত্য বললেন, 'বেশ তো! আপনি যখন এত দ্রুত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন—তা হলে আর আমাকে দরকার কী? বেস্ট অফ লাক।'

বলতে-বলতে সাঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন সত্য। হেসে বললেন, 'মধুকর। জেরা শেষ হল?'

রোগা, কৃষ্ণকায়া মহিলাটি বোধহয় দক্ষিণ দেশের। স্কার্ট-ব্লাউজ সমেত কাঁপছিল সাঠের জেরার ঠেলায়।

সাঠে ঘুরে সত্যকে দেখে বললেন, 'লাশ দেখবে নাকি?'

প্রায় 'না' বলতে যাচ্ছিলেন, বাঁ-দিকের কাঁধের কাছে ফিসফিস গলা শুনতে পেলেন সত্য। 'স্যার, যা-যা জানতে চাইবেন সব বলব—প্লিজ!'

বলতে-বলতে জয়দীপ আবার দু-হাতে সত্যর বাঁ-হাত আঁকড়ে ধরেছে।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে সত্যসাধন মধুকরকে জিগ্যেস করলেন, 'সে কী? লাশ এখনও নিয়ে যায়নি?'

সাঠে বললেন, 'আর বোলো না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে, ফোন করেছি। এখনও ফিঙ্গার-প্রিন্ট-ওয়ালা এসে পৌঁছোল না। রাস্তায় জ্যামে আটকেছে বোধহয়।'

'কোন ঘরে?'

হকচকিয়ে গেলেন সাঠে সত্যর প্রশ্নে, 'কে?'

'লাশ।'

'ও।' বলেই নিজেকে সামলালেন মধুকর। তারপর, চালাক ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে জয়দীপের দিকে ইশারা করলেন, 'কোথায় আবার! তোমার মক্কেলের ক্যাবিনে।'

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন পুলিশসায়েব। হলঘর পেরিয়ে, রিসেপশন ছাড়িয়ে অন্য দিকের উইঙ্গে চলে এলেন দু-জনে। হাঁটতে-হাঁটতে সাঠে বললেন, 'সব জেরা প্রায় হয়ে গেছে, সাধনকর। তিন-চারজন সন্দেহভাজন।'

'কে কে?'

সত্যর জিজ্ঞাসায় দাঁড়িয়ে পড়লেন সাঠে। দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললেন, 'উঁহু! আমি বলব না। তুমি নিজে খেটে জেনে নাও। তবে, অই রয় হ্যাজ টু বি দ্য কালপ্রিট। খুনের মোটিভ দেখলে—ওর ছাড়া আর কারও কোনও লাভ নেই।'

বলতে-বলতে 'কনফারেন্স-রুম' লেখা দরজার সামনের ফাঁকা চওড়া করিডোরে এসে পৌঁছলেন দু-জনে। দু-দিকে তিনটে দরজা। সামনে দাঁড়ানো কনস্টেবল সেলাম ঠুকল সাঠেকে দেখে। সাঠে ওকেই বললেন, 'ইয়ে সাহাবকো লাশ দিখা দো। হেলপ করো। আর কেউ যেন না ঢোকে, খেয়াল রেখো।' সাঠেকে 'থ্যাংক ইউ' বলে ঘরে ঢুকলেন সত্যসাধন। আপিস ক্যাবিন হিসেবে শ-বাই-বারো বেশ ভালো সাইজ বলা চলে। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ও-পাশে গদিমোড়া সোফা। তাতে কোট ঝুলছে। কোটটি অবশ্যই জয়দীপের। টেবিলের এ-পাশে পিছন ফিরে আছে তিনটে একই রকম সোফা। মধ্যিখানের সোফায় বসে আছে একজন দোহারা মানুষ। যেন বাঁ-দিকে ঘাড় হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁ-হাতটা সোফার হাতলের বাইরে ঝুলছে। পিছন থেকে লোকটির টাকের হালকা চুল দেখা যাচ্ছে। ওর সামনে টেবিলে একটি খালি ডিশ। কাগজপত্র, ফাইল, টেলিফোন, কলম—সব পরিষ্কারভাবে সাজানো টেবিলে। ল্যামিনেট করা ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফ। এটার কথাই মাদল বলছিল।

একটু এগিয়ে, সামনে থেকে মৃতদেহটি দেখলেন সত্যসাধন। মুখে কালচে ছোপ। গোলগাল মুখটিতে মোটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। গোঁফ এবং ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে চিবুকে শুকিয়ে গেছে।

কোলের ওপরে-রাখা ডানহাতের কাপটি কাত হয়ে বোধহয় কফি গড়িয়ে পড়ে গেছে

BanglaBook.org

বেশিরভাগ। সামান্য গাঢ় কফি এখনও রয়েছে কাপে। বুক-খোলা কোট, সাদা জামা ও হালকা রংয়ের ট্রাউজারে কফির দাগ শুকিয়ে এসেছে প্রায়।

ঘরের চারদিকে দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন সত্য। টেবিলের পিছনে দেওয়ালে নানান কোম্পানির প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন, চার্ট টাঙানো। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে তিনজন বসবার মতো সোফা, একটি গদিমোড়া চেয়ার। মাঝখানে টি-টেবিল। অন্য পাশে দেওয়াল আলমারির গায়ে চা-কফি তৈরির জন্যে গরম জল বানাবার যন্ত্র। আলমারির একটি খোলা পাট দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ভেতরকার কাপ-ডিশ, চামচ, চিনির কৌটো, গুঁড়ো দুধ, টি-ব্যাগ এবং নেসকাফের কৌটো।

সত্যসাধন বাইরের সেপাইকে একবার দেখে নিয়ে জয়দীপের কোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এক পকেট থেকে বেরোল সিগারেট-লাইটার। অন্য পকেটে মাথা ধরার ট্যাবলেট, তিন টুকরো কাগজ ভাঁজ করা। শ্রীমতী মনোরমা রায়ের ওষুধের প্রেসক্রিপশন, বিল। আর একটা সাদা চিরকুটে ছোট্ট নোট লেখা ইংরাজিতে। 'গোদরেজের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা রাজি। বাবার সঙ্গে আমি কাল মর্নিংফ্লাইটে পুনা যাচ্ছি। ডাইরেক্টরদের মিটিং আছে। তুমি শনিবার আসছ তো? দেখা হবে। লক্ষ্মীটি, এসো কিন্তু। রাগ কোরো না। এস-কে।'

চিরকুটটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে, বাকি সব যথাস্থানে রেখে দিল সত্য। না! মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নেই। একমাত্র মৃতদেহটি ছাড়া সাদা চোখে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেরিয়ে আসছিলেন ঘর থেকে, হঠাৎ লম্বা সোফার পায়ার কাছে দেখলেন, কী একটা চকচক করছে। ঝুঁকে আলগোছে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখলেন। সিগারেটের প্যাকেটের ভেতরে যেমন রুপোলি রাংতা থাকে—ঠিক সেই জিনিস। কে যেন দুমড়ে গোল্লা পাকিয়ে ফেলেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে জড়িয়ে নিয়ে বস্তুটা ফের পকেটে চালান করে দিলেন সত্য।

অন্য উইঙ্গ থেকে সাঠের হাঁক-ডাক এগিয়ে আসছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন সত্য।

'এই যে, সাধনকর! এতক্ষণে এসেছে শর্মা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওস্তাদ বলে কি আর বম্বের আপিসটাইমের জ্যাম ওকে ছেড়ে কথা বলবে? যা বলেছিলুম।'

বলতে-বলতে শর্মা ও তার ফোটোগ্রাফারকে জয়দীপের ক্যাবিনে নিয়ে এলেন মধুকর। বললেন, 'লেগে যান—লেগে যান। তাড়াতাড়ি করুন। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।'

সত্যর দিকে ঘুরে বললেন, 'কী? লাশ দেখা হল।'

সত্য কী একটা ভাবছিলেন, গাল টেনে হেসে জবাব দিলেন, 'হুঁ।'

'ডেথের কারণ কী' মুচকি হেসে ভুরু নাচালেন সাঠে।

'বিষক্রিয়া মনে হয়।'

'মনে হয় কী হে! আলবাত পয়জনিং। এত বড় কোম্পানির দু-নম্বর ব্যক্তি জয়দীপ, এক নম্বর মিস্টার জোশীকে নিজের খোপে ডেকে আদর করে কফি খাইয়েছে। দু-ফোঁটা বিষ কফির সঙ্গে। ব্যস। ডেথ এন্টারড পুত্তর যোশী'জ বডি উইথআউট নয়েজ—অ্যান্ড, হাইলেন্টলি সাইলেন্সড হিম ফর এভার। নো মারামারি, নো রক্তক্ষয়।'

'দু-ফোঁটা বিষই যে ছিল, তা তো নয়, মধুকর। এ-ঘরে এখনও এত বিষ আছে, যাতে এই আপিস কেন, গোটা দালানের সব আপিসের লোকদের মেরে ফেলা যায়।'

ভুরু কুঁচকে সাঠের প্রশ্ন, প্রায় হোঁচট খেতে খেতে 'এখন, বিষ—এ-ঘরে—মানে—ইয়ে, কোথায়?'

'আলমারিতে রাখা চিনি, দুধের গুঁড়ো বা নেসকাফের কৌটোয় ভরতি। মনে হয়, কফিতেই কারণ, কফির গুঁড়ো সামান্য দলা পাকিয়ে গেছে। স্রেফ হাওয়া লেগে দলা পাকিয়ে গেলে, এত বড় কোম্পানির দু-নম্বরের ক্যাবিনে নিশ্চয়ই তাজা নেসকাফের নতুন কৌটো এসে যেত। তাই না!'

BanglaBook.org

॥ পাঁচ ॥

সত্যসাধনের বাঁ-দিকের বুক পকেটে 'সোনি-পকেট-টেপ-রেকর্ডার'। চেয়ারে বসতে-বসতে ডটপেনটা ছুঁয়ে দেখার কায়দায় টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিলেন। একই সঙ্গে প্রথম প্রশ্ন করার ফলে, 'খুট' শব্দটা চাপা পড়ে গেল।

'মিস্টার জোশী, যাঁকে খুন করা হয়েছে, তিনি কি বোম্বাই ব্রাঞ্চের ডাইরেক্টর, জয়দীপবাবু?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'অ্যাডমার্কেটের হেডঅফিস কোথায়?'

'পুনাতে।'

'আর কোথায়-কোথায় ব্রাঞ্চ আছে?'

'কলকাতা-দিল্লি-ব্যাঙ্গালোর।'

অ্যাডমার্কেটের মতো বিশাল কোম্পানির এসব খবর সত্যর জানা। তবু সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে, কথা বলতে-বলতে বিপর্যস্ত মানুষ কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সত্যসাধন লক্ষ করলেন, কাজ হচ্ছে। জয়দীপের অসাব্যস্ত মুখচোখ সমূহ দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল। পালটাচ্ছে। গলার স্বরও স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

জয়দীপের ঘরে বসেছেন দুজনে। লম্বা সোফায় সত্যসাধন। টি-টেবলের উলটোদিকে জয়দীপ।

সত্য বললেন, 'মিস্টার জোশি আপনার ক্যাবিনে কখন এসেছেন?'

'আমি জানি না। ছিলাম না।'

'কখন বেরিয়েছেন?'

'তা, এই সাড়ে তিনটে-চারটে হবে।'

'কোথায় গিয়েছিলেন? আপিসের বাইরে?'

'না। কনফারেন্স রুমে। অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভদের সঙ্গে মিটিং ছিল।'

মিটিং শেষ হল ক'টায়?'

একটু ভাবল জয়দীপ। ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা নাগাদ।'

'তারপর ক্যাবিনে ফিরে দেখলেন, যে—'

জয়দীপ বাধা দিল। 'না। তারপর, আমি সোজা ডিজাইন স্টুডিওতে গেছি। সাবানের একটা ক্যাম্পেন চেক করতে।'

'মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করে?'

'আমার সেক্রেটারি। মিস সালডানা।'

'আপনি কখন দেখেছেন ডেডবডি?'

'চিৎকার চেঁচামেচি শুনে, আমি ছুটে আসি এদিকে।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'তা তো খেয়াল করিনি, স্যার। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। আমি, ছ'টার একটু পরেই হবে।'

'ঘরে ঢুকে কী দেখলেন?'

মিস্টার জোশী ডেড। জুলি, মানে মিস সালডানা দুহাতে মুখ ঢেকে আপনার ওই সোফায় বসে পড়েছে।'

'আর কী দেখলেন?'

ভাবতে হল জয়দীপকে সামান্য সময়। তারপর যেন ভেবে-ভেবে বলতে লাগল, 'দরজার ভেতরে ঢুকে পড়েছে দত্তারাম।'

'কে?'

BanglaBook.org

'আমার খাস বেয়ারা।'

'হুঁ। আর কী দেখলেন।'

'দরজা খুলে অনেকগুলো মুখ উঁকি মারছে ভেতরে। সকলের চোখেই আতঙ্ক।'

এক মুহূর্তে চুপ থেকে সত্য বললেন, 'তা হলে এখন তো আপনিই ব্রাঞ্চ-ডাইরেক্টর, কী বলেন?'

প্রথমে যেন কথাটা ধরতেই পারল না জয়দীপ। সঙ্গে-সঙ্গে, প্রায় শক খাওয়ার মতো আঁতকে উঠল। ভয়ার্ত চোখে চেয়ে বললেন, 'না, না, বিশ্বাস করুন। আমি কিচ্ছু জানি না।'

তারপরেই অনুনয়ের গলায়, করুণ মুখে বলল, 'পুলিশ-ইন্সপেক্টরও ওই জাতীয় নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলছিল। আপনি অন্তত—'

বলতে-বলতে ঝুঁকে পড়ে সত্যর হাত ধরে ফেলল জয়দীপ।

আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সত্য বললেন, 'ঠিক আছে। সময়ে সত্য বেরোবেই। তবে প্রথম সন্দেহ তো লোকে আপনাকেই করবে! কী? ঠিক বলছি কি না?'

'কিন্তু আমি, মানে আমার—কী আশ্চর্য! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, স্যার। আপনি আমাকে এই বিচ্ছিরি ঝামেলা থেকে উদ্ধার করুন! আপনিই পারবেন।—'

সহসা গম্ভীর গলায় সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'আপনার ভাই কার কাছে গেছে?'

চমকে উঠেই, সামলে নিল জয়দীপ আস্তে-আস্তে বলল, 'এ প্রসঙ্গে, কাল বা পরে কথা বললে হয় না সত্যবাবু? আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর, আপনি বিশ্বাস করুন, মিস্টার জোশীর মার্ডারের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।'

পাথরের মতো চোখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছেন সত্যসাধন। জয়দীপ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনেও ঘামতে শুরু করেছে। আমতা-আমতা করে যেন, শেষ খড়কুটো আঁকড়াবার চেষ্টায় বলল, 'তা ছাড়া, ওরা সবাই বাইরে আপনার অনুমতির অপেক্ষায়—'

হ্যাঁ। এটা ন্যায্য কথা।

বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সাঠে সত্যকে আলাদা ডেকে বলেছিলেন, 'ভাউসায়েব, সাধনকর! তুমি কি অই রায়ের হয়ে কেস তদন্ত করতে চাও?'

'এখনও ঠিক করিনি। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করব।'

'তা হলে, ওকে লকআপে নিয়ে যাব নাকি? এক রাত্তির একটু ঠান্ডাগরম দিলেই স্বীকারোক্তি বেরিয়ে যাবে।—'

সত্য তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলেন ওকে, 'না-না, তা তুমি পারো না। হাতেনাতে খুনি ধরতে পারলে আলাদা কথা। তা ছাড়া, তুমি নিজেই বলছ, চার-পাঁচজন সন্দেহভাজন।'

'বেশ। তুমি কি আলাদা কথা বলবে ওদের সঙ্গে? না, আমার এফ-আই-আর-এ জবানবন্দি দেখে নেবে?'

সত্য হেসে বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই। তুমি এগোও। আমি বরং একবার ঝালিয়ে দেখি এদের।'

প্রথমে একখানা বিদ্রূপের হাসি দিয়েছিলেন সাঠে। তারপর মুখ বেঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে তিন-চার দিকে শূন্যে দু-হাতের খোঁচা মেরে বলেছিলেন, 'ওহ্ হো-হো! তুমি তো আবার নানান দিকে খোঁচা মেরে, ফুঁ দিয়ে সূত্র বের করবার ব্যাপারে এ-রাজ্যে বিখ্যাত!'—দম নিয়ে কথা শেষ করেছিলেন সাঠে, 'ওপরে দুজন, নীচে একজন সেপাই রইল। ওদের বলে যাচ্ছি। দরকার হলে কাজে লাগিও ওদের—'

অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হয় এইসব সময়ে। হুড়মুড়িয়ে একইসঙ্গে সবগুলি বেরিয়ে আসতে চায়। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন সত্যসাধন। মনে-মনে গুছিয়ে ফেলেছেন সব। প্রত্যহ উষাকালে

BanglaBook.org

প্রাণায়াম, কার্টার রোডে জগিং এবং নিত্য যোগব্যায়ামের ফলে অতি দ্রুত এই ব্যাপারটি করে ফেলতে পারেন সত্য।

জয়দীপকে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি বাইরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন। যাওয়ার আগে স্রেফ তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। পুলিশে খবর দিয়েছে কে?'

'অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর হরবিলাস চওধরি।'

'আপনার ক্যাবিনে আজ শেষ কখন আপনি চা বা কফি খেয়েছেন।'

'লাঞ্চের পর আড়াইটে নাগাদ কফি খেয়েছি।'

'নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন, না, অন্য কেউ?'

'আমার খাস বেয়ারা দত্তারাম বানিয়ে দিয়েছে।'

'যান হরবিলাসবাবুকে পাঠিয়ে দিন। আপনি আবার চলে যাবেন না যেন।'

ধীরে-ধীরে, ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল জয়দীপ।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুত বেগে দরজা ঠেলে যে লোকটি ঢুকল, তার বয়েস সত্যসাধনের কাছেপিঠে। শক্ত চেহারায় চৌকো কঠিন মুখ। মুখে মোটা গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। টকটক করছে রং। কোঁচকানো ভুরু এবং ঘাড়ের ভঙ্গিতে সদাউদ্ধত ভাব।

ক্যাবিনে ঢুকেই, প্রায় আক্রমণের ধরণে সত্যকে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'ইয়েস, নাউ হোয়াট?'

সত্য শান্ত গলায় ভদ্রভাবে বললেন, 'বসুন, মিস্টার চওধরি।'

'বাট, হু আর ইউ? আপ কউন হ্যায়? আপনি আমাদের আটকে রাখার কে?'

লোকটার গলাবাজিতে বিরক্ত হলেও সত্য ঠান্ডা গলায় বললেন, মুখে হাসি মাখিয়ে, 'আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'পুলিশের লোক চলে গেছে সব মিটিয়ে। আপনি আবার কোত্থেকে টিকটিকিগিরি ফলিয়ে ঝামেলা বাড়াতে এসেছেন! অ্যাঁ? আমি আপনার কোনও কোয়েশ্চেনের জবাব দিতে রাজি নই। আমি চললাম—'

বসেই ছিলেন সত্য। বসে-বসে বললেন, 'সবাইকে ইনস্পেক্টর সাঠে বলে গেছেন, আমার সঙ্গে কোঅপারেট করতে। আপনি শোনেননি নাকি?' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল চওধরি। সেই অবস্থাতেই, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিল, 'না। শুনিনি। দারোগা যখন লাশ নিয়ে গেছে, আমি টয়লেটে ছিলাম। গুড নাইট—'

দরজা টেনে খুলে এক পা বাড়িয়েছিল লোকটা। সত্যর রাশভারি গলা গর্জে উঠল, 'মিস্টার জোশী ইজ ডেড। মার্ডার-সাসপেক্ট জয়দীপ রায়ের জেল হতে পারে। তা হলে তো কোনও বাধা নেই আপনার—আপনিই তো অ্যাডমার্কেটের বম্বে-ডাইরেক্টর। কী বলেন?'

'হো-হোয়াট? তা-তার মানে?'

স্প্রিংয়ের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে চওধরি।

সত্য গলা আবার যথারীতি শান্ত করে বললেন, 'মানে ঠিক তাই। সেটা আপনার মাস্টারপ্ল্যান হলেও অবাক হবে না পুলিশ। তা ছাড়া, যে কোনও একটা কনস্টেবলকে বললে, আপনার ঘাড় ধরে এক্ষুনি আপনাকে থানা লকআপে নিয়ে গিয়ে রাতটুকু অন্তত ন্যাবড়া তরকারি খেতে সাধাসাধি করবে। কী? বসবেন, না গুড নাইট করে চলে যাবেন?'

ততক্ষণে মূর্তি একেবারে পালটে গেছে লোকটার। সোজা ঘাড়ের মুন্ডু হেলে পড়েছে। ভুরু টানটান। চৌকো মুখ ঝুলন্ত। গুটি-গুটি ফিরে এসে, ধপ করে বসে পড়ল সত্যসাধনের মুখোমুখি।

মিটিমিটি হাসছিলেন সত্য। বললেন, 'সময় নষ্ট না করে, তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারবেন।'

বিড়বিড় করে চওধরি বলল, 'সরি, স্যার। এতটা ভেবে দেখিনি। বলুন, কী জানতে চান?'

BanglaBook.org

এতক্ষণে সত্য পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বের করেছেন। খুলে, চওধরির দিকে এগিয়ে ধরলেন। মাথা নেড়ে হরবিলাস বলল, 'থ্যাংক ইউ। আমার অন্য ব্র্যান্ড। এটা খেলে কাশি হয়।'

'কোন ব্র্যান্ড আপনার?'

'বেনসন হেজেস।'

সত্য সিগারেট ধরাতে-ধরাতে জানতে চাইলেন, 'মদ কি আপনি রোজ খান?'

'অ্যাঁ?' মাথা নীচু করে কী ভাবছিল চওধরি। প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, 'ইয়েস—না, মানে, আপনাকে কে বলল?'

'আপনার চোখের কোল। বেশ ফোলাফোলা। তা ছাড়া, প্রচুর অ্যালকোহল খেলে ফরসা ভারতীয় অনেককেই গোলাপি রঙের দেখায়। সে কথা যাক। মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপনার বনিবনা কী রকম? হাউ ইজ হি?'

'হি ইজ এ বাস্ট—'

গালাগালিটা মাঝপথে থামিয়ে দিল হরবিলাস। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কথা শুরু করার ফলেই বোধহয় ওর শ্বাসের সঙ্গে অ্যালকোহলের গন্ধ পেলেন সত্যসাধন।

সামলে নিয়ে চওধরি কথা শেষ করল, 'খোদ বড়কত্তা, মানে, মালিকের চামচাগিরি করে যথেষ্ট। আমার নামে লাগায়। তবে, হ্যাঁ, নিজের কাজটা বোঝে। তার চেয়ে বেশি বোঝে—কী করে মালিকের মেয়েকে পটাতে হয়।'

গড়গড়িয়ে বলতে-বলতে ব্রেক কষে থেমে গেল হরবিলাস। সত্য অপেক্ষা করলেন, যদি আরও কিছু বলে। না। থেমেছে। তখন সত্য জিগ্যেস করলেন, 'মালিক অর্থাৎ কোম্পানির চেয়ারম্যানের নাম কী?'

'কোরগাঁওকর।'

'পুনাতেই থাকেন?'

'হুঁ।'

'জোশীর সঙ্গে আপনার রিলেশান কী রকম ছিল?'

'মোটামুটি।'

'আজ শেষ কখন দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে?'

'লাঞ্চের আগে। এই বারোটা-সাড়ে বারোটায়।'

'বিকেল চারটে থেকে কোথায় ছিলেন?'

'আমার ক্যাবিনে।'

'আপনি চা বেশি পছন্দ করেন, না, কফি?'

একটু ভেবে নিয়ে চওধরির জবাব, 'যে কোনও একটা হলেই হয়।'

'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

হরবিলাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। বাড়ি যেতে পারি তো?'

'হ্যাঁ, তা পারেন। তবে, পুলিশকে না জানিয়ে শহর ছেড়ে যাবেন না।'

দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে সত্য ওকে বললেন, 'জয়দীপ রায়ের খাস বেয়ারা দত্তারামকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

মহিলা দুজনের কথা ভেবে সঙ্গে-সঙ্গে মত পরিবর্তন করলেন—রাত হয়ে যাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া দরকার।

'না। আপনি বরং মিস সালডানাকে আসতে বলুন।'

জয়দীপের পার্সোনাল সেক্রেটারি জুলি সালডানা ঘরে ঢুকতেই সত্য উঠে দাঁড়ালেন, 'প্লিজ

BanglaBook.org

কাম ইন। সিট ডাউন।'

দু-জনে মুখোমুখি বসলেন। জুলিকে দেখতে বেশ সুশ্রী। ঠোঁট, চিবুক, চোখ ভুরুসমেত পানপাতা মুখটি বেশ যত্ন নিয়ে বানানো। রং একটু চাপা হলেও, জেল্লা আছে। আঁটোসাঁটো তন্বী, প্রায় পঁচিশের মেয়েটির শরীরে এখন অবিশ্যি একটা আলগা ক্লান্তির ছাপ।

একটুক্ষণ মাথা নীচু করে যেন, নিজেকে সংযত করল জুলি। তারপর ডাগর চোখ তুলে সত্যর দিকে চেয়ে রইল। সত্য বললেন, 'মিস্টার জোশী ক'টা নাগাদ আপনার বসের ক্যাবিনে ঢুকেছিলেন?'

'তখন চারটে হবে।'

'ভেতরে কেউ ছিল?'

'আমি ছিলাম।'

'জয়দীপ তো তখন ছিল না। আপনি কী করছিলেন ভেতরে?'

'একটা ফাইল খুঁজছিলাম।'

'জোশীর সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, উনি জিগ্যেস করেছিলেন স্যার কোথায়? বললুম কনফারেন্স রুমে। উনি চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, ঠিক আছে, আমি বসছি। স্যারকে খবর দেব কি না জানতে চাইলে বলেছিলেন, না, দরকার নেই। তারপর আমি বেরিয়ে এসে নিজের টেবিলে বসি।'

'জয়দীপ রায়কে চা-কফি কি আপনি বানিয়ে দ্যান? না, ও নিজেই করে নেয়?'

'কখনও স্যার নিজেই করেন, কখনও আমি বানিয়ে দিই। দত্তারাম বা শিবালকরও বানিয়ে দেয় কখনও-সখনও।'

'শিবালকর কে?'

'মিস্টার জোশীর খাস বেয়ারা।'

'জোশীর সঙ্গে রায়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল।'

'হট অ্যান্ড কোল্ড!'

'ঝগড়াঝাঁটি?'

'মাঝে-মধ্যে চেঁচামেচি হত।'

'কী নিয়ে?'

'বেশির ভাগই ক্লায়েন্ট নিয়ে। জোশী বোধহয় ভাবতেন যে স্যার চেয়ারম্যানের কাছে ওঁর এগেনস্টে কথা বলেন—সেই নিয়েও।'

'জোশী মানুষ কেমন ছিলেন?'

'আমার সঙ্গে তো সরাসরি বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবে, এমনিতে সকলের সঙ্গে বেশ ভালো। তবে, বড় রগচটা। যখন-তখন যাকে-তাকে বলতে শুনেছি—আই ডিড স্যাক ইউ—'

'বিশেষ করে কারুর প্রতি রাগ ছিল কি?'

'না। কোনও বাছবিচার থাকত না রেগে গেলে। এই তো আজ সকালেই তো—'

বলে, হঠাৎ থেমে গেল জুলি।

'আজ সকালে—কী?'

'মানে স্যারকে বলছিলেন—ড্যাম ইট, আই'লকিল ইউ—'

'কোথায়? এই ঘরে?'

'উঁহু! মিস্টার জোশীর ক্যাবিনে।'

'হুঁ।' একটু ভেবে নিয়ে সত্য অন্য প্রশ্নে গেলেন, 'মৃতদেহ আপনিই প্রথম দেখেন, মিস সালডানা?'

BanglaBook.org

'ইয়েস স্যার।'

অর্থাৎ, জীবিত মিস্টার জোশীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আপনার।'

'আজ্ঞে।'

'মৃতদেহও প্রথম আপনিই আবিষ্কার করেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

জুলির চোখমুখে আবার আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠল। বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে।

সত্য মৃদু হেসে বললেন, 'না-না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো, স্রেফ কোইন্সিডেন্স—মানে, কাকতালীয়। আচ্ছা। লাঞ্চের পরে জোশী ক্যাবিনে ঢোকার আগে, কে-কে ক্যাবিনে ঢুকেছিল?'

'দত্তারাম, শিবালকর ছাড়া মিস লাখানি। ও হ্যাঁ, তা ছাড়াও দেশলাই খুঁজতে মিস্টার চওধরি।'

'জোশীকে কফি কে বানিয়ে দিয়েছে? আপনি?'

'নো, স্যার।'

আরও দু-একটা সাধারণ কথাবার্তার পরে জুলিকে ছেড়ে দিলেন সত্যসাধন। উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল জুলি, সত্য হেসে বললেন, 'আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন ও আগাম বেস্ট-অফ-লাক।'

'জুলি অবাক, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। কিন্তু, কী জন্যে?'

'শিগগিরই বিয়ে করছেন তো?'

লজ্জায় এক মুহূর্ত অধোবদন জুলি সালডানা। তারপরেই মুখ তুলে জিগ্যেস করলে, 'স্যার মানে, ইয়ে—আপনাকে কে বলল? অফিসের কেউ তো জানে না এখনও।'

'ভেরি সিম্পল, মিস সালডানা। আপনার হাতের আংটি। 'এন' অক্ষরটি খোদাই করা। অথচ, ওটি আপনার নামের আদ্যাক্ষর নয়। মানে, এনগেজমেন্ট বা আশীর্বাদ হয়ে গেছে আপনার।'

দ্বিতীয় মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছে। ঢুকতেই সত্য বুঝলেন চুলে কলপ করেন। মুখে পুরু মেকআপ। দোহারা শিথিল গঠনকে চাপা সালোয়ারকামিজে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

ওঁকে বসতে বলে, নাম জানতে চাইলেন সত্য।

'মিস মীরা লাখানি।'

'এখানে কদ্দিন চাকরি করছেন?'

লাখানি মনে-মনে হিসেব করে বললেন, 'সাত বছর চার মাস।'

'এই ক্যাবিনে আজ ক'বার এসেছেন আপনি?'

'অ্যাঁ? একবার।'

'কখন?'

'ঠিক খেয়াল নেই। দেড়টা-দুটো।'

'কেন?'

'ইয়ে, ওই টি-ব্যাগ! স্যার, মানে, মিস্টার জোশীর টি-ব্যাগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই নিতে এসেছিলুম।'

'জয়দীপ তখন ছিল কামরায়?'

'না-না। না তো।'

'মিস্টার জোশী কি খুব চা খেতেন?'

'চা-কফি দুটোই।'

'দিনে ক'বার?'

'অন্তত দশ-বারো কাপ।'

হঠাৎ সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনি সিগারেট খান?'

'অ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে।'

BanglaBook.org

'কোন ব্র্যান্ড?'

'উইলস!'

'একটা খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

কোলে রাখা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লাল উইলসের প্যাকেট বের করলেন লাখানি। খুলে এগিয়ে ধরলেন। হাত সামান্য কাঁপছে মহিলার। সত্য বললেন, 'একটাই আছে!'

'তাতে কী! খান না, স্যার! খান!'

সিগারেট বের করে খালি প্যাকেটটা টেবিলে রাখলেন সত্য। ধরিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। আপনি যেতে পারেন। বেয়ারাকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

মীরা লাখানি বেরিয়ে যেতেই দ্রুত সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেললেন সত্যসাধন।

ঠিক তক্ষুনি, বাইরে একটা কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা গেল। পুরুষকণ্ঠে হাঁউ-মাঁউ গোছের অস্ফুট চিৎকার ভেসে এল শীততাপনিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনে।

॥ ছয় ॥

পকেটের টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন সত্য। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল এক বিচিত্র এবং করুণ দৃশ্য। বেয়ারা দুজন একেবারে ভেঙে পড়েছে। কে যে কোনজন, কার কী নাম তখনও জানেন না সত্য।

দুজনেরই জলপাই সবুজ উর্দি পরনে। কালো মতন কমবয়েসিটি জয়দীপের হাঁটু ধরে হাঁউমাঁউ চেঁচাচ্ছে মারাঠি ভাষায়, 'মালা কায় মাইতি নাহি, সাহেব! বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন—'

বাকি কথা ধরা যাচ্ছে না।

অন্যটি বয়স্ক, রোগা। লেবড়ে বসে পড়েছে কার্পেটে। সেপাইয়ের পা জাপটে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কনস্টেবল তার পা ঝটকা দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

সত্যসাধনকে দেখেই দুজনের বাকরোধ হয়ে গেল। জয়দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সত্য জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? কান্নাকাটি কীসের?'

জয়দীপ সামান্য হাসার বৃথা চেষ্টা করল। বলল, 'কিছুই না। ওরা দুজনে অন্যদের মতোই ভয় পেয়েছে। তার ওপরে, ইন্সপেক্টর জবানবন্দি নেওয়ার সময় হাজতে পুরে দেবেন বলে দাবড়ানি দিয়েছেন। লাঠি দিয়ে আলতো খোঁচাও মেরেছেন দত্তাকে। তাই একটু টেরিবাজেড—'

সেপাইকে ইশারায় ভেতরে আসতে বলে, সত্য বয়স্কটিকে উদ্দেশ করে বললেন—'ভয় নেই। আমি মারব না। হাজতেও পুরব না। স্রেফ কয়েকটা কথা জিগ্যেস করে ছেড়ে দেব। এসো।'

বলে, আবার ক্যাবিনে ঢুকলেন সত্যসাধন। ঢুকে, রেকর্ডার 'অন' করে দিলেন। গুটি-গুটি দরজা ঠেলে এসে ঢুকল বয়স্ক। সে তখনও ফোঁপাচ্ছে। ঝাঁটা গোঁফ। কুতকুতে গোল-গোল চোখদুটির চারপাশে কালো বৃত্ত। মাথার টাক দেখে মৃত জোশীকে মনে পড়ল সত্যর। জোশীর মাথায়ও ঠিক এমনি টাক। জিগ্যেস করলেন—'তুমি কি জোশীসায়েবের পিওন? শিবালকর?'

'হো, সাহেব।' নাক টেনে জবাব দিল লোকটা।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে?'

হাত জোড় করে শিবালকর জানাল, 'আজ্ঞে মুম্বাইতে ন'মাস।'

'তার আগে কোথায় ছিলে?'

BanglaBook.org

'পুনা হেড অফিসে।'

'কী করতে?'

'মালিক-সাহেবের খাস-পিওন ছিলাম।'

'ক'বছর?'

'এগারো বছর।'

'সায়েবের ছেলেমেয়ে ক'টি?'

'একই মেয়ে—শকুন্তলা মেমসাব।'

'রয়-সায়েবের ঘরে ক'বার গিয়েছিলে আজ?'

'একবার। সকালে।'

'কী কাজে?'

'জোশী সাবের চিঠি সই করিয়ে আনতে।'

ধমকে উঠলেন সত্যসাধন, 'বিকেলে যাওনি?'

থতমত খেয়ে, আবার কাঁদো-কাঁদো মুখ হল শিবালকরের, 'আজ্ঞে না—মানে, হ্যাঁ। তবে, রয়-সায়েব তো ছিলেন না।'

আবার ধমক, 'তাই ভেতরে ঢুকেছিলে?'

'আজ্ঞে—না—'

বলেই ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সত্যর হাঁটুর কাছে, 'কিছু জানি না, সায়েব। আমি নির্দোষ।'

পা সরিয়ে নিয়ে কড়া গলায় সত্য বললেন, 'একেবারে উঠে দাঁড়াও। সোজা হয়ে।'

কাঁপতে-কাঁপতে আদেশ পালন করল শিবালকর।

সত্য ফের নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, 'ভেতরে ঢুকেছিলে কেন? সত্যি কথা বলো।'

'ঠোঁট চেটে ঢোঁক গিলছে শিবালকর। হাত কচলাতে কচলাতে শব্দ খুঁজছে যেন। সত্য বললেন, 'শিগগির বলো। পুলিশ ডাকব নইলে—'

বেয়ারার মুখ থেকে বুলেটের মতো ছিটকে বেরুল, 'শাকর—'

সত্য অবাক হলেন একটু, 'চিনি? মানে?'

নাকিসুরে কান্নার গলায় জবাব, 'চিনি খেতে ঢুকেছিলুম—সাব—' বলতে বলতে আবার হুমড়ি খেতে যাচ্ছিল লোকটা, 'রয়-সায়েবকে বলবেন না, বাবুজি। আমার চাকরি—'

বাধা দিলেন সত্য। 'ঠিক আছে—ঠিক আছে—। তার মানে তুমি চিনি চুরি করো?

'এক চামচ। রোজ নয়, সাহাব। মাঝে-মধ্যে।' —হঠাৎ কান মলে কথা শেষ করল শিবালকর, 'আর কোনও দিন যাব না, সায়েব—'

মধ্যবয়স্ক একটা মানুষকে হাজতের ভয়ে প্রায় বাঁদরের মতো অঙ্গভঙ্গি করতে দেখে সত্যর প্রথমে সামান্য হাসি পেল। সঙ্গে-সঙ্গে হল রাগ। সে রিপুকেও দমন করতে কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে গেলেন। প্রত্যেকেই কমবেশি অ্যাক্টিং করে গেল জবানবন্দি দেওয়ার সময়। এরটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো? হতেই পারে। হরবিলাস, মিস লাখানি, জয়দীপ—এরা কেউই বেয়ারাজাতীয় পোস্টের নয়। ওদের ব্যবহার এতটা 'লাউড' হওয়ার কথাও নয়। সুতরাং, অশিক্ষিত-অধস্তন বেয়ারার পক্ষে—এ-ধরনের 'অ্যাক্ট-করা', বা, আতঙ্কের এমন প্রকাশ অস্বাভাবিক নয় বোধহয়।

'জোশীকে এ-ঘরে কফি কে বানিয়ে দিয়েছে? তুমি?'

'না, সায়েব।'

আচমকা চাপা গলায় শিবালকরকে জিগ্যেস করলেন সত্য, 'একটা গোপন খবর দিতে পারো হে?'

BanglaBook.org

মুহূর্তে স্থির হয়ে, অল্প ঝুঁকে দাঁড়াল শিবালকর। জুলজুল চোখে ঔৎসুক্য এবং উদ্বেগ। গলা খাটো করে সে বলল, 'হো সায়েব, বোলা—'

'তোমাদের রয়-সায়েব কেমন লোক?'

জিভ কেটে এক-পা পিছিয়ে গেল শিবালকর, 'ছোট মুখে বড় কথা—না সাব, আমি কিছু বলতে পারব না—সাব।'

ওর মুখ দেখে কিন্তু সত্যর একটি কথাই মনে হল—'আর একবার সাধিলেই খাইব।' ফলে, আরও গলা নামিয়ে বললেন, 'আমি কাউকে বলব না, তুমি বলো।'

যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে, দরজা টেনে শিবালকর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। সত্যও ওকে দেখলেন। খসখসে আওয়াজে কথা বলল লোকটা, 'প্রায়ই জোশীসায়েবের সঙ্গে লেগে যায়। সেদিন তো প্রায় হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়—'

'কোথায়?' বাধা দিলেন সত্য।

'আমার সায়েবের ক্যাবিনে।'

'কী নিয়ে?

'তা, আমি, মুখ্যু মানুষ—আংরেজি তো বুঝি না—'

'হুঁ।' সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন সত্য।

'তা ছাড়া, রয়-সায়েবের সঙ্গে শকুন্তলা বাইয়ের—'

বলতে-বলতে থেমে গেল শিবালকর।

'হুঁ।' বলে ধরতাই দিলেন সত্য আবার।

'মানে, তাই নিয়ে জোশীজির সঙ্গে খটাখটি—'

'তোমার কী মনে হল, জয়দীপ রায় ওঁকে খুন করতে পারে?'

'আলবাত পারে, স্যার?'

'আর ওর বেয়ারা—?'

'ও-ও পারে। সায়েব!'

'কেন?'

'রয়-সাবের জন্যে ও জান দিতে পারে।'

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে অজস্র সুতো এসে জুটছে, আর জট পাকিয়ে যাচ্ছে সত্যসাধনের ভাবনায়। বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। রয়ের বেয়ারা—কী নাম যেন—পাঠিয়ে দাও।'

'দত্তারাম।' বলতে-বলতে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলে, খুশি-খুশি মুখে বেরিয়ে গেল শিবালকর।

কাঁচুমাচু মুখ করে দত্তারাম ঘরে ঢুকতেই সত্যসাধন দুম করে প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, 'কোন সিগারেট খাও তুমি?'

'জি?—ইয়ে,—গোল্ড, সায়েব!'

'কই, দেখি?'

বলে হাত বাড়ালেন সত্য।

দত্তার বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছে-পিঠে। মাথাভরতি চুল। ছোপাড়ে মুখ। ইউনিফর্মের পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে দত্তা বলল, 'নেই, স্যার। খতম হো গিয়া।'

তড়াক করে উঠে এগিয়ে এলেন সত্য। ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললেন, 'মিথ্যে কথা। তোমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানতে। হঠাৎ পকেট হাতড়ালে কেন? দেখি—'

বলে, বুশশার্টের সাইড-পকেট জোড়ায় হাত ঢোকালেন। ও কাঁদো-কাঁদো মিনমিনে সুরে বলে চলেছে, 'নেই সায়েব। খতম। সম্পলা—'

BanglaBook.org

'ততক্ষণে বুক-পকেট থেকে রুপোলি রাংতার মোড়ক বের করে ফেলেছেন সত্য। ওকে কোনও কথা না বলে, ফিরে এলেন সোফায়। দত্তারাম ডুকরে কেঁদে ফেলেছে এবার।

মোড়ক খুলতে একটা সিগারেট বেরোল। সাধারণ সিগারেট। গোল্ড। সত্য ওটার দিকে দেখতে-দেখতে জিগ্যেস করলেন, 'প্যাকেটটা কোথায়?'

কান্না চাপতেই বোধহয় দমকে-দমকে হেঁচকি তোলার কায়দায় জবাব দিল দত্তারাম 'ফেহ্-হে-হেলে দি-ই-য়েছি—'

'কেন?'

'এ-হে-হ্-হেমনি—'

'প্যাকেট ফেলে দিয়ে রাংতায় মুড়ে রেখেছ? ততক্ষণে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়েছে। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকতেই টের পেলেন সত্য। ভেতরকার তামাকের সঙ্গে হয় গাঁজা বা চরস মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে!

'কোথায় পেলে এটা?'

'প্যাকেটেই ছি-হি-হিল—'

এবার ধমক, 'সত্যি কথা বলো।' সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হল দত্তার, 'ওরলির অনেক পানওয়ালার কাছে চরস পাওয়া যায়। আমরা সিগারেটের তামাক বের করে, মিলিয়ে, ফের ভরে দিই।'

'আমরা মানে?'

'আমি, শিবা, গেটম্যান—'

'হুঁ। তা এ-ক্যাবিনে তুমি মোটামুটি দিনে ক'বার ঢোকো।'

'ঠিক নেই, সায়েব।' দম নিয়ে আবার বলল, 'আমার সায়েব যতবার ডাকেন।'

'আজ ক'বার ঢুকেছ মনে আছে?'

একটু ভেবে নিয়ে দত্তার জবাব, মাথা নেড়ে-নেড়ে, 'ঠিক মনে নেই, স্যার। ছ' সাতবার হবে।'

'তোমার সায়েব না থাকলে ঢোকো না?'

'না, সায়েব।'

ধমকে উঠলেন সত্য, 'আজ বিকেলে কেন ঢুকেছিলে?'

একটু থতমত খেয়েই, সামলে নিল দত্তা, বলল, জোশীসায়েব ডেকে ছিলেন। জল চাইতে। আমি জল দিয়ে, খালি গেলাস নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'যাওয়ার আগে কফি বানিয়ে দিয়েছিলে তো?'

'হাঁ, সাব—নেহি, সাব—কিন্তু, আমি কিছু জানি না—আমাকে ছেড়ে দিন, সাব—' বলতে-বলতে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল দত্তা। দু-হাতে মুখ ঢেকে হাঁউমাঁউ শব্দে কান্না মিশিয়ে কী বলতে লাগল বোঝা গেল না।

উঠে, কাছে গেলেন সত্য। হাত ধরে তুলে ওকে দাঁড় করালেন, 'ওই চরস-সিগারেট ক'টা খেয়েছ আজ, দত্তা?'

চোখ মুছে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'জানি না, স্যার—মনে নেই—আমায় ছেড়ে দিন, বাবুজি—'

'চোপ!'

ধমক খেয়ে দত্তা একেবারে বোবা।

'কফি ওকে তুমি বানিয়ে দিয়েছ?'

ভয়ার্ত চোখে মুণ্ডু নেড়ে দত্তা জানাল—হ্যাঁ।

BanglaBook.org

'তুমি কি জানতে কফির কৌটোয় বিষ মেশানো ছিল?'

মুখ বিকৃত করে, কান্না চাপতে-চাপতে, মাথা দুপাশে নাড়িয়ে জানাল—না।

গলার স্বর নামিয়ে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'কে মেশাতে পারে, বলো দিকি?'

ভয়ে-ভয়ে মাথা নেড়ে বোঝালো দত্তা—জানে না।

সত্য ফিসফিস করে, প্রায় ওর কানে-কানে বললেন, 'শিবালকর?'

মুহূর্তে দত্তার মুখের চেহারা পালটে গেল, 'হ্যাঁ, সায়েব! ও-ই তো! আপনি কী করে জানলেন? অথচ, দারোগা সায়েব ওকে ধরলই না।—'

'তুমি কী করে জানলে, বলো তো?'

'আহা! ও তো গুরু ঘন্টাল। পুনায় নানান লটর-ঘটর করেছে! ওই কারণেই তো ওকে এখানে বদলি দেওয়া হয়েছে!'

দত্তাকে ছেড়ে দিয়ে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করলেন সত্য। আরএকবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলেন ঘরটায়। খুচরো যা জিনিসপত্তর ছিল পুলিশ সব নিয়ে গেছে। জয়দীপের কোট থেকে আরম্ভ করে ভাঙা কাপ-ডিশ, কফি-দুধ-চিনির কৌটো। জল গরমের কেটলি, চামচ ইত্যাদি। সোফায় ফেরত এসে বসে, একটা গোল্ড ফ্লেক ধরাতেই মনে হল, জয়দীপের টেবিলের ওপাশের অভিশপ্ত চেয়ারে জোশী টানটান বসে আছেন। হাতে ভাঙা কাপের হ্যান্ডেল ধরা। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়াচ্ছে। বাঁ-হাত তুলে কোটের হাতায় সেটা মুছলেন। গোলগাল, বিষণ্ণ মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে কী যেন বিড়বিড় করলেন।

এ-সি হলেও বদ্ধ ঘর। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সত্যসাধন তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরোতেই, জয়দীপের প্রায় মুখোমুখি। সত্য বললেন, 'চলুন।' বলেই হাঁটতে আরম্ভ করলেন হলঘরের দিকে।

'কোথায়?' জয়দীপ কি একটু ইতস্তত করছে? সত্যর তাই মনে হল। বললেন, 'কেন? আপনি তো জুহুর দিকে থাকেন। চলুন, বান্দ্রা অবধি একসঙ্গে যাই। যেতে-যেতে কথা হবে।—'

'না, মানে আমাকে যে একটু অন্যদিকে—'

জয়দীপকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে সত্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। সরাসরি জিগ্যেস করলেন, 'ভাইয়ের খোঁজে?'

'হুঁ।'

'মনে হচ্ছে, পুলিশকে এসব কিছুই বলেননি?'

'না।'

'কেন?'

হলঘরে আর কোনও লোক নেই এখন। সেপাই দুজন টুলে বসেছিল। ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। সত্য ওদের বললেন, 'ক্যাবিনটা সিল করে দাও। হয়তো, কাল আবার আমি আসব।'

'জি, সাহাব।'

সেলাম ঠুকল দুজনে।

লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। পেছনে জয়দীপ। জয়দীপ বলল, 'ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ওরা দুজন এখন যার কাছে আছে, তাকে আমি চিনি।'

লিফট এসে গেল। ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'দুজন মানে?'

'আমার ভাই-বোন।'

লিফট নিঃশব্দে নামছে। সত্য জিগ্যেস করলেন, 'দুজনকেই কিডন্যাপ করেছে?'

'হুঁ।'

সত্য ভেবে দেখলেন, মাদল এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে, প্রথম গাড়িতে যে-মহিলা বা

BanglaBook.org

মেয়েটিকে ও শুয়ে থাকতে দেখেছে, সেই কি জয়দীপের বোন?

ঝমর-গাড়ির কাছে পৌঁছে সত্য প্রশ্ন করলেন, 'পুলিশকে জানালে তো ব্যাপারটার সুরাহা তাড়াতাড়ি হতে পারত। তাই নয় কি?'

'না। সে-লোক বড় ভয়ঙ্কর, ওদের হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলবে। সেইরকম হুমকিও দিয়ে রেখেছে।'

গাড়িতে বসতে-বসতে সত্য বললেন, প্রায় আদেশের ভঙ্গি, 'আসুন ভেতরে।'

জয়দীপ সত্যর পাশে খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসতে বাধ্য হল। ঝমর একবারেই স্টার্ট নেয়। এখনও নিল। সত্য জিগ্যেস করল, 'ওরা যে কিডন্যাপড হয়েছে আজ এবং আপনার পরিচিত ব্যক্তিই এ-কাণ্ড করেছে···এসব আপনি জানলেন কখন এবং কীভাবে? তখন তো পুলিশের লোক, মানে, ইন্সপেক্টর সাঠে আপনাদের অফিসে?'

'টেলিফোন এসেছিল আমার নামে। সাঠেই তুলেছিল। ওপার থেকে বলেছিল, কোনও বন্ধু ফোন করছে, ব্যক্তিগত ব্যাপার।—'

'কী বলল লোকটি আপনাকে?'

'বলল, তুমি কোনও কথা বলো না, খালি শুনে যাও। আমি রুদ্রাক্ষ সেন কথা বলছি। তোমার ভাইবোন আমার কাছে আছে। ভালো আছে। চিন্তার কারণ নেই। ভালোও থাকবে, অবশ্যই যদি তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার কথা শোনো।—'

জয়দীপ চুপ করে গেল হঠাৎ।

সত্য জানতে চাইলেন, 'কোন দিকে যাব?'

জয়দীপ বিহ্বল চোখে চেয়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি-সত্যিই আমার সঙ্গে যেতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'জয়-জাহ্নবী, মানে, আমার ভাইবোনের ক্ষতি হতে পারে।'

'যেতে-যেতে আপনার গোটা ঘটনাটা আমি শুনতে চাই। শোনার পর যদি তেমন মনে করি, তো আমি অবশ্যই শেষ অবধি যাব না। আর, এতেও যদি আপনি রাজি না থাকেন, তা হলে, অনায়াসে নেমে যেতে পারেন। তবে, আমার কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্যের আশা আর আপনি করতে পারবেন না।'

জয়দীপ করুণ গলায় বলল, 'এমন করে বলবেন না, স্যার। পুরো ব্যাপারটা শুনলে আপনি বুঝবেন, কী বিচ্ছিরি বিপদে আমি পড়েছি। এবং আমার আর কেউ নেই—আপনি ছাড়া।'

'কোন দিকে যাব?'

'ব্রিচ ক্যান্ডি। ওয়ার্ডেন রোড।'

BanglaBook.org

॥ সাত ॥

নারিমান পয়েন্ট থেকে চৌপাটি, ওয়ালকেশ্বর অবধি মেরিন ড্রাইভের প্রশস্ত দীর্ঘ পথটি অর্ধবৃত্তাকার। ঝমর তার বিচিত্র রং-বেরঙের চেহারা নিয়ে ঝমঝমিয়ে চলেছে। বাঁ-দিকে খোলা আরব সমুদ্রের অন্ধকার থেকে হা-হা বাতাস ছুটে আসছে দমকে-দমকে। দু-ধারে রাস্তার আলো। ডানদিকের সারিবদ্ধ বাড়ির গায়ে ঝুলছে অজস্র নিয়ন সাইন। টিভি, টায়ার, জীবনবীমার আলোকিত বিজ্ঞাপন জ্বলছে-নিভছে, আবার জ্বলছে। এই আলোকমালা এ-ধারে নারিমান পয়েন্ট থেকেই একেবারে শেষ প্রান্তে চৌপাটি পর্যন্ত দেখা যায়। মনে হয়, আলো অন্ধকার সমুদ্র তটভূমির মিলনক্ষেত্রে একটি মণিমানিক্যের কণ্ঠহার কেউ পরিয়ে দিয়েছে। সায়েবরা এ-অঞ্চলের নাম ভালোবেসে রেখেছে—'কুইনস নেকলেস'।

টপ গিয়ারে ইঞ্জিন রেখেও খুব ধীরে-ধীরে গাড়ি চালাচ্ছেন সত্যসাধন। একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে চকচকে-ঝকঝকে গাড়ির স্রোত ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে যাচ্ছে ঝমরকে ছাড়িয়ে। খুব মন দিয়ে জয়দীপের প্রত্যেকটি কথা শুনছেন সত্য। ওর কথার গতিতে বাধা না দিয়ে আলগোছে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করছেন টুপটাপ। যেমন—

'নিজামুদ্দিনে আপনাদের বাড়ি থেকে, আপনার অই দিল্লি পাবলিক স্কুল কতটা পথ?'

জয়দীপ ভাবতে-ভাবতে বলল, 'কত আর হবে? এই দেড়-দুই কিমি।'

'হেঁটে যেতেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তারপর?'

আবার খেই ধরে কথা বলতে শুরু করে জয়দীপ। তার ছোটবেলার কথা।

'কাছাকাছি বাড়ি। একই স্কুল। প্রায়ই একসঙ্গে যাতায়াত। উঁচু ক্লাসের দিকে ওর দাদা, এই রুদ্রাক্ষ, কখনও-সখনও গাড়িতে লিফট দিত আমাদের। নিজের গাড়ি। কলেজের থার্ড ইয়ারেই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনে ফেলেছিল একখানা। অত ছোট বয়সে কিছুই বুঝতাম না। পরে বুঝেছি, রুদ্রদা নানান ধান্দায়, দলবলে মিশে বেশ মোটা হাত-খরচা নিজেই রোজগার করত—ঠিক কীভাবে, কে জানে!'

সত্যসাধন বাধা দিলেন এখানে, 'ওর বাবা কী করতেন?'

'মালটি-ন্যাশানাল কোম্পানিতে বড় অফিসার ছিলেন। রাশভারি লোক। কোম্পানির গাড়িই ছিল। নিজামুদ্দিনের মতো উচ্চমধ্যবিত্ত পাড়ায় বাংলো করেছিলেন নিজে। তবে, ছেলে কম বয়েসেই লায়েক হয়ে উঠেছিল। বাবার সঙ্গে বনত না বিশেষ। প্রায়ই দুজনে লেগে যেত। মা-ই নাকি ছেলেকে সামাল দিয়ে আগলে রাখতেন—'

'এসব ঘরের-খবর আপনি জানলেন কী করে?'

'নিম্বু এসে বলত।'

সত্য ভুরু কুঁচকে আড় নয়নে জয়দীপকে দেখলেন, 'নিবেদিতা সেনের ডাক নাম নিম্বু? মানে, লেবু?'

'হুঁ। পাড়ায় সবাই ওই নামেই ডাকত।'

প্রচ্ছন্ন রসিকতার গলায় সত্য জিগ্যেস করলেন, 'নামটি কি আপনিই রেখেছিলেন?'

প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল জয়দীপ, 'বোধহয়! ঠিক মনে নেই। সেই ক্লাস ফোর-ফাইভের কথা। স্কুলের বন্ধুরাও শর্টকার্টে "নিম্বু" বলে ডাকত ওকে।'

বলে, থেমে গেল সে। ভাবছে কী যেন।

'হু। তারপর?'

খেই ধরালেন সত্যসাধন। ধরিয়ে, শ্রুতি এবং বোধ টানটান করে থাকলেন।

সোজা সামনে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল জয়দীপ। বলতে-বলতে বর্তমান অবস্থা, সময় থেকে পিছিয়ে গেল সে অনেকগুলো বছর। দিল্লির নিজামুদ্দিনে। মথুরা রোডের কাছে, ছোট রাস্তায়, গলিতে নেমে পড়ল হাফ প্যান্ট পরে। লুকোচুরি, ডাং-গুলি, ছি-কাড়ি। নিম্বু বলল, হাঁফাতে-হাঁফাতে, 'এই জয়, প্লিজ! আমাকে ছুঁস না। আমি "আউট" হই সবক্ষণ। আজকে ছেড়ে দে। দম ফুরিয়ে গেছে। অন্য কাউকে ধর। উফ—'

বলে, জয়ের কাঁধে ভর রেখে হাঁফাতে লাগল। কেউ দেখল কি না দেখে নিয়ে বালক আবার ছুটল অন্য কাউকে ছুঁয়ে দিতে।

নিম্বুর দাদা, মানে, রুদ্রকে দেখতে সেই তখন থেকেই বেশ হিরো-হিরো। জয়দীপ উঠেছে ক্লাস টেনে। নিম্বু নাইন। রুদ্রদা কলেজ ছেড়েছে বেশ ক'বছর আগে। গাড়ি কিনেছে। কীসের ব্যাবসা

BanglaBook.org

করে কে জানে। বলে, আমদানি-রপ্তানি। ব্যাবসার প্রয়োজনে হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে যায় দিল্লি থেকে। নিজে একখানা বিশাল ফ্ল্যাটও কিনে ফেলেছে বড়লোক পাড়ায়। গ্রিন পার্কে।

একদিন গাড়িতে ওদের দুজনকে লিফট দিচ্ছিল স্কুল অবধি। যেতে-যেতে রুদ্রদা জিগ্যেস করল জয়দীপকে, 'নেক্সট ইয়ার তো কলেজে। বিগ বয়, অ্যাঁ কলেজে পাশ-টাশ দিয়ে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

যেমন নিম্বু তেমনি জয়। দুজনেই ভয় পেত ওকে। কোনওরকমে আমতা-আমতা করে জয়দীপের জবাব, 'মানে—এখনও ভাবিনি কিছু?'

'ভাবোনি মানে! স্কুলের রাস্তার মোড়ে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রুদ্রদা। কথা শেষ করল হাসতে-হাসতে, 'বিগ বয়! বিগম্যান হওয়ার কথা ভাবো। আর কিচ্ছু ভেবে, হায়ার এডুকেশন করে হবে স্রেফ লবডংকা। বেসিক এডুকেশানটা নিয়ে বুদ্ধিতে একটু ধার দিয়ে নাও। দেন—ড্রিম অ্যান্ড প্ল্যান—হাউ টু বিকাম এ বিগ ম্যান—অর্থাৎ বড়লোক।'

ততক্ষণে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে 'বাই' জানিয়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে গেল রুদ্রদা। পিঠে বই-ভরতি ব্যাগের বোঝা বয়ে স্কুলের গেট পেরোতে-পেরোতে জয় জিগ্যেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে নিম্বু, গ্রেট মানে কি খালি বড়লোক?'

তেমন কিছু না বুঝেই, বেণী দুলিয়ে নিম্বু হেসে-হেসে দুলাইনের ইংরাজি গানটা শুনিয়েছিল,

'মানি মানি মানি
মাস্ট বি হানি
ইন এ রিচ ম্যানস ওয়ার্লড—'

আর এক দিনের কথা ঝুপ করে কুয়াশা নামার মতো জয়দীপের স্মৃতি আচ্ছন্ন করে দিল। খুব কেঁদেছিল নিম্বু সেদিন। ওদের বাংলো বাড়ির গেটের কাছে পাড়ার লোকদের বিড়। পুলিশের ভ্যান। সামনের বাগানে সাদাপোশাকে অচেনা কিছু লোক। পুলিশ বলেই মনে হয়েছিল জয়দীপের। জটলার ফাঁক দিয়ে পাশ কাটিয়ে জয়দীপ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে গেল। নিম্বু ক্লাস নাইনে তখন। জয় টেন। দুজনের যাওয়া বা ফিরে আসা একসঙ্গে হলেও, আলাদা ক্লাস বলেই সারাদিন আর দেখা হয় না। সেদিন ফেরার সময় নিম্বুকে না পেয়ে খোঁজ নিতেই সে ঢুকেছিল বাড়ির ভেতর অবধি। গোটা দালানে এত মানুষ।—অথচ, কেমন শ্মশানের মতো চুপচাপ।

হলঘরের দুটি দরজার মুখেই দুজন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে। জয়ের দিকে আড় নয়নে দেখে নিয়েও কিছু বলল না। নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথায় ব্যস্ত হয়ে থাকল।

নীচের তলায় এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রান্নাঘরে পাওয়া গেল নিম্বুকে।

আধা-ভেজানো দরজার পেছনে দু-হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাঁধুনি-বউ চওরাসিয়া ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে কাঁধে-পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'কী হয়েছে, মওসি?' দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে জয়দীপ জিগ্যেস করল। চোখে কৌতূহল। গলায় উৎকণ্ঠা। মওসি বিহারের বউ। আধো-হিন্দি আধো-বাংলায় জবাব দিল চাপা গলায়, 'উই তো জয়বাবু আ গয়া! আসলে পুলিশ ছাপা মারল বাড়িতে। ছোট দাদাবাবুকে ধরিয়ে লিয়ে গেল।'

তারপর, ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ থাকতে বলল, 'কিসিকো বলো নেহি, জয়বাবা। তুমহি ইকটু দিদিটাকে দ্যাখো। চাইকি, তুমহাদের বাসায় লিয়ে যাও। পোরে, পুলিশ আদমিরা চোলে গেলে হামি লিয়ে আসব। হামি উপোরে গিয়ে দেখছি কী হাল সাহাব-মেমসাহাবের—'

বলতে-বলতে বেরিয়ে গেল মওসি।

BanglaBook.org

সেই ষোলো-সতেরোর জয়দীপ এমন অবস্থায় এর আগে পড়েনি কখনও। নিবেদিতার কান্না থেমে গিয়েছিল ততক্ষণে। তবু, ওর পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে জয়দীপ বেশ বড়দের মতোই, কিছু সান্ত্বনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল আশ্রয়ের মতো জয়কে আঁকড়ে ধরল নিবেদিতা। বুকে মুখ লুকিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠল। নাক-টানার শব্দের মধ্যে জড়ানো কথা শুনতে পেল জয়, 'দাদা আর ফিরে আসবে না। দাদাটা খুব খারাপ—তাই পুলিশ ওকে জেলে নিয়ে গেল—

তখন প্রায়-যুবক জয়ের মুখে আর কথা ফুটছিল না। সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। এতকালের খেলার সখীকে সে হঠাৎ নতুন অনুভূতিতে আবিষ্কার করেছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের স্বরে সান্ত্বনার কথা আওড়াতে গিয়ে ছেলেমানুষি গলায়, ভয়ে-ভয়ে, বলতে পেরেছিল, 'ভয় কী! আমি তো আছি!'

ঘটনার শেষের অংশ প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করল জয়দীপ। ডান ধারে, অত কাছে বসেও স্পষ্ট শুনতে পেলেন না সত্যসাধন। তার ওপরে ঝমরের ঝমঝমানি, সমুদ্রের বাতাসি শব্দ—সব মিলিয়ে মিশিয়ে সত্য শুনতে না পেলেও দিল্লির কোনও এক অপরিচিত রান্নাঘরে, থমথমে আবহাওয়ায় আনকোরা দুটি তরুণ-তরুণীকে সঘন এবং আবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। ব্রেক কষে লাল ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড় করালেন ঝমরকে। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে দিল্লি থেকে, প্রথম যৌবন থেকে যেন ফিরে এল জয়দীপ। বলল, 'ওমা। এসেই তো গেছি। বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে, প্রথম ডানদিকের গলিতে ঢুকতে হবে।'

শুনে নিয়ে, আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন সত্যসাধন, 'হুম। তার মানে, আপনার সঙ্গে ওই নিম্বু বা নিবেদিতার একটা মধুর সম্পর্ক হয়েছিল?'

'উঁ? হ্যাঁ। মানে, তা বলতে পারেন।'

জয়ের গলায় অন্যমনস্কতা ও সঙ্গে-সঙ্গে সচেতন হয়ে, সোজা উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা লক্ষ করলেন সত্য। হলুদ ছুঁয়ে সবুজ আলোও জ্বলে উঠল একইসঙ্গে। রাত হয়ে আসছে। মেরিন ড্রাইভের আলোকমালা ছাড়িয়ে ঝমর এসেছে অনেকটা পথ। পথে বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা একেবারে হালকা হয়নি এখনও। ডানপাশের মারুতি জিপসির গা থেকে ঝমরকে সাবধানে বাঁচিয়ে, বাঁ-দিকে ঘুরলেন সত্যসাধন। ঝমর কিঞ্চিৎ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ঘ্যং-ঘটর-ঘ্যাংটক-ঝম—'

মনে-মনে সত্য জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, বাছা! ঠিক আছে। কাল সকালেই তোমার বাঁ-দিকের মার্ডগাড কষে দেব। রবার লাইনিং কিনেও এনেছি।'

মুখে জিগ্যেস করলেন জয়দীপকে, 'তা এখন কি সেই সম্পর্ক নেই?'

জয়দীপ কেমন তেতোভাবে বলল, 'দেখুন স্যার। কিছু মনে করবেন না। এগুলো আমার একেবারেই ব্যক্তিগত জীবনের কথা। এই খুনের ঝামেলায় আমার জড়িয়ে পড়বার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এ-কথা আমি বারবার বলা সত্ত্বেও কেন জানি না, আপনার সন্দেহ মিটছে না।'

বাম গালে দ্যাখন-হাসি ফুটিয়ে জয়ের দিকে ফিরে তাকালেন সত্য। বললেন, 'সন্দেহ ব্যাপারটি আমার বাতিক বলতে পারেন। কাজের সর্বপ্রথম হাতিয়ার বললেও খুব ভুল বলা হবে না।'

ডানদিকের গলিতে ঝমরকে ঢুকিয়ে সামান্য এগোতেই জয়দীপ বলল, 'এসে গেছি।'

ঝমর দাঁড়াল।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল জয়দীপ, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনি একটু বসুন আসছি।'

সত্য হাসলেন। বললেন, 'কতক্ষণে?'

'দেখে আসছি। ওপরের অবস্থা দেখে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

'নিবেদিতা দেবী এই বাড়িতে থাকেন?'

পুরোনো আমলের পাঁচ-তলা বাড়ি। ইট নয়, শক্ত পাথরের দেওয়াল। কারুকাজ করা ফটক

BanglaBook.org

থেকে সামান্য এগিয়ে ঝমরকে দাঁড় করাতে হয়েছে। কারণ, ফটক জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মস্ত লিম্যুসিন। সাদা রঙের বিলেতি হন্ডা।

সত্য চারপাশ দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বান্ধবীরই বাড়ি?'

'না। ও এখানে সেন্ট অ্যান স্কুলের প্রিন্সিপাল। পুরো তিন তলায়, স্কুলের কোয়ার্টারে নিবেদিতা থাকে।'

'আর কে-কে?'

'কেউ নয়। ও-একা।'

'ওঁর মা-বাবা?'

'বাবা দিল্লিতেই মারা গেছেন বছরখানেক হল। মা কলকাতায় ফিরে গেছেন। শ্বশুরের পৈতৃক ভিটেতে। ডায়মন্ড হারবার। আমি ঘুরে আসছি...'

বলে, এক কদম পিছোতেই, সামান্য গলা তুলে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি নিয়মিতই এখানে আসেন?'

'না। কখনও-সখনও।'

চট করে পকেট থেকে ডায়েরি আর কলম বের করলেন সত্যসাধন, 'এখানকার ও আপনার বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিয়ে যান।'

'এক্ষুনি?'

জবাব দিলেন না সত্য। ডায়েরির পাতা খুলে ডটপেন এগিয়ে ধরলেন।

হাতে নিয়ে নাম্বার লিখছে জয়দীপ, সত্য পকেট থেকে নিজের বাড়ির নম্বর লেখা 'সি-আই-এ'র কার্ড বের করে দু-আঙুলে ধরে থাকলেন। ডায়েরি পেন ফেরত দিয়ে কার্ড নিয়ে পকেটে রাখতে-রাখতে মেইন গেটের দিকে হাঁটতে লাগল জয়দীপ। শেষ মুহূর্তে ওর মুখে-চোখে চাপা উত্তেজনার ছাপ সত্যর নজর এড়াল না। ফিরে না তাকিয়ে, ঝমরের 'রিয়ার ভিউ মিরারে' চোখ পেতে ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন।

সাদা হন্ডার পাশ দিয়ে ঘুরে দ্রুত পায়ে ফটকের তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়দীপ। সঙ্গে-সঙ্গে দূর থেকে ওর গলা শুনতে পেলেন সত্য 'এ কী? রুদ্রদা!'

ওপরের ধাপে মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটিকে দেখতে পাওয়া গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সাদা পোশাক। ট্রাউজার, জামা, জ্যাকেট সব সাদা। দারুণ স্মার্ট দেখতে। টকটকে ফরসা রং। ললাট এত প্রশস্ত—মাথার সামনের দিকটাকে টাকও বলা যায়। পিছনে পাতলা, কুচকুচে কালো চুল। উন্নত নাসা। অসম্ভব দৃঢ় চিবুক। সত্যসাধন মনে-মনে ভাবলেন, এই-ই তা হলে রুদ্রাক্ষ সেন। এ-রাজ্যের পাতালপুরীর অজস্র নাটের হোতা। এর বিপক্ষে কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যায় না বলেই পুলিশ আজ অবধি মানুষটির ধারে-কাছে পৌঁছোতে পারেনি। যারা পৌঁছেছে, তারা এর মোসাহেব হয়ে গেছে। গোপনে হয়তো মাসোহারাও পায়। এ ছাড়া, যে দু-একজন রুদ্রাক্ষ বা গাজি কাপ্তানের ছায়া অবধি ছুঁতে পেরেছে—হাত পুড়েছে সেই মুষ্টিমেয় অফিসারদের। লাশ পাওয়া গেছে লোকালয়ের বাইরে। আরব সাগরের তীরে। চিহ্নবিহীন। সত্যসাধন আয়নায় চোখ রেখে মনে-মনে বললেন, 'সাবাস বাঙালির বাচ্চা! অ্যাই ঝমর! পোন্নাম কর বাচ্চা! হিল্লি-দিল্লি-দেশের নমস্য বঙ্গসন্তান। এনার দরশন পাওয়া-সৌভাগ্যের বিষয়!'

রুদ্রাক্ষ একখানা সুন্দর হাসি উপহার দিয়েছে এখন জয়দীপকে। সত্য আন্দাজ করলেন—কত বয়েস আর হবে? পঁয়তাল্লিশ? ছে-চল্লিশ! বাহ্! একেবারে তাজা জোয়ান। রুদ্রাক্ষ মিষ্টি গলায় বলল, সত্য শুনলেন, 'ইটস নাইস টু সি ইউ হিয়ার, জয়! যাও, ওপরে যাও!—'

বলে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

BanglaBook.org

জয় উদ্বিগ্ন গলায় জিগ্যেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'ওরা? কারা? মুখে হাসি নিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে রুদ্রর পালটা প্রশ্ন।

'আমার ভাইবোন? জয়ী-জাহ্নবী?'

লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ গাড়ি। চালকের কাছের দরজা খুলতে-খুলতে রুদ্রাক্ষ বলল, 'সব ঠিক আছে। ওরা বহাল তবিয়তে আছে। ব্যাপারটি আর ঝুলিয়ে রেখো না। ওপরে গিয়ে কথা বলো—'

ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। জয়ের করুণ গলা শুনতে পেলেন সত্য, 'প্লিজ ওদের ছেড়ে দিন। ওরা কী দোষ করেছে? আমি কথা দিচ্ছি—দু-একদিনের মধ্যেই ভেবে দেখব—'

রুদ্রকে আর দেখা যাচ্ছে না। কথাও স্পষ্ট নয় এত দূর থেকে। জয় আবার বলল, 'আমি সঙ্গে যাব আপনার।—' বলতে-বলতে পিছনের দরজার হ্যান্ডেল ধরে টান দিয়েই বোধহয় রুদ্রর দিকে চোখ পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে হাত-জোড়া কেমন অসহায়ের মতো শূন্যে ঝুলতে লাগল।

সত্য আন্দাজ করলেন হয়তো ভয়ানক কিছু দেখাল রুদ্রাক্ষ গাড়ির মধ্যে বসেই। খুব সম্ভব—আগ্নেয়াস্ত্র।

'কাম অন, বিগ বয়। গো আপ! মিট হার। টক-টু হার।—'

বলতে-বলতে, রিভার্স গিয়ারে সাদা গাড়ি বড়রাস্তায় পড়ল। হাঁ করে, ভয়ার্ত বিহ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়দীপ।

॥ আট ॥

রুদ্রাক্ষকে দেখে জয়দীপ বোধহয় সত্যসাধনের কথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। পিছনের মোড়ে পৌঁছে সাদা হন্ডা অদৃশ্য হতেই ঝমর ঝাঁকুনি দিয়ে স্টার্ট নিয়েছে। রিভার্স গিয়ারে পিছিয়ে এসে জয়ের সামনে দাঁড়াতেই সত্য বললেন, 'জয়দীপবাবু! আপনি ওপরে যান আমি ঘুরে আসছি। আটকে গেলে টেলিফোনে খবর নেব।—'

জয়দীপ যেন ভাসমান অবস্থায় নৌকো পেল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওকে ফলো করবেন? আমিও আসছি!—'

দৃঢ় স্বরে সত্য বললেন, 'না। আপনি ওপরেই যাবেন। হয়তো, আপনার ভাইবোনকে এখানেই রেখে গেলেন রুদ্রাক্ষবাবু। না থাকলেও ক্ষতি নেই। আপনার এখন ওপরে গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না সত্য। পিছিয়ে বড় রাস্তায় নেমে এল ঝমর। গিয়ার টপকে-টপকে জখমি চিতার মতো লাফাতে-লাফাতে এগোল—ঝম-ঝম ঝমর-ঝম—। সত্যসাধন ও মাদলের এই প্রিয় পোষা ঝমরের গতি এবং ধ্বনি ভারী বিচিত্র। অনেকটা ঘোড়ার চরিত্র। প্রথম-দ্বিতীয় গিয়ারে যখন ট্রটিং করে দুলকি চালে চলে, সারা অঙ্গের বাদ্যি-বাজনা, হেলন-দোলন থাকে চরমে। তৃতীয় গিয়ারে উঠে দ্রুত হাঁটা এবং দৌড়ের মাঝামাঝি অবস্থায়—দোলা এবং শব্দ কমে যায়। টপ গিয়ারে ঊর্ধ্বশ্বাস গ্যালপ করে যখন, তখন সারা শরীরে তীব্র গতি—শব্দহীন প্রায়। বড় জোর ঘুঙুরের ফিসফিসানি শোনা যেতে পারে কখনও-সখনও।

এখন ফোর্থ গিয়ারে ঝমর গলায় ঘুন্টি-বাঁধা স্পটেড চিতাবাঘের মতো গ্যালপ করে ছুটছে পেডার রোড ধরে। দূরে, সাদা লিম্যুজিনকে দেখতে পাওয়া গেল দশ-বারো সেকেন্ড পরেই। কেম্পস কর্নারের উড়ালপুল দিয়ে ওপরে উঠছে। সত্য ঘড়ি দেখলেন—রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। মাদল

BanglaBook.org

এখন কোথায়? কী করছে? ছেলেটা বিপদে না পড়লেই হল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে বোঝালেন। না-না, ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সাহসী এবং সাবধানী। চট করে নিজের বিপদ ডেকে আনবে না।...

ঠিক সেই সময়, মাদল এক অতিকায় সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মালাবার হিলের এদিককার অংশকে বোধহয় ওয়ালকেশ্বর বলে। এর আগে এদিকে আসেনি মাদল। দরকারই পড়েনি। চারিদিকে বেশ নির্জন পরিবেশ। সমুদ্র সমতল থেকে যথেষ্ট উচ্চতায় বলেই জায়গাটায় বেশ আরামের ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। সিংহদরজার দুই পাশ আঁকড়ে রয়েছে দেড়-দু-মানুষ উঁচু পাথরের দেওয়াল। ফটকের গায়ে দুটি গুমটি-ঘর। তার সামনে সটান দাঁড়িয়ে দারোয়ান দুজন। হাতে বন্দুক-টন্দুক নেই। তবে, লাঠি দেখতে পেল মাদল। সাদামাটা লাঠি কি না সে-বিষয়ে মাদলের সন্দেহ আছে। গুপ্তিও হতে পারে।

জগ্‌গু তখন ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ দিচ্ছে হিন্দি এবং মারাঠি মেশানো খিচুড়ি ভাষায়, 'হো মাস্টার। সাইডমে লাগাও। বাজুলা আস্বা।'

ড্রাইভার গাঁইগুঁই করছে, 'হামকো ছোড় দো! গাড়ি দেওয়ার টাইম হয়ে গেছে।'

জগ্‌গু হুঙ্কার ছাড়ল, 'চো-ও-ও-প।'

ছেড়ে, এগিয়ে এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। মাদলের পাশে। দারোয়ানদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে, স্বর পালটে বলল, 'গুর্খাজি। জেজে সাবকো বোলো জগগু আয়া। জুহুকা জগগু। জগমোহন।'

ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে ডানদিকের দারোয়ান গুমটির ভেতরে ঢুকল। অন্যজন সটান দাঁড়িয়ে মরা মানুষের মঙ্গোলিয়ান চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকল।

গুমটির ভেতরে হয় ইন্টারকম বা ওয়াকি-টকি রয়েছে। কারণ, ভেতরে অদৃশ্য দারোয়ানের গলা শুনতে পেল মাদল, 'সাহাব! এক জগ্‌গু আয়া। বলছে, জুহু কা জগ্‌গু—'

চুপচাপ।

একটু পরে আবার, দু-বার, 'জি সাহাব।'

সঙ্গে-সঙ্গে গুমটির দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকটি জগ্‌গুকে জিগোস করলে, 'সঙ্গে কে?'

স্থির দাঁড়িয়ে চোখ-কান সজাগ রেখেছে মাদল।

জগ্‌গু বলল, 'আর্টিস। যাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা।'

মুখটি অদৃশ্য হয়ে গেল ফের। গলা শোনা গেল, 'আর্টিস—'

দু-চার সেকেন্ড চুপ। তারপর আবার, 'জি সাহাব।'

বলে, বেরিয়ে এল দারোয়ানজি। সোজা মাদলের সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, 'চলো।'

সঙ্গীকে কী ইশারা করতেই, সে চাবি দিয়ে সিংহফটকের গায়ের ছোট দরজা খুলে দিল। মাদলকে বলল, 'চলো।'

জগ্‌গুও মাদলের পিছন-পিছন ঢুকতে যেতেই বাধা পেল, 'নেহি। আপকো যানে কা অর্ডার নেহি হ্যায়।'

জগ্‌গু বোধহয় প্রথমে বুঝতেই পারেনি, যে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জুহু এলাকার এত বড় মাস্তান, 'দাদা' বলতে ছোটখাটো স্মাগলাররা অজ্ঞান হয়ে যায়, তার পক্ষে এমন অপমান—বুকে লাগারই কথা। মাদলের হাসি পেল। পাড়ার মাস্তান বা গুণ্ডা প্রায় কুকুরের সামিল। বে-পাড়ায় গেলেই দাপট শুকিয়ে কেঁচো হয়ে যায়। লেজ গুটিয়ে কুঁই-কুঁই। প্রায় তেমনি গলায় জগ্‌গু মিনমিন করল, 'আমি ভেতরে যাব না? অ্যাঁ? তুমি ঠিক শুনেছ, দারোয়ানজি?' বলতে-বলতে শেষ খড়কুটোর মতো মাদলকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জিম্মেদারি জেজে-সাহাব নিজে আমাকে দিয়েছে। হ্যাঁ। আজই—সন্ধেবেলা—'

বাইরের দারোয়ান ছোট্ট ঘুলঘুলি-দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। মাদল আর শুনতে পেল না

BanglaBook.org

কিছু। দ্বিতীয় ওয়াচম্যানের পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল। লাল মোরামের পথ। দু-ধারে সুন্দর ঘাসের গালিচা, বাগান। বাগানে নানান ঝোপঝাড়। ছোট-বড়-মাঝারি গাছ আধো-অন্ধকারে অপরিচিতের মতো দাঁড়িয়ে। সামনে, অল্প দূরে মস্ত দালান। পোর্টিকোর নীচে এবং দু-পাশে খান চারেক ছোট-বড় গাড়ি।

হলঘরের কাছে পৌঁছে দারোয়ান বলল, 'অন্দর যাও, সাহাব। উও মেমসাহাবকো পাস।'

দারোয়ান গেটের দিকে ফিরে চলল।

সাদা মারবেলের মেঝেয় পা রাখল মাদল। ঝকঝকে পাথরে ছায়াও পিছলে যেতে চায়। বিশাল হলটি প্রায় আসবাববিহীন। স্রেফ চার কোণে চারটে হাই-কুশন। সাদা, হলুদ, নীল, সবুজ। ঠিক মধ্যিখানে কালো পাথরের গোল টেবিলে টেলিফোন। টেবিলে বাঁ-হাতের ভর রেখে যে দাঁড়িয়েছিল সে-ই দারোয়ান-কথিত মেমসাহেব। খাঁটি দিশি তরুণী। বব-ছাঁট চুল। ছিমছাম শরীরের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যেই হয়তো, বেশ চাপা লাল রঙের স্কার্ট পরনে। কলার-ওয়ালা টপ। রং খুব ফরসা না হলেও, কালো লকেট ও গাঢ় ক্রিমসান রঙের পটে, মোটামুটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

মাদলের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। দু-পা এগিয়ে অপাঙ্গে একবার মাদলের পোশাক-আশাকের ছিরি দেখে নিল। ক্ষয়া নীল জিনস, হাতা-গোটানো গেরুয়া পাঞ্জাবি পরনে মাদলকে দেখে তরুণী হয়তো অনায়াসে ভেবে ফেলেছে—এই চিজটির গা থেকে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে। ইচ্ছে করেই গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি খচ-খচ শব্দে দু-বার চুলকে নিল মাদল। তরুণীটি হিন্দিতে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।—'

বলে, হলুদ হাই-কুশনের গা বেয়ে, সরু করিডোর ধরে এগোল। মনে-মনে গুনতে লাগল মাদল। ঠিক আঠারো পা হেঁটে আলোকিত করিডোরের শেষে সিঁড়ির সামনে পৌঁছল। মেয়েটির পিছন-পিছন দশ ধাপ উঠে দরজা। ঠকঠক করে তিনবার নক করে দরজা ঠেলে ধরে মাদলকে বলল মেয়েটি, 'অন্দর যাও।'

উরিব্বাস! ঘরে ঢুকতেই মাদলের চোখ প্রায় চড়কগাছ। এমন ঘর সে জীবনে দেখেনি। কল্পনাতেও নয়। একেবারে হলুদ ঘর। কার্পেটে মোড়া মেঝে ইয়োলো অকার। দেওয়ালে গাঢ় ক্যাডমিয়াম। প্রত্যেকটি দেওয়ালে একটা দুটো চেনা-অচেনা হলুদ ছবি। জলরঙের, তেল রঙের। সরাসরি উলটোদিকে প্রকাণ্ড সূর্যমুখীর ছবিটি বেশ চেনা ঠেকল। তক্ষুনি মনে পড়ল না, কার ছবি? কোথায় দেখেছে? তার নীচে হাঁটু-সাইজের হলদে গোল টেবিল। ডজনখানেক সোফা সাজানো সারা ঘরে। সব হলুদ। উজ্জ্বল লেমন হলুদ আলো ঘরটিকে মায়াবী করে রেখেছে। হঠাৎ ঠেক লাগল মাদলের। জন্ডিস হল না তো? ন্যাবা?

ঠিক তক্ষুনি, শূন্য ঘরে মানুষের গলা শোনা গেল, 'অন্দর আও! ব্যয়ঠো! সিট ডাউন।'

অল্প দূরে, ডানদিকের কোণ ঘেঁষে সোফায় বসে রয়েছে মানুষটা। গায়ের সাদা জামাটা হলুদ আলো পড়ে পারিপার্শ্বের সঙ্গে মিশে গেছে। চট করে নজরে পড়ে না। দু-কদম এগিয়ে চিনতে পারল মাদল। জুহুতে দেখা প্রথম গাড়ি—সেই মার্সিডিসের মুখ।

এমন একখানা ঘর! তাতে একা লোকটি বসে, যে আবার কিনা জগগুর মতো বেপরোয়া খুনি মাস্তানকে হুকুম দেয়। মাদলের গা ছমছম করতেই পারে। তবে ভয় সে পায়নি। মস্তিষ্ক দ্বিগুণ বেগে কাজ করছে। মনে হচ্ছে, মস্ত কোনও রুই-কাতলাদের দলে, জলে এবং জালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে। তবে, জাল এখনও জানেই না, মাদল কে অথবা কেন এসেছে? অন্তত, ওর ধারণা তাই।

তবু, মুখ ঘুরিয়ে ঝট করে একবার পিছনে দেখে নিল। পিছনের দরজা বন্ধ। টাইট-বসনা সুন্দরী উধাও। হালকা প্রসাধনের গন্ধ পেল মাদল।

কাঁচুমাচু পায়ে হেঁটে গোল টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মার্সিডিসের মুখ অর্থাৎ জয়ন্ত

BanglaBook.org

জোগলেকর ওরফে জেজে আবার বলল, 'ঘাবড়াও নেহি! ব্যয়ঠো।'

সোফায় বসতে-বসতে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল মাদল। মস্ত সূর্যমুখীওয়ালা হলুদ ছবিটা দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'কার ছবি?'

ছবি-টবির ব্যাপারে জেজের তেমন আগ্রহ নেই। যেটুকু কাজকর্মের আওতায় সেইটুকু জানা থাকলেই যথেষ্ট। ইমিডিয়েট বস সেন-সায়েবের রাজত্ব এসব। ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে ছবিটি দেখার ভঙ্গি করে হাসল জেজে। বলল, 'ফ্রান্সের এক আর্টিস্ট। নীচে দেখো নাম সই আছে—ভিনসেন্ট!'

ভিনসেন্ট ভ্যানগখ!

সাইজের কথা ভেবে মাদল বলল, 'এটা তো প্রিন্ট—না?'

'উঁহু। কপি। মূল ছবির থেকে সাইজে একটু বড় করে করা।'

আপনা থেকেই মাদলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'বাঃ! দারুণ। কে কপি করেছেন!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জেজে। পালটা জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'মাদল।'

'মাধো? তা, বম্বেতে কদ্দিন? থাক কোথায়?'

'এই তো কিছুদিন। ভারসোবার কাছে থাকি।'

'তোমার হাত ভালো। ছবি-টবি নিয়ে এসেছ সঙ্গে?'

মাদল বলল, 'না তো! জগগুদাদা ছবি নিয়ে আসবার কথা তো বলেনি!'

টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে-করতে জেজে বলল, 'হুম! তা হলে তো মুশকিল। তোমাকে তো আমাদের এখানে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবছিলুম। আমার ওপরঅলাকে তোমার কাজের নমুনা না দেখালে তো কাজ হবে না!'

'কী ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে?'

'ঠিক যে-কাজটা তুমি জানো। ছবি আঁকতে হবে।'

'কীরকম ছবি?' মাদলের কৌতূহল বাড়তে থাকে। এরা কি সাদামাটা ছবির ব্যাবসা করে? সাধারণ এক অনামী-অখ্যাত শিল্পীর ছবি দিয়ে তো ব্যাবসা হয় না? হাজার-হাজার আর্টিস্ট যে-দেশে আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে—সেখানে এদের ধান্ধাটা কী জাতের আঁচ করতে পারছে না মাদল। বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ কপি করলেও তো সমঝদার ক্রেতা সহজেই ধরে ফেলবে। তা হলে?

টেবিলের গাঢ় হলুদ টেলিফোন হালকা এবং মধুর শব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে জেজে বলল, 'ইয়েস?'

পিনপিন করে একটা যান্ত্রিক মেয়েলি গলা শুনতে পেল মাদল? কথা বোঝা যাচ্ছে না।

'হুম। কোন ঘরে গেল?' জেজের প্রশ্ন।

আবার পিনপিন।

'ঠিক আছে। এক্ষুনি আসছি। নিশা, মেজাজ কেমন বুঝলে।'

পিনপিন।

'কী যনত্রোন্না। আবার কী হল?'

রিসিভার রাখতে-রাখতে উঠে দাঁড়াল জেজে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে মাদলকে বলে গেল, 'একটু বোসো। এক্ষুনি আসছি।—'

বসতে বলে গেলেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না মাদল। সোফায় দু-এক মিনিট ছটফট করে, উঠে দাঁড়াল। ঘরের চারপাশে আর কিছু নেই। কতগুলি ঘর আছে এই প্রকাণ্ড বাড়িতে, কে জানে! এই লোকটিই জয়দীপের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই এ-বাড়িতেই কোথাও! কোথায়! কোন ঘরে ওদের রেখেছে? কোনও চিৎকার-টিৎকারও তো শোনা যাচ্ছে না। ভাবতে-ভাবতে মাদল সূর্যমুখীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফুলের টবে একগুচ্ছ হলুদ ফুল। ছবিটা কি তেল রঙে? ক্যানভাসের

BanglaBook.org

ওপর করা। না কি, জল রঙে? তর্জনী বুলিয়ে কিছুই বোঝা গেল না। ক্যানভাস হলে, ছবি পিছন দিকের জমি দেখলে বোঝা যাবে। দরজায় চোখ রেখে, আলতো হাতে ফ্রেমের নীচের অংশ খানিকটা তুলে, ঝুঁকে পেছন দিক দেখতে গেল মাদল। বেশি ওজন নয়। আসল ক্যানভাসের টেক্সচারই মনে হচ্ছে। নিরীক্ষার পদ্ধতির কারণেই একটু কাত হয়ে গেল গোটা পেইন্টিং। তক্ষুনি, হালকা ঘড়-ঘড় শব্দ হল ঘরে। চমকে, ছবি ছেড়ে সরে এল মাদল।

এ কী! টেবিলের ওপাশের দেওয়াল অনেকখানি ফাঁক হয়ে, একটা দরজার মতো হাঁ-মুখ খুলে গেছে। এবারে ভয় পেল মাদল। হঠাৎ শীত লাগার কাঁপুনি দিল গায়ে।

এক্ষুনি কেউ ঢুকে পড়লে কেলেঙ্কারি। কী হবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে যন্ত্রচালিতের মতো দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল সে হাঁ-মুখের সামনে। ভেতরে অন্ধকার। এ-ঘরের যেটুকু আলো পড়েছে, তাতে সিঁড়ির ধাপ দেখতে পেল মাদল। নেমে গেছে ঘুরে, গভীরতর অন্ধকারে।

ভয় ছাপিয়ে কৌতূহল, অদম্য জিজ্ঞাসা ওকে ভেতরে টেনে নিল। পিছন ফিরে একবার ঘরের বন্ধ দরজা দেখে মনে হল, এই মুহূর্তে ওই লোকটা বা যে কেউ একজন ঢুকে পড়লেই মাদল আর কোনওদিনই হয়তো এখান থেকে বেরোতে পারবে না। সত্যকাকু এখন কোথায়? জয়দীপের ভাইবোনকে কি এই পথের শেষে আটকে রেখেছে? এ-পথ কতদূর অবধি? মাদল সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে, অন্ধকার হাতড়ে নীচে নামতে লাগল।

ঘুরে-ঘুরে সাত-আট নয় ধাপ। দশ-এ-গা-রো—পিছনের হাঁ মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। সামনে, নীচের দিক থেকে খুব হালকা আলোর আলগা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পা রাখতে না-রাখতেই শব্দ শুনতে পেল মাদল। সামনে নীচে থেকে অতিদূর কণ্ঠস্বর—বাচ্চা ছেলের, 'দিদি! এরা কি আমাদের মার্ডার করবে?'

মেয়েলি গলায় পালটা প্রশ্ন, 'কী বলতে হয়?

'আই মিন—ওই—কী বলে—খুন!'

'দূর বোকা ছেলে! খুন করলে তো জুহুতে করে ফেলত?' সান্ত্বনার গলা মেয়েটির।

নিশ্চয়ই জয়দীপের ভাইবোন, মাদল ভাবল। সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ ভয়ে হঠাৎ চমকে ওঠার মতো শব্দ হল পিছনে—ওপরে। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

এক মুহূর্ত সময় গেল ভাবতে। নীচে যাবে দৌড়ে, না, ওপরে উঠে দেখবে। খতিয়ে বোঝবার আগেই উঠতে আরম্ভ করেছে মাদল। নীচের হালকা আলো, কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল। সাত-ছয়-পাঁচ-চার ধাপে পা তুলে—রক্ত হিম। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বড় জোর চার-পাঁচ ফুট দূরে সিঁড়ির শেষে হাঁ-মুখের দরজা। ঘরের আলোয় সিলিউট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষটা। বেঁটে-খাটো শক্ত চেহারা বলিষ্ঠ দু-হাত ছড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়ানো। মুখ দেখা যাচ্ছে না। হলুদ পটভূমিতে অন্ধকার পাথরের মূর্তিটি শব্দহীন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর। মাদল হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেল।

॥ নয় ॥

লোকটি ভারী গলায় ডাকল, 'উপর আও!' সুড়ঙ্গের ভিতর দৈববাণীর মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে গমগম করল শব্দ।

ভয়ে বিহ্বল মাদল বসু হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে ওপরে, হলুদ ঘরে উঠে এল। গোল-গলা ছাই রঙের হাতা-ওলা গেঞ্জি ও কালো প্যান্ট পরনে লোকটাকে পুরো দেখা গেল এবার। অসম্ভব কঠিন মুখ। বয়েস চল্লিশ-পঞ্চাশ—যা খুশি হতে পারে। শক্ত হাতের মাংসপেশি হলদে আলোয় চকচক করছে। ক্ষুধার্ত, ধারালো চোখ দিয়ে জরিপ করছে মাদলকে।

BanglaBook.org

আচমকা মাদলের জঙ্গুলে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান। অসহ্য যন্ত্রণায় মাদল চেঁচিয়ে উঠতেই অন্য হাতে তার মুখ চেপে ধরল, 'চোপ—চো-ও-ওপ—'

বলে, দুটো হাতই সরিয়ে নিল বদমাশটা। 'উহ্-আহ্,' করে তখনও গালে হাত বোলাচ্ছে মাদল। পাষণ্ড ব্যাটা অবাক গলায় বলল, পরিষ্কার বাংলায়, 'এ শালা দাড়ি তো আসল দেখছি—তু কউন রে?'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে মাদল। এমন জায়গায় মাতৃভাষা শুনে রাগ ব্যথা কমে এল। তবু বেশ আক্রমণের ভঙ্গিতেই কথা বলল সে, 'এটা কী ধরনের অসভ্যতা? তুই, মানে তুমি—ইয়ে, আপনি কে? আমি মাদল।'

জুলজুল চোখে চেয়ে আছে লোকটা। বললেন, 'বাঃ! তুমিও বাঙালি। আমি রঘুনাথ—'

পিছনের বন্ধ দরজার দিকে দেখে নিয়ে, গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'পুলিশের চামচে নাকি?'

মাদল বলল, 'না। আমি আর্টিস্ট। আপনি?'

'আমি এখানে চাকরবাকর। তা, তুমি কি এখানে ছবি আঁকবে বলে এয়েছ?'

'হম।'

সাপের গলায় রঘুনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'ঈশ!—হায় রে, পোড়া কপাল। পালাও! শিগগির পালাও এখান থেকে—'

'কেন? পালাবার কী হল?' মাদল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

রঘুনাথের কথাবার্তায় মুখচোখের ভঙ্গিতে অশিক্ষার ছাপ। গোল-গোল চোখে ঘৃণা ক্রোধ এবং ভয় মিশিয়ে দাঁত কিড়মিড় করল। হিসহিস করে বলল, 'রাক্ষস! রাক্ষসের দল। আমার ভাইটারে খেয়েছে। কত মানুষ যে খেয়েছে—তার গোনাগুনতি নেই। তোমারেও খাবে। পালাও—'

মাদলের মনে হল লোকটা পাগল নয় তো? তা যে নয়, পরের মুহূর্তেই বোঝা গেল। স্বর পালটে সামান্য খুশি মিশল এবার। দেওয়ালের হাঁ-মুখ দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'ওটা এল কোত্থেকে? তুমি খুললে নাকি? কী করে?—' সুড়ঙ্গর মুখের কাছে যেতে-যেতে রঘুনাথ বলল।

'জানি না। ওই ছবিটার সঙ্গে দেওয়ালের চোরা দরজার কোনও যোগাযোগ আছে।'

'আমি জানতাম। জানতাম এ-ঘরে কোনও চোরা-দরজা আছে।—'

বলতে-বলতে দ্রুত পায়ে পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। অল্প ফাঁক করে বোধহয় দেখে নিল কেউ আসছে কি না। ওখান থেকেই নির্দেশ দিল রঘু। 'শিগগির বন্ধ করো ওটা। জেজে-সাব আসছে।—'

ছবিটা কাত হয়ে ছিল।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওটাকে টেনেটুনে সোজা করে দিল মাদল। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের খেল। বেড়ালের গলায় আদরের মৃদু গরর-গরর আওয়াজে দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দেওয়াল। গোটা ব্যাপারটাই দু-তিন সেকেন্ডে নিরেট হয়ে গেল আবার। আগের মতোই যেমন-কে-তেমন।

ঠিক তক্ষুনি জেজে এসে ঢুকল। দুজনকে এক পলক দেখে নিল। মাদলকে দেওয়ালের সূর্যমুখীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামান্য কুঁচকে গেল ভুরু। জিগ্যেস করলে, 'ওখানে কী করছ?'

মাদল এক মুহূর্তও না ভেবে শপাং করে বলে দিল, 'ছবিটা দেখছিলাম। ক্যানভাসে আঁকা। তাই না?'

কোনও জবাব না দিয়ে, গোল টেবিলের দিকে হেঁটে গেল জেজে। সোফায় বসতে-বসতে রঘুকে একটু ধমকের সুরে বলল, 'ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিলুম না! এতক্ষণ কী করছ এখানে?'

রঘু এখন একেবারে ভিন্ন মানুষ। অতি বশংবদ মোসায়েব বা পোষা জানোয়ারের মতো

BanglaBook.org

হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, 'কী করব, সাহাব? ও বাবু ছবি দেখছিল!—'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মাদল। রঘু তা হলে মোটেই পাগল নয়। বরং পরে কাজে লাগবে—ভাবতে-ভাবতে মাদল জেজেকে বলল, 'আমাকে পৌঁছোতে হবে না। একাই যেতে পারব, স্যার।'

কেটে-কেটে কথা বলল জেজে, 'না। তুমি/একা/যেতে/পারবে/না। রঘুই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। যাও।'

'ঠিক আছে, স্যার—' বলতে-বলতে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল মাদল। পরিষ্কার বুঝে গেল সে, যে, রঘুকে ওর আস্তানা ইত্যাদি জেনেশুনে আসবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দরজা টেনে খুলে ধরল রঘু। মাদল বেরোতে যাবে, পিছন থেকে জেজে বলল। 'শোনো হে!'

মাদল মুখ ঘুরিয়ে দেখল জেজের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। বলছে, 'ঠিক চারদিন বাদে, রোববার, সকাল এগারোটায় গাড়ি যাবে। সব ছবি সঙ্গে নিয়ে আসবে। তোমার ছবি দেখতে বস রাজি হয়েছে।'

মাদল হাসল, 'থ্যাংক্যু স্যার।'

'আর একটা কথা। এ-বাড়িতে কোনও ব্যাপারেই বিশেষ কৌতূহল রেখো না মাথায়, কেমন?'

সুবোধ বালক হয়ে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল মাদল। পিছনে রঘুনাথ।...

সত্যসাধন সেই সময় মস্ত দালানটির পশ্চিমের দুই-মানুষ উঁচু দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। রুদ্রাক্ষর গাড়ি মেইন গেট দিয়ে এ-বাড়িতেই ঢুকে গেছে একটু আগে। ঝমরের গতি কমিয়ে তো রাস্তার মোড় থেকে লক্ষ করেছেন সত্য। ওখানেই ঝমরকে পার্ক করে হেঁটে উঠে এসেছেন মালাবার হিলের ওপরে। ওয়ালকেশ্বর নামে পরিচিত এ-পাড়ায় বিশেষ যাতায়াত না থাকলেও অন্তত মাসে-দু-মাসে এক-আধবার আসতেই হয়। গণতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের বাড়িতে নামী দামি শহরবাসীদের নেমন্তন্ন করা হয়। সেদিন সত্যসাধনও আসেন। তা ছাড়া, ডাক্তার-বন্ধু রাজীব রাজনও থাকে এখানে। খানিক দূরে হাসপাতালের কোয়ার্টারে। বেশ পুরোনো প্রাসাদোপম অট্টালিকা এইটি। হয়তো কোনও ইংরেজ বা পার্সির নামে রয়েছে। আলোকিত সদর গেটে পাথরে খোদাই-করা নামও দেখেছেন তিনি ওঠবার সময়। সানসেট ভিলা। সজাগ প্রহরী দুটির সতর্ক চোখ এড়াতে সত্য সানসেট ভিলা ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে, বুনো ঝোপঝাড়, বাগান এবং আরও একটি মাঝারি বাংলো ছাড়িয়ে, তবে পশ্চিমে হাঁটা ধরেছেন। উদ্দেশ্য, পিছন দিকে পৌঁছে ভিলাটির ব্যাপার-স্যাপার কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা। শুকনো কাঁটাঝোপ, আবর্জনা পেরিয়ে, হোঁচট খেতে-খেতে সানসেটের এই পিছনের দেওয়ালে পৌঁছেছেন সত্য। অপূর্ব দৃশ্য এখানে। কয়েকশো ফুট নীচে, পাহাড়ের ঢাল শেষ হলে মূল আরব সাগর খানিকটা ডানদিকে ঢুকে খাঁড়ির মতো চেহারা নিয়েছে। চোখের সামনে সরাসরি দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল। কোথাও গাঢ়, কোথাও আধখানা চাঁদের আলোয় হালকা এবং চকচকে। হু-হু বাতাসে নোনা গন্ধ। বহু দূরে দিগন্তের সীমারেখা যেখানে অন্ধকারে মিলিয়েছে, সেখানে, কয়েকটি ছোট-ছোট নক্ষত্র নেমে এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট হলেও সমান-সমান। যারা জানে না, তারা কয়েক মুহূর্ত ভেবে অবাক হবে—বোম্বাই শহর ও সমুদ্রের অংশ পাহারা দিতে সন্ধের পর ডিউটিতে নেমে আসে, আকাশের কয়েকটি তারা। সত্য জানেন, ওগুলি দূরের জাহাজ। বন্দরে ঢোকার অনুমতির অপেক্ষায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। একটা সরে গেলে, তার জায়গা নেয় নতুন জাহাজ।

ভিলাটির চারিদিকে নিরেট প্রাচীর এত উঁচু যে, এখান থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামার চেষ্টা করা মানে সরাসরি গড়িয়ে জলে গিয়ে পড়া। ছোট-ছোট শুকনো ঝোপ বা বুনো ঘাস, গাছ-গাছড়া ধরে-ধরে নামতে যাওয়াও বিপজ্জনক। সত্যর মতো

লম্বা চওড়া মানুষের শরীরের ভার রাখতে পারবে না। তবু ঝুঁকি নিতে হল সত্যসাধনকে। অস্ফুট চাঁদের আলোতে একটা খটকা লাগার মতো ব্যাপার চোখে পড়েছে তাঁর। পাহাড়ের এই খাড়া উতরাইয়ের প্রায় সর্বত্রই রুক্ষ-শুকনো ঘাস-ঝোপ। কিন্তু, একেবারে নীচের দিকে, ডানধারে খাঁড়ির জল ছুঁয়ে বেশ খানিকটা জায়গা বেশ তরতাজা সবুজ।

হাঁটু মুড়ে ঢালের শুরুতে বসে পড়লেন সত্য। দু-হাতের ভর রেখে স্লিপ খাওয়ার ধরনে ঘষটে-ঘষটে নামতে লাগলেন তিনি। ট্রাউজার নোংরা তো হবেই। ছিঁড়েও যেতে পারে। কিন্তু উপায়ও তো নেই। এই ভিলাতেই খুব সম্ভবত মাদলের আসার কথা। টেলিফোনে বলেছিল—ওয়ালকেশ্বর—মালাবার হিল এলাকা। তা ছাড়া, জয়দীপের ভাইবোনও কি এখানে? না, শহরের বাইরে কোথাও পাচার করে দিয়েছে? সবচেয়ে বড় কথা, বোম্বাই পাতালপুরীর 'ডন' রুদ্রাক্ষকে এই ভিলাতেই ঢুকতে দেখেছেন সত্য। 'জয়েন্ট সিম্ফনি' নামে কুখ্যাত দলটির মূল ঘাঁটি কি এখানেই?

দু-হাতে ও পায়ে ব্রেক কষতে-কষতে নামছেন সত্য। হাতের চেটো কাঁটাঝোপে ছড়ে গিয়ে বিচ্ছিরি জ্বালা করছে। তা করুক, ভাবলেন সত্যসাধন। কিন্তু হঠাৎ সবুজের ব্যাপারটা, একটা যাচাই করা দরকার। 'জয়েন্ট' শব্দটির দু-রকম মানে, সত্য জানেন। যৌথ এবং শুকনো মাদক দ্রব্য। গাঁজা, চরস, হাশহিশ। জয়দীপের আপিসে জোশীর মার্ডার এবং রুদ্রাক্ষর মধ্যে তো একমাত্র কমন ফ্যাক্টর জয়দীপ। ওর ভূমিকাটা এখনও ঠাহর পাচ্ছেন না সত্য। বাড়ি পৌঁছে, খতিয়ে না ভাবলে অন্ধকার কাটবে না।

ভাবতে-ভাবতে একেবারে সবুজের কাছে নেমে এলেন। কাছাকাছি বলেই খুব একটা তফাত চোখে পড়ছে না। সামান্য ঝুঁকতেই দেখা গেল অনেকটা জায়গা স্যাঁতসেতে, ভেজা। শুধু ভেজাই নয়। খাঁড়ির জল থেকে অন্তত দশ-বারো ফুট ওপরে, সত্যর প্রায় পাশ দিয়ে ক্ষীণ জলধারা অদৃশ্য গতিতে নীচে নেমে সমুদ্রের সঙ্গে মিশছে। অসম্ভব পিছল জায়গাটা।

জলের জন্যেই শ্যাওলা এবং সবুজ ঘাস-পাতা। কিন্তু জলটা আসছে কোত্থেকে বুঝতে পারছেন না সত্য। ভিলার ভেতরে কোনও সুইমিং পুল? যার থেকে জল চুঁইয়ে? নাকি, নর্দমার জল? কোনও চোরা পথ নয় তো?

এই সব ভাবনা-চিন্তার মধ্যে হঠাৎ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক গুরু গম্ভীর ডাক, 'হোউ!'

মুখ তুলে ওপরে দেখবার আগেই সত্য বুঝে গেছেন—এ-ডাক কোনও নেড়ি-কুত্তার নয়। ঠিক তাই। খুদে যমদূতের মতো পাহাড়ের মাথায়, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটা। বুলমাস্টিফ। পথে-ঘাটে সচরাচর এ-জিনিস দেখা যায় না। খাস বিলেতি পাহারাদার কুকুর। চট করে কামড়ায় না। কামড়ে ধরলে ছাড়ে না এবং মাংস ছাড়া কিছুই রোচে না এদের মুখে!

আর একখানা ডাক।

'হোউ!' যেন কী হচ্ছে ওখানে!

সত্য টের পেলেন, গতিক সুবিধের নয়। যদিও খাড়া ঢাল বেয়ে শ্রীমান নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু ওঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ওপরে ওঠা মুশকিল। সমুদ্রের জলে নেমে, সাঁতরে খানিকটা দূরে গিয়ে, ওঠবার চেষ্টা করা যায়। সে-রাস্তায় দু-রকম সম্ভাবনা। এক, ওদিক দিয়ে ওপরে ওঠার পথ আছে কি? থাকলেও সে যে আরও দুর্গম হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। দুই, শ্রীমানের ডাকাডাকিতে সশস্ত্র মানুষ-প্রহরীরা এসে উপস্থিত হলেও চিত্তির।

'হোউ-হোউ!' অর্থাৎ ওপরে উঠে এসোই বোধহয়!

ডাকের আওয়াজ চড়েছে। ক্রমে আরও চড়বে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়েই শ্রীমান নামছে না। নইলে, এতক্ষণে নেমে আসত।

'যা থাকে বরাতে—ভেবে চার-হাতে পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো সন্তর্পণে উঠতে লাগলেন সত্য। ওর কাছাকাছি পৌঁছতেই অভ্যর্থনা উত্তেজনায় অধীর শ্রীমান সামনের দু'পা নেমে একটু এগিয়ে

BanglaBook.org

এল।

কুকুরের গলার ভেতরে একটানা রাগের গর্জন শুনতে পেলেন সত্য—গর-র-গর-র। এই সব ইংরেজ কুত্তার সঙ্গে মাঝামাঝি রফা হয় না। মনঃস্থির করে ফেললেন সত্য। হয় এসপার, নয় ওসপার। ডানহাতে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ও-ব্যাটার আগ-বাড়ানো ডান পাটি আচমকা ধরে ফেললেন তিনি। ক্ষিপ্র গতিতে টান মেরে ছুঁড়ে দিলেন নীচে। যমদূত কিছু বুঝে ওঠবার আগেই খানিকটা শূন্যে উড়ে পাহাড়ের গায়ে পড়ে গড়িয়ে চলল জলের দিকে। ভয়-পাওয়া কুকুরের চিরন্তন ডাক ফুটল সায়েবের মুখে, 'ইঁইক—কিউ—ইঁউ—।

আর এক মুহূর্তে দেরি না করে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন সত্য। কিন্তু দেরি হয়েই গেছে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দৌড়ে আসছিল মানুষটা। মঙ্গোলিয়ান মুখ। গেটের লোক দুটির কেউ নয়। এ অন্য। হাতে টু-ব্যারেল রাইফেল। এখন, সত্যর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো। লোকটার কথা বলার ধরন অই 'হোউ-হোউ' গোছের। হিন্দিতে জিগ্যেস করলে, 'কী ব্যাপার? কী হচ্ছে এখানে?'

ততক্ষণে শ্রীমান হোউ সামলে নিয়েছেন। ঘন-ঘন ডাকতে-ডাকতে উঠে আসছে ওপরে।

মুখে হাসি টেনে সত্য বললেন, 'তোমার কুকুর হোঁচট খেয়েছে?' এক পলক নীচে তাকিয়ে লোকটা ডাকল, 'আও—রবসন আও।'

তারপর সত্যর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল আবার, 'তা তো দেখছিই।—তা তুমি কী করছ এখানে?'

সত্য একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ বানিয়ে বললেন, 'না—মানে—কিছু না! একটু ইয়ে—'

প্যান্টের বোতাম লাগাবার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে-বলতে 'মানে—বাথরুম সারছিলুম—'

যথেষ্ট অবিশ্বাসের চোখে ওঁর আপাদমস্তক জরিপ করছে লোকটা। বলল, 'জামা-প্যান্টের এই ছিরি কেন?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন। কারণ, হঠাৎ-ই মনে হল, এর সন্দেহ একটু বাড়িয়ে দিলে, পাঁচিলের গণ্ডির ভিতরে কি আছে-না-আছে—দেখে নেওয়ার সুযোগ হয়। ভয় একটাই—রুদ্রাক্ষ ওকে চিনে রাখবে। সেটা বোধহয় এক্ষুনি বাঞ্ছনীয় নয়।

কুকুরটা ততক্ষণে কাছে উঠে এসেছে। ডাক থামেনি। সত্যর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। হয়, ওঁকে ভয় পেয়েছে। নয়, প্রহরীটি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বলে। সত্য ভাবলেন, ভাগ্যিস। ব্যাটা নালিশ করবার মানুষি ভাষা জানে না। সত্য বললেন, 'ওর ডাকে ভয় পেয়ে, আমারও পা পিছলে গিয়েছিল।'

বলে বোকা-গোছের হাসি ছেড়ে, জামার হাতা প্যান্ট, ঝাড়তে-ঝাড়তে রাস্তামুখো হলেন।

'দাঁড়াও।'

লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে বুলমাস্টিফও বলল, 'হোউ-হোউ!'

দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্য।

শ্রীমান রাগে গজর-গজর গর-র গর-র করছে—শুনতে পেলেন এবার।

লোকটি পাশাপাশি এসে, এক কদম এগিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

॥ দশ ॥

'একী? কী চেহারা হয়েছে আপনার, সত্যকাকু? কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে মাদলকে জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, হালকা গলায়,'ছোটবেলায় কলকাতায় থাকতে স্লিপ খেয়েছ কখনও?'

মাদল অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'টালিগঞ্জে। লেকের লাগোয়া চিলড্রেন্স পার্ক-এ। বেশ বড় সিমেন্টে বাঁধানো স্লিপ!'

'আমিও অনেক নীচু স্লিপ খেয়ে আসছি। খেতে ভালোই! তবে মসৃণ সিমেন্টের নয় বলেই,—সামান্য খোঁচাখাঁচি খেয়েছি উপরি!' বলতে-বলতে, ধপাস করে ওঁর ফেবারিট বেতের ইজি-চেয়ারে আধ-শোয়া হলেন। মাদল দৌড়োল তুলো-ডেটল আনতে।

'ইশ? হাতের চেটো, কনুই প্রচণ্ড ছড়ে গেছে—' ওষুধ লাগাচ্ছে মাদল আর উঃ-আঃ করছে নিজেই।

সত্য বললেন, 'তোমার অ্যাডভেঞ্চার বিস্তারিত বলো শুনি।' বলে চোখ বুজলেন তিনি।

মাঝে-মধ্যে এক-আধটা প্রশ্ন, দু-একটা হুঁ-হা করে মাদলের ঘটনা সবটা শোনা হয়ে গেলে বললেন, 'তার মানে, তুমি যখন ভিতরে ছিলে, আমি তখন পাঁচিলের বাইরে। রুদ্রাক্ষকে দেখেছ?'

'উঁ-হুঁ? কিন্তু ওই পাহারাওলা আপনাকে ধরেনি?'

উঠে দাঁড়ালেন সত্য। বললেন, 'ধরেছিল। গেট অবধি যেতে হয়েছিল সঙ্গে। তবে, ভেতরে আর নিয়ে যায়নি। বলতে গেলে, খেদিয়ে দিয়েছে।—'

হেসে, বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন সত্যসাধন। যেতে-যেতে বললেন, 'খাবার কী করেছে সখা?

আপিসের সখারাম এখানেই থাকে। ঘরের কাজকর্ম, রান্না ইত্যাদি করে দেয়। মাদল বলল, 'ডিমের লাবড়া। আস্ত মুসুরির ডাল। খেতে বসলে, বেগুন ভেজে দেবে, বলল।—'

'ওকে ছেড়ে দাও হে। বেশ রাত হয়েছে। বেচারা শুয়ে পড়ুক। আমরাই ভেজে নেব'খন বেগুন-বেদোষ—যা হোক কিছু।'

মাদল তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি স্নানে যান। আমিই ভেজে নিচ্ছি।

বাথরুমে ঢুকে পড়েছেন সত্যকাকু। দরজা বন্ধ করবার আগে বললেন, 'ঝমরের পিছনের সিটে পকেট-রেকর্ডারটা আছে। তোমার জয়দীপদা ও অন্যান্যদের কথাবার্তা বেগুনভাজার সঙ্গে শুনে নাও।—'

মাদল রেকর্ডার নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

রাত বাজল বারোটা। শহরের শব্দগুলি ক্লান্তিতে অবশ বলেই দূরের গির্জার ঘড়ি থেকে ঢং-ঢং শুনতে পাওয়া গেল। দিনের বেলাতেও নিশ্চয়ই বাজে ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। শুনতে পাওয়া যায় না। মাদলের মনে হল, গত কয়েক বছরে এ-শহরের কোলাহল কত বেড়ে গেছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে খেতে-খেতে মাদল জিগ্যেস করল, 'সত্যকাকু, জয়দীপদা কি খুন করতে পারেন? আমার তো মনে হয় না!'

সত্যসাধন অতি মনোযোগ দিয়ে আহার করছেন। এই মুহূর্তে যেন বেগুনভাজার চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে আর ভাবার নেই। অথচ, মাদলের কেমন মনে হল, উনি আপন চিন্তার জগতে ডুবে গেছেন—যেখানে বেগুন, ডিম বা মুসুরির ডাল—কিসসু নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মাদল ভাবল, ইশ! অন্যের মনের কথা যদি টের পাওয়া যেত! তা হলে এক্ষুনি সে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ত। সত্যকাকুর ভাবনায় ভর দিয়ে ও-ও সব কিছু দেখতে পেত!

ফোন বেজে উঠল এই সময়। মাদল টেবিল ছেড়ে উঠে, এঁটো হাতেই পাশের ঘরে দৌড়োল ফোন ধরতে। এ-ঘরটা সত্যকাকুর 'স্টাডি'। তিন পাশের দেওয়ালে সিলিং অবধি রাজ্যের বই। টিভি-ভি.সি. আর। ছবি,এনলার্জার। বাঁ-দিকের দেওয়ালের পুরোটাই দুটি মানচিত্রে ঢাকা। একটি পৃথিবীর। অন্যটি ভারতবর্ষের। সেখানেই ছোট্ট লেখার টেবিল, একটি মাত্র রিভলভিং চেয়ার। টেবিলে লাল-নীল ডটপেন। লেখার প্যাড এবং সাদা টেলিফোন-যন্ত্র। বাঁ-হাতে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলার

BanglaBook.org

সঙ্গে-সঙ্গে জয়দীপদার ক্লান্ত স্বর ভেসে এল, 'কুড আই স্পিক টু মিস্টার কর?'

এক মুহূর্ত ভাবল মাদল। ওর গলার স্বর জয়দীপদা চিনতে পারেননি। আপন পরিচয় দেবে কি দেবে না ঠিক করতে পারল না। ও-ঘর থেকে সত্যকাকুর গলা, 'কার ফোন? জয়দীপ রায়?'

মাদল ফোনের মাউথপিসে বলল—'জাস্ট এ মিনিট!'

পরক্ষণেই ডানহাতের পিঠে মাউথপিস ঢেকে সত্যকাকুকে জবাব দিল, গলা তুলে, 'হ্যাঁ। আপনি আছেন, কি, নেই?'

সত্যকাকু হেসে ফেললেন শব্দ করে। হাসতে-হাসতে বললেন, 'সাব্বাশ, মিস্টার মাদল বসু। পাকা সহকারীর মতো কাজ করলে—'

টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে আরও বললেন, 'আছি ভাই, আছি। বহাল তবিয়তে আছি। হাত ধুয়ে আসছি, ধরতে বলো।'

ওয়াশ-বেসিনের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, নিজের মনেই এবং জোরে-জোরে, 'বেগুন ভাজাটা যা জমেছে না! আহা! দারুণ—'

মাদল নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল, সত্যকাকু হয় কোনও ক্লু পেয়েছেন ভেবে অথবা উনি জয়দীপদার ফোন—এত রাতেও আশা করেছিলেন। হয়তো বা দুটোই!

সত্যকাকুকে রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে মাদল ফিরে এল টেবিলে। খিদেটা তো পেয়েই ছিল। চেটেপুটে থালা সাফ করে উঠতে-উঠতে মিনিট-দশ-পনেরো লেগে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসেও দেখল সত্যসাধন 'স্টাডি'-তে রয়েছেন। মাদল অবাক হল না। তবু সামান্য এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারল ও-ঘরে। রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন সত্যকাকু, কখন কে জানে! পিছন ফিরে চেয়ারে বসে আছেন চুপচাপ। হাতের চুরোট হয়তো নিভেও গেছে—খেয়াল নেই। ঘরে ধোঁয়ার গন্ধ। এখন ওঁকে বিরক্ত করা চলবে না। মাদল জেনে গেছে অ্যাদ্দিনে। শার্লক হোমস, ব্যোমকেশ থেকে নিয়ে ফেলুদা বা আজকের তরতাজা গল্প-উপন্যাসের ডিটেকটিভরা এইরকমই। ওঁদের কখনও-সখনও, ধোঁয়ার আশ্রয় নিতে হয় ধোঁয়াটে ব্যাপারের জট ছাড়াতে।

ফলে-পা টিপে-টিপে ফিরে আসছিল সে। পিছন থেকে সত্যকাকুর গলা শুনতে পেল, 'শুয়ে পড়ো গে যাও। তোমার ঘুম দরকার। কাল ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ো। বেরোতে হবে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট'—বলে, কোণের ঘরে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না-দিতেই মাদল কাদা।....

ঝমর তার দুজন প্রেমিক ও বিশ্বস্ত আরোহী নিয়ে জুহু-পার্লে স্কিমের দশ নম্বর রোড ধরে চলেছে। ঢিমে তেতালায়। ভোরবেলার কুকুরেরা পেটের ধান্দা ভুলে দু-চারবার ডাকাডাকি করে কণ্ঠস্বর ঝালিয়ে নিচ্ছে।

বাসা থেকে বেরোবার পর দুজনের কেউ একটাও কথা বলেনি। মাদল লক্ষ করেছে, সত্যকাকু অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে ঝমরের গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা সাধারণত অনায়াসেই উনি করে থাকেন। অর্থাৎ সকাল থেকে অন্য ভাবনায় ডুবে আছেন। সারারাত ঘুমিয়েছেন কিনা, বলা মুশকিল। চোখে-মুখে চিন্তার ভাব থাকলেও—একবিন্দু ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে না।

সিনেমা তারকা অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ছাড়িয়ে বিহারি ভাইয়ার সাময়িক চায়ের স্টল ফুটপাতে দু-তিনজন শ্রমিক-গোছের মানুষ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। ঝমরকে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে সত্যকাকু রাস্তায় পা রাখতে-রাখতে বললেন, 'একটু চা খেলে হয়।'

যেন, সকালের বাতাস বা সূর্যোদয়কে বলছেন।

মাদলও নামল।

BanglaBook.org

সেই ভোর-রাত্তিরে ঘুম ভাঙার পর পেটে কিছু পড়েনি। নিয়মিত সকালের চা-ও নয়। কারণ সাড়ে-পাঁচটায় ঘুম ভাঙিয়েছেন সত্যকাকু। একেবারে তৈরি। বলেছেন, 'উঠে পড়ো—যদি, যেতে চাও।'

ঘুম-চোখে মাদলের মুখে প্রশ্ন ফুটতেই পারে, 'কোথায়?'

জবাব সে পায়নি। ততক্ষণে। সত্যকাকু দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন। শেষ শব্দের রেশ রেখে গেছেন, 'আমি ঝমরকে গরম করছি। আসতে পারো।...'

এতক্ষণে সকালের প্রথম গরম চা জিভ পোড়াতেই আর থাকতে পারল না মাদল। বলেই ফেলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, সত্যকাকু?'

'অ্যাড-ম্যাগনেট কে-কে এবং তাঁর একমাত্র লাডলি কন্যা এস-কে'র বাড়ি।'

'আপনি কি জয়দীপদার বড় কর্তা আর শকুন্তলা ম্যাডামের কথা বলছেন?'

কথা বলতে-বলতে চা শেষ করে দুজনে ঝমরে বসল।

সত্যসাধন নাকে শব্দ করলেন, 'হু।'

অবাক গলা মাদলের, 'ওঁদের বাড়ি তো পুনায়!'

'বম্বেতেও আছে।'

'আপনি বাড়ি চিনতেন নাকি—আগেই?'

'না। কাল রাতে জয়দীপ রায় টেলিফোন করেছিল, ভুলে গেছ? অনেক কথা হয়েছে। ওর কাছেই জানলুম।'

মাদল একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'কিন্তু, ওঁরা দুজন তো পরশুই ফিরে গেলেন পুনায়। আজ কখন এলেন?'

'খুনের খবর পেয়ে কালই সন্ধের পর এসেছেন। জয়দীপের সঙ্গে শকুন্তলার কথা হয়েছে টেলিফোনে।'

চেম্বুরের ঘিঞ্জি বাজার এলাকা ছাড়িয়ে লায়ন্স পার্ক থেকে বাঁ-দিকে ঢুকল ঝমর। এখানটায় যথেষ্ট গাছপালা, শান্ত পরিবেশ। বাংলো টাইপের খানকয়েক বাড়ির পর সবুজের মধ্যে ধবধবে সাদা দোতলা বাড়ি। সামনে মস্ত বাগান।

সূর্য উঠে গেছে। তবে, বাগানে এখনও রোদ আসেনি। বাড়িটার বারান্দার সামনে ঘাসের গালিচায় বেতের সাদা চেয়ার-টেবিলে বসে আছে শকুন্তলা। মাদল দূর থেকেই চিনতে পারল।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'উনিই কি তোমাদের ম্যাডাম?'

মাদল ঘাড় নাড়তে, দুজনে ঝমর থেকে নামল। হেঁটে এসে, বুক অবধি উঁচু গেটের সামনে দাঁড়াল। সামান্য গলা তুলে সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'মে উই কাম ইন?'

সত্য স্পষ্ট দেখলেন, মেয়েটির ভুরু অল্প কুঁচকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর মনে হল, এমন সুন্দরী রমণীর ভুরু কোঁচকালেই আধা-সৌন্দর্য মার খেয়ে যায়। সে-যুগের সুচিত্রা সেন, বা আজকের শ্রীদেবীকে কোঁচকানো ভ্রূ-সমেত দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

ততক্ষণে মাদলকে দেখে বোধহয় চিনতে পেরেছে মেয়েটি। মুখ স্বাভাবিক হয়েছে। ঠোঁটের কোলে হাসি এক্ষুনি ফুটলেও ফুটতে পারে—এমন ভাব! হাসি না ফুটলেও কথা ফুটল মুখে, অবশ্যই ইংরিজিতে, 'গেট খোলা আছে—আসুন!'

ওরা দুজনে কাছে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়াল শকুন্তলা। শূন্য চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।' তারপর মাদলকে উদ্দেশ করে জুড়ে দিল, 'কী ব্যাপার? এত সকাল-সকাল? এখানে এসে উপস্থিত?' বলতে-বলতে ফের বসে পড়ল।

ফরসা সুডৌল মুখটি সুন্দর বলা চলে। তবে কমনীয়তার অভাব। বরং একটু আহ্লাদী বা গরবিনী-গোছের চাউনি। ফোলা ঠোঁট, সামান্য উদ্ধত চিবুক ছাড়াও—উঠে দাঁড়ানো এবং বসার

BanglaBook.org

মধ্যে বেশ উগ্র উদ্ধত ভঙ্গি। ওর পাশাপাশি জয়দীপের চশমা-চোখে গোবেচারা মুখটি ভাবতে বেশ অসুবিধে হল সত্যর।

মাদল বলল, 'ইনি মিস্টার সত্যসাধন কর। চ্যানেল ইনটেলিজেন্সের ডাইরেক্টর—'

ততক্ষণে সত্য তাঁর কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়েছেন শকুন্তলার দিকে। মুখে হাসি টেনে বললেন, 'আপনার তুলনায় চুনোপুঁটি কোম্পানি। মোটমাট, অথরাইজড প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

যেটুকু হাসি ফুটব-কি-ফুটব না করছিল সেটি একেবারে গায়েব এখন। শকুন্তলার মুখে সেই বেমানান ভুরু-সমেত কঠিন ভাব দেখা গেল স্পষ্ট। বলল, 'চ্যানেলের নাম আমি জানি। অ্যাড মার্কেটের সিকিউরিটির ভার আপনাদের দেওয়ার কথাও উঠেছিল গেল বছর। যাক! বলুন—কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'আপনাদের বম্বে আপিসের মিস্টার জোশীর মার্ডারের ব্যাপারে ক'টা প্রশ্ন করতে চাই?'

'বেশ। তবে তার আগে আমার দুটি প্রশ্নের জবাব দিন। এক—আপনি কি খুনি, মানে, জয়দীপের হয়ে ওকালতি করছেন? দুই—ঠিক ক'টি প্রশ্ন করবেন?'

ওর কথা শুনতে-শুনতে, টেবিলের টুকিটাকি জিনিস দেখে নিচ্ছিলেন সত্য। চায়ের সরঞ্জাম। দুটি কাপে চা খাওয়া হয়ে গেছে। এখন পরিত্যক্ত। ব্রেকফাস্টের প্লেটেরও একই দশা। জলের গেলাস একটি ভরা ও অন্যটি প্রায় খালি। তিন-চার রকম ট্যাবলেটের কৌটো এবং স্ট্রিপ। ভরা গেলাসটি শকুন্তলার সামনে। মেয়েটির কথা শুনতে-শুনতে মনে-মনে তারিফ করলেন সত্য—সাব্বাস! এই তো চাই। বাবার ব্যাবসার যোগ্য ডাইরেক্টর। হুঁশিয়ার ওয়ারিশ। মুখ ফুটে জবাব দিলেন, 'প্রথম প্রশ্নের উত্তর—হ্যাঁ। কারণ, জয়দীপ খুনি না-ও হতে পারেন। দ্বিতীয়র জবাব—সাতটি।'

শকুন্তলা চুপ করে থাকল। ওর চোখ এড়িয়ে সত্যসাধন বুক পকেটে হাত ছোঁয়ালেন। তর্জনীর মৃদু চাপে টেপ রেকর্ডার অন হয়ে গেল। খুট শব্দটুকুও শোনা গেল না। কারণ, ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছেন সত্য, 'খুনের খবর পুনায় কে দিয়েছে আপনাদের এবং কখন?'

'আমাদের সিনিয়ার একজিকিউটিভ মিস্টার চওধরি ও ইন্সপেক্টর সাঠে। টেলিফোন পেয়েছিলুম সাড়ে ছ'টা নাগাদ।'

'রাত্রে বোম্বাই পৌঁছে এখানে এলেন, না, সোজা আপিসে গিয়েছিলেন? নাকি, অন্য কোথাও?'

'থানায় সাঠের সঙ্গে দেখা করে সোজা অফিসে।'

'জয়দীপকে ফোন করেছেন ক'টায়?'

'রাত প্রায় এগারোটা।'

'জয়দীপ ও আপনার ঘনিষ্ঠতা কি বিয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং মিস্টার কোরগাঁওকর কি তা জানেন?'

'এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। জবাব দেব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, ওর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—'

বলতে-বলতে শকুন্তলার গলা প্রায় বুজে এল। শেষের শব্দগুলি স্পষ্ট শুনতে পেলেন না সত্যসাধন।

'কেন?'

ঘৃণা-জড়িয়ে জবাব দিল শকুন্তলা, 'হি ইজ এ কেরিয়ারিস্ট। এ মার্ডারার —এ ফ্রড—'বলে, মুখ নামিয়ে বোধহয় কান্না চাপার চেষ্টা করল শকুন্তলা। সেই ফাঁকে সত্য পকেট থেকে জয়দীপের পকেটে পাওয়া চিরকুটটি বের করে দেখালেন, 'এটা কি আপনার হাতের লেখা?'

সামলে নিয়ে, আবার ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটার। চিরকুটটি দেখে বলল 'কে দিল আপনাকে? জয়দীপ?'

'হুঁ।'

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে শকুন্তলা, 'মাফ করবেন, আমার শরীর ভালো লাগছে না।'

সত্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। দেখাদেখি মাদলও। সত্য বললেন, 'সাতটার মধ্যে দুটি প্রশ্ন রয়ে গেছে। আপনার বাবা এখন কোথায়?

'পুনা ফিরে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন একটু আগে।'

টেবিলে ওষুধগুলোর মধ্যে দুটি বিলেতি কোম্পানির। এখানে, সোজা পথে এ-দেশে পাওয়া যায় না। সেগুলো দেখিয়ে সত্য বললেন, 'সপ্তম এবং শেষ প্রশ্ন। আপনার বাবার হাই ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবিটিস আছে মনে হয়। এ-সব ওষুধ কোত্থেকে কেনেন?'

শকুন্তলা একটুও না ভেবে জবাব দিল, 'খাপোলিতে আমার দূর সম্পর্কের কাকা আছেন। কেমিস্ট ও কেমিক্যালস সাপ্লায়ার। উনিই পাঠিয়ে দেন বা বাবা লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেন।'

'শেষ প্রশ্নের লেজ হিসেবেই—কাকার নামটা একটু বলে দিন।'

শকুন্তলার মুখে হাসি না ফুটলেও গুমোট ভাবটা কিছু কমল। গটগটিয়ে দালানের দিকে হেঁটে যেতে-যেতে নামটা ছুঁড়ে দিল, 'জগদীশ কোরগাঁওকর।'

টি-পটে হাত ছুঁইয়ে পরখ করলেন সত্য। তারপর গেটের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'শিগগির এসো, মাদল। চা এখনও কুসুম-কুসুম গরম আছে।'

নড়বড়িয়ে উঠল ঝমর। ঝম-ঝমর থেকে গিয়ার পালটে-পালটে প্রায় নিঃশব্দ এবং ঝড়ের গতিতে ছুটতে আরম্ভ করল।

ঝমরকে ছুটিয়ে দিয়ে মাদলকে জিগ্যেস করলেন সত্য, 'কে-কের গাড়ির নম্বর জানো?'

'না তো।'

'কী গাড়ি?'

'দু-তিন রকমের গাড়ি নিয়ে আসেন বোম্বেতে।'

'কোন-কোন গাড়ি তুমি দেখেছ অ্যাদ্দিনে? কী-কী রঙের?'

মাদল মনে করে-করে বলল, 'গাঢ় নীল অ্যাম্বাসাডার, লাল মারুতি-ভ্যান। আর—আর—ইয়ে, শেষ দেখেছি গত পরশু—নতুন গাড়ি—অই প্রিমিয়ার ওয়ান-ওয়ান এইট। সাদা রং।'

থানা ক্রিকের ব্রিজ পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে ছুটেছে ঝমর। দু-ধারে সবুজ খেত-খামার। দূরে ধূসর পাহাড়। তাজা রোদ পড়ে চারদিকে চনমনে ভাব। বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে মাদলের চোখে-মুখে। খালি পেটে চড়ুইপাখি, পায়রা ডেকে বেড়াচ্ছে। বলেই ফেলল, 'এখন কোথায় যাচ্ছি, সত্যকাকু? পুনা?'

'দরকার হলে পুনা। না হলে, খাপোলি।'

'খাপোলিতে গরম-গরম বটাটা, মানে, আলুর বড়া ভাজে সকালে—'

সত্য হেসে, বাধা দিলেন, 'খিদে পেয়েছে, তাই না?'

ব্যস, আর বলার দরকার নেই মাদলের। সেই থেকে খটকা লেগে আছে। জিগ্যেস করল অন্য কথা, 'চা গরম আছে, বললেন কেন হঠাৎ?'

'নিজেই ভেবে বের করো দেখি।'

খালি পেটে গভীর ভাবনা ভাবা মুশকিল। তবু, মাদল খতিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। চা গরম আছে, মানে, এখনও খাওয়া যায়। অথবা এইমাত্র দুজনে চা শেষ করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি খুলল তার। হেসে বলল, 'এ মা! এ তো খুব সোজা! তার মানে, ভদ্রলোক একটু আগেই বেরিয়েছেন। অর্থাৎ বেশি দূর যেতে পারেননি। হয়তো খাপোলিতেই ধরা যাবে—কি, তাই না, কাকু?'

সত্য মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'মস্তিষ্ককে অলস ফেলে রাখতে নেই। কার্যকারণ, আগে-পিছে ভাবতে থাকবে—নইলে গোয়েন্দা হওয়া যায় না—'

BanglaBook.org

সকালের ফাঁকা রাস্তা ধরে খাপোলি পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

ভিন্ন-ভিন্ন জাতের তিন-চারটে রেস্টুরেন্ট পথের দু-পাশে। মাদল দূর থেকেই শুনে দেখল, মাল-বোঝাই দুটি লরি ছাড়া, পাঁচখানা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে।

তকতকে নতুন সাদা প্রিমিয়ার ওয়ান-ওয়ান-এইট বাঁ-দিকের দোকান ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। দোকানের ওপরে সাইনবোর্ড—জে. কে. কেমিস্ট, ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিক্যালস সাপ্লায়ার। সামনে গাছের ছায়ায়, চেয়ারে বসে যে-লোকটি প্লেটে চা ঢেলে খাচ্ছে, তাকে দেখে সত্যসাধন মাদলকে জিগ্যেস করলেন, 'চেনো নাকি ওকে?'

মাদল অবাক গলায় বলল, 'অ্যাড-মার্কেটের শিবালকর।'

॥ এগারো ॥

ইন্সপেক্টর সাঠে ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়ালেন মিস্টার জোশীর ফ্ল্যাটবাড়ির কম্পাউন্ডে। পিছনে চওধরির গাড়ি থেকে নামল জুলি সালডানা, দত্তারাম এবং চওধরি স্বয়ং। শকুন্তলা ম্যাডামের লাল মারুতি ভ্যান আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

সাধারণত কাটা-ছেঁড়া বডি লাশকাটা ঘর থেকে সোজা শ্মশানেই নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, তিরাশি বছরের বৃদ্ধা, জোশীর পিসিমা সারা রাত উথাল-পাথাল কান্নাকাটি করেছেন শেষবারের মতো দেখবেন বলে। পুলিশ ভ্যানের পিছন দিক থেকে মাধব জোশীকে নামানো হল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মোড়া।

চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির পড়শিরা বেশিরভাগই জানালা বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু পুরুষ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা এসে জুটল কাছেপিঠে। চাপা গুঞ্জন। আপিসের ওরা দোতলায় উঠে গিয়ে খবর দিয়েছে। জোশীর বউ ছেলের হাত ধরে নেমে আসছে। পাশে জুলি। শকুন্তলা, দত্তারাম ও আরও দুজন প্রতিবেশী বৃদ্ধাকে ধরে-ধরে নামাচ্ছে।

ঠিক তখনই পুলিশ ভ্যানের দু-দিকে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি ও ঝমর। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে জয়দীপ নেমে এল। সত্যসাধন এগিয়ে গেলেন সাঠের দিকে। পিছনে মাদল। জয়দীপ যেন একটু ভয়ে-ভয়েই সাঠের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। সাঠের কাছে পৌঁছে সত্য নীচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'পোস্টমর্টেম কী বলে।'

'রিপোর্ট বিকেলে পাব। পেলেই জানাব।' শোকের ছায়ায় চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই। এমন কি সাঠের মতো উদাত্ত-কণ্ঠ পুলিশসায়েবও সে-রেওয়াজ না ভেঙে কথা বলছেন। এত ফিসফিসিয়ে যে, পিছনে দাঁড়ানো মাদলও আর শুনতে পেল না। ওঁরা কথা বলছেন, মাদল শোক-সন্তপ্ত মানুষদের লক্ষ করছে।

শবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বজনেরা, জোশীর স্ত্রী স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হলেন। ফরসা সুন্দর মুখটি ফোলা-ফোলা। জোশীর সঙ্গে বয়েসের ফারাক যথেষ্ট। এঁর বোধহয় তিরিশও হবে না। বেশ আঁটোসাটো শরীরে অসাব্যস্ত ছাপা শাড়ি কোনওমতে জড়ানো। মাথা নীচু করে নিঃশব্দে কাঁদছেন। জোশীর পিসিমাকে বসতে সাহায্য করছে শকুন্তলা ম্যাডাম। বিড়বিড় করে সমানে কী যে বকে যাচ্ছেন বুড়ি, শুনতে পাচ্ছে না মাদল। জোশীর মুখের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে চাদর সরাতে চেষ্টা করলেন। হাত কাঁপছে বলে, পেরে উঠছেন না। একজন সেপাই দাঁড়িয়েছিল। সামান্য ঝুঁকে জোশীর মুখের ঢাকনা সরিয়ে দিল সে। গোটা ভিড়টা একটু-আধটু নড়ে-চড়ে মুখটি দেখার-জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাদল ভেবে পেল না মরা একটা মানুষের মুখ দেখতে জ্যান্ত লোকগুলির এত উৎসাহ কেন? খুন হয়েছে বলে? নাকি, জীবিত চেনা, সেই মুখটির সঙ্গে এ-মুখের তফাত কীরকম—

BanglaBook.org

দেখার জন্যে! আর দেখা যাবে না এই মুখ বলেও হতে পারে! ভাবতে-ভাবতে, মাদল নিজেও দু-কদম সরে, একটি অচেনা কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে উঁকি দিয়ে দেখল। বেলা এগারোটার খটখটে আলোয় নীলচে, ফোলা-ফোলা জোশী সাহেবের শেষ চেহারা। দু'টি মাছি উড়ছিল।

একটি ঠোঁটে, অন্যটি টাকের ওপর বসছে, উড়ছে আবার। চওধরি বোধহয় লক্ষ করল। এগিয়ে এসে হাত নাড়ল একবার। মাছিরা সরে গেল কিনা বোঝবার আগেই দারুণ চমকে উঠল সবাই। জোশীর বৃদ্ধা পিসিমা কাঁপা এবং ভাঙা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছেন হঠাৎ। না, শুধু কান্না নয়।

মারাঠি ভাষায় অকথ্য গালাগাল দিচ্ছেন চওধরিকে, যার বাংলা করলে দাঁড়াবে অনেকটা, 'মুখপোড়া, মাতাল, লুচ্চা কোথাকার! ছুঁবি না। ছুঁবি না ছেলেকে।' সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ব্যাপার কী? প্রতিবেশীদের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস জুড়ে দিয়েছে। মাদলের মনে হল, বুড়ি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে—এত রাগ! শোকে মাথা খারাপ হল না তো? ছোটবেলা থেকে বাপ-মা-মরা জোশীকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছে। মাথায় ধাক্কা লাগতেই পারে।

তারপরেই, বাপরে! এ কী কাণ্ড!

অশীতিপর বৃদ্ধা এমনিতেই ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছেন না। তার ওপর অমন শীর্ণকায় লোলচর্ম শরীর যেন পাহাড়-প্রমাণ ঘৃণা এবং ক্রোধে নুয়ে পড়ে টাল-মাটাল। সমানে শাপ-শাপান্ত করে যাচ্ছেন চওধরিকে। বাছা-বাছা মারাঠি গালাগাল ও বক্তব্যের বিষয় শুনে মাদল তো থ! বলে কি বুড়ি।

'ওরে মুখপোড়া, শকুনের বাচ্চা মাতাল! তুই কি আর বেলেল্লাপনার জায়গা পেলি না? মাধবের সংসার ভাঙতে এলি!—'

হাত ঘুরিয়ে জোশীর স্ত্রীকে দেখিয়ে জুড়ে দিলেন, 'ভাঙলি তো—ছেনাল মাগিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলি না কেন? হারামজাদা, মলখেকোর পো—আমার ছেলেটাকে না মেরে তোর কেলো কলজে ঠান্ডা হল না—'

শকুন্তলা ওঁকে ঠান্ডা করবার বৃথা চেষ্টা করছে। অমন টকটকে রং চওধরির—যেন, কালি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ! তবু, কাঁচুমাচু মুখে লোকটা বোঝাবার চেষ্টা করছে দু-হাত তুলে, বুড়ির কাছে গিয়ে, 'আহা মাসিমা! শান্ত হোন! এইভাবে উলটোপালটা মুখ খারাপ করলে কি মাধবের আত্মা শান্তি পাবে?—'

কীসের কী? টার্গেটকে হাতের কাছে পেয়েই বোধহয় দ্বিগুণ উৎসাহে হামলে পড়লেন পিসিমা। খামচে ধরলেন ওর কলার। একটি মৃতদেহের সামনে সে ভারী বেমানান দৃশ্য। জোশীর ছ'সাত বছরের ছেলেটি মৃত্যুর তেমন কিছু বোঝে না বোধহয়। এতক্ষণ, চুপচাপ জুলজুল চোখে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন, পুলিশের ইউনিফর্ম, পিস্তল ইত্যাদি দেখছিল। এবার, হয়তো ভয় পেয়েই ডুকরে কেঁদে ফেলল।

দু-তিনজন প্রতিবেশীর সাহায্যে শকুন্তলা ও দত্তারাম পিসিমাকে সরে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে বসিয়ে দিল। বুড়ি হাঁফাচ্ছেন তখন।

এদিকে, সত্যসাধন ও সাঠে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন। এবার পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন দুজনেই। চওধরির কাছে এসে সাঠে প্রায় কানে-কানে বললেন, 'মিস্টার চওধরি! একটু আসুন তো!'

মাদল একবার ভাবল ওদের পিছন-পিছন যায়। না গিয়ে, জয়দীপের কাছে চলে এল।

'জয়দীপদা, কী ব্যাপার বলুন তো?'

জয়দীপ বৃদ্ধা এবং শকুন্তলাকে দেখছিল। অন্য কিছু ভাবছিল বোধহয়। মাদলের কথা শুনে একটু যেন চমকে উঠল। বলল, 'কীসের কী ব্যাপার?'

মাদল বলল, 'ইয়ে, মানে—বৃদ্ধা অমন খেপে গেলেন কেন?' জয়দীপের জবাবে বিস্ময়,

BanglaBook.org

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! তবে, চওধরির সঙ্গে বোধহয় এ-পরিবারের সম্পর্ক বেশ কাছের।'

মাদলের মনে হল, জয়দীপদা বেশি ভাঙতে চাইছে না এখন। অবশ্য, এটাও ঠিক—বিষয়টা মুখরোচক হলেও স্থান-কালের বিচারে রুচি-সঙ্গত নয়। তা ছাড়া, মাদল আরও ভেবে দেখল, সব ব্যাপারে অপরিসীম কৌতূহল থাকা গোয়েন্দার কাছে প্রায়োজন তবে, তার পক্ষে সেটা সব সময়, সব ক্ষেত্রে প্রকাশ করে ফেলা ভালো নয়। কারণ, সে না সরকারি পুলিশ, না, বেসরকারি গোয়েন্দা। সুতরাং, মাদল বসু চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে যেতে লাগল।

পিসিমাকে ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা। তবু সিঁড়ি ভাঙার সময় মাঝে-মধ্যে হেঁচকি তোলার মতো কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। মিসেস জোশী যেমন স্থাণু হয়ে বসেছিলেন, তেমনি রয়েছেন। একমাত্র ছেলে তাঁর কোলে মাথা গুঁজে হাঁটু মুড়ে বসে। মহিলার পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে জুলি সালডানা।

মাছ-ভাজার তেলতেলে গন্ধ ভেসে এল মাদলের ঘ্রাণে। সকালের রোদ দুপুরের দিকে দ্রুত হাঁটছে। শবদেহের কাছাকাছি পৌঁছে গেল প্রায়। মাদলের বাঁ-পাশে দাঁড়ানো লোকটি বোধহয় দক্ষিণের। লুঙি ও ফতুয়া পরনে। সিঁড়ি দিয়েই নেমে এসেছে কম্পাউন্ডে। মাদল ধরে নিল, এ-বাড়িরই বাসিন্দা। গলা খাটো করে হিন্দিতে জিগ্যেস করলে, 'শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কী ব্যবস্থা?'

লোকটিও চাপা গলায় জবাব দিল, 'ফোন করা হয়েছে। শিবসেনার শববাহিকা ভ্যান এক্ষুনি এসে পড়ল বলে।'

'জোশীর আত্মীয়-স্বজন?

'খুব বেশি আত্মীয়-স্বজন তো কখনোই ওঁর ফ্ল্যাটে আসতে দেখিনি। ওই নীল ডোরাকাটা জামা-পরা মামাতো ভাই। ওরই কাছাকাছি যে তিন-চারজনকে দেখছেন, ওরা কীরকম সম্পর্কের জানি না। তবে, কখনও-সখনও, মানে, ন'মাসে-ছ'মাসে মুখ দেখেছি—এই পর্যন্ত। আপনি?'

'আমি আপিসের।' জবাব সেরেই মাদলের আবার জিভ চুলকোল। লোকটি ওর চেয়ে বয়েসে খুব বেশি নয়। মিশুকেও মনে হচ্ছে। জিগ্যেস করে দেখা যাক, ভেবে যতটা সম্ভব কৌতূহলবিহীন প্রশ্ন করলে মাদল, 'আচ্ছা ওই বৃদ্ধা, মানে, জোশীসায়েবের পিসিমা হঠাৎ অমন চেঁচামেচি করলেন কেন? মিস্টার চওধরির ওপরে খুব খাপপা দেখলুম?'

'আপনি যা দেখলেন-শুনলেন, আমিও তাই। এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।'

বলে, মুখে কুলুপ লাগিয়েই যেন অন্য দিকে মনোযোগ দিল লোকটি।

কী আর হবে? মারবে তো না! এই পরিবেশে চেঁচিয়েও উঠবে না—ভেবে মাদল খুবই আন্তরিক গলায় আর-এক খোঁচা দিল, 'না। মানে, আমি তো আপিসের লোক। কদ্দুর আর জানব বলুন? আর, আপনি তো এ-বাড়িতেই থাকেন। সজাগ প্রতিবেশী হিসেবে হয়তো আমার চেয়ে একটু বেশিই জেনেশুনে থাকবেন!'

গ্যাসে কাজ হল। মুখ ফেরাল দক্ষিণীবাবু। হিসহিস গলায় বলল, 'আছে ব্রাদার। কেলেঙ্কারি আছে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ। চনমনে জওয়ানিও রয়েছে গতরে। আধা-বুড়ো ঠান্ডা সোয়ামিতে শানাবে কেন?'

বলে, চারপাশে জরিপ করে নিল লোকটা। ফের বলল, 'আপনাদের চওধরিও বাপু ধুরন্ধর মাল। গোড়ায়-গোড়ায় জোশীর সঙ্গেই আসত। গত বছরখানেক ধরে দেখছি একাই দিন-দুপুরে এসে হাজির হচ্ছে। মেয়েটা যায় ইস্কুলে। বুড়ি তো সারাক্ষণ ওঁর ঘরের খাটেই শুয়ে থাকে। কস্টিনস্টির অসুবিধে নেই—তাছাড়া, এ-পাড়ার লোকেও দুজনকে দিন দুপুরে হোটেলে-মোটেলে ঢুকতে দেখেছে—' বলতে-বলতে শিবসেনার সাদা ভ্যান প্যাঁ-পোঁ করে এসে গেল।

ফুল-টুল নিয়ে আসা হয়েছে। অতি সাধারণ ভাবে, নিয়ম-মানার জন্যেই যেন, ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হল। দত্তারাম একটি বড় তোড়া এনেছে কখন কে জানে? সেটি দিল শকুন্তলা মেমসাব।

BanglaBook.org

আপিসের তরফ থেকেই বোধহয়।

'রামনাম' সামান্য কান্নার আওয়াজ এবং শবদেহ তোলার মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে মাধব জোশীকে শেষবারের যাত্রার জন্যে মোটরে তুলে দেওয়া হল।

মাদলও যন্ত্রচালিতের মতো হাত লাগিয়েছিল। ও-সবের মধ্যেও মনে একটা খচখচানি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে সেই থেকে। চওধরিই কি তবে কালপ্রিট? জোশী সরে যাওয়ায় ওর সুবিধে তো এখন বাধা-বন্ধ-হারা। মাতাল মানুষ। খুনিও কি?

পুলিশ ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে সাঠে ও সত্যসাধন চওধরির সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাঠেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। সত্য শুনছিলেন। চওধরি বলল, 'এবার আমায় ছেড়ে দিন। শ্মশানে যেতে হবে।'

ইনস্পেক্টর সাঠের গলায় কি সামান্য ব্যঙ্গের সুর, 'শ্মশানে গিয়ে আর হবে কী? এখন তো বরং আপনার এখানে থাকাই ভালো। সান্ত্বনা-টান্ত্বনা।'

'ছি-ছি,! কী বলছেন আপনি? স্যারের শেষযাত্রায়—! তা ছাড়া, ওখানে কী লাগে-টাগে—' বলতে-বলতে, নিজের গাড়ির দিকে এক পা বাড়াল চওধরি।

ইনস্পেক্টর সাঠে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে। যান। আমি থানায় থাকব। আপনি ওখান থেকে সোজা থানায় চলে আসবেন। একঘণ্টার মধ্যে। মড়া ছাই হল কিনা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করবেন না আবার!' শিবসেনার হার্স বেরিয়ে যেতেই, সাঠে বললেন, 'আমি চলি হে, সাধনকর! সায়ন হাসপাতালে একবার ঢুঁ মারতে হবে। তুমি কি যাবে, না এখানেই সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে?'

সত্য কী একটা ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'নাহ! যাব এবার। এখানে থেকে আর করবটা কী?'

কালো ভ্যানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে ঠাট্টা করলেন সাঠে 'সে কী। বাতাসে ফুঁ দিয়ে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সূত্র খুঁজবে না।' জোরে শ্বাস টেনে সাঠে জুড়ে দিলেন। 'আহ! দারুণ মাছ ভাজা হচ্ছে। হয় পমফ্রেট, নয় রাউস। শোঁকো হে! আমি চলি—'

ওঁর ভ্যান বেরিয়ে গেল। মাদল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসল গাড়ি দুটি বেরিয়ে যেতেই কম্পাউন্ড প্রায় সাফ।

হঠাৎ সিঁড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন সত্য। মাদলকে ডাকলেন, 'এসো দেখি।'

দোতলায় উঠে জোশীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। পেছনে মাদল। দরজা খোলা। ল্যান্ডিংয়ের দু-ধারে আরও দুটি ফ্ল্যাটের দরজা। জনা পাঁচ-ছয়েক নারী-পুরুষের ছোট জটলা। জোশীর হলঘরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানে, জুলি সালডানা সোফায় বসে কারুর সঙ্গে কথা বলছে নীচু গলায়; দ্বিতীয় ব্যক্তি দরজার আড়ালে বলে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

সত্যকে দেখে জুলি উঠে দাঁড়াল। শুকনো এবং দ্বিধা-ভরা হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে জিগ্যেস করলে, 'ইয়েস স্যার?'

'মে আই কাম ইন?' বলতে-বলতে সত্য এককদম ঢুকে পড়লেন ঘরের চৌহদ্দিতে। হলের একদিকে সোফাসেট, অন্য প্রান্তে ডাইনিং টেবিল ঘিরে ছ'টা চেয়ার। তার একটাতে মিসেস জোশী। অন্যটায় শকুন্তলা। দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে, টেবিলে মাথা রেখেছেন মিসেস জোশী। পিছন থেকে দেখে মনে হয় মাঝে-মাঝে শরীর কেঁপে উঠছে। কাঁদছেন। জুলি কথা বলছিল শকুন্তলার সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে পড়তেই শকুন্তলা খানিকটা বাঁকা সুরে বলল, 'ইউ হ্যাভ অলরেডি কাম ইন। জিগ্যেস করা তো বাহুল্য।—' জুলি তাড়াতাড়ি পরিচয় দেওয়ার ধরনে বলে উঠল, 'ম্যাডাম, ইনি মিস্টার রয়ের হয়ে ইনভেস্টি—'

শকুন্তলা হাত তুলে বাধা দিল জুলিকে। এবং সত্যকে বলল, 'এখানে কী? এখানেও জেরা করবেন নাকি?'

BanglaBook.org

সত্যর মুখে বিনয়ের হাসি, 'আপনাকে নয়। এবং জেরাও নয়। মিসেস জোশীর সঙ্গে দুটো কথা বলার দরকার ছিল—'

মাথা না তুলেই, কান্নাভাঙা অথচ কড়া গলায় জবাব দিলেন মহিলা, 'আমার কারুর সঙ্গে কোনও কথা নেই। বলবারও নেই। শোনবারও নয়।—' বলতে-বলতে সামান্য মুখ তুলে সত্যকে দেখে বললেন, 'ইউ মে প্লিজ গেট আউট। ডোন্ট ডিস্টার্ব মি।—' মাদল যেটুকু ঘরে ঢুকেছিল, অভ্যর্থনার নমুনা দেখে সেটুকুও পিছিয়ে গেল। সত্য দমলেন না। বললেন, 'তা হলে আপনার স্বামীকে চওধরিই খুন করেছে, বলছেন?'

এবার চমকে সোজা হয়ে বসলেন মহিলা। 'কিছুতেই না। কী বলতে চান, আপনি?'

'আমার তো কোনও কথাই শুনতে চাইছেন না। তবে, চওধরিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল বলেই ভাবলুম, হয়তো আপনার সাহায্যে আসতেও পারি।

শকুন্তলা বলল, 'চওধরিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল? মিথ্যে কথা।'

সত্য বললেন, 'একটু বাদে থানায় ফোন করলেই সত্যি-মিথ্যে টের পাবেন।'

মহিলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ মুছলেন আঁচলে। বললেন, 'আপনি কে?'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার।'

'ভেতরে আসুন।'

সত্য মাদলকে ডেকে নিলেন—'এসো মাদল।'

ছোট প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাদল দেখল ডানদিকে রান্নাঘর। তেমন গোছানো নয়। বাঁ-দিকে টয়লেট। রান্নাঘরের পরে ছোট বেডরুম। আধা-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বৃদ্ধা পিসিমা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। কেমন একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ আসছে। তারপরে, মাস্টার বেডরুমের খোলা দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ডবল-বেডের বিছানায় চাদর বালিশ অগোছালো। ওয়াল ক্যাবিনেট। ড্রেসিং টেবিল ও দুটি ছোট গদিমোড়া টুল। বাঁ-ধারের কোণে জানালা-ঘেঁষে একটা টেবিল-চেয়ার। টেবিলে খানকয়েক বই, টেবল-ল্যাম্প।

মিসেস জোশী চেয়ারটির মুখ বিছানার দিকে ঘুরিয়ে সত্যকাকুকে বললেন, 'প্লিজ সিট ডাউন।' মাদলের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

সত্যকাকু না বসে মিসেস জোশীকে বললেন, ইংরিজিতে, 'এ আমার সহকারী—মাদল বসু।'

'অ।' বিরক্তি চাপা-দেওয়ার ধরনে জবাব দিলেন মহিলা। তারপর, অপাঙ্গে এক পলক দেখে নিয়ে মাদলকে বললেন, 'ওখানে বসতে পারেন।'

মানে, ড্রেসিং টেবিলের টুলে।

'থ্যাংক ইউ'—বলে, আম্লানবদনে বসে পড়ল মাদল। বসেই, খেয়াল হল, আয়নার পাশে, দেওয়াল গেঁথে লাগানো রয়েছে এ-সি-মেশিন। বন্ধ এখন।

একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাটের ধার ঘেঁষে বসলেন মিসেস জোশী। কাছ থেকে এবার মাদল টের পেল ওঁর মুখে, গলায়, ঘাড়ে অল্প-অল্প ঘাম। চোখের কোলে রাত-জাগার ছাপ। শাড়ির আঁচল বুলিয়ে মুখ মুছে যেন তৈরি হয়ে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন কী জানতে চান?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সত্যকাকু দুম করে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'মিস্টার চওধরির সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?'

নীচের কম্পাউন্ডে অমন নাটকীয় ঘটনা, বৃদ্ধা পিসিমার চিৎকার ইত্যাদির পর এ-প্রশ্ন যে আসবে তা নিশ্চয়ই মহিলা আশঙ্কা করেছিলেন। তবে, মুখে সামান্য চমকানোর ভাব দেখে বোঝা গেল, একেবারে গোড়াতেই সরাসরি বুলেট ছুটে আসবে—ভাবতে পারেননি।

সামলে নিয়ে, সপ্রতিভ গলায় জবাব দেওয়ার চেষ্টাও মাদলের চোখে পড়ল, 'স্বামীর কলিগ এবং বন্ধু। এ-বাড়ির প্রায় পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন।—'

BanglaBook.org

ভারী শান্ত এবং নির্লিপ্ত কণ্ঠে সত্যকাকু আবার বললেন, 'আই রিপিট—মিস্টার চওধরির সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?'

॥ বারো ॥

মাদল লক্ষ করল সত্যকাকু 'আপনার' শব্দটিতে পাথরের ওজন চাপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

'বন্ধুর মতো।'

'পুরুষ-বন্ধুর মতো বলছেন?'

'হ্যাঁ—' বলেই ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করলেন মিসেস জোশী, 'মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'বলতে চাই না কিছুই। স্রেফ জানতে চাই—মিস্টার জোশীর পিসিমা যে-কথাগুলো বললেন তার কতখানি সত্য?'

দ্যাখন হাসির চেষ্টা দিয়ে ঠাট্টার গলায় মহিলা বললেন, 'সেনিলিটি বলে একটা কথা আছে—ভীমরতি? নিশ্চয়ই শুনেছেন?'—

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন সত্যকাকু। হ্যাঁ, শুনেছেন।

'ওঁর বয়েস বিরাশি। সাতান্নরকম রোগে ধুঁকছেন। আবোল-তাবোল বকা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি?'

সত্যকাকু এক সেকেন্ড চুপ থেকে বোধহয় পরের প্রশ্ন সাজাচ্ছিলেন মনে-মনে। মাদল হুট করে জিগ্যেস করল, 'কাকু, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে সত্যসাধন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবার মধ্যেই মহিলা প্রায় টিটকারির গলায় বললেন ওঁকে, 'আপনার চ্যালা টিকটিকির কথাও শুনতে হবে নাকি?'

সত্যকাকুর মাথা নাড়া দেখে নিয়েছে মাদল। মহিলার কথা গায়ে না মেখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে জিগ্যেস করলে, 'বম্বে শহরের কয়েকটি আধাখ্যাত আবাসিক হোটেলে ভর-দুপুরে আপনাকে ঢুকতে দেখা গেছে। চওধরি সায়েবের সঙ্গে অবশ্যই।—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তেরিয়া ভঙ্গিতে মহিলা বলে উঠলেন, 'শাট আপ!—কোথায়? কোন হোটেলে?'

মাদলকে এক মুহূর্ত চুপ দেখে সত্যসাধন বললেন, মিসেস জোশী, মাফ করবেন। আমি ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না—আপনার প্রশ্নের জবাব আমরা দেব, না, আপনি আমাদের প্রশ্নের?'

গলা নরম করে মহিল বললেন, 'এই সব ভিত্তিহীন ফালতু প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজি নই।'

সত্য মৃদু হাসলেন, 'ভিত্তিহীন হলে, খুব সম্ভবত আপনি "কোন হোটেলে" কথাটি বলে ফেলতেন না! এনিওয়ে থ্যাঙ্ক ইউ, মাদল—' শেষেরটুকু মাদলকে উপহার দিয়ে আবার ঘুরলেন মহিলার দিকে।

'একটি বাস্তব প্রশ্নের সোজা উত্তর দিলে আপনাকে তথা, চওধরি সায়েবকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব এবং সহজ হবে।'

সাপের উদ্যত ফণা নেতিয়েছে, এমনই ধরনে বললেন মিসেস জোশী, 'বলুন।'

'চওধরির সঙ্গে আপনার যতখানি বা যেটুকু সম্পর্কই থাক—তা কি মিস্টার জোশী, মানে আপনার স্বামী জানতেন?'

মাথা নীচু করে ধরা গলায় জবাব। 'কিছুটা।'

BanglaBook.org

'মানে, পুরোটা নয়?'

সত্যকাকুর প্রশ্নে চমৎকৃত হল মাদল। এ-ক্ষেত্রে, সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না দেখে উনি আঙুল বেঁকিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কাজও হল। কারণ, মহিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তেমনি মুখ নীচু করেই তাঁর গলায় ভাঙনের সুর ফুটল, 'আপনি বিশ্বাস করুন, হরবিলাসকে আমার মতো কেউই বোধহয় জানে না। ওর পক্ষে, এমন নৃশংস কাণ্ড—না, না—এ অসম্ভব। ওরা পরশুও দুজনে এই এ-ঘরে বসে ড্রিংক করেছে একসঙ্গে।—'

'ওদের দুজনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ইদানীং?'

মুখ তুললেন মিসেস জোশী। চোখে জল জমছে। সামলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'না। কোনওদিনও তেমন কিছু আমি দেখিনি, শুনিনি।'

'হরবিলাস চওধরির সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে—যখন মিস্টার জোশী উপস্থিত ছিলেন না?'

'গতকাল।'

'কোথায়? বাড়িতেই?'

'না। "কপার চিমনি" রেস্তোরাঁয়।'

'কখন?'

'বেলা এগারোটা নাগাদ।'

'কতক্ষণ ছিলেন একসঙ্গে।'

'ঘণ্টাখানেক।'

'তারপর?'

'ও আপিসে চলে যায়। আমি বাসায় ফিরে আসি।'

মিস্টার জোশী প্রসঙ্গে কোনও কথা? আলোচনা?'

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মিসেস জোশীর জবাব, 'না।'

উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সত্যসাধন বললেন, 'শেষ দুটি প্রশ্ন। মিস্টার চওধরি অবিবাহিত। আপনারা দুজনে কি বিয়ের কথা ভাবছিলেন?'

'আমার স্বামী সরল ও উদারচেতা ছিলেন। ওঁকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবিনি কখনও।'

'কিন্তু মিস্টার চওধরি?'

একটু চুপ থেকে জবাব দিলেন মহিলা, 'ওঁকেই জিগ্যেস করবেন।' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন খাট থেকে। মাদলও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিসেস জোশী দরজার দিকে এগোতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। সত্যকাকুকে জিগ্যেস করলেন, 'হরবিলাসকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? আপনি ঠিক বলছেন?'

'এখনও অ্যারেস্টেড হননি। তবে থানায় ওঁকে যেতে হচ্ছে। তারপর কী হবে বলা মুশকিল।'

'আপনি কি ওকে সাহায্য করতে পারেন না? আমি আপনার ফিস দেব, কারণ, আমি জানতে চাই হরবিলাস এরকম অমানুষিক ব্যাপারে থাকতে পারে কি না—না, না অসম্ভব।'

বলে মুখ নামিয়ে যেন নিজেকে সংযত করতে সময় নিলেন মিসেস জোশী।

সত্যকাকু হঠাৎ জিগ্যেস করলেন ঘর থেকে বেরোবার মুখে, 'আপনার ছেলেকে দেখছি না?'

মুখ তুলে ম্লান হাসবার চেষ্টা করলেন মহিলা। বললেন, 'ওকে পাশের ফ্ল্যাটে প্রতিবেশীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই শোক, এই নোংরা কথাবার্তার মধ্যে ওর না-থাকাই ভালো। কী বলেন?'

মাথা নেড়ে সত্যকাকু বললেন, 'ঠিক করেছেন। বড়ই নোংরা—'

হঠাৎ মাদলের সামনেই, মহিলা সত্যকাকুর হাত ধরে ফেললেন। কান্না চাপার চেষ্টা করে,

BanglaBook.org

অনুরোধের গলায় বললেন, 'হরবিলাসের কিছু হবে না তো? ওকে আপনি সাহায্য করুন। ও ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই এখন।'

শুনে মাদলের মন তেতো হয়ে গেল। সবে স্বামী খুন হয়েছে। তার কিনারা এখনও হয়নি। তার শেষকৃত্যও বাকি এখনও। এই অবস্থায়, এমন করে কথা বলতে পারল মহিলা! পরক্ষণেই ভাবার চেষ্টা করল মাদল অন্যদিক। সত্যিই তো! বুড়ি পিসিমার দু-চক্ষের বিষ। একমাত্র ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে মিসেস জোশীর একমাত্র সহায় হয়তো তার অবৈধ প্রেমিক।

সত্যকাকুর মাপা জবাব শুনতে পেল মাদল, 'উনি যদি নির্দোষ হন, আমি কথা দিচ্ছি—ওঁর কিছু হবে না।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে তিনজন প্যাসেজ ধরে হাঁটতে লাগল।

আহা-হা! দেখেও আনন্দ! মাদলের ঠিক এই কথাই মনে হল। যদিও বিশাল ঘরটি একটু স্যাঁতসেঁতে। মাটির নীচে বলেই হয়তো। যদিও ঘরটির কোনও দেওয়ালে কোনও জানালা নেই, এবং যদিও, স্রেফ একটাই দরজা—যেটা দিয়ে মাদল ঘরে ঢুকেছে! তবু, চারিদিকে এতগুলি সাদা-সাদা ক্যানভাস—অবশ্যই স্ট্রেচ করে ফ্রেমে লাগানো—! তার ওপরে, নীচু টেবিলে এবং প্যাকিং বাক্সে গাদাগুচ্ছের রং-ভরতি টিউব। সবকিছু যেন মাদলের স্পর্শের অপেক্ষায় হাঁ করে চেয়ে আছে।।

মাদল খুশি-খুশি, অবাক গলায় বললে, 'এ-এ স-অ-ব আমার??' খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা পরিপূর্ণ যুবকের কণ্ঠস্বর প্রায় শিশুর মতো শোনাল।

যুবক দেখতে পেল না, জেজে রুদ্রাক্ষর দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসি দিল। রুদ্রাক্ষ গম্ভীর। এয়ার কন্ডিশন মেশিনের মৃদু আওয়াজ না থাকলে ওঃ উত্তর এ-ঘরে নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনিত হত, 'হ্যাঁ, তোমার। আপাতত। ছবি আঁকার জন্যে।'

একশো পাওয়ারের একটা নাঙ্গা বালব ঝুলছে সিলিং থেকে। মস্ত ঘরটির বেশিরভাগই মরা আলোয় আবছা।

পিছনে, রুদ্রাক্ষ এবং জেজের দিকে ঘুরে মাদল জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু আলো? এ-আলোয় তো রং বোঝাই যাবে না?' বসের ইশারায় জেজে হাত ছোঁয়াল দরজার পিছনে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের চার কোণে নকল সিলিং-এর তলা দিয়ে চারটে আলো জ্বলে উঠল। পরপর। দুটো স্পট। ইজেল, ক্যানভাস, রং, প্যালেট—তকতকে আলোয় অলঙ্কারের মতো ঝকঝক করতে লাগল শিল্পী মাদলের চোখের সামনে।

পেতে আরম্ভ করলে, মানুষ স্বভাবতই—আরও কি পাওয়া যায়—কতখানি—জেনে নেওয়ার তৃষ্ণায় আকুল হয়। মাদলেরও প্রায় তেমনি অবস্থা। না কি, ওর মনের লুকোনো কোণে অন্য জিজ্ঞাসা? 'কিন্তু ন্যাচারাল লাইট? দিনের আলো কই? এরকম নকল আলো, মানে, আর্টিফিশিয়াল লাইটে, তো অনেক হলুদ সাদা দেখাবে। অনেক নীল সবুজ। যা আঁকব, বাইরের আলোয় তো সেরকম দেখা না-ও যেতে পারে?'

ঠিক সময়েই জুহুতে গাড়ি এসে পৌঁছেছিল। মাদলও তার ছবি-টবি নিয়ে যথা সময়ে ওয়ালকেশ্বরের এই অট্টালিকায় হাজির হয়েছে। প্রধান ঘরের একদিকে করিডোর যেমন শেষ হয় হলুদ চেম্বারে, অন্য দিকে তেমনি লাল চেম্বার। সমস্ত কিছুই লাল বা লালচে। সেখানে জেজে নিয়ে গেল তার বসের সঙ্গে আলাপ করাতে। ঘরে ঢুকতেই গা ছমছম করে। দু-পাঁচটা খুন করে লাশ সরিয়ে ফেললে রক্তের দাগ চেনা যাবে না এখানে। অন্তত, খালি চোখে। ক্রিমসান রংয়ের মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে বস। মুখটি ক্ষণিকের জন্যে চমকে দিয়েছে মাদলকে। উরিত্তারা!

BanglaBook.org

এ তো অনুপম খের। সিনেমার নামকরা ভিলেন।

মাদলের ছবিগুলি টেবিলে সাজিয়ে রাখল জেজে। দ্রুত চোখ বুলোচ্ছে বস। মাদল ভাবছে, এই-ই তাহলে রুদ্রাক্ষ সেন। নাটের গুরু। উঁহু! গুরুর গুরু মহাগুরুও আছেন। তিনি 'কফেপোসা' ও 'ফেরা'র আসামী। কী কাপ্তান যেন বলেছিলেন সত্যকাকু! দুবাই না আবুধাবিতে থাকে এখন। কলকাঠি নাড়ে ওখান থেকেই।

ছবি দেখে রুদ্রাক্ষ বলল, 'হুম! ঠিক হ্যায়!'

আইব্বাস! গলা তো একেবারে আর-এক হিন্দি ভিলেনের। অমরীশ পুরি। দানা-ওয়ালা জলদ-গম্ভীর স্বর ঘরে গমগম করে উঠল।

জেজেকে হুকুম দিল হিন্দিতে, 'ওকে নিয়ে যাও। ঘর-টর দেখিয়ে দাও। খেয়াল রেখো—ওর যেন এখানে কোনও অসুবিধে না হয়।'

তারপর, মাদলকে জিগ্যেস করল বাংলায়, 'তোমার নাম কী?'

ও যে বাঙালি—সেটা নিশ্চয়ই জগগু জেজেকে এবং জেজে বসকে বলেছে।

বিনীত জবাব মাদলের, 'মাদল।'

'বাহ! তুমি বাজাতে জানো?'

মাদল অবাক, 'কী স্যার?'

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে রুদ্রাক্ষ বলল, 'অই, তোমার নাম! তা, তুমি ছবি আঁকতে শিখলে কোথায়?'

'কলকাতায়। দু-বছর। আর্ট স্কুলে।'

'যাও। আজ থেকে কাজে লেগে যাবে।'

'কী কাজ, স্যার?'

'ছবি আঁকবে। যত ইচ্ছে। যেমন খুশি। যত বেশি এবং দ্রুত আঁকবে, তত টাকা।'

'কত টাকা, স্যার?'

'ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে রুদ্রাক্ষর, 'কত চাই?'

লজ্জা পেয়ে গেল মাদল, 'সে—স্যার—আমি কেমন করে জানব—!'

'রাস্তায় বসে কত করে পেতে?'

'এই দশ-কুড়ি। সবচেয়ে বড় ছবির দাম পঞ্চাশ টাকা।'

'প্রত্যেক ছবির জন্যে তুমি পাঁচশো টাকা করে পাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাদলের আফশোস হল। ইশ। এরা যদি গুণ্ডা-বদমাশ বা স্মাগলার না হত? তা হলে, সারা জীবন এখানে কাজ করত সে। টাকা-বাড়ি-গাড়ি আরও টাকা। ইশ, মনে-মনে সে বলল—'ওরে! তোরা মানুষ হলি না কেন রে?'

মাদল চুপ করে ছিল বলে, রুদ্রাক্ষ বলল, 'কী? ঠিক আছে তো?'

একগাল হেসে মাথা নাড়াল মাদল। রুদ্রাক্ষ আরও বলল, 'তুমি কিন্তু এক বছর ছুটি পাবে না। এ-বাড়ির যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে। তবে, বাড়ির বাইরে নয়। বছর শেষে একমাসের ছুটিতে তুমি বাড়ি, মানে, কলকাতায় যেতে পারবে। প্লেনে যাবে-আসবে।'

মাদল ভাবল—তার মানে, ও কি এখন থেকেই বন্দি হয়ে গেল? রঘুনাথ কী যেন বলছিল সেদিন? ওর ভাই এখানে ছবি আঁকত। ওকেও এরা সাবাড় করে দিয়েছে! তাহলে, সে কি এখানে ওই রঘুনাথের ভাইয়ের শূন্যস্থান পূরণ করতে এসেছে? লাল ঠান্ডা ঘরে এমনিতেই শীত-শীত ভাব। এই মুহূর্তে মাদলের ভেতরে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল।

বসকে একটু তোয়াজ করে 'মস্কা' মারলে হয়! খুশি হবে লোকটা। ভেবে নিয়ে মাদল বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না একটা কথা বলব?'

BanglaBook.org

'বলো।'

'আপনাকে না, স্যার, অনেকটা সিনেমার—' গম্ভীর স্বরে বাধা পেল মাদল 'হুম জানি।'

বলেই, প্রসঙ্গ পালটাতে রুদ্রাক্ষ চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'চলো। তোমার স্টুডিও দেখিয়ে দিই। আও জেজে।' লোকটা খুশি হল কিনা বোঝা গেল না। তাই, আরেকটা চেষ্টা দিল মাদল, হাঁটতে-হাঁটতে, 'স্যার, আপনার পোর্ট্রেট এঁকে দেব?

দুম করে দাঁড়িয়ে পড়ল রুদ্রাক্ষ। ঘুরে, ওর মুখোমুখি হল, চোখে-চোখে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ভয়ঙ্কর চোখের চাউনি! মাদলের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা কী একটা নামছে। ভয়ে, চোখ সরিয়ে নিল সে। রুদ্রাক্ষ খুব ধীরে-ধীরে বরফের গলায় কেটে-কেটে উচ্চারণ করল—'না। কোনও মানুষের। জীবিত বা। মৃত। মুখ আঁকবে না।'

সায় দিতে গিয়ে, গলা মৃদু কেঁপে গেল মাদলের! ঘাড় কাত করে বলল, 'ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু স্যার, তাহলে—ইয়ে, কী ধরনের ছবি আঁকতে হবে, স্যার?'

আবার রওনা হল রুদ্রাক্ষ। দরজার কাছে পৌঁছে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পোর্ট্রেট ছাড়া যা খুশি। হাতি-ঘোড়া-বাঘ-সিংহ। ঠাকুর-দেবতা। সিনসিনারি—যা মন চায়।'

বলতে-বলতে ওরা তিনজনে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল ভূগর্ভে। মাদল গুনেছিল মনে-মনে—সাতাশটা সিঁড়ি। মনুমেন্ট থেকে নামার মতো ঘুরে-ঘুরে এসে এ-ঘরে ঢুকেছিল।

ন্যাচারাল ও আর্টিফিসিয়াল লাইটে রঙের তফাত বলতে-বলতে মাদল দেখল, রুদ্রাক্ষর মুখে অতি ক্ষীণ হাসির রেখা। লোকটা খুশির গলায় জেজেকে বলল, 'বাহ! ছোকরা তো সমঝদার হ্যায়! বহুৎ খুব!' মাদলকে বলল, 'প্রত্যেক ছবিতে তোমাকে পাঁচশো নয়। হাজার করে দেব, মাদল।'

ওর মুখে হাসি দেখে, ধড়ে প্রাণ পেল মাদল। মনে-মনে বলল, কিছুই তো দেবে না, বাপু। ছবি আঁকা শেষ হলে তোমাদের উদ্দেশ্য ফুরোবে। তারপরেই, ওই রঘুনাথের ভাইয়ের মতো আমার লাশ গায়েব হবে যাবে। কিন্তু ছবি আঁকানোর পিছনে এদের উদ্দেশ্যটা কী? প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্পকর্ম বা অত্যন্ত নামী-দামি শিল্পীর ছবি-টবি স্মাগলড হয়। কিন্তু মাদল বসুর মতো হরিদাস পালের ছবি তো স্মাগল করার দরকারই হবে না। কিনবেটা কে?

ভাবতে-ভাবতে মুখে বলল, 'কিন্তু স্যার, আলো? মানে, ন্যাচারাল লাইট না পেলে যে—

বাধা দিয়ে জবাবে রুদ্রাক্ষ যা বলতে আরম্ভ করল, তাতে মাদল বুঝল লোকটার জ্ঞান যথেষ্ট। শুধু দু-নম্বরি ব্যাপারে নয়—শিল্পজগৎ সম্পর্কে এর চিন্তাধারা দারুণ আধুনিক। যতই সে চোরাপথের বোতাম-চাবি ছবির পিছনে লুকিয়ে রাখুক—ভ্যানগখ বা যামিনী রায় সম্পর্কে অবশ্যই বেশ ওয়াকিবহাল। রুদ্রাক্ষ তখন বলছিল, 'তা ছাড়া, আজকের দিনে প্রাকৃতিক আলোয় ছবি আঁকা বোকামি। কারণ, পৃথিবীর কোনও আধুনিক শহরের কারও বাড়িতেই পর্যাপ্ত আলো আর ঢোকার পথ পায় না। আর্ট গ্যালারিগুলোতে তো সবই আর্টিফিশিয়াল লাইট। ছবি দেখাই হয়ে থাকে আজকাল কৃত্রিম আলোয়। সুতরাং, এই আলোতেই লেগে যাও, মাদল। আধুনিক, বুদ্ধিজীবী এবং প্র্যাকটিক্যাল শিল্পী হও।—'

লেকচার শুনে, ওরা চলে যাওয়ার পরও, বেশ কিছুক্ষণ মাদল ধুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা বাব্বা! প্রমাণাভাবে পুলিশ ধরতে পারছে না বলেই পুলিশের হট-ফেভারিট এক টপ স্মাগলার-খুনির মুখে ছবি নিয়ে এত জ্ঞান খেতে হবে কোনওদিন—স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

আসবাব বলতে এ-ঘরটার স্রেফ দু-তিনটে প্যাকিং বাক্স—তাতে রং-তেল-টেলই হবে। তা ছাড়া, দুটো কাঠের চেয়ার। কাঠের একটা বড় টেবিলে একগাদা সাদা কাগজ, স্কেচ পেন ছড়ানো। দেখে মনে হবে, কিছুক্ষণ আগে ওখানে কেউ বসেছিল। রঘুনাথের ভাই?

মনে হতেই, বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল মাদলের। যথেষ্ট আলো থাকা সত্ত্বেও, প্রায় নিস্তব্ধ

BanglaBook.org

পাতালঘরে অস্বস্তির ছোঁয়াচ লাগল। ভূত-প্রেত যদি থাকে, তো, খুন হয়ে যাওয়া একটা মানুষের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা এ-ঘরে রয়েছে। রঙে তুলিতে, ক্যানভাসে। হয়তো, ওই চেয়ারটায় বসে-বসেই ও খুন হয়েছে! ভাবতে গিয়ে, স্যাঁতসেতে ঠান্ডা ঘরে কাঁটা দিল মাদলের গায়ে। ঠিক তক্ষুনি, হঠাৎ ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ, 'হ্যাই!'

চমকে লাফিয়ে উঠল মাদল। ধক্ করে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজেই শুনতে পেল সে। ফিরে তাকিয়ে দেখল—রঘুনাথ। আগের থেকেও পাগল-পাগল চেহারা। হাতে ট্রে। তাতে দুধ, চিনি, কাপ এবং টি-পট। সঙ্গের প্লেটে দু-রকমের বিস্কুট। আপ্যায়ন ভালোই। তবে, রঘুনাথের সহসা এমন রোমাঞ্চকর প্রবেশের ধাক্কা সামলাতে একটু সময় নিল মাদল। হাঁফ ছেড়ে বলল, 'এমন করে চুপচাপ ঢুকে, ভয়—'

কথা শেষ করতে দিল না রঘু। টেবিলে ট্রে নামাতে-নামাতে বলল, 'চা খাও।'

মাদল বলল, 'খাচ্ছি। তা তোমার ভাইয়ের—'

এবারও বাধা দিল রঘুনাথ। ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে চুপ করতে ইশারা করল। মাদলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'চা খেয়ে, সিঁড়িতে এসো। এ-ঘরে মাইক আছে—'

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ-মুখ বন্ধ হয়ে গেল মাদলের। মাথাও কাজ করতে লাগল তীব্রবেগে। রঘুনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিছু ডাকল সে, 'শোনো!'

তড়িৎবেগে ঘুরে রঘু ফের আঙুল ছোঁয়াল ঠোঁটে। গোল-গোল চোখ ঘুরিয়ে 'চুপ' থাকতে বলল। জবাবে, সামান্য গলা তুলে মাদল জিগ্যেস করল, 'আমার শোওয়ার ঘর, বাথরুম, জামাকাপড়—এসব কোথায় পাব?'

হলদে দাঁত দেখিয়ে পুরো দু-গালে হেসে দিল রঘু। অবশ্য নিঃশব্দে। শব্দ তুলে বলল, 'চা খেয়ে এসো। সব দেখিয়ে দিচ্ছি!'

চা খেতে-খেতে মাদল ভাবল—অ্যাদ্দুর আসা কি ঠিক হল? 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে'—গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল প্রায়। আসল দাড়ির মেকআপ নিয়ে রাস্তায় বসে ছবি বিক্রির অছিলায় দু-নম্বরি বদমাশের গতিবিধির হদিশ খোঁজা এক কথা। কিন্তু, এ যে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজতে গিয়ে সোজা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়া! এখানে বাইরের একফোঁটা আলো ঢোকে না। বেরোবার পথ কই? আদৌ আছে কি? না কি, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারময় গোয়েন্দাগিরির হাতেখড়ি হাতে নিয়েই বেঘোরে—

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে রঘুনাথের পিছন-পিছন সাত ধাপ সিঁড়ি ভেঙে, ছোট্ট ল্যান্ডিংয়ে ডানদিক ঘুরে, একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। মাথা সমান উঁচু টিমটিমে আলো-অন্ধকার এ-পথ কতদূর গেছে? রঘুকে জিগ্যেস করতে বলল, 'এখানে, এই মালাবার হিলের পাতালপুরিতে কত যে সিঁড়ি আর সুড়ঙ্গ—তার ঠিক নেই। তবে, এটা শেষ হয়েছে গুদামঘরে।'

'সেখানে কী আছে?'

'মাথার ছাদের ওপরে সুইমিং পুল। পশ্চিমের দেওয়ালের গায়ে সমুদ্র—আবার কী?'

'তা নয় হল। কিন্তু গোডাউনে কী রাখা হয়?'

'ছবি, মূর্তি, প্যাকিং বাক্স। তা ছাড়া, অই ছবি আঁকার ফ্রেমও ওখানেই তৈরি হয়।'

কথা বলতে-বলতে একটা আবছা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ছিটকিনি খুলে, ঠেলে দিতেই খুলে গেল দরজা। রঘু বলল, 'এই নাও। তোমার ঘর। লাগোয়া বাথরুম আছে।'

ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'এখানে আমার ভাই থাকত। শালারা—'

দাঁত কিড়মিড় করে গাল দিল রঘুনাথ।

ছিমছাম গোছানো খাট-বিছানা, আয়নাওয়ালা টেবিল, স্টিলআলমারি-সমেত ঘরটির চারপাশে দেখতে-দেখতে মাদল জিগ্যেস করল, 'রঘুদা, তুমি এখানে ক'দ্দিন এসেছ?'

BanglaBook.org

'তা—বছরখানেক। আগে ডায়মন্ড হারবারে সেন-দের পৈতৃক ভূতবাংলোয় ছিলুম প্রায় তিন বছর।'

'আর তোমার ভাই?'

'ও আগেই এসেছিল। সাইনবোর্ড আঁকত বেহালায়। ব্যাটা সেনের পো তুলে এনেছিল।'

'তুমি জানলে কী করে যে, তাকে এরা খুন করেছে?'

পাগল-পাগল চোখ হয়ে গেল রঘুর। সাপের গলায় হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি, আমি জানি। শয়তানদের দলের ভেতরকার ঘাঁতঘোঁত ও অনেক টের পেয়ে গিয়েছিল। গত দু-বছর ওকে ছুটিই দেয়নি। পরে ও লুকিয়ে পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল—।'

'কতদিন আগের ঘটনা?'

'তা, দিন পনেরো হবে। আমাকে সাতদিনের জন্যে গোয়া পাঠিয়ে দিল, মাল ডেলিভারি দিতে। ফিরে এসে আর দেখতেই পাই না ওকে। জিগ্যেস করলে বলল, ও নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেউ জানে না! হুঁহ! চাইলেই যেন এখান থেকে সবাই অমনি -অমনি ছাড়া পেয়ে যায়?—'হুঁ!' বলে, বেরিয়ে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল রঘু। মাদলের প্রায় কানের কাছে এসে ফিসফিস করলে, 'আজ রাতেই আমি লাশের হদিশ পেয়ে যাব। দেখাব তোমায়। তারপর, সেনের বাচ্চাকে নিকেশ করে তবে শান্তি—'

মৃদু ঠুকঠুক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মাদলের। স্থান-কাল-অবস্থা বুঝতে সময় লাগল একটু। দুপুর থেকে নিয়ে তিনখানা তেল রঙের পেইন্টিং শেষ করে ফেলেছে সে। যামিনী রায়ের ঢংয়ে মা-কালী, হুসেনের টাইপের ঘোড়া এবং একটা নৌকোয়ালা ছবি।

নানান চিন্তা ও আবোল-তাবোল দুশ্চিন্তায় মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল রঘু চলে যাওয়ার পর। ভালো করে সাবান মেখে চান করে ঠান্ডা হয়েছে। আলমারিতে পাট করা পাজামা-পাঞ্জাবি ছিল দু-জোড়া। প্রায় ওরই সাইজের। হয়, জেজেই আনিয়ে রেখেছে আন্দাজমতো। নয়তো, রঘুদার ভাইয়ের। সামান্য ইতস্তত করে পরে ফেসে বেশ ফ্রেশ লাগছিল। তারপর, সারাটা দিন রং-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল শিল্পী মাদল। দুপুরের খাবার, বিকেলের চা দিয়ে গেছে স্টুডিওতে। রঘু আসেনি। অন্য একজন সাদা পোশাকের গোঁফয়ালা বুড়ো বেয়ারা। নাম বলেছিল, কাপ্যাপ। রাতের খাবারও ও-ই নিয়ে এসেছে। শোওয়ার ঘরে। ডাল-রুটি-কষা মাংস আর একটা লাবড়া তরকারি। ভরপেট খেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মাদল, খেয়াল নেই।

এখন, আবার দরজায় ঠুকঠুক।

অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে খাট থেকে উঠে, দেওয়াল ছুঁয়ে, ঘরের বাতি জ্বালল সে। দরজা খুলতেই রঘুনাথের মুখ। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আরও। গোল-গোল চোখ দুটিতে এখন রক্তের ছোপ ধরেছে। নেশা করেছে কি না বোঝা গেল না। 'শিগগির এসো!'

চাপা গলায় হাতছানি দিয়েই সরে গেল রঘু। কী করবে বুঝতে পারল না মাদল। কত রাত কে জানে? একেবারে অজানা অচেনা ভূগর্ভের অন্ধকার। কে কোথায় কীসের জন্য ওত পেতে আছে বলা যায় না। এর মধ্যে আধ-পাগল এক আধ-চেনা লোকের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? দ্রুত ভাবছে মাদল। রঘুনাথের হাতে টর্চ। সেই বৃত্তাকার আলোতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পথ শুঁকতে-শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে সে। জেজের কথা মনে পড়ল, 'এখানে বেশি কৌতূহল থাকা ভালো নয়।'

দোনোমনো করতে-করতে 'যা থাকে বরাতে' ভেবে বেরিয়ে পড়ল মাদল। রঘুর পিছন-পিছন পা টিপে-টিপে টানেল ধরে হাঁটতে লাগল।

BanglaBook.org

দূরে কোথায়, অনেক দূরে যেন জল পড়ার ক্ষীণ শব্দ। সেই সঙ্গে, কান পাতলে বোঝা যায় ভারী জিনিস পতনের শব্দও ভেসে আসছে। একের পর এক-একটানা। স্যাঁতসেতে ঠান্ডা আর ভেজা গন্ধ।

দেওয়ালের কোণ ধরে কী যেন দেখতে-দেখতে হাঁটছে রঘুনাথ। ওইভাবেই ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, 'শুনতে পাচ্ছ হে। মাল নামছে। ধাউ এসেছে। তাতে এবার সব মাল উঠবে। আমার ভাইয়ের শেষ ছবিগুলোও প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে।'

হঠাৎ মাদলের খেয়াল হল, রঘুর ডানহাতে টর্চ এবং বাঁ-হাতে লোহার শাবল। সামান্য ঝুঁকে নিজেও দেখার চেষ্টা করে সে বলল, 'কী দেখছ?'

'পিঁপড়ে।'

'মানে?'

আরও ঝুঁকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে লাগল মাদল এবং সত্যিই দেখল—লাল পিঁপড়ের সারি। একদল যাচ্ছে। আরেক দল—যারা আসছে—তাদের মুখে সাদা-সাদা কণা।

দুবার বাঁক নিয়ে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে এবড়ো-খেবড়ো ল্যান্ডিংয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে ছলছলাত জলের এবং ধুপধাপ পতনের শব্দ একটু জোরালো শোনা যাচ্ছে। মাদল জিগ্যেস করল, 'ভাইয়ের লাশ খুঁজছ?'

'খুঁজছি না, পেয়ে গেছি—' বলে আঙুল দিয়ে একটা খুদে গর্ত দেখাল। চলন্ত পিঁপড়ের সারি ওখানেই নেমে গেছে। তার মানে, রঘু বলতে চায়, লাশ পচে গিয়ে পিঁপড়ে ধরেছে? অন্য কিছুও তো হতে পারে? মাদল দ্বিধার গলায় বলল, 'ওকে খুন করে থাকলে তো সমুদ্রের জলেই ফেলে দেবে?'

'না। মড়া ফুলে ভেসে উঠত থা'লে। পুলিশি তদন্ত হত—'

বলতে-বলতে ছমাত করে শাবলের কোপ বসাল রঘু ল্যান্ডিংয়ের পাথুরে মাটিতে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাদল। যে কোনও মুহূর্তে কী যে ঘটবে, সেই আতঙ্কে অস্থির। টর্চটা শুয়ে-শুয়ে আলো দিচ্ছে। রঘু কোপাতে-কোপাতে বলল, 'মাটি সরাও।'

উবু হয়ে বসে আদেশ পালন করতে লাগল মাদল। প্রথমে হালকা, পরে ভয়ঙ্কর পচা গন্ধ উঠে আসতে লাগল খোঁড়া জায়গা থেকে। গা ঘুলিয়ে দুবার ওয়াক পেল মাদলের। বেশ কিছুক্ষণ বাদে লাশের খানিকটা পচা-গলা অংশ দেখা গেল প্রায় তিন হাত মাটির নীচে। মুখ এবং বুকই সম্ভবত। বীভৎস দৃশ্য। শুকনো রক্ত, কাদামাটি মাখা ডানহাত বুকের ওপরে রাখা। মাদল তার পাঞ্জাবির ঝুল নাকে চেপে দম বন্ধ করেই প্রায় টর্চের আলো ফেলল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে রঘু। ঘামছে দরদর করে। হঠাৎ কান্না ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো। ভাইয়ের আঙুলে আমার আংটিটা দ্যাখো—'

ঠিক তক্ষুনি, ডানদিকে সুড়ঙ্গের বাঁকে, সিঁড়ির কাছ থেকে ভারী আওয়াজ, 'কউন হ্যায় রে?'

মাদল চমকে উঠতেই জ্বলন্ত টর্চটা গর্তে পড়ে গেল। দ্রুত অন্ধকারে সরে এল সে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে।

শাবল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে রঘু। দৌড়তে আরম্ভ করেছে সুড়ঙ্গের ওই মুখে। ওখানে, আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে রুদ্রাক্ষ সেন।

'হা-রাম-জা-দা, শুয়োরের বাচ্চা—আমি তোর যম—' বলতে-বলতে অনেকটা গুহা-মানবের মতো ছুটছে রঘুনাথ। দেয়ালের খাঁজের আড়াল থেকে, লুকিয়ে মাদল স্পষ্ট দেখতে পেল বাকিটুকু।

'হ্যাই—' চিৎকার তুলে রঘুনাথ পাহাড়ের মতো পড়ে গেল হঠাৎ। শাবল ছিটকে লাগল দেয়ালে।

BanglaBook.org

রুদ্রাক্ষর হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সাইলেন্সার লাগানো, নিশ্চয়ই।

রুদ্রাক্ষর গলা দূরে সরে যেতে লাগল, শান্ত এবং নির্লিপ্ত, 'জেজে! রঘুকো উসকে ভাইকে পাস সুলা দো—'

॥ তেরো ॥

অসম্ভব ভয় পেয়েছে মাদল। সাধারণ বুদ্ধিসুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। ঠকঠক করে কাঁপছে গোটা শরীর। পারলে পাথুরে দেওয়ালের মধ্যে মিশে পাথর হয়ে যেত সে।

নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে, রুদ্রাক্ষ সেনের মতো মানুষ একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করে ফেলতে পারে। অমন ঠান্ডা মাথায়, নিঃশব্দে! দু-মিনিট আগেও রঘুনাথের সঙ্গে কথা বলেছে মাদল। এখন লোকটা স্রেফ লাশ হয়ে পড়ে আছে। উফ্! ভাবা যায় না!

লাশ ডিঙিয়ে যদি সুড়ঙ্গের এদিকে চলে আসত রুদ্রাক্ষ? তাহলে, এখানে তিনটে লাশ শুয়ে থাকত পাশাপাশি। মাদল কেঁপে উঠল। কাঁটা দিল গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রঘুনাথ অথবা ভয় কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পালাও হে, ছোকরা! পালাও!'

বাস! ওইটুকু বুদ্ধি যেই মাথায় ফিরে এল, সঙ্গে-সঙ্গে ভূতগ্রস্তের মতো পা বাড়াল মাদল। উলটোদিকে, অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে। একবার মনে হল টর্চটা তুলে আনলে হত। পরক্ষণেই ভাবল, যে কোনও মুহূর্তে জেজে ঢুকে পড়বে লাশের গতি করতে। সুতরাং কখনও উবু হয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, দেওয়াল ধরে-ধরে এগোতে লাগল সে। অন্ধকার থেকে, গভীরতর অন্ধকারে।

কীসে একটা হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাদল। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নোখটা বোধহয় উঠেই গেল। তা যাক! প্রাণ বাঁচাও। পালাও হে, ছোকরা পালাও!

কপাল ঠুকে গেল পাথরে। ঝিম লাগল মাথায়। আস্তে-আস্তে দেওয়াল ধরে-ধরে বসে পড়ল মাদল। কোন পায়ের চটি যে কোথায় খুলে গেছে, খেয়াল নেই। খালি পায়ে জল-জল ঠেকল অন্ধকারে। কপালে হাত রেখে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। ঘুরঘুট্টি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আওয়াজের কথা খেয়াল হল। ধুপধাপ ও জলের শব্দ বেশ কাছেই কোথাও।

দু-পাশে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে বোঝা গেল বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গ। বসে-বসেই পা ঘষটে-ঘষটে এগোতে থাকল সে। অসহ্য যন্ত্রণা ডানপায়ে। কপালে। ব্যথায় টনটন করছে পা। মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে গেল। মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে সে।

হঠাৎ, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই হুড়মুড়িয়ে দলা পাকিয়ে ছ-সাতটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মাদল। ব্যাথায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করতে বাধ্য হল। কারণ, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। যেখানে এসে পড়েছে মাদল, তার ডানদিকে, বেশ খানিকটা নীচে আবছা আলোর আভাস। দম বন্ধ হতে-হতে অক্সিজেন পাওয়ার মতো অবস্থা। চোখ ভরে সেই আলোটুকুই দেখে নিল মাদল। দৃষ্টি শান্ত হতে-হতে টের পেল, সিঁড়ি ঘুরে নেমে গেছে ওই দিকে। এই প্ল্যাটফর্মটি না পেলে মাদল সোজা ওই অবধি নেমে যেত। টাল সামলাতে পারত না। মাথা ফাটত এবং ওখানে মানুষজন আছে—ফলে, ধরাই পড়ে যেত সে। দ্রুত এই সব মাথায় খেলা করে গেল তার। গুছিয়ে, সোজা হয়ে বসল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। মানুষের গলায় কী কথা হচ্ছে।

প্রথমটি সেই অমরীশ পুরীর ভরাট আওয়াজ। অবশ্যই রুদ্রাক্ষর। হিন্দিতে বলছে, 'কেন হয়নি? সব বাক্স প্যাক করা হয়নি কেন?'

দ্বিতীয়টি জেজে। ভীত গলায় জবাব, 'অতগুলি মাল নিয়ে ষোলটা বাক্স প্যাক করতে এরা চারজনে হিমসিম খেয়ে গেছে বস—'

BanglaBook.org

'তা আরও দু-তিনজনকে লাগালেই পারতে?—'

'বিশ্বস্ত লোক তো এখানে নেই, বস?'

'একটু আগে বললেই পারতে? কিংবা, ভারসোবা, ওয়াসাই থেকে আনিয়ে নিতে পারতে সাময়িকভাবে?'

'এর পরে, আর ভুল হবে না, বস।'

এবারে তৃতীয় কণ্ঠ। অচেনা। ভাঙা হিন্দি। অশুদ্ধ ইংরিজি ও বোধহয় আরবিতে বলল, 'ইয়াল রফিক। হোয়াট আই ডু বস? বাকি বজেস হোয়েন?'

অচেনা কণ্ঠস্বরের মালিককে দেখার জন্য উশখুশ করে উঠল মাদল। অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে নামতে লাগল সে। বুকের টিপটিপানি বাড়ছে। প্রায় কুড়ি ফুট নীচে খানিকটা সমতল দেখা গেল। ফ্লাড লাইটে দিনের আলো। উলটো দিকে পাহাড়-কাটা দেওয়াল অমসৃণ। তিনটে সিঁড়ি নামতেই জলরেখা ছলছলাত করে সমতলে জিভ বোলাচ্ছে। মাদল অবাক। পাহাড়ের মধ্যে এমন জল কোত্থেকে এল? ভয় সরে গিয়ে কৌতূহলের খোঁচায়, আরও চার ধাপ, সাবধানে, দেওয়াল ধরে-ধরে। নীচের অনেকখানি অংশ মোটামুটিভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। ব্যাপার-স্যাপারও অনেকখানি আন্দাজ করা গেল।

রঘু বলেছিল—আজ 'মাল' যাবে।

পাহাড়ের বাঁ-দিকে সমুদ্রের খাঁড়ি। পাথর কেটে পথ। সেই পথে জোয়ারের জল ঢোকে রাত্রে। পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে মিশে যায়, এমন দরজাও নিশ্চয়ই আছে। যাতে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। ওই পথেই একটি মস্ত 'ধাউ' নৌকো এসে ঢুকেছে। মোটর-লাগানো 'ধাউ' হওয়াই স্বাভাবিক। ওতে 'মাল' ভরা হয়ে গেছে—চোরা পথে চলে যাবে এবার আসল সমুদ্রের মধ্যে। স্মাগলারদের বে-আইনি বা চোরা কারবারের জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝসমুদ্রের কোথাও। শোনা-কথা ও পড়ে-জানা ঘটনা মিলিয়ে মাদল এই পর্যন্ত টের পেয়ে গেল।

শেষ প্যাকিং বাক্সটি মোটা দড়িতে বেঁধে তোলা হচ্ছে নৌকোয়। জনা পাঁচেক লোক টেনে-টুনে, ঠ্যালা মেরে সাহায্য করছে। এদিকে দেওয়াল ঘেঁষে, জলের কাছে দাঁড়িয়ে তিনজন কথা বলছে। পিছন ফিরে রয়েছে জেজে। তার মুখোমুখি অচেনা লোকটা। কালো টাইট প্যান্ট এবং গাঢ় নীল জামা। মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। লালচে দাঁড়ি এবং চুল। মাদল আর-এক ধাপ নেমে বাঁ-দিকে ঝুঁকলে রুদ্রাক্ষকেও দেখতে পাবে নির্ঘাত।

নাঃ। আর ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। নিজের শোওয়ার ঘর এখন খুঁজতে হবে। সুড়ঙ্গ ও সিঁড়ির গোলকধাঁধায় কতক্ষণ ঘুরতে হবে কে জানে। ভাবতে-ভাবতে, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল মাদল। শেষ কথা শোনা গেল অচেনা লোকটির, 'দেন পরশু সেম টাইম?'

বস এবং জেজের গলা একই সঙ্গে, 'ইয়েস, ইলেভেন-ও-ক্লক।'

'গোল্ড? হাউ মেনি বারস?'

'ওয়ান থাউজেন্ড।' বসের জবাব।

'ইনসাল্লাহ! খোদা হাফিজ।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আবার অন্ধকারে পথ খুঁজে-খুঁজে চলল মাদল অন্ধের মতো হাতড়ে কখনও সিঁড়ি, কখনও সুড়ঙ্গ। কোথাও ডাইনে, কোথাও বাঁয়ে। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। মনে হল, একই জায়গায় ঘুরে মরছে না তো? ওলায় ধরল নাকি?

দমে গেলে চলবে না। সত্যকাকুকে খবর দিতেই হবে। উনি বলেছিলেন, 'মন থেকে আমি ঠিক সায় পাচ্ছি না, ভায়া। তুমি সাহসী, বুদ্ধিমান। কিন্তু যেখানে যাচ্ছ—সে বড় ভয়ানক দলের ঘাঁটি। এর আগে দু-দুবার ফুল ফোর্স নিয়ে গিয়েও পুলিশ প্রমাণাভাবে নাকাল হয়ে ফিরেছে। উলটে, মামলা করেছে রুদ্রাক্ষর উকিল। ফলে, সৎ পুলিশি কর্তারা হাত কামড়াচ্ছে। অসতেরা জেনেশুনেও

BanglaBook.org

মুখ বুজে আছে।'

'কিন্তু, আমি তো পুলিশ-টুলিশ নই। কোনও অ্যাকশানের প্রশ্নই ওঠে না একা-একা। সুযোগ যখন পাচ্ছি ভেতরে ঢোকার—সুলুক-সন্ধান করতে দোষ কি? সবাই তো এমন সুযোগ পায় না।—'

'হক কথা। তবে, ঢোকার সৌভাগ্যই তো সব নয়—এ সব জায়গা থেকে বেরুনোটাও ততোধিক সৌভাগ্য। শেষে, অভিমন্যুর মতো বে-ঘোরে কিছু ভালো-মন্দ হলে—আজীবন আফশোস থেকে যাবে আমার।—'

বলতে-বলতে গলা ধরে এসেছিল সত্যকাকুর। চুপ করে ছিল মাদল। হয়তো শেষ দেখা!

পরে, গলা সাফ করে হাসবার চেষ্টা করেছিল সত্যকাকু, 'জেদ ধরেছ, যাও! অল দ্য বেস্ট! তবে ঠিক দু-দিনের মধ্যে তোমার কাছ থেকে খবর না পেলে, কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব—ডাইরেক্ট অপারেশানের পথ ধরতে হবে...'

হঠাৎ অত্যন্ত ফিকে নীল আলোর ভাব দেখা গেল। যেন, কোনও অদৃশ্য ঘুলঘুলি থেকে মরা চাঁদের আলোর ছিটেফোঁটা আসছে। ঝিমিয়ে-পড়া মাদল পায়ের ব্যথা ভুলে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে গেল। সামনের বাঁকে পৌঁছে, সত্যি-সত্যিই ছোট্ট ভেন্টিলেটার বা বড় ঘুলঘুলি চোখে পড়ল। নীচে, পায়ের কাছে। হামা দিয়ে বসল মাদল। না। চাঁদের আলো মোটেই নয়। ঘুমের আলো। নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। পাথুরে জমিতে চিবুক ছুঁইয়ে, বেশ কসরত করে, মাথা ঢোকাতে হল ঘুলঘুলির ভেতরে। কংক্রিটের জাল দিয়ে ও-মুখ ঢাকা। জালের ফাঁকে চোখ রেখে মাদল তাজ্জব বনে গেল। প্রায় তিনমানুষ নীচু ঘরের মেঝেয় কার্পেট বিছানো। সোফাসেটের অংশ দেখা যাচ্ছে। তাতে একগাদা কমিকস ছড়ানো। গোল টেবিলে দুটি থালা, বাটি। একটি থালায় আধ-খাওয়া ভাত-তরকারি। অন্যটা যেন কেউ ছুঁয়েই দেখেনি। টিভিসেট, ভিডিও এবং আয়নাওয়ালা আলমারির খানিকটা দৃশ্যমান। জোড়া খাটে শুয়ে আছে দুজন। তাদের জড়াজড়ি করা পা দেখা যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলের শেষে মেয়েটি এবং হাফ-প্যান্ট-পরা বালকের খোলা পা। জয়দীপদার ভাইবোন? প্রথমে মনে হল—বেচারি! তারপরে ভাবল, কপাল তো খুব খারাপ নয় ওদের। রুদ্রাক্ষ বেশ ঘটা করেই রেখেছে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই বিশেষ।

মাদল শুনেছে—বড়-বড় রাজনৈতিক কয়েদিদের ফার্স্ট ক্লাশ জেলে রাখা হয়। সেখানে নাকি, পাঁচ-তারকা ব্যাপার-স্যাপার! এরা এখানে বন্দি হলেও, কম করে তিন-তারকা ঘরে আছে। তাহলে, আদৌ এদের এনে আটকে রেখেছে কেন রুদ্রাক্ষ? উদ্দেশ্যটা কী? কিছুই ভেবে পেল না মাদল। ওরা ঘুমুচ্ছে। তা ছাড়া, এখান থেকে কথা বলতে যাওয়াও বিপজ্জনক। মাদল উঠে পড়ল। কিন্তু তার ঘরটা কোন দিকে?

আবার গোলকধাঁধায় তিন পাক ঘুরে ছ-খানা সিঁড়ি ভেঙে নামতে-নামতে, অন্ধকার দেওয়ালে হাতলের মতো কী ঠেকল। দু-হাত বুলিয়ে বুঝল—দরজার হাতল। ঘরের দরজা? নাকি, অন্য কোনও পথ? কী আছে ওপারে? মাদল হাতল ঘুরিয়ে মৃদু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট রকমের ঝাঁঝালো, উগ্র গন্ধ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাদলের ঘ্রাণে। ও ঠিক চিনতে পারল না, কীসের গন্ধ। তবে, আন্দাজ করল—নিশ্চয়ই গাঁজা বা চরস! বা, ওই জাতীয় মাদক দ্রব্য।

বন্ধ ঘর বলেই মনে হচ্ছে। গন্ধটা কোনও দিক দিয়েই আর বেরোবার পথ পাচ্ছে না বলেই বোধহয় এত উৎকট কড়া! এবং যেহেতু, মাদল হিসাব করল, আলো জ্বলছে না ঘরে, তার মানে, কেউ নেই।

নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে পড়ল সে। খুব সাবধানে, আলতো হাতে ভেজিয়ে দিল পিছনের

BanglaBook.org

দরজা। কয়েক পা এগোতেই কাঠ মতন কী ঠেকল বাঁ-পায়ে এবং প্রায় একই সঙ্গে ডানপায়ে লাগল মানুষের শরীর। চমকে, স্ট্যাচু হয়ে গেল মাদল। বুক ঢিপঢিপ। না। কোনও সাড়া নেই। কী সর্বনাশ। আর-একটা লাশ নয় তো? কে? কার মৃতদেহ এখানে?

ধীরে-ধীরে ঝুঁকে, হাতের স্পর্শে নিশ্চিত হল মাদল। মানুষের পা, হাঁটু, কোমর। গোটা একটা মানুষ পড়ে আছে কাত হয়ে।

ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার আঁতকে উঠতে হল। ছিটকে পিছিয়ে এল সে। কারণ, জড়ানো ঘড়ঘড়ে শব্দে হিন্দি কথা ফুটল লোকটার মুখে 'অ্যাই সসালা। কেয়া হো রহা? খোঁচাচ্ছিস কেন? বাতি জ্বালিয়ে নে—'

কী জানি কেন, মাদল মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, 'সুইচ কিধর?'

লোকটাও জবাব দিল, গোল্লা পাকানো-জড়ানো উচ্চারণে, 'দরওয়াজা-কে-পাস—নেই মালুম? স-সালা—কাবাবমে হাড্ডি—' শেষের শব্দগুলি অধিকতর জড়িয়ে-মিইয়ে ঘড়ঘড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

তার মানে, লোকটার দোসর কেউ ছিল। হয়তো, কোনও কারণে বেরিয়েছে। ফিরে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তবু, এমন সুযোগ ছাড়া যায় না! এ-ঘরটায় কি আছে-না-আছে দেখে রাখা দরকার। পরে হয়তো কাজে লাগবে।

দ্রুত দরজার পাশের দেওয়াল হাতড়াতে লাগল মাদল। পেল সুইচ। আলো জ্বলে উঠতেই প্রথমে চোখ গেল জ্যান্ত লোকটার দিকে। প্রায় লাশের মতোই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। মাথা এবং পিঠের নীচে একগাদা কাঠের পট্টি। এইরকম সাদা পট্টি চারটে দিয়ে ক্যানভাস লাগাবার জন্যে নাঙ্গা ফ্রেম তৈরি হয়।

তা, সেই পট্টি-ফটিতে লোকটার শুয়ে থাকার কোনও ব্যাঘাত ঘটছে না। নেশা করেছে কি? ঘর আলোকিত হতেই , চোখ পিট-পিট করে তাকাবার চেষ্টা করল। দু-একবার বুজে-খুলে, মাদলকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ জোড়া। গেঁজেলের ঢুলু-ঢুলু চাউনি পালটে গিয়ে ভূত দেখার চোখ। গলায় ঘড়-ঘড় আওয়াজ, 'ক-কউন—?'

কনুইয়ের ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা দিল একবার। খানিকটা উঠলও। হাই-তোলার ভঙ্গিতে হাঁ করে নির্ঘাত চ্যাঁচাতে যাচ্ছিল। মাদল আর দেরি করল না। মানুষটার হাঁ-করা-মুখ ও নাক লক্ষ করে জবরদস্ত একখানা ঘুষি চালিয়ে দিল। কাজ হল। যে-ভঙ্গিতে শুয়েছিল, হুবহু সেই ভঙ্গিতে ফের ঢলে পড়ল সে। জীবনে মারামারি করেনি মাদল, এমন নয়। কিন্তু, নেশায় নির্জীব একটা মানুষকে অত জোরে ঘুষিটা মেরে একটু খারাপই লাগল। অথচ, উপায় ছিল না। এই ওষুধ না পড়লে, ব্যাটা ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠত। বিপদ বাড়ত মাদলের। সে মনে-মনে আধা-লাশটিকে বলল, 'সরি স্যার! মাফ করনা!'

এবার পর্যবেক্ষণের চোখে ঘরটি দেখল সে। বেশ বড় ঘর। কুড়ি ফিট বাই কুড়ি ফিট হবে। চার রকমের জিনিস চার ভাগে রাখা আছে। এক দিকে অজস্র প্লাস্টিকের স্ক্রু নল জড়ো করা। তার কাছাকাছি, আধ-কেজি, এক-কেজি সাইজের প্লাস্টিক ব্যাগ। সীলড্। একটা হাতে তুলে, দাঁতে কেটে ছিঁড়ল মাদল। কালচে, শুকনো এবং স্যাঁতসেতে তামাক-পাতা।

নির্ঘাত গাঁজা বা চরস। অন্য দিকে, কাঠের পট্টিও দু-ভাগে ভাগ করে রাখা। একটি তুলে পরখ করল সে। অত্যন্ত হালকা। তবে, ফ্রেম বানানোর সাধারণ পট্টির চেয়ে একটু মোটা-সোটা। এবং—অদ্ভুত কাণ্ড—ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। অর্থাৎ তিন ফুট লম্বা একটা ফালির ভিতরে প্রায় ইঞ্চিখানেক ব্যাসের বৃত্তাকার গর্ত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। প্লাস্টিকের নলে মাদকদ্রব্য ঠেসে ভরে গর্তে ঢোকানো হয়েছে। ভরা পট্টিগুলি আলাদা ভাগায় সাজানো।

চমৎকৃত হয়ে গেল মাদল। অভিনব আইডিয়া দেখে শিল্পীর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, 'বাহ! দারুণ তো!'

BanglaBook.org

এবার, চার-চারটে পট্টি দিয়ে ফ্রেম হবে। তাতে ক্যানভাস স্ট্রেচ করে লাগিয়ে তৈরি হবে ছবি। অসাধারণ! মনে-মনে রুদ্রাক্ষ সেনকে মাদল বললে, 'সেলাম, সেন-সাহেব।'

তক্ষুনি মনে পড়ল, দ্বিতীয় লোকটি যে কোনও সময় ঢুকে পড়বে। বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে পা রাখল সে। সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে দেওয়ালে বাধা পেল বারকয়েক। বাঁক নিয়ে, মাথায় আবার টাক খেল এইমাত্র। শারীরিক ব্যথা-বেদনা কেমন কমে গেছে এখন। যেন, হুমড়ি না খেলে, গড়িয়ে না পড়লেই সে অবাক হবে প্রতি পদে। গিলতে-গিলতে অন্ধকারই সত্য বলে বোধ হচ্ছে। আলো দেখলে চমকে যাবে।

অথচ, সেই আলোর বিন্দু খুঁজতে-খুঁজতে পেল অন্য পথ। কিছুক্ষণ আগেই, যে-গন্ধে গা ঘুলিয়ে বমি পাচ্ছিল, সেই গন্ধই হালকা হয়ে নাকে লাগল মাদলের। চেনা পথ খুঁজে পাওয়ার আনন্দে, অত্যন্ত খুশি হয়ে সেই পচা-গন্ধের উৎস-সন্ধানে হাঁটতে লাগল সে। ধীরে-ধীরে রঘুনাথের ভাইয়ের পচাগলা লাশের গন্ধ বাড়তে লাগল। ওই অসহ্য গন্ধই মাদলকে নিকষ অন্ধকারে আলোর মতো পথ দেখাল।

ঠিক তাই।

দুই ভাইয়ের শবদেহ পেরিয়ে, ডিঙিয়ে মাদল পৌঁছে গেল আবছা আলোকিত সিঁড়ির কাছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল খুনি রুদ্রাক্ষ সেন।

সিঁড়িতে পা রেখে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল সে। অন্ধকার থেকে আলোয়। আনন্দ উপভোগের সময় নেই তার। ঊর্ধ্বশ্বাসে ওপরে উঠতে লাগল ঘুরে-ঘুরে।

একেবারে ওপরে, প্রধান হলঘরে পৌঁছে গেল মাদল। চার কোণে, চার রঙের কুশন। সাদা মার্বেলের মেঝের মধ্যিখানে টেলিফোন।

চোখ ঘুরিয়ে নিল সে। কেউ নেই আশেপাশে, হলঘরে ঢোকার পথও বন্ধ। লোহার শিক-লাগানো গেট নামিয়ে তালা লাগানো হয়েছে। কয়েদখানার গরাদের মতো দেখতে। পিছনের সুইমিং পুল থেকেই সম্ভবত, ঠান্ডা হাওয়ার ঢেউ আসছে থেকে-থেকে। ভিতরের করিডোরগুলির দিকে চোখ রেখে, রিসিভার তুলে নম্বর লাগাল মাদল।

ক্রিং-ক্রিং! ক্রিং-ক্রিং। ক্রিং-ক্রিং!

অনেক রাত হয়েছে নিশ্চয়ই! ইশ! সত্যকাকুকে বোধহয় ঘুম থেকে তুলতে হল।

ঘুম-জড়ানো গলায় সত্যকাকু বললেন, 'হ্যালো!'

মুহূর্ত দেরি না করে হুড়মুড়িয়ে বলে গেল মাদল, প্রায় টেলিগ্রামের ভাষায়, 'মাদল বলছি। চিন্তার কিছু নেই। যে-রঘুর কথা বলেছিলাম সে খুন হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ টাকার হ্যাশহিশ। অ্যান্টিকস। পরশু এগারোটায় অপারেশান করুন। রাত এগারোটা। জয়দীপদার ভাইবোন ভগ্নো আছে।—'

সত্যকাকু প্রত্যেক কথায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মাদল সুযোগ দেয়নি। ও যেই দম নিচ্ছে, উনি প্রথম কথা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আহত হওনি তো?'

'না।'

'সারাদিনে কিছু খেয়েছ?'

বিদেশে, এই শত্রুপুরীতে, সকল ভয়ের মধ্যেও মাদলের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। সত্যকাকু তাকে এত ভালোবাসে? আহ! একটা কথায় যেখানে কাজ হয়, সেখানে ধরা গলায়, থেমে-থেমে বলল, 'আমি পেট ভরে খেয়েছি, সত্যকাকু। চিন্তা একদম করবেন না।'

'সাবধানে থেকো।'

জরুরি কথা মনে পড়ল মাদলের, 'খাঁড়ির দিকে শক্ত পাহারার দরকার। রাখছি।'

বাড়ির বাগানে এরা কুকুর ছেড়ে দেয় হয়তো। নাইট-ডিউটি। গোটা তিনেক দানব গোছের

BanglaBook.org

কুকুর লোহার শিকেয় ওপরে হামলে পড়ে ডাকছে।

রিসিভার নামিয়ে, সামান্য খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওই দিকে হেঁটে গেল মাদল।

পিছনে জেজের কণ্ঠস্বর, 'কী করছ এখানে? এত রাতে?'

সেই চেনা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে ব্যাটা। 'ধাউ' চলে গেছে নিশ্চয়ই। মাদল ঘুরে দেখে, মৃদু হেসে বলল, 'বন্ধ ঘরে ঘুম আসছে না। হাওয়া খেতে এসেছি। কুকুর দেখছি।'

॥ চোদ্দো ॥

জয়দীপ জিগ্যেস করল, 'মিস্টার চওধরির ব্যাপারটা কীরকম বুঝলেন, সত্যসাধনবাবু?'

'এই মুহূর্তে, আপনার মুখে এ-ধরনের প্রশ্ন শোভা পায় না। যথা সময়ে জানা যাবে। বরং, আপনার সম্পর্কেই আমার কিছু জানার আছে। আপনিই যে জোশীকে খুন করেননি, সেটা অন্তত আমার বোঝা দরকার।'

'বেশ তো! বলুন?'

'আপনাদের ম্যাডাম শকুন্তলার সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা ক'দিনের?'

ঝমরে চেপে এঁরা দুজনে চলেছেন নিবেদিতা বা নিম্বুর বাসায়। কাকভোরে টেলিফোন করে সত্য জয়দীপকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দুলকি চালে নয়, বেশ দ্রুতগতিতে শব্দহীন ছুটছে ঝমর—নিবেদিতা স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরতে হবে।

একটু ভেবে জয়দীপ বলল, 'তা—প্রায় দেড় বছরের পরিচয়।'

ঝমরের গতি কমিয়ে, ঝপ করে ব্রেক কষলেন সত্য। সরাসরি জয়দীপের চোখে চেয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বিয়ে-শাদির কথাবার্তা পর্যন্ত গড়িয়েছে?'

'প্রায়। গড়িয়ে—ছিল—'

ভুরু কোঁচকালেন সত্য, 'মানে?'

'এখন আমাকে ও খুনি বলেই মনে করে।'

ঝমর চলতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জয়দীপ যেন আপনমনে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'গত পাঁচ দিনে বহু চেষ্টা করেও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। টেলিফোনেও বোঝাতে পারিনি যে, খুনটা আমি করিনি।—'

সহানুভূতির স্বরে সত্য বললেন, 'আপনি যে খুনি নন, ব্যাপারটা প্রমাণিত হলেই, আবার দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ধরা গলা জয়দীপের, 'না, ঠিক হবে না।'

'আর কী কারণ থাকতে পারে?'

'দুটি কারণে। প্রথমত, ওর বাবা, মিস্টার কোরগাঁওকর আমাদের দুজনের সম্পর্ক কখনোই ভালো চোখে দেখেননি। সম্ভবত উনিই মেয়ের কানে বিষ ঢেলেছেন।'

একটু চুপ করে রইল জয়দীপ। সত্য ধরিয়ে দিলেন, 'দ্বিতীয় কারণ?'

প্রেমিকের হতাশ গলা বদলে পুরুষের দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল জয়দীপ, 'যে-মেয়ে আমাকে বিশ্বাসই করে না, সে যত ধনি-কন্যাই হোক না কেন, তাকে কোনও মতেই বিয়ে করতে পারব না। তা ছাড়া, হয় ওরাই আর রাখবে না, বা, আমিই ছেড়ে দেব চাকরি।'

'এই ক'দিন তো আপিস বন্ধ রাখা হয়েছে। কবে খুলবে?'

'সোমবারে। তবে, আমি আর যাবই না, ঠিক করেছি।'

BanglaBook.org

ওয়ারডেন রোডের বাঁ-দিকে ছোট রাস্তায় ঝমরকে ঘোরাতে-ঘোরাতে সত্য বললেন, 'এসে গেছি। আর-সোমবার আপনি আপিসে যাবেন। লাঞ্চের পর। অবস্থা বুঝে, ফাইনাল ডিসিসন নেবেন। ও-কে?'

জয়দীপ চশমার কাচের ভেতর দিয়ে চোখ পিটপিট করে সত্যকে দেখল। কিছুই না বুঝতে পেরে, বলল, 'ও-কে।'

বলে, দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, সত্য বললেন, 'দাঁড়ান। আরও একটা ভাইটাল কোয়েশ্চন আছে।'

জয়দীপ ফের দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সত্যর দিকে। সত্য প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সঙ্গে নিবেদিতার কীরকম সম্পর্ক? এখন?'

'ভালোই।'

'কোন পর্যায়ের ভালো?'

'ভালো বন্ধু।'

'তা হলে, রুদ্রাক্ষ সেনের ইচ্ছে পুরণ করছেন না কেন? নিবেদিতাকে যদি আপনি বিয়েটা করেই ফেলেন—তা হলেই একদিকের ঝঞ্ঝাট থেকে আপনি রেহাই পেয়ে যান। ভাইবোনকেও ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেন।'

ম্লান হাসি ফুটল জয়দীপের মুখে। বলল, 'আপনি কি ঘটকালি করছেন?'

'কেন নয়? সমস্যার সরল সমাধান ভেবে, ঘটকালি করতেই বা দোষের কী?'

'বড় দেরি হয়ে গেছে, সত্যবাবু! নিম্বুর আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট প্রবল। দিল্লিতে যখন আমরা ছিলুম—সেই কৈশোর ও প্রথম যৌবনে কাছাকাছি থাকার জন্য যে-সম্পর্ক, হয়তো, অজান্তেই কোনও সম্ভবনার দিকে নিয়ে যেতে পারত—তা তো আর নেই এখন!'

'তা ভাঙন ধরল কেন এবং কোথায়? সেই 'আউট-অফ-সাইট-আউট-অফ-মাইন্ড' ব্যাপারটিই কি মূল কারণ?'

'অনেকটা তাই। তা ছাড়া, সেই সাত-আট বছর আগে বাবার বদলির কারণে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। আমাকে তখন নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে বৃহত্তর জগতে মন দিতে হয়েছে।'

'তাই বলে, ভালোবাসার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে?'

'একদিনে তো নয়! প্রথম কিছুদিন, চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখা গেছে। ক্রমে, নতুন কাজ শেখার আগ্রহে ও কাজের চাপে—ধীরে-ধীরে তাও থেমে গিয়েছিল।'

মৃদু হাসলেন সত্য। বললেন, 'নারী, তথা প্রণয়-জাতীয় ব্যাপারে যদিও আমার অভিজ্ঞতা শূন্যের পর্যায়ে পড়ে, তবু, শুনেছি, মেয়েরা তাদের জীবনের প্রথম প্রেম কখনও ভুলতে পারে না। তদুপরি, সমবয়সী ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মেয়েই নাকি অধিকতর গাম্ভীর্য এবং বুঝদার। প্রথম প্রেমে পড়লে প্রেমিককেই শিবের মতো স্বামী হিসেবে ভাবতে শুরু করে। আপনার কী মনে হয়?'

কিছু যেন মনে পড়ল এইমাত্র, ঠিক তেমনি ভাবে তৃপ্তিদায়ক কিঞ্চিৎ রসিকতার সুরে জয়দীপ বললে, 'জানেন সত্যবাবু! ছোটবেলায় ও শিবরাত্রির উপোস করত ওর মার সঙ্গে। পরে, আমাকে প্রসাদি ফল খাইয়ে হেসে-হেসে বলত, তোর ভালোর জন্য উপোস দিলাম। তোর দুষ্টুমি নষ্টামি যাতে কমে—'

বলে, হাসতে গিয়ে জয়দীপের মুখটুক কেমন কোমল করুণ হয়ে গেল। সত্য গাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতে বললেন, 'ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন নাকি?'

'পাড়ার লোক এবং স্কুলের মাস্টাররা বলতেন বটে।'

'এখন মোটেই বোঝা যায় না!'

BanglaBook.org

বাড়িটা পুরোনো আমলের হলেও মেঝে, সিঁড়ি সব ঝকঝকে তকতকে। একটা টালিও ভাঙা বা নোংরা নয়।

তিনতলায় উঠতে-উঠতে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'উনি কি আপনার ও শকুন্তলার বিষয়ে জানেন কিছু?'

'হুঁ। আমিই বলেছি।' অপরাধীর গলায় জয়দীপ বলল।

সত্যসাধন অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, 'ইশ! বেচারি!'

দরজা খুলে দিল নিবেদিতা নিজেই। ওকে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে মন ভালো হয়ে গেল সত্যর। ভারী মিষ্টি মুখশ্রী। প্রায় গোল মুখে সরু চিবুক। পাতলা ঠোঁট, টানা ভুরু এবং আয়ত চোখজোড়া মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ প্রতিমা-প্রতিমা দেখতে। প্রশান্ত ও গম্ভীর। রংটা একটু চাপা। সত্যর মনে হল, ফরসা রং হলে যেন মানাত না। পরনে হালকা খয়েরি জমির ধনেখালি। গাঢ় ছাই রঙের মোটা পাড়-আঁচল।

জয়দীপকে এক পলক দেখে নিয়ে সত্যর দিকে তাকাল। হেসে, অভ্যর্থনা করল, নমস্কার-সমেত, 'কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন!' বলে, দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'চিনে ফেলেছেন?'

ঘাড় কাত করে নিবেদিতা বলল, 'জয়ের মুখে শুনেছি! আপনার তো দু-এক দিন আগেই আসার কথা ছিল—'

'হয়ে উঠল না। আরও কয়েকটা মামুলি কেস হাতে আছে। আপিসেও কামাই দিতে পারি না। নেহাত, আজকে না এলেই নয়—তাই, বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম।'

'না-না, বিরক্ত কীসের? কিন্তু, এই কি সময় হল আসার? আমাকে তো একটু বাদেই বেরুতে হবে! বসুন। একটু চা করে আনি—'

সোফায় বসতে-বসতে সত্য আপত্তি করলেন, 'এখন আর চায়ের ঝামেলা করবেন না। আরও দেরি হয়ে যাবে আপনার। বরং বসুন, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা সেরে নিই। বেশি সময় নেব না।'

মাঝারি ঘরটি পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। জানালার লাগোয়া ছোট্ট ডাইনিং টেবিল, চারটি চেয়ার। দরজার পাশে তিনটি সোফা ও নীচু কাচের টেবিল, ইংরিজি, হিন্দি পত্রপত্রিকা এবং আনন্দবাজার।

সত্যর মুখোমুখি সোফার হাতল ছুঁয়ে নিবেদিতা বলল, 'ঠিক আছে। আমি বসছি। জয়, প্লিজ, তুমি বরং আজ চা করে খাওয়াও আমাদের। আমিই তো রোজ করি—প্লিজ!—'

জয়দীপ লাজুক ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল। সুবোধ বালক হয়ে, ভেতরের দিকে যেতে-যেতে বলল, 'ঠিক আছে। আমি চা করে খাওয়াচ্ছি—তোমরা কথা বলো।'

গলা তুলে নিবেদিতা জিগ্যেস করল, 'চা-চিনি কোথায় আছে, জানো তো?'

ভিতর থেকে জয়দীপ সাড়া দিল, 'হ্যাঁ। ওপরের ক্যাবিনেটে। ডানদিকে।'

তার মানে, সত্য আন্দাজ পেলেন, জয়দীপ রায় এখানে রোজ না হলেও, প্রায়ই আসে-টাসে।

সোফায় বসে, শান্ত কণ্ঠে নিবেদিতা বলল, 'বলুন, ওরা কেমন আছে?'

'ওরা কারা?'

'জয়ের ভাইবোন। জয়ী-জাহ্নবী?'

ওর চোখে চোখ রেখে সত্য বললেন, 'আপনার দাদাকে টেলিফোন করে, আপনি নিজেই তো খবর পেতে পারেন!'

নিবেদিতা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, 'না। পারি না। ও বম্বেতে এলে কোথায় ওঠে, কী তার টেলিফোন নম্বর আমি জানি না, জানতেও চাই না। ওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলেই ধরে নিন।'

BanglaBook.org

বাঁকা সুরেই একটু খোঁচালেন সত্যসাধন, 'যোগাযোগ তো আছে। খোঁজ-খবর নেয়—'

বাধা দিল নিবেদিতা, 'স্রেফ নিজের প্রয়োজনে দাদাগিরি ফলাতে আসে। "দাদাগিরি"—শব্দটি দুই অর্থেই এখানে খাটে। ওর সম্পর্কে আলোচনা করতেই ঘৃণা করে আমার।'

'ওদের দুজনকে কেন আটকে রেখেছে, আপনি জানেন?'

'ব্ল্যাকমেইলিং! যাতে আমি ও জয়দীপ বিয়েটা করে ফেলি—ছোটবেলার সেই পুতুল-বিয়ের মতো! হুঁহ!'

'আপনাদের অসুবিধেটা কোথায়?'

'প্রশ্নটা বড় ব্যক্তিগত হয়ে গেল না!'

'ইচ্ছে না হলে, অসুবিধে থাকলে জবাব দেওয়ার দরকার নেই।'

'শুধু এইটুকু জেনে রাখুন—আমি বিয়েই করব না।' এক বিন্দুও হাসি নেই নিবেদিতার মুখে। স্থির গম্ভীর গলায় কথা বলছে ও।

পরিবেশটা একটু হালকা করতে সত্য হেসে বললেন, 'চিরকুমারী বলছেন?'

কথাটার মধ্যে ঠাট্টার রেশ কতটা বোঝবার জন্যেই বোধহয়, নিবেদিতা চোখের পলক না ফেলে সত্যর মুখ লক্ষ করল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করে জবাব দিল, 'বলতে পারেন।'

'আপনাদের বিয়ে হলে রুদ্রাক্ষর কী স্বার্থসিদ্ধি হয়, জানেন কিছু?'

'আন্দাজ করতে পারি।'

'কী?'

'আমার বাবার পৈতৃক ভিটে কলকাতার ডায়মন্ড হারবারে। বে-অফ-বেঙ্গলের সমুদ্র ও গঙ্গার মোহনার খুব কাছে। অনেকখানি জমি। সেখানে বেশ বড়সড় পুরোনো আমলের বাড়ি আছে। নোনা জলে, দেখাশোনার অভাবে সে-বাড়ি এখন ভূত-বাংলা বা হানাবাড়ি নামে পরিচিত। আমার দূর-সম্পর্কের এক মেসোমশাই তাঁর পরিবার নিয়ে কোনমতে দুখানা ঘরে থাকেন এবং যতটা সম্ভব দেখাশোনা করেন। একজন মালি-কাম-দারোয়ানও আছে। আরেকটি বাংলো-টাইপ বাড়ি আছে দিল্লির নিজামুদ্দিনে। বাবা উইল করে, দিল্লির বাড়ি আমাকে দিয়ে গেছেন। ডায়মন্ড হারবারের জমি-বাড়ির অংশীদার মা-আমি ও দাদা। তবে, মার মৃত্যু এবং আমার বিয়ে হলে—ও-বাড়ি সম্পূর্ণই দাদা পাবে।—'

সত্যসাধন সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! আপনার দাদার বুদ্ধি ও হিসেব তুলনাহীন।'

নিজের দাদা বলেই হয়তো সামান্য সংকোচে মাথা নীচু করে চুপ থাকল নিবেদিতা।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনার মা নিশ্চয়ই জীবিত নেই।'

'উঁহু। প্রায় দেড়মাস হল।'

আর 'দাদা' ব্যবহার না করে সত্য বললেন, 'আপনার বিয়েটা ঘটাতে পারলে, ভাবুন—রুদ্রাক্ষ সেনের উচ্চাঙ্গের আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসা আরও ফলাও হবে। পূবের সমুদ্রও ঘাঁটির গায়ে লেগে সার্ভিস দেবে। বাহ! সত্যিই চমৎকার—'

জয়দীপ চা নিয়ে এল।

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, জয়দীপ ও সত্যসাধন উঠে পড়লেন।

BanglaBook.org

জেজে বলল, 'লালুয়া, ফির তুম কাল নেশা কিয়া?'

লালুয়া নিজের কান ধরে। জিভ কেটে বলল, 'জি নেহি সাব। কসমসে। আমি দেখলাম লোকটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।'

রাগ সামলে জেজে বলল, 'হুম। তারপর?'

'ভূতই হবে, সাব! অ্যায়সা জোরে একটা ঘুষি মারলে—চোয়ালের ব্যথায় কিচ্ছু খেতে পারছি না!—'

'হুম। তারপর?—'

'আমার আর মনে নেই, হুজুর—'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে-তুলতে জেজে ধমক দিল, 'চোপ মিথ্যুক—গেঁজেল! গেট আউট। আর-একদিনও যদি শুনিও ঘরে বসে তুই গাঁজা খেয়েছিস—তাহলে, ভূত আর আসবে না,—তোকেই ভূতের কাছে পাঠিয়ে দেব—ভাগ—'

চোয়ালে হাত বোলাতে-বোলাতে হলুদ চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লালুয়া, জেজে ফোনে বলল, 'ইয়েস, নিশা?'

'বসকে ফোনটা দিন। একটা কল আছে।'

'বস তো এ-ঘরে নেই। বোধহয় ব্লু চেম্বারে—'

নীল ঘরে বিপ-বিপ হতেই রুদ্রাক্ষ রিসিভার তুলে ভারী গলায় বলল, 'ইয়াপ!'

'বস। জয়দীপ রায়'জ অন দ্য লাইন।'

খুট আওয়াজটা হতেই রুদ্রাক্ষ বলল, 'জাস্ট এ রিমাইন্ডার, জয়দীপ।'

'বলুন?' জয়দীপের গলায় ত্রাস টের পেল রুদ্রাক্ষ।

'আটচল্লিশ ঘণ্টাও নেই আর। কাল রাত বারোটার আগে যদি ব্যবস্থাটা না হয়, দেন ইউল নেভার সি দেম এগেন। গাম্ফ-এ যুদ্ধ লাগছে সম্ভবত। দ্য হাংরি ড্রাই সোলজারস নিড গার্লস অ্যান্ড চিলড্রেন ফর এন্টারটেইনমেন্ট—'

ওপার থেকে বাধা এল, 'রুদ্রদা, প্লিজ, অমন কথা বলবেন না—গা ঘুলিয়ে ওঠে। উফ্! আপনি কি অসম্ভব—'

কণ্ঠরোধ হল বোধহয় জয়দীপের। রুদ্রাক্ষ বলল, 'তুমি কিছু বলবে, না ফোন রাখব?'

দু-সেকেন্ড চুপ। তারপর ধরা গলায় জবাব এল, 'আমি রাজি, রুদ্রদা—নিম্বুকেও মোটামুটি রাজি করিয়েছি।'

খুশি হল রুদ্রাক্ষ। বলল, 'আহ্-হা! দ্যাটস লাইক আ গুড বয়। তা আজ রাতেই আমি রেজিস্ট্রারকে ধরে এনে ব্যবস্থা করি?'

'না-না, রুদ্রদা। আজ নয়। আমরা একটু রীতি-রেওয়াজ মেনে করতে চাই। সাত পাক ঘুরে, মানে, সপ্তপদী—'

'ও-নো! ও-সব ঝামেলা আবার কেন?'

'বিয়ে তো জীবনে দুবার করার ইচ্ছে নেই। একবারই। তাই বাপ-দাদার নিয়ম মেনে—তাছাড়া, আপনারও একমাত্র বোন—কন্যাদান করবেন—'

'উরিব্বাবা! সে তো বিস্তর ঝামেলা। পুরুত কোথায় পাব? বিয়ের ছপ্পন্ন রকমের সরঞ্জাম?'

'দাদার নারায়ণ স্টোর্স-এ সব পাবেন। ওখানে, অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ—সবকিছুর উপকরণ পাবেন। আর পুরুত আমি আনতে পারব। বাবার এক বন্ধু, বৃদ্ধ এক রিটায়ার্ড কেরানি। উনি যজমানগিরি করেন—ভটচাজ বামুন।'

'বেশ। তোমাদের ইচ্ছেই পূরণ হোক। তবে, রেজিস্ট্রি ইজ এ মাস্ট। কাল করতে চাও?'

'কাল বিয়ের দিনও আছে। লগ্ন—দশটা চল্লিশ গতে—'

'রাত! একটু আগে—সন্ধে নাগাদ মানে, ইয়ে, তোমাদের ওই গোধূলি লগ্নে চুকিয়ে দেওয়া যায় না?'

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর, জয়দীপের গলা, 'আমাদের তাড়া আছে বলে, বিয়ের লগ্ন তো এগিয়ে আনা যাবে না।'

BanglaBook.org

রুদ্র চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে, আওয়াজ খাদে নামিয়ে জিগ্যেস করলে, 'আই হোপ—নো মাঙ্কি বিজনেস? নো চালাকি?'

'রুদ্রদা, কী যে বলেন আপনি? আপনার সঙ্গে—'

'ঠিক আছে। খেয়াল থাকে যেন—আরব রাজ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সৈনিকরা বেশ উত্তেজিত এখন—'

'কিন্তু, আপনার ওখানকার ঠিকানা তো আমরা জানি না?'

'রাত ঠিক ন'টায় ফুলে-সাজানো মার্সিডিস ওয়ারডেন রোডে নিজের বাড়ির দরজায় তৈরি থাকবে।'...

পরদিন রাত দশটা নাগাদ বাগানে পায়চারি করছিল মাদল। দুপুর থেকে সানসেট ভিলায় কেমন যেন সাজ-সাজ রব। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, ভেতরের প্রথম হলঘরটি বেশ কয়েক ডজন ফুলের ছড়া দিয়ে সাজানো হয়েছে। বসের নির্দেশ পালন করে মাদল আলপনা করে দিয়েছে মেঝেয়। বিয়ের পিঁড়ি ঘট ইত্যাকার সব জড়ো করে সবাই তৈরি বসের একমাত্র বোনের নাকি বিয়ে। জেজে, নিশা, আরও দুটি মেয়ে, যাদের আগে দেখেনি মাদল, এবং বেয়ারা, কর্মচারী—সব মিলিয়ে চোদ্দ জন লোককে খাটতে দেখা গেছে। যদিও, ভূগর্ভে দেখা সেই গেঁজেল বা 'ধাউতে' পরশু যারা 'মাল' তুলছিল তারা ওপরে ওঠেনি।

সিংহ-দরজা খুলে ফুলে-সাজানো কালো মার্সিডিস ঢুকল। মোরামের পথে খুকুর-পুকুর শব্দ তুলে গাড়ি বারান্দার আলোয় গিয়ে থামল। মাদল এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছনে বসা জয়দীপকে দেখে ক্যানাঝোপের পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল। জয়দীপদা দেখে ফেললে গণ্ডগোল হতে পারে। ধরা পড়ে যাবে সে।

রুদ্রাক্ষ, নিশা হলের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা করছে। কী বলছে রুদ্রাক্ষ, অ্যাদ্দুর থেকে শোনা যাচ্ছে না। জয়দীপদার পিছন-পিছন লাল বেনারসি-পরা কনে নামল। রুদ্রাক্ষর বোনই হবে। কেমন দেখতে, পিছন থেকে বোঝবার উপায় নেই।

মাদল ভাবল, এ আবার কেমনতরো বিয়ে রে, বাবা! উলু নেই, শাঁখ নেই, সানাই বাজছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শকুন্তলা ম্যাডামকে ছেড়ে জয়দীপদা হঠাৎ এই ধুরন্ধর স্মাগলারের বোনের পাল্লায় কবে পড়ল?

ড্রাইভারের পাশ থেকে বুড়ো সৌম্যদর্শন পুরুতঠাকুর ধীরে-সুস্থে নামছেন। গায়ে নামাবলি, চোখে নিকেলের গোল চশমা। ধবধবে সাদা চুলের মধ্যিখানে সিঁথি। পাকা গোঁফ। কুঁজো হয়ে ঠুকঠুক লাঠি ঠুকে হাঁটছেন। কীরকম খটকা লাগল মাদলের। ক্যাকটাস, ক্যানাঝোপের আড়াল নিয়ে এগিয়ে গেল সে। পুরুতঠাকুরের হাতে গামছার পুঁটুলি। রুদ্রাক্ষর গলা শুনতে পেল মাদল, 'আসুন, ঠাকুরমশাই। আসুন। আপনার ওই পুঁটুলিতে আবার কী?'

খনখনে কাঁপা গলায় পুরোহিত জবাব দিলেন, 'বাছা! এটা ছাড়া যে আমার চলে না।' হেসে, গলার শ্লেষ্মা ফেলতে মোরামপথের পাশে এগিয়ে এলেন। মাদল যে ক্যাকটাসের পিছনে ছিল তারই কাছে এসে নানান বিচিত্র আওয়াজ তুলে কেশে, কী একটা বলতে বলতে 'খ্যাক-থুঃ।'

গামছার পুঁটুলি তুলে রুদ্রাক্ষকে দেখিয়ে দোলালেন। হেসে বললেন, 'শালগ্রাম শিলা বাবা।' বলে, মাথায় ঠেকালেন।

মাদল ভাবার চেষ্টা করল, কফ ফেলতে গিয়ে পুরুত যেন কী একটা বললেন? 'এলাম' নাকি!

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা-আনন্দে চনমন করে উঠল সে। কী কাণ্ড! এ তো সত্যকাকু!!

BanglaBook.org

॥ পনেরো ॥

পুরুতমশাই যে আসলে সত্যকাকু, ব্যাপারটি আন্দাজ করে, মাদল মনে-মনে প্রায় নেচে উঠল। ইশ! একেবারে চেনাই যায় না। ও নিজেই তো প্রথমে চিনতে পারেনি। চুলে রং করে একদম সাদা। গোঁফ-জোড়াও লাগিয়েছেন একেবারে ম্যাচিং। সারা বছরে ক্বচিৎ-কখনও ধুতি পরেন সত্যকাকু। লাস্ট পরেছিলেন সেই ছাব্বিশে জানুয়ারি। রাজ্যপালের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাওয়ার সময়। কিন্তু, সে তো অন্য ব্যাপার। চুনোট ধাক্কা-ওয়ালা ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। গিলে-করা ফুরফুরে শৌখিন আদ্দির পাঞ্জাবি। একেবারে বাংলা ছবির নায়ক। আর, আজ কী ছিরি! কোরা, মিলের সরুপাড় ধুতি। তা-ও প্রায় হাঁটু অবধি তোলা। পাঞ্জাবি দূরস্থান, গেঞ্জি পর্যন্ত নেই। স্রেফ নামাবলি। হিন্দিতে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' লেখা। মাদল ভেবে পেল না, এ-জিনিস সত্যকাকু জোগাড় করলেন কোত্থেকে, কখন? শুধু নামাবলিই নয়। ধবধবে পৈতে। বাম-বাহুতে কালো-সুতোয় বাঁধা একটি তাবিজ। শুধু টিকিটাই বাকি।

বাগানের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে সোজা হলঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এই সব লক্ষ করছে মাদল। জয়দীপ রায়কে দেখে প্রথমে আবডাল নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যেই দেখল সত্যসাধন ওঁর সঙ্গে রয়েছেন—অমনি সব ভয় সরে গিয়ে ডবল সাহসী হয়ে উঠল, মাদল বসু। মনে-মনে সে ধরেই নিয়েছে, সত্যকাকু আছেন মানেই জয়দীপদাও নিশ্চয়ই জানেন যে, মাদল এখানে এসেছে আত্মপরিচয় গোপন করে।

ডানহাতে লাল গামছার পুঁটুলিতে শালগ্রাম শিলা ও লাঠি, বাঁ-হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝোলাসমেত, কুঁজো হয়ে হলঘরে পা রাখলেন সত্যকাকু। ওমা! পায়ে তো সেই মাদলের অতি-পরিচিত খয়েরি তালতলার চটি!

রুদ্রাক্ষ হাসিমুখে হাত তুলে বলল, 'একটু দাঁড়ান, ঠাকুরমশাই।' বলে, কাছে-দাঁড়ানো জেজেকে ইশারা করল, 'জেজে, পুরোহিতজিকো জরা পরখ কর লো।'

মাদলের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। ধুরন্ধর রুদ্রাক্ষর সন্দেহ হল নাকি? ধরা পড়ে যাবেন না তো সত্যকাকু?

জয়দীপের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে রুদ্রাক্ষ। মুখের মিষ্টি হাসিটি বজায় রেখে বলছে, 'ওয়েলকাম, মিস্টার জামাই। তা, পকেটে কোনও আপত্তিকর বস্তু নেই তো?' বলতে-বলতে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে ওর সারা গায়ে দু-হাত বুলিয়ে দেখে নিল সে।

কাণ্ডটা এত দ্রুত হল যে, জয়দীপ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই তার বডি সার্চ হয়ে গেল। রুদ্রাক্ষ হেসে-হেসেই বলল, 'বাহ্! গুড বয়!'

বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে নিশার টেবিলে কাঁধের ঝোলা এবং কমণ্ডলু রেখেছেন সত্যসাধন। কমণ্ডলুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে, ঝোলা হাতড়াতে লাগল জেজে। এক-এক করে বের করে দেখল সব—বিড়ির প্যাকেট, দেশলাই, চন্দনপিঁড়ি, টর্চ, পঞ্জিকা। সত্য 'হাঁ-হাঁ' করে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন—রুদ্রাক্ষ জিগ্যেস করলে হাত বাড়িয়ে—'ঠাকুরমশাই, আপনার লাঠিখানা তো দারুণ—দেখি, দেখি—'

সত্য বিরক্ত মুখে একবার জেজে ও একবার রুদ্রাক্ষকে দেখতে-দেখতে লাঠিটা এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে গাঁটে-গাঁটে প্যাঁচ ঘুরিয়ে দেখে নিল রুদ্রাক্ষ, 'বেশ পোক্ত, কী বলেন?'

মাদল বুঝল, ধুরন্ধর খুনি লোকটা দেখে নিল—ওতে চোরা-গুপ্তি-টুপ্তি আছে কি না। ততক্ষণে, ঝোলা পরখ করে, ছোঁওয়ার ভঙ্গিতে দু-হাত বাড়িয়ে জেজে সত্যকাকুর কাছে আসতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি। গামছার পুঁটলি সমেত হাত জোড়া মাথার ওপরে তুলে শ্রীচৈতন্যের কায়দায় প্রায় নেচে উঠলেন। খনখনে কাঁপা গলায় হিন্দি বেরোল, 'আহা-হা—আহা-হা! ছুঁয়ো মাত—ছুঁয়ো

BanglaBook.org

মাত—কেয়া করতা হ্যায়—তুম ব্রাহ্মণ হ্যায়—অ্যাঁ—?'

জেজে যত এগোচ্ছে সত্যকাকু এক-পা দু-পা করে পেছোচ্ছেন—ভারতনাট্যমের কায়দায়। জেজে হিন্দিতে বলল, 'দাঁড়ান স্থির হয়ে। আপনার বডি সার্চ করব—'

'কেন হে বাপু। আমি কী করেছি। আমি কি চোর না, ছ্যাঁচোড়? ওহে, জয়বাবা। এ কোথায় এনে ফেললে আমায়—' সে প্রায় হাঁউমাঁউ চিৎকার।

হলঘরে যে ক'জন ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। সত্যকাকুর অভিনয় দেখে মাদল চমৎকৃত। হাসিও পাচ্ছিল—একটু-একটু ভয়ও। গোঁফটা না ছিটকে পড়ে যায়! অথবা, জেজে যদি আসল-নকল পরখ করতে হঠাৎ টান মেরে বসে? তাহলেই সর্বনাশ! খুনে-স্মাগলারদের এই আড্ডা থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা মুশকিল। ভাবতেই শরীর অবশ হয়ে আসে।

ততক্ষণে, সুর পালটেছেন সত্য। সামান্য থিতিয়ে ভারী দুঃখ-মাখা গলায় বলছেন, 'কী আর সার্চ করবে, বাছা! সে-বডি কি আর আছে! ভেজাল খেয়ে-খেয়ে দেহের চোদ্দোটা বেজে গিয়েছে—এখন দেহরক্ষাই বাকি!'

রুদ্রাক্ষ অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে ইশারা করল জেজেকে। ঠোঁটের কোলে হাসি ঠেকিয়ে সত্যকে বলল, 'আপনি উতলা হবেন না, ঠাকুর। এখানে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।'

'বসের বোনের বিয়ে, বসের হাসি-হাসি মুখ—এই সব দেখে জেজে হয়তো একটু ইতস্তত করছিল। এবার ঘাপ বুঝে হামলে পড়ল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছিলেন সত্য। তাঁর গলা, কাঁধ, নামাবলি চেপে, বগল, পিঠ ছুঁয়ে বোলানোর কায়দায় হাত ঘুরিয়ে নেমে এল কোমরের কষিতে। ধুতি চেপে-চেপে হাত বোলাতে-বোলাতে নগ্ন হাঁটু অবধি নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জেজে।

মাদল জানে না, কী প্ল্যান করে এসেছেন সত্যকাকু! এমন বিপজ্জনক একটি ঘাঁটির ভেতরে আসবার জন্যে উনি কতখানি প্রস্তুত? তাই, কাঁটা হয়ে ছিল। টানটান স্নায়ু শিথিল হতেই প্রায় ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল সে।

'পাপ ধুয়ে যাক'—বা, 'ঈশ্বর ক্ষমা করুন' গোছের আধবোজা চোখে বিড়বিড় মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন সত্যসাধন। জেজে সরে দাঁড়াতেই ড্যাবড্যাব চোখে চারপাশে দেখে নিলেন। 'হরি ওঁম—হরি ওঁম' বলতে-বলতে দ্রুত হাতে কমণ্ডলু তুলে নিলেন টেবিল থেকে। জয়দীপ ও রুদ্রাক্ষর দিকে চেয়ে নিজের মনেই বললেন যেন, 'চান করতে পারলে ভালো হত! ইশ! নাহ্-থাক! অ্যাতো রাতে আবার ঠান্ডা লেগে শ্লেষ্মা জমবে। গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেহশুদ্ধি করে নিই—হরি ওঁম—' হাতে জল নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় ছেটাতে-ছেটাতে বললেন, 'অপবিত্র পবিত্রবা—ওঁম—হুঁম—' বলতে-বলতে খকখক কেশে বোধহয় শ্লোক ভেবে নিলেন এবং শুরু করলেন আবার, 'মন্দাকিনী সলিল চন্দন চর্চিতায়—নন্দীশ্বর প্রমথনাথ বিশ্বেশ্বরায়—ওঁ মা গঙ্গে—'

মাদল ভেবে পাচ্ছে না, কীসের মন্ত্র পড়ছেন সত্যকাকু? আদৌ কোনও মন্ত্র কি? না, স্রেফ ভুজুং ভাজুং? রুদ্রাক্ষ, জেজে এবং চারপাশের অন্য সব মুখগুলির দিকে একে-একে চেয়ে দেখল মাদল। এরা কেউ পুজো-পাঠ, সংস্কৃত মন্ত্র-ফন্ত্রের ধার বোধহয় ধারে না। আগেকার দিনের ডাকাত, যারা কালীপুজো-টুজো করত, তাদের সামনে সত্যকাকু অবশ্যই এতক্ষণে ধরা পড়ে যেতেন। এই বদমাশগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সত্যকাকুর কাণ্ড-কারখানা এরা খানিকটা মজা-দেখার চোখেই দেখছে। বাঁদর-নাচ, বা সার্কাসের জোকার দেখার মতো।

কমণ্ডলু, পুঁটলি হাতে ছিলই। এবার, টেবিলের ওপর থেকে ঝোলা তুলে নিলেন সত্য। রুদ্রাক্ষ বলল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! চললেন, কোথায়? আপনি গেলে এদের বিয়ে হবে কী করে?—'

বলতে-বলতে, ভাবী বর-কনের দিকে দেখাল। জয়দীপের চেহারা এখন বোকা-বোকা। কী করবে ঠাহর পাচ্ছে না যেন। মাদলও দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল, সত্যি-সত্যিই যদি সত্যকাকু এখন চলে যান, তো এসেছিলেনই বা কেন?

BanglaBook.org

জিনিসপত্তরসুদ্ধই হাতজোড়া কপালে ঠেকিয়ে রুদ্রাক্ষকে নমস্কার করার ভঙ্গি করলেন সত্যকাকু। বললেন, 'না, বাবাজীবন। বিবাহ হচ্ছে শুদ্ধাচারের ব্যাপার। এখানে, সে-কার্য সমাধা করতে গেলে আরও কী কী অপমান এই অভাগা ব্রাহ্মণকে সইতে হবে, কে জানে! তার চেয়ে বরং আমাকে কাছের লোকাল ইস্টিশানে পৌঁছে দিন—আমি বিদেয় হই।'

রুদ্রাক্ষ জয়দীপকে ইশারা করল এবং হাতজোড় করে যথেষ্ট করুণ গলায় বলল, 'এ-যাত্রা মাফ করে দিন, ঠাকুর। আসলে, আমি একটু সাবধানী মানুষ কিনা! তবে, কথা দিচ্ছি, আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। প্রমিস! —' চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে কয়েক পলক রুদ্রাক্ষকে দেখলেন সত্যকাকু! বললেন, 'কথা দিচ্ছেন?'

'আমার একমাত্র বোনের দিব্যি।'

'বেশ! চলো হে জয়বাবু। বিবাহের আয়োজন হোক—রাত বেড়ে যাচ্ছে—'

রুদ্রাক্ষ হাতের ঘড়ি দেখে নিয়ে জেজে এবং অন্যদের হিন্দিতে হুকুম করল, এই—সব মালপত্তর এনে পুজারিজিকে দাও তোমরা—উনি যেমন-যেমন বলবেন—সাহায্য করো সবাই—হাত লাগাও—'

বাংলায় কথা হচ্ছিল বলে, অন্যেরা এতক্ষণ ঠিক ধরতে পারছিল না—কী হচ্ছে না হচ্ছে, এবার নাড়াচাড়া পড়ে গেল বসের হুকুম পেয়ে। দুপুরের আগেই চটের থলি বোঝাই বিয়ের যে সব সরঞ্জাম এসেছে—সেই সব নিয়ে আসতে ছুটল জনা তিনেক। সত্যসাধন পিঁড়ি ও আলপনার কাছে ধীরে-সুস্থে উবু হয়ে বসলেন।

রুদ্রাক্ষ ততক্ষণে নিবেদিতার দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে একটা সোনার নেকলেস বের করে ধরিয়ে দিল ওর হাতে। মুখে অল্প হাসি টেনে বলল, 'নিবে! ইটস মাই গিফট। এটা পরে একটু সাজগোজ করে নাও।—'

নেকলেসটি হাতে ধরে দাদার দিকে চেয়ে আছে নিবেদিতা। পলক পড়ছে না চোখের। চেয়েই আছে। তার কি ছোটবেলার কথা মনে পড়ল? নাকি, কোনও বিশেষ ঘটনা?

অথবা, হয়তো মনে পড়ল হঠাৎ, ভাই-বোনের ফেলে-আসা সেই খেলাধুলো খুনসুটির দিনরাত্তির? এই সব ভাবনা এল মাদলের মনে। কারণ, সে স্পষ্ট দেখতে পেল, নিবেদিতার আয়ত চোখজোড়া ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে। জল উপছে পড়বে বুঝি এক্ষুনি। রুদ্রাক্ষও সহসা চোখ সরিয়ে পিছনে নিশার দিকে তাকাল। ব্যস্ত গলায় বলল, 'নিশা। বি এ গুড গার্ল। আমার বোনকে তোমাদের প্রসাধন কক্ষে নিয়ে যাও—' জয়দীপের কাছে চলে গেল দ্রুত পায়ে। গাল ভরে হেসে বলল, 'মাই ডিয়ার হবু-জামাই! এসো আমার সঙ্গে। ও-ঘরে তোমার নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি রাখা আছে—পরে নেবে চলো—'

জয়দীপ সত্যসাধনের দিকে তাকাল। সত্য সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাও শিগগির। তবে কাছা-কোঁচার ঝামেলায় যেও না। অভ্যেস নেই তো! খুলে যেতে পারে। একেবার আদি ও অকৃত্রিম মালকোঁচা মেরে, কষে বেঁধে নিও।' রুদ্রাক্ষর সঙ্গে জয়দীপ হলুদ চেম্বারের দিকে হাঁটা দিল।

খানিকটা ঠাট্টার সুর থাকলেও সত্যকাকুর কথার মধ্যে অন্য ইঙ্গিত নেই তো! মাদলের কেমন সন্দেহ হল। অ্যাকশানের গন্ধ? কে জানে! মাথা খাটিয়েও কোনও আন্দাজ পাচ্ছে না মাদল। সত্যকাকুর প্ল্যানটা কী অথবা দু-একজনের কাজ তো নয়? পুলিশ ফোর্সের সাহায্য না থাকলে তো সামলানো যাবে না। এত জটিল ঘাঁটি, এতগুলো ষণ্ডা? আগ্নেয়াস্ত্রও প্রচুর আছে নিশ্চয়ই। কীভাবে যে কী হবে তার কণামাত্রও টের পাওয়ার আশায় হাঁ করে গিলে খাচ্ছে সত্যকাকুর প্রতিটি ভঙ্গি বা কথা।

জেজেকে বললেন, উনি, অবশ্যই হোঁচট হিন্দিতে, 'চারঠো আস্তো, মানে থান ইট মাংতা, বাবা!'

BanglaBook.org

'থান ইট?' জেজের বুঝি আক্কেল-গড়ুম, 'থান ইট দিয়ে কী হবে?'

'বিয়ে হবে, বাপ, বিবাহ! অগ্নিসাক্ষী চাই না?'

'ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকে, চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাবছে জেজে। মাদলের বেদম হাসি পাচ্ছে। মহা ফাঁপরে পড়েছে ব্যাটা। রাত এগারোটার সময় মালাবার হিলে থান ইট? অসম্ভব! কাছেপিঠে নতুন দালান তৈরির কাজ চললে, তবেই জোগাড় হতে পারে।

ভেবেচিন্তে জেজের প্রশ্ন, 'চার খণ্ড পাথরে কাজ চলবে না?'

হাতের অসহায় ভঙ্গি করে সত্য বললেন, 'মধ্যাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। কী আর করা যাবে। তাই এনে দাও, ভায়া!'

হলঘর থেকে সুইমিং পুলে যাওয়ার প্যাসেজের মাথায় একটা সাদা-কালো কোয়ার্তজ ওয়াল ক্লক। ওদিকে দেখে, নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখল জেজে। ব্যস্ত গলায় বলল, 'আর কী কী চাই, একেবারে তাড়াতাড়ি বলে দিন। অন্য কাজও তো আছে আমাদের!'

কী কাজ, তা মাদলের বেশ ভালো করেই জানা। এগারোটা বাজতে আর মিনিট দশেক বাকি। আমদানি-রপ্তানির সেই 'মালবাহী ধাউ' এসে পড়ল বলে।

উত্তেজনায়, কৌতূহলে ছটফট করছে মাদল। সত্যকাকুর দিক থেকে চোখ সরছে না একদম—পাছে, ওঁর কোনও ইশারা-ইঙ্গিত 'মিস' করে ফেলে! অথচ, পুরুতমশাই একেবারে নির্বিকার। 'নারায়ণ স্টোর্সে-র ছাপ-মারা বস্তা থেকে যে সব টুকিটাকি সরঞ্জাম বেরোচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখতেই ব্যস্ত। যেন, মানুষটা চোদ্দপুরুষের যজমান। স্রেফ প্রজাপতয়ে নমঃ করতেই এসেছেন এখানে।

কোশার ভিতরে কুশি রাখতে-রাখতে বললেন, 'ব্যস। আর তো মনে হয় না কিছু লাগবে। শুধু এই কলসি ভরে জল চাই। সমুদ্রের নোনাজল নয় কিন্তু! মিষ্টি জল—' বলে জেজেকে একগাল হাসি উপহার দিলেন সত্য।

মনে-মনে চটলেও, 'বসের হুকুম মানতেই একজন চ্যালাকে হাত নেড়ে ডাকল জেজে। তার হাতে কলসি ধরিয়ে সুইমিং পুলের দিকে পাঠিয়ে দিল। অন্য দুজনকে সঙ্গে নিয়ে নিজে চলল বাগানের পথে।

ঘরে অন্য যে ক'জন মাসলম্যান ছিল, তারা হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সত্যর কাছাকাছি বসে পড়েছে দু-জন উবু হয়ে পুরুতের কাণ্ড দেখছে। সুইমিং পুলের প্যাসেজে একজন পাহারায়। মাদল গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসে সত্যকে জিগ্যেস করল, 'আমায় কিছু করতে হবে?'

বাংলা বোঝে এমন কেউ নেই এখন। উবু হয়ে বসা ষণ্ডা দু'জন ভুরু কুঁচকে মাদলকে দেখল। সত্য বোধহয় লক্ষ করলেন আড়নয়নে। বললেন, 'হিন্দিমে বোলো, বেটা। রাষ্ট্রভাষা হায় হামারা। আভি সেরেফ দাঁড়াকে থাকো। বোহৎ কিছু করনা হায়—' নিজের মনে কাজ করতে-করতে অশুদ্ধ বিকট উচ্চারণে হিন্দি বললেন সত্য। হাসি চাপতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল মাদলকে। কারণ, সে জানে, সত্যকাকু চোস্ত পণ্ডিতি-হিন্দি যেমন বলতে পারেন, লখনউয়ের উর্দু-ঘেঁষা হিন্দুস্তানিও তেমনি।

গামছার পুঁটুলি মাদলের হাতে ধরিয়ে আবার বললেন, 'আপাতত ইসকো ধরো। শালগ্রাম শিলাকো প্রণাম করো—কাম আয়গা।—'

জয়দীপকে নিজের হাতে ধুতি-পাঞ্জাবি দেওয়ার জন্যেই হয়তো হলুদ চেম্বারের দিকে নিয়ে গিয়েছিল রুদ্রাক্ষ। কখন যে একা বেরিয়ে এসেছে খেয়াল করেনি মাদল। হঠাৎ পিছনে চোখ পড়তেই দেখল, সিঁড়ি দিয়ে দু-পা নেমে থমকে দাঁড়িয়েছে লোকটা। মুখের ভাব কি একটু থমথমে? মুহূর্তেই সে-ভাব পালটে সত্যকে ডাকল, 'ঠাকুরমশাই। একটু আসবেন?'

'কে বাবা?' বলতে-বলতে বসা অবস্থাতেই ঘুরে দেখলেন সত্য। জুড়ে দিলেন উঠতে-উঠতে,

BanglaBook.org

'ও হরি! আপনি! না এসে উপায় আছে—' আরও কী সব বিড়বিড় করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন। কোমরে বাঁ-হাতের ভর রেখে হাঁটতে লাগলেন সামান্য কুঁজো হয়ে।

শালগ্রাম শিলার পুঁটুলি বেশ ভারী। সত্যকাকু এ-জিনিস জোগাড় করলেন কোত্থেকে? সত্যি -সত্যিই জয়দীপদার বিয়ে দেবেন নাকি? ধুর! তা কী করে হয়। আনসান ভাবতে-ভাবতে নেহাত কৌতূহলেই গামছার গিঁট খুলে ফেলল মাদল। একটাই বেশ শক্ত মোটা গিঁট। ফাঁক হতেই, ভেতরে উঁকি দিয়ে আঁতকে উঠল সে। কী সব্বোনাশ! কোথায় শিলা? ছ-ঘড়ার একটা রিভলভার চকচক করছে। ভয়ে, হাত থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। কিছুই না, কিছুই না, মুখ বানাবার চেষ্টা করল সে। চারপাশে নজর ঘুরিয়ে, অতি কষ্টে থরথর হাতের কাঁপুনি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গামছা দলা পাকিয়ে হাতের মুঠোয়। বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ ভাবনা শুরু হল—সত্য-কাকুকে হলুদ ঘরে নিয়ে গেল কেন খুনি লোকটা? ওঁর অস্ত্রটাও তো দিয়ে গেলেন তাকে!

রুদ্রাক্ষর পিছন-পিছন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন সত্যসাধন। ঘরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঠান্ডা এবং বড়সড় হলুদ ঘরটি সাউন্ডপ্রুফ। কোনও কারণে মাদলের সাহায্যের দরকার হলে, গলা ফাটালেও আওয়াজ পৌঁছোবে না বাইরে। ভ্যানগখের 'সান-ফ্লাওয়ার' টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। এই ছবিটার কথাই মাদল বলেছিল। তার নীচে টেবিল। টেবিলের বাঁ-ধারের শেষ কোণে, ছোটো একটি ঘর। দরজা আধখোলা। বড় আয়নায় জয়দীপকে দেখা যাচ্ছে। ধুতি পরছে সে।

টেবিলের কাছে পৌঁছে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রুদ্রাক্ষ। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর বরফ গলায় বলল, 'মিস্টার—সত্যসাধন—কর!'

হৃৎপিণ্ডের একটা শব্দ হয়তো একটু জোরে পড়ল। ব্যস! ওই পর্যন্তই! মুখের ভাব এতটুকুও বদলাল না সত্যর। বরং সামান্য হাসলেন। হেসে, কোমর সোজা করে টানটান দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে মোটামুটি দেখে নিলেন দুজনের মধ্যে ব্যবধান কতটা। বড় জোর পাঁচ-ছয় ফুট। নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়লেন যেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আহ! এই তো! ধরা পড়ে গেছি!—'

ওঁর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে পিছনের টেবিল স্পর্শ করল রুদ্রাক্ষ। একটা ফাইল হাতে তুলে নিয়ে দোলাতে-দোলাতে বলল, 'ধরা অনেক আগেই পড়েছ, মিস্টার লিজার্ড! অ্যাক্টিং-ফ্যাক্টিং মন্দ নয়। তবে, তোমার স্বাস্থ্যটি বড় বেশি রকমের ভালো। হাত-পায়ের মাসলগুলির সঙ্গে তোমার হাঁটাটা ঠিক ম্যাচ করছিল না। গোঁফটাও কেমন অচেনা লাগছিল।'

আড্ডা মারার ধরনে হালকা গলায় বলে উঠলেন সত্যসাধন, 'তা কী করে হবে! আঁ? ছড়াটা পড়োনি বাংলায়—গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে—' বলতে, একটানে গোঁফ খুলে ফেললেন।

'শাট আপ, বাস্টার্ড!—ঠান্ডা ভারী গলায় ধমক দিল রুদ্রাক্ষ, 'এখানে কী জন্যে এসেছ? জয়দীপের ভাই-বোনকে সেভ করতে? না মারিয়ুয়ানা, হ্যাশ চেখে, সোনা এঞ্জয় করতে?'

গোঁফটা উলটেপালটে দেখে সত্যর জবাব, 'দুটো হলেই বা ক্ষতি কী!'

অন্য কথায় গেল রুদ্রাক্ষ। হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বলল, —এটা দেখছ, সাধনকর! এতে গত পাঁচ-সাত বছরের পেপার-কাটিং আছে। রাজ্যের খবরের কাগজ থেকে জড়ো করা। স্মাগলিং বা অন্য নানান জাতের ক্রাইমের রোমহর্ষক রিপোর্ট। ঢ্যামনা তথা সাধু দারোগা সাঠের সঙ্গে তোমার ছবিও ছাপা আছে নাম-সমেত। দাউদের কেস, প্লাস, সত্যবতী-মার্ডার কেস! মনের খচখচানি শান করতেই ঘরে এসে ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম।'

'বাহ! দেখি, দেখি। অনেকদিন নিজের ছাপা ছবি দেখি না—' বলে, সত্যসাধন এক পা এগোতে যেতেই, চোখের পলকে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে লিলিপুট পিস্তল বেরিয়ে এল। সোজা সত্যর বুকে তাক করে, দাঁতে দাঁত চেপে কেটে-কেটে উচ্চারণ করল সে, 'না। আর—কোনওরকম—চালাকি নয়।'

BanglaBook.org

॥ ষোলো ॥

ইন্টার-কলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ান সত্যসাধন বুঝে গিয়েছিলেন, প্রায় ছ-হাত দূর থেকে কোনও সুবিধে করতে পারবেন না। সেই জন্যেই একটু এগোতে চেয়েছিলেন। সে-পথও রুদ্ধ হল।

চকিতে রুদ্রাক্ষর পিছনে চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন, জয়দীপের ধুতি পরা তখনও শেষ হয়নি। সেই অবস্থাতেই ছোট ঘরটির বাইরে মুখ বের করে দেখছে এদিকে। অত দূর থেকে পুরো ঘটনাটা ধরতে না পারলেও বিপদ-সংকেতের আঁচ সে পেয়েছে।

ওইদিকে চোখ রেখেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন সত্য, 'ধরো জয়দীপ।'

অতি চতুর এবং টপ-ক্লাস ধুরন্ধর রুদ্রাক্ষ। সে যে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে দেখবে, এতটা আশা মোটেই করেননি সত্য। তবে, সামান্য অসতর্ক সে হয়ে পড়ল মনুষ্যজনিত ন্যাচারাল রিফ্লেক্সের কারণেই। পরে চোখের মণি চকিতের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত। জাপানি কুংফু, বা ক্যারাটে-ফ্যারাটে হাতে-কলমে কোনওদিন শেখেননি সত্যসাধন। তবু, ওই এক দণ্ডের অসতর্কতাই কাজে লাগালেন তিনি। তা ছাড়া, আর উপায়ও তো নেই। সামনে থেকে পিছনে শরীরের ভার দুলিয়ে, ডান পায়ে সাদা বাংলায় একখানা লাথি ঝাড়লেন সজোরে। মোক্ষম লাথিখানা যথাস্থানে, অর্থাৎ, পিস্তল-ধরা রুদ্রাক্ষর ডানহাতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের হলকা বেরোল পিস্তল থেকে। ওই অবস্থাতেও সত্য খেয়াল করলেন—কোনও শব্দই হল না। গুলিটা যে কোন দিকে গেল, কে জানে! তবু লিলিপুট পিস্তল অমন 'গালিভার' লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। অবশ্যই, ভায়া সিলিং।

ততক্ষণে, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুদ্রাক্ষ। সত্যকে হলুদ পাথরের মেঝেয় ফেলে বাঁ-হাতে টুঁটি চেপে ধরেছে। ডানহাতে ঘুষি চালাচ্ছে পর-পর। এলোপাথাড়ি হিংস্র ঘুষির ঘায়ে নাক মুখ ফেটে যাচ্ছে সত্যর। দম বন্ধ হয়ে আসছে নলি চেপে ধরার জন্যে। তবু, দু-হাতে রুদ্রাক্ষর কোমরে, পাঁজরায় ঘুষি মারছেন। নীচে পড়ে আছেন বলে, বক্সিংয়ের কায়দায় বাগে পাচ্ছেন না ওকে। এরই মধ্যে কসরত করে হাঁটুজোড়া সামান্য ভাঁজ হল। ডান হাঁটু দিয়ে একখানা গুঁতো ম্যানেজ করলেন সত্য। কাজ দিল। তলপেটে লাগার ফলে, আঁক শব্দের সঙ্গে রুদ্রাক্ষর বাঁ-হাত একটু আলগা হয়ে গেল। ব্যস! ওইটুকুই যথেষ্ট। ওজনদার চ্যাম্পিয়ান ঘুষি পড়ল রুদ্রাক্ষর চোয়ালে। উলটে ওকে চিত করে ফেললেন সত্য।

জয়দীপ এই সময়টুকু হতভম্ব হয়ে হুটোপুটি ঘুষোঘুষি দেখছিল দুজনের। এমন হয়। কথায় -কথায় হঠাৎ মারামারি লেগে গেল, তৃতীয় ব্যক্তির বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগতেই পারে। এবার জয়দীপ রায় তার চশমা ঠিক করে নিল দ্রুত হাতে। তারপর, আধা-পরা ধুতির বাকি অংশ পোঁটলা করে দু-হাতে ধরে দৌড়ে গেল ও-পাশে, দেওয়ালের দিকে। কোণে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে মল্লভূমের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। যদি সত্য কোনও ইনস্ট্রাকশন দেন? না। তেমন অবস্থা নয়। ওঁর নিকেলের নকল চশমা ছিটকে পড়ে আছে দূরে। পরনের খাটো ধুতি এবং নামাবলি পুরোপুরি অসাব্যস্ত। অতি মনোযোগের সঙ্গেই দুজনে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত। দেখতে-দেখতে পট পালটাল। রুদ্রাক্ষকে কাবু করা অত সোজা নয়। লোকটার যেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেমনি মোষের মতো জোরও আছে গায়ে। উলটে দিয়েছে সত্যকে ফের চিত করে। জয়দীপ ভাবল, এমন অবস্থায় এত কাছ থেকে গুলি ছোঁড়াটা কি ঠিক হবে? রুদ্রাক্ষর মৃত্যু নিশ্চিত। প্লাস, সে নিজে আরেকটা খুনের দায়ে পড়তে পারে।

ভেবেচিন্তে, ধীরে-সুস্থে অথচ যথেষ্ট শক্তিসমেত পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘা মারল রুদ্রাক্ষর মাথায়। তার শিথিল শরীর ঠেলে পাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। হাঁফাতে-হাঁফাতে জয়দীপকে বললেন 'থ্যাঙ্ক ইউ!' তারপরে আরও একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'ধুতিটা খুলে ফেলুন চট করে। পরে, ট্রাউজার পরে নেবেন। আগে এই শক্তিমান ধুরন্ধরকে বেঁধে ফেলতে হবে আষ্টেপৃষ্টে। ওরই কেনা

BanglaBook.org

কোরা ধুতির পাকানো রশি কাজে লাগানো যাক—আসুন—'

নির্দ্বিধায় অন্তর্বাস পরেই জয়দীপ হাত লাগাল সত্যর সঙ্গে। অচেতন রুদ্রাক্ষকে বাঁধতে-বাঁধতে সত্য বললেন, 'সাক্ষাৎ বোয়াল। সমস্ত শক্তি দিয়ে কষে বাঁধুন। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। এ-ব্যাক্তির ক্ষমতা অসীম। পুলিশের প্রায় সব রকম কায়দা-কানুনই বানচাল করে এসেছে বছরের পর বছর। বলা যায় না, এত কাণ্ড করেও প্রমাণাভাবে পুলিশ হয়তো ওকে ছেড়ে দিয়ে সেলাম করতে বাধ্য হবে। ভেলকিও তো জানে প্রচুর। হয়তো দেখবেন, জাদুসম্রাট পি.সি.সরকারের মতো সকল বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ—'

শেষেরটুকু হালকা গলায় বলে, সত্যসাধন ভালো করে রুদ্রাক্ষর বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলেন আপাদমস্তক। না। এখন, এই বোয়ালের পক্ষে ঘাই মারা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র নড়তে পারা উচিত নয়। সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্য। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন 'সূর্যমুখীর দেওয়ালে। মাদলের কথা মনে রেখে, ছবিটা কয়েক ইঞ্চি কাত করতেই দেওয়ালে লুকোনো দরজা খুলে গেল, মৃদু ঘড়ঘড় শব্দে। গুপ্তপথের মুখ হাঁ।

'জয়দীপবাবু। আমাকে এক্ষুনি হলঘরে ফিরে যেতে হবে—আমাদের দেরি দেখে হলের লোক কেউ এখানে এসে উপস্থিত হলে মুশকিল। তা ছাড়া, মাদল-নিবেদিতাদেবী ওখানে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। স্মাগলার-মাফিয়া দলের এই নাম্বার-টু লোকটির বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে হলে এক্ষুনি যাওয়া দরকার। বামাল-সমেত গ্রেপ্তার করতে হবে।

'আমাকে কী করতে হবে বলুন! জয়ী-জাহ্নবী ওরা কোথায় কে জানে?'

বলতে-বলতে লিলিপুট পিস্তলটি সত্যর হাতে দিল। সি-আই-এর প্রোপ্রাইটর, গোয়েন্দা সত্যসাধনের জায়গায় অন্য কেউ হলে, এখানে জয়দীপকে দেখে হেসে ফেলত। সুবিশাল বিজ্ঞাপন কোম্পানি অ্যাড মার্কেটের উর্ধ্বতন অফিসার সুট-টাইয়ের বদলে স্রেফ একটি জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে। চোখে চশমা। মুখে টেনশানের ছাপ।

সত্য ওকে একবার দেখে নিলেন। সহানুভূতির গলায় বললেন, 'রিল্যাক্স মিস্টার রয়। জামা-প্যান্টটা পরে ফেলুন। এই চোরা দরজা দিয়ে, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। আলো-অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় পৌঁছে আপনার ভাইবোনকে দেখতে পাবেন। ওদের এখানে, ওপরে নিয়ে আসুন। আমি হলঘরে যাচ্ছি—'

বলে, নকল গোঁফ ও নিকেলের চশমা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন। দ্রুত পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন কোণের ছোট ঘরে। আয়নার সামনে।

জয়দীপ ওঁর পিছন পিছন কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'ওদের দুজনকে নীচে গেলেই পাব?'

নাক সত্যর আগে থেকেই ভাঙা। বক্সিং প্র্যাকটিসের শুরু থেকেই। হাড়ে ব্যথা-বেদনা-বোধও কম। আয়নায় চোখ রেখে নামাবলি দিয়ে চোয়ালের ও নাকের রক্ত মুছতে-মুছতে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

জয়দীপ জামা-প্যান্ট পরছে। বলল, 'আপনি কি গেছেন এই চোরা পথে?'

গোঁফ ও চশমা যথাস্থানে বসিয়ে নিলেন সত্য। বললেন, 'না।'

'তাহলে, এই দরজা, সিঁড়ি বা জয়ি-জাহ্নবীর কথা—আপনি জানলেন কী করে?'

ধুতির কাছা-কোঁচা দুরস্ত করে ফেলেছেন সত্য। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকারী মাদলের কাছে। চিরুনি আছে?'

জয়দীপ প্রথমে বুঝতে পারেনি। পেরে, প্যান্টের পকেট থেকে চিরুনি বের করে সত্যকে দিল, 'মাদল তো আর্টিস্ট। ও আপনার সহকারী হল কবে থেকে?'

চুল ঠিকঠাক করে চিরুনি ফেরত দিলেন সত্য। নামাবলির আড়ালে পিস্তলটা একবার ছুঁয়ে দেখে নিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আজ থেকে।' তারপরে অজ্ঞান রুদ্রাক্ষকে পেরিয়ে দরজার কাছে

BanglaBook.org

এসে বললেন, 'যান। আপনি আর দেরি করবেন না? তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে ফিরে আসুন। একে বেশিক্ষণ একলা রাখা ঠিক হবে না। বোয়াল মাছের জ্ঞান ফিরতে সময় লাগবে না। এদের আমি চিনি। আর হ্যাঁ—'বলে, ঘরের চারপাশে নজর ঘোরালেন সত্য। টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটিকে দেখিয়ে বললেন, আবার, 'বস্তুটি ভারী। তার ছিঁড়ে হাতের কাছে রাখবেন। সেন-মশাই একটুও নড়ে উঠলেই, ফের মাথায় মুগুর জোরে মেরে বেহুঁশ করে দেবেন।'

অকারণে আবার রুদ্রদাকে মারতে হবে শুনে জয়দীপ মিনমিন করল, 'আবার মারব! অমন শক্ত করে বাঁধা—'

কথা শেষ করতে দিলেন না সত্য। বেরিয়ে যেতে-যেতে প্রায় হুকুম দিলেন, 'উঁহু! একটুও নরম হয়ে, কোনও দ্বিধা নয়। যা বলছি করবেন। জ্ঞানে ফিরে এ-মানুষ যে কোন চালাকি করবে—সে বোঝার সাধ্য এ-রাজ্যের তাবড়-তাবড় বুদ্ধিমানেরও নেই—অল দ্য বেস্ট—'

সত্য বেরিয়ে যেতেই, গুপ্ত পথের সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগল জয়দীপ। হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকার পেরিয়ে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখা গেল নীচে। স্যাঁতসেতে গন্ধ। শব্দ নেই কোথাও। সিঁড়ির শেষে একটা লোহার গেট। ওপরের দিকটা গরাদের মতন মোটা শিক লাগানো। ওপারে ঘর। ঘরটি স্বল্প আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টিভি-ভিসিআর, সোফাসেট। সেন্টার টেবল, জোড়া পালঙ্কে ছিমছাম। সেন্টার টেবলে দুটি খাবারের থালা। ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে আছে। খাটে শুয়ে জয়ী। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। সোফায় ঘাড় কাত করে আধ শোয়া হয়ে রয়েছে জাহ্নবী। কোলে ইংরাজি ম্যাগাজিন। ভঙ্গিটি দেখে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল জয়দীপের। অফিস-ক্যাবিনে মিস্টার জোশীর মৃতদেহ মনে পড়ল।

লোহার দরজায় তালা ঝুলছে। দু-হাতে গরাদ চেপে ধরে উদ্বেগের গলায় জয়দীপ ডাক দিল, 'জাহ্নবী! জানু!'

কাঁপা গলায় তার সাবধানী ডাক পাতালের ঠান্ডা দেওয়ালে লেগে, ভেঙেচুরে ফিরে এল জয়দীপের কাছে আবার। গা ছমছম করে উঠল। কণ্ঠস্বর আর একটু বাড়িয়ে ফের ডাক দিল সে, 'জয়ী! জানু!'

ওদের কোনও সাড়া নেই।

এবার বেশ ভয় পেল জয়দীপ। ওরা কি বেঁচে নেই? সত্যসাধনের প্ল্যান আগে থেকেই টের পেয়ে গিয়ে শয়তান রুদ্রাক্ষ প্রতিশোধ নিল? এই ভাবনায় ভর দিয়ে তার মন-মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ল দারুণ আতঙ্ক এবং স্বজন-হারানোর শোক। কান্না ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জয়ী—জাহ্নবী—।'

প্রায় পাগলের মতো লোহার দরজায় তালা ঝাঁকিয়ে শব্দ করতে লাগল জয়দীপ। কখন যে জাহ্নবী চোখ মেলেছে খেয়াল হয়নি। খুব ধীরে-ধীরে সে যখন সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন টের পেল জয়দীপ, যে তার বোন জীবিত। কিন্তু অমন টালমাটাল হেঁটে আসছে কেন? নেশা করেনি তো? দুবার পড়তে-পড়তে সামলে নিয়ে কোনও রকমে জড়ানো পায়ে হেঁটে এল জাহ্নবী। কাছে এসে ওপার থেকে গরাদে ভর দিয়ে ঝুঁকে দেখল দাদাকে। চোখ যেন খুলে রাখতে পারছে না। দু-একবার টানটান চোখ করে দেখেও চিনতে পারল না তাকে। গরাদের ফাঁক দিয়ে দু'হাত গলিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল জয়দীপ, 'জানু! জানু এই দ্যাখ—আমি এসে গেছি—। কী হয়েছে তোর? ভালো করে দ্যাখ—আমি। তোর দাদা। জয়দীপ—'

ধীরে-ধীরে চিনতে পারল জাহ্নবী বহু পরিশ্রম করে ঠোঁটের কোলে হাসি ফোটাল সে। জড়ানো ক্ষীণ স্বরে বলল, 'দাদা! এসেছ! আমি তাহলে ঘুমোই!'

জয়দীপের মাথা খুব দ্রুত কাজ করছে। বোনের মুখে মদের গন্ধ নেই। তবু, রুদ্রাক্ষর লোকেরা নিশ্চয়ই কর্তার হুকুমে ওদের দুজনকে অন্য কোনও মাদক দ্রব্য বা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে

BanglaBook.org

দেয়। এ কদিন কি ওরা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে? খুব সম্ভবত, খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। বা, জোর করে। তবু, ওরা দুজন জীবিত এবং অক্ষত আছে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিল জয়দীপ। বোনের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দরজাটা খুলে ওদের বাইরে আনবে কি করে? ওপরে রুদ্রাক্ষর জ্ঞান ফিরে এল না তো?

দুশ্চিন্তা, ভয়ে, খানিকটা আক্রোশেই হয়তো নিজের অজান্তে ঠাস করে এক চড় কষাল জাহ্নবীর গালে। 'এই—এই জানু। চাবি কই? এই তালাটার চাবি? চাবি কোথায় থাকে জানিস?'

আঘাতে জাহ্নবী ভুরু অল্প কোঁচকাল। চোখও একটু স্বাভাবিক মনে হল। তারপর দাদাকে আবার নতুন করে চিনে সারামুখে ফুটে উঠল অসহায় করুণ ভাব। খানিকটা অভিমানও বুঝিবা। তারপরে, হয়তো বর্তমান অবস্থার খানিকটা আন্দাজ পেয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, থেমে থেমে, 'সিঁড়ির ডান দিকে দেয়ালে, ওপরে হাতড়ে—একটা বোতাম—টিপলে কুলুঙ্গি—ওখান থেকেই তো চাবি নামিয়ে আনে—ওরা—'

ওদিকে, ঠিক তখন, মাদল দেখল এগারোটা বাজতে আর তিন-চার মিনিট বাকি। সত্যকাকু, জয়দীপদা কি করছে এতক্ষণ? রুদ্রাক্ষকে বিশ্বাস নেই। ভাবতে না ভাবতেই দেখল, সত্যকাকু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। যদিও তাঁর চেহারা স্বাভাবিকই আছে, তবু হাঁটার ভঙ্গি বা অন্য কিছু ব্যাপারে কেমন খটকা লাগল মাদলের। ঠিক ধরতে না পারলেও ওর পাকা চোখে মনে হল কোথায় যেন একটু অন্য রকম।

হলঘর পেরিয়ে সোজা বাগানের দিকে হেঁটে চললেন সত্যসাধন। যেতে-যেতে মাদলকে বললেন, হিন্দিতে, 'হেই ছোকরা! হামারা পেছন পেছনমে আও। থোড়া দূর্বাঘাস মাংতা—'

পাঁচ-ছ'জন যারা হলঘরে বসে বা দাঁড়িয়েছিল হুকুমের অপেক্ষায়, তারা বিশেষ গ্রাহ্য করল না বুড়ো পুরুত বা ছোকরাকে। ওরা দুজনে যেই হল পেরিয়ে বাগানে পা রাখতে যাবে ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ আরম্ভ হল আওয়াজটা। বিপ-বিপ-বিপ। চমকে ফিরে তাকাল ওরা। মাদলের চোখ পড়ল দেওয়াল ঘড়িতে। এগারোটা। এবং মাদল অবাক হয়ে লক্ষ করল, ঘড়ির ডায়াল আগে সাদা ছিল, এখন ফ্রেমের ভেতর লাল আলো পড়ে পুরো ডায়ালটিকে একচক্ষু শয়তানের মতো দেখাচ্ছে। এ নিশ্চয় পাহাড়ের গায়ের পাথুরে দেওয়াল সরে যাওয়ার সংকেত। খাঁড়িপথের গেট খুলে যাওয়ার ইঙ্গিত মাদল হিসেব মিলিয়ে স্থির করল, এগারোটা বাজে, মানেই ওই মালবাহী ধাউ এসে গেছে। অপেক্ষমাণ পাঁচ-ছ'টি লোক ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছে। লাল কুশনের পাশ দিয়ে প্যাসেজে ঢুকে পড়ছে ওরা, অবশ্যই ওরা নীচে নেমে যাচ্ছে যন্ত্রচালিতের মতো। কোনও উত্তেজনা নেই। বিশৃঙ্খল চেঁচামেচিও নয়। মাদলের মনে হল, এরা সবাই এই নিয়মে অভ্যস্ত। ধাউ এসেছে। মাল তুলতে হবে।

সত্যও বোধহয় আন্দাজ করেছেন ব্যাপারটা। কারণ, সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাগানে। দ্রুত গলায় মাদলকে বললেন, 'রিভলবার হাতে নিয়ে রেডি থাকো—'

উত্তেজনায় হাত কাঁপছে মাদলের। কারণ, সে বুঝতে পারছে অ্যাকশান শুরু হয়ে গেছে। খলবলিয়ে গামছার পুঁটুলি থেকে রিভলবার হাতে নিল সে। গামছাটা পড়েই গেল কাঁপা হাত থেকে। তা যাক।

জেজে তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে ছুটে আসছিল। ছোট এবং মাঝারি ক্যানা গাছগুলো ডিঙিয়ে, লাল মোরামের রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি। ওরা তিনজন। এরা দুজন। ওদের হাত খালি। এদের হাতে উদ্যত পিস্তল, রিভলবার।

পরিষ্কার হিন্দি উচ্চারণে গম্ভীর গলায় সত্য বললেন, 'মুখে টু শব্দটি নয়। গলা খাঁকারির

BanglaBook.org

শব্দ করলেও কিন্তু নলি এ-ফোঁড়-ও-ফোঁড় হয়ে যাবে।। হাত তুলে দাঁড়াও।'

তিনজনেরই ভুত দেখার চোখ তখন। গলা টিপে ধরলে যেমন ফ্যাঁসফেঁসে অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় তেমনি গলায় জেজে বলতে যাচ্ছিল 'প-পূজারিজি—'

'একদম চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিলেন সত্য। তারপর বললেন, 'গেটের দিকে চলো চুপচাপ।'

তিনজনেই গুটি-গুটি মেইন গেটের দিকে পা বাড়িয়েছিল, সত্য চ্যালা দুটিকে বললেন, 'উঁহু। তোমরা এখানেই থাকো। পিছন ফিরে দাঁড়াও। মাথার ওপর থেকে হাত নামাবে না। মাদল, এ দুটোর কেউ একটুও আওয়াজ করলে বা নড়লে সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা করে, শুইয়ে দিও।'

মাদল ঘাড় নেড়ে, দুহাতে রিভলবার বাগিয়ে ধরে থাকল। ওরা দুজন শান্ত মোষের মতো সত্যর আদেশ পালন করতে ঘুরে দাঁড়াল।

জেজেকে আগে-আগে রেখে সত্য চললেন সিংহ দরজার দিকে। মাদলের উত্তেজনা একটু কমে গিয়ে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। ও এখন একা। হাতে রিভলবার থাকলেও জীবনে সে কখনও গুলি ছোঁড়েনি। ছবি-আঁকার পেনসিল-তুলি-ধরা হাতে পিস্তল খুব একটা স্থির নয়। তার ওপরে, পিছন ফিরে হাত-ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেও এক জোড়া পাষণ্ড যমের মতো মোষের পাহারা দেওয়াতে যতটা কলজের জোর লাগে, ততটা মাদলের নেই। অন্তত এই মুহূর্তে। তবু, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই—এরা এখন কিছুই করতে পারবে না।'—ভাবনা মনে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ আকাশের কথা ভাবল মাদল। ওপরে তাকালে এখন ক'টা তারা দেখা যাবে, গুনতে ইচ্ছা করল তার। আজ কি চাঁদ আছে আকাশে? নাঃ। ওপরে চোখ তুলে দেখতে যাওয়া 'রিস্কি' হতে পারে। মোষ দুটো হঠাৎ ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর ওপর। তাই সে আশেপাশে খুটখাট নজর ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। মোরামের পথে এবং বাগানের নানান অংশে নীচু ল্যাম্প-পোস্ট বসানো। তাতে মাথা-ঢাকা বাতি। অল্প দূরে, বাঁদিকের ক্যানা ঝোপে বসেই বোধহয় একলা একটা ঝিঁঝি নাগাড়ে ডেকে চলেছে। হঠাৎ, মাদল টের পেল তার ডানদিকের কপালে মশা কামড়াচ্ছে। চটি-পরা পায়ের গোড়ালিতেও। উফ, চুলকোচ্ছে। জ্বালা করছে। ওদের মারবার বা হাত দিয়ে তাড়াবার উপায় নেই। তাই মাদল বসু খুব মন দিয়ে মহাভারতের কথা চিন্তা করতে লাগল। কোন বীরপুরুষ যেন তাঁর গুরুদেবের ঘুম ভাঙাবে না বলে, ভয়ঙ্কর বিছের কামড় চুপচাপ সহ্য করেছিলেন! দম বন্ধ করে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিছু! অর্জুন? না কর্ণ? মোষের মতো লোক দুটোর দিকে রিভলবারের নল স্থির রেখে, দম বন্ধ করে মশার কামড় ভুলতে চেষ্টা করল মাদল।...

জেজে বন্ধ মেইন-গেটের কাছে পৌঁছোতে, পেছন থেকে সত্য বললেন, চাপা গলায়, 'তোমার ওই বাইরের থুম্বোমুখো দুটোকে গেট খুলে দিতে বলো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে জেজে বলল, 'কিন্তু ওরা তো এভাবে খুলবে না। ইন্টারকমে অর্ডার পেলে, তবেই খুলবে।'

'উহুঁ! এদিকে নয়। সামনে তাকাও। এবং যা বলছি, তাই করো। ফালতু কথা বললেই গুলি ছুঁড়ব। তোমার গলা শুনে, ওরা যাতে খুলে দেয়, তেমনি আদেশ দেওয়ার গলায় বলো। জোরে—' বলে, জেজের পিঠে লিলিপুটের নলটা চেপে ধরে, মৃদু চাপ দিলেন সত্য।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হল।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল জেজে, 'রেশম বাহাদুর, গ-গেট খোল দো।—'

বন্ধ গেটের ওপার থেকে আওয়াজ এল, 'কউন? জেজে সাহাব?'

জেজে চুপ করে আছে। সত্য লিলি-নলের খোঁচা দিতেই ফের আর্তস্বর বেরুল, 'হাঁ-হাঁ-

'বড়া, কি, ছোটা?'

সত্য প্রশ্নটি করলেন ফিসফিস করে, জেজের কানের কাছে, 'বড়া গেট।'

BanglaBook.org

আরেক খোঁচার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাঙা গলা থেকে শব্দ ছিটকে বেরুল, 'ব-বড়া গেট।'

ঘড়ঘড় যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে সিংহ-দরজা খুলতে লাগল। সত্যর নির্দেশে তোতাপাখির মতো জেজে প্রহরী দুজনকে বলল, 'তোমরা গুমটি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াও।'

ওরা দুজনে অবাক চোখে জেজে-সাব ও পুজারিজিকে দেখল। গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে। যেন, কত ভাব দুজনের। আসলে, জেজের পিঠে গাঁথা সত্যর লিলিপুট, প্রহরীরা দেখতে পাচ্ছে না। পরস্পরকে বোকা-চোখের চাউনি দিয়ে গুমটি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সত্যর আরেক খোঁচায় জেজে চেঁচাল, 'যাও।'

পেছন ফিরে তাকাতে-তাকাতে ওরা রাস্তার ওপারে পৌঁছে গেল। এক লাফে ডানদিকের গুমটিতে ঢুকে স্টেনগানটা তুলে নিলেন সত্য। এর পরের তিনটে ঘটনা প্রায় একই সঙ্গে ঘটল। মালাবার হিলের নীচের দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। সত্য বুঝলেন, পুলিশের গাড়ি আসছে। ভয় পেয়ে চড়াইয়ের দিকে ছুট দিল একজন প্রহরী। সুযোগ পেয়ে জেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সত্যর ওপরে। সব্যসাচীর মতো দু-হাতে কাজ করতে লাগলেন সত্য। ছুটন্ত প্রহরীর পা লক্ষ করে নিঃশব্দে গুলি ছুঁড়লেন ডান হাতে। বাঁ-হাতে স্টেনগানের শক্ত বাঁট দিয়ে ঘা মারলেন জেজের মাথায়।

গুলি খেয়ে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রহরীটি। অন্যজনকে আদেশ দিলেন সত্য, 'শিগগির ভিতরে চলে এসো। জলদি!'

লোকটা ধরা-পড়া চোরের মতো ভয়ে-ভয়ে গেটের কাছে আসতেই, গলা তুলে বাংলায় চেঁচিয়ে উঠল সত্যসাধন, মাদল। পিছিয়ে এসে পড়ো এখানে—শিগগির—'

কাত হয়ে নেতিয়ে-পড়া জেজে মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারছে না। চোখের অন্ধকার, মগজের মধ্যে ভোঁ-শব্দের ঘোর কাটতে সময় লাগছে।

মাদল কাছে আসতে বাঁ-দিকের গুমটি থেকে দ্বিতীয় স্টেনগানটা ওকে তুলে নিতে বললেন সত্য। আরও নির্দেশ দিলেন, 'পুলিশের ভ্যান এসে পড়ল বলে। তুমি ততক্ষণ এই প্রহরীদের আর ওই ষণ্ডা দুটোকে সামলাও। আমি নীচে সুড়ঙ্গে চললুম—'

বলে, স্টেনগানের এক খোঁচা দিলেন জেজেকে,—'কি হে। তুমি মানে-মানে পথ দেখাবে, না, আমি ট্রিগারটা টিপব?'

শুনে, টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল জেজে।

ওর পিঠে স্টেনগান ঠেকিয়ে হলঘরে এলেন সত্য। ভারী বিচিত্র দেখতে লাগছে তাঁকে। খাটো করে পরা ধুতি। গয়ে নামাবলি। হাতে স্টেনগান। চোয়ালটা সামান্য ফোলা-ফোলা।

হলঘরে কোনও লোক নেই। একা নিবেদিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলের কাছে। দেওয়াল-ঘড়ির লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে। সত্যকে দেখে নিবেদিতা উদ্বেগের গলায় জিগ্যেস করলে, 'দাদা কোথায়? জয়দীপ! ভালো আছে তো?'

'হুঁ। কিন্তু আপনার সঙ্গিনী তিনজন কোথায় গেল?'

'গোলমাল দেখে ওরা আমাকে ফেলে, ওই লাল-কুশনের পাশ দিয়ে কোথায় সরে গেল।'

সত্য বললেন, 'গোটা দালান চারপাশ থেকে পুলিশে ঘিরে ফেলছে এক্ষুনি। কেউ পালাতে পারবে না। আপনি বরং এই পিস্তলটা রাখুন। কাউকে দেখলেই আটকে রাখবেন—' বলে, বাঁ-হাতে ওটা এগিয়ে ধরলেন সত্য।

দু-পা পিছিয়ে গেল, নিবেদিতা, 'না-না। এসব আমাকে দেবেন না। প্লিজ! আমাকে বরং আপনি বলে দিন দাদা বা জয়দীপ কোথায়? ওখানেই যাই বরং।'

একটুক্ষণ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন সত্যসাধন। একেবারে কনে বউয়ের মতো সাজানো হয়েছে ওকে। শুধু মুকুটটাই যা বাকি। শুকনো মুখে একটা আলগা ক্লান্তির ছাপ। ওকে দেখতে-দেখতে শ্বাস ফেলার সময়টুকু মন বিষণ্ণ হয়ে গেল সত্যর। এক কালের ভালোবাসার জনের

BanglaBook.org

সঙ্গে নকল বিয়ের সাজগোজ। বেচারি!

পারিপার্শ্ব ভুলে, সহানুভূতির গলায় সত্য বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। সবই ঠিক আছে। আমাদের অপারেশান অলমোস্ট সাকসেসফুল মনে হচ্ছে। আপনার সাহায্য ছাড়া হত না। সরি, অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ট্রাবল।'

তারপর, বুঝিয়ে দিলেন, 'হলুদ কুশনের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হলুদ ঘরে চলে যান। দেখবেন, দাদার প্রতি করুণা উথলে গিয়ে তার বাঁধন-টাধন আলগা করে দেবেন না যেন। তাহলে, কিন্তু আমাদের এত রিস্কি অপারেশানটা মাঠে মারা যাবে। তা ছাড়া, আইনের চোখে আপনাকে অপরাধী করা হবে।—'

বলে, জেজেকে খোঁচা দিলেন নল দিয়ে। 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া! গুষ্ঠিসুদ্ধ বামাল-সমেত ধরব আজ।'

জেজে হাঁটতে আরম্ভ করে, ক্ষীণ গলায় জানাল, 'তা পারবেন না, স্যার। ওরা সবাই এতক্ষণে ধাউতে চেপে পগার পার।'

সত্য বাঁহাতে টর্চটা নিয়ে নিয়েছে। লিলিপুট গুঁজেছেন কোমরে। মাদল বলেছিল। সুড়ঙ্গ বেশ অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে উনি হাসলেন, 'মেশিনগান, স্টেনগান, রাইফেল, কাঁদুনে গ্যাসসমেত, নিদেন চল্লিশজন সেপাই-দারোগা নিয়ে জল-পুলিশের চারটে স্পিডবোট তোমাদের ওই নীচের গুপ্ত-খাঁড়ি-পথ ঘিরে ফেলেছে এতক্ষণে।'

'ও মাই গড! এত খবর পেলেন কোথায়!' বলতে-বলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে জেজে। আবার বলল, 'তবে বসকে ধরতেই পারবেন না, স্যার। উনি গোলমালের গন্ধ পেয়ে আগেই সরে পড়েছেন হয়তো—'

জবাবে সত্য বললেন, 'তোমার বস অজ্ঞান এবং বন্দি অবস্থায় হলুদ ঘরে রয়েছে। তুমি চলো দেখি।'

'ও—নোহ!' মাথায় হাত দিয়ে সিঁড়িতেই বসে পড়ল জেজে। সত্য ওর ঘাড়ে নল ঠেকিয়ে বললেন, 'উঁহু! কোনওরকম বেচাল, বেয়াদপি নয়, বাছা। আবার বাঁটের বাড়ি মারব। ওঠ—'

অতি কষ্টে দোমড়ানো শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল জেজে। সত্য রেগে যাচ্ছেন। সময় খাচ্ছে লোকটা। দাঁতে-দাঁত চেপে সত্য বললেন, 'সুড়ঙ্গের অন্ধকারে সুযোগ নিতে যদি একটুও এদিক-ওদিক করো তো, পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেব। চলো—জলদি' বলে টর্চের আলো ফেললেন সিঁড়িতে।

দেওয়াল ধরে-ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল জেজে। পিছনে সত্যসাধন।

হলুদ ঘরে ঢুকে দাদার অবস্থা চোখে পড়তেই কষ্ট হল নিবেদিতার। যতই যাই হোক, মানুষটা তার একমাত্র দাদা। চোখ খোলা। গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল। নিবেদিতাকে দেখে শব্দটা বেড়ে গেল—কিছু বলতে চায় যেন।

জয়দীপের দিকে একবার তাকিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে যাচ্ছিল দাদার কাছে। জয়দীপ ইশারায় বারণ করল ওকে। নিবেদিতার থমকে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'যথেষ্টই শক্ত-অকরুণ হাতে বাঁধা হয়েছে। শুধু মুখের কাপড়টুকু সরিয়ে দিচ্ছি। পালাতে তো পারবে না! কিছু বলতে চায় মনে হচ্ছে—'

বলতে-বলতে এগিয়ে গেল সে। দাদার মাথার কাছে উবু হয়ে বসল। জয়দীপও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'সত্যসাধনবাবু মানা করে গেছেন কিন্তু—'

অনেক জোর লাগিয়ে প্রায় খামচে মুখের কাপড়টুকু নীচে নামিয়ে দিল নিবেদিতা। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল রুদ্রাক্ষ। 'নিবে। মরে গেলাম ব্যথায়।—'

BanglaBook.org

বোন ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে, অসহায় গলায় বলল, 'কোথায় ব্যথা রে, দাদা? কীসের ব্যথা?'

বাঁধা অবস্থাতেই ছটফট করছে রুদ্রাক্ষ।

'বুকে। হার্টের ব্যাথাটা। গেল বছর মাইল্ড একটা অ্যাটাকও হয়ে গেছে—'

একটু দম নিয়ে অনুনয় করল তারপর, 'একটু জল খাব, নিবে। হাতটা —হাতটা খুলে দে, প্লিজ—'

জয়দীপ সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিল, কড়া গলায়, 'না। একদম নয়। জল চান তো হাঁ করুন। খাইয়ে দেওয়া হবে।'

নিবেদিতা হাত গুটিয়ে দাদার দিক থেকে চোখ সরাল। তখনই চোখে পড়ল তার। দূরে দুটি সোফায় বালক জয়ী হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। পাশের সোফায় জাহ্নবীরও একই অবস্থা প্রায়। আধশোয়া, ঘাড় হেলানো, চোখ বোজা।

জয়দীপকে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল নিবেদিতা, 'তোমার ভাইবোন, না? কি হয়েছে, ওদের?'

জবাব দিল রুদ্রাক্ষ, ব্যাথার গলায়, 'আমারই অপরাধ নিবে। ওদের প্রায় সারাক্ষণ খাবার, চা বা দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে। নইলে, গোলমাল। তবে—'

যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে গেল রুদ্রাক্ষর, জয়দীপকে বলল, 'তবে বিশ্বাস করো, ওদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি। স্পর্শও করেনি কেউ—। একটু—জল—'

নিবেদিতার রাগ হচ্ছিল। দুঃখও। দাদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। জিগ্যেস করল জয়দীপকে, 'জল কোথায়?'

জবাব দিল রুদ্রাক্ষ, 'ওই আয়নার ঘরে ফ্লাস্কে। গেলাসও আছে।'

নিবেদিতা জল আনতে গেল। যন্ত্রণাকাতর গলায় রুদ্রাক্ষ বলল, 'ভাই জয়। টেবিলের বাঁদিকে ড্রয়ারে হার্টের ওষুধ আছে। একটা দেবে? প্লিজ—আহ—'

জয়দীপ সেই ছোটবেলার দিল্লির কয়েকটি দৃশ্য মনে-মনে দেখতে পেল হঠাৎ। রুদ্রদা ওদের দুজনকে গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছে—টেনিস র‍্যাকেট উপহার দিচ্ছে—লম্বা-লম্বা পা ফেলে নিজামুদ্দিনের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে রুদ্রদা—।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে ছোট সাদা কৌটো বের করে আনল জয়দীপ। ততক্ষণে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে এসেছে নিবেদিতা। এক ঢোক জলের সঙ্গে একটা সাদা ট্যাবলেট ওঁক খাইয়ে দিল দুজনে মিলে। আরামের শ্বাস ছাড়ল রুদ্রাক্ষ। ম্লান হাসল সে। বলল, সত্যসাধনের আগের রেকর্ড যা পড়েছি, তাতে জানি, ও কাঁচা কাজ করে না। নিশ্চয়ই খুব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেই হবে এসেছে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল জয়দীপ, 'পুলিশ আর জল-পুলিশ এগারোটার মধ্যেই বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—আপনাদের খাঁড়িপথও—'

'বাহ! চমৎকার'। বলে, আবার হাসল রুদ্রাক্ষ। বলল, 'আর আমার অপরাধের সীমা তো নেই। ফলে, তোমরা আমার বাঁধন কোনও মতেই এখন খুলবে না। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলে বা যাবজ্জীবন পাঠাতে পারলে তোমাদের সত্যবাবু হয়তো পদ্মশ্রীও পেয়ে যেত। কিন্তু, পুলিশ তথা, আমাদের এ-দেশের করাপ্ট আইনের হাতে আমি কোনও শাস্তিই নিতে রাজি নই।—'

ওর মুখে-চোখে যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নেই আর। তবে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে জড়িয়ে আসছে।

নিবেদিতা ও জয়দীপ দু-পাশে বসে আছে। জয়দীপ বলল, 'কিন্তু, কোনও উপায় নেই রুদ্রদা। এবার পালানো আপনার পক্ষে মুশকিল। ইন্সপেক্টার সাঠে এসে পড়লেন বলে—'

চোখ উজ্জ্বল হল রুদ্রাক্ষর। মুখে হাসি টেনে বলল, 'জানো ভায়া। ওই পুলিশের হাতকড়া আমাকে মানায় না। সেই জন্যেই বড়িটার দরকার ছিল। হার্ট আমার পোক্তই আছে। চেয়ে দ্যাখো

BanglaBook.org

মুখে কোনও ঘাম নেই। ওটা আসলে সবচেয়ে কড়া ঘুমের ওষুধ ছিল—যে ঘুম ভাঙে না—'

আরও অস্পষ্ট, অস্ফুট জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা বলছে, 'চলি রে, নিবে! আমার কোনও খেদ নেই। আই ওয়ান্টেড টু লিভ ডেঞ্জারাসলি—অ্যান্ড—আই লিভ্‌ড ইট —। যার জন্যে এত কান্ড করলুম তোদের সঙ্গে—সেই— ডায়মন্ডহারবারের বাড়িটা আমার আর কাজে লাগল না।— তুই ভোগ করিস। আর হ্যাঁ, যদি আদৌ সত্যি সত্যিই বিয়ে করিস কখনও—ওই নেকলেসটাই পরবি কিন্তু—আমার গিফট—'

চোখ ছোট হয়ে বুজে এল প্রায়। বিড়বিড় করে আরও কি সব বলার চেষ্টা করল মানুষটা—শোনা গেল না। ধীরে-ধীরে মাথাটা কাত হয়ে ঝুলে পড়ল রুদ্রাক্ষর।

জয়দীপ বোকার মতো চেয়ে থাকল। নিবেদিতাকে দেখল একবার। হয়তো চোখের ভুল, মনে হল, নিবুর চোখ জলে ভরে গেছে।

॥ সতেরো ॥

'স্যার, জয়দীপ রয় হ্যাজ বিন মার্ডারড!'

'রিপিট?'

'ইয়েস, স্যার—জয়দীপ রায়—খুন হয়েছেন!'

দু-হাতে রিসিভার ধরেও কাঁপছে। ভয়ে, কান্না দলা পাকিয়ে যাচ্ছে গলার কাছে। ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না জুলি সালডানা। রিসেপশানের টেলিফোন-বোর্ড থেকে ডায়াল করেছে জুলি। ওপার থেকে ইন্সপেক্টর সাঠের গলা, 'কোথায় মার্ডারটা হল? ঠিক কখন?'

রুমাল দিয়ে নাক মুছতে গিয়ে, রিসিভার ফস্কে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে জবাব দিল জুলি, 'ওঁর ক্যাবিনে। টাইম ঠিক—' ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল জয়দীপের সেক্রেটারি।

'আহ-হা! মোটামুটি কখন?'

ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোম্পানির অ্যাসিটেন্ট ডাইরেক্টর মিস্টার হরবিলাস চওধরি, জোশীর সেক্রেটারি মীরা লাখানি এবং ফ্রি-লান্স আর্টিস্ট মাদল বসু। জুলি একটু সামলে নিয়ে জবাব দিল, 'মিস্টার রয় আজ এসেছেন দুটো নাগাদ। আমি লাঞ্চ সেরে আসার একটু পরে। তারপর আর ক্যাবিন থেকে বেরোননি। আধঘণ্টা আগে চা চাইলেন—দিলাম। এইমাত্র আমি একটা কোটেশানের চিঠি সই করাতে ঢুকে দেখি—স্যার—স্যার টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।'

'ওকে। আমি এক্ষুনি আসছি। দশ মিনিটে। কাউকে ডেডবডি টাচ করতে দেবেন না। রায়ের ক্যাবিনে যেন কেউ না ঢোকে! বুঝেছ, মিস সালডানা? কেউ নয়।—আর, অফিসের বাইরে যেন কেউ না যায়!'

'ইয়েস স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জুলি সকলের দিকে দেখল। চোখ মুছে, রুমালে নাক ঝাড়ল। মিস্টার চওধরিই এখন, এই মুহূর্তে অন্তত, সবচেয়ে সিনিয়ার। তাকে উদ্দেশ করে এবং সবাইকে শুনিয়ে জুলি বলল, 'ইন্সপেক্টর সাঠে দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন। কেউ যেন অফিসের বাইরে না যায়। কাউকে স্যারের ক্যাবিনে ঢুকতে মানা করেছেন।'

চওধরি সঙ্গে-সঙ্গে ডাক দিল, 'দত্তরাম!'

এখন বেলা সাড়ে-তিনটে। পুরোদমে আপিস টাইম। প্রায় পঞ্চাশজন অফিস-কর্মীর সকলেই কাছেপিঠে উপস্থিত। জয়দীপের ঘরের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটো-খাটো জটলা। সকলেই কৌতূহলবশে একবার উঁকি মেরে ডেডবডি দেখে নিয়েছে। দু-দুটো খুন নিয়ে তুমুল তর্ক, আলোচনা।

BanglaBook.org

দত্তারাম একটি জটলার মধ্যে থেকে সাড়া দিল, 'জি সাব? আয়া।' বলে, রিসেপশান কাউন্টারে দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল।

চওধরি বলল, 'তোমার সায়েবের ক্যাবিনের সামনে টুল নিয়ে বোসো। দরজা টেনে বন্ধ করে দাও। কাউকে ঢুকতে দেবে না।'

'জি সাব—' বলে, নির্দেশ পালন করতে ছুটল দত্তা।

মাদল বলল, 'মিস সালডানা! আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

জুলি সরে জায়গা করে দিল ওকে। চওধরি জিগ্যেস করলেন, 'কাকে?'

'স্যার, "সি আই-এ"তে সত্যসাধন করকে!'

'খুবই প্রয়োজন কি? পুলিশ তো আসছেই!'

'স্যার! জয়দীপ রায় ওঁর ক্লায়েন্ট। খবরটা ওঁর জানা দরকার—'

সত্যসাধনের চেহারা ও কথা বলার ভঙ্গি মনে করে চওধরি আর ঘাঁটাল না।

নম্বর লাগিয়ে মাদল বলল, সত্যকাকু, অ্যাডমার্কেটে একবার আসুন। জয়দীপদা খুন হয়েছেন।'

'এক্ষুনি আসছি।' লাইন কেটে দিলেন সত্যসাধন।

জুলি যখন আর্তনাদ করে ওঠে তখন সবচেয়ে কাছে মানে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল দত্তারাম। ভেতরে ঢুকে দেখল, সায়েবের বাঁ-হাত টেবিলে ছড়ানো, ডানহাতে ধরা চায়ের কাপ, মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন প্লেটের ওপরে। চা ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলময়। জুলির হাতে টাইপ করা কাগজ থরথর করে কাঁপছে। কোনওরকমে টলতে-টলতে বেরিয়ে এসেছে জুলি। পিছনে দত্তারাম। ততক্ষণে ভিড় জমে গিয়েছিল দরজায়। নানান কথার মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে সারা অফিসে।

সত্যকাকুকে টেলিফোন করে, ধীরে-সুস্থে রিসেপশান থেকে সরে এল মাদল। বাথরুমের দিকে হাঁটতে লাগল সবার অলক্ষ্যে। দ্বিতীয় হলের কিউবিকলগুলো পেরিয়ে পরলোকগত মিস্টার জোশীর ক্যাবিনের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়াল। এদিকটায় জটলা নেই। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। কিছু না। কোনও আওয়াজ আসছে না। চারপাশে তাকিয়ে দরজা ঠেলে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ল সে। একটু বাদে বেরিয়ে সোজা লিফটের কাছে, রিসেপশানের সামনে সোফায় গিয়ে বসল। সত্যকাকু কখন আসবেন?

মাদল আজ চলে এসেছে সকাল-সকাল। অনেকদিন আসা হয়নি। ঘুম থেকে উঠেই সত্যকাকুর ঘরে চলে গেছে সোজা, 'কেমন আছেন?'

চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ দেখছিলেন। হেসে বললেন, 'এসো। ভালোই আছি।'

'কাল রাতে আপনার জ্বর এসেছিল। চোয়ালের ব্যথা এখন কমেছে?'

সত্যকাকু এড়িয়ে গেছেন, 'হ্যাঁরে বাবা, জ্যাঠামশাই। সব ঠিক আছে। ও-হ্যাঁ, সাঠে কাল বলছিল, পুলিশের তরফ থেকে তোমাকে একটা সার্টিফিকেট পাইয়ে দেবে। সঙ্গে কিছু টোকেন নগদ পুরস্কার।—কী খাওয়াবে, বলো?'

'কেন, আপনার ফেবারিট মধু-মিষ্টান্নর গরমাগরম জিলিপি!'

'ভেরি গুড।' বলে, শব্দ করে হেসে উঠেছিল সত্যকাকু। ওঁর চোয়ালের ফোলা-ভাব কিছুটা কমেছে। তবে, ডানচোখের নীচে ফাটা দাগটা পুরোপুরি শুকোয়নি এখনও। যদিও, রাতে শোওয়ার আগে যত্ন করে মলম লাগিয়ে দিয়েছিল মাদল। ওই দিকে চেয়ে মাদল বলল, 'মুখে খুব ব্যথা আছে, তাই না?'

নিজের ব্যথা-বেদনা প্রসঙ্গে মানুষটা বড় উদাসীন। আবার এড়িয়ে গেলেন। 'রুদ্রাক্ষকে ধরতে পারলুম না। এইভাবে পালিয়ে গেল হে। অমন ব্রিলিয়্যান্ট মানুষ। ইশ!' বলে, মাদলকে দেখে আবার বললেন, 'তোমাকেও পাঠানো উচিত ছিল হলুদ ঘরে। ওর "হার্ট-অ্যাটাকে"র অভিনয়টা তুমি হয়তো বুঝতে পারতে। আমারই ভুল—' অসহায় হাত নেড়ে খবরের কাগজে মন দিলেন।

মাদল বলল, 'সখাকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলছি।'

BanglaBook.org

'তুমি স্নান করে নিয়েছ?'

'না। এই যাব—'

মাদলের দিকে তাকিয়ে সত্যকাকু বললেন, 'আর কী! এবার দাড়িটাও কামিয়ে ফেলো।'

গালে হাত বুলিয়ে মাদল মুচকি হাসল, 'কেমন মায়া পড়ে গেছে, কাকু!'

হাসতে-হাসতে সত্যকাকু বললেন, 'দ্যাখো বাপু! তোমার দাড়ি—রাখবে কি কামাবে—তোমার মর্জি। তবে, এটা ঠিক—আর্টিস্ট হিসেবে দাড়ি মানিয়ে যায়। কিন্তু যদ্দুর মনে পড়ছে, প্রফেশনাল অভিনেতা বা নাম-করা গোয়েন্দাদের দাড়ি ছিল না। নেই।'

মাদল ভেবে দেখল, সত্যিই তো! রবার্ট ব্লেক, শার্লক হোমস থেকে ফেলুদা বা সত্যকাকু কারুরই দাড়ি নেই। ওদিকে দেবানন্দ, দিলীপকুমার, অমিতাভ বচ্চনের কিংবা উত্তমকুমার—সৌমিত্র উঁহু। নো দাড়ি! নাসিরুদ্দিন শাহকেও দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হয়েছে।

'কারণ কী, সত্যকাকু?'

'প্রয়োজন-মাফিক নকল দাড়ি বা গোঁফ লাগিয়ে যখন তখন চেহারা পালটে ফেলা যায়—তাই!'

বাথরুমে ঢুকে, আয়নার সামনে দু-তিনমিনিট সময় নিল মাদল। আঙুল দিয়ে 'বিলি' কাটল দাড়িতে। মুচড়ে-মুচড়ে আদর করল। তারপর নির্দয়, নির্মম হাতে কামিয়ে ফেলল। সান্ত্বনা দিল নিজেকে, শুধু অভিনেতা-গোয়েন্দা কেন, অনেক বড়-বড় শিল্পীদেরও দাড়ি নেই। গোগ্যাঁ, পিকাসো, নন্দলাল বোস।

'অ্যাড-মার্কেটে' এসে পড়েছে মাদল সকাল এগারোটার আগেই। জয়দীপদা তখনও আসেননি। সোজা আর্ট ডিপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিল মাদল। এর-ওর-তার টেবিলে ঘুরে-ঘুরে, আড্ডা মেরে চা খেয়ে সময় কাটিয়েছে।

স্টুডিয়ো ম্যানেজার রমনিকভাই ফলাও করে জোশী-হত্যার বিবরণ দিয়েছেন। ফিসফিসিয়ে এও জানিয়েছেন, তাঁর সন্দেহ দুজনকে নয়, তিনজনকে।

'কে কে বলুন তো?' চায়ে চুমুক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে মাদল।

'রায়, চওধরি আরও অই ঢলানি মাদি মীরা লাখানি!'

আপিসের অনেকেই জানে, এই প্রৌঢ় গুজরাতি ভদ্রলোক নিরীহ প্রকৃতির। তবে, বছরখানেক আগে জোশীর সেক্রেটারি মিস লাখানির সঙ্গে একটু ঢলাঢলির চেষ্টা দিতে গিয়ে যথেষ্টই ল্যাজেগোবরে হয়েছিলেন। সেই থেকে মহিলার ওপর ভয়ঙ্কর খার। যে কোনও রকমে গোলমালের দায়িত্ব রমনিকভাই মীরার ঘাড়ে চাপাতে পারলেই খুশি।

খুব সিরিয়াস গলায় মাদল খুঁচিয়েছে, 'ওঁর মোটিভ এ-ক্ষেত্রে কী হতে পারে বলুন তো?'

রমনিকভাই অবাক, 'সে কী, মাধো! চওধরি তো ওর নাগর। জোশী সরে গেলে ছেনালি করে প্রমোশনের রাস্তা তো অল ক্লিয়ার—'

'পুলিশ কিন্তু এ-ব্যাপারটা জানে না। আপনি বলেছেন তো?'

সঙ্গে-সঙ্গে চুপসে গেছেন রমনিকভাই, 'না-না! পুলিশকে আবার বলতে যাব কেন! আমি তো সেদিন ছিলুমই না। তা ছাড়া, জানোই তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।'

মাদল হাসি চেপে উঠে অন্য টেবিলের দিকে রওনা দিতেই রমনিকভাই পিছু ডেকেছিলেন। গলা নামিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আবার কাউকে যেন বলতে যেয়ো না, হে—'

সেই সকাল থেকে ঘুরে-ঘুরে সময় কাটিয়েছে মাদল। সত্যকাকুকে টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে আবার উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

শকুন্তলা ম্যাডামও বম্বেতে আছে। বেশ দামি ফুরফুরে গোলাপি শাড়ি পরে তাকে দু-একবার উড়ে আসতে-যেতে দেখেছে মাদল। রিসেপশানের যে-সোফাটায় মাদল বসে দাঁতে নখ কাটছে

BanglaBook.org

টেনশানে, তার থেকে অল্প দূরে লিফটের দরজা। সেখানে টুলে টানটনে বসে শংকর বাহাদুর। ওয়াচম্যান। অন্য সোফা তিনটি খালি। টেলিফোন বোর্ডের কাছে ও অফিসের ভেতরে চাপা কথাবার্তা চলছে। ছোট-ছোট দলে প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর বাহাদুরের দিকে সামান্য হেলে পড়ে মাদল জিগ্যেস করল, অবশ্যই নীচু গলায়, 'ম্যাডাম কোথায় গেলেন?'

বাহাদুরও কথা বলার সুযোগ পেয়ে এদিকে ঝুঁকে বলল, 'কী জানি, সাব। এক-দেড় বাজে নিকলে গেল—কিলায়েন্টকে সাথ—'

তার মানে, লাঞ্চে গেছে ক্লায়েন্টকে নিয়ে। কখন ফিরবে, কে জানে। হয়তো আজ ফিরলই না! তবে, চওধরি-সায়েব নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর করছেন। আজ টেলিফোন অপারেটার আসেনি। জুলিকে দিয়ে একের পর এক নাম্বার ডায়াল করিয়ে যাচ্ছেন হরবিলাস।

বাহাদুর সাধারণত কোনও ব্যাপারেই বিশেষ কৌতূহল দেখায় না। কিন্তু এখন একটু উসখুস করে আবার মাদলের দিকে ঝুঁকল, 'মাধো সাব! রয়-সাবকে যে খুন করতে পারে সে মানুষ নয়। অত ভালো, দেবতুল্য—'

বলতে-বলতে, স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাহাদুর। লিফট উঠে এসেছে। বাহাদুর সেলাম করল। শকুন্তলাকে লিফট থেকে বেরোতে দেখে, মাদলও উঠে দাঁড়াল। ওকে যেন লক্ষই করল না মহিলা। সোজা রিসেপশান পেরিয়ে চওধরির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শুধাল, 'বাহ! মেলা বসে গেছে দেখছি। অ্যাডমার্কেটের লাঞ্চ-আওয়ার কি সাড়ে-তিনটেতেও শেষ হয়নি? ব্যাপার কি?—'

পরিবেশের গুরুত্বের জন্যেই সকলে-প্রায় নিঃশ্বাসের শব্দে কথা বলছিল। হঠাৎ শকুন্তলার খাপছাড়া উচ্চকিত বক্রোক্তি চমকে দিল সবাইকে। বিরক্ত হলেও মালকিন বলে কথা! গুটি-গুটি হেঁটে যে যার টেবিল, ক্যাবিনের দিকে রওনা দিল।

চওধরি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। গম্ভীর মুখে বলল, 'সরি ম্যাডাম। মিস্টার রয় খুন হয়েছেন।'

প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেও পরে গলা নামিয়ে শকুন্তলা বলল, 'হোয়াট! অ্যানাদার মার্ডার! কোথায়?'

'ওঁর ক্যাবিনেই।'

রিসেপশানের টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়াল শকুন্তলা। নিজের মনেই মন্তব্য করলে যেন, 'ইশ, কি কেলেঙ্কারি! ছি-ছি! কোম্পানির বদনাম—অ্যাড-মার্কেট ইজ ডুমড—।'

তারপরে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে?'

চওধরি বলল, 'পুনার লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, ম্যাডাম!'

বিরক্ত গলায় শকুন্তলা প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'ওহ নো! হি ইজ ইন টাউন, বাই নাউ! লাঞ্চের আগেই তো বম্বে পৌঁছোনোর কথা।—শিগগির বাড়িতে লাইন লাগান—অ্যান্ড গিভ মি দ্য লাইন—'

বলে, কনফারেন্স রুমের দিকে দু-কদম এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ব্যাপারটা হয়েছে কখন?'

চওধরি বলল, 'সঠিক টাইম তো পোস্টমর্টেমে বেরোবে। আমরা টের পেয়েছি এই দশ-পনেরো মিনিট আগে।'

'কে দেখেছে প্রথম?'

'জুলি। জুলি সালডানা।'

টেলিফোন বোর্ডে বসা জুলি অপরাধীর মতো ভীত মুখে উঠে দাঁড়াল। শকুন্তলা তাকে এক পলক দেখে নিয়ে চওধরিকে জিগ্যেস করল, অ্যাট লিস্ট—পুলিশকে খবর দিতে পেরেছেন আশা

BanglaBook.org

করি—নাকি, থানার লাইনও পাওয়া যাচ্ছে না—'

'না-না! পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ইন্সপেক্টর সাঠে এসে পড়বেন—'

চারপাশে দেখে নিল শকুন্তলা। জটলা ভেঙে অনেকেই ডিপার্টমেন্টের দিকে রওনা দিয়েছে। রিসেপশানের পেছনে মার্কেটিং-এর টেবিলে যারা বসে পড়েছে, তারা জোর করে কাজে মন দেওয়ার ভান করছে। কান খাড়া করে ফাইলপত্তর ঘাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

খুব নীচু গলায় নির্দেশ দিল, শকুন্তলা, 'কাগজ-অলারা আসতে পারে। আফটার অল, পর পর দুটো মার্ডার! ছিছি! কি চলছে আপিসে কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্লডে টি-টি পড়ে যাবে। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন, যাতে, ক্রাইম-রিপোর্টাররা ব্যাপারটা চেপে যায়। অ্যাট লিস্ট ফলাও করে না লেখে। দরকার হয়, ভালো করে খাইয়ে দেবেন—ইউ নো হোয়াট আই মিন—নইলে, ক্লায়েন্টদের ধরে রাখা যাবে না—'

বলে, নিজের ক্যাবিনের দিকে হাঁটা দিল শকুন্তলা। যেতে-যেতে, গলা তুলে জুলিকে বলে গেল, 'বাবাকে পেলে, ইমিডিয়েটলি লাইনটা আমার ঘরে দিয়ে দেবে—'

কথা বলতে-বলতে শকুন্তলাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল হরবিলাস চওধরি, ঠিক তক্ষুনি ওপরে উঠে এল লিফট। দরজা খুলে প্রথমে বেরুলেন মধুকর সাঠে তারপর বেরুলেন সত্যসাধন। পেছনে চারজন কনস্টেবল।

শংকর বাহাদুর গোড়ালি ঠুকে এক জবর সেলাম দিল। সাঠে গটগটিয়ে হেঁটে চললেন আগে-আগে। মাদল উঠে দাঁড়িয়েছিল। সত্যসাধন ওর কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করলেন, 'কোনও গন্ডগোল হয়নি তো?'

মাদল ঘাড় নেড়ে জানাল—'না।'

'সব ঠিক-ঠিক?'

'সব।'

দুজন সেপাই লিফট তথা, গেটের কাছে মোতায়েন হল। বাকি দুজনকে নিয়ে সাঠে এগোচ্ছিলেন সোজা জয়দীপের ক্যাবিন লক্ষ্য করে। পেছন থেকে ডাক দিলেন সত্যসাধন, 'মধুকর!'

ডাক শুনে, সাঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সত্য ওর কাছে পৌঁছে জিগ্যেস করলেন, 'চললে কোথায়?'

সাঠে অবাক, 'বাহ! লাশ দেখবে না! এসো—'

বলে, আবার পা বাড়াচ্ছিলেন, সত্য হাত ধরে ফেললেন সাঠের, 'দাঁড়াও। বলি, লাশ তো আর পালাচ্ছে না!'

মাদল ওদের পেছন-পেছন এসে পড়েছে। চওধরি এবং জুলিও। জয়দীপের ক্যাবিনের সামনে টুলে বসা দত্তারাম তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সাঠেকে দেখে।

সাঠে বললেন, বোকা-বোকা হাসি মেখে, 'না। লাশ পালাবে বা ভবে, হ্যাঁ। তোমার মক্কেল কিন্তু ফুড়ুত! মজুরি লস—'

মাদল টানটান চোখে সত্যকে লক্ষ করছে। সত্য খোঁচা গায়ে না মেখে বললেন, 'আমি একটা রিকোয়েস্ট করব তোমাকে। রাখবে?'

খোঁচা-দেওয়ার বোকা-বোকা হাসি উঠে গিয়ে সাঠের মুখে গদগদভাব 'বলো কি হে, সাধনকর? এভাবে লজ্জা দিয়ো না, ব্রাদার। তোমার আবার রিকোয়েস্ট কি? স্রেফ হুকুম করো! একটা কেন? আজকের দিনটায় অন্তত তোমার তিনটে হুকুম তামিল করতে রাজি—'

বলে, বেশ ঘনিষ্ঠ বেড়ালের আদুরে গলায় যা বললেন, মাদল শুনতে পেল স্পষ্ট, 'সকালের কাগজ দেখেছ? আমাদের ছবি বেরিয়েছে!'

BanglaBook.org

সত্যকাকু চঞ্চল, লাজুক ভঙ্গিতে পাশ কাটালেন, 'ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখেছি।—'

'আমার প্রমোশন এবার কেউ আটকাতে পারবে না, হে সাধনকর! ওই খাঁড়ি-পথে আমি না থাকলে—'

নিজের কথা বলতে গিয়ে যেন, মনে পড়ল হঠাৎ—তাই সুর পালটালেন। সত্যকাকুর কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও কাছেপিঠের লোকজনকে দেখে সামলে নিলেন। শেষ করলেন কথা খুব চাপা স্বরে, 'সবই তোমার জন্যে, হে—'

সত্যকাকু অসোয়াস্তি ঝেড়ে ফেলার মতো বললেন, 'ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ!—হ্যাঁ, যা বলছিলুম—'

'বলো-বলো। কী করতে হবে?'

দুজনে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অস্ফুট আলোচনা শুরু করতেই, শকুন্তলা ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল। পুলিশ আসার খবর পেয়েই বোধহয়।

সঙ্গে-সঙ্গে সাঠে ওর দিকে এগোলেন। বললেন, 'এই যে মিস, ইয়ে, মানে, কোরগাঁওকার। আসুন। আপনার সাহায্যের ভীষণ দরকার।'

শকুন্তলা অপাঙ্গে সত্যকে দেখে নিয়ে যেন, চিনতেই চাইল না। সাঠেকে বলল, 'কি কাণ্ড বলুন দেখি। একটার পর একটা মার্ডার হতে থাকলে তো, কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। জোশী-হত্যার কোনও কিনারা করতে পারলেন না—আর একটা খুন হয়ে গেল—ইশ—'

কিঞ্চিৎ ঠাট্টা এবং বিরক্তি মিশিয়ে সাঠে বললেন, 'তা আর কী করব বলুন ম্যাডাম! আমাদের পুলিশ-বিভাগে এখনও পর্যন্তও তো তেমন কম্পিউটার বসানো যায়নি, যে তিনটে বোতাম টিপলেই খুনির নাম-ঠিকুজি স্যাটাস্যাট বেরিয়ে আসবে। তাই, একটু সময় লাগছে—'

খোঁচা খেয়ে শকুন্তলা সুর বদলাল, 'হ্যাঁ, বলুন। আমাকে কী করতে হবে?'

হঠাৎ যেন খেয়াল হল, এমনিভাবে চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বাবা, মানে, মিস্টার কোরগাঁওকার কি পুনায় নাকি?'

'না। আজই এসেছেন বম্বেতে। বাড়িতে নেই। মনে হয় অফিসেই আছেন।'

'বাঃ বেশ! আচ্ছা, ম্যাডাম, আপনাদের কনফারেন্স রুমটা কত বড়? আপিসের সমস্ত কর্মচারীদের কি ও ঘরে এক সঙ্গে জড়ো করা যাবে?'

'মোটামুটি। তবে, সবাই হয়তো বসতে পারবে না। কিন্তু, কি ব্যাপার বলুন তো, মিস্টার সাঠে? আপনি ডেডবডি দেখে নিয়েছেন?'

মাদল এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি লোকের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। প্রায় সব মুখগুলিতেই কেমন তটস্থ, বিচলিত ভাব। মৃত্যুর ছায়ায় শোক না থাকলেও, থমথমে ভয়ের ছাপ। জয়দীপ রায়ের মৃত্যুতে কেঁদে ভাসাবার লোক আপিসে থাকার কথাও নয়। তবু, সারাক্ষণ কাছাকাছি থাকার ফলে এবং আতঙ্কেই হয়তো জুলি সালডানা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু, সেই তখন থেকেই মাদল অবাক হয়ে দেখছে, শকুন্তলা ম্যাডামের ভাবসাব! যত দেখছে তত বেশি অবাক হচ্ছে। এ কি করে সম্ভব? জয়দীপদার মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহিলার মুখের চেহারা দেখে মনে হল, অ্যাডমার্কেটের যে কোনও একজন রাম-শ্যাম বা যদু কর্মচারী নিহত হয়েছে। চমকে উঠে, যথেষ্ট বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে তার কথাবার্তায়। কোম্পানির বদনাম, ঝামেলা ইত্যাদির চিন্তাতেই মহিলা মহা ব্যস্ত। অথচ, শুধু মাদল কেন, তার মতো অনেকেই ভেবেছিল—'জয়দীপ রায় নিহত' শুনে কান্নায় ভেঙে পড়বে শকুন্তলা। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কানাঘুসোয় শুনেছে মাদল। এমনকি, বিয়ে হওয়ার কথাও নাকি হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মহিলাটি একবার নিহত মানুষটিকে দেখতে চাইল না! নাম পর্যন্ত আনল না মুখে! শোকতাপ তো দূর অস্ত। এ কেমন করে হয়, ভেবে পেল না মাদল। মেয়েরা এত নিষ্ঠুর, এত প্র্যাকটিকাল হতে পারে-ভাবা যায় না। চব্বিশ বছরের

BanglaBook.org

যুবক মাদলের মনে নারীজাতি সম্পর্কে ধারণাই আজ পালটে যেতে লাগল। লোক-মুখে-শোনা, পড়া বা নিজস্ব মন-গড়া প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির ছবি রং পালটাতে শুরু করল শকুন্তলাকে দেখে। আবার এও ভেবে দেখল সে—হয়তো, আদপেই দুজনের মধ্যে কোনও গভীর সম্পর্ক ছিল না। স্রেফ খেলাধুলো। খেলা শেষ হলে, ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাও।

শকুন্তলার কথার জবাব দিলেন সাঠে, দু-হাত তুলে, আশ্বাসের ভঙ্গিতে, 'সব হবে, ম্যাডাম! ফরেনসিকের লোক, ফিঙ্গার প্রিন্টের শর্মা আর ফোটোগ্রাফার এসে গেলে, একসঙ্গে ঢুকব ক্যাবিনে। তার আগে—' সত্যসাধনকে দেখিয়ে ঘোষণার ঢঙে কথা শেষ করলেন, মধুকর, 'দিস গ্রেট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্লড অফ ইন্ডিয়ান ইনভেস্টিগেশান, মিস্টার সত্যসাধন কর আপনাদের কিছু বলবেন। আমার সঙ্গে আজ কাগজে এঁর ছবি ছাপা হয়েছে—দেখেছেন নিশ্চয়ই!'

দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে ওর কথা বলার ধরনধারণ দেখে মাদলের হাসি পেল। বহু কষ্টে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। শকুন্তলা, চওধরি, জুলি—এমনকি, জয়দীপের ক্যাবিনের দরজার পাহারাদার দত্তারামের মুখেও বিরক্তির চিহ্ন। সবাই মনে-মনে চটে যাচ্ছে—পাশের ঘরে একটা লাশ পড়ে আছে—আর উনি কি না—

সাঠেকে প্রায় বাধা দিয়ে শকুন্তলা জিগ্যেস করল, 'তা কী করতে হবে বলুন?'

সাঠে সত্যকে ইশারা করল, 'সাধনকর! বলে ফ্যালো—'

যথেষ্ট বিনীতভাবে সত্য শকুন্তলাকে বললেন, 'আই অ্যাম সরি টু ট্রাবল ইউ ম্যাডাম! অথচ উপায় নেই। জোশী-হত্যার ব্যাপারে আমার ক্লায়েন্ট জয়দীপ রায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আজ উনি নিজেও নিহত। ফলে, কর্তব্যের খাতিরেই আমি আপনাদের সামান্য বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।'

অসহিষ্ণু শকুন্তলা ওঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ভূমিকা না-করে তাড়াতাড়ি বলুন কী করতে হবে?'

এক মুহূর্তের জন্যে সত্যর চোয়াল শক্ত হল। সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, 'আজ এবং এখন অ্যাড-মার্কেটে যে ক'জন লোক রয়েছেন প্রত্যেককে আপনাদের কনফারেন্স রুমে ডেকে পাঠান। খেয়াল রাখবেন, জোশী-হত্যার দিনে যাঁরা আপিসে ছিলেন এবং পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন—তাদের প্রত্যেকে যেন বসবার জায়গা পান। আমরা এগোচ্ছি। এসো সাঠে—' বলে, কনফারেন্স রুমের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মাদলকেও সঙ্গে ডেকে নিলেন সত্যসাধন।

জয়দীপের বন্ধ ক্যাবিনের সামনে একজন সেপাইকে মোতায়েন করে, সর্বশেষটিকে সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করলেন সাঠে।

ওরা এগিয়ে গেল। চওধরি জিগ্যেস করল শকুন্তলাকে, 'স্যার এখনও এসে পৌঁছোলেন না! মহা ঝামেলা হল ম্যাডাম! গোয়েন্দা লোকটার মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইন্সপেক্টার সাঠেও তো লোকটার কথায় ঘাড় কাত করে আছে। আপনিই বলুন ম্যাডাম, এখন কি লেকচার শোনবার মুড আছে, না শোকসভা করার?'

শকুন্তলা দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, 'রাবিশ অ্যান্ড বোগাস!'

দত্তারামের পাহারা দেওয়ার কাজ সেপাইটি নিয়েছে। ফলে, জুলিগুটি সে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। ম্যাডামের মুড দেখে, ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলে চওধরিকে, 'সবাইকে ডেকে আনব, সাব?'

BanglaBook.org

॥ আঠারো ॥

মস্ত একখানা ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরে দশ-বারোটি চেয়ার। তা ছাড়া, দেওয়াল ঘেঁষেও অনেকগুলি চেয়ার পাতা। এ-ঘরে এক-আধবার ঢুকেছে মাদল। জয়দীপদার ক্যাবিনে অন্য লোক থাকলে, আর্ট-

ডিরেক্টর এবং মাদলকে নিয়ে উনি এখানে চলে আসতেন। ক্যাম্পেনের কাজ বোঝাতে। দরজা দিয়ে ঢুকে, ডানহাতি দেওয়ালে আলো এবং পাখার সুইচ-বোর্ড।

আগে-আগে ঢুকে সুইচ টিপে সব ক'টা আলো এবং পাখা চালিয়ে দিল মাদল। সাঠেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সত্যসাধন। ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চারপাশে। উলটোদিকের দেওয়ালের গায়ে সাময়িক সাদা পরদা লাগানো। ছবির প্রোজেকশানের জন্যেই বোধহয়।

টেবিলটাকে চক্কর মেরে ওই পর্দার কাছে পৌঁছে গেলেন সত্য। সঙ্গে মধুকর সাঠে। সত্য মাদলকে বললেন, 'তুমি দরজার কাছেই থেকো।'

পাশাপাশি চেয়ারে বসে পড়লেন দুজনে। ভুরু নাচিয়ে সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'সাধনকর, তোমার মতলবটা কী বলো দেখি?'

মুচকি হাসলেন সত্য। বললেন, 'দেখা যাক! হয়তো, হত্যা-রহস্যের একটা কিনারা হলেও হতে পারে—'

'দুটোরই? মানে, জোশী এবং জয়দীপ?'

সত্য জবাব দেওয়ার আগেই দরজার কাছে, দুজন-চারজন করে অফিস-কর্মী এসে জড়ো হল। তারা ভেতরে 'ঢুকবে কি, ঢুকবে না' ভাবছে। মাদল বলল, 'চলে যান। ভেতরে গিয়ে বসে পড়ুন সবাই।'

সত্যও উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন হাসিমুখে, 'আসুন, মিস সালডানা, মিস লাখানি—ভেতরে আসুন।'

এক-এক করে, আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে আসতে আরম্ভ করল ওরা। চাপা গুঞ্জন। সত্য এবং সাঠের থেকে দূরের চেয়ারগুলি ভরতি হয়ে গেল প্রথমে। তারপরে, ধীরে-ধীরে সব আসনই দখল হয়ে গেল। সাঠের বাঁ-দিকের তিনটি এবং সত্যর ডানদিকের দুটি চেয়ার খালি রয়ে গেল। পুলিশের অত কাছে বোধহয় কেউই বসতে ভরসা পাচ্ছে না। কয়েকজন দেওয়াল ঘেঁষে, দরজার কাছাকাছি সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবশেষে মাদলের পাশ কাটিয়ে শকুন্তলার পিছন-পিছন এসে ঢুকল চওধরি। দু-রকম গন্ধ পেল মাদল। প্রথমে হালকা সেন্ট ও পরে আলতো অ্যালকোহল। হঠাৎ মাদলের সন্দেহ হল হরবিলাস চওধরি কি তার ক্যাবিনে বিয়ার বা হুইস্কির বোতল লুকিয়ে রেখে দেয়! এক্ষুনি এক ঢোঁক মেরে এল হয়তো!

সাঠের কাছের চেয়ারে শকুন্তলা ও সত্যর পাশে চওধরি এসে বসতে-না-বসতে দরজার সামনে এসে উপস্থিত মিস্টার কোরগাঁওকর। কোম্পানির খোদ মালিক। জাঁদরেল ভারিক্কি চেহারাটি প্রায় দরজা জুড়ে দাঁড়ানো। ছাই রঙের সুট পরনে। মাথায় টাক। ভারী ফ্রেমের চশমার পিছনে ছোট চোখজোড়া চঞ্চল। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম নিয়ে সামান্য হাঁফাচ্ছেন। বাটের কাছে থেকে বয়েস।

বড় কর্তার আবির্ভাবে তটস্থ হয়ে প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে। সাঠে পুরোপুরি একগাল হেসে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন আসুন, স্যার! আপনার ঘাটতি মালুম হচ্ছিল। আপনাকে ছাড়া—'

হাত তুলে বাধা দিলেন কোরগাঁওকর। হেঁটে আসতে-আসতে উত্তেজিত এবং বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী হচ্ছে এখানে? কীসের মজলিস বসেছে, অ্যাঁ? লিফটম্যান বলল, আবার একটা খুন—জয়দীপ রায়?'

সত্যসাধন হেসে বললেন, 'আগে আপনি বসুন, স্যার। সব বলছি। হার্টের রুগির পক্ষে অত উত্তেজনা ভালো নয়!'

ভিড়ের মধ্যে ডিম-টেবিলের চূড়ামণি হয়ে বসা সত্যসাধনকে আগে বোধহয় লক্ষ করেননি ভদ্রলোক। এবার, দেখতে পেয়ে অবাক গলায় বললেন, 'আপনি? আপনাকে না দু-একদিন আগে পুনার হেড অফিসে দেখেছি?—'

BanglaBook.org

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন সত্যসাধন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার দীপন গুহ আমার পুরোনো বন্ধু—ওর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলুম—'

শকুন্তলার পাশে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে কোরগাঁওকর বললেন, 'বেশ তো। তা—এখানে? হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুয়িং হিয়ার?'

মাদল মনে-মনে হিসাব কষছিল। ওয়ালকেশ্বরের 'সানসেট ভিলা'য় তিনদিন ছিল সে। ওরই মধ্যে সত্যকাকু পুনা ঘুরে এসেছেন। নিশ্চয়ই কোনও 'ক্লু' আবিষ্কার করেছেন। মাদলকে কিচ্ছু বলেননি ভেবে একটু অভিমান হল তার। সঙ্গে-সঙ্গে, ভেবে দেখল, অবিশ্যি, সেসব কথা বলার সময়ই বা পেলেন কোথায়? তিনদিন দেখা হয়নি। গতকাল মধ্য রাত অবধি তো 'অপারেশান সানসেট' নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত। আরও একটা কথা এক্ষুনি মনে পড়ে গেল। সেই যে ভোর-ভোর থাকতে বেরিয়ে ঝমরে চেপে খাপোলি যাওয়া হয়েছিল, কোরগাঁওকরের গাড়ি ও তাঁর খাসবেয়ারা শিবালকরকে দেখে ঝমরকে একটু আড়ালে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সত্যকাকু। একটু বাদে সাদা প্রিমিয়ার নিয়ে ওরা বেরিয়ে যেতেই সত্যকাকু ঝমর থেকে নেমেছিলেন। মাদলকে বলেছিলেন, 'এসো, নেমে পড়ো। তুমি চা-আলুবড়ার অর্ডারটা দিয়ে ফেলো। আমি ছোট্ট একটা পাক দিয়ে আসি।'

বলে, দ্রুত পায়ে 'জে. কে. কেমিস্ট-ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল সাপ্লায়ারে'র দিকে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন। মাদলের পেটে তখন ছুঁচোয় ডন মারছে। হোটেলে ঢুকে দু-প্লেট 'বটাটা বড়া' আর দুটো চা বলে ফিরে এসেছিল ঝমরে। সকালের শীতল বাতাস আর নেই। রোদের তাত বাড়ছে। ছোট্ট একটি ছেলে অর্ডার সার্ভ করে যেতে-না-যেতেই ফিরে এলেন সত্যকাকু। সঙ্গে ঠোঙে নিয়ে এলেন রবি ঠাকুর, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়—'

ঝমরের দরজা খুলে সিটে বসেও গান থামে না। আপনমনে একটা বড়া তুলে কামড় দিয়েই বললেন, 'আহা! সত্যি মাদল। খাপোলির বড়া অতুলনীয়।'

হা-ভাতের মতো বড়া খেতে-খেতে মাদল জিগ্যেস করল, 'ও-দোকানটায় কিছু পেলেন?'

'হুম বাবা। পেলাম তো বটেই। নানান ওষুধের গন্ধ। স্পিরিট।— আরও দুটো করে বড়া সঙ্গে নিয়ে নাও হে, শ্রীমান। দেড় ঘণ্টার ফিরতি পথে লেগে যাবে—'

অনর্গল ফালতু কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারই ফাঁকে চায়ে যেই চুমুক দিতে যাবেন, মাদল ফাঁক বুঝে আবার চেষ্টা দিল, 'মানে কোনও হদিশ-টদিশ?'

ও মা! তার জবাবে সত্যকাকু বলে উঠলেন, 'নাড়িতে মোর রক্তধারায়—লেগেছে তার টান—'

'আকাশভরা সূর্যতারা'র মধ্যে ঝমর স্টার্ট নিয়েছে। ছোকরাটি এসে কাপ-ডিশ-পয়সা নিয়ে গেছে। সত্যকাকুর মুখ থেকে কাজের কোনও কথাই বেরোয়নি। মাদল টের পেয়ে গেছে, এখন ওঁকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

কয়েক মুহূর্তে খাপোলির ঘটনা থেকে ঘুরে-ফিরে আসতে দেখল, সাঠে সত্যকাকুর পরিচয় করাচ্ছে মিস্টার কোরগাঁওকরের সঙ্গে। 'সি-আই-এ' প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর শুনে-টুনে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে একখানা শব্দ উপহার দিলেন বাতাসে, 'অ।'

তারপর, সাঠেকে জিগ্যেস করলেন, 'বাট হোয়াট, অ্যাবাউট দ্য ডেডবডি? পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

শকুন্তলা প্রায় ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ক্ষমাতদন্ত দুরস্থান, এঁরা এখনও পর্যন্ত লাশই দেখেননি।'

সাঠে এক পলক সত্যকে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'উই নো আওয়ার ডিউটি, মিস্টার অ্যান্ড মিস কোরগাঁওকর। সাধনকর আপনাদের সবাইকে কিছু বলবেন বলেই এখানে সমবেত হয়েছি আমরা। পুলিশের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি বা, ধরে নিন, নির্দেশ দিচ্ছি—একটু ধৈর্য ধরুন সবাই। বলো হে, সাধনকর—'

BanglaBook.org

বলে, সত্যর দিকে তাকালেন সাঠে।

মৃদু-মৃদু হাসছিলেন সত্য। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, কে কোথায় রয়েছে। প্রায় সকলের মুখে-চোখে অসহিষ্ণুতার ভাব। কৌতূহল। মাদলের মনে হল এই মুহূর্তে প্রকাণ্ড ঘরের কোথাও হঠাৎ টিকটিকি ডেকে উঠলেও ধক করে উঠবে বুকের মধ্যে।

সত্যসাধন বলতে শুরু করলেন, 'পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিস্টার জোশীর মৃত্যু হয়েছে বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। মৃত্যুর কারণ—সায়নায়েড বিষ। জয়দীপ রায়ের ঘরে, চিনির কৌটোয় মেশানো হয়েছিল এই মারাত্মক বিষ। সেই চিনি দিয়ে তৈরি চা মুখে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিস্টার জোশী মারা যান—চিৎকার তো দূরের কথা, সামান্যতম শব্দ করবারও অবকাশ উনি পাননি। তা ছাড়া—'

মিস্টার কোরগাঁওকর অধৈর্য স্বরে বাধা দিলেন, 'কিন্তু এসবের সঙ্গে আজকের খুনের সম্পর্ক কী?'

হাত তুলে, বেশ কড়া গলায় জবাব দিলেন সত্যসাধন, 'হবে। একে-একে সব আসবে। —আর-একটা কথা, অতি সাধারণ যে-বোধটি, যে-কোনও দায়িত্বশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের থাকা উচিত, তা হল—ভদ্রতা। কথার মধ্যিখানে বাধা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে কথা বলাটা অশালীনতা।—'

ভদ্রলোকের ফরসা রঙে যেন কেউ ছাই মিশিয়ে দিল এতগুলো বেতনভুকের সামনে। এক সেকেন্ডের জন্যে চশমার পিছনে চোখ দুটো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। একেবারে চুপ করে গেলেন কোরগাঁওকর।

ওঁর দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার বলতে লাগলেন সত্য, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সন্দেহভাজন মোট পাঁচজন। প্রথমেই ধরা যাক, জয়দীপ রায়। প্রত্যেক বিজ্ঞাপন কোম্পানিতেই ক্লায়েন্ট এবং অ্যাকাউন্ট নিয়ে কম-বেশি মন-কষাকষিই হয়েই থাকে। এমনকি ঝগড়াঝাঁটি হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে, জয়দীপ জোশীকে একেবারে খুন করে ফেলবে—প্ল্যান করে—এটা হজম করা শক্ত। দ্বিতীয়ত জোশীর মৃত্যুর ফলে, রায় ব্রাঞ্চ ডিরেক্টর হবে—এই "মোটিভ"-ও খুব পোক্ত নয়। কারণ, অ্যাডমার্কেটের অ্যাতো বিশাল রাজত্বের একমাত্র রাজকন্যাই যেখানে হাতের নাগালে, সেখানে খুদে একটা ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর হওয়া তো মামুলি—'

'আই ওবজেক্ট!—' সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে শকুন্তলা, 'উটকো লোকের মনগড়া সব রাবিশ মন্তব্য বসে-বসে শুনতে রাজি নই—'

বলে, গটগট করে হাঁটা ধরেছিল গেটের দিকে, সত্য একটু গলা বাড়িয়ে বললেন, 'আহা। এখন আপনার আপত্তি থাকতেই পারে। সাময়িক মোহও কেটে যেতে পারে বৈকি! তবে, আমার কথার অকাট্য প্রমাণ-স্বরূপ খানকয়েক চিঠি-চাপাটি আমার পকেটে আছে, যেগুলি দেখলে সবাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে—'

মোলায়েম গলায় সাঠে ডাক দিলেন, 'আসুন, আসুন, মিস কোরগাঁওকর। এসে, বসে পড়ুন দেখি।—এই সাধনকর বড় সাংঘাতিক চিজ, ওকে ঘাঁটিয়ে জল ঘোলা করবেন না।—'

দরজা অবধি পৌঁছে গিয়েছিল শকুন্তলা। মাদল স্পষ্ট শুনতে পেল, দাঁতে-দাঁত চেপে ম্যাডাম বিড়বিড় করল শূন্যে 'স্কাউন্ড্রেল।'

বিশেষণটির টার্গেট হয় অনুপস্থিত জয়দীপদা, নয়তো, সন্ধ্যাকাকু—এটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না মাদলের। তবু, সে চুপ করে থাকল। এই অবস্থায় ভরভরতি লোকের সামনে মাথা-গরম করার কোনও মানে হয় না।

আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের চেয়ারে ফিরে গেছে শকুন্তলা। ওর বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সত্য বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' এবং জুড়ে দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে, 'খুনি হিসেবে জয়দীপকে বাদ দেওয়ার ভাইটাল পয়েন্ট হল—মোটিভের কথা ভুলে গিয়ে, যে কোনও কারণেই হোক, জয়দীপ রায়ের মতো বুদ্ধিমান লোক যদি জোশীকে খুন করতে চাইত, তা হলে কখনোই নিজের ঘরে চিনির

BanglaBook.org

কৌটোয় বিষ মিশিয়ে তাকে খুন করত না।'

সামান্য দম নিয়ে, সমবেত মানুষগুলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন সত্য। শুরু করলেন আবার, 'দ্বিতীয় নম্বরে, জুলি সালডানাকে দেখা যাক—'

সত্যর ডানদিকে চারটি চেয়ারের পরে পঞ্চম চেয়ারে বসে জুলি। ওর নাম উচ্চারিত হতেই, চমকে তাকাল সত্যর দিকে। শরীর টানটান, শক্ত হয়ে গেল। চোখের চাউনি ভীত, সন্ত্রস্ত।

সত্য বললেন, 'জোশী মারা গেলে, জুলির কোনও সুবিধে হয় না। অর্থাৎ "মোটিভ" একেবারে নিল। ভিতু নার্ভাস টাইপের এক যুবতী, বিনা কারণে একটা লোককে খুন করতে পারে না। বিশেষত, যে-তরুণীর দু-চার দিন বাদেই বিয়ের ঠিকঠাক—তার মাথায় হত্যার প্ল্যান ঘুরছে—এটা সাইকোলজির ধোপে টেকা মুশকিল।—অ্যাম আই রাইট মিস সালডানা?'

জুলির ভীতমুখে ম্লান হাসির রেখা। সত্যর দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। কৃতজ্ঞতায় জল বুঝি উপছে পড়বে এক্ষুনি। ও মুখে জবাবই দিতে পারল না। ছোট্ট করে দু-তিনবার মাথা কাঁপিয়ে সত্যর কথায় সম্মতি জানাল। নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে, গলা শুকিয়ে আসছিল সত্যর। একটু চা পেলে ভালো হত। কিন্তু কাকেই বা বলবেন? বেশিরভাগ লোককেই চেনেন না। যাদের চেনেন তাদের মধ্যে জয়দীপ নেই। অন্য যে ক'জন আছে, তারা ঘোর বিতৃষ্ণা, বিরক্তির চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তবু, নিদেন এক চুমুক জল না পেলে চলছে না। সত্য, হঠাৎ যেন কিছু না-ভেবেই এই কোম্পানির খোদ মালিককে জিগ্যেস করলেন, 'একটু জল পেতে পারি, মিস্টার কোরগাঁওকর?'

ভদ্রলোক সোজা ওঁর দিকে চেয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। খাবেন, না, কুলকুচি করবেন?'

সত্যও হাজির-জবাব দিলেন, 'দুটোই।'

বড় কর্তা হাঁক দিলেন, 'শিবালকর?'

দরজার কাছে ভিড়ের মধ্যে বেয়ারা দত্তারাম ও শিবালকর দাঁড়িয়েছিল। মালিকের ডাক শুনেই শিবালকর ছুটল জল আনতে।

ঢোঁক গিলে সত্য শুরু করেছেন আবার, 'একটা ব্যাপার সারাক্ষণ মনে রাখা দরকার, খুনটা হয়েছে জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে। ঠিক ওই দিন ওই সময়ে মিস্টার জোশী যদি ওর ক্যাবিনে না যেতেন, তা হলে হয়তো উনি আজ আমাদের মধ্যে থাকতেন। কারণ, জোশী ছাড়াও সিনিয়র অফিসারদের যে কেউ ওই ক্যাবিনে গিয়ে বসতে এবং চা খেতে পারতেন। এমনকি, জোশীর বদলে কোনও ক্লায়েন্টেরও মৃত্যু হতে পারত স্রেফ চা খেয়ে। সুতরাং, আমাদের দু-ভাবে ভাবতে হবে। এক, জোশীকে হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে, হত্যাকারী আগে থেকে জেনে গিয়েছিল ওই সময় জোশী জয়দীপের ক্যাবিনে যাবে। দুই, জোশী আদপেই হত্যাকারীর টার্গেট ছিল না। যার ক্যাবিন, তাকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল খুনির উদ্দেশ্য—অর্থাৎ জয়দীপ স্বয়ং।'

এতক্ষণে, আবার একটা চাপা গুঞ্জন আরম্ভ হল ঘরের মধ্যে। মাদলের এখন আর দাড়ি নেই। তবু সত্যকাকুর কথা শুনে এই ক'দিনের অভ্যেসের ফলে, গাল চুলকে ফেলল সে। শিবালকর কাচের গেলাসে জল নিয়ে ফিরে এল। সত্যসাধনের সামনে, টেবিলে গেলাস রেখে ফেরত চলে গেল নিজের জায়গায়। দত্তরাম ও অন্যান্য বেয়ারাদের কাছে।

বড়সড় এক চুমুক জল খেয়ে সত্য বললেন, 'এবারে দেখা যাক, তিন নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি দত্তারামকে, জয়দীপ ও চওধরি-সায়েবের বেয়ারা। এরও কোনও জোরদার "মোটিভ" দেখা যাচ্ছে না। কারণ, জোশীর সঙ্গে ওর সরাসরি যোগাযোগই ছিল না। তবে হ্যাঁ, যদি ওর আপন বস জয়দীপকে খুন করবার "মোটিভ" কিছু আবিষ্কার করা যায়, তা হলেও, খুনটা ও করেছে—এমন কথা মগজবিহীন ব্যক্তিও ভাবতে পারবে না।'

এতক্ষণে, সাঠে কথা বললেন, 'এটা তুমি কী করে বলতে পারলে, সাধনকর?'

BanglaBook.org

জবাবে, প্রথমে সাঠেকে একখান ছোট্ট হাসি উপহার দিলেন সত্য। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'তাই যদি হয়, তা হলে, ধরে নিতে হবে যে, দত্তা চিনিতে বিষ মিশিয়ে রেখেছে। পরে, জোশী যখন ওর কাছে কফি চাইল, তখন, সেই বিষাক্ত চিনি দিয়ে ও নিজেই কফি বানিয়ে খাইয়ে দিল জোশীকে। জেনেশুনে, এটা ও করবে না। কারণ, আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিয়েছি যে, ওর টার্গেট জয়দীপ রায়—'

বাধা দিলেন সাঠে এঁড়ে-তর্কের ধরনে, 'কিন্তু, ও তো গাঁজা-টাজা খায়—'

সত্য হাসলেন, 'তা অ্যাডমার্কেটের বেশ কিছু লোকই হয় শুকনো, নয়, ভেজা নেশা করে থাকেন। তা হলেও, ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুন যে করবে, সে এমন বোকামি করতে পারে না—তা সে, দু-চার ছিলিম গাঁজা বা দু-চার পেগ মদের ঘোরেও নয়।'

'তা হলে, খুনটা করেছে কে?'

দরজার কাছে দাঁড়ানো এবং দেওয়াল-ঘেঁষে-বসা প্রায় ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে থেকে আবছা, অস্পষ্ট প্রশ্নটা উড়ে এল বাতাসে। ঘরের নৈঃশব্দের মধ্যে, উপস্থিত সকলের মনের কথা হয়ে কয়েক সেকেন্ড ঘুরে-ঘুরে মিলিয়ে গেল শব্দ ক'টি। মাদল চিনতে পারল কণ্ঠস্বর। সামান্য উত্তেজিত, অধৈর্য রমনিকভাই। স্টুডিয়ো ম্যানেজার। জোশী হত্যার দিন মিস লাখানিকেও পুলিশের জেরায় যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে—এই খবরে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে রমনিকভাই। স্টুডিয়োর দু একজন শিল্পী হাসাহাসি করেই জানিয়েছে মাদলকে, আজ সকালে। হঠাৎ মাদলের মনে হল মিস লাখানির সঙ্গে ঢলাঢলি করতে গিয়ে মানুষটি হয়তো মনে-মনে বড়ই অপমানিত বোধ করেছে। আজ যদি প্রমাণিত হয় যে, ওই মহিলাই খুনি—তা হলে, হয়তো, রমনিকভাই সেই জ্বালা মেটাবার পরম্পদী আনন্দ পাবে। সেই আশাতেই কি এই আকুল জিজ্ঞাসা?

সত্যসাধন বললেন, যেন, রমনিকভাইয়ের প্রশ্নের জবাবেই, 'সম্ভাব্য ডাইরেক্ট খুনির তালিকায় এখন তিনজন। জোশীর সেক্রেটারি মিস লাখানি, বেয়ারা শিবালকর ও মিস্টার হরবিলাস চওধরি। পরোক্ষ অথচ আসল খুনি হয়তো কোনও চতুর্থ নামের মালিক।'

বলে, এক চুমুকে জলের গেলাস পুরো খালি করে দিয়ে আবার শুরু করলেন 'মিস লাখানির নামটি এই তালিকা থেকে এক কথায় নাকচ করা যায়। কারণ উনি জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে একবার গিয়েছিলেন ঠিকই—টি-ব্যাগ আনতে। দেড়টা-দুটো নাগাদ। এই সময়ের পরে, অর্থাৎ আড়াইটের পর জয়দীপ রায় কফি খেয়েছে। তার মানে, তখনও চিনির কৌটোয় সায়নায়েড মেশানো হয়নি। তা হলে, বাকি রইল দুজন। হরবিলাস চওধরি ও জোশীর বেয়ারা শিবালকর।—'

শিবালকর দরজার পাশে, কোণে দাঁড়িয়ে। জুলজুল চোখে চেয়ে আছে সত্যসাধনের দিকে। চওধরি সত্যর ডানদিকে পঞ্চম চেয়ারে বসে। সিগারেট ধরাল একটা।

'হত্যার দিন আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন হরবিলাস। জোশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নাকি, স্রেফ—মোটামুটি। পরে, নানান সূত্রে জানা গেছে ওদের দুজনের সম্পর্ক অফিসের বাইরেও বেশ ঘন ছিল। মিসেস জোশীর সঙ্গে চওধরির ভাবের সম্পর্ক আছে। এটা বেশ বড় রকমের ব্যক্তিগত কারণ বা খুনের "মোটিভ" বলে সহজেই ধরা যেতে পারে। তাই বলে অফিসেই মার্ডারটা করতে হবে, এটা কেমন খটোমটো। কারণ, মৃত জোশীর সঙ্গে মিস্টার চওধরির যত্রতত্র ওঠা-বসা, পানাহার চলত।'

বাধা দিলেন সাঠে, 'আপিসের ভিড়ে তৃতীয় ব্যক্তি জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে খুন করলে তো "মোটিভ"-ওয়ালা সন্দেহের পাত্র অনেক জুটে যায়—'

সাঠের কথা শেষ হওয়ার আগেই 'হো-হো' করে হেসে উঠল হরবিলাস। ঘর সুদ্ধ সবাই চমকে অবাক চোখে ওকে দেখল। ততক্ষণে, সে কাশতে আরম্ভ করেছে। গলায় ধোঁয়া লেগে বিষম লাগার জন্যেই বোধহয়। হাসি এবং কাশি থামতে বেশ কষ্ট হল চওধরির। চোখ-মুখ লালচে-ভয়ঙ্কর তখন। কেউ কিছু বলার আগেই দত্তারাম দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এসেছে গেলাসে। এক চুমুক খেয়ে,

BanglaBook.org

শান্ত হল লোকটা।

সত্য জবাব দিলেন সাঠের কথার, 'বলেছ হয়তো ঠিকই। তবে ছোট্ট একটা মুশকিল থেকে যাচ্ছে।'

'কী?' সাঠের প্রশ্ন।

'জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনের সামনে সারাক্ষণ হয় মিস সালডানা বা দত্তারাম মজুত থাকে। আমি মিস্টার চওধরির কথার সত্যতা যাচাই করতে ওদের দুজনকেই জিগ্যেস করে জেনেছি যে, বারোটা-সাড়ে বারোটায় উনি ঢুকেছিলেন রায়ের ক্যাবিনে। লাঞ্চের আগে, দেশলাই খুঁজতে। তার পরে আর যাননি। সুতরাং—বাকি থাকে—' বলে, ঘরের কোণের দিকে তাকালেন সত্যসাধন। পা ঘষে-ঘষে শিবালকর দরজার বাইরে পৌঁছে গেছে প্রায়। মাদল লাফ দিয়ে, ওর হাত চেপে ধরল। কড়া গলায় হুকুম দিল, 'ভেতরে এসো।'

ভারী মোলায়েম গলায় সত্যও ডাক দিলেন, 'এসো হে শিবালকর। কাছে এসো দেখি—'

নাকি সুরে গাঁওটি মারাঠিতে কী সব হাঁউমাউ চেঁচিয়ে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই, মাদলের এক ধাক্কা। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিল শিবালকর। কুঁজো হয়ে হাতজোড়া করে, কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এল লোকটা।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'এ মাসের শেষে তুমি রিটায়ার করবে?'

মাথা নেড়ে শিবালকর জানাল—হ্যাঁ।

'পুনা জেলায় শিরুরে তোমার কত একর জমি আছে?'

'তিন।'

'নিজেই কিনলে, না কেউ দিল?'

শিবালকর চোরের চাউনিতে, অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে মিস্টার কোরগাঁওকরের দিকে দেখল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছেন ভদ্রলোক।

শিবালকর জবাব দিচ্ছে না দেখে, সত্যই ধরিয়ে দিলেন। 'তোমার মালিক, মিস্টার, কোরগাঁওকর দিলেন?'

'হুঁ।' মুখ নামিয়ে মাথা কাঁপাতে লাগল শিবালকর।

'দিন দশেক আগে। তাই না? কিন্তু, হঠাৎ? কেন বলো তো?'

মালিক তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাঠেকে বলছেন, 'এসব কী হচ্ছে— জমিজমা নিয়ে! আপনারা খুনের কিনারা করতে এসেছেন, না, জমিজিরেত নিয়ে গপ্পো? এত বছর চাকরি করে লোকটা রিটায়ার করছে—একটা গিফট দিতে পারব না! কী আশ্চর্য!'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ছাড়াও তিন-চার লক্ষ টাকার উপহার? বাঃ! ভারী উদার প্রাণ তো!—বসুন, বসুন।'

বসলেন বটে, তবে, যথেষ্ট ছটফট করতে লাগলেন কোরগাঁওকর। সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'এসব খবর জোগাড় করলে কোত্থেকে, সাধনকর?'

'অ্যাড-মার্কেটের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার দীপন আমার পুরোনো বন্ধু—ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম পুনায়— বললুম না?'

সত্য শিবালকরের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তোমার মালিকের ভাইয়ের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং ডিলিং কোম্পানি খাপোলিতে। তুমিই সব ওষুধপত্তর এনে দাও ওঁকে?'

'জি।' ভাঙা গলায় ফুঁপিয়ে উঠল শিবালকর।

'এবার। একটা ছোট্ট গল্প শোনাব—মন দিয়ে শুনুন সবাই।—'

কোরগাঁওকর আবার উঠেছেন। দরজার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'অসম্ভব! রিডিকিউলাস! এখন বসে-বসে টিকটিকির গপ্পো শোনো—আই অ্যাম সরি—আমার অনেক কাজ—'

BanglaBook.org

সত্যসাধন সাঠেকে ইশারা করতেই বাজখাঁই গলায় সাঠে ডাকলেন, 'মিস্টার কোরগাঁওকর! আপনি যদি না বসেন, তো আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হবো।—'

পুলিশের মুখে 'গ্রেপ্তার' শব্দটি সবসময় কাজে দেয়।

মালিক বসে পড়তেই সত্য শুরু করলেন, 'সুবিশাল মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির মালিকের একমাত্র কন্যার সঙ্গে এক অত্যন্ত সাধারণ কর্মচারীর অনুরাগ চলছে। খবর পেয়ে, মালিকের দুশ্চিন্তা। দু-একবার আকারে-ইঙ্গিতে মেয়েকে বোঝালেন। আদুরে কন্যা বিশেষ গায়ে মাখল না। বেশি বললে আবার একগুঁয়ে মেয়ে যদি আরও বেঁকে যায় ওদিকে?—সেই ভেবে, অন্য পন্থা ধরলেন মালিক। কর্মচারীটিকে সরিয়ে দাও। নইলে, সে তো রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের অধিপতি হয়ে বসবে। কিন্তু, নিজে এ-কাজ করা যায় না। ভাড়াটে গুন্ডা-ফুন্ডাও নিরাপদ নয়। কেমিক্যাল ডিলার কাম অ্যাডমার্কেটের অংশীদার ভ্রাতার সঙ্গে পরমার্শ করে ঠিক করলেন—পুরাতন ভৃত্যই সবচেয়ে সেফ। ভাইয়ের কাছ থেকে সামান্য কেমিক্যাল বিষ ধরিয়ে দিলেন ভৃত্যকে। আর দিলেন তোওফা হিসেবে—সুবিশাল জমি। কাজ হলে, তাকে বাড়ি করে দেওয়ার লোভও দেখালেন। জয়দীপের ঘরে অনেকেরই আসা-যাওয়া। মোটামুটি, ফাঁক বুঝে চিনির কৌটোয় সায়নায়েড ফেলে নেড়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না বিশ্বস্ত ভৃত্যের। মারা পড়লেন বেচারা জোশী।—'

উশখুশ করছিলেন কোরগাঁওকর। মরিয়া গলায় প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'প্রমাণ? প্রমাণ কী? এসবের মানেটাই বা কী?'

সত্যসাধন শান্ত গলায় ডাকলেন, 'মাদল।'

মাদল কাছে যেতে বললেন, 'যন্ত্রটা দাও এবার।'

পকেট থেকে কালো-কুচকুচে টেপ-রেকর্ডারটি বের করে দিল মাদল। একটা সরু তারও ঝুলছে ওটার সঙ্গে।

সত্য বললেন, 'আমি জানি, ভুল লোকের মৃত্যুতে খুবই আফশোস হয়েছে কর্তার। ভুল না শোধরালে তো চলবে না। এদিকে, শকুন্তলা ম্যাডাম হঠাৎ বাবার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। আফটার অল সি ইজ প্র্যাকটিকাল অ্যান্ড কেরিয়ারিস্ট। খুনের দায়ে জয়দীপ যখন নাকাল, তখনই, মনে-মনে ম্যাডাম উক্ত কর্মচারীকে নাকচ করেছেন। কারণ, প্রেম করতে হলে অন্য কোনও বিশাল কোম্পানির মালিক বা তার ছেলেই সবচেয়ে উপযোগী। খাপোলি থেকে আবার যে সায়নাইড বা অন্য কোনও বিষাক্ত কেমিক্যাল ভৃত্যটির হাতে পৌঁছেছে গেল হপ্তায়—সেটুকু আমার আন্দাজ। তাতে ভর দিয়েই সামান্য নাটকের আশ্রয় নিলাম। আজ সকালে মাদল এসে জোশীর ঘরের টেলিফোনের সঙ্গে এই 'সোনি' টেপ-রেকর্ডারটি লাগিয়ে দিল। একটা মজা হল, এই সরু তারটির অন্য প্রান্ত দু-ভাগে ভাগ করে, একটা দিক টেলিফোনের যন্ত্র ও প্লাগ-পয়েন্টের মধ্যেকার তারে জুড়ে দিল, যখনই কোনও কথা হবে—দু-তরফের বাক্যালাপ পরিষ্কার শোনা যাবে।'

শিবালকর ততক্ষণে মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে পড়েছে। ঝুলে পড়েছে মাথা। কালকে রুদ্রাক্ষকে জ্যান্ত ধরতে পারেননি—সেই আফশোস সাঠের মনে কাজ করেছে বোধহয়। চেয়ার থেকে উঠে, তিনি এখন কোরগাঁওকরের পিছন দিকটায় পায়চারি করছেন ধীর পায়ে।

সত্য বললেন, 'আপিস থেকে আজ জয়দীপ রায়ের মৃত্যুর খবরের পর কে-কে টেলিফোন করেছেন—হাত তুলুন।'

জুলি, মাদল ও চওধরি হাত তুলল। সত্য দেখে বললেন, 'আরও-একজন করেছে। এবং সে যে জোশীর ঘর থেকেই করবে—এটাও আশা করেছিলাম কারণ, রিসেপশান বোর্ডে ভিড় থাকবে। অন্য ডাইরেক্ট ফোন জয়দীপের ঘরে। সম্ভব নয়। শিবালকরের বস, মৃত জোশীর ক্যাবিন থেকেই তার পক্ষে সেই সময় গোপনে ফোনটা করা স্বাভাবিক।'

যন্ত্রটা চালু হল। মারাঠি ভাষায়, দুটি পুরুষ কণ্ঠ চমকে দিল নিস্তব্ধ ঘরের সবাইকে। কোরগাঁওকর ও শিবালকরের গলা শোনা গেল পরিষ্কার। প্রথমে মিস্টার কোরগাঁওকর।

BanglaBook.org

'হ্যালো?'

'সাব। আমি শিবালকর।'

'হ্যাঁ বলো?'

'সাব, জয়দীপরায়-সাব খুন হয়েছে।'

'কী বলছিস তুই!' চাপা গলা মালিকের, 'বারণ করেছিলাম না—এ-সপ্তাহটা কিছু করবি না। ওফ,—'.

'কিন্তু, সাব অমি কিছু করিনি—আমি শপথ—মায়ের দিব্যি—ওষুধ আমি মেশাইনি সাব—'

'উল্লুক—হারামজাদা। কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমি আসছি।—'

ঝপাং করে লাইনটা কাটার আওয়াজ।

চওধরি ও সাঠে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে কি? তাহলে, রায়কে খুন করল কে?'

সত্যসাধন হাসলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'জয়দীপ মোটেই খুন হয়নি বললাম না, নাটক করতে হল একটু! যথেষ্ট রিস্কি, একটা চান্স নিয়েই ফেললাম। জয়দীপকে বহু কষ্টে রাজি করিয়েছি।—সাঠে ভায়া, আমার কাজ শেষ। তুমি যা করবার করো। এই সব রাখো তোমার কাছে—' বলে, টেপ-রেকর্ডারটা সাঠেকে দিলেন। পকেট থেকে শকুন্তলার চিঠিচাপাটি। জয়দীপকে লেখা প্রেমপত্র।

মাদলকে বললেন, 'চলো হে! তোমার জয়দীপদাকে নিয়ে নিবেদিতার বাড়ি যেতে হবে।' বলতে-বলতে সেপাইরা জয়দীপকে ধরে আনল। সাঠেকে বলল, 'এ-আদমি ঘরের মধ্যেই ছিল। লাশ ভাগ গিয়া সাব।—'

কনফারেন্স রুমে উপস্থিত সবাই ভূত-দেখার মতো চমকে উঠেছে, মাদল এবং সত্যসাধন ছাড়া। সমবেত, চাপা, ভিন্ন-ভিন্ন আওয়াজ অনেকটা গোঙানির মতো। তারপর মৃদু গুঞ্জন।

সাঠে ঝপ করে সত্যর হাত ধরলেন। অপ্রস্তুত গলায় প্রায় ধমক দিলেন আস্তে করে, 'পুলিশকে চিট করে —ভাঁওতা দেওয়ার জন্য তোমাকেও গ্রেপ্তার করতাম সাধনকর—ইয়ে—মানে—আজকের কাগজে ওই ছবিটার জন্যে—যাও—মাফ—! আই মিন, আই ফরগিভ ইউ, অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ—' বলে, ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটালেন। চাপ দিলেন সত্যর হাতে।

দুলকি চালে ঝমর চলছে ঝমঝমিয়ে। সত্যসাধন ও মাদল সামনে। পিছনে জয়দীপ। অফিস থেকে বেরিয়ে, ঝমরে ঢুকে পিছনের সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে সে। হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলেছে, 'উফ! হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে, সত্যবাবু! ঘাড়ে এমন ব্যথা—স্পন্ডিলাইটিস না হয়!'

মাদল জিগ্যেস করেছে, 'আড়াইটে নাগাদ ক্যাবিনে ঢুকেছেন আপনি। আমি খেয়াল রেখেছি। সেই থেকেই কি লাশ সেজে বসে ছিলেন?'

'না। জুলিকে ডেকে, একটা ফালতু লম্বা চিঠি ডিকটেট করেছি—যাতে ওর টাইপ করতে সময় লাগে। তারপর, দু-কাপ চা বানিয়ে, একই কাপে প্রথমে তৃপ্তি ভরে খেয়েছি। তারপর, দ্বিতীয় কাপ ভরে নিয়ে পোজিশান নিয়ে এবং পোজ দিয়ে হুমড়ি খেয়েছি টেবিলে—'

মাদল একেবারে পরান খুলে হো-হো করে হাসতে লাগল। সত্যর মুখেও হাসি। বললেন, 'সারক্ষণই কি স্ট্যাচু হয়ে ছিলেন?'

'অলমোস্ট। শুধু, সেপাই মোতায়েন হওয়ার পর একবার উঠে জল খেয়ে এসেছি—'

মাদল চমকে উঠল, যেন, এখনও অবস্থা একই রয়েছে, 'কী সর্বনাশ! যদি ধরা পড়ে যেতেন? যদি কোনও শব্দ হত?'

সত্য বললেন, 'আহ্-হা! এখন আর অত ঘাবড়াচ্ছ কেন হে! ধরা তো উনি পড়েননি!'

BanglaBook.org

জুড়ে দিল জয়দীপ, 'পড়েছে দুই "কর"। মনিব ও পুরাতন ভৃত্য।'

অফিস-ছুটির ভিড় আরম্ভ হব-হব রাস্তায়। পেডার রোডে যানজটের উপক্রমণিকা শুরু হয়ে গেছে। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে ঝমর। সত্য জিগ্যেস করলেন, 'ওরা ঠিক আছে? আপনার ভাই-বোন? ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

জয়দীপ বলল, 'গ্লুকোজ ইঞ্জেকশানেও পুরো ফ্লাশ হয়নি ঘুমের ওষুধ। পরপর ক'দিন—দু-বেলা—। ডাক্তার বলল, কালকেই পুরো সজাগ হয়ে উঠবে ওরা।'

'ইশ। এমন গুণী বদমায়েশকে ধরতে পারলুম না।'

সত্যকাকু আপনমনে বললেও মাদল বুঝল, রুদ্রাক্ষের জন্যে আফশোস হচ্ছে। ও জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা কাকু! আপনার পকেট রেকর্ডার শুনে মনে হল, আপনি সবার কাছ থেকেই সিগারেট চেয়েছেন? কেন?'

সবুজ সিগন্যাল পেয়ে ঝমর চলল। সত্য বললেন, 'যেখানে পাইবে ছাই—উড়াইয়া দ্যাখো তাই। পাইলে পাইতে পারো—।'

মাদল-জয়দীপও যোগ দিয়ে বলল ওঁর সঙ্গে, 'অমূল্য রতন!' এবং মাদল খেই ধরাল, 'পেলেন?'

'না। সিগারেটের রাংতার টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম জয়দীপের ক্যাবিনে। সেটা ওরই। কারণ, স্রেফ ওরই আঙুলের ছাপ রয়েছে তাতে।'

ডানদিকের গলিতে ঢুকে, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝমর। মাদল জিগ্যেস করল, 'আর চিনির কৌটোয়? আঙুলের ছাপ?'

'একমাত্র দত্তারামের পাওয়া গেছে।'

'সে কী? তাহলে?'

ঝমর থেকে নামতে-নামতে সত্য বললেন, 'হয় নির্দেশ ছিল মনিবের, নয়, শিবালকর মহা-চালাক। খুব সম্ভবত, রুমালে হাত জড়িয়ে ঢাকনায় চাপ দিয়ে, এক হাতেই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খুলে ফেলেছে কৌটো।'

'কিন্তু কখন? জুলি বা দত্তারাম তো সারাক্ষণই ওখানে বসে থাকে?'

'দত্তা গাঁজা খেতে পালিয়েছিল। জুলিও গিয়েছিল টয়লেটে। সুযোগ সন্ধানী শিবালকর ফাঁক পেয়ে গেছে। অথচ, ভুলেই হয়তো, আমাকে বলে ফেলেছিল—"চিনি" খেতে ঢুকেছিল একবার—ক্যাবিনে!'

কলিং বেল টিপতেই হাসিমুখে দরজা খুলে দিল নিবেদিতা। জিগ্যেস করল, 'ঝামেলা সব মিটল?'

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'উঁহু এখনও একটা বাকি।'

নিবেদিতার ভুরু সামান্য কোঁচকাল। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ উদ্বেগ, 'সে কী? খুনি ধরা পড়েনি?'

চোখ নাচিয়ে সত্যর জবাব, 'তা পড়েছে। দু-দুটো। কিন্তু, একটা কনে এখনও ধরা পড়েনি। বলি, বিয়েটা হবে তো?'

নিবেদিতার মুখটি স্বাভাবিক হল। জয়দীপের দিকে পলক ফেলে লজ্জার ছোঁয়ায় সুন্দর হল আরও। মাথা নীচু করে বলল, 'আসল পুরুত চাই কিন্তু।'

BanglaBook.org

শেষে দিল রা

মনোজ সেন

॥ ১ ॥

রোববারের বিকেল। দময়ন্তী ঘটর-ঘটর করে কল চালিয়ে সেলাই করছে দেখে সমরেশ একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ার তালে ছিল। সবে আলমারি থেকে কিছু টাকা বের করে পকেটে ঢুকিয়েছে, দময়ন্তী পিছন থেকে খপ্ করে ধরে ফেলল।

'কোথায় চলেছ শুনি?' দময়ন্তী ভ্রূকুটি করে জিগ্যেস করল।

'এই না, মানে, একটু বেরোচ্ছিলুম আর কি।' সমরেশ আমতা-আমতা করে বলল।

'বেরোচ্ছিলে তো বুঝেছি। যাচ্ছটা কোথায়?'

'এই এদিক-ওদিক। মানে ভাবছিলুম একটু রথীনের বাড়ি থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়।'

'খুব ভালো হয়। রথীনের বাড়ি জমাট আড্ডা বসে, সেখানে একবার গেলে উঠবে তো সেই রাত ন'টায়। ততক্ষণ আমি ঘরে বসে-বসে পচি আর যাই করি, তোমার তাতে কী যায় আসে? যেন আমার কোনও আনন্দ নেই, ফূর্তি নেই। কলেজ আর রান্নাঘর, রান্নাঘর আর কলেজ।'

'আহা, এই তো সেদিন নৈহাটি থেকে ঘুরে এলুম।' সমরেশ বোঝাতে গিয়ে গিন্নির মুখ চিমনির কালি হেন দেখে তাড়াতাড়ি স্ট্র্যাটেজিটা পালটে ফেলল। 'অবিশ্যি তাতে কী হয়েছে? চলো না, দুজনেই যাই। কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমি ভেবেছিলুম তুমি কাজ করছ। তাই...।'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চিত্রঘরে "মনে পড়ে হায়" দেখাচ্ছে। শুনেছি খুব ভালো হয়েছে। চলো, দেখে আসি।'

সমরেশের চক্ষু চড়কগাছ। বলল, ' "মনে পড়ে হায়"? ওই স্যাঁতসেঁতে প্যানপেনে বাংলা বই তুমি আবার দেখবে? সেদিন একটা দেখে সাধ মেটেনি? ক্যাঁচক্যাঁচ করে কেঁদে যে কী সুখ পাও!'

দময়ন্তীর মুখে আবার ক্রীড়মান পরিণত গজের মতো মেঘ ঘনীভূত হয়ে এল। বলল, 'আমাদের যে কীসে সুখ তা কি তোমরা কোনওদিন বোঝবার চেষ্টা করেছ?'

খুব বিপদে পড়লে সমরেশের দিব্যচক্ষু মাঝে-মাঝে খুলে যায়। হঠাৎ তার প্রভাবে উল্লসিত হয়ে বলল, 'তার চেয়ে চলো শ্রীরূপাদের বাড়ি যাই। অনেকদিন যাইনি।'

দময়ন্তীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই ভালো।'

॥ ২ ॥

শ্রীরূপা দময়ন্তীর অনেকদিনের বন্ধু। স্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছে। কলেজেও একসঙ্গে ঢুকেছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার আগেই শ্রীরূপার বিয়ে হয়ে গিয়ে রোজকার দেখাশুনোয় ছেদ পড়ে। তবে তাতে অন্তরঙ্গতার কোনও অভাব ঘটেনি। শ্রীরূপার স্বামী বিশ্বরূপ মৈত্র ইকনমিক্সের মতো নীরস বিষয়ের অধ্যাপক হয়েও অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আড্ডাবাজ, জমাটি চরিত্র। তিনি অন্যরকম হলে হয়তো সম্পর্কেও ছেদ পড়ত, কিন্তু তার বদলে অন্তরঙ্গতা আরও ঘনীভূতই হয়েছে। সমরেশ তো মিস্টার মৈত্র বলতে অজ্ঞান, যদিও বয়েসে দুজনের তফাত অনেক। বিশ্বরূপ সমরেশের চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়। অবশ্য তাতে দুজনের প্রচণ্ড আড্ডা মারার কোনও অসুবিধে হয় না। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য অগাধ, ওঁর সঙ্গে একসন্ধে কাটিয়ে এলে সমরেশ নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করে। ওঁর বসবার ঘরে সমরেশের অবারিত দ্বার, চারজন একত্র হলে গানে, গল্পে, খাওয়া-দাওয়ায় সময়টা নিমেষে কেটে যায়।

শ্রীরূপারা যদি কাছাকাছি থাকত তাহলে বোধহয় রোজই আড্ডা বসত, কিন্তু দুঃখের বিষয়,

BanglaBook.org

জগতে ভালো-ভালো জিনিসগুলো সাধারণত খুব সহজলভ্য হয় না। রাধাকান্ত মৈত্র লেনে ওদের বাড়িটা উত্তর কলকাতার একপ্রান্তে। এই দূরত্বটাই অসুবিধেজনক। যদিও একটা বাসেই অর্কিড রোড থেকে ওখানে যাওয়া চলে, আর যদি দোতলায় বসবার জায়গা পাওয়া যায় তাহলে তো যাত্রাটা প্রায় আনন্দজনকই হয়। তাহলেও অতদূর যেতে হবে ভাবতেই সমরেশের গায়ে জ্বর আসে। নিতান্ত বেকার না হলে ওদিকে যাওয়ার কথা আর মনে আসে না।

আপার সার্কুলার রোডে রাধাকান্ত লাইব্রেরির স্টপে বাস থেকে নামতে হয়। লাইব্রেরির পাশ দিয়ে কংগ্রেস রোড দিয়ে একটু এগিয়ে রাধাকান্ত মৈত্র লেন। গলিটা ব্লাইন্ড। একদিকে পুরোটা জুড়ে রাধাকান্ত লাইব্রেরির প্রকাণ্ড চারতলা লাল রঙের বাড়ি আর অন্যদিকে প্রায় দশ বিঘে জমির ওপর শ্রীরূপাদের মান্ধাতার আমলের বাড়ি। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বাড়ি নেই রাস্তাটায়।

রাস্তার মাঝামাঝি লোহার কারুকার্য করা ফটক, দু-পাশে প্রায় দেড় হাত ব্যাসের লতাপাতা, কাটা স্তম্ভ, তার ওপরে সিংহের গম্ভীর মূর্তি দম্ভভরে বসে আছে। তারপর প্রায় পঁচিশ গজ লনের পর বাড়ি।

বাড়িটা একটু অদ্ভুত। বহুদিনের পুরোনো বাড়ি, যদিও বেশ সযত্নেই রক্ষিত। বাড়িটা যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি পয়সাওলা লোক ছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও কম অর্থশালী ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িটা অসম্ভব রকমের চাঁছাছোলা, সাদামাটা, কোনওরকম অলঙ্কারবর্জিত। চারদিকে স্রেফ চুনকাম করা নিরেট খাড়া দেওয়াল, একমাত্র জানলাগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনও ফাঁক-ফোকর বা উঁচু-নীচু টক্কর বলে কিচ্ছু নেই। একতলার জানলাগুলো বড়-বড়, প্রায় মেঝে পর্যন্ত, দোতলার জানলাগুলো আবার ছোট-ছোট। সেগুলোতে যদি রঙিন পরদা না ঝুলত, তাহলে বোধহয় সেগুলোকে অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের কোটরের মতো দেখাত। প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, সে-যুগে যেমন হত। যদিও দোতলা, দেখায় তিনতলার মতো।

একতলায় একটা ফুট পাঁচেক চওড়া দরজা আছে—সেটাই প্রধান প্রবেশ পথ।

সমরেশ আর দময়ন্তী গেটের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল, শ্রীরূপা লনে একটা বেতের চেয়ার পেতে বসে আছে আর ওর কাছে তিন বছরের ছেলে শান্তরূপ ওরফে শান্ত খেলা করছে। শান্তই ওদের প্রথম দেখতে পায়। রবারের বলটা মার কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'মা, দেখো কে এসেছে।'

অন্যান্য বারের মতোই এবারও শ্রীরূপার সহর্ষ অভ্যর্থনা আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম। সমরেশদের দেখেই শ্রীরূপা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে শান্তকে কোলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

॥ ৩ ॥

গেটটা খুলে সমরেশ আর দময়ন্তী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা ওদের এই প্রথম এবং অকল্পনীয়পূর্ব। শ্রীরূপা দময়ন্তীকে দেখে খুশি হয়ে উঠবে না, এটা স্বপ্নে ভাবা যায় না। ওকে যতদূর জানা আছে, তাতে এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, শ্রীরূপার মনটা স্বচ্ছ এবং নির্মল। কেউ অপমান করলেও ও মুখ কালো করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। কারোর ওপর রাগ করলে, গজগজ করতে-করতে তাকে একটা ভয়ানক কড়া চিঠি লিখতে বসে, পাঁচ মিনিটে দশটা কাগজ ছেঁড়া হয়ে যায়, তারপরে রাগটা পড়ে যায়।

সমরেশ কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপারটা কী হল?'

দময়ন্তী বলল, 'কী জানি। হয়তো কেউ ভেতরে ডেকেছে, এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে।'

BanglaBook.org

কিন্তু পঁচিশ গজ লন পেরোতে-পেরোতেও কেউ বেরিয়ে এল না। অবাক বিস্ময়ে দুজনে নিঃশব্দে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

বাড়িটার ওপর-নীচে চারটে করে মোট আটখানা ঘর, মাঝখানে সিঁড়ি। একতলায় একজন ভাড়াটে আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র পাল। দোতলায় তিনটে ঘর নিয়ে ডক্টর মৈত্র থাকেন, একটা ঘর তালাবন্ধ থাকে।

সিঁড়িটা খুব চওড়া, শ্বেতপাথরে বাঁধানো, দোতলায় উঠে শেষ হয়ে গেছে। সেখানে চওড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো চত্বর। বাঁ-দিকে বসবার ঘর, ডানদিকে অন্দর।

দুজনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে চত্বরে দাঁড়াল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্তর গলা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত সমরেশ বাজখাঁই গলায় হাঁক মারল, 'মিস্টার মৈত্র বাড়ি আছেন নাকি?'

কোনও সাড়া নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডানদিকের দরজার পরদা সরিয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ষোলো-সতেরো বছরের, বোধহয় বাড়ির ঝি হবে। সে বাঁ-দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'বাবু বাড়ি নেই। আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসবেন।'

সমরেশের হঠাৎ মনে হল, নীচে যাকে দেখে শ্রীরূপা বলে মনে হয়েছিল সে হয়তো শ্রীরূপা নয়, অন্য কেউ। হয়তো শ্রীরূপার কোনও বোন হবে। তাইতে ওর মনটা খুশি হয়ে উঠল। বসবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে জিগ্যেস করল, 'মা বাড়ি নেই?'

'আছেন।'

'তাহলে ওঁকে একটু ডেকে দাও, বলো সমরেশবাবু এসেছেন।'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে অদৃশ্য হলে সমরেশ দময়ন্তীকে বলল, 'তুমি এখানে বসছ কেন? ভেতরে যাও। নীচে যাকে দেখলুম, সে বোধহয় শ্রীরূপা নয়, শ্রীরূপার বোন-টোন হবে।'

মাথা নেড়ে দময়ন্তী বলল, 'নাঃ, এখানেই বসি। আর নীচে যাকে দেখেছি, সে শ্রীরূপাই, অন্য কেউ নয়। তা ছাড়া, শুনলে না, শান্ত ওকে মা বলে ডাকল?'

সমরেশ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'হুঁ, তা বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি জানো কিছু?'

চিন্তিত মুখে দময়ন্তী বলল, 'নাঃ, কিচ্ছু না।'

॥ ৪ ॥

প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল, অন্দর থেকে কেউ এল না। সমরেশের বিস্ময় ততক্ষণে ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। বলল, 'দুত্তেরি ছাই! কী হয়েছে, আমি জানতে চাই না। চলো, চলে যাই।'

দময়ন্তী স্থির হয়ে বসে কি চিন্তা করছিল। চটকা ভেঙে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চলো।'

দুজনে উঠতে যাবে, এমন সময় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু বাদেই পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন গৃহকর্তা। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, অত্যন্ত ফরসা আর মাথাজোড়া প্রকাণ্ড টাক। চওড়া ফ্রেমের চশমার পিছনে একজোড়া উজ্জ্বল চোখ আর মোটা-গোঁফের নীচে দৃঢ় সংবদ্ধ অথচ সংবেদনশীল ঠোঁট। ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে শিক্ষা আর আভিজাত্যের ছাপ।

ঘরে ঢুকে অতিথিদের দেখে বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'আরে! তোমরা কতক্ষণ।'

সমরেশ নীরস গলায় বলল, 'এই মিনিট পনেরো হবে।'

'শ্রী কোথায়?'

দুজনে চুপ করে আছে দেখে বিশ্বরূপ আবার জিগ্যেস করলেন, 'আসেনি?'

দুজনে তখনও চুপ।

BanglaBook.org

বিশ্বরূপ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মায়া! মায়া!'

পূর্বদৃষ্ট মেয়েটি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল। বিশ্বরূপ তাকে বললেন, 'মাকে একবার ডেকে দাও। বলো, আমি ডাকছি।'

মায়া অদৃশ্য হলে, বিশ্বরূপ বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে একটা সোফায় বসলেন। বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে।'

শান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, 'বুঝেছি। কী ব্যাপার?'

'বলছি। শ্রী আসুক।'

একটু বাদেই শ্রীরূপা ঘরে এসে ঢুকল। আঁচলে মুখের আধখানা ঢাকা, চোখ দুটো লাল, স্পষ্টতই জোর করে চোখে.. জল মোছার ফল।

বিশ্বরূপ ক্ষুব্ধ অভিযোগের স্বরে বললেন, 'এরা আমাদের বাড়ি এসেছে, আর তুমি এদের একলা বসিয়ে রেখেছ? একবার এলে না পর্যন্ত?'

চাপা গলায় শ্রীরূপা বলল, 'আমি কেন আসব? আমার কাছে তো ওরা আসেনি! তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, তুমি কথা বলো।' বলে দাঁড়িয়েই রইল, বসল না।

সমরেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করো, শ্রী, আমি ওদের ডেকে পাঠাইনি। তুমি তো জানো, আমি প্রতিশ্রুতি ভাঙি না।'

আঁচলের তলা থেকে বন্দুকের গুলি ছুটে এল, 'জানি। আর এ-ও জানি, লোভ মানুষকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়, অমানুষ করে তোলে পর্যন্ত। লোভী মানুষ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।' বলতে-বলতে শ্রীরূপার গলা কান্নায় ভারী হয়ে এল। কোনওক্রমে উদ্গত অশ্রু চেপে বলল, 'আমি যাই, শান্তকে খাওয়াতে হবে।'

॥ ৫ ॥

শ্রীরূপা চলে যেতে স্তম্ভিত সমরেশ আত্মসম্বরণ করতে পারল না। বলল, 'এ যে অবিশ্বাস্য, মিস্টার মৈত্র! কী ব্যাপার?'

মৈত্র বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে ছিলেন। আত্মগত ভাবে বললেন, 'শ্রী হয়তো ঠিকই বলেছে। লোভ মানুষকে পালটে দেয়, হয়তো আমাকেও দিয়েছে। কতখানি আমি জানি না। কিন্তু অন্ধ কুসংস্কার যে একজনকে কতদূর পালটে দিতে পারে, আজ সেইটে দেখলে, সমরেশ। শ্রীকে প্রায় চেনা গেল না, তাই নয়?

সমরেশ বলল, 'তাই বটে। কিন্তু কুসংস্কারটা কী? আর তার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়লুম কী করে?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'বলছি। আসলে আমি একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। সেটা বললেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

দময়ন্তী বলল, 'কিন্তু শ্রীর কথায় বোঝা গেল, এ-সমস্যার সমাধান হয়, সেটা ওর ইচ্ছে নয়। এ-অবস্থায় আমাদের সেটা শোনা কি উচিত হবে?

'সেটা তুমি বিবেচনা করে দেখো। এ-কথা সত্যি যে, আমি আমার সমস্যাটার সমাধান করার উদ্দেশ্যে তোমার সাহায্য নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলুম এবং আজকের এই অশান্তির কারণটা তাই। শ্রীর বিশ্বাস, তোমাকে সমস্যাটা বললেই তুমি তার সমাধান বের করে ফেলবে। এতে করে, তোমার বন্ধুর তোমার পরিজ্ঞানের ওপর অগাধ বিশ্বাস প্রমাণিত হয় ঠিকই, কিন্তু অশান্তিটা আটকায় না। যা হোক, সমস্যাটা আমার, সংস্কারটা তোমার বন্ধুর। এখন, আমিও নিজেকে তোমার বন্ধু বলেই

BanglaBook.org

মনে করি। এ-অবস্থায়, তোমার বেশিদিনের বন্ধুর কুসংস্কারের মর্যাদা রাখতে অল্পদিনের বন্ধুকে সাহায্য করবে কিনা, সেটা বিচার করে দেখো।'

দময়ন্তী কোনও জবাব দেওয়ার আগেই সমরেশ জিগ্যেস করল, 'কিন্তু সমস্যাটার আগে কুসংস্কারটা কী, সেটা শুনলে হত না? আপনাদের এই মান্ধাতার আমলের বাড়িটার আনাচে-কানাচে কত যে অদ্ভুত সব সংস্কার লুকিয়ে আছে, তার তো হিসেব নেই। তাঁদের কোনটি এসে শ্রীমতী শ্রীরূপার ঘাড়ে চেপেছেন, সেটা আগে জানতে পারলে সুবিধে হত।'

'কেন, কী সুবিধে হত?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'হয়তো জুতোর সুকতলা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া নাকে দিতে পারলে আপনিই ওসব ছেড়ে যেত। তখন নিশ্চিন্তে সমস্যার সমাধান হত।'

বিশ্বরূপ ম্লান হাসলেন। বললেন, 'না হে, জুতোর শুকনো সুকতলার কম্ম নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তবে যদি কোনও কাজ হয়। এখন, দময়ন্তী, তোমার রায় কী?'

দময়ন্তী চিন্তিত ভাবে বলল, 'আপনি যদি সমস্যাটা আমাকে বলেন, তাহলেও কি কোনও সাংসারিক অশান্তির সম্ভাবনা আছে?'

ইতিমধ্যে কখন যেন শ্রীরূপা আবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর কণ্ঠস্বরে সবাই চমকে উঠল, 'না, বরং ওকে বলতে না দিলেই অশান্তির শেষ নেই। তোকে না শোনানো পর্যন্ত ওর মনে শান্তি নেই। যাই হোক, আমি তো আর এ-বাড়িতে থাকছিই না। শান্তকে নিয়ে দাদার কাছে চলে যাব। লাথি-ঝাঁটা খেয়েও শান্তকে বড় করে তুলতে পারব, আশা করি। কাজেই সাংসারিক অশান্তি আর কী হবে? তুই ওকে বলতে দে।'

দময়ন্তী উদ্বিগ্ন চোখে বিশ্বরূপের দিকে তাকাল। বলল, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? শ্রীকে দুঃখ দিয়েও আপনার সমস্যার সমাধান দরকার—এ তো চিন্তা করা যায় না, মিস্টার মৈত্র।'

নিষ্পলক অসহায় চোখে শ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন বিশ্বরূপ, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন আর্ত চোখে চেয়ে থাকে তীরের দিকে। দময়ন্তীর কথায় কিছুটা আশ্বস্থ হলেন। বললেন, 'শ্রীকে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, দময়ন্তী। আমি যে-কথাটা ওকে বোঝাতে পারছি না, তা হল, ওর দুঃখ লাঘব করাই আমার উদ্দেশ্য।'

শ্রীরূপা বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনও কথা বলবার আগেই কেঁদে ফেলল। ওর মুখের দিকে একপলক চেয়ে দময়ন্তী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'কাঁদিসনি, শ্রী। মিস্টার মৈত্রের সমস্যাটা কী শোনাই যাক, ওঁর মনের ভারও হালকা হোক। হয়তো তার সমাধান আমি করতেই পারব না। যদি পারিও তাহলেও তা প্রকাশ করব না, যদি বুঝতে পারি যে তাতে তোদের একজনেরও অমঙ্গল হবে। আমার ওপর এ-আস্থা রাখতে পারিস।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিশ্বরূপ বললেন, 'সাবাস দময়ন্তী, বাঁচালে। এবারে আমার প্রবলেমটা শোনো।'

'গোড়াতেই বলে রাখি, বিষয়টা একটু বিশদভাবে বলা দরকার। তা না হলে তোমার বন্ধুর এত অশ্রুর কারণটা তোমার ভালো করে বোধগম্য হবে না। এর জন্য আমাদের পরিবারের ইতিহাসটা তোমাকে একটু শুনতে হবে।'

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

'তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বরেন্দ্রী থেকে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এসে কৃষ্ণনগরে বসতি স্থাপন করেন। আমার

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বগলাচরণের বাবা ছিলেন এইরকম একটি পরিবারের কর্তা। সোজা বাংলায় উনি হচ্ছেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা।'

বিস্ফারিত চোখে সমরেশ বলল, 'ওরে বাবা! এ যে পলাশীর যুদ্ধের আমলের কথা।'

'ঠিক তাই। পলাশী যুদ্ধের আমলেরই কথা। যা হোক, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বগলাচরণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত এবং ডানপিটে। ১৭৯০ সালে তাঁর জন্ম আর ১৮০০ সালের গোড়ার কয়েকটা বছর কাটতে-না-কাটতেই ভদ্রলোক ত্যাজ্যপুত্র।

'কলকাতা তখন সদ্যোজাত। বগলাচরণের মতো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেদের তীর্থস্থান। কাজেই গত শতকের গোড়ার দিকে একদিন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবা ঠুকঠুক করতে-করতে এই শহরে এসে উপস্থিত হলেন।

'এসে যে তিনি কী করেছিলেন, আল্লায় মালুম। কিন্তু ১৮২৫-এর মধ্যেই দেখছি তিনি কলকাতার একজন মহাপ্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, সকলের শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষার পাত্র। ১৮৩০ সালে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভোলানাথের জন্ম হয় এবং সে-বছরেই এই জমিটা কিনে বগলাচরণ তাঁর ভদ্রাসন পত্তন করেন। না-না, এ-বাড়িটা নয়। ওই যে রাধাকান্ত লাইব্রেরির বিশাল বাড়িটা দেখছ, ওটাই ছিল তাঁর বসতবাড়ি। ১৮৫০ সালে আটষট্টি বছর বয়েসে বগলাচরণ তাঁর দুই ছোট ছেলে কাশীনাথ আর রমানাথকে নিয়ে প্রয়াগে তীর্থ করতে যান, আর ফিরে আসেননি। শোনা যায়, সিপাহী বিদ্রোহের দলছুট একদল সিপাহী তাঁদের সকলকে খুন করে টাকাপয়সা সব হস্তগত করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁদের সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু কম ছিল না।

'ভোলানাথের তিরিশ বছর বয়েসে আমার ঠাকুরদার বাবা ত্রৈলোক্যের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে ভোলানাথ তাঁর টাকাপয়সা আরও বাড়িয়েছেন। তাঁর প্রখর ব্যাবসাবুদ্ধি ছিল, তার ওপর বিবেক বা বদনেশা কোনওটাই ছিল না। কাজেই একসময়ে তিনি যে কলকাতার একজন ধনীশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এবং এই সুখ্যাতির জন্যেই তাঁকে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় ডাকাতের হাতে। একদিন রাত্রে বাড়িতে ঢুকে তারা নৃশংস ভাবে সবাইকে হত্যা করে। অথচ পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, তারা টাকাপয়সা সম্ভবত কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। ত্রৈলোক্য মামাবাড়ি ছিলেন সে-রাত্রে, কাজেই প্রাণে বেঁচে যান।

'ত্রৈলোক্য মাত্র তিন বছর বয়সে পিতৃহারা হন। কিন্তু তিনি দারুণ ঐশ্বর্যের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠেন। বড় হয়ে ওঠার পর দেখা গেল যে, তিনি প্রতিভার ক্ষেত্রে তাঁর বাপের ওপরেও এককাঠি। যেখানে পয়সা, সেখানেই ত্রৈলোক্য। মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন ত্রৈলোক্যনারায়ণ, কিন্তু তার মধ্যেই অবিশ্বাস্য পরিমাণে পয়সা রোজগার করে গেছেন।

'ইতিমধ্যে আমাদের বংশে একটা কুসংস্কার চালু হয়ে গেছে যে, বগলাচরণের বাড়িটা অভিশপ্ত। সে-বাড়িতে যে-ই থাকে সে-ই অপঘাতে মারা যায়। এটা অবশ্য কেবল পুরুষদের প্রতিই প্রযোজ্য। মজা এই যে, এ-কথা কেউই বিচার করে দেখেনি যে, যখন ব্যাঙ্ক ছিল না তখন বড়লোকদের টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি বাড়িতেই মজুত রাখতে হত এবং সেই সঞ্চিত সম্পদের জন্য চোর-ডাকাতদের হাতে প্রাণ খোয়ানো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিচার আর কুসংস্কার তো একসঙ্গে চলতে পারে না।

'তবে এই কুসংস্কার ত্রৈলোক্যকেও অধিকার করে এবং তিনি তারই বশবর্তী হয়ে নিজে থাকার জন্যে এই বাড়িটা তৈরি করেন ১৮৮৫ সালে এবং তাঁর ঠাকুরদার বসতবাড়িটাকে পরিণত করেন কাছারিবাড়িতে। সে-সময় এ-দুটো বাড়িই ছিল একই জমির ভেতরে, রাধাকান্ত লেন তখন ছিলই না। একটা ঢাকা বারান্দা, যেমন মেডিক্যাল কলেজে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্যে করা আছে, যোগ করে রেখেছিল কাছারিবাড়ি আর অন্দরমহলকে।

'বগলাচরণের বাড়ি ছেড়ে দিয়েও কিন্তু ত্রৈলোক্যনারায়ণ অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা

BanglaBook.org

পেলেন না। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বরানগরের বাগানবাড়িতে ফুর্তি করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ডাকাতের হাতে সবান্ধব নিহত হন।'

দময়ন্তী এখানে বাধা না দিয়ে আর পারল না। বলে উঠল, 'কী ভয়ানক!'

'হ্যাঁ। ভয়ানকই বটে। এবং এটাই শেষ নয়।'

'ত্রৈলোক্যনারায়ণের মৃতদেহ যখন বাড়িতে এল, তখন স্বভাবতই বিরাট হুলুস্থুল পড়ে গেল। ত্রৈলোক্যের দুই স্ত্রী—জ্ঞানদাসুন্দরী আর শকুন্তলার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যদিও জানা যায় দুজনে অন্তরঙ্গ ছিলেন সতীন হওয়া সত্ত্বেও। জ্ঞানদাসুন্দরী ঘোষণা করলেন, অপঘাত মৃত্যুর যে সংস্কারটা বলে বগলাচরণের বাড়ির দোষ সেটা ঠিক নয়, দোষটা বগলাচরণের সম্পত্তির। অতএব, সকলের উচিত পত্রপাঠ সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেওয়া। শকুন্তলা কিন্তু এই সংস্কারের নতুন সংস্করণটাকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। টাকার মূল্য তিনি বুঝতেন, কাজেই সম্পত্তি দান করা ব্যাপারটা তাঁর কাছে মোটেই ভালো লাগল না। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মহিলা ছিলেন, সে-যুগে অমন ঋজু বলিষ্ঠ মনের মহিলা বড় দেখা যেত না। দুঃখের কথা, আমার ঠাকুরদার মা শকুন্তলা ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানদাসুন্দরী।'

শ্রীরূপা কান্নাভেজা গলায় বলল, 'সত্যিই দুঃখের কথা। শকুন্তলা তোমার পূর্বপুরুষ হলে তোমাকে আর জন্মাতে হত না আর আজকে এই সমস্যাও উঠত না।'

মৃদু হেসে বিশ্বরূপ বললেন, 'সে যাই হোক, ত্রৈলোক্যের শেষকৃত্যের পরেই জ্ঞানদাসুন্দরী একবস্ত্রে তাঁর দুই ছেলে রাধাকান্ত আর শঙ্করনাথকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। রাধাকান্তর বয়েস তখন পনেরো, শঙ্করনাথের দশ। আর শকুন্তলা তাঁর তিন ছেলে গঙ্গাধর, চন্দ্রধর আর জয়রামকে নিয়ে ত্রৈলোক্যের ব্যাবসা আর জমিদারি দেখাশুনো আরম্ভ করেন। সেসময় গঙ্গাধরের বয়েস ষোলো, চন্দ্রধরের চোদ্দো আর জয়রামের বারো। পঞ্চপাণ্ডবের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

'ছোটরানি দুই ছেলেকে নিয়ে ডেরা বাঁধলেন শ্যামবাজারে।'

'ত্রৈলোক্যের মৃত্যুর পর শকুন্তলা হাল ধরলেন বটে, কিন্তু ভালো ম্যানেজ করতে পারলেন না। পূর্ববঙ্গের বিশাল সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেল শয়তান কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে। কলকাতার ব্যাবসাপাতিও লাটে ওঠবার অবস্থা হল। গঙ্গাধরের বয়েস যখন কুড়ি তখন শকুন্তলা ভগ্নহৃদয়ে, অর্থাভাবের মধ্যেই মারা গেলেন।'

'গঙ্গাধর, বগলাচরণের বংশে যা কেউ কখনও করেনি, চাকরি নিলেন।'

সমরেশ প্রশ্ন করল, 'মাত্র চার বছরে অত বিশাল সম্পত্তি শেষ হয়ে গেল? সব টাকাই বুঝি ব্যাবসায় লগ্নি করা ছিল?'

'না, তা ছিল না? এবং ছিল না যে সেটা পরে বুঝতে পারবে।'

'যাই হোক। গঙ্গাধর মোটামুটি ভালোই চাকরি করতেন, বুদ্ধিমান লোক ছিলেন বলে বিলাসিতাও অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেননি। ভাইদের অন্তর্প্রাণ অতো ভালোবাসতেন, তাদের মানুষ করে তোলার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করে গেছেন। শান্ত, নির্বিরোধ ভালোমানুষ লোক ছিলেন, সেজন্যে অনেকে তাঁকে নানাভাবে ঠকিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে।

তাঁকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল তাঁর ছোট দুই ভাই। প্রথম-প্রথম তারা ভালোই ছিল, ভালো লেখাপড়া শিখেছিল, ভালো চাকরিতেও ঢুকেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাদের তানা গজাল, তারা উড়তে আরম্ভ করল।

'আর সে কী ওড়া! চৌরঙ্গী পাড়ায় বাড়ি কেনা হল, সেখানে দু-বেলা দীয়তাং, ভুজ্যতাং চলতে লাগল। নাচনা, গাওনা কত কী!'

'ওঁদের তখন কত বয়েস?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'চন্দ্রধর তখন চৌত্রিশ হবে, তাহলে জয়রাম বত্রিশ।'

BoiRboi.org

'অর্থাৎ, ত্রৈলোক্যনারায়ণ মারা যাওয়ার প্রায় বিশ বছর বাদে?'

'হ্যাঁ। স্পষ্টতই, তারা ত্রৈলোক্যনারায়ণের, শুধু ত্রৈলোক্যনারায়ণের কেন, তাদের বংশের সঞ্চিত ধনসম্পদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। সে-কথা সবাই বুঝতে পেরেছিল, বিশেষ করে গঙ্গাধর। কিন্তু তাঁর কিছু করবার ছিল না। কারণ, প্রথমত, সেই সম্পদ কোথায় আছে সেটা তাঁর জানা ছিল না, দ্বিতীয়ত, তাঁর ছোট দুই ভাই তাঁর কথা শোনবার পাত্র ছিল না। তারা প্রায়ই চৌরঙ্গীর বাড়িতে থাকত, মাঝে-মাঝে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করে যেত। দাদা তখন তাদের অনেক লেকচার দিতেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হত না। আমাদের বাড়ির পুরোনো রেকর্ডে দেখতে পাচ্ছি, দাদা অনবরত ছোট দুই ভাইকে তাদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নিবৃত্ত করার আশায় চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছেন, তাঁর ছোট-মা অর্থাৎ জ্ঞানদাসুন্দরীর রিজরেভারটার কথা অর্থাৎ বগলাচরণের সম্পত্তি যে অভিশপ্ত সে-কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হচ্ছে।

'বৈমাত্রেয় ভাই শঙ্করনাথকে লেখা একটা চিঠিতে দেখছি গঙ্গাধর লিখছেন,

> *"আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পিতৃদেব আমার বাল্যাবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। তিনি তাঁহার তোষাখানার সন্ধান আমাকে দিয়া যাইতে পারেন নাই। বালককে তাহা দিবার কথাও হয়তো তাঁহার কর্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। কিন্তু হায়, তাহা যদি দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এই অসহ্য মানসিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে হইত না। আমার পরমারাধ্যা ছোট মাতাঠাকুরণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার সেই সাবধান-বাণী আজিও আমার স্মৃতিপটে জ্যোতির্ময় শিখায় জ্বলজ্বল করিতেছে। কাজেই, পিতৃদেবের তোষাখানার সন্ধান যদি আমি পাইতাম, তাহা হইলে তাহাতে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতাম না। হয়তো সদাশয় গভর্নমেন্ট বাহাদুরের মধ্যস্থতায় তাহা গরিব দুঃখীর কল্যাণকর্মে বিতরিত করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে। তোমার অপর দুই ভ্রাতা আমার কোনও উপদেশেই কর্ণপাত করে না। তাহাদের জন্য আমার যে কী ভয়ানক দুশ্চিন্তা তাহা তোমাকে কী লিখিব। যতবার তাহাদের কথা ভাবি, আমার কল্পনায় নিহত পিতৃদেবের রক্তাপ্লুত বদনমণ্ডল জাগরূক হইয়া উঠে। আমি শিহরিয়া উঠি। কতবার যে গভীর নিশীথে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি, তাহা তোমাকে আর কী লিখিব।"*

'গঙ্গাধরের আশঙ্কা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খানিকটা সত্য বলে প্রমাণিত হল। রামবাগানের একটি কুখ্যাত বাড়িতে চন্দ্রধর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। সেই বাড়ি থেকে তার মৃতদেহ যখন পুলিশ এ-বাড়িতে নিয়ে আসে, তখন তার স্ত্রী ক্ষোভে লজ্জায় সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর একটি বছর দশেকের ছেলে ছিল, একমাত্র ছেলে। সে এই ঘটনার ভীষণতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। সে যুগে যক্ষ্মা রোগ হলে তার থেকে নিস্তার ছিল না।

'জয়রাম কিন্তু চন্দ্রধরের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখেও নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। তার অবশ্য অন্যতম কারণ ছিল যে, জয়রাম কিঞ্চিৎ জড়বুদ্ধি ছিল। সেজন্য গঙ্গাধর তার বিয়ে দেবেন না স্থির করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রধরের পাল্লায় পড়ে সে যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ল, তখন তাকে ঘরে বাঁধবার জন্যে তার বিয়ে দেন। তার ফল ভালো হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকত। শেষ পর্যন্ত জয়রাম আর বাড়িতে আসতই না, প্রায় পাকাপাকি ভাবেই চৌরঙ্গীতে থাকত। অবশেষে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে জয়রাম একদিন বাড়ি এলে একপ্রস্থ চূড়ান্ত ঝগড়া হয়, জয়রামের চিৎকার আর গালিগালাজ নাকি সার্কুলার রোড থেকেও শোনা যায়। তারপরেই

BanglaBook.org

জয়রাম বেপাত্তা। মনে হয়, ততদিনে সংসারে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার ওপর, সেদিন কলকাতায় একটা ভীষণ ভূমিকম্প হয়, হয়তো তাতে জয়রামের মানসলোকেও একটা তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল।

'গঙ্গাধর ছোট ভাইয়ের অনেক খোঁজ-খবর করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন। ভগ্নহৃদয়ে তাঁর বৈমাত্র ভাইদের অনেক কাকুতি মিনতি করে এ-বাড়িতে নিয়ে এলেন।'

'সেই দুই ভাই এতদিন কী করছিলেন?' সমরেশ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। জ্ঞানদাসুন্দরীর কথা এবার একটু বলা দরকার। আগেই বলেছি, জ্ঞানদাসুন্দরী শ্যামবাজারে গিয়ে বাসা নিয়েছিলেন। আসলে সেটা ছিল তাঁর দাদার বাড়ি। সে-ভদ্রলোক ছিলেন কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চু, মারাত্মক পণ্ডিত! তাঁর দুই ছেলে ছিল। তাঁরাও বাপের মতোই দিগগজ ছিলেন। তিনজনে মিলে চালাতেন টোল। আর কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চু আন্তরিক ভাবে বোনের শ্বশুরবাড়িকে ঘেন্না করতেন। এখন সেই বোন যখন ঐশ্বর্যের লোভ ত্যাগ করের দু-ছেলের হাত ধরে আশ্রয়ের আশায় এসে দাঁড়ালেন, দাদা পরম পুলকিত হয়ে তাঁদের পক্ষপুটে গ্রহণ করলেন। অসুবিধে কিছুই হল না, তাঁর টোলে দুজন ছাত্র বাড়ল, এই পর্যন্ত।

'এই দুজন ছাত্রের মধ্যে বড় ভাই রাধাকান্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ আর শঙ্করনাথ—আমার ঠাকুরদা—ছিলেন মোটামুটি। রাধাকান্ত জ্ঞানে, বিদ্যায় তাঁর মামাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই জ্ঞানের জ্যোতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বই লিখে অজস্র পয়সা রোজগার করেছিলেন, তার সমস্তই দান করে গিয়েছিলেন। গঙ্গাধর স্বভাবতই এই ভাইয়ের সহচর্যে অনেক বেশি আরাম বোধ করতেন এবং রাধাকান্ত ষাট বছর বয়েসে দেহরক্ষা করলে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী অর্ধেক জমি আর ওই কাছারিবাড়ি লাইব্রেরি করার উদ্দেশ্যে সরকারকে দান করে নিজে কাশীবাসী হন।'

দময়ন্তী বলল, 'তারপরে আর এই পরিবারে অপঘাত মৃত্যু হয়নি?'

'না। ত্রৈলোক্যনারায়ণের বংশের জেল্লাও কমে গেল, অপঘাত মৃত্যুও কমে গেল।'

শ্রীরূপা বলল, 'তবে? এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, বগলাচরণের সম্পত্তি সত্যিই অভিশপ্ত? কত লোকের অশ্রু আর হাহাকারের ওপর যে তিনি এই সম্পত্তি গড়ে তুলেছিলেন, সে তো তুমি জানো।'

'জানি। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা কখনওই আদালতে অভিযুক্ত হননি বা তাঁদের সম্পত্তি কখনওই বেআইনি বলে ঘোষিত হয়নি, সেহেতু কীভাবে সেই সম্পত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটা দেখবার আমার তো কোনও দরকার নেই। সে-সম্পত্তি আমার পিতৃপিতামহের এবং তা ভোগ-দখলের সম্পূর্ণ অধিকার আমার। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজে অপরকে শোষণ না করেল, একজন কখনওই সম্পদ আহরণ করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে কি সেই সম্পদের সুযোগ-সুবিধে থেকে তার উত্তরপুরুষ বঞ্চিত হয়?' বলতে-বলতে বিশ্বরূপ কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রীরূপার গলা আবার কাঁপতে শুরু করল। বলল, 'কিন্তু এই সামান্য জিনিসটা কেন তোমার চোখে পড়ছে না যে, বগলাচরণ, তাঁর তিন ছেলে, ত্রৈলোক্য, তাঁর ছেলে সকলেই কী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন এই সম্পত্তি ভোগ করতে গিয়ে। অথচ দেখো, যাঁরা ভোগ করেননি, তাঁরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে গেছেন।'

'না, শ্রী। তাঁরা হয়তো বেশি দিন বেঁচেছিলেন, কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দে কখনওই ছিলেন না। এই সহজ কথাটা তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে, যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি হয় বেশি লোক-দেখানো শো করেছেন, নয়তো অপব্যবহার করেছেন, সেইজন্য। যদি সেই সম্পত্তি ঠান্ডা মাথায় সদ্ব্যবহার করতেন, তাহলে কখনওই তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হত না।

'কিন্তু যাঁরা আদৌ ভোগ করেননি, তাঁদের যে বেঁচে থাকাটাই মর্মান্তিক ছিল। রাধাকান্তর

BanglaBook.org

কথা বাদ দাও, তিনি সর্বত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই শঙ্করনাথ সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন। আমার এখনও মনে আছে, ঠাকুমার সঙ্গে বাজারের হিসেব নিয়ে তাঁর দু-বেলা খিটিমিটি লেগে থাকত। আমার বাবা গ্রাসাচ্ছাদনের ধান্দায় সারা জীবন দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়ে বেড়ালেন। আর আমি? অর্থাভাবে বিলেত যেতে পারিনি, এম-এ পাশ করেই চাকরিতে ঢুকেছি, ডক্টরেট করবার আহ্বান এবং প্রবল ইচ্ছেকে পাশ কাটাতে হয়েছে। আর সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শেষে এসে যখন দেখি আধো-অন্ধকার ঘর তুমি শুধু তোমার মঙ্গল চিন্তা আর শুভ আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল করে রেখেছে, তখন ত্রৈলোক্যনারায়ণকে মনে-মনে অভিশম্পাত দিই। আমার সব থেকেও নেই, এটা যে কত বড় দুঃখ, তোমাকে কী করে বোঝাব!'

শ্রীরূপা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী? আপনি কি সেই গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছেন?'

মাথা নেড়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'না, পাইনি। আর সেইজন্যেই দময়ন্তীর সাহায্য চাই।'

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি আপনাকে কী সাহায্য করব? আপনি কি নিশ্চিত যে, সেই গুপ্তধন এ-বাড়িতেই কোথাও আছে? ত্রৈলোক্যনারায়ণ এ-বাড়ি বানানোর বছর পঁচিশেকের মধ্যেই নিহত হন। তারপর গঙ্গাধর তাঁর সম্পত্তি চোখে দেখেননি এ-বাড়িতে থেকেও, অথচ দেখেছিলেন তাঁর ছোট দুই ভাই। কাজেই এটা সম্ভব হতে পারে যে, সে-সম্পত্তি হয় আপনাদের ওই পুরোনো বাড়িতে অথবা বাইরে অন্যত্র কোথাও লুকোনো ছিল। আমার তো ধারণা, ওই আদি বসতবাড়িতেই লুকোনো আছে। বলা যেতে পারে, গভর্নমেন্টের ঘরে জমা পড়ে গেছে।'

পুনরায় মাথা নাড়লেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'না। এ-বড়িতেই কোথাও আছে। এ-ব্যাপারে আমি কেন নিশ্চিত, সে-কথাই বলছি।

'আমার ঠাকুরদা শঙ্করনাথ তাঁর দাদা গঙ্গাধর কাশীবাসী হওয়ার বছর দুয়েক বাদে একবার বাড়ির চারদিকের জমি লাঙল দিয়ে তছনছ করে ফেলেছিলেন। একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝের প্রত্যেকটি পাথর তুলে তার তলায় খুঁচিয়েছিলেন। সে-কথাটা কী করে যেন গঙ্গাধরের কান পর্যন্ত পৌঁছয়। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শঙ্করনাথকে আবার একটি মর্মস্পর্শী সাবধানবাণী পাঠান।'

'আপনার বাবা তখন কোথায় ছিলেন?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'সেটা ধরুন ১৯৪৭ সাল, স্বাধীনতার বছর। তখন আমার বাবার বয়েস বত্রিশ, আমার সাত। আমরা তখন ছিলুম আদ্রায়। বাবা রেলে চাকরি করতেন।'

'আপনার ঠাকুরদা কিছু পেয়েছিলেন?'

'না। কিছুই পাননি। তারপর আবার আমার বাবাও একবার লাঙল দিয়েছিলেন, আবার মেঝের সব পাথর তুলিয়েছিলেন, জায়গায়-জায়গায় দেওয়ালে গর্ত করিয়েছিলেন।'

'সেটা কবে? আপনি তখন ছিলেন এ-বাড়িতে?'

'সেটা ১৯৫০ সালে, আমার ঠাকুরদা ষাট বছর বয়েসে মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরে। আমার বয়েস তখন দশ। কী হয়েছিল আমার মনে নেই, তবে মা যে ভয়ানক আপসেট হয়েছিলেন এবং আমাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে থেকেছিলেন সেটা মনে আছে।'

সমরেশ মৃদু হেসে বলল, 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবাও কিছু পাননি?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'না। উনিও কিছু পাননি। কিন্তু এতে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁরা দুজনেই এমন কোনও প্রমাণ পেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা এ-বাড়ির সর্বত্র সেই সম্পদ আঁতিপাতি করে খুঁজেছিলেন। এবং সেই প্রমাণ সম্প্রতি আমিও পেয়েছি।'

বিশ্বরূপের কথা শুনে সমরেশ স্তম্ভিত। দময়ন্তীর দিকে চেয়ে দেখল, ওর চোখ দুটো একটা

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জলজ্বল করছে, অর্থাৎ, ও মনে-মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

দময়ন্তী মৃদু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী প্রমাণ?'

'দেখাচ্ছি।' বলে বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীরূপাকে ডেকে নিয়ে পরদা সরিয়ে চলে গেলেন ঘরের বাইরে।

॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপ একাই ফিরে এলেন।

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'শ্রীরূপা?'

হতাশ মুখ করে বিশ্বরূপ বললেন, 'ও এল না। ও বলছে, এত উত্তেজনায় ওর নাকি বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। শান্তর ঘরে খাটে শুয়ে পড়েছে।'

'কোনও বিপদ-আপদ হবে না তো?'

'না-না। অত্যন্ত নার্ভাস টাইপের মেয়ে। তবে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। যাক, এই দেখো প্রমাণ।'

প্রমাণ দেখে সমরেশ আর দময়ন্তী দুজনেরই চক্ষুস্থির। একটা প্রায় দেশি সুপুরির সাইজের গোলাপি রঙের অস্বচ্ছ পাথর, ভেতর থেকে একটা নীলাভ দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। অপূর্ব তার গড়ন, অবিশ্বাস্য আর সৌন্দর্য।

স্তম্ভিত দময়ন্তী জিগ্যেস করল কোনওক্রমে, 'এটা কী?'

'এটা পদ্মরাগমণি। বাজারে এর দাম পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। কিন্তু এমন কোনও লোক আছেন, যাঁরা এহেন একটি পদ্মরাগমণির জন্য লাখ টাকা দিতেও প্রস্তুত। এ-মণি যার ঘরে থাকে, সে নাকি মহা সৌভাগ্যবান হয়। টাকায় এর ঠিক মূল্য হয় না।'

'কোথায় পেলেন এটা?'

'শান্তর মার্বেলের কৌটোয়।'

'সে কি! শান্ত কোথায় পেয়েছিল?'

'সঠিক কিছু বলতে পারে না। সারা বাড়িময় মার্বেল গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কোনটা কোত্থেকে কুড়িয়ে তুলছে, ও কি তার হিসেব রাখতে পারে? তবে আমার ধারণা, ইঁদুরে মুখে করে এনে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে ভয়ানক ইঁদুর।'

'একতলার ভাড়াটেদের জিগ্যেস করেছিলেন? এটা ওঁদের জিনিস নয় তো?'

'জিগ্যেস করেছিলুম। ওদের জিনিস নয়। আমারও গোড়াতে এরকম সন্দেহই হয়েছিল। বিশেষত, বঙ্কিমকাকার যখন সোনা-রুপোর দোকান। এটা যে পদ্মরাগমণি এবং এর যে অসাধারণ মূল্য, সেটা তো উনিই আমাকে বললেন। এরকম জিনিস উনি নাকি জীবনে কখনও দেখেননি।'

দময়ন্তী চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'বঙ্কিমকাকা, মানে আপনার ভাড়াটে বঙ্কিমচন্দ্র পাল? ওঁরা কতদিন আছেন এ-বাড়িতে?'

'বহুদিন। ওঁরা বংশানুক্রমে আমাদের স্যাকরা। আমার ঠাকুরদার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লে, বঙ্কিমকাকার বাবা হারাণচন্দ্র একতলাটা ভাড়া নেন।'

বিশ্বরূপের কথা শুনে দময়ন্তীর ভ্রূকুটি আরও গভীর হল। বলল, 'ওঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

বিশ্বরূপ হেসে বললেন, 'খুব ভালো। এত ভালো যে, সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমাদের অবস্থা বহুদিনই খারাপ হয়ে গেছে, অথচ এখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে তাঁর জমিদারবাবু বলে মনে করেন। মাথা তুলে কথা বলেন না। আর সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি, মেয়ের বিয়ে, ছেলের লেখাপড়া ইত্যাদি

BanglaBook.org

সমস্ত বিষয়েই আমার পরামর্শ বা উপদেশ যাই বল, না নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। আসলে, সমস্ত পরিবারটাই অত্যন্ত নির্বিরোধ, শান্ত, ভীরু প্রকৃতির আর আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে পরনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী।

'তুমি কী ভাবছ, আমি জানি। ভাবছ, এটা একটা কোনওরকমের অসৎ ঠাট্টা, যে-ধরনের রসিকতা কোনও-কোনও বদরসিক ভাড়াটে বাড়িওলার কাছা খোলার জন্যে করে থাকে। যেমন অনেকে ভূতের ভয় দেখায়। আমারও গোড়ায় এ-ধরনের একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এটা সত্যিই ঠাট্টা নয়, তার কারণ, এ-মণিটা খাঁটি, জাল নয়। আমার মনে সন্দেহটা আসতেই আমি ঠাকুরদাস মোতিলালের দোকানে গিয়ে এ-বিষয়ে পরামর্শ নিই।'

'ওঁরা কী বললেন?' সমরেশ জিগ্যেস করল।

বললেন, 'মণিটা আসল। বঙ্কিমকাকা যা-যা কথা বলেছিলেন, ওঁরাও ঠিক সেই সব কথাই বললেন। কাজেই, এ-ব্যাপারটা ঠাট্টা বলা যায় না, তাই না?'

দময়ন্তী বলল, 'এটা যে ঠাট্টা, সেরকম সন্দেহ আমার একবারও হয়নি। আমি শুধু জানতে চাইছিলুম যে, বঙ্কিমবাবুদের সঙ্গে আপনাদের বংশানুক্রমিক সম্পর্কটা ঠিক কীরকম। অবাধ মেলামেশা আছে কি না, দেখাশুনো, কথাবার্তা হয় কিনা।'

বিশ্বরূপ একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। চাও তো আরও বিস্তারিত ভাবে বলতে পারি।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'না-না, আমার জবাব আমি পেয়ে গেছি।'

'তুমি এ-প্রশ্নটা করলে কেন? তোমার ধারণা, আমাদেব বংশের স্যাকরা হিসেবে বঙ্কিমকাকার ত্রৈলোক্যনারায়ণের তোষাখানা কোথায়, সে-বিষয়ে জ্ঞান আছে? তোমার সে-ধারণা ভুল।'

'আমার এরকম কোনও ধারণাই নেই। আপনাদের দুই পরিবারের সম্পর্কটা কেমন, সে সম্পর্কে প্রশ্নটা হঠাৎ মাথায় এল, তাই করে ফেললুম।'

'তাই বলো। তা তোমার কী ধারণা, তোষাখানাটা এ-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই আছে?'

'তোষাখানা কি না জানি না, তবে কিছু লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন আছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'তোমার কি মনে হয়, সেটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব?'

'অসম্ভব নয়। ত্রৈলোক্যনারায়ণ একটা ধাঁধা রেখে গেছেন, সেটার সমাধান করতে হবে। তার জন্যে চিন্তা করতে হবে। তবে ধাঁধা যখন আছে, তখন তার উত্তরও নিশ্চয়ই আছে।'

'চিন্তা আমি অনেক করেছি। উত্তর পাইনি। তুমি কি চেষ্টা করে দেখবে, দময়ন্তী?' বলতে-বলতে বিশ্বরূপের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। গলা কেঁপে গেল।

সমরেশ অবাক হয়ে দেখছিল, একজন বিদগ্ধ, পণ্ডিত লোক অর্থের লালসায় চোখের সামনে কেমন লোভী, নির্লজ্জ ছোট ছেলের মতো দেখতে হয়ে গেলেন। মুখ থেকে জিভটা বের করলেই হয়তো টসটস করে লালা ঝরে পড়বে।

দময়ন্তী বলল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমি শ্রীরূপার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।' বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

BanglaBook.org

॥ ৮ ॥

সমরেশ আর বিশ্বরূপ দুজনেই নির্বাক হয়ে বসেছিল। বিশ্বরূপ নার্ভাস কম্পিত হাতে অনবরত চেয়ারের হাতলে টরেটক্কা বাজিয়ে যাচ্ছিলেন; সমরেশ চিন্তা করছিল, ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে কিনা। এমনসময় পরদা সরিয়ে দময়ন্তী ঘরে এসে ঢুকল।

বিশ্বরূপের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে দময়ন্তী বলল, 'শ্রীরূপা রাজি হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা শর্তে।'

বিশ্বরূপ রক্তাভ মুখ তুলে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী শর্ত?'

'প্রথমত, তোষাখানার সন্ধান যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেটা শ্রীর কাছে গোপন রাখা চলবে না। দ্বিতীয়ত, তোষাখানার একটি পয়সাও শ্রীর অনুমতি ছাড়া খরচ করা চলবে না। তৃতীয়ত, তার প্রতিটি পয়সা খরচা করতে হবে এমন বিষয়ে, যাতে শুধু শ্রী-ই উপকৃত হয়, আপনার বা শান্তর জন্যে তা করা চলবে না।'

বিশ্বরূপের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর হেসে বললেন, 'লিখিত মুচলেকা দিতে হবে?'

'না, আপনার অঙ্গীকারই যথেষ্ট।'

'বেশ।' বলে বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি শ্রীবিশ্বরূপ মৈত্র, ঈশ্বর চিত্তরঞ্জন মৈত্রের পুত্র, ঈশ্বর শঙ্করনাথ মৈত্রের পৌত্র, সাকিন কলিকাতা, অদ্য ১৪ই আশ্বিন এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার স্ত্রী শ্রীরূপা যে-সকল শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা সারা জীবন অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিব।'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'প্রতিজ্ঞাপালনে অপারগ হলে কিন্তু শ্রীরূপা সমস্ত তোষাখানাটাকেই টান মেরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে বলেছে। তার এই অধিকারে কোনওরকমেই হস্তক্ষেপ করা চলবে না।'

বিশ্বরূপ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রাজা ভোলানাথ মৈত্রবাহাদুরের বংশধর কথার খেলাপ করে না, দময়ন্তী। এ-বিষয়ে কোনওরকম সন্দেহ কোরো না।'

॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ বললেন, 'আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, দময়ন্তী?'

'প্রথমে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই, তারপরে বাড়িটা আর লনটা একবার ঘুরে দেখব। যদি দেখি, যেটুকু সন্দেহ হয়েছে তা ভুল, তাহলে আর অগ্রসরই হব না। অন্তত, এবারের মতো ত্রৈলোক্যনারায়ণের ধাঁধা ধাঁধাই থেকে যাবে।'

'কী সন্দেহ করেছ তুমি?'

'সে তেমন কিছু নয়। এখন বলুন, আপনার বাড়িতে যেসব কাগজপত্র আছে, পুরোনো চিঠিপত্র আছে, তাতে কি কোথাও এমন কোনও ছবি বা লেখা বা অন্য কোনও কিছু পেয়েছেন, যা আপনার বোধগম্য হয়নি বা হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে?'

'না। কিচ্ছু নয়। অজস্র চিঠি আছে, ডায়েরি আছে। তাদের প্রত্যেকটি পড়েছি আর প্রত্যেকটি অতিশয় সরল, প্রাঞ্জল। দ্ব্যর্থক কোনও কিছুই নেই।'

সমরেশ হাত নেড়ে বলল, 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা গোছের কোনও কবিতাও নেই?'

বিশ্বরূপ সহাস্যে মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'বাড়ি তো দেখছি সম্প্রতি চুনকাম করিয়েছেন। মিস্তিরিরা কি কখনও কোথাও পলেস্তারা ঢপঢপে বলেছে?'

'ঢপঢপে? কী যে বলো, তার ঠিক নেই। এ তোমাদের আজকালকার ঠুনকো ফ্যাশনদার বাড়ি নয়। রীতিমতো শামুক পোড়ানো চুন আর বালির পলেস্তারা করা হয়েছিল, যাতে গঙ্গামাটি মেশানো সিমেন্টের নামগন্ধ নেই। ঢপঢপে তো নয়ই বরং লোহার মতো শক্ত। একটা ছ'ইঞ্চি বাই

BanglaBook.org

ছ'ইঞ্চি ঢপঢপে জায়গা কাটতে একটা লোকের সারাদিন লাগে, তার মধ্যে দুটো ছেনি ভেঙে যায়। আসল কথা, তুমি জানতে চাইছ কোথাও কোনও গুপ্তপথ আছে কি না। থাকতে যে পারে না তা নয়, কারণ, দেখছ তো, দেওয়ালগুলো এই তলায় কুড়ি ইঞ্চি চওড়া, একতলার পঁচিশ ইঞ্চি। কিন্তু আগাপাস্তলা ঠুকে দেখেছি দেওয়াল কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয়নি।'

'আমি অবশ্য ঠিক গুপ্তপথের কথা চিন্তা করিনি, কারণ, বাড়ির প্ল্যানটা সাদামাটা। দেওয়ালে অজস্র জানলা, এ-অবস্থায় গুপ্তপথ থাকা খুব একটা সম্ভব নয়। আমি ভাবছিলুম কোনও লুকোনোর জায়গা, কোনও গোপন কুলুঙ্গি কোথাও আছে কিনা। থাকলে হয়তো তার মধ্যে কোনও সূত্র পাওয়া যেত। থাক সে-কথা। জানলার কথায় মনে পড়ল, একতলায় বড় জানলা, দোতলায় ছোট জানলা কেন? নাকি আপনি পরে পালটেছেন?'

'আমি পালটাইনি কিছুই। তবে জানলার রকমফের কেন তা বলতে পারব না, ত্রৈলোক্যনারায়ণের পছন্দ হয়তো এইরকমই ছিল।'

'এ-বাড়ির কোনও প্ল্যান আছে? কর্পোরেশনে যেমন জমা দেওয়া হয়ে থাকে আর কী।'

'আছে।'

'বাড়িটা কি ঠিক সেইভাবেই তৈরি? কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই?'

'না, কোনও পরিবর্তন নেই।'

'বাড়ির সামনে আপনি ফুলের বাগান করেছেন, খানিকটা লন আছে, পেছনেও তরিতরকারির চাষ করেন। কোথাও কি জমির কোনও তারতম্য বোঝেন? মানে, জমি কি সর্বত্রই একরকম উর্বর?'

'হ্যাঁ। জমি সর্বত্রই একইরকম।'

'বাড়ির পিছনে ওই গোল স্তম্ভ মতন, ওটা কী? দেখতে অনেকটা দুর্গের টারেটের মতো, অথচ জানলা, দরজা নেই।'

'ওটা ওপরে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। জানলা নেই ঠিকই, তবে দরজা আছে। আমার বাবা গাঁথনি করে বন্ধ করে দেন। মণিটা পাওয়ার পর আমি সেটা ভেঙে আবার দরজাটা বের করি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ছাদে ওঠার জন্যে বাইরে আলাদা সিঁড়ি কেন? ওটা কী প্ল্যান বহির্ভূত?'

'না, ওটাও প্ল্যানে আছে। আসলে ত্রৈলোক্যনারায়ণ মেয়েদের ছাদে ওঠা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, ছাদে উঠলেই মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। সেজন্যে বাইরে আলাদা সিঁড়ি করেছিলেন, অন্দরের সিঁড়িটা দোতলাতেই শেষ।'

'আপনার বাবা দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?'

'প্রথমত, ছাদে কেউ উঠত না। দ্বিতীয়ত, একবার একদল চোর অন্য কোনও বাড়িতে চুরি করে চোরাই মাল এনে এই অব্যবহৃত সিঁড়ির ঘরে রেখে গিয়েছিল। পরে খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ এসে হাজির হয় আর বিষম হাঙ্গামা বেধে যায়। এইসব কারণে বাবা ওটা একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে আমি এই সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি ভেতর থেকে ঠুকে-ঠুকে দেখেছি, কিচ্ছু নেই। সিম্পল দশ ইঞ্চি দেওয়াল, ভেতরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।'

'আচ্ছা, এই সিঁড়ির ওপাশে দুটো ঘর, এপাশে দুটো। ওপাশের ঘর দুটো আমি দেখেছি, কিন্তু চতুর্থ ঘরটা কখনও দেখিনি। সে-ঘরটা তো এই ঘরের লাগোয়া। কী আছে সেখানে?'

'কিছু না। তালাবন্ধ থাকে। ভেতরে একগাদা পুরোনো অয়েল পেন্টিং, পারিবারিক কাগজপত্র, পুরোনো শাল, সামিয়ানা ইত্যাদি, একটা ভাঙা অর্গান এই সমস্ত আছে। ও-ঘরটাও আমি ভালো করে দেখেছি। কিছু নেই।'

'এ-বাড়িতে মোট ঘর তো আটটা। সে-যুগের জমিদারবাড়ির অন্দরমহলের তুলনায় সংখ্যাটা একটু ছোট নয়? ষাট-সত্তরটা ঘর থাকলেই যেন মানানসই হত, তাই না?'

'মানানসই হত কিনা জানি না, তবে আমার ধারণা কোনও জমিদারবাড়িই প্রথমেই ষাট-

BanglaBook.org

সত্তরখানা ঘর নিয়ে তৈরি হত না। প্রথমে ছোটই থাকত, পরে প্রয়োজন অনুসারে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আয়তনে বাড়ত।'

সমরেশ বলল, 'সে-কথা ঠিক। অনেক পুরোনো প্রাসাদই এককোশী প্রাণীর মতো বেড়েছে, যেখানে-সেখানে যেমন-তেমনভাবে।'

বিশ্বরূপ বললেন, 'তা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে। ত্রৈলোক্যনারায়ণ তাঁর ঠাকুরদা বগলাচরণের মতো অমিতব্যয়ী ছিলেন না। সে-যুগের লক্কা জমিদারদের অনেকেই তাঁকে কিপটে বলত, যদিও তিনি মোটেই কিপটে ছিলেন না। অতিরিক্ত বিলাসিতা তিনি পছন্দ করতেন না। দেখছ না, বাড়িটা কেমন নিরাভরণ সাদামাটা?

'ত্রৈলোক্যনারায়ণ বাড়িটা বানিয়েছিলেন তাঁর নিজের থাকবার জন্যে। শিশুকালে তিনি পিতৃহারা হন। কাজেই থাকবার মধ্যে ছিলেন তাঁর দুই স্ত্রী আর পাঁচ ছেলে। তাই বাড়িটা মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা ছিল। ছেলেরা বড় হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন, এক স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন, কাজেই বাড়িটা বাড়াবার আর দরকার হল না। তিন ছেলের বড়জন তো সারাটা জীবন কাটালেন একতলার কোণের ঘরটায়। বাকি দুজনের কী হল তা তো আগেই বলেছি। জয়রাম নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী উন্মাদ হয়ে যান। তিনি মারা না-যাওয়া পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় গঙ্গাধর কাছারিবাড়িতেই থাকতেন, এ-তল্লাট মাড়াতেনই না। কাজেই বাড়িটা আর বাড়াবে কে?

'জয়রামের স্ত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হল?' সমরেশ প্রশ্ন করল।

'কী আবার হবে? বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকতেন, যত্রতত্র নোংরা করতেন, বিরাট-বিরাট নখ আর জটার মতো চুল নিয়ে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতেন, অমানুষিক চিৎকার করে গালাগালি করতেন অদৃশ্য শত্রুদের। ভয়ে লোক প্রাণান্তেও ওদিক মাড়াত না। কেবল মহিলার বাপের বাড়ির এক বুড়ি ঝি তাকে রান্না করে দিত আর সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকত। উনি যখন মারা গেলেন, তখন দেখা গেল সারা বাড়ি নরককুণ্ড হয়ে আছে, দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। প্রায় সাতদিন ধরে সারা বাড়ি পরিষ্কার করা হল, গঙ্গাজল আর আতর ছড়ানো হল, তবে এ-বাড়ি আবার বাসোপযোগী হয়।'

দময়ন্তী স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বিশ্বরূপের কথা শুনেছিল। চাপা নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'তারপর কী হল?'

'তারপর আমার আপন ঠাকুরদারা এলেন। গঙ্গাধর রাধাকান্তর সঙ্গে একতলায় থাকতেন, শঙ্করনাথ থাকতেন দোতলায়। আমার ঠাকুমা প্রথমটা এ-বাড়িতে থাকতে ভীষণ ভয় পেতেন, পরে সয়ে যায়। মানে, কুসংস্কার আর কী।'

মগ্ন কণ্ঠে যান্ত্রিক ভাবে দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

বিশ্বরূপ হাত নেড়ে বললেন, 'তারপরে আর নেই। বগলাচরণের বংশধররা পেটের অন্ন যোগাতে বাড়ির বাইরে বেরোল, বাড়ি বাড়ানো তখন তাদের সাধ্যাতীত।' বলে বিশ্বরূপ চুপ করলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনও কথা বলল না। অবশেষে বিশ্বরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'আর তোমার কিছু জানবার আছে, দময়ন্তী?'

দময়ন্তী বলল, 'আর কয়েকটা সামান্য প্রশ্ন। আপনি তো সম্প্রতি বাড়ি চুনকাম করলেন, ওপর নীচে সবক'টা ঘরই কি এক মাপের?'

'না। ওপরে চারটে ঘরই আঠারো ফুট দশ ইঞ্চি বাই বিশ ফুট দশ ইঞ্চি বাই বারো ফুট আর নীচের চারটে ঘর আঠারো ফুট বাই বিশ ফুট বাই বারো ফুট।'

সমরেশ বলল, 'সেটা স্বাভাবিক। এটা হয় দেওয়ালের চওড়ার পাঁচ ইঞ্চি করে তফাতের জন্যে।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'আপনি কতদিন বাদে-বাদে বাড়ি রং করান?'

BanglaBook.org

বিশ্বরূপ পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কেন? এই সংবাদেও কি তোমার গুপ্তধন খুঁজে বের করায় সুবিধে হবে নাকি?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'তা হতেও পারে।'

বিশ্বরূপ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'চার কি পাঁচ বছর অন্তর। যে-বছর ভেতরটা রং করাই, তার বছর দুয়েক বাদে বাইরেটা করাই। তবে এখন মাল-মশলার এমন দাম বেড়েছে যে ভাবছি, বাইরেটা রং করা বন্ধই করে দেব।'

'এ-বাড়ির প্রধান ফটকের কারুকার্য করা স্তম্ভ আর গেট কে করেছিলেন? ত্রৈলোক্যনারায়ণ?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকা দেওয়া বারান্দাটা ভেঙে দিলেন কে? ত্রৈলোক্যনারায়ণ?'

'না। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে শঙ্করনাথ ভাঙিয়েছিলেন। তখন আর তার প্রয়োজন ছিল না, কাছারিবাড়ি দান করা হয়ে গিয়েছে।'

আবার সকলে চুপ করে গেল। দময়ন্তী মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল বেশ অনেকক্ষণ, তারপর চোখ তুলে উদ্বিগ্ন বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে ফিকে হাসল।

বিশ্বরূপ বললেন, 'এবার? জমিটা একবার ঘুরে দেখবে?'

দময়ন্তী হেসে মাথা নাড়ল। বলল, 'জমিটা দেখে তো কোনও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক মতো দেখতে হলে তো আবার লাঙল চালাতে হয়। তারচেয়ে বরং চলুন, বাড়িটাই একবার ঘুরে দেখি।'

'কোত্থেকে শুরু করবে? এ-তলাটা তো প্রায় সবটাই তোমার দেখা। একতলা থেকে শুরু করবে?'

'আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে, একতলাটা প্রায় দোতলার মতোই। কাজেই ওটা পরে দেখব। তারচেয়ে বরং চলুন, যে-দুটো জিনিস দেখিনি, সে-দুটো দেখে আসি। একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি আর অন্যটা আপনাদের ছাদ। ছাদে চিলেকোঠা আছে?'

'আছে। তবে তুমি যা ভাবছ তা নেই। চিলেকোঠার মেঝে আর ছাদ একদম এক লেভেলে। তাছাড়া চিলেকাঠাটাও একটি অতি ছোট্ট ঘর মাত্র।'

শুনে দময়ন্তী হতাশ মুখ করে হাসল।

বিশ্বরূপ ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে দময়ন্তীকে জিগ্যেস করলেন, 'কিছু কি বুঝতে পারলে?'

মৃদু হেসে দময়ন্তী বলল, 'কিছু-কিছু।'

॥ ১০ ॥

সিঁড়ির ঘরটা গোলাকৃতি, ভেতরের ব্যাস প্রায় ছ'ফুট। বৃত্তের বাইরেটা বাড়ির পিছনের দেওয়ালটাকে স্পর্শ করে আছে। ওই দেওয়ালটার সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে একটা দরজা, তার সামনে একরাশ ভাঙা ইঁট।

বিশ্বরূপ সেদিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওইটে হল শেষ দরজা। গাঁথনি করে বন্ধ করা ছিল, তাই চোখে পড়েনি। তা ছাড়া, এধারে তো আসাই হয় না। চলো, ভেতরে চলো।'

সিঁড়ির ঘরটা বাইরে থেকে দেখলে যেমন অন্ধকূপ বলে মনে হয়, ভেতরটা কিন্তু তত অন্ধকার নয়। তার দেওয়ালে কোনও জানলা নেই বটে, কিন্তু একদম ওপরে ছাদে অনুভূমিক কতগুলো রঙিন কাচ লাগানো রয়েছে। সিঁড়িটা ঢালাই লোহার, ধাপগুলো ফুটো-ফুটো, কাজেই ওই ওপরের কাচের মধ্যে দিয়ে আসা আলো অনেকটাই নীচ পর্যন্ত চলে আসছে।

BanglaBook.org

মাঝখানে খাড়া একটা দণ্ডকে ঘিরে সিঁড়ির ধাপগুলো যেন কেবল ঘুরেই যাচ্ছে আর ঘুরেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন কোথাও আর শেষ নেই। আধখানা উঠেই সমরেশ হাঁপিয়ে পড়ল। ওর আগে-আগে দময়ন্তী উঠেছিল। সম্বোধন করে বলল, 'এই স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে জানলে আজ আর এখানে আসতুম? এর চেয়ে তোমার "মনে পড়ে হায়" ছিল শতগুণে ভালো।'

দময়ন্তী হাঁপিয়ে পড়েছিল। কোনওক্রমে বলল, 'যা বলেছ! তাও যদি দু-চারটে জানলা থাকত, তাহলে আর এমন দমবন্ধ করা হত না ভেতরটা।'

সমরেশ পূর্ববৎ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'সত্যি। দুটো জানলা যে কেন করেননি ত্রৈলোক্যনারায়ণ, কে জানে।'

কেবল বিশ্বরূপ ক্লান্তিহীন। গটগট-গটগট করে উঠে যাচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে হাঁক লাগাচ্ছেন, 'কী হল, পিছিয়ে পড়লেন যে? সবে তো আধখানা উঠেছি।' কিংবা, 'আর বেশি বাকি নেই। এই তো হয়ে এল।'

ছাদের ওপরে উঠে দময়ন্তী লম্বা শ্বাস নিল। বলল, 'আমার মাথা ঘুরছে। একটু বসি।' বলে মাটির ওপর বসে পড়ে চারদিকে তাকাল।

তার পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত খাড়া হয়ে দাঁড়াল দময়ন্তী। সমরেশ তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

চাপা গলায় দময়ন্তী বলল, 'ছাদটা ন্যাড়া, লক্ষ করেছ?'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ। এত উঁচু বাড়িতে ন্যাড়া ছাদ থাকা খুব অন্যায়।'

'আর ওই সামনের চিলেকোঠাটা অসম্ভব নীচু, একটা মানুষ কোনওরকমে ভেতরে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারে, দেখেছ?'

এবার বিশ্বরূপ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। ঘরটা নীচু করেই তৈরি করা হয়েছিল। ওখানে তো কোনও লোক থাকে না, কেবল কতগুলো ভাঙা সুটকেস, তোরঙ্গ, হোল্ডঅল, ট্রাঙ্ক এই সমস্ত আছে। ওসব আমি ঘেঁটে দেখেছি।'

'ঘরটা কে তৈরি করেছিলেন?'

'ত্রৈলোক্যনারায়ণই।'

'কেন?' বলে দময়ন্তী সমরেশের দিকে তাকাল।

সমরেশ হতাশ মুখে করে বলল, 'তা আমি কী করে বলব? আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে এক ভদ্রলোক চিলেকোঠার ঘর কেন তৈরি করেছিলেন, সে কি আজ বলা সম্ভব? বিশেষ করে এই এক হাজারটা সিঁড়ি ভাঙার পর?'

বিশ্বরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দময়ন্তীর দিকে চেয়েছিলেন। সমরেশের কথা শুনে হেসে বললেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, সমরেশ। হাজারটা সিঁড়ি সত্যিই যদি কোনওদিন ভাঙতে হয় তোমাকে তাহলে তোমার যে কী দুর্দশা হবে, আমি তাই ভাবি। তার মোটে ছয় শতাংশ ভেঙেই নেতিয়ে পড়লে?'

দময়ন্তীর শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমরেশ একলাফে এগিয়ে এল। দময়ন্তীর একটা কাঁধ খামচে ধরে জিগ্যেস করল, 'পেয়ে গেছ?'

যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়ল দময়ন্তী। বলল, 'হ্যাঁ।'

দময়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সমরেশ দেখতে পেল একটা নারকোল গাছের মাথা। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করল, 'ওই নারকোল গাছের মাথায়?'

দময়ন্তী তৎক্ষণাৎ সংবিত ফিরে পেল। বলল, 'দ্যুৎ! কী যে বল তার ঠিক নেই।'

বিশ্বরূপ এতক্ষণ স্থির হয়ে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যদিও স্পষ্টতই তিনি দময়ন্তীকে

BanglaBook.org

দেখছিলেন না। তাঁর সামান্য যন্ত্রণাক্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর মাথার মধ্যে একটা পিচ্ছিল বুদ্বুদ ভেসে বেড়াচ্ছে আর তিনি সহস্রবাহু দিয়ে সেটাকে ধরবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না।

হঠাৎ বুদ্বুদটা ফেটে গেল।

বিস্ফারিত চোখে পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠলেন বিশ্বরূপ। বিকৃত অসংলগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'ষাটখানা সিঁড়ি। বুঝেছি, বুঝেছি। পেয়ে গেছি, হে ভগবান, পেয়ে গেছি।' বলে ছাদের ওপর নাচ জুড়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে খ্যাপা ষাঁড় যেমন ম্যাটাডোরের দিকে ছুটে যায়, তেমনিভাবে অন্ধবেগে ছুট লাগালেন চিলেকোঠার দরজার দিকে।

দময়ন্তী আর সমরেশ এতক্ষণ হাঁ করে ভদ্রলোকের নাচ দেখছিল। দৌড় শুরু হতেই দময়ন্তী ব্যাকুল গলায় চিৎকার করে উঠল, 'যাবেন না, বিশ্বরূপবাবু, ওদিকে যাবেন না। আপনার পায়ে পড়ি, ফিরে আসুন।'

দময়ন্তীর চিৎকার কানে ঢুকল বিশ্বরূপের। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভাঙা, কর্কশ গলায় বললেন, 'কেন, যাব না কেন?' তাঁর চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতো।

দময়ন্তী সজল গলায় বলল, 'ফিরে আসুন, বিশ্বরূপবাবু। ওখানে যা অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্যে, আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না।'

হিংস্রভাবে দাঁত বের করলেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'কেন, কী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে? কে অপেক্ষা করছে?'

'আপনার নিয়তি, বিশ্বরূপবাবু, আপনার নিয়তি!'

'ওঃ, আমার নিয়তি? হোক গে, করুক গে। আমি যাবই, তোমরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না যেন। হুঃ, আমার নিয়তি!' বলে গজগজ করতে-করতে বিশ্বরূপ পিছন ফিরলেন।

দময়ন্তী ব্যাকুল চোখে সমরেশের দিকে তাকাল। বলল, 'হাঁ করে দেখছ কী? যাও ওঁর সঙ্গে।'

সমরেশ নিয়তি ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'জোর করে ধরে নিয়ে আসব?'

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল দময়ন্তী। বলল, 'নাঃ। শুধু সঙ্গে থাকো। ওঁকে ওঁর ভবিতব্যের সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে দাও।'

॥ ১১ ॥

অন্ধকার ঘরের মধ্যে হারিয়ে গেছেন বিশ্বরূপ, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন সমরেশ তাঁর ওপর নজর রাখছে। দুমদাম করে আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে, বাক্স-প্যাঁটরা এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলবার আওয়াজ। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, তারপর ঠকঠক করে শব্দ শুরু হল। সেটা চলল প্রায় মিনিট দশেক। অবশেষে হঠাৎ একটা চাপা উল্লাসের চিৎকার ধ্বনি ভেসে এল। তার একটু পরেই অন্ধকার দরজার মাঝখানে বিশ্বরূপের মুখটা দেখা গেল। সে-মুখ উল্লাসে, উত্তেজনায়, লোভে একটা দানবীয় রূপ নিয়েছে।

কম্পিত কণ্ঠে বিশ্বরূপ বললেন, 'তুমি তো সিগারেট খাও, সমরেশ। একটা দেশলাই দিতে পারো?'

সমরেশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে দিল। মুখটা আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

গড়গড় করে একটা শব্দ হল ঘরের মধ্যে, যেন একটা পাটাতন সরানো হল। একটা পাণ্ডুর হলদে আলো জ্বলে উঠল। বোঝা গেল, বিশ্বরূপ দেশলাই জ্বালালেন। একটু পরেই হলদে আলোটা হারিয়ে গেল। সমরেশ এতক্ষণ অকম্পিত প্রস্তরবৎ বাইরে দাঁড়িয়েছিল, এবার এক-পা ভেতরে ঢোকাল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বীভৎস, রক্ত জল-করা, বুকফাটা আর্তনাদে দময়ন্তী থরথর করে কেঁপে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর বিকট আর্তনাদে কেবল অবিমিশ্র বিভীষিকা। বেশ কিছু সময় ধরে সেই আর্তনাদ যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে-হতে দূরে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। সমরেশ ততক্ষণে একলাফে ঘরের মধ্যে চলে গেছে।

॥ ১২ ॥

আবার ঘরের মধ্যে একটা গড়গড় শব্দ হল। তবে এবারের শব্দটা অনেক ব্যস্তসমস্ত, অল্পক্ষণ স্থায়ী। বোঝা গেল, পাটাতনটা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তার পূর্বতন অবস্থায় সরিয়ে দেওয়া হল।

একটু পরেই বিশ্বরূপের জ্ঞানহীন শরীরটাকে কাঁধে করে বিরাটাকার সমরেশ অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল।

কিন্তু এ কোন সমরেশ? ভয়াবহ আতঙ্কে ওর সমস্ত মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাশে। বিশ্বরূপের শরীরটা ছাদের ওপরে নামিয়ে দিয়ে বিহ্বল দৃষ্টি তুলে দময়ন্তীর দিকে তাকাল সমরেশ। স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'ভেতরে একটা কঙ্কাল। সিঁড়ির ঠিক নীচে, একটা থামে হেলান দিয়ে বসে হাঁ করে ওপরে তাকিয়ে আছে।' বলতে-বলতে শিউরে উঠল।

শান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, 'আমি জানতুম।'

'ওটা কে?'

'জয়রাম।'

'জয়রাম? কী ভয়ানক! কিন্তু ওই অন্ধকূপের মধ্যে আরও একটা কিছু জীবন্ত আছে! আমি তার নড়াচড়া করবার খড়খড় শব্দ শুনেছি।'

'ও কিছু নয়। ইঁদুর। বহু বছরের নিশ্চিন্ত বসবাস ওদের। তাদেরই সম্মিলিত পদধ্বনি শুনেছ।'

দময়ন্তীর কথায় সমরেশ নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হল না। বিশ্বরূপের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে ছাদের ওপর বসে নীরবে হাঁপাতে লাগল।

দময়ন্তী আলসের দিকে এগিয়ে গেল, সাবধানে নীচের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'এই শ্রীরূপা! শিগগির এক বালতি জল নিয়ে ওপরে আয়।'

শ্রীরূপা তখন লনের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, তার স্বামীটি অতিথিদের নিয়ে কোন দিকে গেল তারই খোঁজ করছিল বোধহয়। দময়ন্তীর ডাক শুনে জলের সন্ধানে একদৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

BanglaBook.org

॥ ১৩ ॥

ভিজে আঁচল দিয়ে বারংবার মুখ মুছিয়ে দেওয়ার পর বিশ্বরূপ ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। শরতের সূর্য তখন পাটে বসেছেন। কনে-দেখা আলো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রীরূপার মুখে। বিশ্বরূপ চোখ খুলে সেই প্রেমে, করুণায় কোমল মধুর মুখখানি প্রাণভরে দেখলেন, তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল।

আস্তে-আস্তে উঠে বসে বিশ্বরূপ পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে স্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, 'এটা সেই পদ্মরাগমণি। তুমি নিজের হাতে এটাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো।'

শ্রীরূপার উদ্বিগ্ন মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। সে-হাসিতে কী গর্ব, কী অহঙ্কার, কী মাধুর্য। কম্পিত গলায় বলল, 'ফেলে দেব কেন? আমার গলায় লকেট বানিয়ে পরব। এমন মণি কি সহজে পাওয়া যায়?'

শ্রীরূপার শেষ কথাগুলো বোধহয় বিশ্বরূপের কানে ঢোকেনি। তিনি তার আগেই হঠাৎ, স্থান কাল ভুলে, শ্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রবল আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরেছেন। শীতার্ত লোক যেমন জ্বলন্ত কাঠকয়লার আংঠা জড়িয়ে ধরে তার থেকে উত্তাপ টেনে নেয়, বিশ্বরূপও যেন সেই ভাবেই শ্রীর শরীর থেকে তাঁর প্রাণশক্তি টেনে নিচ্ছিলেন।

সমরেশের কাঁধে ভর দিয়ে নীচে নামতে-নামতে বিশ্বরূপ জনান্তিকে জিগ্যেস করলেন, 'আমরা আজ যা দেখলুম, সেটা শ্রীকে বলনি তো?'

সমরেশ বলল, 'না। সেটা শুধু আমদের দুজনের অভিজ্ঞতাতেই থাক।'

॥ ১৪ ॥

শ্রীরূপা বলল, 'আমি জানতুম, তুই ঠিক বের করতে পারবি। এখন একটু বস। আমি রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি।'

বিশ্বরূপ বললেন, 'দ্যাখো না, একটু চিংড়িমাছ লাগাতে পারো কি না।' ভদ্রলোক আড় হয়ে খাটে শুয়েছিলেন, মুখে সুস্পষ্ট ক্লান্তি, কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিদগ্ধ, সুশীল হাসিটি ফিরে এসেছে।

শ্রীরূপা মাথা নেড়ে বলল, 'সেই ভালো। চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর...।'

'ভাজা মুগের ডাল।' নির্লজ্জ সমরেশ যোগ করল।

শ্রীরূপা বলল, 'হুঁ। তাও হবে। তবে আপনার কপালে আরও কিছু হবে।'

শ্রীরূপার বলার ভঙ্গিতে ওই 'আরও কিছুটা' বিশেষ আনন্দজনক হবে বলে মনে হল না সমরেশের। ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করল, 'আমার কপালে আবার কী হবে?'

'হবে, হবে। আমি বাজার থেকে ঘুরে আসি।' বলে শ্রীরূপা তার স্বামীর দিকে ফিরল। বলল, 'আমি মায়াকে নিয়ে বাজারে চললুম, চিংড়িমাছ না দেখে কেনা ঠিক নয়। তুমি ততক্ষণ সাবধানে থেকো, দময়ন্তী দেখবে'খন তোমাকে। ফিরে এসে পুরো গল্পটা শুনব আর সমরেশদাকে দেখে নেব।'

সমরেশ হাঁ-হাঁ করে উঠতে-না-উঠতেই শ্রীরূপা পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ ১৫ ॥

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'আপনি ওপরে কী দেখেছেন, শ্রীরূপাকে জানিয়েছেন কি?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'না। বলেছি, ওপরে বিশেষ কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে কিছু ইঁদুর আর বিষাক্ত গ্যাস। সেই গ্যাসের প্রভাবেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।'

সমরেশ বলল, 'শ্রীরূপা কি এই গ্যাসটা বিশ্বাস করেছে?'

'করেছে। আমি যে অভিশপ্ত গুপ্তধনের মরীচিকার পিছনে ছোটা একেবারে বন্ধ করেছি, তাতে ও এতই আনন্দিত যে, কেন বন্ধ করেছি তা নিয়ে প্রশ্নই করছে না। যে-কোনও গল্পই ও এখন বিশ্বাস করতে রাজি আছে।'

BanglaBook.org

'সে-কথা থাক। এখন বোঝা যাচ্ছে, ওপরের ছাদটা পুরোটাই পরছাদ, মানে ইংরিজিতে যাকে বলে ফলস সিলিং বা আন্ডার সিলিং। ওই ছাদ আর আসল ছাদের মধ্যে একটা ফুট ছয়েক উঁচু আস্ত ফ্লোর। বাড়িটা আদতে তিনতলা, তার একটা তলা রাখা হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

সমরেশ বলল, 'লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে কত কিছু না করা হয়েছে। ওই জন্যেই বাড়ির ফ্যাশানটা এমন সাদামাটা, চাঁছাছোলা। ওপরের আর নীচের জানলাগুলো ইচ্ছে করেই দু-রকম করা হয়েছে, আর বাইরেটা করা হয়েছে নিরেট, যাতে করে বিভিন্ন তলার আপেক্ষিক অবস্থানটা চট করে কারোর চোখে না পড়ে। ছাদটা ন্যাড়া, সেটা নীচ থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। চিলেকোঠার ঘরটা অসম্ভব নীচু করে তৈরি, যাতে নীচ থেকে দেখলে মনে হয় সেটা ওইটুকু রেলিংয়ের ওপর মাথা উঁচিয়ে আছে। আর সিঁড়ির ঘরে একটাও জানলা নেই, যাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কেউ বাড়িটা দেখতে না পায়, আধো অন্ধকারে ঘুরতে-ঘুরতে ওপরে উঠে একেবারে ভুল করে ছাদে উত্তরণ, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে বাড়ির উচ্চতা আর ছাদের ন্যাড়াত্বটা কারোর চোখে পড়ে। উঃ, কী ঘুঘুই না ছিলেন, যিনি বানিয়েছিলেন এই বাড়ি। আই বেগ ইওর পার্ডন, মিস্টার মৈত্র, মানে আপনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ত্রিলোকেশ্বরের আসলে হওয়া উচিত ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোক তাহলে কলকাতায় এরকম খান পনেরো বাড়ি করে রেখে যেতে পারতেন।'

বিশ্বরূপ সহাস্যে বললেন, 'ত্রিলোকেশ্বর নয়, ত্রৈলোক্যনারায়ণ, আর উনি ছিলেন আমার ঠাকুরদার বাবা। তবে তুমি লজ্জিত হয়ো না। তিনি যে অত্যন্ত ঘুঘু লোক ছিলেন, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমিই বরং তাঁকে একটু আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলুম। ভেবেছিলুম, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই তিনি এ-বাড়িটা তৈরি করেন। আসলে, এখন বুঝি, তা মোটেই নয়। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, তাঁর বিশাল ধনভাণ্ডার ও-বাড়িতে আর নিরাপদ নয়। কাজেই এমন ভাবে সরাতে হবে সেই মূল্যবান ঐশ্বর্য যাতে তা কারোর চোখে না পড়তে পারে। তা নাহলে, ওই সম্পত্তির জন্যেই বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে হবে।

'তখন ব্যাঙ্ক ছিল না, জগতে হেন সিন্দুক নেই যা চোর-ডাকাতে ভাঙতে পারে না, দেওয়ালে গোপন সুড়ঙ্গ, মাটির তলায় গুপ্ত কুঠুরি নেহাত পুরোনো হয়ে গেছে, লোকে আগে ওসব জায়গাতেই খোঁজ করে। তাহলে কোথায় রাখা যায়? তখন এই ব্রিলিয়ান্ট প্ল্যান তাঁর মাথায় এল, আসলে সংস্কার-টংস্কার সব বাজে। এ-বাড়িতে যদি কেউ খোঁজেও, খুঁজবে দেওয়ালে, একতলার মেঝেয়। কারোর মাথায় মরে গেলেও এ-ধারণা আসবে না, ছাদের চিলেকোঠার মেঝের মধ্যে গোপন দরজার খোঁজ করা দরকার। তাও সে কী দরজা! লোহাকাঠের ওপর মার্বেল টালি মেরে এমন ভাবে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, কার সাধ্যি বোঝে!'

'আপনি বুঝলেন কী করে?'

'আমি প্রত্যেকটি টালি ঠুকে-ঠুকে দেখছিলুম যে। একটা টালিতে জোরে চাপ দিতে পুরো দরজাটা ইঞ্চি তিনেক নেমে যায়, তারপর সেটা ঠেলতে গড়গড় করে সরে গেল। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তুমি কী করে বুঝলে বলো তো দময়ন্তী, যে গুপ্ত কুঠুরি যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা ছাদে?'

দময়ন্তী বলল, 'অনেকগুলো কারণে। প্রথমত, ওই পদ্মরাগমণিটা পাওয়া গেল শান্তর মার্বেলের কৌটোয়, কারণ, ইঁদুর ওটা মুখে করে এনে ফেলেছিল আর শান্ত সেটা কুড়িয়ে তুলে রেখেছিল, তাই। এখন, ইঁদুর তো ওটাকে মুখে করে একতলায়ও যেতে পারত, আর গেলে যেহেতু পালেদের সঙ্গে আপনার দারুণ সদ্ভাব অতএব আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানতে পারতেন। পাল সৎ লোক, আপনাকে মণিটার আসল দামই বলেছিলেন, বাজে কাচ বলে গাপ করবার চেষ্টা করেননি। তবে,

BanglaBook.org

ইঁদুর পালেদের বাড়ি না ফেলে কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে বারো ফুট উঠে আপনার বাড়িতে ফেলেছে। তা ফেলতে পারে, ইঁদুর তো আর মানুষ নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ-ঘটনা বারংবারই ঘটছে। আপনার বাবা আর ঠাকুরদা, দুজনেই দোতলাতেই এ-ধরনের কিছু জিনিস পেয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই কোনও ছুতোয় পালেদের বের করে দিয়ে তাঁদের মেঝে খুঁড়িয়েছিলেন। কাজেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে পালেরা এ-ব্যাপারে অংশীদার ছিল না এবং সম্ভবত কোনও সন্দেহও করেনি। করলে, বঙ্কিমবাবু আপনার কাছে এ-বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতেন। তাহলে, একটা সন্দেহ হতেই পারে যে, মণিটা বাইরে থেকেই আসেনি। সেক্ষেত্রে অন্যতম সম্ভাবনা, ওপর থেকে পড়েছে।

'দ্বিতীয়ত, যে বাড়ির গেট এত কারুকার্য করা, সে-বাড়িটা এত সাদামাটা কেন? এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে—স্রেফ মিতব্যয়িতা এর কারণ হতে পারে না।

'তৃতীয়ত, ছাদে ওঠবার সিঁড়িটা নিতান্তই অনাবশ্যক। ছাদে উঠলে মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, এ-ধরনের হাস্যকর কথা ত্রৈলোক্যনারায়ণের মতো বিচক্ষণ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাহলে সিঁড়িটা ওখানে রাখার সার্থকতা কোথায়?

'চতুর্থত, জানলাগুলোর তারতম্য কেন?

'এ সমস্তই, একটা সন্দেহেরই উদ্রেক করে যে, এ-বাড়িটাতেই কোনও গন্ডগোল আছে, এবং সেটা আছে ওপরের দিকে, নীচের দিকে নয়। সমরেশ ঠিকই বলেছে, এ-সমস্তই লোককে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে।

'আমি অবশ্য সন্দেহ করেছিলুম, চিলেকোঠার ঘরের মেঝে নিশ্চয়ই ছাদের লেভেলের চেয়ে উঁচুতে এবং তার মধ্যেই গুপ্ত কুঠুরি, কিন্তু যখন শুনলুম ছাদ আর ওই ঘরের মেঝে সমান-সমান, তখন হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। তবু আমার মন বলছিল রহস্যের সমাধান ছাদেই আছে। তারপর আপনি যখন বললেন, সিঁড়ির সংখ্যা ষাটটা, তখুনি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার ঘরগুলো বারো ফুট করে উঁচু, তাহলে দুটো তলায় হয় চব্বিশ ফুট, অথচ ষাটটা সিঁড়ি কভার করে ত্রিশ ফুট। তাহলে, এই ছাদের তলায়ই লুকোনো আছে হারানো ছ'ফুট।

'সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলুম, জয়রামের দেহও ওখানেই রয়েছে। ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওখান গিয়ে ঢুকেছিলেন, কিন্তু ভূমিকম্পে হঠাৎ দরজাটা সরে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। জড়বুদ্ধি জয়রাম ভয়ে দিশেহারা হয়ে যান, আর বেরোতে পারেননি। বোধহয়, দরজাটা এমন যে তলা থেকে খোলাও যায় না।'

বিশ্বরূপ জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু পদ্মরাগমণিটা এই ফ্লোরে এল কী করে? ছাদে কি কোনও ফুটো আছে?'

দময়ন্তী বলল, 'ঠিক ফুটো বলতে যা বোঝায় তা হয়তো নেই। ওই তো, ছাদের কনস্ট্রাকশানটা দেখুন না। বিমের ওপর প্রিকাস্ট টালি বসিয়ে-বসিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে। বেশি পুরোনো হয়ে গেলে টালিগুলোর মধ্যে ফাঁক হয়ে যায়। হাতিবাগানে আমার মার মামাবাড়িতে অমন দেখেছি। এখন, আমার বিশ্বাস, আপনার যে-ঘরটি বন্ধ থাকে, তার ছাদে অমন ফাঁক রয়েছে। যেহেতু ঘরটা ব্যবহার হয় না আর সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আলোও আসে না, সেই জন্যে সেটা কোনওদিনও আপনার নজরে পড়েনি। ইঁদুরের দৌড়োদৌড়িতে ধাক্কা লেগে পদ্মরাগমণিটা এবং তারও আগে গোটা দুই মূল্যবান রত্ন ওই পথেই নীচে পড়েছে। এবং যেহেতু আপনার ঠাকুরদা, বাবা আর আপনি কোথায় এ-রত্নগুলি পাওয়া গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেননি, সেইজন্যে খেয়াল করেননি যে, তাদের উৎপত্তি একই ঘরে। করলে হয়তো বহুদিন আগেই রহস্যের সমাধান হয়ে যেত।'

দময়ন্তী চুপ করল। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর সমরেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওপরে ওই ওটা থাকলে আপনার নীচে থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না?'

মাথা নাড়লেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'কীসের অসুবিধে? এতদিন থাকলুম, ভবিষ্যতেও থাকব।

BanglaBook.org

তা ছাড়া, এখন তো আর এ-বাড়িটা বাইরের লোককে ভাড়া দিতে পারব না। ভাড়া না দিলে আমার পক্ষে অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। আর, আমি তো শ্রীরূপা নই। আমার কোনও কুসংস্কার-টুসংস্কার নেই।'

॥ ১৬ ॥

শ্রীরূপা ঘরে ঢুকল।

সমরেশ বলল, 'আমায় যেন কী তুমি দেবে বলেছিলে?'

শ্রীরূপা বলল, 'দেব বইকী। আমার নাকে জুতোর সুকতলা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে বলেছিলেন না? দেওয়াচ্ছি, দাঁড়ান। আমার কাছে ত্রৈলোক্যনারায়ণের রুপো বাঁধানো খড়ম আছে, সেটা ভাঙছি এখন আপনার মাথায়।'

হাতজোড় করে সমরেশ বলল, 'আমার মাথাই যদি ভাঙতে চাও, তাহলে রুপো বাঁধানো খড়মটা নষ্ট করে কী লাভ? তারচেয়ে বরং তোমার ভাঙা গলায় একটি মেশিনগান চালাও, আমি মরে পড়ে থাকি।'

একটু পরে শ্রীরূপার ভরাট মিষ্টি গলার গানে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল ঃ

'ওই আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গণ,
কোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ,
মন লাগল না, তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।'

BanglaBook.org

অন্বেষন

অমলেন্দু সামুই

প্রস্তাবনা

মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধে ভরা ঘরখানার সব আলোগুলো একসঙ্গে নিভে গেল। অন্ধকার ঘরে একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল অলক ঘোষ। এতক্ষণ যেন শরীরের পেশিগুলো উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল নতুন এক চমকের।

মেজর অলক ঘোষ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসার। হালকা ঋজু চেহারা, ছ'ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা। সারা মুখে বুদ্ধির ছাপ জ্বলজ্বল করছে। চোখদুটো উদাস।

অন্ধকার ঘরে আওয়াজ ভেসে এল পুরুষ-কণ্ঠের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার মালহোত্রাসাহেব বলতে লাগলেন, মেজর ঘোষ, আপনার চাকরি জীবনের অতীত ইতিহাস আমরা খুঁটিয়ে তন্নতন্ন করে দেখেছি। বলতে দ্বিধা নেই, যে-কয়জন অফিসারকে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরব বলে মনে করি, তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম। সেইজন্যে এই বিরাট কাজের দায়িত্ব আপনার হাতে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, এ-কাজে আপনি সফল হবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘরের মধ্যে মিস্টার মালহোত্রা ও মেজর অলক ঘোষ ছাড়া আর কেউ নেই। ঘরের সমস্ত জানলা ও দরজা বন্ধ। তার ওপর ভারি পরদা ঝুলছে।

হঠাৎ সামনের দেওয়ালের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। বোঝা গেল, মিস্টার মালহোত্রা প্রোজেক্টর চালিয়েছেন।

অলক তাকিয়ে দেখল, ধীরে-ধীরে ছবি ফুটে উঠছে। ওপরে নীল আকাশ। নীচে পাহাড় আর সবুজ বনানী।

মিস্টার মালহোত্রা বলতে লাগলেন, এই জায়গাটার নাম নেফা। এখন যার নাম অরুণাচল প্রদেশ। জায়গাটার অবস্থান নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। ওই জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে আছে আমাদের ছোট্ট একটা আর্মি ইউনিট। কম্যান্ড করছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু-দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত একটা দলিল ওই ইউনিটে এসে পৌঁছেছে। আপনার কাজ হবে দলিলটি নিরাপদে দিল্লিতে নিয়ে আসা। কাজটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা অনুমান করছি, শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অলরেডি দলিলটার একটা মাইক্রো ফিল্ম ফটো তুলে নিয়েছে। কিন্তু ফিল্মটি ইউনিটের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওরা এখনও সরিয়ে ফেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, মাত্র কয়েকদিন আগে ওই ইউনিটের সিকিউরিটি অফিসার মেজর নায়ার নিহত হয়েছেন।

দেওয়ালের গায়ে তখন পাহাড় আর জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো এঁকেবেঁকে কখনও পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, আবার কখনও উচ্ছ্বলা তরুণীর মতো খিলখিল করে হেসে উঠছে। তারপর ক্যামেরা আরও নীচে নেমে এল। সারি-সারি কুঁড়েঘর। অর্ধ উলঙ্গ কিছু মানুষ চলে বেড়াচ্ছে।

মিস্টার মালহোত্রা বললেন, ওরা হল ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। শিক্ষা-দীক্ষার আলো এখনও পৌঁছায়নি। ফলে, ওরা এখনও সো-কলড্ 'অসভ্যই' রয়ে গেছে। সাধারণভাবে ওরা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু ওদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগলে ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ওখানে ছোট একটা 'হেলথ সেন্টার' আছে। একজন ডাক্তার আর কিছু নার্স আছে। আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, ওইসব আদিবাসী মেয়েরা খুব সুন্দরী এবং ওদের স্বাস্থ্যও খুব লোভনীয়।

প্রোজেক্টরের আলো নিভে গেল। মিস্টার মালহোত্রা ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এলেন অলক ঘোষের কাছে।

মেজর ঘোষ, ওই দলিলটির ওপর আমাদের দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। আশা করি, আপনার কাজের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পেরেছেন।

BanglaBook.org

অলক ঘোষ উঠে দাঁড়াল। খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল শরীরখানা। মিস্টার মালহোত্রা তাকিয়ে দেখলেন। দেখবার মতোই চেহারা অলক ঘোষের। শরীরের কোথাও একটু মেদ নেই। চওড়া বুক আর সরু কোমরে বীরের কাঠিন্য।

মালহোত্রা বললেন, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

দলিলটা বর্তমানে কোথায় আছে?

কর্নেল চ্যাটার্জির কাছে।

মেজর নায়ার কীভাবে নিহত হয়েছেন?

অফ ডিউটিতে তিনি যখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।

অলক ঘোষ দু-এক মিনিট কী যেন চিন্তা করে নিল। তারপর বলল, আমাকে ওখানে কীভাবে পাঠানো হচ্ছে?

আপনাকে পাঠানো হচ্ছে মেজর নায়ারের জায়গায়—সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে আপনার কাজ শেষ হবে—আপনি সোজা চলে আসবেন দিল্লিতে। এর জন্য নতুনভাবে কোনও অর্ডার ইস্যু করা হবে না। আপনার চলে আসার সুবিধার জন্য দু-খানা প্লেন ও একখানা হেলিকপ্টার সবসময় 'স্ট্যান্ড বাই' থাকবে। তবে প্রয়োজন মনে করলে 'বাই রেল' অথবা 'বাই রোড'ও আপনি আসতে পারেন। আর কিছু?

মৃদু হেসে অলক বলল, ধন্যবাদ স্যার। আর কিছু নয়।

উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।

এক ঃ ভৌতিক কণ্ঠস্বর

প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে মেজর অলক ঘোষ যখন বেরিয়ে এল তখন দিল্লির ঘড়িতে রাত ন'টা। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এল চাঁদনি চকে। কাল সকালেই রওনা হতে হবে নেফার উদ্দেশে। সেইজন্যই কিছু কেনাকাটার দরকার।

চাঁদনি চকে তখন আলোর পসরা।

আনমনে হাঁটতে লাগল অলক। দু-একটা দোকানে ঢুকে কিছু কেনাকাটা করল। তারপর বাড়ি ফেরার জন্য যখন ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল, হাই অলক? তুই এখানে?

অলক চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল, রজত সেন। এককালে দুজনে কলেজে পড়েছিল একসঙ্গে। রজতের পরনে টেরিকটনের প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।

একগাল হেসে রজত বলল, তোকে যে একবারে চেনাই যাচ্ছে না রে। একেবারে পাকা মিলিটারি ম্যান।

হাসির জবাবে হাসি দিয়ে অলক বলল, মিলিটারি ম্যানদের চেনা সবসময়ই একটু কঠিন। কিন্তু তোরও তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট একখানা গোঁফ রেখেছিস। তুই না ডাকলে আমি তো চিনতেই পারতাম না।

রজত বলল, তোরই ভাষায় জবাব দিই। মিলিটারি ম্যানদের চেনা সবসময়ই একটু কঠিন।

অর্থাৎ?

আমি বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একজন পাইলট। ফ্লাইট লেফটেনান্ট রজত সেন।

মাই গুডনেস! আমরা তাহলে একই গোয়ালের গরু।

BanglaBook.org

তুই তো আমার কোনও খোঁজই রাখিস না। চল, কোথাও গিয়ে বসা যাক।

অলক বলল, না রে, আজ আর সময় হবে না। কাল সকালের ফ্লাইটেই আমাকে আসাম চলে যেতে হচ্ছে।

পোস্টিং?

হ্যাঁ।

তবুও চল না। একজনের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল অলক। চাঁদনি চক থেকে লালকেল্লার দিক হাঁটতে লাগল দুজনে। রজত একটা সিগারেট ধরাল। বড়রাস্তা পার হয়ে যখন সামনের খোলা ময়দানে দুজনে পা রাখল, অকস্মাৎ মনে হল, বর্তমান সভ্যতা থেকে তারা যেন বহুদূর পিছিয়ে এসেছে।

সামনে ইতিহাসের স্মৃতি-ভরা লালকেল্লা। অতিকায় এক জীবের মতো আবছা অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। থমথম করছে চারদিক। অথচ কিছুটা দূরেই দিল্লির চাঁদনি চক অনেক মানুষের কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে। চলছে বেচাকেনা।

অলক হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, এইদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে?

রজত বলল, আমার লেটেস্ট প্রেমিকা সারদার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। মেয়েটিকে দেখলে তুই চমকে উঠবি। তমিলনাড়ুর মেয়ে। পেশায় নার্স। নেফার কাছে কোনও এক হাসপাতালে চাকরি করছে। তোর কাজে লাগবে।

আমার কাজে লাগবে?

চকিতে অলকের সমস্ত স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। কী বলতে চায় রজত? নেফার কাছে কোনও এক হাসপাতালে রজতের প্রেমিকা সারদা চাকরি করে। সে নাকি অলকের কাজে লাগবে! তার মানে, সে যে নেফা যাচ্ছে, সেটা রজত জানে।

অর্থাৎ?

তার যাওয়াটা গোপন নেই? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? মাত্র একঘণ্টা আগে সে প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে নির্দেশ পেয়েছে। এর মধ্যেই রজত সেন নামক এয়ার ফোর্সের একজন পাইলট সে খবর জানতে পারল? অর্থাৎ, গোপন খবরটা আর গোপন নেই। কেন সে যাচ্ছে—তাও নিশ্চয়ই রজত জানে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল অলক।

মুখে বলল, তোর প্রেমিকা আর আমার কী কাজে লাগবে। তুই তো জানিস, মেয়েদের সংশ্রব সবসময় আমি এড়িয়ে চলি।

কেন! মিলাইকে এখনও ভুলতে পারিসনি?

মিলাই!

অনেকদিনের পুরোনো একটা ব্যথার জায়গায় কেউ যেন খোঁচা মারল। সারা শরীরটা একবার কেঁপে উঠল অলকের। মিলাই! এটা তো একটা নাম নয়। একটা সঙ্গীত। সুরময় যার রেশ অলকের বুকের মাঝে রিনরিনিয়ে বাজে। একটা ব্যথা, একটা যন্ত্রণা, তার সঙ্গে অফুরন্ত আনন্দের ধারা। সব মিলিয়ে একটা মিষ্টি মেয়ের নাম—মিলাই।

হৃদয়ের গভীর গোপনে সানাই-এর যে-সুরটা বেজে উঠতে চাইছিল, সেটাকে কঠিন চোখে শাসন করল অলক। উদাস চোখ দুটো থিরথির করে কেঁপে উঠল। এখন ভাবাবেগের সময় নয়। রজতের পরের কথায় সমগ্র মন-প্রাণ আবার সজাগ হয়ে উঠল।

রজত ফিসফিসানি সুরে বলল, অলক, তুই যে-কাজের ভার নিয়ে কাল রওনা হচ্ছিস সেটা আমি জানি। আমি ডিটেল হয়েছি তোর 'স্ট্যান্ড বাই' এয়ারক্র্যাফ্টের পাইলট হিসাবে। তোকে নেফা থেকে নিরাপদে দিল্লি ফিরিয়ে আনাই আমার কাজ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোর আর আমার পিছনে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর লেগেছে। খুব সাবধানে থাকিস।

BanglaBook.org

পরক্ষণেই পাকা অভিনেতার মতো গলার স্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়ে দিয়ে বলল, তাহলে তোর মিলাই-এর আর কোনও খবরই পাসনি?

অলক ঘোষের মনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এ কোন রজত? কী বলল সে? একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই সামনের অন্ধকার থেকে কে যেন এগিয়ে এল। অলক দেখল, স্কার্ট পরিহিতা একজন রমণী। আবছা আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অলক।

রজত পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বান্ধবী সারদা কৃষ্ণমূর্তি। আর এ হল আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেজর অলক ঘোষ।

নিজেকে সামলে নিল অলক। মেয়েটি অবিকল যেন মিলাই-এর প্রতিচ্ছবি। শুধু তফাত গায়ের রং-এ। মিলাই ছিল কাঁচা হলুদে সূর্যের আলো ঠিকরে-পড়া রঙের স্বপ্নময়ী সান্ত্বনা। আর এ হল তামিলনাড়ুর স্বাভাবিক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মূর্তিময়ী যৌবনের আবেদন। তফাত আছে বইকী। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে চমকে ওঠার মতোই মিল।

অলক ঘোষ মুহূর্তে 'মেজর'-এ রূপান্তরিত হল। রজতের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বাইরে রজত জানে তার পরবর্তী ডিউটি কী। আর রজতের কথা অনুযায়ী তার পিছনে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ঘুরছে। সারদা হল রজতের বান্ধবী। তাকে বিশ্বাস করা যায় কি?

ইংরেজিতে আলাপ শুরু হল তিনজনের। পায়ে-পায়ে হাঁটতে লাগল চাঁদনি চকের দিকে। সারদা বলল, সেন তো আপনার কথা বলতে অজ্ঞান। ওর কাছে আপনার প্রশংসা এত শুনেছি যে, বহুদিন থেকেই আপনাকে আমার দেখার ইচ্ছা। আজ সে-আশা পূর্ণ হল।

উদাস চোখে সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে অলক বলল, ধন্যবাদ।

সারদার চোখের যেন পলক পড়ে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহাচ্ছন্নের মতো বলল, ইউ আর রিয়েলি হ্যান্ডসাম মিস্টার ঘোষ।

আবার বলছি ধন্যবাদ, মিস কৃষ্ণমূর্তি।

আপনি আমাকে সারদা বলেই ডাকবেন।

অলকের কপালে চিন্তার রেখা পড়ল। মেয়েটি কি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে?

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে অলক বলল, তার কি কোনও প্রয়োজন আছে, মিস? আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না সন্দেহ। হয়তো আজকের আলাপই শেষ আলাপ।

অপমানে সারদার মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এল।

অলক বলল, আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য ও-কথা বলিনি, মিস কৃষ্ণমূর্তি। আমরা মিলিটারি মানুষ। লোকালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই কম। তবে আপনাকে আমার মনে থাকবে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অলক। সাড়ে দশটা। বুঝতে পেরে রজত বলল, তোকে আর দেরি করাব না, অলক। তুই যা। গুডনাইট।

চাঁদনি চকের হালকা ভিড়ের মাঝে ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলমান একটা ট্যাক্সি থামিয়ে অলক উঠে পড়ল।

অলক ভেবেছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে যে-কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা শুরু হবে নেফার সেই আর্মি ইউনিট থেকে। কিন্তু এখন বোঝা গেল, তার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এখন থেকে প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। সময়ের হিসাবে মাত্র দেড়ঘণ্টা সে অপচয় করেছে। অপচয়! না, ভুল বলা হল। রজতের সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎ তাকে সচেতন করে দিয়েছে। মনে করিয়ে দিয়েছে, সে হল মেজর অলক ঘোষ। ভারত সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী। মালহোত্রার ভাষায়, মিলিটারির গৌরব।

বাড়ির কাছে ট্যাক্সি থামাতে ভাড়া মিটিয়ে অলক নেমে পড়ল।

BanglaBook.org

তারপর সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলল তার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। ব্যাচেলার মানুষ। সংসারের দিকে কোনও আকর্ষণ নেই। অথচ তার মতো দায়িত্ববান অফিসার খুব কমই দেখা যায়। এটা সকলেই জানে।

চাবি খুলে নিজের ঘরের মধ্যে পা দিল অলক। অন্ধকার ঘর। দূরের লাইটপোস্টের আলো আবছা ভাবে মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে। আলোর সুইচটা 'অন' করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল সে। ঘড়িতে তখন এগারোটা।

দু-মিনিট বা তিন মিনিট সময় কেটেছে। সহসা এক ভরাট গলার আওয়াজে চমকে উঠল অলক।

কে যেন বলছে, নমস্কার, মেজর ঘোষ। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু প্রয়োজনটা খুবই জরুরি—তাই আর অপেক্ষা না করে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি।

বিদ্যুচ্চমকের মতো বিছানার ওপর উঠে বসল অলক। চকিতে দেখে নিল, ঘরের একমাত্র দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এবং মুহূর্তের মধ্যে কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা হাতের মুঠোয় চলে এল। কেউ কি ঘরের মধ্যে আগে থেকে লুকিয়েছিল?

কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, অলকবাবু, ভারত সরকার আপনাকে যতখানি গুরুত্ব দেয়, আমরাও ঠিক ততখানি দিই। আপনার কাজের ওপর আমাদের ভরসা আছে। তাই অনুরোধ, নেফায় গিয়ে আপনি দলিলের একখানা ফটোস্ট্যাট কপি অথবা মাইক্রোফিল্মটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন। এর জন্যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অলক ইতিমধ্যে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে। তারপর রিভলভারটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল সুইচবোর্ডের দিকে। পরপর কয়েকটা সুইচ টিপে দিল। রান্নাঘর, বাথরুম, ডাইনিং স্পেস নিমেষের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকাল অলক। কেউ নেই। খাটের নীচে, পরদার আড়াল, রান্নাঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলল। আশ্চর্য, কোনওখানে মানুষের ছায়ামাত্র নেই। তাহলে এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী কোথা থেকে কথা বলছে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে?

সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর তখন বলে চলেছে, আপনাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনি যদি আমাদের কথামতো কাজ করেন, সরকারকে আমরা এ-বিষয়ে কিছুই জানাব না। আপনি নিরাপদে আসল দলিলখানা নিয়ে দিল্লি ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, স্বয়ং ভগবানও আপনার মৃত্যু রোধ করতে পারবে না।

অলক এক দৌড়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সামনেই লাইটপোস্টের আলোয় সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার। মানুষ কেন, একটা ইঁদুর থাকলেও তাকে স্পষ্ট দেখা যেত।

জানলা বন্ধ করে দিল অলক। হাতের পেশিগুলো শক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। একটা দারুণ উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অলকের। কে কথা বলছে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে নিজেকে?

কণ্ঠস্বর বলেই চলেছে, যদি আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে দয়া করে আপনার শোওয়ার ঘরের আলোটা তিনবার নেভাবেন, তিনবার জ্বালাবেন। তাহলেই আমরা সব জানতে পারব। এবং কথা দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনি পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। বাকিটা কাজ মিটলে। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।

BanglaBook.org

ভৌতিক কণ্ঠস্বর থেমে গেল। ঘরের মধ্যে নিদারুণ স্তব্ধতা। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে সারা মন ভরে গেল অলকের। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। আবার সবক'টা ঘর খুঁজে ফেলল অলক। সে ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই পুরো অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে। তবে কে কথা বলল?

ভূত?

নিজের মনেই হেসে ফেলল অলক। চোখ রাঙিয়ে শাসন করল শৈশবের মনটাকে, শাট আপ! ঠাকুমার কোলে শুয়ে ভূতের গল্প শোনার দিন অনেকদিন আগেই চলে গেছে। এখন তুমি মেজর ঘোষ। আর্মি অফিসার। দেশের সৈনিক। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গীকৃত। ভুলে যেও না, ধোঁয়ার দেখা পেলে তার পিছনে আগুনের অস্তিত্ব থাকতেই হবে।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল অলক।

অবশেষে পাওয়া গেল। ভৌতিক কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিভলভারটা পকেটে পুরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল অলক।

একটা টেপরেকর্ডার।

বই-এর র‍্যাকের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা। সেখান থেকে একজোড়া তার চলে গেছে ঘরের সুইচবোর্ডে। ফলে যখন অলক ঘরের আলো জ্বালাবার জন্য সুইচটা 'অন' করেছিল, তখন নিজের অজান্তে টেপরেকর্ডারটাও চালু করে দিয়েছিল।

টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিল অলক। বিদেশি জিনিস। ছোট অথচ শক্তিশালী। এ-সি মেনস-এর সঙ্গে রেকটিফায়ার লাগানো। স্পুলটা রি-ওয়াইন্ড করে টেপটি আবার চালু করে দিল অলক।

আবার শোনা গেল সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর, নমস্কার, মেজর ঘোষ। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।

দুই ঃ স্মৃতি, তুমি বেদনার

পালাম এয়ারপোর্ট থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন যখন আকাশের নীলে মিলিয়ে গেল, তখন অলকের ঘড়িতে সকাল ছ'টা।

কাল থেকে একটার-পর-একটা বিস্ময় যেন অলকের জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রথমত, এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে তার নির্বাচন। তারপর, চাঁদনি চকে এককালের কলেজী বন্ধু রজতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রজতের বান্ধবী সারদা—যার সাথে অলকের স্বপ্নের রানি মিলাই-এর মিল আছে।

কিন্তু এতগুলো চমকপ্রদ ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে, আজকের সকালের বিস্ময়। বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে অলক আবিষ্কার করল, তার পাশের সিটে সারদা বসে আছে।

চোখাচখি হাতেই সারদা বলল, গুডমর্নিং, মিস্টার ঘোষ।

সবিস্ময়ে অলক বলল, আপনি!

মিষ্টি হেসে সারদা বলল, ছুটি শেষ। ডিউটিতে জয়েন করতে চলেছি।

এয়ার হোস্টেস তখন বলতে শুরু করেছে, গুডমর্নিং লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকের ফ্লাইট পাটনা, গৌহাটি হয়ে বেলা এগারোটার সময় ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে পৌঁছাবে। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

BanglaBook.org

এয়ার হোস্টেসের বক্তব্য শেষ হতেই হালকা সেতারের সুরে জায়গাটা ভরে উঠল।

অলক জিগ্যেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

নেফা।

নেফা—কোথায়?

চেংগেল।

চেংগেল!

চমকের ওপর চমক। অলকেরও গন্তব্যস্থল চেংগেল। ভারত-চীন সীমান্তে নেফার অন্তর্গত ছোট্ট একটি জনপদ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার দিকে তাকাল অলক। চোখের পাতা নাচিয়ে দু-গালে টোল ফেলে সারদা বলল, কাল রজতের কাছে আপনার মিলাই-এর গল্প শুনলাম। আরও শুনলাম, আমাকে নাকি অবিকল মিলাই-এর মতো দেখতে। সত্যি নাকি, অলকবাবু?

মিলাই—মিলাই—মিলাই! মুখটা ব্যথাতুর হয়ে উঠল অলকের।

চকিতে বাঁ-হাতের তিনটে আঙুলে একটা বিশেষ মুদ্রা করল সারদা। আবার একটা চমক। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মালহোত্রা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিশেষ মুদ্রার প্রদর্শনকারী তার বন্ধু। অর্থাৎ, সারদা তার বন্ধু। একই কাজের ভার নিয়ে দুজনে চলেছে। অর্থাৎ, সারদাকে বিশ্বাস করা যায়।

অলক বলল, আপনাকে ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমা চাইছি, মিস কৃষ্ণমূর্তি।

ও-প্রসঙ্গ এখন থাক, অলকবাবু।—বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল সারদা।

ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না অলকের। এয়ারক্র্যাফটটা বর্তমানে একটা পাবলিক প্লেস ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সাবধানতার প্রয়োজন আছে বইকী।

সারদা বলল, সত্যি বলছি, আমাকে আর-একটা মেয়ের মতো দেখতে জেনে আমি কিছুতেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। বলবেন মিস্টার ঘোষ, আপনার মিলাই-এর গল্প?

আবার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল অলকের।

মিলাই! এ তো শুধু একটা নাম নয়। একটা বেদনা। অনেক যন্ত্রণা দিয়ে অলকের বুকের মধ্যে যে-ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখান থেকে নতুন করে রক্তের ধারা নেমে এল।

সে কে?

'মিলাই' নামে সেই ছোট্ট মেয়েটি, যার সঙ্গে অলকের বয়সের তফাত অনেক, সেই মেয়েটিকে অনেকবার, অনেকদিন দেখেছে সে।

দুধে-আলতা রঙে, পটল-চেরা চোখে সে এক স্বপ্নের দেশের মেয়ে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সে তার মামার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখল মিলাইকে।

বাচ্চাদের নাটক হবে। তাই মেকাপ দেওয়ার জন্য ডাক পড়ল অলকের। সন্ধে থেকে একজনের পর একজনকে মেকাপ দিয়ে চলেছে অলক। মেকাপ টিউব, ফেস পাউডার, রুজ আর আইব্রো পেনসিলে তারা একে-একে রূপান্তরিত হচ্ছে নাটকের চরিত্রে। অবশেষে মেকাপ নেওয়ার জন্য এগিয়ে এল বছর বারোর একটা মেয়ে।

দ্রুত হাত চলতে লাগল অলকের। মেকাপের গুণে রং যেন ফেটে পড়তে লাগল মেয়েটার। ফেস পাউডারের প্রলেপ দিয়ে, আইব্রো পেনসিলের ছোঁয়ায় চোখ দুটোকে স্বপ্নময় করে দিল অলক। তখনও তার মনে ঝড় ওঠেনি।

কিন্তু যে-মুহূর্তে সিঁদুরের টিপ পরিয়েছে মেয়েটির কপালে, সেই মুহূর্তে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে হাজার সুরের ঐকতান বেজে উঠল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্নের রাজকন্যায় পরিণত হল মেয়েটি। এত রূপ সম্ভব একটি মেয়ের দেহে?

একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ছোট্ট কপাল, টানা-টানা ডাগর দুটি চোখ, ছবির মতো ভুরু, পাতলা

BanglaBook.org

নাক আর চাপা চিবুকে এ কাকে দেখছে অলক? স্বর্গের মেনকা, উর্বশী কি এর চেয়েও সুন্দরী ছিল? মেনকার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্রেরও কি তারই মতো অবস্থা হয়েছিল?

নিজেকে হারিয়ে ফেলল অলক। কতক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—মনে নেই। শুধু মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে জগতের সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। সময় বইছে না। নদীর জলে স্রোত নেই। সাগরের জলে উথালি-পাথালি নেই। অলক তখন কোথায়?

চমক ভাঙল মেয়েটার কথায়, যাঃ, অমন করে তাকিয়ে থাকলে আমার বুঝি লজ্জা করে না!

বাস্তবে ফিরে এল অলক। লজ্জার হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোণে। এই হাসি, মুখের এই স্বর্গীয় অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা। অলকের মনে হল, সে ধন্য হয়ে গেছে।

মেয়েটি আবার বলল, আর কতক্ষণ লাগবে তোমার সাজাতে?

এতক্ষণে জবাব দিতে পারল অলক, এই তো হয়ে এল।

শেষবারের মতো পাউডারের পাফ বোলাতে-বোলাতে অলক বলল, কী নাম তোমার?

মিলাই।

সেই সুর বেজে উঠল অলকের মনে।

তারপর কতবার, কতদিন মিলাইকে দেখল সে। রূপনারায়ণ নদীর চরে, খোলা মাঠে, সবুজ গাছের ছায়ায় সে আর মিলাই খেলে বেড়াল, গল্প করল।

মিলাই হাসলে তার বুকে ঝড় ওঠে। মিলাই-এর চোখে জল দেখলে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করে। চারিদিকে শুধু মিলাই, মিলাই আর মিলাই।

কলকাতায় ফিরে এসে আর পড়ায় মন বসে না। বই খুললে বই-এর পাতায় মিলাই-এর ছবি ভেসে ওঠে। চোখ বন্ধ করলে মিলাই হাসতে থাকে। অলক যেন পাগল হয়ে যাবে।

দু-একমাস ছাড়া-ছাড়াই সে দৌড়ে যায় তার মামাবাড়ির গ্রামে। কলকাতা থেকে মাত্র দু-ঘণ্টার পথ। দিনগুলো আবার রঙিন প্রজাপতির মতো উড়তে থাকে। তারপর একদিন অবাকবিস্ময়ে অলক আবিষ্কার করল, মিলাই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে।

শাড়িপরা অবস্থায় প্রথম মিলাইকে দেখে অলক বলেছিল, ইচ্ছে করছে এখুনি তোমাকে আমার বউ করে নিয়ে চলে যাই।

যাঃ! লজ্জায় লাল হয়ে ছুটে পালিয়েছিল মিলাই। পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল ধরে ফেলেছিল অলক।

সিনেমার যেমন ফ্রিজ শট থাকে, সেই মুহূর্তে অলক ও মিলাইও বুঝি পটে আঁকা ছবির মতো হয়ে গেছিল। দুজনেই দুজনের চোখের গভীরে কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেছিল। ঈথার তরঙ্গের মতো, হাজার-হাজার কথা পরস্পরের বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছিল।

কিন্তু সেটা শুধু কিছুক্ষণই।

মিলাই এগিয়ে এসেছিল অলকের কাছে। একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ফিসফিস করে বলেছিল, আমারও ইচ্ছে করছে—।

কী? আরও ফিসফিসিয়ে অলক প্রশ্ন করেছিল।

তোমার বউ হয়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতে।

তারপরেই অলকের হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে পালিয়েছিল।

এই পর্যন্ত সবটাই সুখের স্মৃতি।

কিন্তু...।

তারপর! তারপর?

অলক ভাবতে পারে না, বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। কপালের শিরা দুটো ছিঁড়ে

BanglaBook.org

যেতে চায়।

অথচ অলক কত অসহায়। বিশ বছরের তরুণ হয়েও তার কিছু করার ছিল না। মিলাই যেন হারিয়ে গেল।

সেই দুঃস্বপ্নের দিনে বেলা দুটোর সময় স্কুলের ছুটির পর মিলাই বাড়ি ফিরছিল। সঙ্গে আর কোনও সাথী ছিল না। স্কুল থেকে বাড়ি আসার পথে প্রতিদিন মিলাইকে একটা 'জাতীয় সড়ক' অর্থাৎ বম্বে রোড পার হয়ে আসতে হয়।

'জাতীয় সড়ক' অর্থাৎ যে-পথ দিয়ে প্রতিদিন শত-শত লরি মালপত্র নিয়ে দৈত্যের মতো উর্ধ্বশ্বাসে যাতায়াত করে—যে-পথে প্রতি তিনদিনে একটা করে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই পথ অতিক্রম করে মিলাইকে যাতায়াত করতে হয়।

সেইদিন দুপুরবেলা, নির্জন পথ ধরে মিলাই আসছিল। যে-মুহূর্তে বম্বে রোডে সে পা রেখেছে, একটা ট্রাক হঠাৎ এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে শয়তানের মতো কয়েকটা লোক তার মুখ বেঁধে তাকে ট্রাকে তুলে নিল। তারপর ছুটে চলল বম্বের দিকে।

মিলাই হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক থানা-পুলিশ করা হল, কিন্তু মিলাই নামক অলকের স্বপ্নের রানিকে আজ বারো বছরের মধ্যে একবারও দেখা যায়নি।

তিন : কর্নেল চ্যাটার্জি

ডিব্রুগড় থেকে হেলিকপ্টারে অলক যখন চেংগেল পৌঁছাল, তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সারদাকে ডিব্রুগড়েই 'গুডবাই' জানিয়ে এসেছে অলক। কারণ, সারদা চেংগেলে আসবে বাসে চড়ে। আগামীকাল সকালে সে চেংগেল পৌঁছাবে। অলকের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা ছিল।

চেংগেলের ছোট 'হেলিপ্যাডে' যখন সে অবতরণ করল, তখন সন্ধ্যা বেশ ভালোভাবেই আসর জমিয়ে বসেছে। তারই মাঝখান থেকে মিলিটারি পোশাক পরা একজন এগিয়ে এল।

ওয়েলকাম টু চেংগেল, মেজর ঘোষ।

অলক তাকিয়ে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। এখানকার আর্মি ইউনিটের অফিসার কম্যান্ড। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল অলক।

গুড ইভিনিং, স্যার। মেজর ঘোষ ইজ রিপোর্টিং টু ইউ।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। পথে তেমন কোনও কষ্ট হয়নি তো?

মৃদু হেসে অলক বলল, না, তেমন কিছু নয়।

তারপর কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর অফিসে এসে হাজির হল অলক।

সুন্দর সাজানো-গোছানো অফিস। অফিসার-কম্যান্ডিং-এর অফিস যেমন হওয়া উচিত। ঠিক তেমন। শুধু দৃষ্টিকটু লাগল একটা জিনিস। অফিস ঘরের এক কোণে পুজোর সরঞ্জাম। ছোট একটা জলচৌকির ওপর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তার সামনে ধূপদানি, কোশাকুশি প্রভৃতি নানাবিধ পুজোর সরঞ্জাম।

অলকের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হতে দেখে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, আপনাদের ভাষায় আমি একটু বেশি পরিমাণ আস্তিক। আমার দিন শুরু হয় রাধাকৃষ্ণের পুজো দিয়ে।

আরও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। ইউনিটের কাজ এবং সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে অলকের দায়িত্ব কী হবে—সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, আমাদের ইউনিটে কিছু সিভিলিয়ান লোকও কাজ করে। আপনি কখন থেকে কাজ শুরু করতে চান, মেজর ঘোষ?

BanglaBook.org

স্থির দৃষ্টিতে কর্নেল চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে অলক বলল, সত্যি কথা বলতে কী, দিল্লিতেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কথা শুরু করার আগে আমার অন্য ধরনের কিছু খবর চাই।

যথা?

চেংগেল শহরটা এখান থেকে কতদূর?

প্রায় দশমাইল হবে। আমাদের ইউনিট থেকে চেংগেল পর্যন্ত শুধু একটা রোড লিঙ্ক আছে।

পোস্ট অফিস?

হেড পোস্ট অফিস আছে। চেংগেল এক্সটেনশান কাউন্টার।

শুনেছি এখানে একটা হাসপাতাল আছে। সেটা কোথায়?

চেংগেলে। কথাটা হাসিমুখেই বললেন কর্নেল চ্যাটার্জি। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অলক ঘোষের বুকের ভেতরটা যেন তিনি তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতে চাইছেন।

তারপর হিসহিসানি স্বরে বললেন, এক্সকিউজ মিস্টার মেজর ঘোষ। চেংগেল হসপিটাল সম্বন্ধে আপনার ইন্টারেস্ট কি মিস সারদা কৃষ্ণমূর্তির জন্যে?

ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল অলক। এবং দেখা গেল, কর্নেল চ্যাটার্জি সেই চমকটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন। বললেন, দেন আই অ্যাম রাইট! তাহলে আপনার ফারদার ইনফরমেশনের জন্যে জানাচ্ছি, মেজর ঘোষ, আমাদের নিহত সিকিউরিটি অফিসার মেজর নায়ারের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল মেয়েটি। প্রায়ই দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত। সেইজন্যে আপনাকে বলছি, মিস সারদা কৃষ্ণমূর্তিকে সবসময় দূরে-দূরে রাখবেন।

আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ, স্যার। এইবার আসল কথায় আসা যাক।

তার আগে চলুন, ডিনার শেষ করে ফেলা যাক। সেখানে অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে অফিসঘরের বারান্দায় এল অলক। এই ইউনিটের প্রতিটি বাড়িই একতলা। বাড়ির মেঝে এবং মেঝে থেকে দেওয়ালের তিনফুট পর্যন্ত পাকা। অর্থাৎ, ইট ও সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। বাকি দেওয়াল কাঠের তৈরি। ছাদ টিনের। অবশ্য পাকাবাড়ি মাত্র চারখানা। অফিস-কাজের জন্য দু-খানা। আর বাকি দু-খানা। আর বাকি দু-খানা মেস। একটা অফিসারদের, অন্যটা সাধারণ সৈনিকদের জন্য। থাকবার ব্যবস্থা তাঁবুতে। এ বিষয়ে অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে কোনও তফাত নেই।

ইউনিটের নিজস্ব জেনারেটর আছে। জেনারেটর চলে সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য কমিউনিকেশনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। সেটা চব্বিশ ঘণ্টাই চালু থাকে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অলক। অল্প চাঁদের আলোয় তার চোখে পড়ল, সামনে, দূরে—ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। অতিকায় জীবের মতো বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের একটানা গুমগুমানি আওয়াজ।

অলক যেন নিজেকে ভুলে গেল। রাতের নেফা সত্যিই রহস্যময়ী।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, লেট আস গো নাউ।

অলক লজ্জিত হয়ে বলল, আই অ্যাম সরি, স্যার। পাহাড়গুলো এত ভালো লাগছিল।

আপনি কি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?

না-না।

BanglaBook.org

হা-হা করে হেসে উঠলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। বললেন, না, না—এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এককালে আমারও ওসব বাতিক ছিল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই দুজনে মেসে পৌঁছে গেল। অন্যান্য অফিসাররাও ততক্ষণে এসে গেছে।

কর্নেল চ্যাটার্জিকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সবাইকে বসতে বলে চ্যাটার্জি বললেন, আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমাদের নতুন সিকিউরিটি অফিসার মেজর ঘোষ।

তারপর একে-একে পরিচয় করাতে লাগলেন, ক্যাপটেন স্যানিয়েল, মেডিকেল অফিসার। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সকলের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করল অলক।

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, আপনি কি দিল্লি থেকে আসছেন, ঘোষ?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

না এমনিই। জাস্ট এ কিউরিওসিটি। কারণ, আমিও দিল্লি থেকে এই জঙ্গলে এসেছি। সেইজন্যে যারা দিল্লি থেকে এখানে আসে, তাদেরকে আমার খুব আপনজন বলে মনে হয়।

আই সি। মেজর দেশপাণ্ডের মুখখানা মনের মধ্যে একে নিল অলক।

ডিনার শেষ হওয়ার পর কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর অফিসে এসে হাজির হল অলক। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চ্যাটার্জি সাহেবের কথায় জানা গেল, এখানে প্রায় সারা বছর ধরেই বৃষ্টিপাত হয়। কখনও-কখনও এমন হয়, দিন পনেরো ধরে সূর্যের মুখ দেখাই গেল না।

অফিসঘরের দরজা বন্ধ করে কোমরের বেল্ট খুলতে-খুলতে চ্যাটার্জি বললেন, এইবার বলুন—আপনার আর কী জানার আছে?

দলিলটা কোথায় আছে? অলক একেবারে আসল কথা দিয়েই তার বক্তব্য শুরু করল।

চ্যাটার্জি বললেন, মেজর ঘোষ, আমার ওপর অর্ডার আছে, আমি যেন সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করি। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ওসি এবং জুনিয়ার অফিসারের নয়। এই কাজের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছাই শেষ কথা। সেক্ষেত্রে আমাকেও আপনার আদেশমতো কাজ করতে হবে। এইরকমই নির্দেশ। এখন কথা হল, দলিলটা বর্তমানে নিরাপদেই আছে। আপনি কি এখনই ওটা চান?

অলক বলল, না, এই মুহূর্তে নয়।

দলিলটা সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আপনাকে জানাই। ওটা আমার হাতে আসার পর আমার প্রধান চিন্তা হয় কোথায় ওটাকে রাখা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, মাটির মধ্যে পুঁতে রাখব। একদিন গভীর রাতে আমার অফিসের সামনে নিজের হাতে এক ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়লাম। তারপর কী মনে হতে গর্তের মধ্যে ওটা না রেখে গর্তটা আবার বুজিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, ঘোষ, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গর্তটা আবার কে যেন খুঁড়ে রেখেছে।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান, দলিলটা ওখানে থাকলে সেই রাত্রেই চুরি হয়ে যেত?

নিশ্চয়ই!

অর্থাৎ শত্রুপক্ষ সবসময়ই আপনার ওপর নজর রেখেছে?

একজ্যাক্টলি।

তারপর?

সেই থেকে দলিলটা আমি স্টিল আলমারির মধ্যে বন্ধ করে রাখতাম। কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের ঘোরটা কাটতে অনুভব করলাম, আমার কপালে একটা ঠান্ডা

BanglaBook.org

জিনিসের স্পর্শ। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিল আলমারির কাছে একটা পেনসিল টর্চের আলো নড়াচড়া করছে আর কানের কাছে কে যেন ইংরেজিতে বলল, একদম নড়াচড়া করবে না। তাহলে এক গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ফলে আমারই চোখের সামনে ওরা দলিলটার ফটো তুলে নিয়ে চলে গেল। পরের দিনই ম্যাটারটা আমি হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করি।

এই পর্যন্ত বলে চ্যাটার্জি একটু থামলেন। এমনসময়ে দপ্ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। চকিতে পকেটের মধ্যে হাত ঢোকাল অলক।

চ্যাটার্জি বললেন, দশটা বেজে গেল। জেনারেটর 'অফ' করে দিল।

অলক আশ্বস্ত হল। ভালো করে কান পেতে শুনল, জেনারেটরের একটানা গুমগুমানি আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না।

চ্যাটার্জি বলতে লাগলেন, এরপর থেকে আমি আরও সাবধান হয়ে গেলাম। দলিলটা আলমারি থেকে সরিয়ে অন্য একটা জায়গায় রাখলাম। এবং আজ পর্যন্ত সেটা নিরাপদেই আছে।

ঘরের অন্ধকারটা যেন অসহ্য লাগছে অলকের। জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে আরও উজ্জ্বল, আরও মোহময়ী লাগছে।

এই ইউনিটের সিকিউরিটি কতখানি নিরাপদ?

সেন্ট পারসেন্ট।

অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকা বা ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া সকলের অজান্তে—সম্ভব নয়, কেমন?

একজ্যাক্টলি।

অর্থাৎ, সেদিন রাত্রে যারা আপনার ঘরে ঢুকেছিল দলিলের ফটো তুলতে, তারা আমাদের ক্যাম্পের লোক হলেও হতে পারে, তাই না?

চিন্তিত স্বরে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা, ঘোষ। আমাদের এই ক্যাম্প—কিছু অফিসার, দুজন জে সি ও আর শ'দেড়েক জওয়ান। ওয়ার্কিং আওয়ার্সে আরও দশজন সিভিলিয়ান—এর মধ্যে কে বা কারা শত্রুপক্ষীয় দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবেই।

চ্যাটার্জির কথা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুৎবেগে অলক ছুটে গেল জানলার কাছে। তারপর পকেট থেকে রিভলভার বের করে দুবার 'ফায়ার' করল। নৈশ স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল রিভলভারের আওয়াজে। সচকিত হয়ে উঠল ছোট ইউনিট।

বিস্মিত চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার, ঘোষ?

আমার সঙ্গে আসুন।

দরজা খুলে দ্রুত বাইরে এল অলক। পিছনে কর্নেল চ্যাটার্জি। এগিয়ে গেল সামনের ছোট ময়দানের দিকে। ময়দানের একাংশে সারি-সারি তাঁবু—যার মধ্যে জওয়ানরা এতক্ষণ বিশ্রাম করছিল। রিভলভারের আওয়াজে প্রায় সকলেই তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অলক আর চ্যাটার্জি এগিয়ে যাচ্ছে। উলটোদিক থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো তাদের দিকে আসছে।

হোয়াট হ্যাপেনড, স্যার? এনিথিং রং?

গলা শুনে বোঝা গেল মেজর দেশপাণ্ডে।

এবং তার কয়েক মিনিট পরেই আবিষ্কার হল, ছোট একটা ঝোপের ধারে একটা দেহ পড়ে আছে।

একটা মানুষের মৃতদেহ। পিঠের ওপর ছ'ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো ক্ষত। প্রায় উলঙ্গ একটা মানুষ। মাথায় পালক-গোঁজা বাঁশের মুকুট। দু-কানে বড়-বড় দুটো বালা। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। নিম্নাঙ্গে ছোট্ট

BanglaBook.org

একফালি কাপড় কোনওরকমে লজ্জা নিবারণ করেছে।

চ্যাটার্জি বললেন, মাই গুডনেস, এ কোথা থেকে এল?

অলক প্রশ্ন করল, এ কে?

এখানকার জংলি আদিবাসী। অফিসারদের জুতো পালিশ করত। কিন্তু সন্ধের পর ক্যাম্পের মধ্যে থাকার অনুমতি ছিল না। হাওএভার,—চ্যাটার্জি মুহূর্তে অফিসার কম্যান্ডিং-এ রূপান্তরিত হলেন, মেজর ঘোষ, আপনি এই ইউনিটের সিকিউরিটি অফিসার। ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করে পরশু আমায় রিপোর্ট দেবেন।

চার ঃ লালা বাবা

পরের দিন বিকেল চারটের সময় কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরে ডাক পড়ল অলকের। ঘরে ঢুকে অলক দেখল চ্যাটার্জি বাইরে বেরোবার জন্য তৈরি। অলককে দেখেই তিনি বললেন, আজ সারাদিন ইচ্ছে করেই আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার কান, চোখ আর হাতের অব্যর্থ নিশানার জন্যে। কাল রাত্রে আমিও তো আপনার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু কই—আমার চোখে তো কিছুই পড়েনি বা কানেও কিছু শুনিনি। সত্যি, আমি গর্বিত যে, আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একজন যোগ্য অফিসারকেই নির্বাচন করেছেন এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে।

ধন্যবাদ, স্যার।

চলুন—আজ আপনাকে আশেপাশের কিছুটা জায়গা ঘুরিয়ে আনি। তারপর সন্ধে হলে যাব আদিবাসীদের উৎসবে। সেখানে লালা বাবাকে দেখাব।

লালা বাবা?

হ্যাঁ, লালা বাবা। এখানে যে-উপজাতি বাস করে, তাদের সর্দার, পুরোহিত হল ওই লালা বাবা। আটানব্বই বছর বয়েস, কিন্তু এখনও যুবতী মেয়েগুলোর সঙ্গে সমানতালে নাচতে পারে।

বলতে-বলতে দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জিপের কাছে এল। জিপের ড্রাইভার অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল।

চ্যাটার্জি বললেন, আজ আর তোমাকে লাগবে না। তুমি বিশ্রাম করো।

আর-একখানা স্যালুট দিয়ে ড্রাইভার প্রস্থান করল। অলককে আহ্বান জানিয়ে চ্যাটার্জি স্বয়ং ড্রাইভারের আসনে বসলেন। জিপ এগিয়ে চলল মেন গেটের দিকে।

গেটের সামনে আসতেই প্রহরী হাত দেখিয়ে জিপ থামাল। জিপের ভেতরটা পরীক্ষা করে লম্বা এক স্যালুট মারল। জিপ আবার এগিয়ে চলল সামনের চড়াই-এর দিকে।

অলক দেখতে লাগল চোখ মেলে। চারিদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনের সূর্যটা পাহাড়ের কোলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে নিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আর পাহাড়টাও সেই আনন্দে ক্ষণে-ক্ষণে নিজের রং বদলাচ্ছে।

ওপরের আকাশে রামধনু রঙের খেলা। আকাশে এত রঙের সমারোহ সমতল ভূমির দেশে দেখা যায় না। একই আকাশে জলভরা মেঘ, সোনাঝরা সূর্যের আলো, তার সঙ্গে হোলির রঙে রাঙানো আকাশ—এ বুঝি শুধু নেফাতেই দেখা যায়।

অলক মুগ্ধ হয়ে গেল।

জিপ চলেছে মন্থরগতিতে। এখন অলকের বাঁ-দিকে পাহাড়। আর ডানদিকে খাদ। খাদের

BanglaBook.org

অনেক নীচে সরু একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। নদীর কলকল আওয়াজ পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

চ্যাটার্জি বললেন, ওই নদীটার নাম হল ঘাই নদী। দারুণ স্রোত। আরও মাইল পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে।

অলক প্রশ্ন করল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

চেংগেল শহরের দিকে।

জিপ এগিয়ে চলল।

কিছু-কিছু সমতল জমিতে ধানের চাষ করা হয়েছে। আশেপাশে কিছু কুঁড়েঘরও নজরে পড়ল। নীচু মাটির দেওয়াল। চালে লম্বা-লম্বা ঘাস চাপানো। অলক অবাক বিস্ময়ে দেখল, এখানকার আদিবাসীরা সত্যিই এখনও 'অসভ্য' রয়ে গেছে।

পরুষদের পরনে 'কৌপীন' ছাড়া আর কিছু নেই। আর মেয়েরা একটা লুঙ্গিজাতীয় কাপড় বুকে বেঁধে রাখে। সেটাই হাঁটু পর্যন্ত ঝুলতে থাকে। মায়েরা তাদের পিঠের ওপর একটা কাপড়ে বাচ্চাকে বসিয়ে রাখে। দোলার মতো নিশ্চিন্তে বসে থাকে বাচ্চারা। পড়ে না।

চ্যাটার্জি বললেন, এবার ফেরা যাক। ওদের উৎসব শুরু হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

জিপ ঘুরিয়ে নিলেন চ্যাটার্জি। কিছুটা আসার পর এক জায়গায় জিপ থামিয়ে বললেন, এবার আমাদের হেঁটে যেতে হবে।

পাকা রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল দুজনে। সবে সন্ধ্যা নামছে সেখানে। অলকেব ভারি ভালো লাগল। আবছা আলো-আঁধারির মাঝখানে এইভাবে হেঁটে যেতে খুবই ভালো লাগছে অলকের।

কিছুটা যাওয়ার পরই গুমগুম করে একটা আওয়াজ শোনা গেল।

চ্যাটার্জি বললেন, এই হল ওদের বাজনা। এই বাজনার তালে-তালে ওরা নাচবে। একটা খুব সুন্দরী মেয়ে আছে। লালা বাবার মেয়ে। দারুণ ভালো নাচে।

আরও মিনিটপাঁচেক হাঁটার পর দেখা গেল।

জঙ্গলের মাঝখানে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। চার-পাঁচ ফুট ছাড়া-ছাড়া একটা করে মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। তারই আলোয় জায়গাটা আলোকিত। দেখা যাচ্ছে, জনাপঞ্চাশেক স্ত্রী-পুরুষ ইতস্তত চলাফেরা করছে।

অকস্মাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একজনের আবির্ভাব হল তাদের সামনে। ন্যাড়া মাথা, দু-কানে বড় বড় দুটো বালা। সারা মুখ বলিরেখায় ভরা। হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

অবোধ্য ভাষায় একবার চিৎকার করে উঠল লোকটা। অলক ভয় পেয়ে গেল। এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, কর্নেল চ্যাটার্জিও সেইরকম ভাষায় কী যেন বললেন। এইরকম কথোপকথন মিনিট-দুয়েক চলল। তারপর লোকটা হাসতে লাগল।

কী বীভৎস সেই হাসি।

অলকের শিরদাড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

তারপর লোকটা হাতছানি দিয়ে ওদের দুজনকে ডেকে এগিয়ে চলল।

চ্যাটার্জি বললেন, এই হল লালা বাবা। এদের সর্দার।

লালা বাবার নির্দেশে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর দুজনে বসল।

চ্যাটার্জি বললেন, প্রতি পূর্ণিমাতেই এদের এই উৎসব হয়।

ওদিকে বাজনার আওয়াজ তীব্র হয়ে উঠল। লালা বাবা চিৎকার করে উঠল একবার। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে-পুরুষের দল নাচ শুরু করল। কিছুক্ষণ নাচ চলার পর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। সেই গানের সুর যেন অলককে চমকে দিল।

BanglaBook.org

দেখা গেল, নাচের ভঙ্গিমায় একটা মেয়ে এগিয়ে আসছে। মশালের আলোয় দেখা গেল, মেয়েটির দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব। মেয়েটির গানের তালে-তালে বাজনা শুরু হল।

চ্যাটার্জি বললেন, এ হল হীরা। লালা বাবার মেয়ে।

মেয়েটি যখন নাচতে-নাচতে আরও কিছুটা কাছে এল, অলকের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হীরার দিকে। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা। বুকের ভেতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অলক পাথরের মতো বসে রইল। চোখের পলক আর পড়ে না।

নাচতে-নাচতে হীরার দৃষ্টিও পড়ল একবার তার ওপর। চোখ ঘুরিয়ে নিল। পরমুহূর্তে আবার তাকাল। আবার। আবার। নাচের তাল কেটে গেল তার। গানের সুরে ভুল হয়ে গেল।

কতক্ষণ?

সময়ের হিসাবে দু-চার সেকেন্ডের বেশি নয়। কিন্তু তার মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল।

নাচ-গান থামিয়ে রুদ্ধশ্বাসে হীরা দৌড়ে গেল ঘন জঙ্গলের দিকে। আর অলকের মুখ থেকে শোনা গেল এক বুকফাটা আর্তনাদ, মিলাই—!

তারপর তার জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল চ্যাটার্জির কোলে।

পাঁচ ঃ মাইক্রোফিল্ম

চ্যাটার্জি বললেন, আমি এই ইউনিটের প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু মাইক্রোফিল্মের সন্ধান কোথাও পাইনি।

অলক প্রশ্ন করল, কিন্তু এটা কি ঠিক যে, তারা দলিলটার ফটো তুলতে সমর্থ হয়েছে?

তা না পারলে, সেদিন ওরা আমাকে জীবিত ছেড়ে দিত না।

অলক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, মেজর নায়ারের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

চ্যাটার্জি বললেন, আমার ধারণা, মেজর নায়ার শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তারপর কোনও কারণে বনিবনা না হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হয়।

মাইক্রোফিল্মটা যে এখনও ক্যাম্পের মধ্যেই রয়ে গেছে, সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে?

মাইক্রোফিল্মটা যদি ওরা পেয়ে যেত, তাহলে আমার ধারণা, ওরা এখান থেকে চলে যেত, বা আমাদের ইউনিটের ব্যাপারে আর নাক গলাত না। কিন্তু দিল্লিতে আপনাকে ভয় দেখানো এবং পরশু রাত্রে একজন আদিবাসীর আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার চেষ্টা—এইসব দেখেই মনে হচ্ছে, ওরা এখনও হাতে কিছু পায়নি।

আরও কিছুক্ষণ নিজেকে চিন্তার গভীরে ডুবিয়ে রাখল অলক। মাইক্রোফিল্ম আর সামরিক দলিল—যার সঙ্গে তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। দলিলটা অবশ্য নিরাপদেই আছে। কিন্তু দলিলটা সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে সোজা দিল্লি চলে যাওয়া এবং মিস্টার মালহোত্রার হাতে তুলে দেওয়া—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অত সহজ নয়। তাহলে অলক ঘোষকে বিশেষ করে এখানে পাঠানোর কোনও প্রয়োজনই হত না।

কিন্তু কাজটা কতখানি কঠিন?

এখান থেকে দলিল ও মাইক্রোফিল্ম নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে শত্রুপক্ষ ঠিক কতখানি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে? ভাবতে লাগল অলক। কিছুটা হয়তো অনুমানও করতে পারল। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যাপারটা রয়ে গেল অন্ধকারে। দলিল নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে পরে তীব্র

BanglaBook.org

বাধার সম্মুখীন হয়ে সেটাকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আর তা যদি ঘটে, তাহলে অলক নিজেকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারবে না।

কাজে নামার আগে ওদের শক্তি কতখানি জানতে হবে।

অলক ঈষৎ মাথা নীচু করে চ্যাটার্জিকে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না। কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আপনি যে-কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন, তার জন্যে একটা কেন, প্রয়োজন হলে হাজারটা প্রশ্ন করবেন। আপনার সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক শুধুমাত্র ওসি আর সাবোর্ডিনেট অফিসারের নয়, তার চেয়েও বেশি। বলুন, আপনি কী জানতে চান?

আপনি—মানে আপনাকে আমি ঠিক কতখানি বিশ্বাস করতে পারি?

সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ-হাতের তিন আঙুলের এক বিশেষ মুদ্রা করলেন চ্যাটার্জি। অলকের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। এই মুদ্রার প্রদর্শনকারী তার বন্ধু।

অলক বলল, স্যার, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। এটা কেন করছি—সেটা পরে বলব।

বলুন, কী কাজ?

এই দলিলের ব্যাপারটা আর কে-কে জানেন?

সাধারণ জওয়ানদের বাদ দিলে প্রায় সবাই। কারণ, আমাদের ইউনিটের কাজটাই তাই।

আপনি সমস্ত অফিসার ও জেসিওদের জানান যে, আমি মাইক্রো ফিল্মটা খুঁজে পেয়েছি। এবং সেটা এখানে রাখা নিরাপদ নয়। তাই আজই বিকেলে আমি বাই রোড চেংগেল যাব। সেখানে মাইক্রো ফিল্মটা নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করব। আর আপনি আমার জন্যে একখানা জিপ ও দু-জন সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করবেন, যারা আমার সঙ্গে চেংগেল পর্যন্ত যাবে।

আপনি কি সত্যিই মাইক্রোফিল্মটা খুঁজে পেয়েছেন?

এখনও পাইনি। তবে আসল কাজে নামবার আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে নিতে চাই।

বেশ, তাই হবে। আজ লাঞ্চের সময় আমি সমস্ত অফিসারদের জানিয়ে দেব।

আর-একটা কথা, যদি আমি সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ফিরে না আসি, তাহলে আমার খোঁজ করবেন।

চ্যাটার্জিকে আর কোনও প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়ে অলক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল আরও অনেক ভাবনা নিয়ে।

বিকেল ঠিক চারটের সময় অলকের তাঁবুর সামনে জিপ এসে দাঁড়াল। একজন ড্রাইভার আর দুজন সশস্ত্র জওয়ান। দুজনের কাঁধে দু-খানা স্টেন এম সি ঝুলছে। অলক তৈরি হয়েই ছিল। ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিয়ে জিপে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের আসনে।

জিপ ছুটে চলল মেন গেটের দিকে। ডিউটি গার্ড নিয়মমাফিক গাড়ি পরীক্ষা করল। তারপর গাড়ি আবার এগিয়ে চলল।

কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। দেখা গেল, কালকের রাত্রির সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হীরা। পরনে কালকের পোশাক। চোখ-মুখের ভাব আনমনা। একটা ঘাস নিয়ে দাঁতে করে ছিঁড়ছে।

অলকের শরীর অবশ হয়ে এল। বুকের মধ্যে দামামা বাজতে শুরু করল। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে জিপটা থামাতে।

জিপ এগিয়ে চলেছে। অলকের সময় আর কাটছে না। অবশেষে একসময় ব্রেক কষে গাড়িটা থেকে গেল। চমকে ফিরে তাকাল হীরা।

BanglaBook.org

চার চোখের মিলন হল। জিপের ওপর অলক। আর নীচে, রাস্তার ধারে ঘাসের জঙ্গলে হীরা।

জীবনে এইরকম ক্ষণ খুব কমই আসে, যেখানে সময় স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত নিমেষের মধ্যে মুছে যায় স্মৃতি থেকে। এমনকী নিজেকেই ভুলে যায় মানুষ।

এই কি সেই ক্ষণ অলকের জীবনে? অলক কি ভুলে যাচ্ছে যে, সে একজন মিলিটারি মানুষ। মেজর অলক ঘোষ। গোলাগুলি বারুদ নিয়েই তার জীবন। এই ধরনের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া তার উচিত নয়।

অথবা ওই মেয়েটি! হীরা যার নাম। যে মিলিটারি দেখলে সামাজিক মানুষ দশ হাত দূর দিয়ে পথ হাঁটে, সেই ধরনের এক মানুষকে এমন তন্ময় হয়ে দেখবার কী আছে?

অলক আর হীরার জীবনে এই কি সেই স্থাবর মুহূর্ত?

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, কে জানে!

অলক মোহাচ্ছন্নের মতো ডাকল, মিলাই—।

কোন সাড়া নেই। পাথর-প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে হীরা। অলকের আহ্বান তার কানে গেল কি না বোঝা গেল না।

অলক আবার ডাকল, মিলাই। আমাকে চিনতে পারছ না। আমি অলক। বলে মাথার পি-ক্যাপটা খুলে ফেলল সে।

তবুও হীরা কিছু বলল না। জিপের ড্রাইভার আর প্রহরী দুজন অবাক-বিস্ময়ে দেখল, হীরা নামের 'অসভ্য' মেয়েটার দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।

অলক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জিপ থেকে নেমে পড়ল। অলককে নামতে দেখে হীরার ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল কয়েকবার। সারা শরীরটা দুলে উঠল একবার। তারপর চিৎকার করে উঠল, নেহী—ঈ—ঈ!

তারপর কোনও কিছু বোঝবার আগেই হীরা দৌড়াতে শুরু করল, ভয়াবহ খাদের দিকে। যে-খাদের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ঘাই নদী। শুধু পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল হীরার সুরেলা কণ্ঠের আর্তনাদ, নেহী—!

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অলক।

ড্রাইভার বলল, সাব—ও লালা বাবা কি লেড়কি আছে।

অলক ফিরে এল। জিপে উঠে বসল।

গাড়ি আবার এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ আগেই সূর্য ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

তবে কি অলকের ভুল হল?

লালকেল্লার আবছা অন্ধকারে সারদাকে দেখে যে-ভুল সে করেছিল, কাল রাত্রে মশালের আলোয় হীরাকে দেখে কি সে একই ভুল করেছে? হীরা কি মিলাই?

কিন্তু পশ্চিমবাংলার একটা মেয়ে, যাকে ট্রাক-ড্রাইভার জোর করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাকে নেফার চেংগেল নামক জনপদে আদিবাসীদের মাঝখানে দেখা যাবে—অলক কি একটু বেশি কল্পনা করে ফেলছে? এ যে রূপকথার গল্পকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু এমন কি ঘটে না?

তাহলে মিলাই এখন কোথায়?

তাকে দেখে, তার মুখে 'মিলাই' ডাক শুনে, হীরার চোখে জল আসে কেন?

অলকের মনে ঝড় বয়ে গেল। স্মৃতির হীরা, মিলাই সব একাকার হয়ে যায়।

হঠাৎ এক তীব্র আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে জিপটা একদিকে হেলে গিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে

BanglaBook.org

ধাক্কা মারল।

কোনওকিছু বোঝবার আগেই অলক ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখল, তার চারদিকে জনাদশেক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নেফার জঙ্গলে তখন অন্ধকার।

মুহূর্তে অলক ফিরে এল বাস্তব জগতে। পরনে তার সৈনিকের পোশাক। নিমেষের মধ্যে ডানহাতখানা পকেট থেকে পিস্তলখানা বের করে আনল। কিন্তু গুলি চালাবার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ল অলক।

ছয় ঃ শয়তানের সঙ্গে এক রাত

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন চারিদিকে অন্ধকার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল অলক।

তারপর একটু নড়বার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল, তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। চোখ মেলে তাকাল অলক। ঘরটা একেবারে অন্ধকার নয়। নীল আলোর আবছা আলোয় সবই পরিদৃশ্যমান।

শুয়ে-শুয়েই চারিদিকে তাকাল অলক। একটা ঘর। ঘর না বলে গুহা বলাই উচিত। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সে। মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা কীসের বুঝতে পারল না। অলক বুঝতে পারল, শত্রুর হাতে সে বন্দি।

হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল হিন্দিতে, এই যে, মেহমানের জ্ঞান ফিরে এসেছে। চলো—বড় কর্তার সঙ্গে মোলাকাতটা সেরে আসবে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল অলক, একজন কুৎসিতদর্শন মানুষ ঘরের কোণে বসে আছে। অলকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল সে।

তারপর এগিয়ে এসে তার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

বলল, এবার চলো। সোজা সামনের দিকে। কোনওরকম কায়দা করার চেষ্টা কোরো না। আমার পকেটে রিভলভার আছে।

অলক উঠে দাঁড়াল। মাথাটা অসহ্য ভারী। দেওয়াল ধরে কোনওরকমে টাল সামলে নিল অলক। তারপর এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

গলির মতো একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

লোকটার নির্দেশমতো চলতে লাগল অলক।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বড় ঘরে এসে উপস্থিত হল অলক। দেখল, তার সামনে জনাচারেক লোক চেয়ারে বসে আছে। এক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে অলক দুটি জিনিস লক্ষ করল।

ওই চারজনের মধ্যে একজন লালা বাবা।

আর-একজনের মুখে মুখোশ। বাকি দুজনকে দেখলেই বোঝা যায়, তারা ভারতীয় নয়। শয়তানের দৃষ্টিতে তারা অলকের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুখোশধারী বলল, আসুন, মেজর ঘোষ। আপনাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না। এখন স্পষ্ট করে আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চাই।

অলক কোনও জবাব দিল না। মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, আদিবাসীদের সম্মানীয় পুরোহিত হয়ে লালা বাবা কেন শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল? আর ওই লোকটা মুখোশ পরে আছে কেন? মুখোশ পরে আছে কেন—তার শুধু একটাই কারণ হতে পারে। লোকটা নিজের মুখ অলককে দেখাতে চায় না। কারণ, অলক তাকে চিনে ফেলতে পারে।

BanglaBook.org

তবে কি ওই মুখোশধারী তার পরিচিত?

মুখোশধারী বলল, মাইক্রোফিল্মটা কোথায়?

অলক এবারও জবাব দিল না।

আপনার সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু মাইক্রোফিল্মটা পাওয়া যায়নি। কোথায় রেখেছেন বলুন?

কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। অলকের চোখ তখন সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক কোণে টেবিলের ওপর পোর্টেবল ট্রান্সমিটার-রিসিভার রাখা আছে। অর্থাৎ কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা আছে।

মেজর ঘোষ, আপনি হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব সঠিক বুঝতে পারছেন না। দিল্লিতে আপনাকে আমরা যে-প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তা আপনি পালন করেননি। এর শাস্তি একটাই হয়। সেটা হল মৃত্যু। কিন্তু আপনাকে আমরা আর-একটা সুযোগ দিতে চাই। আসল দলিলটা অথবা মাইক্রো ফিল্ম—যেটা নিয়ে আপনি চেংগেল যাচ্ছিলেন, সেটা আমাদের চাই-ই।

অলক বলল, আপনারা যত চেষ্টাই করুন না কেন—আমাকে দিয়ে আপনাদের কোনও কাজই হবে না।

মুখোশধারী বলল, অন্য কোনও পার্টি আরও বেশি টাকা দিচ্ছে নাকি?

এবার অলকের বিস্ময়ের পালা, অন্য কোনও পার্টি?

আপনাদের মেজর নায়ারকে যেমন আর-একটা কানট্রি প্রস্তাব দিয়েছিল। বেশি লাভ করার জন্যেই তাকে মরতে হল।

মেজর নায়ারকে তাহলে আপনারা হত্যা করেছিলেন?

সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে নাকি? আপনিও যদি আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে আপনার অবস্থাও মেজর নায়ারের মতো হবে। আপাতত আপনি আমাদের বন্দি হয়েই থাকবেন, যতদিন না আমাদের প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন।

অলক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল। কেউ কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। ব্যাপারটা এত আকস্মিক ঘটল যে, ঘরের মানুষগুলো প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠল মুখোশধারী, পাকড়ো, পাকড়ো উসকো।

অলক ছুটছে। লম্বা গলিপথ থেকেই মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক কিছু রাস্তা চলে গেছে। অলক সোজা পথে না গিয়ে এ-গলি ও-গলি দিয়ে ছুটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ একটানা ছোটার পর পরিশ্রান্ত হয়ে থামল অলক। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছে। হাঁপাতে লাগল অলক।

এখানে আলো প্রায় নেই বললেই হয়। ইন্ডিয়ান আর্মির পোশাকপরা অলক ঘোষকে এখন সহজে কেউ দেখতে পাবে না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল অলক। না, কেউ তাকে অনুসরণ করে এদিকে আসতে পারেনি। ওপরের দিকে তাকাল। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ অলক এখনও গুহার মধ্যেই রয়েছে। গুহার মধ্যে থাকার অর্থ, সে শত্রুপুরীর মধ্যে বিচরণ করছে।

কী করা যায়? কীভাবে পালানো যায় এখান থেকে?

অচেনা, অজানা জায়গা। কেউ তাকে সাহায্য করার নেই। অলক নিজেকে খুব অসহায় বোধ করল।

মেজর অলক ঘোষ!

কে যেন পাশ থেকে তার নাম ধরে ডেকে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অলকের। আর বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

মেজর অলক ঘোষ, পালাবার চেষ্টা করবেন না। এই গুহাটা একটা গোলকধাঁধার মতো।

BanglaBook.org

প্রতিটি গেটে কড়া পাহারা আছে। আপনি শত চেষ্টা করলেও পালাতে পারবেন না। আপনাকে কথা দিচ্ছি, নিজে থেকে ধরা দিলে আপনাকে হত্যা করা হবে না। যেখানেই থাকুন না কেন, দেওয়ালের গায়ে কালো রঙের বোতাম দেখতে পাবেন। সেটা টিপুন, তাহলেই আমরা জানতে পারব আপনি কোথায়!

এতক্ষণে অলক বুঝতে পারল, তার আশেপাশে কেউ নেই। এই গুহার দেওয়ালে অসংখ্য লাউডস্পিকার ফিট করা আছে। সেইখান থেকেই এই কথাগুলো শুনতে পেল সে। অলকের নিশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

অলক আবার পা টিপে-টিপে হাঁটতে লাগল। কিছুটা যাওয়ার পর এক জায়গায় একটা ছোট ফাঁক দেখতে পেল। সেখান থেকে নীল রঙের একটা আলোর রেখা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে।

অলক এগিয়ে গেল সেইদিকে। ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে তাকাল। একটা ঘর। গোলা-বারুদ, নানাধরনের বন্দুক-পিস্তলে ঘরটা ঠাসা। একদিকে একটা লোক চেয়ার-টেবিলে বসে কী যেন লিখছে।

এত গোলা-বারুদ-বন্দুকের আয়োজন কীসের জন্য? তবে কি কিছুদিন আগে আসামে যেসব নাশকতামূলক কাজ ঘটত বা কিছু-কিছু দেশদ্রোহীর কাছে বিদেশি অস্ত্রসস্ত্র পাওয়া যেত, তা কি এখান থেকে চালান দেওয়া হত?

যাক গে, এসব পরে ভাবলেও চলবে। এখন যেভাবে হোক এখান থেকে পালাতে হবে।

অলক এগিয়ে চলল। কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। একইরকমের সুড়ঙ্গ-পথেই সে তখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনওখান দিয়েও একটুখানি আকাশ দেখা গেল না। আকাশ—একটুখানি আকাশ। অলকের প্রাণটা হাহাকার করে উঠল।

লাউডস্পিকারে আবার আওয়াজ ভেসে এল, মেজর ঘোষ, আপনাকে আবার বলছি, আত্মসমর্পণ করুন। নইলে এর জন্যে সারাজীবন ধরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

অলক এগিয়ে চলল। কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! সারা শরীর অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে।

হঠাৎ একটা টর্চের আলো তার গায়ে এসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার, পেয়েছি, পেয়েছি।

অলক দেখল, তিনজনের একটা দল। সঙ্গে সেই মুখোশধারী আছে।

মুখোশধারী এগিয়ে এল। বলল, তাহলে মেজর ঘোষ, ধরা পড়তেই হল!

উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখোশধারীর নাক লক্ষ করে এক ঘুষি মারল অলক। সঙ্গে-সঙ্গে বাকি দুজন লোক তাকে জাপটে ধরল।

নাক চেপে ধরে মুখোশধারী বলল, ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে চল।

লোক দুটো অলককে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কিছুটা যাওয়ার পর একটা দরজা খুলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অলক। দাঁতের আঘাতে নীচের ঠোঁটটা কেটে গেল। রক্ত পড়ছে। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরটা সত্যিই একটা অপারেশন থিয়েটার।

দু-হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে ভালো করে তাকাল অলক।

দেখল, টেবিলের ওপর একজন লোক শুয়ে আছে। আর সাদা অ্যাপ্রন-পরা একজন বিদেশি মানুষ ছুরি দিয়ে তার একখানা পা কেটে বাদ দিয়ে দিল। তারপর আর একখানা। মিনিট দশেকের মধ্যেই অলক দেখল, টেবিলে শায়িত লোকটার দু-খানা হাত আর দু-খানা পা নেই।

শিউরে উঠল অলক।

পাশ থেকে মুখোশধারী বলে উঠল, ওই লোকটা আমাদের সঙ্গে একটু চালাকি করবার চেষ্টা

BanglaBook.org

করছিল। তাই ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে ভেবো না, ওকে আমরা মেরে ফেলব না। তাকিয়ে দেখো, আমাদের ডাক্তার কত যত্ন করে ওর হাত আর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। মাস-দেড়েকের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন আমরা ওকে তোমাদের ক্যালকাটা বা দিল্লিতে ছেড়ে দেব। ভিক্ষে করে দিব্যি ওর দিন চলে যাবে।

অলকের ইচ্ছে করল, পা থেকে জুতো খুলে মুখোশধারীর মুখে মারে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করবার সময় এখনও আসেনি। তাকে আরও কিছুটা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

মুখোশধারী বলল, তুমি যদি আমাদের কথামতো কাজ না কর বা কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা কর—তাহলে তোমার অবস্থাও ওইরকম হবে, মনে থাকে যেন!

বলে সদর্পে মুখোশধারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অলক।

ইতিমধ্যে লোকটার হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছল। বিদেশি ডাক্তার অলকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চোখে চোখ পড়তেই বিশ্রীভাবে হাসল সে। তারপর বলল, ডোন্ট ওরি, হি উইল বি অলরাইট উইদিন এ মানথ অর টু।

অলকের ইচ্ছে করল, ডাক্তারটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়।

কিন্তু তার আগেই একটা লোক এসে তার হাত ধরল, চলো, এখন ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে। হেডকোয়ার্টারে তোমার ব্যাপারে খবর পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে খবর না আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করবে চলো।

অলক দেখল, এ সেই আগের লোকটা, যে তাকে সঙ্গে নিয়ে মুখোশধারীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। কোনও কথা না বলে লোকটাকে অনুসরণ করল অলক।

লোকটা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যেতে-যেতে অলক বলল, তুমি তো একজন ভারতীয়। তোমার লজ্জা করে না নিজের দেশের সঙ্গে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে?

লোকটা বলল, ওসব কথা এখানে উচ্চারণ কোরো না। তাহলে তোমাকে-আমাকে দুজনকেই ডাক্তারের রুগি হতে হবে।

একটা ঘরের মধ্যে অলককে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল সে। অলক আবার বন্দি হল।

সাত ঃ সারি-সারি মৃতদেহ

অলক কি স্বপ্ন দেখছে?

শত্রুপুরীতে বন্দি হয়েও কি এমন স্বপ্ন দেখা যায়?

অলকের মনের মধ্যে যেন সপ্তসুরের রাগিণী বেজে চলল। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতেও তার ভয় হচ্ছে। যদি স্বপ্নটা মুছে যায়! সামনের ওই অনিন্দ্য সুন্দরীর পরিচিত মুখখানা যদি মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়?

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে ছবিটাকে চোখের সামনে ধরে রাখল অলক। মিলাই, মিলাই—আমার মিলাই।

কিন্তু কতক্ষণ?

আবার একটা ধাক্কা খেল অলক। কে যেন হাত দিয়ে তাকে ঠেলছে।

মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবে ফিরে এল অলক। গুহার মধ্যে বন্দি অলক।

কিন্তু আশ্চর্য, স্বপ্নটা তো চোখের সামনে থেকে মুছে গেল না?

BanglaBook.org

ঘরের নীল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অলকের সামনে বসে আছে হীরা। হীরা, না কি মিলাই?

অলক কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হীরার একটা হাত তার মুখের ওপর এসে পড়ল। অর্থাৎ, হীরা তাকে কথা বলতে মানা করছে। অলকের সারা শরীরে একটা স্বর্গীয় শিহরন বয়ে গেল। কতদিন, কতদিন পরে সে তার মিলাই-এর স্পর্শ অনুভব করল।

হীরার হাতের ওপর অলক তার নিজের হাত রাখল। চোখে-চোখে, হাতে-হাতে কত কথার যেন আদানপ্রদান হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। অলকের মনে হল, এখন যদি তাকে ওই বিদেশি ডাক্তারের রুগিও হতে হয়, তাহলেও কোনও আক্ষেপ থাকবে না তার।

হীরা একটানে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল।

অলক উঠে দাঁড়াল। হীরার পিছন-পিছন এগিয়ে চলল সে। হরিণীর মতো ছুটে চলেছে হীরা, আর তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো তাকে অনুসরণ করছে অলক।

কত গুহা-পথ পার হয়ে গেল। চলার আর শেষ নেই। কিন্তু নিজেকে এতটুকু ক্লান্ত মনে হচ্ছে না অলকের। এইভাবে সারা জীবন ধরে সে যেন হীরার সঙ্গে পথ চলতে প্রস্তুত।

অবশেষে গুহা শেষ হল। পাহাড়ের একটা ফাটল, যার পরিসর একফুটেরও কম হবে, সেখান দিয়ে অনায়াসে হীরা বেরিয়ে গেল। অলকও একটু চেষ্টা করতে বেরিয়ে যেতে পারল।

আঃ—এতক্ষণে একটু আকাশ দেখা গেল।

অলকের মনে হল সে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেল। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিল অলক। প্রকৃতির একটু হাওয়া আর একফালি নীল আকাশ দেখবার জন্য তার প্রাণটা যেন আনচান করছিল এতক্ষণ।

নেফার প্রকৃতিতে তখন ঊষা। রাত্রি শেষ হতে চলেছে। কিন্তু দিন এখনও শুরু হয়নি। অথচ তার আভাস মিলছে স্নিগ্ধ হাওয়ায়, শিশিরসিক্ত ঘাসে, আর আকাশের নীলিমায়।

হীরা পিছন ফিরে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল অলককে।

অলক আবার চলতে শুরু করল। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ঘাস, তার মধ্যে ছোট বড় নানারকমের পাথর। রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হীরা ছুটে চলেছে। অলকের বেশ অসুবিধা হলেও, গতিতে ছেদ পড়েনি তার।

দুজনে প্রায় ছুটেই চলেছে। পদে-পদে শত্রুপক্ষের ভয়। ধরা পড়লে হয়তো দুজনের লাশ লুটিয়ে পড়বে এই পাহাড়ি জঙ্গলে। এইবার অলক একটু বাস্তব চিন্তা শুরু করল। হীরা কীভাবে শত্রুপক্ষের গুহায় এল? তবে কি হীরাও ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?

কপালের শিরা ফুলে উঠল অলকের।

তার মিলাই একজন দেশদ্রোহী?

দিনের আলো একটু-একটু করে ফুটে উঠছে। চারিদিক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অলক দেখল, হীরা উৎরাই-এর মুখে এগিয়ে চলেছে ঘাই নদীর দিকে।

অলক পিছন ফিরে তাকাল। কেউ তাদের অনুসরণ করছে না।

ঘাই নদীর কূলে এসে হীরা থামল। পরিশ্রান্ত হীরার বুক কামারের হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সায়ার নীচের দিকটা শিশিরসিক্ত। হীরার কাছে এলে অলকও থামল।

হীরা হিন্দিতে বলল, এই নদীটা পার হয়ে আরও মাইলখানেক হাঁটলেই তোমার ইউনিট দেখতে পাবে। আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। আমি এখান থেকেই বাড়ি চলে যাব। তুমি আর দেরি কোরো না, চলে যাও। ওরা জানতে পারলে আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।

অলক হীরার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের পলক আর পড়ে না।

হীরা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল।

BanglaBook.org

মেদুর গলায় অলক ডাকল, মিলাই!

হীরা যেন একবার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ম্যায় মিলাই নেহি—ম্যায় হীরা হুঁ।

মিলাই! আবার স্বপ্নভরা কণ্ঠের আহ্বান।

হীরা যেন আর সহ্য করতে পারছে না। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুড়ে দাঁড়াল।

অলক আবার বলল, মিলাই, এতদিন পরে তোমাকে পেলাম আমি, তবুও তুমি ধরা দেবে না?

হীরার সারা শরীর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। কাছে এগিয়ে এল অলক। হীরার পিঠে একটা হাত রাখল। দেখল, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

মিলাই, এত কষ্ট পাচ্ছ তুমি! তবু সত্যি কথা বলবে না?

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল হীরা। তারপর বুকফাটা কান্নায়, আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলে উঠল সে, মিলাই বলে আমার মধ্যে যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই গো, অলকদা!

বাঁধভাঙা জলের মতো অলকের বুকে আছড়ে পড়ল অলকের স্বপ্নসুন্দরী মিলাই। তার কান্না, তার কথা—নেফার প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল, আমার যে আর কিছু নেই, অলকদা! তোমার মিলাই বারো বছর আগে মরে গেছে। তুমি কেন ডাকো বারবার ও-নামে? আমি যে সব ভুলে যেতে চাই গো—সব ভুলে যেতে চাই!

অলকের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এত যন্ত্রণা, এত আনন্দ—সে ওইটুকু বুকে ধরে রাখবে কেমন করে? বুক ফেটে যেতে চাইছে তার। নিজের চোখ দিয়েও দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে, মিলাই-এর কান্না সে কেমন করে থামাবে?

এই যে এতবড় আকাশ, ধ্যানগম্ভীর পাহাড়, শ্যামল বনানী—তোমরা পার না মিলাই-এর চোখের জল মোছাতে? সামান্য একজন প্রেমিক হয়ে অলক তা কেমন করে পারবে?

ভারতের পূর্ব সীমান্তে, নেফার এক অখ্যাত নদীর কূলে এই যে মিলন, এই যে দুটো প্রাণের মিলন—কেউ তার সাক্ষী রইল না। শুধু চোখের জলে দুজনের বুক ভেসে গেল।

বারোটা বছর!

যে-মেয়েটা একদিন পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেল নেফার গভীর অরণ্যে।

মিলাই—মিলাই—আর কেঁদো না—আর কেঁদো না তুমি—।

ওগো—আমি যে আর পারছি না। আমায় তুমি ধরে রাখো—আর আমাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিয়ো না গো।

কতক্ষণ—কতক্ষণ—সময় কেটে গেছে, কেউ জানে না। অলক যখন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, তখন ঘাই নদীর জলে সপ্তরঙের খেলা।

ঘাই নদীর জলে পা ডুবিয়ে মিলাই বলে চলেছে তার বারো বছরের কাহিনি। বোম্বে রোডে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল একদল শয়তানের দল। তারপর কুকুর-শেয়ালের মতো তাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেল তারা। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তখন গুপ্তচরগিরি করার জন্য বিদেশি শক্তির হাতে তাকে বিক্রি করে দিল।

লালা বাবা এখানকার পুরোহিত হলেও সে হল শত্রুপক্ষের একজন এজেন্ট। এখানকার মিলিটারিদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখাটাই হল তার প্রধান কাজ। এইরকম এজেন্ট এই সীমান্তপ্রদেশে অনেক আছে। মিলাইকে লালা বাবার মেয়ে সাজিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে তাকে সাহায্য করতে।

আমি জানি অলকদা, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি নিজের

BanglaBook.org

মাতৃভূমির সঙ্গে। কিন্তু যেভাবে এরা আমার ওপর নজর রেখেছে, এখান থেকে পালাতেও সাহস পাইনি। আত্মহত্যা করতে আমার বড় ভয় অলকদা, নইলে যেদিন আমার দেহটা নিয়ে শয়তানগুলো ছিনিমিনি খেলেছিল, সেদিনই শেষ করে দিতাম নিজেকে। তাহলে আমাকে আজ দেশদ্রোহী সাজতে হত না।

অলকদা, আজ এতদিন বাদে তোমাকে পেয়েছি। আর আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি তো দেশের একজন বীর সৈনিক, তুমি নিজে হাতে দেশদ্রোহিতার শাস্তি আমাকে দাও। আমাকে মেরে ফেলো তুমি।

অলক যেন এতক্ষণ নিজেকে ভুলে গেছল। মিলাই-এর কথায় আবার ফিরে পেল নিজেকে। সে একজন সৈনিক। তার হাতে বিরাট একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কী করবে সে?

একদিকে দায়িত্ব, আর-একদিকে তার বুকের পাঁজর, মিলাই!

অলক ডাকল, মিলাই।

জলভরা চোখে মিলাই তাকাল অলকের দিকে।

মিলাই, আজ আমারও কোনও দুঃখ নেই। যেদিন থেকে তোমাকে হারিয়েছি সেদিন থেকে আমার মধ্যে আর আমি ছিলাম না। সেই দুঃখে ঘর ছেড়ে মিলিটারিতে ঢুকেছি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ভুলতে পারিনি। আজ বারো বছর পরে তোমাকে পেয়েছি। মরতে যদি হয় দুজনে একসঙ্গে মরব। কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের স্বপ্ন সার্থক করব।

কী স্বপ্ন, অলকদা?

এত শিগগির ভুলে গেলে? রূপনারায়ণের ধারে যে-স্বপ্নের জাল রোজ আমরা বুনতাম? আমরা বিয়ে করব।

বিয়ে? সাপ দেখার মতো চমকে উঠল মিলাই। বলল, আজ আর তা হয় না, অলকদা। তোমাকে তো সব বললাম—আমি নষ্ট হয়ে গেছি অলকদা।

আমার কাছে তুমি আগের মতোই পবিত্র আছ, মিলাই। আমিও তোমার সেই অলকদাই আছি। কিন্তু তার আগে আমাদের অন্য কাজ আছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিলাই তাকাল অলকের দিকে।

অলক বলল, এতদিন ধরে তুমি নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এবারে তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলো, রাজি?

মিলাই বলল, প্রায়শ্চিত্ত! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

অলক তার প্ল্যানটা খুলে বলল মিলাই-এর কাছে। মিলাই এখন থেকে সর্বসময় অলককে সাহায্য করবে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। তারপর অলকের কাজ শেষ হয়ে গেলে দুজনে দেশে ফিরবে। বিয়ে করবে। ঘর বাঁধবে। তাদের স্বপ্ন সফল করে তুলবে।

ওদিকে সূর্য আরও কিছুটা ওপরে উঠেছে। তার আলোয় ঘাই নদীর জল মাঝে-মাঝে হেসে উঠছে।

মিলাই বলল, চলো—এবার ওঠা যাক। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব জানতে পেরেছে। হয়তো তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়াল। ঘাই নদীর জলে যেসব পাথরগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নদী পার হল। তারপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল দুজনে।

অলক বলল, ওরা একটা মাইক্রোফিল্ম খুঁজছে। তুমি কিছু জান ও-সম্বন্ধে?

মিলাই বলল, ওটা এখন আমার কাছে আছে।

BanglaBook.org

এবার অলকের বিস্ময়ের পালা, তোমার কাছে?

মিলাই বলল, তোমাদের মেজর নায়ার টাকার লোভে দলিলটার ফটো তুলেছিল। সেই সময় আরও একটা বিদেশি দেশ মেজর নায়ারের কাছে বিরাট অঙ্কের টোপ ফেলেছিল। ফলে নায়ার দোটানায় পড়ে গেছল। কার কাছে ফিল্মটা বিক্রি করবে—ঠিক করতে পারছিল না। ওদিকে দু-দেশই ওকে শাসাচ্ছে। সেইসময় আমার সঙ্গে ওর একটু ঘনিষ্ঠতা হয়। বুঝতেই পারছ। তোমাদের অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে খবর বের করাটাই আমার কাজ। তখন মেজর নায়ার মাইক্রোফিল্ম আমার কাছে লুকিয়ে রাখে। আর ওদিকে দাম বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার আগেই এ-পক্ষের গুলিতে তাকে মরতে হল। ফলে মাইক্রোফিল্মটা আমার কাছে রয়েই গেল।

অলক জিগ্যেস করল, তুমি কেন তাহলে এখনও ওটা ওদের হাতে তুলে দাওনি?

মৃদু স্বরে মিলাই বলল, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু সত্যি বলছি, নিজের দেশের সঙ্গে অতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রবৃত্তি হয়নি। মিলিটারি ইউনিটের একটু-আধটু খবর আমি ওদেরকে দিয়েছি বটে, কিন্তু মাইক্রোফিল্ম শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া মানে দেশের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেওয়া—তাই এখনও মনস্থির করতে পারছিলাম না। তোমার চাই? তাহলে তোমাকে ওটা দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, ওটা আমাকেই দিয়ে দিয়ো। নইলে ওরা জানতে পারলে তুমি আবার বিপদে পড়ে যাবে।

আবার কিছুটা সময় চুপচাপ কাটল। শুধু দুজনের পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচমচানি।

একসময় মিলাই বলল, এবার আমি যাই, তুমি এই পথ দিয়ে সোজা চলে গেলেই তোমার ইউনিটে পৌঁছাতে পারবে।

মিলাইকে যেতে দিতে হবে, আবার তাকে চোখের আড়াল করতে হবে—ভাবতেই অলকের বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু হায়, তবু যেতে দিতে হবে।

মিলাই-এর হাতদুটো নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে অলক বলল, কথা দাও—আবার তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না? রোজ বিকেলে রাস্তার ধারে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

কথা দিচ্ছি, অলকদা। তোমাকে না দেখে আমিই কি থাকতে পারব?

অলক বলল, আমার মনে হচ্ছে, আর কয়েকদিনের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর কয়েকটা দিন, মিলাই।

আধোস্বরে আবেগজড়ানো কণ্ঠে মিলাই বলল, আমি অপেক্ষা করব, অলকদা।

দুজনে দুজনের দিকে আবেশবিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। একের হৃদয়ের স্পন্দন আর-একজনের হৃদয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে।

মিলাই বলল, লক্ষ্মীটি, এবার ছেড়ে দাও—আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

ধীরে-ধীরে হাতের বাঁধন শিথিল করে দিল অলক।

মিলাই অন্য রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। যতদূর চোখ যায়, অলক দেখতে লাগল। তারপর একসময় আর দেখা গেল না মিলাইকে।

অলক হাঁটতে লাগল মিলাই-এর নির্দেশিত পথে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে ক্যাম্পের গেটে এসে পৌঁছাল।

তাকে দেখেই যেন গার্ডদের মধ্যে উত্তেজনা বয়ে গেল। একজন গার্ড টেলিফোন তুলে কাকে যেন ফোন করল।

অলক সবিস্ময়ে লক্ষ করল, মিনিট তিনেকের মধ্যে একটা জিপ ভেতর থেকে তীব্র গতিতে এগিয়ে এল গেটের দিকে। ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল আর জিপ থেকে নেমে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি।

BanglaBook.org

আসুন, মেজর ঘোষ, এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার?

অলক মৃদু হাসল।

আসুন, জিপে উঠে আসুন।

অলক উঠে বসল। স্টিয়ারিং ধরলেন স্বয়ং চ্যাটার্জি।

মুখ ঘুরিয়ে জিপ আবার ছুটে চলল ক্যাম্পের দিকে।

চ্যাটার্জি বললেন, জানি আপনার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন—কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

মিনিটদু-তিনের মধ্যে জিপ এসে একটা তাঁবুর কাছে থামল। অলক দেখল একজন প্রহরী সেখানে ডিউটি দিচ্ছে রাইফেল হাতে।

চ্যাটার্জির সঙ্গে জিপ থেকে নেমে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল অলক।

এবং দেখল, সারি-সারি তিনটি মৃতদেহ মেঝের ওপর শোয়ানো আছে। প্রত্যেকের দেহে অসংখ্য গুলির আঘাতের চিহ্ন।

চ্যাটার্জি বললেন, এরা হল আপনার কালকের দুজন সশস্ত্র প্রহরী আর ড্রাইভার। এদের খুন করে আমার কাছে মৃতদেহগুলো ওরাই পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা ছিল, আপনার মৃতদেহও দু-চারদিনের মধ্যে আমার কাছে ফেরত পাঠাবে।

অলকের মাথাটা নীচু হয়ে গেল। কাল এরা তার সঙ্গেই গিয়েছিল। কিন্তু 'মেজর অলক ঘোষ' সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এরা কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারেনি। এ-লজ্জা রাখবে কোথায় অলক।

মৃতদেহগুলোর দিকে আবার তাকাল সে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তিনজন সৈনিক।

চ্যাটার্জি বললেন, আপনি এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন। পরে আপনার কাছ থেকে সব শুনব।

আট : দলিল চুরি

নেফার বুকে আরও একটা রাত্রি নেমে এল। ঘন কালো আকাশ, তার মাঝে রুপোলি বিদ্যুতের রেখা মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই যে বৃষ্টি নেমেছে, এখনও তার বিরাম নেই। মনে হয়, আকাশ ভেঙে পড়ছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়ায় গা-শিরশির করে ওঠে।

কর্নেল চ্যাটার্জির অফিসঘরে অলক বসে আছে।

দুজনেই গম্ভীর। অলকের চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে উঠছে সকালবেলার দেখা সারি-সারি মৃতদেহ।

অলক বলল, একটা বিরাট গ্যাং এই কাজ করে চলেছে, স্যার। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমাদের দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল। কাল রাত্রে যেটুকু বুঝেছি—তাতে মনে হয়, ওই পাহাড়টা একটু দুর্গবিশেষ। আধুনিক ট্রান্সমিটার রিসিভার সহযোগে ওরা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ রাখে। তা ছাড়া, ওদের কাছে প্রচুর আর্মস আর অ্যামিউনিশন আছে। ওদের ক্ষমতা অনেক। আমাদের আরও সাবধানে কাজ করতে হবে।

চ্যাটার্জি বললেন, তাহলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়?

অলক বলল, এখানে আসার পর ভেবেছিলাম যে-দলিলটা নিয়ে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখছি, আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রক ব্যাপারটার গুরুত্ব সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন।

BanglaBook.org

একটু থামল অলক। বাইরে থেকে একটানা বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছে।

অলক বলল, কাল যে আমি মাইক্রোফিল্ম নিয়ে চেংগেল যাচ্ছিলাম, এ-কথা কে-কে জানতে পারে, স্যার?

চ্যাটার্জি বললেন, কথাটা প্রথমে আপনি আমাকে বলেছিলেন, তারপর আপনার কথামতো আমি লাঞ্চ আওয়ারে সমস্ত অফিসারদের জানাই।

অলক বলল, তাহলে শত্রুপক্ষ কেন আমাদের গাড়ি আক্রমণ করল? কী করে ওরা আমাদের প্রোগ্রামের কথা জানতে পারল?

চমকে উঠলেন চ্যাটার্জি। বললেন, তার মানে আপনি বলতে চান আমাদের মধ্যে কেউ একজন ওদের এজেন্ট?

একজ্যাক্টলি, স্যার। আমি, আপনি এবং এই ইউনিটের অন্যান্য অফিসার, এদের মধ্যে কোনও একজন হল শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

একটা কথা মেজর ঘোষ, মাইক্রো ফিল্মটা কি সত্যি-সত্যিই আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

অলক হাসল। বলল, না, স্যার। তবে আমি জানি, সেটা কোথায় আছে।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন চ্যাটার্জি, কোথায় আছে?

সেটা বর্তমানে নিরাপদেই আছে। কাল আমি ওই কথা বলে জিপ নিয়ে কেন বেরিয়েছিলাম জানেন? ওরা কতখানি ক্ষমতাসম্পন্ন, সেটা জানতে। যেদিন সত্যিই আমি দলিল আর মাইক্রোফিল্ম নিয়ে দিল্লি ফিরব, সেদিন কতখানি বাধা আসতে পারে ওদের তরফ থেকে—তাই জানবার জন্যেই কালকের প্ল্যানটা ঠিক করেছিলাম। দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। দলিল নিয়ে ওরা আমাকে এত সহজে ফিরে যেতে দেবে না। প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে আমাকে।

কিন্তু মাইক্রোফিল্মের খোঁজ আপনি পেলেন কেমন করে?

অলকের মুখ এক অনির্বচনীয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, সে-কথা আপনাকে পরে বলব, স্যার। তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

বলুন।

ওই যে লালা বাবার মেয়ে হীরা, ওকে ওর ইচ্ছেমতো আমাদের ক্যাম্পের মধ্যে আসবার অনুমতি দিতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের অপারেশনের সম্পর্ক আছে। তাই এই অনুরোধ।

একটু চিন্তা করে নিয়ে চ্যাটার্জি বললেন, কাজটা যদিও নিয়মবিরুদ্ধ, তবুও আপনার কথামতো ব্যবস্থা হবে। আর কিছু?

লালা বাবাকে অ্যারেস্ট করার আদেশ চাই।

চ্যাটার্জি আবার চমকে উঠলেন। বললেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবে দেখেছেন কি? এখানকার সমস্ত আদিবাসীরা খেপে উঠবে। হয়তো ওরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে বসবে।

অলক বলল, জানি, স্যার। কিন্তু লালা বাবাকে গ্রেপ্তার করলে ওদের একটা হাত পঙ্গু করে দেওয়া যাবে। চাই কী, লালা বাবার কাছ থেকে আরও অনেক খবর জানা যাবে।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু দলিলটা কীভাবে দিল্লি নিয়ে যাবেন?

ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মোটামুটি একটা প্ল্যানও ছকে ফেলেছি। কিন্তু আমার কাজ শুধু দলিল আর মাইক্রোফিল্ম নিয়েই নয়। এখানে আসার পর একটা নৈতিক দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সেটা হচ্ছে—ওদেরকে সমূলে ধ্বংস করা। যাই হোক, সে-সম্বন্ধে কাল ব্যবস্থা করা যাবে।

এমনসময় ঘরের আলো নিভে গেল। অর্থাৎ, রাত দশটা বাজল। ইউনিটের জেনারেটর অফ করে দেওয়া হল।

BanglaBook.org

অলক উঠে দাঁড়াল।

ও কে, স্যার। আজ চলি। গুডনাইট।

গুডনাইট।

অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে অলক চলে গেল। কর্নেল চ্যাটার্জি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপরে বসলেন।

মনের মধ্যে অনেকগুলো ভাবনা ঘুরপাক খেয়ে মরছে। মেজর অলক ঘোষ সত্যিই করিৎকর্মা পুরুষ। তার চলা-বলা—সবকিছুর মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। কিন্তু তবুও কতকগুলো প্রশ্ন কর্নেল চ্যাটার্জির মনে ভেসে ওঠে।

যে-লোকটা দলিলের জন্য এখানে এসেছে, সে এখনও দলিলটা একবার দেখতেও চাইল না! কর্নেল চ্যাটার্জির কথাতেই কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল। এবং দলিল-প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়।

তারপর সেই আদিবাসীদের উৎসবের রাত্রি। লালা বাবার মেয়ে হীরাকে দেখে মেজর অলক ঘোষের মূর্ছিত হয়ে পড়া—কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল চ্যাটার্জির কাছে। পরে অলককে তিনি প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু অলক এড়িয়ে গেছে।

অবশ্য হীরা মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। দেখলে লোভ হয়। কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গেও হীরার আলাপ আছে। মেয়েটা কেমন যেন গায়ে-পড়া। সেই রাত্রে হীরার চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল চ্যাটার্জির। তা ছাড়া, অলককে দেখে হীরা ছুটে পালিয়েছিল কেন?

তা বলে মেজর ঘোষ যে একজন দক্ষ অফিসার, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কর্নেল চ্যাটার্জির। মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যেই সে শত্রু-ঘাঁটির সন্ধান করে ফেলল। আর অলকের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে মাইক্রোফিল্মও সে খুঁজে পেয়েছে।

হাই উঠল চ্যাটার্জির। পোড়া সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বাইরের বৃষ্টি সমান বেগে চলেছে। একটানা একঘেয়ে আওয়াজ। সেই আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন চ্যাটার্জি।

ক্রমে রাত গভীর হল। বৃষ্টি কমে এল। আকাশে একটা-দুটো তারা ফুটে উঠল। নিশুতি রাতে সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

এমনসময় দেখা গেল, একটা মূর্তি পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসছে কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরের দিকে—বারান্দায় উঠে মূর্তিটা এদিক-ওদিক তাকাল। যখন নিশ্চিন্ত হল যে, তাকে কেউ দেখছে না—তখন আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল জানলার কাছে।

দূরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

মূর্তিটা বিশেষ কায়দায় জানলাটা খুলে ফেলল। তারপর একলাফে কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরের মধ্যে পা দিল। চ্যাটার্জি তখন নাক ডাকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। নৈশ অতিথির কথা জানতেও পারলেন না।

মূর্তিটা একটা পেনসিল টর্চ বের করে, তার আলো চ্যাটার্জির মুখে ফেলল। একটু ঝুঁকে তাঁর ঘুমের গভীরতা পরীক্ষা করল। তারপর এগিয়ে গেল চ্যাটার্জির পুজোর বেদির দিকে। যেখানে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখা আছে।

চটপট মূর্তি দুটো পকেটের মধ্যে পুরে আবার জানলা টপকে বাইরে চলে গেল। চ্যাটার্জি কিছু জানতেও পারলেন না।

BanglaBook.org

নয় : একটা মৃতদেহ ও হেলিকপ্টার

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কর্নেল চ্যাটার্জি সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর পুজোর বেদি শূন্য। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি সেখানে নেই।

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল চ্যাটার্জির। যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, মেজর ঘোষ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চ্যাটার্জির চিৎকারে প্রায় সমস্ত অফিসাররা ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজর দেশপাণ্ডে জিগ্যেস করল, হোয়াট হ্যাপেনড্, স্যার! এনিথিং রং!

চ্যাটার্জি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, হোয়ার ইজ মেজর ঘোষ? আই ওয়ান্ট হিম ইমিডিয়েটলি।

ততক্ষণে অলকও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দু-চোখে তখনও তার ঘুমের রেশ।

কী ব্যাপার, স্যার।

সর্বনাশ হয়ে গেছে, ঘোষ। আমার রাধাকৃষ্ণের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে দলিলটা ছিল।

হোয়াট! বিস্ময়ে ও বেদনায় হতভম্ব হয়ে গেল অলক।

ক্রমে-ক্রমে সব জানা গেল। দলিলটা লুকিয়ে রাখার জন্য চ্যাটার্জি নিজে ছুরি দিয়ে কাঠের রাধাকৃষ্ণের মূর্তির ভেতরটা ফাঁপা করেছিলেন। তারপর তার মধ্যে দলিলটা লুকিয়ে রেখে নীচে থেকে গালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সকলে জানত, কর্নেল চ্যাটার্জি একটু বেশি পরিমাণ ঠাকুর দেবতার ভক্ত। কিন্তু তা নয়। দলিলের নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে ওই ভান করতে হয়েছিল।

চ্যাটার্জির কাছ থেকে সব শোনার পর সমস্ত অফিসারদের মুখ শুকিয়ে গেল। ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছে। আর দলিলটার দায়িত্ব শুধুমাত্র চ্যাটার্জির নয়, তাদের সকলের। ফলে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অলক এগিয়ে এল চ্যাটার্জির কাছে।

স্যার, দলিলটা আপনি অন্য কোথাও রাখেননি তো?

কী বলছেন আপনি, মেজর ঘোষ! আমি রেখেছি আর আমি জানি না?

না—মানে, আমতা-আমতা করে অলক বলল, যদি ভুল করে অন্য কোথাও রেখে থাকেন!

শাট আপ। কর্নেল চ্যাটার্জির ওইরকম ভুল হয় না। কিন্তু এখন আমি কী করি? ডিফেন্স মিনিস্টার যখন প্রশ্ন করবেন, আমি কী জবাব দেব!

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, চলুন স্যার, আপনার অফিসটা ভালো করে খুঁজে দেখা যাক।

অলক তাকাল দেশপাণ্ডের দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল।

এমনসময় দেখা গেল, মেন গেটের দিক থেকে দুজন গার্ড দৌড়াতে-দৌড়াতে এদিকে আসছে।

স্যার, আদিবাসীদের একদঙ্গল লোক গেটের সামনে এসে চেঁচামেচি শুরু করেছে। ওরা ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন, ওদের আবার কী হল?

কী জানি, স্যার। ওরা কিছুই বলছে না। বলছে, ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে, ওদের অপেক্ষা করতে বলো। আমি আসছি।

গার্ড দুজন চলে গেল।

মিনিটপনেরোর মধ্যে মিলিটারি পোশাক পরে কর্নেল চ্যাটার্জি মেজর ঘোষ ও দেশপাণ্ডেকে নিয়ে মেন গেটের দিকে চলে গেলেন।

অলক দেখল, প্রায় শ'খানেক নারী-পুরুষ সেখানে জমায়েত হয়েছে। কর্নেল চ্যাটার্জিকে দেখে

BanglaBook.org

সবাই চিৎকার করে উঠল।

চ্যাটার্জি বললেন, কী ব্যাপার? এই সকালবেলায় কী চাই তোমাদের?

তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় ওদের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা চলতে লাগল। তার মধ্যে একখানা পাথর এসে পড়ল জিপের ওপর।

চ্যাটার্জি অলক ও দেশপাণ্ডেকে ইংরেজিতে বললেন, কাল রাত থেকে ওরা নাকি লালা বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা খবর পেয়েছে, আমরা নাকি লালা বাবাকে বন্দি করে রেখেছি। ওদের দাবি, লালা বাবাকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হবে। নইলে ওরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে। আমি বোঝাচ্ছি, লালা বাবার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, তাকে আমরা বন্দি করে রাখিনি, কিন্তু ওরা সে-কথা বিশ্বাস করছে না।

চ্যাটার্জিকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখে ওরা আবার চিৎকার করে উঠল।

চ্যাটার্জি বললেন, তোমরা যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে না যাও, তাহলে আমি গুলি চালাবার আদেশ দেব।

সঙ্গে-সঙ্গে আদিবাসীরা চুপ হয়ে গেল। কিছুটা পিছিয়ে গেল তারা। নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করল।

পরমুহূর্তে দশ-বারোখানা তির ছুটে এল চ্যাটার্জিকে লক্ষ্য করে। তড়িৎ গতিতে জিপের মধ্যে ঢুকে পড়ে চ্যাটার্জি অর্ডার দিলেন, ফায়ার।

গার্ডের রাইফেল গর্জে উঠল দুবার। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত সেই আওয়াজ হাজার গুণ হয়ে ফিরে এল। ওদিকে আদিবাসীদের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হল। নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ছোট-ছোট টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

গার্ড আরও দুবার ফায়ার করল। সেই আওয়াজ মিলিয়ে যেতে-না-যেতে দেখা গেল জঙ্গলের ভেতর থেকে বনহরিণীর মতো দৌড়ে আসছে একটি নারী।

কাছে আসতে সবাই দেখল, হীরা।

আর অলক দেখল, মিলাই।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অলকের। একটা অজানা সুখের অনুভূতি সারা দেহটাকে একবার কাঁপিয়ে দিল। তার মিলাই আসছে। মুখখানা আনন্দে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। সে এখন মেজর অলক ঘোষ। হীরা-অলকের সম্পর্ক এখন গোপন থাকাই উচিত।

হীরা এগিয়ে এসে বলতে লাগল, ওগো, তোমরা সবাই দেখবে চলো না, ওই জঙ্গলের মধ্যে লালা বাবা মরে পড়ে আছে। কে যেন তাকে ছোরা মেরে খুন করে গেছে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

লালা বাবা নিহত।

কর্নেল চ্যাটার্জি এগিয়ে গেলেন হীরার দিকে।

কী বলছ তুমি? লালা বাবাকে খুন করেছে?

ওদিকে টিলার আড়াল থেকে একজন, দুজন করে আদিবাসীর দল বেরিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে সবাই এসে হীরাকে ঘিরে দাঁড়াল।

চ্যাটার্জি, দেশপাণ্ডে আর অলকও এগিয়ে গেল।

হীরা বলল, আমি সকালে উঠে আমার ছাগলগুলো চরাতে গেছলুম। হঠাৎ দেখি ঘাসের জঙ্গলে লালা বাবার দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল হীরা।

ওগো, তোমরা চলো না, আমার বাবাকে কে খুন করেছে—দেখবে চলো না।

BanglaBook.org

মিলাই-এর কান্নার অভিনয় দেখে অলক মুগ্ধ হয়ে গেল। কে বলবে, লালা বাবা মিলাই-এর, তথা হীরার, আসল বাবা নয়।

হীরাকে অনুসরণ করে সবাই এগিয়ে গেল। কিছুটা যাওয়ার পর দেখা গেল, লালা বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা দেহে দশ-বারোটা ছোরার আঘাতের চিহ্ন। পরনের একমাত্র কাপড় জলে ভিজে সপসপ করছে। জলে, রক্তে, কাদায়—আশেপাশের জমি মাখামাখি হয়ে গেছে।

লালা বাবার দেহের ওপর আছড়ে পড়ে পাগলিনীর মতো কাঁদতে লাগল হীরা। একজন আদিবাসী বুড়ি এগিয়ে গেল তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

চ্যাটার্জি অলক আর দেশপাণ্ডেকে নিয়ে ইউনিটে ফিরে এলেন।

চ্যাটার্জি বললেন, কী মনে হয় মেজর ঘোষ?

অলক বলল, আপনি দলিলটার সম্বন্ধে জিগ্যেস করছেন? নাকি লালা বাবার মৃত্যু সম্পর্কে?

দুটোই।

দলিলটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব। আর, একজন আদিবাসীর মৃত্যু সম্পর্কে আমার কোনও কৌতূহল নেই।

হোয়াট! চ্যাটার্জি যেন চিৎকার করে উঠলেন, লালা বাবার হত্যা সম্পর্কে আপনার কোনও কৌতূহল নেই?

না, স্যার। ওরা অসভ্য বন্যজাতি। হয়তো নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে একে অপরকে খুন করেছে।

অলকের এই নিরাসক্ত ভাব চ্যাটার্জি যেন আর সইতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে লালা বাবা একজন শত্রুপক্ষের চর?

এ-বিষয়ে আমি পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। এখন আমার একটা নিবেদন আছে।

বলুন।

আপনার গাড়িটা একবার চাই। একবার চারপাশটা ঘুরে দেখব। আর চেংগেল যাব।

চেংগেল? হঠাৎ?

সারদা কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করতে।

চ্যাটার্জি সাহেবের আরও একবার মনে হল, তিনি মেজর অলক ঘোষকে ঠিক চিনতে পারেননি।

চেংগেল শহরটা ঠিক শহর নয়। একটা ছোট বাজারকে কেন্দ্র করে কয়েকটা কাঠের বাড়ির অস্তিত্ব জায়গাটাকে সজীব করে রেখেছে মাত্র। তারচেয়ে বড় কথা, এখানে 'ইলেকট্রিক' আছে। ব্যাঙ্ক আছে। গভর্নমেন্টের 'রুরাল হেল্‌থ সেন্টার' আছে। আর আছে ডিব্রুগড় পর্যন্ত একটা পিচঢালা পাহাড়ি রাস্তা। দুটো কাজ এখানে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। প্রথমত, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা। আর দ্বিতীয়টা হল, পরিবার পরিকল্পনা।

কাউকে কোনও কিছু জিগ্যেস না করেই অলক জিপ চালিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। তারপর একটু খোঁজ করতেই নার্সের পোশাক-পরা সারদার আবির্ভাব হল।

অলককে দেখেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারদার।

গুডমর্নিং, মেজর ঘোষ। আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন।

মৃদু হেসে অলক বলল, ভুলিনি। কিন্তু এই ক'টা দিন ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। তার মধ্যে একদিন আবার শত্রুপুরীতে বন্দি হয়েছিলাম। কিন্তু সে-কথা থাক। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু

BanglaBook.org

আলোচনা আছে।

সারদা বলল, চলুন, তাহলে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে বসা যাক।

না—ওখানে নয়। ওখানে লোকে আড়ি পাততে পারে। তার চেয়ে আমার জিপে আসুন।

ডিউটি মেডিকেল অফিসারদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সারদা এসে বসল অলকের জিপে।

জিপ নিয়ে এলোমেলো ভাবে চেংগেল শহরটা ঘুরতে লাগল অলক।

জিপ ছুটে চলল ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ডিব্রুগড়ের দিকে। তারপর আবার ফিরে এল চেংগেলের পথে।

একসময় সারদা প্রশ্ন করল, আপনার কাজ কতদূর এগোল, মেজর ঘোষ?

মাইক্রোফিল্ম খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু দলিলটা চুরি হয়ে গেছে।

সেকী! চমকে উঠল সারদা।

অলক বলল, আশা করছি, আর দু-দিনের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে এল অলক, আপনি নাচ জানেন সারদা দেবী?

নাচ? কেন বলুন তো?

জানেন কি না আগে বলুন!

জানি।

তাহলে আমি শত্রুপক্ষকে সমূলে ধ্বংস করে এখান থেকে চলে যাব। আপনি আমায় সাহায্য করবেন, কথা দিন।

সারদা বলল, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যেই আমাকে এখনও চেংগেলে রাখা হয়েছে। নইলে আমার বদলি হয়ে চলে যাওয়ার কথা।

অলক বলল, কাল রাত্রে আপনাকে একজনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। সে অবিকল আপনার মতো দেখতে।

আপনি কার কথা বলছেন?

লালা বাবার মেয়ে হীরা।

হীরা! নাম শুনেছি। এখনও দেখিনি।

সে শুধু হীরাই নয়, সারদা দেবী। সে হল আমার হারিয়ে যাওয়া মিলাই।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সারদা যেন বোবা হয়ে গেল।

অলক এবার তার সমস্ত প্ল্যান খুলে বলল। শুনতে-শুনতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সারদার। তারপর বলল, আমি রাজি মেজর ঘোষ। কামনা করি, আপনার আর মিলাই-এর মিলন শুভ হোক।

হাসপাতালের কাছে সারদাকে নামিয়ে দিয়ে অলক তার জিপ ছুটিয়ে নিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে। সূর্য তখন মাথার ওপর। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই।

এমনসময় একটা আওয়াজে অলক তাকাল উপরের দিকে। একটা হেলিকপ্টার। ভারতীয় বিমানবাহিনীর ছাপ মারা হেলিকপ্টার। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নিশানার দিকে।

অলকের জিপ ছুটে চলল।

ছোট ব্রিজটা পার হয়ে অলক তার গাড়ি থামাল। তারপর তাকিয়ে রইল সামনের বড় পাহাড়টার দিকে। ওই পাহাড়টার মধ্যেই আছে শত্রুপক্ষের বিরাট অফিস। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অলকের। ওই পাহাড়টা ধ্বংস না করা পর্যন্ত ওর যেন শান্তি নেই।

অলক ফিরে এল জিপে। জিপ আবার ছুটে চলল তার গন্তব্যস্থলের দিকে। মনে-মনে সব প্ল্যানগুলো আর-একবার জরিপ করে নিল। যদি সবকিছু ঠিকমতো হয়, তাহলে কাল রাত্রিশেষে

BanglaBook.org

সে এখান থেকে চলে যেতে পারবে।

এখন শুধু একবার মিলাই-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সারদা বুদ্ধিমতী। তার ওপর অলকের ভরসা আছে।

মিনিটদশেক পরে অলকের জিপ যখন ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল, সে দেখল, তার একটু আগে-দেখা হেলিকপ্টারখানা ক্যাম্পের হেলিপ্যাডে দাঁড় করানো আছে।

অলক গিয়ে জিপখানা থামাতেই পাইলটের পোশাক পরা একজন মানুষ এগিয়ে এসে লম্বা স্যালুট দিয়ে বলল, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সেন ইজ রিপোর্টিং টু ইউ, স্যার।

অলক দেখল, মানুষটা আর কেউ নয়, তার বন্ধু রজত সেন।

দশ ঃ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি

অফিসারস মেসের অ্যান্টিরুমে জরুরি মিটিং-এর আহ্বান জানিয়েছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। বলা বাহুল্য, মেজর অলক ঘোষের পরামর্শেই।

সময় ওই দিনই বিকেল চারটে। অলকের মনে হয়, উত্তর আসাম ও নেফা অঞ্চলে 'বিকেল' বলে বিশেষ কোনও সময় নেই। এখানে দুপুরের পর সোজাসুজি সন্ধ্যা নেমে আসে। আর ওদিকে রাত তিনটের সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

চারটে বাজতে মিনিট দুই-তিন বাকি আছে, একে-একে সমস্ত অফিসার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সবশেষে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি স্বয়ং। সঙ্গে মেজর ঘোষ, ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সেন। এয়ার ফোর্সের মাস্টার গ্রিন পাইলট।

অ্যান্টিরুমের ঘড়িতে ঢংঢং করে চারটে বাজতেই কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, ডিয়ার অফিসারস্, আজ এক বিশেষ প্রয়োজনের সন্ধিক্ষণে আমি আপনাদের আহ্বান জানিয়েছি। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতা আমি পাব। আমার যা বক্তব্য, আমার পক্ষ থেকে মেজর ঘোষ আপনাদের তা জানাবেন।

অলক উঠে দাঁড়াল। তারপর ওসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে শুরু করল, আপনারা জানেন, আমাকে এক বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি হয়তো সে-কাজ পেরে উঠব না।

মেজর দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, এক্সকিউজ মি, আপনার এই সন্দেহের কি কোনও কারণ আছে? কারণ, আমি যতদূর জানি, আপনার পক্ষে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। অন্তত আমাদের সরকার তাই বিশ্বাস করেন।

অলক ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল দেশপাণ্ডের দিকে। তারপর বলল, জানি না আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কি না; তবুও বলছি, আমাদের শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই কোনও কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে, আমাদের চিন্তা করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই, মেজর দেশপাণ্ডে।

বলুন, আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। দেশের জন্যে প্রয়োজন হলে আমি জীবন উৎসর্গ করব।

ধন্যবাদ। কাজটা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যে-দলিল নিয়ে আমাদের অভিযান, সেই দলিলটা, তথা কর্নেল চ্যাটার্জির রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা চুরি হয়ে গেছে। আমার ধারণা, সেটা এখনও ক্যাম্পের মধ্যেই আছে। আজকের রাতের মধ্যেই ওটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মেজর দেশপাণ্ডে, এই দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা পেলেই

BanglaBook.org

ওটা আপনি আমার কাছে দিয়ে দেবেন।

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, আমি সম্মত, মেজর ঘোষ।

অলক বলল, আপনার দ্বিতীয় কাজটা আরও গুরুত্বপূর্ণ মেজর। আমি খবর পেয়েছি, সিভিল পুলিশ লালা বাবার মৃতদেহ, পোস্টমর্টেমের পর, আগামীকাল দুপুরে আদিবাসীদের কাছে ফেরত দেবে। তারপর কাল রাত্রে ওই মৃতদেহ নিয়ে আদিবাসীদের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠানে লালা বাবার মেয়ে হীরার নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে। আপনার কাজ হবে, হীরার ওপর নজর রাখা, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে চোখের আড়ালে যেতে না দেওয়া।

মেজর দেশপাণ্ডে সব শুনে বললেন, এ-কাজের ভারও আমি নিলাম। কথা দিচ্ছি, আমার তরফ থেকে কর্তব্যের কোনও ত্রুটি থাকবে না।

মেজর ঘোষ বসে পড়ল। আর তার কোনও বক্তব্য নেই।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা এই মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজা শুরু করে দিন। প্রয়োজন হলে ইউনিটের প্রতিটি মানুষকে এই কাজে লাগিয়ে দিন।

নিয়মমাফিক অভিবাদন জানিয়ে একে-একে সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল। রইল শুধু তিনজন। চ্যাটার্জি, অলক আর রজত সেন।

সবাই চলে যেতে চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, ঘোষ, আপনি যে সব কাজের ভার দেশপাণ্ডের ওপর চাপিয়ে দিলেন!

রহস্যময় হাসি হেসে অলক বলল, আমি ওকে সবসময় এনগেজ করে রাখতে চাই। আর আপনাকেও একটা কাজ দিতে চাই, স্যার!

বলুন।

আপনার কাজ হবে দেশপাণ্ডের ওপর নজর রাখা।

আপনি কি মেজর দেশপাণ্ডেকে সন্দেহ করেন নাকি?

আমার ধারণা সত্যি হলে দেশপাণ্ডেই হল সেই বিভীষণ—যাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রমাণ আছে?

আছে বইকী! আপনি দেশপাণ্ডের নাকে একটা কালশিটের দাগ লক্ষ করেছেন কি?

ঠিক খেয়াল করিনি।

ওইটাই হল আমার প্রমাণ। তবে ওই দাগ দু-চারদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আরও গভীর কোনও দাগ—যা কোনওদিন মুছে যাবে না।

কর্নেল চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন অলকের দিকে। তার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমার রাধাকৃষ্ণের মূর্তি!

অলক বলল, ওটা আজকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং কাল রাত্রে আবার ওটা চুরি হয়ে যাবে।

তার মানে?

তার মানে, রাধাকৃষ্ণের মূর্তিসহ দলিলটা যে চুরি করেছে, তাকে আমি জানি।

চ্যাটার্জি মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সেকী? আমি এখুনি তাকে গুলি করে মারব। কোথায় আছে সে?

অলক ধীরস্বরে বলল, সে আপনার সামনেই বসে আছে।

আপনি! ধপ্ করে বসে পড়লেন চ্যাটার্জি। অতবড় একটা মিলিটারি অফিসারের মুখখানা একটা বাচ্চা ছেলের মতো অসহায় দেখাল।

অলক বলল, আপনি রাগ করবেন না, স্যার। এর প্রয়োজন ছিল। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা

BanglaBook.org

আমি নিজেই চুরি করেছি এই কারণে যে, শত্রুপক্ষ জানুক যে ওটা চুরি হয়ে গেছে। তাহলে আমি কিছুটা সময় পাব। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, এই দলিলটার পিছনে দুটি দেশ কাজ করছে। ফলে এই চুরির খবর রটে যেতেই এখন তারা একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। এটা আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হল আজ সকালে। আমাকে চেংগেল যাওয়ার পথে কেউ অনুসরণ করেনি।

কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন যে, ওটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির মধ্যে লুকোনো আছে?

একজন মিলিটারি অফিসারের অফিসঘরে ঠাকুরের মূর্তি দেখে প্রথম দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অবশ্য আপনি নিজেকে 'গোঁড়া ব্রাহ্মণ' বলে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম, আপনি রাত্রে নিজের অফিসঘরেই শুয়ে থাকেন। অতএব দুয়ে-দুয়ে চার।

রজত সেন এতক্ষণ দুজনের কথোপকথন শুনছিল। অলক এবার তার দিকে তাকাল। বলল, তোর এখানে আসতে এত সময় লাগল কেন?

হেলিকপ্টারটা ডিব্রুগড়ে 'আনসারভিসেবল্' হয়ে গেছল।

এখন ওটার অবস্থা কী?

ফুল্‌লি সারভিসেবল্।

আগামীকাল রাত বারোটা থেকে তুই হেলিকপ্টারের মধ্যেই থাকবি। আমি যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসব, এবং তৎক্ষণাৎ তোকে হেলিকপ্টার চালিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পারবি?

নিশ্চয়ই।

চ্যাটার্জি বললেন, আপনি কি কাল রাত্রেই এখান থেকে চলে যাবেন?

আমার প্ল্যানমতো সবকিছু যদি চলে, আশা করছি, কাল গভীর রাতেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব।

দলিল? মাইক্রোফিল্ম?

ওগুলোও আমার সঙ্গে থাকবে।

আরও কিছুক্ষণ নানা ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পর রজত চলে গেল অফিসারস্ মেসে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। অ্যান্টিরুম থেকে অলক আর চ্যাটার্জি যখন বাইরে এলেন, আকাশে তখন ঘন কালো মেঘ। সন্ধ্যা নামতে হয়তো কিছুক্ষণ দেরি ছিল, কিন্তু কালো মেঘের জন্য এখনই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মেঘের নীচে নেফার প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে কীসের যেন প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু হাওয়া বইছে না। কালো মেঘের বুকে পাহাড়গুলো আরও কালো হয়ে যেন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল চ্যাটার্জির।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অলক। পি-ক্যাপের আড়ালে তার মুখটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। তবুও বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির মতোই অলকের মুখখানা কোনও এক অজানা রহস্যে থমথম করছে।

অলক দেখতে পেল, সারা ক্যাম্প জুড়ে অনেকগুলো মানুষ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ফেন্সিং-এর যতখানি অংশ দেখা যাচ্ছে, এক-একজন জওয়ান দশফুট ছাড়া-ছাড়া রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ক্যাম্পের মধ্যে যেন নিঃশব্দে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

বারান্দা থেকে নীচে নেমে এল অলক।

ঘাসের জঙ্গল কেটে ছোট-ছোট পাথর ফেলে সুন্দর রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল অলক। পাশ দিয়ে একজন জওয়ান যাচ্ছিল। ওদেরকে দেখে স্যালুট দিল।

BanglaBook.org

চ্যাটার্জি বললেন, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজার কাজ বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে দেখছি।

অলক বলল, হবে না। এর মধ্যে দেশপাণ্ডের নিজের ইন্টারেস্টও আছে যে।

একটু পরেই জেনারেটর চালানোর আওয়াজ ভেসে এল। সারা ক্যাম্প আলোকিত হয়ে উঠল। মাথার ওপর আকাশ গর্জে উঠল। তার সঙ্গে ঘন-ঘন বিদ্যুচ্চমক। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই প্রকৃতি তার তাণ্ডবলীলা শুরু করবে।

অকস্মাৎ একটা গুলির আওয়াজে চমকে উঠল অলক।

কে গুলি চালাল?

কান পেতে গুলির আওয়াজের উৎপত্তিস্থল অনুমান করার চেষ্টা করল অলক। চ্যাটার্জির কানেও শব্দটা গেছে। কিন্তু বুঝতে পারেননি, কোনদিক থেকে শব্দটা এল।

এর মধ্যেই একটা হইহল্লার আওয়াজ শোনা গেল।

মুহূর্তের মধ্যে চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করতে বলে ঝড়ের বেগে অলক দৌড়ে গেল জওয়ানদের তাঁবুর পিছন দিকে।

ওপর থেকে তখন বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জওয়ানদের তাঁবুর পিছনে, যেখানে ছোট একটা জঙ্গল আছে, এবং যার মধ্যে অনায়াসে দশ-বারোজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, সেখানে গিয়ে অলক দেখল এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

সবচেয়ে বড় যে-বিস্ময়, সেটা হল ঘাসের জঙ্গলে রঙিন পোশাক পরে মিলাই দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর একসঙ্গে দুটো জিনিস চোখে পড়ল। মেজর দেশপাণ্ডের বাঁ-হাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, আর ডানহাতে উদ্যত পিস্তল। আর কিছুটা দূরে রক্তাক্ত দেহে একজন জওয়ানের মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু অফিসার ও জওয়ানের দল।

চ্যাটার্জি চেঁচিয়ে বললেন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? মেজর দেশপাণ্ডে, হোয়াটস দ্যা ম্যাটার?

মেজর দেশপাণ্ডের কথায় জানা গেল যে, তিনি এই ইউনিটের সবাইকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজার কাছে 'ডিটেল' করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে খুঁজে পাবে তাকে একশো টাকা পুরস্কারও দেবেন বলেছিলেন।

যাই হোক, প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুজির পর মেজর দেশপাণ্ডে যখন হঠাৎই এখানে এসে পড়েছিলেন, তখন দেখলেন ওই জওয়ানটা—ওর নাম সিপাই রাম সিং—ও একটা গর্ত খুঁড়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা বের করল। মেজর দেশপাণ্ডের কোনওরকম সন্দেহই নেই যে, রাম সিং-ই মূর্তিটা চুরি করেছিল।

মেজর দেশপাণ্ডে তখন রাম সিংয়ের কাছ থেকে মূর্তিটা চাইলেন। কিন্তু রাম সিং ওটা দিতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, মূর্তিটা নিয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পাছে দলিলটা আবার হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করতে হয়।

অতএব, ওই হল রাম সিংয়ের মৃতদেহ। আর এই হল কর্নেল চ্যাটার্জির রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। বলে মূর্তিটা চ্যাটার্জির হাতে তুলে দিলেন দেশপাণ্ডে।

চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি মূর্তিটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে তলার ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তারপর একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে, আবার সেটা ভেতরে রেখে দিলেন।

ভালো, সবকিছু ঠিকই আছে। প্রায় স্বগতোক্তি করলেন চ্যাটার্জি। অলকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ঘষা কাচের মতো দৃষ্টি নিয়ে অলক তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

চ্যাটার্জি এবার হীরার দিকে তাকালেন। ওদের ভাষায় জিগ্যেস করলেন, তুমি এখানে কেমন করে এলে?

BanglaBook.org

হীরা আমতা-আমতা করে কী যেন বলল।

চ্যাটার্জি তখন দেশপাণ্ডেকে জিগ্যেস করলেন, ইজ ইট দ্যা ফ্যাক্ট?

দেশপাণ্ডে বললেন, হ্যাঁ স্যার। মেসের কাজে মাঝে-মাঝে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে লোক্যাল মানুষদের এমপ্লয় করতে হয়। আজকে হীরাকে লাগানো হয়েছিল। বোধহয় চেঁচামেচি শুনে এখানে এসে থাকবে।

আই সি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন চ্যাটার্জি।

ওদিকে বৃষ্টি তখন আরও জোরে পড়তে শুরু করেছে।

চ্যাটার্জি দেশপাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মৃত্যুর ব্যাপারে একটা ফর্মাল ইনভেস্টিগেশান না হওয়া পর্যন্ত আপনি অফিসারস্ মেসে কনফাইন্ড হয়ে থাকবেন। আশা করি, এর জন্যে কিছু মনে করবেন না।

তারপর দুজন জওয়ানকে মৃতদেহটা পাহারা দেওয়ার আদেশ জানিয়ে কর্নেল চ্যাটার্জি মেসের দিকে পা বাড়ালেন। বুকের সঙ্গে সযত্নে জড়িয়ে ধরেছেন রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি। বৃষ্টির জলে সকলেই ততক্ষণে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

অলক বলে উঠল, এক্সকিউজ মি, স্যার। আমি সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে জানাচ্ছি যে, আমি চাই না সন্ধ্যার পর কোনও 'সিভিলিয়ান' ক্যাম্পের মধ্যে থাকুক। কাজেই ওই মেয়েটাকে এসকর্ট দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে দিয়ে আসবার আদেশ দিন। এর মধ্যে আপনি ইচ্ছে করলে মেজর দেশপাণ্ডের স্টেটমেন্টটা লিখিয়ে নিতে পারেন।

শুধু বক্তব্যটুকুই নয়, চ্যাটার্জি দেখলেন, অলকের চোখ দুটোও যেন কী বলতে চায়। ইঙ্গিত বুঝতে চ্যাটার্জির দেরি হল না।

সঙ্গে-সঙ্গে চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, ও-কে, ইউ গো এহেড উইথ ইয়োর ডিউটিজ। আমি ইতিমধ্যে ফর্ম্যাল ইনভেস্টিগেশানটা সেরে ফেলছি।

বলে দেশপাণ্ডেকে আহ্বান জানালেন, আসুন, মেজর দেশপাণ্ডে।

মাথা নীচু করে চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করতে লাগলেন দেশপাণ্ডে।

অলক এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মিলাই-এর দিকে।

অনেক দূর থেকে ল্যাম্পপোস্টের একচিলতে আলো এসে পড়েছে মিলাই-এর মুখে। সেই আলোয় মিলাইকে দেখতে লাগল অলক। মিলাই-এর পিছনে ঘাসের জঙ্গল। তারও অনেক পিছনে সারি-সারি পাহাড়। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে-মাঝে মিলাই পাহাড়ি পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আবার মুহূর্তের মধ্যে 'স্বপ্নময়ী' হয়ে উঠছে ঘন আঁধারের মাঝে ল্যাম্পপোস্টের রশ্মিতে।

মাথার ওপরে আকাশ ভেঙে পড়ছে। সেই অঝোরধারা বৃষ্টিতে স্পন্দনহীন চোখে, স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে মিলাই।

অলক হিন্দিতে বলল, চলো হে মেয়েটা, তোমাকে ক্যাম্পের বাইরে দিয়ে আসি।

BanglaBook.org

এগারো ঃ বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি

ক্যাম্প ছাড়িয়ে কিছুটা আসার পর একটা বাঁক পার হতেই যখন ক্যাম্পটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না অলক। প্রচণ্ড আবেগে জড়িয়ে ধরল মিলাইকে। মিলাইও বুঝি এই শুভক্ষণের প্রত্যাশায় ছিল। বিরামহীন বৃষ্টির মাঝে, অন্ধকার প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে, অব্যক্ত

ভাষায় ওরা যেন কত কথা বলে নিল।

একসময় একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মিলাই বলল, এই, এখানে নয়। কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। চলো—ওদিকে যাই।

অলকের হাত ধরে টানতে-টানতে মিলাই এগিয়ে চলল গভীর জঙ্গলের দিকে। রাতের জঙ্গল এমনিতেই ভয়াবহ, তার ওপর এমন মুষলধারা বৃষ্টিতে সেটা আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

পথ দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র মিলাই-এর হাত ভরসা করে এগিয়ে চলছে অলক। মাঝে-মাঝে গাছের ডাল এসে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু ওরা দুটো মানুষ যেন আজ কোনও কিছুরই পরোয়া করে না। এই নগ্ন প্রকৃতির বুকে ওরা যেন দুজন আদিম মানব-মানবী।

একসময় থামল মিলাই। হাঁপাচ্ছে সে। মিলাই-এর হাত-ধরা অবস্থায় অলকও থামল। সে-ও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে দুজনেই হেসে ফেলল একসঙ্গে। মাথার ওপর গাছের পাতার ফাঁকে বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।

মিলাই বলল, আমি আর পারছি না গো। এখন ওদের সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কিছু একটা করো।

অলক বলল, কিছু করার কথা বলবার জন্যেই আজ সকাল থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর বোধহয় বেশিদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে না। তারপর তোমাকে নিয়ে সোজা চলে যাব বাড়িতে। ভাবো দেখি, কী মজাই না হবে! তোমার মা-বাবা হঠাৎ তোমাকে দেখে কীরকম অবাক হয়ে যাবেন! তারপর দেখবেন, মাথায় ঘোমটা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে মিলাই দাঁড়িয়ে আছে অলক ঘোষের পাশে।

মিলাই-এর চোখদুটো জলে ভরে এল।

হ্যাঁগো, এত সুখ কি আমার সইবে! হ্যাঁগো, আমার সব কথা জানার পরও কি তুমি আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে!

অলক সমবেদনার কণ্ঠে বলল, আবার তুমি ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করছ? আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?

অলকের মুখে হাত-চাপা দিয়ে মিলাই বলল, ও-কথা বোলো না গো। তোমাকে বিশ্বাস করব না তো আর কাকে করব? তোমাকে আমি এত বিশ্বাস করি যে, সেই বিশ্বাসের ভারে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার শুধু মনে হয়—আমি বোধহয় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারব না।

একটু থামল মিলাই। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, এবার বলো তোমার কথা। কবে এখান থেকে আমরা যাব?

অলক বলল, তার আগে তুমি বলো আজ হঠাৎ তুমি ক্যাম্পের মধ্যে গিয়েছিলে কেন?

আমাকে মেজর দেশপাণ্ডে ডেকে পাঠিয়েছিল। তুমি হয়তো জান না, তোমাদের ওই মেজর হল শত্রুপক্ষের লোক। আমাকে ও ডেকে পাঠিয়েছিল কী একটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেবে বলে। সেই মূর্তিটা নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে ওই পাহাড়ে ওদের হেডকোয়ার্টারে—যেখানে তোমাকে ওরা বন্দি করে রেখেছিল।

অলক বলল, এবার তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো।

বলো।

কাল রাত আটটার সময় তুমি আমার সঙ্গে যাবে একটা জায়গায়—যেখানে দুজনে একটা

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ কাজ করব।

কাল রাত আটটায়? অসম্ভব।

কেন?

কাল সন্ধে থেকে লালা বাবার মৃতদেহ নিয়ে আমাদের উৎসব হবে। সেই উৎসবে আমাদের নাচতে হবে, গাইতে হবে। ওরা যদি আমাকে ওখানে না দেখতে পায়, তাহলে সন্দেহ করবে।

এই পর্যন্ত বলে মাথা নীচু করল মিলাই। তারপর আবার বলতে লাগল, তোমাকে একটা কথা এখনও বলিনি। লালা বাবাকে আমিই খুন করেছি।

চমকে উঠল অলক। কথাটা যেন সে বুঝতে পারল না।

কী বলছ তুমি? লালা বাবাকে তুমি খুন করেছ? কেন?

সেদিন রাত্রে যে আমিই তোমাকে শত্রুপুরী থেকে মুক্ত করেছি, তারপর পথ দেখিয়ে এখানে পৌঁছে দিয়েছি—সেটা লালা বাবা বুঝতে পেরেছিল। তাই বাধ্য হয়েই তাকে পথ থেকে সরাতে হয়েছে। নইলে এতদিনে তুমি, আমি দুজনেই শেষ হয়ে যেতাম ওদের গুলিতে। আমার জন্যে আমি ভাবি না। শুধু তোমার কথা ভেবেই—।

আর বলতে পারল না মিলাই। কেঁদে ফেলল।

সস্নেহে মিলাই-এর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে অলক বলল, ছিঃ, কেঁদো না। এখন শোনো আমার কথা। কাল রাত্রে যে তোমাদের উৎসব আছে, আর সেই উৎসবে তোমাকে যে নাচতে-গাইতে হবে, তা আমি জানি। তার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার বদলে তোমারই মতো দেখতে অন্য একটা মেয়ে কাল ওই উৎসবে নাচবে। তুমি আর আমি যাব ওই পাহাড়ে।

ওই পাহাড়ে? মানে হেডকোয়ার্টারে?

হ্যাঁ। তুমি শুধু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বাকি যা করার আমি করব।

বেশ, তাই হবে।

আমার কাজ যদি সফল হয়, তাহলে কাল রাত্রেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারব। ভালো কথা, কাল আসবার সময় মাইক্রো ফিল্মটা সঙ্গে নিয়ে আসবে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মিলাই। তারপর অলকের হাতের ওপর হাত রেখে বসে রইল।

কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! একসময় উঠে দাঁড়াল মিলাই।

চলো, এবার ওঠা যাক। বেশি দেরি হলে ওরা আবার আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল অলকের। সত্যিই তো, সারারাত মিলাইকে সঙ্গে নিয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকা যায় না। এখানকার পরিবেশ আলাদা। এখানে তাদের পরিচয় আলাদা। একজন হল জংলি আদিবাসী, আর-একজন হল সুশিক্ষিত সৈনিক। কাছাকাছি থেকেও এক হওয়া যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল অলক। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে দুজনে বৃষ্টিতে ভিজেছে। এখনও তার বিরাম নেই। আকাশের অবস্থা আর বৃষ্টির বেগ দেখে মনে হচ্ছে, সারারাতেও বুঝি এ আর থামবে না। বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।

দুজনে ধীর পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে চলল বড়রাস্তার দিকে। তারপর একজন চলে যাবে আদিবাসীদের কুঁড়েঘরে, আর-একজন যাবে মিলিটারি ছাউনির তাঁবুতে।

জঙ্গলের পাতায়-পাতায় শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি। দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পথ চলতে লাগল।

BanglaBook.org

বারো : নতুন ফন্দি

অলক যখন ক্যাম্পের মধ্যে পা দিল, ঠিক তখনই সব আলোগুলো নিভে গেল। রাত দশটা বেজেছে। এই মুহূর্তে অলকের এককাপ গরম চা খেতে ইচ্ছে করল।

নিজের তাঁবুতে এসে ভিজে জামাকাপড়গুলো খুলে শুকনো পাজামা পরে নিল। শীত-শীত করছে দেখে গায়ে একটা চাদর জড়াল। তারপর রেনকোটটা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল কর্নেল চ্যাটার্জির অফিসের দিকে।

চ্যাটার্জি বোধহয় এতক্ষণ অলকের প্রতীক্ষা করছিলেন। অফিসঘরে ছোট একটা কেরোসিনের আলো জ্বলছে।

দরজা খুলতে-খুলতে চ্যাটার্জি বললেন, এত দেরি হল, কোথায় ছিলেন আপনি?

সব কাজ শেষ করে এলাম, স্যার।

অলককে বসতে বলে চ্যাটার্জি বললেন, আমি তো ভাবলাম আজও বুঝি আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল।

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল অলক। তারপর বলল, মেজর দেশপাণ্ডের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন?

হ্যাঁ।

নতুন কিছু বলেছে নাকি?

না। ওই একই কথা।

আমি চলে যাওয়ার পর দেশপাণ্ডে ক্যাম্পের বাইরে গিয়েছিল নাকি?

না। যতদূর জানি, ও নিজের তাঁবুতেই আছে।

রাধাকৃষ্ণের মূর্তি?

আমার কাছেই আছে; শুধু ওর মধ্যে থেকে দলিলটা বের করে নিয়েছি। ওটা চাই আপনার এখন?

না, এখনই চাই না। ওটা কাল সকালে কোনও অফিসারকে দিয়ে চেংগেলে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যেন দলিলটা নিয়ে ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট লকারে জমা দিয়ে আসেন।

আপনি কি কাল রাত্রে সত্যিই চলে যাবেন?

ইচ্ছে করলে আমি এখনই চলে যেতে পারি। কিন্তু দুটো কারণে আমাকে আরও একটা দিন থেকে যেতে হচ্ছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চ্যাটার্জি তাকালেন অলকের দিকে।

অলক বলে চলল, প্রথম কারণটা হল, আমি চাই না ওগুলো কেউ আবার ছিনতাই করে নিক আমার কাছ থেকে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, ওই পাহাড়টাকে আমি ধ্বংস করে যেতে চাই। এর জন্যে আমার কিছু এক্সপ্লোসিভের প্রয়োজন হবে, স্যার। ডিনামাইট জাতীয় কিছু। এবং ওগুলো কাল সন্ধের মধ্যে চাই। ছোট এবং শক্তিশালী জিনিস চাই।

চ্যাটার্জি সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, পেয়ে যাবেন। আমি আর্মানেন্ট অফিসারকে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখব।

আর আজ রাত্রে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। প্রয়োজন হলে গুলি চালাতেও দ্বিধা করবেন না।

আপনি কি কোনও বিপদ আশংকা করছেন?

মনে হচ্ছে, দলিলের জন্যে আজ আবার হামলা হতে পারে।

BanglaBook.org

*

পরের দিন সকালে ইউনিট অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন কুলকার্নির হাতে দলিলটা দিয়ে তাকে চেংগেল যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অলকের পরামর্শমতো কুলকার্নি একাই রওনা হল জিপ চালিয়ে।

আর এদিকে অলক ও রজত ব্যস্ত রইল হেলিকপ্টার নিয়ে। রজত আর-একবার পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছিল, যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক কাজ করছে কি না।

মেজর দেশপাণ্ডে একবার ঘুরে গেলেন।

রজতকে কাজ করতে দেখে জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার—কিছু খারাপ হয়েছে নাকি?

রজত কোনও কিছু বলার আগেই অলক জবাব দিল, হ্যাঁ। ফুয়েল প্রেশার ড্রপ করেছে। সেটাকেই মেরামত করবার চেষ্টা করছি দুজনে।

আরও কিছুক্ষণ পরে রজত বলল, মনে হচ্ছে, বেসে খবর পাঠাতে হবে। ওখান থেকে টেকনিশিয়ান আনাতে হবে।

দেশপাণ্ডে চলে গেলেন।

সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অলক মৃদু স্বরে বলল, কেউ জিগ্যেস করলে বলবি, হেলিকপ্টারটা আনসারভিসেবল্।

আরও আধঘণ্টা পরে দেখা গেল ঝড়ের বেগে একটা জিপ ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। গেটে যারা প্রহরায় আছে, তাদেরকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে জিপটা দ্রুতবেগে এসে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে পড়ল একেবারে অলকের কাছে। বিস্মিত অলক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিপ থেকে নেমে দাঁড়াল ক্যাপটেন কুলকার্নি। দারুণ উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছে।

কী ব্যাপার, কুলকার্নি? আপনাকে এত উত্তেজিত লাগছে কেন?

দারুণ ব্যাপার হয়ে গেছে, মেজর ঘোষ। এখান থেকে চেংগেল যাওয়ার পথে ছোট যে-ব্রিজটা আছে, সেটা কেউ ডিনামাইট চার্জ করে উড়িয়ে দিয়েছে। বাই রোড চেংগেল যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি কর্নেল চ্যাটার্জির একটা কাজে চেংগেল যাচ্ছিলাম। কিন্তু ব্রিজের মুখ থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অলক। শত্রুপক্ষের তৎপরতায় মুগ্ধ হল। ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে চেংগেলের সঙ্গে এই ইউনিটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল তারা। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। এখন একমাত্র সম্বল হেলিকপ্টার। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আছে।

আজই সারদা আসবে চেংগেল থেকে এখানে হীরার ভূমিকায় অভিনয় করতে। কিন্তু...কেমন করে আসবে সে? গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অলক। তবে কী তার সমস্ত প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যাবে?

ক্যাপ্টেন কুলকার্নি বলল, যাই, ওসিকে খবরটা দিয়ে আসি।

বলে সশব্দে জিপ চালিয়ে চলে গেল।

অলক ধপ করে বসে পড়ল হেলিপ্যাডের উপরে।

কী উপায়? কী করা যায়?

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল সে। ব্যাপারটার মধ্যে প্রচুর রিস্ক আছে সত্য, কিন্তু এই মুহূর্তে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

BanglaBook.org

রজতের দিতে তাকিয়ে অলক বলল, তোকে একটা কাজ করতে হবে রজত। কিন্তু কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়।

বল।

আজ সন্ধ্যার সময় তোকে চেংগেল যেতে হবে হেলিকপ্টার নিয়ে। ওখানে হসপিটাল থেকে সারদাকে তুলে নিয়ে আসবি। কেউ যেন জানতে না পারে। হেলিকপ্টার দেখে কেউ যদি কিছু জিগ্যেস করে বলবি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে তোকে ক্র্যাশল্যান্ড করতে হয়েছে। পারবি?

কেন পারব না! খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

তারপর শোন, সারদাকে এখানে এনে হেলিকপ্টারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে বলবি। তারপর সুযোগ বুঝে যেন সে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। আমি আশেপাশেই থাকব।

তেরো ঃ দুরন্ত অভিযান

নেফার বুকে আরও একটা সন্ধ্যা নেমে এল।

আজকের সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার। ঘন নীল আকাশে এ এক নতুন নেফা। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, তার নীচে ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ের সারি। এমনকী কান পাতলে ঘাই নদীর কলকল ধ্বনিও শোনা যায়।

আজকের এই সুন্দরী নেফাকে দেখে অলক মুগ্ধ হয়ে গেল।

মনের মধ্যে হাজার চিন্তার ঝড় না থাকলে সে হয়তো আরও বেশি উপভোগ করতে পারত এই সৌন্দর্যকে। একদিকে আজকের বিপজ্জনক অভিযানের দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে মিলাই-এর সঙ্গে তার মধুর মিলনের সুখস্মৃতি—সব মিলিয়ে এক জোয়ার-ভাটা খেলে যাচ্ছে তার অন্তরে।

এইরকম নানা ভাবনায় তার মন যখন বিক্ষিপ্ত, তখন দেখল, রজতের হেলিকপ্টারখানা ক্রমশ নীচে নেমে আসছে।

যাক, রজত নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছে।

হেলিকপ্টারটা আস্তে-আস্তে মাটি স্পর্শ করল। ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হতে, প্রপেলারের ব্লেডগুলো থেমে যেতে, দ্রুতপদে অলক এগিয়ে গেল। ততক্ষণে ককপিট থেকে রজত নীচে নেমে পড়েছে।

অলক বলল, সারদা এসেছে?

রজত জবাব দিল, হ্যাঁ।

এদিকেও অল ক্লিয়ার। একটু আগেই কর্নেল চ্যাটার্জি আর মেজর দেশপাণ্ডে আদিবাসীদের আড্ডায় চলে গেছে। তুই চটপট খেয়ে নিয়ে এয়ারক্র্যাফটের মধ্যেই বসে থাক। আমি ঘণ্টাতিন-চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

বলে অলক এগিয়ে গিয়ে প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজাটা খুলে ফেলল।

খুলেই চমকে উঠল।

কেবিনের মধ্যে মিলাই বসে আছে!

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল অলক। এ মিলাই নয়। হীরার ছদ্মবেশে সারদা।

অলক আহ্বান জানাল, নেমে এসো, সারদা।

সারদা নেমে এল। কে বলবে এই মেয়েটি চেংগেল হসপিটালের নার্স। এ যেন একটা জংলি মেয়ে। যারা হীরাকে চেনে, তারা বলবে, এ হল লালা বাবার মেয়ে হীরা।

অলক গাঢ়স্বরে বলল, তোমার এই সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ সারদা। আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। তাই এখনই তোমাকে 'শুডবাই' জানিয়ে রাখছি। আমার আজকের অভিযান

BanglaBook.org

যদি সফল হয়, তাহলে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে তোমার নাম আমি রেকমেন্ড করব। আর ব্যক্তিগতভাবে সারাজীবন আমি তোমাকে ভুলতে পারব না। চলো, লেট আস গো।

সারদার হাত ধরে গেটের দিকে এগিয়ে চলল অলক।

যেতে-যেতে বলল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে, তুমি সোজা এই ইউনিটে চাল আসবে। কর্নেল চ্যাটার্জি তোমার জন্যে গেটেই অপেক্ষা করবেন। পরে তিনিই তোমাকে চেংগেলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

গেট পার হয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে চলল দুজনে।

কানে এল আদিবাসীদের উৎসবের প্রাথমিক বাজনা।

অলক বলল, যাও—তাড়াতাড়ি গিয়ে উৎসবে যোগ দাও। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে পালিয়ে যেয়ো। কর্নেল চ্যাটার্জি তোমায় সাহায্য করবেন।

পাকা রাস্তা থেকে খাদের দিকে নেমে গেল অলক। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল, মিলাই।

সন্ধ্যার কিছু পরে অলকের নির্দেশমতো মিলাই এখানে লুকিয়েছিল। অলক একটা ব্যাগও রেখে গিয়েছিল মিলাই-এর জিম্মায়।

অলকের ডাক শুনে মিলাই বের হয়ে এল গোপন আস্তানা থেকে। তারপর সামনে আর একটা হীরাকে দেখে নির্বাক-বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

অলক বলল, এইবার তুমি যাও, সারদা। আমার নির্দেশ মনে রেখো।

সারদা তাকাল অলকের দিকে। অলকের মনে হল, সারদার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল টলটল করছে। যে-কোনও মুহূর্তে তা অঝোরধারায় ঝরে পড়তে পারে।

অলক হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সারদা দৌড়ে চলে গেল উৎসবস্থলের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘাসের জঙ্গলে।

মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে অলকের। কঠিন কণ্ঠে নিজেকে শাসন করে অলক বলল, মাইক্রো ফিল্মটা আমাকে দাও, মিলাই।

ব্লাউজের মধ্যে থেকে একটা কৌটো বের করল মিলাই। তারপর সেটা তুলে দিল অলকের প্রসারিত হাতে।

ব্যাগটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে অলক বলল, চলো, এবার আমরা যাই।

পরমুহূর্তে সচল হয়ে উঠল দুজনের পা। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল একটা পাহাড়ের উদ্দেশে।

চড়াই-উৎরাই-এর পথ। কিন্তু পথ বলে বিশেষ কিছু নেই। ছোট-বড় পাথরের মাঝে পা ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে চলল ওরা।

মাইলখানেক যাওয়ার পর ঘাই নদী এসে পথ আগলে দাঁড়াল। এখানে আর আদিবাসীদের বাজনা শোনা যাচ্ছে না। ঘাই নদী পার হলেই তারা গন্তব্যস্থলে এসে পড়বে। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করতে লাগল অলকের।

কিন্তু থামলে চলবে না। এগিয়ে চলল অলক। মিলাই-এর হাত ধরে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নদী পার হয়ে এল। এবার শুধু চড়াই।

সামনে মিলাই। পিছনে অলক। চঞ্চলা হরিণীর মতো মিলাই বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একটানা চড়াই-এর পথে হাঁটতে-হাঁটতে বুকের ভেতরে বিরাট একটা চাপ অনুভব করছে অলক। তার ওপর কাঁধে তার বোঝা। আসন্ন সংঘাতের নেশায় তার মন আচ্ছন্ন। ওদিকে সারদার জন্যও সর্বক্ষণ চিন্তা হচ্ছে।

অবশেষে পথ একসময় শেষ হল। হাঁপাতে-হাঁপাতে যেখানে থামল অলক, সেখানেই বিরাট

BanglaBook.org

পাহাড়ের দুর্ভেদ্য দেওয়াল।

ফিসফিস করে মিলাই বলল, আমরা এসে গেছি। খুব সাবধান কিন্তু।

পা টিপে-টিপে দেওয়ালের আরও কাছে এগিয়ে গেল তারা। রাত কত হবে এখন? দশটা? মিলিটারি ক্যাম্পটা কোথায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথাও এতটুকু আলো নেই। শুধু আকাশের অগুনতি তারার আলোয় চারিদিকে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

দেওয়ালের খুব কাছে আসতে একটা ফাটল নজরে পড়ল। মিলাই-এর পিছন-পিছন সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল অলক। ঢুকেই আবার পিছিয়ে এল দুজনে। তারা সুড়ঙ্গ-পথে এসে পড়েছে। আর একজন প্রহরী বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে।

চকিতে অলকের সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠল। তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মিলিটারি মানুষটা। ইঙ্গিতে মিলাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল অলক।

তারপর সহসা রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল প্রহরীর মাথায়। নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল সে। মিলাই এগিয়ে গেল। অলকের মুখে মৃদু হাসি। কাজের শুরুটা ভালোই হল।

আবার গলিপথ ধরে এগিয়ে চলল দুজনে। এখন লক্ষ্য আর্মস-অ্যামিউনেশনের ডিপো। মিলাই-এর নির্দেশমতো কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়ল সেই ঘরে। অলক উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরের মধ্যে কোনও মানুষ নেই। সারা ঘরটা নানারকম বন্দুক, রাইফেল, পিস্তলে ঠাসা। এছাড়াও গ্রেনেড, লাইট মেশিনগান আর স্টেন এম সি আছে। বারুদের বাক্স যে কত, তা বুঝি গুনে শেষ করা যাবে না।

মিলাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অলক। চটপট ব্যাগ থেকে একখানা টাইম-বম্ব বের করে বারুদের বাক্সের পিছনে রেখে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমনসময় একটা পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন বলছে, একী হীরা! তুমি এখানে?

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অলকের। নিমেষে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল দরজার পিছনে। এইভাবে যে ধরা পড়তে হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

ওদিকে হীরার কণ্ঠ শোনা গেল, একটু বসের কাছে এসেছিলাম। জরুরি দরকার আছে।

যাও। বস এখন তার বেডরুমে আছে।

অলক শুনতে পেল, পায়ের আওয়াজ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অলক।

তাকিয়ে দেখল, গলিপথে কেউ নেই।

আশ্চর্য! মিলাই কোথায় গেল?

গলিপথে এসে চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল অলক। একটু পরে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে মিলাইকে আসতে দেখা গেল।

কাছে আসতে অলক জিগ্যেস করল, কোথায় গেছলে?

ওই লোকটা আমাকে দেখে ফেলেছিল। তাই একটু ওদিকে চলে গিয়ে ওকে বোঝাচ্ছিলাম, সত্যিই আমি বসের কাছে যাচ্ছি। চল, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

নিঃশব্দে, যতটা সম্ভব দ্রুত ওরা পা চালাল। এবারে লক্ষ্য শত্রুপক্ষের কমিউনিকেশন সেন্টার।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা এসে পড়ল সঠিক জায়গায়।

দেখা গেল, একজন অপারেটর উত্তেজিতভাবে মুখে মাইক্রোফোন লাগিয়ে কার সাথে যেন কথা বলছে।

BanglaBook.org

হ্যালো, হ্যালো, দিস ইজ আলফা কনট্রোল কলিং—হ্যালো—।

তারপর বোধহয় ভালোভাবে শোনবার জন্য রিসিভারের ভলিউম বাড়িয়ে দিল। ফলে বাইরে থেকে সবকিছু শুনতে পেল অলক আর মিলাই।

দূরের স্টেশন থেকে তখন কে যেন বলছে, হ্যালো, আলফা কনট্রোল, দিস ইজ এজেন্ট নাম্বার ফিফটি সেভেন। মেসেজ ফর ইউ। কনফারম রেডিনেস।

অপারেটর জবাব দিল, আলফা কনট্রোল ইজ রেডি টু অ্যাকসেপ্ট ইয়োর মেসেজ। প্লিজ, গো এহেড।

রিসিভারে শোনা গেল, আমি ফিফটি সেভেন বলছি। এখানে হীরার মতো দেখতে একটি মেয়ে নাচ-গান করছে। আমি শিওর যে-মেয়েটি হীরা নয়। হীরাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার সঙ্গে-সঙ্গে মেজর অলক ঘোষও মিসিং। কোথায় গেছে বুঝতে পারছি না।

অপারেটর জিগ্যেস করল, ওদের হেলিকপ্টারের খবর কী?

উত্তর এল, হেলিকপ্টার আনসারভিসেবল্। সন্ধ্যার সময় একবার টেস্ট-ফ্লাইটে গিয়েছিল। কিন্তু পারফরমেন্স স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়। ওদের পাইলট এখনও কাজ করে চলেছে।

তাহলে মেজর ঘোষ কোথায়? বাই রোড কোথাও যেতে পারবে না। কারণ ব্রিজ আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, আপনি মেজর ঘোষ আর হীরার সন্ধানে থাকুন। আমি বসকে খবর দিচ্ছি। কোনও কিছু খবর থাকলেই সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন।

রিসিভার স্তব্ধ হয়ে গেল। অলক আর মিলাই-এর চোখাচোখি হল। তাদের পলায়ন আর শত্রুপক্ষের কাছে গোপন নেই। অতএব আরও তাড়াতাড়ি তাদের কাজ শেষ করতে হবে।

একলাফে অলক ঘরে ঢুকে গেল। ঢোকার মুহূর্তে হয়তো একটু শব্দ হয়েছিল। অপারেটর ঘুরে তাকাল। কিন্তু কোনও কিছু বোঝার আগেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অলক। তারপর দু-হাতে গলা টিপে ধরল।

অমানুষিক তেজে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। কিন্তু অলকের দেহে যেন আজ অসুরিক শক্তি ভর করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার।

মিলাই চটপট ব্যাগ থেকে একটা টাইম-বম্ব বের করে ট্রান্সমিটারের পিছনে রেখে দিল।

মোটামুটি কাজ শেষ। অলকের লক্ষ্য ছিল এই দুটো জায়গাই। বারুদঘর আর কমিউনিকেশন সেন্টার। তারপরের কাজ বারুদঘর নিজেই করবে।

অলক বলল, চলো, এবার পালাই। হাতে আর মাত্র মিনিটদশেক সময় আছে। আর দশ মিনিট পরেই বম্বগুলো বার্স্ট করবে। তার মধ্যেই আমাদের এই গুহার বাইরে চলে যেতে হবে।

আবার চারখানা পা একযোগে চলতে শুরু করল। শর্টকাট করার উদ্দেশ্যে একটা গলি দিয়ে ঢুকতে যেতেই কতকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ফিরে চলার গতি বাড়িয়ে দিল মিলাই।

সময় কেটে চলেছে।

এক মিনিট—দু-মিনিট।

একী! এদিকেও যে পায়ের শব্দ। শুধু পায়ের শব্দ নয়, তার সঙ্গে গলার আওয়াজও শোনা গেল, কই—হীরা তো আমার কাছে আসেনি।

দু-পায়ে পাষাণভার নেমে এল অলকের। কোনদিকে যাবে সে? এদিকে দুজন মানুষরূপী শয়তান, ওদিকে নিজেরই হাতে রেখে আসা তীব্র মারণাস্ত্র। অথচ হাতে আর সময় নেই বললেও

BanglaBook.org

চলে। অলক আর কোনওকিছু চিন্তা করারও সাহস পেল না।

এমনি মুহূর্তে, হঠাৎ মিলাই ওর রিভলভারখানা ছিনিয়ে নিল। তারপর তড়িৎগতিতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে, অলকের দিকে রিভলভারখানা বাগিয়ে ধরে গর্জে উঠল, হ্যান্ডস আপ, মেজর ঘোষ। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।

কী নিষ্ঠুর দৃষ্টি মিলাই-এর চোখে। দু-চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। আস্ত একটা শয়তানের মতো দেখাচ্ছে মিলাইকে। অলকের মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল।

সময় বয়ে যায়।

তিন মিনিট, চার মিনিট!

চোদ্দো ঃ পলায়ন

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দুজন মানুষের আবির্ভাব হল তাদের সামনে।

একজন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার, হীরা?

মিলাই জবাব দিল, দেখুন না বস। এই শয়তানটা লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টারে এসেছিল।

বস ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু তুমি এই সময় এখানে কেন? তোমার তো এখন লালা বাবার সমাধিতে যাওয়ার কথা।

চটপট জবাব দিল মিলাই, মেজর দেশপাণ্ডে আমাকে এই পিস্তলটা দিয়ে আপনার কাছে পাঠালেন একটা জরুরি খবর দিয়ে।

কী খবর শুনি?

মেজর ঘোষ নাকি অনেক লোকজন নিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করতে আসছে।

তাই নাকি?

বলে আরও কিছু এগিয়ে এল বস। সঙ্গে-সঙ্গে মিলাই-এর হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল দুবার। অলক দেখল, বস আর তার সঙ্গীর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল পাথরের রাস্তার ওপর।

অলকের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল মিলাই, পালাও—।

সময় কেটে গেছে। পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট।

দুজনে দৌড়চ্ছে। কিন্তু এ-পথের যেন শেষ নেই। অথচ সময় বয়ে চলেছে তার নিজের গতিতে। সাত মিনিট, আট মিনিট।

ওই তো পাহাড়ের গায়ের সেই ফাটল।

দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে।

আঃ! মুক্তি—ওই তো আকাশ দেখা যাচ্ছে। অনেক পরিচিত নেফার নির্মল আকাশ।

কিন্তু থামলে চলবে না। পিছনে যেন একটা পায়ের শব্দ!

আরও জোরে ছুটতে লাগল দুজনে। পাথরের ধাক্কায় বিষফোঁড়ার মতো ব্যথা পায়ে। গাছের ডালে যন্ত্রণাদায়ক খোঁচা লাগছে শরীরে।

ন'মিনিট, দশ মিনিট।

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে যেন তালা লেগে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দিনের আলোর মতো আলোকিত হয়ে গেল জায়গাটা। মিলাইকে এক টান দিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল দুজনে।

BanglaBook.org

শরীরের ওপর দু-চারখানা পাথরের টুকরো এসে পড়ল। শুয়ে-শুয়েই শুনতে লাগল অলক, একের-পর-এক বিস্ফোরণ হয়েই চলেছে পাহাড়ের অভ্যন্তরে।

সেই আওয়াজে বুকের নীচে মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অভিযান সফল হয়েছে তার।

কতক্ষণ ওইভাবে শুয়েছিল কে জানে, এক সময় উঠে দাঁড়াল অলক। সস্নেহে ডাকল, ওঠো মিলাই, আর কোনও ভয় নেই। এবার ফেরা যাক।

মিলাই উঠে দাঁড়াল। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে।

অলকের কাঁধে ভর দিয়ে উৎরাই-এর পথে নামতে লাগল সে। অলক একবার পিছন ফিরে তাকাল। গোটা পাহাড়টা যেন জ্বলছে। মাঝে-মাঝে তার মধ্য থেকে বড়-বড় আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে আর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘাই নদীর পাড়ে এসে হাতে-মুখে জলের ঝাপটা দিল দুজনে। অনেকটা আরাম বোধ হচ্ছে।

হঠাৎ কীসের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠল মিলাই।

আবছা অন্ধকারে নদীর ওপারে যেন কিছু মানুষের আনাগোনা।

ফিসফিস করে মিলাই বলল, বোধহয় কর্নেল দেশপাণ্ডের নির্দেশে আদিবাসীরা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। সাবধান অলক। ওদের বিষ মাখানো একটা তিরের আঘাতে জংলি হাতিগুলো পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ে। চলো, আমরা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে এগোতে থাকি।

নদী আর পার হওয়া গেল না। তার পরিবর্তে কখনও শুয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল দুজনে।

একসময় মিলাই বলল, চলো, আমরা চট করে নদীটা পার হয়ে নিই। ওপারে জঙ্গলটা বেশি। পালাতে সুবিধা হবে।

পাথরের ওপর পা রেখে-রেখে যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে নিল দুজনে। কিন্তু ওই সময়েই বোধহয় আদিবাসীদের একটা দল তাদের দেখতে পেয়েছিল।

ওই যে পালাচ্ছে। কে যেন চিৎকার করে উঠল।

পালাও, অলক! আরও জোরে।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কি জোরে দৌড়ানো যায়। এখানে পদে-পদে বাধা। কখনও পায়ের তলায় পাথরের ধাক্কা, কখনও বা কাদার মধ্যে পা বসে যায়। সামনের গাছগুলো তো প্রতি মুহূর্তে বিরাট এক প্রাচীর হয়ে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে।

দূর থেকে একটা তির ছুটে এল।

নাম-না-জানা কিছু পাখি নৈশ স্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে চিৎকার করে উড়ে পালাল।

কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়।

হোঁচট লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মিলাই। পরনের কাপড়জামা ছিন্নভিন্ন। হাত ধরে তাকে টেনে তুলল অলক।

ওপরের আকাশ ক্রমে কালো হয়ে আসছে। তারাগুলো একটা-একটা করে নিভে যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলে স্লেট পাথরের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

আর বেশি পথ বাকি নেই।

কিন্তু মিলাই-এর শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ পাথরের আঘাতে দু-পায়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। অলক একপ্রকার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁকে-ঝাঁকে আরও কিছু তির এসে পড়ল। অর্থাৎ, আদিবাসীরা বেশি দূরে নেই। নইলে

BanglaBook.org

জঙ্গলের মধ্যে তিরের গতি তাদের ছুঁতে পারত না।

অলক বলল, মিলাই, লক্ষ্মীটি, মনে জোর আনো। আমরা প্রায় এসে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে যাব।

নতুন উৎসাহে মিলাই আবার চলতে লাগল।

কিছুটা দূরে অনেক আলোর মালা। আজ বোধহয় ক্যাম্পের জেনারেটর বন্ধ করা হয়নি। হয়তো ওদেরকে ফিরে আসতে না দেখে কর্নেল চ্যাটার্জিই এই ব্যবস্থা করেছেন।

আলোর রেখা দেখতে পেয়ে ওদের গতি যেন আপনাতেই বেড়ে গেল।

অবশেষে একসময় সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান হল। ক্যাম্পের গেট আর মাত্র বিশ গজ দূরে। ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছে আলোকিত ময়দানে তাদের হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। আরও কাছে আসতে দেখা গেল কর্নেল চ্যাটার্জি, সারদা আর রজত দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের কাছে পৌঁছেই অলক চেঁচিয়ে উঠল রজতের উদ্দেশ্যে, রজত, ইঞ্জিন চালু করে দে।

রজত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। মাথার ওপর প্রপেলার সবেগে ঘুরতে লাগল।

অলক ও মিলাইকে দেখে এগিয়ে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। সঙ্গে সারদা।

অলক বলল, আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে চাই, স্যার। মনে হচ্ছে, আদিবাসীরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে পারে। আপনি মেজর দেশপাণ্ডেকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করুন।

বলে অলক দ্রুত এগিয়ে গেল হেলিকপ্টারের দিকে।

চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, দলিলখানা নেবেন না?

বাঁ-হাত দিয়ে মিলাইকে কাছে টেনে এনে অলক বলল, আপনার কাছে যেটা আছে, ওটা নকল। আসল দলিলটা আর মাইক্রো ফিল্ম আমার সঙ্গে আছে। ও-কে স্যার, গুডবাই। মেজর দেশপাণ্ডেকে কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে দেবেন না।

অলকের কথা শেষ হতে-না-হতে কতকগুলো ঘটনা চকিতে ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে।

কর্নেল চ্যাটার্জি চিৎকার করে উঠলেন, সাবধান অলক—।

মিলাই একটা আর্ত চিৎকার করে অলককে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

অলক কোনও কিছু বোঝবার আগেই, ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে দু-খানা গুলির শব্দ পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

অলক তাকিয়ে দেখল, একটু দূরে কর্নেল চ্যাটার্জির হাতে উদ্যত পিস্তল। বাঁ দিকে প্রায় হেলিকপ্টারের গা-ঘেঁষে মেজর দেশপাণ্ডের দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পাশে একটা পিস্তল।

আরও দেখল, মিলাই-এর হাতের বাঁধন ক্রমশ আলগা হয়ে তার দেহ থেকে খসে পড়তে চাইছে।

গুলির আওয়াজে রজত ততক্ষণে ইঞ্জিন 'কাট অফ' করে দিয়েছে।

অলক তাড়াতাড়ি মিলাইকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। দু-হাত তার লাল হয়ে উঠল মিলাই-এর তাজা রক্তে।

এক হাতে মিলাইকে ধরে রেখে, অন্য হাতটা চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল অলক। দু-চোখের তারা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। কপালের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে। ঠোঁট দুটো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সকলকে চমকে দিয়ে, এক বুকফাটা চিৎকারে কেঁদে উঠল অলক, মিলাই—।

দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই আর্ত আহ্বান।

BanglaBook.org

আর পটে-আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল মিলিটারি মানুষগুলো। সবাই যেন এক অজানা মন্ত্রবলে বোবা হয়ে গেছে।

উপসংহার

আর-এক সকালে নেফার আকাশে একটা হেলিকপ্টার ভেসে উঠল—যার পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রজত সেন। আর-একমাত্র যাত্রী মেজর অলক ঘোষ।

অনেক নীচে নেফাকে আজও এক মোহময়ী নারীর মতো দেখাচ্ছে। পাহাড়গুলো যেন একরাশ বোবা বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আলোয় লম্বা সুতোর মতো রুপোলি ঘাই নদী পাহাড়গুলোকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে।

ওই ঘাই নদীর জলেই মিলাই-এর চিতাভস্ম বিসর্জন দিয়ে এসেছে অলক। মিলাই আজ সত্যিই হারিয়ে গেল।

চোখ দুটো জলে ভরে উঠল অলকের।

মিলাই, মিলাই, মিলাই।

আর তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে না মিলাইকে। বারো বছরের অন্বেষণ আজ শেষ হয়ে গেল।

হেলিকপ্টারটা তখন আরও উঁচুতে উঠছে।

নেফার প্রকৃতি ক্রমে ছোট হয়ে আসছে অলকের চোখে। ছোট আর স্থির। স্থির আর আরও ছোট।

BanglaBook.org

বিদায়, শরীর

BanglaBook.org

অনিরুদ্ধ চৌধুরী

শ. সে. র. উ. ৩—৫৭

অসিত

অস্বীকার করি না। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মাথায় ছ'টা গুলি করে ওর মাথাটাকে আমি ঝাঁঝরা করে দিয়েছি। তবু বিশ্বাস করুন, আমি খুনি নই। কী, আমায় পাগল ভাবছেন? না, আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই আমি কাজটা করেছি, এবং এখনও আমার কোনও মানসিক বিকৃতি হয়নি। কী ভাবছেন? ভাবছেন, পাগল কি কখনও বুঝতে পারে যে, তার মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দয়া করে আমার এ-বিবৃতিটা পড়ুন, তারপর বলুন, এ ছাড়া আমার কী-ই বা করবার ছিল।

সেই ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের আগে আমি নিজেও এ-ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। এখনও মাঝে-মাঝে ভাবি আমাকে কি ভ্রান্ত পথে চালিত করা হয়েছিল? নাকি সবাই যা বলে, তা-ই ঠিক, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছি। কিন্তু অসিত আর বিনতা সম্পর্কে অনেকেই তো অনেকরকম অদ্ভুত কথা বলে। পুলিশও এখন পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। অবশ্য পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, কোনও ছাঁটাই চাকর সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর রসিকতা করেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বেশ ভালো করেই জানেন যে, তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যা নিতান্তই দুর্বল। আসলে যা ঘটেছে, তা আরও ভয়াবহ, আরও অবিশ্বাস্য।

যাক যা বলছিলাম। আমি খুনি নই। আমি অসিত মল্লিককে হত্যা করিনি, বরং বলা যেতে পারে, আমি বন্ধুকৃত্য করেছি। হতভাগ্য অসিতের যে শোচনীয় পরিণাম হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিয়েছি, এবং এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পৃথিবীকে আতঙ্কমুক্ত করেছি। এ-মহা-আতঙ্ককে যদি আমি ধ্বংস না করতাম, তবে সমস্ত মানবজাতির ওপর নেমে আসত এক অবর্ণনীয় পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। আমাদের দৈনন্দিন চলার পথের কাছাকাছিই রয়েছে এক রহস্যে ঘেরা ছায়াময় জগৎ। সে-জগৎ থেকে মাঝে-মাঝে কোনও দুষ্টু আত্মা জানা আর অজানা জগতের মাঝখানের ক্ষীণ সীমারেখা ভেদ করে চলে আসে আমাদের জগতে। সেই দুষ্ট আত্মার অস্তিত্ব যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে, তবে তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে এই নারকীয় শক্তিকে আঘাত করা। কোনওরকম করুণা না করে এই শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলা, ফলাফল তা সে যাই হোক না কেন।

অসিত মল্লিককে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। বয়েসে আমি ওর বড়। অদ্ভুত ধী-শক্তি ছিল ওর। সাত-আট বছর বয়েস থেকেই ও কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না ওর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে। সম্ভবত ওর ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং নিঃসঙ্গতার ফলেই এমন এক মানসিকতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, যা ওর বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল অসিত মল্লিক। স্বাস্থ্য ওর ভালো ছিল না। আর সেজন্যেই বোধ করি ও পেয়েছিল বাপ-মায়ের অন্ধ স্নেহ। তাঁরা ওকে মোটে কাছছাড়াই করতে চাইতেন না। ছেলেবেলায় দেখেছি, ও কোনওদিন একা-একা পার্কে বেড়াতে যেতে পারত না, সঙ্গে একজন ঝি অথবা চাকর থাকতই। সমবয়েসি অন্য ছেলেদের সঙ্গে ও খেলাধুলো করবার সুযোগও পেত না। নিঃসন্দেহে এর ফলে ওর অদ্ভুত স্বভাব-গোপন এক অন্তর্জীবনের যেন সৃষ্টি হয়েছিল, যে-জীবনে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে কল্পনা, উদ্দাম কল্পনা।

ছেলেবেলা থেকেই ও প্রচুর পড়াশুনা করত। ওর সাবলীল লেখা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল গভীরভাবে। কলেজ-জীবনে একসময় আমার ঝোঁক পড়েছিল অদ্ভুত শিল্পকলার দিকে। এ-ব্যাপারে আমি লক্ষ্য করেছিলাম অসিতের অপরিসীম আগ্রহ। চিত্রকলার আলো-ছায়ার মধ্যে বহু সময় কল্পজগতের আভাস পেয়ে আমরা দুজনেই মানসিক তৃপ্তি বোধ করতাম। এক পুরোনো মফঃস্বল শহরে আমরা থাকতাম, এই শহরের উপকণ্ঠের পুরোনো সব ভাঙা বাড়ি আর জঙ্গল আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত। ধূসর, বিবর্ণ, পাণ্ডুর আর ভগ্নবস্তুর ওপর অসিতের ছিল যেন এক সহজাত

BanglaBook.org

আকর্ষণ।

মফঃস্বল শহরের পড়া শেষ করে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকলাম। অসিত ঢুকল ইউনিভার্সিটিতে, এম.এ. পড়তে। বলা বাহুল্য, ওকে একলা ছাড়া হল না। কলকাতার বাসায় ওর মা ওর সঙ্গেই রইলেন, কাজেই দেশছাড়া হয়েও দুজনের মধ্যে যোগাযোগটা রয়েই গেল। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ই প্রকাশিত হল অসিতের প্রথম কবিতা সঙ্কলন 'দুঃস্বপ্ন এবং অন্যান্য কবিতা'। প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল এই কবিতাগুচ্ছ। অনেকেই স্বাগত জানাল কবিমনের এই বলগাহীন উদ্দাম কল্পনাকে, আবার কেউ-কেউ সমালোচনার ঝড় তুললেন এই বলে যে, এটা কোনও মহৎ সাহিত্যকর্ম নয়, এটা হচ্ছে এক ধূসর কবিমনের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

ছেলেবেলা থেকে মা-বাপের অন্ধস্নেহের ছত্রছায়ায় মানুষ হওয়ার ফলে অসিতের চরিত্রে আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। ছেলেবেলায় ও ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য, কিন্তু বয়েসের সঙ্গে -সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো হলেও ওর সেই শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। একা-একা কোনওদিন ও বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। কোনও বিষয়ে স্বাধীনভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা দায়িত্ব নেওয়া ওর ধাতে ছিল না। জীবন-সংগ্রামের কঠিন বন্ধুর পথে ও যে সাফল্য লাভ করবে না তা বেশ বোঝা গিয়েছিল। কেন না, ওর যেরকম মানসিকতা তাতে ব্যাবসা বা চাকুরি কোনটা করাই ওর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য সেজন্যে চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল না, কেন না, ওর বাবার যা সম্পদ ছিল, তাতে তিন পুরুষ স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। বয়েস বাড়লেও ওর চেহারায় বয়সোচিত ছাপ বিশেষ পড়ল না। ও সুকুমার এক কিশোরেই যেন রয়ে গেল। গোঁফ রেখে কিশোর মুখে বয়েসের ভাব ফুটিয়ে তুলবার একটা চেষ্টা অসিত করেছিল, কিন্তু ওর গোঁফ কোনওদিনই পুষ্ট হয়নি, রেখামাত্রই থেকে গিয়েছিল।

প্রত্যেকবার পুজোর ছুটিতে ও মা-বাবার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেত। এই সূত্রেই ভারতের নানা অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ওর একটা পরিচিতি ঘটে গিয়েছিল। পুরোনো ধ্বংসস্তূপ, পুরোনো সব অলৌকিক বিশ্বাস, এ-সবের দিকে কেমন এক অন্ধ আকর্ষণ ও অনুভব করত। ফিরে এসে ও এসব পুরোনো স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং বিশ্বাস নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত। ইতিমধ্যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমাদের শহরে এক সদ্য প্রতিষ্ঠিত পলিটেকনিকের দায়িত্ব নিয়ে বসেছি। অসিতও এম.এ. পাশ করে কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে ফিরে এসেছে নিজের শহরে।

প্রতি সন্ধ্যায় অসিত আমাদের বাড়িতে আসত। আমি ও আমার স্ত্রী ওকে পরিবারের একজনের মতোই দেখতাম। প্রতি সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে আমি ওর আগমনের প্রতীক্ষা করতাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। কলিংবেল বেজে উঠত। আমার স্ত্রী দরজা খুলে দিতেন, অসিত আসত। তারপর শুরু হত আর-একদফা চা-পান। অসিতের কলিংবেল টিপবার এক বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং করে তিনবার বেল বেজে উঠত, তারপর একটু থেমে আবার দু-বার ক্রিং-ক্রিং- করে বাজত। এটা যেন অসিতের একটা বিশেষ কোডসিগনালে পরিণত হয়েছিল। যেদিন বেল বাজত না, সেদিন আমরা দুজনে অসিতদের বাড়িতে যেতাম। অসিত তার পড়বার ঘরে আমাদের নিয়ে বসাত। দেখতাম ওর বই-ঠাসা আলমারির সারি। একটু ঈর্ষাক্ত দৃষ্টিতেই বোধ করি বই-ভরা আলমারিগুলোর দিকে তাকাতাম। কেন না, বই পড়বার শখ আমারও খুব, কিন্তু কিনবার সামর্থ্য সীমিত।

কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম যে, অসিত ভারতের প্রাচীন তন্ত্র-মন্ত্রের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে। প্রায় বিলুপ্ত এবং আদিবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাস নিয়ে ও প্রায়ই আমার সঙ্গে আলোচনার অবতারণা করত, আলোচনায় দেখতাম, এসব ব্যাপারে ওর জ্ঞান মোটেই ভাসা-ভাসা নয়, বরং বেশ গভীর।

BanglaBook.org

অদ্ভুত! আশ্চর্য! অসিত উত্তেজিত ভাবেই মন্তব্য করত, তন্ত্রের পুরোনো পুঁথি আর আদিবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে কত যেসব রত্ন লুকানো রয়েছে তা আর তোমাকে কী বলব তপন। এসব লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করতে পারলে মানুষ জরা-মৃত্যু জয় করে অনন্ত শক্তির অধিকারী হবে। সেই অমিত শক্তিধর মানুষ বিশ্বজগৎকে চালাতে পারবে নিজের অঙ্গুলি হেলনে। অতীত তার মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে যেসব সূত্র রেখে গেছে তার রহস্য ভেদ আমি করবই। কিন্তু মুশকিল কী জানো, আমাকে সব কাজই একা-একা করতে হচ্ছে। যেসব জিনিস নিজে বুঝতে পারছি না, তা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে যদি পেতাম তবে অনেক তাড়াতাড়ি আমি এগোতে পারতাম। তুমি বোধহয় আন্দাজও করতে পারবে না যে, কত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আমি পড়েছি।

কিন্তু তুমি যে এত তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছ, তা কি তোমার মা-বাবা জানেন?

না ওঁদের বলিনি। বললে মা হয়তো ভয় পেয়ে আমার পুরোনো পুঁথিপত্র কেনা বন্ধ করে দেবেন।

অসিতের বয়েস তখন পঁচিশ। ইতিমধ্যেই তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত তন্ত্র সম্পর্কে তার গবেষণামূলক কয়েকটি দামি প্রবন্ধ তখন দেশি এবং বিলেতি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওর মা-বাবাও জানতে পেরেছেন, অসিতের গবেষণার বিষয়বস্তু কী। কিন্তু ওর পড়াশুনা সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক, ও তো আর সত্যিই তন্ত্রসাধনা করতে যাচ্ছে না, এ-কথা ভেবেই হয়তো ওঁরা অসিতের তান্ত্রিক গবেষণায় বাধা দেননি।

আমিই অসিতের একমাত্র বন্ধু ছিলাম। ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পারতাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ওর কী সুগভীর জ্ঞান।

যেসব ব্যাপার নিয়ে ও মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইত না, সেসব ব্যাপারে ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করত। অবশ্য ওর সব কথাই যে আমার কাছে খুলে বলত তা নয়, মূলত ও ছিল এক নিঃসঙ্গ চরিত্র। ওর বাবা ওর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ও বিয়ে করতে রাজি হয়নি। সমাজে মেলামেশা করার ব্যাপারেও ওর ছিল দারুণ অনিচ্ছা।

এমনি করেই অসিতের নির্জন, নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক জীবন কেটে যেতে লাগল। পঁচিশের কোঠা ছাড়িয়ে ওর বয়েস তিরিশের কোঠায় এগিয়ে চলল।

বিনতা

অসিতের বয়েস যখন তিরিশ, তখন ওর পরিচয় হল বিনতা সোমের সঙ্গে। বিনতার বয়েস তখন তেইশ কি চব্বিশ। বিনতাও গবেষণা করছিল। ওর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, তন্ত্র এবং অধিবিদ্যা। আমার এক বন্ধুর ছোট বোন কলেজ জীবনে বিনতার সহপাঠিনী ছিল। কিন্তু বিনতাকে সে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলত। বিনতার ছিল নাতিদীর্ঘ দেহ, শ্যামলা রং আর ভাসা-ভাসা বড়-বড় চোখ। মোটের ওপর বিনতাকে বেশ সুন্দরীই বলা যেতে পারে। কিন্তু ওর ভাবে-ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে অনেক মেয়েই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইত না। সম্ভবত ওকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল ওর পিতৃপরিচয়। বন্ধুর ছোট বোনের কাছ থেকে বিনতার যে বংশপরিচয় পেয়েছিলাম তা হচ্ছে মোটামুটি এরকম :

বিনতার বাবা করালীকিঙ্কর সোম ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। সারাজীবন তিনি তন্ত্রসাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা এবং গবেষণা করেছিলেন। বিভিন্ন তন্ত্রের তিনি টীকা রচনাও করেছিলেন এবং তাঁর টীকাগুলি সত্যিই মূল্যবান। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি ঝুঁকে পড়লেন তন্ত্রসাধনার দিকে। কতকগুলো নীচু দরের তন্ত্র সম্পর্কে তিনি এতদূর কৌতূহলী হলেন যে, বাস্তবে তিনি এগুলোর

BanglaBook.org

কার্যকারিতা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এ-সময়ে তাঁর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হল। এ-পুস্তিকায় তিনি বলতে চাইলেন ঃ

আমাদের জানা জগতের কাছাকাছিই রয়েছে এক রহস্য-ঘেরা ছায়াময় অতীন্দ্রিয় লোক। জ্ঞাত আর অজ্ঞাত লোকের মাঝখানের সীমারেখা খুব ক্ষীণ, স্থানে-স্থানে খুবই অস্পষ্ট, এই অতীন্দ্রিয় লোক অসীম শক্তির উৎস। বিশেষ তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ব্যতীত লোকের মাঝখানের অস্পষ্ট কুহেলীময় আবরণকে ছিন্ন করে অলৌকিক শক্তিকে আমাদের জগতে নিয়ে আসা যায়। সঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হলে মন্ত্র-তরঙ্গের আঘাত এই কুয়াশাময় আবরণকে ছিন্ন করে। কিন্তু সাধককে সাবধান হতে হবে। দেখতে হবে তার অবাহনের ফলে কোনও দুষ্ট শক্তির আবির্ভাব যাতে না হয়।

শেষ জীবনে করালীকিঙ্কর তন্ত্রসাধনা নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর সম্পর্কে নানারকম কাহিনি শোনা যেতে লাগল। তিনি নাকি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে প্রেত-চক্রে বসছেন, তিনি নাকি শবসাধনা করছেন, পিশাচ আবাহন করছেন ইত্যাদি। জানি না এসব গুজবের কতটা সত্যি। তবে শেষ জীবনে করালীকিঙ্কর যে মানুষের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন এটা সত্যি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রায় ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত অকৃতদার থেকে করালীকিঙ্কর শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন। কাকে বিয়ে করলেন, কোথায় বিয়ে করলেন, তা কিন্তু কেউ জানে না। করালীকিঙ্করের স্ত্রীর মুখও কেউ কোনওদিন দেখেনি। পারতপক্ষে তিনি বাড়ির বাইরে আসতেন না। যদি বা কোনও কারণে আসতে হত, তবে একগলা ঘোমটায় তাঁর মুখ ঢাকা থাকত।

এই বিয়ের দু-বছর পরে বিনতার জন্ম। ওর বাবার বয়েস তখন বাষট্টি, মায়ের বয়েস? কেউ জানে না।

বন্ধুর বোনের কাছ থেকে বিনতা সম্পর্কেও অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে বিনতাও নাকি কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছিল। কলেজ জীবনে এসব ক্ষমতার কিছু-কিছু পরিচয়ও নাকি ও দিয়েছিল। বিনতা দাবি করত, ও নাকি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ঝড় তুলতে পারে। এ-শক্তির প্রমাণও সে নাকি কয়েকবার দিয়েছিল। কিন্তু সহপাঠিনী মেয়েদের বিশ্বাস যে, আসলে ওর ঝড় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আসন্ন ঝড়ের সংকেত ও অনেক আগেই বুঝতে পারত এবং এ-সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে সতীর্থদের কাছে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা করত। কুকুর-বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা বিনতাকে ভীষণ অপচ্ছন্দ করত। বিশেষ ভঙ্গিমায় ডানহাতের আঙুল নাড়িয়ে ও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের ভয় পাইয়ে দিতে পারত। চোখ ঘুরিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে এমন অনেক ভঙ্গি ও করত, যাতে করে ওর কাছাকাছি যারা থাকত, তারা ভয় পেয়ে যেত। অন্যরা ভয় পেলে ও কেমন এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করত। অনেক সময় তন্ত্র, যাদুবিদ্যা, তুক্‌তাক্ ইত্যাদি নিয়ে ও এমন সব কথা বলত যা ওর মতো বয়েসের একটি মেয়ের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

সবচেয়ে অস্বাভাবিক ছিল ওর অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা। যারা ওকে এড়িয়ে যেতে চাইত, তারাও ওর কাছাকাছি এলে ওর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। সম্মোহন বিদ্যা ও বেশ ভালো করেই জানত। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কোনও সহপাঠিনীর দিকে তাকিয়ে ও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারত। সম্মোহিতার মনে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হত। বন্ধুর বোন সুতপার ভাষাতেই বলি ব্যাপারটা।

জানেন তপনদা, বিনতা একবার আমাকে সম্মোহিত করেছিল। আমি যে খুব ইচ্ছুক ছিলাম তা নয়, তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার যে একটা কৌতূহল হয়েছিল, তা অস্বীকার করব না। ওই সময় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার, মনে হয়েছিল আমার ব্যক্তিত্বের বুঝি বদল হয়ে গেছে। আমার আত্মা যেন বিনতার দেহ আশ্রয় করে তাকিয়ে আছে আমার সত্যিকারের

BanglaBook.org

দেহের দিকে। আমার আবিষ্ট দেহের দু-চোখে অদ্ভুত দীপ্তি, আমার দেহের চোখ দুটি যেন আমার সম্পূর্ণ অজানা, সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন আমার চোখ নয়, ও-চোখের মধ্য দিয়ে আমি যেন পেলাম বিনতার দৃষ্টির ইশারা।

দেহ, চৈতন্য, আত্মা এসব নিয়ে বিনতা অনেক বড়-বড় কথা বলত। এসব কথার অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না, তপনদা। চৈতন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ও বলত যে, চৈতন্য দেহের অধীন নয়, দেহ-বন্ধনের বাইরেও বিদেহী চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব। দেহের সীমাবদ্ধতার মধ্যে চৈতন্যের শক্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কিন্তু দেহ-মুক্ত চৈতন্য অমিত শক্তিধর, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

বিনতা মাঝে-মাঝে রেগে যেত ও মেয়ে বলে, কেন না ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু উপাদান আছে যার ফলে পুরুষ-মস্তিষ্ক অনেক বেশি পরিমাণে অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করতে সক্ষম, এ-কথা ও অনেকবারই বলেছে যে, ও যদি ছেলে হত, তবে অজ্ঞাত অলৌকিক শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তারে ও কেবল বাবার সমানই হত না, বাবাকেও ছাড়িয়ে যেত। ও যে ছেলে হয়ে জন্মায়নি, এটা ওর মহা দুর্ভাগ্য।

অসিত-বিনতা সংবাদ

অসিতের সঙ্গে বিনতার প্রথম দেখা হয়েছিল এক সেমিনারে। এখান অসিত তন্ত্রের ওপর তার সদ্য-লিখিত এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিল। এসব ক্ষেত্রে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে শ্রোতারা সাধারণত প্রবন্ধকারকে তার বক্তব্যের ওপর নানারকম প্রশ্ন করে, অসিতের পাঠ শেষ হতে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল নিতান্ত মামুলি, নিছক কৌতূহল সঞ্জাত। সবার শেষে প্রশ্ন করতে উঠল একটি মেয়ে। মেয়েটির প্রশ্নের ধরন থেকেই অসিত বুঝতে পারল, তন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে এরকম প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। অসিত তার জ্ঞান-বুদ্ধি মতো জবাব দিল ঠিকই, কিন্তু অনেক জবাব ওর নিজেরই মনঃপূত হল না। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই বুঝি ও প্রথম সচেতন হল।

সভার শেষে মেয়েটি নিজেই এসে অসিতের সঙ্গে পরিচিত হল। তন্ত্র সম্পর্কে মেয়েটির জ্ঞানের গভীরতায় অসিত তখন মুগ্ধ। ও ঠিক করল মেয়েটির সঙ্গে আলোচনা করে নিজের সদ্য লিখিত প্রবন্ধে ও কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত করবে।

পরদিন সন্ধ্যায় অসিত আমার বাড়িতে এল। সে-সন্ধ্যায় অসিতের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল বিনতা প্রসঙ্গ।

জানো তপন, অদ্ভুত এই বিনতা সোম। কতই বা ওর বয়েস, কিন্তু এ-বয়েসেই কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য তন্ত্র সম্বন্ধে! ওর সহায়তা যদি পাই, তবে তন্ত্র সম্পর্কে এক যুগান্তকারী গবেষণা করতে পারব। শুধু গবেষণাই বা কেন, তন্ত্রসাধন পদ্ধতি অনুসরণ করে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির ওপর প্রভাব পর্যন্ত বিস্তার করতে পারব। আর তা ছাড়া শুধু কি তন্ত্র? বিনতার বাবা করালীকিঙ্কর সোম অ্যালকেমি নিয়েও অনেক পড়াশুনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে অ্যালকেমির অনেক পুরোনো পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। আজ সকালেই বিনতার সঙ্গে দেখা করেছি। তন্ত্র এবং অ্যালকেমির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা দুজনে মিলে একটা পেপার তৈরি করব বলে ঠিক হয়েছে।

বিনতাকে তখন পর্যন্ত আমি চোখে দেখিনি। ওর সম্পর্কে দু-একটা ভাসা-ভাসা মন্তব্য আমার কানে এসেছিল। আমি জানতাম ওর পিতৃপরিচয়। বিনতা সম্পর্কে অসিতের উচ্ছ্বাসে একটু দুঃখই পেলাম। কিন্তু অসিতের উৎসাহে বাধা দিলাম না, কারণ জানতাম, ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলে সেটা

BanglaBook.org

না কমে আরও বেড়েই যাবে।

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে অসিতের কাছ থেকে বিনতার প্রশংসা ছাড়া কিছুই শুনলাম না। বুঝলাম, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। বিনতা নামক মেয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বওকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিনতা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেব বলে ঠিক করলাম। আর এই সূত্রেই বন্ধুর বোনের কাছ থেকে বিনতা এবং করালীকিঙ্কর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম।

মাসখানেক কেটে গেল। এক সন্ধ্যায় অসিত বিনতাকে নিয়ে এল আমাদের বাড়িতে। বুঝলাম, অসিত কেবল নিজেই বিনতার দিকে আকৃষ্ট হয়নি, বিনতাও ওর প্রতি আকৃষ্ট। যতক্ষণ ওরা আমার বাড়িতে ছিল, ততক্ষণ বিনতা প্রায়ই চোরাদৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকাচ্ছিল, অসিতের দিক থেকেও চোরা কটাক্ষের বিরাম ছিল না। ওরা এত ঘনিষ্ঠ হয়েছে যে, এই ঘনিষ্ঠতার জট এখন খোলার বাইরে চলে গেছে।

কয়েকদিন পরে অসিতের বাবা অক্ষয় মল্লিক মশাই আমার বাড়িতে এলেন। মল্লিক মশাইকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল, পারস্পরিক কুশল সংবাদ এবং এ-কথা ও-কথায় কিছু সময় কেটে গেল। চা-পান শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। বুঝলাম, মল্লিক মশাই আমাকে কিছু বলতে চান এবং যা বলতে চান তা তিনি মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছেন। কী নিয়ে বলতে চান তা-ও আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম, উনি নিশ্চয়ই অসিত-বিনতা প্রসঙ্গেই আমাকে কিছু বলবেন।

আমার আন্দাজ ঠিক হল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে মল্লিক মশাই বললেন, অসিতের কোনও খবর রাখ?

কেন রাখব না, সে তো মাঝে-মাঝেই আমার এখানে আসে।

মাঝে-মাঝে, তার মানে আগের মতো আর রোজ ও তোমার বাড়িতে আসে না।

রোজ, মানে না, মানে আজকাল ওর এখানে আসাটা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

কমে গেছে, কিন্তু ও তো রোজই বিকেলে বেরিয়ে পড়ে, মানে ও অন্য কোথাও যায়। কোথায় যায় বলতে পার, তপন?

কোথায় যে অসিত যায় তা ঠিকই বুঝেছিলাম। কিন্তু মল্লিক মশাইয়ের মতো প্রবীণ লোকের সঙ্গে এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না।

আমার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে মল্লিক মশাই এবার সোজাসুজি জিগ্যেস করলেন, বিনতা সোমের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

দেখেছ মেয়েটিকে?

দেখেছি।

কোথায়?

এখানেই।

এখানে?

হ্যাঁ, অসিত একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

অসিত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, একটু আত্মগতভাবেই মল্লিক মশাই বললেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মল্লিক মশাই। তারপর নিজেই নীরবতা ভেঙে বললেন, অসিতের সঙ্গে করালী সোমের মেয়ের নাম জড়িয়ে শহরে অনেক কথা রটতে শুরু করেছে। আমি চাই না অসিত ওর সঙ্গে মেলামেশা করে। অসিতকে আমি মেলামেশা বন্ধ করতে বলেছিলাম। কিন্তু ও চায় বিনতাকে বিয়ে করতে। আমি ছেলেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে, এ-বিয়েতে আমার মোটেই সম্মতি নেই। খবর পেলাম, অসিত আর বিনতা নাকি একটা বাসা খুঁজছে। তার মানে, বিয়ে ওরা করবেই। অসিত আমার একমাত্র সন্তান। তপন, বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তুমি

BanglaBook.org

কি বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমার অসিতকে ওই ডাইনির খপ্পর থেকে বের করে আনতে পারো না?

শেষ দিকে মল্লিক মশাইয়ের গলার স্বরটা করুণ হয়ে এল।

এখন বোধহয় আর তা সম্ভব নয়।

তবু যদি একটু বুঝিয়ে দেখতে...।

শুধু তো দুর্বলমনা অসিতকে বোঝালে হবে না। এখন এক শক্ত মেয়ের পালায় পড়েছে অসিত। সেই মেয়েকেও বোঝাতে হবে। তবে আমার ধারণা সে-মেয়েকেও বোঝানো যাবে না। সে-মেয়ে অসিতকে আর ছাড়বে না।

কিন্তু আমার অসিত যে মনের দিক থেকে একেবারে ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ, চিরশিশু অসিত এতদিন শুধু বাবার ওপর নির্ভর করেছে, এখন সে নির্ভর করতে শিখেছে বিনতার ওপর। আগেই আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এখন আর এ-ব্যাপারে কিছু করা যাবে বলে আমার মনে হয় না।

আমার ধারণা সত্যি হল। একমাসের মধ্যেই অসিত আর বিনতার বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বিয়ের পর ওরা দার্জিলিং-সিকিম সীমান্তে চলে গেল হনিমুনে। ওই অঞ্চলে যাওয়ার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। ওদের ইচ্ছে ছিল ওদিককার বৌদ্ধ গোম্ফাগুলিতে যে সমস্ত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পুঁথিপত্র আছে, সুযোগ মিললে তা-ও দেখে আসা।

আমার পরামর্শে মল্লিক মশাই বিয়েতে বাধা দেননি। হনিমুনে যাওয়ার আগে বিনতা নিজেই আমাদের শহরের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে একখানা পুরোনো বাগানবাড়ি ভাড়া করল। পরলোকগত করালীকিঙ্করের পৈত্রিক বাড়ি ছিল আমাদের শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, যে-পাহাড় থেকে আমাদের শহরের নদীটা বেড়িয়ে এসেছে।

হনিমুন থেকে ফিরে এসে অসিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। মনে হল, ওর চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ওর ঠোঁটের ওপরকার সেই ক্ষীণ গোঁফের রেখার অস্তিত্ব আর নেই। বোধ করি, বিনতার পরামর্শেই অসিত তার গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরিবর্তনটা এখানেই নয়, ওকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল আর এই গাম্ভীর্যের পিছনে যেন ছিল এক বিষণ্ণ ব্যাথাতুর ভাব। সদ্য হনিমুন প্রত্যাগত নববিবাহিতের পক্ষে এ যেন একটু অস্বাভাবিক। অসিত যেন তার দীর্ঘস্থায়ী কৈশোর পার হয়ে হঠাৎ পরিণত দেহ-মনের এক মানুষে পরিণত হয়েছে। বুঝতে পারলাম না ওর এই পরিবর্তনটা আমার ভালো লেগেছে কিনা। অসিত একলাই এসেছিল আমার বাড়িতে, কেননা বিনতা নিজেই নাকি খুব ব্যস্ত। করালীকিঙ্করের পুরো লাইব্রেরিটাই সে নিয়ে এসেছে ওদের নতুন বাসায়। সেই লাইব্রেরি সাজানো আর নতুন ঘরকন্না সাজাতেই এখন ব্যস্ত বিনতা।

হনিমুন থেকে ফিরে প্রথমে শ্বশুরবাড়িতেই উঠেছিলাম। সপ্তাহখানেক ছিলাম ওখানে। মনে হল, অসিতের গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে উঠল—এ সাতদিনে অনেক নতুন জিনিস শিখেছি। বিনতার গাইডেন্সে আমার প্রগ্রেস বেশ ভালোই হচ্ছে। তন্ত্র আর অ্যালকেমি থেকে পাওয়া কতগুলো নতুন সূত্রের ওপর নির্ভর করে বিনতা একটু দুঃসাহসী এবং যুগান্তকারী পরীক্ষা করতে চাইছে। ওর স্থির বিশ্বাস এ-পরীক্ষায় ও সফলতা লাভ করবেই।

কী পরীক্ষা? আমি জিগ্যেস করলাম।

মানে, পরীক্ষার ব্যাপারটা আপাতত বিনতা গোপন রাখতে চাইছে। তপন, ভাই—কিছু মনে কোরো না, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে বিনতা বারণ করেছে। একটু অপ্রস্তুত ভাবেই অসিত কথাগুলো বলল।

না-না, ঠিক আছে, এ নিয়ে তুমি এত কিন্তু করছ কেন, মনে-মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেও আমি বললাম, থাক ও-কথা, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো গবেষণা করবে, নতুন সংসারে কাজকর্ম করবার লোকজন পেয়েছ তো?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, বিনতাই ওর বাপের বাড়ির পুরোনো ঝি-চাকরদের এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এরা তিনজনেই রহস্যময়, একজন এক বুড়ো, সে বাজার-টাজার করে আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে তার স্ত্রী এক বুড়ি, সে করে রান্না-বান্না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব কম কথা বলে, এদের গতিবিধিও নিঃশব্দ। তৃতীয়টি হচ্ছে আরও অদ্ভুত। এটি হচ্ছে একটি আদিবাসী কালো মেয়ে। মেয়েটি নাকি বিনতার গবেষণায় সাহায্য করে। কী সাহায্য করে বলতে পারি না, তবে মেয়েটির আকৃতিটাই অদ্ভুত। মাথাটা বিরাট লম্বা, হাত-পাগুলো কাঠি-কাঠি। দুটো বড়-বড় ছুঁচলো শ্ব-দন্ত। হঠাৎ দেখলে কেমন আঁতকে উঠতে হয়। আমি তো প্রথমে ওকে দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আর সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার কী জানো, মেয়েটার গা থেকে সবসময়ই পচা মাছের মতো বিকট দুর্গন্ধ বেরোয়।

পরিবর্তন

দেখতে-দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। আমার বাড়িতে অসিতের আগমন তখন আর প্রাত্যহিক নয়। ওর আসা অনেক কমে গেছে, মাঝে-মাঝে সপ্তাহ দুয়ের ব্যবধানে সেই পরিচিত কলিংবেল-এর আওয়াজ পেতাম। সেই প্রথমে তিনবার ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং, তারপর একটু থেমে আবার দু-বার ক্রিং-ক্রিং। আমিও মাঝে-মাঝে ওদের বাগানবাড়িতে যেতাম। এ-আসা-যাওয়াটা নেহাত সৌজন্যমূলক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ও যখন আসত, বা আমি যখন যেতাম, তখন আমার আর অসিতের মধ্যে ওদের অতীন্দ্রিয় গবেষণা নিয়ে কোনও কথা হত না। অসিত ওই প্রসঙ্গ এড়িয়েই যেতে চাইত। এতে আমি যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ না হতাম তা নয়, কেননা অসিত একদা একমাত্র আমার সঙ্গেই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করত। এর মানে কী? এই যে আগে আমি ওর যে বিশ্বাসের পাত্র ছিলাম, এখন আর তা নই? বিনতা সম্পর্কেও ও কোনও কথা বলতে চাইত না। ওর বাড়িতে গিয়ে বিনতাকে কয়েকবার দেখেছি, বিয়ের পর ওর বয়েস যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে। অসিত আর বিনতাকে একসঙ্গে দেখলে দুজনের মধ্যে বিনতারই বয়েস বেশি বলে এখন মনে হয়। ওর দৃঢ় ভাবভঙ্গি, মুখের কঠিন ভাব এবং বাইরের লোকের সঙ্গে নিরুত্তাপ কথাবার্তা কাউকেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক করে না। আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অসিতের বাড়িতে আমাদের যাওয়া ক্রমে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর এজন্য, অসিত এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেই ফেলল, বিনতা নাকি মনে-মনে খুশিই হয়েছিল। কেন না বাইরের লোক ও-বাড়িতে যাক, এটা বিনতা আদপেই চাইত না।

মাঝে-মাঝে ওরা দুজনে দূরপাল্লায় পাড়ি দিত। অসিত বলত, এসব যাত্রার উদ্দেশ্য ওদের গবেষণার উপাদান সংগ্রহ।

ওদের বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই অসিতের পরিবর্তন নিয়ে লোকে নানা কথা বলতে শুরু করেছিল। অসিত যেন আর আগেকার মতো নেই, ও যেন অনেক পালটে গেছে। এসব ছিল নিছক কথার কথা, কেন না পরিবর্তন যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তা হচ্ছে একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। কিন্তু এর মধ্যেও কতকগুলো নজরে পড়বার মতো ব্যাপার ছিল। অনেক সময় অসিত এমন ভাবভঙ্গি বা কাজ করত, যা ঠিক ওর পরিচিত প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেত না। যেমন প্রায়ই দেখা যেত, অসিত বিনতার টু-সিটার গাড়িখানা হাইওয়ে দিয়ে বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন নিপুণ ড্রাইভারের মতোই ওর ভাবভঙ্গি। কিন্তু অতীতের অসিত মোটেই গাড়ি চালাতে পারত না। অসিত যে কোনওদিন গাড়ি চালাতে পারবে এটা ছিল আমাদের কল্পনারও বাইরে। পরিবর্তন তাহলে সত্যিই হয়েছে, আর এটা কেবল নিছক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনই নয়, এ-পরিবর্তনটা দেখা যেত অসিত আর বিনতা যখন দূরপাল্লায় পাড়ি দিয়ে ফিরত, অথবা পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি হত।

BanglaBook.org

অসিতের এই পরিবর্তনটা আমার ভালো লাগেনি। লোকে বলাবলি করত, মাঝে-মাঝে ওর মুখভঙ্গি হাবভাব নাকি বিনতার মতো হয়ে যেত। কেউ-কেউ আবার আরও অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলত। তারা বলত যে, উদ্দীপ্ত অবস্থায় ওর চেহারায় এবং আচরণে পরলোকগত করালীকিঙ্কর সোমের ভাবভঙ্গিই যেন ফুটে উঠত।

একদিন একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। ন'টার সময় যখন পলিটেকনিকে বেরুচ্ছি, তখন দেখলাম, অসিতের গাড়িখানা বেগে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের আসনে দেখলাম তেজোদৃপ্ত অসিতকে। নিপুণ হাতে ও স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। এ অসিত যেন আমার অপরিচিত। সন্ধ্যায় পলিটেকনিক থেকে ফিরবার সময় দেখলাম, অসিতের গাড়ি ফিরছে। পিছনের সিটে নিস্তেজ অবসন্ন দেহে বসে আছে অসিত আর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছে কোনও ভাড়া করা ড্রাইভার অথবা মেকানিক। এ আমার পরিচিত অসিত।

বিবাহিত জীবনের তৃতীয় বৎসরে অসিত আমার কাছে তার আশঙ্কার আর অসন্তোষের কথা বলতে শুরু করল। প্রথম-প্রথম ও অবশ্য খোলাখুলিভাবে কোনও কথা বলত না। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আমার ব্যক্তি-সত্তা ফিরে পেতে হবে—এ-ধরনের সব হেঁয়ালিভরা মন্তব্য ও করত। আভাসে ইঙ্গিতে ও যেন আমাকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করত। প্রথম-প্রথম এ-ধরনের মন্তব্যকে আমি কোনও আমল দিতাম না। কিন্তু প্রায়ই এ-ধরনের কথা ওর কাছ থেকে শুনে আমিও সতর্কভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমার প্রশ্নে অসিত একই সঙ্গে যেন ভীত আর কৃতজ্ঞ হত। বুঝতে পারতাম, আমার কাছে সব কথা বলে ও ওর মনটাকে হালকা করতে চায়, কিন্তু সব কথা খুলে বলবার মতো সাহস অথবা মনোবল ওর নেই। বিড়বিড় করে ও বলত, বলব, বলব, একদিন তোমায় সব কথা খুলে বলব, তপন।

অসিতের যখন এই অবস্থা তখন একদিন ওর বাবা বুড়ো মল্লিক মশাই মারা গেলেন। ওর মা মারা গিয়েছিলেন ওর বিয়ের আগেই। বিয়ের পর থেকে অসিতের সঙ্গে মল্লিক মশাইয়ের যোগাযোগ একরকম ছিলই না। বিনতার সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল ও। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পাছে ও আবার বাবার প্রভাবে পড়ে যায়, এই ভয়েই বোধ করি বিনতা অসিতের সঙ্গে তার বাবার যোগাযোগটা একেবারেই পছন্দ করত না।

বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাওয়ার পর অসিত পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু বিনতা রাজি হল না, ফলে অসিতেরও ফিরে যাওয়া হল না। কয়েকদিন পরে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনলাম। অসিতের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় আমার স্ত্রী এখানে ছিলেন না, বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে আসা একটা সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে উনি এক বিকেলে অসিত-বিনতার বাড়িতে গেলেন।

আমার স্ত্রী যখন ওদের বাগানবাড়ির গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখন বেগে ওদের টু-সিটারখানা গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। আমার স্ত্রী দেখলেন চালকের আসনে তেজোদৃপ্ত অসিতকে। গাড়ির ভিতর আর কোনও আরোহী ছিল না। উনি অসিতকে ডাকলেন, কিন্তু অসিত শুনতে পেল বলে ওঁর মনে হল না। ও দারুণ স্পিডে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার স্ত্রী একেবার ভাবলেন ফিরে আসবার কথা, তারপর আবার কী ভেবে বাগানবাড়িতে ঢুকেই পড়লেন, কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিল সেই ভীষণদর্শন কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা।

বিনতাদি বাড়ি আছেন তো? আমার স্ত্রীর এ-প্রশ্নের জবাবে মেয়েটা বলল, না, দিদিমণি বাড়িতে নেই, তিনি দাদাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। মেয়েটার জবাব শুনে আমার স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, কেন না তিনি পরিষ্কার দেখেছেন অসিতের গাড়িতে দ্বিতীয় কোনও আরোহী নেই, মেয়েটা পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে।

ফিরেই আসছিলেন আমার স্ত্রী উর্মিলা। গেটের কাছাকাছি এসে একবার ফিরে তাকালেন

BanglaBook.org

বাড়িটার দিকে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার উর্মিলার চোখে পড়ল।

জানো, আমি ফিরে তাকাতে দোতলায় লাইব্রেরি ঘরের জানলা থেকে সাঁৎ করে একখানা মুখ সরে গেল।

কার মুখ?

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে উর্মিলা বললেন, খুব অল্প সময়ের জন্য আমি মুখখানা দেখেছি। ব্যর্থতা, বেদনা আর চূড়ান্ত আশাহীনতায় ভরা সেই মুখ। মুখখানা নিঃসন্দেহে বিনতার। কিন্তু হেসো না, বিশ্বাস করো, ও-মুখের দু-চোখে আমি দেখেছি অসিতবাবুর অসহায় দৃষ্টি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে পড়ল বিনতা সম্পর্কে আমার বন্ধুর বোন যেসব কথা বলেছিল।

এ-ঘটনার পর অসিত আবার মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ি আসতে শুরু করল। কিছুদিন ধরে আভাসে ইঙ্গিতে ও যেসব কথা বলছিল, এবার অনেকটা খোলাখুলি ভাবেই তা বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু ওর যা বক্তব্য তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। এসব কথা শুনলে ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই মনে সন্দেহ জাগবে।

জানো তপন, অসিত একদিন বলল, প্রেত-চক্রের অনুষ্ঠান এখনও হয়, তোমরা জানো না, কিন্তু আমি জানি, পিশাচ উপাসক সম্প্রদায় এখনও আছে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে নির্জন বনভূমিতে অমঙ্গল আর অশুভ শক্তির আবাহনকারীরা আজও মিলিত হয় বিশেষ-বিশেষ তিথিতে। সুন্দরবনে গিয়েছ কখনও? সুন্দরবনের গভীরে এক গোপন অঞ্চলে রয়েছে এক বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এই প্রাসাদের এক ঘরে রয়েছে এক গোপন সিঁড়ি-পথ। এ-সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের অন্ধকার গহ্বরে। এ-গহ্বরের জটিল কোণ আর পথ যেন এক অদৃশ্য দেওয়াল ভেদ করে নিয়ে যায় অন্য মাত্রা আর সময়ের এক রহস্যময় অজ্ঞাত জগতে। বড় ভয়ংকর এই নিষিদ্ধ জগৎ। এ-জগতে বিচরণ যেন এক দারুণ দুঃস্বপ্ন, এ নিষিদ্ধ জগতে আমি গিয়েছি, যেতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সত্যিই কি আমি গিয়েছি? না, আমার দেহ আশ্রয় করে আর কেউ—হঠাৎ থেমে গেল অসিত। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

নিজের অবিশ্বাস্য বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে অসিত একদিন আমাকে কতগুলো জিনিস দেখাল। হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম জিনিসগুলো দেখে। এগুলো কোথাকার জিনিস? অদ্ভুত রং আর গড়ন জিনিসগুলোর। এ-রং আমাদের অজানা। গড়নের রেখা আর তল আমাদের অপরিচিত। আমাদের জানা জ্যামিতিকে মোটেই অনুসরণ করেনি। কী এগুলো? এগুলো তৈরির উদ্দেশ্যই বা কী?

এগুলো সেই অজ্ঞাত জগতের জিনিস, তবে এর প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা বলতে পারব না। আমার প্রশ্নের জবাবে অসিত বলল।

কী পাগলের মতো কথা বলছ, এগুলো তুমি পেলে কোথায়?

আমি পাইনি, বিনতা পেয়েছে। ও জানে কী করে এগুলো পেতে হয়।

আর-একদিন সন্ধ্যায় কিছু এলোমেলো কথা বলে অসিত হঠাৎ ফিসফিস করে আমায় জিগ্যেস করল, করালীকিঙ্কর সোমকে তুমি কখনও দেখেছ?

দেখেছি?

কীরকম লোক মনে হত তাঁকে?

অদ্ভুত মানুষ, কারু সঙ্গে মেলামেশা করতেন না।

আচ্ছা, তিনি কি সত্যিই মারা গেছেন, না কি তাঁর দেহটাই শুধু নষ্ট হয়েছে?

কী আবোল-তাবোল বকছ, অসিত? তোমার এসব কথার কোনও অর্থই হয় না।

অর্থ হয় না। তপন, তুমি যদি ভাই সব কথা জানতে তাহলে আমায় আর পাগল

BanglaBook.org

ভাবতে না।

বেশ তো, তোমার কথা আমায় খুলে বলো। এভাবে কথা চেপে রেখে তুমি তোমার নিজেরই ক্ষতি করছ।

বলব, তোমায় আমি সব খুলে বলব। আজই বলব। আমি আর পারছি না, তপন, আমার দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন। তপন, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে, কোন পরিবেশের মধ্যে আমায় দিন কাটাতে হচ্ছে। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এক অভিশপ্ত মানুষ। এক অশুভ শক্তি এক মহা অমঙ্গল আমায় পাকে-পাকে বেঁধে ফেলেছে। এ থেকে কী করে যে আমি মুক্তি পাব—অসিত হঠাৎ থেমে গেল।

আজকাল ওর এই এক দোষ হয়েছে। কথা বলতে-বলতে ও হঠাৎ থেমে যায়। যেন চলা রেডিওকে কেউ হঠাৎ নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দেয়। এখন ভাবি, বিনতাই কি তাহলে দূর থেকে তার দুরন্ত সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে অসিতের বক্তব্যকে মাঝপথে থামিয়ে দিত? বিনতা নিশ্চয়ই সন্দেহ করত যে, অসিত মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসে এবং অনেক গোপন কথা বলে। এ-আসাটা বন্ধ করতে বিনতার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। অনেক কষ্ট করেই অসিতকে আমার কাছে আসতে হত। অনেক সময় আমার কাছে আসবার জন্য পথে বেরিয়ে ও সম্পূর্ণভাবে ভুলেই যেত ওর গন্তব্যস্থলের কথা। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। সেই অদৃশ্য শক্তির টানে আবিষ্ট অসিত আবার টলতে-টলতে ফিরে যেত নিজের বাগানবাড়িতে।

যখন বিনতা বাইরে যেত, নিজের দেহে বাইরে যেত, অসিত একবার এরকম একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল, তখনই কেবল অসিত আমার কাছে স্বাধীনভাবে আসতে পারত। ফিরে এসে অবশ্য বিনতা সবই জানতে পারত, কেননা সেই বিকটদর্শন ঢ্যাঙা মেয়েটা সব সময়ই অসিতের যাওয়া আসার ওপর নজর রাখত।

জানতে পেরে ও গম্ভীর হয়ে যেত, কিন্তু এই ব্যাপারে কঠোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া ও সমীচীন মনে করত না।

ইঙ্গিত

অসিত আর বিনতার বিবাহিত জীবনের চার বছর পূর্ণ হল। আগস্ট মাস শেষ হতে চলল। গত জুন থেকে অসিতের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছে। বিনতাও সম্ভবত ওর সঙ্গে গিয়েছে। কেননা তাকেও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশের লোকের ধারণা ও-বাড়ির দোতলার লাইব্রেরি ঘরে কেউ একজন রয়েছে, এই কেউ একজন সেই বুড়ো-বুড়ি বা ঢ্যাঙা মেয়েটা নয়। লাইব্রেরি ঘরের জানলায় ডবল করে কালো রঙের পরদা খাটানো হয়েছে। কোনও-কোনও পথচারীর কানে এসেছে পরদার পিছন থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের অসহায় আর্তনাদ। দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কেউ যেন জোর করে আর্তনাদটা থামিয়ে দিয়েছে।

এমনি একদিনে আমি টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামটা এসেছে নামখানা থেকে। করেছেন সুরেন মাইতি নামে এক ভদ্রলোক। এক অর্ধ-উন্মাদ ব্যক্তিকে তিনি নাকি সপ্তমুখী নদী থেকে উদ্ধার করেছেন। তার কাছ থেকে আমার নাম-ঠিকানা পেয়েই মাইতি আমায় টেলিগ্রাম করছেন। আমার অবিলম্বে নামখানায় যাওয়া দরকার।

এক বন্ধুর কাছ থেকে গাড়িখানা ধার করে বেরিয়ে পড়লাম নামখানার দিকে।

যথাসময়ে নামখানায় পৌঁছলাম। দেখা হল মাইতি মশাইয়ের সঙ্গে। সবিস্তারে শুনলাম সব কথা।

BanglaBook.org

মাইতি মশাইয়ের কিছু জমি-জমা আছে সুন্দরবন অঞ্চলে। বৈষয়িক প্রয়োজনে তাঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল। কাজ মিটে গেলে তিনি নৌকোয় করে সপ্তমুখী নদী ধরে ফিরছিলেন নামখানার দিকে। সন্ধ্যা হয়-হয়। পানসীর ছাদে বসে মাইতি মশাই অস্তসূর্যের শোভা দেখছিলেন। পশ্চিমের আকাশটা লাল। সূর্যকে দেখাচ্ছে টকটকে লাল একটা বিরাট সিঁদুরের ফোটার মতো। নদীর নীল জলে লাল আকাশের ছায়া পড়ে লালে-নীলে মিলে এক অপূর্ব বর্ণসুষমার সৃষ্টি হয়েছে। দূরে নদীর পাড়ের ঘন জঙ্গলের গাছগুলোর মাথায় লেগেছে লালের ছোপ। নীড়মুখী পাখির পাখায় বিদায়ী সূর্যের রক্তিম পরশ। সবটা মিনিয়ে যেন কোনও এক মহাশিল্পীর আঁকা অপূর্ব একখানি ছবি মাইতি মশাই তন্ময় হয়ে দেখছিলেন।

হঠাৎ মাইতি দেখলেন, দূরের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা লোক ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে এসে নদীতে ঝাঁপ দিল। ভাবে মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সাঁতার জানে না। আর সাঁতার জানলেই বা কী হবে? এই দুরন্ত সপ্তমুখী কি সাঁতরে পার হওয়া সোজা? সাঁতরে যাবেই বা কোথায়? ডুবন্ত লোকটার কাছে সুরেনবাবু নৌকো নিয়ে যেতে বললেন। তারপর মাঝিদের সাহায্যে জল থেকে উদ্ধার করলেন অচৈতন্য দেহটাকে।

নামখানায় নিজের বাড়িতে লোকটাকে নিয়ে এলেন সুরেনবাবু। প্রাথমিক চিকিৎসার পর লোকটি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। সুরেনবাবুর মনে হল কোনও ব্যাপারে লোকটা দারুণ ভয় পেয়েছে। মাঝে-মাঝে ও আঁতকে ওঠে, পাগলের মতো আবোল-তাবোল এমন সব কথা বলে যার কোনও অর্থই হয় না। লোকটার কাছ থেকে জিগ্যেস করে আমার নাম আর ঠিকানা পেয়েছেন সুরেনবাবু, ওর নিজের নামও জেনেছেন। ওর নাম নাকি অসিত মল্লিক। অসিতই সুরেনবাবুকে বারবার অনুরোধ করেছে আমাকে খবর দেওয়ার জন্য।

অসিতের সঙ্গে দেখা হল, এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে ওর। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখ কোটরগত, চোখের কোণে কালি। হঠাৎ দেখলে চেনাই যায় না ওকে।

আমায় দেখে অসিত কেঁদে ফেলল। তপন এসেছ, এসেছ ভাই, কান্না ভরা গলায় ও বলল, ঈশ্বরের দোহাই আমায় বাঁচাও। অভিশাপের জগৎ থেকে আমায় উদ্ধার করো। জানো, নরকের অন্ধকার অতল গহ্বরে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। আমি পারলাম না, থাকতে পারলাম না সেখানে, সহ্য করতে পারলাম না সেই মূর্তিমান মহা-অমঙ্গলকে। আমি পালিয়ে এসেছি। কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়, আমাকে আবার সেই মহা-নরকে নিয়ে যাবে। আমাকে গ্রাস করবে, আমার দেহটাকে গ্রাস করবে, আমার অভিশপ্ত আত্মা নিক্ষিপ্ত হবে পূতিগন্ধময় অনন্ত নরকে। তপন, তপন, আমার আর নিস্তার নেই, আমার আর মুক্তি নেই, আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল অসিত।

বড় কষ্ট হল ওর অবস্থা দেখে।

কোনও ভয় নেই, তুমি শুয়ে পড়ো অসিত। আমি তোমার পাশে বসছি।

তুমি আমায় ছেড়ে যেও না ভাই, আমার হাত দু-খানা চেপে ধরে আকুলভাবে অসিত বলল।

না, কোথাও যাব না, যখন যাব তখন তোমায় সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। কোনও চিন্তা নেই, তুমি ঘুমোও।

ঘুমিয়ে পড়ল অসিত। জাগল ঘণ্টাখানেক পরে। মনে হল ও যেন কিছুটা সুস্থ হয়েছে।

তপন জানো, আমি কোথায় গিয়েছিলাম? কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে? ফিসফিস করে অসিত বলল।

ওসব কথা এখন থাক, তুমি সুস্থ হলে তখন সব কথা শুনব।

সুস্থ! ম্লান হাসি হাসল অসিত, সুস্থ আর আমি কোনওদিনই হব না, ভাই।

কেন হবে না? তোমার কী এমন হয়েছে যে...।

BanglaBook.org

বৃথাই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ, আমি জানি আমার এই হতভাগ্য জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়। তাই তো সময় থাকতে তোমায় কিছু বলে যেতে চাই, জানি না পরে আর সুযোগ পাব কি না।

অসিত, তুমি অসুস্থ।

বাধা দিয়ো না, আমায় বলতে দাও। জানো কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে? আমায় নিয়ে গিয়েছিল নরকের অন্ধকার অতল গহ্বর পেরিয়ে অন্য কাল আর মাত্রার এক ভয়ঙ্কর জগতে। লাইব্রেরি ঘরে আমি বন্ধ ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এক পৈশাচিক প্রেত-জগতের মধ্যে এসে পড়েছি। বিনতা কথা দিয়েছিল যে এ-জগতে আমায় কখনই নিয়ে আসবে না। কিন্তু ও কথা রাখল না।

লাইব্রেরি ঘরে তুমি বন্ধ ছিলে।

হ্যাঁ, লাইব্রেরি ঘরে আমার আত্মাকে ওর নিজের দেহে বন্দি করল বিনতা। তারপর আমার দেহটাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই দেহকে আশ্রয় করে বিনতার আত্মা চলে এল অন্য কাল আর মাত্রার সেই পৈশাচিক জগতে। অশুভ প্রেত-চক্রে যোগ দিতে। লোকে জানল আমি বাইরে গিয়েছি, কিন্তু আসলে আমার দেহ আশ্রয় করে বাইরে গেল বিনতা।

কী বলছ তুমি অসিত! দারুণ বিস্ময়ে আমি বলে উঠলাম, এ-ও কি সম্ভব।

হ্যাঁ, সম্ভব। 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রে অনেক গূঢ় সাধন পদ্ধতির কথা আছে। এ-তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনও সাধক তার নিজের আত্মাকে অন্য দেহের মধ্যে চালিত করতে পারে।

অসিত, তুমি ওসব তান্ত্রিক পুঁথিপত্র পড়া ছাড়ো দেখি। ক্রমাগত এসব পুঁথি পড়ে-পড়ে তুমি সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা ভুলে গেছ। তুমি হয়ে পড়েছ এক কল্পজগতের বাসিন্দা।

বিশ্বাস করলে না তো, ম্লান হাসি হাসল অসিত, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, বরং যা বলছিলাম তাই বলি।

বলছিলাম আমি লাইব্রেরি ঘরে বিনতার দেহে বন্দি ছিলাম। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আমি বোধহয় কাঁদছিলাম। সেই কুৎসিত ঢ্যাঙ্গা মেয়েটা আমায় ধমকাচ্ছিল, চুপ করতে বলছিল। ঘর থেকে যাতে আমি কোনওরকমে বেরিয়ে যেতে না পারি সেজন্য আমায় বেঁধে রাখত ওরা। হঠাৎ কি হল বুঝলাম না। আমার চোখের সামনে দিনের আলো নিভে গেল। নিরন্ধ্র অন্ধকার যেন গ্রাস করল আমাকে, চারপাশের জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আমার চৈতন্য। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখলাম আমি আর লাইব্রেরি ঘরে বন্দি অবস্থায় নেই। এসে পড়েছি সেই ভয়াবহ প্রেত-চক্রের মাঝখানে।

দেখলাম, একটা ম্লান নীলাভ আলোয় আলোকিত একটা জায়গা। একদল লোক গোল হয়ে একটা বেদিকে ঘিরে বসে সাপ-খেলানো সুরে মন্ত্রপাঠ করছে। আমি তো কিছু তান্ত্রিক পুঁথি-পত্র পড়েছি, কিন্তু এ-মন্ত্র আমার কাছে দুর্বোধ্য, লোকগুলোর ভাবভঙ্গি আর চেহারা অত্যন্ত রহস্যময়। ওদের দেখলেই প্রাণে যেন দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

মন্ত্রপাঠ ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। মনে হয় মন্ত্রের ধ্বনি-তরঙ্গে সমস্ত জায়গাটা যেন থরথর করে কাঁপছে, একটা অশুভ আশঙ্কায় আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল ভয়ানক কিছু একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই এখান থেকে, কিন্তু পালাব কোথায়? পালাবার পথ নেই। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি যেন অদেখা বাঁধনে আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে।

একখণ্ড পাতলা কুয়াশা বেদির ওপর জমতে লাগল। তাই দেখে সাপ-খেলানো সুরের মন্ত্রপাঠ আরও তীব্র, আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। থির-থির করে কাঁপতে লাগল কুয়াশা খণ্ড। হালকা কুয়াশা পরতের-পর-পরত জমতে-জমতে ঘন হল। তারপর এক সময় দেখলাম বেদির ওপর জমে উঠেছে বিরাট একখণ্ড নিকষ কালো মেঘ। মেঘখণ্ড স্থির নয়। প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে সেই পুঞ্জীভূত কালো মেঘের মধ্যে। মুহূর্তে-মুহূর্তে মেঘের আকৃতি পালটে যাচ্ছে। আমার ভয়-বিহ্বলদৃষ্টির সামনে

BanglaBook.org

মেঘটা যেন একটা আকার নেওয়ার চেষ্টা করছে। এক সময়ে সেই মূর্তিমান মহা-আতঙ্ক রূপ নিল।

একটা হিমেল হাওয়ার স্রোত বইতে লাগল। সেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় আমার শরীরের রক্ত যেন জমে গেল। সে কী ঠান্ডা! মনে হল, এক তুষার সমুদ্রের মধ্যে কে যেন আমায় ফেলে দিয়েছে। লোকগুলো এক পৈশাচিক উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। সে যে কী ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃশ্য, তা আর আমি তোমায় কেমন করে বোঝাব, তপন!

বেদির ওপরকার মহা-আতঙ্ক ততক্ষণে রূপ নিয়েছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিপুল দেহ। পৃথিবীর কোনও জীবদেহের সঙ্গে এর মিল নেই। এ এক অপার্থিব দেহ। মূর্তির মেঘময় দেহ কোনও কঠিন উপাদানে গড়া নয়। একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট আকারও নেই মূর্তিটার। ক্ষণে-ক্ষণে ওটা রূপ আর রং পালটাচ্ছে। শুঁড়ের মতো অদ্ভুত সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে আসছে ওটার মেঘময় দেহ থেকে। নিষ্ঠুর জিঘাংসায় ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে দুটো অগ্নিময় প্রেতচক্ষু।

বেদি ঘিরে গোল হয়ে বসা লোকগুলো নতজানু হল। একটা হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল সেই মেঘ-মূর্তির দেহ থেকে।

নতজানু মূর্তিগুলো প্রার্থনার সুরে বলতে লাগল ঃ হে মহাপ্রেত! হে মহাপিশাচ, হে অলৌকিক শক্তিধর! তুমি প্রসন্ন হও। তুমি তৃপ্ত হও। তোমার অনুগামীদের তুমি অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান করো। পৃথিবীতে তারা তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তারা চূর্ণ করবে মঙ্গলের রাজত্ব, নিয়ে আসবে অমঙ্গলের প্লাবনকে। হে সহস্রমুণ্ড! তুমি আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করো। তোমার সন্তানদের তুমি শক্তিমান করো, যাতে তারা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে। হে মহা-আতঙ্ক! তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক।

নতজানু মূর্তিগুলো এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই মেঘবর্ণ মূর্তি থেকে শুঁড়ের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এগিয়ে এসে স্পর্শ করল মাটিতে লুটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে। মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল মূর্তিগুলো। একটা বীভৎস শুঁড় এসে স্পর্শ করল আমার দেহ। পিচ্ছিল ক্লেদাক্ত সেই স্পর্শ। সেই শীতল স্পর্শে আমার শরীরটা যেন বরফের মতো জমে গেল। লক্ষ-লক্ষ সাপ যেন হিসহিস করে উঠল নিষ্ঠুর জিঘাংসায়। সেই অপার্থিব মেঘদেহ আমার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। আমি এখানে অনাহূত অবাঞ্ছিত। সেই বীভৎস শুঁড় আমায় পাকে-পাকে বেঁধে ফেলল, তারপর আমার দেহটাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে দিল সেই বিবর্ণ নীল আলোর সীমার বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে। আমার চৈতন্য লুপ্ত হল।

জ্ঞান হতে দেখি আমি সুন্দরবনের সেই বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে পড়ে আছি। আমার সমস্ত শরীর জলে ভেজা—কাদায় মাখা। দারুণ আতঙ্কে আমি ছুটতে শুরু করলাম। এ-অভিশপ্ত পুরীর কাছে আর এক মুহূর্তও থাকা আমি নিরাপদ মনে করলাম না। তারপর কী করে যেন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে-ছুটতে নদীর কিনারায় এসে জলে ঝাঁপ দিলাম তা আমি নিজেই গুছিয়ে ঠিক করে বলতে পারব না।

এ-ভগ্ন প্রসাদের ভিতরে আমি আগেও গিয়েছি। এ-প্রাসাদের তলায় গহ্বরের ভেতরেই রয়েছে অজানা জগতের মাঝখানকার অতি ক্ষীণ সীমারেখা। এ-সীমার বাঁধন আমি আগেও ভেদ করেছি, কিন্তু মূর্তিমান সেই মহা-অমঙ্গলকে আগে কখনও দেখিনি। বিনতা আমায় কথা দিয়েছিল, ওখানে আর কখনও আমাকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু ও কথা রাখেনি। ও আমায় সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ওর হাত থেকে আমার আর নিস্তার নেই...ওকে আমি খুন করব...ওকে আমি নিজের হাতে খুন করব...। উত্তেজনায় অসিতের গলা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

অনেক কষ্টে ওকে শান্ত করলাম।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে নামখানার একটা দোকান থেকে ওর জন্য একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি কিনলাম। ওর পোশাক পরিচ্ছদের এমন হাল হয়েছে যে, এটা না কিনলেই চলছিল না। একজন ক্ষৌরকার ডেকে ওর চুল কাটানো এবং দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর মাইতি মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অসিতকে সঙ্গে করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের ভরপেট জলযোগ না করিয়ে মাইতি মশাই ছাড়লেন না।

অসিতের হিস্ট্রিরিয়ার ভাবটা কেটে গেছে। ও কোনও কথা বলছিল না। চুপচাপ থাকতে চাইছিল। গাড়িতে ও পিছনের সিটে না বসে আমার পাশেই বসল। গাড়ি স্টার্ট দিলাম। কাকদ্বীপ পর্যন্ত অসিত চুপচাপ রইল, কেবল মাঝে একবার ও আপন মনেই কী যেন বিড়বিড় করে উঠেছিল। মনে হয়, কোনও অপ্রীতিকর স্মৃতি ভেসে উঠেছিল ওর মানসপটে। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে, অসিত আর ওদের বাগানবাড়িতে ফিরে যেতে চাইছে না। আমিও ভাবছিলাম আপাতত অসিতের ওখানে না ফেরাই ভালো। বিনতা সম্পর্কে ওর মনে অদ্ভুত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, আর এ-ভ্রান্তি হয়তো কোনও মারাত্মক সম্মোহনমূলক পরীক্ষার ফল।

ঠিক করলাম, অসিতকে কিছুদিন আমার বাড়িতে নিয়ে রাখব। এর ফলে বিনতার সঙ্গে যদি অপ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তো হোক। অসিতের মানসিক অবস্থা সুস্থ হলে আমি চেষ্টা করব যাতে ওর সঙ্গে বিনতার ডিভোর্স হয়ে যায়। এ-বিয়ে মোটেই শুভ হয়নি। অসিতের কাছে বিবাহিত জীবন হয়ে উঠেছে মারাত্মক। অসিতের দিকে তাকালাম। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুমন্ত অসহায় দেহের দিকে তাকিয়ে মায়া হল।

ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছলাম। ট্যুরিস্ট লজে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। তিনটের সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমাদের যেতে হবে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে কলকাতার দিকে। কলকাতা পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে না, শহরতলির মধ্য দিয়ে আমরা গিয়ে পড়ব ন্যাশনাল হাইওয়েতে। তারপর হাইওয়ে ধরে ঘণ্টা পাঁচেক ড্রাইভ করলেই আমাদের শহরে পৌঁছে যাব।

সূর্য অস্ত গেল। অসিতের ঘুম ভাঙল। ও আবার বিড়বিড় করা শুরু করল। ওর কথায় কান দিলাম। বিনতার সম্পর্কেই ও অসংলগ্ন কথা বলছে। বিবাহিত জীবনে বিনতা ওর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করেছে। আর তারই ফলে বিনতাকে কেন্দ্র করে ওর মনে সৃষ্টি হয়েছে একটা ভ্রান্ত আমূল প্রত্যক্ষের (হ্যালুসিনেশন) জগৎ। ওর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি ঘটেছে। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে একান্ত উদাসীন হয়ে ও এক মনগড়া কল্পজগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে।

আমার এই অবস্থা...এ কি এই প্রথম হল? না, আগেও অনেকবার হয়েছে...অবশ্য এতটা সাংঘাতিক কোনওদিন হয়নি। জানো, ও আমাকে কেড়ে নিচ্ছে...আমার দেহ ছিনিয়ে নিচ্ছে...এখনও ও আমাকে সবসময় ধরে রাখতে পারে না...কিন্তু ওর শক্তি বাড়ছে। এমন একদিন আসছে যখন আমি আর আমাকে ফিরে পাব না। ও আমার দেহ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় অজানা সব ভয়ঙ্কর জায়গায় প্রেত-চক্রের অধিবেশনে যোগ দিতে। এমনি সব অশুভ চক্রে যোগ দিয়ে ও ওর পৈশাচিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। বিনতা আমায় জোর করে আটকে রাখে ওর নারীদেহের মধ্যে। লাইব্রেরি ঘরে বন্ধ করে রাখে আমাকে। ওই কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা, ওটা কি মানুষ! আমায় বেঁধে রাখে, আমায় শাসন করে। কিন্তু সময়-সময় ছিনিয়ে নেওয়া দেহকে বিনতা ধরে রাখতে পারে না। ওর বাঁধন আলগা হয়ে যায়। আমি ফিরে যাই নিজের দেহে। দেখি, আমি এক অচেনা অজানা ভয়ঙ্কর জায়গায় এসে পড়েছি।...আমি আর পারছি না। এ-জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

আগে কিছুক্ষণের জন্য ও আমার দেহ কেড়ে নিতে পারত। বারবার দখল করে ওর শক্তি

BanglaBook.org

এখন অনেক বেড়ে গেছে। এখন দিনের-পর-দিন ওর আত্মা আমার দেহকে আশ্রয় করে থাকতে পারে। ও পুরুষ হতে চায়, আর সেজন্যই আমাকে বিয়ে করেছে। ও চেয়েছিল এমন একটি পুরুষ, যার ধীশক্তি প্রবল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। আমার মধ্যে ও সেরকম একজন পুরুষই পেয়েছে। একদিন হয়তো ও আমার দেহ নিয়ে চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর আমি তখন বাঁধা পড়ে থাকব ওর নারীদেহের মধ্যে।

বুড়ো করালীকিঙ্কর সোম, তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন চিরকাল। আর এ-জন্য তিনি এক পৈশাচিক কাণ্ড করেছিলেন...। বিনতা? বিনতার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। একবার যখন সফলতা এসেছে, তখন আর-একবারই বা আসবে না কেন!

তপন, তপন, তুমি করালীকিঙ্কর সোমকে দেখেছ। কেমন অদ্ভুতভাবে তাকাতেন বুড়ো। আজকাল বিনতাও সেরকম অদ্ভুতভাবে তাকায় আমার দিকে। আমি জানি কেন ওভাবে তাকায়।

বুড়ো করালীকিঙ্কর 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রে এই রহস্যময় মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তুমি যদি সে-পুঁথি পড়, বুঝতে পারবে আমার এরকম হাল হল কেন, কীরকম এক ভয়ঙ্কর পৈশাচিক আবর্তের মধ্যে আমি পড়েছি।

বাঁচতে হবে, চিরকাল বাঁচতে হবে...এক দেহ বার্ধক্যে জীর্ণ হলে নবীন এক দেহ আশ্রয় করে বাঁচতে হবে। এমনি করেই ঘটবে দেহ থেকে দেহান্তরে দুষ্ট আত্মার চিরন্তন অশুভ সঞ্চার। বুড়ো করালীকিঙ্কর বোধহয় এরকম সব কথাই ভেবেছিলেন।

দেহ মরে গেলেও দেহমুক্ত জীবনদীপ কিছুকাল জ্বলতে পারে। আমি তোমায় ইঙ্গিত দিচ্ছি, তুমি হয়তো গোটা ব্যাপারটা ধারণা করে নিতে পারবে। বিনতার হাতের লেখা দেখেছ?

দেখেছি। গাড়ি চালাতে-চালাতে এই প্রথম আমি কথা বললাম।

ওর হাতের অক্ষরগুলো কী কায়দায় লেখা?

অক্ষরগুলো বাঁ-দিকে হেলানো।

ঠিক বলেছ। বুড়ো করালীকিঙ্করের কোনও পাণ্ডুলিপি দেখেছ? অসিত প্রশ্ন করল।

না।

একদিন বিনতা লাইব্রেরি ঘরে বসে একখানা পুরোনো পুঁথি থেকে কী যেন নোট করছিল। সে-দিন ওর হাতের লেখা দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম। কেন ভয় পেয়েছিলাম জানতে চাও?

বিনতা—সত্যিই কি বিনতা বলে কেউ আছে? নিজেকেই যেন অসিত এক অদ্ভুত প্রশ্ন করল। আর এমন গুজবই বা উঠেছিল কেন যে, বুড়ো করালীকিঙ্করকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে? এরকম কথাই বা লোকে বলে কেন যে, পাগল করালীকিঙ্করকে বিনতা যখন চিলে কোঠায় আটকে রাখছিল তখন সে এক ভীত-আতঙ্কিত শিশুর মতো আর্ত চিৎকার করছিল? বুড়ো করালীকিঙ্করের দেহে কি তার নিজের আত্মা ছিল? না কি...? কার দেহে কার আত্মা ছিল? কেনই বা করালীকিঙ্কর শেষ জীবনে পোষ্যপুত্র নেওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন? কেন নিজের মেয়েকে মোটেই দেখতে পারতেন না? কেন? কেন? ভাবো, তপন, ভাবো। কল্পনা করো কী নারকীয় পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল করালীকিঙ্করের সেই আতঙ্ক-ভরা পাষাণপুরীতে, যেখানে দুরন্ত পৈশাচিক শক্তির অধিকারী এক দানব একটা অল্পবুদ্ধি কিশোরীকে পেয়েছিল একেবারে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। পরিবর্তনটা কি সাময়িক, না চিরন্তন? বলো তপন, বলো, কেন অসতর্ক মুহূর্তে বিনতার হাতের লেখা অন্যরকম হয়? কেন সেই হাতের লেখার সঙ্গে...ওঃ আঃ মা গো! তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে অসিত হঠাৎ থেমে গেল।

মনে পড়ল, আমার বাড়িতে বসেও কথা বলতে-বলতে অসিত হঠাৎ থেমে গেছে। কিন্তু

এবারের থামাটা একেবারে অন্যরকম। আমার পাশে বসা অসিতের মুখটা দারুণ যন্ত্রণায় যেন বিকৃত হয়ে গেল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে। ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল থরথর করে। ওর শরীরের অস্থি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি, স্নায়ু, গ্ল্যান্ড সবই যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিমা এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা সুরু করল। ভয় পেয়ে গেলাম।

কেন ভয় পেলাম, ভয়ের কারণটাই বা কোথায় ঠিক করে বলতে পারব না। স্টিয়ারিং হুইলে রাখা আমার হাত শিথিল হয়ে গেল, নেহাত হাইওয়ে বেশ চওড়া এবং একেবারে ফাঁকা, তা না হলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত। মনে হল, আমার পাশে বসে দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে যে-দেহটা, তা যেন অসিতের নয়, এ-দেহ যেন অন্য ভুবনের কোনও অজানা আগন্তুকের। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অভিশাপ যেন বর্ষিত হচ্ছে এ-দেহের ওপর, আর সে-অভিশাপের যন্ত্রণায় হতভাগ্য দেহটায় শুরু হয়েছে প্রচণ্ড আক্ষেপ।

স্টিয়ারিং হুইলে আমার হাত আলগা হয়ে গেল। হঠাৎ এক ধাক্কায় আমায় সরিয়ে অসিত শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল। মুখের ভাব, এ যেন মুহূর্তকাল আগের অসিত নয়। ওর মুখের ভাবভঙ্গি, দৃঢ়, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। এ এক তেজীয়ান বলদৃপ্ত চেহারা।

এ-পাশে সরে এস তপন, অ্যাকসিডেন্ট করবে নাকি! আমি গাড়ি চালাচ্ছি।—অসিতের গলার স্বরে স্পষ্ট আদেশের সুর।

এ কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু এ-অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি সত্যিই ঘটেছিল সেদিন সন্ধ্যায়।

ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ছুটছিল গাড়ি। কোনও কথা বলছিল না অসিত। একটা হিংস্র শ্বাপদের চোখের মতোই যেন জ্বলজ্বল করছিল ওর চোখ দুটো। লোকে ঠিকই বলে তেজীয়ান অসিতের মুখের ভাবভঙ্গি যেন অনেকটা বিনতারই মতো। ওর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো যেন মনে করিয়ে দেয় করালী-কিঙ্কর সোমের কথা।

খড়্গপুর পেরিয়ে অসিত প্রথম কথা বলল, ওর গলায় স্বর আমার কাছে একেবারে অপরিচিত মনে হল। এ-স্বর গভীর, দৃঢ়, এক অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ে ভরা। গলার স্বর নয়, ওর বলার ভঙ্গিটা যেন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। ওর কথার মধ্যে যেন রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তুমি ভয় পাওনি তো? যাকগে, ওসব কথা ভুলে যাও, জানই তো আমার নার্ভের অবস্থা কীরকম। সত্যি তপন, তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ।

কোনও জবাব দিলাম না।

আমি বোধহয় পাগলের মতো আবোল-তাবোল অনেক বকেছি। বিনতা সম্পর্কেও বোধহয় আজে-বাজে অনেক কথা বলেছি। ওসব কথা ভুলে যাও। সবসময় তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ফলেই আমার এই হাল হয়েছে। যখন আমার মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন নানারকম সব অসম্ভব আজগুবি ধারণার সৃষ্টি হয় আমার দুর্বল মনে, আমি তখন ভাবি, বুঝি এসব আজগুবি ধারণা সত্যি। নাঃ, বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। বাইরেই কোথাও যাব ঠিক করেছি। কিছুদিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। বিনতা বেচারির কোনও দোষ নেই, অসুস্থ অবস্থায় ওর সম্পর্কে যদি কোনও কথা বলে থাকি, তা নিতান্তই অমূলক।

এ-যাত্রায় কিছু তান্ত্রিক পুঁথিপত্রের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, নানা জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়েছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলে। এখানে এক সময় কাপালিকদের আস্তানা ছিল। তাঁদের সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যই এ-অঞ্চলে আসা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আর আমার দুর্বল নার্ভের কথা তো জানই। অসুস্থ শরীর, দুর্বল নার্ভ, তারই ফলে

BanglaBook.org

হয়তো অনেক ভুল বকেছি। মাসখানেক বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনে পড়ছে না এসব কথার পিঠে আমি কোনও কথা বলেছিলাম কি না। যদিও বলেও থাকি তবে তা খুব অল্প। কেমন এক অদ্ভুত অস্বস্তি, অদ্ভুত আতঙ্ক যেন আমায় পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবছিলাম কতক্ষণে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। এ-যাত্রার সমাপ্তি যত তাড়াতাড়ি ঘটে ততই মঙ্গল। অসিত স্টিয়ারিং হুইল ছাড়ল না। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ও যেন গাড়িখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলাম। দূরে দেখা গেল অসিতদের বাগানবাড়িখানা। বাগানের গেটে একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। এ ছাড়া সারা বাগানবাড়িটা অন্ধকার।

আমি এখানেই নেমে যাই, তপন। তোমায় ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্য।

গেট পেরিয়ে বাগানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অসিত।

বাকি পথটুকুন আমি একা ফিরে এলাম।

বাড়ি ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এ-যাত্রায় এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। কেন অদ্ভুত? নিজের মনকে প্রশ্ন করেও যেন সঠিক জবাব পেলাম না। অসিতের সঙ্গে যে বেশ কিছুদিন দেখা হবে না, এ-কথা ভেবে মনে-মনে দুঃখিত না হয়ে যেন খুশিই হলাম।

কিন্তু দেখা হল, বাইরে যাওয়ার আগে অসিত একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সন্ধ্যাবেলায় ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছিলাম। ক্রিং...করে কলিংবেল বেজে উঠল। উঠে দরজা খুলে দিলাম, দেখলাম অসিত দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তেজোদৃপ্ত বলীয়ান অসিত। ওকে দেখব বলে আশা করিনি। না, সত্যিই ওর পরিবর্তন হয়েছে। ওর পুরোনো কলিংবেল বাজাবার ধরনটা পর্যন্ত পালটে গেছে।

এসো, ভিতরে এসো।

আসছি, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না, তপন। কাল সকালে বাইরে যাচ্ছি গোছগাছ করা এখনও বাকি ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

কোথায় যাচ্ছ?—কিছুটা নিস্পৃহ স্বরেই জিগ্যেস করলাম, অসিতের এই তেজীয়ান চেহারাটা কেন জানি না আমার ভালো লাগছিল না।

শিমুলতলা। খুব কম ভাড়ায় ওখানে একখানা বাড়ি পেয়ে গেছি। জায়গাটাও খুব স্বাস্থ্যকর। সোফায় বসতে-বসতে অসিত বলল।

একাই যাচ্ছ, নাকি বিনতাও সঙ্গে যাবে?

না, একাই যাচ্ছি। বিনতা একটা আর্টিকল লেখার কাজে ব্যস্ত আছে। ওখানে গিয়ে একটা ছোকরা চাকর ঠিক করে নেব, সে-ই আমার রান্নাবান্না, হাটবাজার আর অন্য সব কাজ করে দেবে।

কতদিন থাকবে ওখানে?

মাসখানেক তো বটেই, বেশিও হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ বসল অসিত। এমনি ধরনের মামুলি কথাবার্তাই হল ওর সঙ্গে। তারপর এক সময় ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমিও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সেই সন্ধ্যার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, গাড়ির ভিতর আমার চোখের সামনে অসিতের যে-পরিবর্তনটা হয়েছিল তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা আমি বারবার চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। আর ওর পরিবর্তনের ফলে আমার মনে যে কেন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে পারছিলাম না।

BanglaBook.org

একলা

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় আমার বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠল, ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। একটু থেমে আবার ক্রিং-ক্রিং। এ তো অসিতের সেই পুরোনো ডাকবার ভঙ্গি। দরজা খুলে দেখলাম, দোরগোড়ায় অসিত দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন সেই আগেকার অসিত। এক বিচিত্র মিশ্র আবেগে ওর মুখের রেখাগুলো কাঁপছে, একইসঙ্গে যেন ভয় আর জয়ের ছাপ পড়েছে ওর রেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে, বারবার ও পিছন ফিরে কী যেন দেখছিল।

এসো-এসো, ভিতরে এসো।

অসিত এল আমার পিছু-পিছু। দুজনে বসলাম এসে ড্রয়িংরুমে।

তারপর, কবে এলে?

কাল রাতে, তপন। আজ আমি তোমায় সব কথাই খুলে বলব, কিন্তু আগে আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে? বেশ কড়া করে এক কাপ কফি।

কফি খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও। আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না, ও নিজে থেকেই বলা শুরু করুক।

বিনতা চলে গেছে তপন, চাপা গলায় অসিত বলতে শুরু করল, কাল রাতে ওর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, ঝি-চাকরেরা বাড়িতে ছিল না। বিনতা আর আমার দেহ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, বেকায়দায় ফেলে ওর কাছ থেকে আমি এ-প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি। আমিও কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলাম। এ-সম্পর্কে তোমায় আগে কিছু বলিনি আমি। আমার সে-শক্তির কাছে বিনতার শক্তি পরাজিত হয়েছে। সাংঘাতিক রেগে গেছে ও। আজ সকালে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেছে। জানি, এ নিয়ে নানা গুজব উঠবে, লোকে নানারকম কথা বলবে। কিন্তু বিশ্বাস করো তপন, আমার সামনে এ ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বিনতার সঙ্গে যে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এ-কথা আপাতত কাউকে বোলো না তুমি, কেউ জিগ্যেস করলে বোলো, গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য ও দূর পাল্লায় পাড়ি দিয়েছে, ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরি হবে।

আমার ধারণা, বিনতা তার প্রেতচক্রের সঙ্গীদের কাছেই গিয়েছে, এখন আমাদের মধ্যে একটা আইনসঙ্গত বিবাহ-বিচ্ছেদ দরকার। তা সে-বিবাহ-বিচ্ছেদ হোক আর নাই হোক, আমি যে ওর অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একলা থাকতে পারব তাতেই আমি খুশি। কী সাংঘাতিক জীবনের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তপন, বিনতা আমার দেহ ছিনিয়ে নিত, আমার অসহায় আত্মাকে বন্দি করে রাখত নিজের নারীদেহের মধ্যে। আমি বাধ্য হতাম নিজের দেহ ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি সব সময়ই সুযোগ খুঁজতাম। আমার মনের কথা পুরোপুরি বুঝবার মতো শক্তি বিনতার ছিল না। তবে আমি যে মনে-মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছি, এটা ও বুঝতে পারত। ও সবসময়ই ভাবত আমি বুঝি একান্ত অসহায়। বিনতা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে, আমিই শেষ পর্যন্ত ওকে কোণঠাসা করব। আমিও যে কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ করেছি এটা বিনতা বুঝতেই পারেনি। কাজেই ও সতর্ক ছিল না, আর ওর অসতর্কতার সুযোগ নিয়েই আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করেছি।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অসিত।

আর একটু কফি খাবে? আমি জিগ্যেস করলাম।

তা খেতে পারি, উদাসভাবে অসিত বলল।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ও আবার বলতে শুরু করল, বিনতার ঝি-চাকরদের বিদায় করে দিয়েছি। সহজে কি যেতে চায় ওরা, নানারকম অজুহাত তুলেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে শুরু করেছিল। যাক, শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে ওরা। মনে হয়, ওরা আমাকে বিরক্ত করতে

BanglaBook.org

আসবে না। সেই কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা, যে আমার ওপর তর্জন-গর্জন করত, এমনভাবে লম্বা দুটো শ্ব-দন্ত বের করে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল যে, মনে হয়েছিল এই বুঝি দিলে কামড়ে। যাওয়ার আগে হিঃহিঃ করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠেছিল ও। মেয়েটা যেন এক মূর্তিমতী প্রেতিনী! ও-অভিশপ্ত বাড়িটাই আমি ছেড়ে দেব, তপন, ফিরে আসব আমাদের নিজের বাড়িতে। বাবার পুরোনো চাকর-বাকরদের আবার কাজে বহাল করব।

সেই ভালো, ও-বাড়িটা তুমি ছেড়েই দাও। নিজেদের বাড়িতে ফিরে এলে পরিবর্তিত পরিবেশে তোমার দেহ-মন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

তপন, তুমি বোধহয় ভাবছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিন্তু ভাই, তুমি নিজের চোখেই তো আমার একটা পরিবর্তন দেখেছ, বিষণ্ণ গলায় অসিত বলল, নামখানা থেকে ফিরে আসবার পথে তোমার চোখের সামনেই তো পরিবর্তনটা ঘটেছিল। বিনতার দুষ্ট আত্মা তখন আমার দেহে ভর করেছিল। আমার আত্মা চলে গিয়েছিল লাইব্রেরি-ঘরে ওর নারীদেহের পিঞ্জরের মধ্যে। আমি বোধহয় তখন তোমায় বলছিলাম বিনতা আসলে কে বা কী।

পরিবর্তনটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলে। সুরেন মাইতি মহাশয়-এর বাড়িতে তুমি আমাকেই দেখেছিলে, ফিরবার পথে প্রথমদিকটায় আমিই তোমার পাশে ছিলাম। কিন্তু শেষদিকে আমি আর তোমার পাশে ছিলাম না। ছিল কেবল আমার দেহটা, আর সেই দেহকে আশ্রয় করে ছিল এক অশুভ দুষ্ট আত্মা, সে আত্মা কার? বিনতার? না কি...?

অসিত থামল। আমি কেঁপে উঠলাম। সেদিনের সেই পরিবর্তনের কোনও ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি। কিন্তু এখন অসিত যে-ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা একেবারে অসম্ভব। একান্ত অবিশ্বাস্য। এ তো উন্মাদের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, এ-ব্যাখ্যা কী করে বিশ্বাস করি?

কিন্তু আমায় তো নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাটা কি অপরাধ, তপন? বিনতা চিরকালের মতো আমার দেহকে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। সেই অন্য মাত্রা আর সময়ের ভয়ঙ্কর জগতের পৈশাচিক প্রেত-চক্রে আর কয়েকবার যোগ দিতে পারলেই বিনতার উদ্দেশ্য সফল হত। ও চিরকালের মতো পেয়ে যেত আমার দেহটাকে। বিনতা হয়ে যেত অসিত, আর হতভাগ্য অসিত মল্লিককে আশ্রয় নিতে হত বিনতার দেহ-পিঞ্জরে। ওর পুরুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত। নিজের পুরোনো দেহটাকে খুন করে ও পথের কাঁটা অসিত মল্লিককে অবলুপ্ত করে দিত চিরকালের মত। এরকম কাণ্ড ও আগেও করেছে।

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল অসিত। ওর মুখের রেখায়-রেখায় যেন ভয়ের ছাপ।

গাড়িতে আমি আভাসে ইঙ্গিতে তোমায় যা বলতে চাইছিলাম তা হচ্ছে, ও আসলে মোটেই বিনতা নয়। ও হচ্ছে সেই বুড়ো করালীকিঙ্কর সোম। আতঙ্কভরা গলায় অসিত ফিসফিস করে বলল, দেড় বছর আগেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, এবং এখন আমি জানি যে, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। অসতর্ক মুহূর্তে বিনতার হাতের লেখা হয়ে যায় অবিকল করালীকিঙ্করের হাতের অক্ষরের মতো। কথাপ্রসঙ্গে এমন ভাবে অনেক অতীত ঘটনার কথা ও বলত, যাতে মনে হত ঘটনাগুলো যেন ও নিজের চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছে। কিন্তু ঘটনাগুলো হয়তো ওর জন্মেরও অনেক আগেকার।

বুড়ো করালীকিঙ্কর বাঁচতে চেয়েছিলেন অনন্তকাল। তিনি যখন দেখলেন দেহের মৃত্যু আসন্ন, তখন দুরন্ত পৈশাচিক শক্তির প্রভাবে নিজের জরাজীর্ণ দেহটাকে পালটে নিলেন, আশ্রয় নিলেন নিজেরই কিশোরী মেয়ের দেহের মধ্যে। করালীকিঙ্করের জীর্ণ দেহের মধ্যে বন্দি সেই অসহায় মেয়েটিকে তারপর ধীরে-ধীরে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হল। এমনি করেই করালীকিঙ্কর পেয়ে গেলেন এক নবীন দেহ। কিন্তু এ-দেহ পেয়ে করালীকিঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি চাইছিলেন একটি পুরুষ দেহ। আমার সঙ্গে তথাকথিক বিনতার আলাপ হতে সে-সুযোগও এসে গেল। বিনতার দেহ-আশ্রয়ী পিশাচ করালীকিঙ্কর এবার চাইল আমার দেহটাকে ছিনিয়ে নিতে। এক পৈশাচিক পরিকল্পনার

অসহায় শিকার হলাম আমি। কিন্তু আমায় যতটা অসহায় ভেবেছিল ততটা অসহায় আমি সত্যিই নই। আমি সুযোগ খুঁজছিলাম, সুযোগ আসতেই দানবীয় ষড়যন্ত্রের জাল কেটে আমি বেরিয়ে এসেছি।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে অসিত হাঁপাতে লাগল। দম নেওয়ার জন্য থামল কিছুক্ষণ। আমি চুপ করে রইলাম। এর পর অসিত যখন আবার কথা বলতে শুরু করল, তখন ওর গলার স্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ভাবছিলাম অসিতের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, ও অদ্ভুত সব কথা বলছে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছে। ওর ব্যক্তিত্বটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার পাগলাগারদের কেস। কিন্তু ওকে আমি পাগলাগারদে পাঠাতে পারব না, মনে হয় কিছুকাল বিনতার প্রভাব-মুক্ত জীবন কাটাতে পারলে ও নিজেই ঠিক হয়ে যাবে, আমাকে দেখতে হবে যাতে ও পুরোনো তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে না পারে।

পরে তোমায় আমি আরও বলব, আমার দেহ-মনের ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গেছে, তাতে এখন আমার দরকার দীর্ঘ বিশ্রাম। আমি তোমায় সেই নিষিদ্ধ আতঙ্কময় জগতের কথাও বলব। এ-আতঙ্কময় জগতের বিদেহী বাসিন্দাদের পৈশাচিক মন্ত্রশক্তিতে জাগরিত করে আমাদের জানা জগতে নিয়ে আসতে পারে এমন সাধনভ্রষ্ট বিপথগামী উপাসক সম্প্রদায় এখনও রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে যা কোনও মানুষেরই জানা উচিত নয়। অবশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞান হিসেবে যদি কেউ এর চর্চা করে তবে সেটা খারাপ নয়। কিন্তু এই জ্ঞানের ফলে যে-শক্তি অর্জিত হয় তার অপব্যবহার করলেই নেমে আসে অমঙ্গল। শক্তি লাভ করবার পর তা ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই তো দেখি অনেক তান্ত্রিক সাধক কিছু ক্ষমতা লাভ করেই তার অপপ্রয়োগ করে সাধন-ভ্রষ্ট হয়। করালীকিঙ্কর সোমের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছিল। তন্ত্র-শক্তি লাভ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এমন কাজ করেছিলেন যা কোনও সাধকেরই করা উচিত নয়।

তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না, একটু দৃঢ়ভাবেই আমি বললাম।

'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রের পুঁথিখানা আমি আজই পুড়িয়ে ফেলব। বিনতা ছিল আমার জীবনে একরকম অভিশাপ। আমি শাপমুক্ত হয়েছি, তপন। বিনতা আর আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তপন, ভাই, একটা কথা বলি। যদি কোনওদিন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তুমি আমাকে সাহায্য কোরো, অবশ্য জানি, এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমার বিপদে তুমি না বললেও আমায় সাহায্য করবে।

সে-রাতে অসিতকে আর বাড়ি ফিরতে দিলাম না। আমার বাড়িতেই ওর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। সকালে ওকে অনেক শান্ত, অনেক স্বাভাবিক মনে হল। ওর পৈতৃক বাড়িতে ফিরবার ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। আমার ধারণা, যত তাড়াতাড়ি ও পৈতৃক বাড়িতে ফিরতে পারে ততই মঙ্গল, বিনতার অপ্রীতিকর স্মৃতি-মাখানো ওই বাগানবাড়ি অসিতের দুর্বল মনের ওপর হয়তো আবার কোনও অশুভ প্রভাব বিস্তার করবে। আমার ধারণার কথা অসিতকে বললাম।

পরদিন সন্ধ্যায় অসিত এল না। আমিই গেলাম ওর বাগানবাড়িতে। সে-সন্ধ্যায় আমরা দুজনেই আমাদের আলোচনায় অদ্ভুত এবং অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গেলাম। বিনতা সম্পর্কে আমাদের, বলতে গেলে মোটেই আলোচনা হল না। স্ত্রীর প্রসঙ্গে আলোচনা অসিতের কাছে শুধু অপ্রীতিকর নয়, বেদনাদায়কও।

অসিত-বিনতাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট মফঃস্বল শহরে অনেক রসাল গালগল্প, অনেক গুজব শোনা যেতে লাগল। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে ঘরে রাখতে পারে না বা যে স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, তাদের নিয়ে যে কোনও গুজব উঠবে না, এটাই বা আশা করা যায় কী করে।

BanglaBook.org

অসিত যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ভেবেছিলাম, তা কিন্তু হল না। কেমন একটা ভয়, একটা মানসিক অবসাদে ও ভুগতে শুরু করল। মাঝে-মাঝে ওর মধ্যে আসত উচ্ছ্বাসের প্রবল জোয়ার। কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন হিস্টিরিয়ার ছোঁয়াচ মাখানো।

ইতিমধ্যে অসিতের পৈতৃক বাড়িখানাকে নতুন করে রং করা হয়েছিল। কিছু-কিছু সংস্কারও করা হয়েছিল বাড়িখানায়। কিন্তু ও পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এল না। সেই ঘৃণ্য বাগানবাড়িখানা যেন কোনও এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রাখল ওকে। বাড়ি পরিবর্তনের কথা বললেই ও নানা অজুহাত তুলে কথাটা আর বেশিদূর এগোতে দিত না।

বিনতার আমলের ঝি-চাকরদের বিদায় করে দেওয়ার পর অসিতের বাবার আমলের এক বুড়ো চাকর ওরসঙ্গে বাগানবাড়িতে থাকত। তার মুখ থেকেই একদিন শুনলাম কথাটা। বাজার থেকে ফিরছিল বুড়ো, রাস্তায় দেখা হল।

কী ব্যাপার নিবারণ, তোমরা বাগানবাড়িটা ছাড়ছ কবে? মল্লিকমশাই-এর বাড়ি তো রং-টং করে রেডি করা হয়ে গেছে, এখন তো উঠে এলেই হয়।

কী জানি বাবু, খোকাবাবুর কী মর্জি। প্রথমে তো ও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার খুব উৎসাহ দেখেছিলাম, এখন যেন সে-উৎসাহ কেমন ঝিমিয়ে গেছে। একটু থামল নিবারণ। কিছু ভাবল। তারপর আবার বলল, আর খোকাবাবুও যেন কেমন হয়ে গেছেন। এ যেন সেই আগের খোকাবাবু নন। ডাইনি মেয়েটা খোকাবাবুকে কি কম দাগা দিয়ে গেছে। জানেন বাবু, প্রায় রাতেই খোকাবাবু ঘুমোন না। কেমন যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো একা-একা বাগানে ঘুরে বেড়ান।

তাই নাকি! এসব কথা তো জানতাম না।

আমার মনে হয় কী জানেন বাবু, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে নিবারণ বলল, সেই ডাইনি মেয়েটা বোধহয় বিদেশ থেকে খোকাবাবুকে ভয়-দেখানো চিঠি লিখতে শুরু করছে আর সেজন্যই চিন্তায়-চিন্তায় খোকাবাবুর রাতে ঘুম হচ্ছে না।

নিবারণ, তোমার খোকাবাবুর ওপর নজর রেখো। আর দেখো, যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে তোমাদের পুরোনো বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

চেষ্টা তো করছি বাবু, কিন্তু খোকাবাবু কথা শুনছেন কোথায়? ও-বাড়িটা আমারও ভালো লাগে না, কেমন যেন ছমছমে-থমথমে ভাব বাড়িটায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, রাতেরবেলা—আমি এখন চলি, বাবু।

নিবারণ চলে গেল। চিন্তিত হলাম অসিতের নৈশ বিচরণের সংবাদে। ও কি সমনামব্যুলিস্ট হয়ে যাচ্ছে!

পুজোর ছুটি এসে গেল। ঠিক করলাম, যে করেই হোক অসিতকে বাগানবাড়ি থেকে বের করে আনতেই হবে। ও-বাড়ি থেকে বের করে না আনলে ও কোনওদিনই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। ভাবলাম, ওকে সঙ্গে করে বাইরে কোথাও কিছুদিন ঘুরে আসব।

আমার প্রস্তাবে রাজি হল অসিত। সেদিন সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসন্ন বিদেশযাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলাম দুজনে। আচম্বিতে অসিতের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। দারুণ উত্তেজনায় ও চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। দারুণ আতঙ্কে ওর মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল ঝড়ের মুখে বাঁশপাতার মতো।

আমার মাথা! আমার মগজ! টানছে—জোর টানছে...ধাক্কা দিচ্ছে...খুবলে নিচ্ছে...তপন, তপন, শয়তানী আমায় ছাড়েনি...দুষ্ট পিশাচ করালীকিঙ্কর এখনও শক্তিহীন হয়নি...আমায় টানছে...অনেক দূর থেকে...নরকের অতল অন্ধকার গহ্বর থেকে আমায় টানছে...আমি পারছি না নিজেকে ধরে রাখতে, পারছি না!...জীবনদীপ! দেহসীমার বাইরে জীবনদীপ কাঁপছে...থিরথির করে কাঁপছে। আমি অভিশপ্ত...আমার মুক্তি নেই...হায় ভগবান!

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অসিতকে ধরলাম। ওকে শুইয়ে দিলাম বড় সোফাটার ওপরে। ওর তখন অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে অসিত যেন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। ওর ঠোঁট নড়তে লাগল। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করল ও। ওর মুখের কাছে আমার কান নিয়ে এলাম।

আবার, আবার ও চেষ্টা করছে, আমার শরীরটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার জানা উচিত ছিল, ও-দুরন্ত দুষ্ট শক্তিকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না, দুরন্ত, জাদু, এমনকী মৃত্যু, কোনও কিছুই এ-অশুভ পৈশাচিক শক্তির চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। অদৃশ্য এই শক্তি আসে, রোজ আমায় টানে—কী ভয়ঙ্কর!—তপন, তুমি যদি জানতে এ কী ভয়ানক!...

অসিত থামল, চোখ বন্ধ করল। আমি একটা বালিশ নিয়ে এসে ওর মাথার নীচে রাখলাম। ঘুমোক, ও কিছুক্ষণ ঘুমোক। ডাক্তার ডাকলাম না। ডেকে কী হবে? ডাক্তার তো ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করবেন। ডাক্তার তো বলবেন, ওকে এখুনি কোনও মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠাতে। স্বাভাবিক ভাবেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে, এ-আশা আমি তখনও ছাড়িনি। মাঝরাতে আবার অসিত চিৎকার করে জেগে উঠল, আমি ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমরা স্বামী-স্ত্রী রইলাম পাশের ছোট ঘরখানায়। সকালে উঠে দেখলাম ও চলে গেছে। আমাদের কাউকে কিছু না বলে কোথায় গেল অসিত? নিবারণকে ফোন করলাম। জানলাম, অসিত বাড়ি ফিরে এসেছে। গম্ভীর ভাবে লাইব্রেরি ঘরে পায়চারি করছে ও।

এরপর অতি দ্রুত অসিতের ব্যক্তিত্বটা যেন খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতে লাগল। ও আর বাড়ির বাইরে বেরোত না। আমি রোজ ওকে দেখতে যেতাম। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে বসে থাকত অসিত। মাঝে-মাঝে মনে হত ও যেন কিছু শুনছে। মাঝে-মাঝে ও যে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলত না তা নয়, কিন্তু সেসব কথা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। ওর অসুস্থতার কথা বললে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললে, অথবা বিনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, অসিত পাগলের মতো হয়ে যেত। নিবারণের কাছে শুনলাম রাতেরবেলা আজকাল ও মোটেই ঘুমোয় না। অদ্ভুত সব আচরণ করে, কখনও নিজের চুল ধরে টানে, কখনও বুক চাপড়ায়, কখনও যেন অদৃশ্য কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। এরকম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও হয়তো কোনদিন নিজেরই দারুণ ক্ষতি করে ফেলবে, হয়তো বা আত্মহত্যাই করে বসবে।

অসিত সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কথা বললাম। উনি কলকাতায় ওঁর দুজন স্পেশালিস্ট বন্ধুর কাছে তার করে দিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় তিনজন ডাক্তার আর আমি অসিতের বাগানবাড়িতে এলাম।

স্পেশালিস্ট ডাক্তার সিনহার প্রথম প্রশ্নেই অসিতের সারা দেহ প্রচণ্ড আক্ষেপে থরথর করে কেঁপে উঠল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ও, তপন, কাদের নিয়ে এসেছ? চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও। জানো না আমি অভিশপ্ত? আমার কাছে এসো না, আমায় ছুঁয়ো না, তোমরাও অভিশপ্ত হয়ে যাবে। পালাও, পালাও, শিগগির চলে যাও এখান থেকে।

সেই সন্ধ্যায়ই একখানা ঢাকা গাড়িতে অসিতকে নিয়ে আসা হল আমাদের মফঃস্বল শহরের হাসপাতালে। ঠিক হল, পরে প্রয়োজন হলে ওকে কলকাতায় ডাক্তার সিনহার নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হবে।

হাসপাতালে আমাকেই উন্মাদ অসিতের গার্জিয়ান করা হল। পলিটেকনিক থেকে ফিরবার পথে রোজই ওকে দেখতে যেতাম। আমাকে কাছে পেলেই ও নানারকম অসংলগ্ন কথা বলতে আরম্ভ করত।

আমাকে এ-কাজ করতে হয়েছে, বাধ্য হয়েই এ-কাজ করেছি আমি, ও আমাকে ছিনিয়ে নেবে,

BanglaBook.org

জোর করে ছিনিয়ে নেবে, কেউ আটকাতে পারবে না। আমাকে চলে যেতে হবে সেখানে, সেই অন্ধকার গহ্বরে, মা। মাগো। তপন! বাঁচাও, আমায় বাঁচাও...।

ওর এসব কথা শুনে কান্না পেত আমার। ও কোনওদিন সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করতাম।

হাসপাতালে

মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে একটা ফোন পেলাম। ফোনে খবর পেলাম অসিতের বিচারবুদ্ধি নাকি হঠাৎ ফিরে এসেছে। ওর অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি দুর্বল হয়ে গেলেও, মানসিক সুস্থতা যে ফিরে এসেছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। অবশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ওকে আরও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। মনে হয়, পর্যবেক্ষণের ফল আশাপ্রদই হবে। সব ঠিক থাকলে, আশা করা যায়, ওকে এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

আনন্দে ভরে গেল মনটা, ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। একজন নার্স যখন আমাকে অসিতের কেবিনে নিয়ে গেলেন তখন ওকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

হ্যালো তপন, কেমন আছ? আমায় দেখে সোল্লাসে এক লাফে খাট থেকে নেমে এল অসিত। এ তো সেই দুর্বলমনা অসুস্থ অসিত নয়! এ তো তেজোদৃপ্ত বলীয়ান অসিত!

কী হে কথা বলছ না কেন? অবাক হয়ে গেলে নাকি? অসিতের গলার স্বরে কেমন ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ মাখানো। এ সেই অসিত, যে পাঁচ মাস আগে নামখানা থেকে ফিরবার পথে গাড়ি চালিয়েছিল। এ-অসিতকে আমি শেষ দেখেছিলাম, ওর বাইরে যাওয়ার আগে, যখন ও অভ্যেস মতো কলিংবেল টিপতে ভুলে গিয়েছিল। এ সেই অসিত, যে আমার মনে কেমন যেন এক অজানা অস্পষ্ট ভয়ের শিহরন জাগিয়ে তোলে।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি হে! দরাজ গলায় অসিত বলল, তারপর? কবে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছ? অমায়িকভাবেই অসিত প্রশ্ন করল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকদিন তোমায় অবজারভেশনে রাখতে চান।

আরও কয়েকদিন এখানে রাখতে চান! কেন, আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি! স্মৃতিশক্তিটা অবশ্য এখনও দুর্বল। এখানে আসবার কিছুদিন আগের কথা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তবে ওটাও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করো।

আরও কয়েকদিন থাকো না কেন এখানে!

এখানে আর মোটেই ভালো লাগছে না। তা ছাড়া অনেক কাজ রয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে এখন আমার কেবল কাজ আর কাজ। একদণ্ড ফুরসৎ ফেলবার সময় হবে না।

এখান থেকে তোমায় সোজা তোমাদের পুরোনো বাড়িতেই নিয়ে যাব।

ও-বাড়িতে আমি যাব না। বাগানবাড়িটাই আমার গবেষণার পক্ষে সুবিধাজনক।

মনের ভিতর আবার ধাক্কা খেলাম। ও আবার বাগানবাড়িতে ফিরতে চাইছে, ও আবার তান্ত্রিক গবেষণা করতে চাইছে। ও না বাগানবাড়ি ছাড়বে বলেছিল? ও না বলেছিল 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রের পুঁথিখানি পুড়িয়ে ফেলবে? কেমন যেন গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে না? একটা সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলছি, এর মধ্যে পাগলামির লেশমাত্র নেই, কিন্তু এ কি আমার জানা অসিত? যদি না হয়, তবে এ কে? অসিতই বা কোথায়? সে কি মুক্ত, না বন্দি? নাকি তাকে দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে?

এরকম সব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য চিন্তা আমার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। আমি কি আমার জানা অসিতের অসংলগ্ন প্রলাপ বিশ্বাস করতে শুরু করেছি? আমার মনটাও কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

কী ভাবছ, তপন? আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করো।

যাই ডাক্তার গুপ্তর কাছে, দেখি উনি কী বলেন। হতবুদ্ধি হয়ে কেবিন থেকে বেড়িয়ে এলাম। টানা করিডর ধরে এগিয়ে চললাম ডাক্তার গুপ্তর চেম্বারের দিকে। একটা দারুণ অস্বস্তিতে ভরে আছে সারা মন। কিন্তু কেন এই অস্বস্তি তা পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছি না।

দু-দিন ধরে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামালাম। কী ঘটেছে? অসিতের আচরণে আবার কেন এই পরিবর্তন? এ কী প্রহেলিকা! ভেবে-ভেবে সমস্যার কোনও কূলকিনারা করতে পারলাম না। দু-দিন ধরে নিজের কোনও কাজকর্মও আমি ঠিকমতো করতে পারলাম না। তৃতীয় দিন সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফোনে জানালেন, রোগীর অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

খবরটা পেয়ে কোথায় আনন্দিত হব তা নয়, কেমন এক দুশ্চিন্তার কালো মেঘে আমার মনের আকাশ ছেয়ে গেল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আমার মনটা। লোকে বলে, আচ্ছন্ন মনেই আমি সে-রাতে সেই কাল্পনিক অবাস্তব দৃশ্য দেখেছিলাম। এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলবার নেই—এ নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে তর্কও করতে চাই না। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে তা-ই যথেষ্ট।

আবির্ভাব

সে-রাতেই ঘটল সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কময় আবির্ভাব। সে-রাতে যে-দারুণ ভয় পেয়েছিলাম, তা থেকে আজও আমি মুক্ত হতে পারিনি। সে-নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে, এখনও আমার সারা দেহ শিউরে ওঠে। সে-রাতে এক 'টেলিফোন কল' হল ঘটনার সূচনা।

রাত প্রায় বারোটা। আমার স্ত্রী শুয়ে পড়েছেন। আমি একা 'স্টাডি'-তে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। ব্র্যাম স্টোকারের লেখা 'ড্রাকুলা'। নিঝুম নিস্তব্ধ রাতেই এ-ধরনের বই পড়তে হয়। ট্রানসিলভানিয়ার এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ। জোনাথান হারকার সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। জনহীন সেই প্রাসাদে রাতের বেলা পুঞ্জ-পুঞ্জ ধুলো দিয়ে গড়া তিন পিশাচী ঘুরে বেড়ায় পৈশাচিক রক্ত-তৃষ্ণায়...।

ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল, বিরক্ত হলাম। কাহিনির এমন একটা জমাট জায়গায় এসে পড়েছি, এ-সময়ে কে আবার বাধা দিয়ে রসভঙ্গ করল?

ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বেজেই চলল। নিতান্ত অনিচ্ছায় রিসিভারটা তুললাম।

হ্যালো, কে? আমি তপন চৌধুরী বলছি।

ওপাশ থেকে কোনও সাড়া এল না।

হ্যালো, কে? কথা বলুন।

কোনও সাড়া নেই।

বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা রেখে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, ওপাশ থেকে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

কেউ যেন দারুণ অসুবিধার মধ্যে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বক্তার কোনও কথা আমি বুঝতে পারলাম না। গ্লাব...গ্লাব...গ্লাব...ধরনের কতগুলো অদ্ভুত ধ্বনি ওপাশ থেকে আমার

BanglaBook.org

কানে ভেসে এল।

কে? কে কথা বলছেন? পরিষ্কার করে বলুন।

আবার ভেসে এল সেই সেই অদ্ভুত গ্লাব...গ্লাব...ব্লাব...ব্লাব ধ্বনি।

মনে হল, এটা বোধহয় কোনও যান্ত্রিক শব্দ। হয়তো ও পাশের ফোন খারাপ হয়ে গেছে, তাই বক্তার কোনও কথা আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে না, আমার কথা হয়তো সে শুনলেও শুনতে পারে। এই ভেবে বললাম ঃ

দেখুন, আপনার কোনও কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। আপনার ফোনে বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। আপনি বরং রেখে দিন। যদি আমাকে কিছু জানাবার থাকে তবে অন্যপথে জানাতে চেষ্টা করুন।

বলতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ ভেসে এল।

রাত বারোটা দশ। কোথা থেকে এল ফোনটা? পরে খোঁজ করে জানা গিয়েছিল যে, ফোনটা এসেছিল অসিতের বাগানবাড়ি থেকে। কিন্তু ও-বাড়ি থেকে কে ফোন করবে? ও-বাড়ি তো তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কেবল নিবারণ সপ্তাহে একদিন গিয়ে অসিতের বইগুলো ঝেড়ে-মুছে দিয়ে আসে।

পরে বাগানবাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ কী দেখেছিল? দেখেছিল, বাগানের এক জায়গায় মাটি খোঁড়া, সেখান থেকে কেউ যেন বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছিল। তার চলার পথে অদ্ভুত পায়ের দাগ, ছড়ানো মাটি—ঝুরঝুর করে মাটি যেন ঝরে পড়েছে। একটা ভাঙা তালা আর একখানা পাথর—এ-পাথর দিয়েই তালা ভাঙা হয়েছে। একটা খোলা পোশাকের আলমারি। পোশাকগুলো এলোমেলো—মনে হয় কে যেন ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। টেলিফোনের রিসিভারটার ওপর আঠা-আঠা কী যেন লেগে আছে। পড়ার টেবিলে ছড়ানো বই আর খাতাপত্র। একখানা খাতা খোলা, তার একটা পাতা কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। আর সব জায়গায় বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে এক অসহ্য দুর্গন্ধে।

পুলিশ ভুল করছে—এখনও বুঝতে পারছে না আসল ব্যাপারটা—এখনও পুলিশ ভাবছে কোনও ছাড়িয়ে দেওয়া ঝি অথবা চাকরই সে-রাতের কাণ্ডের জন্য দায়ী। কর্মচ্যুতির প্রতিশোধ নিয়েছে সে। আর আমাকেও ভয় দেখিয়েছিল এজন্য যে, ঝি-চাকরদের মনে হয়তো এই ধারণা হয়েছিল যে, ওদের কর্মচ্যুতির জন্য আমিও দায়ী। আমিই হয়তো অসিতকে ওদের ছাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

যতসব বোকার দল! ওরা কী মনে করে যে মূর্খ ঝি-চাকরেরা হাতের লেখা জাল করেছিল? ওদের কি ধারণা সে-রাতে যে-ভয়ঙ্করের আবির্ভাব হয়েছিল কর্মচ্যুত কোনও ঝি অথবা চাকরই তার জন্য দায়ী? অসিতের মধ্যে কোনও পরিবর্তনই কি পুলিশ লক্ষ করেনি?

আমি? আমি এখন বিশ্বাস করি অসিত আমাকে যা বলেছিল তা মোটেই বিকারগ্রস্ত মনের অসংলগ্ন প্রলাপ নয়। অসিতের প্রতিটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

জীবনের কিনারায় রয়েছে কুয়াশাঘেরা এক অস্পষ্ট ছায়াময় আতঙ্কঘন অবাস্তব জগৎ। তার অস্তিত্ব আমরা জানি না।

কোনও কৌতূহলী মনের আহ্বান সে-জগতের কোনও আতঙ্ককে নিয়ে আসতে পারে আমাদের জগতে। ক্রমে সেই বিদেহী আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলে আবাহনকারীকেই।

তন্ত্রসাধক করালীকিঙ্কর আহ্বান করেছিলেন এমনি এক মহা ভয়ঙ্করকে। সে-ভয়ঙ্কর আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাঁকে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজস্ব সত্তা। বিদেহী ভয়ঙ্কর অন্য দেহ আশ্রয় করে অনন্তকাল ধরে বিচরণ করতে চেয়েছিল পৃথিবীর বুকে। তার প্রথম শিকার সাধক করালীকিঙ্কর স্বয়ং। করালীর দেহ জীর্ণ হলে সেই দুষ্ট আত্মা বিনতার দেহ কেড়ে নিল। তারপর এল অসিতের

BanglaBook.org

পালা। এমনি করে হয়তো যুগ-যুগান্তর ধরে সেই বিদেহী দুষ্ট আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় নেবে। পৃথিবীতে থাকবার ফলে বিদেহী আত্মার অনেক শক্তি ক্ষয় হয়। তাই নষ্ট শক্তিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য যেতে হয় সেই নাম-না-জানা অবাস্তব জগতের প্রেতচক্রে। প্রেতপুরীর অধীশ্বরের কাছ থেকে নতুন করে অশুভ শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

কী মহা দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করেছিলেন তন্ত্রসাধক হতভাগ্য করালীকিঙ্কর!

আমি নিজে কি নিরাপদ? অসিতের বন্ধু হিসেবে বিদেহী দুষ্ট আত্মার কোপে আমি কি পড়িনি?

পরদিন বিকেলে যখন রাতের আতঙ্ক থেকে আমি কিছুটা মুক্ত হলাম, তখন সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে। অসিতের কেবিনে গিয়ে পরপর ছ'টা গুলি করে ওর দেহটাকে মেরে ফেললাম, হতভাগ্য অসিতের মুক্তির জন্য—পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য এ-কাজ আমাকে করতে হল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অসিতের দেহটা পুড়িয়ে না ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। মূর্খের দল ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহটাকে আটকে রাখছে। দেহটাকে এক্ষুনি পুড়িয়ে ফেলা দরকার। কেন না এখনও দুষ্ট আত্মা মৃতদেহটার মায়া কাটাতে পারেনি। দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলে সে আত্মা বাধ্য হবে নিজের প্রেতলোকে ফিরে যেতে। দেরি হলেই সর্বনাশ! হয়তো আর কোনও হতভাগ্য সেই বিদেহী পিশাচের শিকার হবে। হয়তো আমিই হব সেই হতভাগ্য শিকার!

না, আমি হব না, আমি অসিতের মতো দুর্বলমনা নই। যতবড় দুরন্ত দুষ্ট আত্মাই হোক না কেন, আমার দেহ সে কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

না, পরের কথা আগে বলে ফেলেছি, ধারাবাহিকভাবেই কাহিনিটা বলা যাক।

সে-রাতের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আমি যতদূর সম্ভব গুছিয়ে বলবারই চেষ্টা করব। সে-রাতে তিনজন চৌকিদার যে একটা অদ্ভুত মূর্তিকে দেখেছিল, তার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি নিজের চোখে যা দেখেছিলাম তার কথা। কিন্তু চৌকিদারদের দেখা আর আমার দেখার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। পুলিশ কেন যোগসূত্রটা দেখতে পাচ্ছে না? নাকি দেখতে পেয়েও অবিশ্বাস্য বলে অস্বীকার করে যাচ্ছে?

যাক ও কথা, আমার নিজের কাহিনিতেই ফিরে আসি।

ঘুমিয়ে ছিলাম। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এ তো অসিতের পুরোনো 'সিগনাল'। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত দুটো। এত রাতে অসিত আমার দরজায়! আমার জানা পুরোনো অসিত, যে তার পুরোনো ডাকবার ভঙ্গিটা মনে রেখেছে। ওর নতুন ব্যক্তিত্ব তো ভুলে গিয়েছিল এ-ডাক। অসিত কি আবার তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে ফিরে এসেছে? এত রাতে ও এখানে কেন? ওকে কি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে? নাকি ও পালিয়ে এসেছে? আমার মনে এ-প্রশ্নগুলো জাগল।

যাই হোক না কেন, এ যে অসিতের ডাক সে-বিষয়ে কোনও ভুল নেই। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সদর দরজা খুলতে হবে। স্ত্রীর ঘুম ভাঙাইনি, ওকে আর জাগালাম না।

দরজা খুললাম। আচম্বিতে একটা দারুণ দুর্গন্ধের ঝাপটা যেন আমার ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়কে আঘাত করল। একটা দারুণ বিবমিষা যেন পেয়ে বসল আমাকে। অতি কষ্টে বমনের বেগ সংবরণ করলাম। আমার দৃষ্টি পড়ল দরজার সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর। ডাকটা নিঃসন্দেহে অসিতের। কিন্তু, এ কে? এ তো অসিত নয়। এই তো এক্ষুনি অসিত বেল টিপছিল, মুহূর্তের মধ্যে সে উধাও হল কোথায়?

দরজায় দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ঢাকা এক খর্বকায় মূর্তি। মূর্তির গায়ে অসিতেরই একটা ওভারকোট। ওভারকোটের তলাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হাতগুলো যদিও গুটোনো, তবুও ঢলঢল

BanglaBook.org

করছে। তাই হাত দেখা যাচ্ছে না। মূর্তির মাথায় অসিতের শখ করে কেনা বিলিতি টুপি। টুপির কিনারা মুখের ওপর টেনে নামানো। একটা কালো রঙের সিল্কের মাফলারে মূর্তির মুখটা ঢাকা। এ কে? কোথা থেকে এল এই গভীর রাতের আগন্তুক?

স্খলিতপদে এগোলাম। কে আপনি? কী চাই? কোনও স্পষ্ট জবাব এল না মূর্তিটার কাছ থেকে। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা অর্ধ-তরল ধ্বনি, গ্লাব...গ্লাব...ব্লাব...ব্লাব...।

এরকমের ধ্বনিই আমি ফোনে শুনেছিলাম।

টলতে-টলতে আমার দিকে এগিয়ে এল আপাদমস্তক ঢাকা দেহটা। আমার দিকে এগিয়ে ধরল একটা বড় পেনসিলের মাথায় আটকানো একখানা লম্বা কাগজ। প্রচণ্ড অস্বস্তিকর দুর্গন্ধে তখনও আমার বমি পাচ্ছে। কাগজখানা পেনসিলের মাথা থেকে খুলে নিলাম। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসা আলোয় চেষ্টা করলাম কাগজখানা পড়তে।

নিঃসন্দেহে এ অসিতের হাতের লেখা। কিন্তু অসিতের লিখবার কী দরকার ছিল? ওর বক্তব্য তো ও ফোন করেই আমাকে জানাতে পারত। ওর হাতের অক্ষরও তো দেখছি এলোমেলো, কাঁপা-কাঁপা, যেন কোনও অশীতিপর বৃদ্ধ লিখেছেন কাগজখানা। ম্লান আলোয় পড়তে পারলাম না। এগোলাম ড্রয়িংরুমের দিকে। টলমল করতে-করতে মূর্তিটাও এগোতে লাগল। কিন্তু ড্রয়িংরুমে ঢুকল না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর রাতের এই আপাদমস্তক ঢাকা রহস্যময় আগন্তুকের গায়ের গন্ধ সত্যিই অসহ্য। শুধু অসহ্যই বা কেন, দারুণ আতঙ্ককর। এ-বিশ্রী পচা গন্ধটা যেন ভেসে আসছে জীবনের ওপার থেকে।

কাগজখানা পড়তে শুরু করলাম, একখানা চিঠি। আমাকেই লেখা। পড়তে-পড়তে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের হিমশীতল স্রোত যেন আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে গেল, দু-চোখে নেমে এল অমানিশার নিকষ কালো অন্ধকার। অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান হতে দেখলাম ড্রয়িংরুমের মেঝেতে পড়ে আছি। সেই অভিশপ্ত চিঠিখানা তখনও আমার মুঠোয় শক্ত করে ধরা। দরজার বাইরে সেই আপাদমস্তক ঢাকা হতভাগ্য মূর্তিটা আর দাঁড়িয়ে নেই। তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে দরজার বাইরে বারান্দার মেঝেতে। পূতিগন্ধময় গলিত স্রোত বেরিয়ে আসছে পোশাকের স্তূপের মধ্যে থেকে। এবার আমি জানি এ কে। এ কী!

বাইরের খোলা হাওয়ায় ভাঙনের কাজ শুরু হয়েছে। এ-দেহ আর কোনওদিন হাঁটবে না। এ-দেহে আর কোনওদিন চেতনা আসবে না। দারুণ আতঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

চিঠি

সে-রাতে যে-চিঠিখানা পেয়েছিলাম তা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

তপন,

চিঠিখানা পাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে গিয়ে আমার দেহটাকে হত্যা করে আসবে। ও-দেহে আর আমি নেই। বিনতা চিরকালের মতো আমার দেহ ছিনিয়ে নিয়েছে। না, বিনতাই বা বলি কেন, মন্দভাগ্য করালীকিঙ্কর যে দুষ্ট বিদেহী আত্মাকে এক অশুভ মুহূর্তে আহ্বান করেছিলেন, সেই আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার দেহটাকে কেড়ে নিয়েছে।

তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। বিনতা আমায় ছেড়ে চলে

BanglaBook.org

যায়নি। আজ প্রায় চারমাস হল সে মারা গেছে। আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, আমিই বিনতাকে খুন করেছি, খুন করতে বাধ্য হয়েছি। হঠাৎ-ই সুযোগ এল, আর মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। ঝি-চাকররা বাড়িতে ছিল না। ওরা যাত্রা শুনতে গিয়েছিল, বাড়িতে ছিলাম আমরা দুজন। আমি তখন আমার নিজের দেহেই ছিলাম।

লাইব্রেরি, ঘরে পড়ছিল বিনতা। আমি পাশের ঘরে বসেছিলাম চুপচাপ। হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলের উপরে রাখা পাথরের ফুলদানিটার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে মাথার ভিতরে পরিকল্পনাটা তৈরি হয়ে গেল। ভারী ফুলদানিটা নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলাম পাশের ঘরের দিকে। ফুলদানিটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম বিনতার ব্রহ্মতালুতে। টুঁ শব্দটি করবার অবসর পেল না ও। মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল। বিশ্বাস করো তপন, এ ছাড়া আমার সামনে মুক্তির আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বিনতা পরিকল্পনা করছিল, আর সাময়িকভাবে নয়, চিরকালের মতো আমার দেহটাকে কেড়ে নিতে।

বিনতার দেহটাকে কবর দিলাম বাগানে। ঝি-চাকর কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। কিন্তু ওদের অতীত জীবনও কলঙ্কমুক্ত নয়, পিশাচ-আশ্রিত করালীকিঙ্করের অনেক অপকর্মের সঙ্গী ছিল ওরা। কাজেই পুলিশের কাছে যাওয়ার সাহস ওদের ছিল না। বেশ কিছু টাকাপয়সা দিয়ে ওদের বিদায় করলাম।

ভাবলাম এবার আমি নিশ্চিন্ত, কিন্তু হায় ভগবান! তখনও আমি বুঝিনি কী সাংঘাতিক অশুভ শক্তির পাল্লায় আমি পড়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত এ-শক্তির গতি রোধ করতে পারে না।

ক'দিন বেশ কাটল। তারপর একদিন সন্ধ্যায় যখন তোমার বাড়িতে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন আবার এল সেই অদ্ভুত অনুভূতি। অদৃশ্য কোনও শক্তি যেন আমার মস্তিষ্কে জোর টান মারছে। মগজটা যেন আমার দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি এ কীসের আকর্ষণ—আমার মনে রাখা উচিত ছিল। অশুভ আত্মা বিনতার মৃতদেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়নি। যতদিন পর্যন্ত ওর দেহটা পচে গলে মাটির সঙ্গে না মিশে যাবে ততদিন পর্যন্ত প্রেতলোকের দুষ্ট আত্মার প্রভাব থাকবে ও-দেহের ওপরে।

দুষ্ট আত্মা আমার দেহকে আবার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার হতভাগ্য আত্মাকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে কবরের নীচে শায়িত এক বিকৃত গলিত শবদেহের মধ্যে।

বুঝলাম কী মহা দুর্ভাগ্য আমার জীবনে আসছে। আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আর সেইজন্যই আমাকে যেতে হল হাসপাতালে।

তারপর একদিন এল সেই মহা দুর্ভাগ্য। দেখলাম, বিনতার গলিত শবদেহে আমি বন্দি। দুষ্ট আত্মা নিশ্চয়ই হাসপাতালে আমার দেহে আশ্রয় নিয়েছে—চিরকালের মতোই ছিনিয়ে নিয়েছে আমার হতভাগ্য দেহটাকে। এবার হাসপাতালের আমি-বিহীন আমার দেহটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তারপর একদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেবেন অসিত মল্লিককে। পৃথিবীর বুকে শুরু হবে অসিত মল্লিকের দেহ-আশ্রয়ী এক মহা-অমঙ্গলের অবাধ বিচরণ।

গলিত শবদেহের ভিতরে আমার বন্দি আত্মা এ-কথা ভাবতে-ভাবতে

BanglaBook.org

উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা কিছু করা দরকার—একটা কিছু করতে হবে—পৃথিবীকে মুক্ত করতে হবে দুষ্ট আত্মার প্রভাব থেকে। দারুণ উত্তেজনায় আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। অনেক কষ্টে দু-হাতে কবরের মাটি সরিয়ে আমি পৃথিবীর বুকে উঠে এলাম।

শবদেহের মুখের কাছটা একেবারে পচে গেছে। ও-মুখ দিয়ে আর কথা বলা যায় না। তোমাকে ফোন করলাম কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলাম না। লিখবার শক্তি বোধহয় এখনও আছে। অনেক কষ্টে চিঠিখানা লিখলাম। কিন্তু তোমাকে পাঠাই কী করে? আর-একটা বেপরোয়া কাজ করলাম। নিজেই নিয়ে এলাম, আমার শেষ চিঠিখানা। এ-চিঠি কেবল কোনও হতভাগ্য মানুষের শোচনীয় পরিণতির দলিল নয়—এ হচ্ছে এক সাবধানবাণী। এ-চিঠির মধ্যে দিয়ে অভিশপ্ত অসিত মল্লিক তোমাকে সাবধান করছে—সমস্ত পৃথিবীকে সাবধান করছে।

তপন, পৃথিবীতে যদি শান্তি চাও, মানুষকে যদি ভালোবাসো, তবে হাসপাতালে গিয়ে আমার দেহটাকে হত্যা করো, কোনও দয়া কোরো না—কোনও মায়া কোরো না। মনে রাখবে, ও-দেহে আমি নেই। আছে এক অশুভ দুষ্ট আত্মা। দেখো, আমার দেহটাকে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। দেহটা নষ্ট হলেই বিদেহী আত্মাকে ফিরে যেতে হবে প্রেতলোকে।

নীচু স্তরের তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে কোনওদিন ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, তপন। শেষ পর্যন্ত তা অমঙ্গলই ডেকে আনে।

বিদায় বন্ধু, পুলিশকে সব কথা খুলে বলো। জানি না পুলিশ কতটা বিশ্বাস করবে, তোমাকে এই পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনতে হল বলে আমি খুব দুঃখিত।

আমার অভিশপ্ত জীবনও শেষ হয়ে এল, পচা গলা এ দেহটা আর বেশি দিন টিকবে না। দেহটা নষ্ট হয়ে গেলেই আমার মুক্তি আসবে।

আশা করি, আমার হাতের লেখা তুমি পড়তে পারছ। যাওয়ার আগে আবার বলি পিশাচ-আশ্রিত ওই দেহটাকে তুমি হাসপাতালে গিয়ে খুন করো।

আমার জন্য দুঃখ করবার মতো কেউ নেই। আমার কথা মনে করে তুমি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো।

অসিত

BanglaBook.org

উপসংহার

পরদিন সকালে আমাদের ছোকরা চাকরটাই আমার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহটাকে আবিষ্কার করল। দরজার ওপাশে আপাদমস্তক মোড়া তালগোল পাকানো বস্তুটা দেখে ও ভয় পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ও পুলিশে ফোন করল। পুলিশ যখন এল তখন আমার অচেতন দেহটাকে দোতলায় শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্গন্ধময় পোশাকের স্তূপটা তখনও পড়ে আছে ড্রয়িংরুমের বারান্দায়। পুলিশের লোকেরা নাকে রুমাল চাপা দিল।

অসিতের পোশাকের ভেতর থেকে পুলিশ যা খুঁজে পেল তা হচ্ছে এক পচা গলা শবদেহ, শবদেহের কোনও-কোনও অংশে মাংস ঝরে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। মাথার ব্রহ্মতালু ফাটা।

মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। বোঝাই যায় না কার দেহ এটা।

শেষ পর্যন্ত দাঁতের গড়ন দেখে বোঝাই গেল দেহটা বিনতারই।

আমার কাহিনি শেষ হল, সব কথাই খুলে লিখলাম আমি। এখনও কি আপনারা আমায় পাগল ভাবছেন? ভাবুন। আমার আর কিছু বলবার নেই। আমার যা বক্তব্য তা আমি বলেছি। আমার যা করণীয় তা আমি করেছি।

শুনছি, কর্তৃপক্ষ নাকি আমাকে রাঁচি পাঠাবার কথা ভাবছেন। ঠিক আছে—ডাক্তারি পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হবে আমার সত্যিই মনোবিকার ঘটেছে কি না।

কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, ওরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অসিতের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেন। না হলে..

তপনের বিবৃতি এখানেই শেষ হয়েছে। শেষ বাক্যটা আর ও সমাপ্ত করেনি।

BanglaBook.org

নাটকের নাম শিবাজী

BanglaBook.org

অশোক বিশ্বাস

শ. সে. র. উ. ৩—৬১

গ্রীষ্মের খরতাপে ধরণী যখন দগ্ধ, তখন আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে!

কয়েক দিন ধরিয়া প্রচণ্ড গরম যাইবার পর মাঝরাত হইতে রিমঝিম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। আমরা চা ও তেলেভাজা সহযোগে আদিরসাত্মক গল্প জমাইয়াছিলাম। হিমাদ্রি আগাগোড়াই এত তর্ক করিতেছে, তাহার সহিত গলা চড়াইয়া তর্ক করা আমার কর্ম নয়। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং শেষ পর্যন্ত লখিন্দরকে আমার পিছনে লেলাইয়া দিবে। লখিন্দর একটি বানর শিশু। একদিন যেন কী একটা অপরাধের জন্য আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া আর একটু হইলে প্রায় নাগা সন্ন্যাসী করিয়া ফেলিয়াছিল আর কী! তির্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলাম, হিমাদ্রির ইজিচেয়ারের হাতলে বসিয়া সে কচি লেজটি খেলাইতে-খেলাইতে বেগুনি চিবাইতেছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই একবার দাঁত খিঁচাইয়া দিল।

অতঃপর আমি একেবারে নীরব শ্রোতা হইয়া গেলাম। হয়তো আরও কিছুক্ষণ হিমাদ্রির জ্ঞান বিতরণ চলিত, কিন্তু গদাই হন্তদন্তভাবে আসিয়া হাজির। গদাই আমাদের বাসার নিকটেই থাকে। মাঝে-মাঝে আমাদের এখানে বেড়াইতে আসে। তাহার বাবা প্রণবশঙ্কর রায় স্টোন চিপসের বড় ব্যবসায়ী। দিন পনেরো পূর্বে তাহার দিদি যূথিকার বিবাহ হইয়াছে। আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। জামাই চিত্তরঞ্জনের চাকুরে। দেখিতে-শুনিতে খারাপ নয়।

গদাইয়ের কাছে কয়েকদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহার দিদি ও জামাইবাবুকে দ্বিরাগমনে আনিবার জন্য তাহার বাবা চিত্তরঞ্জনে গিয়াছেন।

কিশোর গদাইকে এভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কী খবর, গদাই, দিদি এসেছে বুঝি?

গদাই বলিল, দিদি তো পরশু এসেছে। জানেন, আমাদের কুকুরটা জামাইবাবুর গলা কামড়ে দিয়েছে। জামাইবাবু মরে গেছে। মা, বাবা, দিদি, ফড়িং, ভেঁপু সবাই কাঁদছে। আপনারা দেখবেন তো চলুন। পুলিশ এসেছে। ডাক্তার এসেছে। বিনুকাকু; মাসি, রমেনদা আরও কত লোক। জামাইবাবুর বাড়ি টেলিগ্রাম করেছে।

গদাই এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল।

খবর শুনিয়া আমরা হতবাক হইয়া গেলাম।

গদাইদের বাড়িতে বাঘের মতো একটি কুকুর আছে। দরজায় 'কুকুর হইতে সাবধান' কথাটি বড়-বড় হরফে লেখা আছে। তাহাদের বাড়ির সামনে দিয়া যাইবার সময় মাঝে-মাঝে দরজায় কুকুরটিকে বড়-বড় ধারালো দাঁতের উপর দিয়া জিভটি ঝুলাইয়া দিয়া হিংস্রভাবে রাস্তার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লক্ষ করিয়াছি।

হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা যাচ্ছি। তুমি যাও।

গদাইদের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত ইন্সপেক্টর চট্টরাজকে দেখিতে পাইলাম।

হিমাদ্রি বলিল, কাছেই থাকি। খবরটা শুনে না এসে পারলাম না।

চট্টরাজ আমাদের বসিতে বলিলেন।

ঘরে গদাইয়ের মা, বাবা প্রণবশঙ্করবাবু ছাড়াও তিনজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলাকে উপস্থিত থাকিতে দেখিলাম। অপরিচিতদের সহিত ইন্সপেক্টর পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভদ্রমহিলার নাম নির্ঝরিণী দেবরায়। প্রণবশঙ্করবাবুর জ্যাঠতুতো শ্যালিকা। তিনজন ভদ্রলোক। বিনয়বাবু—

BanglaBook.org

গদাইয়ের দূরসম্পর্কের কাকা। সমিতবাবু—প্রণবশঙ্করবাবুর পিসতুতো বোনের ছেলে। এবং রমেনবাবু, গদাইয়ের দিদি যূথিকার পুরোনো গৃহশিক্ষক। রমেনবাবু ছাড়া সকলেই এ-বাড়িতে থাকেন।

ঘরে শোকপর্ব চলিতেছিল। চারিদিকে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ও ছলছল চোখ দেখিয়া মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল বসিবার ঘরের দরজা পার হইয়া বারান্দায়— যেখানে গদাইয়ের সদ্য-বিধবা দিদি যূথিকা পা ছড়াইয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া উদাসভাবে বসিয়াছিল। যূথিকার বয়েস বছর বাইশ হইবে। চোখ, মুখ, রং, চুল, স্বাস্থ্য—সব মিলিয়া তাহাকে সুন্দরী দেখিতে। মুখে তাহার গতরাত্রের প্রসাধন চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। কোলের ওপর নিটোল হাত দুটি অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। গায়ে অন্তর্বাস কিছু নাই। পরিধানে কেবল একটি মাত্র শাড়ি। তাহাও অগোছালো। উগ্র যৌবনের প্রতিটি রেখা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

হঠাৎ হিমাদ্রির কনুইয়ের মৃদু খোঁচা খাইলাম। লজ্জা পাইয়া দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া সকলের প্রতি একবার চাহিয়া লইলাম—কেহ দেখিয়া ফেলে নাই তো!

হিমাদ্রির প্রশ্নে চট্টরাজ জানাইলেন যে, কুকুরটির হিংস্রতার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

হিমাদ্রির আগ্রহে চট্টরাজ এবার আমাদের মৃতদেহ দেখাইতে চলিলেন।

একটি ঘরে পুলিশ পাহারায় মৃতদেহটি একটি সাদা কাপড়ে আবৃত ছিল। হিমাদ্রি স্বহস্তে কাপড় উঠাইয়া লইল। মৃত ব্যক্তির বয়েস ত্রিশের মধ্যে। সুদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরনে কেবল একটি ধুতি। মৃতদেহের কণ্ঠনালি কাটা। গলার সমস্ত মাংস, শিরা-উপশিরা একেবারে উপড়াইয়া গিয়াছে। চোখ দুটি খোলা। কষ বাহিয়া খানিকটা রক্ত মিশ্রিত লালা বাহির হইয়া শুকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি বিভীষিকার চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। শরীরে কোনও আঁচড়ানোর চিহ্ন নাই।

হিমাদ্রি মৃতদেহ উপুড় করিয়া দিল। তারপর অনেকক্ষণ কী যেন দেখিয়া লইয়া ঘাড়ের কাছে একটি কালশিটা পড়া জায়গার দিকে চট্টরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইল।

চট্টরাজ বলিলেন, আমি দেখেছি। মনে হয়, কুকুরটাকে আক্রমণ করতে দেখে পিছু হটতে গিয়ে দেওয়ালে বা রেলিঙের গরাদে ধাক্কা খাওয়ার ফলে হয়ে থাকবে।

হিমাদ্রি মৃতদেহের উপর আবরণটি টানিয়া দিয়া বলিল, যেখানে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সে-জায়গাটা একটু দেখব।

আমরা সিঁড়ি ভাঙিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম। দ্বিতলে সিঁড়ির দুপাশে দু-খানি করিয়া চারখানি ঘর। সামনে বারান্দা। ঘরগুলির পিছনদিক দিয়াও এই একই রূপ বারান্দা। প্রতিটি ঘরে পূর্ব-পশ্চিম-মুখো দুইটি করিয়া দরজা। বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে বাথরুম। উত্তর প্রান্তে খোলা ছাদে যাইবার দরজা। একপাশে একখানি ঘরে থাকেন বিনয়বাবু। তাহার পাশের ঘরে সমিতবাবু। অন্যপাশে পাশাপাশি দু-খানি ঘরে যূথিকা এবং নির্ঝরিণী।

ইন্সপেক্টর চট্টরাজ বাথরুম হইতে কয়েকহাত দূরে বারান্দায় একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে বিবেকবাবুর মৃতদেহ পড়েছিল।

দেখা গেল, সেখানে খানিকটা রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে এবং রক্তের ছোট-ছোট ফোঁটা ক্রমশ বাথরুমের দিকে গিয়াছে। হিমাদ্রি রক্তের দাগ লক্ষ করিয়া বাথরুমের দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া দিল। ভিতরে রক্তের দাগ নাই।

হিমাদ্রি খানিক্ষণ আনমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া বলিল, ইন্সপেক্টর, বাড়ির লোকেদের স্টেটমেন্ট নেবেন না?

ও, শিওর। অন্তত মৃত্যুটা যখন স্বাভাবিক নয়।

তাহলে আমি যদি ঘরগুলো একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই, আপনার কোনও আপত্তি হবে কি?

BanglaBook.org

বুঝেছি, কেসটার ব্যাপারে আপনি খুব ইন্টারেস্টেড। কিন্তু এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, মিস্টার সেন? অমায়িকভাবে হাসলেন চট্টরাজ।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। আমার খেয়ালি মনের খানিকটা খোরাক আর এ-ফ্যামিলির সঙ্গে আমার খানিকটা সূক্ষ্ম কৃতজ্ঞতা জড়িয়ে আছে, তাই আর কী।

বেশ, আপনি দেখুন। আমি ততক্ষণে তলায় গিয়ে স্টেটমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করি। শীঘ্র আসছেন আশা করতে পারি।

ইন্সপেক্টর নীচে নামিয়া গেলেন।

আমরা প্রথমে যূথিকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। এই ঘরে কাল বিবেকবাবু শয়ন করিয়াছিলেন। আজ তিনি নাই।

ঘরের আসবাব অল্প। একটি খাট। ড্রেসিং টেবিল। টিপয়ে পানীয় জল-ভরতি একটি জার। আলনায় যূথিকার পোশাকের সঙ্গে বিবেকরঞ্জনের ধুতি-পাঞ্জাবি রহিয়াছে। এক নজরে চারিদিক দেখিয়া লইয়া হিমাদ্রি ঘরের কোণে টেবিলের দিকে আগাইয়া গেল। টেবিলে যূথিকার পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থা। হিমাদ্রি আনমনে ড্রয়ার টানিল। কালো রেক্সিনের বাঁধানো একটি অ্যালবাম দেখা গেল। অ্যালবামটি তুলিয়া লইয়া হিমাদ্রি পাতা উলটাইল। প্রথম পাতায় লেখা ঃ

'এমনি করে তোমার মনে এঁকে দিলাম আলপনা,
আমার কথা মনে কোরো যখন আমি থাকব না।'

যূথিকে।—'র'।

কবিতাটি পড়া শেষ করিয়া হিমাদ্রি একের-পর-এক পাতা উলটাইয়া চলিল। সমস্ত অ্যালবাম ভরিয়া শুধু যূথিকার ছবি। নানা পোশাকের। নানা ঢঙের। নানা অভিব্যক্তির। কখনও সে অভিমানী, কখনও সে কপট রাগী, কখনও অনুরাগী, কখনও বা লাস্যময়ী। প্রতিটি ছবিতেই যূথিকার যৌবনের বিশেষ রেখাগুলি সযত্ন প্রচেষ্টায় ধরিয়া রাখা হইয়াছে। যূথিকা তাহার দেহকে যে ক্যামেরার সামনে এমনিভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সে ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যান উভয়েরই সৌভাগ্য!

আমরা আসিলাম নির্ঝরিণীর ঘরে। নির্ঝরিণী যে যূথিকার সম্পর্কে মাসি—সে-পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। নির্ঝরিণী শিক্ষকতা করেন। বোধহয় ইতিহাস পড়ান। ঘরের শেলফে ইতিহাসের বই-ই বেশি। হিমাদ্রি বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল। পরিপাটিভাবে শেলফে সাজানো। কিছু বাঁধানো খাতা। তাহাতে পড়াশুনা সংক্রান্ত নোট। দুই-তিনটা খাতার অন্তরালে একটি বড় খাতা কাগজের মোড়কে রহিয়াছে দেখা গেল। মোড়ক খুলিতে দেখা গেল দামি ফ্রেমে একটি ফটো। সদ্য ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ করিয়া বোধ করি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া হাতে র‍্যাকেট লইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিতেছে একটি যুবক ও একটি যুবতী। যুবতী নির্ঝরিণী এবং যুবক মৃত বিবেকরঞ্জন—যূথিকার স্বামী। ছবিটি নতুন তোলা নয়।

নির্ঝরিণীর ঘরে একটি খাট। আলনা। চেয়ার-টেবিল। টেবিলের উপর একটি মোটা বই অলসভাবে পড়িয়াছিল। হিমাদ্রি বইখানি হাতে তুলিয়া লইল। একটি ইতিহাস বই। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস। মুখবন্ধের ওপর লেখা ঃ

নির্ঝরিণী দেবরায়। শিক্ষয়িত্রী। '—' বালিকা বিদ্যালয়।

এক নজরে পাতা উলটাইতে গিয়া হিমাদ্রি 'ছত্রপতি শিবাজী' পরিচ্ছেদে থামিল। একস্থানে লাল পেনসিল দিয়া কয়েকটি ছত্র আন্ডারলাইন করা। অংশটি হিমাদ্রি বারবার পড়িল। তারপর বইটি যথাস্থানে রাখিয়া জানলার সামনে আসিয়া সিগারেট ধরাইয়া দূর আকাশের দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, সে-দৃষ্টির সহিত আমি গভীরভাবে পরিচিত।

এবার আমরা বিনয়বাবুর ঘরে আসিলাম। বিনয়বাবু যে একজন কবি তাহা ঘরে প্রবেশ করিতেই অচিরাৎ প্রমাণ হইয়া গেল। অন্য দুইটি ঘরের মতো একইভাবে ঘরটি সাজানো। নতুন

BanglaBook.org

কিছু নাই। টেবিলে একটি মোটা খাতা শোভা পাইতেছিল। বিনয়বাবুর কবিতাঞ্জলি। আদিরসাত্মক কত কবিতা যে বিনয়বাবু লিখিয়াছেন, বাংলাদেশের পাঠক তাহার খোঁজ রাখেন না। কয়েকটি কবিতা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা গেল।

প্রথম কবিতা ঃ

সে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি।
আলনাতে তার ঝুলছে শাড়ি।।
এসব নিয়েই নাড়ি-চাড়ি,
চিঠিতে সে লিখেছে 'আড়ি'
মা হবে সে তাড়াতাড়ি।।

দ্বিতীয় কবিতা ঃ

আসুক ঝড়, বন্যা কিংবা ঝঞ্ঝা,
পরোয়া করিনে, লড়ে যাব পাঞ্জা।।
শুধু আমরা ডিম ভাত খাব আর
একদম হব নাকো ঘরের বার।।
তুমি ইচ্ছে করে থাকবে চোখ বুজে।
আমি তখন তোমার বুকে মুখ গুঁজে...।

কী সর্বনাশ! এর পরের অংশ বুঝিতে পারিলে হিমাদ্রির লখিন্দরও লজ্জায় মরিয়া যাইত।

তৃতীয় কবিতা ঃ

সত্যি বলছি মাইরি!
তুমি যেন খাবারের ঝুড়ি,
তোমার মুখটি খাজা কাঁঠালের কোয়া।
বুকটি তোমার...।

বর্ণনা ক্রমশ নিম্নাভিমুখী। পড়িতে গিয়া মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। 'শ্রীহরি' বলিয়া হিমাদ্রি খাতা রাখিয়া দিল।

হিমাদ্রি হাতের ঘড়ি দেখিল। বেলা বাড়িতেছে। ইন্সপেক্টরও অনেকক্ষণ নীচে গিয়াছেন। আমাদের আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। হিমাদ্রি তাই দেরি না করিয়া সমিতের ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সমিতের ঘরে প্রবেশ করিয়া সিগারেট টানিতে ভুলিয়া গেলাম। সমিত যে কত বড় শিল্পী তাহা তাহার ঘরে না আসিলে বোঝা যাইত না। সারা ঘরে সুরুচির পরিচয় মেলে। ঘরের দেওয়ালে হাতে-আঁকা অনেক ছবি। ঘরে নানা আকারের নানা ধরনের মডেল রহিয়াছে। একটি নটরাজের। একটি বুদ্ধের। একটি মহাত্মাজির। একটি মৎস্যকন্যার ব্রোঞ্জ মডেল। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল টেবিলে রক্ষিত ব্রোঞ্জ বা সীসা জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি একটি হাফ-বডি শিবাজীর মূর্তি।

হিমাদ্রির মুখ দিয়া শুধু একটি মাত্র কথা বাহির হইল, এখানেও শিবাজী!! দেখিবার মতো আর বিশেষ কিছু ছিল না। টেবিলে একটি পোর্টফালিও রহিয়াছে। তাহার এককোণে সাদা কার্ডে টাইপ করা ঃ

মিস্টার সমিত মিত্র। ফোরম্যান। '—' ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড।

BanglaBook.org

সেদিন বাড়ি ফিরিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। আহারাদি সমাপন করিয়া আমি দিবানিদ্রায় আত্মনিয়োগ করিলাম। বৈকালে যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম হিমাদ্রী বুকের উপর হাত আড় করিয়া ঘরময় পায়চারি করিতেছে।

আত্মারাম চা দিয়া গেল। মুখ ধুইয়া চায়ের কাপ লইয়া বসিলাম। চা খাইতে-খাইতে হিমাদ্রি বলিল, চট্টরাজ সকালে যখন স্টেটমেন্ট নিচ্ছিল, তখন আমি মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করেছি। এর থেকে ও-বাড়ির লোকদের মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করেছি। কেমন হয়েছে শোনো।

সে উঠিয়া গিয়া একটি খাতা লইয়া আসিল। তারপর পড়িতে আরম্ভ করিল ঃ

(১) প্রণবশঙ্কর রায়—প্রৌঢ়। ব্যবসায়ী। অতিথিবৎসল। অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের পেয়িংগেস্ট-এর মতো বাড়িতে আশ্রয় দিয়াছেন। জামাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। কুকুর সম্বন্ধে সাবধান করিয়া তিনি জামাইকে বলিয়াছিলেন, রাত্রে বাহিরে আসিলে যেন সে যূথিকাকে ডাকে। তিনি কুকুরের ডাক শোনেন নাই।

(২) সুরমা রায়—প্রণববাবুর স্ত্রী। জামাইয়ের মৃত্যুতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। ঘটনার রাত্রে কুকুরের ডাক শোনেন নাই।

(৩) বিনয় ঘোষ—প্রবণবাবুর সম্পর্কে ভাই। বয়স পঁয়ত্রিশ বা কিছু কম। অত্যন্ত শৌখিন। কবিতা লেখেন। অবিবাহিত। প্রণববাবুকে ব্যবসায়ে সাহায্য করেন। কুকুরের দেখাশুনা তিনিই করিতেন। সে-রাত্রে নিজের খাওয়ার পর কুকু'টিকে খাওয়ান। কুকুরটিকে তিনিই নাড়াচাড়া করেন বলিয়া তাহার সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল। রাত্রে কোনও অপরিচিত বা সন্দেহজনক কিছু দেখিলে সে নিশ্চয়ই ডাকিত। এবং তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন। কিন্তু কুকুরের সেরকম কোনও চিৎকার তিনি রাত্রে শোনেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কুকুরটি হিংস্র হইলেও কাহাকেও আক্রমণের পূর্বে সে চিৎকার করে। যূথিকার চিৎকারে তিনিই প্রথম দরজা খুলিয়াছিলেন। তিনি তখন বাথরুমের দরজার পাশে রক্তের ধারা ও কুকুরটিকে শুইয়া থাকিতে দেখেন। কুকুরটিকে তখন রণক্লান্ত সৈনিকের মতো ঝিমাইতে দেখা যায়। সে বিনয়বাবুকে দেখিয়া কেমন অসহায়ভাবে মৃদু স্বরে ডাকিয়া ওঠে। তাহার সে-স্বরে গভীর অপরাধবোধ ছিল। এমন স্বর তিনি কোনওদিন কুকুরটির গলায় শোনেন নাই।

(৪) সমিত মিত্র—ব্যায়ামপুষ্ট ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক। ভালো চাকুরে। সম্পর্কে প্রণবাবুর ভাগনে। প্রাণচঞ্চল এই যুবকটি অত্যন্ত প্রগতিশীল মনের। কারুশিল্পে তাহার প্রবল অনুরাগ। নিজের আঁকা ছবি এবং মডেল দ্বারা নিজের ঘর সুরুচিসম্মতভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কুকুরটিকে সে-ও কিছু-কিছু দেখাশুনা করিত, এবং কুকুরটির চরিত্রও কিছু-কিছু জানিত। তবুও কুকুরটির এরূপ ব্যবহারে সে মর্মাহত হইয়াছে। এই আকস্মিক ঘটনা তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

(৫) নির্ঝরিণী দেবরায়—পঁচিশ বছরের এই যুবতী প্রণববাবুর সম্পর্কে শ্যালিকা। শিক্ষকতা করেন। সুন্দরী না হইলেও নিজেকে সুন্দরী করিয়া তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন—প্রসাধনে, চালচলনে, কথাবার্তায়। মৃত বিবেকরঞ্জনের সহিত তাঁহার পূর্ব হইতেই আলাপ ছিল। কিন্তু তাহা তিনি গোপন বা অস্বীকার করিয়াছেন। ঘটনার রাত্রে তিনি কয়েকবার কুকুরের ডাক শুনিতে পান। তবে সে-ডাক কেমন যেন মিয়ানো ছিল।

(৬) যূথিকা বসু (রায়)—বয়স আঠারো। অপূর্ব সুন্দরী। সারা শরীরে যৌবন অকৃপণ মেলা বসাইয়াছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা নির্জন ছাদে তাহার স্বামীর সহিত নির্ঝরিণীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিতে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়। রাত্রে বিছানায় আশ্রয় লইবার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা হয়। তাহাদের জীবনের কথা। ভবিষ্যতের কথা। কত রঙিন স্বপ্নের কথা। তারপর এক সময় রাগ-অনুরাগ একাকার হইয়া শরীরে অবসাদ আসে। যূথিকা ঘুমাইয়া পড়ে। হঠাৎ এক সময় বিছানায় পাশ ফিরিতে গিয়া নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। দেখে বিবেকরঞ্জন বিছানায় নাই। ভেজানো দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ওই মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ে। বাথরুমের পাশে বিবেকরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে। কুকুরটিকে ওপাশে শুইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহাকে দেখিয়া কুকুরটি বারকয়েক ক্ষীণ আওয়াজ করে। তারপর লম্বা জিভ দিয়া মুখ চাটিতে-চাটিতে মাথাটি সামনের দুই ছড়ানো পায়ের উপর কাত করিয়া রাখে। আর্ত চিৎকার করিয়া যূথিকা সংবিৎ হারাইয়া

BanglaBook.org

ফেলে। তাহার চিৎকারে বাড়ির সকলে উঠিয়া পড়েন।

(৭) রমেন পতিতুণ্ডী—যূথিকার গৃহশিক্ষক। রবীন্দ্রপ্রভাবযুক্ত ব্যক্তি। গিলে-করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি আর সোনার ফ্রেমের চশমা পরেন। সুন্দর চেহারায় একটি নারীসুলভ সলজ্জ ভাব আছে। তিনি ভালো ছবি তুলিতে পারেন। বেড়ানো, গান লেখা এবং ছবি তোলা তাঁহার 'হবি'। যূথিকার বিবাহের পরও এ-বাড়িতে তাঁহার যাতায়াত কমে নাই।

হিমাদ্রি খাতা বন্ধ করিল।

আমি বলিলাম, তা নয় হল, কিন্তু এসব করে কী লাভ তোমার?

খেয়াল লাভ-লোকসান বিচার করে না, মুকুল। আর—।

বাহিরে আবার বর্ষণ শুরু হইল।

সকালে ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে। প্রখর সূর্যকিরণ চারিদিকে ঝলমল করিতেছে।

চায়ের পাট চুকাইয়া সবে দৈনিক পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়াছি, কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। দ্বারে অতিথি। মক্কেল হইতে পারে। আমিই গিয়া দরজা খুলিলাম। ইন্সপেক্টর চট্টরাজ একটি ফাইল হাতে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আত্মারামকে ডাকিয়া হিমাদ্রি আর-একদফা চায়ের ফরমাশ করিল। ইন্সপেক্টর হিমাদ্রির হাতে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তুলিয়া দিলেন।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে—গলার ক্যারোটিড আর্টারি, সারভাইকল ভ্যাটিব্রা প্রভৃতি কাটিয়া যাওয়ায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে। মাংসাশী পশু হিংস্র দাঁত দ্বারা যেন সমস্ত শিরা-উপশিরা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। না, মস্তিষ্কে কুকুরের কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই।

হিমাদ্রি মন্তব্য করিল, আমি জানতাম।

সিগারেট ধরাইয়া চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কী বুঝছেন বলুন, মিস্টার সেন।

আত্মারাম চা দিয়া গেল। নীরবে চা পান সমাপ্ত হইল।

ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া হিমাদ্রি অলসভাবে প্রশ্ন করিল, ইন্সপেক্টর চট্টরাজ, আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দিন।—একরাশ ধোঁয়া বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মুদিত চোখে হিমাদ্রি বলিল, মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে কোন রাজনৈতিক বীরের চরিত্র আপনাকে মুগ্ধ করে?

মিস্টার চট্টরাজ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, শের শা বা আকবর।

যদিও আমি ইতিহাসের ছাত্র নই তবুও বলছি, শিবাজীর চরিত্র আমায় মুগ্ধ করে।—বলিয়া হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখে মিঃ চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তারপর অনেক সিগারেট পুড়িয়া ছাই হইল। এবং হিমাদ্রি ইজিচেয়ারে দেহ ছড়াইয়া চোখ মুদিল। কেবল ইন্সপেক্টর চট্টরাজের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল একটি কথা—স্ট্রেঞ্জ!

যাইবার পূর্বে ইন্সপেক্টর বলিলেন, আমার সাহায্য আপনি সবসময় পাবেন।

অতঃপর অনিবার্যভাবে প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমাদের যাতায়াত বাড়িয়া গেল। আমরা তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। সম্প্রতি যে-প্রচণ্ড শোকের ঝড় এই পরিবারের ওপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে মাঝে-মাঝে এখানে আসিয়া ইহাদের শোকের বোঝা হালকা করা প্রয়োজন। ইহা আমরাও যেমন

BanglaBook.org

বুঝিতাম, প্রণববাবুও বুঝিতেন। সুতরাং, বাড়িতে সকলেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির যত্রতত্র আমাদের গতিবিধি অবাধ হইয়া গেল। ড্রইংরুম হইতে কোনও নোটিশ না দিয়াই আমরা উপরে উঠিয়া আসিতাম।

এমনিভাবে প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় আমরা প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়িতে হাজিরা দিতাম। চা হইত। গল্প হইত। নানা সুখ-দুঃখের কথা হইত। এবং আলোচনার অংশীদার বাড়ির সকলেই ছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রণবশঙ্করবাবুর ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গদাই ছবি আঁকিতেছে। পড়িবার বইগুলি একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

হিমাদ্রি বলিল, স্কুলের ছেলে। সন্ধ্যাবেলা পড়া না করে ছবি আঁকছ কেন?

গদাই বিস্ময় বোধ করিল : বারে, ছবি আঁকা বুঝি খারাপ! সমুদা বলে, যারা ছবি আঁকে তারা শিল্পী। সমুদা কত ভালো-ভালো ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন। হিমাদ্রিদা, আমি না বড় হয়ে শিল্পী হব।

কিন্তু লেখাপড়াটাও তো শিখতে হবে। যাক, দেখি কী-কী ছবি এঁকেছ?

গদাইয়ের হাত হইতে খাতাটি লইয়া হিমাদ্রি পাতা উলটাইল।

শিল্পীমন গদাইয়ের আছে। কাঁচা হাতে সে বাড়ির সকলের ছবি আঁকিয়াছে। বাড়ির চাকর হইতে শুরু করিয়া কুকুরটিও বাদ যায় নাই। প্রতিটি ছবির তলায় পরিচয়লিপি রহিয়াছে।

নির্ঝরিণীর হাতে বই ও বেত। সুরমা দেবীর হাতে পূজার থালা। প্রণববাবুর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাতে ছড়ি। বিনয়বাবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। যূথিকার কপালে টিপ ও হাতে চুড়ি। যূথিকা ও সমিত মুখোমুখি। যূথিকার মুখ নত। সমিতের হাত দুটি যূথিকার কাঁধে। পরিশেষে একটি অর্ধসমাপ্ত ছবি। দুটি যুবক। তাহাদের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া গদাইয়ের দিকে তাকাইতেই সে হাসিয়া উঠিল।

এটা কাদের ছবি বলুন তো?

আমাদের নিরুত্তর দেখিয়া গদাই আরও হাসিতে লাগিল।

বুঝতে পারলেন না? ওটা তো আপনাদের ছবি।

দেখিলাম গদাইয়ের শিল্পদৃষ্টি হইতে আমরাও বাদ পড়ি নাই। সে বড় হইলে সত্যিই শিল্পী হইবে।

কিন্তু হিমাদ্রি বিমনা হইয়া রহিল।

ইহাতে বোধ করি গদাই একটু ভড়কাইয়া গেল। সে যে গোপনে শিল্পচর্চা করিয়া বাড়ির লোকদের এইভাবে বিকৃত করিয়াছে, হিমাদ্রির ভাবভঙ্গি দেখিয়া এ-কথা তাহার মনে উদয় হইতেই সে ভয় পাইল।

হিমাদ্রি জিগ্যেস করিল, তোমার বাবা কোথায়?

শুষ্ক কণ্ঠে গদাই জবাব দিল, বাবা-মা ভাইবোনদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেছেন।

এসো মুকুল, ভেতরে যাওয়া যাক।

যাওয়ার পথে গদাই আসিয়া হিমাদ্রির হাত চাপিয়া ধরিল। হিমাদ্রি হয়তো এমন কিছু আশা করিয়াছিল, বলিল, ভয় নেই, কাউকে বলব না। পড়ার সময়ে ছবি আঁকবে না।

দ্বিতলে পদার্পণ করিয়া দেখা গেল বারান্দায় কম পাওয়ারের আলো জ্বলিতেছে। কোনও ঘর হইতেই আলোর ছটা বারান্দায় আসে নাই। সামনের বারান্দার দিকের দরজা-জানলা বন্ধ দেখিয়া মনে হইল, যে যার নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। ফিরিয়া যাইব কি না চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ অত্যন্ত মৃদু কথার আওয়াজ কানে আসিল। বিনয়বাবু কাহারও সহিত খুব চাপা কণ্ঠে কথা বলিতেছিলেন। হিমাদ্রিকে চোরের স্বভাব পাইয়া বসিল। সে সন্তর্পণে পা টিপিয়া-টিপিয়া বিনয়বাবুর ঘরের দিকে চলিল। আমিও তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে গিয়া বিনয়বাবুর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়াইলাম। এবার বিনয়বাবুর কণ্ঠ পরিষ্কার বোঝা গেল। আমরা শুনিতে লাগিলাম।

বিনয়বাবু বলিলেন, তোমাকে যে আমি মনে-প্রাণে চাই, কেন বোঝো না গো?

অপরপক্ষের কোনও কথা শুনিলাম না।

তুমি তো আস না। আমি কত ডাকি। তুমি কি আমার মনের কথা বোঝো না? কথা বলছ না কেন? বারে, আমার কথার জবাব দাও।

আবার চুপচাপ।

ও, রাগ হয়েছে সোনা? এসো, আমার বুকের মধ্যে এসো।

এবার সশব্দে চুম্বনের আওয়াজ শুনিলাম।

সর্বনাশ। আর দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। কিন্তু হিমাদ্রির মধ্যে কোনও ব্যস্ততা লক্ষ করিলাম না। সে সরাসরি বিনয়বাবুর দরজায় মৃদু টোকা দিল।

ভেতর হইতে বিনয়বাবুর গলা পাওয়া গেল ঃ কে?

আমরা। দরজা খুলুন। এই সন্ধেবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে কীসের ধ্যান করছেন, মশায়!—শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে চাপা হাসি হাসিয়া উঠিল হিমাদ্রি।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিনয়বাবু ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। আমরা ভেতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু একটু আগে যাহার সহিত বিনয়বাবু প্রেমালাপ করিতেছিলেন, তাহার কোনও অস্তিত্বই ঘরে দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঝুলানো বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ ছিল।

হিমাদ্রি কোনও প্রকার সঙ্কোচ না করিয়াই বিনয়বাবুর খাটের ওপর পা ঝুলাইয়া বসিল।

বিনয়বাবু একটু আগেই যে এই ঘরে বৃন্দাবনলীলা চালাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। ভয় বা বিরক্তির কোনও চিহ্নই তাঁহার মুখে নাই। এমনকী আমাদের এখন এখানে এভাবে দেখিয়াও তিনি বিস্মিত হন নাই বোঝা গেল।

হিমাদ্রি বলিল, তলায় গদাইয়ের কাছে শুনলাম, কর্তা-গিন্নি দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। তাই সোজা উপরেই চলে এলাম। এসে দেখি, শুধু আপনার ঘরেই আলো জ্বলছে। তাই...।

বিলক্ষণ। আমি মশাই বাড়ি ছেড়ে বের হই না। হওয়ার দরকারও হয় না। একলা মানুষ বেশ আছি।

বড্ড গরম হচ্ছে। জানলাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছেন দেখছি।

তাই তো!—ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিনয়বাবু জানলা খুলিয়া দিতে গেলেন।

বিনয়বাবুর বিছানাটা একটু এলোমেলো। মাথার বালিশের পাশে কোনও মেয়ের একটি বক্ষবন্ধনী পড়িয়া আছে। আর পড়িয়া আছে দুইটি রুপোর মাথার-কাঁটা।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত।

হিমাদ্রি ওই সময়টুকু নিপুণভাবে কাজে লাগাইল। কাঁটা দুইটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া সুদীর্ঘ আঘ্রাণ লইল। তারপর আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

জানলা খুলিয়া দিয়া বিনয়বাবু আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরের যত্রতত্র তাকাইতেছিলাম। দেখিলাম, আলনায় বিনয়বাবুর জামা-কাপড়ের সঙ্গে একটি সিল্কের শাড়ি শোভা পাইতেছে। শাড়ি যাহারই হউক, বিনয়বাবুর নিশ্চয়ই নয়। মনে-মনে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিলাম। বিনয়বাবু সত্যিই ভাগ্যবান।

একটু পরেই নীচে আমাদের চায়ের আসর বসিল। যূথিকা আসিয়া আসরে যোগ দিল। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি ছিলেন নাকি?

যূথিকা অল্প ঘাড় নাড়িল—ছাদে বেড়াচ্ছিলাম। অন্ধকার ছাদে বেড়াতে আমার ভালো লাগে।

আমার বলিতে ইচ্ছা হইল, অন্ধকার ছাদে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় বেড়াইতে আমারও

BanglaBook.org

ভালো লাগে। কিন্তু সব জায়গায় সবকিছু বলা যায় না। নিজের ইচ্ছাটাকে দমন করিলাম।

চাকর চা আনিল। যূথিকা উঠিয়া টি-পট হইতে চা ঢালিতে লাগিল। যূথিকাকে আজ খুব ভালো দেখাইতেছিল। গায়ে গাঢ় লাল রঙের একটি স্লিভলেস ব্লাউজ। পরনে হালকা ঘাসীরঙের সিল্কের শাড়ি। মাথার চুলগুলি একটি লম্বা বেণীতে আবদ্ধ। চোখে সূক্ষ্ম কাজল। কপালে টিপ নাই। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁয়া। ওর ছোট-ছোট দু-একটি কথা, মানানসই হাসি—এসব দেখিয়া মনে হইতেছিল যূথিকার বিবাহ হয় নাই—অথবা সে বিধবা হয় নাই।

চা পান সমাপ্ত হইল। আমরা উঠি-উঠি করিতেছি, অন্দরের দিক হইতে একটা স্ত্রীলোক আসিয়া যূথিকাকে বলিল, সব হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি, দিদিমণি। বলিয়া ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমাদ্রি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিনয়বাবুর দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, ও বাসন্তী। বড় ভালো মেয়ে। এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

কিন্তু আমাদের ঠিক তখনই উঠা হইল না। যূথিকার পূর্বকথিত গৃহশিক্ষক রমেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া যূথিকার মুখটি খুশিতে ভরিয়া গেল।

যূথিকা বলিল, দু-দিন আসেননি কেন?

রমেনবাবুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিতেছিল। সেটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, রোজ-রোজ আসতে হবে, তার কী মানে আছে! আর তা ছাড়া, এখন আর আমাকে এ-বাড়িতে পড়াতে আসতে হয় না।

অতঃপর যূথিকা আর কিছু বলিল না। ভিতরে রমেনবাবুর চা আনিতে গেল। হিমাদ্রি বলিল, ব্যাপার কি মশাই। একেবারে ক্যামেরা-ট্যামেরা সহ?

দিন দুয়েকের জন্য দীঘায় বেড়িয়ে এলাম। তারপর কেমন আছেন বলুন? বিনয়বাবুর খবর কি?

এইরকম মামুলি কথাবার্তার মধ্যে যূথিকা চা লইয়া প্রবেশ করিল। রমেনবাবু চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলেন। যূথিকা তাঁহার পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িল। তারপর রমেনবাবুর সহিত নিম্নকণ্ঠে কথা বলিতে লাগিল। আমিই এদের সবচেয়ে কাছে নিলাম। হিমাদ্রি ও বিনয়বাবু নিজেদের মধ্যে কথায় ব্যস্ত। ওদের কথায় সায় দিলেও আমার কান সজাগ ছিল রমেনবাবু ও যূথিকার কথায়। দু-একটি ছাড়া তাহাদের সব কথা আমার কানে আসিতেছিল না।

রমেনবাবু বলিলেন, ব্যাপারটা সকলের দিক দিয়েই ভালো হবে।...তোমার...আর তোমার মতো মেয়ের অন্তত চিরকাল বাবার উপর নির্ভর করে থাকাটা শোভা পায় না...না, কোনও কিন্তু না,...তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমিই করব।...

ঢং-ঢং করিয়া দেওয়াল ঘড়িতে রাত ন'টা বাজিল।

আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

যূথিকাকে আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হইতেছিল। সে আমাদের সঙ্গে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত আসিল। লক্ষ করিতেছি, যূথিকার উপর আমার একটা তীব্র লোভ ভিতরে-ভিতরে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে।

বিদায় লইবার সময় তাহার অত্যন্ত কাছেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যূথিকার মাথা হইতে কী সুন্দর একটা গন্ধ বাহির হইতেছে।

আজ রাতে নির্ঘাত ওকে স্বপ্ন দেখিব।

BanglaBook.org

রাতে খাওয়ার পর বিছানায় বসিয়া আমরা কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া থাকি—সেইসঙ্গে হয়তো কিছু পরচর্চা হয়। তারপর ঘুমাইয়া পড়ি। এ আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

আজ সিগারেট ধরাইয়া হিমাদ্রি বলিল, বিনয়বাবুর ঘরে যে-মাথার কাঁটা দুটো দেখেছিলাম সেগুলো যূথিকার। যূথিকার মাথা থেকে যে-তেলের গন্ধ বেরোচ্ছিল, সেই একই গন্ধ ওই কাঁটাতেও ছিল।

আমি একটু হাঁ করিয়া রহিলাম।—যূথিকার...বিনয়বাবুর ঘরে...।

যাক, রমেন-যূথিকার কথায় তেমন কিছু শুনতে পেয়েছ কি না বলো।

আমি যাহা-যাহা শুনিতে পাইয়াছিলাম বলিলাম।

হিমাদ্রি আবার পায়চারি শুরু করিল। আমি নীরবে তাহার পদচারণা লক্ষ করিতে-করিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করিবার পূর্বে শুধু অস্পষ্টভাবে শুনিলাম সে কাহাকে ফোন করিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় হিমাদ্রি আমাকে লইয়া সমিতবাবুর ঘরে প্রবেশ করিল। সমিতবাবু তখন ঘরে বসিয়া ল্যান্ডস্কেপের ওপর একটি ছবিতে তুলির আঁচড় দিতেছিলেন। ছবিটি সমাপ্তির পথে। আমাদের দেখিয়া সমিতবাবু বসিতে বলিলেন। হিমাদ্রি বসিল না। সে দাঁড়াইয়া ছবিটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোনও গ্রিক ভাস্কর্যের অনুকরণ। একটি নারীকে বিবস্ত্র করিতেছে একটি পুরুষ। পুরুষের একটি পেশিবহুল হাত নির্মমভাবে নারীর কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে। অন্য হাতে নারীর অঞ্চলের শেষপ্রান্ত ধরা। পুরুষটির বুকের সুগঠিত পেশিগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখ দুটিতে আদিম ক্ষুধা। নারীটির শরীরে ধরা-নাহি-দিব এমনি একটি কপট প্রচেষ্টা। একটি পেলব হাত উন্মুক্ত বক্ষসম্পদ আড়াল করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কাপড়ের একপ্রান্ত অন্য হাতে ধরিয়া পুরুষের চোখ হইতে দেহ ঢাকিবার ছলনা করিতেছে। চোখে কটাক্ষ। ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে সূক্ষ্ম প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত। সব মিলিয়া ছবিটিতে সজীবতা এত স্পষ্ট যে, দেখিলেই উগ্র কামনা জাগিয়া উঠে।

সমিতবাবু সত্যিকারের শিল্পী। নিখুঁত কল্পনাশক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু ছবিটিতে যে-নারীটি রহিয়াছে, তাহার সহিত কাহার যেন মুখের সাদৃশ্য আছে।

আমি বলিলাম, অপূর্ব! অদ্ভুত!

হিমাদ্রি বলিল, মশায় দেখছি মাইকেল এঞ্জেলো!

সমিতবাবু বলিলেন, সমালোচনা করুন। তাতে সত্যিকারের উপকার হয়। প্রশংসাটা একঘেয়ে।

হিমাদ্রি সমিতবাবুর ঘরে সাজানো ছবি ও মডেলগুলি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতেছিল। সমিতবাবুর সৃষ্ট প্রতিটি শিল্পই প্রশংসার দাবি রাখে। মনোযোগ দিয়া হিমাদ্রি সেগুলিই দেখিতেছিল। সমিতবাবুর ঘরে তাঁহার নিজের ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিস পরিপাটিভাবে সাজানো রহিয়াছে। সিঙ্গল খাটে নিভাঁজ শয্যা। টিপয়ে টাইমপিস। একটা ফুলদানি। তাহাতে একগুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা। ফুলের গুচ্ছটিকে বেষ্টন করিয়া সুগন্ধী ধূপের ধূম্রজাল নাচিয়া-নাচিয়া উঠিয়া বাতাসে হারাইয়া যাইতেছে। দেওয়ালের একধার ঘেঁষিয়া একটি আলনা। তাহাতে কাপড়-জামা। তলার কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর পাশাপাশি তিনজোড়া জুতা সাজানো রহিয়াছে। ঘরের এপাশে টেবিল-চেয়ার। টেবিলের উপর শিবাজীর স্ট্যাচু শোভা পাইতেছে। হিমাদ্রি ধীরে-ধীরে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর বুকের উপর হাত দুইটি ভাঁজ করিয়া সেটিকে দেখিতে লাগিল।

BanglaBook.org

সেদিন সকালবেলা দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবক প্রবেশ করিল। সাদামাটা একহারা চেহারা। চোখ দুটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সজাগ। নাম পঞ্চানন কুণ্ডু। পুলিশের ইনফরমার।

হিমাদ্রি বলিল, কী খবর বলো, পঞ্চানন।

পঞ্চানন শুরু করিল : আপনার কথামতো স্যার, আমি বিনয়বাবুর ওপর নজর রেখেছিলাম। কাল সকালে ভদ্রলোকের পিছু নিলাম। উনি বাসে উঠলেন। আমিও উঠলাম। কাদাপাড়া স্টপেজে ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও নামলাম। উনি একটা বস্তিবাড়িতে ঢুকে গেলেন। আমি বাইরে ঘুরতে লাগলাম। বাড়িটার সামনে রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা প্রাইভেট গাড়ি পার্ক করা ছিল। বেশ ঝকঝকে নতুন গাড়ি। বাড়ির দরজার ওপর নজর রেখে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। চা খেতে-খেতে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জমালাম। তার কাছেই জানতে পারলাম, সামনের বস্তিবাড়িটাতে রাখাল নামে একটা লোক থাকে। সে ড্রাইভারি করে। মাঝে-মাঝে গাড়িটা নিয়ে আসে।

পঞ্চানন চায়ের কাপ সরাইয়া রুমালে মুখ মুছিল।

হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণ পরে বিনয়বাবু বেরোলেন?

তা প্রায় মিনিট পনেরো পরে। সঙ্গে একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মধ্যবয়স্ক হলেও চালচলনে এবং পরনের আঁটোসাঁটো পোশাকে কুড়ি বছরের খোকা-খোকা ভাব। বুঝলাম এই রাখাল। সে গাড়ির দরজা খুলে ড্রয়ারের মধ্যে থেকে কাগজের একটা বই-সাইজের মোড়ক বিনয়বাবুর হাতে দিল। বিনয়বাবু অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করলেন। বিনয়বাবুর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা লোভী-লোভী খুশি-খুশি ভাব। রাস্তা তখন প্রায় ফাঁকা ছিল। তবু বিনয়বাবু চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে পাঞ্জাবি তুলে পেট-কোঁচড়ে সেটা গুঁজে নিয়ে পাঞ্জাবি চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর পার্স খুলে কিছু টাকা রাখালের হাতে দিলেন। টাকাগুলো গুনে দেখে রাখাল কায়দা করে একটা হাত ওঠাল। সেটা নমস্কার না বিদায় সম্ভাষণ বুঝলাম না। বিনয়বাবু হনহন করে বড়রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাখাল খানিকক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে আপনমনে শিস দিয়ে উঠল। তারপর কানে গোঁজা সিগারেটটা হাতঘড়ির কাচের ওপর ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে-করতে ভাবলাম, এবার কী করব।

একটা সিগারেট শেষ হল। আর-একটা ধরালাম। সেটাও শেষ হয়ে গেল। গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে আমিও বড়রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। বড়রাস্তায় পড়বার মুখেই দেখি নির্ঝরিণী দেবী ব্যগ্রদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছেন। চোখে সানগ্লাস। হাতে চামড়ার একটা শৌখিন ব্যাগ। এমনটি আশা করিনি। যাই হোক, লক্ষ করতে লাগলাম। নির্ঝরিণী দেবী—যে-চায়ের দোকানে আমি চা খেয়েছিলাম—সেই দোকানে কী যেন জিগ্যেস করলেন। তারপর বিনয়বাবু যে-বাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলেন।

একটা দশ-বারো বছরের ছেলে বাড়ির মধ্যে যাচ্ছিল। তাকে কিছু বললেন। একটু পরেই রাখাল হাসিতে দন্তবিকশিত করে বেরিয়ে এল। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়াল। নির্ঝরিণী দেবী দাঁড়ালেন তার সামনে। দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর রাখাল বাড়ির মধ্যে চলে গেল। নির্ঝরিণী দেবী ঘড়ি দেখলেন। রাখাল ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। নির্ঝরিণী দেবীও উঠে বসলেন। তারপর হাতের ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়না বার করে মুখ দেখতে লাগলেন। রাখাল গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সৌভাগ্যবশত মোড়েই আমি একটি খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। রাখালের গাড়িটা অবিশ্যি এগিয়ে গিয়েছিল। তবুও আয়ত্বে এসে গেল। ড্রাইভার আমার কথামতো ওর গাড়িকে ফলো করে এগোতে লাগল।

হিমাদ্রির ফরমাশে আর-একদফা চা আসিল। চা পানের পর পঞ্চানন পুনরায় তাহার অভিযানের কাহিনি শুরু করিল।

BanglaBook.org

রাখালের গাড়ি বালিগঞ্জের একটা বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ভাড়া মিটিয়ে আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও ওদের কাউকে বেরোতে দেখলাম না। আমি রাস্তা থেকে একটা বাস ধরে মোটর ভেহিকেলসের অফিসে এসে নাম্বারটা ট্রেস করলাম। গাড়ির মালিক এস. পি. দত্তগুপ্ত। বালিগঞ্জের ওই বাড়ির মালিক।

সিগারেটে মৃদু টান দিয়া হিমাদ্রি প্রশ্ন করিল, আর কিছু দেখেছ?

কাল সন্ধেবেলা, স্যার, একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। সন্ধে নয়। রাত প্রায় আটটা হবে। প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে একজন মেয়েছেলে বেরিয়ে এল। রাস্তায় রাখাল অনেকক্ষণ থেকেই ঘোরাফেরা করছিল। মেয়েছেলেটি বেরিয়ে আসতেই রাখাল তার সঙ্গে গল্প করতে-করতে এগিয়ে গেল বাস-স্টপেজের দিকে। ওরা দুজন বাসে উঠল। বাস তখন খালি। জেন্টস্ সিটে পাশাপাশি বসল। মেয়েছেলেটি টিকিট কাটল। দুজনা খুব স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল। হাসাহাসিও হচ্ছিল মাঝে-মাঝে। ওরা রাখালের বাড়ির স্টপেজে নামল। সেই বাড়িতেই ঢুকল। আমি ফিরে এলাম। মেয়েছেলেটি রাখালের বউ বোধহয়।

কোনও সন্দেহ নেই।—হিমাদ্রি সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজিয়া দিল।

আজ বিকাল হইতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। শনশন করিয়া বাতাস বহিতেছে। আমি চেয়ারটি জানলার পাশে আনিয়া প্রকৃতির এই প্রলয়রূপ অবলোকন করিতেছিলান। হিমাদ্রি বাসায় নাই। সকাল এগারোটায় খাইয়া কোথায় যেন বাহির হইয়াছে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া হিমাদ্রি ফিরিল। আত্মারামকে চা করিতে বলিয়া সে বাথরুমে গেল।

যখন আমরা বাহির হইলাম তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তবে আকাশ পরিষ্কার হয় নাই।

নির্ঝরিণীর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া আমাদের একটু থামিতে হইল। দরজার বাহিরে একটি ছেঁড়া খাম রহিয়াছে। হিমাদ্রি তুলিয়া লইল। আজকের তারিখে চিঠিটা বিলি হইয়াছে। নির্ঝরিণীর নাম এবং এ-বাড়ির ঠিকানা প্রণববাবুর কেয়ার-অফে লেখা। খামের ভিতর কিছু চিঠি নাই। ঘরের দরজা কিন্তু খোলাই ছিল। আমরা দেখিলাম জানলার ধারে দাঁড়াইয়া নির্ঝরিণী অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। হয়তো বা কিছু ভাবিতেছেন।

আসতে পারি?

নির্ঝরিণী জানলার ধার হইতে সরিয়া আসিলেন—বসুন।

ঘরে বসিবার অন্য ব্যবস্থা না থাকায় আমরা নির্ঝরিণীর নির্দেশে তাহার খাটের কিনারায় বসিলাম। উনি বসিলেন না। দাঁড়াইয়া রহিলেন। নির্ঝরিণীকে চিন্তাচ্ছন্ন মনে হইল।

আজ ট্যুশানি যাননি?

না।

ড্রয়ার হইতে দুটি ধূপ বাহির করিয়া নির্ঝরিণী জ্বালাইয়া দিলেন। তারপর চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িলেন। ধূপ ঘরের বাতাসে সৌরভ ছড়াইতেছে। ধীরে-ধীরে পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছে। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া নির্ঝরিণী বোধহয় একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেলেন।

জানেন হিমাদ্রিবাবু, এ-বাড়িতে আমার একদম ভালো লাগে না।

কেন?

তা জানি না। শুধু মনে হয় এ-বাড়িতে থাকব না।

তাহলে কোনও লেডিস মেসে বা অন্য কোথাও চলে যান।

কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠছে কই?

কেন?

BanglaBook.org

বর্তমানে একটা স্কুলে টেম্পোরারিলি কাজ করছি। সেখানে বেতনও কম। সে-টাকায় ভদ্রভাবে অন্যত্র থাকা সম্ভব হবে না।

অন্য জায়গায় চেষ্টা করছেন না?

করছি—করেছি। বহু জায়গায় আবেদন করেছি। কোনও ফল হয়নি।

হিমাদ্রি কোনও কথা বলিল না। নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, এক্সকিউজ মি, আপনার কোয়ালিফিকেশন?

পাস কোর্সে বি-এ পাশ করেছি। পার্সেন্টেজও খুব একটা ভালো নয়। আঁচলের কোণ দিয়া একটি আঙুলে নির্ঝরিণী পাক দিতেছিলেন।

হিমাদ্রি চোখ বুজাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

আপনার তো অনেক বড়-বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনা, দিন না হিমাদ্রিবাবু, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে।

নির্ঝরিণীর গলার স্বরে বোধহয় করুণ আবেদন।

আজ মধ্যাহ্নে গুরুভোজন হইয়াছে। সিগারেট শেষ করিয়া সবে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছি, হিমাদ্রি মালকোঁচা মারিতে-মারিতে আসিয়া বলিল, 'পূরবী'-তে একটা ভালো বই হচ্ছে। এভারগ্রিন হিরোর ছবি। চলো, দেখে আসি।

তাহাকে নিবৃত্ত করা অপচেষ্টা মাত্র। এখনি হয়তো 'বাঙালি অলস' এই পর্যায়ে লম্বা বক্তৃতা শুরু করিবে। অগত্যা উঠিলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য 'হাউস-ফুল'। কালোবাজারী মহোদয়ের নিকটও টিকিট পাওয়া গেল না। মধ্য হইতে আমার দিবানিদ্রাটিও মাটি হইল। মনের উষ্মা রোধ করিতে পারিলাম না। হিমাদ্রিকে বলিলাম, কী দরকার ছিল সিনেমায় আসার? ঘুমটাও বিগড়ে দিলে, টিকিটও পেলে না...যত্ত সব ইয়ে...।

কোণের দোকানটায় পান কিনিতেছি, হিমাদ্রি কনুইয়ের খোঁচা দিল, ওহে, ওদিকে দেখো।

তাহার কথায় মুখ ঘুরাইয়া রাস্তার অন্যপাশের ফুটপাতের দিকে তাকাইলাম। রমেন পতিতুণ্ডী আর যূথিকা। রমেনবাবু একটি খালি ট্যাক্সি থামাইলেন। দুজনে পিছনের সিটে উঠিলে ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

হিমাদ্রিও একটি খালি ট্যাক্সি ধরিল। গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে বলিল, বাড়িতে গিয়ে ঘুমোও গে। যত্ত...।

হিমাদ্রিকে লইয়া গাড়ি তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

সে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রণববাবু তখনও ফেরেন নাই। ড্রয়িংরুম ফাঁকা। বোধহয় যে-যার নিজের ঘরে বিশ্রাম লইতেছেন। আমরা উপরে উঠিয়া আসিলাম।

বিনয়বাবুর উপর হিমাদ্রির বোধ করি একটি আন্তরিক টান জন্মিয়া গিয়াছিল। কারণ লক্ষ করিতাম যে, এ-বাড়িতে আসিলে বিনয়বাবুর ঘরেই আগে যাইত।

বিনয়বাবুর ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজানো, অনুচ্চ কণ্ঠে ভিতরে বিনয়বাবু আবৃত্তি করিতেছিলেন—

তুমি ফুল গো আমি ভোমরা,
তোমরা অরুচি মুখে আমি আমড়া।
তুমি চুষ-প্যান্ট আমি পা...

BanglaBook.org

তারপর। তারপর...উঁহু।

মিলিতেছে না। বিনয়বাবু কবিতার ছন্দ মিলাইতে পারিতেছেন না।

তুমি চুষ-প্যান্ট আমি পা।
আমি স্যাকারিন তুমি চা।।

কেমন মিলল।

হাসিতে-হাসিতে হিমাদ্রি ঘরে প্রবেশ করিল। আমরা খাটে বসিলাম। চেয়ার-টেবিলে বসিয়া বিনয়বাবু কবিতা রচনা করিতেছিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, আপনি কবিতা লেখেন? বলেননি তো?

বিনয়বাবু লজ্জায় লাল হইয়া গেলেন ঃ না-না, তেমন কিছু না। একা মানুষ। যখন যা খেয়াল আসে লিখি...। খাতা মুড়িয়া ফেলিলেন।

হিমাদ্রি চোখ পাকাইল।

একা...খেয়াল...। তুমি-আমি! আমি-তুমি দিয়ে কবিতা লেখা। কন্ডিশন খারাপ। মুকুল, বিনয়বাবুকে বাঁচাও।

তার মানে বিয়ে?—আমি বলিলাম।

বিয়ে—মানে আমার?—বিনয়বাবু ঘাবড়াইয়া গেলেন।

কেন দাদা,—হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইল, বেশ তো শাঁসে-জলে আছেন! অবস্থা তো আর আমাদের মতো সজনে কাঠ নয়।

বিনয়বাবু বলিলেন, কী জানি মশাই, আমার আবার মেয়েদের কেমন যেন ভয় করে।

হিমাদ্রি আবার বসিয়া পড়িল। খুকখুক করিয়া কাশিল।—মুকুল, বিনয়বাবুকে বাঁচাও—।

মেয়েদের দূর থেকে দেখতে ভালো। ওদের কথা, গল্প, কাহিনি পড়তে ভালো, শুনতে ভালো, কল্পনা করতেও ভালো। কিন্তু ওদের আমি ভয় করি।

থাক ওসব কথা। অনেকক্ষণ থেকে বকবক করছি, চায়ের ব্যবস্থা করুন দেখি। আজ আপনার ঘরে বসেই আমি আর মুকুল চা খাব।

বিনয়বাবু একটু ইতস্তত করিয়া নীচে গেলেন। হিমাদ্রির নির্দেশে আমি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হিমাদ্রির কাজ শুরু হইল।

আমরা তখন তলার ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছি। সঙ্গে বিনয়বাবু ছাড়া কেহ নাই। প্রণববাবু তখনও ফেরেন নাই।

সেদিনের পর গদাইয়ের খুব শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তাই সন্ধ্যায় আমরা আসিলেই নীচের কোনও ঘরে বসিয়া গলা ছাড়িয়া পড়িতে থাকে। আজও হিমাদ্রিকে শুনাইয়া শুনাইয়া গায়ের সমস্ত শক্তি গলা দিয়া বাহির করিয়া পড়িতেছে। ইংরেজি পড়িতেছে। যেখানে ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিতেছে, সেখানটায় গলা চাপিয়া দিতেছে।

বিনয়বাবু উঠিলেন।

গদাইটা কেমন পড়ছে দেখে আসি। বসুন আপনারা।

বিনয়বাবু চলিয়া গেলেন।

মিনিট দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। হিমাদ্রি আস্তে-আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। আমি তাহাকে অনুসরণ করিলাম।

দোতলার বারান্দা অন্ধকার। সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ কিংবা ভেজানো। পিছনদিকের ঝুলবারান্দামুখো দরজাগুলো খোলা আছে কি না ঘরের মালিক বলিতে পারেন শুধু।

BanglaBook.org

আমার বিশ্রী লাগে। এই সন্ধ্যাবেলা উপরতলাটা বড় নিঝুম লাগে।

বারান্দার উত্তরদিকে দরজাটা পার হইলেই একফালি ছাদ। হিমাদ্রির কখন কী খেয়াল হয় বুঝিতে পারি না। কেন যে সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারেবারে এই দোতলায় আসে তাহা জানি না। এই দোতলাই হয়তো সব রহস্যের চাবিকাঠি! সে একে-একে ঘরগুলি অতিক্রম করিয়া ছাদের দিকে চলিল। ছাদে যাইবার দরজাটা ভেজানো। হিমাদ্রি মুহূর্তের জন্য থমকিয়া রহিল। তারপর আস্তে-আস্তে দরজার পাল্লাটা একটু খুলিয়া দিল। হিমাদ্রির পাশে আমি। ছাদের একটি কোনায় একটি নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়িল। চিরনূতন দৃশ্য। একটি পুরুষ, একটি নারী। প্রায়ান্ধকারে কাহাকেও চেনা যাইতেছে না। কিন্তু নারীটি অত্যন্ত চাপা স্বরে কাঁদিতেছে।

ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিয়া যখন যথাস্থানে বসিলাম, তখন সেখানে কেহ নাই। হিমাদ্রি বিমনাভাবে সিগারেট ধরাইল।

প্রণববাবু প্রবেশ করিলেন।

ক্লান্ত-বিশ্রস্ত চেহারা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরিতেছেন।

আপনারা...কতক্ষণ?

এই তো খানিক আগেই এসেছি। আপনার আজ দেরি মনে হচ্ছে।

তা একটু হয়েছে, ভাই। কাজের ঝামেলা বাড়ছে। দিনকাল যা পড়ছে বাঙালির আর করে খেতে হবে না। আপনারা বসুন। আমি আসছি।

হিমাদ্রী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনার বাড়িতে বারান্দা ছাড়া ছাদে যাওয়ার আর কোনও পথ আছে কি?

আছে। বাগান থেকে দুটো লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। তবে তা কেউ ইউজ করে না।

হিমাদ্রি আবার সিগারেট ধরাইল।

প্রণববাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। শুনিয়াছি মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, মানসিক চিন্তা মানুষের শরীরের চেয়ে মুখ-চোখের উপর বেশি রেখাপাত করে। আজ তাঁহাকে দেখিয়া এই কথাটিই মনে হইল। সামনের চুলগুলিতে পাক ধরিলেও এতদিন যেন চোখে পড়িত না। আজ মনে হইল তাঁহার চোখে-মুখে বার্ধক্যের ছায়া যেন গভীরভাবে পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতরের দিক হইতে রমেনবাবু আসিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, আরে রমেনবাবু যে, কতক্ষণ এসেছেন?

বেশ কিছুক্ষণ হল।—বারকয়েক কাশিয়া রমেনবাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।—এখানে দেখলাম কেউ নেই। তাই ভেতরে গিয়েছিলাম মাসিমার সঙ্গে গল্প করতে।

হিমাদ্রি রমেনবাবুর দিকে সিগারেট কেসটি বাড়াইয়া দিল, নিন, সিগারেট খান।

রমেনবাবু সযত্নে একটি সিগারেট তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতের আঙুলগুলি সরু-সরু, নরম। একটু কম্পমান। ভারি সুন্দর দেখিতে। জ্যোতিষীরা বোধহয় এই আঙুলকেই শিল্পীর আঙুল বলেন।

সমিতবাবু আসিলেন। পাজামা-স্যান্ডোগেঞ্জি পরিয়া আছেন। গায়ে একখানি দামি তারকিস। হিমাদ্রির পাশে বসিয়া পড়িয়া পটপট করিয়া আঙুল মটকাইতে লাগিলেন। তারপর কোনওরকম ভণিতা না করিয়া হিমাদ্রিকে বলিলেন, মিস্টার সেন, সিগারেট দিন।

ও শিয়োর। হিমাদ্রি সিগারেট কেসটি দিয়া বলিল, কী করছিলেন এতক্ষণ?

কেসটি খুলিয়া সমিতবাবু সিগারেট লইলেন।

বারকয়েক জোরে টান দিয়া সবেগে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, একটা বই পড়ছিলাম। রাসেলের 'কনকোয়েস্ট অব দ্য হ্যাপিনেস'।

হিমাদ্রি বলিল, একটা অনুরোধ করব? আমাকে একটা নেতাজীর স্ট্যাচু তৈরি করে দেবেন? G. O. C. ইউনিফর্মে।

BanglaBook.org

এক্সট্রিমলি সরি। আপনার অনুরোধটা বড় অসময়ে করলেন, মিস্টার সেন। আমি হয়তো শীঘ্রই চলে যাচ্ছি বোম্বেতে।

বোম্বেতে? ব্যাপার কী, রঞ্জু?—প্রণববাবু প্রবেশ করিলেন।

সমিতবাবু সিগারেট পায়ের তলায় চাপিয়া দিলেন।

কোম্পানি বোম্বেতে একটা নতুন ফ্যাক্টরি খুলেছে। হায়ার প্রোমোশন দিয়ে সেখানেই আমাকে পাঠাবার কথা হচ্ছে।

কথা শেষ করিয়া সমিতবাবু তাকাইলেন রমেনবাবুর দিকে। রমেনবাবু চোখের চশমা খুলিয়া আস্তে-আস্তে চশমার কাচ মুছিতে লাগিলেন।

প্রণববাবু চিৎকার করিয়া চাকরকে চা দিতে বলিলেন।

বিনয়বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, পরিপাটি করিয়া চুল আঁচড়াইতেছেন। মুখটি বৃষ্টিধোয়া ফুলের মতো স্বচ্ছ। স্নো মাখিতে পারেন।

চাকর চা ও টোস্ট লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন নির্ঝরিণী। অলসভাবে একটি সোফায় বসিলেন। চোখ দুটি একটু ফোলা-ফোলা। চুলগুলি একটু অবিন্যস্ত।

চাকর চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

যূথিকা ধীর পদক্ষেপে আসিল। আনমনাভাবে ঘরের কোণে রক্ষিত গোল শ্বেতপাথরের টেবিলটার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর আনমনাভাবেই ফুলদানির ফুলগুলি নতুন করিয়া গোছাইতে লাগিল।

হিমাদ্রি চায়ের কাপে চুমুক দিয়া নির্ঝরিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়িতে ছিলেন নাকি?

ভাঙা-ভাঙা গলায় নির্ঝরিণী বলিলেন, ঘুমোচ্ছিলাম। শরীরটা ভালো নেই।

যূথিকা নির্ঝরিণীর দিকে চকিতে ফিরিয়া চাহিল।

নির্ঝরিণী হাতের চুড়িগুলি দেখিতে লাগিলেন।

যূথিকা যেমন আসিয়াছিল, তেমনভাবে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নির্ঝরিণী দেবী শাড়ির আঁচলটি মুখের ওপর একবার বুলাইয়া লইয়া চায়ের কাপ মুখে তুলিলেন। লক্ষ করিলাম, নির্ঝরিণী যে-শাড়িটা পরিয়া আছেন, সেটা একদিন বিনয়বাবুর আলনায় দেখিয়াছি।

প্রণববাবুর দিকে চোখ পড়িতে দেখিলাম তিনি যেন কী ভাবিতেছেন।

কী ভাবছেন?

আমার ব্যাবসার অবস্থা এখন বড় খারাপ। কিছু টাকা নতুন করে ইনভেস্ট করতে পারলে কয়েকটা ভালো টেন্ডারের কাজ ধরা যেত। কিন্তু...।

হিমাদ্রি দেখিলাম একমনে ধূম্রজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে।

বাসায় ফিরিতেই দেখা গেল পঞ্চানন অপেক্ষা করিতেছে। সে কয়েকটি খবর দিয়া গেল।

প্রথম খবর ঃ আগের দিন বৈকালে মেট্রোর কাছে ফুটপাথে একটা পত্রিকার স্টলে রাখালকে দেখে। পরে তাহাকে বালিগঞ্জের সেই বাড়িতে যাইতে দেখে।

দ্বিতীয় খবর ঃ কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ি হইতে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এবং নির্ঝরিণীকে মোটরে করিয়া বাহির হইতে দেখে। মোটর তাঁহাদের লইয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে আসে। ওই ভদ্রলোক এবং নির্ঝরিণী একটি বাড়িতে প্রবেশ করেন। আধঘণ্টা পরে ওই ভদ্রলোক একা ফিরিয়া আসেন। রাখাল তাঁহাকে লইয়া গাড়ি চালায় বালিগঞ্জ অভিমুখে।

তৃতীয় খবর ঃ রমেনবাবু ও যূথিকাকে সুরাবর্দি অ্যাভিনিউতে একটি বাড়িতে প্রবেশ করিতে

BanglaBook.org

দেখা যায়। একঘণ্টা বাহিরে অপেক্ষা করিয়াও তাঁহাদের ফিরিতে না দেখিয়া পঞ্চানন চলিয়া আসে।

পঞ্চানন বিলক্ষণ কাজের ছেলে। সে বাড়িগুলির নম্বর লইতে ভোলে নাই।

অন্যান্য দিনের মতো আজও প্রণববাবুর চায়ের মজলিশ জমিয়া উঠিয়াছিল। কেবল হিমাদ্রি নিবিষ্ট মনে একের-পর-এক সিগারেট শেষ করিতেছিল।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে ইন্সপেক্টর চট্টরাজকে দেখা গেল। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এবং একজন সাব-ইন্সপেক্টর। সকলেই খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

হিমাদ্রিই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল।

ইন্সপেক্টর হিমাদ্রির পাশে আসিয়া বসিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, এই আসরে এঁকে হঠাৎ দেখে আপনাদের সকলের সেই নিদারুণ ঘটনার কথা আজ আবার মনে পড়ছে। সেটা নির্মম সত্য। অ্যান্ড ট্রুথ উইল কাম আউট সুনার অর লেটার।

প্রণববাবু, সেদিন আপনার জামাই বিবেকবাবু কুকুরের কামড়ে মারা যাননি। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রণববাবু কিছু বলিতে পারিলেন না। যূথিকা একবার চমকাইয়া উঠিয়া একেবারে স্থির হইয়া গেল। সারা ঘরে মৃদু গুঞ্জন ছড়াইয়া পড়িল।

এ-গল্পকথা নয়। প্রমাণিত সত্য। সেই ঘটনার পর এ-বাড়িতে আমি সময়ে-অসময়ে এসেছি, গল্প করেছি, চা খেয়েছি। কিন্তু একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছি।

কুকুর আপনার জামাইকে একটা আঁচড়ও দেয়নি। স্পর্শ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিল না। সে তীব্র এক নেশার ঘোরে পঙ্গু হয়ে ছিল। তাকে সামনে শিখণ্ডির মতো খাড়া রেখে হত্যাকারী তার পরিকল্পিত পথে কাজ হাসিল করেছিল।

বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করার মতলব হত্যাকারীর আগে থেকেই ছিল। আমার হিসাবে যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম রাতে—অর্থাৎ, দ্বিরাগমনে আসার রাত্রেই—হত্যাকারী তৈরি ছিল। কিন্তু সেদিন সে সুযোগ পেল না। কুকুরটির ওপর তার যা করণীয় তা সে করেছিল। বিনয়বাবু বলেছেন, ঘটনার দিন সকালে কুকুরটিকে কেমন একটু ঝিম-ধরা লাগছিল।

দ্বিতীয় রাত্রে সেই সুযোগ এল, তার সদ্ব্যবহার করল হত্যাকারী। বিবেকবাবু আসছিলেন বাথরুমের দিকে...একা। কেন তিনি যূথিকাকে ডাকেননি, সে-কথা চিন্তা করা নিস্ফল। যাই হোক, বিবেকবাবু বাইরে আসতেই হত্যাকারী তার মাথায় আঘাত করল। তিনি চিৎকার করতেও পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হত্যাকারী সেই মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে পরপর তাঁর ওপর মরণ আঘাত হানল। বিবেকবাবুর মৃত্যু হয়েছে দেখে হত্যাকারী বাথরুমের মধ্যে ঢুকল। তারপর মেথর আসবার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাগানে। তারপর সকলের সঙ্গেই বিবেকবাবুর মৃতদেহ স্বাভাবিকভাবেই দেখতে এল।

এতখানি বলার পর হিমাদ্রি থামিল। সিগারেট ধরাইয়া আবার শুরু করিল : হত্যাকারীর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু সে তিনটি ভুল করেছিল, যেগুলো তাকে চিনিয়ে দিল আমায়। প্রথম, হত্যা করার সময় অস্ত্রটা ডানহাতে ধরা ছিল বটে, কিন্তু বাঁ-হাতে গ্লাভস বা দস্তানা পরার প্রয়োজন বোধ করেনি। যার ফলে তার রক্তমাখা বাঁ-হাতের কয়েকটি আঙুলের ছাপ বাথরুমের কপাটে পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয়, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ যে-জুতো পরে সে হত্যা করেছিল সেটা সে সরিয়ে ফেলেনি। বাথরুম থেকে জুতোর দাগ মৃতদেহ পর্যন্ত এসেছে। মৃতদেহের কাছে বিক্ষিপ্ত। আবার রক্তের ফোঁটা-ফোঁটা দাগের সঙ্গে বাথরুমের দিকে ফিরে গেছে। এই জুতোজোড়া হত্যাকারীর ঘরে এখনও আছে। বাথরুমের ঘোরানো সিঁড়ির নীচে বাগানের মাটিতে সেই একই

BanglaBook.org

জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। এখানে বলা বাহুল্য, বাগান ছাড়া যাওয়ার আর কোনও নিরাপদ পথও ছিল না তার। তৃতীয়, এই খুনের ঘটনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর হল 'খুনের অস্ত্র'। হত্যার অনেক পথ ছিল। হত্যাকারী ছুরি মারতে পারত, গলায় রেশমের ফাঁস দিতে পারত, বিষ প্রয়োগের সুযোগ তার ছিল, এমনকী সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্রও সে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু সেদিক দিয়ে সে গেল না। কুকুরের ওপর দোষ চাপাতে গিয়ে সে যে-অস্ত্রটি দিয়ে খুন করল—তার এই প্রচেষ্টার মনোবৃত্তিই তাকে ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ, আমি বলতে পারি, হত্যাকারী নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছে। অস্ত্রটি কী, আমি প্রথমে ধারণা করতে পারিনি। তারপর বুঝতে পেরেছি। জানি, সেটা এখন কোথায় কীভাবে আছে। সে-কথায় পরে আসছি। এখন আমি ভাবছি, হত্যাকারী এত বুদ্ধিমান হয়েও এ-পথের কথা ভাবল কেমন করে! তার বুদ্ধি অনায়াসে অন্যভাবেও তার স্বার্থসিদ্ধি ঘটাতে পারত।

হিমাদ্রি মুখটি রুমালে মুছিয়া লইল।

এ-রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে বারবার আমি পথ হারিয়েছি। রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কত রহস্য লুকিয়ে আছে। সকলেই বুকের মধ্যে রহস্য বয়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, পারিপার্শ্বিক সবকিছু মিলে আমার কাছে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছিল। হত্যার মোটিভ জানতে পারলে হত্যাকারীকে ধরাটা সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি মোটিভ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে মোটিভ খুঁজে পেলাম। রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। হত্যাকারীকে চিনতে পারলাম। এই হত্যার মোটিভ লোভ আর কামনা।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়া হিমাদ্রি বলিল, দুঃখের সঙ্গে আজ জানাতে হচ্ছে, আমার কাছে অনেকে অনেক কথা গোপন করে গেছেন।

নির্ঝরিণীর দিকে তাকাইয়া হিমাদ্রি বলিল, আপনার সঙ্গে বিবেকরঞ্জনবাবুর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি কেন?

নির্ঝরিণী কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপিয়া উঠিল। হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখে প্রণববাবুর দিকে তাকাইল। মুহ্যমানের মতো তিনি বসিয়াছিলেন।

প্রণববাবু, আপনি বলেছিলেন, আমার মনে আছে, আপনার ব্যবসায়ে বেশ কিছু টাকা লগ্নি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মেয়ে-জামাইকে দ্বিরাগমনে আনতে গিয়ে যখন জানতে পারলেন যে, বিবেকবাবু তার পঁচিশ হাজার টাকার পলিসিটাতে আপনার মেয়েকে 'নমিনি' করেছে, সে-কথাটা আমাকে জানাতে ভুললেন কেন?

আমি...আমি...মানে...।—কিছু বলিতে পারিলেন না প্রণববাবু। তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া গেল।

হিমাদ্রি অঙ্গুলিসঙ্কেতে হত্যাকারীকে দেখাইয়া দিল। হত্যাকারী হইচই করিয়া উঠিল। ভব্যতার মুখোশ তাহার খসিয়া পড়িল। হিমাদ্রিকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করিল। কিন্তু একটি কনস্টেবল তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল।

হিমাদ্রি বলিল, এখনও প্রমাণ চান? যে কয়টি বলেছি তাই যথেষ্ট। বাকিটা কোর্টেই দাখিল করা যাবে।

ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল।

ঘর এবং স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া হিমাদ্রি বলিল, মিস্টার চট্টরাজ, একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিন। নায়কের বুকের মধ্যে পাবেন অস্ত্রটিকে। এখনও তাতে বিবেকবাবুর রক্তকণিকা শুকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

বাসায় ফিরিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সুস্থ হইয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিলাম। হিমাদ্রিকে বলিলাম, তুমি গোড়া থেকে সবকিছু খুলে বলো।

হিমাদ্রি বলিল, হ্যাঁ, তোমায় সবকিছু বলব। তুমি আমার কাছে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করেছ, কিছু-কিছু ব্যাপার জানতে চেয়েছ, তখন কিছু বলিনি। আজ তোমায় সবকিছু খুলে বলছি। শোনো—।

আমি নড়িয়া-চড়িয়া বসিলাম। হিমাদ্রি শুরু করিল ঃ

মৃতদেহ দেখেই আমার মনে হল, এটা নিখুঁত খুন। কুকুরের ব্যাপার সাজানো। মৃতের ঘাড়ে আঘাতের দাগ দেখে বুঝলাম, আগে মাথার পিছনদিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের তীব্রতা হয়তো এতখানি নিঁখুত ছিল যে, কোনও আওয়াজ বিবেকরঞ্জন করতে পারেনি। তারপর সংজ্ঞাহীন বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করল খুনি। আঘাত দেখে মনে হয়, কোনও হিংস্র পশু ধারালো দাঁত দিয়ে গলা থেকে গভীরভাবে মাংস উপড়ে নিয়েছে। কিন্তু কী দিয়ে হত্যা করল? অস্ত্রটা মারাত্মক বুঝতে পারলেও তার রূপটা বুঝতে পারলাম না। অস্ত্রটির চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল।

বাথরুমের দরজায় পেলাম রক্তমাখা বাঁ-হাতের কয়েকটি আঙুলের ছাপ। বাথরুমের মেথর-যাওয়া সিঁড়ির তলায় বাগানে পাওয়া গেল জুতোর ছাপ—যা উপরেও ছিল। তুমি তো জানো সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ঘরগুলো সার্চ করতে এসে নির্ঝরিণীর ঘরে পেলাম একটি ইতিহাসের বই। বইটা খুলতে গিয়ে 'ছত্রপতি শিবাজী' পরিচ্ছেদে আটকে গেলাম। বইটার অনেক জায়গায় দাগ দেওয়া আছে; কিন্তু ওই পরিচ্ছেদে একটি অংশ বিশেষভাবে মোটা-মোটা করে দাগ দেওয়া ঃ

'শিবাজী আফজল খাঁকে বাঘনখ দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন।'

অস্ত্রটির ইঙ্গিত পেলাম। শিবাজীর একটা মডেল দেখা গেল সমিতের ঘরে। সে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ফোরম্যান। ধাতু উপাদানে নিজের হাতে সে তৈরি করেছে এই মডেল। তাহলে...শিবাজীর বাঘনখও তো সে তৈরি করতে পারে।

ভালো কথা, আমি সমিতের কাছে খবর পেয়েছিলাম, মডেলটা সে খুব বেশিদিন তৈরি করেনি। কেন সে হঠাৎ শিবাজীর মডেল তৈরি করতে গেল, জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিয়েছিল, শিবাজীকে তার ভালো লাগে। তার ভাষায় অত বড় ধুরন্ধর রাজনৈতিক বীর আর নেই।

বেশ বোঝা যায়, শিবাজীর চরিত্র তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিজের ঈপ্সিতকে পাওয়ার জন্যে সে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

ভুল হল। পরের ঘটনা আগে বলে ফেললাম।

সমিতের পক্ষে বাঘনখের মতো অস্ত্র তৈরি করা যত স্বাভাবিক ছিল, আর কারও পক্ষে ততখানি ছিল না। আর সমিতের তৈরি বাঘনখ নিয়ে আর অন্য কেউ তো এ-কাজে নামতে পারে না। সমিতকে সন্দেহ করলাম। তাকে অনুসরণ করলাম সন্তর্পণে। সিগারেট দেওয়ার সময় কেসটা তার হাতে দিলাম। বাঁ-হাতে কেসটা ধরে সে সিগারেট নিল। কেসের ওপরে আঙুলের ছাপ রয়ে গেল। পরে মিলিয়ে দেখলাম, বাথরুমের ধারে পাওয়া দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একদিন তুমি আর সমিত যখন কথায় ব্যস্ত ছিলে, তখন তার ঘর দেখতে-দেখতে আলনার তলায় রাখা জুতোর মাপ বাগানে পাওয়া ছাপের সঙ্গে মেলাতে মোটামুটি মিলে গেল।

সমিতের বড় দোষ, সে নিজেকে খুব চালাক ভাবত। তার সঙ্গে ছিল দম্ভ। এই দুয়ে সে বেশি বোকা হয়ে গেছল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না সমিতের মোটিভ কী।

গদাইয়ের অপটু হাতে আঁকা ছবি আমার চোখ ফুটিয়ে দিল। তার কাঁচা-মন সমিতের সঙ্গে যূথিকার প্রণয় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল।

মোটিভ পরিষ্কার—প্রণয়। প্রয়োজন—পথের কাঁটা সরানো।

BanglaBook.org

এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো—যূথিকা এবং সমিতের মধ্যে যদি প্রেম হয়ে থাকে, তবে যূথিকা বিবেকরঞ্জনের সঙ্গে বিয়েতে মত দিল কী করে? এ-বিষয়ে চিন্তা করে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। তোমার সঙ্গে তো যূথিকার বেশ আলাপ জমে উঠেছে—তুমিই তাকে জিগ্যেস করে মিলিয়ে নাও আমার অনুমান কতটুকু সত্য।

নীরবে হিমাদ্রির খোঁচাটি হজম করিয়া বলিলাম, যাক, সে না হয় হবে। তুমি তোমার কথা বলো—।

যূথিকাকে দেখে বুঝেছি, তার মধ্যে একটা বিরাট দুর্বলতা আছে। তার সংস্কারের দুর্বলতা। সত্য প্রকাশ করার মতো মনের দৃঢ়তাও তার কম। হয়তো প্রণববাবুর প্রবল ব্যক্তিত্বের কঠোরতা তাকে আত্মসচেতনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

তবুও জীবনধর্মকে অস্বীকার করা যায় না। 'ইন্সেস্টুয়াস্ লভ' বলে একটা কথা আছে। যূথিকা তখন কৈশোর থেকে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। তার দেহের বাইরে এবং ভিতরে চলছে বিপ্লব। তার রক্তে এক চরম কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠছে। সমিত বাড়িতে একটি যুবক। সে অগ্রসর হল। যূথিকা তাকে প্রশ্রয় দিল। তুমি রমেনবাবুর কথা তুলতে পারো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাবে, এই যুগসন্ধিক্ষণে মেয়েরা জ্যাঠামশাই-মার্কা ছেলেদের চেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়, যেসব ছেলেরা ভাঁড়ামি করতে পারে—তাদের প্রতি। এরপর যখন যূথিকার ভেতরের বিপ্লব স্তিমিত হয়ে এল—তরল মনটা যখন একটা আকার নিল, তখন এল তার উপলব্ধি। কিন্তু সে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। সে না পারল স্বীকার করতে, না পারল অস্বীকার করতে। সমিত হয়তো চেষ্টা করেও তার মনের কাঠামোকে দৃঢ় করতে পারেনি। কিন্তু সে প্রণববাবুকে ভালো করেই চিনত। সে জানত কুমারী যূথিকার বিয়ে হতে পারে, বিধবা যূথিকার বিয়ে হবে না।

তাই সমিত বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করার পথই বেছে নিল। অবশ্য সমিতের মনের এই অভিসন্ধি যূথিকা জানতে পারেনি। জানলেও সে কী করত, এ-কথা উত্থাপন করা নিস্প্রয়োজন।

একটি কথা মনে আসিতে গা শিহরিয়া উঠিল। সমিতের ঘরে শিবাজীর স্ট্যাচুর মধ্যে অদ্ভুত অস্ত্রটি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রটি লৌহশলাকা নির্মিত। হাত-মোজার মতো। ডানহাতেই পরা যায়। নখের জায়গাগুলি ছুরির ফলার চাইতেও তীক্ষ্ণ। আঙুলের গাঁট বরাবর ছোট-ছোট কবজা বসানো আছে। সমিত ইহা স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছে। কী জানি, শিবাজীর বাঘনখ অস্ত্র হয়তো এমনিই ছিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা, তুমি কী করে জানলে ওটা ওখানে আছে?

হিমাদ্রি বলিল, ইতিহাস বইয়ের ওই আন্ডারলাইন করা অংশ এবং সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নায়কের স্ট্যাচু দেখে প্রথম থেকেই আমার মনে হয় 'শিবাজী' ঘটনার মধ্যে মিশে আছেন। সমিতের ঘরে শিবাজীর স্ট্যাচুটা আমার বরাবর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিন সন্ধ্যায় একা গেলাম ওখানে। সে ছাদে ব্যায়াম করছিল। ছাদের দরজায় শিকল তুলে দিলাম। বারান্দায় কেউ ছিল না। তার ঘরের তালা আমার চাবির গোছার একটি চাবি দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকলাম। মূর্তিটার পিছনদিকে একটা ঢাকনা দেখতে পেলাম। সেটা টান দিতে ভিতরে একটা গহ্বর দেখা গেল। আর সেই গহ্বরের কোঠরে রয়েছে মারণাস্ত্রটি।

তাহলে বলো, নির্ঝরিণীর ইতিহাস বই পড়েই ধারণাটা সমিতের মাথায় আসে।

নির্ঝরিণীর কাছ থেকে বইটা হয়তো নিয়ে থাকবে সমিত। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে বইতে দাগ দিতে গেল কেন? এটাও তার একটা মস্ত ভুল। যদি অন্যরকম সন্দেহ হয়, তা নির্ঝরিণীর ওপর দিয়েই যাবে। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, যে ইতিহাস পড়ে বা পড়ায়, সে ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায় আন্ডার-লাইন করতে পারে, কিন্তু সকলের জানা ওই ঘটনার ওপরে দাগ দেওয়াটা যে একান্তই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তা বুঝতে আমার দেরি হল না।

আচ্ছা হিমাদ্রি, যূথিকার ঘরে অ্যালবামের 'র' কে?

BanglaBook.org

রমেন নয়। রমেনকে যূথিকা ভালোবাসেনি। ভক্তি করেছে। অবশ্য রমেন তাকে ভালোবাসতে পারে।

কিন্তু রমেনকে দেখতে ভালো। সে তাকে অনেকদিন ধরে পড়িয়েছে...।

আগেই তো তোমায় বলেছি, কাঁচা মনে রঙ ধরাতে গেলে, জ্ঞান দিলে হটে যাবে। ফাজলামি করো, হিরো হবে। রমেন ফাজলামি করতে পারত না। 'র' রমেন নয়। 'র' মানে রঞ্জু, অর্থাৎ সমিত। ওটা যে তার ডাকনাম, তা একদিন প্রণববাবুকে ডাকতে শুনে বুঝতে পারি।

কিন্তু রমেনের সঙ্গে যে যূথিকার কীসব পরামর্শ হয়েছিল। তাদের একসঙ্গে...।

রমেন যূথিকাকে বাঁচবার একটা অবলম্বন করে দিতে চাইছিল। শিক্ষকতা লাইনে সে আছে, অনেক স্কুলে তার সুপারিশের সুযোগ ছিল।

কিন্তু রাখালের গাড়িতে নির্ঝরিণীকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যাতায়াত...।

উপযুক্ত প্রশ্ন করেছ। রাখালের মনিব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নির্ঝরিণী রাখালের মাধ্যমে তার দ্বারস্থ হয়েছিল। নির্ঝরিণী হচ্ছে সেই নারী যে জীবনে ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়।

আচ্ছা, বিনয়বাবু...।

একটি যৌনবিকৃত কল্পনাবিলাসী অদ্ভুত জীব। প্রকৃত নারীকে পাওয়ার প্রচেষ্টার চেয়ে যার বিলাস বা আত্মতৃপ্তি হচ্ছে মেয়েদের ব্যবহার্য জিনিস লুকিয়ে এনে নিজের ঘরে রাখা—মেয়েটি তার ঘরে এসেছে, তাকে সে পেয়েছে, কাছে এসেছে, সে উপভোগ করছে...এইসব কল্পনার মধ্যেই যৌবনের আনন্দকে সে লুটে নিতে চায়। এমনি কত হাজার-হাজার বিনয়বাবু রয়েছে আমাদের মধ্যে কে তার হিসেব রাখে!

রাখাল বাড়ির রাঁধুনি-বউয়ের স্বামী। কী সূত্রে বিনয়বাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল জানি না। সে ড্রাইভার। অসৎ সংসর্গ তার আছে। বিনয়বাবু টাকা দিয়ে তাকে দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতেন।

আমাকে হাঁ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হিমাদ্রি বলিল, বুঝলে না তো! রাখাল বিনয়বাবুকে নিষিদ্ধ বই এবং ছবি জোগাড় করে দিত। উঁহু, অবাক হয়ো না। ওই ধরনের বই আজকাল অনেক বড়-বড় বাবুর পোর্টফোলিওর মধ্যেও পেতে পারো—যদি খোঁজ করো। মনে হচ্ছে, তোমারও লোভ হচ্ছে?

হিমাদ্রি হাসিতে-হাসিতে ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিল।

ভিতরে আত্মারাম মাংস চাপাইয়াছে। তারই মনোরম গন্ধ আসিতেছে। আহা, আত্মারাম ভারী চমৎকার রান্না করে। তবে গঞ্জিকার মাত্রা চড়িয়া গেলে একটু-আধটু গোলমাল করিয়া ফেলে বইকি। তা করুক। আজ মন ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা হইল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—আত্মারাম যেন শত পুত্রের পিতা হইতে পারে!

BanglaBook.org

অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক

হিমাংশু সরকার

॥ ১ ॥

এক চোখে তাকিয়ে আছে ০'৩৮ ম্যাগনাম সাইলেন্সড অটোমেটিক পিস্তলটা আমার বুকের দিকে। ট্রিগারে সামান্য একটু চাপের দরকার।

তাহলেই তপ্ত একটা সিসের বুলেট ছিটকে এসে আমার কলজেটাকে আদর করে পিঠ ফুঁড়ে দেওয়ালে গিয়ে লাগবে।

একটা হিমশীতল অনুভূতি পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে।

মনে হল আমার পা-দুটো পাথরের থামের মতো শক্ত হয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। আমার যেন আর নড়বার শক্তি নেই।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে এভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হব, তা ভাবতে পারিনি। ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মাত্র ছ'ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখে তার খুনের নেশা।

আমি তাকে ভালো করে আপাদমস্তক মেপে নিলাম। শক্ত শরীর। শক্তিশালী। কিন্তু সুগঠিত বলতে যা বোঝায়, তা নয়। শরীরের প্রত্যেকটি অংশের বৃদ্ধি সমান নয়। বুঝলাম এ-শরীরে শক্তি আছে, কিন্তু এ-শরীর শিক্ষিত নয়। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও নাটকীয়। অতিরিক্ত হিন্দি সিনেমা দেখেছে।

কিন্তু আমি কী করি? সাক্ষাৎ মৃত্যু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। নিশানা তার বিন্দুমাত্র ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এভাবে আমি বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আহতও হয়েছিলাম।

প্রাণরক্ষার একটা উপায় আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। এমন অসহায় হয়ে আমার মরা চলে না। আমাকে লড়তেই হবে।

আমার ভাগ্য ভালো, অস্ত্রধারী নিজেই হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, আমাদের তালিকায় তোমার নামটা সকলের ওপরে।

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, আমার নাম সর্বত্র ওপরেই থাকে।

এবং সেইজন্যে, তোমাকেই প্রথমে মরতে হবে।

বিশ-পঁচিশ বছর ধরে সকলেই অপেক্ষা করছে আমার মৃত্যুর জন্যে।

তোমাকে হত্যা করার জন্যে একটা মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে।

আমি যথাসাধ্য হাসতে চেষ্টা করে বললাম, তাহলে আর দেরি করছ কেন? বেঠকবাজিতে তুমি ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

কিন্তু তুমি যে এত অসহায়ভাবে মরবে, তা ভাবতে পারছি না। তবু তোমাকে আজ মরতেই হবে, বিমান।

বিমান! আমার নাম বিমান নয়। হত্যাকারী আমাকে চেনে না। কেউ নামটা বলে দিয়েছিল, ভুলে গেছে। অতএব হত্যাকারী ভিতরের লোক নয়। ভাড়াটে খুনি।

হাসতে-হাসতে বললাম, সকলকেই তো একদিন মরতে হয় বন্ধু, কিন্তু...।

কিন্তু?

কিন্তু যারা আমায় মারতে চেয়েছে, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। কেউ-কেউ পুড়ে ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিলেছে। কেউ-কেউ বিভিন্ন গোরস্থানে মাটির ছ'ফিট নীচে ঘুমুচ্ছে। এবং তুমিও একটা মূর্খ, মরবার জন্যেই এসেছ।

এবার সেও হাসল : তাই নাকি? দূরবিনের উলটোদিক দিয়ে দেখছ মনে হচ্ছে। তুমি বোধহয় জানো না যে, তুমি আমার সপ্তম বলি। আমি ঠিক আর-পাঁচজন খুনির মতো নই।

জানি, তুমি ভাড়াটে খুনি। তোমার হাতের অস্ত্রটা বিদেশি। রাশিয়ার তৈরি। রাশিয়া অনেক

BanglaBook.org

যুগ আগে চিনকে দিয়েছিল। এক নতুন ধরনের সাইলেন্সার লাগানো আছে ওতে। প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বুলেট। যাকে বলে, high velocity slug। প্রায় রাইফেলের মতো কাজ করে।

সে একটু অবাক হয়ে বলল, অনেক কিছু জানো দেখছি।

ওটা আমার ব্যাবসা, গর্দভ।

বাঃ! মরবার আগে নার্ভগুলোকে শক্ত করে নিচ্ছ মনে হচ্ছে!

আবার হাসলাম, তুমি এ-লাইনে নতুন এসেছ মনে হচ্ছে। আগে কী করতে? চোলাই মদ বিক্রি করতে, না পাড়ার নতুন রংবাজ তুমি? কোনটা?

সে আরও অবাক হয়ে বলল, কি করে জানলে তুমি এসব?

বললাম, ওটা জানাও আমার ব্যাবসা। তুমি নিখুঁতভাবে পিস্তলটা ধরতে পারোনি। তোমার বুড়ো আঙুলটা পিস্তলের বাঁট ছোঁয়নি। তুমি জানো না যে, এ-পিস্তলে গুলি ছোড়ার সময় প্রচণ্ড জার্ক খায়। পিস্তলটা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তুমি এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নও। আর তোমার ডান হাতের কনুইয়ের নীচে একটা কাটা দাগ। তোমার নাকের পাশে একটা কাটা দাগ। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ওগুলো ছুরির আঘাত থেকে হয়েছে। পাড়ার গুন্ডাদের অমন দু-একটা দাগ থাকে। তাই না?

কাজ হয়েছে। ওর চোখে এক গভীর বিস্ময় ও অস্বস্তি ফুটে উঠেছে।

ও খুন করতে এসেছিল। কথা না বলে খুন করাই উচিত ছিল। কোনও বুদ্ধিমান লোক এতক্ষণ কথা বলত না।

'কম্ব্যাট' ট্রেনিংয়ে শিখেছিলাম বেয়নেট চার্জ করলে মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়। তারপর ক্রমাগত গড়াতে হয়। তারপর বেয়নেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে গেঁথে গেলেই, শুয়ে-শুয়েই মারতে হয় প্রতিপক্ষের চোয়ালে এক লাথি। এ ব্যবহারিক শিক্ষা আমি নিয়েছি।

কিন্তু এটা বেয়নেট নয়। পরিস্থিতিও আলাদা।

আর আমি গড়িয়ে পালাব কোথায়?

পিছনে দেওয়াল। দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে আমাকে মারাত্মক বুলেটগুলো। সেভাবে বাঁচা যাবে না।

অতএব?

রিভার্স! ঠিক উলটোটা করতে হবে।

আমার কথাগুলো শুনে খুনি একটু অবাক হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে।

আমি বিদ্যুৎগতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। ততক্ষণে একটা বুলেট আমার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে বিঁধেছে।

আমার ভাববার সময় নেই। মরতেই যদি হয় তো না লড়ে মরব কেন?

মাটিতে পড়ে আমি গড়াচ্ছি। কিন্তু দেওয়ালের দিকে নয়, খুনির দিকেই।

একটা তীব্র অনুভূতি আমার বাঁ-দিকের পাঁজরে, বোধহয় একটা গুলি লেগেছে। কিন্তু ভাববার সময় নেই। আমাকে তবুও শেষ চেষ্টা করতে হবে। বাঁচতেই হবে।

গড়াতে-গড়াতে হাত বাড়ালাম। হত্যাকারীর বাঁ-পা-টা ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিলাম। ভারসাম্য না রাখতে পেরে আমার ওপরেই পড়ল সে। পিস্তলটা ছিটকে গেছে দূরে। আমি যা চাইছিলাম।

আমার ভেতরে যে ক্রোধ এতক্ষণ জমা ছিল, এবার সেটা বেরোবার পথ পেল।

আমার তলপেটের—দু-পায়ের মাঝখান লক্ষ্য করে সে হাঁটু চালাল।

কিন্তু ব্যর্থ হল। এ-শিক্ষা আমার বহুদিনের। আমি সহজেই ওর আক্রমণ ব্যর্থ করলাম।

আমি বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে আঘাত করলাম ওর চোয়ালে। সে উঠে পালাতে গেল।

BanglaBook.org

আমি দরজার কাছেই ওকে ধরে ফেললাম। আমার শরীরে তখন অসম্ভব এক জ্বালা। ক্রোধ যার নাম।

আমি ওর পাঁজরার নীচে যকৃতের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে এক 'পাঞ্চ' করলাম। ও ভাঁজ খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আমি ভাঁজ-করা হাঁটু বিদ্যুৎবেগে ওপরে তুলে আঘাত করলাম ওর নাকে। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আবার পাঞ্চ। এবার পেটের ওপর। ওর দম বেরিয়ে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে রক্তাক্ত নাকের ওপর আর একটা স্ট্রেট পাঞ্চ।

ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। বুঝলাম, ওর তখনও দম আছে।

হাঁটুর মালাইচাকিতে জুতোর ডগা দিয়ে প্রচণ্ড কয়েকটা আঘাত। সঙ্গে-সঙ্গে থুতনির নীচে একটা হুক।

কিন্তু তখনও ওর দম আছে। সে হাত ঘুরিয়ে দুর্বল একটা ঘুসি ছুড়ল আমার দিকে। আমি মাথা নীচু করে একটা ঘুঁসি ছুড়লাম ওর চোখ লক্ষ করে। শেষ ঘুষি।

লোকটা ছিটকে পড়ল দূরে।

কিন্তু সর্বনাশ। ওর হাতের কাছেই মাটিতে পড়ে আছে ওরই হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা। ওটা যে-কোনও মুহূর্তে আমার মৃত্যুবাণ হয়ে যেতে পারে।

ও হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিয়েছে। আর সময় নেই।

ও নিশানা করার আগেই আমার হাতের Lugar 9 mm-টা গর্জন করে উঠল।

একটা ঝাঁকানি খেয়ে ওর মাথাটা কাত হয়ে পড়ল। এ-দৃশ্য আমি জীবনে অনেকবার দেখেছি।

গুলি লেগেছে কপালের ঠিক মাঝখানে। আমি তাড়াতাড়ি অটোমেটিকটা যথাস্থানে রেখে ওকে তল্লাশি করতে লাগলাম।

পেলাম কয়েকটি একশো টাকার নোট। কিছু খুচরো পয়সা। সিগারেট। দেশলাই।

আর একটা কাগজের টুকরো (প্রফেশনাল খুনিরা পকেটে এসব রাখে না)। তাতে একটা নাম। একটা ঠিকানা।

আমার বাঁ-দিকের পাঁজরটা এবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

চোট মারাত্মক নয়। শার্টের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে খানিকটা মাংস ও চামড়া। তাড়াতাড়ি 'ফার্স্ট-এইড' সেরে নিলাম। এ ধরনের আঘাতের চিহ্ন আমার শরীরে অনেক আছে। আমার এখন প্রধান চিন্তা, এই মৃতদেহের কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব পালাতে হবে। কেন না, আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে হবে।

রঞ্জন। আমার বাল্যবন্ধু। আমার ডান হাত। আমার মন্ত্রী। সেই রঞ্জন হঠাৎ একদিন আমায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল।

বারো বছর পর আমাকে আবার ফিরতে হল কলকাতায়।

কিন্তু রঞ্জন এখানে নেই। আমি কলকাতা পৌঁছনোর ঠিক আগের দিন রঞ্জন নিহত হল।

যাই হোক, আমি এখন বাধ্য এই হোটেল ছেড়ে যেতে। পুলিশ আসবে।

আর পুলিশ মানেই হাজারখানেক প্রশ্ন, যার কোনওটারই উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার সঙ্গে সামান্য কয়েকটি জামাকাপড় ছিল। সেগুলো সুটকেসে পুরে, সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে পথে নেমে এলাম।

আমি যে দীর্ঘ বারো বছর পর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে কলকাতায় ফিরেছি, সেটা কারোর

BanglaBook.org

জানার কথা নয়।

কিন্তু ওরা জেনেছে। পাঠিয়েছে খুনিকে। কিন্তু কেন? ওরা কারা? ওরা আমায় মারতে চায় কেন? কী ওদের উদ্দেশ্য?

সৌভাগ্যবশত একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললাম, চলো মৌলালির কাছে—ক্রিক রো।

॥ ২ ॥

ক্রিক রো। সেন্ট্রালের সেন্টার।

আমার জন্মস্থান। আমার পাড়া। আমাদের পাঁচ পুরুষের বাস। আমি সেন্ট্রালের ছেলে।

আমি দীর্ঘদিন কলকাতায় নেই, অথচ কোনওদিন ভাবতে পারিনি যে, ওটা আমার পাড়া নয়। কোনওদিনই বোধহয় ও-পাড়াটা আমার কাছে পর হবে না।

কাঁধের ওপর সেই কাটা দাগটা এখনও আছে। ওই পাড়াতেই আমাকে গভীর রাতে আক্রমণ করেছিল বদ্রি। বদ্রিপ্রসাদ সিং।

বদ্রিপ্রসাদ সত্যিই সিংহ ছিল। মধ্য-কলকাতার এলাকা ছাড়িয়েও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার ক্রাইমের সাম্রাজ্য। বদ্রি সম্রাট ছিল।

আর সাম্রাজ্যের বাইরেও বিস্তৃত ছিল তার খ্যাতি (আপনারা সেটাকে কুখ্যাতি বলবেন)। অসাধারণ ছিল তার সাহস এবং শক্তি। পুলিশ কোনওদিন তার নাগাল পেত না। কেন না, এমন ইনফরমার ছিল না যে, বদ্রিকে উপেক্ষা করে পুলিশকে সাহায্য করার কথা ভাবতে পারত। অন্তত গোটা পাঁচেক ইনফরমারের জীবন গেছিল বদ্রির ইশারায়। সেন্ট্রাল তখন সিংহের জন্ম দিত। 'ইনফরমার' একটাও ছিল না।

সেই বদ্রি আমার উত্থানকে বিপদের সঙ্কেত বলে ভাবত। কেননা, বদ্রি পরিষ্কার বুঝেছিল, আমার বৃদ্ধি মানেই ওর পতন।

সে ছিল এক নম্বর পয়দাবাজ। ভাবত আমার বৃদ্ধি হলে ওর পয়দা কমে যাবে। সেই জন্যে বদ্রি প্রথমে আমাকে ওর দলে টানতে চেষ্টা করল।

বদ্রির নির্দেশে আমি কয়েকটি ছোটখাটো 'তোড়' করেছিলাম। কিন্তু এক পয়সাও ওকে ঠেকাইনি।

কাজেই বদ্রি বুঝল আমাকে দলে টানা যাবে না। তখন সে চেষ্টা করল আমাকে শেষ করে দিতে। শুরু হল আমার মরণ-বাঁচন লড়াই।

বদ্রির চেলারা কয়েকবার আমাকে আক্রমণ করেছিল। পারেনি।

আমার বাহিনী ছিল ছোট, তাই আমাকে লড়তে হত গেরিলা প্রথায়।

'হিট অ্যান্ড রান' মেথডে।

দেখতে-দেখতে আমি অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। ঠেক জমালাম 'হিন্দমোটর' এলাকায়। দু-চারটে কারখানার ইউনিয়নের হয়ে কাজ করার কনট্রাক্ট পেলাম। টালার কয়েকটি দুর্ধর্ষ ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল। নর্থের একটা হিরোকে ধরে একদিন মেরামত করে দিয়ে চমক সৃষ্টি করলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি 'হাইজ্যাকিং করলাম। অর্থাৎ, চোরের ওপর বাটপাড়ি।

বদ্রির রাজ্য সেন্ট্রাল ক্যালকাটা থেকেও দু-চার পয়সা পয়দা করছি। চারদিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি তখন সারা কলকাতার উঠতিদের মধ্যমণি। সব উঠতিরাই তখন আমার নেতৃত্ব পেতে চাইছে।

BanglaBook.org

বদ্রি শঙ্কিত। বদ্রি আমার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনি শুনে চমকে উঠেছে। আমার ওপর আক্রমণের পর আক্রমণ হচ্ছে।

আমি তখনও কলেজে পড়ছি। বদ্রির আক্রমণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আমি বাধ্য হলাম ঘর ছেড়ে পালাতে।

পরীক্ষা দেওয়া হল না। দিলেও পাশ করতাম না। প্রাণ নিয়ে পালাতে হল।

ছেলে বাড়ি ছাড়লে যে আরও দ্রুত অবনতি ঘটে তার চরিত্রের, তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমি। আমি আমার পরিচিত জগৎ থেকে অনেক দূরে এক অন্ধকার জগতে চলে গেলাম। সেখানেও টিকে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে হত। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ না করে কোনও মানুষ বাঁচতে পারে না। যুদ্ধের রকমফের থাকতে পারে, কিন্তু বাঁচার রীতি-নীতি সেই একই। লড়াই।

সেই দূর-সাম্রাজ্য থেকে আমার দ্রুত উন্নতির কাহিনি বিস্তারিতরূপে সেন্ট্রালের সম্রাট বদ্রির কানে পৌঁছত।

বদ্রি দূর থেকে লোক পাঠাত আমাকে শেষ করতে। আমি সে-আঘাত প্রতিহত করতাম। নেপাল থেকে চোরাপথে বদ্রির মাদকদ্রব্য, বিশেষ করে গাঁজা আসত। আমি আমার উঠতি বাহিনি নিয়ে পরপর তিনবার তার মাল 'হাইজ্যাকিং' করলাম। পূর্বপাকিস্থান থেকে বদ্রির জন্যে লবঙ্গ আসত, সেটাও ঘুরিয়ে দিলাম বারদুয়েক।

বদ্রি মহা বিপদে পড়ল। শেষে সে কলকাতা এবং তার আশপাশের সম্রাটদের ডেকে কনফারেন্স করল।

কিন্তু সফল হল না। অন্য রাজারা বদ্রিকে ভয় করত, ভালোবাসত না। তাদের মধ্যে দু-একজন বদ্রির পতন দেখতে চাইছিল।

আমি তখন যে-এলাকায় ছিলাম, তার সম্রাট বদ্রির এই ক্ষতিতে খুশি হল। কেন না আমার কাছ থেকে সেই অনামী সম্রাট মোটা টাকা পেত।

এইভাবে দীর্ঘ ছ-সাত মাস ধরে বদ্রির সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলল।

সেই ছ-সাত মাস পরে। যেদিন আমার মা মারা যায়, সেই রাত্রে লুকিয়ে মায়ের মরামুখ দেখতে এসেছিলাম।

বদ্রি প্রস্তুত ছিল। সে জানত আমার মাকে আমি দেখতে আসব।

রাত দেড়টা নাগাদ প্রায়ান্ধকার গলিতে ঢুকতেই পেছন থেকে কাঁধের ওপর কোপ পড়ল ভোজালির।

কিন্তু ভোজালিটা ভালোভাবে লাগেনি। কেন না ভোজালিটা আমার কাঁধ স্পর্শ করার আগেই আমি ওর ছায়া দেখে বিদুৎবেগে বসে পড়েছিলাম। কাঁধে লেগেছিল, কিন্তু তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল না।

কিন্তু বদ্রি ভুল করেছিল। তার জীবনের প্রথম ও শেষ ভুল।

সে জানত না এই দীর্ঘদিন আমি বাড়ির বাইরে থেকে কী শিক্ষা পেয়েছি। দ্বিতীয় ভুল, সে নিজে এসেছিল আমাকে মারতে। তার উচিত ছিল অন্য কাউকে পাঠানো।

আঘাতটা লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি খানিকটা ঘাবড়ে গেছিলাম। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আমি ছিটকে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এবার আমি আর বদ্রি সামনা-সামনি। দুজনের চোখেই আগুন।

বদ্রি ভোজালি তুলে তেড়ে এল আমাকে আক্রমণ করতে। কিন্তু মাত্র তিন হাত।

আমার হাতের ০.৪৫ অটোমেটিকটা তখন গর্জন করে উঠেছে। আমার লক্ষ্য নিখুঁত।

কলকাতার অপরাজেয় সম্রাট বদ্রির পতন ঘটল আমার হাতে।

আমার মাকে প্রণাম করে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।

BanglaBook.org

দীর্ঘ চার-মাস পর ছাড়া পেলাম। 'সেলফ ডিফেন্স'। দিদি-জামাইবাবুর সে-উপকার কোনওদিন ভুলব না। জে-সি থেকে বেরিয়ে দেখি বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে দিদির সঙ্গে। বিকাশ এখন পুলিশ অফিসার। বিকাশ আমার বাল্যবন্ধু।

বিকাশ বলল, বদ্রির পতন ঘটিয়ে তুই কলকাতাকে ত্রাসমুক্ত করেছিস।

তবু তো আমাকে নাস্তানাবুদ করতে ছাড়িসনি।

তার কারণ সম্রাটের বদলে সম্রাট চাই না আমরা। তুই যেন বদ্রির বদলে নিজে...।

আমি ওর কথা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে দিদির সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম।

তার পরের ইতিহাস আমার পূর্ণবিকাশের ইতিহাস। আমি মানে হিমাদ্রি সরকার হয়ে গেলাম সেন্ট্রালের মস্তান। কিং। রংবাজ শব্দটা তখনও প্রচলিত হয়নি।

রেসের বুকিরা বাড়ি এসে টাকা দিয়ে যায়। আশপাশের উঠতিরা পয়দা করলে আমার কাছে একটা মোটা অংশ পৌঁছয়।

আর, আশ্চর্য। রাতারাতি আমি বিভিন্ন রকমের প্রোটেকশান পেতে লাগলাম। রাজনৈতিক নেতারা গাড়ি করে এসে তোষামোদ শুরু করল। আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে লাগল।

আমারও গাড়ি হল। চতুর্দিক থেকে পয়দার রাস্তা খুলে গেল।

আর, স্বাভাবিকভাবেই আমার চারদিকে জুটে গেল 'চামচা'রা। সাম্রাজ্য রাখতে গেলে তো বাহিনী দরকার। এ তো শিশুরাও জানে।

এক কথায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার সাথী হল অতি দ্রুত। আমি হলাম কলকাতার রাজধানী সেন্ট্রালের সম্রাট।

কিন্তু সেই সাম্রাজ্য আমি একদিন ছেড়ে গেলাম। কোথায় গেলাম, কেন গেলাম, একমাত্র রঞ্জন ছাড়া আর কেউ তা জানত না।

আজ দীর্ঘ বারোবছর পর আবার দেশে ফিরলাম।

কিন্তু আজ রঞ্জন নেই। সে নিহত।

॥ ৩ ॥

মৌলালি ছেড়ে ক্রিক রো-তে ঢুকলাম। ট্যাক্সি থেকে নামলাম কমলের বাড়ির সামনে। কমল এখন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

কমল বাড়িতেই ছিল।

আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি ও। তারপর জড়িয়ে ধরে বলল, এতদিন কোথায় ছিলি?

চাঁদে। হাসতে-হাসতে বললাম আমি।

ঠাট্টা রাখ। সত্যিই তোকে আর কোনওদিন দেখব বলে ভাবতে পারিনি। কমলের অনুযোগ।

পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে, কমল। ঘুরে-ফিরে সেই একই লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

কমল হাসল ঃ হ্যাঁ। আমাদের মনের মতোই পৃথিবীটাও ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু তুই তো বিরাট চেহারা করেছিস। ব্যায়াম করিস নাকি? আর তোর চেহারা এত রুক্ষ হল কী করে?

হেসে বললাম, রোদে—জলে—ঝড়ে।

হিপিদের মতো কাঁধ পর্যন্ত চুল রেখেছিস।

যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলছি মাত্র।

তা বেশ। তোর খবর কী বল?

BanglaBook.org

আমারই খবরের দরকার, এখন এখানকার সম্রাট কে?

কী হবে জেনে? কমলের কণ্ঠস্বর কঠিন।

না, মানে আমি চলে যাওয়ার পর...।

তুই চলে গেলি কেন?

যেতে হল কমল।—আমি যেন উদাস হয়ে গেলাম।

কিন্তু কেন? তোর তো কোনও অভাব ছিল না। একটি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য...যথেষ্ট অর্থ...সুজাতা...।

সুজাতা?—আমার অবাক হওয়ার পালা।

হ্যাঁ। জীবনে তুই কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরলি না, হিমাদ্রি। মা-বাবা তোকে ঘরে রাখতে পারল না। কলেজের শেষ দরজায় গিয়েও পরীক্ষা দিলি না। ক্রাইমের জগৎ বেছে নিলি। কিন্তু সেখানেও থাকলি না। যে তোকে ভালোবাসল, তার ভালোবাসার মূল্য দিলি না। তার চোখের সামনেই ক্রাইমের জগতে তলিয়ে গেলি। তবু...।

আমি জানি কমল। কিন্তু...।

বলতে দে, হিমাদ্রি। তবু সেই মেয়েটা সমাজ, সংসার সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তার কথাও তুই ভাবলি না। অনায়াসে সব ছেড়ে চলে গেলি।

আমার বলার কিছুই ছিল না। আমি অভিশপ্ত। আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে সেদিনকার সেই ষোলো বছরের মেয়েটার জীবন জড়াতে চাইনি।

তাই, যেদিন গভীর রাতে আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাই, সেদিন সুজাতাকে ওরই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম ঃ তুই আমায় ভুলে যা, সুজাতা। আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

সুজাতা কাঁদেনি। রাগেনি। শুধু প্রশ্ন করেছিল, তুমি হঠাৎ ভগবানে এত বিশ্বাসী হয়ে পড়লে কী করে?

ভগবানে আমি চিরকালই বিশ্বাসী। মুখে স্বীকার করতাম না।—একটু থেমে আবার বলেছিলাম, তোর বয়স এখন কম। কিছুদিন পর ভালো ঘরে তোর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন ভুলে যাবি।

আমি সুজাতাকে বলেছিলাম আমাকে ভুলে যেতে। কিন্তু আজ এতকাল পর আমার মনে হচ্ছে, সত্যিই কি আমি চেয়েছিলাম যে, সুজাতা আমাকে ভুলে যাক? তাহলে ওভাবে কথাটা বলেছিলাম কেন?

সুজাতা অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু এখানে তোমাকে ফিরতেই হবে। এই তোমার দেশ, তোমার ঘর। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করবি! পাগল নাকি। আমি যদি না ফিরি আর?

এবার সুজাতা হাসল। মলিন হাসি। মুখ ফিরিয়ে অনেক দূরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এসব বুঝবে না।

আমি উত্তর দিলাম না।

সুজাতা বলল, যেদিন তুমি বাড়ি ছেড়েছিলে, সেদিন তুমি নিশ্চিতরূপে নিজের জীবনের গতিপথ বদল করেছিলে। তারপর তিলেতিলে নিজের সর্বনাশ করছিলে। যেদিন বদ্রিকে তুমি মারলে, সেদিন তোমার উত্থান এবং পতন দুই-ই হল। একটা হিংস্র জীব হয়ে তুমি জন্মালে, আর মানুষ হিমাদ্রি সরকার হারিয়ে গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, সুজাতা, আমি তোর সর্বনাশ করতে চাই না। তুই আর-পাঁচটা মেয়ের মতো হলে আলাদা কথা ছিল। আমার অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা কর।

সুজাতা দেবদাসীর মতো মলিন হেসে বলল, ক্ষমা! ক্ষমা করারও অধিকার থাকা চাই। আমার তাও নেই। তোমরা ছেলেরা কত সহজে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পারো, 'আমায় ক্ষমা

BanglaBook.org

করো', আমরা পারি না। আমি অন্তত বলতে পারব না। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করব।

আমি যেন হঠাৎ একটু ব্যঙ্গ করার জন্যেই বললাম, সব মেয়েরাই অমন বলে, সুজাতা। কিন্তু আবার যখন বিয়ে হয়, তখন সব ভুলে যায়। তোরও বিয়ে হবে, তুইও ভুলে যাবি। এই নে, এটা তোর বিয়েতে আমার উপহার।

সুজাতা চমকে মুখ তুলল, একী! এটা যে তোমার মায়ের গলার হার!

বললাম, মাকে ওটা দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরমা। মা ওটা তোকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ওটা ছাড়া তো তোকে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই। মায়ের আর সব গয়না আমি দিদিকে দিয়ে দিয়েছি।

তারপর আর কথা না বাড়িয়ে উলটোদিকের ফুটপাতের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলাম। আমি কলকাতা ছাড়লাম।

॥ ৪ ॥

আজ এতকাল পর আবার সুজাতার কথা উঠল।

বললাম, কোথায় বিয়ে হয়েছে সুজাতার? বাপের একমাত্র মেয়ে ছিল। নিশ্চয় খুব ভালোভাবেই বিয়ে হয়েছে?

কমল একটু চুপ করে থেকে বলল, সুজাতা বাড়িতেই থাকে। চল, দেখে আসবি।

আমি কিছু বলার আগেই কমল উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। সেই পরিচিত সিঁড়ি। সেই দেওয়াল। অনেক কথা। অনেক গুঞ্জন। সুর। অভিমান।

সেই সব স্মৃতি আজ জড়িয়ে যাচ্ছে।

কমলই বেল টিপল। দরজা খুলে উঁকি মারল ঝি। আমি কিছু বলার আগেই কমল বলল, তোর দিদিমণিকে বলগে যা, আমাদের পাড়ার সেই পুরোনো হিমুদা এসেছে।

আমরা বসার ঘরে বসলাম। আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা ধক-ধক শব্দ হচ্ছিল। মনে হল, কমল বুঝি শুনতে পাবে সেই শব্দ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার শরীরের কোনও এক স্থানে জন্ম নিয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরটা অবশ করে দিচ্ছে।

আমি, দুর্দান্ত হিমাদ্রি সরকার সুজাতার মতো এক সাধারণ মেয়ের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছি। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত।

হঠাৎ কমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চট করে একটা পান নিয়ে আসছি।

আমার একা বসে থাকতে আরও অস্বস্তি লাগছিল। এই ঘরে কতদিন সুজাতার সঙ্গে বসে-বসে গল্প করেছি। হারিয়ে যাওয়া সেই স্মৃতিগুলো ভিড় করে এল।

আমার পুনরাবির্ভাবের খবর শুনে সুজাতা নিশ্চয় চমকে উঠেছে।

সুজাতার মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছে? চোখ দুটো কি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, না ঘৃণায় ওর নাক কুঞ্চিত হল?

ছায়া পড়ল চৌকাঠের বাইরে। আমি অনেকক্ষণ সেই ছায়ার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

চোখ তুললেই...বারো বছর, দীর্ঘ বারো বছর পর সুজাতার সঙ্গে চোখাচোখি হবে।

আর হঠাৎ সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল।

আমি জোর করে চোখ তুলে তাকালাম।

সেই বিশাল নীল চোখ। সমুদ্রের মতো গভীর অথচ স্থির। পলক পড়ছে না। আমার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে সুজাতা। যেন একটা মূর্তি।

আর শরীর। অদ্ভুত। একটু লম্বা হয়েছে। শরীরের ঠিক-ঠিক জায়গায় মাংস লেগেছে। মেদহীন পেলব মসৃণ দেহ।

সেদিনকার সেই সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা ষোলো বছরের মেয়ে যে আজ এত সুন্দরী হয়েছে, তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

জীবনে কত মেয়ে তো দেখলাম। কত শরীর। কত মুখ। কিন্তু এই মুহূর্তে আটাশ বছরের এই শরীরটার দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেলাম।

আমার মনে হল, আমি কোথাও, কোনওদিন কোনও মেয়ে দেখিনি। আমি কোনওদিন কোনও শরীর ছুঁইনি। সুজাতা সত্যি সুন্দরী।

মধ্যের এই বারোটা বছর এই দুনিয়া আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সুজাতার সঙ্গে সেই পুরোনো যোগসূত্রটা খুঁজে পাচ্ছি না।

আমি আচমকা বলে উঠলাম, কীরে, কেমন আছিস—মানে কেমন আছ সুজাতা? তোমাদের দেখতে এলাম...মানে আসতে হল। এই কলকাতা...।

তোমার ঘর।—সুজাতার সংযোজন।

ঘর!...ও, হ্যাঁ। আমার কলকাতা। মাই সিটি। আমার শহর—।

আমি বলেছিলাম তোমাকে ফিরতে হবে। সুজাতা একটুও নড়েনি, নড়ছে শুধু ওর ঠোঁটজোড়া।

হ্যাঁ, তুই...তুমি বলেছিলে বটে যে আমাকে আবার একদিন ফিরতে হবে। আর বলেছিলে..।

আমি অপেক্ষা করব। আমি অপেক্ষা করেছি।

আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম। আমার সব যেন উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে।

এবার সুজাতা খুব ধীর পদক্ষেপে ঘরের ভিতরে এল। গুছিয়ে বসল সামনের সোফাতে। নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করেই আমার সামনে এসেছে। একটা বেনারসী পরেছে। পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শ্রাবণের মেঘের মতো তার ঘন একরাশ চুল।

আর, একী।

সুজাতার গলায় সেই নেকলেসটা। আমার মাকে আমার ঠাকুমা যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন—যে নেকলেসটা আমি বারো বছর আগে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওকে দিয়ে গেছলাম।

সুজাতা বলল, ওটা আমি এখনও যত্ন করে রেখেছি। তুমি ছিলে না, তোমার দেওয়া উপহার ছিল।

আশ্চর্য! তুমি এই সামান্য একটা জিনিসকে এত যত্ন করে রেখেছ। আর, সত্যি-সত্যি বিয়ে করলে না।

বিয়ে যে করব তাই বা ভাবলে কী করে?

আমার ওপর রাগ করেও তো বিয়ে করতে পারতে—যেমন আর পাঁচটা মেয়ে করে?

পারতাম—সব কিছুই পারতাম। কিন্তু করিনি।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। জীবনটাকে আমি যেভাবে বিচার করতে চেয়েছি, সেটা বোধহয় ভুল পন্থা। জীবনটা যদি অঙ্ক হয়, সব উত্তরই এক হয় না। মাঝপথে কোথায় যে যোগ গুণ ভাগ করতে গিয়ে ভুল করি, তা আমরা নিজেরাই জানি না।

বললাম, জানি আজ এসব প্রশ্ন করা বৃথা। তবু জানতে ইচ্ছা করে সুজাতা, এই দীর্ঘ বারো বছর তোমার কাটল কেমন করে?

সুজাতা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখো, দলে-দলে, মেঘেরা, কেমন উড়ে যাচ্ছে। আজকের দিনটা বড় সুন্দর!

আমি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বললাম, প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

BanglaBook.org

ওসব আলোচনায় কোনও লাভ নেই বলেই এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। পুরুষরা সর্বদাই জানতে চায় যে কেউ তার সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে কি না। বাবা অনেক পাত্র দেখেছিলেন। কলেজের বন্ধুরাও মন ছুঁতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি। বাবার দেখা পাত্রদের আমি দেখিনি পর্যন্ত।

কেন?

আমার মনের দরজায় তুমি চাবি দিয়ে গেছিলে। সে মন আর কাকে দেব? মন না দিয়ে বিয়ে করাটা দেহের বেসাতি। তা আমি পারব না।

সুজাতা একটুও বদলায়নি। খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি বলতে চাইছ যে আমার জন্যেই তুমি বিয়ে করোনি?

বলতে চাইছি নয়, বলছি। সুজাতা হাসছে।

কিন্তু আমি যদি না ফিরতাম আর?

তা হয় না। আমি জানতাম তুমি ফিরবেই। আমি অপেক্ষা করেছি। কথা রেখেছি। এরপর সব কিছুই তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

আর একটা কথা—

আর কথা নয়। স্নান করে নাও। আমি ঝিকে রাঁধতে বলেছি।

সেকী! না, না সুজাতা। আমার এখানে থাকা চলে না।

খেতে আপত্তি কি? আমি তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ব না কিছুতেই।

But I am on the run, সুজাতা।

মানে?

মানে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যে-কোনও মুহূর্তে পুলিশ বা শত্রুপক্ষ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

স্তব্ধ হয়ে সুজাতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখে সেই পুরোনো দিনের জ্যোতি ফুটিয়ে বলল, তাহলে তুমি পথ বদল করোনি—সবকিছুই সেই আগের মতো চলছে?

আমি উত্তর দিলাম না।

সুজাতা বলে চলল, তোমার ওই বিরাট চেহারার ভেতর যেটুকু কমনীয়তা ছিল, আজ দেখছি সেটুকুও নেই। তুমি রৌদ্রদগ্ধ পাহাড়ের মতো রুক্ষ হয়ে গেছ। এভাবে বাঁচার মানে কী?

মানে নেই। এই বেঁচে থাকাটা খুব কঠিন ব্যাপার সুজাতা। এই বেঁচে থাকার জন্যে সবকিছু করতে হয়।

তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

কোথায় ছিলাম না, তাই জিগ্যেস করো। পাঞ্জাব, দিল্লি, বোম্বাই, কর্নাটক—পাগলা কুকুরের মতো ঘুরছি।

সেই একই ব্যাবসা করছ?

বলতে পারো।

তাহলে বাড়ি ছাড়লে কেন? এখানেও তো সাম্রাজ্য ছিল।

তোমরাই তো বলো আমি অস্থির। বোধহয় তাই জীবনে কোনও কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারলাম না।

তুমি চলে যাওয়ার আগে তোমার ভেতর একটা স্থিরতা দেখেছিলাম। সেটার সঙ্গে বৈরাগ্যের তুলনা করা চলে। ভেবেছিলাম তোমার ভেতর পরিবর্তন আসছে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি পথ বদল করোনি, পন্থা বদলেছ।

পথ বদল করা সহজ নয়, সুজাতা।

BanglaBook.org

কেন? তুমি তো সত্যি করে এই অন্ধকার জগতে থাকতে চাও না।

আমি না চাইলেই বা। এই সমাজ আমায় ফিরিয়ে নেবে? না। আর, তাছাড়া ক্রাইমের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, সুজাতা। অপরাধ নিয়েই আমার কারবার।

তাহলে তুমি ফিরে এলে কেন?

ফিরতে হল সুজাতা। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু—আমার নিজের ভাইয়ের মতো একজন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

কে, রঞ্জন? সুজাতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, আমার এই বারো বছরের সমস্ত ইতিহাসই রঞ্জন জানত। কিন্তু আমি এখানে এসে পৌঁছনোর আগেই রঞ্জন নিহত হল।

হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম তাই।

আমি এখন জানতে চাই কেন ওকে হত্যা করা হল। কে ওকে হত্যা করল? রঞ্জন কেন আমায় ডেকে আনল? কী এমন কথা ছিল তার যে, সে-কথা আর কাউকে বলতে পারল না? কী এমন কথা যে, চিঠিতে পর্যন্ত লিখতে পারেনি সে? রঞ্জনের চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখেছি।

সত্যিই অবাক লাগছে। রঞ্জন কেন যে তোমাকে ডেকে আনল, সেটা সম্ভবত রহস্যই থেকে যাবে।

আমার কাছে রহস্য থাকবে না। আমি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করবই, এ তুমি দেখে নিয়ো।

তাহলে বলতে চাও যে, রঞ্জনকে হত্যা করার পিছনে একটা বিরাট রহস্য আছে?

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সুজাতা, আমার এখানে এসে পৌঁছনোর কথা কোনও এক পক্ষ—এখন যেটা শত্রুপক্ষ বলেই মনে হচ্ছে—জানল কী করে?

এখানে তো তোমার কোনও শত্রু নেই।

সুজাতা, মাত্র এক ঘণ্টা আগে একজন খুনি মাত্র দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছে। বিশ্বাস করো আমায়—।

সুজাতা কিন্তু কথাটা শুনে একটুও অবাক হল না। বরং ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল, সে নিশ্চয় এখন আর বেঁচে নেই?

আমি মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে উত্তর দিলাম, উপায় ছিল না, সুজাতা। এ এক ভয়ংকর জগৎ!

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা খুন! বাঃ চমৎকার! কী বলে তোমায় অভিনন্দন জানাব? Killer of the century?

বিশ্বাস করো সুজাতা, Purely self-defence। আমি ওকে খুন না করলে, ও আমায় খুন করত। এ জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই। বড়মাছ ছোট মাছকে খায়। প্রাণ-রক্ষার জন্যে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। সামান্য মাত্র ভুলের জন্যে প্রাণ যেতে পারে। I had to kill him.

এখন তাহলে কী করবে?

আমাকে যে-লোকটা খুন করতে এসেছিল, তার কাছে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। সেই কাগজে আছে একটা ঠিকানা আর একটা নাম।

কোথাকার ঠিকানা? কার নাম?

পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলের ঠিকানা। নামটা তোমার শোনার দরকার নেই। তুমি তাকে চিনবে না।

সুজাতা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রঞ্জন বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্যে কঠিন সংগ্রাম করেছিল। তুমি চলে যাওয়ার পরই তোমার মন্ত্রীর ওপর সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নতুন রাজা হল

BanglaBook.org

এখানে। রঞ্জনকে তারা পাত্তা দিল না। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মতো সাহস রঞ্জনের ছিল না। ছোটখাটো যুদ্ধ হল। ওরা রঞ্জনকে পুলিশে ধরিয়ে দিল মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে। দু-বছর জেল হল রঞ্জনের। জেল থেকে বেরিয়ে রঞ্জন বদলে গেল।

এই বারো বছর রঞ্জনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু রঞ্জন এসব কোনও কথাই তো আমাকে বলেনি!

তুমি তো জানো, রঞ্জন নিজের বিপদের মধ্যে কোনওদিন কাউকে টেনে আনত না।

অথচ সেই রঞ্জন আমাকে ডেকে আনল নিজের বিপদের কথা জানিয়ে। তাহলে বুঝতে হবে রঞ্জনের জেল-খাটা ইত্যাদি ব্যাপারের চেয়েও এবারের ব্যাপারটা আরও গুরুতর। তারপর কী হল?

জেল-খাটা লোক কোথাও চাকরি পেল না। শেষে কেষ্টপদ ওকে ট্রেনে হকারি করার জন্যে নিয়ে গেল।

রঞ্জন হকারি করতে গেল!

রঞ্জন প্রায়ই আসত আমার এখানে। মাঝে-মাঝে আমার জন্যে নানান ধরনের উপহার নিয়ে আসত। মরবার আগের দিনও এসেছিল।

অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

রঞ্জনের দেওয়া অনেক জিনিস দেখতে পাবে এ-বাড়িতে। তোমার মাথার ওপর দেওয়ালে ঝোলানো ওই অয়েল পেন্টিংটা রঞ্জনের দেওয়া। ওই ফুলদানি—ওই মাছ পোষার জন্যে কাচের অ্যাকুরিয়াম, একটা গয়নার বাক্স, একটা সেতার—।

সেতার? সেতার কী হবে?

তুমি চলে যাওয়ার পরই রঞ্জন ওটা এনে দিয়ে বলেছিল, বউদি তোমাকে সেতার বাজানো শিখতে হবে। আমি গত দশ বছর ধরে বাজাতে শিখেছি।

Strange ! সবকিছুই অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে, এটা আমার জগৎ নয়। কিন্তু রঞ্জন কি এ সমস্তই হকারির পয়সায় কিনত?

হ্যাঁ। বলত, এতকাল তোমাদের কিছুই দিতে পারিনি, বউদি। কিন্তু এসব আমার নিজের হকের পয়সা।

রঞ্জন আমার নিজের রক্তের ভায়ের মতো ছিল। আমি ওর খুনিকে খুঁজে বার করবই। আমি এই কলকাতার বুকের ওপর আরেকবার তাণ্ডব নৃত্য দেখাব।

কিন্তু—কিন্তু তুমি বোধহয় আর পারবে না।

কেন পারব না?

সবকিছুই পালটে গেছে এখানে। তোমার যুগ আর নেই। Socio-economic কাঠামোটা পালটানোর দরুন সমস্ত ব্যাপারটা একটা নতুন রূপ নিয়েছে। আর, তা ছাড়া তোমার বাহিনী নেই। এখন কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের সব রাজারাই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক নেতারাই তাদের প্রধান সহায়। পুলিশ শুধু অভিনয় করে এখন। তারা নেতাদের কথাতেই ওঠে-বসে।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম খোলা জানলা দিয়ে। তারপর বললাম, কিন্তু আমি তো হারতে শিখিনি সুজাতা। দিস সিটি ওয়াজ মাই সিটি। আমার নাম হিমাদ্রি সরকার। আমার হাতে বদ্রির মতো সম্রাটের পতন ঘটেছিল। দমদমের নিমু রায়ের অতবড় বাহিনী আমি তছনছ করে দিয়েছিলাম। মনে আছে তোমার সুজাতা, সাউথের শেখর সেনকে, আমি একদিনে তাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম? একটু থেমে আবার বললাম, আমি একটুও নরম হইনি। দরকার হলে কলকাতার নতুন রংবাজদের এবং কলকাতার পুলিশকে আর-একবার চরকি খাওয়াব।

সুজাতা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। মনে হল, ওর চোখের পাতা-দুটো থিরথির করে কাঁপছে। ঘৃণা নয়, সে-চোখে প্রশংসাই দেখতে পেলাম।

BanglaBook.org

সেই চোদ্দো-পনেরো বছর আগে আমি এক-একটা অভিযান থেকে ফিরে যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফলাফল পর্যালোচনা করতাম, তখনও সুজাতার চোখে ওই দৃষ্টি দেখতাম।

আমি আবার বললাম, আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, জীবনটা একটা জুয়ো খেলা। চোখ-কান খুলে সতর্ক হয়ে খেলতে হয়। আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নই। জিততে আমাকে হবেই।

সুজাতা হাসি-হাসি ভাব দেখিয়ে আমাকে যেন খোঁচা দেওয়ার জন্যেই বলল, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের তুমি ঠেকাবে কী করে? যে-মুহূর্তে তুমি এক সম্রাটকে ছোঁবে, সেই মুহূর্তে সমস্ত রাজনৈতিক হিরোরা চিৎকার করে উঠবে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে তোমার পিছনে—যেমন দিয়েছিল রঞ্জনের পিছনে।

আমিও হাসলাম। বললাম, পুলিশের সঙ্গে সারা জীবনই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। ওতে আমি ভয় পাই না। তোমার ওইসব রাজনৈতিক নেতাদের আমি তোয়াক্কা করি না। যারা গুণ্ডাদের দিয়ে দেশ শাসন করবার চেষ্টা করছে, তারা নিজেরাই অসহায়।

সুজাতা আমার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল, তুমি নিজেকে কী মনে করো? তোমার দৌড় কতদূর পর্যন্ত?

সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না, সুজাতা। আমার দৌড় বা ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই থাকতে পারে না—।

তুমি কী করতে পারো?

তুমি দেখতেই পাবে। আমি রঞ্জনের খুনিকে চাই। যে আমায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে ভেঙে চুরমার করে দেব। আমার ভেতর সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ দৈত্যটা এখনও মরেনি। আমার এই বারো বছরের ইতিহাস তুমি জানো না—জানলে শিউরে উঠতে। কিষেণলাল দুবের নাম শুনেছ?

শুনেছি। নামকরা লোক। আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী বলে পুলিশ তাকে ধরেছিল। শুনেছি একজন এম-পি নাকি তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেয়। পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু আমি ছাড়িনি। সেই কিষেণলাল চলন্ত ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে।

সুজাতা শিউরে উঠল ঃ মানে?

আমি কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট।

কথাটা শেষ করে হাসলাম। এক-একটা খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে যেমন করে হাসতাম। কদর্য হাসি। সেই হাসি দেখে সুজাতা শিউরে উঠত। বলত, সবকিছুর একটা সীমা থাকা দরকার।

আজও সুজাতা মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে বলল, আসলে তুমি এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে। কারণ, তোমার আরও বড় সাম্রাজ্যের দরকার ছিল। কলকাতার একটা নির্দিষ্ট এলাকার সম্রাট হয়ে তোমার মন ভরছিল না, তাই তুমি রাজধানী বদল করলে। এখন দেখছি তোমার কাজের টেকনিক পাল্টেছে।

তাতে সুবিধা আছে। পুলিশ আমার নাগাল পায় না।

পুলিশের হাত থেকে চিরকাল কি বাঁচা যায়? Sooner or later they will get you।

বললাম, এখনও তো ধরা পড়িনি।

সুজাতা রেগে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘরে এসে ঢুকল ঝি।

আমাদের উঠতে হল।

বারো বছর পর আজ আবার সুজাতার বাড়ি খেতে বসলাম।

পুরোনো স্মৃতিগুলো ভিড় করে এল। অনেকদিন পর বাড়ির রান্না খেতে সত্যিই ভালো লাগছিল।

BanglaBook.org

খাওয়ার টেবিলটা খাওয়ার ঘরের জানলার ধারে। সামনে বসে সুজাতা এটা-ওটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। নানান ধরনের গল্প হচ্ছিল।

আর তখনই গুলিটা আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পিছনের কাবার্ডে লাগল। আমি মাথা নীচু করে টেবিলটা ঠেলে দিয়ে কাত হয়ে মাটিতে পড়লাম। সুজাতাও টেবিলের ধাক্কায় ওপাশে পড়েছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে সুজাতার কাছে পৌঁছনোর আগেই আরও গোটা তিনেক গুলি কাবার্ডটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে। আমি আমার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে পাশের জানালায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন গাড়িটা তিরবেগে ক্রিক রো ছাড়িয়ে সার্কুলার রোডে গিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে সুজাতার দিকে তাকালাম। সুজাতা মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছে। আমি ওকে তুলে ধরে বললাম, দেখলে তো, কেন আমি মানুষ খুন করি? আমি খুন না করলে আমাকে খুন হতে হবে। I live dangerously.

ভয়ে সুজাতার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

আমি টেবিলে বসে আবার নিশ্চিন্তে খেতে শুরু করলাম।

আমাকে শেষ করার একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। আমায় এবার একটা কিছু করতেই হবে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন।

মানিকতলার সেই বহু পরিচিত প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হাতে সুটকেস।

একটা রাত কাটিয়েছি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে। আমার পুরোনো এক বন্ধুর বাড়ি। আজ নতুন আস্তানা খুঁজতে হবে।

দরজার কড়া নাড়তেই একজন যুবক এসে দরজা খুলে দাঁড়াল ঃ কাকে চাই?

ফরসা টকটকে রং। লম্বা। শক্ত বাঁধানো শরীর। বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস আছে। বয়স কুড়ির কাছেই।

বললাম, কল্যাণবাবু আছেন?

বাড়ি নেই।

কল্যাণবাবুর স্ত্রী...মানে...।

আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনার নাম?

তুমিই কি ইন্দ্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।

কী করে চিনবে। তোমাকে শেষ যখন দেখেছি, তোমার বয়স তখন সাত। তোমার মা-কে গিয়ে বলো, তোমার হিমু মামা এসেছে।

হিমু মামা!—মনে হল বিস্ময়ে ইন্দ্রের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

বলল, আপনিই হিমু মামা? কত সব অদ্ভুত গল্প শুনেছি আপনার বিষয়ে। আপনিই বদ্রিকে খুন করেছিলেন? আপনি একাই নিমুর দলের সঙ্গে লড়েছিলেন? শেখর সেন আপনার ভয়েই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ছিল? এই কলকাতার গুণ্ডাদের আপনিই শাসন করতেন? আপনি...।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি কি পুলিশে চাকরি নিয়েছ নাকি? আমায় ভেতরে যেতে বলবে না?

BanglaBook.org

এবার লজ্জিত হয়ে ইন্দ্র বলল, আসুন, আসুন। আজ দারুণ আনন্দের দিন।

আমি ভেতরে পা দিলাম।

আমার দিদি বাংলাদেশের অধিকাংশ দিদির মতোই দারুণ সেন্টিমেন্টাল, পুরোপুরি গৃহিণী, এবং তার স্নেহাস্পদ সকলের চারদিকে সর্বদাই বিপদ দেখতে পায়।

দিদি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যে আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম।

দিদি অনুযোগ করল, এতদিনে আমাদের মনে পড়ল? তুই যে বেঁচে আছিস, সে-খবরটাও তো দিবি?

মরলে জানতে পারতে। তুমি তো জানো, পুলিশের গুলি খেয়েও আমি মরিনি। আমি আরও অনেকদিন তোমাদের জ্বালাব। তোমরা কেমন আছ?

দিদি গুছিয়ে বসে তার কাহিনি শুরু করল। কবে জামাইবাবুর নিউমোনিয়া হয়েছিল, কবে ইন্দ্রের ভয়ানক অসুখ করেছিল (সর্দি), দিদি নিজেও কোন-কোন অসুখের জন্যে কোন-কোন ডাক্তার ঠিক করে রেখেছে। দিদির দেওর এখন লন্ডনের কোন ইউনিভার্সিটিতে কী নিয়ে রিসার্চ করছে, কিছুই বাদ গেল না। সব শেষে বলল, এই বারো বছর তুই কোথায় ছিলি?

কোথায় ছিলাম না তাই জিগ্যেস করো।

তা একটাও চিঠি দিতে নেই?

চিঠি দেওয়ার উপায় থাকলে নিশ্চয় দিতাম। তুমি তো জানো, আমাকে লুকিয়ে বেড়াতে হয়।

মানে? এবার দিদি চমকে উঠল, তাহলে...তাহলে...কি তুই এখনও সেই পথেই আছিস?

উত্তরে আমি শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

দিদি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই জন্যে তুই কথার ফাঁকে-ফাঁকে বারবার রাস্তার ওপাশে চোখে কালো চশমা পরা ওই লোকটাকে দেখছিস?

আমি আবার হাসলাম।

লোকটা কে?

লোকটা নিশ্চয় আমায় অনুসরণ করছে। অপেক্ষা করছে, আমি কখন এখান থেকে বেরোব। হয় দেখতে চায় আমার গন্তব্য স্থানগুলো, নচেৎ...।

নচেৎ?

নচেৎ ফুটপাথের ওপরই আমার মৃতদেহটা ফেলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা ওর আছে।

দিদি শঙ্কিত হয়ে বলল, তাহলে তো পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।

আমি হেসে বললাম, তোমার মাথা খারাপ নাকি, দিদি! পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো জানো।

কিন্তু সত্যিই যদি লোকটা তোকে...।

ওর ইচ্ছাটা যাই হোক না কেন, পুলিশে আমি খবর দিতে পারব না, কেন না, ও নিজেই তো পুলিশের লোক হতে পারে।

কিন্তু এ তুই কী খেলায় মেতেছিস, হিমু?

আমি নিজের ইচ্ছায় কাউকে খুন করি না। কেউ আমায় খুন করতে চাইলে...যাকগে সে-কথা। আমি রঞ্জন সম্পর্কে তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। রঞ্জনকে নিশ্চয় তুমি চেনো?

চিনব না কেন! প্রায়ই তো আসত আমাদের বাড়ি।

রঞ্জনের চালচলন তোমার কেমন লাগত?

BanglaBook.org

আপত্তির কিছু ছিল না। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। ইন্দ্রকে দারুণ ভালোবাসত। ট্রেনে হকারির কাজ করত। আমাকে অনেক উপহার এনে দিয়েছে।

উপহার! আমি বিস্মিত হলাম।

হ্যাঁ। বলত, এবার ব্যাবসা করছি, দিদি। এবার তোমাদের যা কিছু উপহার দিচ্ছি, তার কোনওটাতেই পাপের স্পর্শ নেই।

বড় আশ্চর্য লাগছে। সুজাতাকে মনে আছে তোমার?

খুব ভালো করে মনে আছে। তোর বিচারের সময় কোর্টে যেত। ওখানেই আলাপ। আমার এখানে প্রায়ই আসে। খুব ভালো মেয়ে। সেবার পুজোর সময় আমাকে ছানার পোলাও রাঁধতে...।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সুজাতা। রঞ্জন সুজাতার ওখানেও যেত। সুজাতাকেও সে অনেক উপহার দিয়েছে।

আমাকে একটা হাড়ের চিরুণি, একটা শাড়ি এনে দিয়েছিল। ইন্দ্রকে একটা ব্যায়ামের যন্ত্র এনে দিয়েছিল...ওই যে বুলওয়ার্কার না কী যেন বলে।

তাহলে বলতে চাও, রঞ্জন সম্পূর্ণ সৎ জীবন-যাপন করছিল?

দিদি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আমি উঠে পড়লাম।

দিদি আমাকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করল। আমি বললাম, আমি এখন অনেকদিন কলকাতাতেই থাকব। কাজেই আবার নিশ্চয় আসব।

আমি পথে নেমে এলাম। কালো চশমা পরা লোকটা নেই। আমি সার্কুলার রোডে এসে বাসস্টপে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম লোকটা একটা রিকশাতে বসে আছে, দূরে।

পরনে একটা ধূসর রঙের স্যুট। গলায় টাই। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় লোকটার শরীর খুব মজবুত। প্রায় আমার মতোই লম্বা। ওজন অন্তত দুশো পাউন্ড।

আমি বাসে না উঠে সার্কুলার রোড ধরে শিয়ালদার দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চলার পর পিছন ফিরে দেখি, লোকটা রিকশা ছেড়ে পায়ে হেঁটে (প্রায় দুশো গজ দূরে) পিছন-পিছন আসছে।

হাঁটতে-হাঁটতে শিয়ালদা এলাম। এখানে বড় রাস্তার ওপর আমার পরিচিত খুব ভালো একটা হোটেল ছিল। হোটেলটা সত্যিই খুব সুন্দর। এখানে একটা স্যুট ভাড়া নিলাম।

চাবিটা নিয়ে ওপরে উঠছি সিঁড়ি দিয়ে, দেখি কালো চশমা পরা সেই বন্ধুটি হোটেলের 'লবি'তে ঢুকছে।

ওপরে এসে প্রথমেই স্নান করতে ঢুকলাম।

অটোমেটিকটা রাখলাম ফোয়ারার পাশে বেসিনের ওপর আয়নার তাকে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এলাম। বন্ধু এল না। নীচে এলাম। খাবারের অর্ডার দিলাম। খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম।

রঞ্জনের চিঠি। আমার কলকাতায় আসা। মধ্যে রঞ্জনের মৃত্যু। আমাকে হত্যার চেষ্টা। কালো চশমা-পরা আগন্তুক। ঘটনাগুলো সাজালাম।

সমস্ত ঘটনা একে-একে আমার মনের পরদায় ভেসে উঠল। রঞ্জনের হত্যার সঙ্গে কি আমাকে হত্যা করতে চাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে? ওই কালো চশমা পরা লোকটা কে? পুলিশ? তাহলে কি গতকাল বউবাজারের হোটেলে সেই আততায়ীর নিহত হওয়ার সঙ্গে পুলিশ আমার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে? কী করে পেল? আমি তো কোনও প্রমাণ ফেলে আসিনি!

কিন্তু ওই লোকটা যদি পুলিশের লোক না হয়, তাহলে ও কে? শত্রুপক্ষের লোক? শত্রু কে? আমাকে জানতেই হবে যে, কারা আমায় খুন করতে চাইছে।

BanglaBook.org

এতদিন আমি ক্রাইমের জগতে ঘুরে-ঘুরে একটা জিনিস বুঝেছি। সেটা হল এই যে, যে-কোনও অপরাধের একটা প্যাটার্ন থাকবে। সেই প্যাটার্ন দিয়ে সেই অপরাধের প্রকৃতি চেনা যায়।

কিন্তু এখনও আমি কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পাইনি। প্যাটার্ন খুঁজে পাইনি, কারণ শত্রু এখনও কোনও ভুল করেনি। করলেও সেটা আমার কাছে ধরা পড়েনি।

কিন্তু কেন?

আমি হিমাদ্রি সরকার, এককালে মাস্টার ক্রিমিনাল বলে পরিচিত ছিলাম। আমি এখনও একটা ভালো হাইপথেসিস খাড়া করতে পারলাম না কেন?

তাহলে কি শত্রুপক্ষ খুবই মেথডিকাল? বিরাট মাথা আছে এর পেছনে? কার মাথা?

আমার প্রথম হাইপথেসিস হল যে, এর পিছনে একটা মাথা নয়, অনেক ক'টা মাথা আছে। আছে একটা অর্গানাইজেশান।

আমি বিল চুকিয়ে উঠে পড়লাম। রঞ্জন সম্পর্কে আর একটু খোঁজখবর নিতে হবে।

কমলের কাছে আমি আমার বিগত সাম্রাজ্যের অনেক সৈনিকের খবর পেয়েছিলাম।

তপন ছিল আমার সবচেয়ে বড় গুপ্তচর। সে বিভিন্ন বিষয়ে খবরাখবর এনে আমাকে দিত। তপন এখন ইন্টালি বাজারে একটা ভালো স্টেশনারি দোকান করেছে। থাকে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে। বেশ পয়সাও হয়েছে 'বেবি ফুড' ব্ল্যাক করে।

তপনকে দোকানেই পেলাম।

প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমিই বললাম, চিনতে পারছিস?

গুরু, তুমি?

গুরু শব্দটা প্রথম শুনলাম।

এখনও বেঁচে আছি।—ভনিতা করলাম।

তেমনি আছ? মানে সেই হিমুদা? সেই tough?

More than that. আমায় দেখে কী মনে হচ্ছে?—আমার ঠোঁটের কোণে হাসি।

শরীর তেমনই আছে। মুখটা rough হয়ে গেছে অনেক বেশি।

আমি হেসে দোকানের ভিতর ঢুকে একটা চেয়ারে বসলাম। দোকানটা দেখলাম ভালো করে। অন্তত হাজার দশেক টাকার মাল আছে দোকানে।

তপন বলল, তুমি কি থাকবে এখানে, হিমুদা?

কেন?—সাবধানে প্রশ্নটা ছুঁড়লাম।

না—তাহলে বলো ব্যাবসা তুলে দিই। আবার পুরোনো দিনের মতো—।

না, তপন। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। আমার কিছু খবরের দরকার।

আমি একটু থেমে সিগারেটা জোরে-জোরে টানতে লাগলাম। তপন তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি আচমকা বললাম, রঞ্জন কী করে মরল, তপন?

তপন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি রঞ্জনের খুনের কিনারা করতে চাইছ?

হ্যাঁ। আমি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করবই। আমি শুধু জানতে চাই যে, রঞ্জন মরল কেন? কীভাবে মরল।

রঞ্জনের মৃত্যুর কারণটা সত্যিই একটা বিরাট রহস্য।—তপন গম্ভীর হয়ে বলল।

রহস্য! না কেউ পুরোনো 'খার' মেটালো?

রঞ্জন লাইন ছেড়ে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

বললাম, কীরকম?

অনেক অবিচার হয়েছে রঞ্জনের ওপর। শেষে ওরা চক্রান্ত করে ওকে জেল খাটাল। জেল থেকে বেরিয়ে কোথাও চাকরি পেল না। জীবিকার জন্যে অনেক যুদ্ধ করেছিল রঞ্জন।

আমি একটু ভেবে বললাম, বিকাশকে তোর মনে আছে?

কোন বিকাশ? পুলিশে চাকরি করত যে বিকাশ?

বললাম, হ্যাঁ, সে কি আমাদের সাহায্য করতে পারে?

সাহায্য। সাহায্য করবে বিকাশ চৌধুরি? তোমার মনে নেই, এককালে সে আমাদের কীরকম নাস্তানাবুদ করেছে? He had ambition এবং সেই অ্যামবিশন পূরণ করার জন্যে সে কোনও কিছু করতেই দ্বিধা করেনি। সে এখন হেড কোয়ার্টার্সের বিরাট অফিসার। সে আমাদের চিরকালকার শত্রু।

কিন্তু পুলিশ হিসাবে বিকাশ perfect । সে যতবারই আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে গেছে, তার প্রত্যেকবারই একটা কারণ ছিল। পুলিশ হিসাবে সে তার কর্তব্য করেছে মাত্র।

বিকাশ তোমাকে সাহায্য করবে না, হিমুদা। রঞ্জনের খুনিকে ধরতে হলে তোমাকে অন্য কোনও উপায় বার করতে হবে।

বেশ। রঞ্জনের একটা বন্ধু ছিল। সেই বারো-তেরো বছর আগে একটা খুনের আসামি হয়ে সে আমাদের এখানে ঠেক নিয়েছিল। তারপর সে থেকেই গেছিল আমাদের এখানে। বাড়তি কাজগুলো সেই করত।

আমার মনে আছে তাকে। সে 'কর' আদায় করত। তুমি কেষ্টপদ গড়াইয়ের কথা বলছ।

কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

নিতাই বলতে পারবে।

নিতাইকে কোথায় পাওয়া যাবে?

ইনফর্মার নিতাই থাকে তালতলায়।

আমি উঠে পড়লাম।

তপন বলল, কিন্তু একটা কথা, হিমুদা।

বল।

কিছু মনে কোরো না। তুমি আমাদের গুরু। তুমি সমস্ত কলকাতাটা শাসন করতে একদিন। তোমাকে কিছু শেখাতে চাইছি না। কিন্তু...।

সঙ্কোচ কীসের, তপন?—আমার স্বরে ব্যঙ্গ।

পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন সব পাড়াতেই একটা করে হিরো আছে। তুমি সেই পুরোনো দিনের মতো করে অপারেশন চালাতে গেলে বিপদে পড়বে।

অবস্থা যত বদলেছে, তার থেকে অনেক বেশি বদলেছি আমি।

কিন্তু হিমুদা, এখন যারা সম্রাট তাদের সকলেই রাজনীতি করে। তার মানে, পুলিশও তাদের ছুঁতে পারে না।

পুলিশ আমাকেও কোনওদিন ছুঁতে পারেনি।—আমার গলায় ব্যঙ্গ। চোখে আগুন।

কিন্তু এখন 'মিসা' নামে এক আইন আছে, যার বলে বিনা বিচারে তোমাকে বছর কয়েকের জন্যে গরাদের ওপারে বন্ধ করে রাখা চলে।

গোটা কলকাতার মানুষ নানান সমাজবিরোধী এবং নানান আইনের ভয়ে কাঁপছে। গণতন্ত্র!

আমি হেসে বললাম, একটা কাজ কর তপন। এই নে, একশোটা টাকা। আমাদের পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজনকে জোগাড় কর। তাদের বল, কলকাতার অন্ধকার জগতে একটা খবর প্রচার করতে। আজ রাত দশটার মধ্যেই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়া চাই।

BanglaBook.org

কী খবর? তপন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

আমি খানিকক্ষণ তপনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, খবরটা হল, হিমাদ্রি সরকার ফিরে এসেছে।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যায় চা খেতে গেলাম সুজাতার ওখানে। সেন্টার টেবিলের ওপাশে বসল সুজাতা।

সুজাতা আজ আরও বেশি সেজেছে। আজ অনেক বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে ওকে। ওকে যতই দেখছি, ততই ভালো লাগছে।

সুজাতার রূপ খুব উগ্র নয়।

শূন্য চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে গিয়ে চোখ তুলে সুজাতা তাকাল আমার দিকে। আর স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর মুখটা লাল হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল, কী দেখছ অমন অসভ্যের মতো?

তোমাকে দেখছি, সুজাতা। দেখছি আর অবাক হচ্ছি। আমি হঠাৎ একদিন চলে গেলাম, আর তুমি আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে রইলে?

আমরা মেয়ে। তোমরা কেবলই ভাঙতে চাও। আমরা গড়তে চাই। আমার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বারকয়েক টান দিয়ে বললাম, একটা কথার স্পষ্ট জবাব দেবে?

সুজাতাও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সব প্রশ্নেরই জবাব দেব। বলো কী জানতে চাও।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, তুমি—তুমি সত্যিই আমায় ভালোবাসো?

এ-প্রশ্ন করছ কেন?

It is too good to be true.

সেই চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকে তোমার কথায় উঠছি-বসছি। এ-পাড়ায় এই কলকাতার লোকেরা তোমাকে ভয় করত। আমি কিন্তু কোনওদিন তোমাকে ভয় করিনি। আমি তোমার কাছে এসেছিলাম ভয়ে নয়, ভালোবেসে।

তোমাকে তো সকলেই বাধা দিয়েছিল।

সকলের কথা অমান্য করেছিলাম শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলেই। আজও তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।

সত্যিই কি তাই?

মানে? সুজাতা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। ক্রুদ্ধ ভঙ্গি। চোখের কোণে ভাঁজ।

ধরো, যদিও এটা purely guess work, এমন তো হতে পারে যে, এককালে তুমি আমার সঙ্গে ঘুরেছিলে। আমার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ছিল বলে কেউ তোমাকে বিয়ে করতে চায়নি।

সুজাতা জানলা দিয়ে বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তুমি দীর্ঘ বারো বছর ছিলে না। আর আমি একটা সাধারণ মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। এসব তো নাটক-নভেলে ঘটে।

ধরো, আমার জন্যেই তোমার ভালো ঘরে বিয়ে হল না। তাই তুমি হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছ।

BanglaBook.org

সুজাতার মুখের চেহারার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না। এক ঠান্ডা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে যতখানি চিনি, এক তোমার মা ছাড়া, আর কেউ তোমাকে ততখানি চেনে না।

ওটা তো আমার প্রশ্নের উত্তর নয়!

ওটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। কেন না, আমি তোমাকে চিনতাম বলেই জানতাম যে, একদিন তুমি ফিরবে। যদি অপেক্ষা না করি, ধৈর্য না থাকে, বিশ্বাস না করতে পারি, তবে কীসের ভালোবাসা? অবশ্য তোমাকে দোষ দেব না। তোমার ও ধরনের ধারণা হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

বললাম, আমার ধারণাটা কি ঠিক?

সুজাতা সামান্য একটু হাসল ঃ যেদিন সকলে তোমাকে সমাজবিরোধী বলত, গুণ্ডা বলত, সেদিনও আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। জানি, রঞ্জনের মৃত্যুর জন্যে আজ তুমি সকলকেই সন্দেহ করছ—।

ঠিক তাই, সুজাতা। আজ কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

কিন্তু রঞ্জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

তুমি কি গুলি করে হত্যা করতে পারো না?

সুজাতা এবার জোরে হেসে উঠল ঃ প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করতে চাই। তুমি তো জীবনে অনেক দেখেছ, অনেক শুনেছ। ক্রাইমের জগৎ তো তুমিই ভালো চেনো আমার থেকে। তুমিই বল না, যে-রঞ্জনকে আমি ভালোবাসতাম—একমাত্র যার 'বউদি' ডাকের জন্যেই আমার মনে পড়ত আমি তোমার, সেই রঞ্জনকে আমার পক্ষে খুন করা সম্ভব কি না?

মার্ডার করা যে-কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব। তা সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক, সে ক্রিমিনাল হোক বা না-ই হোক। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সুজাতাকে সেসব কথা বলতে পারলাম না।

আমি আর-একটা সিগারেট ধরালাম। অনেক স্মৃতি ভিড় করে এল। অনেক ঘটনা, অনেক কথা মনে পড়ল আমার।

আমার জন্যে সুজাতা অনেক টিটকারি সহ্য করেছে, সহ্য করেছে অনেক অত্যাচার। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। সুজাতা হারেনি। যদি কেউ হেরে থাকে, সে আমি।

আমি জীবনটাকে ঠিক গুছিয়ে চলতে পারলাম না। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম ছন্নছাড়া হয়ে। আমার যে-ব্যাবসা, তাতে একদিন হয়তো বিদেশে কোথাও গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকব। কেউ জানতেও পারবে না যে, হিমাদ্রি সরকার নেই।

আমি দেওয়াল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুজাতার দিকে তাকালাম। বললাম, তুমি আমার মতো এক ছন্নছাড়া মানুষকে বিয়ে করে কি সুখী হবে, সুজাতা?

তোমাকে বিয়ে না করেই বা কি সুখী হলাম? আমি জানি, তুমি কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর অনেক মেয়ে দেখেছ—দেখেছ অনেক নারীর শরীর। তবু বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে একদিনের জন্যেও ঘৃণা করতে পারিনি।

কিন্তু কেন? এত কিছু জেনেও আমায় তুমি ঘৃণা করতে পারো না কেন?

কথাটা আমি বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে ফেললাম। সেই উত্তেজনা প্রতিফলিত হল এবার সুজাতার মধ্যেও। সে সোজা হয়ে বসল।

ওর সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা। সে-হাত দুটো একটু-একটু কাঁপতে লাগল। ওর সেই ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওর বাহ্যজ্ঞান ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

সুজাতা ধীরে-ধীরে বলল, তুমি সত্যি শুনতে চাও তো শোনো। তুমি হিমাদ্রি সরকার যখন

BanglaBook.org

সারা কলকাতার ওপব রাজত্ব করছিলে, যখন তোমার অঙ্গুলিহেলনে অনেক প্রাণ যেতে পারত, যখন কেয়া এবং অনিতার মতো মেয়েরা সেধে এসে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যেত—।

আমি বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালাম ঃ কী বলছ, সুজাতা?

ভুল বলেছি? সুজাতাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

তুমি—তুমি এসব জানতে?

জানতাম। ওরা তখন সিনেমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তোমার সাহায্য নেওয়ার জন্যেই তোমার কাছে ছিল। তুমিই ওদের নিয়ে গেছিলে কমল রায়চৌধুরীর কাছে। তোমার সুপারিশেই ওরা নায়িকা হয়েছিল।

সুজাতা এবার থরথর করে কাঁপতে লাগল ঃ জানতাম গো—আমি সবই জানতাম।

আমি এক-পা বাড়িয়ে সুজাতাকে ধরলাম। ও আমার বুকে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ঃ সব জেনেও তোমাকে ভালোবেসেছি—জেনেও তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি, কারণ তুমি আমাকে কোনওদিন ছোঁওনি। তুমি আমাকে—আমার এই দেহটাকে অন্তত মর্যাদা দিয়েছ।

আমাকে সকলে বলে যে, আমি সেন্টিমেন্টাল নই। কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।

সেই মুহূর্তে সুজাতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মনে হল, আমি যদি জীবনে আর কোনও অপরাধ নাও করতাম, শুধু সুজাতাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যেই আমাকে গুলি করে মারা উচিত।

মা বলেছিলেন, আমি যেন সুজাতাকে কোনওদিন অসম্মান না করি, কষ্ট না দিই। মা ওকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

মায়ের প্রথম আদেশটা রেখেছি। দ্বিতীয়টা অজান্তে লঙ্ঘন করেছি।

আমি ওকে দু-হাতে ধরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, আমায় ক্ষমা করো, সুজাতা। আমি অমানুষ—আমি পশু। কিন্তু এর জন্যে সম্পূর্ণ আমি দায়ী নই। আমি এক ভয়ানক যুদ্ধে নেমেছি। একদল লোক আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে। তুমি জানো না, এই দীর্ঘ বারো বছর আমার কীভাবে কেটেছে। আমি কী সব ভয়ংকর কাণ্ড করেছি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। আমি যদি শেষ পর্যন্ত বাঁচি, কথা দিলাম, তোমার মাথায় আমি সিঁদুর পরিয়ে দেবই।

কথাগুলো শেষ করে আমি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমায় থামতে হল। আমার কানে সেই শব্দটা এল। অত্যন্ত মৃদু। শব্দটা আমি এর আগে বহুবার শুনেছি।

আমি পিছন ফিরে সুজাতার দিকে তাকালাম। ও তখনও সেন্টার টেবিলের পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি সিলিং-এর দিকে তাকালাম। শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। আমি সুজাতাকে বললাম, তুমি বাথরুমে গিয়ে (শব্দটা পেলাম) মুখে-হাতে জল দাও।

শব্দটার শেষ রেশ শুনতে পেলাম। শব্দটা থেমে গেল। আমরা কথা বললেই সেই ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ সাঁই-সাঁই শব্দটা হচ্ছে? আমি পাখাটা বন্ধ করে দিলাম। পাখার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ঘরটা স্তব্ধ।

আমি একটা গান ধরলাম। শব্দটা শুরু হল। গান করতে-করতে শব্দটার উৎস সন্ধানে চারদিকে তাকালাম।

অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে শব্দটার উৎসে এসে পৌঁছলাম। দেওয়ালে জানলার ধারে একটা বইয়ের আলমারি। শব্দটা ওই আলমারির ভেতর থেকেই আসছে।

আলমারি খুলে পরীক্ষা করতে-করতে পেয়ে গেলাম সেটা।

একটা মোটা বাংলা অভিধান। সেটার ভেতরের পাতা কৌশলে কেটে নেওয়া। আর সেই ফাঁকা অংশে সযত্নে বসানো আছে সেটা। একটা 8"x6" ফোটো।

BanglaBook.org

মিনি টেপ রেকর্ডার। অত্যাধুনিক শক্তিশালী যন্ত্র। বিদেশি। দামি।

এই টেপ রেকর্ডারটা রাখা হয়েছে এখানে আমাদের সমস্ত কথাবার্তা টেপ করার জন্যে। এটা অটোমেটিক। কথা বললে আপনি-আপনি চলে, কথা শেষ হলে এটা আপনি থেমে যায়।

কিন্তু এটা এখানে এল কী করে? কে এই বসার ঘরে বই কেটে এর ভেতর এই বস্তুটি সযত্নে রেখে গেল?

সুজাতা, না বাইরের কেউ?

আমি অনায়াসে সেটা খুঁজে বার করতে পারি। কিন্তু তাতে সময় লাগবে।

আমি কি এটা নষ্ট করে দেব? না। তাহলে শত্রু সর্তক হয়ে যাবে। শত্রুকে বোকা বানাতে হবে।

আমি এবার একটা প্যাটার্ন পাচ্ছি। দরকার নেই অনুসন্ধানের। শত্রু এটা নিয়ে যা ইচ্ছা করুক।

ঘরে সুজাতা নেই। কিন্তু আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম, আমি জানি সুজাতা, রঞ্জনকে কারা খুন করেছে, এবং কেন খুন করেছে। তাদের ধরতে আর মাত্র দিন দুই সময় লাগবে।

আমার কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেল টেপে। আমি জানি না, রঞ্জন কেন খুন হয়েছে বা তাকে কে খুন করেছে।

আমি শুধু কথাগুলো বললাম এই জন্যে যে, শত্রু জানুক আমি তাদের চিনি। শত্রুকে ঘাবড়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

আমি অভিধানটা আবার যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম রাস্তায়। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

কে রেখেছে ওটা? সুজাতা? সুজাতা কি তাহলে...।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি কী যেন একটা ভুল করলাম।

ভুল? না, ঠিক ভুল নয়। তবে?

আমার বুদ্ধির দরজায় একটা ধাক্কা লাগল। আমি কী যেন একটা দেখেও দেখিনি। আমি নীচু হয়ে জুতোর ফিতেটা ভালো করে বাঁধবার ভান করে চারদিকে তাকালাম।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে আছে সেই কালো চশমা পরা লোকটি।

কিন্তু আমি বেশ মনে করতে পারছি যে, লোকটা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল সামনের একটা ওষুধের দোকান থেকে। সেই ছুটে বেরিয়ে আসাটাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

আমি দ্রুত ওষুধের দোকানে ঢুকে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, একটা অ্যানাসিন দিন তো।

ভদ্রলোক অ্যানাসিনটা দিতেই একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বললাম, অ্যানাসিন আর ফোনচার্জ দুটোই কেটে নেবেন।

ফোন চার্জ। আপনি ফোন করেছেন নাকি?

না, আমি নই। আমার বন্ধু ফোনটা ব্যবহার করেছিলেন। ওই যে কালো চশমা পরা ভদ্রলোকটি, এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।

উনি? উনি তো প্রায় তিন-চারটে ফোন করেছেন। সব চার্জ উনি মিটিয়ে দিয়েছেন।

ও—I am sorry।

রাস্তায় নেমে এলাম আবার। আমার ধারণাই ঠিক। ওরা আমায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে। প্রত্যেকটি রিপোর্ট ফোন মারফত যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

কিন্তু কালো চশমা পরা ওই লোকটা কে? কাকে খবর পাঠাচ্ছে?

BanglaBook.org

ওরা কি পুলিশ? ওরা কি সন্দেহ করছে যে, সেই আততায়ীর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী? পুলিশ কী করে জানল? কেউ কি পুলিশকে খবর দিয়েছে?

কিন্তু সুজাতার ঘরে ওই টেপ-রেকর্ডার এল কী করে? আমি কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারি না।

আমি একটা ট্যাক্সি ধরলাম। সোজা চলে এলাম পার্ক স্ট্রিটের সেই হোটেলে।

॥ ৭ ॥

পার্কস্ট্রিটের এই হোটেলের বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলে যে, এ-হোটেলে সকলে আসতে পারে না। খুব উঁচুদরের হোটেল। আদবকায়দা সবই সাহেবি।

বলাই বাহুল্য, আমার পরনে ছিল একটা দামি স্যুট। আমার মাথায় লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত চুল। হাতে দামি ঘড়ি। একটা হীরের আংটি। আমাকে এখানে বেমানান লাগছিল শুধু একটি কারণে। দৈর্ঘে-প্রস্থে আমি আর সমস্ত খদ্দেরের চেয়েই বেশি।

ভেতরে পা দিতেই 'অ্যাটেন্ডান্ট' স্যালুট করে দাঁড়াল। আমি কোণের দিকে একটা টেবিল দেখিয়ে বললাম, ওই টেবিলটা চাই।

সে আমাকে টেবিলে বসিয়ে একটা মেনু ধরিয়ে দিল।

সামনে বার। প্রকাণ্ড কক্ষের চারদিকে টেবিল। বেয়ারারা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।

আমার হাতঘড়িতে সবে রাত আটটা। অর্থাৎ তখনও ভালো করে প্রাণ আসেনি এখানে।

একটা বিয়ারের অর্ডার দিলাম। বিয়ার এল। সেটা পান করার পর হুইস্কি। আবার বিয়ার। এখান থেকে দরজাটা বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বিয়ারে চুমুক দিয়ে দরজার দিকে তাকালাম।

এক-এক করে নিশাচরেরা ঢুকছে। প্রত্যেকেই বেশ ধনী।

কোথায় যেন মিষ্টি একটা বাজনা বাজছে। আমার টেবিলের ওপাশে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন সুন্দরী যুবতী। প্রথম থেকেই সে আমার আপাদমস্তক লেহন করছিল তার সুন্দর চোখজোড়া দিয়ে।

হঠাৎ সে এগিয়ে এসে হাসতে-হাসতে বলল, হ্যালো, বিগ ম্যান।

হ্যালো, ডল।

বসতে পারি?

নিশ্চয়ই।—চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম।

মেয়েটি বসল। আমি তার জন্যেও একটা বিয়ার অর্ডার দিলাম। মেয়েটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। বিয়ার এল।

মেয়েটি বলল, আমার নাম লিলি। কিন্তু আপনাকে তো কোনওদিন দেখিনি এ-হোটেলে। শহরে নতুন নাকি?

বললাম, হ্যাঁ। আর্মিতে ছিলাম। চাকরি ছেড়ে এসেছি এখানে থাকতে। তুমি এ-হোটেলে কতদিন ধরে আছ?

আমি সব হোটেলেই থাকি। তবে এ-হোটেলটাই আমার বেশি পছন্দ। আমার অধিকাংশ খদ্দের এই হোটেলেই আসে।

এই হোটেলের ওপরের ঘরগুলো খুব ভালো শুনেছি।

হ্যাঁ। এয়ারকন্ডিশনড ঘর।

BanglaBook.org

আমার একজন বন্ধু এখানে থাকে। বলতে পারো, কোন ঘরে সে থাকে?

সেটা তো রিসেপশানে গেলেই জানা যাবে।

না, আমি রিসেপশানে যেতে চাই না। কারণ আছে।

আমি পকেট থেকে নিহত আততায়ীর কাছ থেকে পাওয়া কাগজটা তার সামনে মেলে ধরলাম।

মেয়েটি নামটা পড়ল, তারপর বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল, উনি তো প্রায় সকলেরই পরিচিত। গত দু-তিন দিন ধরে উনি হোটেলে ফিরছেন না। অন্য কোথাও গেছেন বোধহয়।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, দরজার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলাম। দরজা দিয়ে একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে যিনি ঢুকলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের সেই পুরাতন অবিনাশদা।

অবিনাশ ভট্টাচার্য। এখন একজন বেশ বড় মিনিস্টার। প্রচণ্ড ধনী। বসিরহাটের দিকে বিরাট সম্পত্তি।

আমার রাজত্বকালে আমার কাছে আসতেন তিনি। আমাকে খুব ভালোবাসতেন, কেন না, তার অধিকাংশ ভোট আসত আমার দৌলতে।

আমাকে দেখতে পেয়ে উনি এগিয়ে এলেন : কে? হিমাদ্রি না?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চিনেছেন দেখছি। ভাবলাম কী জানি, মিনিস্টার হওয়ার পর হয়তো চিনতে পারবেন না।

অবিনাশদা হাসলেন, তোমাকে কি ভুলতে পারি, হিমাদ্রি? তা এতকাল কোথায় ছিলে?

কলকাতায় ছিলাম না।—আমার দৃষ্টি কিন্তু বরাবর অবিনাশদার সঙ্গে আসা সেই মেয়েটির দিকে। মহিলাটি অত্যন্ত সুন্দরী।

অবিনাশদা সেটা লক্ষ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন, হিমু, ইনি মিস মলয়া দে। দু-চারটে ছবি করেছেন। বেশ নাম হয়েছে। আর মলয়া, একে দেখে রাখো। এর নাম হিমাদ্রি...হিমাদ্রি সরকার। এককালে কলকাতায় এর রাজত্ব ছিল। কলকাতায় এমন কোনও বদমায়েশ, এমন কোনও গুণ্ডা ছিল না যে ওকে ভয় করত না।

মলয়া দে হাত তুলে নমস্কার করলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাঙালিদের এ ধরনের চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না।—আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার চেহারা অনেকটা western ছবির নায়কের মতো। আপনি অনায়াসে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে পারেন।

আমি হেসে বললাম, ধন্যবাদ। আমাকে যে হিন্দি ছবির ভিলেন বলেননি, সেজন্যে ধন্যবাদ।

মলয়াও হাসলেন : আমি ঠাট্টা করছি মনে করেছেন? মোটেই না। আমি সিরিয়াস।

অবিনাশদা যোগ দিলেন, বুঝলে হিমু, মলয়া আবার সব কিছুতেই সিনেমা জগতের তুলনা দিতে ভালোবাসে।

আমি মলয়াকে উদ্দেশ করে বললাম, আপনার ছবি দেখার বাসনা রইল। অবিনাশদার সামনেই বলছি, আপনার যা রূপ, আর কথা বলার মধ্যে যে স্মার্টনেস, তাতে মনে হয় আপনি অনায়াসে ভারতের এক নম্বর নায়িকা হতে পারবেন।

এক মুহূর্তের জন্যে মলয়ার গাল দুটো লাল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ওর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। ও-দৃষ্টি আমি অনেকবার অনেক মেয়ের চোখে দেখেছি। ওর অপর নাম আত্মতৃপ্তি।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো?

টু টেল য়ু ফ্র্যাঙ্কলি,—মলয়া বললেন, ওই কথাটা আমিও আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

অবিনাশদা কয়েক পা দূরে গিয়ে বললেন, আবার পরে কথা হবে, হিমু। একদিন বাড়িতে এসো। চলো মলয়া, ওঁরা এসে পড়েছেন।

BanglaBook.org

অবিনাশদা নিজে এগিয়ে গেলেন। মলয়া বলল, আপনি চলুন, অবিনাশদা, আমি আসছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি আছেন তো? পালাবেন না। ওদিকের একটা 'বিজনেস' মিটিং সেরে আসছি। অবিনাশদার এক বন্ধু একটা ছবি করছেন। কনট্রাক্টটা আমায় পাইয়ে দিচ্ছেন। প্রোডিউসার এখানেই আসবেন।

মলয়া কথা শেষ করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে অবিনাশদার সঙ্গে যোগ দিলেন। লিলি এতক্ষণ এসব দেখছিল। এবার বলল, আপনাদের এই মিনিস্টারটি সর্বদাই মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। এতে বদনাম হয় না?

বললাম, ও-বদনাম অবিনাশদার চিরকালের। তবে লোক বড় ভালো। লোকের উপকার করে খুব।

কিন্তু আপনি নিজের পরিচয় গোপন করলেন কেন আমার কাছে? আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন আপনার নাম শুনেছিলাম। আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার বিষয়ে যা কিছু শুনেছি তার কোনওটাই মিথ্যা নয়।

আমি তো এখন আর এখানে থাকি না। কলকাতার খবর রাখি না। আমার জীবন...।

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। দরজা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকল, তার দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। আমি মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য তার দৃষ্টির আড়াল করতে চাইলাম।

আমার ভাগ্য মন্দ। ঠিক সেই সময়েই লিলি চলে গেল লেডিস রুমে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে কেয়া। সঙ্গে একজন লম্বা-চওড়া লোক।

কেয়া অবিনাশদাকে দেখতে পেয়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল। অবিনাশদা কেয়াকে অভ্যর্থনা করলেন। ওদের মধ্যে কী সব কথা হতে লাগল।

একসময় হঠাৎ অবিনাশদা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে-হাসতে কী যেন বললেন।

কেয়া চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

আমি আর কেয়া মুখোমুখি। কেয়ার দৃষ্টি বরফের মতো ঠান্ডা। মুখটা অসম্ভব গম্ভীর হলেও আমি বুঝতে পারছিলাম, ও ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কেয়া! সেই কেয়া! কমল রায়চৌধুরীর কাছে বাঁধা ছিল। কিন্তু তার আগে বাঁধা ছিল আমার কাছে।

কেয়া তখন সবে কলেজের একটা দরজা পার হয়েছে। তখন তার বয়স কম ছিল। সে ছিল কুমারী।

বললাম, বসো।

কেয়া বসল। কোনও ভণিতা না করেই বলল, তুমি আবার ফিরে এলে কেন?

তোমার অসুবিধে হচ্ছে?—আমি এর মধ্যে বারকয়েক হুইস্কি ঢেলেছি গলায়। সামনে আমার সপ্তম পেগটা ছিল। সেটা তুলে নিলাম।

কেয়া বলল, আমার কথার জবাব দাও।

বললাম, মানে?

You heard me.—কেয়ার কণ্ঠস্বর কঠিন।

আমি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলাম, এটা আমার শহর, আমার ঘর...।

ঘর?—কেয়া গর্জন করে উঠল, তোমার ঘর? তোমার আবার কোনওকালে ঘর ছিল নাকি? তুমি তো ঘর ভাঙতেই ওস্তাদ!

BanglaBook.org

তোমার ঘর ভেঙেছি নাকি?

মনে নেই?

বাজে কথা বোলো না, কেয়া। একটা মেয়ের সঙ্গে দিনকয়েক একত্রে বাস করলেই ঘর করা হয় না।

তাহলে আমায় তালতলার সেই ফ্ল্যাটে রেখেছিলে কেন?

তুমি যেতে চেয়েছিলে বলে।

আমায় বিয়ে করলে না কেন?—কেয়া গরম হচ্ছে।

বিয়ে? তোমায় বিয়ে? You got to be kidding. আর তা ছাড়া তুমি কি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলে নাকি? তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে নায়িকা হওয়ার জন্যে। আমি তোমায় সাহায্য করেছি। বিয়ে করার কথা তুমি ভাবওনি।

তুমি কী করে জানলে?

কেয়া, আমার নাম হিমাদ্রি। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে একটা ফ্ল্যাটে রাখিনি।

তবে কী জন্যে রেখেছিলে?

To give you a good start. তুমি নায়িকা হতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে ফিল্ম জগতের পাঁচটা লোক আসা-যাওয়া করবে সেজন্যে তোমার ভালো একটা বাসস্থানের দরকার ছিল। আর বিয়ের কথা বলছ? যদি আমাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে, তাহলে আমার অনুপস্থিতিতে কমলবাবু তোমার ওখানে রাত কাটাত কেন?

কথাটা শেষ করে গ্লাসটা আবার তুলে নিলাম। বললাম, আমি সব জানতাম, কেয়া, কিন্তু কিছু বলিনি। কারণ, it did not matter to me.

কেয়া আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

আমি বললাম, একটা কথার জবাব দাও, রঞ্জনকে কে খুন করেছে?

কেয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তাই বলো, তুমি তাহলে সেইজন্যেই এসেছ?

মনে করো, রঞ্জন এমন একজনকে চিনত—যার বর্তমান সামাজিক অবস্থা খুবই ভালো। টাকা-পয়সা-প্রতিপত্তি সবই আছে, অথচ অতীতে সে ছিল সামান্য একটি মেয়ে। নোংরা। গুণ্ডার রক্ষিতা—।

Stop.

হয়তো রঞ্জন তাকে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে প্রাণ হারাল।

Stop ! Stop ! তোমার একটুও পরিবর্তন হয়নি।

তোমার হয়েছে। থাকতে ক্রিক লেনের একটা বস্তিতে। কলেজে পড়তে। দু-বেলা পেট পুরে খেতে পেতে না। এখন তোমার কত দর, কেয়া?

কেয়া উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল : তোমাকে—তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।

ইতিমধ্যে সে চেষ্টা একবার হয়ে গেছে। তার ফল ভালো হয়নি। আচ্ছা কেয়া, বলো তো, আমার এই কলকাতা ফেরাটাকে কেউ পছন্দ করছে না কেন?

তার কারণ, তুমি একটা হিংস্র পশু—একটা অভিশাপ। তুমি তোমার চারদিকের আবহাওয়াটাকে দূষিত করে তোলো। আমরা যারা তোমাকে চিনতাম, কেউই তোমাকে কোনওদিন ভালোবাসিনি। আমরা তোমাকে ভয় পেতাম মাত্র। তুমি মানুষের শান্তি কেড়ে নাও। তুমি ঝড়। তুমি কিছুই গড়ো না। তুমি শুধু ভাঙতে শিখেছ। তুমি কোথায় ছিলে জানি না। তুমি সেই নরকে ফিরে যাও, হিমাদ্রি। এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখানে আর তোমার হুকুম চলবে না।

BanglaBook.org

কেয়া ভয়ানক উত্তেজিত হওয়ার দরুন ওর কণ্ঠস্বর খুব উঁচু পরদায় ঘোরাফেরা করছিল। ওর তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শুনে ওর সঙ্গে আসা সেই লম্বা-চওড়া লোকটি এবার দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল।

আমি আমার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এক নজরেই দেখে নিলাম তাকে। আমার সমান লম্বা। চওড়া কাঁধ ও বুক। হাতের কবজি বেশ চওড়া। শক্তি ধরে সন্দেহ নেই।

কেয়া লোকটাকে দেখিয়ে বলল, একে দ্যাখো, হিমাদ্রি। এর নাম পঞ্চা। সেন্ট্রালে এখন এরই হুকুম চলে। তোমার দিন চলে গেছে।

পঞ্চা কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে, কেয়া? এই লোকটা কি তোমায় ইনসাল্ট করেছে?

আমি অতি ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ালাম। চেয়ারটা পিছনে সরিয়ে দিলাম এক হাত। আমার ডানদিকে কেয়া। বাঁ-দিকে পঞ্চা। আমি কেয়ার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে বললাম, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি।

কেয়ার চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পঞ্চা বিজয়ীর ভঙ্গিতে বড় টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলল, অবিনাশদা, ওহে বীরেশ, মলয়া, তোমরা শোনো। এই বাচ্চা ছেলেটা কেয়াকে অপমান করেছে বলে ক্ষমা চাইছে।

অবিনাশদা এগিয়ে এসে বলল, পঞ্চা থাক। কেয়া হিমাদ্রির অনেক দিনের পরিচিত।

তা হোক। ওকে ক্ষমা চাইতে হবে সকলের সামনে।—আমাকে বলল, চাও, ক্ষমা চাও। শুনি তোমার ক্ষমা চাওয়ার ভাষাটা।

আমার চারদিকে বেশ ভিড় জমে গেছে। লিলি কখন একসময় লেডিস রুম থেকে এসে উৎকণ্ঠিত হয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে নিরস্ত হওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করছে।

আমি কেয়ার দিকে ফিরে বললাম, কেয়া, এককালে তুমি ভালো মেয়ে ছিলে। কিন্তু যেহেতু এখন তুমি এই পঞ্চার মতো একটা নেড়ি কুত্তার সঙ্গে মিশছ, তখন বলতেই হবে যে, তুমি এখন রাস্তার একটা কুত্তির চেয়ে বেশি কিছু নও।

পঞ্চার দিকে ফিরে বললাম, শুনলে আমার ক্ষমা চাওয়ার ভাষাটা? Now, what are you going to do about it?

চোখের কোণে দেখতে পেলাম, ম্যানেজার গুটিগুটি এগিয়ে যাচ্ছেন ফোনের দিকে।

এক ঘর লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পঞ্চার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তাকে এবং কেয়াকে কেউ এভাবে অপমান করতে পারে। পঞ্চার মুখ রাগে টসটস করছে।

আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সবটুকু হুইস্কি শেষ করে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা মলয়ার দিকে তাকালাম।

মলয়ার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। আমাকে তারিফ জানাচ্ছে চোখের ইশারায়।

হঠাৎ পঞ্চা একটা প্রচণ্ড ঘুসি চালাল আমার মুখ লক্ষ করে।

আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম। নিমেষে মাথা নীচু করে ছুড়লাম একটা তীব্র ঘুসি। লাগল ওর চোয়ালে।

ওর বিরাট শরীরটা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল 'বার'-এর ওপর। কয়েক মুহূর্ত পরে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতটা পকেটে দিয়ে আবার বার করে আনল। দেখতে পেলাম সে হাতে 'ব্রাস নাকল'।

আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুললাম। স্যার এটা ছেলেখেলা নয়। এবার পঞ্চার মুখে এক বীভৎস হাসি দেখা দিল। ওর সামনের সবকটা দাঁত ঝকঝক করছে।

পঞ্চা এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। ঠিক যেন একটা শিকারি বাঘ। আমার আর পঞ্চার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ছ'হাত। মধ্যে একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমি অতি দ্রুত আমার আক্রমণের ধারা ঠিক করে নিলাম।

আমি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে উলটে-পড়া চেয়ারের ওপর বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে হাই-জাম্প

BanglaBook.org

দিয়ে শূন্যে ভেসে গিয়ে পড়লাম পঞ্চার মাথার ওপর।

পঞ্চা ঘুসি চালাল। লাগল আমার ডান পায়ের উরুতে। পঞ্চা জানে না, নিজের কাঁধের সমান্তরাল কোনও লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঘুসি মারলেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা যায়। কেন না সেটাই আমাদের অভ্যাস। কিন্তু আমার শরীরটা ছিল শূন্যে—পঞ্চার মাথার ওপর।

ওর ঘুসিটা আমার লাগল বটে, কিন্তু তাতে কোনও জোর ছিল না। আমি ওর মাথার ওপর পড়লাম। পঞ্চা ঠিক এ ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আমরা দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। সেই অবস্থাতেই আমি জুতোর ডগা দিয়ে ওর পাঁজরে মারলাম গোটাকয়েক লাথি।

পঞ্চা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বেঁকে গেল। সেই সময়টুকুই আমার উঠে দাঁড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর ডানহাতের কবজির ওপর একটা পা রেখে প্রচণ্ড চাপ দিলাম। ওর মুঠো খুলে গেল। আমি ওর হাত থেকে 'নাকল ডাস্টার' খুলে নিলাম।

সুযোগ দিলাম ওকে উঠে দাঁড়াতে। কেন না এখানে অনেক দর্শক। এদের কিছু দেখানো দরকার।

পঞ্চা উঠে দাঁড়াতেই আমি আমার অভ্যস্ত 'রুটে' আক্রমণ করলাম। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওর পাঁজরার নীচে যকৃতের ওপর একটা বাঁ-হাতের স্ট্রেট পাঞ্চ আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর থুতনির নীচে ডানহাতের একটা 'হুক'।

পঞ্চা ছিটকে পড়ল। আবার উঠতে চেষ্টা করতেই ওর ঘাড়ের ওপর বসালাম একটা 'কাবাটি চপ'। পঞ্চা মুখ থুবড়ে পড়ল। এবার ওর ঘাড়ের কাছে কলার ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে আবার একটা পাঞ্চ করলাম ওর পেটে। পঞ্চা ছিটকে পড়ল, আর উঠল না।

আমি রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলাম। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, অদ্ভুত!

অবিনাশদা এগিয়ে এসে বললেন, একি ভোজবাজি নাকি! পঞ্চার মতো একটা বিরাট দৈত্যকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিলে?

আমিও এবার এক কুৎসিত হাসি হেসে বললাম, Training, অবিনাশদা। One should have training to do this kind of dirty job.

কেয়ার দিকে ফিরে বললাম, I can take over this city whenever I want to, These are all small time punks ! মনে রেখো, কেয়া, আমার নাম হিমাদ্রি সরকার। I am class one ! যাও, এবার ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করো। আমি জানি, you always fell for the big guys.

আমি জানি, এতগুলো ইংরাজি একসঙ্গে না বললেও চলত। তবু এসব ক্ষেত্রে ইংরাজি বললে ওরা বেশি প্রভাবিত হয়।

আমি চিবিয়ে-চিবিয়ে বললাম, আমি হিমাদ্রি সরকার ফিরে এসেছি। This city is mine. আমার বন্ধু রঞ্জনের খুনিকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ-শহর তোলপাড় করে ছাড়ব।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে আর-একটা হুইস্কির অর্ডার দিলাম। হুইস্কিটা এক চুমুকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখতেই দরজার দিকে চোখ পড়ল। জনকয়েক S. I. এবং কনস্টেবলের সঙ্গে ভেতরে এল বিকাশ চৌধুরি। মনে পড়ল, ম্যানেজারের ফোন করার কথাটা। এবার সত্যিই আমার বিপদ।

বহু বছর পর আজ আবার আমি আর বিকাশ মুখোমুখি।

বিকাশ সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

ম্যানেজার আমাকে এবং পঞ্চার অচৈতন্য দেহটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, সেন্ট্রালের এই প্রাক্তন রংবাজ বনাম বর্তমান রংবাজের ডুয়েল। ফল বর্তমান রংবাজের চৈতন্য লোপ। আমার দশটা গ্লাস ভেঙে চুরমার। একটা চেয়ারের পা নেই।

বিকাশ আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। চিবিয়ে

BanglaBook.org

চিবিয়ে বলল, So you are back ?

বললাম, You are not blind.

পঞ্চাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, একে তুই মেরেছিস?

আমি বিশ্রীভাবে হেসে বললাম, self-defence.

প্রমাণ?

এই একদল সম্ভ্রান্ত নাগরিক।

ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন মিস মলয়া দে। বললেন, আমি প্রথম থেকেই সব দেখেছি। পঞ্চা আগে মিস্টার হিমাদ্রি সরকারকে আক্রমণ করেছিলেন। উনি আত্মরক্ষার জন্যে...।

বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, যথেষ্ট। কিন্তু আমি ওকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাব।

এবার আমার প্রশ্ন করার পালা। বললাম, আমার অপরাধ?

দাঙ্গা। হত্যার চেষ্টা।

সাক্ষী?

এই জ্ঞানহীন দেহ।—পঞ্চাকে নির্দেশ করল বিকাশ।

কিন্তু অফিসার, ওটা তো অন্যভাবেও হতে পারে। It is only his words against mine.

বিকাশ চোখে আগুন ছিটিয়ে বলল, বেশি চালাক সাজবার চেষ্টা ভালো নয়।

আমি চালাক সাজবার চেষ্টা করছি না। শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি, তুমি একজন পুলিশ অফিসার। আইন রক্ষা করা তোমার কাজ। আইনের বাইরে পদক্ষেপ ঘটলে আমি তোমাকে...।

বিকাশ বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, কী করবি?

তুমি আমাকে এই মুহূর্তে যা করছ বা করতে চাইছ, ঠিক তাই করব।

Boy! হিমাদ্রি! তোর একটা শিক্ষা হওয়ার দরকার। You have gone too far!

That's right, Officer, and you can not do anything about it. হয় আমাকে arrest করো সকলের সামনে, নতুবা আমায় যেতে দাও। ওসব হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করার ভান করে জনতাকে ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতি পুরোনো হয়ে গেছে।

তুমি একজন পুলিশ অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করছ!

সকলের সামনেই করছি। আমি আগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। অথচ তুমি আক্রমণকারীকে ছেড়ে আমাকেই ধরতে চাইছ। এটা আইনের বিকৃতি।

পুলিশ হিসাবে বিকাশের খ্যাতি আছে। বিকাশ জানে, কোথায় কখন কোন কৌশল খাটাতে হয়। বিকাশ কেয়ার দিকে ফিরে বলল, কেয়া দেবী, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। আপনার কী বলবার আছে?

কেয়া আমার দিকে তাকাল। কেয়ার চোখে খানিকক্ষণ আগের সেই সাহস, সেই বিদ্রূপ আর দেখতে পেলাম না।

কেয়া চোখ নামিয়ে বলল, আমি কোনও অভিযোগ আনছি না। আমি পঞ্চার হয়েও বলতে পারি...।

বাধা পড়ল। পঞ্চা ওপাশ থেকে কাতরোক্তি করে নড়ে উঠল।

খানিক পরে দুজন কনস্টেবল ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। প্রায় আধ গ্লাস হুইস্কি এনে দেওয়া হল ওকে। এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করে পঞ্চা তাকাল আমার দিকে। কেউটের মতো দৃষ্টি। দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, কী হয়েছে?

বিকাশ প্রশ্ন করল, পঞ্চা, হিমাদ্রি তোমাকে আক্রমণ করেছিল?

পঞ্চা মাথা নেড়ে বলল, না। আমি পড়ে গিয়ে টেবিলে আঘাত পেয়ে...।

BanglaBook.org

স্টুপিড! সত্যি কথা বল।—বিকাশ গর্জে উঠল।

আমিও এগিয়ে গেলাম ঃ অফিসার, তুমি আবার জোর করে আমার নামে অভিযোগ আনছ।

পঞ্চা উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম হিমাদ্রি সরকার?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, অনেক দেরিতে চিনলে আমায়, পঞ্চা।

হিসাব মিটল না। একদিন না একদিন এ হিসাব আমি চুকিয়ে দেব। আমার নাম পঞ্চা। আমি পুলিশে নালিশ করি না।

আমি হেসে বললাম, আমি এখানে—মানে, এই শহরে পা দিয়েই তোমার নাম শুনেছি। এও শুনেছি যে, তোমার কাছে অন্তত নব্বই হাজার টাকার বেবিফুড আছে। রংবাজরা শিশুর খাদ্য নিয়ে কালোবাজারি করে না, পঞ্চা। তুমি শের নও—কুত্তা।

পঞ্চা কোনও উত্তর না দিয়ে কেয়ার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি পেছন থেকে ডাকলাম ঃ পঞ্চা, হিসাব চুকিয়ে এই নাক্‌ল ডাস্টারটা নিয়ে যেয়ো। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি কেয়ার আঁচলের নীচে লুকিয়ে থাকলেই ভালো হবে। এরপর আর কোনওদিন যদি আমার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ। যাও।

পঞ্চা বেরিয়ে গেল।

বিকাশ এতক্ষণ এসব শুনছিল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা তোকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। তোকে হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে।

বললাম, আমাকে নিয়ে যেতে হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমার মনে হয়, সেটা তুই করতে সাহস পাবি না। বিনা অপরাধে নাগরিকদের গ্রেপ্তার করার অপরাধে অনেক পুলিশ অফিসারের চাকরি গেছে।

কথা শেষ করে আমি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনে একদল লোক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি দরজার হাতলে হাত রেখে অরসন ওয়েলস-এর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালাম ঃ অবিনাশদা, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রঞ্জনকে তুমি চিনতে, এককালে তোমার ভোটের জন্যে সে রক্ত দিয়েছে। সেই রঞ্জন খুন হয়েছে—খুন, মানে মার্ডার। বিকাশ আমাকে উত্যক্ত করছে। ওকে জিগ্যেস করুন, রঞ্জনের খুনিকে কেন এখনও খুঁজে বার করতে পারল না।

দরজা খুলে আমি পথে নেমে এলাম।

॥ ৮ ॥

পথ প্রায় জনশূন্য।

হোটেলের সামনে খানকয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। আমি সামনেই যে-ট্যাক্সিটা পেলাম, তার পেছনের দরজা খুলে উঠে বসলাম।

কিন্তু আমার আগেই পেছনের আসনে বসে আছে মিস মলয়া দে।

আমি সিটে বসে চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই উনি বললেন, সত্যি বাঘের বাচ্চা বটে আপনি।

আপনি?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

বললাম, আপনার সাহস আছে।

মলয়া, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বললেন, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু।

BanglaBook.org

গাড়ি গতি নেওয়ার পর উনি আবার বললেন, আপনি এসব শিখলেন কোথায়?

কীসব?

ওই সব...ওই মারপিট?

জীবনের পাঠশালায়। তা ছাড়া আমি আর্মিতে যোগ দিয়ে যুদ্ধেও গেছিলাম।

তাই আপনার এত সাহস।

আমরা যারা সত্যিকারের সৈনিকের ট্রেনিং নিয়েছি, যাই করি না কেন, আমাদের মরাল অনেক হাই। কিন্তু আজকে সাহসের কী দেখলেন?

ওরে বাবা, পঞ্চাকে কে না ভয় পায়। ওর মতো নিষ্ঠুর লোক খুব কমই আছে। মধ্য কলকাতাটা ও নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। অবশ্য...।

অবশ্য?

অবশ্য বিদ্যুৎ রায় ওকে বাধা দিচ্ছে। বিদ্যুৎ রায়কে চেনেন? প্রচণ্ড এক ধনীর একমাত্র ছেলে। কিন্তু underworld-এর বড়-বড় হিরোরা ওকে ভয় করে। প্রচণ্ড সাহস আছে।

মনে পড়ে গেল আমার প্রথম যৌবনের কথা। অনেক দুঃসাহসী ঘটনা। অনেক কাহিনি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। শুধু মাঝে-মাঝে সেগুলো বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উঁকি মারে।

আমি উদাস হয়ে বললাম, এ-লাইনে সাহস না থাকলে হয় না।

তাই বলছি, সেটা আপনার আছে। আপনার শিক্ষা নিখুঁত।

শিক্ষা এবং চর্চা— অর্থাৎ practice—দুটোই চাই। কিন্তু এ-লাইনে যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার, সেটা সকলের থাকে না।

সেটা কী?

প্রতিভা। যার প্রতিভা আছে, তার সাহস, শিক্ষা এবং বুদ্ধি, এ তিনটেই আছে। প্রতিভা না থাকলে বেশিদিন এই ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না। পঞ্চার মতো ক্রিমিনালদের শুধু সাহস আছে। প্রতিভা নেই। সাহস আর প্রতিভা এক জিনিস নয়।

আশ্চর্য! আপনি এত সুন্দর ব্যাখ্যা কোথায় পেলেন?

বললাম তো, জীবনের পাঠশালায়। আমার বন্ধু রঞ্জনের সাহস ছিল, শিক্ষা ছিল। কিন্তু প্রতিভা ছিল না। আমি দীর্ঘ বারো বছর পর ফিরে এসে দেখছি, প্রতি পাড়ায় একটা করে রাজা। কলকাতাকে এরা ভাগ করে নিয়েছে। প্রকৃত প্রতিভার অভাবেই আজ এত রাজা মাথা তুলে উঠেছে।

সত্যি আপনি গ্রেট। এ-জগৎ সম্বন্ধে আপনার গভীর জ্ঞান আছে।

এই জগতের জন্যেই আমি ঘর ছেড়েছি। এই জগৎ আমাকে আমার সমস্ত প্রিয়জনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, মলয়া দেবী।

হঠাৎ মিস মলয়া আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, দেবী নয়, শুধু মলয়া। আপনি নয়, তুমি। ওতে বন্ধুত্বের সুবিধা হয়।

আমিও ওর হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, বেশ, তাই হবে।

কেয়াকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?

অনেকদিন ধরে। আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমিই ওকে প্রথম কমলবাবুর কাছে নিয়ে যাই। আমার অনুরোধ ফেলতে না পেরে শেষে কমলবাবু ওকে নায়িকা করেন।

আর বিনিময়ে কেয়া কী দিয়েছিল আপনাকে?

আমি মলয়ার চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো চকচক করছে। ঠোঁটের কোণায় হাসি। মলয়ার উরুর ওপর আমার ডান হাতটা রেখে বললাম, কেয়ার মতো একটা তাজা জিনিস কী দিতে পারে বলে তোমার মনে হয়? তুমি কী চাও, তাই বলো।

আমি আর কী চাইব? আমি...।

BanglaBook.org

একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্যাক্সিটা থেমে গেল। রাসবিহারীর মোড় এসে গেছে। মলয়া আবার নির্দেশ দিল। গাড়িটা ওর তিনতলা বাড়ির সামনে থামল।

তিনতলায় এলাম। ওর বসার ঘরে একটা সোফায় বসলাম। মলয়া হাসতে-হাসতে ভেতরে গেল কাপড় বদলাতে।

আমি চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম। ফিল্ম-দুনিয়ার অনেক লোককেই আমি চিনতাম এককালে। এরা বড় অদ্ভুত। এদের সব কাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বিত্তবান। প্রচুর ব্ল্যাকমানি।

মলয়া ভেতরে এল। পরনে একটা সিল্কের হাউস-কোট। সামনেটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চেরা। কোনও বোতাম নেই। মাঝখানে কোমরের কাছে একটা ফিতের বাঁধন। ফলে ওর শরীরের বিশেষ-বিশেষ অংশগুলো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

আমি ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মলয়া গাউনের ভেতর কিছুই পরেনি। কথাটা ভাবতেই আমার শরীরের ভেতর শিরশির করতে লাগল।

মলয়া অসামান্য সুন্দরী। সত্যিকারের একটা বন্য শরীর আছে। সরু কোমর, ভারী নিতম্ব আর সাঙ্ঘাতিক বুক। যেন র‍্যাক্যুয়েল ওয়েল্‌চ।

আমি ভেতর-ভেতর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মলয়া সেটা টের পেল। বলল, কী দেখছ?

তোমায়। তোমার শরীর। অপূর্ব!

কেয়ার চেয়েও?

কেয়ার মতো করে তোমাকে দেখার সুযোগ হয়নি।

মলয়া শব্দ করে হাসল। হাসলে মলয়াকে আরও সুন্দর লাগে। হাসি থামিয়ে বলল, কী দেব? জিন, হুইস্কি, না ইমপোর্টেড ব্র্যান্ডি?

বললাম, হুইস্কি।

মলয়া নিজেও নিল, আমাকেও দিল। হুইস্কি খেতে-খেতে গল্প হচ্ছিল। মলয়া ঘরে চলাফেরা করছে। আমি ভেতর-ভেতর উত্তেজিত হয়ে উঠছি। সম্ভবত সেটাই ছিল মলয়ার উদ্দেশ্য।

আমরা দুজনেই পরপর কয়েক পেগ শেষ করলাম। মলয়ার স্বর সামান্য একটু জড়িয়ে আসছে। আমারও বেশ নেশা ধরছে মনে হল। এর আগে হোটেলে তো কয়েক পেগ পান করেছি।

মলয়া আর-এক পেগ নিয়ে আমার পাশে বসল। বলল, ফিল্ম লাইনে এসেছি বছর পাঁচেক। কিন্তু fed up. এ-জগতের বাইরের লোকেদেরই বেশি ভালো লাগে। তোমার toughness আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তুমি সত্যিই আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। আমাকে তো দেখলে। আমাকে ভয় করছে না তোমার?

ভয়? ভয় কেন?

I can be dangerous.

মলয়া শব্দ করে হেসে উঠল। হাসি না থামিয়েই বলল, যে হরিণ নিজে ধরা দেয়, তাকে তির মেরে শিকার করতে হয় না।

গ্রিন সিগন্যাল। এগিয়ে চলো।

আমি হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানলাম। বিনা দ্বিধায় মলয়া চলে এল আমার দু-বাহুর মধ্যে।

বাইরে থেকে ওর শরীর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি সম্পদ আছে ওর শরীরে। র‍্যাক্যুয়েল ওয়েল্‌চ-এর মতো বন্য শরীরটা অনাবৃত হয়ে লেপটে গেছে আমার শরীরের সঙ্গে। ওর অনাবৃত দেহে আমার লোভী হাত আবিষ্কারের নেশায় ঘোরাফেরা করছে। মলয়া উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। আমি ওকে ধরে উঠে দাঁড়ালাম।

মলয়া হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েই পায়ে-পায়ে নিয়ে

BanglaBook.org

চলল শোওয়ার ঘরের দিকে।

শোওয়ার ঘরে এসে আমরা গড়িয়ে পড়লাম নরম বিছানায়। নরম বিছানা। একটা নরম পিচ্ছিল শরীর। পেটে প্রচুর সুরা।

কী এক অপূর্ব কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে মলয়া আমার কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলল। আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত বুলাতে লাগল। হঠাৎ ওর চঞ্চল ডান হাতটা থেমে গেল আমার বাঁ-দিকের বগলের নীচে। মলয়া এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল।

আমার বাঁ-দিকের বগলের নিচে sling-এ ঝোলানো ছিল ৯ মিঃমিঃ লুগার স্করপিয়ন। ওটা যে আমার কাছে থাকতে পারে, এ ধারণা মলয়ার ছিল না।

আর আমি তখনই সেই গন্ধটা পেলাম। আমি এই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার বুদ্ধির দরজায় ধাক্কা লাগল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সর্তক করে দিল। আমার চারদিকের বাতাসে বিপদের অদৃশ্য সঙ্কেত পেলাম।

আমি ডান হাত দিয়ে অটোমেটিকটা বাগিয়ে ধরে, বাঁ-হাত দিয়ে মলয়ার মুখটা চেপে ধরে খাটের উলটো দিকে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়লাম।

ফিসফিস করে বললাম, এতটুকু শব্দ কোরো না, মলয়া। করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

দ্রুত খাটের ওপর দুটো পাশ-বালিশ সাজিয়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দিলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকলেই সামনে খাটটা। আর খাটের পেছনে আমরা দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে আছি। আমাদের পেছনে দেওয়াল।

রুদ্ধশ্বাসে একহাতে অটোমেটিকটা বাগিয়ে ধরে, অন্য হাতে মলয়ার মুখ চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রথমে অন্ধকারে চলায় অভ্যস্ত কারোর মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট, পায়ের শব্দ পেলাম। তারপর প্রায় নিঃশব্দে সে ঘরের ভেতর এল। সেই গন্ধটা তীব্রতর হল। ট্রেনিংয়ের অভাব।

খাটের ওপর বালিশ দুটোকে লক্ষ করে গুলি চালাতে লাগল। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে শুধু 'প্লপ' 'প্লপ' করে কয়েকটি শব্দ হল মাত্র।

এসব কাজে নিখুঁত ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ওর ট্রেনিং নিখুঁত ছিল না। থাকলে ওর জানা থাকত যে, যে-কোনও প্রাণীর দেহে ওই তীব্র গতিবেগসম্পন্ন বুলেট লাগলেই সেই দেহ ঝাঁকানি খেত। ঘুমন্ত শরীরও কেঁপে উঠতে বাধ্য।

ওর ট্রেনিং নিখুঁত ছিল না। ঘর ছিল অন্ধকার। কাজেই ও লক্ষ করল না যে, যেখানে গুলি করা হল, সেখানে কোনও ঝাঁকানি বা কম্পন দেখা গেল না।

কাজ শেষ করে সে নিশ্চিন্তে ঘুরে দাঁড়াল যাওয়ার জন্যে। আমি ওর পেছনদিকে। মাত্র কয়েক পা ও এগিয়েছে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমি ওকে পেছন থেকে ডাকলাম, এই যে, এদিকে—।

সে বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার পিস্তলটা তুলতে গেল। তার আগেই আমি প্রসারিত বাঁ-হাতের কবজির ওপর ডান হাতের কবজিটা রেখে ট্রিগারে চাপ দিলাম। পরপর তিনটে বুলেট ছিটকে গেল প্রচণ্ড গর্জন করে।

আমি লাফিয়ে উঠে বাতিটা জ্বালালাম। সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ পেলাম, নীচে একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল ওর সহযোগী রূপে।

নিহত লোকটির দিকে তাকালাম। ওর বুকের বাঁ-দিকটা রক্তে ভিজে গেছে।

মলয়া উঠে এল। ভয়ে ওর মুখ রক্তহীন। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, আমি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব—এসব...।

আমি বাঁ-হাতের উলটো দিক দিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষালাম ওর গালে। মলয়ার জ্ঞানহীন

BanglaBook.org

দেহটা লুটিয়ে পড়ল খাটের ওপর।

আমি দ্রুত হাঁটু মুড়ে বসে নিহত লোকটার তল্লাশি নিতে লাগলাম। কিন্তু তার কাছে সেই কালো চশমাটা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। তার ব্যবহৃত পিস্তলটা স্পর্শ না করেই পরীক্ষা করলাম। এই একই ধরনের পিস্তলের আর-একজন অধিকারীকে আমি এর আগে খুন করেছি। একই পিস্তল। একই মেকার।

প্যাটার্নটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে। বলেছি সব অপরাধেরই একটা প্যাটার্ন থাকে।

আমার পিস্তলের শব্দে নিশ্চয় আশপাশের প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে গেছে। কেউ না কেউ নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে।

আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম পথে। প্রায় তিনশো গজ ছুটে আসার পর দেখতে পেলাম পুলিশের গাড়ি।

আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটা বন্ধ দোকানের অন্ধকার দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভ্যানটা প্রচণ্ড বেগে আমার সামনে দিয়ে মলয়ার বাড়ির দিকে চলে গেল।

আমি দুটো হাত পকেটে রেখে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে পেয়ে গেলাম একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিনিট দশেক পরে ট্যাক্সিটা এসে থামল হোটেলের ফুটপাথে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। ট্যাক্সিটা চলে গেল। হোটেলে ঢুকব বলে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে মনে হল আমি একটা গর্দভ। ভয়ানক ভুল করেছি।

আর কালক্ষেপ না করে আমি সেই শক্ত সিমেন্টের ফুটপাথের ওপরই 'ডাইভ' দিলাম। কেন না ততক্ষণে আমি দেখে ফেলেছি উলটোদিকের ফুটপাথে একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে—যার ইঞ্জিনটা চালু। গাড়ির পেছনের জানলা দিয়ে ধীরে-ধীরে একটা হাত বেরিয়ে আসছে। সে-হাতে একটা অগ্নেয়াস্ত্র।

আমি মাটিতে পড়ে গড়াতে-গড়াতেই আমার পিস্তলটা চেপে ধরেছি। গাড়ি থেকে বিরামহীন গুলি আমাকে লক্ষ করে ছুটে আসছে। আমার মাথার কাছে সিমেন্টের চলকা উড়ে গেল কয়েকটি বুলেট লেগে।

আমিও গাড়িটা লক্ষ করে গুলি চালালাম। এবার গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে হারিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে।

আমি সেই একইভাবে পড়ে রইলাম মাটিতে মিনিটখানেক। বুঝতে পারলাম, শত্রুপক্ষ অনেক বেশি তৎপর হয়েছে আমাকে শেষ করার জন্যে। আমি ওদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছি।

তাহলে কি টেপরেকর্ডারটা ওরা এর মধ্যেই নিয়ে গেছে? আমার 'ব্লাফ' কাজ করেছে। ওরা যত সক্রিয় হবে আমাকে মারার জন্যে আমার পক্ষে তত সুবিধা হবে ওদের কাছে পৌঁছতে।

এই পথই ঠিক পথ। এই পথেই রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে পাব।

আমি কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে হোটেলে ঢুকলাম। ওপরে এসে কাপড় ছেড়ে আগে স্নান করলাম।

আর স্নান করতে-করতে আমার দু-চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। কোনওরকমে স্নান সেরে শোওয়ার ঘরে এসে সুটকেস থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করতে গিয়েই থমকে গেলাম।

সুটকেসটা খাটের ওপরই ছিল। লকারের সঙ্গে একটা অতি সূক্ষ্ম তার দেখতে পেলাম। তারটা লকার থেকে সুটকেসের মধ্যে চলে গেছে।

আমি মুখ টিপে হাসলাম। আমার চারদিকে সাংঘাতিক মৃত্যুর জাল বিছানো।

আমি পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বার করে তারটা কেটে দিলাম আগে। তারে বিন্দুমাত্র টান

BanglaBook.org

পড়ল না।

সুটকেসটা খুললাম। ভিতরে আমার জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে আছে। আর, ঠিক মাঝখানে, আছে সেই বিস্ফোরক পদার্থটা। বিশেষ ধরনের একটা বোমা। তাতে বিদেশি ছাপ। চমৎকার পরিকল্পনা।

আমি পিনটা খুলে বোমাটা রেখে এলাম বাথরুমে।

মাত্র সামান্য অসাবধানতার জন্যে আজ হিমাদ্রি সরকার ইহলোক ত্যাগ করত।

হাতঘড়িতে ভোর তিনটে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৯ ॥

ঘুম ভাঙল দরজার কড়া-নাড়ার শব্দে। দরজা খুলেই প্রত্যাশামতো বিকাশকে দেখতে পেলাম। ওকে ভিতরে আসতে বলে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুমের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, নীচে একটা ভ্যান। অন্তত জনা বিশেক পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে আছে। পালানোর কোনও পথ নেই।

বিকাশ 'মেথড' মেনে চলে। বিকাশ সাবধানতা অবলম্বন করেছে। বিকাশ আমাকে খুব ভালো করেই চেনে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বোতলটা আবার বার করলাম।

বিকাশ আমায় গ্রেপ্তার করতে এসেছে। নার্ভগুলোকে আবার শক্ত করে নেওয়া দরকার। কেন না, এর পর বিকাশ ও তার কর্তারা আমাকে যে ধরনের প্রশ্ন করবে, তার উত্তর দিতে হলে নার্ভ চাই।

দু-তিন ঢোক পান করার পর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে খুঁজে পেতে এত দেরি হল কেন, বিকাশ?

মলয়ার জ্ঞান ফিরতে দেরি হল, তাই। আর this is murder ! আগে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা চলে না।

মেথড, অ্যাঁ? সত্যিই তোর প্রশংসা না করে উপায় নেই।—আমি হাসলাম।

But that does not help you.

I know, I know.

আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম। তারপর ওর সঙ্গে নেমে এলাম নীচে। লবিতে বেশ ছোটখাটো ভিড়।

যেতে-যেতে শুনতে পেলাম কে যেন কাকে বলছে, এরই নাম হিমাদ্রি সরকার। ভয়ংকর লোক।

আমি মুচকি হেসে এগিয়ে গেলাম। লবিতে একটা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ছিল। আমি এক মুহূর্ত থেমে হেডলাইনটা পড়লাম। বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে ঃ

নায়িকার শয়নকক্ষে খুন ঃ কলিকাতার পুরোনো গুণ্ডা হিমাদ্রি সরকারের পুনরায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

BanglaBook.org

আমি বিকাশকে অনুরোধ করলাম এক মিনিট অপেক্ষা করতে। তারপর ডায়াল করলাম সেই পত্রিকার অফিসে।

অনুরোধ করলাম 'নিউজ এডিটার'কে দিতে। নিউজ এডিটারের কাছে জানতে পারলাম, ওদের এই বিশেষ সংবাদের উৎস 'পুলিশ কমিশনার'।

পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে বললাম, পুলিশ আমার আবির্ভাবের খবর কাগজওয়ালাদের দিতে গেল কেন?

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বলল, হেডকোয়ার্টার্সের নীতি নিয়ে আমি আলোচনা করি না কোনওদিন, হিমাদ্রি।

কেন? ভয়ে?—আমি খোঁচা দিলাম।

না। Principle !

কিন্তু এখনও আমার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রমাণ হয়নি। এ ধরনের পাবলিসিটিতে আমার ক্ষতি হতে পারে।

এ Spade is a spade.

কিন্তু বিকাশ, আমি যে কোনওকালে ক্রিমিনাল ছিলাম, এটা আদালতে প্রমাণ হয়নি। নট অ্যান অ্যারেস্ট নো কনভিকশান। আমি একজন নাগরিক। আমার অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেটা তোমাদের দেখার কথা।

আমি বক্তৃতা শুনতে চাই না, হিমু। আমি দার্শনিক নই, সাহিত্যিক নই, রাজনীতিবিদ নই। আমি পুলিশ। আমি মনেপ্রাণে পুলিশ। আমি আমার ওপরওয়ালার আদেশ পালন করি মাত্র।

যন্ত্রের মতো।

রাইট। আর একটা কথা তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই। তোকে যিনি পাঁচ-পাঁচবার গ্রেপ্তার করেছিলেন, সেই অবনীবাবু এখন ডি-সি, ডি-ডি। তুই তাকে খুব ভালো করে জানিস। So you better behave youself ! Don't play it wrong.

Damn !—আমার অজান্তেই আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

আবার সেই লালবাড়ি! পুরোনো সিঁড়ি। এখানে আমি বহুবার এসেছি। এখানকার সব কিছুই আমার চেনা। বিশেষ করে সেই ভয়াবহ ইন্টারোগেশান রুম।

শুনেছি, আমেরিকা থেকে নাকি Lie Detecting Machine আনা হয়েছে। সর্বনাশ!

বিকাশ আমাকে ওর ঘরে এনে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। নিজে বসল টেবিলের ওপাশে নিজের আসনে। টেবিলটা থেকে খানকয়েক ফাইল সযত্নে তুলে ড্রয়ারে রাখল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর বিরুদ্ধে মার্ডারের চার্জ আছে। Now you tell me your story.

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গোটাকয়েক টান দিয়ে বললাম, কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে ইন্টারোগেশানের টেকনিক পালটেছে তোদের?

বিকাশ কঠিন কণ্ঠে বলল, tell me your story.

আমি একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, গতকাল পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে পঞ্চার সঙ্গে বিবাদ হওয়ার পর আমি মলয়ার সঙ্গে মলয়ার বাড়ি গেছিলাম।

মলয়াকে কোথায় পেলি? আমি তো তোকে একা বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

মলয়া আমার আগেই ট্যাক্সিতে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকেই ওর বাড়ি গেছিলাম।

কেন?

সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মলয়া এবং আমি ওর শয়নকক্ষে বসে গল্প করছিলাম।

গল্প? এবং সেটা শয়ন কক্ষে বসে!

হ্যাঁ। গল্প।

বাতি জ্বলছিল?

বিকাশ অত্যন্ত ধূর্ত। যদি বলি বাতি জ্বলছিল, তাহলে ও প্রশ্ন করবে, আততায়ী তাহলে

BanglaBook.org

নিশানা ভুল করল কেন?

আমি বললাম, বাতি জ্বলছিল।

তাহলে আততায়ী তোর কপালে গুলি না করে বালিশে গুলি করল কেন?

কারণ ও একটা বুদ্ধু। ওর training নিখুঁত ছিল না।

Explain. বিকাশ কঠিন কণ্ঠে বলল।

Murder is a dangerous game, বিকাশ। You must have the best training for this. He did not have this.

তারপর?

এ লাইনে আমি বহুদিন আছি। আমি জীবনের পাঠশালায় ট্রেনিং নিয়েছি। যে খুন করতে এসেছিল, তার একটা বাতিক ছিল।

সেটা কী?

Scent, সুগন্ধী দ্রব্য, deoderizer যাকে বলে।

লোকটার গায়ে scent ছিল?

হ্যাঁ। মলয়ার ঘরে সুন্দর গন্ধ ছিল। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমি সেই গন্ধ পেয়েই অনুমান করলাম আততায়ী খুব কাছেই—সম্ভবত সিঁড়িতে—দরজার বাইরে এসে গেছে।

Strange !

Training বিকাশ। আমি কোনওদিন challenge প্রত্যাখ্যান করি না। আমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে দেখছিলাম যে, আমার ধারণা সত্যি কি না। আততায়ী ঘরে ঢুকে গুলি চালাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে মরতে রাজি ছিলাম না।...এই হল আমার গল্প।

বিকাশকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সেও একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন টানতে লাগল। তারপর একসময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কী এক অজ্ঞাত কারণে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছিলি। তারপর আবার এক অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘ বারো বছর পর ফিরে এলি। আর সঙ্গে-সঙ্গে somebody wants to kill you. তারও কারণ অজ্ঞাত।

আমি হাসলাম।

বিকাশ বলল, কেউ তোকে খুন করতে চাইছে। কিন্তু কেন?

আমি মুখের ভাব পরিবর্তন না করে বললাম, আমি এর পরে আক্রান্ত হলে সুবোধ বালকের মতো এসে পুলিশের খাতায় ডায়েরি করব। কেমন?

বিকাশ টেবিলের ওপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, এসব চালাকিগুলো এখানে না করলেও চলবে। We know how to deal with you..

মলয়া দেবী কী বলেন?

তার মতে তুই আগে আক্রান্ত হয়েছিলি। কিন্তু আমরা তোকে চিনি, হিমু।

তার মানে? আমি আগে আক্রমণ করেছি?

না, কিন্তু কাউকে খুন করবার ইচ্ছা হলে তুই আগে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাস, যাতে করে সে আগে তোকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এবং তারপর তুই তাকে খুন করিস।

এর কোনও প্রমাণ নেই।

সেটাই সবচেয়ে অসুবিধায় ফেলেছে আমাদের। তোকে যদি এখন গ্রেপ্তার করি—ঘণ্টা-দুয়েক পরে বা কালকেই তুই জামিনে বেরিয়ে যাবি।

যাক, তাহলে তুই নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন।

কিন্তু হিমাদ্রি, তুই যে গল্প বললি, এইটুকুই সব নয়। তুই অনেক কিছু গোপন করছিস।

যেমন?

BanglaBook.org

এমন তো হতে পারে যে, মলয়া তোকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিল খুন করবার জন্যে।

মলয়া আমাকে খুন করতে চাইবে কেন?

সেইটাই তো আমি জানতে চাই।

আমি একটু হেসে বললাম, তোর নিজের কী ধারণা?

Something fishy. এটা একটা খুব সাধারণ গুণ্ডা-বদমায়েশের ব্যাপারে বলে মনে হচ্ছে না।

বিকাশ। এই জন্যেই ও আজ এত ওপরে উঠে এসেছে। ও জানে, সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করতে।

আমি বললাম, গতকাল পঞ্চার সঙ্গে আমার বিবাদের ঘটনা তো তোর জানা আছে। এমনও তো হতে পারে যে, পঞ্চারই দলের কেউ এসেছিল আমায় খুন করতে।

Don't bluff us, হিমু। আমি স্বীকার করছি যে, তোর উপস্থিতবুদ্ধির কাছে আমরা বহুবার হেরে গেছি। কিন্তু আজ তোকে যে spot-এ পেয়েছি, সেখান থেকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সর্বনাশ! আবার বিকাশের কথার মোড় ঘুরছে।

আমাকে হাজতে পুরলে আমি অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারব। কিন্তু ততক্ষণে রঞ্জনের খুনি অনেক দূরে চলে যাবে। সেটা আমি কোনওমতেই হতে দিতে পারি না।

বললাম, এটা যদি সাধারণ গুণ্ডা-বদমায়েশের ব্যাপার না হয়, তাহলে এটা কী?

বিকাশের চোখে ফিরে এল হিমশীতল দৃষ্টি। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, I will give you a chance.

কারণ?

কারণ আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ?

হয়তো এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এর পেছনে অনেক কিছু আছে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি তো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।

বিকাশ হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, বাংলাদেশে খুব গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, তাই না, হিমু?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাংলাদেশ? বাংলাদেশের সঙ্গে আমাকে খুন করতে চাওয়ার কী সম্পর্ক?

কিছুই না। Just a guess. লক্ষ-লক্ষ শরণার্থী আসছে ভারতে। ভারতের অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। পাকিস্তানও ভারতকে শত্রুরাষ্ট্র বলে ভাবে। এ-অবস্থায় ভারত আর নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। আমাদের ধারণা ভারত আক্রান্ত হবেই। এবং আধুনিক যুদ্ধে...।

হঠাৎ বিকাশ থেমে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। তারপর বলল, So, I am right ?

Right? Right about what ?

বিকাশ মুখ টিপে হাসতে লাগল। আমিও না হেসে পারলাম না। বললাম, তুই বলতে চাইছিস আধুনিক যুদ্ধে গুপ্তচরদের অবদান কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না?

Am I wrong ?

না। কিন্তু তবু আমি আমার সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধের কোনও যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছি না।

হিমু, I am just giving you some facts. আমরা আমাদের তিনটে মূল্যবান রত্নকে

BanglaBook.org

হারিয়েছি।

আমি এবার সোজা হয়ে বসলাম, What was that ?

আমরা আমাদের তিনটি অমূল্য রত্ন হারিয়েছি। একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে কলকাতার একটি হোটেলে। দ্বিতীয় জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে ঢাকায়। তৃতীয় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যারাকপুরে।

এই তিনজন কী ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিল?

They were trying to break a spy ring. এই তিনটি ভারতীয় এজেন্ট এসেছিলেন সেন্ট্রাল থেকে। তিনজনেই কাউন্টার spying এর জন্যে প্রসিদ্ধ।

॥ ১০ ॥

বিকাশ একটু থেমে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এইসব ব্যাপারের সঙ্গে তোর যোগ কোথায়?

আমার যোগ? আমার যোগ থাকবে কেন? আমি শুধু রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে চাই। আমার একটাই উদ্দেশ্য।

তুই আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বেশ এক্সপার্ট, তাই না?

সামান্য বুঝি।

মলয়ার ঘরে যে-লোকটার লাশ পাওয়া গেছে, তার হাতে যে-পিস্তলটা আছে, সেটা নিশ্চয়ই তুই পরীক্ষা করেছিস?

করেছি।

আরেকটা লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে দু-দিন আগে, কলকাতার আর-একটি হোটেল থেকে। তার হাতেও ঠিক ওই একই ধরনের একটা পিস্তল পাওয়া গেছে। দুটো পিস্তলই একটি বিদেশি রাষ্ট্রের ছাপ বহন করছে।

রাশিয়া?

হ্যাঁ। যতদূর জানি ওগুলো চিনকে দেওয়া হয়েছিল।

তাহলে কি এই গুপ্তচরবৃত্তির ভেতর চিনও আছে?

আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি শুধু factsগুলো সাজাচ্ছি। তোকে বোঝাতে চাইছি, উই নো দি গেম।

তাহলে আর আমাকে নিয়ে টানাটানি করছিস কেন?

বিদেশি পিস্তল যাদের কাছে পাওয়া গেছে, তারা তোকে খুন করতে চাইছে কেন?

কী করে বলব?

I am giving you a chance, হিমাদ্রি। আমার এই বন্ধুত্বটাকে বা এই সুযোগ দেওয়াটাকে আমার দুর্বলতা বলে ভাবলে ভুল হবে। আমরা শুধু জানতে চাই, তোর সঙ্গে এদের যোগাযোগটা কোথায়?

আমি আমার বন্ধুর মার্ডারারকে খুঁজছি, বিকাশ। আমার বন্ধু এককালে অতি সাধারণ গুণ্ডা ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় থাকে। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, সে কোনওদিন গুপ্তচর, বৃত্তি গ্রহণ করেনি।

বিকাশ চুপ করে বসে কী যেন ভাবতে লাগল। চিন্তা করলে বিকাশকে পুলিশ অফিসার মনে হয় না। মনে হয় দার্শনিক। অনেকক্ষণ পরে বলল, আমি একটা রিস্ক নিচ্ছি। তোকে একটা

BanglaBook.org

কথা বলতে চাই। গোপন কথা। তৃতীয় ব্যক্তি যেন না জানতে পারে।

A secret shared is never a secret halved, আমি বললাম।

জানি, কিন্তু তোকে এগুলো বলার কারণ তোর কাছ থেকেও আমি কিছু জানতে চাই। মাসখানেক আগে ডি. ডি.-র স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও মিলিটারি ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের কর্তাদের নিয়ে একটা ক্লোজ্‌ডডোর মিটিং হয়ে গেছে। সেখানে কী আলোচনা হয়েছিল জানি না, কিন্তু...।

বিকাশ ইতস্তত করতে লাগল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, কিন্তু এটা আমি শুনেছি যে, দিল্লি থেকে মিস্টার মালহোত্রা আসছেন।

মিস্টার মালহোত্রা। মন্ত্রী নাকি?

ওঁর নাম শুনিসনি?

আমি মন্ত্রীদের চিনি না।

উনি মন্ত্রী নন। শুনেছি তিনি একজন এক্সপার্ট। তাঁকে ছোটখাটো ব্যাপারে পাঠানো হয় না। তিনি নাকি একটা ব্যাপারে প্রায় একক। গুপ্তচর চক্রকে ভেঙে দিতে তাঁর মতো মাথা সারা দেশে নেই।

আমার এবার সত্যিই হাসি পেল। মনে হল মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে।

বিকাশ বলল, দুটো লাশের সঙ্গে দুটো বিদেশি পিস্তল আর মিস্টার মালহোত্রার কলকাতায় আসা—এই দুটো যোগ করলে কী দাঁড়ায়?

আমি বিরক্ত হয়ে আর-একটা সিগারেট ধরালাম। কয়েকটা টান দিয়ে বললাম, আমার কাছ থেকে কী জানতে চাস?

Where do you come in?

I don't. একটু থেমে বললাম, একটা জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে। হয়তো....mind that, হয়তো রঞ্জন কোনওক্রমে এদের বিছানো পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রঞ্জন। একজন 'হকার' এদের বিছানো পথের কাঁটা? তাহলে তোকে কারা খুন করতে চাইছে?

আমার ধারণা, রঞ্জন এদের গুপ্ততত্ত্ব জানতে পারায় এরা তাকে খুন করেছে। এবং এখন আমাকে খুন করতে চাইছে।

কিন্তু তোকে খুন করতে চাইবে কেন?

কারণ আমি রঞ্জনের বন্ধু। আমি—একমাত্র আমি হিমাদ্রি সরকার পারি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে।

একমাত্র তুই?

হ্যাঁ, একমাত্র আমি। পুলিশ পারবে না। কেন না, আমাদের সরকার তোমাদের পররাষ্ট্র-নীতি নিয়েছে। কোন রাষ্ট্র কবে আমাদের কোন আচরণে চটে যাবে, সেই চিন্তাতেই ভারত সরকার গলদঘর্ম। আর তোরা—এই পুলিশ বিভাগ? তোদের কথা শুনলেই দেশের লোক ঘৃণায় নাক সিঁটকোয়। এখানে এক নোংরা রাজনীতি চলছে।

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

মোটেই না। সরকারি নির্দেশ ছাড়া তোরা কিছুই তদন্ত করতে পারিস না। কেন না কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। কারণ প্রায়-সময়েই তোমাদের মহান দেশনেতারা সেই সব তদন্তের ফলে বিপদে পড়ে যান। আর তখনই তোমাদের চাকরি যায়, নতুবা অকালে অবসর নিতে হয়। একে বলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট?

সদ্য-আনা চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। বিকাশ গম্ভীর হয়ে বলল, তোর কথায় কিছু সত্য আছে।

কিছু সত্য? তুই বিবেকে হাত দিয়ে বল তো, গতকাল রাত্রে আমি যা করেছি, তা না করলে

BanglaBook.org

আমি প্রাণে বাঁচতাম? সংবিধান আমাকে অধিকার দেয়নি আমার প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার?

দিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ হওয়া চাই তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করছিলে, অপরের প্রাণ নিচ্ছিলে না। এবং তার জন্যে কোর্ট আছে।

পুলিশ—আগাগোড়া তুই একটা পুলিশ। তোর ভেতর কি আর কোনও অনুভূতি নেই?

যতক্ষণ আমার দেহে পোশাক আছে, ততক্ষণ আমি আর কিছু নই। আমি এখন 'অন ডিউটি'। কিন্তু তোর ওই সব বক্তৃতা আমি অনেক শুনেছি, হিমু। ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।

আমার ধারণা, রঞ্জনকে হয়তো এই গুপ্তচর চক্রের কেউ খুন করেছে। তাই যদি হয়, তাহলে রঞ্জন নিশ্চয় ওদের বিপদের কারণ হয়েছিল। রঞ্জন আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। বলেছিল ওর খুব জরুরি দরকার। ভীষণ বিপদ। সে জানত, খুব প্রয়োজন না থাকলে আমাকে চিঠি দেওয়া বা ডেকে আনা উচিত নয়।

কিন্তু সত্যিই রঞ্জন যদি এদের কোনও গুপ্ত কথা জেনেছিল, তাহলে পুলিশের কাছে এল না কেন?

কোন পুলিশের কাছে? যে-পুলিশ রাজনৈতিক নেতাদের আদেশে তাকে দু-বৎসর জেল খাটাল, সেই পুলিশের কাছে? কে তাকে বিশ্বাস করত? একটা জেলখাটা দাগি আসামির কথা পুলিশ বিশ্বাস করত? তারপর তাকে মরতেই হত ওদের হাতে।

আমরা ওকে প্রোটেকশান দিতাম।

প্রোটেকশান! আর হাসাস না বিকাশ! সেদিন ডালাসে চৌষট্টি জন সিক্রেট সার্ভিস মেন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ঘিরেছিল—কই, পারল তাকে প্রোটেকশান দিতে? পুলিশ কাউকে প্রোটেকশান দিতে পারে না।

তোর ধারণা...।

আমার ধারণা, একজন সাধারণ গুণ্ডা হঠাৎ স্বদেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। রঞ্জন সেই গুপ্ত কথাটা জেনেও চুপচাপ চেপে যেতে পারত। তাতে তার ক্ষতি হত না, কিন্তু দেশের ক্ষতি হত।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম যে, দেশের একদল শত্রু রঞ্জনকে মেরেছে। তারা গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার ধারণা ওটা হাইপথেসিস। কোনও প্রমাণ নেই।

হাইপথেসিস খাড়া করতেও প্রমাণ দরকার, হিমু।

Facts—আমার কাছে কতকগুলো facts আছে। তার ওপর নির্ভর করেই ওই ধারণা হয়েছে।

আমরা এক বন্ধুরাষ্ট্র মারফত জানতে পেরেছি যে, এখানে একদল গুপ্তচর কাজ করে চলেছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করলাম, এই গুপ্তচরেরা কোন লাইনে কাজ করছে?

আমি ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, আসন্ন যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করাই এদের উদ্দেশ্য।

মিলিটারি সিক্রেট?

আমার মনে হয়। হিমু, আমি তোকে জামিনে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা আমি ব্যক্তিগত রিস্কে করছি। কিন্তু এক শর্তে—।

কী শর্তে?

তুই পুলিশকে সাহায্য করবি।

তোর মাথার ঠিক আছে তো?

BanglaBook.org

কেন?

আমি আর যা-ই কিছু করি না কেন, পুলিশ হতে পারব না। পুলিশ আমার চিরকালের শত্রু।

কিন্তু পুলিশ হওয়ার সব যোগ্যতাই তো তোর আছে। আমরা দুজনে ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা অনায়াসে কাঁধে-কাঁধ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম। অথচ নিয়তির কী পরিহাস। ভাগ্যচক্রে তুই আজ লাইনের ওপারে। আমি এপারে।

তা হয় না, বিকাশ।

কেন হয় না?

হয় না, কারণ আমি পুলিশকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

মুহূর্তে বিকাশের মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি দেখতে পেলাম, ওর ডান হাতটা কাঁপছে। অনেকক্ষণ পর বিকাশ বলল, O. K. We will deal this in a different way. আমি তোকে জামিনে ছাড়ছি। You go out and hunt that killer of your friend. কিন্তু যে-মুহূর্তে এই গুপ্তচরচক্রের বিষয়ে কোনও ক্লু, কোনও সংবাদ তোর কাছে আসবে, you bring it to us.

রেগে গেলে বিকাশ খুব ইংরাজি বলে।

আমি বললাম, কেন?

কারণ, রঞ্জনের খুনিকে ধরা আর আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের সঙ্গে লড়াই করা এক কথা নয়, হিমু। It is just too big for you.

তার মানে, আমি পুলিশকে সাহায্য করার বদলে পুলিশ আমাকে সাহায্য করবে, যদি এই গুপ্তচররাই রঞ্জনের খুনি হয়ে থাকে?

ঠিক তাই। পঞ্চার মতো দু-একটা গুণ্ডা-বদমায়েশকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা হয়তো তোর আছে। কিন্তু একটা well organised spy ring-এর সঙ্গে লড়াই করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়।

বললাম, এটা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচার করে দেখব কোনটা পুলিশকে বলা দরকার। I am not interested in any spy business.

আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম, রঞ্জন যদি সত্যিই এই গুপ্তচরদের হাতে প্রাণ দিয়ে থাকে, তবে this is your game.

হ্যাঁ, কিন্তু আর-একবার বলছি, হিমু, তোর কি ফিরে আসার কোনও উপায় নেই?

আমি তো দেশে ফিরে এসেছি।

দেশে নয়, হিমু। সমাজে।

সমাজে?

হ্যাঁ। Can't you leave that underworld? সুস্থ নাগরিকের মতো জীবনযাপন করা কি সম্ভব নয়?

অনেক দেরি হয়ে গেছে বিকাশ। আমি গলা পর্যন্ত জলে নেমে গেছি। আমার শত্রু অনেক। আমি এ-জগৎ ত্যাগ করলেই তারা আমায় খুন করবে।

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতে গেলাম। বিকাশ বলল, আর একটা কথা হিমু—।

কী?

সেই অস্ত্রটা। The gun—যেটা কাল ব্যবহার করেছিলি—।

বলেছি বিকাশ মেথড মেনে চলে। কোনও সময়েই কর্তব্যচ্যুত হয় না।

কী হবে?

তুই জানিস কী হবে। ব্যালিস্টিক টেস্ট। ফোরেনসিক রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

আমি কোটের ভেতরে হাত দিয়ে পিস্তলটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। আমি জানি

BanglaBook.org

আমাকে আর-একটা পিস্তল জোগাড় করতে হবে। আমি জানি কোথায় সেটা পাব। আমাকে বরাবর সেই একই উৎসে ফিরে যেতে হয়।

পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে জিগ্যেস করলাম, মিস্টার মালহোত্রা কবে আসছেন?

দিন সাতেকের মধ্যে। আমরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তিনি এলে তার নির্দেশ মতোই চলতে হবে আমাদের। কিন্তু...।

কিন্তু?

উনি আসার আগেই কলকাতা পুলিশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এই অপারেশন শেষ করতে চাই।

আমি আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে বিকাশ বলল, Stay away from that snake.

বিদ্যুৎবেগে আমি ফিরে দাঁড়ালাম : কে? মলয়া দে?

She is trouble. ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে জানিস?

কে? অবিনাশদা?

না, পুলক সেন।

পুলক সেন!—নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ, পুলক সেন।

লোকটা কে?

You will find out.

আমি নামটা মনে-মনে বারতিনেক উচ্চারণ করলাম। তারপর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললাম, আমার ওপর তোর এত বিশ্বাস দেখে কৃতজ্ঞ হলাম।

তার কারণ আমরা বন্ধু, হিমাদ্রি। আমি আজও বিশ্বাস করি, তুই কলকাতায় ফিরে আসতে পারিস, আবার সাধারণ নাগরিকের মতো জীবনযাপন করতে পারিস। It is never too late.

এই সমাজের সব লোকগুলোই তোর মতো উদার নয় বিকাশ। সমাজের সর্বস্তরে পাপ ঢুকেছে। এ-সমাজ পায়ে-পায়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে।

সমাজের সব লোকই খারাপ নয়।

ভালো মানুষ আছে—তবে সংখ্যায় খুব কম। তারা ভয়ে লুকিয়ে গেছে।

দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুটপাথে পা দিলাম। একটা পেপার কিনলাম ফুটপাথ থেকে। মলয়ার বাড়িতে নিহত লোকটার ছবি ছাপা হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠায়।

বিকাশের সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। রঞ্জন নিহত হয়েছে একটা গুপ্তচর-বাহিনীর হাতে। গুপ্তচররা সাধারণ মানুষকে খুন করে না। রঞ্জনকে যখন তারা খুন করেছে, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গুরুতর কারণ আছে।

সেই গুরুতর কারণেই রঞ্জন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল।

আমি কলকাতায় পা দিয়েই শুনলাম রঞ্জন নিহত হয়েছে। ওর বাড়ি এসে শুনি চোর এসেছিল।

রঞ্জনের ঘরে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। অর্থাৎ, নিপুণভাবে তার ঘরের তল্লাশি নেওয়া হয়েছে। রঞ্জনের প্রতিবেশীরা যেটাকে চোরের কাজ বলে মনে করছে। তল্লাশি যারা নিয়েছিল, তারা এ-কাজের ট্রেনিং নিয়েছে।

কিন্তু তল্লাশি কেন? কী খুঁজছিল তারা? তবে কি রঞ্জনের কাছে এমন কিছু ছিল, যার জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?

কিন্তু তারা যে-জিনিসটা খুঁজছিল, সেটা তারা পায়নি। বিকাশের অফিস থেকে বেরিয়ে আমার মনে হল, সেই জিনিসটা খুঁজে বার করতে হবে।

BanglaBook.org

যেভাবে রঞ্জন মৃত্যুবরণ করেছে, ঠিক সেইভাবে আমাকে হত্যাকারীর কাছে পৌঁছতে হবে।

কিন্তু তার আগে আমাকে দু-চারজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কলকাতার হিরোরা জানুক যে আমি ফিরে এসেছি।

॥ ১১ ॥

তালতলা এলাকার সারেং লেনে যখন ঢুকলাম, তখন আমার মনে পড়ে গেল অতীতের অনেক কথা।

এখানে প্রথমেই দেখা করলাম প্রণব রোজারিওর সঙ্গে। বাঙালি খ্রিশ্চান। বিদেশি সাহেবরা নিজেদের দেশের পদবি দিয়ে দিয়েছেন এদের অনেককে। ব্রিটিশ আমলে এরা এটা পছন্দ করত। তখন বিদেশি পদবিওয়ালা খ্রিশ্চানদের চাকরি জুটত সহজে।

প্রণব রোজারিওকে আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করতাম। তার কারণ ছিল অনেক।

প্রণব একাই রংবাজি করত। কোনও দল ছিল না। ও কোনওদিন কোনও সম্রাটকে ভয় করত না। আমাকেও না।

ওকে একবার তুলে এনে প্রচণ্ড বিট (ধোলাই) দিয়েছিলাম। তবু প্রণব আমার দলে যোগ দেয়নি।

রক্তাক্ত মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বলেছিল, আমি ভাওয়ালের লোক, হিমু। আমায় ধোলাই দিয়ে কিছু হবে না।

প্রণব ওর ঘরেই ছিল। দোতলা বাড়ি। সুন্দর সাজানো। রোজারিও পয়সা করেছে। আমাকে দেখে হাসল। বলল, এসো, এসো। শুনেছি তুমি আবার ফিরে এসেছ, এবং ফিরে এসেই কলকাতা তোলপাড় করছ।

তোমার খবর কী?

আমার সেই একই খবর। একই ব্যাবসা—ডকের কাজ। তা হঠাৎ পঞ্চার সঙ্গে ঝগড়া হল কেন?

পঞ্চাকে বুঝিয়ে দিলাম আমি ফিরে এসেছি।

তোমার চারদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, হিমাদ্রি।

তাই নাকি?

তুমি জানো গতকাল রাত্রে প্রীতম সিংয়ের ওখানে তিন ঘণ্টা ধরে মিটিং হয়ে গেছে?

শুনিনি তো।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত এলাকা থেকে সম্রাটরা আর তাদের মন্ত্রীরা একত্রিত হয়েছিল।

কী জন্যে?

তোমাকে শেষ করার জন্যে। ওরা বেশ পয়সা করছিল, সুখে রাজ্য শাসন করছিল। তুমি এসে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ। ওরা বলছে, হিমাদ্রি থাকতে আমাদের কোনও চান্স নেই।

বেশ, ভালো কথা। আমি চাইছিলাম, আমার প্রত্যাবর্তন সংবাদ যেন ওদের কাছে পৌঁছয়। আমি চাই ওরা আগে 'মুভ' করুক।

কিন্তু কেন, হিমাদ্রি? তুমি ফিরে এসেছ—ভালো কথা। তুমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ফিরে পেতে চাও, তাও মেনে নেব। কিন্তু সমস্ত কলকাতা তোলপাড় করার কী কারণ?

আমার বন্ধু রঞ্জনের খুনিকে চাই। আমার বন্ধু রঞ্জন খুন হল আর কেউ তা দেখেনি, কেউ কিছু জানে না—এটা আমি বিশ্বাস করি না।

BanglaBook.org

কিন্তু কেউ কিছু জানলেও কি সাহস করে বলবে?

যার ভয়ে বলছে না, তার চেয়েও যদি আমাকে বেশি ভয় করে, তবে নিশ্চয়ই বলবে।

হিমাদ্রি, যুগ পালটে গেছে।

যুগটা একটা বা একদল লোক পালটেছে। সেই লোকগুলোকে শায়েস্তা করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রোজারিও চুপ করে রইল। চা নিয়ে এল ওর ভৃত্য। চায়ে চুমুক দিয়ে ও বলল, কী করতে চাও তুমি?

প্রত্যেক এলাকায় এখন সম্রাট আছে, তাই না?

হ্যাঁ।

তাদের পরের ধাপে আছে তাদের চামচারা।

ঠিক।

কিন্তু কিছু-কিছু লোক আছে যাদের সাহস অনেক বেশি, কিন্তু কোনও দলে নেই। যেমন তুমি।

তাদের পাবে কী করে?

টাকা খরচ করে তাদের একত্রিত করতে হবে। যদি এই underworld থেকে রাজনীতিকদের সরানো না যায়, তাহলে—।

এটা খুবই কঠিন কাজ, হিমাদ্রি।

আই উইল ডু দিস। আমি একদিন এ-কাজ করেছিলাম। এই কলকাতার সম্রাট আমরা। যারা রাজনীতি করে তারা নয়। তাদের উস্কানিতে, তাদের স্বার্থ রাখার জন্যে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরব না। এটা বোকামি।

প্রোটেকশান দেবে কে?

Organized হলে প্রোটেকশান পাওয়া যাবে। পুলিশ চিরকাল সমাজবিরোধীদের পক্ষে, কারণ এই underworld এর লোকেরাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল রোজারিও। ওর সাহস সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সারা কলকাতার self-operator-রা ওকে চেনে। কেউ ওকে বিরক্ত করতে সাহস পায় না। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, ঠিক আছে, আমি আরও দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু লাখখানেক টাকার দরকার এর জন্যে।

পাওয়া যাবে। Organized way-তে একমাস অপারেশন করলেই পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, তাই হবে।

আর-একটা কথা, ইনফরমার নিতাইকে কোথায় পাব?

তাকে কী দরকার?

দরকার আছে।

রোজারিও ওর পার্শ্বচরকে আদেশ দিল নিতাইকে ধরে আনার জন্যে।

নিতাই এল মিনিট দশেক পরে। আমাকে দেখে বেশ ভয় পেল।

নিতাইকে উদ্দেশ করে বলল রোজারিও, একে চিনিস, নিতাই?

না তো!

হিমাদ্রি সরকার—হিমু। কাল পঞ্চাকে যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

এবার চিনেছি।

আমি বললাম, তুমি সারা কলকাতার খবর রাখো। সকলে কী বলছে?

সেন্ট্রালের প্রত্যেক থানার বড়বাবুরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। প্রত্যেক পাড়ার রাজারা

BanglaBook.org

বারবার মিটিং করছে। আর পুরোনো রংবাজরা এবং উঠতিরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। শিগগির ওরা আপনার সঙ্গে দলে-দলে এসে দেখা করবে। চারদিকে একটা হইচই পড়ে গেছে।

তোমার কী মনে হয়, আমি জিতব?

আপনি কোন পার্টি করেন? মানে, কোন মন্ত্রী আপনাকে ব্যাকিং করছে?

প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী? ভারতের প্রধানমন্ত্রী?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি।

নিতাই বোকার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি বললাম, আমি কোনও ব্যাকিং নিয়ে কাজ করি না, নিতাই। কিন্তু পুলিশ আমায় বিরক্ত করবে না।

ব্যস। ওইটাই দরকার। তাহলেই আপনি জিতবেন।

কেষ্টপদ কোথায়?

কে?

কেষ্টপদ গড়াই।

রোজারিও বলল, ঠিক জবাব দিবি, নিতাই, নতুবা মাথা ভেঙে দেব।

কেষ্টপদ...কেষ্টপদ তিনদিন আগে...।

নিতাই!—ধমকে উঠল রোজারিও।

কেষ্টপদ রাজাবাজারে আছে। ইজরাইলের ঠেকে।

আমি রোজারিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। আগে একটা পিস্তল জোগাড় করলাম। তারপর ট্যাক্সি করে সোজা চলে এলাম রাজাবাজার।

॥ ১২ ॥

রাজাবাজারে এসে একটা অতি নোংরা স্যাঁতসেতে গলিতে ঢুকলাম।

ইজরাইল নিজের দরজার ওপরেই বসেছিল। আমাকে দেখে চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আরে হিমুবাবু, আপনি? এক জমানাসে আপকো দেখা নেহি।

বেঁচে আছি, ইজরাইল।

শুনলাম, আপনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

কার কাছে শুনলে?

কাল বেলঘরিয়া গিয়াছিলুম। আপনার পুরোনো দোস্ত অপূর্ব ঘোষ বলল, আপনি আসিয়েছেন। সব এলাকামে হইচই। পুরোনো দোস্তরা আবার আপনাকে বাদশা বানাবে বলছে।

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, তোমার চুলে পাক ধরে গেল, ইজরাইল। অনেক বদলে গেছ।

আপভি বদলে গেছেন। হিপিদের মতো বড়-বড় চুল রাখিয়েছেন। সাহেবদের মতো দামি স্যুট পরেছেন। অনেক বড় নোকরি পাকড়েছেন নাকি?

আমি লাইন বদলাইনি, ইজরাইল। চাকরিও করি না। এসব এমনি-এমনি এসে যায়।

পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, আমার খবর দরকার।

কিন্তু টাকা দিচ্ছেন কেন? এক জমানামে আপনি আমার বহুত মদত করেছেন। বলুন, কী জানতে চান?

BanglaBook.org

রঞ্জনকে তোমার মনে আছে?

মুখ কালো হয়ে গেল ইজরাইলের। মনে হল ভয় পেয়েছে।

বললাম, রঞ্জনকে কেউ খুন করেছে। আমি জানতে চাই, রঞ্জন কেন খুন হল।

চলুন, ভেতরে চলুন।

ইজরাইল আমাকে নিয়ে গেল গলির আরও ভেতরে। একটা ছোট্ট দরজায় টোকা দিল। অনেকক্ষণ পর কে যেন দরজা খুলল। আমি অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখতে পেলাম না।

ইজরাইল বলল, ভয় নেই কেষ্টা, পুলিশ নয়। আমাদের পুরোনো দোস্ত।

ভিতরে এলাম। এবার চিনতে পারলাম লোকটাকে। সেই চোদ্দো-পনেরো বছর আগে খুনের আসামি কেষ্টপদ আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। রঞ্জনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

বললাম, কী খবর, কেষ্টা? কেমন আছ?

কেষ্টা কোনওরকমে ঢোক গিলে বলল, হিমুদা, তুমি আবার কলকাতায় কবে এলে?

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, আমি জিগ্যেস করেছি, তুমি কেমন আছ?

ভালো...ভালোই আছি।

কিন্তু তুমি খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?

ইজরাইল জবাব দিল, কয়েকদিন ধরে কেষ্টা বেরোচ্ছে না, এখানেই ঠেক নিয়েছে।

কেন কেষ্টা, কী হয়েছে?

হঠাৎ কেঁদে ফেলল কেষ্টা। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, হিমুদা, আমার বড় বিপদ। ওরা আমাকেও খুন করবে।

কারা খুন করবে?

ওরা...ওরা...।

আমি প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় কষালাম ওর গালে। কেষ্টা ছিটকে পড়ল। ঠোঁট থেকে দু-এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, আমার কাছে নক্সাবাজি নয়, কেষ্টা। রঞ্জন কীভাবে মরল? কে বৈঠকবাজি করেছে?

কেষ্টা উঠে গিয়ে সামনের সেল্‌ফ থেকে একটা বোতল বার করে পান করতে লাগল।

ইজরাইল বলল, এ ক'দিন ধরে শুধু শরাব খাচ্ছে।

খানিকবাদে আবার আমার সামনে বসল কেষ্টা।

বলল, রঞ্জনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, হিমুদা। রঞ্জন মরল, কষ্টেণ সে সৎ হতে চেয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে রঞ্জন কোনও কাজই পেল না। ও যখন মাস তিনেক অর্ধাহারে এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, আমিই ওকে ট্রেনে হকারির লাইনে নিয়ে যাই।

বলে যাও।

হকারিতে বেশ দু-পয়সা হচ্ছিল। হঠাৎ এই হপ্তা দেড়েক থেকে ও কাজে যাওয়া বন্ধ করল।

একটু থেমে আবার বলল, ইদানীং রঞ্জন চুপচাপ বসে থাকত ঘরে। বলত, আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এলে তার কথা মতো কাজ করব। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রঞ্জন ভয় পেয়েছিল। সবসময় ওকে খুব চিন্তিত দেখাত।

রঞ্জন কার জন্যে অপেক্ষা করছিল?

জানি না। অনেক জিগ্যেস করেও জানতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জন কি জানত যে, তুমি আসছ?

BanglaBook.org

তুমি গল্পটা শেষ করো, কেষ্টপদ। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।

একদিন ওকে বোঝাবার জন্যে ওর ওখানে গেলাম। সঙ্গে একটা বাংলা বোতল ছিল। সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। একসময় আমি বাথরুমে গেলাম। ফিরে আসার সময় দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, ঘরের মধ্যে দুটো ষণ্ডামার্কা লোক রঞ্জনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চুপকি দিয়ে ছপ্পড়ে সেঁটে গেলাম। একজন ষণ্ডামার্কা লোক প্রশ্ন করল, তোমার নাম রঞ্জন?—রঞ্জন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে আর একজন বলল, তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসছি।—তার হাতে একটা পিস্তল ছিল। আর একটা কার্ড ছিল। রঞ্জন কার্ডটা পরীক্ষা করে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আমি ধাঁ করে বাথরুমে সেঁটে গেলাম। দেখি, ওরা রঞ্জনকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন বলছে, আমাদের সামনে-সামনে চলো। চালাকি করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। আমি লোক দুটোকে দেখলাম। যেন আর্মির কোনও অফিসার। যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য, অনেকটা তোমার মতো।

ওদের দেখলে চিনতে পারবি?

একশো বার। আমি ভালো করে ওদের খুমা মেপে রেখেছি। একজনের বাঁ-চোখের ওপর একটা কাটা দাগ ছিল। কিন্তু ওরা কারা জানি না, কিন্তু পরের দিনই রঞ্জনের লাশ পাওয়া গেল। ওরাই বোধহয় রঞ্জনকে মেরেছে।

আমি সেদিনকার দৈনিক পত্রিকাটা ওর সামনে মেলে ধরে বললাম এই লোকটাকে চেনো?

এই তো! ওদেরই একজন। ওই তো বাঁ-চোখের ওপর কাটা দাগ।—কেষ্টা কাগজটা পড়তে লাগল।

আমি বললাম, তাহলে এ-লোকটা আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।

কী করে মরল লোকটা?

কাগজে একটা গল্প দিয়েছে। আসলে আমি হাতের টিপ প্র্যাকটিস করছিলাম। একটা নয়, তিনটে বুলেট ওর হৃৎপিণ্ডে গিয়ে লেগেছে।

তুমি...তুমি মারলে? পুলিশ ধরল না তোমায়?

আমি সেই বিশ্রী হাসিটা হাসতে-হাসতে বললাম, পুলিশ আমায় ধরে না। ধরলেও বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারে না।

কেষ্টার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। বলল, তুমি কোথা থেকে আসছ, হিমুদা?

আমি হাসলাম। উত্তর দিলাম না।

তুমি....তুমি কী করতে এতদিন?

এই একই ব্যাবসা।

কোথায়?

বোম্বাই...দিল্লি...মাদ্রাজ সর্বত্র।

কী বলছ, হিমুদা!

হ্যাঁ, কেষ্টা। তোমরা এখানে কার জোরে রংবাজি করো?

মিনিস্টারদের জোরে।

শুধু মিনিস্টার নয়, কিছু-কিছু এম-পি, কিছু-কিছু মেরুদণ্ডহীন পুলিশ অফিসারদের সাহায্যও দরকার হয়। তাই না?

ঠিক বলেছ।

রঞ্জন কি কোনও নতুন দলে ভিড়ে ছিল? ওরাই কি বৈঠকবাজি করে রঞ্জনকে মারল?

BanglaBook.org

রঞ্জনকে ওরা কোনও গোপন আস্তানায় ধরে নিয়ে গেছিল। ওরা রঞ্জনের কাছে কিছু চাইছিল। অত্যাচার করেও যখন সেটা পেল না, তখন ওকে খুন করল।

কিন্তু কী জিনিস তারা চাইছিল?

এমন একটা জিনিস, যার জন্যে বিনা দ্বিধায় মানুষকে খুন করা যায়। আমিও জানতে চাই, সেটা কী জিনিস।

কেষ্টা ভ্রূকুটি করে বলল, কী এমন জিনিস হতে পারে? একজন ট্রেনের হকার কী এমন জিনিস পেতে পারে, যেটা ওই সব ভয়ংকর লোকেদের কাজে লাগবে! টাকাপয়সাও তো রঞ্জন নিত না। একবার একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল ট্রেনে হকারি করার সময়। ব্যাগ ভরতি টাকা ছিল। অথচ রঞ্জন সেটা জমা দিয়েছিল।

কী বললে?

বলছি, অপরের টাকাতেও রঞ্জনের লোভ ছিল না। এক ব্যাগ ভরতি টাকা পেয়েও রেলওয়ের 'হারানো-প্রাপ্তি' বিভাগে জমা দিয়েছিল।

আমার মাথার ভিতর দপদপ করে আওয়াজ হতে লাগল। একটা কীসের সংকেত পেলাম মাথার মধ্যে।

আমি একটা একশো টাকার নোট কেষ্টার হাতে দিয়ে উঠে পড়লাম।

॥ ১৩ ॥

হারানো-প্রাপ্তি ডিপার্টমেন্টে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে-বসে বিড়ি টানছিলেন। আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা একশো টাকার নোট বার করলাম। ভদ্রলোকের চোখজোড়া বড়-বড় হয়ে উঠল। বললাম, এটা কি আপনার দরকার?

মানে?—ভদ্রলোক জোরে-জোরে বিড়ি টানতে লাগলেন।

মানে এটা আপানাকে দিতে পারি।

কাকে খুন করতে হবে?—ভদ্রলোক রসিকতা করলেন।

খুন নয়। এমন একজনের বিষয় খবর দেবেন যে নিজেই খুন হয়ে গেছে।

মানে মৃত?

মৃত।

তাহলে মর্গে যান, নতুবা প্ল্যানচেট করুন।

আমি রঞ্জনের খবর চাইছি।

কোন রঞ্জন? যে হকারি করত?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আরাম করে বসলেন : দিন দুয়েক আগের কাগজেই পাবেন। একটা অদ্ভুত চরিত্র। স্ট্রেঞ্জ।

কেন?

আরে মশাই, সামান্য একটা হকার, একসঙ্গে অত টাকা পেয়েও নিলে না। অথচ শুনেছি, এই রঞ্জন নাকি এককালে কলকাতার এক বিরাট গুণ্ডার ডানহাত ছিল।

কত টাকা ছিল?

অনেক। পাঁচ হাজার।

BanglaBook.org

পাঁচ হাজার!

সঠিক হিসাব হল পাঁচ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা।

সব একশো টাকার নোট?

সব একশো টাকার নোট। নতুন সিরিয়াল নাম্বার ছিল।

এটাও তো অদ্ভুত! এত টাকা লোকে সঙ্গে করে ঘোরে? তাও আলাদা কোনও ব্যাগ নয়, মানিব্যাগে?

আরে মশাই, গোটা ব্যাপারটাই রহস্যময়। অবশ্য যার টাকা তিনি নিয়ে গেছেন।

কার টাকা?

খাতা দেখে বলতে হবে। তিনি অবশ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। পুলিশ কেসটা ডিল করেছিল। টাকা পেয়ে ভদ্রলোক রঞ্জনের সততায় খুশি হয়ে শ-পাঁচেক টাকা উপহার দিতে চেয়েছিলেন।

রঞ্জন নিশ্চয় নেয়নি?

এলই না! বলে পাঠাল টাকার দরকার নেই।

আবার আমার মাথার মধ্যে দপদপ করতে লাগল। আমি যেন কী বুঝেও বুঝতে পারছি না।

পঞ্চাশটা একশো টাকার নতুন করকরে নোট। সামান্য একটা মানিব্যাগে ছিল। তার মানে ভদ্রলোক এত টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু রঞ্জন টাকাটা ফেরত দিল কেন? সে কি এত সৎ?

বললাম, যার টাকা তিনি কী করে প্রমাণ করলেন যে টাকাটা তাঁর?

মানিব্যাগে ভদ্রলোকের অনেক কাগজপত্র ছিল। আর তা ছাড়া ব্যাগের প্রথম ফোল্ডে সেলোফোন আটকানো ছিল তাঁর নিজের ছবি।

বললাম, ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানাটা দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই টাকাটা আগে নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার—মানে আমার বুকপকেটে।

আমি হাসতে-হাসতে টাকাটা বাড়িয়ে ধরলাম। উনি সেটা দ্রুত যথাস্থানে চালান করে দিয়ে খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাম-ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে আমার হাতে দিতে-দিতে বললেন, একে চেনেন বোধহয়? বিখ্যাত লোক।

আচ্ছা, রঞ্জন বকশিসের টাকাটা নিতে এল না কেন?

কী করে জানব? বলে পাঠাল টাকার দরকার নেই। তারপর সপ্তা-দেড়েক হল আর কাজেই এল না। তারপর কাগজে ওর মৃত্যু-সংবাদ বেরোল।

সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেল। রঞ্জনের হত্যার রহস্য নিহিত আছে এই ব্যাগটার মধ্যে। এবার আমি পেয়েছি। 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

রঞ্জন ব্যাগটা ফেরত দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাগের ভেতর এমন কিছু ছিল—যেটা কোনওক্রমে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেটা রঞ্জন ফেরত দেয়নি। সম্ভবত প্রথমে জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি সে। পরে যখন সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারল, তখন ব্যাগটা জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এবং রঞ্জন তখনই আমাকে ডেকে পাঠাল।

এদিকে ব্যাগের মালিক ব্যাগটা ফেরত পেয়ে তার ভেতর সেই বিশেষ জিনিসটি দেখতে না পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিছু টাকা দেওয়ার ছলে রঞ্জনকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলেন।

আমার নিজের ওপর রাগ হল। আমি যদি আর একদিন আগে কলকাতায় আসতে পারতাম, তাহলে রঞ্জনকে জীবিত অবস্থায় পেতাম। পেতাম সেই অমূল্য বস্তুটি।

BanglaBook.org

রঞ্জন পুলিশের কাছে যায়নি। পৃথিবীর কারোর কাছে যায়নি। অতএব আমি বুঝতে পারছি, সে কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সে-বস্তুটির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার ধারণা হল।

আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে, সেটা যাই হোক, সমস্তরকম চেষ্টা করেও শত্রু সেটা হাতাতে পারেনি।

আর আমার ওপর কেন আক্রমণ হচ্ছে, তাও বুঝতে পারলাম। শত্রু এমন একজন লোক, যে জানে আমি রঞ্জনের বন্ধু এবং তার খুনিকে ধরতেই কলকাতা এসেছি।

রঞ্জন নিশ্চয় জানত যে, ওই বস্তুটির জন্যে তার জীবন বিপদাপন্ন। কাজেই সে নিশ্চয় সেটা কোথাও রেখে গেছে। এমন জায়গায় রেখে গেছে, সে মরে গেলেও যাতে জিনিসটা সহজেই আমার হাতে আসে।

রঞ্জনের বিশ্বাস ছিল আমার ওপর—আমার বুদ্ধির ওপর। ও জানত, আমি সেটা খুঁজে পাবই।

ভদ্রলোকের দেওয়া চিরকুটটা হাতে নিয়ে থমকে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

প্রথম আততায়ীর পকেটে এই ঠিকানাটা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এক নাম ছিল; এখানে অন্য নাম।

এই লোকটা ব্যাগের মালিক। এরই নির্দেশে রঞ্জন নিহত হয়েছে। এরই নির্দেশে আমাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে।

রঞ্জন কেন ব্যাগটা জমা দিয়েছিল, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকের ব্যাগ বলেই সে ব্যাগটা জমা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাগ থেকে সেই বস্তুটি বেরিয়ে এসেছিল কোনওরকমে। সেটা জমা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। পরে নিশ্চয় কৌতূহলের বশে সেটা পরীক্ষা করে তার গুরত্ব বুঝতে পারে, এবং আমায় ডেকে পাঠায়।

কিন্তু সেই বিশেষ জিনিসটা এখনও শত্রুর হাতে পড়েনি।

॥ ১৪ ॥

আমি কিন্তু সত্যিই বোকা। সেই জিনিসটা আমার চোখের সামনেই ছিল, আমি দেখতে পাইনি। রঞ্জন সেটা আমার জন্যে ঠিক জায়গায় রেখে গেছিল।

সুজাতার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি বেশ ভিড়। ঝি-চাকররা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আর সুজাতা তাদের বকাঝকা করছে।

জানতে পারলাম, বাড়িতে চোর এসেছিল। জিনিসপত্র সব তছনছ করে গেছে। কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।

আমি দ্রুত বসার ঘরে এসে বইয়ের আলমারিটা খুললাম। মোটা বইটা বার করে দেখলাম। আমার ধারণা মতো ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা সেখানে নেই। পেওয়ার ঘরে গেলাম। সেখানে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে।

Pattern ! সেই একই অদৃশ্য হাতের ছাপ ঘরময় ছড়ানো। সুজাতার ঘরেও সেই তল্লাশি। আমি থমকে গেলাম। তল্লাশি মাঝপথে থেমে গেছে।

ওরা ওটা পেয়েছে। ওরা জানত জিনিসটা এখানে আছে। আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ওরা আমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

ওরা ওই টেপরেকর্ডার দিয়ে আমাদের কথাবার্তা টেপ করেছে। সেই কথাবার্তার ভেতর ওরা যা খুঁজে পেয়েছিল, তা আমরা উচ্চারণ করেছি অথচ বুঝতে পারিনি জিনিসটার সন্ধান আমরাই ওদের দিয়ে দিচ্ছি। ওরা সম্ভবত অনেকদিন ধরেই ওখানে টেপ-যন্ত্রটা বসিয়ে রেখেছিল।

আমি দ্রুত পকেট থেকে রঞ্জনের চিঠিটা বার করে আবার পড়তে লাগলাম ঃ

হিমু,

তোর নিষেধ সত্ত্বেও আজ এই চিঠি দিতে হচ্ছে। তুই অতি অবিশ্যি একবার অন্তত কলকাতায় আসিস। খুব জরুরি দরকার। নতুবা আমি বিপদে পড়ব।

ইতি—তোর রঞ্জন

পুনঃ আমি সুজাতার বাড়ি তোর জন্যে অপেক্ষা করব। ওখানেই আমাকে পাবি।

রঞ্জন সুজাতার বাড়ি থাকত না। অতএব 'ওখানেই আমাকে পাবি' কথাটার ভেতর সব কিছু বলা হয়ে গেছে।

তখন কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি।

ঘরের চারদিকে তাকালাম। কোথায় ছিল সেটা? সত্যিই কি সেটা ওরা পেয়েছে?

আমি রঞ্জনের দেওয়া উপহারগুলোর কথা ভাবলাম। মাছের অ্যাকুইরিয়ামটা উবুড় করে সব জল আর মাছ ফেলে দিলাম বাথরুমে। মাটিতে উবুড় করে ঢাললাম সব বালি। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না।

এবার দেওয়াল থেকে নামালাম অয়েলপেইনটিংটা। ফ্রেম খুলে ক্যানভাসটা বার করলাম। উলটোপিঠে খুব ছোট-ছোট করে লেখা আছে ঃ 'মাইক্রোফিল্ম ক্যাপসুল—গয়নার বাক্স'।

আমি গয়নার বাক্সটা রুমাল দিয়ে ধরলাম। সমস্ত গয়না আলমারির ভেতরেই পড়ে আছে। বাক্সটা শূন্য।

আমি রাগে দুঃখে বাক্সটা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

কিন্তু এ কী! একটা অদ্ভুত শব্দ হল। খালি বাক্সের এরকম শব্দ হবে কেন? বাক্সটা আবার তুলে নিলাম আমি। বেশ ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলাম।

সামান্য চেষ্টার পর দেখতে পেলাম, নীচে একটা সিক্রেট চেম্বার আছে। সেটা খুলতে দেখি, ভেতরে পাতলা একটুখানি জায়গা। সিক্রেট চেম্বার।

কিন্তু সেটাও শূন্য!

ওরা সেটা পেয়েছে। সেই ক্যাপসুল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে চেম্বারটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। কাঠের গায়ে পেরেক বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে কুঁদে-কুঁদে লেখা আছে 'কর্নেল এ. বি.।'

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল কাবুলের সেই ভয়ঙ্কর শীতের রাত।

সেই নির্জন অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম ঘরটার ভিতরে। টেবিলের চারদিকে দাঁড়িয়েছিল অনেকগুলো লোক। আর টেবিলের মাথায় যে লম্বা-চওড়া লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সকলে তাকে কর্নেল বলে সম্বোধন করছিল।

খান আবদুল গফুর কাবুল সফরে গেছিলেন। তাঁকে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল ওরা। সেদিন আমার জন্যেই ওরা তা পারেনি।

তাহলে সেই মহাপুরুষ এখন ভারতবর্ষে। তারই নেতৃত্বে এই গুপ্তচরচক্র কাজ করছে।

এই গয়নার বাক্সে যা ছিল, সেটা ওরা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জানত না যে,

BanglaBook.org

রঞ্জন বহুদিন অপরাধের জগতে ঘুরে ছিল। রঞ্জনের একটা trained mind ছিল। একমাত্র ক্যাপসুলটা ছাড়া আর সবকিছুই আমার জানা হয়ে গেছে।

সেই ক্যাপসুলে কী ছিল, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না।

রুমাল দিয়ে ধরে বাক্সটা আমি বিকাশের কাছে নিয়ে এলাম। বিকাশ হাজার-হাজার প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে।

আমি তার কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাক্সতে সুজাতার হাতের ছাপ ছাড়া আর একজনের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।

কার হাতের ছাপ?

সেটা পরে বলব। পুলিশ ল্যাব থেকে ছাপটা তৈরি কর। এবং এর জন্যেই তোর প্রমোশন হয়ে যাবে।

ব্যাপার কী, হিমু? কীসব ঘটে যাচ্ছে?

অনেক কিছু। সব বলব সময় হলে। আমি খুনির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি।

তার মানে গুপ্তচরদের সন্ধান পেয়েছিস?

না। রঞ্জনকে খুন করেছে একজন সাধারণ গুণ্ডা।

সাধারণ গুণ্ডা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাকে খুলে বল, হিমু।

বলব, সময় হলে।

আর কথা না বাড়িয়ে আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আজ রাতেই কাজ শেষ করে কলকাতা ছেড়ে চলে যাব। সঙ্গে নিয়ে যাব সুজাতাকে।

সুজাতার ঝি আমাকে দেখে চমকে উঠল ঃ এ কী জামাইবাবু, আপনি এখানে?

কেন, আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

এইমাত্র এক ভদ্রলোক এসে বললেন যে, আপনি গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। দিদিমণি তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

ওরা কৌশল পালটেছে। ওরা আসলে আমাকে চায়। প্রশ্ন করলাম, ভদ্রলোক দেখতে কেমন?

বেশ লম্বা-চওড়া। চোখে কালো চশমা।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে হয়ে গেছে। আমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

আমি চলে এলাম হোটেলে। সুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম।

বাথরুমে ঢুকলাম স্নান করবার জন্যে। ঝরনার নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিলাম। আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত। অনেকক্ষণ জলের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গা মুছতে-মুছতে লেখাটা দেখতে পেলাম। দেওয়ালে আটকানো 'বাথরুম মিরর'-এর পাশে সাদা দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে লেখা ১২ নং নুর আলি লেন। প্রথম ঘরটা।

এ ভাষা আমি বুঝি। এর একটাই অর্থ হয়।

আমি নীচের লবিতে এসে ফোন করলাম কমলকে। তারপর সুটকেসটা নিয়ে, হোটেলের বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম। পায়ে হেঁটে চলে এলাম কমলের বাড়ি।

কমল বলল, গাড়ি প্রস্তুত। কিন্তু গাড়ি কী হবে?

যথেষ্ট তেল আছে তো?

আছে। ব্যাপার কী?

ওরা সুজাতাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ওরা কারা?

BanglaBook.org

একদল গুপ্তচর। যারা রঞ্জনকে মেরেছে।

তাহলে তো পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার।

আমি হাসলাম, In this kind of game you don't go to the police. ওরা শুধু সুজাতাকে নিয়ে গেছে আমাকে ধরার জন্যে।

কিন্তু তবু...।

They will kill her, কমল।

॥ ১৫ ॥

আমি মৌলালি থেকে একটা হুইস্কির বোতল নিলাম। গাড়িতে বসেই খানিকটা পান করলাম।

তারপর এলাম এন্টালি পেরিয়ে বেনেপুকুর থানা এলাকায় নূর আলি লেনে। এসব পথঘাট আমার খুব পরিচিত।

ছোট সুন্দর দোতলা বাড়ি। কিন্তু সব ঘরই অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি, এই অন্ধকারে আমার জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। জীবনে বহুবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আজ আমি অসহায়। কোনওরকম চালাকি করলে ওরা সুজাতাকে খুন করবে। আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারি না।

যে মেয়েটা আমার জন্যে বারো বছর অপেক্ষা করে আছে, আমি আজ ফিরে এসে কিছুতেই তার মৃত্যুর কারণ হতে পারি না।

আমি অন্ধকারে পা টিপে-টিপে ওপরে এলাম। লম্বা বারান্দা। বাঁ-দিকে সারি-সারি তিনটে ঘর।

আমি পকেট থেকে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা বার করলাম। বার করলাম ছোট্ট এক গোলা কালো সুতো। সিঁড়ির রেলিংটা যেখানে বাঁক নিয়ে ছাদে চলে গেছে, সেই বাঁকে টর্চটা রাখলাম। কালো সুতোর একটা প্রান্ত বাঁধলাম টর্চটার সঙ্গে। গোলাটা খুললাম। আন্দাজ মতো খানিকটা সুতো খুলে সুতোটা ছিন্ন করে সেই প্রান্তটা বাঁধলাম আমার বাঁ-পায়ের গোড়ালির ওপরে, পায়ে। প্যান্ট দিয়ে ঢাকা।

সুতোটা চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কেন না, আততায়ী আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। প্রফেশনাল খুনি হলে তাই করা উচিত।

আমাকে এমনিতেই মরতে হবে। একটা সুযোগ নেব না কেন? সুতোর একটা প্রান্ত টর্চে বাঁধা আছে, আর একটা প্রান্ত আমার পায়ে।

আমি পা টিপে-টিপে প্রথম ঘরটাতে ঢুকলাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলাম বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি, হিমু। হাত দুটো ওপরে তোলো।

আমি হাত দুটো ওপরে তুলতেই বাতি জ্বলে উঠল।

রাস্তার দিকে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চা। মুখে সেই কদর্য হাসি। হাতে একটা পিস্তল।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরটা বেশ দামি-দামি আসবাবপত্রে সাজানো। সুদৃশ্য আলমারি, ড্রেসিং টেবিল। মেঝেতে পুরু লাল কার্পেট।

আমি বললাম, আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। সুজাতা কোথায়?

পঞ্চা হাসতে-হাসতে বলল, জানতাম, তুমি আমাদের ভাষা বুঝবে, তাই সুজাতাকে আমিই নিয়ে এসেছি।

BanglaBook.org

কিন্তু কেন? তুমি না সেন্ট্রালের সম্রাট? তোমার পেশা চুরি—ডাকাতি—বেবি ফুড ব্ল্যাক করা। এ-খেলা তো তোমার নয়!

তোমাকে চাই, হিমাদ্রি। কলকাতার কেউ তোমাকে জীবিত দেখতে চায় না। আমরা কলকাতার সম্রাটরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—।

প্রীতম সিং-এর ওখানে বসে?

হ্যাঁ। ভোট হয়েছিল। প্রত্যেকে তোমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে একজন ছাড়া—।

সেই একজন কে? রোজারিও?

হ্যাঁ। তুমি সবই জানো দেখছি।

হ্যাঁ, আমি সবই জানি। তুমি কিন্তু একটা জিনিস জানো না পঞ্চা, কলকাতার উঠতি 'মাফিয়া'রা তোমায় চায় না।

তাতে কিছু আসে যায় না। আমি জানি কী করে বিদ্রোহ দমন করতে হয়।

তোমরা নতুন রাজা কলকাতার। তোমরা ভাব, তোমরা সব জানো। কিন্তু তোমরা বোকা। কলকাতার মাফিয়ারা নতুন করে দল তৈরি করতে চাইছে।

চাইলেই তো হবে না, বন্ধু। এতগুলো রাজাকে সরাবে কী করে?

কিন্তু তুমি জানো না, তুমি কী সাঙ্ঘাতিক খেলায় মেতেছ। তুমি ধরা পড়লে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি যেসব মিনিস্টারদের ছায়ায় আছ, তাদের সাধ্যি নেই—।

চুপ করো! তোমায় বক্তৃতা করতে ডাকা হয়নি। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে হিসাব চুকিয়ে দেব। সুজাতাকে ধরে আমার জন্যে পাঁচ হাজার, আর তোমাকে খুন করার জন্যে দশ হাজার। এক ঢিলে তিন পাখি।

আমি জানি, পঞ্চার পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে। ও খুন করতে দ্বিধা করবে না।

বললাম, তোমার 'বস'রা সব গেল কোথায়?

তুমি তো মরবে এখুনি, এসব জেনে কী হবে?

আমি যখন মরবই, তখন আর বলতে আপত্তি কী?

ওরা সব হাসনাবাদের দিকে রওনা হয়ে গেছে। কালীকে চেনো?

চিনি।

কালী তোমাকে—তোমার মতো তিনটে হিমাদ্রিকে গিলে খেতে পারে।

ওরা হাসনাবাদে গেছে কেন? ওরা কি বর্ডার ক্রস করে ওপারে যাবে?

ঠিক ধরেছে। তোমার বুদ্ধি আছে। কাল সকালে ওরা বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে রসদ পৌঁছে দেওয়ার অজুহাতে ওপারে চলে যাবে। এবং সেখান থেকে—।

পশ্চিম পাকিস্তান।

সবই জানো দেখছি।

আমি কথা বলতে-বলতে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছিলাম, যাতে টর্চে বাঁধা সুতোটা টান-টান হয়ে থাকে।

বললাম, আর ওদের সঙ্গে চলে যাবে সেই মাইক্রোফিল্ম-এর ক্যাপসুলটা। তাই না? কী আছে ওতে?

সে কী, এই সামান্য খবরটা রাখো না? পঞ্চার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

জানি, শুধু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।

মিলিটারির টপ সিক্রেট। অর্থাৎ—।

অর্থাৎ তোমাদের 'কোড' বলছে অপারেশন টপ সিক্রেট, তাই না?

BanglaBook.org

ওটা কোড নয়, কোডের তর্জমা। কোড বলছে, অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক।

ব্ল্যাঙ্ক?

হ্যাঁ। ওটাই কোড—অর্থাৎ, তোমাদের ভারত সরকারকে বোকা বানানো। আমাদের ভিতরেও তোমাদের গুপ্তচর আছে। তারা যদি খবরটা পাচার করে, তবুও তোমরা আসল অর্থ ধরতে পারবে না। অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক কথার কোনও অর্থ হয় না।

আমি মনে-মনে ওদের এ-পরিকল্পনার প্রশংসা না করে পারলাম না। বললাম, যদি বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানেব সঙ্গে যুদ্ধ হয়, তাহলে পাকিস্তানের বেশি সুবিধা হবে, এই টপ সিক্রেটগুলো জানা থাকলে। তাই না?

স্বাভাবিক।

তাতে তোমার লাভ?

আমি টাকা পেলাম। মোটা টাকা।

কিন্তু তুমি কি মনে করেছ, ওরা যখন বোমা ফেলবে, তখন তোমার বাড়িটা বাঁচিয়ে বোমা ফেলবে? না, এ-দেশ ওদের পদানত হলে, ওরা তোমাকে 'উজির-এ-আজম' করবে? 'গদ্দার'-কে ওরা ছাড়বে না, পঞ্চা। তুমি বিশ্বাসঘাতক...তুমি দেশদ্রোহী...তুমি...।

পঞ্চা সশব্দে হাসতে লাগল। প্রচণ্ড সে-হাসির বেগ। প্রচণ্ড শব্দ।

আমি লক্ষ করলাম, ওর সমস্ত শরীর হাসির চোটে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। ফলে ওর পিস্তলের নলটা সামান্য একটু দিক পরিবর্তন করেছে। আমি এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি সুযোগ বুঝে শরীরের ওপরের অংশ একটুও না নড়িয়ে, শুধু বাঁ-পাটা ঝাঁকানি দিলাম। টর্চের সঙ্গে বাঁধা সুতোটা টান-টান হয়েছিল। সুতোতে টান পড়ল, আর তীব্র আওয়াজ পেলাম দরজার ওপারে বারান্দায়—টর্চটা পড়ার।

সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চা হাসি থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

ব্যস। আমি এইটুকুই চাইছিলাম। শব্দটা শুনে যে-মুহূর্তে পঞ্চা দরজার দিকে তাকাল সেই মুহূর্তে আমি দ্রুত মাটিতে পড়ে কার্পেটটা ধরে প্রচণ্ড এক টান দিলাম।

পঞ্চা প্রস্তুত ছিল না। সে চিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

আমি লাফিয়ে পড়লাম ওর ওপর। পিস্তলটা কেড়ে ছুড়ে দিলাম। সেটা গড়িয়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলটার নীচে।

থুতনির নীচে জুতোর ডগা দিয়ে একটা আঘাত। ধনুকের মতো বেঁকে গেল পিছনদিকে পঞ্চা। সঙ্গে-সঙ্গে ওর পাঁজরে গোটাকয়েক লাথি জুতোর ডগা দিয়ে। পঞ্চা ছটফট করতে লাগল।

আমি প্রচণ্ড রাগে তখন কাঁপছি। আমার ভেতর তখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। ওকে সুযোগ দিলাম উঠে দাঁড়াতে।

পঞ্চা আত্মরক্ষার জন্যে উঠে পালাতে গেল। ওর ছুটন্ত শরীর লক্ষ করে একটা সাঙঘাতিক ঘুষি চালালাম। ঘুষিটা লাগল ওর বাঁ-দিকের কানের নীচে।

পঞ্চা পাক খেয়ে পড়ল। আবার উঠল। এবার পেটে, বুকে, নাকে কয়েকটা পাঞ্চ পরপর।

পঞ্চা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। বুঝতে পারলাম, পঞ্চা চোখে অন্ধকার দেখছে। আমি ওকে আর কষ্ট না দিয়ে ওর কণ্ঠার ওপর একটা 'কারাটে' চপ দিলাম। পঞ্চা হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ল। আর নড়ল না।

আমি বাথরুমে একখণ্ড দড়ি পেলাম। সেটা দিয়ে ওর হাত-পা বাঁধলাম।

Writing pad টেনে নিয়ে লিখলাম ঃ

BanglaBook.org

বিকাশ,

পঞ্চাকে রেখে গেলাম। ওর 'কলার বোন' ভেঙে গেছে। পঞ্চা জড়িয়ে পড়েছে এই গুপ্তচরদের সঙ্গে।

আমি যাচ্ছি হাসনাবাদ। গোটা দলটা ওখানে আছে। এতবড় একটা দলের সঙ্গে একা লড়াই করা সম্ভব নয়। তোর সাহায্য দরকার। কিন্তু আমি আগে রওনা হব।

—হিমু

টেলিফোনটা তুলে নিলাম।

বিকাশ অফিসেই ছিল। চিৎকার করে উঠল, হিমু, তুই কোথায়?

একটা পাবলিক ফোন থেকে ফোন করছি। কেন?

তোর সেই finger print তৈরি।

তার আর দরকার নেই। আমি জানি, ওটা কার হাতের ছাপ। তার বদলে একটা কাজ কর—পুলক সেন আগে মন্ত্রী ছিলেন, নিশ্চয় তার নামে একটা file আছে S. B.-তে। অমি ওর 'ব্যাকগ্রাউন্ড' চাই। যা কিছু পাওয়া যায় সব।

কিন্তু পুলক সেন তো...।

Please, বিকাশ, এখন সময় নেই।

O. K. বিকাশ মনে হয় ফোনটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। মিনিট তিনেক পর আবার আমার লাইনে এল, হিমু...।

Yes.

S. B. কিছুই জানাতে চায় না। নিয়মবিরুদ্ধ ওটা। তবে আমাদের ফাইলে যা আছে, তা হল এই : পুলক সেন ছিলেন পুলিশ মন্ত্রী। A very controversial character. তুই যেদিন কলকাতায় পা দিয়েছিস, সেইদিন থেকেই সে অদৃশ্য।

আমার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা দিল। আমার ধারণাটাই ঠিক তাহলে। বললাম, এই কাহিনির অন্যতম নায়ক পঞ্চাকে পাবি ২২ নং নূর আলি লেনের ওপরের ঘরে।

লাইন কেটে দিলাম। এক সেকেন্ড পরে আবার ডায়াল করলাম। সেই গোপন স্থান থেকে উত্তর আসতে আমি পুলক সেনের নামটা বললাম। উত্তরে যা শুনলাম, তাতে আমি বেশ সন্তুষ্ট হলাম।

গোটা ব্যাপারটা এবার আমার কাছে জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল। প্রত্যেককে এবার চিনতে পারলাম আমি।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমি জানি ওরা আজ রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে। সে-বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি। থেকেছি।

একটার পর একটা সিগারেট টানছি আর মাঝে-মাঝে বোতলটা বার করে চুমুক দিচ্ছি। স্টিয়ারিং ধরেছি এক হাতে, আর বোতল আর-এক হাতে।

আমার জীবনের অলিন্দে-অলিন্দে অনেক পাপ জমা হয়ে আছে। হয়তো এই রাত শেষ রাত আমার জীবনে।

মায়ের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল দিদি-জামাইবাবুর কথা। সুজাতার কথা। এই সমাজের কথা। হয়তো সকলের প্রতি আমি অবিচার করেছি। এদের সকলের কাছে আমি অপরাধী হয়তো।

আমি শুধু কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু শুধু কলকাতায় ফিরলে হবে না। আমি এই সমাজে ফিরব।

BanglaBook.org

আমার প্রাণ থাকতে আমি কর্নেলকে জীবিত অবস্থায় ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে দেব না। যারা রঞ্জনকে মেরেছে, সুজাতাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের আমি ক্ষমা করব না। তাতে যদি আমায় মরতে হয় মরব।

॥ ১৬ ॥

অবশেষে এসে পৌঁছলাম। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে, একাই ঠেলে-ঠেলে এনে রাখলাম দোতলা বাড়িটার কাছে।

ওপরের একটা ঘর ছাড়া আর কোথাও বাতি জ্বলছে না। বাড়ির পিছনদিকে আছে বিঘে তিনেক জমির ওপর একটা প্রকাণ্ড বাগান। প্রধানত আম ও লিচুর গাছ।

আমি আগে আমবাগানে এসে চারদিকে ঘুরে পরীক্ষা করলাম। সেখানে কেউ নেই।

সকলেই বোধহয় ওপরের ঘরে বসে মিটিং করছে।

ওপরের প্রত্যেকটি কক্ষ আমি চিনি। বদ্রির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আমি এখানেই পালিয়ে এসেছিলাম। আমার অজ্ঞাতবাসের অনেকটাই এখানে কেটেছিল।

বাড়ির পিছনদিকে ছাদের জল নিকাশের পাইপ ছিল। সেই পাইপ বেয়ে ওপরে উঠলাম।

খোলা জানলা দিয়ে প্রথমে যেখানে ঢুকলাম, সেটা রান্নাঘর। সেখান থেকে পা টিপে-টিপে এলাম পাশের খাওয়ার ঘরে। খাওয়ার ঘর থেকে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেটা শোওয়ার ঘর। এই শোওয়ার ঘরটা পার হলেই প্রকাণ্ড একটা 'হল' কামরা। সেখানে বাতি জ্বলছে। ওরা সেখানেই বসে আছে।

শোওয়ার ঘর আর হল-কামরার মধ্যের দরজায় একটা ভারী পরদা। পরদা সরালেই ওদের দেখা যাবে। সেই আলো এসে পড়েছে এই ঘরের পরদার উলটোদিকে।

সামান্য একটু সরালাম পরদাটা। লম্বা একটা টেবিল। সেই টেবিলের মাথায় বসেছে কর্নেল। আমি তার ডানদিকটা দেখতে পাচ্ছি। কর্নেলের সামনে টেবিলের ওপর একটা পিস্তল।

কর্নেলের বাঁ-দিকে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে সুজাতা এবং মলয়া। আর কর্নেলের ডানদিকে, আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছেন এই বাড়ির মালিক অবিনাশদা।

কর্নেল গম্ভীর কণ্ঠে বলছে ঃ The job is done. কিন্তু হঠাৎ হিমাদ্রি কলকাতায় এসে পড়ায় আমাদের 'সারভে সেকশানের' ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেল। এর জন্যে আমাকে ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মলয়া বলল, কী ধরনের ক্ষতির কথা বলছেন?

কর্নেল জানলা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন আপনার ঘরে আমাদের যে লোকটা মারা গেছে, তার পরিচয় জানেন? সে ছিল সারভে সেকশানের যশোর শাখার বড়কর্তা মেজর এ. এম. হাবিবউল্লা।

আমি চমকে উঠলাম। হাবিবউল্লার নাম শুনেছিলাম। হাবিবউল্লা ছিল ঢাকার 'টু হানড্রেড সারভে সেকশানে'র একজন প্রথম শ্রেণির 'ইনটেলিজেন্ট অফিসার'। পরে তাকে যশোর শাখার বড়কর্তা করে পাঠানো হয়।

অবিনাশদা বললেন, হিমাদ্রির জন্যেই এই ক্ষতি হল।

কর্নেল বলল, ওই ধরনের একজন অফিসার রাতারাতি তৈরি করা যায় না। অনেক পরিশ্রম, অনেক অর্থ ব্যয় করলে তবে একজন অফিসার তৈরি হয়। He was one of the best.

সকলে চুপ করে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

কর্নেল আবার বলল, আমি কালই টু হানড্রেড সারভে সেকশানের হেড অফিস ঢাকায় যাব। সেখানে নতুন কর্তা হয়েছেন ব্রিগেডিয়ার সামসের। তাঁকে কিছু-কিছু তথ্য সরবরাহ করে পরের দিন ক্যাপসুলটা নিয়ে যাব পশ্চিমে। মিস দে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ওঁর আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু কতকগুলো কাজ বাকি আছে, সেগুলো আপনাকে করতে হবে, অবিনাশবাবু।

অবিনাশদা প্রশ্ন করলেন, কী কাজ?

শিলিগুড়ি এবং বারাকপুরে 'ফিল্ড ইনটেলিজেন্স' বিভাগের দুজন লোক আছে। একজনের নাম কিরণ চৌধুরী ওরফে শেখ নিজামউদ্দিন—তাকে পাবেন শিলিগুড়িতে, আর-একজন—যার নাম কে. এ. নাইমুজুমান, তাকে পাবেন বারাকপুরে। এরা দুজনেই আপনাদের সাহায্য করবে।

কিন্তু তাদের তো চিনি না।

এই নিন তাদের ছবি। এবার থেকে এদের মারফত সব কাজ হবে। একটা কথা বলে রাখি, হিমাদ্রিকে পঞ্চা শেষ করলেও বিপদ কেটে যাবে না। বিদ্যুৎ রায়কে কিছুতেই আন্ডারএস্টিমেট করবেন না।

অবিনাশদা বললেন, অতএব আমাদের সামনে এখন দুটো কাজ। একটা হল বিদ্যুৎ রায়কে উড়িয়ে দেওয়া, আরেকটা হল পঞ্চাকে শেষ করা।

রাইট। পঞ্চাকে আগে শেষ করবেন, কেন না পঞ্চা পরে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। কোনও সাক্ষী না রাখাই ভালো। আর-একজন আছে—তাকেও শেষ না করলে আপনি নিরাপদ হবেন না।

কে সেটা?

পুলক সেন।

হ্যাঁ, আমি জানি। পুলক আমার বিষয়ে অনেক কিছুই জেনেছে এবং সে-ই আমার প্রধান শত্রু।

মলয়া সুজাতাকে দেখিয়ে বলল, আর এই অহল্যাকে নিয়ে কী করবেন?

কর্নেল প্রশ্ন করল, এর নাম অহল্যা নাকি?

খিলখিল করে হেসে উঠল মলয়া : না, এর নাম সুজাতা। আঠাশ বছরের খাঁটি কুমারী, বারো বছর অপেক্ষা করে আছে হিমাদ্রির জন্যে।

সুজাতা লজ্জায় অপমানে রাঙা হয়ে বলল, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

এবার অবিনাশদা বললেন, আমাদের উচিত মেয়েটাকে এখানে রাখা। একে আমি একটু ভদ্রতা শেখাব।

কর্নেল বলল, না, তার দরকার নেই। আমি একে নীচের বাগানে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, অবিনাশবাবু, আপনার শোওয়ার ঘরের আয়রন সেফে আমার সরকারের দেওয়া তিন লাখ টাকা আছে। ওটা আপনার।

মলয়া বলল, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আজ রাতেই কর্তার তর্পণকালে হয় না? কেন না, হিমাদ্রি বড় সাংঘাতিক! আমি জীবনে ওর মতো পুরুষ দেখিনি, কর্নেল। ওকে যদি পঞ্চা না মারতে পারে, তাহলে ও এখানেও এসে পৌঁছবে।

কর্নেল হাসল শব্দ করে। বলল, ও জানবে কী করে যে আমরা এখানে আছি?

হিমাদ্রিকে আপনারা চেনেন না। He is not an ordinary hoodlum, He is...

সুজাতা উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। চোখের ইশারায় ওকে মাথা নীচু করতে বললাম।

কিন্তু কর্নেল অতি ধূর্ত। সুজাতার এই সামান্য মুভমেন্টও ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

আমি 'বডি থ্রো' করার আগেই কর্নেল বিদ্যুৎবেগে মাটিতে পড়ে ফায়ার করতে-করতে

BanglaBook.org

লাথি মেরে টেবিলটা উলটে দিল।

আমি লাফিয়ে হলের মধ্যে পড়লাম। কর্নেলের দিকে নজর দেওয়ার আগেই দেখি অবিনাশদা কোমর থেকে পিস্তল বার করছে।

আমি কালক্ষেপ না করে দুটো বুলেট গেঁথে দিলাম ওর বুকে।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, কর্নেল ততক্ষণে গড়িয়ে-গড়িয়ে বাগানের দিকে খোলা জানলার কাছে পৌঁছে গেছে।

আমার ফায়ার আর কর্নেলের জানলা টপকে নীচের বাগানে লাফ দেওয়াটা একইসঙ্গে ঘটল। আমি সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললাম, দৈহিক শক্তিতে এই মেয়েটা তোমার চেয়ে বেশি নয়। এই মেয়েটাকে যেতে দিয়ো না। বলে মলয়াকে দেখিয়ে দিলাম।

আমিও জানলা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্ত কয়েক উবুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। কিন্তু কর্নেল সেখানে নেই।

এটা বাড়ির পিছনের দিক। হঠাৎ সামনের দিকে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। সঙ্গে হেডলাইটের আলো।

বুঝলাম পুলিশ এসে গেছে। আমি দৌড়ে আমবাগানে ঢুকলাম। যতদূর সম্ভব জোরে ছুটতে লাগলাম।

সামনে কারও ছুটে যাওয়ার শব্দ পেলাম। এর আগে প্রতিবারই কর্নেল পালাতে সক্ষম হয়েছে। এবার আর আমি তাকে ছাড়ব না।

কর্নেলের ছোটার ধরনে মনে হল সে আহত।

ছুটতে-ছুটতে বাগান শেষ হয়ে গেল। এবার আমি সাবধান হলাম। সামনে খোলা মাঠ। কোনও আড়াল নেই। আমি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আমাকে গুলি করলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব না।

খোলা মাঠে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। এবার দেখতে পেলাম কর্নেলের ছায়ামূর্তি আকাশের গায়ে। আবছা রেখাচিত্র।

নিশানা ঠিক করে একটা গুলি ছুড়লাম। কর্নেল পড়ে গেল।

আমি বুক টেনে-টেনে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। নীচু হয়ে আলো ফেললাম ওর ওপর। গুলি লেগেছে পিঠে ও কোমরে।

কর্নেলের হাতে পিস্তল নেই। আমি দাঁতে-দাঁত চেপে বললাম, I got you.

কর্নেল কাতরাচ্ছে। সেই একইভাবে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, You son of a...

টর্চের আলোটা নিজের মুখে ফেললাম, পিস্তলের নলটা ওর কপালে ঠেকিয়ে বললাম, দেখতে পাচ্ছ আমার হাসি? আজ আমার হাসবার পালা। মনে পড়ে হংকং-এর সেই হোটেল? যেখানে তোমার লোকেরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল? আমার ডান উরুতে সেই কাটা দাগটা এখনও আছে।

কর্নেল যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে বলল, প্লিজ, হিমু, আমায় খুন করো।

বেশ, তাহলে সেই ক্যাপসুলটা দাও।

নেই, সেটা নেই...।

আমি পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম ওর মাথায়। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

আমি ওকে তল্লাশি করে ওর একটা জুতোর ফাঁপা হিলের মধ্যে সেটা পেলাম। সেটা পকেটে রেখে বললাম, এবার বলো, রঞ্জনকে কে খুন করেছে?

হাঁপাতে-হাঁপাতে কর্নেল বলল, আমি...আমি মেরেছি...।

BanglaBook.org

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পুলিশের সার্চ লাইট।

বিকাশ তার বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে সুজাতা এবং মলয়া।

আমি পিস্তলটা আবার কর্নেলের কপালের ডানদিকে ধরতেই বিকাশ চিৎকার করে উঠল, Stop! Don't kill him.

আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম। কর্নেলের দেহটা একবার মাত্র কেঁপে উঠল।

বিকাশ চিৎকার করে এগিয়ে এল, এবং আমি সাবধান হওয়ার আগেই আমার পিঠে প্রচণ্ড এক লাথি মারল ঃ আমি নিষেধ করলাম না ওকে খুন করতে?

সুজাতা আর্তচিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার ওপর।

আমি ফিসফিস করে বললাম, গাড়িটা স্টার্ট দাও।

সুজাতা উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, আবার একটা ঘুসি এসে পড়ল আমার চোয়ালে। আমি কোনওরকমে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ হল। বিকাশ চমকে সেদিকে তাকাতেই আমি এক লাফে ওর ওপর পড়লাম। ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

সিপাইরা কিছু বোঝার আগেই আমি ছুটলাম।

গাড়ির দরজাটা খোলাই ছিল। সুজাতা সরে বসল হুইলের পেছন থেকে। আমি স্টিয়ারিংয়ের পেছনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু দেখতে পেলাম ওরাও আমার পেছনে তাড়া করছে।

আমি জানি, ওরা এতক্ষণে ওয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছে আমাকে সামনে থেকে ঘিরে ধরার জন্যে।

আমিও ক্রমাগত রাস্তা বদল করতে লাগলাম।

এইভাবে রাত্রির অন্ধকারে চোর-পুলিশ খেলতে-খেলতে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থামালাম কলকাতার সবচেয়ে বড় এবং অভিজাত এক হোটেলের সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের লিফটে পা দিতে-দিতে আড়চোখে দেখলাম, পুলিশের গাড়িটা আমার গাড়ির পেছনে থামল।

লিফটে করে আমি আর সুজাতা এলাম এগারো তলায়। এখানে একটা কক্ষের সামনে দাঁড়িয়েছিল দুজন ষণ্ডামার্কা লোক।

আমাকে দেখে স্যালুট করে দাঁড়াল। আমি বললাম, পেছনে পুলিশ আসছে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। বিকাশ গুলি চালাবে। আমি রক্তারক্তি চাই না।

সুজাতাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এটাই এ-হোটেলের সবচেয়ে বড় কক্ষ। সুন্দর করে সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। দেওয়ালে ছবি। দামি-দামি আসবাবপত্র।

দরজা দিয়ে ঢুকলে ঠিক উলটোদিকে দেখা যাবে একটা সুন্দর বড় টেবিল। এই ঘরের চার কোণে চারজন বিশালদেহী যুবক সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

সামনের বড় টেবিলে দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

আমাদের ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক ঠোঁটের কোণে সাদাসিধে হাসি ফুটিয়ে বললেন, Come in, son.

আমি এগিয়ে গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়ালাম। উনি আমায় বসতে বললেন।

আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

উনি বললেন, কাজ শেষ?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

BanglaBook.org

উনি আবার বললেন, কর্নেল?

আমি তার চোখে-চোখ রেখে বললাম, Dead.

Good. আমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে।

এমন সময় দরজার কাছে একটা হট্টগোল শোনা গেল। এবং মুহূর্ত পরেই সদলবলে ভেতরে ঢুকল বিকাশ।

আমি তখন পকেট থেকে ক্যাপসুলটা বার করেছি। ক্যাপসুলটা রাখলাম প্রৌঢ় ভদ্রলোকের প্রসারিত হাতের ওপর। বললাম, অপারেশন ব্ল্যাক—।

মানে?

ওটা 'কোড'। অপারেশন মিলিটারি টপ সিক্রেট। ওটা নেওয়ার জন্যেই কর্নেল ভারতবর্ষে এসেছিল।

হঠাৎ বিকাশ চিৎকার করে উঠল, ওটা আমায় দিন, নতুবা গুলি করব।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনাকে তো এখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি, আপনি কে?

আমি একজন পুলিশ অফিসার। এই আসামিকে তাড়া করে এখানে এসেছি।

আসামি?

হ্যাঁ। গুপ্তচরবৃত্তি এবং হত্যার অপরাধে একে গ্রেপ্তার করতে চাই, আপনাদের গ্রেপ্তার করতে চাই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে।

বলেন কী? হিমাদ্রি, আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব নাটক হচ্ছে নাকি?

বিকাশ হাতকড়ি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই ঘরের চার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা চার যুবক একসঙ্গে পিস্তল তুলে বিকাশকে তাক করল।

সেটা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে ওদের বললেন, Stop !

তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কাকে হাতকড়ি পরাচ্ছেন? ওর অপরাধ?

Murder.

কাকে?

ভারতীয় নাগরিক অবিনাশ ভট্টাচার্য।

Damn it, ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন।—ভারতীয় নাগরিক! এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টটার কী হয়েছে? এরা কি কোনও খবরই রাখে না?

না, স্যার। আমি বললাম, কলকাতার পুলিশ শুধু ঠেলাওয়ালা আর রিকশাওয়ালাদের ধরে। ফুটপাথে বসে যারা দু-পয়সা রোজগার করে, তাদের ধরে-ধরে হ্যারাস করে। কলকাতার পুলিশ রাজনীতি করতে গিয়ে সব কুশলতা, সব সুনাম নষ্ট করেছে। এঁরা এখন রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুল।

তাই তো দেখছি। আপনি যাকে ভারতীয় নাগরিক বলছেন, অফিসার, he was a notorious spy. পাকিস্তানের এজেন্ট। And Himadri is our man.

কী বলছেন আপনি?

হিমাদ্রি, tell him boy.

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে আমার wallet বার করলাম। প্রথম ফোল্ডটা খুলে ধরলাম—সেখানে আমার আইডেন্টিটি কার্ডটা আটকানো ছিল।

বিকাশ মিনিট খানেক সেদিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পলক পড়ছে না। ধীরে-ধীরে ওর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, C. B. I ! Interpol !

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, প্রত্যাবর্তন, বিকাশ। That was the only way to

BanglaBook.org

come back.

Strange !...Very strange !

তারপর বিকাশ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলল, এরা কারা?

এরা সকলেই C. B. I.-র অফিসার। Specialists.

আর উনি?

এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম বলদেব মালহোত্রা, দি টপ ম্যান।

বিস্মিত বিকাশ কোনওরকমে বলল, কিন্তু...কিন্তু উনি তো...।

হ্যাঁ। দিন কয়েক পরে উনি কলকাতায় আসবেন বলে এখানকার পুলিশ মহল জানত। প্রকৃতপক্ষে উনি কলকাতায় এসেছেন আমারও আসার আগে। আর এই হোটেলের এই কক্ষটা সি-বি-আই'র অস্থায়ী কার্যালয়।

বিকাশ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, আমাকে তুই বলতে পারতিস, হিমু। It is rather humiliating.

আমি বিকাশের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললাম, old boy, you know how it is, আমরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কিছুই করতে পারি না। লোকাল পুলিশ যদি আমাদের আসার সংবাদ জানত, তাহলে পাখি উড়ে যেত। কেন না, পুলিশ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের হাতের মুঠোর মধ্যে। আমি ক্ষমা চাইছি, বিকাশ।

বিকাশ করুণভাবে হেসে বলল, It does not matter.

মিঃ মালহোত্রা সকলকে বসতে অনুরোধ করে খাবারের অর্ডার দিলেন।

আমরা বসলে মিঃ মালহোত্রা বললেন, হিমাদ্রি, তোমার দ্বিতীয় পিস্তলটা জমা দাও। বিকাশবাবু, এই ডিপার্টমেন্টের একটা পিস্তল আপনি হিমাদ্রির কাছ থেকে নিয়েছেন। দয়া করে ওটা ফেরত দেবেন।

নিশ্চয়।

হিমাদ্রি, my clever boy, তুমি ওদের হাসনাবাদের ডেরা চিনলে কী করে?

আমি বিকাশের দিকে ফিরে বললাম, for your benifit, আমি প্রথম থেকে শুরু করছি। এটা একটা ভালো গল্প হতে পারে। তবে এটাকে তোরা গোয়েন্দা কাহিনি বলবি, না গুপ্তচর কাহিনি বলবি, তা বলতে পারি না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলা দিয়ে পুব-আকাশের দিকে তাকালাম। ভোর হয়ে আসছে। আমি ফিরে এসেছি।

ধীরে-ধীরে বললাম, আমি ছিলাম বেইরুটে। কথা ছিল, সেখান থেকে এক ভারতীয় স্মাগলারকে অনুসরণ করে তার সঙ্গে দিল্লি আসব। সেখানেই তাকে জেলে পুরব।

কিন্তু বেইরুটেই নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেলাম। হেড-অফিসের আদেশ, সেই বেইরুটের কাজটা দিল্লিতে শেষ করে কলকাতায় আসব। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট—কর্নেল। এই সময় রঞ্জনের চিঠি পেলাম। হেড অফিস থেকে রঞ্জনের চিঠিটা আর-একটা খামে পুরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিকাশ বলল, তাহলে তুই রঞ্জনের চিঠি পেয়ে কলকাতায় আসিসনি?

না, বিকাশ। ভাগ্যচক্রে আমার ওপর আদেশ হল কলকাতায় আসার, তাই। কিন্তু আমার ওপর যদি আদেশ হত বোম্বাইয়ে যেতে, আমায় যেতে হত। রঞ্জনের চিঠি পেলেও আমি আসতে পারতাম না। আমাদের কাজটাই ওই ধরনের। আগে কাজ।

সিগারেটটা ফেলে আবার শুরু করলাম, কলকাতায় এসে ভাবলাম, রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করা যাবে। অবশ্য তোমার সঙ্গেও দেখা করার অদম্য বাসনা ছিল, সুজাতা। কিন্তু এখানে পৌঁছে শুনলাম, রঞ্জন খুন হয়েছে। তারপরই আমাকে খুন করার চেষ্টা হল। আমি বুঝতে পারলাম রঞ্জনের খুনিই

BanglaBook.org

আমাকে খুন করতে চাইছে; কেন না রঞ্জনের খুনি জানত আমি কলকাতায় এসেছি রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে নয়, গুপ্তচরদের ধরতে। অতএব ধরে নিতে হবে গুপ্তচররাই রঞ্জনকে মেরেছিল, এবং তারাই জানত যে, রঞ্জন তাদের মারণাস্ত্র আমাকে দেবে বলে ডেকেছে। সুতরাং সেটা আমার হাতে আসার আগে আমাকে সরাতে চেষ্টা করছে।

আমার পথ সহজ হয়ে গেল। আমি জানতাম, রঞ্জনের খুনিকে বার করতে পারলেই গুপ্তচরদের কাছে পৌঁছে যাব। হলও তাই।

কিন্তু আমি একটু ধোঁকায় পড়েছিলাম—প্রথম দিন হোটেলের কক্ষে নিহত আততায়ীর পকেটে সেই কাগজের টুকরোটা পেয়ে। তাতে ছিল একটা হোটেলের ঠিকানা আর পুলক সেনের নাম। প্রথমে মনে হয়েছিল আততায়ী পুলক সেনের লোক। তার নির্দেশেই আমাকে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু রেলওয়ের হারানো-প্রাপ্তি বিভাগ থেকে যে-নামটা পেলাম, সেটা অবিনাশদার—অবিনাশ ভট্টাচার্যের টাকার ব্যাগ ওটা। আমি বুঝতে পারলাম, পুলক সেন অপরাধী নন, তিনি নিজেই এদের টার্গেট। আমার নাম এবং পুলক সেনের নাম ও ঠিকানা আততায়ীকে দেওয়া হয়েছিল। আততায়ী ছিল ভাড়াটে—কাউকেই সে চিনত না।

পঞ্চা আমাকে যখন হাসনাবাদের ঠিকানা দিল, তখন বুঝতে পারলাম, পুলক সেন এর কেন্দ্রে নেই, কেন না পুলক সেনের সম্পত্তি সবই হুগলিতে। হাসনাবাদের বাগানবাড়ির মালিক যে অবিনাশদা, তা আমি জানতাম। বদ্রির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি ওখানে মাস কয়েক ছিলাম।

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে লিলির কাছে শুনেছিলাম, আমি কলকাতায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে পুলক সেন অদৃশ্য হয়েছে। মনে হয়েছিল পলায়ন। পরে পঞ্চাকে বন্দি করে এই হোটেলে মিস্টার মালহোত্রাকে ফোন করে জানলাম, মিস্টার সেনের নিরাপত্তার জন্যেই তাঁকে সরিয়ে নিয়েছে C. B. I.

আমি তোমাকে ওটা আগে বলিনি, হিমাদ্রি, কারণ নিয়মবিরুদ্ধ। এজেন্টদের সব কথা বলা যায় না।—বললেন মিঃ মালহোত্রা।

বিকাশ বলল, পুলক সেনকে ওরা মারতে চাইবে কেন?

মিঃ মালহোত্রা বললেন, পুলক সেন ছিলেন পুলিশ-মন্ত্রী। তিনি এই সময়ে অবিনাশের বিষয় জানতে পারেন। তখন কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে হোম ডিপার্টমেন্টে যান। হোম ডিপার্টমেন্ট তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

আমি বললাম, এই সময় ভোটের ফলাফল বের হল। পরাজিত হলেন পুলক সেন। প্রধানত অবিনাশ ভট্টাচার্যের চক্রান্তেই তিনি হেরেছিলেন।

মিঃ মালহোত্রা বললেন, আমরা বুঝতে পারলাম এবার মিস্টার সেন বিপদে পড়বেন। তাই তাঁকে সরিয়ে নিতে হল।

মিঃ মালহোত্রার ডাকে পাশের ঘর থেকে পুলক সেন বেরিয়ে এলেন। বিকাশ বিস্মিত হয়ে নমস্কার করল। পুলক সেন হেসে বললেন, ভালো আছ, বিকাশ? তোমরা চিরকাল ভেবেছ যে, আমি একটা shady character, অথচ তোমার প্রমোশান হয়েছিল আমারই জন্যে।

বিকাশ বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন ধোঁয়াটে ঠেকছে।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, Operation blank—শূন্য। কিন্তু আমি দুঃখিত বিকাশ, তোকে প্রথম থেকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্যে।

Luck হিমু, with all these degrees আমি নীচেই পড়ে রইলাম।

মিঃ মালহোত্রা বললেন, দুঃখ করার কিছু নেই, বিকাশবাবু। আপনি সৎ এবং পরিশ্রমী। You are in our sights all along. আপনার মতো বুদ্ধিমান এবং সাহসী লোক আমাদের দরকার। হিমাদ্রি আমাদের বহুবার আপনার কথা বলেছে। আপনি প্রস্তুত থাকুন, আপনাকে আমরা

BanglaBook.org

খুব শিগগিরই এখান থেকে নিয়ে যাব।

খাবার এল। নীরবে সকলে খেতে লাগলাম।

হঠাৎ মিঃ মালহোত্রা বললেন, তোমার পরবর্তী কাজ হবে...।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, আমার একটা অনুরোধ আছে, স্যার। আমি দীর্ঘদিন কোনও ছুটি পাইনি, কিন্তু এবার আমার তিন মাসের ছুটি চাই। এই যে এই ভদ্রমহিলাকে দেখছেন—ইনি দীর্ঘ বারো বছর আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। ইনি...।

জানি, হিমাদ্রি। তুমি চলে যাওয়ার পর এই সেন্ট্রালে তিন-চারটে রাজা রাজত্ব করেছে। এখন পঞ্চা আর বিদ্যুৎ রায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

শুনেছি স্যার।

এই বিদ্যুৎ রায়ই শেষ পর্যন্ত সম্রাট হবে। He has every quality you had. প্রচণ্ড ধনী। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল নয়। শিক্ষিত অথচ underworld-এ থাকে।

আপনি এত খবর রাখেন?

তোমার বিষয়েও তো সব খবর রাখতাম, হিমাদ্রি। তুমি সেদিন রাত্রে যখন এই মেয়েটিকে তোমার মায়ের গলার হার উপহার দিয়ে বিদায় নিচ্ছিলে, তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলে যে, সেই সময় উলটোদিকের ফুটপাথে উন্মুক্ত পিস্তল হাতে আমার ছ'জন অফিসার অপেক্ষা করছে?

সুজাতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল সেদিন।

অথচ তুমি ঠিক আট মিনিট বিশ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলে।

চমকে উঠলাম। আমি এই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি, অথচ আমার বিষয়ে এত detailed রিপোর্ট রাখেন মিঃ মালহোত্রা, তা আমি জানি না।

উনি বললেন, এই বিদ্যুৎ রায়কে খুন করার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত হচ্ছে। আর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন পরমাণু বিজ্ঞানী ডাক্তার অসীম সোম। কেন সকলে বিদ্যুৎ রায়কে মারতে চাইছে? কেন ডাক্তার সোম অদৃশ্য হলেন? So you have another job to do.

কথা শেষ করে উনি উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

বুঝলাম। মিটিং শেষ। একটা মেয়ের পক্ষে বারো বছর অপেক্ষা করাটা বোধহয় যথেষ্ট নয়। আমি সুজাতার দিকে ফিরে বললাম, আমার পরবর্তী মিশন হওয়া উচিত 'অপারেশন ম্যারেজ'। কিন্তু ভাগ্যে এসে জুটল অপারেশন কিডন্যাপ।

BanglaBook.org

বহে বিষ বাতাস

BanglaBook.org

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ. সে. র. উ. ৩—৭২

॥ ১ ॥

হঠাৎই আজ একটু ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে গেল গার্গীর। জানালার দিকে চোখ মেলতেই দেখল, বাইরের পৃথিবীতে তখন ধোঁয়ারং আলোর উদ্ভাস খুব ধীরে, খুবই নরমভাবে জন্ম দিচ্ছে কলকাতার বুকে আরও একটি মোলায়েম সকাল। জুবিলি পার্কের যে-দোতলা বাড়িটিতে তারা বহুকাল ধরে ভাড়াটে হিসেবে আছে, তার সামনের নাতিপ্রশস্ত মরচেধরা পিচরাস্তাটি ক্রমশ মুখর হয়ে উঠতে থাকে এই ব্রহ্মসময় থেকেই। রোদের সোনালি তুলি দিয়ে যতই একটু-একটু করে মুছতে থাকবে ভোরের কুয়াশারং, জুবিলি পার্ক হয়ে উঠবে আরও কোলাহলময়।

সবদিন এমন ভোরেই ঘুম ভাঙে না গার্গীর। তবে সে লেট রাইজার তাও নয়। ভোর ও সকালের সন্ধিসময়েই বিছানা ছাড়ে সে। ভোরে ঘুম ভাঙলেও সেই সন্ধিক্ষণ না আসা তক জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা তার বহুদিনের অভ্যাস। আজও সে-দৃশ্য অবলোকনের মুহূর্তগুলো তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে গিয়েই কী যেন মনে পড়ল তার। পরক্ষণেই তার শরীর জুড়ে যা প্রবলভাবে ঘনিয়ে এল, তার নাম টেনশন।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল, আজ বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে যে-ডিবেট কমপিটিশনের আয়োজন হয়েছে, তাতে সে একজন পার্টিসিপ্যান্ট। কয়েকদিন আগে মুহূর্তের এক দুর্বলতায় এই বিতর্ক-প্রতিযোগিতার নাম লিখিয়েছিল। বিতর্কের বিষয়বস্তুটি তার খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল বলেই তার এই আকস্মিক অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তারপর যত দিন গড়িয়েছে, ততই কিছুটা উত্তেজনায়, শিহরনে কিছুটা শঙ্কায়ও চুরমুর হচ্ছে নিজের ভেতর। আজ সেই দিনের দিন টেনশন যে তুঙ্গে উঠবে তা তো অনিবার্যই।

বিতর্কের বিষয়বস্তু অবশ্য গার্গীর কাছে গ্রিক কিংবা রোমানের মতো দুর্বোধ্য ঠেকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ছাত্রী সে। 'ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র'—এই বিষয়বস্তু তার অধীত বিষয়ের ধারেকাছেও ঘেঁষে না। কিন্তু গণিতের ছাত্রী হয়েও গার্গীর কৌতূহলের বৃত্তটি পরিসরে বড্ডই বড়। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরে হটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কখনও দর্শনের তত্ত্বতালাশও তার অন্যতম হবি। কখনও-কখনও কলকাতার পথে-পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে টুকটাক ঘোরাফেরা করাও তার আর এক প্রিয় বিলাস। ঠিক বোহেমিয়ান তাকে বলা যাবে না। কেন না আসলে এতসব অ্যাডভেঞ্চারের ভেতর টুঁ দিতে-দিতে তার কালি, কলম ও মন জন্ম দেয় এক-একটি ফিচারের। ইতিমধ্যে তার কিছু-কিছু ফিচার প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দু-তিনটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। বিংশতিবর্ষীয়া এই তরুণীটির নাম অতএব সংবাদপত্রের কল্যাণে কোনও-কোনও মহলে সামান্য পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী মহলে তো অবশ্যই। তাই বিতর্কের আসরে গার্গী মুখার্জির অংশগ্রহণ রীতিমতো কৌতূহলের তো বটেই, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সমীহেরও।

এতসব ভাবনার মধ্যে গার্গী বিছানা ছেড়ে শুরু করে দিয়েছে তার দৈনন্দিন রোজনামচা। বিছানা তোলা, ঘরকন্নার কাজে তার মাকে একটু সাহায্য করার পর বইখাতা খুলে গণিতের গভীর তত্ত্বে কিছুক্ষণ হাবিডুবি খাওয়া। আজ সেইসঙ্গে বিতর্কের বিষয়েও এক ঝলক নজর রাখল সে। তার মধ্যে রান্নাঘর থেকে মায়ের রান্নার আওয়াজ, তার বাবা সুশোভনের অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি, একটু পরেই খেয়েদেয়ে তার অ্যাটাচি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ, এতসব শোনার পর সে হামলে পড়ল সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে।

সকাল সাড়ে আটটা-ন'টার পর মিনিট পঁয়তাল্লিশেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন চোখ বোলাবুলিও তার রোজনামচার একটি বিশেষ আইটেম। যারা রোজ সারারাত জেগে সাদা পৃষ্ঠা কালো করেন, তাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে গার্গীর কোনওদিনই ক্লান্তি নেই। সারা

বিশ্বে কোথায় কী ঘটে চলেছে তা না জানা তক একটা মূর্খ-মূর্খ অনুভূতি ঘুলিয়ে ওঠে তার শরীরে। তার বান্ধবীরা যাকে বোকা-বোকা লাগা বলে। পি. টি. এস.-এর অক্ষরগুলি গোগ্রাসে গেলার পর তবেই যেন বিশেষ অজ্ঞ থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে গার্গী। অন্তত সেদিনকার মতো।

আজও পঞ্চম পৃষ্ঠায় পৌঁছনোর পর একটা চমকপ্রদ খবরে তার চোখ আটক হয়ে রইল। শুধু চমকপ্রদই তা নয়, বেশ রহস্যময়ও। সংবাদে প্রকাশ, কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে বেশ রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন সে-বাড়ির রানিমা। রানিমার বয়স হয়েছিল প্রায় সাতাত্তর। গত চারপাঁচ বছর ধরে চলচ্ছক্তিহীনও হয়ে পড়েছিলেন বাতজনিত ব্যথায়। তবু তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিবেচনাবোধ, রাজকীয় মেজাজ খুবই অটুট ছিল এখনও। বছর দশেক আগে রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যাওয়ার পর রানি লাবণ্যপ্রভা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে। তিনি ছাড়াও রাজপ্রাসাদে বাস করতেন তাঁর বহু আশ্রিত-আশ্রিতারা। কেউ একা, কেউ সপরিবারে। দিন চারেক আগে রঙিন সাইডব্যাগ কাঁধে দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক যুবক রাজপ্রাসাদে হঠাৎ হাজির হয় সাংবাদিক পরিচয়ে। রাজপ্রাসাদেরই একটি ঘরে থাকত সে, চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা, হাতে সর্বক্ষণই লেখার প্যাড ও কলম। গত চারদিন ধরেই সে কখনও রানিমার কাছে, কখনও আশ্রিতদের কাছে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করত, আর সেগুলি নোট করত মনোযোগ সহকারে। যুবকটির বিশেষত্ব হল, সে লেখালেখি করে বাঁ-হাতে, কিন্তু খাওয়াদাওয়া বা অন্য কাজের সময়ে ব্যবহার করে ডানহাত। খুব বেশি কথা বলে তা নয়। কিন্তু যখন বলে, একটু উত্তেজিত দেখায় তাকে। গতকাল দুপুরে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছুতোয় সে রানিমার ঘরে ঢুকেছিল। ঘণ্টাখানেক পর সে চলে যাওয়ার পরেই আবিষ্কৃত হয়, রানিমার নিস্পন্দ শরীর পড়ে আছে বিছানায়। তাঁর গলার নলিটি কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেই যুবককে দেখা যায়নি সে-তল্লাটে। যুবকটি রাজবাড়িতে ঢোকার সময় জানিয়েছিল, সে কলকাতায় থাকে, পেশায় ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক, তবে ছবিও আঁকে মাঝেমধ্যে, এখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে-ঘুরে পুরোনো রাজবাড়িগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে একটি পূর্ণাঙ্গ লেখা তৈরি করবে বলে। প্রাসাদের আশ্রিতরা তাকে সাংবাদিকবাবু বলেই জানত। রানিমার কাছে নাম বলেছিল অশেষ রায়। কী কারণে খুনটি হল তা সবার কাছেই ভারী রহস্যজনক। পুলিশ তদন্ত করছে।

সংবাদটিতে বার-দুই চোখ বুলিয়ে ভারী আশ্চর্য হল গার্গী। খুনের খবরটি যেমন তার কাছে বিস্ময়কর, তেমনই সেই 'সাংবাদিক'টির লেখার বিষয়বস্তুটিও। পুরোনো রাজবাড়িগুলো নিয়ে লেখার কথা সে নিজেও তো কতবার ভেবেছে!

কিন্তু এহেন রোমাঞ্চকর একটি লেখা তৈরি করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধা, পঙ্গু রানিমাকে খুন করতে গেল কেন সেই অদ্ভুত দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটি।

কতক্ষণ এই রহস্যের ভেতর নিজেকে ওতপ্রোত রেখেছিল গার্গী তা স্মরণে নেই তার। হঠাৎ টেবিল-ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। সময় দশটার ঘর ছুঁই-ছুঁই। বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা বলেছেন, অন্তত বারোটার মধ্যে হাজিরা দিয়ে প্রতিযোগিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা চাই।

দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে একরাশ উত্তেজনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হল গার্গী। সময়ানুবর্তিতা যেমন তার পছন্দের, তেমনি কর্তব্যবোধ। আসলে যে-কোনও ব্যাপারেই সে ভীষণ সিরিয়াস। বিতর্কে নামার ঘণ্টাখানেক আগে সে তার ব্যাগ খুলে চোখ রাখল নির্দিষ্ট কাগজটিতে যাতে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুটি লেখা আছে বিশদ করে।

সেই দিনটা গার্গীর জীবনের এক লাল অক্ষরের দিন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিতর্কে সে-ই একমাত্র প্রতিনিধি যে কিনা সায়েন্স স্ট্রিমের ছাত্রী। স্বভাবতই বিচারক, অধ্যাপক, শ্রোতা, সবারই কৌতূহলের দৃষ্টি ছিল তারই দিকে। তবে সে নিরাশও করেনি তাদের। তার বাচনভঙ্গি বরাবরই ভারি সাবলীল,

BanglaBook.org

তার বিশ্লেষণবোধও তীক্ষ্ণ, বিষয়বস্তুটি উপস্থাপনাও করল খুবই বিশদ, প্রাঞ্জল ও নিপুণভাবে। বিতর্কের পক্ষে সে এমন বিপুল তথ্যাবলি হাজির করল শ্রোতাদের সামনে যে, তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অডিয়েন্স ফেটে পড়ল তুমুল হাততালিতে।

বিচারকরাও একবাক্যে ঘোষণা করলেন, গার্গী মুখার্জিই প্রথম।

গার্গী তখনও এক ঘোরের মধ্যে আছে। মঞ্চ থেকে নামার পর এতজনে এতভাবে প্রশংসা করল যে, সে বহুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল নিজের ভেতর। কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ তাকে এক অলিখিত উপাধিতে ভূষিত করল, মিস ইউনিভার্সিটি, মিস ইউনিভার্সিটি। ইয়ার্কি করেই বলেছে, তবু এই ঘোরের মুহূর্তে উপাধিটি মন্দ লাগল না তার। সে তেমন রূপসি নয় যে সে কখনও মিস ইউনিভার্স হতে পারবে। সে-যোগ্যতা তার নেই, বাসনাও নেই। কিন্তু মিস ইউনিভার্সিটি! বাহ্ বেশ বলেছে, তো ছেলেটা। নিশ্চয়ই কোনও ছাত্র।

দু-একজন পরিচিত অধ্যাপকও তাকে কনগ্রাটস জানিয়ে গেলেন।

শেষে তার হাতে তুলে দেওয়া হল উইনার্স কাপ, সুদৃশ্য সার্টিফিকেটটি। সেই সঙ্গে একগুচ্ছ ভারী-ভারী বই। বইয়ের প্যাকেটটিই সবচেয়ে পছন্দ হল তার। বই-ই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে কখনও বিট্রে করে না।

বাড়ি ফিরতেই তার মা বললেন, সে কি রে, তুই ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছিস! এ তো ভাবাই যায় না। ছোটবেলায় যা মুখচোরা ছিলি তুই!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল। মা জানে না এই ক'বছর কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পর সে এখন রীতিমতো মুখরা। তার তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে কখনও ঘাবড়ে যান অধ্যাপকবৃন্দও। তার শাণিত আক্রমণকে সমীহ করে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা। আসলে গার্গী ভীষণ স্পষ্টবক্তা। কাউকেও রেয়াত করে না আজকাল। অন্তত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

বিতর্কে প্রথম হয়ে পুরস্কার জিতেই যে সে রেহাই পেল তা নয়। তার বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পরদিন তাকে চেপে ধরল, অ্যাই গার্গী, আমরা অনেকেই তো ডিবেট কমপিটিশন দেখতে যাইনি। কী বির্তক করে ফার্স্ট হলি তা আমাদের শোনা। আজ ক্লাসে ডেইসে দাঁড়িয়ে তোর বক্তিমে দিয়ে তাক লাগিয়ে দে সবাইকে।

গার্গী এড়াতে চাইছিল। কিন্তু সুপ্রতিম, শঙ্খলেখা, রীতেশ, বুম্বা, স্বাগতা, এরা কয়েকজন এমন নাছোড়বান্দা হল যে, গার্গীকে উঠতেই হল ডেইসে। তারপর সেই বক্তব্য রেকর্ডের মতো পুনর্বার—।

আবারও তুমুল হাততালি। সবাই উদ্ভাসিত হয়ে বলল, আমাদের ডিপার্টমেন্টের মান বাড়ালি তুই।

হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এস. কে. জি. পর্যন্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর অথচ মৃদুভাষে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড।

এভাবে বেশ কয়েকদিন প্রশংসা আর উচ্ছ্বাসে ডুবে থাকার পর হঠাৎ দিন পনেরো বাদে আর এক সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ আটক হল তার। এবার সংবাদ নয়। বিজ্ঞাপন। সেই বীরভঙ্গপুরের ঘটনারই জের টেনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তৃতীয় পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকের কলামে। বীরভঙ্গপুরের নামটি দেখেই গার্গী কৌতূহলী হল। বিজ্ঞপ্তিটি খুবই অদ্ভুত আর বিস্ময়কর। তার বয়ানটি এইরকম ঃ

বীরভঙ্গপুর রাজপ্রাসাদে রানিমা লাবণ্যপ্রভা মিত্রর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এইমুহূর্তে উত্তরাধিকারবিহীন। যদি এ-দেশের কোথাও তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি বা তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি

BanglaBook.org

সহ রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের নিযুক্ত অ্যাডভোকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যিনি বা যাঁরা উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, রানিমার বিপুল ধনসম্পত্তি, রাজবাড়ি, জমিজমা—সবকিছুরই মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে তাঁকে বা তাদের। যদি কেউ ভুয়ো প্রমাণাদি নিয়ে উত্তরাধিকারত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তির নীচে জনৈক অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর। ট্রাস্টিবোর্ডের নিযুক্ত আইনজ্ঞ হিসেবে এই অ্যাডভোকেটকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিটি পড়েই গার্গী লাফিয়ে উঠল প্রায় ছেলেমানুষের মতো। যে প্রসঙ্গটি গত কয়েকদিন তার ভেতরে হাজারবার ঢালাউপুড় হয়েছে, সেই কাহিনিটিই হঠাৎ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এভাবে ফিরে আসবে তা ভাবতেই পারেনি। আগের দিন প্রকাশিত সংবাদটির সঙ্গে আজকের বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করলে রাজবাড়ির রহস্যটি খুবই যে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল তাতে সন্দেহ নেই। কীভাবে হঠাৎ এক অপরিচিত সাংবাদিকের হাতে খুন হলেন বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির রানিমা, তাঁর হত্যারহস্যের কী তদন্ত হল, তার জট এতদিনে খুলেছে কি না, এর কোনও কিছুই জানা হয়নি গার্গীর। তার আগেই উত্তরাধিকারী চেয়ে এই বিজ্ঞপ্তি দ্বিগুণ কৌতূহল উসকে দিল তার ভেতরে। তা হলে কি এই দাঁড়ায় যে, রানিমার কোনওভাবে মৃত্যু হলে তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি অন্য কারও হাতে বর্তাবে! তার মানে রানিমার খুনের পিছনে কারও সুনির্দিষ্ট মোটিভ কাজ করেছে! উত্তরাধিকারী হওয়ার মোটিভ! সে-মোটিভ তা হলে কার? সেই তথাকথিত সাংবাদিকের! না অন্য কারও!

সমস্ত বিষয়টি আরও কয়েকবার নিজের মনে নাড়াচাড়া করার পর ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল গার্গী। এ ধরনের কোনও রোমাঞ্চকর বা রহস্যঘন ঘটনা তার কানে এলে কিংবা সংবাদপত্রে পড়লে আজকার এক ধরনের টেনশন চারিয়ে যায় তার ভেতর। তা সে কোনও বস্তিবাড়ির একটি শিশুশ্রমিকের দৈনন্দিন লড়াইয়ের কথাই হোক, অথবা কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের খুব সামান্য পরিবার থেকে দ্রুত উত্থানের কাহিনিই হোক, কিংবা তিরিশের দশকে লখনউ থেকে আসা কোনও বাইজির চমকপ্রদ স্মৃতিকথাই হোক। আর আশ্চর্য, রোজই কোনও না কোনওভাবে এই ধরনের 'স্টোরি' তার নজরে চলে আসে ঠিক। সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্টোরিটিতে সাহিত্য মিশেল দিয়ে সে প্রতিদিন চমক দিতে চায় সংবাদপত্রের পাঠকদের।

তবে এর আগে কোনও খুনের ঘটনা তাকে আলোড়িত করেনি এভাবে। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, বীরভঙ্গপুরের কাহিনিতেও কোনও দারুণ চমক অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। জায়গাটা কলকাতা থেকে তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। ওদিকে কখনও যায়ওনি গার্গী। একেবারেই অচেনা, অজানা জায়গা। অপরিচিত বলেই বীরভঙ্গপুর সম্পর্কে আরও কৌতূহল উসিয়ে যাচ্ছে তার মনে! সেখানে তার মতো একজন মেয়ের পক্ষে ঘটনার উৎস খুঁজতে যাওয়া সত্যিই কি সম্ভব! কীভাবে যাবে সেখানে! কী পরিচয়েই বা!

হঠাৎ এই আনকা ব্যাপারটা নিয়ে তার মাথায় জট পাকিয়ে যেতে কয়েকদিন রাতে ঘুমই এল না চোখে।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

কলকাতা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটি নৃশংস খুনের ঘটনার জের খুঁজতে যাওয়া, এ যেন প্রায় শার্লক হোমসের মতোই এক অ্যাডভেঞ্চার। গোয়েন্দা-

উপন্যাস পড়ার দিকে তার বরাবরের ঝোঁক। আগাথা ক্রিস্টি কিংবা আর্থার কোনান ডয়েলের কোনও বই তার হাতে পড়লেই সে গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। শুধু পড়েই তা নয়, পড়ার পর খুনের মোটিভ, খুনির চালচলন, গোয়েন্দাপ্রবরের তদন্তের ধারা সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবে, আর মনে-মনে এও চিন্তা করে, সে গোয়েন্দা হলে এই হত্যারহস্যটির কিনারা করতে পারত কি না। তারপর নিজের মনে হেসেও ফেলে সে। তার এই অলীক, অদ্ভুত ভাবনার কথা ভেবেই। বীরভঙ্গপুরের রানিমার করুণ পরিণতির কথাও তাকে ভাবাল। খুবই ভাবাল। যত না খুনের মোটিভ নিয়ে, তার চেয়েও বেশি সেই সাংবাদিকটিকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান হল তার ভাবনার আবর্ত। গার্গী নিজেও ভবিষ্যতে কোনও বিখ্যাত কাগজের সাংবাদিক হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করে। কোনও অভিনব সংবাদের পিছু-পিছু ধাওয়া করে তার ভেতরকার খুঁটিনাটি বার করার মধ্যে যে অদ্ভুত একটা থ্রিল আছে তা রেলিশ করে। অথচ একজন সাংবাদিক কিনা রাজবাড়ি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এক বিধবা বৃদ্ধা রানিমাকে খুন করে পালিয়ে এল চুপিচুপি। কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য!

কিন্তু গার্গী তখন এও ভাবতে শুরু করেছে, এক্ষেত্রে সাংবাদিক যুবকটির মোটিভই বা কী হতে পারে! সে কি রাজবাড়ির সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত! ভাবনাটা আরও গাঢ় হল এই কারণে যে, রানিমার খুনের সঙ্গে হয়তো তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

এরকম একটি অনুসন্ধিৎসা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করার ফাঁকে-ফাঁকে গার্গী কয়েকদিন ধরে খোঁজখবর নিতে লাগল, অশেষ রায় নামে কোনও সাংবাদিককে কোনওভাবে আবিষ্কার করা যায় কি না। নানান ধরনের ফিচার লেখার সুবাদে প্রায় সব সংবাদপত্রের অফিসেই তার অল্পস্বল্প যোগাযোগ আছে। সব অফিসেই কোনও-না-কোনও সাংবাদিক, অথবা বার্তা-সম্পাদক, কিংবা খোদ পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে মোটামুটি 'জান-পয়চান' হয়ে গেছে গত দু-তিন বছর যাতায়াতের ফলে। কিন্তু কয়েকদিন ফোনাফুনি ঘোরাঘুরি করার পর সে তার অনুমানমতো ব্যর্থই হল। সব কাগজের অফিস থেকে তার চেনাজানারা কেউ ঠোঁট উলটে অথবা কাঁধ শ্রাগ করে অথবা জিবে চুক-চুক করে জানিয়েছে, স্যরি গার্গী—।

অর্থাৎ যে যুবকটি বীরভঙ্গপুর রাজবাড়িতে গিয়েছিল, হয় সে আদৌ কোনও সাংবাদিক নয়, অথবা তার নাম হয়তো অশেষ রায় নয়, অন্য কিছু। এ ক্ষেত্রে নাম গোপন করাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লুও পাওয়া গেছে খবরের কাগজের রিপোর্টিং থেকে। 'সাংবাদিক' যুবকটি বাঁ-হাতে লেখে, এবং আরও বড় কথা, ছবি-আঁকার অভ্যাসও আছে তার।

তা হলে যদি সাংবাদিক না হয়, এমন কোনও শিল্পী যে বাঁ-হাতে কলম ধরে বা ধরে নেওয়া যেতে পারে সে তুলিও ধরে বাঁ-হাতে।

সে যাই হোক, সেই রাজবাড়ির খুনের ঘটনাটি যতটা চমক দিয়েছে, ততটাই তাকে উসকে দিয়েছে সেই তথাকথিত সাংবাদিক-কাম-শিল্পীর ফিচারের বিষয়টি। গত দু-তিন বছরে গার্গী এত-এত ফিচারের পিছনে দৌড়েছে, তার ছোট্ট নোটবইটিতে সংগ্রহ করেছে কত না খুঁটিনাটি 'স্টোরি', কিন্তু কখনও এইসব পুরোনো রাজবাড়ি নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। এ যুগে রাজা নেই, তাদের রাজত্ব নেই, থাকবার কথাও নয়, কারণ সরকারি আইনবলে এইসব রাজা তথা জমিদারদের রাজত্ব অনেকদিন আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু অতীতদিনের ছায়া হয়ে পড়ে আছে তাঁদের আভিজাত্য ও গড়ে যাওয়া বিশাল অট্টালিকাগুলি। সেইসঙ্গে রাজবাড়ির বর্ণাঢ্য সব ইতিহাস।

ভাবতে-ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। মনে হল তার এক্ষুনি একবার বীরভঙ্গপুরে যাওয়াটা খুবই জরুরি। এহেন একটি নৃশংস খুনের ঘটনার পর রাজবাড়ির অতীত ইতিহাস টেনে বার করার পক্ষে এই হল উপযুক্ত সময়। কথার পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসবে চমক-দেওয়া সব কাহিনি। হয়তো অনেক লোমহর্ষক গল্পও। অনেক বর্ণাঢ্য চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে সেই প্রাচীন অট্টালিকাটির চত্বরে।

BanglaBook.org

কিন্তু যাওয়া বললেই তো যাওয়া নয়। অচেনা জায়গা, অচেনা পথঘাট। বিশেষ করে কলকাতা থেকে যখন এতখানি দূরে, সেখানে হুট করে একা গার্গী যায়ই বা কী করে। কলকাতার পথঘাট তার চেনা। এখানকার অলিতেগলিতেও সে অনেক রাত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হঠাৎ ফুটপাতে উবু হয়ে বসে নোট করে নিতে পারে কোনও ফুটপাত-বাসিন্দার জীবনকথা। কিন্তু অত দূরে, ঠিক মফস্‌সল শহরও নয় যে গিয়ে কোনও হোটেলে উঠে পড়বে!

কিছুক্ষণ নিজের ভেতর ডুব দিয়ে চক্কর দিতে-দিতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বান্ধবী শঙ্খলেখার কথা। খুবই শান্ত, মার্জিত স্বভাবের মাঝারি ধরনের রূপসি শঙ্খলেখা পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে। কিছুকাল আগে কথায়-কথায় বলেছিল, তার বাড়ি ঝাড়গ্রামের দিকে কোথাও, কোনও এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে তারপর বাস ধরে আরও কিছুক্ষণ। জায়গাটার নাম এই মুহূর্তে গার্গীর মনে না পড়লেও সে জানে, প্রতি পনেরো দিন পরপর শনিবার হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সেই গাঁয়ের বাড়িতে যায় শঙ্খলেখা। রবিবার কাটিয়ে সোমবার ভোরেই আবার কলকাতার ট্রেন ধরে। যতদূর মনে হচ্ছে বীরভঙ্গপুর জায়গাটা ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হবে। তা হলে হয়তো শঙ্খলেখার কাছে হালহদিশ পাওয়া যেতে পারে বীরভঙ্গপুরের।

ঠিক যেমনটি মনে হওয়া, অমনি পরদিনই গার্গী হোস্টেলে গিয়ে পাকড়াও করল শঙ্খলেখাকে, হ্যাঁ রে, শঙ্খলেখা, তুই কি বীরভঙ্গপুর নামটা কখনও শুনেছিস?

গ্রন্থকীট মেয়ে শঙ্খলেখা, সারাক্ষণ অঙ্কের গভীর সব সমস্যার ভেতর ডুবে থাকতেই পছন্দ করে। গার্গীর আচমকা প্রশ্নে তার দীর্ঘ চোখের পাতা আস্তে করে তোলে, হঠাৎ বীরভঙ্গপুর নিয়ে তোর কী কাজ।

শঙ্খলেখার বলার ভঙ্গি দেখেই তৎক্ষণাৎ গার্গী অনুমান করে ফেলল, বীরভঙ্গপুর নামটা তার খুবই চেনা, সে উৎসুক হয়ে বলল, ওখানকার রাজবাড়ি নিয়ে একটা স্টোরি বেরিয়েছে কাগজে, নিশ্চয়ই দেখেছিস খবরটা?

শঙ্খলেখা মিষ্টি করে হাসল, এই রে, তোর মাথায় সেই রাজবাড়ির ভূত চেপেছে নাকি!

গার্গীর তখন আর তর সইছে না, আরে বলবি তো, তুই ব্যাপারটার কিছু জানিস কি না—

—একটু-একটু জানি বলেই তো তোকে ল্যাজে খেলাচ্ছি। তবে বীরভঙ্গপুর আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। কিন্তু গাঁ-গ্রামের ব্যাপার তো, দূরে হলেও রাজবাড়ির ব্যাপারস্যাপার বলে ওখানে খুব হই-চই পড়ে গেছে ঘটনাটা নিয়ে। তার ওপর একটা লোকাল নিউজপেপারে মাঝেমধ্যে স্কুপ নিউজ হিসেবে ঘটা করে ছাপছেও ব্যাপারটা।

—তাই! গার্গী ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়ল শুনে, পড়েছিস খবরগুলো? খুব ইন্টারেস্টিং?

—মোটামুটি ইন্টারেস্টিংই বলতে পারিস। রাজবাড়ির ঘটনা তো, তাতে একটু কেচ্ছাকাহিনি থাকবেই।

—কেচ্ছা! গার্গীকে একটু ভুরু কুঁচকাতে দেখা যায়।

শঙ্খলেখা হাসল, আসলে কী জানিস, সাধারণ ঘরে যেটা আকছার ঘটে, সেই ঘটনাটাই রাজবাড়িতে ঘটতে থাকলে সেটা মুখরোচক হয়ে লোকের মুখে-মুখে ঘোরে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল, তা হলে তো একদিন ওখানে যেতে হয়। নিয়ে যাবি আমাকে?

—তুই যাবি সেই বীরভঙ্গপুরে। শঙ্খলেখাকে বেশ আশ্চর্য হতেই দেখা যায়, কেন রে?

—তুই তো জানিস, আমার আবার এই ধরনের খবর সংগ্রহের একটা বাতিক আছে। কেন কে জানে, আমার ভারী ইচ্ছে করছে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জানতে। হয়তো দারুণ একটা স্টোরি বেরিয়ে আসবে ওর ভেতর থেকে।

শঙ্খলেখা খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গার্গীর মুখের দিকে। গার্গী মাঝেমধ্যে কী

BanglaBook.org

যেন সব লেখে এ-কাগজে ও-কাগজে। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্খলেখার কোনও মাথাব্যথা হয়নি কখনও। তার একমাত্র চিন্তাভাবনা ম্যাথসের জটিল প্রবলেমগুলো নিয়ে। এখন গার্গী অত দূরে সেই বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি যেতে চায় শুনে তার আশ্চর্য হওয়ারই কথা। কিন্তু গার্গীর আগ্রহে সে তৎক্ষণাৎ জল ঢেলে দিয়ে বলল, ধুর মাথা খারাপ নাকি তোর। একবার এক সাংবাদিক গিয়ে খোদ রানিমাকে খুন করে এসেছে। তারপর তার ওই রাশরাশ সোনার গয়না, টাকাকড়ি জমিজমা কে পাবে তা নিয়ে দিনরাত লাঠালাঠি চলছে ওখানে। সেই খবর ওখানকার এক স্থানীয় সাংবাদিক কাগজে ছেপেছে। তাই নিয়ে আরও হুলুস্থুল। সেই স্থানীয় সাংবাদিক দ্বিতীয়বার রাজবাড়িতে যেই খবর আনতে গেছে, রাজবাড়ির লোকজন তাকে ধরে বেদম পিটিয়েছে।

—সে কি! গার্গী বিস্মিত।

—হ্যাঁ। আবার তুই যদি সাংবাদিক হয়ে ওখানে যাস তো তোকেও—বলতে-বলতে শঙ্খলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসলে আবার শঙ্খলেখার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গালে দুটো চমৎকার টোল।

গার্গী একমুহূর্ত থমকায়। শঙ্খলেখাকে নিয়ে যদি স্পটে যায়, তাহলে সত্যিই কী ঘটতে পারে বোধহয় তাই-ই ভেবে নিল মনে-মনে। পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল, তবে মেয়ে সাংবাদিক তো, বোধহয় পিটুনি দেবে না—

শঙ্খলেখা কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ করে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, রাজবাড়ির ভূত তুই মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। ওসব রূপকথা এখন কেউ শুনতে চায় না। জানতেও চায় না।

গার্গী অবশ্য একবিন্দুও নিরুদ্যম হতে নারাজ। তার স্বভাবই এই যে, কেউ যদি তাকে কোনওভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তো সে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শঙ্খলেখা আসলে ভীতু স্বভাবের। অধিকাংশ মেয়েই যেরকম হয়ে থাকে আর কী। যেহেতু এখানে বিপদের গন্ধ আছে—

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ কী মনে হতে সে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু একজন সাংবাদিক সেখানে গিয়ে পিটুনি খেল, এটা ভাবতে কিন্তু আমার আশ্চর্যই লাগছে।

শঙ্খলেখা তার চোখেমুখে একটা ভয়-ভয় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, না রে, রাজবাড়িতে নাকি হরিশংকর চৌধুরি বলে একজন লোক আছে। এককালে রাজবাড়ির লেঠেল ছিল। এখন অবশ্য আর লেঠেলগিরি করার কোনও স্কোপ নেই। তাছাড়া লোকটার বয়সও হয়েছে। কিন্তু এখনও নাকি লোকটা ভয়ঙ্কর। তার যা বিশাল চেহারা—

—ও, গার্গী সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরির চেহারাটা মনে-মনে কল্পনা করে নেয়, তারপর একটু থিতু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুঁ, আর কী-কী জেনেছিস তুই?

—জেনেছি যে আপাতত রাজবাড়ির কোনও উত্তরাধিকারী নেই। হরিশংকর চৌধুরির মতো আরও বেশ কয়েকটি পরিবার দীর্ঘদিন রাজবাড়িতে রয়ে গেছে আশ্রিত হিসেবে। তারা এখন চাইছে, রাজবাড়ির উত্তরাধিকারত্ব তাদেরই ওপর বর্তাক। কিন্তু রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের যে উকিলবাবু আছেন, তিনি তা মানতে চাইছেন না। বলেছেন, প্রয়োজন হলে গভর্নমেন্টের ঘরে চলে যাবে এত বড় সম্পত্তি।

গার্গী এতক্ষণে জোরে-জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিকই তো বলেছেন উকিলবাবু। তাঁর হেডে মাথা আছে বলতে হবে। আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি তো সরকারেই বর্তায়।

শঙ্খলেখা হাসল খুক-খুক করে কিন্তু সত্যি কথাটা বলে ফেলায় উকিলবাবুর হেডে আর মাথা থাকবে না। সেই হরিশংকর চৌধুরি নাকি উকিলবাবুর লাশ ফেলে দেবে বলে শাসিয়েছে। বলেছে, কর্তাবাবুর হুকুমে এরকম বহু লাশ এককালে ফেলেছি। না হয় আরও একটা ফেলব। কিন্তু এই সম্পত্তির হক ছাড়ব না। আমি না থাকলে রানিমার সাধ্যি কী ছিল এত বড় সম্পত্তি আগলে-আগলে রাখেন।

গার্গী থম মেরে গেল, তাই নাকি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, শঙ্খলেখা এবার কণ্ঠস্বর একটু খাদে নামাল, যেন তার কথা সেই বীরভঙ্গপুরের লোক শুনে ফেলবে, বলল, তার হুমকি শুনে এখন এলাকার লোক অন্যকথা বলাবলি করছে। বলছে, হরিশংকর চৌধুরি-ই বুড়ি রানিমাকে খুন করেছে। তারপর ওই সাংবাদিককে সে-ই গুম করে পাচার করেছে কোথাও, অথবা হয়তো মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তারপর এমনভাবে প্রচার করছে যাতে লোকের ধারণা হয়, সেই সাংবাদিকটিই খুন করে পালিয়েছে।

গার্গী এবার যেন চিন্তায় পড়ল ধুর, তা হতে পারে নাকি!

—না হওয়ার কিছু নেই। কারণ সাংবাদিক পালিয়ে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় সে তার লেখার প্যাড আর কলমটা ফেলে গেল কেন।

গার্গী কিছুক্ষণের জন্য হাঁ হয়ে গেল, বাহ বেশ বলেছিস তো।

—আমি বলিনি। সেই স্থানীয় সাংবাদিকটিই এত সব কথা তার কাগজে লিখে ছাপিয়ে ছিল। তার ফলেই তাকে পিটুনি খেতে হয়েছে হরিশংকর চৌধুরির হাতে।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গার্গী বলল, তাহলে তো তাকে পিটুনি খেতেই হবে। সরাসরি দুটো খুনের চার্জ। নিশ্চিত ফাঁসি হবে প্রমাণ হলে। যাই হোক, আমার তো তাহলে বীরভঙ্গপুরে না গিয়ে উপায় নেই, শঙ্খলেখা।

—তুই যাবি? শঙ্খলেখা সত্যিই আঁতকে উঠল। হয়তো সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরির কথা ভেবেই। তারপর বলল, ঠিক আছে, তাহলে বরং আমি পরেরবার বাড়ি গিয়ে সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। যদি শুনি, কোনও ঝামেলা নেই আর, তখন না হয়—

—দ্যাটস রাইট, এতক্ষণে সহজ হয়ে নিশ্বাস নিল গার্গী, দ্যাটস লাইক অ্যা গুড গার্ল, বলে আজকালকার ছেলেমেয়েদের কায়দায় কাঁধ শ্রাগ করার ভঙ্গি করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে তার সঙ্গে হেসে উঠল শঙ্খলেখাও।

গার্গী অবশ্য সেখানেই থামল না, কিছু একটা ভাবল, কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে, যেমন সে সারাদিনের মধ্যে হাজারবার ভেবে থাকে, তারপর বলল, কিন্তু সেই সাংবাদিকের গতি তাহলে কী হল? সে খুন করে পালিয়ে গেল, না তাকেই খুন করা হল! অবশ্য ভুয়ো সাংবাদিক যখন, তার হোয়ার-অ্যাবাউটস আর আমার পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, তবে—বলে, গার্গী হঠাৎ তার হাতের আঙুল তুলে তুড়ি মারার ভঙ্গি করল, দি আইডিয়া, সে তো আবার শিল্পীও ছিল নাকি। তাহলে এরকম কোনও তরুণ শিল্পী কলকাতার শিল্পজগৎ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল কি না সে হদিশও তো নেওয়া যেতে পারে—।

শঙ্খলেখা গার্গীর টেনাসিটি দেখে অবাকই হয়ে উঠছে ক্রমশ নাহ। তোর মাথা থেকে সেই রাজবাড়ির ভূত আর নামানো যাবে না মনে হচ্ছে। তরুণ শিল্পীটির হদিশ তুই এখন পাবিই বা কী করে।

গার্গী মিটমিট করে হাসছে, দাঁড়া না, আমার এক নতুন বান্ধবী জুটেছে। তার নাম ডোনা। ডোনা চ্যাটার্জি। তার বাবা একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তিনি নিশ্চয়ই কিছু হদিশ দিতে পারবেন। দ্যাটস দ্য আইডিয়া।

বলতে-বলতে গার্গী শঙ্খলেখাদের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এল পথে। সত্যিই তার মাথায় এখন রাজবাড়ির ভাবনা বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে। কতদিন থাকবে তা সে জানে না। এরকম এক-একটা বিষয় তার মগজে ভর করে প্রায়শ। তারপর সে অন্ধের মতো ছুটে চলে তার পিছু-পিছু। কয়েকদিন পরে একটা দুর্ধর্ষ লেখা সাদা পৃষ্ঠায় নামিয়ে তবে খালাস। তবে এরকম খুনের ঘটনা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি এর আগে।

বড়রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে প্রথম যে পাবলিক বুথটি তার নজরে এল, তার ভেতর ঢুকে ডায়াল ঘোরাল, হ্যালো—।

BanglaBook.org

ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল ডোনার মা বনানীর গলা, কে, গার্গী?

—আন্টি, ডোনাকে একটু দেবেন ফোনটা? খুব জরুরি কথা আছে।

—জরুরি! বনানী তৎক্ষণাৎ হতাশ করলেন তাকে, ডোনা তো বাড়িতে নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আউটিঙে গেছে পরশু। কাল ফেরার কথা ছিল, কিন্তু বোধহয় আটকে গেছে কোনওভাবে।

—আউটিঙে? কোথায়, আন্টি?

—সে অনেকদূর। গুপ্তিপাড়ায়। হয়তো আজ রাতে ফিরতে পারে। ফিরলে তোমাকে ফোন করতে বলব।

—ঠিক আছে, আন্টি। আমি এখন পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। আমার বাড়ি ফিরতেও হয়তো একটু রাত হবে আজ। তখন যোগাযোগ করে নেব।

বলে ঝুপ করে রিসিভার রেখে দিল গার্গী। ডোনার সঙ্গে দিন চার-পাঁচ আগেই দেখা হয়েছিল তার। কই, তখন তো তাকে বলেনি আউটিঙে যাওয়ার কথা। বললে, সেও হয়তো তাদের সঙ্গে সামিল হত অভিযানে। পরক্ষণেই অবশ্য মনে হল, নাহ ডোনা হয়তো তার ছেলেবন্ধুদের সঙ্গেই ঘুরতে বেরিয়েছে। যা উড়নচণ্ডি স্বভাব ওর। তাহলে গার্গী যেতে পারত না। সে আবার একটু রক্ষণশীল। একেবারে ঠাকুমা-ঠাকুমা হয়তো নয়, তবু সমাজ-সংসারের নর্মস কিছুটা তো মেনে চলতে হয় বঙ্গসমাজে বাস করতে হলে। ডোনা অবশ্য এত সব মানে না।

আসলে ডোনাকে যা দেখেছে গার্গী, ও বেশ মড ধরনের। চুলের কারুকাজে, পোশাকের চমকে প্রায়ই বিপ্লব ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। হয় তো কোনওদিন ছেলেদের সঙ্গে সিগারেট খেতে শুরু করল দারুণ মেজাজে। কখনও ছেলেদের হোস্টেলে গিয়ে পানীয়ও। ক'দিন আগে এমন একটা মিনিস্কার্ট পরে ক্লাস করতে এসেছিল যে, সারা চত্বরে যেন একটা অস্বস্তি, একটা গুঞ্জন। কিন্তু ডোনার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনিতে ডোনার গায়ের রং যাকে বলে সাদা-ফরসা, মেমসাহেবদের মতো তার শরীরের গড়ন, পোশাকেও কখনও তেমনি মেমসাহেব-মেমসাহেব ভাব। ডিজাইনও আমদানি করে প্যারিস কিংবা ফ্রাঙ্কফুর্ট ধরনের। এ-মেয়ের সঙ্গে গার্গীর বন্ধুত্ব হওয়াটাই আশ্চর্যের।

কিন্তু এত সব আশ্চর্য নিয়েই তো জীবন।

গার্গী নিজে দুঃসাহসী না হলেও অন্য কারও দুঃসাহস তাকে চমকে দেয়। সে অনেকবার ভেবেছে, এ-দেশে বাস করেও ডোনা কী করে বিদেশিদের ঢং-ঢাং আত্মীকরণ করল। সে অবশ্য শুনেছে, ডোনারা নাকি কিছুদিন আমেরিকায় বাস করে এসেছে। সেই সুবাদেই কি তার এহেন বোহেমিয়ান জীবনযাপন!

॥ ৩ ॥

BanglaBook.org

পুরো কালনা রোড ড্রাইভ করে এসেছে মন্দার। দিল্লি রোড পড়তেই ডোনা তার কপালের ওপর উড়ে এসে পড়া চুলের রাশ বাঁ-হাতে সরিয়ে বলল, দাও, এবার আমিও চালাই—।

মন্দার তার ঘন ছাইরঙের মারুতি ভ্যান থামিয়ে সিট অদলবদল করতে-করতে বলল, দিল্লি রোড কিন্তু একটা খুনি রাস্তা। সেদিন যাওয়ার পথে দ্যাখোনি, পরপর তিন জায়গায় উলটে-পালটে পড়ে আছে ভারী-ভারী ট্রাকগুলো। একটা আম্বাসাডার তো দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে ছিটকে গেছে ধানখেতে।

ডোনা কোনও কথা না বলে অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর গিয়ার বদল করে গতিবেগ বাড়াতে শুরু করল দ্রুত। পরক্ষণেই একদমকে কিলোমিটারের কাঁটা ছুঁয়ে ফেলল আশির ঘর। তার স্টিয়ারিঙের এক আচমকা মোচড়ে টাল খেয়ে পড়তেই মন্দার আবার

বলল, একটু আস্তে চালিয়ো, ডোনা। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম, রাস্তার পাশে একটা ফলকে লেখা রয়েছে, ইট্‌স বেটার টু বি মিস্টার লেট দ্যান টু বি লেট মিস্টার...।

অ্যাকসিলারেটরে আরও একটু চাপ দিয়ে কিলোমিটারের কাঁটা একশোর দাগে ছুঁইয়ে দিতে-দিতে ডোনা বলল, মিস্টার নয়, মিস। লেট মিস ডোনা চ্যাটার্জি, বলে খিলখিল করে শরীর দুলিয়ে হেসে মন্দারকে চমকে দিয়ে ঝড়ের মতো পার হয়ে চলল দিল্লি রোডের মসৃণ একঢালা পথ। সামনেই বিশাল শরীর নিয়ে একটা পাঞ্জাববডির ট্রাক আসছিল, তার মুখোমুখি হয়ে হঠাৎই কবজির এক মোচড়ে তাকে এমন ভড়কি দিল যে, ট্রাক-ড্রাইভার আর একটু হলেই মারুতি বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ধান খেতে নেমে পড়েছিল আর কী।

তার অবস্থা দেখে জিভে চুকচুক শব্দ করল ডোনা, আহা, বেচারি।

মন্দার প্রায় আঁতকে উঠল তার গাড়ি চালানোর রকম দেখে, নার্ভাসও বোধ করল খানিক, কিন্তু আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বললেই হয়তো ডোনা আরও এমন কোনও কারিকুরি দেখাতে শুরু করবে যে, আজ আর তাদের কলকাতা না পৌঁছে ভরতি হতে হবে কোনও হাসপাতালের বেডে। কিংবা লোকালয় ছেড়ে আরও দূর অন্য কোনও লোকে।

ডোনার গাড়ি চালানোর হাত অবশ্য খুব ভালোই, লং ড্রাইভেও তার অভ্যেস আছে, কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তাই মন্দারের ভীত হয়ে ওঠার কারণ। কিছুকাল আগেও ডোনাদের একটা গাড়ি ছিল। সে সময় সে-ই গাড়িটা চালাত বেশিরভাগ সময়। কিন্তু ক্রমাগত পেট্রলের দাম বাড়তে থাকায় বছর দুয়েক হল গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন তার বাবা। তারপরও অবশ্য এর-ওর গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভিংটা রপ্ত রাখতে ভুল করেনি ডোনা। তবে যা ভাবনার বিষয় তা হল, তার গাড়ি-চালানোর ধরনটা বরাবরই বেপরোয়া। তার বেহিসেবি জীবনযাপন, পোশাকআশাক, চালচলনের মতোই তার উড়নচণ্ডি ড্রাইভিং। সব সময়ই সে নিজেকে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবতে পছন্দ করে। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোয়নি, অথচ তার ভাবভঙ্গি, চাউনি, তুখোড় সংলাপ—সবই এত অসাধারণ যে, অন্যের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে অতিসহজেই। যখন তাদের বাড়ির ড্রইংরুমে সাদা ধবধবে হাউসকোটটি পরে বসে থাকে সোফায় গা এলিয়ে, তখন প্রায় রাজহংসীর মতোই তার শরীরে অহংকার। যখন ক্লাসে বসে থাকে সুবোধ বালিকার মতো নিষ্পাপ, যেন কিছুই জানে না এমন মুখভঙ্গি করে, তখন অধ্যাপকদের চোখ কিংবা পড়ানো সবই আবর্তিত হয় ডোনাকে ঘিরেই। আবার যখন উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটি শান্ত, নিরীহ প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করে দেয় স্বয়ং অধ্যাপককেই, তখনও ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক সবারই নজর আছড়ে পড়ে তারই ওপর। আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, কিংবা কলেজের লম্বা করিডোর দিয়ে দারুণ মড-ফ্যাশনের কোনও পোশাক পরে হেঁটে যায় ছিপনৌকোর মতো অনায়াস ভঙ্গিতে তখনও সে-ই যেন সম্রাজ্ঞী, অন্য কেউ নয়। আবার এখন, এই যে তেলচুকচুকে, কোথাও বা হঠাৎ একটা স্পট-হোল আগলি-স্পটের মতো জেগে আছে এহেন থাকা দিল্লিরোডের বুকের ওপর দিয়ে তীব্রগতিতে মারুতি হাঁকিয়ে ছুটছে, তখনও সে-ই যেন রাস্তার একমাত্র চালক, একক অধিশ্বরী। দু-একজন ট্রাক-ড্রাইভার সত্যিই তার গতির কাছে সম্ভ্রম জানিয়ে তাদের দৈত্যকায় ট্রাক স্লো করে দিল সহসা। কিংবা হয়তো চালিকার রূপ ও সৌন্দর্য দেখে কুর্নিশ জানাল কয়েক লহমা।

মন্দার অবশ্য এনজয় করছিল বেশ। সে-ও গতি পছন্দ করে। গুপ্তিপাড়া থেকে বেরুতে একটু দেরিই করে ফেলেছে বলে গোটা কালনারোড সে-ও ঝড়ের গতিতে চালিয়ে এনেছে এতক্ষণ। এখন ডোনার পাশে বসে তার হাতে কবজির অনায়াস দক্ষতা, দু-পায়ে অ্যাকসিলেরেটরে, ব্রেক, ক্লাচের রিডে সা-রে-গা-মা বাজানোর মতো ক্রমান্বয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়ার ভঙ্গি, হঠাৎ আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় গিয়ার বদলানো, তারই ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর ডিম্বাকৃতি ফরসা মুখের ওপর থেকে ছড়ানো চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দেওয়া, সবই মন্দারের কাছে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। তবু আবার একসময় ফিসফিস

BanglaBook.org

করে বলল, বি এলার্ট, ডোনা, মোমের পুতুলের মতো মারুতিটা যদি কোনও দৈত্যকায় ট্রাক একলহমা চুমু খেতে চায়—।

—কী আর হবে। বড়জোর কিমা হয়ে যাব তুমি, আমি, এবং তোমার মারুতি সব্বাই, বলে ডোনা অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে হেসে উঠে বোধহয় আরও একটু চাপ দিল অ্যাকসিলেরেটর রিডে।

মন্দার অগত্যা ক্ষান্ত দিল। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে না বললেই সে আরও বেশি করে নাড়াবে। ডোনা বরাবর এমনই জেদি, একগুঁয়ে, অবাধ্য কখনও-কখনও। কিংবা হয়তো তার হঠাৎ মনে হয়েছে এক্ষুনি কলকাতা ফেরার দরকার। এই মুহূর্তেই তাই এই ঝড়বৎ প্রস্থানের তাগিদ।

কলকাতা যাওয়ার তাড়া অবশ্য মন্দারেরই বেশি। বস্তুত পরশু সকালেই গুপ্তিপাড়া থেকে ফেরার কথা ছিল তাদের। মাত্র একরাত গুপ্তিপাড়ার আস্তানায় কাটিয়ে তারা কলকাতা ফিরবে এমন কড়ারেই সে ডোনার সঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল দিনতিনেক আগের এক উমসুম ভোরে। বেরুবার দিন ঠিক এরকমই বলেছিল ডোনা, কিন্তু গুপ্তিপাড়ার সেই প্রায় পোড়োবাড়িটায় থাকতে গিয়ে হঠাৎ তার এমনই ভালো লেগে গেল যে, যাব-যাচ্ছি করে তিনদিন তিনরাত্রি দিব্যি থেকে গেল সেখানে। বেশ অবাকই হয়েছিল মন্দার। ডোনা অবশ্য দারুণ মড-ধরনের মেয়ে, এরকমই এলোমেলো, উদভ্রান্ত জীবনযাপন করাই তার পছন্দের। তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়াটা যেমন মন্দারের জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, তেমনই তার সঙ্গে এভাবে দ্রুত প্রেমে পড়াটাও। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় মন্দার ভাবতেই পারেনি এহেন বিচিত্র মেয়েটি তার প্রেমে হাবুডবু খাবে। এখন মন্দারেরও এমন হয়েছে ডোনাকে না দেখে সে একদিনও সুস্থির থাকতে পারে না।

তবে ডোনার সঙ্গে হঠাৎ করে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা তার এই প্রথম। তাই সেটাই ছিল তার কাছে পরম বিস্ময়ের। ডোনাই ক'দিন আগে দিয়েছিল খবরটা, জানো, বাবার এক বন্ধুর একটা অদ্ভুত ধরনের বাড়ি আছে গুপ্তিপাড়ার কাছেপিঠে। বিশাল তিনতলা বাড়ি। তবে ভীষণ পুরোনো। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়ো টাইপের। চলো না, একদিন আবিষ্কার করে আসি, তোমার ওই মারুতি করে—

ছাইরঙের এই মারুতিভ্যানটা সদ্য কিনেছে মন্দার, এখনও তেমন করে আউটিঙে বেরুনো হয়নি। তাই ডোনার প্রস্তাব কিছুটা বুঝে, কিছুটা না-বুঝেই লাফিয়ে উঠেছিল, ফাইন,—।

কতটা ফাইন তা ডোনার সঙ্গে এবার গুপ্তিপাড়া না গেলে সত্যিই বুঝতে পারত না। পুরোনো বাড়ি যে আসলে কতটা পুরোনো তা ওখানে না গেলে বোঝা সম্ভবই নয়। ডোনার বাবার বন্ধুও একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং স্বভাবতই বোহেমিয়ান। তাই এমন একটা পোড়োবাড়ি হঠাৎ কিনে ফেলেছেন শখ করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাড়িটা কেনার পর রেখে দিয়েছেন প্রায় অ্যাজ-ইট-ইজ, মহেঞ্জোদাড়োর আদলেই। জঙ্গল, আগাছাও রয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গে। মন্দার সে-বাড়ির দশা দেখে আঁতকে উঠেছিল প্রথমটায়। যখন তারা পৌঁছেছিল বাড়ির সামনে, তখন ঠা-ঠা দুপুর। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনার স্তূপ, সামনে-পিছনে ভাঙা পাঁচিল, ঢোকার মুখে খোয়া-ওঠা পথের দু-ধারে কয়েকটা বাজ-পড়া পামগাছ, এবং পাঁচিলের চারপাশে খাঁ-খাঁ শূন্যতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। বাড়ির সিঁড়ি প্রায় পড়ো-পড়ো, তবু সিঁড়িটা এমনভাবে বাঁশের প্যালা দিয়ে ভেঙে পড়া ঠেকানো হয়েছে তার ধাপগুলো পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যে, তাতে কোনওক্রমে তিনতলায় পৌঁছনো যায়। পুরো একতলা-দোতলা তো বটেই, তিনতলার বাকি ছ-সাতখানা ঘরও ভীষণ অন্ধকার, শুধু তিনতলার দক্ষিণ প্রান্তে একখানা ঘর কী অলৌকিকভাবে রেনোভেট করে আধুনিক কায়দায় সাজানো হয়েছে বসবাসের জন্য।

এহেন অদ্ভুত বাড়িতে পৌঁছে বিহ্বল মন্দার বলে ফেলেছিল, খুবই বিদঘুটে টেস্ট তো তোমার বাবার বন্ধুর।

ডোনা কিন্তু একেবারেই অবাক হয়নি। তার তীব্র লাল-হলুদ রঙের স্কার্ট-ব্লাউজ পরা শরীরটা নিয়ে ঘুরপাক খেল এক মুহূর্ত, লাফিয়ে উঠে বলল, আহ, কী দারুণ। বলে ডানলোপিলো পাতা

BanglaBook.org

খাটে ধাঁই করে শুয়ে ওলটপালট খেয়ে নিল একবার, পরক্ষণেই উঠে এসে বলল, আসলে এ-বাড়ির রহস্য কী জানো! মডার্ন সুযোগসুবিধের মধ্যে বাস করেও একটা পোড়োবাড়িতে থাকার রোমাঞ্চ উপভোগ করা। তাকিয়ে দ্যাখো, এই ঘরখানার মেঝেয় দামি ইটালিয়ান টাইলস, দেওয়ালে প্লাস্টার অব প্যারিস, ঘরের ভেতর পরপর সাজানো খাট-আলমারি-ওয়ারড্রোব, কিচেন গ্যাস, প্রেসার কুকার, ক্যাসারোল, ফ্রিজ, বাথরুমে গিজার, শাওয়ার, এমনকী কমোড পর্যন্ত। এ-বাড়ির মাত্র একটা ঘরেই ইলেকট্রিসিটি, ব্যস। বাকি সব ঘরে পুরোনো আসবাবপত্র, টিকটিকি, মাকড়সা আর চামচিকের বাসা, সবঘরেই পুরোনো মরচে-ধরা তালা লাগানো, ঠেললেই চাপ-চাপ অন্ধকার। রীতিমতো থ্রিলিং।

তা এই তিনদিন, মন্দারের জীবনেও এক স্মরণীয় থ্রিল এনে দিয়েছে ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে একলা-একা দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বাগানবাড়িটি। যেমন শতাব্দীর ধুলো জমে থাকা মহেঞ্জোদাড়ো-প্রতিম বাড়িটির ইট-কাঠ-কড়িবরগা আবিষ্কার করেছে, তেমনি আবিষ্কার করেছে নিজেদের। কয়েকদিন ধরে তারা ফিরে গিয়েছিল সেই মহেঞ্জোদাড়োর পৃথিবীতে, গুহামানবদের আদিম জীবনযাপন খুঁজে বেড়িয়েছে পাগলের মতো। ডোনা শুধু যে কথাবার্তায়, চালচলনে, বুদ্ধিতেই তুখোড় তা নয়, প্রেমের ছলাকলায় যে দুরন্ত পারদর্শী তা উপলব্ধি করেছে বারবার। তবু সব অভিজ্ঞতার পরেও মন্দারের মনে হয়েছে, ডোনাকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। ডোনা অধরা, রহস্যময়ীই।

যেমন এই মুহূর্তে যে ডোনা ঝড়ের মতো ড্রাইভ করে চলেছে, সে-ও যেন মন্দারের চেনা নয়। হু হু করে তীব্রগতিতে কালো পিচরাস্তা পেরোতে-পেরোতে হঠাৎই ব্রেক কষে থমকালো হাইওয়ের পাশেই একটা ধাবার সামনে, ধাঁই করে মারুতির মুখ ঢুকিয়ে দিল গোটা চার-ছয় দড়ির খাটিয়া-ঝিমোতে-থাকা খোলা চত্বরের ভেতর। মন্দারের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, দাঁড়াও, একটু চায়ের হদিশ করি।

মন্দারের ফেরার তাড়া ছিল। হাতের কবজিতে ঘড়ির দিকে নজর রেখে বলল, নামার কী দরকার! এই তো, ফ্লাস্কে এখনও অনেকটা চা রয়ে গেছে। ঢেলে দিচ্ছি।

ডোনা ততক্ষণে দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে তার এতক্ষণের ক্লান্তি দূর করতে। মন্দারের প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, ধুর, ফ্লাস্কের চা তো আমার তৈরি করা। এর আগে দু-দুবার খেয়েছি আসার পথে। এখন ধাবার চা না খেলে আর একটুও এনথু পাচ্ছি না। নামো-নামো শিগগির—।

মন্দার নেমে আসে অনিচ্ছুক পায়ে। অন্তত বেলা চারটের মধ্যেও কলকাতা পৌঁছুতে পারলে সে জনসন অ্যান্ড টেনিসন কোম্পানির টেন্ডারটা ধরতে পারবে আজ। ওখানে টেন্ডার জমা দেওয়ার আজই শেষদিন। গতকালও অন্য একটা কোম্পানির টেন্ডার জমা দেওয়ার কথা ছিল তার। কাল সকালে উঠে সে 'ফিরব' বলতেই ডোনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাকে, ধুর, আজ তো কিছুতেই না। এ-বাড়িতে এসে কেমন একটা নেশা ধরে গিয়েছে। পোড়োবাড়িতে বাস করার যে-এমন থ্রিল তা কে জানত! বাবার বন্ধু সত্যিই একটা জিনিয়াস। প্রায়ই নাকি এখানে চলে আসেন দু-তিনদিনের জন্য। একতাড়া অদ্ভুত-অদ্ভুত ছবি এঁকে নিয়ে যান কলকাতায়। কী বিশাল দামে নাকি বিকোয় ছবিগুলো।

থ্রিল অবশ্য মন্দারের কম হয়নি। বস্তুত ডোনার সঙ্গে বসবাসের প্রতিটি মুহূর্তই যেন এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরপুর। ডোনা নামের এই ঝোড়ো হাওয়ার তরুণীটি যে প্রতিমুহূর্তে কী অবলীলায় নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তা তার সঙ্গে না মিশলে উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়।

কিন্তু মন্দার আপাতত আপাদমস্তক ওতপ্রোত হয়ে আছে তার টেন্ডারের ভাবনায়। মাত্র বছর পাঁচ-ছয় হল সে সাকার হয়েছে একটি ইনটেরিয়র ডেকরেশনের ছোট্ট ব্যাবসায়ে নেমে। আর্কিটেকচারের একটি কোর্সে ভরতি হওয়ার দু-তিন বছর পরে সে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেয়, চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যাবসা করে অর্থ উপার্জন করবে। সে জানত, সবসময়ই তার ভেতরে কাজ করে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যবোধ। কোনও একটি তরুণীকে দেখে যেমন সে চুলচেরা বিচার করে মেয়েটি

BanglaBook.org

যথেষ্ট সুন্দরী কি না, সুন্দরী হলে তার সৌন্দর্যের চাবিকাঠি ঠিক কোনখানে। সুন্দরী না হলে ঠিক কোনখানে তার খুঁত। কোথায় কী প্রসাধন হলে সে আর একটু সুন্দরী হয়ে উঠতে পারত, এইসব, ঠিক তেমনই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের প্ল্যান করতে গিয়েও সে সচেতন হয়ে পড়ে, কীভাবে একটি ঘরকে সাজিয়ে তোলা যায় আরও চমৎকারভাবে ছোট্ট স্পেসকে শুধু সাজানোর গুণে বাড়ানো যায় তার পরিসর, সৌন্দর্য—।

মাত্র ক'বছর ব্যাবসায়ে নেমেই সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। তার ছোট্ট কোম্পানি 'ইনডেক' শুধু তরতর করে ব্যাবসা বাড়িয়েই চলেছে তাই নয়, কলকাতার অনেক নামিদামি ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কোম্পনির সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে রীতিমতো। এর মধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিটে ছোট্ট একটি অফিস খুলেছে, তাতে জনাতিনেক উৎসাহী যুবক-যুবতী বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে, কখনও বিভিন্ন অফিসে খোঁজখবর নিয়ে তারা টেন্ডারের কাগজ তৈরি করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজপত্রও জমা দেয়। টেন্ডার অ্যাক্সেপ্টেড হলে কাজ শুরু করে দেয় নিখুঁত জ্যামিতিক পদ্ধতিতে, কাজ শেষও করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। শুধু প্লাইউড, সানমাইকা, টাইলস, কাচের কারিকুরিতেই হাজার-হাজার টাকা লাভ।

ব্যাবসা এখন উঠতির মুখে। স্বভাবতই মন্দারকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় কোন সংবাদপত্রে কী টেন্ডারের খবর বেরুল। সেখানে যোগাযোগ করা, টেন্ডার খোলার দিন হাজির থাকা ইত্যাদিতে। বেশি কাজ ধরার তাগিদে কম লাভ রেখে টেন্ডার দেয় সে, তাতে কখনও 'ইনডেক' কাজ পায়, কখনও পায়ও না। বহুক্ষেত্রে নানান বাধাবিপত্তি দেখা দেয়। কত জায়গায় অসৎ আবদার এসে ভিড় করে, কতজনকে বিভিন্নভাবে তুষ্ট করতে হয়। কখনও নানা প্রলোভনের হাতছানিও না আসে তা নয়। এই পাঁচ-ছ বছরেই মন্দার জেনে গেছে, ইনটেরিয়র ডেকরেশনের এই জগৎ দারুণ কমপিটিটিভ, সারাক্ষণই এক টানাপোড়েনের ভেতর কাজ করতে হয়। এখানে টিকে থাকতে হলে প্রবল লড়াই চালিয়ে যেতে হবে সদা সতর্ক পা ফেলে। প্রতিপক্ষ প্রতিটি কনসার্নই রীতিমতো ধুরন্ধর, চোখের পলক না ফেলতে হঠিয়ে দেবে অন্যকে। কোনও একটি টেন্ডার ফেল করা মানেই প্রতিযোগিতা থেকে কয়েকধাপ পিছিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে বেশ কয়েক হাজার, কখনও লক্ষ টাকার ক্ষতি।

অতএব প্রতিটি টেন্ডারের ব্যাপারেই মন্দারকে টান-টান সতর্ক থাকতে হয়। কোনওক্রমেই যেন তার আওতা থেকে ফস্কে না বেরিয়ে যায় কাজগুলো। অথচ তার জীবনে এই প্রথম, গুপ্তিপাড়া অভিযানে বেরুবার পর থেকেই, পরপর টেন্ডার মিস করার ঘটনাই ঘটে চলেছে। কালও তার অনুপস্থিতিতে নিশ্চিত তার সংস্থার ছেলেমেয়েরা টেন্ডার জমা দিতে পারেনি। প্রায় দু-লাখ টাকার টেন্ডার ছিল সেটা। আজও তাদের তিন লাখ টাকার টেন্ডার জমা দেওয়ার কথা। সম্ভবত এ টেন্ডারটিও মিস হয়ে যাবে স্রেফ ডোনার খামখেয়ালিপনার জন্যই। মন্দার বেশ কয়েকবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, প্লিজ ডোনা, তুমি ব্যাপারটার ইমপর্ট্যান্স বোঝো। একটা টেন্ডার মিস করা মানে—।

ডোনা প্রতিবারই খিলখিল করে হেসে উঠেছে, মন্দারকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে, অদ্ভুত মানুষ তো তুমি। দু-একদিনের আউটিং-এ বেরিয়েছ, তাও এমন একটা রোমহর্ষক স্পটে, যেখানে রাতের বেলা তিনতলার বারান্দায় বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে অন্ধকারে হয়তো দু-একটা ভূতফুতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে, আর তুমি কিনা টেন্ডার-টেন্ডার করে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছ না!

শেষ পর্যন্ত রণে ক্ষান্ত দিয়েছে মন্দার। ডোনা সত্যিই অবুঝ, খেয়ালি, আনপ্রেডিক্টেবল। কখন ওর মগজে কী আইডিয়া ঘাই দিয়ে উঠবে তা বোধহয় ও নিজেও জানে না। এই যেমন এ মুহূর্তে দুরন্ত রোদ্দুর থেকে মারুতিটাকে বাঁচাতে পার্ক করল মস্ত একটা রেন-ট্রি গাছের এপাশে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে, রেন-ট্রি গাছের তলায় খোলা চত্বরে বিছোনো একটি খাটিয়ার গা এলিয়ে দিয়ে হুকুম করল, জলদি-জলদি দো গেলাস চায়ে—।

BanglaBook.org

ধাবার মালিক মস্ত মোচওয়ালা এক হিন্দুস্থানি, দুপুরের অলস আরামে টাকা গুনছিল ক্যাশ-বাক্সের সামনে বসে। সারাদিন ট্রাক-ড্রাইভারদের সামলানো ছাড়াও এখন অজস্র ট্যুরিস্টের বায়নাক্কা মেটাতে হয় তাকে। এখনও দু-একটি ড্রাইভার মৌজ করে রুটি-তড়কা খাচ্ছে। ডোনার হুকুম শুনে চোখ ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তেরো-চোদ্দো বছরের এক রোগা পাতলা ঝাঁকড়াচুলো কিশোরের উদ্দেশে চালান করে দিল সেই নির্দেশটিই।

ডোনা তখন খাটিয়ার ওপর কাত হয়ে শুয়ে, একটা কনুই ভাঁজ করে সেই হাতের করতলে মাথার ভার রেখে মন্দারকে বলছে, এই ধাবার পাঞ্জাবি-চায়ের যা টেস্ট না, এক-এক চুমুকে এক-এক বছর বয়স কমিয়ে দেয়, বুঝলে?

মন্দারের চোখ তখন তার হাতের কবজির দিকে। এখনও রওনা দিলে হয়তো ডালহৌসি পাড়ায় পৌঁছুতে পারত শেষ মুহূর্তে। নিশ্চয়ই তার অফিসের কেউ-না-কেউ টেন্ডার পেপার তৈরি করে জনসন অ্যান্ড টেনিসন কোম্পানির গেটে অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে টেন্ডার ফর্মে সই না করলে জমা দিতে পারবে না কাগজগুলো। হয়তো ভাবছে, মন্দার কাল না এসে পৌঁছুতে পারলেও আজ নিশ্চয়ই এসে পড়বে বেলা চারটের মধ্যে।

মন্দারের কোনও জবাব না পেয়ে ডোনা পুনর্বার বলল, শুধু এই ধাবার চা খেতে আমি কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে দিল্লি রোডে চলে আসতে পারি—।

ডোনা কী পারে আর কী পারে না, তার কিছুটা ইতিমধ্যে জেনেছে মন্দার, তবে অনেকটাই জানেনি এখনও। যেটুকু জেনেছে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছে তাকে। মাত্র ক'মাস হল ডোনার প্রেমিক হয়েছে সে, শরিক হয়েছে ডোনার ভাবনাচিন্তার, তাতে তার এমন আশ্চর্য-আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এর মধ্যেই সে একখানা মহাভারত লিখে ফেলতে পারে। ডোনার কথার মন্দার কোনও জবাব দেওয়ার আগেই চা এসে গেল তাদের হাতে।

প্রমাণ সাইজের কাচের গেলাসে গরম ধোঁয়া-ওঠা টলটলে ঘন চায়ে চুমুক দিয়ে ডোনা এবার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, তুমি কি এখনও টেন্ডার নিয়েই ভেবে যাচ্ছ, মন্দার?

মন্দার করুণভাবে হাসল, এখন আর কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না। তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন কখন যে কলকাতায় পৌঁছুতে পারব, কিংবা আদৌ পারব কি না তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিল্লি রোড শেষ হলে কলকাতার পথে টার্ন না নিয়ে তোমার স্টিয়ারিং হয়তো ঘুরে যাবে বোম্বে রোডের দিকে।

ডোনা সহসা খাটিয়ার ওপর সোজা হয়ে উঠে বলল, দি আইডিয়া, যাবে নাকি মন্দার, বোম্বে রোড ধরে? উলুবেড়িয়ার ওদিকে নদীর ধারে চমৎকার সব বাংলো আছে—।

মনে-মনে প্রমাদ গুনল মন্দার, তবু ডোনার কথায় হাসতে হল, গেলে মন্দ হয় না। ফুলেশ্বর কিংবা বাগনানের কোনও বাংলোয় আরও কয়েকদিন থেকে আসা যেতে পারে। চাই কি, ব্যাবসাপত্তর সব গুটিয়ে দিয়ে এভাবে বাংলোয়-বাংলোয় ঘুরে কাটিয়ে দিতে পারি জীবনটা। স্রেফ যাযাবরের মতো, কি বলো?

তার কথায় সূক্ষ্ম একটা খোঁচা ছিল। ডোনা তা একেবারেই গায়ে না মেখে হেসে উঠল শরীর কাঁপিয়ে, বাহ, চমৎকার বলেছ কিন্তু। যাযাবরের জীবনযাপন আমার বরাবর ভীষণ পছন্দের। ভারী ইচ্ছে করছে, তোমাকে নিয়ে জিপসি হয়ে ঘুরে বেড়াই এক শহর থেকে আর এক শহরে—

দ্রুত পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে হাতের গেলাস নিঃশেষ করে খাটিয়া থেকে উঠতে যাচ্ছিল মন্দার। হঠাৎ ডোনা তার কথা মাঝপথে থামিয়ে তাকে উঠতে নিষেধ করল, হাতের ইশারায় দেখাল ধাবার ডানদিকে মস্ত চৌবাচ্চাটার চাতালের দিকে, যেখানে তখন বালতি-বালতি জল ঢেলে স্নান করছে এক ট্রাক-ড্রাইভার। চেক-কাটা লুঙ্গি পরনে, আদুল গা। সে-আদুল শরীরে এমন অটুট স্বাস্থ্য ফেটে বেরুচ্ছে যে, সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ডোনা। তার প্রগলভ চাউনি মোটেই খুশি

BanglaBook.org

করল না মন্দারকে। সে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই ডোনা নীচু গলায় বলল, দ্যাখো, দূর থেকে দেখলে মনে হয় না, একদম সিলভেস্টার স্ট্যালোন?

মন্দার হাঁ হয়ে গিয়ে বলল, ধুর কীসে আর কীসে তুলনা? সামান্য একজন ট্রাকড্রাইভারকে দেখে—।

—আমি বলছি, লোকটার স্বাস্থ্যের কথা। প্রফেশন যাই হোক, কী রোবাস্ট চেহারা বলো ওর? মন্দারের বুকের কোথাও একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল। চেহারার ব্যাপারে তার সামান্য দুর্বলতা আছে। তার স্বাস্থ্য অটুট হলেও পুরুষদের নর্মাল হাইটের তুলনায় সে দৈর্ঘ্যে একটু খাটোই। পাঁচ-পাঁচের মতো তার উচ্চতা। অন্তত ছ'ফুট উচ্চতার বিশালদেহী ট্রাক-ড্রাইভারকে দেখে সে হয়তো কিছু হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে। চায়ের গেলাসটা খাটিয়ার পায়ার কাছে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, পুরুষদের ফিগার খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার নয় কিন্তু। আসলে যা দরকার তা হল তার অকুপেশন, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স—এইসব। একটা সিনেমার কাগজে পড়েছিলাম কে যেন লিখেছিলেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাঙ্কের ফিগার, আর মেয়েদের দরকার ফিগারের ব্যাঙ্ক।

ডোনা হেসে উঠল ফের, বাহ সংজ্ঞাটি তো বেশ। কিন্তু সংজ্ঞাটি নিশ্চয়ই কোনও পুরুষের মাথা থেকে বেরিয়েছে। মেয়েরা পুরুষদের ফিগারকেও ইম্পর্ট্যান্স দ্যায় তা তোমরা জানো না—।

মন্দার ততক্ষণে ধাবার মালিককে চায়ের দাম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, চলো এবার কুইক। ডোনা ফের চালকের আসনেই বসল। মন্দার তার পাশে এসে বসতেই একদমকায় অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, আমাদের এক অধ্যাপক মণীশ রায় ঠিক এ ধরনের কথাই একটু অন্য মোড়কে মুড়ে বলতেন মাঝে-মাঝে।

মন্দার ভুরু কোঁচকালো ফের, কী কথা?

—বলতেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে যা প্রধান তা হল মস্তিষ্ক, আর মেয়েদের হল শরীর।

মন্দারের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, ওই একই হল আর কি। যার মস্তিষ্ক আছে, তারই টাকা হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়ে।

—উঁহু, মস্তিষ্ক অর্থে উনি মিন করেন প্রতিভা। ট্যালেন্ট। কমপ্যারেটিভ লিটারেচার পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ বার্নার্ড শ'-এর প্রসঙ্গ উঠতে বলেছিলেন কথাটা। সেই যে বার্নার্ড শ-'এর' প্রেমিকা ছিল, অভিনেত্রী, অপরূপা সুন্দরী, যে বার্নার্ড শ'-কে প্রস্তাব দিয়েছিল, এসো, আমরা বিয়ে করি। তোমার প্রতিভা আর আমার সৌন্দর্য, দুয়ে মিলে যে সন্তানের জন্ম হবে, সে হবে ভাবী পৃথিবীর এক অনন্ত বিস্ময়। খুবই কুৎসিত দেখতে ছিলেন বার্নার্ড শ'। প্রেমিকার কথা শুনে কী জবাব দিয়েছিলেন জানো? বলেছিলেন, কিন্তু যদি উলটোটা হয়? তোমার বুদ্ধি আর আমার রূপ। তা হলে, তাহলে কী হবে?

মন্দার হো-হো করে হেসে বলল, তোমাদের ওই মণীশ রায় যে-অর্থেই বলে থাকুন না কেন, আমার কথারই প্রতিধ্বনি ওটা। ট্যালেন্ট ব্রিঙস মানি—।

—উহুঁ, ডোনা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, প্রতিভা থাকলেই যে টাকা হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তার সঙ্গে ভাগ্যও ক্লিক করতে হবে। এটাও কিন্তু মণীশ রায়েরই কথা।

মন্দার হঠাৎই কৌতুক করে বলল, তুমি মণীশ রায়ের ফ্যান বলে মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ মণীশ রায়-মণীশ রায় করে চলেছ?

ডোনা একটা ভারী ট্রাককে অনায়াসে কাটিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে, তুমি কি আবার জেলাস হয়ে উঠছ নাকি? শুধু আমি নই, ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে মণীশ রায়ের ফ্যান। এত চমৎকার পড়ান উনি, এমন চমৎকার ভয়েস যে কী বলব। চল্লিশের ওপর বয়স, অথচ এখনও এমন চমৎকার দেখতে যে, মেয়েরা একবার দেখলেই ওঁর প্রেমে পড়ে যায়।

—তুমিও পড়েছ নাকি ওঁর প্রেমে?

BanglaBook.org

—আমার আগে অন্তত আরও পঞ্চাশজনের লাইন আছে, ডোনা মজা করে হাসতে-হাসতে বলল, তবে তুমি বোধহয় জানো না, আমার মা-ও ওঁর সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন।

মন্দার অবাক হয়ে বলল, তাই।

—হুঁ আমার মা-ও নাকি তখন ওঁর রূপমুগ্ধ ছিলেন। হয়তো মনে-মনে এখনও আছেন। এখন আবার আমিও। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তোমার ফিগারটা সত্যিই ভালো।

—ও, ওঁর কথা শুনেই বুঝি তুমি মডেলিং-এ উৎসাহী হয়েছ?

—ঠিক তা নয়। তার আগে থেকেই ফিগার সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। কিন্তু মডেলিং-এর অফারটা এনে দিয়েছিলেন শিহরনদা।

—ও, তোমাদের বাড়ির পেয়িং গেস্ট। মেয়েদের দেখলেই যিনি তাদের সঙ্গে ফেবিকলের মতো সেঁটে থাকেন?

—ওহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। শিহরনদাই তো 'রিক্রিয়েশন ফ্যান কোম্পানি' থেকে অফারটা এনে দিয়েছিলেন। আমিও চট করে রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেখিই না, ক্লিক করে কি না।

—ক্লিক করে গেল তো?

—হুঁ, বেশ নাম হয়ে গেল হঠাৎ। জানো, গত সপ্তাহেও এক সাবান-কোম্পানি থেকে একটা অফার এসেছে। ভাবতে পারো, মাত্র চার ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে কয়েকটা পোজ দিয়ে। তাতেই তিন হাজার টাকা দেবে। ছবিগুলো ভালো হলে পরে ওদের অ্যাড-ফিল্মেও হয়তো আমাকে নেবে।

মন্দার ম্লান হেসে বলল, তারপর হয়তো, ফিল্ম থেকেও অফার আসবে, কী বলো?

—খারাপ কী, আই লিভ ফর ফান। জাস্ট ফর ফান, বলে ডোনা শব্দ করে হেসে উঠল।

ডোনাকে হঠাৎ বেশ নিষ্ঠুর মনে হল মন্দারের। সে গুম হয়ে রইল প্রবল ক্ষোভে। হয়তো তাই পরক্ষণে ডোনা প্রসঙ্গ বদলে চলে গেল অন্য আলোচনায়। স্টিয়ারিঙে মোচড় দিতে-দিতে বলল, কয়েকদিন আগে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটা অদ্ভুত ধরনের খুন হয়েছে, খবরটা তোমার চোখে পড়েছে, মন্দার?

মন্দার মাথা ঝাঁকাল, কই না তো।

—দেখোনি। একেবারে পঞ্চম পৃষ্ঠায় বক্স করে নিউজ করেছিল। অবশ্য তুমি দেখবেই বা কী করে! তুমি তো খবরের কাগজে একমাত্র টেন্ডারের পৃষ্ঠাটাই যা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ো। বাকি-পৃথিবী রসাতলে গেল কি গেল না তাতে তোমার মাথাব্যথা নেই।

মন্দার উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, এই খুনটার খবর রাখা কি খুব জরুরি, ডোনা?

ডোনা হেসে উঠে বলল, না। আসলে খুনি হিসেবে যার কথা লিখেছে কাগজে, সে একজন সাংবাদিক, আবার আর্টিস্টও। কী আশ্চর্য, আর্টিস্টরা আবার খুন করতে পারে নাকি?

মন্দার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, আমি এক বছর আর্ট কলেজে পড়েছিলাম, কিন্তু আর্টিস্ট হতে পারিনি বলেই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের ব্যাবসাটা খুলে বসেছি। তুমি কি তাই-ই আর্টিস্টের প্রসঙ্গ তুলে আমাকে টিজ করতে চাইছ, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, না, তা নয়—।

—তবে কী ভাবছ, আমিই ওই খুনটা করেছি কি না?

ডোনা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, না। তবে এবার আমিই তোমাকে খুন করব, এই দ্যাখো না—।

বলেই ডোনা তার দিল্লি রোড পরিক্রমা শেষ করে বিবেকানন্দ সেতুর পথ না ধরে হঠাৎ ডাইনে বাঁক নিল বোম্বে রোডের দিকে। এতক্ষণ একটা খুনের গল্প ফেঁদে সে ইচ্ছে করেই অন্যমনস্ক

BanglaBook.org

করে রেখেছিল মন্দারকে। মন্দার বুঝতেই পারেনি। সংবিত ফিরতেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এদিকে কোথায় চলেছ?

ডোনা হাসল মিটিমিটি, চলোই না। এখনই কলকাতা ফিরে কী হবে? এই বেহদ্দ দুপুরে?

—আমার অনেক কাজ আছে, তোমাকে কখন থেকে বলছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না, মন্দারের গলায় উপচে উঠল ক্ষোভ।

—ঠিক আছে, সামনেই হাওড়া ব্রিজে ওঠার মোড় আছে, না-হয় ওখানে গিয়েই বাঁক নেব।

মন্দার ক্ষুব্ধ, বিস্মিত। ডোনা কিন্তু নির্বিকার, ঝোড়ো হাওয়ার মতো উড়ে চলেছে বোম্বে রোড ধরে। কখনও একলহমা মুচকি হাসি খেলা করে যাচ্ছে তার হালকা লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে। তারপর হঠাৎ মন্দারকে চমকে দিয়ে বলল, তুমি কখনও চুল্লু খেয়েছ, মন্দার?

—চল্লু? মুখ বিকৃত করল মন্দার, তুমি তো জানোই কোনও ড্রিঙ্কস পছন্দ করিনে আমি।

—মারিজুয়ানা।

—ধুর, কী আলফাল বকছ? গাড়ি চালাতে-চালাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?

ডোনা আবার শব্দ করে হেসে উঠল, চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা ধাবা আছে। ওখানে চুল্লু পাওয়া যায়। যাবে নাকি?

মন্দার রেগে গিয়ে বলল, এখন কোথাও যাব না। এক্ষুনি কলকাতা না পৌঁছুতে পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।

—কী এত ক্ষতি হবে, মন্দার?

—টেন্ডারটা জমা না দিতে পারলে বিরাট লস হয়ে যাবে।

ডোনা তার দিকে তাকিয়ে ভুরুতে অদ্ভুত ভঙ্গি করল, আমার জন্য একদিন না হয় লসই হল তোমার। অনেক তো গেইন করেছ গত তিনদিনে?

—তুমি বুঝতে পারছ না ডোনা, ইনটেরিয়র ডেকরেশনের লাইনটা ভীষণ কমপিটিটিভ। একটা টেন্ডার মিস করা মানে শুধু টাকাটাই লস হবে তা নয়, আরও অনেক ক্ষতি। কন্ট্রাক্টর হিসেবে শিগগিরই আমার গ্রেড চেঞ্জ হবে। সে তুমি বুঝবে না। ভীষণ ভাইট্যাল সময় এটা আমার কাছে। এত কমপিটিটিভ লাইন—।

—তাই নাকি? ডোনা তখনও নির্বিকার, কীরকম কমপিটিটিভ?

—ভীষণ, মন্দার ফের বোঝাতে চাইল, একটা কাজ পাওয়ার জন্য যে-কোনও কনসার্ন যে কোনও লেভেলে চলে যেতে পারে। ঘুষ, ব্যাক-বাইটিং, লেঙ্গি মারা—সবই চলে। দরকার হলে আমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে ওরা।

—তাই? ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, ঠিক আছে, আজ না-হয় তোমাকে আমিই খুন করি। একেবারে ঠান্ডা মাথায়—।

বলে অ্যাকসিলারেটরে আর-একটু চাপ দিল ডোনা। বাঁ-দিকে বাঁকড়া-সাসনগর হয়ে হাওড়া সেতুর পথ। সেদিকে বাঁক না নিয়ে তীব্রগতিতে ডোনা সোজা এগিয়ে চলল বোম্বে রোড ধরে। মন্দার এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল, এ কী করছ, কী করছ ডোনা, গাড়ি ঘোরাও, ঘোরাও—।

ডোনা হাসতে-হাসতে আরও চাপ দিল অ্যাকসিলারেটরে, প্রায় বিদ্যুতের মতো কালো পিচঢালা পথ বেয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মন্দারের ছাই রঙের মারুতিভ্যানে। সামনে একটা লংরুটের বাস আসছিল গাঁকগাঁক করে, নিখুঁতভাবে তার পাশ কাটিয়ে চলল দূর থেকে আরও দূরে, তারপর কপালের ওপর উড়তে থাকা চুলের গুচ্ছ সরাতে-সরাতে বলল, ভয় নেই, মধ্যরাতের আগে নিশ্চয় কলকাতা ফিরে আসব আমরা। লেটস হোপ সো—।

মন্দারের মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল, অসহায়ভাবে কেবল বিড়বিড় করল, আমার চারদিকে

BanglaBook.org

এখন এত শত্রু, কেউই বোধহয় আমাকে আর বাঁচতে দেবে না।

ডোনা হাসল, নিষ্ঠুরের মতো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তাই! তা হলে তো তুমি এখন একজন ভি. আই. পি.।

সামানে তখন একটা ওভারলোডেড ট্রাক আসছে, ঝড়ের মতো।

॥ ৪ ॥

পাশের বাড়ির দোতলা থেকে মস্ত দেওয়াল-ঘড়িটা ঢং-ঢং করে একরাশ বাজনা শোনানো শুরু করতেই মণীশ সচকিত হয়ে তাঁর টেবিল-ক্লকের দিকে চোখ রাখেন। রাত এখন বারোটার মতো। এমন মধ্যরাত্রে দক্ষিণ কলকাতার এই শহরতলি এলাকা নাকতলা প্রায় ঘুমের দিকে ঢলে পড়েছে। একটু আগেই লোডশেডিং হওয়ায় অন্ধকারে ডুবে আছে এলাকা। মণীশের এই সময় শুতে যাওয়ার কথা। তাঁর চব্বিশ বছরের ভরা যুবতী বউ ঈষিতা অনেকক্ষণ আগেই তাঁকে তাড়া দিয়ে গেছে বিছানায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু মনীশের সামনে টেবিলের ওপর এই মুহূর্তে খুলে রাখা রয়েছে তাঁর সেমিনারের কাগজপত্র। ইনভার্টারের আলো জ্বেলে মুখ নীচু করে লিখেই চলেছেন একমনে। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দুদিন পরেই যে বিশাল সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতে একটি অভিনব বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করবেন তিনি। বক্তৃতাটা শুধু বক্তৃতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। সেমিনারটির মূল্য মণীশের কাছে তার চেয়ে কিছু বেশিই। গত দু-সপ্তাহ ধরে বইপত্তর, লেখাজোকা নিয়ে তাই গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে সেঁটে থাকতে হচ্ছে তাঁর রিডিং-রুমের বাদামি রেক্সিন-ফিট-করা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে।

মণীশের লেখার বিষয়বস্তু বেশ নতুন ধরনের, একটু দুরূহও বটে। সেমিনারের আয়োজকরা অবশ্য প্রত্যেক অধ্যাপককে পইপই করে অনুরোধ করেছেন, আলোচনার বিষয় যেন খুবই আনকোরা এবং চমকপ্রদ হয়, যাতে আরও অনেক সেমিনারের মতো নিতান্ত দায়সারা বা ম্যাড়মেড়ে না হয়ে পড়ে। যাতে শ্রোতাদের ঘুম না পেয়ে যায়। যাতে শ্রোতারা টানটান হয়ে চার-পাঁচঘণ্টার আলোচনাচক্রের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। সাহিত্যের সেমিনার যখন, তাঁকে তো নানাভাবেই আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে।

মণীশও অবশ্য এহেন অদ্ভুত ধরনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে ভারী রোমাঞ্চিত। অনেক ভেবেচিন্তে একটি দুর্দান্ত বিষয়ও খুঁজে পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কবি-লেখকদের চমকপ্রদ জীবনী, তাঁদের কালজয়ী সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে। তার সঙ্গে সাহিত্যের চমকপ্রদ খুঁটিনাটিও তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে থাকেন নিয়মিত। কী নিয়ে লিখবেন এমন ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ যে আইডিয়াটা পেয়েছেন তা শ্রোতাদের বেশ রহস্যেই ডুবিয়ে রাখবে। সেমিনারে তাঁর বিষয়বস্তু হবে, 'মিস্টিসিজম ইন লিটারেচার।' অনেকগুলো চ্যাপ্টারে ভাগ করে নিয়েছেন প্রবন্ধটিকে। প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারই ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করছেন। আপাতত যে পরিচ্ছেদটিতে হাত দিয়েছেন, তার বিষয় হল, কোনও-কোনও লেখার জন্মরহস্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অলৌকিক কোনও কাহিনি। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখকের লেখার উৎস খুঁজতে-খুঁজতে কখনও জানা গেছে, কোনও লেখার বিষয় হয়তো স্বপ্নের ভেতর খুঁজে পেয়েছেন সেই কবি বা লেখক। অথবা দৈববলে লাভ করেছেন কোনও কবিতার পংক্তি। কিংবা অদ্ভুত কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে লেখাটির জন্মকথায়।

বেশ কিছুক্ষণ বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে হঠাৎই মণীশের মনে পড়ে গেল ইংরেজ কবি কোলরিজের কথা। কুবলাই খান নামের বিখ্যাত কবিতাটি তিনি নাকি পেয়েছিলেন ভোর রাতের

স্বপ্নে। স্বপ্নের নীল রহস্যের ভেতর ঘটনাটি ঘটতে দেখছিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার পংক্তিগুলিও সাজিয়ে নিচ্ছিলেন মনে-মনে। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠেই কবিতাটি লিখে চলেছিলেন দ্রুত, সেইসময় দরজায় হঠাৎ কড়ানাড়া শুনে গিয়ে দেখলেন, তাঁরই এক প্রিয় বন্ধু সামনে দাঁড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ কবিতা লেখা ফেলে মেতে উঠলেন আড্ডায়। বহুক্ষণ পর বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর দেখলেন, স্বপ্নের বাকি অংশের বিন্দু-বিসর্গও আর মনে নেই তাঁর। ফলে কবিতাটি রয়ে গেল অসমাপ্ত, সেই অবস্থাতেই ছাপতে দিয়েছিলেন কোলরিজ। ছাপা হতে বিখ্যাত হয়েছিল কবিতাটি।

এপিসোডটি মনে-মনে ভেঁজে যে-মুহূর্তে গুছিয়ে সাদা পৃষ্ঠায় লিখতে যাবেন মণীশ, তক্ষুনি ঈষিতা এসে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে, কী হল, শুতে যাবে না?

মণীশ হাসি-হাসি মুখে ঈষিতার দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, এই হয়ে গেছে আর কি। আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।

—আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

ঈষিতার পরনে এখন দুধসাদা রঙের একটি চমৎকার নাইটি। কাঁধ থেকে দুটো সরু স্ট্রাইপ নেমে এসেছে তার ভরাট বুকের ওপর পর্যন্ত। তাতে তার ফরসা বুকের ওপরটা এবং নগ্নবাহুতে যেন আলাদা একটা সৌন্দর্য অবয়ব পেয়েছে। বুকের ওপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নাইটির গায়ে এমন দারুণ সব কারুকাজ, লেস-বসানো, চমৎকারিত্ব আর ঝলমলে ব্যাপার আছে, যা ঈষিতাকে প্রায় পরী করে তুলেছে। মণীশের খুব ইচ্ছে করছিল, তাঁর লেখার প্যাড, কলম ফেলে বিছানায় গিয়ে ঈষিতার পাশে শুয়ে পড়তে, কিন্তু তিনি আপাতত আটকে গিয়েছেন কোলরিজ সাহেবের স্বপ্নের ভিতরে। এমন অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন মণীশরাও দেখে থাকেন প্রতিনিয়ত, কিন্তু তাঁরা তো আর কোলরিজ নন যে, সেগুলো থেকে এমন দুর্দান্ত একটি কবিতার জন্ম হবে। এই যে ঈষিতার এমন নয়নাভিরাম সাজ, তা দেখেও তাঁর এখনই একটি কবিতা লেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কলমে প্রবন্ধ যা-ও বা খেলে, কবিতা নৈব-নৈব চ। সেই প্রবন্ধ লিখতেই এখন কলমের নিব ভাঙতে হচ্ছে তাঁকে। তাই না পারছেন ঈষিতার রূপের স্তুতি করতে, না পারছেন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। আর দুদিনের মধ্যেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। কোনও উপায় নেই।

ঈষিতার আকর্ষণীয় শরীরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে টেবিলের প্যাডে নিবিষ্ট হতেই ঈষিতা ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ চোখ করে তাঁর টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল, এই বাইরে না ফাটাফাটি জ্যোৎস্না। চলো না, ছাদে যাই—।

—ছাদে! মণীশকে হঠাৎ খুবই বিপন্ন দেখাল।

—হুঁ, ছাদে। লোডশেডিং-এর সময়ই তো জ্যোৎস্নার কারিকুরি ফুটে ওঠে কলকাতায়। চলো না, কতদিন ভালো করে জ্যোৎস্না দেখিনি। বিয়ের আগে একবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম জ্যোৎস্না দেখব বলে। পূর্ণিমার রাত ছিল সেদিন। যাচ্ছে থেকে চাঁদ উঠবে বলে উসখুস করছি, হঠাৎ কোত্থেকে একরাশ কালো মেঘ উড়ে এসে জুড়ে বসল সারা আকাশে। ইস, কী যে আফসোস হয়েছিল সেদিন।

টেবিলের ওপর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ায় এই মুহূর্তে ঈষিতার শরীরের কারুকাজ মণীশের সামনে উদ্ভাসিত। তার উপছানো স্তনবিভাজের দিকে একঝলক মুগ্ধদৃষ্টি রেখে মণীশ চোখ ফিরিয়ে বললেন, এই ঈষিতা, তোমার মনে আছে, রিলকে যখন তাঁর ডুয়িনো এলিজি লিখেছিলেন, তখন হঠাৎ দু-লাইন কবিতা দৈববাণীর মতো উপহার পেয়েছিলেন। তোমার তো তখন বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ মুখস্থ ছিল। সে লাইনদুটো কী ছিল বলো তো?

জ্যোৎস্না রাতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে ছাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ পরিহার করে হঠাৎ রিলকে প্রসঙ্গে চলে যেতে ঈষিতা ভীষণ রেগে গেল। ঝট করে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বলল, ধুর ছাড়ো তো তোমার ওই সেমিনার। রাত ক'টা বাজে সেটা খেয়াল আছে?

BanglaBook.org

মণীশ তবুও নাছোড়। কোলরিজ হয়ে চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে, রাজর্ষির তাতা ও হাসির ঘটনাটিও তো রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের ঘোরেই পেয়েছিলেন, সেটা নোট করে চলে এসেছেন রিলকের এপিসোডে, ঈষিতাকে ধরলেন ফের, তোমার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ প্রখর। বলো না, মনে আছে পঙক্তি দুটো?

ঈষিতা তখন তার পরির মতো দুধসাদা শরীর নিয়ে ক্ষুব্ধমুখে পায়চারি করছে রিডিং রুমের মেঝেয়। মাত্র বছর তিনেক আগেও ঈষিতা মণীশের ছাত্রী ছিল। তুলনামূলক সাহিত্যে প্রতিবছরই একঝাঁক করে সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়ে এসে ভরতি হয়। প্রায় প্রত্যেকের চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ, তুখোড় ব্যক্তিত্ব আর প্রবল সাহিত্যপিপাসা। প্রায় সবাই-ই মেধাবীও। তারই মধ্যে ঈষিতা নামের তরুণীটি ছিল একেবারেই অন্যরকম। যেমন অসাধারণ সুন্দরী, কাটাকাটা চোখমুখ, তেমনই চমৎকার তার পড়াশুনোর পরিধি। দীর্ঘ একযুগ অধ্যাপনা করেও মণীশ যখন একজন সুন্দরী তরুণী ছাত্রীরও প্রেমে পড়েননি, এবং তিনি একজন কনফার্মড ব্যাচেলর হতে যাচ্ছেন বলে সবাই ধরে নিয়েছে, ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর জীবনে ঈষিতার আবির্ভাব। আটত্রিশ বছরের মণীশের সঙ্গে একুশ বছরের ঈষিতা কীভাবে যে লটকে গেল তা ক্লাসের কোনও ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপকরাই ধরতে পারেননি। শুধু দু-বছরের ক্লাস শেষ হলে, ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রিপারেটিভ লিভ-এর সময় একদিন ঈষিতাকে দেখা গেল লাইব্রেরি রুমে। তাকে দেখে তার এক সহপাঠী বিশ্ববন্ধু চমকে উঠে বলল, কী রে, ঈষিতা, তোর কপাল ফাটলো কী করে? কে-ই বা ফাটালো?

ঈষিতার সিঁথিতে তখন জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের সরু একটা রেখা। সে-রেখা এসে ছুঁয়েছে তার কপালের প্রায় মাঝখান পর্যন্ত। ঈষিতা শুধু রহস্যময়ীর মতো হেসেছিল, কিন্তু রহস্যটি ফাঁস করেনি। সে-রহস্য অবশ্য সবাই জেনে গিয়েছিল কিছুদিন পরে, ততক্ষণে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ।

মণীশের প্রশ্নে ঈষিতা হঠাৎ থেমে গিয়ে চমৎকার করে আবৃত্তি করল ঃ

কে, আমি চিৎকার করে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণিবদ্ধ ওই দেবদূত-পর্যায়ের মধ্য থেকে?

রিলকে তখন ট্যাক্সিস-হোহেনলাহে নামের এক সুন্দরী রাজকন্যার আতিথ্যে আছেন তাঁদের ডুয়িনো দুর্গে। পাহাড়ের ওপর এক নির্জন বিশাল বাড়ি, পাহাড়ের পা ছুঁয়ে আছে চমৎকার অন্তহীন নীল সমুদ্র। সেই দুর্গের খোলা বারান্দায় বসে ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল হাওয়ায় মুহূর্তে এই পংক্তি দুটি যেন হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলেন জার্মান-কবি রিলকে। তারপর অনায়াসে লিখে গিয়েছিলেন আরও অসংখ্য পঙক্তি, পঙক্তির পর পঙক্তি।

—থ্যাঙ্কু ঈষিতা, বলে মণীশ আবার ডুবে গেলেন তাঁর লেখার মধ্যে। কলকাতায় আপাতত লোডশেডিং-এর দাপট এত বেশি যে, জ্যোৎস্নারাতের ম্যাজিক এখন প্রায়শ দেখতে পায় কলকাতাবাসী। বছর কুড়ি আগেও লোডশেডিং-এর এমন বিদঘুটে প্রকোপ ছিল না। তখন একবার গ্রামে বেড়াতে গিয়ে মণীশ আবিষ্কার করেছিলেন, জ্যোৎস্নারাতে পৃথিবী এক অন্যরকম সাজে সেজে ওঠে। কলকাতা ফিরে এসে জনে-জনে গল্পও করেছিলেন, জানেন, মনে হচ্ছিল কোনও রূপকথার দেশে বেড়াতে গিয়েছি আমি। সে এমন চমৎকার সৌন্দর্য। যেন আকাশ থেকে সারবেঁধে নেমে আসছে কিন্নর-কিন্নরীরা। সে-গল্প শুনে অনেকেরই সাধ হয়েছিল গ্রামবাংলায় জ্যোৎস্না দেখতে যাওয়ার। তারপর গত কুড়িবছর অনেক জ্যোৎস্নার রাত এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যও তাই গা-সওয়া হয়ে গেছে কলকাতাবাসীর।

আর ইদানীং লোডশেডিং-এর ভয়াল আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে মণীশ তাঁর রিডিংরুম আর বেডরুম দুটো ঘরই ইনভার্টারের আলোয় আলোকিত করে রাখেন। ঘরের ভেতর লোডশেডিং আর বুঝতেই পারেন না। বুঝতে হলে ছাদে যেতে হয়। বিয়ের পর অনেক লোডশেডিং-এর অন্ধকার রাতে ছাদে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন ঈষিতাকে, অনেক জ্যোৎস্নাভেজা রাতে ছাদের আলসেয় বসে

BanglaBook.org

গল্প করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু এই মুহূর্তে আর সে-সময় নেই। সেমিনারটি নিয়ে খুবই টেনশনে আছেন মণীশ।

টেনশনে থাকার অন্যতম কারণ হল সেমিনারের দিন সারাক্ষণ উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর। যেসব অধ্যাপকেরা পেপার পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু, তার গভীরতা, লেখার বিশ্লেষণ, এ সবকিছুই নাকি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগির রিডারের একটি পোস্ট খালি হচ্ছে। রিডারের পদ মনোনয়নের আগে এই সেমিনারটিকে তাই খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। স্বভাবতই একে সমীহ করছে সব অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকও। মণীশ তো গত পনেরো কুড়িদিন যাবত পাগলের মতো পড়শুনা করছেন, নোট নিচ্ছেন, অবশেষে গত দিনতিনেক ধরে প্রবন্ধটি একটা শেপে আনার চেষ্টা করছেন। কমদিন হল না তার চাকরি, এখন রিডার হওয়ার সব যোগ্যতাই তাঁর হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সেমিনারটির গুরুত্ব তাঁর কাছে খুবই বেশি। বিশেষ করে তাঁরই বিভাগের রণজয় দত্ত একেবারে তাঁর ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে। রণজয় কনটেম্পোরারি হলেও খুব সম্প্রতি তরুণ কবি হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে। তরুণ কবি শব্দটা অবশ্য মণীশের কাছে ভারী গোলমেলে বলে মনে হয়। রণজয়ের বয়সও চল্লিশের মতো, লেকচারার হিসেবে বেশ সিনিয়রই বলা যায়, ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা তাকে রীতিমতো রেসপেক্ট করে, তা সত্ত্বেও সে কী করে তরুণ কবি হিসেবে অভিহিত হয় তা মণীশ বুঝতে পারেন না। আর এই খ্যাতির জন্য রণজয়ের মনে একটা চাপা অহঙ্কার আছে। কথাবার্তার মধ্যে তার এই নাক উঁচু স্বভাবটা কখনোই চাপা থাকে না। সেজন্য রণজয়কে বেশ অপছন্দই করেন মণীশ। সম্ভবত রণজয়ও মণীশকে।

দিনতিনেক আগেও এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা আরও একবার যাচাই হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। যে বিষয়টি নিয়ে মণীশ তাঁর প্রবন্ধ লিখছেন, যথাসম্ভব সেটি তিনি গোপনই রেখেছিলেন অন্য সবার কাছ থেকে। তবু রণজয় কীভাবে যেন সেটি জেনে ফেলে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার মণীশদা, আপনি নাকি কীসব অলৌকিক ব্যাপারসাপার নিয়ে পেপার তৈরি করছেন?

মণীশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, হুঁ, ওই আর কী, কেন?

—আসলে আপনি তো মৌলিক লেখা লেখেন না। লিখলে জানতেন, সব সৃষ্টিশীল লেখাই একটা অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ কখন কবিতার কোন পঙক্তি কিংবা একটা গল্পের প্লট মাথার ভিতর স্পার্ক করবে তা কোনও কবি বা লেখকই আগে থেকে জানতে পারেন না। কোনও চিত্রশিল্পীর ছবি আঁকা, কিংবা কোনও মিউজিসিয়ানের মিউজিক কম্পোজ করার ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস খাটে। সুতরাং অলৌকিক উপায়ে সাহিত্যের জন্ম এই বিষয় নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রবন্ধ লেখার মানে হয় না।

কথাটা শুনে মণীশ সেদিন বেশ গুম হয়ে গিয়েছিলেন। রণজয় দত্ত কীভাবে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু জেনে গেল তা বুঝতে পারেননি। সম্ভবত দিনকয়েক আগে ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক সুশোভন চ্যাটার্জির সঙ্গে কোলরিজের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে কুবলাই খানের প্রসঙ্গ উঠেছিল। হয়তো সুশোভন চ্যাটার্জির কাছ থেকেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে রণজয়, আর তাই-ই প্রথম চোটে মণীশকে ঘাবড়ে দিতেই রণজয়ের এমন বক্রোক্তি।

আসলে রণজয় যেমন স্বার্থপর, তেমনই অহঙ্কারী। ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে চাকরির ব্যাপারে উমেদারিও করছে নাকি ও, এমন তথ্যও জানা গিয়েছে ওর মধ্যে।

নিজের লেখার মধ্যে ডুবে গিয়েও এমন অনেক এলোমেলো কথা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল মণীশের। ঈষিতা বেশ কিছুক্ষণ তাঁর ঘরে ঘোরাঘুরি করার পর এখন আবার শোওয়ার ঘরে ঢুকে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল আয়নায় তারই নাইটি পরা সুন্দর শরীরটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছে। হঠাৎ নীচু হয়ে পাফে পাউডার মাখিয়ে নিয়ে হালকা করে প্রলেপ লাগিয়ে নিল তার ঘাড়ে-পিঠে। দু-হাত তুলে মসৃণ বগলের নীচেও এক ঝলক। তারপর হঠাৎ আলতো

BanglaBook.org

করে বেঁধে রাখা খোঁপার চুল খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠে। চুল খুলে এভাবে ছড়িয়ে দিলেই যে ঈষিতাকে অতিরিক্ত সুন্দরী লাগে তা মণীশ ওকে অনেকবার বলেছেন। হয়তো তাই-ই তার এমন আলুলায়িতকুন্তলা চেহারা। চুল ছড়িয়ে দিয়ে একবার বড় করে হাই তুলল, তারপর রিডিংরুমের দিকে গলা বাড়িয়ে গলায় খানিক বিরক্তি মাখিয়ে বলল, আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

মণীশ লেখার প্যাড থেকে মুখ না তুলেই বললেন, তুমি শুয়ে পড়ো না গিয়ে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। হয়ে এসেছে প্রায়। আর এক পাতা।

বিরক্ত ক্ষুব্ধমুখে আর একটা হাই তুলল ঈষিতা। তারপর বিড়বিড় করে কিছু বলল একা-একা। ওপাশে সরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আসলে এই মুহূর্তে একা-একা বিছানায় যেতে ইচ্ছে করছে না ঈষিতার। তিন বছর বিয়ে হয়ে গেছে তাদের, তবু মণীশের প্রতি তার এখনও এক তীব্র আকর্ষণ, তিন বছর আগেও যেমন ছিল। আসলে, মণীশের চেহারার মধ্যে এমন একটা গ্ল্যামার আছে, যা যে-কোনও মেয়েকেই ভীষণভাবে টানে। আজ বহু বছর ধরে এভাবেই মেয়েদের আকর্ষণ করে আসছেন মণীশ।

দোতলার জানালা থেকে দেখা যায়, ওপাশের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংটা বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সব আলোই এখন লোডশেডিং-এর কল্যাণে নেভা। কেবল একটা জানালায় এখনও রাতের নীল আলো জ্বলছে। কী এক কৌতূহলে সেদিকে চোখ রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈষিতা।

বিয়ের পর-পরই ঈষিতা বলে দিয়েছিল, এখনই দু-চার বছরের মধ্যে তার মা হওয়ার ইচ্ছে নেই। মা হলেই তো সন্তানের কাছে সমর্পণ করে দিতে হয় মায়ের বাকি জীবন-যৌবন সব। তার আগে একটু হালকা থাকলে জীবনটা উপভোগ করে নেওয়া যায়।

ঈষিতার যেমন ইচ্ছে, মণীশকে তেমনই মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ছিল ঠিক এর অন্যরকম। তাঁর বিয়ে হয়েছে অনেক দেরিতেই। আটত্রিশ বছরের মণীশের পাশে একুশের ঈষিতা, বয়সের হিসেবে বেমানান হলেও দেখতে তেমনটা লাগেনি। মণীশকে এখনও সদ্য তিরিশের যুবক বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। শুধু তাঁর কোঁকড়ানো চুলে দু-চারটে রূপোলি চমক দেওয়া ছাড়া তাঁর চেহারায় বয়সজনিত কোনও অতিরিক্ত মেদ এখনও জমেনি। তবু হাজার হোক, তাঁর লেট ম্যারেজ। তাই এই একচল্লিশে পৌঁছে যদি তিনি সন্তানের জনক না হতে পারেন, তাহলে তো ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কোনও সুযোগ কপালে জুটবে না। তবু ঈষিতা তার দাবিতে অনড়। সে তার শরীরের যত্ন একেবারে টায়টায় বজায় রেখেছে। শ্যাম্পু করা চুলের কেয়ারিতে, পোশাকের পরিপাটিতে, চোখের স্বপ্নালু চাউনিতে, কথার সুরেলা ধ্বনিতে এমন নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে তার যৌবন যে, তার দিকে একবার নজর রাখলে যে-কোনও পুরুষের আর একবার তাকাতে ইচ্ছে করবে। তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তবু মণীশের নিজেরই এখনও তাকিয়ে আশ মেটে না। অন্য পুরুষদের তো হবেই। তাঁরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে মেড ফর ইচ আদার।

বেডরুমের জানালা থেকে সরে এসে ঈষিতা ততক্ষণে বলছে, ধুর, তোমার ওই লেখার কাজও আর শেষ হবে না, তোমার শুতে আসারও আর সময় হবে না। রাত তো এদিকে ভোর হয়ে গেল। মণীশ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, দাঁড়াও না, সেমিনারটা হয়ে গেলেই আমি ফ্রি। তখন দেখো—।

ঈষিতা ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি আর ফ্রি হয়েছ! সারা বছর হয় সেমিনার, না হয় কোনও রিসার্চ পেপার তৈরি করা। অথবা পরীক্ষার কোশ্চেন-পেপার সেট করা। অথবা অন্য ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বক্তৃতা করতে যাওয়া। এই তো দেখছি তিন বছর ধরে।

এতক্ষণে মণীশ মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

ঈষিতা সত্যিই চটে গিয়েছে তাঁর ওপর। একপশলা ফায়ারিং করে পায়ের স্লিপারে ফটফট

BanglaBook.org

শব্দ তুলে চলে গেল খাটের কাছে। বেশ যত্ন করে সে বিছানা পাতে রোজ। প্রায়ই নতুন-নতুন বেডকভার। প্রায়ই নতুন বেডশিট। প্রতিটি চমৎকার সব রঙের আর কারুকাজের। ঈষিতার মতে রোজ বেডকভার বদলালে তাতে ঘরের চার্ম বদলে যায়। বিছানার একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়। রাতে শুতে যাওয়ার মোহ বেড়ে যায়। মণীশ তাই ঈষিতার নাম দিয়েছেন শয্যাবিলাসিনী। তবে সত্যি বলতে কি, ঈষিতার এই ব্যাপারটা মণীশও ভারী পছন্দ করেন। কখনও ঘরের ভিতর খাটটা এদিক-ওদিক করে ঘরের চেহারাটাই বদলে দেয় ঈষিতা। তখন মনে হয় তাঁদের বেডরুমটা যেন নতুন, হঠাৎ যেন বদলে গেছে কীভাবে।

আর শুধু বেডরুমটাই নয়, ঈষিতা নিজেকেও কখনও বদলে ফেলে বিছানায়। যত দিন যাচ্ছে, ততই ঈষিতা যেন নতুন করে ধরা দিচ্ছে মণীশের কাছে। প্রতিদিনই যেন তার বয়স কমে যাচ্ছে আরও। সে চায় মণীশের বয়সও যেন এভাবে কমে যায়।

তবু মণীশের বয়স যে বেড়েছে তা মোটেই ধরা যায় না। ক'দিন আগেই ডোনা নামের একটি ছাত্রী এসেছিল তাঁর কাছে। একটু অন্যরকম ব্যাক্তিত্ব আছে মেয়েটির, বেশ কিছুটা অভিনব তার চালচলন। বলেছিল, স্যার, আজকাল কাগজগুলোতে মেয়েদের রূপচর্চা সম্পর্কে নানারকম টিপস দিয়ে থাকে, কীভাবে সাজবেন, কী দিয়ে সাজবেন, কী খাবেন—এসব তথ্য দিয়ে। কিন্তু পুরষদের বয়স কী করে ধরা যায়, আরও ব্যাক্তিত্ব গড়ে ওঠে, কীভাবে আরও হ্যান্ডসাম হয়ে ওঠা যায়, কীভাবে শরীর মেইনটেইন করা উচিত তা নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। আপনি একটা কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিন, প্রতি সপ্তাহে পুরুষদের রূপচর্চার জন্য টিপস দেবেন। দেখবেন, কাগজের বিক্রি বেড়ে যাবে। পুরুষরাও প্রত্যেকেই আরও সুন্দর হয়ে উঠতে চায় সে-কথা কিন্তু কেউ ভাবে না। আপনি দেখতে এত সুন্দর বলে অন্য পুরুষরা মনে-মনে হিংসে করে আপনাকে, তা জানেন?

সে-কথা খুব ভালো করেই জানেন মণীশ। প্রসঙ্গটা মনে পড়তেই হঠাৎ ঈষিতাকে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন, সে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢোকার তোড়জোড় করছে। ডোনার কথা তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। এক মেয়ে যে অন্য মেয়েদের কথা শুনতে পছন্দ করে না তা হাড়ে-হাড়ে জেনে গিয়েছেন বহুকাল। আজ দুপুরে একটা ফোন এসেছিল তাঁদের রুমে, ডোনার বাবাই ফোনটা করেছিলেন, পরশু নাকি বাড়ি ফেরার কথা ছিল ডোনার, কোন বন্ধুদে· ·ঙ্গে আউটিঙে গিয়েছে এখনও ফেরেনি বলে খোঁজ করছিলেন, ক্লাসের বান্ধবীরা কেউ যায়নি শুনে আশ্চর্য হয়ে রেখে দিয়েছেন ফোন।

মণীশ অবশ্য তেমন আশ্চর্য হননি, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডোনা তার বিচিত্র জীবনযাপনে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সেই ডোনাই অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিল, স্যার, অনেকেই কিন্তু হিংসে করে আপনাকে।

কথাটা ঠিকই, আরও বহুজনের চোখেই এমনই পরশ্রীকাতরতার ঝিলিক বহুদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছেন মণীশ। সে বিদ্বেষের স্ফুরণ কখনও ক্ষীণ, কখনও তীব্র হয়ে ধরা দেয় তাঁর কাছে। কখনও শিউরেও ওঠেন তার ভয়াবহতা অনুমান করে।

দৃশ্যগুলো ভাবতে-ভাবতে লেখার টেবিলে মণীশ আর বসে থাকতে পারলেন না, আলো নিভিয়ে ধীরপায়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁদের শোওয়ার ঘরে। ততক্ষণে বিছানায় শরীর মেলে দিয়ে এটা হালকা নীল আলো জ্বেলে দিয়েছে ঈষিতা। সাদা ধবধবে মশারির ভিতর আজ ক্রিম-কালারের বেডশিট। তার ওপর শাদা নাইটিতে ওতপ্রোত হয়ে থাকা ঈষিতা কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে আছে এলায়িতভঙ্গিতে।

মণীশও মশারি তুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঈষিতা ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। তার চমৎকার মুখে ছড়িয়ে রয়েছে একরাশ অভিমান। বাইরে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঈষিতা কথিত সেই ফাটাফাটি

BanglaBook.org

জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার চাদরে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কলকাতার বাদবাকি মানুষ।

সে-দৃশ্যের দিকে কয়েক লহমা অপলক তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মণীশ। ঈষিতার পাশে শুয়ে তাকে কাছে টানতে-টানতে বললেন, জানো, আজকাল আমার যেন কীরকম ভয়-ভয় করে।

ঈষিতার মুখের মেঘ কেটে যাচ্ছিল। মণীশের কথায় সহসা বিস্ময় ঘনিয়ে এল তার চোখমুখ জুড়ে, সে কি, কীসের ভয়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মণীশ, তাকিয়ে ছিলেন ঈষিতার মুখের দিকেই, হঠাৎ সে-মুখ পেরিয়ে তাঁর চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো পরপর ভেসে উঠতে লাগল অনেক দৃশ্য অনেক মুখ, অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত পটভূমিকা। যেন এই মুহূর্তে সেসব মনে পড়ার কথা ছিল না। হঠাৎ বিড়বিড় করে বললেন, মনে হচ্ছে মৃত্যুভয়। সবসময় মনে হয়, কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে, আমাকে তাড়া করছে মারবে বলে।

ঈষিতা অবাক, কিছুই বুঝতে পারছিল না মণীশের কথা। এতদিন বিয়ে হয়েছে তাদের, কখনও মণীশ ও ধরনের কথাবার্তা বলেনি। বরং তার কথায় আত্মপ্রত্যয়ের ভাবই বেশি। একটা অন্যরকমের অহঙ্কার। এই মুহূর্তে অন্যধরনের কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। নাইটি সামলে ধড়মড় করে উঠে বসল, সে আবার কী কথা? কারা তাড়া করে বেড়াচ্ছে তোমাকে? তোমার কোনও শত্রু আছে নাকি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বললেন, কী জানি! আমি জানি না।

॥ ৫ ॥

চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে লিভিংরুমটা বেশ বড়সড়ো এল-সেপের। এল-এর হরাইজন্ট্যাল বাহুতে চারজনের যাওয়ার মতো একটা ডাইনিং টেবিল পাতা। ঠিক তার পিছনেই কিচেন। ভার্টিকাল বাহুতে চিত্রদীপের একটা ছোট্ট লাইব্রেরি, তাতে পেইন্টিঙের বই-ই বেশি। তার একপাশে ছবি আঁকার একটা ক্যানভাস দাঁড় করানো। তাতে অর্ধেক আঁকা হয়ে রয়েছে একটি রমণী-শরীর।

প্রতিদিন সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ক্যানভাসের সামনে রং তুলি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো চিত্রদীপের অভ্যাস। দু-এক পোঁচ তুলি চালিয়ে কখনও সরে আসেন, কখনও মন লেগে গেলে সারাটা সকাল। আজ কিন্তু একবারও ক্যানভাসের সামনে যাননি, বসে আছেন পাশেই পড়ার টেবিলে। অবশ্য পড়ছেন না, চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে টুকটুক করে এঁকে চলেছেন একটি কমিক-স্ট্রিপ, আর মাঝেমধ্যে তাঁর ঠোঁটের খাড়-বাঁকানো পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন ফুরফুর করে।

কমিকটির বিষয় যেমন মজার, তেমনই মন দিয়ে তার বিষয়বস্তুটিতে প্রাণ সঞ্চার করে চলেছেন চিত্রদীপ। ত্রৈলোক্যনাথের একটি হাসির গল্পকে কমিকে রূপান্তরিত করছেন ক'দিন ধরে। প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ কিচেন থেকে মুখ বাড়ালেন বনানী, ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু—।

আর্ট-কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পর গত কুড়ি বছর ধরে ছবি আঁকার লাইনে রয়েছেন চিত্রদীপ, কিন্তু আর্টিস্ট হিসেবে এখনও কোনও খ্যাতি হয়নি। তাঁরই সমসাময়িক অন্য শিল্পীদের ছবির দাম যেমন চড়া, তেমনই তাদের ছবির জন্য রসিক মহলে বেশ ক্রেজ। অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের ছবি নাকি আঁকার অনেক আগেই বিক্রি হয়ে যায় চিত্ররসিকদের কাছে, তাঁদের পাশাপাশি কী কারণে যেন চিত্রদীপের ছবির বিক্রি নেই বললেই চলে। কখনও-কখনও দু-একখানা বিক্রি হয় বটে, কিন্তু তাতে একজন শিল্পীর পক্ষে শুধু ছবি এঁকে সংসার চালানো অসম্ভব।

BanglaBook.org

ফলে বাধ্য হয়ে চিত্রদীপকে বেশির ভাগ সময়ই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে হয়। প্রথমদিকে তো সিনেমার পোস্টার আঁকতেন, এখনও একটি বাচ্চাদের পত্রিকায় গল্প-উপন্যাসের ছবি এঁকে, কখনও ক্রমিক-স্ট্রিপ এঁকে, কখনও পত্রিকা বা বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁকে। চিত্রদীপ অনেক সময় ভাববার চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবি বিক্রি না হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো, কিন্তু ভেবে বেশিদূর এগুতে পারেননি। এখনও তাঁর ছোট্ট বাড়ির এদিকে-ওদিকে কয়েকশো ছবি পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় নতুন ছবি আঁকতে গিয়ে থমকে যান। কখনও আধখানা এঁকে ফেলে রাখেন অবহেলায়, মনে হয় এঁকে আর কী হবে, গ্যালারিতে শো দিলে তো অবিক্রীত অবস্থায় ফেরত আসবে আবার। তার চেয়ে খরিদ্দারের অর্ডারমাফিক কিছু বাণিজ্যিক আঁকাআঁকি করলে দুটো পয়সা আসবে ঘরে।

বনানী অবশ্য মাঝেমধ্যে উৎসাহ দিতেন, আঁকাটা একেবারে বন্ধ কোরো না তুমি। একদিন হয়তো তোমার ছবি কেনার জন্যেই লাইন পড়ে যাবে। কখনও উদাহরণ দেন, বিদেশের বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর জীবনীতে লেখা আছে, যাঁরা জীবিত অবস্থায় প্রায় অখ্যাত ছিলেন, মৃত্যুর পর এখন তাঁদের একেকটি ছবি নীলামে উঠলে কয়েক কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। যেমন ধর পল গগ্যাঁর কথা, কিংবা ভ্যান গখ—।

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে চেপে ধরে ম্লান হেসে বলেন, উঁহু, আমার মধ্যে নিশ্চয় প্রতিভা নেই। নইলে দ্যাখো, সুহাস ভট্টাচার্যের ছবি লক্ষ-লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, আর আমার ছবি কেউ ছুঁয়েও দ্যাখে না।

এমন ভাবতে-ভাবতে কমিক-স্ট্রিপটা আঁকা শেষ করে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। পত্রিকার সম্পাদক একটু পরেই লোক পাঠাবেন বলে ফোন করেছিলেন খানিক আগে। বাচ্চারা নাকি তাঁর এই কমিক-স্ট্রিপ দারুণ পছন্দ করছে। একটা বাচ্চা ছেলে চিঠিও লিখেছে এই বলে যে, হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে চিত্রদীপের কমিক-স্ট্রিপ পড়ে। চিত্রদীপ অবশ্য বুঝতে পারেন না কমিকের ম্যাজিকটা তাঁর আঁকার মধ্যে, না ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে। এক-এক সময় মনে হয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মজার জন্যেই উতরে যাচ্ছে তাঁর আঁকা। কখনও অবশ্য ভাবেন, নিজেই গল্প তৈরি করে তা দিয়ে কমিক-স্ট্রিপ তৈরি করবেন কিনা। কিন্তু ভাবনাটা ভাবনার মধ্যেই থেকে যায়, আঁকতে সাহস হয় না। যদি তাতে বাচ্চারা খুশি না হয়!

আসলে, চিত্রদীপ বুঝতে পারেন, ছবি বিক্রি না হওয়ার ফলে নিজের ওপর কনফিডেন্স ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাঁর। এভাবেই বোধহয় অনেক প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়ে থাকে।

ততক্ষণে ডাইনিং টেবিলের ওপর চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে ফেলেছেন বনানী, সাজিয়ে ডাক দিচ্ছেন, শিগগির চলে এসো, নইলে, জুড়িয়ে যাবে।

কমিক স্ট্রিপটা সযত্নে একটা বই-এর মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালেন চিত্রদীপ। প্রায় ঘণ্টাখানেক টানা এঁকেছেন ভোরবেলা থেকে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে আঁকলে তাঁর ঘাড়ে একটা টনটনে ব্যথা হয়। ডাক্তার বলেছে স্পন্ডিলাইটিস।

উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা একটু পিছন দিকে বাঁকিয়ে দেখলেন, ঘাড়ের ব্যথাটা কমে কিনা, তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন ডাইনিং টেবিলের সামনে। টেবিলে সাদা কড়ির প্লেটে সাজানো আহার্যদ্রব্য দেখে তৃপ্তির স্বরে বলে উঠলেন, ফাইন।

প্রতিদিন সকালের ব্রেকফাস্টটি বেশ মনোযোগ দিয়েই বানান বনানী। সপ্তাহের সাতদিন সাতরকম মেনু নির্দিষ্ট আছে তাঁর। কখনও অবশ্য প্রথা ভেঙে নতুন কোনও রান্না তৈরি করে ফেলেন। আজ শুক্রবার, আজ অবশ্য প্রথামতো বড় এক প্লেট এগ-নুডলস, তার সঙ্গে শসাকুচি-বীট-গাজর-পেঁয়াজ কুচিয়ে স্যালাড। শেষে মস্ত একখণ্ড পুডিং।

চেয়ার টেনে বসতে-বসতে খেয়াল করলেন, মাত্র দুজনের জন্যেই আজ ব্রেকফাস্টের

BanglaBook.org

আয়োজন। চামচ দিয়ে নুডলস মুখে তুলতে-তুলতে বললেন, ডোনা ওঠেনি ঘুম থেকে?

বনানী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, না। এগ নুডলস-এর দিকে মনোযোগ ছেড়ে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। কী একটা যেন ভাবছেন আনমনে। ভাবনার সময় তাঁর হাতে চামচ থেমে যায় রোজ। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজে-নিজেই ধ্যান ভেঙে জিজ্ঞাসা করলেন, শিহরন ব্রেকফাস্টের টেবিলে এল না?

বনানী অবাক হয়ে বললেন, ওমা, শিহরন তো কাল রাতের ট্রেনে দিল্লি গেছে।

—তাই নাকি?

—বাহ, কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কত কথাই তো বলল। তুমি কি কিছুই শোনোনি।

এতক্ষণে চিত্রদীপের মনে পড়ল, কাল শিহরন এরকম কিছু বলেছিল বোধহয়। তিনি তখন অন্যমনস্ক হয়ে অন্যকিছু চিন্তা করছিলেন গভীরভাবে। ভাসা-ভাসা কথাটা কানে এসেছিল বটে। কাল দুপুরে খেয়ে-দেয়ে চিত্রদীপ বেরিয়েছিলেন অ্যাকাডেমিতে তাঁর এক বন্ধু মণিময়-এর ছবির একজিবিশন দেখতে। ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। তার মধ্যে শিহরন কখন যেন বেরিয়ে গেছে তার ট্রেন ধরতে। তাই আর জানতেও পারেননি। মনেও নেই।

সেই কথাই আবার বললেন বনানী, ওদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা জরুরি কাজে শিহরনকে দিল্লি যেতে হয়েছে।

—কবে ফিরবে?

—ফিরতে-ফিরতে তো দিন সাতেক লাগবে এরকমই বলল।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে খাবারের প্লেটে মনঃসংযোগ করলেন চিত্রদীপ। শিহরন রায়চৌধুরী তাঁদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকে। তাঁদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা গেস্টরুম আছে, একখানা ঘর, তবে বেশ বড়ই, অ্যাটাচড বাথ। বছরখানেক হল চল্লিশ-পেরুনো এই প্রায়-যুবক ব্যাচেলরটি তাঁদের বাড়িতে থাকা-খাওয়া করছেন। তার বিনিময়ে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দিয়ে থাকেন চিত্রদীপদের। চিত্রদীপের অবশ্য এই ব্যবস্থাপনায় তেমন সায় ছিল না, হঠাৎ তাঁদের ছোট্ট নিরিবিলি পরিবারে বাইরের একজন আগন্তুককে ঠাঁই দিলে নিজেদের প্রাইভেসি তেমন থাকবে না এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু বনানী তখন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, গেস্টরুমটা এ-বাড়ি থেকে বেশ বিচ্ছিন্নই, সেখানে একজন বাইরের লোক থাকলে কী আর এমন প্রাইভেসি নষ্ট হবে! সকালের ব্রেকফাস্ট, আর দু-বেলার লাঞ্চ-ডিনার ওর ঘরে ঠিক টাইমে পৌঁছে দিলেই তো কাজ শেষ। তার বিনিময়ে মাসে এতগুলো টাকার নিশ্চিন্ত আয় মন্দ কী। আমাদের বাড়িতে যখন মাস-পয়লার চাকরির কোনও বাঁধা আয় নেই।

শেষ কথাটা অবশ্য চিত্রদীপকে লক্ষ করেই বলা। এককালে বড় শিল্পী হবেন এমন আশা নিয়েই চিত্রদীপ কখনও চাকরির ধার ধারেননি। ফলে তাঁর বাঁধা আয় কোনওদিনই নেই। শুধু নিজের পরিশ্রম দিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে খুব-একটা অসুবিধে তাঁর কোনওদিনই হয়নি। তবু সচ্ছলতার অভাব এখনও অনুভূত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়েই শেষ পর্যন্ত বনানীর মত অনুযায়ী পেয়িংগেস্ট রাখতে রাজি হতে হয়েছিল তাঁকে। পরে জানতে পেরেছিলেন শিহরন একসময় বনানীরই ক্লাসমেট ছিল, কলেজে পড়াকালীন।

পেয়িংগেস্টের গতিবিধি অবশ্য শেষপর্যন্ত তার গেস্টরুমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, শিহরন তাঁদের সংসারের একজনই হয়ে গিয়েছেন শেষপর্যন্ত। এই অবিবাহিত মধ্যবয়সি যুবকটি বেশ স্মার্ট সদালাপি এবং সমসময়েই হাস্যোচ্ছল। দু-একদিন ব্রেকফাস্টের সময় হাজিরা দিতে-দিতে এখন তিন বেলাই তিনি চিত্রদীপের ডাইনিং-টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করেন।

তবে শিহরনের নাকি কিছু অতীত ইতিহাস আছে। অল্পবয়সে জড়িয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র

BanglaBook.org

বিপ্লবের আন্দোলনে। এখন সে-ভূত অবশ্য মাথায় নেই, কিন্তু বিভিন্ন ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আর আছে এক অদ্ভুত শখ, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। কলকাতা শহরে তার অনেক বান্ধবী আছে। প্রায়ই তাদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায় তাকে।

এ-বাড়িতেও যেমন বনানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, তেমনি ডোনার সঙ্গেও। প্রায়দিনই খাওয়ার টেবিলে তর্কবিতর্ক-পরিহাসে জমজমাট করে তোলে ওরা। ডোনা আর শিহরনই এই বিতর্কসভার প্রধান আলোচক।

দুই প্রধানের অভাবে আজ ব্রেকফাস্টের আসর তাই চুপচাপ, শান্ত। চিত্রদীপ অবশ্য বেশিরভাগ দিনই নিস্পৃহ থাকেন, আজও তেমনি উদাসীন ভঙ্গিতে শেষ করলেন তাঁর পুডিং-এর প্লেট। বনানী তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমাকে কি আর একটু পুডিং দেব? আজ অনেকটা বেশি আছে।

পুডিং-এর আসল পৃষ্ঠপোষক অবশ্য ডোনাই। খাওয়ার ব্যাপারে আজকালকার সব ছেলেমেয়েদের মতো ডোনাও ভীষণ চুজি। কোনও-কোনও খাবার সে ছুঁয়েও দেখে না। আবার কোনও-কোনও খাবার তার দারুণ পছন্দসই। বনানীর হাতের তৈরি পুডিং এরকমই ভীষণ পছন্দের খাবার ওর।

মৃদু ঘাড় নেড়ে হঠাৎই চিত্রদীপ বললেন, ডোনা কত রাতে ফিরেছে?

বনানী উত্তর দিলেন, প্রায় একটায়।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, একটা! কোথায় গিয়েছিল ওরা? সঙ্গে কে ছিল?

—সে তো তোমাকে বললাম, এবার মন্দারের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

—আর কারা ছিল?

—আর কেউ তো নয়। অন্যবার দলবেঁধে আউটিঙে যায়। এবার কেবল ওরা দুজনেই গিয়েছিল। তোমারই বন্ধুর বাড়িতে সেই গুপ্তিপাড়ায়। তোমার টেলিফোন পেয়ে সে-ই তো ঘরের চাবি পাঠিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই?

—শুধু মন্দার আর ডোনা! কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে হঠাৎ কেমন যেন গুম হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফের বললেন, তা ওরা একদিন পরে ফিরবে বলে তিনদিন পরে কেন ফিরল, তা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

বনানী ঘাড় নাড়লেন, অত রাতে ফিরেছে, এমনিতেই ঘুমে টলছিল তখন, অত-শত জিজ্ঞাসা করার সময় পাইনি।

—তাই বলে একটা ছেলের সঙ্গে তিন-চারদিন বাইরে কাটাতে হবে।

হঠাৎ চিত্রদীপের এহেন প্রশ্নবাণে বনানী কিছুটা হতভম্ব, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ও মা, তাতে কী হয়েছে? আমেরিকায় যদি এতদিন আমরা সেটল করতাম, তাহলে তো আর এ-প্রশ্ন তুলতে পারতে না। সেখানে দ্যাখোনি, ওখানকার মেয়েরা রোজ নাতুন-নতুন ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং করতে বেরিয়ে যায়। সেখানে ডোনা থাকলে আটকানো যেত। আর এ তো গেছে মন্দারের সঙ্গে। মন্দারের সঙ্গে ওর একটা কোর্টশিপ চলছে। তাতে আর আমাদের কী বলার আছে?

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বনানীর দিকে, তারপর ঠোঁটের পাইপটা দাঁতে চিবোনোর ভঙ্গি করে বললেন, তোমরা কি তাহলে দেশটাকে আমেরিকা করে তুলছ?

—আমরা মানে! বনানী হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন।

—মানে, তোমার একটা অ্যাফেয়ার চলছে, তোমার মেয়ের একটা অ্যাফেয়ার চলছে, বেশ আছ তাহলে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছ বটে, কিন্তু আসার সময় দেশটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ।

চিত্রদীপের কথা শুনে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন বনানী। তাঁর চোখমুখ

BanglaBook.org

সহসা বদলে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। মনে হল, এর পরেই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু তার আগেই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠায় সেদিকে এগিয়ে গেলেন চিত্রদীপ। রিসিভার কানে দিতে শুনলেন, ওপাশ থেকে শুভব্রত চৌধুরির গলা, আপনার কমিকস্ট্রিপের পাতাটা কি শেষ হয়েছে চিত্রদীপদা?

—এই হয়ে এল, চিত্রদীপের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—তাহলে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

টেলিফোন রেখে দিয়ে চিত্রদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বনানী আশেপাশে কোথাও আছে কিনা। যে বিস্ফোরণটি একটু আগেই হতে পারত, সেখানে এখনও বারুদ মজুত আছে কিনা সেটাই ভাবছিলেন মনে-মনে। কিন্তু বনানী সম্ভবত কিচেনে কিংবা ওপাশের শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ডোনা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি দেখে হঠাৎই মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাকে আবার বনানী প্রশ্রয় দিচ্ছে দেখে হঠাৎই বলে ফেলেছেন কথাটা। আসলে শিহরনের উপস্থিতিটা কেন যেন আর পছন্দ হচ্ছে না চিত্রদীপের। প্রথম-প্রথম মনে হয়নি, এখন মনে হয় শিহরনের ওপর বনানীর কিছু দুর্বলতা জন্মেছে। শিহরনের বয়স অবশ্য বেশি না, চল্লিশ পেরিয়েছে। বনানীরও হয়তো তাই। তবু একদিন সন্ধের পর খেয়াল করলেন, বাইরের গেস্টরুমে শিহরন আর বনানী বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছেন নীচু স্বরে। তার পর থেকে প্রায়ই মনে হয়, শিহরনকে খুব বেশি পাত্তা দেন বনানী। এমনকী চিত্রদীপের সামনেই। এর আগে কখনও এভাবে বনানীকে বলেননি চিত্রদীপ, আজই রাগের মাথায় হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছেন তাঁর ক্ষোভ।

কমিক-স্ট্রিপটা ততক্ষণে হাতে নিয়ে তার ছবির মধ্যে কয়েকটা ডায়ালগ বসাচ্ছেন চিত্রদীপ। কথাগুলো আগেই ভেবে রেখেছিলেন, এখন চাইনিজ ইঙ্কে কলম ডুবিয়ে লিখে চললেন পরপর। লেখাটা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎই বাড়ির ডোর-বেল বেজে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলেন, সে কি, এর মধ্যে শুভব্রত চৌধুরি তার লোক পাঠিয়ে দিল! উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলতে যাবেন, হঠাৎ আবার টেলিফোনের ঝনঝনানি। দরজা আগে খুলবেন, না টেলিফোন আগে ধরবেন, ভাবতে-ভাবতে টেলিফোনটাই তুললেন আগে। হয়তো শুভব্রতই আবার ফোন করছে ভেবে বললেন, হ্যালো—।

—হ্যালো, আমি কি বিখ্যাত শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছি?

চিত্রদীপের ভুরুদুটোয় কোঁচ পড়ল, বললেন, হ্যাঁ, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বলছি।

—দেখুন, আমার নাম অলর্ক বোস। আমি 'এ টু জেড' নামে একটা ছোট্ট কোম্পানি খুলেছি। এই কোম্পানি কলকাতায় কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে শিগগির। সব ক'টা স্টোরই কলকাতার প্রধান-প্রধান রাস্তার মোড়ে। বেশ কয়েকটা স্পেসও পেয়ে গিয়েছি আমরা।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, তাতে আমার কী করার আছে?

—এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো হবে কলকাতার মার্কেটিং ওয়ার্ল্ডে একেকটি বিস্ময়। ভিতরে ছবির মতো করে সাজানো থাকবে সমস্ত পণ্যদ্রব্য। শো-রুমের ভিতরের লে-আউট থেকে শুরু করে তার দেয়ালে বিভিন্নরকম ম্যুরাল আঁকার জন্য আপনার সহযোগিতা চাই আমি।

চিত্রদীপ একটু কঠিন হয়ে বললেন, আয়্যাম স্যরি। দোকানের লে-আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।

—তা আমি জানি, মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি একজন বড় আর্টিস্ট। কিন্তু কখনও-সখনও কমার্শিয়াল কাজও তো করেন আপনি।

—মাপ করবেন, তাই বলে স্টেশনারি কিংবা মুদির দোকানের লে-আউট কখনও করব না।

—মিঃ চ্যাটার্জি, এই কাজের জন্য আপনি যেরকম পারিশ্রমিক চান, তাই-ই পাবেন।

তবু চিত্রদীপ আবার বললেন, আয়্যাম স্যরি মিঃ বোস, আপনি ভুল জায়গায় ফোন করেছেন।

BanglaBook.org

—আমি দু-একদিনের মধ্যে আপনার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে হাজির হচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জি। কাইন্ডলি আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।

॥ ৬ ॥

বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির সেই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের ভূতটি তখনও পুরোপুরি নেমে যায়নি গার্গীর মাথা থেকে। তার মধ্যেই আর একটি ভূত হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। কয়েকদিন আগে কলকাতার সবচেয়ে দামি সংবাদপত্রটির সাপ্লিমেন্টের সম্পাদক তাকে ডেকে একটা ফিচার লেখার অর্ডার দিয়েছেন। সেই লেখাটার ভাবনা তার মগজে টোকা দিচ্ছিল বলে হাতের নোটবই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বর্তমান প্রজন্মের কিছু তরুণী ও কিশোরীদের ইন্টারভিউ নিতে। দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করার পর তার নোটবইতে আপাতত অনেক সাক্ষাৎকার। সেই নোটগুলিতে চোখ বোলাতে-বোলাতে এখন মনে হচ্ছে, এই দেশটা খুব দ্রুত আমেরিকা হয়ে উঠতে চাইছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই প্রজন্মের আচার-আচরণ, জীবনযাপন, কথাবার্তা—সব।

এভাবেই ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ঘরে দেখা হয়ে গেল শঙ্খলেখার সঙ্গে। শঙ্খলেখা তখন দিব্যি ভালোমেয়ে-ভালোমেয়ে মুখ করে রিম্যানিয়ান ইন্টিগ্রালের অঙ্ক কষে গলদঘর্ম হচ্ছে। গার্গীকে দেখে বলল, কী ব্যাপার, তুই যে একেবারে নিপাত্তা হয়ে গেলি?

—আরে কী যে মুশকিলে পড়েছি। নতুন একটা ফিচার লেখার ঝামেলায় পড়ে খুব জেরবার হচ্ছি। তারপর, তুই তো এ-সপ্তাহে বাড়ি গিয়েছিলি শুনেছি। আমার জন্য কোনও খবর এনেছিস?

—খবর এনেছি বলেই তো তোর জন্যে হা-পিত্তেশ করে বসে আছি। ব্যাপারটা এত্ত ইন্টারেস্টিং যে, আমি নিজেও যেন থ্রিলড হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ।

শঙ্খলেখার নরম-নরম মুখখানায় হঠাৎ উত্তেজনার ঢেউখেলা দেখে গার্গী জাঁকিয়ে বসল তার পাশে, তার নোটবইয়ের সেই বীরভঙ্গপুরপর্বের পৃষ্ঠা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, হুঁ বলতো, কী সন্দেশ এনেছিস আমার জন্যে—।

শঙ্খলেখা ততক্ষণে তার ছোট্ট দেরাজটি খুলে বার করেছে একটি ট্যাবলয়েড সাইজের সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যা। সপ্তাহে দুবার বেরোয় কাগজটা। তাতেই কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয়েছে রাজবাড়িতে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ও তার ফলো-আপ। প্রায় রুদ্ধশ্বাস কাহিনিই যেন একটি। গার্গী তার নোট বই সরিয়ে রেখে মুহূর্তে অন্তরিন হল বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির অদ্ভুত অভিনব ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

শহর থেকে অনেকখানি ভেতরে রাজবাড়ির বিশাল চেহারাটা সত্যিই নাকি দেখবার মতোই। পলেস্তারা খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে সরু পাতলা ধরনের পুরোনো যুগের ইঁট, তবু তার উঁচু-উঁচু গোলাকার থাম, চওড়া দেওয়াল আর উঁচু ছাদের কড়ি-বরগা বহন করছে রাজবাড়ির ঐতিহ্য। এককালে মস্ত জমিদার ছিলেন ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এদিককার লোক বড় জমিদারদের রাজা বলতেই অভ্যস্ত, সেই রাজার ছিল শ'-শ' বিঘে শালিজমি। এ ছাড়া সিন্দুক বোঝাই টাকা-পয়সা, সোনার গয়না। লোকে বলে, তাঁদের মেঝে খুঁড়লে এমন অনেক রূপসি বেরুবে যার মধ্যে হীরে জহরত ভরতি। রাজার কোনও ছেলে ছিল না। কিন্তু দুটি কন্যা ছিল। দুজনেই নাকি ভারী রূপসি। এতদিন পর্যন্ত রাজবাড়ির ঐতিহ্য সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু আজ থেকে আঠাশ তিরিশ বছর আগে পরপর দুটি ঘটনায়, দুর্ঘটনাই বলা যায়, বিপর্যয় ঘনিয়ে এল রাজবাড়িতে। রাজার দুই কন্যাই একে-একে রাজারানির অমতে বিয়ে করে বসল নিজেদের পছন্দ করা পাত্র। সেই যে চলে গিয়েছিল তারা রাজবাড়ি ছেড়ে, আর কখনও তাদের মুখ দেখা যায়নি বীরভঙ্গপুরে। রাজার হুকুমও ছিল নাকি

BanglaBook.org

যে, তাদের দেখামাত্র যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। রানিমাও এত আঘাত পেয়েছিলেন যে কোনও মেয়েরই আর মুখ দর্শন করেননি। তারপর বছর দশেক আগে মারা গেছেন ব্রজেন্দ্রলাল। এতদিন রানিমাই দেখাশুনো করেছেন সেই বিপুল সম্পত্তি। তারপর তিনি খুন হতে সেখানে এখন টালমাটাল অবস্থা।

একটার পর একটা পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে গার্গী, আর তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এ-যুগের এক রাজকাহিনি। পড়তে-পড়তে মুখ তুলল, আশ্চর্য হয়ে বলল, মেঝে খুঁড়লে সোনা হীরে জহরত ভরতি কলসি পাওয়া যাবে। খুব ইন্টারেস্টিং তো! যাই হোক, কিন্তু তারপর তো আর কোনও সংবাদ নেই! সেই উত্তরাধিকারত্বের ঝামেলাটা এখনও রয়ে গেল।

শঙ্খলেখা মিটমিট করে হাসল এবার, সেটাই তো সদ্য জেনে এলাম এবার বাড়ি গিয়ে। সে-খবর বাই-উইকলির যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সেটা এমন হটকেকের মতো বিক্রি হয়েছে যে, অনেক কষ্ট করেও জোগাড় করে উঠতে পারিনি। একেবারে রুদ্ধশ্বাস কাহিনি—।

গার্গীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কী খবর?

—রাজবাড়ির সাতকুলে কেউ আর বেঁচে নেই এমনই জানত সবাই। হঠাৎ একজন যুবক খবরের কাগজে তাদের বিজ্ঞাপন দেখে এসে হাজির হয়ে জানিয়েছে, সে-ই এই রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী। অমনি তাদের ট্রাস্টিবোর্ডের উকিল নাকি মেনে নিয়েছে তাকে। সে-ই বিশাল সম্পত্তির মালিক এখন।

গার্গীও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাজবাড়ির কেউ তাকে মানতে চাইছে না। বলছে, সে রাজবাড়ির কেউ নয়। ভুয়ো উত্তরাধিকারী।

—রাজবাড়িতে আর কারা থাকে?

—ও বাড়িতে যারা আশ্রিত হিসেবে থাকে, তারাই তো বুড়ি রানিমাকে দেখাশুনো করেছে এতদিন। ভেবেছিল, বুড়ি মরে গেলে তারা এ-বাড়ির সম্পত্তি ভোগ করবে।

—তাহলে সেই ছেলেটা কে?

—সে নাকি গিয়ে বলেছে, তার নাম অলক বোস। রানিমার এক মেয়ের ছেলে। কিন্তু চেহারা একেবারে সাহেবদের মতো। গায়ের রং লাল। চুল-দাড়ি সবই নাকি লালচে ধরনের।

গার্গী ঘটনাটা নিয়ে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে ভাবল নিজের মনে। এসব ঘটনা যেন গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়। হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদে পৌঁছেও এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না। কে যেন বলেছিলেন সামটাইমস ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ভাবতে-ভাবতে নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে, অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। তারপর হঠাৎ বলল, রানিমার সেই খুনের ঘটনা? তার কোনও তদন্ত হয়েছে কে খুন করল তাকে! কেনই বা!

—না। থানা থেকে একদিন এসে হরিশংকর চৌধুরিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তারপর আস্তে-আস্তে ধামা চাপা পড়ে গেছে এতদিনে। আসলে রাজবাড়ির ব্যাপার চিরকালই একটু রহস্যময় লাগত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। এখনও তার সবকিছুই রহস্যে ভরা। শুনলাম, সাহেবপানা যে ছেলেটা উত্তরাধিকারী হিসেবে সব সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তার সঙ্গে ওদের বাড়ির হেড-লেঠেল হরিশংকর চৌধুরির তকরার হয়েছে।

—তকরার!

—মানে তর্কাতর্কি। তাতে দুজন-দুজনকেই শাসিয়েছে, পরে হেস্তনেস্ত করবে বলে।

—বাহ্, তাহলে তো বেশ জমেছে ব্যাপারটা, একদিন তাহলে যেতেই হচ্ছে ওখানে। গার্গী হাসতে-হাসতে বলল।

সত্যিই এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেয়ে তার ভেতরে তোলপাড় হচ্ছে তখন। যে-ঘটনার

BanglaBook.org

সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই, হয়তো খবরের কাগজ না পড়লে, জানতেই পারত না ব্যাপারটা, তেমন একটি ঘটনার সঙ্গে সে যেন ওতপ্রোত হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

কিন্তু যাই হোক, গার্গীর মাথায় তখন একই সঙ্গে অন্য চিন্তাও চারিয়ে যাচ্ছে এবার। নতুন ফিচারটির সন্ধানেও তো তাকে বেরোতে হবে। নইলে ওদিকে গোঁসা হবে সম্পাদকের। অতএব হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পায়ে-পায়ে ঘুরল সে। কিছু ভাবছিল, আবার ভাবছিলও না। ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় আচমকা ধরা পড়ে গেল আর এক তরুণীর হাতে। তার পরনে বেশ মড-ধরনের পোশাক। গার্গীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, হাই, তুই এখানে কেন? বিদেশি অনুপ্রবেশকে আমরা বেশ সন্দেহের চোখে দেখছি আজকাল—।

গার্গী চমকে উঠে দেখল, সে ঢুকে পড়েছে তুলনামূলক সাহিত্যের চত্বরে। তরুণীটি আর কেউ নয়, তার অতি সাম্প্রতিক বান্ধবী ডোনা।

গার্গী কিছু অবাক, কিছু দোলাচলভঙ্গিতে তাকাল ডোনার দিকে। ডোনা এই চত্বরে বেশ বিখ্যাত মেয়ে। তবে ছাত্রী হিসেবে নয়, সে প্রসিদ্ধ তার বোহেমিয়ানা স্বভাবের জন্য। পোশাকের ব্যাপারে সে যেমন সবচেয়ে দুঃসাহসী, তেমনই তার চোখা-চোখা কথাবার্তা, অদ্ভুত চালচলনের জন্যও সবার নজর কাড়ে অহরহ। আজও সে পরেছে লালরঙের একটি চাপা স্ল্যাকস। গায়ে ততোধিক চাপা স্লিভলেস জামা। হঠাৎ তার শরীরের দিকে তাকালে গা-টা শিরশির করে যেন। গার্গী নজর ফিরিয়ে বলল, কেন?

উত্তর না দিয়ে ডোনা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করল, নিশ্চয় তুই কারও দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছিস এখানে? কোনও অধ্যাপকের?

—উহুঁ, মনে কর, আপাতত তোর হদিশেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, আমার খোঁজে। নো, নো, মাই ফ্রেন্ড, গার্গী মুখার্জি আমার খোঁজে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে আসবে, এ-কথা মরে গেলেও আমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু ম্যাথসের ছাত্রী হঠাৎ এ-দপ্তরে কেন তা জানতে ভারী আগ্রহ হচ্ছে।

গার্গী হাসল, তার হাসির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক, বলল, একটা ফিচার তৈরি করছি আমাদের প্রজন্মের মেয়েদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে। তুই নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবি, আমাদের মা-কাকিমা কিংবা মাসি-পিসিরা যেভাবে জীবনযাপন করত তাদের কৈশোর কিংবা যৌবনে, এখনকার মেয়েরা তাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা।

—অফ কোর্স।

—আমার ফিচারের বিষয়বস্তু সেটাই। হঠাৎ এমন করে বদলে গেল কেন মেয়েরা, সে ব্যাপারে তোর মতামত নিতে চাই।

—গুড হেভেনস! তুই ম্যাথস পড়তে-পড়তে হঠাৎ সোসিওলজির ব্যাপারে এত আগ্রহী হলি কেন? ম্যাথসে এম. এস. সি করে সোসিওলজিতে ডক্টরেট করতে চাস নাকি?

—না, না, তা নয়। গার্গী হেসে উঠল, জাস্ট ফর কিউরিওসিটি। আমার এরকম হাজারো কৌতূহল থাকে চারপাশে যা-সব ঘটে যাচ্ছে তাই নিয়ে।

—সে তা ডিবেট-কম্পিটিশনে তোর চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখেই বুঝেছি। সেও তো তোর নিজের সাবজেক্ট নয়। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের বিষয় নিয়ে সেদিন যেভাবে লড়ে গেলি—। তা হঠাৎ আমার কাছে কেন?

—তোর বোহেমিয়ান জীবনযাপন এই চত্বরে আজকাল গসিপের বিষয়বস্তু। হঠাৎ কানে এল, তুই নাকি কার সঙ্গে ডেটিং করে ফিরেছিস, আর সেটা ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছিস একে-ওকে। শুনে মনে হল, ব্যাপারটা আনলাইক বেঙ্গলিজ। তুই অন্য সবার থেকে আলাদা। দুঃসাহসী।

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, দ্যাটস জাস্ট ফর ফান। আই লিভ ফর ফান, বুঝলি?

BanglaBook.org

হি-হি-হি-হি...সেদিন যখন মারুতি চালিয়ে ফিরছি, সেই ছেলেটা তার টেন্ডার মিস হয়ে গেল বলে কেবলই হাপসি কাটছিল। তা আমি বললাম, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তুলনায় টেন্ডার একটা ভারী সামান্য ব্যাপার। এই দ্যাখো সামনে একটা ট্রাক আসছে, একটা অ্যাকসিডেন্ট করি। তখন দেখবে টেন্ডার-ফেন্ডার সব আসলে মায়া। শুনে বুঝলি, ছেলেটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল প্রায়, বলল, মেরো না, মেরো না, প্লিজ—।

ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গীর হাসি পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর হাসি-হাসি মুখে বলল, তুই পারিসও বটে। তা হঠাৎ বিদেশি অনুপ্রবেশ নজরে পড়লে তোরা সন্দেহের চোখে দেখছিস কেন?

ডোনা মিটমিট করে হাসল, তা হলে আয়, তোর ওই 'কিউরিওসিটি'র কাজে লেগে যাবে এমন কিছু তথ্য জোগাড় করে দিই। আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা ঠিক কীরকম—।

যে বিল্ডিংটিতে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানো হয়, তার একতলার বারান্দায় এককোণে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে আনমনে। তরুণীটিকে গার্গী চেনে না, কিন্তু তার উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। পরনে চটলা-ওঠা নীল রঙের জিনস আর সাদা শার্ট। দূর থেকে দেখে মনে হল, চোখের চশমাটা সে উঠিয়ে রেখেছে মাথার ওপর, মাথার, চুলে। কানের দুপাশ থেকে চশমার কালো কার নেমে এসেছে গলার দুপাশে। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, অথচ মৃদু-মৃদু দুলছে তার শরীর। যেন তালে-তালে পা নাচাচ্ছে—।

ডোনা গলা নামিয়ে বলল, এও কিন্তু বিদেশি অনুপ্রবেশ। ইংরেজির ছাত্রী।

তারপর বেশ সপ্রতিভভঙ্গিতে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, হা-ই।

মেয়েটি কিন্তু শুনতেই পেল না ডোনার ডাক। বরং তার শরীর কী এক অদ্ভুত তালে দুলে-দুলে উঠছে। ডোনা ফের ডাকল, হাই ইলিনা—।

ইলিনা নামের মেয়েটি তখনও ভাবে বিভোর। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ডোনা একেবারে তার সঙ্গে কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, হোয়াট হ্যাপেনড ইলিনা, সো এ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড—!

ইলিনা এতক্ষণে হুঁসে ফিরে এল যেন। ততক্ষণে তার কানের কাছে ঝুলতে থাকা কালো কার টেনে সরিয়ে দিয়ে বলল, কিছু বলছিস, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, ও, তাই বল। তাহলে তুই বিভোর হয়ে ওয়াকম্যান শুনছিলি।

গার্গীর খেয়াল হয় এতক্ষণে। তাই তো, মাথার ওপর তোলা ডাঁটিটা তো চশমার নয়, ওয়াকম্যানের। দেখেই হাসি পেয়ে গেল তার। বেশ মজার মেয়ে তো।

ডোনা হাসি থামিয়ে বলল, কী ব্যাপার, ইলিনা, কার মিউজিক শুনছিস অত মন দিয়ে?

—কার আবার। মাইকেল জ্যাকসনের। কী দারুণ গেয়েছে। শুনবি-শুনবি বলে তাড়াহুড়ো করে তার ওয়াকম্যানটি পরিয়ে দিতে চায় ডোনার কানে।

ডোনা তাকে নিবৃত্ত করে আগের প্রশ্নটাই ফের করল, কিন্তু হঠাৎ ইংলিশ ডিপার্টের ছাত্রী কমপ্যারেটিভে কেন, মাদামাজেল?

ইলিনা হঠাৎ মুখটা সিরিয়াস করে বলল, আমি তো এম. আর-এর জন্য ওয়েট করছি।

ডোনা মুহূর্তে গার্গীর সঙ্গে চোখাচোখি করে নিল, তারপর বলল, কেন, এম. আর-এর জন্য কেন?

ইলিনা হাসি-হাসি মুখে বলল, উনি তো আমাকে শেক্সপিয়ার-এর ওপর লেখা একটা বই দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু সেই কখন থেকে এসে ওয়েট করছি। এখনও প্রফেসর্স রুমে ফেরেননি।

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, ফেরেননি। মানে? আমাদের ক্লাস তো সেই কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তুই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ওপরে যাসনি।

BanglaBook.org

ইলিনা আঁতকে ওঠে, তাই! এ হে, আমি আসলে গানের মধ্যে ছিলাম তো। বলেই হুড়মুড় করে ছুটল দোতলায়, যেন তার ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে।

তার ছোটার ভঙ্গি দেখে ডোনা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। গার্গী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এম. আর-এর ফ্যান বুঝি ও?

—শুধু একা ইলিনাই নয়। মণীশ রায়ের যে কত্ত ফ্যান তা তুই ভাবতে পারবি না। যেদিন মণীশ রায়ের ক্লাস থাকে, সেদিন আমরা বসার সিটই পাই না ক্লাসে। অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা এসে দলে-দলে ভিড় করে মণীশ রায়ের লেকচার শুনতে।

—তাই! খুব ভালো পড়ান বুঝি?

—পড়ান অবশ্য ভালোই। বিদেশি-সাহিত্য এত নিখুঁতভাবে পড়েছেন, আর তা এমন চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন করেন যে, অবাক হয়ে শোনার মতোই। কিন্তু অন্য মেয়েরা তো ওঁর পড়ানো শুনতে আসে না, ওঁকে দেখতে আসে। এমন সুপুরুষ চেহারা এই চত্বরে চট করে দেখতে পাবি না।

—মাই গড। গার্গী অবাক হয়ে বলল, খুব ক্রেজি তো তাহলে মেয়েগুলো।

—তাহলেই দ্যাখ, ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে তার ভুরু নাচায়, এ ব্যাপারটা তোর কাছে একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। তোর ডায়েরিতে এই পয়েন্টটা অনায়াসে নোট করতে পারিস।

গার্গী হেসে বলতে যাচ্ছিল, ব্যাপারটা অবশ্যই নোট করব। এই ক্রেজটাই তো আমার কৌতূহলের বিষয়বস্তু, কিন্তু হল না, তার আগেই ডোনা তার ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে মুখে স-স-স-স শব্দ করে চুপ করতে বলল গার্গীকে। ততক্ষণে সেখানে হনহন করে এসে পড়েছে উজ্জ্বল হলুদরঙের শাড়ি পরে আরেক তরুণী। লবজ করা চুল কপালে লতিয়ে নেমেছে, কানে বড়-আকারের ঝুমকো দুল। চোখে পড়ার মতো সাজ। তাকে থামিয়ে ডোনা বলে উঠল, তুই কি এম. আর-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস, তিতির? উনি কিন্তু একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।

তিতির নামের মেয়েটি হতাশ হয়ে বলল, তাই নাকি? উনি যে বলেছিলেন সোয়া একটা নাগাদ আসতে?

—হুঁ। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি থেকে টেলিফোন এসেছে, ওঁর মিসেসের শরীরটা ভালো নেই। তাই-ই—।

—তাই? মেয়েটি গম্ভীর হল। সুপুরুষ পুরুষদের 'মিসেস' থাকার অস্তিত্ব কোনও প্রেমিকা বা ফ্যানই বোধহয় পছন্দ করে না। একমুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে সে আবার পা বাড়াল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই।

তিতির চোখের আড়াল হতেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে ডোনা, বলল, আমার খুব মজা লাগে এইসব ক্রেজি মেয়েগুলোকে নিয়ে একটু নাচানাচি করতে। এই মেয়েগুলোর স্বভাবই এই যে, তারা কোনও-না-কোনও ছলছুতোয় মণীশ রায়ের কাছে যাবে, তাঁর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবে।

—আশ্চর্য, এতদিন হয়ে গেল এখানে পড়ছি, অথচ তোদের ডিপার্টে এমন একটি সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন আছে তা কেউ কখনও আমাকে বলেনি তো।

—এ তো কেউ কাউকে বলে না। সবাই ভাবে, এম. আরের সান্নিধ্য সে একাই উপভোগ করবে। যারা জানবার তারা ঠিকই খুঁজে নেয় এই দপ্তরের ঠিকানা। তোর এরকম কোনও ধান্দা থাকলে নিশ্চয় জেনে যেতিস।

—এম. আর. নিশ্চয়ই বিবাহিত?

—হুঁ, লেট-ম্যারেজ। এতদিন কয়েকহাজার মেয়েকে সান্নিধ্য দেওয়ার পর হঠাৎ কিছুদিন আগে ফেঁসে গেছেন। বিয়ে করেছেন ওঁর ক্লাসেরই এক ছাত্রীকে। কী করে আরও হাজারখানেক ছাত্রীকে

BanglaBook.org

ওভারটেক করে সে এম. আর-কে বিয়ে করতে পারল, তা নিশ্চয়ই তোর কাছে এক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

—যা বলেছিস। তাহলে তো ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হয়।

ডোনা আঁতকে উঠে বলল, ওঁর সঙ্গে আলাপ করলে তুইও ফেঁসে যাবি কিন্তু। আর বেরিয়ে আসতে পারবি না। নারীদের মোহিনীশক্তি থাকে জানতাম, কিন্তু পুরুষদের আকর্ষণী-ক্ষমতা যে এত প্রবল হতে পারে তা ওঁকে দেখে প্রথম জানতে পারলাম।

—তোকে আকর্ষণ করেন না!

—যখন প্রথম পড়তে এসেছিলাম, তখন ওঁর রূপ, কথা বলার স্টাইল, পড়ানোর চার্ম আমাকেও মুগ্ধ করত। কিন্তু পরে মনে হল, আমি একজন মেয়ে, কোথায় আমাকে দেখে সবাই মুগ্ধ হবে, তা নয় তো আমিই মুগ্ধ হচ্ছি এক পুরুষকে দেখে। এ বড় অনাছিষ্টি ব্যাপার। এরকম হওয়া উচিত নয়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বদলে গেলাম। এখন অন্য মেয়েদের আদেখলেপনা দেখলে হাসি লাগে আমার। ওদের নিয়ে প্রায়ই এরকম মজা করি আমি।

গার্গী কয়েকমুহূর্ত ডোনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডোনা আসলে নিজেই সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন হতে চায়। সে চায়, অন্যে তাকিয়ে থাকুক তার দিকে। অন্যেরা ছুটুক তার পিছনে। সে কারও পিছনে ছুটবে না। বোধহয় তাই তার এমন অদ্ভুত পোশাক, এমন বোহেমিয়ানা জীবনযাপন। খানিক পরে বলল, একালের মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্যের। ভেরি-মাচ ক্রেজি অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল। বোধহয় মেয়েদের ষোল থেকে উনিশ কুড়ি বয়সটাই এমন। এই বয়সে মেয়েরা কাউকে-না-কাউকে পাগলের মতো ভালোবেসে ফ্যালে। কাকে ভালোবাসছে তা খতিয়ে দেখার সময় নেই তাদের। মনে নেই, মীরাকে বলা হয়েছিল পাথরের তৈরি কৃষ্ণমূর্তিটি তার স্বামী? ব্যস, বাকি জীবন সে পাথরের মূর্তিটিকে স্বামী বলে পুজো করে গেল। তবে আদ্যিকালের মেয়েরা বোধহয় এমন ভীষণভাবে ক্রেজি ছিল না, যা এখনকার মেয়েরা। আসলে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ যত ঘটছে, ততই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মেয়েদের। সামনে ঝলমলে যা-কিছু দ্যাখে, তার পিছনেই ছুটতে চায়। আজকালকার প্রায় সব ইয়াং মেয়েরাই ভাবে সাজগোজ করে এক-একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেস হয়ে উঠবে। দামি কসমেটিকস মাখবে যেগুলো রোজ তারা টিভি-র বিজ্ঞাপনে দ্যাখে। ভালো বাড়িতে থাকবে, গাড়ি চড়বে, ভালো খাবার খাবে। যেমন আজকালকার সব ইয়াং মা-ই ভাবে তার ছেলে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়বে। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে। সি. এ. অথবা আই. এ. এস.। ফলে সবার সঙ্গে সবার এক অন্তহীন প্রতিযোগিতা।

ডোনা হেসে বলল, স্টাডি করার বিষয়বস্তু ভালোই বেছেছিস তুই।

—মাঝেমধ্যে দাদার বাচ্চাটাকে স্কুলের গেটে পৌঁছে দিয়ে আসতে কিংবা নিয়ে আসতে হয়। গেটের সামনে অপেক্ষা করার সময় কয়েক হাজার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তাদের আলোচনা কানে আসে। সে যা ইন্টারেস্টিং আলোচনা, শুনতে-শুনতে মনে হয়, আমাদের শৈশবে আমাদের মায়েরা এসব ভাবেইনি কখনও। হঠাৎ দশ-পনেরো বছরের মধ্যে কয়েকযুগ এগিয়ে গেছি যেন আমরা।

গার্গীরা লম্বা বক্তৃতা শুনতে-শুনতে ডোনা অল্প-অল্প হাসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসছেন তাদের এক অধ্যাপক। সে ঠোঁটে হিসহিস শব্দ করে বলল, ইটস অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং কেস। আর. ডি. আসছেন।

আর. ডি.-এর পরনে ঘন ছাই রঙের প্যান্ট। গায়ের সাদার ওপর নীল সরু স্ট্রাইপের জামাটা প্যান্টের ভিতর বেশ নিখুঁত করে গোঁজা। দ্রুত হেঁটে আসা দেখেই বোঝা যায় এক্ষুনি তাঁর ক্লাস আছে। চলতে-চলতে হঠাৎই ডোনাকে দেখে থমকে গেলেন, ক্লাসে যাবে না?

—যাব, স্যার।

BanglaBook.org

আর ডি-র হঠাৎ নজর পড়ল গার্গীর দিকে। এমনিতে চেনার কথা নয়, তবু চিনলেন, তুমি এবার ডিবেট কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে না।

গার্গী খুব লজ্জা পেয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার।

—বাহ্। ভালো। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন দুজনে।

ডোনা হঠাৎ ফস করে বলল, স্যার, এম. আর.-এর সঙ্গে আলাপ করার খুব শখ ওর। তাই অপেক্ষা করছে। ইলিনা বলে একটা মেয়ে প্রায় আধঘণ্টা আগে এম. আর এর কাছে গেছে শেক্সপিয়ার-এর ওপর একটা বই আনতে। কিন্তু এখনও ওঁর ঘর থেকে বেরোয়নি।

তৎক্ষণাৎ আর ডি-এর মুখটা শক্ত হয়ে গেল। মুখটা সামান্য বাঁকিয়ে গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী বই-এর দরকার?

ভীষণ বিব্রত, বিপন্ন দেখাল গার্গীকে, হঠাৎ ডোনা তাকে এমন অপ্রস্তুত করে দেবে তা সে একবারও ভাবতে পারেনি। আর ডি-র প্রশ্নের উত্তরে সে কী জবাব দেবে ভাবতে-ভাবতে একমুহূর্ত লাল হয়ে গেল। কিন্তু উত্তর দিতে হল না তাকে, তার হয়ে দ্রুত উত্তর দিল ডোনাই, স্যার গার্গী ম্যাথস-এর ছাত্রী, আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির ওপর কী যেন একটা বই চাই বলছিল।

আর. ডি.-র মুখটা আবারও পাথর হয়ে গেল, চোয়াল দুটো ঘৃণায় বেঁকেও গেল একটু, বললেন, ও মণীশ আজকাল ম্যাথস-এর বইও সাপ্লাই করছে নাকি?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনার কাছে আছে নাকি বইটা? তাহলে আর ওকে এম. আর.-এর জন্য ওয়েট করতে হয় না।

আর. ডি. গম্ভীর হয়ে বললেন, না, ম্যাথস তো আমার সাবজেক্ট নয়। বলে হনহন করে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

আর. ডি অন্তর্হিত হওয়ার পরের মুহূর্তেই ডোনা আবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। গার্গী অপ্রস্তুত মুখে বলল, তুই ভারী অদ্ভুত তো?

—দেখলি, এম. আর.-এর নাম কানে যেতেই আর. ডি-র মুখখানা কীরকম স্টিফ হয়ে গেল?

—তা তো দেখলাম। দুজনের মধ্যে খুব রেষারেষি বুঝি?

—ভীষণ। আসলে এটাই তো হিউম্যান সাইকোলজি। সব মেয়েরা যেভাবে এম. আর, এম. আর. করে পাগল, তাতে তার সহকর্মীর তো ঈর্ষা হওয়ারই কথা।

—আর তার মধ্যে আবার তুই আমাকে লটকে দিলি?

ডোনা আর একদফা হেসে উঠে বলল, ভাগ্যিশ সেই মুহূর্তে আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির কথা পট করে মনে পড়ে গেল। ব্যস, এক আইনস্টাইন-এর নামেই আর. ডি. কাত। সাহিত্যের বই-এর নাম মনে পড়লে হয়েছিল আর কি। তোকে টানতে-টানতে নিয়ে যেতেন ওপরে, বলতেন ওহো, ও-বইটা তো আমার কাছেই আছে—।

ফের আঁতকে উঠল গার্গী, ও মা গো—।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল ডোনার, এ হে, আর. ডি-র ক্লাসে যেতে হবে যে। একবার যখন দেখে ফেলেছেন, তখন ক্লাসে না গেলে পরের দিন ক্লাসেই ধরবেন, কী হল, ডোনা, এম. আর.-এর ক্লাস হলে নিশ্চয় এভাবে অফ দিতে না—।

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

কালো রঙের একটা বিশাল কনটেসা চালিয়ে অলর্ক একদিন সকালে ঢুকে পড়ল যোধপুর পার্কের ভিতর। লক্ষ রাখছিল কেউ তাকে ফলো করছে কি না। রাস্তার দুপাশে লেটেস্ট ডিজাইনের রঙচঙে

দোতলা তিনতলা বাড়িগুলো ফেলে, কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে পাক খেয়ে, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে সে এসে থামল চমৎকার, প্রায় ছবির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ির সামনে। এরকম নতুন সব পল্লী কলকাতার যেখানেই গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেমন এই যোধপুর, কিংবা আলিপুর, লেকটাউন বা সল্টলেক এলাকায়, সেখানেই আর্কিটেক্টদের এমন অভাবনীয় চোখ-ধাঁধানো, স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে অহঙ্কারীর মতো। কনটেসার ইঞ্জিন বন্ধ করে অলর্ক বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িটার দিকে।

কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে ফোন করা মাত্র পত্রপাঠ রিফিউজড হয়েছিল সে। অবশ্য কর্কশ কণ্ঠের 'সরি' শুনেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। শিল্পীরা এমন রুক্ষমেজাজের, একগুঁয়ে হতে পারে এমন আভাস তার এক বন্ধু দিব্যজ্যোতি আগেই দিয়েছিল তাকে। যে-কোনও শিল্পীই তার আঁকাজোকার গণ্ডির বাইরে বেরুনোকে খুবই অপছন্দ করবেন সেটাই সম্ভব। কিন্তু চিত্রদীপ শুধুমাত্র শখের শিল্পী নন, কিছু-কিছু কমার্শিয়াল কাজও করে থাকেন এ খবর তার কাছে আছে। তাইই আজ তার হঠাৎ এই যোধপুর পার্কে অভিযান। চেনাগণ্ডির বাইরে তাঁকে যে-কোনও ভাবেই হোক বের করে আনতে হবে অলর্ককেই। তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার, সময় চাই, শিল্পীকে সেভাবেই আস্তে-আস্তে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে, তাকে রাজি করাতে হবে।

এককালের রকবাজ ছোকরা অলর্কের সামনে এখন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। যজ্ঞই বটে। সে যজ্ঞ সঠিকভাবে, এবং হ্যাঁ, দুরন্তগতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাকে খুব হিসেব করে এগুতে হবে এখন।

রকের আড্ডাবাজ ছোকরা যে হঠাৎই এভাবে একইসঙ্গে রাজপ্রাসাদ ও রাজকোষের মালিক হতে পারে, তা কোনও গল্প-উপন্যাসে পড়া থাকলেও কখনও সত্যি হয় তা ভাবতে পারেনি। অলর্ক। কলকাতার রাসেল স্ট্রিটের এক পুরোনো বাড়িতে তার আশৈশব বসবাস। পিতৃদত্ত এই অদ্ভুত ধরনের প্রাচীন বাড়িটি ছাড়া তার আর কোনও সম্পত্তি ছিল না ভূভারতে। তার বাবা ছিলেন আর্মেনিয়ান, কিন্তু মা এদেশি রমণী। সে কারণে তার জন্ম-রহস্যটি ভারী গোলমেলে। জন্মের কারণেই তার চোখর তারা নীলচে, চুল একটু সোনালি ধরনের, গায়ের রংও অসম্ভব ফরসা। তার ওপর চুল-দাড়ি লম্বা করে রাখায় তার চেহারাটা দেখায় প্রায় যিশুর মতো। তার মা হঠাৎ করে মারা যাওয়ায়, এবং বাবা এদেশ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে সে হয়ে গেল একেবারে ছন্নছাড়া, নিঃসঙ্গ। তার এমন কোনও যোগ্যতা ছিল না। যাতে সে নিজের ভরণপোষণের সংস্থানটুকুও করতে পারে। শুধু বাবার জমানো টাকার সুদ হিসেবে মাসে হাজার দেড়েক টাকা তার একমাত্র সম্বল। তাতেই তার একার জীবনযাপন চলে যাচ্ছিল কোনওক্রমে। বাড়তি রোজগারের জন্য কোনও চেষ্টাই করেনি। হঠাৎই তার জীবনে ঘটে গেল এক অলৌকিক ব্যাপার।

আকস্মিকভাবে তার কাছে খবর এসে পৌঁছুল তার কোনও এক দিদিমা নাকি সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক, রাজৈশ্বর্যই বলা চলে, কিন্তু কোনও উত্তরাধিকারি ছিল না সেই অগাধ রাজকোষের। ছিল না নয়, সন্ধানে পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তরাধিকারীর অভাবে যখন বীরভঙ্গপুরের সেই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা অন্যের করায়ত্ত হতে চলেছে, ঠিক সেসময়ে কোনও শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে একটা খবর তার কাছে এসে গেল অদ্ভুতভাবে। অলর্কই নাকি সেই উত্তরাধিকারী। সম্পত্তি বেহাত হওয়ার আগে তার এক্ষুনি পৌঁছনো দরকার সেখানে। এই মুহূর্তে। শুনে অলর্ক বিস্মিত, স্তম্ভিত। সে নিজে খুব অবহিত ছিল না এ-ব্যাপারে। এহেন কোনও দিদিমার কথা তার শৈশবে কৈশোরে কখনও শোনেওনি মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে তার মা মারা যাওয়ায় এখন জানার কোনও প্রশ্নও ওঠে না। তবু খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখল এক এলাহি কাণ্ড।

শুধু যে দিদিমার বাড়িটাই এক রাজপ্রাসাদের মতো তা নয়, বাড়িতে মজুত আছে ব্যাঙ্কের

BanglaBook.org

আমানতের প্রচুর কাগজপত্র। তাছাড়া দু-তিনটে সিন্দুকভরতি সোনাদানা। দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর পূর্বপুরুষরা এককালে রাজা ছিলেন। এখন রাজত্ব গেছে, কিন্তু তিলতিল করে সঞ্চিত অর্থ তাঁরা যক্ষের মতো আগলে রেখে গেছেন আমৃত্যু। বছর দশেক আগে দাদামশাই মারা যাওয়ার পর বিধবা দিদিমাও সে অর্থ প্রাণ ধরে খরচ করে উঠতে পারেননি। শুধু একপাল পোষ্য পালন করে গেছেন প্রাসাদটিতে।

শেষে মৃত্যুর আগে একটি উইল করে তাতে নির্দেশ দিয়ে যান: আমার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই বংশের জীবিত নাতি। তার নাম অলি।

অলিই যে অলর্ক, সে কথা অলর্ক জানে না। তার ডাকনাম টোটো, কস্মিনকালেও অলি ছিল না। কী ভাবে যে বহু বাধাবন্ধ ডিঙিয়ে দিদিমার মৃত্যুসংবাদও তার উত্তরাধিকারী হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছুল সেটাও তার কাছে ভারী রহস্যজনক। আসলে সম্পত্তির অনেক দাবিদার জুটে গিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই ছলে-বলে-কৌশলে হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল এ বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ। তাদের মধ্যে যারা এই চাতুর্যের খেলায় হেরে যেতে বসেছিল, তাদের কেউ বা কারা খোঁজ করে আবিষ্কার করেছিল তাকে। নিজে যখন পাচ্ছি না, তখন অন্য দাবিদারও পেতে দেব না এমন ঈর্ষাজনিত কারণেই অলর্কের খোঁজ।

শুনে অলর্ক নিঃসন্দেহ হতে পারেনি এই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সত্যিই তাঁর দাদামশাই ছিলেন কি না। তার মাকে প্রায় লোপাট করে নিয়ে এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবা এমন সংবাদ ভাসা-ভাসা শুনেছিল তার শৈশবে। মায়ের কুলপঞ্জিকা নিয়ে কখনও অতঃপর কেউই মাথা ঘামায়নি, ঘামানোর প্রয়োজনও ছিল না, কারণ সে তরুণী তখন ছিল এক লালমুখো বিধর্মীর হেপাজতে। এতদিন পর সেই তরুণীর গর্ভজাত সন্তানকে সন্ধান করবে তার পিত্রালয়ের কিংবা মাতুলালয়ের কেউ তা অলর্কের পক্ষে ভাবা অসম্ভব।

যাই হোক, তা নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনও ফুরসতই তার হয়নি। সে রাজপ্রাসাদে পৌঁছুনো মাত্র বুঝতে পারল, তার উপস্থিতি সে-বাড়ির অন্য দাবিদারদের আশায় একমুহূর্তে জল ঢেলে দিয়েছে। রাজবাড়িতে দিদিমার অনেক পোষ্য। চাকর-বাকর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা বাস করতেন বহুদিন ধরে। অলর্ক পৌঁছুবার অনেক আগেই তারা নিজেদের মধ্যে সেই বিশাল সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে আলোচনা চালাচ্ছিল। রাজবাড়ির সব সম্পত্তির চাবি গচ্ছিত ছিল স্থানীয় একজন নামজাদা উকিলবাবুর কাছে। তিনি উত্তরাধিকারী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে না পারায় আত্মীয়স্বজনদের আলোচনা আলোচনার স্তরেই থেকে যাচ্ছিল, ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্ভবপর হয়নি। অলর্ক যদি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছত তাহলে কী হত বলা যায় না।

অলর্ক সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই পুরো আবহাওয়াটা বদলে গেল ভোজবাজির মতো। সবাই যেন আগে থেকে জেনেই গিয়েছিল তার অস্তিত্ব, কিন্তু তার ঠিকানা জানত না। শুধু ভয়ে-ভয়ে ছিল সে কখন পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে পড়ে। তারা হয়তো মনেপ্রাণে কামনা করেছিল, অলি নামের নাতিটির কাছে যেন এই সম্পত্তির খবর গিয়ে না পৌঁছয়। অথবা সে যেন জীবিত না থাকে। অথবা যে-কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ফলে অলর্কের পৌঁছনোতে তারা প্রবল আশাহত, প্রত্যেকেই হতাশ, ক্ষুব্ধ, কিন্তু কেউই তা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না। কারণ সেই উকিলবাবু অলর্ককে দু-চারটে প্রশ্ন করেই নিঃসন্দেহ হলেন এই যুবকটিই বুড়ি দিদিমার উইল কথিত নাতি। অলিই অলর্ক।

দাবিদারদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন সেই হরিশংকর চৌধুরি নানা কুলপঞ্জিকা মুখে-মুখে শুনিয়ে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বহুকাল ধরে। হরিশংকরের বয়স ষাটের ওপর। কিন্তু বিশাল দশাসই চেহারায় তিনি তখনও কর্মক্ষম। তাঁর চোখদুটি সর্বদাই লাট্টুর মতো ঘুরছে, সারাক্ষণই অন্যদের দাবিয়ে কীভাবে গ্রাস করবেন এই ঐশ্বর্য, তার ছক কষে যাচ্ছিলেন নিখুঁতভাবে।

BanglaBook.org

অলর্ক ঘটনাস্থলে হাজির হতে তিনি প্রথমেই তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, কে হে তুমি, ছোকরা? কোথাকার নেপো যে ফোকটে দই খেয়ে যাবে। এ-বাড়িতে আমাদের তিরিশ বছরের বাস।

অলর্ক তাকে একধরনের গা জ্বালানো হাসি উপহার দিয়ে বলেছিল, সেটা পরে বুঝবে চাঁদু। আপাতত আমার হিস্যা বুঝে নিতে দাও।

হরিশংকর দপ করে জ্বলে উঠে বলেছিলেন, খবরদার বলছি। এখানে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করবে না। তাহলে—।

—তাহলে? অলর্ক তার চোখে-চোখ রেখেছিল, দাঁতে-দাঁতও।

—তাহলে, বলে হরিশংকর চুপ করে গিয়েছিলেন, তাঁর ক্রুর চোখে তখন হাজার আগুনের দাপাদাপি। সে আগুনে অলর্ককে ভস্ম করে দিতেই বুঝি চাইলেন।

অলর্ক পরে এর ওর কাছে শুনেছিল, হরিশংকর এককালে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের লেঠেল হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তার লাঠিতে প্রাণ হারিয়েছে বহু গরিব মানুষ। লোকটা জহ্লাদের চেয়েও নাকি নিষ্ঠুর। তিনি হঠাৎ অলর্কের অলি হয়ে যাওয়াটা সহ্য করবেন কেন।

অলর্ক তার পিতাকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল তার নামকরণের জন্য। ভদ্রলোক চেহারায় সাহেব হলেও বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার সুবাদে মেজাজে কিছুটা এদেশি হয়ে উঠেছিলেন। কোত্থেকে যেন জোগাড় করেছিলেন তাঁর ছেলের এই এদেশি নামটি যা শুনতে কিছুটা বিদেশি লাগে। অলর্কের ডাক নাম যে অলি হতে পারে তা বোধহয় কখনও ভাবেননি তিনি, অলর্কও নয়। অলি বড়জোর কোনও মেয়ের নাম হতে পারে।

সে-কথা চেপে গিয়ে সে এ-বাড়ির উকিলবাবু সঙ্গে জাঁকিয়ে বসল এই বিশাল ধন ঐশ্বর্যের হিসেব বুঝে নিতে। সঙ্গে-সঙ্গে এও বুঝতে পারল, তার বিরুদ্ধে ভেতরে-ভেতরে সংগঠিত হতে চলেছে এক বিপুল ষড়যন্ত্র। যে-কোনও মুহূর্তে সে খুন হয়ে যেতে পারে এমন ফিসফিসানিও তার কানে পৌঁছে দিয়ে গেল কোনও শুভানুধ্যায়ী। অলর্কও সতর্ক হয়ে গেল। অনুভব করতে পারল, হরিশংকর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ নজর তাকে অনুসরণ করে চলেছে সদাসর্বদা। সে একটু অসাবধান হলেই—।

কয়েকদিন রাজপ্রাসাদে থাকার পর উকিলবাবুর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সে যখন পুরো সম্পত্তির হদিশ পেল তখন প্রথমটা তার বিশ্বাসই হয়নি। এত পরিমাণ অর্থ এখন তার হেপাজতে। কেবল তারই! এও কি কখনও সম্ভব! এ তো রূপকথার কোনও রাজপুত্রই পেতে পারে। এ তো আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাওয়ার মতোই।

সেই প্রায়-ভিখারি অলর্ক হঠাৎই যখন দৈববলে রাজা হয়ে গেল, প্রথমে ভাবতেই পারল না এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কী করবে। সমস্ত সম্পত্তি তার হস্তগত হওয়ার পর সে সেই উকিলবাবুকে এই সম্পত্তি এতকাল আগলে রাখার জন্য একটা মোটা টাকার চেক দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর প্রাসাদের অন্য বাসিন্দা, পোষ্য, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে মিটিং করে জানিয়ে দিল, এই বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বসবাস করে আসছে, তারা আপাতত সেখানেই বাস করতে পারবে। কিছু-কিছু টাকাও সে প্রত্যেককে দিয়ে কিছুটা খুশি করে দিল। শুধু হরিশংকর চৌধুরিকে বলল, আপনি কালকের মধ্যেই বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যান অন্যত্র। তারপর ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, সিন্দুকের চাবি নিয়ে সে চলে এল কলকাতায়, অতঃপর সে কী করবে বা তার কী করা উচিত এমন এক প্রবল উদভ্রান্তি নিয়ে।

টাকাটা নিয়ে প্রথমে তার কিছু গুপ্তবাসনা চরিতার্থ করল একজন উচ্চবিত্ত মানুষের যা-যা উচ্চাকাঙ্খা থাকে সেই ভোগবিলাসের সব উপকরণ কিনে। তার সঙ্গে কিনল এই চমৎকার কনটেসা গাড়িটি, যার দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে হবে। দ্বিতীয়বার তাকালে তৃতীয়বার।

গাড়িটি কেনার তার অন্য একটি ছোট্ট কারণও ছিল। ছোট্ট, কিন্তু অলর্কের কাছে সেই মুহূর্তে

BanglaBook.org

বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রথম যৌবনে সে হঠাৎ দুম করে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এক সুন্দরী কিশোরীর। এই রাসেল স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সাইকেলে খুব বেশি হলে দশ মিনিটের দূরত্বে তার বাস। রুবিনা নামের এই পাঞ্জাবি মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ একেবারে আচমকা, এক সন্ধেয়, নিবিড় বৃষ্টির মুহূর্তে। কী একটা কাজে অলর্ক গিয়েছিল ভবানীপুরে, বুকলবাগানের দিকে। ফেরার পথেই সহসা এমন দারুণ বৃষ্টি ঘনিয়ে এল যে, তাকে দাঁড়াতে হল একটা পুরোনো বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে। বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল রুবিনাও। জংলা স্কার্ট হলুদ টপে ওতপ্রোত হয়ে থাকা এই কিশোরীকে দেখে মুহূর্তেই অলর্কের মনে শুরু হয়ে গিয়েছিল চড়ুইয়ের কিচমিচ। বারবার তাকিয়ে দেখছিল ধারাবর্ষণের দৃশ্যে শঙ্কিত কিশোরীটির ডিম-ছাঁচের চমৎকার ফরসা মুখখানা। বেশ লম্বাটে চেহারা, হাতে একগোছা বই। নিশ্চয় টিউশন পড়ে ফিরছে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বব-করা সিল্কি চুলের গুচ্ছ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে তার ঘাড় নাড়ছিল, ও মাই গড, এতনা বারিষ।

বৃষ্টি সেদিন খুব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল কলকাতায়। সন্ধে পার হয়ে রাত্রিও নেমে এল ক্রমশ। জলও জমে গেল ভবানীপুরের এই অঞ্চলটিতে। সেই জলভারাক্রান্ত পথের দিকে তাকিয়ে রুবিনার মুখ শুকিয়ে আসছিল ক্রমশ, বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণই ছিল না। জল বেড়েই চলেছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন বৃষ্টি থামল, রুবিনা ভেবে পাচ্ছিল না, কীভাবে এত জল ভেঙে বাড়ি ফিরবে। তার ফরসা মুখখানা কালো দেখাচ্ছিল। অলর্ক কিন্তু অনায়াসেই তার কাছে একটি সমাধান প্রস্তাব দিল, ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, যদি কিছু মনে না করো, আমার সাইকেলের সামনে বসিয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

রুবিনাও অনেকক্ষণ এই যুবকটির চেহারা দৈর্ঘ, মুখের সাহেবি-ধাঁচ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল মনে-মনে। অবলীলায় রাজি হয়ে গেল অলর্কের প্রস্তাবে।

প্রেমের শুরু সেই থেকে, তারপর একবছর ধরে রুবিনার সঙ্গ পেয়েছিল অর্লক। বেশ অনেকবার তার সাইকেলে সামনে বসিয়ে রুবিনাকে নিয়ে গেছে কখনও পার্ক সাকার্সের দিকে, কখনও গড়ের মাঠের দিকে, কখনও খিদিরপুর পর্যন্তও।

কিন্তু রুবিনা বোধহয় বুঝে গিয়েছিল, অলর্কের চেহারার মতো তার জীবনযাপন খুব লোভনীয় নয়। হঠাৎ একদিন তার অপেক্ষায় থেকে-থেকে আর দেখা পেল না অলর্ক। বেশ কিছুদিন পব হঠাৎ তাকে দেখতে পেল অন্য এক যুবকের স্কুটারের পিছনে। বেশ নিবিড় করে জড়িয়ে রয়েছে যুবকটিকে। তারপর আরও কয়েকদিন দেখতে পেল দৃশ্যটি। অলর্ক অবাক হল, কষ্টও পেল। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল, রুবিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার দিন শেষ। অপমানে, কষ্টে কয়েকদিন পাগলের মতো ছটফট করে বেড়িয়েছিল। সাইকেল নয়, স্কুটারের আকর্ষণই হয়তো রুবিনার কাছে বেশি।

কনটেসা কেনার পর একদিন অলর্ক বাবুঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড় করাল গাড়িটা। আকাশি নীল রঙের স্কুটারটা সে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। দেখেছিল, রুবিনা সেই যুবকের সঙ্গে বসে আছে স্কুটারের কাছেই। কনটেসা দাঁড় করিয়ে ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়েছিল অলর্ক, হাই রুবিনা—

রুবিনার চোখে স্পষ্টতই সে দেখেছিল একরাশ বিস্ময়। যে অলর্ক সাইকেলে চড়ে ঢনঢন করে ঘুরত, সে কিনা কনটেসায়! পরক্ষণেই রুবিনা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, কী যেন ফিসফিস করে বলেছিল তার পাশে বসা যুবকটিকে।

অলর্ক আরও কাছে গিয়েছিল, লিফট চাই, রুবিনা?

রুবিনা কথা বলেনি। অলর্ক হাসতে-হাসতে কনটেসায় স্পিড তুলে চলে গিয়েছিল রাজার মতো।

এমন আরও দু-তিনদিন ক্রমাগত টিজ করল রুবিনাকে। প্রতিবারই সে দেখেছে, পাশে বসা যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে।

আর একদিন আরও এক বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলল সে। দেখল, এক ঝালমুড়িওয়ালার

BanglaBook.org

কাছে দুজনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঝালমুড়ি খাবে বলে। অলর্ক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সেখানে। পকেট থেকে দুখানা একশো টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল ঝালমুড়িওয়ালাকে, গম্ভীরস্বরে বলল, তোমার কাছে যত ঝালমুড়ি আছে, সব আমার গাড়িতে তুলে দাও।

এবং আক্ষরিক অর্থে তা নিয়েও ছিল।

রুবিনার সঙ্গী যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, শালা, এর বদলা আমি নেব।

পরে অলর্ক লক্ষ করেছিল, যুবকটি প্রায়শ তার দলবল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে তাদের পাড়ায়।

অলর্ক অবশ্য কয়েকদিন পরে ভেবেছিল, ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব হাস্যকর। রুবিনার মতো সামান্য এক কিশোরীর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা তার উচিত হয়নি। তাছাড়া তার এই খামখেয়ালিতে ক্রমশ শত্রুর সংখ্যা বেড়েই যাবে দিনদিন।

সে তখন অন্যদিকে তার নজর ফেরাল।

যে উড়ো টাকা হঠাৎ অলৌকিকভাবে পেয়ে গেল অলর্ক, তাতে সে অনায়াসে পায়ের ওপর পা দিয়ে বাকি জীবন নবাবের মতো কাটিয়ে দিতে পারত। শুধু সে নয়, তার পরবর্তী কয়েক পুরুষও। কিন্তু অলর্কের মাথায় তখন অন্য এক ভাবনা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা ছোট্ট একটি বীজ হয়ে বরাবর ঘাঁই মারত তার স্বপ্নে-জাগরণে। ব্যাপারটা ভাবত একা-একা, কিন্তু সে জানত না, কীভাবে আস্তে-আস্তে বড় হয়ে ওঠে মানুষ। সে মাত্র একটাই পরীক্ষার গণ্ডি পেরোতে পেরেছিল তার বাবার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে। তারপর গত আট-ন' বছর স্রেফ তার নামের মতোই টোটো-কোম্পানি। অথবা তার এমন কোনও শিক্ষা বা গুণাবলী নেই যা দিয়ে সে নিজেকে কেউকেটা প্রতিপন্ন করবে। তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনও ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা। ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে যে প্রবল বুদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা টেকনিক্যাল নো-হাউ জানা দরকার তা একটুও তার নেই।

অলর্ক অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, সে কোনও একটা ব্যাবসা করবে, কিন্তু সে ব্যাবসায়ের ধরন এমন হবে যা আর পাঁচজনের থেকে পৃথক। সে অনায়াসে ইলেকট্রনিকস সরঞ্জামের দোকান বা লোহালক্কড়ের ব্যাবসা করতে পারত যাতে লোকসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সে তো আর পাঁচজনও করে। তাকে এমন কোনও ব্যাবসায়ে হাত দিতে হবে যা কলকাতায় বেশ অভিনব বলে তো মনে হবেই, উপরন্তু তার মধ্যে থাকবে অন্য গ্র্যাঞ্জার।

এর-ওর কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে, এর-তার সঙ্গে পরামর্শ করে অলর্ক ভাবল, সে কলকাতার প্রধান-প্রধান রাস্তার ধারে, অথবা জনবহুল জায়গায় বিশালসাইজের সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে। বিদেশে এমন সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কথা প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায়। কলকাতায় এ-ধরনের দু-চারটে দোকান থাকলেও চোখে পড়ার মতো কোনও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নাগালে পায় না কলকাতাবাসী।

খুব দ্রুত যোগাযোগ করে সে বড় ধরনের গোটা পাঁচেক ফ্লোর-স্পেস পেয়ে গেল, যে পাঁচটি জায়গাই কলকাতার সবচেয়ে প্রধান এলাকায়। শ্যামবাজার, হাতিবাগান এবং গড়িয়াহাট মোড়ের তিনটি ফ্লোর স্পেস পেয়েছে দুই থেকে তিনহাজার স্কোয়ারফুটের মধ্যে। লিন্ডসে স্ট্রিটে যে স্পেসটি পেয়েছে সেটি দোতলা-একতলা মিলিয়ে সাত হাজার স্কোয়ারফুট। অন্য জায়গাটি হল শিয়ালদহ স্টেশনের সামনেই। সেটিও কম বড় নয়। চার হাজার স্কোয়ারফুটের। আরও তিন-চারটি পেয়েও যাবে শিগগির।

কিন্তু শুধু স্পেস পেলেই তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলা যায় না। তার জন্যে আলাদা প্ল্যানিং করতে হবে। প্রথমেই শো-রুমগুলির একটি জুতসই নাম দেয়া দরকার। তার পরিকল্পিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি হবে এমন যাতে আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট সবই পাওয়া যাবে। অথবা সংক্ষেপে বলা যায় এ টু জেড। কিছু সুস্থির চিন্তাভাবনার পর সে ঠিক করল, তার শো-রুমগুলির প্রত্যেকটিরই নাম হবে, এ টু জেড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সবক'টি স্টোরের নাম শুধু একই থাকবে

BanglaBook.org

তাই নয়, তাদের একই ধরনের গ্রো-সাইন হবে, নিজস্ব একটি এমব্লেম থাকবে এবং প্রতিটি শো-রুমের সামনেটা হবে একই ডিজাইনের, একই রঙের, এমনকী প্রবেশ পথটিও হবে একরকম।

কিন্তু শো-রুমগুলির ভিতরটা হবে আরও চমকে দেওয়ার মতো। প্রতিটি দেয়ালে থাকবে নতুন ধরনের কারুকাজ, তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাও হবে অন্য পাঁচটা শো-রুমের থেকে পৃথক। এমনকী একে অন্যের থেকেও আলাদা হবে। কিন্তু শুধু ভাবলেই তো হবে না, এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ইমপ্লিমেন্ট করাই হবে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা।

সে ভেবে রেখেছে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে থাকবে সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত সমস্ত জিনিসপত্র। টুকিটাকি জিনিসগুলি তো অবশ্যই। তার জন্যে তাকে চুঁড়ে ফেলতে হবে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত গঞ্জ ও বাজার। আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে ঘুরে সেখানকার সমস্ত কারিগরি বৈশিষ্ট্য তাকে হাজির করাতে হবে একই ছাদের নীচে। যাতে কোনও ক্রেতাকেই তার দোকানে ঢুকে খালিহাতে ফিরে না যেতে হয়।

অলর্ক আরও ভেবে রেখেছে, প্রতিটি শো-রুমে থাকবে একজন করে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। প্রতিটি কাউন্টারে শোভা পাবে একগুচ্ছ সুন্দর চেহারার যুবক ও যুবতী। প্রত্যেকের মুখেই থাকবে সুন্দরী এয়ারহোস্টেসদের মতো মন-জুড়োনো হাসি, সপ্রতিভ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মতো চমৎকার ব্যবহার।

কিন্তু এর সবকিছুর পিছনেই চাই খুব স্থির মস্তিষ্কের প্ল্যানিং ও তার রূপায়ণ।

সে প্রথমেই ভাবল, বাইরের ও ভিতরের সাজসজ্জার জন্য চাই একজন প্রথিতযশা আর্টিস্টের সূক্ষ্ম তুলির ছোঁয়া। এমন শিল্পীর, যিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধের চূড়ান্ত রূপটি রূপায়িত করবেন এই শো-রুমগুলিতে। কিন্তু শিল্পীদের সঙ্গে একের পর এক যোগাযোগ করে পরপর বেশ ধাক্কা খেল সে, কলকাতার প্রিয় সব বিখ্যাত শিল্পী এমন প্রবলভাবে ব্যস্ত যে, তাঁরা অলর্কের জন্য এক সেকেন্ড সময়ও ব্যয় করতে পারবেন না। কোনও-কোনও শিল্পী দিনপ্রতি একটি করে ছবি আঁকেন, যেগুলি তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার থেকে একলাখ টাকায়। কোনও-কোনও ছবির দাম নাকি আরও বেশি। কলকাতায় আর একজন শিল্পী দু-বছর পরে যে ছবি আঁকবেন তা নাকি এখনই বুকড় হয়ে যাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে। আর একজন শিল্পীর কয়েকটি মাত্র ছবি নীলাম হয়ে গেল কোটি টাকার বেশি দামে। ছবির বাজার ঠিক এরকম তা জানা ছিল না অলর্কের। সে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি কৌতূহলী হয়ে উঠল শিল্পীদের সম্পর্কে।

তার শুভানুধ্যায়ীরা তাকে উপদেশ দিল, এমন এক শিল্পীর সন্ধান করো, যে ভালো ছবি আঁকে, কিন্তু এখনও বাজারে যথেষ্ট দর হয়নি। স্বভাবতই অলর্ক অনুসন্ধান করছিল তরুণ শিল্পীদের। প্রথম বয়সে সব নবীন শিল্পীই তার শরীরের শেষ ঘামবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেয় তাদের ক্যানভাসে। প্রথমদিকে টাকার লোভও তেমন থাকে না, আবার ছবির গুণমান যাতে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছয় সেদিকেও যত্নবান থাকে।

খুঁজতে বেরিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে অলর্কের। এই পরিচয়ের ফলে কয়েকদিনেই ছবি সম্পর্কে আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেশ অবাক হয়ে গেছে সে। শিল্পীরা বোধহয় সবসময়ই এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ হয়। তারা আর পাঁচজন মানুষের থেকে শুধু যে পৃথক স্বভাবের হন তাই নয়, তাদের জীবনযাপন, চলাফেরা চাউনি, জীবনবোধ সবই অন্যরকম। তাদের মুখমণ্ডল শোভিত থাকবে লম্বা দাড়ি-গোঁফে, পরনে থাকবে বিচিত্রধরনের পোশাক, কাঁধে থাকবে অদ্ভুত ধরনের ঝোলা ব্যাগ। বিচিত্র নকশায় ভরা থাকবে সে ব্যাগের দু-দিক। মুখে সিগারেট ধরাই থাকবে, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে জ্বালানো হবে না বহুক্ষণ। আর চোখ দুটি থাকবে উদাসীন-উদাসীন।

এইসব তরুণদের ছবির বিষয়বস্তু, রঙের ব্যবহার, কারুকাজও অদ্ভুত লেগেছে অলর্কের কাছে।

BanglaBook.org

তাদেরই একজন কাউকে মনোনীত করবে কি করবে না এমন দ্বিধায় যখন সে আন্দোলিত, সে সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল।

এক তরুণ শিল্পীর বেশকিছু ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ অসতর্কভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নাহ, এসব ছবি চলবে না।

তরুণ শিল্পীটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে। বেশ বলশালী চেহারা, মুখে বিশাল দাড়ি-গোঁফ, হাতের বাইসেপ চোখে পড়ার মতো। সে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, কী বললেন? এ-ছবি চলবে না! আপনি ছবির কী বোঝেন?

অলর্ক কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু শিল্পী ততক্ষণে ভীষণ খেপে গেছে। আর একটু হলেই অলর্ককে প্রবল একখানা ঘুঁসি ঝেড়ে দিয়েছিল আর কি। কোনওক্রমে অলর্ক সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

কয়েকদিন হতভম্ব হয়ে যখন কী করবে ভাবছে, ঠিক তখনই তাকে কে একজন বলল, একটু প্রবীণ কোনও শিল্পীকে খোঁজ করো না। শিল্পের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে।

দিশেহারা অলর্ক বলেছিল, প্রবীণদের কাউকে ধরা আমার সাধ্যের বাইরে। তারা সবাই ভীষণ ব্যস্ত।

—দেন ট্রাই চিত্রদীপ চ্যাটার্জি। বেচারির লাক ফেবার করছে না। আদারওয়াইজ হি ইজ অ্যা গুড আর্টিস্ট।

সেই থেকে অলর্কের মাথায় চিত্রদীপ চ্যাটার্জির নামটা ঢুকে গিয়েছিল। আরও দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, চিত্রদীপ খুবই প্রতিভাবান, কিন্তু ছবি বিক্রির দৌড়ে তাঁর সমকালীনদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। ইদানীং কিছু কমার্শিয়াল ছবিও আঁকছেন জীবিকার তাগিদে।

টেলিফোন ডিরেক্টরি হাতড়ে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির টেলিফোন নম্বর খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না তার। সেইসঙ্গে ঠিকানাও। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে টেলিফোন করতেই আবার সেই ধাক্কা চিত্রদীপ সরাসরি বলছেন অ্যায়্যাম স্যরি। দোকানের লে আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসেছিল অলর্ক। সে যে প্রত্যাখাত হবে এমন ভাবনা তার ছিল না তা নয়। এই কয়েক দিনে বহু শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথন করে, তাদের বাড়িতে গিয়ে, ছবি দেখে, তার দরদাম করে অলর্ক এটুকু বুঝেছে, শিল্পীদের সম্পর্কে কোনওরকম অনুমান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তার প্রিয় সবাই, যাকে বলে, আনপ্রেডিক্টেবল।

প্রাথমিক ধাক্কায় অনেকখানি পিছিয়ে এলেও অলর্ক হাল ছাড়ল না। এসব পরিস্থিতিতে হেরে পিছিয়ে গেলে তো তার এহেন বিশাল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অতএব লেগে থাকতে হবে। কীভাবে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে রাজি করানো যায় এ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে আলাদাভাবে। সেদিন তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়ার অফার দিয়েও টলাতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরেছে কোনও শিল্পীকে এভাবে কিনতে চাওয়া উচিত হয়নি তার। এভাবে অফার দেয়াই শিল্পীর পক্ষে অপমানজনক।

সুতরাং অন্য কোনও পরিকল্পনার ছক কষতে হবে তাকে। তার শিয়রে যেন প্রতিমুহূর্তে এসে দাঁড়াচ্ছে শমন, কিন্তু কোনও কাজেই উৎসাহের কমতি নেই তার।

এমন ভাবতে-ভাবতেই যোধপুর পার্কের বর্ণাঢ্য পল্লীতে অলর্ক তার বিশাল কনটেসা চালিয়ে ঢুকে পড়েছে আজ। তার শার্টের পকেটে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে টুকে নেয়া চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ঠিকানা। সেই ঠিকানা অনুসরণ করে কয়েকবার এলোমেলো পাক খেয়ে সে এসে দাঁড়াল একটা বিশাল পুষ্করিণীর কোণে ছবির মতো বাড়িটার সামনে। ঠিকানা দেখে নিশ্চিন্ত হল তার গন্তব্য সম্পর্কে। তবে অবাক হল, একজন শিল্পী তাঁর বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কতখানি শিল্পসম্মত হতে পারেন তার

BanglaBook.org

নমুনা দেখে। যাকে বলে সুন্দর তাইই।

ইঞ্জিন বন্ধ করে, গাড়ির দরজা-জানালায় লক লাগিয়ে সে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বন্ধ দরজার সামনে। তারপর কলিং বেলে সামান্য আঙুল ছোঁয়াতেই টুং-টাং জলতরঙ্গের মৃদু শব্দ।

॥ ৮ ॥

ক্যানভাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছবির একদিকে ঘন লাল রং বোলাচ্ছিল চিত্রদীপ। যথারীতি কালোরঙের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি তাঁর ঠোঁটে চেপে ধরা। ইদানীং লাল রং ভারী প্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর। প্রায় ছবিতেই ঘন লাল রঙের আঁচড় কেটে গোটা ছবিটিকেই ভীষণ তীব্র করে তুলতে চাইছেন। যেন শিল্পীর ভিতরকার এক প্রবল ক্রোধ লাল রং হয়ে ফেটে পড়ছে ক্যানভাসে।

ছবিটা গত সাতদিন ধরেই অর্ধেক আঁকা হয়ে পড়েছিল চিত্রদীপের স্ট্যাডিতে। তাঁর নিজস্ব স্টুডিও বলতে এই লিভিংরুমটিই। লিভিংরুমেই তাঁর লাইব্রেরি, স্টাডিরুম, স্টুডিও সবকিছুই। যখন উত্তর কলকাতার পুরোনো বনেদি বাড়িটি বিক্রি করে যোধপুর পার্কে খোলামেলা পরিবেশে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, তখন আলাদা করে স্টুডিও করার কথা মনে হয়নি। তাঁর বাড়িতে লিভিংরুম ছাড়া দুটো বেডরুম, যার একটি তিনি আর বনানী, অন্যটায় ডোনা। একটা গেস্টরুমের প্রভিশনও রেখেছিলেন বাড়ির বাইরের দিকে, যেটা এতদিন খালিই পড়েছিল। ইচ্ছে করলে সেই ঘরে তাঁর স্টুডিও করতে পারতেন, কিন্তু ছবি এঁকে তেমন নাম হল না, তাই আলাদা করে স্টুডিও করে কী হবে এমন ভাবতে-ভাবতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি ও-ঘরে। এর মধ্যে হঠাৎ শিহরণ রায়চৌধুরি এসে জুটে গেল পেয়িংগেস্ট হিসেবে। এখন ইচ্ছে করলেও আর সে-ঘরে স্টুডিও খোলা সম্ভব নয়। অথচ ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে এই লিভিংরুমে আঁকাজোকার কাজ করাটা বেশ ঝকমারি। কাজ করতে-করতে প্রায়ই অন্য লোকজন ঢুকে পড়ছে, সাংসারিক কাজকর্মের কথাবার্তা চলছে, আড্ডা-ইয়ার্কি শুরু হয়ে যায় চেনা লোকজন চলে এলে। এই পরিবেশে আঁকা যায় না।

বনানীকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেওছিলেন, যদি শিহরণকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলা হয়, তাহলে তিনি নতুন করে স্টুডিও খুলে সিরিয়াসলি কাজ শুরু করতে পারেন। শুনে বনানী মুখ বাঁকিয়ে হেসেছেন। বলেছেন, আর এ বয়সে নতুন করে স্টুডিও খুলে কী লাভ। ছবি যখন বিক্রিই হয় না, তখন পেয়িংগেস্টের কাছ থেকে মাসে দেড়হাজার টাকার বাঁধা আয় ছেড়ে দিলে সংসার চালানোই মুশকিল।

চিত্রদীপ মনে-মনে ক্ষুব্ধই হয়েছেন কেবল, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারেননি। তাঁর খুব ইচ্ছে, আর একটা বড় করে শো করবেন অ্যাকাডেমিতে, একটু বেশিরকমের প্রপ্রেসিটি দিলে যদি নাম হয়ে যায়—।

ভাবতে-ভাবতে আরও লাল রং তুলিতে মাখিয়ে নিলেন। ক্যানভাসে যে ছবিটি অনেকখানি অবয়ব পেয়েছে তা একজন গ্রাম্য রমণীর। তার গায়ে জামা নেই, বুকের আঁচলও বেশ ঢিলেঢালা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে দূরের কোনও দৃশ্যের দিকে। যেন তার গরু সকালে চরতে গিয়েছে, এখনও ঘরে ফেরেনি, অথবা অন্য কোনও কারণেও। সময়টা বিকেল বেলা। গোধুলিও বলা যায়। সূর্যাস্তের লাল আভা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার রক্তবর্ণ ফুলের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ আগেই খবরের কাগজওয়ালা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছে আজকের কাগজ, কিন্তু চিত্রদীপ তখনও মেঝের ওপর থেকে তুলে নেননি সেটা। ছবিতে আরও দু-একটি তুলির পোঁচ

BanglaBook.org

দিয়ে তারপর মন দেবেন খবরের কাগজে এমন ভাবছেন, এমন সময় কিচেন থেকে বনানী এসে চট করে তুলে নিলেন ভাঁজ করা কাগজ।

কাগজ খুলে দেখতে-দেখতে হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে দ্যাখো-দ্যাখো, ডোনার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

বেশ খানিকটা চমকে উঠলেন চিত্রদীপ। চমকে ওঠার ফলে তাঁর হাতের তুলি নড়েও গেল বেশ খানিকটা। হঠাৎ কী কারণে ডোনার ছবি খবরের কাগজে উঠতে পারে তা একেবারেই মাথায় ঢুকল না তাঁর। না কি বনানী অন্য কারও ছবি দেখে ডোনার ছবি বলে ভুল করছে!

চমকে ওঠারই কথা চিত্রদীপের। তিনি বিশ বছর ছবি আঁকার লাইনে থেকে আজ পর্যন্ত তেমন নাম করতে পারেননি যাতে তাঁর ছবি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেরুতে পারে। মাঝেমধ্যে কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট বলে ক্যাপশনে তাঁর সমকালীন অনেক শিল্পীর ছবিই গ্রুপ ফোটো হিসেবে ছাপা হয়েছে কাগজে, কিন্তু তার মধ্যে কখনওই তাঁকে রাখা হয়নি। এ নিয়ে বরাবরই একটা চাপা ক্ষোভ রয়ে গেছে তাঁর ভিতরে। মনে হয়েছে ইচ্ছা করেই তাঁকে উঠতে দেয়া হচ্ছে না। আঁকাআঁকির লাইনে এত গ্রুপিজম, এত ল্যাংমারামারি শুরু হয়েছে আজকাল যে-কোনও সমকালীন শিল্পীই চান না অন্য আর একজন কেউ নাম করুক, বড় হোক কিংবা পয়সা উপার্জন করুক। অথচ বনানী এখন উল্লসিত হয়ে বলছে ডোনার ছবি—।

প্যালেটে তুলি রেখে সাগ্রহে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখলেন, হুঁ, ডোনার ছবি। বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে, একটা সাবান কোম্পানির মডেল হিসেবে।

ছবিটা দেখে প্রায় তাজ্জব হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। ডোনা যে কোনও সাবান কোম্পানির মডেল হয়েছে তা জানা ছিল না তাঁর। বনানী নিশ্চয়ই জানতেন, তাই তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় নেই, বরং উপচে পড়ছে উল্লাস। হইচই করে ডাকছেন ডোনাকে, ডোনা, এই ডোনা, শিগগির উঠে আয় বিছানা থেকে। দেখে যা—।

চিত্রদীপের চোখমুখ থেকে কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। ডোনাকে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমদিকে। রং, তুলি, আর্টপেপার সবই তার জন্য আলাদাভাবে কিনে দিয়েছিলেন যাতে সে তার আঁকার জগৎ গড়ে নিতে পারে। ছবি আঁকা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে বলেছিলেন, এবার নিজের মতো করে আঁকো। আর আশ্চর্য, কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ করলেন, ডোনার আঁকার হাত ভারী চমৎকার। তার শিল্পবোধ যে শুধু অসাধারণ তাই-ই নয়, তার রঙের ব্যবহারও সংযত এবং যথাযথ। মনে-মনে ভেবেছিলেন শিল্পীর কন্যার শিল্পবোধ থাকবে না তো কার থাকবে।

কিন্তু ডোনার স্বভাব ছটফটে। সে কোনও বিষয়েই মন-সংযোগ করতে পারে না। যে-কোনও ব্যাপারেই সে কিছুকাল দারুণ ডিভোশন নিয়ে লেগে থাকে, তখন সেই বিষয়টিই তার কাছে পৃথিবীর একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু, তারপর হঠাৎই সেই বিষয় সম্পর্কে হারিয়ে ফেলে তার আগ্রহ। এভাবেই কলেজে সে তার পড়ার বিষয় বদলে ফেলেছে দ্রুত। কিছুদিন বিজ্ঞান পড়ে বলল, উঁহু, ভালো লাগছে না, আর্টসে ভরতি করে দাও। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ে বলল, ভালো লাগছে না। ইংরেজি পড়ব না, অন্যকিছু। খুঁজে পেতে কমপ্যারেটিভ লিটারেচারে ভরতি করে দেওয়া হল। কিছুদিন খুব মন দিয়ে ক্লাস করার পর এখন তাকে দেখে বোঝা যায় তুলনামূলক সাহিত্যেও তার আর আগ্রহ নেই। এর মধ্যে কখন যে মডেলিং-এ ঝুঁকে পড়েছে তা জানতেই পারেননি তিনি।

ডোনার সন্ধানে বাড়ির এখানে ওখানে খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে এলেন বনানী, নাহ্, ডোনা বোধহয় বেরিয়েছে।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, এই সাতসকালে কোথায় আবার বেরুল?

—নিশ্চয়ই জগিং করতে।

BanglaBook.org

—জগিং। জগিং আবার কবে থেকে করতে শুরু করল।

বনানী হাসলেন, ওই যে, হঠাৎ মাথায় ঢুকেছে শরীরে নাকি মেদ জমতে শুরু করে এ বয়সে। অতএব তার আগেই জগিং শুরু করে দাও।

—তাই নাকি! এটা আবার মাথায় কে ঢোকাল ওর।

—কে আবার। ওই যে, শিহরন।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ বিস্মিত হয়ে রইলেন। আজকাল তিনি শিহরনকে যে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না এই তথ্যটি বোধহয় মা-মেয়ে দুজনই জেনে থাকবে। তাই দুজনেই একযোগে শিহরনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে চলেছে ক্রমশ।

—ও, চিত্রদীপ বিড়বিড় করে বললেন, আর মডেলিং? এই আইডিয়াটা ওর মাথায় আবার কে ঢোকাল?

—কে আবার, ওই শিহরনই।

—ও, তাহলে শিহরনই আজকাল ওর গডফাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বনানী ভুরু কুঁচকে বললেন, তা তুমি এতে রাগ করছ কেন? মডেলিং করা কি কোনও ব্যাড প্রফেশন? আজকাল এই প্রফেশনে যাওয়ার জন্য কী কমপিটিশন শুরু হয়েছে তার তো খবর রাখো না। শিহরনের জানাশুনো ছিল বলেই চট করে এমন নামকরা সাবান কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে গেল সুযোগটা। মেয়ের এমন চমৎকার ফিগার, যদি মডেলিঙে একবার নাম করা যায়—

চিত্রদীপ আরও গলা চড়িয়ে বললেন, মডেলিং কি একটা প্রফেশন হল? ওসব লাইনে কারা যায় তা খোঁজ নিয়ে দেখেছ? তারা আলটিমেটলি কোন লেভেলে নেমে যায় তা তো জানো না। যারা দেহ সর্বস্ব, রূপ আছে অথচ ব্রেন ডাল, তারাই ওসব লাইনে যায়, গিয়ে নামটাম করে। কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে ওখানে গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারে না। কী যে নোংরা হয়ে গেছে ও-সব জগতের লোকজন তা ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম, একটা মেয়ে মডেল হতে ঘোরাঘুরি করত ওইসব লোকেদের চারপাশে। শেষে তাকে সুইসাইড করতে হল—।

বনানী কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন, তারপর নরম হয়ে বললেন, সবাই-ই খারাপ নয়। এই যে জুহি চাওলা, আরও সব নামকরা-নামকরা আর্টিস্ট, তাদের এখন কত নাম, তারা সবাই-ই তো মডেল হিসেবেই প্রথমে এসেছিল, তার থেকে নায়িকা হয়ে গেছে। তাদের কত টাকা পয়সা এখন।

—বাহ্, শুধু টাকাপয়সা দেখলেই হবে? টাকাপয়সার মোহেই তো তোমরা সব ছুটছ। এভাবে টাকা রোজগার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মুনষ্যত্ব, বিবেক সব যে বিসর্জন দিতে হয়, তা খেয়াল করো না?

—রাখো তো তোমার ওসব বড়-বড় কথা। টাকাটাই এ-যুগে সব। যার টাকা আছে, লোকে তাকেই সমীহ করে। তারই পিছনে ছোটে। যার টাকা নেই, লোকে তাকে করুণা করে, পিছনে হাসাহাসি করে। এই যেমন তুমি, তোমার ছবি বিক্রি হয় না এর জন্যে তোমারই বন্ধুরা তোমার পিছনে কতরকম টিপ্পনী কাটে তা কি তুমি জানো?

চিত্রদীপ তখন ভিতরে-ভিতরে ভীষণভাবে ফুঁসছেন। যখনই তিনি বনানী বা ডোনার কোনও ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবেন, তখনই তারা তাঁর ছবি আঁকার ব্যর্থতার কথা তুলে তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চায়। ওরা জানে, এই ব্যর্থতাই তাঁর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। ব্যর্থ মানুষরা চিরকালই উপহাসের পাত্র। তাদের ভেতরে যত প্রতিভাই থাক, যতক্ষণ না সেই প্রতিভার বিনিময়ে টাকা ঘরে না আসছে, ততক্ষণ লোকে তাকে করুণা করবে। প্রতিভার মূল্য তো দেবেই না, উপরন্তু তাদের ফেলে দেবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, টাকাটাই পৃথিবীতে সব নয়। বহু ধনকুবের আছে পৃথিবীতে, জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা বুঝতে পারে তারা আসলে হেরেই

BanglaBook.org

গেছে জীবনের খেলায়।

বনানী থামলেন না, বললেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি হল তো বয়েই গেল। সারাটা জীবন তো ভোগ করে গেছে তারা। শিহরন তো বলেই যে টাকা হল—।

—স্টপ, স্টপ ইট, চিত্রদীপ হঠাৎ যেন গর্জন করে উঠলেন, বারবার আমাদের কথার ভেতর শিহরনের নাম টেনে আনবে না। কথায়-কথায় শিহরন আর শিহরন। শিহরনকে একদিন আমি—

—কী করবে শিহরনকে তুমি? খুন করবে নাকি?

চিত্রদীপ সহসা থমকে গেলেন। তাঁর ভেতরে তখন যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। শিহরনের নাম শুনলেই কী জানি কেন, তাঁর মাথায় যেন সত্যিই খুন চেপে যায়। বনানীর কথার উত্তরে সেরকমই বলে ফেললেন, হ্যাঁ দরকার হলে খুনই করে ফেলব কোনদিন। দিনদিন বড় বেড়ে যাচ্ছে ও। আমার সংসারের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে—।

—বাহ্-বাহ্ বনানী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে, ফ্রাস্ট্রেটেড হতে-হতে তোমার মনোবৃত্তি এখন এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে নাকি।

—ঠেকেছে তো তোমাদের জন্যই, তোমরাই এ জন্যে দায়ী। দ্যাট ব্লাডি ফেলো এখন আমার মেয়েটাকে প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনানী ক্রমশই যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন চিত্রদীপের কথা শুনে। আজকাল শিহরনকে নিয়ে প্রায়ই তাঁদের কলহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চিত্রদীপ যে এতসব আজেবাজে কথা বলবেন তা যেন তিনি ভাবতেই পারছেন না। শক্ত চোখমুখে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর নিজেই নীরব হয়ে গেলেন হঠাৎ, বললেন, এটা প্রলোভনের ব্যাপার নয়। মডেলিং ইজ এ গুড প্রফেশন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে দেখো—।

চিত্রদীপ ততক্ষণে আবার গুম হয়ে গেছেন। ডোনার যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, সেদিকে বাবা হয়ে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না। একটা বড় বাথটাবের মধ্যে শুয়ে আছে ডোনা, ফেনা-ওঠা জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে। তাঁর কাঁধ, বুকের ওপর পর্যন্ত কোনও পোশাক নেই। চিত্রদীপ জানেন, মডেলিঙে নামা মানেই শরীরের পোশাক নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। বিজ্ঞাপনের প্রযোজকদের খুশিমতো চলতে হয় মডেলকে। ব্যাপারটা তাঁকে ইরিটেট করার পক্ষে যথেষ্ট। বনানীর উদ্দাম উল্লাস দেখে তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, স্টপ ইট।

বনানী তৎক্ষণাৎ রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, থামব কেন। নিজের দু-পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, আর ও যে চারঘণ্টা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তিনহাজার টাকা ঘরে নিয়ে এল, তাতে অমনি গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে—।

—তাই বলে এভাবে পোশাক না পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে।

—বাহ, বিজ্ঞাপনটা তো সাবানের। টি. ভি.-তে রোজই দ্যাখো, কীভাবে সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলরা পোজ দেয়। ডোনা কি তার চেয়ে খারাপ কিছু করেছে? আর তা ছাড়া তোমার মতো একজন শিল্পীর কাছ থেকে এমন কনজারভেটিভ কথাবার্তা আশা করা যায় না। তোমরা যখন মডেলদের সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকো তখন। আমি কি কিছু জানি না ভেবেছ। বিয়ের পর আমাকেই একবার বলোনি ওভাবে তোমার ক্যানভাসের পাশে দাঁড়াতে? আর তোমার ছবিগুলোই বা তাহলে ওভাবে আঁকা কেন? অর্ধেক ছবিই তো ন্যুড—।

চিত্রদীপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন বনানীর ক্রুদ্ধ, হিংস্র মূর্তির সামনে। বনানী তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করবেন তা ভাবতে পারেননি। নিজে ছবি আঁকলেও, জীবন্ত মডেল বেশ কয়েকবার ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করলেও, নিজের মেয়ে এমন অশ্লীলভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে এটা ভাবতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। আর বনানী নিজের মেয়ের কাজকে ক্রমাগত সমর্থন করে যাচ্ছে দেখে অবাক হচ্ছিলেন। আসলে শিহরন এই অফারটা এনে দিয়েছে বলেই বনানীর এমন

BanglaBook.org

সমর্থন তাও বুঝতে পারছেন এখন।

হয়তো আরও কিছুক্ষণ বনানীর এই আক্রমণ অব্যাহত থাকত, হঠাৎই কলিংবেল বেজে ওঠায় দ্রুত চলে গেলেন দরজা খুলতে। নিশ্চয় শিহরন আর ডোনা ফিরেছে এমনই ভেবেছিলেন, দরজা খুলে অবাক হয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

—এটা কি শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়ি?

—হ্যাঁ, আসুন।

বেশ লম্বা চওড়া গড়নের এক অচেনা যুবককে চিত্রদীপের খোঁজ করতে দেখে প্রথমটা বেশ অবাকই হলেন বনানী। লম্বা চুল, একমুখ দাড়ি গোঁফ দেখে ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনও তরুণ ছবি-আঁকিয়ে হবে। কিন্তু তরুণ শিল্পীরা তো তেমন খোঁজ খবর রাখে না চিত্রদীপের। শিল্পী হিসেবে চিত্রদীপ তেমন নামি-দামি নন, শিল্পজগতে তেমন কোনও ক্ষমতা বা প্রভাবও নেই তাঁর, সুতরাং কীসের তাগিদেই বা খোঁজ করতে আসবে তাঁকে।

অচেনা যুবক ততক্ষণে চিত্রদীপের স্টাডিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্ধসমাপ্ত ছবিটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিস্মিত চোখে, খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎ আনমনে তার অবাক অনুভূতি ব্যক্ত করল মাত্র একটিই শব্দে, বাহ্। তারপর চিত্রদীপের সামনে গিয়ে বলল, আমার নাম অলর্ক বোস। কয়েকদিন আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম, আপনার বোধহয় এই মুহূর্তে তা মনে নেই।

চিত্রদীপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, হঠাৎ মনে পড়ল কয়েকদিন আগেকার ফোনবার্তাটি, মনে পড়তেই শক্ত হয়ে এল তাঁর মুখ, বললেন, হুঁ, মনে আছে, কিন্তু আমি তো আমার ডিসিশন জানিয়েই দিয়েছি আপনাকে।

অলর্ক খানিকক্ষণ সময় নিল চিত্রদীপকে বুঝতে, একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি এসেছি আপনার কয়েকটা ছবি কিনতে। আপনার ছবি দিয়েই আমার দু-একটা শোরুম সাজিয়ে দেখতে চাই—।

চিত্রদীপের শক্ত মুখে খানিক বিস্ময়ের ঢেউ খেলা করে গেল যেন, বুঝি নরম হল তাঁর অভিব্যক্তি, কিন্তু ভুরুর কোঁচ তবু রয়েই গেল কিছুটা; বললেন, আপনি আমার ছবি দেখেছেন?

—না, তবে এই যে ছবিটা আঁকছেন ক্যানভাসে, শুধু এটুকু দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কত বড় শিল্পী।

—ব্যস।

—তবে আরও ছবি দেখতে চাই। কোথায় গেলে আপনার ছবি দেখা যাবে যদি বলে দেন, তাহলে সেখানে যাব। যদি আগামী দিনে আপনার কোনও শো হয় সেখানেও যেতে পারি। অথবা আপনার বাড়িতে এখনও বিক্রি হয়নি এমন ছবি যদি থাকে তাও দেখব এখন।

চিত্রদীপ এতক্ষণে অবাক হচ্ছেন, হয়তো ঠিক বুঝতেও পারছেন না এই অচেনা যুবকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। খানিক ভেবে বললেন, আপাতত কোনও গ্যালারি বুক করা নেই আমার নামে। দু-তিন মাস পরে একটা শো করার ইচ্ছে আছে। যদি ততদিন আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে দেখতে পারবেন নিশ্চয়ই।

অলর্ক ইতস্তত করে বলল, বাড়িতে কোনও ছবি নেই আপনার?

—আছে, তবে এই মুহূর্তে দেখানোর একটু অসুবিধে আছে। ঠিকমতো সব সাজানো-গোছানো নেই।

বনানী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলেন। বাড়িতে খরিদ্দার যেচে এসে ছবি দেখতে চাইছে, আর চিত্রদীপ বেমালুম তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, দেখে রাগে গা-হাত-পা জ্বলছিল তাঁর। তাঁর স্বামীর যে বিন্দুমাত্র ব্যাবসায়িক বুদ্ধি নেই এ সংবাদ তাঁর অজানা নয়। বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কয়েকটা ছবি ঘরে পরিষ্কার করে রাখা আছে। আমি

BanglaBook.org

এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

অলর্ক সাগ্রহে বলে উঠল, খুব ভালো হয় তাহলে।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে। হঠাৎ বোধহয় তাঁর খেয়াল হল অচেনা যুবকটিকে তিনি বসতে বলেননি তখনও। সম্বিত ফিরতে বললেন, আপনি বসুন। আমি দেখছি—

বনানীর পিছু-পিছু তিনিও ছুটলেন ভিতরের ঘরে, সেখানে তাঁর একরাশ ছবি ধুলো পড়ে বেঘোরে নষ্ট হচ্ছে বহুদিন ধরে। বনানী ঠিকমতো ছবি চেনে না। পাছে সে ভালো ছবিগুলো চিনতে না পারে, যে ছবি পছন্দ হবে না হয়তো সেগুলোই বেছে নিয়ে আসে এই আশঙ্কায় নিজেই হন্তদন্ত হয়ে চললেন ছবি বাছাই করতে। আসলে তাঁর ইচ্ছে ছিল না এমন অগোছালো অবস্থায় ছবিগুলো হাজির করতে কোনও ক্রেতার সামনে। কিন্তু বনানী নাছোড়বান্দা হয়েছে যখন—

চিত্রদীপ ভিতরে যেতে অলর্ক এবার থিতু হয়ে বসল স্টাডির মধ্যে বিছোনো মোড়ার একটিতে। মোড়াগুলো বেতের, প্রতিটির ওপর রঙিন কাপড়ের টুকরো জুড়ে ডিমের আকারের ছোট-ছোট গদি তৈরি করে রাখা। মোড়ায় জুত করে বসে সে স্টাডি কাম স্টুডিয়োর চারপাশে একবার নজর চালিয়ে দেখল আঁতিপাতি চোখে। তারপর পাশেই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল সময় কাটানোর জন্য।

খবরের কাগজের যে অংশটি টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় ছিল, সেখানেই ছাপা রয়েছে সেই সাবানের বিজ্ঞাপনটি। অলর্ক ডোনাকে চেনে না। সে অভ্যাসবশত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডোনার খোলামেলা শরীরটার দিকে। মেয়েটার চাউনির মধ্যে যেন একটা উত্তেজক ব্যাপার আছে। যেন হঠাৎ এই গোলমেলে শহর ছেড়ে কোনও দূর তোপান্তরে উধাও হয়ে যেতে ডাক দেয় মেয়েটা। এই সাবানটায় পাতিলেবুর গন্ধ পাওয়া যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন বিজ্ঞাপনদাতা। স্নান করে বেরুবার পর সমস্ত শরীরে, আবহাওয়ায় ভরে উঠবে তাজা পাতিলেবুর গন্ধ। ভাবতে-ভাবতে ডোনার অনাবৃত শরীর থেকে অলর্ক সেই পাতিলেবুর গন্ধ শুষে ওম হতে চাইল কিছুক্ষণ।

চিত্রদীপ আর তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ হল ভেতরের ঘরে ঢুকেছেন, এখনও বেরোননি। এতটা সময় একা বসে থেকে কিছুটা বোর লাগছে অলর্কের। হঠাৎ চমকে উঠল দরজার দিকে তাকিয়ে। চোখ কচলে দেখবে কিনা ভাবছে, তার আগে নিজের কণ্ঠস্বর থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, কী অদ্ভুত!

দরজা খুলে ততক্ষণে লিভিংরুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ডোনা। তার পরনে ভোরের জগিং করার ড্রেস, ধবধবে সাদা শার্ট ও সর্টস। বোধহয় অনেকখানি ছুটে আসার ফলে তার মুখে নাকে কপালে বিনবিন করছে ছোট-ছোট ঘামের ফোঁটা। ঘাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত নেমে আসা ঝোপাচুলের রাশ এলোমেলো হয়ে কিছুটা উড়ে এসে পড়েছে তার চোখেমুখে।

ডোনা সুন্দরী বলেই যে অলর্ক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা নয়। সুন্দরী এবং তার সঙ্গে সকালের বিশুদ্ধ বাতাসে খানিকটা কেয়ারলেস বিউটিতে ভূষিত হলে ডোনা যেন এই মুহূর্তে প্রায় রূপকথার নায়িকা। কিন্তু আসলে অলর্কের মনে হচ্ছিল এই মেয়েটি তার ভীষণ চেনা। কোথায় দেখেছে কীভাবে দেখেছে তা মনে করতে পারছে না বলে তার দু-চোখে আরও বিস্ময় আরও আকুতি ঘনিয়ে উঠল মুহূর্তে।

ততক্ষণে ডোনা এগিয়ে এসেছে অলর্কের অনেকটা কাছে। স্বাভাবিক সৌজন্যবশত অলর্ক তার মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, কী বলবে ভেবে না পেয়ে এক চিলতে বোকার মতো হাসল।

ডোনা চোখে কৌতুক ফুটিয়ে, ভুরু কপালের ওপর তুলে বলল, অদ্ভুত। কে অদ্ভুত? আমি?

তক্ষুনি অলর্কের মনে পড়ে গেল, কোথায় সে ডোনাকে দেখেছে। তড়িঘড়ি হাতের খবরের কাগজটা তুলে আরেকবার দেখল বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে। দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল আরও।

BanglaBook.org

তারপর শব্দ করে হেসে বলল, খুব আশ্চর্য লাগছে আমার। সিনেমার নায়িকারা হঠাৎ পরদা ছেড়ে অডিয়েন্সের মধ্যে নেমে এলে যেরকম স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হয় ঠিক সেরকম।

ডোনার বিস্মিত হওয়ার পালা এবার, মানে? তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে অলর্কের হাত থেকে কেড়ে নিল খবরের কাগজখানা, কই, দেখি—।

ছবিটা দেখেই সে মুখে বিচিত্র শব্দ করে হেসে উঠল, আরে, আজই বেরিয়ে গেছে।

নিজের ছবি সংবাদপত্রের পাতায় দেখার যে আনন্দ, সেই খুশির হিল্লোল ততক্ষণে বয়ে যাচ্ছে ডোনার আকর্ষণীয় শরীরে। কিছুটা জগিং করার ফলেই হোক, কিছুটা বিজ্ঞাপনে নিজেকে দেখার থ্রিলেই হোক, ডোনা বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছে তখন। তার ভারী বুকের ওঠানামা, চোখমুখের অভিব্যক্তি, সরু কোমর, সর্টসের বাইরে সোনালি উরু দেখতে-দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিল অলর্ক। আর মনে-মনে ভাবছিল, আজ সকালে কী এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি সে।

ইতিমধ্যে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন চিত্রদীপ ও বনানী। দুজনের হাতেই বেশ কয়েকখানা করে ছবি। কয়েকটা বড় সাইজেরও। ঘর থেকে বেরিয়েই বনানী ডোনাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দেখেছিস ডোনা, কী দারুণ ছবিটা হয়েছে—।

চিত্রদীপ ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই দেখুন, ছবিগুলো কালের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করে এনেছি। আপনার পছন্দ হয় কিনা।

চিত্রদীপ আর বনানী দুজনে মিলে ততক্ষণে স্টাডির মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখছেন ছবিগুলো। যেন এক্ষুনি এগুলো নিয়ে কোথাও 'শো' দিতে যাবেন। অলর্ক এতক্ষণে তার বিস্ময় ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ক্যানভাসে আঁকা বিচিত্ররঙের ছবিগুলোর ওপর। প্রতিটি ছবির আড়ালে রয়েছে একজন শিল্পীর অবিরত নিষ্ঠা আর শ্রম। রঙের কারুকাজে মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর এক-একটি ভাবনা। এ-ছবিগুলোতে অবশ্য ইদানীংকার মতো লাল রঙের প্রাচুর্য নেই। বরং সবুজ বা তুঁতে রঙেরই প্রাধান্য। বেশ অনেকক্ষণ এই 'গ্যালারি'তে ঘুরে-ঘুরে ছবিগুলো দেখল অলর্ক। সবসমেত আঠারোখানা ছবি সাজানো হয়েছে। ঝুঁকে পড়ে সেগুলো দেখতে-দেখতে হঠাৎ অলর্ক বলে উঠল, আর নেই?

—আর চিত্রদীপ খুবই অবাক হলেন। পরমুহূর্তে খানিক রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, এগুলো একটাও পছন্দ হল না?

অলর্ক চোখ তুলে প্রথমে দেখল চিত্রদীপকে। এতগুলো ছবির সবকটাই বাতিল করলে একজন শিল্পীর চোখমুখের অভিব্যাক্তি কীরকম হতে পারে তা ক'দিন আগে এক তরুণ শিল্পীকে দেখে সে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখন আরও একবার উপলব্ধি করল সে। ক্রমান্বয়ে সে তাকাল বনানী ও ডোনার মুখের দিকে। বনানী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন অলর্কের কথা শুনে। ডোনার চোখেমুখে কিন্তু বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে কৌতুক, যেন ভাবখানা এমন যে, এইটুকু ছোকরা তার বাবার মতো মহান প্রতিভার শিল্পকর্মকে অনায়াসে বাতিল করছে।

—এর সবগুলোই আমি কিনতে চাই। প্রত্যেকটি ছবিই ভারী চমৎকার হয়েছে। আমি গত দু-তিনমাস ধরে বারো চোদ্দজন শিল্পীর স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু এমন সুন্দর কাজ কারও কাছেই দেখতে পাইনি। আমি আরও কিছু ছবি কিনব।

অলর্কের কথার মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস গমগম করে উঠল যে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তার অনেক-অনেক গুণ বিস্ময় চারিয়ে গেল এ-বাড়ির তিন বাসিন্দার চোখেমুখে। ডোনা তো বিস্ময় চেপে রাখতেই পারল না, সব!

—হুঁ, সবগুলোই। আমাকে আরও কিছু ছবি দেখান।

চিত্রদীপ তার চোখের তারায় কিছু সন্দেহ নাচিয়ে বললেন, এতগুলো ছবির দাম সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?

অলর্ক দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল, এই ক'দিনে সে বিষয়ে কিছু ধারণা নিশ্চয় হয়েছে। আমি সুহাস

BanglaBook.org

ভট্টাচার্যের স্টুডিওতেও ঘুরেছি। অবিনাশ ঘড়াই-এর কাছেও গিয়েছি দু-তিনবার।

চিত্রদীপ কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কে। আই উইল শো য়্যু সাম মোর। তারপর ডোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোনা, প্লিজ হেল্প—।

চিত্রদীপ ডোনাকে নিয়ে ফের ভেতরের ঘরে ঢুকলেন ছবির সন্ধানে। বহুদিন অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা ছবিগুলোকে ধুলোর জঞ্জাল থেকে বার করে আনাটা সহজ কাজ নয়। অনেক ছবির রঙই চটে গেছে। কোথাও-কোথাও ভাঁজ পড়ে গেছে ক্যানভাসে। তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দ্বিতীয় দফায় ছবি বাছতে বসলেন চিত্রদীপ।

ডোনা তার বাবাকে সাহায্য করতে-করতে বলল, হু ইজ দ্যাট ফেলো, ড্যাডি?

ডোনাকে বিস্মিত করে চিত্রদীপ বললেন, এ্যা শপকিপার। কলকাতায় কয়েকটা দোকান খুলছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, না কী যেন বলল। তার ইনটেরিয়র ডেকরেশনের লে-আউট করাতে চাইছিল আমাকে দিয়ে।

—ইনটেরিয়র ডেকরেশন। তোমাকে দিয়ে! লোকটা পাগল নাকি?

—পাগল বলেই তো মনে হচ্ছে। হঠাৎ পাগলের মতো এখন ছবি কিনতে চাইছে। কিন্তু লোকটা নভিস।

—নভিস!

—হুঁ, এর আগে ছবি কিনেছে বলে মনে হচ্ছে না। হঠাৎ কী কারণে আমার ছবি কিনতে চাইছে তাও বোধগম্য হচ্ছে না।

স্টাডিতে তখন বনানী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন অলর্ককে, আপনার বুঝি ছবি কেনার নেশা?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, আগে ছিল না, এখন হয়েছে।

—আপনার বাড়িতে গ্যালারি আছে?

—না, ছবিগুলো আমি কিনছি অন্য কারণে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সাজাব বলে।

—ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

অলর্ক খুব সংক্ষেপে তার ভেঞ্চারের কথা বনানীকে জানাল। প্রতিটি শোরুম সে যে চমৎকার করে সাজাতে চাইছে কোনও বড় শিল্পীর সহায়তায়, তাও বলল অকপটে। শেষে বলল, আপনি যখন একজন শিল্পীর স্ত্রী, তখন নিশ্চয় স্বীকার করবেন, কাস্টমার শো-রুমে ঢোকে যতটা তার দ্রব্যসামগ্রীর টানে, ততটাই তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার আকর্ষণে। হঠাৎ শো-রুমে ঢুকে যদি তার মনে হয়, এটা-কলকাতা শহর নয়, দাঁড়িয়ে আছি নতুন কোনও জায়গায়, তখন তার কেনার আগ্রহ বেড়ে যায় অনেকগুণ। তেমনই অভিনবভাবে সাজাতে চাইছি আমার শো-রুমগুলো—

ততক্ষণে চিত্রদীপ আর ডোনা বার করে নিয়ে এসেছে আরও কিছু ছবি। সেসব ছবি সাজাতে-সাজাতে ভরে গেল গোটা লিভিংরুমখানাই। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে অলর্ক বলল, সব ছবিগুলোই আমি বুক করে যাচ্ছি। কত দামাদাম হবে তার একটা হিসেব করে আমাকে জানাবেন। আপাতত একটা চেক দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। দশ লাখ। বাকিটা আমি নেক্সট দিন এসে দিয়ে যাব। আপনি যদি কাউকে দিয়ে ছবিগুলো প্যাকিং করে রাখার ব্যবস্থা করেন তো আমি সঙ্গে বড় গাড়ি নিয়ে আসব। আর হ্যাঁ—।

খসখস করে চেক লিখে তার নীচে লম্বা ধরনের সই করে সেটা তুলে দিল চিত্রদীপের হাতে। প্রায় বোবা হয়ে গেছেন চিত্রদীপ। বনানী আর ডোনাও দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে অলর্কের দিকে।

—আর হ্যাঁ, অলর্ক সেই তিন মুখ, তিন স্থির অবয়বের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তবে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার সব ক'টা শো-রুমের লে-আউটের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান পরামর্শ চাই। এই ছবিগুলো কোনটা কোন শো-রুমে কোথায় রাখলে সবচেয়ে আকর্ষণীয়

BanglaBook.org

হবে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন। তা ছাড়াও যেসব দেওয়ালে ফাঁকা স্পেস থাকবে, সেখানেও আপনার পরিকল্পনা মতো সাজাতে চাই।

চিত্রদীপ আগের দিনের মতো প্রতিবাদ করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু স্তিমিত গলায় বললেন, ভেবে দেখি—।

অলর্ক তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, কী যেন দেখল, তারপর বলল, কিন্তু খুব দ্রুত জানাতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি হয়তো জানেন না, আমি খুব ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে আছি।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, কেন?

—হঠাৎ কোনও মানুষের টাকা হয়ে গেলে তার অনেক শত্রু হয়ে যায়। আমারও এখন সেরকমই প্রচুর শত্রু। কয়েকদিন আগেই আমার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা মার্কেটিং কমপ্লেক্সে ঢুকেছিলাম। ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম, তাদের শো-রুমগুলো কীভাবে সাজিয়েছে, কোথায় কী রাখলে ভালো দেখায়। ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমেছি, হঠাৎ দেখি গাড়িতে ব্রেক ধরছে না। অথচ এরকম হওয়ার কথাই নয়। নতুন গাড়ি। শেষে মেকানিককে দেখাতে বলল, খুব পাকা হাতের কাজ, কেউ আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করেছে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

—স্ট্রেঞ্জ! বাপ-মা-মেয়ে তিনজনেই যেন একযোগে আর্তনাদ করে উঠল।

—আরও আছে। সেদিন রাতের বেলা বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দু-দুটো বোমা ফাটলো গাড়ির জানলার কাছেই। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।

—মাই গড! কারা করছে এ-সব?

—বুঝতে পারছি, আবার পারছি না। আসলে আমার অনেক শত্রু জুটে গেছে। সেসব পরে বলব একদিন। সেদিন এক আর্টিস্ট পর্যন্ত আমাকে ঘুসি মারতে গিয়েছিল। তার ছবি পছন্দ হয়নি বলেছিলাম বলে—।

শেষ বাক্যটি বলে অবশ্য হাসল অলর্ক, ঠিক আছে, চলি—।

অলর্ক বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত তিনজনে বিস্ময়, আতঙ্কে নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বানানী ও ডোনা প্রায় একসঙ্গে আছড়ে পড়ল চিত্রদীপের উদ্দেশে, কে লোকটা, তোমার চেনা?

—নাহ্, একেবারেই নয়।

—ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শেষে তুমি আবার বিপদে পড়বে না তো!

চিত্রদীপ গম্ভীর হল, বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণে তাঁর হাতে ধরা বিশাল অঙ্কের চেকটার দিকে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে বনানী বললেন, চেকটা বাউন্স করবে না তো?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে—।

॥ ৯ ॥

গতকাল থেকে অভিনন্দনের বন্যায় প্রায় ডুবে আছেন মণীশ রায়। পরশু শ্রোতায় পরিপূর্ণ হলের মধ্যে তাঁর পেপার পড়ার পর চারপাশে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা মণীশের কাছে সত্যিই বিস্ময়কর। কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, প্রবন্ধকারের ভাষ্য এককথায় প্রশংসনীয়। লেখাটির বিষয় যেমন অভিনব, লেখার স্টাইল তেমনই নতুন ধরনের। তুলনায় রণজয় দত্তের লেখায় কবিত্ব বেশি, তথ্য কম। ফলে সে প্রবন্ধটি জোলো হয়ে গিয়েছে। সেমিনারে আরও তিন-চারজন অংশগ্রহণকারীর লেখা সম্পর্কেও তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়নি। শ্রোতাদের

BanglaBook.org

মধ্য থেকে শিহরন রায়চৌধুরি নামে এক অধ্যাপক এসে চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। মণীশ রায়ের লেখার প্রশংসা করে এবং রণজয় দত্তের লেখাকে তীব্র আক্রমণ করায় তিনিও কম হাততালি পাননি। শোনা গেছে, ভাইস চ্যান্সেলর নিজে কোনও বক্তব্য না রাখলেও একান্তে কারও কারও কাছে প্রশংসা করেছেন মণীশ রায়ের। বলেছেন, বিষয়টি কিন্তু বেশ বেছেছে মণীশ।

তবে ভাইস চ্যান্সেলরের, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের, কিংবা শ্রোতাদের তরফ থেকে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সবচেয়ে বেশি প্রশংসা মণীশ পেয়েছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। ছাত্ররা যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছ্বাস ভেসে আসছিল ছাত্রীদের কর্নার থেকে। মণীশের ডেইসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল হাততালি শুনেই বোঝা গিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অধ্যাপক খুবই পপুলার। তাছাড়া, তাঁর পাঠ চলাকালীন বেশ কয়েকবার তুমুল ক্ল্যাপ। মণীশ আড়চোখে দু-একবার দেখে নিয়েছেন, ঠিক কোন জায়গা থেকে উচ্ছ্বাস ও হাততালি ভেসে আসছে।

তার পাশাপাশি রণজয় দত্ত পড়তে ওঠার পর দৃশ্যপট গেল বদলে। ক্ল্যাপ তো নয়ই, কেবল দীর্ঘশ্বাস। আসলে মণীশ রায় নেমে যাওয়ার পর বোধহয় সেমিনার জমানো আর কারও পক্ষেই বেশ কঠিন ব্যাপার। মণীশের সুন্দর চেহারা, বাচনভঙ্গি, পড়তে-পড়তে ঠিক জায়গায় এক-এক মুহূর্তে পজ দেয়া, আর সর্বোপরি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রণজয় দত্ত অনেক কবিত্ব করেও প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েও শুধু ভালো পড়তে না পারার জন্যই বোধহয় শেষ পর্যন্ত জমিয়ে তুলতে পারলেন না তাঁর আলোচনা। তেমন হাততালিও না পেয়ে ডেইস থেকে নেমে তাই বিড়বিড় করেছেন, সব বোগাস। এরা আলোচনা শুনতে আসেনি। নাটক শুনতে এসেছে—

ডেইস থেকে রণজয় দত্ত নামার পর শ্রোতাদের ভিতর থেকে হঠাৎ বিড়াল ডাকও শুনতে পাওয়া গেছে। সম্ভবত রণজয়ের সরু মিনমিনে গলাকে ব্যঙ্গ করেই এই ডাক। তিনি কটমট করে সেদিকে তাকাতেই দেখলেন, কয়েকজন অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েও বসে আছে সেখানে।

এতসব বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে রণজয় দত্ত কাল ক্লাস নিতেই আসেননি। আজও এসে নিজের সিটে বসে আছেন গুম হয়ে। ক্লাস নিতে গিয়েও বুঝতে পেরেছেন কালকের ব্যাপারটা বেশ প্রচার হয়ে গিয়েছে মুখে-মুখে, সব ছাত্র-ছাত্রীই যে সেমিনার শুনতে গিয়েছিল তা নয়, কিন্তু যারা গিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই এসে অন্যদের কাছে গল্প করেছে, জানিস, আর ডি. পেপার পড়ার পর খুব প্যাঁক খেয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝে দুটোর ক্লাসটা আর নিতেই গেলেন না রণজয়। একটা মোটামতন বই মুখে দিয়ে বসে আছেন নিঃশব্দে।

একটু দূরে কোণের দিকে বসে থাকা মণীশ রায়ের অবস্থাটা ঠিক বিপরীত, ক্লাস নিয়ে ফিরে এসে সজনী দাশগুপ্ত নামের একজন অধ্যাপক বললেন, কী মণীশ, পরশু নাকি সেমিনারে ফাটিয়ে দিয়েছ একেবারে—।

মণীশ কাল থেকে এত প্রশংসা আর অভিনন্দন পেয়েছেন যে, এখন আর ভালো করে কিছু বলতেই পারছেন না। শুধু হাসলেন মৃদু।

—ভি. সি. নাকি বলেছেন, ছেলেটার ফান্ডা আছে বেশ।

মণীশ আর একবার শুধু হাসলেন সজনী দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে।

—বাহ্, গুড। বলে সজনী দাশগুপ্ত তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রফেসরস-রুমটা বেশ বড়ই। প্রায় পনেরো-কুড়িজন অধ্যাপকের জন্য এই ঘরটা নির্দিষ্ট। যারা একটু সিনিয়র, তাঁদের জন্য আলাদা টেবিল-চেয়ার। জুনিয়রদের জন্য ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিলের দুপাশে খানদশেক চেয়ার পাতা। যখন সব অধ্যাপকই ঘরে থাকেন, তখন হইচইতে মুখর হয়ে ওঠে প্রফেসরস-রুম। তবে তেমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

আজও ঘরে বেশি অধ্যাপক নেই। জনাচারেক বসে আছেন মাঝখানের টেবিলে। তারা

BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে আড্ডা-ইয়ার্কি মারছেন। মণীশ বসে আছেন তাঁর কোণের দিকের আলাদা চেয়ার-টেবিলে। তাঁর ক্লাস একটু আগেই শেষ হয়েছে। আপাতত পরপর দুটো পিরিয়ড অফ। রণজয় দত্ত বসে আছেন অন্যদিকের কোণায় সেরকম গম্ভীর মুখেই। সজনী দাশগুপ্তের মন্তব্য শুনে একবার কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের পাতায় মনসংযোগ করার চেষ্টা করলেন।

পরক্ষণেই প্রফেসরস রুমে ঢুকে পড়ল দুই তরুণী। তার মধ্যে একজন গার্গী। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির ঘটনাটায় ক'দিন খুবই উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সে, বিশেষ করে অলর্ক বোস নামের এক যুবক কীভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হল, তারপর এখন সে কোথায়, কী করছে, রাজবাড়ির অন্য পোষ্যদেরই বা কী হল, এহেন হাজার রোমাঞ্চকর প্রশ্ন এখন তার মগজে। তার মধ্যেই চলছে তার অন্য ফিচার লেখার প্রস্তুতি। এ-ঘরে তরুণীরা ঢুকে কোন অধ্যাপকের কাছে যায়, তা অন্য সবারই জানা। মণীশ রায়ও সাধারণত প্রস্তুত থাকেন অফ-পিরিয়ডে কেউ না কেউ তাঁর কাছে আসবেই। দুই তরুণীর একজন তাঁর চেনা। তাঁদের ডিপার্টমেন্টেরই ছাত্রী ডোনা চ্যাটার্জি। ডোনা মাঝেমধ্যেই তাঁর ক্লাসে অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্ন করে রীতিমতো সোরগোল ফেলে দেয়।

এহেন ডোনা আজ হঠাৎ আর একটি তরুণীকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল, স্যার, এ হল গার্গী মুখার্জি, মাই ফ্রেন্ড। ম্যাথস-এর ছাত্রী। কিন্তু অঙ্কের বাইরে অনেক বিষয় নিয়ে ওর কৌতূহল। আপাতত একটা ফিচার লেখার কাজে খুবই ব্যস্ত। ফিচারটির বিষয় 'আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা।'

মণীশ তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেয়েই ভিন্ন-ভিন্ন ছুতো নিয়ে তাঁর কাছে এসে থাকে। নিশ্চয় তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেয়েটি এসেছে। তবু গার্গী মুখার্জি নামটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল তাঁর। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করলেন, হুঁ, মনে পড়েছে, তুমিই সেই ডিবেট চ্যাম্পিয়ন, তাই না?

গার্গী লজ্জিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, সবাই আমাকে এই পরিচয়েই চেনে এখন। কিন্তু আপাতত আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। ফিচারটির বিষয়েই—।

মণীশ বললেন, ফিচারটি তো খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে ডোনাদের মতো আধুনিক প্রজন্মের মেয়েদের কাছেই তোমাকে প্রশ্ন রাখতে হবে। আমার কাছে কেন?

—স্যার, এ পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটজন মেয়ের কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এই প্রজন্মের মেয়েদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন এমন পুরুষদের থেকেও কিছু জেনে নেয়া যায়।

মণীশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি! কিন্তু প্রফেসরস-রুমে বসে সেসব প্রশ্নের উত্তর কি দেয়া যাবে? দেখছ না, মেয়েরা আমার কাছে এলে জোড়ায়-জোড়ায় চোখ আমাকে ফলো করতে থাকে।

ডোনা তৎক্ষণাৎ বলল, তাহলে স্যার, অন্য কোথাও আপনার সঙ্গে বসতে পারে গার্গী, ধরুন, কোনও রেস্তোরাঁ, কিংবা কফি-হাউসে—।

মণীশ সায় দিয়ে বললেন, চলো, তাহলে সামনের মোড়ে যে কফি হাউসটা আছে, সেখানেই বসা যাক। আমার এখন অফ আছে।

গার্গী খুশি হয়ে বলল, চমৎকার প্রস্তাব। চলুন, স্যার—।

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই দেখল, চারপাশ থেকে অন্য সব অধ্যাপকেরা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বিশেষ করে রণজয় দত্ত। তিনি এমন হিংস্রচোখে তাকালেন মণীশ রায়ের দিকে যে, গার্গীর শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। একজন অধ্যাপকের চাউনি কি এমন সাংঘাতিক হতে পারে!

বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে তারা বেরিয়ে এল প্রফেসরস-রুমের বাইরে। মণীশ রায়ের তো রীতিমতো অস্বস্তি হয় আজকাল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে তিনজন হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল

BanglaBook.org

কফি হাউসের ভেতর। কিছুটা এসেই ডোনা বলেছিল, তাহলে গার্গী, স্যারের সঙ্গে তোর তো পরিচয় হয়ে গেল, এবার আমি চলি—।

গার্গী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলেছে, উঁহু, ওটি হচ্ছে না। ইন্টারভিউয়ের সময় তোকেও থাকতে হবে। তোরা, স্যারের ছাত্রীরা কী কারণে তাঁর এমন অন্ধ ভক্ত হয়ে তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করিস তাও জানতে হবে। সেদিন এ ব্যাপারটা তোকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

কফি-হাউসে ঢুকে মণীশ বললেন, বলো, কী খাবে তোমরা? কফির সঙ্গে আর কিছু?

—উঁহু, শুধুই কফি।

কফি-হাউসের সুবিধে এই যে, সামনে এককাপ কফি নিয়ে অনন্ত সময় ধরে কথাবার্তায়, আড্ডায়, আলোচনায় পার করে দেয়া যায়। উঠতি কবি-লেখকেরা, তরুণ শিল্পীরা তাদের ইনটেলেকচুয়াল কথাবার্তা আদানপ্রদান করার জন্য কফি-হাউসগুলোকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে। নামিদামিরাও যে একেবারে আসেন না তা নয়। এককাপ কফিতেই সংস্কৃতির তুফান বয়ে যায় রোজ।

তবু মণীশ বললেন, তাহলে অন্তত পকৌড়া নেওয়া যাক। কফির সঙ্গে পকৌড়া থাকলে একটু গরম হতে পারে আলোচনা।

বলেই বেয়ারাকে ডেকে কফি আর পকৌড়ার অর্ডার দিয়ে বললেন, হুঁ, বলো তোমার কী প্রশ্ন? তবে দেখো, তোমার এই বান্ধবীটি, ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস মেয়ে। ক্লাসে মাঝেমধ্যে অধ্যাপকদের এমন সব ঝামেলায় ফেলে দ্যায়। সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, পরকীয়াতত্ত্ব কবি-লেখকদের এত ফেবারিট কেন?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনিও কম ডেঞ্জারাস না। তার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন, তাতে কান লাল হয়ে গিয়েছিল।

মণীশও হাসলেন, ডেঞ্জারাস মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস না হলে তো এই কলেজে আমাকে আর অধ্যাপনা করতে হত না। যা সব বাঘিনীরা পড়তে আসে—

ততক্ষণে কফি আর পকৌড়া এসে গেছে তাদের সামনে। কফিতে চুমুক দিয়ে মণীশ বললেন, এসো, এবার তাহলে আমাদের মুল আলোচনায় ফিরে আসি। পৃথিবীর যাবতীয় ডিপ্লোম্যাটদের আলোচনা কিন্তু ডাইনিং টেবিলে হয়। আপাতত কফির টেবিলেই আলোচনা শুরু হোক।

খানিকক্ষণ ভেবেটেবে নিজেকে গুছিয়ে নিল গার্গী। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছেন। ভালো অধ্যাপক হিসেবে যেমন আপনার সুনাম, তেমনই আরও একটি খ্যাতি ইতিমধ্যে এই চত্বরে বহুল প্রচারিত তা হল, মেয়েরা আপনাকে ভীষণ পছন্দ করে। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে বহু তরুণীর সংস্পর্শে এসেছেন আপনি, তাতে মেয়েদের মধ্যে এই ক'বছরে যে আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাও গভীরভাবে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই আমার প্রথম প্রশ্ন, কুড়ি বছর আগে আপনি যে তরুণীদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে হাল আমলের তরুণীদের কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে কি না, থাকলে কোথায় সেই পার্থক্য?

মণীশ কিছুক্ষণ ভাবলেন প্রশ্নটি নিয়ে। তারপর বললেন, ভারী ইন্টারেস্টিং ডিসকাসন। তবে তুমি ফিচারিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে ভেবেছ, আমি তো তাদের সেভাবে দেখিনি। কুড়িবছর আগেও মেয়েরা যে কারণে ছুটে আসত আমার কাছে, এখনও সেই কারণেই আসে। মেয়েরা পুরুষের কাছে আসে ভালোবাসার খোঁজে। যে পুরুষের ব্যাক্তিত্ব আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, খ্যাতি আছে তাদের দিকেই সাধারণত ঝুঁকে পড়ে মেয়েরা। রূপের আকর্ষণেও কেউ-কেউ না আসে তা নয়। এই সবকিছু মিলিয়ে আমার হয়তো একটা চাহিদা তৈরি হয়ে যায় তাদের কাছে।

—এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে নেন? তারাই বা কী চায় আপনার কাছে?

মণীশ হাসলেন, অবশ্যই উপভোগ করি ব্যাপারটা। তারা কুড়িবছর আগেও যেভাবে আকারে ইঙ্গিতে, কখনও কেবলমাত্র চাউনি দিয়েই তাদের প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করত, এখনও সেভাবেই

BanglaBook.org

প্রকাশ করে থাকে। কোনও পার্থক্য নেই।

—বলতে চাইছেন কেবল প্রেম-ভালোবাসাই?

—তাই-ই। আসলে প্রেম-ভালোবাসা মেয়েদের এক চিরন্তন কাঙ্খিত বিষয়। কয়েক হাজার বছর আগে মেয়েরা যেভাবে ভালোবাসত পুরুষকে, আজও তেমনিভাবেই ভালোবাসে। শুধু পার্থক্য যেটুকু তা হল, এক নারীর সঙ্গে আর এক নারীর আচরণের মধ্যে, কিংবা এক পুরুষের সঙ্গে আর এক পুরুষের।

—আপনার মনে হয় না, এখনকার মেয়েরা অনেক বেশি ক্রেজি?

মণীশ রায় এ-প্রশ্নে খানিকক্ষণ থমকালেন, বোধহয় ভাবতে চাইলেন গার্গী আসলে কী বলতে চায়। এত বিচিত্র ধরনের তরুণী তাঁর কাছে প্রতিদিন আসে, এমন বিভিন্ন ছলছুতোয় তাঁর সাহচর্য উপভোগ করতে চায় যে, তাদের সবাইকেই তো তাহলে ক্রেজি বলতে হয়। এমনকী তাঁর স্ত্রী ঈষিতাকেও। ঈষিতাও তো পাঁচ বছর আগে তাঁর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার আগে আরও অনেক তরুণী। তাঁদের সবাইকে একে-একে এড়িয়ে যেতে পারলেও শেষ পর্যন্ত ঈষিতাকে আর এড়াতে পারেননি। কিছুক্ষণ ভেবেটেবে বললেন, মেয়েদের পাগলের মতো ভালোবাসাকে যদি তাদের ক্রেজ বলতে চাও, তাহলে বেশিরভাগ মেয়েই ক্রেজি। যাকে ভালোবাসে, তার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পিছপা হয় না।

—উঁহু, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। এখনকার অনেক মেয়েই ঠিক আগের দিনের মতো নরমসরম, লাজুক কিংবা সনাতন ভারতীয় ধ্যানধারণায় আর বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ ওয়েস্টার্নাইজড হয়ে উঠেছে তারা। প্রাচ্যের সংস্কৃতির গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেই আদর্শ মনে করছে। আপনার কি সেরকমই মনে হয় না?

মণীশ কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই বাধা দিল ডোনা, বলল, ওয়েস্টার্ন কালচার তো এখন আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে দ্রুত ঢুকে পড়েছে অমনিই। তার জন্য শুধু মেয়েদেরই বা দায়ী করছ কেন, গার্গী?

—দায়ী করছি না। কিন্তু তাতে আমাদের জীবনযাপন থেকে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে সনাতন মূল্যবোধ।

—তা তো হবেই, গার্গী। মূল্যবোধের সংজ্ঞা কখনও থেমে থাকে না পৃথিবীতে। যত বদলে যেতে থাকে সিভিলাইজেশন, মূল্যবোধ বদলে যায়। পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের মূল্যবোধ যেরকম ছিল, পরের শতাব্দীতে পৌঁছে নিশ্চয় তার আগের শতাব্দী থেকে ঢের বদলে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও তার প্রথম দিককার মূল্যবোধ বজায় থাকবে, নিশ্চতভাবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। একবিংশ শতাব্দী যত এগুবে, মূল্যবোধের সংজ্ঞা নিশ্চয় তত বদলে যাবে।

মণীশও এবার অংশগ্রহণ করলেন আলোচনায়, ডোনা ঠিকই বলেছে, গার্গী। যেভাবে আমরা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার কাছাকাছি আসছি, তত জীবনযাপনের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে আমাদের।

—কিন্তু স্যার, তাতে আমাদের জীবনে পিস নামক ব্যাপারটি কমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুকাল আগেও আমাদের সমাজে এত ডিভোর্স ছিল না, এত অশান্তি ছিল না সংসারে, পারস্পরিক অ্যাডজাস্টমেন্টের এত অভাব ছিল না—।

ডোনা ফোঁস করে উঠে বলল, কিন্তু পুরুষরা তখন অনেক বেশি দাবিয়ে চলত মেয়েদের ওপর। সেটা নিশ্চয় এখন টলারেট করা যায় না। ম্যারেড লাইফে দুজন-দুজনের লাইফ পার্টনার। দেয়ার মাস্ট বি ইকোয়াল শেয়ার। তার অভাব হলে ডিভোর্স আসবেই। আগের দিনের মেয়েরা সেসব অত্যাচার সহ্য করত নীরবে।

গার্গী মুচকি হেসে তার ডায়েরিতে নোট করে নিতে-নিতে বলল, চমৎকার জমেছে কিন্তু ডিবেটটা। যাই হোক, ডোনা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল, তাতে সমাজের এক শ্রেণির মেয়েদের মতামত

BanglaBook.org

তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। আবার অন্যধরনের মেয়েও আছে, যারা পুরোনো ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারা আবার এই ওয়েস্টার্নাইজড হওয়াটাকে মেনে নিতে পারছে না। তেমন মেয়ের সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নয়।

কফি ও পকৌড়ার প্লেট ইতিমধ্যে নিঃশেষ করে ফেলেছে তিনজনে। মণীশ ঘড়ি দেখে বললেন, আমার আর একটা ক্লাস আছে, গার্গী। আমাকে এখনই উঠতে হবে। তোমার যদি আরও প্রশ্ন থাকে, পরে একদিন সময়ে করে চলে এসো।

গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, আমার প্রশ্নের তো সবে শুরু, স্যার। এখনও অনেক বাকি।

—ঠিক আছে মাঝেমাঝেই চলে এসো তবে। যখন যেরকম মনে হবে তোমার।

মণীশ রায় চলে যেতেই ডোনা হঠাৎ ধরল গার্গীকে, কি রে, তুই তো তাহলে পার্মানেন্ট ইনভাইটি হয়ে গেলি মনে হচ্ছে।

গার্গী অন্যমনস্কভাবে বলল, ইস, সবে আলোচনাটা জমে উঠেছিল, এমন সময়—।

ডোনা হেসে উঠে বলল, সব আলোচনা একদিনে কি শেষ করে ফেলতে হয়! রোজ একটু-একটু করে করতে হয়। কিন্তু দেখিস, তুই আবার ফেঁসে যাসনে যেন আলোচনা করতে-করতে।

—তুই জেলাস হচ্ছিস নাকি?

—না। তবে আরও অনেকে হবে। অনেকেই কাছে ভিড়তে চাইছে, পাত্তা পাচ্ছে না। তুই যেরকম পাত্তা পেতে শুরু করেছিস, অন্যেরা তোকে হয়তো মেরে গুম করে ফেলবে—।

ডোনার মজা করে বলা কথাটার উত্তরে প্রবলভাবে হেসে উঠতে যাচ্ছিল গার্গী, কিন্তু জায়গাটা কফি হাউস, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম নয় মনে পড়তে ঝট করে উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে, চল তো, বাইরে যাই।

কফি হাউসের জমজমাট পরিবেশ ছেড়ে বাইরে আসতেই ডোনাকে চেপে ধরল গার্গী, কী ব্যাপার, তোর সেই গুপ্তিপাড়ার প্রেমিকের কী খবর? আবার কোথাও আউটিঙে যাচ্ছিস নাকি?

ডোনা অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বলল, নাহ। তাকে আপাতত কোল্ডস্টোরেজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই মুহূর্তে আর এক রাজকুমার আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—।

গার্গী কিছুটা অবাক হল, আবার হলও না। ডোনার স্বভাবচরিত্র, হাবভাব তার এ ক'দিনে হাড়ে-হাড়ে চেনা হয়ে গিয়েছে। সে বড় বেশি বৈচিত্র্য আগ্রহী। সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও বিপ্লব ঘটাতে খুবই উৎসাহ তার। তবু হঠাৎ রাজকুমার শব্দটি শুনে ঔৎসুক্য গোপন করতে পারল না, বলল, সে আবার কে?

—একজন ধনকুবের। সে হঠাৎ দশলক্ষ টাকা দিয়ে আমার বাবার আঁকা কয়েকখানা ছবি কিনে নিয়ে গেছে। আরও নাকি কিনবে। বিশাল একখানা কনটেসা হাঁকিয়ে সেদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। একদম সাহেবদের মতো চেহারা, কিন্তু বাংলায় কথা বলে।

গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল, সেই রাজকুমার সম্পর্কে এতক্ষণ কথা বলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘোর ঘনিয়ে আসছিল ডোনার চোখেমুখে। একেই তো ধনকুবের, তার ওপর সাহেবদের মতো চেহারা, ডোনা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী। ডোনার তো আবার একটা আমেরিকা-আমেরিকা ব্যাপার আছে কিনা। মুচকি হেসে বলল, তার সঙ্গেও আউটিঙে যাবি নাকি?

ডোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাহ। এখনও তো ইন্টিমেসি হয়নি। জাস্ট আলাপ হয়েছে। নামটাও কী অদ্ভুত। অলর্ক। অলর্ক বোস।

নাম শুনে এবার গার্গীরই ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, সে ছিটকে উঠে বলল, কী নাম বললি?

—অলর্ক বোস। কেন, তুই চিনিস নাকি তাকে।

গার্গী স্তব্ধ হয়ে গিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, চিনি, আবার চিনিও না। কিন্তু তাকে আমার

BanglaBook.org

খুব দরকার। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি?

ডোনা হতবাক হয়ে গিয়েছিল গার্গীর এই আকস্মিক আচরণে। তার চোখে কী যেন পর্যবেক্ষণ করে জোরে-জোরে ঘাড় ঝাঁকাল, নো ম্যাডাম। আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর হিম। হি ইজ অ্যা নাইস গাই—।

গার্গী পুরোপুরি নিরুৎসাহ হল না। সে তো অলর্ক বোসের প্রেমে পড়বে বলে তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়নি। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি নিয়ে তার ভাবনাটা শেষপর্যন্ত ভাবনার স্তরেই রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও আজ পর্যন্ত বীরভঙ্গপুর পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ক'দিন হল সেই রহস্যের জট খোলার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আচমকা অলর্ক বোসের সন্ধান পেতে একেবারে মুখিয়ে উঠল এবার। ব্যাপারটা অতএব চেপে গিয়ে গার্গী মৃদু হাসল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তাহলে মন্দার মিত্রের এখন স্টার খারাপ যাচ্ছে বল—।

ডোনাও হাসল। তবে রহস্যময়ীর মতো।

॥ ১০ ॥

ঠিক দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে তার রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা ইংরাজি কাগজের টেন্ডারের পাতায় চোখ রাখছিল মন্দার।

লিন্ডসে স্ট্রিটে ঢুকেই কিছুটা এগিয়ে গেলে এই চারতলা পুরোনো বাড়িটা। কলকাতার এই সব ব্যস্ত এলাকায় যখন পুরোনো বাড়ি ভেঙে মহামান্য প্রমোটাররা পটাপট মালটিস্টোরিড বিল্ডিং গজিয়ে তুলছে, তখন এই বাজাজ ম্যানশনটি কী করে তাদের নজর এড়িয়ে এখনও টিকে আছে, সেটাই মন্দারের কাছে ভারী বিস্ময়কর। পুরোনো বলেই দু-লাখ সেলামিতে দোতলার ওপর একটা ষোল বাই দশ ঘর পেয়ে গেছে সে। লোকেশনের তুলনায় টাকাটা খুবই কম হলেও মন্দারের কাছে আপাতত অনেক। দালালের হাতে দু-লাখ টাকা গুনে-গুনে দেওয়ার সময় তার বুকের ভিতরটা চিনচিন করছিল। তার বিজনেসে এখন লিকুইড ক্যাশের খুবই প্রয়োজন। এতগুলো টাকা ব্লকড হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। মন্দারের কথা শুনে দালাল শিবরাম দস্তিদার বলছিল, মন্দারবাবু, অনেক কপাল করেছিলেন বলেই এত সস্তায় ঘরখানা পেয়ে গেলেন। একটু অপেক্ষা করলে তিন-চার লাখ টাকাও হয়তো অফার দিত কেউ। এখনকার একটা ঘরের কীরকম ডিমান্ড জানেন! এই ঘরখানায় শুধু একটা টেলিফোন নিয়ে বসে থাকলে এক বছরে দু-লাখ টাকা ঘরে এসে যাবে। স্রেফ ব্রোকারি করেই—।

না, মন্দার দালালি করে বড়লোক হতে চায় না। একটা ভালো ব্যাবসা করেই সে তার ভাগ্য ফেরাবে। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্বল করে নেমে এই চার-পাঁচ বছরে সে চোদ্দ-পনেরো লাখ টাকা ক্যাপিটাল করে ফেলেছে। সব টাকাটাই অবশ্য তার ব্যাবসায়ে খাটছে। বছর খানেক হল এই ঘরখানা পেয়ে যেতে সুবিধে হয়ে গেছে তার।

ষোলো বাই দশ ঘরে মন্দার ও তার তিন কর্মচারী মিলে খুলে বসেছে তাদের 'ইন-ডেক' কোম্পানি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে দরজার ওপরে তাদের কোম্পানির নেমপ্লেটটি বেশ কায়দা করে বসানো। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকে পরপর তিনখানা টেবিল। রঞ্জীত, নিখিলেশ ও সুমনা নামের তিন যুবক-যুবতীকে কোম্পানির কাজে নিয়োগ করেছে মন্দার। তিনজনই বেশ স্মার্ট, কাজেকর্মেও তুখোড়। সুমনা নামের মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরীও। তিনজনের টেবিল-চেয়ার যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটি প্লাইউডের পার্টিশন। তার ওপাশে একটা হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল নিয়ে বসে থাকে মন্দার। তার টেবিলের সামনে দু-খানা স্টিল-ফ্রেমের গদি আঁটা চেয়ার, ভিজিটরদের বসার জন্য।

BanglaBook.org

প্লাইউডের পার্টিশনটা ইচ্ছে করেই রেখেছে মন্দার। তার কর্মচারীদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। তাতে একটু আড়ালও রইল, আবার ইচ্ছেমতো তিনজনকে ঠিকঠাক ইনস্ট্রাকশনও দেয়া যাবে।

টেন্ডারগুলো পরপর পড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা অ্যানাউন্সমেন্টের দিকে নজর আটকে গেল তার। বেশ বড় অঙ্কের একটা টেন্ডারের কল দিয়েছে একেবারে নতুন একটা কোম্পানি। টাকার অঙ্কটিই শুধু চোখে পড়ার মতো তাই নয়, টেন্ডারের বিষয়টিও ভারী অভিনব। বারকয়েক গড়গড় করে বিজ্ঞাপনটি পড়ার পর নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল মন্দারের, সে একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠল, রঞ্জীত, রঞ্জীত।

রঞ্জীতের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে। দশটা বাজার আগেই সে অফিসে পৌঁছে তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। আজও যথারীতি ফাইল খুলে 'বাড কোম্পানিতে' জমা দেওয়ার জন্য টেন্ডার পেপার তৈরি করছে। তার টেবিলে খোলা ফাইলের পাশে ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো কাগজ, একপাশে একটি ক্যালকুলেটরও। মন্দারের ডাক শুনেই দ্রুত কাজ ফেলে চলে এল পার্টিশনের এপাশে, ইয়েস স্যার—।

খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ না তুলে মন্দার বলল, ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের অফিস থেকে যে পেমেন্টটা পাওয়ার কথা ছিল সেটার কী হল?

—সেটা বোধহয় শিগগিরই পাওয়া যাবে, সুমনা তো কাল গিয়েছিল ওদের অফিসে।

—কবে পাওয়া যাবে কিছু বলেছে?

—সুমনা এখনও অফিসে আসেনি। কাল সকাল-সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল ক্যারিসমা সিন্ডিকেটে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, অ্যাকাউন্টস, অফিসারের সঙ্গে দেখা না হলে আজ অফিস আসার পথে দেখা করে আসবে।

ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের পেমেন্ট নিয়ে বেশ কয়েকদিন চিন্তায় আছে মন্দার। প্রায় তিনমাস হয়ে গেল ওদের অফিসের ভেতরটায় রি-মডেলিং-এর কাজ করে 'ইন-ডেক' অথচ এখনও পেমেন্ট দেয়নি ওরা। প্রায় লাখদুয়েক টাকা আটকে যাওয়ায় খুবই অসুবিধে হচ্ছে। রঞ্জীতের কথা শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল, 'এ টু জেড' কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?

রঞ্জীত ঘাড় নাড়ে, দেখেছি স্যার।

—আমরা কি টেন্ডার দিতে পারব?

খানিক ইতস্তত করে রঞ্জীত বলল, মনে হচ্ছে পারব না। শুধু আর্নেস্ট মানিই জমা দিতে হবে আড়াই লাখ টাকা। তারপর প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার কাজ প্রথম দফায়। আমাদের যা ক্যাপিটাল তাতে কুলোবে না।

মন্দার কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বলল, ওরা মোট পাঁচটা শো-রুমের জন্য টেন্ডার কল করেছে। আমরা যদি একটা শো-রুমের জন্য কমপিট করি?

—টেন্ডারের অ্যানাউন্সমেন্টে তা বলা নেই। বলেছে, একজন বিখ্যাত শিল্পীর বিশেষ লে-আউট অনুযায়ী সবক'টা শোরুমের ইনটেরিয়র ডেকরেশন করতে হবে, মাত্র একটি কনসার্নই সব ক'টা কাজের বরাত পাবে।

মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রে এরকম বড়-বড় কাজের টেন্ডার প্রকাশিত হয়। সমস্ত টেন্ডারগুলিই মন্দার খুঁটিয়ে পড়ে, কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে হয় অর্থাভাবের জন্য। সে তার ছোট্ট কোম্পানিটিকে দ্রুত বড় করে তোলার জন্য প্রবল পরিশ্রম করে চলেছে। প্রতিটি মাঝারি টেন্ডারেই সে অংশগ্রহণ করে এবং এ পর্যন্ত যতগুলি কাজ তার 'ইন-ডেক' হাতে নিয়েছে, প্রতিটির পারফরমেন্সই চমৎকার। শুধু এ মাসে দু-দুটি ভালো টেন্ডার সে পায়নি তারই গাফিলতির জন্য। রঞ্জীতরা দুটো

BanglaBook.org

টেন্ডারের কাগজপত্রই ঠিকঠাক প্রস্তুত করে রেখেছিল। মন্দার বিনা নোটিশে পরপর তিনদিন অফিসে না আসায় তারা জমা দিতে পারেনি টেন্ডার। তিনদিন পর অফিসে ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিল, অফিস-মাস্টারের অনুপস্থিতির জন্য তার কর্মীরা মনে-মনে ক্ষুব্ধ, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তা প্রকাশ করেনি তারা।

মন্দার মনে-মনে লজ্জিত বোধ করেছিল, কিন্তু খুশিও হয়েছিল এই কারণে যে, তার কোম্পানির কর্মীরা তাহলে কোম্পানির জন্য মমত্ব অনুভব করতে শিখেছে। কোথায় অফিস-মাস্টার তার কর্মীদের গাফিলতির জন্য রাগারাগি করবে, তা নয়তো কর্মীরাই ক্ষুব্ধ হচ্ছে অফিস-মাস্টারের গরহাজিরায়। কিন্তু সেই একবারই না, এই নিয়ে দুবার। এর আগেও হঠাৎ এভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল তিন-চারদিনের জন্য, একাই অবশ্য। সেবার ফিরে এসে শুনেছিল, রজীত তার অনুপস্থিতিতে তারই নাম সই করে জমা দিয়েছে টেন্ডারের কাগজপত্র। সেবার রজীতকে খুব বকাবকি করেছিল মন্দার, এভাবে স্বাক্ষর জাল করায়। কিন্তু দু-লাখ টাকার কাজটা পেয়ে যেতে মনে-মনে খুশিই হয়েছিল, তবে রজীতকে তা জানায়নি, ইচ্ছে করেই। সেইজন্যেই এবার রজীত আর টেন্ডার পেপার জমা দেয়নি। যাই হোক, মন্দার তার কোম্পানির জন্য গত পাঁচ-ছ বছর জান লড়িয়ে দিচ্ছে। 'ডি' ক্লাস থেকে 'সি' ক্লাস কন্ট্রাক্টর হয়েছে। খুব শিগগির হয়তো 'বি' ক্লাসও হয়ে যাবে। কিন্তু তার টার্গেট 'এ' ক্লাস হওয়া। কবে কোটি টাকার টেন্ডার ধরতে পারবে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু আপাতত চল্লিশ লাখ টাকার টেন্ডারেও সে অংশগ্রহণ করতে পারছে না এই বোধটাই তাকে পীড়িত করছে। যে করেই হোক, কিছু টাকা তাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

—এক কাজ করো রজীত। ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের পেমেন্টটা পেয়ে গেলে আর্নেস্ট মানির টাকাটা জমা দিয়ে দাও। তারপর ওয়ার্ক অর্ডার পেলে কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

রজীত তবুও মাথা নাড়ল, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, স্যার। বিজ্ঞাপনে বলা আছে, যেসব কোম্পানি অন্তত এককোটি টাকার কাজ করার অর্ডার পেয়েছে, কেবল তাঁরাই পার্টিসিপেট করতে পারবে।

মন্দার বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, এখনও এককোটি টাকার কাজ আমরা করিনি।

—না স্যার। আমি হিসেব করে দেখছিলাম, 'ইন-ডেক' কোম্পানি এ পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছে মোট সাড়ে সাতানব্বই লাখ টাকার। মাত্র আড়াই লাখ টাকা শর্ট আছে এখনও।

—মাত্র আড়াই লাখ?

—হ্যাঁ, এ মাসে দু-দুটো অর্ডার হাতছাড়া না হয়ে গেলে হয়তো আমরা কমপিট করতে পারতাম।

মন্দার কয়েক মুহূর্ত অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল রজীতের মুখের দিকে। এত বড় একটা টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করতে পারায় যাবতীয় দায়িত্ব কিনা তারই ওপর এসে বর্তাচ্ছে। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এখন তাহলে থাক।

রজীত চলে যাওয়ার পর নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল মন্দারের। সেই রাগ পুঞ্জীভূত হতে-হতে অবশেষে আছড়ে পড়ল ডোনার ওপর। সেদিন তোমা অমন নাছোড় না হলে তারা তো পরদিনই ফিরে আসতে পারত গুপ্তিপাড়ার সেই মহেঞ্জোদাড়ো স্টাইলের পোড়ো বাড়িটা থেকে। তাহলে তো 'জনসন অ্যান্ড টেনিসন' আর 'ট্রেড-টায়ার' নামে দুটো কোম্পানির প্রায় পাঁচ লাখ টাকার টেন্ডার তাদের হাতছাড়া হত না। পাঁচ লাখ টাকার মতো কাজ পেলে অন্তত সত্তর আশি হাজার টাকা লাভ হত এ-মাসে। সে টাকাটাও এখন তাদের কোম্পানির কাছে অনেক।

নাহ, ডোনা সত্যিই কেয়ারলেস, ইররেসপনসিবল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডোনার

BanglaBook.org

কথাই ভাবতে বসল মন্দার। হয়তো কেয়ারলেস বলেই ডোনার মতো বোহেমিয়ান সুন্দরী তার মতো একজন ব্যবসায়ীর প্রেমে পড়ে গেছে হঠাৎ। হয়তো তাই-ই হঠাৎ তার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করতে সে বেরিয়ে পড়েছিল গুপ্তিপাড়ার পোড়োবাড়ির উদ্দেশে। আর একদিনের বদলে তারা কীভাবে তিনদিন পার করে ফেলল তা বুঝতেই পারেনি। তার এই আঠাশ বছর বয়সে দু-একজন মেয়ের সঙ্গে একটু-আধটু ঘনিষ্ঠতা হয়নি এমন নয়। কিন্তু সে ওই চোখাচোখি, একটু হাসি, কিংবা অপালা নামের একটি মেয়ের হাতটাও হঠাৎ ধরে ফেলেছিল একদিন। কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। তার বেশি প্রেম করার ধৈর্য বা ক্ষমতা তার ছিল না। তখনও পর্যন্ত সে ছিল বেকার, বাবা-মায়ের বাঁয়ে-এলেক-দেয়া ছেলে। তারপর ছোট্ট ব্যাবসায়ে হাত দেয়ার পর আর কোনওদিকে তাকানোর ফুরসত পায়নি। তরতর করে কেবল সাফল্যের মুখ দেখতে চেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ করেছে নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর সততা। এর মধ্যে কীভাবে যেন সে লটকে গেল ডোনার সঙ্গে। তার কয়েকদিনের মধ্যে তার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল যে, সে অভিজ্ঞতা তার কাছে অদ্ভুত, প্রায় অসম্ভবের মতো। ডোনা বোহেমিয়ান তো বোহেমিয়ান। মাত্র তিনদিনের মধ্যে প্রেমে আনাড়ি মন্দারকে সে মন্ত্রের মতো পুরোপুরি সাবালক করে ছেড়ে দিয়েছে। মাত্র তিনদিনের জন্য সে আর ডোনা কাছাকাছি হয়েছিল। এই তিনদিনে তার মনে হল সে জয় করে এসেছে তাবৎ বিশ্ব। এভারেস্ট-শৃঙ্গ ডিঙিয়ে ফিরে এল এক্ষুনি।

তারপর কয়েকদিন তার সমস্ত শরীর ও মন জুড়ে কেবল ডোনা, ডোনা আর ডোনা। দু-দুটো টেন্ডার মিস করার শোকও সে অনায়াসে ভুলতে পেরেছিল, ডোনার কাছ থেকে যে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছিল তার আনন্দে, উল্লাসে, এক নিশ্চিন্ত ভাবনায়।

কিন্তু এখন আবার সেই শোকটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। রঞ্জীতের একটু আগের কথাগুলো কয়েকটা আলপিন হয়ে বিঁধে রয়েছে তার বুকের ভিতরে, 'এ মাসে দু-দুটো অর্ডার হাতছাড়া হয়ে না গেলে হয়তো আমরা কমপিট করতে পারতাম।'

কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে মন্দার হঠাৎ হাত দিল তার টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনে, ডায়াল ঘোরাতেই ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ, কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝল, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি।

—হ্যালো, আমি মন্দার বলছি। মন্দার মিত্র। ডোনাকে একবার ফোনটা দেবেন?

ওপাশ থেকে নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, ডোনা বাড়ি নেই।

মন্দার জানে, চিত্রদীপ তাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। করার কথাও নয়, কারণ ডোনার সঙ্গে ম্যাচ হিসেবে মন্দারের তেমন যোগ্যতা আছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। চিত্রদীপ শিল্পী মানুষ। শিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম না হলেও তাঁর বাড়ির আবহাওয়া, আদবকায়দা, পরিবেশ সবই একেবারে আলাদা ধরনের। একটা বিদেশি-বিদেশি ব্যাপারও আছে। আর সেটা বেশ উপভোগ করে মন্দার। ডোনা সুন্দরী, শিক্ষিতা, আদবকায়দায় অতীব আধুনিক, তবু সে যে কেন হঠাৎ পছন্দ করে ফেলল মন্দারকে তা তার কাছে অবোধ্য।

একটু থেমে, পরক্ষণে মন্দার আবার বলল, ডোনা কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে বলতে পারবেন?

—কখন ফিরবে বলতে পারব না। কোথায় গেছে সেটা জানিয়ে গেছে আমাকে। মা-মেয়ে দুজনে মিলে একটা গাড়ি কিনবে স্থির করেছে। তার মডেল পছন্দ করতে বেরিয়েছে ঘণ্টাদুয়েক আগে।

মন্দারের বিস্ময় চাপা থাকল না, গাড়ি কিনতে? ইয়ে মানে কোন গাড়ি?

—ওই চার চাকার গাড়ি আর কি।

খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কথা বলছেন চিত্রদীপ, কিন্তু মন্দার ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। চিত্রদীপ মারুতি কিংবা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কেনার কথা বলছেন কি না। ডোনাদের বাড়ির অবস্থা সে যতদূর

BanglaBook.org

জানে, তা এই মুহূর্তে গাড়ি কেনার মতো নয়। তার শিল্পী-বাবার যা আয় তাতে হেসেখেলে সংসারটা চলে যায়, কিন্তু আবার একটা গাড়ি কেনার মতো হয়ে ওঠেনি। আগের সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটাই তো বিক্রি করে দিয়েছে মেইনটেন করতে পারছে না বলে। তবু হয় তো—।

মন্দার আবারও বিস্মিত হয়ে বলল, তা ওরা মানে ডোনা আর তার মা গাড়ির মডেল পছন্দ করতে গেল! ওরা কি পারবে!

—না পারার কি আছে।

—মানে আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হত না?

—আমার যাওয়ার আর কী দরকার। আই অ্যাম ওল্ড হ্যাগার্ড। ওদের সঙ্গে শিহরণ গেছে —দ্যাট বাস্টার্ড। বাস্টার্ড! আবারও থমকালো মন্দার, শিহরণ মানে ডোনাদের বাড়ি যিনি পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন। তিনি তো ইংরাজির অধ্যাপক বলে মন্দার জানে। তাঁর নিজের সংসার চালচুলো বলতে কিচ্ছু নেই। গাড়ির মডেল কি তিনি পছন্দ করতে পারবেন! কে জানে—

মনে-মনে খুবই রাগ হয়ে গেল মন্দারের। গাড়ি কিনবে ডোনারা, তা সেটা মন্দারকে একটু বলতে পারত না! এই কিছুদিন আগেই সে নতুন মারুতিটা কিনেছে। সেসময় সে কলকাতার যাবতীয় গাড়ির ডিলারদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়েছে, কোন মডেলের কত দাম, কোন গাড়ির সবচেয়ে ভালো পিক-আপ, কোন গাড়ির তেল-খরচ সবচেয়ে কম, কোন ডিলার সবচেয়ে বেশি কমিশন দিতে পারেন ক্রেতাকে। এ সমস্তই তার নখদর্পণে। যে মানুষটা সদ্য গাড়ি কিনেছে, ডোনা তো তার কাছ থেকেই পরামর্শ নিতে পারত। নিদেন একবার তাকে ফোনও তো করতে পারত।

না কি ডোনার একবারও মনে হয়নি মন্দারের কথা! তাছাড়া হঠাৎ গাড়ি কেনার মতো টাকাই বা ওরা পেল কোত্থেকে! এই তো ক'দিন আগে দিল্লি রোড দিয়ে তুমুল গতিতে গাড়ি চালাতে-চালাতে ডোনা বলেছিল, তার নিজের একটা গাড়ি থাকলে সে ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরুতে পারত। মন্দারের মুখে একবার এসে গিয়েছিল, তা চলো না, এই গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। এই গাড়িটার অর্ধেক তো তোমার। বলেনি অবশ্য কথাটা, কারণ তাতে ডোনা তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরুবার দিনক্ষণ ভাঁজতে বসবে। তার তো আর চারপাশের পৃথিবী নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা নেই। সে তো প্রায় জন্ম ভবঘুরে। কিন্তু এভাবে বেরিয়ে পড়লে মন্দারের তো চলবে না।

আসলে মন্দার বুঝতে পারে, অল্পবয়স থেকেই ডোনা ফাস্ট লাইফ লিড করতে অভ্যস্ত। তারা একসময় আমেরিকায় বসবাস করে এসেছে। দেশে ফেরার সময় সেখানকার বোহেমিয়ান জীবনযাপন, আদবকায়দা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। এহেন উড়নচণ্ডীকে কীভাবে শাসনে রাখবে মন্দার তা বুঝতে পারে না।

তা ছাড়া ক'দিন আগে খবরের কাগজে ডোনার যে ছবিটা বেরিয়েছে, তা মন্দারের কাছে রীতিমতো শকিং। এভাবে বেআব্রু হয়ে স্টুডিওতে সবার সামনে ছবি তুলেছে, তা ছাপাতে পেরেছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, এই ব্যাপারটা ভাবতেই পারে না মন্দার। যে-পরিবারে বড় হয়েছে মন্দার, তা রক্ষণশীল আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতোই। তার বাবা-মা ভেবে রেখেছেন কোনও নরমসরম বাঙালি মেয়ে তাদের ঘরে বউ হয়ে আসবে। তাঁদের চিন্তাভাবনার পথে ডোনার মতো মড মেয়েকে কেমন লাগবে তা ভেবে মন্দার দিশেহারা। অথচ ডোনার বেহিসেবি বাঁধন কাটিয়ে তার পক্ষে এখন ফেরাও কঠিন। ডোনা আসলে একটা নেশার মতো, তার ভালোবাসা উদ্দাম, উচ্ছল, যার বাঁধভাঙা তোড়ে উধাও হওয়া যায় অসীমের টানে। সে ভালোবাসা আবার কোনও বাঙালি ঘরের নরম মেয়ে দিতে পারবে না কখনও। ডোনা-নামী সেই তুমুল নেশা ছেড়ে মন্দার তাহলে কীভাবে থাকবে।

বাস্টার্ড শব্দটি মনের ভেতর আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। ক'দিন আগে ডোনাদের বাড়ি ঢোকার মুখে শুনতে পেয়েছিল, চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে শিহরনকে নিয়ে প্রবল কলহ হচ্ছে।

BanglaBook.org

সে সময় চিত্রদীপের মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছিল। কোনও পুরুষই বোধহয় তার স্ত্রীর জীবনে অন্য পুরুষকে সহ্য করে না।

বহুক্ষণ পর তার সহসা খেয়াল হল, শেষ বাক্যালাপটি দীর্ঘক্ষণ আগে করে চিত্রদীপ কখন যেন ওপাশে টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, আর সেও দীর্ঘক্ষণ রিসিভার হাতে নিয়ে আবোলতাবোল ভেবে চলেছে।

লজ্জা পেয়ে রিসিভার রাখতেই শুনল, প্লাইউডের পার্টিশনের ওপাশে সুমনার উচ্ছ্বসিত গলা জানেন রঞ্জীতদা, ক্যারিসমা সিন্ডিকেট দু-মাস টলিয়ে তারপর আজ চেক ইস্যু করল। উহ্, যা ধকল আর টেনশান গেছে না আমার ওপর দিয়ে।

রঞ্জীত সঙ্গে-সঙ্গে বলল, যাও, বসকে খবরটা দিয়ে এসো এক্ষুনি।

সুমনার সঙ্গে রঞ্জীতও চলে এল মন্দারের কাছে, স্যার গুড নিউজ। মন্দার হেসে বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু সুমনা। তুমি কোম্পানির জন্য ক'দিন ধরে যা ট্রাবল নিয়েছ, তাতে আপাতত শুধু ধন্যবাদই জানাচ্ছি। পরে নিশ্চয়ই কোনও প্রেজেন্টস দিতে পারব তোমাকে। রঞ্জীত, তুমি তাহলে এ টু জেড-এর টেন্ডার পেপার তৈরি করে ফেলো—। কুইক।

রঞ্জীত বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই মন্দার আবার বলল, আগে কম্পিটিশনে নামি তো, তারপর দেখা যাবে—।

॥ ১১ ॥

সকালে উঠেই চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে যাওয়ার কথা অলর্কের, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার মুখেই এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা তাকে রীতিমতো চমকে দিল আজ। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই দেখল, সিঁড়ির গোড়ায় কুণ্ডলি পাকানো একখণ্ড কাগজ পড়ে আছে নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। হয়তো অদরকারি কাগজই, ফেলে দিতে হবে ওয়েস্ট পেপার ফেলার ঝুড়িতে, এমন ভাবতে-ভাবতে কাগজখণ্ডটি তুলে কী লেখা দেখতে গিয়েই তাজ্জব। তাতে হিজিবিজি অক্ষরে লেখা কয়েকটি শব্দ, যা অতিকষ্টে উদ্ধার করতেই সে উপলব্ধি করল সেগুলো শব্দ নয়, অ্যাটম বোমাই যেন। লেখা আছে তোমার আয়ু মাত্র আর কয়েকদিন।

মাত্র কয়েকদিন নিজের ভেতর সহসা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে গেল অলর্ক। সে এখন কলকাতার অন্যতম ধনী ব্যক্তি, বোধহয় বিলিওনেয়ার শব্দটাই তার নামের পাশে এখন দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। তার মাথায় এখন অনেক পরিকল্পনা, সামনে লক্ষ কাজের পাহাড় যা রূপায়িত করতে দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে চলেছে ভূতের মতো। এহেন মুহূর্তে তার আয়ু মাত্র কয়েকদিনের হলে চলবেই বা কী করে? ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল, তবু সে প্রতিমুহূর্তে আজকাল অনুভব করতে পারে, তার চারপাশে শত্রুর সংখ্যা এখন অনেক। বহু প্রতিহিংসার নজর সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের মতো। কেউ বা কারা যেন সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মতো। যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর। কয়েকদিন ধরেই দেখছে, বিশাল একটা কালো রঙের মোটরবাইক তার গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গতিতে। দু-তিনটি গগলস পরা যুবক তাতে বসে, সবই অচেনা, কিন্তু তারা এভাবে গুমগুম শব্দে বাইক চালিয়ে প্রতিমুহূর্তে তাকে ধমক দিয়ে চলেছে যেন। দেখলেই মনে হয় ভাড়াটে খুনি, কেউ বা কারা হয়তো তার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে এদের।

অলর্ক খুবই সাহসী, এসব ধমক পরোয়া করে না তেমন, তাই পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়নি এতদিন, আজ চিরকুটটা হাতে পেতেই মনে হল, একবার থানায় জানিয়ে রাখলে ভালো হত। কিন্তু

BanglaBook.org

কী বলেই বা জানাবে। জানাতে গেলে হয়তো পুলিশই ফেউয়ের মতো লেগে থাকবে তার পিছনে। তার টাকার গন্ধে চকচক করতে থাকবে তাদের মুখগুলো।

অনেক ভেবেচিন্তে, যাতে ছোটখাটো প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে, একটা বিদেশি পিস্তল জোগাড় করে ফেলেছে অলর্ক। খুবই আধুনিক মারণাস্ত্র, অনেক দূর থেকেও পেড়ে ফেলা যায় শত্রুকে। তা হাতে পেয়ে কয়েকদিন ধরে নাড়াচাড়া করে দেখেছে, শরীরে বেশ সাহস এনে দেয় যন্ত্রটা। চিরকুটটা বার দুই পড়ার পর তার অজান্তেই ডানহাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে ফেলল কোমরে গুঁজে রাখা নতুন পিস্তলের বাঁট। সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল তার শরীরটা। বুঝতে পারছে না, কে লাগিয়ে দিল এই ভাড়াটে খুনিদের। সেই রাজপ্রাসাদপ্রতিম বাড়ির হরিশঙ্করবাবু, না কি তার সেই একদা প্রেমিকার নবতম প্রেমিকটি। যে-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে কি অলর্ককে শেষ পর্যন্ত একটা এসপার-ওসপার করতেই হবে।

পিস্তলটির শরীর ছুঁয়ে অলর্ক একমুহূর্তে যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। 'আয়ু মাত্র কয়েকদিনের' শব্দগুলো তাকে বারবার প্রবলভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। কার আয়ু—তার না তার প্রতিপক্ষের?

কয়েকদিন আগে হরিশংকর চৌধুরি তার বাড়িতে এসেছিল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে। বীরভ পুরের রানিমাকে খুন করেছিল যে সাংবাদিকটি, সে নাকি ঘোরাফেরা করছে অলর্কের বাড়ির কাছাকাছি। হরিশংকর চৌধুরি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল, রানিমাকে আপনিই খুন করিয়েছেন ওই লোকটিকে পাঠিয়ে—

অলর্ক অবাক হয়ে বলেছিল, আমি!

—হ্যাঁ। লোকটাকে সেদিন আপনার অফিসেও দেখলাম। শুধু দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে এই যা। শুনে অলর্ক যেমন বিস্মিত, তেমনই শঙ্কিত। কেন তার আশেপাশে সর্বক্ষণ ঘুরছে লোকটা। কী মতলব তার।

পিস্তলটি নিয়ে এর মধ্যে বারকয়েক প্র্যাকটিসও করেছে সে। ঠিক কতদূর থেকে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হবে এখনও জানে না। দুশো গজ, কিংবা দুশো বিঘৎ—দুরত্ব যাই হোক না কেন, তাকে জিততেই হবে সেই লড়াইয়ে। হয় এসপার, না হয় ওসপার।

কিন্তু হঠাৎ যদি চোরাগোপ্তা কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। অন্ধকারে, গোপনে, কিংবা পেছন থেকে। এমন ভাবতে-ভাবতে সে তার বিশাল ঝকঝকে গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে তার এখন অনেক কাজ। পরপর অনেক আলোচনা সেরে নিতে হবে। লোকটি যেমন গুরুগম্ভীর, তেমনই ভারী আনপ্রেডিকেটেবল। শিল্পীরা এমন অদ্ভুত ধরনের হয়, তারা আর পাঁচটা মানুষের থেকে যে আলাদা, তা ক'দিনে বুঝে ফেলার পর চিত্রদীপকে নিয়ে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে তাকে। খুবই বড় শিল্পী চিত্রদীপ, বড় বলেই এরকম পাগলা ধরনের।

আর এরকম একজন বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করা কী যে ঝকমারি ব্যাপার তা এখন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছে অলর্ক। প্রথমে চিত্রদীপ সরাসরি প্রত্যাখান করেছিলেন তাকে। কিন্তু অলর্ক প্রথম থেকে ঠিক করে রেখেছে, তার প্রজেক্ট সে যেভাবে করবে বলে মনে করেছে, ঠিক সেভাবেই করবে। তা সে যে-কোনও মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন। ওই সঠিক লক্ষে এগিয়ে যাওয়ার পথে সে আপাতত সফল। এতগুলো ছবি একসঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় চিত্রদীপই শুধু অবাক হয়েছেন তাই নয়, তাঁর পরিবারের বাকি সবাইও তাজ্জব। তারা জেনেছে, তাহলে চিত্রদীপের ছবিও বিক্রি হতে পারে। তাহলে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিও একজন প্রতিভাবান শিল্পী।

তাঁদের এই আকস্মিক বিহ্বলতার মধ্যেই অলর্ক তার কাজ হাসিল করে নিয়েছে টায়েটায়ে। চিত্রদীপ শেষ পর্যন্ত অলর্কের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এখন পুরোপুরি মগ্ন ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের লে-আউট তৈরির কাজে। কাজটি তাঁর কাছে অদ্ভুত, কিন্তু দারুণ লাগছে আপাতত। কাজটা চ্যালেঞ্জিং

BanglaBook.org

বটে। কিন্তু অলর্কের কোনও সাজেশনেই কর্ণপাত করেননি।

কয়েকদিনের মধ্যেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলির জন্য একটি চমৎকার লে-আউট প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছেন চিত্রদীপ। আপাতত পাঁচটি শো-রুমের কাজ শুরু হবে, তার জন্য নকশা একটাই, শুধু রঙের আর দৃশ্যপটের তারতম্য করে প্রতিটি শো-রুমের বৈচিত্র্য আনতে চান তিনি। অলর্কের লিন্ডসে স্ট্রিটের স্পেসটাই বৃহত্তম, একতলা-দোতলা মিলিয়ে প্রায় সাতহাজার স্কোয়ার ফুট, তাই এই শো-রুমটির ভিতরে শুধু নীল আর নীল। তাঁর যে ছবিগুলোতে শুধু নীলরঙের ছড়াছড়ি সেগুলিই এই শো-রুমটিতে টাঙাবার পরিকল্পনা করেছেন। ছবির সঙ্গে রং মিলিয়ে প্রতিটি দেওয়াল। তার মাঝখানে নীলরঙের প্রাধান্য দিয়ে এখানে ওখানে ম্যুরাল।. শো-রুমের কোথাও প্লাইউডের পার্টিশন, কোথাও কাচের। প্লাইউডের ওপর কখনও হালকা নীল, কখনও ঘন নীলরঙের ঢেউ-ঢেউ ডিজাইনওয়ালা সানমাইকা। শো-উইনডোতে কয়েকটি ন্যুড মডেল। তার সঙ্গে যেখানে যেমন প্রয়োজন আলোর কাজ। ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে মনে হবে যেন কোনও সমুদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। তার সেই অফুরন্ত জলরাশির ভেতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাসের মতো নগ্ননারীরা।

হঠাৎ কোনও নতুন কাস্টমার শো-রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লে নিশ্চিন্ত দিশেহারা হয়ে পড়বে। এমন অলৌকিক পরিবেশে ঘুরে-ঘুরে জিনিসপত্র কেনার থ্রিলই তো অন্যরকম।

লিন্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমে যদি নীল রঙের ছড়াছড়ি হয়, তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে শো-রুমটিতে হবে সবুজের প্রাচুর্য। এখানে এমন উপছানো সবুজের ঢেলখেল, যেন তা হবে প্রকৃতির এক চমৎকার ল্যান্ডস্কেপ। যেন কোথাও সবুজ ধানখেত, কোথাও ঘন বাঁশবন ঝুঁকে আছে ক্রেতার মাথার ওপরে, কখনও বা বিশাল শাল সেগুনের ছায়ায়-ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্রেতারা।

ঠিক তেমনই হাতিবাগানের শো-রুমে থাকবে ঘন ও হালকা খয়েরি রঙের ছড়াছড়ি। দূরে একটা গ্লোব এমনভাবে রাখা থাকবে যেন পৃথিবীটাই কেউ দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীর বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে। আসলে শো-রুমটি করা হচ্ছে মানুষ চাঁদে গেলে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখতে পাবে তারই আদলে। চাঁদের গায়ে যে অসংখ্য নগ্ন পাহাড়, ধু-ধু জলহীন সমুদ্র, গিরিখাত আছে, তাতে যে খয়েরি, কালচে-খয়েরি রঙের প্রাধান্য, চিত্রদীপ তাই-ই ফোটাতে চেয়েছেন এখানে।

পাশাপাশি শ্যামবাজারে মরুভূমির দৃশ্য। তার ভেতরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি যেন হবে একটি চমৎকার মরুদ্যান। কয়েকটি খেজুর গাছ এমন চমৎকার ভাবে এঁকেছেন যে, তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার আরামই আলাদা। আর গড়িয়াহাটের শো-রুমে অন্য এক চমক, সেখানে সাদা রঙের কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বরফের দেশ। তার সঙ্গে থাকবে এয়ারকন্ডিশনের কৃত্রিম শীত। এস্কিমোরাই যেন বিক্রেতার ভূমিকায়।

চিত্রদীপকে যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে অলর্ক। প্রতিটি শো-রুমের জন্য মডেল তৈরি করে সেগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে চিত্রদীপ ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, এখন বলো, কেমন লাগছে এগুলো?

বিহ্বল অলর্ক শুধু বলতে পারল, সুপার্ব। আমি কিন্তু এর দশভাগের একভাগও এক্সপেক্ট করিনি। সত্যিই আপনার প্রতিভা এতদিন শুধু অপচয় হয়েছে।

—নাও য়্যু গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর প্রজেক্ট।

—আমি কিন্তু আপনার এই শিল্পকর্মের নমুনা সহ কাগজে আলাদা করে বিজ্ঞাপন দেব প্রতিটি শো-রুম ওপেনিং-এর সময়। এমন শৈল্পিকভাবেও যে শো-রুম সাজানো যায় তা এতদিন এই শহরের বাসিন্দারা জানত না। 'এ টু জেড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস' দেখে সবাই নিশ্চিতভাবে চমকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার হবেন আপনিই।

চিত্রদীপ পাইপে খানিক ধোঁয়া উড়িয়ে হেসে বললেন, আগে কাজটা কমপ্লিট হোক—।

BanglaBook.org

এবার খানিক ইতস্তত করে অলর্ক বলল, কিন্তু এই ডিজাইনের জন্য আপনার পারিশ্রমিক কত তা কিন্তু বলেননি এখনও—।

গত কয়েকদিন রাতদিন পরিশ্রম করে তাঁর স্টুডিওতে কাজগুলো করছেন চিত্রদীপ। এ ধরনের কাজ আগে কখনও করেননি, তাই ব্যাপারটা তাঁর মনে হয়েছিল চ্যালেঞ্জিং। তারপর কাজ করতে-করতে মনে হয়েছে এই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের পুরো ব্যাপারটাই একধরনের শিল্প। শুধু প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন কমোডিটির জন্য র‍্যাক তৈরি করা, দামি সানমাইকা দিয়ে কাউন্টার বানানো, আর শো-উইন্ডোয় মডেল রেখে দিলেই তা ইনটেরিয়র ডেকরেশন হয় না। তাকে শৈল্পিক সুষমায়ও উন্নীত করে তোলা যায়। এক-একটি শো-রুম হবে এক একটি চিরস্থায়ী গ্যালারি। এ টু জেড-এর প্রতিটি শো-রুমেই থাকবে চিত্রদীপের প্রতিভার এ টু জেড স্বাক্ষর।

একটু ভেবে চিত্রদীপ বললেন, শিল্পী যখন ছবি আঁকে, তখন তা কত দামে বিকোবে তা ভেবে আঁকে না। এই কাজটা করার সময়ও শিল্পের কথা ভেবেই দিনরাত খেটেছি। টাকার কথা ভেবে করিনি। তবে আমার ছবিগুলোর দাম বাবদ তুমি যে টাকা এ পর্যন্ত দিয়েছ, তা এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেক। আপাতত আর কিছু না হলেও চলবে।

অলর্ক চমকে উঠল রীতিমতো। একজন শিল্পী গত কয়েকদিন পাগলের মতো খেটে এতগুলো দুর্দান্ত মডেল, লে-আউট তৈরি করার পর এখন কিনা বলছেন, আপাতত কিছু না হলেও চলবে!

প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গেলে অলর্ক বলল, ঠিক আছে, ও'টা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তাহলে আপাতত মডেলগুলো আমি গাড়িতে তুলে নিচ্ছি। শো-রুমগুলোর জন্য ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের কাছ থেকে টেন্ডার চেয়েছি। তারা দু-একদিনের মধ্যেই আসতে শুরু করবে আমার অফিসে-মডেল দেখে এস্টিমেট তৈরি করবে।

—তোমার অফিস কোথায়?

অলর্ক হেসে বলল, আমার বাড়িতেই অফিস করেছি আপাতত। রাসেল স্ট্রিটে।

—ও, চিত্রদীপ আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। কথা বলতে-বলতে মাঝেমধ্যেই এমন হারিয়ে যান নিজের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সম্বিত ফিরে পান। তৎক্ষণাৎ ডেকে ওঠেন, ডোনা, ডোনা—।

ডোনা বোধহয় এতক্ষণ নিজের ঘরেই ছিল। বহুক্ষণ এ-বাড়িতে এসেছে অলর্ক, বেলা ন'টা নাগাদ, এখন দশটা পনেরো বাজে তার ঘড়িতে, এতক্ষণ ডোনাকে দেখেনি বলে তার একটু যেন আশ্চর্যই লাগছিল। চিত্রদীপের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডোনা, অলর্ককে দেখে চমকে বলে উঠল, আরে আপনি!

ডোনার পরনে একটা ঘন গোলাপি রঙের গাউন, পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে আছে গাউনের ফ্রিল, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, তাতে তাকে দেখাচ্ছে কোনও ইউরোপিয়ান তরুণীর মতো। তার ফরসা রঙে, চোখের চটুলতায়, পোশাকের অভিনবত্বে ফুটে উঠেছে তার বিদেশিয়ানা। কিছুক্ষণ তাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার পর অলর্ক হাসল, অনেকক্ষণ হল এসেছি, এখন যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

—তাই! জানতে পারিনি তো, ও হো, এতক্ষণ শিহরনদার ঘরে জোর আড্ডা হচ্ছিল যে। নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে, কোথায় যাওয়া যায়, তারই প্ল্যান করছিলাম। শিহরনদা বলেছে সমুদ্র, মা বলছে পাহাড়, আমি বলেছি, উঁহু সমুদ্র পাহাড়, জঙ্গল কোনওটাই নয়। লোকালয়ের বাইরে কোনও আনকমন স্পটে। যে-স্পট আমরা হঠাৎ যেন এক্সপ্লোর করব।

—ফাইন, অলর্ক অনায়াসে অ্যাপ্রুভ করল ডোনার প্রস্তাব, কোনও আনকমন জায়গা আমারও পছন্দের। তা হবে আমার একান্তই নিজের, এক্সক্লিউসিভ।

ডোনা ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে চিত্রদীপের টেবিলে হিপ হয়ে থাকা মডেলগুলোর দিকে। কয়েকদিন ধরে চিত্রদীপ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তা নজরে পড়েছে ডোনার, কিন্তু ঠিক

খেয়াল করে দ্যাখেনি তার বাবা ছবি আঁকছেন, না অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত। এখন মডেলগুলো দেখে সেও বলে উঠল একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে, ফাইন। এগুলো নিশ্চয় আপনার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের?

অলর্ক ঘাড় নাড়ে, অবশ্যই। প্রতিটি ডিজাইনই এক্সক্লিউসিভ, যা আমি পছন্দ করি।

ডোনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে আপনার আর কী-কী আছে এক্সক্লিউসিভ?

হাসল অলর্ক, অনেককিছুই, আমার এই যে যিশুখ্রিস্টপ্রতিম চেহারা, এটাও। যে প্রাচীন বাড়িটিতে আমি থাকি, তাও। যে রাজপ্রাসাদটি আমি দৈববলে উপহার পেয়েছি, সেটাও। আপাতত আরও একটি এক্সক্লিউসিভের সন্ধানে আমি আছি। সেটিও আমি চাই।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কী সেটা?

—একজন সুন্দরী তরুণী, যাকে আমি আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাতে পারি। শি উইল বি এক্সক্লিউসিভ ফর এ টু জেড।

ডোনা অপলক তাকিয়ে রইল অলর্কের মুখের দিকে, বলল, সেটা কীরকম?

—সেই মেয়েটি একান্তভাবেই 'এ টু জেডে'র জন্য কাজ করবে। 'এ টু জেড' তাকে সমস্ত সংবাদপত্রে এমনভাবে হাজির করবে, যাতে সে এবং 'এ টু জেড' এক ও অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে। সি উইল বি অ্যান 'এ টু জেড' গার্ল। পারিশ্রমিক হিসেবে তাকেও আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব—।

ডোনা খিলখিল করে হেসে বলল, বাহ, আইডিয়াটা তো চমৎকার। এ টু জেড গার্ল।

—আমার মাথায় আরও একটা আইডিয়া এসেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি যখন আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জন্য এতটা পরিশ্রম করলেন, তার বিনিময়ে আমিও ওঁর জন্য কিছু করতে চাই। ভাবছি ওঁর একটা একজিবিশন আমি স্পনসর করব। কলকাতার সবচেয়ে বড় গ্যালারিতে সব চেয়ে বেশি পাবলিসিটি দিয়ে, সেখানে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বেস্ট কালেকশন দেখানো হবে।

চিত্রদীপ এতক্ষণে চমকে উঠে বললেন, সে কী!

—আমার মনে হয় এতবড় একজন আর্টিস্টকে আলোর কেন্দ্রবিন্দু থেকে এভাবে আড়ালে রাখা ঠিক নয়। সংবাদপত্রে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে সমস্ত ক্রিটিকদের একটা পার্টিতে এনে খুব হই-চই করে জানাতে চাই এই শো-এর কথা। আর সেটা হবে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর উদ্বোধনের আগেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, ফাইন। আমিও এরকম একটা কথা ভাবছিলাম।

চিত্রদীপ হঠাৎ বলে উঠলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। সমস্ত ব্যাপারটা যে গুলিয়ে যাচ্ছে আমার—।

অলর্ক হেসে বলল, আপনি আবার নতুন করে আঁকা শুরু করুন, মিঃ চ্যাটার্জি। অনেক সময় শুধু প্রেরণার অভাবে, উৎসাহ না পাওয়ায় অনেক বড় প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের দেশে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনিও আঁকার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা হতে দেব না আমি।

কিছু আর বলতে পারলেন না চিত্রদীপ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন অলর্কের দিকে। ভালো করে একটা প্রদর্শনী করার তাঁরও অনেকদিনের ইচ্ছে। এর আগে যা দু-তিনটে শো করেছেন, শেষ পর্যন্ত উৎসাহের অভাবে কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে যেন।

এবার অলর্ক বলল, আমাকে কিন্তু এবার ফিরতে হবে। মডেলগুলো গাড়িতে তুলে নিতে হবে। ডোনা, উড য়্যু হেল্প মি?

ডোনা সাগ্রহে বলল, ওহ শিওর।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে অলর্ক একে-একে সমস্ত মডেলগুলো ভরে ফেলল তার গাড়িতে। এগুলো

BanglaBook.org

এখন পৌঁছে দিতে হবে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যেটি লাগবে। তারপর সেখানে গিয়ে চিত্রদীপ শুরু করবেন তাঁর আঁকাজোকার কাজ।

গাড়িতে চালকের আসনে বসে এবার অলর্ক তাকাল ডোনার দিকে, থ্যাঙ্কস অ্যা লট।

ডোনা চমৎকার করে হাসল। সে হাসির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল অলর্ক মনে-মনে বলল, আমি আরও একটি এক্সক্লিউসিভ চাই, ডোনা। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউ।

॥ ১২ ॥

উপাচার্য নীতিশ দে সরকার হঠাৎ এক জরুরি চিঠি পাঠিয়ে তলব করেছেন মণীশ রায়কে। প্রফেসরস-রুমে একা বসে ছিলেন মণীশ। তাঁর আপাতত পর-পর দুটি পিরিয়ড অফ থাকায় একটু জিরিয়ে নেবেন এমন ভাবছেন, সেসময়ে এহেন আচমকা তলবে বিস্মিত হয়ে পড়লেন ভারী। সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন, সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে চেপে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। ওপাশে রণজয় দত্ত একটা খবরের কাগজ পড়ার ভান করে বসে আছে গা এলিয়ে, মণীশকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটা চোরাহাসির স্রোত যেন ঝিলিক মেরে গেল তাঁর ঠোঁটের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। সেটা মণীশের নজর এড়ালো না, আর তাই তাঁর মুখটা শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের ভিতর। ডিসগাস্টিং—।

এমনিতেই মণীশের মনমেজাজ খুব একটা ভালো নেই ক'দিন ধরে। ঈষিতা ক'দিন ধরেই অভিযোগ করছিল, মণীশ আজকাল নাকি তাকে আর সময় দিচ্ছেন না। আজকাল মণীশ ব্যস্ত থাকেন, বইপত্র, সেমিনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানো নিয়ে। ঈষিতাকে নিয়ে অনেকদিন সিনেমায় পর্যন্ত যায়নি। মণীশ হেসে বলেছিলেন, এত ভালো কোয়ালিটি ভি. সি. পি. কিনে দিলাম, পাড়ায় দুটো বড়-বড় ভিডিও লাইব্রেরি হয়েছে, তাতেও কি তোমার সিনেমা দেখার শখ মিটছে না?

গতকাল রাতে কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল। কোথায় একা-একা মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল ঈষিতা, ফেরার পথে বাস থেকে নাকি দেখেছে, মণীশ একটা শালোয়ার কামিজ পরা মেয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের একটা সিনেমা হল থেকে বেরুচ্ছেন।

মণীশ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, তুমি ভুল দেখেছ। কাল বিকেলে আমি লাইব্রেরিতে বসে নোট নিচ্ছিলাম—।

ঈষিতা তার বক্তব্যে অনড় থেকে মুখ লাল করে বলেছে, বাজে কথা বলো না। মেয়েরা তার স্বামীকে এক মাইল দূর থেকে দেখলেও ঠিক চিনতে পারে। হাজার ভিড়ের মধ্যেও একপলক নজর চালিয়ে বলে দিতে পারে তার স্বামী কোথায় আছেন।

—কিন্তু কাল যে তুমি ভুলই দেখেছ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দিল্লির একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে পেপার পড়তে ডেকেছে সামনের মাসে। সেটা নিয়ে এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। হাতে একদম সময় নেই, আর আমি কিনা এখন যাব সিনেমা দেখতে।

প্রায় ধমক দিয়ে ঈষিতাকে কাল রাতে থামিয়ে দিয়েছেন মণীশ। কিন্তু বিছানায় শুয়ে রাতে অনেকক্ষণ একা-একা কেঁদেছে সে, বিড়বিড় করে অস্ফুটে বলেছে, তোমাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। তুমি মেয়েদের নিয়ে সিনেমায় যাও কি না যাও আমার চেয়ে ভালো করে কেউ জানে না।

সেই থেকে বাড়ির আবহাওয়া গরম। সকালেও ঈষিতা তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। ক্লাসে পড়ানোর সময় স্বভাবতই আজ তেমন ফ্রি হতে পারছিলেন না। ক্লাসের ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি বিচ্ছু। পড়ানোর ফাঁকে স্পষ্ট শুনলেন, সেকেন্ড বেঞ্চের একটা ছেলে তার পাশের জনকে ফিসফিস করে বলছে, স্যারের বাড়িতে নিশ্চয় আজ রাগারাগি হয়েছে। দেখছিস না, স্যার আজ

BanglaBook.org

ঠিক মুডে নেই। সেই ভুবনমজানো হাসিটিও নেই—।

উপাচার্যের চেম্বার মণীশদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনটে বিল্ডিং পরে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে ঘুরেই তাঁর বিশাল রাজকীয় ঘরখানা। বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠাতেই মণীশের ভেতরে যাওয়ার হুকুম হল।

মণীশ ভিতরে যেতেই মিঃ দে সরকার বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন, বসুন।

মণীশ আড়ষ্টভাবে বসলেও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, উপাচার্য তাঁকে কী কারণে ডেকে পাঠিয়েছেন। ক'দিন আগেই সেমিনারে ভালো বক্তৃতা দেওয়ায় উপাচার্য নাকি মন্তব্য করেছিলেন, ছেলেটার বেশ ফান্ডা আছে তো। তাহলে কি সেই বিষয়েই কিছু বলবেন তিনি! শিগগিরই একটা রিডারের পদ খালি হচ্ছে মণীশদের ডিপার্টমেন্টে। এহেন ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে উপাচার্যের মতামত খুবই গুরত্বপূর্ণ এমন ভাবতেই টেনশনে টান-টান হয়ে উঠলেন।

মিঃ দে সরকারের চেম্বারটি আকারে বিশাল। পুব-দক্ষিণ খোলা এই ঘরে বসলে বাঁদিকের সবুজে উমসুম খেলার মাঠটি চোখে পড়ে। এতখানি নয়নাভিরাম খোলা জায়গা পাশেই থাকার ফলে ভি.সি.-র ঘরে সর্বক্ষণেই হইহই করে হাওয়া। এমন একটা খোলামেলা ঘর রেক্সিন-আঁটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সিংহাসনপ্রতিম রিভলভিং চেয়ার, চেয়ারের পিছনে দুটো আলমারি বোঝাই মোটা-মোটা বই—সব মিলিয়ে বেশ রাজসিক পরিবেশ। এমন পরিবেশে উপাচার্যের মতো একজন গম্ভীর মানুষের টেবিলের উলটোদিকে কিছুক্ষণ বসে থাকাটা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর।

কতকগুলো ফাইল খুলে পর-পর সই করে যাচ্ছিলেন মিঃ দে সরকার। তাঁর সই বেশ লম্বা ধরনের, একটু অলঙ্কারময়ও বটে। সই হয়ে হঠাৎ ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বললেন, তুমিই তো সেদিন সেমিনারে ভালো বক্তৃতা করেছিলে, তাই না?

উপাচার্য কী বলতে চাইছেন ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে মণীশ আস্তে করে বললেন, একটা পেপার পড়েছিলাম, স্যার।

—সেদিন তোমার ওপর আমার ভালোই ইম্প্রেশন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার নামে প্রচুর কমপ্লেন এসেছে।

—কমপ্লেন! মণীশ চমকে উঠলেন।

—হুঁ। সহকর্মীদের সঙ্গে তুমি খুব ইলট্রিটমেন্ট করছ আজকাল, এমন অভিযোগ পেয়ে আমিও বিস্মিত।

মণীশ অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলেন, স্যার, তাহলে কী ঘটেছে আমি বুঝতে পারি। কমপ্লেনটা কার কাছ থেকে এসেছে?

—দু-তরফের কমপ্লেনই এসেছে আমার কাছে। একদিকে ছাত্ররাও কমপ্লেন করেছে, অন্যদিকে একজন অধ্যাপকও এসেছিল কাল।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর পিঠ দিয়ে একটা ঠান্ডা রক্তস্রোত দ্রুত নেমে গেল যেন। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। একটু পরে ঢোক গিলে বললেন, অধ্যাপকদের মধ্যে কে এসেছিলেন স্যার?

—রণজয় দত্ত। আমার কাছে অভিযোগ করেছে, দীর্ঘদিন ধরে তুমি তার বিরুদ্ধে নানান ধরনের ষড়যন্ত্র করছ, তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ।

মণীশের বুকের ভিতর নিশ্বাস আটকে গেল কয়েক মুহূর্ত। প্রফেসরস রুম থেকে উঠে আসার মুহূর্তে রণজয় দত্তের মুখে একটা বাঁকা হাসির স্রোত খেলা করছিল তা লক্ষ করেছিলেন তিনি। উপাচার্যের তলবটি যে তার অভিযোগের জন্যই এটা রণজয় তাহলে বুঝতে পেরেছিল।

—অভিযোগটা কী ধরনের, যদি আর একটু স্পষ্ট করে বলেন, স্যার।

—সেদিন তোমার সঙ্গে রণজয়ও একটা পেপার পড়েছিল সেমিনারে। তার পড়াটা তেমন

BanglaBook.org

ভালো হয়নি। কিন্তু সে ডেইস থেকে নেমে আসার পর শিহরন রায়চৌধুরি নামের একজন অধ্যাপক মাইকের সামনে গিয়ে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছে। রণজয়ের অভিযোগ, এই সমালোচনা আসলে তোমারই ইনস্টিগেশনে হয়েছে। গট-আপ।

মণীশ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, গট-আপ।

—হ্যাঁ, তুমি শিহরন রায়চৌধুরিকে ভালো করে চেনো।

মণীশ প্রতিবাদ করে বললেন, সে আজ কুড়ি বছর আগের কথা। একই ইয়ারে পড়তাম এইটুকুই। তারপর আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ নেই।

—তোমাদের ডিপার্টমেন্টে ডোনা চ্যাটার্জি নামে এক ছাত্রী আছে—।

—ডোনা চ্যাটার্জি! মণীশ বেশ অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তার নাম এই আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেল কী করে তাও বুঝতে পারলেন না।

—শিহরন রায়চৌধুরি ডোনাদের বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে। ডোনাই শিহরণ রায়চৌধুরিকে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করে। আর সেটা তোমার নির্দেশেই।

মণীশ প্রথমে কথাই বলতে পারলেন না। উপাচার্যের কথাগুলো তাঁর কাছে যেমন আশ্চর্যের তেমনি ভিত্তিহীন। প্রতিবাদ করে বলল, অ্যাবসার্ড, স্যার। শিহরন রায়চৌধুরি একটা নামি কলেজের অধ্যাপক। তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, মতামত আছে, তিনি ডোনার কথায় এরকম একটা কাজ করবেন ভাবতেও অবাক লাগছে।

—কিন্তু রণজয় তাই-ই বলেছে।

—তা এ-ঘটনার পেছনে আমার ভূমিকা রয়েছে এ-কথা সে ভাবল কী করে?

—ডোনা নাকি তোমার ভীষণ অনুরাগী। ডোনাকে ইনস্টিগেট করেছ নাকি তুমিই।

—মাই গড! এও কি সম্ভব, স্যার? আপনি এ-কথা বিশ্বাস করলেন? ডোনা তো রণজয় দত্তেরও ছাত্রী।

উপাচার্য কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মণীশের দিকে। উত্তেজিত মণীশের মুখ চোখ দেখে অনুমান করতে চাইলেন কিছু। তারপর বললেন, আরও একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি নাকি তোমার ক্লাসে পড়ানোর সময় রণজয়কে সরাসরি কটাক্ষ করে কিছু বক্তব্য রেখেছ।

মণীশ উত্তরোত্তর আশ্চর্য হয়ে চলেছেন। তাঁর শরীরের ভিতর একধরনের প্রতিক্রিয়াও হয়ে চলেছে অনবরত। তাঁর ভিতরে ক্রোধ কম, কিন্তু এখন একধরনের উত্তেজনায় ঘাম ঝরে পড়ছে তাঁর সারা শরীর থেকে।

—কী বক্তব্য, স্যার?

—তুমি জানো, রণজয় একজন আধুনিক কবি। ক্লাসে পড়ানোর সময় তুমি বলেছ, পৃথিবীর অনেক কবি-লেখকদের মধ্যে একটা কিলিং ইনস্টিংকট আছে, অনেকেই খুনি, নরকামী।

—স্যার, এখানেও আমার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। আসলে আমি সেসময় র‍্যাঁবোর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে এসে পড়ল কবি ভের্লেনের কথা। আপনি তো জানেন, এই দুই প্রথিতযশা কবি—র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের বন্ধুত্ব ছিল প্রবাদপ্রতিম। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের আকর্ষণেই ভের্লেন তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে র‍্যাঁবোর সঙ্গে ফ্রান্স ছেড়ে চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডনে তখন আরও অনেক কবি-লেখকের সমাগম হয়েছে। দুই কবি লন্ডনের সাহিত্য পারিমণ্ডলে খুঁজে পেলেন অফুরন্ত আড্ডা, মজার খোরাক। তা ছাড়াও লেখার প্রেরণা। এখানেই ভের্লেনের 'রোমান্স' নামের সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর দারুন হই-চই পড়ে যায় সাহিত্যমহলে। তার কিছুদিন পর দুই বন্ধুতে হঠাৎ কী কারণে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। যে বন্ধুর জন্য ভের্লেন তাঁর সংসার ভেঙে দিয়ে চলে এসেছিলেন লন্ডনে, সেই র‍্যাঁবোর কোনও উক্তিতে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, রাগের মাথায় রিভলভার চালিয়ে গুলি করে বসলেন তাকে। র‍্যাঁবো

ভয়ঙ্কর রকমের আহত হয়েছিলেন। আর বিচারে দু-বছরের জেল হয়েছিল ভের্লেনের। র‍্যাঁবোও তো পরবর্তীকালে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকার দুর্দান্ত চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

উপাচার্য মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনও কথা না বলে শুধু উচ্চারণ করলেন, হুম।

—আর সমকামী বলতে অস্কার ওয়াইল্ডের কথা বলেছিলাম, স্যার। অস্কার ওয়াইল্ড জীবনযাপন করতেন লাগামছাড়াভাবে। লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করার কিছুকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় সমকামিতার। লর্ড আলফ্রেড ডগলাস নামে এক তরুণের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল ওয়াইল্ডের। ওয়াইল্ড নিজেই এমন দক্ষতার সঙ্গে মামলা লড়েছিলেন যে, জুরীরা প্রথমবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। দ্বিতীয়বারের বিচারে অবশ্য তাঁর দু-বছরের জেল হয়।

উপাচার্য গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মণীশের বাচনভঙ্গিমা লক্ষ করছিলেন। হয়তো কৌতুকও অনুভব করছিলেন কিছুটা, কিন্তু গম্ভীর মুখ করে বললেন, ঠিক আছে, এখন তাহলে তুমি যেতে পারো।

—কিন্তু ছাত্ররাও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে বলছিলেন আপনি।

—ছাত্রদের অভিযোগ, তুমি ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত থাক।

মণীশ হেসে ফেললেন, হঠাৎ, আপনি একদিন ক্লাসে আমার পড়ানো দেখুন স্যার। আমি সবাইকেই সমানভাবে পড়াই।

—সে তো আমাকেই তুমি যেভাবে এতক্ষণ লেকচার দিয়ে শোনালে তাতেই বুঝে গেছি।

উপাচার্যের কথার মধ্যে এবার আর কৌতুক গোপন থাকেনি। মণীশ আবারও হাসলেন, তবে ক্লাসের বাইরে অনেকেই আমার কাছে নানারকম সাহায্য নিতে আসে। এমনকী অন্য দপ্তর থেকে কেউকেউ এসেও বইপত্র ধার নিয়ে যায়। প্রশ্নের উত্তর জানতে আসে।

—ও কে, দ্যাট উইল ডু।

মণীশ একরাশ উত্তেজনা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন উপাচার্যের ঘরে। এক নাগাড়ে নিজেকে ডিফেন্ড করতে-করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। রণজয় দত্ত যে সেমিনারের ঘটনার পরে এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা ভাবতে পারেননি। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে, ছাত্রদের দিয়েও নালিশ করিয়েছে। কোন-কোন ছাত্ররা তাঁর নামে উপাচার্যের কাছে এসে বলেছে তা জানতে ভারী ইচ্ছে করছিল তাঁর। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যার।

বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। রণজয় দত্ত কতদূর ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা ভেবে অবাক হচ্ছিলেন। রণজয়ের পূর্ব-ইতিহাস তো কিছুটা জানেন তিনি। সে ইতিহাস স্মরণ করলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেরকম কাঁটা দিয়ে উঠল এই মুহূর্তে মণীশের সমস্ত রোমকূপে। মনে হল রণজয়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়াটা বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে তাঁর। অথবা তাঁর নিয়তিই হয়তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক পরিণতির দিকে।

BanglaBook.org

॥ ১৩ ॥

কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড়-করানো মস্ত ক্যানভাসে তুলি বোলাচ্ছিলেন চিত্রদীপ। তাঁর তুলিতে এখন নীল রং। কিছুটা সমুদ্র, কিছু আকাশ। তারই তারতম্য করতে নীল রং নিয়ে ঘনত্বের অদলবদল ঘটাচ্ছিলেন ভারী মনোযোগ দিয়ে।

গত কয়েকদিন যাবৎ ভীষণ এক ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে চিত্রদীপের। পাঁচ-পাঁচটা শো-রুমের ইনটেরিয়র ডেকরেশনের জন্য বড়-বড় দেওয়াল জুড়ে ছবি আঁকা। তার ওপর প্রায় একইসঙ্গে তাঁর বিশাল চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হতে চলেছে। তার জন্যও প্রচুর ছবির প্রয়োজন। এতকাল প্রায় অকর্মা থাকার পর হঠাৎ তাঁর চাহিদা এভাবে দেখা দেবে তা ভাবতেও পারেননি। একজন প্রোমোটার তাঁর অনেকগুলো ছবি মোটা দামে কিনে নিয়ে গেছে এ-খবর বাজারে চাউর হওয়ার পর আরও প্রোমোটার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে, ছবির দরদাম করছে। আরও কয়েকখানা ছবিও ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেল বেশ ভালো দামে।

ছবিতে রং বোলাতে-বোলাতে মাঝেমধ্যে দূরে সরে এসে চোখ রাখছেন ক্যানভাসে। দূর থেকে দেখলে ছবি আরও খোলতাই লাগে। দেখতে-দেখতে আরও খানিকটা পিছোলেন, আর তখনই তাঁর মনে হল, তাঁর এই স্টাডি-কাম স্টুডিওটা আকারে বড়ই ছোট। এত স্বল্প পরিসরে তাঁর আর কুলোচ্ছে না। অন্য শিল্পীদের স্টুডিওতে কখনও-সখনও গিয়ে দেখেছেন, তাঁদের স্টুডিওগুলো দেখবার মতো। আকারে বড় তো বটেই, তার ভিতরটা চমৎকার সাজানো গোছানো। সে তুলনায় তাঁর স্টুডিও প্রায় হাস্যকর।

ভাবনাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র মনটা হঠাৎই বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তাঁর। একজন শিল্পীর বড় হয়ে ওঠা না-ওঠা অনেকখানি নির্ভর করে তার স্টুডিওর ওপর। এমন অপরিসর, অগোছালো স্টুডিওতে বসে কি ছবি আঁকা যায়। অথচ আজই 'এ টু জেড কোম্পানি'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র দু-মাস পরেও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বৃহৎ এক কপ্রদর্শনী।

ভাবতে-ভাবতে অলর্ক বসুর ভাবনাটাও কয়েক মুহূর্ত ঘাই মেরে গেল তাঁর মগজে। ছেলেটা লেখাপড়া না জানলেও তার ব্যাবসায়িক বুদ্ধিটা এর মধ্যে বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর পর-পরই তার দু-তিনটে শো-রুম খোলা হবে। কিন্তু সে-কথা আপাতত তার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই। আগে সে ফলাও করে প্রচার করতে চাইছে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনীকে। লোকে আগে শিল্পীকে চিনুক। শিল্পী বিখ্যাত হয়ে গেলে সেই শিল্পীর জাদু-আঙুলের কারুকাজ সমন্বিত শো-রুমের একটা আলাদা আকর্ষণ হবে। তখন 'এ টু জেড'-এর শো-রুমে যাওয়ার তাগিদও বাড়বে কাস্টমারদের।

অলর্কের এই ব্যাবসায়িক বুদ্ধির দৌলতে অবশ্য চিত্রীদেরও লাভ। হঠাৎ একজন শিল্পী প্রায় জিরো থেকে উঠে দৌড়ুচ্ছে চড়চড় করে। চিত্রদীপের ছবির বাজারও ক্রমশ শেয়ার মার্কেটের মতো লাফ দিয়ে উঠে যাবে অনেক দূর।

এতদিন পরে তাঁর মনে হল, সব শিল্পীরই বড় হওয়ার মূলে একজন ভালো প্রমোটার লাগে। সে যে অর্থেই হোক না কেন।

কিন্তু আপাতত তাঁর স্টুডিওটি আরও বড় করে তোলা দরকার। চারপাশে অসংখ্য ছবি, রং তুলির সরঞ্জাম এমন বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রাখতে হয়েছে যে, তাতে ভালো করে ঘোরবার ফেরবার জায়গাই নেই।

সেই মুহূর্তেই কিচেন থেকে ঘেমেচুমে বেরিয়ে এলেন বনানী। মাঝেমাধ্যে চিত্রদীপের ক্যানভাসের দিকে চোখ রেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাঁর এখন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পর তাঁরও মনে হচ্ছে, তাঁর স্বামী-দেবতাটি ভালোই ছবি আঁকেন। এখন সেরকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে চিত্রদীপ বললেন, এইটুকু স্টুডিওতে আর কাজ করা যাচ্ছে না।

বনানী চারপাশের অগোছালো ছবির পাহাড়ের দিকে নজর রেখে বললেন, ঠিক আছে, আজ দুপুরে সব গোছগাছ করে রাখব'খন। তাতে অনেকটা জায়গা বেরুবে। ডোনা ফিরুক।

—ডোনা কোথায় বেরিয়েছে?

BanglaBook.org

—ডোনা তো বেরিয়েছে শিহরনের সঙ্গে। চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, এখন, এই সকালে?

—দুজনে ব্যাডমিন্টন খেলবে। তাই র‍্যাকেট-কর্ক-নেট ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনতে গেছে।

—তা তোমাকে বাদ দিল যে বড়?

বনানী চোখে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, শিহরনকে অন্য কোথাও ঘর খুঁজে নিতে বোলো। আমি ওই ঘরে স্টুডিও শিফট করব।

বনানী খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে চিত্রদীপের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, সে এখন কী করে হবে?

—কী করে হবে মানে? চিত্রদীপ হঠাৎ প্রায় রুখে দাঁড়ালেন, যখন আমাদের অতিরিক্ত ঘর ছিল, তখন তাকে আমরা থাকতে দিয়েছিলাম। এখন নিজেদেরই ঘরের সংকুলান হচ্ছে না। এখন তাকে অন্য ব্যবস্থা দেখে নিতে হবে।

—বাহ, এতদিন এ-ঘরে বসেই তো ছবি আঁকলে, এখন আর এখানে বসে ছবি আঁকা যাচ্ছে না?

চিত্রদীপ প্রায় গর্জে উঠে বললেন, না, যাচ্ছে না। এতটুকু জায়গায় ভালো করে চলাফেরা করাই যায় না। ছবি আঁকতে গেলে নিরিবিলি চাই, আলাদা পরিবেশ চাই, মনের কনসেনট্রেশন চাই।

বনানী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে।

একটু পরে চিত্রদীপ আবার বললেন, তুমি যদি বলতে না পারো, তাহলে আমি বলে দেব।

বনানী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলেন, না, বলতে পারবে না।

—ও, খুব যে তার ওপর তোমার দরদ দেখছি।

—দরদ যতটা আমার, তার চেয়ে তোমার মেয়ের এখন বেশি। সে এখন শিহরনদা বলতে অজ্ঞান।

চিত্রদীপ ভুরু কুঁচকে বনানীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন, আবারও ঝেঁঝে উঠে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। বনানী তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে বললেন, ওই বোধহয় ওরা এসেছে। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। কিন্তু শিহরন বা ডোনা নয়, দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দার।

বনানী মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, ও তুমি, ভিতরে এসো—।

মন্দার ভিতরে আসতেই আবার দরজা লাগিয়ে দিলেন বনানী।

চিত্রদীপ মন্দারকে খুব একটা পছন্দ করেন না কোনওদিন। আজ তার এমনিতেই মুড খারাপ ছিল। হঠাৎ এহেন পরিস্থিতিতে মন্দারের দিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আবার মনোনিবেশ করলেন তাঁর ক্যানভাসে।

অবস্থা সামাল দিতে বনানী মন্দারকে বললেন, তুমি সোফায় একটু বোসো। আমি ততক্ষণে চা করে আনি।

মন্দার ঘরের ভেতরে ঢুকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চিত্রদীপ এবং বনানী দুজনে যে একটু আগে কথা কাটাকাটিতে ব্যস্ত ছিলেন সেটুকু বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল, ডোনা বাড়ি নেই?

বনানী চা করার উদ্যোগ নিতে কিচেনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন, না, ওরা একটু মার্কেটিং-এ গেছে।

BanglaBook.org

মন্দার অবাক হয়ে বলল, ওরা মানে—।

—ডোনার সঙ্গে শিহরন গেছে। ওই যে, শিহরন—

—ও, মন্দার চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার বলল, তাহলে আমি এখন উঠি—

—উঠবে কেন। একটু বোসো না। ওরা বোধহয় এখনই এসে পড়বে। সেই আটটা নাগাদ বেরিয়েছে। ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম কিনতে গেছে দুজনে। তুমি বোসো—।

বনানী কিচেনের মধ্যে ঢুকে যেতে মন্দার চুপচাপ বসে রইল। চিত্রদীপ চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর ক্যানভাসের দিকে। ছবিটা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সমুদ্রের ভিতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাস, এরকম একটি থিম নিয়ে আঁকা হচ্ছে ছবিটা। ভেনাসের শরীর অবশ্য পুরো আঁকা হয়নি। কিন্তু যেটুকু ফুটে উঠেছে ছবির মধ্যে, তাতে বোঝা যাচ্ছে তার সুন্দর অনাবৃত দেহসৌষ্ঠব। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই মন্দারের শরীরটা শিরশির করে উঠল। শিল্পীরা কেমন করে ঘরের মধ্যে সবার সামনে এসব ছবি আঁকেন তা সে বুঝে উঠতে পারে না। আসলে শিল্পীদের বাড়ির আবহাওয়া বোধহয় এরকম হয়। আর এজন্যই বোধহয় ডোনা অবলীলায় সাবানের বিজ্ঞাপনে নিজেকে প্রকাশ করে।

সেই সকাল থেকে নীল রং নিয়েই মগ্ন ছিলেন চিত্রদীপ। হঠাৎ তাঁর তুলি চুবিয়ে নিলেন লালরঙের মধ্যে। কখনও মন বিক্ষিপ্ত থাকলে কিংবা রাগ হলে তিনি লাল রঙের মধ্যে ডুবে থাকেন। এখন হঠাৎ সমুদ্রের প্রান্তে দিগন্তরেখায় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন লাল রং। যেন সূর্য উঠবে এখনই, অথবা সূর্য এইমাত্র দিগন্তরেখা থেকে লাফ দিয়ে উঠে আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তাভ রশ্মি। সেই রশ্মি থেকে আবার প্রতিফলিত হচ্ছে লালাভা।

একটু পরেই কিচেন থেকে বনানী বেরিয়ে এলেন চায়ের কাপ হাতে। এ-বাড়ির চায়ের কাপগুলি চমৎকার রঙিন হয়। এই কাপটার রং প্রায় চায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো। প্লেটের রং-ও তাই। সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর।

সেন্টার টেবিলের ওপর চায়ের কাপপ্লেট রেখে বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ডোনার দেখা হয় না!

চায়ে চুমুক দিয়ে মন্দার চোখ তুলল, হয়। তবে এবার অনেকদিন হয়নি।

বনানী চুপ করে থেকে তারপর বললেন, তোমার হাতে বোধহয় এখন অনেক কাজ, তাই না?

—ঠিক তা নয়। তবে একটা বড় কাজের সন্ধান পেয়েছি। যদি টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়, তাহলে প্রায় চারমাস লেগে যাবে শেষ হতে।

—বাহ্! তা কত টাকার টেন্ডার?

—অনেক। আমার অবশ্য অত টাকা নেই। তবু যদি কাজটার সিকিভাগও পাই তবে আপাতত আমার কোম্পানির একটা হিল্লে হয়ে যায়।

বনানী কিছু বলার আগেই বাইরে গাড়ি আসার শব্দ হল। একমুহূর্তে সেদিকে কান রেখে বনানী বললেন, ওই বোধহয় ডোনারা এল। তুমি একটু ডোনার ওপর নজর রেখো। মেয়েটা বড্ড উড়ু-উড়ু হয়ে যাচ্ছে কেমন।

তার কথা শেষ না হতেই গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হল বাইরে। তারপর দরজা খুলে ফের বন্ধ করল কেউ। পরক্ষণেই ডোরবেল বেজে উঠল।

বনানী দরজা খুলতেই দেখলেন, বাইরে ডোনা আর শিহরন। দুজনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট। তাদের খেলার সরঞ্জাম। মন্দারকে দেখেই ডোনা বলে উঠল, হাই।

মন্দার হাসল। শিহরন ঘরে ঢুকে একমুহূর্ত মন্দারের দিকে তাকিয়ে বনানীকে বললেন, এই নাও। তোমার মেয়ে বোধহয় স্পোর্টসম্যান না হয়ে ছাড়ছে না।

BanglaBook.org

শিহরনের কথার উত্তর না দিয়ে বনানী ডোনাকে বললেন, এই দ্যাখ। মন্দার কতক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। তোর সঙ্গে আজকাল নাকি ওর দেখাই হয় না—।

ডোনা ঠোঁট উলটে বলল, দেখা আর হবে কী করে। হি ইজ নাউ অ্যা বিজি গাই। বিজনেস নিয়ে এত বিজি হয়ে পড়েছে—। তারপর শিহরনের দিকে তাকিয়ে বলল, প্লিজ শিহরনদা, গাড়িটা একটু গ্যারেজ করে দেবে?

শিহরন বাইরে চলে গেলে ডোনা এবার মন্দারের দিকে তাকায়, কাম ইন মিস্টার। তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া জমে আছে। তোমার তো আজকাল দেখা পাওয়াই ভার।

—আমার, না তোমার?

ডোনা হেসে বলল, মা, একটু চা হবে? তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে—।

মন্দার আর ডোনার ঝগড়ার রকম দেখে বনানী হাসতে-হাসতে আবার কিচেনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ডোনা তক্ষুনি বলল, চলো, আমার ঘরে যাই। এ-ঘরে বেশিক্ষণ আড্ডা মারলে ড্যাডি রেগে ফায়ার হয়ে যায়। ড্যাডি ইজ নাউ অ্যা ভেরি বিজি আর্টিস্ট।

শেষ কথাগুলো ডোনা তার বাবার উদ্দেশে ছুড়ে দিয়ে মন্দারকে নিয়ে এল তার ঘরে।

ডোনার ঘরখানা আকারে খুব বড় নয়। কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো, টিপ-টপ। ঘরে একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। তার ওপর নরম গদির সঙ্গে চমৎকার ফুল-কাটা বেডকভার। ঘরের এককোণে ড্রেসিং টেবিল। অন্যকোণে শোকেস। শোকেসের ভিতর বইপত্তর, খাতা। শোকেসের ওপর একটা চিনেমাটির পরি। দেওয়ালে চিত্রদীপের আঁকা একখানা বিশাল ছবি। হঠাৎ দেখলে অজন্তার স্টাইলের কথা মনে পড়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্দার বলল, তোমার বাবার একটা চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে দেখলাম।

—হ্যাঁ, আজকের কাগজে বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনটা।

একটু চুপ করে থেকে মন্দার আবার বলল, 'এ টু জেড' থেকে স্পনসর করছে? কী করে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে?

—ও, সে এক-ইতিহাস। ভদ্রলোকের হঠাৎই দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে বাবার পেইন্টিংস। এখন সে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ব্লাইন্ড অ্যাডমায়ারার বলা যায়। হঠাৎ বাবার সব ছবি কিনে নিচ্ছে পটাপট। এখন একটা একজিবিশন করবে। তাছাড়া আরও একটা বড় খবর—।

—কী?

—'এ টু জেড'-এর অনেকগুলো শো-রুম খুলছে কলকাতায়। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার সমস্ত লে-আউট ড্যাডিকেই করতে হচ্ছে। সে প্রচুর কাজ।

মন্দার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বলল, তাহলে অলর্ক বোসের সঙ্গে তোমার ড্যাডির এখন খুব ক্লোজ রিলেশন?

—ভেরি ক্লোজ।

একটু পরে ইতস্তত করে মন্দার বলল, 'এ টু জেড' থেকে তাদের সমস্ত শো-রুমের ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের জন্য টেন্ডার কল করেছে, বেশ মোটা টাকার টেন্ডার। আমার কোম্পানি তাতে কমপিট করছে—।

—তাই নাকি? ডোনা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, ভারী ইন্টারেস্টিং তো।

—খুব একটা ইন্টারেস্টিং নয়। কারণ ওরা যা-যা শর্ত দিয়েছে, আমার কোম্পানি তা ফুলফিল করতে পারছে না।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন?

—'এ টু জেড' বলেছে, যেসব কোম্পানি এর আগে এককোটি টাকার ব্যাবসা করেছে কেবল

BanglaBook.org

তারাই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করতে পারবে। কিন্তু আমার কোম্পানি এ পর্যন্ত সাড়ে সাতানব্বই লক্ষ টাকার কাজ পেয়েছে, মাত্র আড়াই লক্ষের জন্য আমার 'ইন-ডেক' টেন্ডার পাচ্ছে না।

—ইস, তাই নাকি!

—হুঁ, তার জন্য তোমার কিছু কনট্রিবিউশনও রয়েছে।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল মন্দারের দিকে, বলল, আমার কনট্রিবিউশন?

—হুঁ, সেবার গুপ্তিপাড়ার আউটিঙে যাওয়ার ফলে দুটো টেন্ডার আমি মিস করেছি, যার পরিমাণ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। তোমাকে বলেছিলাম তখন, মনে পড়ে?

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। একটু পরে বলল, তখন তাহলে না গেলেই পারতে?

—তখন তো ভাবিনি, একদিনের জায়গায় তিনদিন ডিটেইনড হবে যাব।

—সেটা তো হতেই পারে। বাইরে বেরুলে ফেরার কোনও নিশ্চয়তা থাকে নাকি?

মন্দার আমতা-আমতা করল একটু, না, তা নয়। তবে বুঝিনি, হঠাৎ ডিটেইনড হয়ে যাব।

—না কি, আমাকে পাওয়ার লোভটা সামলাতে পারোনি?

ডোনা হঠাৎ এভাবে উলটে চার্জ করবে তা ভাবতে পারেনি মন্দার। থতমত খেয়ে বলল, সে কথা এখন থাক।

—তাহলে তোমার ক্ষতিটা আমি এখন কীভাবে কমপেনসেট করতে পারি?

এতক্ষণে উৎসাহিত হল মন্দার। তার চোখে চকচক করে উঠল একটা প্রত্যাশা। বলল, তোমার ড্যাডির সঙ্গে অলর্ক বোসের যখন খুব দহরম-মহরম, উনি যদি একবার আমার নামটা রেকমেন্ড করে দ্যান, তাহলে টেন্ডারটা আমি পেতে পারি। বিরাট টাকার টেন্ডার।

ডোনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পর মুখটা কালো হয়ে গেল তার। সে যেন এইমুহূর্তে এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে।

মন্দার আবার বলল, কাজটা যদি আমি পাই, তাহলে 'এ টু জেড'-এর সুবিধেই হবে। টেন্ডারে বলা আছে, যে শিল্পী এই শো-রুমগুলোর লে-আউট করছেন, তাঁর নির্দেশেই ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের কাজ করতে হবে।

ডোনা আস্তে-আস্তে বলল, ড্যাডি কি রেকমেন্ড করতে রাজি হবেন?

মন্দার থমকে গেল হঠাৎ। ডোনার মুখ থেকে এ ধরনের উত্তর পাবে তা যেন সে আশা করেনি। হঠাৎ সাগ্রহে বলল, এ-বাড়িতে অলর্ক বোস কয়েকবার এসেছেন নিশ্চয়ই।

—এসেছেন।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

—হয়েছে।

সাগ্রহে মন্দার বলল, তাহলে তুমি বলে দিলেই তো কাজটা আমি পেতে পারি। চলো না, কাল সন্ধেবেলা আমি ফ্রি আছি, এবার দুজনে মিলে ওঁর কাছে যাই।

ডোনা তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, বলল, কাল সন্ধ্যায় আমি ফ্রি নেই।

—কেন, কোথাও যাচ্ছ?

—আমার কাল একটা শ্যুটিং আছে।

—শ্যুটিং? কীসের, ছবিতে অভিনয় করছ নাকি?

—না, মডেলিঙের। হঠাৎ একটা দারুণ অফার পেয়েছি। একদিন শুটিঙের জন্য বারো হাজার টাকা দিচ্ছে আমাকে।

—বারো হাজার!

—এই রেটটা নাকি এখন কলকাতার শ্রেষ্ঠ এবং ব্যস্ততম নায়িকা নিয়ে থাকে মডেলিং করতে।

মন্দারের মুখটা কালো হয়ে এল, ও, তা কে ঠিক করে দিলেন? তোমার ওই শিহরনদা নাকি?

BanglaBook.org

ডোনা হঠাৎ হাসল, একেবারে রহস্যময়ীর মতো। তার চিলতে হাসির স্রোত মন্দারকে বিমূঢ় করে বসিয়ে রাখে ডোনার ঘরের ভিতর।

॥ ১৪ ॥

শিহরন রায়চৌধুরি নয়, ডোনাকে এবারের মডেলিঙের অফার দিয়েছে 'এ টু জেড' কোম্পানির কর্ণধার অলর্ক বোস। ডোনার রূপ, সৌন্দর্য, স্মার্টনেস সে ব্যবহার করতে চায় তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনে। তার নতুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি যেমন কলকাতার বুকে এক অন্য চমক হবে, তেমনি ডোনার উপস্থিতি হবে ফ্যাশনের যুগে এক অন্য থ্রিল। যেখানেই 'এ টু জেড'-এর বিজ্ঞাপন থাকবে, সেখানেই ডোনার ছবি। ডোনা হবে 'এ টু জেড'-এর এক্সক্লিউসিভ গার্ল।

রীতিমতো মড গার্লের সাজে নিজেকে সাজিয়ে তাদের নতুন কেনা গাড়িটা ড্রাইভ করে স্টুডিওতে চলে এল ডোনা। ঠিক দশটায় তার আসার কথা, কাঁটায়-কাঁটায় ন'টা উনষাটে পৌঁছে গেল আনোয়ার শাহ রোডের ওপর ছোট্ট স্টুডিও 'ফোটোজিনিক' এর সামনে। গাড়ি পার্ক করে যখন স্টুডিও-র দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তখন সেখানকার ঘড়িতে ঠিক দশটা। সামনের ঘরে অলর্ক আগেই এসে অপেক্ষা করছিল, ডোনাকে দেখে তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে হাসি বিস্তৃত করে বলল, দিস ইজ পাংচুয়ালিটি।

স্টুডিওটি বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার নারাণ ঘোষের। বাইরে থেকে দেখতে যত ছোট মনে হয় স্টুডিওটা, ভিতরটা সেরকম নয়। দরজা ঠেলে ঢুকেই একটা বসার ঘর, তিন-চারখানা বড় সোফা রাখা আছে একদিকে, অন্যদিকে শো-উইন্ডোতে নারাণ ঘোষের তোলা বিখ্যাত সব সিনেমাভিনেত্রী আর মডেলদের ছবি। বড়-বড় কাট-আউট। ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, নারাণ ঘোষের ফোটোগ্রাফির হাত দুর্দান্ত। তাঁর ক্যামেরার কল্যাণে অভিনেত্রী বা মডেলরা প্রায় জীবন্ত হয়ে বসে আছে শো-উইন্ডোর ভিতর। এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর মেয়ের ছবিও শোভা পাচ্ছে সেখানে। দারুণ সেক্সি-পোজের। সেই ছবিটির দিকে ডোনার চোখ কয়েক সেকেন্ড বেশি থমকে গেল নিজের অজান্তেই।

—খুব সেজেছেন দেখছি আজ, অলর্ক তার স্বভাব-সিদ্ধ সারল্যে বলে উঠল। তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে সেই অসাধারণ, সরল, বিস্ময়-মাখানো হাসি।

ডোনা সামান্য হাসল তাতে। প্রায় বিদেশি ঢঙের ঝকমকে স্কার্ট-ব্লাউজ তার পরনে, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, চোখে কালো চশমা। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে তাকে মেরিলিন মনরো বলেও ভাবা যেতে পারে। প্রায় সেরকমভাবে সেজে এসেছে যাতে 'এ টু জেড'-এর বিজ্ঞাপনে দারুণ চনমনে দেখায় তাকে। কিন্তু অলর্ক বলল, তোমাকে কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি কন্যার সাজেই দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে।

বাঙালিকন্যা শব্দটা কেমন অদ্ভুত শব্দে বেজে উঠল ডোনার কানে। অনিবার্যভাবেই তার চোখ চলে গেল ঘরের কোণে রাখা বিশাল সাইজের আয়নাটার দিকে, সেখানে এই মুহূর্তে ওই শব্দটির ঠিক বিপরীত অবস্থানে সে দাঁড়িয়ে। অলর্কের দিকে সামান্য বিস্মিতচোখে তাকিয়ে এবার সে তার চোখ থেকে রহস্যময় কালো চশমাটি খুলে ফেলল।

স্টুডিওর সময় চলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নারাণ ঘোষ এখন এই শহরের ব্যস্ততম ফোটোগ্রাফার। প্রতি আট ঘণ্টার জন্য তাঁর স্টুডিওর ভাড়া হাজার ছয়েক। কলকাতার বিখ্যাত সিনেমা ম্যাগাজিন, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যায় তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রকাশিত হয়। অনেক মডেল নারাণ ঘোষের ক্যামেরা ছাড়া অন্য কারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই রাজি হন না। এহেন নামি

BanglaBook.org

ক্যামেরাম্যান ডোনার সামনে এসে চটপট তাড়া দিলেন, নিন, মেকআপ রুমে বসে যান। কুইক।

মেকআপ রুমে নামি বিউটিশিয়ান বেবি মিত্র দশটার আগেই তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে হাজির হয়েছেন। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেরিলিন মনরোকে এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি বানিয়ে ফেললেন জয়াপ্রদার মতো এক মিষ্টি তরুণীতে। মেকআপ রুমে বসেই ডোনা বুঝতে পারল, কেন অলর্ক সেদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে তার ব্লাউজের মাপ জিজ্ঞাসা করছিল, তখন ডোনা ঠিক বুঝতে পারেনি, অলর্ক তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে, না কি সে সত্যিই সরল আর বোকা। এখন বেবি মিত্র যখন তাকে মেক-আপ করে ম্যাচিং শাড়ি-ব্লাউজে সাজিয়ে বাইরে বার করে আনল, তখন ডোনা নিজেকে আর চিনতেই পারল না। ফুল সাইজের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

—বিউটিফুল, অলর্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে তার ভালোলাগাটিকে মাত্র একটি শব্দে প্রকাশ করে ফেলল।

ডোনা নিজেও ভাবতে পারেনি, গাঢ় উজ্জ্বল আগুন রঙের শাড়ি-ব্লাউজ এহেন আগুন পারা রূপে উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। সে বড় হওয়া ইস্তক শালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট-ব্লাউজ, শার্ট-প্যান্ট-জিনসে অভ্যস্ত। শাড়ি পরে জবরজঙ হয়ে রাস্তায় বেরুনো, বাসে-ট্রামে ওঠা; এর-বাড়ি ওর-বাড়ি যাওয়া তার কাছে অসহনীয়। এখনকার যুগে শাড়ির ব্যবহার যে কতখানি অসম্ভব, এ নিয়ে তার কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কতবার আলোচনা করেছে। তার মা বনানী তাকে কোনও উৎসবে কিংবা পার্টিতে শাড়ি পরবার জন্য জেদাজেদি করলেও সে অনায়াসে রিফিউজ করেছে। বলেছে, শাড়ি হচ্ছে তোমাদের জেনারেশনের মহিলাদের জন্য। এখনকার দিনে শাড়ি একেবারেই ব্যাক-ডেটেড। অথচ এখন তাকে কিনা সেই শাড়িতেই—।

অলর্ক হাসি-হাসি মুখে বলল, শাড়ি পরলেই যে বাঙালি মেয়েকে সবচেয়ে সুন্দরী দেখায়, তা তোমাকে দেখে আরেকবার বুঝতে পারছি, ডোনা।

ডোনা নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল। অলর্কের কমপ্লিমেন্ট শুনে হেসে বলল, থ্যাঙ্কস।

ততক্ষণে নারাণ ঘোষ প্রস্তুত হয়ে গেছেন তাঁর ক্যামেরার সামনে। বারবার আলো জ্বালিয়ে, আলো নিভিয়ে অ্যাডজাস্ট করছেন লাইট। একবার ডোনাকেও দাঁড় করালেন ক্যামেরার সামনের ছোট্ট বেদিটার ওপর। ডোনার স্কিন কতটা আলো নেবে তা নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

আগেরবারে সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য ডোনাকে যখন অনেক খোলামেলা হয়ে বাথটাবে নামতে হয়েছিল, তখন তার শরীরে যে ধরনের থ্রিল হয়েছিল, আজ শাড়ি পরিহিতা হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো তার চেয়ে কিছু কম উত্তেজনাকর নয়। ডোনা বোধহয় তার জীবনে এই প্রথম জানল, শাড়ি পরলেই তাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী দেখায়।

ডোনার স্কিনে কতটা আলো লাগবে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর নারাণ ঘোষ বললেন, ও কে, এবার তাহলে টেক শুরু হবে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ডোনার ঠিক কী-কী পোজের ছবি হবে তা অলর্ক আগে থেকেই ব্রিফ করে রেখেছিল নারাণ ঘোষকে। ঠিক সেইমতো স্টুডিওর ভেতর দৃশ্যপট তৈরি শুরু হয়ে গেল। ডোনা অবাক হয়ে দেখল, তার বাবা চিত্রদীপের আঁকা সমুদ্রের একটি বিশাল ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দাঁড় করানো হল বেদির ওপর। সেদিকে কোঁচকানো মুখ রেখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ডোনা। মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে নড়তে থাকবে তার ঠোঁটদুটো। একটু আগেই ডোনা জেনেছে, বীরভঙ্গপুরের সম্পত্তির ব্যাপারে খুবই টেনশনে আছে অলর্ক। তার জীবন বিপন্ন। কে বা কারা নাকি প্রতিনিয়ত খুনের হুমকি দিয়ে চলেছে তাকে। তবু কী আশ্চর্য, এত ঝড়ঝামেলার মধ্যেও কী নিস্পৃহভাবে, কোনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করেই তার প্রতিটি কাজ করে চলেছে নিখুঁত ছক অনুযায়ী।

প্রায় চিত্রপরিচালকের মতো এক-একটি দৃশ্য রচনা করেছে অলর্ক। ফোটোগ্রাফার এবং মডেল

BanglaBook.org

দুজনকেই তার ভাবনার হদিশ বুঝিয়ে দিচ্ছে যাতে ক্যামেরায় ঠিক-ঠিক ধরা পড়ে ডোনার অভিব্যক্তি। নারাণ ঘোষ অনেকদিনের দক্ষ ফটোগ্রাফার, একটু বলতেই তিনি বুঝে নেন কোথায় বসাতে হবে তাঁর ক্যামেরা, পিছনের দৃশ্যপটই বা কীভাবে সাজাতে হবে। মডেলই বা কোন অ্যাঙ্গেলে মুখ করে কীভাবে দাঁড়াবে ক্যামেরার সামনে। মডেল হিসেবে ডোনা প্রায় নতুনই। তবু সে তার তুখোড় স্মার্টনেস দিয়ে চেষ্টা করছে অলর্কের চাহিদা অনুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে। এ দফায় মোট পাঁচটি ছবি তোলা হবে, এক একটি ছবি তুলতেই লেগে যাচ্ছে একঘণ্টা কখনও দু-ঘণ্টাও। শো-রুমগুলির এক-একটি দৃশ্যপট এক-একরকম। বিজ্ঞাপনের ছবির দৃশ্যপটও সেভাবে বদলে যাচ্ছে প্রতিবারে। তার সঙ্গে আরও চমক হল এই যে, প্রতিবারেই ডোনার জন্য নতুনরঙের নতুন ধরনের শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া চলে আসছে। আর বেবি মিত্র প্রত্যেকবার তার মুখের মেক-আপ বদলে তাকে নতুন এক-একটি তরুণী হিসেবে হাজির করছেন ক্যামেরার সামনে।

মাঝে আধঘণ্টার জন্যে ফুরসত পেতে ডোনা তারিফ জানাল অলর্ককে, আইডিয়াগুলো দারুণ।

অলর্ক হাসল, শুধু ফটো দেখেই সব কিছু বুঝতে পারা যাবে না। যখন কাগজে ছাপার জন্য পুরো লে-আউট তৈরি হবে, তখন আরও সব চমক থাকবে। অ্যাডভার্টাইজিঙের পুরোনো ধ্যানধারণা ভেঙে নতুন ঘরানা আনতে চাই।

—মডেল হিসেবে ছবি তুলতে এসে আমারই যা চমক লাগছে, তাতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাস্টমারদের কত যে চমক লাগবে তা বুঝতে বাকি নেই আমার। আমার ধারণা ছিল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যখন বিদেশি ঘরানায় সাজানো হচ্ছে, তখন মডেলও নিশ্চয় বিদেশিনীর সাজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে। হয়তো আমাকে কিছু বোল্ড পোজে ছবি তোলাতে হবে এমন ভেবে রেখেছিলাম।

মাথা নাড়ল অলর্ক, আমার আইডিয়া ঠিক তার উলটো। কলকাতার শো-রুমগুলো বিদেশি স্টাইলে করছি এই কারণে যে, তাতে এ দেশে থেকেও অন্য দেশের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকার অনুভূতি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার কাস্টমাররা তো সব এদেশি, অতএব মডেলকে হবে হতে দেশীয় ঘরানার। তাকে দেখেই তো কাস্টমারদের শো-রুমে ঢোকার সাহস বাড়বে।

আধঘণ্টার অবসরে কিছু চা ও স্ন্যাকসও এল। নারাণ ঘোষ এসব লাইনে ভারী সমঝদার লোক। ডোনাকে তিনি আগে কখনও দ্যাখেননি। চা খেতে-খেতে অলর্ককে বললেন, আপনি যে মডেলটি এনেছেন, তিনি নতুন হলেও ভারী ট্যালেন্টেড। ভবিষ্যতে খুবই শাইন করবে।

ডোনা চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু, মিঃ ঘোষ।

নারাণ ঘোষ আবার বললেন, আমার কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসে তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন মুখ খুঁজতে, আমি কি তাদের কাছে ডোনা চ্যাটার্জির নাম রেকমেন্ড করতে পারি?

ডোনা অবাক হল, খুব খুশিও হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে আরও অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলে উঠল, নট নাউ, মিঃ ঘোষ। ডোনা ইজ নাউ ওনলি ফর 'এ টু জেড'। পরপর আরও অনেকগুলো ডেট ডোনার জন্য ব্যয় করতে হবে আপনাকে। এখন থেকে 'এ টু জেড'-এর যত বিজ্ঞাপন বেরুবে, সবগুলোতেই ডোনার ছবি থাকবে, শি উইল বি এক্সক্লুসিভ ফর 'এ টু জেড'।

নারাণ ঘোষ তাঁর জহুরি চোখ নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন ডোনার দিকে, তারপর আরেকবার ঘাড় নেড়ে তারিফ করলেন, ইয়েস, এ গুড চয়েস।

সেদিন স্টুডিও-র কাজ মিটিয়ে বাইরে বেরুতে সন্ধে উতরে গেল। অলর্ক প্রতিবার শটের পর উদ্ভাসিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, একজ্যাকটলি, যা চেয়েছিলাম সেরকমই পোজ দিয়েছ, ডোনা। লাজুক হওয়ার দৃশ্যে লজ্জাবতী লতা, অহংকারী হওয়ার দৃশ্যে এ প্রাউড গার্ল। যখন নববধূর সাজে, তখন তোমাকে বিয়ের কনে ছাড়া আর কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না।

BanglaBook.org

স্টুডিও থেকে বাইরে বেরুতেই বলল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে?

—নো থ্যাঙ্কস। বলে ডোনা তার গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিঙে বসল। তারপর অলর্ককে ফের মেরিলিন মনরোর মতোই হাসিতে ভিজিয়ে বলল, আজ চলি।

—এক মিনিট প্লিজ, অলর্ক দৌড়ে স্টুডিওর ভিতরে গেল। এক মিনিটও লাগল না, তার নির্দেশে স্টুডিওর এক কর্মী বয়ে নিয়ে এল বিরাট একটা প্যাকেট, প্যাকেটে একরাশ শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ, যেগুলো এতক্ষণ পরে ডোনা ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছে।

ডোনা প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠল, এগুলো আবার কেন? আমি কিন্তু একেবারেই শাড়ি ইউজ করি না।

অলর্ক তার মুখমণ্ডল দীর্ঘ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত করে বলল, এবার থেকে পরবে। শাড়ি পরলে তোমাকে যে কী চমৎকার দেখায় তা নিশ্চয় আজ আবিষ্কার করেছ। নারাণ ঘোষের তোলা ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে তা সবাই জানতে পারবে আরও।

ডোনা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে ফেলল তার শরীর, থ্যাঙ্ক য়্যু, মিস্টার।

পরক্ষণেই ডোনাকে অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলল, বাট হু ইজ মন্দার?

ডোনা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক।

তেমনই হাসি-হাসি মুখে অলর্ক বলল, এবার থেকে ডোনা কিন্তু একমাত্র অলর্কেরই, এক্সক্লুসিভ টু অলর্ক বোস।

ডোনা অবাক হয়ে তাকাল অলর্কের দিকে। দেখল, অলর্কের শ্মশ্রুগুম্ফময় মুখে খেলা করছে এক দৃঢ় প্রত্যয়। দু-চোখে প্রগাঢ় চাউনি। সে-দৃশ্য তার শরীরে সহসা কী এক শিরশিরানি স্রোতের মতো পাক খেয়ে গেল যেন।

একরাশ উত্তেজনা, উল্লাস আর একটুকরো বিস্ময় বুকে নিয়ে সেদিন অনেকটা রাত করে ঘরে ফিরল ডোনা। চমৎকার স্বপ্নের মতো একটা দিন তার জীবনে কেটে গেল আজ। উচ্ছ্বাসে ভরা নীল টইটম্বুর স্বপ্ন। গেটের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতে-নামতে সে অবাকও হচ্ছিল। তাহলে মন্দার সম্পর্কে জেলাস হচ্ছে অলর্ক। খুবই অদ্ভুত আর আশ্চর্য লাগছে তার। অপ্রত্যাশিত যেন। প্রেমে পড়লেই এ ধরনের জেলাস হয়ে ওঠে মানুষ। তাহলে অলর্ক নিশ্চয়ই তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কখন তার প্রেমে পড়ল অলর্ক। আজই কি! না কি সেই প্রথম দিনেই! যেদিন তার ছবি দিয়ে সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা বেরিয়ে ছিল। তাহলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট!

উত্তেজনায় থরথর হয়ে ডোনা তাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে দেখল, কী কারণে যেন দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকতেই দেখে, বনানী ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো শিহরনদার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। বলছেন, তুমি এরকম লম্পট, দুশ্চরিত্র, তা জানতাম না।

শিহরনও বলছেন, তুমিও কিসে কম যাও। এ ব্রুট ক্যারেকটারলেস উওমেন। তোমাকে কি আমার চিনতে বাকি আছে?

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, এখনও পুরোপুরি চেনোনি আমাকে। তোমাকে এমন শাস্তি দেব—।

ডোনার দিকে চোখ পড়তেই সহসা থেমে গেলেন বনানী।

BanglaBook.org

॥ ১৫ ॥

সংবাদপত্রের পঞ্চম পৃষ্ঠায়, যে-পৃষ্ঠাটিতে পাঠকরা সাধারণত চোখ রাখে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবরগুলির টুকিটাকির সন্ধানে, সেখানে একেবারে ডানদিকে পুরো তিনকলম জুড়ে ছাপা

হয়েছে বিজ্ঞাপনটা। প্রথমে বেশ বড়-বড় অক্ষরে। এ টু জেড ইজ কামিং টু ক্যালকাটা। তার নীচে আরও একটু ছোট লেটারিং-এ ফ্রম প্যারিস উইথ লাভ, ফ্রম নরওয়ে উইথ বিউটি, ফ্রম ভেনিস উইথ নেচার, ফ্রম নিউইয়র্ক উইথ প্যাশন, ফ্রম লন্ডন উইথ থ্রিল।

তার ঠিক নীচে ডোনার হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। সুন্দরী বাঙালি ললনা বলতে যা বোঝায়, ডোনার ফোটোটি এখানে ঠিক সেরকমই।

বিজ্ঞাপনটা এমন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, এত বড় করে, আর এমন চমক দিয়ে যে, কেউই সেটি এড়িয়ে যেতে পারবে না। ডোনা সকালের খবরের কাগজ দেখেই বুঝে নিয়েছে, সে এই বিজ্ঞাপনটির পর রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে পড়বে।

'এ টু জেড'-এর সেই এক্সক্লিউসিভ গার্ল ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু এখন নিতান্ত নিরীহ মুখে হন-হন করে হেঁটে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর দিয়ে। তার চলনে স্পষ্টতই ব্যস্ততা। দ্রুত পায়ে সে এগুচ্ছিল তাদের তুলনামূলক সাহিত্যের দপ্তরের দিকে, হঠাৎ তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল অনিল কাপুরের মতো মুখে ক-দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে এক যুবক, মুখ হাঁ করে বলল, তুই কি ডোনা?

ডোনা মুখে সামান্য বিরক্তি দেখিয়ে বলল, ফাজলামি করিস না ঋজু, পথ ছাড়। ঋজুরেখ নামের যুবকটি তবুও পথ ছাড়ে না, বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, তুই সত্যিই ডোনা?

—কেন, অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে?

—না, মানে, এরকম বেশে তোকে কখনও দেখিনি তো, যাকে বলে ফ্যান্টাস্টিক, তাই-ই—।

ডোনা হেসে ফেলল। সে আজ কচি কলাপাতা রঙের একটা সিফন শাড়ি পরেছে। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। দৃশ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অবাক করে দেওয়ার মতোই বটে। যে-ডোনা এই ক্যাম্পাসটিতে নতুন ডিজাইনের পোশাকের বিপ্লব ঘটায় রোজ-রোজ, সে কিনা আজ সনাতন বাঙালিয়ানার পোশাক শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিত করেছে নিজেকে!

—কেন, পরতে নেই নাকি?

—নাহ, পরতে থাকবে না কেন? বরং শাড়ি পরে তোকে যা সুন্দরী দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এক্ষুনি তোকে ইলোপ করে পালিয়ে যাই।

—যাহ, ডোনা ভ্রূকুটি করে হাসল।

—হ্যাঁ রে, তোকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে। আজ কাগজে একখানা দারুণ ছবি বেরিয়েছে তোর।

ঋজুরেখর হাত থেকে কোনওক্রমে নিষ্কৃতি নিয়ে পালাতে চাইল ডোনা। বেশ খুশিখুশি লাগছে তার। খানিক এগুতেই দেখা হয়ে গেল গার্গীর সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠল সেই।

—কী ব্যাপার, এমন হন্তদন্ত পায়ে কোথায় চলেছিস?

—বুঝলি গার্গী, আজ আমাদের দপ্তর থেকে এম. আরকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে।

—হঠাৎ? তাই বুঝি তুই এমন শাড়িটাড়ি পরে—। তা অকেশানটা কী?

—আমাদের দপ্তরে একটা রিডারের পোস্ট খালি হয়েছিল। পরশু সে পোস্টে মণীশ রায়কে প্রোমোশন দিয়েছেন ভি. সি.।

—তাই? তোদের এম. আর.-এর সময় এখন তাহলে ভালো যাচ্ছে, বল?

—যাচ্ছেই তো। ওঁর ফ্যানের সংখ্যা অন্তত বেড়ে গেল কয়েকগুণ। যাবি নাকি?

—আমার একটা ক্লাস ছিল যে।

—অফ করে দে ক্লাসটা। চল না, দেখবি মেয়েগুলো এম. আরকে নিয়ে কী শাগুটাই না করবে। সম্বর্ধনার নাম করে এম. আরকে যদি একটু ছুঁতেটুতে পারা যায়। মেয়েরা দল বেঁধে ফুলের

BanglaBook.org

মালা, বোকে সব আনতে ছুটেছে। কেউ গানের মহড়া দিচ্ছে সকাল থেকে। কেউবা আবার দামি প্রেজেন্টস কিনে আনছে।

গার্গী তার কবজিতে চোখ রেখে সময় দেখে নিয়ে বলল, চল তাহলে। এই রগড়গুলো দেখতে আমি বেশ পছন্দই করি। কিন্তু তাহলে তো তোদের আর. ডি.-র পজিশন বেশ খারাপ হয়ে গেল রে।

—সাংঘাতিক, পরশু খবরটা পাওয়ার পর সেই যে প্রফেসরস রুম থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেননি। শোনা যাচ্ছে চাকরিই ছেড়ে দেবেন নাকি। ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গী হেসে ফেলল।

—তারপর তোর অলর্ক বোসের খবর কী রে? গার্গী আজকাল ডোনার সঙ্গে দেখা হলেই অলর্ক বোসের হালচাল গতিবিধি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে। ডোনা যে ইতিমধ্যে অলর্ক বোসের কাছ থেকে জেনেছে, হরিশংকর চৌধুরি অলর্ককেই দায়ী করেছে রানিমাকে খুনের ব্যাপারে, সে খবরটাও খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জেনে নিল গার্গী। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সাংবাদিকটি ভুয়ো পরিচয়েই গিয়েছিল বীরভঙ্গপুরে। এখন ডোনার কাছ থেকে সব শুনে বুঝে ফেলল, তার অনুমান সঠিক। কিন্তু অলর্কই সেই লোকটিকে পাঠিয়ে খুন করেছে, হরিশংকর চৌধুরির এহেন অভিযোগ শুনে দোনামনা হল। বুঝতে পারল না, এমন একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগের কথাটা অলর্ক বললই বা কেন ডোনাকে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই নাকি!

দুজনে একটু পরেই পৌঁছে গেল দোতলায়, কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে। গিয়ে দেখল, বেশ ভিড় জমে গেছে দপ্তরের চারপাশে। যথারীতি অন্য দপ্তরের মেয়েরাও এসে জুটেছে সম্বর্ধনার আয়োজন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অন্য দপ্তরের মেয়েরাই কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে ডোনাদের ক্লাসের মেয়েদের হটিয়ে দিয়ে।

ডোনা হেসে বলল, দেখেছিস মজাটা?

—কিন্তু এম. আর. কোথায়?

—এম. আর. তো ঘেরাও হয়ে বসে আছেন। এখন তাঁর চারপাশে অজস্র হরিপরিদের ভিড়, তাদের নাগাল এড়িয়ে এম. আর.-এর দেখা পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে মণীশ রায় ঠিকই দেখতে পেলেন ডোনাকে। দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকলেন, ডোনা—।

ডোনাকে আজ সবাই তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। শুধু যে শাড়ি পরেই সে আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, আজ খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়ও সে দ্রষ্টব্যবস্তু। ভিড় ঠেলে গার্গীকে নিয়ে মণীশ রায়ের কাছে পৌঁছেই ডোনা বলল, কনগ্রাটস, স্যার।

মণীশ রায় হেসে বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু। তবে আজকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে পরোক্ষে হলেও তোমার কিছু কনট্রিবিউশন আছে, ডোনা।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, স্যার?

—সেদিন সেমিনারে আমরা যে প্রবন্ধগুলো পড়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার সঙ্গে শ্রোতাদের বক্তব্যও টেপ থেকে তুলে নিয়ে হুবহু ছাপা হয়েছে। সেখানে শিহরন রায়চৌধুরির বক্তব্য ছেপেছে ওরা।

—তাই নাকি? বইটা দেখতে হবে তো।

—শিহরন আমার বক্তব্যকে সাপোর্ট করেছে বলে, আয়্যাম গ্রেটফুল টু হিম। তার বক্তব্য আমার প্রোমোশন পেতে সাহায্য করেছে।

ডোনা হাসি-হাসি মুখে বলল, আমি শিহরনদাকে আপনার কথা জানিয়ে দেব, স্যার।

—আমি ভাবছি, একদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আসব।

BanglaBook.org

উৎফুল্ল হয়ে ডোনা বলল, তাহলে তো খুব ভালো হয়, স্যার। আমার মা-ও তো আপনার কনটেমপোরারি ছিলেন শুনেছি। মা-ও খুব খুশি হবে। তবে শিহরনদা আজই সকালে দিল্লি চলে গেলেন কী একটা জরুরি কাজে। ফিরতে-ফিরতে দিনসাতেক লাগবে। ঠিক ওই সময় আবার আমার বাবার একটা প্রর্দশনী শুরু হচ্ছে তাঁর নতুন ছবিগুলো নিয়ে। আপনি যদি একেবারে প্রদর্শনী দেখতে চলে আসেন, তাহলে প্রদর্শনী-ও দেখা হবে, শিহরনদার সঙ্গেও কথাবার্তা হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। তোমার বাবার ছবি নিয়ে একেবারে অভিনব প্রদর্শনী হচ্ছে কোথাও।

—ঠিক তাই স্যার। অভিনবই বলা যায়, কারণ প্রদর্শনীটা হচ্ছে কোনও প্রচলিত গ্যালারিতে নয়, একটা অদ্ভুতদর্শনের বাড়ির ভেতর, যার ভেতর-বাইরে পুরোটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো, পুরোনো ধরনের।

—বাহ্, সত্যিই অদ্ভুত। যেতে হবে তো।

মণীশ রায় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হঠাৎ দপ্তর থেকে ছুটতে-ছুটতে এল একজন বেয়ারা, ডোনাকে বলল, ফোন আছে, আপনার খুব জরুরি।

ডোনা খুবই আশ্চর্য হল। কলেজে হঠাৎ তার কাছে কে ফোন করবে, এত জরুরিই বা কেন, বুঝে উঠতে পারল না। এর আগেও অবশ্য বনানী কিংবা চিত্রদীপ কখনও দরকারমতো তাকে ফোন করেছেন। কিন্তু আজ তো মাত্র কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে।

ডোনা দ্রুতপায়ে প্রফেসরস' রুমে গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশে বনানীর গলা, ডোনা? যাক, তোকে পেয়ে গেলাম ফোনে। এদিকে ভীষণ একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। আমি একটা নার্সিংহোম থেকে কথা বলছি। রডন স্ট্রিটের কাছেই নার্সিংহোমটা। মন্দার হঠাৎ ভীষণভাবে ইনজিওরড হয়েছে। তুই শিগগির চলে আয়। মাথা ফেটে—।

ডোনা উদ্বিগ্ন হল, সে কী? কী করে হল? কোথায় বলল নার্সিংহোমটা?

বনানী একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন ডোনাকে। নার্সিংহোমের লোকেশনটা বুঝে নিয়ে ডোনা এসে গার্গীকে বলল, এম. আর.-এর সম্বর্ধনায় আমার আর থাকা হল না রে। তুই এম, আর-কে বলে দিস।

গার্গী অবশ্য সব শুনে রীতিমতো বিস্মিত। তৎক্ষণাৎ বলল, চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে, এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে যখন। হাজার হোক, ওর সঙ্গে তো তোর একটা—।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল। সন্ধের পর কলকাতার পথে আজকাল এত ট্রাফিক-জ্যাম বেড়ে গেছে যে নার্সিংহোমে পৌঁছুতেই লেগে গেল প্রায় একঘণ্টার মতো। বিপর্যস্ত হয়ে যখন রডন স্ট্রিটের কাছে হোয়াইট ঈগল নার্সিংহোমের সামনে এসে পৌঁছল, তখনও বনানী তাদের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

বনানীকে দেখে আপাতত টেনশনমুক্ত মনে হচ্ছে। তবুও উদ্বিগ্নকণ্ঠে ডোনা জিজ্ঞাসা করে, এখন কেমন আছে?

—ডাক্তার বলেছে আউট অফ ডেঞ্জার।

—দেখা করতে দেবে?

—হ্যাঁ। দু-তিনটে এক্স-রে করেছে ইতিমধ্যে। তাঁরা বলল, ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়। তবে বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। ইনটারনাল হেমারেজ যদি হয়ে থাকে—।

তিনজনে দ্রুত উঠে এল দোতলায় মন্দারের কেবিনে। মন্দারের জ্ঞান ফিরেছে বটে, কিন্তু চোখে এখনও ঘোর লেগে রয়েছে। ডোনাকে দেখে অবশ্য খুশি হল খুব। একটু হাসল। তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বনানীই জানালেন, মন্দার একটা মালটিস্টোরিড বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে হেঁটে

BanglaBook.org

আসছিল, হঠাৎই একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ে তার মাথার পিছনদিকে। পাথরের টুকরোটা বেশ বড় আকারের। সুতরাং বলা যায়, অল্পের জন্য বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মন্দারের বক্তব্য ভারী অদ্ভুত। পাথরের টুকরোটা কেউ নাকি ছুড়ে মেরেছে।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী কথা? কে তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে?

মন্দার ম্লান হেসে জড়ানো গলায় বলল, বুঝতে পারছি না।

—কারও সঙ্গে এর মধ্যে বড় রকমের কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?

—টুকটাক তো হয়ই আমাদের এ ধরনের ব্যাবসায়ে। তবে এ ঘটনাটার পিছনে মনে হচ্ছে অন্য কোনও কারণ।

—কী কারণ? ডোনা অবাক হল।

—হঠাৎ কাল সকালে একটা অদ্ভুত টেলিফোন এল আমার অফিসে। রিসিভার তুলতেই বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা। ডোনা ইজ মাইন।

মন্দারের কথা শুনে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল ডোনা। মুহূর্তে চোখাচোখি করে নিল একবার গার্গীর সঙ্গে, একবার বনানীর সঙ্গে। তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

মন্দারই আবার বলল, হঠাৎ এরকম হুমকি কে দিল বুঝতেই পারিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে বলছেন? তাতে উত্তর দিল, যেই হই না কেন। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। দরকার হলে পথের কাঁটা সরিয়ে দেব। বলেই টেলিফোন রেখে দিল পট করে। পরদিনই এভাবে পাথর ছুড়ে মারল কেউ, তাতেই বুঝে নিয়েছি—।

ডোনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এটা নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। যে-ই কাজটা করে থাকুক, ভালো করেনি।

কিছুক্ষণ পর মন্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই গার্গী ধরল ডোনাকে, কী রে, আর কেউ তোর দিকে নজর দিয়েছে নাকি?

ডোনা বিব্রত হল, লাল হয়ে উঠল তার চোখমুখ, কোনওক্রমে বলতে পারল, বুঝতে পারছি না।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, বুঝতে পারছিস না? না কি চেপে যাচ্ছিস? তোর যা ব্যাপার স্যাপার—।

ঠিক এ সময় বনানী এগিয়ে এলেন হঠাৎ, ডোনার দিকে কীরকম কড়া চোখে তাকিয়ে হিসহিস করে বললেন, শিহরনের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু—।

ডোনা শুধু বলল, শিহরনদা নয়। মনে হচ্ছে অন্য কেউ।

॥ ১৬ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা কিছু বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন চিত্রদীপ। তার সঙ্গে মুঘলযুগের এবং পরবর্তীকালের বাবু-কালচারের কিছু ছবিও দেখছিলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। কয়েকদিন আগে অলর্কের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন প্রদর্শনীর স্পটটি ঘুরেফিরে দেখতে। এই বাড়িটিতেই অলর্ক থাকে। রাসেল স্ট্রিটে এখনও কিছু পুরোনো আমলের সাহেবিকেতার বাড়ি অবশিষ্ট আছে। বাড়িটা দোতলা, কিন্তু আকারে বিশাল। বাইরে থেকে দেখলে প্রাচীন ঘরানার একটা গন্ধ পাওয়া যায়। অলর্কের ইচ্ছে, এই বাড়িটিতেই চিত্রদীপের প্রদর্শনী হোক। সেটা অভিনব হবে। তার আরও ইচ্ছে, এই বাড়িটির আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিত্রদীপ তাঁর নতুন

BanglaBook.org

সিরিজের ছবিগুলো আঁকুন।

লিভিংরুমের স্টাডিতে এক গভীর ভাবনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন চিত্রদীপ, আর ওদিক সেন্টার টেবিলে কফির কাপ হাতে নিয়ে ডোনা তার মাকে বলছিল, বুঝতে পারছি নে মা, কী করে এতসব ম্যানেজ করব আমি। এক সঙ্গে দু-দুটো পারফরমেন্স—

ডোনার কাঁধে এখন জমা হয়েছে রাজ্যের ব্যস্ততা। চিত্রদীপের প্রদর্শনী সাকসেসফুল করে তোলার জন্য ঘোরাঘুরির আর অন্ত নেই তার। সে কয়েকদিন ধরে টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া থেকে সল্টলেক ঘুরে-ঘুরে যোগাযোগ করছে শিল্পবোদ্ধাদের সঙ্গে, চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে, তাদের পরিবারের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও। প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীদের কাছেও সে জনে-জনে গিয়ে বলে এসেছে তাঁরা যেন চিত্রদীপের এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

একই সঙ্গে ডোনা জড়িয়ে পড়েছে আরও একটি থ্রিলিং অথচ ঝামেলাপূর্ণ কাজে। হঠাৎ তাদের ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা ঠিক করেছে, একটা ড্যান্সড্রামা করবে অ্যানুয়াল সোস্যাল ফাংশনে। ইংরেজি ড্যান্সড্রামা। তার রিহার্সাল হয়ে গেল একদিন। এখন প্রায় প্রতি একদিন অন্তর তাকে যেতে হবে মহড়ায়।

এমন দ্বিবিধ চাপে ডোনা ব্যস্ত, বিপর্যস্ত, তার এখন নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই। কফির কাপ নিঃশেষ করে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে সবে তার সারাদিনের প্ল্যান মনে-মনে চক-আউট করছে এমন সময় ডোরবেলে টুং নানা টুং নানা।

নিশ্চয়ই অলর্ক।

প্রদর্শনীর দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ডোনাদের বাড়িতে অলর্কের যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই, কারণ প্রোমোটার ও শিল্পী দুজনের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এতবড় প্রদর্শনী সফল করা সম্ভব নয়। প্রচুর ছোটাছুটি করতে হচ্ছে অলর্ককেও। তার মধ্যে বারবার আলোচনা করতে এ-বাড়িতে আসছে বটে, কিন্তু চিত্রদীপ তাঁর ছবি আঁকা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকছেন যে অলর্কের সঙ্গে কথা বলার মতো তাঁর সময়ই নেই। কেবলই পাইপ দাঁতে কামড়ে রেখে রঙের নেশায় বিভোর হয়ে আছেন।

ফলে ডোনাকেই বেশিরভাগ সময় সঙ্গ দিতে হচ্ছে অলর্ককে। ডোনা অবশ্য বুঝতে পারছে, অলর্ক যত না চিত্রদীপের জন্য এ-বাড়িতে আসে, তারচেয়ে বেশি আসে ডোনার আকর্ষণে। ডোনার সঙ্গে প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করতেই বেশি আগ্রহ। ডোনাও এই দীর্ঘকায় সরল যুবকটির সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। তবু সেদিন মন্দারের কথা শোনার পর তার মনে একটা খটকা লেগে রয়েছে।

ডোরবেলের শব্দ শুনে বেতের চেয়ার থেকে আলসেমি-ভরা শরীরটা তুলে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে হাসল ডোনা, হাই।

অলর্ক ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, শিহরনদা আছেন?

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। খুব দরকার? শিহরনদার ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আপাতত না হলেও চলবে। আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করে নেবখন।

গত কয়েকদিন যাওয়া আসার মধ্যেই একদিন অলর্কের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে শিহরনের। শিহরনের যা স্বভাব, একদিন আলাপেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন অলর্কের সঙ্গে। শিহরন একজন অধ্যাপক, তাছাড়া সাহিত্যরসিকও, এ-কথা জেনে ফেলার পর অলর্ক একদিন শিহরনকে বলেছিল, খুব ভালো হল, যদি আপনার কিছু সাহিত্যভাবনা আমার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার জন্য লিখে দেন।

শিহরন তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হয়ে বলেছিলেন, আমি কয়েকটা ক্যাপশন লিখে দিতে পারি—

যেদিন ডোনা ও অলর্কের আলোচনার সময় শিহরন উপস্থিত থাকে, সেদিন আড্ডাটা একটু বেশিই জমে। শিহরন হলেন কথার জাদুকর, টেবিল-টকে তিনি বরাবরই চমৎকার। কখনও গুরুগম্ভীর বক্তৃতায়, কখনও ঈষৎ হাস্যরসে, কখনও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন মুহূর্তে।

BanglaBook.org

অলর্ক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে ডোনা ভুরু তুলে বলল, কি হল, শিহরনদা বাড়ি নেই বলে বসবেন না মনে হচ্ছে?

অলর্ক ধপ করে বসে পড়ে বলল, না, তা নয়, তবে অন্যত্র যাওয়ার একটা তাড়া আছে।

—ঠিক আছে, আপাতত চা তো খাবেন, চা কিংবা কফি?

অলর্ক হঠাৎ বলল, তোমার এই খাবেন, বসবেন শব্দগুলি কিন্তু আমাকে বড্ড পর-পর করে রেখেছে এ-বাড়িতে। ঠিক যেন ফ্রি হতে পারছিনে—।

ডোনাও প্রথমটা ফ্রি হতে পারছিল না। তবু অলর্কের কথাবার্তা এতই সহজ, চাউনি এতই সরল যে তার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা করতে ইচ্ছে করে না। ঘন-বেগুনি সুতোয় কাশ্মিরী-কাজ করা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আলিগড়িতে ওতপ্রোত যুবকটির দিকে ভালো করে তাকাল ডোনা, তারপর রহস্যময়ীর মতো হেসে বলল, ও কে মিস্টার। এখন তাহলে বোসো। মা-কে কফি করতে বলি—।

কিচেন থেকে একপাক ঘুরে এসে ডোনা বেতের চেয়ারে বসতেই অলর্ক বলল, একদিন শিহরনদাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর কাজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

ডোনা জানত না, অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ঘুরে-ঘুরে দেখলেন সব। রঙের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপরই শুরু হবে ইনটেরিয়র ডেকরেশনের বাকি কাজ। দেওয়ালের ফাঁকা জায়গাগুলোতে আঁকা হবে ম্যুরল। নীচে এ-মুড়ো ও-মুড়ো জুড়ে র‍্যাক, কাউন্টার, বাইরে শো-উইন্ডো। প্লাইউড ম্যাসোনাইট কাচের আয়না বসানো হলে দারুণ দেখাবে কিন্তু—।

ডোনা অ্যাপ্রুভ করার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তেই অলর্ক আবার বলল, একত্রিশজন কন্ট্রাক্টর কমপিট করছে ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ পাওয়ার জন্য। তা শিহরনদাকে বললাম, ডোনার ইচ্ছে, বিশেষ একজনকে কাজটা দেওয়ার। তা শিহরনদা, শুনে কী বললেন জানো?

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

—বললেন, তাই নাকি। ভারী ইন্টারেস্টিং। ডোনা বিশেষ একজনকে যখন রেকমেন্ড করছে, তখন সে বিষয়টাতে নিশ্চয় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাকে একদিন কাগজপত্তরগুলো দেখতে দিও তো—

ডোনা অবাক হয়ে বলল, শিহরনদা এসব কাগজও দেখছেন নাকি!

—আমি একা মানুষ। নিজস্ব কয়েকজন লোক রেখেছি সব কাজকর্ম দেখাশুনো করার জন্য। কিন্তু তারা কী করছে না করছে তা দেখার সময়ও আমার নেই। লে-আউট না হয় তোমার বাবা দেখছেন, কিন্তু তার বাইরেও হাজারো কাজ। শিহরনদাকে একদিন সব বলতেই তিনি বললেন, তা এত ভাবনার কী আছে। আমি কিছু সাহায্য করতে পারি, যদি তোমার দরকার মনে হয়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছি।

ডোনা খানিকটা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অলর্কের মুখের দিকে।

—বুঝলে ডোনা, একসময় আমি ছিলাম একদম বেকার, ভাগাবন্ড। আর এখন একসঙ্গে এতরকম কাজে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে যে, এক চিলতে অবসর বলে কিছু নেই। কখনও গভীর রাতে ঘুমোবার আগে এতসব কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। মনে হয়, এত কাজ সব আমিই করছি নাকি। এগুলো সব স্বপ্ন নয় তো। কিছুকাল আগেও চরম ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। বহু ভিখারিকে রাস্তায় যেমন দেখি, খাদ্যাভাবে, দুর্দশায় দিন কাটিয়ে যাচ্ছে ছন্নছাড়াভাবে, নিজেকে তেমনি মনে হত। ভাবতাম, এমন কর্মহীনভাবে কি বেঁচে থাকা চলে, না থাকা উচিত। অজস্র কুষ্ঠরোগী তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতেও বেঁচে থাকে বছরের পর বছর। তারা সবাই ভাবে, একদিন তাদের সব দুঃখযন্ত্রণা শেষ হয়ে এসে পৌঁছবে সুসময়। কিন্তু

BanglaBook.org

সবাই জানে, তা আর কখনও হবে না। আমিও বেঁচে ছিলাম ঠিক এদেরই মতো। কিন্তু কর্মহীন, বাউণ্ডুলে একজন যুবক কীসের জন্যই বা বেঁচে থাকবে। অথচ বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়ে যাওয়ার পর এখন মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষের কাজ না করে বেঁচে থাকাটাই এক সমস্যা। পৃথিবীতে কাজের অভাব নেই, সময়ের বড় অভাব।

ডোনা হেসে বলল, পার্থক্য একটাই। টাকা থাকা, আর না-থাকা।

—যাই হোক, অলর্ক হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বলল, আমার অ্যাড-এজেন্সি বলেছে, তোমার আরও কিছু ছবি তুলতে হবে।

—আবার! ডোনা চোখ কপালে তুলে বলল, এরপর তো তোমার অ্যালবাম ছাপাছাপি হয়ে যাবে আমার ফোটোয়।

—সেটা খারাপই বা কী, অলর্ক অবলীলায় বলল, সুন্দর মুখ বারবার ঘুরিয়ে দেখলে মন ভালো থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ তো একজন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সেটা অসভ্যতা বলেই ভাববে সবাই। শুধু তোমার কাছেই নয়, এই বিশ্বসংসারের সকলের কাছে সেটা এক অভব্য ব্যাপার। তার চেয়ে অ্যালবামে প্রচুর ফোটো থাকলে সেদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকা যায়।

ডোনা এমন অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনে হাঁ করে থাকিয়ে থাকে অলর্কের দিকে। কেমন শিরশির করে ওঠে তার শরীরের ভিতর।

—তবে আপাতত তোমার ফোটো তুলতে চাই সে কারণে নয়। প্রায় সব শো-রুমগুলোর ভিতরে রঙের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। প্লাইউডের পার্টিশন শুরু হওয়ার আগে শো-রুমের এই মুহূর্তের ছবিগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাই। কী চমৎকার হয়েছে ভিতরগুলো তা না দেখলে অনুমান করতে পারবে না। লিন্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়লে মনে হবে, দাঁড়িয়ে আছ একটা জাহাজের ডেকের ওপর। চারপাশে শুধু নীল সমুদ্র আর সমুদ্র। চারপাশে উত্তাল ঢেউ বিশাল হয়ে তোমাকে ভাসিয়ে রেখেছে অনন্ত জলরাশির ওপর। আবার শিয়ালদহ শো-রুমে গেলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছো কোনও সবুজ গাছগাছালি ভরা গাঁয়ের রাস্তায়। তেমনি—।

ডোনা হেসে বলল, তা না হয় দেখলাম, কিন্তু আবার ফোটো তোলা কেন?

—এই শো-রুমগুলোর মধ্যে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফোটো তোলা হবে। এক-এক পটভূমিতে এক-এক রকমের পোশাকে। কখনও তোমাকে মনে হবে সমুদ্রকন্যা, কখনও গাঁয়ের বধূ, কখনও চাঁদের বুকে এক তরুণী মহাকাশচারী, কখনও মরুভূমির বুকে এক বেদুইনকন্যা। তুমি কাল সকালে তৈরি হয়ে থেকো। আমি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। নারাণ ঘোষের সঙ্গে সেভাবেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে—।

এতসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডোনাও যেন আর থই খুঁজে পাচ্ছে না। এতদিন সে নিজেই ছিল একটি বিশাল সমুদ্র। কখন কাকে বানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক ছিল না। এখন অলর্কই তার অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুকুল প্লাবিত বন্যার মতো।

ডোনা আপ্লুত হয়ে বলল, ফ্যান্টাস্টিক। এই আইডিয়াটা নতুন মনে হচ্ছে, আগে তো কখনও বলোনি।

অলর্ক মিটিমিটি হেসে বলল, আইডিয়াটা আগেই ছিল মাথার মধ্যে। ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। সেদিন শিহরনদাকে বলতেই বললেন, গুড আইডিয়া। এক্ষুনি শ্যুট করে ফেলো—।

—বাহ, শিহরনদা তোমাকে আজকাল এসব বিষয়েও অ্যাডভাইস করছেন নাকি?

—ওঁর কিছু-কিছু আইডিয়া আমার দারুণ লাগে। সেদিন ওঁকে নিয়ে কয়েকজন বিগ সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বিভিন্ন স্টেট থেকে বেস্ট কমোডিটিজ সাপ্লাই করে। শিহরণদা তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। দু-একজন সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিলেন পরে। বললেন,

BanglaBook.org

দুনম্বরি মাল গছিয়ে দিতে পারে।

—বাহ, অধ্যাপককে তাহলে বিজনেসের লাইনে নিয়ে আসছ? সর্বঘটের কাঁঠালিকলা হয়ে উঠছেন দেখি।

অলর্ক হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, সেদিন শিহরনদাকে দেখলাম এক মহিলার সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় বসে চাইনিজ খাচ্ছেন।

ডোনা হেসে উঠে বলল, কলকাতার এমন আরও অনেক তরুণীকে নিয়েই উনি ঘুরতে বেরোন, রেস্তোরাঁয় চা-কফি, চাইনিজ খান।

—হুঁ, আলাপও করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। নাম বললেন, ঈষিতা, ম্যারেড।

ডোনা চমকে উঠে বলল, সে কি?

—চেনো না কি তুমি ভদ্রমহিলাকে? খুব সুন্দরী কিন্তু।

ডোনা হঠাৎ শক খেয়েছে বলে মনে হল। মাত্র কিছুদিন আগেই শিহরনদা এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'জানো ডোনা। মণীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। কনগ্রাটস জানাতে। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। বেশ মিশুকে কিন্তু।' সেই ক্ষণিকের আলাপ যে শিহরন ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছেন তা ভেবে যতটা না অবাক হল ডোনা, তার চেয়ে কেন যেন উৎকণ্ঠিত হল। শিহরনদা সামান্য আলাপ আরও বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন। সে ভালোই জানে ব্যাপারটা।

ডোনা খানিক পরে হেসে বলল, আমার চেনাজানার পরিধি তো খুব কম নয়। তবে শিহরনদার মতো নয়। শিহরনদা ছুঁচ হয়ে ঢুকে—।

অলর্ক ডোনার অভিব্যক্তি নিরিখ করতে-করতে বলল, আচ্ছা, শিহরনদার সঙ্গে তোমাদের কীরকম সম্পর্ক?

—সম্পর্ক। এহেন জটিল প্রশ্নে ডোনা এক লহমা বেশ হকচকিয়ে গেল। সম্পর্কের কথা ভেবে সে কি কারও সঙ্গে মেশে। সে তো মেশে জাস্ট ফর ফান। হেসে বলল, কীরকম আবার। আমাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন।

—উঁহু। ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয় সম্পর্কটা তার চেয়েও একটু গভীর।

ডোনা তীক্ষ্ণ চোখে অলর্কের চোখের দিকে তাকাল। অলর্কের চাউনিতে অবশ্য যথারীতি সারল্য। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিটিমিটি হাসি। সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বলল, আসলে উনি আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে।

—ও, আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ধরনের? তোমার ওপর খুবই যে ডমিনেট করেন তা ওঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়।

ডোনা রীতিমতো বিচলিত বোধ করল এবার। শিহরনদা তার সম্পর্কে কী বলেছে অলর্কের কাছে তা সে জানে না। হয়তো এমন কিছু বলেছে যা শুনে এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছে অলর্ক। বোধহয় জেলাসও হয়েছে। ক'দিন আগেই ঠিক এমনই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, হু ইজ মন্দার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ডোনা, বোধহয় কয়েকমুহূর্তে জমে ওঠা চোরঘুর্ণির টানটুকু পেরিয়ে আসতে চাইল, বলল, কীরকম আবার। শিহরণদা আমারও ফ্রেন্ড।

—শুধু ফ্রেন্ড।

ডোনা আরও হতবাক হয়ে থমকে যায় হঠাৎ। এতদিন অলর্ককে মনে হত স্বপ্নের জগতের মানুষ হিসেবে, যে সারাক্ষণ তার স্বপ্নের ভেতর, তার একান্ত ভাবনায় লীন হয়ে থাকে। হঠাৎ যেন সে তার পারিপার্শ্বিক অন্য জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। হয়তো ডোনার জন্যই।

ডোনা নির্বিকারভাবে বলল, বলতে পারো, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। বলে তার মুখ উদ্ভাসিত করল এক রহস্যময় হাসিতে।

BanglaBook.org

—এত! অলর্কের গোঁফ-দাড়ির ভিতর দিয়ে চিলতে হাসি ফুটে বেরুল। কিন্তু চোখদুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে পরখ করতে লাগল, ডোনার চোখ-মুখ।

কেন যেন ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ডোনা। হঠাৎ ভারী অপরিচিত মনে হল অলর্ককে। খুবই অদ্ভুত আর অচেনা।

সেই মুহূর্তে অলর্ক হঠাৎ বলল, আজ সকালে বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়ে গেল, ডোনা।

ডোনা চোখ নরম করল, এত্ত বড় বিজনেসম্যান। ঝামেলা তো সারাক্ষণ লেগেই থাকবে।

—সে তো থাকবেই। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ পিছনে লাগলে মহা মুশকিল।

ডোনা চমকে উঠে বলল, পুলিশ কেন!

—আর বলো কেন। সেই যে বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি, সেখানে হরিশংকর চৌধুরি বলে একটা লোক থাকত। সে নাকি এককালে মস্ত লেঠেল ছিল। আমার দাদামশাইয়ের রাজত্ব সামলাত তার বাহিনি নিয়ে। হঠাৎ সে-লোকটা খুন হয়ে গেছে।

ডোনা স্তব্ধ হয়ে গেল, খুন! কীভাবে?

—লোকটা মাঝেমধ্যে দরকার পড়লে কলকাতায় আমার কাছে আসত। দিনকয়েক আগেও এসেছিল টাকাপয়সা নিতে। টাকাপয়সা দিয়েও ছিলাম। তারপর শুনি আমার বাড়ি থেকে বীরভঙ্গপুর ফেরার পথে খুন হয়ে গেছে।

—কোথায় হয়েছে খুনটা?

—কোথায় হয়েছে তা বলতে পারব না। কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেছে আমার বাড়ির খুব কাছেই। কে যেন খুন করে ফেলে গেছে এখানে। পুলিশ তাই নিয়ে খুব হুজ্জুতি করছে। বলছে আপনার বাড়ির কাছে যখন পাওয়া গেছে, তখন আপনিই খুন করেছেন। বোঝো অবস্থা। নিজেরা অপরাধী বার করতে পারে না, এখন উদোর পিণ্ডি চাপাচ্ছে বুধোর ঘাড়ে!

ডোনার নিশ্বাস আটকে গেল, তারপর?

—আমি বললাম, ভালো করে তদন্ত করুন। আমাকেই বলির পাঁঠা সাজিয়ে লাভ কী! হা-হা-হা—।

অলর্কের হাসি শুনে ডোনা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তাকে একগলা কাঁপুনির মধ্যে দাঁড় করিয়ে অলর্ক স্টার্ট দিল তার গাড়িতে। হু-স করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তায়।

॥ ১৭ ॥

অলর্কের হাড়-কাঁপানো হাসি গোটা একটি দিন বেশ প্যানিকে রাখল ডোনাকে। সন্ধেবেলা গার্গীকে ফোন করে জানালও ব্যাপারটা। গার্গী শুনে এতটাই চমকে গেল যে, মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব মিস্টেরিয়াস কিন্তু।

ডোনা সত্যিই বেশ কয়েকদিন ধরে অলর্ককে নিয়ে একটু ধন্দে আছে। তার ম্যানলি চেহারা, উদার, রাজা-রাজা স্বভাব যেমন তাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভাবনায় ফেলে তার অতীত জীবন, রহস্যময় কথাবার্তা।

গার্গী সাবধানবাণী উচ্চারণ করল, একটু এলার্ট থাকিস, ডোনা।

—ওহ, শিওর। ডোনা এরকম বহু পুরুষের ধকল বহন করতে পারে, গার্গী। ডোন্ট ওরি—, বেশ রেলা মেরে বলল বটে ডোনা, বেশ সাহস দেখিয়েই তবু কী একটা আলপিন তার গলার কাছটায় বেধে আছে ক'দিন ধরে। রাতেও গভীরভাবে ভেবে চলেছে ব্যাপারটা। মন্দারকে তবু বোঝা যায়, টেন্ডার-পাগল একটা লোক। কিন্তু অলর্ক রহস্যময়। আগাপাশতলা রহস্যে মোড়া

BanglaBook.org

তার সমস্ত অস্তিত্বই। অলর্ককে নিয়ে এখন সে কী করবে।

দিনদুয়েক পরে বেলা এগারোটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া সেরে ডোনা বেরিয়ে এল তাদের বাড়ির বাইরে। আজ তাকেই ঘর ইন্টারলক করে বেরুতে হবে। প্রায় সকাল থেকে বাড়িতে সে আজ একাই। চিত্রদীপ খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছেন শিয়ালদহের দিকে। আজই ওখানকার শো-রুমে রঙের ফাইনাল টাচ হবে। ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে রংকর্মীদের ঠিকঠাক নির্দেশ দিতে হবে, কখনও নিজেকেই মই-এ উঠে ব্রাশ চালাতে হবে ম্যুরালের কারুকাজ ফোটাতে। চিত্রদীপের পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন বনানীও, নিউমার্কেটের দিকে কিছু টুকটাক কেনাকাটি আছে তাঁর। ফেরার পথে ভবানীপুরে কার বাড়িতে যেন যাবেন। ফিরতে বেলা একটা-দেড়টা হয়ে যাবে। তার বেরুনোর সময় শিহরনও বেরুচ্ছিলেন তৈরি হয়ে। বনানীকে গাড়িতে উঠতে দেখে বললেন, তোমার গাড়িতে একটা লিফট দেবে, বনানী?

বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে তুমি?

—বলতে পারো একটা ছোটখাটো আউটিঙে, অলর্কের সঙ্গে খড়গপুরের দিকে।

—সে কি, হঠাৎ?

—ওখানে কয়েকজন বিজনেসম্যানের সঙ্গে অলর্কের একটা ডিল আছে। হয়তো আজ নাও ফিরতে পারি।

—তাই নাকি? কবে ফেরার কথা?

—কাল বিকেলের দিকে, কিংবা রাতও হতে পারে।

—পরশু ডোনাদের কলেজে ফাংশন আছে, সে খেয়াল আছে?

—খুবই আছে। কারণ ওদের নাটকে আমারও তো কিছু অবদান আছে।

বনানী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি তো তোমার লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, অধ্যাপক-সমিতি এ সব নিয়ে ভালোই ছিলে এতদিন। হঠাৎ অলর্কের ব্যাবসার মধ্যে মাথা গলাচ্ছ কেন?

শিহরন অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিলেন, মাঝেমধ্যে মুখ বদলাতে কার না সাধ হয়।

শিহরনের বলার ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে মুখটা বিকৃত করেছিলেন বনানী। হিসহিস করে বলেছিলেন, তুমি যে এতটা লম্পট তা আগে এভাবে বুঝতে পারিনি।

শিহরন বিশ্রীভাবে হেসে বলেছিলেন, বুঝতে পারলে কী করতে?

কথার উত্তর না দিয়ে বনানী বললেন, শেষ পর্যন্ত অন্য অধ্যাপকদের বউ নিয়ে টানাটানি করছ আজকাল?

শিহরন আবার হাসলেন, সে তো আমার বহুদিনের অভ্যাস।

ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে বনানী প্রায় বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে উঠলেন, এর শাস্তি কিন্তু তোমাকে একদিন পেতেই হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এবার বোধহয় তুমি সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

—তাই নাকি? হঠাৎ আমার চরিত্র নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে শুরু করলে কেন? আমাকে তো তুমি বিশ বছর ধরে চেনো। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কত করেছি। আমার স্বভাবটাই যে এরকম, না মরা পর্যন্ত স্বভাব বদলাবে না। সেই যে একটা প্রবচন আছে না, অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। বাংলায় বলে, কয়লা না যায় ধুলে, স্বভাব না যায় মলে—।

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, তোমার মরাই দরকার। তাহলে ঘরের মেয়ে-বউগুলো অন্তত বাঁচে।

এত ঝগড়াঝাঁটির পরও শিহরনকে সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন বনানী। সমস্ত কথোপকথন ঘটেছিল ডোনার সামনেই। ক'দিন ধরেই লক্ষ করছিল ডোনা, বনানীর সঙ্গে শিহরনের একটা কোল্ড-ওয়ার চলছে। কারণটা সে একেবারে না বোঝে তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে

BanglaBook.org

তেমন মাথা ঘামায়নি।

শিহরন গাড়িতে ওঠার সময় আবার বলেছিলেন, খুব বেশিদিন তোমাদের আর জ্বালাব না, শিগগির এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

বনানী এবং শিহরনের মধ্যে যে একটা প্রবল টানাপোড়েন চলছে তাতে ব্যাহত হচ্ছে ডোনাদের বাড়ির আবহাওয়া, সে-টানাপোড়েনে ডোনারও যে একটা ভূমিকা আছে তা ডোনা জানে। শিহরনের সঙ্গে ডোনার ঘনিষ্ঠতা একেবারেই সহ্য করতে পারছেন না বনানী। ওদিকে কয়েকদিন আগে শিহরনদার সামনেই তাঁকে নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছে চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে। চিত্রদীপ তখনই সরাসরি বলে দিয়েছেন, তিনি চান শিহরন তাঁদের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক। শুধু যে তাঁদের ঘরই আটকে রেখেছেন শিহরন তা নয়, কয়েকদিন আগে শিহরন কোনও একটি শো-রুম দেখে এসে মন্তব্য করেছেন, লে-আউটটা যতটা ভাবা গিয়েছিল, তত ভালো হয়নি। শুনে চিত্রদীপের মুখ গনগনে হয়ে উঠেছিল রাগে। হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, হু ইজ হি টু কমেন্ট লাইক দ্যাট!

শিহরনের কোনও ধারণাই নেই, এহেন মন্তব্য করলে চিত্রদীপের সম্মান কতটা হানি হয়। না কি ইচ্ছে করেই মন্তব্যটা করেছেন শিহরনদা! চিত্রদীপ তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন, তাতে পালটা রাগ দেখাতেই।

এতসব টানাপোড়েন মন কষাকষির মধ্যে থাকতে চায় না ডোনাও। সে ভাবতে চায়, লাইফ ইজ জাস্ট অ্যা ফান, তবু এই ঘাত-প্রতিঘাতের আঁচে সামান্য ক্লান্ত বোধ করছে আজকাল। তার কাঁধেও এখন প্রচণ্ড ঝামেলা চেপে বসেছে। একদিকে চিত্রদীপের চিত্রপ্রদর্শনী, অন্য দিকে ড্যান্স-ড্রামার রিহার্সাল।

এমন সব ভাবনায় গেরো দিতে-দিতে যোধপুর পার্কের স্টপেজ থেকে একটা মিনিবাস ধরে নিল ডোনা। আজ মাত্র গোটা দুয়েক ক্লাস আছে, তারপর ড্যান্স-ড্রামাটার মহড়া শুরু হবে দোতলার একটা ঘরে। রিহার্সাল শেষ হলে তার ইচ্ছে মন্দারকে একবার দেখতে যাবে নার্সিংহোমে। হাজারো কাজের চাপে এতখানি স্যান্ডউইচড হয়ে আছে ডোনা যে, গত এক সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখতে যেতে পারেনি মন্দারকে দেখতে। খুবই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে আছে মন্দার। নার্সিংহোম থেকে পরশু টেলিফোন করেছিল তাকে, তুমি কি আমাকে ভুলেই গেলে, ডোনা!

ডোনা বিব্রত হয়ে বলেছিল, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার কাঁধে এখন দু-কোটি দায়িত্ব।

—আশ্চর্য, আমি মরে গেলেও বোধহয় তোমার দেখতে আসার সময় হবে না।

—ঠিক আছে, দু-একদিনের মধ্যে অবশ্যই যাব।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা আজ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, শুনশান। নিশ্চয় আজ শনিবার বলেই। কিছু ছেলে-মেয়ে এদিকে-ওদিকে জটলা করছে, হয়তো তারাও বাড়ি ফিরবে বলে উদ্যোগ করছে মনে-মনে, আর একটু আড্ডা মেরে ফেরার বাস ধরবে। ক্যাম্পাস বরাবর হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই ডোনার চোখ পড়ে গেল গার্গীর দিকে, বলল, হাই।

গার্গী তখন তার সামনে দাঁড়ানো এক বিশালকায় কাবুলিওয়ালার সঙ্গে বাতচিত করছে। আপাদগলা ঢোলা পোশাকে ঢাকা দৈত্যের মতো চেহারার কাবুলিওয়ালার পাশে সাধারণ মাপের বাঙালিকন্যা গার্গীকে দেখাচ্ছে প্রায় লিলিপুটপ্রতিম।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার গার্গী।

গার্গী হাসল, দ্যাখ না, হঠাৎ এই কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে ভারী ইন্টারেস্ট জাগল। ওরা কোথায় থাকে, কবে আসে, কবে যায়, এখানে কী-কী ব্যাবসা করে, দেশে কে-কে থাকে, এইসব।

—বেশ মেয়ে বাবা। সঙ্গে-সঙ্গে ডায়েরিতে নোটও করে নিচ্ছিস। নিশ্চয় একটা লেখা তৈরি করে ফেলবি ওদের নিয়ে? তাহলে আমিও একটা পয়েন্ট সাপ্লাই করতে পারি। পয়েন্টটা হল, এ-দেশে রাস্তাঘাটে এতই তো কাবুলিওয়ালা দেখতে পায় সবাই, কাবুলিওয়ালার বউ কেউ

BanglaBook.org

কখনও দেখেছে?

গার্গী হেসে উঠল, বেশ বলেছিস তো। শুনেছি খুব সুন্দরী হয় ওরা।

—সুন্দরী বলে সুন্দরী। লোকে বলে, একেবারে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী। সেইজন্যই নাকি ওরা বউ নিয়ে কখনও এ-দেশে আসে না, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়।

—বাহ, উপমাটা বেশ দিলি যা-হোক। মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী! একেবারে ছেলেরা যেমনভাবে বলে—।

ডোনা খিলখিল করে হাসল, মেয়েদের সম্পর্কে সব উপমা তো এ পর্যন্ত ছেলেরাই দিয়ে এসেছে। মেয়েরা মেয়েদের সম্পর্কে তেমন ভালো উপমা আর দিল কোথায়। মেয়েরা তো মেয়েদের শুধু হিংসেই করে।

—একজ্যাকটলি। দাঁড়া, সাক্ষাৎকারটা শেষ করে নিই। বলতে-বলতে গার্গী আবার মন দেয় তার সামনে দাঁড়ানো কাবুলিওয়ালাটার দিকে। ডোনাও হাসতে-হাসতে এগোয় তাদের ডিপার্টমেন্টের দিকে। কাবুলিওয়ালাটা এতক্ষণ তাকে যেন হাঁ করে গিলছিল। হয়তো তার শরীরের পোশাক-বিপ্লবের জন্যই।

ডিপার্টমেন্টের দোতলায় উঠতেই তাদের ক্লাসের লোলিটার সঙ্গে দেখা। চাঁপাফুলের রঙের একটা স্কার্ট পরেছে লোলিটা, ব্ল্যাক টপ। মাথায় হর্সটেল করে চুল বাঁধা। তাতে বিদেশি সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখাচ্ছে লোলিটাকে। ডোনা তার দিকে একনজর তাকিয়ে মনে-মনে হাসল। লোলিটা আজকাল পোশাকেআশাকে ডোনাকেই নকল করার চেষ্টা করে। ডোনার পরনেও আজ স্কার্ট-ব্লাউজ। তবে তার রং জেড-ব্ল্যাক। মুখে বলল, কী রে, লোলিটা, ক্লাস হবে না?

—না। আর. ডি. আসেননি আজ। তার পরের ক্লাসটাও নাকি হবে না।

—বাহ, বেশ। তাহলে চল, রিহার্সালটা সেরে নিই।

—রিহার্সাল কাদের নিয়ে হবে। দু-তিনজন ছাড়া কেউই তো আসেনি দেখছি।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে কী রে। কাল বাদে পরশু ড্রামা। আজ যদি রিহার্সাল না হয়, তাহলে ফাংশন হবে কী করে?

—দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, এ নিয়ে কিছু ভাবিস না, দেখবি, ঠিক স্টেজে মেরে দেব।

—বাহ্, বেশ-বেশ, ডোনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, হঠাৎ না-ক্লাস, না-রিহার্সাল, কোনওটাই না হওয়াতে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল সে। এখন এই লম্বা দুপুরটা সে কীভাবে কাটাবে, কোথায় যাবে তার কোনও কিনারা করতে পারল না। আপাতত তার হাতে একটাই কাজ, মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়া। সেও বিকেল চারটের দিকে।

লম্বা করিডোরে বেশ কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে-করতে তার মনে পড়ে গেল গার্গীর কথা। একলা-একা এভাবে কালক্ষেপ না করে বরং গার্গীর কাবুলিওয়ালাপর্ব এখন কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেটাই সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা যাক। কাবুলিওয়ালার বউ আছে কি নেই এ নিয়ে যে জোকটা প্রায়শ তারা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনা করে, গার্গী সে-রহস্যের কোনও উন্মোচন করতে পারল কি না দেখতে গিয়ে প্রায় তাজ্জব হল। দেখল কাবুলিওয়ালাটা তার ঝোলা পকেট থেকে বার করেছে সযত্নে রাখা একটা রঙিন ফোটো। একটি যুবতীরই ছবি, কালো বোরখা তুলে রেখেছে মাথার ওপর। মুখের যে অংশটুকু বোরখার বাইরে দৃশ্যমান, তাতে যুবতী যে অতীব সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই।

ডোনাকে দেখে গার্গী হেসে ফিসফিস করে বলল, এই দ্যাখ, তোর কথা শুনে যেই লোকটাকে বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফোটোটা বার করে দিল। ছেলেদের চোখে পড়লে সত্যি পাগল হয়ে যেত কিন্তু—।

BanglaBook.org

ডোনা গলাটা নীচে নামিয়ে ঠাট্টা করে বলল, তুই মেয়ে বলেই ফোটোটা বার করে দেখাল। যাই হোক, দেখিস, লোকটার চাউনি মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। তোকে বগলদাবা করে না নিয়ে যায় ওদের দেশে। আজকাল কলকাতার টিনএজাররা নাকি কাবুলিওলাদের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

—সে হয়তো তোকে নিয়ে যেতে চাইবে, আমাকে নয়, বলে গার্গী হাসল। তার ইন্টারভিউ নেওয়া ততক্ষণে শেষ। কাবুলিওয়ালার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে এল হাঁটতে-হাঁটতে। গার্গীর কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তোর সেই ফিয়াসের খবর কী? সেই যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, এখন কেমন আছে?

—ভালোই আছে মনে হয়। পরশু টেলিফোন করেছিল। আর দেখতে যাইনি বলে রেগে ফায়ার।

—সে কী রে। এতদিন হয়ে গেল, আর একবারও দেখতে যেতে সময় পাসনি? কীরকম প্রেম রে তোদের?

ডোনা রহস্যময়ীর মতো শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, একেবারে প্লেটনিক প্রেম। দূর থেকে, দেখা না-দিয়ে যতটুকু প্রেম করা যায়, ততটুকুই। তবে ইচ্ছে আছে, আজ বিকেলে একবার যাব নার্সিংহোমে।

—ছাড়া পায়নি এখনও?

—না। তবে এর মধ্যে আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। কে যেন টেলিফোন করে বলেছে, একবার টার্গেট মিস করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরুলেই তোমার মৃত্যু। তাই ছাড়া পেলেও চট করে রিলিজ নেবে না বলল।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, সে কী! কে এমন ফোন করল?

—তা বুঝতে পারেনি। তবে সন্দেহ করছে এর আগে যে লোকটা টেলিফোন করে বলেছিল ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা, সি ইজ মাইন, এবারও সে-ই ফোন করেছিল।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে, তোকে আরও কেউ চাইছে! কে সে! নিশ্চয় চিনিস তাকে?

ডোনা গম্ভীর হয়ে তার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। তারপর উদাস হয়ে বলল, কী জানি, কে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গার্গী ডোনার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তোর অন্য কেউ প্রেমিক আছে? যে তোকে মনে-মনে পছন্দ করে—।

ডোনা এবারও শব্দ করে হেসে উঠল, সেরকম তো কতই আছে। তুই তো জানিসই আমি বিশ্বপ্রেমিকা। আমি বহুজনকে ভালোবাসি, অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা।

—ইয়ার্কি নয়, আমি সিরিয়াসলি বলছি। প্রথমে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, পরে হুমকি, ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবা দরকার।

ডোনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, দ্যাখ, যদি কেউ এভাবে পেছন থেকে মারতে চেষ্টা করে, তারপর টেলিফোনে হুমকি দেয়, আমি তাকে পুরুষ বলতে পারিনে। সাহস থাকে তো সামনে এসে ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিক।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কী ফয়সালা করে নেবে? ডুয়েল লড়বে নাকি?

—না, ডুয়েল লড়ার কথা বলিনি। আমি বলেছি, পেছন থেকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারার চক্রান্ত করে, তারা কাপুরুষ।

গার্গী ডোনার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল গভীরভাবে। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, কে ফোন করেছে মন্দারকে, কেনই বা, তা ডোনা জানে, অথচ এড়িয়ে যাচ্ছে সে প্রসঙ্গ। ভাবতে-

BanglaBook.org

ভাবতে হঠাৎ বলল, তাহলে এখন কী করবি? তোদের এম. আর.-এর কাছে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা ছিল যাবি নাকি একবার?

ডোনা ভুরু কোঁচকাল, মুখ টিপে হেসে বলল, ব্যাপারখানা কী বলত তোর? ফেঁসে গেছিস নাকি?

গার্গী হাসল, ফাঁসব কেন? সেদিন এম. আর. কে গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে দেখলাম। সস্ত্রীক হেঁটে আসছেন। কী সুন্দর দেখতে ঈষিতাদিকে, তাই না? ঈষিতাদির মতো বউ যার ঘরে আছে, তিনি আমার মতো সাধারণ মেয়ের দিকে তাকাবেন কেন?

—ঈষিতাদিকে দেখলি তাহলে? সেদিন একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঈষিতাদি নাকি আর ডি-র সঙ্গেও একটা অ্যাফেয়ার করবার চেষ্টা করছেন। এম.আর.-এর ওপর রাগ করেই।

—যাহ! কে বলল তোকে?

—শিহরনদাই হাসতে-হাসতে বলল সেদিন। শুনে আমি ভীষণ রাগারাগি করেছি শিহরনদার সঙ্গে। বলেছি, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়, কেন শুধু-শুধু একজন মহিলাকে নিয়ে আপনারা এভাবে ঘুরছেন? তাতে হেসে বলল, আমার আর দোষ কী! একজন মহিলা যদি যেচে এসে আমার ঘাড়ে চাপতে চায় কার কী করার আছে?

গার্গী অবাক হয়, কেন, ঈষিতাদি এরকম করছেনই বা কেন?

—শুনলাম, এম. আর.-এর ওপর প্রতিশোধ নিতে। এম. আর.-এর তো অনেক ফ্যান। প্রায়ই তো এর-ওর সঙ্গে ঘোরেন। ঈষিতাদি নাকি বেশ ক'দিন নিজের চোখে দেখেওছে, কোন ছাত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখে বেরুতে।

গার্গী কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, এগুলো খুব খারাপ। এতে কার কতটা লাভ হয় তা জানিনে, কিন্তু জীবনযাপনে ক্রমশ জটিলতা বেড়েই যায়। নেশাটা ফিকে হয়ে এলে পস্তাতে হয় সারাজীবন।

ডোনা হাসল রহস্যময়ীর মতো। সে এসব জটিলতার প্রসঙ্গ যেভাবে এড়িয়ে যায় সেভাবেই এড়িয়ে গেল চুপচাপ থেকে। গার্গী একটু পরে বলল, চল, আমিও তোর সঙ্গে নার্সিংহোমে যাই। গিয়ে দেখে আসি তোর মিস্টারকে।

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, যাবি? কিন্তু বিকেল চারটের আগে বোধহয় ঢুকতে দেবে না।

—তাহলে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে চা খেয়ে নিই দুজনে। সঙ্গে একটা কাটলেট-ফাটলেট নিলে কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক আরও সব আগডুম-বাগডুম বকে তিনটে নাগাদ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনে চলে এল বড় রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেতেই ডোনা ডাক দিল, অ্যাই, রোখখে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল, ছোটখাটো জ্যামজোম, ক্রশিঙে পুলিশের হাত ইত্যাদি নানান বাধাবন্ধ পেরিয়ে রডন স্ট্রিটের নার্সিংহোমটিতে পৌঁছতে।

নির্দিষ্ট কেবিনটিতে ঢুকে দুজনে এক আজব দৃশ্য দেখল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে তার সামনে রাখা একরাশ কাগজপত্র উলটেপালটে দেখছে মন্দার। তার হাতে একটা লাল রঙের ডটপেন। এতই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে, যে হাতের পেনটা সে কামড়াচ্ছিল দাঁত দিয়ে। মাথায় চওড়া করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডোনাদের দেখেই কাগজগুলো একপাশে জড়ো করে রেখে ম্লান হাসল, এতদিনে মহারানির সময় হল আমাকে দেখতে আসার!

মন্দারের চোখমুখ জুড়ে থমথমে অভিমান, আর তা হওয়ারই কথা। ডোনা সামান্য হেসে অন্যভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, বাহ, হেড-ইনজুরি হয়ে যে মহারাজ নার্সিংহোমে ভরতি আছে, সে আবার অফিসের কাগজপত্র দেখে কোন নিয়মে! শিগগির সরাও ওগুলো—।

মন্দার যে খুব রেগে আছে তা বোঝাতে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে

BanglaBook.org

বলল, যেরকম সিরিয়াস ইনজুরি হয়েছে মাথায়, তাতে এসব কাগজপত্রের জটিল হিসেবটিসেব দেখার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু আমি তো তোমার মতো সুখী রাজকন্যা নই, একটা কোম্পানি অনেক কষ্ট করে চালাতে হয়। সেখানের একদিনের অনুপস্থিতি মানেই বিরাট লস। গত কয়েকদিন চুপচাপ শুয়েই ছিলাম। কিন্তু আজ একটু আগেই আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা দেখতে এসেছিল, তারা এই কাগজগুলো দিয়ে বলে গেল, আপনি যখন একটু ভালো আছেন, টেন্ডার পেপারগুলো দেখে সই করে রাখবেন। কালই জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট। তাই-ই—।

গার্গীও মৃদু ধমক দিয়ে বলল, সেদিন আপনাকে দেখে গেলাম প্রায় আনকনসাস, কথাই বলতে পারছিলেন না। এত বড় একটা হেড-ইনজুরি হয়েছে, তার মধ্যে এইসব কমপ্লিকেটেড কাগজপত্র মোটেই দেখা উচিত হচ্ছে না আপনার।

মন্দার বেশ খুশি হল গার্গীর ধমক খেয়ে। বিষণ্ণভাবে হেসে বলল, তবু যা-হোক আপনি ইনজুরির সিরিয়াসনেসটা বুঝতে পেরেছেন। অথচ আপনার বান্ধবী দেখতে আসার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। ডাক্তার এক্স-রে রিপোর্ট দেখে বললেন, মাত্র একচুলের জন্য বেঁচে গেছেন। ইনটারনাল হেমারেজও নাকি সামান্য হয়েছিল। কনটিনিউ করলেই মারা যেতাম নির্ঘাত।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, কী ডেঞ্জারাস। তার পরও আপনি এসব জটিল কাগজপত্রে মাথা ঘামাচ্ছেন! উঁহু, মোটেই ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, যে কথাটা আমাকে ভাবাচ্ছে তা হল, আপনি তো বলেছেন, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

মন্দার এতক্ষণে উৎসাহী হয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি, কে আমার ক্ষতি চাইছে। আমার প্রফেশনাল লাইনে অবশ্য বহু শত্রু আছে। আমি যে দ্রুত সাইন করছি আমাদের প্রফেসনে, তা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। তবে এ ঘটনাটা খুবই মিস্টিরিয়াস। লোকটা এর মধ্যে ডোনাকে জড়াচ্ছে কেন বুঝতে পারছিনে।

হঠাৎ বিব্রত দেখাল ডোনাকে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, অ্যায়াম ভেরি স্যরি, মন্দার। আমার কারণেই যদি তোমার এই বিপদ হয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো, যে তোমাকে আঘাত করেছে, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করব না।

মন্দার যেন এই কথাটাই শুনতে চাইছিল ডোনার কাছ থেকে। এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, আমারও খুব খারাপ লাগছে। আমি অন্য কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি এই ভাবনাটাই আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। যাক গে, এখন রিলিজ নিয়ে বাড়ি চলে যাব, তাতেও ঘাবড়ে যাচ্ছি। ডাক্তার অবশ্য বলছে, আরও দিনসাতেক থেকে যান। পুরোপুরি সুস্থ না করে ছাড়ব না আপনাকে। আমিও বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ বলা যায় না, এখান থেকে বেরুবার পর হয়তো আবার একটা অ্যাটেম্পট হল আমার ওপর। তার চেয়ে সাতদিন পরে যাওয়াই ভালো। এই সাতদিনই হয়তো অতিরিক্ত আয়ু হয়ে গেল আমার।

গার্গী এতক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিল গভীরভাবে। এবার বলল, আপনার কিন্তু থানায় একটা এফ. আই. আর. করা উচিত মিঃ মিত্র।

প্রস্তাব শুনে মন্দার লাফিয়ে উঠল, ঠিকই বলেছেন। এখানে টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমি তাই-ই ভাবছিলাম। কালই লিখে পাঠাব থানায়।

ডোনা ততক্ষণে তার কাঁধের ঝোলাব্যাগটি থেকে বের করেছে একগুচ্ছ রঙিন ছবিওয়ালা কার্ড। সুদৃশ্য ছবির একপাশে অলঙ্কারময় হস্তলিপিতে লেখা ডোনাদের ড্যান্স-ড্রামার বিবরণ। তারই একটি কার্ডে মন্দারের নাম লিখে ডোনা মৃদু হেসে এগিয়ে দিল, যেতে পারবে না তা তো বুঝতেই পারছি। তবু কার্ডটা দিয়ে গেলাম। শিহরনদারই লেখা নাটক। বললেন, নাটকটা লিখেছেন স্রেফ নাকি আমার কথা ভেবেই। আমার মাথায় একরাশ ফাঁপানো চুল আছে তাই। একেবারে নতুন ধরনের ড্যান্সড্রামা।

BanglaBook.org

মন্দার তার হাতের ডটপেনটা কুটকুট করে কামড়াচ্ছিল। পেনটা দাঁতের ফাঁকেই আটকে রেখে ডানহাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে বলল, ইস, তাই নাকি? সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে যেতাম। তোমার অভিনয় দেখা সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার। খুবই কৌতূহল হচ্ছে দেখার জন্যে।

ডোনা হেসে বলল, ব্যাড লাক। কী আর করবে। এখন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো।

—যদি নেক্সট টাইম কখনও স্টেজ হয়, বোলো কিন্তু।

—ওহ, শিওর। ঠিক আছে। গুড লাক, বলে মন্দারকে গুডবাই করে ডোনা আর গার্গী বেরিয়ে এল নার্সিংহোমের বাইরে। বেরুবার সময় গার্গী দেখতে পেল, ডোনা চলে যাচ্ছে বলে মুখটা কালো হয়ে গেল মন্দারের। বাইরে এসেই তাই অনুযোগ করতে ছাড়ল না, এ তোর কিন্তু খুবই অন্যায়, ডোনা, অসুস্থরোগী তখনই দ্রুত সেরে ওঠে, যদি তার প্রিয়জনেরা ঠিকমতো দেখভাল করে তাকে, কিংবা সেবা করে মনোযোগ দিয়ে। আর তুই একবার তাকে দেখতে আসার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিস না!

আবারও কাঁচুমাচু হয়ে এল ডোনার মুখ, শেষ পর্যন্ত তুইও এরকম বললি, গার্গী? তুই তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস, কীরকম বিজি হয়ে রয়েছি আমি। তারপর হেসে আবার বলল, আমার হয়ে বরং তুইই না-হয় আর একদিন এসে দেখে যাস—।

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, বেশ বলেছিস তো!

॥ ১৮ ॥

শিহরন রায়চৌধুরি যে ড্যান্স-ড্রামাটা লিখে দিয়েছেন ডোনাদের অভিনয়ের জন্য সেটা একেবারেই নতুন ধরনের। যে ইংরেজি গল্পটিকে তিনি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছেন, সেটি সবারই পরিচিত, বিখ্যাত লেখক ও. হেনরির বিখ্যাত গল্প, দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই। ডোনাদের ক্লাসের মেয়েরাই শুধু অংশগ্রহণ করবে এই ড্যান্স-ড্রামাটিতে। ডোনারা সাত-আটজন মেয়ে খুব খেটেখুটে মাত্র কয়েকদিনের রিহার্সালে কোনওরকমে দাঁড় করিয়েছে নৃত্যনাট্যটিকে। সাত-আটখানা ইংরেজি গানও আছে যেগুলি সবই শিহরনের নিজের লেখা। গানগুলিতে ডোনারা এমন চমৎকার সুর দিয়েছে যে, যেসব অধ্যাপক মাঝেমধ্যে সময় করে রিহার্সাল দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এর আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দু-একবার ইংরেজি নাটক না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কখনও ইংরেজি ড্যান্স-ড্রামা হয়নি। ডোনা অনেকদিন হল নাচ ছেড়ে দিয়েছে। তবু বেশ চেষ্টাচরিত্র করে আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বিদেশিনীর ভূমিকায়। আগের বার 'ওথেলো' করেছিল তারা। ডোনা ডেসডিমোনার ভূমিকায় ফাটাফাটি অভিনয় করে প্রায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইউনিভার্সিটি চত্বর। এবার নতুন নৃত্যনাট্যটিতে তার ভূমিকা ডেলার।

কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানটি রূপায়িত করতে যেমন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তেমনি এই নৃত্যনাট্যটি নিয়ে তাদের দপ্তরে নাটকও হচ্ছে কম নয়। নাটকের রিহার্সাল দেখে প্রায় সব অধ্যাপকই যখন প্রশংসায় মুখর, তখন একা রণজয় দত্তই নাকি বলেছেন, বাহ, এরা আর নাটক লেখানোর লোক পেল না? শেষ পর্যন্ত শিহরন রায়চৌধুরি। সে নাটক কি লোকে দেখতে আসবে? কেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আর নাটক লেখানোর লোক ছিল না!

কথাটা কানে আসতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছে ডোনা। এহেন তীব্র মন্তব্য তাকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা তাদের দপ্তরের এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত তার ভূমিকাই প্রধান। নাটকের মনোনয়ন থেকে শুরু করে তার কাস্টিং, পরিচালনা, রিহার্সাল, লাইটিং, স্টেজ, এমনকী আমন্ত্রণ—সবই সে একা হাতে করে। সব ব্যাপারে সে-ই প্রতিবার উদ্যোগী হয় বলে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানই সফল হয়। এবার তো আবার নৃত্যনাট্যটি লেখা তারই পরিচিতজনের। যদি দর্শক না

BanglaBook.org

আসে, যদি অনুষ্ঠান ঠিকমতো না করতে পারে, যদি ফ্লপ করে গোটা ব্যাপারটা, তাহলে তো সব দায়িত্ব বর্তাবে ডোনারই ওপর।

কিন্তু শোয়ের দিন দর্শকদের ঢল দেখে সবাই বিস্মিত। অবিশ্বাস্যও মনে হল ব্যাপারটা। তাদের প্রেক্ষাগৃহটিতে যত সিট ছিল, ইচ্ছে করেই তার চেয়ে দশ শতাংশ কার্ড বেশি বিলি করেছিল, যাতে কিছু আমন্ত্রিতজন শেষ পর্যন্ত না এলেও (যা প্রতিবারেই হয়ে থাকে) যেন হলটা ভরতি হয়ে যায়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সমস্ত সিট ভরতি হওয়ার পরও কিছু বাড়তি দর্শক এসে গেছেন। কিছু গুঞ্জন-হইচই শুরু হতেই দ্রুত তাড়াহুড়ো করে আরও কিছু ফোল্ডিং চেয়ার জোগাড় করে সামাল দেওয়া হল পরিস্থিতি, তবু কিছু বাড়তি দর্শক রয়েই গেল শেষ রো-এর পিছনে।

ওদিকে ডোনা ততক্ষণে নিজেকে প্রবিষ্ট করছে ডেলার চরিত্রে। বুকের ভেতরে মৃদু কাঁপুনি না আছে তা নয়, প্রতিবারই মঞ্চে নামার আগে এমন হয়ে থাকে, এবার যেন আরও একটু বেশি, কারণ মেক-আপ রুমে বসেই খবর পাচ্ছিল, হলে তিলধারণের জায়গা নেই, তবু পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা সাদা লেস বসানো ঝলমলে হলুদ গাউন পরে, চমৎকার মেক-আপ নিয়ে মঞ্চে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল নিজেকেই যেন আর চিনতে পারল না। সে যেন এই মুহূর্তে আর ডোনা নয়, এক বিদেশিনী, যার নাম ডেলা, যার মাথায় একঢাল চুল আর চমৎকার মুখের ছাঁদ নজর কাড়ার মতো। তার ফরসা শরীরে হলুদ গাউনটা মানিয়েওছে সুন্দর। হলুদ রংটা তারই পছন্দ করা। মাত্র এই কিছুকাল আগে বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর যখন তাঁর অষ্টম বিবাহ করলেন, তখন বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রে অনুরোধ ছিল, আমন্ত্রিতরা কেউ যেন হলুদ পোশাক পরে না আসেন বিবাহ অনুষ্ঠানে। কেন এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা তা পরিষ্কার হল বিবাহের দিন, কেননা সেদিন এলিজাবেথ টেলর এমনই একটি হলুদ গাউনে নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন।

ডোনা যেন আজ সেই অপরূপ সুন্দরীর সাজে। আর মঞ্চে অভিনয়ও করল প্রায় এলিজাবেথ টেলরের মতোই। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল তার নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে, গানগুলি গাইল চমৎকার করে। এমনকী চলনে-হাবভাবেও সে অবিকল বিদেশিনীর মতো, শুধু নাটকের শেষদৃশ্যে একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল, ঝামেলা বাধল সেই সময়েই। দেবযানী নামের যে মেয়েটি পুরুষ সেজে জিমির ভূমিকায় অভিনয় করছিল, রিহার্সালের সময় এই দৃশ্যটিতে ঝুঁকে পড়ে ভঙ্গি করত চুমু খাওয়ার। কিন্তু আজ মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিসত্যিই সে ডেলার ঠোঁটে-ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেয়ে নিল, বেশ একটু সময় নিয়েই। ডোনা নিজেও কম অবাক হয়নি। চুমু খেতে-খেতেই ফ্রিজ হয়ে যাবে তারা, ধীরে-ধীরে নেমে আসবে পরদা, নাটকও শেষ, এরকমই পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু ঘটনা হয়ে গেল অন্যরকম। ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একদল দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে তুমুল হাততালি দিতে থাকল প্রযোজনাকে প্রশংসা করে, আর একদল দর্শক চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট, স্টপ ইট।

ডোনারা প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা। ভাবছিল, হয়তো জিমিবেশি দেবযানীকে দর্শকরা পুরুষ বলে ভেবে নিয়েছে, তাই এই চুম্বনের দৃশ্যটির প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। দেবযানীর চেহারাটা বেশ বড়সড়, প্রায় পাঁচ-সাত হাইট, কোথায় যেন একটা পুরুষালি বলিষ্ঠতা আছে তার উপস্থিতিতে, সেটা ডোনাও বুঝতে পারছিল তাকে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে। দর্শকরা বোধহয় তাই বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছে দৃশ্যটা।

স্টপ ইট, স্টপ, চিৎকারে হাততালি মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্চের ওপর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ডোনা আর দেবযানী। পরদা নামাও বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। সেই মুহূর্তে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, আলো, আলো জ্বালাও শিগগির।

সে সময় স্বাভাবিক নিয়মে আলো জ্বলে ওঠারই কথা। আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল একেবারে সামনের রো-এর কাছে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে শোনা গেল, খুন, খুন, মার্ডার।

BanglaBook.org

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ডোনারা চমকে উঠল তৎক্ষণাৎ, ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে প্রবল হইচই-হুড়োহুড়ি। সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। তার ভেতর প্রবল ঠেলাঠেলি, গুতোগুতি—কেউ-কেউ আহতও হল ভীষণভাবে।

মঞ্চের ওপর ডোনাদের এক অধ্যাপক ত্রিদিবেশবাবু মাইক নিয়ে বলতে লাগলেন, আপনারা অযথা হুড়োহুড়ি করবেন না। আস্তে-আস্তে একে-একে বাইরে যান। কোনও ভয় নেই। মনে হচ্ছে, এটা একটা দুর্ঘটনা।

ডোনারা সবাই পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন। ভিড় একটু হালকা হলে দেখা গেল, একেবারে সামনের রোয়ের কাছে তখনও বেশ কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কেউ বলছে, শিগগির হাসপাতালে নিয়ে চল। কেউ বলছে, জল নিয়ে আয়।

ডোনারা কয়েকজন তাদের মেক-আপ করা অবস্থায়ই ছুটে গেল সেদিকে। ভিড় ঠেলেঠুলে কোনওক্রমে কাছে গিয়ে দেখল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক উপুড় হয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে। তার সাদা পাঞ্জাবি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। আরও একটু কাছে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখ তার চোখে পড়তে সে একদম নিশ্চল হয়ে গেল। খুন হয়েছেন শিহরন। একটা গুলি ভেদ করে চলে গিয়েছে তাঁর হৃৎপিণ্ড।

॥ ১৯ ॥

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ এভাবে পড়ে আছে দেখে তখন প্রবল বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। এভাবে জনাকীর্ণ জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে খুন হলেন শিহরন তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে সবাই।

গার্গী গ্রিনরুমের ভেতরেই ছিল। হই-চই শুনে ছুটে এসে নীচে এহেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল সেও। ওদিকে ডেলার পোশাক পরা ডোনার চোখ আতঙ্কে ছিটকে বেরুচ্ছে যেন। তারও চোখের সামনে ঝাপসা, অন্ধকার ঠেকছে সব। একটু পরেই কেউ যেন বলল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত।

একজন কাছে গিয়ে শিহরনের নাড়ি টিপে ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তার আর দরকার হবে না বোধহয়। হি ইজ ডেড।

ততক্ষণে গার্গী দেখতে পেল, সেখানে জড়ো হয়েছেন চিত্রদীপ, বনানী আরও অনেকে। চিত্রদীপ প্রায় পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন, অ্যাবসার্ড, অ্যাবসার্ড। বনানী ভয়ার্ত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন শিহরনের মৃতদেহের দিকে। যেন কারোরই বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা সহসা ঘটে যেতে পারে প্রেক্ষাগৃহের ভেতর। একটু দূরেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অলর্ক। ভিড়ের ভেতর একপাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। আরও অনেক চেনাজানা লোক দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে শঙ্কিত দৃষ্টি ছড়িয়ে।

তখনও টাটকা রক্ত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের মেঝে। এহেন বীভৎস দৃশ্যের সামনে একজন মহিলা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামী ঠিকঠিক সময়ে ধরে না ফেললে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল শুশ্রূষা করতে।

দেখতে-দেখতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা। এমনিতেই সারাদিনই প্রবল টেনশনে, খাটাখাটুনিতে পরিশ্রান্ত হয়ে ছিল, তার ওপর এরকম একটা শক ভাবতেই পারছে না সে। তার একটু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী, সে চট করে ডোনার কাছে গিয়ে বলল, এদিকে আয়, ডোনা

BanglaBook.org

বাইরে যাই—।

তার পরের মুহূর্তগুলো তাদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। হাসপাতাল, থানা, পুলিশ—এদের কারোরই মুখোমুখি হওয়া কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে কাম্য নয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ, জেরা, খুঁটিনাটি নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে-হতে প্রত্যেকেই জেরবার হয়ে গেল।

অভিনয়ের প্রবল পরিশ্রমের পর কোথায় ডোনারা স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটু বিশ্রাম নেবে, পরিবর্তে সে রাতটা তাদের কাটল এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের ভেতর। টেনশনে, শোকে, দুশ্চিন্তায় সারাটা রাত ছোটাছুটি করে যখন ভোর হল, তখন ডোনাদের বাড়ির তিনজন মানুষের চেহারা হয়ে দাঁড়াল বিধ্বস্ত, ঝোড়ো-কাকের মতোই।

শিহরন রায়চৌধুরির মৃত্যুর ঘটনায় যেমন শোকস্তব্ধ হয়ে গেছে ডোনাদের বাড়ির সবাই, তেমনই বিহ্বল হয়ে গেছে গার্গীও। পরের দিন পোস্টমর্টেমের ঝামেলা তো আছেই, তাছাড়া ডোনাদের বাড়ি অসংখ্য লোকের যাতায়াত, ফোন ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল সবাই। সারারাত ঘুম হয়নি কাল, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতঙ্কে কেউ আর দাঁড়াতে পারছে না পায়ের পাতা মেলে। গার্গী সামান্য সময়ের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, তার মা ও দাদা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন, গার্গী অবশ্য মাঝরাতের দিকে একবার ফোন করে দিয়েছিল, সে রাতে ফিরতে পারবে না জানিয়ে। ভোরে বাড়ি গিয়ে চেষ্টা করল ঘুমোতে, কিন্তু ঘুমই এল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফের চলে এল ডোনাদের বাড়ি। শিহরনের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় হয়েছিল একদিন, না হওয়ার মতোই, কিন্তু সে এটুকু জানত, শিহরন ডোনাদের বাড়িতে পরিবারের একজনের মতোই বাস করতেন। সেই শিহরন হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের ভেতর ভিড়ের মধ্যে গুলিতে নিহত হয়েছেন এটা যেমন আশ্চর্যের, তেমনই রহস্যেরও।

ভোর রাতে থানা থেকে টেলিফোন এসেছিল ডোনাদের বাড়ি, পুলিশ-অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র বিকেলের দিকে আসবেন ঘটনার তদন্ত করতে। ডিটেকটিভ বইয়ে এহেন তদন্তের কথা হাজারবার পড়া থাকলেও কখনও স্বচক্ষে খুনের তদন্ত দেখেনি গার্গী। তাই তার ভেতরে উসকে উঠছিল একটা প্রবল কৌতূহল। কলকাতা শহরে খুনের কিনারা আজকাল হয় না বললেই চলে। এখানে সেই অর্থে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভও নেই যার নাম শহরবাসী একডাকে জানে। যা কিছু ইনভেস্টিগেশন তা কলকাতা-পুলিশেরই একচেটিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্জশিট দিতে দিতেই তারা বছর পার করে দেয়। বহু ক্ষেত্রে চার্জশিটই দিতে পারে না। কোর্টে মামলা খারিজ হয়ে যায় প্রমাণের অভাবে। এখন এহেন একটি জলজ্যান্ত খুনের রহস্য কীভাবে উদঘাটিত হয় তা দেখার জন্য উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে গার্গী।

শেষ-দুপুরের একটু আগেই ডোনাদের বাড়ি পৌঁছে দেখল, গোটা বাড়ির পরিবেশ থমথম করছে। চিত্রদীপ পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন মাঝেমাঝে, কী সব বকছেন বিড়বিড় করে, কখনও পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে, কখনও স্টাডির চেয়ারে গিয়ে বসে থাকছেন অপ্রকৃতিস্থের মতো, আর বলছেন, আমার সব শেষ হয়ে গেল। বনানী তাঁর শোওয়ার ঘরে বসে আছেন গুম হয়ে। ডোনা বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল অন্যমনস্কের মতো। বোঝাই যাচ্ছে, পড়ার মতো মানসিক স্থৈর্য তার নেই। গার্গীকে দেখে ম্লান হেসে বলল, এসব কী হয়ে গেল বল তো?

গার্গী কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কাল থেকে ডোনার পাশে-পাশে থেকে ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। ঘটনাটা এতই আকস্মিক, এমনই অনভিপ্রেত যে, এখন কী ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে তা কেউই জানে না। গার্গীকে কোনও কথা না বলতে দেখে ডোনা আবার বলল, বাবা তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বারবার বলছে, পুলিশ ঘরে ঢোকা মানে সমূহ সর্বনাশ। এখন কত যে ঝড় বয়ে যাবে এ-বাড়ির ওপর দিয়ে তা ভাবা যাচ্ছে না।

গার্গী আবারও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, দ্যাখ, এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। পুরোপুরি অন্ধকার

BanglaBook.org

প্রেক্ষাগৃহে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একজ্যাক্টলি কী হয়েছে তা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। অতএব অনর্থক ভাবনাচিন্তা করাটা ঠিক নয়। পুলিশ আসুক, ইনভেস্টিগেট করুক, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। তবে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। কানায়-কানায় ভরতি হল, তার মাঝখানে হঠাৎ একজন লোকের পিঠে গুলি চালিয়ে হত্যাকারী কীভাবে গা ঢাকা দিল তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।

ডোনার গলাটা ধরে এল, ব্যাপারটা আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ কে এমনভাবে শিহরনদাকে—।

ডোনার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় কলিং বেলের গুঞ্জন। ডোনাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন স্মার্ট পুলিশ-অফিসার বুটের শব্দ তুলে ঢুকলেন লিভিংরুমের ভেতর। তার সঙ্গে জনা দুয়েক কনস্টেবল, তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে পুলিশ-অফিসারটি দৃপ্তভঙ্গিতে মুখোমুখি হলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির, নমস্কার, আমার নাম তুষারশুভ্র মিত্র। কালরাতেই একবার আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বোধহয় মনে আছে।

স্টাডিতে কয়েকটি চেয়ার, কুশন-পাতা মোড়া ছড়ানো ছিটোনো, তারই একটায় মৃদুকণ্ঠে পুলিশ-অফিসারকে বসতে বলে চিত্রদীপ বললেন, হুঁ, বলুন, কী জানতে চান?

পুলিশ-অফিসার একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসলেন, হাতের ছোট্ট ডায়েরিটা খুলে কিছু যেন পড়লেন মন দিয়ে। হয়তো কাল রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে যা-যা দেখেছিলেন, বা শুনেছিলেন এর-ওর মুখে, তাই-ই নোট করা রয়েছে সেখানে। তারপর পকেট থেকে পেন বার করতে-করতে বললেন, কাল রাতে আপনারা সবাই তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন, তাই না?

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে কামড়ে এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন পুলিশ-অফিসারের দিকে। প্রশ্ন শুনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, হুঁ, সবাই।

—সবাই মানে?

—আমি, আমার স্ত্রী বনানী। আমার মেয়ে ডোনা কাল নাটকে অংশ নিয়েছিল, নিশ্চয় শুনেছেন। এ ছাড়া শিহরণ।

ডায়েরিতে নোট করতে-করতে তুষারশুভ্র মিত্র আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, অন্য কোনও প্রশ্নে যাওয়ার আগে কাল রাতে ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল, একটু ডিটেলসে শুনতে চাই প্রথমে।

পাইপে কয়েকবার ফুকফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কোন ঘটনা?

—শিহরন রায়চৌধুরি কীভাবে খুন হলেন কাল সন্ধেয়?

—কীভাবে খুন হলেন সেটা তো বলতে পারব না। তবে ওদের ড্যান্স-ড্রামার লাস্ট সিনে, শেষ দৃশ্যে আজকালকার নাটকে যেরকম হয়, হঠাৎ ফ্রিজ হয়ে যায় কুশীলবরা। দর্শকরা সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তুমুল অভিনন্দন দিচ্ছে, ঠিক সেসময় মনে হল, কেউ যেন ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায়নি কী হল, কীভাবে হল। তারপর আলো জ্বালাতেই দেখা গেল, একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মেঝেয়, তার পিঠের দিকে পাঞ্জাবি রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—শিহরন রায়চৌধুরি বোধহয় একেবারে সামনের রোয়েই বসেছিলেন?

চিত্রদীপ ঘাড় নাড়লেন, একেবারে ফ্রন্ট রোতেই। সে-ই কালকের ড্যান্স-ড্রামার স্ক্রিপ্ট লিখেছিল। তাই নাট্যকার হিসেবে এই সম্মানটুকু তাকে দিয়েছিল ওরা।

—ও, আর আপনারা কোথায় বসেছিলেন?

—আমরাও ফ্রন্ট রোতেই বসেছিলাম। শিহরনের বাঁ-পাশে বনানী, বনানীর পাশে আমি। ড্যান্স-ড্রামার হিরোয়িনের বাবা-মা হিসেবে আমাদের গেস্ট কার্ড দিয়েছিল।

—শিহরনবাবুর ডানপাশে কে ছিলেন?

BanglaBook.org

—অলর্ক বোস নামের এক যুবক।

—তিনিও কি ওদের গেস্ট ছিলেন?

—হ্যাঁ। অলর্ক ওদের ফাংশনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিল। কালকের স্টেটসম্যান আর টেলিগ্রাফে ওদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনসর করেছিল সে।

—ও, শিহরনবাবুর পেছনের রো-এ কি আপনাদের চেনা কেউ বসেছিল?

চিত্রদীপ একটু ভেবে বললেন, হলের প্রথম দুটো রোয়ে বেশিরভাগই ছিলেন ওদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আর ড্যান্সড্রামার কুশীলবদের পেরেন্টসরা। এর চেয়ে ডিটেলসে আমি বলতে পারব না।

—আচ্ছা, আপনারা যখন শিহরনবাবুর পাশেই বসে ছিলেন, তখন কোনও গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একমুহূর্তে থমকে গিয়ে বললেন, না, শোনা সম্ভবও নয়। কারণ নাটক শেষ হওয়ামাত্র হলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছিল। দু-একজন সিট ছেড়ে বেরিয়েও পড়েছিল ডান পাশের রো আর বাঁ-পাশের রোয়ের মাঝখানে প্যাসেজ। প্রশংসাসূচক কিছু ধ্বনিও ভেসে আসছিল চারপাশ থেকে। এত হট্টগোলের মাঝখানে আমি অন্তত কিছু শুনতে পাইনি। বনানী, তুমি কিছু শুনেছিলে?

বনানী বসেছিলেন একটু দূরে একটা মোড়া টেনে নিয়ে, ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

—শিহরনবাবু যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তা আপনারা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন?

চিত্রদীপ নয়, উত্তর দিলেন বনানীই, হ্যাঁ, আমার পাশেই বসেছিল শিহরন। হাততালি দিতে দাঁড়িয়েও উঠেছিল মনে হল। তারপরই মনে হল, কে যেন ওকে ঠেলে ফেলে দিল।

—পেছন থেকে কেউ?

—আসলে সেসময় ভিড়টা কয়েক মুহূর্তের জন্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা বা থিয়েটারের শো ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছু গেটের বাইরে বেরুবার জন্য হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়, তেমনি কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে আবার পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।

দ্রুত হাতে তাঁর ডায়েরিতে কিছু পয়েন্টস নোট করে নিতে-নিতে তুষারশুভ্র মিত্র এবার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, আচ্ছা, শিহরনবাবুর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের সম্পর্ক? উনি তো এ-বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতেন?

উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, তা প্রায় এক বছরের ওপর হয়ে গেল শিহরণ এ-বাড়িতে ছিল।

—হঠাৎ উনি কীভাবে পেয়িংগেস্ট হয়ে এলেন এ-বাড়িতে? আগে থেকে পরিচয় ছিল নাকি ওঁর সঙ্গে?

—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, 'পেয়িংগেস্ট চাই' বলে। তাতে শিহরন অ্যাপ্লাই করেছিল—।

—হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি আপনাদের বাড়ি পেয়িংগেস্ট হিসেবে এন্ট্রি পেলেন? তার সম্পর্কে কোনও খবরাখবর নিলেন না?

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন চিত্রদীপ, হঠাৎ বনানী বললেন, শিহরন আমার সঙ্গে এক কলেজে পড়ত। সে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার কথা। আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে ও এসে দেখা করেছিল। চেনা লোক বলে আর আপত্তি করিনি।

—গত কুড়ি বছরের মধ্যে আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না? বনানী ঘাড় নাড়ালেন, না।

শিহরনবাবু কি কলেজে পড়াকালীন আপনার বন্ধু ছিল?

ইতস্তত করে বনানী বললেন, ওই আর কি। একসঙ্গে পড়তে-পড়তে যেরকম বন্ধুত্ব হয়ে

BanglaBook.org

থাকে।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাকালেন চিত্রদীপের দিকে, শিহরনবাবুর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কীরকম ছিল?

দ্রুত উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, ভালো। খুব ভালো। শিহরন প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হয়েই ছিল। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম।

—ও আচ্ছা। স্ত্রীর পুরুষবন্ধু কোনও পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে এলে হঠাৎ কখনও-কখনও গোলযোগ দেখা দেয়। আপনাদের পরিবারে সেরকম হয়নি?

চিত্রদীপ দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, কখনওই না।

—শিহরনবাবু তো ব্যাচেলর ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—এখানে আসার আগে শিহরনবাবু কোথায় থাকতেন?

চিত্রদীপ আর বনানী একবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিলেন। তারপর চিত্রদীপ বললেন, ঠিক কোথায় থাকত তা জানি না। তবে কোনও মেসে থাকত শুনেছি।

—ওঁর বাড়িতে কেউ নেই? বাবা-মা, ভাই-বোন?

—ঠিক জানা নেই।

—কখনও জিজ্ঞাসা করেননি?

—না, দরকার হয়নি।

—কেউ কখনও ওঁর সঙ্গে এ-বাড়িতে দেখা করতে আসত?

—আত্মীয়স্বজন কেউ কখনও এসেছে বলে দেখিনি। ও যে কলেজে পড়ায়, সেখান থেকে কখনও অধ্যাপক বা ছাত্রছাত্রীরা কখনও-সখনও এসেছে।

—কাল আপনারা সবাই একই সঙ্গে ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, না। ডোনা দুপুরেই চলে গিয়েছিল। ও-ই ড্যান্স-ড্রামার ডিরেক্টর ছিল, অতএব প্রস্তুতির ব্যাপারে আগেই যেতে হয়েছিল ওকে। আমি আর বনানী সন্ধের সময় একসঙ্গে গিয়েছিলাম গাড়িতে।

—আর শিহরনবাবু?

—শিহরন কাল ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর নানারকম কাজ থাকে। দুপুরে বোধহয় কলেজে কী একটা মিটিংও ছিল। সেখান থেকে সোজা এসেছিল ফাংশনে।

—হলে ঢোকার আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হয়েছিল। কিন্তু ও বলল, আপনারা ভেতরে ঢুকে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—কেন, পরে কেন?

—বোধহয় কারও জন্য অপেক্ষা করছিল।

—কার জন্যে, জানতেন?

—বোধহয় অলর্কের জন্য।

—অলর্ক কে?

—একজন ব্যবসায়ী। একটু আগেই আপনাকে বলেছি, সে ডোনাদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনসর করেছিল কাগজে।

তুষারশুভ্র মিত্র আবার কীসব নোট করলেন ডায়েরিতে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অলর্কবাবুর সঙ্গে শিহরনবাবুর সম্পর্ক কী?

—অলর্ক আপাতত আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ি। সেই সূত্রে শিহরনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

BanglaBook.org

একটু থেমে কী যেন ভেবে হঠাৎ তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের বাড়িতে একটা পিস্তল আছে না?

চিত্রদীপ এতক্ষণে যেন বেশ নার্ভাস হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ।

—কই দেখি, একবার দেখান তো আমাকে?

চিত্রদীপ এতক্ষণ যথাসম্ভব শান্ত মেজাজেই কথা বলছিলেন, হঠাৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলেন, কেন, পিস্তল দেখতে চাইছেন কেন? আপনি কি ভাবছেন, আমি মার্ডার করেছি?

—তা তো বলিনি। পিস্তলটা একবার দেখতে চেয়েছি মাত্র।

চিত্রদীপ বনানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নিয়ে এসো তো পিস্তলটা। বেডরুমে আলমারির ভেতর রাখা আছে।

বনানীকে বেশ বিব্রত দেখাল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে উঠে গেলেন শোওয়ার ঘরের দিকে। একটু বেশিই সময় নিলেন খোঁজাখুঁজি করতে। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, ওটা কি আলমারির মধ্যেই ছিল?

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ।

আবার থমকে গিয়ে বনানী বললেন, কই নেই তো—।

—নেই। চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠলেন, অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, কই দেখি—।

চিত্রদীপও ঘরে ঢুকে আলমারি ঢুঁড়ে ফেললেন আঁতিপাতি করে। তাক থেকে জিনিসপত্র ছুড়ে-ছুড়ে ফেললেন মেঝেয়, তবু কোথাও পিস্তলটির সন্ধান না পেয়ে বিভ্রান্তমুখে বেরিয়ে এলেন বাইরে। স্টাডির একোণ-ওকোণ খুঁজলেন, যাবতীয় ড্রয়ার টেনে-টেনে দেখতে লাগলেন কোথাও ভুলে রেখেছেন কি না পিস্তলটা। তারপর আবার ঘরে গেলেন। খাটের বিছানা উলটেপালটে দেখলেন অনেকক্ষণ, তারপর বিড়বিড় করতে লাগলেন আপনমনে, স্ট্রেঞ্জ। কোথায় রাখলাম সেটা!

পুলিশ-অফিসার আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কী! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পিস্তলটা?

চিত্রদীপ প্রায় বোবা হয়ে গেছেন যেন। অনেকক্ষণ থম হয়ে থেকে হঠাৎ বনানীর দিকে তাকালেন, তুমি জানো কিছু এ ব্যাপারে?

বনানী নার্ভাস হয়ে বললেন, না তো।

—ডোনা, তুই জানিস কিছু?

ডোনা অবাক হয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারস্যাপার দেখে। বলল, পিস্তল নিয়ে আমি কী করব?

—তা হলে কোথায় গেল সেটা? চিত্রদীপকে প্রায় ক্ষিপ্ত দেখায়।

ডোনা বিব্রত হয়ে বলল, নিশ্চয় কোথাও আছে ঘরের ভিতর যা এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে।

পরের কয়েক মুহূর্ত ঘরের ভিতর এক থমথমে অবস্থা। চিত্রদীপ কিছুটা বিভ্রান্ত, কিছুটা ক্রুদ্ধ, কিছুটা অসহায়। ওদিকে পুলিশ-অফিসারের মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু পিস্তলটার হোয়ার অ্যাবাউটস যে আমার চাই-ই, মিঃ চ্যাটার্জি।

চিত্রদীপ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কি ভাবছেন, কাল আমার পিস্তল থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে?

তুষারশুভ্র মিত্র মুচকি হাসলেন, এতক্ষণ তা না ভাবলেও আপাতত তাই-ই ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। জিনিসটা তো আর পাখি নয় যে ডানা মেলে উড়ে যাবে জানালা দিয়ে।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি হাতে পেয়ে গেছেন, মিঃ মিত্র?

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, না, তা পাইনি।

BanglaBook.org

—তাহলে কী করে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন যে আমার পিস্তলই ব্যবহার হয়েছিল কাল?

—আপনার পিস্তল যে ব্যবহার হয়নি তা প্রমাণ করতেই এক্ষুনি সেটা আমার সামনে বার করে দেওয়া উচিত, মিঃ চ্যাটার্জি। দিলেই তো পরিষ্কার হয়ে যাবে, কাল সেটা ব্যবহার হয়েছিল, কি হয়নি। লুকিয়ে রেখেছেন বলেই তো সন্দেহ করছি।

—লুকিয়ে! বলতে-বলতে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিত্রদীপ।

পুলিশ-অফিসার এবার উঠে দাঁড়ালেন, চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, আপনি ভালো করে ঘর সার্চ করে দেখুন। কাল সকালের মধ্যে খুঁজে বার করে দেখিয়ে আসবেন থানায়। নইলে আমরাই ঘর সার্চ করতে বাধ্য হব।

চিত্রদীপ প্রায় ক্রুদ্ধ-চোখে তাকালেন, তুষারশুভ্র মিত্রের দিকে, তারপর চোখে আগুন জ্বেলে তাকালেন বনানীর দিকে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো পিস্তলটা কোথায়? আমি এই সেদিন রেখেছি আলমারির ভেতর।

বনানী ততক্ষণে প্রায় হিম হয়ে গেছেন ভয়ে, ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে তাঁর, ঘর সার্চ হবে শুনে হঠাৎ বললেন, সেদিন অলর্কের সঙ্গে শিহরন যখন খড়্গপুরে গেল, আমাকে বলল, পিস্তলটা একটু দেখি। আমি বললাম, কেন? বলল, দরকার আছে। পিস্তলটা বার করে ওর হাতে দিতেই বলল, খড়্গপুর থেকে ফিরে এসেই দিয়ে দেব তোমাকে।

কথাটা শুনে চিত্রদীপ প্রায় অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইলেন, আর তুমি তাই দিয়ে দিলে?

পুলিশ-অফিসারের চোখেও তখন ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। একটু আগেই বনানী বলেছেন, তিনি জানেন না কোথায় গেল পিস্তলটা, এখন আবার বলছেন—।

বনানী কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, কী করব। চট করে পকেটে পুরে নিল যে, বলল, খড়্গপুরে ঝামেলা হতে পারে। কাছে থাকা ভালো।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, কীসের ঝামেলা?

—অলর্ক যাদের ওখানে গিয়েছিল, সেটা খুব ভালো জায়গা নয়। ওর কোম্পানির সাপ্লায়ার হবে বোধহয়। ওরা নাকি সেখানে একটা ঝামেলা এক্সপেক্ট করেছিল।

—তা সত্ত্বেও সেখানে যাওয়ার দরকার কী ছিল?

—অলর্ক নাকি অনেক টাকা অ্যাডভান্স করে ফেলেছে ওদের। সেটা শিহরনের পরামর্শক্রমেই। কিন্তু তারপর সাপ্লায়ার ক্রমাগত ঘোরাচ্ছিল ওদের। তার আগের সপ্তাহে পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় তাদের সঙ্গে বেশ ঝগড়াও হয়ে গেছে। টাকাটা আদায় করার জন্যই নাকি গিয়েছিল ওরা।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন অদ্ভুত তো, এতসব ঘটনা ঘটে গেছে আর আমি কিছুই জানতে পারিনি। তা শিহরন খড়্গপুর থেকে ফিরে এসে আর ফিরিয়ে দেয়নি পিস্তলটা?

—আগের দিন অনেক রাতে ফিরেছিল। তখন আর জিজ্ঞাসা করতে মনে নেই। পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সোজা ফাংশনে। এর মধ্যে কোনও কথা হয়নি আমার সঙ্গে।

—খড়্গপুরে কোনও গোলমাল হয়েছিল নাকি?

—বললাম তো, আমার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি।

—আশ্চর্য!

চিত্রদীপ বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে নির্বাক হয়ে গেলেন হঠাৎ। বনানীর কথাগুলো কিছুই সেঁধুচ্ছে না তাঁর মগজে। যেন এক ভয়ঙ্কর খাড়াই পাহাড় থেকে সহসা তাঁকে গড়িয়ে দেওয়া হল নীচে।

চিত্রদীপের বিস্ময় কিন্তু একটুও প্রভাবিত করল না পুলিশ-অফিসারটিকে। গভীর কৌতূহলের সঙ্গে ভ্রূকুটি করে শুনছিলেন এতক্ষণের কথোপকথন। চিত্রদীপ 'আশ্চর্য' বলে চুপ হয়ে যেতেই হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, বাহ্, ভালো গল্প ফেঁদেছেন তো আপনারা! প্রায় রূপকথার মতোই

BanglaBook.org

লাগছে শুনতে। কিন্তু এসব ছেঁদো গল্পে আমি ভুলছিনে। পিস্তলটা আমাকে দেখাতেই হবে। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো মিঃ চ্যাটার্জি, হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন হল যার জন্য এই বয়সে পিস্তল কেনার দরকার হল আপনার?

চিত্রদীপ তখনও স্তব্ধ হয়ে আছেন। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে কটমট করে তাকালেন তুষারশুভ্র মিত্র, আপনাকে একদিন সময় দিলাম, মিঃ চ্যাটার্জি। তার মধ্যে পিস্তলটা থানায় গিয়ে শো করে আসবেন। নইলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

বলে আর দাঁড়ালেন না। বুটে গটগট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

॥ ২০ ॥

পুলিশ-ইনস্পেকটর চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে প্রথমে কিছুক্ষণ পিনপতন নিস্তব্ধতা। তারপর চিত্রদীপের মুখচোখ হিংস্র হয়ে উঠল, যেন বনানীর ওপর লাফিয়ে পড়বেন বাঘের মতো। ডোনা দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিত হয়ে। কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ একটা পিস্তল এনেছেন এইটুকুই জানত সে। কিন্তু তার ফল যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতেই পারছে না এখন। বনানী কেনই বা হঠাৎ শিহরনকে দিতে গেলেন কে জানে। তারপর সেটা এখন কোথায় তা একমাত্র শিহরনই জানতে পারেন হয়তো। কিন্তু সেই শিহরনই এখন সবাইকার ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ দু-একদিনের মধ্যে থানায় সেটা না দেখাতে পারলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

গার্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। এইমুহূর্তে কিছু একটা না করলে ঘরের অবস্থা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা অনুধাবন করে সে দ্রুত এগিয়ে গেল চিত্রদীপের কাছে, বলল, আঙ্কেল, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে পিস্তলটা। আপনি দু-একদিন অপেক্ষা করুন। ঘরের ভেতরটা একটু খোঁজাখুঁজি করি আমরা, বিশেষ করে শিহরনদার ঘর। না হলে, শিহরনদা, কাল কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন আমরা খবর নিয়ে দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওটা পাওয়া যাবেই।

এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলল গার্গী যে, চিত্রদীপ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন হয়তো। মুখের হিংস্রভাব কমে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল এক ধরনের অসহায়তা, কেবল বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, হোপলেস, হোপলেস, ইট'স অল হোপলেস, আমাকে এরা সবাই প্ল্যান করে ডোবাবে ঠিক করেছে। দ্যাট ডার্টি উওম্যান, ক্যারাকটারলেস, নিশ্চয় কোনও একটা কনস্পিরেসি করেছে—।

বলতে-বলতে প্রায় টলমল পায়ে ঢুকে গেলেন শোওয়ার ঘরে। গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়। বোধহয় শকটা এত প্রবল হয়ে ধাক্কা দিয়েছিল যে, চোখ বুজে শুয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন নিজেকে।

গার্গী ডোনাকে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে, বলল, কী ব্যাপার বলো তো, ডোনা। আমার তো সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে। ডোনা তখনও বিভ্রান্ত, আমারও তাই। মা হঠাৎ কেন যে শিহরনদাকে—। তা ছাড়া, শিহরনদা কেন পিস্তল নিয়ে গেলেন খড়গপুরে, তাও তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

গার্গী কড়া চোখে তাকাল ডোনার দিকে, সবকিছুই এখন ভারী রহস্যময় মনে হচ্ছে। তোদের বাড়িতে পরপর এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল যা শুধু অদ্ভুত নয়, ভয়ঙ্কর। প্রথমে মন্দারবাবুর কথাই ধর। হঠাৎ কে বা কারা তাকে খুন করার চেষ্টা করল। বেচারি প্রাণে বেঁচে গেছে কপাল জোরে। তারপর এখন টেলিফোনে কেউ হুমকি দিচ্ছে তাকে এবং তার কেন্দ্রবিন্দু তুই-ই। তারপর

BanglaBook.org

শিহরনদা খুন হলেন। এর পেছনে কারও কোনও মোটিভ আছে বলে তোর মনে হয়?

ডোনা ঠোঁট কামড়াতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। তার মুখে চিন্তার ছাপও। গার্গী তার মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ ধরে নিল ব্যাপারটা, একটু ধমক দিয়েই বলল, কোনও ঘটনা এখন একদম লুকোবিনে, ডোনা। কিছু চেপে যাওয়া মানে প্রথমেই বিপদে পড়বেন তোর বাবা। অন্তত পিস্তলটা যে করে হোক উদ্ধার করতেই হবে এই মুহূর্তে। যা তোর মনে আসছে, খোলসা করে বল তো—।

ডোনার মনে তবু দ্বিধা যায় না। কিছুক্ষণ দোনামোনা করে হঠাৎ বলল, দ্যাখ, অলর্ক বোসকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

গার্গী চমকাল কম নয়। তবু একটি হত্যাকাণ্ডের পর কোনও তথ্যই অসম্ভব মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। ডোনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কেন?

—আসলে পর-পর দুটো ঘটনা ঘটে গেল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভাবনাটা মনে এল হঠাৎ। বুঝলি, অলর্ক হঠাৎ ভীষণ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে আমার সম্পর্কে। আমাকে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের এক্সক্লিউসিভ মডেল করেই সখ মেটেনি, সেদিন বলল, তার জীবনেও আমাকে এক্সক্লিউসিভ হিসেবে চায়—।

—তাই নাকি! গার্গী আবার চমকাল।

—তারপর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ মন্দার? তারপরই তার ওপর খুনের চেষ্টা হয়ে গেল। ক'দিন আগে আবার জিজ্ঞাসা করল, শিহরনদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? ঠিক তার দিনকয়েকের মধ্যে শিহরনদা—।

বলতে-বলতে ডোনার গলা কাঁপতে শুরু করল, আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না, উনি এরকম করতে পারেন। কিন্তু এমনভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা!

গার্গী খুবই অবাক হল, বিশ্বাস করতে তারও কষ্ট হচ্ছিল, তবু তার বিস্ময় মনের ভেতর চেপে রেখে বলল, অলর্কবাবু তো সেদিন ছিলেন প্রেক্ষাগৃহের ভেতর?

—ছিলেনই তো। শিহরনদার পাশেই বসেছিলেন শুনলাম।

—তাহলে তৈরি হয়ে নে। এখনই একবার অলর্কবাবুর ওখানে আমাতে তোতে যাই। ওঁর রি-অ্যাকশনটা বোঝার চেষ্টা করি। তা ছাড়া পরশু খড়গপুর থেকে ফিরে শিহরনদা কাল ভোরেই আবার কেন গিয়েছিলেন অলর্কবাবুর বাড়ি, সে সময় পিস্তলটা তাঁর কাছে ছিল কিনা এগুলো জানা দরকার।

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনই?

—হ্যাঁ, এখনই। কি কুইক।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে গার্গী যখন রাসেল স্ট্রিটে পৌঁছল, সন্ধ্যা পার হয়ে আলোয় ঝলমল করে উঠেছে কলকাতা শহর। কলকাতার এই সাহেব-পাড়াটিতে এখন চারপাশে উঁচু-উঁচু সব মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। এহেন আধুনিকতার ছোঁয়াচ এড়িয়ে অলর্ক বসুর দোতলা বিশাল বাড়িটা সেই সাবেকি ধরনের। সাবেকি বলতে চৌরঙ্গির এপাশে এই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই হয়ে একধরনের সাহেবিপনা বজায় রেখেছে চটলা-ওঠা হলুদবাড়িটা। চারপাশের বাকি সব দৃশ্য আঙুলে চেপে হঠাৎ এই বাড়িটা নজরে পড়লে যে-কোনও পথচারীর মনে হতে পারে, সে এসে পৌঁছেছে লন্ডনের কোনও শহরতলিতে। ইংরেজি সিনেমায় দেখা কোনও পুরোনো বাড়িই যেন। এমন একটি বাড়ির উঁচু পাঁচিলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে গার্গী মনে-মনে তারিফ জানাল বাড়ির নির্মাতাকে। সেইসঙ্গে এখন যিনি বাড়ির মালিক তার কথা ভেবে কিছুটা সম্ভ্রমও। কিন্তু আপাতত অলর্ক বসু সম্পর্কে গার্গীর মনে এক ঘোর সন্দেহ।

প্রাচীন এই বাড়িটিতে দোতালায় ওঠার সিঁড়িটি কাঠের। কিন্তু খুবই মজবুত আর কারুকার্যময়।

BanglaBook.org

একতলা-দোতলা মিলিয়ে এ-বাড়িতে কতগুলো ঘর তা বোধহয় গুনে শেষ করা যাবে না। দারোয়ানের পিছু-পিছু দোতালায় উঠে এমনই অনেকগুলো ঘরের পাশ দিয়ে, এক লম্বা করিডোর পার হয়ে যে ড্রইংরুমটায় এসে পৌঁছল গার্গীরা, সেটাতে বোধহয় অনায়াসে লন টেনিসের কোর্ট বানানো যায়। বাকি ঘরগুলোর ক্ষেত্রফলও কম কিছু নয়। আর গার্গী শুনে আশ্চর্য হল যে, এই বিশাল বাড়িটিতে অলর্ক আর তার দারোয়ানটি ছাড়া কোনও তৃতীয় প্রাণী থাকে না।

অলর্কের কাছে এসে প্রথম প্রশ্ন যা গার্গীর মনে এল, এত বড় বাড়িতে এভাবে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

—ভয়! অলর্কের হাসি ছড়িয়ে পড়ে তার লম্বা দাড়ি গোঁফের অন্তরালে। একা থাকি আপনাকে কে বলল? এ-বাড়িতে তো অনেকগুলো ভূত থাকে। তারা আছে বলেই তো একলা মনে হয় না।

—সর্বনাশ। ভূত আছে কী করে বুঝলেন?

—বাহ! তারা তো সারারাত ফিসফাস করে কথা বলে। কখনও নিজেদের মধ্যে। কখনও আমাকে লক্ষ করেও। কখনও করিডোর দিয়ে খটখট শব্দ তুলে যাতায়াত করে। হি-হি করে হাসেও কখনও বা।

গার্গী আর ডোনা দুজনে একবার চোখাচোখি করে নেয়, আর?

—লোডশেডিঙের সময় মোমবাতি জ্বালালে ফস করে হঠাৎ নিভিয়ে দেয়।

—আপনি খুবই যে বীরপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, গার্গী হাসতে হাসতে বলল, ডোনা বরাবরই বলত, আপনি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। আজ মনে হচ্ছে, সত্যিই অদ্ভুত। যাই হোক, আপনার কাছে কতকগুলো দরকারে এসেছি।

অলর্ক যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল তার কাছে কেউ অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসবে। হেসে বলল, সে তো দুই সুন্দরীর যৌথ অভিযান দেখেই বুঝতে পেরেছি। ভাবাই যায় না এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল আমাদের চোখের সামনে, অথচ কেউ কিছু বুঝতেই পারলাম না।

গার্গী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল অলর্কের মুখ। ডোনা ঠিকই বলেছিল ক'দিন আগে। যিশুর মতোই সরল-সুন্দর। কিছুক্ষণ অলর্কের অভিব্যক্তি নিরিখ করে বলল, আচ্ছা, মিঃ বোস, সেদিন আপনিও তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন ওখানে। ঠিক কোথায় বসেছিলেন আপনি?

—শিহরণদার ডানপাশেই ছিলাম। একেবারে ফ্রন্ট রোয়ে।

—অন্ধকারের ভেতর কী ঘটতে চলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলেন কিছু?

—ঠিক বুঝতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে। শেষ দৃশ্যে যে মুহূর্তে ডান্স ড্রামার কুশীলবরা ফ্রিজ হয়ে গেছে, আমরা দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল হাততালি দিচ্ছি, অনেক দর্শক হুড়মুড় করে এগিয়েও এসেছেন অভিনন্দন জানাতে, সেসময় হঠাৎ আমার মনে হল কে যেন পিছন থেকে ঠেলে দিল আমাকে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। সামলে নেওয়ার ফাঁকেই দেখি, পাশে দাঁড়ানো শিহরণদাও পড়ে গেলেন হঠাৎ।

—স্ট্রেঞ্জ, গার্গী অবাক হল, আর একবার চোখাচোখি করল ডোনার সঙ্গে, আচ্ছা, মিঃ বোস। শিহরনদার ঠিক পিছনে কে ছিলেন, মনে আছে আপনার?

—হ্যাঁ, মনীশ রায়।

—তাই নাকি? আর আপনার পিছনে?

—আমার পিছনে যিনি ছিলেন, তাঁকে চিনি না। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। চোখে চশমা।

আবারও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল গার্গী, তার আগেই অলর্ক হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল, এই যা, শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। এমনভাবে তখন থেকে জেরা করে যাচ্ছেন যে, আপনাদের সামান্য আপ্যায়নটুকু করার কথাও ভুলে গেছি।

তারপর একবার গার্গীর দিকে, একবার ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন তো, কলকাতার

BanglaBook.org

দুই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এখন কী পছন্দ করবেন? চা, না কফি, অথবা লস্যি?

—আপাতত কিছুই না, গার্গী বাধা দিয়ে বলল, আমরা কয়েকটা জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছি, সেটাই এখন মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট। আপনার সঙ্গে সেদিন শিহরনদা গিয়েছিলেন খড়্গপুরে। সেখানে সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কোনও ডিসপুট হয়েছিল আপনাদের?

অলর্ক অবাক হয়ে বলল, না তো—।

—আচ্ছা, আপনি কি জানেন, শিহরনদার সঙ্গে একটা পিস্তল ছিল সে-সময়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। গাড়িতে যেতে-যেতে উনি আমাকে পিস্তলটা দেখিয়েছিলেন। আমি তো বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওটা দেখে। বুঝতে পারিনি কেন উনি সঙ্গে করে এনেছেন ওটা।

—পিস্তলটা কি উনি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?

অলর্ক একটু থমকে গিয়ে বলল, হ্যাঁ। তা তো নিশ্চয়ই।

—কিন্তু পিস্তলটা এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তাই নাকি? কিন্তু যখন গাড়ি থেকে নামেন, তখনও কিন্তু পিস্তলটা ছিল ওঁর কাছে।

—কোথায় নেমেছিলেন গাড়ি থেকে?

—এসপ্লানেডেই নেমেছিলেন। আমি বলেছিলাম, বাড়ি পৌঁছে দিই। কিন্তু উনি রাজি হননি। বলেছিলেন, চৌরঙ্গিতে কী একটা দরকার আছে। সেটা মিটিয়ে উনি নাকতলা যাবেন।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, নাকতলা! অদ্ভুত তো! যখন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন তখন ক'টা বাজে?

—সন্ধে ছ'টা নাগাদ।

—আশ্চর্য, সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন অনেক রাতে। ফিরে আমাকে বলেছিলেন, এক্ষুনি ফিরলাম খড়্গপুর থেকে।

গার্গী ডোনার দিকে তাকাল, হঠাৎ নাকতলায় কেন?

ডোনা গম্ভীর হয়ে বলল, নিশ্চয় এম. আরের বাড়িতে। কিন্তু সেটা স্রেফ চেপে গিয়েছিলেন আমার কাছে। যাই হোক, বাড়ি ফিরে পিস্তলটা কেন ফেরত দেননি মার কাছে, সেটাই ভারী অবাক লাগছে আমার।

অলর্ক বলল, এমনও হতে পারে পরদিন হয়তো ওঁর কাজে লাগবে বলেই ফিরিয়ে দেননি ওটা। পরদিন ভোরেই অবশ্য প্রথমে আমার বাড়ি এসেছিলেন। তখন ওটা ওঁর কাছে ছিল কি না জানি না। বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন খুব জরুরি মিটিং আছে এই বলে।

ডোনা অবাক হল, কীসের মিটিং?

—তা আমাকে বলেননি। তবে বলেছিলেন, আজকের মিটিংটা খুব ইমপর্ট্যান্ট, ভীষণ ফাটাফাটি হবে।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিঃ বোস, দু-দিন আপনার সঙ্গে খড়্গপুরে ব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটেছিল যাতে পরদিন ভোরেই আবার আপনার বাড়ি আসতে হয়েছিল ওঁকে?

অলর্ক হেসে বলল, আসলে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যাপারে কিছু-কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছিলেন শিহরনদা। তারই কাগজপত্র দেখেছিলেন সারা সকাল।

—আপনার বিজনেস নিয়ে কি কোনও ঝামেলা চলছে, মিঃ বোস?

—বিজনেস মানেই হাজারো ঝামেলা। সে তো সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও সমস্যা এসে পড়ছে সামনে।

—এমনও তো হতে পারে বিজনেসে উনি জড়িয়ে পড়ায় কেউ তা সহ্য করতে পারছিলেন না।

BanglaBook.org

—তাতে টার্গেট হওয়ার কথা এই অলর্ক বোসের। কিন্তু অলর্ক বোস কাউকে তোয়াক্কা করে না।

—আচ্ছা, কী-কী ব্যাপারে আপনাকে অ্যাডভাইস করছিলেন শিহরনদা?

একটু ইতস্তত করে অলর্ক বলল, সে তো প্রায় সব ব্যাপারেই সাহায্য করছিলেন। খড়্গপুরেও গিয়েছিলেন সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে। কোন জিনিস কোন মার্কেটে সুবিধেমতো দরে পাওয়া যায়, কোন প্রভিন্স থেকে কোন প্রোডাক্ট আনলে সস্তায় পাওয়া যাবে, সবই লিস্ট করে দিয়েছিলেন একদিন বসে। তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

ডোনার দিকে একমুহূর্তে তাকিয়ে অলর্ক বলল, এমনকী চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে দিয়ে আমি যেসব লে-আউট করিয়েছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর জন্য, সে ব্যাপারেও বলেছিলেন, মাত্র একজন আর্টিস্টকে দিয়ে সব শো-রুমের লে-আউট কেন করাচ্ছি। বিভিন্ন আর্টিস্টকে দিয়ে করালে তার এফেক্ট হত অন্যরকম।

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে বলল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ওঁর কথা শুনিনি। বলেছিলাম, এসব ব্যাপারে আমি একজনের হাতেই দায়িত্ব দিতে চাই।

গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করল, ডোনার বাবা এ ঘটনার কথা জানতেন?

ইতস্তত করে অলর্ক বলল, হ্যাঁ। একদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনার সময় আমি বলে ফেলেছিলাম। তাতে উনি ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দেব।

ডোনার মুখখানা সহসা কালো হয়ে গেল। গার্গী তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল, আচ্ছা, আর কী-কী ব্যাপার আপনাকে অ্যাডভাইস করেছিলেন শিহরনদা?

—সে অনেক ব্যাপার। সব বলতে গেলে একখানা বাইবেল হয়ে যাবে। বরং একদিন সকালের দিকে আসুন। এখন ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। আপনাদের বাড়ি ফিরতে হবে তো—

গার্গী এতক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকায়নি। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, সত্যিই তো। ডোনা, শিগগির ওঠ।

দুজনে ড্রইং ছেড়ে উঠতে গিয়েই হঠাৎ কী যেন নজরে পড়তে ডোনা চমকে উঠে বলল, ওটা পিস্তল নয়?

অলর্ক অবশ্য চমকাল না, হ্যাঁ, ওটা আমার পিস্তল।

—আপনার পিস্তল আছে নাকি? গার্গী বিস্মিত হল। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছড়ে পড়ল ড্রইঙের কোণে যে দেরাজটা আছে তার কাচের ভেতর। পিস্তলের নলটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমাকেও সম্প্রতি একটা লাইসেন্স করাতে হল। নইলে চলছিল না।

পরমুহূর্তে গার্গীর প্রশ্ন আছড়ে পড়ল, কেন?

—আর বলবেন না, কী যে সব বিপদের মধ্যে আছি। হাতে হঠাৎ অনেক টাকা এসে গেলে চারদিকে প্রচুর শত্রু হয়ে যায়। এই দেখুন না। ক'দিন আগেই একটা চিরকুট কেউ ফেলে গেছে বারান্দায়, ইয়োর ডে'জ আর নাম্বারড। তারপর হঠাৎ টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে আজ সকালেহ : সাবধান। তোমাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

গার্গী ভুরুতে কোঁচ ফেলে তাকাচ্ছিল অলর্কের দিকে। গল্পগুলো কতটা সত্যি কতটা আষাঢ়ে তাই-ই বোধহয় মাপার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কী মনে হতে বলল, পিস্তলটা একবার দেখব?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, না। খড়্গপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা। ওখান থেকে ফিরে এসে দেরাজে রেখেছিলাম ওভাবেই। তারপর কাল ওই ঘটনার পর আর ওটায় হাত দিইনি। পুলিশ হয়তো আসতে

BanglaBook.org

পারে, খোঁজ করতে পারে পিস্তলটার এই ভেবে আজ ইট ইজ রেখে দিয়েছি। ছ'টা গুলিই ভরা আছে ওর ভেতর।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, কতদিন গুলি ছোড়েননি ওটা থেকে?

অবারও ইতস্তত করল অলর্ক, খড়গপুরে গিয়ে একটা গুলি ছুড়তে হয়েছিল। তক্ষুনি অবশ্য আর একটা গুলি লোড করে রেখে দিয়েছি।

অলর্কের গলাটা হঠাৎ করেই কেন যেন কেঁপে গেল। গার্গীর চোখ এড়াল না। সে এবার মৃদুস্বরে বলল, আপনি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন, মিঃ বোস।

রীতিমতো নার্ভাস দেখাল অলর্ককে, কেন! কেন?

গার্গী সঙ্গে-সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আচ্ছা, মিঃ বোস, আপনি তো বেশ কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশছিলেন শিহরনদার সঙ্গে। নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে আলোচনাও করতেন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে। কিছু অনুমান করতে পারেন, কে খুন করতে পারেন ওঁকে?

অলর্ক একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, সে আমি কী করে জানব। নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলতেন না উনি। একদিকে খুবই এক্সট্রোভার্ট সারাক্ষণ হইচই করে কথা বলতেন। অন্যদিকে ভীষণ ইনট্রোভার্ট, নিজের ব্যাপারে খুবই চাপা। শুধু একটা ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল ওঁর। মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন খুব। সেদিন খড়গপুর থেকে ফিরে, অতটা জার্নির পরও বললেন, নাকতলায় যাব। আমাকে কিছু না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম, কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা করাটা খুব দরকার ছিল ওঁর।

ডোনা আর গার্গী ফের চোখাচোখি করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ চলি। দরকার হলে আবার আসব কখনও।

—ওহ, শিওর, অলর্ক তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভরিয়ে ফেলল হাসিতে। পরমুহূর্তে বলল, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি বরং গাড়িতে করে পৌঁছে দি।

ডোনা, গার্গী দুজনেই অবশ্য বাধা দিল, থ্যাঙ্কস অ্যা লট। তার দরকার হবে না। আমরা ট্যাক্সি ধরে নিচ্ছি একটা—।

বড় রাস্তা পর্যন্ত অলর্ক তাদের সঙ্গে এল। ট্যাক্সিও ডেকে দিল কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে। তারপর ডোনাকে বলল, শিহরনদা মারা যাওয়ায় আমি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে গেলাম, ডোনা, আমার ব্যাবসার অনেকটাই ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন যে তার কী হবে কে জানে। কিন্তু তোমার বাবার চিত্রপ্রদর্শনীটা ঠিক সময়ে করে ফেলতে চাই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, এর পর একজিবিশনের কথা আর ভাবতেই পারছে না কেউ। বাবার পিস্তল হারিয়ে যাওয়ায় যা বিপদে পড়ে গেছি আমরা।

ট্যাক্সি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ অলর্ক বলল, ওহো এবার মনে পড়েছে। কাল সকালে শিহরনদা যখন আমার বাড়ি এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন, পিস্তলটা নাকি ভুলে ফেলে এসেছেন নাকতলায়।

গার্গী চমকে উঠল, তা সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

BanglaBook.org

॥ ২১ ॥

গতকাল সংবাদপত্রে শিহরন হত্যার ঘটনাটি ছাপা হয়েছিল ছোট্ট করে, পাঁচের পাতায় নীচের দিকে, অবশ্য বক্স করে ছাপিয়ে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিল খবরটায়। সংবাদে বলা হয়েছিল, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফাংশনে ইংরেজি ড্যান্স-ড্রামার অভিনয় চলাকালীন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল সুকৌশলে। পুলিশ তদন্ত করছে ঘটনাটির।

আজ কিন্তু ঘটনাটির ফলো-আপ রিপোর্ট ছাপা হয়েছে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়, মাঝখানে বেশ বড় করে, আর রিপোর্টটি খুবই চাঞ্চল্যকর। সাংবাদিক জানিয়েছেন, গতকালের রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁদের দপ্তরে হঠাৎই একটি উড়ো ফোন আসে, তাতে জানা যায়, কলেজের অধ্যাপক-সমিতির এক কর্মকর্তা ছিলেন শিহরন। হত্যার দিন দুপুরে সেই সমিতির মিটিং ছিল। সেখানে শিহরনের বক্তৃতার সময় তাঁর কোনও একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়। সেই বচসার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। উড়ো-ফোনটি পাওয়ার পর সাংবাদিকটি অধ্যাপক-সমিতির অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জোগাড় করেছেন অনেক আশ্চর্য তথ্য। শিহরন রায়চৌধুরি প্রথম যৌবনে নাকি যুক্ত ছিলেন এক বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। পরে অবশ্য কোনও কারণে সরে এসেছিলেন আন্দোলন থেকে। প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরবর্তীকালে সামিল হয়েছিলেন অধ্যাপক সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে। সামনেই কর্মসমিতির নির্বাচন। বহুদিন ধরেই বিরোধীপক্ষের সঙ্গে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল তাঁদের। গত পরশু অর্থাৎ হত্যার দিন দুপুরে মিটিং চলাকালীন সেই বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। বক্তৃতা দিতে উঠে শিহরন এমন জ্বালাময়ী ভাষায় নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিলেন বিরোধীপক্ষের কোনও-কোনও অধ্যাপককে, তাতে পিছনের দিকে বসা কোনও-কোনও সদস্য উত্তেজিত হয়ে শাসিয়েছিলেন, এরকম আলগা মন্তব্য করলে মেরে লাশ ফেলে দেওয়া হবে। অতএব এই শত্রুতার জের হিসেবে শিহরন খুন হতে পারেন এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খবরটা বার-দু-তিন খুঁটিয়ে পড়ে খুবই আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। তার ঘরের ছোট্ট জানালাটির পাশে বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে মনে-মনে কয়েকমুহূর্ত বিশ্লেষণ করে নিল ঘটনাটা। যে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল চিত্রদীপের পিস্তল হারানো নিয়ে অদ্ভুত বাঁক নিচ্ছে শিহরন-হত্যার রহস্য, ঠিক সেসময় সংবাদপত্রের এই তথ্যাদি সমস্ত হিসেব যেন উল্টে দিল।

শিহরন রায়চৌধুরি সম্পর্কে গার্গী যতটুকু খবর জেনেছে, তিনি ব্যাচেলর মানুষ, অধ্যাপনা নিয়ে যতটা ব্যস্ত থাকতেন, তার চেয়েও ব্যাপৃত থাকতেন তাঁর একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ নিয়ে। মাঝে মাঝে শৌখিন সাহিত্যচর্চা যেমন করতেন, তেমনই কোনও একটি আঁতেলমার্কা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্যও ছিলেন। কিন্তু তিনি অধ্যাপক-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, থাকলে কতটা প্রত্যক্ষভাবে, এসব গার্গীর জানার বাইরে। ডোনা জানে কি না কে জানে। শিহরনের সঙ্গে ডোনার কখনও এসব ব্যাপারে আলোচনা হত কি না তা একসময় জেনে নেবে গার্গী। ডোনা প্রায়ই বলত, জানিস, শিহরনদা এমন সব বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা করেন, যা শুনতে-শুনতে হেসে কুটপাট হতে হয়।

সত্যিই নানারকম কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার ফলে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন শিহরন। টুকটাক এখানে-ওখানে ভ্রমণের ভীষণ নেশা ছিল, সেই সুবাদে তাঁকে থাকতে হত কখনও দূর-দূর প্রান্তের হোটেলে, কখনও জেলায় সার্কিট হাউস বা ডাকবাংলোয়। কোথায় কখন কোন ডাকবাংলোয় গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তা শুনতে-শুনতেই কাবার হয়ে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন-কোন ডাকবাংলোয় ভূত আছে, সেসব ভূতেরা কে কীরকম, কে মাঝরাতে হা-হা করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, কোন সার্কিট হাউসে মাঝরাতে শুধু ফিসফাস শব্দ শোনা যায়, কিন্তু ভূত দেখা যায় না। কোন ফরেস্ট বাংলোয় রাতে বাঘ এসে টুঁ মারে। কোথায় বাংলো-চত্বরে হরিণ এসে জিরোয় ভেড়া ছাগলদের মতো, এমন হাজারো সব গল্প তাঁর ঠোঁটে গিজগিজ করত সারাক্ষণ। কখনও রাজনীতিবিদদের নিয়েও মজা করে গল্প বলতেন। আবার চমৎকার সব কার্টুনও আঁকতে পারতেন তাদের নিয়ে, তাদের কার কী ম্যানারিজম তাও হুই-হুই করে শোনাতেন প্রায়ই। এমনকী কোন বাস-কন্ডাক্টর কেমনভাবে টিকিট চায় যাত্রীদের কাছে, তাও নিখুঁতভাবে ক্যারিক্যাচার করে দেখাতেন।

এহেন শিহরনের যে কিছু শত্রু না ছিল তা নয়। যারা স্ট্রেটকাট কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে

BanglaBook.org

কিছু মতামত তৈরি হয়ে যায় এমনিই। যাদের কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন হয়, তাদেরও কিছু-কিছু বিরোধীপক্ষ থেকে থাকে।

তবু গার্গী বুঝে উঠতে পারছে না, অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে কী এমন সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে খুন হতে হল শিহরনকে।

তার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কে সংবাদপত্রে উড়ো ফোন করে জানাতে গেল খবরটি। অধ্যাপক-সমিতির কোনও সদস্য, না কি বাইরের কেউ। বিরোধীপক্ষের কেউ যদি খুন করেই থাকবে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা ফোন করে জানাতে যাবে না। আর শিহরনের পক্ষের কোনও সদস্য যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারা পুলিশের কাছে না জানিয়ে হঠাৎ সংবাদপত্রে জানাল কেন? সে যাই হোক, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে শিহরনকে হত্যার জন্য হত্যাকারীকে নিশ্চয়ই শিহরনকে অনুসরণ করে ড্যান্স-ড্রামার হলে ঢুকতে হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে এ প্রশ্নও জাগে, কোন-কোন অধ্যাপক সেদিন ড্যান্স-ড্রামা দেখার কার্ড পেয়েছিলেন অর্গানাইজারদের কাছ থেকে?

এইসব প্রশ্নে আলুথালু হতে-হতে গার্গী খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে দ্রুত তৈরি হল। সমিতির ব্যাপারে আজই একটা খোঁজখবর নেবে এমনও ভাবল মনে-মনে। মাকে ডেকে 'বেরুচ্ছি একটু' বলেই পাড়ার পথ পেরিয়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে। নতুন একটা স্পেশাল-বাস চালু হয়েছে যেটা যাদবপুর থানা হয়ে এইট বি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যায়। তাতে উঠলে সরাসরি গিয়ে নামা যায় যোধপুর পার্কের স্টপেজে। আনোয়ার শা রোড থেকে ডোনাদের বাড়ি সামান্য দূরে হলেও রাস্তাটি বেশ ছিমছাম। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে কলিংবেল টিপতেই জংলা-ছাপা শালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এল ডোনা। অন্যদিনকার মতো লাফিয়ে উঠে বলল না 'হাই', শুধু গম্ভীর মুখে বলল, আয়।

ডোনাও এতক্ষণ খুঁটিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজের সেই অংশ, যেখানে ফলাও করে ছাপা হয়েছে শিহরন-হত্যার সংবাদ। সেও এতক্ষণ ঘটনাটির আকস্মিকতায় বোধহয় চুরমুর হচ্ছিল একা-একা। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, লোকটা কী অদ্ভুত ছিল তাই না?

গার্গী বুঝতে পারল না যেন, কেন, অদ্ভুত কেন?

ডোনা যে বেশ সংকটের মধ্যে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে তার মুখ দেখে। নিশ্চয়ই সেই পিস্তল সমস্যা এখনও মেটেনি, সেজন্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তার জের অবশ্যই ঝামরে পড়ছে ডোনার ওপর। গার্গীর কথার উত্তরে শুধু বলল, খুবই অদ্ভুত মানুষ। সারাদিন যেসব কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখতেন নিজেকে, তার মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাটের কাজও থাকত। কিন্তু কোনও টেনশনই ছিল না। এত কাজ কোনটার পর কোনটা করবেন, তা ওঁর মাথার মধ্যে ছক কষে রাখা থাকত, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তার কিছুই বোঝার উপায় নেই। এই মুহূর্তে যে সামনে আছে, সে জানতেই পারত না পরের মুহূর্তে উনি কোথায় যাবেন, কিংবা কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এমনিতে মনে হয় দারুন দিল-খোলা, সারাক্ষণ মজা করছেন, অথচ আসলে ভীষণ চাপা।

গার্গী কৌতূহলী হল, যেমন—।

—যেমন পরশুর কথাই ধর না। তার আগের দিন সন্ধে নাগাদ খড়গপুর থেকে ফিরেছেন অলর্ক বোসের সঙ্গে, আমাদের এখানে না ফিরে সোজা চলে গেছেন এম. আর.-এর বাড়ি। রাতে বাড়ি ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝাই যায়নি সারাদিন কী টেনশনে কাটিয়েছেন। কোনও আলোচনাও করেননি তা নিয়ে। পরশু ভোরে উঠেই চলে গেছেন অলর্ক বোসের বাড়ি। নিশ্চয়ই জরুরি কাজ ছিল নইলে অত ভোরে যাবেনই বা কেন। আমি জগিং করতে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিলেন, 'নো, মাই চাইল্ড, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে। দুপুরে হয়তো ফিরব না।' অলর্ক বোসের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেছেন অধ্যাপক-সমিতির মিটিংয়ে। সেখানে এত কাণ্ড হয়েছে তা কিন্তু সন্ধের সময় ফাংশন দেখতে এলে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি কেউ। মায়ের

BanglaBook.org

সঙ্গে নাকি দারুণ খোশমেজাজে কথা বলেছেন। অথচ এত সব টেনশনের ব্যাপার থাকলে আমার তো ঘুমই হত না রাতে।

গার্গী সামান্য হাসল, কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করছিল ডোনার মুখের অভিব্যক্তি। তাকে আরও একটু উসকে দেওয়ার জন্য বলল, আর এমন কোনও ব্যাপার মনে পড়ছে তোর?

একটু ইতস্তত করে ডোনা বলল, সেদিন কী হয়েছে শোন। আমাকে বললেন, চলো ডোনা, তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করি আজ। গাড়ি নিয়ে দুজনে এখানে-ওখানে ঘুরে লাঞ্চ খেয়ে হইহই করতে-করতে ফিরছি, হঠাৎ বললেন, 'আমাকে একটু রবীন্দ্রসদনের সামনে নামিয়ে দিও, ডোনা।' 'কেন,' তা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'তিনটে নাগাদ এখানে একটা ফাংশন আছে। উদ্যোক্তারা জোর করে কার্ড গছিয়ে দিয়েছেন,—।' তা ওঁকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি, হঠাৎ দেখি ওঁর সিগারেটের প্যাকেটটা পড়ে আছে সিটের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি-ঘুরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি যেতে দেখি, ঈষিতাদির সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাঁটছেন ভিক্টোরিয়ার দিকে। কী আশ্চর্য, বল। ঈষিতাদির সঙ্গে ওঁর যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তা আমার কাছে একবারও ভাঙেননি। গার্গী তার অবাক হয়ে যাওয়া চোখে হঠাৎ হাসি ভরিয়ে বলল, যাদের অনেক প্রেমিকা তাকে, তাদের এমন মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। কী আর করা যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, কাগজে হঠাৎ যেভাবে লিখেছে, তাতে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ভারী রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার।

—তাই! কথা বলতে-বলতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ডোনা, কেমন অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় বলল, আমারও কিন্তু অদ্ভুত লাগছে। হঠাৎ কী এমন শত্রুতার সৃষ্টি হল অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে যে, বলতে-বলতে থেমে গেল, তার পর হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, এতদিন জানতাম, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নির্বাচনে মারামারি-খুনোখুনি হয়। এখন তাহলে সে অভ্যেসটা অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচনেও সংক্রামিত হল!

গার্গী ঘাড় নেড়ে বলল, কাগজে লিখেছে বলেই সেটা সত্যি হবে তার কোনও মানে নেই। একটা উড়ো ফোনের খবরে নির্ভর করে সাংবাদিক একটা মোটিভ তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে যদি আমল দিতে হয় তাহলে জানা দরকার, অধ্যাপক সমিতির কোন-কোন মেম্বার ফাংশনের কার্ড পেয়েছিলেন সেদিন।

ডোনা ঠোঁট উলটে বলল, সে কি আর এক মুহূর্তে বলা যায়! আমাদের ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রীকেই কিছু-কিছু করে কার্ড বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে কে কাকে কার্ড দিয়েছে, তা তো আর লেখাজোখা নেই। তাছাড়া একজনের কার্ড নিয়ে অন্য কেউ আসতে পারে।

গার্গী চিন্তিত হয়ে বলল, তাহলে কী করা যায়?

ডোনা গার্গীর মুখচোখ দেখে হেসে ফেলল হঠাৎ, কী ব্যাপার, তুই কি এই ব্যাপারটা নিয়েও কোনও আর্টিকেল লিখে ফেলতে চাস?

গার্গী আবার ঘাড় নাড়ল, না, তা নয়। কিন্তু চোখের সামনে এরকম মার্ডার কখনও দেখিনি তো। ঠিক কী পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ ধরনের মার্ডার করে তা জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ, জড়ানো গলায় বলল, জানিস, আমার ভীষণ ভয় করছে—।

গার্গী অবাক হল, কেন?

—আমার বাবাকে কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম, শিহরনদার ব্যাপারে ভীষণ টেনশনে ছিলেন। শিহরনদা যে এ-বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে আছেন, মায়ের সঙ্গে আমার সঙ্গে যে এত খোলামেলাভাবে মেশেন তা যেন বাবা একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তার ওপর হঠাৎ এই বয়েসে কেনই বা একটা পিস্তল কিনে তার লাইসেন্স করালেন, কেনই বা সেটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। মা বললেন, ফাংশনে যাওয়ার আগে কী একটা টেলিফোন পেতে

BanglaBook.org

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বাবা। পুলিশ-ইনস্পেকটরের কথাবার্তা শুনে মনে হল, বাবাকেই এই মার্ডারের ব্যাপারে সন্দেহ করছে।

গার্গীও কিছুক্ষণের জন্য থম মেরে গেল। হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, তোর বাবাকে কি তোর সন্দেহ হয়?

ডোনা সজোরে ঘাড় নাড়াতে-নাড়াতে বলল, না, হয় না। আমার বাবা ভীষণ রাগি। রেগে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাই বলে আমার বাবা শিহরনদাকে খুন করবেন----, বলতে-বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ তাকে সান্ত্বনা দিতে বসল, শুধু-শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই, ডোনা। বরং গোটা ব্যাপারটা ভালো করে খোঁজ খবর নিই। সেদিন শিহরনদা যখন ফাংশন দেখতে ঢুকেছিলেন। তুই তাঁকে দেখেছিলি?

—আমি কী করে দেখব। শুনলাম, উনি এসেছিলেন শো আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। তখন তো আমি গ্রিনরুমে।

গার্গী কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপারে নিশ্চয় এম. আর খোঁজখবর রাখবেন?—হ্যাঁ, তা হয় তো রাখবেন।

—শিহরনদা যেখানে বসেছিলেন সেদিন, তার কাছাকাছি মণীশ রায়ও ছিলেন কিন্তু। হয়তো এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে। শিহরনদার আশেপাশে অধ্যাপক-সমিতির আর কে-কে বসেছিলেন, তাও হয়তো বলতে পারবেন।

ডোনা ঘাড় নাড়ল, ঠিক বলেছিস।—তা হলে আমি একবার এম. আর.-এর বাড়ি হানা দিচ্ছি দেখা যাক, কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কিনা। বলে ডোনাদের যোধপুর পার্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গার্গী এসে দাঁড়াল বাসস্টপে। নাকতলা যদিও এখান থেকে তেমন দূরে নয়, তবু দক্ষিণ কলকাতার এই দুটো পল্লী বাসে যাওয়ার দূরত্ব হিসেবে অনেকটা। অন্তত দুটো বাসে না চড়লে কোনওভাবেই পৌঁছনো যাবে না মণীশ রায়ের বাড়ি। লেগেও গেল প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার ওপর। বাস থেকে নাকতলার স্টপে নেমে বাঁ-দিকের একটা লেন ধরে কিছু দূর এগোতেই ডানদিকে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়ির গেটে একটা ফুলন্ত মাধবীলতার আর্চ। আর্চ ছাড়িয়ে তার ডালপালা দোতলার ছাদ অভিমুখে ধাবিত। গেটের মুখে পৌঁছতেই মিষ্টি গন্ধটা গার্গীর নাকে চারিয়ে যেতেই কেমন রোমাঞ্চিত হল তার শরীর।

কিন্তু কলিংবেলে হাত দিতেই সেই রোমাঞ্চ কেটে গিয়ে তার শরীর জুড়ে দপদপ করে উঠল এক ধরনের অস্বস্তি। মিনিটখানেকের মধ্যে দরজা খুলে দাঁড়ালেন ঈষিতাদি। খুবই সুন্দরী যুবতী। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর ফরসা মুখখানা কেমন যেন শোকাহত। গার্গীকে দেখে অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন কী চাই?

গার্গী তৎক্ষণাৎ বেশ আড়ষ্ট হল, এম. আর-এর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ঈষিতাদিকে, তবু গার্গীকে পরখ করছেন বেশ কড়া দৃষ্টিতে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গার্গীকে দেখে মোটেই খুশি হননি মহিলা। অবশ্য না হওয়ারই কথা। নিশ্চয়ই গার্গীকে তিনি ভেবেছেন মণীশ রায়ের অজস্র ফ্যানদের একজন। একটু পরে দরজা ছেড়ে দিয়ে বললেন, এম. আর. ওপরে আছেন।

পরনে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি, মণীশ রায় তাঁর স্টাডিরুমে বসেছিলেন একটা ইংরাজি জার্নাল হাতে নিয়ে। বেশ রংচঙে পত্রিকাটি খুব সম্ভব এদেশি নয়। গার্গীকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখে মৃদু হেসে বললেন, এসো। তোমার প্রশ্নের ঝুলি নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে এসেছ?

গার্গী লক্ষ করছিল, শিহরন রায়চৌধুরির মৃত্যুতে কতখানি শক পেয়েছেন মণীশ রায়। শিহরণ যে হঠাৎ করে মণীশ ঈষিতার সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তারপর দুজনের ওপর কীভাবে তাঁর

BanglaBook.org

প্রভাব পড়েছিল তা গার্গী খুব খোলসা করে জানে না। কিছুটা তাঁদের অভিব্যক্তি দেখে, কিছুটা তাঁদের কথাবার্তা থেকে আঁচ করে নিতে হবে। মণীশের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে গার্গী সামান্য হাসল, স্যার, প্রশ্নের ঝুলি এনেছি ঠিকই, কিন্তু আমার এবারের টপিক অন্য।

—নতুন কোনও ফিচার লিখছ বুঝি?

—প্রায় সেরকমই, স্যার। তবে ফিচারটি ভারী মিস্টেরিয়াস। আজকের কাগজ পড়ে হঠাৎ কতকগুলো অদ্ভুত প্রশ্ন মগজে উদয় হয়েছে। সে ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করব।

মণীশ রায় ঠিক বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসুচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে।

—স্যার, শিহরনদার ব্যাপারে কতকগুলো কথা জানতে চাই। আপনি যতটুকু জানেন, যদি আমাকে বলেন—

মণীশ রায় অবাক হয়ে বললেন, তুমি কি পুলিশে জয়েন করেছ নাকি?

—না স্যার, গার্গী হাসল, জাস্ট ফর কিউরিওসিটি। আজকের কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, অধ্যাপক সমিতির মিটিঙে কী সব ঝামেলা হয়েছিল সেদিন। তারই জেরে শিহরনদা খুন হয়েছেন, এরকম সন্দেহ করা হয়েছে খবরে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?

মণীশ রায় হঠাৎ বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন যেন, বললেন, আমি তো সেদিন মিটিঙে যাইনি। ফলে একজ্যাক্টলি কী ঘটেছিল তা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে যেটুকু জানি, অধ্যাপকদের মধ্যে দুটো দল ইদানীং বৈরী হয়ে উঠেছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে। আর শিহরন তো বরাবরই এসব ব্যাপারে ভীষণ এককাট্টা।

গার্গী জিজ্ঞাসু হল, এককাট্টা?

—হ্যাঁ। আসলে শিহরনের অ্যাটাকের ধরন বরাবরই খুব সাংঘাতিক। ছাত্রজীবনে ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল বিপ্লবি আন্দোলনের সঙ্গে। সভা সমিতিতে বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিত বরাবর। ক্যাডাবরা খুবই উদ্বুদ্ধ হত ওর ভাষণে। অনেক মিটিঙে ওকে নিয়ে যেত শুধু বক্তৃতা ভালো দিতে পারত বলেই। সেই টেম্পারামেন্টের কিছুটা বেশ এখনও ওর বক্তৃতার মধ্যে আছে তা নিশ্চয়ই এতদিনে তোমরাও জেনেছ। তাতে এখনকার বিরোধীপক্ষও মনে-মনে শত্রু হয়ে গিয়েছিল ওর।

—ওঁর বিরোধীপক্ষের কাউকে আপনি চেনেন?

কিছুটা ইতস্তত করে মণীশ রায় বললেন, আছেন তো অনেকেই। আলাদা করে কার আর নাম বলব? তবে একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লেগেছে। হয়তো আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, কীসের খটকা?

—তোমরা হয়তো জানো না, অধ্যাপক সমিতিতে এই যে রেষারেষি তার শিকড় নিহিত আছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগের এক ঘটনায়।

গার্গী আরও অবাক হল, কুড়ি বছর?

—হ্যাঁ। শিহরণ আর রণজয় একই সঙ্গে পড়ত প্রেসিডেন্সিতে। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল একসঙ্গেই। কিছুকাল পর কোনও একটা ইস্যু নিয়ে গোলমেলে বেধেছিল দুজনের মধ্যে। শিহরন বেরিয়ে আসে দল ছেড়ে। তারপর অবশ্য ও আর রাজনীতি করত না। এতকাল পর অধ্যাপক সমিতি করতে গিয়ে দুজনে যোগ দিয়েছিল দুই বিপরীত প্রোসেসিয়েশনে।

—আপনি বলতে চাইছেন সেই পুরোনো ঝগড়ার জের হিসেবে?

—সম্ভবত। তবে ওদের মধ্যে বৈরিতার আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল। তুমি তো ডোনার মা বনানী চ্যাটার্জিকে চেনো?

গার্গী অবাক হয়ে বলল হ্যাঁ—।

—বনানীও ওদের ক্লাসমেট ছিল। তখন অসাধারণ সুন্দরী হিসেবে বনানীর খ্যাতি ছড়িয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিল অনেক দূর। সেসময় খুবই আশ্চর্যের কথা, রণজয় আর শিহরন, দুজনে একই সঙ্গে বনানীর প্রেমে পড়েছিল।

—তাই! এরকম ভীষণ একটা আশ্চর্যের ঘটনা মণীশ রায়ের কাছ থেকে শুনতে পাবে তা গার্গী স্বপ্নেও ভাবেনি। তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল, স্ট্রেঞ্জ। আপনিও কি তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন?

না, আমি ওদের কনটেম্পোরারি ছিলাম, কিন্তু পড়তাম অন্য কলেজে। আমি স্কটিশের ছাত্র। স্কটিশে পড়লেও আমরা সবাই তাকিয়ে থাকতাম প্রেসিডেন্সিতে কী হচ্ছে তা জানার জন্য। সে লেখাপড়া সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারেই হোক, আর কোন মেয়ে সুন্দরী, কে কার প্রেমে পড়ল সে বিষয়েই হোক, অথবা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারেই হোক। আসলে প্রেসিডেন্সিকে চিরকালই একনম্বর বলে গণ্য করত সবাই। আজও বোধহয় তাই-ই করে।

গার্গী উৎসুক হয়ে বলল, তারপর?

—বনানী তখন দুজনের সঙ্গেই একটা রিলেশন রেখে চলত। তারপর কলেজের পড়া শেষ হতে রণজয় চলে এল কমপ্যারেটিভ লিটারেচার পড়তে, আর শিহরন ভরতি হল ইংরেজি নিয়ে।

—সে সময় আপনি নিশ্চয়ই আর. ডি.-র সহপাঠী ছিলেন?

—হ্যাঁ, রণজয় আর আমি একই সঙ্গে পড়তাম। কমপ্যারেটিভ লিটারেচার নিয়ে, তবে রণজয় আমাকে মণীশদা বলত। সেসময় বনানী কী কারণে যেন আমার গুণগ্রাহী হয়ে পড়ে, তবে রণজয়ের সঙ্গে তার আর কোনও রিলেশন ছিল না।

—আর শিহরনদার সঙ্গে?

মণীশ রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শিহরনের সঙ্গে বনানীর একটা সম্পর্ক বরাবর থেকেই গিয়েছিল।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে হঠাৎ বিয়ে করলেন কেন উনি?

—সে অনেক ঘটনা। সবটা তোমার না জানলেও চলবে। হঠাৎ কেন যে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছিল বনানী, তা তখন কলকাতার অনেক মহলে দারুণ একটা আলোচনার বিষয় ছিল। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বরাবর একটু খ্যাপা ধরনের। যাই হোক, তার সঙ্গে বিয়ের এতকাল পর হঠাৎ শিহরন বনানীর বাড়িতে এসে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকছে জেনে আমরা কম অবাক হইনি। তাতে রণজয় হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলা যায়, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল যেন।

—সেই জন্যে কি আপনাদের সেমিনারের দিন শিহরনদা হঠাৎ আগ বাড়িয়ে রণজয় দত্তের আর্টিকেলটির অমন নির্মম সমালোচনা করেছিলেন।

মণীশ রায় আবার একটু থমকালেন, হয়তো তা-ই। তবে অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে ক্রমশ চূড়ান্ত শত্রুতা তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেমিনারে বক্তৃতা সে কারণেও করে থাকতে পারে শিহরন।

গার্গী এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল মণীশ রায়ের দিকে, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, শিহরণদার হত্যার ব্যাপারে আর.ডি-র কোনও ভূমিকা আছে?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মণীশ রায় এবার বললেন, রণজয়কে আমার কিছুটা সন্দেহ হয়—

ক্রমশ আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। মণীশ রায় যে সরাসরি এভাবে রণজয় দত্তর নাম বলবেন তা সে ভাবতেই পারেনি। রহস্যের মোড়ক আঁট হয়ে উঠেছে যেন ক্রমে। কী যেন ভেবে হঠাৎ বলল, কিন্তু আর. ডি. তো সেদিন ফাংশন দেখতেই যাননি শুনলাম।

—কে বলল আসেনি? সেকেন্ড কিংবা থার্ড রোয়ের চোয়ারে বসেছিল রণজয়। তারপর ফাংশন শেষ হওয়ার সময় গন্ডগোলের মধ্যে দেখি, দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—।

—তাই? গার্গীর ভুরুতে একটা ভাঁজ ঘনিয়ে এল স্বাভাবিকভাবে।

BanglaBook.org

—শুধু তাই নয়। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, অথচ রণজয়কে তারপর ওখানে আর দেখাই গেল না। সেইটেই আমার কাছে ভারী আশ্চর্য লাগছে—।

মণীশ রায়ের কথা শেষ না হতেই গার্গী হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, স্যার পরশুর আগের দিন, অর্থাৎ শিহরনদা যেদিন খুন হন, তার আগের দিন সন্ধের পর শিহরনদা বোধহয় এসেছিলেন আপনাদের বাড়িতে?

প্রসঙ্গ হঠাৎ ঘুরে যেতে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেলেন মণীশ রায়। পরক্ষণে বললেন, হ্যাঁ, এসেছিল—।

—হঠাৎ খড়্গপুর থেকে ফিরেই শিহরণদা কেন এসেছিলেন এখানে, তা একটু বলবেন?

মুহূর্তে মণীশ রায়ের মুখখানা শক্ত হয়ে গেল, বোধহয় ঈর্ষিতার সঙ্গে কোনও দরকার ছিল।

—ও, গার্গীই এবার যেন থমকে গেল, আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি?

—হ্যাঁ, হয়েছিল। খড়্গপুরে গিয়ে নাকি একটা দারুণ রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই শোনাল সাতকাহন করে।

গার্গী আশ্চর্য হল, কী রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা।

—বলল, যার সঙ্গে খড়্গপুরে গিয়েছিল সে লোকটা এমন থার্ড ক্লাস তা আগে বুঝতে পারেনি।

—সে কী, কেন?

—সে লোকটা নাকি খড়্গপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার দিয়েছিল। অ্যাডভান্স করেছিল একলাখের মতন? কিন্তু লোকটা মালও দেয়নি, অ্যাডভান্সও ফেরত দিচ্ছিল না। তাই শিহরনকে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা সেটল করতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু ব্যাবসায়ীর সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন সেই মিঃ বোস নাকি শিহরনকে বলে বসল, এ ধরনের কথাবার্তা আপনি বলবেন জানলে আপনাকে নিয়ে আসতাম না—।

—তাই নাকি? শিহরনদা কিছু খারাপ কথা বলেছিলেন নাকি ব্যাবসায়ীকে?

—হ্যাঁ, বলল, এ ধরনের চাপ না দিলে তো টাকা আদায় করা যাবে না। কিন্তু মিঃ বোস যে ও ধরনের কথা বলবেন তা ভাবতেই পারেনি শিহরন। ফেরার পথে গাড়িতে নাকি খুব ঝগড়া হয়েছে।

গার্গী আরও আশ্চর্য হয়, কী ধরনের ঝগড়া তা কি আপনাকে বলেছিলেন?

—তা বলেনি, তবে বলল, লোকটা ফ্রড। যে টাকা নিয়ে ফুটানি মারছে তা নাকি নিজের নয়।

—স্ট্রেঞ্জ! আর কিছু বলেছিলেন?

—না।

এবার গার্গী আসল কথায় চলে এল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করছিল কথাটা কীভাবে পাড়বে এই ভেবে, এতক্ষণে বলতে পারল, স্যার, শিহরনদা সেদিন সন্ধেয় যখন এখানে এসেছিলেন, তাঁর কাছে কি একটা পিস্তল ছিল?

—পিস্তল। মণীশ রায় প্রথমে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, একবার দেখিয়েছিল বটে। বলেছিল, খড়্গপুরে দরকার হতে পারে এই মনে করে নিয়ে গিয়েছিল।

—পিস্তলটা কি উনি আপনার বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন?

—ফেলে। মণীশ রায় খুবই অবাক হলেন, কই না তো! সঙ্গে-সঙ্গে তো কোমরে গুঁজেছিল। পাঞ্জাবির নীচে ধুতির সঙ্গে আটকে রাখা ছিল ওটা।

—পিস্তলটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার।

BanglaBook.org

—তাই নাকি?

—শিহরনদা ডোনার মাঝে বলেছিলেন, উনি কারও বাড়িতে ভুলে ফেলে এসেছেন।

মণীশ রায় তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না-না, এখানে মোটেই পিস্তল ফেলে যায়নি। নিজেই কোথাও রেখেছে ভুলে। কিংবা হয়তো কোথাও রেখেছিল, যাতে পরে কাজে লাগানো যায়। ওর তো অনেক গুণ, বলতে-বলতে আবার শক্ত হয়ে গেল মণীশ রায়ের মুখ। এতক্ষণ যেন একটা রাগ চাপা ছিল ভেতরে, হঠাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়ল গার্গীর সামনেই।

—গুণ! যেন কথাটা বুঝতে পারেনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল গার্গী।

রাগটা আর চেপে রাখতে পারলেন না মণীশ রায়, বললেন, মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ানোটাই তো ওর নেশা ছিল কি না—।

মণীশ রায়ের রাগের কারণ অবশ্য বুঝতেই পেরে গিয়েছিল গার্গী। শিহরন রায়চৌধুরি আজকাল ঘন-ঘন কেন আসতেন এ-বাড়ি তা তার অজানা নয়। মণীশ রায়ও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আক্রোশে ফুঁসছিলেন ভেতরে-ভেতরে। হঠাৎ তার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যেতে হাসি পাচ্ছিল গার্গীর। মণীশ রায় নিজেও যে এই অদ্ভুত নেশায় আক্রান্ত তা নিশ্চয় এ সময় ভুলে গিয়ে থাকবেন। তাঁর নেশাটি এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাঁরই সংসারে।

মণীশ রায়কে আর বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই বুঝতে পেরে গার্গী চট করে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

—ঠিক আছে, স্যার, আজ চললাম, বলেই ঘাড় ফেরাতেই দেখল স্টাডিরুমের জানালার ওপাশে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঈষিতাদি। তাঁর মুখ গম্ভীর, দু-চোখ এক অদ্ভুত ক্রুরভঙ্গি। দৃশ্যটি নজরে পড়তে খুবই অবাক হল গার্গী। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন ঈষিতাদি! মণীশ রায়ের সঙ্গে তার কথোপকথন শুনছিলেন গোপনে! ছাত্রীরা তাদের অধ্যাপকের সঙ্গে কীভাবে প্রেম করে তা শুনতেই আড়ি পেতেছিলেন!

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে-ভাবতে গার্গী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। দরজা খুলে বেরুতে যাবে, হঠাৎ পেছন থেকে নারী কণ্ঠে 'শোনো' শুনতেই থমকে দাঁড়াল অবাক হয়ে। তার পিছু-পিছু নেমে এসেছেন ঈষিতাদিও। গার্গী ঘুরে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে, কিন্তু বেশ রাগতভাবেই ফুঁসে উঠলেন মণীশ রায়ের যুবতী স্ত্রী, উনি যা বলেছেন, সব কিন্তু মিথ্যে কথা।

এতক্ষণ যতটা চমকে উঠছিল, গার্গী তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে গেল ঈষিতাদির কথা শুনে। অনুচ্চকণ্ঠে বলল, কোনটা মিথ্যে কথা?

—ওই যে, তোমাদের আর. ডি. সম্পর্কে যা-যা বললেন। আমিও তো মাত্র ক'বছর আগে আর. ডি.-র ছাত্রী ছিলাম। উনি আর যাই হোন, মানুষ খুন করতে যাবেন না।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

তেমনই ফিসফিস করে ঈষিতাদি বললেন, আমি জানি। তোমাদের এম. আর. এখন নিজেকে আড়াল করার জন্য সমস্ত দোষ আর. ডি.-র ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

—নিজেকে আড়াল করতে? বিস্ময়ে গার্গীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতে চাইছে যেন।

—তা ছাড়া আবার কী। তোমাদের শিহরনদাকে সন্দেহ করতেন উনি। আমাদের বাড়ি আসাটা একেবারেই পছন্দ করছিলেন না। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর সঙ্গে মেলামেশাটা বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের এম. আর. কে উচিত শিক্ষা দিতে। নিজে সারাক্ষণ মেয়েপরিবৃত হয়ে থাকবেন, আর আমি কারও সঙ্গে হেসে কথা বললেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!

গার্গী লক্ষ করছিল ঈষিতাদির ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মুখখানা। রাগে লাল হয়ে উঠেছে পানপাতা ছাঁদের ফরসা মুখমণ্ডল। বড়-বড় নিশ্বাসে উঠছে-পড়ছে তাঁর ভারী বুক। অনেকদিনের জমে থাকা ক্রোধ হঠাৎ হুড়মুড় করে তাঁরও বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। গার্গী এই সুযোগটা

BanglaBook.org

ছাড়তে চাইল না। তক্ষুনি গলা যথাসম্ভব নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি জানেন, শিহরনদা সেদিন রাতের বেলা একটা পিস্তল এ-বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন কিনা?

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, আমি দেখেছি পিস্তলটা।

গার্গীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল, কোথায় সেটা?

—উনি তো শিহরনদার কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করছিলেন, কীভাবে চালাতে হয় পিস্তলটা। শিহরনদা দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে গুলি ভরতে হয়, কীভাবে ট্রিগার টিপতে হয়, লক্ষ্যবস্তু কোথায় থাকলে নলের মুখ কোথায় থাকবে—।

—তাহলে শিহরনদা এ-বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলেন পিস্তলটা?

—আমার তো তাই মনে হয়। নইলে উনি পিস্তল কোথায় পেলেন?

গার্গী প্রবল আশ্চর্য হয়ে ঈষিতাদির মুখের দিকে ভালো করে দেখল। ঈষিতাদি যেন ধরেই নিয়েছেন মণীশ রায়ই এই খুনটা করেছেন। কিন্তু সে-কথা কেন হুড়মুড় করে গার্গীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তা ভেবে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তার। তার মানে শিহরনদা খুন হতে ঈষিতাদি এতটাই শকড হয়েছেন যে, মণীশ রায়কে খুনি সাব্যস্ত করতেও এতটুকু দ্বিধা করছেন না। গার্গী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, পিস্তলটা নিশ্চয় তাহলে এ-বাড়িতেই আছে?

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, না, তারপর থেকে আমি আর পিস্তলটা দেখতে পাইনি। কাল সারাদিন খুঁজেছি ঘরে—।

—ও, গার্গী কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

॥ ২২ ॥

বাড়ি ফিরে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর প্রথমেই যে কথাটা মনে হল গার্গীর তা হল, সকালে মণীশ রায় উত্তেজনার বশে কিছু কথা বলে, কিছু কথা না বলে যে রহস্যটুকু চারিয়ে দিয়েছেন তার মনে, তার যদি কিনারা করতে হয়, তাহলে অধ্যাপক রণজয় দত্তর সঙ্গে গার্গীর কিছুক্ষণ বসা দরকার। রণজয় দত্তর সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ডোনা। সে আলাপ-পর্বটি অবশ্যই খুব সুখের ছিল না, কারণ ডোনা তার স্বভাবসিদ্ধ চটুলতায় হাসি-হাসি মুখে আর. ডি.-কে বলেছিল, গার্গী অপেক্ষা করছে এম. আর.-এর জন্য। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির ওপর একখানা বই নেবে বলে। কথাটা শুনেই শক্ত হয়ে গিয়েছিল রণজয় দত্তর ভাবী, গোলগাল মুখখানা। এখন গার্গী যদি হঠাৎ গিয়ে রণজয় দত্ত সমীপে হাজির হয়, কীভাবে যে তাকে অভ্যর্থনা করবেন আর. ডি. তা কে জানে!

তবু এবম্বিধ কিছু দ্বিধায় আন্দোলিত হয়ে গার্গী দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল রণজয় দত্তর উদ্দেশে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরস রুমে থাকার কথা তাঁর। একই ঘরে বসেন মণীশ রায়, অতএব তাঁর নজর এড়িয়ে কীভাবে রণজয় দত্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসা যায় এমন ভাবতে-ভাবতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে প্রফেসরস রুমে উঁকি দিল গার্গী। কিন্তু না, ঘরে আজ প্রায় কেউই নেই। খবর নিয়ে জানল, কী একটা জরুরি ব্যাপারে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সব অধ্যাপকদের মিটিং চলছে কনফারেন্স রুমে। অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কারোর দেখা পাওয়া ভার।

সামান্য বিমর্ষ মুখে গার্গী যখন লম্বা করিডোরে সিমেন্ট পনেরো পায়চারি করেও ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, কীভাবে বাকি সময়টা কাটাবে, সেই মুহূর্তে সে দেখা পেয়ে গেল যাকে খুঁজছিল সেই আর. ডি.-র। বোধহয় কনফারেন্স রুম থেকেই আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। মুখে সামান্য বিরক্তির আভাস। হয়তো মিটিং থেকেই কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

সে যাই হোক, গার্গী তার প্রার্থিত ব্যক্তিকে হঠাৎ পেয়ে যেতে যেমন খুশিও হল, তেমনই

BanglaBook.org

দ্বিধান্বিত হল এই ভেবে, এহেন রাগত একজন লোককে এখন কীভাবে প্রশ্নগুলো করবে।

রণজয় দত্ত হনহন করে প্রফেসরস রুমে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসতেই সেদিকে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল গার্গী, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—।

—আমার সঙ্গে। রণজয় দত্ত, বলাই বাহুল্য, ভারী আশ্চর্য হলেন। তাঁর অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-ভালো চেহারাটা যে মোটেই তরুণী আকর্ষণকারী নয় তো বোধহয় এতকালে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

—হ্যাঁ, স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্নগুলো একেবারেই ব্যক্তিগত।

রণজয় দত্তর মুখ একটু গম্ভীর হল। হাতের ঘড়িতে চোখ রেখে বললেন, আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে। থানার ও. সি. ফোন করে জানিয়েছেন, উনি আমাকে ইন্টারোগেট করতে চান। কাগজে কী সব আলফাল রিপোর্ট বেরিয়েছে সেসব নিয়েই। হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে জানিয়েছেন। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই—।

কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটও পার হল না। গার্গী সবে মনে-মনে গুছিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে কীভাবে শুরু করবে তার প্রশ্নগুচ্ছ, তার আগেই নীচে জিপ এসে থামার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরস রুমে এসে ঢুকলেন পুলিশ-ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র। দৈর্ঘে ততটা উচ্চ নন, কিন্তু বেশ স্টাউট চেহারা, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, তাতে ওঁর নিঁখুতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখখানায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। রণজয় দত্ত সামান্য নিষ্প্রভ হয়ে বললেন, আসুন, মিঃ মিত্র।

আর. ডি.-র সামনে রাখা একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে তুষারশুভ্র মিত্র তাকালেন গার্গীর দিকে। তাঁর জিজ্ঞাসুচোখ দেখে সামাল দিলেন রণজয়, ও গার্গী, আমাদের এক ছাত্রী—

—ও, বলে তুষারশুভ্র মিত্র যেন তেমন আমল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না গার্গীকে। রণজয় দত্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ দত্ত, আপনি নিশ্চয় জানেন, শিহরন রায়চৌধুরি নামে একজন অধ্যাপক খুন হয়েছেন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে, এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে গিয়ে নানা রকম ক্লু পাচ্ছি একের পর এক। তার মধ্যে একটি তথ্য আমাদের নজর কেড়েছে। তা হল, আপনি আর শিহরন একসঙ্গে পড়াশুনা করতেন কলেজে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন করেছেন, তারপর হঠাৎ কী কারণে আপনাদের মধ্যে বচসা হয়, তার জেরে শিহরন সরে আসেন আন্দোলনের পথ থেকে। সেসময় কী ধরনের মতভেদ হয়েছিল আপনাদের দুজনের মধ্যে, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। নিশ্চয় আপনিই একমাত্র জানেন—।

রণজয় দত্ত বেশ একরোখা, একটু জটিল ধরনের মানুষ, তবু পুলিশ ইনস্পেকটরের জেরার সামনে নার্ভাস হয়ে পড়লেন। একবার গার্গীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন, সবাই জানে, আমাদের আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। সেসময় আমাদের নেতৃত্বও ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিলেন নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিতর্কে, এক-একজন এক-একরকম মত প্রকাশ করছিলেন আমাদের পার্টির বুলেটিনে, তাতে আমরা নীচুস্তরের ক্যাডাররাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশ। সেরকম একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে শিহরনের সঙ্গে আমার মতভেদ হয়। আসলে শিহরন ঠিক ডেডিকেটেড ছিল না। আমাদের মনে হচ্ছিল ও নিতান্তই অ্যামেচারিস্ট। শিহরনের বরাবরই একটু হিরোইজমের নেশা ছিল। আর সেই হিরো হওয়ার চেষ্টাটা ছিল শুধুমাত্র মেয়েদের চোখে একটা কেউকেটা হয়ে ওঠার অভিপ্রায়েই। পার্টিতে আসার কারণও ছিল তাই। অতএব তার যে অভিসন্ধি ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যেতেই ও নিজে থেকেই সরে যেতে চাইল পার্টি-লাইন থেকে।

তুষারশুভ্র মিত্রের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, অভিসন্ধি পরিষ্কার হওয়া বলতে আপনি কী মিন করছেন?

রণজয় হাসলেন, আসলে আমাদের পার্টিতে বনানী নামে একটি মেয়ে ছিল যে সেসময়

খুবই সুন্দরী হিসেবে খ্যাত ছিল। তার নজরে পড়ার জন্যই শিহরন আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়। তারপর যেই বনানীর চোখে ও হিরো হয়ে গেল, সেইমুহূর্তে নিছক একটা ফালতু কারণে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ও সরে গেল বনানীকে নিয়ে।

—বনানীকে নিয়ে! তুষারশুভ্র মিত্র যেন এ ব্যাপারটাও ঠিক বুঝতে পারলেন না।

—হ্যাঁ, রণজয় দত্ত এবার ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছেন নিজের বক্তব্যে, এতদিন কাউকে বলিনি, খুব একটা বেশি কেউ জানেও না ব্যাপারটা, তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে বলা দরকার কথাগুলো। সেসময় শিহরন বনানীকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। একসঙ্গে ছিলও মাস ছয়েকের মতো। কিন্তু বিয়েটা টেঁকেনি। হঠাৎই শিহরনকে অপছন্দ করতে শুরু করে বনানী করার কথাও, কারণ শিহরন, যাকে আপনারা বলেন উওম্যানাইজার, সেরকমই ছিল। বনানী ছাড়াও ওর আরও প্রেমিকা ছিল। তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়াত বনানীর সামনেই, অতএব—।

পুলিশ-ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র যতটা চমকে উঠলেন রণজয়ের কথায়, তার চেয়ে ঢের বেশি চমকে উঠল ওপাশে বসা গার্গী। এতবড় একটা ঘটনা সে এতদিন ডোনার সঙ্গে মিশেও জানতে পারেনি ভেবে ভারী অবাক লাগছে তার। কিংবা হয়তো এও হতে পারে ডোনাও জানে না ঘটনাটা।

পরক্ষণেই স্তম্ভিত তুষারশুভ্র মিত্র সেই প্রশ্নই করে বসলেন রণজয় দত্তকে, চিত্রদীপ কি জানেন, বনানী তাঁকে বিয়ে করার আগে শিহরনকে বিয়ে করেছিলেন?

রণজয় দত্ত ঘাড় নাড়লেন, সম্ভবত জানতেন না। তাহলে পরে শিহরন যখন তাঁর বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতে এলেন, তখন নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। তা ছাড়া, রণজয় একটু ভেবে বললেন, ওদের বিয়েটা অনেক দিন গোপন করে রেখেছিল। রেজেস্ট্রি করার অন্তত একবছর পর দুজনে কলকাতার কোনও শহরতলির দুরূহ এলাকায় বাসাভাড়া নিয়ে থাকত। সে-খবর ওদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউই জানত না। তারপর কখন বনানী শিহরনের কাছ থেকে চলে এসে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে বিয়ে করল সে খবর আমি জানতাম না, জানার দরকারও বোধ করিনি তখন।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাঁর হাতের ছোট্ট ডায়েরি খুলে কী সব দেখে নিলেন এক পলক। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বনানীকে ভালোবাসতেন সেসময়?

রণজয় দত্ত মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলেন, এক লহমা থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, বনানী আমাদের পার্টিতে ছিল। খুব ডিভোটেড ওয়ার্কার, সেই হিসেবে তাকে পছন্দ করতাম—।

—পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার যা খবর, আপনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু শিহরন আপনার কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। সেই ব্যর্থতা, সেই ক্রোধেই আপনি তুমুল ঝগড়া করেছিলেন শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে। আপনার সুপারিশেই পার্টি থেকে এক্সপেল করা হয় তাকে, বলতে-বলতে রণজয় দত্তের দিকে বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন পুলিশ ইনস্পেকটর, কী, ঠিক বলেছি কি না?

এহেন পুরোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে রণজয় দত্তও বেশ তেতে উঠেছিলেন। ইনস্পেকটর তাঁকে চার্জ করতেই হঠাৎ বেশ ক্রুদ্ধ দেখাল, তাঁকে, এসব মিথ্যে খবর আপনাকে কে দিল? শিহরন নিজেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আমার চিন্তাভাবনা ভুল, আমি ভুলপথে চলেছি বলে নিজেই রিজাইন করে একদিন। আসলে, আগেই বলেছি, ঝগড়াটা একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে সে পার্টি থেকে পালিয়ে যেতেই চেয়েছিল। কারণ পার্টি সে সময় খুব কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে এগুবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাতে লাইফ রিস্ক ছিল। শিহরন সে রিস্ক নিতে চায়নি বলেই—

—চায়নি বলেই আপনি তাকে থ্রেট করেছিলেন, ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস ইটস কনসিকোয়েন্সস, তাই না?

রণজয় দত্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর সংবিত ভেঙে বললেন, এত সব কথা

BanglaBook.org

আপনাকে কে বলল?

তুষারশুভ্র মিত্র এতক্ষণে মুচকি হাসি হেসে বললেন, পুলিশের কানে সব খবরই চলে আসে, মিঃ দত্ত। শুধু তাই নয়, তারপর এই দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা শত্রুতা বজায় থেকেছে। সে শত্রুতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে শিহরন রায়চৌধুরি অধ্যাপক সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর। সমিতির মিটিঙে রীতিমতো লড়াই হত আপনাদের দুজনের মধ্যে। এমনকী শিহরনবাবু আপনাকে হেয় করার জন্য কদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে তীব্রভাবে আক্রমণ করে আপনাকে। সেই আক্রমণের জের পড়েছে আপনার কেরিয়ারেও। রিডারের পোস্টে আপনার পরিবর্তে প্রমোশন পেয়েছেন মণীশ রায়।

রণজয় দত্তর চোখদুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন মণীশ রায়ের নাম শুনে। বললেন, তার মানে এই নয় যে, আমি শিহরনকে খুন করেছি। যদি আমার সেই মোটিভই থাকত, তাহলে শিহরন খুন হয়ে যেত আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। পার্টির সঙ্গে বিট্রে করায় তখন খুন হয়ে যেতে হয়েছিল অনেককেই। আমাদের পার্টির নির্দেশও ছিল তাই—।

পুলিশ ইনস্পেকটর খেয়াল করছিলেন রণজয় দত্তের অভিব্যক্তি, বললেন, শুধু পার্টির সঙ্গেই বিট্রে করেননি শিহরন, আপনার সঙ্গেও তো করেছিলেন। নইলে বনানী তো আপনারই ছিল সেসময়—

—উইল য়্যু প্লিজ স্টপ, ইনস্পেকটর, রণজয় দত্ত এবার স্থান-কাল ভুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট। সেসব কথা তুলে শুধু-শুধু আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না।

পুলিশ ইনস্পেকটর আবার মুচকি হাসলেন, তার মানে শিহরনের ওপর আপনি প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন ভেতরে-ভেতরে?

—তার মানে এই নয় যে, আমি তাকে খুন করেছি। রণজয় আবার বললেন কথাটা।

—কিন্তু, পুলিশ ইনস্পেকটর আবার ঝুঁকে পড়লেন, সেদিন ফাংশনে আপনার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। শিহরন রায়চৌধুরি ড্যান্স-ড্রামাটির লেখক জানতে পেরে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, কেন, নাটক লেখার আর লোক পেল না ওরা? কার্ডও নাকি নিতে চাননি আপনি। তা সত্ত্বেও আপনি ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন। হত্যার মুহূর্তে শিহরন রায়চৌধুরির আশেপাশেই দেখা গিয়েছিল আপনাকে। তারপর উনি খুন হওয়ার পর আপনাকে আর দেখাও যায়নি। কেন বলতে পারেন, মিঃ দত্ত?

রণজয় দত্ত এবার যেন অবাক হলেন, ঠিক এজন্যই কি আপনাদের মনে হয়েছে, আমি তাকে খুন করতে পারি?

—আসলে বুঝলেন, হত্যাকারীর মোটিভ, তার চলাফেরা, হত্যার সময়ে তার অবস্থান, হত্যার পর তার প্রতিক্রিয়া, সব কিছুই খেয়াল রাখতে হয় আমাদের। আর আপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুভমেন্টই এত সন্দেহজনক ঠেকছে আমাদের কাছে—।

—বাহ চমৎকার বলেছেন, ইনস্পেকটর। এ ছাড়া শিহরনের আশেপাশে আর কাউকেই চোখে পড়ছে না আপনাদের?

তুষারশুভ্র মিত্র তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের সামনে, সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বললেন, কার কথা বলতে চাইছেন আপনি?

—অনেকের কথাই। মণীশ রয়ের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কী করে। ঈষিতাকে নিয়ে ইদানীং শিহরন—তারপর চিত্রদীপ চ্যাটার্জির কথাই ভাবুন না। আপনি হয় তো জেনেছেন, শিহরণকে নিয়ে ইদানীং এক ঘোরতর পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল ওঁদের বাড়িতে।

তুষারশুভ্র যেন ভালো করে জানেন না এমন ভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, যেমন?

—চিত্রদীপ কখনও চাননি, শিহরন এ-বাড়িতে আর থাকুক। বনানীর ওপর চাপ সৃষ্টি

BanglaBook.org

করছিলেন শিহরনকে চলে যেতে বলার জন্য। তার ওপর, তিনি সেদিনই জানতে পেরেছিলেন, বনানীর সঙ্গে আগে শিহরনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

রণজয় দত্ত ইতস্তত করে বললেন, আমি জেনেছি ব্যাপারটা যে-করেই হোক।

পুলিশ ইন্সপেকটর দুম করে বলে উঠলেন, না কি ঘটনাটা আপনিই তাঁর কানে তুলেছেন, মিঃ দত্ত? শিহরন যে বনানীর কাছে এসে থাকছে, এটা বোধহয় আপনি একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই-ই আপনি ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে?

রণজয় দত্ত প্রায় চুপসে গেলেন একলহমায়, একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম। অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে ও এমন সব কথা আমাকে লক্ষ করে বলেছিল যে, তখনই মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, ওর মুখোশ আমি খুলে দেব। সেদিন চিত্রদীপ ফোনে সব শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেছিলেন, তাই নাকি? তারপরই ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

পুলিশ ইনস্পেকটর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু যেন চিন্তা করে নিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই অবশ্য রণজয় দত্ত আবার বললেন, তা ছাড়া বনানী নিজেও শিহরনকে নিয়ে খুব শান্তিতে ছিল না। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হত মাঝে-মাঝে। একদিন বলল, শিহরন ওর মেয়ে ডোনার সঙ্গেও একটা আনএথিক্যাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। বনানী চেষ্টা করেও কাউকে নিবৃত্ত করতে পারছে না।

তুষারশুভ্র মিত্র ভুরু কুঁচকে বললেন, কীরকম সম্পর্ক বললেন?

—ওরা নাকি দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যেত গাড়ি নিয়ে। ফিরত অনেক রাতে। মেয়ের মুখ দেখে বনানী সন্দেহ করত, ওদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও শুরু হয়েছে।

—মাই গড! পুলিশ ইনস্পেকটর বিড়বিড় করলেন মনে-মনে।

—বনানী নিজেও খুবই ফিউরিয়াস হয়েছিল ভেতরে-ভেতরে। আমার মনে হচ্ছিল, যে কোনওদিন আউটবার্স্ট হলেও হতে পারে।

—ঠিক আছে, মিঃ দত্ত, পুলিশ ইনস্পেকটর উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, তদন্তের প্রয়োজনে এর পরেও কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে হতে পারে। আপনি যতই অন্যদিকে আমাদের অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আপনার ওপর কিন্তু আমাদের নজর থাকছে। ও. কে।

পুলিশ ইনস্পেকটর চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও বেশ গুম হয়ে রইলেন রণজয় দত্ত। হঠাৎ খেয়াল হল, এতক্ষণ স্ট্যাচুর মতো কাছেই বসে রয়েছে গার্গী। তার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, তুমি কী যেন জিজ্ঞাসা করবে বলেছিলে?

গার্গী অবশ্য তার যা-যা জিজ্ঞাস্য তার উত্তর পেয়েই গিয়েছে এতক্ষণের প্রশ্নোত্তরের ভেতর। শুধু হেসে বলল, আপনি এখন খুবই ডিস্টার্বড আছেন, স্যার। আমি পরে কোনও এক সময় আসব।

॥ ২৩ ॥

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামব-নামব করছে কলকাতার বুকে। ঠিক সেসময় গার্গী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল বড় রাস্তার মুখে। শিহরন হত্যার রহস্য ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে দেখে তার ভুরুতে মস্ত একটা ভাঁজ জাঁকিয়ে বসছিল। তার এই কুড়ি বছরের জীবনে এহেন চোরাঘূর্ণি কখনও ঘুলিয়ে ওঠেনি। ওঠেনি বলেই ঘটনাটার গভীরে ঢুকতে-ঢুকতে এক গভীর গভীরতর বিস্ময়ে আবর্তিত হচ্ছিল ক্রমশ। পুলিশ ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র নিশ্চয়ই সে-রহস্য

BanglaBook.org

উদ্ধার করার চেষ্টায় তাঁর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গার্গী এক নিদারুণ সন্ধিৎসায় এক ঠেক থেকে আর এক ঠেকে ঘুরপাক খাচ্ছে নিজের খেয়ালে।

শিহরন খুনের ঠিক দুদিন আগে ডোনার প্রেমিক মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়ে শুনেছিল তাকেও নাকি কোনও অদৃশ্য-ঘাতক টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেছে একবার টার্গেট মিস করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরুলেই তোমার মৃত্যু। বেচারি ভয়ে নাকি নার্সিংহোম থেকে বেরুতেই সাহস পাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, তাকেই বা কে শাসানি দিতে পারে এভাবে! শিহরন খুনের সঙ্গে মন্দারকে এই হুমকির কি কোনও আপাত সাযুজ্য আছে! দুজনের মধ্যে অবশ্য একজন কমন ফ্যাক্টর আছে, সে হল ডোনা। মন্দারও ডোনার প্রেমিক।

যতদূর মনে হচ্ছে শিহরনদার খপ্পরেও পা দিয়েছিল ডোনা, সেক্ষেত্রে ডোনার জীবনে তৃতীয় কোনও পুরুষ কি আবির্ভূত হয়েছে! সেদিন ডোনাকে সেভাবেই প্রশ্ন করাতে সে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, কী জানি, সে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তার ইতস্তত ভঙ্গিমার রকম দেখে মনে হয়েছিল ডোনা লুকোতে চাইছে কিছু? কিন্তু কাকে লুকোতে চাইছে ডোনা! কেনই বা! পরে অবশ্য বলেছিল, অলর্ক বোসকে সন্দেহ করছে। অলর্ক বোসকে নিয়েও অবশ্য তার নানান চিন্তা। হরিশংকর চৌধুরি লোকটা হঠাৎ খুন হয়ে গেল কেন, কেনই বা তার লাশ পাওয়া গেল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। হরিশংকর চৌধুরির অভিযোগ ছিল, বীরভঙ্গপুরের রানিমার খুনি এখন দাড়ি কামিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও অলর্ক বোসের বাড়ির কাছে, কখনও তার অফিসেও। প্রশ্ন হল, তাহলে সে লোকটাই বা কে! সে কি সত্যিই অলর্ক বোসের নিজস্ব কোনও লোক, যাকে সে এইসব কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছে! হরিশংকর চৌধুরিকে কি তাকে দিয়েই খুন করিয়েছে অলর্ক বোস! তাহলে অলর্ক বোসকেই বা হুমকি দিচ্ছে কে!

এমন নানান ভাবনায় আবর্তিত হতে-হতে ডোনা উঠে পড়ল এমন একটা বাসে, যা তাকে নিয়ে গেল রডন স্ট্রিটের কাছাকাছি। রডন স্ট্রিটের একটা নার্সিংহোমে কয়েকদিন ধরে ভরতি আছে মন্দার। দিনকয়েক আগে যখন ডোনার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল মন্দারকে, কথা দিয়ে এসেছিল আর একবার দেখতে যাবে। ডোনাকে নিয়েই অবশ্য আসা উচিত ছিল তার, ডোনাকে বললে হয়তো, আসতও কিন্তু কেন যেন গার্গীর মনে হল, মন্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলা দরকার, এবং আজই।

'হোয়াইট ঈগল' নার্সিংহোমের দোতলার কেবিনটিতে পরদা সরাতেই কিন্তু ভারী হতাশ হল গার্গী। ঘরে কেউই নেই। কেবিনের বেডটিতে অবশ্য ধবধবে চাদর পাতা, পাশের স্টিলফ্রেমের হোয়াটনটটিতে ওষুধ, হরলিকস ও অন্যান্য সরঞ্জাম সবই ঠিকঠাক আছে, যেমনটি ছিল সেদিন, কিন্তু পেশেন্টই নেই। না কি এ ক'দিনের মধ্যে রিলিজ হয়ে গেল মন্দার।

কাছেই সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে গেল গার্গী, শুনুন—।

নার্স দাঁড়াতেই গার্গী জিজ্ঞাসা করল, এই কেবিনে মন্দার মিত্র নামে একজন পেশেন্ট ছিলেন।

—উনি একটু বেরিয়েছেন। বলে গেছেন সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরবেন।

—বেরিয়ে গেছেন? গার্গী অবাক তো হলই, ভুরু কুঁচকে এও ভাবল, নার্সিংহোমটা বাড়ি নাকি যে, হঠাৎ কেবিন ছেড়ে বেরুনো যায়।

নার্স মেয়েটির তাড়া ছিল, মৃদু হেসে বলল, না, মানে ওঁর ইনজুরি তো প্রায় সেরে এসেছে, ডাক্তার ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই দু-একদিন ওভারস্টে করছেন মিঃ মিত্র। হয়তো দু-তিনদিনের মধ্যেই রিলিজ পাবেন। আজ ডাক্তারকে অনেক করে রিকোয়েস্ট করলেন, কোথায় একটা টেন্ডার না কী আছে, একবার দু-ঘণ্টার জন্যে যেতেই হবে তাঁকে, তাই-ই—।

—টেন্ডার! গার্গীর মুখে একটা হাসি ঢেউ খেলে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ডোনা একদিন

BanglaBook.org

বলেছিল, মন্দার টেন্ডার ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ডোনা কবে যেন তাকে কৌতুক করে বলেছিল, মন্দার মিত্রের নাম হওয়া উচিত টেন্ডার মিত্র। ভাবতে-ভাবতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল গার্গী, ছ'টা কুড়ি, অর্থাৎ আরও দশ মিনিট পরে টেন্ডার মিত্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই দশ মিনিট মন্দারের জন্য অপেক্ষা করা যায়। এতদূর যখন এসেছে—।

কেবিনের বেডটির ওপর ছড়ানো-ছিটোনো কিছু কাগজপত্র, সম্ভবত অফিসেরই। বালিশের পাশে একটা মাঝারি আকারের নীল ডায়েরি, একটা টর্চ, কিছু কাগজ। কাগজপত্রগুলোর দিকে একলহমা ঝুঁকে পড়তেই একটা হাসির টুকরো আলোছায়া খেলে গেল গার্গীর মুখে। কাগজগুলো টেন্ডারেরই।

তারপর হঠাৎ কী খেয়াল হতে নীল ডায়েরিটি তুলে নিল হাতে। তেমন কিছু অবশ্য লেখা নেই ডায়েরিটায়। মাঝেমধ্যে কিছু হিসেব লেখা, টাকা পয়সার ডিটেইলস। কোথাও এক আধ লাইন নোট, তাতে কখনও লেখা ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেস, কখনও সুইনহো, স্ট্রিট, কখনও লিন্ডসে অ্যাট নাইন। চার লাইন ইংরেজি কবিতাও : 'ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়েট টিল / সি দ্যাট ফেলো, অ্যান্ড গেট থ্রিল / দেন ইউ চিল টিল ইউ কিল / অ্যান্ড আই টেক এ হট মিল।' কোনও পৃষ্ঠায় হিজিবিজি ছবি আঁকা, পাখি, নৌকো, কখনও একটি মেয়ের আদল। কোথাও লেখা, আই অ্যাম দ্য লর্ড অফ অল আই সি—।

হস্তাক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার। বেশ স্টাইলিশ, অলঙ্কারবহুল। তবে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় হিসেব, হিসেব আর হিসেব। লক্ষ-লক্ষ টাকার সব হিসেব। এ সবই কি মন্দার মিত্রের ব্যাবসার হিসেব! টাকা পয়সার চিন্তা ছাড়া কি তার মাথায় আর কিছুই নেই!

সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য এতসব ভাবতে-ভাবতে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কোথাও পায়ের শব্দ পেতেই চমকে উঠে ডায়েরিটা দ্রুত রেখে দিল যথাস্থানে। অন্যের ডায়েরি এভাবে পড়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু গার্গীর সব ব্যাপারেই অনাবশ্যক কৌতূহল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে সে মুহূর্তে চলে গেল কেবিনের জানলাটির কাছে, যেখান থেকে রডন স্ট্রিটের অনেকখানি দেখা যায়। পরমুহূর্তে চটিতে শব্দ তুলে কেবিনের ভেতর যে ঢুকল, সে মন্দার মিত্র। ঘরে ঢুকেই গার্গীকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ চমকে উঠল, আরে, কতক্ষণ এসেছেন? গার্গী সরে এল জানলা থেকে, এই তো মিনিট দশ। কিন্তু কী ব্যাপার। এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি, এর মধ্যে টেন্ডার না কী ধরতে বেরিয়েছিলেন।

মন্দার লাজুক-লাজুক মুখে হাসল, আর বলবেন না। টানা এতদিন নার্সিংহোমে থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আজ 'ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড গ্রিন কোম্পানি'র একটা বড় টেন্ডার জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল। প্রায় বারো লাখ টাকার কাজ। না গিয়ে আর থাকতে পারলাম না। ডাক্তারকে দিয়ে একটা পারমিশান করিয়ে নিলাম বাধ্য হয়ে। ডাক্তার বলল, দু-তিনদিনের মধ্যে রিলিজ তো হয়েই যাবেন, তাহলে যান ঘুরে আসুন। ব্যাবসার ব্যাপারে যখন—।

—তাহলে এখন ভালোই আছেন মনে হচ্ছে—।

—হ্যাঁ, ইনজুরি শুকিয়ে এসেছে ডাক্তার বললেন, এ সবই ডাক্তারের হাতযশ আর আমার কপাল। তা আপনি একা এলেন? আপনার বান্ধবী কই?

—ডোনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি আমার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার আপনার খবর নিয়ে যাই। তা ছাড়া, ডোনা একটু সমস্যায় আছে। আপনি ওদের বাড়ির ঘটনা কি শুনেছেন!

মন্দারের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে, হ্যাঁ, আজ সকালেই শুনলাম সব। ফোন করেছিলাম ডোনাকে, তখনই জানলাম। ভীষণ শকিং। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবাই যায় না। ডোনা খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম।

—আপনি ফোন করেছিলেন? তাই নাকি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, দু-একদিন পরপরই তো করি। আজ ফোন করতেই এরকম শকিং নিউজ।

—সত্যিই শকিং দুদিন ধরে যা ঝড় যাচ্ছে ওদের ওপর।

—তা তো যাবেই। আর আমারও ব্যাড লাক, ঠিক এ সময়েই আমি ইনজিওরড হয়ে নার্সিংহোমে পড়ে আছি। না হলে ওদের একটু হেল্প করতে পারতাম।

—আপনি আর কী করবেন। আপনি নিজেই তো খুন হতে যাচ্ছিলেন। মন্দার একটু শিউরে উঠে বলল, এখন বুঝতে পারছি একটুর জন্য বেঁচে গেছি সেদিন। তবে শিহরনদাও যে টার্গেট হতে পারেন তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম।

গার্গী এবার নড়েচড়ে বসল, ভালো করে তাকাল মন্দারের মুখের দিকে, বলল, অনুমান করেছিলেন। কীভাবে?

মন্দার একটু হাসল, আসলে, আমার ওপর অ্যাটেম্পট হওয়ার পরই আমি সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই মনে হল, কয়েকদিন ধরে যে-সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি, তাতে অন্য একটা ইন্টারেস্ট প্লে করছে কারও।

গার্গী চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকাল, কার ইন্টারেস্ট প্লে করছে?

—নাম এই মুহূর্তে বলা কি সঙ্গত হবে? পুলিশ নিশ্চয়ই ইনভেস্টিগেট করছে। হত্যাকারী খুঁজে বার করা তাদেরই কাজ। তবে ডোনার কাছে ফোনে যা শুনলাম, তাতে আমার অনুমান হত্যাকারী অসংখ্য ক্লু ফেলে গেছে সবার চোখের সামনে।

গার্গীর বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন, তাই নাকি? একটি ক্লু সম্পর্কে আমাকে যদি হিন্টস দেন?

মন্দার আবার হাসল, ঠিক আছে, বলছি। আপনি বলুন তো, শিহরনদা গত কয়েকদিন ধরে কাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ইনভলভড ছিলেন?

—ইনভলভড! গার্গী হঠাৎ বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল। শিহরনদা এত বিচিত্র রকমের সমস্যা নিয়ে এ ক'দিন ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজেকে যে, ঠিক কার কথা বলতে চাইছে মন্দার তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপারে যেমন লিডিং পার্ট নিয়েছিলেন, তেমনই ব্যস্ত ছিলেন ঈষিতাদির সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার গড়ে তুলতে। ডোনাকে নিয়েও তাঁর উৎসাহের কমতি ছিল না। গত দুদিন রহস্যটির পিছু-পিছু তাড়া করে গার্গী যে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শিহরনদার চরিত্রের অত্যাশ্চর্য সব দিক একে-একে উন্মোচিত হচ্ছে তার সামনে। এমনকী বনানী-শিহরনপর্বও তার কাছে আশ্চর্যতম বলে মনে হয়েছে। এতসব অভিজ্ঞতাবলী একলহমা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এসে হঠাৎ কেমন বোকার মতো মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গার্গী, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, মিঃ মিত্র।

—পারলেন না? মন্দার অদ্ভুতভাবে হাসল, অলর্ক বোসকে তো আপনি দেখেছেন? কেমন মনে হয়েছে লোকটাকে?

গার্গী আবারও বেশ ধাঁধায় ঘুরতে লাগল। অলর্ক বোস যে খুবই রহস্যময় পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি হঠাৎ শিহরনকে খুন করতে উদ্যোগী হবেন কেন তা যেন প্রথম দমকায় সেঁধুল না গার্গীর মনে।

—যে লোকটা এই মুহূর্তে কোটি-কোটি টাকার মালিক, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কেউ জানে? তার পাস্ট হিস্ট্রি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি কেউ।

—পাস্ট হিস্ট্রি! গার্গী যেন প্রবল ধাক্কা খেল কোনও ডুবো-পাহাড়ে, আপনি জানেন নাকি?

—বিজনেসের ব্যাপারে অনেক কিছুই খোঁজখবর রাখতে হয় আমাদের। হঠাৎ একটা লোক ঢুকে পড়ল বিজনেস ওয়ার্ল্ডে, কোটি-কোটি টাকা ক্যাপিটালসহ, তাকে নিয়ে সবার মুখেই তো

BanglaBook.org

আলোচনা ঘুরছে। তাতে যেসব কথা কানে এল, সে তো সত্যিকারের রোমহর্ষক গল্প। এক কোটিপতি বিধবা কোনও উত্তরাধিকারী ছাড়াই হঠাৎ মারা গেলে প্রায় বেওয়ারিশ হতে বসেছিল তার সমস্ত সম্পত্তি। যখন বারোভূতে সে সম্পত্তি লুটেপুটে খাওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভুয়ো উত্তরাধিকারী সেজে সমস্ত সম্পত্তি নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় অলর্ক বোস। সেই কোটিপতি বিধবার যারা আশ্রিত ছিল, যারা সেই সম্পত্তির ভাগীদার হবে বলে স্থির করে ফেলেছিল মনে-মনে, ভাগ বাঁটোয়ারাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে, ঠিক সেসময় অলর্ক বোস তাদের মুখের গ্রাস হঠাৎ ছিনিয়ে নিল এই ভুয়ো পরিচয়ের বিনিময়ে।

এ-গল্পটা কিছু-কিছু জানে গার্গী। মন্দারের কাছে এহেন একটি চমকপ্রদ গল্প শুনে তাই আশ্চর্য হল না, মুখে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, রাসেল স্ট্রিটের এই বাড়িটি ছাড়া অলর্ক বোসের আর কোনও সম্পত্তিও ছিল না ভারতে। বলা যায় ফার্দিংলেস, ভ্যাগাবন্ড। অথচ আজ সে কোটি-কোটি টাকার মালিক। ওয়ান অফ দ্য টপ বিজনেসমেন অব ক্যালকাটা। ঘটনাটা প্রায় রূপকথার মতো নয়। কিন্তু রূপকথা কখনও-কখনও সত্যিও যে হয়, অলর্ক বোসই তার প্রমাণ।

গার্গী এবার তাকাল মন্দারের চোখের দিকে, কিন্তু তার সঙ্গে শিহরন হত্যার কী সম্পর্ক?

—শিহরন রায়চৌধুরি হঠাৎ ক'দিন ধরে খুবই মাথা ঘামাচ্ছিলেন অলর্ক বোসের ব্যাবসা নিয়ে। বিজনেস সম্পর্কে এটা-ওটা পরামর্শ দিতে গিয়ে জেনে ফেলেছিলেন অলর্কের সম্পত্তির উৎস। তারপর আমার ধারণা দুজনের মধ্যে কোনও ঝামেলা শুরু হয়েছিল—।

গার্গী চমৎকৃত হচ্ছিল। আজই মণীশ রায় তাকে বলেছিলেন, শিহরনের সঙ্গে অলর্কের কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে খড়্গপুরে গিয়ে। সে কথা মনের মধ্যে রেখে মন্দারকে আবারও বাজাতে চাইল গার্গী, কী ধরনের ঝামেলা হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

—সম্ভবত শিহরনদা ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসকে, যাতে তিনি ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির কিছুটা পান। হয়তো বলেছিলেন, সম্পত্তির ভাগ না পেলে তিনি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেবেন জনসমক্ষে।

গার্গী তার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, হুঁ, তারপর?

—ডোনা বলল, মার্ডারের দিনদুই আগে অলর্ক বোস শিহরনদাকে খড়্গপুর নিয়ে গিয়েছিল কোনও একটা অছিলায়। সম্ভবত বাইরে গিয়েই ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল অলর্ক বোস। হয়তো ওখানেই কোনও ভাবে শিহরণদাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। শিহরনদা সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। নইলে শুধু-শুধু হঠাৎ পিস্তল দরকার হল কেন তাঁর। হয়তো সেজন্যই খড়্গপুরের অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি অলর্কের, তাই ফিরে এসে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। ফাংশনের রাতেই সুযোগ বুঝে—।

গার্গীর হঠাৎ মনে হল, মন্দারের অনুমান একেবারেই নিখুঁত, যা সে নিজেও ভাবতে পারেনি। হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ফর দি ইনফরমেশনস। মনে হচ্ছে, শিহরন-হত্যার জট খুলতে আপনার বিশ্লেষণ কাজে লাগলেও লাগতে পারে। এত অসুস্থতার মধ্যে আপনি যে এতটা ভেবেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু যাওয়ার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার ওপর যে অ্যাটেম্পট নেওয়া হয়েছিল, আপনি কি মনে করেন তার নেপথ্যেও অলর্ক বোস?

সহসা তপ্ত হয়ে উঠল মন্দারের মুখ, চোখ ক্রুদ্ধ করে বলল, তা নয়তো কী।

গার্গী তা বুঝল না যেন। জিজ্ঞাসু চোখে নিরিখ করতে লাগল মন্দারের অভিব্যক্তি, মুখে বলল, কেন?

মন্দার তখন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে তার যুক্তিজালের ভেতর। তখন তার সামনে গার্গীও নেই যেন। নিজেই একটি হত্যাকাণ্ডের ক্লু খুঁজে চলেছে, উত্তেজিত হয়ে বলল, কারণ একটাই, সে ডোনা।

BanglaBook.org

ডোনা যেহেতু আমাকে পছন্দ করে, ভালোবাসে, অতএব মন্দার মিত্রকে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে। টাকা পেয়ে লোকটা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। জীবনে যা-যা চায় তার সবই পেয়েছে। এখন ডোনাকেও চাই তার—।

গার্গী বেশ আশ্চর্য হল। মন্দারের উত্তেজনার কারণও বুঝল। হঠাৎ মনে হল, মন্দার ঠিকই বলেছে। ডোনা সেদিন যাকে আড়াল করতে চাইছিল, সে অলর্ক বোস। কেন আড়াল করতে চাইছে কে জানে। তাহলে কি অলর্কের সঙ্গেও ডোনার কোনও অ্যাফেয়ার চলছে। এ খবরটা গার্গী জানে না। মন্দারের পক্ষে সেটা অনুমান করা স্বাভাবিক। মন্দার ডোনার প্রেমিক, একজন প্রেমিকই ভালো বুঝতে পারে তার প্রেমিকার মনস্তত্ত্ব। তার গতিবিধি, অন্য যুবকের প্রতি তার ব্যবহার, আসক্তি।

হঠাৎ গার্গী গাত্রোত্থান করার উদ্যোগ করল, বলল, আপনার সঙ্গে আরও একদিন আলোচনায় বসতে হবে, মিঃ মিত্র। আপনার অফিসের ঠিকানাটা দিন তো।

মন্দার খুশি হয়ে তার বালিশের তলা থেকে বার করল একটা নীল রঙের ডটপেন। পেনটার তলার দিকে দাঁতের দাগ। ডায়েরির ভেতর থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বেশ গোটা-গোটা অক্ষরে মন্দার তার অফিসের নাম-ঠিকানা লিখে দিল। সঙ্গে ফোন নম্বরও, গার্গী শুধু আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মন্দারের হাতের লেখা যেন কোনও বাচ্চাদের মতোই।

আরও আশ্চর্য হল, ডায়েরিতে তাহলে কার হাতের লেখা এই ভেবে।

॥ ২৪ ॥

বাড়ি ফিরে দীর্ঘ রাত বড় বিনিদ্র কাটল গার্গীর। হঠাৎই সমস্ত ঘটনা তার কাছে কেমন ধোঁয়াশা হয়ে নেমে আসছে টুপটুপ করে। তাতে তার শরীরময় একধরনের অস্থিরতা। ঠিক কোন অ্যাঙ্গেল থেকে উন্মোচন করবে জটিল ক্লু-গুলো তা ভেবেই পাচ্ছে না যেন। গত দু-দিন ক্লাসে যায়নি, গণিতের জটিল ভাবনাগুলো মাথার ভেতর থেকে উধাও হয়ে সেখানে হিসেবনিকেষ হচ্ছে অন্য এক অঙ্কের। বুঝতেই পারছে না, এহেন অদ্ভুত-পরিস্থিতির মধ্যে কার পক্ষে শিহরণ রায়চৌধুরিকে খুন করা সম্ভব।

পরদিন সকালে উঠেই সে আবারও বেরিয়ে পড়ল যোধপুরপার্কের উদ্দেশে। ডোনাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে ডোরবেল টিপতেই যে দরজা খুলে দিল, সে ডোনাই। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে যেতে-যেতে ফিসফাস করে বলল, ধুর, যা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বাড়ি নয় যেন শ্মশান।

গার্গী একলহমা তার নজর ছুড়ে দিল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির স্টাডির দিকে। মস্ত চেয়ারটায় কেমন ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছেন চিত্রদীপ। এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে সাধারণত কমই বসে থাকেন উনি। সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও কাজে যিনি সদাব্যস্ত থাকতেন, হঠাৎ এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। বনানী কাছাকাছি নেই। হয়তো টয়লেটে, কিংবা হয়তো বা কিচেনেই অন্তরিন।

ডোনার কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল, সে কথাই জিজ্ঞাসা করল তার ঘরে ঢুকে, অলর্ক বোস লোকটিকে তোর কেমন মনে হয় রে, ডোনা?

ডোনা বোধহয় আশা করেনি এহেন প্রশ্ন, বলল, কী করে জানব বল? মাত্র কয়েকদিনের চেনাজানা। তবে টাকার ওপর কোনও মায়া-দয়া নেই। যখন যেটা করবে ভাবে, সেটা করবেই। অ্যাট এনি কস্ট।

গার্গী তাকাল তীক্ষ্ণচোখে ডোনার দিকে, তোর সঙ্গে রিলেশন কেমন?

BanglaBook.org

ডোনা একটু গম্ভীর হল, কেমন আবার? বন্ধুরা যেমন হয়ে থাকে আর কি?

—বন্ধু, না কি তার চেয়েও বেশি?

ডোনা হাসার চেষ্টা করল, বেশি তো নয়ই বরং কমই বলতে পারিস। তুই তো জানিসই, আমি তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মডেল। সুতরাং রিলেশন কিছুটা টাকারও বটে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, নির্নিমেষে নিরিখ করল তার মুখ, কিন্তু তোকে টাকা দিয়ে কি পারচেজ করতে চেয়েছিল? তেমন কোনও প্রপোজাল দিয়েছে কখনও।

ডোনা হঠাৎ থমকে গেল। প্রায় জার্ক খেয়ে উঠল যেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই হঠাৎ তাদের লিভিংরুমে টেলিফোন বেজে উঠল সবাইকে চমকিত করে। এখন প্রতিটি টেলিফোনই যেন ভয়ঙ্কর। আগে টেলিফোন বাজলে ছুটে যেত ডোনাই। এখন গেল না। গেল না বলেই স্টাডি থেকে উঠে এসে টেলিফোন ধরতে হল চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেই, হ্যালো।

ওপাশ থেকে কিছু কথা শুনলেন চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, না, পাওয়া যায়নি। আবার ওদিক থেকে কিছু কথা, তারপর ঝট করে বেশ শব্দ তুলেই ক্র্যাডলের ওপর রেখে দিলেন ফোনটা, অর্থাৎ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে ডাকলেন, বনানী—।

ডোনার ঘরের সমানে দিয়ে ফ্যাকাসে। মুখে এগিয়ে গেলেন বনানী, কাপড়ে হাত মুছতে-মুছতে তাঁকে দেখেই আবারও প্রায় গর্জন করে উঠলেন চিত্রদীপ, থানা থেকে ফোন করেছিল। পিস্তলটা আজকের মধ্যেই দেখিয়ে আসতে হবে ওদের। কোথায় রেখেছ পিস্তলটা বার করে দাও—।

বনানী ভীত, সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, আমি কোত্থেকে বার করব। সে তো শিহরন—।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন চিত্রদীপ, একদম বাজে কথা বলবে না। পিস্তলটা শিহরন দিয়ে গিয়েছিল খড়্গপুর থেকে ফেরার পর। আমি দেখেছি, বইয়ের র‍্যাকের এপাশে ছিল ওটা—

বনানী আবারও সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, ঠিক দেখেছ? কবে বললে?

—যেদিন শিহরন খুন হয় সেদিন সকালেই।

বনানী হঠাৎ এবার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুললেন, যদি দেখেই থাকো, তাহলে তুমিই সে পিস্তল সরিয়েছ।

—আমি? আমি সরিয়েছি?

—হ্যাঁ, তোমার রাগ ছিল শিহরনের ওপর, তার শোধ তুলেছ।

চিত্রদীপ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর দ্বিগুণ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি শোধ তুলেছি, না তুমি?

—আমি কেন শোধ তুলতে যাব?

—তুমিই তুলেছ। তুমি সহ্য করতে পারোনি যে, শিহরন এখন তোমাকে ছেড়ে তোমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। দুজনে একসঙ্গে বেরুত গাড়ি নিয়ে। সারা দুপুর-বিকেল-সন্ধে কাটিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরত। তোমার সেসব সহ্য হয়নি—।

—চুপ করো, বনানী হিংস্র হয়ে উঠলেন, নিজের মেয়ের সম্পর্কে এতসব বাজে কথা বলতে তোমার আটকায় না?

—আটকাবে কেন? যা সত্যি তাই-ই বলছি। নিজে যেমন হয়েছ, তেমনি তোমার মেয়েও। পিস্তলটা কোথায় রেখেছ বার করে দাও—।

বনানী কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, পিস্তল কোথায় আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমিই সরিয়েছিলে বইয়ের র‍্যাক থেকে—।

আবারও একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছিল লিভিংরুমের মধ্যে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ

BanglaBook.org

ডোরবেল বেজে ওঠায় কয়েক লহমা এক ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা। হয়তো আবারও পুলিশ এসেছে এই আশঙ্কায় বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষই সিঁটিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। খুব ধীর পায়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলেন বনানী। ডোনা, গার্গীও ঘরের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল, সত্যিই পুলিশ কি না। কিন্তু না, বাইরে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে অলর্ক।

অলর্কের মুখে হাসি দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল সবাই, এহেন দুঃসহ পরিস্থিতিতে তার মুখে হাসি আসেই বা কী করে! লিভিংরুমে ঢুকে, যেন এ ক'দিন কিছুই ঘটেনি, ঘটে থাকলেও তাতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি, এমন ভঙ্গিতে চিত্রদীপের কাছে এগিয়ে গেল অলর্ক, বলল, আজকের কাগজ দেখেছেন?

—কাগজ। চিত্রদীপ মুখ বিকৃত করলেন, কাগজ দেখার মতো মনের পরিস্থিতি আছে?

—আপনার একজিবিশনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ। আগামী মাসের এক থেকে সাত তারিখ।

চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠে বললেন, সে কী, কে বিজ্ঞাপন দিল কাগজে?

—আমিই দিয়েছি।

শুধু চিত্রদীপ নয়। বনানী, ডোনাও এমন চোখে অলর্কের দিকে তাকাল যেন সবাই ভূত দেখছে। ডোনাই তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, এই পরিস্থিতিতে একজিবিশন হবেই বা কী করে। অসম্ভব।

চিত্রদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ঘাড় নাড়তে-নাড়তেই বললেন, ঠিকই বলেছে ডোনা। এখন একজিবিশন করার মতো পরিস্থিতি নেই।

—সে কী! এবার অবাক হওয়ার পালা যেন অলর্কেরই, বলল, এতদূর এগিয়ে গিয়ে এখন কি আর ফেরা সম্ভব?

চিত্রদীপ তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অলর্কের দিকে। এপাশ থেকে ডোনা বলল, বুঝতেই পারছেন, আমরা সবাই ভীষণ আপসেট। এখন একজিবিশন করাই যাবে না।

—যাবে না মানে? অলর্ক তাদের কাউকেই পাত্তা দিল না যেন, বলল, এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা তো কেউ দায়ী নই। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার তদন্তের দায় পুলিশের। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করুক। যে দোষী তাকে শাস্তি দিক, তাতে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মুলতুবি রাখব কেন?

গার্গী খুবই বিস্মিত হচ্ছিল। কাল সন্ধেয় মন্দারের কথাগুলোর সঙ্গে অলর্কের ভাবলেশহীন মুখ মিলিয়ে নিচ্ছিল দ্রুত। এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনার মাত্র দুদিনের মধ্যে যে এমন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে, এতটা নিস্পৃহ তাতে তার সম্পর্কে সন্দেহ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অলর্ক অবশ্য থামল না, বলল, তা ছাড়া, আমি কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেছি গোটা স্কিমটার জন্য। আপনার একজিবিশনের সঙ্গে আমার শো-রুমগুলো ওপেন করারও একটা সম্পর্ক আছে। এর মধ্যে অনেকগুলো শো-রুম প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সেসব তো আপনি জানেনই। একজিবিশনে আপনি সাফল্য পেলে সেই গুডউইল আমি কাজে লাগাব শো-রুমের বিজ্ঞাপনে।

এমন অদ্ভুত সব কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলর্ক যে ব্যবসায়ী হিসেবেও বেশ দূরদর্শী, তা এর আগেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রদর্শনী করলে তা শিল্পী মহলে, কিংবা বুদ্ধিজীবি মহলে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সে ভাবনাও তো ভাবা দরকার। হঠাৎ হুট করে এত বড় একটা কাজে নামা চলে কি না, তা অলর্ক না ভাবলেও চিত্রদীপকে নাড়িয়ে দিল বেশ। এমনও তো হতে পারে, সাংবাদিকরা এই চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে শিহরন খুনের ঘটনাকে জড়িয়ে দিয়ে একটা কেচ্ছা গল্প ফাঁদতে পারে তাদের কাগজে। চিত্র সমালোচকদেরও কিছু একটা আলগা মন্তব্য লিখে দিতেও বা বাধা কোথায়।

কিন্তু চিত্রদীপের কোনও যুক্তিই অলর্ক গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়

BanglaBook.org

রইল, দেখুন, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমি যখন দায়ী নই, তখন আমার বিজনেস এই কারণে ডুবে যাবে সেটা আমি মানব না। আপনি যেভাবে কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই আমার প্রোগ্রাম সেট করা আছে। সেই পরিকল্পনা মাফিক কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। আপনার ছবিও প্রায় প্রস্তুত। আমার বাড়িও নতুনভাবে সাজাতে হচ্ছে যাতে আপনার ছবির গ্যালারি হিসেবে সেটা ব্যবহার করা যায়। এখন আর কোনওভাবে পরিকল্পনাটা নষ্ট করে দেবেন না। যদি আপনার যাওয়ায় কোনও অসুবিধা থাকে, তাহলে ছবিগুলোয় ফাইনাল টাচ দিয়ে আমাকে দিন। একজিবিশন আমি একাই চালিয়ে দেব।

চিত্রদীপ এর পর আর কথাই বলতে পারলেন না। তাঁকে বিস্মিত, স্তম্ভিত করে অলর্ক যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল তার গাড়ি হাঁকিয়ে।

অলর্কের ব্যবহারে-ভাবভঙ্গিতে সব্বাই প্রায় স্তব্ধ। ঘটনাটা কখন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে তার কোনও খেই খুঁজে পাচ্ছে না। একটু আগেই চিত্রদীপ আর বনানীর কোঁদল যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে পিস্তলের হালহদিশ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মনে হচ্ছে, পিস্তল এ-বাড়িতেই ছিল, এই মুহূর্তে তা নিশ্চয় হয় বনানী কিংবা চিত্রদীপের হেপাজতে। সেদিন পুলিশের সামনে পিস্তল খুঁজে না পাওয়ায় বনানীর বিস্ময় প্রকাশ, সেইসঙ্গে চিত্রদীপের আকাশ থেকে পড়ার ভান করা—এ সবই পুলিশকে দেখানো। এদিকে অলর্কের এহেন নিস্পৃহ ভঙ্গিও সন্দেহের উদ্রেক করছে। বাড়ির প্রতিটি লোকই যখন এভাবে অনড়, সেইমুহূর্তে আবার ফোনের পিকপিকাপিক আওয়াজ। ডোনা এতক্ষণ স্টিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল, হ্যালো, ডোনা স্পিকিং—।

ওপাশ থেকে কথা বলছিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র, হ্যালো, মিস চ্যাটার্জি, একটা খবর আছে। একটু আগেই আপনাদের খোয়া-যাওয়া পিস্তলটা পাওয়া গেছে।

ডোনা লাফিয়ে উঠতে চাইল, তাই নাকি? কোথায়?

—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। একট বড় বিল্ডিং-এর পাশে কিছু ভাঙা ইঁটের টুকরোর আড়ালে পড়েছিল ওটা, ঠিক যে হলে আপনাদের ড্যান্স-ড্রামা হয়েছিল তারই কাছাকাছি। ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দিয়েছেন থানায়।

—পিস্তলটা দেখে কী মনে হচ্ছে? এই পিস্তল থেকেই কি গুলিটা ছোড়া হয়েছিল?

—পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটা গুলি ভরা আছে, মাত্র একটা ফাঁকা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সন্দেহ করছি, এই পিস্তল থেকেই ছোড়া হয়েছিল গুলিটা, তবে পরীক্ষা না করে এই মুহূর্তে কিছুই কনফার্মড হওয়া যাচ্ছে না। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট পেলেই তবে জানা যাবে—।

ডোনার হৃৎপিণ্ড কয়েকমুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ওটা যে আমাদেরই পিস্তল তা জানলেন কী করে?

ইনস্পেকটর জানালেন, সেটা কনফার্মড হয়ে তবেই টেলিফোন করছি। আপনি জানেন না বোধহয়, প্রতিটি থানা-এলাকায় যত আর্মস থাকে, স্মল-আর্মস বা লিগ্ট-আর্মস যাই হোক না কেন, তার একটা তালিকা থানার রেজিস্টারে লেখা থাকে। বছর-বছর তার লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়। রেজিস্টার দেখে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে এই পিস্তলের নম্বর। আপনার বাবা এসে পিস্তলটা আইডেন্টিফাই করে যেতে পারেন—।

চিত্রদীপ শুনে আঁতকে উঠলেন, পরক্ষণেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, থানায় গেলে নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করবে আমাকে—।

বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেসে হয়ে গেল। আর কিছু বলতেই পারলেন না। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। শরীরটা টলে উঠল যেন।

BanglaBook.org

গার্গী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরেই। চিত্রদীপের টলায়মান শরীর, তাঁর অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর—সব দেখেশুনে মনে হল এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবেন ভদ্রলোক। দ্রুত ছুটে গিয়ে তাঁর হাতদুটো ধরে আস্তে-আস্তে বলল, আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। আমরা দেখছি কী করা যায়—।

॥ ২৫ ॥

চিত্রদীপের পিস্তল উদ্ধার-পর্ব শেষ হতে-না-হতেই আরও একটি যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেল থানা থেকে, তাতে দ্বিগুণ জট পাকিয়ে গেল ঘটনাটা। জানা গেল, ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন অলর্ক বোসের বাড়ি। ইন্টারোগেশনের পর তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসের পিস্তলটি। অলর্ক বোস প্রথমে দেখাতে রাজি হয়নি। বলেছিল, পরে গিয়ে দেখিয়ে আসবে থানায়। ইনস্পেকটর একটু কড়া হতেই সে সুড়সুড় করে বার করে দিয়েছে পিস্তলটি। সেটি পরীক্ষা করে দেখার পর যে তথ্যটি সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে ইনস্পেকটরকে, তা হল অলর্ক বোসের পিস্তলটিতে ছ'টা গুলি ভরা, কিন্তু এই পিস্তলটি থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যে। অলর্ক বোস অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে এই পিস্তলটি শিহরন হত্যার কাজে মোটেই ব্যবহৃত হয়নি। ফাঁকা আওয়াজ করেছিল একদিন। পুলিশ অবশ্য তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, কিন্তু গ্রেপ্তারও করেনি এখনও।

সংবাদটি চমকে দিয়েছে চিত্রদীপদের। ফাঁপরে পড়েছে গার্গীও। শিহরন হত্যার রহস্য এতে আরও জটিলতর হয়ে উঠল সন্দেহ নেই। দু-বাড়ি থেকে দুটি পিস্তল পাওয়া গেল, যে পিস্তল দুটি থেকে ছোড়া হয়েছে একটি করে গুলি, এর মধ্যে কোন পিস্তলের গুলি শিহরনের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তা এখন লাখটাকার প্রশ্ন।

সে প্রশ্ন অবশ্য আপাতত ঝুলেই থাকবে একটি সরল জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে। তার আগে গার্গীকে যে প্রসঙ্গ ভাবিত করল, তা হল, অলর্ক বোস ক্রমশ পরিণত হচ্ছেন একটি হেঁয়ালিতে। সুতরাং জানা দরকার অলর্ক বোসের প্রকৃত পরিচয় কী, কীভাবেই বা সে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হল। মন্দার মিত্র তাকে সেদিন যে কাহিনি জানিয়েছে তা কি সত্যি! সত্যি!! সে কি সত্যিই ভুয়ো উত্তরাধিকারী। কিন্তু কলকাতায় বসে এহেন তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা তো আদৌ সম্ভব নয়। অগত্যা কী আর করা। গার্গীকে অতএব প্রবল ঝুঁকি নিয়ে সেই সকালেই বেরিয়ে পড়তে হল কলকাতা থেকে ঘণ্টা আড়াই ট্রেন-জার্নির দূরত্বে এক মফস্‌সলে, যেখানে অলর্কের সেই তথাকথিত দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ-তল্লাটের সবাই রাজা বলেই জানত। এ-জেলায় এহেন পুরোনো রাজবাড়ি অবশ্য আরও অনেকই আছে। কিন্তু আজকাল কোনও রাজবাড়িতেই রাজাও নেই, রাজত্বও বহুকাল আগে এস্টেট অ্যাকুইজিশন আইনের আওতায় অন্তর্হিত। গোটা একটা দিন সেই রাজবাড়ি-প্রতিম অট্টালিকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে প্রভূত ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গার্গী প্রায় গভীর রাতে ফিরে এল তার জুবিলি পার্কের বাড়িতে।

তার এ ক'দিনের এলোপাথাড়ি জীবনযাপনে সে নিজেও যেমন কিছুটা পরিশ্রান্ত, তার মা ও দাদাও যথাক্রমে বিচলিত ও বিরক্ত।

তবু এই মুহূর্তে তার উত্তেজনা এতই চরমে যে, পরদিন সকাল না হতেই সে আবার ঢুঁ দিল ডোনাদের বাড়ি। মাত্র একদিন ছিল না কলকাতা, কিন্তু তার ধারণা, এর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু অঘটন ঘটে থাকতে পারে। আসলে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার ধারণা যদিও বা ঠিক হল, কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে তা কিছুটা অবিশ্বাস্যই যেন বা।

গার্গী ডোনাদের বাড়ি ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে ডোনা সন্ত্রস্ত গলায় বলে, জানিস গার্গী, কাল

BanglaBook.org

অলর্ক বোসের ওপর অ্যাটেম্পট হয়েছিল।

—অ্যাটেম্পট! গার্গী বিস্ময়ের-চোখ রাখে ডোনার দিকে।

—হ্যাঁ, গুলি ছোড়া হয়েছিল তার দিকে। কাল গাড়ি চালিয়ে যে মুহূর্তে ঢুকছিল তার রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে, ঠিক তখনই। সন্ধের অন্ধকারে সম্ভবত কোথাও লুকিয়ে ছিল আততায়ী।

গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ল, তারপর আস্তে-আস্তে বলল, অ্যাটেম্পট হওয়াই তো দরকার ছিল।

—দরকার ছিল? ডোনার কণ্ঠস্বরে অযাচিতভাবে একটা তীক্ষ্ণতা ঝরে পড়ল, কী বলছিস কী?

—তাহলে আমার অঙ্কটা মিলে যায়।

—অঙ্ক! এর মধ্যে তুই অঙ্ক কোথায় পেলি? এটাও কি তোর ম্যাথসের ক্লাস নাকি?

গার্গী সামান্য হাসল। কিছু বলল না।

—কাল সারাদিন কোথায় ছিলিস তুই? এদিকে এত কাণ্ড ঘটে গেল, আর তোর পাত্তাই নেই।

—আরও কোনও ঘটনা ঘটে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ, অ্যাটেম্পট হওয়ার পর পুলিশ অলর্ক বোসকে ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ ঠিক বিশ্বাস করছে না ঘটনাটা। গুলি করল, অথচ অলর্ক বোসের গায়ে তো নয়ই, গাড়িতেও গুলির আঁচড় লাগেনি এটা ভারী অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

—এমনও তো হতে পারে, হত্যাকারীর টিপ ভালো নয়। দূর থেকে গুলি ছুড়লে নাও তো লাগতে পারে।

কিন্তু পুলিশ সাসপেকট করছে, অলর্ক বোসই মার্ডারার। সে নিজের অপরাধ ঢাকতে এখন এইসব গালগল্প তৈরি করছে। ইনস্পেকটর নিজে এ-বাড়িতে এসে বলে গেলেন।

—তাহলে অলর্ক বোসকে অ্যারেস্ট করছে না কেন?

—বলল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিছু গোলমাল আছে। তাতে এখনই অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না।

—তাই! গার্গী তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হল, তাহলে তো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখা দরকার। কী ধরনের গোলমাল তা কিছু বলল?

ডোনা ঘাড় নাড়ল। পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কাল হঠাৎ সেই যে সকালে একবার দেখা দিয়ে নিপাত্তা হলি, কোথায় গিয়েছিলি তা তো বললি না?

গার্গীর চোখে এতক্ষণে ফুটে উঠল সেই রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করার আত্মপ্রসাদ। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, গিয়েছিলাম অলর্ক বোসের সম্পত্তির হদিশ নিতে।

ডোনা আশ্চর্য হল, সে কী! পেলি তার হদিশ?

—পেলাম। সে এক রাজপ্রাসাদই বটে। ছোটবেলায় একবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে হাজার দুয়ারী দেখে এসেছিলাম, অলর্ক বোসের রাজপ্রাসাদ প্রায় সেরকমই মস্ত এক অট্টালিকা। বিশাল-বিশাল গোলাকার থাম। পেল্লাই-পেল্লাই ঘর। ইয়া উঁচু ছাদ। ঘরে-ঘরে ঝাড়লণ্ঠন।

ডোনা চোখ কপালে তুলল, তাই!

—তবে এখন প্রায় সবই তার ধ্বংসাবশেষ। ঠিকমতো মেইনটেন্যান্স না হওয়ায় পলেস্তারা খসে পড়ছে এখান থেকে ওখান থেকে। দেওয়ালে, ছাদে সর্বত্রই লকলক করে বেড়ে উঠছে অশ্বত্থের চারা। এমনকী অলিন্দে ঘাস, গুল্মলতা। এ ছাড়াও যা অভিজ্ঞতা হল তা এক অদ্ভুত রহস্য।

—রহস্য! ডোনার চোখের পেয়ালা ক্রমশই উপচে পড়ছে কৌতূহলে।

—রাজপ্রাসাদে বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করে যারা কেউই রাজবাড়ির লোক নয়, সবাই

BanglaBook.org

আশ্রিত। বাড়ির মালিক, অর্থাৎ যাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজা বলে জানত, সেই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যান তাঁর বিধবাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে। হঠাৎ কিছুদিন আগে এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা যুবা সেখানে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছিল থাকতে। উদ্দেশ্য, রাজবাড়ি নিয়ে কিছু লেখালেখি করা। দিন তিনচার রাজবাড়িতে থাকার পর যুবকটি হঠাৎ উধাও হয়। সে চলে যাওয়ার পরই আবিষ্কৃত হল, সেই বিধবা মহিলা খুন হয়েছেন।

—মাই গড। ডোনা আঁতকে উঠল।

—সেই বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না রাজবাড়িতে। তাই ট্রাস্টি বোর্ডের লইয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী যদি কোথাও জীবিত থাকে, তাহলে এক্ষুনি যেন যোগাযোগ করে ট্রাস্টিবোর্ডের ল'ইয়ারের সঙ্গে।

—তারপর? যোগাযোগ করেছিল কেউ?

—হ্যাঁ। অলর্ক বোস। সে-ই নাকি বিধবার একমাত্র নাতি, যোগাযোগ করামাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে রাতারাতি। যদিও তার উত্তরাধিকারের সত্যতা নিয়ে বাড়ির যারা আশ্রিত তাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

ডোনা যেন রূপকথা শুনছে গোগ্রাসে এমন ভঙ্গিতে বলল, তারপর?

—কিন্তু ল'ইয়ার ভদ্রলোক নাকি অলর্ক বোসের কথায় কনভিনসড। কিন্তু আর একটি যে ঘটনা শুনে এলাম, সেটা খুবই রহস্যময়। যে যুবা আগে সাংবাদিক পরিচয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে, সে নাকি বিধবার কাছে জানিয়েছিল, সে-ই বিধবার নাতি। সম্পত্তি তারই হওয়া উচিত। বিধবা তাকে স্বীকার করেননি, উলটে পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে সে-ই বুড়িকে মেরে আসে।

ডোনা সামান্য আতঙ্কিত হল, তাহলে তো রীতিমতো রহস্যই। তা সেই সাংবাদিক আর ধরা পড়েনি?

—না। তবে আশ্রিতদের এখন কেউ-কেউ বলছে সেই যুবকটিই নাকি বিধবার আসল নাতি। অলর্ক বোসই নাকি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এতবড় সম্পত্তির মালিক হয়েছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আশ্রিতরা কী বলল না বলল সেটা বড় কথা নয়। লইয়ার যখন কনভিন্সড হয়েছেন, তখন অলর্ক বোসই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে ধরে নিতে হবে। তা সেই আসল নাতি কোর্টে মামলা করছে না কেন?

গার্গী হাসল, কোর্টে যাবেই বা কী করে। তার নামে তো খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তাকে এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে। এত সব গল্প শুনে আমি থানায় গিয়েছিলাম—।

ডোনা উত্তরোত্তর হতবাক হচ্ছে, থানায়ও গেলি?

—হ্যাঁ। যুবকটি সাংবাদিক বলেই আমার কৌতূহল হল। আমিও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থানার ও.সি-কে অনুরোধ করতে যে দুটি জিনিস তিনি আমাকে দেখতে দিলেন, সেগুলো খুব কাজে লেগেছে আমার। সাংবাদিকটি খুন করে পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় ফেলে গিয়েছিল সাংবাদিকদের দুটি মহাস্ত্র। একটি তার নোট নেওয়ার প্যাড, অন্যটি তার কলম।

—বাহ। বেশ সাংবাদিক তো সে।

—হ্যাঁ, ও. সি. সেগুলো কোর্টের একজিবিট হিসেবে রেখে দিয়েছেন। আমি তার প্যাডের পৃষ্ঠা উলটে অবাক। হাতের লেখাটা যেন চেনা-চেনা মনে হল। তবে সেই বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে সেই যুবক নাতি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে সাংবাদিক সেজে যেসব তথ্য নোট করেছিল, তার সঙ্গে তার নিজস্ব মতামত হিসেবে যা-যা লিখেছে, তা পড়ে কিন্তু আমারও মনে হয়েছে সে-ই বুড়ির আসল নাতি।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল গার্গীর মুখের দিকে, তারপর আস্তে-আস্তে বলল,

BanglaBook.org

তাহলে অলর্ক বোস।

হয়তো ভুয়ো নাতি হতে পারে। তবে এখনই নিশ্চয় করে কিছু বলা যাচ্ছে না। অলর্ক বোসের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। তার সব ইতিহাস তো আমরা কেউই জানি না। হয়তো সেই সাংবাদিকের মতামতও ভুল হতে পারে। সেও তো চেয়েছিল, এত বিশাল সম্পত্তি কোনওক্রমে হাতাতে—।

গার্গীর কথা শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ বেজে উঠল ডোরবেল। ডোনা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই প্রায় চমকে উঠে বলল, আরে, তুমি?

মন্দার হাসতে-হাসতে বলল, বেশ সারপ্রাইজ দিয়েছি, তাই নয়? আজ ভোরেই নার্সিংহোম থেকে রিলিজ পেয়েছি। জিনিসপত্রগুলো ঘরে রেখে এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি তোমাদের বাড়ি। কেমন যেন অস্থির-অস্থির করছিল মনটা—।

ডোনা ঠোঁট টিপে হাসল, কার জন্যে মন খারাপ করছিল! আমার জন্যে নাকি!

মন্দার হাসল বড় করে, তা আর বলতে।

বলতে-বলতে তার নজর পড়ল ডোনার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গীর দিকে। গার্গী ছাই-ছাই রঙের শালোয়ার-কামিজ পরেছে আজ। তাতে ওর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে দারুণ খুলেছে। তাকে দেখে মন্দার হাত তুলল, আরে, আপনি এখানে?

মন্দারের মাথায় সেই বড় করে বাঁধা ব্যান্ডেজটা নেই। তার পরিবর্তে বাঁ-দিকে কানের ওপর বেশ খানিকটা তুলো ব্যান্ড-এড দিয়ে আটকানো। গার্গী সেদিকে তাকিয়ে বলল, আসলে আমার মনটাও কেমন অস্থির-অস্থির করছিল—।

ডোনাদের বাড়ির আবহাওয়া বেশ থমথমে। তার বাবা চিত্রদীপ স্টাডিতে এতক্ষণ বসেছিলেন চুপচাপ। মুখে পাইপ, কিন্তু তাতে আঁচ নিভে গেছে। এতক্ষণে সকালের খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে তাতে চোখ বুলোচ্ছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তাতে আজও প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে বড় করে। বিজ্ঞাপনে এও লেখা রয়েছে, শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির এই নতুন সিরিজের ছবিগুলি সম্পূর্ণ অভিনব।

মন্দার চিত্রদীপের দিকে একপলক তাকিয়ে চলে এল ডোনার ঘরেই। একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসতে-বসতে হঠাৎ গার্গীকে বলল, তাহলে আমার কথা মিলল তো! যে মার্ডারার, তার কাছেই পিস্তল পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত।

ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে বেশ অবাকই হল। গার্গীর সঙ্গে মন্দারের যে আলোচনা হয়েছিল নার্সিংহোমের কেবিনে বসে, তা সে জানে না বলেই তার চোখে এহেন বিস্ময়। কী বুঝল সে কে জানে, মন্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, জানো তো, অলর্ক বোসের ওপরও পরশু সন্ধেয় অ্যাটেম্পট হয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে—।

মন্দার বিস্মিত হয়ে ভুরু কোঁচকাল, তাই! ইঞ্জিওরড নাকি? পুলিশ গিয়েছিল ইনভেস্টিগেশনে? কিছু জানা গেল, কারা অ্যাটেম্পট নিয়েছিল?

—না-না। পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করেনি। আসলে গাড়িতে বা ওঁর শরীরে গুলি লাগার চিহ্ন নেই তো।

মন্দার হো-হো করে হেসে উঠল, আসলে ঢপ দেয়া অলর্ক বোসের ছোটবেলার অভ্যেস। এটাও একটা ঢপ।

গার্গী আর ডোনা পরস্পর চোখাচোখি করল।

মন্দার পরক্ষণেই বলল, ওঁকে তোমরা অলর্ক বোস বলছ তো? ওঁর বাবা একজন আর্মেনিয়ান ছিলেন, তা জানো? তার ছেলে বোস হয় কী করে?

গার্গী ডোনা দুজনেই চমকে উঠল ভীষণভাবে। এ কথাটা এতদিন কেউই ভেবে দেখেনি,

BanglaBook.org

মন্দার সত্যিই একটা বোমা ফাটিয়ে দারুণ হকচকিয়ে দিয়েছে দুজনকে। অলর্কের চেহারাটা এমনই যে, দেখলেই অনুমিত হয় তার রক্তে বিদেশি রক্তের মিশেল আছে। তার বাবা আর্মেনিয়ান সে-খবর ডোনারা ঠিকঠাক না জানলেও রাসেল স্ট্রিটের বাড়িটা যে কোনও বিদেশির বানানো তা সবাই জানে। অলর্ক সে বাড়ি পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রেই।

গার্গী হয়তো এই বোমাটির মোকাবিলা করতে কোনও জুতসই উত্তরের সন্ধান করছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আবারও ডোরবেল। ডোনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে আবারও এক চমক। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ নয়, সুদর্শন মণীশ রায়। তাঁর মুখ আপাতত গম্ভীর হলেও তাঁর চেহারায় এমনই একটি সৌম্যভাব আছে যাতে তাঁর অভিব্যক্তিতে উপছে পড়ছে একধরনের স্মিত প্রশান্তি। ডোনার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় লুকোনো রইল না, স্যার, আপনি!

মণীশ অপ্রস্তুত হলেন না, বললেন, ঘটনাটায় আমি এতই শকড যে, মনে হল একবার তোমাদের বাড়ি ঘুরে আসি। খবরাখবর নিই। তোমার বাবার শরীর ভালো আছে?

বলতে-বলতে ভেতরে ঢুকে এলেন মণীশ রায়। ডোনা অবশ্য এই মুহূর্তে চাইছিল না, মণীশ চিত্রদীপের কাছে কুশলাদি নিন, কিংবা জমিয়ে খোশগল্প করুন। চিত্রদীপ এমনিতেই রাগি মানুষ, তার ওপর আপাতত ভীষণ টেনশনে আছেন। হঠাৎ মণীশের এই অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি তাঁকে ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। কায়দা করে মণীশকে বলল, স্যার, এ-ঘরে আসুন—।

মণীশ ডোনার ঘরে ঢুকে মোড়ার ওপর বসে থাকা মন্দারকে দেখে হঠাৎ হেসে বললেন, আরে, আপনি?

মন্দার অপ্রস্তুত হয়ে গেল মণীশের কথায়, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মানে, আপনি—।

ডোনা মুহূর্তে অনুমান করে নিল মন্দারের অবাক হওয়ার কারণ। সে মণীশকে বলল, স্যার, আপনি ওকে এর আগে দেখেননি বোধহয়। মন্দার মিত্র, আমার বন্ধু।

মন্দারকে চেনার কথা নয় মণীশের। এতক্ষণে লজ্জিত হয়ে বললেন, আমারই ভুল। কেন যে ওঁকে চেনা মনে হল বুঝতে পারছি না। বোধহয় অন্য কারুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি—।

মন্দার বোধহয় মণীশের উপস্থিতি পছন্দ করল না। তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। হয়তো মণীশের কথা ডোনার মুখে আগেই শুনে থাকবে। নিঃসন্দেহে তা প্রশংসাই। সৌম্য চেহারার মণীশকে ডোনার কাছে আসতে দেখে মন্দার অতএব অপছন্দ করতেই পারে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ আমি উঠি, ডোনা।

ডোনা আশ্চর্য হল, তা কেন? এককাপ চা-ও তো আসেনি এখনও। দাঁড়াও—।

মন্দার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, না-না, থাক। আমার কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে। ক'দিন নার্সিংহোমে বন্দি থাকায় অফিসের কাজ কিছুই তো করা হয়ে ওঠেনি। কী যে হচ্ছে আমার কোম্পানিতে কে জানে—।

বলতে-বলতে দ্রুত উঠে পড়ল মন্দার। মণীশের দিকে একবারও না তাকিয়ে বড়-বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। গার্গী একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। মণীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মন্দারবাবুকে আপনি এর আগে দেখেছেন নাকি, স্যার?

মণীশ ঠিক মনে করতে পারলেন না কোথায় দেখেছেন। কিছুক্ষণ ভাবার চেষ্টা করে বললেন, আসলে দু-একটা মুখ এমন থাকে না যে, দেখলেই মনে হয় কোথায় দেখেছি। হয়তো সেরকমই—।

যাই হোক, মণীশ হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, তোমাদের পিস্তলটা পাওয়া গেছে শুনলাম—।

—হ্যাঁ, স্যার। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। তবে এখনও আমরা ফেরত পাইনি। ইনস্পেক্টর জানালেন, ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হলে তবেই। হয়তো কোর্টের একজিবিটও হতে পারে—।

BanglaBook.org

মণীশ রায় হঠাৎ হাসলেন, ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিল, ওটা ইঁটের ভেতর ঝোপের মধ্যে রাখা আছে। কে ফোন করেছিল তা জানো?

ডোনা, গার্গী দুজনেই ঘাড় নাড়ল, না তো—।

—রণজয় দত্তই ফোন করে থানায় জানায়, পিস্তলটি ওভাবে লুকোনো আছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, রণজয় কীভাবে জানল ওটা ওভাবে রাখা আছে, ওরকম একটা গোপন জায়গায়!

ডোনা, গার্গী দুজনেই আশ্চর্য হল, আর. ডি.?

—হ্যাঁ। ওরকম একটা গোপন জায়গার হদিশ একমাত্র সেই বলতে পারে যে ওখানে লুকিয়েছিল। তাই কি না বলো।

গার্গীরা হতবাক হয়ে গেল একমুহূর্তে।

—তার মানে রণজয় খুন করার পর ওখানে ফেলে গিয়েছিল পিস্তলটা। তারপর সুযোগ বুঝে থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে ওটার হদিশ।

—কিন্তু আর. ডি. কী করে পাবেন পিস্তলটা?

—আমার অনুমান, সেদিন অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে বাদানুবাদ হওয়ার সময়, কিংবা তার আগে বা পরে। পিস্তলটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল সেখানে। রণজয়ই কুড়িয়ে নিয়েছিল গোপনে। তারপর—।

ডোনা আর গার্গী আর-একবার চোখাচোখি করল পরস্পর, শুধু এই অনুমানটুকু জানাতেই কি মণীশ এসেছেন এ-বাড়ি। যাতে রণজয় দত্ত পুলিশের নজরে পড়ে যায়!

॥ ২৬ ॥

চিত্রদীপের প্রদর্শনী যে সত্যিই হবে তা অলর্কের কথায় সেদিন বিশ্বাস হয়নি কারও। কিন্তু অলর্কের প্রবল জেদে, তার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় সামিল হতে হল ডোনাদের বাড়ির প্রতিটি সদস্যকেই। এমনকী ডোনা উদ্বিগ্নমুখে গার্গীকে বলল, তোকেও কিন্তু আমার সঙ্গে সারাক্ষণ থাকতে হবে। ভীষণ নার্ভাস লাগছে আমার।

গার্গীও কম উত্তেজিত বোধ করছে না। কিন্তু তার টেনশন তো আর প্রদর্শনী সফল করে তোলার জন্য নয়, সে অন্য এক জটিল আবর্তে পড়ে প্রায় হাবিডুবি খাচ্ছে ক'দিন ধরে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, হয়তো খুব শিগগির আরও অঘটন ঘটবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি তুঙ্গে, যে-কোনও সময় হত্যাকারীর খাঁড়া নেমে আসবে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায়।

গত কয়েকদিন সে আরও বহু জায়গায় হানা দিয়েছে খুঁটিনাটি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে। একদিন মণীশ রায়ের বাড়িতেই গিয়েছিল, মন্দার মিত্রকে সত্যিই আগে কোথাও দেখেছেন কি না। ঈষিতাদিকেও গোপনে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই মণীশ রায় এর মধ্যে জড়িত আছেন কি না। অলর্ক বোসকে জিজ্ঞাসা করল, শিহরনদার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল কি না শেষদিকে, ঘটে থাকলে কেনই-বা। সত্যিই কী ঘটেছিল খড়্গপুরে গিয়ে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেও সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই বইয়ের র‍্যাকের পাশে পিস্তলটা দেখেছিলেন কি না।

আর কী আশ্চর্য, কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর পেল না। যা পেল তা ভাসা-ভাসা। তাতে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। পুরো ব্যাপারটাই সহসা ধোঁয়াশার ঘোরাটোপ হয়ে ঝুলে রইল তার সামনে।

প্রবল সন্ধিৎসায় তাকে এতসব ঘোরাঘুরি করতে দেখে ডোনা একদিন রহস্য করে বলল, কী ব্যাপার রে, তুই কি তাহলে শখের গোয়েন্দা হয়েছিস?

গার্গী চোখ কপালে তুলে বলল, ধুর সে-যোগ্যতা কি আমার আছে? আসলে আমি একটা জটিল অঙ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। থিয়োরেমটা অদ্ভুত।

—তোর ম্যাথসের থিয়োরেম!

গার্গী রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যায়, তারই হিসেব কষছি ক'দিন ধরে।

ডোনা বিষয়টা বোধহয় ঠিক বুঝল না।

গার্গী আবার বলল, সর্বশেষ যে-ত্রিভুজটির সন্ধান পেয়েছি, তা হল, ঈষিতাদি ইদানীং মণীশ রায়ের ওপর এতটাই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত যে, অধ্যাপক রণজয় দত্তের সঙ্গেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছিলেন। হয়তো এরই নাম প্রতিহিংসা। যে-রণজয় দত্তকে কেউই কোনও দিন পছন্দ করেনি, এড়িয়ে-এড়িয়ে থাকত, তাঁর সঙ্গেও ঈষিতাদি—, বলে একটু হাসল গার্গী। সব জানতে পেরে এর মধ্যে মণীশ রায় একদিন রণজয় দত্তকে বলেছেন, আই উইল সি ইউ—।

ডোনা চমকে উঠল, ইজ ইট?

গার্গী হাসল, কী যে জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি!

প্রদর্শনীর কারণে ইদানীং অলর্ক বোসের খুব যাওয়া-আসা বেড়ে গেছে ডোনাদের বাড়িতে। রোজই তাকে আরও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। যেন তার নিজের ছবিরই প্রদর্শনী হচ্ছে এমন হাবভাব তার চোখেমুখে। শুধু সংবাদপত্রেই নয়, শহরে হোর্ডিং লাগাল কয়েকটা। কিছু রঙিন পোস্টারও। এমনকি তার বাড়ির সিঁড়ির কাছে দুটো ভিডিও ক্যামেরা বসানোর আয়োজন করেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে সে বিখ্যাত করে তুলেছে রাতারাতি। সেইসঙ্গে ডোনাকেও। ডোনার বেশ কয়েকটা ছবি প্রকাশিত হয়েছে কাগজে—অবশ্যই 'এ টু জেড'-এর শো-রুমের মডেল হিসেবে।

এতসব প্রস্তুতির ভেতর ডোনা খুব উত্তেজিত। গার্গীকে বলল একদিন, কেমন বুঝছিস বল তো লোকটাকে?

গার্গী হাসল, আপাতত খুবই মিস্টেরিয়াস। যাই হোক, লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।

ডোনা কিছুক্ষণ গার্গীর অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করল, তারপর ভুরু নাচাল, তোর শখের গোয়েন্দাগিরি কদ্দুর? কে হত্যাকারী তার কোনও খোঁজ পেলি?

গার্গী আবার রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটু-একটু অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এখনও কনফার্মড হইনি—।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই!

এর মধ্যে অলর্ক বোস একদিন সন্ধেয় সেজেগুজে এল ডোনাদের বাড়ি। সত্যিই ম্যানলি চেহারা অলকের। তার লম্বা চুল আর গোঁফ-দাড়িতে বেশ অদ্ভুত লাগে তাকে। ডোনা কিছু একটা প্রশংসাসূচক বাক্য বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অলর্ক একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল, তোমার ওই মন্দার মিত্র। লোকটা একেবারে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে আমার পিছনে। ডিসগাস্টিং।

ডোনা চোখ তুলল, শান্তভাবে বলল, কেন?

—আমার শো-রুমগুলোর ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সব টেন্ডারই বাতিল হয়ে গেছে। তবু পিছু ছাড়ছে না।

—সবগুলোই বাতিল হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, টেন্ডার জমা দেওয়ার যেসব শর্তাবলী ছিল, মন্দার সেগুলো পূরণ করতে পারেনি। তা ছাড়া, অলর্ক একমুহূর্ত থামল কিছু একটা ভেবে, তারপর বলল, তা ছাড়া শিহরনদা চাননি, যে, মন্দার কাজগুলো পাক।

ডোনা হতবাক হয়ে গেল, শিহরনদা চাননি?

—না, উনি বারবার চাপ দিচ্ছিলেন যাতে মন্দারকে কাজটা না দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

—মন্দার সে কথা জানত?

—না, কারণ আমাদের ডিসিশন নেওয়ার আগেই মন্দার ইঞ্জিওরড হয়ে নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছিল। পরে নিশ্চয়ই তার কানে গেছে।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, কাজটা এখন আর দেওয়া যায় না?

অলর্ক ইতস্তত করল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তারপর হঠাৎ বলল, মন্দারের ওপর তোমার কি কোনও দুর্বলতা আছে? হঠাৎ তাকে কাজ দেওয়ার জন্য এত পীড়াপীড়ি করছ কেন?

অলর্কের শেষ কথাগুলোয় এমন প্রচ্ছন্ন ধমক ছিল যে, তাতে চমকে উঠল ডোনা। এই অলর্ক যেন তার অচেনা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে বলল, তাহলে থাক।

চিত্রদীপের প্রদর্শনীটি ঠিক কী ধরনের হবে, তা অলর্কের পরিকল্পনা শুনে প্রথমে বোধগম্য হয়নি ডোনাদের। শিল্পীদের প্রদর্শনী সাধারণত কোনও আর্ট গ্যালারিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু অলর্ক বলেছিল, তার মধ্য কলকাতার পুরোনো দোতলা বাড়িতেই সে চিত্রদীপের প্রদর্শনী করতে চায়। সেটাই হবে একজিবিশনটির সবচেয়ে বড় স্টান্ট। তাতে চিত্রদীপ ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

কিন্তু ক'দিন আগে চিত্রদীপ নিজে গিয়ে বাড়িটার একতলা-দোতলা ঘুরেফিরে দেখার পর বিস্মিত হয়ে এসে ডোনাকে বলেছেন, বাড়িটা সুপার্ব।

সত্যিই বাড়িটি প্রাচীন ধরনের হলেও তার গঠনপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। ইংরেজ আমলে বিদেশিদের বসবাসের বাড়িগুলি যেমন হত, এ-বাড়িটাতেও তেমনি বিশাল-বিশাল ঘর, উঁচু ছাদ, সিলিঙে কড়িবরগা, এপাশে-ওপাশে উঁচু সিঁড়ি। অলর্কের বাবা বিদেশি, মা এদেশি। বিদেশি ধাঁচের এহেন বাড়িটা সে পেয়েছে বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে। এই বাড়িটিরই গোটা দোতলা জুড়ে প্রদর্শনী হবে।

দোতলায় খানছয়েক বড়-বড় ঘর। কোনওটা ড্রইং, কোনওটা ডাইনিং, কোনওটা বেডরুম। প্রতিটি ঘরে, মস্ত-মস্ত বারান্দা জুড়ে রয়েছে পুরোনো আমলের আশ্চর্য ডিজাইনের সব দামি কাঠের ফার্নিচার। এ ছাড়াও সারা বাড়িতে ছড়ানো-ছিটানো বিচিত্র সব অ্যান্টিক কালেকশন।

এ-বাড়িতে প্রদর্শনী হলে, সেটি ছবির, না কি অ্যান্টিক কালেকশনের, তা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে কেউ।

অলর্ক চিত্রদীপকে জানিয়েছে, এই ফার্নিচারগুলোর সবক'টিই তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। কিছু পুরোনো আসবাবপত্র আগে থেকেই ছিল ঘরে, সেগুলো এত চমৎকার আর অভিনব যে, সেগুলোর মর্যাদা বাড়াতে সে এখন কোথাও পুরোনো বাড়ির ফার্নিচার বিক্রি হচ্ছে শুনতে পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কোনও ফার্নিচারের অ্যান্টিকভ্যালু আছে বুঝতে পারলে তৎক্ষণাৎ কিনে নেয় যে কোনও মূল্যে। এভাবেই সে অনেক পুরোনো টেবিল-চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, কারুকাজ করা খাট, প্রায় ম্যান-হাইটের পিলসুজ, অ্যাশট্রে, এমনকী পুরোনো ঝাড়লণ্ঠনও কিনে সাজিয়েছে বাড়িটা।

তাই অলর্ক বলেছিল চিত্রদীপকে, তাঁর এবারের যে-প্রদর্শনীটি হবে, তার ছবিগুলো একটা নতুন সিরিজ হিসেবে আঁকুন। এই বাড়িটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

প্রস্তাবটা সে-মুহূর্তে ভারী স্পর্ধার বলে মনে হয়েছিল চিত্রদীপের। একজন আর্টিস্টকে কিনা ডিকটেট করছে একটা দুদিনের ছোকরা, লেম্যান। পরে বাড়িটা দেখতে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এহেন বাড়িতে ছবির প্রদর্শনী করতে হলে পুরোনো যুগের স্টাইলে চিত্রমালা হাজির করলেই তা মানানসই হবে।

অলর্কের সাজেশান অনুযায়ী এবারের আঁকা তার সমস্ত ছবিই উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায়। ছবিগুলো টাঙানো শুরু হয়েছে সিঁড়িতে ওঠার পাশের দেয়াল থেকেই। ওপরের ঘরগুলিতে যেখানে যে ফার্নিচার আছে তা বিন্দুমাত্র না সরিয়ে তার ফাঁকা দেয়ালগুলোতে পরপর ছবির সমাহার। ছ'খানা

BanglaBook.org

ঘর, বিশাল বারান্দা, লম্বা করিডোরের দুপাশের দেয়াল, সিঁড়ি—সব জায়গা মিলিয়ে প্রায় সত্তরখানা ছবি। মাত্র দেড়মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন চিত্রদীপ। প্রদর্শনীটি আরও চমৎকার হয়ে উঠতে পারত, যদি কয়েকদিন আগে সেই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি না ঘটত।

প্রদর্শনী সত্যিই তাহলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই সংবাদে চিত্রদীপ খুবই উত্তেজিত, তবু মাঝেমধ্যে হতাশ হয়ে বলছেন, কী হবে আর এসব করে। যে কোনওদিন পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে আমাকে। তখন তো সব শেষ।

ডোনা তার বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবু তারও মনের কোণে একটা বড় খিঁচ।

গার্গীও অবাক হচ্ছিল কম নয়। দু-দুটো পিস্তলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ, দুটো থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনও পিস্তলের মালিককেই এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। ব্যাপারটা খোলসা করতে সে একদিন দেখা করল ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। ইনস্পেকটর এড়াতে চাইলেন প্রথমটা, তারপর অনেক কথাই বললেন। গার্গী ঘটনাটার পরম্পরা নোট করছে শুনে অবাকই হলেন একটু, তারপর একসময় বললেন, কে মার্ডার করেছে তা আমাদের কাছেও এক প্রহেলিকা। এই দেখুন না, সেদিন এক বৃদ্ধ অধ্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বললেন, তিনি এক যুবককে শিহরন রায়চৌধুরির পিছনে ওইসময় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তার চোখে চশমা, মুখময় কালো দাড়ি-গোঁফ।

গার্গী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ইনস্পেকটরের দিকে। কালো দাড়ি-গোঁফ শুনে কোনও থই পাচ্ছিল না। কেন কে জানে বীরভঙ্গপুরের সেই 'সাংবাদিক'-এর চেহারার বিবরণ চকিতে ঝলক দিয়ে উঠল তার মগজে। কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপক-কথিত এই রহস্যময় যুবকই কি শিহরন-হত্যার জন্য দায়ী।

এতসব উৎকণ্ঠা, টেনসন, রহস্যের মধ্যেই উদ্বোধন হয়ে গেল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন হওয়ার পর হইচই পড়ে গেল সারা কলকাতায়। মধ্য-কলকাতার এইসব বিদেশি ধাঁচের বাড়িতে সচরাচর কেউ প্রবেশ করে না। অধিকাংশই হয় পরিত্যক্ত, নয় অপরিচ্ছন্ন। সেরকম একটা বাড়িতে এহেন ঝকমকে চেহারার একটা প্রদর্শনী করা যায়, তা ভাবনায় ছিল না কারও। শিল্পবোদ্ধাদের যে কয়েকজন প্রথমদিন প্রদর্শনী দেখতে এলেন, তাঁরা সবাই অকুণ্ঠ তারিফ জানালেন চিত্রদীপকে।

প্রদর্শনীর ব্যাপারে ডোনার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। সে সারা কলকাতা ঘুরে-ঘুরে অজস্র মানুষকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে প্রদর্শনীতে আসার জন্য। শিল্পরসিক, নামি-অনামি চিত্রশিল্পী, সংবাদপত্রের শিল্পসমালোচকদের তো বটেই, সে আরও আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তার পরিচিত সবাইকেও। গার্গীকে বলেছে, রোজই আসা চাই তোর। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে একটা মস্ত টেবিলের ওপর ভিজিটরস-বুক রাখা থাকবে। যাঁরা প্রদর্শনী দেখতে আসবেন তাঁদের অনুরোধ করা হবে প্রদর্শনী দেখে মতামত জানানোর জন্য। তুই সেই ভিজিটরস বুকের কাছেই থাকবি।

গার্গীও এই ব্যাপারে ভারী উৎসাহ দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই। এস আর বলতে।

একতলার ঘরে গেট-টুগেদার। দোতলায় প্রদর্শনী। প্রথমদিনেই চেনাজানা, অচেনা মানুষে উপচে পড়ল রাসেল স্ট্রিটের গায়ে লাগা প্রাচীন চেহারার বাড়িটিতে। বাইরে থেকে দেখা যায় দোতলার ছাদের আলসেয় একটা মাঝারি চেহারার অশথগাছ বেশ উঁটো হয়ে বড় হচ্ছে ক্রমে। অলর্ক গাছটা কাটেনি, তাহলে তো বাড়িটার প্রচীনত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রদর্শনীর রিসেপশনে ডোনা নিজেই। প্রাচীন ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের রাজকুমারীদের মতোই পোশাক তার পরনে। মাথায় একটা বাঁকানো টুপি পরে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে নিজেকে।

BanglaBook.org

বনানী আছেন আপ্যায়নের দায়িত্বে। অলর্ক অতিথি অভ্যাগতের জন্য সরবত ও মিষ্টির আয়োজন রেখেছে একতলার একটি বিশাল হলঘরে। সেকালে হয়তো নাচঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হত ঘরটি।

সন্ধের মধ্যেই অজস্র অতিথিতে ভরে গেল প্রদর্শনীর কক্ষগুলি। চেনা-অচেনা মানুষ আসছেন, আর হই-চই করে উঠছে ডোনা, এই যে, এইদিকে আসুন—এই অনামিকা, এত দেরি করলি যে—। এই যে আন্টি, আপনি একা এলেন যে বড়, আঙ্কেলকে নিয়ে আসতে পারলেন না? আঙ্কেল কি খুব বিজি? ঠিক আছে, ছুটির দিন দেখে আরেকবার আসুন। এই যে মিঃ দত্ত, আপনাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে আজ কিন্তু দারুণ লাগছে। কী বললেন, এরকম উৎসবের পরিবেশে ধুতি-পাঞ্জাবিই একমাত্র মানায়!

কখনও গার্গীকে বলছে, এই গার্গী তুই একটু এদিকটা দেখিস তো! কাগজের অফিস থেকে দুজন ক্রিটিক এসেছে। আমি একটু ওদের সামলে আসি।

আবার কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সস্ত্রীক মণীশ রায়কে দেখে, এই যে স্যার, আপনি তাহলে শেষ পর্যন্ত সময় করে আসতে পারলেন! ঈষিতাদি, আপনি যে সত্যিই আসবেন তা ভাবতেই পারিনি। ইস ঈষিতাদি, আপনি কী সুন্দর সেজেছেন আজ!

একটু পরেই বিখ্যাত শিল্পী সুহাস ভট্টাচার্য এসে হাজির। চিত্রদীপ ভাবতেই পারেননি সুহাসের মতো ব্যস্ত শিল্পী তাঁর প্রদর্শনী দেখতে আসবে। সুহাস ভট্টাচার্য অবশ্য বললেন, আর না এসে উপায় আছে। তোমার মেয়ে কার্ড দিতে গিয়ে পইপই করে বলে এসেছে, কাকু, যেতেই হবে কিন্তু। না গেলে কিন্তু ভাবব, আপনি আমার বাবাকে শিল্পী বলেই মনে করেন না।

সেই সুহাস ভট্টাচার্য কিন্তু চিত্রদীপের ছবি দেখে নিজেই বিস্মিত। বারবার ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। আর বললেন, ওয়ান্ডারফুল। চিত্রদীপের ছবি যে এতটা হাইটে উঠেছে—।

চিত্রদীপ বেশ অবাক হলেন। এ যুগে কোনও শিল্পী অন্য কোনও শিল্পীর প্রশংসা করেন না। সবাই সবাইকে এড়িয়ে যান। বরং আড়ালে নাক সিটকান। এহেন পরিস্থিতিতে সুহাস ভট্টাচার্যের প্রশংসার একটা অন্য মূল্য আছে।

প্রদর্শনীতে আসতে বেশ দেরি করে ফেলল মন্দার। তাকে দেখেই ডোনা প্রায় ঝামরে পড়ল, এই যে মিস্টার, তুমি কি আজ এই প্রদর্শনীতে গেস্ট হয়েই এসেছ নাকি! তোমাকে আসতে বলেছিলাম বেলা তিনটেয়, আর তোমার আসতে সন্ধে সাতটা হয়ে গেল! আমরা এদিকে অতিথি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—।

সত্যিই ডোনার এ ক'দিন নিশ্বাস ফেলার ফুরসতটুকুও ছিল না। অলর্ক আর চিত্রদীপ যেমন কয়েকদিন ধরে এই বাড়িতে সারাদিনরাত পড়ে থেকে ছবিগুলো টাঙিয়েছে, তেমনি ডোনা করেছে পাবলিক রিলেশনের কাজ।

একটু পরে ডোনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হইচই করে এসে পড়ল প্রদর্শনী দেখতে। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অধ্যাপকও। সরকারি আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরাও এসে গেল দল বেঁধে। কেউ-কেউ ছবির সঙ্গে অলর্কের অ্যান্টিক কালেকশনগুলো দেখে তারিফ করছে। একজন দর্শক দেখতে-দেখতে বললেন, এ যেন টু ইন ওয়ান। একইসঙ্গে দুটো প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

সেই ভদ্রলোক গার্গীর কাছে গিয়ে ভিজিটরস-বুক টেনে নিয়ে সে-কথা লিখেও দিলেন বেশ ভালোবাসা দিয়ে।

গার্গী এক ফাঁকে ডোনাকে গিয়ে একটা অদ্ভুত সংবাদ দিয়ে এল, জানিস ডোনা, তোদের রণজয় দত্তও এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে।

ডোনা তো প্রায় টলে পড়ে যায় আর কি, বলিস কী! ওঁকে আমি অবশ্য ইনভাইট করে

BanglaBook.org

এসেছিলাম, কিন্তু ভাবতে পারিনি, উনি সত্যিই আসবেন। দাঁড়া, ওঁকে একটু স্পেশ্যাল খাতির করে আসি। আমার ওপর ওঁর বোধহয় রাগ আছে। গার্গী হেসে বলল, মনে হয় না। তা হলে উনি এমন হাসিহাসি মুখে ঘুরে-ঘুরে ছবি দেখতেন না।

এক বিদেশিনীও এসে ছবি দেখছেন প্রদর্শনীতে। মহিলা বয়স্কা, মাথার সব চুলই সাদা, তবু চেহারার মধ্যে বেশ একটা তারুণ্য ঝলমল করছে, হাতের একটা নোটবইতে কী যেন নোটও করছেন ছবি দেখতে-দেখতে। অলর্ক এসে পরিচয় করিয়ে দিল ডোনার সঙ্গে, ইনি মিসেস হোয়াইট, সম্পর্কে আমার পিসি হন। বোম্বের একটা কাগজের আর্ট-ক্রিটিক। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে চলে এসেছেন।

রাত আটটা নাগাদ ভিড় উপছে পড়ল একেবারে। ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে একটা চমৎকার গেট-টুগেদারের আবহাওয়া। এমন একটা অদ্ভুত বাড়ির পরিবেশ পেয়ে সবাই বেশ খুশি। ছবি দেখতে-দেখতে গল্পগুজব করছেন এক-একটা দল বেঁধে। এক-একটা ঘরে এক-এক দলের ভিড়। আলো ঝলমল করছে ঘরগুলো। তার মধ্যে কোনও দল ড্রয়িঙের সোফায়, কেউ-কেউ ডাইনিং টেবিলের চারপাশের চেয়ারে গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দিয়েছেন।

অলর্ক এসে হঠাৎ ডোনাকে ডেকে নিয়ে গেল, মাদামাজেল, মণীশ রায় তোমাকে খুঁজছেন, বলছেন, ডোনা এত বিজি যে, দেখা পাওয়াই যাচ্ছে না। উনি বাড়ি চলে যেতে চাইছেন।

ডোনা হাসতে-হাসতে বলল, আমি একা আর ক'জনকে সামলাব। প্রথমদিনেই যে এতজন আসবেন, তা আমার ধারণায় ছিল না, প্রদর্শনী চলবে তো সাতদিন ধরে।

ডোনা দ্রুত চলে গেল একেবারে উত্তরের ডাইনিং-হলের দিকে। মণীশ রায় তখন সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আরও দু-তিনজন মেয়ে। খুব জমিয়ে গল্প করছে সবাই মিলে, ডোনাকে দেখে বললেন, দারুণ হয়েছে কিন্তু একজিবিশনটা। আমি কিন্তু আরও দু-একদিন চলে আসব।

ডোনা খুশি হয়ে বলল, নিশ্চয়ই স্যার। সবাই এলে তবেই না ড্যাডির এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু ঈষিতাদি কোথায়?

—ঈষিতা বোধহয় নীচের দিকে গেল। ওই যে তোমার বন্ধু মন্দার এসে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, সরবত আর মিষ্টি খাওয়াবে।

—আপনি গেলেন না?

—না, আমার বেশ ভালো লাগছে এখানে। ডাইনিং-হলের এই ছবিগুলোর কালার কম্বিনেশন দারুণ লেগেছে আমার। বারবার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে ছবিগুলোর দিকে।

—জানেন আর. ডি.-ও এসেছেন একজিবিশন দেখতে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মণীশ রায় হাসলেন নাহ। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে অন্যদিকে চলে গেল। বোধহয় এ-বাড়ির ড্রইঙের দিকে ঘোরাঘুরি করছে।

—গার্গী কিন্তু আপনাকে খুঁজছিল, ভিজিটরস বুকে কিছু একটা লিখিয়ে নিতে চাইছে আপনাকে দিয়ে।

—আমি তো এইমাত্র লিখে দিয়ে এলাম।

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, কী লিখলেন, স্যার?

—লিখলাম, বিংশ শতাব্দীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল। গার্গীর খুব পছন্দ হয়েছে মন্তব্যটা।

ডোনাও খুশি হয়ে বলল, থ্যাঙ্ক স্যার, গার্গী বলেছে, এই চিত্রপ্রদর্শনী আর খাতায় লেখা মতামতগুলো নিয়ে ও কাগজে একটা আর্টিকেল লিখবে।

একটু পরেই সেই ঘরে এসে ঢুকলেন চিত্রদীপ। চিত্রদীপ আজ একটা চকরাবকরা ঢোলা জামা, তার সঙ্গে জিনসের প্যান্ট পরেছেন।

BanglaBook.org

ঢোলাজামায় অনেকগুলো বড়-বড় পকেট। সবক'টা পকেটেই ঠাসা জিনিসপত্র। তার কোনওটায় তামাকের প্যাকেট, কোনওটা থেকে গলা বাড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকারের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি। ক'দিন ধরে চিত্রদীপ কেন যেন আর পাইপ ধরাচ্ছেন না সর্বক্ষণ। মাঝেমাঝে দু-একবার টান দিয়েই নিভিয়ে ফেলছেন তামাক।

বরং তাঁর হাতে ধরা রয়েছে এক গোছা রংমাখানো তুলি। হঠাৎ-হঠাৎ দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোয় টুকটাক রং বুলিয়ে দৃশ্যপট অদলবদল করে দিচ্ছেন। দিয়ে যেন ভাবছেন, হ্যাঁ, এবারই ছবিটা ঠিক হল। পরমুহূর্তে আবার অন্যরং চাপিয়ে দিচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ অস্থিরতার মধ্যে আছেন আজ।

চিত্রদীপকে দেখে ডোনা বলল, ড্যাডি, তুমি একটু এঁদের সঙ্গে কথা বলো। আমি নীচে যাচ্ছি। আমাদের আরও কয়েকজন অধ্যাপক নীচে রয়েছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পথে দেখা হল ঈষিতার সঙ্গে। ওপরে উঠছেন। ঈষিতা প্রায় পরির মতো সেজে এসেছেন আজ। আর সবচেয়ে যেটা অবাক লাগছিল ডোনার, ঈষিতা এতক্ষণ রণজয় দত্তর সঙ্গে নীচুস্বরে কিছু যেন বলছিলেন। এই ভিড়ের মধ্যেও দুজনে হঠাৎ আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য।

উজ্জ্বল রোদ্দুর রঙের শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিতা ঈষিতাকে দেখে ডোনা হাসল, ঈষিতাদি, আপনার জন্যে স্যার অপেক্ষা করছেন। ডাইনিং-এ আছেন।

—হ্যাঁ, এইবার আমরা ফিরব।

ঈষিতা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, আর ডোনা নেমে এল নীচে। ওর সহপাঠী আর অধ্যাপকদের নিয়ে তখন হিমসিম খাচ্ছেন বনানী। ডোনাকে দেখে ফিসফিস করে বললেন, শিগগির আয়, আমাকে একটু হেল্প কর।

অরুনাভ নামের একটি ছেলে ডোনাকে বলল, কোত্থেকে এ-বাড়িটা তোরা জোগাড় করলি বল তো? একজিবিশনের পক্ষে ফ্যান্টা—।

—জোগাড় হয়ে গেল। বলতে গেলে আকাশ থেকে পড়ে পেলাম—।

—এটাও তোদের বাড়ি নাকি?

অলর্ক কাছেই ছিল, তাকে দেখিয়ে ডোনা বলল, উঁহু। ইনি হলেন অলর্ক বোস। এ নিউ বিজনেসম্যান ইন ক্যালকাটা। বাড়িটা এঁরই। এই ক'দিনের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে-করতে কথা থামিয়ে হঠাৎ অলর্ক বলল, এক মিনিট। আমি একটু নীচে থেকে আসছি, বলে সিঁড়ির দিকে দৌড়ল।

সেই মুহূর্তে অমন আলোঝলমলে বাড়িতে পট করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

এ-বাড়িতে লোডশেডিং মানে চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটু পরেই সিঁড়ি থেকে অলর্কের গলা শোনা গেল, যে-যেখানে আছেন সবাই চুপ করে দাঁড়ান। এক্ষুনি জেনারেটার চালানো হবে।

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফট করে একটা আওয়াজ, পরক্ষণেই হঠাৎ ভারী কিছু একটা পতনের শব্দ হল সিঁড়িতে। তার সঙ্গে আর্ত একটা চিৎকার। কিছু যেন গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে।

ঘটনাটা এমন অতর্কিতে ঘটে গেল যে, কয়েকমুহূর্ত ভীষণ একটা নীরবতায় ছমছম করে উঠল গোটা বাড়িটা। তারপরেই কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে এল নীচে। কিছু যেন ছুড়েও ফেলল কেউ। সিঁড়িতে তখনও সেই গোঙানির শব্দ। তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে সমস্বরে শব্দ ভেসে এল, কী হল? কী হল?

গোঙানির আওয়াজ তখনও থামেনি। ওপর থেকে কেউ যেন বলল, সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে। শিগগির আলো জ্বালাও, আলো জ্বালাও, টর্চ কোথায়?

BanglaBook.org

দেড়-দু-মিনিটের মধ্যে জেনারেটারের শব্দ শোনা গেল বাড়ির বাইরে থেকে। তারপরই দপ করে আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। আর একরাশ আতঙ্ক চোখে নিয়ে অতগুলো মানুষ দেখল—।

সিঁড়ির মাঝামাঝি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। মাথাটা নীচের দিকে, পা দুটো ওপরের দিকের সিঁড়িতে, চোখ দুটো খোলা, বুকের বাঁ-দিকে একটা বড় ক্ষত। তার থেকে প্রবলভাবে ভেসে আসছে রক্ত। সেই তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

কে যেন সেই রক্ত দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়ল হঠাৎ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গী, বলল, এই, শিগগির শুইয়ে দিন ঈষিতাদিকে। অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

চিত্রদীপ ততক্ষণে ছুটে এসেছেন সিঁড়ির কাছে। মণীশ রায়কে অমনভাবে পড়ে থাকতে দেখে মাথা চাপড়াতে লাগলেন, এ কী হল, অ্যাঁ। এ কী হল। কী সর্বনাশ।

কে যেন বলে উঠল, সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিশ্চয় পড়ে গেছেন অন্ধকারে—।

—সিরিয়াস ইনজুরি?

—শিগগির হসপিট্যালে নিয়ে চলুন, বলে মন্দার তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ধরতে গেল মণীশ রায়ের শরীরটা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বাধা দিল, এখন কেউ ওঁর গায়ে হাত দেবেন না। এখানে ডাক্তার কেউ আছেন, ডাক্তার?

ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তারও দেখতে এসেছিলেন চিত্রদীপের প্রদর্শনী। বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপকের বন্ধু ডাঃ প্রবাল রায়। তিনি দ্রুত ছুটে এসে নীচু হয়ে পরীক্ষা করলেন মণীশ রায়কে। কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যরি, হি ইজ ডেড। বুকে গুলি লেগেছে, মনে হচ্ছে—।

চিত্রদীপ আর্তনাদ করে উঠে বললেন, গুলি! মাই গড। ডেড। কী সর্বনাশ—।

—হ্যাঁ, বুকের বাঁ-দিকে একেবারে মোক্ষম জায়গায় গুলি করা হয়েছে ওঁকে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ওঁর। শিগগির পুলিশকে খবর দিন।

ভিড়ের মধ্যে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সহসা। পুলিশ শব্দের উচ্চারণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল সবার ভেতর। ডোনা ওপাশ থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, আমরা তাহলে একেবারে শেষ হয়ে গেলাম।

মণীশ রায়ের নিথর শরীর ঘিরে তখন গোটা প্রদর্শনীর লোক। যেন কেউ ভাবতেই পারছে না, অমন সুদর্শন পুরুষটির শরীরে প্রাণ নেই। তাঁর দুটি চোখই ভয়ার্তভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

অলর্ক এতক্ষণ ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ক্ষীণকণ্ঠে গলায় বলে উঠল, পুলিশে খবর দিন, এক্ষুনি—।

গার্গী দোতলায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন করতে বসল পুলিশকে, হ্যালো, ইনস্পেকটর মিঃ মিত্র কথা বলছেন? আপনাকে এক্ষুনি একবার এ-বাড়িতে আসতে হবে। রাসেল স্ট্রিটে। আবার খুন—।

পরক্ষণে গার্গী ফোন করল স্থানীয় থানায়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে মন্দার বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাকে টার্গেট করে গুলিটা ছোড়া হয়েছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েই স্যারের বুকে,—ওহ, কী সাংঘাতিক। নইলে কেউ স্যারকে খুন করতে যাবে কেন?

মন্দারের চোখেমুখে কিছুটা আতঙ্ক। তার মাথার বাঁ-দিকে এখনও তুলো লাগিয়ে সেলোফেন দিয়ে আটকানো। সেদিকে তাকিয়ে দৃশ্যটি কল্পনা করে শিউরে উঠল কেউ-কেউ। মন্দার ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে, কিন্তু মণীশ নিহত হলেন আততায়ীর গুলিতে।

BanglaBook.org

ক্রমশ বিষাক্ত, ভারী হয়ে উঠল গোটা বাড়ির আবহাওয়া। পুলিশ আসা মানেই এখন হাজারো কৈফিয়ত চাইবে সবাইয়ের কাছে। কয়েকদিন আগেই একটি মৃত্যু হয়ে গেছে, আবার একটি মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটি তাজা শরীর।

চিত্রদীপ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, কনস্পিরেসি, কনস্পিরেসি। আমার প্রদর্শনী বানচাল করার জন্য কেউ-কেউ উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্গী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, আপনি কিছু ভাববেন না, আঙ্কেল। যে অপরাধী সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। একটু ওয়েট করুন—।

বলে কাছেই দাঁড়ানো অলর্ককে বলল, আপনি দেখুন তো, কেউ যেন পুলিশ না আসা পর্যন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে না পারে—।

মন্দার তৎক্ষণাৎ সায় দিল তার কথায়, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হত্যাকারী এ-বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে অলর্ক জানাল, এ-বাড়ি থেকে বেরুনোর সব গেটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগে পুলিশ আসুক, জবানবন্দি নেওয়া হয়ে গেলে তারপর গেট খুলে দেওয়া হবে—।

ভিড়ের মধ্য থেকে দু-একজন অস্ফুটস্বরে বললেন, কিন্তু সে তো এখনও ঢের দেরি। আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে যে—।

গার্গী হাত ঘুরিয়ে বলল, স্যরি। এখন আমাদের কিছুই করার নেই। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবাইকেই কিছু-কিছু সাফার করতে হবে। কিন্তু অলর্কবাবু, আপনি দেখুন তো, মনে হচ্ছে এটা লোডশেডিং নয়। অন্য বাড়িতে, এমনকী রাস্তায়ও আলো আছে। হয়তো কোনও ফল্ট হয়েছে এ-বাড়িতে, কিংবা এ-বাড়ির মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে কেউ।

অলর্ক ছুটে উঠে গেল সিঁড়ির ওপরে মেনি সুইচের কাছে। সেদিকে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে বলল, ঠিকই বলছেন তো। মাই জেশাস, কে বন্ধ করল মেইন সুইচ?

গার্গী হাসল, যিনি গুলি চালিয়েছেন, তিনিই। আমাদের মধ্যেই কেউ।

॥ ২৭ ॥

আধঘণ্টার মধ্যেই এক বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে গেল রাসেল স্ট্রিটের মস্ত বাড়িটার গেটে। তখন রাত দশটার মতো, দ্রুত নিরিবিলি হয়ে আসছে গোটা কলকাতা। এতক্ষণে প্রদর্শনীর জায়গা থেকে কাউকেও একচুল নড়তে দেওয়া হয়নি। অনেকেই উসখুস করছিলেন, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরতে হবে' এই বলে। পুলিশ এসে গোটা বাড়িটা ঘিরে ফেলতেই গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পুলিশবাহিনীর নেতৃত্বে স্থানীয় থানার ইনস্পেকটর ছাড়াও রয়েছেন শিহরন-হত্যার দায়িত্বে থাকা তুষারশুভ্র মিত্রও। গার্গী বিশেষভাবে তাঁকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল টেলিফোনে। তাঁরা পৌঁছতেই সমস্ত দর্শককে হাজির করা হল নীচের বিশাল হলঘরটিতে। আপাতত পুলিশের হেপাজতে সবাই সাময়িকভাবে আটক।

তুষারশুভ্র মিত্র গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন কী ব্যাপার। আপনি বললেন, শিহরন-হত্যার সঙ্গে আজকের ঘটনার একটা যোগসূত্র আছে!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, আছে মনে হয়েছে বলেই আপনাকে ডিসটার্ব করলাম, ইনস্পেকটর সাহেব। তার আগে আপনি পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিন। নিহত অধ্যাপক মণীশ রায়কেও একবার দেখে নিতে পারেন। তা ছাড়া একটা কিছু ছুড়ে ফেলে দেওয়ার শব্দও শুনেছি আমরা। হয়তো সেটা একটা পিস্তল।

পুলিশ অফিসাররা মিনিট দশেকের মধ্যে ঘুরেফিরে এসে একটা ঝকমকে পিস্তল রুমালে

BanglaBook.org

মুড়ে এনে বললেন, কিন্তু আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হয়নি। হঠাৎ মণীশ রায়ের মতো একজন অধ্যাপকের ওপর অ্যাটেম্পট হল কেন? সেই অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপার নিয়েই নাকি? সিঁড়ির নীচে এই পিস্তলটাই বা কার।

পুলিশ অতঃপর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে একে-ওকে জেরা করল কিছুক্ষণ, তার মধ্যে মণীশ রায়ের ডেডবডিও পাঠিয়ে দিল যথাস্থানে। অনেকেই উশখুশ করছিলেন বাড়ি যাবেন বলে। রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই বিরক্ত। তাদের কয়েকজনকে ছেড়েও দেওয়া হল প্রাথমিক জেরার পর।

গার্গী হেসে বলল, সবাইকে তো দরকার নেই আমাদের। যারা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারেন, শুধু তাঁরা থাকলেই হবে।

পুলিশ ইনস্পেকটর অবিশ্বাসের গলায় গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী করে শিওর হচ্ছেন, খুনিকে আপনি চিনতে পেরেছেন! অন্ধকারে যে ঘটনাটা ঘটে গেল—।

গার্গী বলল, সবই একে-একে বলছি, ইনস্পেকটরসাহেব। সে এতক্ষণে পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। হলঘরের সমস্ত লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা বিস্ময়ের চোখেও। তাদের জোড়া-জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে শুরু করল, আজকের ঘটনাটা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু এরকম একটা কিছু ঘটবে বলে আমি কয়েকদিন ধরেই আশঙ্কা করছিলাম।

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, সে কী!

—হ্যাঁ, কারণ যিনি শিহরন রায়চৌধুরিকে হত্যা করেছিলেন, তিনি একইসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও অনেকগুলো ঝামেলায়। একটা থেকে আর-একটা তারপর আরও একটা। শেষদিকে তিনি ধরা পড়ে যাবেন এমন আশঙ্কা করেই হঠাৎ আজকের এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছেন। আজকের ঘটনাটার কথাই প্রথমে বলি। আমি ভিজিটরস বুক নিয়ে সারাক্ষণ বসে ছিলাম সিঁড়ির ওপরে ফাঁকা জায়গাটায়। যিনিই প্রদর্শনী দেখতে আসছেন, সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছিলাম, প্রদর্শনী দেখে এসে যেন তাঁর মতামত লিখে জানান ভিজিটরস বুকে। তার ফলে প্রত্যেক দর্শকের গতিবিধি আমার নজরে থাকছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো। হত্যার চেষ্টাটি ঘটেছে সিঁড়ি থেকে নামবার ঠিক মুখেই। যে মুহূর্তে আলো নিভে যায়, ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ঘটে গেল ঘটনাটি। অর্থাৎ মণীশ রায় প্রদর্শনী দেখা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করার পরের মুহূর্তেই। সেক্ষেত্রে আমরা যদি কোনও উপায়ে দেখতে পারি, সেই মুহূর্তে রায়ের পেছনে বা সামনে বা কাছাকাছি কে-কে ছিলেন—।

চিত্রদীপ হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলেন। কাছাকাছি কে বা কারা ছিল তা কি এখন আর প্রমাণ করা সম্ভব? তা ছাড়া তখন তো অন্ধকার।

মন্দার হেসে বলল, বোধহয় সেটা গার্গী মুখার্জির এক্স-রে আইতে ধরা আছে। গার্গী সব কথা উপেক্ষা করে বলে চলল, আমরা আরও লক্ষ করেছি, গুলির শব্দ হওয়ার পরের মুহূর্তে মণীশ রায়ের চিৎকার, সিঁড়িতে তাঁর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। পরের মুহূর্তে কেউ যেন হুড়মুড় করে নীচে নেমে গেলেন। অর্থাৎ হত্যাকারী তাঁর কাজটি শেষ করে ওপর থেকে নীচে নেমে এসে প্রথমে ছুড়ে ফেললেন পিস্তলটি, তারপর নেমে মিশে গেলেন ভিড়ের মধ্যে, যাতে তাঁকে কোনওক্রমেই কেউ আর সন্দেহ না করতে পারে।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে রণজয় দত্ত বলে উঠলেন, ঠিকই বলেছ, নামবার সময় কেউ যেন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি তখন সিঁড়ির একেবারে নীচের স্টেপে।

—তাহলে আমাদের দেখতে হবে, আলো নেভার পূর্বমুহূর্তে কার অবস্থান কোথায় ছিল, তারপর আলো জ্বলার পরমুহূর্তে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ এইটুকু সময়ের মধ্যে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন কি না—।

BanglaBook.org

মন্দার এই মুহূর্তে বলে উঠলেন, সেসব এখন আর কীভাবে প্রমাণ হবে! ফোটো তো আর কেউ তুলে রাখেনি—।

—সেই প্রসঙ্গেই আমি আসছি এবার। আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন না, এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধনের মুহূর্ত থেকেই দু-দুটো ভিডিও ক্যামেরা গোটা অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ক্যামেরা রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে সিঁড়িতে ওঠার জায়গায়, ওপরের সিলিঙে, তাতে ছবি তোলা হচ্ছে আমাদের কোন-কোন অতিথি গেট পেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন ওপরে, কিংবা কে-কে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন নীচে। আর একটা ক্যামেরা দোতলার সিলিঙে আটকানো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আরও খানিকটা ওপাশে। তাতে রেকর্ডিং হচ্ছে, গোটা দোতলার বারান্দায় যাওয়া-আসা করছেন কারা, কারা নামতে যাচ্ছেন, তাও। এই দুটো ক্যামেরায় তোলা ছবি যদি আমরা আলো নেভার আগে থেকে আলো জ্বলে ওঠার পর পর্যন্ত দেখে নিই, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে, ঘটনা ঘটার আগে ও পরে আমাদের অতিথিদের কার অবস্থান কোথায় ছিল। অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ঠিক আগে মণীশ রায়ের কাছাকাছি বা পিছনদিকে ছিলেন, তারপর আলো জ্বলার পর তাঁকে সিঁড়ির নীচে দেখা যাচ্ছে কি না!

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, ক্যামেরায় গোটা প্রদর্শনী রেকর্ডিং করে রাখা হচ্ছে, তা তো আমাকে জানানো হয়নি।

অলর্ক বলে উঠল, আপনাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে বলেই ডোনা নিষেধ করেছিল বলতে।

রণজয় দত্ত অবিশ্বাসের গলায় বললেন, মাই গড! তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে এই মার্ডারটি করেছে?

গার্গী মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত না। তার আগে এই ঘটনার নেপথ্যে যে-জটিল কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছিল, সেগুলো বলা দরকার। আমি প্রথমে সেই কাহিনি বলে খুনের মোটিভ প্রমাণ করতে চাই। তারপর ভিডিও ক্যামেরার রেকর্ডিং দেখে শনাক্ত করব অপরাধীকে। তা ছাড়াও আমার হাতে আরও প্রমাণ আছে।

টুঁ শব্দটি শোনা যায় না এমন নিস্তব্ধ হলঘরের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। আপনারা অনেকেই জানে, কয়েকদিন আগেই অধ্যাপক শিহরন রায়চৌধুরি খুন হয়েছিলেন। একটি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। বীভৎস সে-খুন, কিন্তু তার খুনিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। আমি গোপনে সমস্ত ব্যাপারটা স্টাডি করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে। কিছু-কিছু প্রমাণ আমার হাতে পৌঁছলেও আমি অপেক্ষা করতে চাইছিলাম চরম মুহূর্তের জন্যে। মনে হচ্ছিল হত্যাকারীকে খুব শিগগির হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু তাতে ক্ষতির মধ্যে এই হল যে, আমাদের একজন প্রিয় অধ্যাপককে হারাতে হল। তবে—, গার্গী একমুহূর্ত থেমে আবার বলল, তবে এই মণীশ রায়কে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি ত্রিভুজ রহস্য, যা এই জটিল কেসটি সমাধানে অনেকগুলো ক্লু রেখে যায়—।

ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র এই সময় মুখ খুললেন, ত্রিভুজ রহস্য?

—হ্যাঁ, কয়েকদিন আগেই ডোনাকে বলেছিলাম একটা জটিল থিয়োরেম আমাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে ক'দিন ধরে। একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যেতে পারে সেটাই আমার কাছে এক জটিল ধাঁধা। সত্যিই অসংখ্য ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে এই হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে। চরিত্রগুলো হল, শিহরন রায়চৌধুরি, মণীশ রায়, ঈষিতা রায়, অলর্ক বোস, রণজয় দত্ত, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি, বনানী চ্যাটার্জি, ডোনা চ্যাটার্জি এবং মন্দার মিত্র।

ভিড়ের ভেতর থেকে যেন ধমকে উঠলেন চিত্রদীপ, ননসেন্স।

—শিহরন রায়চৌধুরি খুন হওয়ার পর সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথমে আমি যে-দুজনের কথা মনে করেছিলাম, তাঁদের একজন হলেন রণজয় দত্ত, অন্যজন মণীশ রায়। হ্যাঁ, মণীশ রায়। কিন্তু

BanglaBook.org

তাঁর কথায় পরে আসছি। প্রথমে শুরু করি রণজয় দত্তকে দিয়ে। একটি রিডার পোস্টের জন্য দাবিদার ছিলেন দুই অধ্যাপক মণীশ রায় ও রণজয় দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে মণীশ তাঁর চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়ার পর প্রতিযোগিতা থেকে হটে গিয়েছিলেন রণজয় দত্ত। কিন্তু তাতে হাল ছাড়েননি তিনি। অধ্যাপক হিসেবে মণীশ রায় ভীষণ জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁর ওপর আগে থেকেই তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তার ওপর রিডারের পদটিও মণীশ পাচ্ছেন বুঝে তাঁর নামে নানান অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং উপাচার্যের কাছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রিডারের পোস্টটি পেয়েছিলেন মণীশ রায়ই। আর এ ব্যাপারে মণীশকে প্রবলভাবে সহায়তা করেছিলেন আর-এক অধ্যাপক শিহরন রায়চৌধুরি, এই সেমিনারে মণীশ রায়ের পক্ষে এবং রণজয়ের বিপক্ষে তাঁর শাণিত বক্তব্য রেখে। তা ছাড়া রণজয় ও শিহরনের মধ্যে ছিল দীর্ঘ কুড়ি বছরের শত্রুতা। স্বভাবতই এই খুনের ব্যাপারে প্রথমে যাঁর ওপর আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে, তিনি রণজয় দত্ত।

রণজয় দত্ত চোখ কটমট করে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ইউ আর অ্যা ফার্স্ট ক্লাস স্টুপিড।

—কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরণ রায়চৌধুরি জড়িয়ে পড়েছিলেন অন্য একটি ব্যাপারে। আমরা জানি, শিহরন ছিলেন একজন তুখোড় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাঁর প্রচুর সদগুণ ছিল সন্দেহ নেই। তিনি ভালো লিখতে পারতেন, বলতে পারতেন, পড়াতেনও ভারী চমৎকার পড়ানোর বিষয়ের বাইরেও তাঁর অনেক জ্ঞান ছিল, টেবিল-টেনিসেও ছিলেন বেশ এক্সপার্ট। কিন্তু তাঁর আর একটি হবি ছিল মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমানোয়। নারীর প্রতি ছিল তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ। তাঁর অনেক বান্ধবী ছিল, তাদের নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোটা ছিল তাঁর অন্যতম হবি। এর মধ্যে একদিন শিহরন রায়চৌধুরি গেলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তাঁর প্রোমোশন পাওয়ার ব্যাপারে কনগ্রাচুলেশন রাখতে। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল ঈষিতা রায়ের।

মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছিল ঈষিতা-মণীশের। কিন্তু মণীশ রায়ের ইদানীংকার ব্যবহারে ঈষিতা ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড। মণীশ রায় সুপুরুষ, আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্বের মানুষ। ঠিক যে-কারণে ঈষিতা ছুটেছিলেন তাঁর পিছনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, একইভাবে বহুকাল ধরে ছুটেছে বা ছুটছে আরও বহু তরুণী। মণীশ তাদের প্রত্যেককেই প্রশ্রয় দিতেন, তাদের জন্যে সময় ব্যয় করতেন ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে। তাতে আস্তে-আস্তে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ঈষিতা। তাঁর মনের ভেতরকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ একদিন টার্ন নিল অন্যভাবে। হঠাৎ তিনিও অন্য পুরুষদের প্রতি আসক্ত হতে শুরু করলেন। শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে পরিচয় হতেই তাঁর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন প্রবলভাবে। প্রায়ই তাঁদের দেখা যেতে লাগল এখানে-ওখানে, কখনও রেস্তোরাঁয়, কখনও হোটেলে, কখনও লেকে-পার্কেও।

মণীশ রায়ের পক্ষে ছিল এটা একটা বিরাট ধাক্কা। এতকাল তিনিই একচেটিয়া উপভোগ করেছেন নারীসঙ্গ, তাদের নিয়ে ঘুরেছেন, সিনেমা দেখেছেন, রেস্তোরাঁয় খেয়েছেন, এখন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী ভোগ করছেন অন্য পুরুষ-সঙ্গ, এটা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। জীবনে সফলকাম একজন সুপুরুষ হঠাৎ আঘাত পেলে তার পরিণাম বড় ভীষণ হতে পারে। শিহরন রায়চৌধুরির হত্যার পর আমি তাই মণীশ রায়কে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। যে-সন্দেহে আরও ইন্ধন জোগালেন ঈষিতা রায়ই। আমাকে বললেন, এম. আর. নিজেকে আড়াল করার জন্যে দোষ চাপাচ্ছে অন্যের কাঁধে।

এখানে 'অন্যকে' বলতে বুঝিয়েছিলেন রণজয় দত্তর কথা। এর মধ্যে রণজয় দত্তকে নিয়ে আর একটা ইতিহাস আছে। ঈষিতা যেমন শিহরনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তেমনি সঙ্গ দিচ্ছিলেন রণজয় দত্তকেও। এ ব্যাপারটাও হঠাৎ করে ঘটে যায়। ঈষিতা মণীশের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে নিজে থেকেই একদিন রণজয় দত্তের সঙ্গে পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে তুলতে চাইলেন। একদা ছাত্রী

BanglaBook.org

ঈষিতা, তার ওপর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মণীশ রায়ের স্ত্রী, এমন সুবর্ণ সুযোগ হারালেন না রণজয়। তিনিও ঈষিতাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে লাগলেন। আর তা অন্যকে দেখিয়েই। ফলে রণজয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কলহ হল মণীশের, আবার শিহরনেরও। রণজয় আর শিহরনের কলহ অনেকদিনের, তা আবার অন্য চেহারায় ধরা দিল ঈষিতাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং শিহরন-হত্যার পিছনে রণজয় দত্তের ভূমিকা আছে, আমার এই পুরোনো ধারণাটি উসকে উঠল আবারও। এদিকে মণীশ রায়ও আমাকে ঠিক একই কথা বললেন। তিনিও চাইছিলেন, এই সুযোগে রণজয় দত্তকে ফাঁসিয়ে দিতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরন জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও কয়েকটি ব্যাপারে। তার প্রথমটি হল অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন শিহরন। সে-সময় তাঁর সহপাঠী এবং বিপ্লবী-আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন রণজয় দত্তও। পরে রণজয় পড়তে আসেন কমপ্যারেটিভ লিটারেচার। শিহরন থেকে যান ইংরেজিতে। কলেজে আন্দোলন চলাকালীন ম্যানিফেস্টো লেখা নিয়ে রণজয় দত্তর সঙ্গে প্রবল ঝগড়া হয়েছিল শিহরনের। শিহরন দল থেকে বেরিয়ে আসেন। রণজয় শিহরনের বিবাদ সেই শুরু। আর তার জের এখনও চলছিল অধ্যাপক-সমিতির দুই অ্যাসোসিয়েশনের লড়াইয়ে। এর সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে আর একটি প্রেমপর্ব।

শিহরন রণজয়ের সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন বনানী, আর এই দুই পুরুষই ছিলেন বনানীর দুই প্রেমিক। দুজনেই বনানীর প্রেমে পাগল। কিন্তু বনানী হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন শিহরনকে। সম্ভবত শিহরনের কিছুটা নারী আকর্ষণের প্রতিভা ছিল বলেই। বিয়েটা হয়েছিল কিছুটা গোপনে, বাসও করতেন একটু দূরে শহরতলি এলাকায়। কিন্তু শিহরন কোনওদিন এক নারীতে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই বনানীর সঙ্গে তাঁর বিয়েটা টিকল না। এর কিছুদিন পরেই বনানীর বিয়ে হল চিত্রদীপের সঙ্গে। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু এর মধ্যে শিহরন হঠাৎ দীর্ঘকাল পরে চিত্রদীপের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পুরোনো ত্রিভুজ শিহরন-বনানী-রণজয়ের মধ্যে যেমন নতুন মাত্রা পেল, তেমনি তৈরি হল শিহরন-বনানী-চিত্রদীপের মধ্যে নতুন ত্রিভুজ। শিহরন আর বনানীর মধ্যে যে একদা একটি সম্পর্ক ছিল তা আগে জানতেন না চিত্রদীপ, হঠাৎ ইদানীং সেটা জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বনানী-শিহরন দুজনেরই ওপর।

চিত্রদীপ বেশ কয়েকবার বিরক্ত হয়ে বনানীকে বলেছেন, শিহরনকে ঘর ছেড়ে দিতে বলো, আমি ও-ঘরে স্টুডিও করব। কিন্তু বানানী তাতে একবারও রাজি হননি। তাতে আরও জটিল হয়ে উঠল রহস্য। এ ছাড়া শিহরন যে চিত্রদীপের সে-আউট করা শো-রুম দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তা সহ্য করাও কঠিন হয়ে উঠল চিত্রদীপের পক্ষে। শিহরন হয়ে উঠেছিল তাঁর পরম শত্রু। অতএব চিত্রদীপও হয়ে উঠলেন অন্যতম সন্দেহভাজন।

তার সঙ্গে কিন্তু বনানীও—।

কারণ ঘটনাটা হঠাৎই মোড় নিল অন্যদিকে, যখন শিহরন ওঁদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকতে-থাকতে ঝুঁকে পড়লেন ডোনার দিকে। শিহরন যে তাকে নিয়ে প্রায়ই এখানে-ওখানে যাচ্ছেন এটা সহ্য করতে পারছিলেন না বনানী। বনানী শিহরনকে হাড়ে-হাড়ে চেনেন। শিহরন কতটা নারী-শরীরপিপাসু তা জানেন বলেই তাঁর ভেতরে জ্বলছে এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ, কিন্তু তা প্রকাশও করতে পারছেন না, কারণ শিহরনকে তিনিই ডেকে এনে জায়গা দিয়েছেন বাড়িতে এবং জীবনের চরম ভুলটি করেছেন। ইতিমধ্যে বনানী এও জেনেছেন, শিহরন ঈষিতা রায়ের সঙ্গেও ঘোরাঘুরি করছিলেন ইদানীং। এসব নিয়ে গোপনে প্রায়ই কথাকাটাকাটি চলছিল বনানী আর শিহরনের মধ্যে।

এহেন প্রেক্ষাপটে হঠাৎ চিত্রদীপের পিস্তল খোয়া যাওয়ায় ঘটনার গতিবেগ ঘুরে গেল অন্যদিকে। পিস্তল পুনরুদ্ধার হতে আরও গাঢ় হল রহস্য, কারণ দেখা গেল তাতে একটি কার্তুজ কম। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ল চিত্রদীপ বা বনানীর ওপর।

BanglaBook.org

এই খোয়া যাওয়া পিস্তলটি নিয়েও কিন্তু ঘটে গেল অনেক নাটক। চিত্রদীপের অনুমতি না নিয়েই বনানী আলমারি থেকে বার করেছিলেন পিস্তলটা। তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে শিহরন গিয়েছিলেন খড়্গপুরের ট্যুরে। খড়্গপুর থেকে ফেরার পর পিস্তলটা ঠিক কার কাছে ছিল তা পরিস্কার বোঝা গেল না। প্রথমে ভাবা হল, শিহরন ফেলে এসেছেন অলর্কের বাড়িতে। অলর্ক জানালেন, ওটা শিহরনদা রেখে এসেছেন মণীশ রায়ের ওখানে। মণীশ রায় কিন্তু অস্বীকার করলেন ব্যাপারটা। অথচ ঈষিতা জানালেন, মণীশ রায়ের কাছেই পিস্তলটা দেখেছেন উনি। এদিকে চিত্রদীপ বললেন, শিহরন খড়্গপুর থেকে ফিরে আসার দিন রাতেই অথবা তার পরদিন সকালে বেরুবার আগে বইয়ের র‍্যাকের পাশে ওটা রেখে গিয়েছিলেন। তারপর বনানী, না কি চিত্রদীপ, কার কাছে ওটা ছিল শেষ পর্যন্ত তাও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিস্তলটা পাওয়া গেল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। আমার অনুমান, সেদিন খড়্গপুর থেকে ফেরার পর যখন শিহরনদা গিয়েছিলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তখনও তাঁর কাছে পিস্তলটা ছিল, সেটা দেখিয়েও ছিলেন মণীশ রায়কে, কিন্তু রাতে সেটা বাড়ি এনে ভুলে রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের র‍্যাকের পাশে। পরদিন সকালে সেটা চিত্রদীপের চোখে পড়লেও কোনও কারণে তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে বনানীই কোথাও রেখেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এসে ঝামেলা শুরু করায় ভয়ে আর বার করেননি। কারণ, তাতে একটি কার্তুজ কম ছিল, শেষ পর্যন্ত ফেলে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, যাতে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরে যায়।

কিন্তু এত সব ঝামেলার মধ্যে আর-একটি যে জটিলতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তা আর-এক ত্রিভুজ রহস্যের নায়ক অলর্ক বসুর বিশাল ব্যাবসাসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড। ভবঘুরে, প্রায় কপর্দকহীন অলর্ক বসু ভোজবাজির মতো এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন রাতারাতি। অত টাকা হাতে পেয়ে প্রথম দিকে তাঁর মাথা ঘুরে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, ভালো একটি ব্যাবসায়ে নিয়োগ করবেন টাকাটা। সে-ব্যাবসার পরিধি এমনই বড় যে, একা অলর্কের পক্ষে তা সামাল দেওয়া অসম্ভব। এহেন অবস্থায় শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে অলর্কের আলাপ, তাতে অলর্ক তাঁর ওপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। শিহরনও উপলব্ধি করলেন, অলর্ককে ঠিকমতো গাইড করার একজন লোক দরকার, নইলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এত বড় ব্যাবসায়। এই ভাবনাটাই তাঁর পক্ষে কাল হল, কারণ ব্যাবসায় নামলেই শত্রুর সৃষ্টি হয় চারপাশে। শিহরনও এমন-এমন সিদ্ধান্ত নিতে লাগলেন, তাতে কারও-কারও স্বার্থের হানি হতে শুরু হল। যেমন হল চিত্রদীপ, কিংবা মন্দারের। হয়তো আরও অনেকের। সিদ্ধান্তগুলো যদি অলর্ক নিজে নিতেন, তাহলে হয়তো এত শত্রুর সৃষ্টি হত না, যতটা হল শিহরনের নাক গলানোয়। অলর্ক নিজেও কখনও-কখনও বিরক্ত হতে লাগল শিহরনের এই অতিরিক্ত ফোঁপরদালালিতে। খড়্গপুরে একবার কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে, এমনকী প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দুজন-দুজনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যার পরিণতি হয়তো এই ঘটনায় এনে দিত অন্য এক বাঁক, কিন্তু তার ডিটেলস পরে বলছি। চ্যালেঞ্জের মূল কারণ ব্যাবসা-সংক্রান্ত হলেও আসল লক্ষ ছিল ডোনা। শিহরন যেমন ঝুঁকেছিলেন ডোনার দিকে, অলর্ক বোসও চেয়েছিলেন ডোনা হবে তাঁরই এক্সক্লুসিভ।

আসলে অলর্ক বোস একটু রোমান্টিক স্বভাবের যুবক, কিন্তু তাঁর রক্তে বিদেশি-ছোঁয়া থাকার ফলেই হোক, অথবা একা-একা নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে ওঠার কারণেই হোক, তিনি অসম্ভব জেদি, একগুঁয়ে, যা ভাববেন, তাই-ই করতে হবে ওঁকে। ওঁদের কেন্দ্র করেও সৃষ্টি হয়েছিল তিন-তিনটি ত্রিভুজের। শিহরন-অলর্ক-ডোনা, শিহরন-মন্দার-ডোনা, এবং অলর্ক-মন্দার-ডোনা। আসলে ডোনা এমনই একটি মেয়ে যে একইসঙ্গে অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তাদের সময় দিতে পছন্দ করে। তাদের ভালোবাসে কি বাসে না তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু তার এই বোহেমিয়ানা অহেতুক সৃষ্টি করল প্রচুর জটিলতা। হঠাৎ একদিন আলাপ হওয়ার পর সে পছন্দ করে ফেলল মন্দার মিত্রকে। তাকে সময় দিতে লাগল, এমনকী তাকে নিয়ে তিনদিনের আউটিংও করে ফেলল

BanglaBook.org

প্রেমিক-প্রেমিকার ধাঁচে। পাশাপাশি শিহরনের সঙ্গে গড়ে উঠল এক অসম অস্বাভাবিক সম্পর্ক। ঠিক সেই মুহূর্তে পটভূমিকায় অলর্ক বোসের দুর্দান্ত আবির্ভাব বদলে ফেলল সমস্ত ছক। অলর্ক হঠাৎ ডোনাকে তার 'এ টু জেড'-এর এক্সক্লিউসিভ গার্ল হিসেবে যেমন পাবলিসিটি দিতে লাগল বিপুলভাবে, তেমনই তার পিছনে খরচ করতে লাগল হাজার-হাজার টাকা, আবার এই আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করল, ডোনাই হবে তার জীবনের এক্সক্লিউসিভ নারী।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই ঘনিয়ে এল শিহরন-মন্দার-অলর্কের ভেতরকার যুদ্ধ।

আর এটা তো জানা কথাই যে, যুদ্ধ যদি প্রেমঘটিত হয়, তবে তা হয়ে ওঠে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম লড়াই। যার মুখে পড়লে যে-কেউ কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে। সুতরাং শিহরন-হত্যার এই জটিল রহস্যের মধ্যে মণীশ-রণজয়-চিত্রদীপ-বনানীর মতোই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি অলর্ক বা মন্দারকে।

কিন্তু এর মধ্যে আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যা এই জটিলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধু জড়িতই নয়, জটিলতাকে জটিলতর করে তুলল। দুর্ঘটনার প্রথমটি হল মন্দার মিত্রের আহত হওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ভরতি করতে হল নার্সিংহোমে। শিহরন হত্যার কয়েকদিন পর পর্যন্ত তাঁকে নার্সিংহোমের কেবিনেই কাটাতে হল। দ্বিতীয়টি, অলর্ক বোসের ওপর হত্যার প্রচেষ্টা যা একটুর জন্যে লক্ষভ্রষ্ট হল। তৃতীয় ঘটনাটি হল, মণীশ রায়ের ওপর আজকের এই আক্রমণ।

আরও একটি ঘটনা এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলেও কারও ঠিক নজরে পড়েনি, পড়বার কথাও নয়, তা হল, বীরভঙ্গপুরের এক রাজবাড়ির রানিমার খুন হওয়া, তার জের হিসেবে তাঁদের হেড লেঠেল হরিশংকর চৌধুরির মৃত্যু। হরিশংকরের লাশ আবার পাওয়া গিয়েছিল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। পুলিশ সন্দেহ করেছে, এটা অলর্কের কাজ।

আমরা ভিডিও-রেকর্ডিং দেখার আগে একবার বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির ইতিহাসও শুনে নিই, তাতে এতগুলো খুনের মোটিভ সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আপনারা লক্ষ করেছেন কি না জানি না, কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরত্বে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে সেখানকার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বৃদ্ধা লাবণ্যপ্রভা মিত্র নাটকীয়ভাবে খুন হয়েছিলেন। সে-বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, এমনকী, স্থানীয় পুলিশও খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রাজবাড়িতে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অছিলায় বেড়াতে আসা জনৈক সাংবাদিককে। সাংবাদিকটির বিশেষত্ব হল, তার মুখময় কালো দাড়ি-গোঁফ, চোখে চশমা, এবং লেখে বাঁ-হাতে। তার কাছে ছিল একটি সাইডব্যাগ, তার মধ্যে কিছু জামাকাপড়, লেখার প্যাড ও একটি কলম। সেই সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধার কাছে সে রোজই গিয়ে বসত রাজবাড়ির প্রাচীন ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকারের গল্প শুনতে। তারপর হঠাৎ শেষ দিনে সে বৃদ্ধার কাছে প্রকাশ করে সে-ই বৃদ্ধার একমাত্র জীবিত নাতি, এই রাজবাড়ির শেষ জীবিত উত্তরাধিকারী, বৃদ্ধার এই যাবতীয় সম্পত্তি তারই প্রাপ্য। বৃদ্ধা কোনও কারণে তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। 'সাংবাদিক'টি আক্রোশে, ক্রোধে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। বৃদ্ধাকে খুন করে সেই মুহূর্তে পালিয়ে আসে বীরভঙ্গপুর ছেড়ে। আসার সময় তাড়াহুড়োয় সে বীরভঙ্গপুরে ফেলে এল সাংবাদিকের মোক্ষম অস্ত্র, লেখার প্যাড আর কলম—যে-দুটি থেকে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতার এই বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে সেই সাংবাদিককে খুঁজে বার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না সে তার কোনও ঠিকানা অথবা নির্দেশ কোনও হদিশ রেখে আসে রাজবাড়ির কোনও আশ্রিত-আশ্রিতার কাছে। তাকে চেনা আরও অসম্ভব হয়ে পড়ল, কেন না তার দাড়িটি ছিল নকল, সে চশমাও পরে না। শুধু যা লুকোতে পারেনি, তার লেখার প্যাড আর কলম।

যুবকটি হয়তো এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই চলে যেত, যদি না তার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়ে যেত হরিশংকর চৌধুরির। তার চশমা, কালো দাড়ি-গোঁফ না থাকা সত্ত্বেও তাকে একদিন

চিনে ফেলেন হরিশংকর। যুবকটিকে চিনে ফেলাই কারণ হল হরিশংকরবাবুর জীবনের সমাপ্তির। তাঁকে খুন হতে হল সেই মুহূর্তে। কারণ হরিশংকরবাবু তাকে চিনে ফেললে সেই যুবককে ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। শুধু তা-ই নয়, হরিশংকরবাবু বরাবর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁকে লাবণ্যপ্রভার নাতি হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে একটু দম নেওয়ার জন্য থামল গার্গী। মন্দার মিত্র হঠাৎ হেসে উঠে বলল, এত সব কথা আপনি জানলেন কী করে ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

গার্গী হাসল, এর জন্যে এ ক'দিন কম ছোটাছুটি করতে হয়নি, মন্দারবাবু। এমনকী ক'দিন আগে একদিন বীরভঙ্গপুরেও ছুটতে হয়েছে আমাকে। যাই হোক, ইতিমধ্যে পুলিশ অলর্ক বোসের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুঁজে পেল আর-একটা পিস্তল, এটা আবার বিদেশি মেকারের। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে-পিস্তলটির চেম্বারেও একটি কার্তুজ কম। অর্থাৎ, সেটা থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে। তাতে ব্যাপারটায় আরও জট পাকিয়ে গেল। চিত্রদীপ ও অলর্ক দুজনের পিস্তলেই একটি করে কাতুর্জ কম, তাহলে কার পিস্তল সেদিন সন্ধেয় ব্যবহৃত হয়েছিল শিহরনকে খুন করতে। দুটো পিস্তল যেহেতু দুই মেকারের, তাহলে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট দেখলেই তো বোঝা যাবে শিহরনের শরীরে কোন পিস্তলের গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা তো পুলিশ ইনস্পেকটর জেনেই গেছেন। তাহলে তিনি কেনই-বা সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করছেন না? পুলিশের তরফ থেকে কোনও উচ্চবাচ্য না হওয়ায় আমি নিজেই একদিন যোগাযোগ করলাম ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম তা আরও আশ্চর্যের। জানা গেল শিহরনের দেহ থেকে যে-গুলি পাওয়া গেছে তা এই দুটো পিস্তলের কোনওটা থেকেই ছোড়া নয়। সে-গুলি অন্য কোনও পিস্তলের। অর্থাৎ, আরও ঘোরালো হয়ে উঠল রহস্য।

হত্যাকারী কে, ততদিনে অবশ্য একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার সামনে। বীরভঙ্গপুরের রানিমাকে যিনি হত্যা করেছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত লেখার প্যাড আর কলম দেখে দুটি ক্লু আমার সামনে তখন পরিষ্কার। একটি, খুনি বাঁ-হাতে লেখে, কিন্তু তার হাতের লেখা চমৎকার, অলঙ্কারবহুল, আর তার ব্যবহৃত পেনটিতেও একটি বিশেষত্ব। সে-কথায় আমি পরে আসছি। আরও একটি ক্লু, তার মুখে কালো দাড়ি। কয়েকদিন আগে পুলিশ ইনস্পেকটর আমাকে জানালেন, এক বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি এক দাড়িওয়ালা যুবককে শিহরনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছেন। আবার সেদিন মণীশ রায়ও আমাকে বললেন, তাঁর পাশেই বসেছিল যে যুবক, তার মুখে দাড়ি ছিল, সে-ও শো-ভাঙার মুখে হঠাৎ তাঁর পাশ থেকে উঠে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যুবকটিকে অবশ্য তিনি চেনেন না।

আমাদের চেনাজানা যতজন সন্দেহভাজন আছেন, তাঁদের মধ্যে এক অলর্ক বসুর মুখেই দাঁড়ি-গোঁফ ভরতি।

অলর্ক বোস এই সময় হেসে উঠে বলল, তাহলে কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমিই এই খুনগুলো করেছি।

গার্গী হাসল, আপনাকে হত্যাকারী হিসেবে ভাবার কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে, মিঃ বোস। তার কিছু-কিছু কথা আমি আগেই বলেছি। হয়তো আপনিই ছদ্মবেশে বীরভঙ্গপুরে গিয়ে উত্তরাধিকারত্বর লোভে হত্যা করেছিলেন লাবণ্যপ্রভাকে। তাঁদের হরিশংকর চৌধুরির সঙ্গে আপনার শত্রুতা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছিল তা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। হরিশংকর বরাবর আপনার উত্তরাধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন, এবং শাসিয়েও ছিলেন— আপনি যে সত্যিই উত্তরাধিকারী নন তা ফাঁস করে দেবেন সবার কাছে। দ্বিতীয়ত, শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গেও আপনি জড়িয়ে ফাঁস করে দেবেন সবার কাছে। দ্বিতীয়ত, শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গেও আপনি জড়িয়ে পড়েছিলেন অনেকগুলো ঝামেলায়। ডোনার সঙ্গে আপনার মেলামেশা যেমন উনি পছন্দ

BoiRiBook.org

করেননি, আপনিও সহ্য করতে পারছিলেন না শিহরণদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করুক ডোনা। শিহরনদার সঙ্গে আপনার ব্যাবসা সম্পর্কিত ব্যাপারেও নানান জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল। হয়তো শিহরনদা চেয়েছিলেন আপনার এই বিশাল সম্পত্তির অংশও। সবচেয়ে বড় কথা, খড়্গপুরে আপনারা দুজনই গিয়েছিলেন দুটি পিস্তল নিয়ে, সে-দুটি পিস্তলেরই একটি করে চেম্বারে কার্তুজ নেই। আপনি অবশ্য সেদিন স্বীকার করেছেন, খড়্গপুরে দুজন-দুজনকে উদ্দেশ করে গুলি ছুড়েছিলেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কারও গায়ে গুলি লাগেনি। হয়তো সে-উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে ডান্স-ড্রামার শেষ দৃশ্যে পৌঁছে।

অলর্ক বোস হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, অদ্ভুত আপনার ব্যাখ্যা—।

—আমাদের সন্দেহভাজনদের মধ্যে আরও একজন আছেন তিনি মন্দার মিত্র।

মন্দার মিত্র আকাশ থেকে পড়লেন, আমিও?

—হ্যাঁ, ধরুন আপনিই ছদ্মবেশ ধারণ করে গিয়েছিলেন বীরভঙ্গপুরে, রানিমার নাতি বলে পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আপনাকে মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। মনে করুন, দাড়ি এবং চশমা দুটোই ছিল আপনার ছদ্মবেশ। পরবর্তীকালে অলর্ক বসুর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ফেরার সময় হরিশংকর চৌধুরি চিনে ফেলেন আপনাকে। আপনি তখন অলর্ক বসুকে টার্গেট করতে ঘুরঘুর করছেন সেখানে, তাঁর অফিসেও। সুতরাং হরিশংকরকেও হত্যা করতে হল আপনাকে। শুধু তাই নয়, তার লাশ আপনি ফেলে এলেন অলর্ক বসুর বাড়ির কাছাকাছি, যাতে পুলিশের নজর পড়ে তারই ওপর। কিন্তু আপনার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী তখন অলর্ক বসু, যে কিনা রাজবাড়ি গিয়ে আপনার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন ক'দিন আগে, বীরভঙ্গপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে। তাঁকে চিঠি দিয়ে শাসালেনও, ইয়োর ডেজ আর নাম্বারড। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, অলর্ক বসুকে মেরে আর লাভ নেই, তাতে তার দখল করা সম্পত্তি আর আপনার ভোগে আসবে না। বরং ইতিমধ্যে এ চেষ্টাও করতে লাগলেন, যাতে অলর্ক বসুর কয়েক লক্ষ টাকার ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজটা হাতানো যায় কোনও ভাবে। কিন্তু তাতে আপনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন শিহরন রায়চৌধুরি। তিনি বারবার চাপ সৃষ্টি করছিলেন অলর্ক বসুর ওপর, যাতে মন্দার মিত্রকে কাজটা না দেওয়া হয়। আপনি তা জানতে পেরে প্রথমেই ঠিক করলেন শিহরন রায়চৌধুরিকে সরিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী থেকে। সিদ্ধান্ত নেওয়ামাত্র আপনি হঠাৎ একদিন শরীরে একটা মাইনর ইনজুরি করে ভরতি হলেন নার্সিংহোমে। ডোনা আপনার সঙ্গে নার্সিংহোমে দেখা করতে গিয়ে ড্যান্স-ড্রামার একটি কার্ড দিয়ে আসে নিছক সৌজন্যবশত। আপনার সামনে এসে গেল সুবর্ণসুযোগ। ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই কার্ড নিয়ে আপনি ফাংশনের দিন চলে গেলেন অডিটোরিয়াম হলে, বসলেন মণীশ রায়ের ঠিক পাশেই। আপনার ঠিক সামনের চেয়ারে ছিলেন শিহরন রায়চৌধুরি। যিনি শো শেষের ঠিক আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন সামনে, ডোনাদের অভিনয়কে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন বলে। ভিড়ের মধ্যে আপনিও সিট ছেড়ে এগোলেন আপনার কোমরে গোঁজা পিস্তলটি নিয়ে। তারপর—।

—বাহ্-বাহ্, মন্দার মিত্র ব্যঙ্গের সুর মিলিয়ে একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠল গার্গীকে লক্ষ করে, ভালো বানিয়েছেন তো গল্পটা। আপনি একজন ভালো স্টোরি-টেলার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অন্যের চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন করবেন না। শিহরনদা মার্ডার হওয়ার সময় আমি নার্সিংহোমে অচেতন।

—কিন্তু মন্দারবাবু, নার্সিহোমের ব্যাপারটা একেবারে সাজানো। ওই নার্সিংহোম থেকে যে আপনি যখন-তখন বেরোতে পারতেন, তা আমার জানাই আছে। শিহরনদার মার্ডারের সময় আপনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েছিলেন কি না তাও জানা গেছে ওই নার্সিংহোমে যোগাযোগ করে। ওদের রেজিস্টারে নোট করা আছে আমি দেখে এসেছি। যাই হোক, সেদিন ফাংশনের হলে যিনি আপনাকে

BanglaBook.org

নজরে রেখেছিলেন এবং পরে ডোনাদের বাড়িতে চিনলেন তিনি মণীশ রায়। ফলে হত্যাকারীর পরবর্তী টার্গেট হলেন মণীশ রায়ই। এখন তাহলে আমরা ভিডিও রেকর্ডিঙের দুটি টেপই একবার চালিয়ে দেখে নিই, ছবি দেখে মণীশ রায়ের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায় কি না। আমার এতক্ষণের অনুমান কিছু-কিছু মিলছে কি না তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে—।

গার্গী সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে হলঘরের এককোণে রাখা টি.ভি.-র স্ক্রিনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল রুদ্ধশ্বাসে।

স্ক্রিনে তখন দোতলার ক্যামেরার দৃশ্য দেখাচ্ছে। জমজমাট আলোর মধ্যে প্রদর্শনী কক্ষে যাওয়া-আসার ভিড়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একে-একে অতিথিরা চলেছেন প্রদর্শনীর দিকে। কেউ-কেউ ফিরে আসছেন তাঁদের দেখা শেষ করে। গার্গী তার ভিজিটরস বুক নিয়ে বসে আছে সিঁড়ির প্রায় কাছাকাছি। মাননীয় অতিথিদের ফিরে আসতে দেখলেই সে অনুরোধ করছে ভিজিটরস বুকে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। অনেকেই নীচু হয়ে দু-একটা লাইন লিখছেন, কেউ হেসে বললেন, এখনও সব দেখা শেষ হয়নি, পরে লিখছি। কেউ আবার লেখার অনুরোধ এড়িয়ে যাচ্ছেন। খানিক পরেই দেখা গেল মণীশ রায়কে। মণীশ রায় তার আগেই তাঁর মন্তব্য লিখে গেছেন, তাই তাঁকে আর অনুরোধ জানাল না গার্গী, পরিবর্তে মিষ্টি হেসে বলল, 'এখনই কি চলে যাবেন, স্যার?' মণীশ রায় হেসে বললেন, 'যাব, ঈষিতা কোথায় আছে আগে খুঁজে বার করি। সে বোধহয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।' মণীশ রায়ের ঠিক পিছনেই ছিলেন একজন অপরিচিত মহিলা, তাঁকে এর আগে দেখেনি গার্গী, তাই শুধু মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনি কি কিছু লিখবেন? তিনি ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলেন, তাঁর ঠিক পিছনে মন্দারকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে। তারপর রণজয় দত্ত। হঠাৎ অলর্ককে দেখা গেল উঠে আসতে।

তার একটু পরেই লোডশেডিং। লোডশেডিং পর্ব শেষ হলে দেখা গেল অনেকেই ছুটে আসছেন দোতলার ঘরগুলো থেকে। কিন্তু তার আগেই তো ঘটে গেছে সেই নৃশংস ঘটনাটি!

গার্গী উঠে এসে বদলে দিল ক্যাসেট। এরপর একতলার সিঁড়ির গোড়ায় যে-ক্যামেরা ছিল তার দৃশ্য ভেসে উঠল টি.ভি.-তে। সবাই আর-একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্ক্রিনের দিকে।

আবার সেই অতিথিদের ক্রমাগত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার দৃশ্য। চমৎকার পোশাকে সেজেগুজে এসেছেন সবাই। প্রত্যেকেই দারুণ খুশির মেজাজে আছেন। কত যে দর্শক এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন তা সত্যিই গুনে শেষ করা যায় না, কেউ উঠছেন কেউ নামছেন। কেউ-কেউ পাশাপাশি গল্প করতে-করতে উঠছেন বা নামছেন। টুকরো-টুকরো শব্দও ধরা পড়েছে রেকর্ডিঙের সময়। 'চমৎকার, দারুণ হয়েছে।' 'এতদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির একজিবিশন ঠিক ফলো করিনি আমরা', ইত্যাদি নানান সব মন্তব্য।

বেশ অনেকক্ষণ পর দেখা গেল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। তাঁর পিছনেই সেই অপরিচিত মহিলা, তারপর আগে-পরে মন্দার ও রণজয় দত্ত। কাছাকাছি অলর্ক বসু। পরক্ষণেই নিভে গেল স্ক্রিনের ছবি। একটা বিরাট শব্দ, আর আর্ত চিৎকার। হুড়মুড় করে কেউ নেমে এল যেন নীচে। বেশ খানিকক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল সিঁড়ির ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। তাঁর বাঁ-দিক থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তারপর হুড়মুড় করে ওপর দিকে ছুটে আসছেন কেউ-কেউ, নীচ থেকেও অনেকে—তাদের মধ্যে মন্দারও।

দেখতে-দেখতে গার্গী বলে উঠল, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কে ওপরের দিক থেকে ছুটে নেমে আসছেন, কেই-বা নীচের দিক থেকে ছুটে ওপরে যাচ্ছেন। যিনি ওপরে ছিলেন আলো নেভার আগে, আলো জ্বালার পর কেন তিনি নীচে থেকে ওপরে ছুটে গেলেন সেটাই নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। মণীশ রায়কে কে খুন করতে পারেন, তা নিশ্চয় আপনারা অনুমান করতে পারছেন?

গার্গী মুখে না বললেও সবাই বুঝতে পারলেন, মন্দার মিত্রের কথাই বলতে চাইছে সে।

BanglaBook.org

ভিডিও-রেকর্ডিং শেষ হতেই পুলিশ ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র বলে উঠলেন, ভিডিও-টেপে দারুণ ধরেছেন কিন্তু ব্যাপারটা। কিন্তু আপনারা কী করে জানলেন, আজই এরকম একটা মিসহ্যাপ হবে?

গার্গী হাসল, আমরা জানতাম না এরকম মিসহ্যাপ হবে আজ। ব্যাপারটা একেবারেই কাকতালীয়। অলর্ক বসু নেহাত খেয়ালবশেই এই রেকর্ডিঙের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইনস্পেকটর তবু আবারও প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে, বীরভঙ্গপুরের ঘটনার সঙ্গে কলকাতার ঘটনা আপনি মেলালেন কী করে?

গার্গীর কাছে সে-প্রশ্নের জবাবও তৈরি। হেসে বলল, তাহলে বীরভঙ্গপুরের কাহিনির আসল রহস্য পরিষ্কার করি এবার। বীরভঙ্গপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বিপুল সম্পত্তির মালিক, তবু তাঁকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রকন্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষজীবনে প্রায় নিঃসন্তানের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি পুত্রকন্যা অল্পবয়েসে মারা যায়। তিনটি সন্তান জীবিত ছিল, তার মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়ার পর খবর এসেছিল সে-ও মারা গিয়েছে। বাকি দুটি কন্যা বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের বিয়ের কথা যখন ভাবাভাবি হচ্ছিল, দুটি কন্যাই পরপর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এমন দুই যুবককে, যারা কেউ-ই রাজবাড়ির পছন্দের নয়। একজন রাজেশ্বরী, সে বিয়ে করেছিল রাজবাড়িরই আশ্রিত একটি লোককে যে একাধারে মাতাল ও লম্পট, শুধু তা-ই নয়, তার অন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। অন্যজন উর্বশী, সে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ এক বিদেশি যুবককে পছন্দ করে, তার সঙ্গেই কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে এমন খবর এসেছিল রাজবাড়িতে। অতঃপর কোনও মেয়ের সঙ্গেই আর রাজবাড়ির সম্পর্ক ছিল না। রাজা জীবিত থাকতে তাদের নামও কখনও উচ্চারিত হয়নি রাজবাড়িতে। এমনকী রানিমাও কখনও মেয়েদের নাম মুখে আনতেন না।

আশ্চর্যের কথা এই যে, দীর্ঘকাল পরে যে-যুবক রাজবাড়িতে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে সম্পত্তির লোভে হানা দিয়েছিল, সে রাজেশ্বরীরই পুত্র। কিন্তু রানিমা সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন রাজেশ্বরী এক বিবাহিত লম্পটের সঙ্গে পালানোয়। ফলে তার গর্ভজ সন্তানকেও ক্ষমা করতে পারেননি। তাতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ সেই যুবক উত্তেজনার মাথায় খুন করেছিল রানিমাকে। তার পরের কাহিনিও কম রোমাঞ্চকর নয়। রানিমা খুন হওয়ার পরে অন্য যে-যুবক রাজবাড়ির উত্তরাধিকার দাবি করে হাজির হয়েছিল বীরভঙ্গপুরে, সে রানিমার আর-এক কন্যা উর্বশীর একমাত্র পুত্র।

আপনারা হয়তো অনুমান করেছেন, এই দুই যুবকের প্রথমজন মন্দার মিত্র, অন্যজন অলর্ক বোস।

গার্গী একটু থামতেই উপস্থিত শ্রোতাদের ভেতর কেউ-কেউ বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য!

কিছু গুঞ্জন, ফিসফাসও শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। মন্দার মিত্রকে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেল।

আর-একটু বলার ছিল গার্গীর। কিছুক্ষণ দম নিয়ে সে বলল, মন্দার মিত্র একদিন একটা প্রশ্ন করে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন আমাদের। অলর্ক বোসের পিতা ছিলেন এক আর্মেনীয়, সেক্ষেত্রে তাদের পদবি বোস হল কী করে। অলর্ক তার উত্তর দিয়েছেন সেদিন। সেই বিদেশি ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী উর্বশীর রূপে, গুণে, ভালোবাসায় এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, নিজের বিদেশি পদবি বদলে কিছুটা মজা করেই উর্বশীর পালটি ঘর হিসেবে নিজের নামের পাশে বোস পদবি লিখতেন বরাবর। ছেলের নামও রেখেছিলেন সেভাবে। ঘটনাটি অভিনব সন্দেহ নেই।

অলর্ক এতক্ষণে তার মুখে সেই বিখ্যাত সরল হাসিটি ফুটিয়ে বলল, এত ইতিহাস কিন্তু আমিও জানতাম না, মিস মুখার্জি। আপনি আমাকেও সারপ্রাইজ দিলেন।

গার্গী হাসল, অবাক করার মতোই ঘটনা। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব

BanglaBook.org

রাজবাড়িতেই এমন আশ্চর্য সব রূপকথা লুকিয়ে থাকে। এ-যুগের পরিত্যক্ত রাজবাড়িগুলো খুঁজলে আবিষ্কৃত হতে পারে এহেন দুর্ধর্ষ সব কাহিনি। এহেন অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা আরও উসকে দিয়েছে মন্দার মিত্রের বীরভঙ্গপুরে অভিযান। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির কাহিনি খুঁজে বার করতে আমাকে আরও সাহায্য করেছেন সে-বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, তার সঙ্গে সেই সাংবাদিক ওরফে মন্দার মিত্রের সংগ্রহ করা তথ্যাবলী, যা লেখা আছে ওখানকার থানায় একজিবিট হিসেবে রক্ষিত প্যাডটিতে।

বলতে-বলতে মন্দার মিত্রের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে গার্গী বলল, আপনি কিন্তু কোনওভাবেই বাঁচতে পারছেন না, মিঃ মিত্র। আপনি বরাবর বাঁ-হাতে লেখেন। আপনার প্যাডের সেই হাতের লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি নার্সিংহোমের বেডে রাখা আপনার ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে। তা ছাড়া আপনার যাবতীয় টেন্ডারের কাগজের লেখালেখি সব বাঁ-হাতে লেখা। শুধু সেদিন আমাকে আপনার অফিসের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন যে-কাগজটিতে, তাতে ছিল ডানহাতের লেখা। গোটা-গোটা অক্ষরের সেই লেখা পড়ে আশ্চর্যই হয়েছিলাম সেদিন। কারণ ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে তার কোনও মিলই ছিল না। পরে বুঝেছিলাম, বীরভঙ্গপুরের ঘটনাটা গোপন করতে আপনি অন্যের সামনে ডানহাতে লেখার চেষ্টা করছিলেন ইদানীং। আপনার বিরুদ্ধে আর-একটি প্রমাণও আছে—তা আপনার কলমগুলি। ডটপেনই হোক, বা ফাউন্টেন পেনই হোক, তার পেছনদিকটা দাঁত দিয়ে চিবোনো আপনার অভ্যাস। এই মুহূর্তে আপনার পকেটে যে-কালো রঙের ডটপেনটি আছে, তাতেও নিশ্চিত দাঁতের দাগ থাকবে, যে-দাঁতের কারুকাজ আমি দেখে এসেছি বীরভঙ্গপুরের থানায় জমা রাখা ফাউন্টেন পেনটিতেও। সব মিলিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনিই সেই অপরাধী। শুধু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম চিত্রদীপ চ্যাটার্জির খোয়া-যাওয়া পিস্তল, কিংবা অলর্ক বসুর পিস্তলটির জন্যে। পরে যখন জানতে পারলাম, শিহরনদাকে খুন করা হয়েছে তৃতীয় কোনও পিস্তল দিয়ে, তখনই নিশ্চিত হই, খুনি চিত্রদীপ, বনানী বা অলর্ক নয়, অন্য কেউ।

বলে একমুহূর্ত থামল গার্গী, আচ্ছা, মিঃ ইনস্পেকটর, আপনি একটু দেখবেন মন্দার মিত্রের ডটপেনটি? আর এ-বাড়িতে সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটিতে ক'টা কার্তুজ আছে?

মন্দার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে তুষারশুভ্র মিত্র তার পকেট থেকে বার করলেন যে-কলমটি, তাতেও দাঁতের দাগ।

পিস্তলের চেম্বার খুলতে দেখা গেল, তাতে তিনটি গুলি কম। সম্ভবত শিহরন হত্যার পর অলর্ক বোসকেও ছোড়া হয়েছিল আর-একটি গুলি। এ ছাড়া আজ আর-একটি।

গার্গী বলে উঠল, তাহলে মন্দার মিত্রের সত্যিই দুর্ভাগ্য। অমন বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা কিন্তু তাঁরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনায় ভোগেন বলে তাঁকে খেসারত দিতে হল আজ। শেষ পর্যন্ত অলর্ক বোসই জিতলেন।

অলর্ক বোস উঠে দাঁড়াল সেইমুহূর্তে, তার সেই ভুবন-ভোলানো হাসি ছড়িয়ে বলল, এখনও পুরোপুরি জিতিনি কিন্তু। আই ওয়ান্ট ডোনা চ্যাটার্জি অ্যাজ মাই এক্সিকিউসিভ—।

BanglaBook.org

কৃষ্ণাপ্পার শিকে

অমিত মুখোপাধ্যায়

গত রোববার প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে বীরভদ্র রায়চৌধুরি আবার ওঁর বাড়িতে আমায় আমন্ত্রণ জানালেন। আগেও বেশ কয়েকবার উনি আমায় বাড়িতে ডেকেছেন, আর আমি 'পরে আসব' বলে এড়িয়ে গেছি। ভদ্রতার খাতিরে সেদিন ভেতরে যেতেই হল। প্রথমে সিঙাড়া সহযোগে চা পানের পরে বীরভদ্র আমায় বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন—সত্যিই সুন্দর আর সাজানো বাড়ি। ওঁকে তা বলতে, প্রশ্ন করলেন, 'বাড়িটা তো ভালো লেগেছে বললেন, তা বাড়ির নামটা আপনার কেমন লাগল?'

বীরভদ্রের বাংলোটার নাম 'কৃষ্ণাপ্পা প্রসাদ'। প্রশ্নটাতে একটু আশ্চর্য হলেও বলি, 'কেন, ভালোই তো। তবে নামটায় যেন একটা দক্ষিণী ছাপ রয়েছে বলে মনে হয়।'

বীরভদ্র বললেন, 'আমি বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও আমার বাড়ির নামে দক্ষিণী ছাপ হল কেন বলুন তো?'

আর-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। তাই পালটা প্রশ্ন করি, 'মনে হচ্ছে আপনার বাড়ির নামকরণের পিছনে একটা গল্প রয়েছে, তাই না?'

বীরভদ্র বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। তবে গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অবিশ্বাস আর ঠাট্টা-তামাশার শিকার হতে হবে বলে এতদিন তা কাউকে বলিনি। এ ক'দিন আপনার সঙ্গে মিশে বুঝেছি যে, আপনি অন্যদের মতো নন, তাই ঘটনাটা আপনাকে শোনাব। তবে তা বলতে সময় লাগবে, তাই আজ দুপুরে চলে আসুন না।'

দুপুরে আসব কথা দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হই। বীরভদ্র রায়চৌধুরির সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দেড় মাসের। এখানে উঠে আসবার পর, প্রাতর্ভ্রমণের সময় প্রতিদিনই ভদ্রলোককে রাস্তায় দেখতাম। শুরু থেকেই ওঁর ক'টি জিনিস আমার নজর কাড়ে। প্রথমটি হল, ভদ্রলোকের 'বাঘা' নামের বৃদ্ধ অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কুকুরের নামটাই শুধু খাঁটি বাংলা নয়, কুকুরের সঙ্গে ওঁর কথোপকথনও চলে বাংলা ভাষায়। মহারাষ্ট্রের এক শহরতলিতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বাংলা ভাষা শুনলে তা যে-কোনও বাঙালিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দ্বিতীয়টি হল, ভদ্রলোকের হাতের ছড়ি। সেটা যে ওঁর কুকুরকে সামলানোর জন্য নেওয়া নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। ছড়িটা কাঠের—নানারকম বাহারি কাজ করা। এ-ধরনের ছড়ি সাধারণত নজরে পড়ে না। আমার ধারণা যে, সেটা খুবই পুরোনো—অ্যান্টিক জাতীয় কিছু। তৃতীয়টি আমার কাছে একটু হাস্যকর লাগলেও তা নিঃসন্দেহে নজরে পড়বার মতো। সেটি হল ওঁর বাড়ির নেপালি দারোয়ান—আসতে যেতে সে ওঁকে প্রকাণ্ড সেলাম ঠোকে।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও নিজের অমিশুক স্বভাবের জন্য আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে উঠতে পারিনি। একদিন সকালে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলাম। ভদ্রলোক নিজের থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। সম্ভবত আমাদের দুজনেরই পরস্পরকে বেশ ভালো লেগেছিল, তাই তার পরদিন থেকে আমরা একসঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতে শুরু করলাম। সেদিন থেকে বীরভদ্রের সঙ্গে আমার সকালটা কাটে। প্রতিদিনই আমাদের নানারকম গল্পগুজব হয় বটে, তবে ওঁর বাড়ি সম্বন্ধে কোনও কথা উনি আমায় আগে বলেননি।

সে যাই হোক, ঠিক দুপুর একটায় বীরভদ্রের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ওঁর নিজস্ব বসবার ঘরে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসবার পর বীরভদ্র শুরু করলেন।

BanglaBook.org

আজ থেকে বারো বছর আগেকার কথা। আমার চাকুরি জীবনের সেই সময় একটা অদ্ভুত জিনিস বেচতে হত আমাকে—শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি। এই চুল্লি বেচতে দেশের এ-কোণ থেকে

ও-কোণ অবধি ছুটে বেড়াতাম। দৌড়োদৌড়ি থাকলেও কাজটা আমার ভালোই লাগত।

সেবার কেরলের একটা ছোট্ট শহর থিরুভাল্লা থেকে একটা চুল্লির অর্ডার পেয়েছিলাম। চুল্লির দামের কিছুটা অংশ যদিও অগ্রিম পাওয়া গেছে, কিন্তু তার সিংহভাগটাই বাকি। চুল্লিটা থিরুভাল্লার শ্মশানে বসিয়ে দিয়ে, একটি শব দাহ করে শহর কর্তৃপক্ষকে চুল্লির কার্যকুশলতার প্রমাণ দিয়ে তবেই সকেয়া টাকাটা পাওয়া যাবে। তাই চুল্লি বানানো শেষ হতেই সেটা নিয়ে থিরুভাল্লা রওনা হয়ে গেলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি, শহর-মিউনিসিপ্যালিটির আসন্ন নির্বাচনের জন্য শহরের অবস্থা থমথমে হয়ে রয়েছে। ভেবেছিলাম চুল্লিটা চালু করে দিয়ে চটপট ফিরে আসতে পারব। কিন্তু প্রথম দিনেই বুঝতে পারলাম যে, কাজটা সোজা হবে না। নির্বাচনের কাজে শুধু নেতারা নন, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারাও ব্যস্ত।

প্রথম দিনটায় কোনও কাজই হল না। থিরুভাল্লা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার অতি সজ্জন ব্যক্তি। দ্বিতীয় দিনে তাঁর মধ্যস্থতায় শ্মশান বিভাগের কর্তারা একটু তৎপর হয়ে, তাঁদের নতুন শ্মশানে চুল্লিটি বসাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্মশানটা নতুন তৈরি হচ্ছে, সেখানে তখনও শব দাহ হয় না। সেজন্য একদিক থেকে কাজের সুবিধে হলেও নানা জিনিসের অভাব আর যাতায়াতের অসুবিধের জন্য শুধু চুল্লি বসাতেই পুরো দুটো দিন গেল। ইলেকট্রিকাল কানেকশন দিতে আরও একদিন।

চুল্লি বসাতেই চারটে দিন কেটে গেল। এবারে একটা শব ঠিকঠাকভাবে দাহ করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের দেখিয়ে দিতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু সেটা করতে ক'দিন লাগবে কে জানে। দাহ করবার জন্য একটা বেওয়ারিশ লাশ দরকার। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের সহায়তা ছাড়া তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। এমনিতেই তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া মুশকিল, তার ওপর নির্বাচনের জন্য এখন তাদের দর্শন মেলাই ভার।

আরও দুটি দিন কেটে গেল কিন্তু লাশ জোগাড় হল না। এই এক সপ্তাহে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় লড়াইয়ের পর্যায়ে নামায় আমাদের কাজটা আরও মুশকিল হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে এমন একটা খবর কানে এল যে, আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। চুল্লি বসানোর ব্যাপারটা নিয়ে বিপক্ষের রাজনৈতিক নেতারা না কি একটা গোলমাল পাকাবার তালে রয়েছেন। প্রচার চালানো হচ্ছে যে, এখনকার মিউনিসিপ্যালিটির নেতারা অনেক টাকাকড়ি নিয়ে অনৈতিকভাবে এ-কাজটা আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ঠারেঠোরে চাওয়া সত্ত্বেও আমরা কাউকে ঘুষ দিইনি বলে মিউনিসিপ্যালিটির কিছু লোক আমাদের ওপর অখুশি ছিল। এই অপপ্রচারের পিছনে যে তারাই রয়েছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু বুঝলেই বা কী করবার আছে? এই ডামাডোলের মধ্যে এ-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া, ভস্মে ঘি ঢালার সমান।

কমিশনার সাহেবের পরামর্শ নিতে ওঁর অফিসে হাজির হয়েছিলাম। চুল্লি বসানোর ব্যাপার নিয়ে রাজনৈতিক অপপ্রচারটা ওঁর কানেও পৌঁছেছে। উনি বললেন, সে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই—একটা শব দাহ করে চুল্লিটি কার্যকর হয়েছে দেখাতে পারলেই তিনি আমাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তবে শব দাহের জন্য প্রয়োজনীয় বেওয়ারিশ লাশ জোগাড় করা যে এখন সহজ হবে না সে-কথাও তিনি বললেন। শুধু মিউনিসিপ্যালিটির ভরসায় না থেকে বেওয়ারিশ লাশ জোগাড়ের প্রচেষ্টায় আমাদেরও একটু তৎপর হতে বললেন উনি। জানা গেল যে, এখানকার সরকারি হাসপাতালের 'ডিন' ও মর্গের অধিকারী ডাক্তার, দুজনেই অতি সজ্জন ব্যক্তি ও কমিশনার সাহেবের বিশেষ পরিচিত। বেওয়ারিশ লাশ জোগাড় করবার

BanglaBook.org

জন্য এঁদের দুজনের সঙ্গে উনি আমাদের সরাসরি আলোচনা করে দেখতে বললেন।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তাতে আমরা আরও মুষড়ে পড়লাম। প্রথম দুটো বেওয়ারিশ লাশ জেলার মেডিকেল কলেজে পাঠানোর জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সেদিনই ওঁদের কাছে নির্দেশ এসেছে। এ-নির্দেশ অনুসারে আমাদের লাশ পেতে তিন-চার সপ্তাহ লাগাও অসম্ভব নয়। ঘটনাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না বলা মুশকিল হলেও আমরা অসহায়। তবে একটা আশার কথা যে, মেডিকেল কলেজের কাজের জন্য লাশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়াটা জরুরি। আমাদের সে-প্রয়োজন নেই। তাই যেমন-তেমন লাশ এলেও তা আমাদের দিতে ওঁদের কোনও অসুবিধা নেই। তবে তার জন্য সেভাবে আমাদের একটা আবেদন থাকা দরকার।

আবেদনটা সঙ্গে-সঙ্গে লিখে দিলাম। ওঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করবেন, এ-আশ্বাস দিলেও আমরা তেমন আশ্বস্ত হতে পারি না। কাজ চালানোর জন্য শুধু একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে সঙ্গে রেখে বাকি কোম্পানির সকলকে পরদিনই ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। আমাদের দুজনেরও আর চার-পাঁচ দিনের বেশি এখানে থাকা সম্ভব হবে না। এর মধ্যে লাশ জোগাড় না হলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তারপরে কবে লাশ জোগাড় হবে আর কখনই-বা চুন্নির কার্যকুশলতার প্রমাণ দেখিয়ে টাকাপয়সা উশুল করতে পারব তা ভগবানই জানেন! নির্বাচনের পর মিউনিসিপ্যালিটির নতুন নগরসেবকদেরই বা কীরকম মনোভাব হবে, তা কে জানে!

পরদিনও আমাদের উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একঘেয়েমি কাটাতে বিকেলবেলা তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম। বারকয়েক এখানে এলেও শহরটা ঘুরে দেখবার কখনও সুযোগ হয়নি। ভাবলাম, পায়ে হেঁটে আশপাশটা একটু ঘুরে আসি। হাঁটাও হবে, আর তার সঙ্গে শহরটাও একটু দেখা হয়ে যাবে।

শহরের যেদিকটায় লোকবসতি কম, সেদিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর খেয়াল হল যে, গত পনেরো মিনিটে একটাও বাড়ি-ঘর নজরে পড়েনি। এদিকটায় চারদিকেই শুধু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। পিছনে চেয়ে দেখি বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বাড়ি-ঘর ইতস্তত ছড়ানো। সন্ধ্যা নেমে আসছে, ঘরে ফিরতে থাকা পাখিদের কলকাকলিতে চারদিক ভরে গেছে। পাখিদের ঘরে-ফেরা দেখতে আর তাদের ডাক শুনতে এতই বিভোর হয়ে ছিলাম যে, সন্ধ্যাটা কখন গাঢ় হয়ে উঠেছে তা খেয়াল করিনি। খেয়াল হতে ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। চটপট হোটেলের পথে পা বাড়াই।

বড়জোর ছ-সাত কদম চলেছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল, 'জরা সুনো না, বাবুজি।'

ফিরে দেখি, একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক আমায় হাত নেড়ে ডাকছে। লোকটার পরনে একটা ময়লা গোছের ধুতি। গায়ে কী আছে তা বোঝবার উপায় নেই, কারণ, তার মাথা থেকে হাঁটু অবধি একটা কালো কম্বলে ঢাকা। শীতকাল হলেও ঠান্ডা তো এখানে নেই বললেই হয়, তাই কম্বল জড়ানোটা একটু বেখাপ্পা ঠেকছিল। তা ছাড়া, ভাঙা-ভাঙা হলেও লোকটাকে হিন্দিতে কথা বলতে শুনে একটু অবাকও হয়েছিলাম, কারণ, হিন্দি ভাষাটা এখানে খুব কম লোকই বলতে পারে। মনে হয়, সে-কারণেই হয়তো লোকটির প্রতি একটু ঔৎসুক্যও জেগে উঠেছিল।

তাহলেও নিজের গলাটা নিজেরই যেন একটু রূঢ় শোনাল। বললাম, 'কী ব্যাপার, ভাই?'

BanglaBook.org

'জরা সুনো না, বাবুজি। কুছ জরুরি বাত করনি হ্যায়।'—লোকটির গলায় অনুনয়ের সুর।

নিজের রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। লোকটির অনুনয় সেজন্য কোনওমতেই অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। দু-পা এগিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?' এর উত্তর সবই সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে দিয়েছিল। আমি অবশ্য তার বাংলা তর্জমা করেই বলব।

একটু এদিকে এসো না, বাবুজি। তোমার সমস্যার কথা আমার জানা আছে। একজন সাধারণ মানুষ হলেও আমিও হয়তো তোমার মুশকিল আসান করতে পারব।

লোকটার কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। আমার সমস্যার কথা তো এর জানবার কথা নয়—কিন্তু কে জানে, সত্যিই যদি কোনও উপকার করতে পারে। কথায় বলে, ডুবতে বসলে লোকে খড়কুটোও আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই ভেবে আরও দু-পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'বলো তো আমার সমস্যাটাই বা কী, আর কীভাবেই বা তুমি তার সমাধান করতে পারো?'

'তোমরা নতুন শ্মশানে চুল্লি বসাতে এসেছ। চুল্লি বসানো হয়ে গেলেও, সেটা চালু না করে দিলে তোমাদের কাজ শেষ হচ্ছে না। এই সুযোগে, ভোটের জন্য ব্যস্ততা দেখিয়ে ও আরও নানারকমভাবে তোমাদের নাকাল করবার চেষ্টা চলছে। এসবের পিছনে যে কে আছে তা তোমাদের জানা নেই। এ সবই হচ্ছে চ্যারিয়নের ইশারায়। সবাই জানে, কিন্তু ভয়ে সকলের মুখ বন্ধ। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই ওর হাতের মুঠোয়। তা ছাড়া, সব রাজনৈতিক দলেই ওর লোক আছে। ছ'মাস আগে যখন তোমাদের চুল্লি বসানোর কাজটা দেওয়া হয়, তখন মাসখানেক চ্যারিয়ন শহরে ছিল না। চুল্লি বানানোর জন্য কোনও কোম্পানির হয়ে সুপারিশও করেনি চ্যারিয়ন। চুল্লির অর্ডারটা তোমরা তাই সহজেই পেয়ে গেলে। ইতিমধ্যে এ-কাজটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য চ্যারিয়ন আর-একটা কোম্পানির থেকে পয়সা নেয়। ভেবেছিল, ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করবে। ফিরে এসে যখন শুনল যে, কাজটা তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ও রেগে কাঁই হয়ে গেল। তা শুধু ওর আগাম নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হল বলে নয়, ওর এতদিনের প্রতিপত্তি হেয় হয়ে গেল বলে। এ-ঘটনার পরে অনেকেই আর আগের মতো ওর ওপর ভরসা করবে না, তা চ্যারিয়ন ভালোমতোই বুঝেছিল। তোমাদের কাজটা পুরোপুরি পণ্ড করা যাবে না তা জানা থাকলেও, নানারকম বাধায় তোমাদের উত্যক্ত করে ও সকলকে জানাতে চাইছে যে-চ্যারিয়নের সাহায্য ছাড়া এ-শহরে কাজে নামলে কীরকম ভুগতে হয়।'

চ্যারিয়নের সম্বন্ধে এ-ধরনের কিছু কথা লোকের মুখে আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু সে-ই যে আমাদের পিছনে লেগেছে সে-ধারণা ছিল না। এ থেকে অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এ-লোকটা যে-ই হোক না কেন, আমাদের সমস্যাটা এর জানা।

বললাম, 'তোমার কথা তো বুঝলাম, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কী, আর তুমিই বা কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারো? তা ছাড়া, কেনই-বা তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাইছ?'

লোকটি বলে, 'তোমার যে একটু সন্দেহ হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, বাবুজি। তাই তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিই। আমি শহরতলির একটা স্কুলে পড়াতাম। সেখানে একটা ঘোরতর অন্যায় চোখে পড়ায় তার প্রতিবাদ করি। অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া তো দূরের কথা, প্রতিবাদ জানানোর ফলে আমার চাকরিটাই চলে গেল। পরে জানতে পারি যে, আমার চাকরি যাওয়ার পিছনে ছিল এই চ্যারিয়নই। সেদিন থেকে আমি চ্যারিয়নের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছি। এতদিনে আমার সে-সুযোগ এসেছে। তা ছাড়া, তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি

BanglaBook.org

তো কোনও অন্যায় কাজ করছি না। তোমাদের সাহায্য করলে চ্যারিয়নের প্রতিপত্তি কমবে। এ-শহরের অনেক লোক তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারবে।'

লোকটা কেন যে আমাদের সাহায্য করতে চাইছে, এবারে তা বোধগম্য হল। এবারে তার কথা অন্তত অনেক খোলা মনে শুনতে পারব। বললাম, 'তোমার উদ্দেশ্য তো বোঝা গেল, এবারে বাকিটা শুনি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, সে-কথাই এবার তোমায় বলব। আমি জানি যে, শ্মশানের চুল্লি কার্যকর করে দেখাবার জন্য তোমাদের একটা বেওয়ারিশ লাশ দরকার। সে-লাশ যাতে তোমরা না পাও তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে চ্যারিয়ন। একটা বেওয়ারিশ লাশ আমি তোমাদের জোগাড় করে দিতে পারি। তবে তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম করিয়ে সে-লাশ নেওয়ার দায়িত্বটা তোমাদের। খেয়াল রেখো যে, লাশটা তোমাদের হাতে আসার আগে ওটা যে তোমরা নিতে চেষ্টা করছ সে-খবরটা যেন যথাসম্ভব গোপন থাকে। চ্যারিয়নের লোক চারদিকে ছড়িয়ে আছে এ-কথাটা মনে রেখো।'

মেডিকেল কলেজে লাশ পাঠানোর নির্দেশটা না থাকলে হয়তো হাসপাতালের ডিন ডক্টর জেকব ও মর্গের ডাক্তার পিল্লেকে দিয়ে তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম করিয়ে লাশটা আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করানো যেত। কিন্তু এখন কি তা সম্ভব হবে? আমার মনে এ সন্দেহটা উঁকি দেয়। আমাকে নীরব দেখে লোকটি তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে, তাকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশের কথাটা বলি।

ঘটনাটা শোনবার পরে লোকটি বলল, 'কোনও চিন্তা নেই, বাবুজি। তিন দিন ধরে ও লাশ একটা কুয়োয় পড়ে পচছে। মেডিকেল কলেজের কাজে ও-লাশ আসবে না।'

বললাম, 'তাহলে আমার কী করা উচিত বলে মনে করো?'

'লাশটার হদিশ তোমায় পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, বাবুজি।'

'সে-কাজটা তো তুমিও করতে পারতে।' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'অসুবিধে আছে, বাবুজি। আমি যে-লাশটার কথা তোমায় বলছি সেটা আমার বন্ধু মুরলীর। মুরলী ভালো লোক ছিল। চ্যারিয়নের অসৎ কাজে সে সবসময় বাধার সৃষ্টি করে এসেছে। তাকে অন্য কোনওভাবে কবজা করতে না পেরে শেষমেশ চ্যারিয়নের লোকেরা তাকে খুন করেছে। মুরলী ভালো লোক হলেও চ্যারিয়নের ভয়ে কেউ তার সঙ্গে মিশত না। মুরলী নিজেও কখনও কারও সঙ্গে মেশবার গরজ দেখায়নি। তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে সে একাই থাকত। মুরলীর খুন হওয়ার ঘটনাটা তাই কারও নজরে পড়েনি। অবশ্য নজরে পড়লেও চ্যারিয়নের ভয়ে কেউ কিছুই করত না। মৃতদেহটা খুঁজে পেলেও আমার পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি যেখানে থাকি, তার আশেপাশে কোনও টেলিফোন নেই। শহরে গেলে চ্যারিয়নের লোকেদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করছি জানলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে। তাই এ-কাজটা তোমাকেই করতে হবে। খবরটা দেওয়ার সময় পুলিশকে শুধু তোমার পরিচয়টা জানিও না।'

আমি বললাম, 'পুলিশে খবর দিলেও তারা কতক্ষণে লাশটা তুলে তা লাশকাটা ঘরে পাঠাবে তার কোনও ঠিক নেই। তা ছাড়া, পুলিশের কাছ থেকে চ্যারিয়নের লোকেরা এ-খবর পেয়ে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল বাধাবে কি না, তাই বা কে জানে?'

সে বলল, 'বাবুজি, তোমার তো ডক্টর জেকবের সঙ্গে আলাপ আছে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে ডক্টর জেকবের খুবই সদ্ভাব। তাঁকেই বলো না পুলিশ সুপারের মারফত স্থানীয় থানায়

BanglaBook.org

খবরটা দিয়ে লাশটা উদ্ধার করতে। পুলিশ সুপার সৎ লোক। তিনি নিজে এ-ব্যাপারে নির্দেশ দিলে কাজটাও তাড়াতাড়ি হবে, আর চ্যারিয়নের লোকেরাও কিছু করতে পারবে না।'

লোকটার বুদ্ধিটা আমার মনে ধরে। তবে ডক্টর জেকবকে জানানোর আগে মৃতদেহটা আমার নিজের একবার দেখে নেওয়া দরকার। লোকটার কথা ভুল হলে ওঁর তো হয়রানি হবেই, আমার ওপরেও উনি অখুশি হবেন। সে-কথা ভেবে বলি, 'কিন্তু তা করতে হলেও তো লাশটা ঠিক কোথায় আছে তা আমার জানতে হবে।'

'সে নিয়ে চিন্তা কোরো না, বাবুজি। আমি লাশটা তোমায় দেখিয়ে দেব।'

আমি বলি, 'দেখিয়ে তো দেবে বলছ, কিন্তু কখন? আমি এ-ব্যাপারে দেরি করতে চাই না।'

'তোমার কাছে যদি একটা টর্চ থাকে তো এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি।' সে বলল।

অন্ধকারটা যে এতটা ঘন হয়ে উঠেছে কথার মাঝে তা খেয়ালই করিনি। একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা আমার নিত্যসঙ্গী। এতে সবসময়ই একটা মালটিপারপাস ছুরি আর একটা টর্চ রাখি। টর্চটা ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি বললাম, 'তাহলে দেখাবে চলো—টর্চ একটা আছে আমার কাছে।'

সে বলল, 'ঠিক আছে, চলো তাহলে। রাস্তা দেখার জন্য কিন্তু টর্চ জ্বেলো না—কারও নজরে পড়তে পারে। শুধু চুপচাপ আমায় অনুসরণ করো।'

এই বলে সে পিছন ফিরে এগোতে থাকল, আর আমিও তাকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। রাস্তা বলতে একটা পায়ে-চলা শুঁড়িপথ এঁকেবেঁকে চলেছে। দুপাশে গাছের সারি আর ল্যানটানা ঝোপ। মিনিট পাঁচ-সাতেক হেঁটে চলেছি। গাছপালায় ঢাকা ঘন অন্ধকার পথে চলতে-চলতে হঠাৎই আমার ভয় করে উঠল। কে জানে লাশটা দেখতে চাওয়াটা হঠকারিতা হল কি না? লোকটা চ্যারিয়নের দলেরই কেউ কি না, তাই-বা কে জানে! আমাকে কোনও গন্ডগোলে ফাঁসাতে চাইছে না তো? এখন পিছন ফেরবারও উপায় নেই। এই শুঁড়িপথটা যে সোজা নয়, এতক্ষণ তা লক্ষ করেছি। পথে একের বেশি মোড় এলে আমার চলনদার যেদিকে চলেছে, আমিও তাকে অনুসরণ করে সেদিকে চলেছি। একলা ফিরতে হলে আমার পথ হারানোর সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। তাই এগিয়ে চলাই মনস্থ করলাম।

আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পরে রাস্তার দুপাশের গাছপালাগুলো একটু পাতলা হয়ে এল। সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। একটু ঢাল বেয়ে সামনের জমিতে নেমে পড়লাম আমরা। আরও দশ-বারো পা হাঁটবার পরে আমার সঙ্গী একটা কোমর সমান উঁচু কোনও জিনিসের সামনে থেমে গেল। তার কাছে পৌঁছতে বুঝলাম যে, সেটা একটা কুয়ো। তখনই নাকে একটা পচা গন্ধ পেলাম। আমার সঙ্গী লোকটি ততক্ষণে কুয়োটার অন্যদিকে পৌঁছে গেছে।

সে বলল, 'এই কুয়োটার মধ্যেই থলিতে ভরে মুরলীর মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে গেছে চ্যারিয়নের লোকেরা। আলো জ্বাললেই দেখতে পাবে। টর্চটা কুয়োর ভেতরে নিয়ে তবেই জ্বেলো, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়।'

পচা গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। গন্ধটার তীব্রতায় পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকটা চাপা দিতে হল। তারপর লোকটির কথামতো টর্চটা জ্বেলে দেখি, ফুট তিরিশেক নীচে সত্যিই বস্তামোড়া কিছু একটা ভাসছে। বস্তা ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে দুটো পায়ের কিছুটা বেরিয়ে পড়েছে। মৃতদেহটা দেখে আমার বুকটা শিরশির করে উঠল। শেষ পর্যন্ত খুনের দায়ে ফেঁসে যাব না তো?

সংবিৎ ফিরল লোকটির কথায়।

BanglaBook.org

সে বলছে, 'লাশটা তো দেখলে। এবারে চলো এখান থেকে। তোমায় এখন অনেক কাজ করতে হবে।'

ফিরতে আরও মিনিট পনেরো লাগল। শুঁড়িপথটার মুখে পৌঁছোনোর পরে আমার সঙ্গী বলল, 'তোমার সঙ্গে আগে যেমন কথা হয়েছে, ঠিক সেভাবে কাজ করবে। তাহলে তোমার চিন্তার কিছু থাকবে না। আমি এখন চলি। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তবে এখানে নয়, এই ডানদিকের রাস্তাটা দিয়ে মিনিট কুড়ি গেলে একটা ছোট পুকুর পাবে। পুকুরটার পাশ দিয়ে বাঁদিকে আরও মিনিট তিনেক গেলে একটা ছোট একচালা কাঁচা বাড়ি আছে। আমি কাল সন্ধ্যাবেলা সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তোমার এই কাঁধব্যাগ আর টর্চটা যেন সঙ্গে আনতে ভুলো না।'

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয় যে, লোকটির নামটাই জানা হয়নি। তাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বলে, 'আমায় সকলে আপ্পা বলে ডাকে, তুমিও সে-নামেই ডাকতে পারো। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা ভুলেও যেন কাউকে বলে বোসো না। জানাজানি হলে আমাদের দুজনেরই ক্ষতির আশঙ্কা।'

এমন সময় বড়সড় একটা বেড়াল শুঁড়িপথটায় ঢুকছিল। আমাদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে সেটা চমকে উঠে 'ম্যাঁও-ও' বলে একটা বিকট আওয়াজ তুলে পালাল। আচমকা বেড়ালটার এই বিকট আওয়াজ শুনে আমিও এমন চমকে উঠলাম যে, ঝাড়া পাঁচ মিনিট আমার বুক টিপটিপ করে চলল।

যাই হোক, আপ্পার কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম। হোটেলে পৌঁছে দেখি যে, মাত্র পৌনে ন'টা বাজে। এসে ডক্টর জেকবকে ফোন করে মৃতদেহটার হদিশ দিই। ওঁকে বলি যে, রাস্তায় একজন অচেনা লোক আমায় এ-খবর দিয়েছে। কথাটা সত্যি তো বটেই, কারণ, আপ্পার পরিচয় আমি সত্যিই জানি না। নিজের চোখে লাশটা দেখবার কথাটা গোপন করেছি বটে, তবে এতে কারও কোনও ক্ষতি নেই।

ডক্টর জেকবও আমাকে পুলিশকে খবরটা দিতে বারণ করলেন। বললেন, 'আপনি বাইরের লোক, ক'দিনের জন্য এসেছেন। শুধু-শুধু এ-ব্যাপারে পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না। পুলিশ সুপার আমার বন্ধু, আমি তাকে খবরটা জানিয়ে দিচ্ছি। যা করবার তিনি করবেন।'

রাত সাড়ে এগারোটার সময় ডক্টর জেকব ফোন করে জানালেন যে, আপনার খবরটা ঠিকই ছিল। শহরের পশ্চিমদিকের একটি অব্যবহৃত পুরোনো কুয়োর মধ্যে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ লাশটা তুলে মর্গে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তবে মৃত ব্যক্তির শনাক্তকরণ করা হয়নি।

পরদিনের কাগজে মৃতদেহের ছবি ছাপিয়ে পুলিশ তার পরিচয় জোগাড় করবার চেষ্টা করবে। পরদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি, সত্যিই মৃতদেহের ছবি ও বর্ণনা দিয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বিকেলে ডক্টর জেকব ফোন করে জানিয়েছেন যে, গতকালের পাওয়া মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের কাজ শেষ হলেও সেটির তখনও শনাক্তকরণ হয়নি। তা ছাড়া, লাশটায় খুবই পচন ধরেছে। ওঁর তাই ধারণা যে, এ-লাশটি আমরা পেলেও পেয়ে যেতে পারি। উনি জানালেন যে, পরশু রাতের মধ্যে কেউ মৃতদেহটি দাবি না করলে, সেটি বেওয়ারিশ বলে ধরে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে, তার পরদিন সকালে দাহ করবার জন্য মৃতদেহটি ওঁরা আমাদের দিতে পারবেন।

পরদিন বিকেলে যখন আমি হোটেল থেকে বেরোলাম সন্ধ্যা হতে তখনও খানিকটা দেরি আছে। খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে সন্ধ্যার ঠিক মুখটাতে শহরের পশ্চিম সীমান্তের দিকে হাঁটা

BanglaBook.org

দিলাম। আপ্পার কথামতো রাস্তা ধরে পুকুরের পাশের চালাঘরটায় পৌঁছনোর আগেই অন্ধকার নেমে এসেছে। আপ্পাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। চালাঘরটার আশপাশটা আম, কলা আর নারকেল গাছে ভরতি। ঘরটার সামনের দিকটায় একটা দাওয়া মতো রয়েছে, আর তার সামনে খানিকটা জায়গায় একটু আঙিনা। ঘরের দরজাটা দেখলাম হাট করে খোলা। তবে ভেতরটা অন্ধকার বলে সেখানে কেউ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। দাওয়াটায় বসব ভেবে একটু এগিয়েছি, হঠাৎ পায়ে কিছু একটা ঠেকল, আর পরক্ষণেই কুঁই-কুঁই করে আওয়াজ। টর্চটা জ্বেলে দেখি পায়ের কাছে ছোট্ট কুকুরের বাচ্চা, মাসখানেকও বয়স হয়নি বোধহয়। নীচু হয়ে সেটাকে তুলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে আপ্পার গলা কানে এল।

'ওটাকে পরে দেখো, বাবুজি। এখন অন্য কাজ রয়েছে।'

মুখ তুলে দেখি আপ্পা দাঁড়িয়ে আছে। আজকেও সেই গতকালের বেশ, কম্বলে কান-মাথা থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা। জিজ্ঞাসা করি, 'দেরি হল? সব ঠিকঠাক তো?'

সে বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি, সব ঠিকঠাক। এখন চলো, আগে ঘরের ভেতরে যাই, তারপর কেন তোমায় এখানে ডেকেছিলাম তা বলব।'

দাওয়ায় উঠে আমরা দুজনে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম—আগে আপ্পা আর পিছনে আমি। আমাদের পিছনে কুকুরের বাচ্চাটাও সমানতালে কুঁই-কুঁই করে ডাকতে-ডাকতে দাওয়ায় ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরে ঢোকবার পরে আপ্পা আমায় টর্চটা জ্বালতে বলল। তারপর বলল, 'আলোটা একটু ঘরের ডানদিকে ফেলো তো, বাবুজি। দেখো, একটা ছোট বাঁশের মই থাকবে।'

সেদিকে আলো ফেলে দেখি যে, সেখানে সত্যিই ফুট ছয়েক লম্বা একটা বাঁশের মই রয়েছে। এরপরে আপ্পা আলোটা সামনে ফেলতে বলে। তারপর বলে, 'তোমার সামনে দেখো একটা মাচা বাঁধা আছে। মাচাটার বাঁ-দিক ঘেঁষে মইটা লাগিয়ে ওটার ওপরে উঠে পড়ো।'

দেখি সামনের দেওয়ালে, মাটি থেকে আন্দাজ ফুট পাঁচেক ওপরে, ফুট তিনেক চওড়া, লফটের মতো একটা বাঁশের মাচা বাঁধা রয়েছে। মাচাটার একদিক বোধহয় সামনের দেওয়ালের ভেতরের খুঁটিগুলোর সঙ্গে বাঁধা, আর অন্যদিকটা বাঁধা ঘরের চাল থেকে নামা চারটে মোটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে। ঘরের চাল আর মাচাটার মাঝে প্রায় ফুট চারেক জায়গা, আর সেটা দেখতেও বেশ মজবুত। একজন লোক অনায়াসে মাচাটায় উঠে বসতে পারে। আপ্পা নিজে ওখানে না উঠে, আমায় কেন ওখানে ওঠাতে চাইছে জানি না। তবে সে-প্রশ্নটা করতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকল, কারণ, কম্বলে ঢাকা আপ্পার বয়েস বোঝা না গেলেও আমার ধারণা যে, তার বয়েস খুব একটা কম নয়। অন্তত আমার চাইতে তো ঢের বেশি। তাই কোনও প্রশ্ন না করেই আপ্পার কথামতো মাচাটায় উঠে পড়ি।

মাচাটা সত্যিই বেশ পোক্ত। আমি চড়ে বসতে সামান্য একটু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠল শুধু, কিন্তু একটুও নড়ল না।

আমি উঠে পড়তে আপ্পা আমায় বলল, 'এবারে মাচাটার বাঁ-ধার ঘেঁষে একটু ভেতরে ঢুকে পড়ে, দু-দিকের দেওয়াল থেকেই ফুটখানেক আলোটা ফেলো। একটু নজর করলে দেখবে বাঁশের একটা ছ'ইঞ্চি মতো অংশ অন্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি কালচে রঙের। ওটার থেকে ফুট দেড়েক দূরে আবার ঠিক ওরকম একটা জায়গা পাবে। ওই কালচে অংশের জায়গা দুটোয় একটু টানলেই দুটো বাঁশের টুকরো খুলে আসবে। প্রথমে ও-দুটোকে খুলে ফেলো।'

কালচে অংশ দুটো পাওয়া গেলেও বাঁশের টুকরো দুটোকে খুলে নেওয়া খুব সহজ হল না। শেষে কাঁধব্যাগ থেকে পেনসিল-কাটা ছুরিটা বের করে বাঁশের ধারে চাড় দিতে তবে সেগুলো

BanglaBook.org

খোলা গেল। বাঁশের টুকরো দুটো খুলে নিতে মাচার মধ্যে তিন ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চির দুটো ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সে-কথা আপ্পাকে বলতে সে বলল, 'ওই ফাঁকা জায়গা দুটোর মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে বাঁশের পাটাতনটা ওপরে টেনে তোলো।'

একটু চেষ্টাতেই ওখানে থেকে একটা দু-ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট মতো টুকরো উঠে এল। বাঁশের টুকরোটা উঠিয়ে ফেলতে দেখা গেল যে, ওখানে একটা দেড় ফুট মতো গভীর গর্ত রয়েছে। বোঝা গেল যে, গর্তটা করা হয়েছে চালাটার দেওয়ালে, সেজন্য বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ভেতরে একটা সুটকেস আর একটা ছড়ি ছাড়া কিছু নেই। ছড়িটা বার করে মাচার সামনের দিকে রেখে, সুটকেসটা খুলতে বলল আপ্পা। সুটকেসের অবস্থা দেখলাম খুবই খারাপ—শুধু তার হাতল আর তালাগুলোই নয়, পিছনের কবজাগুলোও ভেঙে গেছে। সেজন্য খোলবার চেষ্টা করতে তার ওপরের ডালাটাই সম্পূর্ণ উঠে এল।

সুটকেসটাতে পাওয়া গেল শুধু দুটো ফাইল—একটা শক্ত কার্ডবোর্ড আর চটের মতো মোটা কাপড়ের বানানো, আর অন্যটা দড়ি-বাঁধা পাতলা মতো। কৌতূহলের বশে কার্ডবোর্ডের ফাইলটা একটু উলটে দেখে মনে হল যে, ওতে কিছু অফিসিয়াল চিঠিপত্র রয়েছে।

তাই দেখে আপ্পা বোধহয় একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সে বলল, 'ফাইল পড়বার অনেক সময় পাবে, এখন ও-দুটোকে তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলে বাঁশের টুকরোগুলো আগেকার মতো ঠিকঠাক ভাবে রাখো। তারপর মাচা থেকে নেমে পড়ে সিঁড়িটা আগের মতো রেখে, ছড়িটা নামিয়ে নাও।'

আপ্পার কথামতো সবকিছু করলাম। ছড়িটা নামিয়ে হাতে নেওয়ার সময় ডানহাতে ধরা টর্চের ফোকাসটা দরজার দিকে হয়ে যায়। আপ্পা আগে সে-দিকেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু টর্চের আলোটা পড়তে তাকে দেখতে পেলাম না। পরক্ষণেই তার আওয়াজ ঘরের বাইরে থেকে ভেসে এল, 'টর্চের আলো সামলে, বাবুজি। আমরা যে মুরলীর ঘরে ঢুকেছি তা বুঝি সারা দুনিয়াকে জানাতে চাও?'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে টর্চের আলোটা জমির দিকে নামিয়ে ঘরের বাইরে আসি।

আপ্পা বলে, 'এবারে আলোটা নিভিয়ে দাও। ফাইলগুলো আর ছড়িটা নিয়েছ তো?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। কুকুরছানাটা তখনও সমানে কুঁই-কুঁই করে চলেছে।

আপ্পা বলে, 'বাবুজি, খুব ভালো জাতের এই কুকুরছানাটাকে মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই নিয়ে এসেছিল মুরলী। সে মনে করেছিল যে, ছানাটা বড় হলে তার একটু নিরাপত্তা বাড়বে। তা আর হল না। সে খুন হওয়ার পরে এটাকে দেখবার কেউ নেই। গত দু-দিন ধরে খিদে-তেষ্টায় এটা সমানে কেঁদে চলেছে। এটাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, তা নইলে বেচারা মরে যাবে।'

আমি বলি, 'তুমিও তো রাখতে পারো এটাকে?'

আপ্পা বলল, 'আমার নিজেরই কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, আমি কোথায় নেব বলো তো এটাকে?'

কথাটা হয়তো সত্যি, তাই আর বাক্যব্যয় না করে কুকুরছানাটাকে আমি হাতে তুলে নিই। ছড়িটা আর ফাইল দুটো কী করব, ফেরবার পথে আপ্পাকে তা জিজ্ঞাসা করি।

সে বলল, 'বাবুজি, এ-ছড়িটা মুরলীর বাবার। মহীশূরের রাজা একবার এক পণ্ডিতসভার আয়োজন করেন। সেই পণ্ডিতসভায় মুরলীর বাবার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা এ-চন্দনকাঠের ছড়িটা তাঁকে উপহার দেন। বাবার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মুরলী আজীবন ছড়িটা সযত্নে রেখেছিল।

BanglaBook.org

সম্ভব হলে ছড়িটা আমি নিজের কাছেই রাখতাম, কিন্তু আমার মতো বাউন্ডুলের কাছ থেকে এটা খোয়া যেতে পারে। ছড়িটা তাই তুমিই রাখো, বাবুজি।'

'ছড়ি দিয়ে আমি কী করব? এ-বয়সেই আমায় ছড়ি নিয়ে ঘুরতে দেখলে লোকে হাসবে না?' আমি প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না।

আপ্পা বলে, 'ছড়িটা তোমাকে নিতেই হবে, বাবুজি। চাইলে ওটা তুমি ঘরেও সাজিয়ে রাখতে পারো—কত কিছু দিয়েই তো শুনি আজকাল লোকে ঘর সাজায়। এ ছাড়া, আরও একটা জিনিস তোমায় নিতে হবে। ওই পাতলা ফাইলটায় কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট আছে। মুরলীর এক মারাঠি ছাত্র রত্নাগিরিতে আমের পাল্প বানাবার একটা কারখানা খোলে। সে নাছোড়বান্দা হয়ে মুরলীকে ওই শেয়ারগুলো কিনিয়েছিল। তখন থেকে ওগুলো সেরকমই পড়ে আছে। তিন মাস আগে মুরলী ওগুলো বেচে দেবে ঠিক করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর করে উঠতে পারেনি। অবশ্য শেয়ার ট্রান্সফার ফর্মগুলোতে সই করা রয়েছে। ওগুলো তোমার নামে ট্রান্সফার হতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না, না, সে কী কথা! কথা নেই, বার্তা নেই, একজন অজানা অচেনা লোকের শেয়ার আমি নিজের নামে করে নিতে যাব কেন? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমায় বলিহারি আপ্পা, যা পাচ্ছ আমার ওপরেই চাপিয়ে দিচ্ছ। কুকুরছানা আর ছড়িটা নেওয়া, আর শেয়ার নেওয়া এক হল—আমি কি তোমার মুরলীধরের ওয়ারিশ না কি?' আপ্পার ওপর ভারী রাগ হয় আমার।

একটু চাপা হেসে আপ্পা বলে, 'তুমি শুধু-শুধুই রাগ করছ, বাবুজি। তোমায় তো আগেই বলেছি, মুরলীর আপনজন বলতে কেউ নেই। তাই তার ওয়ারিশও বা আসবে কোথা থেকে। সত্যি কথা বলতে কী, মুরলীর বন্ধুই বলো আর আত্মীয়ই বলো—আমি ছাড়া এ-দুনিয়ার তার আর কেউ ছিল না। সেই আমিই যখন তোমায় এই শেয়ারগুলো দিচ্ছি তখন তাতে কোনও দোষ নেই, বাবুজি।'

'তোমার কথা সত্যি হলে এই শেয়ারগুলোর ন্যায্য মালিক তো এখন তুমি নিজেই। তাহলে নিজে না নিয়ে এগুলো আমায় দিতে চাইছ কেন? এ তো কুকুরছানাও নয় যে, দেখাশুনো করতে হবে, বা ছড়িও নয় যে সামলে রাখতে হবে। যখন ইচ্ছে এগুলো বেচে তুমি টাকা নিতে পারো। এই শেয়ারগুলো তুমিই নেবে—' আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিই আপ্পাকে।

আপ্পা যেন নিমরাজি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বাবুজি। তোমার যখন তা-ই ইচ্ছে তখন তাই হবে। তবে একটা উপকার তোমায় করতে হবে। শেয়ারগুলো এখানে বেচতে গেলে মুরলীর খুন হওয়ার ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন হয়তো আমাদের দুজনকেই অকারণ নাজেহাল হতে হবে। তার চেয়ে তুমি বরং ওগুলো তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও এখন। তারপর শেয়ারগুলো বেচে পয়সাটা আমায় পাঠিয়ে দিয়ো।'

আমি ভেবে দেখলাম যে, আপ্পার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে দাও।'

আপ্পা বলল, 'এক্ষুনি তো সেটা দিতে পারছি না। এতকাল আমার সবকিছুই মুরলীর ঠিকানায় আসত। এখন অন্য কোনও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে আর দেখা না হলেও মুরলীর দাহ সংস্কারের দিন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। সেদিনই তোমায় ঠিকানা দিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, সেদিন দিলেও চলবে, কিন্তু এই মোটা ফাইলটা নিয়ে কী করব তা কিন্তু আমায় এখনও বলোনি।'

BanglaBook.org

আপ্পা বলল, 'ও-ফাইলটাতে এমন কিছু কাগজ রয়েছে যা থেকে চ্যারিয়ন আর তার সঙ্গীদের বেশ কিছু কুকর্ম সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। চ্যারিয়নের কুকর্মের সঙ্গীদের মধ্যে বেশ কিছু মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকারি কর্মচারী, এমনকী ক'জন রাজনৈতিক নেতাও আছে। ও-ফাইলটা তুমি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে দিয়ে দিয়ো। উনি সৎ লোক। দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা যদি তিনি করতে পারেন তো ভালোই, আর না পারলেও আমাদের কিছু করবার নেই।'

সেরকমই করব কথা দিয়ে আপ্পার কাছে বিদায় নিই। তার সঙ্গে আবার কোথায় আর কখন দেখা হবে জানতে চাইলে আপ্পা বলে যে, মর্গ আর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খোঁজখবর নিয়ে মুরলীধরের দাহ-সংস্কারের দিন সে আমার সঙ্গে নতুন শ্মশানেই দেখা করবে। এর মধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে সে আমায় বারণ করে।

দেখতে-দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। কুকুরের বাচ্চাটা এর মধ্যেই ভারী পোষ মেনে গেছে। হোটেলে ওটাকে রাখতে আপত্তি করতে পারে সে-আশঙ্কা ছিল। ভাগ্যের কথা, হোটেলের মালিকেরও নাকি কুকুর পোষার শখ। উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হোটেল থেকে কুকুরছানাটারও খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ওঁর কাছেই জানা গেল যে, কুকুরছানাটা অ্যালসেশিয়ান।

এ দু-দিনে আরও কিছু কাজ সেরে ফেলেছি। প্রথমত, দরজির দোকান থেকে মাপসই একটা কাপড়ের খোল বানিয়ে ছড়িটাকে সেটায় পুরে ফেলেছি। ভাগ্যক্রমে সেদিন হোটেলে ফেরবার পরে কাউন্টারে কেউ না থাকায় ছড়িটা কারও নজরে পড়েনি। তা না হলে নানারকম কারুকার্য করা, চন্দনকাঠের এমন চমৎকার ছড়িটা লোকের চোখে পড়তই, আর এরকম একটা ছড়ি কোথায় পেলাম তার জবাবদিহি করা সহজ হত না।

দ্বিতীয়ত, শেয়ার সার্টিফিকেট আর ট্রান্সফার ফর্মগুলো ঠিকঠাক আছে তা দেখে নিয়েছি। শেয়ারগুলো দেখলাম 'আম্বাপাল্ল' বলে একটা কোম্পানির—পুরো এক হাজার শেয়ার রয়েছে। কাগজ দেখে বোঝা গেল যে, সেগুলোর বেচাকেনা চলছে মাত্র এগারো-বারো টাকায়। এ-দামে আপ্পা শেয়ারগুলো বেচতে রাজি আছে কি না তা পরদিন জেনে নেব।

তৃতীয় কাজটা ছিল মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে চ্যারিয়ন ও তার সঙ্গীদের কুকীর্তির প্রমাণ জড়ো-করা ফাইলটা দেওয়া। আজ বিকেলে ফাইলটা কমিশনারকে দিতে যাওয়ার সময় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ফাইলটা কী করে আমার হস্তগত হল সে-কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ওঁকে বলা খুব সহজ ছিল না। সেটাই ছিল অস্বস্তির কারণ। সৌভাগ্যের কথা যে, কমিশনার সাহেব সে-সম্বন্ধে আমায় কোনও প্রশ্ন করলেন না। ফাইলটা উলটেপালটে দেখে উনি বললেন যে, কয়েকজন অসৎ লোককে প্রমাণের অভাবে এতদিন শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ-ফাইলটাতে যেসব কাগজ রয়েছে তা সেই লোকদের দোষ প্রমাণ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ-ফাইলটা জোগাড় করে দেওয়ার জন্য উনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। ধন্যবাদটা আসলে আপ্পার প্রাপ্য, কিন্তু সে-কথা কমিশনারকে বলবার উপায় নেই বলে চুপ করে থাকি।

যাই হোক, আপ্পার ইচ্ছামতো কাজটা ঠিকমতো সারতে পেরেছি বলে যথেষ্ট হালকা বোধ করছিলাম। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে আমাদের চুল্লি চালু করবার জন্য বেওয়ারিশ লাশের কী হল তা জানতে চাইলেন কমিশনার। ওঁকে বলি যে, পরদিন সকালে একটা লাশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সে-কথা শুনে উনি বললেন, 'সকালেই সরকারি হাসপাতালে চলে যান। লাশটা পাওয়া গেলে, সেটা আপনাদের কাজের জন্য ইস্যু করিয়ে নিয়ে আমায় একটা ফোন করে দেবেন। লাশটা পাওয়া গেছে জানালে কালকেই আপনাদের চুল্লির ট্রায়ালটা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

কমিশনারের কথা শুনে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। হোটেল থেকে রাত ন'টা নাগাদ

BanglaBook.org

ডক্টর জেকবকে ফোন করে জানতে পারলাম যে, মুরলীধরের লাশটা তখনও কেউ দাবি করেনি। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ পুরো হবে। তখনও কোনও দাবিদার না এলে লাশটা বেওয়ারিশ হিসেবে দাহ করবার জন্য আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

পরদিন সকাল দশটায় সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে জানা গেল যে, লাশটার কোনও দাবিদার আসেনি। তাই দাহ করবার জন্য সেটা সহজেই আমাদের জন্য ইস্যু করিয়ে নেওয়া গেল। তবে লাশটা যতক্ষণ আমরা নিয়ে যেতে না পারছি ততক্ষণ সেটা মর্গেই রাখা থাকবে। সেখান থেকেই ফোন করে কমিশনারকে লাশটা পাওয়ার কথা জানিয়ে দিলাম। উনি আমায় তখনই মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে চলে আসতে বললেন।

মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে পৌঁছে কমিশনার ও শ্মশান বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল যে, সেদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় চুল্লির ট্রায়াল নেওয়া হবে।

সবকিছু এত সহজে হয়ে গেল যে, আমার নিজেরই একটু অবাক লাগছিল। চ্যারিয়নের লোকেরা এত সহজেই হার মেনে নেবে, সে-কথা বিশ্বাস করতে পারা শক্ত। মনে হয়, খুনের ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়ার ভয়েই তারা চুপচাপ রয়েছে। তবে কিছু একটা গন্ডগোল তারা পাকাতেই পারে, এ-আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না।

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান দেশপাণ্ডেকে চুল্লির সব কানেকশন আর-একবার দেখে নিতে বলে মুরলীর লাশটা নিয়ে আসতে মর্গে চলে গেলাম। ডক্টর পিল্লে অবশ্য বলেছিলেন যে, একটা ফোন করে দিলেই লাশটা উনি নতুন শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু বিরোধীপক্ষকে কোনও সুযোগ দিতে মন চাইছিল না।

সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে ডক্টর পিল্লের অফিস থেকে লাশটা নিয়ে যাওয়ার চালান আর সার্টিফিকেট নেওয়ার পর, একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সোজা লাশকাটা ঘরে চলে গেলাম। ডক্টর পিল্লে বললেন যে, আমরা লাশটা নিতে আসব সে-কথা থাপাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। চালানের একটা কপিতে সই করে তাকে দিলে, বেওয়ারিশ লাশটা সে আমাকে দিয়ে দেবে। দিন দুয়েক দেখে মর্গের চৌকিদার থাপা আমায় চিনে গেছে, সেজন্য কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

স্বাভাবিক কারণেই লাশকাটা ঘরটা বাকি হাসপাতাল থেকে একটু তফাতে। ডক্টর পিল্লের অফিস থেকে সেটা মিনিট দুয়েকের হাঁটাপথ। সরাসরি দেখা না গেলেও গাছপালার ফাঁকে নজর করে দেখলে তার খানিকটা দেখা যায়। কয়েক পা সেদিকে এগোনোর পর লাশকাটা ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো থাপা ও আরও তিনজন লোককে দেখতে পেলাম। থাপা এবং অন্য লোকগুলোর হাবভাব দেখে মনে হল যেন একটা বচসা চলছে। কেন যেন ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না। ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকবার জন্য একটু ধারের দিকে সরে এসে হালকা পায়ে লাশকাটা ঘরের দিকে ছুট দিলাম।

লাশকাটা ঘরের বারান্দার যেদিকে থাপা আর অন্য লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিকটায় একটা থামের আড়াল থেকে ওদের কথা শুনে ঘটনাটা বুঝতে পারি। লোকগুলো আমাদের নাম করে মুরলীধরের লাশটা নিয়ে যেতে এসেছিল, কিন্তু চালান দেখাতে পারছে না বলে থাপা তাদের লাশটা দিতে নারাজ। লোকগুলো নানাভাবে থাপাকে বোঝাতে চাইছে, কিন্তু সে অনড়। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে থাপা বলে যে, লাশটা দেওয়া যাবে কিনা তা সে ইন্টারকমে ডক্টর পিল্লের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, কথাটা শুনেই লোক তিনটের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এবার একটা মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে বুঝতে পেরে চুপিসাড়ে বারান্দার দিকে এগোলাম। লোকগুলোর

BanglaBook.org

দৃষ্টি এখন শুধু থাপার ওপরেই, সেজন্য আমার এগিয়ে যাওয়াটা তারা লক্ষই করল না। থাপা ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলতে যেতেই একজন সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত চেপে ধরল। তারপর বলল, 'ফোনটা রাখ। আর যদি বাঁচতে চাস তো চুপচাপ মর্গের দরজাটা খুলে দে। নইলে নিজেই একটা লাশ হয়ে যাবি।'

থাপা ঘাবড়ে গেলেও সেটা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না। উলটে সে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে তোদের দরজা খুলতে দেব না। দেখি কী করে তোরা লাশটা নিয়ে যাস?'

থাপার কথা শুনে লোক তিনটে রেগে কাঁই হয়ে গেল। একজন তার দিকে একটা পেল্লাই চড় হাঁকাল। থাপা সেটা আটকে দিয়ে পালটা একটা ঘুসি চালাল। সেটা ঠিকমতো না লাগলেও লোকটা ভয়ানক খেপে গিয়ে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করল। এদিকে আর-একটা লোকও ছোরা বার করেছে, আর তৃতীয় লোকটা হাতে নিয়েছে তার কোমরের বেল্ট। তিনটে লোকই আমার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। এ-সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। ছুটে গিয়ে প্রথমে বাঁ-দিকের লোকটার মাথার পিছনে একটা মোক্ষম ঘুসি মারলাম। তারপর ঠিক তার পাশের লোকটাকে একই ভাবে ঘুসি মারলাম। সে-দুজনেই তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেল। তিন নম্বর লোকটা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, হাতের ছোরাটা একবার এলোমেলোভাবে চালিয়ে সে দৌড়ে পালাল।

থাপাকে বললাম হাসপাতালের মেন গেটের সিকিউরিটিকে খবরটা দিয়ে দিতে। থাপা প্রথমে আমায় একটা লম্বা সেলাম ঠুকল, তারপর ইন্টারকমে খবরটা জানিয়ে দিল সিকিউরিটিকে। তার দুই আততায়ী তখনও মাটিতে গড়াচ্ছে। থাপাকে দিয়ে মর্গের ভেতর থেকে খানিকটা মোটা দড়ি আনিয়ে দুজন মিলে লোকদুটোকে ভালো করে বেঁধে ফেললাম। তারপর ডক্টর পিল্লেকে ইন্টারকমে ঘটনাটা জানিয়ে দিলাম।

খানিক বাদেই ডক্টর জেকব ও ডক্টর পিল্লে আরও কয়েকজনকে নিয়ে মর্গে এসে উপস্থিত হলেন। ডক্টর জেকব জানালেন যে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এখনই এসে পড়বে। ইতিমধ্যে মেন গেটের সিকিউরিটি থেকে খবর এল যে, তৃতীয় লোকটাও ধরা পড়েছে। দুজন গার্ড দিয়ে তাকে মর্গে পাঠিয়ে দিতে বললেন ডক্টর পিল্লে। মাটিতে পড়ে থাকা লোকদুটোর মধ্যে এবার একটু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। বোঝা গেল যে, ওদের এবার জ্ঞান ফিরছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে উপস্থিত হল। তারা তৃতীয় লোকটাকে লাশ চুরি করবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেও সে কোনও উত্তর দিল না। আমাদের বক্তব্য লিখে নেওয়ার পর পুলিশ ইন্সপেক্টর লোক তিনটেকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেলেন। ডক্টর জেকবের অনুরোধে লাশটা নিয়ে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে একজন আর্মড গার্ড দিতেও রাজি হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

লাশটা নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আর দেরি না করে চালানের একটি কপি সই করে দিয়ে, লাশটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে বলি থাপাকে। রওনা হওয়ার আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে ফোন করে কমিশনারকে এখানকার ঘটনাটা জানিয়ে দিই। সবকিছু শোনার পর উনি বললেন যে, তাহলে শ্মশানেও ক'জন পুলিশ মোতায়েন করবার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

ডক্টর জেকব ও ডক্টর পিল্লের কাছে বিদায় নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে যাব, এমন সময় থাপা আবার একটা লম্বা সেলাম ঠুকল। আমি বলি, 'আরে করো কী, এত সেলাম ঠোকার কী হল?'

'না সাহেব, তা বললে কী হয়? আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।' থাপা বলে।

BanglaBook.org

এর পরে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! একটু হেসে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলাম। ভাগ্যক্রমে রাস্তায় আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, তবে শ্মশানে পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। লাশটা নামাবার সময় দেখলাম, আরও দুজন আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম যে, কমিশনার সাহেবও দুষ্কৃতীদের কোনও সুযোগ দিতে চাননি।

দেশপাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। সকলের অনুমতি নিয়ে চুল্লিটা চালু করে দিলাম।

এতক্ষণ লাশটা ঢাকাই ছিল। চুল্লিতে ঢোকানোর আগে ভাবলাম যার লাশটা নিয়ে এত কাণ্ড হল, সেই মুরলীধরকে একবারে দেখে নিই। দেখলাম, লাশটার বেশিরভাগটাই পচন ধরে খুব খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, মুখটা তেমন নষ্ট হয়নি। মুরলীধরের বয়েস পঞ্চান্ন থেকে ষাটের বেশি ছিল বলে মনে হল না। মুরলীধরের মুখের যে ক'টা জিনিস আমার নজর কাড়ল তা হল তার পাতলা উন্নত নাক, বড়-বড় দুটো কান, আর কপালের বাঁ-দিকে ইঞ্চিদেড়েক লম্বা একটা নীলচে দাগ।

এর মধ্যে চুল্লির তাপমাত্রা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিটারের রিডিং ইত্যাদি সবকিছু নোট করে নিয়েছেন দেশপাণ্ডে আর মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার। ওঁরা দুজনে সঙ্কেত দিলে লাশটা চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঘড়িতে দেখলাম তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। লাশটা সম্পূর্ণ দাহ হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে পঞ্চাশ মিনিট। কয়েকটা রিডিং নেওয়া ছাড়া এর মধ্যে অন্য কারও কোনও কাজ নেই। সেগুলোও দেশপাণ্ডে নেবে, তাই এ-সময়টা আমার কিছুই করবার নেই।

আশ্চর্য লাগছে যে, এখনও আপ্পার দেখা নেই। মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে চারদিকে দেখছি, কিন্তু আপ্পাকে কোথাও দেখা গেল না।

তখন সাতটা বেজে দশ, দাহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এমন সময় শ্মশানের গেটের পাশে আপ্পাকে দেখা গেল। সেই রোজকার মতো মাথা থেকে হাঁটুর নীচ অবধি কম্বলে ঢাকা। আপ্পা ইশারায় জানাল যে, অন্য লোকদের সামনে সে আসবে না। সব কাজ মিটে গেলে সে আমাকে শ্মশানের পিছনদিকে আসতে বলল। শ্মশানের পিছনে খালের ওপর একটা ঘাট বাঁধানো আছে দেখেছি। ঠিক করলাম, সব কাজ মিটলে সেখানেই আপ্পার সঙ্গে দেখা করব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দাহ শেষ হয়ে গেল। দেশপাণ্ডের নেওয়া রিডিংগুলো দেখে মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার আমাদের চুল্লিটা পাস করে দিলেন। ভালোয়-ভালোয় সব কাজ মিটতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরদিন সকালেই চুল্লির দামের বকেয়া টাকার চেকটা আমাদের দিয়ে দেবেন কথা দিয়ে কমিশনার সাহেব বিদায় নিলেন। তারপর দেশপাণ্ডে, পুরোহিত আর আমি ছাড়া একে-একে বাকি সবাই চলে গেলেন।

সকলে চলে যেতে মৃতদেহের চিতাভস্ম পাশের নালাটায় ভাসিয়ে দিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। ঘাট থেকে ওঠবার সময় আপ্পাকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাকে ইশারায় জানালাম যে, আর খানিকবাদেই আসছি।

শ্মশান থেকে বেরোনোর সময় পুরোহিতমশাই বললেন উনিও আমাদের হোটেলের দিকেই যাবেন, কিন্তু মুশকিল হল যে, ওঁর স্কুটারে আমাদের একজনই যেতে পারি। আমার এতে ভারী সুবিধে হয়ে গেল। দেশপাণ্ডেকে ওঁর সঙ্গে চলে যেতে বললাম। দেশপাণ্ডের একটু ভূতের ভয় আছে জানি, তাই আমার কথা শুনে সে যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

ওদের দেখিয়ে আমিও শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু পুরোহিতের স্কুটার

BanglaBook.org

দৃষ্টির সীমানা ছাড়াতেই আমি শ্মশানের দিকে ফিরলাম। ঘাটের কাছে পৌঁছতে একটা গাছের পিছনে আপ্পাকে দেখা গেল। বললাম, 'শেষ পর্যন্ত সব কাজ চুকল, আপ্পা। তোমার সাহায্য না পেলে আমাদের যে কী অবস্থা হত, কে জানে।'

আপ্পা বলে, 'সে-কথা কেন বলছ, বাবুজি তুমি না থাকলে মুরলীর শেষকৃত্যটুকুও হত না। তোমার জন্যই তার আত্মার শান্তি হবে। সেজন্য আমারই উলটে তোমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

আমি বলি, 'যাকগে সে-কথা, আসল কথাটা আগে সেরে নিই। শোনো আপ্পা, চ্যারিয়নের কুকর্মের ফাইলটা কমিশনারকে দিয়ে দিয়েছি। উনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলেই আমার মনে হয়। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু করণীয় নেই। শেয়ার বেচবার কাজটা আমি অবশ্যই করে দেব। মুরলীর শেয়ারগুলোর দাম এখন দশ থেকে বারো টাকা চলছে—বেচলে হাজার দশেক টাকা পেয়ে যাবে। বেচবে না রাখবে ভেবে বলো, আর তোমার ঠিকানাটা দাও।'

'শেয়ারগুলো এখন থাক না, বাবুজি। পরে হয়তো ওগুলোর দাম বাড়বে, তখনই বেচো। তা ছাড়া, এখনও আমার কোনও আস্তানা জোটেনি, তাই ঠিকানাটাও তোমায় আজ দিতে পারছি না। আর-একটা কথা তোমায় বলবার ছিল। অনেক ভেবে দেখলাম যে, ও-শেয়ারগুলো আমার কোনও কাজে লাগবে না। তাই ওগুলো আমি তোমাকেই দিয়ে দিলাম।'

এবারে বেজায় রাগ হয়ে যায় আমার। বলি, 'শেয়ারগুলো তোমার কাজে লাগবে না কেন শুনি? এমন একটা লোক দেখাতে পারো যার বেঁচে থাকতে পয়সার দরকার হয় না? এগুলো আমি যে নেব না তা সেদিনই তোমায় বলে দিয়েছি। তুমি যদি তোমার ঠিকানা না দাও তবে শেয়ারগুলো আমি মুরলীর চালায় ফেলে আসব বলে দিলাম।'

'শেয়ারগুলো কেন আমার কাজে লাগবার নয়, সে-কথা তোমার ভালো লাগবে না বলেই জানাতে চাইনি, বাবুজি। কিন্তু তুমি এত জেদ করছ যে তা না জানিয়ে আর উপায় নেই—' এ-কথা বলে মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলে আপ্পা।

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমশীতল ধারা নেমে গেল। আপ্পার মুখটা চিনতে একটুও ভুল হয়নি আমার। এই উন্নত পাতলা নাক, বড়-বড় দুটি কান, আর কপালের বাঁ-দিকে ইঞ্চিদেড়েক নীলচে দাগটা আমি ঘণ্টা দুয়েক আগেই দেখেছি। হ্যাঁ, হুবহু এসবই দেখেছি মুরলীধরের মৃতদেহে।

ভয়ে আর চমকে আমার বোধবুদ্ধি সব কেমন গুলিয়ে গেল। আমি যেন একটা পাথরের মতো নিষ্পলক চোখে আপ্পার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ এভাবে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। সংবিৎ ফিরল আপ্পার কথায়।

'হ্যাঁ বাবুজি, আমিই মুরলীধর। সেটা আমার পোশাকি নাম, তবে ও-নামে আমায় খুব কম লোকই চিনত। ছোটবেলায় বাবা "কৃষ্ণা" বলে ডাকতেন। বড় হওয়ার পর তার সঙ্গে আপ্পা জুড়ে লোকে আমায় "কৃষ্ণাপ্পা" বানিয়ে দিল। আসল নামটা অনেকে জানতও না।

'আমি সারা জীবন শিক্ষকতা করেছি। নীতি আর আদর্শকেই জীবনে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলাম বলে চ্যারিয়নের দুর্নীতিপরায়ণতাকে কখনও মেনে নিতে পারিনি। তাদের বিরুদ্ধে আমি অনেক প্রমাণ জড়ো করেছি জানতে পেরে চ্যারিয়নের লোকেরা আমাকে প্রথমে খোশামোদ করে, পরে ভয় দেখিয়ে সেগুলো আমার কাছ থেকে হাতাবার চেষ্টা করে। তাতেও অসফল হতে তারা আমায় খুন করে আমার মৃতদেহটা কুয়োটায় ফেলে চলে গেল।

'আমাকে মেরে ফেললেও ওরা ওদের কুকর্মের দলিলগুলো উদ্ধার করতে পারেনি। সেগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে না পারায় মরেও আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। এমন সময়

BanglaBook.org

সেদিন তোমায় দেখতে পেলাম। একটা লাশ জোগাড়ের চিন্তায় ঘুরছ। ঈশ্বরই হয়তো তোমায় আমার সামনে পাঠিয়ে দিলেন। চ্যারিয়ন আর তার চেলারাই তোমার পিছনে লেগেছে, সেজন্য তোমার হাত দিয়ে ওদের কুকর্মের প্রমাণগুলো নিশ্চিন্তে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারা যাবে।

'তা ছাড়া, তোমার দরকার একটা লাশ—আমার দেহটার শেষকৃত্য হলে আমারও ভালো। আমাদের দুজনের কাজই সহজ হয়ে গেল। বাকিটা তোমার জানা আছে।

'এবার তো বুঝতে পারলে যে, এ-দুনিয়ায় কোনও কিছুতেই আমার আর প্রয়োজন নেই। এবার নিশ্চয়ই এ-শেয়ারগুলো নিতে আর আপত্তি করবে না? তুমি এগুলো নিলে আমার বড় ভালো লাগবে। কী, নেবে তো?'

মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, নেব।

আপ্পা বলল, 'আমার সব কাজ শেষ। এবার আমায় যেতে হবে। চলি, বাবুজি।' বলে বিদায়ের ভঙ্গিতে ডানহাতটা তুলল আপ্পা। তার শরীরটা ধীরে-ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আমার গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। দেরি না করে আমি ফেরার পথ ধরলাম। ফেরবার পথে ছমছমে ভাবটা কেটে গিয়ে কেন জানি না একটা প্রশান্ত ভাব আমার মনে ছেয়ে গেল।

পরদিন দুপুরেই চুন্নির দামের বকেয়া চেকটা পেয়ে গেছি। ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার একটা ট্রেনে রিজার্ভেশনও জুটে গেল আমাদের। ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল প্ল্যাটফর্ম থেকে কেউ ডাকল। তাকিয়ে দেখি, থাপা। ওর চোখে চোখ পড়তেই আবার সেই প্রকাণ্ড সেলাম। বলল, আমি চলে যাচ্ছি শুনে দেখা করতে এসেছে। ট্রেন ছাড়বার আগে সে আমার ঠিকানা চাইল—পালাপার্বণে আমায় চিঠি লিখতে চায়। ঠিকানাটা তাকে লিখে দিলাম।

চেকটা নিয়ে ফিরে আসায় অফিসে আমার বেশ সুখ্যাতি হল। আপ্পার কথা কাউকে বলিনি। তার সাহায্য ছাড়া যে কিছুই করতে পারতাম না, তা শুধু আমিই জানলাম।

এর বছর খানেক বাদে থিরুভাল্লা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি আসে। আমার দেওয়া ফাইলের কাগজপত্রের দৌলতে চ্যারিয়ন ও তার আরও পাঁচজন সঙ্গীর দুই থেকে ছ'বছর অবধি জেল হয়েছে—সেজন্যই আমায় এ-ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আবারও আপ্পার প্রাপ্য ধন্যবাদটা জুটল আমার কপালে।

গত এক বছরে আপ্পার দেওয়া ছোট্ট কুকুর মস্ত বড় হয়েছে। তার নাম রেখেছি বাঘা। প্রতিদিন তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় আপ্পার দেওয়া চন্দনকাঠের ছড়িটাও সঙ্গে নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

এরপরে বছর ছয়েক কেটে গেছে। থিরুভাল্লার স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে। শুধু থাপার কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পেতাম। প্রত্যেকটা চিঠিতেই তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমায় একটা সেলাম জানাত সে। একদিন হঠাৎ থাপা এসে হাজির। জানা গেল, থিরুভাল্লার গভর্নমেন্ট হাসপাতাল থেকে গতমাসে সে রিটায়ার করেছে। আপনার বলতে থাপার কেউ নেই, তাই সে আমায় দেখতে চলে এসেছে।

দু-দিনের জন্য এসেছিল, কিন্তু দেখি তার যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নেই। আমায় বলে, সে আমার কাছে থেকে ফাইফরমাশ খাটবে। তখন একটা ফ্ল্যাটে থাকি। জায়গার একটু অভাব সত্ত্বেও তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারিনি। সেই থেকে সে আমার কাছেই আছে।

BanglaBook.org

এই বাড়িটা বানানো শেষ হতে সে এখন এটার রাখোয়ালি করে। আমাকে দেখলেই তার ওই প্রকাণ্ড সেলাম করাটা তাকে অনেক বলেও ছাড়াতে পারিনি। থাপার সবই ভালো, তাই অস্বস্তি লাগলেও তার এই সেলাম করাটা মেনে নিয়েছি।

এবারে এ-বাড়ির কথায় আসি। বছর পাঁচেক আগে একদিন সকালে কাগজ খুলে এমন একটা খবর চোখে পড়ল যে-বুঝতে পারলাম কৃষ্ণাপ্পার যে-শিকে আমার ভাগ্যে ছিঁড়েছিল তা তখনও খালি হয়নি। খবরটা হল—কোঙ্কন রেলওয়ের দৌলতে 'আম্বাপাল্ল' কোম্পানির ভাগ্য খুলে গেছে। এক মস্ত বিদেশি ফুড প্রসেসিং কোম্পানি তাতে মোটা অর্থ লগ্নি করবে বলে মনস্থ করেছে। শুধু তাই নয়, সেই বিদেশি কোম্পানিই 'আম্বাপাল্ল'-এর সমস্ত উৎপাদন সারা বিশ্ব জুড়ে রপ্তানি করবার দায়িত্বও নেবে বলে ঘোষণা করেছে। 'আম্বাপাল্ল'-এর শেয়ারগুলো আমার নামে ট্রান্সফার করিয়ে নেওয়ার পর, প্রথম কয়েক মাস ওই শেয়ারের দাম বাড়তে না দেখে ওগুলো যে আমার কাছে আছে সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। এই খবরটা পড়ে 'আম্বাপাল্ল'-এর শেয়ারের দামের ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল জাগল। 'আম্বাপাল্ল' বারকয়েক বোনাস শেয়ার ঘোষণা করায় বছর দুয়েকের মধ্যেই আমার সেই এক হাজার শেয়ার বেড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়।

বছর দুয়েক আগে একদিন কাগজ খুলে দেখি যে, 'আম্বাপাল্ল'-এর প্রতিটি শেয়ারের দাম হয়েছে দু-হাজার আটশো টাকার মতো। তখন সবক'টা শেয়ার বেচে দিই। রাতারাতি আমি সোয়া এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলাম।

সে-টাকা থেকে এই বাড়ি করবার পরেও আমার হাতে যা রইল তাতে আমার তিন পুরুষ বসে খেতে পারবে। আপ্পার কথা কেউ জানে না বলে সকলে ভাবে শেয়ার মার্কেটে আমার ভাগ্য খুলে যাওয়াতেই আমার এ-রমরমা অবস্থা। আমার সবকিছুই হয়েছে আপ্পার কল্যাণে, কিন্তু তার সমস্ত কৃতিত্বই পেয়েছি আমি। আপ্পার ওপর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যই বাড়ির নামটা রেখেছি "কৃষ্ণাপ্পা প্রসাদ"। অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও এভাবেই আপ্পাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

এতক্ষণ একটানা কথা বলবার পরে বীরভদ্র রায়চৌধুরি বোধহয় একটু দম নিতেই থামলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মশাই, বাড়ির নামটা ঠিক রাখা হয়েছে কি না বলুন তো এবার? অবশ্য ঘটনাটা আপনার বিশ্বাস হল কি না তাও তো জানি না।'

আমি বললাম, 'ঘটনাটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে দেখলে বাড়ির নামকরণটাও সার্থক হয়েছে বলতেই হয়।'

বীরভদ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পা চালাই। তাড়া আছে বইকি—কৃষ্ণাপ্পার শিকে ছিঁড়ে যে-গল্পটা আমার ঝুলিতে পড়েছে, সেটাকে চট করে খাতাবন্দি করে ফেলতে হবে না।

BanglaBook.org

বীজমন্ত্র

নীল মজুমদার

॥ ১ ॥

ইন্টারভিউয়ের শেষ প্রশ্নটি করলেন চেয়ারম্যান নিজেই। বললেন, মিস্টার সোম, এই চাকরিটা যদি আমরা আপনাকে অফার করি, আপনি কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন?

ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে ঠিকই কিন্তু এতটা তন্ময়ও আশা করেনি। ভেতরের উত্তেজনা চেপে ও বলল, স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যদি সত্যিই আমাকে এই পোস্ট-এর উপযুক্ত মনে করে থাকেন, আমি আজই জয়েন করতে পারি।

চেয়ারম্যান অসিত মুখার্জি বোর্ডের অন্য চারজন মেম্বারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, আজ নয়, আগামীকাল জয়েন করলেও চলবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনার তো বাড়ি দেখছি নাগপুরে। আপনি এখানে আছেন কোথায়?

তন্ময় বলল, স্যার, আমি আজ সকালের ট্রেনে পুনে এসে পৌঁছেছি। রিটায়ারিং রুমে তৈরি হয়ে এখানে এসেছি ইন্টারভিউ দিতে। রাত্রে মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেসে ফিরে যাওয়ার কথা।

আই সি,—অসিত মুখার্জির পাশে বসা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, আপনার, তার মানে, এখানে থাকার কোনও জায়গা নেই!

না স্যার,—তন্ময় মাথা নেড়ে বলল, পুনেতে আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। এখানে আমি কাউকে চিনি না।

চেয়ারম্যান ইন্টারকমে কাউকে ভেতরে আসতে বলে, বললেন, তাতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয় থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি।

বাইরের ওয়েটিং হলে বসে থাকা রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা সুইংডোর ঠেলে ভেতরে এসেছিলেন ইতিমধ্যেই। অসিত তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, অ্যালিস, তন্ময় সোমের নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তৈরি করে দাও।

কফি শেষ হয়ে এসেছিল। অভিনন্দন, ধন্যবাদ ইত্যাদির পাট চুকিয়ে বোর্ড মেম্বাররা সকলে উঠলেন এবার। হাতের ইশারায় তন্ময়কে বসতে বলে অসিত বাইরে গেলেন ওঁদের ছাড়তে।

তার মানে চাকরিটা আমার সত্যিই হয়ে গেছে! খালি ঘরে তন্ময়ের উচ্ছ্বাস জোরালো একটা নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল এতক্ষণে। ইয়েস, আই গট ইট, আই গট ইট—নিজেকেই চাপা গলায় বলল তন্ময়। ডেকান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকরিটা এখন আমার। সতেরো জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করে এই পোস্ট আমি জয় করেছি।

অসিতকে ফিরে আসতে দেখে তন্ময় উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজি ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় উনি বললেন, বোসো বোসো। তুমি করে বলছি কিন্তু—।

তন্ময় বলল, নিশ্চয়ই।

অসিত বললেন, তোমার ওই রিটায়ারিং রুমের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। এটার একটা হিল্লে করতে হবে।

তন্ময় হেসে বলল, স্যার, আপনি ব্যস্ত হবেন না—।

অসিত বললেন, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। শোনো, আমাদের একটা ছোট গেস্টহাউস আছে, ফ্যাকট্রির পিছনদিকটায়। খালি থাকলে ওখানেই তুমি তিন-চার দিন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর ততদিনে, থাকার একটা—।

অ্যালিস কাগজপত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকেছিলেন। দেখে বাঙালি মনে না হলেও বাংলা বোঝেন নিশ্চয়ই। অসিতের সই নেওয়ার পর বললেন, স্যার, মিস্টার পালিত সেদিন একটা অ্যাপার্টমেন্টের কথা বলেছিলেন আপনাকে—।

ও ইয়েস! খুব খুশি হয়ে অসিত বললেন, ঠিক সময় মনে পড়িয়েছ। আমি দেখছি।

BanglaBook.org

টেবিলে রাখা ফোন তুলে ডায়াল করে অসিত বললেন, কী রে, কী খবর।

কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, ওদিক থেকে কী উত্তর এল, কিছুই অবশ্য বুঝতে পারল না তন্ময়। এতক্ষণে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে এসে গেছে। কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের সুন্দর অক্ষরগুলির মধ্যে নিজের সৌভাগ্য ও সফলতার সূচনা অনুভব করতে-করতে পড়তে লাগল তন্ময়...মনে-মনে প্রতিটি অক্ষর, শব্দ উচ্চারণ করে।

ফোন রেখে অসিত বললেন, আমার এক ছোটবেলার বন্ধু থাকে পাশেই। ওর বাড়ির একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছিল, কয়েকদিন আগে। ইউ আর লাকি। ওটা এখনও খালি আছে। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। আর আজ,—ইন্টারকম উঠিয়ে অসিত বললেন, অ্যালিস গেস্টহাউসে স্যুট খালি আছে কি না দেখো তো। ওদিক থেকে জবাব শুনে বললেন, গুড। আজ তুমি যে-কোনও সময় তোমার তল্পিতল্পা নিয়ে রিটায়ারিং রুম ছেড়ে আমাদের গেস্টহাউসে চলে আসতে পার।

চেয়ারম্যান সাহেবের তৎপরতায় ও সহৃদয়তায় তন্ময় মুগ্ধ। উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, স্যার, আপনার এই ঋণ আমি—।

অসিত উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন, ঋণ শোধ করবে কী করে, এই তো? কাজ করে, মন লাগিয়ে কাজ করে। অ্যালিসের কাছে ডিরেকশনটা বুঝে নিয়ো। পাশেই বাড়ি। আর হ্যাঁ, সাড়ে সাতটার যেন এক মিনিটও বেশি না হয়। তাহলে কিন্তু স্বয়ং ভগবানও গ্যাগির ওই ফ্ল্যাট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন না। বুঝলে তো! আচ্ছা, এসো।

অফিসের বাইরে সবুজ লন। একপাশে পার্কিংয়ের জায়গা। ফ্যাকট্রি সম্ভবত অফিসের পিছনে। সবকিছুই বেশ ছিমছাম, সাজানো।

গেট দিয়ে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল তন্ময়, প্রায় সাড়ে চারটে। খুব কাছেই একসারি পাহাড় বিকেলের রোদ মাখছে গায়ে। কী করা যায় এখন! খিদে পেয়েছে, সবচেয়ে আগে কিছু খাওয়া দরকার। ফেরার রিজার্ভেশনও ক্যানসেল করতে হবে। তারপর! সিনেমা গেলে কেমন হয়! আর কোথাও তো যাওয়ার নেই, এমনকী এতবড় এই খবরটাও ফোন করে জানাবার মতো কেউ নেই তন্ময়ের। আহ্, সামনের ওই সবুজ পাহাড়ের ওপর চিত হয়ে শুয়ে যদি আকাশের সঙ্গে কথা বলা যেত!

দু-একটা মশার উপদ্রব ছাড়া গেস্টহাউসে রাতটা মন্দ কাটেনি। সকালে তৈরি হতে-হতে ভাবছিল তন্ময়। বাড়িটা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! তা ছাড়াও আছে ভাড়ার ব্যাপার। চেয়ারম্যান সাহেবের বন্ধু বলে একটু কমসম হলেও হতে পারে। কিন্তু পুনেতে, তন্ময় শুনেছে, এমনিতেই বাড়ির ভাড়া আকাশছোঁয়া।

গেস্টহাউসের পাশেই একটা গেট। গেট দিয়ে বেরিয়ে তন্ময় দেখল এটা অফিসের সামনের সেই চওড়া রাস্তাটা নয়—সম্ভবত তারই একটা শাখা। লোক চলাচল সবে শুরু হয়েছে। একঝাঁক ফুলের মতো বাচ্চা নিয়ে চলে গেল স্কুলের একটি মিনিবাস। এদিকে বাড়ি-ঘরের সংখ্যা কম। বাড়ির মাঝখানের দূরত্ব ভরাট করে রেখেছে বড়-বড় গাছের বাগান। প্রতিটি বাড়িই যেন ছোট এক-একটা জঙ্গলের মধ্যে।

প্রায় পাঁচ মিনিট সোজা হেঁটে তন্ময় দেখল রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরেছে। বাঁক ঘুরতে চোখে পড়ল। অসিত মুখার্জি ট্র্যাক-স্যুট পরে জগিং করে এদিকেই আসছেন। সুঠাম ফরসা চেহারা, কপালে ঘাম, তন্ময়কে দেখে না থেমেই বললেন, আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ-দিকে টিক নার্সারি দেখতে পাবে—একপাশে কম্পাউন্ডের গেট।

BanglaBook.org

সাইনবোর্ড চোখে পড়ল দূর থেকেই। পাশে লোহার গেট। কেউ কোথাও নেই। কম্পাউন্ডের ভেতর দীর্ঘ, সবুজ সেগুন গাছ সারি-সারি। বিভিন্ন সাইজের টিন-শেড গোটাকয়েক। বাঁ-দিকে ছোট চারার অসংখ্য বেড। সিমেন্টের বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। এইসব দেখতে-দেখতে গেট পার হয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে পৌঁছে তন্ময় দেখল—লেখা রয়েছে 'অফিস' এবং স্বাভাবিকভাবেই তালা ঝুলছে।

আমাকে তো অফিসে ডাকা হয়নি, ডাকা হয়েছে বাড়িতে। বাড়ি বা বাড়ির রাস্তা কি অন্যদিক দিয়ে? থমকে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছিল তন্ময়। ডানদিকে চোখ পড়তেই দেখল একটা বোর্ডে 'রেসিডেন্স' লিখে তির চিহ্ন দেওয়া আছে।

তিরের নিশানা লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে তন্ময় দেখল, বারান্দার গায়ে একটা দরজায় ভারী পরদা ঝুলছে। সিগারেটের গন্ধে জায়গাটা আমোদিত। না, দেরি হয়নি, ঘড়ি দেখল তন্ময়। এখনও সাড়ে সাতটা বাজতে প্রায় দু-মিনিট বাকি।

তন্ময়ের না হলেও দুলালের আজ অসম্ভব দেরি হয়েছে ঘুম ভাঙতে। কাল কেষ্টদাদের আড্ডায় যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। ফিরতে দেরি, শুতে দেরি, খোয়ারি ভাঙতে দেরি। হুঁশ হল শেকলের ঝনঝন শব্দে। কুলুঙ্গিতে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল দুলাল, সাতটা পঁচিশ। সর্বনাশ! সাহেবকে সকালের কফি দেওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখে ঝি বিমলা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দরজার শেকল বাজাচ্ছে।

দৃকপাত না করে, মুখে-চোখে জল দিয়েই ও এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। আজ কপালে দুঃখ আছে। দেবতার মতো মানুষটা সময়ের হেরফের দেখলেই একেবারে বদলে যায়। কিছুই বলবে না হয়তো, শুধু হিমশীতল চোখে দুলালের পা থেকে মাথা অবধি দেখবে। সে কী দেখা রে বাবা! যেন হাড় ফুটো হয়ে যায়!

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্লেটের ওপর কফি পড়ে গেল চলকে। এইভাবে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্লেটের কফি ফেলে পরিষ্কার করে আবার কাপ রাখল দুলাল। বিমলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। এ-বাড়িতে একজনের কাজে অন্যজনের সাহায্য করার নিয়ম নেই। তাই চুপচাপ মজা দেখছে। ওকে পরে দেখে নেবে দুলাল। এখন ক'টা বাজল কে জানে!

কফির কাপ-প্লেট ট্রেতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হওয়ার আগেই ঝনঝন শব্দ।

আপনার কী হয়েছে, কী হয়েছে আপনার? উঠুন, উঠুন, বাড়িতে কে আছেন!

ঘর ফাটানো এইরকম চিৎকারে মাথা ঘুরে গেল দুলালের। প্রায় ছুটে সাহেবের বসার ঘরে এসে দেখল, সাহেব মাটিতে পড়ে আছেন, আর একটি অচেনা, অল্পবয়েসি ছেলে ওঁর পাশে বসে চিৎকার করছে, বাড়িতে কে আছেন!

দুলালের পা কাঁপতে লাগল। কফির ট্রে একপাশে রেখে সাহেবকে ধরে তুলতে গিয়েই বুঝল, সব শেষ। ততক্ষণে বিমলা পায়ের কাছে বসে তীক্ষ্ণস্বরে কাঁদতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

চেয়ারে বসেই রবির চোখ লেগে এসেছিল। টেবিলের খাতাপত্রের ওপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেই জানে না। কান্নার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। নীচের তলা থেকেই শব্দটা আসছে নাকি! দু-চোখে রাত জাগার ক্লান্তি করকর করছে। প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গগনদার স্টাডিরুমে এসে যেন দেওয়ালের সঙ্গে প্রবল ধাক্কা খেল রবি। গগনদা ঘরের একদিকে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, খোলা মুখ থেকে জিভটা লটকে বেরিয়ে আছে

বাইরে। বসে পড়ে গায়ে হাত দিয়ে চিৎকার করে ডাকল রবি, গগনদা—।

ওর গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বের হল না। উঠে ভেতরে গিয়ে ও ডাকল, বউদি, ও বউদি, তুমি কোথায়?

বিমলা রুদ্ধস্বরে বলল, বাঈসাহেব বাড়িতে নেই, ছোটবাবু।

জগিং করে ফিরে, লতা-পাতা ঘেরা বাড়ির পিছনের বারান্দায় বারবেল নিয়ে একটা ওয়ার্কআউট করছিলেন অসিত। বেতের টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটা সুর করে বাজল এইসময়।

বোতাম টিপে কানে লাগাতেই শুনলেন রবির গলা—অসিতদা, বাড়িতে ভীষণ বিপদ, মনে হয় গগনদা আর নেই।

বুকের ভেতর কোথায় বিরাট একটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, অনুভব করলেন অসিত। রবি তখনও বলে চলেছে, একটা অচেনা ছেলে, নাম বলছে তন্ময়, বলছে, তুমিই নাকি ওকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলে। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্যে—।

॥ ২ ॥

পুনেতে আসার আগে গগনরা কোথায় ছিল সেটা এখন আর মনে পড়ে না অসিতের। ওর বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন। বদলি হয়ে এসেছিলেন পুনেতে আর গগন এসে ভরতি হয়েছিল অসিতদের স্কুলে।

প্রথম দিনেই লম্বা, কালো, রোগা, গভীর কণ্ঠস্বরের এই ছেলেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অবলীলাক্রমে। সব থেকে পিছনের বেঞ্চে বসে ক্রমাগত কোর্সের বাইরের বই পড়ত যে-ছেলেটি, তাকে কোর্সের কূটকচালি প্রশ্ন জিগোস করে কিন্তু প্যাঁচে ফেলতে পারেননি স্কুলের কোনও শিক্ষকই।

মেধা ছাড়া চরিত্রের অন্য দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছিল আরও পরে। গগন অসম্ভব একরোখা, রাগী। গগন ভালো ফুটবল খেলে, গগন ভালো বলে, গগন মেয়েদের ব্যাপারে বেশ দুর্বল। অসিতের সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে গিয়েছিল, প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনেই। থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স-এর তৃতীয় জন, মানে তরুণ, কিন্তু বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আড়ালে বলত, হি ল্যাক্স সফিস্টিকেশন।

ইন্টারমিডিয়েটের পর ওদের কলেজ আলাদা হয়ে গেল। তরুণ আর অসিত ভরতি হল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, আর গগন থেকে গেল সায়েন্স কলেজেই। দেখা-সাক্ষাৎ, আড্ডা অবশ্য একটুও কম হয়নি, বরং বেড়েছিল। মাঝে-মাঝে দু-দিন ছুটি পড়লে ওরা বেরিয়ে পড়ত লোনাবালা, খান্ডালা বা মাথেরনের দিকে। এইরকমই একটা খামখেয়ালি ট্যুরে আলাপ হয়েছিল জার্নালিজমের ছাত্রী বর্ষা দেশপাণ্ডের সঙ্গে।

গগন যে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে যাবে, এটা মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু বি.এসসি-র পর ও যখন আই.এ.এস-এর দিকে হাত না বাড়িয়ে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য তৈরি হতে শুরু করল, তখন অসিতরা অবাক হয়েছিল নিঃসন্দেহেই। কংক্রিটের জঙ্গল নয়, সত্যিকারের জঙ্গল হবে আমার কর্মস্থল,—এই ছিল গগনের বাঁধা উত্তর। তবে তরুণ অবশ্য আড়ালে বলেছিল, বর্ষার পর্যাবরণ নিয়ে লেখার আগ্রহ আর অনুসন্ধানের ইচ্ছে—এইগুলোই নাকি আসল কারণ। গগন 'ফরেস্ট অফিসার' হয়ে বর্ষাকে ইমপ্রেস করতে চায়।

দেরাদুনে গগন ট্রেনিং-এ চলে যাওয়ার পর ওদের সম্পর্ক একটু ক্ষীণ হয়েছিল সাময়িকভাবে।

BanglaBook.org

কিন্তু ছুটিছাটায় পুনে এসে ও আগের মতোই হইহুল্লোড় করত। ততদিনে বর্ষা আর ওর বোন উষাকে ভালোরকম বাংলা শিখিয়ে দিয়েছে অসিতরা, আর বর্ষাও নতুন শেখা বাংলায় এটা-সেটা পড়তে শুরু করেছে।

এই সময় একবার দেরাদুন থেকে পুনে এসে গগন বলল, 'তোমার লেখা প্রথম বাংলা চিঠি হবে আমার জন্যে। এটা শুনে তরুণ বাস্তবিক চটেছিল। অসিতরা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ারে। আর এটাও ততদিনে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বর্ষার ব্যাপারে গগনের যতই উৎসাহ থাক, বর্ষা ভালোবাসে তরুণকে আর তরুণ বর্ষাকে। অসিত ছিল এই নাটকের নির্বাক দর্শক। কিন্তু সত্যিই নির্বাক ছিল কি?

এখন মনে হয়, এর মধ্যে কোথাও ভবিতব্যেরও বিরাট একটা ভূমিকা ছিল যেন। আই. এফ. এস. হয়ে গগন পেতেই পারত হিমাচল প্রদেশ বা কেরলের মতো একটা ক্যাডার। বিশাল এই ভারতের অন্য এক কোনায় থেকে, বর্ষার সঙ্গে সারা জীবনে আর একবারও দেখা না হয়ে কাটতেই পারত ওর জীবন। তা না হয়ে গগন কিন্তু পেল মহারাষ্ট্র ক্যাডার। আর তার কিছুদিন পরে পুনের ইন্ডিয়া কফি হাউসে বসে গগনের সেই অদ্ভুত ঘোষণা—এই ইঞ্জিনিয়াররা কিস্যু করতে পারবে না। বি-টেক করেই এরা ছুটবে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রির দিকে, দেখে নিয়ো। বর্ষা, তোমার জীবনে যদি কেউ স্থিতি আনতে পারে, তো সে এই বান্দা, এই হার্ডকোর ফরেস্টার।

বর্ষা চটপট জবাব দিয়েছিল, স্থিতির জন্যে আমার যে তোমাদেরই একজনকে দরকার হবে এটা ধরে নিচ্ছ কেন?

একটা সিগারেট ধরিয়ে গগন জবাব দিয়েছিল, আমি ইস্যু ওপেন করে অফার দিয়ে গেলাম। জীবনটা তোমার—তুমি ভেবে দেখো। বলেই গটমট করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এর পরের তিন-চারটে বছর একটু এলোমেলো। গগন ওই সময় পোস্টেড ছিল নাগপুরে, গন্দিয়ার দিকে। তরুণ গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় ম্যানেজমেন্ট পড়তে। ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়েছিল অসিতও, তবে দেশেই। আর বর্ষা এই সময় একটা বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিকে লিখতে শুরু করে হইচই ফেলে দিয়েছিল। তবু পুনে বা পুনের আশেপাশে ছিল বর্ষা আর অসিতই। গগন আর তরুণ এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে বর্ষাকে কেড়ে নেওয়ার চিন্তা অসিতের মনের কোনও স্তরে এইসময় কাজ করেনি। নাকি অসিত সাহস করেনি হেরে যাওয়ার ভয়ে।

এইসব চুলচেরা বিচারের সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না অসিত। বর্ষারও তো বোঝা উচিত ছিল, এটা আসলে প্রেমের ত্রিভুজ নয় চতুর্ভুজ, যার চতুর্থ কোণটা আঁকড়ে ধরে আছে সক্ষম অসিত। ওর মনে হয়, বর্ষা এটা বুঝেও না বোঝার ভান করেছে চিরকাল।

জীবন এইভাবে গড়িয়ে-গড়িয়ে কোথায় গিয়ে থামত কে জানে। এইসময় হঠাৎ একদিন চরম বোঝাপড়া হয়ে গেল অদৃষ্টের হাতে। গগন জুনারে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হয়ে পোস্টেড হওয়ার পরের কথা। তরুণ ফিরে এসেছে, অসিতও পুনেতেই। গগন পুনে এসেছিল কী একটা কাজে। এসেই বলল, বর্ষা এখানে নেই তাতে বয়ে গেছে। চল, আমরা মহাবালেশ্বর ঘুরে আসি।

মাহিন্দ্রা জিপে, খাবারদাবার, থার্মোস, জলের বোতল নিয়ে ড্রাইভার বসেছে পিছনে। ড্রাইভ করছিল গগন নিজে। মাঝখানে অসিত, সবচেয়ে ধারে তরুণ। গগন আর তরুণই বক্তা, অসিত মূলত শ্রোতা। তরুণ বলছিল ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আর গগন অরণ্যের অজানা তথ্য। সহ্যাদ্রির জিলিপির প্যাঁচ দেওয়া রাস্তায় সেপ্টেম্বরের এক সকালে জিপ ছুটছিল হু-হু করে। ঠিক এইসময় ঘটল ঘটনাটা। বাঁ-দিকে দাঁত বার-করা পাথুরে পাহাড় আর ডানদিকে অতলান্ত খাদ। একটা 'ইউ টার্ন' ঘুরতেই চোখে পড়ল, রাক্ষসের মতো একটা ট্রাক প্রবল গতিতে এগিয়ে আসছে মুখোমুখি, একেবারে কাছেই। গগন প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল, ব্রেক কষল। আলোর চমক, প্রচণ্ড শব্দ, তারপর সব অন্ধকার।

তরুণ ছিটকে পড়েছিল বাইরে, মাথাটা চুরমার হয়ে গিয়েছিল পাথরের ধাক্কায়। আই. সি. ইউ.-তে সাতদিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকার পর ও আর কাউকে কষ্ট দেয়নি।

তিন টুকরো ডানহাত নিয়ে অসিত কিন্তু বেঁচে উঠল খুব কমের ওপর দিয়ে।

গগনের বাঁ-পাটা হাঁটুর নীচে থেকে বাদ দিতে হল। বাঁ-দিকের চোখটাও অক্ষত নেই।

বাকি গল্পটা অসিত শুনেছিল গগনের কাছেই।

চোখ খুলে গগন দেখেছিল বর্ষার উৎকণ্ঠিত মুখ। বর্ষা জিগ্যেস করেছিল, তুমি কেমন আছ?

আমি বেঁচে যাব এ-যাত্রায়—গগন বলেছিল, ইঞ্জিনিয়ার দুটোর কী খবর?

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়নি বর্ষা। চোখে জল, অস্ফুট গলায় বলেছিল, আজ থেকে বছর চারেক আগে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বলেছিলে, মনে আছে? আমি ভেবে নিয়েছি, আমি রাজি।

কষ্টের মধ্যেও হেসে গগন জিজ্ঞাসা করেছিল, সহানুভূতি?

প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে গগনের বাড়িতে পৌঁছে অসিত দেখল, সেই গগন, এখন ইতিহাস হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। প্রবীণ ডাক্তার পাটিল এসে গেছেন, পরীক্ষা করছেন গগনকে।

সাব-ইন্সপেক্টার প্রসাদ, কনস্টেবল, ফটোগ্রাফার ইত্যাদির দলবল নিয়ে গগন পালিতের বাড়িতে পৌঁছে আকাশ দেখল, বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। ডাক্তার গগনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন—এমনকী অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানাতেও বাকি রাখেননি।

বর্ষা পালিত মন্দির থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। বিমলা ওঁকে ভেতরে নিয়ে গেছে। মন্দিরের থালা, ফুল, প্রসাদ ছড়িয়ে আছে মাটিতে।

মৃতদেহ একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। মাথার দিকে একটা চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে। একটা সোফায় বসে ডাক্তার পাটিল আর অসিত খুব নীচু গলায় কথা বলছিলেন। অন্য একটা সোফায় তন্ময় বসেছিল একা। আকাশকে ঢুকতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়ালেন।

প্রাথমিক আলাপের পর্ব চুকিয়ে অসিত সংক্ষেপে বললেন আনুপূর্বিক ঘটনা। শেষের দিকটা বলল তন্ময়। মৃতদেহের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, প্রথম যখন দেখেছিলেন আপনি, তখন কি ঠিক এইভাবেই পড়েছিলেন?

তন্ময় একটু ভেবে বলল, না, বাঁ-হাতটা বোধহয় বুকের ওপর ছিল। আমি এই হাতটা ধরে ওঁকে ডেকেছিলাম, ঝাঁকানি দিয়েছিলাম। তারপর হাতটা নীচে মাটিতে রেখে ফেলেছি। ওই সময় আমারই কনুই-এ লেগে ওই ফ্লাওয়ার ভাসটা ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

আকাশ দেখল, গগন পালিতের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় এলোমেলো বড় চুল, গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। কর্কশ মুখে ভয়, উত্তেজনা, কষ্ট আর ঘৃণার অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। সাদা খাদির পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে গলায় সাদা সুতির স্কার্ফ। বাঁ-পাটা একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় পরীক্ষা করে আকাশ বলল, ফলস লিম্ব?

—হ্যাঁ, অসিত জবাব দিলেন, প্রায় তেরো বছর আগে একটা অ্যাকসিডেন্টে ওঁর একটা পা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কোনাকুনিভাবে রাখা একটা সোফার পিছনে প্রায় দু-হাত জায়গা ছেড়ে পড়ে আছে গগনের শরীর। সোফার ডানদিকের হাতলে সুন্দর কাজ করা ওয়াকিং স্টিক ঠেস দিয়ে রাখা। সোফার নীচে মাটিতে একটা ভাঙা দোমড়ানো সিগারেট চোখে পড়ল আকাশের। সামনের পোড়া অংশটা দেখলেই বোঝা যায়, এটা জ্বালানো হয়েছিল, সম্ভবত খাওয়াও হয়েছিল। আকাশ জিজ্ঞাসা করল, এ-বাড়িতে

BanglaBook.org

সিগারেট কে খান?

—গগনই খেত। আর তো কেউ, অসিত ইতস্তত করে বললেন, আমার মনে হয় না রবি সিগারেট খায়।

—গগনবাবু কি একটু বা অর্ধেকটা সিগারেট খেয়ে ফেলে দিতেন?

আকাশের প্রশ্নের উত্তরে একটু ভেবে অসিত বললেন, কখনও এরকম দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—আর-একটা প্রশ্ন। গগনবাবুর কি যেখানে-সেখানে সিগারেট ফেলে দেওয়ার অভ্যেস ছিল?

—ঠিক তার উলটো। ওকে আমি অ্যাশট্রেতে ছাড়া সিগারেট ফেলতে দেখিনি কখনও। ইন ফ্যাক্ট, ও খুব মেথডিক্যাল আর ডিসিপ্লিনড ছিল। কথার শেষে অসিতের গলা ভারি হয়ে এল।

রক্তপাত বা আঘাতের কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না আপাতদৃষ্টিতে। প্রসাদের সাহায্য নিয়ে মৃতদেহ উপুড় করে দিতেই আকাশের চোখে পড়ল, সুপুরির চেয়েও ছোট সাইজের সম্ভবত কিছুর দুটো বীজ পড়ে আছে।

সাবধানে হাতে নিয়ে দেখল, গড়ন গোলাকার, গায়ে লাইনটানা দাগ।

এগুলো কী দেখুন তো, আকাশ বলল।

একটু মলিন হেসে অসিত বললেন, সম্ভবত সেগুনের বীজ। আমি এ-লাইনের লোক নই, রবি ভালো বলতে পারবে।

খানিকটা স্বগতোক্তির মতো আকাশ বলল, এগুলো এখানে কেন!

মাঝারি সাইজের এই ঘরে ঢোকার তিনটি দরজা, একটা বাইরের দিকে, অন্য দুটি ভেতরের দিকে। ভেতরের একটি দরজার কাছে রবি এসে দাঁড়িয়েছিল উদ্বিগ্নভাবে। ওকে ভালো করে দেখে আকাশ বলল, আপনিও কি মন্দিরে গিয়েছিলেন? না কি অন্য কোথাও?

—না তো, কোথাও যাইনি। রবি বলল।

—কোথাও যাননি? মানে ঘুম থেকে উঠে সোজা এই ঘরে এসেছিলেন, তাই তো?

—হ্যাঁ, কেন?

আকাশ বলল, আপনি কি জামা, প্যান্ট, জুতো—এইসব পরেই ঘুমোতে যান?

এতক্ষণে সকলের চোখে পড়ল রবি সত্যিই বাইরে যাওয়ার পোশাকেই আছে। থতমত খেয়ে রবি বলল, না, মানে...কাল রাত্রে একটু দেরি করে, মানে ইয়ে, তখন আর চেঞ্জ করা হয়নি।

ওই ঘরটাকে প্রথাসিদ্ধ ড্রয়িংরুম বলা চলে না, ড্রয়িং কাম স্টাডি। একপাশে রাইটিং টেবিল, চেয়ার, দুটি আলমারি ভরতি বই। ঘরের মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল ঘিরে গোটাকয়েক সোফা। সেন্টার টেবিলে একটা কাঠের অ্যাশট্রে, তাতে একটাই পোড়া কাঠি। সম্ভবত এই কাঠি দিয়েই জ্বালানো হয়েছিল সিগারেটটা।

লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল আকাশ। বাঁশের কলমদানি, বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরি টেবিল ল্যাম্প, বাঁশের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট টেবিল ঘড়ি। একপাশে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। পেপার ওয়েটের নীচে রাখা একটা টেলিগ্রাম তুলে নিয়ে আকাশ দেখল, জনৈক গায়কোয়াড়, আকোলার পোস্ট অফিস থেকে, ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে আটকে পড়ার কথা লিখেছে। গায়কোয়াড় নিশ্চয়ই গগনবাবুর ফার্মের কোনও কর্মচারী। টেলিগ্রামের কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঁকিবুকি কাটা। আর-এক জায়গায় কয়েকবার লেখা কান্তিলাল, কান্তিলাল।

—এই হাতের লেখা কি গগনবাবুর? আকাশ জিগ্যেস করল।

মন দিয়ে লেখাটা দেখে অসিত বললেন—হ্যাঁ।

—আর কান্তিলাল কে?

যদিও ডাক্তারের বিষয়ের অন্তর্গত নয়, তবু যেন ভীষণ আশ্চর্য হয়েছেন এইভাবে ডাক্তার

BanglaBook.org

পাটিল বললেন, সেকী, আপনি পুনেতে পোস্টেড আর কান্তিলালের নাম শোনেননি?

আকাশ হেসে বলল, আমি খুব অল্প দিন হল এখানে এসেছি। তবু আমার অজ্ঞতার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি সত্যিই কান্তিলালকে চিনি না।

—কান্তিলাল এখানে একজন নামকরা বিজনেসম্যান। ওঁর—।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, ওঁর কীসের বিজনেস?

—ওঁর নানারকম বিজনেস আছে। বিড়ি পাতার, স-মিলের, নার্সারির। ইলেকশনে দাঁড়িয়ে দুবার হেরে গেছেন ঠিকই, তবে শুনেছি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ যাতায়াত আছে। অসিত বললেন।

—গগনবাবুর সঙ্গে ওঁর কীসের সম্পর্ক?

—সঠিক সম্পর্ক কী তা তো বলতে পারব না। বিজনেস রাইভ্যালরি হতে পারে, কারণ কান্তিলালেরও নার্সারির বিজনেস আছে। তা ছাড়া, ভেবে দেখুন ওঁর অন্য যা কিছু বিজনেস তার সঙ্গেও জঙ্গলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আর গগন ছিল ফরেস্ট অফিসার। আমার মনে হয়, বর্ষা এ-বিষয়ে আরও কিছু বলতে পারবে।

তন্ময় এতক্ষণ চুপচাপ সকলের কথা শুনেছিল। অসিতের কথা শেষ হতেই ও হঠাৎ উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে বলল, আমি অবশ্য কাউকেই চিনি না, কিন্তু স্যার, এখন আমার একটা কথা মনে পড়ছে যেটা বলা দরকার। আমি যখন আজ সকালে পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, মে আই কাম ইন, সাড়া পেলাম না। এদিক-ওদিক দেখছি, ভাবছি কী করব, এমনসময় একটা লোককে দেখলাম, সামনের গেটের ওপাশ থেকে ধাঁ করে সরে গেল।

আকাশ বলল, লোকটার চেহারা কেমন কিছু মনে আছে?

—কিছুটা মনে আছে। তন্ময় বলল, বেশ কালো গায়ের রং, দোহারা গড়ন, ধুতি আর শার্ট পরা, মাথায় সাদা টুপি।

॥ ৩ ॥

পকেট থেকে কাগজে মোড়া বীজ দুটি বার করে রবির হাতে দিয়ে আকাশ বলল, এগুলো কীসের বীজ আর গগনবাবুর মৃতদেহের নীচে কী করে এল, কিছু বলতে পারবেন?

রবির ঘর ওপরতলায় ছাদের পাশে।

সিঙ্গল বেডের খাটে সুন্দর নিভাঁজ বিছানা। জানলার পাশে টেবিল চেয়ার, দেওয়ালে আয়না লাগানো একটা ছোট ওয়ার্ডরোব। টেবিলের ওপরে স্তূপীকৃত মোটা-মোটা হিসেবের খাতাগুলো ছাড়া ঘরের আর সবকিছুই গোছানো, পরিপাটি।

বীজগুলো হাতে নিয়ে দেখে রবি বলল, এগুলো সেগুনের বীজ—কোনও নার্সারি থেকে এসেছে। কী করে এসেছে বলতে পারব না।

আকাশ বলল, পুনেতে সেগুন গাছের অভাব নেই। বীজগুলো যে নার্সারি থেকেই এসেছে তা কী করে বলছেন?

রবি বলল, সেগুনের গাছ থেকে যে-বীজ মাটিতে পড়ে, তাকে সাধারণ ভাষায় আমরা 'বীজ' বললেও আসলে সেগুলো সেগুনের ফল। ফলের ওপর একটা শক্ত শাঁসের মতো আবরণ থাকে। এই আবরণ বা খোলসটা সরিয়ে দিলে আঁটির মতো এই অংশটা বেরিয়ে পড়ে।

—খোলসটা কি নিজে থেকেই সরে যায়? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

রবি বলল, জঙ্গলে, ন্যাচারাল কন্ডিশনে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ঘষা লেগে নিজে থেকেই সরে যায় ঠিকই, তবে তাতে অনেক সময় লাগে। যারা সেগুন নিয়ে কারবার করে, গাছ লাগায়,

BanglaBook.org

নার্সারি করে, তাদের অত অপেক্ষা করলে চলে না। তারা নার্সারিতে কৃত্রিম উপায়ে এই খোলসটা সরিয়ে ফেলে। এই খোলস বা কভার সরিয়ে নেওয়াটাকেই আমরা বলি 'ট্রিটমেন্ট' করা। আর যেহেতু এই ফলগুলো 'ট্রিটমেন্ট' করা ফল তাই আমার ধারণা এগুলো এসেছে কোনও নার্সারি থেকে।

রবির টেবিলে অন্তত কুড়ি-বাইশটা ছোট-ছোট প্লাস্টিকের কৌটো—প্রত্যেকটার ওপর লেবেল লাগানো। একটা কৌটো তুলে আকাশ বলল, এতে কী রেখেছেন?

একটু ইতস্তত করে রবি বলল, ওর ভেতর তা-ই আছে যা আপনি দেখালেন।

ঢাকা খুলে হাতে নিয়ে আকাশ দেখল, গগনের মৃতদেহের নীচে পাওয়া বীজের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কোনও তফাত নেই।

সব কৌটটাতেই কি সেগুনের বীজ?

রবি বলল, সেগুনেরই, তবে আলাদা ভ্যারাইটির বলতে পারেন। ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্য সেগুনের জন্যে বিখ্যাত। আবার প্রত্যেকটা রাজ্যের একাধিক ভ্যারাইটিও আছে। আমরা এইরকম অনেকগুলো ভ্যারাইটির ক্লোনাল গার্ডেন তৈরি করেছি। এই বীজগুলো আমাদের বিভিন্ন ক্লোনাল গার্ডেন থেকে সংগ্রহ করা নমুনা।

—আপনাদের মার্কেট কি প্রধানত সেগুন বীজের? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

রবি বলল, আজ থেকে সাত-আট বছর আগে আহমেদনগরে থাকতে গগনদা যখন চাকরি ছেড়ে বিজনেসে নামার কথা ভাবল তখন শুরু করেছিল বীজ দিয়েই। বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ট্রিটমেন্ট করে বিক্রি। তারপর এল সেগুনের স্টাম্প আর চারা। তবে আহমেদনগরের চেয়ে পুনের মার্কেট অনেক বড়, আর মুম্বই-এর সঙ্গে যাতায়াত, আদানপ্রদানও অনেক সোজা, তাই কয়েক বছরের মধ্যেই পাকাপাকিভাবে পুনেতে শিফট করল। এইখানে বীজের ট্রিটমেন্ট বাড়ল, শুরু হল বিভিন্ন ক্লোনের স্টাম্প, ক্লোনাল গার্ডেন, হাইব্রিড তৈরি। তা ছাড়াও. সেগুনের প্ল্যান্টেশন তৈরি করে দেওয়া। এখন তো আমাদের লাগানো সেগুন গাছও বেশ বড় হয়ে গেছে। গগনদার ইচ্ছে ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই 'পোলক্রপের' বাজারে ঢুকে পড়ার।

—এই ব্যাবসায় কান্তিলাল আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই না? আকাশ প্রশ্ন করল।

—বলতে পারেন, না-ও বলতে পারেন।

—মানে?

—মানে, রবি বলল, সেগুনের ব্যাপারে আমরা যা করছি ও-ও তা-ই করে বা করতে চায়। তবে গগনদার মাথা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কোনওটাই ওর নেই। তাই ধারে-কাছে আসতে পারে না। তবে ওর অন্য আরও বিজনেস আছে। একটাতে না হলে আর-একটাতে পুষিয়ে নেয়। সেখানে আমরা নেই।

—আর গায়কোয়াড়?

—ও আমাদের ট্রাক ড্রাইভার।

—ওর টেলিগ্রামের কথা কি আপনি জানেন? ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়ার কথা?

—জানি, গতকাল গগনদা বলেছিল।

—গায়কোয়াড় কি ট্রাকে কিছু নিয়ে আসছিল? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

রবি বলল, হ্যাঁ। পূর্ব-দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে একটা জায়গা আছে—আলাপল্লী—একেবারে অন্ধ্র প্রদেশের গায়ে লাগানো। ওখানকার সেগুন জগৎ বিখ্যাত। ওখান থেকে বীজ নিয়ে আসছিল, মাঝপথে ব্রেকডাউন। রবিকে একটু বিচলিত মনে হল—ট্রাক খারাপ হতেই পারে। কিন্তু মালটা না এসে পৌঁছোনোয় আমাদের সুনামের ক্ষতি হয়ে গেল। করপোরেশনকে সাপ্লাই করার কথা ছিল—ট্রিটমেন্ট করে। খুব বড় কনট্র্যাক্ট।

—আপনারা এই কনট্র্যাক্ট কীভাবে পেয়েছিলেন, আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

ভ্রূকুটি করে রবি বলল, যেভাবে লোকে পায় সেভাবেই—টেন্ডার নোটিশে আবেদন করে।

—কান্তিলাল চেষ্টা করেনি?

—করেছিল বইকি, পারেনি।

আকাশ বলল, আপনাকে সোজাসুজি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি মনে হয় না, এটা একটা স্যাবোটাজ?

রবি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলল, কী জানি!

—আর-একটা কথা, আকাশ বলল, একটু আগে আপনি বললেন, এগুলো বীজ নয়, ফল বা ফলের আঁটি। কৌতূহলবশে জিগ্যেস করছি, সেগুনের বীজটা তাহলে থাকে কোথায়?

—বীজ থাকে এর ভেতরে। বলে রবি একটা কৌটো খুলে হাতে একটা ফল নিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল একটা সুপুরি কাটার জাঁতি। জাঁতি দিয়ে ফলটা দু-ভাগে কেটে বলল, এর ভেতরে চারটে ছোট-ছোট চেম্বার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? দুটো চেম্বারে দেখুন, সরষের চেয়ে একটু বড় সাদা দানার মতো রয়েছে—ওটাই বীজ। কখনও-কখনও চারটে চেম্বার খালিও থাকে। মানে বীজ থাকে না।

প্রসাদ উঁকি মেরে দেখে বলল, সেগুন গাছ লাগাবার সময় আপনারা এই সাদা বীজগুলো বের করে লাগান? সে তো খুব পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, মশাই!

—না-না, যারা গাছ লাগায় তারা নার্সারিতে ট্রিটমেন্ট করা এই আঁটিটাই লাগায়। বারবার জলে ভিজিয়ে, শুকিয়ে, মাটির নীচে গর্ত করে রেখে, এইরকম ট্রিটমেন্ট করার নানান প্রণালী আছে। তবে আমাদের নার্সারির কথা আলাদা। গগনদার কিছু নিজস্ব ইনোভেশন ছিল, ওটা ট্রেড সিক্রেট। আমরা ট্রিটমেন্ট করি মেশিনে। তাতে সময় লাগে অনেক কম আর রেজাল্ট হয় অনেক ভালো। সেইজন্যেই আমাদের ফার্মের বীজের দাম এত বেশি।

তন্ময় মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছিল, বিনীতভাবে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, মিস্টার পালিত, এর মধ্যে ইনোভেশনের কোনও ব্যাপার নেই। ওই ধরনের ডিকর্টিকেশনের মেশিন বাজারে এসে গেছে অনেকদিন আগেই।

রবি কিছুক্ষণ দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তন্ময়ের দিকে। বলল, আমার নাম রবি বাসু, আমি পালিত নই। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি এর কী বোঝেন? আপনি কি একজন সেগুন বিশেষজ্ঞ?

তন্ময় হাতজোড় করে বলল, ক্ষমা করবেন, আমি সেগুনের কিছুই বুঝি না। তবে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিসেবে এই ধরনের মেশিন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি একটু। আর আপনি মিস্টার গগন পালিতের ভাই, তাই আপনাকে মিস্টার পালিত বলেছিলাম। আই অ্যাম সরি!

খুব তেতো হেসে রবি বলল, কে বলেছে, আমি গগন পালিতের ছোটভাই? আমার মেজদা তরুণ বাসু ছিল ওঁর বন্ধু। অ্যাকসিডেন্টের নামে ওকে মেরে ফেলে—।

—রবি।

উঁচু মেয়েলি গলার শব্দে চমকে আকাশ দেখল, দরজার পরদা সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন গৌরবর্ণা একজন মহিলা, যাঁকে দেখে মেঘ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মধ্যাহ্নের সূর্যের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। চোখে-মুখে স্পষ্টত কান্নার ছাপ, এলোমেলো চুল, কপালে আধমোছা সিঁদুর—কিন্তু বেদনার আড়ালে ঝকঝক করছে শাণিত প্রতিজ্ঞা। নিঃসন্দেহে শ্রীমতী বর্ষা পালিত।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই উনি বললেন, কোথায় কী বলতে হয় এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটাও কি তোমার লোপ পেয়েছে, রবি!

রবিও জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, না বউদি, আমাকে বলতে দাও! কুকুর-বেড়ালের মতো আমি তোমাদের আশ্রিত হতে পারি, কিন্তু—।

BanglaBook.org

গলার স্বর আরেক পরদা ওপরে চড়িয়ে বর্ষা ধমক দিলেন।

—রবি! ওঁর দু-চোখের আগুন মনে হল রবিকে ভস্ম করে দেবে। রবি মুখ নীচু করে ওঁকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার আকাশের পালা। চোখের আগুন একটু নরম করে ওকে ভর্ৎসনা করলেন বর্ষা, ইন্সপেক্টর, আমাদের আজকের দিনটা কিন্তু সুখের দিন নয়। সওয়াল-জবাব বিকেলের দিকেও হতে পারে, আমরা কেউ পালিয়ে যাব না।

মুখে তিক্ত স্বাদ নিয়ে গগন পালিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আকাশ, প্রসাদ আর তন্ময়। হাত কচলে তন্ময় বলল, আমারই একটা বোকামির জন্যে এই অশান্তির সৃষ্টি হল, আর আপনাকে অপমানিত হতে হল।

—আরে ভাই, আমাদের চাকরিতে এসব রোজদিন হয়, আকাশ বলল, তুমি মন ছোট কোরো না।

বাড়ির সামনে সদর রাস্তার গেটের কাছে আকাশের জিপ দাঁড়িয়ে। সেদিকে হাঁটতে-হাঁটতে তন্ময় বলল, আসলে কী জানেন, ডিকর্টিকেশন জিনিসটা খুব একটা নতুন কিছু নয়। আর উনি দাবি করছিলেন ওটা ওঁর গগনদার ইনোভেশন।

আকাশ একটু হেসে বলল, বিজ্ঞান নিজেই নিজের সীমানা ভেঙে এগিয়ে যায়। প্রযুক্তির দুনিয়ায় কত কী যে হচ্ছে প্রতিদিন।

—তবে ওঁদের মেশিনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হল, তন্ময় বলল, শুধু শাঁস বা খোলসটাই সরায় না, তারপর আঁটির গায়ে হালকা আঘাত দিয়ে সামান্য ক্র্যাক করে দেয়। তাতে জল ঢুকে, আমার মনে হয়, জার্মিনেশন তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, তুমি তোমার সাবজেক্টটা খুব মন দিয়ে পড়েছিলে, তাই না?

উত্তর না দিয়ে তন্ময় সলজ্জভাবে হাসল।

প্রসাদ বলল, মুখ্য ব্যাপার যা বোঝা গেল, রবি গগনবাবুর ভাই নয় মোটেই। বন্ধু মারা যাওয়ার পর বন্ধুর ভাইকে রেখেছেন ম্যানেজার করে। দ্বিতীয় কথা, রবির ধারণা, তরুণবাবুর অ্যাকসিডেন্টঘটিত মৃত্যুর মধ্যেও গগনবাবুর হাত ছিল। আর তৃতীয় কথা, সম্ভবত সেই কারণেই রবি ওর অন্নদাতাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

—কিন্তু, আকাশ হেসে বলল, অন্নদাত্রীকে ভয় করে বাঘের মতো।

BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

'কান্তিলাল পুনের ফরেস্ট ডিভিশনে বিট ইনচার্জ ছিল একসময়। চুরির দায়ে আমার স্বামী ওকে ডিসমিস করেছিলেন। তখন থেকেই আমাদের সঙ্গে ওর শত্রুতা। এর অনেক পরে স-মিলের চোরাকারবারের কথা নিয়ে আমি একটা স্টোরি করেছিলাম, তাতে ওর মিলের নামধাম সবই ছিল। এরপর ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে ওর স-মিলের লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল দু-বছরের জন্যে।'

কান্তিলালের অফিস বাড়িতেই। খোঁজখবর নিতে যেতে-যেতে আকাশের খুব স্বাভাবিকভাবেই গতকাল বিকেলে দেওয়া শ্রীমতী পালিতের স্টেটমেন্টের কথা মনে পড়ছিল।

দোতলা বাড়ির দরজায় সশস্ত্র চৌকিদার। আকাশের ইউনিফর্ম দেখে সেলাম করলেও দরজা

ছেড়ে নড়ল না। পরিচয় ও আসার কারণ জানিয়ে খবর পাঠাবার কিছুক্ষণ পরে আকাশের ডাক পড়ল।

চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি উঠে, গদির ওপর সাদা চাদর পাতা প্রশস্ত হলঘর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে বসে আছে অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন স্ত্রী-পুরুষ। দেওয়ালে জনপ্রিয় এক নেতার সঙ্গে কান্তিলালের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে-থাকার বিরাট ছবি। সঙ্গের চাকরটি এই হলঘর পার হয়ে অন্য একটি ঘরে নিয়ে এল আকাশদের। ডিভানের ওপর কোলে বালিশ নিয়ে বসে কান্তিলাল নীচু গলায় একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন-আসুন, দারোগাজি, গগনবাবুর খুন হওয়ার ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছেন, তাই তো?

কান্তিলালের বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, গায়ের রং মিশমিশে কালো। পানের রসে রঞ্জিত ঠোঁট, পরনে সাদা ধুতি ও শার্ট, কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা। হাত নেড়ে বাকি সকলকে বিদায় করলেন।

একটা সোফায় বসতে-বসতে আকাশ বলল, খবর পেয়েছেন ইতিমধ্যেই?

ছাদ ফাটিয়ে হাসলেন কান্তিলাল, বললেন, এই তো পেপারে পড়লাম, মারাঠি, হিন্দি দুটোতেই আছে। তখনই মনে হল আপনি আসতে পারেন।

—কেন এইরকম মনে হল বলুন তো?

—গগন পালিত খুন হয়েছে আর পুলিশ আমার বাড়ি আসবে না, তা কি হয়, দারোগাজি? আমার সঙ্গে তো খুব 'পেয়ারের' সম্বন্ধ ছিল ওর। কী নেবেন, চা না ঠান্ডা কিছু?

আকাশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতেই বললেন, না-না, সে কী! আজ প্রথমবার এসেছেন আপনি!

আকাশ বলল, দেখুন, আমি এসেছি কাজে। কয়েকটা কাজের কথা বলেই চলে যাব, আপনার সময় নষ্ট করব না।

—কিছু সময় নষ্ট হবে না। ভাজু!

হাঁক শুনে নিরেট মুখের চাকরটি এসে দাঁড়াতেই বললেন, ঠান্ডা লে আও। আর হ্যাঁ, বোতল এখানেই খুলবে।—লোকটি চলে যেতে বললেন, বোতল আপনার সামনে খোলাই ভালো। কী বলেন, আপনার মনে কোনও সন্দেহ থাকবে না, মানে জহর-উহর মিলিয়েছি কি না! হাঃ-হাঃ!—আবার অট্টহাস্য করলেন কান্তিলাল।

লোকটা দু-কান-কাটা নির্লজ্জ। মনে-মনে ভাবল আকাশ। সোজাসুজি কান্তিলালের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে একটু আগে আপনি বললেন, খুব 'পেয়ারের' সম্পর্ক ছিল, সেটা কী যদি একটু খোলসা করে বলেন—!

—আমার লাইফে হরদম প্রবলেম এনেছে ওই লোকটা, হরদম। আর হ্যাঁ, ওর আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু ভালো নয়।

—আমি যদি বলি প্রবলেমগুলো আপনারই তৈরি করা। ওঁরা শুধু সেটা প্রকাশ করেছেন ডিউটির খাতিরে, আকাশ বলল।

—আমি ডিউটি করা মানুষ অনেক দেখেছি, আমাকে আর ডিউটি দেখাবেন না দয়া করে। আপনি কি বলতে চান উনি ওঁর ডিভিশনের সমস্ত 'করাপশন' বন্ধ করতে পেরেছিলেন?

—দেখুন, আমি গগনবাবুদের উকিল নই।—আকাশ মুচকি হেসে বলল, তবে আপনার যুক্তিটা আমার একেবারেই টেঁকসই মনে হচ্ছে না। তিনটে চোর ধরতে পারিনি বলে, চতুর্থ চোরটাকে ধরতে পেরেও ছেড়ে দেব, এ কীরকম কথা? যাক, আপনি বলুন, গত দু-দিন কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন?

পাশে রাখা ডায়েরি থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে আকাশকে দিয়ে কান্তিলাল বললেন, আমাদের পার্টির কনফারেন্স ছিল। চিঞ্চবড়ে। কাল রাত্রে ফিরেছি।

BanglaBook.org

চিঞ্চবড পুনে থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। আকাশ কার্ড পড়ে দেখল চিঞ্চবডে দু-দিনের কনফারেন্সের তারিখ—গতকাল আর গত পরশুর। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তাদের মধ্যে রয়েছে স্বয়ং কান্তিলালের নাম। কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে আকাশ জিগ্যেস করল, কনফারেন্সের রোজকার সময়সূচি কীরকম ছিল?

—এটা তো কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতেন। কান্তিলাল বললেন, সকাল দশটা থেকে দুটো, তারপর খাওয়ার ব্রেক। আবার সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে সাতটা। দু-দিনই তাই।

—পরশু রাত্রে, তার মানে, আপনি ওখানেই শিফট করেছিলেন?

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—ছিলেন কোথায়?

—রয়্যাল হোটেল, রুম নম্বর একশো তিন।

—আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও অনেকে ছিলেন?

—আমার রুমে আর কেউ ছিল না, অন্যান্য রুমে ছিল। আমার বাবুকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে লোকজনদের লিস্ট দিয়ে দেবে।

—লোকজনরা তো আপনাকে সারারাত বা ভোরবেলায় দেখেনি। আকাশ বলল।

—সেটা অবশ্যই আমার একটা ভুল হয়েছে, দারোগাজি! খুব মোলায়েমভাবে বিদ্রূপ করে কান্তিলাল বললেন, আমি তো জানতাম না গগন পালিত খুন হবে আর আপনি আমাকে জেরা করতে আসবেন! নইলে একটা লোককে সারারাত বিছানার পাশে বসিয়ে রাখতাম।

খোঁচা গায়ে না মেখে আকাশ বলল, একটু আগে আপনি যে বললেন গগন পালিত আর মিসেস পালিত ভালো লোক নন। তা গগনবাবুর ভাই রবি এবং বন্ধু অসিত মুখার্জি সম্বন্ধে আপনার ধারণা কীরকম?

—রবি ওর ভাই নয়, বন্ধুর ভাই। বন্ধুর মারা যাওয়ার মধ্যেও গগনের হাত ছিল। —কান্তিলাল বললেন। রবি নিজের কাজটা ভালো বোঝে। আর অসিত লোকটাকে আমি ঠিক চিনি না। লোকে বলে, ও হচ্ছে ওই আওরাতটার পুরোনো আশিক। বলে কান্তিলাল গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় শব্দ করে হাসলেন, এখনও শাদি করেনি, বুঝলেন তো?

পকেট থেকে বীজগুলো বার করে কান্তিলালের হাতে দিয়ে আকাশ বলল, এগুলো কী বলতে পারেন?

কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে বীজ ফেরত দিলেন কান্তিলাল। বললেন, সাধারণ সাগবানের বীজ, দেখার মতো কিছু নেই।

আকাশ বলল, এগুলো পাওয়া গিয়েছিল গগনবাবুর বডির নীচে।

আবার ছাদ ফাটানো হাসি হেসে কান্তিলাল বললেন, খুনের জায়গায় নিজের কোনও পরিচয় চিহ্ন ফেলে যেত আগেকার ক্রিমিনালরা—গল্পে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। আপনি কি দারোগাজি আমাকে ওই দলে ফেললেন না কি!

—আরে না-না, কী বলছেন! তা কি আমি পারি? বলে আকাশ উঠে দাঁড়াল, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আপনার গেটে যে-দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন, পুলিশের লোককে বাধা দেওয়া বেআইনি তো বটেই, তাতে সন্দেহও বাড়ে। মারা যাওয়ার আগে গগনবাবু যে কারণেই হোক, একটা কাগজে আপনার নাম লিখে গেছেন। আপনার বাড়ির সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে যখন খুশি যেমন করে খুশি আপনার বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করাটা আমার জন্যে খুব একটা বড় কথা নয়, এটা আপনি নিশ্চিত জানেন।

প্রসাদ ভেবেছিল, আকাশের সেই হাড়-জ্বালানো কথায় কান্তিলাল নিশ্চয়ই আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন। এরকম কিন্তু কিছুই হল না। গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে উনি হাঁক দিলেন,

BanglaBook.org

গোরেলাল, গোরেলাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গেটের সেই সশস্ত্র চৌকিদারটি এসে দাঁড়াতেই ওর দিকে আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে সশব্দে একটি চড় মারলেন ওর গালে। বললেন, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো গে যাও।

ফেরার সময় জিপে বসে প্রসাদ বলল, লোকটা এক নম্বরের শয়তান।

—সেইসঙ্গে স্মার্টও, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রিট স্মার্ট।'

—আপনার কি মনে হয় স্যার, ও সব সত্যি বলছিল?

—অন্তত কাগজে-কলমে ও মিথ্যে বলছে এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে এটুকু বলতে পারি। তবে, প্রসাদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই আকাশ বলল, ও সারারাত বা ভোরের দিকে নিজের ঘরে ছিল কি না এ-কথাটা হোটেলের রুমবয় বা ওয়েটারদের বশ করে জেনে নিতে হবে। গাড়িতে বা মোটর সাইকেলে চিঞ্চবড থেকে পুনে পৌঁছতে পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

॥ ৫ ॥

থলি হাতে গেট থেকে বেরিয়ে বাজারে যাচ্ছিল দুলাল। ক্যাঁচ করে গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে পিছন ফিরে দেখল পুলিশের জিপ থেকে নামছে আকাশ আর প্রসাদ। পরশু সাহেব মারা যাওয়ার দিন সকালেই একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে এরা। এখন আবার কী চাই কে জানে! কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে ও একপাশে সরে দাঁড়াল।

—তোমাদের বাড়িই আসছিলাম, আকাশ বলল, কোথায় যাচ্ছ, দুলাল?

দুলাল বলল, আজ্ঞে বাজার। চা-পাতা, চিনি, এইসব দু-একটা জিনিস কেনার ছিল।

—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আকাশ বলল, সেদিন রাত্রে রবিবাবু দেরি করে বাড়ি ফেরার পর দরজা কি তুমিই খুলে দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুলাল চটপট উত্তর দিল।

—রবিবাবু কি প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরেন নাকি?

—না সাহেব, এই কখনও-সখনও। ঢোক গিলে দুলাল বলল।

—আচ্ছা, রবিবাবু রাত্রে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন ক'টা বাজে বলতে পারবে?

এই প্রশ্নটা সম্ভবত দুলাল আশা করেনি। ওর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। খুব ঘাবড়ে গিয়ে ও বলল, সাহেব, মানে আমি তো ঘড়ি দেখিনি, তবে—।

খুব কর্কশভাবে আকাশ বলল, দুলাল, পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বললে কিন্তু বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুলালের মুখের ভাব বদলে গেল একেবারে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে, আকাশের পা ধরে বলল, সাহেব আমি গরিব মানুষ, আমি মরে যাব, আপনি আমাকে বাঁচান,—বলতে-বলতে সত্যিই কেঁদে ফেলল।

আকাশ শক্ত হাতে দুলালকে ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, সত্যি কথা বললে তোমার কিছু হবে না।

দুলাল তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এদিকটা যদিও বেশ ফাঁকা তবু দু-একজন কৌতূহলী লোক উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে আকাশ বলল, গাড়িতে এসে বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দুলাল বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির পিছনে এসে বসল। গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আকাশ জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছিল বলো, তুমি দরজা খোলোনি?

BanglaBook.org

বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে, দুলাল বলল, আজ্ঞে না। রবিবাবু কখনও দেরি করে ফিরলেও এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসেন। সেদিন রাত্রে যখন বারোটা বাজার পরও ফিরলেন না, তখন আমি খিড়কির দরজা দিয়ে একটু বেরিয়েছিলাম। বলতে-বলতে দুলাল আবার কাঁদতে লাগল।

—বলো দুলাল, স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—আমাদের বাড়ির চারটে বাড়ির পরে একটা বাড়ির গ্যারেজে, মানে কেষ্টদাদের গ্যারেজে বসে আমরা কয়েকজন একটু গল্পগুজব করি, সেখানেই গিয়েছিলাম। দুলাল বলল।

—শুধু আড্ডা, না মদ-টদও?

জিভ কেটে দুলাল বলল, না-না, সাহেব, মদ নয়। তবে কখনও-সখনও ওই একটু তাস খেলি। ভেবেছিলাম, দু-হাত খেলেই চলে আসব, কিন্তু ফিরতে এক ঘণ্টা লেগে গেল।

—খিড়কির দরজা খোলা রেখে গিয়েছিলে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

দুলাল হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। মাঝদরিয়ায় কোথাও কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছে না ও। বলল, সাহেব, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও বদ মতলব ছিল না, শুধু তাসের নেশায়—। খিড়কির দরজায় বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম, হুড়কো খোলা। হয়তো রবিবাবু খিড়কির দরজা দিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আর কেউ ঢুকে বসেছিল কি না—, সাহেব, আমারই দোষে সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনি আমাকে ফাঁসি দিন।

—থামো! ধমক লাগাল আকাশ। খিড়কির দরজা দিয়ে যাওয়া যায় শুধু উঠোনে। কিন্তু উঠোন থেকে ডাইনিং স্পেসে ঢুকতে হলে আর-একটা দরজা পার হতে হবে, তাই না? সেটা কি তখন খোলা ছিল?

—না, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল আমি ঠেলে দেখেছিলাম। তখন আমার অবাক লাগল। ভাবলাম রবিবাবু ফিরেছে কি ফেরেনি! বাইরে গিয়ে গ্যারেজে উঁকি মেরে দেখি রবিবাবুর মোটর সাইকেলটা নেই।

—আচ্ছা, তার মানে রবিবাবু তখনও ফেরেননি। অথচ খিড়কির দরজা খোলা, তার মানে কেউ ঢুকেছিল! প্রসাদ বলল।

—হ্যাঁ সাহেব। উঠোনের সঙ্গে লাগানো আমার ঘরটা। আমি আর কিছু না ভেবে খিড়কির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না করেই শুয়ে পড়লাম। আর কিছু জানি না, সকালে বিমলার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল।

—আচ্ছা, আর দুটো কথার জবাব দাও। আকাশ জিজ্ঞাসা করল, বিমলা সাধারণত কখন আসে?

—এই ধরুন সকাল ছ'টা-সওয়া ছ'টা নাগাদ।

—এসেই প্রথমে কী করে বলতে পারবে?

—পারব সাহেব, দুলাল বলল, প্রথমেই ঘরে ঝাড়ু লাগায়, তারপর আসন পরিষ্কার করে, তারপর—।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, ও কি রোজ খিড়কির দরজা দিয়ে আসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পরশু সকালেও কি তাই এসেছিল?

দুলাল আবার চুপচাপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল, পরশু সকালেও ও রোজকার মতোই খিড়কির দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। আমাকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেছিল। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙেনি বলে ও ঘুরে সদর দরজা দিয়ে এসেছিল। ওকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন বাঈসাহেব।

—আচ্ছা! কিন্তু তুমি তো খিড়কির দরজা খুলেই শুয়ে পড়েছিলে!

দুলাল হাতজোড় করে বলল, সেটাই বুঝতে পারছি না সাহেব। পরে কে এল, এসে কেন

BanglaBook.org

দরজা বন্ধ করে দিল, সে গেল কোথায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

দুলালকে বাজারে নামিয়ে দিয়ে আকাশ ফিরে এল গগনবাবুদের বাড়িতে।

সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে। সামনেই গ্রিল দিয়ে ঘেরা একটা গোল বারান্দা। গ্রিল ঘেঁষে মাধবীলতার গাছ উঠেছে। বারান্দার গায়ে ড্রয়িংরুম।

আকাশরা বেল বাজানোর আগেই, 'আমি তাহলে এখন আসি, বর্ষা' বলে বের হতে গিয়ে অসিত। আকাশ আর প্রসাদকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ম্লান হেসে বললেন, গুড মর্নিং, ইন্সপেক্টর, আসুন।

ঘরে ঢুকে আকাশ দেখল, বর্ষা একটা সোফায় বসে আছেন। অনেকটা সামলে নিলেও, মুখে-চোখে এখনও শোকের গাঢ় ছায়া।

নমস্কার করে আকাশ বলল, আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

বর্ষা বললেন, বলুন। ওঁর কণ্ঠস্বর খুব ক্লান্ত মনে হল। অসিত যদিও যাওয়ার জন্যই বেরিয়েছিলেন, কী ভেবে কে জানে, বসে পড়লেন একটা সোফায়।

আকাশ বলল, সোমবার সকালে আপনি মন্দিরে কখন গিয়েছিলেন?

বর্ষা বললেন, ঘড়ি দেখিনি, সাড়ে ছ'টা-পৌনে সাতটা হবে।

—গগনবাবু তখন কোথায় ছিলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—উনি তখন ওঁর স্টাডিরুমের সঙ্গে লাগানো বাথরুমে। আমি জলের শব্দ পেয়েছিলাম।

—আর বিমলা, দুলাল, রবিবাবু—এঁরা?

—বিমলার তখন ঝাড়ু লাগানো শেষ গেছে প্রায়। দুলাল বোধহয় তখনও জাগেনি। রবিও নিজের ঘরে ছিল নিশ্চয়ই, দেখা হয়নি।

—আপনি বাড়ি থেকে বেরুবার সময় গগনবাবুকে—।

—না, বিমলাকে বলে বেরিয়েছিলাম। বর্ষা বললেন।

—আপনি কোন মন্দিরে গিয়েছিলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—ক্যাম্প এরিয়ার শিব মন্দিরে।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আপনাদের মেন গেট দিয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি পিছনের, মানে নার্সারির, দিকের গেট দিয়ে?

—মেন গেট দিয়ে।

—হেঁটে গিয়েছিলেন?

বর্ষা বললেন, একটু হেঁটে গিয়ে অটো রিকশা নিয়েছিলাম।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, গাড়িতে যাননি কেন?

বর্ষা একটু বিরক্তভাবে বললেন, আপনার এইসব প্রশ্নের সঙ্গে আমার স্বামীর খুনের কী সম্পর্ক আছে জানি না, অত সকালে ড্রাইভার আসেনি। আর নিজেরও গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করছিল না, তাই গাড়ি নিয়ে যাইনি।

আকাশ একটু সময় নিয়ে বলল, রবিবার রাত্রে আপনি আবার উঠেছিলেন দরজা খোলার বা বন্ধ করার জন্যে, তাই না?

বর্ষা ভীষণ চটে বললেন, এইসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব আমি ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারি। দিচ্ছি, বিকজ আই হ্যাভ নাথিং টু হাইড। রবিবার রাত্রে রবি একটু দেরি করে বাড়ি ফিরেছিল। ওকে দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, তখন ক'টা বেজেছিল, ঘড়ি দেখেছিলেন?

—সাড়ে বারোটা, ডট্। বর্ষা বললেন।

BanglaBook.org

—আর পরের বার, সে কি শেষ রাতের দিকে—।

—নো, খুব জোর দিয়ে বর্ষা বললেন, আমি আর উঠিনি।

—শিয়োর?

—নিশ্চয়ই। একটা কথা বলি ইন্সপেক্টর, বর্ষা বললেন, আপনি বোধহয় কাজ ছেড়ে অন্যদের পারিবারিক ব্যাপারে একটু বেশিই মাথা ঘামাচ্ছেন।

আকাশ উঠে দাঁড়াল। ওর চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ধারালো এখন। বলল, আপনার স্বামীর খুন হওয়ার ব্যাপারটাকে যদি আপনি পারিবারিক একটা ঘটনা মনে করে থাকেন, তাহলে পুলিশে খবর না দিলেই ভালো করতেন। আমি এতক্ষণ নিজের কাজই করছিলাম। কাজের ফলাফলও আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই। আজ এইমাত্র আপনি আমার কাছে দুটো মিথ্যে কথা বলেছেন। এসো, প্রসাদ।

॥ ৬ ॥

আকাশ ওর নোট খাতায় জরুরি কয়েকটা কথা গুছিয়ে লিখে রাখছিল।

প্রথমত, আশানুরূপ পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কথা। রিপোর্টে লিখেছে, 'অ্যাসফিক্সিয়া, ডেথ ডিউ টু স্ট্র্যাংগুলেশন।' থাইরয়েড আর প্রিকয়েড কার্টিলেজ ভাঙা। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে জলে ডোবা, গলায় ফাঁস ইত্যাদি সম্ভাবনাগুলো বাদ দিয়ে অনায়াসে গলা টিপে মারার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ডাক্তার।

লেখা থামিয়ে আকাশ বলল, প্রসাদ, একটু এদিকে এসো তো, তোমার গলা টিপে দেখি।

প্রসাদ দূরের একটা চেয়ারে বসে ওর প্রিয় কড়া চা খাচ্ছিল তারিয়ে-তারিয়ে। আঁতকে উঠে বলল, স্যার, কী বলছেন!

—ভয় নেই, এসো, বোসো এইখানে। ভালো করে ভেবে আমাকে বলো, তোমার গলার ঠিক এইখানে জোর পড়বে কখন, সামনে থেকে গলা টিপলে, না পিছন থেকে?—বলে আকাশ হালকা করে গলা টিপে দেখাল।

—স্যার, বুঝেছি। প্রসাদ বলল, পিছন থেকে গলা টিপলেই হাতের আঙুল দিয়ে জোর দেওয়া যাবে বেশি।

—ঠিক তাই। আকাশ সম্মতি জানায়।

—স্যার, গগনবাবু যেখানে ও যেভাবে পড়েছিলেন তাতে মনে হয়, ড্রয়িংরুম থেকে কেউ চুপিসাড়ে স্টাডিরুমে ঢুকে পিছন থেকে আচমকা ওঁর গলা টিপে—।

—ওয়েট, প্রসাদ, ওয়েট। আকাশ প্রসাদকে থামিয়ে বলল, গলা টিপে মারা এক সেকেন্ডের কাজ নয়, মানুষ ছটফট করে। সেই সময় বডির অ্যাঙ্গেল বদলে যেতে পারে। তা ছাড়া, আঘাতটা অতর্কিতে হয়েছে, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? খুনির সঙ্গে গগনবাবুর কথাবার্তা হয়নি তার প্রমাণ কী? বলে, চায়ে চুমুক দিয়ে ও দেখল ঠান্ডা হয়ে গেছে।

—স্যার, ওটা ছেড়ে দিন, আমি গরম চা আনছি। বলে প্রসাদ চায়ের অর্ডার দিল।

বিড়বিড় করে আকাশ বলল, আচ্ছা, প্রসাদ, তোমার কি মনে হয় খুন করার জন্যে গলা টেপাটা খুব ভালো উপায়?

—আমি কী করে বলব বলুন।—প্রসাদ গোবেচারা মুখ করে বলল, আমি তো বাকি উপায়গুলো প্রয়োগ করে দেখিনি। আমার তো মনে হয়, রিভলভার, ছোরাছুরি, বিষ এসবের সুবিধে না থাকলে তবেই—।

BanglaBook.org

আকাশের দুই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, তার থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না যে, আগে থেকে প্ল্যান করা না থাকলে তবেই লোকে গলা টিপে মারে। বলেই আবার লেখায় মন দিল আকাশ।

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই রাইটিং টেবিলে, একটা জ্বালানো কাঠি সমেত অ্যাশট্রে একটু দূরের সেন্টার টেবিলে, এবং ভাঙা সিগারেটটা নীচে সোফার পাশে পড়ে আছে। এই তিনটের মধ্যে যোগাযোগটা ঠিক কীরকম? উনি যেখানে-সেখানে সিগারেট ফেলতেন না এবং সবসময় পুরো সিগারেট খেতেন এটা আমরা জানতে পেরেছি। তার মানে, উনি সিগারেট অর্ধসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কিংবা বলা যায় মারা যাওয়ার সময় সিগারেট খাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল কীভাবে?

এক নম্বর সম্ভাবনা, উনি সেন্টার টেবিলের পাশে সোফায় বসে সিগারেট বের করে জ্বালালেন, খেতে শুরু করলেন, আততায়ী ঘরে ঢুকল, কথা বলল কিংবা বলল না, গলা টিপে মারল। এটা জুতসই মনে হচ্ছে না, কারণ, সে-ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই থাকত সেন্টার টেবিলের ওপরে। গগনবাবু খোঁড়া পা নিয়ে আবার প্যাকেট আর দেশলাই রাইটিং টেবিলে রেখে আসবেন কেন?

অন্য একটা সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। উনি সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে ছিলেন রাইটিং টেবিলের কাছেই। সম্ভবত তারপর খেয়াল হয়েছিল অ্যাশট্রেটা আছে সেন্টার টেবিলে। তাই সেন্টার টেবিলের কাছে এসে আশট্রেতে কাঠিটা ফেলেছিলেন। এরপর যদি ওঁর আবার রাইটিং টেবিলে গিয়ে বসার থাকত তাহলে অ্যাশট্রেটা উঠিয়ে নিয়ে যেতেন রাইটিং টেবলে। তা যখন যাননি এবং ওয়াকিং স্টিকটাও যখন সেন্টার টেবিলের পাশে সোফায় হেলান দিয়ে রাখা তখন ধরে নেওয়া যায় চরম আঘাতটা এসেছিল সোফার কাছেই। এই থিয়োরিটা মন্দ নয় কিন্তু...লেখা থামিয়ে আকাশ বলল, প্রসাদ, তোমার কী মনে হয়, সিগারেট ভাঙা কেন?

—গগনবাবুর বা আততায়ীর পায়ের নীচে চেপে ভেঙে গেছে, এমন হতে পারে না কি? প্রসাদ বলল।

—না, হতে পারে না। পায়ের নীচে পড়লে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেত, তা কিন্তু হয়নি।—আকাশ বলল, ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে হঠাৎ চাপ দিয়ে, দুমড়ে ভাঙা সিগারেটের গোল ভাবটা কিন্তু আছে।

—এরপর আসছে বীজের কথা।—আকাশ লিখছিল, বিমলা যখন ঘরে ঝাড়ু লাগিয়েছিল গগনবাবু তখনও এসে বসেননি। বীজগুলো এসেছে ঝাড়ু লাগানোর পরে। কিন্তু মৃতদেহের নীচে পাওয়া। তার মানে বুঝতে হবে মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুর সময় এসেছে, কিন্তু মৃত্যুর পরে নয়। তার চেয়েও বড় কথা, এল কী করে! বীজগুলো কি ওখানে কেউ রেখেছে, বিশেষ উদ্দেশ্যে? নাকি বীজগুলো এসেছে ঘটনাচক্রে, হঠাৎই?

যেন মনের কথা শুনতে পেয়েছে এইভাবে হঠাৎ প্রসাদ বলল, স্যার, আপনি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন নিশ্চয়ই। ছোট-ছোট কৌটোতে যেমন রবিবাবুর টেবিলে বীজ রাখা ছিল, অতগুলো না হলেও ঠিক ওইরকমই কয়েকটা কৌটো ছিল গগনবাবুর টেবিলেও।

—লক্ষ করেছি, প্রসাদ আমি ভাবছি, বীজগুলো মৃতদেহের নীচে পৌঁছল কী করে?

—এমনও তো হতে পারে, প্রসাদ বলল, বীজগুলো উনি হাতে নিয়ে দেখছিলেন। মৃত্যুর সময় হাত থেকে নীচে পড়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে আকাশ বলল, একেবারে অসম্ভব তা বলছি না, তবে খুব স্বাভাবিক নয়। কারণ, সেরকম হলে, বীজগুলো ওঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ত ঘরের অন্য কোথাও। ঠিক মৃতদেহের নীচেই পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। মনে রেখো, ওঁকে গলা টিপে মারা হয়েছে, অর্থাৎ

BanglaBook.org

মারা যাওয়ার সময় উনি স্ট্রাগল করেছিলেন।

—দুলাল যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে রবিবার রাত্রে খিড়কির দরজা কম করেও দুবার খোলা হয়েছিল। একবার, দুলাল তাস খেলে ফেরবার আগে। দ্বিতীয়বার, ও ঘুমিয়ে পড়ার পর। অবশ্য এমন হতেই পারে, দ্বিতীয় বারেরটা শুধুই বন্ধ করা, দরজা খোলা রয়েছে দেখে। কিন্তু সেটাও করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে বিমলা আসার আগেই। শ্রীমতী পালিতের বয়ান অনুযায়ী উনি শুধু রবিকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সময় যা বলেছেন তাতে মনে হয় সেটা প্রথমবার। দ্বিতীয়বারের কথা উনি পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়বার দরজা তাহলে কে খুলেছিল এবং কার জন্যে? তা ছাড়া, রবি যদি প্রথমবার এসে থাকে, ওর মোটরসাইকেল ছিল না কেন? তাহলে কি রবি প্রথমবার আসেনি? তাহলে কে এসেছিল?

বিমলা যখন ঘরে ঝাড়ু লাগিয়েছে—অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ, তখনও গগনবাবু ঘরে এসে বসেননি। আর তন্ময় ঘরে ঢুকে যখন ওঁর মৃতদেহ দেখেছে তখন সাড়ে সাতটা। খুনের সময় নিয়ে তাই কোনও দ্বিধা নেই। তা যখন নেই, তখন রাত্রে কে এসেছিল এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কী আছে! অবশ্য এ-ও হতে পারে, রাত্রে কেউ এসে বাড়ির ভেতর লুকিয়েছিল, সকালে খুন করে বেরিয়ে গেছে। কোনও সম্ভাবনাই বাদ দেওয়া চলে না।

—আপনার লেখা হয়ে গেছে, স্যার?

মুখ তুলে আকাশ দেখল প্রসাদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। পেনের ঢাকা বন্ধ করে ও বলল, হয়েছে, কেন বলো তো?

—মিসেস পালিতের এক নম্বর মিথ্যে কথাটা বুঝতে পেরেছি, দুবার দরজা খোলার কথা চেপে যাওয়া। অনেকক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল ভেবেও কিন্তু ওঁর দু-নম্বর মিথ্যে কথা কী সেটা বুঝতে পারলাম না।

হো-হো করে খানিকটা হেসে আকাশ বলল, সেদিন যে খুনের খবর পেয়েই আমরা সকলে তদন্ত করতে গগনবাবুদের বাড়ি গেলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ স্যার, মনে আছে বইকি।

—বেশ। জিপ ওঁদের বাড়ির গেটের কাছে থামার পর কী-কী হল মনে করে বলো তো।

একটু চিন্তা করে প্রসাদ বলল, জিপ থামতেই ড্রাইভার হর্ন দিল, আমরা নামলাম। মেন গেটটা খোলা হল, আমরা ভেতরে ঢুকে বেল বাজালাম। দুলাল বেরিয়ে এসে সোজা আমাদের স্টাডিরুমে নিয়ে গেল। সেখানে, অসিতবাবু, ডাক্তার, তন্ময়—।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, ব্যস-ব্যস, হয়ে গেছে। এর মধ্যেই মিসেস পালিতের দু-নম্বর মিথ্যে কথাটা লুকিয়ে আছে।

—বলেন কী! মিসেস পালিত তো ওই সময় ধারে-কাছেই ছিলেন না—চোখ কপালে তুলে প্রসাদ বলল।

—মেন গেটের দুটো পাল্লা শেকল পরিয়ে তালা দেওয়া ছিল মনে আছে? আকাশ বলল, আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই একজন দারোয়ান চাবি দিয়ে তালা খুলে, গেট খুলে দিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছে।

—আমরা যখন ওঁদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা কুড়ি হয়ে গেছে। তখন যদি মেন গেট খোলা হয়, তাহলে সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটার সময় মিসেস পালিত ওই মেন গেট দিয়ে মন্দিরে গেলেন কী করে!

—যা বলেছেন! এইবার একগাল হেসে প্রসাদ বলল, শাড়ি পরে অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু গেট টপকে উনি নিশ্চয়ই মন্দিরে যাননি।

BanglaBook.org

—ঠিক তাই। যাওয়া ও আসার জন্যে দুবারই উনি পিছনদিকের, অর্থাৎ নার্সরির দিকের, গেটটা ব্যবহার করেছিলেন। সেইজন্যেই উনি জানতেন না সেদিন মেন গেটের তালা কখন খোলা হয়েছিল। চেয়ার থেকে উঠতে-উঠতে আকাশ বলল, আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, এই কথাটা উনি আমার কাছে লুকোলেন কেন!

অফিসের আলমারি থেকে গগনবাবুর শেষবার ব্যবহৃত জামাকাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে এসে আবার বসল আকাশ। পাটভাঙা ধবধবে সাদা খাদির পাজামা। কলার দেওয়া ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির পকেটে কিছু নেই। সাদা সুতির স্কার্ফটা কিন্তু ভীষণ ভাবে কোঁচকানো। এমনকী, চোখের সামনে এনে লক্ষ করে দেখল আকাশ, সাদা স্কার্ফে একটা হলদেটে, গোল, পোড়া দাগ।

—প্রসাদ, আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিগুলো আনো তো। আকাশ বলল।

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা, মৃতদেহ, আসবাবপত্র, পারিপার্শ্বিক, উপস্থিত সকলের প্রায় গোটা কুড়ি ছবি টেবিলে সাজিয়ে রেখে, স্কার্ফটা হাতে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল আকাশ। তারপর বলল, প্রসাদ, একটা সিগারেট আনাও তো। অবাক হয়ে প্রসাদ বলল, আপনি সিগারেট খাবেন?

—খাব না, মুচকি হেসে আকাশ বলল, তুমি আনাও তো। হ্যাঁ, যে-কোনও ব্র্যান্ডের হলেই চলবে।

ছবিতে গগনবাবু যেভাবে স্কার্ফ নিয়ে ছিলেন, সেইভাবে স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে হাতে সিগারেট নিয়ে বারবার স্কার্ফের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখল আকাশ, মুখে-চোখে অসন্তোষের ছাপ। সিগারেট জ্বালিয়ে আকাশ অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল তার ওপর। ছোট একটা ফুটো তার চারপাশে কালো পোড়া দাগ রেখে সিগারেটটা দুমড়ে ভেঙে নিভে গেল একটু পরেই।

সাদা স্কার্ফ আর রুমাল পাশাপাশি রেখে এইবার কথা বলল আকাশ। স্কার্ফের গোল দাগটা সিগারেটেরই, কিন্তু এটাই সিগারেট পিষে যাওয়ার কারণ হতে পারে না। তাহলে, দাগটা হচ্ছে আরও গভীর, তাই না প্রসাদ?

প্রসাদ উত্তর দেওয়ার আগেই টেলিফোন বাজল। প্রসাদ ফোন ধরে আকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, স্যার, চিঞ্চবড থেকে সাব-ইন্সপেক্টর ভোঁসলের ফোন।

ফোন ধরে খানিকক্ষণ শুনেই চমকে উঠে আকাশ বলল, তুমি নিজে ভালো করে যাচাই করে নিয়েছ? কোনও সন্দেহ নেই? বলো কী! গুড, চলে এসো।

প্রসাদ জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে আছে দেখে আকাশ বলল, রবিবার রাত্রে বা সোমবার খুব সকালে কান্তিলাল ওর রুম থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়েছিল কি না সেটা এখনও জানা যায়নি, তবে রবিবার রাত্রে দুবার ওর রুমে দেখা করতে এসেছিল গেস্ট। এই দুজনের মধ্যে প্রথম জনকে আমরা চিনতে পেরেছি।

উত্তেজিত ভাবে প্রসাদ বলল, স্যার, এক মিনিট, লেট মি গেস। দেখা করতে এসেছিল রবিবাবু, তাই না?

আকাশ হাসল। বলল না, অসিতবাবু।

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

অসিত মুখার্জি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, ইন্সপেক্টর, আসুন।

অসিতের চোখেমুখে একটা ম্লান অন্যমনস্কতা এখনও লক্ষ করা যায়। বাল্যবন্ধুর অস্বাভাবিক

অকালমৃত্যু এখনও ওঁকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে দেয়নি।

আকাশ কোনও ভূমিকা না করেই বলল, অসিতবাবু, আমি আপনাকে গগনবাবুর খুনের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আপনি যদি মনে করেন আপনার অফিস উপযুক্ত জায়গা নয়, আমি আপনার বাড়িতেও আসতে পারি, কিংবা আপনাকে থানাতেও ডাকতে পারি।

অসিতের শরীরের ভাষায় সহজাত স্মার্টনেস ফুটে উঠল। বললেন, এখানেও আমার কোনও অসুবিধে নেই। আপনি জিগ্যেস করুন। অবশ্য, আমার যা জানা ছিল, আমার স্টেটমেন্টে সবই বলেছি সেদিন।

—সবটা বোধহয় বলেননি, অসিতবাবু।—আকাশ খুব গম্ভীরভাবে বলল, যেমন ধরুন রবিবার রাত্রে আপনি যে চিঞ্জবডের একটা হোটেলে কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আগে বলেননি।

—ইন্সপেক্টর, আমি মনে করিনি, এই ব্যাপারে ওই ঘটনাটা ইমপর্ট্যান্ট। অসিত খুব শান্তভাবে বললেন।

—বলেন কী! কান্তিলালের পরিচয় দিলেন, গগনবাবু নিজের হাতে টেলিগ্রামের ওপর ওর নাম লিখে গেছেন এটাও জানলেন, তবু এই কথাটা আমাকে বলার কথা আপনার মনে হল না! এটা খুব আশ্চর্য নয় কি!

অবিচলিতভাবে অসিত বললেন, ঠিক তাই। নইলে না বলার কোনও কারণই নেই। যাই হোক, শুরু থেকেই বলি, আপনি নিশ্চই জানেন, রবি আমাদের এক বাল্যবন্ধু তরুণের ভাই। গগন বিজনেস শুরু করার পর ওকে রেখেছিল নিজের কাছে, ম্যানেজার হিসেবে। রবি একটু শর্ট টেম্পারড ঠিকই তবে খুব কাজের ছেলে। গগন যাকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসত। তবে ইদানীং নার্সারির প্রফিট নিয়ে ওর মনে নানারকম সন্দেহ জেগেছিল এবং রবিকে ও এর জন্যে দায়ীও করেছিল।

—আপনি হয়তো জানেন, ছোটখাটো বিজনেসে একজন ম্যানেজারের পক্ষে কোম্পানি বদল করা খুব একটা বড় কথা নয়। কোম্পানিরাও একে অন্যের লোক টানার চেষ্টা করে থাকে। কান্তিলালও রবিকে নিজের ফার্মে রাখার অফার দিয়েছিল।

আমি জানতাম, কিন্তু কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। রবিবার রাত্রে রবি যখন বাড়িতে এসে আমাকে বলল, ও যা পায়, কান্তিলাল তার ডবলেরও বেশি অফার দিয়েছে, আমি বুঝলুম কান্তিলাল এটা স্রেফ গগনের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে করছে। শত্রুতা মিটে গেলে রবিকেও ঘাড় ধাক্কা দেবে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চয়ই চাই না যে, রবি কান্তিলালের মতো একটা লোকের সঙ্গে কাজ করুক।

তাই রবি চলে যাওয়ার পর কনট্যাক্ট করলাম কান্তিলালের সঙ্গে। খবর পেলাম ও চিঞ্চবডে। ভাবলাম, এমন কিছু দূর নয়, যাই ওর সঙ্গে আলোচনা করে রবিকে কাজে নেওয়ার ব্যাপারে ওকে নিবৃত্ত করে আসি।

অসিতের এই দীর্ঘ বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে আকাশ বলল, আপনার বিশ্বাস ছিল, কান্তিলাল আপনার কথা শুনবে?

—বিশ্বাস ঠিক নয়, তবে গগন এবং রবি এই দুজনের স্বার্থে আমার এরকম চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা মাথায় ছিল। খুব সততার সঙ্গে অসিত বললেন।

আকাশ বলল, পরদিন সকালেও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। আই মিন, অত রাত্রে না গিয়ে—।

—এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে। এই ভুলটা তো আর শোধরানো যাবে না। অসিত দুঃখিতভাবে বললেন।

BanglaBook.org

—আপনি যে সত্যি কথা বললেন এতক্ষণ, তার কোনও প্রমাণ আছে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

অসিত বললেন, কান্তিলালকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

—উনি তো বলেন, আপনাকে ঠিকমতো চেনেন না।

এই প্রথম অসিতকে বিব্রত মনে হল। টাইয়ের নট ঢিলে করে বললেন, উনি কি তাই বলেছেন?

—ঠিক তাই বলেছেন।

টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের জল ঢকঢক করে খেয়ে অসিত সম্ভবত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আকাশ বলল, অসিতবাবু, খুনের আগের রাত্রে আপনি গিয়ে দেখা করেছিলেন এমন একজনের সঙ্গে যার সঙ্গে গগনবাবুর পুরোনো শত্রুতা ছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলেছিলেন, তার কোনও সাক্ষীসাবুদ নেই—।

—প্লিজ, ইন্সপেক্টর! ব্যাপারটাকে ওইভাবে সাজাবেন না, প্লিজ। আমি যখন কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখন জানতাম না গগন মারা যাবে—।

—গগনবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল কবে?

—শুক্রবারে—ওদের বাড়িতে ডিনারে ডেকেছিল আমাকে। এই একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার আর কী, তখনই। তারপর অবশ্য ফোনে কথা হয়েছে।

আর মিসেস পালিতের সঙ্গে?

এই প্রশ্নটা সম্ভবত অসিত আশা করেননি। তাই উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন। বেশ জোর দিয়ে বললেন, ওই তখনই।

উঠে দাঁড়িয়ে আকাশ বলল, আর একটা প্রশ্ন করব, মনে করে জবাব দিন। গগনবাবু সাধারণত কোন হাত দিয়ে সিগারেট খেতেন?

অসিত একটু চিন্তা করলেন। পর্যায়ক্রমে দুটো হাতই মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, যতদূর মনে করতে পারছি, বাঁ-হাত দিয়ে।

অসিতের চেম্বার থেকে বের হতেই আকাশদের দেখা হয়ে গেল তন্ময়ের সঙ্গে। ও সম্ভবত অসিতের কাছেই আসছিল কোনও কাজে।

অসিতবাবু, আকাশ বলল, এসেছি যখন আপনার কারখানাটাও যদি এইসঙ্গে দেখা হয়ে যেত—।

—নিশ্চয়ই। অসিত উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, আমার একটু কাজ রয়েছে। তন্ময় যদি আপনাদের দেখিয়ে দেয় কোনও আপত্তি নেই তো?

—না-না, আপত্তি কীসের! তন্ময় তো আপনার কারখানারই একজন—।

ইয়াং অ্যান্ড এনারজেটিক ম্যানেজার, হেসে কথাটা শেষ করলেন অসিত।

যে-কোনও নতুন ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা, নতুন বিষয় বোঝার বা জানার চেষ্টা করা আকাশের স্বভাব, প্রসাদ জানে। প্রসাদকে বুঝিয়েছে কয়েকবার, কখন যে কোন তথ্য কোথায় কাজে লাগে আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই বিষয় অজানা হলেও বেশিক্ষ ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া ভালো।

এখনও লাঞ্চ ব্রেক হয়নি, ওয়ার্কশপে ব্যস্ততা। দু-একজন তন্ময়কে দেখে হাত তুলে 'হ্যালো' বলল। একজন মারাঠিও জিজ্ঞাসা করল, আজ খাবার খেতে ক্যান্টিনে যাবে তো?

মেশিনের শব্দে জায়গাটা গমগমে। একটু জোরে কথা বলতে হয়। আকাশ বলল, কেমন লাগছে, তন্ময়?

তন্ময় বলল, খুব ভালো। এখানকার ওয়ার্ক কালচারের তুলনা নেই। তা ছাড়া, আমাকে সবাই খুব ভালোবাসে।

BanglaBook.org

—আপনি কোন সেকশনে কাজ করছেন? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

তন্ময় বলল, এখানে চারটে সেকশন। র মেটিরিয়াল, প্রোডাকশন, মেইনটেন্যান্স আর মার্কেটিং। আমাকে সব সেকশনের কাজ শিখতে হচ্ছে। আপাতত রয়েছি মেইনটেন্যান্স-এ।

আকাশ বলল, কাজে উন্নতি করতে হলে সবকিছুই শিখতে হয়, এবং গোড়া থেকে।

তন্ময় ওর বয়েস অনুযায়ী খুব উৎসাহী। বলল, এই দেখুন না, আজকেই আমি এই ফ্লোর-এর গ্যাংওয়েটা ঠিক করাচ্ছিলাম।

প্রসাদ বলল, গ্যাংওয়ে মানে কী?

—পাশাপাশি যখন বেশ কয়েকটা মেশিন রাখা থাকে তখন প্রতিটি মেশিনের দুপাশে বেশ খানিকটা জায়গা, মানে ওয়াকিং স্পেস, ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা হলুদ রঙের লাইন টানি। দুটো পাশাপাশি মেশিনের পাশ দিয়ে টানা এই হলুদ লাইনের মাঝখানে যে-জায়গাটা থাকল, সেটা দিয়ে লোড করার জিনিসপত্র আনা হয়। সেটাকেই বলে গ্যাংওয়ে। তন্ময় বুঝিয়ে বলল।

একজন বয়স্ক লোক এসে তন্ময়ের কাছে কিছু চাইতেই ও আকাশদের অপেক্ষা করতে বলে, একটা ছোট ঘরে ঢুকে একরাশ কাপড়ের টুকরো এনে দিল লোকটার হাতে। দর্জির দোকানে পড়ে থাকা নানা সাইজের, নানা রঙের কাপড়ের টুকরো যেমন হয়।

আকাশ বলল, ওই কাপড়গুলো দিয়ে ওরা কী করবে।

—রং করার কাজে মোছা-টোছার জন্যে দরকার হবে।—বলতে-বলতে তন্ময় এগিয়ে গিয়ে একজনকে ডেকে এই ফ্লোরটা আজকেই শেষ করতে বলল।

মানুষের স্বভাবে কী আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা আছে। আজ থেকে কয়েকদিন আগে তন্ময় ছিল এখানে প্রথমবার আসা একজন অচেনা আগন্তুক। আর আজ ও এদেরই একজন।

কারখানার ঘেরা থেকে বেরিয়ে বাগান। রং-বেরঙের ক্রোটোনের ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে চমৎকার। প্রসাদ বলল, আপনি এখনও গেস্টহাউসেই আছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, তন্ময় হেসে বলল, এখনও গেস্টহাউসেই। প্রথম বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে যা হল, তাতে আর দ্বিতীয় বাড়ি দেখতে যাওয়ার উৎসাহ জোটাতে পারিনি। বলা উচিত হবে কি না জানি না, যদি কোনও ছোটখাটো ফ্ল্যাটের সন্ধান জানা থাকে আমাকে বলবেন, প্লিজ।

প্রসাদ বলল, নিশ্চয়ই।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, গেস্টহাউসটা কোন দিকে?

—এই তো, আরও একটু হাঁটলেই ডানদিকে। যদি সময় থাকে চলুন না, পায়ের ধুলো দিন।

প্রসাদ বলল, গেস্টহাউসের চৌকিদাররা বললে চা-টা এনে দেয়?

তন্ময় হাসতে-হাসতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি এনে দেয়। এখনও দেবে, আসুন।

চা-এ চুমুক দিয়ে প্রসাদ বলল, বাঃ, চমৎকার চা।

তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, স্যার, এই কেসের ব্যাপারে কতদূর এগোলেন?

আকাশ মাথা নেড়ে বলল, খুব একটা সুরাহা করতে পারিনি।

—এই কেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তন্ময় বলল, তবে আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। কাল থেকে আমার মাথায় জমে আছে।

—বেশ তো, বলো না। আকাশ বলল।

তন্ময় বলল, লুকিয়ে কারও কথা শোনা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু গতকাল হঠাৎ শুনে ফেললাম। আপনি তো দেখছেন আমার এই রুমটা একেবারে রাস্তার ধারেই। এই রাস্তাটাই এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে গগনবাবুদের নার্সারির পিছন দিয়ে গেছে। কাল সন্ধেবেলায় লোডশেডিং

BanglaBook.org

হয়ে গিয়ে চারদিক অন্ধকার। আমি চুপচাপ জানলার ধারে বসেছিলাম। হঠাৎ আমার স্যারের কথা শুনতে পেলাম, রবি অবুঝের মতো কাজ করেছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বার দরজা খোলার কথা চেপে গেলে কেন? সঙ্গে সম্ভবত মিসেস পালিত ছিলেন, বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না, তাতে প্রশ্ন উঠত রবি অত রাত্রে গিয়েছিল কোথায়। কেন গিয়েছিল। স্যার বললেন, তাতে লাভ কী হল? তোমার মুখের ওপর ইন্সপেক্টর বলে দিল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমরা পুলিশের সঙ্গে কোঅপারেট না করে—বলতে-বলতে জায়গাটা পার হয়ে চলে গেলেন।

আকাশ প্রসাদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, বলল, আজ উঠি।

॥ ৮ ॥

গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে গগনবাবুদের নার্সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল, রবি দাঁড়িয়ে কথা বলছে কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে। জিপ থেকে নেমে আকাশ এগিয়ে এসে বলল, আপনি কি আমাকে ফোন করেছিলেন, মোবাইলে?

রবি নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ, আপনাকে কিছু বলার ছিল।

—বেশ তো জিপে উঠে বসুন, আকাশ বলল।

থানায় পৌঁছে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল রবি। তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, আসলে আমি আজ এসেছি আমার আর বউদির তরফ থেকে ক্ষমা চাইতে।

আকাশ রবির মুখের দিকে তাকাল। রবি বলল, আমি সোমবার আমার স্টেটমেন্টে—।

—সত্যি কথা বলেননি।

—বলেছিলাম, পুরোটা বলিনি। আমি সেদিন রাত্রে আরও একবার বেরিয়েছিলাম। রবি বলল।

নির্লিপ্তভাবে আকাশ বলল, কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি?

অবাক হয়ে রবি বলল, আপনি জানেন?

—কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি, আকাশ বলল, আর প্রথমবার কোথায় গিয়েছিলেন, অসিতদার বাড়ি?

রবি বলল, আপনি যখন সবই জানেন, তখন কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। মাস দুয়েক হল গগনদার সঙ্গে আমার টাকাপয়সা নিয়ে একটু অশান্তি চলছিল। উনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। এদিকে কান্তিলাল আমাকে অনেক বেশি টাকা অফার করছিল। এইসব নিয়ে অসিতদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেদিন রাত্রে অনেক দেরি হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে ডাইনিং স্পেসের দরজায় নক করতেই বউদি দরজা খুলে দিলেন। আমি ড্রয়িংরুম দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি, গগনদা ডাকলেন। উনি যে স্টাডিতে বসে আছেন তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

গগনদা আমাকে তক্ষুনি হিসেবের খাতা আনতে বললেন। পাঁচটা দিন আগেই অ্যাকাউন্টের তিন-চারটে গলদ বার করে আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন। আমার ব্যাপারটা বুঝে ঠিক করে রাখা হয়নি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। কাজ পুরো হয়নি দেখে দারুণ রেগে গেলেন গগনদা। আমাকে যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করলেন। এমনকি কোনওদিন যা বলেননি তাও বললেন, 'আমার এখানে এইসব বেয়াদপি, বেহিসেবি চাল চলবে না, কাল থেকে অন্য রাস্তা দেখো।' রাগের মাথায় আমিও দু-এক কথা শুনিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আর ওপরতলায় নিজের ঘরে গেলাম না। যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশ বলল, খিড়কির দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় বাইরে থেকে হুড়কো লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন?

BanglaBook.org

রবি অন্যমনস্কভাবে বলল, হয়তো। খেয়াল ছিল না। ঠিক করলাম এখানে আর নয়। কান্তিলালের অফার ছিলই। ভাবলাম, একটা হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলব। মোবাইলে কান্তিলালের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতেই ও চিঞ্চবড়ে ডাকল। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। এলোমেলো রাস্তায় ঘুরে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষে ওর কাছে পৌঁছলাম। সব শুনে বলল, আগামীকাল থেকেই ওর ফার্মে জয়েন করতে। আর গগনদার সঙ্গে হিসেবে যত টাকার গন্ডগোল হয়েছে, ও আগামীকালই সব দিয়ে দেবে। বাড়ি ফিরতে প্রায় আড়াইটে-তিনটে বেজে গেল। নিজের রুমে হিসেবটা ঠিক করতে বসেছিলাম। সকালের দিকটায় চোখ লেগে এসেছিল।

আকাশ বলল, আপনার বউদি কি জানেন কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা?

রবি একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, পরদিন আমিই বলেছিলাম।

—উনি কী বললেন?

—ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন প্রথমে। পরে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। পুলিশের কাছে এইসব বলার দরকার নেই।—রবি বলল।

—আর কান্তিলালের ফার্মে জয়েন করার ব্যাপারে কী ভাবলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল একটু হেসে।

রবির চোখ ছলছলে হয়ে এল, গাঢ় স্বরে বলল, কী বলছেন, এই অবস্থায় চলে যাব? শুধু এই অবস্থায় কেন, আর কোনওদিনই যেতে পারব না।—বলে হাত তুলে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল।

পুলিশের জিপে রবিকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে আকাশ গুম হয়ে বসে রইল নিজের চেয়ারে।

প্রসাদ বলল, অসিতবাবুর উপদেশে মিসেস পালিতের একটু সুবুদ্ধি হয়েছে দেখা যাচ্ছে। আর এ-ও বোঝা যাচ্ছে, তন্ময় ওদের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেনি।

আকাশ বলল, সেটা তো তখনই বোঝা গিয়েছিল। ও কী করে জানবে মিসেস পালিতকে আমি মিথ্যে কথা বলার ব্যাপারে বলেছি!

—এই কেসটা কিন্তু স্যার, ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।—প্রসাদ বলল, আপনি কি পরিষ্কার কোনও ধারণা করতে পেরেছেন?

—না প্রসাদ, আকাশ বলল, ধোঁয়ার মতো একটা ছবি তৈরি হচ্ছে আর পরমুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

—আপনার কি মনে হয় বাইরের লোকের পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়?

—একেবারে সম্ভব নয় তা বলছি না, তবে ভেবে দেখো, আকাশ বলল, বাইরের কেউ, ধরো, কারুর ভাড়াটে গুন্ডা যদি খুন করে, সে বাড়িতে এসে মারবে কেন? আর গলা টিপেই বা মারবে কেন? তার পক্ষে অফিসে, সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারে খুন করাটা অনেক সুবিধেজনক। না ডাকলে সাধারণত গগনবাবুর চেম্বারে কোনও কর্মচারী ঢুকত না। অর্থাৎ দেখা করতে আসার ছলে ওঁর চেম্বারে এসে ওঁকে খুন করে চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়তো ব্যাপারটা জানাজানি হত। ততক্ষণে খুনি চলে যেতে পারত অনেক দূরে।

—তার মানে বাড়ির বা আশেপাশের চেনাশোনাদের মধ্যেই কেউ? এদের মধ্যে কে খুন করতে পারে? প্রসাদ বলল।

—পারে তো সকলেই। আকাশ বলল, গগনবাবুকে গলা টিপে মারার জন্যে যতখানি শক্তি বা সাহসের দরকার, আমার মনে হয়, অসিত, বর্ষা, রবি, দুলাল, সকলেরই তা আছে।

প্রসাদ গলা নামিয়ে বলল, আপনার কী মনে হয়, এই চারজনের মধ্যে কেউ একজন?

—তা বলিনি। আকাশ বলল, এর মধ্যে যড়ও থাকতে পারে। যেমন ধরো, অসিত-বর্ষা, অসিত-রবি, বর্ষা-রবি, রবি-দুলাল এইরকম। এমনকী এই টিম গেমে, কান্তিলালও প্লেয়ার হতেই

BanglaBook.org

পারেন, কিংবা 'নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন'।

—খুনের মোটিভ কী?

—অসিতের ক্ষেত্রে জেলাসি, বর্ষার ক্ষেত্রে অর্থ এবং অসিতকে পাওয়া, রবির ক্ষেত্রে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ আর রাগ, কান্তিলালের ক্ষেত্রে পুরোনো হিসেবের ফয়সালা, মোটিভের আর অভাব কী। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল অবধি আমাদের জানা ঘটনাগুলোকে পরপর সাজালে আর মাঝখানের ফাঁকগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে ভরাট করার চেষ্টা করলে, কী দাঁড়াচ্ছে?—আকাশ কিছুটা আত্মগত হয়ে বলতে লাগল, রাত প্রায় বারোটা, দুলাল বেরিয়েছে তাস খেলতে। অসিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা সেরে রবি বাড়ি ফিরল। আর অসিতবাবু গেলেন কান্তিলালের কাছে। এদিকে গগনবাবুর সঙ্গে রবির হিসেব নিয়ে বচসা। এইসময় শ্রীমতী বর্ষা পালিত কী করছিলেন আমরা জানি না। হয়তো গগনবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নরম করার চেষ্টা করছিলেন। তবে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

ধরো, রবি গালাগাল খেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। ফিরল প্রায় আড়াইটে-তিনটের সময়। শ্রীমতী পালিত প্রায় সারারাত ঘুমোলেন না। সকাল সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটার সময় নার্সারির রাস্তা দিয়ে বের হলেন। এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি নার্সারির গেটের কাছে বা কাছাকাছি রাস্তায় কোথাও 'জগিং ম্যান' অসিতবাবুর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল বা দেখা করেছিলেন। ধরে নিচ্ছি, কারণ তা ছাড়া, নার্সারির গেট দিয়ে বাইরে যাওয়ার কথা আমার কাছে লুকোনোর অন্য কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। অসিতবাবুকে উনি নিশ্চয়ই রাত্রের ঘটনাবলির কথা বলেছিলেন। এমনকী অনুরোধও করে থাকতে পারেন গগনবাবুকে বোঝানোর জন্যে, যাতে রবিকে গলাধাক্কা না দেন। তরুণের ছোট ভাই রবির প্রতি শ্রীমতী পালিতের স্নেহ থাকাটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না আমার।

যাই হোক, আলোচনা সেরে উনি গেলেন মন্দিরে আর জগিং শেষ করে অসিতবাবু ফিরলেন ফ্যাকট্রির বা বাড়ির দিকে। ফেরার সময় রাস্তায় দেখা হয়ে গেল তন্ময়ের সঙ্গে। তন্ময় স্টাডিরুমে ঢুকল ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। মাঝখানের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাড়িতে ছিল রবি, দুলাল এবং বিমলা।

—স্যার, সেই সাদা টুপি পরা লোকটাকে কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি। প্রসাদ বলল।

—ও ভুলে যাওয়ারই যোগ্য। আকাশ বলল, ওর সঙ্গে এই খুনের কোনও সম্পর্ক নেই।

কাঁচুমাচু মুখ করে প্রসাদ বলল, এত জোর দিয়ে কী করে বলছেন?

—খুব সহজে। প্রসাদ, ধুতি আর শার্টের সঙ্গে সাদা টুপি পরে, যা কি না হাওয়ার এক ঝটকায় খুলে যায়, লোকে বরযাত্রী যেতে পারে, খুন করতে নয়। যাই হোক, আমি নিজেই স্বীকার করছি, বর্ষা-অসিতের আলোচনা কতক্ষণ চলেছিল এবং বর্ষা যাওয়ার পর অসিত কতক্ষণ জগিং করেছিলেন বা করেননি এই দুটি তথ্য জানা না থাকায় ছবিটা সাজাতে আমি কোথাও কিছু ভুল করছি। কিন্তু আর না, চলো, খোলা হাওয়ায় একটু হেঁটে আসি। শরীর ও মন দুই চাঙ্গা হবে।—বলে আকাশ উঠল। পিছনে প্রসাদ।

থানার বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশ ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, রবিবাবুকে ছেড়ে এসেছ? ড্রাইভার সম্মতি জানাতেই বলল, ঠিক আছে, তুমি বাড়ি চলে যাও।

ড্রাইভার জিপের চাবি আকাশের হাতে দিয়ে পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বার করে বলল, স্যার, এক্ষুনি গাড়ি সাফ করার সময় পিছনের সিটে পেলাম।

মোড়ক হাতে নিয়ে খুলেই চমকে উঠল আকাশ। একটা ট্রিটমেন্ট করা সেগুনের বীজ। আকাশ জিগ্যেস করল, রবিবাবু ছাড়াও গাড়িতে আর কেউ বসেছিলেন নাকি?

ড্রাইভার বলল, না স্যার।

আকাশ বলল, ফেরত যাওয়ার সময় রবিবাবু পিছনে বসেছিলেন নাকি সামনে, তোমার

BanglaBook.org

পাশের সিটে?

অবাক হয়ে ড্রাইভার বলল, সামনে বসেছিলেন।

—আই সি। তার মানে এখানে আসার সময়। প্রসাদ—।

প্রসাদ দেখল, আকাশের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা।

প্রসাদ,—আকাশ বলল, রবি আজ কেমন জুতো পরেছিল মনে আছে?

—আছে স্যার,—প্রসাদ বলল, মোটা সোলের স্পোর্টস শু। এই ধরনের জুতো আজকাল খুব চলছে।

—সোলের নীচে খাঁজ-কাটা গ্রিপ থাকে। একেকটা কোম্পানির খাঁজের ডিজাইন একেক-রকম। নার্সারি থেকে বেরিয়ে রবি যখন গাড়ির পিছনে উঠে বসেছিল, ওর জুতোর নীচের খাঁজে আটকে ওই বীজটা চলে এসেছে গাড়ির পিছনে।—গাড়ি স্টার্ট করে আকাশ বলল।

—তার মানে কি স্যার, রবিই? নীচু গলায় প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

—সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। আকাশ বলল, তবে জুতোর সোলের খাঁজে আটকে সুপুরির চেয়েও ছোট সাইজের এই সেগুন বীজের চলে আসাটা আমার সামনে বিরাট একটা সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। সেটা এই যে, বীজ কেউ ইচ্ছে করে না নিয়ে এলেও, অনায়াসে, এমনকী বাহকের অজান্তেই বেশ খানিকটা চলে আসতে পারে। তাই আপাতত দুটো কথা বলতে পারি। এক, খুনি সম্ভবত এই ধরনের জুতো পরেছিল। আর দুই, সে নার্সারির রাস্তা দিয়ে এসেছিল কিংবা খুন করার আগে একবার নার্সারির দিকে নিশ্চয়ই গিয়েছিল।—এতটা বলেই গাড়ি থামাল আকাশ, বলল, প্রসাদ, এসো, তুমি চালাও।

অবাক হয়ে প্রসাদ বলল, কী হল, স্যার?

—কিছু না। আমি তোমার সিটে বসে চোখ বন্ধ করে পুরো ছবিটা শুরু থেকে আবার একবার ভাবতে চাই। আর চোখ বন্ধ করে, আর যাই করা যাক, গাড়ি চালানো যায় না!

॥ ৯ ॥

একটা পার্কে গিয়ে ইতস্তত অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল আকাশ। একটা বেঞ্চে বসল কিছুক্ষণ। মোবাইল ফোনে কারুর সঙ্গে কথাও বলল, পরপর দুবার। প্রসাদ জানে, আকাশের মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা তোলপাড় চলছে। একটা ঘটনা যা আজ থেকে চার-পাঁচদিন আগে ঘটে গেছে, টুকরো কয়েকটা জানা তথ্যের সঙ্গে যুক্তি মিলিয়ে মাথার মধ্যে সেটাকেই আবার রচনা করছে আকাশ।

দিনের আলো শেষ হয়ে গেল। বাচ্চাদের ক্রিকেট বন্ধ হয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের সংখ্যা বাড়ল একসময়। রাস্তার ও আশপাশের বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে। খুব উত্তেজিতভাবে প্রসাদের কাছে এসে আকাশ বলল, চলো।

কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দিয়ে প্রসাদকে থানায় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আকাশ। হাতে দুটো পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে। একটা প্যাকেটের সঙ্গে চিঠি লিখে বড় একটা খামে সিল করে একটা কনস্টেবলের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিল কোথাও। তারপর লম্বা একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে বলল, আজকের কাজ শেষ। চলো, এইবার বাড়ি ফেরা যাক।

পরের সারাটা দিন পুরোনো ফাইল দেখে আকাশ এমন চুপচাপ কাটিয়ে দিল যেন গগন পালিতের নাম শোনেনি কখনও বা উনি খুন হননি আদপেই। প্রসাদের মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরঘুর করছিল, তবু অনেক কষ্টে সংযত করে রাখল নিজেকে। আকাশের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, এটা হচ্ছে ঝড় ওঠার আগের নীরবতা। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের প্রস্তুতি।

BanglaBook.org

এই সময় আলোচনা করা একেবারেই পছন্দ করে না আকাশ।

প্রতীক্ষা শেষ হল সন্ধের দিকে। ফ্যাক্স-এর জবাব এল ফ্যাক্স-এ। সঙ্গে একটা দূরপাল্লার টেলিফোন। উৎসাহিত হয়ে আকাশ বলল, এসো প্রসাদ, একটু চা খাওয়া যাক।

কিন্তু চা শেষ হওয়ার আগেই একটা লোকাল টেলিফোন কল এল। খানিকক্ষণ শুনেই, রিসিভার রেখে দিয়ে এমন গুম হয়ে গেল আকাশ, প্রসাদের সাহস হল না জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে।

পুনে শহর বা আশেপাশের পনেরো-ষোলো জন ডিলারের সঙ্গে কয়েকটি যন্ত্রপাতির চাহিদা ও বাজারদর নিয়ে আলোচনা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবে সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া, তন্ময় এই লাইনে এবং এই শহরে একেবারেই নতুন। অসিতের নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজটা করতে ওর সারাটা দিন লেগে গেল। যা হোক, এও একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। সন্ধে প্রায় সাড়ে সাতটায় গেস্টহাউসে ফিরে জামাকাপড় বদলে আজকের কাগজটাই আবার দেখছিল তন্ময়। এই সময় দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ল। উঠে দরজা খুলে তন্ময় দেখল আকাশ আর প্রসাদ।

গুড ইভিনিং স্যার, আসুন, তন্ময় অভ্যর্থনা জানাল।

গুড ইভিনিং। বিরক্ত করলাম না তো?—একটা চেয়ারে বসতে-বসতে আকাশ বলল, তন্ময়, একটা কাজে তোমার সাহায্য দরকার।

নিশ্চয়ই, উৎসাহী হয়ে তন্ময় বলল, বলুন—।

তন্ময়ের পাজামা-পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, একটু বেরোতে হবে আমাদের সঙ্গে, চেঞ্জ করে নাও।

বাথরুমে গিয়ে জামা-প্যান্ট পরে এসে তন্ময় বলল, চলুন, কোথায় যেতে হবে?

এসো, বলছি, আকাশ প্রসাদ আর তন্ময়কে নিয়ে গেস্টহাউসের পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল—তন্ময়, এই রাস্তাটা দিয়ে সোমবার সকালে গগনবাবুদের বাড়ি যাওয়ার সময় অসিতবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, মনে আছে?

—হ্যাঁ, আছে বইকি।

—ঠিক কোনখানে দেখা হয়েছিল? মানে, কোনখানে দাঁড়িয়ে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আমাদের দেখাতে পারবে?

—নিশ্চয়ই, চলুন।

তন্ময় হাঁটতে লাগল, পিছনে আকাশ আর প্রসাদ।

বেশ খানিকটা গিয়ে, রাস্তাটা ডানদিকে ঘোরার পর প্রায় পঁচিশ-তিরিশ মিটার গিয়ে থামল তন্ময়। বলল, এইখানেই দাঁড়িয়ে উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

—তখন ঠিক ক'টা বাজছিল বলতে পারবে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—এই ধরুন প্রায় সাতটা বেজে কুড়ি বা দু-এক মিনিট কম।

—গুড,—আকাশ বলল, এবার তোমাদের দুজনকে একটা কাজ করতে হবে। তোমরা আলাদাভাবে জগিং করে নার্সারির গেট পর্যন্ত যাবে। গেট দিয়ে ঢুকে সাধারণভাবে হেঁটে গগনবাবুর স্টাডি অবধি গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত গুনবে মনে-মনে। তারপর ঠিক যেভাবে গিয়েছিলে সেইভাবে ফিরে আসবে এইখানে। আর অন্যজন এইখানে দাঁড়িয়ে স্টপ ওয়াচে টাইম দেখবে। এই নাও স্টপ ওয়াচ আর এই নাও একটা টর্চ, কাজে লাগতে পারে। ইচ্ছে ছিল, আমি আর প্রসাদ দুজনে এই কাজটা করে ফেলব। কিন্তু আমি একটা অন্য মুশকিলে পড়ে গেছি বলে থাকতে পারছি না।

—কী হল স্যার? তন্ময় জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

—আরে ভাই, কী বলব!—আকাশ বলল, দুলাল আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, ও নাকি স্টাডিরুমের আলমারি থেকে চাবি নিতে ঘরে ঢুকেছিল। যেখানে গগনবাবুর বডি পড়েছিল, মাথার দিকটায় খুব অস্পষ্ট একটা ধুলোমাখা জুতোর সোলের ছাপ দেখেছে। আশ্চর্য, আমার সেদিন চোখে পড়ল না। এদিকে আমাদের থানার ফটোগ্রাফার আজ আবার ছুটিতে। আমি দেখতে যাচ্ছি অন্য কাউকে ম্যানেজ করে আনা যায় কি না। পেলে ভালো, নইলে কাল সকালে দেখা যাবে। এটা একটা জোরালো প্রমাণ, বুঝলে তো, ফেলে রাখা যায় না। যাই হোক, তোমরা কাজ করো। প্রসাদ, হয়ে গেলে গেস্টহাউসেই আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। বলতে-বলতে আকাশ গেস্টহাউসের গেটের কাছে রাখা জিপের উদ্দেশে ছুটল।

—পুলিশ অফিসার এইরকমই হওয়া উচিত। আকাশ চলে যাওয়ার পর যেন ঘোর ভেঙে তন্ময় বলল, স্যার খুব হার্ড ওয়ার্কিং, তাই না?

—ওরে বাবা! প্রসাদ পকেট থেকে একটা মৌরির কৌটোটা বের করে তন্ময়কে দিয়ে এবং নিজে খানিকটা মুখে ফেলে বলল, একটা কাজ ধরলে, একেবারে খাওয়া-দাওয়া ভুলে পিছনে লেগে যান। অগত্যা আমরাও লাগি।

—ভালো লাগে?

—সবসময় লাগে বললে মিথ্যে বলা হয়।—প্রসাদ হেসে বলল, মাঝে-মাঝে তো ওঁর সিরিয়াসনেস আমার প্রায় পাগলামো মনে হয়। এই ধরুন এই কাজটাই। আপনি ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়ার পর আমি একাই জগিং করে গিয়ে ফিরে এসে টাইম দেখে নিতে পারতাম। এই কাজটা আপনাকেও করতে বলার কোনও মানেই হয় না।

—আমার মনে হয়, উনি অ্যাভারেজ টাইম দেখতে চাইছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা। এটাকে পাগলামো বলা যায় না। তন্ময় বলল।

—ওঃ, আপনিও ওই দলেই।—বলে হাসল প্রসাদ, আসুন, কাজটা সেরে ফেলা যাক। প্রথমে আমি করছি, কেমন?

—বেশ তো, বলে তন্ময় ঘড়ির বোতাম টিপল প্রসাদ জগিং করতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে। ঘন অন্ধকারে একটু পরেই মিলিয়ে গেল প্রসাদ। শুধু ওর পায়ের শব্দ আরও কিছুক্ষণ শুনতে পাওয়া গেল।

হাওয়ায় নভেম্বর মাসের চোরা শীত। পাশের একটা ঝোপ থেকে পোকার কটকট শব্দ আসছে। আকাশে চাঁদ নেই। এদিকে স্ট্রিট লাইট আছে, কিন্তু যথেষ্ট দূরত্বে। স্কুটার চালিয়ে চলে গেল একজন, হাওয়ায় ঢেউ তুলে। এই চাকরি, ইন্টারভিউ, গগনবাবুদের বাড়িতে যাওয়া, খুন, ভাবলে এই সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে তন্ময়ের। যেন সিনেমার আলাদা-আলাদা কয়েকটা ফ্রেম। জীবন্ত হয়েও অলীক, অলৌকিক।

প্রসাদ ফিরে আসতে সময় দেখল তন্ময়, ন'মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড।

—এবার আমি, তন্ময় বলল।

—টর্চটা রাখুন।—প্রসাদ বলল, গেটের কাছটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এই পরীক্ষার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে, তন্ময় জগিং করতে-করতে ভাবল, সেদিন অসিতবাবুর কতটা সময় লেগেছিল সেটাই আন্দাজ করতে চায় আকাশ। তার মানে, আকাশের ধারণা, জগিং করে স্যার গগনবাবুর স্টাডিরুম অবধি গিয়েছিলেন। ওঁর চিন্তা কোন জটিল পথে চলেছে কে জানে। অসিতের জগিং করার ছন্দ মনে করে সেইভাবেই জগিং করতে-করতে নার্সারির গেট অবধি পৌঁছে গেল তন্ময়।

চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। গেট খোলার হালকা হলেও স্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল। শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ তুলে এগিয়ে গেল তন্ময়। একটু দূরেই অফিস দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ঠিক এই সময় লাইট অফ হয়ে গিয়ে চরাচর ডুবে গেল মিশমিশে অন্ধকারে। তীব্র একটা হুইসেলের শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই, ধুপধাপ করে অনেক লোকের দৌড়নোর শব্দ পাওয়া গেল, মেন গেটের দিকে। বর্ষা পালিতের তীক্ষ্ণ গলা শুনল তন্ময়, 'হোয়াট ননসেন্স! ওকে ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন!' কয়েকটা টর্চ ঝলসাল আর তারপরেই দুম করে ফায়ার।

কী হল ঠিক বোঝা গেল না। না যাক, পরে বোঝা যাবেই। গগন পালিতের খুনের নাটকের যবনিকাপাত হল মনে হচ্ছে। নিজের অজান্তেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই তো স্টাডির দরজা, বাইরে থেকে পুলিশের লক। এইখানে দাঁড়িয়ে পঁচিশ অবধি গুনতে হবে।

তন্ময় টর্চ জ্বালিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। না থাকারই কথা। ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে গেল তন্ময়। কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রয়িংরুমে ঢুকে আর-একবার টর্চ জ্বালাল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এদিক দিয়ে স্টাডিতে ঢোকার দরজায় শুধু ল্যাচ লাগানো, তালা নেই। পুলিশের বুদ্ধি!

মেন গেটের কাছে তুমুল হট্টগোল চলছে। চলুক, এটাই সুবর্ণ মুহূর্ত। ড্রইংরুমের কার্পেটে ভালো করে জুতো মুছে, ল্যাচ খুলে স্টাডিতে ঢুকে পড়ল তন্ময়। মাটির দিকে নিশানা করে টর্চ জ্বালাল। এইখানে, ঠিক এইখানে পড়েছিল লোকটা। এইদিকে ছিল মাথা। এখানে এখনও ধুলোর দাগ আছে! আশ্চর্য! ঠিক আছে, আর থাকবে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে বসে টর্চ জ্বেলে জায়গাটা মুছতে লাগল তন্ময়। আর কোনও প্রমাণ থাকবে না—ফটোগ্রাফারের অপেক্ষায়! থ্যাংকস, ইন্সপেক্টর। থ্যাংকস ফর দ্য ভাইটাল ইনফরমেশন!

ঠিক এই সময় মুখের ওপর অতর্কিতে জোরালো টর্চের আলো পড়ায় চমকে উঠল তন্ময়। সোফার পিছন থেকে বেরিয়ে আকাশ বলল, ওয়েলকাম, তন্ময়! আমি ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

বইয়ের আলমারির পিছন থেকে বেরিয়ে অসিত বললেন, তন্ময়, শেষ পর্যন্ত তুমি!

তন্ময় ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ তো ভারী অন্যায়, স্যার! ইন্সপেক্টর আমাকে বলেছিলেন এখানে আসতে। ওঁকে সাহায্য করেছি বলে আপনারা আমাকে—।

আকাশ বলল, আমি তোমাকে স্টাডিরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে পঁচিশ অবধি গুনে ফিরে যেতে বলেছিলাম। ঘরে ঢুকে রুমাল দিয়ে জুতোর দাগ তুলতে বলিনি।

এই সময় আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ঢুকলেন বর্ষা, রবি, সাব-ইন্সপেক্টার ভোঁসলে ও তিন-চারজন কনস্টেবল।

তন্ময়ের মুখে অচেনা একটা হিংস্র, ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। ও বলল, জুতোর দাগ মুছলেই কি প্রমাণ হয় যে, আমি গগনবাবুকে খুন করেছি?

—না তন্ময়, তা ছাড়াও, অন্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তুমি কি বলতে পারবে, যে-শার্টটা পরে সোমবার সকালে তুমি প্রথমবার গগনবাবুদের, মানে এই বাড়িতে এসেছিলে সেই শার্টটা কোথায়?

—লন্ড্রিতে।

—তাই নাকি! লন্ড্রির রসিদ আছে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—ছিল, হারিয়ে গেছে।

—হারাবারই কথা! কেন না, ওই শার্টটা লন্ড্রিতে কোনওদিন দেওয়াই হয়নি। ওই শার্টের কিছুটা অংশ এখন পুলিশের জিম্মায়।—বলে আকাশ হাঁক দিল, হাজারে—।

—জি সাব, বলে একজন কনস্টেবল পলিথিনের একটা প্যাকেট হাতে ঘরে ঢুকল। প্যাকেট থেকে হালকা নীল রঙের শার্টের পাঁচ-ছ'টা টুকরো বের করে আকাশ বলল, কী, চিনতে পারছ? আপনারা চিনতে পারছেন?

BanglaBook.org

অসিত, রবি, বর্ষা সকলেই মাথা নাড়লেন।

এই টুকরোগুলো আমি অসিতবাবুর উপস্থিতিতে ওঁরই কারখানার স্টোর্স-এর একটা বড় বিন্ থেকে খুঁজে বের করেছি—যেখানে তুমি গ্যাংওয়ে ঠিক করাচ্ছিলে সেদিন। তুমি কি বলতে পারবে শার্টটা টুকরো-টুকরো করে কেটে অন্যান্য টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কারণ কী?

তন্ময় নিরুত্তর।

সব টুকরোগুলো আমি খুঁজে পাইনি ঠিকই,—আকাশ বলল, তবে সৌভাগ্যক্রমে কলারের টুকরো আর লেবেলটা অটুট পেয়েছিলাম। সিটি টেলার্স, ধরমপেঠ, নাগপুরের নাম বেশ স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। এই টুকরোটি নিয়ে কালই একজন কনস্টেবলকে নাগপুরে পাঠানো হয়েছিল। আজ একটু আগে নাগপুর পুলিশ আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, মাত্র একমাস আগে সেলাই করানো এই জামা, আর জামার অর্ডার দেওয়া তন্ময় সোমের নাম খুঁজে বের করতে ওদের কোনও অসুবিধেই হয়নি।

॥ ১০ ॥

গগনবাবুর খুন হওয়ার সময়টুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—গরম চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে আকাশ ব লল।

পুলিশের গাড়িতে তন্ময়কে থানায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর গগনদের বাড়ির ড্রয়িংরুম হাউসফুল। অসিত অনুরোধ করেছেন সবকিছু বিশদভাবে বোঝাতে। গল্পের টানে অন্য সকলের সঙ্গে চায়ের ট্রে একপাশে রেখে দুলাল, এমনকী বিমলাও দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

কথার জের টেনে আকাশ বলল, লক্ষণীয় কারণ, ওই সময়টায় অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল গগনবাবুকে খুন করা। আমার এই অনেকের তালিকায়, ক্ষমা করবেন, আপনারা প্রায় সকলেই ছিলেন।

কান্তিলালবাবুকে আমি প্রথমেই বাদ দিয়েছিলাম। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা লোকের পক্ষে নিজের হাতে খুন করা প্রায় অসম্ভব। ভাড়াটে গুন্ডা অবশ্যই পাঠাতে পারেন। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকে গলা টিপে মারার ঝুঁকি নেবে কেন?

তারপর ধরা যাক অসিতবাবুর কথা। ঠিক ওই সময় জগিং করে উনি যে নার্সারির দিকে এসেছিলেন এ-কথা আমরা সবাই জানি। উনি নার্সারির গেট দিয়ে ঢুকে স্টাডিরুম পর্যন্ত এসে নিঃশব্দে কাজটা সেরে বেরিয়ে যেতে পারেন। গগনবাবু স্টাডিতে এসে বসার পর শ্রীমতী পালিত যদি খুন করে বাড়ির বাইরে চলে যান, চমৎকার একটা অ্যালিবাই তৈরি হয় যে, খুনের সময় উনি বাড়িতেই ছিলেন না। কারণ, পোস্টমর্টেমে মৃত্যুর সময়ে দু-এক ঘণ্টার হেরফের ধরা পড়ে না। আবার উনি যখন মন্দিরে গেছেন, নিজের ঘর থেকে নীচে এসে রবিবাবুর পক্ষেও চুপিসাড়ে গগনবাবুকে খুন করে আবার নিজের ঘরে ফিরে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা অসম্ভব নয়। দুলাল এঁদের কোনও একজনের সহকারী হতেও পারে। অকুস্থলে পাওয়া দুটো সেগুনের বীজ আর একটা দোমড়ানো ভাঙা সিগারেট, এই নিয়ে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো, এটাই ছিল আমার কাজ।

রবিবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম বীজগুলো টিটাগেস্ট করা বীজ, এসেছে নার্সারি থেকে। কিন্তু এল কী করে? না কি কেউ ইচ্ছা করে রেখেছে, হদিশ পাচ্ছিলাম না। পরে রবিবাবুরই জুতোর সোলে আটকে আমার জিপের পিছনে আসা বীজ সম্ভাবনার একটা নতুন দরজা খুলে দিল। বুঝলাম, খুনির পায়ে ওই ধরনের জুতো থাকলে খুনির অজান্তেই বীজ চলে আসতে পারে। আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিতে দেখলাম রবিবাবু সেদিনও ওই একই জুতো পরেছিলেন। অসিতবাবুও পরেছিলেন জগিং করার স্পোর্টস শু। পরেছিল তন্ময়ও। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ও সন্দেহের তালিকা

BanglaBook.org

থেকে বাদ পড়ল।

সিগারেট জ্বালানো হয়েছিল নিঃসন্দেহে রাইটিং টেবিলের কাছে। কারণ দেশলাইটা ওখানেই রাখা। অথচ যতটা সিগারেট খরচ হয়েছে তাতে বোঝা যায় ওটা বেশিক্ষণ আগে জ্বালানো হয়নি। সিগারেট ভেঙে বা নিবে যাওয়ার সঙ্গে যদি আততায়ীর আঘাত হানার সম্পর্ক থাকে, তাহলে এ-কথা বুঝতে দেরি হয় না যে, আততায়ীর সঙ্গে বসে কথা বলার জন্যেই গগনবাবু একটু আগেই রাইটিং টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন সোফার কাছে। যার সঙ্গে কাল রাত্রেই তুমুল বচসা হয়েছে, অর্থাৎ রবিবাবু, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এই উঠে আসাটা স্বাভাবিক মনে হল না। যদিও অসিতবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তা সম্ভব। তাই রবিবাবুর নাম অসিতবাবুর চেয়ে নীচে চলে গেল সন্দেহের তালিকায়।

সিগারেট যেভাবে দোমড়ানো, ভাঙা—তাতে বোঝা যায়, সামনের জ্বালানো অংশটার ওপরে আচমকা চাপ পড়েছিল বা ধাক্কা লেগেছিল। ওটা স্বাভাবিকভাবে অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভানো সিগারেট নয়। তা যদি হয় তবে, কোথায় ধাক্কা লাগল? সোফার হাতলে, কুশনে কোথাও কোনও চিহ্ন নেই কেন? তাহলে কি আততায়ীর শরীর বা পোশাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল? লেগেছিল কি না বুঝব কী করে?

উত্তরের ইশারা পেলাম গগনবাবুর সাদা সুতির স্কার্ফে। স্কার্ফের মাঝবরাবর, যে-জায়গাটা গলায় জড়ানো হয়, সেখানে একটা গোল পোড়া দাগ পড়েছে। কিন্তু দাগটা এতই হালকা যে, এটা সিগারেট নিভে বা ভেঙে যাওয়ার কারণ কিছুতেই হতে পারে না। তার মানে কি স্কার্ফের কাছাকাছি কোথাও ছিল ধাক্কা লাগার আসল জায়গাটা? কিন্তু গলার কাছে কেন যাবে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটা?

ঠিক এইসময় গগনবাবু বাঁ-হাতে সিগারেট খেতেন শুনে বিদ্যুৎচমকের মতো আরও একটা কথা মাথায় এল। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো গগনবাবুও আততায়ীর হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেননি তো! যে-মানুষের গলা টিপে ধরে আছে কেউ তার পক্ষে এই ছ্যাঁকা দেওয়ার ব্যাপারটা অব্যর্থ লক্ষ্য নাও হতে পারে। হাতের বদলে স্কার্ফে, বা আততায়ীর মণিবন্ধে, ছ্যাঁকা লেগে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে খুনির হাতেও পোড়া দাগ বা ঘা থাকা উচিত। যদি সে ফুলস্লিভ শার্ট পরে থাকে তাহলেও শার্টের হাতায় দাগ বা ফুটো থাকবে। আবার ছবি দেখলাম। রবিবাবু সেদিন হাফ শার্ট পরেছিলেন। শ্রীমতী পালিত হাফ হাতা ব্লাউজ। দুলাল হাফ ফতুয়া। ফুলহাতা ট্র্যাকস্যুট পরেছিলেন অসিতবাবু। কিন্তু ওঁর স্লিভে কোনও দাগ নেই। বলা বাহুল্য, সন্দেহের তালিকা থেকে আবার ফুলহাতা শার্ট পরা তন্ময় বাদ পড়ল।

বস্তুত এই কেসের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এটাই, তন্ময়ের উপস্থিতি। সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যে ক্যামেরাম্যানের মতো ও থেকেও নেই। কেন? এর একটাই কারণ। যে আজ প্রথমবার দেখবে গগনবাবুকে, সে গগনবাবুর হত্যাকারী কী করে হতে পারে। এটাকেই যদি উলটো দিক থেকে ভাবা যায়, অর্থাৎ খানিকক্ষণের জন্যে এ-কথাটা যদি মন থেকে মুছে ফেলা যায় যে, তন্ময় ও গগনবাবু একে অন্যের অচেনা ছিলেন না, তাহলে ভেবে দেখুন, সবই সম্ভব। তন্ময়ের পায়েও ওরকম জুতো ছিল, তন্ময়ও নার্সারির রাস্তা দিয়েই এসেছিল, তন্ময়ও আগে থেকে প্ল্যান করে ছোরাছুরি বা রিভলভার নিয়ে আসেনি। তন্ময়ের আসা আর গগনবাবুর মারা যাওয়ার সময় একই।

আমার মনে হয়, বীজ সংক্রান্ত আলোচনা শুনে তন্ময় বুঝে গিয়েছিল, বীজ দুটো দিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু শার্টটা নিয়ে ও সমস্যায় পড়েছিল। আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিতে তন্ময় আছে। কিন্তু ফুলহাতা হালকা নীল শার্টের দুটো হাতই দেখলাম একটু করে গোটানো। আমার মনে পড়ল তারপরে ওকে ওই শার্ট পরে দেখিনি কখনও। কিন্তু

BanglaBook.org

রাখবে কোথায়?

তন্ময় অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি ভাবার চেষ্টা করলাম ও শার্টটা নিয়ে কী করবে। নিজের কাছে গেস্টহাউসে বেশিদিন রাখা নিরাপদ নয়। ঘর সার্চ হলেই ধরা পড়বে। জ্বালিয়ে দিলে ধোঁয়া হবে, ছাই হবে, তা ছাড়া জ্বালানোর একটা জায়গা চাই। কেউ দেখে ফেললে সাক্ষী থেকে যাবে। রাস্তায় ডাস্টবিনে ফেলে দিলে অন্য কারোর, এমনকী পুলিশের হাতেও, পড়তে পারে। এমন একটা ব্যবস্থা কি হতে পারে যা ওর জন্যে খুব সহজ কিন্তু সাধারণ মানুষের বা পুলিশের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে? আমার ধারণা, তন্ময় নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিল প্রথম দু-দিন। তারপর বুধবার গ্যাংওয়ের কাজ করতে গিয়ে ও দেখল এইখানে অনেক ছোট-ছোট কাপড়ের টুকরো কাজে লাগে, আর সেগুলো রাখা থাকে স্টোর-এর এক কোণে একটা বড় পিচবোর্ডের বাক্সে। সেইদিনই, সম্ভবত আমাদের গেস্ট হাউস থেকে বিদায় জানানোর পরেই, তন্ময় এই সুন্দর সহজ উপায়টা কাজে লাগিয়ে ফেলল। শার্টটা আট-দশ টুকরো করে কেটে নিয়ে গিয়ে আরও অনেক টেলারিং ওয়েস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এল।

এই কথাটা মাথায় এল গ্যাংওয়ের কাজ দেখার পর, সেইদিনই সন্ধেবেলায় পার্কে ঘোরার সময়। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, শুধু সন্দেহ করলে চলবে না, সন্দেহ সত্যি কি না যাচাই করে দেখা দরকার। কারখানার সময় শেষ হওয়ার পর আজই খুঁজে দেখা দরকার, দেরি করলে চলবে না। অসিতবাবুর অনুমতি নিয়ে এবং ওঁর উপস্থিতিতে কাজটা সম্পন্ন হল। শুধু সম্পন্নই নয়, সন্দেহ অনুযায়ী কয়েকটা টুকরো পাওয়াও গেল। তার একটা নমুনা নাগপুরের দর্জির কাছ থেকে যাচাই করা দরকার। তা ছাড়া, নাগপুরের এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতেও তন্ময় সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল। এসবের জন্যে আমার দরকার ছিল অন্তত একটা দিন। কিন্তু পরদিন কারখানায় গিয়েই যদি তন্ময় বুঝতে পারে শার্টের টুকরো সরিয়ে নেওয়ার কথা, তাহলে সাবধান হয়ে যেতে পারে। তাই অসিতবাবু, আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, তন্ময়কে কিছু একটা কাজ দিয়ে সারাদিন কারখানার বাইরে পাঠিয়ে দিতে। কারখানায় না পেলে, অবশ্যই ঘর সার্চ করতাম।

তবু তন্ময়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই স্টেজে সেট তৈরি করে আমি নাটক মঞ্চস্থ করে ফেললাম। তন্ময় প্রথম দিনেই ধুতি আর সাদা টুপি পরা কাল্পনিক লোকের গল্প শুনিয়ে আমাদের দিশেহারা করার চেষ্টা করেছিল। আমিও কাল্পনিক জুতোর ছাপের গল্প ওকে শুনিয়ে ফাঁদ পাতলাম। তারপর জিপ নিয়ে অন্যদিক দিয়ে এসে মেন গেট দিয়ে ঢুকে স্টাডিরুমে লুকিয়ে থাকলাম।

প্রসাদকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যাতে ও আগে জগিং করে। আমি ঠিকমতো লুকোতে একটু বেশি সময় পাব। টর্চটাও ইচ্ছে করেই দেওয়া, যাতে তন্ময়ের ড্রয়িংরুম বা স্টাডিতে পৌঁছতে কোনও অসুবিধে না হয়। এসব ক্ষেত্রে একজন বেসরকারি সাক্ষী থাকলে ভালো হয়। তাই অসিতবাবুর আলমারির পিছনে অবস্থান।

মেন সুইচ অফ করে, গেটের কাছে হট্টগোল, হুইসেল ও ব্লাঙ্কে ফায়ারের নাটকটা সাব-ইন্সপেক্টর ভোঁসলে দারুণ জমিয়ে তুলেছিল। এই চাকরিতে আসার আগে ও যে পুনের একটি নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, মাত্র একটি সংলাপেই, ম্যাডাম, আপনিও চমৎকার অভিনয় করেছেন,—আকাশ ফেলে বর্ষার দিকে তাকিয়ে।

ঘরে সকলে চুপচাপ। আকাশের চুলচেরা বিশ্লেষণ আর তার নিষ্কর্ষ এখনও সকলের মন ছুঁয়ে আছে।

তবু, ইন্সপেক্টর,—বেশ খানিকটা সময় নিয়ে অসিতবাবু নীরবতা ভাঙলেন, দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। এক, তন্ময় গগনকে খুন করল কেন? আর দুই, ওকে যখন খুন করতে কেউ দেখেনি তখন ও চুপচাপ পালিয়ে গেল না কেন?

BanglaBook.org

আকাশ বলল, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি। আমার অনুমান, গলা টিপে মারার পর গগনবাবুকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার সময় তন্ময়ের কনুইয়ে লেগে চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাসটা টিপয় থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল। এই শব্দে কেউ এসে পড়তে পারে ভেবে ও আর পালাবার চেষ্টা না করে গগনবাবুকে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠাবার ভান করতে থাকে। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে ঝাঁকানি দেওয়ার সময় ওটা পড়ে-যাওয়ার কথা আমার কাছে স্বীকার করে নেয়।

প্রথম প্রশ্নটাও আমাকেও কম ভাবায়নি। গগনবাবুর জীবদ্দশায় তন্ময়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়নি। ওঁদের পরস্পরের সম্বন্ধে ধারণা বা মতামত কী ছিল সে-বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু গগনবাবু বা ওঁর কাজের ব্যাপারে তন্ময়ের করা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সব রকমের টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য হাতড়ে দেখে আমার মনে পড়েছিল দুটি কথা। প্রথমত, রবিবাবু বীজ ট্রিটমেন্ট করার মেশিনটির ব্যাপারে গগনবাবুর ইনোভেটিভ আইডিয়ার কথা দাবি করায় তন্ময় ভদ্রভাবে হলেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তন্ময়ের এই প্রতিক্রিয়া ওর মৃদু স্বভাবের সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, রবিবাবুর টেবিলে রাখা বীজ হাতে নিয়েছিলাম আমি, তন্ময় নয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু তন্ময় বলতে পেরেছিল, ওর ওপর হালকা ক্র্যাক আছে যেটা মেশিনে করা। এটা কি শুধুই মেধা, পূর্ব পরিচিতি নয়?

এই দুটি আনুষঙ্গিক থেকে মোটামুটিভাবে সন্দেহের একটা ভিত্তি তৈরি করে আমি নাগপুর পুলিশের সাহায্য চেয়ে ফ্যাক্স করেছিলাম। জবাবে, আমি জানতে পেরেছি তন্ময় ঠিক এই ধরনের একটি মিনিয়েচার মেশিন তৈরি করেছিল, ওর ছাত্রজীবনের শেষ দিকে। এ-বিষয়ে কোনও ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার উল্লেখ আছে ওর বায়োডেটায়। এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চলছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তন্ময় ও গগনবাবুর অতীতের অন্তত একটা অধ্যায় গাঁথা আছে ওই বীজ ট্রিটমেন্ট করার মেশিনটির পরিকল্পনায়।

পুনের ক্যাম্প এরিয়া পুলিশ স্টেশনে তন্ময় সোমের যে-স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছিল তার বাংলা অনুবাদ করলে কিছুটা এইরকম দাঁড়ায় :

এই ঘটনার সূত্রপাত আজ বা চার-পাঁচদিন আগে হয়নি, হয়েছিল প্রায় ছ'বছর আগে। নাগপুরে সায়েন্স ও টেকনোলজির একটি প্রদর্শনীতে ছোট্ট একটি মোটর অপারেটেড, ডিকর্টিকেশন মেশিন বানিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিল এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি ছাত্র। এই মেশিনটি ছোটখাটো ফলের বীজের খোসা ও শাঁস ছাড়িয়ে ফেলত। শুধু তাই নয়, শক্ত আঁটির গায়ে ঘা দিয়ে হালকা একটা ক্র্যাক করে দিতে পারত চক্ষের নিমেষে। প্রদর্শনীতে এসে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, দাড়িওয়ালা, হ্যান্ডিক্যাপড লোক ওই ছেলেটির কাছ থেকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, ডিজাইনের ব্লুপ্রিন্ট দেখে সব জেনে নিয়েছিলেন।

এর প্রায় আট-দশ মাস পর কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে ছেলেটি অবাক। আহমেদনগরের কোনও এক 'ফিউচার স্টিক' নামের কোম্পানির তরফ থেকে বলা হয়েছে যান্ত্রিকভাবে সেগুনের বীজ ট্রিটমেন্ট করার কথা, যাতে শতকরা জার্মিনেশন বহুলাংশে বেড়ে যায়।

ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি লিখল, বলল, এ তো আমার তৈরি করা মেশিন! জবাব পেল না। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা পাশ করে ও তখন বেকার। ও ছুটল আহমেদনগর। খুঁজে বার করল কোম্পানির অফিস, দেখা করল বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ইনিই এসেছিলেন প্রদর্শনীতে। এখন বিরাট ব্যাবসা ফেঁদে বসেছেন। ছেলেটি দাবি জানাল। অকৃতজ্ঞ লোকটি কর্কশভাবে বলল, তোমার কাছে কোনও প্রমাণ আছে যে, এটা তোমার তৈরি করা মেশিনের কপি?

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর, ওই ছেলেটি তার সবজেক্টটুকু জানত ভালোই, কিন্তু পেটেন্ট অ্যাক্ট বা তার নিয়মাবলির নামই শোনেনি কোনওদিন। ও বুঝল, আইনের প্যাঁচে ওই মেশিনটির ওপর ওর সমস্ত দাবি এখন হাতছাড়া। অসহায়ভাবে ও বলেছিল, আমাকে ক্ষতিপূরণ দিন। ক্ষতিপূরণ না বলতে চান দাম বলুন, সাহায্য বলুন, এ আপনাকে দিতেই হবে।

লোকটি রাজি তো হয়ইনি, দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। ইন্সপেক্টর, এই বেকার ছেলেটিই আমি। আর আমার বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করা একটা স্বপ্নকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল যে-ধূর্ত লোকটি সে-ই গগন পালিত। অবশ্য ওঁর স্টাডিতে ঢোকার আগের মুহূর্ত অবধি এই কথাটা আমি জানতে পারিনি।

উনি রাইটিং টেবিলে বসে কিছু লিখছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে অসিতবাবুর ফোনের কথা উল্লেখ করতেই হাতের ইশারায় আমাকে সোফায় বসতে বলে আরও প্রায় দু-মিনিট সময় নিলেন। উনি আমার মুখের দিকে লক্ষ করেননি, বা করলেও চিনতে পারেননি। আমি কিন্তু চিনলাম। শুধু চিনলাম তাই নয়, এই দু-মিনিট আমি ওঁকে দেখলাম জীবনের সমস্ত অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে। আমার কী করণীয় ততক্ষণে আমি ভেবে ফেলেছি।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে লাঠি নিয়ে সোফার কাছে এলেন।

ওঁকে দাঁড়াতে দেখে সম্মান দেখিয়ে আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে আমার দিকে পিছনে ফিরে সোফায় ঠেস দিয়ে লাঠিটা রাখলেন। আর ঠিক সেইসময়—!

সিগারেটের কথা আমার মনে ছিল, সরিয়েও নিতাম, কিন্তু শার্টের হাতা গুটিয়ে নিতে না নিতেই দুলাল এসে পড়ল। আর বীজদুটো যে আমার জুতোর সঙ্গে এসেছে, এ-কথা আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে।

আগেও কয়েকবার পড়া, তবু অফিসে বসে আর-একবার লেখাটা আদ্যোপান্ত পড়ে প্রসাদ বলল, বীজগুলো কিন্তু স্যার, অহেতুক ধাঁধায় ফেলেছিল আমাদের। সত্যি বলতে কী, এই খুনের সঙ্গে বীজের কোনও সম্পর্কই নেই।

—কেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—কেন না, এই বীজগুলো জুতোর নীচে আটকে চলে আসাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। বীজ না আটকালেও তন্ময় সেদিন খুন করতই। আবার এ-ও বলতে পারেন, যে খুনি নয় সে-ও ওই রাস্তা দিয়ে ওইরকম জুতো পায়ে দিয়ে এলে বীজ আটকাতে পারত।—প্রসাদ বলল।

—আপাতদৃষ্টিতে তুমি যা বলছ, তা ঠিক। জানলা দিয়ে উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে আকাশ বলল, তবে অনেক সময় অনেক ঘটনার পিছনে দেখবে সনাতন সত্যের গভীর কোনও ইঙ্গিত থাকে, যা সাধারণভাবে দেখলে অর্থহীন মনে হয়। এই কেসে বীজের প্রসঙ্গটা আমার তা-ই মনে হচ্ছে। ভেবে দেখো, ওই বীজ ওখানে না থাকলে, সেগুন বীজের এত অজানা তথ্য জানতে পারতাম না। মেশিনের ব্যাপারটাই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হত না। এমনকী 'গগন-তন্ময়'-এর অতীত সম্বন্ধটাই রয়ে যেত বোধের বাইরে। আবার এ-ও ভেবে দেখো, অত্যন্ত মেধাবী আর পরিশ্রমী গগনবাবু সারাজীবন সৎ পথে থেকে চাকরি করে হঠাৎ যেদিন বিপথে গেলেন, মেশিনটির আসল কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত করলেন তন্ময়কে, সেইদিনই ওঁর জীবনে অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর বীজ প্রোথিত হয়ে গেল আশ্চর্য নয়?

BanglaBook.org

গোধূলিতে মৃত্যুর ছায়া

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

রাস্তাটা একেবারে রাবিশ। দেড়হাত অন্তর এক-একখানা গর্ত, ঝকাং-ঝকাং লাফাচ্ছে জিপটা। ঝাঁকুনিতে সারা শরীরের স্প্রিং ঢিলে হয়ে যাচ্ছে যেন। ঠক করে মাথাটা সলিড লোহায় ঠুকে গেল একবার। এতক্ষণ যা মনে-মনে বলছিলুম, ধাক্কা খেয়ে ফস করে ছিটকে বেরিয়ে এল—'ওফ, মেয়েটা আর মরার জায়গা পেল না শালা!'

কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ম্যাডামের মুখখানা শক্ত হয়ে উঠেছে। ম্যাডাম—মানে, সিনিয়র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মিস সুবর্ণরেখা সেন। সাত দিন হল জয়েন করেছেন, ঠিক আমার ওপরের পোস্টে—অর্থাৎ আমার ইমিডিয়েট বস। যেখানে-যেখানে ইনি তদন্তে যাবেন, আমাকে বশংবদের মতো পিছন-পিছন দৌড়তে হবে। শেষ অবধি একটা লেডিজের আন্ডারে!...আমি আসলে একটু যাকে বলে মেল শভিনিস্ট গোছের আছি। আগের বস ছিলেন ঘোষালসাহেব—গুঁফো, ভুঁড়িওয়ালা, খইনিখোর। কিন্তু পুরুষ মানুষ হাজার হোক। তার জায়গায় এই হালকা-পলকা বয়েজ কাট...একে দিনরাত্তির 'হ্যাঁ ম্যাডাম, জো ম্যাডাম' করা—ভারী হ্যাটা-হ্যাটা লাগে। তার ওপর এনার টাইপটা আবার হান্টারওয়ালি মার্কা। সেদিন আমায় কী ধাতানিই দিলেন! আমার একটু—ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—ল্যাংগোয়েজের দোষ আছে। মেজাজ একটু চড়লেই পটাপট কাঁচা নামিয়ে দিই। ঘোষালসাহেব উৎসাহই দিতেন। বলতেন, খিস্তি দিতে না জানলে ভালো পুলিশ হওয়া যায় না। ও বাবা, এই সেদিন লক আপের একটা পাতি মস্তানকে একখানা পাঁচ অক্ষর বলে ফেলেছি—সঙ্গে-সঙ্গে এই মহিলা ফোঁস করে উঠলেন, 'নো আনপার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ।' গলাটা একেবারে হিম ঠান্ডা, মাইরি—সেই থেকে শালা-টালা বলে ফেললেও জিভ কাটি।

তবে এই রাত্তির সাড়ে এগারোটায় ঠোক্কর খেতে-খেতে ডেডবডি দেখার জন্যে স্পটে যেতে হলে মেজাজ খারাপ হবে না তো কী? আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছেও তেমনি—পান থেকে চুন খসল কী ব্যস, বেমক্কা পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছে দুনিয়া থেকে। গলায় দড়ি-রেলে মাথা-পেস্টিসাইড খাওয়া এখন আবার ব্যাকডেটেড। নতুন ট্রেন্ড দেখছি এই উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়া। দশ-বিশতলা বাড়িও উঠছে দেদার, সুইসাইডের সুযোগও বাড়ছে দিন-দিন। ...তবে হ্যাঁ, আমার এও মনে হয়, আর পাঁচটা মেথডের চেয়ে এইটায় সুবিধে অনেক বেশি। ফাঁস লাগানোর হ্যাপা নেই, বিষ জোগাড় করার রিস্ক নেই, ট্রেন কখন আসবে তার জন্যে হাপিত্যেশ নেই। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠো, সরসরিয়ে হাওয়া কাটতে-কাটতে নেমে এসো—খেল খতম। এই মেথডটা চয়েস করে যারা—আমি তো বলব, তারা অন্যদের চেয়ে ইনটেলিজেন্ট। এই যে মেয়েটা পাঁচতলা থেকে ঝাঁপিয়েছে—এও তাই।

জিপ থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উঁচু খাঁচাবাড়িটার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যাডাম সুবর্ণরেখা। এগিয়ে-পেছিয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে জরিপ করে নিলেন। নতুন-নতুন জয়েন করে এইসব মেয়ে হেভি কায়দাবাজি দেখায়। ইনিও এমন করছেন, যেন এক্ষুনি বিরাট একটা মিস্ট্রি সলভ করে ফেলবেন।

আমি মনে-মনে হাসলুম একটু। কিসসু নেই গো মহারানি, একেবারে রদ্দি কেস। বাড়িতে অশান্তি, পরীক্ষায় গুবলেট, নয়তো সেই আদি অকৃত্রিম ল্যাং। লাখো সুইসাইডের পিছনের গল্প মাত্তর এই তিন-চাররকম মালটিপল চয়েসের মধ্যেই ঘুরপাক খায়।

প্রায় কাঠা ছয়েক জমির ওপর উঠেছে এই 'মঙ্গলম' বিল্ডিং। আপাতত পাঁচতলা—নীচের তলাটা ফিনিশড হয়েছে। সারি-সারি দোকানঘর, অনেকগুলো বন্ধ, দু-চারটে খোলা রয়েছে। ওপরের চারটে তলায় ওনারশিপ ফ্ল্যাট বানানোর প্রজেক্ট। দোতলা আর তিনতলায় পিলার-টু-পিলার পার্টিশন ওয়ালগুলো গাঁথা শেষ হয়েছে সবে, টপ ফ্লোর দুটো এখনও খাঁচা হয়েই দাঁড়িয়ে। মেয়েটা

BanglaBook.org

সম্ভবত একদম ওপর থেকেই ঝাঁপিয়েছে—অবশ্য একজ্যাক্টলি বলা মুশকিল। ঝাঁপটা রাস্তার দিকে দিলে সঙ্গে-সঙ্গেই জানা যেত...সেটা চায়নি বোধহয়, পিছন দিকটায় পড়েছে। ওদিকটায় এক চিলতে ওয়েস্টল্যান্ডের মতন রয়েছে, ঝোপঝাড় জঞ্জাল আর ইটপাটকেলে ভরতি। কেউ বিশেষ মাড়ায় না। মাঝেমধ্যে একটা দুটো ভবঘুরে বা ভিখিরি যায় হয়তো, কিংবা গাঁজাখোরেরা একটু নিরিবিলিতে দম দেবে বলে ঢোকে। আজও দুটো গেঁজেলই ঢুকেছিল অন্ধকার ঘন হওয়ার পর। বডি পড়ে আছে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

এই মাঝরাত্তিরেও ভিড় জমেছে মন্দ নয়। মেয়েছেলের লাশ—উৎসাহ আর কৌতূহল সুলসুলিয়ে উঠেছে লোকের। এখন ক'দিন জব্বর মুখরোচক আলোচনা চলবে। ভিড়টা ঠেলি, গম্ভীর গলায় ধমক-টমক দিয়ে সরিয়ে দিই সামনের ক'জনকে। পিছনে ম্যাডামকে দেখে একটা চাপা আওয়াজ গুনগুনিয়ে ওঠে : 'মেয়ে-পুলিশ! মেয়ে-অফিসার!'

ভিড়টা পাতলা হল, ম্যাডাম এগোলেন।

জোরালো টর্চের আলোয় কাত হয়ে পড়ে-থাকা শরীরটা ঝলসে উঠল যেন। হলুদ চুড়িদার, সাদা ওড়না, একটা পায়ে চটি এখনও পরা। হাতে চুড়িটুড়ি কিছু নেই, জাস্ট একট রিস্টওয়াচ। ছিমছাম চেহারা, ফরসা...সুন্দরী ঠিক বলা যাবে না, তবে অ্যাট্রাকটিভ। মাথার একটা দিক থেঁতলে বিচ্ছিরি হয়ে আছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধেছে। চোখের পাতাগুলো আধখোলা।...সিম্পটম সব পরিষ্কার, উঁচু থেকে পড়ে ইনস্ট্যান্ট ডেথ।

ঝুঁকে পড়ে, প্রায় ফুটখানেক ডিসট্যান্স থেকে মুখখানা খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যাডাম। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল কেন হঠাৎ? যেন ভীষণ একটা গন্ডগোলের গন্ধ পেয়ে গেছেন। স্ত্রী-স্বভাব তো—সন্দেহবাতিক রক্তের মধ্যেই আছে, সোজাসাপটা জিনিসকেও জটিল করে দেখতে ভালোবাসেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বুঝছেন?'

বিজ্ঞের মতো হাসলুম, ঈষৎ তাচ্ছিল্য মিশিয়ে।—'বোঝার কী আছে ম্যাডাম? ক্লিয়ার কেস—ওয়ান টু থ্রি...ঝপাং।'

'ইজ ইট?'—একটু অন্যমনস্ক, চিন্তিত দেখাল মুখটা। বিড়বিড় করছেন নিজের মনে, 'ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে ফাউন্ডেশন, বডি স্প্রে-র গন্ধ রয়েছে এখনও—এত প্রসাধন করে সুইসাইড করতে আসা...?'

মুখে এসে গিয়েছিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এরকম, মরতে গেলেও মেকআপ লাগে। সামলে নিলুম। একটু দার্শনিক হাসি টেনে এনে বললুম, 'ওই...শেষ সাজা সেজে নিয়েছে আর কী!'

বোধহয় মনঃপূত হল না কথাটা। উত্তর দিলেন না, চারপাশে ঝুঁকে আসা মুখগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু উঁচু গলায় বললেন, 'আপনারা কেউ এই মেয়েটিকে চেনেন?'

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। পাবলিক পুরো চুপ। একটু ঘাবড়েছে সবাই—পুলিশের আঠারো ঘা কে না জানে? এগিয়ে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম—'মুখ না খুললে সব ক'টাকে নিয়ে গিয়ে থানায়...।'

মহিলা মাঝপথে থামিয়ে দিলেন আমায়। হঠাৎ নিজের গলাটাকে কেমন অদ্ভুতরকমের নরম করে ফেললেন—'দেখুন, আপনাদের সবার সাহায্যেই কিন্তু ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে আমাদের। একটি মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে থাকবে, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না? প্লিজ, যদি কারও কিছু জানা থাকে নির্ভয়ে বলুন।'

বলিহারি ট্যাকটিকস—গরম দেখিয়ে আমি যা পারতুম না, নরম দিয়ে এক সেকেন্ডেই করে ফেললেন, শ্রীমতী। দুটো ইয়ং ছেলে ফস করে এগিয়ে এসে বললে, 'আমরা চিনি ম্যাডাম। এর নাম টিনা। ট্রাম ডিপোর কাছে বাড়ি...।'

'আপনারা?'

BanglaBook.org

'আমাদের সব দোকান আছে—ওই যে, ওইটা আমার...আমার নাম সমীর কর্মকার। পাশেরটা এর, এ হল মকবুল শেখ। সবে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি গেছি—খবরটা পেলাম, দৌড়ে এসে দেখি, আরে—এ তো চেনা মেয়ে!'

'এর বাড়ি চেনেন? একটা খবর দিতে হবে।'

এবার একটা বুড়ো লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল, 'আমার ভাইপো চেনে আজ্ঞে, আমাদেরও ওই দিকেই বাড়ি—তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বাইকে করে। বলেছি ওর মামা-টামা কাউকে চাপিয়ে নিয়ে চলে আসতে।'

'মামা...কেন? এ কি মামার বাড়িতে থাকে, মানে থাকত?'

'আজ্ঞে, বাবা নেই যদ্দুর জানি—মামার কাছেই মা-মেয়ে থাকত বলে খবর শুনেছি।'

'আচ্ছা...' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবলেন ম্যাডাম। ভুরু দুটো কিন্তু সোজা হয়নি এখনও। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ন্যাপগুলো নেওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলুন, মিস্টার দাশগুপ্ত। আমি এদের সঙ্গে আরও দু-একটা কথা বলে নিই।'

বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে ফ্ল্যাশগান ঝিকিয়ে উঠতে থাকে। ওদিক থেকে টুকরো-টুকরো তত্ত্বতালাশ কানে আসছে। ওহ্, জিজ্ঞাসাবাদের যা ধরনধারণ—হাসি পাচ্ছে ব্যাপক। শ্রীমতী শার্লকরেখা...। ছোট নোটবুক বার করে আবার খসখস করে লেখা হচ্ছে। যেন মামুলি সুইসাইড কেস নয়—একটা দুরন্ত ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্রের জাল এক্ষুনি ভুঁই ফুঁড়ে আবিষ্কার করে ফেলবেন! সব দড়িকেই সাপ ভাবছেন, সব ঝোপেই বাঘের গন্ধ...।

ভটভটিয়ে একটা বাইক এসে থামল। সামনের ছোকরাটিই খবর দিতে গিয়েছিল—পিছনে বসে পাজামা পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়েসি ভদ্রলোক একজন। গালে চাপ দাড়ি, মাথার সামনের চুল পাতলা। চাউনিটা উদভ্রান্ত, মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। জানা গেল, ইনিই মেয়ের মামা—বিনোদবিহারী শাসমল।

বাইকের পিছন থেকে নেমে এত লোকের ভিড় এবং পুলিশ দেখে ভদ্রলোক রীতিমতো থরথর করে কাঁপছিলেন। মুখ দিয়ে বাক্যি সরছিল না।

ধরে-ধরে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলুম। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল, 'দিদির সামনে গিয়ে কী বলব...' বলেই হাত-পা ল্যাতপেতিয়ে আমার ঘাড়ে এলিয়ে পড়লেন।

আইডেন্টিফিকেশন তো হয়েই গেল। এবার পোস্টমর্টেমে পাঠানোর পালা। ম্যাডাম বেছে ঘেঁটে জনাতিনেককে সঙ্গে নিয়ে নিলেন, সমীর-মকবুল, ছোকরা দুজন সমেত থানায় গিয়ে স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে হবে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে বিনোদবাবুকেও ধাতস্থ করার চেষ্টা করা হল। ম্যাডাম স্বয়ং তাঁকে ধরে-ধরে জিপে বসালেন, সান্ত্বনা-টান্ত্বনাও দিলেন কিছু।

জিপের দিকে পা বাড়াতে যাব, কী যেন একটা বুটে ঠেকল। ঝুঁকে দেখলুম, একটা মোবাইল। হাতে নিয়ে দেখি, ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে গেছে। ন্যাচারালি—পাঁচতলার ওপর থেকে পড়েছে ইটপাটকেলের ওপর। মোবাইল আর তার মালিক, খুড়ি মালকিন—শেষ হয়ে গেছে একইসঙ্গে।

BanglaBook.org

॥ দুই ॥

কলিংবেল টেপার চেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই বেশি পছন্দ করি আমি। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ পুলিশি টাচ আছে—'দরজা খুলুন, পুলিশ...' গম্ভীর গলায় শব্দ তিনটে গড়িয়ে দিতে হেভি ঘ্যাম লাগে।

দুটো ধাক্কার পরেই অবশ্য এখানে খুলে গেল দরজাটা। সবে ভোর হচ্ছে, এই সময় ছোকরা জেগে ছিল না কি? বেশ সন্দেহজনক। অবশ্য পরনে দেখছি বারমুডা-টি-শার্ট, পায়ে কেড্‌স—দৌড়তে বেরোচ্ছিল এমনও হতে পারে।

পেটানো লম্বা চেহারা, কাটা-কাটা চোখমুখ, এক কথায় হ্যান্ডসাম। একটু যেন অবাক, সাতসকালে বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ—'কী ব্যাপার?'

গলায় কড়া দানাগুলো ফুটিয়ে তুলি।—'আপনি কমল বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'থানায় চলুন।'

'থানায়....? কী ব্যাপার?'

'গেলেই জানতে পারবেন। টিনা বলে কাউকে চিনতেন?'

'চিনতেন মানে? টিনা আমার বান্ধবী—কালকেও কথা হয়েছে ফোনে...!'

'ওহ্, শুধু ফোনে? সাক্ষাৎ হয়নি, তাই না!'—গলাতে একটু তরল ব্যঙ্গ মেশালুম, কিন্তু ফাইন টাচটা ধরতেই পারল না, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'না, আসলে আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল...।'

কথাটা শেষ করল না, হঠাৎ কী ভেবে এক ঝটকায় সোজা হয়ে তাকাল আমার দিকে—'কী ব্যাপার বললেন না তো, হঠাৎ টিনার কথা...?'

'জিপে উঠুন। টিনার বডি পাওয়া গেছে কাল।'

একটা পা বাড়িয়েছিল, সেই অবস্থায় স্ট্যাচু হওয়ার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়ল ছোকরা। তারপর পাগলের মতো কেমন একটা অদ্ভুত গলায় চিৎকার করে উঠল, দু-হাতে আমার ইউনিফর্মটা খামচে ধরল, ঝাঁকাতে লাগল বেপরোয়াভাবে—'মিথ্যে কথা বলছেন, লায়ার...ফালতু বকছেন সকালবেলা...।'

খুব ঠান্ডা মাথায় হাত দুটো ছাড়ালুম, তারপর সপাটে একটা থাপ্পড়। এসব অ্যাকটিং দেখে-দেখে হাড় পেকে গেছে আমার এই লাইনে।—'থানায় চল শুয়োরের বাচ্চা। শালা খুনি...ন্যাকরাবাজি হচ্ছে, হারামজাদা!'

আহ কতদিন পর ফুল ফোর্সে একটু গালাগাল দেওয়া গেল! খোলসা হল গলার ভেতরটা।

থাপ্পড়টা মারতুম না হয়তো। কিন্তু কাল রাত্তিরে থানায় বসে দোকানদারগুলো যা সব স্টেটমেন্ট দিলে—তাতে মেজাজটা টক হয়ে গেছে। কেস হিস্ট্রি যা দাঁড়াচ্ছে, মার্ডারের গন্ধ পরিষ্কার। আর আমি কিনা গোড়া থেকেই কনফিডেন্টলি বলে আসছি, ক্লিয়ার সুইসাইড! এখন নিজের থুতুই গিলতে হচ্ছে ওই মহিলার সামনে। এই ছোকরাই হচ্ছে খুনি—তবে সেজন্যে অতটা রাগ হচ্ছে না। চোরডাকাত খুনি ঘেঁটে হাতে কড়া পড়ে গেছে। কিন্তু যেই ভাবছি এই ব্যাটার জন্যেই আমার প্রেস্টিজটা পাংচার হয়ে গেল, মনে হচ্ছে আর-একটা চড় কষাই।

হ্যাঁ, খুনি এই কমল বিশ্বাসই। এই ছেলে আর ওই মেয়ের মধ্যে একটা অ্যাফেয়ার ছিল অনেকদিন ধরে। ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায় ছেলেটা একটা ঘর বুক করেছিল—মাঝে-মাঝেই কাজ দেখার অছিলায় ওপরে উঠে যেত। একই সময় বুঝে-পড়ে মিনা মেয়েও আসত। দুজনে মিলে সিঁড়ি বেয়ে চারতলা-পাঁচতলার নিরিবিলিতে উঠে ঘাপটি মেরে প্রেমালাপ করত—এমনই বয়ান পাওয়া যাচ্ছে।

কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেয়েটা এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সমীর কর্মকার বলে যে-ছেলেটা স্টেটমেন্ট দেয়, তার দোকান সিঁড়ির ঠিক মুখটাতেই—তার মেমারি খুব শার্প। তার স্পষ্ট মনে আছে, একাই আসে মেয়েটা। ঠিক তার পরপরই একটা বাচ্চা জোগাড়ে ছেলে ওপর থেকে নেমে এসেছিল। একজন বোরখা পরা মহিলা বোধহয় ওপরে উঠেছিলেন,

BanglaBook.org

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনিও নেমে আসেন। কমল বিশ্বাস এসেছিল তারও মিনিট পাঁচ-সাত পরে। কিছুক্ষণ পরেই তাকেও নেমে আসতে দেখে সমীর। একা।

মেয়েটাকে নামতে দেখেনি কেউ।

এবং আরও দু-একজনের বয়ান অনুসারে, নীচে নামার সময় বারকয়েক ইতিউতি তাকিয়ে, অনেকটা যেন অপরাধীর ভঙ্গিতে দ্রুত বেরিয়ে যায় কমল বিশ্বাস। পকেট থেকে মোবাইল বার করে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছিল বারবার—এটাও চোখ এড়ায়নি কয়েকজনের।

মেয়ের মামা বিনোদ শাসমলকেও আলাদা বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি খুব ইমপর্ট্যান্ট একটা তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বয়ানেও কমল বিশ্বাসের নামই উঠে আসছে। হ্যাঁ—তাঁরা জানতেন এদের মেলামেশার কথা, তেমন আপত্তিও ছিল না তাঁর বা তাঁর দিদির। কিন্তু ইদানীং এদের দুজনের মধ্যে কোনও একটা গোলমাল চলছিল। কাল দুপুরবেলা টিনা মোবাইলে খুব ঝগড়া করছিল—বিনোদ এবং তাঁর দিদি, অর্থাৎ টিনার মা, দুজনেই শুনতে পেয়েছেন। মনে হচ্ছিল কমলই ছিল উলটোদিকে।

অর্থাৎ এ-কেসটি জলবৎ তরল হয়ে এসেছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিরোধ, প্রেমিকাকে নিরিবিলিতে ডেকে এনে পাঁচতলা থেকে একটি মসৃণ ধাক্কা এবং প্রেমিকের পলায়ন। কী নিয়ে বিরোধটা ঘটেছিল সেটাই শুধু জানতে বাকি। এবং সেটাও খুব অভিনব কিছু হবে না—পাতি একটা ট্র্যাঙ্গলই খুঁজে পাওয়া যাবে সম্ভবত। এবার এই কেসটা সলভ করে বিস্তর হাততালি কুড়োবেন অগ্নিকন্যা। আমার শালা বরাতটাই খারাপ—বেফাঁস ডিসিশনটা আগেভাগে দিয়ে ফেলে এখন মুখ লুকোতে হচ্ছে।

খুনিটার কলার ধরে জিপ থেকে টেনে নামালুম। কলের পুতুলের মতো হেঁটে-হেঁটে ভেতরে এল। হেভি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে—এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি বোধহয়।

॥ তিন ॥

'কাল দুপুরে মোবাইলে ঝগড়া হয়েছিল আপনাদের?'

'হ্যাঁ...মানে, ঝগড়া নয় ঠিক, একটু কথা কাটাকাটি...।'

'কী নিয়ে?'—সুবর্ণরেখার গলাটা বেশ নরমসরমই।

'ও চাইছিল ওর টাকা নিয়ে আমি ব্যাবসা শুরু করি। আমি বলছিলাম, আমি নিজেই এসট্যাবলিশড হতে পারব, ওর টাকা নেব না।'

'একটু এক্সপ্লেন করে বলুন।'

বাঁ-হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছল কমল বিশ্বাস। শালা একেবারে অরিজিনাল চোখের জল বার করে ফেলেছে মাইরি! তবে আমাকে গলাতে পারবে না, ক্রোকোডাইল টিয়ার্স কম দেখিনি আমি। চুপচাপ শুনতে লাগলুম। মহিলা আবার গলে না যান!

কমল বিশ্বাস ফোঁপাতে-ফোঁপাতেই বলতে লাগল, 'আমি একটা কম্পিউটারের বিজনেস খুলব বলে ভেবেছিলাম। একটা ঘর বুক করেছিলাম, ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায়। এখন সবে দেয়ালগুলো গাঁথা হয়েছে, প্লাস্টার হয়নি। আমার কিছু ক্যাপিট্যাল লাগবে তো...তাই এদিক-ওদিক লোন নেওয়ার চেষ্টা করছি—টিনা একদিন হঠাৎ বলল ওর হাতে রিসেন্টলি কিছু টাকা এসেছে কোনও একটা ফ্যামিলি-সোর্স থেকে। ও টাকাটা আমাকে দিতে চাইছিল।'

BanglaBook.org

'কত টাকা?'

'আমার দরকার...সব মিলিয়ে আট-ন'লাখ টাকা।'

'পুরোটাই টিনা দিতে চেয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এত টাকা ঠিক কোন সোর্স থেকে পেতে পারে টিনা—কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'ও একটু চাপা টাইপের ছিল, সব খুলে বলত না...। তবে যতদূর জানি ওর বাবা মারা যাওয়ার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে ওকে দিয়ে যান—আঠেরো বছর বয়স হলে ওর হাতে আসবে এই কন্ডিশনে।'

'টিনার আঠেরো কমপ্লিট হয়েছে কবে?'

'এক সপ্তাহ আগে...।'

এই অবধি পৌঁছে কমল বিশ্বাস মুখে হাত চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

এতক্ষণ মিস সুবর্ণরেখার ইন্টারোগেশনের ভঙ্গি দেখে গা-টা চিড়বিড় করছিল আমার। এই কি তরিকা, খুনের আসামিকে প্রশ্ন করার? যেন 'রোজগেরে গিন্নির' ইন্টারভিউ, কিংবা রান্না শেখানোর ক্লাস।...একটি ধমকে জাঙিয়া ভিজিয়ে ফেলবে এমন গলা বার করতে হবে, মাঝে-মধ্যেই বাঘা থাবায় চেপে ধরতে হবে টুঁটিখানা—তবে না পুলিশি জেরা!

হতচ্ছাড়া ছেলেটা কান্নাকাটির পালা শুরু করতে আর বসে থাকা গেল না। বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠলুম, 'অ্যাই...ঢং রাখ, ওঠ, উঠে বোস—রাস্কেল!'

ও হরি! অ্যাসিস্ট করছি বলে কোথায় প্রসন্ন হবেন—তার বদলে ম্যাডাম একটা গা-শিরশিরে হিম চাউনিতে তাকালেন আমার দিকে—'প্লিজ হোল্ড ইয়োর টেম্পার...দেখছেন তো আপসেট হয়ে পড়েছে ভদ্রলোক!'

'ভদ্রলোক, ম্যাডাম! খুনি শয়তান একটা...।'

'দ্যাট ইজ ইয়েট টু বি প্রুভড, সার!'—মহিলার গলায় বেশ একটা ব্যঙ্গের খোঁচা টের পেলুম—স্টিকিং প্লাস্টারের মতো হাসিটা আটকে রেখেছেন ঠোঁটে, তবুও।

আমিও ছাড়নেওয়ালা নই, গলাটাকে অমিতাভ বচ্চনের মতো ব্যারিটোন করার চেষ্টা করে বললুম, 'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স তো যথেষ্টই রয়েছে...।'

'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, মিস্টার দাশগুপ্ত। ওর মধ্যে বিস্তর ফ্যালাসির ফাঁকফোকর থাকে। যাক গে, আমরা ওটা নিয়ে পরে আলোচনা করব...। আপাতত আমার আরও কিছু জানার আছে, সেটুকুর মধ্যে প্লিজ আপনি ইন্টারভেন করবেন না।'

দেখলে! একটা খুনের আসামির সামনে কী রকম ইনসাল্ট করলে আমায়! ঠিক আছে, এই আমি মুখে কুলুপ দিলুম, এবার তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজায় কাটো মুড়োয় কাটো, সে তোমার মর্জি!

কমল বিশ্বাসের পিঠে একটু হাত চাপড়ে শ্রীমতী তাকে ফের উঠিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, 'কালকের কথাকাটাকাটির ব্যাপারটা একটু ডিটেলস-এ বলুন তো।'

ধরা-ধরা গলায় ছোকরা বলতে শুরু করল, 'কাল টিনা দুপুরবেলায় আমার মোবাইলে ফোন করল। বলল, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গলম বিল্ডিংয়ে চলে আসতে। ওই টাকাপয়সাটার ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশন কালই নিতে চাইছিল ও। সেটা নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হয়। তার ওপর আমি বলেছিলাম, সাড়ে পাঁচটায় হয়তো আমি পৌঁছোতে পারব না, দশ-পনেরো মিনিট দেরি হবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ওয়ান ডে-টা পুরো দেখে তবে যাব। তাতে ও একেবারে ফায়ার হয়ে ওঠে...।'

'কেন?'

'আসলে ও ভীষণ পাংচুয়ালিটি মেনটেন করতে চাইত...একটু ম্যানিয়াগ্রস্তের মতনও লাগত

BanglaBook.org

অনেক সময়। অনেকবার এমন হয়েছে, জাস্ট দু-তিন মিনিট দেরি হয়েছে আমার—ও চলে গেছে সেখান থেকে। বলত, ওর ঘড়ি একদম সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মাপে ঠিক করা থাকে এবং সেটা ও ভীষণ জেদির মতো ফলো করত...।'

'তারপর বলুন।'

'আমি যত বলি তুমি ওটা পৌনে ছ'টা করো অন্তত আজকের জন্যে, কিছুতেই শুনবে না। আমি একটু রেগেমেগে বললাম...বেশ, খেলা দেখবই না তাহলে আজ...।'

'সত্যিই দেখলেন না?'

'না-না, ঠিক তার দশ মিনিটের মাথায় টিনা আমার মোবাইলে একটা এস. এম. এস. পাঠায়। পৌনে ছ'টাতেই টাইমটাকে ফিক্সড করে।...আমার অবশ্য পৌঁছোতে আরও তিন মিনিট লেট হয়েছিল, আর তাই ভেবেছিলাম রাগ করে চলে গেছে হয়তো—তখন কি জানি যে, ও বরাবরের মতো...।'

আবার নিজের বাঁ-হাতে মুখ চাপা দিল ছোকরা। বেড়ে অ্যাকটিং। তবে আমি কিন্তু স্পিকটি নট।

সুবর্ণরেখাও দেখলুম এবার আর সান্ত্বনা-টান্ত্বনার দিকে গেলেন না। বরং যেন একটু অন্যমনস্ক, ভুরু দুটো কুঁচকে ভাবছেন কিছু।

'আচ্ছা, টিনা এই দ্বিতীয়বার সময় দেওয়ার সময় এস. এম. এস. করল কেন?'

'আমিও অবাক হয়েছিলাম। ও বড়-একটা এস. এম. এস. করত না, বলত বোতাম টিপতে-টিপতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবে ও একটু খামখেয়ালি ছিল, ওর মতিগতি কখন যে কী হত...।'

টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে এলেন সুবর্ণরেখা। 'এস. এম. এস.-টা ডিলিট করে ফেলেননি নিশ্চয়ই?'

কমল বিশ্বাস মাথা নাড়ল,—'না, কোনওদিনই মুছব না ওটা, ওর শেষ মেসেজ...।' গলাটা আবার যেন বুজে এল।

ম্যাডাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপাতত এই অবধি থাক। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি ওকে কাইন্ডলি একটু বাড়ি পৌঁছে দিন...আর ওর মোবাইলটা নিয়ে আসুন বাড়ি থেকে।'

এতটা অবাক লাগল যে, নীরব থাকার সংকল্পটা ভুলে গিয়ে বলে ফেললুম, 'ছেড়ে দিচ্ছেন...?'

হাসলেন শ্রীমতী—'আটকে রাখার মতো সলিড গ্রাউন্ড পেলেই আবার নিয়ে আসতে কতক্ষণ? তবে আমি মনে করি, উনি কোথাও পালাবেন না...কারণ, সেক্ষেত্রে ওঁর পোজিশনটা আরও খারাপই হয়ে দাঁড়াবে। কী কমলবাবু, ঠিক না?'

এর মধ্যেই কয়েক দফা কান্নাকাটিতে ছোকরার মুখচোখ ফুলে থমথম করছে। কথা না বলে ঘাড় নাড়ল শুধু।

BanglaBook.org

॥ চার ॥

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু কমল বিশ্বাসের পোজিশনটা সত্যি-সত্যিই আরও ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠল দেখা যাচ্ছে। রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর আগে টিনার শ্বাসরোধ করা হয়েছিল—সম্ভবত পড়ার সময় চেঁচাতে পারে, এই সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যেই—এবং গলায় যে-হাতের ছাপটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি বাঁ-হাত। ফিংগারপ্রিন্ট অবিশ্যি মেলেনি, দস্তানা পরা ছিল বলেই অনুমান।

কমল বিশ্বাস যে ন্যাটা সেটা সেদিন থানায় বসেই তার হাতের গতিবিধি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। ম্যাডামও লক্ষ করেছেন।

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিলেন শ্রীমতী, বেশ অস্থির দেখাচ্ছিল। আমি চুপচাপ সামনে বসে আছি। হঠাৎ যেন স্বগত ভঙ্গিতেই বলে উঠলেন, 'এই ছেলে যদি সত্যিই খুনি হয় তবে আমি আজ পর্যন্ত ম্যান-ওয়াচিং-এর কিচ্ছু শিখিনি, বুঝলেন?'

মনে-মনে বললুম, পথে এসো মহারানি। স্বীকার করো যে, তোমারও ভুল হয়। মুখে বললুম, 'এবার তাহলে অ্যারেস্ট করে আনি?'

চোখ বুজে দুই ভুরুর মাঝখানে তর্জনীটা রেখে পুরো দু-মিনিট ধ্যানস্থের মতো বসে রইলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা। চোখ খুললেন যখন, দেখি চাউনিটা পুরো পালটে গেছে। কী যেন একটা খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনা চিকচিক করছে চোখে, গোটা মুখটাই যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

লাফিয়ে উঠে আলমারিটার চাবি খুললেন, একটু ঘেঁটেঘুঁটে বার করে নিয়ে এলেন একটা ছোট্ট বাক্স। টিনার মোবাইল—যেটা আমি পেয়েছিলুম, আর সেদিনকার পরা সেই রিস্টওয়াচটা বার করলেন বাক্স থেকে। ঘড়িটা খুব যত্নে এবং সাবধানে মেলে রাখলেন টেবিলের ওপর।

দামি কোম্পানির ঘড়ি। বন্ধ হয়ে আছে। ছোট কাঁটাটা পাঁচ আর ছয়ের মাঝামাঝি, বড় কাঁটাটা ঠিক সাত ছুঁয়েছে। সেকেন্ডের কাঁটাটা একটার কাছাকাছি স্থির।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

সুবর্ণরেখা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কী বুঝছেন?'

বোকার মতো হাসলুম। কিছুই বুঝছি না যে।

'ওপর থেকে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল এই ঘড়ি...' নিরেট ছাত্রকে বোঝাচ্ছেন এমনভাবে বললেন ম্যাডাম, 'অ্যান্ড দ্যাটস দ্য একজ্যাক্ট টাইম অব হার ডেথ!'

এর থেকে কী সুবিধে হবে আমার মাথায় ঢুকছে না। কখন মেয়েটা মরেছে সেটা একজ্যাক্ট জেনে লাভ কী? ওই সময় নাগাদ মরেছে সেটা তো আগেই প্রমাণ হয়েছে। কমল বিশ্বাস এসেছে সাড়ে পাঁচটার কিছুক্ষণ পর, এ তো জানা কথা!

আমার চাউনিটা সম্ভবত আগের মতোই নিষ্প্রভ থেকে গিয়েছিল, সুবর্ণরেখা একটু অধীর গলায় বলে উঠলেন, 'আপনার মনে পড়ছে না কমল বিশ্বাস ক'টায় পৌঁছেছে বলে জানিয়েছিল?'

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। পৌনে ছ'টারও তিন মিনিট পর, অর্থাৎ পাঁচটা আটচল্লিশ নাগাদ।

'তার মানে কমল পৌঁছনোর বারো-তেরো মিনিট আগেই...' বলতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেলুম।—'আচ্ছা, কমল তো মিথ্যেও বলতে পারে!'

মাথা নাড়লেন শ্রীমতী।—'পারে। সেটা ভেরিফাই করার দুটো স্টেপ আছে। প্রথমে টেলিকাস্টিং সেন্টারে একটা ফোন করে জানতে হবে, ঠিক কখন ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ম্যাচটা শেষ হয়েছিল সেদিন। আর তারপর...আচ্ছা, আগে প্রথমটাই হোক।'

ফোনের দিকে এগোলেন সুবর্ণরেখা। নাহ, সুতো একটা বার করেছেন ঠিক—ব্রেন আছে মানতেই হবে।

BanglaBook.org

॥ পাঁচ ॥

নার্সিংহোমের কেবিনে ঢোকার আগে একজন ডাক্তার এগিয়ে এলেন। বললেন, 'বেশি এক্সাইটমেন্ট হলে ক্ষতি হবে কিন্তু...।'

সুবর্ণরেখা হাসলেন। হাসিটা অনেকভাবে ব্যবহার করতে জানেন মহিলা। এখন যে-স্মার্ট

হাসিটা প্রেজেন্ট করলেন তার মানেটা দাঁড়ায়—'ডোন্ট ওরি, আই নো মাই বিজনেস।'

মেয়ের মৃত্যুর খবরটা পেয়েই একটা অ্যাটাক হয়ে গেছে তপতী মিত্রর। হার্ট উইক অনেকদিন থেকেই, আচমকা ধাক্কাটা সামলাতে পারেননি। প্রায় এক সপ্তাহ অর্ধ-অচৈতন্য ছিলেন, আজই সবে ডাক্তাররা অনুমতি দিয়েছেন, খুব সংক্ষিপ্ত একটা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

বিছানায় মিশে আছেন শীর্ণকায়া মহিলা। চোখের কোণে গভীর কালি, মুখের রেখায় অসীম হতাশা। জীবিত থাকার কোনও অর্থ খুঁজে না পেলে মানুষের যেমন হয়ে থাকে।

খুব ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না কমল এই কাজ করতে পারে...।'

একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় সুবর্ণরেখা বললেন, 'আমিও করি না। কিন্তু তাহলে অন্য কে করতে পারে, সে ব্যাপারে যদি একটু অনুমান করেন...।'

মহিলার মুখের পেশিগুলো এই অবস্থাতেও একটু কঠিন হয়ে উঠল যেন। গলার আওয়াজেও পরিবর্তন এল একটা। একইসঙ্গে দুঃখ, ক্ষোভ এবং ঘৃণা মিশলে যা দাঁড়ায়, সেইরকম গলায় বললেন, 'আমার মেয়ের কোনও শত্রু ছিল না—শুধু একজন ছাড়া! ওর এক ক্লাসমেট, রেহানা।...ওকে অনেকবার বলেছে, তোর মৃত্যু দেখে ছাড়ব। শেষ করে ফেলব তোকে।...আমি আপনাকে বলছি অফিসার, ওই শয়তান মেয়েটা ছাড়া এ কাজ আর কারও নয়। ওই রাক্ষুসি রেহানাই ওকে...।'

তীব্র হয়ে উঠছিল তপতী মিত্রর গলার আওয়াজ সুবর্ণরেখা কপালে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করতে লাগলেন।

খুব শান্তভাবে প্রশ্নগুলো ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুবর্ণরেখা।

'রেহানা...কোথায় থাকে?'

তপতী বললেন,—'বাজার পেরিয়ে যে শেখপাড়া আছে, সেখানেই কোথায় বাড়ি শুনেছি...।'

'কিন্তু, কী এমন শত্রুতা থাকতে পারে যার জন্যে...।'

'ওই মেয়ের দারুণ হিংসে ছিল, কমলকে নিয়ে...। ও প্রপোজ করেছিল কমলকে, কমল রাজি হয়নি...। সেই থেকে আমার মেয়ের ওপর ওর আক্রোশ। বলেছিল, কিছুতেই পেতে দেবে না কমলকে...।'

সেই ট্র্যাঙ্গল। সত্যি, সেই এক ফুল দো মালির গপ্পো নিয়ে দুনিয়াভর যে কত খুনখারাপি হয়ে আসছে চিরটাকাল—এত দিন পুরুষরাই তাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে বেশিরভাগ, এখন দেখছি মেয়েরাও কম যায় না! সত্যিই যদি এই রেহানা মেয়েটা টিনার পিছন-পিছন গিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে...।

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে কী একটা চিড়িক দিয়ে উঠল। প্রায় লাফিয়ে উঠে বলতে যাচ্ছিলুম, 'ম্যাডাম, ওই সমীর বলে ছেলেটা কিন্তু বলেছিল টিনা ওপরে উঠে যাওয়ার পরই একজন...।'

সুবর্ণরেখা ঝটিতি থামিয়ে দিলেন মাঝপথে—'আচ্ছা-আচ্ছা, ওটা আমরা ভালো করে খতিয়ে দেখব...কিন্তু মিসেস মিত্র, আমার আরও দু-একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন।'

'টিনার বাবা মারা গেছেন কতদিন হল?'

'সাত বছর।'

'ন্যাচারাল ডেথ?'

একটু নীরব থেকে আস্তে-আস্তে বললেন তপতী, 'না। স্লিপিং পিল খেয়েছিলেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ সুবর্ণরেখা। তারপর বললেন, 'এ-প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ব্যক্তিগত।...আপনার

BanglaBook.org

সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল কি? যতদূর জানি উনি সব সম্পত্তি মেয়ের নামে লিখে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে সন্দেহ করতেন। ভাবতেন, আমার কোনও এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে...। এক ধরনের মানসিক রোগ আসলে। শেষ দিকটায় চূড়ান্ত অশান্তি হত—। তারপর একদিন ওই কাণ্ড ঘটালেন...।'

'আপনি আপনার ভাইয়ের বাড়িতে এসে উঠলেন কবে?'

'তারও বছর তিন পরে। যখন থেকে আমার হার্টের অসুখটা ধরা পড়ল। মেয়েটাও বড় হচ্ছিল, অভিভাবকের মতো একজন কাউকে দরকার হচ্ছিল খুব...।'

'বাই দ্য ওয়ে, বিনোদবাবু বিয়ে-থা করেননি?'

'না, আর করবেও না বলেছে। বয়েসও তো হল চল্লিশের ওপর...।'

'উনি কী করেন? মানে, প্রফেশন...।'

'বাসস্ট্যান্ডের কাছে ওর দোকান, লন্ড্রি...। "স্ট্যান্ডার্ড ডায়ার্স অ্যান্ড ক্লিনার্স" নাম...।'

উঠে পড়লেন ম্যাডাম। উঠতে-উঠতে বললেন, 'শেষ প্রশ্ন। গত সপ্তাহে টিনা আঠেরোয় পড়েছিল। ওর বাবার রেখে যাওয়া সমস্ত টাকাপয়সা ওর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই, ব্যাংক থেকে জেনেছি আমরা। অ্যামাউন্টটা আপনি জানেন কি?'

'জানি। সাড়ে আট লক্ষ টাকা। টিনা ওই অ্যাকাউন্টে আমার নামটাও ইনক্লুড করাতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। সেই মানুষটা যখন আমাকে বাদই দিয়েছেন, ও-টাকার সঙ্গে আমি সংস্রব রাখতে পারি না।'

'কিন্তু এখন তো নিয়ারেস্ট কিন হিসেবে আপনিই ওই টাকার...।'

থামিয়ে দিলেন তপতী। এই প্রথম তাঁর চোখে জল দেখলাম। ফোঁপাতে-ফোঁপাতেই বললেন, 'ও-টাকা আমি ছোঁব? তিনি উইলে কী কন্ডিশন দিয়েছিলেন জানেন? যদি আঠেরোয় পৌঁছোনোর আগে টিনার ভালোমন্দ কিছু হয়—ওই টাকা ভারত সেবাশ্রম সংঘে চলে যাবে!...এতখানি বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর আমার ওপর। ও-টাকা আমি ভারত সেবাশ্রমেই দিয়ে দেব... মেয়েই চলে গেল, টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

আবার একবার তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে দরজার দিকে এগোলেন সুবর্ণরেখা।

এই তপতী মিত্রর অবস্থাটা দেখে আমার সত্যিই ভারী দুঃখ হচ্ছিল। আহা—স্বামী ওইভাবে গেছেন, আর একমাত্র সম্বল মেয়েটা এইভাবে...।

দরজা থেকে আর একবার পিছন ফিরলেন মিস সেন।

'আচ্ছা, টিনা লেখাপড়ায় কেমন ছিল মিসেস মিত্র? বিশেষ করে ইংরেজি বা অঙ্কে...।'

একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল যেন ক্লিষ্ট মুখটায়—'যে-দুটো নাম করলেন...ওই দুটোতেই ভীষণ কাঁচা ছিল। বলত অঙ্ক যেন আমার কাছে বাঘ, আর ইংরেজিতে তিনের কোঠা পেরত না...।'

সুবর্ণরেখাও দেখলাম কেমন অদ্ভুত একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'ওহ্ হো, তাই? আচ্ছা, আজ আসি, নমস্কার।'

মাঝে-মাঝে এনার ভাবগতিক সত্যিই বেজায় দুর্বোধ্য লাগে আমার। কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যান! কিছু বোঝা যায় না। অবিশ্যি পণ্ডিতেরা তো বলেইছেন, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম...!

জিপে বসে থানায় ফিরছি। ম্যাডাম সিটে হেলান দিয়েছেন, চোখ দুটো বোজা। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে অল্প-অল্প। এইরকম দু-একটা দুলর্ভ মুহূর্তে ভারি নরমসরম দেখায় প্রোফাইলটা,

BanglaBook.org

ঝাঁঝালো ডাঁটিয়াল ভাবটা অদৃশ্য হয়ে যায় ম্যাজিকের মতো।

মহিলাকে ইদানীং আর ততটা যেন অসহ্য লাগে না আমার। একটু-একটু পছন্দই হতে শুরু করেছে বুঝি-বা।...মেল শভিনিজমটা আর ততখানি ফুঁসে উঠছে না ভেতরে। একটা কারণ হতে পারে, মহিলা যে আমার থেকে অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন সেই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকেছে। পালটা চালবাজি দিয়ে এনাকে ডাউন দেওয়া যাবে না। আর নিজের কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। ঘোষালসাহেবের থেকে অন্তত দশগুণ এফিশিয়েন্ট, স্বীকার করতেই হবে। আমার অ্যাটিটিউডের এই পরিবর্তন বোধহয় উনিও টের পান সিক্সথ সেন্স দিয়ে। আগের মতন অতটা তেরছাভাবে বা ঠান্ডা গলায় কথা বলেন না দেখি। মাঝেমধ্যেই হাসেন-টাসেনও আজকাল। চুপিচুপি বলছি—হাসিটা কিন্তু ভারী ঝকঝকে আর ইমপ্রেসিভ।...আরে না, এর মধ্যে অন্য কোনও মিনিং নেই, আমি সবসময় মনে রেখে চলি যে, শি ইজ মাই বস! যথেষ্ট বিনয়ও বজায় রাখি।

এখনই যেমন, খুব মোলায়েম গলায় বললুম, 'ম্যাডাম, একটা কথা বলব?'

চোখ মেললেন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

একটু গলাখাঁকরে বলি, 'এই রেহানা মেয়েটাকে তো একটু কালচার করে দেখতে হচ্ছে। সেই যে বোরখা-পরা মহিলার কথা শোনা গিয়েছিল...আর এই যে ইনফরমেশন আজ পাওয়া যাচ্ছে—এ দুটো তো লিংকড!'

'হতে পারে...' একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন সুবর্ণরেখা।

'কিন্তু তাহলে কমল বিশ্বাসের কেসটা...!'

'কমল যে ক্রিকেট ম্যাচটার কথা বলেছে, খবর নিয়ে দেখেছি সেটা শেষ হয়েছিল পাঁচটা চল্লিশে। সত্যিই যদি ও ম্যাচটা পুরো দেখে তবে বেরিয়ে থাকে...তাহলে ও ইনোসেন্ট। কারণ, খুনের সময়টা আমরা জেনেছি, পাঁচটা পঁয়তিরিশ। কিন্তু যদি...!'

'যদি ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়ে...!'

'হুম।'—চিন্তিত দেখাচ্ছে শ্রীমতীকে, 'কমলের মোটিভটা নিয়েও আমার ধন্দ লাগছে। টিনা অতগুলো টাকা ওকে দিতে চাইছিল, সেটা রিফিউজ করে কমল ওকে খুন করতে যাবে কেন?'

'রেহানার কিন্তু মোটিভ ছিল। জেলাসি...!'

'সেটা মেয়েটার মুখোমুখি না হয়ে, কথা না বলে, ডিসাইড করা যাবে না। আপাতত সমস্ত পসিবিলিটিই ওপেন রাখা চাই—কোনও প্রি-কনভিকশন নিয়ে এগোনো ঠিক নয়। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে, কেসটি সরল সিধে নয়। দ্য প্লট ইজ থিকেনিং!'

॥ ছয় ॥

এক-একজন মানুষকে দেখলেই মনে হয়, ইস—এই সামান্য খুঁতটুকু না থাকলেই এ একেবারে পারফেক্ট হত। হয়তো নাকটা একটু শুধু থ্যাবড়া, কিংবা নীচের ঠোঁটটা একটু বেশি পুরু, বা গায়ের রংটা যেন বড্ড চাপা...এইটুকুই যদি রেকটিফাই করা যেত—সর্বাঙ্গসুন্দর যাকে বলে, তাই হয়ে উঠতে পারত।

রেহানা সুলতানাকে দেখে প্রথমেই এরকম একটা আপশোসের অনুভূতি হল আমার। অসাধারণ সুন্দরী যাকে বলে, এ-মেয়েটি তাই। কাটা-কাটা চোখ-মুখ, চমৎকার ফরসা রং, চুলের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুই-ই একদম ফার্স্ট গ্রেডের। মুখে একটা দারুণ তেজিয়ান ভাব। কোনও কিছুতেই ঘাবড়ায় না এই মেয়ে। এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দরী বলা যেত, যদি হাইটটা

BanglaBook.org

স্ট্যান্ডার্ড হত।

হ্যাঁ, ওইটাই রেহানার মাইনাস পয়েন্ট। গড়পড়তার মাপেও বড্ড বেঁটে। হার্ডলি চার সাত কী চার আট।...ইঞ্চি চার-পাঁচ বেশি হলে ফিল্মস্টার হয়ে যেতে পারত অনায়াসে।

মুখের তেজিয়ান ভাবের কথা বলছিলাম। কথাবার্তাতেও সেই ঝাঁঝ প্রকট। ম্যাডাম যখন জিগ্যেস করলেন, 'ষোলো তারিখ বিকেলে আপনি কোথায় ছিলেন?'—চোখের পাতা না ফেলে স্ট্রেট তাকাল, 'বিছানায়। ভাইরাল ফিভার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগলে দেখাতে পারি।'

বসে আছি রেহানাদের বৈঠকখানায়। রেহানার বাবা শেখ আবিদ আলি অতি সজ্জন ভদ্রলোক। চমৎকার শরবত খাইয়েছেন। মেয়েকে ভেতর থেকে ডেকে পাঠানোর আগে বারবার আমাদের বুঝিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ে একটু মেজাজি, কিন্তু এই কাজ তার পক্ষে অসম্ভব। এখনও প্রত্যেক কথাতেই মেয়েকে ঢেকে-ঢুকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মেয়ে যেন জ্বলন্ত আগুনের শিখা, লকলকিয়ে উঠছে থেকে-থেকেই।

'আপনি টিনাকে খুন করবার হুমকি দিয়েছিলেন?' খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন সুবর্ণরেখা।

'হ্যাঁ। এবং তার জন্যে আমি অনুতপ্ত নই। ও আমাকে আমাদের জাত তুলে, ধর্ম তুলে, গালাগাল দিয়েছিল। অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির মেয়ে ছিল, কুটিল মন। শি ডিজার্ভড সাচ অ্যান এন্ড।'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আবিদ আলি—'আহ্, কীসব যা-তা বলছিস! ছেড়ে দে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে...।'

সুবর্ণরেখার মুখে সেই স্টিকিং প্লাস্টারের মতো সাঁটা হাসি। স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, রেহানা, আপনি বোরখা পরেন?'

'হ্যাঁ, অকেশনে পরি। কেন?'

'নাহ্ এমনিই।' উঠে দাঁড়ালেন সুবর্ণরেখা। তারপরই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলেন। হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে নিজের বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

রেহানা একটু থতমত খেল, কোন হাতটা বাড়াবে ঠিক করতে পারল না। অবাক চোখে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

ম্যাডাম একটু যেন অপ্রস্তুতের মতো হাসলেন, বললেন, 'ওহ্ হো, সরি...' তারপর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। এবার রেহানারও ডান হাতটা এগিয়ে এল। হ্যান্ডশেক করলেন সুবর্ণরেখা। আমার দিকে একবার তাকালেন। আমি একটু হাসলাম।

বেরিয়ে এসে বললুম, 'ন্যাটা তো নয় দেখলুম। তবে ম্যাডাম, ও-মেয়ে কিন্তু খুন করতেই পারে! কী ফোঁসফোঁসানি, বাপ্স!'

'হুম, সুন্দরী মেয়েরা রিফিউজড হলে, বা অন্যের কাছে হেরে গেলে, পাগল হয়ে যায়...', ম্যাডাম হাসলেন, '...তবে ওর অ্যালিবাই আছে একটা, অসুস্থ ছিল—বাড়ির লোক সাক্ষ্য দেবে। যদিও সেই সাক্ষ্যর ভ্যালিডিটি সম্পর্কে সন্দেহ করা যেতেই পারে।'

'তাহলে কী দাঁড়াল?'

কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা, তারপর বললেন, 'আমি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে থানায় যাব। দু-একটা জায়গায় খোঁজ নেওয়ার আছে। আপনি এক কাজ করুন, তপতী মিত্র কাল বাড়ি ফিরেছেন, বিনোদবাবুও বাড়িতে আছেন এখন নিশ্চয়ই—একবার ওঁদের দেখে আসুন।...আর হ্যাঁ, একটা ভাইটাল কথা মাথায় রাখবেন। এই যে বোরখা-পরা মহিলার কথা শোনা গেছে, এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না। সেদিন নার্সিংহোমে তো বলেই ফেলছিলেন প্রায়, থামিয়ে না দিলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। মনে রাখবেন, বোরখা-র "ব"-ও নয়।'

BanglaBook.org

॥ সাত ॥

সন্ধে থেকেই লোডশেডিং আজকে। টেবিলের ওপর বসানো মোমবাতিটার মৃদু আলোয় ঘরটার মধ্যে অদ্ভুত একটা রহস্যময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠেছে যেন। আমার তো মাঝে-মাঝেই রোমাঞ্চ হচ্ছে রীতিমতো। এইরকম আলো-আঁধারিই বুঝি জটিল রহস্যের জাল খোলার জন্যে একদম আইডিয়াল সেটিং।

টেবিলের এপাশে বসে-থাকা সুবর্ণরেখার মুখখানা অবশ্য দেখছি আশ্চর্যরকমের প্রশান্তিতে ভরপুর, সামান্য টেনশনও নেই যেন। কিন্তু ওপাশে যারা?...খুঁটিয়ে ওয়াচ করলাম, এক-একজনের ভাব এক-একরকম—বেশ ইন্টারেস্টিং স্টাডি-মেটিরিয়াল।

দু-সারি চেয়ার পাতা হয়েছে টেবিলের ওপাশটায়। প্রথম সারিতে কমল বিশ্বাস, তপতী মিত্র এবং রেহানা সুলতানা। দ্বিতীয় সারিতে বসে আছেন এঁদের যাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন থানায়—কমলের বাবা নারায়ণ বিশ্বাস, টিনার মামা বিনোদবাবু এবং রেহানার বাবা আলিসাহেব। এঁদেরও পিছনে দুটো টুলের ওপর বসেছেন দুজন—একজনকে আমি ঠিক চিনি না, সুবর্ণরেখারই পরিচিত কেউ হবেন। অন্যজন 'মঙ্গলম' বিল্ডিংয়ের সেই তরুণ দোকানদার, সমীর কর্মকার।

মোমের আলো পড়েছে প্রথম সারির মুখগুলোতে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—কমল যেন কিছুটা সংকুচিত, তপতী মিত্র একটু বিহ্বল মতো, রেহানার মুখে বিরক্তি। তার পিছনের সারিতে....কমলের বাবার বেশ ভয়-ভয় ভাব। বিনোদ শাসমল বেশ ক্যাজুয়াল এবং আবিদ আলি—দৃশ্যতই উদ্বিগ্ন। একদম শেষে বসা দুজনের মুখ অস্পষ্ট আলোয় আবছা লাগছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আজ এঁদের সকলকে বিশেষভাবে ডেকে আনা হয়েছে এখানে।

'এই কনফারেন্স-পদ্ধতিটা মাঝেমধ্যে খুব কাজ দেয়, ফেলুদার ফেভারিট স্টাইল—জানেন তো?'—ম্যাডাম হাসতে-হাসতে বলেছিলেন। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসলে নাকি পারস্পরিক বক্তব্যগুলোর ঠোকাঠুকিতে মিথ্যের খোলস ভেঙে সত্যির শাঁসটুকু সহজে বেরিয়ে আসে। ....আমি অবিশ্যি ব্যাপারটার মধ্যে যে সাসপেন্সের শিরশিরানি আছে, সেটুকুই এনজয় করছি আপাতত। এইটুকু বুঝতে পারছি শুধু, সুবর্ণরেখার একটা পরিষ্কার প্ল্যানিং আছে পুরো প্রোগ্রামটার ব্যাপারে—কিন্তু মহিলার মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতাটাও অসাধারণ! আমি হাজার হোক ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট তো বটে...কিন্তু নিপুণভাবে আমাকে অবধি অন্ধকারে রেখেছেন। না, তার জন্যে আমি অবিশ্যি অফেন্স নিচ্ছি না, শি নোজ হার বিজনেস।

সুবর্ণরেখা উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘ ছায়া পড়ল পিছনের দেওয়ালে।

'আজ আমরা জানার চেষ্টা করব ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল টিনার। প্রথমেই তপতীদেবীর কাছে আমি মাপ চাইছি, অসুস্থ শরীরে এখানে টেনে আনার জন্যে। এই ধরনের পরিস্থিতিগুলোতে মানসিক উত্তেজনাও তৈরি হয়—যা হার্ট পেশেন্টের পক্ষে হার্মফুল, আমি জানি। তাই আমি আমার বন্ধু ডাক্তার অনিমেষ চক্রবর্তীকে এখানে আনিয়ে রেখেছি ব্যক্তিগত অনুরোধে —ও একজন অভিজ্ঞ কার্ডিয়োলজিস্ট। আপনার মিনিমাম ট্রাবল হলেই, হি উইল অ্যাটেন্ড আপন ইউ।'

পিছনের টুলে চুপচাপ বসে ছিলেন যে-অচেনা ভদ্রলোকটি, তিনি তপতী মিত্রর দিকে তাকিয়ে হেসে নমস্কার জানালেন। আমি মনে-মনে ম্যাডামের বিবেচনার তারিফ করলুম। আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছেন শ্রীমতী।

আবার সুবর্ণরেখা। বাক্স খুলে বার করলেন টিনার ভাঙা মোবাইল, আর বন্ধ হয়ে যাওয়া হাতঘড়ি। 'মিসেস মিত্র, আপনি কি এই মোবাইলটা শনাক্ত করতে পারবেন? এটা আমরা স্পটে পেয়েছি, টিনার হতে পারে, অন্য কারোরও...।'

তপতী মিত্র একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ওইরকমই তো অনেকটা...আসলে আমি

BanglaBook.org

মোবাইল ব্যবহার করি না, মানে ঠিকমতো জানিও না সবকিছু, আমার ভাই মোবাইল ইউজ করে, ও হয়তো...।'

'বিনোদবাবু কি একটু দেখে-টেখে বলতে পারবেন, এটা আপনার ভাগনির মোবাইল কি না?'

নেড়েচেড়ে দেখে বিনোদ শাসমল মাথা নাড়লেন। মোবাইল টিনারই।

'অনেক ধন্যবাদ, দুজনকেই—' হাসলেন সুবর্ণরেখা, 'ইন ফ্যাক্ট এই একটা তথ্যই আমার জানতে বাকি ছিল। এবার আমরা মূল পয়েন্টে চলে যাব।'

ঘরে থমথমে নিস্তব্ধতা। অনেকের নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

'এই কেসের তদন্তে নেমে প্রথমে কমলকেই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট মনে হয়। জানা গেছে, দুপুরে সে টিনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। টিনা যে-সময়ে মারা গেছে, সেই সময় নাগাদ সে "মঙ্গলম" বিল্ডিংয়ে এসেছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল বলেও খবর পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা টিনার বন্ধ-হয়ে-যাওয়া এই ঘড়ির সাক্ষ্য থেকে খুব ভাইটাল একটা তথ্য জানতে পারি—টিনাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে পাঁচটা পঁয়ত্রিশে। আর ক্রিকেট ম্যাচ দেখে কমল তার পাড়ার ক্লাব থেকে বেরিয়েছে ঠিক পাঁচটা চল্লিশে। "ভাই-ভাই সংঘ"-এর অন্তত কুড়িজন মেম্বার সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং তারা শেখানো উইটনেস নয়। তাদের অনেকে কমলের প্রতি বেশ হোস্টাইল। তারা চায় কমলের পানিশমেন্ট হোক! কিন্তু ম্যাচ শেষ হতে তবেই সে ক্লাব থেকে বেরিয়েছে—এতে কারও দ্বিমত নেই। দ্যাট প্রুভস হিজ ইনোসেন্স।'

কমল এতক্ষণে মুখ তুলল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। সুবর্ণরেখা মৃদু হাসলেন।

'মিসেস মিত্রর বয়ান থেকে জানতে পারি, রেহানা টিনাকে "শেষ করে দেবে" বলেছিল। ট্র্যাঙ্গল লাভের ঘটনা। এবং আমাদের এক সাক্ষীর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, ঠিক খুনের সময়টিতেই এক মুসলিম মহিলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন এবং কিছুক্ষণ পরে নেমে আসেন। এই দুই বয়ান একসঙ্গে রাখলে রেহানার ওপর স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ পড়ে। কিন্তু রেহানাকে চাক্ষুষ দেখামাত্র আমার সে সন্দেহ উবে গিয়েছিল।'

'কেন, উবে গিয়েছিল কেন?'—একটু যেন কঠিন স্বরে জানতে চান তপতী মিত্র।

'তার কারণ, সেদিন যে-মহিলাকে আমাদের সাক্ষী দেখেছে, তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও তাঁর হাইটটা লুকোনোর মতো নয়! মেয়েদের হাইটের বিচারে তিনি যথেষ্ট দীর্ঘাঙ্গী। ...সমীরবাবু, রেহানার হাইটের সঙ্গে তাঁর হাইট মেলে কি?'

সমীর কর্মকার উঠে দাঁড়াল, 'না ম্যাডাম, অন্তত দশ-বারো ইঞ্চির তফাত।'

'এই হিসেব অনুযায়ী রেহানাও লিস্ট থেকে বাদ পড়ে যায়। তখন আমি ফোকাসটা চেঞ্জ করি। টিনার হত্যার পিছনে ট্র্যাঙ্গল লাভের বদলে অন্য কোনও মোটিভ কি থাকতে পারে না? ...হ্যাঁ, অন্য মোটিভও আছে এবং সেটা যথেষ্ট জোরালো। টিনার বাবার রেখে যাওয়া সাড়ে আট লক্ষ টাকা মাত্র কয়েকদিন আগে তার হাতে এসেছিল। সেই টাকা টিনা তার ভালোবাসার মানুষ কমলকে দিতে চায়। কিন্তু দেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হল, না, তাকে মেরে ফেলা হল?...এমন কি কেউ আছে, যে চায় না ওই টাকা অন্য কেউ পাক? টু বি প্রাইজ, কে লাভবান হচ্ছে টিনার মৃত্যুতে?'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুবর্ণরেখা। টিক-টিক করে সেকেন্ডগুলো কাটছে, কারও মুখে কথা নেই। এমন সময় তপতী মিত্র খুব আস্তে-আস্তে বললেন, 'টাকাগুলো দাবি করতে পারে, আইনত সে ব্যক্তি একজন আছে। টিনার মা।...আপনি কি বলবেন, আমি মেরেছি আমার মেয়েকে?'

গম্ভীর গলায় সুবর্ণরেখা বললেন, 'রেয়ারেস্ট ক্রাইম, কিন্তু ইমপসিবল নয়। বাবা-মা'র

BanglaBook.org

হাতে সন্তানের হত্যার নজির ইতিহাস ঘাঁটলে...।'

আচমকা উঠে দাঁড়ালেন বিনোদ শাসমল। 'অফিসার, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? একজন হার্ট পেশেন্ট, তার ওপর বিরিভিং মাদার—তার সম্বন্ধে আপনি...।'

'বিরিভিং...মাদার...!'—একটু কেটে-কেটে, ঈষৎ রসিকতার সুরেই যেন বিনোদবাবুর শব্দপ্রয়োগের প্রশংসা করলেন ম্যাডাম, 'আপনার ইংরেজি ভাষায় বেশ দখল আছে, তাই না মিস্টার শাসমল? লোকে বলে নরানাং মাতুলক্রমঃ...কিন্তু আপনার ভাগনি টিনা শুনেছি বেদম কাঁচা ছিল ওই সাবজেক্টে!'

প্রসঙ্গটা হঠাৎ ঘুলিয়ে যেতে একটু যেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ...কিন্তু হঠাৎ এসব কথা আবার...।'

'হঠাৎ নয়। খুবই প্রাসঙ্গিক কথা এগুলো, মিস্টার শাসমল! খুন হওয়ার দিন দুপুরে, কমলের সঙ্গে মোবাইলে তর্কাতর্কির মিনিট দশেক পরেই, টিনার মোবাইল থেকে একটা এস. এম. এস. যায় কমলের মোবাইলে। শুনে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, কারণ টিনা এস. এম. এস. করতে পছন্দ করত না...তা ছাড়া একটু আগে তো কথাই বলেছে সে! পরে কমলের মোবাইলে সেভ করে রাখা মেসেজটা দেখে আমি নিঃসন্দেহ হই। ইংরেজিতে তিরিশ পাওয়া কোনও ব্যক্তি ওই ইংরেজি ফ্রেম করতেই পারবে না! ...অর্থাৎ টিনার মোবাইল থেকে ওই এস. এম. এস. গিয়েছিল—কিন্তু পাঠিয়েছিল অন্য লোক।'

'ক্-কী বোঝাতে চাইছেন?' প্রাথমিক বিহ্বলতাটা কাটিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন বিনোদ শাসমল।

'সেটা আপনি ইতিমধ্যেই চমৎকারভাবে বুঝে গেছেন। টিনার সাময়িক অনুপস্থিতিতে ওই এস. এম. এস.-টি পাঠিয়েছেন হয় টিনার মা...নয়তো আপনি। এবং আজ সর্বপ্রথমেই আমি যাচাই করে দেখে নিয়েছি, তপতীদেবী মোবাইল ব্যবহার করতে জানেন না!'

নিজেকে সামলে নিয়েছেন বিনোদ শাসমল। বেশ আত্মবিশ্বাসী একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'অতএব রইল বাকি এক। হাঃ হাঃ! আমি খামোখা টিনার লাভারকে মেসেজ পাঠাব কেন—আমার কি মাথা খারাপ হয়েছিল ওই দশ মিনিটের মধ্যে?'

'দশ মিনিট নয়, আজ চার বছর ধরে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে আছে...' ইস্পাত কঠিন গলাটা যেন ঝনঝনিয়ে উঠল, ডান হাতের তর্জনী ইঙ্গিত করে বললেন সবুর্ণরেখা, 'লোভ! কয়েক লক্ষ টাকার লোভ আপনাকে উন্মাদ করে রেখেছিল, নাহলে এত ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে নিজের দিদির একমাত্র সন্তানকে...।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে তপতী মিত্র ছটফটিয়ে উঠলেন। ডাক্তার অনিমেষ রেডি ছিলেন, ছোট্ট একটা ট্যাবলেট পুরে দিলেন জিভের তলায়, বললেন, 'ভয় নেই, কুল ডাউন!'

বিনোদ শাসমল ফুঁসে উঠলেন এবার। 'দেখছেন আপনাদের পাগলামির ফলে আমার দিদি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? আমরা এক্ষুনি চলে যাব এখান থেকে। আপনাদের এই ফার্স দেখার আগ্রহ নেই আমার!'

'সিট ডাউন অ্যান্ড ডোন্ট মুভ!' —গর্জে উঠলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা (অনেকদিন পর আবার সেই হিম কণ্ঠস্বর!)—'চাইলেই কি যাওয়া যায়, মিস্টার শাসমল? আগে যে গল্পটা পুরো শুনতে হবে!'

'কী গ্রাউন্ড আছে আপনার, আমাকে ইনক্রিমিনেট করার?' বিনোদ তবু নুইতে রাজি নন।

'শুনুনই না পুরোটা, তারপর নিজেই ঠিক করবেন!' গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে ম্যাডাম শুরু করলেন, 'এ-গল্পের শুরু টিনার বাবাকে দিয়ে। ভদ্রলোক কোনও এক তীব্র অভিমানে সুইসাইড করেন, সমস্ত টাকাপয়সা মেয়ের নামে উইল করে দিয়ে। পাছে এ-টাকা অন্য কেউ হাতিয়ে নেয়—

BanglaBook.org

সন্দেহটা অবশ্য তপতীদেবীকেই করেছিলেন ভদ্রলোক—উইলে শর্ত দিয়ে যান, আঠেরো বছরে পৌঁছোনোর আগে যদি টিনার মৃত্যু হয়, টাকা চলে যাবে ভারত সেবাশ্রমে। টিনা অবশ্য নির্বিবাদেই আঠেরোয় পৌঁছল, কিন্তু সে বা তার মা জানত না, এই টাকার ওপর রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিনোদবাবু এই টাকাটাকে টার্গেট করে আছেন। তাঁর মতলব ছিল ভাগনির হাতে টাকা এসে পড়ার পর ভুলিয়ে-ভালিয়ে আস্তে-আস্তে সেটা গ্রাস করবেন। কিন্তু খেয়ালি টিনা হঠাৎই ঠিক করে, পুরো টাকাটা সে তার প্রেমিককে দিয়ে দেবে। আচমকা প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রমে বিনোদবাবু মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, আপাতত টিনাকে সরিয়ে দিয়ে টাকা বেহাত হওয়াটা রুখবেন। হার্ট পেশেন্ট দিদির ব্যবস্থা পরে ভেবে দেখলেও চলবে। এবং চমৎকার সুযোগও মিলে গেল। শুনতে পেলেন মোবাইলে তর্কাতর্কি চলছে—টিনা বলছে, সাড়ে পাঁচটার পর এক মিনিটও সে অপেক্ষা করবে না, চলে আসবে 'মঙ্গলম' বিল্ডিং থেকে।...বিনোদবাবু একটু পরেই ফাঁক পেলেন। টিনা ঘরে ছিল না—তার মোবাইলটা থেকে কমলকে এস. এম. এস. করলেন, পৌনে ছ'টায় এসো। মানে পরিষ্কার পনেরো মিনিটের একটা গ্যাপ তৈরি করে নিলেন।'

'বাঃ, বেড়ে কল্পনাশক্তি! রহস্য উপন্যাস লিখুন না, হটকেক হয়ে যাবে...' বিনোদ শাসমলের ঠান্ডা প্রতিক্রিয়া দেখে চমকে উঠলুম আমি। লোকটার নার্ভ আছে বটে!

'উপন্যাসের উপসংহারটা আগে শুনুন, তারপর হাততালি দেবেন।' ম্যাডাম ততোধিক হিমশীতল, 'সাড়ে পাঁচটার টাইম মেনটেন করবে বলেই টিনা বাড়ি থেকে বেরোয়। তার মিনিট দু-তিন পরেই, আপনিও তার পিছু নেন। পথের মধ্যে কোনও সুবিধেমতো নির্জন জায়গায় আপনি একটা ছদ্মবেশ পরে নেন, মহিলার পোশাক।...ওইখানটাতেই আপনার মাস্টার স্ট্রোক! আমি প্রথমে লম্বা মহিলার খোঁজে নেমে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ খেয়াল হল, লম্বা মহিলার হাইট ইজ ইকুয়্যাল টু মাঝারি উচ্চতার পুরুষ! আপনার হাইট কত বিনোদবাবু? সাড়ে পাঁচ এর মতন, তাই না?'

'তাতেই প্রমাণ হল আমিই খুনি? সাড়ে পাঁচ হাইটের পুরুষ দুনিয়ায় কত কোটি আছে জানেন?'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু উপন্যাস এখনও শেষ হয়নি যে। ছদ্মবেশ পরে, টিনার দু-মিনিট পরেই আপনি বিল্ডিংয়ের ওপরে উঠে যান এবং অতর্কিতে তার শ্বাসরোধ করে, নিঃশব্দে পিছনদিকের পরিত্যক্ত ঝোপঝাড় জঙ্গলে ফেলে দেন। বাঁ-হাতটির ব্যবহারও পরিকল্পনামাফিকই করেন, যাতে কমল ফেঁসে যায়; আপনি জানতেন আপনার ভাগনির প্রেমিকটি ন্যাটা। আর ছদ্মবেশের পোশাকটির জন্যেও আপনাকে খুব একটা মাথার ঘাম ফেলতে হয়নি। আপনার লন্ড্রিতে ওরকম বিস্তর জিনিস কাচতে দেয় লোকে...।'

'ডাহা মিথ্যে কথা!'—চিৎকার করে প্রতিবাদ করলেন বিনোদ, 'আজ পর্যন্ত একটা বোরখাও কাচতে দেয়নি কেউ আমার লন্ড্রিতে...।'

কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সুবর্ণরেখা স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত হাসি! যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি যেন।

'তাহলে ভুলটা শুধরেই দিলেন, বিনোদবাবু! এবার তবে বোরখাটা কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন সেটাও আপনিই বলুন।'

দাঁতে-দাঁত চেপে সম্ভবত নিজের নির্বুদ্ধিতাকেই একবার ধিক্কার দিলেন বিনোদ শাসমল। তারপর, ট্রেনারের চাবুকের সামনে বশীভূত বাঘের মতো, তাঁর মাথাটা নীচু হয়ে গেল। মুখ ঢাকলেন দু হাতে।

খেলাটা ততক্ষণে ধরে ফেলেছি আমি—বহু পুরোনো সাইকোলজিক্যাল ট্রিক, কিন্তু তুখোড়

BanglaBook.org

শয়তানও চকিতে ফেঁসে যায় এই ছোট্ট চালে। অপরাধের গল্পটা শোনাতে-শোনাতে ইচ্ছে করেই একটা-দুটো ভুল ডিটেল বলেন গোয়েন্দা। অপরাধী মুহূর্তের অসতর্কতায় প্রতিবাদ করে ভুল ধরিয়ে দিতে চায় এবং সেখানেই ধরা পড়ে সে। ব্যাপারটাকে এই দিকে টেনে আনবেন বলেই শ্রীমতী সুবর্ণরেখা এতক্ষণের মধ্যে একবারও 'বোরখা' কথাটা উচ্চারণ অবধি করেননি। 'ছদ্মবেশ' 'পোশাক'—এইসব টার্ম ব্যবহার করেছেন খুব সযত্নে। পোশাকটা যে বোরখাই সেটা বিনোদ শাসমলের জানার কথা নয়—যদি সে নিজে দোষী না হত!

'আমাদের কাজটা সহজ করে দিলেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার শাসমল...' সুবর্ণরেখার গলা আবার খুব স্বাভাবিক, প্রশান্ত শোনাচ্ছে, 'অ্যাকচুয়ালি দুটো পয়েন্টে আপনি ফেঁসেছেন। প্রথমটা আপনার নিজের ভুল—এস. এম. এস.-টাতে চোস্ত নিখুঁত ইংরেজি ব্যবহার করা। আর অন্যটা দৈবকৃত। টিনার হাতঘড়িটা যে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাতেই কমল বিশ্বাস আলটিমেটলি সন্দেহমুক্ত হতে পেরেছে। এই ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা নেহাতই নিয়তিনির্দিষ্ট। একে আপনি ভগবানের মারও বলতে পারেন—পাপ কর্মের শাস্তি-টাস্তি তিনিই দিয়ে থাকেন বলে শোনা যায় কিনা!'

একটু থেমে হাসলেন ম্যাডাম, 'আমি অবশ্য ভগবান-টগবান নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না। আসলে এগুলো এক-একটা কো-ইনসিডেন্স। অপরাধের দুনিয়ায় এইরকম কো-ইনসিডেন্সগুলো, কেন কে জানে, অপরাধীর এগেনস্টেই যায় বেশিরভাগ!'

বলতে-বলতে হঠাৎই কারেন্ট চলে এল। এতক্ষণে অস্পষ্ট আলো-আঁধারি কেটে গিয়ে উজ্জ্বলতায় ভরে গেল সারা ঘর।

আমি ভাবছিলুম, রহস্য উদঘাটনের মুহূর্তেই এই যে আলোর ফিরে আসা, এটাও কি একটা আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স নয়!

শ্রীমতী সুবর্ণরেখা সেন, সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর—বোধহয় আমার মনের কথা পড়তে পারলেন। সেই ঝকঝকে হাসিটা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—এটাও!'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG